লেখ-সূচী

চিত্রসূচী

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

বেরোতে হবে ? চুল শুকিয়েছে তো ?
ভিজে চুল বাঁধা আর চুলের সর্বনাশ ডেকে আনা একই ব্যাপার। ভুলেও কখনও ভিজে চুল বাঁধবেন না কারণ ভিজে চুল বাঁধলে চুলের সৌন্দর্য আর সাবলীলতা দুই-ই নষ্ট হয়ে যায়। যদি মনে করেন যে আপনার চুল শুকোবার আগেই আপনাকে বেরোতে হবে তবে ভাল করে জবাকুসুম তেল দিয়ে চুলের গোড়াগুলিতে মালিশ করুন, তারপর পরিষ্কার করে আঁচড়ে চুল বেঁধে ফেলুন। জবাকুসুম তেল চুলের একটি মস্ত বড় খাদ্য আর এ তেল মেখে জল না ঢাললে কোন ক্ষতি হয়না। এর চমৎকার সুগন্ধ আপনার মন নিশ্চয়ই স্নিগ্ধ আনন্দে ভরিয়ে দেবে। জবাকুসুমের অপূর্ব ভেষজ-গুণাবলী মাথা ও স্নায়ু স্নিগ্ধ করে।
জবাকুসুম
সি, কে, সেন এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
কলিকাতা-১২

ভারতবর্ষ

মাসিক পত্রিকার

= সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্তি উৎসব =

গত ৯ঠা আষাঢ় "মহাজাতি সদন"-এ এক উৎসব মুখর পরিবেশে "ভারতবর্ষ" পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্তি উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট নেতা, গুণীজন ও সাহিত্যিকগণের সমাবেশে এবং সঙ্গীত, আবৃত্তি, হাস্যকৌতুক, নৃত্যানুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি স্মরণীয় হয়ে উঠেছিল।

এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোক কুমার সরকার।

এই উৎসব অনুষ্ঠানের চিত্রসম্বলিত বিবরণী মুদ্রিত করা হল পাঠক-পাঠিকা ও অনুরাগীদের আনন্দ দানের জন্য।
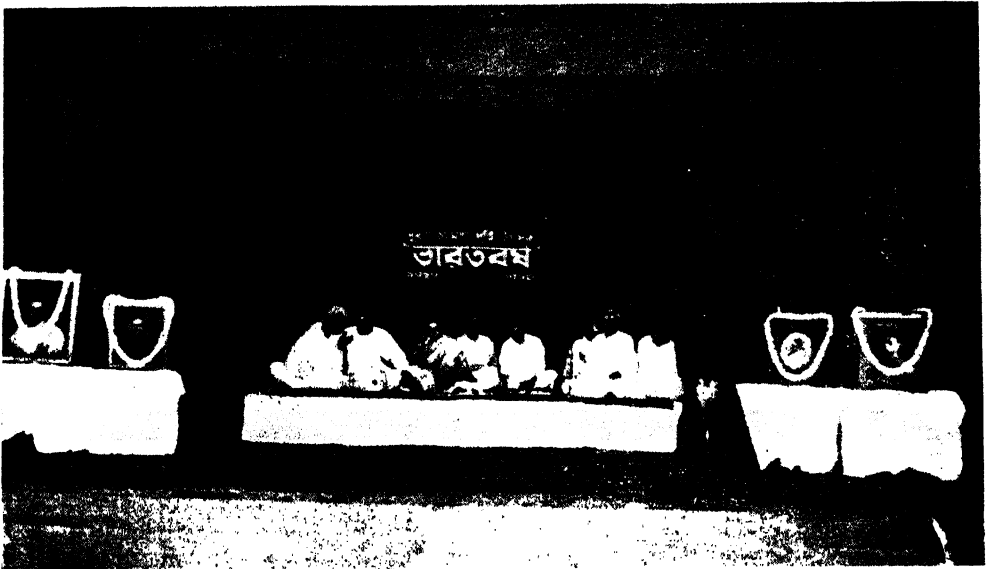
মহাজাতি সদনের উৎসব মঞ্চে সমবেত সুধীগণ

'ভারতবর্ষ' সম্পাদক শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় অতিথিবৃন্দের উদ্দেশে স্বাগত ভাষণ দিচ্ছেন।

'ভারতবর্ষ' সম্পাদক শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন—

বাংলার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের শ্রদ্ধেয় সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ, আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার, শ্রদ্ধেয় গুণীজন ও সাহিত্যিকবৃন্দ এবং সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,—'ভারতবর্ষ' পত্রিকার পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

আমাদের আহ্বানে আপনারা আজ এখানে সমবেত হয়ে শুধু আমাদেরই সম্মানিত করেন নি ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি, বাঙ্গালীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি, তথা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির পরিচয়ই প্রদান করেছেন। বাংলা ভাষা ভারতের জাতীয় সম্পদ, বাংলা সাহিত্য বাঙ্গালীর গর্ব্ব ও আশা স্থল। তাই কবি গেয়ে গেছেন—"মোদের গরব, মোদের আশা—আমাদের এই বাংলা ভাষা।" আর সেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরই পঞ্চাশ বৎসরের এক ইতিহাসকে যেন স্মরণ করতেই আমরা আজ এখানে মিলিত হয়েছি।

আজ যে পত্রিকার এই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে আপনারা এখানে সমবেত হয়েছেন ১৩২০ সালের সম্ভবতঃ এই রকমই এক বর্ষণক্লান্ত 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' স্বদেশ মন্ত্রের ঋষি দ্বিজেন্দ্রলালের বাণী ও অমর সঙ্গীত 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি ভারতবর্ষ'-কে বক্ষে নিয়ে তার প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল। সেই দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত 'ভারতবর্ষ' শুধু সৎ-সাহিত্য সৃষ্টিই করে আসে নি,—সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে দেশবাসীকে স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করবার, নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করবার, এবং নূতন শক্তিশালী লেখক সৃষ্টি করবার মহান ব্রতও পরম নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্‌যাপন করে এসেছে। শরৎচন্দ্রের কাহিনী ধারায় পরিপুষ্ট হয়ে এবং অতীত ও বর্ত্তমানের প্রায় সব দিকপাল সাহিত্যরথীদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে 'ভারতবর্ষ' ৫০ বৎসর অতিক্রম করল। বয়সের গাম্ভীর্য্যে ও অভিজ্ঞতায় সে আজ প্রবীণ, কিন্তু যখন সে নবীন ছিল তখনও চপলতায়, অর্ব্বাচীনতায়, বাচালতায় সে নিকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করে সাহিত্য রসিকদের বিরক্তি উৎপাদন করেনি—আজও করে না এবং ভবিষ্যতে নিজে তো করবেই না, অপরকেও করতে উৎসাহিত করবে না। তার এই আভিজাত্য, তার এই স্বাতন্ত্র, তার এই নিষ্ঠা বজায় রাখতে অবশ্যই তাকে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে—বহু প্রলোভনও তার

সামনে এসেছে ; কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শ-পুষ্ট, গুরুদাস, প্রমথনাথ, জলধর, অমূল্যচরণ, হরিদাস, সুধাংশুশেখরের নিষ্ঠায় সুপ্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' তার লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়নি। তবে যুগধর্মকেও সে অস্বীকার করেনি এবং কালের গতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতেও সে দ্বিধা করেনি বলেই নব নব ভাবধারায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতে আরও নতুনত্বের সমাবেশ ঘটিয়ে নবকলেবরে প্রকাশ পাবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

আজ যাঁরা রাষ্ট্রের কর্ণধার ও জননায়ক, সাহিত্যসেবী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক এবং সাধারণ পাঠক-পাঠিকা তাঁদের সকলকে আমি আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি ও অনুরোধ করছি সমগ্র দেশের কল্যাণের নামে, সমগ্র জাতির স্বাদেশিকতার নামে এবং জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষের নামে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে যেন আমাদের অতীতের মত চিরকালই উৎসাহিত করেন।

* * *

উৎসবের উদ্বোধক আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন। তাঁর বাম পার্শ্বে ডঃ কালিদাস নাগকে দেখা যাচ্ছে এবং অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীনরেন্দ্র দেব, মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅতুল্য ঘোষ

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শ্রীঅশোককুমার সরকার বলেন—'বঙ্গদর্শন,' 'সাধনা,' 'মানসী ও মর্মবাণী,' 'বিচিত্রা' কত পত্রিকার জন্ম হয়েছে, কিন্তু কোনটাই টেঁকে নাই। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত যে ক'টি মুষ্টিমেয় পত্রিকা আজও টিঁকিয়া আছে, তাহার মধ্যে 'ভারতবর্ষ' অন্যতম।

শ্রীসরকার বলেন, কৃষ্টির প্রধান অঙ্গ জ্ঞানের বিষয় আলোচনা। সংবাদপত্র পাঠ এজন্য আবশ্যকীয়। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যে সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাস নেই। তাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে উপেন্দ্রনাথ অনেকেই উচ্চ ধরণের পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাহা টিকিয়া থাকে নাই।

শ্রীসরকার প্রসঙ্গত তামিল, তেলেগু, মালায়লম্ প্রভৃতি ভাষায় প্রচারিত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার প্রচার সংখ্যার সহিত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এই ধরণের পত্র-পত্রিকাগুলির তুলনা করে দেখান, প্রচারের দিক থেকে বাংলা সাপ্তাহিক ও মাসিক এখনও পিছনে পড়ে আছে। শ্রীসরকার বলেন, তামিল ভাষায় তি-টি বড় সাপ্তাহিক আছে। তাহার মধ্যে একটির প্রচার ২ লক্ষ ৬২ হাজার। তেলেগু সাপ্তাহিকের সর্বোচ্চ প্রচার ১ লক্ষ ৮ হাজার। মালায়লম্ ভাষায় সর্বোচ্চ প্রচারিত পত্রিকার সংখ্যা ১ লক্ষ ৯৬ হাজার।

শ্রীসরকার তাঁহার ভাষণের প্রারম্ভে বলেন: 'ভারতবর্ষ'র প্রথম দিককার সম্পাদক অমূল্যচরণ বিদ্যারত্ন, জলধর সেন প্রমুখ ব্যক্তিরা আমার স্বর্গত পিতার সুহৃদ্ ছিলেন। তাই ভারতবর্ষের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে উপস্থিত হওয়াটাকে আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। ৫০ বৎসর ধরে একটি পত্রিকা চলার পিছনে একটি বড় তাৎপর্য আছে। সেই তাৎপর্যটুকু আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

শ্রীসরকার বলেন, জনসাধারণের মধ্যে যদি পত্রপত্রিকা ক্রয়ের আগ্রহ না থাকে, তা হলে কি করে পত্রিকাগুলি চলবে? তিনি বলেন, অবশ্য এ বিষয়ে প্রকাশকদেরও দায়িত্ব রয়েছে। মুদ্রন পারিপাট্যের জন্য ভাল যন্ত্রপাতি চাই, ভাল ছাপাখানা চাই, ভাল কাগজ চাই। কিন্তু অধুনা এইসব পাওয়ার পথে কিছু প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে। তিনি আশা করেন, সরকার এই অসুবিধাগুলি দূর করবেন।

* * *

উৎসবের প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ বক্তৃতা করছেন। মঞ্চোপরি উপবিষ্ট রয়েছেন (বাম দিক থেকে)—শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্র দেব, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (দণ্ডায়মান), শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, কবি শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, কবি শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, গায়ক সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় (দণ্ডায়মান) ও ডঃ কালিদাস নাগ

প্রধান অতিথি শ্রীঅতুল্য ঘোষ তাঁহার ভাষণে অতীত দিনের স্মৃতিকথার রোমন্থন করিয়া বলেন,—ভারতবর্ষ যখন প্রথম বাহির হয়, তখন তাঁহার বয়স দশ। দ্বিজেন্দ্রলালের গান তখন খুব জনপ্রিয় ছিল। সেই বহুখ্যাত দ্বিজেন্দ্রলাল একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার ভার নেবেন, এ যেন সেদিন দুর্লভ ঘটনা বলে মনে হয়েছিল। তিনি বলেন সে যুগে 'ভারতবর্ষ'-তে সাময়িক বিষয়ের উপর যে রসরচনা বের হত, তা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। তিনি আশা করেন, রাজনীতি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'ভারতবর্ষ' বাঙালীর মনের খোরাক জোগাতে পারবে।

* * *

সভাপতির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন,—পঞ্চাশ বৎসর ধরে 'ভারতবর্ষ' যেভাবে সাহিত্যের সেবা করে আসছে, তাতে দেশ কৃতজ্ঞ। এই পত্রিকার পিছনে 'আদর্শ' ছিল বলেই ইহা টিঁকিয়া আছে। শ্রীসেন বলেন.

উৎসবের সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন। মঞ্চোপরি দেখা যাচ্ছে (বাম দিক থেকে)—শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় (দণ্ডায়মান), শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীঅশোককুমার সরকার ও ডঃ কালিদাস নাগ

বাংলা সাহিত্যের যাহাতে পুষ্টি হয়, সে-জন্য 'ভারতবর্ষ' প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

শ্রীঘোষ আরও বলেন: আজ পত্রপত্রিকাগুলির সুর পাল্‌টিয়ে গেছে। আজ পত্রপত্রিকার প্রধান সুর

বাংলা সাময়িকপত্রের প্রচার সংখ্যা যে অন্যান্য ভাষার সাময়িক পত্রিকার প্রচারসংখ্যার কম, এই তথ্য তাঁহার জানা ছিল না। তিনি 'ভারতবর্ষ'-র দীর্ঘজীবন কামনা করেন।

* * *

বক্তৃতা করছেন শ্রীনরেন্দ্র দেব। পার্শ্বে উপবিষ্ট রয়েছেন শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়।

শ্রীনরেন্দ্র দেব বলেন—

আমরা আজ এখানে এসেছি একটি বিশেষ আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিতে। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার আজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্তির স্বর্ণ-জয়ন্তী উৎসব। যাঁরা এসেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই পত্রিকাখানিকে ভালবাসেন। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙালী পাঠক সমাজকে এই পত্রিকাখানি সাহিত্যের নানা অর্ঘ সাজিয়ে এনে পরিতৃপ্ত করেছেন।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার এই পঞ্চাশোর্ধ দিবসে কাগজখানি সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমাদের কথাই বলতে হবে। কারণ এই পত্রিকার পরিকল্পনা ও প্রকাশ লগ্ন থেকে আমি এই কাগজ খানির সত্তাধিকারীদের অনুরাগী হিতৈষী বন্ধু এবং নিয়মিত লেখক হিসেবে আজও সংশ্লিষ্ট আছি। একথা আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবো যে সাহিত্য ক্ষেত্রে যদি কিছু প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকি সে পেয়েছি ভারতবর্ষ পত্রিকারই মাধ্যমে।

এই পত্রিকার জন্ম-ইতিহাস বিচিত্র। পঞ্চাশ বছর আগে বাংলা দেশে আরও অনেক পত্র পত্রিকার মধ্যে 'প্রবাসী'ই ছিল অগ্রগণ্য। স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুসম্পাদনার গুণে এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে খ্যাতনামা লেখকগণের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে 'প্রবাসী' প্রতিমাসের পয়লা তারিখে নিয়মিত প্রকাশিত হতো। পত্রিকাখানি উচ্চশ্রেণীর এবং বিদগ্ধ জনের খুবই প্রিয় ছিল।

প্রসিদ্ধ পুস্তকপ্রকাশক ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর সহপাঠী ৺প্রমথনাথ ভট্টাচার্য এই দুই বন্ধুর মনে হঠাৎ এই কল্পনা দেখা দিল যে প্রবাসীর চেয়ে বড়ো একখানি বহু চিত্র-শোভিত ও উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ মাসিকপত্র প্রকাশ করতে পারলে তার ভবিষ্যৎ সাফল্যের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তখন নন্দকুমার চৌধুরী লেনে তাঁর নূতন বাড়ী 'সুরধামে' থাকতেন। 'ইভনিংক্লাব' নামে আমাদের একটি প্রতিষ্ঠান ছিল. প্রমথনাথ ছিলেন সেই ক্লাবের প্রধান সচিব এবং দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সভাপতি। আর হরিদাসবাবু ছিলেন সেই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সদাহাস্য-মুখ সদানন্দময় পুরুষ। আমাদের সঙ্গে তিনি সমবয়সী বন্ধুর মতো প্রাণ খুলে মিশতেন। তাঁর কাছে যাওয়া হল পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব নিয়ে এবং তাঁকেই ধরা হল সম্পাদনার ভার নেবার জন্য। তিনি প্রথমে সম্মত হননি। পরে সকলের নির্বন্ধাতিশয্যে রাজী হলেন এই সর্তে যে—তাঁকে একজন সুযোগ্য সহকারী দিতে হবে ও একছত্র লেখাও তাঁর অনুমোদন ব্যতীত পত্রিকায় প্রকাশ করা হবেনা।

দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ত নতশিরেই মেনে নিয়ে খুশী হয়ে আসা গেল বটে, কিন্তু ভয় ছিল সকলেরই যে 'প্রবাসী'র মতো একখানি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নূতন কাগজ কি দাঁড়াতে পারবে? কিন্তু প্রমথবাবুর ছিল অদম্য উৎসাহ ও সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস। তিনি বেশ জোরের সঙ্গে টেবিল চাপড়ে বললেন, আলবৎ দাঁড়াবে। কাগজ চলে তিন চাকায়। ভাল লেখা, ভাল ছাপা, আর ভাল প্রচার। অবশ্য, ইঞ্জিনে যথেষ্ট কয়লা থাকা চাই। অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করলে চলবেনা।

শুরু হয়ে গেল তোড়জোড়। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেও খুব উৎসাহী হয়ে উঠলেন। পত্রিকার নাম দিলেন 'ভারতবর্ষ'। লিখে ফেললেন একটি সম্পাদকীয় 'সূচনা' এবং মুখপত্রের জন্য রচনা করে দিলেন একটি 'ভারতবর্ষ' স্তুতিগান: "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী

ভারতবর্ষ।" এদিকে প্রমথনাথ ও হরিদাসবাবুতে মিলে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা কেমন হবে, পত্রিকায় কি কি বিষয় থাকবে, কেমন ধরণের ছবি ছাপা হবে এবং কারা কারা এ পত্রিকায় নিয়মিত লিখবেন—তার একটি সংক্ষিপ্ত ও সচিত্র বিবরণ সম্বলিত পরিচয়পত্রিকা মুদ্রিত করে দেশময় ছড়িয়ে দিলেন।

বাংলা দেশে একটা সাড়া পড়ে গেল। 'প্রবাসী' পত্রিকার বার্ষিক চাঁদা তখন তিন টাকা মাত্র। প্রমথনাথ 'ভারতবর্ষের বার্ষিক চাঁদা ঘোষণা করেছিলেন প্রবাসীর দ্বিগুণ। হরিদাসবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। তবেই হয়েছে! কে নেবে অতটাকা দিয়ে তোমার কাগজ? প্রমথনাথ অভয় দিয়ে বললেন, সবাই নেবে। তুমি দেখো। প্রবাসীর চেয়ে ভাল ও বড় কাগজ অসংখ্য ছবি দিয়ে বার করতে হলে ওর চেয়ে কম মূল্যে দেওয়া যাবেনা।

তাঁরা আজ জীবিত নেই। থাকলে দেখে যেতে পারতেন যে বাংলা মাসিকপত্রের বার্ষিক চাঁদা এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বারো টাকা থেকে পনেরো টাকা পর্যন্ত উঠেছে।

'ভারতবর্ষ' প্রকাশের সব আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে দ্বিজেন্দ্রলাল ইহলোক ত্যাগ করলেন। হরিদাসবাবুর চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। কিন্তু প্রমথবাবু বিচলিত হলেও হতাশ হয়ে পড়লেন না। তিনি বললেন, রাজা বিনা রাজ্য আটকায় না। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে ঘোষণা মতো 'ভারতবর্ষ' বেরুবেই।

ছাপা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ নিযুক্ত হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের সহকারী রূপে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের শূন্যস্থান পূর্ণ করবে কে? ৺জলধর সেন মহাশয়ের তখন সাহিত্য ক্ষেত্রে খুব নাম-ডাক। তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয় সকলের 'দাদা'। তাঁকেই এনে ভারতবর্ষের সম্পাদক করা হল। অমূল্যবাবু সহকারীই রইলেন। পরে অবশ্য তিনি ভারতবর্ষ পত্রিকার সংশ্রব ছেড়ে নিজেই 'সংকল্প' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেছিলেন। এই সময় জলধর-দাদার সহকারী রূপে এসেছিলেন স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি-এল। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান। ১লা আষাঢ় যথা কালে ভারতবর্ষ প্রকাশিত হল। প্রমথবাবুর ভবিষৎ-বাণীই সত্য হল। বার্ষিক ৬ টাকা চাঁদা করা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের গ্রাহক সংখ্যা আশাতীত উর্ধ্বে উঠে গেল। বাংলা দেশে এমন কোনো যশস্বী লেখক ছিলেন না, যিনি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার জন্য কলম ধরেন নি। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা কয়েকটি বিশেষত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছিল। যেমন, হরিদাসবাবুর কনিষ্ঠ সোদর সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় নিয়মিত খেলা-ধূলার বিভাগ সম্পাদনা করতেন। সিনেমা ও নাট্যাভিনয়ের সচিত্র বিবরণ অবশ্য থাকতো না। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা প্রতিমাসে 'ভারতবর্ষ'র এক অমূল্য সম্পদ ছিল।

শরৎচন্দ্রের 'ভারতবর্ষ'-তে যোগদান এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী। সবিস্তারে বলবার সময় নেই। শরৎচন্দ্রের গল্পগুলি 'ভারতবর্ষ'-তে প্রকাশের কিছু আগে থেকেই 'যমুনা' মাসিকপত্রে ছাপা শুরু হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন জীবিত। 'রামের সুমতি' গল্পটি পড়ে তিনি এতই মুগ্ধ হ'য়ে পড়লেন যে হরিদাসবাবু ও প্রমথবাবুকে আদেশ করলেন—ভারতবর্ষের জন্য এঁর লেখা সংগ্রহ করতেই হবে। শরৎচন্দ্র ছিলেন প্রমথনাথের বন্ধু। তিনি ব্রহ্মপ্রবাসী। প্রমথনাথের অনুরোধে তিনি পাঠিয়ে দিলেন 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের অর্ধাংশ। দ্বিজেন্দ্রলাল পড়ে বললেন—অদ্ভুত শক্তিশালী লেখক। চমৎকার শুরু করেছে লেখাটি। কিন্তু এ উপন্যাস তিনি ভারতবর্ষে ছাপতে পারবেন না। মেসের একটা ঝী যে গল্পের নায়িকা সে লেখা দুর্নীতিমূলক। দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময় কাব্যে দুর্নীতি নিয়ে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য কাব্য 'চিত্রাঙ্গদা'কেও তিনি দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন।

অগত্যা প্রথমনাথকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই ফেরত পাঠাতে হল 'চরিত্রহীন'। কিন্তু তার পরিবর্তে আদায় করে ছাড়লেন শরৎচন্দ্রের 'বিরাজবৌ' উপন্যাসখানি। এর পর থেকে ভারতবর্ষে নিয়মিত প্রতিমাসে শরৎচন্দ্রের রচনা প্রকাশিত হ'তে লাগলো। প্রমথনাথের চেষ্টায় ও হরিদাসবাবুর বদান্যতায় তিনি বর্মামুলুক ছেড়ে বাংলা-দেশে ফিরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আজ তাঁরা কেউ নেই। সকলকে মনে পড়ে চোখে জল আসছে।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকা যে আদর্শ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে সেই ঐতিহ্য সে বজায় রেখেছে। কিন্তু বর্তমান যুগে সব কিছু দ্রুত পরিবর্তন হয়ে চলেছে।

সাহিত্যের একটা নব রূপান্তর ঘটেছে। ভাষায় নূতনত্ব এসেছে, বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হয়েছে। কবিতারও রূপ বদলে গেছে। সেই কালের উপযোগী হয়েই আমাদের চলতে হবে আজকের দিনে। নমস্কার।

* * *

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার উপর স্বরচিত কবিতা পাঠ করছেন শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষের প্রতি

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মাটির প্রদীপ হয়ে জন্ম নিয়েছিলে
বাংলা মায়ের মাটির ঘরে;
স্নিগ্ধ শান্ত অনুদ্ধত তার শিখা,
দেবতার মন্দিরে বিনম্র নিবেদন।
"দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার,
আমার দেশ।"
এই মন্ত্র নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলে তুমি
'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে॥'
সেদিন বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ মেঘে মেঘে
ভাবী কালের প্রচণ্ড আবেগে স্পন্দিত
কোথাও উঠেছিল ঝড়,
কোথাও বা আসন্ন বর্ষণের প্রস্তুতি
বেগবতী ভাগীরথীর স্তিমিত তরঙ্গে
গতি-চাঞ্চল্যের অলহিন্দু উচ্ছ্বাস—
"হায় পথবাসী, হায় গতিহীন
হায় গৃহহারা।"

তবু সেই রুদ্ধশ্বাস আর্তবেদনায়
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে তুমি ছিলে স্থির জ্যোতি;
গৃহে গৃহে নিরন্ধ্র অন্ধকারে ছিল
ভীরু শিখার ক্ষীণ আলোক,
তবু তুমি সেই শিখায় জ্বালাতে চেয়েছিলে
মাটির ঘরে মাটির প্রদীপ,—
সে চাওয়া তোমার বিফলে যায় নি।

অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আর প্রদীপ শিখা
উত্তেজনা ও শক্তিতে তাদের প্রভেদ;
ঘরের অন্ধকার দূর হয় না স্ফুলিঙ্গে
তার আয়োজন স্বল্প,
প্রয়োজনও তার সামান্য।
প্রদীপের আয়োজন অনেক:
তার আধার নির্মাণ করে শিল্পী
শলিতা পাকায় গৃহস্থ বধূ,
তেল জোগাতে হয় গৃহস্থকে,—
সমস্ত প্রস্তুতির পরে ধীরে ধীরে
জ্ব'লে ওঠে যে প্রদীপটি
তাতেই দূর হয় ঘরের অন্ধকার—
স্ফুলিঙ্গে ঘরে আগুন লাগ্‌তে পারে
কিন্তু তাতে দূর হয় না ঘরের অন্ধকার।
—এতো আলোক-তপস্বী মহাকবির কথা।
তাই তুমি নিয়েছিলে
ঘরের অন্ধকার দূর করবার ব্রত।

তবু ডাক এসেছে আজ নূতন কালের
ঘরে ঘরে মানুষের উদ্বিগ্ন জীবনে;
তুমিও আজ নূতন হয়ে দেখা দাও ভারতবর্ষ,
সার্থকনামা হও ভারতের নূতন সাধনায়।
প্রদীপ জ্বালিয়েছ বঙ্গ-বাণীর মন্দিরে
উজ্জ্বল হয়ে থাক তার অনির্বাণ শিখা;
আজ জ্বালাও তোমার প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে
হোমানলের সহস্র শিখা।
প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নির অক্ষরে
লিখে যাও তুমি
নূতন সাধনার নবতম ইতিহাস,
অন্যায়ের প্রতিরোধে জাগাও কঠোর সংকল্প;
যে সংকল্পে অস্থির হয়ে আছে
দিগন্ত আচ্ছন্ন করা ঝড়ের সংকেত,
চোখে চোখে দৃপ্ত বিক্ষোভের চরম জিজ্ঞাসা।
সে জিজ্ঞাসার উত্তর দাও 'ভারতবর্ষ';
তোমার অন্তর দাহের প্রচণ্ড উত্তাপে

বিগলিত তুষার স্রোতে
ভেসে যাক পররাজ্য লোভীর দুরন্ত অভিযান
ভেসে যাক আত্মঘাতী দেশ-বৈরিতা।

* * *

হে ভারত, তোমার সভায়
একমাত্র প্রার্থনা মোদের
সে প্রার্থনা কণ্ঠে কণ্ঠে হোক উচ্চকিত:
স্বেচ্ছাচারে অহঙ্কৃত, অবিনয়ে উদ্ধত মস্তক
অবনত করে দাও ন্যায়-দণ্ডাঘাতে।
বাণী তব কোষমুক্ত খড়্গ সম যেন
জ্বলে ওঠে সূর্যের আলোকে;
তীক্ষ্ণতায় দুর্বার নিষ্ঠুর
যে অস্ত্র অব্যর্থ হয় নির্ভুল নিক্ষেপে,
সে অস্ত্রের সাধনায় ক্ষত্রিয় ভারত
ব্রাহ্মণের দৃপ্ত তেজে জ্বলে জ্বলে ওঠে।
জ্বলে ওঠো অন্ধকার সীমান্তের পথে,
অত্যুচ্চ পর্বত শীর্ষে
গুপ্ত গুহা দুর্ভেদ্য শিবিরে।
সুখসুপ্ত জীবনের অনায়াস গতির ভঙ্গিতে
তাল ভঙ্গ করে দাও,
ছিন্ন ভিন্ন করে দাও চক্রান্ত বৈরীর।
"সংকটের বিহ্বলতা" আত্ম-প্রবঞ্চনা
নিঃশেষ করিয়া দাও প্রবল বিশ্বাসে।
দিও তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী বীর্যের সন্ধান;
নীলকণ্ঠ এ জাতির তিক্ত হলাহলে
আনো তুমি হে ভারত,
আনো আনো অমৃতের দুর্লভ আস্বাদ।

***

ভারতবর্ষ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পুণ্য পরিক্রমা তব সগৌরবে স্বর্ণ-সরণীতে
পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ত্তি পরে, কীর্ত্তি লয়ে ধরণীতে,
নব নব বন্দনার গীতি স্রোতে হর্ষে অবগাহি।
পুরচারিকার সম দিক্‌বধূ, পুষ্প অর্ঘ্য বাহী,
তোমারে অর্চ্চনা করে নিখিলের আতপত্র তলে
আনন্দের আলিম্পন দিয়া।

সারস্বত যাত্রীদলে
তুমি দিলে অনাগত প্রভাতের আলোর সন্ধান;
মননের দরিদ্রতা হোতে সবে পেলো পরিত্রাণ
আনুকূল্যে তব। বঙ্গভারতীর ম্লানমুখে হাসি
ফুটায়েছ,—ছিল যারা উপেক্ষায় একদা উদাসী,
প্রতিভার সমাদর করে নাই আশা, পেলো তারা
বরমাল্য দাক্ষিণ্যে তোমার। তুমি তো করুণা ধারা

কবি শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 'ভারতবর্ষ'-র উদ্দেশ্যে
স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনাচ্ছেন।

করেছ বর্ষণ লতাতৃণগুল্মদলে, আজ তাই—
আপনার বিস্তারের পথ করি জনারণ্য মাঝে
পেয়েছে প্রাধান্য তারা, যেথা নানা বনস্পতি রাজে।

মহিমার শীর্ষে তব দ্বিজেন্দ্রের স্মৃতি দীপ ধরি
হরিদাস সুধাংশুর কল্পনার অঙ্গরাগ করি
শৈল আর রমেনের প্রদীপের সরোজের সনে
তুমি আজ অবিচ্ছিন্ন অন্তরের পুলক স্পন্দনে।
এরা তব সেবাব্রতী বীজ বুনে চলে অনুক্ষণ,
স্বদেশের মানসিক কেন্দ্রভূমি করি আকর্ষণ
শস্য সঞ্চয়ের তরে। আজ তারা সাফল্যের সাথে
তোমার অর্চ্চনা লাগি রচনার নানা মালা গাঁথে।

মানবের চিত্তাকাশে তুমি দিলে শরতের ভাতি
দূর করি তমোময় ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ দুর্যোগের রাতি।
তাই তুমি বন্দনীয় স্মরণীয় প্রণম্য সবার,
আষাঢ় সন্ধ্যায় মাগো নীরাজন করি যে তোমার।

জলধরে করেছ আহ্বান তৃষ্ণাদীর্ণ অনুর্ব্বর
মৃত্তিকায় সোনার ফসল তরে। প্রাণের প্রান্তর
করেছ শ্যামল, চিত্তচরে চলে বিহঙ্গের খেলা;
তোমারে করিয়া কেন্দ্র দিকে দিকে বিদগ্ধের মেলা
ঋতুদের আমন্ত্রণে।

তুমি দিলে সঙ্গীতের ভাষা

জনে জনে, জয় জয়ন্তীর সুরে সুরে ফোটে আশা
হৃদি-বৃন্ত'পরে। এজীবন আত্মার অমৃত গানে
অনন্তের প্রতিশ্রুতি চিন্তনের স্তরে স্তরে আনে
ভূমার ভিতরে এসে, তুমি তার দিলে অনুভূতি,
তাই আজ জয়ন্তীর বেদীতলে শুনি স্তবস্তুতি।

প্রথম জীবনে মোর তব অঙ্কে নিলে স্নেহ ভরে,
সেই কথা ভুলিবার নয়, কত কথা মনে পড়ে!
ফেলে-আসা দিনগুলি যাযাবর বিহঙ্গের সম
উড়ে গেছে সীমাহীন দূর পারাবারে। স্মৃতি মম
দেয় দোলা, বাঁশী মোর ভরে ওঠে তোমার সঙ্গীতে,
তোমার করুণা লভি কত যাত্রী পেরেছে লঙ্ঘিতে
কত গিরিসঙ্কটেরে, দুর্লভের স্পর্শ পেয়ে তারা
গাঢ় তমো রাত্রি শেষে তীর্থ পীঠে হোলো আত্মহারা।
প্রাণের সৈকতে প্রকৃতির প্রণামের অনুষ্ঠান,
তোমার আতিথ্যে ভরা, দিকে দিকে ওঠে জয় গান।

ভাবনা নিবিড় যুগে সবাকার অকথিত বাণী
শুনাও ভারতবর্ষ অসত্যের বক্ষে বজ্র হানি
সত্য শিব সুন্দরের অর্চ্চনায় জাগাও স্বদেশ,
অভয় ভৈরবরবে দূর কর দুঃখ দ্বন্দ্বদ্বেষ!
অগ্নিমন্ত্র পান্থ মোরা জয়ন্তীর জ্বালি দীপারতি,
উল্লাস উৎসবে দেবি লহ মোর প্রাণের প্রণতি।

—
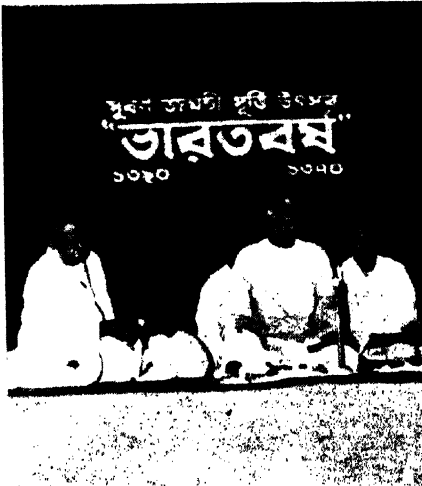
ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দিচ্ছেন। তাঁর বাম পার্শ্বে শ্রীবীরেন ভদ্র ও অপর পার্শ্বে কবি শ্রীনরেন্দ্র দেবকে দেখা যাচ্ছে।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার সুচিন্তিত ভাষণে বলেন—

আজ আমরা এখানে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সমবেত হয়েছি। বাঙলা দেশের মাসিক পত্রিকার ইতিহাস অকালমৃত শিশুর শবকঙ্কালে আকীর্ণ। এই স্বল্পায়ুতার পরিপ্রেক্ষিতে 'ভারতবর্ষ' যে অর্ধশতাব্দী ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যসাধনা ও পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন করে আসছে তার কারণ নির্ণয় করার প্রয়োজন আছে। প্রায়ই দেখা যায় যে আমাদের মাসিক পত্রিকাগুলি এক উগ্র মতবাদের বিতর্কমূলক উত্তেজনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। কোন একটি বিশেষ মতবাদের পোষকতা বা বিরোধিতাই, কোন একটি সাহিত্যিক পরীক্ষার আকর্ষণই অনেক ক্ষেত্রে তাদের জন্ম প্রেরণা যুগিয়েছে। 'সবুজ পত্র' থেকে আরম্ভ করে 'কল্লোল' 'কালিকলম' 'শনিবারের চিঠি' ও অধুনা প্রচলিত বহু আধুনিক সাহিত্যের সমর্থক পত্রিকার নাম এই প্রবণতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। সমকালীন বাদ-প্রতিবাদের উত্তেজনামুখর পরিবেশে যাদের আবির্ভাব তারা এই উত্তেজনার অনুকূল স্রোতে ও সাহিত্যিক বিতর্কে আকৃষ্ট পাঠকগোষ্ঠীর রুচির সমর্থনে গোড়া থেকেই খানিকটা গতিবেগ আহরণ করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে জোয়ারে যারা তরী ভাসিয়েছে, ভাটার টানে তাদের অগ্রগতিতে বাধা পড়ে। অতীতের দিকে চেয়ে দেখলে সহজেই অনুভূত হয় যে সাহিত্যিক বিতর্কের উত্তেজনা কত ক্ষণজীবী, কত অল্প-দিনের মধ্যেই এর বেগ স্তিমিত হয়ে পড়ে।

'ভারতবর্ষ'-র দীর্ঘজীবিত্বের পিছনে স্বত্বাধিকারীদের অর্থস্বাচ্ছল্য ও ব্যবসায়-নৈপুণ্যের একটা প্রভাব আছে ধরে নিলেও ইহার দীর্ঘজীবনের মূল কারণ হচ্ছে উহার উগ্রপন্থী মতবিরোধকে পরিহার করে সুস্থ সার্বজনীন সাহিত্যরুচির উপর নির্ভরশীলতা। 'ভারতবর্ষ' তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে কখনও কোন উত্তপ্ত বাদবিতণ্ডার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে নি। এর সমস্ত সাহিত্য-আলোচনা ও সাংস্কৃতিক মনন কখনও উদ্দাম তর্কের ঝোড়ো হাওয়ায় নিজ শাশ্বত আদর্শ ও নীতি থেকে বিচ্যুত হয় নি। অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের যা ভাল লাগে, বিষয়ের যেরূপ উপস্থাপনা তাদের রুচি ও ঔচিত্যবোধকে আহত করে না, 'ভারত-বর্ষ' সেই নিরাপদ মধ্যপন্থাকেই অনুসরণ করে চলেছে। সাহিত্যের প্রশান্ত আকাশে সে কোন দিনই ক্ষণদীপ্ত,

চোখ-ধাঁধানো হাউই ছাড়ে নাই, মৃৎ-প্রদীপের স্নিগ্ধ, মৃদু আলোই আমাদের বিকিরণ করেছে। কবিবর সাবিত্রী-প্রসন্ন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও দীপশিখার উপমায় যে পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তাই ভারতবর্ষের সঙ্গে মতবিরোধের দাহ্যপদার্থপুষ্ট অন্যান্য মাসিকের পার্থক্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য। দৈনিক ও মাসিক পত্রিকার সমকালীন ঘটনা বিষয়ে ভূমিকা এক নয়। দৈনিকে অব্যবহিত ঘটনার যে তাপ ও দাহ পরিবেশিত হওয়া স্বাভাবিক, মাসিক পত্রিকায় তারই একটি শুদ্ধ-সংহত আকস্মিকতামুক্ত সত্যরূপ প্রতিফলিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ভারতবর্ষের মন্তব্য ও অভিমত প্রকাশের মধ্যেও এই শান্ত বিবৃতি ও উত্তেজনা-হীন মূল্যায়নই বিশেষভাবে প্রকটিত দেখা যায়।

শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র দেব মহাশয় বলেছেন যে 'ভারতবর্ষ'কে আরও এগিয়ে চলতে হলে এর দৃষ্টি-ভঙ্গীতে আরও আধুনিকতার প্রবর্তন করতে হবে। এই নির্দেশ যে সমীচীন তা নিঃসন্দেহ। তবে আধুনিকতার ফেন-বিক্ষোভ প্রবেশ করাতে গিয়ে যাতে 'ভারতবর্ষ'-র চিরন্তন ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ না হয় সে দিকে বিশেষ অবহিত হতে হবে। আধুনিকতার যে মর্মবাণী, যে শাশ্বত সত্য এর বহিরঙ্গের ভঙ্গী ও মনের একটা অনির্দেশ্য অতৃপ্তি, শূন্যতাবোধ ও ঐতিহ্য-অস্বীকৃতির সীমা অতিক্রম করে চিরন্তন মূল্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, তারই প্রতি এর আতিথেয়তা সম্প্রসারিত করার বিশেষ প্রয়োজন। নেতিবাদের তরঙ্গ যেখানে ইতিবাদের কূলে একটা স্থায়ী অনুভূতিছন্দ, জীবন প্রত্যয়ের একটা প্রজ্ঞালব্ধ রূপ অঙ্কিত করে রেখে গেছে, সেইখানেই তা' সাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। সেই সাহিত্য-সঞ্চয় থেকেই মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে তা সাধারণ পাঠকের রসোপভোগের ও জ্ঞান চর্চার অন্তর্ভুক্ত হবে। এই পরিস্রুত আধুনিকতাই ভবিষ্যৎ 'ভারতবর্ষ'-র পৃষ্ঠাকে সমৃদ্ধ করবে এ প্রত্যাশা আমরা নিশ্চয়ই করব।

মহাকালের আবর্তন পথে এই সুবর্ণ-জয়ন্তী একদিন শতবার্ষিকী উৎসবে পরিণত হবে। সেই উৎসবে যোগ দেবার জন্য হয়ত আজকে আমরা যারা উপস্থিত আছি তার মধ্যে কেউই বেঁচে থাকব না। তথাপি কল্পনানেত্রে ও আশার আলোকে 'ভারতবর্ষ'-র সেই আগামী শতবার্ষিকী উৎসব আমরা যেন আজ প্রত্যক্ষ করছি। এর জয়যাত্রার পথ যুগান্ত প্রসারিত হ'ক, এর প্রতিষ্ঠার মহৎ আদর্শ আরও পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করুক, এর সাহিত্যসাধনা ও জনসেবা আরও মহত্তর পরিণতি লাভ করুক এই শুভেচ্ছা জানিয়েই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

——

'ভারতবর্ষ'-র পুরাতন লেখক শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্তও মনোজ্ঞ ভাষণ দানে শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করেন।

'ভারতবর্ষ'-র পুরাতন কর্ম্মী ও বর্ত্তমানে খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত 'ভারতবর্ষ'-র সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাকালীন কয়েকটি গল্প শুনিয়ে শ্রোতাদের আনন্দ দান করেন।

* * *

প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের 'ভারতবর্ষ'-র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত 'সূচনা'-র থেকে আবৃত্তি করে শোনান।

স্বনামখ্যাত শ্রীবীরেন ভদ্রও দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটক থেকে অংশ বিশেষ আবৃত্তি করে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেন।

'ভারতবর্ষ' সম্পাদক শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়কে উৎসবের প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষকে মাল্য দান করতে দেখা যাচ্ছে।

মহাজাতি সদনের দর্শক আসনে উপবিষ্ট (বাম দিক থেকে)—'ভারতবর্ষ'-র অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, পশ্চিম বঙ্গের স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার।

ডঃ কালিদাস নাগ তাঁর ভাষণে বলেন—

'প্রকাশক ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কঠিন অর্থ সমস্যার দিনেও লেখকদের প্রকাশিত বইগুলির হিসাব-পত্র নিয়মিত দেখাইয়াই তখুনি প্রাপ্য কমিশন দিতেন সেকথা প্রবাসী সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলে গেছেন তার সাক্ষ্য দেন অধ্যাপক কালিদাস নাগ। তিনি আরো বলেন যে বাংলার বড় বড় বহু মনীষীদের প্রতিকৃতি ও চিত্রাদি প্রকাশ করে ভারতবর্ষ দেশসেবা করে কৃতার্থ হয়েছিল। সেই সব ছবি সংগ্রহ করে Album প্রকাশ করা হোক এ প্রস্তাবও তিনি 'ভারতবর্ষ' প্রকাশকদের কাছে আনেন। সিনেমা বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থোপার্জ্জন না করে 'ভারতবর্ষ' 'প্রবাসী' প্রভৃতি অল্পসংখ্যক পত্রিকা যে বাঙলার সংস্কৃতির উপাদান বিতরণ করে গেছেন তাতে জাতি উপকৃত হয়েছে, তাই অধ্যাপক নাগ ভারতবর্ষের শতায়ু কামনা করে প্রার্থনা করেন যে আদর্শবাদী 'ভারতবর্ষ'-র মত পত্রিকা বর্দ্ধিত হোক। প্রবাসী সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী ১৯৬৬ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে হবে। সেই বছরে তাঁর সহকর্ম্মিণী ভগ্নী নিবেদিতারও শত-বার্ষিকী পূর্ণ হবে। তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের শতাব্দী উৎসবে এবছর স্মরণ করিয়ে অধ্যাপক নাগ বাঙলা

উৎসব অনুষ্ঠানে সমাগত দর্শকবৃন্দের একাংশের চিত্র। প্রথম সারিতে উপবিষ্ট রয়েছেন (বাম দিক থেকে)—পশ্চিম জার্ম্মান দূতাবাসের ভাইস্ কন্সাল ডঃ সুমান্ ও শ্রীমতী সুমান্, লেখিকা শ্রীমতী মায়া বসু প্রভৃতি।
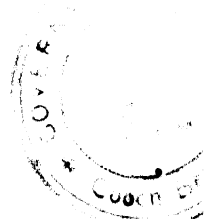
সাহিত্যিক ও পৃষ্ঠপোষকদের সাধুবাদ করেন। মহাজাতি সদন রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় তাই এইখানে সাহিত্যিক সম্মেলন হওয়ায় তিনি বিশেষ প্রীতি জ্ঞাপন করেন ও প্রথম সম্পাদক ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শতাব্দী বৎসরে ভারতবর্ষের সুবর্ণ জয়ন্তী সার্থক ভাবেই হয়েছে। ৺গুরুদাস ও তাঁর সুপুত্রদ্বয় ৺হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও ৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকগুলি প্রচার করে ও যথাযোগ্য Royalty দিয়ে বাংলাসাহিত্যের সেবা করেছেন বলে অধ্যাপক নাগ সাধুবাদ করেন ও 'ভারতবর্ষ'র দীর্ঘজীবন কামনা করেন। আতিথ্য ও সঙ্গীত পরিবেশন খুব মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় এবং বহুকাল পরে বর্ষার সার্থক সাহিত্য সভা দেখে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন।

গত কয়দিন ভারতবর্ষের এই উৎসব সুষ্ঠু সম্পাদন করার জন্য 'ভারতবর্ষ'-র সম্পাদক শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহ ও পরামর্শ এবং কর্ম-পরিচালক শ্রীরমেনকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একান্তিক চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম দেখিয়া আমি উৎসাহিত ও আশান্বিত হইয়াছি এবং আজ ভগবৎ-চরণে প্রার্থনা জানাই, তাঁহাদের দ্বারা ভারতবর্ষ যেন দিন দিন আরও উন্নতি লাভ করিয়া তাহার পূর্ব মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হয়। এই উৎসবের শুভ লগনে যাঁহারা আমাদের আশার কথা শুনাইলেন, তাঁহাদের বাণী যেন আমরা সার্থক ও রূপায়িত করিতে পারি, ইহাই সকলে আশীর্বাদ করুন। সভাপতি প্রফুল্লবাবু, প্রধান-অতিথি অতুল্যবাবু ও উদ্বোধক শ্রীঅশোককুমার তিন জনেই আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়া যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ এবং আশা করি তাঁহাদের এই সহযোগিতা 'ভারতবর্ষ' কে নব-জীবন দান করিবে। নমস্কার।

——

"ভারতবর্ষ" সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন। পার্শ্বে উপবিষ্ট শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাচ্ছে।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন—

'ভারতবর্ষ'-র ৫০ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার উৎসবে ধন্যবাদ দিতে দাঁড়াইয়া আজ তাঁহাদের সকলের কথা মনে হইতেছে—যাঁহাদের প্রীতি, স্নেহ, কৃপা, সাহায্য, সহযোগিতা ও সদিচ্ছা ভারতবর্ষকে জয়যাত্রার পথে অগ্রসর করিয়াছে। যাঁহারা আজ আমাদের মধ্যে নাই, তাঁহাদের কথা সর্বাগ্রে স্মরণীয়। আমার ২৮ বৎসরের ভারতবর্ষ-কার্য্যালয়ে কর্ম-জীবনে ৺হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় ও সাহিত্যক্ষেত্রের সকলের অগ্রজ জলধর সেন মহাশয়ের করুণার কথা সর্বদা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। বাঙ্গলা দেশের খ্যাত ও অখ্যাত শত শত লেখকের রচনায় ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করিতে পারিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, তাঁহারাই সর্বাগ্রে আজ ধন্যবাদের পাত্র। গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, অনুগ্রাহক সকলকে আমরা এই উৎসবের মধ্যে পাইয়া ধন্য, তাঁহাদের সকলকে যথাযোগ্য প্রীতি ও নতি জ্ঞাপন করি।

বিচিত্রানুষ্ঠানে বিশ্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর যাদুসম্রাট পি, সি, সরকারের পুত্র শ্রীমান প্রদীপ সরকার যাদুর খেলা দেখাচ্ছেন।

মহাজাতি সদনের প্রবেশ দ্বারে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেনকে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীরমেন কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত দেখা যাচ্ছে।

বিচিত্রানুষ্ঠানে দ্বিজেন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রীসিদ্ধেশ্বর ও শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় শ্রোতাদের আনন্দ দেন। শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় 'ভারতবর্ষ'-র জন্য লিখিত দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত সঙ্গীত "যেদিন সুনীল জলধি হইতে", গানটি গেয়ে উৎসবের উদ্বোধনও করেন।

শ্রীসমরেশ রায়, শ্রীমতী সুমিত্রা সেন ও শ্রীখোকন মজুমদারও তাঁদের সুললিত কণ্ঠের মধুর সঙ্গীতে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।
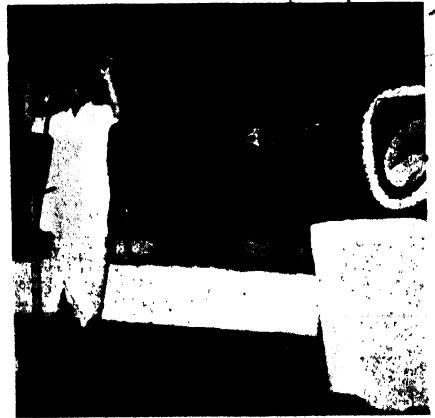
দর্শকদের হাস্য-কৌতুক পরিবেশন করছেন খ্যাতনামা কৌতুকাভিনেতা শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়।

বিচিত্রানুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ "বর্ষামঙ্গল" নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করছেন "চয়নিকা"র শিল্পীবৃন্দ।

...ত্য— শুভ্রা পাল, রুমা ঘোষাল, অনিন্দ্যা রায়চৌধুরী
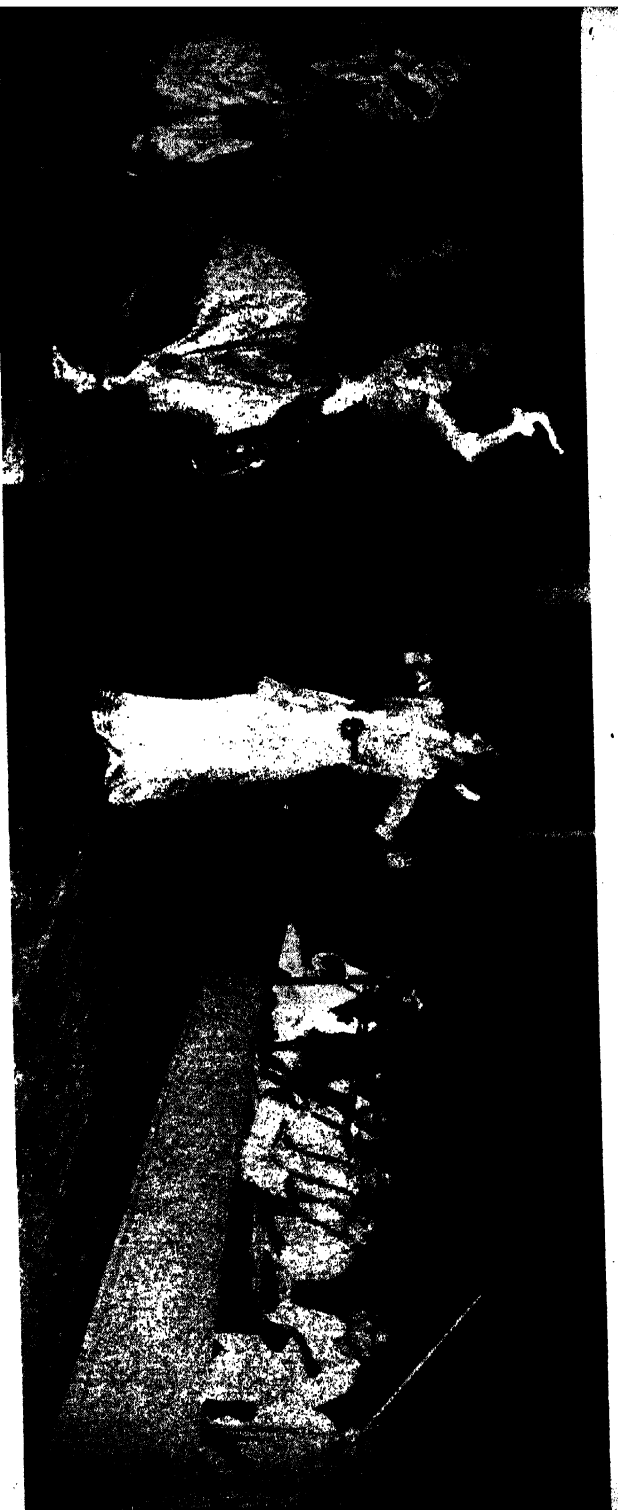
সঙ্গীতাংশে—কমলা বসু, নীলিমা চক্রবর্ত্তী, মায়া বিশ্বাস, আরতি দাস, মীরা মুখোপাধ্যায়, আরতি ভট্টাচার্য, শৈলেন বসু, নিত্যেশ সেন, প্রতাপ ঘোষ, রাধাগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, মুকুল ঘোষ, অমিতাভ সেন ও সসীম দাসগুপ্ত।

...উৎসব অনুষ্ঠানের আলোকচিত্রগুলি গ্রহণ করেছেন শ্রীমনো মিত্র।

আষাঢ়—১৩৭০

প্রথম খণ্ড | একপঞ্চাশত্তম বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

জগজ্জননী, জগৎতারিণী ভারতবর্ষ

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

মৃত্যুঞ্জয়ী দেশপ্রেমী ভারতমাতার সুসন্তান "ভারতবর্ষ"-প্রতিষ্ঠাতা কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের যে কালজয়ী ভারত-সঙ্গীত অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে 'ভারতবর্ষে'র প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাকে অলংকৃত করিয়া তদানীন্তন পরাধীন ভারতবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহা চির-নূতন চির-মহিমাময়—তাহা পদবিন্যাসের ঐশ্বর্যে, ভাবের মাধুর্যে, ভাষার গাম্ভীর্যে ভারতবাসীর হৃদয়কন্দরে চির-অম্লান, চির-জাগরূক! সেদিন কবিবর গাহিয়াছিলেন—

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ!

* * * *

জননি! তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি,
জননি! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা, কত না হর্ষ।
জগৎপালিনি! জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!

হে জগৎপালিনি, জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ। তুমি কোন্ সুদূর অতীতে প্রলয় জলধি হইতে উত্থিত হইয়া পুণ্যভূমি কর্মভূমিরূপে সমস্ত পৃথিবীবাসী বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলে তাহা আজ আমাদের কল্পনার অতীত। ভোগায়তন মনীষীগণ ভারত-পরাধীনতার যুগে ভারত সভ্যতাকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে অবনমিত

করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু, ভারতের মনীষীগণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন ভারত-সভ্যতা সমগ্র পৃথিবীতে অতি প্রাচীন—ইহার প্রাচীনতার কাল কাল নির্ণয় অসম্ভব। কোন জড়পদার্থের, যাহা মানবগণের সৃষ্ট, তাহার উৎপত্তিসময় নির্ণয় সম্ভব হইলেও কোনো পারমার্থিক জ্ঞানের উন্মেষের সৃষ্টিকাল নিরূপণ-চেষ্টা বাতুলতার নামান্তর। ভারতীয় সভ্যতার ধারা ও ভারতের সভ্যতার ধারা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এজন্য পাশ্চাত্য মনীষীগণ বিভ্রান্ত।

ভারতসভ্যতার জন্ম—তপোবনের শান্ত স্নিগ্ধ সমাহিত পারমার্থিক ভাবধারার পরিবেশে—এই পারমার্থিক সভ্যতার উৎস—তপঃসিদ্ধ ত্যাগনিষ্ঠ সত্যাশ্রয়ী সত্যদর্শী সত্যধর্মী ঋষিকুলের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে। ভারতবর্ষের সভ্যতা শাশ্বত ও সনাতন—এই সভ্যতা প্রাণবন্ত। ইহার প্রাণবস্তু অজ, অব্যয়, অক্ষয়। এই সভ্যতা অন্তর্মুখী এবং ত্যাগধর্মী। এই সভ্যতার ভিত্তি অপৌরুষেয় ও পারমার্থিক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, যাহা মানব হৃদয়ে চির-নূতন, চির-অম্লান। ভারতবর্ষের পারমার্থিক জ্ঞানভাণ্ডার পাশ্চাত্য সকল শ্রেষ্ঠ মনীষীগণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে এবং যতদিন এই পৃথিবীতে সূর্যচন্দ্রের উদয়-অস্ত থাকিবে ততদিন সেই সমর্থতা ক্ষুণ্ণ হইবে না। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাম্ সর্বমানবাঃ॥

পাশ্চাত্য ভোগভূমির দর্শন ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ভারতবর্ষের দর্শন ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান মহাসাগরের তুলনায় গোষ্পদ মাত্র। ভারতবর্ষের দর্শন ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান পৃথিবীতে সুপ্রাচীন এবং পৃথিবীর সকল মানব জাতির দীক্ষাগুরু।

পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্ম হইয়াছিল—তাহাদের দেশের মানবগণের আত্মরক্ষার্থ সংগ্রামে—ভোগায়তন নরনারীর ভোগবাধক কঠোর বাধার অতিক্রমণের সংকল্পে—ভোগমান বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম উন্মেষ তপোবনের শান্তস্নিগ্ধ সমাহিত ভাবধারার পরিবেশে হয় নাই। পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে যাহা সমগ্র মানব জাতির সভ্যতার উৎপত্তি ও ইতিহাস এবং যাহা স্বাধীন ভারতবর্ষে আজিও, দুর্ভাগ্যক্রমে, স্বাধীন ভারতের নাগরিকগণের পুত্রকন্যাদের গলাধঃকরণ করিতে হয়, তাহা সমস্ত মানবজাতির সভ্যতার উৎপত্তি ও ইতিহাস হইতে পারে না। তাহা ভারতবর্ষের সভ্যতার উন্মেষের ইতিহাস হইতে পারেনা। পাশ্চাত্য মনীষীগণের মতে আদিম মানবজাতির কোনো ধর্মবোধ ছিলনা—তাহারা বাস করিত পর্বত গুহায়—তাহাদের জীবন রক্ষার্থ আহার ছিল পশুর মতো—আম মাংস ও বনজ ফল ও মূল। তাহারা অগ্নির ব্যবহার জানিত না। তাহারা গুহাযুগ, প্রস্তরযুগ, ধাতুযুগ প্রভৃতি, আত্মরক্ষা ও শারীরিক ভোগমান বৃদ্ধির অদম্য চেষ্টায়, অতিক্রম করিয়া বর্তমানে জড়বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম উন্নতি রকেট-যুগে উপনীত। তাহাদের মতে মানবজাতির ধর্মবোধের উৎপত্তি বাহ্য প্রকৃতির দুর্যোগের ভয়ে ও বিস্ময়ে। এক এবং অদ্বিতীয় ভগবান্ বলিয়া কোন বস্তুর সহিত তাহাদের অন্তরের যুগসূত্র ছিলনা। ভারতবর্ষের পুরাণ-ইতিহাসে লিখিত আছে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার উন্মেষের বিবরণ। তাহা পূর্বোক্ত ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ ভারতবর্ষ—কর্মভূমি ও সাধনভূমি। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশ ভোগভূমি। ভোগভূমির সভ্যতার জন্ম, উন্মেষ এবং বিকাশ পূর্বোক্ত ভাব ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে সম্ভব নহে। সুতরাং ঐ পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্নতির ধারাতে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশের ধারা মনে করা আত্ম-প্রতারণা মাত্র। ভারতবর্ষ কর্মভূমি। এজন্য ভারতের সভ্যতার উন্মেষ, পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্মেষের সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতবর্ষের কোন পুরাণে উপনিষদে গুহাযুগ প্রস্তরযুগ, ধাতুযুগ, বলিয়া কোন কথাই নাই। ভারতবর্ষ-জাত ঋষিগণকে গুহাযুগ, প্রস্তরযুগ, ধাতুযুগ প্রভৃতি অতিক্রমণের দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে কেন? তাঁহারা প্রথম হইতেই অধ্যাত্মযুগে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অধ্যাত্ম চিন্তায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে জাত দানব ও রাক্ষসগণও তপোনিষ্ঠ ছিল। তাহারা তপস্যার বরলাভ করিয়া ভোগমুখী হইয়া ত্যাগধর্মী ঋষিগণকে পীড়িত করিত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইত ভগবৎ ইচ্ছায়। ভোগমুখীগণের আক্রমণে ঋষিগণের ত্যাগধর্ম ও তপস্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। দানব ও রাক্ষসগণের দমনে ও ঋষিগণের তপস্যার সাহায্যের জন্য রাজশক্তি সর্বদা সক্রিয়

থাকিত রাজশক্তি দানব বা রাক্ষসগণের অধিকারে আসিলে ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া দানব ও রাক্ষসগণকে সংহার করিতেন। ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে সত্য। কিন্তু স্বাধীনতার পঞ্চদশ বর্ষ গত হইলেও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানগণ লাভ করিতে পারেন নাই। ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানগণ পাশ্চাত্য ভোগধর্মী সভ্যতায় আবাল্য প্রতিপালিত এবং শিক্ষিত। এজন্য, তাঁহারা আত্মবিস্মৃত—পাশ্চাত্য মনীষীগণের কথাই তাঁহাদের নিকট বেদবাক্য। এজন্য ভারতীয় ছাত্রগণ এখনও পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাকে ভারতবর্ষের সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা বলিয়া জানিতে বাধ্য হয়। ভারতবর্ষের সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা যাহা ভারতীয় শাস্ত্রপুরাণাদিতে লিখিত আছে তাহা তাহারা জানিতে বা উপলব্ধি করিতে পারেনা। বিকৃততথ্য পাঠ করিয়া বিকৃতরুচিগ্রস্ত হইয়া ভারতীয় ছাত্রগণ এবং তরুণ-তরুণীগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে এবং পড়িতেছে—ইহা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট।

পাশ্চাত্য মনীষীগণের মতে আদিম মানবজাতির ধর্মবোধের জনক—প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিমিত্ত ভয় এবং বিস্ময়। তাহাদের দেবতাগণ ভয় এবং বিস্ময়ের স্রষ্টা। ভারতীয় শাস্ত্রে সে কথা কোন স্থানে নাই এজন্য ভারতের মনীষীগণ ঐ কথা ভারতীয় ঋষিগণের সম্বন্ধে বিশ্বাস করেন না। ভারতের শাশ্বত ও সনাতন ধর্মে ঈশ্বর এক এবং একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। কিন্তু, তিনি লীলাময়। ভারতীয় ঋষিগণের উপলব্ধি—এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম নিত্যভাবে নির্গুণ এবং নিরাকার, এবং লীলাভাবে সগুণ ও সাকার। তিনি ঈশ্বরভাবে জীব ও জগতে বিবিধরূপে বাহ্যভাবে প্রকাশিত হইয়া সর্বত্র একভাবে অন্তর্লোকে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিরাজিত আছেন। ভারতীয় সাধকগণের সাধনার সুবিধার জন্য এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বহু দেবদেবীরূপে লীলায়িত আছেন। এক ব্রহ্মবাদের সঙ্গে বহুদেবতাবাদ ভারতীয় সাধকগণের নিত্য উপলব্ধি। এজন্য ভারতীয় সভ্যতার ধর্মবোধের উৎস প্রাকৃতিক-দুর্যোগ নিমিত্ত ভয় ও বিস্ময় নহে। ভারতীয় সাধুগণের ধর্মবোধের উৎস তাহাদের অন্তরের সহজাত ভক্তি এবং পরমানন্দ। পাশ্চাত্য ধর্মে ঈশ্বর বা গড্ এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি বহুরূপে লীলায়িত এই উপলব্ধি নাই। সকলের জন্য তিনি সহজ ও সরলভাবে একনিয়মে সাধ্য এবং ধর্ম সাধনের লক্ষ্য অনন্ত সুখভোগ—ইহজীবনে এবং পরলোকে। ভারতীয় ধর্মে ঈশ্বর অধিকারী ভেদে বহুরূপে এবং বহুভাবে সাধ্য। তাহাদের ধর্মসাধনার লক্ষ্য সুখ ভোগ নহে। ভারতধর্মে সুখও বন্ধন, দুঃখও বন্ধন। এজন্য ভারতধর্মের পরম লক্ষ্য সুখ ও দুঃখ হইতে পরমা মুক্তি বা মোক্ষ। ভারতধর্মের মুক্তিবাদ পাশ্চাত্য মনীষীগণ এবং পাশ্চাত্যসভ্যতা মোহমুগ্ধ জনগণ বুঝিতে অক্ষম—এজন্য বিভ্রান্ত।

বিচিত্রতা বহির্বিশ্বের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর তাঁহার বিশুদ্ধ মায়ার আশ্রয়ে যেরূপ সর্বত্র গভীরে অন্তর্লোক একভাবে অনুপ্রবিষ্ট আছেন তদ্রূপ অবিদ্যার আশ্রয়ে বাহ্য জীবজগতে কর্মপরতন্ত্রতার অধীনে বহুভাবে প্রকাশিত আছেন। জীবজগতে যেরূপ বিচিত্রতা, সভ্যতার ধারা বিকাশেও তদ্রূপ বিচিত্রতা। ভারতের সুপ্রাচীন ইতিহাস—ভারতের সুপ্রাচীন শিক্ষার আদর্শ ও তাহার উন্মেষ—ভারতের প্রাচীন অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারের স্বরূপ ভারতীয় সাধুসন্ত ও মনীষীগণের প্রকৃতি ও চিন্তার ধারা উপলব্ধি করিলে আমরা সহজেই জানিতে পারি—ভারতসভ্যতার ধারা পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্মেষের ধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ভারতবর্ষ সাধন ভূমি ও কর্মভূমি। ভারতবর্ষ যত সাধু-সন্ত ও জ্ঞানী গুরুর জন্ম দিয়াছে পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে তাহা সম্ভব হয় নাই। পরাধীন ভারতে ধর্মের নানা গ্লানির মধ্যেও সেই ধারা অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। অপর দিকে, পাশ্চাত্য সভ্যদেশে, ভোগ্যবস্তুর অভূতপূর্ব উন্নতি, ভোগসহায়ক জড়বিজ্ঞানের অশ্রুতপূর্ব ক্রমবিকাশ, ভোগবাধকগণের ধ্বংসের জন্য মারণাস্ত্রের অভাবনীয় প্রস্তুতি এবং তন্নিমিত্ত প্রতিযোগিতা দেখিলে পাশ্চাত্যদেশ যে ভোগভূমি ইহা উপলব্ধি করিতে অনুমাত্র কষ্ট হয় না।

অহং ব্রহ্মাস্মি—আমি ব্রহ্ম, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এ জড় জগৎ ও জীবজগৎ সমস্তই ব্রহ্মের প্রকাশ, এই সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন—ভারতের উপলব্ধি। ভারতের দর্শন—"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—এই জগতে যাহা কিছু সমস্তই ঈশ্বর দ্বারা আবৃত। ভারতের মর্মবাণী—"ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে।

ভারতের প্রধানতম উপদেশ, "আত্মানাং বিদ্ধি" আপনাকে জানো। "আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতং"—আপনাকে (আত্মাকে) দর্শন শ্রবণ মনন দ্বারা জানিলে সকল বস্তুই জানিতে পারা যায়। যাঁহারা আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহাদের প্রধানতম উপলব্ধি "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমি ব্রহ্ম এবং তাঁহারা জানিয়াছেন—বিজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। ভারতের উপনিষদ বলিতেছেন—"তত্ত্বমসি।" তুমি স্বয়ং ব্রহ্ম। স্বয়ং ব্রহ্ম বিশুদ্ধ মাত্রার আশ্রয়ে ঈশ্বররূপে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট থাকিলেও তিনি অসঙ্গ ও অবিকারী। কিন্তু, জীব অবিদ্যার মোহে অহংমদমত্ততায় সসঙ্গ ও বিকারী। জীবের ব্রহ্মবোধের বাধক অহংজ্ঞান জীবের অহংবুদ্ধি অবসানে ব্রহ্মত্ব বোধ হয়।

হে মাতঃ জননি! ভারতবর্ষ! তুমি যখন তোমার আধ্যাত্মিক ত্যাগধর্মী সভ্যতার উচ্চশিখরে, তখন এই পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে সভ্যতার কোন বিকাশ ছিল না। তখন পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানের জনগণ পর্বতগুহায় বাস করিত, উলঙ্গ থাকিত, আমমাংস ভোজন করিত, বন্যপশুর সঙ্গে পশুবৎ জীবন ধারণ করিত। পাশ্চাত্য দেশে ভোগধর্মী সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, হে জননি! তোমাকে জানিবার জন্য ব্যাকুল হয়। তোমার জ্ঞান, তোমার ঐশ্বর্য, তোমার মাধুর্য, সারা পৃথিবীতে প্রবাদ-বাক্যের মতো বিস্তৃতি লাভ করে। যাহারা জ্ঞানান্বেষী, তাহারা জ্ঞান লাভের জন্য ভারতে আসিতে আরম্ভ করে। যাহারা ভোগায়তক, তাহারা তোমার ঐশ্বর্য লিপ্সায় ভারত আসিবার পথের সন্ধান করে। যাহারা সাধক তাহারা তোমার মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়। প্রায় দ্বিসহস্র বর্ষপূর্বে মহাত্মা যীশু এই ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহার অধ্যাত্মজ্ঞানকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া মনীষীগণের বিশ্বাস। আড়াইহাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম সমগ্র এশিয়ায় প্রচারিত হয়। চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হুয়েন সাং প্রায় চৌদ্দশত বর্ষ পূর্বে জ্ঞানান্বেষী হইয়া এই ভারতবর্ষে উপস্থিত হন তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত যে পুস্তকে লিখিত আছে তাহার নাম "সি-ইউ-কি"। ঐ পুস্তক পাঠে ভারতের তৎকালিক অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়। তখন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হর্ষবর্দ্ধন, দ্বিতীয় শিলাদিত্য, ভারতে রাজত্ব করিতেন। তিনি প্রতি পঞ্চম বৎসরে এলাহাবাদের নিকট গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে একটী দানযজ্ঞ করিতেন। তিনি তাঁহার রাজকীয় সমস্ত অর্থ এমন কি রাজপরিচ্ছদ মণিমুক্তাদি পর্যন্ত সমস্ত-বস্তু জাতিধর্মনির্বিশেষে বিতরণ করিয়া ভিক্ষুজনোচিত সামান্য বস্ত্র পরিধান করিতেন। এই দৃশ্য পৃথিবীর অন্য কোনো মানবের কল্পনার অতীত। প্রাচীন ভারতবর্ষ শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিতরণে এই পৃথিবীর জননীস্বরূপ ছিলেন না, ব্যবহারিক জ্ঞান এবং পার্থিব ধনসম্পদ আদান-প্রদানের ব্যাপারেও জননীস্বরূপ ছিলেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিম ও পূর্ব এশিয়া—এমন কি আফ্রিকা ইউরোপের দেশ-সমূহের সঙ্গে জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্যিক পণ্যের আদান-প্রদান চলিত। এই পৃথিবীতে জননী ভারতবর্ষের দান কত মহৎ তাহা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "ভারততীর্থ" কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন।

"হেথা একদিন বিরামবিহীন মহাওঙ্কার ধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।
তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটী বিরাট হিয়া।

আমাদের জননী ভারতবর্ষ জগজ্জননীরূপে সারা পৃথিবীর নর নারীকে অধ্যাত্মজ্ঞানে, বিশ্বমানবতা জ্ঞানে শুধু উদ্বুদ্ধ করেন নাই, তিনি সবাইকে তাঁহার বিরাট দেহে আশ্রয় দিয়াছেন, তাহাও বিশ্বকবি সুমধুরস্বরে ঐ কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন!'

এক জগজ্জননী ভিন্ন জগতের সকল মানবকে স্বীয় ক্রোড়ে আশ্রয় দিবার আর কাহার সামর্থ্য আছে? জগজ্জননী ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যে লুব্ধ ও মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য জাতি ভারতবর্ষ আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে থাকে। কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার ভারতবর্ষ আবিষ্কারের লক্ষ্যে সাধিত হয়। মহাপ্রাণ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভারতবর্ষ-বন্দনা সার্থক হইয়াছে তাঁহার কবিতার শেষ দুইটী অমর চরণে—

"ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণকমল করিয়া স্পর্শ—
গাইল জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

জগন্মোহিনী জগজ্জননী ভারতবর্ষের সার্থকতা তাহার জগত্তারিণী নামে। আজ সমগ্র পৃথিবী মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত। ভোগধর্মী পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ ধ্বংসের মুখে ! ভোগায়তন পাশ্চাত্য সভ্যগণ যে সকল পারমাণবিক মারণাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া সঞ্চিত করিয়াছেন—তাহা একাধিকবার সমগ্র পৃথিবীর আবালবৃদ্ধনারীকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করিবার উপযোগী। কেন এই মারণাস্ত্রের প্রস্তুতি—ইহার উত্তর নিহিত আছে পাশ্চাত্য ভোগধর্মী সভ্যতার ভোগের আদর্শের রক্ষণাবেক্ষণ মধ্যে—অন্য কোথাও নাই। বর্তমান পৃথিবীতে পাশ্চাত্য ভোগধর্মী সভ্যতার জয়যাত্রা জড়বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে অব্যাহত ভাবে চলিতেছে—এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে উহার ধ্বংসের রথচক্র উদ্দামগতিতে তাহার পশ্চাতে ছুটিতেছে পারমাণবিক মারণাস্ত্র প্রস্তুতির প্রতিযোগিতায়। যদি সংঘর্ষ অনিবার্য হয় তাহা হইলে ভোগধর্মী সভ্যতা নিমিষে ধূলিসাৎ হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতা মূলতঃ ভোগধর্মী হইলেও বিভিন্ন দেশে ভোগের আদর্শে বহু প্রভেদ বর্তমান। বর্তমানে পৃথিবীতে কম্যুনিষ্ট দুনিয়ায় ধনসাম্যবাদ এবং কম্যুনিষ্ট দেশসমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা বা ধনতন্ত্রবাদ প্রধান। কিছুদিন পূর্বে কম্যুনিষ্ট রাশিয়া পঞ্চাশ মেগাটনের অধিক একটী পরমাণু বোমার ধ্বংসকারিতা পরীক্ষা করিয়াছেন, দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত যত বোমা পড়িয়াছিল রাশিয়ার উক্ত মেগাটন বোমার ধ্বংসশক্তি তাহার অপেক্ষা ২৫গুণ বেশী। জাপানে গত যুদ্ধে যে বোমা নাগাসাকি ও হিরোসীমাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল উক্ত মেগাটন বোমার ধ্বংসকারিতা তদপেক্ষা আড়াই হাজার গুণ বেশী। জাপানে অ্যাটম বোমার আঘাতে মরিয়াছিল দুই লক্ষ নরনারী ও শিশু। এবার একটী আঘাতে মরিতে বাধ্য হইবে পঞ্চাশ কোটী আবাল বৃদ্ধ বনিতা। বর্তমান পৃথিবীতে পাশ্চাত্য সভ্যজাতি নাকি সভ্যতার চরমশিখরে উপস্থিত, কিন্তু তাহাদের মারণাস্ত্র প্রস্তুতি দেখিলে মনে হয় উক্ত সভ্যতার অন্তপ্র্রকৃতি পৈশাচিক এবং নারকীয়। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যাহাতে সংঘটিত না হয় তজ্জন্য শান্তিকামী জনগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। তথাপি ভোগধর্মী সভ্যতার ভোগের আদর্শের কোন পরিবর্তনের লক্ষণ নাই : বর্তমান পৃথিবীতে একটী প্রধান প্রশ্ন—রাষ্ট্রনায়কগণের নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের সকল নরনারী সমভাবে রাষ্ট্রের ধনসম্পদ উপভোগ করিবে—না—রাষ্ট্রনায়কগণের সহায়তায় রাষ্ট্রের নরনারী তাহাদের বুদ্ধিও সামর্থ্য অনুসারে রাষ্ট্রের ধনসম্পদ ভোগের অধিকার পাইবে ? পৃথিবীতে সৃষ্ট মানবজাতি কেবলমাত্র ভোগ দেহ লইয়াই জন্ম পরিগ্রহ করে নাই অর্থাৎ তাহারা কেবলমাত্র ভোগায়তন নয়—তাহারা মূলগতভাবে দেবায়তন। মানবের অন্তরে আত্মার অনন্তস্বরূপ সুপ্তভাবে আছে। সেই উপলব্ধিকে জাগ্রত করাই মানবজীবনের পরমসার্থকতা। পশু জীবনের সঙ্গে মানবজীবনের প্রভেদ এইখানে। যে মানব তাহার অন্তরস্থিত অনন্ত স্বরূপতত্ত্ববোধের চেষ্টা না করিয়া, আহার-বিহার লইয়া মত্ত থাকে তাহার জীবনে ভীতি, বিদ্বেষ, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা অবশ্যম্ভাবী। যে সভ্যতা শুধু মানবগণের আহার-বিহারের চিন্তায় সর্বক্ষণ ব্যাপৃত সেই সভ্যতা বিরোধ, ভয়, ঘৃণা, বিদ্বেষ হইতে কোন ভাবেই পরিত্রাণ পাইতে পারে না। বর্তমান কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রনায়কগণ ধর্মনিরপেক্ষ। তাহাদের চিন্তা একমাত্র ভোগমান বৃদ্ধির দিকে, সুতরাং তাহারা যে সভ্যতার রক্ষক সেই সভ্যতা ভীতি, ঘৃণা, বিদ্বেষ অতিক্রম করিবে কিরূপে ? ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানগণের একমাত্র চিন্তা ধনসম্পদ আহরণ ও রক্ষণের ব্যবস্থায়। সুতরাং তাহাদের পক্ষেও ঘৃণা, ভয়, বিদ্বেষ অতিক্রমণ অসম্ভব। মানুষের দুর্গতি তখনই বাড়ে যখন সে শুধু ভোগের পথে চলাকেই জীবনের সার্থকতা মনে করে। সভ্যতার দুর্গতি সেই একই কারণে বাড়িতে থাকে। যে সভ্যতা মানব জীবনের পরম সত্যকে প্রকাশের সাহায্য করেনা—সে সভ্যতা আত্মঘাতী হইতে বাধ্য। এজন্য এই পৃথিবীতে অতীতে বহু দেশের ভোগধর্মী-সভ্যতা তাহার উন্নতির চরমে উঠিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্তমান ভোগধর্মী পাশ্চাত্য সভ্যতা যদি তাহার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন না করে অর্থাৎ ভারতবর্ষের ত্যাগধর্মী সভ্যতার আদর্শে অনুপ্রাণিত না হয় তাহা হইলে ভোগধর্মী এই পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহার উন্নতির চরমে আত্মঘাতী

হইতে বাধ্য। সমস্ত পৃথিবীব্যাপী আজ বিদ্বেষ, আতঙ্ক সেই মৃত্যু পথের নিশানা দেখাইতেছে।

ভারতের ত্যাগধর্মী সভ্যতা ও সমাজ তাহার শাশ্বত ও সনাতন ধর্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য দেশসমূহের সভ্যতা তাহাদের প্রণীত আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য ভারতবাসীর ধর্মবোধের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দ্বারা যেরূপ ভারতীয় সভ্যতার উন্নতি বা অবনতি সাধিত হয়, তদ্রূপ, পাশ্চাত্য দেশের আইনের দোষগুণের তারতম্যে তাহাদের সভ্যতা ও সমাজের উন্নতি বা অবনতি সংঘটিত হয়। ভারতীয় সভ্যতা তাহার শাশ্বত ও সনাতন ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকায় এই সভ্যতার বিনাশ হয় না এজন্য ভারতবর্ষের সভ্যতা কালজয়ী। ভারতবর্ষের সভ্যতার লক্ষ্য-বিষয় ভোগ নহে —আপনার মধ্যে অন্যকে ও অন্যের মধ্যে আপনাকে পাওয়ার লক্ষ্যে। সর্বভূতে যে এক বিরাট "আমি" অনুপ্রবিষ্ট আছে এবং এক বিরাট আমির মধ্যে যে জাগতিক সমস্ত কিছু অনুপ্রবিষ্ট আছে—এই বিরাট উপলব্ধি ভারতবর্ষের সভ্যতার মূলভিত্তি। এজন্য ভারতবর্ষ কোনদিন ভোগ্যবস্তু আহরণে বা উৎপাদনে দলবদ্ধ নহে,কিন্তু ভোগ্যবস্তু বিতরণে মুক্তহস্ত। পাশ্চাত্য ভোগায়তন জনগণ প্রতি দেশে ভোগ্যবস্তু আহরণে বা উৎপাদনে দলবদ্ধ কিন্তু ভোগ বিষয়ে সকলেই স্বতন্ত্র। পার্থিব বিষয়ে ভারতবর্ষের উদাসীনতা পরাধীনতার কারণ হইলেও ভারতবাসীগণ তাহাদের সমাজ ব্যবস্থায় মনে প্রাণে স্বাধীনতা-রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং মানবধর্মকে কোনদিন বিস্মৃত হন নাই। প্রতি মানব পশুত্ব ও মানবত্বের সমন্বয়ে সৃষ্ট। মানবের মধ্যে পশুত্ব তাহাকে অন্য মানব হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টিত এবং মানবের মধ্যে মানবত্ব পৃথিবীর সকল মানবকে আপনার অন্তরের প্রেমলোকে আকর্ষণে আনিতে উৎসুক! ভোগধর্মী সভ্যতায় পশুত্বের বিকাশ যেমন তাহার বিনাশের কারণ—ত্যাগধর্মী সভ্যতায় ভোগবিমুখতা তদ্রূপ তাহার পরাধীনতার কারণ। প্রত্যেক মানব যেরূপ সত্বরজঃতম এই তিন গুণের সমন্বয়ে সৃষ্ট—প্রত্যেক সভ্যতাও তদ্রূপ ঐ তিন গুণের সমন্বয়ে উদ্ভূত। প্রত্যেক মানবের প্রকৃতি যেমন যে গুণের আধিক্য সেই গুণের আশ্রয়ে প্রকাশ পায়—মানব সভ্যতাও সেইরূপ এক গুণের আধিক্যেই জগতে উন্নতি লাভে সামর্থ্য লাভ করে বা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। প্রতি মানবে ঐ গুণত্রয় অধোমুখী ত্রিভুজের মত বর্তমান। অধোমুখে তমোগুণ এবং উপরের দুই মুখে সত্ব ও রজঃগুণ। সত্বগুণ ত্যাগধর্মী। রজোগুণ ভোগধর্মী। তমোগুণ বিনাশধর্মী। ভারতবর্ষের সভ্যতা সত্বগুণাত্মক, এজন্য ত্যাগধর্মী। পাশ্চাত্য সভ্যতা রজোগুণাত্মক, এজন্য ভোগধর্মী। অধোমুখী বিনাশধর্মী তমোগুণ সত্ব ও রজঃগুণকে সর্বদাই অধোদিকে বিনাশ জন্য আকর্ষণ করিতেছে। এই অধোমুখী আকর্ষণকে প্রতিহত করার জন্য ত্যাগধর্মীর যেরূপ রজঃগুণকে আশ্রয় ভিন্ন অন্য উপায় নাই তদ্রূপ রজধর্মীকে সত্বগুণকে আশ্রয় ভিন্ন অন্য উপায় নাই। এজন্য ভারতের সভ্যতার বাণী "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"। এই বাণী শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসনে অভ্যস্ত হইলে পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। ভোগের এই সত্বগুণধর্মীরূপ ভারতবর্ষের নিজস্ব অজর, অমর অক্ষয়! এজন্য ভারতবর্ষের জগত্তারিণী নাম সার্থক!

ওঁ সত্যমেব জয়তে ওঁ

"সুবর্ণ-জয়ন্তী" বৎসরের প্রথম সংখ্যায় (গত আষাঢ় সংখ্যা) 'ভারতবর্ষ'-প্রতিষ্ঠাতা কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্তৃক অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষ'-র প্রথম সংখ্যার জন্য রচিত ও সেই সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ" নামক সঙ্গীতটি পুনঃ প্রকাশিত হবার পর, অনেক পাঠক-পাঠিকা আমাদের অনুরোধ করেছেন ঐ গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করতে। তাঁদের অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলালকৃত মূলসুরের স্বরলিপিটি প্রকাশ করা হল।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার জন্য লেখা হলেও এ গান সারা ভারতের, আর বিশেষ করে আজকের দিনে এরূপ দেশাত্ম-বোধক সঙ্গীতের প্রয়োজনও অনস্বীকার্য্য।—সম্পাদক।

"ভারতবর্ষ"

যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ
সে দিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি! জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রী!"
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাহিল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

২

সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা, চিকুর সিন্ধু-শীকরলিপ্ত;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল-কমল-আনন দীপ্ত;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে—তপন তারকা চন্দ্র;
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ,
গাহিল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

৩

শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট; সাগর-উর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চ সিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে।
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাহিল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

৪

উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি' অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিককলরবে, চুম্বি তোমার চরণ-প্রান্ত;
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রলয়-সলিল বৃষ্টি—
চরণে তোমার, কুঞ্জকানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি!
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ,
গাহিল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ।"

৫

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি।
জননি! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ;
—জগৎপালিনি! জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাহিল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

"ভারতবর্ষ"

মিশ্র ইমন ভূপালী—একতালা।

কথা ও সুর—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। স্বরলিপি—শ্রীআশুতোষ ঘোষ।

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১

স সধ্ - স র গ গ র্গ - গ - - গ - র গ র র র গ হ্ম - - - হ্ম গ র র গ ম প প প — —

যে দি - - - ন সু নী ল জলধি হইতে - - - উ ঠি লে জননি ভার - - - - ত ব — র্ষ

স - - দ্যঃ - - স্না - ন সি-ক্ত বসনা - - - চি কু র সি-ন্ধু শীক - - - - র লি — প্ত

শী - - র্ষে - শু - ভ্র তুষার কিরী - - ট সা গ র উ-র্মি ঘেরি - - - - য়া জ — ঙ্ঘা

উপ - - - রে প ব ন প্রবল স্বননে - - - শূ - ন্যে গরজে অবি - - - - - শ্রা — ন্ত

জন - - - নি তোমার ব-ক্ষে শা-ন্তি - - - ক - ণ্ঠে তোমার অভ - - - - য় উ — ক্তি

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১

হ্ম প ধ ধ - - - ধ ধ ন নধ প - প ধ ন ন - - ধ নর্স র্স - - -

উ ঠি ল বি - শ্বে সেকি ক ল র ব সেকি মা ভ - ক্তি সেকি - মা হ - র্ষ

ল লা টে গ রি মা বি ম ল হা - স্যে অ ম ল ক ম ল আন - ন দী - প্ত

ব - ক্ষে দু লি ছে মুক্তার হা - র প - ঞ্চ সি - ন্ধু যমু - না গ - ঙ্গা

লু টা য়ে প ড়ি ছে পিকক ল র বে চু - ম্বি তোমার চর - ণ প্রা - ন্ত

হ - স্তে তোমার বিতর অ - ন্ন চ র ণে তোমার বিত - র মু - ক্তি

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১

প — হ্ম প ধ ন ন - ন — ন র্স - - - - র্সন র্সর্রর্র - র্র - র্গ র্গর্সর্র র্গ র্গর্সর্রর্সর্র র্গ—

সে দি - - - ন তোমা - র প্রভায় ধরার প্রভা - - - ত হ ই ল গভী - র রা - - - ত্রি

উ প - - - রে গ গ - ন ঘেরিয়া নৃ - ত্য করি - - - ছে ত প ন তার - কা চ - - - ন্দ্র

ক থ - - - ন মাতু - ম্বি ভীষণ দী - প্ত ত - - - প্ত ম রু র উষ - র দৃ - - - শ্যে

উ প - - - রে জল - দ হানিয়া ব - জ্র করি - - - য়া প্র ল য় সলি - ল বৃ - - - ষ্টি

জ ন - - - নি তোমা - র স-ন্তা নত রে কত - - - না বে দ না কত - না হ - - - র্ষ

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১

র্গ - র্প - র্গ - র্র র্র র্স - - ধ - - প ধন ন ন - - ধ ন র্র র্স — —

ব - - ন্ দি ল সবে জ য় মা জ ন নি জগ - - ত্তা রিণি জ গ - দ্ধা — ত্রি

ম - - ন্ এ মু - গ্ধ চ র ণে ফে নি ল জল - ধি গ র জে জ ল দ ম — ন্দ্র

হা - সি - য়া ক থ ন শ্যা ম ল শ - স্যে ছড়া - য়ে প ড়ি ছ নি খি ল বি — শ্বে

চ - র - ণে তোমার কু - ঞ্জ কা ন ন কুসু - ম গ - ন্ধ ক রি ছে সৃ — ষ্টি

\+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১

র্গ - র্গ - র্প র - - র্ - র্গ র্স - - প ধ - ন - - নর্স ধ ন র্ - স - -

জ - গ - -ই পালিনি জ গ - ত্তারিণি জ গ - জ্জ ন নি ভার - ত ব - র্ষ

কোরাস্

\+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১

র্স - - র্স - - ন - - ধ - - প ক্ষ প ন ধ ধ ক্ষ ধ প ক্ষগ — —

ধ - ন্য হ ই ল ধ র ণী তোমার চ র ণ ক ম ল ক রি য়া স্প — র্শ

\+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১

প র্গ - র্ - - র্স র্স সধ - র্ র্স - গ - র গ ম গ র - স — ন্ র স

গা ই ল জ য় মা জ গ - ন্ মোহিনি জগ - জ্জ ন নি ভার - ত ব - র্ষ

স, র, গ, ম, প, ধ, ন, চিহ্ন দ্বারা মুদারার সাতটি স্বর প্রদর্শিত হইল। উচ্চ সপ্তক বা তারার স্বরের চিহ্ন রেফ; যথা, র্স; নিম্ন সপ্তক বা উদারার চিহ্ন হসন্ত; যথা ধ্। ক্ষ = কড়ি মধ্যম। এক একটি অক্ষর বা টান (—) একমাত্রা কাল স্থায়ী; স্বরের পর — চিহ্ন সেই স্বরের টান বুঝাইবে। উপরে লাইন যুক্ত একাধিক অক্ষর বা টান এক মাত্রা বুঝায়। সর, উভয় স্বর মিলিয়া একমাত্রা, অর্থাৎ প্রত্যেকটি আধ মাত্রা; রগরর, ৪টি মিলিয়া এক মাত্রা, প্রত্যেকটি সিকি মাত্রা কাল স্থায়ী, ৩টি এক সঙ্গে থাকিলে, প্রত্যেকটি ⅓ মাত্রা কাল, ইত্যাদি। নধ এইরূপ থাকিলে, উপরের স্বরটি কেবল ছুঁইয়া যাইবে। মপপ, প আধমাত্রা ও মপ আধমাত্রা (ম, ¼ ও প, ¼)।

একতালা দ্বাদশ মাত্রিক তাল; ৪ ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক তাল বিভাগে ৩ মাত্রা আছে। + চিহ্ন দ্বারা সম ও ০ চিহ্ন দ্বারা, অনাঘাত প্রদর্শিত হইল।

নর্ত্তকী

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বনমালী মিত্তির গলির অন্ধকার ঘরটা থেকে বড় রাস্তার ফ্লাট বাড়িতে উঠে এলো ওরা। দু পয়সা আসচে ঘরে। বড় বড় আপিস আর ক্লাব থেকে ডাক আসছে। প্রতি সন্ধ্যায় একটি নাচের জন্যে চল্লিশ। দুটো নাচ থাকলে পঁচাত্তর। নামটাও পালটে নিয়েছে বনলতা। ওটা আজকাল করতেই হয়। ছায়া চিত্র থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রেই একটু—চাহিদা বাড়লেই নামটা বদলাতে হয়। বনমালী মিত্তির গলির বনো এখন হয়েছে মালবিকা সোম।

ছোট বোন আর বিধবা মাকে নিয়ে দিব্যি আরামে আছে এখন বনলতা। ক্রমে চাহিদা বাড়ছে শুধু নৃত্যের নয়, পাণিপ্রার্থীর দলেরও। বনলতার বরাতে এখন বৃহস্পতি তুঙ্গে। কে জানত যে সেই রোগা মেয়েটা আজ শ্রীমতী মালবিকা সোম হয়ে উঠবে!

উঠুক। বনো সুখী হোক।—ভাবতে ভাবতে বনমালী মিত্তির গলির বাঁকের মুখে ছোট একটি বাইরের ঘরের একমাত্র বাসিন্দা যদুনাথ বিড়িতে আগুন ধরায়।

বনো এখন তার ক্লান্ত অবসন্ন কেরাণী মনের নাগালের

বাইরে। বছর ছয়েকের ভেতর কেরাণী যদুনাথের সঙ্গে বনোর আকাশ পাতাল তফাত হয়ে গেছে।

মাত্র ছ' বছর আগেও পনেরো বছরের বনো ছেঁড়া স্কার্ট পরে তার ঘরে এসেছে। চোখা নাকের দু পাশে টানা-টানা চোখ দুটি ছিল তখনো অসহায়।

—আট আনা পয়সা দিতে পারো যদুদা?

যদুনাথ বোঝে, নিশ্চয় সরষের তেল আনবার পয়সা নেই, নয়তো রেশনের চাল আনবার পয়সায় কম পড়েছে। আট আনার জায়গায় দশ আনা ওর হাতে গুঁজে দিল যদুনাথ।

বলতো,—দু আনা বেশী দিলুম, তুমি নিও।

চোখ দুটো ওর আনন্দে সজল হয়ে উঠতো, বলে উঠতো,—আমি নব? দু আনা?

—হ্যাঁ।

বলতে বলতে ওর ইচ্ছে হোত বনোর গা একটু ছুঁয়ে দেয়, কিন্তু পারতো না। চোখের পাতাটা কাঁপত। অসহায় ভাবে হাসত শুধু। হাতটার ভেতরের স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে যেতে চাইতো। হাত উঠতো না।

যদুনাথ বড় ভীতু। কাঁথির কাছাকাছি তার দেশ। দেশে মা বাবা ভাই বোনেরা থাকে। ও চাকরি করে কলকাতায়। থাকে একটা ছোট ঘরে, খায় হোটেলে।

বাড়তি খরচার ভেতর বিড়ি আর বনোদের দু পাঁচ টাকা সাহায্য করা। বনোর মা অবিশ্যি প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী করে, কিন্তু তাতে দুটো মেয়ে নিয়ে চলে না। অগত্যা ধার নিতে হয়, আর যদুর কাছ থেকে ধার নিলে সে ধার শোধ করবার কথা অনায়াসে ভুলে যাওয়া যায়।

যদুনাথও ধার দিয়ে ইচ্ছে করে ভুলে যায়। টাকাটাও সাহায্য বা দান বলেই ধরে নিয়েছে। যদুনাথ বড় ভীতু। ও বরাবর লক্ষ্য করেছে মাসীমা কখনো নিজে ধার চায় না, বনোকে দিয়ে চাওয়ায়। এর পেছনে কি কোন উদ্দেশ্য নেই?

থাকতে পারে। কিন্তু ভাবতে যদুনাথের ভয় হয়। একটা কল্পনা অবশ্য মনে মনে না করে পারে না যে, বিয়ে করলে বনোকে বিয়ে করা যায়। আর তাতে কোন বাধাও নেই। জাতে মেলে, তার ওপর গরীব। যদুনাথের মত পাত্র পেলে বর্তে যাবে ওরা।

কিন্তু কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেলো, যদুনাথ যেন ভাল করে বুঝতেই পারলো না। ভাল করে যখন বোঝবার চেষ্টা করলো, তখন বনোরা বনমালী মিত্তির গলি ছেড়ে বড় রাস্তায় ফ্লাট ভাড়া করেছে। বনোর চেহারা পালটে গেছে, নাম পালটে গেছে।

একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বিড়ি ধরালো যদুনাথ। ওর গলার নীচে বুকের ওপরের হাড় দুটো আরও উঁচু হয়ে উঠলো বিড়ির টানে, চোখ দুটো মার-খাওয়া কুকুরের মত জ্বলো। হাড় বারকরা বুকের বড় বড় লোমগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে ঠোঁটটা একবার জিভ দিয়ে চেটে বিড়িটার গোড়া ভিজিয়ে নিলো যদুনাথ।

বনলতার দেহটি বরাবরই বেশ পুষ্ট, অথচ লম্বা। গায়ের রঙ বোঝা যেত না, গায়ে সাবান পড়ত না কখনো। ময়লা জমে উঠতো ঘাড়ে সব চেয়ে বেশী। দোকানের সস্তা নারকোল তেল মেখে চুলে একটা বিশ্রী গন্ধ বেরোত।

তবু ভাল লাগত বনলতাকে। পনেরো ষোল বছরের পুষ্ট মেয়ে অনায়াসে সে স্কার্ট পরে ঘুরে বেড়াত রাস্তায়। নজর অনেক পড়লেও একটা নজরকেও গ্রাহ্য করতো না বনলতা। ভারী সহজ সাহসী মেয়ে।

ভালমন্দ খেতে পেলে তেলেজলে ধুয়ে মুছে বেশ সুন্দরী হয়ে উঠবে—এ কথা বুঝতে কারো কষ্ট হোত না। যদুনাথের তো নয়ই।

বিয়ে করলে এমনি একটি বৌ পছন্দই করতে হয়। যদুনাথ পছন্দ করেছিলো, কিন্তু মনে মনে। ওইটুকু মেয়ে, একটা কথা প্রাণ খুলে বলতে সাহস পেতো না।

বনলতা কি বুঝত? শেষের দিকটা যেন একটু বুঝতে পারত। কেমন একটু অন্য রকম হাসত। বলত,—এ মা, গায়ে তোমার কি ঘামাচি হয়েছে, মেরে দোব?

বলে যদুনাথের সম্মতির অপেক্ষা না করে পেছনে বসে পড়ে পিঠের ঘামাচি মারতে বসতো। যদুর তখন শ্বাস বন্ধ। ওর প্রতিটি আঙুলের স্পর্শ, নখের স্পর্শ সমস্ত স্নায়ু সজাগ করে ভোগ করতে চাইতো।

কি আশ্চর্য স্পর্শ বনলতার! বুকের ভেতরটা দপ দপ করে কাঁপত। স্কন্ধ বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ত; কিন্তু মোছবার সাহস হোত না।

যদুনাথ বড় ভীতু।

বনলতা অসাবধানে যতুর পিঠের ওপর ওর গা এলিয়ে দিতে চাইলে যতুনাথ পিঠটা সঙ্কুচিত করে সরিয়ে নিত। বনলতা পেছনে বসে মুচকী হাসত কিনা কে জানে! আর বসত না বনো। উঠে পড়তে পড়তে বলত,—পাঁচটা টাকা হবে তোমার কাছে? নয়তো তিনটে টাকা!

পাঁচটাই হবে। নীরবে পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার করে দিত যতুনাথ। মাসের বাইশ তারিখ, ওর হোটেলের খাবার টাকা হয়তো ধার করতে হবে। তা হোক।

বনোকে ও ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

বনলতা কতবার বলেছে—আজ আমাদের বাড়ি যেও যতুদা। মা পিঠে করেছে।

যতুনাথ উল্লসিত হয়েছে, ওর খুদে চোখ ঢুটো লোভার্ত হয়ে উঠেছে।

—যাবে তো?

ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিয়েছে যতুনাথ,—দেখি, যদি সময়—মানে ওভারটাইম খাটতে না হয়।

যাবার আগে বনো সাবধান করে গেছে,—না গেলে কিন্তু মা ভারী রাগ করবে।

যতুনাথ ওর ফাঁক ফাঁক দাঁতের পাটি বার করেছে, একে ঠিক হাসি বলে না। প্রাণের সঙ্গে কোন যোগ নেই। শুধু দাঁত বার করা।

বনো চলে গেছে। হয়তো সন্ধ্যায় যতুনাথ যাবে বলে আশাও করেছে। কিন্তু কিছুতেই যেতে পারেনি ও।

যতুনাথ বড় ভীতু। অপিস থেকে ঠিক সময়েই এসেছে। যাবার জন্যে প্রস্তুতও হয়েছে, কিন্তু বার বার যাবার চেষ্টা করেও যেতে পারেনি। কেন যেতে পারেনি ও নিজেও জানে না। ভয়টা যে কিসের, জিজ্ঞেস করলেও বলতে পারবে না।

এমন কি একবার জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে ওদের বাড়ির সামনে থেকে ঘুরে এসেছে, ভেতরে ঢুকতে পারেনি।

ও জানে, হয়তো বনো রাগ করবে, বনোর মা রাগ করবে, ও কিন্তু নিরুপায়। কিছুতেই ওদের ওখানে যাবার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে না।

গিয়েছিলো যতুনাথ। একবার নয়, ঢুবার নয়, পনেরো বার বিশবার গিয়েছিলো, কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তখন আঠারো উনিশ বছরের বনলতা পুরোদমে নাচ শিখছে। বিনে মাইনেয় নাচ শিখছে ওর কে এক অসীমদার কাছে।

অসীমদাকে ও দেখেনি কখনো। প্রথম প্রথম বনোর কাছেই তার কথা শুনেছে। বার বার শুনেছে। বলতে বলতে বনলতা একবার তাকিয়েও দেখেনি যে যতুনাথের মুখখানায় বেদনার গ্লানি কতখানি।

—অসীমদা যা হাসায় না? কথায় কথায় হাসাবে। নিজেও হাসতে পারে। দাঁত গুলো কি সুন্দর। হাসলে অসীমদাকে এত সুন্দর দেখায়!

যতুনাথ নীরবে শুনে গেছে।

—চুল কোঁকড়া কোঁকড়া, বড় বড়। নাচিয়েদের বড় চুল রাখতে হয়, জানো?

যতুনাথ জানতে চায় না, তবু শুনতে হয়।

—বলে দিয়েছে, অসীমদা আর ছ মাস। তারপর ষ্টেজে নাচব। তবলা বাজায় প্রদীপদা। প্রদীপদা' একটু বেঁটে, কিন্তু বাবুয়ানী খুব। পাতলা পাঞ্জাবী, পাজামা, গায়ে সেণ্টের গন্ধ। দেখতে কিন্তু বেশ। পরশু সিনেমা যাব প্রদীপদার সঙ্গে। টিকিট কেটে রেখেছে।

আরও কত দাদা আছে কে জানে। যতুনাথ বড় একটা নিঃশ্বাস বুকের ভেতর চেপে নেয়। একটা কথাও বলতে পারে না।

—গোটা ঢুয়েক টাকা দাও তো। খুব দরকার।

নীরবে পকেট থেকে ঢুটো টাকা বার করে ওর হাতে দেয় যতুনাথ। একটু প্রতিবাদ করবার সাহসও নেই ওর।

বড় ভীতু যতুনাথ।

সে ভয়টা শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে কেটে গেল।

মরিয়া হয়ে উঠলো যতুনাথ তখন, যখন দেখল বনলতা আর আসে না। মাসের ভেতর একটা দিনও আসবার সময় পায় না। যখন দেখলো যতুনাথ বনলতার গায়ের ময়লা ধুয়ে মুছে গিয়ে চিকচিকে মসৃণ হয়ে উঠেছে গায়ের রঙ, শাড়ির ডিজাইন চৌরঙ্গী-পাড়ার ফালতু মেয়েদেরও হার মানাচ্ছে। কখনো বা ঝুঁবিঝুনী, কখনো

বা ঘোড়ার ল্যাজের মত ঝুলছে বনলতার চুল, বড় বড় চোখের কোলে কাজলের রেখা পরেছে, ঠোঁটে আলতো ফিকে লাল রঙ।

মাথা ঘুরে গেল যতুনাথের। বনলতা এত সুন্দর। দেখলে চোখ ফেরাতে পারে না যতুনাথ, কিন্তু বনলতা চোখ ফেরায় না। চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যায়। কখনো বা চোখে একটু ঝিলিক দিয়ে জানান দিয়ে যায় যে সে যতুনাথকে চেনে।

আর টাকা চাইতে আসেনা বনলতা। না, আর একদিনও আসে না। আসবেই বা কেন? এখন ওর সাজগোজ চালচলন দেখলেই বোঝা যায় যে টাকার অভাব ওর নেই।

কি করবে যতুনাথ?

মরিয়া হয়ে একদিন বনলতাদের ঘরে গিয়ে উঠলো।

তখন বিকেল থেকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। আলো জ্বাললেও হয়, না জ্বাললেও হয়। গিয়ে দেখলো বনলতা ছিটের একটা বগল কাটা ব্লাউজ পরে পাতলা শাড়িখানি আলগোছে বুকের ওপর তুলে পা দু'খানা ছড়িয়ে বসে একটা পাতলা বই দেখছে।

— ওমা, যতুদা যে!

যতুনাথকে দেখে হেসে ফেলল বনলতা। কি সুন্দর সাজানো মুক্তোর মত দাঁত। এমন সুন্দর দাঁত ওর কে জানতো!

যতুনাথ মুখটা নীচু করে দাঁড়ায়।

বনলতার মা বেরিয়ে আসে।—কে রে যতু? এসো বাবা, এসো।

তবু যা হোক বনোর মা ওকে আহ্বান জানালো বসবার। ও তো বনোর মায়ের কাছে আরও অনেক উদাসীন ব্যবহার আশঙ্কা করেছিলো। বনোর মা তাকে বহুদিন আমন্ত্রণ জানিয়েও আনাতে পারেনি। তার শোধ নেবে ভেবেছিলো, কিন্তু তা কিছুই করলে না।

বনোর বোন পদ্মলতাকে বললে ওর মা,—তোর যতুদার জন্যে চা কর পদ্ম।

পদ্ম বনোর চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। রঙ কালো আর মোটা। ঠিক আগেকার বনোর মতই ফ্রক আর স্কার্ট পরে পদ্ম। যদিও বনোর মত সুন্দর ওকে দেখায় না, তবু কৈশোর যৌবনের সন্ধিতে পদ্মকে দেখতে খুব খারাপও লাগে না।

যতুনাথ ঘরে বসলো। বনোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। সময় কেটে গেলো কিছুক্ষণ, কিন্তু বনো এলো না, এলো পদ্ম চা হাতে।

যতুনাথ মুখ তুললো, বনো কই?

সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেললো।

পদ্ম হেসে বললো—দিদি তো এখন বেরোবে। আজ ওদের রিহার্সাল।

পরশু ষ্টেজে নাচবে।

অর্থাৎ বলল তার আসবার সময় নেই।

যতুনাথ চায়ে চুমুক দিলো—পরশুর পরের দিনও কি বনোর কাজ থাকবে?

—না থাকতেও পারে। কেন, কিছু বলবেন?

চা গলাধঃকরণ করে যতুনাথ বললে—না, এমন কিছু নয়। আজ উঠি।

এরপর পরশুর পরের দিন গেল। বনলতা নেই। পদ্মলতা এলো।

দিন সাতেক পরে আরেক দিন গেল। বনলতা তখন সেজেগুজে বেরোচ্ছে। নাচতে নাচতে এসে বললে, আমাকে কিছু বলবে যতুদা?

যতুনাথ ভয় পেলো না আজ, কিন্তু বলবারও কিছু পেলো না। যা ও বলতো তা বলা যায় না। বনোর সেটা বুঝে নিতে হয়।

বনলতা একটু অপেক্ষা করে বললে—দেরী হয়ে গেল। চললুম। অসীমদা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে। দেরী হলে অসীমদা ভীষণ বকে। বাব্বা, অসীমদা যা মানুষ না?

অসীমদা। আবার সেই অসীমদা। অসীমদার গাড়ি। কোথায় অপেক্ষা করছে বা কেন? কিছুই বলতে পারলো না যতুনাথ। নীরবে মুখ নীচু করে চলে এলো। বার বার চলে এলো, বার বার ভাবলো আর যাবে না। কিন্তু আবার গেলো, আবার ফিরে এলো।

এবারে সত্যিই বনলতা একেবারে চলে গেল তার নাগালের বাইরে। বনমালী মিস্ত্রির গলির বাসা ছেড়ে উঠে গেল বড় রাস্তার ফ্ল্যাটে, নাম হোল, মালবিকা সোম।

আর যতুনাথ? যতুনাথ দুদিন আপিস কামাই করলে।

বিড়ির খরচ বেড়ে গেলো ওর। জোলো চোখতুটো আরও সজল তো হোলোই না, শুকনো লিচুর মত নীরস হয়ে উঠলো।

কিছুই করলো না, কিছুই ভাবলো না। একটা চলন্ত জীবের মত যথারীতি আপিস করে চলল।

বছর তুয়েক কাটবার পর যতুনাথ বনলতা সম্পর্কে সমস্ত আশাই ছেড়ে দিলো। তবু কিছু মাত্র আশা না করেও মাঝে মাঝে ওদের নতুন বাসায় যেত। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, আশা নিয়ে নয়, শুধু বনলতাকে একবার দেখতে। চোখে দেখে ভাল লাগে—যেমন ভাল লাগে একটি ছবি দেখতে, সুন্দর একটি ফুল দেখতে রাস্তায় কোন রূপবতীর দিকে তাকিয়ে থাকতে।

বনলতা কখনো ওর সঙ্গে দয়া করে তুচারটে কথা বলত, কখনো বা ওর সামনে দিয়েই সিঁড়িতে চটির ফটাফট শব্দ করতে করতে বেরিয়ে যেত। যতুনাথের গালের ওপর যেন ফটাফট চটির ঘা পড়ত। তবু যতুনাথ দেখত, তাকিয়ে দেখত বনতলাকে যতক্ষণ দেখা যায়।

ও বনলতার কাছ থেকে আর কিছুই আশা করে না, তাই তার ব্যবহারে ওর মনে কোন বিকার জমতে পারে না। যতুনাথ নির্বিকার।

পদ্মলতা মাঝে মাঝে যেন ওকে সান্ত্বনা দেবার ছলে বলে,—এক কাপ চা করে দোব যতুদা'?

যতুনাথ কিছু বলবার আগেই পদ্মর মা বলে ওঠে,—এখন চা কি করে হবে শুনি। উনুনে ভাত চড়ান রয়েছে। পদ্ম মায়ের ওপর বিরক্ত হয়ে বলে,—তা হোক, আমি চা করে দোব স্টোভে করব।

ওর মা বিরক্ত হয়ে চলে যায়। বেশ বোঝায় ইদানীং যতুনাথের আসাটা পদ্মর মা খুব পছন্দ করছে না।

তবু যতুনাথ আসে। ও আসবে। বনলতাকে দেখতে আসবে। পদ্মলতার তুটো মিষ্টি কথা শুনতে আসবে।

দেড় বছরের ওপর যখন কেটে গেছে তখন মাঝে মাঝেই যতুনাথ শুনতো ওদের বাড়ি ফিল্মের মানুষরা যাতায়াত করছে। কে একজন ক্যামেরাম্যান ওদের বাড়ি মাঝে মাঝে খাওয়াদাওয়া করে, সে নাকি কথা দিয়েছে একবছরের ভেতর বনলতাকে নায়িকা করে দেবে।

যতুনাথ শোনে। পদ্মর কাছে শোনে। পদ্মর মায়ের কাছে শোনে। পদ্মর মা তো আড়াল থেকে যতুনাথকে শুনিয়েই বলে,—এখন সব বড় বড় লোক এখানে আসা যাওয়া করছে, আজে বাজে লোক এলে তারা কি মনে করবে কে জানে বাপু!

অর্থাৎ যতুনাথ বাজে লোক!

একটা কথাও বলে না ও। আসাটা আরও কমিয়ে দেয়। বনলতাকে যখন খুব বেশী দেখতে ইচ্ছে হয় তখন একবার এসে মিনিট সাতেক বসে চলে যায়।

এমনি করেও বছর তুয়েক কেটে যায়।

নির্বিকার হয়ে উঠেছে যতুনাথ। ওদের বাসায় যাওয়া আরও কমিয়ে দিয়েছে, ঘরে বসে অবসর সময়ে বিড়ি খায়, আর চিং হয়ে শুয়ে থাকে।

সেদিন বনমালী মিস্ত্রির গলির সেই ছোট ঘরটাতেই চিংহয়ে শুয়ে ছিল যতুনাথ। এবারে প্রায় মাস দেড়েক বনলতাদের বাড়িতে যায়নি ও। রোজ ঘরে এসে আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে চুপ করে শুয়ে থাকে, মাঝে মাঝে উঠে বসে বিড়ি খায়। এ ছাড়া আর কিছু করে না, কোথাও যায় না। ইদানীং মাঝে মধ্যে ওর মাথাটা ঘোরে, চলতে গেলে টলে পড়তে চায়।

আজও শুয়ে ছিল যতুনাথ।

দরজায় ধাক্কা শুনে চমকে উঠলো। সন্ধ্যায় আবার কে তার দরজায় ধাক্কা মারছে? ধীরে ধীরে শরীরটাকে টেনে তুলে দরজাটা খুলে দেখে পদ্মলতা।

পদ্মলতা যেন বেশ খানিকটা রোগা হয়ে গেছে। মুখটা শুকনো।

যতুনাথ অবাক হোল, কিন্তু শুধু—এসো—ছাড়া আর কিছুই বলল না। আলোটা জ্বাললো যতুনাথ।

পদ্ম ঘরে ঢুকলো।

যতুনাথ মাতুরের ওপর বসলো। পদ্ম তাকালো।—যতুদা'?

পদ্ম একটা অস্বস্তি বোধ করছে, বললো—দিদি তোমাকে ডেকেছে।

এবারে অবাক হোল যতুনাথ।—আমাকে?

—হ্যাঁ। তোমাকে। দিদি হাসপাতালে রয়েছে।

—হাসপাতালে? কেন?

—নাচতে নাচতে পড়ে গিয়ে পায়ের হাড় ভেঙে

গিয়েছিলো। দিন সাতেক আগে অপারেশন হয়েছে। যদুনাথ সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। জামাটা পরে বলল, চলো।

পদ্মর সঙ্গে তখনি বেরিয়ে পড়ল যদুনাথ। হাসপাতালে কি এখন দেখা করতে দেবে? দেখা করবার সময় তো পেরিয়ে গেছে।

না। কেবিনে আছে বনলতা। কিন্তু আর বোধহয় বেশীদিন কেবিনে থাকতে পারবে না। বলতে বলতে বনলতার মা আজ যদুনাথের সামনে চোখ মুছলো।

পদ্ম ওকে তাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

টাকা পয়সা যা ছিল, সবই তো ফুরিয়ে এলো। কি করে যে কি হবে বাবা?

আবার চোখ মুছল পদ্মর মা!

যদুনাথ একটা কথাও বলল না। ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়ল।

হাসপাতালে যেতে হবে। বনলতা ডেকেছে।

হাসপাতালে পৌছে বনলতার কেবিন খুঁজে পেতে দেরী হোল না। কেবিনের ভেতরে আলো খুব কম।

ধীর পায়ে ভেতরে ঢুকে বনলতার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো যদুনাথ।

বনলতার বড় বড় চোখ দুটো তার ওপর পড়েছে। ওর চোখদুটোয় ভীষণ ক্লান্তি আর নৈরাশ্য।

যদুনাথ টুলের ওপর বসলো।

বনলতার ঠোঁট দুটো কাঁপছে। কাঁদছে বনলতা।

যদুনাথ কাঁদতে পারে না! কথা বলতেও পারে না।

বনলতা পায়ের দিকের চাদরটা তুলে দিলো।

এতক্ষণে শিউরে উঠলো যদুনাথ। ডান পা-টা হাঁটুর ওপর থেকে কেটে বাদ দেয়া হয়েছে। কই, এ কথা তো তাকে পদ্ম বা পদ্মর মা বলেনি!

বনলতা কাঁদছে। বনলতা আর নাচতে পারবে না। না, জীবনেও আর নাচতে পারবে না। আর অসীমদা' প্রদীপদা' ক্যামেরাম্যান, বড় বড় লোক, তারা কি কেউ আর আসবে?

না, আর আসবে না।

যে মেয়ে এক পায়ে চলবে, তাকে আর কি কাজে লাগবে তাদের?

বনলতা কাঁদছে। আবার বনমালী মিস্ত্রির গলির অন্ধকার ঘর ওদের ভাড়া করতে হবে। আবার যদুনাথের কাছে আসতে হবে এক টাকা বারো আনা ধার নিতে—যে ধার আর কোন দিন শোধ হবে না।

আবার যদুনাথ স্বপ্ন দেখবে, বনলতার একটা পা নেই, তবু তাকে সে বিয়ে করেছে। বনলতা তার বৌ হয়েছে।

বনলতা কাঁদছে।

বনলতার এমন সাংঘাতিক দুরবস্থায় যদুনাথের হাসি পাচ্ছে। মনে মনে ও অজস্র হাসছে। মনে মনে হাসতে হাসতে ঘেমে উঠেছে যদুনাথ।

ঘামতে ঘামতে আবার হেসে উঠছে মনে মনে।

সম্বিৎ

প্রভঞ্জনকুমার রায় চৌধুরী, এম-এ.

স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা নিরন্তর কুলু কুলু তানে,
সাগরেতে মিলিবার কী যে তার
ব্যাকুল সাধন;
কাল বৈশাখীর নভে রুদ্রের প্রচণ্ড আয়োজন,
সবাই চলিছে যেন অন্তরের দুর্নিবার টানে।
বিরহের ব্যথা ভারে ভারাক্রান্ত
তরঙ্গের প্রাণে,
তটিনী-প্রেয়সী লাগি' আয়াস আকুতি অনুক্ষণ,
মিলন লগ্নের সুর অফুরাণ মৃদু আলাপন
ভরিয়া দিয়াছে দূর-দিগন্ত যে প্রেম জয়গানে।
অসহায় মানুষেরা আবর্ত্তিত মহাকাল-জালে,
সত্তার অস্তিত্বে তারা কেমন নির্ব্বাক্ সন্দিহান,
জরাজীর্ণ জীবনের সঞ্চয়ে নিয়ত আনমনা।
চেতন-বর্ত্তিকা জ্বলে সুদূরের মহাকাশ ভালে,
সংসারে আপাতঃ তুচ্ছ খুঁটিনাটি রিক্ততায় ম্লান,
তারাও যে এঁকে যায় সত্যের অমর আলপনা

রসসাহিত্যিক কেদারনাথ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

খাস বঙ্কিমী ভাষায় আমিরী-মেজাজে বলা যেতে পারে আমার পিত্রালয় কোন্নগরে নয়, বালীতে। 'এক নদী বিশ কোশ' হলেও এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গার একূল ওকূল দুকূলে মোটামুটি সম্প্রীতিই ছিলো, যাওয়া আসা কুটুম্বিতা হতো, আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধন গড়ে উঠতো। আবার রেশারেশি দলাদলিও ছিল না যে তা নয়, কিঞ্চিৎ হলাহলও ফুটতো ফুটবলের মাঠে, যাত্রা অপেরার প্রতিযোগিতায়, বাচের নৌকোর জোর টানে। আর সব ছাপিয়ে সব ডুবিয়ে রাণী রাসমণির পঞ্চকলস মন্দির দাঁড়িয়ে থাকতো নিবাত নিষ্কম্প হয়ে এক দক্ষিণপাণি দক্ষিণ দেবতার ইতিহাস বুকে নিয়ে, যেখানে সুরু হয়েছিল এক নতুন যুগের জয়যাত্রার কাহিনী। দেবী ভবতারিণী আজও ঢাক ঢোল ধূপ-ধুনো ফুল ফলের শত উপচারে পূজো পাচ্ছেন ভক্তদের কাছে, কিন্তু সেদিনের সেই মেঘাঙ্গী বিদ্যুৎবাহিনী এলোকেশীকে যিনি পাষাণকারা থেকে মুক্তি দিয়ে প্রাণবেদীতে স্থাপন করে মায়ের ছেলে হলেন, তাঁর স্মৃতিতে যে আজ ভরপুর পঞ্চবটীর আসন, পঞ্চমুণ্ডীর সাধন। কিন্তু ঈশানী যে আবার মিলিয়ে গেলেন পাষাণীতে, কথা যে ক'ন না তিনি, আশ্বাস যে দেননা, নির্ব্বাক বেদনা লুটিয়ে পড়ে পাথরের মেঝের উপর— নাই, নাই, সে নাই, যে কথা কওয়াতো সে নাই। তবু এপার মিলেছিলো ওপারের সঙ্গে, একালের সঙ্গে সেকাল। একটি প্রসন্ন প্রতীক, বরাভয়ের চিহ্ন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো বেলুড়ে, এমনি এক প্রতিষ্ঠান যার নাম আজ বিশ্বজোড়া, এক বিশ্বজয়ী বীর সন্ন্যাসীর দাক্ষিণ্যে।

ছেলেবেলা থেকে এই আনত-ছায়ায় গড়ে ওঠা বালকমনের অবচেতনে দক্ষিণেশ্বর নামটিই ছিল একটি মন্ত্রবীজ। বেদে আছে একটি আশ্চর্য্য মন্ত্র

'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্

আপ্তকাম ঋষি বলছেন—হে দেবতা, হে সবিতা, হে রসপ্রসবিতা, তোমার বামরূপ, রুদ্ররূপ ভয়ালরূপ আর নয়, রুদতী উষার মাঝখানে তুমি উদিত হও শিবময় কল্যাণময় ময়োভব ময়স্করব্রূপে—সেই প্রসন্ন মুখ আমায় রক্ষা করুক—বিপদে মোরে রক্ষা করে নয়, জীবনে মোরে রক্ষা করো—অর্দ্ধনারীশ্বর তুমি ভোগে ত্যাগে সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সমরূপে তুমি উদ্ভাসিত হও। সেদিন, সে ক্ষণ, সে শুভলগ্ন কখন আসে যেদিন শান্তি বচন বলতে পারি—

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতো, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্
—ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি

মন যেন প্রতিষ্ঠিত হয় বাক্যে, বাক্য যেন প্রতিষ্ঠিত হয় মনে। প্রকৃত সাহিত্যিক শুধু কথার বেসাতীই করেননা, শুধু রচনার শৈলী, বাগ্বৈখরী, তার প্রয়োগ, তার ধ্বনি নিয়েই তার মাথাব্যথা নয়, তিনি ডুব দেন হৃদয়ের গভীর রহস্যে, যেখানে পলে পলে যিনি হচ্চেন চিন্তামণি, জীবনের পাঠ তিনি নেন শুধু বেদবেদান্ত উপনিষদের চরম তত্ত্ব থেকে নয়, সাধারণ মানুষের লাভলোভ, হিংসা-রিরংসার মাঝ থেকেও। সাহিত্যিকের 'শিব' শুধু কৈলাসের তুঙ্গী নিরঞ্জনই নন, তিনি মনের মানুষ, মনের মাঝেও তাঁকে অন্বেষণ করতে হয়, তিনি যে ভিক্ষুক, তিনি যে ভোলানাথ, তিনি যে পাগল, তিনি যে দিগম্বর। জীবনের প্রতিটি অনুভূতি দিয়ে জীবনেশ্বরকে পেতে হয়—সাধারণের মধ্যেই যে অসাধারণ লুকিয়ে থাকেন। সেই 'থাকো' 'ক্ষ্যান্তো', 'মাধব,' 'ভাদুড়ী মশাই' বিপত্নীক সবজজবাবুর মধ্যেই রসদেবতার নিবাস।' সাহিত্যিকের কাজই হচ্চে তাকে উন্মোচন, উদ্বোধন, উজ্জীবন করা। কেদারনাথ তাই করে গেছেন—সেইজন্যই তিনি আমাদের নমস্য। চল্লিশ বছর পূর্বে নভেল নাটকের নিষিদ্ধ রসাস্বাদনে মন যখন ব্যস্ত, তখনই শুনেছিলাম হাস্যরসিক দাদামশাইএর

কথা পূর্ণিয়াতে থাকেন, কাশীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ। কে যেন বললে যে—আরে তিনিত দক্ষিণেশ্বরের লোক—পঞ্চগ্রামী মাধুকরী মন বললে—এতো আমার ঘরের মানুষ—গরবে গরবী হলুম তখনি।

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ?
তোর অথিক গুরু পথিক গুরু গুরু অগণন্।

শরৎচন্দ্র একদিন বলেছিলেন—যা সত্যই জানোনা, তা কখনো লিখোনা। যাকে যথার্থ উপলব্ধি করনি, সত্যানুভূতিতে যাকে আপন করে পাওনি, তাকে ঘটা করে ভাষার আড়ম্বরে ঢেকে পাঠক ঠকিয়ে বড় হতে চেয়োনা—এই সত্যনিষ্ঠা আর দরদই তাঁকে শরৎচন্দ্রের সমগোত্রীয় করে তুলেছে। হয়তো আজকের সাহিত্যের বাজারে তিনি আর ধ্বনিপণ্যবাহী নন। কবির ভাষায় কলরব মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণ ছেড়ে হয়তো তিনি নির্জন আঙ্গিনায় এসে বসেছেন, তবু তাঁর স্মৃতিচিহ্ন অনামিক হবেনা, খ্যাতিশূন্য অগোচরে অস্পষ্ট বিস্মৃতি ঘটাবেনা এটুকু বলা যায়। তিনি থাকবেন তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্যে ডিকেন্স এর মত ক্লাসিক্ হয়ে। প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ নাই-বা লাগলো সেখানে—সবকালের জন্য নমস্কার সেখানে নাই বা পেলাম—একটি বিশিষ্ট কালকে, একটি বিশিষ্ট সমাজ চেতনাকে কতকগুলি 'টাইপ'কে তিনি অমর করে রেখে গেলেন এটার কি কোন দাম নেই! কেদার বাঁড়ুয্যে মশাইএর হাস্যরসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার পিছনে আছে অন্তঃসলিলা এক অশ্রুধারা—কারুণ্যামৃতরসে ভরা। সেখানে বঙ্কিমের মত ethical manএর সংস্কারক মনোবৃত্তি নেই (হনুমৎ-বাবু সংবাদ, কমলাকান্ত মুচিরাম গুড় ইত্যাদি) সেখানে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যাঙ্গোজ্জল প্রতিবাদের দীপ্ত ছটা নেই, অমৃতলালের মত শুধু কথার প্যাচে অম্লমধুর পরিবেশন নেই, রবীন্দ্রনাথের মত সূক্ষ্ম সুমার্জ্জিত পরিমিতি বোধ নেই (রবীন্দ্রনাথ রামানন্দবাবুকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে একজন সাহিত্য অধ্যাপক প্রমাণ করে দিয়েছেন নাকি যে তাঁর লেখায় যথার্থ হাস্যরস নেই—দৃষ্টান্ত দিয়েছেন চিরকুমারসভা), প্রমথ চৌধুরীর মত এপিগ্রাম কণ্টকিত (শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমারবাবুর মতে) বুদ্ধির কসরৎ নেই, যোগেনবাবুর মডেল ভগিনীর মত তরল রসিকতা নেই বা ছদ্মনামী পঞ্চানন্দের তীব্রব্যঙ্গ বা সজনীকান্তের মত মননধর্মী বিচিত্র হুল নেই, আর পরশুরামের মত অবাস্তব বা অ-লৌকিক কল্পনা নেই, তবু সব মিলিয়ে স্থূল ও সূক্ষ্মের প্রাণরস-উচ্ছল সীমানায় কেদারবাবুর রসিকতা ডিকেন্স বা উডহাউসকেই স্মরণ করিয়ে দেয়—কারণ এর পিছনে আছে—

'আমায় পাছে সহজে বোঝ, তাইতো এত লীলার ছল
বাহিরে যার হাসির ছটা, ভিতরে তার চোখের জল'।

এখানে আছে শ্যামস্নিগ্ধ জম্বু বনচ্ছায়া। কেদারবাবুর সাহিত্যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ক্যালষ্টাক্, আঙ্কল টোবি নেই বটে, এমন কি গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ্ আসমানী নিমচাঁদও নেই, নেই গঙ্গেরীরাম বাট্‌পারিয়া, ন্যাপলা বা শ্রীমৎ শ্যামানন্দরা, তবু যাঁরা আছেন, তাঁরা আমাদের ঘরের মানুষ, অতি পরিচিতজন দশটা পাঁচটা আফিস করেন, বড় সাহেবের প্রশংসায় মুখর হন, ছোট সাহেবের কেচ্ছায় বিগলিত হন, হুঁকো হাতে চণ্ডী মণ্ডপে, ক্লাবে বা থিয়েটার পার্টির আড্ডায় পরচর্চা পরনিন্দার সঙ্গে 'কচে বারো' বা 'কাদের গজ' বা 'থ্রি নোট্রাম্প' ডাকেন। আজকের দিনে তাঁদের নাতিদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরা সিনেমা দেখেন, ডেলী প্যাসেঞ্জারী করেন, তারকাদের সমালোচনা করেন, বৈঠকখানা বাজারের সঙ্গে পোস্তার বাজারের দরের সামঞ্জস্য করেন, শিক্ষা-দীক্ষার পঞ্চতিক্ত ব্যবস্থার সঙ্গে পঞ্চ গব্যেরও বিধান দেন। কলকাতার বৃহত্তর পরিধির মাঝে শিক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের একটি অতি চমৎকার প্রতিকৃতিই দিয়ে গেছেন কেদারনাথ, বিশেষ করে যৌথ পরিবারের উৎক্রান্তির একটা চিত্র। সেকালে সমাজে সোস্যাল সিকিউরিটি হিসাবেই এই জয়েন্ট ফ্যামিলি প্রথা অনেকটা প্রচলিত ছিল। ভায়ে ভায়ে, খুড়োয় ভাইপোয় দুহাত জমি নিয়ে মারামারি হাতাহাতি থেকে আইন আদালত উকীল মোক্তার পর্য্যন্ত গড়াতো একথাও ঠিক—আবার ভাই ম'লে ভাইপোদের দুমুঠো জুটতো, ভাগ্‌নে ভাগ্‌নীরা গলগ্রহ হলেও শিক্ষা পেতো, পাত্রস্থ হতো।

কেদারবাবুর সর্বশেষ গল্প সমষ্টি "নমস্কারী"। শ্রীকুমারবাবুর মতে আশী বছর বয়সেও যে রসিকতার ধারা অক্ষুন্ন থাকতে পারে তার একটা বিস্ময়কর নিদর্শন। এখানে ছেলে, জিলেষরে অজ্ঞালে নাম মিলিয়ে রাখা হয় 'নিলাম্বর'।

বেইবধের টাকায় কোট কেনা হয়, সরকারী পেট্রোলে গাড়ী চলে। মেজর গাঙ্গুলী বড় অফিসার 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিথায়'। আবার ক্যাস্তোর গল্পটি বড়ই করুণ—সে আর তার স্বামী কলকাতায় কাজ করতো—মার অসুখ বলে পালালো। তার স্বামী তাকে ছেড়ে বিয়ে করেছে আর একটি ছোট জাতের মেয়েকে, কিন্তু ইংরাজী জানা। কেদারবাবুর কথাতেই বলি—বললুম—তাতে তোর কি ? ক্যাস্ত বললে—সে যে আমার বিয়ে করা, ধর্ম সাক্ষী করা স্বামী গো—আমি যে তাকে ভালোবাসি গো—আবার সেই কান্না।

বললুম—সে তো তোকে ভালোবাসে না।

—তা, নাই বা বাসল, আমি ত বাসি। তার থাবার কষ্ট, তার অযত্ন, আমি কি দেখতে পারি।

তাকে যদি দেখো দাদাবাবু···

—আমি যে তার বিয়ে করা, সুখে-দুঃখে আমরা যে এক—

—তাতো আর নেই—আছে দাদাবাবু আছে, ধর্মের কাছে আছে, মনের মাঝে আছে···মেয়ে মানুষের স্বামী না থাকলে আর কেউ থাকে না, পিরথিমী থাকে না। আছে এইটেই তার বড় কথা, বড় ঐশ্বর্য। ভগবানকে কেউ দেখতে পায় না কিন্তু তিনি আছেন। তাঁর নাম কয়ে লোকে বাঁচে আশায়ও থাকে···

ভাবি আজকের দিনে এই ডাইভোর্স, জুডিসিয়াল সেপারেশনের স্বাধীন দিনে কথাগুলো কেমন মানায়। 'না মঞ্জুর' গল্প না মঞ্জুর নয়।

শ্রদ্ধেয় সুসাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রীকুমারবাবু বলেন, কেদারবাবুর 'শেষ খেয়া'ই একমাত্র বই যেখানে হাস্যরসের বাইরে অবিমিশ্র গম্ভীর ভাবের রচনা স্থান পেয়েছে। অবশ্য গল্পে thematic contentএর মধ্যে unity নেই, কিন্তু রসবৈদগ্ধ্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলা যায় না।

আর একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে—লুপ্তোদ্ধারের হরপার্বতী সংবাদ, যেন পঞ্জিকার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাহিত্যিক বর্ষফল বলছেন। কথায় কথায় সখী জয়া বলছে—অহংকে আঁকড়ে ধরে মিথ্যাকে একদম সাফ করে ফেলেছে তারা। উমা বলছেন—বলিস্ কি! ভেতরে ভেতরে ঠিক ভুলটি ধরেছে তো! হবে না ? একদিন হতেই হবে তা জানতুম··· ভারত একদিন আচার্যের আসন নেবে, (অতুলপ্রসাদের মত ধর্মে মহান্ কর্মে মহান্ শুধু নয়)······যাই একবার শুনিয়ে আসি—

এদিকে শিব বসে আছেন মৌতাতের অপেক্ষায়, ঘন ঘন হাই তুলছেন। চক্ষু বুজে আছেন—এমন সময় উমার প্রবেশ, সেই পদশব্দ শুনে,—

শিব—হারামজাদা, এখন তোমার হুঁস হ'ল······

উমা—আমার মাথা, চোখ বুজেই···এদিকে যে শিবত্ব ঘোচে—

শিব—ঠিক বলেছো, পঞ্চত্ব ঐ হারামজাদাই পাওয়াবে ···হাই তুলতে তুলতে হাঁ বেড়ে গেলো—একবার দেখনা।

উমা—ওদিকে মন্দামি যে যায়···তোমার গেঁতোমি দেখে সুসভ্য শিক্ষিতেরা তোমার তক্কা না রেখে নিজেদের বুদ্ধির উপর নির্ভর করেছে, পুরুষকারে পৌছে গেছে। বেদান্তের পারে পৌছলে আমাদের আর পুঁছবে কে—তারা আর 'বাবা বাবা'ও করে না, 'মা, মা'ও করে না, স্বয়ংসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "সারবান্ সাহিত্য"এর কথা মনে পড়ছে।—সেখানেও নাটকের পাত্র-পাত্রী হচ্চেন হরপার্বতী।

হর—প্রিয়ে, পঞ্জিকার প্রথম সৃষ্টিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ষারম্ভ দিনে···তোমার কৌতূহল নিবৃত্ত করিয়া আসিতেছি, জীবিতবল্লভে', আজও কি এ সম্বন্ধে তোমার ধারণা জন্মিল না—

পার্বতী—প্রাণনাথ, জানোইত আমরা বুদ্ধিহীন নারী-জাতি, বিশেষতঃ আজকের বিবিদের মত ফিমেল স্কুলে পড়ি নাই—হৃদয়নাথ অর্হনিশি একমাত্র পতি চিন্তা ব্যতীত যাহার আর কোনো চিন্তা নাই তাহার স্মৃতিপটে অতো-গুলো মনুর কথা কিরূপে অঙ্কিত হইবে। হাজার হউক তাহারা পরপুরুষ ত বটে।

মানুষ কেদারনাথ সম্বন্ধে আমার বলবার অধিকার নেই, কারণ তাঁকে দেখিনি, জানি না, চিনিতামও না, কিন্তু আমার হৃদয়-অন্তঃপুরে তাঁর লেখা থেকেই এই অজাত-শত্রু, ভগবদ্বিশ্বাসী, নিষ্ঠাবান সৌম্য সহাস মানুষটির একটি অন্তরঙ্গ চেহারা গড়ে নিতে পারি।

কাশীসঙ্গীতাঞ্জলিতে পড়ি—

আমি বহু আশা লয়ে তব মুখ চেয়ে
এসেছি সকল ফেলি হে
আমার পুরাও গো আশা মিটাও পিপাসা
আমি ত্রিবিধ জ্বালায় জ্বলি হে
... ...
খেলার সময় নাহি যে গো আর
পারের সময় হয়েছে আমার
সন্ধ্যা দেখে ডাকি কোথা কর্ণধার
নায়েতে লও গো তুলি হে—
বালকের মত সারা বেলা গেছে
বেলা অবসানে চমক ভেঙেছে—

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী তিনি ছিলেন না, কিন্তু তাঁর মত একজন দরদী মরমী প্রেমী মানুষকেই যে আজ দরকার। যিনি বলবেন—

লোকেশ চৈতন্য ময়াধিদেব
মঙ্গল বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব
হিতায় লোকস্য তব প্রিয়ার্থং
সংসার যাত্রাং অনুবর্তয়িষ্যে।

আর— আমার এ ঘরে, আপনার করে
গৃহ দীপখানি জ্বালো হে।

কেদারনাথ সেইটুকুই করে গেছেন। পাষণ্ড ভণ্ড অকাল-কুষ্মাণ্ডদের ব্যঙ্গ করেছেন, 'মত্তমন্থর কুঞ্জ-পুঞ্জর পুঞ্জ অঞ্জন-বর্ণ'দের তাড়া করেছেন, আর কাশীপুরাধীশ্বরের কাছে গিয়ে বলেছেন—

চেতঃ সম্প্রতি চন্দ্রচূড়চরণ ধ্যানামৃতে বর্ততে।

কেদার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবিবাসরের একটি বিশেষ সভায় পঠিত।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক
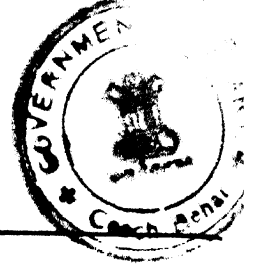
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আপনারা জননী বঙ্গভাষার পূজারী এবং পূজারিণী। আপনাদের পদধূলি দিয়ে আমাদের এই প্রাচীন নগরটিকে আপনারা ধন্য করেছেন। আপনাদিগকে স্বাগত জানাই। এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের কাব্যশাখার উদ্বোধনের ভার বঙ্গবাণীর এই দীন সেবকের উপরে অর্পিত হয়েছে। এতে আজ নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি।

কবি আপনারা। জাতির অন্তরলোকে একটা জ্যোতির্ময় ভাবরাজ্য রচনা করবার জন্যেই আপনারা বাঁশি হাতে আসেন যুগে যুগে। মানুষের মনের জীবনের সঙ্গে তার বাইরের জীবন অবিচ্ছেদ্যসূত্রেই গাঁথা। সুন্দরকে যে ভালোবেসেছে সে কখনও হৃষ্টচিত্তে এমন জায়গায় থাকতে পারে না যেখানে সবকিছুর মধ্যেই রুচির দীনতা। মানুষ তার মর্মের মধ্যে যে আদর্শ, যে স্বপ্ন, যে বিশ্বাস লালন করে তাদেরই রঙে তার সমস্ত জীবনটাই কি রাঙিয়ে যায় না? তাই একথা খুব জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করা যেতে পারে যে একটা জাতির জীবন গৌরবোজ্জ্বল হবে, না তমসায় আচ্ছন্ন থাকবে তা একান্তভাবে নির্ভর করে সেই জাতি তার আত্মার মণিকোঠায় কি রকমের স্বপ্নকে বহন করেছে তারই উপরে। বিজ্ঞানের এবং টেকনলজির গুণকীর্তনে আমরা পঞ্চমুখ। এই গুণকীর্তনের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। এর মধ্যে দোষেরও কিছু দেখি নে। কিন্তু বিজ্ঞানকে, টেকনলজিকে তার প্রাপ্য অর্ঘ্য দিয়েও একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। জড়শক্তিকে পদানত করার প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই; কিন্তু আরও প্রয়োজন মানুষের জীবনকে কল্যাণশ্রীতে এবং আনন্দে উজ্জ্বল করবার। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের দুলঙ্ঘ্য বাধাকে আমরা বহুল পরিমাণে অপসারিত করতে পেরেছি

নিশ্চয়ই এবং সে বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে। আজ যে বাধা মানবজাতির বিকাশের এবং অগ্রগতির পথে প্রায় অলঙ্ঘনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে সে বাধা physical নয়, moral অর্থাৎ আজ মানুষের অন্তরের বিদ্বেষ বুদ্ধিই তার উন্নতির পথে প্রবলতম বাধা হ'য়ে আছে। আণবিক শক্তির ভয়াবহ প্রকাশের সামনে জগৎ আজ নিশ্চিহ্ন হবার মুখে। তৃতীয় মহাযুদ্ধ মানেই তো মানবতার সুনিশ্চিত বিলুপ্তি। তাই তো আজকের দিনে যে সমস্যা চরম হ'য়ে দেখা দিয়েছে সে সমস্যা হচ্ছে নৈতিক সমস্যা, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে প্রেমের এবং করুণার উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার সমস্যা। ধূল্যবলুণ্ঠিত মানুষ আজ মানুষের কাছ থেকে মর্য্যাদা দাবী করছে। আর্ত্ত পৃথিবী সাম্যের আর স্বাধীনতার নূতন উষার মধ্যে নবজন্ম গ্রহণের জন্যে অধীর আগ্রহে আজ অপেক্ষা করছে।

সমস্যা যদি physical হোতো তবে বিজ্ঞানকে সহায় ক'রে আমরা তার সমাধান করতে পারতাম। কিন্তু সমস্যা যখন নৈতিক, Challenge যখন physical নয় moral, তখন প্রয়োজন সাহিত্যিককে, কবিকে, যাঁর লেখনীমুখে স্বর্গের আগুন, যাঁর বাঁশীতে সাম্যের আর স্বাধীনতার মহাসঙ্গীত, যিনি জীর্ণ এবং পুরাতনের বুকে হানেন বজ্র এবং আবাহনগীতি রচনা করেন নূতনের।

Produce great Persons, the rest follows, সেরা সেরা মানুষ তৈরী করাই হোলো বৃহত্তম কাজ। বাকী সব কিছুই আপ্‌সে হয়ে যাবে। সেজন্যে আমাদের ভাবতে হবে না। তাই তো এই নদীয়ার কবি দ্বিজেন্দ্রলাল পরাধীনতার অন্ধকারে অবসাদগ্রস্ত জাতিকে শুনিয়েছিলেন, 'আবার তোরা মানুষ হ'। আর বিবেকানন্দ আকুলকণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলেন: 'মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।' আত্মকেন্দ্রিক দুর্ব্বল কাপুরুষ মানুষকে মনুষ্যত্বের মহিমার মধ্যে রূপান্তরিত করবার ক্ষমতায় সাহিত্যের জুড়ি নেই—বিশেষতঃ কাব্য-সাহিত্যের। কেন? কারণ আবার বলি গীতার ভাষাতে, শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ। মানুষের আত্মা শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস দিয়ে তৈরী। তার বিশ্বাস যেমন, সংকল্প যেমন, স্বপ্ন যেমন, চিন্তার ধারা যেমন, তার জীবনও তেমনি ধারাই হবে। আর কবিদের কাজ কি? মানুষের অন্তরে ভাবের জগত গ'ড়ে তোলা, জাতির আত্মায় নূতনতর সংকল্প এবং স্বপ্ন সঞ্চারিত করা, জনসাধারণের চিত্তকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ দেওয়া। এ কাজে কবিরাই যুগে যুগে অগ্রদূতের ভূমিকা নিয়ে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে রামায়ণ মহাভারতের দান স্মরণ করা যেতে পারে। রামচন্দ্র তো মহাকবির স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের কি গরিমাময় স্বপ্ন। আর আদিকবি তাঁর মহাকাব্যে আদর্শ মানুষের যে-ছবি আঁকলেন ছন্দকে আশ্রয় ক'রে সেই জ্যোতির্ময় ছবি আজও লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে জীবনকে সত্যে, প্রেমে, করুণায় মহিমাময় করবার জন্যে।

জাতীয় জীবনে যদি সত্যনিষ্ঠার, প্রেমের এবং করুণার অভাব হ'য়ে থাকে সে নৈতিক অধঃপতনের জন্যে সাহিত্যিক এবং কবিরাই বিশেষভাবে দায়ী, একথা বললে কি খুবই অসঙ্গত কথা বলা হবে? আমরা কবিরা আমাদের ব্রত বিস্মৃত হয়েছি, মানুষের মহৎ জীবনের অধিকারী হবার প্রেরণা দেবার কথা ভুলে গিয়েছি। সাহিত্যে যেখানে মহান্ আদর্শের জয়ধ্বনির অভাব রয়েছে, কাব্য যেখানে শুধু সুন্দরকেই অর্ঘ্য দিতে আগ্রহান্বিত সেখানে গণতন্ত্র কখনোই মহিমাময় হ'তে পারে না। আমাদের মধ্যে সৌন্দর্য্যের প্রতি যে মজ্জাগত অনুরাগ রয়েছে তার কাছে কাব্যের আবেদন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যে কাব্য মহৎ তা শুধু সুন্দরকে প্রকাশ ক'রেই ফুরিয়ে যায় না। যে কাব্য কালের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হ'য়ে কবিকে কালজয়ী করে তা'র কাজ শুধু হৃদয়ের ব্যক্তিগত আবেগকে প্রকাশ ক'রে নিঃশেষিত হয় না। কালজয়ী কবির সৃষ্টি রসের ভিতর দিয়ে আমাদের চরিত্রকে দৃঢ় করে, আমাদের প্রেরণা দেয় মহৎ কাজ করবার। মহৎ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে আমরা নম্র হ'তে শিখি, যারা রুচিতে, বিশ্বাসে, আচরণে আমাদের থেকে স্বতন্ত্র, তাদের সম্মান দেবার উদারতা অর্জ্জন করি, জ্ঞানের অধিকারী হই এবং হৃদয়ের দরজা সকলের জন্যে উন্মুক্ত ক'রে রাখি। সে কবি চিরকালের তিনি শুধু শব্দের মাধুর্য্য দিয়ে আমাদের কানকে পরিতৃপ্ত করেন না, আমাদের আত্মার পরম তৃষাকেও তৃপ্ত করবার শক্তি তিনি রাখেন।

শেষ কথা, যে কবিতা উৎকৃষ্ট বলে গণ্য হবার দাবী রাখে তার ক্ষমতা থাকা চাই সকলকে আনন্দ দেবার। যে কবিতার ভাষা দুর্ব্বোধ্য, যার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণ পাঠক পাঠিকাদের পক্ষে কঠিন, যা শুধু জনকয়েকের চিত্ত বিনোদনের জন্য তাকে উৎকৃষ্ট কবিতা বলতে বাধে।*

---

* কৃষ্ণনগরে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে কাব্যশাখার উদ্বোধন উপলক্ষে পঠিত।

শিকার

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রায় নয় মাইল লোকালয় পিছনে ফেলে এসেছি। সারা দুপুর রোদ মাথায় নিয়ে, খাড়াই পাহাড়ে হাঁটা সম্ভব হোত না, যদি-না শিকারের নেশা আমাকে টেনে না নিয়ে চলত। ছাউনীআলা দুটো গরুর গাড়ী যোগাড় হয়েছিল। গোড়ার দিকে ছায়ার আশায় গাড়ীর ভিতরেই বসেছিলাম কিন্তু নুড়ীর ঠোক্করে ছাউনীর দুচারটে হেঁচ্‌কা মাথায় লাগায় আরাম সুবিধার লাগল না। গাড়ী থেকে নেমে পড়তে হোল—তারপর সারা রাস্তা হেঁটেই আসছি। টেনিস্‌সু-র রবার-সোল প্রায় গলে যাবার যোগাড়। পায়ের তলায় গরম অসহ্য হলে মাঝে মাঝে জল ঢেলে দিচ্ছি। এরই মধ্যে গাছের ছায়ায় দুবার বসেছি চলার ক্লান্তি দূর করার জন্যে নয়—জুতার ভিতর গরম জলে পা দুটো হেজে যাবার মত হয়েছিল একটু হাওয়া না লাগিয়ে পারি নি।

শেষ পর্য্যন্ত মালকোণ্ডা সেণ্টারে পৌছান গেল, বেলা আন্দাজ পাঁচটার কাছাকাছি হবে। শীতকাল, বিকেলের শেষে পাহাড়ী ঠাণ্ডা, জানিয়ে আসছিল। স্থানটি অন্ধ্রপ্রদেশে, করনুল অঞ্চলে। এখানে আর একবার বাঘ শিকারেই এসেছিলাম। এক বৎসর আগের কথা। সেবার গাছের উপর মাচান বাঁধার সময় না পাওয়ায়

মাটিতে বসতে হয়েছিল। মাটিতে এর আগেও বসেছি, তখন তাড়াহুড়া ছিল না, আড়ালের জন্য সব কিছু মনের মত করে গুছিয়ে নেয়া গিয়েছিল। কিন্তু গতবার সব কিছুই ওলোট পালট হয়ে গেল। ১৫—১৬ হাতের মধ্যে খোলা জায়গায় বাঘ পেয়েও গুলী চালাতে পারিনি। এই কারণে বে দরদীদের কাছ থেকে টিটকারী শুনতে হয়েছিল। অনেকে বলেছিলেন, সাহস যদি নেই তো বাঘের গায়ে বন্দুক ঠেকিয়ে শিকার করতে যাওয়া কেন? কথাগুলো আজও ভুলতে পারিনি।

সে রাত্রির ঘটনা বললে যে কোন অভিজ্ঞ শিকারী আমার উপস্থিতবুদ্ধিকে সমর্থন করবেন। ঘটনাটি এইরূপ। কৃত্রিম ঝোপ বানিয়ে তার আড়ালে মাটিতেই বসেছিলাম। বাঘের natural kill—আমার বসার জায়গা থেকে পনের হাত দূরে রাখা হয়েছিল যাতে সাধারণ বন্দুক দিয়ে এবং চোখ কান বুজে গুলী চালান যায়। L, G, ছর্‌রা হলে তো কথাই নেই। (আমি পারত পক্ষে L, G, ব্যবহার করি না, এবং এদিকে বাঘ মারার জন্য ঐ ছর্‌রার ব্যবহার আইন দ্বারা নিষেধও আছে।) গুলী চালানর বাড়তি সুবিধার জন্য চড়া আলোর ব্যবস্থা করেছিলাম। মোটরকারের head light আমার মাথার উপর ছাউনীতে বাঁধা হয়েছিল, ব্যাটারী ছিল আড়ালের মধ্যে। এই সব ছোটখাট বাঁধনের কাজ, টাট্‌কা ছেঁড়া গাছের ছাল দিয়ে হয়ে থাকে। গাঁটের মোচড় কড়া হলে বাঁধন ভালই হয়। কিন্তু নরম হলে, বাঁধন পিছলে ছালকে ধরে রাখতে পারে না। অন্ধকার হবার আগেই আড়ালের ভিতর বসতে না পারলে সব আয়োজনই পণ্ড হয়, কাজে-কাজেই যেমন তেমন করে আলো ইত্যাদির ব্যবস্থা সেরে লোকগুলো চলে গিয়েছিল।

রাত হতে, দূরে ফেউএর ডাক শুনলাম, কিন্তু বনের রাজার অগ্রদূত কাছে এল না। বুঝলাম, কোন একটা সন্দেহের কারণ ঘটেছে। ফেউএর ডাক থেমে যাবার পর কান খাড়া করে রেখেছিলাম। প্রায় ঘণ্টা খানেক নিশ্চল অবস্থায় বসেছিলাম। প্রত্যাশিত আগমনবার্ত্তার সঙ্কেত আবার পাওয়া গেল, একটু দূরে কয়েকটা শুকন কুটো ভাঙ্গার শব্দে। অতি সন্তর্পণে বন্দুকের বাঁট বগলে লাগিয়ে gun rest থেকে নল তুলে বাঁ হাতে ধরে রাখলাম। সময় কাটতে লাগল, আমার বুকের ভিতরটা থেকে থেকে ধড়ফড় করে উঠছে—যে কোন মুহূর্ত্তে একটি চরম ঘটনা ঘটার সম্ভাবনায়। আরও খানিকটা সময় কেটে গেল, তারপর হঠাৎ মরা গরুটাকে হিঁচড়ে টানার শব্দ শুনলাম। ঐ naturul kill, সুবিধার প্রয়োজনে খানিকটা নাড়িয়ে রাখতে আমার মত কয়েকজন জোয়ানকে হিমশিম খেয়ে যেতে হয়েছিল। বন্দুকের নলে ঝোলান তারে বাঁধা সুইচ লাগান ছিল, টিপে দিলাম, আলো পড়ল, মাটিতে, ঠিক আমার মুখের সামনে রঙ্গমঞ্চে foot light এর মত। মাটি থেকে ঠিকরে আসা আলো gun hole ভেদ করে আমার মুখের উপর এসে পড়াতে, চোখ ঝলসিয়ে দিল। বাঘ তখন অন্ধকারে মিশিয়ে আছে, ঠিকরান আলো যতটা ওদিকে পড়েছিল তাতেই দেখলাম—দুইটি জ্বলন্ত চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার দৃষ্টি একটু ধাতস্থ হতে আর দেখলাম, বাঁ হাতের উপর একটি বড়সড় তেঁতুলে বিছে নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে আছে। বাঘ সামনে আসার আগে কুটিভাঙ্গার শব্দ যখন শুনে-ছিলাম তখন বাঁ হাতে শুড়শুড়ি দেবার মত অনুভূতি বোধ করেছিলাম কিন্তু বাঁচা-মরার সন্ধিক্ষণে শুড়শুড়ির কারণ অনুসন্ধান করার অবসর ছিল না। এইখানে আমার শিকারে সহকারীর কথা বলে নেয়া দরকার। রাতের শিকারে পালা করে রাত জাগার জন্য একজন লোক সঙ্গে রাখি। আমি ঘুমিয়ে গেলে সন্দেহজনক কোন শব্দ শুনলে আমাকে জাগিয়ে দেয়। আমরা উপস্থিত ক্ষেত্রে উভয়ে জেগে ছিলাম। তথাপি লোকটি ভয় পেয়ে এমন একটি শব্দ করে বসল যে বাঘ গেল ঘাবড়ে এবং একটি হুঙ্কার দিয়ে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেল। বর্ণিত আবেষ্টনীতে এত কাছ থেকে ত্রাসজড়িত বাঘের বিরক্তি প্রকাশ স্বকর্ণে না শুনলে প্রতিক্রিয়ার কথা বোঝান যায় না। যাই হোক, লোকটা অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রইল, সারা রাত দুর্গন্ধের মধ্যে কাটালেম। শব্দভেদী অব্যর্থ বাণ চালানর মত রাইফেল থেকে গুলী বার করায় অভ্যস্ত হলেও vital partএ লক্ষ্য করা সেরা ওস্তাদের পক্ষেও অসাধ্য কর্ম্ম। সার্কাসের খেলায় এই ধরণের পারদর্শিতা দেখান সোজা, কারণ সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়ার কোন সর্ত্ত থাকে না, কিন্তু যেখানে nerveএর সঙ্গে লড়াই করে

তাগমারী করতে হয় এবং নিশানার এক ইঞ্চির ভুলে জীবন নিয়ে টানা-পোড়েন চলে, সেখানে আন্দাজে গুলী চালান ও হিসাব করে আত্মহত্যায় কোন প্রভেদ নেই। আত্মহত্যার প্রয়োজনীয়তা তখন বর্তমান ছিল না, তাই গুলী চালাতে পারিনি। আমার সাফাই গাওয়া শুনেও অনেকে মুচকি হাসির আড়ালে কাপুরুষ বলতে ছাড়েন নি।

আত্মাভিমান পিছু নিয়েছিল। ঐ বাঘকে আজও কেহ মারতে পারেনি শুনে আর একবার চেষ্টা করে দেখায় ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল। তখন বাঘের খবর আমার কাছে টেলিগ্রামে আসত। পরিচিত ফরেষ্ট অফিসারের কাছ থেকে তার পেয়ে ভিগুভামেটায় এসে উপস্থিত হলাম। স্টেশনটি মাদ্রাজ থেকে প্রায় চারশ মাইল হবে।

মালকোণ্ডার কথায় ফিরে আসি। স্থানীয় খবুরী যে ঠিকানা দিয়েছিল, তার বর্ণনা অনুসারে ঠিক জায়গাতেই এসেছি বলে মনে হোল, কিন্তু মাচান বাঁধার জন্য আগে যাদের পাঠিয়েছিলাম, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও দেখতে পেলাম না। ভোর হতেই ওরা দলবেঁধে বেরিয়ে পড়েছিল, আমরা এখানে পৌঁছবার আগেই মাচান বেঁধে রাখার জন্য। যাদের পাঠিয়েছিলাম, তাদের রাস্তা ভুল হবার কথা নয়, কারণ খবুরী নিজে তাদের সঙ্গে ছিল। আমি যাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম, তাদের ভিতর একজন পাচক, একজন শিকারী এবং আর একজন স্থানীয় কুলি। মাচান বাঁধার কৌশল ওদের মধ্যে কাহার জানা নেই। শিকারী নামে লোকটী বন্দুকধারী নয়, রাতজাগার জন্য সঙ্গে এসেছিল।

গাছের উপর রাত্রিবাসের কোন আশা না থাকায় রাতটা বেকার কাটানই স্থির হোল।

যে বাঘের সন্ধানে এসেছিলাম, তার ইতিমধ্যে নরখাদক হিসাবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ মারার খ্যাতি সংগ্রহ করেই সন্তুষ্ট হতে পারে নি, হিংস্র জীবটি নাকি গুণ তুকও জানে। স্থানীয়বাসিন্দাদের কাছে এ বিষয় দ্বিমত নেই, থাকার কথাও নয়। জনরব, অনেকে নাকি স্বচক্ষে দেখেছে, বাঘ নানারূপে আবির্ভাব হয় এবং দর্শন দানেই শিকারীকে অজ্ঞান করে ফেলে। অজ্ঞান না হলে বিলাতী বন্দুকের কল পর্য্যন্ত বিগড়ে দেয়, ঘোড়া (Trigger) টিপলেও বারুদ ফাটে না। এমন একটি জীবের আস্তানায়, খোলা জায়গায় রাত্রিবাস স্থানীয় লোকেদের পক্ষে যে কি ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়।

যেখানে আমাদের রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হোল তার সামনে অনেকটা জায়গা খোলা এবং অস্বাভাবিক রকমের পরিষ্কার। হঠাৎ দেখলে মনে হয়ে পাশাপাশি দুই তিনটি টেনিস কোর্ট করার জন্য জমিকে কেহ রোলার দিয়ে শুধু সমতল করে নি, লন মোয়ার lawn mower দিয়ে ঘাসকে পর্য্যন্ত ছেঁটে দিয়েছে। খালিজায়গার একদিকে মোটা ঝুরআলা বটগাছ—তার পাশেই ঝরণার জল বয়ে চলেছে। পানীয় জল অত কাছে পাওয়ায় কেহই বটতলায় রাত্রি-বাসে আপত্তি তুলল না।

ইতিমধ্যে লোকেরা রান্নার কাজে লেগে গিয়েছে। আমার কোন কাজ না থাকায় জায়গাটা একটু দেখার ইচ্ছা এল। আবেষ্টনীটী আমার ভাল লেগেছিল। থেকে থেকে অবর্ণনীয় নিস্তব্ধতা চুরমার করে লক্ষ লক্ষ ঝিল্লীর ডাক উঠছে এখানে ওখানে সেখানে, আবার থেমে যাচ্ছে, জঙ্গলের নিস্তব্ধতাকে রহস্যময় করে তোলার জন্য। স্তব্ধতার মাঝে ঝরণা-বহা জলস্রোতের ক্ষীণ ধ্বনি শুনছি, যেন তানপুরার গম্ভীর বাঁধা সুরে একটানা সারে-গামার যোগ ঘটেছে—রাগ রাগিণীর যাবতীয় উচ্ছ্বাস এক সঙ্গে জড় হয়ে সুরস্রষ্টাকে ডাক দিয়ে চলেছে কেবল ধ্বনির সাহায্যে সুন্দরকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য। সুন্দরের সাড়া গাছের পাতায়, অদৃশ্য বনফুলের গন্ধে এমন-ভাবেই ছড়িয়ে পড়েছে যে নিজের হিংস্র প্রকৃতি ও ভয়ঙ্কর শার্দ্দূলের কথা ভুলেছি। মন ব্যাকুল হয়ে উঠল প্রকৃতির রূপের সঙ্গে মিতালীর জন্য।

আমাদের আস্তানার ঠিক বিপরীত দিকে জঙ্গল খুব গভীর। বিশাল গাছের তলায় আগাছার ঝোপও বেজায় ঘন। ঐ দিকটাই আমাকে টানতে লাগল। সুন্দরের ডাকে অন্তরের রসিক সাড়া দিলেও শিকারী সাবধানতার কথা ভাবে নি এমন নয়, কিন্তু অতগুলি লোকের জটলা কাছে থাকায় নিশ্চিন্ত ভাবে মনকে আশ্বাস দিলাম ভয়ের কিছু নেই। তাছাড়া বন্দুকের বাক্সগুলিও ছাউনীর ভিতরে, এখন ও নামান হয় নি। ওগুলি নিচে নামিয়ে বন্দুক বাছাই করতে করতে অনেকটা সময় কেটে যাবে, দরকার নেই ভেবে, শুধু হাতেই এগুতে লাগলাম।

লোকজনদের ছেড়ে অনেকটা আসার পর খোলা জমির মাঝখানে জঙ্গল ঘেঁসা বাঁশঝাড় আমার দৃষ্টি আড়াল করল। সন্দেহকে সামনে রেখে জঙ্গলে হাঁটা আমার স্বভাব। সামনের দৃষ্টি একেবারে আড়াল পড়ায় পাশের ঝোপগুলির দিকে নজর রেখে চলছিলাম। হঠাৎ কোন ঝোপের ভিতর থেকে দাঁতাল বরাহ বেরিয়ে এসে আমাকে দোফলা করে দিলে অভিযোগ করারও অবসর পাব না। আপন মনে সৌন্দর্য্য-পিপাসুকে ধিক্কার দিলাম। কথায় বলে আপনি বাঁচলে বাপের নাম। বাঘ শিকারে এসে আত্মরক্ষার কথা ভুলে সবুজের সাড়া আর সুরের ঝঙ্কার নিয়ে মেতে উঠলে কুষ্টির দাপট যে বুনো আওতায় ঘায়েল হতে পারে তা ভাবা উচিত ছিল। কেন বলতে পারি না দোমনা হয়ে ফিরে যাবার ইচ্ছা এল, সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম কেহ যেন কানের কাছে বলে গেল, "কাপুরুষ"—পিছান গেল না এগুতে লাগলাম। কয়েক পা চলার পর দেখলাম—বাঘের পদচিহ্ন, দাগ পুরান ধূলির পরত পড়ে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে, চলার গতি কোন দিকে ছিল বোঝার উপায় নেই। বাঘ কত বড় তাও অনুমান করা চলে না। অন্য পায়ের দাগ একেবারে মিলিয়ে গিয়েছে। যাক একটা বিষয় নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, চিহ্নকে বিশ্বাস করতে পারলে ধরে নিতে হবে, বাঘের চলা ফেরা এদিকে আছে। চিহ্ন পুরান হলেও বাঘ দিন গুণে বিশেষ বিশেষ জায়গায় টহল দেয়। যে বাঘের অস্তিত্ব ধূলার দাগে দেখা গেল তার পুনরাবর্ত্তনের সময় যে সন্নিকট নয় তা কে বলতে পারে? যবেই এদিকে ফিরুক—উপস্থিত এ জঙ্গলে নেই কিম্বা থবুরীর দেয়া ঠিকানায় ফিরে আসে নি। পরীক্ষা শেষ করে বাঁশঝাড়ের দিতে এগুতে যাব এমনি সময় জঙ্গলের বেশ খানিকটা ভিতরে ঝোপের তলায় পাতার উপর শব্দ শুনলাম। শব্দ দ্রুতগামী শুকন পাতার উপর খস্ খস্ আওয়াজ আসছে। আওয়াজ ভারী জন্তুর চলায় নয়। সন্দেহ রইল না নিশ্চয় কোন বৃহৎ সরীসৃপ। সাপ, চলেছে বাঁশঝাড়ের দিকে, হয়—অজগর বা রাজ গোক্ষুর। হয়ত প্রেয়সীর পিছনে ধাওয়া করেছে, কারণ সহজ বা শিকার ধরার সময় চলার মধ্যে ছোটা ছুটি থাকে না।

রাজগোক্ষুর হলে এমনিতেই জীবটি বদরাগি, তার উপর প্রেমের উন্মাদনা স্কন্ধে ভর করলে সামনে বা আসে পাশের যে কোন জীবকে যমের বাড়ীর খবর দিয়ে দেয়। আমার চলা বন্ধ করে দিলাম। সাপের রাজা কেবল বুক দিয়ে হাঁটে না, শ্রবণের কাজও বুকদিয়ে সারে। সাপে কান দিয়ে শোনেনা, মাটির উপর যে আওয়াজ হয় তারই প্রতিধ্বনি উপলব্ধি করে হাড়-পাঁজরার উপর এবং এই প্রথায় শোনায় কিছুমাত্র ভুল হয় না। গতিশীল শব্দ যখন অনেকটা দূরে এগিয়ে গেল তখন আবার চলতে লাগলাম। চলার সময় আমার দৃষ্টি চার ধারে ঘুরছিল, মাটির দিকেও নজর ঠিক রেখেছিলাম—শুয়োর বা হরিণের যাতায়াতের কোন চিহ্ন পাইনি—এমন একটি জায়গায় বাঘ আসে কেমন করে বুঝলাম না।

চলতে লাগলাম। অনাহারী বাঘের কথা ভাবতে ভাবতে বাঁশঝাড়ের শেষ প্রান্তে এসে পড়লাম। মোড় ফিরতেই দেখি সামনে প্রকাণ্ড বাঘ! দশ বার হাত দূরে, পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে কান খাড়া করে কিছু দেখছে, হয়ত সাপ ঐ দিকেই যাচ্ছিল। আমার সমস্ত শরীর যেন হঠাৎ অসাড় হয়ে গেল,। পড়ন্ত রোদের আলো পিছন থেকে আসায় আমার চলন্ত ছায়া গিয়ে পড়েছিল বাঘের সামনে। ছায়ায় নড়া চড়ায় বাঘ মুখ ঘোরাল আমার দিকে। অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষকে অতকাছে দেখে বাঘও হতবুদ্ধির মত হয়ে গিয়েছিল। বিরক্তিপূর্ণ ও শ্লেষ্মাজড়িত কাশির মত আওয়াজ বেরিয়ে এল। আমি তখন বাঁচা বা মরা সম্বন্ধে নির্লিপ্ত হয়ে গিয়েছি। বাঘ আমাকে আক্রমণ করার পরিবর্ত্তে লাফ মেরে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে গেল। মুহূর্ত্তের ঘটনায় আমার হৃদ্‌কম্পন এমন একটি স্তরে উঠেছিল যে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হোল না, মাটিতে বসে পড়লাম। ঠিক পরের ঘটনা মনে নেই।

জঙ্গলীরা যখন আমাকে খুঁজে বার করল তখন আমি অজ্ঞান অবস্থায় মাটির উপর উবুড় হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান ফিরে আসার পর যে সব প্রশ্ন সুরু হোল তাতে বোঝা গেল অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বাঘের উপস্থিতি সম্বন্ধে ওরা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। বাঘের গলা খাকরাণীর আওয়াজ নিশ্চয় ওদের কানে গিয়ে পৌছায় নি। শুনলে আমার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য কেহ ব্যস্ত হোত না।

বটতলায় ফিরে এসে নানা কথা ভাবতে লাগলাম।

রাত্রে একটা কিছু বিশ্রী কাণ্ড ঘটবেই। মানুষ হোক, বলদ হোক যে কোন একটি প্রাণীকে টেনে নিলে আমাকে দুরবস্থায় পড়তে হবে। বলদ গেলে খেসারত দিতে হবে, মোটা টাকার ব্যাপার,মানুষ গেলে কি যে হবে তা অনুমান করা যায় না। শেষেরটির সম্ভাবনাই চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল। দুর্ঘটনার পর সকলে একত্রে চলে গেলে করছি কি? একরাশ বন্দুক আর টোটার সন্ধান পেলে ডাকাতের দল আমাকেই শিকার করে খুন করার পর সম্পদ নিয়ে চম্পট দেবে। ফাঁপরে পড়ে গেলাম। পিছনে ও দুই পাশেই গা-ঘেঁসা জঙ্গল; যে কোন দিক থেকে ইচ্ছা করলেই যা খুসী তাই যোগাড় করে নেওয়ার কোন অসুবিধা নেই। সবই নির্ভর করছে বাঘের খেয়ালের উপর। ভাবলাম মোষের বাচ্চাটা, বাঁ ধারের জঙ্গলে, আমাদের কাছ থেকে দূরে বেঁধে দিলে বাঘের দৃষ্টি নিরাপদ স্থানেই আগে পড়বে। মোষের বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম, Natural kill না পেলে live bait হিসাবে ব্যবহার করব বলে। যে ব্যবস্থাই করি, সারা রাত পালা করে পাহারা দিতে হবে। পাহারার ব্যবস্থা ঠিক হলেও পিছন ও দুই পাশ সামলান দরকার। পিছনটা দুইটি গাড়ী মুখোমুখি রাখলে কতকটা বেড়ার মত হয় এবং দুই পাশে ভাল করে আগুন জ্বালাতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া চলে—কারণ সামনের জায়গা খোলা। সামনে থেকে কোন বাঘকে শিকার ধরতে শুনি নি। আগুন থাকলেও সম্পূর্ণ নিরাপদ এমন কথা বলি না, তবে মোষের বাচ্চা আগুনের ওপারে থাকায়, শিকারের লোভ মোষের কাছেই আটক পড়তে পারে।

মনে মনে যে জল্পনা কল্পনা করছিলাম তা প্রকাশ করার আগে, যেখানে বাঘকে দেখেছিলাম সেই জায়গাটা ভাল করে পরীক্ষা করে আসা দরকার। হতেও পারে যা দেখেছি তা আগা গোড়াই কল্পনা।

সারা দুপুর রদ্দুরে হাঁটার পর ঝরণার ঠাণ্ডা জলে মাথা ধোয়ায় সর্দি-গর্মী মত নিশ্চয় একটা কিছু হয়েছিল। বাঘ দেখাটা নিরবচ্ছিন্ন কল্পনাই!

এইটুকু সময়ের ভিতর মনের অবস্থা তালগোল পাকানর মত হয়েছে। ঠিক ভাবে কিছু চিন্তা করতে পারছি না। এমন কি বাঘের অলৌকিক শক্তি পর্য্যন্ত বিশ্বাস করার জন্য মন প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে, কড়া দাওয়াইএর কৃপা একান্ত প্রয়োজন। দাওয়াইকে তরলাগ্নিও বলা চলে। ওষুধের পরিমাণ প্রয়োজনের অনুপাতে করা নিয়ম। অব্যর্থ ওষুধ কাছেই ছিল, বেশ খানিকটা গলাধঃকরণ করে ফেললাম। অল্পক্ষণের মধ্যে ঝিমান ভাব কেটে গেল। জবরদস্ত ওষুধের গুণে দেখতে দেখতে বে-পরোয়া হয়ে উঠলাম।

বন্দুকের বাক্স ইতিমধ্যে গাড়ী থেকে নামান হয়েছিল। আটপৌরে দোনলায় টোটা ভরে নিলাম। এক নলে L. G. আর একটায় lethal ball থাকায় নির্ভিক হয়ে উঠলাম, হঠাৎ সামনে বিপদসঙ্কুল কিছু পড়ে গেলে তিন ইঞ্চি L. G. ছর্‌রা সব কিছু সামলে নিতে পারবে। দূর থেকে নিশানা করে গুলী চালাতে হলে, lethal ballতো আছেই। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন জঙ্গল ঘিরে ফেলেছে। বৈদ্যুতিক টর্চ লাগান ভরা-বন্দুক নিয়ে, লোকেদের মানা সত্বেও যথাস্থানে এসে উপস্থিত হলাম। মাটির উপর বন্দুকে লাগান আলো ফেলতেই প্রমাণ হোল, শার্দ্দূল দর্শন ঠিকই হয়েছিল। বাঘ এইখানে শুধু দাঁড়ায় নি। দাঁড়াবার আগে অনেকক্ষণ আমাদের দিকে মুখ করে বসেছিল। লেজ নাড়ার দাগ থেকে অনুমান করা চলে মতলব ভাল ছিল না। অনেকগুলো লোক এক সঙ্গে থাকায় দিনের আলোয় ওদিকে যেতে সাহস পায় নি।

ওষুধ এর ভিতর কাজ সুরু করে দিয়েছে। ভয়ের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়েছি। বন্দুক ঠিকভাবে ধরে যে দিকে বাঘ চলে গিয়েছিল, সেদিকে নানা ঝোপের তলায় আলো ফেলতে লাগলাম—কোথাও জলন্ত চোখের পাত্তা পাওয়া গেল না। চড়া ওষুধ তখন ভিতরে রুখে উঠেছিল, বাড়ন্ত সাহস আমাকে ঠেলে দিল জঙ্গলের ভিতরে। উন্মাদের মত ঝোপ ভেঙ্গে চলেছি। কাঁটার সহিত সংঘর্ষণে, দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে—কাপড় ছিঁড়ে ন্যাকড়া হয়ে গিয়েছে, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, আমি চলেছি সামনের দিকে। গোক্ষুর, শঙ্খচূড় বা কালকেউটে দেখতে পেলে পা দিয়েই থেঁতলে দিতাম। দাঁতাল বরাহ তেড়ে এলে বলতাম—পথ ছাড়, বিরক্ত করিস না, কাজ আছে। বাঘ এসে গেলে গুলী চালাতাম—না, তাকে বসিয়ে উপদেশ দিতাম—হিংস্র প্রবৃত্তি ছেড়ে দেবার জন্য। তার সঙ্গে কত আধ্যাত্মিক কথা এসে পড়ত কে জানে।

নিরামিষ আহারের প্রস্তাব করে সজনে ডাঁটা থেকে আরম্ভ করে আলু বা কুমড়ো ও কাঁচকলা সিদ্ধর অপূর্ব্ব আস্বাদের কথা নিশ্চয় বলতাম। এই ভাবে চিন্তা করতে করতে, কতক্ষণ গভীর জঙ্গলের ভিতর ঘুরেছিলাম বলতে পারি না,শেষ পর্য্যন্ত চরিত্র-শুদ্ধি সম্বন্ধেমাংস ভুকের কোনরূপ আসক্তি না দেখে ফিরে এলাম আস্তানায়। চলার পথে চরিত্রশুদ্ধির কথা ভাবছিলাম, মাংসভুক্‌কে নিরামিষাশী করার চেষ্টায় আতঙ্ক এসে গেল। অবশেষে ওষুধ আমাকে সাধুবাবা করে ছাড়বে না তো! বেশীর ভাগ ছা মাখা সাধুকে আমি বাঘের চেয়েও বেশি ভয় করি। মানুষের কাছে আসতে চিন্তা সহজ হয়ে এল, পুনরায় সাবধানতার কথা মনে এল। এ বিষয় কি ভাবে আয়োজন হবে আগেই ভেবে রেখেছিলাম। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে নিতে খুব বেশী সময় লাগল না। উনুন জ্বালাবার জন্য সঙ্গে জ্বালানী কাঠ আনা হয়েছিল—কারণ যেখানে শিকারের প্রত্যাশা থাকে তার কাছাকাছি কোন গাছ থেকে ডাল কাটলে যে শব্দ হয় তাতে বাঘের নিজের আস্তানা ছেড়ে দূরে চলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। সদ্য-কাটা ভিজে ডাল, জ্বলতে চায় না। একটি মাত্র হ্যারিকেন লণ্ঠনে কেরোসীন তেল ছিল, সব নিঃশেষ করে চুলো জ্বালান হোল। মোষের বাচ্চাকেও যেখানে চেয়েছিলাম সেইখানে বেঁধে দেয়া গেল। গরুর গাড়ী দুটো পিছনে দেওয়ায় আমার একটু অসুবিধা হোল—কারণ গাড়ীর তলায় খড় বিছিয়ে আমি শুই। কি আর করা; হিম মাথায় নিয়েই রাত কাটাতে হবে।

ব্যবস্থা ভালই হয়েছিল, নিশ্চিন্ত হবার জোগাড় করছি হঠাৎ বাঁ দিকের বলদ দুটো ছটফট করে উঠল। চাঞ্চল্যের কারণ জানার জন্য জঙ্গলীদের বিদ্যালয়ে যেতে হয় না, ওরাও দেখলাম অস্থির হয়ে উঠেছে।

এইরূপ ঘটনার সম্ভাবনাকে মেনে নিয়ে ফিরে আসার পরই rifle, shot gun পিস্তল ও প্রত্যেকটির পৃথক উপরি টোটা উপযুক্ত ভাবে আমার পাশেই সাজিয়ে রেখেছিলাম। সাজান আমার আবার একটি বাতিক। rifle ও পিস্তলের টোটা ঠিক যে ভাবে চেম্বারে (Chamber) সাজিয়ে রাখার নিয়ম সেই ভাবে বন্দুকের বাইরে সাজিয়ে রাখাতেই নিজেকে বীরপুরুষ ভাবতে লাগলাম। সব কয়েকটি অস্ত্রের মালিকানা সত্ব নিয়ে দম্ভ করা চলে। Colt এর 40'5 prohibited borer পিস্তল তো বটেই। এক সঙ্গে সাতটি আগ্নেয়অস্ত্র (বিভিন্ন রকমের অস্ত্র দরকার হয় বিভিন্ন শিকারের জন্য, পুঁটিমাছ ধরার বঁড়শি দিয়ে যেমন কাতলা ধরা যায় না) সেই জন্যই রসদ ও শিকার বিচারে গুলী ও বন্দুকের ব্যবহার ও আলাদা হয়ে থাকে। রসদের অভাব হলে, হরিণ, ময়ূর বা ছোট পাখী মারার জন্য নানা রকমের বন্দুক কাছে রাখতে হয়। এই কারণে হাতী বা গণ্ডার মারার বন্দুককে এক-ঘরে করতে পারিনি সেগুলিও বন্দুকের বাক্সে এসে গিয়েছিল, আমাকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে ভাবতেও আনন্দ লাগে। তার উপর সব কয়টি অস্ত্রই বিশ্বাসী, প্রয়োজনের সময় কখন বিকল হয় নি—কখন বিপদে ফেলে নি। দূর থেকে বাঘের কলজে ফাটানর ব্যবস্থা কাছেই ছিল, হালকা ওজনের ·375 bore high velocity রাইফেল তুলে, যেখানে বসেছিলাম সেইখান থেকেই বাঁ দিকে মোষের কাছে আলো ফেললাম। ওদিকে আলো পড়তেই অতি মৃদু শব্দ শোনা গেল। শুকন পাতা মুচড়ে যাবার আওয়াজ। রাইফেল সংযুক্ত আলো এদিকে ফেলতে লাগলাম। অকস্মাৎ একটি ঝোপ বেশি রকম নড়ে উঠল—তার পরই দেখলাম দুইটি জ্বলন্ত চোখ। আগুন ঠিকরান দৃষ্টি বেশ খানিকক্ষণ আমার উপর নিবদ্ধ হয়েছিল। দুই চোখের মাঝখানে নিশানা করে ঘোড়া টিপে দিলাম। খট করে শব্দ হোল, গুলী বার হোল না। ঐটুকু শব্দেই বাঘ মুখ ফিরিয়ে নিল। তখন রাইফেল পরীক্ষা করার সময় ছিল না। দোনলা সাধারণ বন্দুক (shot gun) তুলে নিয়ে আবার একই জায়গায় আলো ফেললাম,চোখ দেখতে পেলাম না। আবেষ্টনী নিস্তব্ধ, কেবল বিকল (trigger)-এর খট্ শব্দ যেন আমার কানের পাশে পরিহাস সুরু করে দিল। বিশ্বাস-ঘাতকতার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, ওষুধের প্রতিক্রিয়া সাহস যোগান দেবার জন্য আমাকে প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক সাহসী করে তুলল। ভাবলাম হয়ত ছোট হরিণের চোখ দেখেছি। ওদের চোখেও আলো পড়লে ঠিক বাঘের মতই জ্বলে। জায়গাটা পরীক্ষা করা দরকার, হরিণের ক্ষুর মাটিতে দাগ ফেলে থাকলে বুক ফুলিয়ে বলা যাবে বাঘ শিকার করতে হলে

নিরীহ জানোয়ারের উপর গুলী চালান আমার ধাতে সয় না। এক কথায় ওদের সাজান টিটকারী অধম হয়ে যাবে। আমার অনুমান যে সত্যি তা প্রমাণ করতে হলে জায়গাটা স্বচক্ষে দেখে আসা দরকার। মোষের দিকে যাবার জন্য বন্দুক হাতে উঠে দাঁড়ালাম। আমার উদ্দেশ্য বুঝে একজন জামা টেনে ধরল। ঐটুকু টানেই বেসামাল অবস্থায় বসে পড়লাম, মাথার ভিতরটা চরখি বাজীর মত ঘুরতে লাগল। বুঝতে বাকি রইল না যে ওষুধের মাত্রায় হিসাবের গোল বাধিয়েছি। এমনই বেহিসাব যে বসে থাকাও সম্ভব হোল না, সামনেই খড়ের উপর সতরঞ্চি পাতা ছিল, বেহুঁসের মত শুয়ে পড়লাম।

এক ঘুমেই রাত কাবার হয়ে যেত, কিন্তু মাঝ রাত্রে সাংঘাতিক হট্টগোল উঠল। এক সঙ্গে সব কয়টা লোকের চিৎকার জলন্ত চুলোর কাঠ নিয়ে মাথার উপর ঘুরান এবং তার সঙ্গে বলদের বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা—সে এক তুমুল কাণ্ড। এই রূপ বিশৃঙ্খলা দেখেও আবার শুতে যাচ্ছিলাম। একজন ঠেলা মেরে বললে,বাঘ মোষ মেরেছে। বাঘের কথা শুনতে ঘুমের ঘোর কেটে গেল। ভারী রাইফেল নিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম,লোকেরা বললে, বাঘ মোষের উপর লাফিয়ে পড়ে এক ঝটকানিতেই ঘাড় মটকে দেয়, তার পর সকলে চিৎকার করে উঠতে মোষ ছেড়ে পালায়।

সামনের চুলো থেকে প্রত্যেকে একটি করে কাঠ তুলে নেয়ার এদিককার আগুন নিবে গিয়েছে। পাশের লোক জলন্ত কাঠ ধরেছিল, কব্জী ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত তিনটে বেজে কুড়ি মিনিট। মানুষগুলো সারা রাত জেগেই ছিল। এই ঘটনার পর আমারও ঘুম চটে গেল। কনকনে ঠাণ্ডায় হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। ভাবলাম গরম দাওয়াই আর একটু খেয়ে নি, কিন্তু সাধু হয়ে যাওয়ার ভয় থাকায় বিরত হলাম। ওষুধের প্রভাব এক ঘুমেই ঝিমিয়ে গিয়েছিল, গভীর রাত্রে পলাতক বাঘের পিছনে যাওয়া প্রয়োজন বোধ করলাম না। এই সুযোগে হালকা rifle এর cartridge chamber পরীক্ষা করে দেখলাম, টোটা সাজাবার সময় গুলী বাইরেতেই থেকে গিয়েছিল, chamberএ পোরা হয় নি। বড় rifle এর magazine boot টান মেরে দেখি এটির অবস্থাও তদ্রূপ, গুলী ভরি নি।

ওষুধের উপরই বিতৃষ্ণা এসে গেল, না হয় একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছিলাম তাই বলে প্রাণ নিয়ে খেলা! থারমস্ ফ্লাস্কে গরম চা ছিল, এক পেয়ালা খেয়ে সিগারেট ধরালাম এবং পাশের লোকেদের দিতে চাইলাম। ঠাণ্ডায় মুখের কাছে ঐ টুকু আগুনই আরাম দেয়। আমার লোকেরা সিগারেট নিল, কিন্তু গাড়োয়ান জুটো বেঁকে বসল। আচরণটি যে নির্বাক অভিযোগের নিদর্শন, তাতে আর সন্দেহ রইল না।

পরের দিন সকাল হতেই গাড়োয়ানরা বললে—তাদের গ্রামে ফিরতে হয়। মোড়লের মেয়েকে মরণাপন্ন অবস্থায় দেখে এসেছে। সকালেই মারা যাবার কথা—সৎকারে যোগ না দিলে ওদের একঘরে হতে হবে। অতএব পাওনা চুকিয়ে দেয়া হোক এখুনি ওরা রওনা হতে চায়। নির্দ্দিষ্ট সময় ঘোষণা করে মানুষ মরে এমন কথা পূর্ব্বে শুনি নি। ইচ্ছামৃত্যুর খবর মানতে হোল, অন্যথায় সকলে মিলে ষড়যন্ত্রে বসে যাবে এবং ফিরে যাবার প্রস্তাবে আমার লোকগুলিও যোগ দিতে পারে। আমার লোকগুলিকে আটকাতে হলে এখুনি মনখুসীকরা ঘুষ দেয়া দরকার, কাল বিলম্ব না করে মোটা টাকা বকসিশ দিয়ে ফেললাম। করকরে উপরি টাকা গাড়োয়ানদের সামনে আমার লোকেরা গ্রহণ করা সত্বেও গ্রামমুখী চালকরা প্রলুব্ধ হোল না। বাঘ মারতে পারলে আরো বকশিষ দেবার লোভ দেখানয়, আমার লোকেরা রয়ে গেল, কিন্তু এক গুঁয়ে গাড়োয়ানরা বিদায় নিল।

ওরা চলে যেতে, আমার লোকদের বললাম, মোষ যেখানে পড়ে আছে সেই থানেই থাকতে দে। তোরা তাড়াতাড়ি যা হোক কিছু খেয়ে নিয়ে একটু দূরে উঁচু গাছের উপর উঠে পড়। এত লোকের মাঝে যে বাঘ মোষ মারে, তার ক্ষিদে একটু বেশি। মোষের কাছ থেকে আমরা সরে গেলে বাঘ নিশ্চয় ফিরে আসবে। সকালেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যেতে পারে। বাঘ ফিরে আসার কথা জোর দিয়ে বলায় খাওয়ার কথা ভুলে গাছে ওঠার তাড়া পড়ে গেল। কপাল গুণে উঁচু গাছ কাছে ছিল না, ওদের দূরে যেতে হোল। যাবার আগে শিখিয়ে দিলাম,দুইবার গুলী চলার আগে গাছ থেকে নামবি না এবং বাঘকে মোষের দিকে যেতে দেখলে, চেঁচাবি না।

লোকগুলো চলে যেতে, আমিও হালকা রাইফেল নিয়ে মরা মোষটার কাছেই একটি গাছে উঠে পড়লাম। কথায় বলে "নেড়া কয়বার বেলতলায় যায়" গতরাত্রে ওযুধ আমাকে ভাল রকম শিক্ষা দিয়েছিল, Cartridge Chamber ভাল করে দেখে নিলাম।

বড় ডালে বসেছিলাম—১২, ১৩ ফিট উপরে হবে। গাছের পিছনে ছিল কাঁটা বন। কতকটা নিরাপদ বলা যায়, কারণ যতই আহারে লোভ থাক কাঁটাবন ভেঙ্গে বাঘ পিছন থেকে আসবে না। ডান দিক দিয়ে ঘুরে এলে গুলী চালানর অসুবিধা আছে কিন্তু ভোজনে বসতে হলে শেষ পর্য্যন্ত সামনেই আসতে হবে। কতক্ষণ আমাকে বৃক্ষারূঢ় অবস্থায় থাকতে হবে জানা না থাকায়, বসাটা একটু আরামপ্রদ করে নিয়েছিলাম। কাঁটার দুর্গ আগলে থাকায় পিছন দিকে ফেরার প্রয়োজন ছিল না, তাই দোফলা মজবুৎ ডালে আরাম করে বসেছিলাম। বন্দুকের নল আর একটি ডালের উপর রেখে বাঘের আগমন আশায় অপেক্ষা করতে লাগলাম।

জঙ্গল নিস্তব্ধ একটি পাখীর ডাকও শোনা যায় না। বসে বসে পায়ে ঝিনঝিনি ধরে গিয়েছিল। একটু নড়ে বসতে হোল। পাতার আড়ালেই ছিলাম, বাইরে থেকে আমাকে দেখতে হলে খানিকক্ষণ খুঁজতে হয়, কিন্তু আমার সামান্য নড়ায় গাছের তলায় কুটো ভাঙ্গার শব্দ শুনলাম। যেভাবে বসার ভঙ্গীতে আরাম কায়েমি হয়েছিল তাতে পিছন ফেরা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবু ফিরতে হোল। ফিরে যা দেখলাম তাতে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হোল। সেই প্রকাণ্ড বাঘ ঠিক আমার গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে। কি ভাবে কাঁটা বন পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে এখানে উপস্থিত হোল অনুমান করা শক্ত। বন্দুক ঘুরিয়ে বাঘের দিকে নেবার উপায় নেই, আরামের প্রণালী মস্ত বড় বাধা হয়ে আছে—আমার চার পাশে ডাল আর পাতা। ইতিমধ্যে বাঘ নিচের ডালে সামনের পা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার পা থেকে বাঘের থাবা মাত্র কয়েক ইঞ্চি তলায়। বাঁচার কোন রূপ উপায় না থাকায় সামনের দিকে বন্দুকের নল রেখেই বাঁট বগলে তুলে নিলাম, তারপরে ঘোড়া টিপে দিলাম। বিকট আওয়াজ করে গুলী বেরিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঘ আমার সামনে লাফিয়ে পড়ল। snap shot এ rifle এ বহুদিন হাত পাকিয়েছিলাম। বাঘকে সামনে পেয়ে আর একবার গুলী চালালাম। সামনের জমি থেকে একরাশ ধুলো উড়ে গেল, বাঘ ও আর এক লাফে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেল। দ্বিতীয়বার গুলী বার হবার পর যে হুঙ্কার ছেড়েছিল তা শুনলে গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়ে যায়। বুকের কাছাকাছি লক্ষ্য করেই বন্দুকের ঘোড়া টিপেছিলাম। গুলী চলার পর বাঘ যে ভাবে হুঙ্কার দিয়েছিল তাতে অনুমান করা চলে—নিশানা ফাঁকি দেয় নি কিন্তু মাটিতে ধুলো ওড়া এবং পুনরায় লাফ মেরে জঙ্গলে ঢুকে যাওয়ায় লক্ষ্যভেদ সম্বন্ধে আত্মশ্লাঘাকে জীইয়ে রাখা গেল না।

এখন কি করা যায়। দুইবার বন্দুকের আওয়াজের পর লোকেদের গাছ থেকে নেমে আসার কথা। বাঘ কি ভাবে জখম হয়েছে তাও জানি না। মোটের উপর গুলী লাগল কিনা সে বিষয় বা কেমন করে নিশ্চিত হওয়া যায়। বাঘ যেদিকে লাফ মেরে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেল সেই দিকেই লোকেরা গাছের উপর বসতে গিয়েছিল। ভড়কে যাওয়া অথবা জখমি বাঘের সামনে পড়ে গেলে—ফিরতি মানুষদের মধ্যে একজনের চলা চিরকালের জন্য বন্ধ হতে পারে। ওরা নিরস্ত্র অবস্থায় জখমি বাঘের আক্রমণে মারা পড়বে, আর বাঘ জখম করে বন্দুক হাতে গাছের উপর বসে থাকব? ঘটনাটি সম্পূর্ণ উপলব্ধি হতে গাছ থেকে নেমে এলাম। জঙ্গলের দিকে ঝোপ-ঝাপ ভাল করে দেখে নিয়ে যেখানে গুলী লেগে মাটির চাপড়া উড়ে গিয়েছিল, পরীক্ষা করলাম—একফোঁটাও রক্তের দাগ নেই।

লক্ষ্যভেদের ব্যর্থতাই আমাকে আশ্বস্ত হবার সুযোগ দিল। বাঘের গায়ে যখন লাগেনি, তখন লোকগুলো সশরীরে ফিরে আসতে পারবে। পরক্ষণেই পুরাণ অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিল high velocity rifle এর মারে রক্ত অনেক সময় কয়েক সেকেণ্ড পরে বার হয়। পুরাতন ঘটনা মনে পড়ার পর জঙ্গলের ভিতর ঢুকতে হোল। hair trigger প্রস্তুত রেখে এক পা দু পা করে ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম। খোলা জমি থেকে বেশিদূর আসতে হয় নি, দেখলাম কাঁটা ঝোপের অনেকটা জায়গায় আছাড়ের পর আছাড় খাওয়ায় থেঁতলে গিয়েছে—মরণ

কামড়ে ছোট বড় শক্ত ডালকে ডাঁটা চিবানর মত পিষে দিয়েছে—মাটিতে থোকা থোকা টাটকা রক্ত। গুলী লাগার প্রমাণ ভালই পাওয়া গেল, কিন্তু কোথায় লেগেছে না জানতে পারলে কতটা জখম হয়েছে বুঝি কেমন করে। অনেকে রক্তের রং দেখে বলতে পারেন হৃদয় ছেঁদা হয়েছে কিনা। আমার এই জ্ঞানটি ছিল না। রক্ত-ঝরা অনুসরণ করে একলা জঙ্গলের ভিতরে ঢোকার ভরসাও পাচ্ছিলাম না। অপরদিকে চীৎকার করে লোকেদের গাছ থেকে নামতে বারণ করলে, জঙ্গলের প্রতিধ্বনি আমার ভাঙ্গা তামিলকে এমন একটি ভাষা তৈরী করে ছাড়বে যার কোন মানে হয় না। তার উপর বাঘ যদি কাছেই পড়ে থাকে, তাহলে আমার চিৎকার শুনে কোন দিক এবং কত কাছ থেকে আক্রমণ করবে ঠিক নেই। আতান্তরে পড়ে গেলাম। কি করব ভাবছি এমনি সময় সামনের কাঁটা ঝোপ থেকে একটু দূরে গোঙ্গানীর আওয়াজ শুনলাম, অথচ ঝোপ নড়ার কোন ইঙ্গীত পাওয়া গেল না। গোঙ্গানীর আওয়াজে যথেষ্ট শক্তি ছিল, যার থেকে অনুমান করা চলে উত্থান শক্তি রহিত হলেও কাছে পেলে মানুষের উপরও মরণ কামড় দিতে ছাড়বে না। বাঘ কোনদিকে এবং কতটা দূরে আছে ঐটুকু জানতে পারাই আমার পক্ষে যথেষ্ট লাভ। জায়গাটা মনে মনে ঠিক করে ঐ দিকে এগুবার জন্য পা বাড়িয়েছি, বাধা এসে উপস্থিত হোল।

সশব্দে চলার আওয়াজ করতে করতে বাঘ আমার দিকে আসছে। পায়ের তলায় শুকনো কুটো ভেঙ্গে যাওয়া বা পাতা মোচড়ানোর কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। যে জানোয়ার নিঃশব্দে চলে তার এইরূপ আচরণ অদ্ভুত লাগল। বেশি এগুতে দেয়া উচিত হবে না ভেবে শব্দ লক্ষ্য করে বন্দুক তুলে ধরলাম। ট্রিগার টিপতে যাব এমনি সময় মানুষের অনুকরণে কাশির আওয়াজ শুনলাম। দিনের আলোতেই গা ছম্ ছম্ করে উঠল। রক্ষা পেলাম মানুষের কথা শুনে। কে একজন বললে "চুপ"। দুইজন বোধ হয় পাশাপাশি হাঁটছিল সুতরাং ওদের হাঁটাকে চতুস্পদীর চলা ভাবায় অন্যায় করিনি। যাক একটা প্রকাণ্ড ফাঁড়া কেটে গেল। শব্দ অনুসরণ করে লক্ষ্য ভেদের চেষ্টায় সফল হলে ওদের মধ্যে একটা মরত এবং আদালতে আমার প্রাণ নিয়ে টানা পোড়েন পড়ে যেত। বিপদ তখনও সম্পূর্ণ কাটে নি, চেঁচিয়ে বলতে হোল, এদিকে আসিস না বাঘ এখনও মরেনি। কথাটা শেষ হওয়া মাত্র লোকগুলো উল্টো দিকে ছুট দিল। একজন বোধ হয় আছাড়ও খেল। থানায় পড়ে থাকলেও চমৎকার।

দামী রাইফেলের গুলী খেয়েও বাঘ যদি না মরে তা-হলে শিকারীকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়—কারণ তার ইজ্জতের উপর জুলুম চলতে থাকে। এখন আমি করি কি? জখমি বাঘকে শেষ না করতে পারলে মানুষগুলোকে মৃত্যুর মুখে ফেলে দেয়া হয়, নিজেরও মুখ দেখাবার উপায় থাকে না। পায়ে হেঁটে বাঘ শিকারে আসা মানেই সাহসী হিসাবে আত্ম-বিজ্ঞপ্তির প্রচার। হত্যার সৌখিনতায় বন্দুকের শক্তি পরীক্ষা।

সব দিক ভেবে ঠিক করলাম, বাঘকে মেরে মড়াকে স্বচক্ষে না দেখলে টিটকারীর পীড়ন সহ্য করতে হয়। দম্ভের শাসন নত হতে দিল না, এগুতে লাগলাম। দিগভ্রমের সম্ভাবনা ছিল না, বাঘের গোঙ্গানীই জানিয়ে দিয়েছিল কোথায় সে আছে। বেশি দূর যেতে হোল না। একটি ঝোপের তলায় নরখাদকের পিছন থেকে খানিকটা পায়ের অংশ দেখতে পেলাম। পেট ও বুক ঝোপের তলায় আড়াল পড়েছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে কিনা জানতে হলে আর খানিকটা দেহ দেখা দরকার কিন্তু কাছে যেতে হলে পুরাণ উইএর ঢিপি মাড়িয়ে যেতে হয়। পায়ের চাপ পড়লে ঢিপির ডগা কি ভাবে ধসে যাবে কিছুই ঠিক নেই এবং ধসলে যদি টাল সামলাতে না পারি তাহলে আছাড়ের সঙ্গে বন্দুকের নল আমার মাথার খুলি পর্য্যন্ত উড়িয়ে দিতে পারে। খুলি না উড়লেও পুরাণ উইএর ঢিপি কেউটে বা গোক্ষুরের এক একটি কেল্লা। ওখানে অনধিকার প্রবেশের জন্য ছোবল মেরে আপ্যায়িত করলে জীবনের অবসান সুনিশ্চিত।

চিন্তা করে দেখলাম, এখনও যদি বাঘের আক্রমণ করার শক্তি থাকে তাহলে শূন্যে গুলী চালিয়ে ওটাকে ঝোপ থেকে বার করে আনা দরকার। চেম্বারে পাঁচটা টোটা ছিল। দুটো খরচ হয়েছে, আর একটা শূন্যে ওড়ালেও আত্মরক্ষার জন্য দুটো থাকবে। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে যতটা পারলাম পিছিয়ে গিয়ে যেটুকু দেহ দেখা যাচ্ছিল তাই লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলাম, বারুদ ফাটল, সমস্ত পাহাড় তোলপাড় করে গুলী চলার আওয়াজ জানিয়ে দিল আমার দম্ভের কথা। মরা বাঘকে ডবল করে মারলে সাহসের দাবী বাড়ে না, তবে নিশ্চিন্ত হওয়া চলে মানুষের হিংস্র প্রকৃতিকে সুস্থ রাখার জন্য একটি বুভুক্ষু আহারান্বেষী প্রাণীকে বধ করার আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করিনি। বলাই বৃথা, বন্দুকের শক্তির সাহায্যে আমার সাহস দেখানোর প্রমাণ আজও আমার ঘরে সাজান আছে। বাঘ মরেও নিষ্কৃতি পায় নি, আজও হয়ত চরিত্রশুদ্ধির কথা শুনছে।

সমাপ্ত

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিচারের মূলসূত্র

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এচ ডি, এম-এল-সি,

১

শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্যের 'বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস—প্রাচীন পর্ব' গ্রন্থখানির কতকগুলি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা ও সাহিত্যিক তথ্যসমূহের ব্যাখ্যায় অনেক স্থানেই নূতন আলোকপাত করিয়াছেন ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন। সমস্ত ক্ষেত্রেই যে এই সমস্ত নূতন ব্যাখ্যা সকলের নিকট গ্রহণীয় হইবে এমন কথা বলা যায় না। তথাপি বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ জাত নূতন নূতন ব্যাখ্যারীতির সমন্বয়ের দ্বারাই আদর্শ সাহিত্যের ইতিহাস রচনা সম্ভব হইবে। সেই জন্য তাঁহার এই প্রয়াস অভিনন্দন যোগ্য।

প্রথমতঃ তিনি প্রাচীন পর্বের বঙ্গসাহিত্যের যে শাখা বিভাগ করিয়াছেন তাহা প্রচলিত পদ্ধতি হইতে খানিকটা স্বতন্ত্র। সভা-সাহিত্য, গোষ্ঠী-সাহিত্য, জন-সাহিত্য ও ব্যক্তিসাহিত্য এই চতুরঙ্গ বিন্যাস হয়ত সাহিত্যের উদ্ভব প্রেরণার দিক দিয়া যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু বাস্তব ক্রমবিবর্তন রীতিতে এই পার্থক্য অনেকাংশে লুপ্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে মঙ্গল সাহিত্য সভা, গোষ্ঠী ও জন সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানপুষ্ট একটি সংকর শ্রেণীভুক্ত। পুরাণের অনুকরণের ফলে ও দেব মর্য্যদার বাহনরূপে উহা উহার আদিম উৎস জন-সাহিত্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া একটি মিশ্র পদবীতে আরূঢ় হইয়াছে। গোষ্ঠী ও সভাসাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ উহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ আদিতে রাজসভা প্রেরণা সঞ্জাত হইলেও এক ভণিতা ছাড়া অন্যত্র রাজসভার প্রভাব চিহ্নবর্জ্জিত। ব্যক্তিসাহিত্যে এক মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র ও শাক্ত পদাবলী ছাড়া অন্যত্র প্রায়ই অনুপস্থিত। তথাপি প্রাচীন যুগের সাহিত্যকে (তারাপদবাবু মধ্যযুগের বিশেষ অস্তিত্ব স্বীকার করেন না) এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে হয়ত উহার বিভিন্ন শাখার অন্তঃপ্রকৃতির কিছুটা মর্মোদ্ঘাটন হইতে পারে।

তাঁহার এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার গ্রন্থের বহু অধ্যায়েই প্রতিফলিত। 'চর্যাপদ' সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—কবিরা "তত্ত্বের বোঝা চাপাইয়া চর্যানীতিকে করিয়া তুলিয়াছেন—যৌবনে জরতী।... চর্যায় সমস্তই অসমাপ্ত, চিত্র, প্রসাধনকলা, তত্ত্বকথা সমস্তই অপরিস্ফুট।" অথচ চর্যার মধ্যে যে প্রাণশক্তি ও রূপকল্পনা নিহিত তাহা সমস্ত ভবিষ্যৎ বাংলা কাব্যকে প্রভাবিত করিয়াছে। অবশ্য এই বৈশিষ্ট্যের পিছনে কবি-মনের যে ভঙ্গীটি সক্রিয় লেখক তাহাকে উদ্ঘাটিত করেন নাই। চর্যাপদের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে তত্ত্বানুভূতি ও গোষ্ঠী প্রচার যতটা প্রবল ছিল বিশুদ্ধ কাব্যপ্রেরণা ততটা ছিল না। তত্ত্বাচ্ছন্নতার কুয়াশা ভেদ করিয়াই মাঝে মধ্যে কবিত্বের তীক্ষ্ণ স্বর্ণরশ্মি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহাদের বুঝাইবার যতটা আগ্রহ, চাপা দেওয়ার প্রেরণা, মর্মগুপ্তিপ্রবণতা তাহার অপেক্ষা কম নহে। তাছাড়া পদগুলির সংক্ষিপ্ত আয়তনও এই প্রকাশরীতিকে সঙ্কেতাত্মক করিয়া উহাদের দুর্বোধ্যতা বাড়াইয়াছে। কাজেই ইহাদের মধ্যে তত্ত্বচেতনা ও কাব্যচেতনার সুষ্ঠু সমন্বয় না হইয়া এক প্রকার অস্বস্তিকর যুগ্ম-অবস্থান ঘটিয়াছে। অর্দ্ধছিন্ন চিন্তাসূত্র, অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রয়াস, বিকলাঙ্গ চিত্রবিন্যাস, অবদমিত আবেগের অন্তঃরুদ্ধ অস্পষ্ট প্রকাশ এক প্রচণ্ড প্রাণশক্তি ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের রজ্জুধৃত হইয়া এক প্রকারের অবয়বসংহতিলাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে শক্তির যতটা পরিচয় পাই, সমাহিত সৌন্দর্যের ততটা পাই না। তত্ত্বাবিষ্টতার দুর্ভেদ্য অরণ্যানীর

মধ্যে যে সঙ্কীর্ণ সুঁড়িপথ, তাহারই অনুসরণে কাব্যের প্রথম হোঁচট-খাওয়া জয়-যাত্রার এখানে সুরু হইয়াছে। চর্যাপদের কাব্যমূল্য নির্ণয়ে কবিমনের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও রূপকল্প নির্মাণে অস্থিরতার, দর্শনতত্ত্বের কাব্যোন্নয়নের বিহ্বল প্রয়াসের কথা মনে রাখিতে হইবে।

কৃত্তিবাস সম্পর্কে আলোচনায়ও লেখকের সূক্ষ্মদর্শিতা ও বিচারস্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ আমরা বাল্মীকির সহিত তুলনায় কৃত্তিবাসের ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য জীবন ও অতি প্রগল্‌ভ ভক্তিরসের কবি বলিয়াই মনে করি ও তাঁদের হাতে যে মূল মহাকাব্যের মহিমা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা কুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করি। একজন আধুনিক সমালোচক কৃত্তিবাসের রামায়ণকে মহাকাব্য পদবী হইতে বিচ্যুত করিয়া উহাকে পাচালি কাব্যের নিম্নতর পর্যায়ে স্থান দিয়াছেন। তারাপদবাবু এই মতের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। কৃত্তিবাস বাল্মীকির মহাকাব্যের যে রূপান্তর সাধন করিয়াছেন তাহা অন্তঃ সঙ্গতিপূর্ণ ও সমকালীন বাঙালীর পুরাণ চেতনার সার্থক চিহ্ন। "বাল্মীকি যুগের সাহিত্যাদর্শকে কবি বাঙালীর উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেন নাই। বাল্মীকির সহিত তুলনায় কৃত্তিবাস যে কোথাও কোথাও উন্নততর ভাবাদর্শের প্রবর্তন করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্তও লেখক উদ্ধার করিয়াছেন। মোট কথা কৃত্তিবাস বাল্মীকিকে অনুসরণ করেন নাই, তাঁহার অনুসরণে পঞ্চদশশতকো-ত্তর, চৈতন্যলীলাপ্রভাবিত বাঙ্গালী সমাজে যে নূতন জীবনাদর্শ ও ভাবমহিমা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে রামচন্দ্রের জীবনচরিতের পটভূমিকায় তাহাই স্মরণীয়-ভাবে ও অস্খলিত কলাকৌশল ও সঙ্গতিবোধের সহিত পরিস্ফুট করিয়াছেন। সমগ্র জাতির মর্মমূলে অনুপ্রবেশ যদি মহাকাব্যের অন্যতম লক্ষণ হয় তবে সে লক্ষণ কৃত্তিবাসী রামায়ণে সুস্পষ্ট। বাল্মীকি যুগের ক্ষাত্র আদর্শ ও বীরত্বনিষ্ঠা পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বাঙালীর নিকট উপস্থাপিত করিলে উহা প্রত্নতত্ত্ব হইবে, কিন্তু প্রাণ-রসোচ্ছল, জীবন নিয়ামক সাহিত্য হইবে না। এই মতের সমীচীনতা বিশেষভাবে অনুধাবনীয়।

লেখকের ট্রাজেডি সম্বন্ধে ৮৮ পৃষ্ঠায় যে মন্তব্য তাহা আধুনিক সমালোচনার বিরোধী বলিয়াই মনে হয়। জীবনের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা, মূল্যবোধের সম্পূর্ণ উন্মূলন ট্রাজেডির ভাবভিত্তি হইতে পারে না. ইহাতে নৈরাজ্য-বাদই স্পষ্ট হয়। বরং আপাতব্যর্থতার মধ্যে জীবনের যে নিগূঢ় মহিমা ও অভিনব মূল্যবোধ নিহিত থাকে তাহাই ট্রাজেডির মূলসূত্র। রামায়ণ যদি ট্রাজেডি না হইয়া থাকে তাহার কারণ সমস্ত দুঃখাবহ ঘটনার মধ্যে অধ্যাত্ম বিশ্বাসের স্থির দীপ্তি, জীবনমূল্যবোধের বিপর্যয়হীন চিরন্তনতা।

নেপথ্য বার্তায় লেখক কৃত্তিবাস-জীবনীর যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা ঐ বিষয়ের সর্বাধুনিক গ্রন্থ সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'কৃত্তিবাস জীবনী'র সহিত অপরিচয়ের ফলে ঠিক যথার্থ হইয়া উঠে নাই। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে তিনি ঐ গ্রন্থখানির প্রমাণপঞ্জীর মানদণ্ডে নিজ সিদ্ধান্তকে তথ্যনিষ্ঠতার পূর্ণ আদর্শে স্থাপিত করিবেন।

চৈতন্যজীবনী গ্রন্থসমূহের আলোচনায় লেখক চৈতন্য-চরিতামৃতের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ও উহাদের প্রচার-ধর্মিত্বের পার্থক্যটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থগুলির মধ্যে ধর্ম বিষয়ে সমদর্শিতার অভাব ও চৈতন্য-জীবনীর অলৌকিকত্বের মাধ্যমে বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের যে নিগূঢ় উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা হয়ত সকলের নিকট গ্রহণীয় হইবে না। কিন্তু উহা যে আমাদের চিন্তাকে নূতন পথে পরিচালিত করিবে তাহা বলা যায়। তিনি চৈতন্য আবির্ভাবে বাঙালীর মনে ইতিহাস-চেতনার জাগরণ অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু অতিপ্রাকৃত ঘটনাও ভক্তির আতিশয্যজনিত অতিরঞ্জন প্রবণতার মধ্যেও যে ইতিহাস-চেতনার স্ফুরণ সম্ভব তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। রাম ও কৃষ্ণ জীবনের সহিত চৈতন্য জীবনের তথ্য সন্নিবেশের যে পার্থক্য, বাস্তব জগতের সহিত উহার যে প্রত্যক্ষতর সম্পর্ক তাহাই ইতিহাসজ্ঞানের আপেক্ষিক পরিণতির প্রমাণ দেয়। চৈতন্যলীলার ফাঁকে ফাঁকে লৌকিক জীবনযাত্রার যে খণ্ডিত ছবি ফুটিয়া উঠে, বিশেষতঃ অধ্যাত্মতত্ত্ব ও অবতার মহিমা পরিস্ফুটনের মধ্যেও লোকদের যে জীবনা-গ্রহ, সমকালীন জীবনের যথাসম্ভব যথার্থ চিত্রাঙ্কনের যে প্রবণতা লক্ষিত হয় তাহাই পৌরাণিক যুগের সহিত ঐতিহাসিক যুগের বর্ণনাভঙ্গীর বিভিন্নতায় আত্মপ্রকাশ

করিয়াছে। ধর্মপ্রধান ও লোকজীবনানুগ যুগের ইতিহাস-বোধ যে অভিন্ন হইবে ও একই মানদণ্ডে বিচার্য হইবে, তাহা আশা করা যায় না। লেখক নিজেই বলিয়াছেন যে জীবনচরিতকারদের সৃষ্ট চৈতন্যবিগ্রহ সম্পূর্ণভাবে ইতিহাস-গ্রাহ্য না হইলেও শাশ্বত ভাবসত্যের প্রতীক্।

বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতার সঙ্গে মত-বাদের কিছু অনুদারতার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যেই একটি দ্বৈতভাবের বীজ অন্তর্নিহিত। একদিকে উহার মূল প্রাকৃত প্রেমের আদিরসপ্রধান ইন্দ্রিয়াকূতির মধ্যে নিহিত। প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্যের রসবৈদগ্ধ্য ও ভাবচাতুরী ইহা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে। অপরদিকে এক ক্রম উপচীয়মান ভক্তিরসাবেশ এই প্রাকৃত প্রেমের সহিত নিজ স্রোতো-ধারা মিশাইয়া ইহাকে এক অতীন্দ্রিয় ভাবসৌকুমার্যের স্তরে উন্নীত করিতেছে। চৈতন্য-পূর্ব যুগে এই ভক্তির উৎস কোথায় ছিল তাহা ঠিক নির্ধারণ করা যায় না। তবে মোটের উপর বলা যায় যে ভক্তিশাস্ত্রসমাদৃত পৌরাণিক চেতনাই বাংলার কাব্যাকাশে এই ভাবসুরভি বিকীর্ণ করিয়াছিল। পুরাণকল্পিত রাধাচরিত্রই এই প্রেম ও ভক্তিরসের মহাসঙ্গমতীর্থ হইয়াছে। রাধার এক অঙ্গে প্রাকৃত কাব্যনায়িকার রূপদ্যুতি, অপর অঙ্গে ভাববিভোর মহাসাধকের দিব্য ভাবচ্ছটা। একদিকে তিনি আদর্শ কান্তা-প্রেয়সী, অপরদিকে তিনি ধ্যানতন্ময়া ইষ্টদেব পূজারিণী। মহাজন পদাবলীর পূর্বসূরী জয়দেব-বিদ্যাপতির কাব্যে এই উভয় ধারার প্রবাহ প্রায় সম-ভাবেই লক্ষণীয়। তাঁহাদের কাব্যে দেহ কামনার অকুণ্ঠিত প্রকাশ, কিন্তু তাহারই সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাকৃত ব্যঞ্জনার রূপাভিসারী স্পর্শ। চৈতন্যদেবের দৃষ্টান্তে এই প্রেম বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম সাধনার স্তরে উন্নীত—দেহ সৌন্দর্যের আবেশময় অজস্র বর্ণনাও এক নিগূঢ়তর ভাবসঙ্কেতে অপার্থিব আভায় ভাস্বর। চৈতন্যোত্তর কাব্যে এই দিব্যভাবমুগ্ধ রূপাবেশের প্রতিফলন। এখানে প্রতি অঙ্গের জন্য প্রতি অঙ্গ কাঁদে, কিন্তু এই অশ্রুপাত দেহার্তিকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া অপূর্ব অধ্যাত্ম-আকূতি বিহ্বলতা। শ্রীচৈতন্যদেবের বিগলিত ভাবকদম্বের দ্রবীভূত রূপ।

মনে হয় যেন ইক্ষুরসের মধ্যে মিছরির দানার অদৃশ্য অস্তিত্বের ন্যায় বৈষ্ণব কাব্যের রূপ পিপাসার মধ্যে এই তত্ত্বনিষ্ঠতার উপাদান গোড়া হইতেই প্রচ্ছন্ন ছিল। এই ভক্তিতত্ত্ব বাহির হইতে আরোপিত নয়, অন্তর্নিহিত সম্ভাবনারই আবিষ্কার। যেমন রাধাকে অবলম্বন করিয়া শৃঙ্গার ও ভক্তিরস একীভূত হইয়াছে, তেমনি রাধা প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া তত্ত্ব ও রসের এক অপূর্ব, স্বতঃস্ফূর্ত সমন্বয় ঘটিয়াছে। অনুভূতির আগুনে জ্বাল খাইয়া রূপানুরাগ অধ্যাত্ম-চেতনায় ঘনীভূত হইয়াছে। বৈষ্ণবকাব্যের রসাস্বাদন করিতে হইলে এই তত্ত্ব-পরিণতিকে বাদ দিলে চলিবে না। যে জাতীয় প্রেম উহার উপজীব্য তাহার ক্রান্তিবিন্দু (Climax) এই তত্ত্ব সোপানারোহী অরূপ-উপলব্ধিতে। হয়ত স্থানে স্থানে তত্ত্বের আতিশয্য লক্ষিত হয়—অপটু কবির হাতে ক্ষীণ রসপ্রবাহ তত্ত্বের মগ্ন শৈলে প্রতিহত হইয়া উহার গতিবেগ ও অবিচ্ছিন্নতা হারাইয়াছে। কিন্তু তারাপদবাবু যে বৈষ্ণব কবিতাকে কিশোর-কিশোরীর প্রেমকাহিনীর সঙ্গে সমার্থক মনে করিয়াছেন ও উহাকে প্রাকৃত সীমায় আবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছেন তাহা উহার অন্তরধর্ম-বিরোধী। মুষ্টিমেয় কবির কষ্টকল্পনা ও অনুচিত তত্ত্বপ্রবণতা শ্রেষ্ঠ কবিগোষ্ঠীর সার্থক সমন্বয় প্রতিভার, রূপ ও অরূপের মধ্যে শিল্পসুষমাময় সেতুবন্ধনের গৌরব লাঘব করিতে পারে না। যেমন দুগ্ধ মন্থন জাত নবনীত দুগ্ধেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, তেমনি অনুভূতির পৌনঃ-পুনিক আবর্তনসঞ্জাত, প্রাকৃত প্রেমের দিব্য রূপান্তর একটি অনিবার্য পরিণতি রূপেই গ্রহণীয়। বাৎসল্য রসের বৈষ্ণব পদ সম্বন্ধে লেখক যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা তাঁহার মৌলিক অনুভব শক্তির পরিচয়বাহী। "রাধা-ভাবের ন্যায় যশোদা-ভাব বৈষ্ণব কবি-জীবনে সত্য হইয়া উঠে নাই।" ইহার কারণ সম্ভবতঃ ইহাই যে রাধার ন্যায় যশোদা কোন মহৎ ভাব সাধনার প্রতীক হইয়া উঠেন নাই। রাধায় মধ্যে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের গোধূলি-রহস্য-নিবিড় মিলন—যশোদা কেবল লৌকিক মাতৃস্নেহের অধিকারিণী। তাঁহার বিরল মুহূর্তের চকিত লীলা-উপলব্ধি—যেমন মৃত্তিকাভোজী শিশুকৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপদর্শন ও তাঁহার রজ্জুবন্ধন অতিশায়ী বিরাটত্ব—বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর কল্পনাকে উত্তেজিত করিতে পারে নাই। বৈষ্ণব কবিতায় বাল-গোপালের চপল রূপ

ভঙ্গীর মধ্যে সৃষ্টি রহস্য দ্যোতনার নিগূঢ় মহিমা ফুটিয়া উঠে নাই।

পদাবলীসাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে লেখক যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর একদেশদর্শিতার সূত্র নির্দেশক। তিনি সম্পূর্ণরূপে মানবিক নায়কের আদর্শে এই রহস্য-অসঙ্গতিময় ভগবৎসত্তার বিচার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র আদর্শ নায়ক হইলে রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা এক মানবিক প্রেমের মাধুর্যসর্বস্ব কাহিনীতে পর্যবসিত হইত। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে আচরণের সমতা সম্ভব নহে। রাধা শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ একান্ত আগ্রহে কামনা করেন, শ্রীকৃষ্ণও যদি তাহার পূর্ণ প্রতিদান দিতে পারিতেন, তবে ত এই দেব মানবের প্রেম এক আদর্শ দাম্পত্য আকর্ষণের রূপ ধারণ করিত। অবশ্য রাধাও এই ঐশী প্রেমের প্রভাবে, ভক্তির নিবিড়তায় বিরহের তীব্র দহনে ও মিলনের অনির্বাণ আশায় এবং বিশেষ করিয়া সময় সময় তাঁহার অবাঙ্ মনসগোচর পরম দয়িতের মুখ হইতে অপূর্ব মাধুরীময় প্রণয় নিবেদনের উৎসারণে, মর্ত্য সীমা অতিক্রম করিয়া দিব্যরূপে উন্নীত হইয়াছেন। সেইজন্য বৈষ্ণবদর্শন তাঁহাকে মহাভাব-স্বরূপিনী ও ভগবানের হ্লাদিনী শক্তিরূপে অভিহিত করিয়াছেন। এই দৈবলীলা অস্বীকার করিলে রাধাকৃষ্ণ প্রণয়কাহিনী অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস ভারাক্রান্ত ও আতিশয্য বিড়ম্বিত বলিয়া বোধ হইবে। লৌকিক প্রেমের সঙ্কীর্ণ আধারে কি এই অবিরাম হৃদয় মন্থন, আবেগের এই কূলপ্লাবী উচ্ছ্বাস, ভাবকল্পনার এই অশ্রান্ত পক্ষবিস্তার, একই কথার এই ক্লান্তিহীন পুনরাবৃত্তি ধারণ করা সম্ভব হইত? সৃষ্টি রহস্যের অন্তহীন বৈপরীত্য, মানব নিয়তির চরম দুর্বোধ্যতা, হৃদয়ের অতলান্তিক বেদনা ও আকাশচারী উল্লাস যে পরমপুরুষের মধ্যে নির্দ্বন্দ্বভাবে সংহত হইয়াছে তাঁহাকে কি লৌকিক প্রণয়ের একনিষ্ঠতার সঙ্কীর্ণ ভাবভূমিতে ধরিয়া রাখা যায়। হৃদয়হীনতা, লাম্পট্য, শপথভঙ্গ প্রভৃতি অভিযোগ ত মানবিক প্রেমের বন্ধনে তাঁহাকে আবদ্ধ করার কুচেষ্টারই অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। যশোদার ন্যায় রাধিকারও বন্ধন-রজ্জু দুই অঙ্গুলি কম পড়িয়া গিয়াছে—মাতা ও প্রেয়সী উভয়ের নিকটই তিনি দামোদর।

নাথ সাহিত্য সম্বন্ধেও লেখক আমাদের কিছু নূতন কথা শোনাইয়াছেন। মঙ্গলকাব্যে আদিম কোন সংস্কারই অনার্য গোষ্ঠী প্রচলিত নূতন দেব-দেবীর প্রবর্তনের মূল উৎস। কিন্তু কালক্রমে হিন্দু পুরাণ এভাবে এই অর্বাচীন দেব-দেবী আর্যদের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। নাথ সাহিত্যে এক পুরাণবিরোধী সুনির্দিষ্ট ধর্মসাধনা বিধির নির্দেশনার জন্য ও পুরাণ সাহিত্যের সহিত আপেক্ষিক অপরিচয় ও উহার বিকৃতি সাধনের ফলে আদিম অনার্য সংস্কারটি অনেকটা অক্ষুন্নই রহিয়া গিয়াছে। কায়া সাধনা হিন্দু তন্ত্রসাধনা হইতে বিচ্ছিন্ন ও একক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত একটি খণ্ড চর্যা; উহার লক্ষ্য কেবল দৈহিক অমরতা লাভ ও ভোগসুখের চিরন্তনতা বিধান। ইহার অতিরিক্ত ঊর্ধ্বতর কোন অধ্যাত্মকল্যাণ ইহার কাম্য নহে। কাজেই নাথ সাহিত্য মঙ্গলকাব্যেরও পূর্বতন। আর্যধর্মের দ্বারা অতি ক্ষীণভাবে স্পৃষ্ট এক অনার্য গোষ্ঠীসংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। এই হিসাবেই ইহার একটি অসাধারণ তাৎপর্য আছে। চর্যাপদে যাহা দার্শনিক সূত্র সংক্ষিপ্ততায় ঈষৎ ব্যঞ্জিত, নাথসাহিত্যে তাহাই শৈশব কল্পনার বীভৎস অতিরঞ্জনে অতিস্ফীত, তত্ত্ব ব্যাখ্যার অতিপ্রসারে প্রগল্‌ভ ও কাহিনীর আশ্চর্য রসে কৌতূহলোদ্দীপক, বৃহৎ আখ্যায়িকার শাখা-পল্লবে দূরাস্তীর্ণ। ইহাদের মধ্যে মিল শুধু নাথ যোগীদের নামেই সীমাবদ্ধ নয়; উহাদের সমস্ত প্রকাশ পার্থক্যের মধ্যে অন্তর ধর্মের কিছুটা মিল মোটেই দুর্লক্ষ্য নয়। যে শবর-চণ্ডাল জাতির জীবন কাহিনী চর্যাপদে রূপক-ইঙ্গিতের মধ্যে ক্ষণদীপ্ত, সেই অন্ত্যজ শ্রেণীই নিজেদের অসংস্কৃত কল্পনা ও অমার্জিত ভাবানুভূতির প্রয়োগে নাথসাহিত্য-রচয়িতা রূপে আত্মপরিচয় রাখিয়াছেন। দর্শনসূত্র বিসর্পিত প্রসার আখ্যান কাব্যের অতিকায়তায় পুনরাবির্ভূত হইয়াছে।

নাথ সাহিত্যের এই মানবিকতাহীন, ধর্মবিকারগ্রস্ত, তত্ত্বাধিক্যের রক্তহীনতায় পাণ্ডুর রূপটি তারাপদবাবু অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত অনুভব ও প্রকাশ করিয়াছেন। পৌরাণিক দেবদেবী এখানে তাঁহাদের সমস্ত মর্যাদা হারাইয়া অত্যন্ত লঘু ও উপহাস্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। এমন কি শিব দুর্গা পর্যন্ত নাথসিদ্ধাদের অলৌকিক যোগবিভূতির নিকট অত্যন্ত নিষ্প্রভ হইয়া

গিয়াছেন। ছেলের হাতে ধারাল অস্ত্র পরিলে সে যেমন উহার যদৃচ্ছ প্রয়োগ করে ও বহুমূল্য শিল্প মূর্তিকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া নিজ খেয়ালী-পনার পরিচয় দেয়, নাথ-সাহিত্য রচয়িতারা পৌরাণিক কল্পনা লইয়া প্রায় তাহাই করিয়াছেন। রূপকথা ও ধর্মতত্ত্ব এক বিসদৃশ মিলনে সংহত হইয়া আদিম গোষ্ঠীর মানস বিশৃঙ্খলার পরিচয় দিয়াছে। এই ধুম্রপুঞ্জের মধ্যে কোথাও কোথাও মানবিক আবেগের তীব্রতা, কৃতি নির্ভর জীবন সত্যের উপমাসূত্র গ্রথিত সুস্পষ্টতা আশ্চর্য বৈপরীত্যের সহিত বিচ্ছুরিত হইয়াছে। যাহা পরিণত মননের নিকট অস্পষ্ট, তাহাই অনেক ক্ষেত্রে শৈশব দৃষ্টির নিকট বর্ণময় চিত্র-সৌন্দর্যে ও তীক্ষ্ণ অনুভূতি সারল্যে প্রত্যক্ষ। কাজেই তত্ত্বব্যাখ্যার নানা উপমা, অদুনা-পদুনা ও গোপীচন্দ্রের সরল, অকুণ্ঠ জীবন ভোগ স্পৃহা গুরুবাদের অলৌকিকতা ও কায়াসাধনের মন্ত্রগুপ্তির মধ্যে এমন আশ্চর্য স্পষ্টোক্তিতে বিবৃত হইয়াছে। চর্যাপদের তত্ত্বভাবুকতার পর্বত চূড়ালগ্ন কুয়াসা ঘেরা একটু রশ্মিরেখা ক্রমাবতরণে সেই পর্বতের পাদমূলস্থিত অবিন্যস্ত জঙ্গলের ন্যায় নাথকাব্যের যোজন বিস্তারে এক প্রকার আলো-আঁধারি মায়া বিকীর্ণ করিয়াছে।

মর্ম ও নাথ সাহিত্যের মধ্যে পরিকল্পনাগত পার্থক্যটিও লেখক পরিস্ফুট করিয়াছেন।

৩

তারাপদবাবুর মহাভারতের উপর আলোচনা নানা নূতনতথ্যপরিপূর্ণ ও উপাদেয়। মহাভারত সভাকাব্যরূপে আবির্ভূত হয় ও রাজসভার মনোরঞ্জনের জন্য যে উদাত্ত মধুর আবৃত্তিরীতি প্রচলিত ছিল তাহাই উহার ক্রমবর্ধমান অনভিজাত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকটও অনুসৃত হইয়াছিল। রামায়ণ গীতিকাব্য, কিন্তু মহাভারত গীতবাদ্য নিরপেক্ষ পাঠকাব্য। উভয় মহাকাব্যের পরিবেশনরীতির পার্থক্যই উহাদের অন্তর ধর্মের বিভিন্নতার দ্যোতক।

রামায়ণে গৃহধর্মের একছত্র আধিপত্য; এমন কি রণাঙ্গনেও গার্হস্থ্য প্রীতি ভক্তি কোমলতা অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে। মহাভারতে রাষ্ট্রধর্ম গৃহজীবনেও অনুপ্রবিষ্ট। "কুরু পাণ্ডব কাহারও গৃহজীবন নাই।" পাণ্ডব পরিবার পাণ্ডব শিবিরেরই সম্প্রসারণ; পাণ্ডব ভ্রাতৃবর্গের দাম্পত্যজীবন সুকঠোর রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এক পত্নীর পঞ্চস্বামীত্বের মধ্যে নির্বিকার আত্মবিভাজনের উদাহরণ। কৌরবপাণ্ডবকুলের কোন নারীরই স্বতন্ত্র, আত্মনিষ্ঠ সত্তা নাই, সকলেই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত খণ্ড সত্তার অধিকারিণী। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জননী ব্যাসদেবকে ভজনা করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছিলেন; পাণ্ডব-জননী এই দৃষ্টান্ত-গুলি মহাভারতীয় যুগে গার্হস্থ্য নীতির এক বিরাট বিপর্য-য়ের নিদর্শন। কুন্তী মাদ্রীও পঞ্চদেবতার অনুগ্রহে সন্তান-বতী। দ্রৌপদী-সুভদ্রা উভয়েই বীর্যশুল্কে আহৃতা; অর্জুনের অন্যান্য মহিষীবৃন্দ—উলুপী ও চিত্রাঙ্গদা—ও ভীমের রাক্ষসী স্ত্রী হিড়িম্বা সকলেই অকস্মাৎলব্ধ, কেহই শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী অভিলাস-সম্প্রদত্তা নহে। ইহাদের সহিত স্বামীদের সম্পর্ক অত্যন্ত শিথিল ও ইহাদের ব্যক্তি জীবনের ইতিহাস সম্পূর্ণ অনুল্লিখিত। কৌরবমাতা গান্ধারী এক অসম্ভব আদর্শের অনু-করণে স্বেচ্ছায় স্বামীর অন্ধত্ব দুর্ভাগ্যের অংশভাগিনী হইয়াছেন। কৌরব সভায় মাঝে মাঝে তাঁহার অগ্নিগর্ভ সতর্কবাণী উচ্চারিত হইতে শোনা যায়। কিন্তু তথাপি মোটের উপর এক দ্রৌপদী ছাড়া মহাভারতের আর কোন নারীই অকুণ্ঠিত ব্যক্তি-সত্তার দীপ্তিতে প্রকাশমানা নহেন। দ্রৌপদীও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছেন প্রেম মমতাস্নিগ্ধ গার্হস্থ্য জীবনে নয়। অনির্বাণ ক্ষত্রি শৌর্যের ও স্বতন্ত্র প্রতিহিংসা সঙ্কল্পের আগ্নেয় পরিবেশে। তারাপদবাবু সত্যই মন্তব্য করিয়াছেন দ্রৌপদী নামে মা, পাণ্ডব পত্নী। কিন্তু আসলে ষষ্ঠ পাণ্ডব। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ইন্ধন প্রদানেই তাহার নারীত্ব নিঃশেষিত। রামায়ণে নায়ক নায়িকার বনবাস আসলে পুনর্বাসন; মহাভারতে তাহা সত্যকার নির্বাসন। বরং শ্রীকৃষ্ণের কিছুটা সপত্নী কোন্দল আলোড়িত, বিভিন্ন পত্নীর মান-অভিমানের ঝটিকাসংক্ষুব্ধ পারিবারিক জীবন বর্তমান। মনে হয় এই অম্লমধুর জীবনটি তিনি বৃন্দাবন-লীলা হইতে আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন! রুক্মিনী সত্যভামা ব্রজধামের রাধা চন্দ্রাবলীরই দ্বিতীয় সংস্করণ। কিশোর রাখালবালকের প্রেমসমস্যা দ্বারকাধিপতির পরিণত প্রৌঢ় জীবনে কতকটা কৌতুককর বিসদৃশতার সহিত পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। মহাভারতের নারীচরিত্র

রামায়ণের সহিত তুলনায় অনেকটা অস্পষ্ট ও অবহেলার সহিত অঙ্কিত। রণ উন্মাদনার সর্বব্যাপী প্রসারে, কুটিল রাষ্ট্রনীতির সর্বাতিশায়ী প্রভাবে, রাজসভার স্থূলরুচি প্রকাশ্যতায় ও দ্যূতক্রীড়ার উন্মত্ত নেশার মধ্যেনারীচিত্রের সূক্ষ্মতর অনুরণন, নারী প্রকৃতির কোমল রমণীয়তা দুই ভাঁজ করা অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়াছে। যে যজ্ঞ হইতে যাজ্ঞ-সেনীর উদ্ভব,তাহার ধূম্ররাজি যেমন একদিকে তাহার সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে আবৃত করিয়াছে, তেমনি ঐ যজ্ঞের হোমানল তাহার অন্তর মধ্যে সমস্ত কোমল বৃত্তিকে ঝলসাইয়া বৈরনির্যাতনের অনমনীয় সঙ্কল্প ও দৃপ্ত অভিমান-রূপে চির-প্রজ্বলিত রহিয়াছে।

মোটামুটি বাংলা রামায়ণ ও মহাভারতে মূল মহাকাব্যের একই রূপ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে—বীরকাব্য ভক্তি-শাস্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। যুদ্ধ বিগ্রহপূর্ণ মহাভারতের এই রূপান্তর যুগের সহিত ব্যবধানকে আরও বিস্তৃত করিয়াছে। রামায়ণে রামচন্দ্রের সাত্ত্বিক বিনয় ও নিজ-ভগবত্তা সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃতি তাঁহাকে সহজেই ভক্তিরসের আধার ও ভক্তি—উদ্দীপনার উপলক্ষ্যরূপে উপস্থাপিত করিয়াছে। চৈতন্যদেব রামচন্দ্রের নিকটআত্মীয়রূপে ও একই আদর্শের প্রতীকরূপে উহার চরিত্র ও আচরণকে স্বভাব ভাবিত করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিরাট ও বহুমুখী ব্যক্তিত্বের প্রেমধর্মাদর্শের এরূপ অঙ্গীকরণ এতটা সহজ নহে। তাই তাঁহাকে ভক্তবৎসল ও ভক্তাধীন রূপে বাংলা মহাভারতে প্রদর্শন করিলেও তাঁহার দুরবগাহ চরিত্র মহিমা সম্পূর্ণভাবে ভক্তিরসাত্মক হইয়া উঠে নাই। পঞ্চপাণ্ডব একান্তভাবে কৃষ্ণভক্ত, কিন্তু এক যুধিষ্ঠির ছাড়া আর কোন পাণ্ডবই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ চিহ্নিত নয়, তাহাদের বাহুতে জ্যা-আকর্ষণ-কলঙ্ক সম্পূর্ণভাবে ভক্তিচন্দন প্রলেপে আচ্ছাদিত হয় নাই। কৌরব পক্ষে বিদুর অক্রুর ভীষ্ম ও দ্রোণ ছাড়া আর কেহই ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত নয়। দুর্যোধন ও শকুনি ত স্বভাব-দুর্বৃত্ত ও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কৃষ্ণদ্বেষী। কর্ণ রাবণের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ভক্ত। ইহাদের মধ্যে কেহই চৈতন্যযুগের ভক্তগোষ্ঠীর মত সংকীর্তন মত্ততার পরিচয় দেন নাই। মহাভারতে ভক্তি পশ্চাৎপট ব্যাপ্ত। একেবারে ঘটনা-নাটকের পুরোভাগবর্তী প্রধান নটরূপে প্রকাশিত নহে। যুদ্ধের মধ্যে বিরল মুহূর্তে ভীষ্ম ছাড়া আর কেহই স্তব-স্তুতির কোমল কোষাধারে মারণাস্ত্রের নগ্ন তীক্ষ্ণতাকে আবৃত করে নাই। রাষ্ট্রনৈতিক ঝটিকায় উৎক্ষিপ্ত অনেক কলুষিত উপাদান নীতিপ্রবাহের নির্মলতাকে মাঝে মধ্যে আবিল করিয়াছে। শিখণ্ডীকে সামনে রাখিয়া ভীষ্মের হনন, সপ্তরথী মিলিয়া অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুবধ, দ্ব্যর্থক উক্তির সূক্ষ্ম কাপট্যে দ্রোণের মানস বৈক্লব্য সাধন প্রভৃতি ঘটনায় কূটনীতি ধর্মনীতির উপর জয়ী হইয়াছে। যুদ্ধের উষর ভূমির উপর দিয়া ভক্তি-তরঙ্গিনী স্তিমিত প্রবাহে বহিয়া গিয়াছে। বিশেষ কোথাও বাঁধ ভাঙ্গিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার অবসর পায় নাই। তবে ভক্তি যে যুদ্ধের, প্রস্তরবদ্ধ নির্মমতার মধ্যেও অনুপ্রবেশের রন্ধ্র পথ আবিষ্কার করিয়াছে, রক্তনদীর মধ্যেও শান্তিবারি প্রক্ষেপ করিয়াছে, বিজয়-উল্লাসের মধ্যেও বৈরাগ্যের ত্যাগমন্ত্র শোনাইয়াছে ইহাতেই ভারতীয় জীবনে ভক্তির অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য নির্দেশিত হইয়াছে।

মহাভারত সম্বন্ধে আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার কাহিনী মুসলমান শাসনবর্গেরও আস্বাদনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। মূল গ্রন্থ হইতে বিচ্ছিন্ন কৃত্তি-বাসের আত্মজীবন অংশ হঠাৎ আবিষ্কৃত না হইলে আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের প্রোৎসাহ দান সম্পর্কের বিষয় কিছুতেই আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে জানিতে পারিতাম না। নেতের গাছড়া পরিহিত, তৈলা-ভ্যঙ্গরত সুলতান মহোদয় কখনও যে এই গঙ্গাতীরবাসী ফুলিয়া-পণ্ডিতের সুললিত রচনা শ্রবণের অবসর পাইয়া-ছিলেন তাহা মনে হয় না। এই বিবরণটি একটি শ্রুতি-সুখকর, মনোরম প্রবাদ রূপেই কল্পনার ঊর্ধ্বাকাশে বিচরণ করিতে থাকিবে। উহাকে প্রমাণ রজ্জু দিয়া ইতিহাস সত্যের দৃঢ়ভূমিতে কখনই নামান যাইবে না। কিন্তু মহাভারতের সর্বাঙ্গে মুসলমান শাসকের অনুগ্রহ ও কিছুটা অনুপ্রেরণা দলিলী নিশ্চয়তায় দৃঢ় সংলগ্ন আছে। পরাগল ও ছোটি খাঁর নাম মহাভারতের অভিধানেই যজ্ঞাশ্বের কপালে জয়পত্রের ন্যায় আঁটিয়া বসিয়াছে। মধ্যযুগে হিন্দু ছাড়া কেহই রামায়ণ কাহিনী শুনিবার আগ্রহ দেখায় নাই, কিন্তু মহাভারত কাহিনী সকল সম্প্রদায়ের কাছে চিত্তাকর্ষক রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। ইহার

কারণ অনুসন্ধান করিলে তাৎকালিক হিন্দু-মুসলমান জড় সাধারণের রস-আস্বাদনের কোন কোন ক্ষেত্রে রুচি সাম্যের উপর আলোকপাত সম্ভব হইবে। মহাভারতে যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তেজনামূলক আখ্যানের প্রাধান্য ও অনার্য উপাদানের প্রাচুর্যের জন্যই কি ইহা অধিকতর আকর্ষণীয় হইয়াছিল? রামায়ণের প্রধান চরিত্র রাম হিন্দু ভগবানের অবতার বলিয়াই অন্য ধর্মাবলম্বীর নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। উহার অনার্য উপাদানসমূহও—বানর ও রাক্ষসগোষ্ঠী—ভক্তিরসের সমীকরণ-প্রভাবে প্রায় আর্য-মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছে। মহাভারতে ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণ গৌণ চরিত্র ও তাঁহার ভগবত্তা অপেক্ষা মানবিকতার রূপটি অধিকতর প্রকটিত। কারণ অবশ্য অনুমান-সাপেক্ষ, কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্য রসপ্রধান পদসমূহেরও মহাভারতীয় কাহিনীর অবলম্বনেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রথম সূত্র রচিত হইয়াছিল।

৪

'পদ্মাবতী'-কাব্য আলোচনায় লেখক আরাকান রাজসভার কোন বিস্তারিত বিবরণ দেন নাই। কিন্তু কাব্যটির বৈশিষ্ট্য এই রাজসভার ভাবপরিমণ্ডলের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত। রোসাঙ রাজপরিবারের হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান এই ত্রিমুখী-সংস্কৃতি-সমন্বয়ই আলাওল ও দৌলতকাজীর উদার ভাবকল্পনার মূল উৎস। রসায়ন শাস্ত্রে দেখা যায়, যে কোন দুইটি বিরুদ্ধ উপাদানে গঠিত পদার্থ এক তৃতীয় পদার্থের মধ্যস্থতায় পারস্পরিক বিরোধ ভুলিয়া এক যৌগিক সত্তায় মিলিত হয়। এখানেও তেমনি বাঙলাদেশের পূর্ব সীমান্তের বাহিরে এক বৌদ্ধ রাজবংশীয় পরিবারের উদার সমন্বয়ী মনোভাবের আশ্রয়ে, এক মিলনকামী বাতাবরণে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির পরস্পর বিরোধিতা এক অন্তরঙ্গ প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়াছে। তারাপদবাবু দেখাইয়াছেন যে আলাওলের কাব্যে আলাউদ্দিনের পরাজয় স্বীকাররূপ ইতিহাস-বিরোধী পরিণামই প্রদর্শিত হইয়াছে। যেকালে পক্ষপাত-মূলক জাতিবৈর সাহিত্যে উগ্রভাবে প্রতিফলিত, ও হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিক একে অপরের অযথা নিন্দাবাদে অত্যুৎসাহী, সেকালে আলাওল অসাধারণ উদারতা দেখাইয়া নিজ জাতির পক্ষে ইতিহাসের অনুকূল সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সাহিত্যিক শিভাল্‌রির এমন উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসেও অত্যন্ত বিরল। ইহার কারণ কবির স্বধর্মে অনাস্থা নয়। সমস্ত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে এক শাশ্বত প্রেমের ও সৌন্দর্যের রাজ্যে তাঁহার অবিচল মানস অবস্থিতি। দিল্লীশ্বর রাজপুত শৌর্যের নিকট নয়, সতীত্বের দিব্য জ্যোতির্ময়তার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন ও কবিও এই পরিণামে ধর্মের নিকট অধর্মের পরাজয়রূপ এক চিরকল্যাণময় বিশ্ববিধানের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

আলাওলের কাব্যের আর একটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য উহার অধ্যাত্ম সাধনায় উন্নীত প্রেম সাধনা। এ যেন বৈষ্ণব পদাবলীর অতীন্দ্রিয়, ভগবদভিমুখী প্রেম সাধন। ধর্মরূপকের সীমিত গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এক সার্বভৌম ইতিহাস ব্যাপকতায় সম্প্রসারিত হইয়াছে। ইহা যেন কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে ব্রজলীলার পুনরাবির্ভাব। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে আলাওল মালিক মহম্মদ জয়সীর মূল পদ্মাবৎ কাব্যের রূপক কেন্দ্রিকতা বর্জন করিয়া তাঁহার কাব্যে রক্তমাংসের মানব-মানবী ও স্থূল বাস্তব সংঘটনের মধ্যেই এক সূক্ষ্মতর অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা অপূর্ব সাহসিকতার সহিত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। প্রেমের মহামন্ত্র, উহার অসীম ভাবোন্নয়ন শক্তি কেবল ইন্দ্রজাল-মুগ্ধ আদর্শ সাধন লোকেই অর্ধস্ফুট কণ্ঠে গুঞ্জরিত হয় নাই; ইহা লৌকিক জগতের সমস্ত রূঢ় অসঙ্গতি ও হিংসাক্রুদ্ধ কলরবের মধ্যে দৃঢ় যুক্তিনিষ্ঠা ও অক্ষুণ্ণ অপ্রমত্ত সহজ বিশ্বাসের সহিত ঘোষিত হইয়াছে। প্রেমই যে মানব জীবন রহস্যের মূল প্রেরণা—যাহার প্রেমের অনুভূতি জন্মে নাই সে যে মানুষের সর্বোত্তম সার্থকতা বঞ্চিত, প্রেম যে সমগ্র বিশ্বের নিরাময় শক্তি এইরূপ platonic ভাবধারা আলাওলে অকুণ্ঠিত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। প্রেম রূপদর্শন নিরপেক্ষ, ইহা কেবল জনশ্রুতিকে আশ্রয় করিয়া বিকশিত হইতে পারে। কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া জীবনের ভিত্তিভূমিকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে পারে এই সমস্ত তত্ত্বকথা আলাওলের হাতে পরীক্ষিত ও প্রামাণ্য জীবনসত্যে পরিণত হইয়াছে। রত্নসেন ও

পদ্মাবতীর প্রেমকাহিনী এই মরমী কবির অন্তর্দৃষ্টিতে সাধনামার্গের একটি উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে।

সংস্কৃত অলঙ্কার, জ্যোতিষ প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্রে ও ইসলামী শাস্ত্রে সমপরিমাণ প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, বিচিত্র, উত্থান-পতন বন্ধুর জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতা, অপূর্ব শব্দযোজনা কুশলতা ও ভাষার সংহত গাঢ়তা, ইসলামী ও ক্ষাত্র রোমান্সের দ্বারা বাঙালীর লৌকিক জীবনের অনুরঞ্জন—এ সমস্তই বাংলা সাহিত্যে আলাওলের জন্য একটি অনন্যসাধারণ স্থান নির্দেশ করিয়াছে।

ভারতচন্দ্রের কবিস্বরূপ ব্যাখ্যায় তারাপদবাবু একটু নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' এর স্থূল কামকেলিবিলাসকে কবির অভিজাত পরিবারের নীতিহীনতার প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ বলিয়া মনে করেন। বর্ধমান-রাজের প্রতি তাঁহার ক্রোধ ও বিদ্বেষের মূল তাহার বৈষয়িক জীবনে উৎপীড়ন ভোগের মধ্যে নিহিত। বর্ধমানরাজ যেমন তাঁহাকে সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহাকে সভ্যতা ও সুরুচির আশ্রয় হইতে উৎখাত করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইয়াছেন। অত্যাচারী ভূস্বামী যেমন তাঁহার জীবনে সুড়ঙ্গ কাটিয়া দুর্ভাগ্যের অভিশাপ আনিয়াছিলেন, কবিও সেইরূপ রাজার পারিবারিক ব্যবস্থায় এক দুর্নীতির সুড়ঙ্গ কাটিয়া তাঁহাকে জনসমাজে হেয় ও অবজ্ঞেয় করিয়াছেন। এ পর্যন্ত না হয় ভারতচন্দ্রের মনোভাব বেশ সুস্পষ্ট। কিন্তু তাঁহার মুরুব্বি ও হিতৈষী কৃষ্ণনগর-রাজের প্রতিও কি কবির সেই প্রচ্ছন্ন নিন্দা ও ব্যঙ্গ-প্রধান মনোভাব? হাঁড়ি ও সরার মিলের ন্যায় কি কবি ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষক রাজার রুচিসাম্য ও স্বার্থসাম্য অনুমান করা যায় না? কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় না পাইলে কি ভারতচন্দ্রের কাব্যধারা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইত? তাঁহার 'অন্নদা মঙ্গল' কি ছদ্মবেশী 'ভবানন্দ মঙ্গল' না হইয়া, ঈশ্বর পাটনী ও ঈশ্বরী দেবীর মধ্যে একদিকে স্বর্থভাষণবৈদগ্ধ্য অপর দিকে বিস্ময়মূঢ় অবোধ ভক্তির বিনিময়ক্ষেত্র না হইয়া, দেব মানবের আর কোন নূতন মিলন পীঠ রচিত হইত? এ বিষয়ে অনুমান কৌতূহলোদ্দীপক বটে, কিন্তু নিশ্চিত সিদ্ধান্তাভিমুখী নয়।

প্রতিভার সঙ্গে প্রতিবেশের সম্পর্করহস্য অনেক সময়ই তির্যকতাৎপর্যাবৃত। প্রতিভা-পক্ষী যে বৃক্ষ-কোটরে বাসা বাঁধে তাহাকেই কখন কখন ভাব বিপর্যয়ের অস্থিরতায় চঞ্চু নখরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তোলে। কৃষ্ণনগরের আত্মতৃপ্ত, আদিরসচর্চায় মসগুল, তুচ্ছ, রুচিহীন রঙ্গব্যঙ্গপ্রবণতায় আমোদ বিহ্বল রাজ সভার উপর কবির কি চঞ্চুনখাঘাতের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয়? কবি কি আপনাকে গোপাল ভাঁড়ের সংযোগী পারিষদ-রূপে নিজ কবিত্ব শক্তিকে ইতর ভাঁড়ামোর সমপর্যায়ভুক্ত মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছিলেন? তাঁহার মত প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন, আত্মমর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারীর পক্ষে ইহা ঠিক সম্ভব মনে হয় না। তথাপি satire যে সর্বদা ভিন্ন রুচি ও আদর্শের অভ্রান্ত নিদর্শন তাহাও যথার্থ নয়। ইংলণ্ডের দুই শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকবি ড্রাইডেন ও পোপ—অপরের যে বৃত্তি ও রুচিকে ব্যঙ্গ করিতেন, আপনারা সেই জীবনাদর্শেরই অনুসারী ছিলেন। ব্যর্থ কাব্যযশঃস্পৃহার দুর্গতি, নীচতা ও আত্মাবমাননাই তাঁহাদের ব্যঙ্গের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা যে যশঃ বৃক্ষের শীর্ষশাখায় আসন পাতিয়াছিলেন, তাহারই নীচু ডালে আশ্রয়ার্থী মাঝারি ও অপকৃষ্ট কবির দল বিশেষ ভাবে তাঁহাদের কৌতুক ও আক্রমণ স্পৃহার উদ্রেক করিত। ডাঃ জনসন চেষ্টারফিল্ডের পৃষ্ঠপোষকতা প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হওয়ার জন্যই সমস্ত পৃষ্ঠপোষকতা প্রথাকেই ব্যঙ্গবিদ্ধ করিয়াছিলেন। বাইরণ নিজ অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচারে বাধা পাইয়াই সমাজের ভণ্ডামি ও নৈতিক শিথিলতার মুখোস খুলিয়াছিলেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে অনুমান করা চলে যে ভারতচন্দ্র তৎকালীন রাজসভা প্রচলিত কুরুচি ও দুর্নীতিকে উপভোগ করিয়াও উহার আতিশয্যবর্ণনার দ্বারা উহার হেয়তা উদ্ঘাটিত করিয়া থাকিবেন। একদিকে তরুণ নায়ক নায়িকার উন্মত্ত দেহবিলাসের প্রতি তাঁহার প্রশ্রয়মিশ্র সহানুভূতি লক্ষিত হয়; এমন কি এই যৌবনমদিরার পানপাত্রবাহিনী হীরা মালিনীও তাঁহার তির্যক কটাক্ষ কষায় সমর্থন হইতে বঞ্চিত হয় নাই। যেমন তন্ত্রাচারের বীভৎসতা সাধকের নিকট শুধু মন্তব্য নয়, পূজাবিধিরূপে বরেণ্য ও অবশ্য পালনীয়, সেইরূপ বিদ্যাসুন্দরের কামচর্চা কালীমাহাত্ম্য

স্ফুরণের উপায়স্বরূপ কবির নিকট অধ্যাত্ম মূল্যে মহার্ঘ। তা ছাড়া চিরকালীন ঐতিহ্য অনুযায়ী তরুণের অবৈধ প্রেমসম্ভোগ কাব্যের স্নিগ্ধ দাক্ষিণ্য উপভোগ করিয়া আসিয়াছে। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা যৌবন-প্রেমের অসংবরণীয় আবেগে উহার শাসনহীন রূপাকর্ষণের দিকটাই রমনীয় করিয়া দেখাইয়াছে। পরে অবশ্য কবির মধ্যে সুপ্ত নীতিবিদ্ সত্তাটি জাগিয়া উঠিয়া দুর্বাসার অভিশাপের মাধ্যমে এই আবেগমত্ততার প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দিয়াছে। কিন্তু এই অভিশাপ প্রত্যক্ষভাবে প্রেমের বিরুদ্ধে নহে. উহার বাস্তবচেতনালোপী স্মৃতি রোমন্থনের আত্মবিস্মৃতির বিরুদ্ধে। সুতরাং ভারতচন্দ্র যে এই চিরকালীন ঐতিহ্যের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে নিছক ব্যঙ্গকবির ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। অনেক মাতাল এক সঙ্গে মদ খায় ও মদের নিন্দা করে। ভারত-চন্দ্রও এই চির-আস্বাদ্য প্রণয় মদিরার সুরভিত পাত্রে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গের অম্লরস মিশাইয়া যুগপৎ সৌন্দর্যরসিক ও ব্যঙ্গরসিকের মিশ্র ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন। কৃষ্ণ-চন্দ্রের বিরুদ্ধে যদিও তাঁহার মনে কিছুটা অনুচ্চারিত অবজ্ঞার তাড়না থাকিতে পারে, সে যুগের ধনী সম্প্রদায়ের তোষামোদপ্রিয়তা ও বিলাসব্যসনপ্রবণতা কিঞ্চিৎ অশ্রদ্ধেয় ঠেকিতে পারে, তাঁহার রচনাতে তিনি তাঁহার চিহ্ন রাখিবেন এমন স্থূলবুদ্ধির পরিচয় তিনি কখনই দেন নাই। বর্ধমান রাজের বিরুদ্ধে তিনি সূক্ষ্ম প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। রামদেব নাগের বিরুদ্ধে 'নাগাষ্টক' রচনার মধ্যে তিনি নিজ সোচ্চার প্রতিবাদ রাখিয়া গিয়াছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ত ইহাদেরই সগোত্র ও সহধর্মী ; সুতরাং তিনি ভারতচন্দ্রের পরমহিতৈষী ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেও ইহাদের উপর নিক্ষিপ্ত অগ্নিবাণের দুই একটি স্ফুলিঙ্গ কৃষ্ণচন্দ্রকে স্পৃষ্ট ও দগ্ধ করিয়াছে বৈ কি!

৫

গণসাহিত্যজাতীয় অন্যান্য কাব্যশাখা সম্বন্ধেও লেখক অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন। বাউল সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা প্রণিধানযোগ্য। আজকাল সব রকমের ধর্মরূপকমূলক সঙ্গীত বাউল গানের বহিরঙ্গ অনুসরণ করিলেই বাউল সঙ্গীতের নামে চলিয়া যায়। লেখক এই নির্বিচার প্রবণতার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাউলেরা হিন্দুধর্মপ্রচলিত সাধনপদ্ধতির বিরোধীরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শুধু হিন্দু নয়, মুসলমান ধর্মেরও বহিরঙ্গমূলক আচার অনুষ্ঠানের একান্ত নিরর্থকতা সম্বন্ধে ইহারা নিঃসংশয়। একমাত্র গুরুনির্দেশ ও মনের মানুষের চকিত আলোকবর্তিকা প্রদর্শন ছাড়া ইহাদের ধর্মসাধনার পথের আর কোনও দিক্ চিহ্ন নাই। সাধনপদ্ধতির গুহ্য রহস্য ও আপাত বীভৎসতাকে ইহারা ভদ্র প্রতিশব্দের আবরণে প্রচ্ছন্ন রাখে। আধুনিককালের রবীন্দ্রভাবানুপ্রাণিত ছদ্ম বাউল গানসমূহের মধ্যে অকৃত্রিমতার চিহ্ন দুর্লক্ষ্য। যে কোন রূপ ঈশ্বর সম্পর্কহীন অধ্যাত্মতত্ত্বাশ্রয়ী ও বৈরাগ্য আবেশের ইঙ্গিতময় কবিতাকে বাউল সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করা সমীচীন হইবে না। লেখক বাউলতত্ত্ববিষয়ে মোটামুটি ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে অনুসরণ করিয়াছেন।

বাউল কবির তত্ত্বকথা বৈরাগ্যবাদ যাহাই হউক না কেন, তাহার কবিত্বশক্তি ও অধ্যাত্ম অনুভূতির প্রগাঢ়তা সত্যই প্রশংসনীয়। ধর্মসাধনা যতই বিকৃত ও সাম্প্রদায়িক হউক না কেন, উহা গোষ্ঠীভুক্ত লোকের মনে এরূপ অস্থিমজ্জাগত প্রত্যয়ে পরিণত হইত যে উহা তাহাদের কবি-কল্পনাকে উদ্রিক্ত করিয়া শিল্পসংস্কৃতিলাভ করিত। অন্য কোনও দেশে নিরক্ষর পল্লীগ্রামবাসী এইরূপ ব্যাপক ও বিচিত্রস্বভাব কবিত্বের পরিচয় দিতে পারে নাই। ধর্মাবেশ কাব্য চেতনাকে অধিকার করিয়া উহাকে সহজ স্ফুরণের পথে পরিচালিত করিয়াছে। তাই বাঙলা পল্লীর আকাশে বাতাসে বিভিন্ন প্রকারের গীতি-সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছে। কবিয়াল, পাঁচালীকার, বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি আপন আপন ধর্মানুভূতিকে আশ্চর্য সুন্দর কাব্যরূপে প্রকাশ করিয়াছে। এই সমস্ত কবিতার মধ্যে যে উচ্চাঙ্গের কল্পনা শক্তি, জটিল তত্ত্বানুভূতির সহজ প্রকাশ ভঙ্গি, ও স্বতঃস্ফূর্ত চিত্রকল্প যোজনা লক্ষিত হয় তাহা সত্যই বিস্ময়কর। এই স্বভাব কবিত্বের প্রাচুর্যের জন্যই বাংলার লোকগীতির নানা শাখা-প্রশাখা এরূপ সাবলীলতায় পল্লবিত হইয়াছে ও উহা এরূপ কাব্যগুণ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ময়নামতী বা গোপী-

চন্দ্রের গান, ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গগীতিকা সমাজমনের সর্বস্তরব্যাপ্ত এই কবি চেতনার শিল্পসুন্দর ও মননশীল পরিণতি। জীবনে ও কাব্যে, দার্শনিক আখ্যানে ও স্বতঃ উৎসারিত গীতময়তায়, তত্ত্বে ও আবেগে, ধর্মের এরূপ বিচিত্র বাঙ্‌ময় প্রকাশ, এইরূপ সর্বাত্মক প্রেরণা আর কোনও সাহিত্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। ধর্মাশ্রয়ী জীবন সংস্কৃতির এরূপ চিৎপ্রকর্ষ ও রূপবৈচিত্র্য বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে সৃষ্টিক্রিয়ার একটি বিরল অভিপ্রকাশ।

কবিগান অভিজাতধর্মমূলক সংগীতের জনমানসরুচি-সাধিত প্রাকৃত সংস্করণ। ইহার বিষয় পুরাণ এবং বৈষ্ণব ও শাক্ত কাব্য হইতে সংগৃহীত; কিন্তু ইহার প্রকাশভঙ্গী ও ভাবগঠনের মধ্যে স্থূলরুচি, অথচ সহজ ভক্তিপ্রবণ ও পৌরাণিক আদর্শানুসারী জনসাধারণের মনের নিম্নগামী আকর্ষণ সুপরিস্ফুট। কবিয়ালরা প্রাচীন ভাবমহিমা ও রূপ গ্রন্থনকে গ্রহণ করিয়া সুলভ সুরে, অসংযত, কলাবোধ-হীন অতি বিস্তারে, বিন্যাস শিথিলতায় ও সময় সময় অশালীন টিপ্পনী সংযোজনে পদাবলী সাহিত্যকে সাধারণ মানুষের রুচি ও বোধগম্যতার স্তরে নামাইয়া আনিয়াছে। ইহারা স্বর্গীয় ভক্তিসুধার সঙ্গে কিছুটা উত্তেজক সুরা মিশাইয়া ইহাদের রচনাকে প্রাকৃতজনের আস্বাদনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

কবিগান সম্বন্ধে তারাপদবাবু একটি মৌলিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। ইহাকে তিনি 'পীড়িত জন-মানসের প্রতিক্রিয়া' রূপে অভিহিত করিয়াছেন· 'ভক্তি-প্রচার নহে, বিদ্রোহের উত্তেজনা সৃষ্টিই ইহাদের উদ্দেশ্য'—এই মতবাদটি সাবধানে বিচারণীয়। ভক্তিরসপ্রসূত সাহিত্য কালের পথে অগ্রসর হইতে হইতে হিমাচল-নিঃসৃতা গঙ্গার ন্যায় পরবর্তী যুগের নানা ভাবধারা, ধর্ম পরিবেশের সমকালীন রূপান্তর, বিশুদ্ধ ভক্তি প্রেরণার নব সমাজ প্রয়োজনজাত ব্যঙ্গ প্রয়োগ আত্মসাৎ করে। উৎস-মুখের নির্মল প্রবাহ এই সমস্ত বিবিধ বিসদৃশ উপাদানের ও উদ্দেশ্যের সংমিশ্রণে খানিকটা মিশ্র ও আবিল রূপধারণ করে। দেবকাহিনী মানব মনের ক্রমসন্নিহিত সম্পর্ক নিষ্ঠতায়, পরিবর্তনশীল সমাজ চিত্রের দর্পণ স্বরূপ, সামাজিক উদ্দেশ্যের বাহনরূপে প্রতিভাত হয়। কাজেই অনিবার্য যুগ পরিণতির ফলরূপে "হিমালয়-মেনকার বার্ধক্য-বাদে বঙ্গ সমাজের বৃদ্ধ ও দরিদ্র বরে কন্যা সম্প্রদানের বেদনা ফুটিয়া" উঠে, "কৃষ্ণ যাত্রায় ও কবিগানে বৃন্দা-দূতীর মুখে কৃষ্ণ তিরস্কারের ছলে পত্নীত্যাগী লম্পটের প্রতি সমাজের ঘৃণা ও ধিক্কার প্রকাশ" পায়, "খেউড় ও পাঁচালী গানে বিবাদী পাত্র-পাত্রীর বাগ্‌যুদ্ধে সমাজের বিভিন্ন ভণ্ডের ভণ্ডামিকে অনাবৃত করিয়া উপহাস করা" হয়, "এবং বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় হীরা মালিনীর মুখ দিয়া অভিজাত অন্তঃপুরের কুৎসা-রটনায় দরিদ্র সমাজের বিদ্রূপ অট্টহাস্যে ফাটিয়া" পড়ে।

এই সূক্ষ্মদর্শী মন্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাই কি কবিগান ও লোক সাহিত্যের আসল মর্মগত তাৎপর্য? আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ হইতেই ধর্মের সহিত লৌকিক জীবনের একটি নিবিড় সম্পর্ক কল্পিত হইয়াছে ও দেবদেবী গোষ্ঠী মানুষের আকাঙ্ক্ষা—ও—আচরণ সাদৃশ্যেই তাঁহাদের দেব মহিমাকে যথাসম্ভব আবৃত করিয়াছেন। এই মানবজীবন সমতার প্রবল ইঙ্গিতই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার দিব্যজ্যোতিকে মানবগৃহে প্রজ্বলিত মৃৎপ্রদীপের স্নিগ্ধতা ও গার্হস্থ্য পরিবেশের পরিচিত মৃদু-কোমল ভাবমাধুর্যে মণ্ডিত করিয়াছে। অবৈধ, অস্বস্তিকর প্রেমের মর্মদাহ, গুরুজনের তর্জন-ভর্ৎসনা ও সখীবৃন্দের সহৃদয় পরিহাস কঠোর অতীন্দ্রিয় ধর্ম সাধনাকে মানবিক প্রেমের হৃৎস্পন্দনের ছন্দে নিয়মিত করিয়াছে। শাক্তপদাবলী অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের রচনা বলিয়া ইহাতে লৌকিক জীবনের স্পর্শ, সাধারণ সাংসারিক জীবনযাত্রার উপমা ও উপকরণ আরও গভীর-ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং কবিগান যে প্রচলিত কাব্যরীতির সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম, তাহা বলা ঠিক হইবে না। অভিজাত সাহিত্যে ভক্তিরসের আধিক্য উহার লৌকিক উদ্দেশ্যকে ভাবের গভীরতায় সংহরণ করিয়াছে। কবি-গানে ভক্তির সেই সর্বগ্রাসী শোষণশক্তি অনেকটা ক্ষীণ হওয়ায় উহার অন্তর্লীন সমাজ চেতনা ব্যঙ্গ প্রবণতা আরও প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। কবির আসরে পরিবেশিত ধর্ম-সঙ্গীত উহার তুমুল লম্ফঝম্প ও চটুল নৃত্যছন্দ এবং শ্রোতৃ-মণ্ডলীর প্রত্যাশার অনিবার্য মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে, ভক্তির নম্রপেলব কুসুম অপেক্ষা ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ কণ্টকগুচ্ছকেই আরও বড় করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে। ভক্তির অন্তর্ধারা

কবিগানে কোথাও একেবারে শুষ্ক হইয়া যায় নাই—স্রোতের অগভীরতার জন্য তলদেশের উপলখণ্ডগুলি আরও কর্কশ হইয়া দেখা দিয়াছে। কবিয়ালেরা যথারীতি পূজার নৈবেদ্য সাজাইয়াছে, তবে এই অর্ঘ্য থালায় সাত্ত্বিক অপেক্ষা তামসিক ভোগসামগ্রীই বেশী পরিমাণে স্তূপীকৃত হইয়াছে। উমা সঙ্গীতের উদ্ভব কাল হইতেই বর-কন্যার অবস্থা-বৈষম্যের অনুযোগ উহার মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বিপ্রলব্ধা ও খণ্ডিতা নায়িকার আক্ষেপ দয়িত বঞ্চিতা মানব তরুণীর খেদ-ভৎর্সনার সহিত একই সুরে বাঁধা, তবে তাহাদের দেবস্বভাব ইহার মধ্যেই উচ্চতর ব্যঞ্জনায় প্রকটিত হইয়াছে। খেউড়-পাঁচালী ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় ভক্তি কেবল ইতর লালসার পঙ্কস্তরের উপর জলের একটু বঞ্চনাময় আবরণ মাত্র, ইহাদের মধ্যে জলে অবগাহনের ছলে পঙ্ক স্নানই আসল উদ্দেশ্য। সুতরাং কবিগানের মধ্যে বিস্ফোরণ বারুদের অস্তিত্ব-আবিষ্কার যতটা চমকপ্রদ ততটা সত্যনিষ্ঠ মনে হয় না। উহা অসাবধান ও মাত্রাজ্ঞানহীন বালকের হাতে গন্ধকের ছোপ দেওয়া সাধারণ দীপশলাকা, ও উহার দহন জ্বালা অপেক্ষা ঘর্ষণের শব্দই বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে।

দাশরথির পাঁচালী ঠিক কবিগানের সগোত্রীয় নহে। উভয় কাব্যকৃতিই মূলতঃ ভক্তিপ্রেরণাসঞ্জাত হইলেও, দাশরথি শব্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগে সৌন্দর্যসচেতন শিল্পী মনের পরিচয় দিয়াছেন। কবিগানের ভাব বিন্যাসের শিথিলতা ও ভাষার সরল অনবধানতা দাশরথির রচনায় বিপরীত ধরণের অতিরেকে পৌঁছিয়াছে। তাঁহার কবি-কল্পনার অসংবরণীয় গতিবেগ ও উপমা-দৃষ্টান্তের পুঞ্জীভূত আতিশয্য তাঁহার রচনার মাত্রাবোধকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করিয়াছে। ভক্তির অকর্ষিত ক্ষেত্রকে তিনি আধুনিক যুক্তিবাদের অতি শক্তি-সম্পন্ন কলের-লাঙল দিয়া চাষ করিয়া উহার মৃত্তিকা স্তরকে সম্পূর্ণভাবে উলট-পালট করিয়াছেন ও উহার উপর দিয়া সদ্যো-বাঁধ ভাঙ্গা সেচের জলের বন্যা প্রবাহ ছুটাইয়া দিয়াছে। কাজেই এই ভক্তিক্ষেত্রে যতটা ফসল ফলিয়াছে তাহার অপেক্ষা এক অসাধারণ বেগবান কবিপ্রেরণার কল্পনাক্রীড়া পাঠকের চিত্ত চমৎকৃতির উদ্রেক করিয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের মত দাশরথিরও অনুভূতির পরিমাণ অপেক্ষা মানস সক্রিয়-তার দূরযানী বাষ্পবেগের মাত্রা বেশী ছিল—মনের এই উদ্ধত শক্তি দুই পাশে ছড়াইতে ছড়াইতে, থর-থর-কম্প-মান ইঞ্জিন হইতে ভাবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতে করিতে এই দুই কবিই আপনাদের কাব্যরথ হইয়াছেন ও কাব্য প্রয়োজনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলকে বহুদূরে ছাড়াইয়া ভক্তি-যাত্রার মানচিত্রে অচিহ্নিত অকল্পিত তীর্থে আসিয়া তাঁহাদের দম শেষ করিয়াছেন। ফলে উভয় ক্ষেত্রেই একটা হাস্যকর অসঙ্গতি কবির উদ্দেশ্যকে অংশতঃ বিড়ম্বিত করিয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তে ভগবান হাবা আত্মারামে পর্যবসিত হইয়াছেন; দাশরথি-ভক্তিরস তৃপ্তির সহিত ব্যঙ্গবিদ্রূপের উগ্র ঝাঁজ ও উপমা-অলঙ্কারের উৎকট আতিশয্য পাঠকমনে এক বিভ্রান্তি বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। আধুনিক সমাজ-সচেতন ও যুক্তিবাদ ও ব্যঙ্গ প্রধান মনোভাব লইয়া ঐতিহ্য-গত ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন করিতে গেলে পৌরাণিক ও আধুনিক যুগের মধ্যে জীবন যাত্রার অসামঞ্জস্য ও ব্যঙ্গ-রসিক কবির ভাব কল্পনায় নির্বিচার সর্বত্রচারিতার উদ্দাম খেয়াল কাব্যসঙ্গতি ও রস পরিণতির বিঘ্ন ঘটাইবেই। দাশরথির ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান 'রাধাকৃষ্ণের কলহ' ও সুকুমার রায় চৌধুরীর 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' সচেতন ব্যঙ্গানুকৃতির (Parody) সৃষ্টি, পরশুরামের নানা পুরাণঘটনাশ্রয়ী হাসির গল্প খোলাখুলিভাবেই পুরাণ মহিমাকে বিদ্রূপ করিয়াছে। সুতরাং দাশরথির সহিত তাহাদের তুলনা অপ্রযোজ্য। কিন্তু দাশরথি অকৃত্রিম ও খাঁটি কবি; তিনি পাঠক মনে বিশুদ্ধ ভক্তির উদ্দীপন করিতেই চাহিয়াছেন। যুক্তিবাদ ও সমাজ চেতনার দিক দিয়াও তাঁহার আধুনিকতা অনস্বীকার্য। তথাপি উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যসাধন করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি আংশিক-ভাবে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার অভাব আধুনিকতা-বোধের নয়—পরস্পর বিরোধী উপাদানের যৌগিক সমন্বয় সাধনের শক্তির। সুতরাং আমি যে ডাঃ হরিপদ চক্রবর্তীর গ্রন্থের ভূমিকায় দাশরথি ইংরাজিজ্ঞানের অপ্রতুলতার জন্য আধুনিক মনোভাবের অধিকারী ছিলেন না এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছি ইহা আমার যুক্তি—অনুধাবনে প্রমাদের নিদর্শন।

উমাসঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীত শক্ত পদাবলীর এই দুই

ধারার মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন লেখকের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফল। "এ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য উমাসঙ্গীতে কোন গূঢ় সাধন পদ্ধতি নাই, কাব্যরসই আছে" খুবই সমীচীন। তন্ত্রসাধনা বৈষ্ণবদর্শনের মধুর রস অনুশীলন অপেক্ষা অনেক বেশী দুরূহ ও আমাদের মানবিক অনুভূতির সহজ সমর্থন বঞ্চিত। ভীষণমূর্তি সংহার-রূপিণী কালিকাকে সাধনা বলে স্নেহময়ী, বরাভয়দাত্রী মাতৃরূপে পরিবর্তন উগ্র ও কষ্টসাধ্য উপাসনা সাপেক্ষ। আর এই প্রতিকূল দৈব-শক্তির অনুকূল রূপান্তর সাধন হইবে কোন কল্পলোকের মাধুর্যময় ভাববৃন্দাবনে নয়, এই বাস্তব জীবনের সমস্ত বঞ্চনা ও বিভ্রান্তির সমস্ত পার্থিব লালসা ও সহজ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আকর্ষণের মোহ-মরীচিকায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়া। কাজেই শাক্ত-পদাবলীতে যেমন মাতৃভক্ত সন্তানের শরণাগতি আছে, তেমনি আছে জটিল, শাস্ত্র-নির্দেশিত সাধনা-প্রক্রিয়ার একান্ত অনুসৃতি।

অবশ্য যে সমস্ত কবি এই দুরূহ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের সাধনালব্ধ দৃঢ় প্রত্যয় ও শ্রেষ্ঠ কবিসুলভ আন্তরিকতার বলে তাঁহাদের পাঠক-গোষ্ঠীর মনে এই ধারণাই দেখাইতে চাহিয়াছেন যে বিশ্ব-জননীর স্নেহ লৌকিক মাতার স্নেহের ন্যায় দুশ্চরসাধনা-নিরপেক্ষ ও কেবল আবেগ নির্ভর। কেবল মা মা বলিয়া ডাকিলেই ও তাঁহার ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলেই সাধনভজনহীন ব্যক্তিও দেবীর অনুগ্রহের অধি-কারী হইতে পারে। মাতৃক্রোড়ে সন্তানের ন্যায় সকলেরই এই রহস্যময়ী বিশ্বমাতার করুণালাভের অবাধ অধিকার। মাতাপুত্রের সম্পর্কের ন্যায় সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধিকা মহামায়ার সঙ্গে ভক্ত সন্তানের সম্পর্ক একইরূপে স্নেহ নিবিড় ও আদর-আব্দার মান অভিমানের মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠায় সুরক্ষিত। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়া শাক্ত-পদাবলীকে লক্ষ্য করিলে এই আপাতসুলভ মধুর স্বতঃ-স্ফূর্ত সম্পর্কের পিছনে তন্ত্রসাধনারহস্যের ইঙ্গিতটি, পূজাবিধি ও আরাধনাক্রমের নির্দেশটি অর্ধপ্রচ্ছন্ন আছে। কৃচ্ছ্র-সাধনের দুরারোহ সোপানাবলী অতিক্রম করিয়াই যে মাতৃক্রোড়ে নিশ্চিন্ত বিশ্রামের সৌভাগ্য অর্জন করা যায়, এই তত্ত্বকথাটি একান্ত শরণাগতির প্রবল স্রোতোবেগে কিছুটা চাপা পড়িলেও একেবারে অদৃশ্য নয়। জগজ্জননীকে মাতারূপে অনুভব করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও সাধনানির্ভর। কিন্তু তাঁহাকে কন্যারূপে বুকে চাপিয়া ধরার জন্য একমাত্র শত ধারায় উৎসারিত বাৎসল্য রসই যথেষ্ট। ভালবাসাকে উর্ধ্বগামী করিতে হইলে কিছুটা ভারবহনক্ষম শক্তির প্রয়োজন; কিন্তু উহার নিম্নাভিমুখী অবতরণপ্রবণতা স্বতঃই দুর্জয় গতিবেগ অর্জন করে। মাতৃভক্তি অনুশীলন-সাপেক্ষ। কন্যাস্নেহ সহজ সংস্কারলব্ধ ভাবাবেগ। এই স্বভাবনিয়মের অনুবর্তনে মাতা কন্যায় পরিবর্তিত হইলেন; শ্যামাসঙ্গীত উমাসঙ্গীতে রূপান্তরিত হইল। মানবিক আকৃতির অমোঘ মাধ্যাকর্ষণে দ্যুলোকবিহারিণী সুরধুনী প্রথমতঃ হরজটায়, সেখান হইতে হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে ও সর্বশেষে পল্লবপ্রচ্ছায় গাঙ্গেয় উপত্যকার ভাবার্দ্র সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিলেন। দৈবী মায়ার সহিত যদি মানবিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতেই হয়, তবে তাঁহাকে মাতৃমহিমার উচ্চমঞ্চ হইতে নামাইয়া আনিয়া কুটীর প্রাঙ্গণে ক্রীড়াশীলা স্নেহ পুত্তলি দুহিতার রূপে অপত্যবাৎসল্যের বক্ষোকম্পনের ছন্দে আন্দোলিত দোলনাতে আশ্রয় দেওয়াই ত কাম্যতর। আশ্রয় লওয়া অপেক্ষা স্নেহাঞ্চলে আবৃত করায়, আব্দার করা অপেক্ষা আব্দার মেটানোতেই ত ভক্তের আত্মশ্রেষ্ঠত্ব-বোধ বেশী তৃপ্তিলাভ করে। তন্ত্রশাস্ত্রের বিধান মানা অপেক্ষা হৃদয়তন্ত্রের অনুবর্তন ত অধিকতর প্রীতিপ্রদ। আর সর্বশেষে গোপালের যদি মা যশোমতী থাকে, তবে উমারই বা হিমালয়-মেনকা, তাহাদের উদার পিতৃ-মাতৃ হৃদয়ের অপরিমেয় ক্ষুধা লইয়া, বাস্তব বাঙ্গালী জীবনের সমস্ত বঞ্চিত ক্ষোভ ও অতৃপ্ত স্নেহপিপাসা লইয়া, থাকিবে না কেন? বৈষ্ণব শাক্তের রণে শক্তি কখনও পরাভব স্বীকার করিবে না। যদি জগদীশ্বরীর দুহিতৃরূপ গ্রহণের কোন প্রামাণ্য পুরাণসম্মত ইতিহাস নাও থাকে, তবুও ভক্তি নিজ মনোমত ইতিহাস রচনা করিয়া লইতে সঙ্কুচিত হইবে না।

৬

নিধুবাবুর টপ্পার শুধু সঙ্গীতমূল্যই নয়, কাব্যমূল্য নির্ধারণের ব্যাপারেও লেখক যথেষ্ট যত্নশীল হইয়াছেন। নিধুবাবুর প্রেমসঙ্গীতে ধর্মভাবনিরপেক্ষ ও সংস্কৃত-ঐতিহ্যমুক্ত বাঙালীর সমকালীন সমাজজীবন হইতে

উদ্ভূত প্রেমচেতনা প্রথম কাব্যরূপ পাইয়াছে। ধর্মের সর্বগ্রাসী প্রভাবের তলে তলে লৌকিক জীবনের প্রণয়ানুভূতি নিশ্চয়ই ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছিল। তবে উহার সাহিত্যিক প্রকাশ সংস্কার বশতঃ প্রবলভাবে প্রতিরুদ্ধ ছিল। ধর্মের বজ্রমুষ্টি শিথিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাকৃত বৃত্তিগুলি স্বাধীন মর্যাদার আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিতে লাগিল। নিধুবাবুর গানগুলি সেই প্রতিরুদ্ধ আবেগের বহিঃনিষ্ক্রমণেরই নিদর্শন। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ইংরাজী সাহিত্য ও সমাজের সহিত বিশেষ পরিচয়ের অভাব সত্বেও নিধুবাবু বাঙালী সমাজের প্রথা-বহির্ভূত কুলকামিনীদের এই স্বাধীন প্রেমপ্রকাশের প্রেরণা কোথা হইতে পাইলেন। মনে হয় তিন শতাব্দী-ব্যাপী বৈষ্ণব কবিতার প্রাদুর্ভাবের ফলে প্রেমের জ্বালা ও অশ্বস্তি, উহার কামনার তীব্রতা ও ব্যর্থতার বেদনা সাধারণভাবে সমাজ চেতনায় সঞ্চারিত হইয়াছিল। ধর্মের অবরোধের রন্ধ্রপথ দিয়া ধর্মের সহিত অসংশ্লিষ্ট ও রূপকবর্জিত বাস্তব প্রেম তৎকালীন আকাশ-বাতাসে ক্ষীণভাবে হইলেও নিশ্চিতভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ধর্মের খোলসের ভিতর দিয়া প্রবৃত্তির শাঁস বীজরূপে অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। রাধাকৃষ্ণের বেনামীর ছদ্মাবরণটুকু অতিপরিপক্ক জীর্ণ পত্রের ন্যায় নবমুকুলিত প্রেমের দেহ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। আরও একটা সম্ভাব্য কারণ এই প্রেমচেতনার বিস্তারের সহায়ক রূপে অনুমিত হইতে পারে। উচ্চবর্ণের কুলীনকন্যাদের স্বামিবিরহজনিত অবদমিত হৃদয়-বেদনা সমস্ত সমাজ-বাতাবরণকে এক চাপা ক্রন্দনে ব্যথাদীর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। জীবনে কচিৎ-দৃষ্ট এই স্বামীদের সহিত মিলন অনেকটা পরকীয়-প্রেমের প্রত্যাশাকুলতায় স্পন্দিত হইত। স্বামী-সাহচর্য-বঞ্চিতা এই হতভাগিনীরা প্রাণের দায়ে কুলকামিনীসুলভ লজ্জা বিসর্জন দিয়া প্রণয় নিবেদনে মুখর হইয়া উঠিত। ইহাদের প্রেম কাহিনী আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে, ক্ষোভ আত্মধিক্কারে, অপরিচিত পুরুষের চিত্তাকর্ষণের প্রগল্‌ভ চেষ্টায় অবৈধ মিলনাকূতির ঘূর্ণীপাকে আবর্তিত হইত। নারীমনের এই অনভ্যস্ত প্রগল্‌ভতা ও বুকফাটা চাপা কান্নার সুরটি নিধুবাবুর গানে যেন ধরা পড়িয়াছে। তবে ইংরাজী সাহিত্যের সহিত অপরিচয়ের জন্য এই প্রেম বর্ণনা অনেকটা বৈচিত্র্যহীন ও একই সুরে পুনরাবৃত্তিমূলক হইয়াছে। আরও মনে হয় নিধুবাবুর সঙ্গীতে অধিকার যতটা ছিল, কাব্য নৈপুণ্য ঠিক সে পরিমাণে ছিল না। তাঁহার যে গানগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে সে গুলিতে মনস্তত্বজ্ঞান ও প্রকাশউৎকর্ষ উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ গানের মধ্যেই ভাবের অসঙ্গতি, আঙ্গিক শৈথিল্য ও প্রকাশের আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি কয়েকটি চমৎকার গানের রচয়িতা, তাঁহার শিল্প বোধের এইটুকু প্রশংসা বোধ হয় তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য।

লেখকের গ্রন্থের শেষ অধ্যায় মৈমনসিংহগীতিকা সম্বন্ধীয়। ইহাদের রচনাকাল সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেনের অতি-প্রাচীনতার দাবী আজকাল কেহই সমর্থন করেন না। এই পালাগুলি মোটেই নিরক্ষর কবিবৃন্দের আদিমযুগসুলভ রচনা নয়। ইহারা বৈষ্ণব কাব্যের সহিত পরিচিত শ্রেষ্ঠ শিল্পবোধসম্পন্ন ঠিক আধুনিক-পূর্ব যুগের কবিগোষ্ঠীর দ্বারা রচিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে ইহাদের ঘটনাস্থান বাঙলার অনার্যজাতি অধ্যুষিত, সংস্কৃত প্রভাব বর্জিত প্রত্যন্ত অঞ্চল বলিয়া ইহাদের উপমা নির্বাচনে, রচনা ভঙ্গীতে ও আবেগপ্রকাশরীতিতে একটা নূতন প্রতিবেশের ছাপ ও নব জীবন ছন্দের অনুবর্তন লক্ষিত হয়। ইহাদের মধ্যে গাথাকবিতার আখ্যান রস ও অবিরাম চলমান জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল সৌন্দর্য চেতনা ও আবেগ-উৎসার ইহাদিগকে অন্যান্য কবিতার সহিত তুলনায় বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করিয়াছে। এই কবিতায় আদিম যুগের ধুয়া ও অন্যান্য বাচনিক প্রয়োগের সঙ্গে আধুনিক যুগের মনন ও শিল্পবোধের আশ্চর্য সমন্বয় হইয়াছে। এই জন্যই ইহাদিগকে আধুনিক কবির দ্বারা রূপান্তরিত প্রাচীন যুগের কাহিনী বলিয়া কোন কোন সমালোচক মনে করেন। কিন্তু বিরল ব্যতিক্রমস্থল ছাড়া সামগ্রিক ভাবে ইহাদের মধ্যে কোন জোড়াতালির চিহ্ন আবিষ্কার করা দুরূহ। ইহাদের পরিণত শিল্পবোধ ইহারা যে লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। মোট কথা, চরিত্রের বিভিন্নতায়, প্রতিবেশ-পার্থক্যে, মানবিক বৃত্তির ধর্মনিরপেক্ষ প্রবল উৎসারে লোকজীবনের

স্বভাবানুসারী বলিষ্ঠতায়, কাহিনীর ঋজু গতিতে ও সম্পূর্ণ ঐহিক পরিণামে, কাব্যবৈচিত্র্যে ও অন্তর্নিহিত রসের নানামুখী নিষ্পত্তিতে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' বাংলার ঐতিহ্য শাসিত সাহিত্যের এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। হিন্দু, মুসলমান, বেদিয়া ও অন্যান্য অনার্য আরণ্য জাতি, কাজি, দেওয়ান, ভিক্ষুক, ভবঘুরে, কুট্টিনী প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তরভুক্ত নর-নারী এই গাথাগুলিতে আবির্ভূত হইয়াছে। জীবনের সুখান্ত দুঃখান্ত, উদাস বৈরাগ্যশান্ত ও লঘুতরল বিকাশ সমূহ, বন্য প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের আনন্দ বেদনামূলক বিচিত্র সহানুভূতির সম্পর্ক, আঞ্চলিক কথ্য ভাষা ও অশান্ত আবেগোৎক্ষেপ —এই সমস্ত উপাদানই এই গাথাগুলিতে এক অপূর্ব শিল্পরূপ ও অনুভূতিজালে গ্রথিত হইয়াছে। মরণজয়ী আত্মনির্ভরশীল প্রেমের পতাকাতলে আদিম কৌম-সমাজের সমস্ত লৌকিক জীবন সংস্কার সমবেত হইয়াছে। এখানে সাম্প্রদায়িক বিরোধ, ধর্মদ্বন্দ্ব ও সবলের হাতে দুর্বলের উৎপীড়ন প্রভৃতি সংস্কারশাসিত সমাজের দোষগুলিরও উল্লেখ আছে। কিন্তু সমগ্র চিত্রে এই আদিম সরলতা ভ্রষ্ট। কুপ্রথানুসারী সমাজের কলঙ্কচিহ্নগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্ররূপে প্রতিভাত হইয়াছে। আত্মকর্তৃত্ব ছাড়াও অদৃষ্টরথচক্রের পেষণও এই সমাজের প্রাণীগুলির উপর গভীর রেখাচিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছে। মোটের উপর এই গাথাকাহিনীগুলি বাংলা সাহিত্যের এক অপ্রত্যাশিত অধ্যায়ের দ্বার উন্মোচন করিয়াছে। বাঙালী জীবনের কেন্দ্র পরিধির বাহিরে, মঙ্গল কাব্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর পৌনঃপুনিক আবর্তনসৃষ্ট ভাব পরিমণ্ডলের সীমার অপরপারে যে এত রোমান্স, এত নিবিড় প্রণয়াকূতি, দুঃসাহসিক এত জীবন-প্রয়াস, সুখ ও দুঃখ, অদৃষ্ট ও পুরুষকারের এত জটিল মিশ্রিত বিমিশ্রতা, সহজ প্রাণলীলার এরূপ অপূর্ব ছন্দ-ময়তা কাব্যের প্রেরণাভূমি রচনা করিবার জন্য প্রতীক্ষমান ছিল, তাহা এই গাথাগুলির আবিষ্কারের পূর্বে কে অনুমান করিতে পারিত? বাঙালী জীবন ধর্মানুশাসনের চাপে যে একেবারে স্থবির হইয়া যায় নাই, অধ্যাত্ম তত্ত্ব উহাকে যে একেবারে বহিঃসৌন্দর্যবিমুখ করে নাই, উহার যৌবনশক্তি যে নূতন নূতন পথে অভিযাত্রী হইবার প্রেরণায় উন্মুখ ছিল মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ কাব্যগুলি তাহারই নিদর্শন। আরাকান সভায় রচিত ও এই রোমান্স-অনুরঞ্জিত গাথা-কাব্যগুলি ইংরেজ সম্পর্কের পূর্বেই যে আমাদের স্বকীয় জীবনোদ্ভূত রোমান্স প্রবণতা ছিল ও ইহাকেই ভিত্তি করিয়া আমরা যে বিদেশাগত রোমান্সধারাকে সহজেই আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছি তাহারই প্রমাণ উপস্থাপিত করে। এই অধ্যায় সম্বন্ধে তারাপদবাবুর আলোচনা খুব মৌলিক না হইলেও যথাযথ ও সমীচীন হইয়াছে।

৭

এই আলোচনা সমাপ্তির পর লেখকের কয়েকটি বিশেষ উক্তি ও মতবাদ পরীক্ষা করার প্রয়োজন। তিনি বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উদ্‌গমে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবকে উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার এই মত সম্পূর্ণ নয়, আংশিকভাবে সত্য। মধ্যযুগের প্রারম্ভে আমরা যে ধর্মের নামাবলী গায়ে দিয়াছিলাম, আধুনিকতার খররক্ত-প্রবাহের উষ্ণ স্রোতেও তাহা ত্যাগ করি নাই। কাজেই মুকুন্দরামের জীবন কৌতূহল ও বস্তুজীবন সংসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও ভারতচন্দ্রের যৌবনের রক্তচাঞ্চল্য এই প্রৌঢ়ত্বের উত্তরীয়ের আবরণে নিজ স্বরূপপরিচয়কে অবলুপ্ত করিতে চাহিয়াছিল। জীর্ণ নির্মোকের অন্তরালে নবজীবনের অঙ্কুর বিকাশ প্রচ্ছন্ন ছিল মাত্র, অনুপস্থিত ছিল না। সুতরাং ইংরাজের সহিত পরিচয় না হইলেও আমরা এক প্রকারের আধুনিকতায় পৌঁছিতাম, তা স্বীকার করিতে কোন কুণ্ঠা থাকা উচিত নয়। কিন্তু ধর্মসর্বস্বতার বহু-কর্ষিত ক্ষেত্রে যে আধুনিকতার দুই একটি শীর্ণ, বিবর্ণ পাতা আপনা হইতেই দেখা দিত, বৈদেশিক সারের প্রয়োগ ব্যতীত তাহার প্রাণশক্তি যে কতটুকু স্থায়ী হইত তাহাই সন্দেহের বিষয়। ধর্ম মহাবৃক্ষের ঘন পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে আধুনিক জীবনবোধের যে ক্ষীণ ও বিচ্ছিন্ন আলোকরেখা উঁকি মারিত তাহাতে জীবনের কতটুকু আলোকিত হইত? কবির সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এই বাস্তব চেতনার মৃদু ও আলগা স্পর্শে কতটুকু রূপান্তরিত হইতে পারিত? মুকুন্দরাম—ভারতচন্দ্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইংরেজ আগমনের বহু পরের কবি ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল তাঁহাদের কাব্যমুকুরে আধুনিকতার ক্ষীণ ও বহুলাংশে বিকৃত প্রতিচ্ছবি প্রতি-

ফলিত করিতে পারিয়াছিলেন। একটু রঙ্গ-ব্যঙ্গ, একটু হাস্য-কৌতুক, একটু চটুল জীবন সমালোচনা ও অতীত ইতিহাসের অতি-উচ্ছ্বসিত, কিন্তু ঈষৎ অবাস্তব স্বাজাত্য-বোধ, বহুপূর্বে বিলীন ক্ষাত্র শৌর্য ও শীল সৌজন্যের একটু ছায়াময়, পাংশুবর্ণ, কাল্পনিক জীবনছবি—এই দুই শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া তাঁহারা আধুনিকতার দূরপ্রান্তসীমা কোন-মতে স্পর্শ করিয়াছিলেন। উহাকে সামগ্রিকভাবে ও দৃঢ়-মুষ্টিতে ধারণ করার তাঁহাদের সাধ্য ছিল না। একমাত্র পাশ্চাত্য কাব্য সাহিত্যে অতি-ব্যুৎপন্ন, নানা ভাষায় পণ্ডিত, প্রগাঢ় কবিকল্পনার কুহকমন্ত্রে আধুনিক চিত্তের গভীরে অনুপ্রবেশক্ষম মধুসূদনই পাশ্চাত্ত্য ও সার্বভৌম জীব-নৈষণাকে আমাদের রক্তধারার মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছিলেন। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে পৃথিবীর সর্ব-দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রথম কবি। মধুসূদন কল্পনা ও আবেগপ্রধান কাব্য ক্ষেত্রে যে কাজ সুরু করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র চিন্তা-মননের সর্বক্ষেত্রে ও উপন্যাসে সাধারণ মানব-জীবনের প্রতিচ্ছবির মধ্য দিয়া তাহা সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ আসিয়া পৃথিবীর কল্পনা ভাণ্ডারের সোনার চাবি আমাদের হাতে তুলিয়া দিলেন, আমরা আধুনিক কালের জটিল ও বহুমুখী জীবনা-বেদনকে সহজ নিঃশ্বাস বায়ুর মতই গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইলাম। পাশ্চাত্ত্য সম্পর্কহীন যে আধুনিকতার কথা তারাপদবাবু চিন্তা করিয়াছেন তাহার সহিত সর্বদেশের চিন্তামনন কল্পনাপুষ্ট, ও সাংস্কৃতিক মিলনের দক্ষিণা হাওয়ায় স্বতঃবিকশিত আধুনিকতা-চেতনার আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

তারাপদবাবুর মনোজ্ঞ ও মৌলিক চিন্তার পরিচয়বাহী রচনার মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে একটু সঙ্কীর্ণ, অনুচিত নীতিপ্রবণতার নিদর্শন মিলে। তাঁহার সমস্ত মঙ্গলকাব্যের আলোচনাই এই অতিরিক্ত নীতিবাদ প্রভাবিত। তিনি এক দিকে স্বীকার করেন যে বিভিন্ন শ্রেণীর মঙ্গলকাব্য মূলতঃ অনার্য গোষ্ঠীর ভাবকল্পনা প্রসূত। অপর দিকে তিনি ঐ শ্রেণীর কাব্যে উচ্চ সংস্কৃতি হইতে উৎপন্ন, উদার আদর্শ-বাদের প্রত্যাশা করেন। কাজেই তাঁহার বিচারে দুই পরস্পর বিরোধী মানদণ্ডের অ-সমন্বিত সহাবস্থান ঘটিয়াছে। অনার্য দেবকল্পনা প্রধানতঃ ভীতিমূলক ছিল—এই দেবতারা মানবের নীতিস্তর অতিক্রম না করিয়াই কোন দুর্বোধ্য বিধানে অতিমানবিক শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। কাজেই অন্ধ বিশ্বাসে শৃঙ্খলিত, অজানা ভয়ে বিমূঢ়, মধ্য-যুগীয় মানব নিজ সমাজের পশুবল প্রভাবিত ব্যবস্থাকে তাহার দেবকল্পনার আরোপ করিত। তাহার দেবদেবী যেন তাহার গ্রাম-প্রধানের ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বর্ষীয়সী নারী সর্দারণীর পরিবর্ধিত সংস্করণ। আর্য-অনার্যের মিশ্রণ প্রথম প্রথম অনার্যের বিশেষ কোন ভাবোন্নয়নে সহায়তা করে নাই; বরং অনার্যের অস্বচ্ছ জীবনবোধকেই আর্যসমাজে সংক্রামিত করিয়াছিল। মঙ্গলকাব্য সমাজ-পরিবর্তনের এই স্তরেরই কাহিনী, যখন অনার্যের ভয় এক প্রকারের স্থূল, অবোধ ভক্তিতে রূপান্তরিত হইবার উপক্রম করিতেছে ও যখন আর্যের বিশুদ্ধ ভক্তি সমকালীন সমাজ বিশৃঙ্খলার আবর্তে পাক খাইয়া স্বার্থবুদ্ধির আবিলতা কাটাইতে পারে নাই—সুতরাং যে যুগের ও যে লোকস্তরের জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ধারণা মঙ্গল-কাব্যে রূপ লইয়াছে তাহা হইতে উন্নততর ও বিশুদ্ধতর আদর্শবাদ ইহাতে কেমন করিয়া আশা করা যায়? ইহার নৈতিক অপকর্ষের বিরুদ্ধসমালোচনা ইহার আসল প্রাণকেন্দ্রকে স্পর্শ করে না; যাহা পাওয়া যাইবে তাহা হইতে যাহা অপ্রাপনীয় তাহার দিকেই আমাদের দৃষ্টিকে নিবর্তিত করে। এই রীতি সমালোচনার প্রমাদাচ্ছন্ন প্রয়োগ বলিয়াই মনে হয়। ধর্ম হিন্দুদেবমণ্ডলীতে পাকা-পাকি স্থান না পাইয়া ত্রিশঙ্কুর ন্যায় স্বর্গ-মর্ত্যের মধ্যপথেই থামিয়া গেলেন। মনসা কোনদিনই তাহার সরীসৃপ প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া মানবিক সম্ভ্রম ও উদারতা লাভ করিতে পারিল না। চাঁদসদাগর তাহাকে বাম হস্তে অনিচ্ছুক অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছে, কিন্তু তাহার হেন্তালের বাড়ি মনসার মেরুদণ্ডকে চিরকালের মত ভাঙ্গিয়া উরগ পর্যায়ে তাহার স্থান চিরতরে নির্দিষ্ট করিয়াছে। ভক্তিরচিত শিল্পকলা যতই তাহাকে নাগ-মাতার শ্রদ্ধেয় মূর্তিতে অঙ্কিত করুন না কেন, মানুষ তাহার শিল্পসহনীয় রূপ অপেক্ষা তাহার নিজ চক্ষু ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাকেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। চণ্ডী মাতৃপ্রকৃতির প্রতীকরূপে আর্য-অনার্য-নির্বিশেষে সাধারণ মানবের মনোভূমিতে পূজাবেদীতে

আসীনা। সুতরাং তাঁহার মাতৃত্ব মহিমায় উন্নয়ন স্বাভাবিক মানস প্রবণতারই ফল। তাঁহার পশুপালিনী হইতে দরিদ্র ব্যাধের প্রতি অহেতুক কৃপাময়ী মূর্তি, কিঞ্চিৎ অব্যবস্থিত-চিত্ততা ও বন্যা প্রবাহে কলিঙ্গ রাজ্য ধ্বংসের খেয়ালী ক্রুরতার মধ্য দিয়া, ক্রমবিবর্তনের ধারা বাহিয়া মানবমনে মাতৃত্বের প্রতি যে দেবীর পূজার আসন নির্দিষ্ট আছে সেখানে অবিচল মহিমায় স্থির হইয়াছে। পৌরাণিক ভক্তিবাদ ও দার্শনিক কল্পনা এই অনার্য জীবনের খনি হইতে সদ্যো-উত্তোলিত অমার্জিত স্বর্ণ মূর্তিকে আর্য মননের পালিশ দিয়া উহাকে বিশুদ্ধ হিরণ্যদ্যুতি মণ্ডিত করিয়াছে। চণ্ডী নামের পিছনে চণ্ডত্বের যে কলঙ্কচিহ্ন বর্তমান, তাহা পরবর্তী যুগের সৌমাতর পরিবারজীবন ও ক্রম-সংস্কৃত অধ্যাত্মপ্রত্যয়জাত ভক্তিবাদের শুভ্র জ্যোতির্ধারায় ধৌত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। অভিধা-পরিবর্তনের ধাপে ধাপে উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবলোকে উন্নীত হইয়া চণ্ডী-দেবীসারদা, অভয়া ও শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীশ্রীমণ্ডিত গার্হস্থ্য জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নপূর্ণা বা অন্নদা নাম-পরিচয়ে ভক্তের মানসস্বর্গে সর্বাতিশায়ী দেব মহিমায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের সামাজিক ও মানস পরিবেশটি স্মরণ করিলে মঙ্গলকাব্যের আপেক্ষিক নীতিহীনতা তারাপদবাবুর বিবেকবুদ্ধি ও ঔচিত্যবোধকে পীড়িত করিত না। "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই। যাহা পাই তাহা চাই না"—কবির এ সতর্কবাণী সাহিত্য-সমালোচকেরও প্রণিধানযোগ্য।

লেখক এই ইতিহাস রচনায় প্রতি অধ্যায়ের পর 'নেপথ্যবার্তা' নামে একটি বিষয় সংশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র অধ্যায়ের সংযোজনা করিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যের কোন কোন ইতিহাসে, বিশেষতঃ Saints রচনায় Interchapter নামে এক এক পরিচ্ছেদ যুগের সামগ্রিক পরিচয় দিবার ও উহাদের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ভাবশক্তির নির্দেশের জন্য সন্নিবিষ্ট হইতে দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ খণ্ড অধ্যায় সন্নিবেশের বিশেষ প্রয়োজন আছে মনে হয়। আমাদের সাহিত্যের বিকাশের পিছনে এত অসমাহিত প্রশ্ন ও আনুমানিক উপপত্তি, কাল নির্ধারণ ও লেখকের সত্তানির্ণয়ঘটিত এত প্রচুর সংশয় পুঞ্জীভূত আছে যে সাহিত্যের রসবিচারের সঙ্গে এই আনুষঙ্গিক সমস্যাগুলি জড়াইয়া ফেলিলে আলোচনার প্রাঞ্জলতা ও ধারাবাহিকতা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। কাজেই সাহিত্যজগতের এই অতি-পল্লবিত, কল্পনাপুষ্ট, খানিকটা অস্বাস্থ্যকর তথ্যজঙ্গলের জন্য একটা স্বতন্ত্র আধার সব দিক দিয়াই প্রার্থনীয় মনে হয়। তারাপদবাবু এই নেপথ্যবার্তা সঙ্কলনে সব সময় যে একটা সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। তবে তিনি এই উদ্দেশ্যের যতটা অনুবর্তন করিয়াছেন ততটাই প্রশংসনীয়।

রজনীগন্ধা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

ঘিরিয়া ধরেছে বজ্র বৃষ্টি-ধন্দা,
তবুও ফুটিলো শুভ্র রজনীগন্ধা।
কেনো যে ফুটিলো দলে-দলে আছে লেখা ;—
অসীম-লোকের প্রেম সে পেয়েছে একা।
সে প্রেম সহসা ভাগ্যে যাহার জোটে
সে তো ফুটিবেই,—ফুলও সুখেই ফোটে।
বজ্র-বৃষ্টি-তুচ্ছ-করা সে প্রেমে
রজনীগন্ধা ধুলা-কঙ্করে নেমে
মেলিয়া ধরিলো শুভ্র পাপড়ী তা'র ;
গন্ধে ভরিলো অতল অন্ধকার।
গন্ধই শেষে আলোর আকার নিয়া
ভরিয়া তুলিল শতেক তিয়াসী হিয়া।

হিয়ায় হিয়ায় গন্ধ গড়িলো সেতু ;
গন্ধই হোলো শত মিলনের হেতু।
বজ্র-বৃষ্টি ব্যবধান করি দূর
শতেক যুগের শত শত বন্ধুর
আনন্দময় সম্বিৎ সত্তার
গন্ধ করিলো এক সাথে একাকার।
এতো প্রেম-লীলা নীরবে যাহার বহে,
বজ্র যে তা'র—দহনের তরে নহে।—
নিশীথে নিভৃতে ফুটিয়া রজনীগন্ধা
ঘুচালো সবার অন্ধ—অলীক—ধন্দা।
বৃষ্টি-বাদলে সহসা বাজে রে ছন্দ ;—
হাজার নাসায় পশিল প্রেমের গন্ধ।

কান্না

মায়া বসু

এতক্ষণ পর সেই পরম প্রত্যাশিত, চরম মুহূর্ত্তটি এলো!

সেই ভয়ঙ্কর আকর্ষণীয়, অথচ নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি হতে হল অপরেশকে।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি, প্রস্তুত হবার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়েই যে এমন জটিল অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হবে, তা যেন ভাবতে পারেনি অপরেশ। তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রাত এটা। তার কেন। সমস্ত স্ত্রী পুরুষের। বহু স্বপ্নভরা, কল্পনা ভরা প্রত্যাশার, বড় আকাঙ্ক্ষার—বড় আনন্দের ফুলশয্যার রাত।

এমন রাত জীবনে একবারই আসে।

বিয়েতে মত দেবার পর থেকে এই কটা দিন নিজের মনকে অনেক বুঝিয়েছে অপরেশ। কুন্তলার যখন এ বিয়েতে অমত নেই, হয়ত সুখী হতে পারবে দুজনে। হয়ত বয়সের বৈষম্যের কথা ভুলে গিয়ে ত্রুটি বিচ্যুতি সব মানিয়ে নেবে। মন বদলাবে। ভালবাসতে পারবে অপরেশকে। তারই ইচ্ছায়, তারই জোরে অপরেশ বুড়ো বয়সে লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে পাড়ার সবার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ টিটকিরি ভরা কথা আর চোখের উপর দিয়েই মাথায় বেমানান টোপর চড়িয়ে এককালে এ পাড়ার বাসিন্দা, চেনা মেয়ে, এ পাড়ার সবচেয়ে সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করতে রওনা হয়েছিল।

জোর করে তাকে ধরে বেঁধে তো আনা হয়নি? বরং উপযাচক হয়ে কুন্তলার দাদাই অনেকদূর থেকে এসেছিল এই সম্বন্ধ নিয়ে। আর সত্য কথা বলতে গেলে তখন একেবারেই রাজী হয়নি অপরেশ। খুব জোরের সঙ্গেই আপত্তি জানিয়েছিল।

এখনো তো একটা মাসও পোরেনি। এর মধ্যে কুন্তলা ভুলে গেল সে সব কথা?

হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বসার মেয়ে তো নয় ও! বহুদিন ধরেই এই পাড়াতেই ওকে দেখেছে অপরেশ। ইচ্ছে হলে অনেক অনেক ভাল ছেলেকেই ও বিয়ে করতে পারত। তবে?—

স্ত্রী-আচার শেষ করে বড় বৌদি দলবল নিয়ে বেরিয়ে যেতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল অপরেশ। নিজের জন্যে নয়। কুন্তলার জন্যে। এসব সাবেককালের মেয়েলী আচার অনুষ্ঠান ওর ভালই লাগছিল। অনাস্বাদিত পুলকে বার বার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে ওর সর্ব শরীর। অত্যন্ত মধুর নেশার মত লেগেছে সমস্ত ব্যাপারটা। ঠাট্টা, তামাশা। কুন্তলাকে আর তাকে জড়িয়ে নানা রঙ্গের উপহাস। ছোট বড় সবাই মিলে। অপরেশ নিজের বয়সটাকে একেবারে ভুলে গিয়েছিল। যারা ভুলিয়ে দিয়েছিল, তাদের মধ্যে অপরেশের গুরুজনস্থানীয়ারাও ছিলেন অনেকে। কিন্তু তাহলে কি হয়? সব বয়সের মেয়েরা, সব সম্বন্ধ অস্বীকার করে বুঝি জমিয়ে রাখে এই সব উচ্ছল, অসভ্য রসিকতাগুলো এই দিনটির জন্যে। মুখের আটক থাকে না। বুঝি মনেরও নয়।

বিয়ের বর হয়ে কোনমতেই এসব ব্যাপারে বাধা দেওয়া যায় না। বন্যার জল কে কবে আটকে রাখতে পেরেছে দুমুঠো বালির বাঁধ দিয়ে?

দরজার বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়ে গেলেন প্রথমে বড় বৌদিই। কিন্তু অপরেশ মনে মনে হেসে নিজের হাতে ভিতর থেকে আবার খিল বন্ধ করল। ধীরে সুস্থে সিল্কের পাঞ্জাবী, গলার ফুলের মালা, গাঁটছড়া, সব কিছু একে একে খুলে রেখে ফিরে দাঁড়াতেই বুকটা ধক্ করে উঠল।

কুন্তলা কাঁদছে!

উচ্ছ্বসিত ডাকে। দুহাতে মুখ ঢেকে। ফুলে ফুলে। ফুলশয্যার ফুল-ভরা খাটের উপর উপুড় হয়ে কাঁদছে কুন্তলা।

নানা রঙের ফুল। বিছানার চারপাশে মালা আর স্তবক। ফুলের তোড়া। হাই পাওয়ারের কড়া আলোটা বড়বৌদি যাবার সময় নিবিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন ডিম নীলাভাবিচ্ছুরিত ঘরটা যেন স্বপ্নলোকের মত মনে হচ্ছে।

ফাল্গুনের শেষ। অপরেশের দক্ষিণ খোলা ঘরখানার ঠিক পিছনেই গন্ধরাজ গাছটা ফুলে ফুলে সাদা হয়ে গেছে। বাতাসে ভেসে আসা তার তীব্র গন্ধটা ঘরের ফুলগুলোর গন্ধের সঙ্গে এক হয়ে আরো তীব্র মদির সৌরভ ছড়াচ্ছে। সেই সঙ্গে এসেন্সের সুরভি—তারি মাঝখানে স্বর্গচ্যুত উর্বশীর মত আকুল হয়ে কাঁদছে পূর্ণ যৌবনা অপরূপ সুন্দরী রমণী। রক্ত লাল বেনারসী আগুন ছড়াচ্ছে। নতুন ঝকঝকে সোনার গয়নাগুলো ঝকঝক করে উঠছে ওর নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

আত্মসংবরণে অসমর্থ পুরুষ আত্মবিস্মৃতভাবে এগিয়ে এল। অসাড় অবশ হাতখানা বাড়িয়ে কুন্তলার কেঁপে-ওঠা সুকুমার তনুদেহের উপর রাখতে গেল।

কিন্তু পরমুহূর্তেই যেন ধাক্কা খেয়ে সরে এলো ওর কাছ থেকে। মদির ফাল্গুনের বসন্ত বিহ্বলতা নয়, অপরেশের দুচোখে চৈত্রের জ্বালা দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠল।

তবু ধৈর্য ধরে কান পাতল। দরজার বাইরে চুড়ির শব্দ, ফিস্ ফিস্ কথা আর হাসির মৃদু আওয়াজটা আছে কিনা। কুন্তলা আর তার এই চমৎকার ফুলশয্যার রাত্রে আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে আছে কিনা কেউ। এই লজ্জা, এই কান্নার সাক্ষী আছে কিনা কেউ।

না। বোধ হয় কেউ নেই। রাত হয়েছে। সমস্ত বাড়িটা অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। শুধু ছাতে একটা কর্কশ শব্দ। শেষ ব্যাচের পর বৌভাতের একেবারে শেষ কটি কাজকর্ম করা লোকজনের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। তারই এঁটো পাতাগুলি তুলে জল দিয়ে ঝাঁটা দিয়ে খর খর করে ধোয়া হচ্ছে। কিন্তু এখনি ওই শেষ শব্দটাও থেমে যাবে। বিগত কয়েক দিনের খাটা-খাটুনির পর কর্মক্লান্ত লোকগুলো মড়ার মত ঘুমোবে।

শুধু অন্ধকার দেয়ালে অতন্দ্র প্রহরীর মত জেগে থাকা ঘড়িটা টিক টিক করে জানিয়ে দিচ্ছে, সময় চলে গেছে। সময় চলে যাচ্ছে। সময় চলে যাবে।

আড়ি পাতবেই বা কে? বিয়ে করবে না বলেই তো জীবনের বেশী অর্ধেকটা কাটিয়ে দিল অপরেশ। কোথা থেকে হঠাৎ কি যে হয়ে গেল—ধাঁধাঁর মত এখনও যেন লাগছে অপরেশের কাছে। মনে হচ্ছে এটাও ওর একটা স্বপ্ন মাত্র। হয়ত কাল সকালে জেগে উঠে দেখবে, কেউ নেই, কিছু নেই। এই ফুল, এই গন্ধ এই উৎসব আর ওই কুন্তলা, সব মিথ্যে। সব অস্পষ্ট।

এ তো অল্পবয়সী কোন ঘোর লাগা, নেশা লাগা তরুণের ফুলশয্যার রাত নয়। অপরেশের মত প্রৌঢ়, প্রায় বিগত যৌবন বয়স্ক লোকের বাসর রাত্রে আড়ি পাতার

মত ঔৎসুক্য কি থাকে কোন তরুণীর ? কোন মহিলার ? কে জানে ?

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস কোন মতেই রোধ করতে পারল না—অপরেশের পুরুষ-হৃদয়।

সেই যদি বিয়ে করতে গেল টোপর মাথায় দিয়ে, ফুলের মালা গলায় দিয়ে, রাজ্যের লোক হাসিয়ে, আর কটা বছর আগে করলেই হত। যে জন্যে আজ চোখের জল ফেলছে কুন্তলা !

অবশ্য তাহলে কুন্তলার বদলে ওখানে অন্য কেউ থাকত। যে কাঁদত না ! মনের মত তরুণ যুবক সুদর্শন অপরেশকে বর পেয়ে খুশী হয়ে মুচকে মুচকে হাসত। লজ্জা ঢাকবার জন্যে, আনন্দ চাপবার জন্যে লজ্জা-বস্ত্রের আঁচলটা আরো বেশী করে টেনে দিত মুখের উপর। দুরু দুরু বুকে, পুলকে রোমাঞ্চে অধীর উত্তেজনায় প্রতীক্ষা করত, কখন অপরেশ তার সব লজ্জা হরণ করে নেবে।

তারপর !

তারপর এক সময় কুমারী-জীবনের সব লজ্জা সব সঙ্কোচ ঢাকতে ওরই বুকের মধ্যে মুখ লুকোতো।

দুটি হৃদয় দুটি দেহমন একটি-সত্তায় পরিণত হত। অপরেশের অস্থির উত্তাল হৃদ-স্পন্দনের সঙ্গে মিশে যেত আর একটি সুকোমল বুকের আবেগ অনুভূতি, ভালবাসা।

কিন্তু কুন্তলার দোষ কি ? তার মত সুন্দরী অল্প-বয়সী মেয়ের অপরেশের মত স্বামী পাবার দুঃখে কাঁদবার অধিকার আছে বই কি। এক কালে এই অভিজাত পাড়ার কুন্তলা মজুমদারের দেহ-তরঙ্গ-ভঙ্গিমায়, রূপ-যৌবনের জোয়ারে হাবুডুবু খেয়েছে ব্যারিষ্টার রায়ের ছেলে, ময়ুর ছাড়া কার্ত্তিক বিজন বোস। ইঞ্জিনীয়ার কমল সোম। বিখ্যাত গায়ক মিলন মিত্র। মোটা মাইনের চাকরে ব্রজেন দত্ত।

কিন্তু এজন্যে দায়ী কে ? এখনো ওর নিজে হাতে লেখা চিঠিখানা আছে না অপরেশের কাছে ?

মেয়ে মানুষের ছলনায় যদি না ভুলত অপরেশ ?

বৌ-ভাতের সময় পাড়ার ছেলেরা কুন্তলার পূর্ব পরিচিত বিজন কমলরা দল বেঁধেই এসেছিল। নিমন্ত্রণ খেতে। বৌ দেখতে। উপহার হাতে নিয়ে।

অথচ কী কেলেঙ্কারীটাই না করল তখন কুন্তলা ! পুরোনো বন্ধুদের দেখে একটা কথা বলা, একটু হাসা দূরে থাক উপহারগুলো নিতে হাতটা পর্যন্ত বাড়াল না। গম্ভীর মুখে শক্ত কাঠের মত চুপচাপ বসে রইল ! ভাগ্যে ওর পাশে রাণী বৌদি বসে ছিল।' সেই হাত পেতে নিল সব। কে জানে কি ভেবে গেল ওরা। হয়ত ভাবল, অপরেশ এর মধ্যেই বুঝি বারণ করে দিয়েছে কুন্তলাকে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে হেসে কথা কইতে। এর মধ্যেই শাসন সুরু করেছে।

কিন্তু কতক্ষণ এভাবে থাকা যায় ?

ওকি মনে করেছে অনন্তকাল ধরে ও কাঁদবে, আর অপরেশ বিনাদোষে এই অসহ্য ন্যাকামী সহ্য করবে ?

কেউ জানেনা, স্বেচ্ছায় তাকে বিয়ে করেছে কুন্তলা। বাড়ির সবাই পাড়ার সবাই কালই জানতে পারবে ফুলশয্যার রাত্রের এই অদ্ভুত অভাবনীয় ইতিহাস। হাসবে সবাই উপহাসের হাসি।

চূড়ান্ত বোকামির ফল হাতে পেয়েছে—বলে আর একবার বিদ্রূপ ব্যঙ্গের শানিত তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারবে বিজন বোসের দলটা।

তেমন গরম হচ্ছিলনা। তবু পাখাটা বাড়িয়ে দিল শেষ পয়েন্টে। এগিয়ে এসে বিছানার একপাশে বসল অপরেশ। নরম গলায় ডাকল, 'কুন্তলা !'

কুন্তলার ফোঁপানি আরো বেড়ে গেল।

কপালের ভাঁজে ভাঁজে বিরক্তির ক্লান্তির কুঞ্চন রেখা ফুটে উঠল। গলার স্বরে বিতৃষ্ণার ঝাঁঝ অস্পষ্ট রইল না।

'বিয়েটা যখন করেই ফেলেছ, ভুল করেই হোক, আর যে করেই হোক, তখন কান্নার ঢের সময় পাবে। সমস্ত জীবন। আজ রাত্তিরটা বাদ দিলে তোমার কি খুব অসুবিধা হত কুন্তলা -'

উত্তেজিত কুন্তলা মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে বসল। মাথার উপর থেকে লজ্জাবস্ত্রটা খসে পড়তে পড়তেও খসে পড়লনা। বেনারসীর আঁচলের প্রান্ত ভাগটুকু জরীর ফিতে জড়ানো প্রকাণ্ড খোঁপাটায় আটকে রইল।

স্ফুরিত অধরে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে কুন্তলা সোজা চোখে তাকাল অপরেশের মুখের উপর। 'কেন, কেন আপনি ওদের নেমন্তন্ন করেছিলেন ? আমাকে অপমান করার জন্যে ?'

স্তম্ভিত হতচকিত অপরেশের মুগ্ধদৃষ্টি আটকে রইল কুন্তলার আরক্ত অশ্রু ধৌত মুখের পর। 'কাদের নেমন্তন্ন করেছি?'

তেমন ভাবেই জবাব দিল কুন্তলা, 'কেন বিজন কমল ব্রজেন মিলনবাবুদের। ওরা কি আপনার বন্ধু? ওরা কি আগে কখনো এসেছে এ বাড়িতে?'

বিস্ময়ের প্রবল বন্যায় অপরেশের মুখের কথা আটকে গেল। 'কেন, তাতে কী হয়েছে? এক পাড়ার লোক, প্রতিবেশী—'

'এক পাড়ায় থাকলেও ওরা তো আপনার খুব পরিচিত নয়, বন্ধুও নয়। ওরা আপনার চেয়ে বয়সেও অনেক ছোট আপনি কোনকালেই ওদের সঙ্গে মিশতেন না—ওরাও নয়!'

বয়সে ওরা অনেক ছোট! বয়স হয়েছে অপরেশের!

কথাটা কানে যেতেই বুকের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা লেগেছিল। রূঢ় কঠিন সত্যের তীব্র জ্বালা কুন্তলার কথায়। সামলাতে দেরী হল।

অপরেশের বয়স হয়েছে। সেকথা কি এক মুহূর্তের জন্যে কখনো ভুলে গেছে ও? এ কথা কি কুন্তলা এত কাল এ পাড়ায় থেকে মোটে তিন বছর দূরে গিয়ে ভুলে গেল?

অপরেশ কি প্রত্যেকদিন এর দামী প্রমান সাইজের বেলজিয়াম আরশীর সামনে দাঁড়ায় না?

সে কি এত নির্বোধ? বিয়াল্লিশ বছরের আধবুড়ো অপরেশের চোখে এখনো ছাউনি পড়েনি। রঙের রূপোলী ইসারা সুস্পষ্ট। বেশী না হোক, বয়সের কিছুটা ছাপ সর্বাঙ্গে।

মনে পড়ল বাসর ঘরের কথা। কুন্তলার সম্পর্কে ঠাকুমার রসিকতা। 'ওমা শেষ কালে বুড়ো বরের গলায় তুই মালা দিলি দিদি? গৌরী হেন ঝি, তোর কপালে বুড়ো বর আমরা করব কি?'

আশ্চর্য, তখন কিন্তু অপরেশের দিকে সপ্রেম কটাক্ষের বিদ্যুৎ ছড়িয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠেছিল কুন্তলা। 'ঠাকুমা, গৌরী কিন্তু যুগ যুগ ধরে ঐ বুড়ো শিবকে পাবার জন্যে তপস্যা করেছিল; জানো? কুমারসম্ভব পড়নিত, জানবে কি করে বল?'

সম্পর্কে শালী, বৌদি ওরাও খুব খুশী হয়েই ঠাট্টাতামাসা করছিল। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' হল ভাই। দেখ, মন জুগিয়ে চল আমাদের কুন্তির।'

তখন এতটুকুও রাগ করেনি কুন্তলা। সেকি বাপের বাড়ি বলে? ওর দাদা সব জানতো বলে?

এ বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে অমন বিগড়ে গেল কেন? এ পাড়াতেই তো কাটিয়ে গেছে কুড়িটা বছর। আরও কাটাত, যদি হঠাৎ সদাশিববাবু মারা না যেতেন। বড়ছেলে সত্যশিবের মাথায় এত বড় সংসারটা না চেপে বসত। বিধবা দিদি, তার ছেলে, ওর নিজের ছেলে মেয়ে, আইবুড়ো বোন কুন্তলা।

বোঝার উপর বড় বোঝা মোটা ভাড়ার প্রকাণ্ড বাড়িটা। সদাশিববাবু এতকাল যার বোঝা টেনে এসেছেন।

খরচ কমাতে বাধ্য হয়েই সত্যশিবকে এ পাড়া ছেড়ে অনেকদূরে কম ভাড়ার বাড়িতে উঠে যেতে হয়েছে।

সুদাম সরকার লেনের দক্ষিণ খোলা দোতলা বাড়িটা অবশ্য অপরেশের নিজস্ব।

বহুদিনের পুরোনো বাসিন্দা ওরা এখানকার। স্বল্পভাষী গম্ভীর প্রকৃতির ঘরকুনো অপরেশ আফিসটুকু ছাড়া বাকী সময়টার বেশীর ভাগই তার বাইরের ঘরে বই মুখে করে কাটালেও একেবারে অন্ধ ছিল না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা অফিস ফেরত গলির মুখে এসে, চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য এটুকুও চমকাত না, যদি কুন্তলার দাদা সত্যশিবের সঙ্গে অপরেশের বেশ খানিকটা আলাপ পরিচয় না থাকত।

পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে অমিশুক অপরেশের সত্যশিবের প্রকৃতির সঙ্গে বেশ খানিকটা মিল ছিল। সেও কোথাও যেত না। কথাবার্তাও একমাত্র অপরেশ ছাড়া বোধ করি পাড়ার আর কারু সঙ্গে নেহাত দরকার না হলে বলতনা। বই পড়ার ঝোঁক ছিল খুব। লাইব্রেরী ভর্ত্তি বই দেখে অপরেশের ঘর থেকে সহজে নড়তে চাইত না। অন্তরঙ্গতার কারণ দুজনের স্বভাবের মিল।

প্রায় অন্ধকার, প্রায় নির্জন, গলিটার ভিতর কুন্তলা একেবারে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। আর তার খুব কাছে মযূরছাড়া কার্ত্তিক বিজন বোস কি যেন বলছে ওকে।

দুহাতে কলেজের বইগুলো বুকে চেপে ধরে চুপ করে শুনে যাচ্ছে কুন্তলা অবনত মুখে। অবশ্য ওর মুখের ভাব দূর থেকে বোঝা যাচ্ছিল না কিছুই।

একপলক মাত্র দৃশ্যটায় চোখ বুলিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে অপরেশ ওদের পাস কাটিয়ে হন হন করে বাড়ির দিকে রওনা হল।

কিন্তু খানিকটা যেতে না যেতেই আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হল কুন্তলার ত্রস্ত গলার স্বরে। 'শুনুন! অপরেশ-বাবু একটু দাড়ান।'

'আমায় ডাকছেন' অনিচ্ছার সঙ্গে প্রশ্ন করেছিল অপরেশ। গলার স্বরটা কেমন রুক্ষ কঠিন হয়ে গিয়েছিল।

কারণ ছিল। আজ প্রথম নয়। আর শুধু বিজন বোসই একলা নয়। ওকে এভাবে অপরেশ আরো কয়েক-বার দেখতে [illegible]য়েছে।

মিলন মিত্র, কমল সোম, ব্রজেন দত্তের সঙ্গে কথা বলতে। এখানে ওখানে।

কাছে এসে অপরাধীর মত মাথা নীচু করে অস্ফুট কণ্ঠে কুন্তলা বলেছিল, 'ওরা পথে ঘাটে আমাকে ফলো করে। সুযোগ পেলেই জ্বালাতন করে। গায়ে পড়ে কথা বলে। আমার কী দোষ! কলেজে যেতে আসতে তো আমাকে একা একা বেরুতেই হয়। স্টলে, দোকানেও যেতে হয়—'

এ রকম সাফাই গাওয়ার মানে বুঝতে এতটুকু দেরী হয়নি অপরেশের। মনটা বিষিয়ে উঠেছিল আরো। প্রত্যেক মেয়েই সময়-বিশেষে সবদোষ পুরুষের ঘাড়ে চাপায়। বিশেষ করে অপরের কাছে ধরা পড়লে। কিন্তু কুন্তলার অপরেশকে কৈফিয়ৎ দেবার অর্থ? ও কি মনে করেছে এসব কথা ও সত্যশিবের কানে তুলবে?

নীরস রুক্ষভাবে বলেছিল, 'ওরা আপনাদের পরিচিত বন্ধু। প্রশ্রয় না থাকলে, এভাবে ওপরপড়া হয়ে আপনাকে যখন তখন জ্বালাতন করে বলে মনে হয় না। কিন্তু যাই হোক, এসব কথা, আমার কাছে বলে বা নালিশ করে লাভ কি? আমি তো আপনার অভিভাবক নই। আপনার বাবা, দাদা, ওঁদের বলুন।'

অভদ্রভাবে বলা কথাটার অন্তর্নিহিত খোঁচায় কুন্তলার চোখে জল এসে গিয়েছিল। অপরেশ দেখেছিল ওকে সে জল মুছতে। কিন্তু তাতে ওর কঠিন মন নরম হয়নি। এতটা সুন্দরী যুবতীর চোখের জলে গলে পড়বার মত নরম মন অপরেশের নয়। তাই যদি হত, তবে এতদিন কবে প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে গলায় বিয়ের ফাঁস পরে বসত। অর্থে, বিত্তে, সামাজিক প্রতিপত্তিতে, ওদের কারু চেয়ে কোন অংশেই ছোট নয় অপরেশ। আর সত্যি কথা বলতে কি, বয়স হলেও, চেহারাটাও তার একেবারে অচল নয়। বরং সুদর্শন বলাই চলে।

না। কুন্তলার কথায়, চোখের জলের ছলনায় কোন-দিনও ভোলেনি অপরেশ। কুন্তলার তরফ থেকে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার আগ্রহ বড় কম ছিল না। এক পাড়ায়, এক রাস্তায়, এমন কি ওর অফিস আর কুন্তলার কলেজের টাইমটাও যখন এক, তখন মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ না হবার কোন কারণই ছিল না।

একদিন কুন্তলা বাসে উঠে তার পাশেই রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকা অপরেশকে নিজের পাশের খালি সীটটা দেখিয়ে অনুনয় করে বলেছিল, 'বসুন না। এটা তো লেডিজ সীট নয়। উঠতে হবে না আর আপনাকে।'

'বেশ আছি।' নীরসভাবে উত্তর দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সেদিন অপরেশ।

এমনি আরো অনেক ছোটখাট ব্যাপারে, বই দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে, বার বার কথা বলতে, কাছে আসতে চেয়েছে কুন্তলা। কিন্তু ওর দিক থেকে কোন আগ্রহই দেখা যায়নি। অপরেশ নিজের গণ্ডীর সীমা ছাড়ায়নি কোনদিনও।

আই. এ. পাশ করার পর পড়া ছেড়ে দিতে হল কুন্তলাকে। ওর বাবা তখন ভুগছেন পক্ষাঘাতে, বছর খানেক ধরে। ভাল চাকরিটা গেছে। সঞ্চিত অর্থে টান ধরেছে—ডাক্তার ওষুধ পথ্যের রাজকীয় সমারোহে।

সত্যশিবের কাছ থেকেই কিছু কিছু কথা শুনতে পেত অপরেশ। দুহাতে কুন্তলার বাবা রোজগার করেছেন, খরচও করেছেন দুহাতে। মেয়ের বিয়ের জন্যে টাকা রেখেছিলেন, কিন্তু মেয়ের জেদে সে টাকা তাঁর চিকিৎসাতেই শেষ হল।

সদাশিববাবু মারা গেলেন। কুন্তলার বিয়ে হল না। ওরা কিছুদিন বাদে উঠে গেল অন্য পাড়ায়।

কুন্তলাদের আর কোন খবরই রাখেনি অপরেশ এই তিনবছরের উপর। তবে এইটুকু জানত, একদিন না একদিন কমল, বিজন, মিলন বা ব্রজেন, এই সুপাত্র কটির মধ্যে কারু সঙ্গে বিয়ে হবে কুন্তলার। আর সত্যশিব প্রজাপতি মার্কা একখানা হলদে রংয়ের খাম অপরেশকে পাঠাতে ভুলবে না কোনক্রমেই।

তিন তিনটে বছরের উপর চুপচাপ করে থাকার পর হঠাৎ সত্যশিব একদিন সকালে ওর বাইরের ঘরে এসে হাজির হল। আর হঠাৎ আকাশ থেকে পড়ার মত অপরেশ বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে শুনল সত্যশিব তাকেই অনুরোধ জানাচ্ছে কুন্তলাকে বিয়ে করার জন্যে। মেয়ের বয়স হয়েছে। এই বেলা বিয়ে না দিলেই নয়। বাবার কত আদরের মেয়ে! সত্যশিবের বড় আদরের ছোট বোন! রূপে লক্ষ্মী। গুণে সরস্বতী!

কিন্তু অপরেশ অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। শক্ত হয়ে ঘাড় নাড়ল। সত্যশিব পাগল হলেও তার মাথা ঠিকই আছে। সে হয় না! হবার নয়। হয় না।

কেন হয় না? হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল চিরকালের শান্ত, ভদ্র গম্ভীর প্রকৃতির সত্যশিব। 'হয় না আমরা গরীব হয়ে গেছি বলে, এই তো? বাবা মারা গেছেন, কুন্তির জন্যে খুব বেশী খরচ করতে পারব না বলে এই জন্যেই তো? কিন্তু কুন্তলা তো অপছন্দের নয়।' আপনারও কি পণের দাবী আছে অন্য সবার মত? আপনার সম্বন্ধে এ কথা আমি ভাবতেই পারিনি।'

'ওসব কথাই ওঠেনা। বিয়ে করলে সময় মতই করতাম। বিয়ে করব না বলেই স্থির করেছি।' অপরেশ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

সত্যশিবও মরিয়া। 'আপনি পণ্ডিত মানুষ। বেশী কিছু বলবার নেই। সংসারে অনেকি স্থির, নিশ্চিত বস্তুরই বিলুপ্তি ঘটে। এ ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গেরও কোন দোষ হবেনা।

'সে জন্যেও নয়।' এবার আসল বক্তব্যে পৌছুল অপরেশ। 'বিয়ের বয়স আমার আর নেই। আর কুন্তলা আমার চেয়ে অনেক ছোট।'

'এই কথা।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিশ্চিন্ত মনে হেসে উঠল সত্যশিব। আমি বলি কি না কি। যাক্ বাবা, বুক থেকে যেন পাথরের বোঝা নেমে গেল আমার এতক্ষণে।

এবার অনুনয় বিনয় করে অপরেশ বলল, 'ওসব কথা ছাড়ুন। 'এ পাড়ায় অনেক ভাল ছেলে আছে। অল্প বয়সী সুপাত্র। তারা কুন্তলাকে বিয়ে করতে এক কথায় রাজী। সম্বন্ধ করুন, হয়ে যাবে। কুন্তলাও ওদের পছন্দ করে। এত কাল কি চোখ বুজে ছিলেন?'

'সুপাত্র। এ পাড়ায়।' আশ্চর্য হয়ে গেল সত্যশিব। 'কে বলুন তো? আমার তো চোখেই পড়েনি কোনদিনও।

'কেন বিজন বোস? এঞ্জিনীয়ার কমল সোম? ব্রজেন দত্ত? ওরা প্রত্যেকেই সুপাত্র। ওদের সঙ্গে বিয়ে হলে কুন্তলা সুখী হবে। মানাবেও চমৎকার।'

'ওঃ, ওদের কথা বলছেন? ওসব বরবাদ করে দিয়েছে কুন্তলা। ওদের টাকার খাঁই যতটা, তার চেয়েও কুন্তলার অমত আরো অনেক—অনেক বেশী।'

অগত্যা এই ভাল মানুষ সরল লোকটিকে প্রাণান্ত পরিশ্রমে অতি কৌশলে অনেক করে বোঝাল অপরেশ, সব দিক বজায় রেখে। ভাল ছেলের জন্যে টাকা খরচ করতেই হয়। তাতে দোষটা কিসের? অপরেশের প্রচুর টাকা ব্যাঙ্কে পড়ে রয়েছে। ধার দিচ্ছে সে ইচ্ছে করেই। পনেরো কুড়ি বছর ধরে কিছু কিছু করে শোধ করুক সত্যশিব। অপরেশ একা মানুষ। খরচটাই বা কি? বিজন বোসের সঙ্গে বিয়ের কথাটা ঠিক করে ফেলাই উচিত।

'আচ্ছা ভেবে দেখি!' সত্যশিব উঠে গিয়েছিল এক সময়। বিমর্ষ মুখে। কথার জবাব না দিয়ে।

ফাঁড়া কেটে গেছে ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছিল অপরেশ।

কিন্তু কটা দিন পর সত্যশিব আবার এসেছিল। বেশ খুশী খুশী মুখে।' টাকা চাইনা। আপনাকেই চাই। এই দেখুন চিঠি। কুন্তলা নিজে লিখেছে।'

একখানা ছোট্ট চিরকুট। তাতে কুন্তলার হাতের লেখা দুটো লাইন। 'অপরেশের সঙ্গে তার বিয়েতে কোন অমত নেই। বরং এ বিয়ে হলে নিজেকে ও ভাগ্যবতী বলেই মনে করবে।'

বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে একবার চিঠি, আর

একবার সত্যশিবের মুখের দিকে তাকিয়ে অপরেশ কি যে বলবে ভেবে না পেয়ে বলেছিল, 'কিন্তু—'

'আর কিন্তু কিন্তু করবেন না মশাই! আপনার কথা মত ঐ বিজনের নাম করতে গিয়ে হাঁড়ীর হাল হয়েছে আমার। এরা সব আজকালকার দিনের মেয়ে। তাদের মতি গতি বোঝার মত বুদ্ধি আমার মাথায় নেই। ভাগ্যিস্ বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে নিজে পছন্দ করে আমার বিয়েটা দিয়ে গিয়েছিলেন নইলে হয়ত আমারও এই দশা হত আর কি।'

হোহো করে হেসে অপরেশকে জড়িয়ে ধরেছিল সত্যশিব। আর একটা কথাও বলতে দেয়নি।

বলতে পারেও নি অপরেশ।

কুন্তলার চিঠিটা পড়বার পর থেকেই সমস্ত দেহে মনে একটা অদ্ভুত ঝড় উঠেছিল। এত কাল ধরে যে সংযমে নিজেকে আয়ত্ত করে রেখেছিল, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গলে গলে পড়ছিল সেটা। সমস্ত অন্তর জুড়ে বিপ্লবের ঢেউ।

কুন্তলা, সেই কুন্তলা তাকেই বিয়ে করতে চায়।

একটা অনাস্বাদিত পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল সর্বশরীর।

আশ্চর্য মেয়েদের মন। আশ্চর্য কুন্তলার আচরণ।

কিন্তু সেই কুন্তলার আজ একি অদ্ভুত ব্যবহার?

আস্তে আস্তে আঘাতটা সামলে অপরেশ খানিকক্ষণ পর উত্তর দিল, 'শুধু ওরা নয়, তুমিও আমার চেয়ে অনেক ছোট। জেনে শুনে তুমি এত বড় ভুল করলে কেন কুন্তলা? আমিতো স্বপ্নেও একথা ভাবিনি, কল্পনাও করিনি। শুধু তোমার চিঠি পেয়ে সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর ভুল করে বসলাম! এতবড় ভুল জীবনে কখনো করিনি। কী যে হল—'

'ভুল। ভয়ঙ্কর ভুল! আমাকে বিয়ে করে আপনি ভুল করেছেন? ওদের ডেকে এনে, নেমন্তন্ন করে, আমাকে যথেষ্ট অপমান করেও সাধ মেটেনি আপনার? তার উপরও আবার এই কথা?

আবার কুন্তলা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ফুল শয্যার জন্যে সযত্ন রচিত শয্যার উপর।

অপমান! কুন্তলাকে! ওদের নেমন্তন্ন করে? স্তম্ভিত হতবুদ্ধি অপরেশ ভেবে কূল পেলনা তার অপরাধটা কোথায়।

কই, ওরা তো কুন্তলাকে কোন কথা বলেনি। যেটুকু অপমান করার অপরেশকেই করেছে। আর নীলকণ্ঠের মত বিবর্ণ মুখে নিঃশব্দে শুনে গেছে অপরেশ।

বাবা মা নেই। আর বয়স যদিও একটু বেশী হয়ে গেছে, তবু কাকা কাকী জ্যাঠতুতো দাদা বৌদিরা খুব খুশী হয়ে খুব আনন্দের সঙ্গে ধুমধাম করেই বিয়ে দিয়েছেন। অপরেশ আপত্তি করতে পারেনি। শুধু কুন্তলার জন্যে। সে তো ছেলেমানুষ! তার তো সাধ আহ্লাদ আছে।

সন্ধ্যাবেলা ফুল দিয়ে সাজানো ময়ূরপঙ্খী মোটরটা বড়-বউ সুদ্ধ গেটের কাছে থামতেই একটা সোরগোল উঠল। বাজনা উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি। পাড়ারও অনেকেই ভীড় করে দাঁড়াল। এ পাড়ারই মেয়ে তিন বছর পর বৌ হয়ে আসছে, সোজা ব্যাপার? তাও আবার চির কুমার থাকবার মতলব করেছিল যে অপরেশ, তারই ঘরে! আর আর সব সুপাত্রদের বরবাদ করে!

সে দলে অনেকের মধ্যে বিজনরাও ছিল।

শাঁখ, উলুধ্বনি, বাজনা, হৈচৈ, গণ্ডগোল সবার মধ্যেই কথাটা ঠিক নির্ভুল ভাবে যথাস্থানে পৌছল। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।'

আরেক জন বলল, "এ বয়সে টোপর মাথায় দিতে লজ্জাও করলনা। টাকা দিয়ে সুন্দরী যুবতী পাওয়া যায়, যৌবন ফিরে পাওয়া যায়না, লোকটা কি তাও জানে না নাকি?'

আর একজন গলা আর একটু চড়ালো। 'দাদা কি নিজের চেহারাটা আয়নায় দেখেনা না কি? মাথার চুলে কলপ দিয়ে কদিন আর ভুলিয়ে রাখবে? অতই যদি বিয়ে করার সখ, একটা বুড়িটুড়ি জুটিয়ে নিলেই হত। তা নয়, সব সেরা—'

অতি নির্মম কথাগুলো তীরের মত বিঁধছিল বুকের মধ্যে। ইচ্ছে হচ্ছিল, এই উৎসব সমারোহ, আলো গান-বাজনা, সব ফেলে কোথাও পালিয়ে যায়! অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে থাকে! কুন্তলার ওড়না ঢাকা মুখের অভিব্যক্তি

চোখে পড়েনি, কিন্তু অপরেশের চোখ-মুখ জ্বালা করছিল। লজ্জায় অপমানে পাণ্ডুর হয়ে উঠেছিল। মাথা তুলতে পারেনি। তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল কারু কথা না শুনে।

নিষ্ঠুর সত্য কী নিদারুণ যন্ত্রণাই না দিতে পারে নির্দোষী নিরপরাধ মানুষকে! কী অপমানই না করতে পারে!

আবার মুখ তুলল কুন্তলা। সোজা হয়ে বসল। চোখের জল মুছল। মাথার কাপড়টা ঠিক করল।

সেই রূপবতীর দিকে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস পড়ল আবার অপরেশের।

কিন্তু সে অপমান তো ওরা অপরেশকেই করেছিল। কুন্তলার প্রতি সমবেদনায়। কুন্তলার দুঃখে দুঃখিত হয়ে। তাতে কুন্তলার অপমান কেন? কান্নাই বা কেন?

দুই চোখের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের দৃষ্টি আরতির প্রদীপের মত অপরেশের দিকে তুলে ধরল কুন্তলা। ক্রোধ, ক্ষোভ, ঘৃণার সংমিশ্রণে অবরুদ্ধ গলায় বলে উঠল, 'কেন—কেন ওরা আপনাকে ও কথা বলবে? এত বড় স্পর্ধা ওদের কেন হবে? ওরা ছোট—অনেক ছোট। আপনার পায়ের ধুলোর যোগ্যও ওরা নয়। আমি যে ওদের ভাল করে চিনি। আর কোনদিনও ওদের কাউকে এ বাড়িতে ডেকে আমার অপমান করবেন না। না—না—না!

কি বলছে কুন্তলা? ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে না কি? এই তুচ্ছ কারণে দুঃখ পেয়ে ও কান্নাকাটি করছিল? অপরেশ ঠিক শুনতে পেয়েছে তো? ঠিক বুঝতে পেরেছে তো?

'কুন্তলা! কুন্তি!'

রোমাঞ্চিত বিহ্বল অপরেশ এতক্ষণ পর ওর কাঁধের উপর হাত রাখল। অতি সাবধানে। আর একখানা হাত দিয়ে ওর মুখখানা তুলে ধরল নিজের মুখের কাছে। 'কুন্তলা, কি দেখে তুমি আমাকে পছন্দ করলে বলবে? আমি তো কোন দিক দিয়েই তোমার যোগ্য নই!'

প্রথম পুরুষ-স্পর্শে সংকিত পুলকিত কুন্তলা লজ্জায় মুখ সরিয়ে নিতে চাইল। আস্তে আস্তে উত্তর দিল 'আমি যে—আমি যে তোমাকেই—সে তুমি বুঝবে না।'

কথাটা শেষ করতে না পেরে অপরেশের প্রশস্ত বুকের মধ্যেই নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্যে মুখখানা লুকোল কুন্তলা।

প্রাণপণে পরম প্রার্থিতাকে নিজের বুকের মধ্যে নিষ্পিষ্ট করতে করতে অপরেশ জেদ ধরল, 'বল কুন্তলা, আমাকে কি? বলতেই হবে তোমাকে।'

এতক্ষণে সব কান্না কোথায় উড়ে গেছে। সব মেঘ নিশ্চিহ্ন। মুখে মধুর, মদির হাসির আভাস ফুটে উঠেছে। নিজের অজান্তেই কখন নিজেকে অপরেশের বাহু বন্ধনে নিঃশেষে সমর্পণ করেছে। অপরেশের উদ্দাম আদর আর সোহাগের প্রবল বন্যায় হারিয়ে যেতে যেতে, ডুবে যেতে যেতে অপরেশের কানের কাছে নিজের কামনা ব্যাকুল কম্পিত ঠোঁট ছুইয়ে দু চোখ বন্ধ করে কুন্তলা বলল, 'তুমি কি কিছুই বোঝনি এতদিন? আমি যে—আমি যে তোমাকেই'—এবারও প্রাণপণ চেষ্টা করে কথাটা শেষ করতে পারল না কুন্তলা।

ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ও তাঁর মানবিকতা

লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

"মুক্তির উপায়" গল্পে কবি দেখিয়েছেন ফকিরচাঁদ অত্যন্ত নরম প্রকৃতির মানুষ। নবযৌবনা স্ত্রীকে সে সন্ধ্যাবেলায় ধর্ম-গ্রন্থপাঠে উৎসাহ দেয় তার সংগে ধর্ম-গ্রন্থের আলোচনা করিতে চায়। স্ত্রী হৈমবতী জীবন-রসে ভরপুর, সে স্বামীর কাছে যা চায় তা পায় না। নাটক-নভেল পড়ায় তার আসক্তির জন্য সে স্বামীর কাছে অনেক ভৎর্সনা শোনে। এক এক দিন যায় যায় পর্যন্ত। এমনি ক'রে নীরস প্রকৃতির স্বামী হৈমবতীর জীবন থেকে সমস্ত রস, তার মন থেকে সমস্ত আনন্দ নিঃশেষে নিঙড়ে বার ক'রে দেয়। কিন্তু এ সত্বেও যখন ফকিরচাঁদের পর পর তিনটি সন্তানের জন্ম হ'ল, তখন বাপের তাড়ায় তাকে চাকরীর চেষ্টা করতে হ'ল। তখন ইন্টারভিউ দেওয়া ইত্যাদি ঝঞ্ঝাট দেখে সে সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে যাওয়াটাই বেশী সুবিধাজনক ব'লে মনে করল।

যারা নিজেদের গুরু ব'লে প্রচার করে তাদের মধ্যে অনেকেরই যে একটা লাভের ব্যবসা একথাও কবি এই গল্পে ব'লেছেন। ফকিরচাঁদের গুরু তার সমস্ত শিষ্যদের এই মন্ত্র জপ করান যে সোনামাটি এর সমস্ত সোনা আমাকেই এনে দাও। তার এই সোনার ক্ষুধা মেটাতে মেয়েদের গায়ের গয়না চাই। অফিসের কর্মচারী তহবিল তছরুপ ক'রে টাকা এনে তাকে দেয়। অবশেষে একদিন সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল।

কর্মহীন ধর্ম-চর্চায় কবির আস্থা নেই। কবির মতে কর্মই হ'ল মানুষের আশ্রয়, তাকে অবলম্বন ক'রে দাঁড়িয়ে তবেই মানুষ ধর্মাচরণ করতে পারে। যাদের কোন কর্ম নেই, তাদের যেন পায়ের তলায় দাঁড়াবার কোন আশ্রয় নেই। তারা ধর্ম-রসের তলায় তলিতে যেতে থাকে।

ধর্মের নামে কর্মহীন, কর্তব্যহীন রসচর্চা কীর্তন নাচ গুরু এবং শিষ্যের দল মিলে এই যে প্রেম-ধর্মের মত্ততা তার পরিণাম দেখিয়ে "চতুরংগ" বইতে কবি লিখছেন—

"নবীন আমাদের গুরুজীর একজন চেলার আত্মীয়। আমাদের প্রতিবেশী, সে আমাদের কীর্তনের দলের একজন গায়ক। গিয়া দেখিলাম তার স্ত্রী তখন মরিয়া গেছে। খবর লইয়া জানিলাম নবীনের স্ত্রী তার মাতৃহীনা বোনকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়া ছিল। ইহারা কুলীন, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া দায়। মেয়েটিকে দেখিতে ভালো। নবীনের ছোট ভাই তাকে বিবাহ করিবে বলিয়া পছন্দ করিয়াছে। সে কলিকাতায় কলেজে পড়ে, আর কয়েক মাস পরে পরীক্ষা দিয়া আগামী আষাঢ় মাসে সে বিবাহ করিবে এই রকম কথা। এমন সময়ে নবীনের স্ত্রীর কাছে ধরা পড়িল যে তার স্বামী ও তার বোনের পরস্পর আসক্তি জন্মিয়াছে। তখন তার বোনকে বিবাহ করিবার জন্য সে স্বামীকে অনুরোধ করিল। খুব বেশি পীড়াপীড়ি করিতে হইল না। বিবাহ চুকিয়া গেলে পর নবীনের প্রথমা স্ত্রী বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।"

তখন আর কিছু করিবার ছিল না। আমরা ফিরিয়া আসিলাম। গুরুজীর কাছে অনেক শিষ্য জুটিল। তারা তাকে কীর্তন শুনাইতে লাগিল। তিনি কীর্তনে যোগ দিয়া নাচিতে লাগিলেন।"

এই নাচ, এই কীর্তন এই কর্তব্য জ্ঞানহীন প্রেম ধর্মকে ধিক্কার দিয়ে কবি লিখেছেন—দামিনী বলছে— আমাকে বুঝাইয়া দাও তোমরা দিনরাত যা লইয়া আছ তাহাতে পৃথিবীর কী প্রয়োজন? তোমরা কাকে বাঁচাইতে পারিলে? তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছ। তা ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান। তার দয়া নাই,

বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই। এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ?

কবি মনে করেন প্রেমধর্মের যে স্ত্রী-সংসর্গবর্জিত আধ্যাত্মিকতার কথা বলা হয় যে একটা অসম্ভব, অবাস্তব জিনিষ। মেয়ে মানুষকে বাদ দিয়ে এই যে একটা প্রেমভাবের চর্চা করা এর ফলে মানুষের অধঃপতনই ঘটে। মেয়ে মানুষকে এমনি ক'রে দূরে রাখা যায় না। তার চেয়ে সহজে তাকে স্বীকার ক'রে, শান্ত হয়ে, সংযত হয়ে, সংসারধর্ম পালন করলেই মানুষ ঠিক পথে থাকে। জীবনের সংসারের কর্তব্য পালনের মধ্যেই মনুষ্যের ধর্ম চরিতার্থ হয়। কর্তব্য দায়হীন রসচর্চায় মানুষকে আশ্রয়শূন্য অতলের দিকেই নিয়ে যায়। তাকে রসাতলে তলিয়ে মারে। কবি লিখেছেন—শ্রীবিলাস বল্‌ছে আমরা স্ত্রী লোককে আমাদের চতুঃসীমানা হইতে দূরে খেদাইয়া রাখিয়া নিরাপদে রসের চর্চা করিবার ফন্দি করিয়াছি। দামিনী বল্‌ছে আমি তোমার গুরুর কাছ হইতে কিছুই পাই নাই। তিনি আমার উতলা মনকে এক মুহূর্ত শান্ত করিতে পারেন নাই। আগুন দিয়া আগুন নেভানো যায় না। তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য্য নাই, বীর্য্য নাই শান্তি নাই। ওই যে মেয়েটা মরিল, রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল, কী তার কুৎসিত চেহারা সে তো দেখিলে?

এই থেকে আমরা দেখি যে কর্মহীন ধর্মের প্রতি কবির বিতৃষ্ণা। যে পথে মানুষকে বীর্যের চর্চা করতে হয়। ধৈর্যের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হ'তে হয়, যে পথে মানুষ শান্ত, সংযত হ'য়ে জীবনের কর্তব্যপালন করে সেই পথেই সে ধর্মকে লাভ করে। কর্মের অবলম্বন হীন ধর্মচর্চা, শুধু ভগবৎ প্রেমে অশ্রু বিসর্জন, নাচ আর কীর্তন, আর ভাবে গদগদ হয়ে যাকে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরা, এতে মনের কোন শ্রেষ্ঠতর বৃত্তি বীর্য ধৈর্য বা সংযমের চর্চা হয় না। তাই এই প্রেমোন্মাদ সংসারে কোনই উপকারে লাগে না।

কোন কোন ধর্মগুরু যে ভগবৎ প্রেমের ফলস্বরূপ সর্বভূতে প্রেমের কথা বলেন, কবির মতে সে যেন একটা নেশার মত। যাকে দেখি তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে চোখের জল ফেলা, এই জাতীয় ব্যক্তিভেদ জ্ঞানহীন প্রেমকে কবি সত্যিকারের ভালোবাসা ব'লে মনে করেন নি। চতুরংগ উপন্যাসে কবি লিখেছেন—শচীন যখন লীলানন্দ স্বামীর সংগে ছিল তখন অনেক সন্ধানের পরে একদিন শ্রীবিলাস তার কাছে গেল। শ্রীবিলাস বল্‌ছে—"আমাকে দেখিয়া শচীন ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। আমি অবাক হইলাম। শচীন চিরদিন সংযত, তার স্তব্ধতার মধ্যে তার হৃদয়ের গভীরতার পরিচয়। আজ মনে হইল, শচীন নেশা করিয়াছে।—মিলনমাত্র যে আমাকে শচীন বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল সে আমি 'শ্রীবিলাস' নয়। সে আমি 'সর্বভূত' সে আমি একটা আইডিয়া।"

"এই ধরণের আইডিয়া জিনিষটা মদের মতো নেশার বিহ্বলতায় মাতাল, যাকে তাকে বুকে জড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে পারে, তখন আমিই বা কী আর অন্যই বা কী! কিন্তু এই বুকে জড়ানোতে মাতালের যতই আনন্দ থাক্‌, আমার তো নাই। আমি তো ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত একাকারতা বন্যার একটা ঢেউ মাত্র হইতে চাই না—আমি যে আমি।"

কবির মতে মানুষ বিশেষ মানুষ বিশেষের ভালোবাসাই চায়। যার কাছে মানুষে মানুষে ভেদ নেই, যে বিশেষ কোন মানুষকে ভালোবাসে না, যাকে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার মানে সে কারোকেই ভালোবাসে না। সে শুধু নিজের নেশাটাকেই চরিতার্থ করে। তাই এরকম বুকে জড়িয়ে ধরাকে সত্যিকারের প্রেম বলাই চলে না। সত্যিকারের ভালোবাসা ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করেই প্রকাশ পায়। নির্ব্যক্তিক প্রেমাবেগকে কবি নেশা ছাড়া আর কিছু বল্‌তে রাজি নন।

মুক্তির নেশা, গুরুবাদের প্রভাব কেমন ক'রে মানুষকে তার সহজধর্ম সহজ কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট করে 'চতুরংগ' বইতে কবি তা ব'লেছেন। দামিনীর বাপের যখন অবস্থা বিপর্যয় ঘটল, তখন দামিনী একদিন বাপের দেওয়া তার সমস্ত গহনা গোছাতে বসল, দুর্দিনে বাপকে দেবে ব'লে। সেই সময়ে তার স্বামী এসে তাকে বল্‌ল যে গুরু তাকে ডেকেছেন উপদেশ দেবেন ব'লে। পরদিন লোহার সিন্দুক

খুলে দামিনী দেখ্‌ল সেখানে কিছু নেই। তার স্বামী গহনা গুরুকে দান ক'রেছে।' কবি লিখেছেন—"স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল আমার গহনা? স্বামী বলিল—সে তো তুমি তোমার গুরুকে নিবেদন করিয়াছ। সেইজন্যই তিনি ঠিক সেই সময়ে তোমাকে ডাকিয়াছিলেন, তিনি যে অন্তর্যামী। তিনি তোমার কাঞ্চনের লোভ হরণ করিলেন।"

গুরুবাদের প্রভাবে মানুষ এমনি ক'রে অন্যের উপর জবরদস্তি করে। মানুষের আপন ইচ্ছার একান্ত বিরুদ্ধে তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে চায়। কবি ধর্মের নামে মানবাত্মার প্রতি এই জবরদস্তিকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করেছেন। কবি লিখেছেন—"এমনি করিয়া ভক্তির দস্যুবৃত্তি শুরু হইল। জোর করিয়া দামিনীর মন হইতে সকল প্রকার বাসনা কামনার ভূত ঝাড়াইবার জন্য পদে পদে ওঝার উৎপাত চলিতে লাগিল। সে সময়ে দামিনীর বাপ এবং তার ছোট ছোট ভাইরা উপবাসে মরিতেছে। সেই সময়ে বাড়ীতে প্রত্যহ ষাট-সত্তরজন ভক্তের সেবার তাহাকে নিজের হাতে প্রস্তুত করিতে হইয়াছে।"

গুরুবাদের নেশা মানুষকে এমনি ক'রে তাকে তার সহজ কর্তব্য, স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা থেকে ভ্রষ্ট করে। দামিনীর স্বামী তার শ্বশুরের টাকাতেই মানুষ। সেই শ্বশুরের দেওয়া গয়না বিপদের দিনে তার উপকারে লাগাতে সে দিল না। বরং বিষয়ীর ভোগে লাগার চেয়ে গুরুর সেবায় দান করার মূল্য বেশি অবুঝ স্ত্রীকে সে এই কথাই বোঝাতে চেষ্টা কর্‌ল।

কবি দেখে ক্ষুব্ধ হ'য়েছেন যে মানুষ কেমন ক'রে ধর্ম এবং ভগবানকে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপ ক'রে তুলেছে, এবং প্রায়ই এ উদ্দেশ্য সাধু উদ্দেশ্য নয়। কবি লিখেছেন কেমন ক'রে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার আগে জাপানী সৈন্যেরা বুদ্ধের মন্দিরে গিয়ে বুদ্ধের আশীর্বাদ চেয়েছিল। অথচ তারা চ'লেছে ও শিশুর কাটা ছেঁড়া অংগ নিয়ে লোফালুফি করবে ব'লে। এই কাজে তারা করুণাময়কে আপনার দলে টান্‌তে চায়।

কবি লিখেছেন—করুণাময় খ্রীষ্টকেও যারা একদিন মেরেছিল, তারাও ধর্মরক্ষার ছলে ধর্মদ্রোহীকে বধ করছে এই কথাই বলেছিল। তেমনি যারা একদিন খ্রীষ্টের ধর্ম গ্রহণ ক'রেছিল তারাও আজ ধর্মেরই নামে মানুষকে মারছে এবং তাদের সেই মার পৌঁছচ্ছে গিয়ে প্রেমময় খ্রীষ্টেরই বুকে। ওরা তাঁকে আবার মৃত্যু শেলে নূতন ক'রে বিদ্ধ করছে। কবি লিখেছেন—

"সেদিন তাকে মেরেছিল যারা—
ধর্ম মন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে
তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে
তারাই আজ ধর্ম মন্দিরের বেদির সাম্‌নে থেকে
পূজা মন্ত্রের সুরে ডাক্‌ছে ঘাতক সৈন্যকে
বল্‌ছে—মারো—মারো—।
মানব পুত্র ব'লে উঠ্‌লেন উর্দ্ধে চেয়ে
হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর,
কেন আমাকে ত্যাগ করলে।"

যে নিষ্ঠুর মারে একদিন ধর্মযাজকেরা খ্রীষ্টকে মেরেছিল, আজ খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের নামেও খ্রীষ্টের উপাসকেরা সেই মারেই মানুষকে মারছে। আর তার সমস্ত বেদনা গিয়ে বাজ্‌ছে সেই খ্রীষ্টেরই বুকে, তাকে আর একবার ক্রুশের কাঁটায় বিদ্ধ করছে। মানুষের এই দুঃখ দেখে মহামানব বেদনায় আর্তস্বরে ভগবানকে ডেকে বল্‌ছেন—কেন তিনি এমন ক'রে মানুষের মধ্য থেকে তাঁর মংগল বুদ্ধি কেড়ে নিলেন, কেন তিনি মানুষকে এই বীভৎসতার মধ্যে ত্যাগ করলেন।

'রক্তকরবী' বইতে কবি দেখিয়েছেন—কেমন ক'রে ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনিক ধর্মকে নিপীড়িত মানুষকে ফাঁকি দেবার একটা উপায় হিসাবে ব্যবহার করছে। যার গোঁসাইজীর সাজ আসলে সে ধনিকেরই ভাড়া করা ছদ্মবেশী কর্মচারী। বার্ণাড শও লিখেছেন যে কেমন করে পশ্চিমের ধর্মপ্রচারের পতাকার পিছে পিছেই তার সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ এগিয়েছে। যে দেশের প্রতি তার লক্ষ্য সেখানেই প্রথমে গেছে মিশনারীর দল।

'রক্তকরবী'র গোঁসাইজী বলছে—"যদিও দক্ষান পাড়া এখনও নড়নড় করছে মূর্খগুলো ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজেছে। মন্ত্র নেবার মত কান তৈরী হ'ল বলে। তবু আরো কটা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভাল। কেন না নাহংকারাৎ পরো-রিপুঃ। অহঙ্কারের চেয়ে বড় শত্রু মানুষের আর নেই। ফৌজের চাপে অহংকারটা দমন হয়। তারপরে আমাদের পালা।"

ধনিকের হাতে সৈন্য এবং পাণ্ডা পুরোহিত দুইই একই উদ্দেশ্য সাধনের দু রকম উপায়। সৈন্য যখন মানুষের মন থেকে তার তেজ দূর ক'রে দিয়েছে, তখন আসে গোঁসাইজী তার কানে ধর্মের মন্ত্র দিয়ে তার মধ্যে মনুষ্যোচিত তেজ ও আত্মশক্তির যেটুকু বাকি থাকে সেটুকু নিঃশেষে নিঙড়ে বার ক'রে ফেল্‌বার জন্য। গোঁসাইজীর 'নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ' কথার অর্থ এই যে মানুষের যতক্ষণ তেজ থাকে, যতক্ষণ তার আত্মমর্যাদাবোধ এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস থাকে, ততক্ষণ অন্যের পক্ষে তাকে দমন করা কঠিন। কাজেই উৎপীড়নকারীর পক্ষে সব চেয়ে বড় বাধা হ'ল উৎপীড়িতের মধ্যেকার আত্মসম্মানবোধ, নিজের শক্তিতে তার আস্থা, নিজের অধিকারে তার বিশ্বাস। তাই শক্তির শাসন এবং ধর্মের মন্ত্র এই দুই উপায় দিয়েই উৎপীড়নকারী —উৎপীড়িতকে একেবারে নির্জীব ক'রে ফেল্‌তে চায়। আত্মশক্তিতে তার বিশ্বাসকে একেবারে নিঙড়ে বার ক'রে ফেলে দিতে চায়। তথাকথিত ধর্ম যে মানুষকে কেমন ক'রে তার আত্মপ্রত্যয় থেকে ভ্রষ্ট করে, এই দেখে কবির ক্ষোভ।

আমাদের দেশেও ধর্মগ্রন্থ নামে প্রচলিত পুঁথি ও পাঁচালিতে এই ভাবই দেখ্‌তে পাই যে মানুষকে দেবতার নাম ক'রে, তার আত্মপ্রত্যয়, তার আত্মকর্তৃত্ব, তার আত্ম-মর্যাদাবোধ ত্যাগ করতেই উপদেশ দেওয়া হ'য়েছে। শক্তিমান দেবতার সামনে মানুষ যে কত অসহায় এই ভাবটাই ধর্ম নামে প্রাধান্য লাভ ক'রেছে! এমনি ক'রে ধর্মের নামে আমাদের পুরুষকারকে লোপ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে ধর্মের কাজই হ'ল মানুষকে তার আত্মপ্রতিষ্ঠায় অবিচলিত ক'রে রাখা।

মানুষকে শোষণ ক'রে গড়ে উঠেছে যে ধনতান্ত্রিক সভ্যতা, তার হাতে ধর্মের যে কী রকম বিকৃতি ঘটেছে সে কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'রক্তকরবী'তেই। তিনি লিখেছেন—ওদের মদের দোকান, অস্ত্রশালা আর মন্দির—এ সবই পাশাপাশি। মানব পীড়নের ওপরে প্রতিষ্ঠিত যে সভ্যতা, মানুষের রক্ত খেয়ে ফুলে উঠেছে যে দানব, সে যে আবার দেবতার নামে মন্দির উৎসর্গ করে, এই প্রতারণা দেখে কবি অবাক্ হ'য়েছেন।

'রক্তকরবী'তে গোঁসাইজীর কথা কবি লিখেছেন,—যে সর্দার অর্থাৎ ধনতন্ত্রের পেয়াদা, সে সবাইকে জানান দিয়েই পেয়াদাগিরি করে, সে গোঁসাইজীর সম্বন্ধে বলছে—"বুঝ্‌ছ না, আমাদের তো শুধু একটা চেহারা, সর্দারের চেহারা, কিন্তু ওর যে একপিঠে গোঁসাই আর এক পিঠে সর্দার। নামাবলিটা একটু ফেঁসে গেলেই সেটা ফাঁস হ'য়ে পড়ে। তাই সর্দারি ধর্মটা নিজের অগোচরে পালন করতে হয়। তা হ'লে নাম জপের বেলায়—খুব বেশি বাঁধে না।

ধর্মের ছদ্মবেশ ধ'রে যারা মানুষকে ঠকাতে চায়, তারা নিজেকেও ঠকাতে চায়। মনে মনে ভাব্‌তে চায় যে সত্যিই তারা ধর্মাচরণ করছে। কিন্তু যখনি কোন উপলক্ষ্য ঘটে, তখনি তাদের কাজ থেকেই তাদের স্বরূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। ধর্মের এই কপটাচার দেখে ক্ষুব্ধ হ'য়ে কবি লিখেছেন,—

> "কিন্তু দারুণতম যে মৃত্যুবান নূতন তৈরী হ'ল
> ঝক্‌ঝক্ ক'রে উঠ্‌ল, নর-ঘাতকের হাতে।
> পূজারী তাতে লাগিয়েছে তারই নামের ছাপ
> তীক্ষ্ণ নখের আঁচড় দিয়ে।"

তাই আমরা দেখি যে ধর্ম-সম্বন্ধে কবির যে ধারণা, সে কোন দেশ-বিশেষ সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্মমত নয়। এ ধর্ম সর্ব দেশের সর্ব মানবের। এর মধ্যে এমন কিছুই নেই যা অন্য দেশের বা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ বুঝ্‌তে পারে না। যে কেউ মানুষের মংগল চায়, তার সংগেই রয়েছে কবির মতের মিল।

তথাকথিত পুণ্যাত্মা মানুষ, যারা ক্ষতির ভয়ে বা লাভের লোভে ধর্মাচরণ করে, তাদের প্রতি কবির কিছু-মাত্র শ্রদ্ধা নেই। এই রকম ভীরু ও লোভী ধার্মিকের চেয়ে কবি ভগবানে অবিশ্বাসী নাস্তিককে বেশি শ্রদ্ধা করেন। কবি দেখেছেন যে স্বর্গলোভী ধর্মাত্মার চেয়ে নিঃস্পৃহ নাস্তিকের আচরণ মহত্তর হ'য়ে থাকে। কবি লিখেছেন ভগবান বিদ্রোহীকেও শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু কপট ভক্তকে তিনি সম্মান করেন না। মহৎ মানুষের যে প্রকৃতি, ভগবানেরও তো সেই প্রকৃতি। মহৎ মানুষ ও ভণ্ড-ভক্তের চেয়ে নির্ভীক বিদ্রোহীকে বেশি সম্মান করে। অনেক সময় যারা নিজেদের ধার্মিক ব'লে প্রচার করে, তাদের নীচতা, স্বার্থপরতা, লোভ, কপটতা এবং আচরণের

অপবিত্রতা দেখেই মহৎ মানুষ তথাকথিত ধর্মের প্রতি বিমুখ হ'য়ে নাস্তিকতার আশ্রয় নেয়।

চতুরংগ উপন্যাসে কবি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হরিমোহন এবং নাস্তিক জগমোহনের চরিত্র পাশাপাশি রেখে দেখিয়েছেন। কবি লিখেছেন—হরিমোহন যেমন ঈশ্বরকে খাতির করত ঠিক তেমনি সংসারে যে মানুষ তার যতখানি উপকার করতে সমর্থ—তাকে ততখানি খাতির করত। পুলিশের কর্মচারী, ধনী প্রতিবেশী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, সংবাদ-পত্রের সম্পাদক এরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষমতা হিসাবে হরিমোহনের ভক্তির পাত্র ছিল।

জগমোহনের কথা কবি লিখেছেন যে তার ভয় ছিল ঠিক এর বিপরীত। পাছে কেউ তাকে কোন উপকার প্রত্যাশার জন্য সন্দেহ করে এই ভয়ে তিনি সমস্ত ক্ষমতা-শালী লোকদের থেকে দূরে থাক্‌তেন। তিনি যে ভগবান বিশ্বাস করতেন না তারও অর্থ তার মনের এই বিদ্রোহ। পার্থিব বা অপার্থিব কোন ক্ষমতার কাছেই হাতজোড় করবেন না, এই ছিল তার মনের ভাব। তিনি গরীব, মুসলমান চামারদের বলেছেন "ওরাই আমার দেবতা।" জগমোহন বল্‌তেন—ব্রাহ্মরা নিরাকার ভগবানকে মানে কিন্তু তাঁকে দেখা যায় না, হিন্দুরা প্রতিমা মানে কিন্তু তাকে চেনা যায় না, কিন্তু আমার দেবতাকে দেখাও যায় এবং শোনাও যায়, তাই তাকে বিশ্বাস না ক'রে থাক্‌বার জো নেই।

এদের দুভায়ের নামে যে সম্পত্তি ছিল সে ছিল দেবত্র। তার জন্য খাজনা দিয়ে হত না। হরিমোহন জগমোহনের বিরুদ্ধে এই বলে মামলা করল যে সে নাস্তিক অতএব সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার নেই। হরিমোহনের জিত হ'ল। উকীলরা জগমোহনকে পরামর্শ দিল হাইকোর্টে আপীল করতে। কিন্তু জগমোহন উত্তর করলেন—"আমি যে ভগবানকে বিশ্বাস করি না, তাকে ঠকাতে পারব না। যারা বলে ভগবানকে বিশ্বাস করে, ভগবানকে ঠকাবার বুদ্ধিও তাদেরই।"

পাড়ায় যখন প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিল, জগমোহন তখন সরকারী হাসপাতালের অব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হ'য়ে কয়েকজন উৎসাহী বন্ধুর সাহায্যে নিজের বাড়ীতেই এক হাসপাতাল খুললেন। প্রথম রোগী এল এক মুসলমান চামার, সে মারা গেল। দ্বিতীয় রোগী হলেন জগমোহন নিজে। তিনিও বাঁচলেন না। হরিমোহনের ছোট ছেলে শচীশ নিজের জ্যাঠার কাছেই মানুষ হ'য়েছিল। সে ছিল জ্যাঠার ভক্ত শিষ্য। জগমোহনের মৃত্যুর পরে যেদিন শচীশের সংগে হরিমোহনের দেখা হ'ল যেদিন হরিমোহন বল্‌লেন—নাস্তিকের এই রকম মৃত্যুই হয়ে থাকে। শচীশ সগর্বে জবাব দিল, হাঁ।

কবি লিখেছেন—জগমোহনের নাস্তিকতার একটা প্রধান অংগ ছিল লোকের উপকার করা—অর্থাৎ নিজের অপকার করা। কারণ তার কাছে পুণ্যের কোন আশা ছিল না। কোন দেবতা বা কোন শাস্ত্রের পুরস্কারের কোন রকম বিজ্ঞাপন ছিল না, অথবা দেবতা এবং শাস্ত্রের কোন রকম বিভীষিকাও ছিলনা। জগমোহন বল্‌তেন শচীশকে "বাবা, আমরা নাস্তিক, সেই গর্বেই আমাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত থাক্‌তে হবে। যেহেতু আমরা নিজের বাইরে অন্য কোন কিছুকে বিশ্বাস করিনা, সেই জন্যেই আমাদের নিজেদের প্রতি বিশ্বাসের জোর বেশি।"

হরিমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরন্দর। বাপের মতই ঠাকুর দেবতার প্রতি তার ভক্তি। সে এক বিধবা মেয়েকে তার মামার বাড়ী থেকে বের ক'রে এনেছে। একদিন কোন কারণে রাগ ক'রে পুরন্দর তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিল। তখন সে সন্তান-সম্ভবা। শচীশ এসব কথা জানত। সে এই নিরাশ্রয় মেয়েটিকে আশ্রয় দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল। সে যখন জগমোহনকে এই কথা বলল, তিনি তৎক্ষণাৎ মেয়েটিকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দেবেন স্থির করলেন। পুরন্দর যখন এই কথা শুনল, তখন সে ঈর্ষায় জ্বলে উঠল। সে ভাবল—তার ভাই মেয়েটিকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়। কিন্তু শচীশের সংগে জগমোহনের বাড়ীতে মেয়েটির কদাচিৎ দেখা হয়। কথা তো একদিনও হয়নি। একদিন যখন জগমোহন বাড়ীতে নেই, তখন পুরন্দর দেয়াল ডিঙিয়ে বাড়ীতে ঢুকে মেয়েটিকে শাসিয়ে গেল। মেয়েটা এমন ভয় পেল যে তারই দিনকয়েক পরে একটি মৃতসন্তান প্রসব করল। জগমোহন বললেন, ওকে আমি অন্য কোথাও নিয়ে যাব, নইলে ও বাঁচবে না। শচীশ বলল, তা হ'লেও তুমি ওকে দাদার হাত থেকে রক্ষা করতে

পারবে না। ওকে রক্ষা করবার একমাত্র উপায় যদি আমি ওকে বিয়ে করি। কথা শুনে জগমোহন শচীশকে বুকে চেপে ধরলেন, তার চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়্‌তে লাগল। এমন কান্না তিনি জীবনে কখনো কাঁদেন নি।

রবীন্দ্রনাথের যে ধর্মমত তার সংগে মিল রয়েছে ইংল্যাণ্ডের সেরা লেখক বার্ণার্ডশর। শ'র একখানা বইয়ের নাম—'দি ডেভিলস্ ডিসাইপল্'—শয়তানের শিষ্য। শ' এই বই লিখেছেন গোঁড়া ধার্মিকদের লক্ষ্য করে। শ'র বইয়ের মর্মার্থ এই যে—ধর্মের গোঁড়ামি মোটেই সত্যিকারের ধর্ম নয়। গোঁড়া ধার্মিক মানুষকে তার সহজ ইচ্ছা প্রবৃত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চায়। এতে ক'রে প্রকৃতির বিকৃতি ঘটে। এটা মনস্তত্ত্বের একটা সত্য যে মনের ইচ্ছার যদি পরিতৃপ্তি না হয়, তাকে যদি দমন ক'রে রাখা হয়, তা হ'লে সেই ইচ্ছাকে আমরা মন থেকে সমূলে উপড়ে ফেল্‌তে পারি না। চেতন মন থেকে তাড়া খেয়ে তারা গিয়ে অবচেতন মনে আশ্রয় নেয়। আর সেই গোপন আশ্রয় থেকে তারা আমাদের আবরণের উপরে প্রভাব ফেল্‌তে থাকে। আর যেহেতু তারা এই গোপন দুর্গে ব'সে কাজ করে, এই জন্যে আমরা তাদের ধর্‌তেও পারিনে, সামলাতেও পারিনে। এমনি ক'রে সহজ ইচ্ছাকে তার স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি থেকে উপবাসী রাখার ফল সর্বনেশে হ'য়ে ওঠে।

শ'র বইতে আমরা দেখি এক তথাকথিত ধর্মনিষ্ঠা মহিলার এমনি এক বিকৃত দুর্দশাগ্রস্ত আত্মা। সে যৌবনে তার বর্তমান স্বামীর ভাইকে ভালবাস্‌ত। কিন্তু ধার্মিক লোকেরা তখন তাকে বুঝিয়েছিল যে নীতিধর্মের দিক থেকে সেই লোকটিকে বিয়ে না ক'রে তার ভাইকে বিয়ে করাই তার পক্ষে সমুচিত হবে। তখন থেকেই তার প্রকৃতিতে ঘটল বিপর্যয়। সে নিজে তার স্বভাবের খাদ্য থেকে বঞ্চিত হ'য়েছে, তাই সে নিজের জীবনে হ'য়ে উঠল উৎপীড়নকারী। সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—মানুষকে তার স্বাভাবিক ইচ্ছা প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত করাটাই একটা পুণ্য।

শ' এই গল্প লিখেছেন, আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনকে উপলক্ষ্য ক'রে। তৃতীয় জর্জ তখন ইংল্যাণ্ডের রাজা।

ঐ ধর্মনিষ্ঠা মহিলার আশ্রয়ে এসেছে তার সেই দেওরের একটি ১৪ বছরের মেয়ে। সেদিন খবর এসেছে মেয়েটির বাপ'কে ইংরাজরা ফাঁসী দিয়েছে। দুঃখের শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়া একটি শিশুর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ মহিলা মেয়েটিকে এই ব'লে বকাবকি করছেন যে এমন রাতে তার পক্ষে ঘুমোনো একটা ভয়ানক পাপ। তার উচিত জেগে ব'সে প্রার্থনা করা।

শ' লিখেছেন পাড়াপ্রতিবেশী সবাই ঐ মহিলাকে ধার্মিক বল্‌ত, কিন্তু কেউ তার সংগ পছন্দ কর্‌ত না। সে ছিল অভদ্র, অসহিষ্ণু এবং সর্বদাই অসন্তুষ্ট। যে সব লোক ভালোভাবে পোষাক পরিচ্ছদ পরে এবং সারা জীবনে সুখী ও আনন্দিত, তাদের সে দেখ্‌তে পার্‌ত না। এর কারণ এই যে নিজের জীবনে সে সুখী হ'তে পারেনি।

তার বড় ছেলে রিচার্ডের প্রকৃতি ঠিক এর বিপরীত। সে নাস্তিক, সে শয়তানের শিষ্য। সে তার খুড়তুতো বোনটির দুঃখ দেখে বল্‌ছে—আমার সামনে কখনো কোন শিশু যেন দুঃখ না পায়। সে মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিল। তাকে দেখামাত্র মেয়েটি তার প্রতি এমন আকৃষ্ট হ'ল যে, সে একমাত্র তার আশ্রয় ছাড়া আর কোথাও যেতে চাইল না।

এই গল্পে আছে, এক আমেরিকান ধর্মযাজককে ইংরাজরা ধরে নিয়ে যাবে, রিচার্ড এই খবর জানতে পেল। নির্দিষ্ট দিনে রিচার্ড সেই ধর্মযাজকের বাড়ী গেল। সে কোনো ছুতায় ঐ ধর্মযাজককে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে নিজে তার পোষাক পরে ধর্মযাজক সেজে পুলিশের প্রতীক্ষায় ব'সে রইল। ইংরাজ পুলিশের সামনে সে এমন ক'রে ঐ ধর্মযাজকের স্ত্রীর সংগে ব্যবহার করতে লাগল এবং কথা বল্‌তে লাগল যেন ও তার স্বামী।

ক্রমশঃ
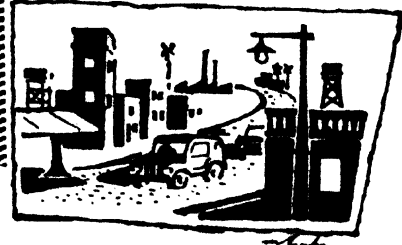
(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অশোক ফিরে এসেছে গ্রামে অন্যমন নিয়ে। দুদিনের জন্য সে যেন বদলে গিয়েছিল, চেয়েছিল গ্রাম ছেড়ে সহরে গিয়ে শান্তি আর উপভোগের জীবনে বাসা বাঁধতে, তাই বোধহয় চেয়েছিল প্রীতিকে। একজনকে নিঃশেষে ভালবেসে নিজেকে হারিয়ে যেতে।

কিন্তু তার এতটুকু চিহ্ন সে যা দেখেছে তাতে শিউরে উঠেছিল, হতাশ হয়েছিল; ব্যর্থ মন হয়তো বেদনায় ভরে গেছে, সরে গিয়ে নিজেকে খুঁজে পেতে চেয়েছিল।

কিন্তু তা পায়নি। পাটনা, কলকাতা, মুঙ্গেরের নির্জনেও পায়নি। ফিরে এসেছে তাই।

নিজের কাযের মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজে পেতে।

ক'মাসেই অনেকখানি এগিয়ে গেছে এই গ্রামের জীবনযাত্রার স্রোত। গঙ্গামণি ঠাকুরুণ নির্বাক ও নারাণঠাকুরের সর্বনাশ রোধ করতে পারেনি। পানুদাস তার আগেই গ্রাস করেছে ওদের সেই পাঁচ বিঘের বাকুড়ী, পাকা দখল করেছে ধান কলের সিমেণ্টের জমানো ধানশুকোবার মাঠে।

...তারকবাবুর প্রাসাদে ফাটল ধরেছে; ও ফাটল ধরবে, ধ্বসে পড়বে ওই প্রাসাদ তা সে জানতো। কিন্তু তারপর?

...বিরাট এই পরিবর্ত্তনের পর কি ভূমিকা নিয়ে গ্রাম জীবনের পরিবর্ত্তন এর সূচনা হবে ঠিক ভাবেনি।

ধীরে ধীরে তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে দুই পথ, কামারপাড়ার এবং অন্যান্য শ্রেণীর রুজি রোজকারকারীরাও বেশ বুঝতে পেরেছে, তাদের দিন বদলাচ্ছে। সচেতন হয়ে উঠেছে তারা।...তারাও জমির মালিক হয়েছে কিন্তু চাষবাসএ মনমেজাজ তাদের নেই; তবু গ্রামের সব ব্যাপারে তারা এগিয়ে আসছে, পাশে পাশে প্রভুত্ব আর প্রতিপত্তি নিয়ে উঠছে পানুদাস, ছানুদাস। তারা যেন ঠাঁই নিয়েছে তারকরত্ন শ্রেণীর।

কিন্তু দুজনের সংঘাতই সেই বুদ্ধিহীনতার দোষে দুষ্ট। সেদিন অশোকের কাছে এইটাই পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

তারকরত্নবাবু একেবারে বদলে গেছেন। বদলেছে তার বাড়ীর আশপাশও। দুপুরের রোদে নিস্তব্ধ পথটা—বোর্ডের অপিসের ওদিকে দু একজন ঘোরাফেরা করছে, কাছারী বাড়ীর বড় ফটকটা তালাবন্ধ, পাশে একটা ছোট দরজা আছে—সেইটাই খোলা থাকে। চলেছে অশোক, হেলু মাষ্টার ক'দিন থেকেই এসে ধন্না দিচ্ছে।

স্কুলটার অবস্থা যায় যায়। মাষ্টাররা মাইনে পাচ্ছে না, ছাত্রও তেমন নেই, যা আছে তারাও মাইনে দেয় না। বাকী ছাত্র অনেকে আমুড়ে দুর্গাপুরের ইস্কুলে গেছে—কতক গেছে মালিয়াড়ার দিকে।

অশোকও দেখেছে দূর থেকে মাঠের মধ্যে বাগানের ধারে ইস্কুলের অবস্থা। গ্রামের কারো নজর নেই, অবহেলায় অনাদরের চিহ্ন ওর সারা গায়ে। চালের খড় নেই, খসে পড়ছে মাটির পাঁচীল।

—একটা কিছু করুন অশোকবাবু!

হেডমাষ্টার এম-এ হওয়া চাই, এবং স্কুলের বাড়ীও চাই। তবেই সরকার গ্রাণ্ট দেবে। কিন্তু বীরেনবাবু চলে যাবার পর হতে সে সব করবার আর কেউ নেই।

অশোক ভাবছে।

—একটা কিছু করা দরকার! হেলু মাষ্টার বলে চলেছে—আর কোথায় এম-এ পাশ লোক পাবো বলুন, যে দরদ দিয়ে নিজের বলে দেখবে।

অশোক জবাব দিল না। আগেকার কথাগুলো মনে পড়ে। ইস্কুলে সেও কমিটিতে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বাধা দিয়েছিল ওরাই।

তারকবাবু সেদিন পরিষ্কার জানিয়েছিল—আমাকে সেক্রেটারী হতে রেহাই দাও। তারকবাবু সেদিন প্রেসিডেন্ট, হাকিম, জমিদার, দায়ে অদায়ে তিনিই দেখবেন, তাঁকে বাদ দিয়ে ইস্কুল চালানো অসম্ভব। অশোককে সেদিন এড়িয়ে গিয়েছিল ওরা। হেলু মাষ্টারও ছিল তাদের দলে। আজ!

…কি ভাবছে অশোক। সেই তাই নিজে এসেছে তারকবাবুর বৈঠকখানায়।

অনেকদিন পর দেখা, কেমন যেন বয়স বেড়ে গেছে তার। মাথার চুলে পাক ধরেছে, চোখে-মুখে বসেছে কালির দাগ।

ওদিকে কারা বসে আছে, পাঁচুদাস—অন্যদিকে কামারপাড়ার এমোকালী, আরও কয়েকজন।

…পাঁচুদাস অশোককে দেখে মুখ তুলল মাত্র, বলে চলেছে—তাহলে বড়কালীর পূজোর আমাকেই অনুমতি দেন?

কামারপাড়ার ওরা বলে—কেন গ্রাম পঞ্চজনই করুক।

—বারোয়ারী পূজো? পাঁচুদাসএর ঠোঁটের ডগায় যেন ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে।

—কেনে?

—তাহলেই হয়েছে আর কি? পাঁচুদাস জবাব দেয়। চটে ওঠে ওরা। সতীশ ভটচায ব্যাপারটাকে মোলায়েম করবার জন্যই বলে ওঠে,—কালীপূজোর সংকল্প একজনের নামেই হবে। তাছাড়া মায়ের পূজোয় নিষ্ঠা চাই, ভক্তি চাই।

গোকুল ফোড়ন কাটে—বলি দিতে হবে।

কালী ধমকে ওঠে—তা তোমাকে ভাবতে হবেক নাই ঠাকুর, বল কেনে নরবলি দিয়ে দোব।

গোকুল চুপ করে যায়। পাঁচুদাস তখনও কোট ছাড়েনি—তাহলে কাকাবাবু!

কালীচরণ এবং অন্যান্য সকলেও চেয়ে থাকে তারকবাবুর দিকে। কি ভাবছেন তারকবাবু। অশোক হেলুমাষ্টারও চুপ করে রয়েছে। পূজোর দখল নিয়ে যেন লাঠালাঠি না বাধে।

বলে ওঠে তারকবাবু—এখনও বেঁচে আছি পাঁচু, যতদিন বেঁচে থাকবো পৈতৃক পূজো ওটা—আমাকেই করতে হবে। করবোও।

—ব্যস, চুকে গেল ল্যাঠা।

খুশী হয় কামারপাড়ার দল। এখনও মনে মনে তারা তারকবাবুকে ফেলে দিতে পারেনি। পাঁচুর মুখে-চোখে এক পোঁচ কালি কে যেন লেপে দিয়েছে।

উঠে গেল চুপ করে। ওরাও চলে গেল পিছু পিছু। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে তারকবাবু। কি ভাবছে।

—মামাবাবু।

তারকবাবু ওর দিকে চাইল—তুমি আবার কি বলবে?

—ইস্কুলের ব্যাপারে এসেছিলাম।

—কালীপূজো নিয়ে যারা কাড়াকাড়ি করছিল, তারা এতে এলো না যে? তারকবাবুর কথাটা ব্যঙ্গের মত শোনাল।

অশোকই বলে ওঠে—আপনিই সেক্রেটারী থাকুন।

কিন্তু তারপর? জানোত আমার অবস্থা?

তারকবাবুকে এমন করে কথা বলতে ওরা দেখেনি। চুপ করে থাকে হেলুমাষ্টার। বলে ওঠে অশোক একে গড়ে তোলা দরকার। একটু চেষ্টা করলেই গার্ল ইস্কুলও হবে। সরকারই টাকা দেবেন।

—কিন্তু ওসবের কিছুই তো বুঝিনা ?

অশোক জবাব দেয় আপনি থাকুন, সব করবার আমরাই করবো।

—বেশ ! গম্ভীরভাবে কথাটা বলে তারকবাবু।

অশোকের দিকে চেয়ে থাকে তারকবাবু। কেমন মনে হয় তাকে ভরসা করা যায়। এই দুর্দিনে একজনকেও যেন দেখেছে—যে একটা সমাধানের পথ নির্দেশ করতে পারে।

—যা ভাল বোঝ করো।

কামারপাড়ার সমবায় বেশ চলেছে।...দিন বদলেছে তাদের।

...ধরণীমুখুয্যের বন্ধকী কারবার উঠে গেছে। উঠে গেছে তারকবাবু অবনীমুখুয্যের সেই হিসাবের মার-প্যাচের ফাঁক দিয়ে দুএকশো গলে যাবার দুঃখটা।... অতুল কামারই প্রেসিডেণ্ট। আর এমোকালী হয়েছে সেক্রেটারী।

...কামার পাড়ার একটা ঘরে কাঠের বোর্ড লাগানো হয়েছে। ওদিকে জাবেদা খাতা লেখে পদমাষ্টার; পোষ্টাপিসের পোষ্টমাষ্টারী করে, আর সন্ধ্যায় এসে বসে সমবায়ের অফিসে।

ভুবন গুম হয়ে বসে আছে সেদিন। কদমের সঙ্গে ঝগড়াটা যে এমনি বাড়াবাড়িতে দাঁড়াবে ভাবতেও পারেনি। খামোকাই ঝগড়াটা করল—মাঝেমাঝে কেমন যেন দপ করে জলে ওঠে ভুবনও—ওই কদমও।

...কি যেন হয়েছে তার।

হঠাৎ কলরব করে ওদের ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইল। ফিরছে এমোকালী দলবল নিয়ে।

কে যেন বলে, পেনো কিন্তু রেগে রইল কালীদা।

—রাগুক আর বাড়ীতে খেয়ে বেশী করে ভাত খাকৃগে।

অতুলও শুনেছে কথাটা। প্রথম থেকেই ভালো লাগেনি তার ওসব। বলে ওঠে।

—তাই বলে শুধু শুধু ঝগড়া করবি ?

—ঝগড়া কুথা করলাম গো মামা ! কালী ঠিক বুঝে উঠতে পারেনা কোথায় অন্যায় করেছে তারা।

—বড্ড বেড়েছে পেনো।

—তুরাও কম বাড়িসনি। বুড়ো গজগজ করে।

অশোককে আসতে দেখে ওরা চুপ করল।

...কালী তখনও বলে ওঠে—শুধোও কেনে ছুটবাবুকে কি করেছি অন্যায়টা! অশোক ব্যাপারটা দেখেছে। পানুও বের হয়ে গেল অযথাই। কিন্তু অর্থবান, শক্তি-মান সে। ছেড়ে কথা কইবে না।

চিরকালই একজাতের শত্রু আর একজন থাকবেই তারকরত্ন সেদিন এদের দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিল আজ যদি পানু চায় অন্যায় হবেনা অন্ততঃ প্রকৃতি এবং সমাজ ব্যবস্থার নিয়মই এই বলে।

সেদিকে গেলনা অশোক। বলে ওঠে

—একটা আর্জি নিয়ে এসেছিলাম অতুলকাকা ?

ব্যস্ত হয়ে ওঠে বুড়ো—সেকি ছুটবাবু: বলুন হুকুম !

হাসে অশোক, হুকুম দেবার দিন গেছে, তাই আর্জিই বলবো।

ইস্কুলের কথায় আসে অশোক।

—তোমাদের ছেলেদেরও মানুষ করতে হবে।

—তাতো বটেই আজ্ঞে।

এতবড় কথাটা এতদিন ওরা কেউ ভাববার অবকাশ পায়নি। আজ ভাবতে সুরু করে। গদাই কামারও বলে।

—লেখাপড়া না শিখলে কিছুই আর হবেক নাই আজ্ঞে। সেদিন দুগ্গোপুরে গেছল মোনা—শোনলাম অনেক লোক লিছে। তা মিস্ত্রীগিরি করতে হবেক—শুধোলে কতদূর পড়া শোনা করেছ ? ছেলের তো ক অক্ষর গোমাংস। লেখাপড়া তাই শিখতে হবেক উদের।

—ইস্কুলটাকে তাই রাখা দরকার !

—কিন্তু সীত অনেক টাকার ব্যাপার ?

জবাব দেয় ভুবন। ইদানীং ব্যবসাবুদ্ধি তার একটু বেড়েছে।

এমোকালীর কথাটা ভালো লাগে না। বলে ওঠে—পূজো করতে গেছলা কি। সেই টাকাটাই দাও কেনে ?

ভুবন বিরক্ত হয়ে ওঠে—সীতো ঈশ্বর বৃত্তির টাকা।

ওদের সমবায় থেকে রেওয়াজ হয়েছে প্রতিমণ মাল কেনাবেচায় একটা সামান্য অঙ্ক তুলে রাখতে হয় ঈশ্বরবৃত্তি খাতে। কয়েকশো টাকা জমেছে।

এমোকালীই জবাব দেয়—রাখ তোমার ঈশ্বরবৃত্তি। উতো ভাল কাযেই লাগবেক।

সঙ্গে সঙ্গেই সমর্থকও জুটে যায়। তাছাড়া ছোটবাবুর কথাও তারা ফেলতে পারে না। অতুলকামারও চুপ করে বসে শুনছিল কথাটা। সেও বলে ওঠে ঠিকই বলেছে কালী।

—তবে! কালীচরণও ভরসা পায়।

ভুবন একটু চটে উঠেছে। বেশ ঝাঁঝালো কণ্ঠে জবাব দেয়—যা ভাল বুঝিস করগে। আমাকে শুধোন কেনে?

—তুমি যে ছেকেটারী।

—কলা! কাঁচকলা।

গজগজ করে ভুবন। অশোক তবু বোঝবার চেষ্টা করে—তুমি অমত করো না ভুবন, ওরা ভালো কথাই বলছে।

সবাই ভালো কথা বলে, ভুল বলি শুধু আমিই।

বের হয়ে চলে গেল সামনে দিয়ে, যেন ওদের সম্মিলিত জনমতকে সে অগ্রাহ্য করে গেল। অতুলকামার ঘোলাটে চোখ মেলে ধমকে ওঠে—ভুবনা!

দাঁড়াল না ভুবন। ফিরেও চাইল না।

ব্যাপারটা ওর অবর্তমানেই পাশ হয়ে গেল। ইস্কুলের ব্যাপারে তারাও সায় দেয়!

…সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঝিঁঝিঁ ডাকা সন্ধ্যা।

…অশোক বের হয়ে আসছে। ছোট্ট গলিটা পার হয়ে রাস্তায় নামতে হঠাৎ কার ডাক শুনে ফিরে চাইল।

—শোন!

ডাকছে কদম। কেমন উস্কোখুস্কো চেহারা—দুটো চোখের তারায় কিসের আবেশ। ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কদম।

কি বলছিল তুমাকে উ?

—কে ভুবন? অশোক পায়ে পায়ে ওদের বাড়ীর দিকেই এগিয়ে যায়! খামার বাড়ী করেছে অতুল সামনের ফাঁকা জায়গাটুকুতে।

খড় গাদা করা—একজোড়া বলদও বাঁধা রয়েছে গোয়ালে, ওদের ল্যাজ দিয়ে ডাঁশ মাছি তাড়ানোর শব্দ শোনা যায়। আবছা ধোঁয়ার যবনিকা গ্রামের আকাশ ভরিয়ে তুলেছে।

—হ্যাঁ! এগিয়ে আসে কদম।

—কই না তো? এমনি তর্ক হচ্ছিল।

জবাব দেয় অশোক।

…কদম আজ যেন বদলে গেছে। হঠাৎ বলে ওঠে।

—তোমাকে ও যেন ঠিক সইতে পারে না।

—কেন? অশোক আবছা আলোয় কদমের দিকে চেয়ে থাকে।

ওর দুচোখের চাহনিতে কি যেন নিবিড় একটা মাদক স্পর্শ। সারা যৌবনপুষ্ট দেহের আঙ্গিনায় কোন বরণের সন্ধ্যাদীপের আকুতি।

…চমকে ওঠে অশোক।

অতল অন্ধকারে কেমন হারিয়ে ফেলে নিজেকে, নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে আকাশের তারা। কদমের হালকা ঠোঁটের ফাঁকে ওর ডাগর দুচোখের তারায় বিচিত্র একটু হাসির প্রকাশ। বলে ওঠে কদম।

—সব কেনর কি জবাব আছে?

সরে গেল কদম।

কেমন একটা বিস্মিত-হতবিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অশোক।

এ কোন কদম!

রাতের আবছা অন্ধকারের রহস্যের মত তাকে নিভৃতে নিরালায় ডেকে কি যেন বলতে চেয়েছে—শোনাতে চেয়েছে।

সে কথা অশোককে যেন ইতিপূর্বে আর কেউ শোনাতে চেয়েছিল।

প্রীতির কথা ভুলতে চেষ্টা করেছে, ভেবেছিল ভুলে গেছে—কিন্তু আজ মনে হয় পারেনি তাকে ভুলতে।

স্তব্ধ চিন্তিত মনে পথে নামল—রাত ঘনিয়ে এসেছে তখন।

‥ বাতাসে কিসের শব্দ—সুর।

…ক'দিন ও সুরটাকে কানে নিতে পারেনি। আজ এই উদার বিধুর রাত্রির অন্ধকারে নিজের মনের অতলে কোন এক নবজাগ্রত সত্ত্বাকে চিনেছে অশোক—প্রীতির কথা মনে পড়ে।

এমনি একটি সন্ধ্যায় সে গিয়েছিল—তার কাছে কি যেন বলতে চেয়েছিল। ওই ব্যাকুল সুরের ইঙ্গিতে হারিয়ে

গেছে সেই না-বলা কথা, সেই ব্যাকুল-চাহনি মিশে আছে আঁধার-জাগানো একক তারার চাহনিতে।

অবিনাশ সুর সাধছে।

…দূর আকাশে ভেসে ওঠে সেই সুর।

মনটা কেমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে—হারানো দিনের কথা, কত এলোমেলো স্মৃতির পাথারে ঝড় উঠেছে। অজানাতেই মনে পড়ে পাটনার কলেজের সেই দিনগুলো।

—শিখাকে আরও কত জনকে।

কোথায় মনের তলে একটা কামনার স্তব্ধতাকে আজ কে জাগিয়ে দিয়েছে দুটো চোখের নীরব প্রশ্নে।

দেখেছে আজ সবাই ওরা কেমন যেন এক সুরে বাঁধা। ওই প্রীতি কদম হারানো সেই শিখা সবাই। একটি সত্বা একটি চেতনা একটি কামনারই রূপান্তর, বার বার পুরুষের জীবনে আসে কোন নীরব-সুরের অণুরণনে।

শিখাকে সেদিন চিনতে পারেনি।

গঙ্গার ধারে এমনি প্রায়ান্ধকার রাতে সে বলেছিল কত যেন স্বপ্নবোধ। গঙ্গার প্রবহমান জলধারায় দূরে কোথায় ভেসে গেল একটা নৌকা, প্রদীপ জ্বলছে তাতে। নদীর কালো জলে সেই প্রকম্প লাল আলোটুকু হারিয়ে গেল।

শিখাও তেমনি একটি স্মৃতির আকাশে নক্ষত্র হয়ে হারিয়ে গেছে। ওরা হারিয়ে যায়; তবু নিঃশেষ হয় না। চুপে চুপে মনের অতলে বার বার বহুরূপে আসে একই সত্যের—স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি ঘটে মাত্র জীবনে।

তাই ওরা যেন একসূত্রে বাঁধা। কিন্তু কদম! গ্রামের ঘরের বৌ। কোথায় তার মনের অতলে এই রূপের প্রকাশ আজ অশোককে বিস্মিত করে তুলেছে।

সরু ধূলিধূসর পথ দিয়ে আসছে। আগেই তারকবাবুর ঠাকুরবাড়ীর কাঁসর ঘণ্টার শব্দ থেমে গেছে। পান্নুদাসের ধানকলের জেনারেটারের শব্দটাই গ্রাস করেছে নীরব পল্লীর স্তব্ধতাকে।

হঠাৎ বকুলতলায় এসে থমকে দাঁড়াল। দীর্ঘ মাস-কয়েক পর প্রীতিদের বাড়ীতে আলো জ্বলছে। জানলার ফাঁক দিয়ে আবছা অন্ধকারপথে এসে লুটিয়ে পড়েছে এক চিলতে আলো।

…কি ভাবছে অশোক। চলে যাবে কিনা! হঠাৎ নীলকণ্ঠবাবুর ডাক শুনে দাঁড়াল।—অশোক না! এস এস!

…অশোক যেন কি একটা অন্যায় কায করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। সামলে নেবার জন্যই বলে ওঠে।

—হ্যাঁ। যাচ্ছি! ভাল ছিলেন তো?

…দাওয়ার ওপর উঠে গেল। হঠাৎ নীলকণ্ঠবাবুর দিকে চেয়ে একটু অবাক্ হয়। ক'মাসেই তার দেহমনের উপর একটা ঝড় বয়ে গেছে। মুখে চোখে তারই ছাপ। শরীরও বেশ খারাপ হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি কেমন ক্লান্ত মলিন।

—বসো।

অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে। নিবিষ্ট মনে কি যেন দেখছে।

বলে চলেছেন নীলকণ্ঠবাবু—তোমাকে খুঁজেছিলাম, কিন্তু তুমি—

অশোক জবাব দেয়—কিছুদিন এখানে ছিলাম না। বাবার ওখানে গিয়েছিলাম। রিটায়ার করেছেন, শরীরও ভাল নেই।

—ও! চুপ করে বসে থাকেন নীলকণ্ঠবাবু।

অশোক দরজার দিকে চেয়ে থাকে। এমনি শান্ত নিভৃত পল্লীর পরিবেশের সব অভাব যেন এখুনি প্রীতির আবির্ভাবে বদলে যাবে। পূর্ণ হয়ে উঠবে এই নীরব ঘর-খানা তার কলকণ্ঠে দেহের ম্লান সৌরভে।

নীলকণ্ঠবাবু বলে ওঠেন—সেদিন তোমাকে হয়তো দুঃখ দিয়েছিলাম। সদরের সেই রাত্রের কথা আজও ভোলেনি অশোক। কি এক মোহ আর মুগ্ধতার আবেশে তার মন ভরে উঠেছিল—আজ তাকে অস্বীকার করতে পারে না।

নীলকণ্ঠবাবু বলে ওঠেন—মনে হয় ঠিকই করেছিলাম।

অবাক হয়ে অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে। গুড়গুড়িটা টানছেন তিনি।…হঠাৎ নলটা রেখে উঠে পায়চারী করতে থাকেন, মনের মধ্যে একটা চাপা ঝড়ের গতিবেগ প্রশমিত করবার চেষ্টাই করছেন মনে হয়।

—নইলে দুঃখই পেতে।

অশোক কথা কয় না। নীলকণ্ঠবাবু বলে ওঠেন।—প্রীতি শেষকালে প্রশান্তকেই বিয়ে করলো।

চমকে ওঠে অশোক। কেমন চকিতের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ অনুভূতি যেন সারা মনে দোলা আনে।…সামলে নিয়ে সহজ-কণ্ঠে জবাব দেয়।

—বেশ ত! প্রশান্তবাবু ব্যবসাপত্র করছেন।

—তা করুন। কিন্তু কি জান—সমস্ত ব্যাপারটাই ওদের ছেলেমানুষী। আমি তাকে সমর্থন করতে পারি না। মন দিয়ে স্বীকার করি—দিন বদলাচ্ছে মানুষের দৃষ্টি-ভঙ্গীও বদলাবে। কিন্তু তাই বলে তার মূলে সত্য কিছু থাকবে না—আসলের বদলে সমস্তটা জুড়ে থাকবে মেকি, এটা মেনে নিতে পারি না।

অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে। কোথায় ওর মনে একটা নিবিড় ব্যথা বেজেছে। বলে চলেন নীলকণ্ঠবাবু।

—ওরা আজ যাকে পরম সত্য বলে জানে—কাল মিথ্যা বলে ফেলে দিতে এতটুকু বাধে না। সত্য ওদের কাছে নিজের স্বার্থ এবং সেইটার জন্যে সব কিছু করতে পারে। প্রীতিও ভুল করল।

অশোক কথা বলে না। এর মধ্যে কথা বলবার কিছু নেই তারও।

কয়েকদিন ওই প্রশান্ত ওর বন্ধু-বান্ধবদের দেখেছে। মনে হয়েছে একটা কথা তাদের কাছে পরম সত্য—সে ওই স্বার্থবুদ্ধি। তার জন্য সব কিছু করতে তারা পারে—একালের যেন খানিকটা খড়ের পুতুল। কাঞ্চন সম্পদের ক্ষেত্রে পাহারাদার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নীলকণ্ঠ-বাবু বলে ওঠে।

—প্রীতি এ যুগের ব্যর্থতা আর গ্লানিকেই সুন্দর বলে দেখেছে। শুধু প্রীতি নয়—ওরা অনেকেই তাতে ভুলেছে।

—অশোক বলে ওঠে—লেখাপড়া শিখেছে—বিচার-বুদ্ধি তারও আছে।

—লেখাপড়া আর বিচার-বুদ্ধির মধ্যে কতখানি যোগ আছে এটা আমার কাছে কঠিন প্রশ্ন হয়ে ঠেকেছে অশোক। ওরা দলে ভারি—তাই সত্যি কথা যদি বলি বুড়ো সাবেকী-কন্‌জারভেটিভ বলে উড়িয়ে দেবে।

…কথা বলেন না নীলকণ্ঠবাবু।

—অশোক কি ভাবছে।

—কিছুদিন থাকবেন তো?

…ওর দিকে চাইলেন নীলকণ্ঠবাবু এক মুহূর্ত। কি ভেবে শান্ত-কণ্ঠে জবাব দেন—হ্যাঁ।

—একটু পরামর্শের ব্যাপার ছিল। এসেছেন যখন ভালোই হয়েছে। হাসেন নীলকণ্ঠবাবু—এখনও ওসব অভ্যাস ছাড়োনি?

—কই ছাড়তে পারলাম!

নিবারণবাবু বলে ওঠেন—দেখ অশোক, এ যুগের ওপর মাঝে মাঝে আস্থা হারাতে পারি না। কিছু বোকা ভালো-মানুষ এখনও আছে তাই অনুকম্পা হয়। ভালোও লাগে। বিশ্বাস করতে পারি—হয়তো এখনও বাঁচবার পথ আমরা পাবো।

চুপ করে থাকে অশোক।

নীলকণ্ঠবাবু বলে ওঠেন—হ্যাঁ, রাত হয়ে যাচ্ছে। তুমি এসো।

বের হয়ে এল অশোক।

জনহীন-পথে চুপ করে দাঁড়াল। শীতের প্রথম কুয়াশা পড়ছে। কি তিথি জানে না। আবছা চাঁদের আলো স্তব্ধ পথ—ঘুমিয়েপড়া বাড়ীগুলো গাছগাছালির বুকে কেমন একটা নিবিড় শান্তি আর আচ্ছন্নতার মধুর আবেশ এনেছে।

প্রীতির কথা মনে পড়ে।

অশোকের সেখানে কোন ঠাঁইই নেই। একা সে। সুরটা জেগে আছে তখনও। মিষ্টি অপরূপ একটি সুর, ওই নিশীথরাতের কোন অধরারূপবতীর আকাশজোড়া কান্নার সুরে মিশে গেছে।

কাঁদছে মিষ্টি।

এমনি আঁধার রাতে ওঠে ওর কান্না—বুকচাপা কান্না।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছে মিষ্টি; যেন অন্য মানুষ। একেবারে বদলে গেছে। সেই রূপ-যৌবন হারিয়ে গেছে কোথায়…যেন একটা ধ্বংসাবশেষ।

যে স্বপ্ন সে দেখেছিল, যে আশা করেছিল এতদিন, তা নিঃশেষে ব্যর্থ হয়ে গেছে। ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তার তাসের প্রাসাদ।

বড় ডাক্তাররা দেখে শুনে পরীক্ষা করে শেষ মন্তব্য প্রকাশ করেছে তার শরীরের রক্তকণিকার সঙ্গে যে বিষ এতদিন মিশিয়ে আছে তা আজও প্রকট। সেই চাপা-

পড়া বীজ এতদিন পরও মাথা তুলেছে, তারা যেন অমর। চিরজীবনই মিশিয়ে থাকবে তার দেহের অণু-পরমাণুতে, ধ্বংস করে দেবে তার সব আশা স্বপ্ন।

মা সে কোনদিনই হতে পারবে না—পূর্ণ হতে তার বাধা দুস্তর।

কথাটা শুনে সেই যন্ত্রণা আর বেদনার মাঝেও গুমরে উঠেছিল তার মন।

—সত্যি ডাক্তারবাবু!

—হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।

গম্ভীর কণ্ঠে কোন রুদ্র বিধাতা যেন বিধান দিচ্ছেন।

কাঁদে না মিষ্টি কথাটা শুনে, স্তব্ধ হয়ে যায়। কেমন স্থির চাহনিতে সে চেয়ে থাকে ওই ভাবালেশহীন মুখ-গুলোর দিকে। ঘসাকাচের অস্বচ্ছ আবরণের ওদিকে কেমন আলোগুলো বিকৃত ছায়া ফেলেছে—লম্বাটে ছায়া, মার্বেল পাথরের মেজেটা চকচক করে। সাদা পোষাক-পরা মূর্তিগুলো যেন কোন অন্যলোকের বাসিন্দা।

ওরা ছিনিয়ে নেবে—কেড়ে নেবে তার কাছ থেকে তার শেষ সম্বল—জীবনের একান্ত গোপন মহামূল্য সঞ্চয়টুকুকে।

চীৎকার করে ওঠে মিষ্টি। আতঙ্ক-বিজড়িত যন্ত্রণা-ভরা সেই চীৎকার, আর অসহায় কান্না মিশেছে ত তে।

কেমন অনড় অচেতন হয়ে আসে সারা দেহ।

চুপ করে হাসপাতালের সামনের বাগানে দাঁড়িয়ে আছে কারিগর। মিষ্টির জন্য বেদনাবোধ করে।

প্রথম থেকেই তার ব্যাপারটা ভালো লাগেনি। জীবনে কেন বা যে সে আটকে পড়ল ওর ওই প্রচণ্ড আকর্ষণে তাও জানে না, নিজের সম্বন্ধে চিরকালই সে হিসাব বাতিল একটি প্রাণী; কোথায় কিছু মনভোলান দেখলে যারা কাষ ভুলে দাঁড়িয়ে যায়—তারিফ করে ও যেন সেই হতচ্ছাড়াদের দলে।

মিষ্টিকে ভাল লেগেছিল—যদিও ভালো হয়, খুসী হয় তাই হয়তো এসেছিল ওর সঙ্গে, ঘর বেঁধেছিল। কারিগর ডুবেছিল তার মনের আনন্দে—কিন্তু মিষ্টি যেদিন ঘর সাজাল—জমি জায়গা কিনল। ক্রমশঃ কারিগর ওর ব্যাপারে বিস্মিত না হয়ে পারে না। বলেছিল—এত যে পাবো পাবো করছিস—হারাবার দুঃখটুকু জানিস?

মিষ্টি ডাগর দুটো চোখ তুলে হাসে—আগে তো পাই।

—পাবার জন্য তৈরী হতে হয় মিষ্টি, হারাবার দুঃখ সইবার ক্ষেমতা আগে পেতে হয়।

—ধ্যাৎ, কি যে আবোল-তাবোল বকিস তুই।

মিষ্টির কাছে তার কথার মানে কিছু নেই, ছিল না।

আজ ওর অসহায় ব্যাকুল কান্নায় কারিগরের মন ভরে ওঠে। জীবনে এই কাঁদবার ভয়েই সে কিছু পেতে চায় নি। বেশ ছিল—কিন্তু অজানতে কোথায় নিবিড় বেদনাবোধ ও করে সে ওই মিষ্টির জন্য।

সেরে উঠেছে মিষ্টি।

বাইরের দেহের ক্ষয়-ক্ষতি সারতে দেরী হয় না। সেরে উঠেছে—কিন্তু মনের দিক থেকে যে নিবিড় বেদনার পুঞ্জীভূত ক্ষতি তা যেন সারাবার নয়।

তাই কাঁদছে মিষ্টি হারানো অনাগত সেই নবাগতের উদ্দেশ্যে। কারিগর থামাবার চেষ্টা করে—চুপ কর মিষ্টি।

মিষ্টি জবাব দিল না, ওর দিকে চাইল কেমন কান্না ভিজে সেই চাহনি মেলে।

কি ভাবছে!

কান্না থামিয়ে কি ভাবছে সে। দুচোখের চাহনিতে সেই ভাবনার কঠিন ছায়া। হঠাৎ আঁধারের মাঝে ওর দুচোখ জ্বলে ওঠে।

—কি বললি? কেঁদে কি হবেক?

কারিগর এগিয়ে আসে।

মিষ্টির মনে চকিতের জন্য ঝড় বইতে থাকে। আঁধার আকাশ-ফাটানো কোন নোতুন জ্বালা আর প্রতিশোধের ঝড়।

ওই চাহনি চেনে কারিগর—ওর সেই আগেকার চাহনি যা দেখেছিল হারানো কোন অতীতে বর্ধমানের পথে।

—তা সত্যি! ঠিক বলেছিস তুই কারিগর।

—মিষ্টি!...

চমকে ওঠে কারিগর।

হঠাৎ হেসে ওঠে মিষ্টি। হা হা শব্দে হাসছে নোতুন কোন হারানো মেয়ে—সেই অতীতের লাঞ্ছনময়ী প্রতিবাদের ব্যর্থতার শিখা।

·· কারিগর ওকে ডাকছে—মিষ্টি!...শোন!...

—অ্যাঁ।

কেমন যেন চমক ভাঙ্গে তার। চুপ করে স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে কারিগরের দিকে চেয়ে থাকে।···ওকে কাছে টেনে নেয় কারিগর।

···ওর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে স্বৈরিণী—পরাজিত ব্যর্থ কোন মিষ্টি।

রাত নামে। অতন্দ্র রাত্রি। অবিনাশের বাঁশীর সুর তখনও থামেনি।

কি এক নিবিড় প্রেম আর মাধুর্য নিয়ে সুরটা রাতের আকাশ ভরে তুলেছে চুপ করে তাই শুনছে মিষ্টি। কেমন যেন স্বপ্ন দেখছে। [ক্রমশঃ

দ্বিজেন্দ্রলাল

সন্তোষকুমার দে

'ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে
কী সঙ্গীত ভেসে আসে'
সে কি 'পতিত উদ্ধারিণীর'
স্তবগাথা কানে ভাসে!
ডাকে কে জন্মভূমির বন্দনাতে
মাতে কে মানুষ হবার মন্ত্রণাতে
কে শোনায় ইতিহাসের পাতে পাতে
যা ছিল সব মৃদুভাষে।
চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যকে
সাহজাহানকে চিনালো কে
রাজপুতনার কীর্তিগাথা
যেন চোখের পরে ভাসে॥
মহাসিন্ধুর ওপার হতে
আজও সে গান ভেসে আসে
যে গানে গোমড়া মুখে ফোটে হাসি
দুখের জীবন ভালোবাসে।
'বিয়ে হলে পুত্র-কন্যা
আসে যেন প্রবল বন্যা'—
দিন-আনি-দিন চলে
তবু চলে না দিন অনায়াসে।
তবু তারই মধ্যে ধমকে থামার
জন্মোনো বিষ্যুৎবারের বার বেলায়
আর বিলাত ফেরতা ক'ভাই মিলে
(পা ফাঁক করে) সিগ্রেট খেতে ভালোবাসে।
হাসির গানের সে প্রস্রবণ
শ্রবণ জুড়ায় নবোল্লাসে
বারে বারে তাই তো তারে
গানে গানে মনে আসে।
দেখতে দেখতে শতবর্ষ
পার হল যে হয় না মনে—
নন্দলাল তো আজো আছে
নিজের ঘরে সঙ্গোপনে
ভঙ্গ বঙ্গও রঙ্গভরা
—সঙ্গে আছে দুঃখ শত
তাই বলে কেউ গোমড়া মুখে
থাকবে কি গো অবিরত?
এ তরীতে দ্বিজেন্দ্রলাল
নিজের হাতে নিয়েছেন হাল
হাসির হাওয়ায় তুলিয়া পাল
আমরা যাবো ভেসে অনায়াসে—
তাই শতবর্ষ পরেও শুনি
সেই সঙ্গীত ভেসে আসে॥

বিস্মৃত কবি বাণেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ঐতিহাসিক যুগ সন্ধিক্ষণে দেশের মধ্যে যখনই ভাঙ্গা-গড়া চলিয়াছে তখনই দেখা গিয়াছে পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িতে, প্রাচীন খাতে নূতন স্রোত বহাইতে বাঙ্গালীই সর্ব্বাগ্রে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে। জনকল্যাণ কাজে যখনই ডাক পড়িয়াছে বাঙ্গালী তাহাতে অন্তরের সহিত সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে নাই। ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় শুধু ভাঙ্গার নেশায় বাঙ্গালী মত্ত হইয়া উঠে নাই, গড়ার প্রেরণাও সে দেশকে অনেক বারই দিয়াছে। পচনশীল পুরাতনকে পরিত্যাগ করিয়া উহার মধ্যে শাশ্বত সত্যের অনুসন্ধানে রত থাকিয়া সেই সত্যের উপর ভিত্তি করিয়াই সজীব সতেজ নূতনের সৃষ্টি করিয়াছে বাঙ্গালী। এইরূপ অনেক বাঙ্গালীর পরিচয় আমরা হারাইয়াছি। কবি বাণেশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। আমরা তাঁহারই জীবনকথা সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

আদিশূর বা বীরসেন বাঙ্গলার স্বাধীন সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দশম শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন এইরূপ অনুমিত হয়। কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ পাঁচজন ব্রাহ্মণ এবং কৃতবিদ্য পাঁচজন কায়স্থকে বাঙ্গলা দেশে আনাইয়া বসতি স্থাপন করাইয়াছিলেন। সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণের নাম—শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড়। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা একথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা ইহা একটি জনশ্রুতি বলিয়াই মনে করেন। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আনয়নের কথা কিন্তু লিখিয়া গিয়াছেন।

যাহাই হউক, প্রাচীন কুলজীতে জানিতে পারা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শোভাকর ভট্ট পূর্বকথিত দক্ষের বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ও সাধুব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে, চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে তপস্যা করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। শোভাকর হইতে সপ্তম পুরুষ সিদ্ধেশ্বর শিমুরালি রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট চণ্ডরিয়া গ্রাম হইতে আসিয়া নদীয়া জেলার বালাগড় থানার অধীনে গুপ্তীপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। হাওড়া ষ্টেশন হইতে ৪৬ মাইল দূরে গুপ্তীপাড়া রেলওয়ে ষ্টেশন। গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপরিস্থিত পাণ্ডুয়া হইতে সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী-গুপ্তীপাড়া-কালনা-কাটোয়া রোড ধরিয়া ইচুরা ও কোরালা গ্রামের মধ্য দিয়া মোটর গাড়ী করিয়াও গুপ্তীপাড়া গ্রামে পৌঁছান যায়।

শোভাকর বংশের অনেকেই পাণ্ডিত্য ও সাধুতায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। শুধু পশ্চিম বাঙ্গলায় নহে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সুদূর বারাণসী, গোয়ালিয়র ও আসাম প্রদেশেও সুপ্রতিষ্ঠিত হন। বাণেশ্বরের পিতা রামদেব তর্কবাগীশও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। শুনা যায় তিনি ব্যাসদেবকৃত সমগ্র মহাভারত স্বহস্তে লিখিয়া কণ্ঠস্থ করেন। এরূপ স্মৃতিধর মেধাবী পুরুষ অতি বিরল।

রামদেবের দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে রামনারায়ণ এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে বাণেশ্বর ও রামকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। মোঘল শক্তির পতন ও বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয়ের যুগসন্ধিতে অনুমান ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বাণেশ্বর তাঁহার পৈতৃক গ্রাম- গুপ্তীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। যে গৃহে তিনি ভূমিষ্ঠ হন এখন উহা গঙ্গাগর্ভে। সেই স্থানকে লোকে এখন "কোঠাবাড়ীর" ঘাট বলিয়া থাকে। রামকান্তও বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র বলরাম বারাণসীর মহারাজা মহীপ নারায়ণ সিংহের দেওয়ান রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

বাণেশ্বরের বাল্যজীবনের বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। এইটুকু মাত্র জানা যায় যে তাঁহার পিতার নিকট তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া অতি অল্প বয়সেই বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। আর একটি জনশ্রুতি আছে—স্বপ্নে সিদ্ধমন্ত্র লাভ করিয়া তিনি হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত থানাকুল-কৃষ্ণনগরের এক বিশিষ্ট সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারই আশীর্ব্বাদে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হন। তদবধি তিনি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার নামে খ্যাতিলাভ করেন।

নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় পণ্ডিত ও কবিদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সভায় রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, সুপণ্ডিত মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি অনেক গুণী ও জ্ঞানীর সমাবেশ হইয়াছিল। বাণেশ্বরও তাঁহার অন্যতম সভাকবি ছিলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের সহিত প্রথমে মতান্তর ও পরে মনান্তর হওয়ায় তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের সভা পরিত্যাগ করেন।

নদীয়া ত্যাগ করিয়া বাণেশ্বর গুপ্তীপাড়ায় ফিরিয়া আসেন। তাহার পর গুপ্তীপাড়ার মঠের অধ্যক্ষ দণ্ডী স্বামী পীতাম্বরানন্দের আশ্রমে বাস করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে মুর্শিদাবাদে গমন করিলে বাণেশ্বর নবাব নাজীম আলিবর্দ্দী খাঁর সভাকবির পদে সাদরে বৃত হন। দণ্ডীস্বামীর কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল। তন্নিবন্ধন তিনি রাজরোষে পড়িয়া কারারুদ্ধ হন। বাণেশ্বরের প্রচেষ্টায় দণ্ডীস্বামী মুক্তিলাভ করেন।

মুর্শিদাবাদ গমনের কয়েক বৎসর পরেই আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হয়। কথিত আছে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি উপলক্ষ্যে সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক বাঙ্গলার পণ্ডিতদিগের নিকট যাবনিক শব্দ সংযুক্ত সংস্কৃতভাষায় রচিত যে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান হয় বাণেশ্বরই তাহা রচনা করেন। সেই নিমন্ত্রণপত্রিকা স্রগ্ধরাছন্দে রচিত। পত্রটি এইরূপ—

গোদাপাদারবিন্দদ্বয় ভজনপরো মাতৃতাতো মদীয়
আলিবর্দ্দী নবাবো, বিবিধগুণযুতোঽল্লামুখঃ পশ্চিমাস্যঃ
ত্যক্তা দেহং, জহৌ স্বয়ং মুনসরমুলুকঃ সিরাজদ্দৌলনামা
যাচেঽহম্ মাং ভবন্তো গলধৃতবসনঃ শুধ্যতাং সংনিয়ন্তাম্।"

উক্ত শ্লোকে অনেক অসংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বাণেশ্বরের উদারহৃদয় ও শব্দ যোজনার অপূর্ব দক্ষতারই উহাতে পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষার মধ্যে ইচ্ছা মত অন্য ভাষার শব্দাদি ব্যবহার করার যে রীতি ছিল তাহাও উহাতে প্রমাণিত হয়।

এই ঐতিহাসিক পত্রের সত্যতা মানিয়া লইলে ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সে সময় সংস্কৃত ভাষা সজীব ও সতেজ ছিল এবং বিদেশী ভাষার শব্দ সম্ভার চয়ন করিয়া ইহাকে সমৃদ্ধ করা হইত। সংস্কৃত ভাষাকে মৃত মনে করিয়া যাঁহারা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে কৃত-সঙ্কল্প তাঁহারা সম্ভবত ভুল পথেই চলিয়াছেন। সর্ব্ব-ভারতীয় ভাষা হিসাবে এদেশের অন্য কোন ভাষাই সংস্কৃত ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না।

নবাব আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া বাণেশ্বর বর্দ্ধমানের মহারাজা চিত্রসেনের সভায় উপস্থিত হন। তখন বাঙ্গলা দেশের প্রায় সর্বত্রই বর্গীর হাঙ্গামা। চিত্রসেন তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রী মাণিকচাঁদের হস্তে বর্দ্ধমান রক্ষার ভার দিয়া ত্রিবেণী ও গঙ্গাসাগরের মধ্যবর্ত্তী বিশালয়া জনপদে গমনান্তর সেখানে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। বাণেশ্বর মাণিকচাঁদের বিশ্বস্ত বন্ধু ও স্বগ্রামবাসী ছিলেন। সেই সূত্রে তিনিও চিত্রসেনের বিশেষ বিশ্বাসভাজন হন। চিত্রসেন বাণেশ্বরকেও সঙ্গে লইয়া বিশালায় যান। তাঁহারই অনুরোধে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে অবস্থান কালে বাণেশ্বর "চিত্রচম্পূ" নামে একখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যে লিখিত। উহাতে বাণেশ্বরের অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। বাঙ্গলার গ্রামগুলি তখন মহারাষ্ট্রদস্যুদিগের অকথ্য অত্যাচারে কিরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং গ্রামবাসীদিগকেও কিরূপ অমানুষিক নির্য্যাতন ও অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহার বিশদ বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

বাণেশ্বরের মতে বাঙ্গলা দেশে বর্গীর হাঙ্গামা আরম্ভ হয় ১৬৬৪ শকাব্দে বৈশাখ মাসে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ইহা একখানি প্রামাণিক ইতিহাস। গুপ্তীপাড়ার অধ্যাপক রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, মহাশয় ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরীতে রক্ষিত কোলব্রুকের পাণ্ডুলিপি হইতে এই

পুস্তকখানি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। শুনা যায় বইখানি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর সংস্কৃতশ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অনুমোদন করাইতে চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হন। তাঁহার এই সাধু প্রচেষ্টা সফল হইলে বাণেশ্বরের আরও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইবার সুযোগ লাভ করিত। বাঙ্গালীর কীর্ত্তি রক্ষায় বাঙ্গালী চিরকালই পরাঙ্মুখ। তাহা না হইলে খাঁটি বাঙ্গালীর উৎকৃষ্ট সংস্কৃত রচনার নিদর্শন স্বরূপ চিত্রচম্পূর অংশবিশেষও আমরা বাংলার বিবিধ সংস্কৃত পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক মধ্যে দেখিতে পাইতাম।

চিত্র সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বাণেশ্বর "চন্দ্রাভিষেকম্" নামে একখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁহার মন্ত্রী চাণক্য বা কৌটিল্যের অভূতপূর্ব্ব শৌর্য্য-বীর্য্য ও কর্ম্ম-কুশলতাই এই নাটকের বিষয়বস্তু। বই খানির পাণ্ডুলিপিই রহিয়া গিয়াছে। উহা মুদ্রিত হইবার সুযোগ মিলে নাই। রাজা চিত্রসেনের বিদ্যোৎসাহী মন্ত্রী মাণিকচাঁদের চেষ্টায় ঐ নাটকখানি বসন্তোৎসবের সময় বর্দ্ধমানে একবার অভিনীত হয়।

চিত্রচম্পূ ও চন্দ্রাভিষেকম্ ব্যতীত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার অনেকগুলি সংস্কৃত কবিতাও রচনা করেন। যে কয়টি কবিতা এখনও পাওয়া যায় তাহা নানা দেবদেবীর স্তোত্র। কালিদাসের মহাকাব্য "কুমারসম্ভব" হইতে আখ্যায়িকা সংগ্রহ করিয়া তিনিও একখানি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন এবং উহার নাম দেন "রহস্যামৃতম্" অর্থ ও উৎসাহের অভাবে উহাও অপ্রকাশিত রহিয়া গিয়াছে।

চিত্র সেনের মৃত্যুর পর বাণেশ্বর নদীয়ায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভায় ফিরিয়া আসেন। কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁহাকে সাদরে বরণ করিয়া লন। মহারাজা তাঁহাকে এত অধিক শ্রদ্ধা করিতেন যে একদিন সর্ব্বসমক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন "আপনারা তাঁহাকে (বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে) আমার পারমার্থিক পথ প্রদর্শকও বলিতে পারেন।"

ইহার কিছুদিন পরে বাণেশ্বর পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা দর্শন করিতে যান। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাইয়া উড়িষ্যাধিপতি অতিশয় মুগ্ধ হন এবং যতদিন তিনি পুরীধামে ছিলেন রাজ-অতিথি রূপেই বিপুল সম্মান ও শ্রদ্ধালাভ করেন।

উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাণেশ্বর আর নদীয়ায় ফিরিয়া যান নাই। কলিকাতায় আসিয়া শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণদেব বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন, নিজ গুণে তাঁহার নবরত্ন সভায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন। রাজা কালীকৃষ্ণের সভা-পণ্ডিত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের রচিত "মাধবমালতী" গ্রন্থে রাজা নবকৃষ্ণের নবরত্ন সভার বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা…

"সাক্ষাৎ বরদা পুত্র নামে জগন্নাথ।
তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবন বিখ্যাত॥
মহাকবি বাণেশ্বর নন্দের শঙ্কর।
বলরাম কামদেব আর গদাধর॥ ইত্যাদি

এইসময় শোভাবাজারের নিকট আপার চিৎপুর রোডে একখণ্ড জমির উপর মহারাজা নবকৃষ্ণ নিজব্যয়ে একটি সুরম্য গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বাণেশ্বরকে দান করেন। সেই বাড়ীর কোন স্মৃতিচিহ্নই এখন আর পাওয়া যায় না।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোগলসম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে বঙ্গ বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হন। ইহার পূর্ব্বে মুসলমান বিচারকেরা হিন্দুদিগের দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য দায়ভাগ আইনে অভিজ্ঞ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-দিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ১৭৬৫ সালের পরও কিছুকাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

কিন্তু চিরকাল এইভাবে বিচার কার্য চালান বিশেষ অসুবিধাজনক মনে করিয়া অনেকেই একখানি লিখিত আইন পুস্তকের (Code) অভাব বোধ করিতে লাগিলেন। এই সকল কারণে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল স্যার ওয়ারেণ হেষ্টিংস হিন্দু আইন পুস্তক (Hindu Code) সংকলন করিতে পারেন এমন একজন লোকের সন্ধান করিতে থাকেন। মহারাজা নবকৃষ্ণ এক সময় হেষ্টিংসকে আরব্যভাষা শিক্ষা করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। অন্যান্য কার্য্যেও তিনি হেষ্টিংসকে নানাবিধ পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিতেন। ইহাতে তিনি তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া

উঠেন। নবকৃষ্ণের মাধ্যমে হেষ্টিংসের সহিত সুপণ্ডিত বাণেশ্বরের পরিচয় ঘটে। হেষ্টিংস বাণেশ্বরকে একখানি "হিন্দু কোড্" লিখিতে অনুরোধ করেন। বাণেশ্বরও সে অনুরোধ সানন্দে রক্ষা করিয়াছিলেন। কৃপারাম, রামগোপাল, কৃষ্ণজীবন, বীরেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরীকান্ত, কালীশঙ্কর, শ্যামসুন্দর, কৃষ্ণকেশব, এবং সীতারাম এই দশজন পণ্ডিতের সহযোগিতায় দুই বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম "হিন্দু কোড" সংকলন করেন। এই পুস্তকখানির নাম দেওয়া হয় "বিবাদার্ণব-সেতু"। ১৬৩২টি শ্লোকে সংস্কৃত ভাষায় উহা রচিত হয়।

সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ কোন সাহেবকে এদেশে তখন পাওয়া না যাওয়ায় সংস্কৃত জানা কোন মৌলবীর সাহায্যে বিবাদার্ণবসেতু পারস্য ভাষায় অনুবাদ করান হয়। পারস্য ভাষায় অনুদিত এই পুস্তক অতঃপর ন্যাথেনিয়াল ব্রাসী হালহেড (Mr. Natheniel Brassy Halhaid) সাহেব ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুদিত পুস্তকের নামকরণ করা হয় "এ কোড অব্ জেণ্টু লজ্" (A code of gentoo Laws) শুনা যায় এই ন্যাথেনিয়াল সাহেবই প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই আইনের পুস্তকখানি ইংলণ্ডে ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত হয়। এই পুস্তক সম্পাদন কার্য্য আরম্ভ হইবার দিন হইতে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও তাঁহার সহযোগীরা সরকার হইতে প্রত্যেকে প্রতিদিন একটাকা করিয়া চতুষ্পাঠী বৃত্তি পাইতে থাকেন। সম্পাদন কার্য্য শেষ হইলেও তাঁহারা আজীবন এই বৃত্তি পাইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া সুপ্রিমকোর্টের বিচারকেরা উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভ বিষয়ে দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকালে "কোড্ অব্ জেণ্টু লজ্" এর সাহায্য গ্রহণ করিতেন। পরে সার উইলিয়ম জোন্স "বিবাদভঙ্গার্ণবসেতু" নামে একখানি সংশোধিত আইন পুস্তক প্রণয়ন করেন। ত্রিবেণীর বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এই পুস্তক রচনায় স্যার উইলিয়ম জোন্সকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। অনেকের ধারণা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননই প্রথম "হিন্দুকোড্" প্রণয়ন করেন। এই ধারণা ভুল। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারই প্রথম "হিন্দুকোড্" সংকলন ও সম্পাদন করেন।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথম বাঙ্গালী পণ্ডিত নিযুক্ত হন—রাধাকান্ত তর্কবাগীশ। রাধাকান্তের মৃত্যুর পর ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে কোলব্রুক সাহেবের অনুরোধে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পৌত্র ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম উক্ত পদ গ্রহণ করেন। ঘনশ্যাম বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় স্বয়ং জগন্নাথকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি ন্যায়শাস্ত্রে ও ব্যবহারশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং "বিবাদভঙ্গার্ণব সেতু" রচনায় জগন্নাথের অন্যতম সহকারী ছিলেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ঘনশ্যামের পরলোকগমনের পর উক্তপদে বাণেশ্বরের পৌত্র চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

বাণেশ্বরের প্রথম জীবনের ন্যায় শেষ জীবনের কাহিনীও অপরিজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। ৭৫।৭৬ বৎসর বয়সের সময় তিনি বিবাদার্ণব সেতু সংকলন সম্পূর্ণ করেন। সম্ভবত ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পরিণত বয়সেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পুত্র হরিনারায়ণ ও পৌত্র চতুর্ভুজ সুবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। শুনা যায় নীলমণি নামে বাণেশ্বরের আর একটি পুত্র ছিল। তিনি সুরসিক ও বিশেষ রহস্যপ্রিয় ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় তিনিও হাস্যরসিক হিসাবে স্থান পাইয়াছিলেন। কথায় বা কাজে তাঁহাকে কেহই ঠকাইতে পারিত না। একদিন তিনি রাজসভায় আসিয়া দেখিলেন, মহারাজা ও অন্যান্য সভাসদেরা মুখে কাপড় চাপা দিয়া কাঁদিতেছেন। নীলমণিও কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে তাঁহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন—"আপনাদের কান্না দেখে আমার বাবার কথা মনে পড়ছে। তিনি প্রায়ই আমাকে বলতেন—নীলু, পড়াশুনা করলি না, তোর দুঃখে শিয়াল-কুকুর কাঁদবে। আজ তাই দেখে বাবার কথা বার বার মনে পড়ছে এবং তাই আমি কাঁদছি।" এইরূপই ছিল তাঁহার রহস্যপ্রিয়তা।

সেকালের পণ্ডিতদিগের রহস্যপ্রিয়তার আর একটি নিদর্শন দিলে বোধহয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণপত্রলাভের আশায় জনৈক পণ্ডিত কবিচন্দ্রকে জগন্নাথের নিকট সুপারিশ করিতে বলেন। কবিচন্দ্র তাঁহাকে নবকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত মহাকবি বাণেশ্বরের পৌত্র চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নকে ধরিতে উপদেশ দেন। পণ্ডিতটি বলিলেন—"এ ক্ষেত্রে চতুর্ভুজের

হাত নাই।" স্বভাব কবি কবিচন্দ্র উহাতে উত্তর দিলেন—"চতুর্ভুজে ভুজো নাস্তি, নির্ভুজঃ কিং করিষ্যতি?" অর্থাৎ চতুর্ভুজের যখন কোন হাত নাই, তখন ভুজহীন জগন্নাথ কি করিতে পারিবেন?" এরূপ রহস্যালাপ বাংলার সমাজ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে। বাঙ্গালী হাসিতে ভুলিয়াছে।

চতুর্ভুজের পৌত্র ক্ষেত্র পাল "রাধাকান্তচম্পূ" নামে গদ্য-পদ্যময় একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া তৎকালীন পণ্ডিত সমাজে কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যবসায় সহকারে অনুসন্ধান করিলে বাণেশ্বর রচিত আরও কিছু পুস্তকের সন্ধান মিলিতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অপূর্ব্ব ধীশক্তি সম্পন্ন এই বাঙ্গালী পণ্ডিতের জীবনকথা ও রচনাবলীর কে এখন সন্ধান করিবে? বাঙ্গালীর ইতিহাস আবার নূতন করিয়া কে লিখিবে?*

* ২৭।১২।১৯৫৯ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৩৩৯ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, রামগতি ন্যায়রত্নের গোপীকথা, ১৩৫৪ সালের প্রবাসী পত্রিকা, ১৩৬৭-৬৮ সালের মাসিক বসুমতী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক হইতে এই প্রবন্ধের উপকরণসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ সকল পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধকার এবং লেখকদিগের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গীতা ও চণ্ডী

শ্রীরাধাবল্লভ দে

গীতা ও চণ্ডী উভয় ধর্মগ্রন্থই অপর এক বৃহত্তর ধর্মগ্রন্থের অন্তর্গত, গীতা মহাভারতের, চণ্ডী পুরাণের। গীতায় মোহগ্রস্ত অর্জ্জুনকে এবং চণ্ডীতে মোহগ্রস্ত সুরথ ও সমাধিকে জ্ঞান প্রদান করা হইয়াছে। গীতার শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ক্রিয়, চণ্ডীর দুর্গা সক্রিয়। তার কারণ ব্রহ্ম স্বয়ং নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, ব্রহ্মের শক্তি মায়া বা প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করেন। গীতার অর্জ্জুন আত্মীয় স্বজনের প্রতি আসক্ত, চণ্ডীর সুরথ ও সমাধি রাজ্য এবং ধনের প্রতি আসক্ত। উভয়েই অজ্ঞান। কি ভাবে কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম বন্ধনজনক না হইয়া চিত্তশুদ্ধির কারণ হয় গীতা তাহারই নির্দ্দেশ দিয়াছে। চণ্ডীতে কেবল সাধনার পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গীতায় ভগবান সর্ব্ব প্রাণীর-হৃদয়ে অবস্থান করিয়া মায়া-শক্তির দ্বারা তাহাদিগকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভ্রমণ করাইতেছেন। চণ্ডীর উত্তম-চরিত্রে দেখিতে পাই দুর্গাদেবী সকল প্রাণীর মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদের যাবতীয় কার্য্য করিতেছেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনটি নরকের দ্বার এবং আত্মার-বিনাশক অতএব এই তিনটি ত্যাগ করিবে। ইহারা সাধন-পথের অন্তরায়। চণ্ডীর প্রথমচরিত্রে মধুকৈটভবধ বর্ণিত হইয়াছে, মধুকৈটভ লোভের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। মধ্যচরিত্রে মহিষাসুরবধ বর্ণিত হইয়াছে, মহিষাসুর ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি, উত্তম চরিত্রে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ বর্ণিত হইয়াছে, শুম্ভ নিশুম্ভ কামের প্রতিমূর্ত্তি। এগুলিকে ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে, কারণ ইহারা সাধন-পথের অন্তরায়। গীতায় ঐশী-শক্তিই সংহার করিতেছেন, চণ্ডীতে সেই শক্তিমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং সংহার করিতেছেন। তত্ত্ব হিসাবে উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। ভগবানের শক্তির দ্বারাই পৃথিবীর সকল কর্ম নিষ্পন্ন হইতেছে। গীতায় যাহা নিগূঢ়-তত্ত্ব, চণ্ডীতে তাহাই মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীপাট মুলুক ঃ বৈষ্ণব সাধনার অন্যতম পীঠস্থান
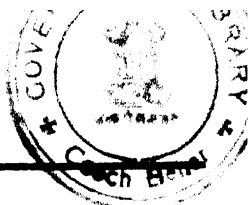
ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ পি, এইচ ডি,

এক সময় বীরভূম ছিল বাংলা দেশে সাধনার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। যে কোনো সম্প্রদায়ের সাধক এখানে এসে অধ্যাত্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে গেছেন। তন্ত্রসাধনার যে বহুল প্রয়াস হয়েছিল এক সময়, তা জানা যায় বীরভূমের সুনামখ্যাত শাক্ত পীঠস্থানগুলির অবস্থানে। কঙ্কালীতলা, নন্দীকেশ্বর, ফুল্লরা, তারাপীঠ ইত্যাদির নাম সকলেরই সুপরিচিত। পরমতান্ত্রিক বামাখ্যাপার সিদ্ধস্থান তারাপীঠ, এখন বাংলা দেশের তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত। জয়দেব, চণ্ডীদাস এই বীরভূমেই আবির্ভূত ; এই মাটিতেই তাঁদের সিদ্ধি এবং এই মাটির সঙ্গে তাঁরা চিরদিন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাধনার উপযুক্ত স্থান অন্বেষণে ভারতের বহু স্থানে পরিভ্রমণ করেন। হিমালয় থেকে সাগরতট পর্যন্ত অনেক জায়গায় তিনি ঘুরেছিলেন ; কিন্তু কোনো স্থান তাঁর মনোমত হয়নি ; শেষে ভগবৎপ্রেরিত হয়েই যেন তিনি বোলপুরে নেমেছিলেন, আর তখনই তাঁর চোখে পড়ল বোলপুর ষ্টেশনের উত্তরস্থিত দিগন্ত প্রান্তর। এই উষর ভূমিই তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকল ; আর তিনি এই মরুপ্রান্তস্থিত সপ্তপর্ণীর ছায়াতলে বসে পেলেন, 'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি'। মহর্ষির সাধনপীঠ শান্তিনিকেতন আজ শুধু কেবল বীরভূম বা বাংলার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে শক্তিবাদ, বৈষ্ণববাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতির যোগসাধনে বীরভূমের মাটি অতুলনীয় গৌরবে গৌরবান্বিত।

বীরভূমের এইসব নানা গৌরবময় ঐতিহ্যের মধ্যে শ্রীপাটমুলুক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে বহুকাল থেকে। এই গ্রামটি বোলপুরের সন্নিকটে ; গ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়েছে বোলপুর পালিতপুরের পিচের সড়ক। প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য স্থানটিকে করে তুলেছে অতীব মনোরম। প্রাতঃস্মরণীয় রামকানাই ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভের মন্দিরে শ্রীপাট মুলুক বিশেষভাবে প্রখ্যাত এবং বৈষ্ণব জগতে এই স্থানটি ঐতিহাসিক তীর্থরূপে স্থায়ী আসন লাভ করেছে বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

গ্রামটির নাম মুলুক কি করে হল, তা সঠিক বলা কঠিন। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে বলা যায়, মুলুক শব্দটি আরবী 'মুল্‌ক' থেকে এসেছে ; এর অর্থ দেশ বা রাজ্য। মনে হয়, পূর্বে এই স্থানটি মুসলমান-অধ্যুষিত বা মুসলমান-প্রধান অঞ্চল ছিল। জনপ্রবাদ, এক সময় এই গ্রামে মল্লিকদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল ; এই মল্লিক থেকে মল্লুক, মুল্লুক বা মুলুক হয়েছে ; তবে এর মধ্যে যে কষ্টকল্পনা আছে, তা স্বীকার না করে পারা যায় না ; কিন্তু এ বিষয়ে কিছু ঐতিহাসিক সূত্রও যে পাওয়া না যায়, তা নয়। এখানে সে সূত্রটি উল্লিখিত হল। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহের আসফ জা নিজাম উল মুলক নামে এক সভাসদ ছিলেন। ইনি এক সময় বাংলা দেশে আসেন নবাব আলিবর্দীর কাছে তথ্যানুসন্ধানের জন্য। নবাবের উপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন দিল্লীর সম্রাট ; শেষে সম্রাটের পারিষদ এই নিজাম উল মুলুকে উৎকোচ দিয়ে নবাব আলিবর্দী পুনরায় সম্রাটের কৃপা লাভ করেন। উক্ত পারিষদের সুজলা সুফলা বাংলায় এসে নানা স্থান পর্যটন করার প্রবল ইচ্ছা হয়। সেই সূত্রে তিনি মল্লিকপুরে রামকানাই ঠাকুরের মাহাত্ম্যকথা শুনে তাঁকে দেখতে আসেন এবং ঠাকুরের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে দেবসেবার জন্য জমির ব্যবস্থা করে যান। এঁর ঔদার্যের জন্য গ্রামটির নাম মুলুক হওয়া অসম্ভব নয়। (দ্রষ্টব্য, History of Bengal, 2nd part, Dacca University, পৃষ্ঠা ৪৪৩)। নবাব আলিবর্দী খাঁর সময় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ; সুতরাং বলা যায়, রামকানাই ঠাকুর

এই সময় বর্তমান ছিলেন এবং শ্রীপাট মুলুকের খ্যাতিও প্রতিষ্ঠিত হয় উক্ত সময়েই।

বহুদিন থেকে মুলুক গ্রামটি বৈষ্ণব-অধ্যুষিত। এখানে রামকানাই ঠাকুরের আগমন ভগবানের কোনো উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই। ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভের মন্দির ও অন্যান্য দেবস্থানগুলি আজিও অক্ষুণ্ণ। দেবসেবা, জনসেবা ও অতিথিসেবায় গ্রামবাসীরা কখনও কার্পণ্য করে না। সন্ধ্যায় নিভৃত পল্লী শঙ্খ-ঘণ্টায় মুখরিত হয়ে ওঠে; ছেলে-বুড়ো সবাই দেবদর্শনে ছুটে যায় মন্দির প্রাঙ্গণে, আর ভুলে যায় সারাদিনের ক্লান্তি খেদমিশ্রিত বৈচিত্র্যহীন জীবনকে। সন্ধ্যারতির পর যখন তারা ঘরে ফিরে আসে, তখন তারা বুঝতেও পারেনা যে তাদের মন চলে গিয়েছে বাস্তব সংসার থেকে বহু দূরে চিরশান্ত অনন্তলোকে। পূর্ণানন্দে তাদের রাত কেটে যায়; প্রভাতে ঠাকুরের নাম স্মরণ করে আবার তারা দিনের কাজে প্রবৃত্ত হয়। পল্লীর এই অনাড়ম্বর ও শান্তিময় পবিত্র জীবন অন্যত্র তেমন সুলভ নয়। যাঁর পুণ্যপাদস্পর্শে শ্রীপাট মুলুক আজ মহিমমণ্ডিত, তাঁর কথা না জানলে স্থান মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ বোধগম্য হবে না। এই উদ্দেশ্যে অতঃপর শ্রীরামকানাই ঠাকুরের প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

ধনঞ্জয় পণ্ডিতের পরিবারে সঞ্জয়ের বংশে যদুচৈতন্যের ঔরসে রামকানাই ঠাকুরের জন্ম। ধনঞ্জয় পণ্ডিত ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক। এঁর উল্লেখ পাওয়া যায় নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ও রঘুনাথ দাসের মিলন প্রসঙ্গে। নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করার পথে রঘুনাথ দাস পানিহাটিতে নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করেন। প্রভুর ইচ্ছায় রঘুনাথ দাস দৈ-চিড়া ভোগোৎসবের আয়োজন করলে বৈষ্ণবগণ সেখানে এসে মিলিত হন। এদের মধ্যে ধনঞ্জয় পণ্ডিত ছিলেন অন্যতম।

> চৌতরা উপরে যত প্রভুর নিজগণ।
> বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলীবন্ধন:
> রামদাস ঠাকুর সুন্দরানন্দ দাস গদাধর।
> মুরারি কমলাকর সদাশিব পুরন্দর॥
> ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বর দাস।
> মহেশ গৌরীদাস আর হোড় কৃষ্ণদাস॥
>
> চৈতন্যচরিতামৃত, ১।৬।৫৯-৬১

এই ধনঞ্জয় পণ্ডিত ছিলেন দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। (ব্রজের বসুধাম সখা)। নিত্যানন্দ শাখার অন্তর্ভুক্ত ইনি। এঁর আবির্ভাব চট্টগ্রামের জাড়গ্রামে। পিতা শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা কালিন্দী দেবী। শ্রীপতি ছিলেন বিশেষ বিত্তশালী। ধনঞ্জয়ের পরিণয় হয় অপরূপ রূপবতী এক কন্যার সঙ্গে। সংসারী হবার পর ধনঞ্জয় বিলাসী হয়ে পড়েন; কিন্তু কিছুকাল পরে সংসারত্যাগে তাঁর প্রবল বাসনা জন্মে। একদিন কাকেও না বলে তীর্থভ্রমণের ছলে বেরিয়ে পড়েন গৃহ থেকে। বর্ধমান জেলার শীতল গ্রামে এসে মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশ করে সকলকে হরিনাম মন্ত্র দান করেন; সেখান থেকে নবদ্বীপে এসে ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হন। পরে বৃন্দাবনের পথে মেমারি ষ্টেশনের নিকট সাঁচড়া পাচড়া গ্রামে কিছুদিন থাকেন। এখানে এক শিষ্যকে সেবাপ্রকাশের অনুমতি দিয়ে ধনঞ্জয় বৃন্দাবনে যান। বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে বোলপুরের নিকট জলুন্দি গ্রামে শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ করে শীতল গ্রামে ফিরে আসেন। এইখানেই হয় তাঁর তিরোভাব। (দ্রষ্টব্য, রাধাগোবিন্দনাথের চৈতন্য চরিতামৃত, পরিশিষ্টভাগ, পৃষ্ঠা ১০৩-৪)।

ধনঞ্জয় পণ্ডিতের ভাই সঞ্জয় পণ্ডিত; সঞ্জয়ের এক পুত্র ছিলেন, নাম যদুচৈতন্য। যদুচৈতন্যের চার পুত্র—ভৃগুরাম, পরশুরাম, জয়রাম ও কানুরাম। কনিষ্ঠ পুত্র কানুরাম পরবর্তীকালে সিদ্ধপুরুষ রামকানাই ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

যদুচৈতন্যের পুত্ররা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। ভৃগুরাম সিউড়ির সন্নিকটে কোমাগ্রামে বাস করতে থাকেন। জয়রাম সন্ন্যাস গ্রহণ করে নানা তীর্থ পর্যটন করেন—শেষে বোলপুরের অনতিদূরে মুলুকগ্রামে এসে দেহরক্ষা করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভৃগুরামের মতো রামকানাই ঠাকুরও জলুন্দিতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সেবায় দিনাতিপাত করতে থাকেন। তিনি কোনো সময়ে পদব্রজে বৃন্দাবনের পথে রওনা হয়ে মুলুকগ্রামে এসে উপস্থিত হন সূর্যাস্ত সময়ে। তখন ধেনু বৎস নিয়ে রাখালবালকেরা ফিরছিল গোষ্ঠ থেকে। শারদ পূর্ণশশীর রূপালী আভায় পূর্বদিক উদ্ভাসিত। হঠাৎ ঠাকুরের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়; কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে তিনি নেচে উঠলেন; তিনি মনে করলেন—এই তো বৃন্দাবন;

এই তো শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি! তখন থেকেই ঠাকুর এখানেই থেকে গেলেন এবং সজ্জন গ্রামবাসীদের সহায়তায় রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, শিব-দুর্গার আসনও স্থাপিত হল রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের পাশেই। নিত্য দেবপূজার সঙ্গে সঙ্গে নরনারায়ণ ও অতিথিসেবার ব্যবস্থা হল দৈনিক ষোল সের চাল ও তদনুযায়ী ব্যঞ্জনের বরাদ্দ নির্ণয়ে। আজও চলে আসছে এই নিয়ম। সিদ্ধ-পুরুষ রামকানাই ঠাকুরের স্মরণে মূলুকগ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিকের শুক্লা অষ্টমীতে উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে হয় এক বিরাট মেলা এবং এই মেলায় রস-পর্যায়ে কীর্তন গান চলে অহোরাত্র ধরে। এই কীর্তনগানই হল উৎসবের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ-ছাড়া চামর সহযোগে রামায়ণ গান ও বাউলদের যোগমার্গিক সঙ্গীত বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

রামকানাই ঠাকুরের মতবাদ ছিল উদার। তিনি এই গ্রামে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মকে এক সূত্রে গেঁথেছিলেন। একদা সর্বধর্মের সমন্বয় সাধিত হয় এই মূলুক গ্রামে—ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে আসছে বহুকাল থেকে।

ভারতবর্ষের একান্ন বর্ষ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

এবার তোমার জন্ম দিনে উল্লাস গভীর
পদধ্বনি শুনছি তব হীরক জয়ন্তীর।
শুভক্ষণে আশীষ করি আমি—
চিরদিনের আনন্দ হও তুমি,
বরেণ্য হও যুগের যুগের সকল মনীষীর।

২

কল্পনাতে সমারোহ হের'ছ বারম্বার,
অনাগত অফুরন্ত বিরাট প্রতিভার।
করবে তোমার পুণ্য অভিষেক—
স্নিগ্ধ নীলাঞ্জনের মত মেঘ—
কত বুকের আদর মাখা স্নেহের আঁখিধার।

৩

জীবন তোমার উৎসবময় সুন্দর, শিব, সত্ত, (সৎ)
নব নীলোৎপলের দলে গড়া তোমার পথ।
পথ তোমারে দেখায় যে মেঘদূত—
রাগের সে পথ—আতিথ্য নিখুঁত,
জয়ধ্বনি করে তোমার অতীত ভবিষ্যৎ।

৪

আসবে অবিস্মরণীয় কতই সুপ্রভাত
সকল রাতই অখণ্ড এক শ্রীপঞ্চমীর রাত,
আহা তোমার গীতের মহোৎসবে,
কতই চেনা কণ্ঠ মিশে রবে,
কি অমৃত রইবে মিশে সে আনন্দ সাথ।

৫

গতিতে যে ছন্দ তোমার হস্তে পূজার ফুল—
ভক্তি ভরা বক্ষ তোমার শুচিতা অতুল।
তোমার শুধু সুধার যে কারবার
পর নহেক কেহই বসুধার,
তুমি কালের কালজয়ী এক আনন্দ পুতুল।

সবিনয় নিবেদন

হরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায়

সবিনয় নিবেদন,

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন। জানি সেদিনের ব্যাপারে আপনি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছেন। আমিও অবশ্য কম অপ্রস্তুত হই নি।

আপনি আসবেন জানতাম, কারণ আপনার মাসিক পত্রিকায় একটা গল্প দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বেশ কয়েক মাস আগে—কিন্তু কিছুটা শারীরিক কারণে, কিছুটা মানসিক, গল্পটা কিছুতেই লিখে উঠতে পারছিলাম না। আপনি বহুবার ফোন করেছেন। আমিও কথা দিয়েছি কিন্তু কথা রাখতে পারিনি। তাই আশা করেছিলাম, নাকি, আশঙ্কা, যে আপনি একদিন বাড়ী চড়াও হয়ে প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন।

কিন্তু আমার বাড়ীতে আসবার অমন একটা ব্রাহ্ম মুহূর্ত আপনি বেছে নেবেন, তা আমি ভাবতেও পারিনি। আপনি দরজা ঠেলেই বিস্ময়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়েছিলেন। আপনার দু চোখের তারায় কৌতূহলের যে ভাবা ফুটে উঠেছিল, তার অর্থ বুঝতে আমার অসুবিধা হয় নি। আপনার বাড়ীতে পা দিয়ে যদি আমি দেখতাম যে আপনার বৈঠকখানায় শোফার হাতলে মাথা দিয়ে একটি তন্বী তরুণী অঝোর ধারায় কেঁদে চলেছে, আর কাছে বসে আপনি মেয়েটির মাথায় হাত বোলাচ্ছেন, তাহলে আমার অবস্থাও আপনারই মতন হ'ত।

বাজারে সাহিত্যিকদের সুনামের একটু অভাব। আমরা আমাদের জনপ্রিয়তার সুযোগের নাকি পূর্ণ সদ্ব্যবহার করি। যে কোন বাড়ীর অন্দরমহলে আমাদের অবাধ প্রবেশ। যে কোন সভাসমিতি উদ্বেলিত হয় আমাদের কেন্দ্র করে। ছিদ্রপথে শনির

দস্যির মতন আমাদের দৃষ্টি সংসার ভাঙে। কেবল যে পরের সংসার তাই নয়, মাঝে মাঝে নিজেরও।

সেদিন আপনি আর দাঁড়ান নি। ঈশ্বর জানেন আমার সম্বন্ধে কি মনোভাব নিয়ে আপনি গিয়েছিলেন। একটু পরেই আমি বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু পথে আপনার মোটর দেখতে পাইনি।

তারপর সাত দিন কেটে গেছে। আশা করেছিলাম ইতিমধ্যে আপনি একবার ফোন করবেন কিন্তু করেন নি। বিশ্বাস করুন আমিও বার কয়েক ফোনের হাতলটা তুলেও রেখে দিয়েছি। আপনাকে ফোন করতে পারিনি। ভেবেছিলাম, আপনাদের অফিসে একবার যাব। সেদিনের সমস্ত ব্যাপারটার কৈফিয়ৎ দেব, কিন্তু তারপরই মনে হল, অফিসে আপনাকে সঙ্গোপনে পাওয়াই দুরূহ ব্যাপার। সব সময়েই আপনি লেখকপরিবৃত হয়ে থাকেন।

তাই অনেক ভেবে চিন্তে আপনাকে এই চিঠি লিখছি।

জানি এত দীর্ঘ চিঠি অন্য কেউ লিখলে, বিশেষ করে নতুন লেখক, আপনার সবটা পড়ার ধৈর্য থাকত না, ছিঁড়ে বাতিল কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিতেন, কিন্তু আমার নামটা দেখলে সবটা আপনাকে পড়তেই হবে। এতদিন সাহিত্যসেবার এইটুকুই পুরস্কার।

সেদিনের সে মেয়েটি আমার চেনা। যেভঙ্গীতে সেদিন দেখেছিলেন, তাতে বিশেষ চেনা বললেই বোধ হয় স্বাভাবিক হ'ত, কিন্তু বিশ্বাস করুন মেয়েটির সঙ্গে আলাপ আমার একটি দিনের বেশী নয়।

কোন এক অখ্যাত কাগজে একটি গল্প লিখেছিলাম, সেই গল্পটি মেয়েটির ভাল লেগে গিয়েছিল। আজকালকার রেওয়াজ ভাল লাগলেই পত্র লিখে কথাটা লেখককে জানিয়ে দিতে হবে—অনতিবিলম্বে।

আমাদের ঠিকানা বোধহয় সব চেয়ে সহজলভ্য, রেডিয়ো, প্রকাশক, পত্র-পত্রিকার কল্যাণে।

চিঠি পেয়েছিলাম কিন্তু উত্তর দিই নি। মেয়েটির হস্তাক্ষর ভাল লেগেছিল, চিঠির ভাষাও।

বছর দুয়েক আগে লক্ষ্ণৌ থেকে একদল ছেলে এল, রবীন্দ্র-অনুষ্ঠানে যোগ দেবার আমন্ত্রণ নিয়ে। একেবারে নাছোড়বান্দা। শরীরের দোহাই মানল না। বাড়ীতে কাজ আছে এমন একটা ওজর গ্রাহ্যই করল না। শেষ কালে অফিসের ছুটির অসুবিধার কথা তুললাম।

এবার তারাও তূণীরের ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করল। শার্টের পকেট থেকে সবুজ রঙের একটা খাম বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই নিন।

মাত্র দু'লাইনের চিঠি। সশ্রদ্ধ সম্বোধনের পরে করুণ মিনতি। আপনাকে আসতেই হবে, নয়তো উদ্যোক্তাদের কাছে আমার মান থাকবে না।

ইতি

প্রণতা মীনাক্ষী।

প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলাম। আমার যাওয়ার ওপর যার সম্মান নির্ভর করছে তাকেই চিনে উঠতে পারলাম না। কিন্তু মনের অতলে আর একটা মন মিল হাতড়াতে লাগল। চিঠির ভাষা আর নাম দুটোই যেন খুব চেনা। ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ে গেল ঠিক এমনি হাতের লেখার কথা। তবে সে চিঠি এসেছিল আসানসোল থেকে, আর এবারের মীনাক্ষীর বাস লক্ষ্ণৌ।

ছেলেরা আমার দ্বিধাগ্রস্ত ভাবের সুযোগ নিল। বলল, স্যর, ওই কথাই রইল। কাল বিকেলের গাড়ী। আমরা ট্যাক্সি নিয়ে ঠিক সময়েই আসব।

লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে নামতেই যে তরুণীটি ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে পায়ের ধূলো নিল, আন্দাজ করলাম, সেই বোধ হয় মীনাক্ষী।

মীনাক্ষীই প্রথম কথা বলল, যাক দাদা, তবু সভা-সমিতির কল্যাণে আপনার দর্শন পাওয়া গেল, নয়তো ভুলেও তো বোনের খোঁজ-খবর নেন না।

বিচলিত হলাম। দূর প্রবাসে আমার কোন বোন রয়েছে, জানা ছিল না, কিন্তু এ নিয়ে তর্কবিতর্ক করতেও মন চাইল না, কারণ তখন মালা দেওয়ার ধুম পড়ে গেছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে নানা সাইজের মালা।

ভেবেছিলাম উদ্যোক্তারা কোন হোটেলে আমার থাকার বন্দোবস্ত করবেন। হোটেলেই আমি বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। অন্য কারো সংসারে অনুপ্রবেশ করেছি এই খুঁতখুঁতে মনোভাব থেকে অব্যাহতি পাই।

কিন্তু দেখা গেল গাড়ী যে বাড়ীর হাতায় ঢুকছে, সেটা আর যাই হোক, হোটেল নয়।

মীনাক্ষী পাশেই ছিল। বলল, গরীব বোনের বাড়ীতে নিয়েই তুলছি দাদা। একটু অসুবিধা হবে জানি।

মুখে কিছু বললাম না, কিন্তু মনে মনে ভাবলাম, একটু নয়, অদৃষ্টে বেশ কষ্ট আছে।

ছোট বাড়ী। দুটি মাত্র ঘর। বোঝা গেল আমার আসা উপলক্ষ্য করেই সবকিছু ছিমছাম করার একটা প্রচেষ্টা রয়েছে। ম্যান্টল পিসের ওপর রবীন্দ্রনাথের যে আবক্ষ মূর্তিটি রয়েছে, সেটা যে সদ্য কেনা, বুঝতে অসুবিধা হয় না। অন্য দিন ফুলদানী দুটো হয়তো বাক্সবন্দীই থাকে, আজ তাদের সংস্কার হয়েছে। প্লাষ্টিকের রজনী-গন্ধার ওপরেও সাবানের প্রলেপ, গন্ধেই মালুম হচ্ছে।

উদ্যোক্তারা চলে যেতেই মীনাক্ষী আমার মুখোমুখি বসল। এবারে সজল চক্ষে।

আমাকে মাপ করতে হবে দাদা।

• কারণ ?

এই অভিনয়ের জন্য।

এর কি প্রয়োজন ছিল ?

একটু ছিল। মীনাক্ষী কেসে গলাটা পরিষ্কার করে নিল, আপনাকে আসানসোল থেকে যখন চিঠি লিখি, তখন আমি কুমারী, আপনার 'চন্দনবাঈ' গল্পটা আমার ভাল লেগেছিল। এই ভাললাগাটুকু আপনাকে জানাতে না পারলে তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না, তাই প্রকাশকের কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম। খুব আশা করেছিলাম, আপনি চিঠির উত্তর দেবেন; কারণ পাঠকদের প্রতি উদাসীন্য দেখালেও পাঠিকাদের সম্বন্ধে আপনারা খুব নিষ্করুণ নন।

বাধা দিলাম। বললাম, সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তোমার এই ধারণাটা খুব প্রশংসাসূচক বলে মনে হচ্ছে না। শোন তবে আমাদের কথা, যে চিঠিতে বস্তু থাকে · তারই শুধু আমরা উত্তর দিই—তা পাঠকেরই হোক আর পাঠিকারই হোক। যখন আমরা বুঝি যে শুধু সাহিত্যিক-দের স্বাক্ষর যোগাড় করার জন্য চিঠির অবতারণা, কিংবা প্রতিবেশীকে দেখাবার জন্য, তখন আর উত্তর দিই না।

আমার বেলাতে কি তাই হয়েছিল ?

তোমার চিঠির ভাষাটা আমার মনে নেই, তবে সম্ভবত সেই জন্যই।

কিছুক্ষণ মীনাক্ষী কোন কথা বলল না। জানলা দিয়ে চুপচাপ বাইরের দিকে চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, একটা কথা বলব ?

হেসে বললাম, খরচ-পত্র করে যখন এত দূরে নিয়ে এসেছ, তখন একটা কেন, একাধিক প্রশ্ন করতে পার।

না দাদা, ঠাট্টা নয়, বলুন আমার কথা রাখবেন। আপনি কথা না রাখলে আমার মান মর্যাদা কিছু থাকবে না।

ব্যাপারটা একটু ঘোরালো হয়ে উঠল। মেয়েটিকে চাক্ষুষ কোনদিন দেখিনি। মুখোমুখি দাঁড়ালাম এই প্রথম। বয়স কম, অন্তত আমার সঙ্গে বয়সের পার্থক্য অনেক, তাই নির্বিবাদে, নিঃসঙ্কোচে তুমি বলে ডাকতে পেরেছি, কিন্তু এমন কি কথা, যা না রাখলে মেয়েটির ইজ্জৎ ধূলিধূসর হবার সম্ভাবনা !

কৌতূহল চাপতে পারলাম না। বললাম, বেশ বল, কথা দিচ্ছি। অবশ্য যদি মারাত্মক কোন কথা না হয়, যা রাখতে হলে আমার ইজ্জৎ যাবার সম্ভাবনা।

মীনাক্ষী মেঝের দিকে চোখ রেখে মৃদুগলায় বলল, এদের কাছে আমি একটা মিথ্যা কথা বলেছি।

কাদের কাছে ?

এখানকার অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কাছে।

কোন প্রশ্ন করলাম না। ভ্রূ-কুঁচকে মীনাক্ষীর দিকে চেয়ে রইলাম।

মিথ্যা কথা মানে, আমি বলেছি—আপনি আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। সত্যি বলতে কি আমি মনে মনে আরো জটিল কিছু ভেবে রেখেছিলাম।

হেসে বললাম, এ আর মিথ্যা কথা কোথায়। পাঠিকা আর লেখকের মধ্যে সম্পর্ক তো একটা থাকেই। তোমাদের বুকের তার ছুঁয়েই তো আমরা সুরের আলাপ শুরু করি। তোমারই তো আমাদের সম্পদ। শুনলে গর্বে তোমাদের বুক ফুলে উঠবে, কিন্তু আমাদের সম্মান, প্রতিপত্তি,

আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের মূলে তোমাদেরই কৃপাদৃষ্টি। এদেশে পুরুষরা পাঠক নয়, তারা বাহক। গ্রন্থাগার থেকে তোমাদের ফরমায়েশমত বই এনেই খালাশ। সে সব বই পড়ার তাদের সুযোগ কম। মাঠ আছে, তাস, পাশা, দাবা, অন্য নেশা আছে। খবরের কাগজ সামনে রেখে রাজনৈতিক তর্কের ঝড় তোলা আছে। দুটো মলাটের মাঝখানে যেটুকু সঞ্চয় তাতে তাদের সময়ও কাটে না, মনও ভরে না। কাজেই মাভৈঃ, তুমি একটুও মিথ্যা কথা বল নি।

ইচ্ছা করেই এতগুলো কথা বললাম, আর কোন কারণে নয়। প্রথম দিকে মীনাক্ষীর কথায় আমি একটু ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম, কি জানি সে কি কথা বলে বসেছে —তার জের সামলাতে আমার প্রাণান্ত হবে। তাই যখন দেখলাম কথাটা খুবই লঘু, মনের মধ্যে কালবোশেখীর যে মেঘের পুঞ্জ জমা হয়েছিল সেটা পলকে উড়ে গেল। হালকা মনে এক গাদা বলে ফেললাম।

মীনাক্ষী হেসে বলল, তা হলে মনে থাকে যেন—আপনি আমার দূর সম্পর্কের দাদা। মাসতুতো কি পিসতুতো সেটা ঠিক করে নিতে হবে। কোনটা আপনার পছন্দ?

আমার পছন্দ? হেসে বললাম, বইতুতো।

মীনাক্ষী সশব্দে হেসে উঠেই থেমে গেল। দরজায় টুক টুক শব্দ।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে মীনাক্ষী বলল, কর্তা ফিরেছে।

মীনাক্ষী যেমন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফিটফাট, তার স্বামী মণীশবাবু ঠিক তার উল্টো।

এখন অবশ্য অফিসের পোশাক, মানে নেভি সার্ট ব্লু আর সেই রংয়েরই প্যাণ্ট। কালিঝুলি মাখা। কোন এক কারখানার ফোরম্যান। সকাল আটটায় বেরিয়ে যান, দুপুরে ঘণ্টাখানেকের জন্য খেতে আসেন, তারপর ফেরেন রাত সাতটায়, ওভার টাইম করে। যাওয়া আসা করেন মোটর বাইকে।

আলাপ করিয়ে দিতে হাতযোড় করে এক গাল হাসলেন, যাক, দয়া করে গরীবের বাড়ী উঠেছেন। আমি মীনাকে বলেছিলাম, লক্ষ্ণৌতে এত ভাল ভাল হোটেল, তারই একটাতে ভদ্রলোককে বরং ওঠাও, আরামে থাকবেন। তা নয়, আমাদের এই কষ্টের সংসারে এনে তোলা! তা মীনা বললে, আপনি যদি একবার জানতে পারেন ও এখানে আছে, তা হ'লে আর কোথাও উঠবেন না।

কথা শেষ করে মণীশবাবু উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই সুরে সুর মেশাতে পারলাম না। কেবলই তাল কেটে যেতে লাগল।

দুপুরে খেতে বসলাম পাশাপাশি। মণীশবাবু আর আমি। মীনাক্ষী পরিবেশন করল।

শুধু ভোজ্য বস্তুই নয়, খাওয়ার ধরনও আমাদের দুজনের একেবারে আলাদা।

আমি খেলাম মিহি চালের ভাত। মণীশবাবু রুটি। তাও দু হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে।—শ্বাপদসুলভ ভঙ্গীতে।

খেতেই খেতেই মীনাক্ষী মনে করিয়ে দিল, আজ বিকেলে তাড়াতাড়ি আসবার চেষ্টা কর।

চেয়ার ঠেলে দাঁড়িয়ে উঠতে উঠতে মণীশবাবু বললেন, কেন?

মীনাক্ষী গালে আঙুল ছুঁইয়ে অবাক হবার ভাণ করল, তুমি কিগো! আজ ছটায় রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটে রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান রয়েছে না! এঁর পৌরোহিত্যে।

রবীন্দ্রনাথের জন্য মণীশবাবু ততটা লজ্জিত হলেন না, যতটা কুন্ঠিত হ'লেন সামনাসামনি আমার কথাটা উল্লেখ করায়। মাথা চুলকে আমতা আমতা করে বললেন, আসবার তো ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মুস্কিল হয়েছে।

কি মুস্কিল?

আমার ওভারটাইম ডিউটি পড়েছে। ফিরতে ন'টা হবে।

কথার মাঝখানে হাত ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই মণীশবাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন, আরে, কথায় কথায়, বড্ড দেরী হয়ে গেল। চলি।

নীচে মোটর সাইকেলের গর্জনটা মিলিয়ে যাবার পর মীনাক্ষী কথা বলল, দেখলেন তো, কেমন মানুষ নিয়ে ঘর করি? কেবল কাজ আর কাজ। আমি যদি মেশিন হতাম, তা হ'লেও হয়তো কোনদিন হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখত।

কি ভেবে মীনাক্ষী কথাটা বলেছিল, জানি না। চোখ

তুলে তার দিকে চাইতেই দেখলাম—গাল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

সামান্য ওই কটা কথায় আর দু ফোঁটা চোখের জলে মীনাক্ষীর রিক্ত, শতচ্ছিন্ন দাম্পত্য-জীবনটা নিরাবরণ হয়ে পড়ল।

সভা শুরু হ'ল সাড়ে ছটায়। মণীশবাবু এলেন না। আসতে পারবেন না, সে কথা বলেই গিয়েছিলেন, তবু মীনাক্ষী আশা ছাড়ে নি। পোশাক পরতে পরতে বার বার জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মোটর সাইকেলের শব্দ কানে যেতেই উন্মনা হয়ে উঠল।

তারপর আশা ছেড়ে দিয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে আমার পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

সভার কাজ শুরু হ'তেই মনে হ'ল, মীনাক্ষী নিজের দাম্পত্য দুঃখটা ভুলে গেছে। ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল। যারা গান গাইবে, পিঠ চাপড়ে উৎসাহিত করল তাদের, একটা আবৃত্তি-অনুষ্ঠানে নেপথ্য থেকে স্মারকের কাজ করল। আমার বক্তৃতার সময় মঞ্চের ওপর একটা চেয়ার সংগ্রহ করে বসে পড়ল।

ফেরার সময় একই মোটরে ফিরলাম। সারাটা পথ কিন্তু মীনাক্ষী একটি কথাও বলল না। বাইরের দিকে চোখ রেখে একমনে কি চিন্তা করতে লাগল। দু একবার যেচে কথা বলবার চেষ্টা করলাম, সুবিধা হ'ল না। মীনাক্ষী রীতিমত অন্যমনস্ক।

সভার পর আহারের বন্দোবস্ত ছিল, কাজেই বাড়ী ফিরে শয়নের উদ্যোগ করলাম। শরীর এমনিতেই যথেষ্ট ক্লান্ত ছিল, তার ওপর সভার অত্যাচার তো ছিলই। শোবামাত্রই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল।

আচমকা ঘুম ভাঙল চাপা গোলমালে। প্রথমে ভাবলাম রাস্তার হট্টগোল, কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম, না পথের নয়, গণ্ডগোলের উৎস পাশের ঘর। একটু জড়ানো হ'লেও কণ্ঠস্বর অচেনা ঠেকল না।

বা, মালাবদল তো দেখছি হয়ে গেছে। এবার ফুলশয্যাটা বাকি।

যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে মীনাক্ষীকে দেখতে পাবার কথা নয়, কিন্তু মনশ্চক্ষে দেখলাম, আমার সভায়-পাওয়া মালাটা মীনাক্ষী খোঁপায় জড়িয়েছে। বাড়ী ফিরে মালাটা আমিই তাকে দিয়েছি, কিন্তু তার কেউ এমন কদর্থ করতে পারে, তা ভাবতেও পারি নি।

দোহাই তোমার, একটু চুপ কর। ভদ্রলোক পাশের ঘরেই ঘুমাচ্ছেন।

কেন, চুপ করব কেন? তোমরা রাসলীলা করতে পার, আমি বললেই যত দোষ। একেবারে পাশাপাশি বাড়ী। একজনের জানলা দিয়ে আর একজনের সংসার দেখা যায়। একদণ্ড একজনকে না দেখলে আর একজনের চলত না। মাঝখানে এত বছর কেটে গেছে, অথচ সোহাগে একটু ভাঁটা পড়ে নি। ভদ্রলোক ঠিক তোমার আস্তানায় এসে উঠেছেন। ইচ্ছা করেই তো আজ মাত্রাটা বাড়িয়েছি।

আর কিছু কানে এল না। মনে হ'ল মণীশবাবুকে মীনাক্ষী বোধহয় মুখ চেপে বাথরুমে নিয়ে গেল। অবশ্য যেটুকু কানে এসেছিল, মর্মমূল পোড়াবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

চুপচাপ বিছানার ওপর বসে রইলাম। পাশাপাশি বাড়ী। দুজনের অন্তরঙ্গতার এই মিথ্যা ছবি কেন আঁকল মীনাক্ষী! কি তার উদ্দেশ্য! মণীশবাবুকে এভাবে উত্তেজিত করে তার লাভ!

লাভ-ক্ষতির হিসাব পরে করলেও চলবে, কিন্তু মনে মনে এইটুকু ঠিক করে নিলাম, অন্ধকার ফিকে হবার সঙ্গে সঙ্গেই এ আস্তানা ছাড়তে হবে। রাতের আঁধারে মণীশবাবুর মনের যে পরিচয়টুকু পেয়েছি, তারপর আর তার সঙ্গে দিনের আলোয় ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলা অন্তত আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বিছানায় শুলাম বটে, কিন্তু ঘুম এল না। আসা সম্ভবও নয়। মনে মনে হিসাব করলাম, জিনিসের মধ্যে কেবল একটি মাঝারি সাইজের সুটকেশ। ওটা আমি অনায়াসেই হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে পারব।

এখান থেকে সোজা স্টেশন। তারপর কলকাতাগামী কোন একটা ট্রেন নিশ্চয় পেয়ে যাব। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা খুব চঞ্চল হবেন না, কারণ আসর শেষ হয়ে গেলে আমাদের জন্য তাঁরা বিশেষ চিন্তিত হন না।

শুধু মীনাক্ষী ভাববে। কিছু না বলে আচমকা আমার এ ভাবে চলে যাওয়াটা সে সহজমনে বরদাস্ত করতে

১

২

৩
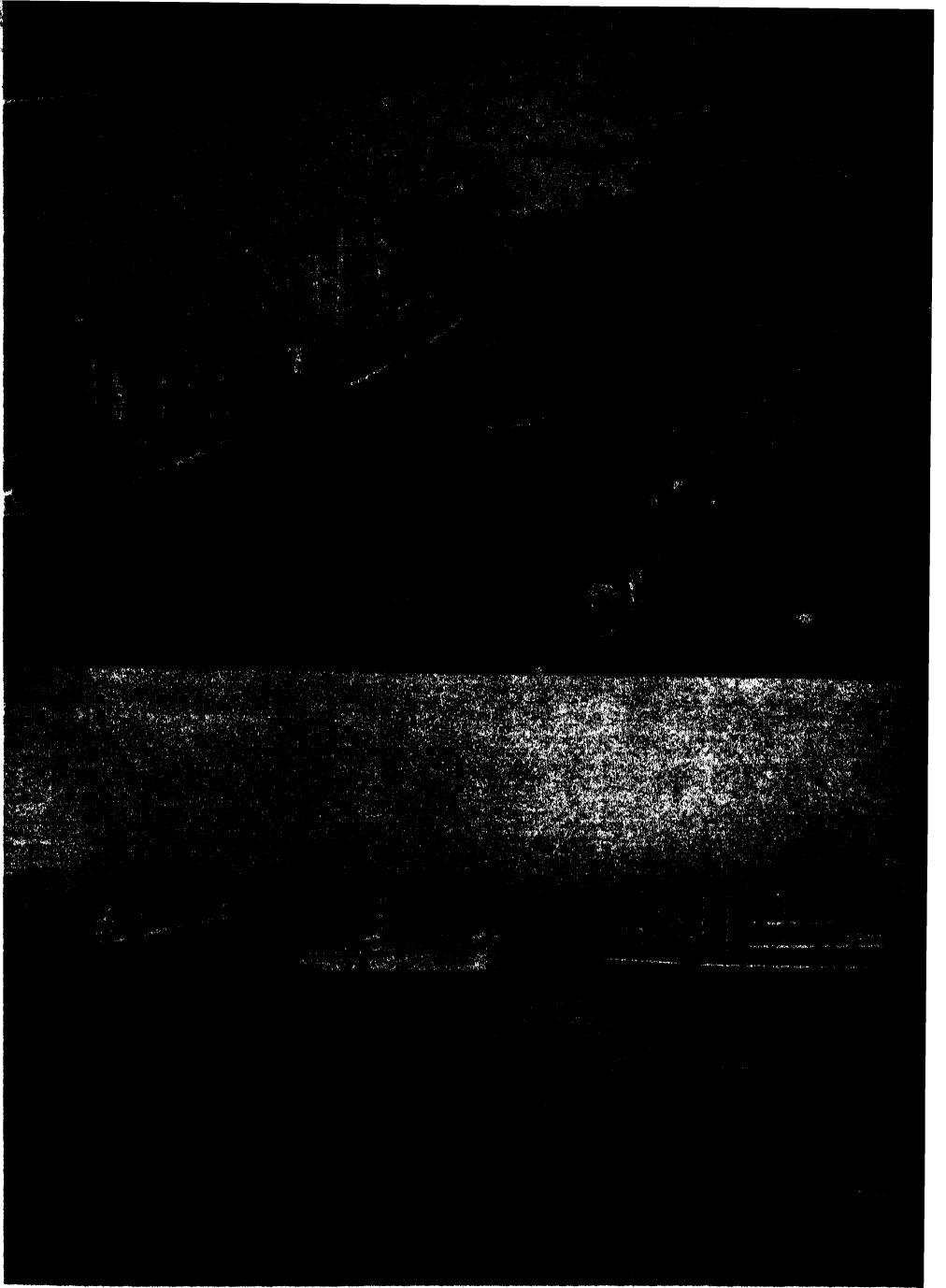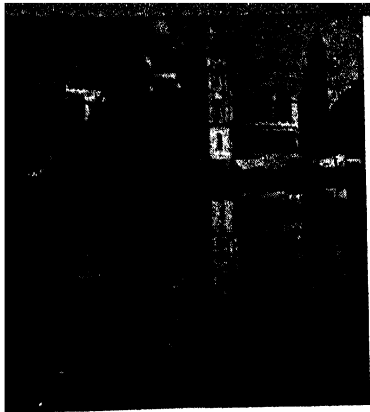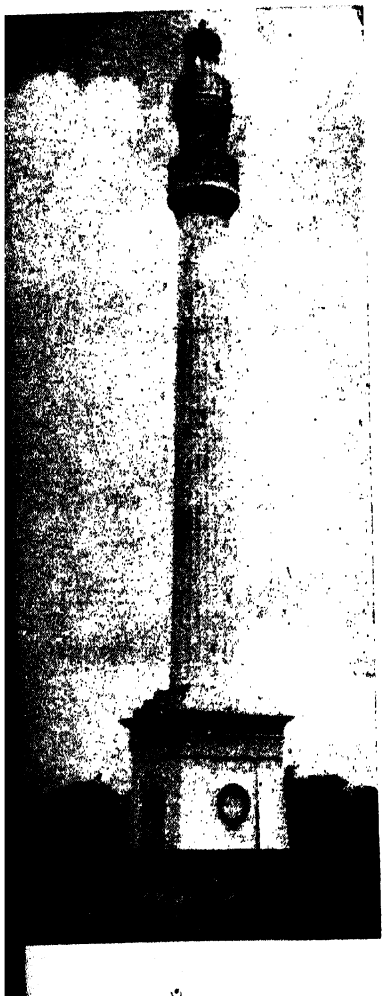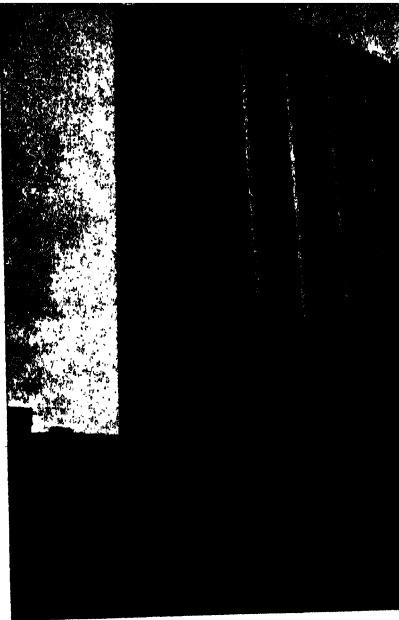
= স্থলে =

*

১। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল
২। সেক্রেটারিয়েট্
৩। অক্টারলোনী মনুমেন্ট

ফটো:
পরিমল মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

পারবে না। অবশ্য একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে। বুঝতে পারবে এমন সব কথার স্ফুলিঙ্গ কানে এসে থাকবে, তারপর নিশ্চিন্তে বসে থাকা সম্ভব হয় নি।

সুটকেশটা গুছিয়ে নিয়ে বেরোবার মুখেই বাধা। একেবারে দরজার গোড়ায় মীনাক্ষী। তার খোঁপায় তখনও আমার দেওয়া বাসি মালাটা জড়ানো।

একবার আমার দিকে, আর একবার আমার হাতের সুটকেশের দিকে চোখ ফিরিয়ে মীনাক্ষী বলল, একটা অপ্রকৃতিস্থ মানুষের কথাগুলোই বড় করে দেখলেন।

যেতে যেতেই বললাম, কথাগুলো শুধু অপ্রকৃতিস্থ মানুষের সাময়িক নেশার ঝোঁকের হ'লে কি করতাম বলতে পারি না, তবে এটুকু বেশ জানি এই মিথ্যা কথা-গুলো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁকে বোঝানো হয়েছে। আমার এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা মানে, সে কথা-গুলোর সত্যতা মেনে নেওয়া।

মীনাক্ষী আস্তে আস্তে পিছিয়ে দাঁড়াল। দরজা ছেড়ে দিয়ে।

কলকাতায় ফিরে এসে ভেবেছিলাম মীনাক্ষী একটা চিঠি লিখবে। ইনিয়ে বিনিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে, কিন্তু সে তা লেখে নি।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে. উত্তাল-ঢেউ উঠেছে জীবন-সমুদ্রে, তার প্রকোপে মীনাক্ষীর জীবন কোথায় গুলিয়ে গেছে, ঠিকঠিকানা নেই—আরো ও একবার লক্ষ্ণৌ থেকে ডাক এসেছে। সাহিত্য সভার, গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্ঘাটনের। যাওয়া সম্ভব হয় নি। মীনাক্ষীকে এড়াবার জন্য নয়, আমার নিজের সংসার সহস্র দংষ্ট্রা বের করে আমাকে আঁকড়ে ধরেছে। যেতে নাহি দিব। তার ওপর নিজের শরীরের আধি-ব্যাধি তো আছেই।

বিশ্বাস করুন, এই কবছরে মীনাক্ষীর কথা একেবারে ভুলে গেছি। আরো বহু নারীর সংস্পর্শে এসেছি। কেউ এসেছে স্বাক্ষর-শিকারিণী হয়ে, কেউ এসেছে সভাসমিতিতে নিয়ে যাবার বায়না নিয়ে, আবার কেউ গুণমুগ্ধা পাঠিকা রূপে। আবার অনেক উদীয়মানা লেখিকা এসেছে আঁচল পেতে প্রশংসার বাণী কুড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

এর মধ্যেই এক সিনেমার পরিচালক অদ্ভুত এক দাবী নিয়ে এসে হাজির হলেন। তিনি একটি গল্প ভেবেছেন, সেটি আমাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রুপালী পর্দার উপযোগী করে দিতে হবে। আমি যত হাতযোড় করি, ভদ্রলোক তত নাছোড়বান্দা।

অবশেষে একদিন এই মারাত্মক কাজটি শেষ হল। দলবল নিয়ে পরিচালক গল্পটি শুনলেন। তাঁর মুখের হাসির রেখা দেখে মনে হল, বোধহয় উৎরে গেছি।

কিন্তু নিস্তার নেই। পাঞ্জিপুঁথি দেখে তিনি মহরতের শুভ লগ্ন ঠিক করলেন, আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ—হাজির থাকতেই হবে।

অগত্যা, যথাসময়ে ষ্টুডিয়োতে গিয়ে জুটলাম। রংচং মাখা একরাশ অভিনেতা-অভিনেত্রী। বুঝলাম পরি-চালকটি খুব কুলীন নন, কারণ অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে যাঁরা সমবেত হয়েছেন সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর। কেউ কেউ আবার তৃতীয় শ্রেণীরও।

নায়িকার সঙ্গে আলাপ হল। তারপর উপনায়িকা।

হাত যোড় করে নমস্কার করতে গিয়েই থেমে গেলাম। চড়া রংয়ের আস্তরণ ভেদ করেও পরিচিত চেহারা নজর এড়াল না।

পরিচালক বললেন. স্বপ্না রায়।

আমি বিড় বিড় করে বললাম, মীনাক্ষী!

মীনাক্ষীও দুটো হাতযোড় করেছিল, এবার নীচু হয়ে একেবারে পায়ের ধূলো নিল।

পরিচালক ব্যস্ত হয়ে পড়তেই ইঙ্গিতে মীনাক্ষীকে একপাশে ডাকলাম।

কি ব্যাপার, এ পরিবেশে তোমাকে দেখব এতটা আশা করি নি। ঘর-সংসার কি এতই খারাপ লাগল? এ নরকে না নামলে আর চলছিল না।

মীনাক্ষী একটি কথাও বলল না। মাথা নীচু করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমিই ভয় পেলাম। এমন একটা নয়নমনোহর দৃশ্য চুটকিচিত্র সাপ্তাহিকের ফটোগ্রাফারদের চোখে পড়লে একেবারে অবিনশ্বর করে রাখার চেষ্টা করবে। শুঁকে শুঁকে বাসী রোমান্সের গন্ধ বের করবে। তারপর দু কলম মুখরোচক হৃদয়াবেদ্য কাহিনী।

সাবধান হবার আগেই মীনাক্ষী বলল, দাদা, আজ

আপনার বাড়ীতে যাব। ফেরার সময় আমাকে ডেকে নেবেন।

আমার বাড়ীতে? সে কি?

কেন, অসুবিধা আছে?

আমতা আমতা করলাম, না, না, বাড়ীতে আর অসুবিধা কি। তবে এখান থেকে দুজনে একসঙ্গে গেলে কেউ কিছু ভাববে না?

মীনাক্ষী হাসল। সশব্দে নয়, অন্যলোকের কান বাঁচিয়ে। তারপর বলল, খুব বেশীদিন অবশ্য এখানে যাওয়া আসা করছি না, কিন্তু এটুকু এর মধ্যেই বুঝেছি, এসব ব্যাপারে এদের আগ্রহ অনেক নয়। কোন এক্সট্রা কোন সহকারী পরিচালকের সঙ্গে বায়ুসেবনে বেরোল, কিংবা কোন উপনায়িকার লক্ষ্য কোন চিত্রশিল্পী, এসব এদের কাছে কানাকানি করার ব্যাপারই নয়। কাজেই মাভৈঃ। ওই সিনেমাপত্রিকাওয়ালাগুলো সরে গেলেই আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়ব। ভয় আমার ওদেরই। ওরাই বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করে।

আধঘণ্টার মধ্যেই ষ্টুডিয়োর ভীড় অনেকটা কমে গেল। কোকাকোলার বোতলটা নামিয়ে রেখে মীনাক্ষী বলল, চলুন দাদা, এইবেলা বেরিয়ে পড়ি।

সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম। বরাতও ভাল স্টুডিয়োর গেট বরাবর আসতেই একটা ট্যাক্সি জুটে গেল।

চলতে চলতেই মনে হ'ল গৃহিণী পিত্রালয়ে। এ সপ্তাহটা নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন হবে না।

আশ্চর্য এক চক্ষু হরিণের মতন কেবল গৃহিণীর কথাটাই ভেবেছি, আপনার কথা অর্থাৎ সম্পাদকের কথাটা একেবারেই মনে আসে নি। এই অবিমৃষ্যকারিতার ফলও পেয়েছি হাতে হাতে।

সোফায় বসেই দুহাতে মুখ ঢেকে মীনাক্ষী কেঁদে ফেলল। একেবারে অঝোর ধারায়।

বিব্রত হলাম। বাড়ীতে গৃহিণী অবশ্য নেই, কিন্তু ঝি চাকরও তো রয়েছে। তারাই বা এমন একটা দৃশ্য দেখলে কি মনে করবে।

প্রবোধ দেবার ভঙ্গীতে বললাম, চোখ মোছ, কি বলবে বলেছিলে বল?

আঁচলে চোখ মুছে ধরা গলায় মীনাক্ষী বলল, মণীশের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

এটা কতকটা আন্দাজ করেছিলাম, বিশেষ করে সে রাত্রে মণীশবাবুর যে মদমত্ত অবস্থায় তার মাত্রাহীন কথাবার্তা শুনেছিলাম, তাতে তাঁর মত পুরুষকে নিয়ে ঘর করার জন্য যে অসীম ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা দরকার, তা অনেক মেয়েরই নেই, একথা না মেনে উপায় ছিল না।

তবু জিজ্ঞাসা করলাম, শেষ পর্যন্ত কি হল?

এই সব দাম্পত্য-বিচ্ছেদে শেষ কারণ একটা থাকে। উটের পিঠে শেষ খড়ের আঁটির মতন।

মীনাক্ষী পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল, তারপর বলল, আপনার ব্যাপারটা বোধহয় বুঝতে পেরে গেছে।

আমার ব্যাপার? প্রায় আঁতকে উঠলাম।

আপনার ব্যাপার মানে, আমার সাজানো ব্যাপার। মীনাক্ষীর কণ্ঠ অবিচল।

তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

মীনাক্ষী সোফায় হেলান দিয়ে বসল। শাড়ীটা গুছিয়ে নিয়ে বলল, আমার আর ভয় নেই দাদা। যার বাস্তুভিটেটা পর্যন্ত বন্যার জলে তলিয়ে যায়, তার আর পৃথিবীর কোন কিছুতে ভয় থাকে না। সব কিছু আপনাকে খুলেই বলি। একটা রাতেই আমার স্বামী দেবতার একটা গুণের পরিচয় পেয়েছেন, কিন্তু বড় গুণটার কথা জানতে পারেন নি। শুধু রঙীণ তরল নেশাই নয়, তার চেয়েও মারাত্মক নেশা মজ্জাগত ছিল। মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন বাইরে কাটাত। বাইরে অর্থাৎ বারনারীর আশ্রয়ে নয়, তারই এক সহকর্মীর বাড়ীতে নেশার খোরাক ছিল। ওভারসিয়ার ব্রিজপ্রসাদ। মাসের বেশী দিনই কাজের জন্য টুরে যেত। বাড়ীতে অল্পবয়সী স্ত্রী কৃষ্ণা। কি ক'রে আলাপ হ'ল জানি না। অবশ্য আলাপ হওয়াটা শক্ত ব্যাপার কিছু ছিল না। ব্রিজপ্রসাদই হয়তো সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে থাকবে। খাল কেটে কুমীর নিয়ে যাওয়ার মতন।

পড়শীদের মুখে হাত চাপা দেওয়া সম্ভব হয় নি, আমি জেনেছিলাম তাদেরই মারফৎ।

সোজাসুজি কথাটা মণীশকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মণীশ অস্বীকার করে নি। এ নিয়ে মন কষাকষি, কান্না-

…টির অন্ত ছিল না। দুদিন খাওয়াদাওয়া বন্ধ করলাম, কিন্তু মণীশ নির্বিকার। তখন বুঝলাম, এ রোগের অন্য চিকিৎসা করতে হবে। হদিশ পেলাম একটা পত্রিকা থেকে।

নতুন খেলা শুরু করলাম, আপনাকে মাঝখানে রেখে। মীনাক্ষী দম নিল। আঁচল দিয়ে মুছে নিল মুখটা।

একদিন ঘুমের ঘোরে আপনার নামটা উচ্চারণ করলাম। পাশের লোকটি উঠে বসল। ভ্রু-কুঁচকে চেয়ে রইল আমার দিকে। চোখের ফাঁক দিয়ে কিছুই আমার নজর এড়াল না।

পরের দিন মণীশ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরল, ক্লাবরটাইমের লোভ এড়িয়ে। সারাক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে রইল। খাবার টেবিলে বসে নিজেকে আর সংবরণ করতে পারল না। বলেই ফেলল।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, সত্যি উত্তর দেবে?

তোমার মতন মিথ্যা বলা তো আর আমার অভ্যাস নেই।

খোচাটা মণীশ গায়ে মাখল না। আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, আচ্ছা, দিবেন্দু কে?

চমকে ওঠার ভান করলাম। মুখ চোখের এমন ভাব যেন অতর্কিতে ধরা পড়ে গেছি। জীবনের গোপনতম কথাটি প্রকাশ্য আলোয় কেউ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসেছে। কাঁদো কাঁদো গলায় বল্লাম, কেন বলতো? এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? এ নাম তুমি কোথায় পেলে?

এক মুহূর্তে মানুষের মুখের সমস্ত রক্তটুকু টেনে নিলে তার যেমন পাংশু, নিস্তেজ অবস্থা হয়, মণীশের ঠিক সেই রকম হ'ল। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে বলল, ভদ্রলোক করেন কি? কত দিনের আলাপ?

উত্তর দিলাম না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। টেবিলের ওপর আপনার 'স্বপ্ন মঞ্জরী' বইটা ছিল, লাইব্রেরী থেকে আনা, সেটা নিয়ে মণীশের সামনে ধরলাম। বললাম, ভদ্রলোক কি করেন সেটা বইয়ের মলাটেই লেখা আছে। আর কত দিনের আলাপ? তা প্রায় ফ্রকপরা অবস্থা থেকে। একই গলিতে আমরা সামনা সামনি থাকতাম। এক বাড়ীর জানলা দিয়ে অন্য বাড়ীর সংসার দেখা যেত।

কথা শেষ করে মোলায়েম একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেললাম। কাজ হল। দুটি চোখে সন্দেহের কুটিল ছায়া ফুটে উঠল!

দেখতে কেমন ভদ্রলোককে? মণীশ নিজেকে চেয়ারের ওপর ছেড়ে দিল।

গ্রীক দেবতাদের ছবি দেখেছি ইংরেজী বইতে, তাদের কারো চেয়ে কম নয়। অন্যদিকে চেয়ে, আস্তে আস্তে কথাগুলো বললাম।

তাই নাকি? এতক্ষণ পরে ভদ্রলোকের মেজাজ নষ্ট হল, সব দিক দিয়েই যখন এত কাম্য, তখন সাত পাকের বাঁধনটা ফসকাল কেন? এই গরীবের সঙ্গে বিয়ে-বিয়ে খেলাটা না করলেই পারতে।

অনেক কষ্টে হাসি সামলালাম। আঁচল মুখে চেপে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। বুক কাঁপিয়ে।

মৃদু কণ্ঠে বললাম, আমার মা বাবা কি ভীষণ গোঁড়া তাতো জানো। বিশেষ করে আমার বাবা! অসবর্ণ বিয়েতে তাঁরা কিছুতেই মত দিলেন না।

মণীশ সে ঘর থেকে উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। অনেকক্ষণ আর ফিরল না।

সে রাতে আদরে সোহাগে আমাকে পাগল করে তুলল। কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বার বার বলল, আমি তোমার জীবনে এসেছি বলে তুমি কি অসুখী হয়েছ মীনাক্ষী? বল? বল? আমি তোমাকে ভালবাসিনা? আদর যত্ন করি না? মনে নেই সেবার যখন টাইফয়েডে ভুগলে, অফিস থেকে ছুটি নিয়ে দিনরাত বসে থাকিনি তোমার পাশে? আপনার কল্যাণে দুটো মাস নিরুপদ্রব জীবন যাত্রা চলল। খবর পেলাম, মণীশ কৃষ্ণার কাছে গেলেও, বেশীক্ষণ বসে না। দু একটা কথা বলেই চলে আসে।

কিন্তু বিষ একবার মানুষের রক্তে ঢুকলে আর তার নিস্তার নেই। বিষের প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই। আজ নয় কাল।

তাই হল, কি একটা কাজে ব্রিজপ্রসাদ মাস খানেকের জন্য বাইরে চলে গেল। মূর্খ আবার নিজের স্ত্রীর তদারকির ভার দিয়ে গেল মণীশের ওপর। লালসার যে বহ্নি স্তিমিত হয়ে এসেছিল, কৃষ্ণার সান্নিধ্যে আবার সেটা লেলিহান শিখায় রূপান্তরিত হল। আমার ওপর,

আমার সংসারের ওপর মনীশের আলিঙ্গন, আকর্ষণ শিথিল হল। আবার চোখে মুখে পাপের ছাপ। অন্যায় আর মিথ্যাচরণের ভেলায় ভর দিয়ে আমার কাছ থেকে সরে যাবার চেষ্টা।

মানুষটাকে কাছে টানবার পথ খুঁজছিলাম, এমন সময় শুনলাম—লক্ষ্ণৌয়ের বাঙালী সমাজ তাদের আসন্ন রবীন্দ্রজয়ন্তীর জন্য সাহিত্যিক খুঁজছে। লাইব্রেরীতে আসা যাওয়ার কল্যাণে কিছু চাঁইদের সঙ্গে পরিচয় ছিল. নিজে যেচে গিয়ে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করলাম। আপনার সঙ্গে আমার হৃদ্যতার কাল্পনিক ছবি আঁকলাম তাদের সামনে। তাদের চিঠির সঙ্গে আমিও একটা চিঠি দিলাম। আপনি এলেন।

আপনার আসার সংবাদ যেদিন এল, সে রাতে মণীশ বাড়ী ফেরেনি। ফিরল পরের দিন ভোরে।

বাড়ীর মধ্যে ঢোকবার আগেই তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সোজাসুজি তার চোখের দিকে চোখ রেখে বললাম, তুমি কয়েকটা দিন অন্য কোথাও থাকতে পারবে?

বেচারী থতমত খেয়ে গেল। বলল, কেন? বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার কি দরকার পড়ল?

অবিচল নিষ্কম্প কণ্ঠে বললাম, দিব্যেন্দুদা আসছেন। লিখেছেন আমার এখানেই থাকবেন।

কিন্তু তার জন্য আমাকে সরে যেতে হবে কেন?

হয়তো দিব্যেন্দুদা কয়েকটা দিন থাকবেন। তোমার মাঝে মাঝে বাইরে রাত কাটাবার কি কৈফিয়ং আমি তাঁকে দেব?

মণীশ কোন উত্তর করল না। পাশ কাটিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকল। আপনি এসে পৌছানোর দিন সকালে জিজ্ঞাসা করল, আমি বাড়ীতে থাকলে তোমাদের কি খুব অসুবিধা হবে?

আমাদের? জেনেও না জানার ভাণ করলাম।

হ্যাঁ, তোমার আর তোমার দিব্যেন্দুদার।

অসুবিধা আর কি?

না, মানে, অনেকদিন পরে দেখা সাক্ষাৎ কিনা। দুজনেরই একেবারে তৃষিত অবস্থা।

উত্তর দিলাম না। সরে গেলাম সেখান থেকে। আপনি আসার আগে পর্যন্ত মণীশ ঠিক সময়ে বাড়ী এল। সারাক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে রইল। দু একবার অনুযোগও করল, দিব্যেন্দুবাবুকে ভাল হোটেলে একটা ওঠালেই তো হয়। এ শহরে কি হোটেলের অভাব। তোমার রবীন্দ্র-জয়ন্তীর কর্ম-কর্তাদের বলে দেখ না কথাটা।

ভ্রূ বাঁকিয়ে হাসলাম, তোমার কি ধারণা দিব্যেন্দুদা লক্ষ্ণৌ আসছেন রবীন্দ্র-জয়ন্তীর জন্য?

সে রকমই তো শুনেছিলাম।

ভুল শুনেছিলে। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্য, আসল লক্ষ্য মীনাক্ষী। মীনাক্ষীর সান্নিধ্য। মীনাক্ষীর আহ্বান।

তারপর সে রাতের ঘটনাটা আপনার কান এড়ায় নি। আপনারা সাহিত্যিক, সামান্য ব্যাপারেই চঞ্চল হয়ে ওঠেন। টনকো সম্মানের বোঝা ঠিক রাখতেই পরিশ্রান্ত।

আপনি ভোর হবার আগেই আমার বাড়ী ছাড়লেন। মণীশ সব কিছু লক্ষ্য করল। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিতে তার একটুও অসুবিধা হ'ল না।

আমার বাঁচবার শেষ অবলম্বনটুকুও আপনি সরিয়ে দিয়ে গেলেন। আমার জীবন থেকে আপনি মুছে গেলেন। অনেক চেষ্টা করেও আর মণীশের ঈর্ষা, হিংসা, সন্দেহ জাগাতে পারলাম না। এটুকু মণীশ বুঝতে পারল ভালবাসার জন্য এর চেয়ে অনেক বেশী কিছু মানুষ সহ্য করে। সেখানে মান-মর্যাদার প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে না।

বিনা হাতিয়ারে এতদিন লড়েছি। তারপরেও ভান করেছি, আপনাকে চিঠি লিখেছি, আপনার উত্তর পেয়েছি. কিন্তু মণীশের কাছে এ ছলনার জাল চিরস্থায়ী হয় নি।

তারপর সর্বনাশ করল আপনার জীবনী। বছরখানেক আগে কোন এক সিনেমা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সাহিত্যের প্রতি মণীশের স্বভাবজ কোন আকর্ষণ ছিল না। শুধু আপনার নাম দেখে কৌতূহলবশতই পত্রিকাটা কিনে থাকবে। এতদিন যেটুকু সন্দেহের আলোছায়ার মধ্যে ছিল, আপনার জীবনী সেটুকু অবারিত করে দিল। মণীশ জানতে পারল, যে কোন দিনই আপনি মধু বিশ্বাস লেনে থাকেন নি, শৈশব থেকে প্রথম যৌবন কাটিয়েছেন বর্মা দেশে।

আমার আঁকড়ে ধরার শেষ তৃণটুকুও নিশ্চিহ্ন হ'ল।

তারপর মণীশ দুর্বার, দুর্বিনীত হয়ে উঠল। কারখানার

এক দুর্ঘটনায় ব্রিজপ্রসাদ প্রাণ হারাল। কৃষ্ণা একেবারে মণীশের আওতার মধ্যে এসে গেল।

প্রায় রাতই মণীশ বাইরে কাটাতে লাগল। দুজনকে —মানে কৃষ্ণা আর মণীশকে গোমতীর ধারে গান্ধীমার্গে, বাদশাবাগের নির্জন প্রান্তরে দেখা গেল। নির্লজ্জ মণীশ প্রায়ই বাড়ী ফিরে আমাকে জিজ্ঞাসা করত, আপনার চিঠি পেয়েছি কিনা? দিব্যেন্দুদাকে আর একবার লক্ষ্ণৌ আমার আমন্ত্রণ জানালে কেমন হয়।

মণীশের ব্যাভিচারের চেয়েও তার শ্লেষ আরও দুঃসহ। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হত, সব লজ্জা, সব সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়ে আপনাকে আর একবার আসবার জন্য চিঠি লিখি। একবার বাঁচার শেষ চেষ্টা করি। কিন্তু সাহস হ'ত না। জানতাম, আপনি আর কোনদিনই আমার মুখ দেখবেন না।

তাই মুখ বাঁচাবার যে একটি মাত্র পথ খোলা ছিল, তারই শরণ নিলাম। কোর্টে দরখাস্ত দিলাম।

সব ব্যাপারটা চুকে যেতে লক্ষ্ণৌ ছাড়লাম। অত ছোট শহরে ভর্তৃহীন অবস্থায় থাকা সম্ভব নয়। তা ছাড়া ভাবলাম, এখানে মা-বাবার কাছে থাকব!

মাস তিনেকের মধ্যেই বাবা জানিয়ে দিলেন, ধিঙ্গী, স্বেচ্ছাচারী মেয়েকে পোষবার মতন যথেষ্ট আয় তার নেই। পথ দেখতে হবে।

পথ দেখলাম। স্টুডিয়োর পথ। মুখে কালি তো যথেষ্টই ছিল, তার ওপর কিছুটা চড়া রং মাখলাম। সেলুলয়েডে হাসি-কান্নার অভিনয়। বাঁচবার মতন জীবন চেয়েছিলাম, পাইনি, সেই জীবনের প্রতিরূপ ফোটালাম স্টুডিয়োর কৃত্রিম আলোয়।

বলুন, দাদা, এ ছাড়া আমি আর কি করতে পারতাম। ভালভাবে মানুষের মতন আমি যে বাঁচতে চেয়েছি, আপনিই তার সবচেয়ে বড় সাক্ষী। অভিনয় করে নিজের স্বামীকে কাছে টানবার, বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলাম, পারি নি, নিজের জীবন বাঁচাতে আবার সেই অভিনয়কেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছি। বলুন দাদা, চুপ করে থাকবেন না। বলুন কোথায় আমার দোষ, কতটা! এক সময় যা জীবন ছিল, আজ তা জীবিকা।

কথার সঙ্গে সঙ্গে মীনাক্ষী অঝোর ধারায় কাঁদতে শুরু করল। নিজের অজানাতেই একটা হাত রাখলাম তার মাথার ওপর। মীনাক্ষীর এ জীবনের জন্য কিছুটা দায়িত্ব যেন আমার, এ অপরাধবোধ থেকে নিষ্কৃতি পেলাম না।

ঠিক এমনই সময়ে আপনি ঘরে ঢুকেছিলেন। লেখার তাগিদ নিয়ে। নাটকীয় এমন একটা দৃশ্যে চমকে উঠে সরে গিয়েছিলেন।

অপকটে সমস্ত কাহিনী আপনাকে জানালাম। তারপরও গল্প লেখার চেষ্টা করেছি। বসেছি কলম হাতে করে, কিন্তু চোখের সামনে মীনাক্ষীর বিষণ্ণ, রিক্ত, মূর্তিটা ভেসে উঠেছে। কাগজে একটি আঁচড় কোটাতে পারি নি। তাই ভাবলাম, আগে আপনাকে চিঠিটা লিখে নিই। কাউকে যা-কিছু জানাতে না পারলে স্বস্তি পাচ্ছি না। বুক থেকে পাষাণভারও নামছে না।

সম্পাদকমশাই, তাই এই দীর্ঘ চিঠির অবতারণা। ধৈর্য ধরে পড়বেন। নমস্কার।
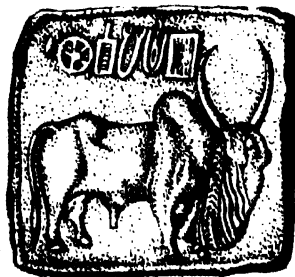
জালিয়ানওয়ালা বাগ

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

যৌবন প্রারম্ভকালে ঘটেছিল যে-ঘটনা,
ভাষা তারে পারি নাই দিতে,
আজি তাহা চাইছি বলিতে ;
শাসন সংযত কণ্ঠে ক্ষুব্ধ চিত্তে রহি
অসহ্য যন্ত্রণা দুঃখ সেইদিন যাইতাম সহি' !

সৈফুদ্দীন সত্যপাল নেতাদ্বয়ে নির্ব্বাসন দণ্ড দিল যবে
মদমত্ত ইংরেজশাসক,
মিলেছিল পাঞ্জাবীরা নৈতিক আহবে
জানাইতে প্রতিবাদ বেদনাজ্ঞাপক।
অমৃতসরের পূত স্বর্ণ মন্দিরের ছায়ে
যেয়ে পায়ে পায়ে,
বিশ হাজারের বেশী নরনারী শিশু যুবা নিরস্ত্র মানব
সম্মিলিত হোলো বাগে সব।
সাতফুট চওড়া মাত্র দুটি পথ ছিল বাগানের;
চল্লিশটি লুইস্‌গানে অবরুদ্ধ পন্থা তাহাদের
হোলো অচিরাৎ,
মাত্র পাঁচ মিনিটেই ষোলো শো রাউণ্ড্ গুলী
সাতশত তেরো জনে করিল নিপাত !
গুলী সব ফুরালো যখনি,
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল্ ডায়ার তখনি
বীরের মতন
ভীষণ কর্ত্তব্য সাধি' সেথা হতে করিল প্রস্থান !
বহিয়াছে শোণিতের বান,
আহত অসংখ্য লোক কাতর চীৎকারে শোকে
ফাটায়েছে সন্ধ্যার আকাশ !
মুখে বিন্দুজল দিতে ছিল না তো কেহ,
শত শত অবসন্ন দেহ
ছাড়িয়াছে জীবনের শেষের নিশ্বাস।

সেই দিন যে-দাবাগ্নি জ্বালায়েছে ডায়ার পাঞ্জাবে,
সেই অগ্নি নির্ব্বাপিতে হাণ্টার কমিটি
এসেছিল 'তুঙ্গদ্বীপ' হতে,
দানিয়া সান্ত্বনা পুনঃ রাখিবারে তাঁবে
বিক্ষুব্ধ ভারতে।
বিচারের মস্ত প্রহসনে
পাষণ্ড ডায়ার বলে : "গুলী না চালালে
হাসিত ও-সব লোকে, আমি মনে মনে
আপনাকে বোকা মেনে পারিনি থাকিতে ;
যা থাক্ কপালে,
ভীষণ কর্ত্তব্য কার্য্য পেরেছি সাধিতে,
এ-কর্ত্তব্য কঠিন কঠোর,
জানেন ঈশ্বর !"

নিহত ছাজুমলের স্ত্রীকে
শ্রীরত্না দেবীকে
এক লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিল ইংরেজ সরকার।
প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি, তাহাই দরকার ;
অধিকন্তু বলেছেন : "ডায়ারকে খুন করো যদি,
আমি তার স্ত্রীকে দেবো দুই লক্ষ টাকা উপহার ;
পারো যদি এসো তারে বধি' !"

ডায়ারের বর্ব্বরতা অতি বাড়াবাড়ি,
ভারত সাম্রাজ্যচ্যুতি ঘটায়েছে তাই তাড়াতাড়ি।
আলি-ভ্রাতৃদ্বয়ে লয়ে গান্ধী সে-অনল
আসমুদ্রহিমাচল
ছড়াইয়া দিল তাহা করিতে প্রবল,
থাকে থাক্, যায় যাক্ জীবন তাহার।
অত্যধিক অমঙ্গলে মঙ্গল উদ্ভব,
অসম্ভাব্য হয়েছে সম্ভব।
সমস্ত ভারতবাসী সুযোগ লভিল অকস্মাৎ,
কোনোদিকে করিল না কিছু দৃক্‌পাত,
ভুলে গেল সুনিদ্রা আহার ;
সারাটা ভারতে এলো মহাজাগরণ,
হোলো জাতি প্রবুদ্ধ চেতন,
বরিল মরণ।
তীর্থ হোলো বন্দীশালা, তুচ্ছ হোলো মৃত্যুভীতি,
নির্ব্বাসন, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলা হোলো রীতি,
দেশপ্রীতি হোলো ধ্যান জ্ঞান,
হেসে প্রাণ দান্।
তরুণ যুবতী যুবা জ্ঞানী মানী বৃদ্ধ অর্ব্বাচীন ;
প্রায় দু-শো বর্ষশেষে দেশ পরে হয়েছে স্বাধীন।

পঞ্চম প্রকরণ, পঞ্চম উচ্ছ্বাস

সদামগ্নং চিত্তং পরিণতি বিষে বস্তুবিষয়ে
নিকৃষ্টা সঞ্জাতা বিষয়মলিনা বুদ্ধিরপিমে।
নমে কানং কিঞ্চিদ্ভবজলধি তরণে নিস্তার বিষয়ে
জগন্নাথ স্বামিন্নগতিকমিমং পাহি কৃপয়া ॥ ৫ ॥
লোকান্নুন্মদয়ন্ শ্রুতীর্মুখরয়ন্ ক্ষৌণীরুহান্ হর্ষয়ন্
শৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মৃগান্ বিবশয়ন্ গোবৃন্দমানন্দয়ম্।
গোপান্ সংভ্রময়ন্ মুনীন্ মুকুলয়ম্ সপ্তস্বরান্ জৃম্ভয়ন্
ওঙ্কারার্থ মুদীরয়ম্ বিজয়তে বংশী নিনাদঃ শিশোঃ ॥৫॥
নমঃ পরমকল্যাণ নমস্তে বিশ্বভাবম।
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ ॥
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
দুরিতানি বিলীয়ন্তে তমাংসীবদিনোদয়ে।
নান্যৎ পশ্যামি জন্তূনাং বিহায় হরিকীর্ত্তনম্।
সর্ব্বপাপ প্রশমনং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তম ॥

বৃহন্নারদীয়ে—

অমিততেজাঃ বিশ্বব্যেপে অবস্থিত কৃষ্ণের নামকীর্ত্তনের দ্বারা যেরূপ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয় তদ্রূপ পাপ সকল বিলীন হয়ে থাকে; হরিকীর্ত্তন ব্যতীত প্রাণিগণের সর্ব্বপাপপ্রণাশন অন্য প্রায়শ্চিত্ত দেখিনা।

বসন্তি যানি কোটিস্তুপাবনানি মহীতলে।
নতানি তত্তুলাং যান্তি কৃষ্ণনামানুকীর্ত্তনে ॥

কৌর্ম্মে

পৃথিবীতে পবিত্রকারক যে কোটিপ্রকার বস্তু আছে কৃষ্ণনামকীর্ত্তনের সহিত তাহাদের তুলনা হয় না। প্রায়শ্চিত্ত বা তীর্থসেবার দ্বারা মানুষ সাময়িক পবিত্র হয় বটে, কালান্তরে পুনরায় চিত্ত দুষ্ট হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণনামকীর্ত্তনে মানুষ পবিত্র হলে আর কোটি কল্পেও তার পাপাদির আশঙ্কা থাকে না। পাপের বীজ কামনা চিরতরে বিনষ্ট হয়।

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তিহ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃপরং ব্রজেৎ ॥ শ্রীমদ্ভা

শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিতকে বলেছিলেন, দোষের সাগর কলির একটী মহান্ গুণ—মাত্র কৃষ্ণনামকীর্ত্তনের দ্বারা সমস্ত বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে পরমধামে গমন করে।

প্রণামের কথা মনে পড়লে মাত্র মুখে "নমঃ" এই কথা উচ্চারণ করলে অক্ষয়লোক লাভ হয়।

প্রপন্নগীতায় সুভদ্রা বলেছেন, একবার কৃষ্ণপ্রণাম দশাশ্বমেধ যজ্ঞস্নানের অধিক। অশ্বমেধযজ্ঞকারী পুনরায় পুণ্যক্ষয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু কৃষ্ণপ্রণামী আর মরজগতে ফিরে আসে না। শ্রীভগবান রামানন্দাচার্য্য বলেছেন—"নমঃ" শব্দের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির বিরোধী অহঙ্কার মমকার অন্য কামক্রোধাদি দূর হয়ে যায়। শ্রীরামোত্তরতাপিনী শ্রুতি বলেন—

নমঃ পদং সুবিজ্ঞেয়ং পূর্ণানন্দৈককারণম্।
সদা নমন্তি হৃদয়ে সর্ব্বেদেবা মুমুক্ষবঃ ॥ ৩ ॥

"নমঃ" পদটী পূর্ণানন্দের একমাত্র কারন, নিখিল দেবগণ ও মুমুক্ষুগণ সতত হৃদয়ে প্রণাম করেন।

হৃদয়ে প্রণাম কেন করেন?

শ্রুতি বলেন—

"এষ প্রজাপতি র্যদ্ধৃদয়মেতদ্ব্রহ্মৈতৎসর্ব্বম্" ৫।৩।১

বৃহদারণ্যক

মহাহৃদয় তাহা এই প্রজাপতি, ইহা ব্রহ্ম এই সমস্ত ব্রহ্ম। হৃদয় শব্দের "হৃ" এই অক্ষরটী যিনি জানেন তার জন্য আত্মীয়গণ ও অন্যলোকেরা উপহার আনে "দ"কে উপাসনা করলে উপাসক জ্যোতি ও অন্যলোকের দান পান, আর য কে উপাসনা করলে স্বর্গেগমন।

মানে হৃদয় নামের এক একটী অক্ষরের উপাসনার এরূপ মনন।

হৃদয় ব্রহ্মের উপাসনায় মানুষ পরম গতি লাভ করে, এইজন্য দেবতা ও মুমুক্ষুগণ হৃদয়ে সতত মনন করেন।

ঠাকুরটির বিশ্রামের স্থান হ'ল হৃদয়, ধ্যান করবার কথা শ্রুতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রসমুদয় শতমুখে বলেছেন।

প্রণাম কত প্রকার

প্রণাম প্রধানত তিন প্রকার—দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হয়ে মন, বাক্য, দুইচরণ, দুই জানু, হৃদয়, মস্তক, নেত্র এবং প্রসারিত হস্ত দ্বারা প্রণামের নাম অষ্টাঙ্গ—ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

হাঁটুগেড়ে বসে মাথা নীচু করে পদধূলিগ্রহণ মধ্যম এবং অঞ্জলিবন্ধন করে মাথায় স্পর্শ করা অধম। কেবলমাত্র মাথা নীচু করা অথবা মুখে "নমস্তে" বলা অধমাধম প্রণাম। সাধু বা গুরুজনকে যেরূপভাবে মানুষ প্রণাম করে তাঁদের কৃপা সেই ভাবে পায়···প্রণাম সত্ত্বগুণ আকর্ষণের চুম্বক প্রস্তর বিশেষ। উত্তমাদি যে ভাবে 'প্রণাম করবে সেই ভাবেই সাধু বা গুরুজনের নিকট হতে সত্ত্বগুণ লাভ করবে। গুরুজন প্রভৃতিকে প্রণাম করবার সময় বাম হাতে বামপদের, দক্ষিণ হাতে দক্ষিণপদের ধূলি নিতে হয়।

পায়ের কোন স্থান থেকে ধূলি নিতে হয়? বুড়ো আঙ্গুলের তলা থেকে—সুষুম্না নাড়ীর শিখা বুড়ো আঙ্গুলে আছে, বৈদ্যুতিকশক্তি সংক্রামিত বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে হয়।

ও তাই বুঝি চরণামৃত বুড়ো আঙ্গুলের নেয়। বৃথা মানুষ চরণামৃত পান বা প্রণাম করে না। সত্ত্বগুণ লাভের জন্যই করে থাকে।

শ্রীভগবান রামানন্দ বলেছেন—শ্রীভগবানের স্তব করতে করতে তাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলে

শতৈ ক্রতুনাংতুসুদুর্লভাং গতিং—
সচাপ্নুয়াদ্বিষ্ণুপরায়ণোজনঃ। ১২৩

শত যজ্ঞের দ্বারা যে সুদুর্লভ গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না প্রণামকারী বিষ্ণুপরায়ণ সেই পরমগতি লাভ করে। প্রণামের মধ্যে কি রহস্য আছে?

দণ্ডবৎ প্রণাম করলে প্রাণ সুষুম্নায় প্রবেশ করে, সাধারণ লোকে তা বুঝতে পারে না। কিন্তু গুরুজনের পায়ের তলায় পড়ে থাকতে আনন্দ বোধ করে। যাঁরা সাধন রাজ্যে অগ্রসর, তাঁরা দণ্ডবৎ কালে ভ্রূমধ্যে একটী গোলাকার জ্যোতি দেখতে পান। প্রণাম করবার সময় ভক্ত ভাবেন—ইষ্টকে আলিঙ্গন করছি—তজ্জন্য প্রাণ পুলকে পূর্ণ হয়। আনন্দ হলে স্থিরে সুষুম্না ব্যতীত স্থির হবার দ্বিতীয় স্থান নাই।

যাঁরা শুদ্ধ ভক্ত, তাঁরা তো এ সবের প্রয়োজনই মনে করেন না।

তাঁরা ভিন্ন নামে সুষুম্না বা কুণ্ডলিনীর ধ্যান করেন। কৃষ্ণ উপাসনার প্রামাণিক গ্রন্থ গৌতমীয় তন্ত্র,তাতে সুষুম্নাকে যমুনা নদী বলেছেন। আমার মোহনমুরলীধারী ঠাকুরটী বলেছেন—

মমপ্রাণাধিদেবী ত্বং স্থিরাভবমনোরসি।
অত্রস্থানং ময়াদত্তং তুভ্যং প্রাণেশ্বরিপ্রিয়ে॥

এক ভগবান কৃষ্ণ প্রথমে একমাত্র ছিলেন, সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করে দুই মূর্ত্তিধারণ করলেন—বিষ্ণুমায়া যিনি তিনি স্ত্রী এবং স্বেচ্ছাময় শ্যামসুন্দর কৃষ্ণপুরুষ সেই রমণীকে দর্শন করে ক্রীড়া করতে ইচ্ছা করলেন। সেই নারী কিছু না বলে ধাবিতা হলেন কম্পিত কলেবর। লজ্জিতা তাঁকে বক্ষেধারণ করলেন—তিনি স্ত্রী জাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মূল প্রকৃতি প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী। ঈশ্বরী। "আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি, আমার বক্ষে স্থির ভাবে অবস্থান কর, আমার বক্ষে তোমায় স্থান দিলাম।"

প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে শুদ্ধ ভক্ত বলেন "রাধারাণী"। আর যোগিগণ বলেন "কুণ্ডলিনী"। নাম-ভেদ মাত্র, বস্তু-ভেদ নাই। আচ্ছা নামের মহিমা শুন—

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপনবাপি পিবন্ ভক্ষসংস্তথা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সঙ্কীর্ত্ত্য মূচ্যতে পাপকঞ্চুকাৎ॥
সম্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযোগেষু দীক্ষিতঃ।
সর্ব্বদান ফলং প্রাপ্তো যস্তুসঙ্কীর্ত্তয়েদ্ধরিম্॥

বৈষ্ণবচিন্তামনৌ

গমন উপবেশন নিদ্রা অথবা জলপান ভোজনে ও জপ করতে করতে যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম উচ্চারণ করে সে পাপ কঞ্চুক আবরণ (মায়া) হতে মুক্ত হয়। সে সর্ব্বতীর্থ স্নানের সকল যজ্ঞে দীক্ষার সমস্ত দানের ফল প্রাপ্ত হয় যে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করে।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ আয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

জীবন গঠনের কথা

উপানন্দ

তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ, ভাবী ভারতের জনক-জননী। তোমরাই স্বদেশের স্বাধীনতাকে অটুট রাখবে, হাসি ফুটিয়ে তুলবে দেশজননীর মুখে। এজন্যে বাল্যকাল থেকেই ফুলের মত নির্মল হবার চেষ্টা করো, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও দৈহিক ও মানসিক শ্রীলাভের জন্য। তোমাদের বিশেষ আশু প্রয়োজন মেধা, স্মৃতি, কান্তি, পুষ্টি ও জীবনীশক্তি। দেহ ও মনে পবিত্রতা ভিন্ন এগুলি লাভ হয়না। জীবনের আদর্শকে যারা বিদ্রূপ করে স্বেচ্ছাচারী হয়, তাদের মধ্যে প্রকাশ পায় মৃত্যুর লক্ষণ। মানুষ হয়ে জন্মলাভ করে যারা পশুর মত জীবনযাপন করে, তারা পৃথিবীতে রেখে যায় তাদের বেদনার ইতিহাস, মনুষ্য জীবনের পরম উদ্দেশ্য করে যায় ব্যাহত। সৎ হও, সত্য লাভ করবে। পবিত্র হও, দেবতা হবে।

তোমাদের জীবন সৃজনশীল। তোমাদের জীবন অধ্যায়ের সূচনা থেকে সৃজনশীল উদ্যম আত্মপ্রকাশ না করলে, ভাবী ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলিষ্ঠ হবে না। ভারতের আদর্শ ও চিন্তাধারার পার্থক্য আছে। ভারতের মৃত্তিকা গঠিত হয়েছে ভিন্ন উপাদানে। এই মৃত্তিকার ভাবসন্তুরস পান করে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। তা না হোলে তোমরা আধুনিকতম বস্তু বিশ্বের জড়ধর্মী গড্ডলিকা প্রবাহের টানে ভেসে যাবে, অস্তিত্বও লোপ হয়ে যাবে। তোমাদের জেনে রাখা দরকার এই বিশাল বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষই একমাত্র দেবভূমি, ভাগবত-শক্তির গোমুখী ধারা এখান থেকে নিঃসৃত, এরই তীর্থসলিলে অবগাহন স্নান করে মানসযাত্রী অধ্যাত্মলোকের সন্ধান পায়। ভগবানের চিরলীলা-ক্ষেত্র ভারতবর্ষ। অধ্যাত্মশক্তি বলে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে, যা কোন যুগে কোন দেশের কোন জাতির পক্ষে সম্ভব হয়নি। সুতরাং এই শক্তিকে যন্ত্রসভ্যতার জড়-বিজ্ঞানের বিকৃত চিন্তাধারায় মোহগ্রস্ত হয়ে তোমরা নষ্ট করো না, এই শক্তিকে বিশেষ ভাবে অর্জন করো। কি ভাবে অর্জন করা যায়, মোটামুটি তোমাদের এ ধারণা হওয়া দরকার। সেই কথাই বলছি।

পশুর মত মানুষের মধ্যে কতকগুলি কুপ্রবৃত্তি আছে। এই সব প্রবৃত্তি ছেলেবেলা থেকেই জেগে ওঠে কুসংসর্গে। এরা রিপু। এগুলি দমন করা আবশ্যক। কেননা এরা স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে, আলোড়ন সৃষ্টি করে জীবকোষে, এনে দেয় জৈবিক চেতনা আর উদ্দীপনা, সর্বদেহের মাংসপেশীও উত্তেজনা বশে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে ছুটতে থাকে, আর পশুর স্তরে নেমে পড়ে মানুষ। তার থাকে না হিতাহিত জ্ঞান। তারপর শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক অবসন্নতা আসে। উত্তেজনার অবসানে কুপ্রবৃত্তি পরিতৃপ্তির পর দেখা দেয় দেহযন্ত্রগুলির শিথিলতা, স্নায়ুমণ্ডলীর দুর্বলতা, আর দেহ মনের জড়তা। এই প্রবৃত্তি নিত্য প্রশ্রয় পেয়ে শেষে শারীরিক ও মানসিক জীবনকে পঙ্গু ও ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে। ব্যাধিগ্রস্ত জীবন বহু বিড়ম্বনা ভোগ করে, লাবণ্যহীন হয়ে পড়ে চেহারা। কর্মশক্তি লোপ পায়। বিজ্ঞানের জড়বাদীরূপ জীবন রসের উৎসকে উৎসারিত করে না, ভোগের নেশায় মোহগ্রস্ত করে আর আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিবোধ ঘটায়।

আগে শারীরিক জীবন, তারপর মানসিক জীবন। এই জগৎ আমাদের খাদ্য জুগিয়ে শারীরিক জীবন গঠন করে দেয়, তারপর ব্যাপকভাবে চিন্তা জুগিয়ে বৃহত্তর

মনঃশক্তির প্রয়োজনে মানসিক জীবন সৃষ্টি করে। মানসিক জীবন সুন্দররূপে গঠিত হোলে মানুষ দেবতা হয়ে যায়, যেমন করে প্রকৃতির জগতে তেলাপোকা কাচপোকায় পরিণত হয়ে থাকে।

তোমরা জেনে রেখো যা তোমরা আহার করো, তা পাকস্থলীতে গিয়ে পরিপাকের পর উৎপন্ন করে সাদা রঙের জলীয় সারভাগ। তার নাম রসধাতু। এই রস যায় লিভার বা যকৃতে, সেখানে রঞ্জক পিত্তের সঙ্গে মিশে রক্তে পরিণত হয়, এম্নিভাবে এসে রক্ত মাংসে, মাংস—মেদে, মেদ অস্থিতে, অস্থি মজ্জায়, আর মজ্জাধাতুশুক্রে পরিণত হয়। শুক্র শরীরের অমূল্য সম্পদ, এর থেকে সৃষ্টি হয় শরীরে ওজোধাতু। ওজোই মহাশক্তি, প্রাণের প্রাণ, আনন্দের লীলাদায়ক। ওজোধাতু সংরক্ষিত হোলে তোমরা হয়ে উঠ্‌বে বীর্য্যবান্ ও বীর্য্যবতী। শুক্রের অপচয় ঘটলে ওজোধাতুর সৃষ্টি ব্যাহত হয়। ধাতুক্ষীণতাই মৃত্যুদূত। আমাদের সভ্যতার উষাকাল থেকে ঋষিরা বলে আসছেন—বাল্যকাল থেকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করো। এদিকে নিশ্চেষ্টতা মানেই আত্মহনন। আনন্দের স্রোতোধারাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম রচনা করেছিলেন, প্রত্যেক ব্রহ্মচারীর মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল ঐশীশক্তি, তাই তারা গার্হস্থ্য আশ্রমে এসে সকল অকল্যাণের শৃঙ্খলামুক্তহয়ে জীবনকে, জাতিকে ও সমাজকে বিশুদ্ধ করতে পেরেছে।

বাধাবিপত্তি ভিন্ন জীবনের পূর্ণতা হয়না, বাধাবিপত্তি আর প্রলোভনের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রামের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্য্যাদার মহিমা প্রত্যক্ষ হয়। তোমাদের মধ্যে এদের মহিমা প্রত্যক্ষ হওয়া সহজেই সম্ভব, যদি তোমাদের প্রত্যেকের কাম্য হয় বলবীর্য্যবর্ণসমুজ্জল স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ আর উত্তম মানসিক শ্রীবৃদ্ধি, যদি তোমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও শরীরের মধ্যে ওজো ধাতুর বিশাল ভাণ্ডার গড়ে রাখতে আর শরীরের কোন ধাতুর অপচয় বা ক্ষয় হোতে যদি না দাও। এর জন্যে চাই প্রাতরুত্থান। তোমরা অনেকেই বেলায় শয্যাত্যাগ করো। এ অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা খুব ভোরে উঠতেন। তার ফলে তাঁরা হয়েছিলেন সবল, সুস্থকায় ও দীর্ঘজীবী। ব্যায়াম, মিতাচার, সচ্চিন্তা ও ঈশ্বরের আরাধনার মাধ্যমে তোমাদের দেহমনের সংযম ঘটবে। সংযম জীবনের সম্প্রসারণ আনে।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার রক্ষণ ও বিবর্দ্ধনই ব্যায়ামের প্রধান উদ্দেশ্য। ভ্রমণই সর্ব্বোত্তম ব্যায়াম। রোজ ভোরে ও সন্ধ্যায় দুই মাইল ভ্রমণ করলে আর কোন ব্যায়ামের দরকার হয় না। ব্যায়াম রক্তসঞ্চালনের সহায়ক। ব্যায়ামের ফলে পাকাশয়, হৃদযন্ত্র, মাংসপেশী প্রভৃতি সতেজ থাকে, নিয়মিত পানাহারে অগ্নিমান্দ্য ও ভোজনস্পৃহার আতিশয্য দূর হয়। অতিভোজন অকাল মৃত্যুর স্রষ্টা। মিতাচারের দ্বারা শারীরিক সকলযন্ত্র সক্রিয় ও সুদৃঢ় থাকে। সৎ চিন্তার দ্বারা দেহ ও মনের পবিত্রতা অটুট হয়। সৎচিন্তা সাধুসঙ্গের দ্বারা পুষ্টিলাভ করে। সদ্‌গ্রন্থ পাঠের দ্বারা চিত্তের সংযম আনে। নিত্য ঈশ্বর আরাধনার দ্বারা উর্দ্ধলোক থেকে দৈবীশক্তিধারা ভিতরে প্রবেশ করে আনন্দের স্পন্দন আনে। ওজো ধাতু সংরক্ষণের সহায়ক এরা। এরা হোক্ তোমাদের চিরসাথী।

জেনে রেখো এ জগৎটা আশ্রম। এখানে নিয়মিতভাবে আশ্রমধর্ম্ম পালন করলে জীবনের সর্ব্বোচ্চ পরিণতি লাভ হয়। দেহমন পবিত্র রাখতে পারলে দৈবশক্তিলাভ অনিবার্য্য, প্রচণ্ড মনঃশক্তি অর্জ্জিত হয়। ভারতের সন্ত সাধু যতিদের অলৌকিক জীবনের ইতিহাস আজও সমগ্র বিশ্বকে বিস্মিত করে তোলে। যা হোক, ছেলেবেলা থেকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে তোমরা ওজোধাতু মস্তিষ্কে সঞ্চয় করো। এই ধাতু উর্দ্ধমুখী করে তোমরা অপরিমেয় শক্তিলাভ করো। একে সৃষ্টি করার সহায়ক ধাতুগুলি যাতে শরীর থেকে কোনক্রমে নির্গত না হয় তার জন্যে সচেষ্ট হও,—যারা উর্দ্ধরেতা, তারা পৃথিবীতে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।

বাগভট্ট বলেছেন—'উৎসাহ, প্রতিভা, ধৈর্য্য, লাবণ্য, সৌকুমার্য্য প্রভৃতির উৎস ওজো ধাতু।'

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—'মানুষের যত শক্তি অবস্থিত তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠশক্তি ওজো। এই ওজঃ মস্তিষ্কে সঞ্চিত থাকে (বাগভট্টের মতে 'হৃদয়ে')। যাহার মস্তকে যে পরিমাণ ওজো ধাতু সঞ্চিত থাকে সে সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক বলে বলী হয়। ইহাই ওজো ধাতুর শক্তি। এক ব্যক্তি অতিসুন্দরভাবে ব্যক্ত করিতেছে কিন্তু লোক আকৃষ্ট হইতেছে না, আবার অপর ব্যক্তি যে খুব সুন্দর ভাষায় সুন্দরভাব বলিতেছে তাহা নহে, তবু তাহার কথায় লোক মুগ্ধ হইতেছে। ওজঃ শক্তি শরীর হইতে বহির্গত হইয়াই এই অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করে। এই ওজঃ-শক্তি-সম্পন্ন-পুরুষ যে কোন কার্য্য করেন, তাহ তেই মহাশক্তির বিকাশ দেখা যায়।

তোমরা যারা বলিষ্ঠ স্বাধীন আদর্শপ্রধান নবীন ভারত গড়ে তোলবার জন্যে আমাদের মধ্যে এসেছ অত্যুন্নত হও, সর্ব্বক্ষেত্রে মহামানবতাকে বিকীর্ণ করো ব্রহ্মচর্য্যপালন, সংযম ও শালীনতা আর দেহমনের পবিত্রতার মাধ্যমে। ওজো ধাতুর প্রাচুর্য্যলাভ করে মানুষের ভেতর অতি মানুষ হয়ে ওঠো আর শ্রীঅরবিন্দের আশা স্বপ্ন ও বাণীকে সার্থক করো তোলো।

স্বামীজীর বাণী হোক্ তোমাদের পরম পাথেয়।

—

কাঠের ঘোমটা

(জাপানী উপকথা)

সতীন্দ্রনাথ লাহা

অনেক দিন আগে এক বৃদ্ধ আর এক বৃদ্ধা তাদের একমাত্র মেয়ে নিয়ে বাস করতো। মেয়েটি নিখুঁত সুন্দরী, দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। যেমন মুখ চোখের গঠন, তেমনি গোলাপী রং।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির খুব অসুখ হল এবং সেই অসুখেই তিনি মারা গেলেন। বৃদ্ধাকে এখন একাই তার সুন্দরী মেয়েটিকে সামলাতে হয়। মেয়েটির ভবিষ্যৎ চিন্তাই তার মাকে পেয়ে বসেছে —কি করলে মেয়ে মানুষ হবে—কি করলে তার সব দিক দিয়ে ভাল হবে। কি করলে সকলে মেয়েকে ভাল বলবে।

একদিন বুড়ি তার মেয়েকে ডেকে বললে —দেখ বাছা, আমারও দিন ঘনিয়ে এসেছে, আমিও এ পৃথিবীতে আর বেশী দিন থাকবো না। সামনেই তোমার বাবার সমাধি, কিছুদিন পর আমারও ওঁর পাশে ঠাঁই হবে। পাপের দুনিয়াতে তোমাকে একলা কি করে ফেলে রেখে যাই—এই-ই আমার একমাত্র ভাবনা। তোমার অসামান্যরূপই যে তোমার সর্বনাশ ডেকে আনবে। একটা সাদা ফুল যতই সুন্দর ও পবিত্র হোক না কেন, তাকে নোংরা কাদার মধ্যে টেনে আনতে বেশী সময় লাগে না।

তোমার ও সুন্দর মুখখানাকে লোকের কুদৃষ্টি থেকে সামলে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তা' না করলে ঐ সুন্দর মুখের জন্যেই তোমাকে শত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে। জীবন বিষময় হয়ে উঠবে।

এই ক'টি কথা বলেই বৃদ্ধা একটা কালরঙের কাঠের গামলা মেয়েটির মাথায় টুপির মত পরিয়ে দিলে,—যা'তে মেয়ের সুন্দর মুখ খানিকটা ঢাকা থাকে, সকলের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে।

বৃদ্ধা মেয়েকে আদর করে বললে, এই কাঠের ঘোমটা দিয়ে সব সময় মুখটা ঢেকে রেখো; যখন আমি থাকবো না, তখন এই কাঠের ঘোমটাই তোমাকে শত লাঞ্ছনা থেকে বাঁচাবে। এটাকে যত্ন করে রেখো, কখনো খুলো না যেন।

কিছুদিন পর অসুখে ভুগে মেয়েটির মা মারা গেল। মা বাপ বলতে কেউ আর তার রইলো না। সংসারে সে একা। পরের ধানক্ষেতে পরিশ্রম করে এখন তাকে পেট চালাতে হয়। যতদিন বাপ মা ছিল, ততদিন তারাই মেয়ের ভরণপোষণ চালিয়েছে। এখন নিজেকেই ক্ষুধার অন্ন যোগাড় করতে হয়।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সারাটা দিন সে পরিশ্রম করে। অসীম সাহস তার বুকে। নির্বিবাদে সে সব কষ্ট মাথা পেতে নিলে।

মুখের খানিকটা গামলায় ঢাকা থাকাতে তাকে বিশ্রী দেখাতো, এ নিয়ে অনেকেই তাকে কটূক্তি করতো।

'গাম্‌লা মাথায় মেয়ে'টা বললে দেশশুদ্ধ সকলেই তাকে চিনতে পারতো।

ছেলেছোকরারা কেউ কেউ কাঠের ঘোম্‌টা খুলে ফেলবার জন্যে চেষ্টা করতো। কেউ বা নীচু হয়ে উঁকি মেরে মুখ দেখবার চেষ্টা করতো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ তার ঘোমটা খুলতে পারেনি বা স্পষ্ট মুখ দেখতেও পায় ন।

মেয়েটি সব অপমান মুখ বুঁজে সহ্য করতো, কারও

কাঠের ঘোম্‌টা

ব্যবহারে কোন প্রতিবাদ করেনি। ব্যথাভরা বুক নিয়ে নিজের কাজটুকু করে গেছে। সে কাউকে গালাগাল দিয়েও কথা বলেনি।

সে জানে মায়ের উপদেশ মেনে চললে এই লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ছাপিয়ে একদিন না একদিন সুদিন আসবেই। মায়ের আশীর্বাদে আবার তার মন ভরে যাবে, আবার তার জীবনে সুখ-শান্তি আসবে, আবার ভগবান তার দিকে মুখ তুলে চাইবেন। মায়ের কথা কি অমান্য করা যায়! প্রাণ থাকতে সে তা' করতে পারবে না।

জমির মালিক ধনী ভদ্রলোকটি ধান ক্ষেতে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে। একমনে মেয়েটির কাজ করা দেখে সে অবাক হয়ে যায়। কাজ-পাগলা মেয়েটার একাগ্রতা সে চেয়ে চেয়ে দেখতো। কাঠের গাম্‌লায় মুখ ঢাকা দেখে তার কিন্তু হাসি পায় নি। কিছুদিন ধরে মেয়েটির কাজ লক্ষ্য করার পর জমির মালিক একদিন মেয়েটিকে ডেকে বলছে—শুনছ বাছা! সত্যিই আমি তোমার কাজের

প্রশংসা করি। কাজ করবার সময় তুমি কারো সঙ্গে গল্প কর না, এক মনে কাজ করে যাও। যতদিন না গোলায় ধান ওঠে, ততদিন তুমি আমার এখানেই কাজ কোরো।

ধান গোলায় উঠল। চাষ-বাসের কাজ শেষ হয়েছে। শীত পড়েছে জাঁকিয়ে। জমির বড়লোক মালিক ভাবে, এর তো কাজ শেষ হল, এখন ওকে কি কাজ দিই। এমন মেয়েকে হাত ছাড়া করতে মন চায় না।

ভদ্রলোক মেয়েটিকে বললেন—আমার স্ত্রীর বড্ড অসুখ, মেয়ের মত তার পাশে থেকে তার একটু দেখাশুনা কর।

মেয়েটি ঘাড় কাত করে ভদ্রলোকের কথা মেনে নিলে। যে মন নিয়ে সে ক্ষেতের কাজ করতো, সেই মন নিয়েই সে আবার সেবার কাজ শুরু করে দিলে। সব কাজেতেই তার সমান নিষ্ঠা। কাজ ছাড়া সে থাকতে পারে না।

ভদ্রমহিলার কোন মেয়ে ছিল না। সেও এই মেয়েটিকে নিজের মেয়ের মত ব্যবহার করতে লাগলো।

কিছুদিন পর ধানজমি মালিকের বড় ছেলে বিদেশ থেকে নিজের পুরোনো বাড়িতে ফিরে এলে। ছেলেটির বিদ্যা-বুদ্ধি আছে। কাইওতোতে সে অনেকদিন কাজ শিখেছে, আর হেসে-খেলে আনন্দ করে দিন কাটিয়েছে।

তার পিতামাতার ভয় হ'ল—হয়তো বা দেশের বাড়ির নির্জনতা তার ভাল লাগবে না। কোন্ দিন সকালে উঠেই হয়তো দেখবে ছেলে বিদেশ যাবার জন্যে বিদায় চাচ্ছে।

কিন্তু বাড়ি ছেড়ে ছেলের কোথাও যাবার ইচ্ছা নেই দেখে কর্তা আশ্চর্য্য ও নিশ্চিন্ত হলেন।

একদিন ছেলে বাবাকে জিজ্ঞেস করে—মাথায় কাল গামলা ঢাকা মেয়েটি কে? ওরকম বিশ্রি ভাবে সেজেছে কেন?—পাগল নাকি!

বাবার কাছ থেকে মেয়েটির গামলা মাথায় দেবার কারণ শুনে ছেলেটি অবাক হয়ে গিয়েছিল। তবুও খানিক-ক্ষণের জন্যে সে না হেসে পারেনি।

যত দিন যায় ততই মেয়েটির সম্বন্ধে তার কৌতূহল বাড়তে থাকে। সে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে মেয়েটি কত শান্ত, কত ভদ্র। কত সংযত ব্যবহার তার। যত দেখে ততই সে বেশী করে মুগ্ধ হয়।

ছেলেটি মনে মনে ঠিক করলে—একেই সে বধূরূপে বরণ করে নেবে। থাক তার মাথায় বিশ্রী কালগামলার টুপি,—কি এসে যায় তাতে। এমন মিষ্টি ব্যবহার সে যে জীবনে দেখেনি। রূপ দুদিনের—গুণ-ই তো আসল।

আত্মীয়-স্বজন সকলেই শুনল ছেলের কি ইচ্ছে। সকলেই ছি ছি করে উঠলো।

—ঝি-গিরি করে যে মেয়েছেলে পেটের ভাত যোগাড় করে, তার সঙ্গে এই সোনারচাঁদ ছেলের বিয়ে!—কি ঘেন্না! কি ঘেন্না! লোকে শুনলে বলবে কি? যা'কে তাকে কখনো ঘরের বৌ করে বাড়িতে আনা যায়!

—রূপ ঢাকবার জন্যে মাথায় কাল গামলা পরেছে—এ সব রটানো কথা। আমরা কিন্তু এক তিলও ওসব কথা বিশ্বাস করিনে।—কে জানে ওর কপালে বিশ্রী দাগ আছে কিনা। এমনও তো হতে পারে, ওর মাথা ভর্তি টাক্! কুরূপ ঢাকবার জন্যেই মাথায় গামলা চাপা দিয়েছে। সবই বুঝি আমরা, কেউ তো চোখ বুঁজে নেই!

—ভাল ঘর দেখে ছেলের বিয়ে দাও। দেখতেও ভাল, শুনতেও ভাল। যা-তা হেজিপেজি ঘরে ঝি-এর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলে আমরা কিন্তু সহ্য করবো না।

ছেলের মা—যে এতদিন এই মেয়েকে নিজের মেয়ের মত ব্যবহার করছিল, সেও আজ হঠাৎ বিগড়ে গেল। তারও মনে হল—সত্যিই তো ঝিএর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দোব কি করে? বিয়ে বলে কথা···বংশ দেখতে হবে না! জাত-কুল দেখব না?

দিন-রাত মেয়েটিকে হাজার অপমান সহ্য করতে হয়। সে তো কোন দোষ করেনি, তবুও তার এই ভোগান্তি। মুখ বুঁজে কাজ করে আর আড়ালে চোখ মোছে।

বাড়ির মালিক কিন্তু এক দিনের জন্যেও মেয়েটিকে একটিও অপমানের কথা বলে নি। তার ব্যবহার আগেকার মতই ছিল। সে মনে মনে চাইতো এই মেয়ের সঙ্গে যেন তার ছেলের বিয়ে হয়। কিন্তু বৌ ও আত্মীয়-স্বজনের ভয়ে সে মুখে একটি কথাও বলতে পারে নি।

ছেলেটি কিন্তু তার মন স্থির করে ফেলেছে। বাইরে থেকে যতই বাধা আসে, ভেতরে ভেতরে তার মন আরো শক্ত হয়ে ওঠে। কারও কোন বাধায় তার মন টলানো গেল না। সকলে যখন বুঝলো কিছুতেই ছেলের মন বদলান যাবে না তখন অনিচ্ছাসত্বেও তারা বললে—যা ইচ্ছে করুক, ভালর জন্যে বললাম, না শুনলে পরে পস্তাবে, তখন বুঝবে।

সবদিক থেকে সকল বাধা যখন থেমে গেছে তখন ছেলেটি একদিন মেয়েটিকে ডেকে বললে—এখন সকলে চুপ করেছে, আমাদের বিয়ের আর কোন বাধা নেই। এবার তোমার অনুমতি চাই।

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমাকে ক্ষমা কর। আমি কি করে তোমার বৌ হব! আমি যে তোমাদের বাড়ির ঝি। ঝিকে কখন কেউ বৌ করে ঘরে নেয়! কোন যোগ্যতায় আমি তোমার পাশে দাঁড়াব?

ছেলেটি বার বার অনুনয় করে বললে—সত্যিই আমি তোমাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চাই। আর তুমি না বলো না, অনুমতি দাও। বিয়ের ব্যবস্থা হোক।

বাড়িশুদ্ধ সকলে মেয়েটির জেদ্ দেখে ভীষণ চোটে গেল।

—এতটুকু মেয়ের স্পর্দ্ধা তো কম নয়। বাঁদর কি আর মুক্তোর মালার কদর বোঝে।—ওযে আমাদের সকলকে বোকা বানিয়ে দিলে! ধন্যি মেয়ে বটে!

যদিও মেয়েটি মনিবের ছেলেকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো, তবুও সব সময় তার মনে হতো এ বিয়ে তার দিকে থেকে যথেষ্ট ক্ষতিকর হবে। ঝিকে কেউ কখন বিয়ে করে? এই সাময়িক মোহ কাটতে কতক্ষণ? —তখন যে তার জীবন ছারখার হয়ে যাবে।—বাঁচবার যে আর কোন উপায় থাকবে না। কাজ নেই আকাশের চাদ পেয়ে। উচুর জিনিষ উচুতেই থাক।

* * * *

রাত নিশুতি। চারদিক নিঝুম। মেয়েটি মাথায় কাঠের কাল গাম্‌লা এঁটে ঘুমচ্ছে তার ছোট্ট খাটে। কেঁদে কেঁদে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। দিনের বেলায় কতবার কে তাকে লাঞ্ছনা অপমান করেছে রাত্রে বার বার সেই সব কথা তার মনে পড়ে, তারপর এক সময় চোখ মুছতে মুছতে ঘুমিয়ে পড়ে।

মালিকের ছেলের কথা রাখতে পারেনি বলে আজও সে কত কেঁদেছে। মনে মনে কতবার বলেছে, এ অভাগীকে বিয়ে করে তুমি তো সুখী হতে পারবে না। ঝি-ঝিএর মত থাকবে। তাকে বিয়ে করলে লোকে বলবে কি! দু দিন পরে তোমারই অনুশোচনা হবে, তখন?...তখন আমি কোথায় যাব?

আবার মনে হয়, ওর কথা অমান্য করবো কি করে? আমার ভাল কি ওর চেয়ে আমি বেশী বুঝি?

জটিল সমস্যার সমাধান খুঁজতে খুঁজতেই তার ঘুমে চোখ বুজে এলো।

* * * *

—বাছারে কেন এত কষ্ট পাচ্ছ? মালিকের ছেলের সঙ্গেই তোমার বিয়ে হোক। এ বিয়েতে দুজনেরই মঙ্গল হবে—আমি অনুমতি দিচ্ছি। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মা এই কটি কথা মেয়েকে বললেন। মা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। স্বপ্নে মায়ের অনুমতি পেয়ে মেয়ের মুখে হাসি ফুটেছে।

মালিকের ছেলেকে বিয়ে করতে আর তার কোন বাধা নেই। সকাল হতেই হাসিমুখে সে জানিয়ে দিল—বিয়েতে তার কোন অমত নেই। এ কথা শুনে মালিকের ছেলের মুখেও হাসি ফুটলো।

আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি ভরে গেছে। মহা-ধুমধাম করে ছেলের বিয়ে হবে। চারিদিক সাজানো হচ্ছে রঙিণ লণ্ঠন দিয়ে। রঙীণ রেশমের পর্দা টাঙিয়ে।

বিয়ের শুভ লগ্ন এগিয়ে এলো। কেউ কেউ আড়-চোখে চাইছে মেয়ের মাথায় চাপানো কাল গামলাটার দিকে। কেউ বা বলে ফেল্লে, ওটা মাথা থেকে না নামালে কখন কনে মানায়! কনেকে সাজাবে কি করে? কী যে এক গাম্‌লা জুটিয়েছে মাথায়!

মেয়ে নিজেই নিজের মাথার কাল গাম্‌লা—ঘোমটা খুলতে চেষ্টা করে বারবার। কি বিপদ! ঘোমটা যে কিছুতেই খোলা যায় না। গামলাটা একেবারে চেপে বসে গেছে মাথার ওপর। কার সাধ্য সেটাকে খুলে দেয়।

কাণ্ড দেখে আত্মীয়-স্বজন সকলেই অবাক। মেয়ে নিজে কম আশ্চর্য্য হয়নি। কে জানত বিয়ের সময় কাল গামলা মাথায় চেপে বসে যাবে।

বিয়ে বাড়ির লোকেরা এত ঝামেলা সহ্য করবে কেন? তারা দশ কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে।

—আহা কি বা মানিয়েছে গাম্‌লা মাথায় দিয়ে।—গাম্‌লা টানাটানি করতে গিয়ে শেষ কালে কনেরই যে ঘাড় মোটকে যাবে।

—কত রকমের টুপি পরতে কত মানুষকে দেখেছি, কাঠের গাম্‌লা মাথায় বাঁধতে জীবনে কাউকে কখনও দেখিনি! এখন কি করে গামলা খুলবে খোল দেখি।

হঠাৎ গাম্‌লার ভেতর থেকে একটা ব্যথার আর্তনাদ শোনা গেল। কে যেন গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছে।

ছেলেটি মেয়েটির সামনে এসে বললে—থাক্, মাথার গামলা খোলার কোন দরকার নেই। যেমন আছে তেমনি থাক। কিছু বেমানান হয়নি। আমার ভালই লাগছে। ওদের কথায় তুমি কিছু মনে কোরো না।

এই ক'টি কথা ব'লেই ছেলেটি বলে, বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাক, আর দেরী নয়, এখনি শুভ কাজ আরম্ভ ক'রে দাও।

বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। এ-ওকে তিনবার খাইয়ে দিলে, ও-একে তিনবার খাইয়ে দিলে। ড্যাং ড্যাং করে বাজনা বেজে উঠল। সকলে ফুল ছিটিয়ে দিলে বর-কনের মাথায়। মন্ত্র পড়া হল, আরো কত কি।

কনের মুখে যেই না খাবার ঠেকান, অমনি সঙ্গে সঙ্গে কাঠের গামলা দুম্ করে মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল। বিয়ে বাড়ির লোকেরা ভেবে পায় না—এ কি ব্যাপার! সকলকার গালে হাত!

গাম্‌লা ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হয়ে গেল মেয়েটি তো ভিখারীর ঘরের মেয়ে নয়। এও তো বিশেষ সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। গামলার ভেতর থেকে কত রকমের মণিমুক্তার গহনা ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন দামী গহনা এ অঞ্চলের কেউ কখন দেখেনি। মেয়ের গহনা দেখে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। হীরে-মাণিকের আলোতে ঘর আলো হয়ে গেল!

আরো অবাক হয়ে গেল মেয়েটির সুন্দর মুখখানি দেখে—সারা জাপানে এমন সুন্দর মুখ কেউ কখনো দেখেনি!

———
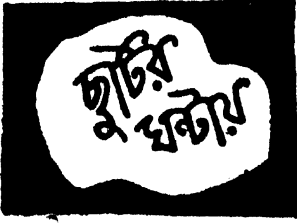
চিত্রগুপ্ত

এবারে শোনো—আরেকটি আজব-মজার খেলার কথা। এ খেলাটির কলা-কৌশল নিতান্তই সহজ-সরল··· একবার শিখে নিলে তোমরা অনায়াসেই তোমাদের বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনদের এই আজব-মজার কারসাজিটুকু দেখিয়ে রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে। তাছাড়া এ কারসাজি দেখানোর জন্য খুব বেশী মেহনৎ বা বিরাট-ব্যয়বহুল কোনো বেয়াড়া সাজ-সরঞ্জামেরও প্রয়োজন নেই···অল্প কয়েকটি ঘরোয়া সামগ্রী—যা সহজেই সকলের বাড়ীতেই মিলবে···অর্থাৎ, পর্দা-টাঙানোর একটি লম্বা ডাণ্ডা (Curtain-Rod), নাতি-দীর্ঘ বোঁটা-সমেত আপেল, নাশপাতি, কমলালেবু অথবা পেয়ারা জাতীয় একজোড়া ফল এবং দু'তিন হাত লম্বা-মাপের একজোড়া মজবুত 'টোয়াইন'-জাতীয় সুতো (Twine-Chord)—মাত্র এই কটি জিনিষ জোগাড় করলেই সুষ্ঠুভাবে মজার খেলাটি দেখানো চলবে। তবে খেলার সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় আর কলা-কৌশল রপ্ত করার উপায় যত সহজ-সরল হলেও এ খেলাটি থেকে তোমরা বিজ্ঞানের এমন একটি অভিনব-রহস্যময় বিচিত্র-তথ্যের পরিচয় পাবে, যেটি তোমাদের অনেকেরই জীবনে বিশেষ কাজে লাগতে পারে। আধুনিক বিশেষজ্ঞেরা বিজ্ঞানের এই বিচিত্র-রহস্যময় তথ্যের নাম দিয়েছেন—'বোর্নৌল্লির সিদ্ধান্ত' বা 'Bernoulli's Law'। তোমাদের মধ্যে যারা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী, তাদের কাছে হয়তো এ তথ্যটি অজানা নয়··· কিন্তু যারা এখনও পর্য্যন্ত এর মর্ম্ম জানো না, তাদের এ সম্বন্ধে মোটামুটি একটু হদিশ দিয়ে রাখি।

আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে, ইউরোপের সুইৎজারল্যাণ্ড (Switzerland) দেশে বোর্নৌল্লি নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞান-বিশারদ ছিলেন। সুদীর্ঘকাল গবেষণার পর তিনি সর্ব্বপ্রথম সিদ্ধান্ত করেন যে—কোনো 'তরল-পদার্থ' (Liquid) বা 'বাষ্পীয়-উপাদানের (Gas) 'গতিবেগ' (speed) যদি 'বৃদ্ধি' (increases) পায়, তাহলে সেই পদার্থ বা বাষ্পের চাপ-মাত্রাও (Pressure) সঙ্গে সঙ্গে 'হ্রাস' (decreases) হয়ে যায়। বোর্নৌল্লির এই অভিনব-সিদ্ধান্ত অনুসরণেই পরবর্ত্তী-যুগের বিভিন্ন গবেষক-পণ্ডিতেরা তাঁদের অসামান্য প্রতিভার বহুমুখী-প্রকাশে—মানুষের সুখ-সুবিধা-সাচ্ছন্দ্য বিধানের উদ্দেশ্যে নিত্য-নূতন নানারকম আধুনিক যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, যান-বাহন প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতি-সাধন করে চলেছেন। তোমরা শুনলে হয়তো আশ্চর্য হবে যে—একালে আকাশ-পথে দ্রুত-গতিতে দূর-পাড়ির সুবিধার জন্য উন্নত-ধরণের যে সব অতিকায় উড়ো-জাহাজের সৃষ্টি হয়েছে—তার মূলেও রয়েছে প্রাচীন-বৈজ্ঞানিক বোর্নৌল্লির এই অভিনব সিদ্ধান্ত! এবারের মজার খেলাটি থেকে বিজ্ঞানী বোর্-নৌল্লির সেই বিচিত্র সিদ্ধান্তের পরিচয় মিলবে কি উপায়ে, আপাততঃ তারই কথা বলি।

খেলার সাজ-সরঞ্জামগুলি জোগাড় হবার পর, উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে ফল দুটির বোঁটার ডগায় এক-এক গাছি লম্বা-সুতোর ফাঁশ এঁটে, সেই সুতো-দুটির অপর প্রান্ত ঘরের দরজা বা

জানলার মাথায় খাটানো পর্দার ডাণ্ডায় পাশাপাশি কয়েক ইঞ্চি দূরে-দূরে বেঁধে ঝুলিয়ে দাও।

এভাবে সুতো-বেঁধে ফল দুটিকে পর্দার ডাণ্ডায় ঝুলিয়ে রাখার পর, শূন্যে-ঝুলন্ত ঐ দুটি ফলের মাঝখানে ফাঁকা-জায়গায় তোমাদের মুখ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সজোরে সুমুখ-দিকে ফুঁ দিতে থাকো। শূন্যে-ঝুলন্ত ফল দুটির মাঝখানে ঐ ফাঁকা-জায়গায় সজোরে ফুঁ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখবে—বিজ্ঞানের আজব-নিয়মে সুতোয়-ঝোলানো ফল দুটি ফুঁয়ের ধাক্কায় দূরে ছিটকে না গিয়ে বরং পরস্পরের আরো কাছাকাছি-জায়গায় সরে আসবে···উপরের ২নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে!

এমন আজব কাণ্ড ঘটতে দেখে তোমরা হয়তো অবাক হবে···ভাববে—এ কি করে সম্ভব? সজোরে ফুঁ দিলে, মুখের বাতাসের ধাক্কায় সুতোয়-বাঁধা শূন্যে-ঝুলন্ত ফল দুটি কোথায় দুদিকে ছিটকে দূরে সরে যাবে··· এই কথা···কিন্তু ঘটলো ঠিক উলটো-ঘটনা···ফুঁয়ের ধাক্কায় ফল দুটি এলো আরো কাছাকাছি সরে!···এ কেমন তাজ্জব-ব্যাপার!

সত্যি···রীতিমত তাজ্জব-ব্যাপারই বটে! এমন আজব-কাণ্ড কেন ঘটে, জানো?···দুশো বছর আগেকার সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বোরনৌল্লির বিচিত্র সিদ্ধান্ত অনুসারে···অর্থাৎ, শূন্যে-ঝোলানো ফল দুটির মাঝখানে ফাঁকা-জায়গায় সজোরে ফুঁ দেবার সঙ্গেসঙ্গে সেখানকার শান্ত বাতাসের স্তরে সহসা আলোড়ন (Movement) জাগে···তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং তারই ফলে, বাতাসের গতিবেগ' (Speed of the air-increases) বাড়ে। এমনিভাবে 'গতিবেগ' বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার বাতাসের 'চাপ' (air pressure), ফল দুটির অপর-দিকের বাতাসের চাপের চেয়ে কমে যায় (Pressure of the air decreases)···তখন আশপাশের 'বাতাসের-চাপের' ঠেলায় (Push) শূন্যে সুতোয়-ঝুলন্ত ফল দুটি বাইরে দূরে ছিটকে না গিয়ে, তোমাদের ফুঁ-দেবার জায়গায়—অর্থাৎ, যেখানে বাতাসের চাপ কম, সেইদিকে সরে পরস্পরের কাছাকাছি এসে হাজির হয়।

এই হলো, এবারের মজার খেলাটির আসল মর্ম!

পরের সংখ্যায় এমনি মজার আরেকটি বিজ্ঞানের খেলার আজব পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

—

মনোহর মৈত্র

১। 'হারানো-ছবির' হেঁয়ালি ঃ
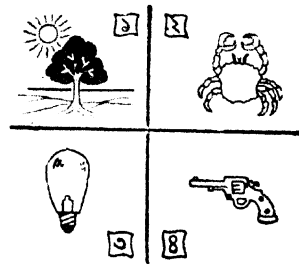
আমাদের পত্রিকার নববর্ষ-সংখ্যার জন্য, চিত্রকর-মশাইকে বিশেষ-ধরণের কয়েকটি ছবি এঁকে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছিলুম। আমাদের অনুরোধমতো চিত্রকর-মশাই সেদিন যে আজব-ছবিগুলি এঁকে পাঠিয়েছেন, সেগুলি দেখে দপ্তরের সবাই খুঁৎখুঁৎ করেছেন···বলছেন,—মোটামুটি দৃষ্টিতে ছবিগুলি নিখুঁত-ছাঁদে আঁকা মনে হলেও, প্রত্যেকটির মধ্যেই নাকি গলদ রয়েছে প্রচুর···অর্থাৎ প্রত্যেকটি ছবিরই কিছু-কিছু অংশ খামখেয়ালী চিত্রকর-মশাই যেন তাড়াতাড়িতে আঁকতে ভুলে গেছেন—এই তাঁদের সবাইকার ধারণা! দপ্তরের লোকজনের অভিমত শুনে সম্পাদক-মশাই নিজে ছবিগুলি বারবার পরীক্ষা করে দেখলেন···তিনিও বলছেন, চিত্রকর-মশাইয়ের তাড়াহুড়োর ফলে, প্রত্যেকটি ছবির

কিছু-কিছু অংশ যথাযথভাবে আঁকা নেই···যেন হারিয়ে গেছে! অথচ, কি যে হারিয়েছে, সেটাও ঠিকমতো ঠাওর করা যাচ্ছে না—এই হয়েছে সমস্যা! তাই আমরা চিত্রকর-মশাইয়ের আঁকা সেই আজব-হেঁয়ালির ছবিগুলি তোমাদের সামনে পেশ করলুম! ছাখো তো পরখ করে!···এ সব ছবি দেখে তোমরা যদি প্রত্যেকটি হারানো-অংশের সঠিক সন্ধান পাও তো, সরাসরি আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে জানিয়ে দিও···তাহলে বুঝতে পারবো, তোমাদের মধ্যে কে কেমন বিচক্ষণ-বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছো!

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি' ঃ

আমাদের বিশেষ প্রিয় এক-ধরণের খেলা···চার অক্ষরে নাম। প্রথম-অংশ দিয়েই দ্বিতীয়-অংশকে খেলতে হয়···আবার প্রথম ও চতুর্থ অক্ষরে যা হয়, সেটা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষরে যা হয়—তাইতে থাকে। কি সে খেলা—বলো তো?

রচনা: সুভাষ দত্ত (আসানসোল)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ

১। ১নং চিত্রে দেখানো হয়েছে—মাথায় বয়-স্কাউটের টুপি পরে একটি ছেলে সাইকেল চালিয়ে চলেছে (তিন-তলা ছাদের উপর থেকে যেমন দেখায়)। ২ নং ছবিতে দেখানো হয়েছে—চৌকোণা-ছাদের জানলার বাইরে একটি জিরাফ দাঁড়িয়েছিল···জানলার ফোকর দিয়ে নজরে পড়ছে শুধু তার চিত্র-বিচিত্রিত, লম্বা গলাটির খানিকটা অংশ। ৩নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে—পাঁচিলের আড়ালে পলায়মান একটি কুকুরের ল্যাজ ও পিছনের ঠ্যাঙ। ৪নং চিত্রে দেখানো হয়েছে—শাঁখের মতো ছাঁদের একটি সামুদ্রিক শামুক জাতীয় জীবের খোলা (উপর থেকে দৃষ্টিপাত করলে দেখায়)।

২। একবাতির রঙীন উড-পেন্সিল (Wood-Pencil)।

৩। ১৯ দিন।

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), বাপি, বুতাম ও পিন্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), বুদ্ধু ও বিজু আচার্য্য (কলিকাতা), কুলু মিত্র (কলিকাতা), রণি ও রিণি মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই),

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), পিন্টু হালদার (বালী), বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), সত্যেন, মুরারী, সঞ্জয় ও সুনীল (ভিলাই), রুবি ও লাডু হালদার (কোরবা), জ্যোতি, স্মৃতি, সোমনাথ, শ্যামা ও বাসু (কালনা), 'তরুণ সঙ্ঘ পাবলিক লাইব্রেরী' সভ্যবৃন্দ (পঞ্চকোট), মিতা, ছেনু, বুবু, বুটু, পুপু, সন্তু, মন্টি, গাব্বু ও নন্তু (মদনপুর, গয়া), তথাগত বন্দোপাধ্যায় লিলি মুখোপাধ্যায় (শিয়ালশোল, বর্দ্ধমান), আশীসকুমার কুণ্ডু (রাণাঘাট), নবনী, ধীরেন, প্রেমানন্দ ও দীনেন্দ্রনাথ কুণ্ডু (হুঁস্কা, সাঁওতাল পরগণা)।

জলযানের কাহিনী

দেবশর্ম্মা বিরচিত
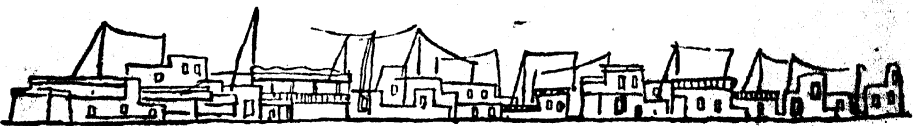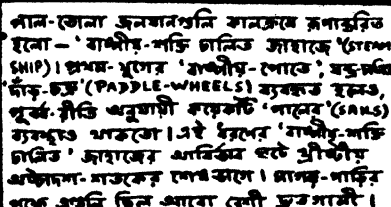
বিচিত্র-ছাঁদের পাল-তোলা এই বিরাট-আকারের জলযানের নাম — 'গ্যালিয়ান্' (GALLEON)। এমনি ধরনের অভিনব অর্ণব-পোত ব্যবহার হতো খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে — স্পেন আর পর্তুগাল দেশীয় সাগর-অভিযাত্রী নাবিক, বাণিজ্য-প্রসারী ব্যবসায়ী আর সুদূর-বিদেশে সাম্রাজ্য-উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাভিলাষী বীর অভিযানী- আবিষ্কারকদের বিজয়-যাত্রার উদ্দেশ্যে। সেকালের এই 'গ্যালিয়ান্' অর্ণব-পোতেই দুরন্ত-সাগরে পাড়ি জমিয়ে বিদেশ-অভিযানে বেরিয়েছিলেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নৌ-বিশারদ ভ্যাস্কো ডি গামা, কলম্বাস প্রভৃতি অনেকেই। এ সব জলযান রচিত হতো মজবুত-সুদৃঢ় কাঠের তক্তা দিয়ে —সেকালে এমনি বিরাটকায় তরীতে পারাপার হতো যাত্রী ও বাণিজ্য-সম্ভার

'গ্যালিয়ান্' অর্ণব-পোতের বহু বছর যুগ পরে সাগর-পথে পাড়ি দেবার উদ্দেশ্যে ইউরোপের নাবিকেরা ব্যবহার করতে লাগলেন সুদৃঢ়-মজবুত আর দ্রুতগামী দুই অথবা তিন সারি পাল-তোলা এমনি সব বিচিত্র-বিরাট ছাঁদের 'স্কুনার্' (SCHOONER) জলযান। এ ধরনের পাল-তোলা জাহাজের প্রচলন খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ-শতকের শেষভাগ থেকে ... সাগর-পথে যাত্রী ও মালপত্র পরিবহনের কাজে 'স্কুনার্' পোতগুলি যেমন উপযোগী, তেমনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পরবর্তী আমলে, উন্নত-ছাঁদের নানারকম 'বাষ্পীয়-পোত' (STEAM-SHIP) আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও, 'স্কুনার্' তরীর ব্যবহার অদ্যাবধি ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক অঞ্চলেই সুপ্রচলিত আছে। ওদেশের বহু বিত্তশালী সৌখিন- বিলাসীপুরুষ একালেও ছোট-বড় ছাঁদের এমনি পাল-তোলা 'স্কুনার্'-পোতে আরোহী হয়ে জলপথে ভ্রমণ করে ছুটির আনন্দ উপভোগ করেন। 'স্কুনার্' তরীগুলি দেখতেও সুন্দর, কাজেও দ

দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যে জাতীয়তার আদর্শ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, বিদ্যাবিনোদ

বঙ্গসাহিত্যে আদর্শ জাতীয়তার চিত্র অঙ্কনে যে কয়জন প্রতিভাবান চিন্তাশীল, যুগপ্রবর্তক জন্মগ্রহণ করিয়া অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতিকে আদর্শ জাতিতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যে, লোকশিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ জাতীয়তা বঙ্কিমচন্দ্রে উন্মেষিত, বিবেকানন্দে পরিবর্দ্ধিত ও দ্বিজেন্দ্রলালে পূর্ণ বিকশিত। "প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় জ্বালাময় অনুভূতি লইয়া, বিশাল বারিধির তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ন্যায় বিপুল আহ্বান জাগাইয়া আমাদের বিরাট ঔদাসীন্যে পরিপূর্ণ জাতীয়জীবনের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রাণের স্পন্দন জাগাইবার জন্য তিনি সারাজীবন সাধনা করিয়াছিলেন। আমাদেরই দেশের অতীত ইতিহাস-সমুদ্র মন্থন করিয়া স্বদেশপ্রেম, স্বার্থত্যাগ, কঠোর কর্ত্তব্য ও কর্মনিষ্ঠার মহান আদর্শ দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়া ছিলেন। আমাদের গৌরবময় অতীত স্মরণ করাইয়া তিনি আমাদের জন্য আদর্শময় ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

সাহিত্য ঋষি টলষ্টয়ের উপর দ্বিজেন্দ্রের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। এই কারণেই দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয়ত্বের আদর্শে টলষ্টয়-প্রচারিত বিশ্বপ্রেম-নীতির বিকাশ দেখিতে পাই। স্নেহ, ত্যাগ, দয়া, ভক্তি, সেবা প্রভৃতি গুণের সমষ্টি হইতেই মনুষ্যত্বের উৎপত্তি, প্রকাশ ও পরিণতি। তাই মনুষ্যত্বের বিরোধী জাতীয়ত্বকে পরিহার করিবার উপদেশ দ্বিজেন্দ্র সর্বত্র দিয়াছেন। তাঁহার অভিনব সৃষ্টি "মেবার পতন" নাটকে তিনি বলিতেছেন, "যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনই জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয়, তবে মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক। দেশ, স্বাধীনতা ডুবে যাক, এ জাতি আবার মানুষ হোক।"

দ্বিজেন্দ্রলাল নবযুগের মন্ত্র লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার দেশাত্মবোধ প্রগাঢ়। তাঁহার সমস্ত রচনা—নাটক, কবিতা, গান, দেশাত্মবোধের পূর্ণ অভিব্যক্তি। তাঁহার চিন্তায়, কল্পনায়, ধ্যানে ও জ্ঞানে সর্বত্র স্বদেশ। স্বদেশীয়তা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র।" তাই তিনি তাঁহার রচনায় কেবল মনুষ্যত্বের আদর্শ অঙ্কিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। সেই আদর্শের কোথায় অসম্পূর্ণতা, কোথায় তাহা জাতীয়তার বিরোধী—তাহাও সুন্দর ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। "রাণা প্রতাপসিংহ" নাটক পাঠে আমরা বুঝতে পারি যে যদি উন্নত আদর্শ না হয় তবে প্রতাপ সিংহের ন্যায়-দৃঢ়চিত্ত বীরপুরুষ জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইতে পারেন না। প্রতাপ কেবল বংশ গৌরব রক্ষায় ব্যগ্র ছিলেন। বংশগৌরব অপেক্ষা জাতীয় গৌরব অনেক বড়। "দুর্গাদাস" নাটকে তিনি দেখাইয়াছেন যে, সমস্ত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও দুর্গাদাসকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। "মেবারপতনে" সত্যবতীর বিরাট সাধনা নৈরাশ্যে পরিণত হইল। এই যে পরাজয় স্বীকার, এই যে উদ্যমের বিফলতা, এই যে সাধনার নিষ্ফলতা, ইহা অবশ্যম্ভাবী। এই সমস্ত বিফলতার মধ্য দিয়াই আমরা সফলতা লাভ করিব। এই নিষ্ফলতাই সংসার-সমুদ্রে জয়যুক্ত হইতে ধ্রুবতারার মত আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিবে। মহান্ প্রতাপসিংহের সাধনা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার কাছে তাঁহার অপত্যস্নেহ, তৃণশয্যা, কঠোর দারিদ্র্য, অর্দ্ধাশন, অনশন কিছুই নহে। তথাপি তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিলেন না। কারণ তাঁহার জাতীয়ত্বে দুর্বলতা ছিল। তাঁহার দেশে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর স্থান নাই। দুর্দ্ধর্ষ বীর ভ্রাতা শক্তসিংহ যবনী বিবাহ করায় প্রতাপ তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। "দেশ যে ধর্ম, নীতি ও আচারের নানাপ্রকার বিরুদ্ধতার মধ্যেও একাত্ম হইয়া উঠিতে পারে প্রতাপ তাহা ভাবিলেন না, দেশাচারের সঙ্কীর্ণ

গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গেলেন। এই প্রকার সংকীর্ণতার জন্য মহাবৎ খাঁর মত উদারচেতা বীর, ভিন্নধর্ম গ্রহণ করায় আর রাজপুতানায় স্থান পাইলেন না।" জাতীয় জীবনের এই বিষাদময় কাহিনী দ্বিজেন্দ্র সর্বত্র বেদনাময় কণ্ঠে গাহিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়া জাতীয়ত্ব লাভ হয় না। যে দিন হইতে জাতি মনুষ্যত্ব হারায় সেইদিন হইতেই তাহার জাতীয়ত্বের অধঃপতন।

দ্বিজেন্দ্রলাল একজাতির উন্নতিকল্পে আর এক জাতির প্রতি বিদ্বেষ কখনও সমর্থন করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন যে বিদ্বেষের মধ্য দিয়া জাতীয় উন্নতি বা জাতীয়ত্বের পরিপুষ্টি হইতে পারে না। মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়া, ধর্ম, ন্যায়, ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করায়, বিভিন্ন ধর্ম, নীতি, ও আচার এক প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া যে জাতীয়তার উদ্বোধন তাহাই সত্য, শিব এবং সুন্দর।

সমাজ উন্নত ও সুসংস্কৃত না হইলে স্বজাতির মনুষ্যত্ব লাভ যে অসম্ভব, ইহা দ্বিজেন্দ্রলাল মর্মে মর্মে অনুভব করিতেন। আদর্শ সমাজের মানুষ না হইলে তাহাদের জাতীয়তার সম্প্রসারণ কল্পনার অতীত। "সামাজিক ব্যাধির নিরাকরণ চেষ্টাকে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশ হিতৈষণা বলিতেন এবং সেই মতের অনুসরণে তিনি সমাজের দমনীয় আচার সমূহের তীব্র নিন্দা এবং তাহাদের উপর তীক্ষ্ণ কশাঘাত করিয়া সমাজকে ব্যাধিমুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "তিনি আমরণ হিন্দুসমাজের শুভকামনা করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যাশ্রম ধর্মের বিলোপ সাধন তাঁহার অভিপ্রেত ছিলনা। জাতি বা বর্ণ নির্ব্বিচারে বিবাহাদির অনুষ্ঠান তিনি আবশ্যক বা সমাজের পক্ষে হিতকারী মনে করেন নাই। রক্তসংমিশ্রণের কোনও আবশ্যকতা বা উপকারিতা তিনি আদৌ স্বীকার করেন নাই।" সনাতন হিন্দু প্রথার তিনি কিছু কিছু পরিবর্ত্তন প্রয়াসী ছিলেন।

তাঁহার সামাজিক নাটক, প্রহসন ও ব্যঙ্গ কবিতায় তিনি দেখাইয়াছেন যে "সনাতন হিন্দুপ্রথা যদি একেবারে নির্ভুল হইত তাহা হইলে এ জাতির আজ এমন দুর্দ্দশা হইত.না। এই প্রথার মধ্যে কেবলমাত্র ধর্ম্মের পুণ্য রশ্মিই নাই, ইহার মধ্যে অনেক অধর্ম্মের আগাছা শিকড় গাড়িয়াছে। তাহাদের একেবারে উপড়াইতে হইবে।"

বাল্যবিবাহ, বালিকা বিধবার বিবাহে বাধা, পণপ্রথা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি অনেক অধর্ম্ম ও অনাচারের শিকড় আমাদের অস্থিমজ্জার রস শোষণ করিয়া সমাজকে আশু ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে।• অধর্ম্ম ও অনাচার সমাজ-পরিপুষ্টির যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছে। এই সকল স্বকৃত-ব্যাধি প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের ঘোর বিরোধী। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল এই সকল ব্যাধির অঙ্গে উপযুক্ত কশা-প্রলেপ-দ্বারা আমাদিগকে দেখাইয়াছেন যে যাহা মনুষ্যত্বের বিরোধী তাহা জাতীয়ত্বের মারণাস্ত্র।

প্রকৃতপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল এমন হিন্দুসমাজ গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন যাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সমগ্র মানব-জাতির আদর্শ সমাজ রূপে পরিগণিত হইতে পারে, যাহার ভিত্তি এমন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যে "ধর্ম্মের মূলমন্ত্র প্রবৃত্তিকে দমন, আত্মজয়; যাহার চরম বিকাশ সর্ব্বভূতে দয়া"। যাহার উদার বক্ষ যে কোনও বিধর্ম্মীকে সর্ব্বদা আলিঙ্গন দিতে প্রস্তুত। তাঁহার আদর্শ ছিল ত্যাগের রাজ্য গঠন। সে রাজ্যের স্বরূপ বর্ণনায় দ্বিজেন্দ্র সগরসিংহের মুখে বলিতেছেন—'সে রাজ্যের রাজা বুদ্ধ, খৃষ্ট, গৌরাঙ্গ। সে রাজ্যের রাজনীতি স্নেহ, দয়া, ভক্তি; শাসন সেবা; রাজদণ্ড অনুকম্পা; পুরস্কার আত্ম-বলিদান।"

জাতীয় মহাসঙ্গীতগুলির মধ্য দিয়া জাতীয়তার যে আদর্শ দ্বিজেন্দ্রলাল প্রচার করিয়াছিলেন তাহাও বিশ্ব-প্রেমের সুষমায় মণ্ডিত। তাঁহার "ভারত আমার" "সাধের বীণা" "বঙ্গভাষা" "ভারতবর্ষ" "আমার দেশ" "আমার জন্ম-ভূমি" প্রভৃতি সঙ্গীতগুলি আজ আমাদের জাতীয় মহাসঙ্গীত, ইহাদের মধ্যে "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমি" তুলনা-হীন। এই দুইটি সঙ্গীত সম্বন্ধে মনস্বী ৺বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছেন, "স্বদেশীর যুগেই দুচারিটি সঙ্গীতে বিশ্বসঙ্গীতের সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার দেশ" বোধ হয় উহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এই সঙ্গীতে কবি বাঙ্গালার জীবনেতিহাস গাঁথিয়া দিয়া বাঙ্গালীর নিকটে ইহাকে অদ্ভুত সত্যোপেত বস্তুতন্ত্র ও শক্তিশালী করিয়াছেন বটে; কিন্তু সেগুলি মূল রসের অবলম্বন ও উদ্দীপনা মাত্র। সেই রস ফুটিয়াছে "কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ" এই অপূর্ব্ব ভক্তির উচ্ছ্বাসে. এই অপূর্ব্ব

ত্যাগে ও স্পর্দ্ধায় ; আর ফুটিয়াছে কবি যখন দেশমাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ"। এই ভাব ও ভক্তি কোনও দেশে বা কালে আবদ্ধ নহে ; ইহা স্বদেশপ্রেমিকের সার্ব্বজনীন ভাব। বিশ্বজনীনতার জন্যই এই সঙ্গীতের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব।"

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুষ্ঠিত শোকসভায় বিপিনচন্দ্র বলেন "ধন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" আর একটি মহাসঙ্গীত। কবির এই সঙ্গীতে বিশ্বের ধ্যান আছে। এই গান ইংরাজীতে অনুবাদ কর, ইংরাজ তাহাতে ভুলিবে। এই গানকে রুষিয়ার ভাষায় অনুবাদ কর, রুষিয়ানরাও এই নাম সঙ্কীর্ত্তনে বিগলিতপ্রাণে যোগদান করিবে। কবির কাব্যে এমনই শক্তি, তাঁহার সার্ব্বভৌমিকতা এমনই অপূর্ব্ব।"

দ্বিজেন্দ্রলালের এই সার্ব্বভৌমিকতার, এই বিশ্বপ্রেমিকতার চরম বিকাশ আমরা "মেবারপতন" নাটকে দেখিতে পাই। তাঁহার মানস-কন্যা "মানসী"র মুখে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেছেন "এ জাতি আবার মানুষ হবে"। "সত্যবতী" জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কবে" ?

মানসী উত্তর দিলেন, "যেদিন তারা এই অথর্ব্ব আচারের ক্রীতদাস না হয়ে আবার ভাব্‌তে শিখবে—যেদিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের স্রোত বইবে—যে দিন তারা যা উচিত, যা কর্ত্তব্য বিবেচনা করবে, নির্ভয়ে তাই করে যাবে—যেদিন তারা যুগজীর্ণ-পুঁথি ফেলে নবধর্ম্মকে বরণ করবে"।

"সত্যবতী" জিজ্ঞাসা করিলেন "কি সে ধর্ম্ম মানসী" ?

মানসী উত্তর দিলেন, "সে ধর্ম্ম ভালবাসা। আপনাকে ছেড়ে ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মানুষকে, মনুষ্যত্বকে, ভালবাসতে শিখতে হবে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিত-প্রবাহের মধ্য দিয়া নয় মা। জাতীয় উন্নতির পথ শত্রু-মিত্র-জ্ঞান ভুলে গিয়ে, বিদ্বেষ বর্জ্জন করে, নিজের কালিমা, দেশের কালিমা, বিশ্বপ্রেমে ধৌত করে আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে"।

তাহার পর হিন্দু-মুসলমান দুই মহাজাতির দুই যুধ্যমান মহাবীর রাণা অমর সিংহ ও মহাবৎ খাঁর সম্মুখে মানসী চারণীদের আদেশ করিতেছেন গাও চারণিগণ সেই গান যা তোমাদের শিখিয়েছি "আবার তোরা মানুষ হ"। চারণীরা গাহিল :—

"কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ'।
পরের 'পরে কেন এ রোষ, নিজেরই যদি শত্রু হোস্‌
তোদের এ যে নিজেরই দোষ, আবার তোরা মানুষ হ'।
ঘুচাতে চাস যদিরে এই হতাশাময় বর্ত্তমান,
বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভায়ের প্রতি ভায়ের টান।
ভুলিয়ে যা রে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর,
বিশ্ব তোর নিজের ঘর, আবার তোরা মানুষ হ'।
শত্রু হয় হোক না—যদি সেথায় পাস্‌ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ তাহারে কর হৃদয় দান ;
মিত্র হোক ভণ্ড যে, তাহারে দূর করিয়া দে,
সবার বাড়া শত্রু সে, আবার তোরা মানুষ হ'।
জগৎ জুড়ে দুইটি সেনা পরস্পরে রাঙ্গায় চোখ
পুণ্য সেবা নিজের কর, পাপের সেবা শত্রু হোক ;
ধর্ম্ম যেথায় সেথায় থাক, ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ,
স্বজন দেশ ডুবিয়ে যাক আবার তোরা মানুষ হ'।

এই সঙ্গীত শেষ হইলে আমাদের সম্মুখে যে চিত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল তাহার সহিত তুলনীয় চিত্র বিশ্ব-সাহিত্যে আছে কিনা আমার জানা নাই। দেখিলাম ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী দুই জাতির দুই পরাক্রান্ত প্রতিনিধি রক্তলোলুপ শাণিত কৃপাণ ত্যাগ করিয়া, ভেদজ্ঞান ভুলিয়া, বিদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন। ভাই, ভাইএর বক্ষোলগ্ন হইলেন, মানুষ মনুষ্যত্বকে জড়াইয়া ধরিয়া ধন্য হইল।

দ্বিজেন্দ্র মানসী

স্বপনকুমার বসু

প্রেম কালজয়ী। পৃথিবীর সর্বত্রই এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে এর অসংখ্য নিদর্শন। বিশেষ করে সাহিত্যিকদের জীবনে প্রেম আসে এক বিচিত্ররূপে, সাহিত্যের কুঞ্জবনে সে বেশ কিছু আফোটা ফুল ফুটিয়ে দিয়ে যায়। কীটস্ তাঁর স্থানিকে পাশে পেয়েছিলেন কাব্য ফোয়ারার উৎসরূপে, ব্রাউনিঙের জীবনও ধন্য হয়েছিল এলিজাবেথের সাহচর্যে। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও কবিমানসীদের প্রভাব অল্প নয়। তবে যদি কোন বাঙালী সাহিত্যিকের প্রেমকে নিয়ে সার্থক কাব্য রচনা করতে হয় তবে দ্বিজেন্দ্রলালের দাবীই সেখানে সর্বাগ্রগণ্য। দ্বিজেন্দ্র-পত্নী সুরবালা দেবী কবির জীবনে এসেছিলেন তাঁর প্রিয়ার মধুররূপে, তাঁর গানে সুর দিতে, তাঁর ছন্দে নাচ দিতে, তাঁর স্বপ্নে সুধা দিতে। এতদিন দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে যা ছিল অস্পষ্ট, অব্যক্ত, তা' হল স্পষ্ট, ব্যক্ত। অরূপের ব্যঞ্জনা আনলেন তিনি তাঁর লেখনীতে, রূপ ও অরূপ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল তাঁর কাব্যে। এক কথায় সুরবালা দেবীই দ্বিজেন্দ্রলালের 'ঘুম ভাঙানিয়া।' দ্বিজেন্দ্রলালের মানসী সুরবালা দেবী তদানীন্তন বাংলার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যারূপে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আবির্ভূতা হন।

তাঁর বাবা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্ত্রী শিক্ষার সমর্থক ছিলেন, তাই তিনি একটু বয়স হতেই তাঁর কন্যাকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দেন, সুরবালা দেবীও লেখাপড়ায় প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু তাঁর মাতামহী মেয়েদের ইংরাজি পড়া পছন্দ করতেন না বলে তাঁকে স্কুল ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। বাড়িতেই তিনি দেশীয় কাব্য ও ধর্মশাস্ত্র পাঠ করতে থাকেন।

রামতনু লাহিড়ীর গৃহে এক উৎসব উপলক্ষ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল সুরবালা দেবীকে প্রথম দেখেন এবং কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে রামতনু লাহিড়ীর পুত্র বসন্ত লাহিড়ীকে মেয়েটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও ঐ সময় তাঁর বড় মেয়ের জন্যে একটি পাত্রের সন্ধান করছিলেন, ফলে উভয়ের যোগাযোগটা বেশ ভালোরকমই হয়। ১৭ বছর বয়সে দ্বিজেন্দ্রলালের মানসী তাঁর গৃহে বধূর কল্যাণী মূর্তিতে আবির্ভূতা হন।

বিয়ের অল্পদিন আগে একটা বেশ মজার ঘটনা ঘটেছিল। বিয়ের যখন সব ঠিকঠাক, তখন কে একজন প্রচার করলো যে মেয়েটি অমন পরীর মতো সুন্দরী হলে হবে কি আসলে কিন্তু বোবা। দ্বিজেন্দ্রলাল কথাটির যাথার্থ্য পরীক্ষা করবার জন্যে স্বয়ং প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে গিয়ে সুরবালা দেবীকে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু ভাবী বরের সামনে কুমারীর স্বাভাবিক লজ্জার জন্যেই তিনি কোন উত্তর দেন না ফলে দ্বিজেন্দ্রলাল সেই উড়ো খবরটাকেই সত্যি বলে ধরে নেন এবং শেষবারের মতো তাঁকে একটা বই পড়তে বলেন, কিন্তু এবার তিনি বেশ ভালোভাবেই বইটি পড়েন এবং তার ফলে দ্বিজেন্দ্রলালেরও সকল সংশয়ের অবসান হয়।

সুরবালা দেবী তাঁর সহজ, সরল ও অকৃত্রিম ব্যবহারে অল্প দিনের মধ্যেই গৃহলক্ষ্মীরূপে পরিচিতা হন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্ব শক্তিও নবপরিণীতা পত্নীকে ঘিরে 'গীতিকবিতার স্ফটিক পাত্রে স্বর্ণ মদিরের মতো বিহ্বল ও উজ্জ্বল হয়ে আত্মপ্রকাশ' করলো। তাঁর 'আর্যগাথা' (২য় ভাগ) ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয়, এর প্রথম পর্বের সকল কবিতার উৎপত্তিস্থল কবিজায়ার প্রতি প্রেম। এর উৎসর্গ পত্রে কবিপত্নীকে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছেন—

> 'নয় কল্পিত সৌন্দর্যে ;—নয়
> কবির নয়নে দেখা—পরীস্বপ্নসম ;—
> এসেছ প্রত্যক্ষ স্বীয় দেবীরূপ ধরি।'

১৮৮৭ থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত এই ষোলবছর কাল সময়কে আমরা দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলতে পারি, তবে বিশেষ করে কবি এই সময়ে হাস্যরসাত্মক জিনিসই রচনা করেছেন।

কবি-জায়ার কথা কবির কাব্যের স্থানে স্থানে ছড়িয়ে আছে সাগরতলে ইতস্তত ছড়ানো মুক্তোর মতো। যেমন—

'আজ যেন রে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভাল,
উঠেছে আজ নূতন বাতাস, ফুটেছে আজ
নূতন আলো।'

আবার—

'গরিমা আমার, গৃহিণী আমার, আমার কুটিররাণী,
প্রণয়ের খনি, প্রীতির নির্ঝর, আশার প্রতিমাখানি'

কবির জীবনে সুরবালা দেবীর আবির্ভাবকে কবি আশীর্বাদ বলে মনে করতেন, তাই তিনি লিখেছেন,

'মর্মরে সংগীতময় বর্ণে, কবিতায়
স্কন্ধে ভর দিয়া।
এসেছে ঢাকিয়া
মাংসের শরীরে আজি সোদ্বেগ তোমার
জীবন্ত হৃদয়।'

কিন্তু কবির জীবনের এই বসন্তকাল, এই কোকিলের কুহুস্বর দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একটি মৃতা সন্তান প্রসব করে ২৯শে নভেম্বর, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কবিজায়া কবির প্রেমের বাঁধন ছিঁড়ে চলে গেলেন এক অচেনা অজানা রহস্য-লোকের পানে। অদৃষ্টের পরিহাসে দ্বিজেন্দ্রলাল স্ত্রীর মৃত্যু সময়ে তাঁর কাছে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তাই তো তিনি লিখেছেন,

'জানতাম নাক, চিনতাম নাক তোমায় আমি প্রিয়তমে
ষোল বছর আগে;
আমার জীবন তোমার জীবন পৃথকগতি, এ সংসারের
ছিল পৃথক্ ভাগে।'

আজ আর কবিজায়া নেই একথা বলা ভুল হবে—তিনি বেঁচে আছেন আমাদের প্রাণে, তাঁর স্বামীর সৃষ্টিতে অমর হয়ে। আমাদের মনের সঙ্গে অগমপারের কবিজায়া যে গাঁটছড়া বেঁধেছেন তা কি আমরা কোনদিন খুলতে পারবো? তাই আজ তাঁকে উদ্দেশ্য করে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষাতেই বলি,

'দুঃখ মিছে, কান্না মিছে, দুদিন আগে, দু'দিন পিছে।
একই সেই পাথারে গিয়ে মিলেছে সব নদী।'

আধুনিক কবি

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

মহাকবি কালিদাস লিখেছেন রঘুবংশ কাব্য ভূমিকায়
—বাগর্থ সম্পৃক্ত নিত্য, হরগৌরী সমযুক্ত
এক দেহলীন—
দেখিল বিস্মিত বিশ্ব বাণীরূপ বিকসিত নব ব্যঞ্জনায়,
রসিক দেখিল তারে অপরূপ রসের কমলে সমাসীন।
দেশে দেশে যুগে যুগে বীণা হাতে সরস্বতী মন্দির দুয়ারে
এল যত যত কবি নব ভাবে নব ছন্দে গেয়ে গেল গান
সে গানের রেশ আজো মধু বর্ষে অতিক্রম করি দেশকাল,
যার সুর করে দূর সর্ব দুঃখ, উল্লসিত করে সর্ব প্রাণ,
নিখিল মানব দেখে—বোনে তারা মনকাড়া সৌন্দর্যের জাল।
হে কবি, তোমার কণ্ঠে কেন শুনি পাগলের প্রমত্ত প্রলাপ?
কোথায় তোমার বীণা? হাতে তব দেখি কেন
হাতুড়ি শাবল?
সুরহারা গান কেন? কেন এই বীণাপাণি-বধের বিলাপ?
কেন এ বিকট নৃত্য? কাব্য নামাবলী গায়ে কেন
কোলাহল?
এসেছ মন্দির মাঝে তোলো তোলো বন্দনার মধুমল্লা রোল
দিয়ে যাও পুষ্পাঞ্জলি, কর পূজা পরিহার কর হট্টগোল।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পর্ব

(অঙ্কুর ও কাঁটা)

এক

মনুভাই কাপাডিয়া ছিল খানিকটা খামখেয়ালী প্রকৃতির মানুষ। বন্ধুরা তার উপাধি দিয়েছিল—"মিস্টার ভলাটাইল।" শত্রুরা টিপ্পনি কাটত: "অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ংকরঃ।" গৌরী বলত সাবিত্রীকে যে মনুভাই বাঙালী মার কাছ থেকে পেয়েছে উচ্ছ্বাস, গুজরাতী বাপের কাছ থেকে—ব্যবসাবুদ্ধি।

এই ব্যবসাবুদ্ধি ওকে খানিকটা বাঁচিয়ে দিয়েছিলই বলতে হবে। নৈলে হয়ত ওর উচ্ছ্বাসের জন্যে—বিশেষ ক'রে সুন্দরীদের সম্বন্ধে—ও ফের বিপদে পড়ত।

সম্পদের কোলে মানুষ হ'য়ে মনুভাইয়ের সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছিল এই যে, যা চায় সহজেই পেয়ে ওর ইচ্ছাশক্তি হ'য়ে পড়েছিল দুর্বল। তাই ও প্রথম ঘা খেল সবলা স্ত্রীর কাছে নানাভাবে প্রতিহত হ'য়ে। সহজপন্থী মানুষ—বরাবরই চ'লে এসেছে খুশখেয়ালে—হঠাৎ স্ত্রীর মধ্যে দেখা পেল শুধু দৃঢ়তা নয়, অনমনীয়তা। গৌরী যা একবার ধরত ছাড়ত না। ও আপত্তি করেই বা কোন্ মুখে, যখন গৌরী ভালো জিনিষই চাইত—সুশীলতা, সৌকুমার্য, গোছগাছ, পড়াশুনা—সর্বোপরি, পদে পদে সংযম—অথচ উঠতে বসতে এত সংযম স'য়ে থাকেই বা কেমন ক'রে?

কিন্তু খামখেয়ালী ও অসংযমী হ'লেও মনুভাই ঠিক দুরাচার ছিল না। তাই অনেক ভালোজিনিষও ভালোবাসত: বিলিতি সংস্কৃতি, ভ্রমণ, সঙ্গীত, বাগান—সবচেয়ে বেশি—বিজ্ঞান। রুড়কী থেকে এঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম হ'য়ে যায় বিলেতে—পরে জর্মনিতে। দেশে ফিরে দেহতে বাড়ি তুলতে না তুলতে গৌরীকে দেখে উঠল অধীর হ'য়ে। ফল যা হবার—বিলিতি কেতায় পূর্বরাগ, আংটিবদল—শেষে রেজিষ্ট্রি ক'রে বিবাহ—সিভিল ম্যারেজ। মনুভাই নিষ্পরোয়া হ'য়েই বলত সাহেবি হাসি হেসে: "হিন্দুবিবাহ তো বিবাহই নয়—Polygamous, fie!" মহাদেব শুনে একটু ঘা খেয়েছিলেন প্রথমটায়, কিন্তু ক্রমশঃ তাঁর বিচক্ষণ মন যুক্তি জোগালো: যুগ বদ্‌লে যাচ্ছে, মানুষ যা চায় সবটা তো পায়ও না। রফা ছাড়া গতি নেই। তাছাড়া মনুভাই জামাই হিসেবে যে হাতে পাওয়া-চাঁদ এ-ও তো না মেনেই উপায় নেই। রূপ, স্বাস্থ্য, বংশ, সঙ্গতি, বুদ্ধি, বিলিতি পালিশ··· কিসের অভাব ওর? বিদেশে বিভুঁয়ে একটু আধটু পদস্খলন—ও কার না হয় এ যুগে? সাহেবি চালচলন যার সে তো খানিকটা মেনে চলবেই চলবে সাহেবপুরাণের বিধি: Sow your wild oats—you are young only once!" মহাদেব নিজে উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন না যৌবনেও, কিন্তু সেকাল আর একালের মধ্যে ব্যবধান তো থাকবেই। সর্বোপরি, মনুভাই ভাগনীজামাই হ'লে ভাগনী কাছেই থাকবে—প্রায় ঘরে থাকারই সামিল। হোক গে সিভিল-ম্যারেজ—ভাণ করা যাক—যেন তিনি জানতেন না ওদের রেজিষ্ট্রি আফিসে যাওয়ার কথা—

যেমন আর পাঁচটা সংসারী করে: "যা দেখতে চাও না, তার দিকে তাকিয়ো না"। ফলে বিবাহ হ'য়ে গেল মহোৎসবেই—যেকথা আগেই বলা হয়েছে।

দুই

বিবাহের পর প্রথম কয়মাস ওদের কাটল পরমানন্দে। মনুভাই তো অস্থির—এমন অনুপমাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে। মধুচন্দ্রে নিয়ে গেল ওকে কাশ্মীরে। সেখানে পনেরদিন কাটল তর তর ক'রে স্বপ্নরঙিণ হিল্লোলে। বাইরে প্রকৃতির সৌন্দর্য, ঘরে সুন্দরী অনুরাগিণী রূপসী গৃহলক্ষ্মী। স্বর্গ আর কার নাম?

কিন্তু দুঃখ এই যে, কালজাত সুখ কালাতিপাতে ধীরে ধীরে মিইয়ে যায়ই যায়। গৌরীর অনুরাগও ধীরে ধীরে ক'মে এল—বিশেষ ক'রে মনুভাইয়ের উৎপাতে। যখন তখন অসংযম ওর ভালো লাগত না। স্বভাবে'ও চির-দিনই সংযমী, দেহ নিয়ে বেশি মাতামাতিতে ও সত্যিই লজ্জা পেত, অথচ স্বামী যে—তাই প্রথম প্রথম কিছু বলতেও পারত না। কিন্তু পতির অত্যধিক অসংযমে সতীর সতীত্ব বজায় থাকলেও রুচি বিদ্রোহ না ক'রে পারে না—বিশেষ স্বভাব-ভক্তিমতী মেয়ের। আশৈশবই ওর মন ধর্মের গুরুর শাস্ত্রের নামে উজিয়ে উঠত—সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এখন স্বামীর উপদ্রবে ও একটু একটু ক'রে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল। তখন আরও চাইল একটি সন্তান। কিন্তু নিয়তি নির্দয়—ডাক্তারের ধাত্রীর রায়—সাবিত্রী ও গৌরী উভয়েই বন্ধ্যা। ও ভাবতে লাগল সাধুসন্তের কাছে দরবার করার কথা, আরো মামীমার কথা স্মরণ ক'রে যিনি বদরীনারায়ণের এক সাধুর বরে প্রহ্লাদকে পেয়েছিলেন। সাধুসন্তে ওর বিশ্বাস আশৈশব প্রায় মজ্জাগত ছিল বললেই হয়—যেজন্যে প্রহ্লাদকেও এত স্নেহ করত। ভাইবোনের এই এক জায়গায় গভীর আন্তর মিল ছিল।

মনুভাই প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে অবুঝ ছিল বটে, কিন্তু তাই ব'লে বুদ্ধির ক্ষেত্রে অন্ধ ছিল না। তাই সে ভয় পেল বৈ কি—যখন ধীরে ধীরে গৌরীর আলিঙ্গন শ্লথ হ'য়ে এল, সাড়া—স্তিমিত। একটু একটু ক'রে খুঁটিনাটি নিয়ে রুচি-ভেদ থেকে মতভেদ, পরে মতভেদ থেকে কলহ সুরু হ'ল। ফলে মনুভাইয়ের প্রবৃত্তি আরো প্রবল হয়ে উঠল সুলভাকে হাতের পাঁচ জানলে বাসনা ঝিমিয়ে আসেই আসে, কিন্তু সেই সুলভা যখন দুর্লভা হয়ে ওঠে, সহজে রাজি হয় না তখন বাধা পেয়ে কামনাও হয়ে ওঠে উদগ্র—বিশেষ নরনারীর দেহলোকে। মনুভাই একথা জানত—কারণ এ বিষয়ে সে ছিল অভিজ্ঞ। গৌরী জানত না, তাই শুধু যে আহত হ'ত তাই নয়, ভালো বুঝতে পারত না ব'লে একটু ভয়ও পেত বৈকি।

এইভাবে ক্রমশঃ ওদের মধ্যে ব্যবধান গভীরায়মান হ'তে থাকে। শেষে গৌরীর মনে হ'ল—সন্তান না এলে এর সমাধান হবার নয়। সন্তানস্পৃহার ক্ষেত্রে সাবিত্রীর সঙ্গে ওর মিল ছিল মূলগত, তাই তাকে ও বলত মনের ব্যথা। কিন্তু সাবিত্রী কী বলবে? শুধু চোখের জলে দরদ জানায়। গৌরী বলত: সাধুসন্তের আশীর্বাদে অসম্ভব সম্ভব হয়। সাবিত্রী সে কথা জানাত মহাদেবকে, কিন্তু তিনি তাড়া দিতেন—যত সব কুসংস্কার—একথাও বলা হয়েছে আগেই।

একদা গৌরী মনুভাইকে বলল—সন্তান যদি না হয় তবে পোষ্য নেবে। মনুভাই রাজী হল না কিছুতেই। গৌরী স্বভাবে অবুঝ ছিল না, বুঝল স্বামীর বিমুখতা। শেষে ভেবেচিন্তে ঠিক করল স্বামীকে ভুতিয়ে পাতিয়ে একবার কাশী নিয়ে যেতেই হবে। পর পর দুতিনজন সখীর কাছে খবর পেল—বিষ্ণুঠাকুরের আশীর্বাদে একাধিক বন্ধ্যা সন্তানবতী হয়েছে। সাহেব মনুভাই একে-বারেই চায় নি সন্তানের জন্যে সাধুসন্তের কাছে গিয়ে ধর্না দিতে। এ কী মিডীভাল কুসংস্কার! এখানে মামা শ্বশুরের সঙ্গে তার মিল ছিল।

কিন্তু থাকলে কী হবে, গৌরী ক্রমশঃ রুখে উঠল, বলল ওকে কাশী যেতে না দিলে হঠাৎ একদিন পালিয়ে যাবে বিষ্ণুঠাকুরকে গুরুবরণ করতে। মনুভাই তখন সত্যিই চোখে সর্ষের ফুল দেখল। জপল: "সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" ঠিক করল গৌরীকে যদি কাশী যাওয়া থেকে ঠেকাতে না পারে, তবে নিজে সঙ্গে যাবে তার তদারক করতে। সঙিন ব্যাপার:—স্বামী হ'তে চায় গুরুদাসী! চোখে চোখে না রাখলে চলে?"

কিন্তু বৃথা! গৌরীর রোখ বিষ্ণুঠাকুরকে দেখতে

দেখতে বানের জলের মতন দুর্বার হয়ে উঠল। বলল: দীক্ষা নেবেই নেবে এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস গুরুবরণ করলেই গুরুর প্রসাদে সন্তানও আসবে কোল জুড়ে, যেমন আরো একজনের এসেছিল কাশীতে।

মন্টুভাই খুব আপত্তি করল। কিন্তু গৌরীর সেই এক কথা: দীক্ষা না নিয়ে "পাদমেকং ন গচ্ছামি।" কী করে? ভেবেচিন্তে রাজিনামা দিতে হ'ল, কারণ এবার "সর্বনাশে সমুৎপন্নে" 'অর্ধেকেরও বেশি খাবার দাখিল। শুধু যতটা বাঁচানো যায় অন্ততঃ উপস্থিত—গৌরীকে তো কোনোমতে ঘরে ফিরিয়ে আনা যাক—to cut one's losses, বলে না! তাই মত দিল—আরো এই ভেবে যে, বিষ্ণুঠাকুর গৃহস্থাশ্রমে থাকতেই বলেন, বিরাগী হয়ে হিমালয়ে চলে যেতে উপদেশ দেন না। মন্দের ভালো। নেক দীক্ষা। গৌরী তখন বায়না ধরল: "তুমিও দীক্ষা নাও।" শুনে প্রথমে ওর খুব রাগ হ'ল, কিন্তু মাথা একটু ঠাণ্ডা হবার পর ভাবল: "ক্ষতি কী? এসব মন্ত্রতন্ত্র যখন আদ্যন্ত ননসেন্স—তখন না হয় নিলামই ছাই একটা মন্ত্র—কোনোমতে একবার ওকে ফিরে পাই তো—তারপর ও অঞ্চলের আর ছায়াও মাড়াচ্ছি না বাবা!"

অথ, মন্টুভাই মন্ত্র নিল—জেনেশুনে যে সে মন্ত্র কোনোদিনও জপ করবে না। তবে স্ত্রীর মতে উপস্থিত সায় না দিলে যখন তার মন পাওয়া যাবে না, তখন ভাণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। স্ত্রীর সামনে কাশীতে আসনে ব'সে একটু সাড়ম্বরে জপও করল। ফলে গৌরীও খুসি হ'য়ে ওর একটু কাছে এল। মন্টুভাইও খুসি, ভাবল: "কিছুটা তো ক্ষতিপূরণ মিলল! ষোলো আনা পাওয়া যখন অসম্ভব তখন আট আনা আট আনাই সই।" গৌরী আরো ধরা দিল—এবার সন্তান আসবে এই ভরসায়। একথা সব শুনে শুধু মৃদু হেসে বললেন: "মা, সংসারী মানুষী যে কত রকম চাল চালে কত কী ভেবে আমি জানি—আরো বেশি জানেন দয়াময়। তাই চলো এখন যেভাবে চলতে চাও। কেবল জেনো একটি কথা: যে রাশ তাঁর হাতে, তিনি এখন একটু আধটু ছাড়া দিলেও ঠিক সময়ে কষবেনই, কষবেন। এখন এর বেশি কিছু বলব না।"

ওদিকে মন্টুভাই শুনে মনে মনে হাসে ভাবে: মেয়েরা অন্ধই হয় গুরুভক্তিতে।"

কাশী থেকে ফিরে এসে ওদের দাম্পত্য সম্বন্ধের রথ চালানো একটু সহজ হ'য়ে এল। গৌরী যতবারই ধরা দেয়, রথচক্রের আপত্তির মধ্যেও জপতে থাকে—সন্তান সন্তান। মন্টুভাই হাতিয়ে নেয় শুধু যা বোঝে তার লোভে, অর্থাৎ নগদ বিদায়। ভাবে: "গৌরী মা হবার স্বপ্নকে আমল দিয়ে যদি আকাশে ফুল ফুটবে ভেবে সুখী হয় ক্ষতি কি—যতক্ষণ আমি যা চাই তা পাচ্ছি? তাই করুনা একটু আধটু গুরু গুরু, জ্বালাক না দুচারটে ধুপদীপ, দিকনা দুটো ফুলপাতা গুরুমূর্তির পায়ে। শুধু আমার প্রাপ্য নৈবেদ্যে পাণ্ডা পুরুতে ভাগ না বসায়।"

কিন্তু তার পরেই এ কী ব্যাপার? গৌরীর গর্ভে সন্তানের আবির্ভাব! কেমন ক'রে এ অসম্ভব সম্ভব হ'ল—বিশেষ এ বিংশশতকে বিজ্ঞানের যুগে? মন্টুভাই একটু হকচকিয়ে গেল বৈ কি। তবে কি বিজ্ঞানের রায় অপ্রতিবাদ্য নয়? ধাত্রী ডাক্তার এক্সরে ইত্যাদি যা বলে, তাই কি মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানমনীষার শেষ রায় নয়? সাধু সন্ন্যাসী কি সত্যিই জানতে সাধতে পারে, যা বৈজ্ঞানিকের জানাজানি সাধনার বাইরে? মনস্থির করতে পারল না প্রধানতঃ এই কারণে যে, সাহেব পুরাণে একথাও বলে: seeing is believing; তবে? এ যে চাক্ষুষ করা সত্য—বিষ্ণুঠাকুরের ম'ত সাধুসন্তরা কি তাহ'লে শুধু সমাধিতেই উত্তাননেত্র হ'য়ে থাকেন না, কার্যক্ষেত্রেও তাঁদের যোগশক্তিকে ফল ফলাতে পারেন এমন কোনো অদৃশ্য বীজে—যার খবর বুদ্ধিবাদী বৈজ্ঞানিকেরা রাখে না?

মানুষের মন বিচিত্র। অসঙ্গতিতে ভরা। তাই মন্টুভাইয়ের মনে প্রথম দিকে হঠাৎ বিষ্ণুঠাকুরের 'পরে একটু সত্যিকার শ্রদ্ধা এল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানতে হ'ল—মানুষটি একটু আশ্চর্য বটে। হাতের কাছে বিলাসের নানা উপাদান থেকেও ভূমিশয্যা, একাহারী, অথচ অবসর থাকা সত্ত্বেও ভোর চারটেয় ওঠেন, সারাদিন সাধন ভজন স্বাধ্যায় বা শিষ্যশিষ্যা অতিথি অভ্যাগতের তদারক..., সমস্তক্ষণ কোনো না কোনো কাজে লিপ্ত, অথচ ব্যস্তবাগীশ নন! বহুপাঠী অথচ মূর্খদের অবজ্ঞা করেন না! সবার উপর সদাস্নিগ্ধ, সদাপ্রফুল্ল! ভক্তি? এইখানেই ও ঠেকে: 'ভক্তি ফক্তি বুঝি না বাপু'—বলে গৌরীকে,

কখনো বা একমুখ পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে—"তবে উনি গান গাইতে শিখেছেন—না মেনে করি কি? এমন কি প্রহ্লাদের চেয়েও সুকণ্ঠ—তার উপর কত রকম আঁখরের ফুলঝুরি! প্রজ্ঞা ধ্যান সমাধি ফমাধি বুঝি না, কিন্তু গানের প্রতিভার কিছু খবর রাখি তো।"

এমনি করে ওর মন একটু নরম হয়ে আসে—গৌরীর সান্নিধ্যের জন্যেও বটে, আর এক বৎসরের মেয়ে রমাকে ভালোবেসেও বটে। সাধুসন্তদের যোগবিভূতি নিয়ে যতই কেন না হাসাহাসি করুক—একটি কথা সে মনে মনে স্বীকার না ক'রে পারে না যে, রমা কখনই আসত না মায়ের কোল জুড়ে যদি গৌরী কাশী আদৌ না যেত। বলতে ইচ্ছা হয় যোগাযোগ (মহাদেবের ভাষায়—"কাকতালীয়")—কিন্তু সংসারের একটা মহা মুস্কিল হয় তাদের—যারা স্বচক্ষে অঘটন দেখেছে। কারণ তারা যতই চেষ্টা করুক কিছুতেই আর তাদের সঙ্গে পুরোপুরি কাঁধ মেলাতে পারে না যারা দেখে নি। কাজেই মনুভাই বিষ্ণুঠাকুরকে ক্ষণজন্মা গুরু ব'লে ভক্তি করতে না পারলেও অদ্ভুতকর্মা সাধু ব'লে খানিকটা মানতে বাধ্য হ'ল বৈ কি।

এইভাবে মনুভাইয়ের মন অজান্তে একটু একটু ক'রে নরম হ'য়ে আসছিল, কিন্তু যখন মহাদেব প্রহ্লাদের দীক্ষা নেওয়ার খবর পেয়ে শয্যা নিলেন তখন তার সংসারিয়ানা ফের ঘা খেয়ে রুখে উঠল। গৌরীর 'পরে খুব রাগ করল প্রহ্লাদকে গুরুবরণের পথে ঠেলে-দেওয়ার জন্যে। বলল: "মামাবাবু এত ভালো লোক, এত করেন সকলের জন্যেই—তাঁর মনে এভাবে কষ্ট দেওয়া"—গৌরী ফোঁশ ক'রে উঠল: "বা রে বা! মামা ভালো বলে কি মামাতো ভাইকে দুটো ভালো কথাও বলা মানা? সংসারে গুরুর চেয়ে আপন কে?"

মনুভাইয়ের সাবধানবুদ্ধিতে কে যেন হাতুড়ি মারল—তার চোখে পড়ল ডেঞ্জার সিগন্যাল। এতো সুলক্ষণ নয়—must be nipped in the bud বলল মনে মনে। মুখে: "তোমাদের মেয়েদের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। স্বামীকে নিয়ে যখন পড়বে—(মনে পড়ে না কাশ্মীরের কথা?)—তখন তাকে এম্‌নিই আঁকড়ে ধরবে যে সে বেচারির প্রায় দমবন্ধ হবার যো। তারপর ছেলে এল তো ছেলে ছেলে ক'রে পাগল। এখন আবার উঠেছে দেখি এক নতুন ধুয়ো: গুরু গুরু গুরু—গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণুঃ ···গুরুর মতন কেউ ভালোবাসে না! যেন গুরু একটি নিখুঁৎ venus de Milo—থুড়ি, Apollo—নবকার্তিকটি। মানি—কাশী থেকে ফিরেই তোমার কোলে রমা এসেছে। কিন্তু ও আসতই—গুরু গুরু না করলেও। তোমার কুষ্ঠীতে লেখে নি কি—যে তোমার সন্তান হবে?

গৌরী (রুখে উঠে): রেখে দাও কুষ্ঠী। যখন আমি বলতাম জ্যোতিষীদের কাছে যাবার কথা তখন তো মার-মুখো হ'য়ে উঠতে—"যত সব মিডীভাল" ব'লে। তবু উঠতে বসতে মেয়েদের দোষ দেওয়া হয়—তাদের সবই বিপরীত! আর, হঠাৎ মামাশ্বশুরের 'পরে এত টান কেন শুনি! আমি তাঁকে যত ভালোবাসি তুমি তার চেয়েও তাঁকে বেশি পেয়ার করো দেখছি! মায়ের চেয়ে মাসীর টান বেশি! মরি মরি।"

মনুভাই (বেকায়দায় প'ড়ে): না, মামাবাবুকে তুমি খুব ভালোবাস জানি—কেবল তিনি অত্যন্ত ভালো লোক ব'লেই কষ্ট হয় তাঁকে দুঃখ পেতে দেখলে।

গৌরী (ঝংকার দিয়ে): কষ্ট হয়? আহা! কী ননীগোপাল প্রাণ গো! তাঁর কষ্টের কথা ভেবে তো তোমার ঘুম হচ্ছে না। আর ভালোলোক ভালোলোক ব'লে কী বলতে চাইছ শুনি? ভালোলোক হ'লেই কি মানুষ নিখুঁৎ নারায়ণ হয় না কি? না, তাঁর দুঃখে কি আমরাও দুঃখ পাই না বলতে চাও? কিন্তু গুরুদেব বলেন—যে যাকেই আঁকড়ে ধরবে তার কাছ থেকেই ঘা খাবে—এ জীবনের নিয়ম।

মনুভাই (সুর নামিয়ে): কিন্তু তাই ব'লে এত বড় ঘা?

গৌরী: ঘা এত বড় হ'ত না যদি তিনি প্রহ্লাদকে তাঁবেদার রাখতে না চাইতেন—যদি না বলতেন—তাঁর মতেই তাকে চলতে হবে সব বিষয়েই। জীবনে ঘা অকারণ আসে না। বুঝলে? কাউকে ভালোবাসা মানে নয় তাকে আষ্টেপিষ্টে চেপে ধরা। পাখা উঠলে পাখীরাও ছানাকে নীড় থেকে ঠেলে ফেলে দেয়—একটু একটু ক'রে উড়তে শিখুক ব'লে। মামাবাবু ভালোবাসেন, খুবই মানি—বহুগুণ তাঁর—জানি। কিন্তু তাঁর ঐ এক মহাদোষ—

ছেলেকে বৌকে ভাগনীকে, সবাইকেই চান নিজের মতের ছাঁচে ঢালাই ক'রে নিজের মনের মতনটি ক'রে গ'ড়ে তুলতে। তাই এ ঘা খেয়ে থতিয়ে তাঁর ভালোই হবে—দেখে নিও—বিশেষ যখন নাতি আসবে তাঁর ঘর আলো ক'রে।

মনুভাই : ঐ তোমাদের এক কথা। প্রহ্লাদের ছেলে হবে—মামাবাবুর নাতি আসবে। যেন তোমার গুরুদেব প্রজাপতির কাছে ছেলেগজানো গঙ্গাজলের পেটেন্ট নিয়েছেন।

গৌরী : ফের অভব্য হাসিঠাট্টা! আর আমার গুরুদেব মানে? তুমিও মন্ত্র নাও নি না কি?

মনুভাই (বিব্রত) : তোমরা—মেয়েরা—কেউ মুখ ফসকে কিছু বললেই গলা টিপে ধরো। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম (নরম স্বরে) যে প্রহ্লাদের ছেলে না হ'তেও তো পারে—

গৌরী : না, পারে না। গুরুদেবের আশীর্বাদ নিষ্ফল হ'তে পারে কেবল তোমার মতন অবিশ্বাসীর ক্ষেত্রে। প্রহ্লাদ স্বভাবধার্মিক—তার উপর গুরুদেবকে ভালোবেসেছে মনে প্রাণে। তুমি লিখে রেখে দাও তোমার ডায়েরিতে—পরে মিলিয়ে নিও—যে গুরুদেবের আশীর্বাদের ফলে দেড় বৎসরের মধ্যেই বৌয়ের কোল জুড়ে আসবে একটি আনন্দদুলাল। আমার বেলায়ও তো তোমরা হাসাহাসি করেছিলে—করো নি—তুমি আর মামাবাবু? বলো নি—গুরুসাধুসন্তরা "সবজান্তা তথা সবপান্তা?" কিন্তু গুরুদেবের কৃপায় কী অঘটনটা ঘটল স্বচক্ষে দেখেও ফের ঐ অবিশ্বাসের বুকনি ঝাড়তে লজ্জা করে না তোমার?

মনুভাই (ঈষৎ কাবু) : একবার একটা অঘটন ঘটলেই যে বার বার ঘটবে এমন কথা বলা চলে না। সমুদ্রে কোনো কোনো লাইফবোটের মানুষ পনের দিন অনাহারে বেঁচেছে ব'লেই কি বলবে যে সব লাইফবোটের মানুষই বাঁচবেই বাঁচবে?

গৌরী : না। কারণ সেখানে গুরুশক্তি কাজ করে না—জগতের চলতি শক্তির ঢেউই চালায় লাইফবোটকে।

মনুভাই : আচ্ছা আচ্ছা বাবা, ঘাট হয়েছে। আর তর্ক করব না। Asquith এর মতন বলব : "Let us wait and see."

তিন

প্রহ্লাদ কাশী থেকে ফিরে এল হরিষে বিষাদ নিয়ে! এত আনন্দ গৌরব মনের মধ্যে—তবু ক্ষমা চাইতে হবে, অনুতাপের ভাণ করতে হবে? মনকে রাজি করায় কী ক'রে? সাবিত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে ট্রেণে তকরারও হয় একটু। সে কাতর ভাবে অনুনয় করে, বলে চোখের জলে যে, মহাদেব অভিমানী, ঘা খেয়েছেনও খুব বেশি, তার উপর অসুস্থ, এক্ষেত্রে প্রহ্লাদ নত না হ'লে ঘরকন্না হ'য়ে উঠবে কাঁটাবন। প্রহ্লাদও অভিমানী কম নয়, কিন্তু তার মনে পড়ে গুরুদেবের কথা : দীক্ষা নেওয়ার পর অভিমানকে প্রশ্রয় দেওয়ার নাম মিথ্যাচার। তাই সাতপাঁচ ভেবেচিন্তে সে শেষে স্থির করল—বাপের কাছে ক্ষমা চাইবে।

কিন্তু মানুষ কী ভাবে আর কী হয়? কে কার কাছে ক্ষমা চাইবে? প্রহ্লাদ কাশী থেকে মহাদেবকে "আসছি" ব'লে তার করতেই তিনি জ্বর গায়েই ফের কলম্বো চ'লে গেলেন আকাশপথে। প্রহ্লাদ ফিরে গৌরীর কাছে সব শুনল। কিন্তু গৌরীও বেশি কিছু বলতে পারল না—কারণ মহাদেব চিঠি পড়ার পর থেকে গৌরীর সঙ্গেও দেখা করেন নি। সে দোরের বাইরে থেকে চেঁচিয়ে ক্ষমা চাওয়া সত্বেও নরম হন নি এতটুকু, শুধু বলেছিলেন কঠিন স্বরে : "বিপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করা যায়, কিন্তু গৃহশত্রুর সঙ্গে নয়।" ব্যস্। আর একটিও কথা নয়। গৌরীর সে কত কান্নাকাটি, কাকুতিমিনতি—কিন্তু তিনি দোর খুললেন না একটিবারও। শেষে ওকে না জানিয়েই প্রস্থান।

প্রহ্লাদ মাথায় হাত দিয়ে পড়ল। এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—অক্ষরে অক্ষরে! একটা আনন্দে-উচ্ছ্বসিত চিঠির সাড়া এল কি না বজ্র হ'য়ে! অভাবনীয়! সে সাবিত্রীর সঙ্গে একত্রে তিন তিনটি চিঠি লিখল, তারপরে দীর্ঘ তার করল ক্ষমা চেয়ে, কিন্তু মহাদেব অচল অটল। তারের উত্তরে শুধু শেষে মনুভাইকে লিখলেন : "ওদের বোলো যেন আমাকে আর বিরক্ত না করে। প্রহ্লাদ আমার আর কেউ নয়। ওরা যখন ধর্মের নামে ভণ্ডামি করতে চেয়ে মিথ্যাচার ও চক্রান্তের পথ ধরেছে, তখন ওদের ছায়াও আমি মাড়াব না আর। বাঘের সঙ্গে মানুষের

মিতালি হ'তে পারে, কিন্তু কালোর সঙ্গে সাদার সহবাস হয় না।"

প্রহ্লাদকে বাজল এ নিদারুণ বাণ। ওর মন উঠল বিষিয়ে। এ কী রকম বিচার? আসামীর বক্তব্য না শুনেই তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া? ও কী এমন অপরাধ করেছে শুনি? মদ-মেয়েমানুষ নয়, খুনখারাপি নয়, চুরি-ডাকাতি নয়, জাল-জালিয়াতি নয়। শুধু মনের আবেগে ভগবানের লক্ষ্যমুখে তীর্থযাত্রী হতে চেয়েছে গুরুকে দিশারি ক'রে। আর চক্রান্ত! এমন কুৎসিত শব্দ? ছি ছি! ছেলেকে ভাগনীকে এতদিনেও চেনেন নি তিনি? তাছাড়া তিনি পিতা, প্রবীণ, গৃহের কর্তা—একটুতে এত অধীর হ'লে চলে? কেন বুঝলেন না কত দুঃখে ভাইবোনকে লুকোচুরি করতে হয়েছে? দুদিন বাদে ওরা তো বলতই সব খুলে—একি আর চাপা থাকত? গৌরী কি লুকিয়েছিল তার দীক্ষার কথা? তবে? হঠাৎ ওর অনুপস্থিতিতে কেমন ক'রে তিনি এক কথায় তাকে ত্যাজ্যপুত্র ক'রে বসতে পারলেন? সব ছাপিয়ে ওর মনে যেন জেগে ওঠে এই ভেবে যে, দেবকল্প গুরুদেব ও করুণাময়ী গুরুমার সম্বন্ধে কিছুই না জেনে, তাঁদের দীক্ষা কী বস্তু কোনো খবর না নিয়েই প্রহ্লাদ ও সাবিত্রীর গুরুবরণ করার নাম দিলেন তিনি "ধর্মের নামে ভণ্ডামি?" মনুভাই যে মনুভাই—সে-ও গুরুদেবকে ভক্তি না করলেও শ্রদ্ধা না ক'রে পারে নি—তাকেও তো একবার জিজ্ঞাসা করতে পারতেন? দুঃখে ক্ষোভে অপমানে শেষে প্রহ্লাদের মন কালো হয়ে গেল। সে পণ নিল—সেও আর পিতার ছায়া মাড়াবে না।

প্রথম প্রথম মনকে শান্ত করতে পারত না। নাম-কীর্তন জপধ্যান পূজাপ্রার্থনার সময়ে মন অধীর হ'য়ে উড়ুক্ষু হ'ত যে কত হাবিজাবি চিন্তার মেঘলা আকাশে! গুরুদেবকে লিখল মস্ত চিঠি খোলাখুলি। তিনি আশীর্বাদ ক'রে লিখলেন: "বড় আধারের পরীক্ষাও তো বড় হবে। সব মেয়েকেই আগুনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় না সতীত্বের প্রমাণ দিতে। সীতাকে যেতে হয়েছিল তিনি সীতা ছিলেন ব'লেই। এ-জগতে বড় অভীপ্সা বড় ত্যাগের প্রতিবন্ধক অগুন্তি। আর আঘাতও তাকেই বাজে বেশি—যে বুঝেছে নাল্পে সুখমস্তি। অল্পাশীর দুঃখ আধিভৌতিক—প্রাণলোকের দেহলোকের দুঃখ; কিন্তু অসীমের দুরাশা যার হৃদয়ে একবার শিখা হয়ে জ্বলেছে তার আর নিস্তার নেই—তার সংসার-বন্ধন পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবেই যাবে। আর দাহনের দুঃখ বাজেই—বিশেষ ক'রে যখন মমতার বন্ধনে আগুন লাগে। শান্ত করো মনকে। কালই সবচেয়ে বড় শান্তিদাতা। ঠাকুরের নাম করো—এ ও তা নিয়ে মনের বাজে খরচ ক'রে কী হবে?—বলতেন না ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ?"···ইত্যাদি।

গুরুদেবের আশ্বাসে ওর ব্যথার তখনি তখনি উপশম না হ'লেও মনস্তাপের ক্ষোভ উপশান্ত হ'ল। ধ্যান জপে মন বসল ফের একটু একটু ক'রে। একমাস···দুমাস···তিন মাস···ক্রমশঃ পিতৃবিচ্ছেদের অসহ বেদনাও সুসহ হ'য়ে এল।

তাছাড়া ক্ষতির পথ বেয়েই তো করুণা উঁকি দেয়। দুঃখ যখন ওদের গভীর, তখনই এল আলো—ওরা দুজনেই একটি নব আশ্বাসের আভাস পেতে সুরু করল। সাবিত্রী আনন্দে অধীর হ'য়ে সব দুঃখ ভুলে গেল দুদিনেঃ ও যে সন্তানবতী হ'তে চলেছে! কী আনন্দ! কী আনন্দ! গুরুদেবের ছবির সামনে আরো বেশি ধ্যান জপ সুরু করল। আরো ভরসা পেল—গৌরীকে কাছে নবরূপে পেয়ে। এতদিন ছিল ওরা সখী। আজ যে গুরুবোন! কী মধুর সম্বন্ধ! কিন্তু হায় রে, আধ্যাত্মিক পথে কোনো আনন্দের সুরই বেশীদিন উঁচু পর্দায় বেঁধে রাখা যায় না। দুটি সংসারেই বেসুর বেজে উঠল একটু একটু করে—মনুভাইয়ের জন্যে।

চার

মনুভাই দীক্ষা নিয়েছিল খানিকটা বাধ্য হ'য়েই। দীক্ষা নেওয়ার ফলে গৌরীর সঙ্গে ওর ব্যবধান খানিকটা কমেছিল কেন ও কীভাবে—বলা হয়েছে। কিন্তু রমা আসার পর থেকে গৌরী ফের একটু একটু ক'রে দূরে সরে যেতে চায় যে! ধরা দেয় না, বা ধরা দিলেও সাড়া দেয় না। বলে বারবার: দীক্ষার পরে স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ গভীর হয়, কেবল চাইতে হবে সে-সম্বন্ধ। এ-সম্বন্ধে দেহের স্থান গৌণ।

মনুভাই প্রমাদ গণল। দীক্ষা নিয়েছিল ও গৌরী

মন রেখে বাঞ্ছিতার দেহকে আরো বেশি করে পেতেই বটে। কিন্তু মন ধরা না দিলে দেহকে অধিকার ক'রে তৃপ্তি কতটুকু? প্রায়ই ক্ষুব্ধ হ'য়ে বলত ও কাশ্মীরের কথা—যখন গৌরী ছিল ওর ষোলো আনা বিলাসবধূ তথা শয্যাসঙ্গিনী। গৌরী বলত—যা যায় তা ফেরে না। তার মন প্রাণ অন্য দিকে মোড় নিয়েছে—মন্টুভাই যদি সহযাত্রী না হয় তাহলে ব্যবধান ক্রমশঃ দুর্লংঘ্য হ'য়ে উঠবেই উঠবে।

মন্টুভাই বিপন্ন হ'য়ে ঝুঁকল ফের মামা শ্বশুরের দিকে। তাকে চিঠি লেখা সুরু করল গৌরী সাবিত্রী ও প্রহ্লাদের দুর্মতির খবর দিয়ে তিলকে তাল ক'রে। লিখল গুরু গুরু ক'রে ওদের মাথা খারাপ হবার উপক্রম—মহাদেবের এখন ফিরে আসা চাইই চাই। নইলে সব ভেসে যাবে।

মহাদেব মন্টুভাইকে দরদী পেয়ে তাকে নিয়মিত চিঠি লেখা সুরু করলেন। কিন্তু যে স্বভাববলিষ্ঠদের হৃদয় ঘা খেয়ে বেঁকে বসেছে, কথায় তারা আর্দ্র হয় না। তার উপর মহাদেব ছিলেন প্রকৃতিতে অত্যন্ত অভিমানী তথা স্পর্শকাতর। তাই নিজের ব্যথার কথা প্রাণপণে গোপন রেখে মন্টুভাইকে একমাত্র আত্মীয়রূপে বরণ করে নিলেন বটে, স্নেহলিপিও লিখতেন, কিন্তু প্রহ্লাদ সাবিত্রী বা গৌরীর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করতেন না। শুধু লিখতেন—একটু জাঁক ক'রেই—তাঁর গানে নানা নতুন শিষ্য হওয়ার কথা, পুণায় যা পেতেন তার চেয়েও বেশি উপার্জন করার কথা, সিংহলের নানা প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা, বিশেষ ক'রে কলম্বোর সমুদ্র ও কান্দির অপরূপ নদীবীথির কথা।

মন্টুভাই সে সব চিঠিই প্রহ্লাদের কাছে গিয়ে জোর ক'রে প'ড়ে শোনাত—প্রহ্লাদ শুনতে না চাইলে সাবিত্রীর কাছে—সাবিত্রী যথাকালে স্বামীকে সব বলত। এই সূত্রে ক্রমশঃ পিতার খবর পেতে পেতে প্রহ্লাদের মন ফের চঞ্চল হ'য়ে উঠল—আরো মন্টুভাইয়ের পীড়াপীড়িতে। মন্টুভাই নানা সূত্রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওকে বোঝাত যে পুত্রের নত হওয়া কর্তব্য পিতার কাছে। বিশেষ যখন এমন মহৎ স্নেহময় পিতা!

কথাটা মিথ্যা নয়। মহাদেব স্বভাবে নীচ ছিলেন না, ভালোবাসতেও জানতেন। প্রহ্লাদের গভীর ব্যথার জায়গায় বারবার আঘাত দিয়ে মন্টুভাই ফের ওর দুর্বলতাকে উস্কে দিল। বলল: "এখন বৌ-মা হ'তে চলল—আর কেন? গৃহবিচ্ছেদ সাঙ্গ হোক। উৎসবের আলোয় মেঘের ছায়া কেটে যাক। তুমি যাও এবার মামাবাবুকে হাতে পায়ে ধ'রে ফিরিয়ে আনো। আর গড়িমসি নয়।"

প্রহ্লাদের বুকে শেষে অশ্রুসাগর ফের দুলে উঠল। সে লিখল গুরুদেবকে সব কথা জানিয়ে। কিন্তু হা অদৃষ্ট! গুরুদেব সাড়া দিলেন না, লিখলেন নিষ্করুণ সুরে:

"কী দরকার? যে-বন্ধন ঠাকুরই কেটে দিয়েছেন কৃপা ক'রে, তাকে পুনর্বরণ করতে চাওয়ার এ-দুর্মতি কেন? পরমহংসদেবের উটের উপমা মনে নেই—কাঁটা ঘাস খেয়ে তার মুখ দিয়ে দর দর ক'রে রক্ত পড়ছে, তবু সে কাঁটাঘাসই খাবে! আর যে-অপরাধই করো না কেন বাবা, কেঁচে গণ্ডূষ ক'রে মুক্তশিবের আদর্শ ছেড়ে ফের বদ্ধজীব হ'তে ছুটো না—যে বারবার ঠেকেও শিখতে চায় না ব'লেই এত ভোগে তবু চৈতন্য হয় না। মনে রেখো তুমি সাধক, আর সব দেশেই খাঁটি সাধককে একলাই পথ চলতে হয়েছে আবহমানকাল। এ-দুঃখ বাজে—মানি। এক সময়ে আমিও প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম বাপের ত্যাজ্যপুত্র হ'য়ে। সে-সংকটে শুধু গুরুকৃপাই আমাকে বাঁচিয়েছিল অকূলপাথারে কাণ্ডারী হ'য়ে এসে। দেখা হ'লে কোনোদিন বলব তোমাদের সে-অঘটনের কাহিনী—কী ভাবে গুরুকৃপা এ-যুগেও অধম-তারণ করে। আজ শুধু তোমাকে একটি কথা জোর দিয়েই বলতে চাই বাবা: তুমি আর যাই করো না কেন, এই কথাটি ভুলো না যে, তুমি খাঁটি সাধক—তোমার স্বধর্ম ভগবানে সর্বসমর্পণ। যদি তুমি ষোলো আনা সাধক হ'তে চাও তাহ'লে অকিঞ্চন তোমাকে হ'তেই হবে।—বাহ্য অকিঞ্চনতার কথা আমি বলছি না—শুধু কৌপিনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ এমন কথাও বলি নি কোনোদিনই, তুমি জানো। অকিঞ্চন বলতে আমি বুঝি এই ভাবদীক্ষা যে, আমার আপন বলতে কেউ নেই এক ভগবান্ ছাড়া। এ-উপলব্ধি যখন সত্য হ'য়ে আসে তখন প্রথম দিকে মানুষ দুঃখ পায়ই পায়। অমন যে মহাপুরুষ খৃষ্ট তাঁকেও দুঃখ পেতে হয়েছিল নিঃস্ব গৃহহীন হ'য়ে। বলেছিলেন: 'বন্য পশুর বিবর আছে, পাখীর নীড় আছে,

কেবল পরম পিতার প্রিয় প্রতিভূরই নেই মাথা গুঁজবার জায়গা।' তুমি তো এদিক দিয়ে ভাগ্যবান্ই বলব—শুধু গৃহ এবং গৃহিণী আছে ব'লেই নয়—আরো এই জন্যে যে, তোমার গৃহিণী স্বভাবে বিশ্বাস্ত্রী, স্বধর্মে সহধর্মিণী—তাই না সে গর্ভবতী হবার পরে কথা দিয়েছে যে, এখন থেকে সানন্দেই হবে ব্রহ্মচারিণী—তোমাকে স্খলিত করবে না ব্রহ্মচর্য থেকে। সে সন্তানের মা হোক এ আমিও চেয়েছিলাম—তুমি জানো। তাই সে আসন্নপ্রসবা শুনে আমি আনন্দিত। কিন্তু এখন থেকে—তোমাকে ফের মনে করিয়ে দিচ্ছি—তোমার স্ত্রীকে আর শয্যাসঙ্গিনী মনে করবে না—মনে করবে শুধু সহধর্মিণী, সহযাত্রিণী, প্রাণধাত্রী আত্মার আত্মীয়া। এখন থেকে তোমাদের উভয়কেই ব্রহ্মচর্যব্রত নিতে হবে। এ-ব্রত তোমাকে দিচ্ছি—ধ্রুবকে পাওয়ার পর থেকে নিজেও এ ত গ্রহণ করেছিলাম ব'লে।"

এইভাবে নানা চিঠিতেই বিষ্ণুঠাকুর প্রহ্লাদ সাবিত্রী ও গৌরীকে উপদেশ দিতেন। সাবিত্রীর গর্ভাধানের পরে প্রহ্লাদ আরো দুবার কাশী গিয়েছিল গুরুসান্নিধ্য পেতে। প্রথমবার সাবিত্রী ও গৌরীও গিয়েছিল ওর সঙ্গে। দ্বিতীয়বার—আটমাস বাদে—সে একলাই গিয়েছিল।

বিষ্ণুঠাকুর ওকে প্রথমেই বলেছিলেন যে বড় আধারকে আঘাতও পেতে হয় বেশি চিরকালই—তাই প্রহ্লাদকেও আরো এমন অনেক ঘা খেতে হবে যা অপ্রত্যাশিত ব'লেই বেশি বাজবে। তাঁর কথা ফেলতে দেরি হয় নি। বাপের ত্যাজ্যপুত্র হওয়ার পরেই এল আর এক পরীক্ষা: মন্নুভাই—যে ছিল সত্যিই ওর পরম বন্ধু তথা দরদী প্রতিবেশী—সে একটু একটু ক'রে শুধু যে গৌরীর'পরেই অপ্রসন্ন হয়ে উঠল তাই নয়—প্রহ্লাদের 'পরেও বিমুখ হ'য়ে উঠল। তারপরে ক্রমশঃ যা হবার তাই হ'ল: প্রকাশ্যে গুরুদ্রোহী হবার সাহস তার ছিল না, কিন্তু অন্তরে সে একটু একটু ক'রে গুরুবিমুখ হ'য়ে উঠল। নানা ভাবেই আভাষ দিত যে, গুরুবাদকে বেশি আস্কারা দিলে মানুষের ব্যক্তিত্ব ভোবে, সে হ'য়ে ওঠে ক্লীব। ফলে তার গৃহে অশান্তি উঠত ফেঁপে—কারণ গৌরী ঢিলটি খেলেই পাটকেলটি ফিরিয়ে দিত—আর সে-অশান্তির আঁচ সাবিত্রীকেও দুঃখ দিত—সে শুধু মনে প্রাণে "দিদি"-র ব্যথার ব্যথী ছিল ব'লেই নয়, গুরুবরণ করার পরে গৌরীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা আরো গভীর হয়ে উঠেছিল ব'লেও বটে। শুধু তাই নয়, মন্নুভাই গৌরীকে গুরুবাদের বিরুদ্ধে কিছু বললে গৌরীর বেদনার ছোঁয়াচ তাকে লাগত। "সন্তান এল ব'লে ঘর আলো ক'রে" এই কথা জপ ক'রে চেষ্টা করত সান্ত্বনা পেতে। কিন্তু যখন দেখল মন্নুভাই ক্রমশঃ প্রহ্লাদকেও এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে—যার ফলে প্রহ্লাদের স্নেহপ্রবণ স্পর্শকাতর মন গভীর দুঃখ পাচ্ছে, তখন থেকে থেকে তার চোখের জল বাধা মানত না। কেন তার দেবতুল্য স্বামীকে এত দুঃখ পেতে হ'ল ধর্মের পথে, ভগবানের পথে পা বাড়ানোর জন্যে? এ-পথে কেন এত বেশি কাঁটা বেঁধে পদে পদে—কেন ফুলের সান্ত্বনা হয়ে ওঠে এত বিরল? সে কত প্রার্থনা করত চোখের জলে, কিন্তু কিছুতেই মনে শান্তি পেত না—কেবলই এই একটা কথা নিরন্তরই মনে শেল হয়ে বাজত যে—অমন শিবতুল্য স্নেহময় শ্বশুর কোন্ প্রাণে এক কথায় ওদের মায়া কাটিয়ে গৃহত্যাগী হ'লেন! শুধু নিজেদের দুঃখই তো নয়, তাঁর দুঃখ অনুমান ক'রেও সাবিত্রীর মমতাভরা মনটি ভারি হয়ে উঠত। "প্রহ্লাদ মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে ওকে বলত—দেহু ছেড়ে পুণায় গিয়ে থাকবে। ওর এখন নামডাক এত হয়েছিল যে ও স্বোপার্জিত অর্থে পুণায় গিয়ে বায়সংকোচ ক'রে কোনোমতে নতুন সংসার পাততে পারত। কিন্তু মহাদেব আর যা-ই হোন নীচ ছিলেন না, তাই পুত্রকে ত্যাগ করলেও তাকে অর্থকষ্টে ফেলতে বা গৃহহারা করতে চান নি। এমন কি কলম্বোয় তিনি গান গেয়েও শিখিয়ে যা উপার্জন করতেন তার অর্ধেক মাস মাস পাঠাতেন মন্নুভাইকে মণি-অর্ডারে। তাকে লিখেছিলেন: "বৌমার সন্তান-সম্ভাবনা, খরচ বাড়বেই বাড়বে। যদি দরকার হয় যেন আমাকে জানানো হয় আমি ফী মাসে আরো দু-তিন শো টাকা সহজেই পাঠাতে পারব। এখানে আমার বহু শিষ্য হয়েছে। রেডিওতেও যথেষ্ট টাকা পাই। আমার খরচও কম—আছি বন্ধুর বাড়িতে। সে কিছুতেই মাসে একশো টাকার বেশি নেয় না। কাজেই বৌমার যদি দরকার হয় তো প্রতি মাসে আরো টাকা পাঠানো আমার পক্ষে একটুও কষ্টকর হবে না। আর এ-টাকা যদি বৌমা না নেয় তবে আমি মনে দুঃখ পাব।"

প্রহ্লাদকে সবচেয়ে বাজল বেশি পিতার এই শক্তিশেল। ক্রোধ দুঃসহ হ'লেও সইতে পারা যায়, কিন্তু স্নেহ ও মহত্ব যখন অভিমানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে থাকে তখন মন অশান্ত হয়ে ওঠেই ওঠে—আরো প্রতিকারের কোনো পথ না পেয়ে। তাছাড়া প্রহ্লাদ এ-ও জানত যে, পিতার পাঠানো মাসকাবারি না নিলে সংসার চালানো সম্ভব হ'লেও নানাদিকে ব্যয়সংকোচ করতে হবে—যার ফল ভুগতে হবে সাবিত্রীকেই বেশি। সে চিরদিন সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটিয়েছে রাজার হালে। এখন দেহুতে বা পুণাতে প্রহ্লাদকে কেবলমাত্র নিজের পায়ে দাঁড়াতে হ'লে দাস দাসী কমাতে হবে—আরো অনেক কিছু ছাড়তে হবে, যা হঠাৎ ছাড়তে হ'লে লাগে—বিশেষ গৃহস্থাশ্রমে! এতো কোনো মঠ বা গুহায় বাস নয়—গৃহের নানা দায়িত্ব আছে —আর, বেশির ভাগ দায়িত্ব থেকেই মুক্ত হবার পথ—অর্থ-সঙ্গতি। গৃহস্থাশ্রমকে এ-চোখে সে আগে কোনোদিনই দেখে নি—বলত প্রায়ই মনুভাইকে: "আমরা যে ভাই পর্বতের আড়ালে আছি—ঝড় ঝাপটায় ভয় কি?" সেই পর্বত—আশ্রয়দাতা স্নেহময় পিতা—ছেড়ে গেছেন দুঃখ পেয়ে—আর ছেড়ে গিয়েও শোধ তুলতে চাইছেন না ওদের ভাতে মেরে! প্রহ্লাদ মাঝে মাঝে ভাবত ক্লিষ্ট মনে: কেন এমন হয়? যে-মানুষ স্বভাবে মহৎ সে কেন হয় এমন নিষ্ঠুর অবুঝ? স্নেহময় অক্রুর পিতার হৃদয় হঠাৎ পাষাণ হ'য়ে গেল কেন্ ক্রুর দানবের ছোঁওয়ায়? সহৃদয় বন্ধু মনুভাইই বা কেন অকারণ দিনের পর দিন ওকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়? চেপে ধরলে কবুল করে না, কাষ্ঠহাসি হেসে ঠাট বজায় রেখে জানিয়ে দেয় যা জানাবার। মাঝে মাঝে ভাবে দূর হোক গে—পুণায় গিয়ে বসবাসই পন্থা। কিন্তু দেহুর ইন্দ্রায়ণী নদীর টান কাটায় কী ক'রে—যে নদীতে মহাত্মা তুকারাম স্নান করতে করতে মুখে মুখে বাঁধতেন তাঁর বিখ্যাত গীতাবলী—"অভঙ্গ?" তাছাড়া দিদিকে ছেড়ে যাওয়াও তো সহজ নয়। সে তো শুধু গুরুবোনই নয়—সাক্ষাৎ গুরুবরদাত্রী, তার নির্দেশ ও উৎসাহ না পেলে প্রহ্লাদ কখনই কাশী যেতে ভরসা পেত না। ফলে পিতৃবিচ্ছেদ হয়েছে দুঃখের কথা, কিন্তু অন্যদিকে লাভ হয়েছে গুরুমিলন, একথা মনে হ'তে না হ'তে তখনকার মত ওর অন্তরের দুঃখকুয়াশা কেটে যেত আনন্দের আলোয়, আর হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে উঠত মাতৃসমা দিদির কথা ভেবে। সেও তো আজ কম সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে না। এ-ক্ষেত্রে ওদের আরো কাছাকাছি থাকা চাই। বাইরের জগৎ যখন বিমুখ হয়, তখনই তো অন্তরঙ্গদের সহায়তা এনে দেয় ক্ষতিপূরণ—তাদের আন্তর সমর্থনে—বিশেষ ক'রে গুরুভাই গুরুবোনদের ক্ষেত্রে।

কিন্তু প্রহ্লাদ যতই মনকে বোঝাক না কেন, কিছুতেই ভুলতে পারত না একটা কথা: যে, স্নেহময় পিতা দুঃখ পেয়ে ক্ষুব্ধ হ'য়ে গৃহত্যাগ ক'রে প্রবাসী জীবন যাপন করছেন একলাটি। শুধু স্নেহময় পিতাই তো নয়, ওর গানের শিক্ষার তথা সংযমের গুরুও তো তিনিই। তাঁর সংযত জীবন ও নির্বিচল নিষ্ঠা দেখেই না ও এতদিন সঙ্গীতের সাধনা ক'রে এসেছে ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে, আগ্রহে। বিধাতা কেন এমন বাদ সাধলেন গানের গুরু ও প্রাণের গুরুর মধ্যে এহেন দুস্তর ব্যবধান এনে? কেন ভাগবতী সাধনার আদর্শের পথেও অশান্তি আসে শুধু বিবেকী হওয়ার দরুণ? শিশু যখন ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে তখন তার ক্ষুদ্র দেহাঙ্গের সঙ্গে বর্ধমান দেহাঙ্গের তো কই কোনো বিরোধই ঘটে না? তবে শুধু মনের বিকাশের বেলায়ই বা কেন ঘটবে এ মর্মান্তিক বিরোধ? ছোট মন কেন বড় মনকে জায়গা ছেড়ে দেবে না প্রসন্ন হ'য়ে? ছোট আদর্শ কেন বড় আদর্শের নির্দেশের সামনে মাথা নোয়াবে না হাসিমুখে?

ও ভেবেচিন্তে অশান্ত হ'য়ে গুরুদেবকে করল এ-প্রশ্ন। উত্তরে তিনি লিখলেন: "অন্তর জগতে বড়র সঙ্গে ছোট আদর্শের দ্বন্দ্ব ঘটে অতীতের অভ্যাসকে সংস্কারকে সহজে কাটিয়ে ওঠা যায় না ব'লে। এক সময়ে আমি দেশের জন্যে জেলে গিয়েছিলাম বিপ্লবী হয়ে। বিপ্লবী যখন হই তখন আমার বিধবা মা ও দুটি ছোট ভাইবোনের কথা ভেবে দুর্ভাবনা হ'ত না কি আর? খুবই হ'ত। ভাবতাম আমি জেলে গেলে তাদের অন্নসংস্থান হবে কী ক'রে? কিন্তু তবু কি-একটা দুর্নিবার স্রোত আমাকে ঠেলে নিয়ে চলেছিল বিপ্লবের পথে। ধরা প'ড়ে যখন জেলে গেলাম তখন আপশোষ হ'ত না কি আর মার ও ভাইবোনের মনঃকষ্ট ও অন্নকষ্টের কথা ভেবে? হ'ত পদে পদেই। কিন্তু উপায় কি? শুধু আত্মীয় স্বজনের

সেবার কথাই যদি ভাবি, ঘরই যদি সবার বড় হয়ে ওঠে, তাহ'লে ঘরের চেয়েও বড় দেশের সেবা করব কেমন করে? সেইখানেই আমি প্রথম ধ্যানধারণা আরম্ভ করি। একদিন ধ্যানে হঠাৎ দেখলাম আমার চেতনা হু হু ক'রে উপরে উঠছে মাটির নাগালের বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল কে আমি? শুধু কি মা-র ছেলে, ভাইবোনের অভিভাবক? আমি যে জন্মমুক্ত। অমনি অদেখা গুরুর জ্যোতির্ময় মূর্তি এল সামনে। সে কী আনন্দ! লাভ হ'ল মহাগুরু। দীক্ষা পেলাম—বিষাদ কেটে গেল। [ক্রমশঃ]

অথ রাষ্ট্র-কথা

সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের প্রাচীন সমাজে কোন শৃঙ্খলা ছিল না, একথা বললে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হবে। প্রাচীন সমাজেও ছিল বাসিলেয়ুস বা উত্তরাধিকার সূত্রে নির্বাচিত সামন্ত সর্দার শ্রেণী। এছাড়া প্রাচীন গ্রীক সমাজে ছিল আগোরা বা পরিষদ ইত্যাদি। আরিষ্টোটল বলেছেন রাষ্ট্রসৃষ্টির আগের যুগে যে সব সমিতি বা পরিষদ ছিল তার ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মানুষের সমাজে তখন যেটুকু শৃঙ্খলা ছিল তার সৃষ্টি হয়েছিল কার্লমার্ক্স এর কথায় প্রয়োজনের তাগিদে, মানুষের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যে আর তার স্বার্থপরতার উপকরণ যোগাতে। এ যুগে মানুষ যেসব নিয়মকানুন মেনে চলতো তা রাষ্ট্রের ভয়ে নয়—আত্মরক্ষার তাগিদে।

কালক্রমে যখন গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল—যখন পরিবার ব্যবস্থা স্থান নিল গোষ্ঠীর—তখন ধীরে ধীরে আগমনবার্তা সূচিত হল রাষ্ট্রের। গোষ্ঠীর স্থানে এলো রাষ্ট্র। এতকাল ছিল সমাজের সমস্ত লোক সশস্ত্র হয়ে সমাজ রক্ষা করবে আর অন্য গোষ্ঠীর সম্পত্তি বলপ্রয়োগে কেড়ে নেবে—এই ব্যবস্থা। এর স্থানে ক্রমশ এলো এক সশস্ত্র সাধারণ শক্তি বিশেষ—এই শক্তিরই নাম রাষ্ট্রীয়শক্তি বা রাষ্ট্র। এই সুসংবদ্ধ সশস্ত্র শক্তি কেবলমাত্র বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে সমাজকে রক্ষার কাজই করতো না—সমাজের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার দায়িত্বও নিতে হল একে। মানুষ যেদিন থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখতে শিখলো সেইদিন থেকেই দরকার হল এক পুলিশি ক্ষমতার যার কাজ পাহারাদেওয়ার আর শান্তিরক্ষা করবার। একের সম্পত্তিতে বা একের অধিকারে অপরে যাতে, হস্তক্ষেপ না করে সেই দিকে দৃষ্টি রাখবার জন্যই প্রয়োজন অনুভূত হল এক ক্ষমতার—সেই ক্ষমতাই রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হল।

সমাজের থেকেই উদ্ভূত হল রাষ্ট্র, কিন্তু শীঘ্রই সমাজ হ'ল রাষ্ট্রানুগত। প্রথম দিকে এর কাজ ছিল শুধু অত্যাচার করা আর দমন করা। এইভাবে সূত্রপাত হল রাষ্ট্রের।

অনেক পণ্ডিত আবার রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য ধরণের মত পোষণ করেন। আসলে রাষ্ট্রের কি ভাবে উৎপত্তি হল আর কি-ই বা তার কাজ এ বিষয়ে পৌর-দার্শনিক বা পলিটিকাল ফিলজফাররা একমত কখনও হন নি।

প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের রাষ্ট্রের উৎপত্তির যে ধারণা ছিল তার কিছু পরিচয় আমরা পাই মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মের বর্ণনার মধ্যে। সত্যযুগে রাষ্ট্র বা রাজা কিছুই ছিল না—দোষও ছিল না তখন, দোষীও ছিল না। শান্তি আর সুখই ছিল তখন সমাজজীবনের সব। এই সব সমাজ বা গোষ্ঠীগুলোকে বলা হত 'জন'। কালক্রমে 'জন'গুলোর ভিতর প্রবেশ করলো পাপ। সমষ্টিগত সম্পত্তি ভোগাধিকারের স্থান নিল ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা—সুরু হ'ল অশান্তি—সৃষ্টি হল রাষ্ট্র।

আগেই বলেছি রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে—আছে হাজারো মত। এদের মধ্যে প্রধানগুলোর আলোচনা সংক্ষেপে করবো।

কারু কারু মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে আছে ক্ষমতা। মানুষ তার প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপাদন করতে গিয়ে দেখলো যে সবাইকার শক্তি বা সামর্থ্য সমান নয়। ক্রমশ অধিক সামর্থ্যশালী লোকদের হাতে সঞ্চিত হ'ল অধিকাংশের তুলনায় অনেক বেশী অর্থ আর প্রতিপত্তি। এই শ্রেণী দমন নীতির আশ্রয় নিল এই জন্য, যাতে সমাজের মধ্যে শ্রেণী সংঘাত না বাধে অথবা যাতে তাদের নিজেদের স্বার্থ বজায় থাকে।

এছাড়া আছে আরো অনেক অনেক মতবাদ—যেমন স্বর্গীয় উৎপত্তির মতবাদ, জীবদেহের মত উৎপত্তির মতবাদ বা Organic theory, সামাজিক চুক্তির মতবাদ বা Social Contract theory, এবং ঐতিহাসিক উৎপত্তির বা বিবর্তনবাদী উৎপত্তির মতবাদ বা Historical বা evolutionary theories প্রথমোক্ত মতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে ভগবানের ইচ্ছায়, জৈবিক মতে রাষ্ট্র হচ্ছে জীবদেহের মত—বাইরের বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করেছে এক চেহারা, আর এই সব উপাদানের উপর এর যে প্রভাব তাই হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রাণ বা আত্মা।

সামাজিক চুক্তিমতবাদ বলে যে আধুনিক রাষ্ট্র সৃষ্টি হবার আগে ছিল এক প্রাকৃতিক রাষ্ট্র বা State of nature —এই ষ্টেট অব্ নেচারের স্বরূপ কিরকম ছিল তা নিয়ে মতভেদের শেষ নেই। টমাস্ হবস্ বলে সুবিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক বলেছেন যে প্রাকৃতিক রাষ্ট্রে ছিল শুধুই বিশৃঙ্খলা। লোকের জীবন ছিল ক্ষণস্থায়ী, নোংরা—পশুর মত। লোকে কেবল ঝগড়া মারামারি করতো। ক্ষমতাই ছিল আইন। যার গায়ে জোর যত বেশী, সেই বেশী সুবিধে ভোগ করতো।

এই নারকীয় পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার জন্য মানুষ বাধ্য হ'ল চুক্তিবদ্ধ হতে। এই চুক্তি অনুযায়ী সমাজের সমস্ত লোক পরস্পরের সংগে পরামর্শ করে ঠিক করলো যে তারা তাদের সব অধিকার কোন ব্যক্তিবিশেষকে বা কোন ব্যক্তিসংসদকে সমর্পণ করবে। এইভাবে স্বাক্ষরিত হল চুক্তি। সৃষ্টি হ'ল রাষ্ট্রের।

হবস্ যে সময় তার বই লেভিয়াথন লিখেছিল সে সময় ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন প্রথম জেমস্। হবস্ ছিলেন তাঁর শিক্ষক। কাজেই ছাত্রের মনোমত করে তিনি তাঁর মতবাদ প্রকাশ করলেন। হবসের চুক্তি অনুযায়ী সাধারণ লোকেরাই চুক্তি করেছিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে—রাজা লোকেদের সংগে কোনো চুক্তি করেন নি। কাজেই চুক্তির প্রকৃতি অনুসারে রাজার শুধু প্রজাদের উপর ছিল একচেটিয়া শাসন করার অধিকার। তবে যেহেতু জনসাধারণ তাদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল সেইজন্য রাজা কেবল তাদের এমন নির্দেশ দিতে পারবে না, যাতে তাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে।

যাই হোক হবসের কিছু পরে সপ্তদশ শতকের ইংলণ্ডেই জন লক্ বলে এক দার্শনিক বললেন যে রাষ্ট্রের উৎপত্তির আগে ষ্টেট অব্ নেচার ছিল বটে, কিন্তু সেই অবস্থার যে চিত্র হবস্ এঁকেছেন তা মিথ্যা। প্রকৃতির রাষ্ট্র মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছিল না। সেখানে ছিল সাম্য, শান্তি আর স্বাধীনতা। মানুষ যে কোন নিয়মই মেনে চলতো না—সেকথা ঠিক নয়। প্রাকৃতিক কিছু আইন তারা মানত। ফলে সমাজে ছিল নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। কিন্তু তবুও ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে মানুষের সম্পত্তির নিরাপত্তা দরকার হোলো—প্রয়োজন হ'ল এমন এক শক্তির যার কাজ হবে এই নিরাপত্তা রক্ষা। কাজেই মানুষ চুক্তিবদ্ধ হ'ল—এক ব্যক্তি বিশেষ বা এক ব্যক্তি সংস্থার সংগে। এই চুক্তির সর্ত অনুযায়ী ব্যক্তিসংস্থার কাজ হ'ল জনসাধারণের জীবন, স্বাধীনতা আর সম্পত্তি রক্ষা করা। জনসাধারণ তাদের প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অধিকারের কিছু অংশ ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু রাষ্ট্র বাধ্য রইল তার দায়িত্বপালনে। রাজা বা রাষ্ট্র তার দায়িত্বপালন না করতে পারলে তার পরিবর্তনের অধিকার রইলো জনসাধারণের হাতে।

লক যখন লিখলো তখন ইংলণ্ডে রাজা প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড হয়েছে আর ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে স্থাপিত হয়েছে সাধারণ-তন্ত্র। কাজেই লক্ সেই ব্যবস্থার উপযোগী করে লিখলেন তার ট্রিটিজ্ অন্ সিভিল গভর্ণমেণ্ট।

সামাজিক চুক্তির ফলেই যে উদ্ভুত হয়েছে রাষ্ট্র, এই মতবাদের সবচেয়ে প্রখ্যাত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রুশো। জেনেভায় এঁর জন্ম হ'লেও ইনি ছিলেন মনে প্রাণে ফরাসি—এঁকে তাই ফরাসি দার্শনিকদের পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়। রুশোও বলেন যে রাষ্ট্রের উৎপত্তির আগে পৃথিবীতে

ছিল প্রাকৃতিক অবস্থা। সেই অবস্থা ছিল মর্ত্যের স্বর্গ। সেখানে রাজা ছিল না, প্রজা ছিল না—ছিল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। শান্তি আর অপার আনন্দের মধ্যে সুখে কেটে যেত মানুষের জীবন। কিন্তু কালক্রমে লোকসংখ্যা বাড়তে লাগলো। সমাজের মধ্যে ঢুকলো ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সম্পত্তিরক্ষার জন্য স্বার্থপরতা, জীবনে দেখা দিল জটিলতা। ফলে মানুষ চুক্তিবদ্ধ হ'ল—প্রাকৃতিক স্বাধীনতার স্থান নিল রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা। রুশোর মতে ব্যক্তিগত ক্ষমতায় মানুষ সমস্ত সমাজের সমষ্টিগত স্বত্তার সংগে চুক্তিবদ্ধ হল অর্থাৎ ক, খ, গ, ঘ, প্রভৃতি লোকেরা ক+খ+গ+ঘ প্রভৃতির সংগে চুক্তি করলো যে ক+খ+গ+ঘ প্রভৃতির সমবেত ইচ্ছাই হবে সমাজের সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। এই শক্তির নাম দিলেন রুশো—'জেনারল উইল' (general will)—এই জেনারল উইল-ই রাষ্ট্র।

হব্‌স্ আর রুশোর মধ্যে একটা বিষয়ে মিল লক্ষ্য করা যায়। দুজনেই বলেছেন, রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী —আর এই সার্বভৌম ক্ষমতা কখনও ভাগ করা যায় না— এ অচ্ছেদ্য, অবিভাজ্য। তবে হব্‌স বলেছেন যে এই ক্ষমতা আছে রাজার—আর রুশো বলেছেন এই ক্ষমতার অধিকারী সাধারণ লোকেরা। আর লক্ তো বলেছেন যে রাজা চলবে সাধারণের ইচ্ছানুযায়ী অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনসাধারণই—রাজা শুধু তার দায়িত্ব পালন করবে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও যে সব মতবাদ রয়েছে তার মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ এবং ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ উল্লেখযোগ্য।

স্যার হেনরী মেইন প্রভৃতি পণ্ডিতরা বলেছেন যে প্রাচীন সমাজে পরিবারের কর্তা ছিল পিতা। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হয়েছিল বংশ; কতকগুলো বংশ মিলে গঠিত হয় উপদল, আর কতকগুলো উপদল মিলিত হয়ে সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রের!

মরগ্যান, জেংকস, রাহুল সংকৃত্যায়ন প্রভৃতি পণ্ডিতরা বলেন—আদিম সমাজে মাতাই ছিল পরিবারের কর্ত্রী। মাতাকে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত হয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্র।

ঐতিহাসিক মতবাদই হচ্ছে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মোটামুটি আধুনিক মতবাদ। ম্যাক্স ষ্টারণার কার্লমার্ক্‌স্ প্রভৃতি দার্শনিকরা মোটামুটিভাবে এই মতের সমর্থক। এই মত বলে যে রাষ্ট্র হচ্ছে ইতিহাসের ধারার স্বাভাবিক পরিণতি। মানুষের অপরিণত সমাজব্যবস্থা সময়ের অগ্রগমনের সংগে সংগে এবং অবস্থার চাপে পরে রাষ্ট্রে পরিণতি লাভ করেছে। ইতিহাস বিবর্তিত হয়েছে যুগ যুগ ধরে। রাষ্ট্র এই বিবর্তনের ফল।

যে সব উপাদান এই বিবর্তনে সাহায্য করেছে তাহ'ল রক্তের সম্বন্ধ, ধর্ম আর সামাজিক সচেতনতা।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত এই সব মতবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই সব মতের কোনটাই পুরোপুরি ঠিক নয়; আবার পুরোপুরি মিথ্যেও কোনটা নয়। রাষ্ট্র ঈশ্বরের তৈরী, কাজেই ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে রাজা যা খুসি তাই করবার অধিকারী—একথা যুক্তি দিয়ে মানা যায় না—অথচ অনেকটা এই মতের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী যুগে জার্মান দার্শনিক হেগেল তাঁর রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় 'রাষ্ট্রই আদর্শ' বা রাষ্ট্রই সর্বশ্রেষ্ঠ বা 'রাষ্ট্রই ভগবান্'—এই মতবাদ সৃষ্টি করেছেন। হেগেল বলেছেন যে রাষ্ট্র হচ্ছে যুক্তির চূড়ান্ত বাস্তবতা বা Image or reality of reason. রাষ্ট্রই মানুষের আদর্শের চরম আর পরম অভিব্যক্তি। হেগেল বলেছেন, রাষ্ট্রের আওতায়ই সভ্যজীবন সম্ভব হয়েছে। বাস্তব প্রয়োজন তৈরী করেছে পরিবার বা সমাজ জীবন— আর এই প্রয়োজন সার্থকতা লাভ করেছে রাষ্ট্রে। রাষ্ট্র হচ্ছে ক্ষমতা—একটা জাতির সমবেত ইচ্ছার প্রকাশ। হেগেলের মতে এই 'জাতীয় রাষ্ট্র' বা 'National state' গুলোই হচ্ছে সভ্যতার আধ্যাত্মিক বা যুক্তিবাদের সার্থক প্রকাশ। হেগেলীয় রাষ্ট্র হল বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তির চরমতম প্রকাশ,ঐশ্বরিক,চিরন্তন,পৃথিবীর বুকে ভগবানের জয়যাত্রা।

হেগেলের কিছুদিন আগে ইমানুয়েল কান্ট বলে একজন জার্মান দার্শনিকও বলেছিলেন যে মানুষের সমস্ত কাজের মূল সূত্র হ'ল সমস্ত জিনিষ যুক্তি দিয়ে বোঝা। এই বিশুদ্ধ যুক্তির চাহিদাকে কান্ট বলেছেন 'ক্যাটেগরিকাল ইমপারেটিভ্'—(Categorical Imperative.) এই হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্র পুরোপুরি যুক্তিবাদ। রাষ্ট্রের অভিপ্রায়ের বহিঃপ্রকাশ হয় আইন দিয়ে। এইভাবে কান্ট তাঁর দর্শনশাস্ত্র নিয়ে এগিয়ে গেছেন, কিন্তু ক্রমশঃই তিনি হয়ে উঠেছেন দুর্বোধ্য।

হেগেল কিন্তু দর্শন থেকে নেমে এসেছেন বাস্তবে—তিনি বলেছেন যে ইতিহাস ক্রমাগতই তার পাতা খুলে চলেছে অত্যন্ত সুসংগতভাবে। প্রত্যেক পাতাতেই অর্থাৎ প্রতি যুগেরই আছে বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য। মানব সভ্যতার অগ্রগতি হচ্ছে কতকগুলো বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী—এই নিয়মগুলোকেই বলা হয় "ঐতিহাসিক প্রয়োজন"। আবার ইতিহাসের গতিপথেও লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন ধরণের বিপরীতধর্মী নিয়মাবলী। এই সব বিপরীত ধর্মীয় প্রভাবের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই এগিয়ে চলেছে মানুষের সভ্যতা। যেমন ধরা যাক কোন একটা নিয়ম পৃথিবীতে ছিল—যথা সামন্ত-তন্ত্র বা ফিউড্যালিজম্। পৃথিবীর ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বেশ কিছুকাল ধরে এই প্রথা মানুষের উপকারে লেগেছে, তার অগ্রগতির পথে সহায়ক হয়েছে। এই প্রথম অবস্থাকে হেগেল বলেছেন থিসিস্। কালক্রমে দেখা গেল এই প্রথার অনেক দোষ রয়েছে—এর পরিবর্তন দরকার। কাজেই এই প্রথার দোষ দেখিয়ে এর পরিবর্তনের চেষ্টা করতে লাগলো মানুষ—এই অবস্থাকে হেগেল বললে 'এ্যান্টি-থিসিস্'। অবশেষে এই ঘাত প্রতিঘাতের পরিণতি—হল এক সমন্বয়ে—পুরোনো প্রথা নূতন প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্কৃত হল—এই অবস্থা হেগেলীয় সিন্‌থেসিস্—এই সিন্‌থেসিস্—আবার থিসিস্ হয়—এই ভাবে এগিয়ে চলেছে মানুষের সভ্যতা—আর হেগেলের মতে রাষ্ট্রই হচ্ছে এই সভ্যতার সর্বোত্তম প্রকাশ। এই যে নিয়ম, একে বলা হয় ডায়ালেক্‌টিক্ পদ্ধতি। হেগেলের পরবর্তীকালের দার্শনিক আর পৌরবিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতি অনুসারেই তাদের বক্তব্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। এইভাবে আলোচনা করে দেখানো যায় যে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ঐশ্বরিক মতবাদ থেকেই পরিণতি লাভ হচ্ছে মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদের। মাঝখানের সেতু তৈরী করেছে হবস্, রুশো, হেগেল, ফিক্‌টে, কাণ্ট প্রভৃতি দার্শনিক।

আধুনিক পৌরদার্শনিকরা মার্ক্সের বিশ্লেষণ অনুযায়ী প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে শ্রেণী সংঘাতের ফলে। খুব প্রাচীনকালে কোন রাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু ক্রমশঃ সমাজে এল অর্থনৈতিক প্রয়োজন। অর্থনীতিই নির্ধারণ করতে লাগলো সমাজের গতি প্রকৃতি। প্রাচীন কাল থেকে লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে মানুষের সমাজে উৎপাদনের নিয়ম অনুযায়ী সব সময়ই দুটো শ্রেণী থেকেছে—একটা শ্রেণী কাজ করেছে, আর অপর একটা শ্রেণী করেছে সেই পরিশ্রমের ফলভোগ। এই শাসক শ্রেণীই গঠন করেছে রাষ্ট্র, আর পরিচালনা করেছে তার সরকার। যখন শাসক শ্রেণীর অত্যাচার চরমে উঠেছে তখনই শাসিত সম্প্রদায় ঘোষণা করেছে বিদ্রোহ, অবসান হয়েছে শাসক সম্প্রদায়ের আধিপত্য। যেমন ফিউডাল যুগে শাসক সম্প্রদায় বলতে বোঝাতো রাজা ও ব্যারণদের। আর ভিলেন বা ভুমিদাসরা ছিল শাসিত সম্প্রদায়। ফিউডাল লর্ডদের অত্যাচার যখন চরমে পৌঁছল তখন শাসিতদের একটা সম্প্রদায় যাদের বর্তমান নাম বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত ধনিক সম্প্রদায়—তারা বিপ্লব আনলো সমাজে—সুরু হল ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার। এই ব্যবস্থায়ও রয়েছে দুটো শ্রেণী—ধনিকশ্রেণী শাসক, আর শ্রমিকশ্রেণী শাসিত। ইতিহাসের নিয়ম অনুযায়ী এই শাসিত শ্রমিক সম্প্রদায় করবে বিপ্লব—এই বিপ্লবের শেষ পরিণতি হিসেবে পৃথিবী থেকে রাষ্ট্র অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

যাইহোক্ এই সব মতবাদ রয়েছে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে। পৃথিবীতে ঐতিহাসিক যুগ সুরু হয়েছে আসলে রাষ্ট্রকেই কেন্দ্র করে। অবশ্য ইতিহাস বলতে শুধু রাষ্ট্রের রোজনামচাই বোঝায় না—রাষ্ট্রের কথা ছাড়া ইতিহাস আরও অনেক কথা বলে। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটেছে সবই ইতিহাসের বিষয় বস্তু। মানুষের সভ্যতার সামগ্রিক রূপ প্রকাশ করে ইতিহাস। আর সুসংবদ্ধ ভাবে এই রূপ প্রকাশের প্রয়াস সম্ভব রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে।

যাইহোক ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে যে রাষ্ট্রের উদ্ভব হ'ল তার স্বরূপ, উপাদান এবং কার্য্যাবলীর সম্বন্ধেও মতভেদের অন্ত নেই।

রাষ্ট্র কি ? এই প্রশ্নের উত্তর এক একজন পৌরবিজ্ঞানী দিয়েছেন এক এক ভাবে। আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন বলেন যে রাষ্ট্র এক বিশেষ জায়গায় আইন

অনুসারে সংগঠিত সংস্থা। অধ্যাপক গার্ণার বলেছেন, যেখানে জনসমাজ একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করছে, যে সমাজের উপর বাইরের কোন শক্তির নিয়ন্ত্রণ নেই, এবং যেখানে এমন একটা সংগঠিত শাসন ব্যবস্থা আছে যার প্রতি জনসাধারণ স্বভাবতঃই আনুগত্য স্বীকার করে—তাকেই বলা যায় রাষ্ট্র।—এই সব সংজ্ঞা থেকে কি কি উপাদান রাষ্ট্র গঠন করে তার ধারণা পাওয়া যায়। রাষ্ট্র তৈরী করতে দরকার জনসংখ্যার—লোক না থাকলে রাষ্ট্র তৈরী করবে কে? এছাড়া চাই ভূমি। রাষ্ট্রের নিজস্ব ভূমি থাকতে হবে। জনসংখ্যা আর ভূমি ছাড়া আরও দুটো উপাদান রাষ্ট্র গঠনের জন্য দরকার—তাদের একটা হল সরকার। রাষ্ট্র হচ্ছে একটা মূর্তিহীন ধারণা। এই ধারণার বাস্তব প্রতিফলন ঘটায় সরকার। সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রের কর্মকর্তা—যার মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রকাশ করে তার মতামত, আর সেইগুলো পরিণত করে কাজে। সবশেষে, রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব হচ্ছে চরম ক্ষমতা। রাষ্ট্রের ক্ষমতাই চরম ক্ষমতা। তা বাইরের সমস্ত নিয়ন্ত্রণের প্রভাব থেকে মুক্ত, আর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের সমস্ত লোক বা সমস্ত সংস্থা সেই ক্ষমতার কাছে করে নতিস্বীকার।

রাষ্ট্রের কাজ কি হওয়া উচিত এ সম্বন্ধেও মতভেদের অন্ত নেই। তবে প্রধানতঃ দুটো মতবাদই আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত মেনে নেওয়া হয়েছে। একদল পণ্ডিত বলেন যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা যত কমান যায় ততই ভাল। এরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী। রাষ্ট্র যদি জনসাধারণের জীবনের সব কাজেই হস্তক্ষেপ করে তাহলে ব্যক্তি স্বাধীনতা হবে সঙ্কুচিত। এই মতবাদকে Laissez Faire বা অবাধ স্বাধীনতার নীতিও বলা যায়। আধুনিক কালে এই মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক-দের মধ্যে জেমস্ মিল, বেন্থাম্, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, টি, এইচ্, গ্রীণ, হ্যারল্ড, ল্যাস্কি, হার্বার্ট স্পেন্সার, অ্যাডাম্ স্মিথ প্রভৃতি ইংরাজ আদর্শবাদীদের নাম উল্লেখযোগ্য। ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে রাষ্ট্রের ঠিক সেইদিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত, যে কাজ করলে দেশের অধিকাংশ লোকের সর্বাধিক উপকার বা মংগল সাধিত হবে। ল্যাস্কি বলছেন দেশের বিভিন্ন সংস্থার মত রাষ্ট্রও একটা সংস্থা—সুতরাং বিভিন্ন সংস্থার সদস্যগণের উপরই যেমন সংস্থার ভাগ্য নির্ভর করে তেমনি রাষ্ট্রও পুরোপুরি নির্ভরশীল দেশের জনসাধারণের উপর—জনগণই নির্ধারণ করবে রাষ্ট্রের ভাগ্য—রাষ্ট্র জনগণের ভাগ্য নির্ধারণ করবে না।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ছাড়া রাষ্ট্রের কাজ সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রাধান্যলাভ করেছে তা হ'ল সমাজতন্ত্রবাদ। সমাজতন্ত্রবাদের মূল ধারণা এই যে ব্যক্তির মংগল ও সামাজিক প্রগতির জন্য রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ খুবই প্রয়োজন। আধুনিককালে রাষ্ট্রের গতি সমাজতন্ত্রবাদের দিকে। আধুনিক রাষ্ট্রের প্রবণতা হচ্ছে জীবন নিয়ন্ত্রণকারী—কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উৎকর্ষসাধন করে জনসাধারণের জীবনের মান উন্নয়নের দিকে।

আধুনিক রাষ্ট্রের প্রকৃতি কি? এই প্রশ্নের উত্তরও এক একজন পণ্ডিত দিয়েছেন এক এক রকম ভাবে। সব-চেয়ে সুসংগতভাবে এই প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন আলডুস্ হাক্সলী তাঁর 'আধুনিক রাষ্ট্রের প্রকৃতি নামে, প্রবন্ধে। তিনি দেখিয়েছেন যে আধুনিক রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান হচ্ছে দুটো—একদল লোক শাসনকর্তা—এদের সংখ্যা খুবই কম—আর একদল লোক শাসিত—এদের সংখ্যা অনেক। শাসক সম্প্রদায় ক্ষমতাপ্রিয়। তবে কিছু কিছু কর্তব্য পালনেও তারা পরাঙ্মুখ নয়। গর্বই তাদের একমাত্র ভূষণ—আর এই গর্বের জয়মাল্য লাভ করবার জন্য তাঁরা নিষ্ঠুর হতেও কুণ্ঠিত নন। শাসিত শ্রেণী প্রায় সব ক্ষেত্রেই নতি স্বীকার করে নেয়। মধ্যে মধ্যে অবশ্য তারা বিপ্লব ঘোষণা করে—তবে সাধারণতঃ তারা অনুগত।

যাইহোক রাষ্ট্রের প্রকৃত বিশ্লেষণ করা উচিত মন-স্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিভংগি থেকে। এই দৃষ্টিভংগি দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে মানুষ যে সমাজ চায় সেই সমাজ হবে হিংসা, লোভ আর ক্ষমতাপ্রিয়তার হাত থেকে মুক্ত। রাষ্ট্র এমন হতে হবে যেখানে ক্ষমতার লোভ থাকবে না, শাসকদের মতে শাসিতরাও হবে না অলস। আধুনিক রাষ্ট্রের প্রকৃতি হবে এমন, যেখানে মানুষের স্বাধীন চিন্তার পূর্ণ অভিব্যক্তির পথে কোন বাধা থাকবে না—আর নৈতিক বলে বলীয়ান্, বুদ্ধিমান্, বিশেষজ্ঞ, আদর্শবাদী মানুষ একপ্রাণ একমন হয়ে সমগ্র মানব সমাজের উন্নতির চেষ্টা করবে সমবেত ভাবে। যে রাষ্ট্রে এই সব ব্যবস্থা করে দেবার পূর্ণ সুযোগ থাকবে তাই হবে সর্বাধুনিক রাষ্ট্র। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন এই আদর্শের দিকেই চালিয়ে নিয়ে চলেছে রাষ্ট্রকে।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

১৬
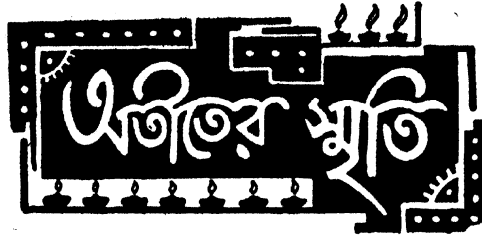
খৃষ্টীয় উনবিংশ-শতকের প্রথমার্দ্ধে বাঙলাদেশের সহর ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, ভদ্র-ইতর সকল শ্রেণীর লোকজনের মনে যাত্রাভিনয়ের সখ যে ক্রমশঃ কতখানি ব্যাপকতা লাভ করেছিল, সেকালের পুরোনো সংবাদপত্রে তারও অনেক নজীর মেলে। তবে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের চেয়ে সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা-নদীমাতৃকা বাঙলাদেশের লোকজনের রসানুরাগ, ভাবাতিশয্য আর নিত্য-নূতনত্বের আস্বাদ-আকাঙ্খা চির-প্রসিদ্ধ...কাজেই সুদীর্ঘকাল ধরে একটানা শুধু পেশাদারী আর সৌখিন যাত্রার দলের বিভিন্ন পৌরাণিক গীতি-নাট্যের পালাভিনয় দেখেই তখনকার আমলের এদেশী-দর্শকদের মন ভরতো না। উপরন্তু সে-যুগের সাম্রাজ্য-প্রসারী বিদেশী ইউরোপীয়-সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক-রীতি অনুকরণে, সদ্য-প্রবর্ত্তিত ইংরাজী-শিক্ষার আলোকে উদ্ভাবিত এদেশের নব্য-শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত-অভিজাত বিলাসী-সৌখিন তরুণ-দলের অনেকেরই বিশেষ ঝোঁক হয়েছিল—বিলাতী-কেতায় কলেজের উঠানে, বাড়ীর ঠাকুর-দালানে মাচা বেঁধে ছোট-বড় নানা-ছাঁদের রঙ্গমঞ্চ বানিয়ে, রঙচঙে দৃশ্যপট আর সাজপোষাক ব্যবহার করে, ঝাড়-লণ্ঠন-থাশ্‌গেলাস-বাতির রোশনিতে চোখ-ধাঁধানো মরীচিকা-মায়ার বিচিত্র-আসর সাজিয়ে সাড়ম্বরে দেশী-বিদেশী ভাষায় রচিত রকমারী নাটকের অভিনয়-চাতুর্য্য দেখাবেন। সেকালের দেশী ও বিলাতী সমাজের লোকজনের এই অভিনব নাট্যানুরাগের যে সব বিচিত্র বিবরণ পাওয়া যায় প্রাচীন সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায়...একালের অনুসন্ধিৎসু-পাঠকপাঠিকাদের কৌতূহল-নিবারণের উদ্দেশ্যে, আপাততঃ তার কয়েকটি চিত্তাকর্ষক-নমুনা সঙ্কলন করে দেওয়া হলো।

এদেশে বিলাতী-কেতায় পাকাপাকিভাবে রঙ্গালয় গড়ে তুলে মঞ্চে নাটকাভিনয়ের সূত্রপাত—খৃষ্টীয় অষ্টাদশ-শতকের শেষার্দ্ধকাল থেকে...তখনকার দিনে রঙ্গালয়ে ছোট-বড় নানা ধরণের যে সব বিদেশী-নাটকের পালা অভিনয় হতো, সেগুলির মূল-উদ্দেশ্য ছিল ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয়দের মনোরঞ্জন করা। তবে সেকালের এ সব বিলাতী-রঙ্গালয়ের অভিনয়-আসরে ইউরোপীয় কেতানু-সরণকারী নব্য-শিক্ষিত বিত্তশালী-সৌখিন এদেশী রসিকজনেরাও ক্রমশঃ ভীড় জমাতে সুরু করেছিলেন—সদ্য-প্রবর্ত্তিত বৈদেশিক নাট্যলীলা-সংস্কৃতির অপরূপ রসাস্বাদনের আগ্রহে। সেকালের বিলাতী রঙ্গালয়গুলির মধ্যে 'চৌরঙ্গী থিয়েটার', 'বৈঠকখানা থিয়েটার' প্রভৃতি রঙ্গালয়গুলি কাল-ক্রমে রীতিমত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল—প্রাচীন সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন খবর ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তারও সুস্পষ্ট-পরিচয় পাওয়া যায়। তখনকার আমলের বিলাতী-রঙ্গালয়ে প্রবেশ-পত্রের দাম ছিল চড়া এবং টিকিটের মূল্য

ঢুকিয়ে দিতে হতো হাতে-হাতেই···ধারে কারবারের রেওয়াজ বন্ধ হয়েছিল সমসাময়িক সংবাদপত্রে নানা রকমের বিজ্ঞাপনজারী করে। কাজেই বিত্তশালী-সৌখিন অভিজাত-সম্প্রদায়ের লোকজন ছাড়া সাধারণের পক্ষে এ সব অভিনয়-আসরে দর্শকের আসন গ্রহণ করা সেকালে রীতিমতই দুঃসাধ্য-ব্যয়বহুল ব্যাপার অনুমিত হতো। সে-যুগে রঙ্গালয়ে নাটকাভিনয়ের পালা সুরু হতো—ইংরাজের হাতে-গড়া কলিকাতা সহরের বুকে দিনের আলো মিলিয়ে যাবার পর সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসার সঙ্গেসঙ্গেই। তখনকার দিনে বিলাতী-রঙ্গালয়ে বিভিন্ন নাটকের পালা অভিনয়কালে শুধু পেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রীবর্গই নন, বহু সময়েই নৃত্য-গীত-বাদ্য ও নাট্য-লীলা-পারদর্শী বহু সৌখিন-শিল্পীরাও বিচিত্র-রূপসজ্জা ধারণ করে পাদপ্রদীপের সামনে এসে মনোমুগ্ধকর অভিনয়-চাতুর্য্যে সমবেত দর্শকদের মাতিয়ে তুলতেন। তাছাড়া দর্শকদের মহলে টিকিট বেচে সদাসর্ব্বদা লাভের কড়ি রোজগার করাই শুধু সেকালের রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠানগুলির মূল-উদ্দেশ্য ছিল না···বরং নানারকম লোকহিতকর-কাজে সহায়তাকল্পে তাঁরা নাটকাভিনয়ের আয়োজন করে মাঝে মাঝে প্রচুর টাকা তুলে দেবারও ব্যবস্থা করতেন। নিছক আনন্দ-পরিবেশন ছাড়াও এমনি সব জনকল্যাণকর কাজে লিপ্ত থাকার ফলেই, সেকালের রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠানগুলি কালে-কালে দেশের দেশী-বিলাতী সম্প্রদায়ের লোকজনের কাছে রীতিমত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

*   *   *   *

(ক্যালকাটা গেজেট, ৬ই মে, ১৭৯০)

The Calcutta Theatre is not an object of equal criticism···In the late performance of the Revenge, the representative of Alonzo appeared to us alone entitled to the eulogium due to eminence, and the well known talents of Mr. P. render it unnecessary to say more···than that he···exhibited the character he now assumed with the same success as he did that of Zanga on a former occasion···To the remainder, we can only return our thanks for their desire to entertain us.

*   *   *   *   *

(ক্যালকাটা গেজেট, ১লা মার্চ্চ, ১৮২৪)

Chowringhee Theatre.—On Friday last Macbeth was repeated, and the representation

সেকালের বিলাতী-রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-দৃশ্য (প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি)

was, in many respects superior to the last. The character of Macbeth was again admirable, and the musical part conducted with the finest effect. The GOVERNOR GENERAL and Lady AMHERST honoured the Theatre with their presence.

* * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ৩০শে জানুয়ারী, ১৮২৬)

Advertisments.

CHOWRINGHEE THEATRE
ON FRIDAY, FEBRUARY 3d.
WILL BE PERFORMED

The Honey Moon

Tickets to be had at the Theatre, and at the HURKARU LIBRARY.

* * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮২৬)

CHOWRINGHEE THEATRE
ON THURSDAY, FEBRUARY 23d
WILL BE PERFORMED

THE OLD MAID

AND

HIGH LIFE BELOW STAIRS

Tickets to be had at the Theatre, and at the HAUKARU LIBRARY.

* * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ৬ই নভেম্বর, ১৮২৬)

CHOWRINGHEE THEATRE
ON FRIDAY NEXT, the 10th Instant
WILL BE PERFORMED

THE COMEDY
OF
"THE WHEEL of FORTUNE"

Doors to open at ¼ past 6, and the perforance to begin at 7 o'clock,

PRICE OF TICKETS
Box Tickets.—.8—Pit Tickets—4.

* * * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ১২ই মার্চ্চ, ১৮২৭)

CHOWRINGHEE THEATRE
On Saturday next, the 17th Instant
WILL BE PERFORMED
The comedy of
"THE LIAR"
After which
With appropriate Music, Scenary, and Decorations,
WILL BE PRSENTED
Melo-Dramatic Entertainment

of
"THE BLIND BOY"

PRICE OF TICKETS
Box Tickets 8—Pit Tickets 4.

* * * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ১৪ই মে, ১৮২৭)

THEATRE BOITACONNAH
For the benefit of Mrs. *BLAND* on Thursday 24th Instant, will be performed the comedy of

"THE YOUNG WIDOW"
OR A LESSON FOR LOVERS"

Between the pieces a favourite Song, to conclude with the laughable

Farce of

"MY LANDLAD'S GOWN"
Box 6 Rupees

Doors to open at Half-past Six O'clock, and performance to commence at Half-past. Seven.

Tickets to be had of Mrs. *BLAND* at the Theatre.

N. B.—No credit for Tickets can be allowed.

* * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ১৪ই জানুয়ারী, ১৮২৮)

"England expects every one will do their duty.

CHOWRINGHEE THEATRE

Aided by several Amateurs, whose zeal has enlisted them in the noble cause of Charity.

ON FRIDAY Evening, the 18th Instant

THE NAUTICK BAND

Will perform Coleman's celebrated comedy of.
JOHN BULL
or
AN ENGLISHMAN'S FIRE-SIDE

In Five Acts

National and comic Songs, between the acts will enliven the Evening's amusement

AFTER WHICH, WILL BE ACTED

THE PATRIOTIC FEAST

or the anniversary of the
GLORIOUS VICTORIES OF CORUNNA
And
BHURTPORE

How sleep the Brave who sink to rest,
By all their Country's wishes blest.
England has saved herself by her firmness and the rest of Europe by her example.

The proceeds to be appropriated to the funds of that excellent Charity,

THE MARIN SCHOOL

A Committee is appointed to reap the rich harvest promised on the occasion, and every House of Agency in Calcutta will receive the donation of those whose health or engagements may prevent their attendence.

Doors to open at half-past 6, and the performance to commence at 7.

PRICE OF TICKETS

Box,............8 Pit,............4

Tickets may be had at the Theatre Office, as also at the usual places.

* * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ২৪শে মার্চ্চ, ১৮২৮)

CHOWRINGHEE THEATRE

THE great exertions made in getting up frequent Performances during the present season, not having met with remunerating success, it is proposed that a Benefit be given to the Lessee, by the resignation, for one night, to be here after fixed, of all Free Admission. Such Proprietors may not feel inclined to accede to this proposal, will be furnished with their Free Admission Tickets as usual, on application to the Secretary at the Theatre.

On the part of the Management
G. J. SIDDONS
Chowringhee Theatre. 22d. Feb. 1828, Manager.

N. B. Under the sanction of the Managers, as expressed in the foregoing proposition Free Admission Tickets will not be issued on the present occasion, expect to such Proprietors as may signify their dissent. Chowringhee Theatre, 24th March, 1828.

* * *

সেকালের ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয়দের রীতি-অনুকরণে, খৃষ্টীয় উনবিংশ-শতাব্দীর তৃতীয়-দশকের গোড়ার দিকে বিলাতী শিক্ষা-সভ্যতার আদর্শে অনুপ্রাণিত এদেশী বিত্তশালী-সম্রান্ত সৌখিন নব্য-সম্প্রদায়ের লোকজনদের মনেও 'রঙ্গালয়' প্রতিষ্ঠার প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। তাঁদের এই আগ্রহ-উৎসাহের ফলেই, ১৮৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুরু হলো—বিলাতী-কেতায় এদেশে

'নাট্যশালা' প্রতিষ্ঠা করবার অভিনব আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের পরিণতি-হিসাবে সে বছর ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি কলিকাতা সহরের বুকে সর্ব্বপ্রথম গড়ে উঠলো বিচিত্র এক দেশীয়-রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠান। প্রাচীন সংবাদ-পত্রের তাড়া খুঁজলে, সেকালের এই দেশীয় 'নাট্যশালা' প্রতিষ্ঠার যে সব চিত্তাকর্ষক-বিবরণ পাওয়া যায়, একালের কৌতূহলী-পাঠকপাঠিকাদের অবগতির জন্য, তারই কিঞ্চিৎ নমুনা নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

* * *

(সমাচার দর্পণ, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩১)

এতদ্দেশীয় নর্ত্তনাগার।—কিয়ৎকালাবধি কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয়েরদের মধ্যে এক নর্ত্তনাগার গ্রন্থননিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে। তদর্থ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুরোধে এতদ্দেশীয় শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়েরদের গত রবিবারে এক বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম-সকল নির্ব্বাহকরণার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কমিটি-স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ সেন ও শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ। ঐ নর্ত্তনশালা ইঙ্গলণ্ডী-য়েরদের রীত্যানুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায়।

* * *

(সমাচার দর্পণ, ১৮৩১)

মহামহিম শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু।—গত ১৪ পৌষ বুধবার [২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৩১] রজনীযোগে শ্রীযুতবাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগানে হিন্দু থিয়েটরি একট অর্থাৎ হিন্দু নৃত্যাগারের কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে আমি চক্ষে দেখি নাই আমার জনৈক আত্মীয় ঐ রামযাত্রা দর্শনে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন তদ্দ্বারা অবগত হইলাম...রামলীলা নাটকের মত যাহা ২ ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমা হইয়াছে হিন্দু বালকেরা তরজমা ভাবাভ্যাস করিয়া সেই সকল বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণ সীতাইত্যাদি সং সাজিয়া যাত্রা করিয়াছেন তাহাতে কে কোন্ সং সাজিয়াছিলেন তাহার বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিলে আগামিতে লিখিব।..এদেশে পূর্ব্বকালে রাজারা নানাপ্রকার যাত্রা দর্শন করিতেন তৎপ্রমাণ নাটক গ্রন্থ-সকল বর্ত্তমান আছে এক্ষণে কেবল কালীয়দমন রামযাত্রা চণ্ডীযাত্রা যাহা রাঢ়দেশীয় ক্ষুদ্রলোকের সন্তানেরা করিয়া থাকে তাহাতেই দেখা যায় এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানেরা ঐ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন ইহা অবশ্যই উত্তমরূপে হইতে পারিবেক। অধিকন্তু সুখের বিষয় ইঁহারা ধনি-লোকের সন্তান ইঁহারদিগকে প্রতিপদে পেলা দিতে হইবেক না কালিদমনের ছোঁড়াগুলা সর্ব্বদাই টাকা পয়সা চাহে তাহারা পয়সা বা সিকি আধুলি না পাইলে দর্শকদের নিকট আসিয়া অনেক রকম রসভঙ্গ করে সম্মুখ হইতে যায় না সুতরাং তাহাতে মনে সন্তোষ জন্মুক বা না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই হয় এ রকম যাত্রায় সে আপদ নাই।

ইঁহারা নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া নানাপ্রকার বেশ ভূষণ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এক জন ইঙ্গরেজ শিক্ষক রাখিয়া ঐ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন আমারদিগের দেশীয় অধিকারী ও বেশকারী বেটারা চিরদিন এক রকম বেশ করিয়া দেয় কেবল থরকাটা প্রেমচাঁদ কতকগুলিন বাইআনা বেশের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র ইঙ্গরেজাধিকারী তাহাহইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ কি তাঁহারা যেং সং সাজাইয়া দিবেন তাহা অবিকল হইবেক ইহা বিশ্বাস-যোগ্য কথা।...১৫ পৌষ। কস্যচিৎ পাঠকস্য।

* * *

(সমাচার দর্পণ, ৭ই জানুয়ারী, ১৮৩২)

হিন্দু নাট্যশালা।—হরকরা পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পূর্ব্ব ২ বুধবারে হিন্দুর নাট্যশালায় নাট্য ব্যাপার আরম্ভ হয় এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপনবিষ-য়োৎসুক এক মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত অনুষ্ঠানপত্রের পাঠ হইল।

তৎপরে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবকর্ত্তৃক সংস্কৃত রামচরিত্রবিষয়ক ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তরীকৃত সুসজ্জ যাত্রানু-ষ্ঠায়িকর্ত্তৃক উচ্চারিত হইল। এতাদৃশ অন্যান্য কাব্যও তৎসময়ে পঠিত হইল পরিশেষে জুলিয়শ সিজরনামক এক

কাব্যের শেষ প্রকরণ পাঠ হইল। দিদৃক্ষু ব্যক্তিরদের মধ্যে শ্রীযুত সর এডবার্ট রৈ:েন সাহেব এবং অন্যান্য মান্যা বিবি ও সাহেবেরা ছিলেন তদ্দৃষ্টে তাঁহারা পরমাপ্যায়িত হইলেন। অপর হরকরা পত্রে লেখে শ্রুত হওয়া গেল যে ইহাহইতেও এক বৃহন্নাট্যশালা প্রস্তুত হইবে এবং এতৎকর্ম্ম সম্পাদনার্থ যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা ভারতবর্ষমধ্যে প্রকৃত নাটক পুনঃ স্থাপনার্থ যথাসাধ্য উদ্যোগ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন।

* * *

(সমাচার দর্পণ, ১৪ই জানুয়ারী, ১৮৩২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। অস্মদ্দেশীয় নাট্যশালা স্থাপনবিষয়ক বার্ত্তা শ্রবণে এবং যাত্রা কি পর্য্যন্ত প্রশংসা ও উৎসাহরূপে হইয়াছে তৎশ্রবণে নাট্যাসক্ত ব্যক্তিরা অত্যন্তামোদী হইয়াছেন। ব্রিটন দেশজাত আমাদের ভ্রাতৃবর্গেরা যেরূপ সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন হিন্দুগণও তদ্রূপ সভ্যতা যে এইক্ষণে প্রাপ্ত হন ইহা আমরা শ্লাঘ্য করিয়া মানি। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠাভিমানি ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে তাঁহারা যাদৃশ সভ্য তাদৃশ কখন হিন্দুরা হইতে পারিবেন না অর্থাৎ ইঙ্গলণ্ড দেশজাত ভাবল্লোকের মনোমধ্যে যে গুণ স্থাপিত হইয়াছে তাদৃশ গুণ কদাচ হিন্দুদের মধ্যে নাই কিন্তু এ কেবল হাস্যাস্পদ কথা যেহেতুক অতিশয় হ্রস্বদর্শি ব্যক্তিরাও দেখিতেছেন যে ঈশ্বর পক্ষপাতী নহেন। যদি ইহাতে ঐ শ্রেষ্ঠাভিমানিরা ক্ষান্ত না হন তবে হিন্দুর নাট্যশালা এবং হিন্দুর ঐচ্ছিক যাত্রাকারিরা কিরূপে তত্তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন তাহা দৃষ্টি করুন। অল্প কালের মধ্যে বুঝি হিন্দু ঐচ্ছিক যাত্রাকারিরা চৌরঙ্গীর ঐচ্ছিক যাত্রাকারিরদের তুল্য হইবেন। যদ্যপি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে চন্দ্রিকা ও রত্নাকর সম্পাদকেরা হিন্দু হইয়া হিন্দুরদের নাট্যশালা এবং ঐচ্ছিক যাত্রাকরেরদের বিশেষতঃ ঐ নাট্যশালা সংস্থাপকদের অতি অপভাষা ও তিরস্কার দ্বারা তুচ্ছ করেন তাহার উত্তর অতি সহজ। প্রকৃত নাট্যের ব্যাপারে তাঁহারদের কিছুমাত্র রসবোধ নাই তাঁহারদের বুদ্ধি অল্প কেবল গালাগালি দিতে সমর্থ সেই বিদ্যায় নিপুণ ঐ অযুক্তধর্ম্মি অথচ স্বীয় মতমাত্রে আসক্ত সম্পাদকেরা নাট্য পদার্থ যে কি ইহাও বোধ করিতে পারেন না এবং দেশের উন্নতিবিষয়ে শাত্রবাচরণ করিয়া তাঁহারা অবোধ বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন অতএব তাঁহারদের বিষয় আমার কিছু মনোযোগযোগ্য নহে।

অপর ঐ হিন্দু নাট্যশালার অধ্যক্ষেরা জুলেস সিজর অথবা অমর সেক্সপিয়র কোন কাব্যহইতে নীত কথাদ্বারা যাত্রারম্ভ না করিয়া যে নাট্য অর্থাৎ এতদ্দেশীয় উত্তররামচরিত্রবিষয়ক কথা লইয়া নাট্যারম্ভ করিলেন ইহা ভ্রম হইয়াছে যদ্যপি তাঁহারা জুলেস সিজর বা সেক্সপিয়রের কথা লইয়া আরম্ভ করিতেন তবে ঐ অযুক্তধর্ম্মি ও স্বমতযাত্রাসক্ত সম্পাদকেরদের তিরস্কারকরণের সম্ভাবনাই ছিল না যেহেতুক তাঁহারা উক্ত কাব্যসকলের কিছুমাত্র জানেন না। উত্তররামচরিত্রবিষয়ক হিন্দুরদের নাট্যশালায় যাত্রা হইবে ইহা শ্রবণে তাঁহারা রামযাত্রা জ্ঞান করিয়া নানা অকারণ কোলাহল করিতে লাগিলেন সে যাহউক অস্মদ্দেশীয়কর্ত্তৃক কৃত নাট্যশালাদর্শনে আমরা পরমামোদী হইলাম এবং তৎসংস্থাপক মহাশয়েরদের ও ঐচ্ছিক যাত্রাকারি মহাশয়েরদের কর্ম্ম যে সফল হইবে এমত আমারদের ভরসা। কস্যচিৎ বুলবুলস্য।

* * *

(সমাচার দর্পণ, ২১শে এপ্রিল, ১৮৩২)

জজসাহেবেরদের প্রতি বিদ্রূপ।—এতন্নগরে কিছুকাল পূর্ব্বে অনেক স্থানে অর্থাৎ পাড়ায়২ সখের যাত্রার দল হইয়াছিল তৎপরে সেই সখে এখানকার লোকের ওয়াক উঠিবাতে পল্লিগ্রামে গেল শেষ অনেক ইতর লোক তাহা অভ্যাস করিয়া জীবনোপায় করিতেছে সংপ্রতি এই নগরের ধনাঢ্য লোকের সন্তানেরা ইঙ্গরেজী মতের যাত্রার সংপ্রদায় করিয়াছেন এ সম্বাদ বড় রাষ্ট্র হওয়াতে কোন সুরসিক বিবেচক এক নাটকগ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য আমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন তাঁহার অভিপ্রায় ঐ বাবুরা যদি উক্ত নাটক মত যাত্রা করেন তবে লোকের আশু আনন্দ জন্মিতে পারে।...

* * *

(রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ, মাসিক পত্রিকা, মাঘ, [১৭৮০ শক] ইংরাজী ১৮৫৮)

"...বঙ্গদেশীয়েরা যবনদিগের প্রথম আধিপত্য-সময়ে কি প্রকারে মনোবিনোদ করিতেন তাহার কোন বিবরণ আমরা জ্ঞাত নহি। বোধ হয় তৎকালে পূর্ব্ব প্রসিদ্ধ নাটকের কথঞ্চিৎ অপভ্রংশ প্রচলিত ছিল। তদনন্তর ক্রমশঃ এতদ্দেশীয়েরা যবনদিগের দৌরাত্ম্যে ঐহিক সুখে একান্ত হতাশ হইলে তাঁহাদের মনে পারলৌকিক সুখের লালসা হয়। সেই লালসা-বর্দ্ধনে নিযুক্ত হইয়া মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টি করেন; এবং তাহাই দেশীয়দিগের মনোরঞ্জনের প্রধান উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকে। যাহারা বিষ্ণুভক্ত ছিল না তাহাদের পক্ষে সঙ্কীর্ত্তন সমাদরনীয় হইতে পারে না; সুতরাং তাহারা চণ্ডীর গান প্রভৃতি সঙ্কীর্ত্তনের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকারে দুই শত বৎসর অতিবাহিত হইলে সাধারণের মন অজ্ঞান, দৌর্ব্বল্য ও পরাধীনতায় নিমগ্ন হইলে তাহাদের কৌতুক কলাপের পরিবর্ত্তন হয়। সেই পরিবর্ত্তনের আদিকারণ নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তিনি সুচতুর ও সুপণ্ডিত ছিলেন, ও তাহার নিকট গুণিগণের প্রচুর সমাদর ছিল; কিন্তু লাম্পট্য-দোষে তাঁহার সে সমুদয় গুণগরিমা কলুষিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠকবি ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রসাদে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহারই কুপ্রবৃত্তির প্রভাবে বিদ্যাসুন্দরে অশ্লীলতার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র বিদগ্ধতাগুণের সমাদরার্থে গোপাল ভাঁড়কে নিকটে রাখিয়াছিলেন, এবং বোধ হয়, তাঁহার সহবাসে সেই সুচতুর মর্ম্মবেদী প্রভুর সন্তোদনার্থে আপন উদ্ভট বাক্যে সর্ব্বদা অশ্লীলতার প্রয়োগ করিত। সে যাহা হউক তাঁহারই উৎসাহে খেঁউড়ের বাহুল্য হয় সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র বারমাস-বর্ণনে তাহার সম্যক্ প্রমাণ দিয়াছেন। ঐ খেঁউড় ও কবি যে কি পর্য্যন্ত জঘন্য ছিল, তাহা সভ্যতার রক্ষা করিয়া বর্ণনা করাও দুষ্কর; যাঁহারা তাহাতে প্রমোদিত হন তাঁহাদিগের মনের অবস্থা অনুধ্যান করিতে হইলে সহৃদয়দিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় সন্দেহ নাই। কথিত আছে, এই কবির রচনায় চুঁচড়া-নিবাসী লালুনন্দ লাল বিখ্যাত ছিল। তাহার পর হুগলী-নিবাসী রামজী ও কলিকাতা-নিবাসী রঘু তাঁতী প্রসিদ্ধ হয়। রঘু তাঁতীর শিষ্য হরু ঠাকুর, এবং তাহার সমকালে কএক ব্যক্তি উত্তম কবি-গায়ক বলিয়া বিখ্যাত হয়।

ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে কবি ও খেঁউড়ের সদৃশ অশ্লীল বিনোদ কদাপি বহুকাল ভদ্র-সমাজে সমাদৃত থাকিতে পারে না; কালসহকারে অবশ্যই তাহার হ্রাস হয়। দেশের কোন অত্যন্ত ধনী ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অনেক মন্দ ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে; কিন্তু তাহার খ্যাতি হ্রাস হইলে ও জ্ঞানলোকের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাপ্তি হইলে অবশ্যই সে ব্যবহার দূষ্যবোধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের প্রচলিত কবি ও খেউড় দশা শীঘ্র প্রাপ্ত হয় নাই। কলিকাতার সুবিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ ও তৎপর কএক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐ কদর্য্য বিনোদের উৎসাহী হন। তাঁহাদিগের অপসৃতির পর গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস হইয়াছে। তাহার ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বহইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। শিশুরাম অধিকারী নামা এক ব্যক্তি কেঁদেলী-গ্রাম-নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশস্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে। সঙ্কীর্ত্তন ও পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায়ঃ লোপ হইয়াছিল। শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্দ্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা আপন আদিম নাটকের অবয়ব ধারণ না করে সে পর্য্যন্ত দেশের বিনোদন-ব্যাপার পরিশুদ্ধ হইবে না। বিদ্যার উৎসাহে এই অভীপ্সিত ব্যাপারের সূত্রপাত হইয়াছে। গত চারি বৎসরাবধি কলিকাতা-নগরে অনেক স্থানে প্রকৃত নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হইতেছে। তদ্দর্শনে ধনী সম্ভ্রান্ত বিদ্যানুরাগী সকলেই একত্র হইয়া থাকেন; ও অভিনয়ের নির্ম্মল-রসে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই সরস বিনোদে দেশ ব্যাপ্ত হয়—প্রতি গ্রামে ইহার অনুরাগ হয়—ইহার প্রাদুর্ভাবে যাত্রা, কবি, খেঁউড়, প্রভৃতি দূষ্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটে—ইহা কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে কুনীতির উৎসেদ ও নির্ম্মল ব্যবহারে প্রাদুর্ভাব হয়—ইহাই আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, এবং তদর্থে আমরা দেশহিতৈষিদিগকে একান্ত-চিত্তে অনুরোধ করিতেছি।

...নাটকের অনুরূপ যাত্রা কল্পিত হইয়াছে; এবং তন্মধ্যে বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা সকলের প্রিয় বলিয়া বিখ্যাত আছে;..."

* * * *

মানুষ-খেকো গাছ

অধ্যাপক অশোককুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এস্ সি, ডি-ফিল্

জগতে প্রতিটি প্রাণীর চারধারে অজস্র শত্রু বিরাজ করছে। মানুষের শত্রুও কম নয়। আমাদের চারপাশে কত হিংস্রজন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর এদের দয়ার ওপর আমাদের জীবন নির্ভরশীল। এই সব মাংসাশী (Carnivorous) প্রাণী মানুষের আতঙ্কের বস্তু। কিন্তু এই আতঙ্ক চতুর্গুণ হয়ে ওঠে যদি আমা শুনি যে কেবলমাত্র লেখা বইএর নাম "Madagascar—the land of man-eating tree" (মাদাগাস্কার—মানুষ-খেকো গাছের দেশ)। সত্যই এটা খুব ভয় ও ভাবনার বিষয় যদি এইরকম মানুষ-খেকো গাছ পৃথিবীতে থাকে। তবে ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি বেচারা উদ্ভিদ জগতে এই রকম ভয়াবহ জীবের সৃষ্টি করেন নি। তাঁর অশেষ
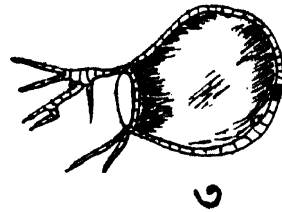
মানুষ-খেকো গাছ

বাঘ সিংহ নয়, "মাংসাশী" উদ্ভিদও আছে। কথিত আছে যে এরা ভেড়া-ছাগল খেয়েও সন্তুষ্ট নয়, মানুষ পর্য্যন্ত খেয়ে ফেলে। আগের দিনে মানুষের ধারণা ছিল এই সব গাছ বিশেষ বিশেষ দেশে পাওয়া যায়। এমন কি এ সম্বন্ধে কেউ কেউ বইও লিখে গেছেন। C. S. Osbornএর করুণা না থাকলে তাঁর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ পৃথিবীতে বাস করতে পারত না। দেখা গেছে যে এই সব গাছের অস্তিত্ব একেবারে ভুয়ো। কেন না যাঁরা এ সম্বন্ধে বলেন বা লিখে গেছেন তাঁরা কেউই এদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতে পারেন নি।

মানুষ-খেকো গাছের অস্তিত্ব না থাকলেও এই বিশাল উদ্ভিদ জগতে কিছু কিছু, অবশ্য খুব অল্পসংখ্যক, গাছ আছে, যাদের জীবনধারণের জন্য প্রাণীদেহের প্রয়োজন হয়। তবে ভয়ের কো-ও কারণ নেই, কেন না এদের শিকার সাধারণতঃ ছোট ছোট পোকামাকড়, মানুষ নয়। এদের বলা যায় পতঙ্গভুক্ গাছ বা Insectivorous plants। যদিও এদের অনেকে Cornivorous বা মাংসাশী" নাম দিয়েছেন, সেটা শুনতে মজার হলেও ব্যঙ্গপূর্ণ।

আমরা সাধারণতঃ জানি যে গাছ তার নাইট্রোজেন বা প্রোটিন জাতীয় খাদ্যসংগ্রহ করে মাটি থেকে। কিন্তু পতঙ্গভুক্ গাছের বৈশিষ্ট্য হ'ল, এরা উক্ত খাদ্যসংগ্রহ করে কীটপতঙ্গের দেহ থেকে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এদের জীবনধারণ-প্রণালী অন্যান্য উদ্ভিদের থেকে কিছুটা তফাৎ। আর কীট-পতঙ্গ ধরার জন্য এদের প্রত্যেকের এক বিশেষ রকম নিজস্ব ফাঁদের (trap) ব্যবস্থা আছে। এই ফাঁদগুলি সাধারণতঃ তৈরী হয় গাছের পাতার অংশ থেকে। পতঙ্গ ধরবার প্রণালী অনুসারে এদের নানারকম নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন Steel-trap, mouse-trap প্রভৃতি।

কলস গাছ বা Pitcher plant এর পাতার কিছুটা অংশ ক্রমশঃ কলসের আকার ধারণ করে, আর তার মাথার ওপর থাকে একটি ঢাকনা বা lid। কলসের ভিতরে থাকে জলীয় পদার্থ যার মধ্যে পোকা পড়লে আর উঠে আসতে পারে না। ঢাকনাটাও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। তখন কলসের ভিতরের দেওয়ালের গ্রন্থি (gland) থেকে লালা বেরিয়ে পোকাকে আত্মসাৎ করে ফেলে।

আর একটি গাছ আছে যার নাম Venus fly trap —এটা অতি অদ্ভুত। এর পাতার কিছুটা অংশ দুভাগে ভাগ করা, আর মাঝখানের প্রধান শিরাটি দরজা বা জানালার কব্জার (hinge) মত কাজ করে এবং পাতার দুটি অংশ বন্ধ করা যায়। পাতার কিনারাগুলি কণ্টকাকীর্ণ। কিছু স্পর্শ করলেই পাতাটি চক্ষের নিমেষে বন্ধ হয়ে যায়। পতঙ্গ এই ফাঁদে পড়লে বেরুতে পারে না। এর এই বিচিত্র ব্যবস্থাকে মরভেন সাহেব বলেছেন "Perhaps the most marvellous in the world !"

আমাদের পুকুরের সাধারণ ঝাঁঝিরও (Bladder wort) এই রকম ফাঁদের ব্যবস্থা আছে। তবে তা খুব ছোট। এদের পাতাগুলি খুব সরুভাবে বিভক্ত, আর পাতার যেখানে সেখানে ছোট ছোট থলি (Bladder) থাকে। এই থলির মুখের কাছে কতকগুলি অনুভূতি-সম্পন্ন সূত্র আছে (sensory hairs)। পোকা এই থলির মধ্যে পড়লে, এই সূত্রগুলি nerve এর মত কাজ করে, গাছ এর দ্বারা বুঝতে পারে এবং তখনই থলির মুখের ঢাকাটি বন্ধ হয়ে যায়। তারপর পোকাটিকে গাছ "খেয়ে" ফেলে।

এই রকম আরও অনেক গাছ আছে যাদের এই জাতীয় নানাধরণের ফাঁদ আছে এবং যার সাহায্যে এরা কীট-পতঙ্গ ধরে। এইসব পতঙ্গভুক্ গাছেদের ফাঁদগুলিকে মানুষের পাকস্থলির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কেন না পাকস্থলির রসের মত এই ফাঁদগুলির ভেতরের গ্রন্থি (gland) গুলিও অম্লজাতীয় রস বের করে পতঙ্গের দেহ থেকে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ বার করে নেয় এবং নিজেদের খাদ্যের অংশ হিসেবে ব্যবহার করে।

পতঙ্গভুক্ গাছেদের এই বিশেষ রকম জীবনপ্রণালী নিয়ে বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে গেছেন—এমন কি স্বয়ং Charles Darwin পর্যন্ত। এ সম্বন্ধে তাঁর লেখা বইয়ের নাম "Insectivorous Plants"। অষ্টাদশ শতকের প্রাণীতত্ত্ববিদরা এদের বলে গেছেন "miracula natvrae"। এরা উদ্ভিদ জগতের একটি আশ্চর্যের বস্তু হলেও মানুষ খাবার লোভ বা ক্ষমতা এদের নেই—এইটুকু আমাদের সান্ত্বনা।

'ভারতবর্ষে'র বর্ষারম্ভ—

বর্তমান আষাঢ় মাসে ভারতবর্ষের বয়স ৫১ বৎসর আরম্ভ হইল। যাঁহাদের কৃপা, করুণা, আশীর্ব্বাদ, সহযোগিতা, সাহায্য ও সহানুভূতির বলে 'ভারতবর্ষ' তাহার ৫০ বৎসরের জয়যাত্রা সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে, আজ এই শুভ মুহূর্তে আমরা শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের সকলের কথা স্মরণ করি এবং যাঁহারা আমাদের মধ্য হইতে সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন ও যাঁহারা আমাদের মধ্যে থাকিয়া সর্বদা আমাদের শুভবুদ্ধি দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতেছেন, সকলের উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভক্তিপূর্ণ নতি জ্ঞাপন করি। আনন্দের দিনে আমরা দ্বিজেন্দ্রলাল, গুরুদাস, হরিদাস, সুধাংশুশেখর, জলধর. অমূল্যচরণ প্রমুখ পূর্বসূরীগণের কথা সাশ্রু নেত্রে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের আশীর্বাদ কামনা করিব এবং প্রার্থনা করিব, ভগবৎ-কৃপা যেন পরিচালক ও কর্মীবৃন্দকে সর্বদা সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া 'ভারতবর্ষে'র শ্রীবৃদ্ধি সাধনের উপযুক্ত শক্তি ও বুদ্ধি দান করে।

খাদ্য সমস্যা—

জুন মাসে চাউলের দাম বাড়িয়া ৪০৲ টাকা মণ হইয়াছে। রেশনে চাউল দেওয়া হয় বটে, তাহাও পর্য্যাপ্ত বা ভাল চাউল নহে। রেশনে ৮৪ নয়া পয়সা কিলো দরে যে ভাল চাউল পাওয়া যায়, সাধারণ মধ্যবিত্তের তাহা ক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই। লোক কালো বাজারে যাইতে বাধ্য হয়—আটা খাইয়া, আলু খাইয়া, কেনশুদ্ধ ভাত খাইয়া কোন রকমে মানুষ বাঁচিয়া আছে। অখাদ্য খাইয়া দলে দলে লোক কলেরায় মারা যাইতেছে। সরকার লোককে চাষ করিতে উপদেশ দেন—কিন্তু চাষের জমি নাই। জমি থাকিলেও সেচের জল পাওয়া যায় না—যথাসময়ে সার বা বীজ পাওয়া যায় না। চাষের সময় চলিয়া গেলে তার পর বীজ ও সার আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা বামপন্থী নহি, সরকারী কাজের নিন্দা করা আমাদের পেশা নহে—কিন্তু নিত্য এই সকল অভাব আমাদের ভোগ করিতে হয়। সরকার কঠোর নহেন, চোর জুয়াচোরের দল শাস্তি পায় না—নিরীহ লোক আইনের ফাঁকে অযথা হয়রাণ হইতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর ১৬ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কাজেই মানুষ আর ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। পশ্চিমবঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তিনিও যেমন অনেক আশার কথা বলিয়াছেন, লোকও তেমনই—তিনি সহৃদয়, দয়ালু ও জন-দরদী বলিয়া—তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছে—কিন্তু ফল কি হইয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু কি চাউলের দাম বেশী, নিত্যব্যবহার্য্য প্রত্যেক জিনিষ অগ্নিমূল্য হইয়াছে। দুধ পাওয়া যায় না—ঘৃতের কথা ত লোক ভুলিয়া গিয়াছে। মাছ সাধারণতঃ ৬৲ টাকা কিলো। সাধারণ মূলা, বেগুন, বরবটী, পটোলও অগ্নিমূল্য। আমের মরসুমে আম টাকায় ৪টা। অন্য ফল ত দুর্লভ। কেন অধিক পরিমাণে খাদ্য উৎপন্ন হইতেছে না, সে বিষয়ে কি মন্ত্রিসভা চিন্তা করিবেন না? শিল্পপতি ও ধনীরা কারখানা করিতেছেন, করুন—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি তাঁহারা তাঁহাদের শ্রমিকদের জন্য ধান, দুধ, মাছ প্রভৃতি উৎপাদনে মনোযোগী হন—তাহা হইলেই এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে যে শ্রেণীর লোক এতদিন ধান বা মাছের চাষ করিত, তাহাদের পক্ষে, নানা কারণে আর সে কাজ করা সম্ভব হইতেছে না। ১৬ বৎসর ধরিয়া আমরা একই কথা বলিয়া যাইতেছি—জনদরদী মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কি সাধারণ শাসন কাজের ভার অন্য লোকের হাতে দিয়া নিজে এ বিষয়ে একটু সচেষ্ট হইবেন না? তিনি জনপ্রিয় মানুষ—সে জন্য দরিদ্র সাধারণ মানুষ তাঁহার নিকট কিছু আশা করে।

ছাত্রদের সাহায্য দান—

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগ ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৬ হাজার ৯ শত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রকে বৃত্তিদানের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। রাজ্য সরকারসমূহের মারফত ১৯৬৩-৬৪ সালে ১৮ হাজার এবং পরবর্তী ২ বৎসরে ৫২ ও ২৬ হাজার ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই বৃত্তি ঋণ হিসাবে দেওয়া হইবে—কিন্তু যে সকল ছাত্র জীবিকা হিসাবে শিক্ষকের কাজ করিবে, তাহাদের ঐ ঋণ শোধ দিতে হইবে না। শুধু মেধাবী অথচ দরিদ্র ছাত্রেরা এই ঋণ পাইবে।

পাক-ভারত সমস্যা—

ইংরাজ চলিয়া গেল, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিল। কিন্তু সে স্বাধীনতা কিরূপ। বাংলাদেশের অর্ধেকের বেশী অংশ ও পাঞ্জাবের একটা বড় অংশ—পাকিস্তান হইয়া গেল। ভারতের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ রহিল না—গত ১৬ বৎসর ধরিয়া পাকিস্তান ভারতের সহিত কলহ ও বিবাদ করিয়া চলিয়াছে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হইল না, পূর্ব বা পশ্চিম কোন পাকিস্তানের সহিত ভারতের সীমা স্থির হয় নাই। ফলে সীমানা সমস্যা লইয়া আজও প্রতি মাসে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের সহিত ভারত-কর্তৃপক্ষের মীমাংসা বৈঠক বসে এবং তাহা নিষ্ফলতায় শেষ হয়। ভারতীয়গণ শান্তিপ্রিয়, কোন বিবাদে সহজে প্রবৃত্ত হয় না—আর পাকিস্তানের লোক তাহার বিপরীত মনোভাবাপন্ন। নানা-অছিলা ও অজুহাতে পরের জমী কাড়িয়া লয়, পরের ক্ষেত হইতে ফসল কাটিয়া লইয়া যায়, পরের মাঠ হইতে গরু, ছাগল লইয়া যায়—পাক-কর্তৃপক্ষ তাহা জানিয়াও তাহাতে বাধা দেন না—বরং তাহা সমর্থন করিয়া থাকেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান রাজনীতিক, তিনি যুদ্ধ বিগ্রহের বিরোধী—তিনি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়া এবং পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার নকল পাঠাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহার এই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ লইয়া গত ১৬ বৎসর ধরিয়া পাকিস্তানীরা অবাধে ভারতের উপর আক্রমণ চালাইতেছে। আজিও তাহার বিরাম নাই। সম্প্রতি আবার চীনাদের সাহায্য ও উস্কানী পাইয়া কোন কোন স্থানে পাকিস্তানীরা ভারত আক্রমণ করিয়া ভারতের অংশ-বিশেষ কাড়িয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ভারতকে প্রতি বৎসর অযথা বহু কোটি টাকা ব্যয় করিয়া সীমান্ত রক্ষা করিতে হয়—তাহার উপর পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে আরও কত কোটি টাকা অপব্যয় হইবে, কে বলিতে পারে? পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ শান্তি চাহেন না, সর্বদা যুদ্ধের মনোভাব। এ অবস্থায় ভবিষ্যতে হয়ত ভারতের পক্ষে পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য উপায় থাকিবে না। সে জন্য নানা অসুবিধা সত্বেও ভারতকে আজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেছে।

আমেরিকায় ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ—

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন আমেরিকা সফরে যাইয়া শুধু নিজ অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য আমেরিকাবাসীর মন জয় করেন নাই, ভারতের বর্তমান দুর্দিনে সকল প্রকার মার্কিণ সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছেন। আমেরিকা চীন-ভারত যুদ্ধে যাহাতে ভারতকে সমর উপকরণ দিয়া সাহায্য না করে সে জন্য পাকিস্তানের নেতারা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। গত ৫ই জুন ওয়াসিংটনে মার্কিণরাষ্ট্রপতি কেনেডি ও ভারতের রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীকেনেডি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন যে, ভারতের উত্তর সীমান্তে চীনা হামলায় বাধা দিবার জন্য আমেরিকা ভারতকে সর্বপ্রকার সাহায্য দান করিবে। এ বিষয়ে পাকিস্তানী নেতারা আমেরিকার নিকট যে আবদার জানাইয়া ছিলেন, কেনেডি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। গত কয় বৎসর ধরিয়া আমেরিকা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সকল প্রকার সাহায্য করিতেছিলেন—তাহার ফলে ভারতে বহু কল কারখানা, রেল, পুল, রাস্তা, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন ভারতের সামরিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আমেরিকা অগ্রসর হওয়ায় বৈষয়িক উন্নতি বিধানের সঙ্গে ভারত তাহার সামরিক শক্তিও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ হইবে এবং তাহার ফলে চীনা হামলা ও পাকিস্তানী হুমকীর সম্মুখীন হইয়া

তাহা বন্ধ করিতে পারিবে। কেনেডি-রাধাকৃষ্ণণের এই সংযুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর সারা বিশ্বের শান্তিকামী দেশসমূহ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন এবং মনে হয় আমেরিকার এই সাহসিকতাপূর্ণ কার্য্যের ফলে পৃথিবী হইতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দূরীভূত হইবে। রাধাকৃষ্ণণের এই অসামান্য কর্মসাফল্যে ভারতবাসী মাত্রই তাঁহাদের যোগ্য রাষ্ট্রপতির বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

সর্বাধ্যক্ষ শ্রীকুমার সম্বর্দ্ধনা—

খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ায় গত ১২ই জুন বঙ্গীয় কবি পরিষদ ও রবিবাসরের এক মিলিত অধিবেশনে বরাহনগর টবিন রোডে শ্রীঅমলকুমার দত্তের সুরম্য উদ্যানবাটিতে এক উৎসবে শ্রীকুমারবাবুকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। তথায় শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং খ্যাতনামা কোবিদ শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি মহাশয় আচার্য্য শ্রীকুমারের বহুমুখী প্রতিভা ও মানবিকতার কথা বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কবি-পরিষদের সম্পাদক শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং বাংলা দেশের শতাধিক কবি ও সাহিত্যিক উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। বহু কবি ঐ দিন কবিতা পাঠ করেন এবং কুমার শ্রীবিশ্বনাথ রায়, কুমার শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি বহু সুধী সভায় যোগদান করিয়া সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। রবিবাসরেরও বহু সদস্য শ্রীকুমারবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের প্রশংসা—

গত ৫ই জুন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ ওয়াসিংটনে শ্রীকেনেডির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এক ভোজ সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। ঐ ভোজ সভায় মার্কিণ রাষ্ট্রপতি শ্রীকেনেডি ডাক্তার রাধাকৃষ্ণনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। তিনি বলেন—বিশ্বখ্যাত কংগ্রেসে কোন রকম প্রস্তুতি ছাড়াই রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন অসাধারণ ভাষণ দিয়াছেন। কেবল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নহে, যে বিরাট মানবজাতির আমরা এক ক্ষুদ্র অংশ তাহার অত্যন্ত মূল্যবান বন্ধু হিসাবে আমরা রাধাকৃষ্ণনকে স্বাগত জানাইতেছি। শ্রীকেনেডির এই প্রশংসা ভারতের সকল অধিবাসীকেই তাঁহাদের সুপণ্ডিত রাষ্ট্রপতির গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছে। ৭৪ বৎসর বয়সে ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের যুবজনোচিত কার্য্যাবলী যেন ভারতকে সকল প্রকার বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া কল্যাণের পথে আগাইয়া লইয়া যায়—ইহাই সকলে প্রার্থনা করিতেছে।

ভারত ও পাকিস্তান—

কাশ্মীর সমস্যা লইয়া ভারতীয় নেতাদের সহিত পাকিস্তানী নেতাদের বহুবার বহু স্থানে বৈঠক হইয়া গেল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্তান কোন মীমাংসায় সম্মত হয় নাই। পাকিস্তানীরা প্রত্যহ ভারতের কোন না কোন অংশে বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া চুরি ডাকাতি করিয়া পলাইয়া যায়। ধরা পড়িলে প্রহৃত বা নিহতও হইয়া থাকে। তথাপি তাহাদের এ কার্য্য বন্ধ হয় না। এরূপ অবস্থা কত দিন চলিবে কে জানে? প্রায় ১৬ বৎসর হইয়া গেল—সীমান্ত নির্দ্ধারণ বা কোন সমস্যার সমাধান হইল না। এ জন্য ভারতকে প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকা ব্যয়ে সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। সীমান্তের স্থানে স্থানে স্বেচ্ছাসৈনিক দল গঠন করিয়া সীমান্তরক্ষার ব্যবস্থা না করিলে এই ব্যয়হ্রাস করা কি করিয়া সম্ভব হইবে।

কেদার ভবনে কেদার জয়ন্তী—

দক্ষিণেশ্বরে খ্যাতনামা রস-সাহিত্যিক কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৈতৃক বাসস্থান—কেদারনাথ তাঁহার পিতৃভূমি জনকল্যাণের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন—তথায় কেদার-ভবন নামক সুবৃহৎ গৃহ নির্মিত হইয়াছে ও সে গৃহে সারদাদেবী বালিকা বিদ্যালয় স্থান পাইয়াছে। গত ১৯শে মে রবিবার সন্ধ্যায় সেই কেদার-ভবনে শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে রবিবাসরের এক অধিবেশনে কেদারনাথের জন্ম শতবার্ষিক পূর্তি উৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসবে শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য এম-পি সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কেদার নাথ সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। দক্ষিণেশ্বর-নিবাসী তরুণকবি ও সাহিত্যিক শ্রীসুবোধকুমার রায় এক সুদীর্ঘ ভাষণে কেদারনাথ ও দক্ষিণেশ্বরের কথা বিবৃত করেন। স্থানীয় রামকৃষ্ণ পাঠাগারের কর্মীরা ১২ই

এপ্রিল কেদার-জয়ন্তীর পর ইহা দ্বিতীয় উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া সকলকে কেদারনাথের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। সে জন্য তাঁহারা দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র। রবিবাসরের বহু সদস্য ঐ দিন কেদারতীর্থে গমন করিয়া কেদারনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় মৎস্য সরবরাহ—

কলিকাতায় মাছ সরবরাহ যাহাতে বৃদ্ধি পায় সে জন্য পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যমন্ত্রী শ্রীফজলর রহমন বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। অন্ধ্ররাজ্য হইতে একদল মৎস্য-ব্যবসায়ী প্রত্যহ কলিকাতায় মাছ পাঠাইতে সম্মত হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় মৎস্যমন্ত্রী শ্রী এস. কে. দে'র পরামর্শক্রমে গভীরসমুদ্র হইতে মাছ ধরার বিভাগটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন—তবে কলিকাতার নিকট সমুদ্রে যে মাছ ধরা হইবে, তাহা কলিকাতার বাজারেই বিক্রয় করা হইবে স্থির হইয়াছে। পশ্চিম বাংলার পুকুরগুলিতে যাহাতে অধিক মাছ উৎপন্ন হয়, সে জন্য সরকার নূতন ব্যবস্থায় মন দিয়াছেন। দেখা যাক্, শেষ পর্য্যন্ত কি হয়।

পোপ ত্রয়োবিংশ জন—

জগতের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মযাজক পোপ ত্রয়োবিংশ জন গত ৩রা জুন ইটালীর ভ্যাটিকান সহরে ৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ৪ বৎসর ৭ মাস পোপের পদে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর ইটালীর এক সাধারণ কৃষক পরিবারের সন্তান। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার ভগিনী ও তিন ভ্রাতা পোপ-প্রাসাদে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব খাদ্য কংগ্রেসে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ—

গত ৪ঠা জুন আমেরিকার ওয়াসিংটন সহরে বিশ্ব খাদ্য কংগ্রেসের সভায় ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—বিশ্ব খাদ্য কংগ্রেস যদি অনশন মোচনের জন্য সমগ্র পৃথিবীতে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য বণ্টনের আরও ভাল ব্যবস্থা করিতে এবং উন্নতিশীল দেশগুলিকে তাহাদের নিজেদের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারে, তাহা হইলেই এই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ঐ সভার উদ্বোধন করেন। ভারতীয় রাষ্ট্রপতির বক্তৃতা এত হৃদয়গ্রাহী হয় যে সকলে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

হেমেন্দ্রকুমার রায়—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় গত ১৮ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার বিকালে তাঁহার কলিকাতা বাগবাজারের বাসগৃহে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৮৮ সালে তাঁহার জন্ম। সাহিত্য ছিল তাঁহার জীবন ও জীবিকা। তিনি উপন্যাস, গোয়েন্দা কাহিনী, গল্প, কবিতা, নাটক, স্মৃতিকথা প্রভৃতি দুই শত পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একশ খানা ছেলে-মেয়েদের জন্য লেখা। তিনি শিশুসাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্ত্তক ছিলেন।

রাহুল সংস্কৃত্যায়ন—

বিশিষ্ট পণ্ডিত, ভাষাবিদ্ ও ঐতিহাসিক রাহুল সংস্কৃত্যায়ন গত ১৪ই এপ্রিল ৭০ বৎসর বয়সে দার্জ্জিলিংয়ে সকাল ১১টা ৪৫ মিঃ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কাশী, লাহোর, মাদ্রাজ ও সিংহলে শিক্ষা লাভ করেন এবং চারবার তিব্বত ও তিনবার সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় ১২৫ খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—সিংহলে ও রাশিয়ায় তাঁহাকে অধ্যাপকের কাজ করিতে হইয়াছিল। তাঁহাকে সম্প্রতি ভারত সরকার "পদ্মভূষণ" উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে খণ্ড প্রলয়—

গত ২৮শে মে মঙ্গলবার পূর্বপাকিস্তানের সমুদ্র তীরবর্তী চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল ও খুলনা জেলায় ভীষণ ঝড়-বৃষ্টির ফলে কয়েক হাজার লোক নিহত ও লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে। এরূপ ঝড় ঐ অঞ্চলে আর কখনও দেখা যায় নাই। কর্ণফুলি নদীতে বহু নৌকা-ডুবির ফলে প্রায় এক হাজার মাঝি ডুবিয়া মারা গিয়াছে। ঝড়ে কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

ত্রিপুরা ও কক্সবাজারের ক্ষতি—

২৮শে জুনের ঝড় বৃষ্টিতে ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া ও সাবরুম নামক দুইটি মহকুমা বিধ্বস্ত হইয়াছে। সেখানে শতকরা ৭৫ জন অধিবাসী গৃহহীন হইয়া আকাশের তলে বাস করিতেছে। চট্টগ্রাম জেলার সৌন্দর্যনিকেতন কক্সবাজার ও সমুদ্রতীরের দ্বীপগুলি কবরস্থানে পরিণত হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত অতি অল্পসংখ্যক লোক প্রাণে বাঁচিয়াছে।

দুর্গাপূজায় ছুটী—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী ২৬শে অক্টোবর হইতে ২৭শে অক্টোবর দুর্গাপূজার ছুটী থাকিবে। ঐ সময়ে পুরাতন পঞ্জিকা অনুসারে পূজা হইবে। বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে পূজা হইবে ২৫শে হইতে ২৮শে সেপ্টেম্বর—সে সময়ে অন্য কোন অজুহাতে ছুটী থাকিবে—তবে বিশুদ্ধসিদ্ধান্তমতে মহালয়া, লক্ষ্মীপূজা বা কালীপূজায় ছুটি দেওয়া হইবে না। উভয় মতকে একত্র করার চেষ্টা এখনও চলিতেছে কাজেই সে চেষ্টা সফল না হইলে পর বৎসরে এই গোলমাল থাকিবে। পুরাতন বা নূতন—কোন দলই নিজেদের মত প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারায় সরকার পুরাতন মতই গ্রহণ করিয়াছেন ও তদনুসারে ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ধুবড়ীতে জলঝড়—

গত ২৯শে এপ্রিল শুক্রবার আসাম গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ী মহকুমায় ভীষণ জলঝড়ের ফলে ৮৪ জন মারা গিয়াছে এবং ৫১২ জন আহত অবস্থায় হাসপাতালে নীত হয়। ঝড়ে বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—

খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক নেতা অধ্যাপক ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় গত ৩১শে মে শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টায় তাঁহার কলিকাতা বালীগঞ্জ পার্ক-প্রেসের বাসভবনে ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্রের দৌহিত্র এবং তাঁহার পত্নী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী। ১৮৯৭ সালে ১৪ই ডিসেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। তিনি আই-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম হন ও পরে কেম্ব্রিজে যাইয়া শিক্ষালাভের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক হন। দীর্ঘ ১১ বৎসর তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসার পদে কাজ করিয়াছিলেন। ঐ পদ ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়া ১৯৬০ সাল পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হন ও কয়েক বৎসর পশ্চিম বঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। সুপণ্ডিত, সাহসী ও দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

সুকুমার সেন—

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন চিফ সেক্রেটারী, ভারত সরকারের প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার ও দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি সুকুমার সেন আই-সি-এস গত ১৩ই মে সোমবার বেলা ৩টায় ৬৩ বৎসর বয়সে তাঁহার ভ্রাতা ডাক্তার অমিয় সেনের গৃহে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অপর ভ্রাতা শ্রীঅশোক সেন কেন্দ্রের আইন মন্ত্রী। তাঁহার পত্নী, দুই পুত্র ও দুই কন্যা বর্তমান। তিনি কিছুকাল বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ছিলেন। তিনি সুদানে যাইয়া নির্বাচন কমিশনারের কাজ করেন এবং তাঁহার কর্ম সাফল্যের জন্য সুদানে একটি পথের নাম সুকুমার সেন রোড করা হইয়াছে। তিনি ১৯৫৭ সালে আই-সি-এস চাকরী ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগে অতিরিক্ত সচিব হন এবং বর্দ্ধমান, কল্যাণী ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন প্রণয়ন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালী জনগণের একজন দরদী বন্ধুর অভাব হইল। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কর্মক্ষমতা তাঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে।

মহারাষ্ট্রের বিদ্বৎসভায় বাঙ্গালী অধ্যাপকের সম্মান—

সংস্কৃত কলেজের স্নাতকোত্তর বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য বেদবিষয়ে অসামান্য গবেষণার পুরস্কার স্বরূপ এই বৎসর বম্বে এসিয়াটিক

সোসাইটির 'পি ভি কানে স্বর্ণপদক' লাভ করিয়াছেন। গত ৭ই মার্চ সোসাইটির ভবনে এক বিদ্বজ্জনসমাবেশে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ১৯৫৯ সালের কার্যের স্বীকৃতিরূপে অধ্যাপক ভট্টাচার্যকে এই পুরস্কার প্রদান করেন।

তাঁহার মৌলিক নিবন্ধরাশি বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়াছে। উড়িষ্যা বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অংশে সহস্র সহস্র ব্যক্তি যে অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ শাখা অনুসরণ করিয়া আজও এই বিলুপ্তপ্রায় বেদশাখার প্রাচীন সংস্কৃতি অক্ষুন্নভাবে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, সে তথ্য অধ্যাপক ভট্টাচার্যই অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি এই শাখার সংহিতা, কল্প ও নানারূপ পদ্ধতিগ্রন্থ বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং বর্তমান সময়ে সে সকল মহাগ্রন্থের সম্পাদনা কার্যে নিযুক্ত আছেন।
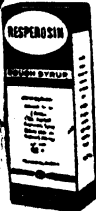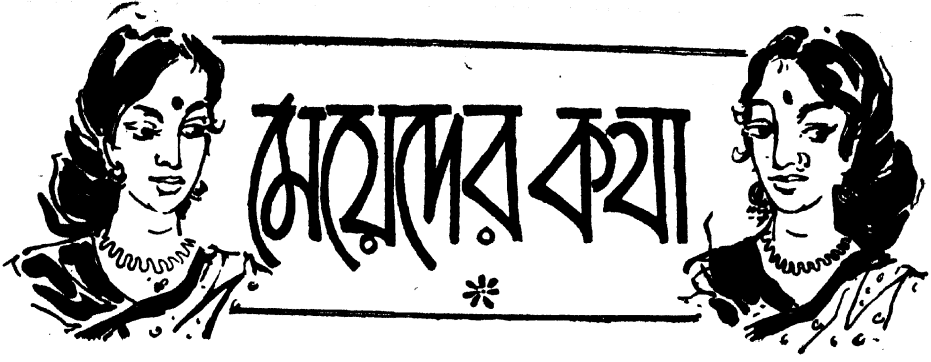
নারী বিচিত্রা

কৌশলে নারী

সু-নন্দা

নারী বুদ্ধির একাংশ যেমন তার সহজবুদ্ধি, অপর অংশ হ'লো তার কৌশল চাতুর্য।

নারীর দক্ষতা সম্বন্ধে আমাদের অনেক ভুল ধারণা আছে। সামাজিক ও সাংসারিক জীবনে নারীর প্রাধান্য এবং চাতুর্য ও কৌশল না থাকলে সামাজিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই মনে হয় নারী সাধারণ ভাবে পুরুষের চেয়ে বেশি কৌশলী। কতক পরিমাণে এ সত্য হলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। সাধারণ সৌজন্যের খাতিরে নারীর কথা ও অনুরোধ উপেক্ষা করা চলে না, তাই সে অনেক কাজ পুরুষের চেয়ে সহজে সমাধান করতে পারে। সে সাফল্যের মূলে আছে পুরুষের শিভ্যলরি।

প্রকৃত কৌশল প্রয়োগ করতে গেলে মানুষের কল্পনা ও অনুভূতি থাকা চাই। নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারে আমরা যে শালীনতা ও সৌজন্য দেখাই তাকে ঠিক কৌশল বলা চলে না। সমাজে থাকতে গেলে যে কোন শিক্ষিত ও এমন কি অশিক্ষিত লোকেরও এটা অবশ্য করণীয়। এটা সামাজিক নিয়ম ও মার্জিত রুচির পরিচায়ক। সামাজিক জীবনের এই পরস্পর আদান-প্রদানে যে শালীনতা ও সৌজন্যের প্রয়োজন হয় তা পুরুষের থেকে নারীর মধ্যে বেশি বিকাশ পায়। সে শুধু ভদ্রতা দেখায় না, সে ভদ্রতা শেখায়। "The society of women is the foundation of good manners" (Goethe) কিন্তু প্রকৃত tact বলতে যা বোঝায় তা ঠিক এ নয়। সে এর অনেক উচ্চে। তাতে অন্যের অনুভূতির প্রতি সজাগ থাকতে হয়। "True tact derives from an inherent kindliness and delicacy of spirit. It is an abiding frame of mind exquisitely adjusted to an appreciation of niceties." প্রকৃত দরদ দিয়ে অন্যের অসহায়তা ও দুর্বলতাকে উপলব্ধি ক'রে সুকৌশলে তার মনে একটু সজীবতা এনে দিতে পারলে তার কৃতজ্ঞতা চিরস্থায়ী হয়। মানব সমাজে তাকে হীন হ'তে হয় না। এরূপ পরিস্থিতি হতে পারে, যখন তার নিজস্ব দুষ্কর্মের জন্যই হোক বা ঘটনা চক্রেই হোক সে অপরের নিকট অকুতো-ভয়ে মিশতে লজ্জা পেতে পারে, অথবা নিজেকে নিকৃষ্ট মনে ক'রে ক্ষুব্ধ মনে থাকে। তখন তাকে কৌশলে আপন ক'রে নিতে যে সাম্য ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, যাতে সে নিজেকে নিকৃষ্ট বলে মনে না করে, তা অনেক উচ্চাঙ্গের কৌশল।

"Always behave as if nothing had happened no matter what has happened "(Arnold Bennet) এতে তার লজ্জা নিবারণ হবে, তার নিকৃষ্ট বোধ দূরীভূত হবে। সে কৌশল চাতুর্যের মূল হচ্ছে

সৌজন্য—Courtesy. "Courtesy is to good will what thoughts are to words. Courtesy affects not only manners, but the mind and the heart, it tempers and sweetens every one of our feelings, opinions and words" (Goubart)

নারীর পছন্দ অপছন্দ অত্যন্ত প্রবল। অনেক স্থলে সে আপোষ মীমাংসী নয়। যাকে সে পছন্দ করে না তার নিকট সে বড়জোর মৌনীভাব অবলম্বন করতে পারে, কিন্তু বাক্যে, আলাপে' আলোচনায়, সৌজন্যে ও সাম্য ব্যবহারে, মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন রেখে তাকে বিহ্বলাবস্থা থেকে রক্ষা করা কষ্টসাধ্য কৌশলের প্রয়োজন। "The test of good manners is being able to put up pleasantly with bad ones"—নারী সেখানে কতখানি সক্ষম এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। অতি নিম্নস্তরের ব্যক্তিকেও ব্যবহারের সৌজন্যে আপন করে নিয়ে তাকে সহজভাবাপন্ন করায় প্রকৃত কৌশলের প্রয়োজন। কোন কোন নারীর মধ্যে এ গুণ সমধিক প্রকাশ পায়। কিন্তু নারীর এইটাই সাধারণ গুণ বললে অত্যুক্তি হবে। বেশির ভাগ নারী মনে করেন যে ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করলেই যথেষ্ট—সেই তাদের সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা। এটা তাঁরা বুঝতে পারেন না—এ সৌজন্যের সাথে যদি থাকে নম্রতা, বিনীত ব্যবহার তা হবে প্রকৃত মহত্ব। সামাজিক সৎব্যবহার নিশ্চয়ই গুণ, কিন্তু বিনম্র সৌজন্য হচ্ছে প্রকৃষ্ট গুণ। কৌশল (Tact) বলতে তাকেই বোঝায় এবং সেইটাই যদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়, তা হলে সে নারী সত্যই গুণান্বিতা। শুধু সামাজিক ভদ্রতা থেকে এ অনেক উর্দ্ধে। সামাজিক শিষ্টতা কয়েকটি নিয়ম মেনে চলে, সেটা যেন একটা সামাজিক "ফর্মুলা"—একটা সামাজিক সূত্র, সামাজিক প্রণালী। কিন্তু এর সাথে যখন থাকে হৃদয়ের যোগ, থাকে যখন প্রকৃত অনুভূতি, সমবেদনা ও সহানুভূতি সে হবে উচ্চাঙ্গের গুণ। প্রকৃত কৌশল তাই। এর প্রকাশ কথায় নয়, ব্যবহারে—যা থাকে অব্যক্ত। সাধারণ সৌজন্য হতে পারে কৃত্রিম, তা নির্ভর করে বচন-চাতুর্য্যের উপর। প্রকৃত কৌশল হয় সেখানে—যেখানে ব্যবহারে মানুষকে আপন করে নিতে পারে, তার সনম্র লজ্জা ও সংকোচ দূরীভূত করে তাকে উৎসাহিত করতে পারে। কবির ভাষায়—

"ছোটরে কখনো ছোট নাহি কর মনে
আদর করিতে জানো অনাদৃত জনে।"

সহজবুদ্ধি যেমন নারীবুদ্ধির অংশ বিশেষ, কৌশল-চাতুর্য্য ও সেই প্রকার নারীবুদ্ধির বিশেষ্য। এদের সমন্বয়ে হয় নারীবুদ্ধির বিকাশ। এর অভাবে তা থাকে অসম্পূর্ণ।

সতর্কতার সাথে অন্যের মনোরঞ্জন করতে সমধিক কৌশলের প্রয়োজন হয়, এবং চাতুর্য্যের বিকাশও হয় এতেই। "Intellectual courtesy consists in pleasing flatters "কিন্তু সেটা হওয়া চাই অতীন্দ্রিয়, যাকে ইংরেজিতে বলে imperceptible· এইখানে নারী চাতুর্য্যের প্রকৃত পরীক্ষা। কারণ প্রকাশ্য তোষামোদে মন ক্ষুন্ন হয় সেটা কৌশল নয়। অন্যের মনোরঞ্জন করা মানে তোষামোদ নয়। To be agreeable it is not necessary to be amusing (Higginson).

দুর্ভাগ্যের বিষয় অনেক নারী ও পুরুষ ভাবে—প্রকাশ্য খোশামোদ করাই তার চাতুর্য্যের পরিচয়। খুব কম লোকেই প্রকাশ্য তোষামোদ পছন্দ করে—ভালো লাগলেও মনে সন্দেহ জাগে। এতে তাকে হীনবল ক'রে দেয় :

"Praise too dearly loved, or
warmly sought,
Enfeebles all internal
strength of thought"
(Goldsmith)

তবু বলতে হবে খোশামোদে অনেক কাজ হয়।

"All live by seeming
The begger begs with it and the gay
Courtier
Gains land and title" (Scott)

এর শক্তি যাই থাক না কেন একে ঠিক কৌশল বলা চলে না। কিন্তু এরই খুব সূক্ষ্ম প্রয়োগে মানুষ মাত্রই বশীভূত হয়,—প্রকাশ্য প্রশংসায় যা হয় না। সেটা হবে চাটুকারী।

অনেক নারী অভীষ্টসিদ্ধ ক'রবার জন্য সুকৌশলে জাল বিস্তার করে—যেটা মোটেই সরল নয়; বরং সরীসৃপের

মতই বক্র ও তার চক্ষুর মত শীতল। অনেক ধৈর্য্য-সহকারে তাকে অপেক্ষা করতে হয়, এবং এতে তার কোন স্বার্থ নেই এইভাব প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত ক'রে নিজের সৎ উদ্দেশ্যের গর্ব করে। কারো মনে প্রকাশ্যে আঘাত না দিয়ে,—কারো সন্দেহের উদ্রেক না ক'রে, এবং সে বুঝতে পারবার আগেই তাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেখতে পাই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সতীন পুত্রদের বিরুদ্ধে স্বামীর মন বিষিয়ে তোলাতে। তবে একথা ঠিক যে "Men are not blindly betrayed to corruption, but abandon themselves to their passions with their eyes open: and lose the direction of truth, because they do not understand it" (Johnson)

নারীচাতুর্য্য উর্বর ভূমিতে প্রয়োগ হলেই তার অঙ্কুর গজায়, ও সে হয় ফলপ্রসূ। তথাপি এ আয়াসসাধ্য, ধৈর্য্য না থাকলে এ কার্য্যকরী হয় না। কারণ প্রথম প্রথম বাধা আসে অনেক ও প্রতিরোধও হয় অবশ্যম্ভাবী। নারীর ভূমিকা এ বিষয়ে ঘৃণার্হ হোলেও তার চাতুর্য্য প্রশংসনীয়।

কিন্তু আমরা একেও প্রকৃত কৌশল বলতে পারি না। "To be really tactful one has to be both imaginative and sensitive, True tact is more than a social virtue, it is a real virtue." এ tact প্রকাশ্য নিবেদন নয়, আবেদন নয়, তোষামোদ নয়! এ হচ্ছে অপ্রকাশ্য, অনভুভবনীয়, কমনীয়! অথচ এ দেয় জীবনকে সজীবতা, দেয় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা।" "we cannot always oblige but we can always speak obligingly." (Voltaire)

এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে নারীর কৌশল খুব উচ্চাঙ্গের নয়। অবশ্য এ কথা সত্য নারী তার অভীষ্ট-সিদ্ধ ক'রতে পারে বটে, কিন্তু সে আশু ফলপ্রসূ হোলেও চিরস্থায়ী নয়। এ কথা অনিবার্য যে পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এটা সম্ভব নয় যে সংসারে কিংবা সমাজে যে কেহ ফন্দি এঁটে দিনের পর দিন তোষামোদ করে তার দুষ্ট অভিসন্ধি সিদ্ধ করবে। একদিন সে তার পারিপার্শিক সমবেদনা ও সহানুভূতি হারিয়ে ফেলবে। প্রকৃত কৌশল লোকের সমাদর এনে দেয়, তাদের অনুকূল ভাবের উন্মেষ করে ও সম্প্রীতি জাগিয়ে তোলে। সমবেদনা বিনষ্ট হলে কৌশলের আর কোন মূল্য থাকে না।

মানুষমাত্রই নিজেকে সকলের নিকট আকর্ষণীয় করে তুলতে প্রয়াস পায়। সে শুধু বাহ্যিক চাকচিক্য দেখিয়ে হয় না। কিন্তু নারীর প্রকৃতি হচ্ছে গোপনতা, এবং এর ফলে একটা কৃত্রিমতা তার সাধারণ সৌজন্যের কমনীয়তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, যাতে তার প্রকৃত সৌন্দর্য্যের বিকাশ পেতে পারে না। অবশ্য এমন নারী আছে যে এ সবের ঊর্দ্ধে—যার মানসিক উৎকৃষ্টতা, সৌজন্যের বদান্যতা, চাতুর্য্যের কৌশলতা, এবং সে কৌশলের উৎকর্ষতা তাকে মহিমান্বিত ক'রে সকলের নিকট বরণীয় ক'রে তোলে। রাণী রাসমণি ছিলেন সেই শ্রেণীর রমণী, যাঁর গুণকীর্তন লোকমুখে এখনও প্রচলিত।

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে নারী যদি তার কুচক্রী ও কৃত্রিমতার ভাব ত্যাগ ক'রে অপ্রয়োজন গোপনতা বর্জন করে নিজেকে প্রকাশ করে, তা হ'লে দেখা যায় তার মধ্যে প্রকৃত মানবীয়তা আছে,—যেটা তার সাংসারিক ও সামাজিক নৈপুণ্যের কুটিলতার আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে থাকে। এই কৃত্রিমতা ও গোপনীয়তা তার চারিদিকে একটা কুহেলিকার সৃষ্টি করে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হোতে পারলে তার মূর্তি হয় মনোহারিণী। কিন্তু সংসারে ও সমাজে থাকতে গেলে একেবারে নিঃস্বার্থ সে হোতে পারে না। তাই তার tact বা নৈপুণ্য অবস্থা বিশেষে কুটিল হয়ে পড়ে। নারী জীবনের উপর অবিশ্বাসী, কিন্তু নিজের উপর সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী।

নারীর সহজ প্রবৃত্তি অর্থাৎ "ইনস্টিংকট" হ'লো আত্মরক্ষা এবং বিপদ বর্জন করা। আত্মসম্মানের প্রতি তার দৃষ্টি খুব সজাগ; তার অনুভূতি খুব তীক্ষ্ণ। তাই অল্পতেই তার সম্ভ্রমের হানি হয়। এটা হয়তো তার শারীরিক দুর্বলতার বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া—আত্মরক্ষারই অভিনব অভিব্যক্তি। এতে তার দোষ নেই। আত্মসম্মান নারী পুরুষ উভয়েরই আছে কতক পরিমাণে, এবং যেখানে সে একবার প্রতিহত হয়েছে সেখানে পুনর্বার অভিগমন তার অভিমানে বাধে। নিরভিমান ব্যক্তির এ বিষয়ে

অনেক সুবিধা, যা অভিমানী ব্যক্তির নেই। সে কৌশলে আপন সম্মান বাঁচিয়ে যেতে চায়। পৃথিবীতে বেশি আশা করলেই নিরাশ হ'তে হয়। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা অন্যের প্রতি কেন, নিজের উপরেও খুব আশা রাখেন না।

কৌশল প্রয়োগের অর্থই হচ্ছে সম্পর্ক মধুর করা। মনের অবস্থা বিশেষে সামান্য কথাতেও লোকে ত্রুটি ধরে। অথচ সেই-ই অন্যস্থলে বড় অপমানকেও উপেক্ষা করে চলে যায়। দৈনন্দিন আদান-প্রদানে কৌশলের স্থান কোথায়? সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন ক'রে আপন জনের সাথেও কথা বলা মানে নিজেকে আড়ষ্ট ক'রে রাখা, সেটা হবে কৃত্রিমতা। সেখানে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত মানসিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ হতে পারে না। জীবন হয় একটা নকল আনুষ্ঠানিক বিধি পালন। তাতে সামাজিক রীতিনীতি, সৌজন্য পালিত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত মানবীয়তা প্রকাশ পায় না। তবে tact ব'লতে অন্যের মনের অবস্থা বিবেচনা করে তা'র সাথে ব্যবহার করা,—তাতে কৃত্রিমতা কিছু থাকবেই। এর উপায় নেই। নিজের নৈসর্গিক চরিত্র সব সময় প্রকাশ্য নয়, তার উপর একটা মার্জিত ভাব এনে কিছুটা "পালিশ" ক'রে লোকচক্ষের সামনে উপস্থিত ক'রতে হয়। তা না হোলে সে জিনিষের কদর হয় না। তাই যেদিন সমাজ গঠিত হ'লো, সংঘবদ্ধ জীবন সুরু হ'লো, সেইদিন থেকে কৃত্রিমতাও এলো। অন্তরের কথা কে শোনে? হৃদয়ের সৌন্দর্য্য কে দেখে? প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুদ্দেশ্যের খবর কে রাখে? শুধু বাহ্যিকটা নিয়েই আমরা বিচার করি,—সন্দেহের নিক্তিতে ওজন করি, আপন স্বার্থ ও পরিবেষ্টনের মাধ্যমে চিন্তা করি। মানুষের সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, আনন্দ-নিরানন্দ, সব কিছুই এই কৃত্রিম আদান প্রদানের উপরই নির্ভর করে। সোপেন-হাওয়ার বলেছেন, সমাজ জীবনে আমরা শতকরা নব্বুই ভাগই কৃত্রিমতার অভিনয় করি। অতি সূক্ষ্মেন্দ্রিয় দিয়ে মানুষের অন্তরের সৌন্দর্য্য, কদর্য কে দেখে? যেখানে কৃত্রিমতা নেই, মার্জিত প্রকাশভঙ্গী নেই, যেখানে শিক্ষার আভিজাত্য নেই, সেখানেও যে গূঢ় সত্য নিহিত থাকতে পারে তা ওয়ালটার স্কটের কথায় বলতে গেলে "The wisest words that I ever heard was from a rustic." সে শিক্ষিত সমাজে স্থান পায় না। আমরাও অনেক সময় অশিক্ষিত, অমার্জিত গ্রাম্য চাষী লোকের মুখে যে কথা শুনেছি সে অতি উচ্চদরের জ্ঞানের পরিচায়ক। তার ভিতর নেই কৃত্রিমতা,—তার প্রকাশভঙ্গী সভ্য, শিক্ষিত, মানী সমাজে চলবে না। তবু তার ভিতর আছে অনাবিল সত্য। আছে তার মধ্যে হৃদয়ের আগ্রহ, প্রকাশ পায় তার নির্মল চরিত্র!

পুরাতন বন্ধুত্ব সজীব রাখতে গেলে বাগানের মত তাকে যত্ন করে পালন ক'রতে হয়। সেইখানেই tact এর প্রয়োজন। বিভিন্ন স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে যে জিনিষ নিয়ত ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যায়, তাকে সজীব রাখতে যে প্রয়াসের প্রয়োজন ক'জনের তা থাকতে পারে? নারীরও না, পুরুষেরও না। সে একদিন শুকিয়ে যাবেই। tact সর্বকালের জন্য তাকে জীবিত রাখতে পারে না,—নারীর তো নাই-ই। তাই বৃদ্ধ বয়সে, বিশেষ করে নারীর বন্ধুত্বের স্রোতে ভাটা পড়ে। "Many love affairs and friendships, which appeared invincible and brought all those victorious emotions which, in their different degrees, love or friendship can evoke, end up in total darkness," চাতুর্য্যের স্থানে আসে ক্রোধ ও তিক্ততা,—ক্রোধ থেকে নির্বিকার, ও নির্বিকার থেকে বিস্মৃতি—এই-ই পৃথিবীর নিয়ম। মোটের উপর কৌশল চাতুর্য্য চিরকাল খাটে না,—একদিন তার শেষ আছে। গোড়া শুকিয়ে গেলে উপরে জল ঢেলে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় না। "All things have an end," তবে সময়োচিত কৌশলের বা tactএর অভাবে সেদিন আসে দ্রুতগতিতে। এ নিয়ম সকলের প্রতিই প্রযোজ্য নারীপুরুষ নির্বিশেষে; তবে নারীর পক্ষে আসে এটা দ্রুততর গতিতে। কারণ তার মন সংসারে নিবিষ্ট, এবং সেখানেই তার সুখ, দুঃখ, কৌশল, চাতুর্য্য, নিপুণতা সব একত্রিত হয়ে আছে। সেই তার পৃথিবী! সেখানেই আছে নিহিত তার আনন্দ নিরানন্দ, গৌরব-অগৌরব, তৃপ্তি-অতৃপ্তি! তাকেই সে স্বর্গ করতে পারে, আবার তাকেই সে নরক ক'রতে পারে—নির্ভর করে তার মনের উপর, তার চিন্তাধারার উপর, তার উদারতা কিংবা সঙ্কীর্ণতার উপর। তার মনের অবস্থা প্রতিফলিত হয় সংসারে।

নারীর বন্ধুবিচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ আছে সংসারে, পুরুষের তা নাই। কারণ পুরুষ সংসারী নয়,—সে ভবঘুরে।

সমাজ ও সংসারে আনন্দ আনতে গেলে চাই "তিতীক্ষা সন্তোষ, ক্ষমা, সুপ্রবৃত্তি দানে।" এই-ই প্রকৃত কৌশল, প্রকৃত বুদ্ধিচাতুর্য্য,—বিশেষ করে নারীর পক্ষে। যে কৌশলের উদ্দেশ্য হ'লো হীন সে কৌশলের প্রকৃত মূল্য কিছুই নেই,—সেটা হবে চাতুর্য্য।

—

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

ইতিপূর্ব্বে রঙীণ কাপড়ের টুকরো দিয়ে মেয়েদের নিত্য-প্রয়োজনীয় টুকিটাকি-জিনিষপত্র বা সেলাইয়ের সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি রাখবার জন্য অভিনব-ছাঁদের যে সব সুদৃশ্য-সুন্দর 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলি' বানানোর হদিশ দিয়েছি, এবারেও তেমনি-ধরণের আরেকটি বিচিত্র কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার কথা বলছি।
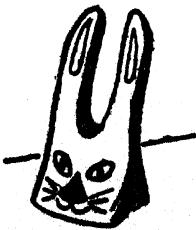
উপরের ১নং চিত্রে বেড়ালের-মুখের ছাঁদে রচিত যে বিচিত্র 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলির' নমুনাটি দেখানো হয়েছে—সেটি হাট-বাজার দোকান থেকে ঘর-সংসারের নানারকম টুকিটাকি-জিনিষপত্র কিনে বাড়ীতে বহে আনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে। ঘরকন্নার কাজের অবসরে নিজের হাতে কাট-ছাট-সেলাই করে রঙীণ কাপড়ের টুকরো দিয়ে এমনি অভিনব-ধরণের সুদৃশ্য-সৌখিন 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলি বানানো এমন কিছু দুঃসাধ্য-কঠিন বা ব্যয়বহুল ব্যাপার নয়...সামান্য চেষ্টায় এবং অল্প কয়েকটি ঘরোয়া-সাজসরঞ্জামের সাহায্যে পরিপাটিভাবে সূচী-শিল্পের কাজ করে অনায়াসেই এ সব সামগ্রী রচিত হতে পারে।

রঙ-বেরঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে উপরের নক্সার ছাঁদে 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলি' বানাতে হলে যে সব সাজ-সরঞ্জাম দরকার—গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ কাজের জন্য চাই—প্রয়োজনমতো ছোট, বড় বা মাঝারি মাপের খদ্দর, দো-সুতী অথবা 'ক্যানভাস্' (Canvas) জাতীয় থাপি-মজবুত রঙীণ-কাপড়ের টুকরো আর ঐ কাপড়ের সঙ্গে মানানসই দেখায়, এমনি রঙের কয়েকটি সুতোর বাণ্ডিল, বড়-ছোট এবং মাঝারি সাইজের কয়েকটি মজবুত ছুঁচ, একখানি ভালো কাঁচি ও গোটাকয়েক সৌখিন-ছাঁদের রঙীণ-বোতাম।

ফর্দ্দমতো সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ হবার পর, উপরের ২নং চিত্রের নমুনা অনুসারে রঙীণ-কাপড়ের বুকে নিখুঁত-পরিপাটিভাবে বিড়ালের মুখের-ছাঁদে একজোড়া 'নক্সার'

pattern বা Design) এঁকে নিন। এ কাজ সারা হলে, নীচের ৩নং চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি-ছাঁদে 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলির' তলদেশের (Bottom) ও পার্শ্বভাগের (Side-flaps of the cloth-bag) কাপড়ের টুকরো দুটিকে আগাগোড়া পরিপাটিভাবে রেখাঙ্কিত করে ফেলুন।
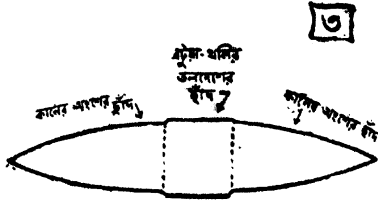
এমনিভাবে রঙীণ কাপড়ের বুকে প্রয়োজনমতো মাপে ও আকারে উপরের ২নং ও ৩নং চিত্রের 'নক্সা-প্রতিলিপি' চারটি নিখুঁত-ছাঁদে এঁকে নেবার পর, রেখাঙ্কিত-নক্সার দাগ বরাবর কাঁচি চালিয়ে কাপড়ের টুকরোগুলিকে নিপুণ-ভঙ্গীতে আলাদা-আলাদা, ছাটাই করে নিন। এবারে প্রয়োজনমতো ছোট, বড় বা মাঝারি ধরণের ছুঁচে মানানসই রঙের সুতো পরিয়ে 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলির' তলদেশের (Bottom) দুই দিকের প্রান্তে বেড়ালের মুখের-ছাঁদে ছাঁটাই-করা রঙীণ-কাপড়ের টুকরো দুটিকে সমানভাবে বসিয়ে সুষ্ঠুভাবে টাঁকা-সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে একত্রে জুড়ে দিন। তাহলেই 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া থলির' সামনের ও পিছনের অংশ এবং তলদেশ রচনার পর্ব্ব মিটবে। তবে সূচী-কার্য্যের সময় খেয়াল রাখবেন, সেলাইয়ের ফোঁড়গুলি যেন ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলির' বাইরের দিকে দেখতে না পাওয়া যায়··· আগাগোড়া যেন 'অন্দর-ভাগেই' (Inside of the bag) থাকে। কারণ, সেলাইয়ের ফোঁড় বাইরের দিকে রচিত হলে—'ব্যাগ' বা 'বটুয়া থলিটি' দেখতে অসুন্দর হবে।

এ কাজটুকু সেরে নেবার পর, ঠিক এমনি পদ্ধতিতেই 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলির' সামনের ও পিছনের অংশ এবং তলদেশের সঙ্গে পার্শ্বভাগের কাপড়ের টুকরোটিকে পরিপাটিভাবে জোড়া দিয়ে পাকাপাকি-ধরণে সেলাই করে ফেলুন। তাহলেই বেড়ালের মুখের ছাঁদে 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলি রচনার কাজ মোটামুটি সারা হয়ে যাবে।

এইভাবে 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলির' প্রত্যেকটি অংশ একত্রে জোড়া দিয়ে নেবার পর, উপরের চিত্রে দেখানো নমুনা-অনুসারে বেড়ালের মুখের সুমুখ ও পিছন দিকের কাপড়ের যথাস্থানে মানানসই-রঙের সৌখিন-বোতাম সেলাই করে চোখ দুটিকে ফুটিয়ে তুলুন। তারপর ত্রিকোণ-আকারে লাল অথবা গোলাপী রঙের ছোট এক-টুকরো রঙীণ-কাপড় ছাটাই করে বেড়ালের নাসিকা রচনা করুন এবং মানানসই-রঙের সূতোর সাহায্যে পরিপাটি-ছাঁদে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে বেড়ালের চোখের ও মুখের রেখা-চিহ্নগুলি ফুটিয়ে তুলুন। তাহলেই বেড়ালের মুখের-ছাঁদে বিচিত্র-অভিনব 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলি' রচনার কাজ শেষ হবে।

পরের সংখ্যায় কাপড়ের কারু-শিল্পের এমনি আরেকটি সৌখিন-অথচ-নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী রচনার কথা আলোচনা করার বাসনা রইলো।

ব্লাউশের নতুন নক্সা-নমুনা

হিরণ্ময়ী দেবী

দৈহিক-গঠন আর রূপ-লাবণ্য ছাড়াও, বিচিত্র-অভিনব সাজসজ্জা, রত্নালঙ্কার-আভরণ আর প্রসাধনী-উপকরণের সহায়তায় নারীর শ্রী-সৌন্দর্য্য যে আরো বেশী মনোরম হয়ে ওঠে—এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। তাই প্রাচীনকাল থেকে সুরু করে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্বদেশে সুসভ্য ও অসভ্য সর্ব্বজাতির নারী-সমাজে বিবিধ-ধরণের বেশভূষা-প্রসাধন আর রূপ-সজ্জা চর্চ্চার রীতিমত আগ্রহ-অনুরাগ দেখা যায়। যুগে-যুগে, কালে-কালে বিশ্বের কত কবি, কত শিল্পী, কত বিলাসী-সৌখিন চিন্তাশীল রসিক সুধীজন নারীর রূপ-লালিত্য বিকাশের উদ্দেশ্যে এত সব মতামত ও সারগর্ভ উপদেশ প্রচার করেছেন যে তার আর ইয়ত্তা নেই···এমন কি, একালেও দুনিয়ার সর্ব্বত্র নারী-সমাজে

বসন-ভূষণ, রূপচর্চ্চা-প্রসাধন নিত্য নিয়মিত আলোচনার এমন একটি বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে যে পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, আসরে-মজলিসে, গ্রামে-শহরে, ঘরে-ঘরে, সাহিত্যে-শিল্পে, ঘরোয়া-আলাপে ধনী-দরিদ্র-মধ্যবিত্ত সবাই আজকাল এ সম্বন্ধে প্রচুর উৎসাহ দেখাতে সুরু করেছেন। বেশভূষা-প্রসাধন আর রূপ-চর্চ্চার দিকে জনসাধারণের এতখানি অনুরাগ-উদয়ের ফলেই, ইদানীং সকল দেশের ছোট-বড় সব রকম সাময়িক-পত্রেই নিত্য-নতুন নানা-ছাঁদের বিচিত্র বসন-ভূষণ, অলঙ্কার-আভরণ, রূপসজ্জা-প্রসাধনের বিবিধ তথ্য ও চিত্র-সম্বলিত প্রবন্ধালোচনা প্রকাশের অভিনব রীতি প্রচলিত হয়েছে। সুপ্রচলিত এই রীতি-অনুসারে আমরাও এবারে মেয়েদের ব্যবহারোপযোগী ব্লাউশের দুটি নতুন নমুনা-নক্সা উপহার দিলুম।

উপরের নক্সায় দেখানো অভিনব-ছাঁদের ব্লাউশের নমুনা দুটি—পোষাকী এবং আটপৌরে—উভয়ভাবেই ব্যবহার করা চলবে। নক্সামতো ছাঁদে, এ দুটি ব্লাউশ বানানো এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে যে সব সুগৃহিনী ঘরে বসে নিজেদের হাতে অল্প-বিস্তর সূচী-শিল্প চর্চ্চা করেন, সামান্য চেষ্টাতেই তারা সুষ্টু-সুন্দরভাবে ছাঁট-কাট-সেলাইয়ের কাজ করে দর্জির সাহায্য না নিয়ে অনায়াসেই সহজ-সরল নমুনার এ দুটি ব্লাউশ বানাতে পারবেন। ব্লাউশের নমুনা দুটি রচনার জন্য—মোটা কাপড়ের বদলে মোলায়েম মিহি-ধরণের রঙীণ অথবা ছিটের রেশমী ও সূতীর কাপড় ব্যবহার করাই ভালো…তাহলে পোষাকের শ্রী-সৌষ্টব আরো বেশী মনোরম দেখাবে। সূচী-শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি-অনুসারে, এক-রঙের কাপড়ের বদলে বিভিন্ন ধরণের মানানসই রঙীন-কাপড় ব্যবহার করেও উপরের নক্সার নমুনামতো এ দুটি ব্লাউশ বানানো যেতে পারে। তবে, গাঢ়-সূতী কিম্বা রেশমী কাপড়ের বদলে যদি কোনো হাল্কা-ফিকে রঙের কাপড় ব্যবহার করা হয়, তাহলে উপরের নক্সামতো-ছাঁদে-রচিত ব্লাউশ দুটি আরো বেশী সুন্দর ও মানানসই দেখাবে। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে—ফিকে-হলুদ (Lemon yellow), গোলাপী (Pink), হাল্কা-সবুজ (Emareld green), ফিকে-বেগুনী (Mauve), হাল্কা-কমলা (Light orange), ফিকে-ধূসর (Light grey), হাল্কা-বাদামী (Fawn), রঙের, অথবা ঈষৎ-চওড়া ডোরাকাটা (Fine-striped) কিম্বা ছোট-ছোট বুটিদার (Tiny-dotted)রঙীণ ছিটের মিহি-মোলায়েম সূতী বা রেশমী কাপড় ব্যবহার করলে—উপরে ১নং চিত্রে দেখানো ব্লাউশের নমুনাটি যে কোনো গাঢ়-রঙীন কাপড়ের চেয়েও আরো অনেক বেশী মনোহর হয়ে উঠবে।

উপরের ২নং চিত্রে দেখানো ব্লাউশের নমুনাটিও ইতি-পূর্ব্বে উল্লিখিত ফিকে-হাল্কা রঙের সূতী বা রেশমী কাপড়েই মানানসই ও সুন্দর দেখাবে। তবে এ ব্লাউশ বানানোর জন্য যে কোনো ফিকে-হাল্কা রঙের সূতী বা রেশমী কাপড়ই বাছাই করে নিন না কেন, পোষাকের গলা ও কাঁধের উপরাংশে এবং জামার হাতার নিম্নাংশে কুঁচি-দেওয়া সরু-ফিতার যে 'আলঙ্কারিক-পাড়' (Decorative-Frills) বসানো রয়েছে, সেগুলি আগাগোড়া শাদা-রঙের কাপড়ের সাহায্যে রচনা করাই যুক্তিযুক্ত… তাহলে পোষাকের বাহার আরো অনেক বেশী খুলবে ও অপরূপ-সুন্দর দেখাবে।

বারান্তরে, এমনি ধরণের আরো কয়েকটি সহজ-সরল ও অনায়াসসাধ্য পোষাক-পরিচ্ছদের বিচিত্র-অভিনব নতুন-নতুন নমুনা-নক্সার হদিশ জানানোর ইচ্ছা রইলো।

—

সুধীরা হালদার

এবারে উত্তর-ভারতের অধিবাসীদের বিশেষ-প্রিয় অপূর্ব্ব-মুখরোচক পায়েস জাতীয় দুটি মিষ্টান্ন রান্নার কথা বলছি। প্রথমটির নাম—'ফির্ণী'···এবং দ্বিতীয়টির নাম—'সেঁওয়াই'। ছুটির দিনে অথবা বাড়ীতে কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সাদরে প্রিয়জনদের পাতে পরিবেষণের উদ্দেশ্যে বিচিত্র-সুস্বাদু এ দুটি খাবারই পরম-উপযোগী হবে।

ফির্ণী ঃ

ফির্ণী রান্নার জন্য উপকরণ চাই—বড় চামচের দু-চামচ সুগন্ধী মিহি-চাল, একসের দুধ, বড়-চামচের আট চামচ চিনি, তিন-চারটি ছোট-এলাচ, চার-পাঁচটি কাগজী-বাদাম, একশিশি গোলাপ-জল বা 'কেওড়া', আর এক চাঙড় বরফ। এই ফর্দ্দমতো উপকরণ দিয়ে প্রায় ছয়-সাতজনের মতো আত্মীয়-বন্ধুর আহারের ব্যবস্থা করা যাবে।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে, প্রথমেই চালগুলিকে ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার একটি পাত্রে খানিকক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখুন। এভাবে ভিজিয়ে রাখার ফলে, চালগুলি বেশ নরম হয়ে গেলে, সেগুলিকে জল থেকে তুলে নিয়ে পরিষ্কার একটি 'শিলাতে' মিহি-ছাঁদে বেটে ফেলুন। তারপর কাগজী-বাদামগুলির খোলা ছাড়িয়ে সেগুলিকে ছোট-ছোট 'টুকরো করে কেটে নিন ও ছোট-এলাচগুলির খোসা ছাড়িয়ে দানাগুলিকে পরিচ্ছন্ন একটি পাত্রে সযত্নে তুলে রাখুন।

এমনিভাবে উদ্যোগ-পর্ব্বের কাজ সারা হলে, উনানের নরম-আঁচে রান্নার কড়া বা ডেকচি চাপিয়ে সেই পাত্রে দুধটুকু ফুটিয়ে নিন। কিছুক্ষণ ফোটানোর পর, দুধটুকু অল্প-ঘন হবার সঙ্গে সঙ্গে, রন্ধন-পাত্রে চিনি ও চাল-বাটা মিশিয়ে, সেই মিশ্রণটিকে অনবরত হাতার সাহায্যে সযত্নে নেড়েচেড়ে বেশ থক্‌থকে গাঢ়-ধরণের না হয়ে ওঠা পর্য্যন্ত পাক করুন। এভাবে চিনি, চাল-বাটা আর দুধ একত্রে মিশিয়ে খানিকক্ষণ ভালভাবে পাক করার ফলে, 'মিশ্রণটুকু' আগাগোড়া বেশ ঘন-থক্‌থকে ও 'লেইয়ের (Pulp) মতো হলে, উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্র নামিয়ে নিয়ে খাবারটি সযত্নে অন্য একটিপরিচ্ছন্ন কাঁচের বা চীনা-মাটির পাত্রে তুলে রাখুন। তাহলেই উত্তর-ভারতীয় প্রথায় 'ফির্ণী' রান্নার কাজ শেষ হবে।

রান্নার কাজ চুকলে পরিবেশনের পালা। তবে প্রিয়-জনদের পাতে 'ফির্ণী' খাবারটি পরিবেষণের আগে আরো কয়েকটি কাজ সেরে রাখা প্রয়োজন। অর্থাৎ, সদ্য-রাঁধা 'ফির্ণীর' উপরে আন্দাজ-মতো অল্প একটু 'কেওড়া' বা গোলাপ-জল ছড়িয়ে খাবারটি মনোরম 'সুগন্ধী' করে নিন এবং পরিপাটিভাবে কাগজী-বাদামের কুচো ও ছোট-এলাচের দানা সাজিয়ে খাবারের পাত্রটিকে কিছুক্ষণ বরফের টুকরোর মাঝখানে বসিয়ে রেখে সেটিকে আগাগোড়া সুশীতল করে তুলুন। তাহলেই আহারের সময় খাবারটি আরো বেশী মুখরোচক হয়ে উঠবে। উত্তর ভারতীয় প্রথায় 'ফির্ণী' রান্নার এই হলো মোটামুটি-রীতি।

সেঁওয়াই ঃ

উত্তর-ভারতীয় প্রথায় 'সেঁওয়াই' মিষ্টান্ন রান্নার জন্য উপকরণ দরকার—বড়-চামচের তিন চামচ 'সেঁওয়াই', চায়ের পেয়ালার চার পেয়ালা দুধ, চায়ের চামচের ছয় চামচ চিনি, বড়-চামচের দুই চামচ পেস্তা, বড়-চামচের দুই চামচ কিস্‌মিস্ আর এক চাঙড় বরফ। এ সব উপকরণ দিয়ে অন্ততঃপক্ষে চার-পাঁচজন লোকের আহারের মতো 'সেঁওয়াই, রান্না করা চলবে।

ফর্দ্দমতো উপকরণগুলি জোগাড় হলে, গোড়াতেই কিসমিসগুলি পরিষ্কার জলে ধুয়ে সাফ করে ফেলুন এবং পেস্তার খোসা ছাড়িয়ে, সেগুলিকে মিহি-ছাঁদে কুচিয়ে রাখুন। এবারে পরিচ্ছন্ন একটি রন্ধন-পাত্রে, দুধের সঙ্গে চিনি, কিসমিস আর 'সেঁওয়াই' মিশিয়ে ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত 'ফির্ণী' রান্নার পদ্ধতিতেই রন্ধন-পাত্রের এই 'মিশ্রণটিকে' খানিকক্ষণ উনানের নরম-আঁচে বসিয়ে রেখে হাতার সাহায্যে অনবরত নাড়াচাড়া করে আগাগোড়া বেশ ঘন-থক্‌থকে 'লেইয়ের' (Pulp) মতো ধরণে ফুটিয়ে নিন।

এমনিভাবে রান্নার ফলে, 'মিশ্রণটুকুর' চেহারা 'লেইয়ের' মতো ঘন-থক্‌থকে হয়ে উঠলে, রন্ধন-পাত্রটি উনানের উপর থেকে নামিয়ে নিয়ে অন্য একটি পরিচ্ছন্ন পাত্রে সযত্নে খাবারটি তুলে রাখুন। তাহলেই রান্নার পালা শেষ। এবারে খাবারের উপর পেস্তার কুচো আর কিসমিস ছড়িয়ে দিন এবং পাত্রটিকে কিছুক্ষণ বরফের টুকরোর মাঝে বসিয়ে রেখে সদ্য-রাঁধা খাবারটিকে সুশীতল করে নিন। এই হলো—উত্তর-ভারতীয় প্রথায় 'সেঁওয়াই' রান্নার মোটামুটি নিয়ম।

—

অফিস ছুটির পর বিভূপদ এসপ্লানেডের ম্যাগাজিন ষ্টলটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আরো অনেকে এসে ভীড় করেছে। ইংরেজী বাংলা হিন্দী উর্দু সব রকম ম্যাগাজিনই এখানে পাওয়া যায়। নানা রুচির নানা-স্তরের পাঠকই এখানে আছে। বেশিরভাগ ক্রেতাই পত্রিকাগুলি শুধু নেড়ে চেড়ে দেখছে। কিনবার উদ্দেশ্য তাদের আছে বলে মনে হচ্ছেনা। কেউবা সিনেমা ম্যাগাজিনের পাতা উলটে অভিনেত্রীদের ছবির দিকে অপলকে তাকিয়ে রয়েছে। দোকানদার ধমক দিয়ে ওঠা না পর্যন্ত কাগজখানা লোকটি হাত ছাড়া করবেনা। কত রকম মানুষই আছে সংসারে। কেউ কেউ চক্ষু লজ্জার একেবারেই ধার ধারেনা। যারা পাশে দাঁড়িয়ে দেখে তাদের কিন্তু লজ্জা করে। মাঝে মাঝে এই সব ষ্টলের কাছে এসে দাঁড়ালে অনেক লোক চরিত্র চেনা যায়। একটু নিস্পৃহ ভাবে মানুষের চাল চলন ধরণ-ধারণ দেখতে মন্দ লাগেনা। সময়টা বেশ কাটে। তাছাড়া বিনা পরিশ্রমে কিছু অভিজ্ঞতাও বাড়ে। কিন্তু

অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিতে এই মূহূর্তে বিভূপদের বিশেষ আনন্দ ছিলনা। তিনি বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছিলেন। যার পাঁচটা দশ কি পনের মিনিটে আসবার কথা সে যদি সাড়ে পাঁচটা বাজিয়ে দে: মানুষ কি স্বস্তিতে থাকতে পারে? বিভূপদও স্বস্তি পাচ্ছিলেননা। শীলা এত দেরি করছে কেন? এত দেরিতো সে কখনো করেনা। কোন কোন দিন নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ সাত মিনিট আগেই এসে বরং সে দাঁড়িয়ে থাকে। বিভূপদই লেট করে ফেলেন। আজ একেবারে উল্টো কাণ্ডটি ঘটল। বিভূপদই আগে এলেন। এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিনিট আর সেকেণ্ড গুণতে লাগলেন; কিন্তু যে সবচেয়ে আগে আসে সেই পড়ল পিছিয়ে। বিভূপদ আর একবার ঘড়ি দেখলেন। পাঁচটা চল্লিশ। না:, আজ আর বোধ হয় শীলা এলনা।

অথচ এই অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দুদিন আগে থেকে শীলা করে রেখেছে তার সঙ্গে। পাঁচটা পনেরোয় শীলা এসে তাঁর সঙ্গে এসপ্লানেডে দেখা করবে। এখান থেকে তাঁরা রাস্তা পার হয়ে পূবদিকের কোন একটি রেষ্টুরেন্টে ঢুকবেন। পর্দা ঢাকা কেবিনে গিয়ে বসবেন। সেখানে বসে বসে কিছু খাবেন। চায়ের সঙ্গে চপ কি কাটলেট—শীলা যেটা পছন্দ করে। কোন কোন দিন মেয়েটির মুখ দেখে বিভূপদের মনে হয় অফিসের খাটুনির পর ওর বড় বেশি ক্ষিদে পেয়েছে। তেমন দিনে কাটলেটের বদলে কারি আর রুটির অর্ডার দেন। নিজে কিন্তু মিতাহারী। মাংস টাংস বড় একটা খাননা। খেতে ভালো ও লাগেনা, তেমন সহ্যও হয়না। কিন্তু যে খায়, যে খেতে ভালোবাসে তাকে খাওয়ান বিভূপদ। ভোজন পর্বের পর দুজনে মিলে একটু গঙ্গার ধারে যাওয়া। কি ইডেন গার্ডেনে বসে গল্প করা। আধুনিক লেকের চেয়ে পুরোন ইর্ডেনগার্ডেনই বিভূপদবাবুর পছন্দ। এই উদ্যানের সঙ্গে তাঁর যৌবন স্মৃতি বিজড়িত। ছাত্র জীবনে সহপাঠী বন্ধুদের নিয়ে বহুদিন এসেছেন এখানে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেছেন, তর্ক বিতর্ক করেছেন। আজ সেই বন্ধুরা অদৃশ্য। তাদের কেউ কেউ সশরীরে এই শহরেই অবশ্য আছে। কিন্তু বিভূপদের সঙ্গে তেমন কোন যোগাযোগ আর নেই। বয়সের এই বোধ হয় নিয়ম।

পঞ্চাশ এখনো পার হননি বিভূপদ। কিন্তু সংসার এরই মধ্যে তাঁর জন্যে অরণ্য রচনা করে রেখেছে। বয়স হয়ে গেলে বনে যাওয়ার জন্যে মানুষকে ডুয়ার্স কি মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে ঢুকতে হয়না, মানুষের আশে পাশের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবরাই গাছ হয়, পাহাড় হয়, পর্বত হয়। সেই বনের মধ্যে কেউ যদি তপোবন কি উপবন রচনা করে নিতে পারল তো ভালো, না পারলে বনের সাপ বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে করেই তাকে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে হয়। সে সব যুদ্ধ বিভূপদের ও আছে। অফিসে ক্লিক আছে। আঘাত যদি নাও দিতে চাও অন্যের অস্ত্রাঘাত থেকে আত্মরক্ষা তো করতেই হবে। সংসারে অভাব অনটন আছে। স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদের ভরণপোষণ লেখাপড়া শেখাবার ব্যয়কে উপার্জনের সীমার মধ্যে ধরে রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টা প্রতিদিন চালিয়ে যেতে হয়। মাঝে মাঝে সংসারের রথ অচল হয়ে পড়বার ও যে আশঙ্কা দেখা দেয়না তা নয়। তবু এরই মধ্যে একটু উপবন, একটু কুঞ্জ কানন বিভূপদ নিজের জন্যে রচনা করে নিয়েছেন। সেই চিরবসন্তের পুষ্পিত কাননভূমির নাম শীলা দত্তগুপ্ত।

এই পুষ্পিত কাননভূমিও আসলে বিভূপদের নিজেরই সাধ আহ্লাদ স্বপ্ন আর বাসনা দিয়ে গড়া। নইলে শীলা দেখতেও সুন্দরী নয়, যৌবনের অপরিমিত স্বাস্থ্যও ওর নেই। লম্বাটে গড়নের মুখের ভৌলটি অবশ্য মিষ্টি। কালো বড় বড় দুটি চোখের দিকে তাকালেও বিভূপদের মনে তা স্বপ্ন সায়রের আভাস আনে। কিন্তু একহারা লম্বাটে ছিপছিপে গড়নের মধ্যে যৌবনের অমিতবিভা শীলার কোথায়! মেয়েটি যেমন দরিদ্র পরিবারের, ওর দেহাধারও তেমনি রূপরিক্ত। অন্তত আর একটু রূপ শীলার থাকতে পারত, দেখতে আর একটু সুশ্রী হলে বিভূপদের চোখ জুড়োত। কিন্তু নেই যখন—তা নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ কি। মেয়েই হোক পুরুষই হোক রূপের ওপর কারোরই যে হাত নেই, এখানে সবাই যে প্রকৃতির অধীন, তার মুখাপেক্ষী, একথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে। প্রকৃতি নিজের খেয়ালে কারো দেহে লাবণ্য পুঞ্জিত করে, কাউকে বা শুধু মুষ্টিভিক্ষা দেয়, কাউকে বা সেটুকুও দেয়না। অবশ্য একে কেউ আর আজকাল

নৈসর্গিক খেয়াল খুসির ব্যাপার বলে মনে করেননা। একটি মেয়ে যে কোন অসুন্দরী জীব, বিস্তায় বিস্তায় তার নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু সেই ব্যাখ্যা মুখস্থ করে লাভ কি বিভূপদের। সেই ব্যাখ্যার জোরে অসুন্দরী একটি মেয়েকে তো আর সুন্দরী করে তুলতে পারেননা তিনি। বরং তাকে নিয়ে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ইর্ডেন গার্ডেনের একখানি বেঞ্চে পাশাপাশি নিঃশব্দে বসে থেকে, কি গঙ্গার ধারে চাতালের ওপরে পা ঝুলিয়ে বসে আকাশের তারা, নদীর স্রোত আর দূরে দূরে অসংখ্য আলোর মালার দিকে তাকিয়ে একটি তরুণীর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তারা মৃত্যুর সীমানা পার হয়ে এক সীমাহীন রূপলোকে উত্তীর্ণ হতে পারেন।

আজও ওই রকমই এক প্রত্যাশা ছিল বিভূপদের। শীলার সঙ্গে চা পান শেষ করে একটু বেড়াতে বেরোবেন। ট্যাক্সি পাওয়া যায় তো ট্যাক্সি ডাকবেন, না হলে ফিটনকি রিকসাই সই। শীলা আবার ফিটনে উঠতে ভয় পায়। কার কাছে কি সব গল্প শুনেছে, সেই থেকে ফিটন গাড়ি সম্বন্ধে ওর বিভীষিকা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ওসব গাড়িতে উঠলে নাকি বিপদে পড়বার আশঙ্কা থাকে। কোচম্যানরা কোথায় নিয়ে যাবে, বেকায়দায় ফেলে কত টাকা আদায় করে নেবে, ডাকাতি রাহাজানি যে করবে না এমন কথা কে জোর করে বলতে পারে। তবু কদাচিৎ শীলাকে ফিটনেও তুলেছেন বিভূপদ। তাঁর নিজের কোন অসুবিধা হয়নি। এক গো-যান ছাড়া তাঁর যে কোন যানবাহনই ভালো লাগে। সঙ্গে কেউ যদি থাকে—তিনি কোথায় যাচ্ছেন, কি ভাবে যাচ্ছেন সে খেয়ালই তাঁর থাকে না। সঙ্গিনীর মধ্যে তিনি একেবারে হারিয়ে যান। আর কিছুক্ষণের জন্যে হারিয়ে যাবেন বলেই তিনি কোন একজনকে খোঁজেন। নারী উপলক্ষ মাত্র। রূপ তার যাই হোক না কেন, শুধু নামটুকু থাকলেই চলে।

বিভূপদ ভেবেছিলেন আজ বেশি জোর জবরদস্তি করবেন না। বিকেল পাঁচটার পরে ট্যাক্‌সি পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। শীলা যদি ফিটনে উঠতে না চায় নাই বা উঠবে। ওর যদি রিক্সায় উঠতে লজ্জা হয়, পরিচিত কোন লোকের সামনে ধরা পড়ে যাবার ভয় থাকে, বিভূপদ ডাকবেন না কোন রিক্সাওয়ালাকে। শীলাকে সঙ্গে করে হেঁটেই যাবেন গঙ্গার ধারে। পাশাপাশি বসবেন বাঁধাঘাটে সিঁড়িতে পা ঝুলিয়ে, আকাশ দেখবেন, জল দেখবেন। জলে ভাসমান জাহাজ দেখে দূর দেশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখবেন। দেখতে দেখতে দেড়ঘণ্টা দুঘণ্টা কী করে যে কেটে যাবে টেরও পাবেন না। তারপর ফেরার পথে ভাগ্যক্রমে যদি একটি ট্যাক্‌সি পাওয়া যায় ট্যাক্‌সিতেই ফিরবেন ; তা যদি না মেলে রিকসা ; রিকসারও অভাব হলে পদরথ তো আছেই। এসপ্লানেডে এসে শীলাকে শ্যামবাজারের বাসে তুলে দিয়ে নিজে কালীঘাটের ট্রামে উঠে বসবেন।

রোজ নয়, তরুণী বান্ধবীকে নিয়ে মাসে দুতিনদিন—বড়-জোর দিন চারেক এই বাঁধাধরা ভোজন ও ভ্রমণ পর্ব চলে বিভূপদের। কিছু অর্থব্যয় অবশ্য হয়। অন্যদিক থেকে মিতব্যয়ী হয়ে সেটা পুষিয়ে নেন। এই গোপন-বিহার আর সম্পর্কটুকুর মধ্যে যে ভয় আশঙ্কা প্রীতি অনুরাগের মিশ্রিত রস সঞ্চিত থাকে তার স্বাদ যেন বিভূপদের কাছে পুরোণ হতে চায় না। বরং একটি তরুণী মেয়ের ঘন সান্নিধ্যে যে উত্তাপটুকু তিনি পান, তা সারা সপ্তাহ ধরে রসদের কাজ করে।

অফিসের সমবয়সী সহকর্মীরা ব্যাপারটা একটু আধটু জানে। তাঁর এই দুর্বলতা নিয়ে ঠাট্টা তামাসাও কম চলে না।

কেউ বলেন, 'কি হে মজুমদার, সান্ধ্যভ্রমণ কেমন চলছে? তুমিও ম্যানেজ করো কী করে হে? মিসেস মজুমদার কিছু টের পান না? কুরুক্ষেত্র বাধান না?'

বিভূপদ কোন সুস্পষ্ট জবাব দেন না। হেসে বলেন, 'কী যে যা-তা বলো তোমরা।'

একাউন্টসের সেহানবীশ বলেন, 'এই হল আসল কায়কল্প। দেখেছ তো পঞ্চাশ পার করে দিয়েও মজুমদারের একগাছি চুল পাকল না। এখনো কী রকম শক্ত মজবুত আর ডাঁটো রেখেছে দেহকে। সব ওই সান্ধ্য-ভ্রমণের ফল। ওই সখিসঙ্গের গুণ।'

বিভূপদ স্বীকারও করেন না, অস্বীকারও করেন না।

লজ্জিত ভঙ্গিতে মৃদু প্রতিবাদের সুরে শুধু বলেন, 'কী যে বলো।'

বিভূপদ জানেন শীলার সঙ্গ তাঁকে উত্তাপ দেয়, আনন্দ দেয়। ভারি মিষ্টি সুরেলা গলা শীলার। এমন গলা পেয়েও শীলা গান শিখল না বলে বিভূপদ আক্ষেপ করেন।

মধুর অভাবে গুড়, গানের অভাবে কবিতা পড়ে শোনাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন বিভূপদ। শীলা কদাচিৎ তাঁর অনুরোধ রাখে। শীলা বলে, 'কবিতা আমার একেবারেই মুখস্থ থাকে না! ও সব আসে না আমার।'

তবু মিষ্টি সুরটুকু বিভূপদের কানে ভেসে আসে। ওই গলায় বাজারদর নিয়ে আলোচনা করলেও তা কবিতার মতই শোনায়। মেয়েটি অনেকদিক থেকেই রিক্ত। শুধু ওই অপূর্ব স্বর-সম্পদটুকু আছে।

ষ্টলের সামনে থেকে সরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরো খানিকক্ষণ কাটালেন বিভূপদ। ছটা দশ যখন হল, আর কোন আশা রইল না। আজ আর আসবে না শীলা। কিন্তু নাই যদি আসবে একটা ফোন করে দিলেই পারত। ফোনটা তো ওর প্রায় হাতের কাছেই থাকে। শীলার কি খেয়াল নেই এক জন তারজন্য অপেক্ষা করছে? ঘণ্টাখানেক ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কারো পথের দিকে চেয়ে থাকা যে কী শক্ত, সে ধারণা শীলার নিশ্চয়ই নেই।

খানিকটা হেঁটে এসে কার্জন পার্কের একখানি বেঞ্চে বসে পড়লেন বিভূপদ। আর একজন শরিক ছিল। সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্বত্ব ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। পুরো একখানি বেঞ্চ নিজের দখলে পেয়ে বিভূপদ খুসি হলেন। আরো একটু বসবেন বিভূপদ। আর কিছুর জন্যে নয় এখন শুধু ট্রামবাসের ভিড় কমবার অপেক্ষা। ভিড় একটু পাতলা হলে ট্রামে অনায়াসে উঠতে পারবেন বিভূপদ, বসবারও একটু জায়গা পাবেন। আজকের মত সেই-টুকুই লাভ।

আর বাকি সময়টা একেবারে লোকসান। একটি মেয়ের পথ চেয়ে চেয়ে এমন করে সময় নষ্ট করবার বয়স কি আর বিভূপদের আছে? সময়টা অন্য কাজে লাগাতে পারতেন তিনি। এর চেয়ে আদর্শ গৃহস্থের মত ফেরার পথে সান্ধ্য বাজার থেকে অতিরিক্ত একটি ইলিশমাছ কিনে নিয়ে গেলে স্ত্রী পুত্রকন্যা সবাই খুসি হত। স্বজন পরিজনদের সঙ্গে চা খেয়ে গল্প করে একটি সন্ধ্যা মধুরভাবেই কেটে যেত। এই নৈরাশ্য গ্লানি আর অপমানের হাত থেকে বেঁচে যেতেন বিভূপদ।

সত্যি কিসের মোহে যে বিভূপদ আটকে আছেন—অতি সাধারণ একটি মেয়েকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছেন তিনি নিজেও জানেন না। বছর তিনেক ধরে শীলার সঙ্গে তাঁর পরিচয়, এই দীর্ঘসময়ের মধ্যে একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানো, চা খাওয়া, গল্প করা কদাচিৎ দু একটা সিনেমা দেখা ছাড়া তাঁদের সম্পর্ক কি বেশিদূর এগিয়েছে! শীলা এগোতে দেয়নি। আর ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে একা এগোবার সাহস বিভূপদের হয়নি। শুধু যে সাহসের—আবার তাও ঠিক নয়। রুচিতে বেঁধেছে। ভেবেছেন জোর জবরদস্তি করে কি হবে। শুধু যদি দেহের ক্ষুধাই হত, তাহলে তো তা মেটাবার অন্য পথ ছিল। কিন্তু বিভূপদতো সেই নগ্নক্ষুধা নিবৃত্তি চাননা। তার চেয়ে বরং একটি সুদৃশ্য রঙ্গীণ মোড়কে নিজের লুব্ধতাকে মুড়ে রাখতে চান। নিজের অর্ধেক বয়সী একটি মেয়ের কাছে সম্মান হারাতে তিনি পারেন না। বরং অতৃপ্তির জ্বালা সহ্য করা ভালো, কিন্তু একটি আধুনিক তরুণীর কাছে মর্যাদা খোয়ানো কোন কাজের কথা নয়।

শীলা অনেকদিন বলেছে 'সত্যি আপনার মত এমন বন্ধু আমি আর কাউকে পাইনি। এমন হিতৈষী আমার আর কেউ নেই।'

এইটুকু স্তুতিতেই খুসি থাকতে হয়েছে বিভূপদকে।

শীলা বলেছে, বিশ্বাস করুন আপনার কাছে যেমন নির্ভয়ে আসতে পারি, এমন আর কারো কাছে পারিনে। আর কারো সঙ্গে আমি বেড়াতে বেরোইনে, আর কারো সঙ্গে এমন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গল্প করিনে।'

মানে শীলা বলতে চায় বিভূপদকে সে যা দিয়েছে তা আর কোন পুরুষকে দেয়নি। কিন্তু তার দান যে নিতান্তই যৎসামান্য। এইটুকু পেয়ে কোন পুরুষ কি গৌরব করতে পারে, তার জিগীষা তৃপ্ত হয়!

বিভূপদ মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেছেন—'আর কোন যুবক বন্ধু কি তোমার নেই! কাকে তুমি সত্যি সত্যি ভালোবেসেছ? শুধু বন্ধুত্ব নয় তার চেয়েও বেশি কিছু দিয়েছ? আমাকে অসংকোচে বলতে পারো। আমি মোটেই

হিংসা করবনা। আমি শুধু প্রথম রিপুর খাস তালুকের প্রজা। অন্য পাঁচটা রিপুর উপদ্রব আমাকে বেশি সইতে হয় না।'

কিন্তু শীলা কিছুতেই স্বীকার করেনি যে দ্বিতীয় পুরুষ তার জীবনে এসেছে। তেমন আগ্রহও তার নেই। কম-বয়সী পুরুষদের সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্য কম। তারা বাচাল, চঞ্চল স্বভাব। জীবন সম্বন্ধে যাদের কোন অভিজ্ঞতাই নেই তাদের সঙ্গে কথা বলে কোন আনন্দ পায় না শীলা। ওদের কাউকে স্বামী হিসাবে কল্পনা করাও তার পক্ষে অসম্ভব। বিভূপদ বলেছেন 'কিন্তু এওতো স্বাভাবিক নয়। শীলা জবাব দিয়েছে, 'তাহলে ধরে নিন আমি অস্বাভাবিক।'

বিভূপদ মেয়েটির এই নিরাসক্তির কারণ সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার। ষোল সতের বছর বয়সে বাপ হারিয়েছে। বিধবা মা আর তিনটি নাবালক ভাই বোনের ভরণ পোষণের দায় পড়েছে ঘাড়ে। পোষ্ট অফিসে কেরাণী গিরি করে। মাইনে যা পায় তাতে সংসারের সব খরচ কুলোয়না। টিউশনি করে ঘাটতি পূরণ করতে হয়। শীলা সবই বলেছে বিভূপদকে। এই দারিদ্র্য দুর্বহ দায়িত্ব আর আশঙ্কা উদ্বেগই কি তিলে তিলে শীলার মন থেকে আবেগ আসক্তি বার করে ফেলেছ। যৌবনে যোগিনী করে তুলেছে শীলাকে? বিভূপদের মনে সহানুভূতি সঞ্চারিত হয়।

কিন্তু মাঝে মাঝে শীলা বড় অযৌক্তিক কাজ করে বসে। যেমন আজ করল। এমন করে কথার খেলাপ করা কি তার উচিত হয়েছে? সে যদি আসবেই না— ফোন করে কি সে কথা বলতে পারতনা শীলা? ফোনে এত কথা বলে আর ওই কথাটুকু বলতে পারত না? আগে জানলে বিভূপদ কি আর এখানে আসতেন? এত-ক্ষণ সময় নষ্ট করতেন? মাঝে মাঝে বড় অবুঝ কাণ্ড-জ্ঞানহীনের মত কাজ করে বসে শীলা। আর একজনের অসুবিধা অস্বস্তির কথা বুঝবার যেন তার ক্ষমতাই থাকে না।

পরদিন অফিসে এসে অ্যাটেনডেন্স খাতায় সইটি করে প্রথমেই শীলাকে ফোন করলেন বিভূপদ। অভিমান করলেন, অভিযোগ করলেন। মৃদু তিরস্কারও করলেন একটু।

শীলা বলল, কাল সে অফিসেই আসেনি। সারাদিন বাড়িতে বন্দী ছিল। কারণ? কারণ সব পরে শুনতে পাবেন বিভূপদ। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়েছে শীলা। সব সাক্ষাতে বলবে। ছুটির পরে তিনি যেন এসপ্লানেডে আসেন। রেষ্টুরেন্টটার সামনে তার জন্যে অপেক্ষা করেন।

আজ আর বেশিক্ষণ দেরি করতে হলনা বিভূপদকে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শীলা এসে পড়ল।

বিভূপদ ওকে নিয়ে যথারীতি পর্দা ঢাকা কেবিনে ঢুকলেন। তারপর সস্নেহে সানুরাগে জিজ্ঞাসা করলেন 'কী খাবে বলো?'

শীলা বলল, শুধু চা। আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। বিশ্বাস করুন ক্ষিদে একেবারে নেই।'

বিভূপদ হেসে বললেন, 'তুমি তো সব রকমের ক্ষিদে তেষ্টা জয় করে ফেলেছ। আমার কিন্তু দারুণ ক্ষিদে।'

শীলা বলল, 'বেশ তো আপনি খাননা।' বিভূপদ দুজনের জন্যেই ফাউল কাটলেটের অর্ডার দিলেন। তার পর বললেন, কী হয়েছিল বলোতো। অতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তুমি এলেনা। একটা খবর দিলে তো পারতে।'

শীলা বলল, 'বললাম না আপনাকে কাল আমি অফিসেই আসতে পারিনি। কলোনীর মধ্যে কাছাকাছি কোন ফোন নেই, যে আপনাকে ফোনে খবর দেব। তাছাড়া কাল সারাদিন মা আমার চারদিকে কড়া পাহারা বসিয়ে রেখেছিলেন। বেরোবার আর কোন উপায় ছিল না।'

বিভূপদ বললেন, 'অত শাসন অনুশাসন মেনে চলবার মত লক্ষী মেয়ে তো এতদিন তুমি ছিলে না। হঠাৎ এমন মায়ের আঁচলে বাঁধা খুকুমণি হয়ে উঠলে কী করে।'

শীলা একটু চুপ করে রইল। তার মুখ দেখে মনে হল সে হাসি চেপে রেখেছে। রাগ করলে বিভূপদকে কি মানায় না? তাঁর ক্রোধ একটি তরুণীর মনে শুধু কি হাসির খোরাক জোগায়?

একটু বাদে শীলা ফিরে তার দিকে তাকাল, 'ব্যাপারটা যদি শোনেন তাহলে বুঝবেন, সত্যিই আমার পক্ষে কাল বেরোন কী অসম্ভব ছিল।'

বিভূপদ বললেন, 'কেন, কী হয়েছিল কাল?'

শীলা বলল, 'কাল আবার সেই উৎপাত। দেখতে

এসেছিল আমাকে। যে সে দেখা নয়, একেবারে পাকা দেখা। এই নিয়ে মার সঙ্গে, আর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে প্রায় সারাদিন ঝগড়া। আমি বিয়ে করবনা বলে দিয়েছি, তবু এসব উৎপাত কেন? কিন্তু কে শোনে আমার কথা। মা একেবারে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে সারা কলোনী মাথায় করে তুললেন। সে এক কেলেঙ্কারী। শেষে আমি বললাম, করো তোমাদের যা খুসি।'

বিভুপদ হঠাৎ চুপ করে গেলেন। শীলার না আসবার মূলে যে অমন কিছু একটা থাকতে পারে তা তিনি ভাবতে পারেনি। অথচ কত স্বাভাবিক ঘটনা। বিভুপদ ভাবলেন—একজন দেখবে আর একজন দেখবে না—সংসারে এই নিয়ম। একটু বাদে বললেন, 'পাকা দেখার আগে কাঁচা দেখা ও নিশ্চয়ই দু'একবার হয়ে গেছে। কই সে খবর তো আমাকে দাও নি।'

শীলা বলল, 'দেওয়ার মত যদি হত তাহলে নিশ্চয়ই দিতাম। ভেবে ছিলাম আগের সম্বন্ধগুলির মত এটাও কাঁচিয়ে দিতে পারব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠলাম না।'

বিভুপদ বললেন, 'ভালোই করেছ। ছেলেটি কেমন? কেমন দেখতে?'

শীলা বলল, কেমন আবার হবে? যেমন দেবী, তেমনি দেবা। আমার মতই ঘষে-ঘষে সেকেণ্ড কি থার্ড চান্সে বি-এ পাশ করেছে। অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণী। মাইনে আমার চেয়ে পাঁচ দশ টাকা কম ছাড়া বেশি পায় না। তবে তার ঝামেলা কম। শুধু একটি মাত্র বোন। কলেজে পড়ে। এক সময় আমার ছাত্রী ছিল। গুরু-দক্ষিণাটা এমনি করে দিল। আসলে ওই রেবাই ঘটকী।'

বিভুপদ বললেন, 'তাই বলো। আগে থেকেই চেনা জানা ছিল তাহলে।'

শীলা বলল, 'আপনি যা ভাবছেন তা নয়। নিতান্তই মুখ চেনা। মন জানাজানির কোন আগ্রহ ওপক্ষ থেকে ছিল কিনা জানিনে, আমার একেবারেই ছিল না।' একটু হাসলেন বিভুপদ—'সত্যি বলছ?'

শীলা বলল, 'আপনাকে তো কতবার বলেছি ও সব রোমান্স-টোমান্সের ধাত আমার মোটেই নেই। আমি একেবারে কাঠখোট্টা গড়।'

বিভুপদ বললেন, 'তবুতো কাঠ-গোলাপ ফুটল।'

একটু চুপ করে থেকে শীলা বলল, 'আপনারা ফোটান তাই ফোটে।'

ওর গলা এমনিতেই নরম আর মিষ্টি! কৃতজ্ঞতায় আজ আরো যেন কোমল হল।

শীলা বলতে লাগল, 'ভেবে দেখুন, কত সামান্য উপলক্ষে আলাপ হয়েছিল আমাদের। পোষ্ট অফিসে ষ্ট্যাম্প বিক্রি করতাম। হিসেব মেলাতে পারতাম না সব দিন। ঘাটতি পয়সা গাঁট থেকে গুণতে হত। আপনি ভুলে একদিন একটা টাকা বেশি দিয়ে ফেললেন। পর দিন যখন এলেন, আমি আপনাকে ডেকে ফেরৎ দিলাম। সেই থেকে আলাপ। সেই আলাপকে আপনিই বন্ধুত্বে পৌঁছে দিলেন। নইলে আমার কি অত সাহস ছিল?'

বিভুপদ চুপ করে রইলেন। এমন ভঙ্গিতে শীলা তো এর আগে কখনো কথা বলেনি। এতদিন ওর গলার স্বরই শুধু মিষ্টি ছিল, বক্তব্যের মধ্যে তেমন কোন মাধুর্য ছিল না। বিশ্ব সংসারের বিরুদ্ধে ওর যত অভিযোগ বিভুপদকে দেখলে সব যেন উদগ্র হয়ে উঠত। তবু এই তিন বছরের কয়েকটি বর্ষা বসন্তের স্মৃতি—কয়েকটি সোনালী বিকাল আর রূপালী সন্ধ্যা—বিভুপদের মনে পড়তে লাগল।

কিন্তু সে সব কথা না তুলে তিনি আজ হঠাৎ একটি স্থূল হিসাবের কথা তুলে বললেন, 'তোমার মায়ের সংসার চলবে কী করে। শুনেছি, ভাই এখনো পড়ছে বোনরাও স্কুলে।'

শীলা বলল, 'আমারও তো সেইজন্যেই আপত্তি ছিল। বলেছিলাম যাক আরো দু তিনটে বছর। কিন্তু যেমন আমার মা ভাই, তেমনি ও পক্ষ। সব একেবারে নাছোড়-বান্দা। তবে আমিও চুক্তি করে নিয়েছি। বিয়ে করি আর যাই করি, যতদিন আমার ভাই রোজগার করতে না শেখে ততদিন আমার মাইনের টাকা সব ওরা পাবে।'

বিভুপদ বললেন, 'এ ব্যবস্থা অবশ্য ভালো। কিন্তু টিকবে কি?'

শীলা বলল, 'নিশ্চয়ই টিঁকবে। এক চুক্তি ভাংলে, আর এক চুক্তি কি আস্ত থাকবে ভাবছেন?'

বয় এসে পর্দা সরিয়ে খাবার দিয়ে গেল। শীলা সাগ্রহে

প্লেটখানি টেনে নিল। বিভূপদ মনে মনে হাসলেন। মুখে যাই বলুক, শীলার নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে!

বিভূপদ পরম অনিচ্ছায় একটুকরো কাটলেট কেটে কাঁটায় বিঁধলেন। মুখে তুলবার আগে বললেন, 'তাহলে এই শেষ। আর আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হবে না।'

শীলা বলল, 'ওমা, দেখা সাক্ষাৎ হবে না কেন?'

বিভূপদ বললেন, 'বিয়ে-থা করবে। ঘর সংসার—।'

শীলা বিভূপদের দিকে তাকাল, তারপর কাটলেটের টুকরো মুখে তুলবার আগে একটু হেসে বলল, 'তাতে কী হয়েছে। আপনার ঘর-সংসারে যদি এসব না আটকায়, আমারই বা আটকাবে কেন?'

বিভূপদ চোখ তুলে তাকালেন। না ব্যঙ্গ নয়—সহজ স্নিগ্ধ কৌতুকে শীলার মুখখানি আজ সত্যিই ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

মৌন পথ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পান্থহীন মৌন পথ, পাদপেরা লতা গুল্ম ভরা,
কুলায় ফেরেনি পাখী, তরীহীন শীর্ণ তোয়া নদী;
এই পথে একদিন তুমি মোরে করেছ মিনতি
বাঁধিবারে জীবনের খেলা ঘরখানি, আলো করা
যৌবনের স্নিগ্ধ পরিবেশে, অন্তরের অনুরাগে!
আজ আর তুমি নাই, শুধু স্মৃতি-স্নাত হয়ে একা,
বসে আছি নিরালায়, মুহূর্ত্তেরা আঁকে অশ্রুরেখা,
আমার নয়ন প্রান্তে; প্রভাতের গানখানি জাগে।

সে প্রভাত ফিরিবে কি আর? বেলা পড়ে
এল পথ 'পরে,
মৃদু মন্দ হাওয়া লেগে আন্দোলিত বলাকার পাখা।
বার্থতার বোঝা বয়ে পথ চলে প্রিয়জনে খুঁজি;
বরষার পদধ্বনি কানে আসে,
দোলে তরুশাখা,
আষাঢ়ের অভিসারে মেঘে মেঘে বারিবিন্দু ঝরে,
এপথে তোমার কণ্ঠ হারায়েছে চিরতরে বুঝি!

শ্রমিক-বিজ্ঞান

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

[উৎপাদক-শ্রম, অনুৎপাদক শ্রম, কর্মতাল, কর্মোদ্যোগ, কর্ম-ক্লান্তি, মন্ত্র-বিরাম, শ্রম বিরাম]

আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে মেহনতি মানুষ দুই প্রকারে শ্রমদান করে থাকেন। উহাদের যথাক্রমে বলা যেতে পারে—(১) ফলপ্রসূ-শ্রম এবং (২) নিষ্ফল-শ্রম। ইহাদের যথাক্রমে অনুৎপাদক এবং উৎপাদক শ্রমও বলা যেতে পারে। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে উহাদের বিচার করা হয়। প্রথমে নিষ্ফল-শ্রম সম্বন্ধে আলোচনা করবো। কর্মরত শ্রমিকদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি। এঁদের কর্মকালের প্রতিটিক্ষণ উৎপাদনে নিযুক্ত হোক—নিয়োগকর্তারা ইহা সর্ব্বতোভাবে তাদের নিকট দাবী করেন। কিন্তু কর্মীদের বহু সময় নিষ্ফল-শ্রমে ব্যয়িত করতে হয়ে থাকে। অথচ এই নিষ্ফল শ্রমের ক্ষণ বহুগুণে কমানো সম্ভব। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই উৎপাদনের হার বেড়ে যেতে বাধ্য। নিষ্ফল বা অনুৎপাদক শ্রমের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাঁচা মাল আনয়ন, নির্ম্মিত দ্রব্যাদি অপসারণ, যন্ত্রপাতির সন্ধানে কালক্ষেপ, বড় মিস্ত্রির [FOREMAN] উপদেশ-গ্রহণ, সহকারীদের পরামর্শ গ্রহণ, প্রভৃতির বিষয় বলা যেতে পারে। এ কথা ঠিক যে, সামগ্রী উৎপাদনের সহিত এই সকল কার্য্যও অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত আছে। কিন্তু তবুও আমি বলবো যে, এই সব কাযেতে ব্যয়িত শ্রমের ক্ষণ বহুগুণে কমানো সম্ভব। বহুক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিয়োজিত সময়ের ত্রিশ ভাগ হতে পঞ্চাশ ভাগ সময় এই নিষ্ফল শ্রমে প্রযুক্ত হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের হার যে কমে যাবে তাতে সন্দেহের কি আছে ? আমি নিজে শ্রম-বিজ্ঞান গবেষণার উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্র কারখানায় এই বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিম্নোক্তরূপ ফল লাভ করেছি।

	বিদ্যুৎ চালিত ফিতাকল	হাতে সুতা গুটানো	মেসিনে টেপ-তৈরী
মাল মশলা সংগ্রহার্থে	২৯.৮	২০.২	
তৈরী সামগ্রী পাচারে	৬.৩	——	
যন্ত্রাদি মেরামত কাযে	২.২		১৫.২
অন্যের উপদেশ গ্রহণে	৪.২		১০.৪

আমি বিভিন্ন কলকারখানা পরিদর্শন করে ও তৎসহ উপরের তথ্য হতে আমি বুঝেছি যে প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সময় ছোট কারখানায় এবং প্রায় ত্রিশ ভাগ সময় বড় কারখানায় এইভাবে শ্রমিকদের নিষ্ফল বা অনুৎপাদক সময় ব্যয়িত হয়ে থাকে। এই সকল ক্ষয়-ক্ষতির কারণগুলি ও উহাদের প্রতিষেধক সম্বন্ধে এইবার আমি আলোচনা করবো।

(ক) মালমশলা সংগ্রহে অযথা বিলম্বের কারণ স্বরূপ ফ্যাক্টারী বা কারখানা বিশেষের গঠনের ত্রুটি এবং উহাতে প্রয়োজনীয় স্থানের অভাবকে দায়ী করা যেতে পারে। কখনও কখনও প্রশাসনিক অব্যবস্থাও এই জন্য দায়ী থেকেছে। প্রায়শ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের একটি বিভাগের সহিত অপর বিভাগের সংযোগের ত্রুটি বিচ্যুতি সহ কাঁচামালের গুদামের স্থান নির্বাচনের ত্রুটি বিচ্যুতিও এই জন্য দায়ী। এতদ্ব্যতীত সমধিক ট্রাক, ঠেলা গাড়ী, ট্রাম লিফট ক্রেন প্রভৃতির অভাবেও এই সকল অঘটন ঘটে থাকে।

(খ) যন্ত্রপাতির অপেক্ষায় কালক্ষেপ একটি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে যন্ত্রপাতির স্বল্পতা এই সময়-অপচয়ের অন্যতম কারণ। বহু ক্ষেত্রে

শ্রমিকগণ ব্যবহারের পর যন্ত্রাদি সুশৃঙ্খলার সহিত উহাদের যথাস্থানে গুছিয়ে রাখেন নি! অন্যদিকে শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য তৈরী বেঞ্চ বা সেল্‌ফ নির্ম্মাণে ত্রুটি থাকায় ঐগুলি সুষ্ঠভাবে সাজিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি।

এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য বিশেষভাবে নির্ম্মিত অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার টেবিল বা র‍্যাক শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য তৈরী করার প্রয়োজন আছে। অযথা এক ইঞ্চি দূরেও এই যন্ত্রগুলি রাখা উচিত নয়। এই খানে এক ইঞ্চি এক ফুটের বারো ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই এক ইঞ্চি ব্যবধানে যন্ত্রপাতি থাকায় উহা সংগ্রহে শ্রমিকদের যে অহেতুক ক্লান্তি আসে তার নাশকতা শক্তি অসীম। এইখানে কতোবার এক ইঞ্চি দূরে কষ্ট করে শ্রমিককে হস্ত প্রসারিত করতে হয়েছে, তাই এখানে বিবেচ্য। প্রতি ঘণ্টায় একশোবার এই ভাবে সহজায়ত্তের বাহিরে হস্ত প্রসারিত করতে হ'লে পেশীর অতিব্যবহারজনিত শ্রম ও তৎজনিত ক্লান্তি অবশ্যম্ভাবী। যন্ত্রপাতি সুষ্ঠভাবে সহজগম্য স্থানে থাকলে প্যাকিং ও একত্রীকরণ বা সমাবেশে (Assemblage) কার্য্যে বিশেষ সুবিধার সৃষ্টি করে থাকে। বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠানে একই যন্ত্র বহু ব্যক্তি ব্যবহার করে থাকে। এই ক্ষেত্রে একজনের সুবিধা অপরজনের অসুবিধার সৃষ্টি করে থাকে। যন্ত্র যন্ত্রীর হাতের অতি প্রিয় অব্যর্থ আয়ুধ। এই জন্য নিজ নিজ যন্ত্রের প্রতি তাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। এই বিষয় যৌথ দায়িত্ব অচল। এই কারণে প্রতিটি শিল্পীর ক্ষুদ্র যন্ত্রাদি তাদের নিজ আয়ত্তে রাখা উচিৎ হবে।

(গ) বড়ো মিস্ত্রি বা ফোরম্যানদের নিকট বারে বারে উপদেশ গ্রহণের মধ্যেও বহু কারণ নিহিত থাকে। ক্রমশঃ ক্ষয়মান মেশিন আদি ও তৎজনিত উৎপাদন হ্রাসের আশঙ্কা ইহার জন্য দায়ী। বহুক্ষেত্রে এই সকল ফোরম্যান-গণ আশু প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্ম্মীদের নিকট ঠিক সময়ে পরিকল্পনা পেশ করতে পারেন নি। এঁরা পূর্ব্বাহ্নে কর্ম্মীদের যথোচিৎ নির্দ্দেশ না দিতে পারায় বহু কর্ম্মকাল বৃথা নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। কর্ম্মীরাও মেশীন ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কীয় সম্ভাব্য আপদ সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ প্রয়োজন মনে করেন নি। ফ্যাক্‌টারীসমূহে নিষ্ফল শ্রমের ক্ষণ বর্দ্ধনে উপরোক্ত ঘটনাগুলি অন্যতম কারণ।

এই রূপ শ্রমের ক্ষণের দৈনিক অপচয় আপাতঃ দৃষ্টিতে সামান্য মনে হতে পারে। কিন্তু এই হারে মাসিক ও বাৎসরিক অপচয় অসামান্য। এতে শিল্পপতিদের ন্যায় কর্ম্মীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। বহু কলকারখানায় ফুরণে কায করানো হয়ে থাকে। এই অপচয়ের দৈনিক ক্ষণ সমূহ একত্রিত করলে দেখা যাবে যে কর্ম্মীর প্রতি মাসে প্রায় সাত দিনের রুজী-রোজগার নষ্ট হয়েছে। এই অনুপাতে মালিকরাও তাদের লভ্যাংশ হারিয়েছেন।

কলকারখানাসমূহে উৎপাদন বর্দ্ধনের জন্য একশ্রেণী কর্ম্মকর্ত্তাকে তাদের উপর নজর রাখবার জন্যে নিযুক্ত করা হয়। এদের সাধারণত তদারকী কর্ম্মি বা সুপারভাইজর নামে অভিহিত করা হয়। এই সকল ব্যক্তি শ্রমিকরা সারাক্ষণ কিছু না কিছু কায করলেই খুশী। এঁদের ফলপ্রসূ ও নিষ্ফল শ্রম সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই। এজন্য এই নিষ্ফল শ্রমের ক্ষণ কমানোর দিকে তাদের নজর থাকে না। ওদিকে শ্রমিকরা শিল্প-সামগ্রীর উৎপাদন দিতে না পারলে এঁরা তাদের তিরস্কার করেন। এদিকে শ্রমিকরাও এই ফুরানের কাযে কম পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। এই সকল পরিদর্শকরা যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয় উৎকর্ষতা আছে কিনা সেই সম্বন্ধেও মাথা ঘামান নি। ফুরোণের কাযে একজন পাকা পোক্ত শ্রমিকও কাঁচামাল পেতে দেরী হলে বিরক্ত হয়ে উঠবেন। এই সকল অসুবিধা দিনের পর দিন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলে সুদক্ষ সৎ শ্রমিকরাও অভিযোগ-মুখর হয়ে উঠে। এই ভাবে কেবলমাত্র মন-স্তাত্ত্বিক কারণে সমগ্র প্রতিষ্ঠানের নৈতিক মান ও কর্ম্ম-ক্ষমতা নিম্নগামী হয়েছে। এইরূপ বিভ্রাটের কোনও এক স্থায়ী সমাধান না ঘটলে অতি ক্ষিপ্র কর্ম্মীরাও নিজেদের অজ্ঞাতেই মন্থর স্বভাবের হয়ে উঠে এবং আখেরে নির্ম্মিত শিল্প দ্রব্যাদির উৎকর্ষতার সমধিক হানি ঘটায়। আলতু ফালতু কাযে মুহুর্মুহু কর্ম্ম বিরতি নিরাবিল কর্ম-ধারার মধ্যে বারে বারে ছেদ ঘটালে স্বাভাবিক কর্ম্মতাল (Rythm) বিনষ্ট হয়। এই ক্ষেত্রে কর্ম্মশক্তি ও দক্ষতার (Skill) অবনমন ঘটতে বাধ্য। অন্যদিকে সমধিক উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র যন্ত্রের (Tools) অভাব শ্রমিকদের

মেজাজ অকারণে বিগড়ে দিয়েছে। সামান্য অর্থের সাশ্রয় করতে গিয়ে মালিকরা শ্রমিকদের নিকট অবজ্ঞার পাত্র হয়ে থাকেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠানের নিষ্ফল ও ফলপ্রসূ শ্রমের ক্ষণ যথাক্রমে বেড়ে ও কমে গিয়ে থাকে। অথচ একটু মনোযোগী হলে বা দৃষ্টিকৃপণতা না করলে এই অব্যবস্থা হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

এতক্ষণ শ্রমিকদের কর্মের রীতিনীতি তৎজনিত নিষ্ফল শ্রমক্ষণের বৃদ্ধির বিষয় আলোচনা করেছি। কিন্তু এই নিষ্ফল শ্রমের হ্রাসবৃদ্ধির জন্য মালিকসহ সাধারণ ও তদারকী কর্মীরাই একমাত্র দায়ী নন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বৃহৎ মেসিনাদির গঠনপ্রণালীও এই অপচয়ের জন্য দায়ী হয়ে থাকে। এই সকল যন্ত্রের পরিকল্পনার সময় নির্মাতারা কেবলমাত্র যন্ত্রের কার্যাকারিতার সম্বন্ধে ভেবেছেন। কিন্তু যে সকল শ্রমিক এই সকল যন্ত্র পরিচালনা করবেন তাদের সুবিধা অসুবিধার বিষয় ভাবেন নি। এইজন্য যন্ত্রের নির্মাণ প্রণালীর ত্রুটী অকারণে কর্মীদের দেহ ও মনে কর্মক্লান্তি এনে ফলপ্রসূ বা উৎপাদন-সময়ের হানি ঘটায়। যন্ত্র নির্মাতাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে ক্লান্তিবিহীন ভাবে শ্রমিকদের পক্ষে দৈনিক আট ঘণ্টা এই সকল মেসিন পরিচালনা সম্ভব কি'না? শ্রমিকদের দেহের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। এই জন্য কোনও মেসিন অত্যধিক উঁচু বা নীচু হওয়া উচিৎ হবে না। কোনও মেসিনে বসিবার স্থান রাখা সম্ভব হলে উহাতে পা রাখার ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। এর কারণ ঝুলানো পা রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘটিয়ে ক্লান্তি আনে। যে সকল মেসিন প্যাডেল দ্বারা পরিচালিত হয়, উহাতে পর্যায়ক্রমে বা একত্রে পা রাখার ব্যবস্থা থাকলে—একটী পায়ের উপর অযথা চাপ পড়ে কর্ম-ক্লান্তি আনে না। এতদ্ব্যতীত এই সব ফুট প্যাডেলে যাতে অবলীলাক্রমে পা রাখা যায় সে দিকেও মেসিন নির্মাতা-দের লক্ষ্য রাখা উচিৎ হবে। বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অযথা তাদের পা লম্বা করে প্যাডেল চালাতে হয়েছে। যন্ত্র নির্মাতারা যন্ত্র নির্মাণের কালে যন্ত্রীদের সম্বন্ধে চিন্তা করলে এইরূপ অসুবিধার সৃষ্টি হবে না। ভালো যন্ত্র এমন সুন্দর কর্ম-তাল সৃষ্টি করে, যার জন্য শ্রমিকরা ক্যান-টিনে ভোজন করতে করতেও তাদের হাত বা পা নাচি-য়েছে। দুই হাত দুই পা একত্রে বা পর্যায়ক্রমে পরি-চালনা করলে শ্রমিকদের এই কর্মতাল [Rythm] অব্যাহত থাকে। এই জন্য মেসিন মধ্যে থাকলে দুই পার্শ্বে অর্দ্ধ-চন্দ্রকার র‍্যাকের উপর ক্ষুদ্র যন্ত্র [tools] রাখা উচিৎ হবে। যেখানে মেসিনের বিনা সাহায্যে শুধু ক্ষুদ্রযন্ত্রের দ্বারা কর্ম করা হয়, সেখানে একটি বৃহৎ অর্দ্ধচন্দ্রাকার র‍্যাকের মধ্যস্থলে ছোট টেবিল সহ শিল্পীর বসিবার ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। এই রীতি ঘড়ী-মেরামত শিল্পে ও ছাপাখানায় চালু থাকলেও বড় বড় কারখানায় এইরূপ রীতি নীতির ব্যবস্থা আজও হয় নি।

মেসিন নির্মাতাদের বাইসিকেল যানের ক্রমোন্নতি হতে শিক্ষা লাভ করা উচিৎ। প্রথমে বাইসিকেল নির্মাতা এই যানের কর্মদক্ষতার প্রতি দৃষ্টি দেন। কিন্তু পরে উহারা আরোহী যাতে পড়ে না যান বা অযথা ভয় না পান—সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই যানে তাদের নির্মাণ কৌশল প্রয়োগ করেন। পরবর্ত্তীকালে এঁরা আরোহীরা যাতে যথাসম্ভব কম শক্তি প্রয়োগ করে এই যান চালাতে পারেন তার ব্যবস্থা করেছিলেন। বর্ত্তমান বাইসিকেল যান এইরূপ ক্রমোন্নতির জন্য পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয় হতে পেরেছে।

মেসিনের ডিজাইন নির্মাণ কালে মনোবিজ্ঞানী ও দেহ-বিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেসিন নির্মাতারা উহাদের কর্মকুশলতার প্রতি মনোনিয়োগ করলেও উহাদের চালক সজীব মানুষদের সম্পর্কে তাঁরা একটু মাত্রও চিন্তা করেন না। এই জন্য এই সকল যন্ত্র মানুষকেও যন্ত্রে পরিণত করে অন্য দিক থেকে সমাজের ক্ষতি করে।

একটি যন্ত্রে প্রতিদিন একই শ্রমিক'কে নিয়োগ করা উচিৎ হবে। মোটর চালনা ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, মোটরচালক প্রতিদিন চালায় তারই হাতে সেটি উত্তমরূপে চলে থাকে। একটি যন্ত্রশকটের ড্রাইভারকে বারে বারে বদলালে সেই শকটটি অতিশীঘ্র অকেযো হয়ে যায়। এই জন্য এই উভয় বিধ কারণে যন্ত্রের পরিচালক-দের এক যন্ত্র হতে অন্য যন্ত্রে প্রেরণ করলে উৎপাদনের হ্রাস ঘটে থাকে। এ ছাড়া নূতন যন্ত্র একই মেকারের হলেও তার সঙ্গে মনের দিক হতে খাপ খাওয়াতে কিছুটা

অযথা সময় শ্রমিকদের অপচয় হয়েছে। দীর্ঘকাল একই যন্ত্রের সংশ্লিষ্ট থাকলে শ্রমিক তার ঐ যন্ত্রের সহিত একাত্ম হয়ে যায়। তার এই চিরসাথী যন্ত্রকে ছেড়ে আসতে তার চোখে জল পর্য্যন্ত এসে যায়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের ম্যানেজার ও অধিকর্ত্তাদের এই বিষয়টি অনুধাবন করা উচিৎ হবে।

এমন বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ফলপ্রসু শ্রম অপেক্ষা নিস্ফল শ্রমের ক্ষণ অনেক বেশী। মূলতঃ ফ্যাক্টারী ও উহা'র গুদাম নির্ম্মাণে ত্রুটি এবং ম্যানেজমেণ্টের অব্যবস্থাই এই জন্য বহুলাংশে দায়ী! অথচ এই বিষয়ে একটু মাত্র চিন্তা করলে ফলপ্রসু শ্রম নিস্ফল শ্রম অপেক্ষা বহু গুণে বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমি অনুৎপাদক শ্রম সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি উৎপাদক শ্রম সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এই ক্ষেত্রে কর্ম্ম-ক্লান্তির হ্রাস ও কর্ম্মতালের বর্দ্ধনের প্রশ্ন উঠবে। দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত এই দুইটি বিষয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে। এই থানে একদিকে যন্ত্র ও অন্যদিকে মানুষ—এই দুইটি সম্পর্কে একত্রে বিবেচনা করতে হবে। এই দুইটি বস্তুর পৃথক সত্তার সমন্বয়ের মধ্যে সমস্যার সমাধান হতে পারে। যেহেতু ঈশ্বরসৃষ্ট মানুষকে পূনঃ নির্ম্মাণ করা সম্ভব নয়, সেহেতু যন্ত্রের পুর্ণবিন্যাসের বিষয় চিন্তা করা উচিৎ। যন্ত্র নির্ম্মাতা ধীরভাবে তাঁর নির্ম্মিত যন্ত্রের গতি ও তার পরিচালকের সুবিধা অসুবিধা লক্ষ্য করলে যন্ত্রের ত্রুটিসমূহ বুঝতে পারেন। এর ফলে তিনি আরও উন্নত ও সহজ যন্ত্র নির্ম্মাণ করতে পারবেন। অন্য দিকে মনেবিজ্ঞানী ও দেহবিজ্ঞানিগণ এই যন্ত্র পরিচালনার সময় ধীর ভাবে শ্রমিকদের পরিবেশ-জনিত মনের মতি গতি ও দেহের সম্ভাব্য ক্ষয় ক্ষতি সম্বন্ধে বিবেচনা করে উহাদের প্রতিষেধক ব্যবস্থা নির্ণয়ন করে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বর্দ্ধনে সহায়ক হতে পারেন।

উৎপাদক শ্রমে দুইটি বিষয় বারে বারে বিঘ্ন উৎপাদন করে থাকে। উহাদের যথাক্রমে বলা যেতে পারে—

(১) যন্ত্রবিরাম এবং শ্রম-বিরাম। প্রথমে যন্ত্র বিরামের বিষয় বলা যাক। মেশিন মাত্রই বহুবিধ কারণে ক্ষণে ক্ষণে বা মধ্যে মধ্যে থামানো দরকার হয়। যেমন ছাপা-খানায় প্রাথমিক ব্যবস্থার জন্যে যন্ত্রের গতি বহু ক্ষণ স্থগিত রাখতে হয়েছে। বিদ্যুৎচালিত কাপড় ও ফিতাকল-সমূহেও সূতা সন্নিবেশ আদি প্রাথমিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। এমন কি চলমান অবস্থাতেও বারে বারে সূতা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মেশিন ক্ষণে ক্ষণে থামানো হয়। অন্যান্য যন্ত্রে নূতন কাঁচামাল প্রয়োগের জন্য চালু মেশিন থামাতে হয়েছে। এক্ষণে কতো শীঘ্র এই অতিরিক্ত কার্য্য সমাধা হবে তা শ্রমিকদের দৈহিক ও মানসিক ক্ষিপ্রতা ও মেসিনপত্রের সহজগতি ও উৎকর্ষতার উপরে নির্ভর করে। এই ক্ষেত্রে যন্ত্রবিদ ইঞ্জিনিয়ার এবং দেহতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানী পণ্ডিতেরা পরস্পরের সহিত সহযোগিতা দ্বারা উপায় উদ্ভাবন করলে সুফল ফলবে। যন্ত্র-বিরামের বিষয় বলা হলো। এইবার শ্রম-বিরামের সম্পর্কে বলা যাক্। যন্ত্র যন্ত্র হলেও মানুষ যন্ত্র নয়। বহুক্ষেত্রে শ্রমিক ইচ্ছা করে যন্ত্রের গতি সম্পর্কে সজাগ থাকে নি। কিংবা ক্লান্তি তাদের অন্যমনস্ক রেখেছে। এই জন্য যন্ত্র মন্থরগতি হয়ে থেমে গিয়েছে। কিংবা তা যন্ত্রীর অন্যমনস্কতায় বিকল হয়ে গিয়েছে। বহু ক্ষেত্রে বিশ্রাম লাভের জন্যে তারা ইচ্ছা করে যন্ত্র থামিয়েছে। বহুক্ষেত্রে যন্ত্রচালক পরি-চালনা ক্ষেত্রে বারে বারে মনস্থির করে থাকেন [decisions] এবং একটি পন্থা ত্যাগ করে অপর পন্থা গ্রহণ করেন। এই সামান্য শ্রম বিরাম বারে বারে ঘটলে উহাদের সামগ্রিক যোগফল অসামান্য হয়। ইহা একদিকে যন্ত্রের অরক্ষয় ঘটায় ও অপর দিকে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন কমায়। এই শ্রম-বিরামের ক্ষণ কমাবার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বোনাস ও পুরস্কারের লোভ ও ক্ষেত্র বিশেষে বরখাস্তর ভয় দেখিয়েছেন। এই অবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে যে উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটানো যায় নি তা'ও নয়। কিন্তু এই অনুপাতে শ্রমিকদের দেহ ও মনের বৃদ্ধি সম্ভব না হওয়ায় আখেরে তাদের দেহে মনে অবসাদ এনেছে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ শ্রমিকদের কর্ম্মক্ষমতা কমে গিয়েছে। এই অবস্থায় কর্ম্মে ক্ষিপ্রতার অভাব তাদের শ্রমে মন্থর গতি এনে দিয়েছে। গবেষণার কারণে আমার নিজস্ব টেপলুম ও ব্রেডিং শিল্পে পরীক্ষা নীরীক্ষা করেছি। নির্দ্ধারিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট উৎপাদনে কাউকে বাধ্য করার সুফল সাময়িক মাত্র। ঘড়ি ধরে কায আদায় এরা অপছন্দ করে থাকে। এটা তাদের মনের উপর

অত্যাচারের সামিল। এই মানসিক অবসাদ মাসেকের মধ্যে তাদের ক্ষিপ্রতার হানি ঘটিয়েছে। ফুরণের শ্রমে কৃতকার্য্য হ'তে হলে শ্রমিকদের সহযোগিতা চাই। এই সহযোগিতা কেবলমাত্র মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে আনা যেতে পারে। তাড়াতাড়ি করতে গেলে অতি-ব্যস্ততা শ্রমিকদের কর্ম্মক্ষমতার ও কর্ম্মচাতুর্য্যের (Tact) একাধারে হানি ঘটায়। প্রায় দেখা গিয়েছে যে তাড়াতাড়ি কাষ করতে গিয়ে বেশি কাষ করতে পারা যায় নি। বহু বাহুল্য যে একমাত্র মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যই শ্রমিকদের কর্ম্মগতি বাড়াতে সক্ষম। পিসরেট বা ফুরাণের কাযে তারা কাযের চেয়ে সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে বাধ্য হয়। উপরন্তু এই ভাবে সময়ের দাসত্ব স্বীকার করায় নিজেদের মালিকের ক্রীতদাস মনে করে। এইক্ষেত্রে মালিকদের প্রতি তারা অনুগত থাকতে পারেনি। ফুরাণের কাজে নিজেদের অক্ষমতাজনিত যা কিছু ক্রোধ মালিকের উপর পড়েছে। এমন কি সতীর্থদের কৃতকার্য্যতাজনিত হিংসাও তাদের মালিকের বিরুদ্ধে বিরূপ করে তুলেছে। প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে যে ফ্যাক্টরীতে ফুরাণের রীতি প্রচলিত, সে প্রতিষ্ঠানকে তারা নিজেদের ফ্যাক্টরী বিবেচনা করতে পারে নি। আমি আমার নিজস্ব শিল্পে ও অন্যান্য স্থানে সময় ও গতি (Movement) সম্বন্ধে গবেষণা করে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। এই অব্যবস্থা হতে অব্যাহতি পেতে হলে শ্রমিকদের সহযোগিতা পাওয়ার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এই বিষয়ে শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহযোগিতা সম্ভব। এই সম্বন্ধে পরে আমি আলোচনা করবো। এক্ষণে অপর বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে—শ্রমিকদের দৈহিক ও মানসিক বিশ্লেষণ করে তাদের উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিয়োগ করা যায় কি'না? এক এক শ্রেণীর শ্রমিকের মানসিক ও দৈহিক গঠন এক এক প্রকারের হয়ে থাকে। লৌহ-শিল্পে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, সে বস্ত্রশিল্পে হয়ত অনুপযোগী। একই প্রতিষ্ঠানে একটি যন্ত্রে বা কাযে যে দক্ষতা দেখিয়েছে, অপর যন্ত্রে বা কাযে সে দক্ষতা দেখায় নি। তদারকী কর্ম্মচারী এবং ইঞ্জিনিয়ারদের বাদ দিলে সাধারণ শ্রমিকেরা সকল শ্রম-শিল্পে উপযোগী হতে পারে না। এইখানে একক-শ্রম এবং মিলিত-শ্রম সম্বন্ধেও বিবেচনা করা উচিৎ। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে দলবদ্ধ শ্রমিকদের মিলিতশ্রমে কয়েকজন অধিক শ্রম এবং কয়েকজন স্বল্প শ্রম করছে। এখানে উৎপাদন সামগ্রিক শ্রমের উপর নির্ভর করে থাকে। এই অবস্থায় তদারকী-কর্ম্মচারীদের উচিৎ হবে প্রয়োজন-মত এদের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়ে দেওয়া। এই শ্রমবণ্টন-রীতি সম্বন্ধে আমি অপর এক পরিচ্ছেদে আলোচনা করবো। আমার মতে অধিক পরিশ্রমী শ্রমিককে বিশ্রাম দেবার জন্য মধ্যে মধ্যে কম পরিশ্রমের কাযে নিযুক্ত করা উচিৎ হবে। এক্ষণে এই যৌথ কর্ম্মে শ্রমিকদের নিয়োগ কালে তাদের প্রত্যেকের শ্রমক্ষমতা, উচ্চতা, স্বাস্থ্য, মানসিক-গঠন পৃথক পৃথক রূপে বিবেচনা করা হয় না। মিলিতশ্রমে একপ্রকার সামাজিক মর্য্যাদা-সম্পন্ন মানুষদের বেছে নেওয়াও উচিৎ হবে। এই সকল বিষয় বিবেচিত না হওয়ায় যৌথশ্রমেই শ্রম-বিরামের ক্ষণ অধিক থাকে। একই সামাজিক মর্য্যাদাসম্পন্ন শ্রমিক যৌথশ্রমে পরস্পর পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য রাখতে সক্ষম। কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষা ও গোষ্ঠীর মানুষ এই বিষয়ে অসহায়। এইজন্য ক্রিকেট ও ফুটবল টিমে আমরা যে সহযোগিতা দেখে থাকি, সেই সহযোগিতা তিলমাত্রও আমরা পরস্পরের অপরিচিত ও সম্পর্ক-রহিত যৌথশ্রমিকদের মধ্যে কদাচ আমরা পাই। এই জন্য পরস্পরের জানচীন শ্রমিকদেরই এই মিলিত বা যৌথ শ্রমে নিয়োগ করা উচিৎ হবে। একক কর্ম্মরত শ্রমিকদের কর্ম্মদক্ষতা ব্যক্তিগত পরীক্ষা দ্বারা স্বীকার করে নেওয়া হয়। কিন্তু পরীক্ষকগণ ভুলে যান, যে প্রচেষ্টা দ্বারা একটিবার অতি ভালো ফল দেখালেও বারে বারে তা দেখানো সম্ভব নয়। উৎপাদনের অনাবিল নির্দ্দিষ্ট মান এই রূপে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা রাখতে পারেন নি। কিন্তু ধীরে কাষ আরম্ভ করে বহু শ্রমিক পরে যে ক্ষিপ্রতা এনেছে, তা সারা দিন অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে। সারা দিন যে শ্রমিক একভাবে কাষ করতে পারে, তারাই বেশী উৎপাদন করে। আট ঘণ্টার দুই ঘণ্টা অধিক কাষ দেখিয়ে বাকী ছয় ঘণ্টা স্বল্প কাজ করলে তার যোগফল ভালো হয় নি। উপরন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শ্রমিক পরের দিন আরও কম কাষ করে উৎপাদনের

হ্রাস ঘটিয়েছে। এক্ষণে শ্রমবিরামের হ্রাস ঘটাতে হলে নিম্নোক্ত উপায়ে শ্রমিকদের সহযোগিতা লাভের প্রয়োজন।

(১) এমন ভাবে ক্ষুদ্র যন্ত্রাদি শ্রমিকদের আয়ত্তাধীন রাখতে হবে যাতে তাদের মনে বিরক্তি উৎপাদন না হয়; কাঁচা মালের জন্য যাতে তাদের অযথা কালক্ষেপ না করতে হয়। কার্য্যারম্ভের প্রথম দিকে তারা ইহা গ্রাহ্য না করলে শেষের দিকে ইহা তাদের মনে বিরক্তি ও অশ্রদ্ধা আনে; যন্ত্রের ত্রুটির জন্য তাদের অযথা শ্রম না করতে হয়। যন্ত্রগুলি ব্যবহারের পূর্ব্বে পরীক্ষা করে বা গ্রীজ আদি প্রদানে উহাদের যত্ন করলে সুফল ফলবে। নূতন অবস্থায় অধিক পরিচালনা যন্ত্রে উৎকর্ষতা আনলেও পুরানো যন্ত্রকে অন্ততঃ একদিন বিশ্রাম দেওয়া উচিৎ—মানুষের ন্যায় যন্ত্রেরও যত্ন নেওয়া উচিৎ হবে।

(২) শিল্প ক্ষুদ্রায়তন হলে মালিকদের উচিৎ হবে শ্রমিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা—তাদের পারিবারিক অসুবিধা সুবিধার বিষয় অনুসন্ধান করাও উচিৎ। পড়শীসুলভ মনোভাব সহ তাদের সাহায্য করা মালিকের অন্যতম কর্ত্তব্য। 'মাই বয়েজ' বা 'আমার ছেলেরা' এই শব্দগুলি ব্যবহার করলে অধিকতর সুফল ফলবে। বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রের মজদুর শব্দটি ছোট শিল্পে অচল। এদের সঙ্গে নিজে পরিশ্রম করতে পারলে আরও ভালো। নানা ভাবে এদের সান্ত্বনার বাণী শুনানো উচিৎ হবে। এদের চাকুরীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিতে হবে। সোজা কথায় তাদের জানাতে হবে—তোমরা না ছাড়লে আমি তোমাদের ছাড়বো না এমন কি, তোমাদের পোষ্যবর্গের জন্যও এই প্রতিষ্ঠানটি সদা উন্মুক্ত।

(৩) সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধীক বেতন দেওয়া যে সম্ভব নয়, সে কথা ঠিক। কিন্তু অন্য ভাবে তাদের মধ্যে পারিবারিক স্বাচ্ছল্য এনে দিতে পারা যায়। একই পরিবার হতে একাধিক শ্রমিক নিয়োগ করা যেতে পারে। এই জন্য নিস্প্রয়োজনেও কয়েকটি আনুসঙ্গিক শিল্পের সৃষ্টি করা ভালো। ফিতা শিল্পে কেবলমাত্র ফিতা তৈরী করে বিক্রয় করা হয়। কিন্তু উৎপাদিত ফিতার কিছুটা নিজেরা রাখলে শ্রমিকদের পুরনারীরা ঘরে বসে তা থেকে জুতার ফিতে ও চুলের ফিতে তৈরী করে আয় করতে পারে। এই আয় বাড়ীর পুরুষদের আয়ের সঙ্গে মিলিত হলে শ্রমিকদের আর্থিক চিন্তা তাদের ক্লিষ্ট করবে না। আমার নিজের ফিতা শিল্পে এই ব্যবস্থা করার পর শ্রমিকদের প্রায়ই বলতে শুনা গিয়েছে—আমাদের ফ্যাক্টারী। আমার ফ্যাক্টারীর ফিতা, ইত্যাদি। এ ছাড়া শ্রমিকদের সহিত ব্যবসার লাভালাভ ও ক্রমোন্নতির সম্বন্ধেও পরামর্শ করা উচিৎ হবে। সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মম সত্য হচ্ছে, ক্ষুদ্রশিল্পের মালিকদের মাসিক এক হাজার টাকার বেশী মুনাফা নেওয়া উচিৎ নয়। বাকী টাকাটা থেকে শতাধিক বেতন-শ্রমিকদের প্রদান করে উদ্বৃত্ত অর্থ ঐ শিল্পেই পুনর্নিয়োগ করা উচিৎ। এই সম্পর্কে বৃহৎ শিল্প সম্বন্ধে পরে আমি আলোচনা করবো।

[এই বিষয়ে আমার স্বকীয় প্রযুক্ত পন্থাও বলা যেতে পারে। আমি স্বগ্রামে স্বকীয় শ্রমিকদের জন্য প্রায় ত্রিশ বিঘা জমী পৃথকীকৃত করে রেখেছি। তারা ছুটীর দিনে সেখানে একত্রে কৃষিকার্য্য করে। অবশ্য দুইজন কৃষককে প্রতিষ্ঠানের অর্থ দ্বারা অকুস্থলে মজুত রাখা হয়েছে। এই ভাবে যতোটা সম্ভব তারা আমার পরিবারের ও তাদের নিজেদের খাদ্য আহরণ ও সংগ্রহ করে থাকে। এইভাবে আমি এদের নিয়ে একটি সুখী-পরিবার সৃষ্টি করতে পেরেছি। এক্ষণে আমাদের স্থাপিত আবাসিক স্কুলে তাদের পুত্রকন্যাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেই বিষয়েও আমি ভাবছি।]

ক্ষুদ্রশিল্পে উপরোক্ত উপায়ে শ্রম-বিরামের ক্ষণ কমানো সম্ভব। কিন্তু বৃহৎ শিল্পসমূহে এই শ্রম বিরামের ক্ষণ কমাতে হলে ইঞ্জিনীয়ার ও মনস্তাত্বিক পণ্ডিতদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রয়োজন আছে। এইখানে ভেজাল বিহীন খাদ্য, আলোক ও বাতাস যুক্ত শ্রমিক নিবাস ও সুপরিবেশ, নির্দোষ আমোদপ্রমোদ প্রভৃতির ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে।

এই আমোদ ব্যবস্থার প্রচলনে কোনও ফ্যাক্টারী পরিচালকদের অত্যুৎসাহী দেখা গিয়েছে। কিন্তু এইখানেও তারা মনস্তাত্বিক খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে ভেবে দেখেন নি। শ্রমকিদের কর্ম্মতাল কর্মোদ্যোগ আনে সে কথা ঠিক। এই জন্য আবহমান কাল ধরে বয়েদ আওড়ানো বা গান করার রীতি আছে। কিন্তু এই গানের শব্দগুলি বরাবর একই থাকা উচিৎ। নিরক্ষর শ্রমিকরা ইহা মুখে ব'লে

গানের শব্দের পরিবর্ত্তন ঘটায় না। এর কারণ নূতন শব্দ বুঝতে গেলে শ্রমিক অন্যমনস্ক হতে বাধ্য। কিছুকাল আগে আমার এক বন্ধুর এনামেল ফ্যাক্টরী পরিদর্শন করেছিলাম। সেখানে সর্ব্বসময় মাইক যোগে শ্রমিকদের রেকর্ড বাজিয়ে শুনানো হয়ে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বারে বারে নূতন সঙ্গীত শুনবার জন্য শ্রমিকদের কর্ম্মকালে চিত্ত অন্যত্র বিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য। এইখানে মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের পরামর্শ নিলে তাঁরা শুধু কথাহীন একটা মৃদু বাজনার সুর বাজিয়ে শুনাবার পরামর্শ দিতেন। এই বাজনার সুর প্রতি সপ্তাহে বদলালে ক্ষতি নেই। অন্যদিকে মজদুরদের বিভিন্ন কৃষ্টির বিষয় না ভেবে মধ্যে মধ্যে তাদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এই সকল আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা সুশিক্ষিত তদারকী অফিসার এবং ইঞ্জিনিয়ার ও কেরাণীদের ফরমাজমত করা হয়। কিন্তু নিরক্ষর ভিন্নসমাজী মজদুরদের পছন্দাপছন্দের বিষয় তারা ভেবে দেখেন না। এই বিষয়েও দৃষ্টিভঙ্গী বদলানোর প্রয়োজন আছে। যারা মাদল বাজাতে চায়, তাদের হারমোনিয়াম শুনিয়ে লাভ হয়নি।

বর্ত্তমান নিবন্ধে আমি বারে বারে সহযোগিতার প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে বলেছি। এই সহযোগিতা শ্রমিকদের সহিত মালিকদের থাকলেই শুধু চলবে না। এই সহযোগিতা শ্রমিকদের নিজেদেয় মধ্যেও থাকা দরকার। বৃহৎশিল্পে এই সহযোগিতা আনতে হলে ছোট ছোট বিভাগে সমকৃষ্টিসম্পন্ন ও সমশিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমিকদের একত্রিত করতে হবে। এই অবস্থায় আবাসিক এবং সামাজিক সহযোগিতার ন্যায় এই ছোট বিভাগেও এদের মধ্যে পল্লী-সুলভ সহযোগিতা এসে যাবে। এই ক্ষেত্রে পরস্পরের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও পিশ্‌রেট বা ফুরণের কাযে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য পর্য্যন্ত করেছে। এইরূপ ছোট ছোট সংস্থার সঙ্গে মালিক ও ম্যানেজারগণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন কয়তে সক্ষম হবেন। সাধারণতঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকদের মধ্য হতে কয়েকজন নেতা বেছে কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাতে বলা হয়। কিন্তু এই নেতৃ নির্বাচনে সাধারণ শ্রমিক মাথা ঘামালো কিনা, তা তাঁরা দেখেন না। এই ক্ষেত্রে একটা ক্ষীণকায় সূত্রের মত এই সংযোগ ব্যবস্থা খুব বেশী কাযে আসেনি। তবে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই ব্যবস্থা ভালোই বলতে হবে। এই মালিক-শ্রমিকের সভায় শ্রমিকদের মনপ্রাণ খুলে কথা বলতে দেওয়া উচিৎ। এতে তাদের মনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ সরল পথে বেরিয়ে তাদের মনকে হাল্কা করে দেবে। মালিকরাও তাদের মনের গতি কোনপথে এবং তাদের সুবিধা অসুবিধা কি—তা অবগত হবেন। এইভাবে শ্রমিকরা তাদের দেহের মনের সুস্থতা ফিরে পেলে উৎপাদক শ্রমের ক্ষণ স্বভাবতঃই বহুগুণে বেড়ে যাবে।

[ক্রমশঃ
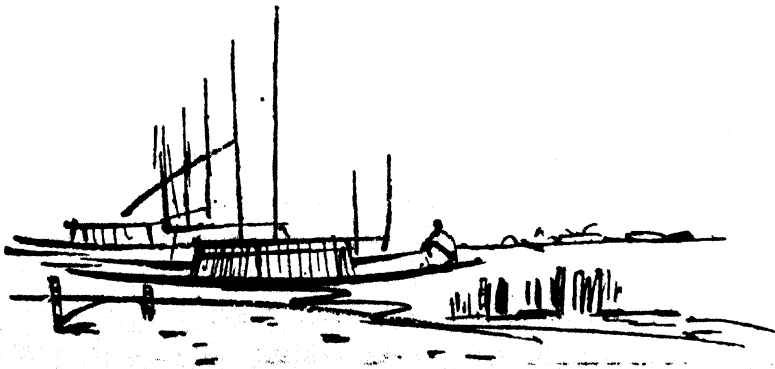
পারিয়া

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মাসের শেষে বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনের বিয়ের নেমন্তন্ন পত্র পেলে কার না হৃদকম্প উপস্থিত হয়! বিজয়েরও মনে মনে রাগ হয়েছিল—বিয়ে যদি করতেই হয়, মাসের প্রথম দিকে করলেই হত। সমর তার বন্ধু, অবশ্য বয়সে অনেক ছোট—প্রায় দশ বছরের, তবুও ছেলেটিকে তার ভাল লাগে। তারই বিয়ে, একটা কিছু না দিলেই নয়, আজ মঙ্গলবার, বৌভাত। হাতে যা আছে তার থেকে বড় জোর দশটা টাকা খরচ করা চল্‌তে পারে, তাতে সোনার কাছে যাওয়ার উপায় নেই, আর তা আজকাল মেলেও না,—কিন্তু দশ টাকায় কি হয়?

আফিস থেকে এসে টেবিলের উপর চিঠিখানা দেখে সমরের উপর রাগই হল। কেন, সেও ত চাকুরে, মাসের প্রথম দিকটায় বৌভাতটা ফেল্‌তে পারেনি! চিঠি খানায় একটা ভাষা ও ভাবের নূতনত্ব ছিল, সেটাও তার উষ্মার কারণ হ'য়ে উঠল। চিঠিটা নতুন রকমের—

ভাই বিজয়—

—আগামী অমুক তারিখে অমুকবারে কুমারী সতী-শীলা চাটার্জ্জী, শ্রীযুক্তা সমর ব্যানার্জীতে রূপান্তরিত হবেন। অমুক তারিখে বধূবরণ ও বৌভাত হবে। তোমার আসা চাই-ই চাই।

ইতি

সমর ব্যানার্জী

বিজয় চিঠিখানা পড়ে মনে মনে রেগে গিয়েছিল, এ কি রকম নেমন্তন্নের ছিরি—এর মধ্যে শালীনতা কোথায়? তারপরে বিয়ের নেমন্তন্ন হলেই বিজয় আজকাল একটু রেগে যায়, অবশ্য তার কারণও আছে।

যা হোক, বিজয় স্যুটকেশটা খুলে কাচান ধুতি ও পাঞ্জাবী পরে নিল। সে থাকে টালিগঞ্জে এক বাড়ীতে পেয়িং গেষ্ট, আর যেতে হবে বরানগর। ট্রামে বাসে ভগবানের কৃপায় দু'ঘন্টাই লাগবে। তার পরে আবার কলেজ ষ্ট্রীটে নেমে, বই হোক, শাড়ী হোক, বা আজকাল হাল ফ্যাসানের যে সব উপহারের জিনিষ বেরিয়েছে তার একটা কিছু কিনতেই হবে ত! কিন্তু দশ টাকায় কি হবে? সমরের বৌকে দিতে হবে দশ টাকার মধ্যে একটা কিছু—এতেই কি তার ইজ্জত থাকে? কিন্তু উপায়ও নেই—

দশ টাকায় এক বই ছাড়া কিছু হয় না, কিন্তু দেবার মত বই কই? আজকাল যে সব pot-boiler উপন্যাস, তা দিয়ে সে ইজ্জত খোয়াতে পারে না—

যা হোক ট্রামে উঠে ভেবে চিন্তে যা হয় করা যাবে, সময় হ'য়ে এসেছে, অতএব সে একটা ট্রামে উঠে প্রথম দিকের সিটে এসে বসল। চিন্তাটা বিয়ের উপহার থেকে বিয়ে, এবং বিয়ে থেকে নিজের জীবনের দিকে ধীরে ধীরে পথ নিল। বিজয়ও বিয়ে করেছিল, কিন্তু সে ঘর তার টেকেনি—কেন টিকলো না এই ভাবনাটা নতুন করে আজ তাকে উদ্বেল করে তুলল—তবে তার জন্যে তার দুঃখ নেই। আজ তার মনে হয় সে নিষ্কৃতি পেয়েছে—সে ভাবছিল—

বিজয় বসু—তার বাবা কুলীন কায়স্থ এবং কৌলিন্যের গর্ব তার শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিল। বৃদ্ধ বয়সেও ছোকরা ব্রাহ্মণ তনয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করতেন। বিজয় এসব পছন্দ করতো না। সে আধুনিক যুবক, সে জানে মানুষ মানুষই, জন্ম ও জাতির জন্যে সে নিজে দায়ী নয়—সে তার কর্মের জন্য দায়ী। জাতের নামে সব বজ্জাতি চল্‌ছে। সে ভগবানও মানতো না,—ভগবান ও ধর্মের ধাপ্পা দিয়ে একদল লোক আর একদল লোকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খায় ইত্যাদি। তার সঙ্গে সেই জন্যে তাদের প্রাচীনপন্থী পরিবারের বিরোধ ছিল তবে সেটা কোনদিন

সাকার হয়ে ওঠে নি। কিন্তু প্রথম সেটা প্রকট হ'য়ে উঠল তার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে। সে বিয়ে করেছিল একটি চাকুরে মেয়েকে—লীলা ঘোষকে। কিন্তু লীলা অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে তাকে ত্যাগ করে গেছে—অথচ সে আত্মীয়-স্বজন ভাই বাবা মা সব ত্যাগ করেছিল তারই জন্যে।

সে কথা আজ তার মনে পড়ে—

আফিস পাড়ায় বিশেষ একটা দোকানে সে টিফিন খেত, সেই দোকানে প্রায় নিয়মিতই লীলা আস্‌তো। হাতে তার প্রায়ই আধুনিক কোন ইংরেজি নভেল বা কাগজ থাকতো। দোকানের এক কোণে বসে পড়তো, তার পরে চা খেয়ে একটু মশলা মুখে দিয়ে চলে যেত। মেয়েটিকে ভাল লাগতো বিজয়ের, ভদ্র, চপলতাহীন,—মাঝারী দেহ, বর্ণ উজ্জ্বল, প্রশান্ত টানা টানা চোখ, কোণে ক্ষীণ কজ্জল, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দু'টি। মুখে একটা অনবদ্য সারল্য ও কমনীয়তা ছিল যা সাধারণতঃ দেখা যায় না। প্রসাধনের মাঝেও বেশ একটা শালীনতা ও পরিমাণবোধ ছিল।

একদিন টিফিনে খুব ভীড় হল, দোকানে বসবার জায়গা নেই, কেবলমাত্র লীলার পাশের চেয়ারটা খালি ছিল। বিজয় একটু ইতস্ততঃ করছিল, লীলা বই থেকে মুখ তুলে বলল,—বসুন না,—বসুন—

সেই প্রথম আলাপ। তারপরে প্রতিদিনই প্রায় দেখা হত, একই টেবিলে তারা খেত, তারপরে ধীরে ধীরে নৈকট্য হল। কথা বলায় সে সত্যিই খুব পটু ছিল,—কোন্ অফিসে কি চাকুরী করে এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছিল,—কেন? মোটা মাইনের ভাল অফিসে চাকুরী করলে বুঝি দাম বাড়ে?

বিজয় বলেছিল,—না, তাতে নারীর দাম বাড়ে না,—টাকায় নারীত্বের মর্য্যাদা বাড়ে এমন বিশ্বাস আমার নেই। তবে কৌতূহল হয় জানতে—

—কিন্তু, আমার তা বলতে ইচ্ছে করে না। কারণ চাকুরী করি, করতে হয় এটাই আমার কাছে অত্যন্ত হীনতা মনে হয়?

বিজয় অবাক্ হয়েছিল শুনে। এমন কথা, আধুনিক মেয়েরা বলে না। তারা চাকুরীর দাসত্বের মধ্যে মুক্তি পেতে চায়, আর এই দাসত্বেই তাদের গর্ব—কিন্তু এ তাকে হীনতা বলছে। বিজয় প্রশ্ন করেছিল,—কেন? এই স্বাধীনতার জন্যে এত সংগ্রাম।

—হ্যাঁ, স্বাধীন টাকার দিক দিয়ে কিছুটা, কিন্তু সে টাকা রোজগার করতে পরাধীনতার অন্ত নেই। তার পরে আপনাদের সহকর্মীরা যে দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে থাকেন সেটাতেও সর্বদাই সঙ্কুচিত হ'য়ে থাকতে হয়—

—ও চাকুরী-জীবন ভাল লাগে না—তবে ছেড়ে দিলেই পারেন।

—যদি পারতাম তবে চাকুরী করতাম না নিশ্চয়ই—গরীব, চাকুরী বিনে চলে না বলেই চাকুরী করি। আমার বোঝা কে বহন করবে?

বিজয় বাইরের দিকে চেয়ে দেখলো, ট্রামটা মাঠের পাশ দিয়ে চলেছে। তখন মাঠে খেলার ভীড়, তার ফাঁকে ফাঁকে তরুণতরুণীরা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কোথাও নির্জনে বসে গল্প করছে। লীলাকে নিয়ে অফিসের পরে সে অনেকদিন এমনি বেড়াতে এসেছে মাঠে। অমনি এক গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর বসে তারা গল্প করতো। একদিন বসন্তের প্রথমে একটা শুকনো পাতা উড়ে এসে পড়েছিল তাদের গায়ে। লীলা সেই পাতাটা তুলে নিয়ে বলেছিল,—এ পাতাটা সবুজ ছিল, বয়স বাড়লে পাণ্ডুর হ'লো। তারপরে ঝরে পড়েছে—এই ত জীবন—

বিজয় বলেছিল,—হ্যাঁ, জন্মেছিল, ও তার জীবনকে ভোগ করেছে, এখন নিঃস্ব তাই ঝরে পড়েছে। এখন ওর প্রয়োজন নেই—

—না, অনেক পাতা গাছে জন্মায়, তারপর ভোগ না করেই ঝরে যায়।

সেদিন বিজয়ের মনে হয়েছিল, ও যেন একটা আশ্রয় চায়—চাকুরীর দাসত্ব ওর যেন সহ্য হয় না। মাঝে মাঝে নানা দার্শনিক কথা সে বলতো—

বিজয় আর একবার মাঠের দিকে তাকালো, ট্রাম-লাইনের পাশে একটা মেহগনী গাছের দিকে সে চেয়েছিল,—এই সেই গাছ। এখানেই সে লীলার কাছে প্রথম বিয়ের কথা তুলেছিল। লীলা হেসে বলেছিল,—তোমার বাবা মা—তাদের মত নিয়ে এসো। তারা আমার মত একটা মেয়েকে গৃহবধূ করে নিতে রাজি কিনা?

বিজয় বলেছিল,—যদি তারা নাই রাজি হন, তাতে কিছু এসে যায় না। আমি স্বাধীন, সক্ষম,—মানুষকে মানুষের অধিকার দিতে আমি শিখেছি। জগতের সব কিছুর উর্দ্ধে জীবনের দাবী, হৃদয়ের দাবী—

লীলা হেসে বলেছিল,—হ্যাঁ, হৃদয় বস্তুটা অতীতের কথা। এখন ওসব জিনিষ দুষ্প্রাপ্য। এখন চল ত যাই, রাত হল—মা বকাবকি করবে—

তারপরে একদিন এই মাঠের এক প্রান্তে, এমনি নির্জন এক সন্ধ্যায়, আকাশে চাঁদ উঠেছিল। মেঘের আড়ালে থেকে চাঁদ সেদিন ঘোলাটে অস্বচ্ছ একটা স্বপ্নালু আলোয় পৃথিবী ছেয়ে দিয়েছিল, সেদিন নেশার ঘোরে মানুষ যেমন আপনাকে ভুলে যায় ঠিক তেমনি নিজেকে ভুলে বিজয় লীলার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। লীলা হেসে বলেছিল,—ভাল তুমি যদি বল, আমি বিনে তোমার জীবন নিষ্ফল—তবে আমি না হয় আমার জীবন তোমার জন্যেই দান করলাম। তাতে হবে ত—

—কিন্তু তাতে কি তোমার জীবন সফল হবে না—

—সে কথা অবান্তর। তবে এই বয়সে, এই মন নিয়ে, পীড়িতে উঠে তোমার চারিপাশে সাতপাক দিতে পারবো না। রেজিষ্ট্রি আফিসে যেয়ে একটা সই বরং গোপনে করে দিয়ে আসতে পারি। তবে তোমার বাবা মার মত নিয়ে এসো, তারা বলবেন কোন ছলনাময়ীর খপ্পরে পড়ে তাদের সুপুত্র বিগড়ে গেছে—এ সব কথা কিন্তু আমার সইবে না। আর যাই করি, তোমাকে বিগড়ে দিয়ে, বাপ মার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে আমি কোন চেষ্টা করিনি, তার সাক্ষী তুমি।

এর পরে বিজয় গিয়েছিল বাবা-মার মত আনতে। তাঁর বাবা প্রাচীনপন্থী, তার কাছে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' এই শাস্ত্রীয় বচনই সব। তাঁর অমতে তার পুত্র প্রেম করে বিয়ে করবে এ তার কাছে ভয়ানক স্পর্দ্ধা ও দুর্নীতির কথা। প্রথম কথাটা শুনে তিনি চাকুরে ছেলের দুর্বলতাবশতঃই বলেছিলেন,—বেশ 'ঘোষ' যদি হয়ই, কোথাকার ঘোষ, তার বংশ পরিচয় কি? আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় আছে খোঁজ করে দেখি, আমাদের ঘরে চলে কিনা? তারপর—আজকাল ঘোষ বোস বাড়ুয্যে চাটুয্যে দেখে ত জাত ধরা যায় না।

বিজয় প্রতিবাদ করেছিল—মানুষ মানুষই, তার আবার বংশ আর জাত-বিচার কি! সবই মানুষ—

পিতা ক্ষেপে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে অনেক কিছু বলেছিলেন, তার মধ্যে প্রথম তিনি আক্রমণ করেছিলেন বিজয়কেই। বলেছিলেন,—সবই মানুষ, বিদ্যাসাগর, পরমহংস, মহাত্মা গান্ধী, আয়েনষ্টাইন—তারাও যা তুমিও তাই। দামোদর ঝাঁপিয়ে মাতৃবাক্য পালন করতে এসেছেন। হাত-পা থাকলেই মানুষ হয় না,—মানুষই দেবতা হয়, মানুষই চোর-ডাকাত হয়, মানুষই সাপ হয়, বাঘ হয়—

বিজয় মরিয়া হ'য়ে তর্ক করেছিল—জাত আর বংশ নিয়ে ত মানুষের বিচার নয়, কর্ম দিয়ে বিচার হয়।

—হ্যাঁ কর্মটা এমনি এমনি হয় না। তার জন্যে জন্মজন্মান্তরের সাধনা লাগে, তোমার মত গাধার পরমহংসদেবের মত সিদ্ধিলাভ করতে একলক্ষ জন্ম ঘুরে সৎবংশে জন্মাতে হবে, তবে—যদি তাই হত তবে লোকে বেতো কুকুর, পারিয়া কুকুরকে ঠেঙ্গা নিয়ে তাড়া করতো না, আর এ্যালসেসিয়ানকে দুধ রুটি মাংস খাওয়াতো না, ভাগলপুরী গাই কিনতে হরিহরছত্রের মেলায় ছুটতো না। তাহ'লে তোমার মাইনে আর জজের মাইনে একই হত,—

বিজয় আরও যেন কি বলেছিল তার উত্তরে তার বাবা অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,—মেয়েমানুষ যদি সবই এক হয় তবে তোর মাও মেয়েমানুষ, সোনাগাছির মেয়েমানুষও মেয়েমানুষ। তোর চোখে সবই এক—

রাগে ক্ষোভে বিজয় চীৎকার করে উঠেছিল,—কি বললে তুমি?

—হ্যাঁ ঠিকই বলেছি। যাকে খুশী বিয়ে করগে, যেখানে খুশী থাকগে, তবে আমার পিতৃপুরুষের এই ভিটের চতুঃসীমার মাঝে পা দিবিনে কখনও—তাহলে তোকে আস্ত ফিরতে হবে না। দূর হয়ে যা এক্ষুণি বাড়ী থেকে, আমি মনে করবো বিজয় মরে গেছে—তাতে আমার দুঃখ নেই। কোন দুঃখ নেই—

এর পরে বিজয় চলে এসেছিল, আর বাড়ীতে সে যায়নি, যতদিন লীলা তার কাছে ছিল। তারপরে দু

একবার গোপনে গেছে, কিন্তু বাবার সঙ্গে দেখা করতে সাহস হয়নি তার। বাবা মৃত্যুকালে নাকি বলে গিয়েছিলেন,—বিজয় যেন তার শ্রাদ্ধে না আসে এবং পিণ্ডদান না করে, তাহলে তার আত্মার সদ্গতি হবে না।

ট্রামটা লাল আলো দেখে দাঁড়িয়ে গেছে—

বিজয় তাকিয়ে দেখে পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়। বিজয় রাস্তার দিকে তাকালো। এইখানটার সঙ্গে একটা ভয়াবহ ঘটনার যোগ আছে তার জীবনে। লীলা ফিরতে প্রায়ই বড় রাত করতো, বলতো মার কাছে গিয়েছিলাম--কিন্তু একদিন বিজয় দেখেছিল এইখান থেকে অন্য এক তরুণের সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠে কোথায় যেন গেল। রাত্রি প্রায় এগারটায় ফিরলে বিজয় জিজ্ঞাসা করেছিল,—কোথায় ছিলে?

—মার সঙ্গে পিসিমার বাড়ী গিয়েছিলাম, তুমি না এলে ব্যস্ত হবে বলে এত রাতেও এসেছি, কিন্তু এত রাতে এমন একা আসা ঠিক হয়নি।

বিজয় প্রশ্ন করেছিল,—তোমাকে যে আমি পার্ক ষ্ট্রীট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে যেতে দেখলাম, কে যেন তোমার সঙ্গে ছিল—

—হ্যাঁ, আমার অন্যতম প্রণয়ী। সে কথা বুঝতে তোমার এত দেরী হবে ভাবিনি। যাক্, এখন শুয়ে পড়ো, খেয়েছ ত? আমি এত বেশী খেয়ে এসেছি যে কাল শরীর ভাল থাকলে হয়—

কিন্তু সেইদিন থেকেই বিজয়ের মনে অবিশ্বাসের বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে। লীলাকে সেদিন সে ভুল বোঝে নি,—সে আপনার চক্ষুকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেছিল এইমাত্র। অন্য কোন মেয়েকে লীলা বলে ভুল করবে এতখানি দৃষ্টিহীন সে নয়।

ট্রামটা এসপ্লানেডে এসে পড়েছে—ট্রাম বদল করে কলেজ ষ্ট্রীট যেতে হবে—

সমরের বৌ-ভাতে কি দেওয়া যায় তা এখনও ঠিক করা হয়নি। একটা রূপোর সিন্দুর-কৌটো? একখানা কাব্য সংগ্রহ? প্রসাধন সামগ্রীর কেস্? কিন্তু দশ টাকার মধ্যে ত হওয়া চাই—একখানা চলতি নভেল? একখানা গীতা দিলেও ত হয়? রামায়ণ? না লোকে হাসবে। আজকার দিনে রামায়ণ আর রামসীতা অচল—সীতার মত বনগমন করার অভিশাপ দেওয়াটা ঠিক নয়—নিজেই ত সে বনগমন একবার করেছে—সীতাহরণও হয়েছে—

যা হোক, বিজয় ট্রাম বদল করে শ্যামবাজারের ট্রামে উঠে পড়ল। বাসে চলাটা তার ভাল লাগে না,—বড় ভীড় আর সংকীর্ণ। তাছাড়া মাঝে মাঝে এমন ব্রেক করে যে মাথা ঠুকে যায়, মানুষের গায়ে গিয়ে পড়তে হয়।

কিন্তু মাত্র দশ টাকায় কি হতে পারে? ভদ্র, সুষ্ঠু উপহার, আশীর্বাদের মত। সমস্যা সমাধানের আগে আবার লীলার কথাই ফিরে এলো মনে। এই অবিশ্বাস তার মনে ক্রমশঃ মহীরুহ হ'য়ে উঠল, সে দূরে দূরে তাকে মাঝে মাঝে অনুসরণও করেছে। একদিন এই ধর্মতলার একটা কাফে থেকে তাকে সে বেরুতে দেখেছে, তখন রাত্রি নটা। গৃহবধূ কেন রাত্রি ন'টায় কাফে থেকে বেরুবে? কিন্তু লীলা ছিল স্বাধীনচেতা, বে-পরোয়া। সে কর্তব্য করেছে, কিন্তু হৃদয় বলে একটা বস্তু তাতে ছিল এমন প্রমাণ সে পায়নি কোন দিন।

নিজের জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে সে নিরাভরণ লীলাকে আভরণ দিয়ে সাজিয়েছিল। পূজার সময় সে যখন সেই নতুন পালিশ করা অলঙ্কার—বিশেষতঃ সোনার চিক পরে তার সঙ্গে বেরুত, আর চিকের উপর মণ্ডপের নিয়ন আলো পড়ে ঠিকরে যেত, তখন সে চেয়ে থাকতো তার মুখের দিকে—মনে হত কি সুন্দর—

কিন্তু সে দেখেছে, একদিন এই মোড়ে আর একজন তরুণের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকতে। অবশ্য সে স্বাধীন চাকুরীজীবী মেয়ে, বন্ধুবান্ধব তার থাকতেই পারে। কিন্তু গৃহকে ছেড়ে এমনি বেড়িয়ে বেড়ানো, তার ভাল লাগেনি—

প্রশ্ন করলে লীলা জবাব দিয়েছিল,—তোমার ওই মন নিয়ে আধুনিক মেয়ে বিয়ে করা ঠিক হয়নি,—তোমার উচিত ছিল প্রাচীনপন্থী ঘরের পর্দানশীন মেয়ে বিয়ে করা। চাকুরী যখন করতে হয় তখন নানাভাবে নানা পরিচয় হয়ই। আর চাকুরী করে ফিরে দিবারাত্রি, সংসার গুছোবো আর রান্না করবো—এমনি যদি ভেবে থাকো ত ভুল করেছো—হ্যাঁ—আর যদি মনে সন্দেহ জেগে থাকে তবে বিদায় দিতে পারো,—আমিও স্বাধীন চাকুরীজীবী,

অসহায় নয়—যে ক'দিন হৃদয়ের সম্পর্ক সে ক'দিনই নৈতিক সম্বন্ধ থাকা ভাল।

এর মধ্যেই ট্রামটা কলেজ ষ্ট্রীটে পৌঁছে গেছে, একটা কিছু করতেই হবে। চারিপাশে আলো জ্বলে গেছে,—দোকান পসার সব আলোয় ঝলমল করছে। এখান থেকে ৩৪ নং বাস ধরে যেতে হবে। তা ছাড়া বরানগর যাওয়ার আর কোন পথ নেই—

বিজয় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটা বই-এর দোকানে ঢুকে পড়ল। নানা রংয়ের বই, উজ্জ্বল, অনুজ্জ্বল, অর্থবোধক, অর্থহীন নানারকম প্রচ্ছদপট। নামও সব অত্যাধুনিক, সমুদ্র বিহ্বল, হলদে আকাশ, হাত বাড়ালেই বৌ, পথে ওঠে ঢেউ, এক আকাশ চাঁদ, লাল নীল তারা। বিহ্বলভাবে নানা বই নাড়াচাড়া করতে করতে বিজয়ের মনে হলো সে গ্রহের ফেরে পড়েছে। বেরিয়ে এল, দেরী হয়ে যাচ্ছে,—কখনই বা যাবে, কখনই বা টালিগঞ্জে ফিরবে!

যাক্‌গে, অত ভাবা যায় না। সে চট্‌ করে একটা রূপোর সিন্দুর কৌটো ও একপাতা সিন্দুর কিনে নিয়ে, গুঁতোগুতি মারামারি করে বিখ্যাত ৩৪নং বাসে উঠে পড়ল।

ভাগ্য ভাল, বাসে যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে সহযাত্রীদের কনুইয়ে গুঁতো আর কাঁধের ধাক্কা খাচ্ছিল ঠিক সেইখান থেকেই একটি লোক তার সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এই ভিড়েই বিজয় বসতে জায়গা পেয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গেই লীলার প্রসঙ্গ মনে ফিরে এল।

বিয়ে করে সে কলকাতায় একখানা ঘর ভাড়া করে বাসা বেঁধেছিল। সকালে তারা কিছু খেয়ে আফিসে বেরিয়ে যেত, দুপুরে আফিস ক্যান্টিনে খেয়ে নিত, রাত্রে রান্না মাঝে মাঝে হত—আর প্রায়ই শিখ হোটেলের রুটি মাংস তরকারী কিনে এনে খেত। বাড়ীতে সে আর যায়নি, গেলে তার বাবা একটা কাণ্ড করে ফেলতেন এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ ছিল।...

বিজয়ের সন্দেহ ক্রমশঃ বাড়তে সুরু করল। এই গৃহে যেন তৃপ্তি নেই, এখানে গৃহ নেই, পরিচয় নেই, যেন একটা ঠিকাদারী ব্যবসা মাত্র। সে মেসে যখন থাকতো মাঝে মাঝে বাড়ী যেয়ে দেখেছে তার বৌদিরা কি সযত্ন আগ্রহে রান্না করে, স্বামী শ্বশুরকে খাওয়ায়, একটা নিবিড় নৈকট্যের মধ্যে সমগ্র পরিবার চলে। বাবা আর মাকে ঘিরে সমস্ত সংসার চলছে। ছোট ভাই বিনয় বৌদির সঙ্গে দিনে কত রকম খুনসুড়ি করে, আর তার বৌদি হেসে নালিশ করেন মায়ের কাছে। মা বিনয়কে কৃত্রিম রাগের সঙ্গে তিরস্কার করেন। সে পরিবারটি যেন একটা বৃহৎ সবুজপত্রময় বনস্পতি, আর তার এই গৃহ শুষ্ক বন্ধ্যা একটা নারকেল গাছের মত একক—

যাক্ এসব নেহাৎ সেন্টিমেন্ট মাত্র, ভাবাবেগ, যার সঙ্গে বর্তমান যুগের কোন সম্পর্ক নেই। যুগ পাল্টাচ্ছে, এখানে বৃহৎ পরিবারের স্থান নেই। গৃহ বা বাড়ীরও প্রয়োজন ঘুচেছে, জীবনের প্রয়োজনে আজ মানুষ ছুটেছে। গৃহের শান্তি ও তৃপ্তির ছায়ায় থাকবার অবসর নেই।

বিজয় আবোল-তাবোল ভেবেই যাচ্ছিল! মাঝে কেবল মনে হল সমর সত্যিই ভাল ছেলে, উদারহৃদয় মহৎ ছেলে। তার জীবন যেন সুন্দর হয়—স্ত্রীর সেবা যত্ন ও ভালবাসায় তার জীবন যেন ভাল হয়। তার মত সে যেন নষ্টনীড় ভ্রষ্টজীবন নিয়ে বেঁচে না থাকে—

যুগধর্মে নীতিরও পরিবর্তন হয়েছে। একদিন জোছনা রাত্রে বারান্দায় বসে গল্প হচ্ছিল। লীলা সেদিন যা বলেছিল তা মনে করলে বিজয়ের হৃদয় আজও ব্যথিত হয়। নারীর-সতীত্ব সম্বন্ধে বলেছিল,—কথাটা আপেক্ষিক, বুঝলে। দেখ ইউরোপের মেয়েদের কুমারীকাল, তারপরে দেখ বিবাহিত জীবনে বহু বিবাহবিচ্ছেদ হলেও তারা অপাংক্তেয় হয় না। সেখানে নটী, চিত্রাভিনেত্রী সকলেরই সমান অধিকার। রাশিয়ায় কুমারী-মাতা বিবাহিতা-মাতার সম্মান একই। কিন্তু আমাদের দেশে কুমারী মেয়ের হাত ধরলেই আগে জাত যেত, পরপুরুষের সঙ্গে বেড়াতে গেলেই গৃহবধূকে চরিত্রহীনা বলা হত। কিন্তু আজ যখন মেয়েরা জীবিকার জন্যে বেরিয়েছে তখন ঐ প্রাচীন সতীত্বের আদর্শ আর নেই। যুগের পরিবর্তনে ওটা আরও বদলে যাবে। আজ সতীত্বের কুসংস্কার বড় হয়ে বেঁচে নেই, জীবনে বেঁচে থাকবার তাগিদই বড় হয়ে উঠেছে। সংস্কারের শৃঙ্খল ছিঁড়ে পড়ছে—

বিজয় সেদিন জবাব দেয়নি—কিন্তু এ যুক্তি তার হৃদয়

গ্রহণ করেনি। জীবনে বাঁচবার তাগিদের মাঝেই ত একটা নারীর অকপট প্রণয়ের প্রয়োজন সর্বাধিক।

—এর পরে ঘটনা খুব বেশী দূর যায়নি। অবশ্য লীলা মাঝে মাঝে তার মায়ের কাছে যেত। বিজয়ও সে বাড়ীতে গেছে, লীলার মায়ের সঙ্গেও দেখা হ'য়েছে। তিনিও অত্যন্ত আধুনিক রুচিসম্পন্না। মা ও মেয়েকে এক সঙ্গে দেখলে দুই বোন বলে ভুল হয় এমনি।

একদিন—ওই বেশী রাত্রে ফেরা ও না বলেই রাত্রে না আসা নিয়ে উভয়ের কথা অনেক দূর গড়ায়। সেদিন বিজয় জোর করে বলেছিল,—তুমি আমার স্ত্রী, তোমার উপর আমার দাবী আছে, অধিকার আছে। আমি দুঃখ পাই—কাজেই তোমার এমনি করে ঘুরে বেড়ান চলবে না—

লীলা বলেছিল,—তুমি আমার স্বামী, আমার দাবী আছে, অধিকার আছে। আমার ঘরের কোণে বসে থাকা ভাল লাগে না,—তোমার সঙ্গে বসে ঘর সংসারের গল্প করা—আর রান্না করা ভাল লাগে না, কাজেই ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা আমায় দিতে হবে—

—যদি না দি—

—তবে আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমার পিছনে ঘুরে ঘুরে তোমাকে বরণ করিনি। তুমিই আমাকে মজিয়েছিলে,—নানা ছলাকলা করে বিয়ে করেছিলে—

—আমি তোমাকে ছাড়বো না, আমার মন আজও তেমনি আছে, তেমনি ভালবাসায় মুখর। তুমি যদি অসুখী হয়ে থাকো, আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পার—

—যেদিন প্রয়োজন হবে নিশ্চয়ই যাবো—

এর পরে দু'দিন তাদের বাক্যালাপ বন্ধ ছিল, কিন্তু সেটা লঘুক্রিয়ায় পরিণত হয়নি। পূজার কয়েকদিন আগের ঘটনা, বিজয় একদিন অফিস থেকে ফিরে দেখে লীলার সুটকেশ কাপড় নেই—তার বদলে একটা চিঠি আছে—তাতে সংক্ষিপ্ত দু'চারটি কথা। লীলা লিখেছে—তোমার জীবনকে অসুখী করে রাখতে চাইনে তাই চললাম। তুমি সুখী হ'য়ো—তোমাকে সম্পূর্ণভাবে, সর্বাঙ্গীণ মুক্তি দিয়ে গেলাম—

তারপর বিজয় কয়েকদিন লীলার ছাড়া ব্লাউজ, পাউডারের বাটি, সুগন্ধি তোয়ালে সামনে করে প্রতীক্ষা করেছিল। আলনায় পুরোণো কাপড় থেকে এখনও লীলার মাথার সুগন্ধি তেলের গন্ধ পাওয়া যায়। রাগ করে চলে গেছে, নিশ্চয়ই রাগ পড়লে দু'চারদিন বাদে আসবে। কিন্তু লীলা ফিরলো না,—তার সুটকেশ ভর্ত্তি সোনার অলঙ্কার আর বিজয়ের বোনাসের টাকা নিয়েই সে গেছে। বিজয় প্রতীক্ষা করে করে অবশেষে একদিন ওর খোঁজ করতে গেল তার মায়ের কাছে। দেখে, তাদের ফ্লাটে তালা ঝুলছে। এদিক ওদিক খোঁজ করলো, কেউ কোন হদিস দিতে পারে না—অবশেষে সিঁড়ি দিয়ে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক উঠে আসছিলেন, তিনি প্রশ্ন করলেন,—কাকে চাই ?

—এই বাড়ীতে যারা ছিলেন. তারা কোথায় ? তারা কি বাড়ী বদল করেছেন ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন,—কেন ? ওদের খুঁজছেন কেন ?

—দরকার আছে—

—এ বাড়ীতে ত দু'জন কলগার্ল থাকতো, তারা আজ ক'দিন চলে গেছে। তারা ত এক জায়গায় থাকে না। তা হলে ব্যবসা চলে না—কেন ? আপনি খুঁজছেন কেন ?

বিজয় তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিল,—নীচে ফুটপাথের মুক্ত বাতাসে এসে বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে যখন সে দেখল সে বেঁচে আছে—তখন তার চোখ জলে ঝাপসা হ'য়ে এসেছে। পথ চলার উপায় নেই, তাই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল দেয়াল ধরে।

বিজয় হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চেয়ে দেখলো বাইরের দিকে,—পরের ষ্টপেই নামতে হবে।

বাস থেকে নেমে যথারীতি বিবাহ বাড়ীতে ঢুকে দেখে অনেক বন্ধু-বান্ধব আসীন। বিজয়ের দেরী দেখে কেউ কেউ পরিহাস করল। তারপরে সকলে বললে—চল বৌ দেখেই একেবারে খেতে যাই। জায়গা ত হ'য়েই আছে—

বিজয় দলের পিছন পিছন দোতলায় উঠল। পকেটের রূপোর সিঁদুর কৌটো আর সিঁদুরের পাতা রয়েছে, সেটাকে হাতে করে সে উপহার দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হল। কিন্তু লীলার চিন্তায় মনটা তার বিষণ্ণ, বিবাহ

উৎসবের উপহাস কৌতুকে যোগ দেওয়ার মত মন তার নেই।

দোতলার সিঁড়ির পাশে ছোট ঘরে নববধূকে সাজিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। নিমন্ত্রিতগণ বধূকে উপহার দিয়ে ছাতে গিয়ে খেতে বসছেন। বিজয় আনমনে দলের পিছন পিছন যেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, বিশেষ কিছু সে লক্ষ্য করে নি। হঠাৎ সে সিঁদুরের কৌটো হাতে করে একেবারে নববধূর সামনে গিয়ে হাজির হল। মুখের দিকে তাকিয়ে বিজয় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল—নববধূ স্মিতহাস্যে উপহার গ্রহণ করছিল। বিজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন ঠোঁটের কোণের হাসিটা মিলিয়ে গেল। চোখ দুটো নামিয়ে নিয়ে, একবার যেন কেঁপে উঠলো। উপহার গ্রহণ করবার জন্যে বাড়ানো হাতের উপর সিন্দুর কৌটোটা কোন মতে ফেলে দিয়ে বিজয় ফিরে দাঁড়ালো। পিছনে ভীড়, সামনের দল ছাতে-পাতা আসনে গিয়ে বসেছে। বিজয় ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল—তার বুকের মাঝে কাঁপছে, হাত-পা যেন বিবশ। সে ভীড় ঠেলে নীচে নেমে এল। ফুস্‌ফুস্ ভরে বাইরের মুক্ত বাতাস নিয়ে একবার দাঁড়াল, তারপর বুক শূন্য করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ে দেখে, একখানা বাস মন্থর গতি হয়ে বাঁক নিচ্ছে। বিজয় কোন কিছু চিন্তা না করেই লাফিয়ে বাসে গিয়ে উঠল—চলতি বাসে উঠতে গিয়ে পা হড়কে গিয়েছিল। হয়ত বা বাসের চাকায় নীচেই চলে যেত, কিন্তু কণ্ডাক্টর গেটে দাঁড়িয়েছিল—কোন মতে টেনে তুলে নিয়ে ধমক দিল,—মশায় এমনি করে চলতি বাসে উঠতে হয়? চাপা পড়লে দোষ হত বাস ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টরের—

বাসের আরোহীগণ সমস্বরে চীৎকার করে তিরস্কার করলে,—হ্যাঁ মশায়, এমনি করে বাসে ওঠে নাকি? একটু হলেই যে একেবারে মহাযাত্রায় যেতেন, একটা বাস পরে গেলে কি হত?

কে একজন পরিহাস করল,—মহাযাত্রায় যেতে দেরী হত—আর কি!

অনেকে হেসে উঠল। বিজয়ের কানে কিছুই যায়নি, তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছে। সমর তার বন্ধু, সোদরপ্রতিম, সুখ-দুঃখের সাথী—বাবা-মা ভাইবোন ত্যাগ করবার পর সমরই তার আশ্রয়, কিন্তু সে আজ ডুবেছে। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের অবসান হলো। এ কথা সে কেমন করে জানাবে তাকে? উদার-হৃদয়, মহৎপ্রাণ সমর কি দুর্বার ভালবাসা নিয়ে বুক উন্মুক্ত করে দিয়েছে ওই মেয়েটির কাছে সে তা জানে,—কি উষ্ণ, কি ফেনিল তরঙ্গ সেই বুকের মাঝে আন্দোলিত হয়েছে ঐ মেয়েটিকে ঘিরে, সে কথা বিজয় জানে। বিজয় চেনে সমরকে,—সমরের হৃদয়কে—

বিজয় রুমালে চোখ মুছে বাইরের দিকে চেয়ে রইল—পথ জনহীন হয়ে এসেছে, দোকানপাট একটা একটা করে বন্ধ হচ্ছে। বিজয় ভাবছিল, আর বার বার তার চোখ ভরে জল আসছিল। তার মনে হল, একান্ত নির্ভর সমর আর বেঁচে নেই। সে মরেছে, অনিবার্য ভাবে মরেছে—এই নিমজ্জমান বন্ধুকে হাত ধরে টেনে তোলে এমন ক্ষমতাও তার নেই। সে তীরে দাঁড়িয়ে দেখছে—আর সমর গঙ্গার স্রোতে ডুবছে, অসহায় বাহু মেলে হয়ত সাহায্য চাইছে, কিন্তু সে বাহু ধরে তাকে তুলে আনা তার সাধ্যাতীত।

এসপ্লানেডে বাস থেকে নেমে সে আকাশের দিকে চাইল, চাঁদহীন অন্ধকার আকাশে অগণ্য তারা, তার নীচে মাঠের বনশ্রেণী সমুদ্র তলদেশের ঘুমন্ত সরীসৃপের মত পড়ে আছে, স্পন্দনহীন,—ঘুমন্ত হিংস্রতা।

টালিগঞ্জের ট্রামে ভীড় নেই, সে আবার ট্রামে উঠে পড়ল। নির্জন মাঠের প্রান্ত দিয়ে ঘর্ঘর করে দুর্মদ ট্রাম চলেছে সবুজ পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে।

বিজয় ভাবছে—তার ভুল হয় নি, সে ঠিক চিনেছে। ও লীলা ঘোষ আজ লীলা চাটার্জী হয়ে সমরকে ছোবল মেরেছে—নইলে ঠোঁটের প্রান্ত থেকে স্মিত হাসি হঠাৎ মিলিয়ে যেত না,—চোখ নামিয়ে নিয়ে সিঁন্দুর-কৌটা ধরতে হাত তার কাঁপত না।

বাড়ীর সামনের ষ্টপে যখন সে নামল, তখন রাত্রি এগারটা। চলতে চলতে দেখে শিখদের হোটেলে তখনও ক্রেতা আছে। সত্যিই ত তার আজ খাওয়া হয়নি। দু'খানা রুটি আর ভাঁড়ে করে একটু মাংস নিয়ে সে চলল। এমনি রুটি মাংস খেয়ে বহু রাত্রি সে আর লীলা কাটিয়েছে।

বিজয় দরজার সামনে মাংস রুটি নামিয়ে রেখে, চাবি

দিয়ে তালাটা খুলে পিছন ফিরে রুটি আর মাংস নিতে গিয়ে দেখে একটা পারিয়া কুকুর মাংসের ভাড়ে মুখ দিয়েছে, বিজয়কে ফিরতে দেখে রুটি মুখে করে নিয়ে পালিয়ে গেল।

বিজয় হেসে মনে মনে বলল,—আজ আর অন্ন নেই কপালে তাই। সে সশব্দে দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলো। পারিয়া কুকুর! তার নামে নালিশ করে আর কি হবে?

চাপ

সামলাও!

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

দিল্লী এবং নৈনিতালে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

পণ্ডিত শ্রীঅনাথশরণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

আনন্দের উপর আনন্দ। মাত্র কয়েকমাস পূর্বে ১৯৬২ সালের ডিসেম্বরে বড়দিনের বন্ধে গোরক্ষপুর নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে আমাদের প্রাচ্যবাণী-সংস্কৃত-পালি-নাট্যসঙ্ঘ পর পর দুইদিন "ভারত-বিবেকম্" ও "ভারত-হৃদয়ারবিন্দম্" নামক ডাঃ যতীন্দ্র-বিমল চৌধুরীর দুটী সুবিখ্যাত সংস্কৃত নাটক অভিনয় করিয়া যে সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কিছু বিবরণ এই পত্রিকা মারফৎ আমি আপনাদের দিয়াছি। পুনরায়, ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে ঈষ্টারের বন্ধে দিল্লীতে পরপর পাঁচবার সংস্কৃত নাটকাভিনয় করিয়া প্রাচ্যবাণী সমান সমাদর লাভ করিল! ইহার অপেক্ষা আনন্দের কারণ আর কি হইতে পারে?

দিল্লীতে গত বৎসরও ঈষ্টারের বন্ধে আমাদের দুইটী সংস্কৃত নাটক ডাঃ চৌধুরী বিরচিত "ভক্তিবিষ্ণুপ্রিয়ম্" ও "বিমল-যতীন্দ্রম্" সুবিখ্যাত সাপ্রু হাউস্ হলে বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। "ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্" অভিনয়ের দিন আমাদের সর্বজনপ্রিয় তদানীন্তন উপরাষ্ট্রপতি পরম-শ্রদ্ধেয় ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সানুগ্রহে প্রায় এক ঘণ্টাকাল উপস্থিত ছিলেন। সেবারে অভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল সুবিখ্যাত শিল্পপতি শ্রীজয়দয়াল ডালমিয়ার "রামায়ণ বিদ্যাপীঠ" ও সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত ডাঃ রঘুবীরের "Institute of International Culture"এর সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে। এইবারও শ্রীযুক্ত জয়দয়াল ডালমিয়াই অগ্রণী হইলেন আমাদের সংস্কৃত অভিনয়ের তত্ত্বাবধায়ক-রূপে। তাঁহার "রামায়ণ বিদ্যাপীঠ" এবং ডাঃ রঘুবীরের "সরস্বতী বিহারে"র সস্নেহ তত্ত্বাবধানে এবারকার অভিনয় সুসমাপ্ত হয়।

অভিনেতা-অভিনেত্রী-গায়ক-বাদক-রূপসজ্জাকার সহ ১৮ জনের একটী দল আমরা পরমোৎসাহে ১২ই এপ্রিল ১৯৬৩ ভেষ্টিবিউল ট্রেণযোগে দিল্লী যাত্রা করিলাম। অন্যান্যবারের ন্যায়ই পরমানন্দে কাটিয়া গেল আমাদের সুদীর্ঘ যাত্রাপথ—জননীরূপিণী ডক্টর রমা চৌধুরীর সস্নেহ পরিচর্যায়।

এবারে আমাদের বাসস্থান ছিল অতিথিবৎসল শ্রীযুক্ত জয়দয়াল ডালমিয়াজীর নিজস্ব বাটীসংলগ্ন অতি সুন্দর "এয়ার কণ্ডিসাণ্ড" অতিথিশালায়। শ্রীযুক্ত ডালমিয়ার সস্নেহ আতিথ্যের তুলনা নেই। পূর্বের ন্যায়, এইবারও তিনি আমাদের অশোধ্য ঋণ-জালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

প্রথমদিন (১৩ই এপ্রিল, ১৯৬৩) আমাদের অভিনয় হয় ডাঃ যতীন্দ্রবিমল বিরচিত বহুবার অভিনীত, জনপ্রিয় সংস্কৃত নাটক "ভারত-বিবেকম্।" স্বামী বিবেকানন্দের শুভজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই নাটকটী বিরচিত হয়। ইহাতে ১৮৮১ হইতে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত স্বামীজীর পুণ্য জীবনের কয়েকটী প্রধান ঘটনা নাট্যাকারে অতি জীবন্ত ও সুললিত ভাবে গ্রথিত করা হইয়াছে। বহু ভক্তি-মূলক সঙ্গীতসমৃদ্ধ এই অপূর্ব নাটকটী ভাষার সারল্য ও মাধুর্য, ভাবের নিগূঢ়তা ও গভীরতা এবং আঙ্গিকের মনো-হারিত্ব ও দক্ষতাগুণে সহজেই দর্শকমন জয় করিতে সমর্থ।

ঐদিন অভিনয় হয় সুন্দর Constitution Club Hall এ। সভায় পৌরোহিত্য করেন দিল্লীস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী স্বাহানন্দ। সভায় তিলধারণের স্থান ছিল না, এবং দিল্লীর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সানুগ্রহে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীভগবানের কৃপায় ঐদিনের নাট্যাভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। প্রত্যেকটী দৃশ্যই সু-অভিনীত হইয়াছিল, এবং অতি বাস্তবভাবে অভিনীত স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সকলকে বিশেষ অভিভূত করে।

দিল্লীর সুবিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা "India Express" এ সম্বন্ধে পরের দিন প্রশংসাসূচক মন্তব্য করিয়া বলেন—

The Sunday Standard, April, 14, 1963.
SANSKRIT PLAY WELL STAGED
By Our Drama Critic.

NEW DELHI, April 13—The Staging by Calcutta's Prachyavani of Dr. Jatindra Bimal Chaudhuri's Sanskrit play, "Bharata-Vivekam", at the Constitution Club this evening, is an important theatrical event in the Capital.

"Bharata-Vivekam" is based on the life of Swami Vivekananda. The playwright succeds enormously in bringing out, early in the play, the internal conflict in Swami Vivekananda. The young sceptic is very well portrayed by Sunil Das. His guru's undemonstrated faith is not enough revelation to him. Playwright Chaudhuri makes clever use of the older ascetic's injunction that Vivekananda look after the needs of his impoverished family before anything else. Ramakrishna himself refrains from preachlng renunciation. The call for it comes ftom Vivekananda's soul.

Thereafter, it is a matter of the young Swami's recognition by his people, and the people of the world. Again playwright Chaudhuri picks on an excellent medium to demonstrate Vivekananda's acceptance. It comes at the world parliament of Religions at Chicago.

Besides Sunil Das Portrayal of Vivekananda, an excellent performance also comes from Partha Banerjee who plays Ramakrishna. There are also some excellent singers in the Prachyavani troup.

The play was directed by Dr. Roma Chaudhuri. Two more plays by the same author are scheduled for Sunday, "Mahaprabhu—Haridasam" and "Amara-Miram" at 8 30 a. m. and 6. 00 p. m. respectively at Constitution Club.

সভান্তে প্রাচ্যবাণীকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন এবং সংস্কৃত ও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের সাধু প্রচেষ্টার জন্য সাধুবাদ প্রদান করেন শ্রদ্ধেয় সভাপতি স্বামী স্বাহানন্দ, রাজকোট রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী তপানন্দ, সুবিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ব-বিশারদ ডক্টর রঘুবীর এবং সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হনুমান কপীন্দ্র। তাঁহারা সকলেই এই কথাই বলেন যে, প্রাচ্যবাণী প্রতিষ্ঠাতৃ—কর্ণধারদ্বয় ডাঃ যতীন্দ্রবিমল ও ডাঃ রমা চৌধুরী যে এইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে মিলনসূত্র দৃঢ়তর করিবার প্রচেষ্টায় জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা সকল দেশবাসিগণেরই অশেষ ধন্যবাদার্হ—শুনিয়া আমরা নিজেদের পরম ধন্য মনে করিলাম।

১৪ই এপ্রিল সকালে ঐ একই স্থানে ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের বহু অভিনীত, সর্বজনপ্রিয় সংস্কৃত নাটক "মহাপ্রভু-হরিদাসম্" সমান কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হয়। পৌরোহিত্য করেন দিল্লী প্রদেশের চীফ সেক্রেটারী মিঃ জোশী। ভূতপূর্ব ফরেন্ সেক্রেটারী, মস্কো প্রভৃতি স্থানের রাজদূত এবং বর্তমানে রাষ্ট্রপতির চীফ্ সেক্রেটারী সর্বজন-শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুবিমল দত্ত, সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীদেবেশ দাশ প্রমুখ বহু জ্ঞানি-গুণি-সমাবেশে এই সভা সার্থক হয়। উপস্থিত সুধীবর্গের অন্তরোত্থ প্রশংসা বাক্যে আমরা নিজেদের বিশেষ কৃতকৃতার্থ বলিয়া গণ্য করিলাম।

১৪ই এপ্রিল আমাদের বিশেষ আনন্দের দিন হইল। কারণ, ঐ দিন বিকালেই আমরা পুনরায় ঐ স্থানেই ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের নবতম, অপূর্ব সুন্দর নাটক "অমর-মীরম্" অভিনয় করিলাম। ভক্ত মীরাবাঈয়ের পুণ্য জীবনী অবলম্বনে বিরচিত এই সংস্কৃত নাটকটী সত্যই সবদিক হইতেই এক অনুপম সৃষ্টি। ইহার প্রত্যেক ছত্রেই

নিঃসৃত হইতেছে এক অপূর্ব ভক্তিমন্দাকিনী ধারা। মীরাবাঈয়ের নিজের কয়েকটী সুপ্রসিদ্ধ ভজন এ নাটকে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল সুললিত সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার নিজস্ব বহু অপূর্ব মধুর সঙ্গীত ও কবিতায় এই সংস্কৃত নাটকটী ঝঙ্কৃত। সভায় পৌরোহিত্য করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রদ্ধেয় ডাঃ কালুলাল শ্রীমালী। তিনি আড়াই ঘণ্টা কাল বসিয়া সমগ্র অভিনয়টী বিশেষ উপভোগ করেন, এবং সভান্তে সকলকে ভূয়সী প্রশংসাপূর্বক আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। এতদ্ব্যতীত, বিহারের মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রীজগজ্জীবন, দিল্লীস্থ অন্যান্য মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী, পণ্ডিতবৃন্দ সানুগ্রহে উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র সভায় একটী অপূর্ব ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়, এবং প্রায় সকলেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে।

১৫ই এপ্রিল শুভ ১লা বৈশাখের দিন দিল্লীর সুবিখ্যাত কালী-বাড়ীর সুবিশাল প্রাঙ্গণে পঞ্চসহস্রাধিক দর্শকের সম্মুখে "অমর-মীরম্" সংস্কৃত নাটক পুনরায় বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। প্রায় রাত্রি এগারটা পর্যন্ত এই বিশাল জনতা সম্পূর্ণ নীরবে বসিয়া অভিনয় রস উপভোগ করেন এবং পরে জনে জনে আমাদের বহু প্রশংসা বাক্যে ধন্যাতিধন্য করেন।

আমাদের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় হয় ১৬ই এপ্রিল বিকালে দিল্লীস্থ রাষ্ট্রপতি-ভবনে সর্বজনবরেণ্য, সর্বজন-প্রিয়, রাষ্ট্রপতি, পরমশ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পুণ্য উপস্থিতিতে। সেই দিনও আমরা "অমর-মীরম্" অভিনয় করি দুই ঘণ্টা ধরিয়া এবং পরমপূজ্যপাদ রাষ্ট্রপতি মহাশয় সানুগ্রহে দুই ঘণ্টাই উপস্থিত ছিলেন। সভায় বহু মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, স্বামীজী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীভগবানের পরমকৃপায় রাষ্ট্রপতিভবনের অভিনয় আমাদের পাঁচটী অভিনয়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল সর্ব-দিক হইতেই। অভিনয়ান্তে পরমশ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি মহাশয় সিট ছাড়িয়া ষ্টেজের নীচে চলিয়া আসিয়া সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনপূর্বক প্রশংসা করেন। আমাদের শেষ প্রাচ্য-বাণী সঙ্গীত "জন্মভূমি ভারত জননী" গীত হইবার কালে তিনি স্বয়ং সিট ছাড়িয়া সমস্তক্ষণ দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন; অন্যান্য সকলেও তাহাই করিলেন। আমাদের মধ্যে একজন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অটোগ্রাফ্ চাওয়াতে তিনি উপরে যাইয়া দুই মিনিটের মধ্যেই তাহা সই করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

তাঁহার এইরূপ মধুর নিরভিমান ব্যবহারে আমরা সকলেই বিশেষ মুগ্ধ ও ধন্য হইলাম। সভান্তে প্রাচ্যবাণীর পক্ষ হইতে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল পরমশ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতির হস্তে এক হাজার টাকার একটী চেক্ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করিলেন। নিজে সই করিয়া তাহার জন্য ধন্যবাদ-পত্রও তিনি ৪।৫ দিনের মধ্যেই পাঠাইয়া দিয়াছেন। সব দিক্ দিয়াই আমাদের রাষ্ট্রপতি-ভবনের অনুষ্ঠানটী চির-স্মরণীয় এবং পরমানন্দকারণ হইয়া রহিল। সভার প্রারম্ভে ডাঃ যতীন্দ্রবিমলের অপূর্ব সংস্কৃত ভাষণও ভুলিবার নহে।

"ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়"—এই মহাসত্য আমরা আমাদের প্রাচ্যবাণী সফরের সময় সর্বদাই বুঝিতে পারি। এইবারও আরেকবার বুঝিলাম। অতিথিবৎসল শ্রীযুক্ত জয়দয়াল ডালমিয়া, তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীবেঙ্কটেশ ও শ্রী কে ভি রাও প্রভৃতি গতবারের ন্যায় এইবারও আমাদের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই, তাঁহাদের ঋণ অপরিশোধ্য। তাহা ছাড়া শ্রদ্ধেয় শ্রীসুবিমল দত্ত, এবং রাষ্ট্রপতি-ভবনের শ্রীঅবনী চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, লেফ্‌টেনাণ্টবৃন্দ প্রভৃতির আদরযত্নের বিষয়ও জীবনে ভুলিবার নহে। শ্রীযুক্ত সুবিমল দত্ত একেবারে যেন মাটীর মানুষ, তাঁহার সস্নেহ, বিনয়নম্র ব্যবহার সত্যই অতুলনীয়। এতদ্ব্যতীত, কালীবাড়ীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দত্ত, পণ্ডিত শ্রীগুরুপদ স্মৃতিরত্ন, শ্রীজিতেন্দ্র মুখো-পাধ্যায় প্রমুখ সকলের আন্তরিক স্নেহ ভালবাসার কথাও চিরস্মরণীয়। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর শ্রী কে, কে, মাথুর, শ্রীসরলকুমার গুহ প্রভৃতির সস্নেহ সাহায্য অবিস্মরণীয়। পূর্ব-বারের ন্যায়, এবারও তাঁহারা সানুগ্রহে আমাদের "অমর-মীরম্" সংস্কৃত নাটকের অংশ বিশেষ রেকর্ড করিয়া নেন, এবং দিল্লী হইতে প্রচার করেন।

সর্বদিক্ হইতেই কি সার্থক আনন্দময়সঘন সফর! শ্রীভগবানের কি অতুল-কৃপা!

অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন মীরার ভূমিকায় শ্রীমতী রত্না গোস্বামী। অন্যান্য ভূমিকায় অধ্যাপিকা শ্রীশান্তি চক্রবর্তী, সর্বশ্রী সুনীল দাশ, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দ্য-

RASHTRAPATI BHAVAN,
NEW DELHI-4.
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली-4।

April 20, 1963.

Dear Shri Chaudhuri,

I appreciate the donation of Rs. 1,000/- which you and other members of the Prachyavani have made to the National Defence Fund. Please convey my grateful thanks to all those who have joined you in raising this contribution.

With the best wishes,

Yours sincerely,

(S. Radhakrishnan)

Shri J.B. Chaudhuri,
Secretary, Prachyavani,
(Institute of Oriental Learning),
3, Federation Street,
P.O. Amherst Street,
CALCUTTA-9.

সুন্দর চট্টোপাধ্যায়, কানাইলাল ভট্টাচার্য, শ্রীশান্তিনাথ ঘোষ প্রভৃতি।

এইবারের সঙ্গীত বড়ই উপভোগ্য হইয়াছিল, বিশেষ

করিয়া "অমর-মীরম্" নাটকের সঙ্গীত। সঙ্গীতাংশে ছিলেন শ্রীগৌরীকেদার ভট্টাচার্য্য, শ্রীপূর্ণেন্দু রায় ও অধ্যাপিকা শ্রীমতী বন্যা মুখোপাধ্যায়। তবলা ও খোল

সঙ্গতে ছিলেন শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী। "অমর-মীরম্" নাটকের অপূর্ব সঙ্গীতগুলিকে অপূর্ব সুরদান করেন শ্রীমান্ পূর্ণেন্দু, এবং অপূর্ব ভাবে গান করেন শ্রীমতী স্বপ্না। সেই সঙ্গে শ্রীমতী রত্নার মীরার ভূমিকায় সুন্দর অভিনয়ের কথাও উল্লেখযোগ্য।

নৈনিতালে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

আরো আনন্দের সংবাদ আছে। এক মাসের মধ্যেই আমরা আরেকটী বড় সফরে বাহির হইলাম। সেটী হইল নৈনীতালে বিশ্ব-নাট্য-মহোৎসবে যোগদানের নিমিত্ত আমাদের পুনরায় দলবলসহ ১৫ই মে নৈনীতাল-যাত্রা। শ্রীযুক্ত মার্তণ্ডের "সাংস্কৃতিকী" নামক প্রতিষ্ঠান আমাদের এই নাট্যোৎসবে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল বিরচিত দুইখানি সংস্কৃত নাটক—যথা বেদান্তাচার্য রামানুজসম্বন্ধীয় "বিমল-যতীন্দ্রম্" এবং ভক্ত মীরাবাঈ সম্বন্ধীয় "অমর-মীরম্"—মঞ্চস্থ করিতে সাদর আমন্ত্রণ জানান। সেই অনুসারে আমরা ১৭ জন সমন্বিত একটী দল ১৭ই মে নৈনীতালে পৌছাই।

সেইদিনই নৈনীতালের সুবিখ্যাত Acoustic হল নৈনীতাল ক্লাবে আমাদের "অমর-মীরম্" সংস্কৃত নাটক অতি সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন উত্তর প্রদেশের উপশিক্ষামন্ত্রী সুধীপ্রবর ডক্টর কেশবান্ রায়। সভায় বহু গণ্যমান্য সুধী উপস্থিত ছিলেন। নবাগতা শ্রীমৈত্রেয়ী চৌধুরী সঙ্গীত সহযোগে মীরার ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেন। কাণপুরের সুবিখ্যাত সমাজসেবিকা, বিধান সভার সদস্যা শ্রীমতী রোহংগী সে জন্য তাঁহাকে সমবেত সকলের পক্ষ হইতে একটী সুবর্ণপদক প্রদান করেন। সভান্তে ডক্টর রায় মহাশয় নাটকের সহজ সরল সুমধুর সঙ্গীত, অভিনেতৃ-বৃন্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও অভিনয়-নৈপুণ্য এবং তৎসঙ্গে প্রাচ্যবাণীর সংস্কৃতিপ্রচারমূলক প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আমাদের পরম কৃতার্থ করিলেন।

২০শে মে ঐ হলেই আমাদের দ্বিতীয় নাটক "বিমল-যতীন্দ্রম্" সমান সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। বিশেষ আনন্দের বিষয় যে, এই সভায় ভারত সরকার কর্তৃক আয়োজিত নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বহু শিক্ষাবিদ উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় উত্তর প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী আচার্য শ্রীযুগলকিশোর। বিশেষ কারণবশতঃ শ্রীঅনিন্দ্যসুন্দর চট্টোপাধ্যায়কে মাত্র একদিনের মধ্যেই রামানুজের ভূমিকাটী প্রস্তুত করিতে হয়। তাহা সত্বেও, তাঁহার অভিনয় সেদিন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হইয়াছিল। অন্যান্য সকলের বিষয়েও ঐ একই কথা বলা চলে: তাঁহারাও সকলেই একদিনের মধ্যে স্ব স্ব ভূমিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন; তাহা সত্বেও, শ্রীভগবানের কৃপায় সকলের অভিনয়ই অতি উচ্চমানের হইয়াছিল। সেই জন্য সমগ্র অভিনয়টী সকলেরই মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছিল। শ্রদ্ধেয় আচার্য শ্রীযুগলকিশোর এরূপ অভিভূত হইয়া পড়েন যে তিনি কেবল অভিনয়ান্তে প্রাচ্যবাণীর সকলকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ করেন—তাহাই নহে, সেই সঙ্গে তিনি বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন যে "অমর-মীরম্" নাটকটী যেন সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ ও মন্ত্রিবর্গের জন্য পুনরায় অভিনয় করা হয়।

তদনুসারে ২১শে মে তারিখে ঐ হলেই আমাদের "অমর-মীরম্" নাটক পুনরভিনীত হয়। আমাদের মধ্যে কয়েক জনকে কার্যব্যপদেশে পূর্বাহ্ণেই প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। তৎসত্বেও দ্বিতীয়বারের "অমর-মীরম্" অভিনয়টী প্রথমবারের অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর হয় এবং সকলের অত্যুচ্চ প্রশংসা লাভ করে। সভায় পৌরোহিত্য করেন সর্বজনবন্দ্য দেশনায়ক কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীধেবর। সেই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত, শিক্ষামন্ত্রী আচার্য শ্রীযুগল-কিশোর, উপশিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কেশবান্ রায়, নৈনিতাল কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ, ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রভৃতি। এরূপ উচ্চকোটীর শ্রোতৃবৃন্দের সম্মেলন কচিৎ দৃষ্ট হয়। শ্রীধেবরের সেই রাত্রেই ট্রেণযোগে স্থানান্তরে যাওয়ার কথা ছিল। তাহা সত্বেও তিনি সমগ্র নাটক অভিনয় রাত্রি নয়টা পর্যন্ত থাকিয়া দেখিয়া যান, এবং সকলের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও অভিনয় কৌশল এবং ডক্টর চৌধুরী দম্পতীর সংস্কৃতিমূলক কার্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া যান। এই দিনের আনন্দের তুলনা নাই।

তিন দিনই মঞ্চসজ্জা অতি মনোরম হইয়াছিল। হলের

ব্যবস্থাও অতি সুন্দর। কারণ নৈনীতাল ক্লাবই ঐখানকার শ্রেষ্ঠ হল। সমস্ত অভিনয় ও সঙ্গীত মাইক-ছাড়া হইল; অথচ সমস্ত অতি পরিষ্কার শোনা গেল॥

নৈনীতালে কোনোদিন ইতঃপূর্বে সংস্কৃত অভিনয় হয় নাই। অথচ তিনদিনই প্রচুর জনসমাগম হইল এবং আমরা প্রচুর সমাদর লাভ করিলাম। সংস্কৃত-জননীর বিজয়পতাকা এখানেও স্থাপিত হইল। ইহা অপেক্ষাও সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

অত্যুৎকৃষ্ট অভিনয়ের জন্য নৈনীতাল কলেজের হিন্দী বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর উপাধ্যায় প্রদত্ত রৌপ্যপদক রামানুজের ভূমিকায় অভিনয়কারী শ্রীঅনিন্দ্যসুন্দর চট্টোপাধ্যায় প্রাপ্ত হন। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু রায় কর্তৃক ভক্ত-গায়করূপে গীত ভক্তিমূলক সংস্কৃত সঙ্গীত তিনদিনই দর্শকগণের উচ্চ প্রশংসা লাভ করে॥

সারা ভারতব্যাপী আমরা যে এই ভাবে সমাদরলাভ করিতেছি, তজ্জন্য আমাদের নিজেদের কৃতিত্ব কিছুই নাই, কারণ ইহা কেবল বারংবার ইহাই সুস্পষ্টতমভাবে প্রমাণ করিতেছে যে, যিনি যাহাই বলুন না কেন, আজ পর্যন্ত সংস্কৃতই ভারতের প্রাণের, সার্বজনীন, সর্ববোধ্য, সর্বপ্রিয় ভাষা। আমরা অন্য কোনো ভাষায় অভিনয় করিয়া নিশ্চয়ই এরূপ সমাদরলাভ করিতে পারিতাম না; এরূপ সহস্র সহস্র দর্শকও সংগ্রহ করিতে পারিতাম না; এরূপ বারংবার প্রতি বৎসরে প্রায় ২৪।২৫ বার, অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রণও পাইতাম না, সংস্কৃত অভিনয় বলিয়াই এই সকল সম্ভবপর হইল। ভারতবর্ষের মঙ্গলকামী এবং দুঃখজনক ভাষাদ্বন্দ্বের অবসানকামী সকলকে ইহাই বিশেষভাবে প্রণিধান করিতে বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই সকল ক্ষুদ্র কাহিনী সকলের গোচরীভূত করিতেছি এবং দেশের সর্বত্রই সংস্কৃত জননীর অদ্যাপি কি মহাসম্মান, তাহা স্বচক্ষে বারংবার দেখিয়া আসিয়া সকলের শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি। ইহাই আমাদের সফরের সার্থকতা।

একটি গ্রাম্য প্রেমের গল্প

সুভাষ চক্রবর্তী

থুপ !

বুঝি তাল পড়ল।

তাল পড়ার শব্দ শুনেও কোন উৎসাহ বোধ করল না দুর্গা। সে পাশ ফিরে শুল।

কিন্তু কিছুদিন আগেও দুর্গা এমন ছিল না। পাছে সে ঘুমিয়ে পড়ে, অন্য কেউ তাল কুড়িয়ে নিয়ে যায়—সেই দুর্ভাবনায় সারারাত জেগে থাকবার চেষ্টা করত দুর্গা। তা সে যত রাতই হোক,—তাল পড়ার শব্দে নফরকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে তাল কুড়িয়ে আনত দুর্গা।

আর এখন ?

তাল পড়ার শব্দ শুনেও উঠতে ইচ্ছে হয় না দুর্গার। যত খুসি তাল পড়ুক,—যার ইচ্ছে কুড়িয়ে নিয়ে যাক,—দুর্গা নির্বিকার।

মন তার বদলে গেছে। মনের সঙ্গে চেহারাও।

নফর রাগ করে বলে,—তুই শ্যাষকালে পেত্নী হয়্যা আমার ভিট্যা আগলাবি ?

রাগ হলে নফরের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। যা মুখে আসে তাই বলে। আর এ তো শুধু রাগ নয়,—নিরুপায়-জ্বালার বিস্ফোরণ। রাগে, দুঃখে গজরায় নফর। বলে,—আমি বুঝি সব। নফর মণ্ডলের ভিট্যায় কি শ্যাযে বেবুশ্যার ডোয়া বসবি ? রূপের বেওসা করা তোর মতলব।

রেগে যায় দুর্গাও। কিন্তু রাগের চেয়ে দুঃখই ঝরে পড়ে তার কথায়,—তুমি না বাপ ! বাপ হয়্যা মিয়েরে বেবুশ্যা বল্যা গাল দ্যাও ?

—গাল দিই কি সাধে ? তোর চাল-চলনে।

—কি চাল-চলনটা আমার খারাপ দেখল্যা তুমি ?

—তোর মতন কোন মিয়েডা বিয়ে পুষব্যার চায় না ? তুই এখনও শঙ্করা শালার জন্যি বস্যা বস্যা আমার মুখে কালি দিতেছিস। তোর ঘরের আনাচে-কানাচে রাত্তির বেলা কারা ঘুর ঘুর করে ?

—কেউ ঘুর ঘুর করে না,—ও তোমার মনের সন্দ। আর যদি করেই, তো আমি কি করব ? আমি কি তাগরে খিল খুল্যা দিচ্ছি না কি ?

—আজ খিল না খুল্যা দিস, একদিন দিবি। আর না হয়ত জোর কর্যাই ঘরে ঢুকবি তারা।

—সিঁথানে আমার রামদাও থাকে।

—যা লো, তোর মনের হাপরের তলে রামদাও তখন চাপা পড়্যা যাবি যে।

—ছিঃ, ছিঃ, বাপ হয়্যা মিয়ের চরিত্তে দোস দেখ তুমি ?

—আমি ম'লি কি দশা হবি তোর, সে কথা ভাবা। ভাব্যা যে মরণের দিন আমার আগুয়ে আইছে।

বৃদ্ধ পিতার মনের অস্বস্তি দুর্গা বোঝে সব। কিন্তু সে যে নিরুপায়! শঙ্করের স্থলে আর কাউকে স্বামী বলে ভাবতে পারে না দুর্গা।

বৃদ্ধ আক্ষেপ করে বলে,—আমি বাঁচ্যা আছি, তাই তোর ঘরের ঝাঁপ ভাঙ্গতি এখনও কেউ সাহস করে না। কিন্তু আমি আর ক'দিন ?

আবার কোনদিন বলে,—শঙ্করা শালা আর বাঁচ্যা নাই। আর যদি বাঁচ্যাও থাকে, ভিনভাশে বিয়ে-সাদি কর্যা সুখে আছে। তুই কালামুখি। শুধ্যাই নিজির মুখে কালি মাখ্যা তার আশায় বস্যা আছিস্। চেহারা খ্যান তোর কি হইছে,—টের পাস ? পেত্নী, পেত্নী—মরা গাছের পেত্নী একটা তুই।

দুর্গার বুক কেঁপে ওঠে। সত্যিই কি শঙ্কর বেঁচে নেই ?

শঙ্কর বেঁচে নেই ভাবতে, প্রাণে যে বেদনা দুর্গার,—তার মাঝেও বুঝি কিছু তার সান্ত্বনা আছে। কিন্তু শঙ্কর অন্য কাউকে বিয়ে করে সুখে আছে,—এ চিন্তাতেও তার বুক ভেঙে যায়।

আজ দুর্গাকে সরা গাছের পেত্নী বলতেও বাধেনা নফরের—কিন্তু একদিন রূপসী দুর্গাকে হিংসে করেনি এ গাঁয়ের কোন মেয়ে? আজ তার এ দশা—কার জন্যে? দুঃখে, অভিমানে দু'চোখ ছেপে জল এসে যায় দুর্গার।

কি না সে করেছে শঙ্করের জন্যে? আর সে শঙ্করই কিনা তাকে ভুল বুঝল?

ছোট থেকে একই সঙ্গে মানুষ হয়েছে গ্রামের দু'টি ছেলেমেয়ে। তাদের অভিভাবকেরা অল্পবয়সেই তাদের বিয়ে স্থির করে রেখেছিল। তারাও জানত, তাদের দু'জনের বিয়ে হবে। দু'জনের মেলামেশাতেও কোন বাধা ছিল না। দুর্গার জ্ঞান হওয়া অবধি শঙ্করকে স্বামী বলেই জেনেছে। শঙ্করের কোন কথাতেই অবাধ্য হতে পারেনি দুর্গা। দুর্দান্ত শঙ্করের উদ্ভট খেয়াল মেটাতে ভরদুপুরে ভূতুড়ে পোড়ো ভিটেয় যেতে দ্বিধা করেনি দুর্গা—ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করলেও, পিছিয়ে যায়নি। অবশ্য শঙ্কর তার সঙ্গে থাকত। যোগিন্দরের পোড়ো ভিটের কুল খুব ভাল। কিন্তু হাজার মিষ্টি কুল হলেও, লোকে যায়না সহজে সেদিকে। জন-শ্রুতি, যোগিন্দরের ভিটেয় নাকি ভূতের আড্ডা। শঙ্কর হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে, ভূত যদিও থাকে, মানুষের মত খারাপ তারা নিশ্চয়ই নয়। যোগিন্দরের ভিটের মিষ্টি কুলের লোভ শঙ্করকে টেনে নিয়ে যায় সেখানে। দুর্গাকেও যেতে হয় তার সাথে।

দেশ-বিভাগ হবার পরে উত্তরবঙ্গের নিজেদের সেই ছোট গ্রাম থেকে উৎখাত হয়ে আনন্দের সঙ্গে দুর্গার বাবা আর শঙ্করের মা-বাবা রাণাঘাটের চুর্ণী নদীর ধারে এসে বাসা বেঁধেছিল। তারপর অনেক দুঃখ-কষ্ট গেছে;—সময় হয়নি, দুর্গা ও শঙ্করে বিয়েটা সেরে ফেলবার। এবার নফর আর শঙ্করের বাবা দুলাল মনস্থ করেছে,—শুভকর্মটি সম্পন্ন করবে।

শঙ্করের বাবা, দুলালের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। দেশে তবুও যা কিছু ছিল, উৎখাত হবার পরে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। শঙ্কর এখন নিজেও সামান্য কেনা-বেচা করে কিছু ঘরে আনছে।

নফর সম্পন্ন চাষী। বেশ কিছু নগদ আছে তার। চাষ আর এখন তার নেই। সে তেজারতি করে। তেজারতি লাভের ব্যবসা।

দু'জনের আর্থিক অবস্থার প্রভেদ থাকলেও, আবাল্য সুহৃদ নফর ও দুলাল। পরস্পরের বন্ধুত্বটা অকৃত্রিম।

নফর বলে, তার যা কিছু আছে—সবই তো শঙ্কর ও দুর্গার। তবে বিয়েতে আর দেরি করা নয়। নফরের জোর তাগিদে দুলালকেও রাজী হতে হয়েছে। বিয়ের দিনও স্থির হয়ে গেছে। অঘটনটি ঘটল তখনই। নদীর ধার থেকে ফিরছিল দুর্গা আর শঙ্কর। পায়ে চলা পথ। দু'পাশে আগাছার ঝোপ। হঠাৎ নজর পড়ল দুর্গার, বেতুল ঝুলছে থোলো থোলো। পাকা বেতুল। শঙ্কর ভালবাসে বেতুল।

দুর্গা বলল,—দাঁড়াও।

তারপর শঙ্করের জন্যে নিজেই হাত বাড়াল বেতুল ছিঁড়তে। দুর্গার জোর টানে বেতের শিষ-কাঁটা ছুটে এসে পড়ল দুর্গার মুখে, জড়িয়ে গেল চুলে। ছাড়াতে গিয়ে, দুর্গার মুখ গেল কাঁটায় ছড়ে। সমস্ত মুখে ফুটে উঠল ফোঁটা ফোঁটা রক্ত।

দুর্গার দশা দেখে হাসতে লাগল শঙ্কর। হেসে হেসে বলল,—সারা মুখে যে তোমার রক্তচন্দনের ফোঁটা। আবার শুকনো রক্তের চটা যখন উঠবে, মুখখান ভর্যা যাবে শ্বেতচন্দনের ফোঁটায়।

শঙ্করের কবিত্ব উপলব্ধি করবার মত মনের অবস্থা তখন দুর্গার নয়। সমস্ত মুখে ছড়ে গিয়ে জ্বলে যাচ্ছে।

আর তা ছাড়া শঙ্করের কাছে কোন সহানুভূতি না পেয়ে, রাগও হয়েছিল দুর্গার।

দুর্গা বলল,—হ্যাঁ, লোকে তখন কবি যে দুগ্গার শ্বেতকুষ্ঠ হইছে। এ মুখ আমি কাউকে দেখাতি পারব না।

—ঠিকই কইছ। ঘোমটার তলে ও-মুখ শুধ্যা আমিই দেখব।

—তোমার জন্যিই আমার এই হাল। না, না—এ মুখ তুমিও দেখতি পাবে না।

—তোমার বড় রূপের গরব যে দুগ্গা।

—রূপ থাকলিই গরব হয়। রূপ ও রূপা দুই ই আছে আমার। গরব হবিক্যা ক্যান?

গম্ভীর হয়ে গেল শঙ্কর।

শঙ্কর ভাবল, তার হীন অবস্থার ইঙ্গিত করেছে দুর্গা।

গম্ভীরভাবে শঙ্কর বলল,—বেশ, রূপা দিয়েই তোমার মত রূপসীর মন কিনব আমি।

শুনে মুচকে হেসেছিল দুর্গা। শঙ্করের রাগ হয়েছে দেখে, কৌতুক বোধ করেছিল দুর্গা।

রূপ তার যতই থাক,—আর বাপের টাকা,—এ নিয়ে কোনদিনই নিজের মনে কোন অহঙ্কার সত্যিই ছিলনা দুর্গার। তবুও শঙ্করকে রাগাতে পেরেছে দেখে হেসেছিল দুর্গা। কিন্তু সেইটাই তার কাল হল।

ভুল বুঝল শঙ্কর।

পরদিন দুর্গা শুনল,—শঙ্কর চলে গেছে। কাউকে কিছু না-বলে চলে গেছে শঙ্কর। শুধু তার মাকে না কি বলে গেছে,—টাকা উপায় করে, তবে ফিরব।

দিন, মাস, বৎসরের পর বৎসর ঘুরে গেল। শঙ্করের কোন খবর নেই।

দুলাল নিজে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে নফরকে অনুরোধ করেছিল, দুর্গার অন্যত্র বিয়ে দিতে।

কিন্তু দুর্গা অটল।

ক্রমে তিন বৎসরও যখন অতীত হয়ে গেল, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল নফরের। সে বৃদ্ধ হয়েছে,—মেয়ের একটা ব্যবস্থা না করে যেতে পারলে তার মনে স্বস্তি নেই।

দুর্গাকে বুঝিয়ে না পেরে, গালাগালি করতে সুরু করেছিল নফর। নফরের মুখ চিরদিনই খারাপ,—কিছুই বলতে বাধে না। সে চিরকেলে চাষা।

এমনি করে পাঁচ বৎসর কেটে গেল।

প্রতীক্ষা করে করে হতাশায় দুর্গার মনে আর কোন কিছুতেই যখন ঢেউ তোলে না,—হঠাৎ একদিন শঙ্কর ফিরে এল।

নফর গেছে হাটে। বিকেলে ঘাট থেকে ভরা কলসি কাঁখে বাড়ীর উঠোনে পা দিয়েই পাথর হয়ে গেল দুর্গা।

ঘরের দাওয়ায় বসে মিটি মিটি হাসছে শঙ্কর।

দুর্গা না পারল এক পা এগোতে, না পারল কোন কথা বলতে।

শঙ্কর উঠে এসে দুর্গার কাঁখ থেকে কলসি নিয়ে মাটিতে রাখল।

তবুও কথা কয়না দুর্গা।

শঙ্কর আস্তে আস্তে বলল,—দুগ্গা, আমি আইছি।

অভিমান-রুদ্ধকণ্ঠে দুর্গা এতক্ষণে বলল,—ক্যান আ্যালে?

মুখ ঘুরিয়ে নিল দুর্গা। বোধহয় চোখের জল গোপন করতে।

—এতদিন তোমার লাগ্যাই তপিস্তে করিছি আসামের জঙ্গলে। আসমানের তারাকে আমার পাশে জমীনে পাওয়ার তপিস্তে। কাঠের ব্যবসা কর্যা অনেক টাকা আনিছি।

—মিথ্যে তোমার তপিস্তে। মিথ্যে অভিমান। আমি চিরদিনই তোমার পাশে জমিনে খাড়ায়ে আছি। তোমার চোখ নাই, তাই দেখব্যার পাও নাই।

—অনেক দুখ পাইছি দুগ্গা, আর দুখ দিওনা!

দুর্গার চিবুক ধরে তার মুখখানি নিজের দিকে ফেরাল শঙ্কর। দেখল, দু'চোখের জলে মুখ ভেসে যাচ্ছে দুর্গার।

পাঁচ বছর পরে ফিরে এসেছে শঙ্কর।

নফর খুসী, দুলাল খুসী,—গাঁয়ের সবাই খুসী। শঙ্কর এখন অনেক টাকার মালিক।

শঙ্করের প্রশংসা সকলের মুখে।

খুব ধুমধাম করে শঙ্কর ও দুর্গার বিয়ে হল।

দুর্গার নামে আরেক বার সাড়া পড়ে গেল গাঁয়ে। শঙ্কর চলে যাওয়ার পর, দুর্গার নিন্দা-অখ্যাতিতে ঘাটেবাটে যে ছড়া শোনা যেত মেয়েদের মুখে মুখে—

'অতি বড় সুন্দরী না পায় বর
অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর।'

দুর্গার ভাগ্যের জৌলুসে আজ আর কারও সে ছড়ার কথা মনে পড়ে না।

দুর্গা জয়ী হয়েছে। কিন্তু মাঝ-রাতে হঠাৎ কেন যেন দুর্গার ঘুম ভেঙ্গে যায়,—আর ঘুম আসে না। বিছানায় উঠে বসে সে। পাশে নিদ্রিত স্বামীর পরিতৃপ্ত মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে দুর্গা। তারপর আস্তে খিল খুলে ঘরের দাওয়ায় গিয়ে সে বসে। উঠোন ভর্তি ফুটফুটে জ্যোৎস্না। আকাশে অগণ্য তারা। চাঁদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কি যেন অন্বেষণ করে দুর্গা। এই পাঁচ বছরে দুর্গার কি যেন হারিয়ে গেছে,—তার ছায়া কি পড়েছে চাঁদে? পরখ করে দেখতে চেষ্টা করে দুর্গা, পাঁচ বছর আগেকার চাঁদ আর আজকের চাঁদ কি অবিকল একই!

রাশিচক্রে শুক্রের প্রভাব

উপাধ্যায়

ফলিত জ্যোতিষে শুক্রের নানা কারকতা আছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিবাহ ও প্রণয়। কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, অলঙ্কার, বসন, বাহন, দ্রব্যসঞ্চয়, ধন, সুখ, গন্ধদ্রব্য, পুষ্প প্রভৃতির কারক এই গ্রহ। প্রাচীন গ্রীকদের কাছে সৌন্দর্য্য ও প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং মদন জননী। ভারতীয় ও গ্রীকদের ধারণা শুক্র ঐক্য, মিলন ও সম্বন্ধ বাচক। দিবাভাগে জাত ব্যক্তির পক্ষে রবি ও শুক্র পিতা এবং মাতা। রাত্রিজাত গণের কাছে এরা খুল্লতাত ও মাতুলানী। শুক্রের ক্ষেত্র বৃষ ও তুলা, তুঙ্গস্থান মীন এবং নীচস্থান কন্যা। কন্যা নৈসর্গিক রাশিচক্রের ষষ্ঠস্থান। এজন্য কন্যারাশিতে শুক্রের অবস্থান প্রীতিপ্রদ নয়। এর নাশস্থান মেষ ও বৃশ্চিক। মীনরাশি অতীন্দ্রিয় রহস্যের ধারক ও বাহক। এজন্য রাশিটি শুক্রের আকর্ষক। বৃষরাশি সমৃদ্ধ বা অধিকার সূচক। তুলারাশি ঐক্য সংজ্ঞক। বৃষ কণ্ঠ আর তুলা কুঁচকির কারক। বৃষের ২৫ ডিগ্রি আর তুলার ৪ ডিগ্রিতে চন্দ্রের অবস্থিতি শুভ-ব্যঞ্জক নয়। বৃষে রবি ৯ ডিগ্রি, মঙ্গল ২৮ ডিগ্রি, বুধ ১৪ ডিগ্রি, বৃহস্পতি ২৯ ডিগ্রি, শুক্র ১৫ ডিগ্রি, শনি ৪ ডিগ্রি, রাহু ১৩ ডিগ্রি আর কেতু ১৮ ডিগ্রিতে অবস্থান শুভফলের ব্যাঘাত ঘটায়। তুলায় রবি ১৬ ডিগ্রি, মঙ্গল ১৪ ডিগ্রি, বুধ ২০ ডিগ্রি, বৃহস্পতি ১৩ ডিগ্রি, শুক্র ৪ ডিগ্রি, শনি ৩ ডিগ্রি, রাহু ২২ ডিগ্রি এবং কেতু ২৩ ডিগ্রিতে সুখকর নয়। চন্দ্রের সঙ্গে শুক্রের সহাবস্থান হোলে চন্দ্র শুক্রকে পরাজিত করে রাখে, আর শুক্রের সঙ্গে বুধ থাকলে, বুধকে শুক্র পরাভূত করে।

বলশালী শুক্র রাহু, বুধ, শনি এবং মঙ্গলের প্রদত্ত অশুভ ফলগুলি নষ্ট করে। শুক্র পাপ ও প্রতিকূল হোলে বহুমূত্র রোগ ও মদ্যাসক্তি আনে। পরাজিত দগ্ধ শুক্র ও বলহীন হয় না। উত্তরকলামৃতে উল্লিখিত আছে, দ্বাদশস্থান শনির ক্ষেত্র না হয়ে অন্য কোন গ্রহের ক্ষেত্র হোলে আর সেখানে শুক্র অবস্থান করলে গ্রহটি শুভ-প্রদ হয়। মধ্যবয়সেই শুক্রের ফল পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। শুক্র অনুকূল হোলে তার দশায় সুখ, পদমর্য্যাদা, প্রতিষ্ঠা, সৌভাগ্য, ধর্ম্ম, স্বর্ণ, উদ্যান, সঙ্গীত এবং উৎসব-অনুষ্ঠানজনিত আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি লাভ হয়। প্রতিকূল হোলে এদশায় স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য এবং স্ত্রীর জন্য নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়, তা ছাড়া জাতক দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন, অপব্যয়ী ও রোগগ্রস্ত হয়। বৃহস্পতি এবং শুক্র রাশিচক্রে পরস্পর উত্তম অবস্থায় সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হোলে, এদের একটির দশায় অপরটির অন্তর্দ্দশা ভোগকালে জন সমাজে উত্তম প্রতিষ্ঠা পদমর্য্যাদা প্রাপ্তি, কর্ম্মোন্নতি, ধনৈশ্বর্য্য, সুখ, মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতি সূচিত হয়। এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বিপরীতগামী হোলে, দশান্তর্দ্দশায় নির্জ্জনতা, বিপদ, বিরহ, বিচ্ছেদ, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও নানা কষ্ট ভোগের কারণ ঘটে।

শুক্র কেন্দ্রাধিপতি হোলে অশুভফল দাতা। কেন্দ্রাধি-পতি হ'য়ে দ্বিতীয় বা সপ্তম স্থানে থাকলে, তার দশায় গুরুতর পীড়া ঘটে এবং সে পীড়াতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আশঙ্কা করা যায়। পাঁচটী গ্রহের সঙ্গে শুক্র একত্র থাকলে নানা রকম ফল দেয়। শনি ভিন্ন শুক্র সমেত পাঁচটি গ্রহ একত্র অবস্থায় থাকলে জাতক ধনী সুখী ও ধর্ম্মভীরু হয়। মঙ্গল ব্যতীত এরূপ যোগ ঘটলে জাতকের প্রচণ্ড শিরঃ-পীড়া, উন্মাদনা এবং দুঃখ অবসাদ ঘটে। চন্দ্র ব্যতীত এরূপ যোগে জাতক জ্ঞানী ও পরিব্রাজক হয়। রবি ভিন্ন এই যোগে জাতক তপস্বী হয়। বৃহস্পতি ভিন্ন এই যোগে

জাতক পরের জন্য কাজ করে, সামান্য অবস্থায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, উল্লেখযোগ্য হয়না আর রোগ ভোগ করে। বুধ ভিন্ন এরূপ যোগের সমাবেশ ঘটলে, জাতক মন্ত্রী, শান্ত সৌম্য ও প্রফুল্লচিত্ত হয়, কিন্তু পারিবারিক সুখের অভাব ঘটে। শুক্রের ক্ষেত্র বৃষ। বৃষ লগ্নের ব্যক্তির সুখ সমুন্নত, তার জীবনের শেষার্দ্ধে সুখ স্বচ্ছন্দতা কঠোর পরিশ্রমী, তার দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কীর্ণ, সহ্যগুণ অসাধারণ। তুলাও শুক্রের ক্ষেত্র। তুলা লগ্নের ব্যক্তির দেহ শীর্ণ, মুষ্টিমেয় সন্তান, ধর্ম্মপ্রবণ, কঠোর সমালোচক, ব্যবসায়ে দক্ষতা। সময়ে সময়ে অত্যন্ত পরিমিত ব্যয়ী। বৃষে রবি থাকলে সাজপোষাক, গন্ধদ্রব্য ও সঙ্গীতের দিকে নজর। তুলায় রবি থাকলে বরাহমিহিরের মতে জাতক মদ্যপ, ভ্রমণকারী, ও স্বর্ণব্যবসায়ী হয়। শুক্রের গৃহে বৃহস্পতি থাকলে জাতক ধনী, স্বাস্থ্যবান, উদার ও জনপ্রিয় হয়। বৃষে বৃহস্পতি পার্থিব সম্পদের বিস্তৃতি ঘটায়, সৌন্দর্য্য-প্রেমিক করে। শুক্রের গৃহে বৃহস্পতি শুভফল দাতা। মঙ্গলের সঙ্গে শুক্রের মিল খায় না। বৃষে চন্দ্র সুন্দর চেহারা দেয়, তুলায় চন্দ্র জাতককে ভ্রমণবিলাসী ও ধনী করে। বৃষে চন্দ্র জাতককে লোভী করে, তুলায় করে নম্র, অলস ও স্বচ্ছন্দবিহারী। বৃষে শনি দেয় যত্ন, সতর্কতা, ধৈর্য্য আর বাস্তব ক্ষেত্রে সাফল্য, আর করে প্রণয় ও সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রে দায়িত্বহীন। তুলায় শনি করে যুক্তি-বাদী, সংযমী, পরের সহানুভূতির অভাবে ভগ্নহৃদয়। শুক্রের ক্ষেত্রে বুধ পারিবারিক জীবন প্রিয় করে, শিক্ষক ও বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে সম্মান এনে দেয়, ধনীও উদার করে। বৃষে বুধ ধীর অথচ চিন্তায় ও কথাবার্ত্তায় আকর্ষণীয় করে, কিন্নরীকণ্ঠ হয়। তুলায় বুধ কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে আকর্ষণীয় করে, মন সুন্দরের ধ্যান করে। শুক্র ও বুধের একত্র সমাবেশ সুন্দর। মেষ ও বৃশ্চিকে শুক্র মেয়ে মানুষের জন্য অর্থ অপচয় ঘটায়। জাতক ছিদ্রান্বেষী ও রূঢ়-প্রকৃতিবিশিষ্ট ও একাধিক নারী প্রিয় হয়। বৃশ্চিকে শুক্র জাতককে অতিরিক্ত প্রণয়াসক্ত ও কামুক করে। শুক্র স্বক্ষেত্রে থাকলে জাতককে নেতা, সাহসী, বিখ্যাত, ও সম্মানার্হ, স্বোপার্জ্জিত ধনে ধনী করে। বৃষে শুক্র থাকলে প্রণয়ে স্থির সঙ্কল্প করে, শিল্প কলা সঙ্গীতে আনে অনুরাগ। তুলায় শুক্র থাকলে জাতক ভাব প্রবণ, সুখী, নম্র, সুদর্শন এবং প্রেমাস্পদ হয়। মিথুনে শুক্র জাতককে শিক্ষিত, ধনী ও সরকারী কর্মচারী করে। কন্যায় শুক্র থাকলে বরাহ মিহির বলেন সর্ব্বব্যাপারে ফলগুলি নিকৃষ্ট এবং নৈরাশ্যজনক হয়। কন্যায় শুক্র ভালবাসা চাপা অবস্থায় রাখে, অনুগমনশীল মেজাজ হয়। শুক্র নীচস্থ হয়ে কন্যাগৃহে মিথুন অপেক্ষা অধিকতরভাবে ফলদাতা, বরাহমিহির যাই বলুন না কেন। কর্কটে শুক্র ইন্দ্রিয়পরায়ণ, দুঃখী ও ভীরু করে, প্রণয়ের পাত্রী তাকে মায়ের মত আদর যত্ন করে। কর্কট দুর্ব্বল রাশি, এখানে শুক্র চারিত্রিক ব্যাপারে অনেক কিছু অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। সিংহে শুক্র থাকলে সুন্দরী পত্নী লাভ, অল্পসংখ্যক সন্তান। ১৩. ২০´ ডিগ্রি থেকে ২৬. ৪০´ ডিগ্রীর মধ্যে শুক্র থাকলে জাতক সৌভাগ্যবান হয়। ধনুতে শুক্র জাতককে ধনী ও ধার্ম্মিক করে। মীনে করে পণ্ডিত, জনপ্রিয়, সম্ভ্রান্ত ও ধনী। ধনুতে শুক্র জাতকের স্নেহ ভালবাসা ব্যক্ত করে। মীনে শুক্র জাতককে আবেগ-প্রধান, ভাবপ্রবণ ও প্রতিপত্তিশালী করে। শনির ক্ষেত্রে শুক্র জাতককে জনপ্রিয় করে। মকরে শুক্র থাকলে জাতকের স্নেহ ভালোবাসা স্থির ও মামুলি ধরণের হয়। কুম্ভে শুক্র আবেগ শূন্য সংযোগ রহিত ভালোবাসা দেয়।

রবি চন্দ্র ও শুক্রের একত্র সংযোগ হোলে জাতক নিষ্ঠুর ও ধনী হয়। রবি মঙ্গল ও শুক্রের একত্র সংযোগ হোলে চক্ষু পীড়া, লাম্পট্য দোষযুক্ত জীবন এবং ধন লাভ হয়। রবি, বুধ ও শুক্রের সংযোগে জাতক উচ্চদরের পণ্ডিত ও সুখহীন হয়। রবি, বৃহস্পতি এবং শুক্র একত্র হোলে বুদ্ধির প্রাখর্য্য, ধন, উত্তম পারিবারিক জীবন এবং চক্ষু পীড়া। শুক্র রবি ও শনির একত্র সমাবেশে জাতক দুষ্ট, গর্ব্বিত ও আত্মপ্রত্যয় শীল হয়। শুক্র শনি ও বৃহস্পতি একত্র থাকলে জাতকের উত্তম বুদ্ধি বৃত্তি হয়। সে হয় বিখ্যাত ও সুখী। চন্দ্র বৃহস্পতি ও শুক্র একত্র থাকলে শিল্প কলায় পারদর্শিতা। চন্দ্র শনি ও শুক্র একত্র হোলে জাতক অত্যন্ত পণ্ডিত ও সম্মানিত শিক্ষক হয়। শুক্র মঙ্গল ও বুধ একত্র থাকলে জাতক চঞ্চল ও দোষযুক্ত। শুক্র মঙ্গল ও বৃহস্পতি একত্র থাকলে জাতক জনপ্রিয়, সম্ভ্রান্ত, সুখী ও ধনী। শুক্র, মঙ্গল ও শনি একত্র থাকলে জাতক বিদেশে বাস করে। চন্দ্র, মঙ্গল ও শুক্র একত্র হোলে জাতক সন্তান দুঃখী হয়। চন্দ্র, শুক্র ও বুধ একত্র থাকলে জাতক পণ্ডিত ও সম্মানিত ব্যক্তি হয়। শুক্র, বুধ এবং বৃহস্পতি একত্র থাকলে জাতক বিখ্যাত ও শক্তিশালী হয়। শুক্র শনি ও বুধ জাতককে মিথ্যাবাদী ও দুষ্ট প্রকৃতি ভাবাপন্ন করে।

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও শুক্র একত্র থাকলে জাতক পণ্ডিত, কোমল স্বভাববিশিষ্ট, ধূর্ত্ত ও সুখী হয়। রবি, চন্দ্র, বুধ ও শুক্র একত্র থাকলে জাতক বক্তা হয়। রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শুক্র একত্র থাকলে জাতক অরণ্যে অথবা সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়, সকলের শ্রদ্ধাভাজন ও সৌভাগ্যবান হয়। রবি, চন্দ্র, শুক্র ও শনি একত্র থাকলে জাতক দুর্ব্বল, ভীরু ও নীচ হয়। রবি, মঙ্গল, বুধ ও শুক্র একত্র থাকলে জাতক চরিত্রহীন এবং দুষ্টপ্রকৃতির হয়। রবি, মঙ্গল, শনি ও শুক্র একত্র থাকলে জাতক অপমান ও অপবাদ, দুঃখকষ্ট বিড়ম্বনা ভোগ করে। রবি, বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্র জাতককে ধন, খ্যাতি, ও নেতৃত্ব

প্রদান করে। রবি, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি একত্র থাকলে জাতক শিল্পকলায় সুদক্ষ ও নেতা হয়। চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ও শুক্র একত্র থাকলে জাতক জ্ঞানী সুখী ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দোষযুক্ত হয়। চন্দ্র, মঙ্গল বৃহস্পতি ও শুক্র একত্র থাকলে জাতক চতুর ও লোভী। চন্দ্র, বুধ বৃহস্পতি এবং শুক্র একত্র থাকলে জাতক পণ্ডিত, বিখ্যাত ধনী ও বধির হয়। শুক্র, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি একত্র থাকলে জাতক ধনী ও পাপাসক্ত হয়। বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি একত্র থাকলে জাতক পণ্ডিত, অমায়িক ও ধনী হয়।

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি একত্র থাকলে জাতক কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং বন্ধু শূন্য হয়। এবং রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শুক্র একত্র থাকলে, জাতক পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং দৃষ্টি ক্ষীণ হয়। রবি, চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র একত্র থাকলে জীবন উন্নতিশীল হয়। তার নম্রতা, ধন ও শক্তি লাভ হয় কিন্তু চরিত্র দোষ ঘটে। রবি, চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্র একত্র থাকলে জাতক বিখ্যাত, শক্তিসম্পন্ন ও কর্ত্তৃত্বশীল হয়। সে বিত্তবান মন্ত্রী অথবা বিচারপতি হোতে পারে। রবি, চন্দ্র, বুধ, শুক্র ও শনি একত্র থাকলে জাতক রুগ্ন ও দরিদ্র হয়। রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি একত্র থাকলে ভয়শূন্য, চতুর, বক্তা ও সুখী হয়। রবি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র একত্র থাকলে জাতক দুঃখকষ্ট রহিত ও সেনাপতি হয়। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি একত্র থাকলে জাতক শিল্পকলানিপুণ এবং সম্মানিত ব্যক্তি হয়, সেনাপতি হবার যোগ্যতা লাভ করে। রবি, মঙ্গল, বুধ, শুক্র ও শনি একত্র থাকলে জাতক জীবনে সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয় কিন্তু রোগযন্ত্রণা, বিপদ ও দুঃখভোগ তাকে করতে হয়। চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি একত্র থাকলে জাতক দরিদ্র, মূর্খ, বেয়ারা চাপরাশি প্রভৃতি হয়। রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও শুক্র একত্র থাকলে জাতক বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ্ ও যন্ত্রশিল্পজ্ঞানী হয়। রবি, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি একত্র থাকলে জাতক পণ্ডিত জ্ঞানী ও ধর্ম্মভীরু হয়। চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ বৃহস্পতি ও শুক্র একত্র থাকলে জাতক ধার্ম্মিক, সুখী, বিদ্বান, শক্তিসম্পন্ন এবং ধনী হয়। চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি একত্র থাকলে জাতক সম্মানিত ও শ্রদ্ধা ভাজন হয়। সে রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি অথবা উল্লেখযোগ্য মন্ত্রী হয়। তার থাকে দৃষ্টিক্ষীণতা। রবি ও শুক্র একত্র থাকলে রঙ্গমঞ্চ থেকে উপার্জ্জন। বরাহমিহির বলেন অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে উপার্জ্জন, তার ব্যবহার সুন্দর। শিল্প নিপুণতা আছে। শিবাজী সিংহলগ্নে জন্মেছিলেন। তাঁর রাশিচক্রে শুক্র মেষে ছিল ১০·৭´ ডিগ্রীতে। জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জন্মলগ্ন ছিল মেষ। মীনরাশিতে শুক্র ৯·৩০´ এবং শনি ১৩´ ডিগ্রিতে ছিল। গোয়েটের জন্মলগ্ন ছিল তুলা। কন্যারাশিতে দ্বাদশ স্থানে ছিল শুক্র ৬·৩০´ ডিগ্রিতে। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের জন্মলগ্ন তুলা। দ্বাদশে কন্যারাশিতে শুক্র ৫· ডিগ্রিতে অবস্থিত। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মলগ্ন ধনু। লগ্নে রবি ০·৫২´ এবং শুক্র ৮·৩২´ ডিগ্রিতে অবস্থিত।

শুক্র প্রধানতঃ পত্নী ও কামবিষয়ক ব্যাপারের কারক এবং রজোগুণী। এইজন্য চন্দ্র শুক্রের সঙ্গে মিলিত হোলে বা শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হোলে জাতক বিষয়ান্বেষী, উচ্চাভিলাষী ও রজোগুণী হয়। তার চিত্ত সর্ব্বদা কামাদি চিন্তায় রত থাকে। শুক্র পাপপীড়িত ও শত্রুযুক্ত হোলে জাতক পত্নী বিষয়ে চিত্তে অসুখী হবে। কারণ শুক্র বিলাসিতা, কামজ ব্যাপার ও শুক্র ধাতুর কারক। শুক্র জলরাশিতে থাকলে জাতকের শুক্র তারল্য অথবা বহুমূত্র রোগের প্রবণতা হয়। শুক্র অগ্নি ও বায়ুরাশিতে থেকে ষষ্ঠাষ্টদ্বাদশগত, অস্তগত, পাপযুক্ত, নীচস্থ প্রভৃতি দোষযুক্ত হোলে জাতকের প্রমেহ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রভৃতি হবে। কিন্তু যদি উক্ত রাশিস্থিত শুক্র শুভদায়ী ও বলবান হয় তাহোলে জাতক সাধনা দ্বারা কাম জয়ী ও উর্দ্ধরেতা হোতে পারে। সাধনা না থাকলেও জাতক সংযতেন্দ্রিয় ও সামান্য কারণে বিচলিত চিত্ত হয় না।

——

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশিরফল

মেষ রাশি

ভরণীনক্ষত্রজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, অশ্বিনীর পক্ষে মধ্যম এবং কৃত্তিকার পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। মাসের প্রথমার্দ্ধে শারীরিক দুর্ব্বলতা ও সন্তানগণের পীড়াদি ভোগ। দ্বিতীয়ার্দ্ধ ভালোই বলা যায়। পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা, মাসটি শান্তিপূর্ণ বলা যায়। পরিবারবহির্ভূত স্বজনগণের সঙ্গে মনোমালিন্য হোতে পারে। আর্থিকক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতি দুইই সম্ভব। প্রথম দিকে ক্ষতির প্রাধান্য, দ্বিতীয় দিকে লাভ। ব্যয়বৃদ্ধি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি ভালোই বলা যায়। চাকুরিক্ষেত্র শুভ, বিশেষতঃ দ্বিতীয়ার্দ্ধে পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি এবং আধিপত্য। বেকার ব্যক্তির কর্ম্মপ্রাপ্তি, দ্বিতীয়ার্দ্ধে কর্ম্মস্থলে খ্যাতি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে কর্ম্মতৎপরতার বৃদ্ধি ও তদনুপাতে লাভ ও আয় বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে পশার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, আধিপত্যবিস্তার, প্রণয়ের ক্ষেত্র নৈরাশ্যজনক, সামাজিক প্রতিষ্ঠা। বিদ্যার্থীর পক্ষে ভালো বলা যায় না।

বৃষ রাশি

রোহিণীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম এবং মৃগশিরার পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই যাবে, কিছু কিছু সময়ে সামান্য শরীর খারাপ হবে। উদর বক্ষ ফুস্ ফুস্ ও চক্ষু প্রভৃতি স্থানে সাময়িক অসুখ হোতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্র ভালোই যাবে। বাইরের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মনোমালিন্য হোতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্র শুভ, নানা দিক দিয়ে আয়ের সম্ভাবনা। উপার্জ্জনের আতিশয্য। নব পরিকল্পনায় সাফল্য। প্রায়ই ভ্রমণের সম্ভাবনা। সম্পত্তিলাভ। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে উত্তম, তবে মামলা মোকর্দ্দমা বা কলহ বিবাদ এড়িয়ে চলাই ভালো। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। পদোন্নতির সম্ভাবনা। অন্য বিভাগে বা স্থানান্তরে বদলি হবার যোগ। এ সব ঘটনা দ্বিতীয়ার্দ্ধেই সম্ভব। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মিশ্রফলদাতা, নানারকম কষ্টভোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধফল।

মিথুন রাশি

আর্দ্রাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পুনর্ব্বসুর পক্ষে মধ্যম। মৃগশিরাজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। দ্বিতীয়ার্দ্ধে শারীরিক কষ্টভোগ। চক্ষুপীড়া, রক্তচাপবৃদ্ধি, উদরশূল প্রভৃতি হোতে পারে। সতর্কতা আবশ্যক। পারিবারিক ক্ষেত্রে সামান্য কলহাদি ভোগ। পরিবার বহির্ভূত আত্মীয়স্বজনের জন্য অশান্তি। আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। লাভ ও সাফল্য। ব্যয়বৃদ্ধি। সময়ে সময়ে নগদ টাকার টান ধরবে। প্রতারণায় ক্ষতি। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি উল্লেখযোগ্য নয়, এক ভাবেই যাবে। চাকুরির ক্ষেত্র মিশ্রফলদাতা, কর্ম্মক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি সর্ব্বক্ষেত্রেই নৈরাশ্যজনক। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কর্কট রাশি

কর্কটের তিনটি নক্ষত্র জাত ব্যক্তিরই ফল একই প্রকার। স্বাস্থ্যোন্নতি। পিত্তপ্রকোপ ও বাতবৃদ্ধি। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা অটুট থাকবে। কথা ভেবে চিন্তে বা হিসেব করে বলাই ভালো। অন্যথা পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হোতে পারে। অর্থাগম যোগ। কিন্তু কোন প্রকার নবপরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। এজেণ্ট বা কোম্পানী সংগঠনকারীদের পক্ষে উত্তম সময়। স্পেকুলেশনে ক্ষতি। বাড়ী ওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে উত্তম। নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ সুরু হোলেও বা গৃহসংস্কার আরম্ভ করলেও বাধা আসবে। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটি অনুকূল, বিশেষতঃ প্রথমার্দ্ধ উল্লেখযোগ্য। উত্তম মর্য্যাদালাভ ও নিজের চেষ্টা ও কর্ম্মদক্ষতার ফলে সম্ভব। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি মন্দ যাবেনা। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, বন্ধুদের সাহায্য প্রাপ্তি। চারুশিল্পকলা, রঙ্গমঞ্চ ও চিত্রে নিযুক্তা নারীর পক্ষে যশ ও প্রতিপত্তি লাভ, তদনুপাতে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

সিংহ রাশি

পূর্ব্বফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। মঘাজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। উত্তরফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। শারীরিক অবস্থা ভালো গেলেও মাঝে মাঝে শরীর সামান্য রকম খারাপ হোতে পারে—অল্পদিনের জন্য অসুখ ভোগ করে আরোগ্য লাভ। পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগীর সতর্কতা প্রয়োজন। পিত্তাধিক্যহেতু রোগের আশঙ্কা। পরিবারবহির্ভূত স্বজন ব্যক্তিগণের সঙ্গে মনোমালিন্য। অর্থাগম যোগ। কোন রূপ নতুন পরিকল্পনায় অগ্রসর হোলে দারুণ ক্ষতি হবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও-কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়। চাকুরির ক্ষেত্র ভালোই যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটা অত্যন্ত শুভ। শিল্পীদের বিশেষ সাফল্য। চাকুরিজীবী নারীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কন্যা রাশি

হস্তাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। উত্তরফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। চিত্রাজাত ব্যক্তির পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। চক্ষুপীড়া ঘটতে পারে। পারিবারিক শান্তি ও ঐক্য। আর্থিকক্ষেত্র উত্তম। নানাদিকে অর্থাগমে আত্মতৃপ্তিলাভ। শিল্পকলা, মঞ্চ ও চিত্র, নৃত্যাভিনয় প্রভৃতি নিয়ে যারা আছে তারা বিশেষ লাভবান হবে। ব্যবসাবাণিজ্য, সাহিত্য ও প্রকাশনার কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদেরও অর্থাগমে বিশেষ সাফল্য। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। চাকুরিক্ষেত্র মন্দ যাবেনা। ধর্ম্মকর্ম্মাধিপতি যোগ হেতু বৃত্তিজীবী, ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবীর উত্তম ফল লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ শুভ। সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ। গর্ভ ও মাতৃত্বের সম্ভাবনা ও অনেকের পক্ষে সম্ভব। ভ্রমণ ও আমোদ উৎসব যোগ।

বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

তুলা রাশি

স্বাতীজাতগণের পক্ষে উত্তম। বিশাখাজাতগণের পক্ষে মধ্যম। চিত্রার পক্ষে নিকৃষ্ট। আরোগ্য লাভ। স্বাস্থ্যোন্নতি। রক্তের চাপ বৃদ্ধি। পারিবারিক শান্তি। অর্থাগমের আতিশয্য। অপরিমিত ব্যয়। ব্যয়সংকোচে ব্যর্থতা।—নগদ টাকার অভাব অর্থাগমের আতিশয্য সত্বেও ঘটবে। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায়। গৃহনির্ম্মাণ বা সংস্কারের পক্ষে

মাসটী অনুকূল। চাকুরি ক্ষেত্র একভাবে যাবে—ভালো মন্দ কিছুই বুঝা যাবে না। কর্ম্ম পরিবর্ত্তন বা স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা বর্জ্জনীয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি মধ্যম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি একই প্রকার। বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কিছু না করাই ভালো। যে সব নারী বৃত্তিজীবী তাদের পক্ষে মাসটী বিশেষ ভালো! বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

বৃশ্চিক রাশি

সুখে দুঃখে ভালোয় মন্দোয় একই ভাবে যাবে বৃশ্চিক রাশির তিনটি নক্ষত্রজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে। শরীর ভালো যাবে না। হজমের দোষ, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি। রক্তের চাপবৃদ্ধিও সম্ভব। স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গে নানা বিষয়ে মতভেদ ও তজ্জনিত অশান্তি এবং কলহ। আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে আশাভঙ্গ ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ বিসংবাদ, মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি সম্ভব। চাকুরিজীবীর পক্ষে মোটেই ভালো নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর কাজ বৃদ্ধি হবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ মাস। শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক কষ্টভোগ। শত্রুবৃদ্ধি ও মনস্তাপ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

ধনু রাশি

পূর্ব্বাষাঢ়াজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, মূলার পক্ষে মধ্যম, উত্তরাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। ভ্রমণে দুর্ঘটনা বা তীক্ষ্ণ অস্ত্রে শরীরের কোথাও কেটে যাওয়ার ভয়। পারিবারিক শান্তি, পরিবারবহির্ভূত স্বজনবর্গের জন্য কষ্টভোগ ও দুশ্চিন্তা। স্বজন বিয়োগ, আর্থিক স্বচ্ছন্দতা, মাসের শেষার্দ্ধে ব্যয়াধিক্য। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম। চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম, যারা সাহিত্য ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত, তাদের পক্ষে অতীব শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধ শুভ, শেষার্দ্ধ শুভ নয়। নানাপ্রকার ক্ষতি ও নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মকর রাশি

শ্রবণাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। উত্তরাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে মধ্যম। ধনিষ্ঠাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। বিশেষ পীড়ার যোগ নেই। শারীরিক দুর্ব্বলতা, রক্তস্বল্পতা, পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা ব্যাহত হবে না। কর্ম্মতৎপরতা সত্বেও আর্থিকক্ষেত্র আশাপ্রদ নয়। লাভ ও ক্ষতি দুই-ই হবে। ক্ষতির ভাগই বেশী বহু সুযোগ সুবিধা এলেও তাদের আনুকূল্য লাভ ঘটবে না। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী নৈরাশ্যজনক, কর্ম্মক্ষেত্র মন্দ নয়। প্রথমার্দ্ধে উপরওয়ালার অসন্তোষ বা অনুগ্রহের অভাব। দ্বিতীয়ার্দ্ধে উপরওয়ালার প্রীতিভাজন হবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী হ্রাস বৃদ্ধি সম্পন্ন। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম, যে সব নারী অধ্যয়নরতা, জ্ঞান চর্চ্চা ও সাহিত্য সাধনা করেন, তাঁরা বিশেষ সাফল্য লাভ করবেন। গার্হস্থ্যক্ষেত্র সাজ সজ্জায় সুন্দর হয়ে উঠ্‌বে, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কুম্ভ রাশি

শতভিষাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পূর্ব্বভাদ্রপদজাতগণের পক্ষে মধ্যম। ধনিষ্ঠার পক্ষে অধম, অজীর্ণ দোষ, উদরশূল প্রভৃতি। স্বাস্থ্যহানি, গুরুতর পীড়ার যোগ নেই, দ্বিতীয়ার্দ্ধে সন্তানদের শরীরের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক, পারিবারিক শান্তি, বিলাসিতার আতিশয্য। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা। ধনাগমের প্রাচুর্য্য সহজেই অনুভূত হবে, কিন্তু ব্যয়ের চাপে বেশ কিছু অর্থ বেরিয়ে যাবে। নগদ টাকার টান ধরবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী মোটামুটি একই ভাবে যাবে। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম হোলেও শেষার্দ্ধে উপরওয়ালার বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। এ ক্ষেত্রে রুটিন মাফিক কাজ করে যাওয়াই ভালো। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী এক ভাবেই যাবে, কোন উন্নতির লক্ষণ নেই। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী সন্তোষজনক নয়। পারিবারিক অশান্তি, সামাজিক মর্য্যাদাহানি ও অপযশ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মীন রাশি

মীন রাশির অন্তর্ভুক্ত তিনটী নক্ষত্রজাত ব্যক্তিবর্গের ফল একই প্রকার। পীড়া না হোলেও শারীরিক দুর্ব্বলতা। রক্তস্রাবাদি পীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির সতর্কতা আবশ্যক। পারিবারিক শান্তি ও সুখস্বচ্ছন্দতা। অর্থাগমের আতিশয্য। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম মাস। ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে। চাকুরির ক্ষেত্রে কোন উন্নতির সম্ভাবনা নেই, সময় একভাবে যাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী শুভ নয়। শারীরিক অসুস্থতা, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, পারিবারিক বিশৃঙ্খলতা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নফল

মেষ লগ্ন—

দৈহিক অবস্থা ভালো বলা যায় না। ধনাগম, সুখ্যাতির আশা, সহোদরভাব অশুভ, কপট বন্ধুর সমাগম, সহোদরের

সহিত বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্য। ব্যয় বাহুল্য, পত্নীর স্বাস্থ্যহানি ও পীড়াদি, মাতৃভাব শুভ বলা যায় না। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

বৃষ লগ্ন—

স্বাস্থ্যের অবনতি, ধনলাভ যোগ, সহোদরের সহিত সম্প্রীতির অভাব, পারিবারিক ঝঞ্ঝাট, প্রাপ্য অর্থের প্রাপ্তিতে কিঞ্চিৎ বিঘ্ন; গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, কর্মোন্নতি, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মিথুন লগ্ন—

অত্যধিক ব্যয়, সাময়িক ঋণ যোগ, স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি ও পীড়া। বেদনাজনিত পীড়া, আকস্মিক দুর্ঘটনা, পারিবারিক অশান্তি, কর্মোন্নতিযোগ, পিতার স্বাস্থ্যোন্নতি, আত্মীয় বিরোধ, মানসিক উদ্বেগ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম নয়।

কর্কট লগ্ন—

হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, অম্লপিত্তজনিত পীড়া, ব্যয়বৃদ্ধি, পত্নীভাবের ফল শুভ নয়। ভাগ্যোন্নতি, পদোন্নতি ও বেতনবৃদ্ধি, কর্মোন্নতির সুযোগ, আকস্মিক ধনলাভ, সন্তানের উন্নতি, ধনলাভ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে আদৌ আশাপ্রদ নয়।

সিংহ লগ্ন—

দেহভাবের ফল মধ্যবিধ, ধনভাব উত্তম, বন্ধুভাবের ফল শুভ, সন্তানের দেহপীড়া ও তজ্জনিত মানসিক বিশৃঙ্খলা, শত্রুহানিযোগ, যশোলাভ, নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ বা গৃহ সংস্কার। হ্রাসবৃদ্ধিসম্পন্ন আয়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ বলা যায় না। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ ফল।

কন্যা লগ্ন—

শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতা, ধনলাভ, আয় বৃদ্ধি. দাম্পত্য প্রণয় ও স্ত্রীর স্বাস্থ্যোন্নতি, শত্রু হ্রাস, মাতার জীবনাশঙ্কা, কর্ম্মস্থানে বাধাবিঘ্ন, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম।

তুলা লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা। স্নায়ু গত পীড়া। ভ্রাতৃভাবের ফল আশঙ্কাজনক। গৃহাদি নির্ম্মাণে অর্থব্যয়, সুখহানি যোগ, ভাগ্যোন্নতিতে বাধা, ব্যয়াধিক্য, তজ্জন্য দুশ্চিন্তা। পুত্রকন্যার বিবাহের আলোচনা বা বিবাহ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে ভালো বলা যায়না।

বৃশ্চিক লগ্ন—

শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতার অভাব, স্ত্রীর শরীর ভালো বলা যায় না, পীড়াদিযোগ, ভ্রাতার সহিত মতানৈক্য ও তজ্জনিত অশান্তি, ভাগ্যোন্নতিযোগ, কর্ম্মস্থলে গুপ্তশত্রুর দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা থাকলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হবেনা। বিবাহজনিত সৌভাগ্য ও দাম্পত্য প্রণয়যোগ, সন্তানাদির ফল শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম।

ধনু লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক বিষয়ের ফল কিছু ভালো। ধনাগমে বিঘ্ন, সহোদরভাব মধ্যম, সন্তানসন্ততির শারীরিক ফল শুভ, পত্নীর হৃদপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, আয়ভাব আশানুরূপ নয়। কর্মোন্নতিযোগ, বাসগৃহের জন্য জমিসংগ্রহ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

মকর লগ্ন—

পাকযন্ত্রের পীড়া, রক্তঘটিত পীড়া, হৃদপিণ্ডের অসুখ। কর্ম্মস্থলে শত্রুবৃদ্ধি, স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। দেশ ভ্রমণ, দাম্পত্য কলহ। কর্ম্মক্ষেত্রে পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা! ভাগ্যোন্নতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ।

কুম্ভ লগ্ন—

শারীরিক অসুস্থতা, বাতবেদনা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, হঠাৎ আঘাতপ্রাপ্তিযোগ। ধনাগম, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, ভাগ্যোন্নতির সম্ভাবনা, কর্মোন্নতির আশা আছে। সন্তানবর্গের লেখাপড়ার ফল আশানুযায়ী হবে না, ব্যয় বাহুল্যহেতু মানসিক চঞ্চলতা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাপ্রদ।

মীন লগ্ন—

শারীরিক অবস্থা মন্দ নয়। ধনলাভ যোগ, সহোদরভাব শুভ। উত্তম বন্ধুলাভ, বন্ধু-বান্ধবের জন্য ব্যয়বৃদ্ধি। সন্তান সন্ততির লেখাপড়ায় বাধা, তাদের পরীক্ষার ফল আশানুযায়ী হবে না। ভাগ্যভাব শুভ, পত্নীর স্বাস্থ্যোন্নতি, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপ

অপেশাদার টেনিসে বিশ্বের সেরা প্রতিযোগিতা উইম্বল্ডন চ্যাম্পিয়নশিপ আগামী ২৪শে জুন আরম্ভ হবে। 'অল্ ইংলণ্ড লন টেনিস এ্যাণ্ড ক্রোকে ক্লাব' প্রতি বৎসর এই প্রতিযোগিতাটি পরিচালনা করেন।

উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার একটি স্বতন্ত্র রকমের আকর্ষণ আছে। সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অপেশাদার টেনিস খেলোয়াড়গণ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবার জন্য প্রতি বৎসর এই উইম্বলডনে সমবেত হন। উইম্বলডনের আকর্ষণ দর্শকদের মধ্যেও সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রতি বৎসর এই সময় উইম্বলডনে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। খেলোয়াড়দের ন্যায় দর্শকদের মধ্যেও আসে এক অদ্ভুত ধরণের উত্তেজনা। একখানি টিকিটের জন্য পড়ে যায় হাহাকার। এবারও সেই একই অবস্থা। টিকিটের দাম আগের চেয়ে বর্দ্ধিত হয়েছে কিন্তু চাহিদার কিছু কম নেই। 'সেণ্ট্রাল কোর্টের' সকল টিকিট তো বিক্রি হয়ে গেছেই, উপরন্তু কয়েক সহস্র দর্শকের টাকা উদ্যোক্তাগণ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

১৮৭০ সালের প্রথম দিকে মেজর ওয়াল্টার উইংফিল্ড একটি খেলার পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। ১৮৭৫ সালে এম্-সি-সি এই খেলার এক নিয়ম কানুন প্রকাশ করেন এবং অল ইংলণ্ড ক্রোকে ক্লাব এই খেলাটিকে গ্রহণ করেন। প্রথম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭৭ সালে, এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন ২২ জন এবং পুরুষদের মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ ছিল। এই হলো সংক্ষেপে উইম্বলডনের আদি কথা।

এবারকার প্রতিযোগিতায় অধিকাংশের মতে অষ্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সনের জয়লাভের সম্ভাবনাই সর্ব্বাধিক। এমার্সন উইম্বলডনে এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে পারলেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত "গ্র্যাণ্ড স্লাম্" লাভ করবেন। এর আগে মাত্র তিনজন খেলোয়াড় এই কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পুরুষদের মধ্যে দু'জন ডোনাল্ড বাজ (আমেরিকা) ১৯৩৮ সালে ও রড্ লেভার (অষ্ট্রেলিয়া) ১৯৬২ সালে আর মহিলাদের মধ্যে মিস্ মরিণ কনোলী (আমেরিকা) 'গ্র্যাণ্ড স্লাম' লাভ করেছেন। 'গ্র্যাণ্ড স্লাম' পাওয়া বলতে বোঝায় অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, উইম্বলডন এবং যুক্তরাষ্ট্রের এই চারটি টেনিস প্রতিযোগিতায় একই বৎসরে জয়লাভ করা। রয় এমার্সন ইতিপূর্ব্বেই অষ্ট্রেলিয়া এবং ফ্রান্সের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছেন। এমার্সনের স্বদেশীয়া কুমারী মার্গারেট স্মিথের 'গ্র্যাণ্ডস্লাম' লাভের আশাও অনেকে করেছিলেন কিন্তু ফ্রান্সে চেকোশ্লোভাকিয়ার শ্রীমতী ভেরা সুকোভার নিকট তাঁর অপ্রত্যাশিত পরাজয় সে সম্ভাবনা লুপ্ত করেছে।

অপর দিকে বিশেষজ্ঞগণের মতে স্পেনের সান্তানার জয়লাভের সম্ভাবনা এমার্সনের পরেই। তারপর আছেন অষ্ট্রেলিয়ার অপর খেলোয়াড় মার্টিন স্থলিভান। মহিলাদের মধ্যে মার্গারেট স্মিথের জয়-লাভের সম্ভাবনা সর্ব্বাধিক। গত বৎসরেও তাঁর উপর অনেকেই আস্থা রেখেছিলেন যে বিজয়িনী হবেন। কিন্তু তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে প্রথম রাউণ্ডেই পরাজিত হন। আশা করা যায় এ'বছর তিনি গত বছরের ব্যর্থতার কালিমা ঘুচাবেন।

দীর্ঘকাল ধরে উইম্বলডনকে ঘিরে বিভিন্ন খেলোয়াড়ের আশা নিরাশার, সাফল্য-ব্যর্থতার ইতিহাস রচনা হচ্ছে। কালের গতির সাথে সাথে এর বাহিরের রূপের পরিবর্ত্তন হয়েছে, কিন্তু উইম্বলডনের সম্মানের পরিবর্ত্তন আজও হয়নি। এখনও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের লক্ষ্য হল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ এবং বিজয়ীর সম্মান লাভ করা।

তবে উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় মার্গারেট স্মিথের জয়ের সম্ভাবনা পুনরায় অনেকেই পোষণ করছেন। গত দুই বৎসর তিনি তাঁর সমর্থকদের হতাশ করেছেন, আশা করা যায় এবার তিনি সাফল্য লাভ করবেন। কুমারী স্মিথ যদি সাফল্য লাভ করেন, তবে অষ্ট্রেলিয়ার মহিলা খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এই গৌরবের অধিকারিণী হবেন।

এবারকার প্রতিযোগিতায় রয় এমার্সন ছাড়া স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানা, মাইক্ গ্রীণ, হুইটনি রিড্ (আমেরিকা), এমার্সনের স্বদেশীয় এম্, স্থলিভ্যান এবং ভারতবর্ষের রমা-নাথন কৃষ্ণানের জয় লাভের সম্ভাবনাও অনেকে করছেন। রমানাথন কৃষ্ণান পর পর দু'বছর সেমিফাইনালে পরাজিত হয়েছেন। এ' বছর তিনি তাঁর সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করবেন জয়লাভের জন্য। কারণ এবার বিফল হ'লে এর পর তাঁর উইম্বলডন বিজয়ের সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে। এশিয়ার মধ্যে টেনিস খেলায় ভারতের স্থান এখন সবার উপরে। টেবল টেনিসে জাপানের কৃতিত্বে বিশ্বে এশিয়ার প্রাধান্য আজ একচ্ছত্র। ভারতের রমানাথন কৃষ্ণানের দ্বারা হয়তো টেনিসেও এশিয়ার প্রাধান্যের সূচনা হতে পারে। কৃষ্ণানের পিছনে আছে সমগ্র এশিয়াবাসীর শুভেচ্ছা।

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ইংল্যাণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রথম টেষ্ট ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৫০১ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কনরাড হাণ্ট ১৮২, রোহন কানহাই ৯০, গারফিল্ড সোবার্স ৬৪ এবং ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ৭৪ নট আউট। ফ্রেডি টু ম্যান ৯৫ রানে ২ এবং এ্যালেন ১২২ রানে ২ উইকেট)

ও ১ রান (কোন উইকেট না খুইয়ে)

ইংল্যাণ্ড ঃ ২০৫ রান (টেড ডেক্সটার ৭৩। ল্যান্স গিবস ৫৯ রানে ৫, ওয়েসেলি হল ৫১ রানে ৩ এবং সোবার্স ৩৪ রানে ২ উইকেট)

ও ২৯৬ রান (এম, স্টুয়ার্ট ৮৭, গিবস ৯৮ রানে ৬ এবং সোবার্স ১২২ রানে ২ উইকেট)

ম্যাঞ্চেষ্টারে ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের প্রথম টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১০ উইকেটে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করেছে। এই খেলাটি ছিল উভয় দেশের ৪১তম টেষ্ট খেলা তথা একাদশ

টেষ্ট সিরিজের প্রথম টেষ্ট খেলা। এই ৪১টি টেষ্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ইংল্যাণ্ডের জয় ১৫, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয় ১১ এবং খেলা অমীমাংসিত ১৫। বিগত ১০টি টেষ্ট সিরিজের ফলাফল : ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় ৫, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের 'রাবার' জয় ৩ এবং দুটি টেষ্ট সিরিজ অমীমাংসিত। ইংল্যাণ্ডের মাঠে এই দুই দেশের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে পাঁচটা টেষ্ট সিরিজের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই পাঁচটা টেষ্ট সিরিজের ফলাফল : ইংল্যাণ্ডের রাবার জয় ৪ এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ মাত্র একবার 'রাবার' পেয়েছে ১৯৫০ সালে। ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠের আলোচ্য প্রথম টেষ্ট খেলা (৬ই—১০ই জুন, ১৯৬৩) ধরে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে এই দুই দেশের মধ্যে যে ১৯টা টেষ্ট ম্যাচ হয়েছে তার ফলাফল : ইংল্যাণ্ডের জয় ১০, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয় ৪ এবং খেলা অমীমাংসিত ৫। সুতরাং বর্ত্তমানে ইংল্যাণ্ড মোট টেষ্ট সিরিজ এবং টেষ্ট খেলার ফলাফলে অগ্রগামী আছে।

৬ই জুন ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে প্রথম দিনের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ৩ উইকেট পড়ে ২৪৪ রান ওঠে। প্রথম উইকেট দলের ৩৭ রানের মাথায় পড়ে যায়। দ্বিতীয় উইকেট পড়ে দলের ১৮৮ রানের মাথায়। কানহাই এবং হান্ট দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ১৫১ রান যোগ করেন। প্রথম দিনের খেলায় অপরাজিত থাকেন হান্ট (১০৪) এবং সোবার্স (৩ রান)। এইদিন একঘণ্টা আগে খেলা বন্ধ করে দিতে হয় আলোর অভাবে।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ৫০১ রানের মাথায় (৬ উইকেট) প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। দ্বিতীয় দিনের খেলায় তারা আরও তিনটে উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের ২৪৪ রানের (৩ উইকেটে) সঙ্গে ২৫৭ রান যোগ করে। দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি ৫৫ মিনিট সময়ে ইংল্যাণ্ড কোন উইকেট না খুইয়ে ৩১ রান তুলে দেয়।

তৃতীয় দিনে চা-পানের সময় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২০৫ রানে শেষ হ'লে তারা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের থেকে ২৯৬ রানের ব্যবধানে পিছনে পড়ে ফলো-অন করতে বাধ্য হয়। ইংল্যাণ্ডের এই শোচনীয় অবস্থার জন্যে সমস্ত কৃতিত্ব ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের অফ্-স্পিন বোলার লান্স গিবস এবং ফাস্ট বোলার ওয়েসলি হলের। গিবস ৫৯ রানে ৫ এবং হল ৫১ রানে ৩টে উইকেট পান। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ ৭৩ রান করেছিলেন অধিনায়ক টেড ডেক্সটার। ডেক্সটার এবং ক্লোজের পঞ্চম উইকেটের জুটিতে দলের ৭৩ রান উঠেছিল। একমাত্র এই জুটিই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের আক্রমণের মুখে দলকে কিছু সময়ের মত পতন থেকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় একটা উইকেট হারিয়ে ৯৭ রান করে; ফলে ইনিংস পরাজয় থেকে উদ্ধার পেতে ইংল্যাণ্ডের আরও ১৯৯ রানের প্রয়োজন হয়—হাতে জমা থাকে দু'দিনের খেলার সময় এবং ৯টা উইকেট।

খেলার চতুর্থ দিনেই প্রথম টেষ্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়, খেলা আর পঞ্চম দিন পর্য্যন্ত গড়ালো না। একদিনের খেলা বরবাদ। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস নির্দ্দিষ্ট সময়ে খেলা ভাঙ্গার অনেক আগেই ২৯৬ রানে শেষ হ'লে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের ৫০১ রানের (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) সমান রান দাঁড়ায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম এবং দ্বিতীয় ইনিংসের রানের যোগফল। তখন জয়লাভের জন্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে মাত্র এক রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করতে হয়। দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা করেন ইংল্যাণ্ডের অফ্-ব্রেক বোলার ডেভিড এ্যালেন এবং তাঁর প্রথম বলেই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের সহ-অধিনায়ক কনরাড হান্ট জয়সূচক এক রান তুলে দিলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল দশ উইকেটে জয়যুক্ত হয়। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় গিবস ৯৮ রানে ৬টা উইকেট পান। খেলায় তিনি মোট ১১টা উইকেট পান ১৫৭ রানে। প্রধানতঃ গিবসের বোলিং সাফল্যে ইংল্যাণ্ড দলের শোচনীয় ব্যর্থতা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের জয়লাভের পথ বাধামুক্ত করে।

এ পর্য্যন্ত (১২ই জুন, ১৯৬৩) ইংল্যাণ্ড সফরকারী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ১০টি খেলায় যোগদান করেছে। খেলার ফলাফল : ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয় ৬, হার ১ এবং খেলা অমীমাংসিত ৩। এই ৩টি অমীমাংসিত খেলার মধ্যে ২টি খেলা বৃষ্টির দরুণ পরিত্যক্ত হয়েছে।

ক্রিকেটে 'হ্যাট-ট্রিক' ঃ

ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে অনুষ্ঠিত কাউন্টি ক্রিকেট লীগ খেলায় ওরস্টারসায়ার দলের 'ফাস্ট বোলার জ্যাক ফ্ল্যাভেল তাঁর উপর্যুপরি তিনটি বলে ল্যাঙ্কাসায়ার দলের তিনজন খেলোয়াড়কে 'এল বি-ডব্লিউ' আইনে আউট ক'রে ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এল-বি-ডব্লিউ আইনের ধারায় তিনজনকে উপর্যুপরি বলে আউট ক'রে প্রথম 'হ্যাট-ট্রিক' করেন এইচ ফিসার (ইয়র্কসায়ার), শেফিল্ড মাঠে সামারসেট দলের বিপক্ষে ১৯৩২ সালে।

বিশ্ব মুষ্টি যুদ্ধ ঃ

বিশ্ব লাইট-হেভিওয়েট বিভাগে খেতাব নির্দ্ধারণের লড়াইয়ে উইলি প্যাটার্সন উক্ত বিভাগের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ফিলাডেলফিয়ার নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা হ্যারল্ড জনসনকে পয়েণ্টের ভিত্তিতে পরাজিত করেছেন। ১৫ রাউণ্ডের লড়াইয়ে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়।

বিশ্ব ওয়েল্টারওয়েট বিভাগে ভূতপূর্ব্ব বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান এমিল গ্রিফিথ ১৫ রাউণ্ডের লড়াইয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান লুই রডরিগসকে পরাজিত করে তৃতীয়বার এই বিভাগে বিশ্ব খেতাব অর্জ্জন করেছেন। ওয়েল্টার ওয়েট বিভাগে একজন মুষ্টি যোদ্ধার পক্ষে তিনবার বিশ্ব খেতাব লাভ বিশ্ব মুষ্টি যুদ্ধের ইতিহাসে রেকর্ড হিসাবে গণ্য হয়েছে। এমিল গ্রিফিথ এই বিভাগে প্রথম বিশ্ব খেতাব পান ১৯৬১ সালে কিউবার বেণী (কিড) প্যারেটকে পরাজিত ক'রে। গ্রিফিন ১৯৬১ সালেই প্যারেটের হাতে পরাজিত হয়ে বিশ্ব খেতাব হাতছাড়া করেন। গ্রিফিথ ১৯৬২ সালের ২৪শে মার্চ্চ তারিখে প্যারেটকে পরাজিত ক'রে দ্বিতীয়বার বিশ্ব খেতাব পান। এই লড়াইয়ে প্যারেট তাঁর বিশ্ব খেতাব অক্ষুন্ন রাখতে গিয়ে গ্রিফিসের প্রচণ্ড ঘুঁসিতে অচৈতন্য অবস্থায় দশ দিন হাসপাতালে শয্যাশায়ী থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৬৩ সালের ২১শে মার্চ্চ তারিখে গ্রিফিথ অপ্রত্যাশিতভাবে দ্বিতীয় বার তাঁর বিশ্ব খেতাব হাতছাড়া করেন কিউবার লুই রডরিগসের ঘুঁসিতে। সেই রডরিগসকেই পয়েণ্টের সিদ্ধান্তে পরাজিত ক'রে গ্রিফিথ তৃতীয়বার খেতাব পেলেন।

ফুটবল লীগ ঃ

কলকাতায় প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় বর্ত্তমানে গত বছরের রানার্স আপ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৮টা খেলায় ১৪ পয়েণ্ট অর্জ্জন ক'রে লীগের তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করেছে। ১০ই জুন পর্য্যন্ত গত বছরের লীগ-চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান খেলার তালিকায় প্রথম স্থানে ছিল। তখন মোহনবাগানের পয়েণ্ট ছিল ৭টা খেলায় ১৩ এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ইস্টবেঙ্গল দলের ৭টা খেলায় ১২ পয়েণ্ট—মোহনবাগান দলের থেকে মাত্র এক পয়েণ্ট কম। ১১ই জুন তারিখে ইস্টবেঙ্গল দল ২—০ গোলে উয়াড়ীকে পরাজিত করলে তাদের পয়েণ্ট দাঁড়ায় ১৪, ৮টা খেলায়। পরের দিন অর্থাৎ ১২ই জুন তারিখে বি এন আর ২—১ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করলে মোহনবাগান তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে নেমে আসে। (৮টা খেলায় ১৩ পয়েণ্ট)। সমান ৮টা খেলায় মোহন বাগান বর্ত্তমানে (১৩ই জুন) ইস্টবেঙ্গল দলের থেকে এক পয়েণ্টের ব্যবধানে দ্বিতীয় স্থানে আছে। তৃতীয় স্থানে আছে বি এন আর—৭টা খেলায় ১১ পয়েণ্ট।

Old Memoris in a New Age :

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল শ্রীসুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ইংরাজিতে লিখিত তাঁহার অধ্যাপক জীবনের স্মৃতি কথা। দীর্ঘকাল অধ্যাপনার অভিজ্ঞতায় তিনি শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষার আদর্শের কথাই এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। শান্তিনিকেতন হইতে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন—তিনি সুরেশচন্দ্রের লিখিত ইংরাজি কথিকা আচার্য্য মনোমোহন ঘোষ বা দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডুর ইংরাজি কবিতার সমপর্য্যায়ের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুরেশচন্দ্রের ইংরাজি যেমন সহজ ও সরল, তেমনই মাধুর্য্যময়। এই পুস্তকখানি সকল শিক্ষাব্রতীর পাঠ করা কর্তব্য। ইহা পাঠ করিলে শুধু ইংরাজি সাহিত্যের জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে না, শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধেও বহু জটিল বিষয়ের সহজ সমাধান হইবে। শিক্ষাবিদ্‌গণ এই ভাবে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কথা প্রচার করিলে পরবর্তী যুগের কর্মীরা উপকৃত হইবে। বইখানি সুবৃহৎ।

[প্রকাশক— শ্রীরবীন্দ্রনাথ চৌধুরী। ২১ ডি জয়মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫। মূল্য—চার টাকা।]

—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কো-ভেডিস্—(নাটক) : অমল সরকার

কয়েকটি নাটক রচনা করে অমলবাবু ইতিমধ্যেই নাট্য-সাহিত্যের আসরে পরিচিত হয়েছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত 'কো-ভেডিস্' নাটকে তাঁর নাট্য-প্রতিভার আরো বেশী পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। কো-ভেডিস্ বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস। তার নাট্য-রূপায়ণ কাজটি বড় সহজ নয়। অমলবাবু সেই কঠিন কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সম্রাট নীরোর অত্যাচার, রাণী পপ্পিয়ার ব্যভিচার, লিজিয়া ও ভিনিসিয়াসের প্রেম ও ধর্মানুরক্তি, নাটকের মধ্যে প্রকটিত হয়ে যে ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে, তাতেই নাটকের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে।

[প্রকাশক—ক্যালকাটা ডায়োসেসান্ বুক ডিপো, ৫১ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬। মূল্য—এক টাকা পচিশ নয়া পয়সা।]

প্রেমের ঠাকুর—(নাটক) : সি, টি, বেণুগোপাল রচিত ও স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য কর্তৃক বাঙলায় অনূদিত।

যীশু খৃষ্টের ধর্ম প্রেমের মহিমায় পরিপূর্ণ। ভাগ্যের বিড়ম্বনা, সমাজের অবিচার, নির্দয় প্রতিবেশীর নির্মম অত্যাচার মানুষের জীবনে বিতৃষ্ণা এনে দেয়। কিন্তু মানুষ যদি এ সকলকে অগ্রাহ্য করে নিজেকে ভুলে যেতে পারে পরের সেবার আনন্দে, তার আর কোন দুঃখই থাকে না তাহলে। জীবের প্রতি প্রেমের মধ্যেই সে আস্বাদন করে ভগবানের প্রেম। মনুষ্যজন্ম তার হয় সার্থক। ছোট এই নাটকাটিতে এই মহৎ তত্ত্বটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। অনুবাদের জড়তা থেকে মুক্ত এ নাটিকাটি আশা করি নাট্যামোদীদের সমাদর লাভ করবে।

[প্রকাশক—সাধনা ভট্টাচার্য। আগড়পাড়া, ২৪ পরগণা। মূল্য—এক টাকা।]

—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

লীলা কমল (কাব্যগ্রন্থ) ঃ হিমাংশুভূষণ সরকার

লীলা কমলের আটাশটী কবিতার রচনাকাল সাম্প্রতিক নয়। এদের আত্মপ্রকাশ হয়েছে একত্রিশ বছর আগে। বিভিন্ন ধরণের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে কবিতাগুলিকে ভাবসমৃদ্ধ করা হয়েছে। অধিকাংশ কবিতায় রোমান্টিক-ধর্মী মনের বহিঃ প্রকাশ, ছন্দ বৈচিত্র্যের মাধুর্য্য, গঠনগত ঔজ্জ্বল্য আর লিরিক

সৌন্দর্য্য উপভোগ্য। ভাব ও ভাষা স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল ও সংযম-সুন্দর। কবিতাগুলি পড়ে তৃপ্তি পাওয়া গেল।

[প্রকাশক—ক্যালকাটা বুক হাউস। ১।১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য—২.৫০ নঃ পঃ]

শতদল (কাব্যগ্রন্থ) : নবগোপাল সিংহ

পঞ্চাশটী কবিতা নিয়ে শতদলের আবির্ভাব। বঙ্গবাণীর অর্চ্চনার পক্ষে যোগ্য অর্ঘ্য বলা যেতে পারে। উপমা উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগে শব্দ বিন্যাসে ও ব্যঞ্জনায় কৃতিত্বের নিদর্শন লক্ষ্য করা গেল। কবিতাগুলির বিভিন্ন পটভূমিকায় অন্তরের নিগূঢ় উপলব্ধির অলঙ্করণের মাধ্যমে কলা সৃষ্টির দক্ষতাকে প্রকাশ করা হয়েছে। পার্থিব ও অপার্থিবলোকের বিষয়বস্তুগুলিকে অবলম্বন করে জগৎ ও জীবন, মানুষ ও প্রকৃতিকে ছন্দঃ স্বচ্ছন্দ গতিতে রসচেতনায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কতকগুলি কবিতায় আছে দার্শনিকতার পরিচয়। কয়েকটি কবিতা কতিপয় মহাপুরুষের প্রশস্তিবন্দনায় মুখর। কবিতাগুলিতে ঐতিহ্যের হনন হয়নি, জন্মমৃত্তিকার সৌরভে ভরপুর হয়েছে শতদল। গ্রন্থখানি রসিক সমাজে সমাদর লাভ করবে।

[প্রকাশক—রামধনু কার্য্যালয়, ১৬নং টাউন সেণ্ড রোড, কলিকাতা—২৫। মূল্য—দুই টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা]

—শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

রূপালী ভূষা : রমাপতি বসু।

উপন্যাসের রচনায় হাত আছে রমাপতিবাবুর। ইতিপূর্বে তাঁর কয়টি উপন্যাস পাঠক-পাঠিকা মহলে আদর লাভ করেছে। প্রেম-বিহ্বল এক নারীর জীবন বিকাশের এই স্নিগ্ধ কাহিনী নিশ্চয়ই মুগ্ধ করবে প্রত্যেক পাঠককে। রমাপতিবাবু তাই অভিনন্দন যোগ্য।

[প্রকাশক—শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র। ৫ শংকর ঘোষ লেন। কলিকাতা-৬। মূল্য ৪৲ টাকা।]

তিন নারী এক আকাশ : বীরু সরকার।

যাত্রাদলের এক অভিনেতার জীবন নিয়ে এর কাহিনী। বঙ্গবিভাগের ফলে পূর্ববাঙলার অগণিত নরনারীর জীবনে নেমে এসেছে দুঃখ দুর্দশার দুর্যোগ। তাদের সে দুঃখদৈন্যের কাহিনী একটি রিক্তসর্বস্ব উদ্বাস্তু অভিনেতার মাধ্যমে যতটুকু প্রকাশ করা সম্ভব ততখানিই রূপায়িত হয়েছে এ উপন্যাসে। লেখকের হৃদয় আছে, অনুভবের শক্তি আছে, অনুভূতিকে প্রকাশ করার ক্ষমতা আছে। তাঁর সাফল্য কামনা করি।

[প্রকাশক—লোক সাহিত্য সংসদ। বারাসত। মূল্য তিন টাকা।]

—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত "বিখ্যাত বিচার ও তদন্ত-কাহিনী (১ম—২য় সং)—৩'০০
শ্রীবার্ণিক প্রণীত উপন্যাস "মেঘের পরে আলো"—৪'৫০
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "চন্দ্রগুপ্ত" (৩২শ সং) ২'৫০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রামের সুমতি" (৪০শ সং) ১'০০
বিমল মিত্র প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "কাহিনী সপ্তক"—২'৭৫
বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় প্রণীত উপন্যাস "উত্তর সাগরের তীরে"—৮'০০
রমাপদ চৌধুরী প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী "রূপযানী"—৪'০০
আশাপূর্ণা দেবী প্রণীত উপন্যাস "উন্মোচন"—৪'০০
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অন্তরাল"—৩'০০
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "এক আশ্চর্য মেয়ে"—২'৫০
নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "পূর্বতনী"—২'৫০
দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "যখের আসন"—২'৫০
শ্রীদীনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "কিশোরের জয়যাত্রা"—১'০০
ভূপেশচন্দ্র সেন প্রণীত রহস্যোপন্যাস "চেঙ্গিস খাঁর তলোয়ার"—১'০০
শ্রীমধুসূদন মজুমদার প্রণীত "প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য"—০'৭০, "আচার্য বিনোবা ভাবে" —০'৫০, "কবি জয়দেব"—০'৭৫
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য প্রণীত শিশু-নাটিকা "বাংলার বিবেক"—০'৭৫, "যুগাবতার রামকৃষ্ণ"—০'৬২
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত শিশু-নাটিকা "রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা"—০'৭৫, "নেতাজী জিন্দাবাদ"—০'৭৫

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ১।৭।৬৩ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষের সূচী

একপঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ—১৩৭০

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্রসূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

অপূর্ব রান্না
আর বাড়ীর মতো
স্বাচ্ছন্দ্য
দক্ষিণ পূর্ব
রেলওয়ের
হোটেল
দিনযাপনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত পুরোপুরি
উপভোগ করতে হলে
রাঁচী
হোটেল
স্থান সংরক্ষণের জন্য দক্ষিণ
পূর্ব রেলওয়ে হোটেলের ম্যানেজারের
নিকট আবেদন করুন
পুরী
হোটেল

রবীন্দ্রনাথে ধর্মতত্ত্ব

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য

'নমো ধর্মায় মহতে' ইহা ভারতের অন্তরের বাণী। এ-দেশে সকল জিজ্ঞাসার উপরে ধর্মজিজ্ঞাসা। এই একটি বিষয়ে জাতির কৌতূহল চিরন্তন, অপরিসীম। মনীষার আগ্রহ, জীবনের সধানা,সমাজের আলোচনা—সকলের এই এক কেন্দ্র। অন্ততঃ উনবিংশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত এই ধারায় ছেদ পড়ে নাই। চিন্তানায়কগণ ধর্মকেই জাতির মর্মকথা, প্রেরণার উৎস, প্রধান পুরুষার্থ বলিয়া অকুণ্ঠভাবে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেও এই পরম্পরা অনুসৃত হইয়াছিল। উহারই আধুনিক প্রখ্যাততম নিদর্শন স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী। ইহাদের প্রত্যেকের অবদান অসাধারণ, প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য একান্ত পৃথক্ পর্য্যায়ের। কিন্তু বিশ্বকবির এ বিষয়ে বিপুল চিন্তাসম্পৎ সচরাচর আলোচিত হয় না।

রসতত্ত্ববিদ্ বিদগ্ধ সমাজ রবীন্দ্র প্রতিভার অভিব্যক্তি যে দৃষ্টিতেই আলোচনা করুন না কেন—ধর্ম বিষয়ে নিপুণ ও গভীর চিন্তার রাজ্যে তাঁহার মহোচ্চপদ পাঠকশ্রেণীর দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। ধর্মের যে ব্যাপক অর্থ এ দেশে প্রচলিত, সেদিকে তাঁহার অন্তর সহজাত প্রেরণাবশে উত্তর-মুখে চুম্বকের কাঁটার মত স্বতঃ আকৃষ্ট হইত। ধর্ম বলিতে

ভারত বুঝিয়াছে সেই তত্ত্ব—যাহা জীবনের স্বরূপ ও তাৎপর্য্য পরিস্ফুট করে—যাহা বিশ্বের নিয়ম-জাল ও তাহার মাঝে মানবের স্থান বুঝাইয়া দেয় এবং মাধ্যাকর্ষণের মত সমাজ-সংস্থা বিধৃত রাখে। ইংরাজ সাহিত্যিক কাব্যকে জীবনের সমালোচনা বলিয়াছেন—এখানে সমালোচনার অর্থ—মানব ব্যবহারে নৈতিক নিয়মতন্ত্রের প্রয়োগ। কিন্তু এ লক্ষণ শুধু কাব্য নহে—সকল সাহিত্যরচনার সম্বন্ধে খাটে। সমগ্র সাহিত্যই জীবনের ক্ষেত্রে নৈতিক ভাবসমূহের অভিব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথের লেখমালা সম্বন্ধে গদ্য-পদ্য নির্বিশেষে, গীতিকাব্য, রূপক ও কথা, প্রবন্ধ, ছোট গল্প, উপন্যাসের বিষয়ে ইহা সত্য। আমাদের দেশে নিখিল জগতে ও মানুষের সমস্ত জীবনে ধর্মকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেখা হইয়াছে। বলা হইয়াছে বিশ্বসৃষ্টি ধর্মে বিধৃত এবং ইহা ছাড়া সাহিত্যের কোনও উপজীব্য নাই। আলঙ্কারিকের দৃষ্টিতে কাব্য ব্যবহারজ্ঞানের জন্য, অশিবক্ষয়ের জন্য, মনোহর উপদেশ বিস্তারের জন্য। এক হিসাবে বলা যায়—সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলিতে ধর্মই প্রধান কথা এবং ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কে প্রযুক্ত তাঁহার ভাষায় তিনি চিরন্তন ভারতবর্ষের একটি আধুনিক আত্মপ্রকাশ। এই অভিব্যক্তি নানামুখী। তাঁহার বিশিষ্ট কবি-প্রকৃতি ইহার মূলে। মহাকবির লক্ষণ—তিনি সর্বানুভূ। সকল অনুভূতি, সকল চিন্তা, মানবমনের সকল ভাব বৈচিত্র্যে যাঁহার সহজ অনুপ্রবেশ—তিনিই মহাকবি। এ বিষয়ে Novalisএর ধারণা তাঁহাতে বিলক্ষণ প্রযোজ্য। A true poet is all-knowing, he is a world in miniature—প্রকৃত কবি সর্ববিদ্—তিনি ছোট আয়তনে একটা নিখিল জগৎ। মহাকবিকে প্রত্যক্ষ সম্বিৎ বলা যাইতে পারে। দেহমনের প্রত্যেক পরতে তিনি জীবন্ত অনুভূতিতে পূর্ণ। গোচরতার উৎকর্ষ ও সুষমাই (organisation of awareness) সভ্যতা বলা হইয়াছে। কবিমানস এই সম্বেদনের চরম অবধি। বেতার শ্রুতিযন্ত্রের বা দৃগ্‌যন্ত্রের আকাশদণ্ডের মত তাঁহার চিত্তের স্পর্শশক্তি দেশকালের বিপুল দূরত্ব অতিক্রম করে। সূক্ষ্ম অপ্রত্যক্ষ মাধ্যমে ইহার ক্রিয়া। জীবনের সকল অভিজ্ঞতা ও অবস্থার বৈচিত্র্যের সহিত তিনি এক হইয়া যাইতে পারেন—সুতরাং কবির আত্মা ব্যক্তিত্বহীন—তিনি সকল ব্যক্তিতে অব্যক্ত—all men is no man এরূপ মন্তব্যও শুনা যায়। কিন্তু ধর্ম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইহা সত্য নহে—তাঁহার নিজ ব্যক্তিত্ব এ ক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট। ব্যাপক ও বিশিষ্ট—দুই রকম উপলব্ধি মিলিয়া তাঁহার মনন সম্পদকে পরিপূর্ণতা দিয়াছে। তাঁহার রচনাবলির বিস্তৃত প্রান্তরে সতর্ক সন্ধান ব্যতীত ইহা আয়ত্ত করা সম্ভব নহে। কারণ এ কথা শুধু প্রবন্ধাকারেই বলা হয় নাই। শান্তিনিকেতন পর্য্যায়ের ১৫০টি ভাষণ, ধর্ম, মানুষের ধর্ম, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, আত্মশক্তি, স্বদেশ, সমাজ, সঞ্চয়, পরিচয়, আত্মপরিচয়, ব্যক্তিত্ব এ সকলে ত আছেই। রাশিয়া, জাপান, পারস্য প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ-বার্ত্তাতেও ইহা বাদ পড়ে নাই। ভানুসিংহের পদাবলী, সোনার তরী, গীতাঞ্জলি, নৈবেদ্য প্রভৃতি গীতিকাব্যগুচ্ছে, কথা ও কাহিনী, পরিশেষ, শেষলেখা আদি শেষের কবিতায়—কোথায় যে নাই বলা সহজ নহে। মালিনী হইতে আরম্ভ করিয়া শ্যামা পর্য্যন্ত বৌদ্ধ রূপক এবং অচলায়তন, ফাল্গুনী প্রভৃতি তত্ত্বনাট্যগুলিতে ধর্মের সর্বাধিকারই প্রমাণিত। কোথাও ছন্দের ঝঙ্কারে, কোথাও রসসঞ্চারে অথবা কল্পনার বর্ণচ্ছটায় সেই এক তত্ত্বই প্রস্ফুট হইয়াছে। কল্পসৃষ্টি ও বিচার-বিবৃতি উভয়েই মহাকবির অধ্যাত্মপ্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ধর্মপ্রসঙ্গ ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহার বিচিত্র সাহিত্য-নির্মিতির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সমাজ-বিধান, চরিত-নীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, অধ্যাত্ম সাধনার আলোচনা হইয়াছে নিরন্তর ও নিরবধি। জীবনরহস্য সম্বন্ধে অনুধ্যান তাঁহার নিয়ত নিঃশ্বসিত প্রায়। প্রত্যক্ষের নিবিড় উপলব্ধি ও উল্লাসের মাঝে বিশ্বরহস্যের বোধ ও ভক্তির প্রেরণা ছায়ার মত কবিপ্রতিভার অনুসরণ করিয়াছে। কবিত্বের অশ্রান্ত নির্ঝরের মাঝে কোথাও তড়িদ্বিলাসের মত, কোথাও স্থিরদীপ্তির বিস্তারের মত—ইহা সর্বত্র ব্যাপ্ত। আত্মত্যাগের মহত্ত্ব ও তাপসের বাসনা-বিসর্জন বিয়োগান্ত নাটকের আশ্রয়বস্তু হইয়াছে। অদৃশ্য নৈতিক শক্তি ও সামাজিক প্রগতি ও জড়তার রহস্য তত্ত্ব নাট্যে রূপায়িত হইয়াছে। গদ্যের লীলায়িতভঙ্গী ও পদ্যের নূপুরসিঞ্জন, নাট্যের সংলাপ ও গীতিকবিতার স্বগত-উচ্ছ্বাসের মাঝে অলঙ্ঘ্য দেয়াল কোথাও আসিয়া পড়ে নাই। চিন্তা ও ভাবের সঙ্গতি, হৃদয়ের প্রেরণা ও সিদ্ধান্তের

সাদৃশ্য সর্বত্র একরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। পার্থক্য আছে শুধু উদ্দেশ্যে ও বিবৃতির রীতিতে। প্রবন্ধ ও ভাষণের বৈশিষ্ট্য হইয়াছে সঙ্গত যুক্তির দ্বারা সমর্থন—শুধু প্রতিপাদন নয়, শুধু প্রকাশ নয়, অনুপ্রাণনা। শান্তিনিকেতন ভাষণমালার সর্বত্র এই রীতি, এই লক্ষণ। প্রাতিভাসিক জগতের স্বরূপ ও পারমার্থিক সত্য, মানবাত্মার বিভূতি ও অসীম সম্ভাব্যতা, আত্মোপলব্ধির পথ ও গম্য—যেমন এগুলিতে বিস্তৃত আলনার বিষয় হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে মানব সমাজের বিবর্ত ও নিয়তি, ভারতীয় সমাজ-বিন্যাস ও সংস্কৃতি সম্পদও প্রভূতরূপে আলোচিত হইয়াছে। রচনাবলীর ষড়্‌বিংশ খণ্ডে মনে হয় রাজসূয়ের ঐশ্বর্য্য যেন সঞ্চিত ও বিতরিত হইয়াছে এবং দীর্ঘ সূচীপত্র ভিন্ন ইহার মধ্যে কোথায় বিশ্বকবির ধর্মতত্ত্ব পরিবেশিত হইয়াছে এবং কোথায় হয় নাই তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

ধর্মসম্পৃক্ত ভাবণগুলি প্রায় কবিত্বের ভাষায় অনুরঞ্জিত। অনেক কবিতার ছত্রে ধর্মপ্রবন্ধের তথ্য ও ভাব অনুরূপ শব্দবিন্যাসে বিবৃত হইয়াছে। ছন্দে শুধু শ্রুতিমাধুর্য্য আনিয়াছে—সাহিত্যের বিশেষ ধরণ আসিয়া পড়িয়াছে—আকস্মিকভাবে কবিমনের সাময়িক আবেশের অনুরোধে। কিন্তু প্রকাশের এই অশেষ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া সমুজ্জ্বলরূপে ব্যক্ত হইয়াছে অনুভব ও সম্বেদনার অমিত শক্তি। অশেষ বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিতা, নৃত্যপরা নিখিল প্রকৃতির হাতে বাঁশরীর মত ধ্বনিয়া উঠিয়াছে কবি প্রতিভা—উচ্ছ্বাসময়ী, নবনবোন্মেষশালিনী।

যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে,
মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

প্রত্যক্ষের মধ্যেই ধর্মকে উপলব্ধি করার এই কথা ব্যক্ত হইয়াছে 'মালিনী' নাটকে। অন্যত্র কবি বলিয়াছেন—বিশ্ব দৃশ্যে নিবিড় আনন্দবোধের চেয়ে সহজ পূজা আর কিছু হতে পারে না। এই উপাসনাই রবীন্দ্রনাথে ধর্ম প্রসঙ্গের মর্মবাণী।

'আত্মপরিচয়' কবিগুরুর অন্তর্জীবনের মুকুর স্বরূপ আধ্যাত্মিক আত্মজীবনী। তাঁহার স্বাভাবিক প্রকাশ-ভঙ্গিমায়, প্রসাদ ও সৌকুমার্য্যের অনবদ্য রীতিতে, ধর্মতত্ত্বের অনুশীলনে ইহাতে তিনি নিজ স্বাতন্ত্র্য রেখাঙ্কিত করিয়াছেন। প্রথম বয়সের উন্মেষ হইতে প্রাধান্যের পরিণতি অবধি তাঁহার কবিচিত্তের অধ্যাত্মপ্রত্যয় কি ভাবে পুষ্ট ও প্রসারিত হয়—ইহা তাহারি প্রকাশ ও প্রচার—একপ্রকার মুদ্রাঙ্কিত, স্বাক্ষরিত আত্মকথা। জীবনপ্রভাত হইতে আপন অধ্যাত্মসত্তার সামঞ্জস্যে উপনীত হইবার আশা ও প্রয়াসের ইহা বিবরণ। ব্যক্তির পক্ষে এই সমন্বয়সাধনই ধর্ম। তিনি লিখিয়াছেন—আমি ক্রমশঃ আপনার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিব—আমার সুখ-দুঃখ অন্তর-বাহির সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। আমার মধ্যে একটি ধর্মতত্ত্ব আছে এবং সেই তত্ত্বটি একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর। আমি আছি এবং আমার সঙ্গে আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণু-পরমাণুও থাকতে পারে না। আরও বলিয়াছেন—জগতের সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন—আর কাহারও টানিবার ক্ষমতাই নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে 'নবা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি—আত্মনস্ত কামায়' বলা হইয়াছে—তাঁহার মতে ইহার অর্থ—এই সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়া মানব আত্মার প্রসার হয়, এই সকল হইতে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক্ হইয়া আত্মলাভ হয় না। আরও তিনি লিখিয়াছেন —আমি কিছুকেই ছাড়বার পক্ষপাতী নহি, কেন না সমস্তকে নিয়েই আমি সম্পূর্ণ। জীবজন্তুকে গড়ে তোলে তার অন্তর্নিহিত প্রাণধর্ম। মানুষের আর একটি প্রাণ আছে—সেইটে তার মনুষ্যত্ব। 'সঞ্চয়ে' তাঁহার উক্তি—ধর্ম মানুষের সমগ্রপ্রকৃতিগত। মানুষের ধর্ম ধর্মই। মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো চাওয়াটি তাহার ধর্ম। মানুষের জীবনব্যাপী তপস্যা আত্ম ত্বের সাধনা—আপনার মধ্যে ধর্মকে গঠিত ও বিকশিত করা। প্রত্যেক মানুষের পথের মূল্যগৌরব স্বতন্ত্র—এইখানেই তার সার্থকতা—এই কথাই নাট্যাকারে দেখান হইয়াছে 'নটীর পূজায়'। ধর্মতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে ত্রিমূর্ত্তির মত—তিনে মিলিয়া একটি সমগ্র সত্তা। তিনি সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র

মনীষী, তিনি ভারতের সুদীর্ঘ ও বিচিত্র ঐতিহ্যর সন্তান ও মর্মপ্রকাশক, তিনি আধুনিক প্রগতির মুখপাত্র। অতীতের ভাবসম্পদ, সমসাময়িক সমাজতন্ত্র ও মানবিকতা-বাদের সহিত অন্তরের যোগ এবং তাঁহার নিজ মত ও প্রত্যয়—এই তিনে মিলিয়া তাঁহার চিন্তাধারায় অপূর্ব প্রসার ও প্রবাহ আনিয়াছে। ১৯০৪ সালে তিনি লিখেন—শাস্ত্রে যা লিখে তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারি নে; কিন্তু সে সমস্ত আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। ১৯৪০ সালে যখন তাঁহার জীবন-সবিতা অস্তোন্মুখ, তখন আপন সমগ্র গৌরবোজ্জ্বল মানসিক গতিপথ স্মরণ করিয়া উহারই পুনরুক্তিতে তিনি বলেন—জন্মকাল হতে আমার যে প্রাণ-রূপ রচিত হয়ে উঠেছে, তার উপর কোন জীর্ণযুগের শাস্ত্রীয় অবলেপন ঘটেনি। নিজ উপলব্ধি, জন্মগত প্রত্যয় এবং আপন বিচারেই তাঁহার জীবনবেদ রচিত। তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে যে মূলতঃ এবং বস্তুতঃ তাঁহার ছিল ভারতীয় প্রাণ—এই প্রাচীন মহাদেশের সংস্কৃতি ও নীতিতত্ত্বে গঠিত ও প্রভাবিত। তিনি ভারতের বরেণ্য সন্তান। 'প্রতি অঙ্গ হইতে প্রতি অঙ্গ উদ্ভূত, হৃদয় হইতে অভিজাত, পূর্বজের আত্মাই পুত্র নামে অভিহিত'—এই বর্ণনার প্রখ্যাত দৃষ্টান্ত। একাধিক স্থলে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে উপনিষদের ভিতর দিয়া ঠাকুরপরিবার প্রাক্-পৌরাণিক যুগের ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করে। তাঁহার চিন্তার পটখানি উপনিষদের বর্ণচ্ছটায় গভীরভাবে অনুরঞ্জিত। শুধু শান্তিনিকেতন ভাষণমালায় নহে, সর্বত্র তাঁহার গদ্যরচনার রীতি ও ছন্দে উপনিষদের অনুরণন কানে আসে। উহার শ্রেষ্ঠ উপাখ্যান ও সংস্কৃত পুরাণ মহাকাব্যের কাহিনী বৌদ্ধ ইতিবৃত্ত ও আখ্যান গুলি, মধ্য যুগের বীর, ভক্ত, সাধু ও মহীয়সী নারী সকলের চরিত-কথা তাঁহার মত এমন সরস-নিপুণ, উদাত্ত সুকুমার লেখা আর কে অঙ্কিত করিয়াছেন? যুগ যুগ খ্যাত ভারত ঐতিহ্যের যাদুস্পর্শে কবি মুগ্ধ ভারতীয় সমাজ-সংস্থা প্রথা, আদর্শ, অনুশাসনের মর্মোদ্ভেদে এবং বিরাট বিশ্বমূর্তি দেবতার মূল তত্ত্ব বিবৃতিতে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি অসাধারণ, ভাবের আবেগে উচ্ছ্বসিত। তাঁহার কল্পনায় নটরাজের নানাভাবে আবেশ—একটা পৃথক্ আলোচ্য বস্তু হইতে পারে। মরণের বেশে অসীমের শোভাযাত্রা চিত্রিত করিয়া তিনি রচিলেন—

> যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন, ওগো মরণ, হে মোর মরণ
> তাঁর কতমত ছিল আয়োজন ছিল কত শত উপকরণ।
> তাঁর লটপট করে বাঘছাল—তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
> তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল যত ভুজঙ্গ দল তরজে।
> তাঁর ববম ববম বাজে গাল—দোলে গলায় কপালা-ভরণ,
> তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান—ওগো মরণ হে মোর মরণ।

ভারতের সংস্কৃতি সম্পদে জন্মগত সংস্কার বশে তাঁহার অনুপ্রবেশ। কিন্তু তাঁহার পাশ্চাত্য আধুনিক সভ্যতার মহাতীর্থ—বিজ্ঞান ও প্রয়োগ কৌশল, মহাযন্ত্র ও সাম্য-তন্ত্রের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠাকেন্দ্রগুলির সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে পুষ্ট ও প্রশস্ত হয়। তথায় মনুষ্যপ্রকৃতির নবরূপায়ণ, নূতন সমাজ ব্যবস্থার পরীক্ষা, অর্থশাস্ত্রকেই জীবন বেদ জ্ঞান, যন্ত্রে মানব শক্তির প্রসার ও কায়িক শ্রমের লাঘব, জীবনের অভিনব মূল্যায়ন—এ সকলই তিনি লক্ষ্য করেন। নিরপেক্ষ সমালোচকের মত প্রতীচ্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সাথে আত্মকেন্দ্রিক জীবন ও অন্তরের নিরাপত্তা এবং চিন্তাধারার সমূহ পরিবর্তন তাঁহার চোখে পড়ে। মানুষের কৃতিত্ব নব নব দিক্‌প্রান্তে কিরূপে প্রসারিত হইয়াছে এবং প্রাচীন জাতিসকলও নবজাত হইয়া কিরূপে অগ্রসর হইয়াছে তাহারও তিনি পর্যালোচনা করেন। 'শিশুতীর্থ' গদ্য কবিতায় মানবের নিয়তি ও নব নব বিবর্তের ছবি তিনি উন্মোচিত করিয়াছেন। কালে কালে ব্যর্থচেষ্ট ও পশ্চাদপসৃত হইয়া পড়িলেও মানবের মহিমায় তাঁহার প্রত্যয় ক্ষুণ্ণ হয় নাই এবং তাহার আত্মাতিক্রমের শক্তিতে আস্থা নষ্ট হয় নাই। বরং এই বিশ্বাসই দৃঢ়মূল হয় যে, মানুষের মধ্যে যে ভূমা—তাঁহার ভাষায় মানবব্রহ্ম—তাহার সমক্ষে নিখিল সত্য একদিন উদ্ভাসিত হইবে এবং প্রকৃতির ভাণ্ডারের উপাদান সমূহ উহার ইচ্ছার সম্পাদনে সহায় ও কায়িক-শক্তির বিস্তারের উপায় হইবে।

তাঁহার পরিণত চিন্তা ও সুনির্ণীত বিশ্বাসগুলি ব্যক্ত

হইয়াছে মানুষের ধর্ম নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে তিনটি বক্তৃতা করেন এবং শান্তিনিকেতনে মানব-সত্য বিষয়ে যে ভাষণ দেন—তাহাতে। আধুনিক মানবতা-বাদের এগুলিকে ঘোষণাবাণী বলা যাইতে পারে। এগুলির প্রতিপাদ্য হইয়াছে মানব-কামনা ও মানব-মনীষার সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা, সর্বকালের মানুষের মূলগত একাত্মতা এবং আত্ম-অতিক্রম দ্বারা চরিতার্থতা বা আত্মলাভ। ধর্ম বলিতে বুঝায় স্বভাব, ব্যক্তিত্ব, নিজস্বরূপ, অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। সেই জন্য মানুষের ধর্ম ধর্মই। উহার বৈশিষ্ট্য—স্বভাবকে অতিক্রম করে স্বভাবকে পাওয়া। আপনাকে ছাড়াইয়া আপনাকে পাওয়াই মানুষের ধর্ম। ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইয়া মানুষ তৃপ্ত হইতে পারে না। তাহার বাস্তুভিটা সেই লাখেরাজ দেবত্রভূমি—প্রকৃতির এলাকার বাহিরে যাহার অবস্থিতি। সেখানে অবকাশের ভূমিকায় সে আপন অমরাবতী রচনায় ব্যস্ত—সেখানে তার আকাশকুসুমের কুঞ্জবন। অন্যত্র আছে—যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায়, তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম। অথর্ব মন্ত্র উল্লেখ করিয়া কবি বলিয়াছেন—ঋত, সত্য, তপস্যা, রাষ্ট্র, শ্রম, ধর্ম, কর্ম, ভূত, ভবিষ্যৎ, বীর্য্য, সম্পদ, বল—এ সমস্তই উচ্ছিষ্টে অর্থাৎ উদ্বৃত্তে আছে। মানবধর্ম বলিতে আমরা যা বুঝি, প্রকৃতির প্রয়োজন সে পেরিয়ে, অতিরিক্ততা থেকে। কারণ সকল জীবের মধ্যে মানুষ অমিতাচারী—বাহুল্য, চরম পন্থা তাহার জীবনের নীতি, তাহার মহত্বের মূলে। সহজ প্রবৃত্তির প্রতিবাদ করে সে স্বীকার করাতে চায় যে, বাইরে সে যা, ভিতরে তার চেয়ে সে বড়ো। অসীম সম্ভাব্যতাই মানুষের অস্তিত্বের সীমা। এই অনুচ্ছিষ্ট উৎসেই তাহার শ্রেষ্ঠ যাহা কিছু, তাহা অবস্থিত। অজ্ঞেয় ও অসাধ্যের সাথে স্পর্ধাই তাঁহার প্রকৃতি। আত্মলাভের জন্য কতবার সে আপনাকে হারাইয়াছে এবং পূর্ণতর জীবনে উন্নীত হইবার জন্য কতবার সে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে। ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে এবং ঐহিক অভ্যুদয়ের চেষ্টায় মানুষের এই অসমসাহসিকতা কবির লেখনীতে অসংখ্য স্থলে মহনীয় ও রোমাঞ্চকর হইয়াছে। এবং আজও এই কৃতিত্বের কাহিনী পর্দার পর পরদা সরাইয়া ভূপৃষ্ঠে উদ্ভাসিত হইতেছে। কবি লিখিয়াছেন—যে তপস্বীরা অন্তহীন ভবিষ্যতে বাস করতেন, ভবিষ্যতে যাঁদের আনন্দ, যাঁদের আশা, যাঁদের গৌরব, সভ্যতা তাঁদের রচনা। অন্তরে আছেন প্রবাহণ রাজ, তিনি বহন করে নিয়ে চলেছেন মানুষের সব প্রশ্নকে সীমা থেকে দূরতর ক্ষেত্রে। মানব-সমাজের অন্তরাত্মা—জীবন দেবতা এই প্রবাহণ। মানুষের মনের একতলায় আছে জীবমানব, আর একতলায় পরম-মানব, মহামানব। এই বৃহৎ মানুষও অন্তরের মানুষ। এই উভয়ের সামঞ্জস্য-চেষ্টাই মানবের মনের নানা অবস্থা-নুসারে নানা আকারে ও প্রকারে ধর্মতত্ত্ব রূপে অভিব্যক্ত। বিশ্বমানব, সর্বজনীন, সর্বকালীন মানব, বিশ্বগত মানুষের একাত্মতা। অতীত ও ভবিষ্যতের অবিচ্ছিন্ন বিস্তারে তাঁহার বিচরণ। সর্বকালের, সর্বদেশের, সর্বজাতির সংযোগে তাঁহার সত্তা—তাই তিনি মানবব্রহ্ম। 'সকল মানুষের মন সমষ্টিভূক্ত হয়ে বিশ্বমানব মনের মহাদেশ সৃষ্ট—একথা বলব না। ব্যক্তিমন বিশ্বমনে আশ্রিত, কিন্তু ব্যক্তিমনের যোগফল বিশ্বমন নয়। সুতরাং বিশ্বের ও ত্রিকালের মানুষ লইয়া এই মানবব্রহ্ম হইলেও সে সমষ্টির অতীত ও বাহিরেও এই বিশ্বমানব। কবি আরও বলেন—আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যে সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে—কারণ তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তার সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। মনীষিপ্রবর আইনষ্টাইনের সহিত সংলাপে মানবের জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য বলিয়া সত্যকে খ্যাপন করেন কবি, আর মানুষের বোধের বাহিরেও সত্যের বিশাল প্রান্তর চির বর্ত্তমান থাকিবে এই অভিমত প্রকাশ করেন বৈজ্ঞানিক। রবীন্দ্রনাথের উক্তি—আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়. আমার কল্পনা মানবকল্পনা। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। তাই তাঁহার প্রশ্ন—মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন? এই ঐকান্তিক মানবিকতারই প্রকাশ তাঁহার সুবিদিত কবিতার ছত্রটি—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।' এটি তাঁহার জীবনদর্শনের নিকর্ষ। তিনি লিখিয়াছেন—এমন সকল

সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা সোঽহং তত্ত্বকে নিজের জীবনে অনুবাদ করে নেন নিরতিশয় নৈষ্কর্ম্য ও নির্মমতায়। কিন্তু তাঁহার মতে সোঽহং সমস্ত মানুষের সম্মিলিত অভিব্যক্তির মন্ত্র—কেবল একক সাধনার লক্ষ্য নয়। অর্থাৎ মানবব্রহ্মই আত্মলাভের চরম পর্য্যায়—তাহাতেই একাত্ম বা মিলিত হওয়া অদ্বৈত সাধনা। ইহাই ধর্ম ও নীতির মানদণ্ড। নিজের মধ্যে সর্বকালীন বিশ্বভূমীন মনুষ্যধর্মের উপলব্ধিই সাধুতা, তাহা হইতে বিচ্যুত হওয়াই হীনতা। মানবিকতা সমাজের সকল চিন্তা ও চেষ্টার কেন্দ্র। এই জন্য ব্রহ্ম-সাধনার পর্য্যবসান বৌদ্ধব্রহ্মবিহারে—সর্ব জীবের প্রতি অপরিসীম মৈত্রীর আদর্শে। ইহাতেই কবির অন্তরের সমর্থন—আধ্যাত্ম আদর্শের পূর্ণরূপ।

মানবের আত্মাতিক্রম—সহজ স্বভাব হইতে উন্নতাবস্থায় উত্তরণ হইবে প্রকৃতিগত সকল মানস শক্তির বিকাশ ও উৎকর্ষে। অভিব্যক্তির ভবিষ্যৎ গতি হইবে অন্তরের দিকে—মনোময়, ভাবময় জীবনের স্ফূরণে। উদার আদর্শও অটুট বিশ্বাস অনুপ্রাণিত বিশ্বের চিন্তানায়কগণ আজ মানব জাতির conscious evolution বা জ্ঞানপূর্বক বিবর্ত্তের এই চিত্রই দিকে দিকে আঁকিতেছেন। আধুনিক চিন্তা ও প্রাচীন প্রজ্ঞা—উভয়েই স্বীকার করে যে মানুষের ভিতরে অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত এবং অনিয়োজিত বহু শক্তি নিহিত আছে। মানব সভ্যতা এখনও বদ্ধগলিতে হাতড়াইতেছে ও হোঁচট খাইতেছে—তাহারই মাঝে পথ হারানো যদি তাহার নিয়তি না হয়, তাহা হইলে এই সকল সুপ্ত মনোবৃত্তিকে এখনও উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় করার প্রয়োজন আছে। ইতিহাসের অরুণোদয় হইতে আজ পর্য্যন্ত যে আদিম অমার্জিত প্রকৃতি আত্মপরিচয় দিয়াছে—তাহার উর্দ্ধেও মনুষ্যত্বের বিকাশের অবকাশ আছে,রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ইহা অতিমানবতা, সমাজ বিবর্ত্তের জন্য মানবিকতাই পর্য্যাপ্ত। নিগূঢ় সাধনা, যোগি-প্রত্যক্ষ, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি প্রভৃতির প্রত্যক্ষ নিষ্ঠ মনোবৃত্তিকে স্থান নাই। ইন্দ্রিয় সাহায্যে নিখিলের যে জ্ঞান আমরা আহরণ করি—তাহা সমগ্র বাস্তবের ভগ্নাংশ মাত্র—বিশ্ব পরিচয়ে ইহা তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা জগতের যে পরিচয় পাইতেছি—তাহা জগৎ পরিচয়ের সামান্য একাংশমাত্র—সেই পরিচয় আমরা ভাবুকদিগের, কবিদিগের, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের চিত্তের ভিতর দিয়া কালে কালে নবতর রূপে, গভীরতর রূপে সম্পূর্ণ করিয়া লইতেছি।

আবার অন্যদিকে প্রকৃতি বিজয়ের যে অভিযান, অসীম সাহসের যে প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান জগতে চলিয়াছে তাহাতে দৃকপাত করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—আধুনিক পাশ্চাত্য দেশেও কতলোক নিরর্থক কৃচ্ছ্রসাধনের গৌরব করে—তাকে বলে দুঃসাধ্যতার পূর্ব অধ্যবসায় পার হওয়া—রেকর্ড ব্রেক করা। রবীন্দ্রনাথ শতায়ু হইলে, মহাশূন্যে যাত্রা, কৃত্রিম উপগ্রহসৃষ্টি প্রভৃতি সাম্প্রতিক মানব কৃতিত্ব দৃষ্টে তাঁহার মনের কি প্রতিক্রিয়া হইত তাহা কে বলিতে পারে? হয়ত এগুলিও আত্মাতিক্রমেরই দৃষ্টান্ত গণ্য হইত। দুর্জয় অভিযানে মরণের বিভীষিকা ভেদ করিয়া সত্যের সম্মুখীন হওয়া যে মানবের জয়যাত্রার মহিমা তত্ত্বনাট্যগুলিতে তাহা উদাত্তচ্ছন্দে, বিচিত্ররূপকে বার বার তিনি ঘোষণা করিয়াছেন।

ধর্মবিষয়ে কবিগুরুর চিন্তারাজি এত বিচিত্র, বিপুল ও বহু বিস্তৃত যে সমগ্রভাবে তাহা দেখিতে হইলে কয়েকটি শ্রেণী বা পরিচ্ছেদে বিভাগ করা প্রয়োজন। অন্যথা এই ব্যাপক তথ্যসম্ভারের মাঝে অনুসন্ধান বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। সীমার মধ্যে না হইলে মানুষের দেখা সম্ভব হয় না। যদি এক দৃষ্টিপাতে পরমাণুর ভিতর কণোর্মি হইতে বিশ্বের শেষ প্রান্ত অবধি ভাসিয়া উঠিত, তাহা হইলে ফল হইত বিহ্বলতা—চক্ষু হইত নিজ ব্যাপারে অশক্ত। সুতরাং দেখার সৌকর্য্যের জন্য অংশকে সমগ্র হইতে বড় বলিতে হয়—বলিতে হয় এই জন্য যে খণ্ডের জ্ঞান হইতে অখণ্ডের জ্ঞানে পৌছান সম্ভব। নহিলে বনস্পতি বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। কবিগুরুর ধর্মপ্রবচনের বিশ্লেষণে কয়েকটি মূল বিভাগ লক্ষ্য হয়।

প্রথমতঃ—রবীন্দ্রনাথ ভারতের প্রাচীন ও পরম্পরাগত চিন্তা ও ভাবপুঞ্জের মুখ স্বরূপ—উহার মর্ম প্রকাশক। দ্বিতীয়তঃ—বৈষ্ণব ভাবাদর্শের ও ভক্তিরসের তিনি পরিবেষক। তৃতীয়তঃ—বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনা ও লক্ষ্যের সহিত মিলিত ও উহাতে অনুরঞ্জিত হইয়া তাঁহার লেখায় একটি অভিনব ব্রহ্মবাদরূপে প্রস্ফুট হইয়াছে। চতুর্থতঃ মানব কল্যাণে উৎসৃষ্টপ্রাণ খৃষ্টের ও মৈত্রী-

করুণাবতার বুদ্ধদেবের মহনীয় জীবন ও উদার আদর্শ-পুঞ্জের রসসমৃদ্ধ বিবৃতি দ্বারা তিনি আধুনিক সহৃদয় সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছেন। পঞ্চমতঃ চিরন্তন ভারতের ভাবসম্পদের নিপুণ ও শক্তিমান পরিবেষক হইলেও তিনি এদেশের সামাজিক সংস্থান প্রথা ও আচারের ত্রুটি বিচ্যুতি প্রদর্শনে ও সমালোচনে নির্মম ও নিঃসংকোচ। ১৯১১ সালে তিনি লেখেন—আমার দেশকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি, আমার দেশের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার তুলনা আমি কোথাও দেখি নাই। সেই জন্য দুর্গতির দিনের যে কোনো ধূলিজঞ্জাল সেই আমাদের চিরসাধনার ধনকে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহার প্রতি আমি লেশমাত্র মমতা প্রকাশ করি নাই। ষষ্ঠতঃ—তিনি আধুনিক প্রতীচ্য সমাজতন্ত্র ও মানবিকতার ভাবসমূহ প্রবলভাবে প্রচার করিয়াছেন। বিশ্বমানবতা এবং আন্তর্জাতিকতার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই বহুবিস্তৃত তত্ত্বরাশির মধ্যে একটি যোগসূত্র ও সমন্বয়ধারা আবিষ্কার ও সংস্থাপন করা সম্ভব কিনা—স্বতঃই প্রশ্ন উঠে। কবির লেখায় তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চিন্তার বৈশিষ্ট্য যেভাবে বিবৃত হইয়াছে তাহাতে ইহার উত্তর পাওয়া সহজ মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথে ধর্মতত্ত্ব তাঁহার কাব্যসৃষ্টির মত রচনার নৈপুণ্যে সর্বত্র সুশোভন—একটা সুষমা ও সমগ্রতা সর্বত্র উহার বৈশিষ্ট্য। আয়তন যাহাই হউক না কেন—প্রত্যেক ভাষণ, প্রবন্ধ, পুস্তিকা একটা ভাব বা তত্ত্ব পূর্ণভাবে বিবৃত করে—প্রত্যেকটির সুডোল স্বসম্পূর্ণতা লক্ষণীয়। একটা বিশিষ্ট মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী বা রসাস্বাদ উহাতে নিঃশেষে অভিব্যক্ত। অধিকন্তু তাঁহার মনের প্রকাশ বিমূর্ত বা বস্তুতন্ত্র হইবে অবচ্ছিন্ন (abstract) যুক্তিতর্কের বিন্যাসের মত নহে, বরং সরসতায় স্নিগ্ধ, চিত্র পরম্পরার মত—উপমার তরঙ্গমালার মত উহা বহিয়া যায়। সেই জন্য বিশ্লেষণ তাঁহার প্রকাশরীতির পরিচয়ের বিজাতীয় মনে হয় এবং তাঁহার কোন বিষয় বিবৃতির পক্ষে পর্য্যাপ্ত বোধ হয়না। তিনি লিখিয়াছেন— ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার যা কিছু প্রকাশ, সে হচ্চে পথ চলতি পথিকের নোট বইয়ে টোকা কথার মত। আরও বলিয়াছেন—আমার ধর্মটি কি, তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট জানি—এমন কথা বলিতে পারিনা। অনুশাসন আকারে, তত্ত্ব আকারে কোনো পুঁথিতে লেখা ধর্ম সে তো নয়। আরও লিখিয়াছেন—যেখানে আমি স্পষ্টত ধর্মব্যাখ্যা করেছি—সেখানে আমি নিজের অন্তরতম কথা না বলতেও পারি,সেখানে বাইরের শোনা কথা নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। সাহিত্য রচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয়—সেটা তাই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। সুতরাং সুদৃঢ় মতবাদ বা সিদ্ধান্ত খ্যাপন তাঁহার লক্ষ্য হয় নাই। বরং যেখানে-তাঁহার ভাষা সর্বাপেক্ষা কবিত্বময় সেইখানেই বুঝিতে হইবে তাঁহার প্রকৃতির স্বতঃ-উৎসারিত চিন্তানিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। সকল রচনায় ও সর্বোপরি তিনি কবি—তাঁহার বাক্য সর্বত্র রসাত্মক। কবিচিত্ত ও দার্শনিক মন বিভিন্ন। অনুমিতি নয় উপমিতি, বিবৃতি নয় অনুপ্রাণনা তাঁহার সহজ চিন্তার রীতি। তাঁহার দৃষ্টি—হৃদয়ের প্রেরণা তর্কের নির্দেশ নয়। সেই জন্য কবিনির্মিত স্বভাবতঃ অন্বীক্ষা পরীক্ষা, সমীক্ষার বিষয় নয়। সঙ্গীতের সুর, পুষ্পের সৌরভ, সৌন্দর্য্যের চমৎকারিতা বিশ্লেষণে নির্ণয় হইবার নয়। সহৃদয়তা বিচারশক্তি নয়, উহা সম্বেদন। দ্বিতীয়তঃ ছোটবড় সকল লেখার মধ্যে একটা পরিপ্রেক্ষা, সমগ্র দৃষ্টি বা সামঞ্জস্যবোধ থাকায় যেখানেই চোখ পড়ে একটা পূর্ণতা ও প্রধান পরিণতি লক্ষ্য হয়। 'পূর্ণ' প্রবন্ধে (শান্তিনিকেতন ১২) তিনি লিখিয়াছেন—ঈশ্বরের চারাগাছটি প্রবীণ বনস্পতির কাছেও দৈন্য প্রকাশ করে না—সেও পূর্ণ, সেও সুন্দর। ঈশ্বরের কাজে কেবল যে অন্তেই সম্পূর্ণতা তা নয়, তার প্রতি সোপানেই সম্পূর্ণতা। প্রথম হইতেই এ পর্য্যাপ্তি তাঁহার লেখনীর বিশেষত্ব! এই জন্য ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী সাহিত্যিকমহলে বিপুল বিভ্রম জন্মায়। সৌরমণ্ডলের নিত্য পূর্ণিমার মত পরিপুষ্ট সুষমা লইয়া সাহিত্যজগতে তাঁহার আবির্ভাব ঘটে। এই কারণে গ্রন্থপরিচয়ের সূচনা ব্যতীত বহুস্থলে তারিখের চিহ্ন মিলেনা। ধর্মপ্রসঙ্গ বিচিত্র ও বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের লেখায় তাঁহার নিজস্ব ধর্ম, সামাজিক ধর্ম বা নীতিতত্ত্ব, সাম্প্রদায়িক-ধর্ম এবং মানব-ধর্মের পার্থক্য দেখান হইয়াছে। তিনি বলেন— যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় সেটা আমার সাম্প্রদায়িক ধর্ম। আমার মধ্যে একটি ধর্মতত্ত্ব আছে এবং সেই তত্ত্বটি একটি

বিশেষ শ্রেণীর। আত্মপরিচয় ইহারই বিবরণ। তিনি লিখিয়াছেন—আমি আত্মাকে, বিশ্বপ্রকৃতিকে, বিশ্বেশ্বরকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোঠায় খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়া আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই। ধর্মের এই সংহত, ব্যাপক ধারণা ভারতের বিশেষত্ব এবং ইহা হইতেই ধর্মের সর্বত্র অখণ্ডিত অধিকার ও সর্বোচ্চ প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। ধর্মতত্ত্বের নিপুণ ও বিপুল আলোচনা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ধর্মোপদেশকের ভূমিকা সতত অস্বীকার করিতেন। ঈশার উক্তি—আমায় ধর্মগুরু বলিও না। 'পান্থ' কবিতা ইহারই অনুরূপ। কবি লিখিয়াছেন—

আমি সাধক নহি, আমি নহি গুরু—আমি কবি। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোন অধিকার নাই। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে। আর একস্থলে আছে—শুভ্র নিরঞ্জনের যাঁরা দূত তাঁরা পৃথিবীর পাপক্ষালন, মানবকে নির্মল নিরাময় কল্যাণব্রতে প্রবর্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য, তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়েনি। আমি বিচিত্রের দূত। বিশ্বকর্মা চপল চির-চঞ্চল—তাঁর ফর্মাশের অন্ত নেই। আমি চঞ্চলের লীলা-সহচর। অন্যত্র কবি লিখিয়াছেন—বস্তু যা পেয়েছি, তার চেয়ে রস পেয়েছি অনেক বেশী। আমি সাধু নই, সাধক নই, বিশ্ব রচনার অমৃতাস্বাদের আমি যানদার, বার বার বলতে এসেছি ভালো লাগল আমার। আরও বলিয়াছেন—'আমার ধর্ম' কথাটা যখন ব্যবহার করি তখন তার মানে নয় যে আমি কোন একটা বিশেষ ধর্মে সিদ্ধিলাভ করেছি।

এ সকল উক্তিতে কবি নিজ অন্তঃপ্রকৃতির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা মুখ্যতঃ ও মূলতঃ সত্য হইলেও ইহার মধ্যে প্রত্যাখ্যান অংশটি সহৃদয় সমাজ মানিয়া লয় নাই। ব্রাহ্ম সমাজের ঈশ্বরবাদের বিবৃতিতে শক্তি ও আয়তি হিসাবে তাঁহার তুল্য অপর কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। মহাত্মা গান্ধী এবং শান্তিনিকেতন তাঁহাকে গুরুদেব বলিয়াই বরণ করিয়াছেন। বিশ্বের আধুনিক বিদ্বৎ-সমাজ উত্তরোত্তর নিবিড় পরিচয়ের সাথে ইতিহাসে প্রথিত ধর্ম প্রবক্তাদের মধ্যে তাঁহাকে অন্যতম অগ্রণী বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। তাঁহার বাণীর উদার গম্ভীর, উদাত্ত মধুর প্রেরণার ও সুদূর প্রসারিত দিগ্‌দর্শনের জন্য বরেণ্য আচার্যের আসনে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত জানিতেছে। ১৩১২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল কবির বিচিত্র ও বিপুল মননে যে ভাব ও তথ্য বিতরিত হইয়াছে, সে সকলের মধ্যে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ দ্বারা একটি পূর্বাপর সঙ্গত চিন্তাধারা—একটি সংযত জীবন-দর্শন প্রতিপন্ন করা কি সম্ভব? ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ও অনুভূতির কি প্রসার ও পরিণতি ঘটে নাই—মতবাদ কি কোনো অংশে পরিবর্তিত হয় নাই? ব্যাপক ও সমগ্রভাবে তাঁহার আত্ম পরিচয়ে কি ইহা বর্ণিত হইয়াছে? বিশ্বকবির বিরাট চিত্তগুহার মধ্যে যে নানা কোণ, নানা সুড়ঙ্গ এবং চিন্তা প্রণালীর মধ্যে যে ত্বরিত গতিচাঞ্চল্য চকিত ও বিমুগ্ধ করে তাহার সমুচিত বিবরণ তাঁহার অনুরূপপর্যায়ের মনীষীর পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতির বিধানে তাহা প্রত্যাশার অতীত। জীবজগতের নিম্নসোপানে প্রকৃতি বহুপ্রসূ, কিন্তু চরম উৎকর্ষের স্তরে সৃষ্টি স্বতঃই কৃপণ ও কুণ্ঠিত—এই জন্য প্রতিভা অসামান্য। সমালোচকগণ বলেন—নাট্যসম্রাট শেক্সপীয়রের অভিমত অনেক প্রশ্নের সপক্ষে ও বিপক্ষে দুইদিকেই উদ্ধৃত হইতে পারে। রবীন্দ্ররচনায় ধর্মতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসুকে দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবা-বেশের নানা বিভেদ, দিগন্তের ক্রমিক বিস্তার ও আবর্তনের জন্য প্রস্তুত মন লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ইহার অর্থ স্ববিরোধ বা অসঙ্গতি নহে—ব্যাপক ও সম্পূর্ণ দৃক্‌পরিক্রমা ইহার অর্থ। কবি নানাস্থলে পুনরুক্তি করিয়াছেন যে জীবন্ত সত্য সদাই আপনাকে ছাড়াইয়া যায় —উহা সক্রিয়, শক্তিসম্পন্ন। নিত্য পরিবর্তন ও অপরি-বর্তনের মধ্যে বিরোধ তর্কশাস্ত্রের সৃষ্টি—জীবনের ধর্ম নহে। পরম ও পরিপূর্ণ তত্ত্বের এক দিকে সত্য, অপর দিকে অনন্ত —এ দুএর মাঝে সংযোজক জ্ঞান তাই উপনিষদ্‌ বাক্যে আছে—'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্‌'। ধর্ম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র মনকে তাঁহার প্রভূত আলোচনাকে তাঁহার বিবিধ ও নানাবর্ণের উক্তিকে করায়ত্ত করা এবং স্বর্ণসূত্রে মণিগণের মত গ্রথিত করা—অশেষের মাঝে একটি বিশেষের আবিষ্কারের প্রয়াস—এখনও উহা অসম্পন্ন, অনারব্ধ। ধর্মচিন্তার এই বিরাট মানচিত্রে বিভিন্ন প্রদেশের মত

কয়েকটি বিভাগ পূর্বে স্থচিত হইয়াছে—কারণ সীমিত পরিধির মধ্যেই মানুষের দৃষ্টি কার্য্য করে। কিন্তু সেগুলির সীমারেখা অলঙ্ঘ্য ও অনম্য ভাবে অঙ্কিত নহে। একটি সংহত জাতি কৃত্রিমভাবে বিভক্ত হইলে সীমান্ত লঙ্ঘনে তাহার বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে যেমন গতায়াত ও বিনিময় ঘটে, এগুলির মধ্যেও তেমনি ভাবসবলতা অপ্রতিহার্য্য। এই বহু বিস্তৃত বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য নির্ণয়—কবির প্রাণ-কেন্দ্রের আত্মার নিভৃত কক্ষের চাবিটী হাতে পাওয়ার মত। পূরবীর 'চাবি' কবিতায় কবি নিজ সত্তার রহস্যের ছবি আঁকিয়াছেন—তাহার বিভু মনের অন্তরঙ্গতা লাভের দুরূহ চেষ্টার ইহা প্রতীক।

বিধাতা যেদিন মোর মন করিলা সৃজন
বহু কক্ষে ভাগ করা হর্ম্ম্যের মতন
শুধু তার বাহিরের ঘরে
প্রস্তুত রহিল সজ্জা নানা মতো অতিথির তরে,
নীরব নির্জন অন্তঃপুরে
তালা তার বন্ধ করি চাবি খানি
ফেলি দিলা দূরে।
মাঝে মাঝে পান্থ এসে দাঁড়িয়েছে দ্বারে
বলিয়াছে 'খুলে দাও'। উপায় জানিনা খুলিবারে
বাহিরে আকাশ তাই ধূলায় আকুল করে হাওয়া
সেখানেই যত খেলা, যত মেলা, যত আসা যাওয়া।

"ভারতবর্ষ"

(পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে)

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

শুভজন্ম সেই কবে কতদিন আগে।
স্বজন বান্ধব মনে কত নাম জাগে
অজাত সন্তান সম। কল্পনা কত যে
'শত নাম' সম কত নাম মনে খোঁজে।

সে নাম ভারতবর্ষ! মিলিল সে নাম।
সাহিত্য স্বদেশ মিলিত প্রণাম!

অর্দ্ধ শতাব্দীর মাস ঋতু চক্র ঘিরে
এক সাথে দেশমাতা বাণীর মন্দিরে
সাজালে পূজার ডালা, কত ফুল মালা,
প্রাঙ্গণ ভরিয়া হল কত দীপ জ্বালা!

এনেছ বিখ্যাত খ্যাত অজ্ঞাত পথিকে
জ্বলেছে সবার দীপ।—নাম গেছে লিখে।

বাণীর সাধনা দেশপ্রেমেকে সার্থক,
বাকি অর্দ্ধশত বর্ষ তব পরিপূর্ণ হোক।
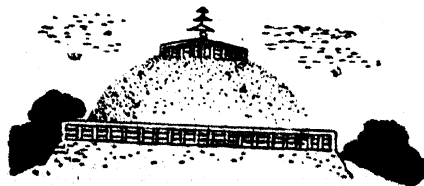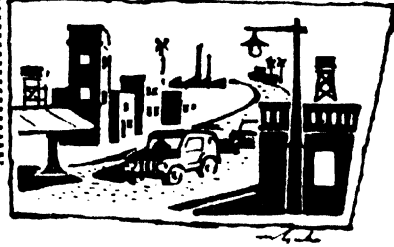
(পূর্বপ্রকাশিতেরপর)

অশোক বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখে চাকরটা তখনও জেগে আছে। খামারের গেটটা খোলা। বাড়ীর ভিতরেও আলো জলছে। দাঁড়াল অশোক—কি ব্যাপাররে বুনো।

বনমালী বলে ওঠে—আজ্ঞে কর্তাবাবু এয়েছেন।

অশোক খেয়াল করেনি উঠানের একপাশে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু অবাক হয়—বাবা!

—আজ্ঞা।

—তা হঠাৎ ?

—কি করে বলি ?

কথাটার কোন জবাব সে দিতে পারে না।

…কি ভাবতে ভাবতে অশোক ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছে—বাইরের ঘরের টেবিলের উপর নামানো রয়েছে কয়েকখানা চিঠি—আজ বৈকালের ডাকে এসেছে সে তখন ব্যস্ত ছিল—কামারপাড়ার মিটিং। কয়েকখানা দরখাস্ত।

ইস্কুলের জন্য ইতিমধ্যে কাগজে কয়েকটা বিজ্ঞাপনও দিয়েছে নোতুন মাষ্টার রাখবে—সেই সঙ্গে গার্ল্স্ স্কুলটার কাজও সুরু হবে।

সদর থেকে স্কুলইনস্পেক্টার জেলাবোর্ডএর চিঠিও এসেছে। কি যেন আশার খবরও পায় তাতে অশোক।

কয়েকখানা দরখাস্তও রয়েছে।

হঠাৎ চিঠিখানা আনমনে খুলে পড়তে থাকে। চমৎকার হাতের লেখা…নামটাও দেখবার সময় হয়না! কোন নোতুন শিক্ষয়িত্রী এখানে এই বন্য আদিম পরিবেশেও চাকরী নিয়ে আসতে রাজী হয়েছে।

অনেকেই যেন দূরদূরান্তর থেকে তার আবেদনে সাড়া দিয়েছে।

বাবার চটির শব্দ শোনাযায়, সিড়ি দিয়ে নেমে আসছেন।

—খোকা!

অশোক চিঠিগুলো আপাততঃ চাপা দিয়ে রেখে এগিয়ে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করে।

—আপনি, হঠাৎ!

মিঃ রায়এর চোখে মুখে কেমন বলিষ্ঠতার ছায়া। দীর্ঘদিন বাংলার বাইরে বিভিন্ন সহরে ঘুরেছেন। হাব-ভাবও তেমনি বাঙ্গালীয়ানা-বর্জ্জিত। চুরুটটা টানছেন।

বলে ওঠেন—বাড়ী যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই তোমার সঙ্গে। তারকের সঙ্গেও দেখা হলো, সে খবর পেয়ে এসেছিল।

তারকরত্নবাবু যে অন্য কারোও বাড়ীতে দেখা করতে যায় উপযাচক হয়ে এই প্রথম শুনলো যেন অশোক। বিস্ময় চেপে রেখে বাবার দিকে চেয়ে থাকে। বাবা বলে চলেছেন।

—শুনলাম নাকি ইস্কুল নিয়ে পড়েছ।

—হ্যাঁ, দেখা যাক।

—তার পর? মিঃ রায়, তির্যকদৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে থাকেন। অশোক জবাব দিলনা। মিঃ রায় চুরুটটার পোড়া ছাইটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন।

—তারক বলছিল ওর ছেলে জীবনের চাকরীর ব্যাপারে।

—জীবন চাকরী করবে? অবাক হয় অশোক।

—তা পেলে করবে বৈকি। এদিকে অবস্থা যা শুনলাম, তাতো গজভুক্ত কপিত্থের মতই একেবারে ফোপরা। দুর্গাপুরে অনেক আমার জুনিয়ার অফিসার চাই হয়ে এসেছে—বলেকয়ে দিলে যা হয় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

অশোক বাবার দিকে চেয়ে থাকে, কি যেন বলতে চান তিনি।

স্তব্ধ ঘরের মাঝে তাঁর ভারি কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে—ভাবছিলাম কথাটা তোমার জন্যেই বলবো। এদিকে জমিদারীও চলে গেল, আমার মাইনেও তো এসে পেন্সনের তলানিতে ঠেকেছে।

বাবার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অশোক। কি ভাবছে। যে কথা বার বার প্রীতি তাকে শুনিয়ে গেছে, যে কথা শুনিয়েছিল অতীতে সেই পাটনার গঙ্গার তীরে কোন অন্ধকারের মাঝে হারিয়ে যাওয়া শিখা—আজ বাবাও যেন অন্ধকারের বুকে মহাকালের কঠিন কণ্ঠস্বরে নির্মম ভবিতব্যের কথা শোনাতে এসেছেন।

কিন্তু কদম তা শোনায় নি, শোনায় নি—অবিনাশ। তারা জীবনের বৃহৎ কোণে এতটুকু শান্তি আর পরম পাওয়ার সার্থকতা খুঁজছে—নিশ্চিন্ত জীবনের নিঃস্বতার মাঝেও।

বলে ওঠে অশোক—তার দরকার হবেনা বাবা।

মিঃ রায়, কথা বলেন না ছেলের দিকে চেয়ে থাকেন কেমন অসহায় দৃষ্টিতে।

...জীবনে আজ মনে হয় কোথায় ভুল করেছেন তিনি—করেছেন অশোকের উপর একটা অবিচার। ছেলেবেলায় মা মারা যাবার পর অশোক স্কুল-বোর্ডিং আর কলেজ-বোর্ডিংএ মানুষ হয়েছে।

মিঃ রায়, আবার সংসার পেতেছিলেন, স্ত্রীপুত্র কন্যাদের নিয়ে সাজানো সমৃদ্ধ সংসার।

অশোকের সেখানে যেন কোন ঠাঁই নেই। ছুটিতে মাঝে মাঝে বাবার কাছে গেছে অশোক—যেন অপরিচিত কোন অতিথি সেই বাড়ীতে। দুচারদিন থেকেছে, আবার চলে এসেছে।

মিঃ রায়ও কাযের চাপে রাত্রে ক্লাব থেকে ফিরে এসে ঠিক খোঁজ খপর নিতে পারেন নি। নেবার চেষ্টা করলেও যেন স্ত্রীও ঠিক পছন্দ করতেন না।

মায়া জবাব দিত—তোমার ছেলেকে কি অযত্ন করবার জন্যই আমি রয়েছি।

—না। না! বড্ড লাজুক কিনা তাই বলছিলাম।

মায়া স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে—অ।

—মিঃ রায়এর মনে সেই নীরব কর্তব্য বোধটা আজও যেন তাঁকে এনেছে এখানে। ওই জবাব শুনে চুপ করে যান তিনি।

—কিন্তু একটা কিছু তো করতে হবে।

—করছিই তো।

—অর্থকরী কিছু করা চাই।

—অশোক বাবার কথায় জবাব দেয়।

বাঁচবার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু ঠিকই পাবো। তাছাড়াও তো করবার অনেক কিছু আছে।

মিঃ রায় ছেলের দিকে চেয়ে থাকেন। ঠিকওর কথাটা বুঝতে পারেন না। দেশবিদেশে ঘুরেছেন, নানা সহরের জীবনযাত্রা—তাদের সমাজ দেখেছেন। মুহূর্ত সেখানে অবসর নেই। বোম্বাই গুজরাট মারাঠা বলে—রোকড়াকা ধান্দা। অন্যপ্রদেশ বলে পয়সে—

দিনের সবচেষ্টা সবসময় তার জন্যই ব্যয়িত হয়, সব উৎসাহ উদ্যম সবকিছু। কিন্তু এ যেন নোতুন কথা শুনলেন তিনি, বলে উঠেন তিনি—

—ঠিক তোমার কথা বুঝতে পারছিনা অশোক।

নীলকণ্ঠবাবুর কথা মনে পড়ে অশোকের। সেদিন আগেকার বৎসর সেই যুগে শত শত হাজার হাজার ছেলে সব কায ছেড়ে অর্থ ছেড়ে দেশস্বাধীন করার—বৃটিশের কবলমুক্ত করার সংকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যোগ্যতা শিক্ষা

তাদেরও কম ছিলনা। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের তারাই ছিল বলি।

···আজ স্বাধীনতা এসেছে।

কিন্তু তাতেই কি সবশেষ—সব পাওয়া হয়ে গেছে। মানুষের বাঁচার ব্যবস্থা—শিক্ষা সমাজ সংগঠন, নোতুন জীবনের মন্ত্রে দীক্ষা, সবকি সমাপ্ত—সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

তার জন্য—সেই মহান ব্রতে দীক্ষা দেবার জন্য কই সে ঋত্বিকের দল! আজ গ্রামসেবকের জন্য মাইনের স্কেলে বেঁধে চাকরী দিতে হয়েছে, সমাজসেবার জন্য মোটা মাইনের লোক বহাল করতে হয়েছে। আর বিনা মাইনেতে যারা আছে এদিক ওদিক ছড়িয়ে তারাও কেবল লুণ্ঠন আর স্বার্থসিদ্ধির সুযোগে ওঁৎ পেতে আছে।

এরই মাঝে সাধারণ গ্রামীণ জীবন—তার মানুষের ভবিষ্যৎ কোথায় কোন্ রসাতলে গিয়ে ঠেকেছে। অর্থ আর কাঞ্চনকৌলিন্যই সমাজের সেই মাপকাঠি হয়ে উঠেছে।

তাই বোধ হয় প্রীতি পরিত্যাগ করে গেছে তাকে, হারিয়ে গেছে শিখা। আজ বাবা এসেছেন অশোককে সেই প্রতিষ্ঠা অর্জনের সুযোগ করে দিতে—তার পদমর্য্যাদা আর প্রতিষ্ঠার পায়াজোর দিয়ে।

একটা ভুল—বৃহৎ ভুলকে তারা সমর্থন করে চলেছে সমাজবদ্ধ সবগুলো মানুষই। কোথায় যেন বিশ্রী ঠেকে অশোকের। সারাঘরে একটা অখণ্ড স্তব্ধতা।

ঘড়িটা টিক টিক শব্দ করে চলেছে। কোথায় একবার একটা শিয়াল ডেকে থেমে গেল। শন শন বয় রাতের হাওয়া।

অশোক বাবার কথার জবাবে যেন এড়িয়ে গেল ওই প্রসঙ্গটা।

—ঠিক আপনাকে বোঝাতে পারবনা বাবা।

বোঝাতে সে সত্যিই পারবেনা। তার কথাগুলো কেউই বিশ্বাস করবে না। এ তার নিজস্ব মতবাদ—দর্শন। তার জন্য দামও দিয়েছে—আরও কতদিতে হবে কে জানে। তবু এটাকে সে কোথায় মনের গভীরে বিশ্বাস করে নিবিড়ভাবে।

·· মিঃ রায় ছেলের দিকে চেয়ে থাকেন। তাঁর এতদিনের ধারণা বিশ্বাস সবকিছুর মূলে একটা নীরব বিদ্রোহ ঘোষণা করছে ওই অশোক। যাকে দূরেই সরিয়ে রেখেছেন সেই দূরের মানুষটি—যেন নিজেরই দ্বিখণ্ডিত একটি সত্তা—আজ কঠিন শাসনের বিধান নিয়ে মাথা তুলেছে অতীতের বুক হতে। আমার উপর রাগকরে কি এমনি সরে থাকতে চাও।

চুপ করে থাকে অশোক। মনে হয় রাগ অভিমান এসব নেহাৎ ছেলে মানুষী—জবাব দিচ্ছনা যে? মিঃ রায় যেন জেরা করছেন।

হাসছে অশোক। বলে ওঠে—আপনি সমস্ত ব্যাপারটাই অন্য চোখে দেখছেন বাবা। দেখা হয়তো আপনার কাছে স্বাভাবিকই। রাগ অভিমান এসব করবার কোন হেতু নাই। যা করছি, যে পথে চলবো ভাবছি, অনেক ভেবে চিন্তেই তা আমি ঠিক করেছি। মনে হয় ভুল করিনি।

মিঃ রায় জবাব দিলেন না। পায়চারী করছেন চুপকরে। আবছা অন্ধকারে সিগারের লালাভ আগুনটা দেখাযায়—কেমন রক্তিম একটু আভা। ওর অন্তরের অতলেও বোধহয় বেদনার অমনি আভা একটু ফুটে উঠেছে।

অশোকের মনে কি একটা নীরব ঝড়

কেমন নিজের অজ্ঞাতসারেই সে কোথায় নিজের সত্যের কাছে বারবার জড়িয়ে পড়েছে কঠিন প্রতিশ্রুতিতে।

প্রীতির কথা তার মনেও ঝড় তুলেছিল, সেই সন্ধ্যার পর সেও চেয়েছিল সাধারণ মানুষের মত বাঁচতে, ঘরের সীমানায় একজনকে নিঃশেষে ভালবেসে শান্তি আর তৃপ্তির অতলে হারিয়ে যেতে—কিন্তু তা পারেনি।

নীলকণ্ঠবাবুর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল গ্রামের অনেক সর্বহারাকে তাদের বেদনায় সঙ্গী হতে—সেই জ্বালা দূর করতে।

আজ বাবার সামনে দাঁড়িয়ে কোন অন্যমন ওই বিলাসব্যসনের পথ থেকে সরে দাঁড়াবার শপথ ঘোষণা করে ফেলেছে।

মিঃ রায় বলে ওঠেন—তবেকি রাজনীতিই করতে চাও। ইলেক্‌সন—এম-এল-এ—অবশ্য ওটাও—

অশোক বাবার দিকে চাইল।

ওরা কোথায় একটি নীতি এবং একটি রীতিতে

বিশ্বাস করে। মাপ করে মানুষের মর্য্যাদা ওই অর্থ না হয় প্রতিষ্ঠার মাপকাঠিতে। জবাবদেয় অশোক ওসব ভাবিনি বাবা।

মিঃ রায় হতচকিত দৃষ্টিমেলে ছেলের দিকে চেয়ে থাকেন।

কি সে করতে চায় বলতে চায়—তাও বোধ হয় জানে না।

অশোক বাবার এই বিরক্তিভরা চাহনির সামনেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্তরের প্রদীপ্ত তেজ ফুটে ওঠে তার চাহনিতে। নীরব কঠিন শপথের মতই ঋজু স্বচ্ছ সে চাহনি। মিঃ রায় তাকে ঠিক বুঝতে পারেননা।

—রাত হয়ে গেল। কাল আবার বেরুতে হবে আমাকে। গুড্ নাইট্।

কথা বললো না অশোক। বাবা উপরে উঠে গেলেন। দীর্ঘ ছায়ামূর্তিটা ক্লান্ত পদক্ষেপে হারিয়ে গেল সিঁড়ির মাথায়। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে অশোক।

টেবিলের উপর চিঠিগুলো উড়ছে।

...বাইরে থেকে আসা চিঠিগুলো, তার প্রচেষ্টাকে নানারকমে সাহায্য আর স্বীকৃতির সংবাদ বয়ে আনা চিঠিগুলো।

অশোক ওদের দিকে চেয়ে থাকে। ভরসা পায়—জোর পায় মনে মনে।

এবার নারাণ ঠাকুর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে আলের মাথায়।

বইচিতলার বাকুড়ির ধান কেটে চলেছে ছানুদাস লোকজন নিয়ে। প্রথমে কাস্তে নিয়ে বাধা দিতে গিয়েছিল নারাণ ঠাকুর। ওর অব্যক্ত ভাষাহীন চীৎকারে ভরে ওঠে আকাশ বাতাস।

ছানুদাস মাথায় বেঁধেছে মস্ত এক পাগড়ী, হাতে একটা লাঠি। সঙ্গে জনকয়েক মুনিষ নিয়ে এসে বাধা দেয়।

—এ্যাই ঠাকুর! এ্যাই দেখো মশমশিয়ে ধান কেটে চলেছ যেন উর বাপের ধান। এ্যাই।

কথা কানে যায় না, ছানু নেমে গিয়ে ওর হাতটা চেপে ধরে। অবাক হয়ে ওর দিকে চাইল নারাণঠাকুর।

নিজের হাতে পুতেছে সে এই বাকুড়ীর ধান। লকলকে হয়ে উঠেছে সার গোবর ছিটিয়ে হাটুজলে বসে নিড়িয়েছে—স্পর্শ করেছে দুহাতের নীরব মমতায় ওই ধান গাছগুলোকে। বড় করে তুলেছে যেমন করে অসীম প্রীতি আর ভালবাসা দিয়ে মানুষ করে তুলেছে সনাতনকে।

...আজ হঠাৎ কে যেন নিষ্ঠুর আঘাতে সরিয়ে দিল তাকে মাঠথেকে।

—প্যাঁ!...

নারাণঠাকুর চীৎকার করছে, মাথা ঠুকছে আলের মাথায়।

ওর চীৎকারে মাঠের এদিক ওদিক থেকেও মুনিষরা এসে জোটে। নিতেবাউরী, ধেনা, পদো বায়েন, আরও অনেকে।

ছানুদাস সকলকে হাঁকিয়ে শোনাচ্ছে—বলিনি পরের হরে হন্মে নেওয়া সম্পত্তিতে ছেনো পেস্বাব করে। খোসকওলা করে দিয়েছে গঙ্গাঠাকরুণ! গঙ্গাজলঘাটি কোর্টে, তারপর দখল লিইছি। কাট রে নসু—গজা হাঁ করে ভাবছিস কি শালোরা।

ওরা ধান কাটছে। সকালের শিশিরভেজা সোনা ধান, এখনও ওদের ডগা হতে মুক্ত বিন্দুর মত রাতের জমা শিশির ঝরে পড়ে।

নারাণঠাকুর বিশ্বাস করতে পারেনা—কি করে এটা সম্ভব হ'ল। তার বুকের মাড়ি এই জমিটুকুনও চলে গেল।

...শীতে আর আতঙ্কে ঠক ঠক করে কাঁপছে। কে যেন হাতের ইসারা করে দেখায়—গঙ্গাঠাকুরুণ বিচে পয়সা নিয়েছে। এ জমি আর তাদের নয়।

...কি ভাবছে নারাণঠাকুর। স্তব্ধ হয়ে গেছে তার চীৎকার—আর্তনাদ। আস্তে আস্তে উঠে আসছে ছেঁড়া ময়লা চাদরখানা আলের মাথার উপর রাখা খেজুর ঝোপের উপর থেকে তুলে নিয়ে।

—কাস্তেটা, ও ঠাকুর।

নিতে ওর কাস্তেখানা হাতে তুলে দেয়।

একবার তার দিকে চাইল নারাণ, ওই কাস্তেটারও আর যেন প্রয়োজন নেই। বাতিলকরা জীবনের শেষ

চিহ্নের মত ওটাকে যেন ফেলে দিয়ে এল সেইখানেই। ফিরছে বাড়ীর দিকে।

...নিতে বাউরীর হাতে তখনও রয়েছে ওর পরিত্যক্ত কাস্তেখানা।

কি ভেবে ওটা নিতে এগিয়ে গিয়ে ফিরিয়ে দিল তাকে।

নারাণঠাকুর চলেছে গ্রামের দিকে হন্ হন্ করে।

গঙ্গাঠাকরুণ ঠিক পথই নিয়েছে—অন্ততঃ তার মনে হয় এ ছাড়া আর পথ নেই। বেদনা বোধ সেও যে করে নি তা নয়, কিন্তু এছাড়া আর পথ কি ?

সনাতন কোন রকমে বড় সড় হয়ে উঠেছে। ম্যাট্রিক পাশ করাতে পারেনি, সনাতন ক্লাশ সেভেন এইটে বার দুয়েক ফেল করে হেডমাষ্টারকে শেষপ্রণাম করে বের হয়ে এসেছিল ইদানীং।

গ্রামেই ছিল—মাঝে মাঝে ফুটবল খেলতে যেত এগ্রাম ওগ্রামে। আড়ালে দু একটা করে টাকা তাদের কাছ থেকে রোজ নিত। অবশ্য গঙ্গাঠাকরুণের হাতে তা পৌছেনি কোনদিনই। সনাতনের ফুল প্যান্ট হাওয়াই সার্ট আর হাওয়াই চটি হয়ে যা থাকতো, বিড়ি সিগ্রেট খরচায় তা লাগতো।

মা ছেলের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতো—কেমন বাপের মতই বাড় বাড়ন্ত গড়ন। তেমনি কথাবার্তাও। রসিক বলে ফকীর ঠাকুরের খ্যাতিছিল। তার শেষ কথা সেই বরযাত্রী হয়ে ফেরবার মুখে বেসামাল হয়ে গাড়ীতে পড়ে পড়ে।

নড়িওনা, চড়িওনা, ধরিয়ে দাও—আজও গ্রামের লোকের মুখে মুখে ফেরে।

তারই যোগ্য ছেলে সনাতন।

হঠাৎ...একদিন এদিক ওদিক ঘোরাঘুরী করে মাকে এসে জানায়।

—চাকরী পেয়েছি। ভাল চাকরী।

গঙ্গামণি—খুদ বাচছিল, ক্রমশঃ অবস্থা এসে ঠেকেছে কোনখানে তা বেশ বুঝতে পেরেছে। বোবা নারাণ-ঠাকুরের দিনান্ত পরিশ্রমে সামান্য জমি থেকে একবেলাও জোটেনা। কথাটা শুনে গঙ্গামণি উপছে পড়ে খুশীতে।

—বলিস্ কিরে ?

হ্যা।

সনাতন সত্যই একটা যোগাযোগ ঘটিয়েছে। দুর্গাপুরে ফলাও কায সুরু হয়েছে। লোক চাই। বাঁধ—ইট-খোলা, বিরাট লোহাকারখানার পত্তন হয়েছে। এলাহি কাণ্ড। এতদিনের নিষ্কর্মা সনাতন তারই মাঝে একটা কায জুটিয়ে নিয়েছে। সেদিন খেলতে গিয়েছিল বড়-জোড়ায়। D, V, C টিমের বিপক্ষে খেলা।...তার খেলা দেখে খুশী হয়ে কোন এক মস্ত ঠিকাদার নিজে যেচে তাকে চাকরী দিতে চেয়েছে। তবে জামিন চাই, নগদ টাকার কারবার—তাই জামিন চাই তিনশো টাকা।

তিনশো টাকা জামিন চাই।

—হ্যা! মাসে একশো টাকা মাইনে, বাসা সব দেবে।

গঙ্গামণি যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। এই নগ্ন অভাব আর দারিদ্র্যের জীবন থেকে মুক্তি পাবে। দুবেলা দুমুঠো খেতে জুটবে, পরতে পাবে। কি ভাবছে।... তারপরই ওই পথ নিতে বাধ্য হয়েছে।

...সনাতন মিথ্যে বলেনি। দুর্গাপুরের বনের ধারে ফাঁকা ডাঙ্গায় বাসাও পেয়েছে।...গঙ্গামণি খুশী হয়েছে। মনে মনে স্বপ্ন দেখে সেও বেঁচে গেছে—মুক্তি পাবে এই দুঃসহ দারিদ্র্য আর হতাশা-ঢাকা পল্লীর জীবন থেকে।

সেই আয়োজনই করছে গঙ্গাঠাকরুণ।

স্বামীর ঘর ভিটে জমিজারাত সবই প্রায় যাবার মুখে, কিন্তু এ ছাড়া আর পথ কি।

...শনিবার দিন আসে সনাতন রবিবারদিনই চলে যাবে তারা। নোতুন ঘর-কন্না আর নোতুন গেরস্থালীর স্বপ্ন দেখছে গঙ্গামণি। গাছের সজনে ডাঁটাগুলো পাড়ছে সনাতন, তাড়া বাঁধছে। খামারের কলাগাছে এসেছে কয়েকটা কলার কাঁদি—মোচাও ঝুলছে। তাও নিয়ে যাবার মনস্থ করে গঙ্গামণি।

ওগুলো কাট বাছা!

সনাতন কেমন ইতস্ততঃ করে—ফলন্ত গাছ।

গঙ্গামণি আজ ঘর ভাঙ্গতেও দ্বিধা করেনা। বলে ওঠে।

—ঘর নাই আগড় বাঁধে।

মায়ের এই সাজসাজ রবের মধ্যে সনাতন কেমন সাড়া পায়না।

মা গল্প করে চলে—হ্যারে তোর বাসায় ইলেকটিরি আলো আছে? সেই যে বোতাম টিপলে জলে?

সনাতন জবাব দেয়না। মা তখনও বলে চলে…তা যদি বলিস বাপু না হয় খামারের চাকলদা গাছটা কাটিয়ে ভূষণ ছুতোরকে দিয়ে গোটা দুয়েক টেবিল চেয়ার বানিয়ে নিয়ে যাবো। সায়েব সুবো আসে, তাদের বসতে দিস কোথায়? আর কতকগুলো চিনেমাটির কাপ গেলাস কিনিস বাপু, অজাত বিজাতের ছোঁয়া বাসন পত্তর আমি সরতে পারবো না।

সনাতন বিরক্ত হয়ে ওঠে—থামোদিকি।

সে জানে মাএর কল্পনার সেই বাসা বাংলোর কাছে তার বাসার কি পরিচয়। কি যেন একটা মস্ত ভুল করে চলেছে মা।

পাওদায়েবের গিন্নী সোনামুখীর বৌ আরও কারা এসেছে। সনাতনের মা আজ মনেমনে খুশী হয়—ওরা যেন ওর এই পুত্রভাগ্যকে হিংসা করে।

গঙ্গামণি আমন্ত্রণ জানায় ওদের।

—মাঝে মাঝে আস্‌বি বাবা, এই তো দুগ্‌গোপুর।

সোনামুখীর বৌ বলে সেইখানেই কি থাকবা দিদি।

নয়তকি বাছা সনাতনের খুব অসুবিধা হয়। ইথানে আর কি মায়া রইল বল?

—তালে নারাণ থাকবেক কুথায়?

গঙ্গামণি জিব আর তালু দিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করে—ঠিক কি তার মানে বোঝা গেল না—তবে এই প্রসঙ্গে নারাণের নাম উচ্চারণ করাতে খুব খুশী যে হয়নি তা বেশ বোঝা যায়।

সনাতনও কথাটা বলতে চেয়েছিল মাকে।

—ওকে ফেলে যাবে?

—তাতে কি? পুড়োঁতে চাল রইল—সিজেবেক আর খাবেক। ওর গোদা গতর টাতো নিয়ে যাইনি। তাছাড়া আর কাজই বা কি মিন্‌ষের।

ব্যাপারটা যেন জলের মতই সোজা ঠেকে গঙ্গাঠাকরুণের কাছে।

কিন্তু ওই কটি চালই কি সব হবে? তার পর? জমিজারাতও প্রায় সব শেষ করে গেছে। ঘরবাড়ীও ছাউনি অভাবে ধ্বসে পড়ছে।

কেমন সব ছেড়ে যেন পালাচ্ছে—সনাতন হেরে গিয়ে গ্রাম থেকে সরে যাচ্ছে পরবাসে পরমাটিতে।

—নে দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে এগো দিকি।

ডাঙ্গার ওদিকেই বনের সীমানা তার বুক চিরে চলেগেছে দুর্গাপুরে যাবার পাকারাস্তা। আগে পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল খোয়া আর পাথর ওঠা এবড়ো খেবড়ো রাস্তাটা—এখন যেন তাতে নোতুন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যেই রাস্তার আয়তন বেড়েছে, পিচের প্রলেপ পড়ছে, পাশে পাশে বসছে ইলেকট্রিক তারের পোষ্ট—বাঁকুড়ার দিকে বিজলী যাবে লাইন আসছে দুর্গাপুর মাইথান—ওদিকে বোকারোর দিক থেকে।

ব্যারেজের কায সুরু হয়েছে। ওদিকে উপরে রাস্তা জমানোর দেরী নেই, আর কমাস, তারপরই নাকি ওই নদীর উপর দিয়ে ছুটবে যাত্রীবাহী বাস, মালবোঝাই ট্রাক, সবকিছু। দুর্গাপুর বাঁকুড়া এক নেতাড়ে হয়ে যাবে।

সকালের রোদ পড়েছে বনের মাথায়—শালবনগুলো নীলাভ স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। ডাকছে কোথায় পত্রাবরণে দোয়েল হরিয়ালের ঝাঁক।

থমকে দাঁড়াল সনাতন।

গ্রামছেড়ে—দেশছেড়ে সেইই প্রথম চলেছে কোন অন্য জগতের পথে ভাগ্য অন্বেষণে। এই শিশিরমাখা পথ—বাতাসের সঙ্গে মেশা নাম-নাজানা ফুলের কত গন্ধ ওই ধূধূ দিগন্তসীমা—এ মাটির বুকথেকে যেন মুছে দিল সে তার নিজের অধিকার।

বেজার মা পুটুলিটা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাসরাস্তার দিকে। পিছনে চলেছে গঙ্গামণি ঠাকরুণ। ছেলেকে দাঁড়াতে দেখে বলে ওঠে।

আয় ও সোনা, চট করে আয়। সাতটার বাস ফেল করবি নাকি?

—এই যে যাচ্ছি চল।

সনাতনকে ওরা যেন জোর করে এ মাটি থেকে তুলে নিয়ে চলে গেল—ওই পরমাটিতে।

পিছনে তবু চাইতে থাকে মাঝে মাঝে—বাতাসে মাথা নাড়ছে কামারপাড়ার তালগাছটা—দূরে কাদের পড়েল

পুকুরের ধারে কলসী কাঁখে দেখা যায়—সবকিছু মিশে একটা সবুজ রৌদ্রস্নাত স্মৃতি হয়ে ধরা দেয়।

সনাতন এককালে ওই গাঁয়ের কোন ছায়াঘন একটি কুটীরে মানুষ হয়েছিল।

বাস আসার শব্দ শোনা যায় দূর থেকে।

চড়াই এ উঠছে পুরোনো আমলের ছ্যাকড়া বাসটা। ঝকঝক—ধক ধক নানা রকমের শব্দ করছে। তারই মাঝে থেকে থেকে ওঠে হর্ণের তীব্র শব্দ। পিছনে উড়ছে লাল ধূলো। ভক ভক করে বনেট ভেদ করে উঠছে বাষ্প।

বাস রাস্তার মহুয়া গাছের নীচে এসে দাঁড়াল ওরা।

ক্রমশঃ

ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ও তাঁর মানবিকতা

লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গল্পের উপসংহারে রিচার্ড বল্‌ছে—সে যা করেছে তা সে ঐ ধর্মযাজক বা তার স্ত্রী কারো প্রতি কোন বিশেষ মমতার ফলে যে করেছে তা নয়। সে বল্‌ছে যখন সে দেখে যে কোন সহজীবী মানুষ বিপদে পড়েছে তখন সে যেমনটি করেছে তেমনটি না ক'রে থাকার তার উপায় নেই। অথচ রিচার্ড নিজেকে নাস্তিক বলে এবং সমাজের সবাই তাকে অধার্মিক বলে জানে।

এক নাস্তিকের এই বর্ণনা দিয়েছেন বার্নাড শ',—যে সে যা কিছু করে বা করেনা, তার জন্যে সে কোন পুরস্কারেরও আশা রাখে না, শাস্তিরও ভয় করে না। ধর্ম বা শাস্ত্রবচন তাকে পুরস্কারের প্রলোভনও দেখাতে পারে না, শাস্তির ভয়ও দেখাতে পারে না। তার কর্তব্যবুদ্ধি তার নিজের মনের নির্দেশ। সে যে আত্মবিসর্জন করে তা এই জন্য করে যে তার প্রকৃতি তাকে দিয়ে এই কাজ করিয়ে নেয়। না ক'রে সে থাক্‌তে পারে না।

মানুষকে বিঘ্ন-বিপদ থেকে মুক্ত দেখ্‌বার জন্যে তার আকাংখা, সেই একান্ত আকাংখাই তাকে বিঘ্নবিপদের মধ্যে তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

বার্নার্ড শ'র এই রিচার্ড, আর চতুরংগ উপন্যাসের জগমোহন—ঠিক একই ছাঁচে গড়া। এই দুই চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমরা শ এবং রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতের মিল দেখ্‌তে পাই।

রবীন্দ্রনাথ নাস্তিকের এই প্রশস্তি গেয়েছেন—

"শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষেরে ভালো।"

নাস্তিকের আচরণ বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংস্কারের বাঁধা পথে সে চলে না। সে শাস্ত্রকে অস্বীকার করে, কিন্তু মানুষের মংগলে তার বিশ্বাস। কপট ভক্তের চেয়ে ভগবান এই বিদ্রোহীকে বেশী স্নেহ ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।

কবি বলেন, শুধু কতকগুলো আচার অনুষ্ঠান পালন করাকে ধর্ম বলে না। এই কথাই বলেছেন বংকিমচন্দ্র আনন্দমঠের উপসংহারে।

"প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে।" জীবনের অবস্থা বিশেষে আচরণের মহত্বের নামই ধর্ম। ধরা-বাঁধা কতকগুলো নিয়ম পালন করাটা ধর্ম নয়। ধর্ম মানুষের বুদ্ধির জিনিষ, অন্ধসংস্কারের জিনিষ নয়। কবি লিখেছেন—

"মনুষ্যত্ব তুচ্ছ করি যারা সারা বেলা—
তোমারে লইয়া শুধু করে পূজা খেলা
মুগ্ধ ভাব ভোগে সে বৃদ্ধ শিশুদল
সমস্ত বিশ্বের আজি খেলার পুতুল।"

দেবতাকে খেলনা বানিয়ে যে পূজা আমাদের দেশে চলেছে, সেই শৌর্য্য-বীর্য্য-হীন পূজাতে আমাদের জীবন অবসন্ন দুর্দশাগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছে। আমরা বিশ্বের দুর্গম পথের যাত্রী-দলের থেকে আলাদা হ'য়ে পিছিয়ে পড়ে পথ হারিয়ে বসে আছি। আমরা কর্মহীন হ'য়ে ধর্মের নামে নিরর্থক আচার পালন করছি। অবাধ উদার জ্ঞানকে পুরাণো শাস্ত্রবচনের

সীমার মধ্যে বদ্ধ করতে চেয়েছি। ধর্মকে জড়ের মত, আলস্যভরে পাওয়া যায় না। তার জন্য প্রাণকে সর্বদা উদ্যত, জাগ্রত রাখতে হয়। কিন্তু আমরা ধর্ম বলতে বুঝেছি একটা অলস ভাবোন্মাদ। ধর্মের এই মদিরা আমাদের চিত্তকে অবসাদগ্রস্ত ক'রে রেখেছে। কবি লিখেছেন—

"দুর্গম পথের প্রান্তে, পান্থশালা পরে—
যাহারা পড়িয়াছিল, ভাবাবেশ ভরে—
রসপানে হতজ্ঞান, যাহারা নিয়ত
রাখে নাই আপনারে উদ্যত, জাগ্রত
মুগ্ধ মূঢ় জানে নাই, বিশ্বযাত্রী দলে
কখন চলিয়া গেছে সুদূর অচলে
বাজায়ে বিজয়-শংখ, শুধু দীর্ঘবেলা
তোমারে খেলনা করি, করিয়াছে খেলা—

*　　*　　*　　*

কর্মেরে ক'রেছে পংগু নিরর্থ আচারে
জ্ঞানেরে ক'রেছে রুদ্ধ শাস্ত্র কারাগারে।"

কবি ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মের নামে মানবাত্মার প্রতি কোনরকম বলপ্রয়োগ একেবারেই পছন্দ করেন নি। কবি ব'লেছেন, বেশির ভাগ লোকই ধর্মের স্থানে সম্প্রদায়কেই পূজো করে। এই রকম সম্প্রদায়সেবী লোকেরাই ধর্মের নামে অন্য মানুষকে অপমান করতে পারে, উৎপীড়ন করতে পারে। পিতা দেবেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি লিখেছেন যে,দেবেন্দ্রনাথ যে কোন ধর্মসম্প্রদায়, কোন দলবিশেষ গ'ড়ে তুলতে পারেন নি; তার কারণই এই যে, যে মনোবৃত্তি সাধারণতঃ ধর্মগুরুদের মধ্যে দেখা যায়, সেই দলগড়া মনোবৃত্তি তাঁর ছিল না। কবি বলেছেন, সম্প্রদায়সেবী মানুষ নিজেকে ধর্মের নামে একটা সূক্ষ্ম বৈষয়িকতার জালে জড়িয়ে ফেলে। অথচ ধর্মের আসল উদ্দেশ্য হ'ল বৈষয়িকতা থেকে মানবাত্মার মুক্তি। দলের প্রতি এই আসক্তিকে মানুষ 'ধর্ম' নাম দিয়েছে ব'লে সে এটাকে আসক্তি ব'লে চিনতেও পারে না। এমনি ক'রে সাম্প্রদায়িকতা মানুষকে সহজ, সরল ধর্ম-পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। সাম্প্রদায়িক জটিলতার জংগলে তার পথ হারিয়ে যায়।

'ধর্ম-মোহ' কবিতায় কবি ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির নিন্দা ক'রে লিখেছেন—

"ধর্মের বেশে মোহ এসে যারে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো—
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষেরে ভালো।
বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে
পিতার নামেতে হানে তার সন্তানে
আচার লইয়া বিচার নাহিক জানে।
পূজাগৃহে তোলে রক্ত মাখানো ধ্বজা
দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা।
অনেক যুগের লজ্জা ও লাঞ্ছনা
বর্বরতার বিকার বিড়ম্বনা—
ধর্মের মাঝে আশ্রয় দিল যারা—
আবর্জনায় রচে তারা নিজ কারা।
প্রলয়ের ঐ শুনি শংখধ্বনি—
মহাকাল আসে ল'য়ে সম্মার্জনী।
যে দেবে মুক্তি, তারে খুঁটিরূপে গড়া—
যে মিলাবে তারে করিল ভেদের খাঁড়া—
যে আনিবে প্রেম অমৃত উৎস হ'তে
তারি নামে ধরা ভাসায় বিষের স্রোতে
তরী ফুটা করি পার হ'তে গিয়ে ডোবে—
তবু এরা কারে অপবাদ দেয় ক্ষোভে।
হে ধর্মরাজ ধর্ম বিকার নাশি
ধর্ম মূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি
যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে।
ধর্ম-কারার প্রাচীরে বজ্র হানো—
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।"

"গোরা" বইতে কবি সত্যিকারের ধর্ম আর সম্প্রদায়ের দাসত্ব, এ দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তা বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে সুন্দর ক'রে বুঝিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক মানুষ ধর্মকে নিজের স্বার্থের অনুকূলে কাজে লাগাতে চায়। সেই স্বার্থে

আঘাত লাগ্‌লে সে অন্য মানুষকে অপমান কর্‌তে, তার ক্ষতি করতে পশ্চাৎপদ হয় না। আর নিজের কাজকে সে উঁচু গলায় 'ধর্মপ্রচার' ব'লে প্রচার কর্‌তে থাকে। আর যে ধর্মকে সত্যি ক'রে অন্তরের মধ্যে লাভ ক'রেছে, সে মানুষ দরকার হ'লে সম্প্রদায়ের আশ্রয়, সমস্ত আশ্রয় ত্যাগ ক'রে, সমস্ত ক্ষতিকে স্বীকার ক'রে একমাত্র ধর্মকেই আশ্রয় ক'রে থাকে। সে যেখানে সত্যিকারের অন্যায় না দেখে, সেখানে সাম্প্রদায়িক নিয়মভংগকে 'অধর্ম' নাম দিয়ে লাঞ্ছিত কর্‌তে, অন্য সবার সংগে যোগ দিতে পারে না।

বরদাসুন্দরী এবং পানুবাবু সম্প্রদায়ের নিয়মভংগকারীকে এবং অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে ক্ষমা কর্‌তে পারে না। তাদের ত্যাগ করাকে, শাস্তি দেওয়াকে, অপমান করাকেই ধর্ম বলে জানে। কিন্তু পরেশবাবু সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ধর্মকে জানেন। তাই তিনি ললিতা ও ভিন্নসম্প্রদায়ভুক্ত বিনয়ের প্রণয়কে পাপ বলে ভাবতে পারেন নি। সম্প্রদায়ের কানুন হিসাবে এটা একটা নিয়মভংগ হলেও ধর্মের নিত্য নিয়ম, সহজ নিয়ম হিসাবে এর মধ্যে তিনি কোন অন্যায়, কোন অধর্ম দেখতে পান নি। নিজের এই ধর্মবিশ্বাস বলে তিনি যেমন একদিন হিন্দুসমাজ ত্যাগ করেছিলেন তেমনি আর একদিন ব্রাহ্মসমাজও ত্যাগ ক'রে শুধু ধর্মকেই আশ্রয় করলেন। নিত্যধর্মের জন্যে যে লৌকিক ধর্ম-ত্যাগের ক্ষতিকে স্বীকার কর্‌তে পারে, সেই-তো ধর্মকে সত্যি ক'রে উপলব্ধি করেছে।

উপন্যাসের উপসংহারে গোরা পরেশকে বলেছে গুরু, আনন্দময়ীকে বলেছে ভারতবর্ষের সত্যিকারের প্রতিনিধি—যে ভারতবর্ষের ঘৃণা নেই, বিচার নেই, সবাইকেই যে ভালোবেসে গ্রহণ করেছে।

কবি দেখিয়েছেন সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা কোন ধর্ম বিশেষের বিশেষত্বও নয়, আবার স্ত্রী-পুরুষ ভেদেও এর কোন তারতম্য হয় না। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ মনোবৃত্তি যেমন হিন্দুর মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তেমনি ব্রাহ্মদের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন মেয়েদের মধ্যে দেখা যায়, তেমনি পুরুষের মধ্যেও দেখা যায়। পুরুষ মানুষ এবং গোঁড়াহিন্দু কৃষ্ণদয়াল নিজের ঘরের বাইরে সমস্ত সংসারটাকে অপবিত্র ব'লে জানেন। তাই তিনি পা বাড়াতে হ'লেই গংগাজল ছিটিয়ে তবে পা বাড়ান। সাহেবের ছেলে গোরা—এতদিন ঘরে থেকেও তার চোখে পরই থেকে গেল। পাছে সে তার শ্রাদ্ধ করে এই ভয়ে তিনি অস্থির।

আবার হিন্দুমেয়ে—আনন্দময়ী বুঝেছেন, মানুষের কোন জাত নেই। তিনি বলেছেন—ছোট শিশুকে কোলে নিলেই বোঝা যায় যে মানুষ জাত নিয়ে জন্মায় না। গোরার প্রতি স্নেহে তিনি সব দেশের সব জাতের মানুষকে আপন বলে দেখ্‌তে শিখেছেন।

ওদিকে বরদাসুন্দরী আর পানুবাবু ব্রাহ্ম মেয়ে এবং পুরুষ। পরেশবাবুও ব্রাহ্ম। কবি দেখিয়েছেন যে আসলে কৃষ্ণদয়াল, পানুবাবু আর বরদাসুন্দরী এরাই হ'ল এক-জাতের লোক। আর পরেশবাবু এবং আনন্দময়ীরও জাত এক।

কবি ধর্মকে এবং ভগবানকে দেখেছেন পথেরই মধ্যে—কোন বিশেষ স্থানে, কোন বিশেষ তীর্থে ধর্ম এবং ভগবান্ বদ্ধ হয়ে আছেন, এমতে কবির আস্থা নেই। ভগবানকে কবি বলেছেন—

"হে মহা পথিক, অবারিত তব দশ দিক
তীর্থ তব পদে পদে।"

বিশ্বের যে কর্মশালা, সেইখানেই ভগবানের সংগে মানুষের চেনা হয়। কবি লিখেছেন—

"ভালো মন্দ ওঠা পড়ায়—
বিশ্বশালার ভাঙ্গা গড়ায়
তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যেন
তোমার সাথে হয় গো চেনা।"

"অচলায়তন" বইতে কবি দেখাতে চেয়েছেন—সমস্ত রকম পাপ থেকে, ভুল থেকে, জগৎ থেকে এবং অন্যমানুষের থেকে আলাদা হয়ে থাকাটাই শুচিতা রক্ষা করবার সব চেয়ে ভালো উপায় নয়। ভুলের মধ্য দিয়ে, পাপের মধ্য দিয়ে, সমস্ত জগৎ সংসারে খোলা হাওয়ার মধ্য দিয়ে, সমস্ত মানুষের সংগের মধ্য দিয়েই আমরা সত্যধর্মকে লাভ করতে পারি। তাই পঞ্চক যখন আচার্যের কাছে জান্‌তে চাইল যে শোনপাংশুদের সংগে তার মেশা নিয়ে আচার্যের কোন বিশেষ আদেশ আছে কিনা, তখন আচার্য তাকে বললেন—

"না না, আদেশ আমার কিছুই নেই। যদি ভুল করতে হয় তবে ভুল করোগে, তুমি ভুল করোগে। আমাদের কথা শুনো না। আমাদের গুরু আস্‌ছেন পঞ্চক, তাঁর কাছে তোমার মত বালক হ'য়ে যদি বস্‌তে পারি, তিনি যদি আমার জরার বন্ধন খুলে দেন, আমাকে ছেড়ে দেন, তিনি যদি অভয় দিয়ে বলেন, আজ থেকে ভুল ক'রে ক'রে সত্য জান্‌বার অধিকার তোমাকে দিলুম, আমার মনের উপর থেকে হাজার দুহাজার বছরের পুরাতন ভার যদি তিনি নামিয়ে দেন।"

কবি বল্‌তে চান—আমরা যে ধর্ম বল্‌তে পুরানো দিনের শাস্ত্রের আবর্জনাকে বুঝি সে আমাদের কত বড় ভুল। ধর্ম কি প্রাণহীন পুরানো দিনের বুলি? ধর্ম মানুষের সজীব জীবনের জিনিষ। তাকে মানুষ আপন বিচার দিয়ে, আপনার বুদ্ধি দিয়ে আপনার প্রাণে উপলব্ধি করবে, তবেই তো মানুষের কাছে ধর্ম সত্য হ'য়ে উঠ্‌বে। শাস্ত্রমানা যে প্রাণহীন ধর্ম, সেই অতীতের কংকালকে কবি সমাজ থেকে দূর করে, সমাজকে, মানুষের মনকে ভারমুক্ত করবার কথা বলেছেন। পুরানো সংস্কার মানুষের ধর্মবিচারকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এর থেকে মুক্ত হতে পারলেই সত্যধর্মকে সহজে অন্তরে উপলব্ধি করা যায়। তাই যারা ধর্মের জরাগ্রস্ত, তাদের চেয়ে যে মানুষ শিশুর মত সংস্কারহীন মন নিয়ে সহজ সরল চিত্ত —তার পক্ষেই ধর্মকে পাওয়া সহজ। পুরানো সংস্কারের আবরণে যার দৃষ্টি আচ্ছন্ন, সে ধর্মকে তার সত্য অর্থে দেখতেই পায়না।

এই জন্যেই অচলায়তনে কবি বলেছেন, যারা নীচজাত, যাদের শাস্ত্র নেই, সেই দর্ভকদের পাড়ায় ভগবান গোঁসাই হ'য়ে তাদের প্রাণের সরল ভক্তির মধ্যে যাওয়া আসা করেন। কিন্তু শাস্ত্রের নিয়মে ঘেরা অচলায়তনে তার আসার সব দুয়ার বন্ধ। সেখানে আস্‌তে হ'লে তাকে যোদ্ধবেশে, আগল ভেঙে. বিপ্লবের ধ্বজা নিয়ে আস্‌তে হয়। সহজে আসার পথ সেখানে রুদ্ধ।

আর যারা সর্বদাই কর্মের চঞ্চলতায় উন্মত্ত, যারা একমুহূর্ত স্থির হ'য়ে বস্‌তে শেখেনি—ভগবান তাদেরও সংগে বন্ধুরূপে মিলিত হন। ভক্তিহীন কাজের মধ্যেও ভগবানকে পাওয়া যায়, আত্মনিবেদন-পর ভক্তির মধ্যেও পাওয়া যায়—শুধু তাকে পাওয়া যায় না কর্মহীন, প্রাণহীন শাস্ত্রবচনের মধ্যে, যার মধ্যে না আছে কর্মের সজীবতা, না আছে ভক্তির সরসতা। এই জন্যেই হিন্দুধর্মের শক্ত পাথরের তলা থেকে সরল ভক্তিধারাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্যের ডাকেও সমাজের নীচু স্তরের মানুষরাই সাড়া দিয়েছিল। কারণ সরল ভক্তি আছে তাদের প্রকৃতিতে। উচ্চবর্ণের মানুষ তাতে সাড়া দেয়নি। কারণ শাস্ত্রবচনের চাপে তাদের প্রাণের ভক্তির উৎস শুকিয়ে গেছে।

দাদাঠাকুর বল্‌ছেন অচলায়তনের আচার্যকে—যিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন তাঁকেই তুমি বাঁধবার চেষ্টা করেছ। আচার্য জবাব দিচ্ছেন—"কিন্তু বাঁধতে তো পারিনি, ঠাকুর। তাঁকে বাঁধছি মনে ক'রে যতগুলো পাক দিয়েছি, সব পাক কেবল নিজের চারিদিকেই জড়িয়েছি। যে হাত দিয়ে সেই বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা শুদ্ধ বেঁধে ফেলেছি।" দাদাঠাকুর বল্‌ছেন—"যিনি সব জায়গায় ধরা দিয়ে বসে আছেন, তাঁকে একটা যায়গায় ধর্‌তে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

পঞ্চক বল্‌ছে—আমার দাদা বলে জগতে যা কিছু আছে সমস্তকে দূর ক'রে ফেল্‌তে পার্‌লে, তবেই আসল জিনিষটিকে পাওয়া যায়। কিন্তু দাদাঠাকুর বলছেন—"কিন্তু আমার দাদা বলে—যখন সমস্ত পাই, তখনই আসল জিনিষকে পাই।" কবি বলতে চান—ধর্মকে জীবন থেকে আলাদা ক'রে পাওয়া যায় না। তাকে কোন তীর্থেও পাওয়া যায় না। ভগবান ছড়িয়ে আছেন, মিলিয়ে আছেন জীবনের সমস্ত কিছুর মধ্যে, সমস্ত মানুষের মধ্যে। চতুরংগ উপন্যাসেও কবি এই কথাই বলেছেন।— জগমোহন যখন সন্তানসম্ভবা বিধবা মেয়ে ননীকে আশ্রয় দিলেন, তখন তার ধার্মিক দিদিমা পিসীমারা এসে বল্‌লেন "পাপ বিদায় করিয়া দে।" জগমোহন উত্তর দিলেন—"তোমরা ধার্মিক, তোমরা এমন কথা বলিতে পার, কিন্তু পাপ যদি বিদায় করি, তবে এই পাপিষ্ঠের গতি কী হইবে?"

কবি বলতে চান—যারা ধর্মের বড়াই করে তারা পাপীকে ঘৃণা করে, নিজেদের পূজা অর্চনা ইত্যাদি জীবনের সংস্পর্শ হীন পবিত্র কাজ নিয়ে দিন কাটাতে পারে এবং

এমনি ক'রে তারা খুব পুণ্য অর্জন করছে এই ব'লে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতেও পারে। কিন্তু যারা ও রকম পুণ্য আচরণ করেনা, তাদের শুভবুদ্ধির খোরাক জোগাবার জন্যেই তাদের দুর্গত মানুষকে আশ্রয় করতে হয়। তারা মানুষের মধ্যে যে উন্নততর শুভবুদ্ধি, তাকে মিথ্যা ধার্মিকতা দিয়ে পরিতৃপ্ত করতে চায় না, তারা সংসারের সেবা করেই তাদের উন্নততর হৃদয়বৃত্তিকে চরিতার্থ করে। তাই তারা কখনো দুর্গত মানুষকে ত্যাগ করতে পারেনা।

কবি এই জীবনের মধ্যে, এই সংসারের মধ্যেই মানবাত্মার পূর্ণ সার্থকতাকে দেখেছেন। এই মাটির পৃথিবীকেই ভগবানের প্রাসাদের প্রাংগণ বলে জেনেছেন। যে ছোটর মধ্যেও সেই বৃহৎকে দেখতে পায়, সীমার মধ্যে অসীমকে দেখতে পায়, তার কাছে কোন কিছুই তুচ্ছ নয়। যে তা দেখতে পায়না তার দৃষ্টি সত্য হয়ে ওঠেনি। কবি লিখছেন—

"মিথ্যায় ঘেরে ছোট কণা-টিরে
তুচ্ছ করিয়া দেখিলে
*　*　*
ধুলা মাঝে আমি ধুলা হ'য়ে রব,
সে গৌরবের চরণে
ফুল মাঝে আমি হব ফুলদল
তাঁরি পূজারতি বরণে
যেথা যাই আর যেথায় চাহিরে
তিল ঠাঁই নাই তাহার বাহিরে—।"

এই ধুলার পৃথিবীতেই কবি নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। জীবনের শেষ সার্থকতা পাবার জন্যে মানুষকে যে এই পৃথিবী ছেড়ে কোথাও যেতে হবে, এই জীবনকে পিছনে ফেলে যে চরম পরিণামের সন্ধান করতে হবে এ কথা কবি মানেন নি। কবি বলেছেন—

যেথা আছি আমি আছি তাঁরি পারে
নাহি জানি ত্রাণ কেন বল কারে
আছি তারি পারে, তারি পারাবারে
বিপুল ভুবন তরণী
যা হ'য়েছি আমি ধন্য হ'য়েছি
ধন্য এ মোর ধরণী—।

চতুঃস্মৃতি বিজড়িত আষাঢ়ী পূর্ণিমা

শ্রীদেবপ্রিয় ভিক্ষু, নালন্দা

ভূমিকা :—

পৃথিবীর ইতিহাসে তথাগত ভগবান্ বুদ্ধের দান অপরিসীম ও অতুলনীয়। মানব-জাতি কেন, পশু-পক্ষী কীটপতঙ্গও তাঁর অপরিমেয় মৈত্রী ও করুণায় বঞ্চিত হয়নি। নিরঙ্কুশ জ্ঞান, অপরিমেয় সহৃদয়তা এবং অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর সহায়তায় তথাগত ভগবান্ বুদ্ধই সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা দেন—সমগ্র মানব-সমাজ অখণ্ড, বিশ্বের সকল মানুষ—এমন কি সকল জীব অবিচ্ছেদ্য এক পরম আত্মীয়তার সূত্রে গ্রথিত এবং একের সুখ-দুঃখ অপরের সুখ-দুঃখের হেতু। অবিদ্যার অন্ধকার বিনাশে রাগ-দ্বেষ-মোহের বেড়াজাল এবং মিথ্যা দৃষ্টির ও আত্মবাদের ব্রহ্মজাল ছিন্ন করে জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-কবলিত জগদ্বাসীকে সংসারাবর্ত্তের দুঃখ হতে মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন তথাগত বুদ্ধ। বিশ্ব-মানবকে জগতের আলোকে উদ্ভাসিত করে অহিংসা-সাম্য-মৈত্রী-করুণায় বিশ্ব-গণতন্ত্র, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, বিশ্ব-প্রেম, ও বিশ্ব-শান্তির বাণী শুনাতে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলেন মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধ।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা বৌদ্ধগণের এক শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র তিথি। উক্ত দিবসটি সিদ্ধার্থের পূতজীবনলীলার চারিটি মহাসন্ধিক্ষণের সহিত জড়িত। এই পবিত্র তিথিতে সিদ্ধার্থের তুষিত পুরী হতে মায়াদেবীর জঠরে প্রতিসন্ধি-গ্রহণ, মহাভিনিষ্ক্রমণ, ঋষিপত্তন মৃগদাবে ধর্ম্মচক্র প্রবর্তন

সূত্রদেশনা, ও ভিক্ষুমণ্ডলীকে ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত উদ্যাপনের জন্যে উপদেশ প্রদান। এই চারিটি শুভ গঠনা এই আষাঢ়ী পূর্ণিমালগ্নে হয়েছিলো।

সিদ্ধার্থ বোধিসত্ব অবস্থায় দশ-পারমিতা, দশ-উপপারমিতা ও দশ-পরমার্থপারমিতা—এ ত্রিংশ পারমিতা সমভাবে পূর্ণ করে "বেস্মান্তর" জন্মে পৃথিবী-বিকম্পী মহাদান দিয়ে, স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করে জীবনাবসানে তুষিত পুরীতে উৎপন্ন হয়ে সেখানে অবস্থান করতে ছিলেন। সে সময়ে এ বসুন্ধরায় ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও ধ্বংসের বিভীষিকায় ত্রাহি ত্রাহি ভাব—তথা পাশবিক ক্ষুধার বশবর্তিতায় ভয়াবহ বিদ্বেষ ও রেষারেষির অনলশিখা প্রজ্জলিত মানবসমাজের ভাগ্যাকাশ ঘনতমসাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিলো। সেই যুগসন্ধিক্ষণে আসক্তি ও হিংসালোলুপ মানব চিত্তকে সাম্য ও মৈত্রী মন্ত্রে দীক্ষা দেবার মানসে শান্তির প্রতীক বোধিসত্বের প্রয়োজন উপলব্ধি করে দশ সহস্র চক্রবাল দেবতা সম্মিলিত হয়ে তাঁর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন—

"কালোয়ং তে মহাবীর উপজ্জ মাতুকুচ্ছিয়ং,
সদেবকং তারয়ন্তো বুজ্ঝস্সু অমতং পদং"তি।

হে মহাবীর। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে, আপনি জননীজঠরে জন্ম নিয়ে অনতিবিলম্বে দেব মনুষ্যগণকে ধর্ম্মের অমৃতপদ শেখান।

দেবতার প্রার্থনায় তথা জীব-দুঃখের কাতরাহ্বানে পবিত্র আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে শাক্যকুলাধিপতি কপিলবস্তুর নৃপতি শুদ্ধধনের অগ্রমহিষী মায়াদেবীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহারাণী পিতৃগৃহে গমনকালীন পথিমধ্যে লুম্বিনীর ছায়া-ঘেরা ফুল্ল-কুসুমিত পূতস্থানে নেমে আসলেন করুণাবতার ভাবী জগদ্‌গুরু কুমার সিদ্ধার্থ। জন্মপরিগ্রহ করার সংগে সংগেই ত্রিজগৎ নিরীক্ষণ করে আপনার সমকক্ষ কাকেও দেখতে না পেয়ে গুরুগম্ভীর স্বরে "আমিই এ জগতে শ্রেষ্ঠ" বলে সিংহনাদ করলেন। শত শতাব্দীর তিমিরঘন রাত্রির অবসানে মহামানবের আবির্ভাবে আকাশে বাতাসে জাগলো নূতন সম্ভাবনা, মহাশ্মশানে যেন শ্যামলিমার স্পর্শ, দুঃখ-দৈন্য, তাপদগ্ধ মানুষের বুকে তৃষ্ণা। সেইদিনের মানুষের কাতর প্রার্থনার ইঙ্গিত বিশ্বকবির ভাষায় বলি—

"ক্রন্দন ময় নিখিল হৃদয় তাপদহন দীপ্ত,
বিষয় বিষ বিকার জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।"

পঙ্কিলময় আবর্ত্তে ভারতের তথা সমগ্র পৃথিবীর শোভাময় জীবন ডুবতে বসেছিলো। মরুভূমির মতো জীবনবনের সব সবুজ সমারোহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো, তখন মানবের একমাত্র প্রার্থনা ছিলো—একটু জীবনের আলো, একটু ভালোবাসার স্পর্শ, একটু সংঘবদ্ধ জীবন ও একটু শান্তির কোমল স্পর্শ। মানুষের এই তৃষ্ণার্ত্ত প্রাণে শান্তির অমিয়-ধারার আবির্ভাবে সকল সত্ব, সকল প্রাণীর কাতর প্রার্থনা পূর্ণ হলো। জগৎ পবিত্র হলো।

সিদ্ধার্থের জন্মের সপ্তাহকাল পরেই মায়াদেবী পরলোক গমন করেন, মাতৃবিয়োগের পর রাজার নন্দন সিদ্ধার্থ বিমাতা বা মাতৃস্বসা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অপত্য-স্নেহে লালিতপালিত হন। জন্মাবধি বহির্জগতের সম্পূর্ণ সম্পর্ক শূন্য হয়ে রাজপ্রাসাদের সুখময় ও আনন্দময় পরিবেষ্টনের মধ্যে তিনি প্রতিপালিত হন। কিন্তু রাজ-প্রাসাদের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভেদ করে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর আকুল আর্তনাদ তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে লাগলো এবং মানব জীবনের অপরিহার্য্য দুঃখ শাক্যকুমার সিদ্ধার্থের নয়নগোচর হলো। মনীষী নিউটন যেমন জগতের সচরাচর ঘটনার মধ্যে একটি আতা ফলের ভূপতন রূপ দেখে জড়জগতের মহাসত্য মাধ্যাকর্ষণ ক্রিয়া বুঝতে পেরেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে বহুশতাব্দী পূর্ব্বে শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ রাজোদ্যান পরিভ্রমণকালে ক্রমে জরা, রুগ্ন, মৃত ও ভিক্ষু দেখতে পেয়েছিলেন। ইহা অতীব সচরাচর ঘটনা। মানব জাতির উদ্ভব হতে আজ পর্য্যন্ত এই পৃথিবীর সকলেই নিরন্তর এবংবিধ দৃশ্যাবলী দেখে আসছেন। কিন্তু এই সচরাচর ঘটনা যা সাধারণের চক্ষে জরা, তাতে সিদ্ধার্থ-কুমার দেখলেন "অনিত্যতা" এবং রুগ্নের মধ্যে "দুঃখ-ময়তা" ও মৃতের মধ্যে "অনাত্মতা" দেখতে পেয়ে বিশ্বের যথার্থ প্রকৃতির দুঃখময়তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং চতুর্থ দৃশ্য সেই সৌম্যকান্তি শান্তগতি ভিক্ষুর মধ্যে দুঃখ নির্ব্বাণের প্রতিচ্ছায়া তাঁর স্মৃতির মধ্যে মুদ্রিত হয়ে রইলো।

সিদ্ধার্থকুমার রাজসুখভোগ ও "কামসুখল্লিকানুযোগো কালে স্বয়ং কোনরূপ দুঃখ ভোগ না করলেও এই সচরাচর দৃশ্য হতে জন্মশীল জীবনের দুঃখ বুঝতে

পেরেছিলেন, কিন্তু তখন এ জীবন দুঃখের কারণ বা প্রতিকার নির্ণয় করতে পারেননি। উহার অনুসন্ধানার্থ শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমার "নিশীথ রজনী" সারথি ছন্দক ও বাহক কণ্ঠককে নিয়ে সদ্যোজাত শিশুপুত্র, জীবনতোষিণী সহধর্ম্মিণী, স্নেহময় জনক, স্নেহময়ী বিমাতা এবং বিলাসময় প্রমোদভবন সমস্ত পরিত্যাগ করে "সকাতরে ডাকে মোরে জগতের বাণী" এবাক্য উচ্চারণ করে উনত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মহাভিনিষ্ক্রমণ করেছিলেন। অনোমা নদীর তীরে পৌছে তিনি বহুমূল্য রাজবেশ ও রত্ন অলঙ্কার খুলে ছন্দকের হাতে দিয়ে কণ্ঠকের পৃষ্ঠদেশ হতে অবতরণ করে পদব্রজে কোথায় কোন নিরুদ্দেশে চলে গেলেন। ছন্দক কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো রাজধানীতে, কিন্তু কণ্ঠক প্রভুর শোকে প্রাণত্যাগ করলো। তারপর তরুণ-তাপস সিদ্ধার্থ আলার কালামত্ত রামপুত্র উদ্রক নামক দুই প্রথিতযশা ব্রাহ্ম অধ্যাপকের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন; কিন্তু তাঁদের নিকট তিনি যে শিক্ষা লাভ করলেন তাতে তাঁর তুষ্টি সাধনে অক্ষম হয়ে সুদীর্ঘ ছয় বৎসর পরমতপস্বী, পরমরুক্ষ, পরমজুগুপ্সী ও পরবিবিক্ত এই চতুরঙ্গসমন্বিত কঠোরতম সাধনায় "অত্তকিলমথানুযোগ" করলেন, কিন্তু মনস্কামনা সিদ্ধ হলো না। অনন্তর তিনি সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করলেন, "দুঃখ মুক্তির জন্যে কামসুখ যেমন অনর্থকর, কৃচ্ছ্রসাধনও তেমন নিস্ফল।" তাই তিনি আত্মনিগ্রহের ব্রত ত্যাগকরে "মধ্যমপথ" অনুসরণ করলেন অর্থাৎ পানাহার গ্রহণ করলেন। একদিন সেনানীকন্যা সুজাতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত "পরমান্ন" পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করে "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" ইহা মূল মন্ত্র মনে করে বোধিতরুমূলে সমাসীন হয়ে দৃঢ় সংকল্প করলেন—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং, ত্বগস্থিমাংসং
প্রলয়ঞ্চ যাতু,
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্ল্লভাং, নৈবাসনাৎকায়মত-
শ্চলিষ্যতে।"

এই আসনে আমার শরীর শুকিয়ে যাক্, আমার দেহের ত্বক্, অস্থি, মাংস বিলীন হোক, কিন্তু বহুকল্পদুর্ল্লভ বুদ্ধত্ব লাভ না করে আমার দেহ এ আসন থেকে বিচলিত হবে না। এই বলে অভেদ্যরূপ অপরাজিত পল্লকে সমাধিস্থ হলেন ভাবী জগদ্‌গুরু।

সেদিন ছিল শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা। পূর্ণিমার পেলব কোমল চাঁদিনী রজনীর গভীর নিরবতায় নিরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবেলার বোধিদ্রুমতলে মারের সংগে মানুষের জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম হলো, তাতে মারকে পরাভূত করে জয়ী হলেন তরুণ তাপস এবং খ্যাতি লাভ করলেন বুদ্ধরূপে। জগতের সেই মহাদিনে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—

"ইমস্মিং সতি ইদং হেতি, ইমস্‌সুপ্পাদা ইদং উপ্পজ্জতি।
ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্‌স নিরোধা ইদং
নিরুজ্জতি॥"

—ইহাই কার্য্যকারণ নীতির মূল সূত্র। হেতুর উৎপত্তিতে ফলের উৎপত্তি এবং ফলের নিরোধে হেতুর নিরোধ—এই নীতির প্রভাবে আমাদের জড় ও মনোজগৎ আবহমান কাল থেকে শাসিত হয়ে আসিতেছে। এই নীতিই তাঁর সদ্ধর্ম্মের মেরুদণ্ড। নীতির দিক দিয়ে যাকে "প্রতীত্য সমুৎপাদ" বলে অভিহিত কচ্ছি, প্রচারের দিক দিয়ে সেটা হচ্ছে "চত্তারি অরিয় সচ্চানি" বা "চারি আর্য্য সত্য"। সম্যকসম্বুদ্ধত্ব লাভে সেই অতুলনীয় জ্যোৎস্নালোকে তিনি এই নীতিই শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছিলেন—"অনুলোম পটিলোম মনসাকাসি" জীবনরহস্য উদঘাটনে ইহাই বীতরাগ, বীতমোহ, বীতদোষের হেতুমূলক দার্শনিক সিদ্ধান্ত। এই পঞ্চস্কন্ধময় জীবনের সংগে অনিত্যতা দুঃখ জড়িত অর্থাৎ অনিত্য দুঃখ এবং পঞ্চস্কন্ধে অভিন্ন, ইহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট স্বতঃসিদ্ধ সত্য। দুঃখ উৎপত্তির ও দুঃখ নিরোধের কারণ পরম্পরা এই নীতিতে সম্যকভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে। এই জন্য এই নীতির নাম দুঃখনিরোধবাদ (এ প্রকার নিরোধ নির্ব্বাণের অপর নাম) "নিরোধ নাম নির্ব্বাণং"।

দুঃখের হেতু নির্ণয় করতে গিয়ে সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ আদিতে অবিদ্যাকে স্থাপন করেছেন। অবিদ্যাই হলো দুঃখের আদি কারণ, সম্যক সম্বুদ্ধ জীবজগতের এই গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে উপভোগ করলেন শান্তি আর প্রশান্তি। সর্ব্বশরীরে বিস্ফারিত হলো পঞ্চপ্রীতিবল। সে কী

আনন্দ! অনুপম অমিয়মধুর লীলায়িত আনন্দোচ্ছ্বাস, অশ্রুতপূর্ব্ব বিস্ময়কর প্রীতি সঙ্গীত ধ্বনিত হলো—

"অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌স অনিব্বিসং,
গহকারকাং গবেসন্তো দুক্খাজাতি পুনপ্‌পুনং।
গহকারক। দিট্‌ঠোসি পুনগেহং ন কাহসি,
সব্ব তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংকিতং,
বিসঙ্‌খার গতং চিত্তং তহানং খয়মজ্‌ঝগা"তি।

—জন্ম জন্মান্তর ধরে দান, শীলাদি পারমিতা পুণ্য প্রভাবে এবং বহু সাধনার পর আজ আমি প্রকৃত গৃহ নির্ম্মাতাকে দেখেছি। আমার এই দেহে আর গৃহরচনা করতে পারবে না, গৃহ-নির্ম্মাণের সমস্ত উপকরণ আমি ভেঙ্গে ফেলেছি। আমার চিত্ত সংস্কার-বিগত—তৃষ্ণা-মুক্ত।

নব-ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে অমিতাভ বুদ্ধ উপনীত হলেন সারনাথ তীর্থে, যেখানে তিনি পেলেন তাঁর পূর্ব্বপরিচিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ সন্তান কৌণ্ডণ্য, ভদ্দীয়, বাপ্পা, মহানামা ও অশ্বজিৎ। তাঁরাই বৌদ্ধসাহিত্যে পঞ্চ বর্গীয় শিষ্য নামে পরিচিত। সুগত বুদ্ধ কৌণ্ডণ্য প্রমুখ অষ্টাদশ কোটি দেব ব্রহ্মাকে অমৃত পান করায়ে পবিত্র আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিবসে "ধর্ম্মচক্র" প্রবর্ত্তন করলেন। ঋষিপত্তন মৃগদাবের তপোবন মন্দ্রিত হলো ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত অনুপম ধর্ম্মদেশনায়। সূর্য্যাস্তের পর পূর্ণচন্দ্রোদয়ে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত পূর্ব্বদিগন্তের ন্যায় পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের চিত্তলোক জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে তিনি বললেন, হে ভিক্ষুগণ। নির্ব্বাণকামী ব্রতাচারী এই দুই অন্তের অনুশীলন করবে না : প্রথম, "কামেসুকামসুখল্লিকানুযোগো" —কামে কামসুখোদ্রেকের প্রতি আসক্তি যা হীন, গ্রাম্য, ইতর সাধারণ সেব্য, অনার্য্য জনোচিত ও অনর্থকর; দ্বিতীয়; "অত্তকিলমথানুযোগো"—আত্ম নিগ্রহে আসক্তি যা দুঃখ-দায়ক, নিকৃষ্ট ও অনর্থকর। এই দুই অন্ত বর্জ্জন করে তথাগত মধ্যমপ্রতিপদ (মধ্যপন্থা) অভিসম্বোধি জ্ঞানে লাভ করেছেন—যা চক্ষু-করণী ও জ্ঞান করণী এবং যা উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্ব্বাণের অভিমুখে সংবর্ত্তিত হয়। আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই সেই মধ্যম প্রতিপদ, যথা, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

তারপর তিনি ধীর মন্দ্রস্বরে ব্যাখ্যা করলেন তাঁর নবাবিষ্কৃত ধর্ম্মতত্ত্ব-চতুরার্য্য সত্য : দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ, দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদ বা পূর্ব্বোক্ত আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ, কার্য্যকারণ শৃঙ্খল রূপ ইদ প্রত্যয়তা বা দ্বাদশ নিদানবিশিষ্ট প্রতীত্য-সমুৎপাদ নীতি, রূপ-বেদনা সংজ্ঞা-সংস্কার বিজ্ঞানের সমন্বয়ে পুদ্‌গল প্রজ্ঞপ্তি—তাদের অনিত্যতা ও পরিবর্ত্তনশীলতা নিবন্ধন আত্মার সাথে সম্বন্ধহীনতা এবং অনাত্মতা, উৎপত্তিশীল ধর্ম্মসমূহের বিনাশশীলতারূপ সম্যক প্রজ্ঞা দৃষ্টির সাহায্যে পঞ্চস্কন্ধে নির্ব্বেদ প্রাপ্তি, নির্ব্বেদ হেতু বীতরাগ, বিরাগ হেতু বিমুক্তি। এ ভাবে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক দেশিত "ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্র" শ্রুত হলে তাঁদের চিত্ত আসব বিমুক্তি হলো। তাঁরা নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করে, ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করে, নিঃসংশয়ে ধর্ম্মবিদিত হয়ে এবং আত্মপ্রত্যয় লাভ করে ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা যাচ্ঞা করলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষুগণ! এসো, ধর্ম্ম সু-আখ্যাত হয়েছে, সম্যক ভাবের দুঃখের অন্ত সাধনের জন্য ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর।" এতেই তাঁদের প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ হলো। স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ সহ পৃথিবীতে অর্হতের সংখ্যা হলো ছয়জন।

বর্ষাকালে প্রচুর বারিবর্ষণসিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত রাস্তায় গ্রাম নগর জনপদে ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে ভ্রমণ সু-কর নহে বলে নবদীক্ষিত ও সদ্যঅর্হত্ত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুগণকে ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত উদ্‌যাপনের উপদেশ দান করে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু সংঘ তথায় প্রথম বর্ষা যাপন করলেন।

ক্রমে বর্ষা শেষ হলো। হেমন্তের আগমনে সূচিত হয়ে হেসে উঠলো শারদ প্রকৃতি। এদিকে ক্রমে নব-ধর্ম্মে দীক্ষিত শিষ্যমণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে যশ-প্রমুখ তাঁর চুয়ান্নজন বন্ধু সহ একষট্টিজন ভিক্ষু মহৎ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হলে নিখিল জগতের হিতার্থে শুভ আশ্বিনী-পূর্ণিমা দিবসে তথাগত বুদ্ধ তাঁর ষাট জন অর্হৎ শিষ্য-মণ্ডলীকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন—"চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়, দেসথ সং ধম্মং আদি কল্যাণং, মজ্ঝে কল্যাণং, পারিযোসানকল্যাণং।" হে ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতের জন্যে, বহুজনের সুখের জন্যে তোমরা গ্রামে নিগমে বিচরণ করো এবং সে ধর্ম

প্রচার করো যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ।" তারপর গ্রাম হতে গ্রামান্তরে নবধর্ম্ম তথা সাম্য-মৈত্রীর বাণী প্রচারে ব্রতী হলেন তিনি এবং তাঁর শিষ্য মণ্ডলী, দলে দলে অমৃত-পিপাসু সমবেত হলো—সদ্ধর্ম্মের প্রেম ও অহিংসার পতাকা তলে, ত্রিরত্নের শরণাগত হলো—অসংখ্য নরনারী, ভিক্ষুত্বে দীক্ষিত হলো অগণিত শান্তিকামী মানব সমাজ। অচিরে সুগঠিত হলো পবিত্র সংঘ, অমৃতধর্ম্মের প্রচারক প্রভুবুদ্ধের যশ, প্রেম, করুণা, সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য ও অহিংসার বাণী সারা-ভারত প্লাবিত করে তার জন্ম-ভূমির গণ্ডী ছাড়িয়ে তথা সুদূর হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গ ডিঙ্গিয়ে এই কল্যাণধর্ম ছড়িয়ে পড়লো তিব্বতে, চীনে, জাপানে, মঙ্গোলিয়ায়, কোরিয়ায়, শ্যামে, লাউসে, ভিয়েৎনামে, কম্বোডিয়ায়, বর্ম্মায় ও সিংহলে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে। পশ্চিমে আফগানিস্তান, পারস্য, তুর্কিস্তান ও ইহার নিকটবর্ত্তী সমগ্র অঞ্চল, সিরিয়া, ম্যাসিডোনিয়া এবং পরিশেষে মিশরেও এ বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করেছিলো। মৈত্রী করুণা-মুদিতা উপেক্ষার সাধনা-গার হতে দেশ-দেশান্তরে বহু ভিক্ষু শ্রামণ ও শ্রাবকবৃন্দ বেরিয়ে আসলেন কল্যাণধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়ে। সেদিন পৃথিবীর অর্দ্ধেক মানব-সমাজ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করলো। কবির ভাষায় বলতে গেলে—

"আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগত,
ভক্তি প্রণত চরণে তাঁর।"

অতীতের কথা বাদ দিলে আজিও পৃথিবীর বুকে অর্দ্ধাংশ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বর্ত্তমান, ইতিহাস তার সাক্ষী। ধীরে ধীরে পৃথিবীর সাক্ষী স্বরূপ সত্য ও অহিংসার নিদর্শন মৈত্রীর পতাকাবাহী বুদ্ধ মূর্ত্তি বসুন্ধরার কঠিন কোমল বুক চিরে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে বাহির হচ্ছে। প্রত্নতাত্ত্বিকের নিকট একটা মহা বিস্ময় রূপে প্রকটিত হয়ে উঠেছে এই বৌদ্ধস্মারক চিহ্নগুলি। এমনিই ভাবেই ভগবান্ ধর্ম্ম প্রচার তথা সাম্য-বাণীর মাধ্যমে জগতে, শান্তি স্থাপিত হয়েছিলো।

বুদ্ধের দর্শন ব্যবহারিক—Practical Philosophy জীবনের ঘটনাবলীতেই ইহার কার্য্যাবলী নিবদ্ধ, এই দর্শন কল্পনা-বিহারী নহে। তাই সদ্ধর্ম্ম প্রত্যাদেশবাদ অস্বীকার করে। সেজন্য ইহার "অত্তাহি অত্তনো নাথো" নিজেই নিজের নাথ তাই ইহার শীল-সমাধি প্রজ্ঞা শুধু দুঃখও দুঃখের হেতু নিরোধের জন্য; কোন প্রভুর অনুজ্ঞা পালন পূর্ব্বক তাঁর সন্তোষ বিধানের উদ্দেশ্যে নহে। এই ধর্ম্মতত্ত্ব গুহায় নিহিত নহে। ইহা মনের ধর্ম্ম ও "এহি পস্সিকো ধর্ম্মো' এবং পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহি"। ইহা এক পবিত্র পরিশুদ্ধ কিনা বিচার করে গ্রহণ করার ধর্ম্ম। ইহার মধ্যে প্রবেশ করে প্রত্যক্ষ ভাবে ইহার গভীরতা অনুভব করার ধর্ম্ম।

প্রত্যাদেশবাদ মুক্তি কল্পনা প্রার্থনামূলক ও প্রত্যাদেশ-কের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। ইহা ধর্ম্মজীবনে মানবজাতিকে দুর্ব্বল, অলস ও পরমুখাপেক্ষী করে রেখেছে; লোভ-দ্বেষ-মোহ পরিত্যাগের আবশ্যকতা ও সম্ভাবিকতা অস্বীকার করে পৃথিবীর অশান্তি হ্রাসের পরিবর্ত্তে বৃদ্ধিই করছে।

তথাগত বুদ্ধের উপদেশ আত্মদীপ, আত্মশরণ ও অনন্যশরণ হবার জন্য; ধর্ম্ম দীপ, ধর্ম্ম-শরণ অনন্যশরণ হবার জন্য। এইরূপে বুদ্ধ মানবকে কত বড় দায়িত্বশীল, কত বড় শক্তিশালী, কতবড় আত্ম-নির্ভরশীল করেছেন। "আমার মুক্তি আমার হাতে।" ইহা কত বড় আশার বাণী। কত বড় সাহসের কথা! কত বড় বীরের কথা! কত বড় গুরুতর দায়িত্ব। তাঁর অন্তিম উপদেশ—"বয়-ধম্মা সঙ্খারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথ" "সংস্কার বিলয়শীল সর্ব্বকাম অপ্রমাদের সহিত সম্পাদন করো"—এই বাণী আজও কোটি কোটি মানব চিত্তে শক্তি ও আশার সঞ্চার করছে।

পুরুষোত্তম গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীর মানব সমাজে এবং বিশ্বের ইতিহাসে চির উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁরই আদর্শ ও নীতি জগতকে করেছে সমৃদ্ধ, এনেছে নতুন সৃষ্টির ইঙ্গিত, তুলে দিয়েছে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ। সাম্য ও মৈত্রীর অখণ্ড শাসনে সকল প্রাণীই সুখী হবে, সকল প্রাণীই স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে বেঁচে থাকবে, জগতের ঘরে ঘরে শান্তি বিরাজ করবে, কেউ কোন দিন জ্ঞাত-সারে কারও করবে না অকুশল, সকল পাপ থেকে থাকবে বিমুক্ত, পুণ্য চেতনা সদা জাগ্রত রাখবে চিত্তের মাঝে, কুশলের অনুশীলন করবে আর নিজের চিত্তকে করবে বিশোধন, এই তো বুদ্ধগণের শাসন, তাই ভগবান বুদ্ধ বলেছেন—।

"সব্ব পাপস্স অকরণং কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিযোদ পণং এতং বুদ্ধান সাসনং।
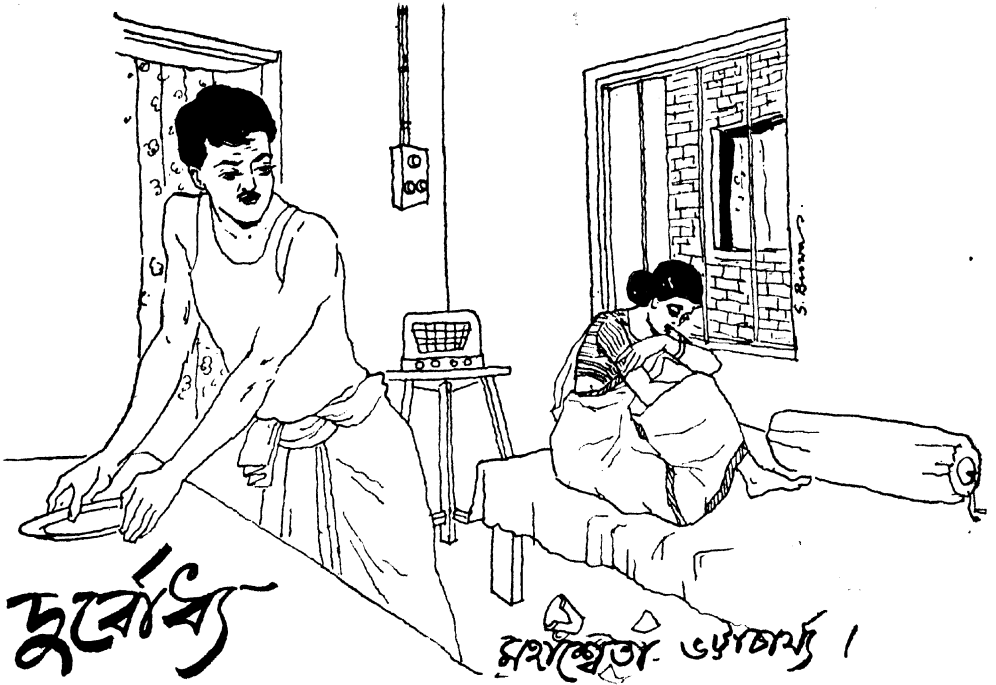
'বেশ করেছি, আবার করব, আবার···'

'বড্ড বাড়াবাড়ি করছ তুমি সু!'

ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে কাচের গেলাস-পেয়ালা ভাঙল। কিছুক্ষণ এ-ঘর ও-ঘরে বাক্স-ডেস্ক টানাটানির আওয়াজ। রেডিওটা বন্ধ, বেকার হয়ে গেল। চড়াপর্দার গান হঠাৎ থেমে যাবার অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা।

'রেডিওটা ভাঙছ কেন?' মেয়েটির গলা বেশ নেমেছে।

'বেশ করছি, আমি কিনেছি আমিই ভাঙছি।'

'খুব যে! আমি আমি করতে লজ্জা করে না? তোমার একার সংসার না কি?'

'আমার আবার সংসার!' পুরুষ কণ্ঠে খেদোক্তি।

'বাঃ, বেশ লোক! জামা পরছ যে!'

'কি করব বল। ঘরে টিকবার উপায় যখন নেই তখন পথই ভাল। পার্কের বেঞ্চি ত' কেউ কেড়ে নিচ্ছে না!'

'এই এই, কি হচ্ছে কি? শোন শুনে যাও··'

'না সু আর কিছু শুনব না। সত্যিই ত', ঠিকই বলছ তুমি। আমার মত মানুষের সাধ-আহ্লাদ থাকা উচিত নয়।'

'দেখ, যা হয়েছে হয়েছে, আর টেনে হিঁচড়ে বাড়িও না বলছি!'

'না, ঠিকই বলেছ। দেখি, কালই হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলব একটা!'

'যদি বেরোও তা হ'লে আমি নির্ঘাৎ ঝাঁপ দেব বলছি, এই দিলুম!'

দাও না বাপু! এক রাত্তিরে ল্যাঠা চুকে যাক। পাড়াপ্রতিবেশীরা বোধহয় মনে মনে এক কথাই বলেন। এ-পাশের ফ্ল্যাট ও-পাশের ফ্ল্যাটের জানলা খুলে যায়, সবাই কান বাড়িয়ে শোনে।

কিন্তু প্রত্যাশিত ঘটনাটি ঘটে কই। একসময়ে টপ ক'রে দোতলার ঘরে আলো নিভে যায়। পুরুষটির গজ-গজানি অথবা মেয়েটির কান্নার ফোঁপানি দুটোর একটা অনেকক্ষণ অবধি শোনা যায়। রোজ রোজ অবিশ্যি তাড়াতাড়ি মেটে না। এক একদিন একতলা থেকে

বাড়ীঅলা ভদ্দরলোককে ওপরে উঠতে হয় চটি ফট্‌ফট্‌ ক'রে। দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলতে হয়—'শুনছেন, ও মশায়, এ বাড়ীতে আরো ক'ঘর ভদ্রলোক থাকেন। এ-সব হই-চই এখানে চালাবেন না। ঐ একটা গুণ ওদের। বাড়ীঅলার গলা শুনলেই থেমে যায়। আর চেঁচামেচি শোনা যায় না।

প্রথম প্রথম সবাই বলত পুরুষমানুষটিই বুঝি দুর্বৃত্ত। মেয়েটির ওপর নির্যাতন চ'লায়। পরে বলত—না, ঐ মেয়েটি দেখতে নিরীহ হ'লে কি হয়, ওর জিভে বিষ আছে। যেন এমনধারা ঝগড়াঝাঁটি করতে হ'লে একে ভাল ওকে মন্দ হ'তেই হবে।

পরে দেখা গেল সে-সব কিছুই না।

এই ঝগড়া করছে দু'জনে—এ-ওর মাথা দিল ফাটিয়ে। কর্তা গেলেন অফিসে, গিন্নী ইস্কুল কামাই ক'রে রইলেন পড়ে। এ-ফ্ল্যাট ও ফ্ল্যাটের গিন্নীরা ছেলেদের বলেন—'যা, তোদের সঙ্গে ত' কথা-টথা কয়। জিগ্যেস করগে যা, কিছু খাবেটাবে না কি!'

কারো সঙ্গে মেশে না বউটি, ওর স্বভাবের সে-ও আরেক দিক! তাই বলে যে অমিশুক বা গোমড়ামুখো তা-ও নয়। পাঁচটি ফ্ল্যাটে জনা তিনেক ছাত্র আছে। একজন ত' চাকরী ক'রেই পড়ে। ওদের সঙ্গে সুগতার বেশ অন্তরঙ্গতা আছে। দিব্যি সোজাসুজি ওকে বলে—'আমার চিঠিটা ফেলে দিও ত' শুভ্র?'

চা এনে দিও, এসো না, ঘরের বাল্‌বটা লাগিয়ে দিয়ে যাও, এ-সব ফরমাস ত' মাঝে মাঝেই জানিয়ে দেয়।

ছেলেগুলোও তেমনি। ডাকলে পরেই যায়। মা, দিদি, বোন এবং বউদিরা যথেষ্ট বিদ্রূপ করেন।

তাঁদের ক্রুদ্ধ হবারও কারণ আছে বই কি! প্রথম দিকে সবাই আলাপ করতে এসেছিলেন।

'অসুবিধে হলেই বলবেন। এদিকে দোকানবাজার চিনে নিয়েছেন? মনে কিন্তু ভাব রাখবেন না।

যেমন বলতে হয়! যেমন লোকে ব'লে থাকে।

ঝিরঝিরে স্নিগ্ধ হাসিতে মুখটি ভরিয়ে সুগতা হাত জোড় ক'রে বলেছিল—'না না, আপনাদের বিব্রত হতে হবে না।'

আমাদের বাড়ী যাবেন, আপনার ত দেখছি ইস্কুলের চাকরি। তাড়াতাড়িই ছুটি হয়। গেলে পরে সময়টা কাটবে!

নিকটতম প্রতিবেশিনী কথাটি বলেন। তখন সুগতা বলেছিল—'না, পাঁচজনের বাসায় ঘুরে ঘুরে গল্পগুজব করতে ভালই লাগে না আমার।'

কথাটি সবাই মনে রেখেছে। ওরা কারো সঙ্গে মেশে না, ওদের বাড়ীতে কেউ আসে না। শুধু ছুটিতে সময় কাটায়। কি ক'রে কাটায় কে জানে।

তবু আপদেবিপদে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। সুগতার মাথা ফাটিয়ে ভদ্রলোক না হয় নিশ্চিন্তে অফিসে গেলেন, প্রতিবেশিনীরা নিশ্চিন্ত থাকেন কি করে?

অগত্যা ছেলেদের শরণাপন্ন হ'তে হয়। যা বাবা, দেখে আয়। কিছু খাবেটাবে না কি জিগ্যেস কর।

বিশেষ ক'রে 'দেখে আয়' কথাটার ওপর উদ্বেগ ঢেলে দেন মহিলা। যেন মনেই পড়ে না আজ সকাল অবধি হক না হক—ও বাড়ীতে যাবার জন্যে ঐ ছেলেকেই কত অনুযোগ জানিয়েছেন। ধমকটমক দেননি বটে, তবু অনুযোগের সুরটি যথেষ্ট তীক্ষ্ণ ছিল। ধমক দেবার দিন চলে গেছে। আজকালকার ছেলে শুভ্র—মা-র মুখে মুখে কোন চটাং চটাং উত্তর দেয়নি বটে, তবে তাচ্ছিল্য মিশ্রিত হাসিটুকু মুখে ধরে রেখে বলেছে—'মনটা বড় কর, ছোট ছোট জিনিষে এমন আবদ্ধ রেখ না, জানলে?'

সে হাসি দেখলে অঙ্গ জলে যায় সত্যি, কিন্তু কি আর করা যায়, দিনকাল এমনই যে পেটের ছেলেকেও রূঢ় ভাষায় শাসন করবার উপায় নেই।

শুভ্র ছেলেটি আবার বিশেষ করে সুগতার দুর্ভাগ্যে বিগলিত হৃদয়। বর্বর স্বামীর অত্যাচারে নির্যাতন সইতে দেখে বউটির ওপর মমতার শেষ নেই ওর।

কিন্তু সুগতা এমনই দুনিয়ার বাইরে' একটি জীব যে, শুভ্র আর ওকে সহানুভূতি জানাতে পারে না। সুগতা ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাসিতে ওর সব উৎসাহের'পরে জল ঢেলে দিয়ে বলে 'কি বললে আমার খাওয়া হয়নি? দেখছ না কেমন গুছিয়ে রেঁধে বেড়ে রেখেছি? ও আসবে, এক-সঙ্গে খাব।'

শুধু কি রান্নাবান্না? কপালে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে সুগতা

দিব্যি ঘরদোরও সাজিয়েছে। পরণেও একখানা ধোপ-ভাঙা শাড়ী।

বিকেলে কর্তা ফিরলেন একতোড়া ফুল হাতে। খুব হাসিগল্পের আওয়াজ শোনা গেল, দু'জনে বেড়াতে বেরুল সন্ধে নাগাদ। রাত হ'তে ঘরে নীল আলো জ্বলল, টুকরো টুকরো গানের কলিও শোনা গেল মাঝে মাঝে। দেখে-শুনে শুভ্রর মা বললেন—দেখা যাক ক'দিন থাকে এমন সদ্ভাব!

শুভ্র বন্ধুদের কাছে বলল—'মেয়েটির মোটেই প্রিন্সিপল নেই, জানলি?

হয়ত নেই, হয়ত সত্যিই সুগতার মনের জোর, আত্ম-সম্মান এ-সব বোধ নেই। নইলে ক'দিন বাদে আবার যখন ভদ্রলোক ওর কপালে জয়পুরী ফুলদানীটাই ছুঁড়ে মারলেন, সেদিন রীতিমত দক্ষযজ্ঞ বেধে গেল।

'কে বলেছে তোমায় মাষ্টারী করতে? চাইনে—তোমার পয়সায় কেনা জিনিষ চাইনে!'

ভদ্রলোক চেঁচাচ্ছেন আর সিঁড়ির ওপর ঠাস ঠাস ক'রে ছুঁড়ে মারছেন সব। কুশন, মোড়া, কাঁচের কুঁজো, ছাইদানী।

সেদিন ত' ফ্ল্যাটের সবাই একত্র হয়ে এসে জানালেন—'আর নয়, এবার আমরা সবাই দস্তখত দিয়ে থানায় চিঠি দেব। এসব হই-চই হাঙ্গামা হুজ্জুত চলতে দেব না। স্ত্রীকে মারধোর, গালিগালাজ নিত্যি নিত্যি, পেয়েছেন কি মশায়?'

সুগতার কপালটা সকলেরই চোখে পড়ছিল। রক্ত শুকিয়ে চাপ হ'য়ে আছে, এতখানি উঁচু হয়ে উঠেছে।

অবশেষে ভদ্রলোককে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সে নেমে এল। জিনিষপত্তর কুড়িয়ে বাড়িয়ে ঘরে গিয়ে উঠল। ভদ্রলোক গজগজ করতে করতে নেমে গেলেন।

প্রতিবেশিনীরা আজ আর সুযোগ ছাড়লেন না। সুগতার কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধলেন, একজন পাখা নিয়ে বাতাস করতে থাকলেন ঘন ঘন।

একটা চোখ ঢাকা। এক চোখেই কাঁদতে সুরু করল সুগতা। দিব্যি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। সে কান্না দেখেই বা ওঁদের মমতা কত! কেন ভাই, সহ্য করেন কেন? আত্মীয়-স্বজন কি কেউ নেই আপনার? আহা, নিজের লোক থাকলে কি এমন করে মারতে ভরসা পায়? আমাদের কথা শুনুন, কে আছে বলুন, ছেলেরা খবর দিয়ে আসুক।

সুগতার ফোঁপানি বেড়ে গেল—'খবর কাকে দেবে বলুন? খবর দেবার মত কেউ কি আছে?'

যার কেউ নেই তার ওপর সহানুভূতি হওয়াটাই ত স্বাভাবিক। তা ছাড়া সুগতার কথাবার্তা আজ যেন কারো গায়ে জ্বালা ধরাচ্ছে না। কথায় সে দুপুর রোদ্দুরের ঝাঁজ মোটেই নেই, বরঞ্চ কেমন যেন একটা ভিজে ভিজে ভাব। 'একে ত এই মানুষের ঘর করি, তবু আপনারা কাছে পিঠে আছেন! এখান থেকে তুলে দিলে যে কোথায় যাব!

'কি আশ্চর্য, তুলে দেবার কথা বলছে কে!'

'না, তা ত' আপনারা বলতেই পারেন। নিত্যি নিত্যি এত গোলমাল কি সহ্য হয়?'

'আহা সে-সব কথা পরে হবে।'

শুভ্র এসেও সেই কথাই বলল। বেশ গম্ভীর গলায়, বিষাদব্যঞ্জক হাসি হেসে 'আপনার স্বামীর মত সকলেই কিছু জ্ঞানকাণ্ড হারায়নি। এখনি কেউ তুলে দিতেও যাচ্ছে না। তবে আমাদের মনে হয়, আপনার কিছু একটা করা উচিত।'

'যা বলেছ!'

'আজকালকার মেয়ে আপনারা, একটু শক্ত হ'তে হয়।'

সুগতা ঘাড় কাত ক'রে তাতেও সম্মতি জানাল। কিন্তু সেদিন রাতেই আবার সেই নীল আলো জ্বলল—সন্ধিপর্বের সূচনা সংকেতের মত। এ-পাশ ও-পাশের ফ্ল্যাটের মানুষরা সুগতার বেহায়াপনার নতুন পরিচয় পেয়ে অবাক।

ঘরের জানলাই না নয় পর্দায় ঢাকা, তা ব'লে দরজায় কান পেতে কথা শুনতে ত' দোষ নেই? গদগদ কণ্ঠ, অস্ফুট কথা, চাপা হাসি।

'কি বলে তুমি ওদের অমন ইনিয়ে বিনিয়ে বললে সু?'

'আহা, না বললে আমাদের তুলে দিও না?'

'তা ব'লে ওদের কাছে···?'

'নইলে ওরা থানায় যেত না?'

'ওরা শুনল ?'

'হ্যাঁ গো, এমন ক'রে বললুম যে নিজেরই হাসি পাচ্ছিল।'

'এতও পার !'

'পারিই ত !'

'এর পরে আর ওদের সম্পর্কে আর কারো আগ্রহ থাকতে পারে ? আরো অসহ্য লাগে যখন দেখা যায় কেউ কথা কইল কিনা, সে বিষয়ে ওরা যেন অবহিতই নয়। নিজেরা নিজেদের নিয়েই মগ্ন। এই ঝগড়ার চীৎকার, এই গানের আওয়াজ। এই কান্নাকাটি গোলমাল, আবার আধঘণ্টা বাদে দুজনে জোরে জোরে একসঙ্গে কবিতা পড়ছে। একদিন ত, সকাল থেকে শুধু সেতারের সুরই শোনা গেল। সুর নয়ত' সুরের দাপাদাপি।

কে জানে ওরা কোন জাতের মানুষ !

কিন্তু একদিন চরম সর্বনাশ ঘটে গেল।

ঝগড়াঝাঁটি ওদের দু'দিন ধরেই চলছিল। ভদ্রলোক কখনো আসেন, কখনো আসেন না।

এবার যেন ব্যাপারটা বেশ গুরুতর। বরফ আর গলছে না। এতকাল দেখাগেছে সকালের ঝড়ঝাপটা বিকেলের মধ্যেই থেমে যায়, সন্ধ্যে নাগাদ ত রীতিমত নীল আলো, গানের টুক্‌রো, কখনো রেডিও-তে কখনো সুগতার গলায়।

এই মাঘ মাসেও ক'দিন আগেই সুগতা ভদ্রলোককে বেরকরে দোর বন্ধ করে দিয়েছিল। কি লজ্জার কথা, ভদ্রলোককে নিজের বাড়ীতেই শেষ পর্যন্ত দেয়াল টপকে ঢুকতে হ'ল। লজ্জার কথা মানে—যারা দেখে তাদের লজ্জা, ওদের আর কি ! ওদের ত ওসবের বালাই নেই বললেই চলে। নইলে তারপরও মানুষটা বউকে সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে বেড়াতে বেরোয় ?

এবাড়ীর জনমত এ-দিক ও দিক দুদিকেই কাৎ করেছে ঘাড়। একবার সুগতার হয়ে বলেছে—অমন স্বামী থাকবার চেয়ে···।

আবার ভদ্রলোককে শুনিয়ে শুনিয়েই বলেছে—আইন আছে আদালত আছে, অমন জাঁহাবাজ মেয়ের হাতে নিত্যি নাকাল হওয়া কেন ?

অনুকূল বাতাস না পেয়ে অবিশ্যি উত্তাপের স্ফুলিঙ্গ আপনিই নিভে গেছে। কে না জানে একপক্ষের অনুমোদন পেলে এই আগুনকেই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দাবানল ক'রে তোলা যেত।

তারপর মাস তিনেক ধরে সত্যিই কেউ কোন খবর রাখেনা। খবর রাখবেই বা কে ! যে-যার জীবন নিয়ে ভয়ানক রকম ব্যস্ত না ? ব্যস্ততারই ত' দিন কাল পড়েছে।

এখন এই ঘটনা।

বুঝি রাগের মাথায় ভদ্রলোক গিয়ে বদলীর জন্যে ধরাধরি করতেন অফিসে। আর সহ্য হয় না, যেখানে হোক বদলী করে দিন। যে কোন জায়গায় যেতে রাজী আছি। অহর্নিশি এ অশান্তি আর সয়না। রাগ পড়লেই আবার সে সব কথা ভুলে গেছেন। ওপরওলাও কখনো তাঁর কথায় তেমন কান পাতেননি। হয়ত এও জানতেন—বদলী করলে ভদ্রলোক মহামুস্কিলে পড়বেন। তিনি হুঁ হুঁ ক'রে হাসতেন আর বলতেন—'রাশ টানতে হয়, বুঝলেন ভায়া, রাশ টানতে হয়।'

পাঞ্জাবী ওপরওলা নতুন এসেই বারকয়েক ভদ্রলোকের কথাবার্তা শোনে। সদ্য এসেছে, অফিসে জনপ্রিয় হবার ইচ্ছে রাখে, দুমক'রে দিল বদলী করে।

তাই নিয়েই বুঝি ঝগড়া বাধে। তারপর একথা, ওকথা, কথায় কথা বাড়ে। দাম্পত্যজীবনে প্রলয় বাধাতে ঘটনার প্রয়োজন হয় না, কথাই যথেষ্ট—এ কে না জানে।

তারপর দুদিন ধ'রে চলেছে।

সুগতার গলার দাপটটাই বাড়ীর সর্বত্র ঝনঝন্ ক'রে বেজে বেড়াচ্ছে। ওপক্ষ একেবারে চুপচাপ। মাঝে মাঝে নেহাৎ অসহ্য হ'লে ভদ্রলোক বেরিয়ে আসছেন। মাথার চুল মুঠো ক'রে ধরে হনহন ক'রে খানিকটা হেঁটে আসছেন রাস্তাধ'রে। চোখ টকটকে লাল, মুখের চেহারা ভয়ঙ্কর। ওঁর রাগ চঞ্চল, রাগলে উনি আর স্ববশে থাকেন না তা সবাই জানে। তবু সুগতা এমন করে খুঁচিয়ে চলেছে কেন ? ও কি ওঁকে দিয়ে ভয়ঙ্কর কিছু করাতে চাইছে ?

শুভ্র বলল সিঁড়ি ধরে নামতে নামতে ভদ্রলোক না কি বিড়বিড় করে বলছিলেন 'আর না, আর সইতে পারছিনা।

সন্ধ্যে থেকে একেবারে চুপচাপ। উনোনে আগুন পড়লনা, ঘরে বাতিও জ্বললনা, শুধু সুগতার গলায় ঝিনঝিনে

কান্নার একটানা সুর। একবার, রাত তখন দশটা হবে, ভদ্রলোকের গলা শোনাগেল। আধা আর্তনাদ আধাদীর্ঘ-শ্বাসে মেলা নিগূঢ় যন্ত্রণায় কথাগুলো ছিটকে বেরিয়ে এল —'সু, এরপরে কিন্তু আমি আর দায়ী থাকবনা। তুমি নিজের কতবড় অনিষ্ট করছ বল ত? এখন, এই অবস্থায়··· তুমি কি আমায় পাগল ক'রে দিতে চাও?

তারপর বললেন—'হা ভগবান!

এই পর্যন্ত!

ভোরবেলা সে কি কাণ্ড! ওদের দরজা হাট ক'রে খোলা। সুগতা মাটিতে পড়ে আছে। কাঁধের কাছে অস্ত্রের আঘাত, ঘরে রক্তের চাপ।

ভদ্রলোক নেই।

তারপর নজরে পড়ল—গলায় গহনা নেই, হাতে নেই বালা। গৃহসজ্জায় দামী জিনিষ বলতে একটি খেলো রেডিও সেট, একটি ইলেকট্রিক ঘড়ি। ঘড়িটাও দেখা যাচ্ছে না।

সুগতা গোঙাতে গোঙাতে বলল—ভদ্রলোক নাকি রেগে রাত একটায় দোর খুলে বেরিয়ে যান। এই আসেন সেই আসেন ভেবে ভেবে, ও খোলাদরজার সামনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙতে দেখে ঘরে একটা লোক।

লোকটার বর্ণনা দিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কালো জোয়ান, মধ্যবয়সী, চেকসার্ট ও প্যান্ট পরণে, ছোট ছোট চুল।

সুগতা ডাকে নি কেন কাউকে?

প্রথমটা ভয়ে গলা কাঠ হ'য়ে গিয়েছিল। তারপর ডাকবার চেষ্টা করতেই ত এই দশা।

যে কথা একবার বলল, সেকথা থেকে সুগতাকে নড়ান গেল না। ও মোটে বুঝতেই চাইল না—ওর কথার বিপক্ষে আরো কত বাঘাবাঘা যুক্তি আছে।

নিচের বড় দরজার সামনে না হোক পাশেই চাকররা শুয়ে থাকে, তারা টের পেলনা কেন? একতলার রমণীবাবু অম্বলের জালায় সমস্ত রাতটাই বসে কাটিয়েছেন তিনি কিছু শোনেননি কেন? সবচেয়ে বড় কথা—দোতলার কুকুরটা রাতে বারান্দায় ছাড়া থাকে, সে কেন ডাকল না? অপরিচিত মানুষ দেখলে সে কি চুপ ক'রে থাকত?

সুগতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—'আমি যে দেখলুম জলজ্যান্ত মানুষটাকে। তাঁর খোঁজ করবেন না? আমার বালা, আমার হার।'

বেশ, চোর না হয় গহনা চুরি করতেই এসেছিল। কিন্তু গতরাত্রে ওর স্বামীর সেই কথা কয়টি। তা ছাড়া এ বাড়ীর সবাই জানে, কি চণ্ডালের মত রাগ ওর!

সুগতা কিছুতেই তার কথা ফেরালনা।

অবশেষে অনেক খোঁজাখুজির পর সন্ধান মিলল।

দারোগা বললেন—'দেখুন দিদি চিনতে পারেন কি না!

শ্রান্তিতে যন্ত্রণায় চোখ বুজে শুয়েছিল সুগতা।

অস্ফুটে বলল, 'হ্যাঁ, দেখলেই চিনব।'

'চেহারাটা মনে আছে ত?'

'মনে আবার নেই! কালো, জোয়ান, মাঝবয়সী লোকটা। চেকসার্ট আর প্যান্ট পরণে, মাথায় খোঁচা খোঁচা ছোট ছোট চুল।

'আপনাকে ছুরি দেখিয়েছিল?'

'দেখায়নি? ছুরি দেখিয়ে ও গয়না গুলো কেড়ে নিল, আমি চেঁচাতে যেতেই মারলে।'

দারোগা বললেন—'বুঝেছি। আচ্ছা এবার দেখুন ত!

সুগতা চোখ মেলে স্তম্ভিত হয়ে রইল। ভয়ে তার মুখ শাদা। না, আর ভুল নেই। মাঝারি চেহারা কুকঁড়ে গেছে, ফর্সা মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি, চোখের নিচে কালি। ঠোঁট দুটি কাঁপল বটে, তবে তারপরেই উদ্বেগ অবসানের আরামে যেন স্বস্তি পেলেন। একটু হেসে বললেন, দেখলে ত, মিছিমিছিই কষ্ট পেলে, এঁরা তোমার কথা একটুও বিশ্বাস করেননি।

দারোগাকে বললেন—'ও ভাবে চিরদিনই বুঝি আমাকে আগলে চলতে পারবে। দেখুননা কি সর্বনেশে মেয়ে। আমাকে ত বের করে দিলই। হার, বালা, ঘড়ি নিয়ে ফেলল কয়লার চৌবাচ্চায়।'

'আপনিও সাংঘাতিক লোক। উনি বাঁচলেন কি মরলেন, তা দেখবার জন্যে দাঁড়ালেন না?'

'সবই ত জানেন!'

'আগেকার জেলরেকর্ড আছে তাই ভয় পেয়েছিলেন?'

'আমি নয় ও।'

উনি বললেন, আপনি শুনলেন ?'

'কি করব বলুন, ওর একটা কথাও আমি ঠেলতে পারিনি, কোনদিনই নয়।

সুগতা এতক্ষণ একবার এর আরেকবার ওর মুখের দিকে চাইছিল। যেন কথা বুঝতে পারছেনা ও, এরা যেন অজানা ভাষায় কথা কইছে।

মজা দেখতে অন্যরাও ভীড় করেছে। শোভনতা শালীনতার কথা তুলে গিয়ে সুগতা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল— চাইনি, তোমায় ধরিয়ে দিতে চাইনি আমি। ওরা আমার কথা বিশ্বাস করলেনা।'

সত্যিই কেউ বিশ্বাস করল না।

ভদ্রলোক বলেন —আমার দোষ। সুগতা বলে—ছেড়ে দিন ওকে, আমরা যেখানে হোক চলে যাই।

বললে কি হবে, পুলিশ যখন কেস নিয়েছে তখন শেষ অবধি দেখতে হবে।

সুগতা কেঁদে বলল, কি অবিচার, আমার আঘাতে এত সাফল্য তবুও ?'

তবু ও। ভদ্রলোককে হাজতে যেতেই হ'ল। যাবার সময়ে জিগ্যেস করলেন—'তুমি কি করবে ?'

'জানি না।'

সুগতার কথা শুনে নতুন ক'রে সবাই অবাক মানল।

কিছুদিন পরেই সুগতা সে পাড়া ছেড়ে চলে গেল।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথম রবিয়ল মাসের ২৯শে তারিখ শনিবার আস্কারিকে মূল্যবান পাথরখচিত ছোরা, কটি-বন্ধনী, সম্মানসূচক রাজকীয় পোষাক, একটি পতাকা, ঘোড়ার লেজ, দামামা, তিনচার জাতীয় অশ্ব, দশটি হাতী, কয়েকটি উট ও খচ্চর, রাজজনোচিত সাজ সরঞ্জামসহ তাঁবুর আসবাবপত্র উপহার দিয়ে তাকে দরবার সভায় সকলের প্রথমে বসার অনুমতি দিই। মোল্লা দাদা আংককে এক জোড়া মূল্যবান বোতাম খচিত পাদুকা এবং তার অন্যান্য কর্ম্মচারীকে তিন × নয় (সাতাশটি) ফতুয়া দান করি। (মংগল ও তুর্কিদের নিয়মানুসারে ৩ × ৯ সংখ্যক দ্রব্য উপহার দেওয়া সৌভাগ্যসূচক)।

এই মাসের শেষ দিন রবিবার সুলতান মহম্মদ বকশিসের বাড়ী যাই। তার বাড়ীতে যাওয়ার রাস্তা মূল্যবান গালিচায় ঢাকা ছিল। সে আমাকে উপঢৌকন দেওয়ার আয়োজন করে। জিনিষপত্রে ও অর্থে যে পেশ-কোশ সে আমাকে প্রদান করে তার মূল্য দুই লাখেরও বেশী। আহার এবং উপঢৌকন নেওয়া শেষ করে আমরা অন্য কক্ষে যাই এবং সেখানে সিদ্ধির সরবৎ পান করি। বেলা তিন প্রহরের সময় আমি সেখান থেকে বেরিয়ে নদী পার হয়ে আমার নিজের প্রাসাদকক্ষে চলে আসি।

শেষ রবিয়ল মাসের ৪ তারিখ বৃহস্পতিবার চিকমাক বেগকে আগ্রা থেকে কাবুলের দূরত্ব মাপ করবার জন্য শীলমোহর যুক্ত রাজ আদেশ জারি করে। সেই আদেশে বলা হয় যে প্রতি নয় ক্রোশে একটি করে ছোট গম্বুজ তৈরী করতে হবে, তার মাপ হবে উচ্চতায় বার গজ এবং শীর্ষে থাকবে চন্দ্রাতপ। প্রতি দশ ক্রোশে থাকবে ছয়টি ঘোড়ার ডাকচৌকি। ডাকচৌকির তদারককারি,পত্রবাহক, ঘোড়ার সহিস এবং রসদের জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকবে। আরও আদেশ দেওয়া হয় যে, যদি ডাকচৌকির কাছে সরকারি খাস জমি থাকে তাহলে তারই আয় থেকে বরাদ্দ মাফিক অর্থ জোগান দিতে হবে। যদি এই ডাক-চৌকি কোনও পরগণার মধ্যে হয় তাহলে সেই পরগণার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বরাদ্দ অর্থ সরবরাহ করতে হবে। সেইদিনই চিকমার পাদসাহি আগ্রা ত্যাগ করে। ক্রোশের মাপ কি ভাবে ঠিক করা হয় নীচের কবিতায় তা উল্লেখ করা হলো।

(তুর্কিতে) এক ক্রোশ হয় চার হাজার পদক্ষেপে।
প্রতি পদক্ষেপ জেনে রাখ, দেড় হাত মাপে

প্রতি হাত হয় ছয় মুষ্টি পরিমাণ।
প্রতি মুষ্টি হয় ছয় ইঞ্চির সমান।
প্রতি ইঞ্চি ছয়টি যবের পরিসর।
এই মাপের কথা জেনে হও তৎপর।

একটি মাপের ফিতায় চল্লিশটি পদক্ষেপের পরিমাপের নির্দ্দেশ থাকে। প্রতি পদক্ষেপের মাপ দেড় হাতের সমান, এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এক পদক্ষেপ নয় মুষ্টি পরিসরের সমান। এই মাপের ফিতায় একশ'বার মেপে গেলে এক ক্রোশ হয়।

৬ই তারিখ শনিবার উদ্যানে আমি ভোজের ব্যবস্থা করি। উদ্যানের উত্তরের দিকে একটি আটকোণা পটমণ্ডপে বসবার স্থান স্থির হয়। এই মণ্ডপ সম্প্রতি নির্ম্মাণ করা হয় এবং উপরটা শীতলতার জন্য খসখস ঘাসে ঢাকা হয়। আমার দক্ষিণ দিকে পাঁচ ছয় গজ দূরে বুঘা সুলতান, আসকারি ও খাজা হুসেনি খলিফা, সমরকন্দ থেকে আগত লোকেরা, খাজার অধীনস্থ লোকজন, কোরাণ পাঠক ও মোল্লারা আসন গ্রহণ করেন। আমার বাঁদিকে পাঁচ ছয় গজ দূরে বসেন—মহম্মদ জেমান মির্জ্জা, আতেঙ্ক ইংসিমে সুলতান, সৈয়দ রফি, সৈয়দ রুমি, সেখ আবুল ফতে, সেখ জামালি, সেখ সাহাবুদ্দিন আরব এবং সৈয়দা দাকনি। এই ভোজোৎসবে কিজিলাস, উজবেক এবং হিন্দু দূতরাও উপস্থিত ছিল। দক্ষিণ দিকে ৭০।৮০ গজ দূরে একটি চাঁদোয়া খাটানো হয় যেখানে কিজিলবাসের দূতদের স্থান দেওয়া হয় এবং আমিরদের মধ্যে ইউনিস আলিকে তাদের পাশে বসবার জন্য নির্ব্বাচিত করা হয়। ঐ একইভাবে বামদিকে উজবেক দূতদের জন্য বসবার স্থান ঠিক করা হয় এবং আমিরদের মধ্যে আবদাল্লাকে তাদের কাছে বসার জন্য নির্ব্বাচিত করা হয়। আহার্য্য পরিবেশন করার আগে সমস্ত খাঁ, সুলতান, উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত লোক এবং আমিররা আমাকে লাল, সাদা এবং কালো রংয়ের মুদ্রা (স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা), বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য উপঢৌকন দেন। আমার সম্মুখে একটি পশমি গালিচা পেতে দেওয়ার নির্দ্দেশ দিই। তার উপর স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রা বর্ষণ হয়। রঙ্গিণ ও সাদা কাপড়ের উপহার, থলিপূর্ণ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার পাশে রাখা হয়। আহারের পূর্ব্বে যখন উপঢৌকন দেওয়ার ব্যাপার চলছে তখন সামনের দিকে একটি উচ্চ ভূমিখণ্ডে উট ও হাতীর ভয়ঙ্কর লড়াই দেখানো হয়। ভেড়ার লড়াই এবং পরে পালওয়ানদের মল্লযুদ্ধও চলতে থাকে। যখন আহার্য্য পরিবেশন করা হয় সেই সময় খাজা আবদুল সহিদ, খাজা কলোনকে মিহি তুলার সুতায় তৈরী মসলিনের এবং সম্মানসূচক আরও পোষাক উপহার দেওয়া হয়। মোল্লা ফারুক, হাফিজ এবং আরও তিনজন কাপড়ের ঢিলা গাত্রাবরণ পায়। কুচিন খাঁয়ের দূত ও হাসান চালেবির ছোট ভাইকে বহুমূল্য বোতামযুক্ত মসলিনের পরিচ্ছদ এবং নিজ নিজ পদমর্য্যাদানুযায়ী অন্যান্য পোষাক দেওয়া হয়। আবু সৈয়দ সুলতান এবং মেহেরবান খাতুনের দূতগণ ও মেহেরবান খাতুনের পুত্র পুলহাদ খানকে এবং সা হাসানের দূতগণকে বোতামযুক্ত কোর্ত্তা ও মূল্যবান কাপড়ের পরিচ্ছদ দেওয়া হয়। একটি সোনার তালকে রূপোর মাপ দিয়ে এবং একটি রূপোর তালকে সোনার ওজনের মাপ দিয়ে ওজন করা হয়। সেই সোনা ও রূপো দোস্ত খাজা ও কোচিন খাঁর দুই মহান দূত এবং হাসেন খাঁ চালেবির ছোট ভাইকে দেওয়া হয়। সোনার তাল ওজনে ছিল পাঁচশ মিককাল যা কাবুলের প্রচলিত ওজনে এক সের এবং রূপোর তাল ওজনে ছিল আড়াইশ' মিশকাল—যা কাবুলের ওজনের আধসের। খাজা মির সুলতানি, তাঁর পুত্রগণ, হাফিজ তাসকেন্দি, মোল্লা ফারুক এবং তাঁর অনুগতগণ, খাজার ভৃত্যগণ ও অন্যান্য দূতরা প্রত্যেকেই সোনা ও রূপার উপহার পায়। মির মহম্মদ জাহেলবান গঙ্গার উপর সেতু তৈরী করার সময় অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখানোর জন্য ভাল পুরস্কারলাভের যোগ্যতা লাভ করে। সে ও অন্যান্য বন্দুকধারী সৈনিক পালওয়ান হাজি মহম্মদ, পালওয়ান বালুল ও ওয়ালি পারশচি—প্রত্যেককে ছোরা উপহার দেওয়া হয়। সৈয়দ দাউদ গারমসিরি সোনা ও রূপার উপহার পায়। আমার কন্যা মাসুমার ও পুত্র জিন্দলের ভৃত্যগণ বোতামযুক্ত ফতুয়া এবং মূল্যবান কাপড়ের সম্মানসূচক পোষাক পায়। আন্দেজানের যে সব লোক দেশ ছাড়া গৃহ ছাড়া হয়ে আমার সঙ্গে যাযাবর জীবন যাপন করে সুখ, হোসিয়ার ও আরও অনেক জায়গায় ঘুরেছে আমার সেই সব বিশ্বস্ত প্রবীণ ব্যক্তিদিগকে সম্মান

সূচক পরিচ্ছদ, ফতুয়া, সোনা, রূপা এবং আরও অনেক মূল্যবান দ্রব্য দান করি। কুরবান, সেখির ও কামাদের অধিবাসীদের অনুরূপ ভাবে উপহার দেওয়া হয়।

আহার্য্য পরিবেশন করার সময় হিন্দুস্থানি ভোজবাজি-করদের আনা হয়। তারা তাদের কৌশল পূর্ণ ভোজবাজি দেখায়। যারা ডিগবাজির খেলা দেখায় এবং দড়ির উপর 'নৃত্য কৌশল দেখায়, তারাও তাদের খেলা দেখাতে থাকে। হিন্দুস্থানী ভেল্কিবাজিকররা এমন কতকগুলি খেলা দেখায় যা আমাদের দেশে কখনও দেখিনি। সেই খেলার একটি এইরূপ :—তারা সাতটি আংটি নিয়ে একটা রাখে কপালের ওপর, দুইটি দুই জানুর ওপর, অবশিষ্ট চারটির দুইটি রাখে দুইটি হাতের আঙ্গুলের ওপর এবং আর দুইটি রাখে পায়ের আঙ্গুলের ওপর। এই সব আংটি তারা একসঙ্গে অবিরাম দ্রুত ঘোরাতে থাকে। আর একটি খেলা এইরূপ :—তারা মাটির ওপর একটা হাত রেখে আর একটা হাত এবং দুই পা উঁচুতে তোলে। এই উত্তোলিত হাত ও পা এমন ভাবে বিস্তার করে যে দেখে মনে হয় যেন পেখম-মেলা ময়ূর। এই অবস্থাতেই তারা হাত ও দুইটি পায়ের ওপর তিনটি আংটি রেখে অনবরত ঘুর পাক খেতে থাকে।

আমাদের দেশে যারা ডিগবাজির খেলা দেখায় তারা দুইটি কাষ্ঠদণ্ড পায়ে বেঁধে সেই দণ্ডের ওপর ভর দিয়ে হেঁটে বেড়ায়। আর হিন্দুস্থানী ডিগবাজিকররা একটি মাত্র কাষ্ঠ-দণ্ডকে আশ্রয় করে তাতে পা না বেঁধে হাঁটার কসরত দেখায়। আমাদের দেশে দুইজন ডিগবাজিওয়ালা পরস্পর জড়াজড়ি করে ডিগবাজি খেলা দেখায়। এখানকার হিন্দু-স্থানি ডিগবাজিকররা তিন চারজন পরস্পরকে ধরে থাকে এবং পরস্পর জড়াজড়ি করে বৃত্তের আকারে ডিগবাজির কসরত দেখাতে থাকে। একটি বিশেষ খেলা এরা দেখিয়ে থাকে সেটি এই। একজন একটি ছয় সাত গজ মাপের বাঁশের নীচের দিকটা তার দেহের মাঝখানে খাড়া করে ধরে থাকে, আর অন্য একজন সেই বাঁশ বেয়ে উঠে বাঁশের ওপর খেলা দেখাতে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একজন ছোকরা ডিগবাজিওয়ালা এক বয়স্থ ডিগবাজি-করের মাথার ওপর চড়ে বসে। নীচের লোকটি এ পাশ ও-পাশ নানা কসরত দেখাতে দেখাতে দ্রুত হেঁটে চলে সেই ছোকরাকে মাথায় করে, আর সেই ছোকরাটিও মাথার ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নানা খেলা দেখাতে থাকে। নর্ত্তকীরা এই সময় তাদের নাচ দেখায়। সান্ধ্য নমাজের সময় অনেক স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা ছড়ানো হয়। এই সময় অনেক লোক জমায়েৎ হয়। খুব হৈ চৈ হতে থাকে। সান্ধ্য ও রাত্রির নমাজের মাঝামাঝি সময়ে আমার কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিকে আমার নিকট বসাই। রাত্রির প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হয়। পরদিন দুপুরের আগে আমি নৌকায় চড়ে হাস্ত-বেহেস্তে যাই।

সোমবার (২১শে ডিসেম্বর) আস্‌কারি এই সহর ত্যাগ করে পূর্ব্বদিকে অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। সে যাওয়ার আগে স্নানাগারে আমার কাছ থেকে বিদায় নেয়।

ঢোলপুরে পুকুর, বাগান ও প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য যে আদেশ দিয়েছিলাম সেগুলো দেখার জন্য মঙ্গলবার (২২শে ডিসেম্বর) যাত্রা করি। আমার উদ্যানপ্রসাদ থেকে সকালে দুই প্রহর এক ঘড়ির সময় (সকাল সাড়ে নয়টা) আমি অশ্বারোহণ করি এবং রাতের প্রথম প্রহরের পাঁচ ঘড়ির সময়ের (রাত আটটা) পর ঢোলপুর উদ্যানে পৌঁছাই।

বৃহস্পতিবার ইঁদার, ছাব্বিশটি নর্দ্দামা, স্তম্ভ ও জল-নিকাশী নালা তৈরীর কাজ শেষ হয়। এগুলি কঠিন পাথর কেটে কেটে করা হয়েছে। সেইদিন তৃতীয় প্রহরের সময় (দুপুর থেকে বেলা তিনটার মধ্যে) ইঁদারা থেকে জল তোলার কাজ আরম্ভ হয়। পাথর খোদাই করে মিস্ত্রি এবং অন্যান্য মজুরদের আগ্রার কারিগর ও মজুরদের প্রাপ্য মজুরির হিসাব অনুসারে বকসিস দেওয়া হয়। ইঁদারার জলে যাতে খারাপ স্বাদ না থাকে সেই জন্য চাকা ঘুরিয়ে ইঁদারা থেকে পনরো দিন দিনরাত অনবরত জল তুলে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়।

শুক্রবার সকালে প্রথম প্রহরের এক ঘড়ি সময়ে (পৌনে নয়টা) ঢোলপুর থেকে যাত্রা করি এবং সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঘোড়া থেকে নেমে নদী পার হয়ে আসি।

গিয়াসউদ্দিন কারচিকে জৌনপুর পাঠিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরে আসার আদেশ দিয়েছিলাম। সে ১৬ দিন অনুপস্থিত থাকার পর আজ (২৭শে ডিসেম্বর) ফিরে এলো। সুলতান জুনিদ ও তার কর্ম-

চারীরা সেই সময় সৈন্যসংগ্রহ করে করিদের (উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলার এক মহকুমা) অগ্রসর হয়। তার সঙ্গে দেখা করার জন্য গিয়াসউদ্দিনকেও সেই দিকে যেতে হয়, যার ফলে সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরে আসতে পারেনি। সুলতান জুনিদ মৌখিক জানায় যে, ভগবানের অসীম দয়ায় ওদিককার ব্যাপার এমন স্বাভাবিক যাতে স্বয়ং সম্রাটের উপস্থিতির প্রয়োজন হবেনা। একজন মির্জ্জা (সম্রাটপুত্র আসকারি) এলেই এ দিককার সুলতান, খাঁ ও আমিরদের আহ্বান করলেই তারা তাঁর সঙ্গে এসে দেখা করবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস সবই সন্তোষজনক ভাবে চলবে, সব ব্যবস্থাই ঠিক মত হয়ে যাবে। আমি এই রকম উত্তর সুলতান জুনিদের কাছ থেকে পেলেও মোল্লা মহম্মদ মজহাবের—যাকে বিধর্ম্মী সঙ্গর সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধের পর বঙ্গদেশে রাজদূত হিসাবে পাঠানো হয়েছে এবং যার ফিরে আসার প্রতি দিনই আশা করছি—কাছ থেকে বিশদ বিবরণ না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি।

১৫২৯ সালের ঘটনাবলী

শুক্রবার (১লা জানুয়ারি) আমি সিদ্ধির সরবৎ খাই। কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে যখন আমার গোপন কক্ষে বসেছিলাম সেই সময় মোল্লা মহম্মদ মজহাব এসে পৌছায়। সন্ধ্যায় সে আমার কাছে এসে সেলাম দেয়। আমি একের পর এক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঐ দিকের ব্যাপার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করি। জানতে পারি যে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ বশে আছে এবং সেখানে শান্তি বিরাজ করছে।

শনিবার আমি তুর্কি ও হিন্দুস্থানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আমার গোপন কক্ষে আহ্বান করি। তাদের সাথে আলোচনা করে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বাঙ্গালীরা যখন দূত পাঠিয়েছে এবং বশ্যতা স্বীকার করে শান্ত হয়ে আছে তখন আমার বঙ্গদেশে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই। আমার বঙ্গদেশে যাওয়ার দরকার না হলে ওদিকে এমন কোনও সম্পদশালী জনপদ নাই যেখানে গেলে সৈন্যরা আনন্দলাভ করতে পারে। বরং পশ্চিম দিকে এমন অনেক জায়গা আছে যেগুলি নিকটেও বটে, সমৃদ্ধিশালীও বটে।

(তুর্কিতে) 'দেশটা সম্পদশালী'
অধিবাসীও বিধর্ম্মী।
রাস্তাও বেশী নয়।
পূব দেশ অনেক দূরে,
এ দেশটা তো হাতের কাছে।'

অবশেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে আমি পশ্চিম দিকে অভিযান করবো—কারণ এই দিকটাই নিকট। অভিযান সুরু করতে আমি কয়েক দিন বিলম্ব করি। পূব দিকের ব্যাপারটায় একটা নিশ্চিন্ততার ভাব মনে না জাগা পর্য্যন্ত অভিযানে বের হতে দ্বিধা করছিলাম। এইজন্য গিয়াসউদ্দিন কারচিকে আর একবার ঐ দিকে নির্দ্দেশ দিয়ে পাঠাই যে, সে যেন দিন কুড়ির মধ্যে সমস্ত সংবাদ জেনে ফিরে আসে। তার হাতে পূব দিকের আমিরদের নিকট আমার হাতে লেখা ফর্ম্মান পাঠিয়ে দিই। তাতে এই ইচ্ছা প্রকাশ করি যে ওদিকে গঙ্গার অপর পারের সমস্ত সুলতান, খাঁ এবং আমিররা যেন আসকারির সঙ্গে যোগ দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে বের হয়। আমি গিয়াসুদ্দিনকে বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ দিই যে ফর্ম্মান বিলি করার পর সে যেন নিজে ঐদিককার সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে তাড়াতাড়ি ধার্য্য সময়ের মধ্যে আমার কাছে ফিরে আসে।

এই সময় মহম্মদ গোকুলতাশের কাছ থেকে এই সরকারি সংবাদ আমার কাছে পৌছায় যে বেলুচিরা আবার বিদ্রোহ করেছে এবং নানা স্থানে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চিন তাইমুর সুলতানকে এই আদেশ দিয়ে পাঠাই যে সে যেন সিরহিন্দ, সামান ও আর আর নিকটস্থ জায়গার আমিরদের—যেমন আদিল সুলতান, সুলতান মহম্মদ দুলদাই, খসরু গোকুলতাস, মহম্মদ আলি জং জং, দিলওয়ার খাঁ, আহম্মদ ইউসুফ, সা মনসুর বিরলাস, আব্দুল আজিজ, মির আখুর, সৈয়দ আলি, ওয়ালি কিজিলবাস, কিরাচ হালাহিল, আসিখ বেকাওয়েল, সেখ আলি কিতে, গজর খাঁ এবং হাসান আলি সিওয়াদি—সমবেত করে। তারা ছয়মাসের জন্য তাদের সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চিন্ তাইমুরের সঙ্গে যোগ দিয়ে বেলুচিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে এই নির্দ্দেশও দিই। আরও আদেশ দিই যে তারা

যেন চিন তাইমুরের নির্দ্দেশমত একত্রে সমবেত হয় এবং তার আদেশ মেনে নিয়ে কাজ করে। আমার এই সব আদেশ জারি করার জন্য আব্দল গোফুরকে বিশেষ পত্র-বাহক নিযুক্ত করি। ঠিক হয় যে আমার ফর্ম্মান নিয়ে প্রথমে সে চিন্ তাইমুর সুলতানের কাছে যাবে। পরে, যে সব আমিরদের নাম ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের কাছে আমার ফর্ম্মানও পৌছে দিয়ে তাদের সসৈন্যে তাইমুর সুলতানের নির্দ্দেশ মত স্থানে সমবেত করার ব্যবস্থা করবে। আব্দুল গোফুরকে আদেশ দেওয়া হয় যে, সে নিজে সৈন্যদলের সঙ্গে থাকবে এবং মাঝে মাঝে চিঠি লিখে জানাবে যে কোনও লোক আলস্য ও নিরুৎসাহভাব দেখাচ্ছে কিনা। যদি তা দেখায় তাহলে সেই দোষী ব্যক্তিকে তার পদবী কেড়ে নিয়ে কর্ম্মচ্যুত করা হবে এবং তাকে শাসনভার থেকে মুক্ত করে পরগণা থেকে দূর করে দেওয়া হবে। এই সব আদেশপত্র লিখে আব্দুল গোফুরের হাতে দিয়ে এবং মৌখিক আরও উপদেশ দিয়ে তাকে রওনা করে দিই।

রবিবার সকালে (১০ই জানুয়ারি) যমুনা পার হয়ে ঢোলপুরের বাগ-ই নিলফুরে (কমল উদ্যানে) তৃতীয় প্রহরের শেষাশেষি সময়ে আসি। এই উদ্যানের কাছাকাছি কয়েকজন আমির ও সভাসদ নিজ নিজ ব্যয়ে প্রাসাদ ও উদ্যান নির্ম্মাণ করবে বলে কয়েকখণ্ড জমি নির্ব্বাচন করা হয়। প্রথম জুমাদা মাসের ৩রা তারিখ বৃহস্পতিবার (১৪ই জানুয়ারি) স্নানাগার নির্ম্মাণের জন্য উদ্যানের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে একটি স্থান ঠিক করি। এই উদ্দেশ্যে সেই স্থানটি পরিষ্কার করা হয়। নির্দ্দেশ দিই যে ঐ জায়গায় উঁচু ভিত্তির ওপর ভাল মাল-মশলা দিয়ে স্নানাগার ও স্নানাগারের একটি কক্ষে কুড়ি বর্গফুট পরিমাপে একটি জলাধার নির্ম্মাণ করতে হবে।

সেই দিনই আমি আগ্রা থেকে খালিবে প্রেরিত কাজি জিয়া ও নর সিং দেওয়ের লেখা চিঠি থেকে জানতে পারি যে ইসকান্দারের পুত্র মহম্মদ বেহার অধিকার করেছে। এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি সসৈন্যে অভিযানে বের হওয়ার সঙ্কল্প করি। পরদিন শুক্রবার সকালে ছয় ঘড়ি বেলার সময় (প্রায় সকাল সাড়ে আটটা) অশ্বারোহণে নিলফুর উদ্যান ত্যাগ করে সান্ধ্য নমাজের সময় আগ্রায় পৌছাই। পথে মহম্মদ জেমান মিরজার সঙ্গে দেখা হয়। সে ঢোলপুরের দিকে আসছিল। চিন তাইমুর সুলতানও সেই দিনই আগ্রায় পৌছায়।

পরদিন শনিবার সকালে আমি আমিরদের পরামর্শ-সভায় যোগ দিতে ডেকে পাঠাই। আলোচনা করে ঠিক হয় যে প্রথম জুমাদা মাসের ১০ই তারিখ (২১শে জানুয়ারি) বৃহস্পতিবার আমরা পূর্ব দিকে রওনা হবো। সেই শনিবারেই কাবুল থেকে যে চিঠি আসে তা থেকে জানতে পারি যে—হুমায়ুন ঐ দিকের প্রদেশগুলি থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে সুলতান উইসকে সঙ্গে নিয়ে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সহ সমরকন্দের দিকে অভিযানে বের হয়ে গেছে। সুলতান উইসের ছোট ভাই সা কুলি এগিয়ে গিয়ে হিসারে প্রবেশ করেছে। তারমেজ থেকে বেরিয়ে তারসুন মহম্মদ সুলতান কারাদিয়ান অধিকার করেছে এবং আরও সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে। হুমায়ুন কিছু সৈন্য এবং একদল মোগলকে সঙ্গে দিয়ে তুলিক গোকুলতাস ও মির খুর্দকে তার সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছে এবং নিজেও তাদের পিছু পিছু গিয়েছে।

প্রথম জুমাদা মাসের ১০ই তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল তিন ঘড়ির পর (সকাল প্রায় সওয়া সাতটা) পূব দেশের দিকে যাত্রা করি। নৌকায় যমুনা নদী পার হয়ে জলেশিরের কিছু উজানে বাগ-ই জারেফসানে (স্বর্ণবর্ষী উদ্যানে) আসি। আদেশ দিই যে ঘোড়ার লেজের পতাকা, দামামা, অশ্ব এবং সমস্ত সৈন্য উদ্যানের বিপরীত দিকে নদীর অপর পারে থাকবে। যদি কেউ সম্রাটকে কুর্নিশ করার জন্য আসতে চায় তাহলে সে নৌকায় নদী পার হয়ে আসবে।

শনিবারে বঙ্গদেশের রাজদূত ইসমালি মিতা নজরাণা নিয়ে আসে ও হিন্দুস্থানের রীতি অনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করে। অভিবাদন জানানোর উদ্দেশ্যে একটি তীর নিক্ষিপ্ত হলে যতদূর যায় ততদূরে সে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করবার পর সরে যায়। তারপর তাকে রীতি অনুযায়ী সম্মান-সূচক পোষাক দেওয়ার পর আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের রীতি অনুযায়ী তিনবার নতজানু হয়ে ভূমি স্পর্শ করার পর সে এগিয়ে এসে নজরাত সার

চিঠি আমাকে দেয়। তারপর যে সব উপঢৌকন সে নিয়ে এসেছিল সে সব দেওয়ার পর বিদায় গ্রহণ করে।

সোমবার (২৫শে জানুয়ারি) খাজা আবদুল হক পৌছানোর পর আমি নৌকায় নদী পার হয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

মঙ্গলবার (২৬শে জানুয়ারি) হাসান চালেবি আমাকে অভিবাদন জানাতে আসে।

সৈন্য সজ্জার জন্য কয়েকদিন চারবাগে অবস্থান করি।

প্রথম জুমাদা মাসের ১৭ই তারিখ বৃহস্পতিবার (২৮শে জানুয়ারি) সকাল তিনঘড়ির সময় (সওয়া সাতটা) আবার সসৈন্যে যাত্রা সুরু করি। একটি নৌকায় চড়ে আগ্রা থেকে সাত ক্রোশ দূর আনওয়ার গ্রামে পৌছে তীরে অবতরণ করি।

রবিবার (৩১শে জানুয়ারি) উজবেক দূতদের বিদায়-কালীন দর্শন দি। কুচিম খাঁর দূত আমিন মির্জ্জাকে একটি ছোরা, একটি জমকালো ছুরিসহ কোমরবন্ধ, এবং সত্তর হাজার ক্ষুদ্র রৌপ্য মুদ্রা (এক একটি প্রায় এক পেনির সমান) উপহার স্বরূপ দিই। আবু সৈয়দ সুলতানের কর্ম্মচারী মোল্লা তাঘাইকে এবং মেহেরবান খানমের ও তার পুত্র পুলাদ সুলতানের ভৃত্যদের তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী অর্থ ছাড়াও বোতাম যুক্ত কোর্ত্তা ও মখমল কাপড়ে তৈরী সম্মানসূচক পোষাক দান করি।

পরদিন (১লা ফেব্রুয়ারি) খাজা আবদুল হক বিদায় নিয়ে আগ্রাতে বাস করার জন্য রওনা হন। খাজা ইয়াজিয়ার নাতি খাজা কালান যিনি উজবেকের সুলতান ও খাদের দূতের সঙ্গে এসেছিলেন, সমরকন্দে ফিরে যাওয়ার পূর্ব্বে আমার সঙ্গে বিদায়কালীন দেখা করেন।

হুমায়ুনের পুত্রসন্তান-জন্ম ও কামরাণের বিবাহ এই দুই শুভ ব্যাপারে আমার আনন্দের অভিব্যক্তি স্বরূপ মির্জ্জা তাব্রিজি ও মির্জ্জা বাগ তাঘাইকে এই দুইজন সম্রাট-পুত্রের কাছে দশ হাজার সারুখি উপহার দিয়ে পাঠাই। তারা একটি করে পোষাক ও কোমরবন্ধও নিয়ে যায়, যা আমি নিজে ব্যবহার করতাম। হিন্দলের জন্য মোল্লা বেহিস্তের হাতে একটি মিনা করা ছোরা ও কোমরবন্ধ, একটি রত্নখচিত দোয়াত-দানি, ঝিনুক বসানো কাঠাসন, কোমরবন্ধসহ ঢিলে জামা এবং বাবর লিপির একটি বর্ণ-মালা পাঠাই। মির্জ্জা বেগ তাঘাইয়ের হাত দিয়ে কামরাণের কাছে হিন্দুস্থানে আসার পর আমি যেসব কবিতার অনুবাদ করেছি ও যে সব মূল কবিতা নিজে লিখেছি তার নকল এবং বাবর লিপিতে লেখা চিঠি পাঠাই।

মঙ্গলবার (২রা ফেব্রুয়ারী) আমার লেখা চিঠিগুলি যারা কাবুলে যাচ্ছে তাদের হাতে দিয়ে বিদায় জানাই। মোল্লা কাসিম, পাথরখোদাইকার ওস্তাদ সা মহম্মদ, মিরেক মির ঘিয়াস, পাথরখোদাইকার মির, সা বাবা বেলদারের (ইদারা ও পুকুর খননকারক) সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে আগ্রায় ও ঢোলপুরে যে সব অট্টালিকা নির্ম্মাণ শেষ করতে হবে সে সম্বন্ধে আমার মনের অভিলাষ কি তাদের বুঝিয়ে দিলাম এবং এই সব কাজের ভার তাদের উপর অর্পণ করে তাদের বিদায় দিলাম। প্রথম প্রহরের শেষে (সকাল প্রায় নয়টা) আনোয়ার ত্যাগ করার জন্য অশ্বা-রোহণ করি ও দুপুরের নমাজের পর চাঁদওয়ারের এক ক্রোশের মধ্যে আবাপুর গ্রামে এসে থামি। (ক্রমশঃ)

দরজা

সঙ্কর্ষণ রায়

চাবি দিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিল জয়ন্ত। দরজাটা খুলতেই সুন্দরভাবে সাজানো একটা ঘর রমলার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। আসবাবের আতিশয্য নেই, স্বল্প উপকরণের সুসমঞ্জস সমাবেশে নিখুঁত একটা শিল্প-কর্মের মত মনে হচ্ছিল ঘরটাকে। বাইরের ঘরের পাশে শোবার ঘর। সেখানে খাট, ড্রেসিং টেবিল ও কাশ্মীরী কাজ করা টিপয়ের ওপর রাখা জয়পুরী ফুলদানি। বাইরের রৌদ্রদগ্ধ বিরস বিবর্ণ রসশূন্যতাকে ঘরের ছায়া-সুশীতল অভ্যর্থনায় সিক্তিত করার এম্নি একটি নিপুণ আয়োজন রমলার ঘর বাঁধার স্বপ্নের মধ্যে জড়িয়ে ছিল এতদিন। তার সেই স্বপ্ন প্রত্যাশাতীতভাবে ফ্ল্যাট বাড়িটির মধ্যে মূর্ত হ'তে দেখে রমলার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না। এর কোনও রকম পূর্বাভাস না দিয়ে জয়ন্ত যে তাকে এম্নি অবাক ক'রে দেবে, তা' সে ভাবেনি কখনো। সমস্ত ফ্ল্যাটবাড়ি জোড়া যে সুরুচি-সম্পন্ন শিল্পীমনের স্বাক্ষর পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তা' যে জয়ন্তরই—ভাবতে রমলার মন বিস্ময়মিশ্রিত পুলকে যেন গান গেয়ে ওঠে। জয়ন্তকে যেন এই মুহূর্তে নতুন ক'রে চেনার পালা এসেছে তার।

জয়ন্তর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধ নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে রমলা নিবিড় স্বরে বললে, সত্যি জয়ন্ত, এত দিনেও যেন তোমাকে চিনে উঠতে পারি নি। অথচ আমার মনে প্রচ্ছন্ন একটা গর্ব ছিল যে তোমাকে আমি পুরোপুরি জানি। আমি স্বপ্নেও ভাবি নি যে তুমি ফ্ল্যাট বাড়িটা এমন সুন্দরভাবে, ঠিক আমারই মনের মতনটি ক'রে সাজিয়ে রাখবে।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে জয়ন্ত ঈষৎ অপ্রস্তুতভাবে বললে, আমি তো সাজিয়ে রাখিনি—সাজানো ফ্ল্যাটই পেয়ে গেছি। তোমাকে কী বলিনি রমু—যে পুরোপুরি ফার্নিশ্‌ড্ ফ্ল্যাট ভাড়া করেছি!

তুমি সাজিয়ে রাখ নি:—রমলা মনে মনে আচমকা একটা বড় রকমের ধাক্কা খেল।

—ফ্ল্যাটটা তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

পছন্দ!—রমলার গলার স্বর কী রকম যেন স্তিমিত হ'য়ে আসে।—তা' এক রকম হ'য়েছে। কিন্তু তুমি তো কালই মণিপুর রওনা হচ্ছ—ফিরবে সেই সাত মাস বাদে। এতগুলো মাস মিছিমিছি ভাড়া গোণার দরকার কী!

জয়ন্ত বললে, দরকার আছে বই কি। এখন যদি ভাড়া না নিই, ফ্ল্যাটটা হাতছাড়া হ'য়ে যাবে নিশ্চয়ই। সাত মাস বাদে ফিরে এসে আবার সেই ওয়াইল্ড গুজ্ চেজিং-এর মত বাসা খোঁজা—ভাবতেও আমার হৃৎকম্প হয়। এতদিন তো কেবলমাত্র মনের মত বাসা খুঁজে পাই নি ব'লে আমরা বিয়ে করতে পারি নি।

ম্লান হেসে রমলা বললে, কিন্তু বাসা পেতেই তো তুমি বাসাছাড়া হচ্ছ। এদিকে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারকে নোটিস দিয়ে বিয়ের দিনক্ষণ পাকা করা হ'য়েছিল।

সিগারেট ধরিয়ে জয়ন্ত বললে, কী করব বল। চাকরি তো আমাদের পরিকল্পনাকে খাতির ক'রে চলবে না। আর চাকরি যখন করতেই হ'বে, তখন চাকরির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে না নিয়ে উপায় কী।

রমলা গম্ভীর মুখে বললে, তোমার চাকরির সঙ্গে না হয় মানিয়ে নিলুম নিজেকে, কিন্তু আর কারুর সাজানো ঘরের সঙ্গে কী পারব নিজেকে মানিয়ে নিতে! এ ঘরটাকে নিজের ঘর ব'লে যে মনেই হ'বে না!

ঈষৎ তিক্তকণ্ঠে জয়ন্ত বললে, একটা নির্জীব ঘর আমাদের দুজনকে ছাপিয়ে যাবে বলতে চাও! সাত আট

বছর ধ'রে তোমাকে চিনি—কিন্তু তোমার হেঁয়ালিগুলোকে কিছুতেই চিনে উঠতে পারলাম না। শোন রমু, আমি প্র্যাক্‌টিক্যাল মানুষ, ভাল একটা বাসা যখন পেয়েছি, তোমার সেন্টিমেন্টের খাতিরে তাকে ছাড়তে পারব না। এ বাসা থাকবে। সাত মাস বাদে পয়লা জুলাই তারিখে সন্ধ্যাবেলায় আমি এসে পৌছাব। সোজা এখানে এসে উঠব। জেনিথ হোটেলের আস্তানা গুটিয়ে ফেলছি। তুমি এখানে চ'লে এস আমি আসার আগে।

—তুমি আসার আগে আসব!

—হ্যাঁ। পয়লা জুলাই সন্ধ্যাবেলায় আমি আসব, একটু আগে—মানে বিকেলের দিকে তুমি এস। ফ্ল্যাটটাকে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখবে আর কি। সেদিন রাত্রেই আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছি কি না। রেজিষ্ট্রারকে বলেছি। বন্ধুদেরও অগ্রিম নেমন্তন্ন ক'রে রেখেছি। তুমিও তোমার বন্ধুনীদের ব'লে রাখতে পার। বিয়ের পর গ্রেট ইষ্টার্ণে ভোজ।

মুখ নীচু ক'রে রমলা বললে, একা আসতে যে আমার ভয় করবে!

জয়ন্ত রমলার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললে, কিসের ভয়! আমার জন্য সব ছাড়ার দুঃসাহস আছে তোমার, একা এখানে আসতেই শুধু ভয়! তোমাদের বাড়ি থেকে এ পাড়া এমন কিছু দূর নয়।

ক্ষীণ স্বরে রমলা বললে, সব দূরত্ব কী তোমার গজের ফিতেয় মাপা যায়! তুমি তো জান, বাবা-মার অনুমতি না নিয়েই আমাকে আসতে হ'বে। পথ যতটুকু হোক, চিরদিনের মত আমার এতদিনের আশ্রয় ছেড়ে আসবার উপযুক্ত শক্তি তুমি সঙ্গে না থাকলে পাব কী না জানি নে জয়ন্ত।

গলার স্বর নরম ক'রে জয়ন্ত বললে, পাবে বই কি। যে শক্তি সব বাধা ডিঙিয়ে তোমাকে আমার কাছে টেনেছে, সেই শক্তিই তোমাকে নিয়ে আসবে এখানে।

জয়ন্তর আশ্বাসে রমলা আশ্বস্ত হ'ল কি না বোঝা গেল না। তবে তাকে নীরব থাকতে দেখে জয়ন্ত এই প্রসঙ্গের ওপর দাঁড়ি টেনে দিয়ে বললে, এই নাও, ফ্ল্যাটের চাবিটা রেখে দাও তোমার কাছে। সাবধানে রেখো। এর ডুপ্লিকেটটা রয়েছে আমেরিকায় বাড়ির মালিকের কাছে। মালিকের খুড়োমশাই অবশ্য বলেছেন যে ভাইপোকে লিখে ওটা আনিয়ে দেবেন।

যন্ত্রচালিতের মত হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিল রমলা।

মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য এনে জয়ন্ত বললে, চাবি তোমার কাছে রইল। কাজেই তুমি যদি দরজা খুলে না দাও, আমার সাধ্য থাকবে না ঘরে ঢোকার।

রমলা রাগ ক'রে বললে, কী যে বল তার ঠিক নেই। এই নাও, চাইনে তোমার চাবি। না হয় ফ্ল্যাটের দোর গোড়ায় ব'সে থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

হেসে উঠে জয়ন্ত বললে, আহা, রাগ কর কেন রমু! সামান্য ঠাট্টাও বোঝ না!

নির্দিষ্ট দিনে বিকেলে নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে এসে পৌছল রমলা। "ল্যাচ্-কি" দিয়ে দরজা খুলে ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে রমলার মনে হ'ল, তাদের বাড়ি থেকে সামান্য পথটুকু আসতে তার সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। অবশিষ্ট আছে শুধু একটা রিক্ততাবোধ।

ফ্ল্যাটের তিনটা ঘর পরিষ্কার করতে বেশি সময় লাগল না। তারপর বসবার ঘরে এসে বসে রমলা শূন্যতার গুরুভার নিয়ে।

এই ঘর তাঁকে তার প্রাক্তন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ঘরটির মধ্যে যেন একঘরে ক'রে রেখেছে। ঘর নয়, যেন অভিমন্যুর ব্যূহ। এতে ঢুকতে পেরেছে সে শুধু, বেরোবার পথ জানে না।

ভয় পায় রমলা। ভবিষ্যতের কোনও রঙিণ ছবি নয়, অনিশ্চিত রহস্যময়তা ঘরের নীলাভ দেয়ালগুলি থেকে যেন ভ্রূকুটি হানে।

এ ঘরের সঙ্গে তার ঘরবাঁধার কল্পনা যেন খাপ খায় না। আসবাবপত্র দিয়ে যে এই ঘরটাকে সাজিয়েছে, সেই অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তিটি যেন অদৃশ্যভাবে সমস্ত ঘরটা জুড়ে বিরাজ করছে। যেন সেই অদৃশ্য উপস্থিতির আড়ালে জয়ন্ত ক্রমশঃ প্রচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে।

এ ঘরে ব'সে জয়ন্তর মুখখানাও যেন সে পারে না স্মরণ করতে।

হাতব্যাগ থেকে জয়ন্তর একটি ছোট সাইজের ছবি বের ক'রে এনে ছবিটির মধ্যে আশ্রয় খোঁজে রমলা। জয়ন্তর

জন্য সে সব ছেড়েছে, তার জীবনে তাকে পুরোপুরি বরণ করবার মত প্রস্তুতি না থাকলে বিশ্বসংসারে কোন আশ্রয় থাকবে না তার জন্য।

ফ্ল্যাটের ঘরগুলির মধ্যে জয়ন্তকে নিয়ে তার গৃহস্থালীর অনেক রঙিণ মধুর ছবি কল্পনার তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে সে।

সন্ধ্যা হ'তে অনেক যত্নে সাজ করে রমলা। আজকের দিনটির জন্য আলাদা ক'রে রাখা ছিল গাঢ় লালরঙের একটি রেশমী শাড়ি। প্রসাধন সেরে শাড়িটি পরল সে। ঘরের মধ্যে রঙের হিল্লোল ওঠে।

ভীরু প্রতীক্ষা। বুকের ভেতরটা দুর দুর করছে। যেন যাকে চেনে না, জানে না, তার সঙ্গে চরম পরিচয়ের মহালগ্নটি এগিয়ে আসছে।

জয়ন্তকে বহুবছর ধ'রে চেনে রমলা। প্রতিদিনের ব্যবহারে, আচরণে, কথাবার্তায়—আর প্রতি মুহূর্তের অস্তিত্বে নিঃশ্বাসবায়ুর মত অপরিহার্যভাবে তাকে জেনে এসেছে এতকাল। কিন্তু হঠাৎ কোন্ মন্ত্রবলে মনে হচ্ছে যেন সম্পূর্ণ এক অচেনাকে চিনে নেবার পালা এসেছে তার। এই যে দেহে-মনে লজ্জা ও পুলকের তড়িৎ প্রবাহে তিমিরবিদারী একটা অজ্ঞাত বিস্ময়ের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠছে, সে কী তার এতদিনের অতিচেনা ঐ জয়ন্ত আসবে ব'লে!

পুরোণো জানা-শোনার মধ্যে এল বুঝি নতুন ক'রে আবিষ্কার করবার লগ্ন।

ঘড়ির ঘণ্টা-মিনিটের কাঁটা দুটি ধীরে ধীরে আটটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বসবার ঘরের সোফায় ব'সে রমলা বহুদূরাগত একটা পদধ্বনি যেন তার বুকের মধ্যে শোনে। অনেক দূর থেকে অন্তবিহীন পথ অতিক্রম ক'রে তার জীবনে এসে পৌছবার জন্য একটি দুঃসাহসী পৌরুষের অভিযান যেন সে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করে।

সন্ধ্যা থেকেই টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল—কখন যে তার বেগ বেড়ে গেছে আত্ম-নিমগ্ন রমলা তা' টের পায়নি। হঠাৎ জানালার শার্সির ওপর উদ্ভাসিত বিদ্যুৎলেখায় সচকিত হ'য়ে রমলা যেন স্বপ্নঘোর থেকে জেগে উঠে বসল।

যে পদধ্বনি তার মনের মধ্যে এতক্ষন গানের সুরের মত বেজে যাচ্ছিল, হঠাৎ যেন তা' বাইরের প্রচণ্ড দুর্যোগের মধ্যে হারিয়ে গেল। বাইরের নিরেট আঁধারের মত একটা আশঙ্কা তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে তার সমস্ত অন্তরাত্মাকে সঙ্কুচিত ক'রে তোলে। সেই পদধ্বনি দুর্যোগের প্রান্তে এসে বুঝি চিরদিনের মত থেমে যাবে। একলা ব'সে তার এই প্রতীক্ষার বুঝি আর অন্ত থাকবে না।

রাত আটটা বাজল। রুদ্ধশ্বাসে দরজার দিকে তাকায় রমলা। এক একটা মুহূর্ত যেন অনন্তকালের মত চেপে বসে তার বুকের ওপর।

হঠাৎ দরজার হাতলটি ন'ড়ে উঠল। দুর্যোগের বাধা না মানা দুঃসাহসী অভিযানের অবসান হ'ল বুঝি। হৃৎ-কম্পতাড়িত বক্ষে উঠে দাঁড়ায় রমলা।

দরজা খুলে গেল। বাইরের অন্ধকারের পটভূমিকায় এ কে এসে দাঁড়িয়েছে তার দ্বারপ্রান্তে! এ তো জয়ন্ত নয়! একে সে চেনে না। চিৎকার ক'রে উঠতে যাবে সে, এমন সময় আগন্তুকটি তাকে প্রশ্ন করল, কে আপনি?

প্রশ্নটি শুনে রমলা থতমত খেয়ে যায়। লোকটির মুখের পানে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে সে বললে, প্রশ্নটি আমারি করার কথা আপনাকে। এ ফ্ল্যাটটা যখন ভাড়া নিয়েছি, এখানকার মালিকানা আপাততঃ আমারি ব'লে ধ'রে নিতে পারি। কাজেই আপনার এই অনধিকার প্রবেশের জন্য আমারি অধিকার আছে আপনাকে প্রশ্ন করার যে—আপনি কে এবং কেনই বা এসেছেন এখানে—ফ্ল্যাটের চাবিই বা পেলেন কোথায়?

লোকটির দু'চোখে ফুটে ওঠা অকপট বিস্ময়ের মধ্যে কৌতুক ঝিলিক দিয়ে ওঠে। সে বললে, ফ্ল্যাটের একটি চাবি বরাবর আমার কাছেই ছিল। সেটা অসঙ্গত কিছু নয়—কারণ এই সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট বাড়িটা আমার এবং এই ফ্ল্যাটটাতে আমিই থাকতুম। বীরেনকাকাকে বারণ করেছিলুম এ ফ্ল্যাটটা ভাড়া দিতে—কিন্তু দেখছি তিনি আমার বারণ শোনেন নি। আসবাবপত্র দিয়ে ফ্ল্যাটটা সাজিয়ে রেখে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম হয়তো স্থায়ী-ভাবে কখনো এখানে থাকবার সুযোগ আসবে আমার জীবনে।

রমলা চমকে উঠে বললে, আপনি ফ্ল্যাটটা সাজিয়ে রেখেছিলেন!

রমলার প্রশ্নটি লোকটিকে আচমকা যেন ধাক্কা দেয়। অপ্রস্তুত হ'য়ে সে বললে, হাঁা। কিন্তু এ প্রশ্ন করছেন কেন বলুন তো? আপনার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না?

লজ্জায় আরক্ত হ'য়ে ওঠে রমলা। মুখ নীচু ক'রে সে বললে, না, না, তা' নয়।

লোকটি রমলার আনত মুখে সন্ধানী দৃষ্টি হেনে কিসের অন্বেষণ করে যেন।

রমলা চোখ তুলে তাকাতে দুজনের চোখাচোখি হ'ল। রমলা দেখল, শরতের মেঘমুক্ত নীল আকাশের মত স্বচ্ছ একজোড়া চোখ। ব্যাকুল লজ্জায় আবার সে চোখ নামিয়ে নেয়।

কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে লোকটি বললে, আপনি বিশ্বাস করুন, বীরেনকাকা যে ফ্ল্যাটটি ভাড়া দিয়েছেন তা' আদৌ জানা ছিল না আমার। এই ভাবে হঠাৎ এসে আপনাকে বিরক্ত করেছি ব'লে আমি খুবই দুঃখিত। এখনি চ'লে যেতুম নিজে—কিন্তু বাইরে প্রচণ্ড দুর্যোগ, আমিও খুবই ক্লান্ত। অনেক দূর থেকে আসছি। আমেরিকার উইস্‌কন্সিন। বোধ হয় নাম শুনেছেন। সেখান থেকে এই খানিক আগে দমদম এয়ার পোর্টে এসে পৌচেছি। আপনি যদি অনুমতি করেন, এই ঘরে ব'সে কয়েক মিনিট বিশ্রাম করি।

রমলার বুকের ভেতরটা উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল। চোখ তুলে তাকিয়ে সে দেখল, সত্যিই অন্তহীন পথ অতিক্রমের ক্লান্তি ও অবসাদ লোকটির দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের ঋজুতায় চিহ্নিত হ'য়ে আছে।

ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটি বললে, বোধ হয় আপনার ইচ্ছে নয় যে এক মুহূর্তও আমি এখানে থাকি। আচ্ছা চলি।

না না!—প্রায় আর্তস্বরে ব'লে ওঠে রমলা।—আপনি আসুন।

লোকটি একটু ইতস্তত: ক'রে ঘরে ঢুকল। সে ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ হ'য়ে যায়। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দটা রমলার বুকের মধ্যে এসে যেন ধাক্কা মারে, হঠাৎ সে আবিষ্কার করল লোকটির সান্নিধ্যের মধ্যে নিজের একান্ত একাকীত্বকে।

রমলার উল্টোদিকের সোফাটিতে ব'সে প'ড়ে লোকটি বললে, দেখুন, আমরা কেউ কাউকে চিনি না। এ ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে পরিচিত করাবার ভদ্রতাসম্মত প্রথা আছে। কিন্তু তা' এখন না মানলেও হয়তো চলবে। কারণ আর কয়েক মুহূর্ত বাদে আমি চ'লে যাব, আর হয়তো কখনোই আমাদের দেখা হ'বে না। তবু একটা কথা না ব'লে আমি পারছি না—আপনি কিছু মনে করবেন না। দরজা খুলে আপনাকে যখন দেখলুম, তখন বিস্মিত হ'য়েছি ঠিকই—কিন্তু সে বিস্ময়টা আমার অপ্রত্যাশিত ছিল না।

রমলার বুকের ভেতরে হঠাৎ যেন বাঁধ ভাঙ্গা নদীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস আলোড়িত হ'য়ে ওঠে। মুখ নীচু ক'রে আত্মসংবরণ করার চেষ্টা করে সে। এই মুহূর্তে যেন সে লোকটির দৃষ্টিপথ থেকে নিজেকে বিলুপ্ত ক'রে ফেলতে পারলে বেঁচে যেত।

আগন্তুক ব'লে চলে, রকমারি আসবাব কিনে এ ঘর যখন সাজিয়েছি, তখন শুধু যে নিজের মনোমত ক'রে সাজিয়েছি তা' নয়—আর কারুর ভাললাগার প্রত্যাশাও ছিল মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে। সে কে, জানতুম না। জানতুম না বলেই পারলুম না এখানে থাকতে। দু'দিন থেকেই আমার মনে হ'য়েছিল, এ ঘর যাকে দিয়ে ভ'রে উঠতে পারে সে আমি নই। তাই উইস্‌কন্সিন য়ুনিভার্সিটি থেকে একটা বৃত্তি পেতেই চ'লে গিয়েছিলুম। তখন ভেবেছিলুম বুঝি আর ফিরে আসব না। বছর দুই সেখানে থেকেছি নিশ্চিন্ত মনে। কাজকর্মও চলছিল বেশ। কিন্তু এই কিছুদিন আগে থেকে হঠাৎ কেন জানি না, এ ঘর আমাকে দুর্বার ভাবে আকর্ষণ করতে লাগল। মনে হ'ল যেন আমার ঘরে ফেরার সময় হ'য়েছে। কাজ ওখানে শেষ হয় নি যদিও, তবু ওখানে তিষ্ঠোতে পারলুম না এক মুহূর্তও। কাজে ইস্তফা দিয়ে চ'লে এলুম। কাউকে খবর না দিয়েই এসেছি। বীরেনকাকাও জানেন না। দমদমে প্লেন থেকে সোজা চ'লে এসেছি এখানে। ফ্লাটের দরজার বাইরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। মনে একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা ছিল, বুঝি

দরজা খুললে আর ভেতরে যেতে পারব না—বুঝি আমার এই খণ্ড অস্তিত্ব দিয়ে ঘরের শূন্যতাটুকুই শুধু উপলব্ধি করব। আবার হয়তো শূন্যঘরে দাঁড়িয়ে ফিরে যাবার পরোয়ানাই পাব। বলা বাহুল্য যে দরজা খুলতে আমার হাত কাঁপছিল। দরজা খুলতেই দেখতে পেলুম আপনাকে। আমার অনেক যত্নে সাজানো ঘরের সঙ্গে আপনাকে এক ক'রে দেখলুম—মনে হ'ল যেন আমার ঘরসাজানো সার্থক হ'য়েছে।

রমলা মুখ নীচু ক'রে স্থির হ'য়ে ব'সে লোকটির কথাগুলি শুনে যাচ্ছিল। বাইরের দুর্যোগের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তার বুকের ভেতর প্রচণ্ড তোলপাড় হচ্ছিল—যেন একটা সুপ্ত ঝর্ণা গিরিশিখরের পাষাণস্তূপ ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে। বহুদূর থেকে যার আসার বার্তা তার অঙ্গে অঙ্গে বাঁশির মত বাজছিল এতক্ষণ, সে যেন তার যৌবনের রুদ্ধ দ্বার খুলে এসে পৌচেছে। কিন্তু মুখতুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে যে তাকে বরণ ক'রে নেবে, সে সাহস নেই তার।

লোকটি হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, অনেক বাজে বকলুম, কিছু মনে করবেন না।

বলেই সে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

স্তম্ভিত রমলা চিত্রার্পিতের মত ব'সে থাকে।

বাতাসে আবার আপনাথেকেই দরজাটি বন্ধ হ'য়ে যায়। শূন্যদৃষ্টিতে বন্ধ দরজাটির দিকে চেয়ে ব'সে থাকে রমলা।

তারপর কতক্ষণ যে কেটে গেল খেয়াল নেই তার। হঠাৎ তার সংবিৎ ফিরল দরজায় কড়া নড়াবার শব্দে।

জয়ন্ত এসেছে।

দরজা খুলে দেবার জন্য উঠে এল না রমলা। সোফার ওপরে পাথরের মত নিথর হ'য়ে বসে থাকে সে।

তার জীবনে একবারই দরজা খুলেছে—আর খুলবে না।

পাগলের মত জয়ন্ত শুধু কড়া নেড়ে যেতে থাকে।

কুমুদরঞ্জন : অশীতিতম জন্মদিনে

শান্তশীল দাশ

কবি তুমি, ভক্ত তুমি, তোমার ভগবানে
নিত্য পূজা করো;
আপন মনে নানান ফুলে মালাখানি গেঁথে
তাঁর চরণে ধরো।
সেই মালাতে কত না রূপ, কত না রঙ তার,
সুগন্ধে ভরপুর;
সেই মালাতে জড়িয়ে আছে ভক্ত হৃদয়খানি
বিনম্র মধুর।

এমনি করে দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে দিলে তুমি,
পূজায় নিরলস;
মনের মালা করলে জড়ো চরণতলে তাঁর,
হওনি কালের বশ।
অনেক পেলাম তোমার কাছে, তৃষ্ণা মেটে না যে,
আরো অনেক চাই;
দীর্ঘতর হোক ও জীবন, বিশ্বধাতার কাছে
প্রার্থনা জানাই।

"ভারতবর্ষ" প্রতিষ্ঠাতা দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মহা সমারোহে শেষ হোলো 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার পঞ্চাশৎ বর্ষোত্তীর্ণ সুবর্ণজয়ন্তী পূর্ত্তি উৎসব। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় পরিবারের আনুকূল্যে বাংলার অমর কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল এই পত্রিকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন—তাঁর ও চলেছে জন্ম শতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসব। সম্পাদনার ভার গ্রহণ করে পত্রিকার প্রথম আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্য জগতের এই জ্যোতিষ্ক চিরদিনের জন্যে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন ১৩২০ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাত্রি নয়টার সময়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হবার দুমাস আগে কাল তাঁর মর্ত্যকায়া হরণ করে নিয়ে গেছে। তিনি কালজয়ী পুরুষ, তাই মৃত্যুর অতীত তিনি। এসেছে আজ তাঁর শতবার্ষিকী জন্মজয়ন্তীর উৎসবের সমারোহ। আমরা তাঁর উদ্দেশে প্রাণের প্রণাম জানাই। রুসো, ভলতেয়ারের মত তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল সুপ্তজাতিকে জাগ্রত করে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ করবার জন্যে।

আজ গৃহদাহী জাতিকে স্বদেশ প্রেম ও সমাজ চেতনায় বলিষ্ঠ প্রেরণাদেবার জন্যে দ্বিজেন্দ্রলালের পুনরার্বিভাবের প্রয়োজন। গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে তাঁর অভাব। মাতৃভূমির সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের পক্ষে তাঁর উদাত্ত সঙ্গীত, তাঁর মহত্তর বাণী, তাঁর ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য, তাঁর স্বাদেশিকতার ভাবধারা আমাদের পরম পাথেয়। প্রত্যেকেরই উচিত দ্বিজেন্দ্রলালকে অর্চ্চনা করা জাতির জীবনবিগ্রহরূপে। স্বাধীনতা লাভের পর যে জাতি জেগে ঘুমোয়, আর কুপ্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয় সে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। জাতির ভবিষ্যৎকে স্বচ্ছ মধ্য দিনের মত করতে হবে, বীরপূজা করতে শিখতে হবে।

রাজা রামমোহন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, ভগ্নী নিবেদিতা, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির মত তিনিও পলাশীর পাপে পতিত অভিশপ্ত জাতির জন্যে গঙ্গোত্রীগুহা হোতে অবতরণ করিয়েছিলেন কেদারবাহিনী ধারাকে। আজিকার বিপন্নতার দিনে জাতির বাঁচা ও বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন দ্বিজেন্দ্র কাব্য, সাহিত্য সঙ্গীত। আমরা যদি এঁদের বলিষ্ঠ আদর্শ ও মহৎপ্রেরণা অবলম্বন করে ভারতের স্বাধীনতাকে মহিমার সর্ব্বোচ্চ শিখরে তুলে ধরতে পারি তবেই সার্থক হবে কবির জন্মশতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসব। শুধু প্রমোদ অনুষ্ঠানের দ্বারা হাজার বাতি জ্বালিয়ে নৃত্যে, গানে, বক্তৃতায় মত্ত হয়ে থাকলে কোন কল্যাণই সাধিত হবে না। পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে এই সব লোকোত্তর মহামানবের।

জন্মমৃত্যু ভগবানের বিধান। জীবজগত তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন। কিন্তু তাঁর জন্ম ধন্য, তাঁরই মরণ সার্থক, যিনি আপনার মেধা, আপনার ধীশক্তি, আপনার পুণ্যচরিত্র প্রভাবে মরণের পরে অমর ও অবিনশ্বর হয়ে থাকেন। তিনি আমাদের চিরনমস্য, তিনি জাতির প্রাণপুরুষ, জীবনের পুরোহিত। তাঁর আর্বিভাবে ধন্য হয় স্বদেশও স্বজাতি, দূষিত আবহাওয়া চলে যায় দূরে, আর জনসাধারণ হাতে যেন পায় আকাশের চাঁদ। দ্বিজেন্দ্রলালকে এই রকম একজন বলতে পারি—যিনি শৈশবেই মাতৃভূমিকে 'দেবী' 'সাধনা' ও 'স্বর্গ' বলে চিনতে পেরেছিলেন—আর সারা জীবন ধরে জননী জন্মভূমিকে চিনিয়ে গেছেন অর্দ্ধশিক্ষিত পাশ্চাত্য-অনুকরণপ্রিয় ও শ্বেতাঙ্গ-পদলেহী হাজার হাজার স্বদেশবাসীর কাছে। জন্মভূমিকে আশ্রয় করেই তাঁর তীব্র সারস্বত সাধনা।

দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম ১২৭০ সালে ৪ঠা শ্রাবণ। নদীয়া জেলার সদর মহকুমা কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান চক্রবর্ত্তী বংশে জন্ম নিয়েছিলেন এই মহাজীবন। পদে, সম্ভ্রমে, কুলমর্য্যাদায় এই বংশ বঙ্গবিশ্রুত। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী ঐতিহাসিক পুরুষ। তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন বারেন্দ্রশ্রেণীর মধ্যে কুলীনের এক নতুন দল। সেজন্য মতকর্ত্তার বংশ বলে এঁরা বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে সম্মানিত।

দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়। তিনি

ছিলেন নদীয়াধিপতির দেওয়ান। তাঁর সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ এড়ুকেশন গেজেটে উল্লিখিত আছে—'দেওয়ান ৺কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয় যেরূপ কায়মনোবাক্য স্বার্থচিন্তা ছাড়িয়া প্রভুর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি করিয়াছিলেন, প্রভুর গৌরব প্রকাশ জন্য ব্যগ্র ছিলেন, তাহা তাঁহার সার্দ্ধশতাব্দী পুর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়াগণ এবং হোলকার সিন্ধিয়া প্রভৃতি সামন্তগণ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে, মহাত্মা শিবাজীর সিংহাসন অটুট থাকিয়া ভারতের ইতিহাস ভিন্নরূপ হইত।'

দ্বিজেন্দ্রলালের পিতার আটপুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ সন্তান ও কন্যা এবং মধ্যম পুত্র অতি শৈশবে দেহত্যাগ করে। দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার নিদর্শন শৈশব থেকেই পরিলক্ষিত হোতো। পাঠ্যাবস্থায় তিনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় সুন্দর ভাবে সহজ শুদ্ধ এবং সুদীর্ঘ বক্তৃতা করতে পারতেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এণ্ট্রান্স, আর দুবছর পরে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিখ্যাত ইংরাজ মনীষী রো সাহেব তাঁর ইংরাজী কাগজ পরীক্ষা করে বলেছিলেন—'দ্বিজেন্দ্র ইংরাজীতে যেরূপ সুন্দর পরীক্ষা দিয়েছে কোন ইংরেজ বালক সেইরূপ দিলে তার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় হোতো।' হুগলী কলেজ থেকে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর দ্বিজেন্দ্রলাল প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে আরম্ভ করেন। এখান থেকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইংরাজী অনার্সে এম-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, আর ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্ত্বেও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল আশৈশব ম্যালেরিয়া-জ্বরে ভুগেছেন, এ জন্যে অনেক সময় পড়াশুনার বিঘ্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক পরীক্ষাতেই তিনি সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এম, এ, পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পরই দ্বিজেন্দ্রলাল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্যে ছাপরা জেলার রেভেলগঞ্জ স্কুলের হেড মাষ্টার পদ গ্রহণ করেন, আর দুই একমাস সেখানে কাজ করার পর কৃষি শিক্ষার জন্যে সরকারী বৃত্তি লাভ করে দ্বিজেন্দ্রলাল পিতামাতার অনুমতি নিয়ে ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে দু বৎসর বাস করে সিসেষ্টার কলেজ থেকে কৃষিবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন ও এম, আর, এ, এস উপাধিতে ভূষিত হন।

১৮৮৬ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতে ফিরে আসেন। দুঃখের বিষয়, ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে তাঁর পিতা মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি, বিলাত প্রবাসকালেই তাঁর পিতৃমাতৃ-বিয়োগ হয়। বিলাত থেকে ফিরে আসবার কয়েক মাস পরে ১৮৮৭ সালে এপ্রিল মাসে কলকাতার স্বনামধন্য চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুরবালা দেবীকে বিবাহ করেন। ১৯০৩ সালে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়। স্ত্রী বিয়োগই কবিজীবনের করুণ ট্রাজেডি।

১৮৮৬ সালে ডিসেম্বর মাসে গভর্নমেণ্ট থেকে সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত হন। নানা স্থানে ঘুরে শেষে এলেন মেদিনীপুরের অন্তর্গত সুজামুটায় সেটেলমেণ্ট

কার্য্যে। এই সময় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর স্বাধীন সত্যবাদিতার জন্য তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুরের অপ্রিয়ভাজন হন। ঐ ছোটলাট বাহাদুর কোন সময়ে সেটেলমেণ্ট অফিসার ছিলেন। বোধ হয়, তাঁর ধারণা ছিল, তিনি যে প্রণালী ও নিয়মে কাজ করেছেন, তাই চিরদিন বহাল থাকবে। সুতরাং যখন রিপোর্ট দেখলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল অন্যরূপ নিয়ম ও প্রণালীতে কাজ করেছেন, তিনি ভ্রান্ত ও অন্যায় বিবেচনা করে দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল নির্ভীক অন্তরে তার প্রতিবাদ করে বলেন, —"আপনার সময়কার নিয়ম ও প্রণালী অনেক বদলে গেছে, আপনি যা বলছেন তা ভুল—" শোনা যায়, এই নির্ভীক সত্যবাদিতার জন্য তাঁর কর্ম্মজীবনের উন্নতির পথে কিছু অন্তরায় হয়েছিল, কিন্তু তবুও তাঁর মতের পরিবর্তন হয় নি। বিদ্যাসাগরের মত তিনি ছিলেন তেজস্বী। যা হোক উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের বিচারে দ্বিজেন্দ্র-লালের মত ও প্রণালী বহাল থাকে।

১৮৯৩ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন এবং পরবর্ত্তী বৎসরে আবগারী বিভাগের প্রথম ইন্‌স্পেক্টর পদে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। পরে ১৮৯৮ সালে তাঁকে কৃষি বিভাগের সহকারী ডিরেক্টারের পদে নিযুক্ত করা হয় এবং দুই বৎসর পরে আবগারী কমিশনারের সহকারী ও সেই বৎসরের শেষে পুনরায় আবগারী ইন্‌স্পেক্টারের পদে কর্ম্ম করেন। এর তিন বৎসর পরে তাঁর পত্নী বিয়োগ হয়, তখন তাঁর সন্তানদ্বয় দিলীপ ও মায়া নিতান্ত শিশু'। এদের লালনপালনের ভার অপরের ওপর নির্ভর করে নিয়ত দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান তাঁর পক্ষে সঙ্গত ও সুখকর না হওয়ায় ১৯০৫ সালে পুনরায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ গ্রহণ করেন। খুলনা, মুর্শিদাবাদ, গয়া প্রভৃতি স্থানে কাজ করে ১৯০৯ সালে চব্বিশপরগণার সদর মহকুমা আলিপুরে বদলী হন এবং এখানে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন। পরে ১৯১২ সালে বাঁকুড়া এবং প্রদেশ বিভাগের পর তাঁকে মুঙ্গেরে বদলী করা হয়। কিন্তু তাঁকে আর মুঙ্গের যেতে হোলো না। হঠাৎ বিষম সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন।

মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ কালভার্টের সূচিকিৎসায় প্রথম আক্রমণ থেকে তিনি রক্ষা পান। ডাক্তারের উপদেশানুসারে এক বৎসর অবকাশ নিতে বাধ্য হন। এই বিশ্রাম সত্ত্বেও পুনর্ব্বার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হতে সমর্থ না হওয়ায় কর্ম্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ভারত-বর্ষ পত্রিকার সত্বাধিকারী চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল, তাঁর ইচ্ছা ছিল অবশিষ্ট জীবন ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদনা আর সাহিত্যসেবা করে কাটিয়ে দেবেন, কিন্তু তাঁর বাসনা অপূর্ণ রয়ে গেল। চির-বিদায় নেবার প্রাক্‌কালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাই হয়েছিল তাঁর প্রধান কর্ত্তব্য।

দ্বিজেন্দ্র প্রতিভা অনন্যসাধারণ। শব্দ শিল্প নির্ম্মিতিতে, ব্যঞ্জনায়, ভাবের স্বচ্ছন্দ বিহারে, ভাষা প্রয়োগে, প্রকাশ ভঙ্গিমায়, লিপিচাতুর্যে বাংলা সাহিত্যে মুষ্টিমেয় কৃতী বিদগ্ধ' পুরুষ তাঁর সমকক্ষ। নাট্য রচনায় তিনি সব্যসাচী। তাঁর অসাধারণত্ব ঐতিহাসিক নাটক সৃষ্টিতে। পৌরাণিক নাটকেও তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আর বিভিন্ন চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাতে উত্তমভাবে অভিব্যক্ত তাঁর নাটকগুলি। নাটকের গান নিজেই রচনা করেছেন, আর তার সুর সংযোজনা করেছেন নিজে। দ্বিজেন্দ্র সঙ্গীত, সঙ্গীত-জগতে এনেছে যুগান্তর। তাঁর সুর বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে সঙ্গীত-জগতে।

নাট্য সাহিত্য ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবদ্দশাতেই তাঁর আবির্ভাব। তাঁর নাটক গিরিশপ্রভাব মুক্ত। বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ হাসির কবিতা নিয়ে। উচ্চাঙ্গের প্রহসন রচনায় তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তি বিরল। তাঁর 'কল্কি অবতার' 'বিরহ' 'প্রায়শ্চিত্ত' 'ত্র্যহস্পর্থ' প্রভৃতি সামাজিক নক্সা অতুলনীয়। এগুলি বিশুদ্ধ আমোদের সরবরাহকারক, অশ্লীলতাবর্জ্জিত, প্রাণস্পর্শী অথচ মর্ম্মঘাতী নয়।

মানুষকে তিনি ঘৃণা করেন নি, ক্ষমাসুন্দর চোখেও দেখেন নি মানব সমাজের সঙ্কীর্ণতার আবেষ্টনী ও ভক্তি-শিষ্টাচারকে। এদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের তুলে ধরেছেন সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আর তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী চালিত হয়েছিল সেগুলির সংশোধনের জন্য। এদিক দিয়ে বিচার করলে তাঁকে সমাজ সংস্কারক বলা যেতে পারে।

দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লে-

যোগ্য 'শাজাহান' 'চন্দ্রগুপ্ত' 'পরপারে' 'সীতা' আর 'পাষাণী'। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে আছে প্রচুর দেশাত্মবোধের অভিব্যক্তি, স্বাদেশিকতার উৎকর্ষতা আর আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই সব নাটকের সংলাপ জাগ্রত করে তুলেছে হাজার হাজার বছরের ঘুমন্ত জাতিকে। তিনি ছিলেন মহান্ আদর্শের মূর্ত্তবিগ্রহ, সত্য শিব সুন্দরের মন্ত্রসিদ্ধ মহাজীবন। স্বার্থ-কেন্দ্রী, আশাহীন, লক্ষ্যহীন, আত্মবিস্মৃত, আত্মঘাতী, গৃহদাহী, বক্র-মেরুদণ্ডী বাঙ্গালী জাতির আত্মসম্বিৎ ফিরে এসেছে তাঁর লেখনীর যাদুদণ্ডস্পর্শে। এই সব নাটকের প্রভাব স্থান করে নিয়েছে জাতির অস্থিতে মজ্জায়।

তাঁর "প্রতাপসিংহ" নাটকে স্বদেশপ্রেমের প্রোজ্জলতায় পরিপূর্ণতা। তাঁর "মেবার পতনে" সকরুণ নৈরাশ্যের পটভূমিকায় আশায় উদ্বোধনী।

চিতোর উদ্ধারের দুর্ব্বার সঙ্কল্প নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন রাণা প্রতাপ, সর্ব্বস্ব পণ করে সংগ্রাম করেছিলেন তিনি মোগল শক্তির বিরুদ্ধে। আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁরই মহান্ আদর্শের আলেখ্য, আর আমরা তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম ভারতের মুক্তি যজ্ঞের বহ্নি-সংযোজক ঋত্বিকরূপে, তাঁকে দেখেছি আমরা প্রজ্জ্বলিত আগ্নেগিরির মত। শ্রদ্ধায় শির নত হয়ে গেছে সমগ্র জাতির।

তাঁর 'তারাবাঈ' 'দুর্গাদাস' 'চন্দ্রগুপ্ত' 'প্রতাপসিংহ' 'নুরজাহান' 'সাজাহান' 'সিংহলবিজয়' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক জাতির ও জাতীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। আজ যে ধরণের চল্‌তি ভাষার রীতিতে বাংলা গদ্যসাহিত্য-সৃষ্টির প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তার পথিকৃৎ দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে এই রীতি প্রথম অবলম্বিত হয়। আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে রয়েছে তাঁর শাশ্বত স্বাক্ষর। তাঁর নাটকের মধ্যে গদ্যের ভাষা যেমন কবিত্বপূর্ণ, তেমনই হৃদয়গ্রাহী। মনে হয় যেন গদ্য কবিতা।

ইংরাজী সাহিত্যেও দ্বিজেন্দ্রলাল অর্জ্জন করেছেন খ্যাতি ও প্রশংসা। বিলাত প্রবাসকালে তাঁর রচিত ইংরাজী কবিতাগ্রন্থ লিরিকস অব ইণ্ড (Lyrics of Ind) ইংল্যাণ্ডের সাহিত্য সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্যার এডুইন আরনাল্ডের মত মনীষীও কবিতা গ্রন্থখানির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। স্যার আরনল্ড বলেছেন—'যদি এই পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম না থাকতো, তাহোলে কোন ইংরাজ কবির রচনা বলেই ভ্রম হোতো—' এরই প্রথম কবিতা 'Land of the Rising Sun' সাজাহান নাটকের সর্ব্বজনসমাদৃত সঙ্গীত।

দ্বিজেন্দ্রলালই জাতির উদয়-ভারতীর প্রথম উদ্‌গাতা। নবরাষ্ট্রীয় চেতনায় মাঙ্গলিকতার রচয়িতা তিনিই। আসমুদ্র হিমাচল তাঁর নাট্যানুরাগী। সমগ্র ভারত তাঁর নাটকগুলিকে বিগ্রহের মত অর্চ্চনা করেছে। সুদূর পল্লীতে পর্য্যন্ত পৌঁচেছে তাঁর নাটক। অভিনীত হয়েছে দেশে দেশে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আর সৌখীন নাট্য সমাজের রঙ্গপীঠে। তাঁর নাটকের অভিনয়কালে সর্ব্বত্র প্রেক্ষাগৃহ দর্শকের ভিড়ে স্থান সঙ্কুলান হয় না।

"নুরজাহান" নাটক দ্বিজেন্দ্রনাট্যপ্রতিভার অপূর্ব্ব নিদর্শন। নুরজাহানের জটিল চরিত্রচিত্রণে আমরা দেখেছি তাঁর অপূর্ব্ব শিল্পনিপুণতা, এই চরিত্রের ভেতর দিয়ে তিনি উদ্‌ঘাটিত করে গেছেন নারী-মনের বিচিত্র রহস্য। মেবার পতনে দেখিয়েছেন দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম আর বিশ্বপ্রেম—যা হয়ে আছে চির অতুলনীয়।

"সাজাহান" তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক। সাজাহানে প্রত্যক্ষ হয়েছে দ্বিজেন্দ্র নাট্য প্রতিভার গৌরবের গৌরীশৃঙ্গ। সাজাহানেই পেয়েছি দ্বিজেন্দ্রলালের শিল্পমানসের পূর্ণ পরিচিতি। নাটকীয় চরিত্রের আঘাতে, সংঘাতে, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে, আবেগপূর্ণ ভাব অনুভাবের আলোছায়া খেলায় নাটকখানি আমাদের অন্তরের পানোৎসবে আনে রসঘন মত্ততা। এই নাটকের জাহানারার চরিত্র বিশ্বনাট্য সাহিত্যে দুর্ল্ভ।

ভারতের এক প্রচণ্ড রাষ্ট্রবিপ্লবের পটভূমিকার ওপর গড়ে উঠেছে সাহাজান। এর সক্রিয় অংশে যাঁরা আছেন, তাঁদের চরিত্রচিত্রণে দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষ নিপুণতা আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। রসোত্তীর্ণ নাটকখানিতে ভারতের বিপ্লবের দুর্য্যোগপূর্ণ পরিবেশ ও পারিবারিক স্নেহের নির্ঝর ধারা প্রবহমান, হৃদয়ের পরিচয় হয়েছে অনবদ্য সংসারের মধ্যে। আর কিছু না লিখে দ্বিজেন্দ্রলাল যদি শুধু সাজাহান লিখে যেতেন, তা নিয়েই বাংলা তাঁকে অমর করে রাখ্‌তো।

সামাজিক নাটক হিসাবে তাঁর 'বঙ্গনারী' ও 'পরপারে' উল্লেখযোগ্য। তাঁর মর্ম্মন্তুদবাণী 'গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ' বৈদিক ঋষির মন্ত্রের মত বাঙালী জাতির অন্তরে সক্রিয়। নারী শক্তির উদ্বোধন করে গেছেন তিনি।

তাঁর গানে আমরা পাই—

'বিধবা সধবা অধবা তোমার রহিবে উচ্চশির,
উঠ বীর জায়া বাঁধ কুন্তল মুছহ অশ্রুনীর।'

দেশবন্দনায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' এর স্থান অধিকার করে আছে নাট্যরথী দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধন ধান্যে পুষ্প ভরা' বাঙালীর অন্তরের অন্তস্তলে। বঙ্কিমের দেশ-জননী দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা, দ্বিজেন্দ্রলালের দেশমাতৃকা স্নেহময়ী গৃহজননী।

দ্বিজেন্দ্রলাল যে আশৈশব স্বদেশপ্রেমিক, শিশুকাল থেকে যে প্রাণ স্বদেশ ও স্বজাতির দুঃখে কেঁদে উঠ্‌তো, শৈশবেই যে তিনি মাতৃভূমিকে 'দেবী' 'সাধনা' ও 'স্বর্গ' বলে চিনতে পেরেছিলেন—তা তাঁর 'লিরিকস্ অব ইণ্ড' এবং আর্য্যগাথা প্রথম পাঠ করলে সম্যক্ উপলব্ধি হয়। তদানীন্তন কালের প্রসিদ্ধ পত্রিকা ক্যালক্যাটা রিভিউ তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'He seems to have a heart that is capable of inspiration, His manner is poeticial, He possesses the trne poetical instinct.'

কবিতার ক্ষেত্রেও দ্বিজেন্দ্রলাল রেখে গেছেন অসাধারণ প্রতিভার নিদর্শন। ইংরাজী ও বাংলায় রেখে গেছেন তিনি প্রাবন্ধিকতার অবদান। বেঁচে থাকলে বঙ্গভারতীর প্রভূত উন্নতি সাধন হোতো। দুঃখের বিষয়, আমরা তাঁকে দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে পাইনি। আরও কিছুকাল বেঁচে থাকলে অতি উচ্চাঙ্গের বাংলা নাট্যসাহিত্য সৃষ্টি করে যেতে পারতেন। আজ ভারতবর্ষ পত্রিকা'ক মহাম'হমান্বিত করে যেতে পারতেন। আজ তাঁর জন্মদিনে তাঁর স্মৃতিপীঠে অন্তরের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তাঁর বন্দনা করি।

সুখ

শ্রীশক্তি মুখোপাধ্যায়

আমার মনের সঙ্গোপনে
তোমার কথা জাগলো
আশায় বাঁধা নদীর বুকে
জীবন তরী ভাসলো।

কোথায় গিয়ে সাঙ্গ হবে
জীবন নদীর খেলা
কোথায় গিয়ে ভিড়বে তরী
ফুরিয়ে এলে বেলা!

জানি না আজ বারে বারে
এই কথাটি ভাব
মনের ময়ূর আসবে নিয়ে
অনুরাগের দাবী।

আশার প্রদীপ জ্বলবে সেথায়
সাঁঝের অবসানে
সাঙ্গ হবে স্মৃতির দোলা
বেলাভূমির গানে।

সব হারাণোর খুঁজে পাওয়া
ভালোবাসার টানে
হৃদয় দিয়ে হৃদয় চাওয়া
স্বর্গীয় সুখ আনে

ভারতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্য

জুল্‌ফিকার

ভারতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার ও অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসে বৈদেশিক সাহায্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতবর্ষ যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় হাত দেয়, তখন কয়েকটী বন্ধুরাষ্ট্র তাকে আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য (Technical aid) দিতে এগিয়ে আসে। এই সময় বিশ্বব্যাঙ্কও (IBRD – International bank of Reconstruction and development) তাকে কয়েক কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিল। সম্প্রতি সাহায্যের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়েছে এবং আরও কয়েকটি বিদেশীরাষ্ট্র ভারতবর্ষকে সাহায্য করতে হাত বাড়িয়েছে।

প্রথম প্ল্যানে মোট লগ্নী অর্থের (investment) শতকরা ৬% ছিল বৈদেশিক সাহায্য। দ্বিতীয় প্ল্যানে শতকরা ১৩% (PL 480 * মার্কিনী সাহায্য বাদে) এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শতকরা ২৫% অর্থাৎ নিয়োজিত মোট অর্থের এক-চতুর্থাংশ বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা সংগৃহীত হবে বলে স্থির হয়েছে।

প্রথম প্ল্যানে ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসের পূর্ব্বের IBRDএর কাছ থেকে পাওনা অপ্রাপ্ত ঋণের টাকা ধরে, মোট ৩১৮ কোটি টাকার মধ্যে পরিকল্পনার পাঁচ বছরে মাত্র ১৯৭ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়েছিল। উদ্বৃত্ত ১৪১ কোটি টাকা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লাগানো হয়েছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনা রূপায়িত করবার সময় বিশ্বব্যাঙ্ক ও বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলি থেকে সাহায্যের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়। এই পরিকল্পনার কাজ করতে গিয়ে ভারতকে দারুণ বৈদেশিক মুদ্রা (foreign exchange) সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেই সময় বিশ্বব্যাঙ্কের প্রচেষ্টায়, যে সব দেশ থেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম আনবার অর্ডার দেওয়া হয়েছিল—তাদের একটা যুক্ত বৈঠকে ভারতের এই বৈদেশিক মুদ্রা সমস্যার কিভাবে সমাধান হতে পারে, আর যাতে তার আরব্ধ পরিকল্পনার কাজে বিঘ্ন না ঘটে সে বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য, Aid india Clubএর সংগঠন হয়। এই ক্লাবের সদস্য দেশগুলি মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে আলোচনা চালাচ্ছে—তারা কি উপায়ে ভারতকে তার রপ্তানী বাড়াতে সাহায্য করতে পারে, এবং কিসে ভারতের পক্ষে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করা সম্ভব হয়। ওদের সকলেরই লক্ষ্য আছে যাতে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতিতে ভারতের পরিকল্পনার কাজগুলো অচল না হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় প্ল্যানে (PL 480এ সাহায্য হিসাবে যে সব মাল পাওয়া গেছে সেগুলোর এবং তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য চিহ্নিত ঋণ ও প্রাপ্ত জিনিষপত্রের মূল্য বাবদ টাকা বাদ দিলে) মোট ১০৭৮ কোটি টাকা ঋণ ও সাহায্য হিসাবে বাইরে থেকে পাওয়া গেছে। এর সঙ্গে প্রথম প্ল্যানের বাড়তি ১৮১ কোটি টাকা যোগ দিলে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায়

---

* PL 480 – ১৯৫৪ সালে P.L (public loan) 480 আইন প্রবর্ত্তনের পর মার্কিণ সরকার তাদের দেশ থেকে আমাদের দেশে গম, চাল, তুলো, তামাক, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য (Dairy products) চালান দিচ্ছে। এই আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র (USA) তার উদ্বৃত্ত কৃষিজাত পণ্য বাইরে পাঠানোর জন্য কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এইসব রপ্তানী শস্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য আমদানীকারী দেশগুলো তাদের নিজ নিজ দেশের চলতি মুদ্রায় পরিশোধ করতে এবং এইসব পণ্য বিক্রয়ের লভ্য টাকাটা ক্রেতা রাষ্ট্রগুলির উন্নয়ন কার্য্যে সাহায্য হিসাবে ব্যয়িত হবে।

১২৬০ কোটি টাকা। এই টাকার মধ্যে খরচা হয়েছে মোট ৮৯০ কোটি টাকা,—বাকি ৩৭০ কোটি উদ্বৃত্ত অর্থ তৃতীয় পরিকল্পনার কাজের জন্য পাওয়া গেছে। IBRD বা বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত অর্থ থেকে কয়েকটী বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য (রেলওয়ে, সেচ ও জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা—river valley project—তাড়িত উৎপাদন, ইস্পাত নির্ম্মাণ ও বন্দর উন্নয়ন) বৈদেশিক মুদ্রার অভাব মেটানো গেছে। এইসব ঋণের সুদের পরিমাণ হচ্ছে, শতকরা সাড়ে তিন টাকা থেকে সওয়া ছ টাকা, আর এদের পরিশোধের মেয়াদ দশ থেকে পঁচিশ বছর। প্রয়োজনবোধে মেয়াদের কাল তিন থেকে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বাড়িয়ে (grace period) দেওয়া যেতে পারে,—যদি দেখা যায় যে সব কাজের জন্য টাকা দেওয়া হচ্ছে, সেগুলো ঠিক ভাবে চালু হবার আগেই ঋণ শোধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। দুই জায়গা থেকে পরিকল্পনা কার্য্যের রূপায়ণের জন্য ঋণ পাওয়া গেছে—এক বিশ্বব্যাঙ্ক (IBRD), দ্বিতীয়টি DLF (Development Loan Fund)। DLF থেকে ঋণ পাওয়া গেছে রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য, সুতো, কাপড়, চিনি ও কাগজকলের আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি কেনার জন্য এবং পেপারবোর্ডের কারখানা খুলবার জন্য। জল ও তাপ সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কার্য্যে (power project) এবং সরকারী ও বেসরকারী (public and private sector) ইস্পাত কারখানার জন্যও এই সংস্থা ঋণ দিয়েছে।

ওয়ার্ল্ড' ব্যাঙ্ক বা DLF ঋণ দানে এমন কোন সর্ত্ত আরোপ করে নাই যাতে সংশ্লিষ্ট দেশ, যারা এই ব্যাঙ্ক ও অর্থভাণ্ডারে মূলধন জুগিয়েছে, কেবল তাদের কাছ থেকেই পরিকল্পনার কাজের যন্ত্রপাতি বা মালপত্তর কিনতে হবে। ভারত মনে করলে পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে তার প্রয়োজন মত জিনিষ সস্তায় কিনতে পারে। ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে DLF সিদ্ধান্ত করে যে ভারতকে যে ডলার সাহায্য (US dollar aid) দেওয়া হচ্ছে, তা তাকে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরী যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জামাদি ক্রয় করবার জন্য কিম্বা মার্কিন বিশেষজ্ঞদের (technicians) জন্য ব্যয় করতে হবে। অবশ্য যে সব কাজ বহু আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছে এবং প্রায় সমাপ্তির পথে সেগুলোর সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটবে না।

DLF থেকে প্রাপ্ত ঋণ ১৫ থেকে ২০ বছরের* মধ্যে পরিশোধ এবং তাদের সুদের হার ৩½% থেকে ৫¾% Utility বা কল্যাণ-মূলক কাজের জন্য যে টাকা পাওয়া গেছে, তাদের সুদ অন্য উদ্দেশ্যের জন্য (non-utility purpose) প্রাপ্ত টাকার সুদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম। যুক্তরাষ্ট্রের এক্সপোর্ট—ইম্পোর্ট ব্যাঙ্কও ভারতকে অর্থকরী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম (Capital goods) কিনবার জন্য শতকরা ৫¾% সুদে, ষোল বছরের মেয়াদে ধার দিচ্ছে—তবে এ ঋণ শোধ করতে হবে ডলারে। সোভিয়েট দেশ (USSR) থেকে ভারী যন্ত্রশিল্পের (Heavy Industries) জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য পাওয়া গেছে। মধ্যপ্রদেশের গোটা ভিলাই কারখানাটা বলতে গেলে রুশীয় অর্থ ও কারিগরী সাহায্যে চলছে। এ ছাড়া আছে নেভেলির লিগনাইটের কারখানা।

ভারী কলকব্জা তৈরীর জন্য, কয়লা উত্তোলনের যন্ত্রপাতি কেনবার জন্য, ঔষধ ও জ্বালানীর কারখানা স্থাপনের জন্য এবং তৈলসন্ধান ও পবিশোধনের কাজে রাশিয়া ভারতকে অর্থ সরবরাহ করছে। অবিশ্যি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সবই কিনতে হবে ওদের দেশ থেকে। ওরা ওদের দেশ থেকে এঞ্জিনীয়ার ও বিশেষজ্ঞ পাঠাবে এবং ওদের থেকে আমাদের লোকদের শিক্ষা দিয়ে আনবার ব্যবস্থাও করবে। এই সব খরচা সবই সাহায্যখাতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। শতকরা আড়াই টাকা সুদে বারো বছরের মেয়াদে ওরা ভারতকে ঋণ দিচ্ছে। ভারতবর্ষ থেকে রাশিয়া যে সমস্ত মাল কিনবে তার দাম ওদের পাওনায় ভারতীয় টাকার হারে উশুল দিতেও ওদের আপত্তি নেই, অর্থাৎ মালের দাম নগদ টাকার পরিবর্ত্তে ইচ্ছে করলে ভারত তার পাওনা টাকার সঙ্গে কাটাকাটি করে নিতে পারে।

পশ্চিম জার্ম্মানী ও বৃটেন ভারতকে মূলধন অর্জ্জনকারী কলকব্জা ও সাজসরঞ্জাম (Capital goods) কেনবার

* বিভিন্ন দফায় প্রাপ্ত বিভিন্ন সময়ের কর্জ্জের টাকার সুদের হারও বিভিন্ন।

জন্য অর্থ সরবরাহ করছে। বৃটেনপ্রদত্ত ঋণের কিছু অংশ বিশেষ কোন কারখানার বা উৎপাদনের কার্য্যের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ (project tied)। দুর্গাপুর ইস্পাতের কারখানার যাবতীয় কলকব্জা ইংল্যাণ্ড বাকীতে সরবরাহ করছে। বৃটেনের এই ঋণ শোধ করবার মেয়াদের সর্ব্বনিম্ন ৩ বৎসর থেকে উর্দ্ধতম সীমা ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত, আর যে সময় টাকা ধার দেওয়া হচ্ছে তখনকার বিটিশ ট্রেজারীর যে চলতি সুদ সব ক্ষেত্রেই তার উপর শতকরা ১% বেশী সুদ দিতে হবে।

রুরকেল্লার ইস্পাত কারখানার জন্য পশ্চিম জার্ম্মানীও যন্ত্রপাতি খরিদ ও কারিগরী সাহায্য হিসাবে ভারতবর্ষকে ঋণ দান করছে, শতকরা ৬% সুদে এবং কারখানা পরিচালনার জন্য আরও ০·৩% টাকা আদায় করে নিচ্ছে। ব্রিটেন ও জার্ম্মানী দেয় কিছুটা ঋণ project tied না থাকায়, তা দিয়ে দ্বিতীয় প্ল্যানের কাজে অপরাপর দেশের পাওনা মেটানো সম্ভব হয়েছে।

জাপান প্রথম দফায় ২৩,৮০০০০০০ টাকার সম মূল্যের ইয়েন, সরকারী (public) এবং বে সরকারী (private) উভয়বিধ শিল্প সংস্থার জন্য ভারতবর্ষকে কর্জ্জ দেয়, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আমদানীর জন্য। এই ইয়েন-ক্রেডিটের আওতায় ছিল—

(১) শক্তি উৎপাদন পরিকল্পনাগুলি (Power Projects)

(২) National Coal Development Corporation.

(৩) রাজস্থানের খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থা (canal projects)

(৪) ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ (Small Scale Industries) এবং (৫) বর্ত্ম নির্ম্মাণ (Road Projects)। জাপানী ইয়েন ঋণের সুদ বিশ্বব্যাঙ্কের প্রচলিত হারে (অর্থাৎ ৫¾-৬%) তের বছরের মেয়াদে চলছে। দ্বিতীয় দফা ইয়েন ঋণের মধ্যে উড়িষ্যার লৌহ আকর থেকে লোহা নিষ্কাশণ কাজের জন্য ৩,৮১,০০,০০০ টাকা পাওয়া গেছে।

এই সব আর্থিক ঋণ ও বাকীতে আনা যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের মূল্য বাবদ টাকা ছাড়াও, ১৯৫২ সালের ৫ই জানুয়ারী তারিখে ভারত ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে কারিগরী সহযোগিতা চুক্তি (Technical Cooperation Agreement) স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেই চুক্তি অনুযায়ী অনেক রকম কলকব্জা ও সরঞ্জাম পাওয়া গেছে।

এছাড়া ভারত বাইরের কতকগুলি জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান —যেমন অ্যামেরিকার রকফেলার ও ফোর্ড-ফাউণ্ডেশান ও ব্রিটেনের ন্যাফিল্ড ফাউণ্ডেশানের কাছ থেকেও এককালীন দান হিসাবে মোটা টাকা পেয়েছে।

দ্বিতীয় প্ল্যানভুক্ত কাজের জন্য বরাদ্দ টাকার মধ্যে ৩৭০ কোটি টাকা অব্যয়িত থেকে যায়। তৃতীয় পরিকল্পনার কাজে হাত দেবার আগে এই উদ্বৃত্ত অর্থ পাওয়া গেছে। এই পরিকল্পনাভুক্ত কাজগুলো যাতে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হয় তার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা চলছে। ভারত এই তৃতীয় পরিকল্পনার কাজে ৩৫০ কোটি টাকার creditএর জন্য কয়েকটী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেছে। এই দেশগুলির সবাই Aid India clubএর সভ্য। AICর সদস্য হিসাবে এই সব দেশের—কার কাছ থেকে কত টাকার ঋণ বা মাল ও সরঞ্জাম বাকীতে পাওয়া যাচ্ছে তার হিসাব নীচে দেওয়া হল :

রাশিয়া (USSR)	— ২৩৮	কোটি টাকা
চেকোশ্লোভাকিয়া	— ২৩	„ „
যুগোশ্লাভিয়া	— ১৯	„ „
পোল্যাণ্ড	— ১৪	„ „
সুইট্জারল্যাণ্ড	— ১১	„ „
যুক্তরাষ্ট্র (USA) (Export-Import Bank)	— ২৪	„
ইটালী (ENI Credit)	— ২১	„ „

১৯৬১ সালের মে-জুন মাসে AICর যে বৈঠক বসে তাতে ফ্রান্স ও IDA (International Development Association—এটা World Bankএরই একটা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান) যোগ দেয়। এ ছাড়া দর্শক হিসাবে এই সভায় উপস্থিত ছিল অষ্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন এবং IMF (International Monitary Fund) বা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের প্রতিনিধিরা। AIC এই সভায় প্রতিশ্রুত সাহায্যের মোট পরিমাণ হচ্ছে ১০৮৯ কোটি টাকা। যে জন্য এই সাহায্য দানের ব্যবস্থা সে সম্বন্ধে এই সভার প্রকাশিত Communiqueএ বলা হয়েছে :

To enable India to launch a Third-Five-year plan of economic development with confidence in the ultimate attainment of its objectives.

১৯৬১-৬২ সালের জন্য প্রতিশ্রুত সাহায্য ৬১৭ কোটি টাকার মধ্যে এ পর্য্যন্ত মাত্র ৩১৯ কোটি টাকার ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে :

	(কোটি টাকা)
পশ্চিম জার্ম্মানী	— ৫৯·৫২
গ্রেট ব্রিটেন (UK)	— ৬০·০০
যুক্তরাষ্ট্র (USA)	— ৫১·৯৯
বিশ্বব্যাঙ্ক (IBRD)	— ৫০·৪৮
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA)	— ৪২·১৪
ক্যানাডা	— ১৭·১৪
জাপান	— ৩৮·০৯
	মোট—৩১৯·৩৬ কোটি টাকা

১৯৬২ সালের ২৯শে-৩০শে জানুয়ারী তারিখে Aid India consortium আবার যে অধিবেশন হয় তাতে পূর্ব প্রতিশ্রুত সাহায্য ব্যাপারে কতদূর অগ্রসর হওয়া গেল সে সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং নতুন পরিকল্পনার কার্য্যে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার কতদূর উন্নতি হয়েছে, এবং ভবিষ্যতে আরও কতটা হওয়া সম্ভব সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এই সংস্থাভুক্ত সমস্ত দেশই এক-বাক্যে স্বীকার করে যে ভারতে আরও সাহায্য প্রয়োজন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য AIC আরও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। PL 480 খাতের সাহায্য ছাড়া এই পরিকল্পনার কাজে মোট ২৬০০ কোটি টাকা বাইরের সাহায্য প্রয়োজন কিন্তু এর মধ্যে ১৮০৯ কোটি টাকার মত সাহায্য পাওয়া গেছে বা পাবার আশা আছে।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭০ থেকে ৮০ জন কৃষিজীবী কিন্তু দেশের মোট আয়ের মাত্র ৫০ শতাংশ বা অর্দ্ধেক পাওয়া যায় চাষ থেকে। এ দেশের গড়পড়তা আয় খুবই সামান্য। কৃষিপ্রধান দেশে শিল্প প্রসারণের কাজে যে সমস্ত অসুবিধা বা বাধা আছে আমাদের সেগুলির সম্মুখীন হতে হয়েছে। দেশের লোকদের সম্মুখে শিল্প ও ব্যবসা সংক্রান্ত অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণ করবার সুযোগ উন্মুক্ত করতে হবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়িত করবার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল বা হয়েছে তার ত্রুটী বিচ্যুতি নিয়ে দেশে বিদেশে বহুরকম সমালোচনা হয়েছে, কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি মোটেই আশানুরূপ না হলেও, দেশের শিল্পের যে সত্যই পরিলক্ষণীয় প্রসার হয়েছে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় হ্রাসের। ফরেন এক্সচেঞ্জের এই সঙ্কটের অবসানের জন্য রপ্তানী বৃদ্ধির বিশেষ চেষ্টা চলছে। চা, কফি, মাছ, চিনি, লৌহ আকরের (ore) রপ্তানী বাড়লেও থইল, মশলা, চামড়া প্রভৃতির রপ্তানী নিম্নমুখী। রপ্তানী বাড়ানোর জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে রপ্তানী শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। রপ্তানী কিসে বৃদ্ধি পাবে সে বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা করবার জন্য Export Promotion Council গঠন করা হয়েছে। বাইরে এ দেশ থেকে বাজে ও ভেজাল মাল পাঠানোয়, কয়েকটী দেশে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এইজন্য মাল রপ্তানীর আগে বর্তমানে তাদের নিরীক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, যাতে বিদেশী আমদানীকারকেরা মাল পেয়ে ভারতীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে না পড়ে।

বর্তমানে ভারতের শিল্প উন্নতি ক্রমবর্দ্ধমান। লোহার ও ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ও বাইরে থেকে আমদানী অব্যাহত থাকায়, যন্ত্রশিল্পে অগ্রগতি চোখে পড়বার মত। চা-পাতা শুকানোর যন্ত্রপাতি (Tea processing machineries) মালগাড়ী, যান্ত্রিক তাঁত, মোটর, পাম্প, স্কুটার, সাইকেল, টাইপরাইটার, রেডিও এদেশে এখন প্রচুর পরিমাণে তৈরী হচ্ছে। সে সব যন্ত্রপাতি আমাদের দেশে নির্ম্মিত হচ্ছে তার মূল্য কমসে কম ২০০ কোটি টাকা। সালফিউরিক এ্যাসিড, কষ্টিক সোডা, বাইক্রোমেট সাবান, রং, বার্ণিশ প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে—বিশেষ করে

রাসায়নিক সারের (fertiliser), রেয়ন বা কৃত্রিম রেশম, কাগজ, চিনি, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, টায়ার, টিউব প্রভৃতির কারখানাগুলোরও সম্প্রসারণ হচ্ছে। বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিরও উন্নয়ন অব্যাহত গতিতে চলেছে।··· কৃত্রিম ঘি (বনস্পতি), ও পাট শিল্পের কিন্তু বেশ কিছুটা অবনতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৬২ সালের মার্চ্চ তক কেন্দ্রীয় সরকার ১০৪২টি নতুন কারখানার বা কারখানার সম্প্রসারণের জন্য লাইসেন্স অনুমোদন করেছেন। বাইরে থেকে প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে কলকব্জা আমদানী হচ্ছে। এই যন্ত্র আমদানী কি হারে বেড়ে চলেছে নীচের হিসাব থেকে তা বোঝা যাবে :

মোট আমদানী যন্ত্রপাতির বাৎসরিক গড় মূল্য (কোটি টাকা হিসাবে)

	মোট আমদানী	বাৎসরিক গড়
১৯৪৬-৫১	৩৬৬	৭৩
১৯৫১-৫৬	৫১৫	১০৩
১৯৫৬-৬১	১৭৫০	৩৫০

ভারতবর্ষের অপর্য্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এখনও কাজে লাগানো হয় নি। জল বিদ্যুৎ ও তাপ-বিদ্যুৎ কারখানাগুলোর কাজ পুরোমাত্রায় চালু হলে অদূর ভবিষ্যতে ভারত অন্যান্য দেশ থেকে অনেক অর্থ অর্জ্জন করতে সক্ষম হবে এবং আয় বৃদ্ধি পেলে দেশের লোকদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাও দেখা দেবে। জীবনযাত্রার মানেরও উন্নতি হবে। আমরা ভবিষ্যতের সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় আছি।

ইতিহাস

মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নিতল সত্তার নীলকৃষ্ণ অন্ধ গভীরে
যুগযুগান্তের তিল তিল অবক্ষেপ
চেতনতার পাললিক স্তর
আণবিক চেতনার সমষ্টিগত রক্তাক্ত আত্মদান
লোহিত প্রবালদ্বীপের মৌলিক বনিয়াদ
ধীরে——অতি ধীরে
নিজেরই অগোচরে
ব্যষ্টি হয় সমষ্টি ;
সৃষ্টির শ্বাপদ—আবির্ভাব।
সাপুড়ের বাঁশির নির্দেশে
ঝাঁপিতে ঢোকা সাপের মত
একই আধারে জমায়েৎ হয় তারা
নগণ্য——অগণ্য ;

মাথা তোলে সেই গর্বী জাতক
তুচ্ছ ক'রে টাইফুনের প্রচেষ্টা,
নীরব মহাকাল শুধু
লিখে রাখে সেই ইতিহাস
অন্তরীক্ষে।

অবচেতনার স্তরীভূত ফসিলগুলো
ঐ নাকি গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদে
ওদের পূর্বতন কণ্ঠে ?

জীবন বাতাস হয়ে জড়িয়ে ধরে
সমস্তটাকে। আর
সাগর-ধোয়া সচেতন উপরিস্তকটা
আরো রাঙা হয়ে
সূর্যে মুখ তুলে আপন মনেই হাসে।

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

"যখন সহজ চেতনায় ফিরে এলাম তখন দেখতে পেলাম অতি স্পষ্ট—একেই বলে গুরুর জ্ঞানাঞ্জনে অজ্ঞানতিমিরান্ধের চোখ খোলা বাবা—যে, বড়র জন্যে ছোটকে না ছাড়লে মানুষের শুধু যে আধ্যাত্মিক প্রগতি অসম্ভব তাই নয়, দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। জীবনের বিকাশ মানেই ছোট সুখ ছোট তৃপ্তিকে ছেড়ে বড় সুখ বড় তৃপ্তির চেতনায় ধীরে ধীরে ওঠা। ধ্যানে গুরুদীক্ষা লাভ হ'তে না হ'তে চোখের ঠুলি খসে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে মানসিক সমস্যার কুয়াশা কেটে গেল আত্মিক সমাধানের আলোকদিশায়। দেখতে পেলাম যেমন দেশের জন্যে মা ভাই বোনকে ছাড়তেই হয়, ঠিক তেমনি দেশের চেয়েও যিনি বড় তাঁর জন্যে দেশকেও ছাড়তে হ'তে পারে। সুতরাং যেমন দেশসেবার আদর্শ বরণ করলে পিতৃমাতৃসেবার আদর্শকে অপমান করা হয় না, তেমনি সর্বদেশাধিপতিকে বরণ করলে দেশকে অবজ্ঞা করা হয় না।

"তোমার ক্ষেত্রেও এই সূত্রটির নির্দেশেই সমাধান পাবে: অর্থাৎ পিতার নির্দেশের সঙ্গে যখন গুরুর নির্দেশের অমিল হয় তখন পিতার নির্দেশকে না-মানা শুধু যে অন্যায় নয় তাই নয়, এতে ক'রে পিতারও অসম্মান হয় না। কারণ গুরু নবজন্মদানের দীক্ষা দেন সর্বজন্মাধীশ জগন্নাথের কাছে পৌঁছে দিতে। তাঁকে পেলে তাঁর আদেশ নিয়ে ফিরে বাপ মা ভাই বোন দেশবাসী সবাইয়েরই সেবা করা সম্ভব হয়—এবং এই সেবাই হ'ল সবার বড় দেশসেবা মানবহিতসাধন, যার নাম—মানুষকে পরমার্থের দিশা দিয়ে বদ্ধ অবস্থা থেকে জীবন্মুক্তের পদবীতে উন্নত করতে চাওয়া। শুধু এই অল্পসুখ অল্পসেবা ছেড়ে অনল্পের মার ভুবরণেই দেশ বড় হয়, মানুষ বড় হয়। তোমার যেটা সব চেয়ে বড় স্বপ্ন তাকে জাগরণে যদি ফলাতে পারো তবে সে-সিদ্ধির ফলে শুধু যে দেশ এগুবে তাই নয় তোমার কুলও পবিত্র হবে, জননীও কৃতার্থ হবেন—কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। জুড়ে দাও—"জনকোঽপি ধন্যো জায়াপি ধন্যা।"

"এ আমার কথার কথা নয় বাবা। বেশি দূরে যাবার দরকার কি? স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টান্তই নেও না। তিনি যখন গুরুর ডাকে সাধু হয়ে ছুটলেন আমেরিকায় বেদান্তপ্রচার করতে তখন তাঁর মা ভাইবোনের কি অন্ন-চিন্তা চমৎকারা হয় নি? হয়েছিল, এবং তারা নিশ্চয়ই তাঁকে দূষেছিল। কিন্তু যখন তিনি ভারতের অধ্যাত্ম-মহিমা জগতের সামনে উজ্জ্বল ক'রে ধরলেন তখন সেই আত্মীয়দের বুকই কি দশহাত হয়ে ওঠে নি—তাঁর গৌরবে হয় নি তারা গৌরবান্বিত? কেবল সাধারণ গৃহস্থের দৃষ্টি হ্রস্ব, প্রাণ ক্ষুদ্র, তাই তারা এত দুঃখ পায় তাদের আত্মীয়-স্বজন বড়র জন্যে ছোট আদর্শকে বিসর্জন দিলে। দেখতে পায় না যে গদাধর গদাধর না থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ হ'লে তাদের অপমান হয় না, নিমাই পণ্ডিত মা স্ত্রী ও টোল ছেড়ে হরিনামে সর্বত্যাগী হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হ'লে বিষ্ণা, মা ও স্ত্রীর অমর্যাদা করা হয় না—তাঁর প্রেমসিদ্ধির আলোয় সব আঁধারই কেটে যায়। রাজপুত্র গৌতম যখন মানুষের দুঃখের কথা ভেবে রাজ্য স্ত্রীপুত্র পরিজন ছেড়ে বিবাগী হয়েছিলেন তখন তাঁর পিতা শুদ্ধোধন ও স্ত্রী যশোধারা কি দুঃখ পান নি? কিন্তু তাই ব'লে কি বলবে যে, পিতা ও স্ত্রীর মনে দুঃখ দিয়ে বুদ্ধত্ব অর্জন করতে চেয়ে

বিবাগী হ'য়ে গুরুসন্ধানে বেরুনো গৌতমের অন্যায় হয়েছিল? না বলবে—তিনি যখন বুদ্ধত্ব লাভ ক'রে ফিরে এসে পিতা ও স্ত্রীকে তাঁর নির্বাণমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন তখন তাঁরা এবং বুদ্ধের আর সব আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কৃতার্থ হন নি? না বাবা, দুঃখ এ নয় যে, তুমি যোগদীক্ষা নেওয়ার দরুণ তোমার পিতৃদেব আজ দুঃখ পাচ্ছেন। দুঃখ এই যে, তিনি চর্মচক্ষে দেখতে পাবেন না যখন তুমি সিদ্ধিলাভ ক'রে বহু মুমুক্ষুকে মুক্তির দিশা দেবে, বহু অশান্তকে শান্তির দিশা দেবে, বহু বাসনান্ধকে প্রেমের দিশা দেবে—যখন তুমি অমৃতস্বরূপকে বোধ ক'রে এসে সবাইকে বলবে: 'বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্'—আমি জেনেছি সেই মহান্ পুরুষকে যাঁকে জানলে মানুষ অমৃত হয়—শুধ্ তারাই পায় এ-পরমা শান্তি, যারা তাঁকে লাভ করে, কামকামীরা নয়—"তম্ আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।"

পাঁচ

সংসারে দুঃখ কষ্টের চাপ সইতে হয় নি এমন মানুষ সংসারে তেম্‌নি নাস্তি যেমন নাস্তি—ঘরোয়া উপমায়—সোনার পাথরবাটি—দেবভাষায়—শশশৃঙ্গ। তবে প্রকৃতির রকমফের আছেই আছে, কেউ কেউ দুঃখের আগুনে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, আবার কেউ কেউ ভেঙ্গে পড়ে। প্রহ্লাদ ছিল প্রথম থাকের মানুষ। তাই পিতার ত্যাজ্য পুত্র হ'য়ে প্রথম দিকে গভীর দুঃখ পেলেও সে-দুঃখে তার অন্তরে ভক্তি ও গুরুনির্ভর দেখতে দেখতে বিকশিত হ'য়ে উঠল বসন্তে কিশলয়ের মতন। তার মুখের শান্তি দেখে সাবিত্রীও আনন্দ কোথায় রাখবে ভেবে পায় না যেন—উঠতে বসতে কেবলই তার মনে হ'তে থাকে গুরুদেবের একটি চিঠির কথা: "অতীত কেবল একটি দীক্ষা দিতে পারে মা!—আত্মসন্ধানের। ভুলচুক চ্যুতি আমাদের অভ্রান্তি অচ্যুতির খেই ধরিয়ে দেবে এইখানেই তাদের সার্থকতা। একথা আরো বেশি প্রযোজ্য তোমার আমার মতন গৃহী যোগীর ক্ষেত্রে। তাই আমাদের এক মুহূর্তও ভুললে চলবে না যে, আমরা সংসারে আছি বিষয়ী হ'তে নয়—প্রতি পদেই ভগবানের বাহন হ'য়ে গৃহকে তপোবন ক'রে তুলতে। এ সাধনায় যদি সিদ্ধি চাও তবে একটি কথা সর্বদা মনে রাখবে: যে, যদি অপরের কাছে আঘাত পাও তাকে মনে পুষে রাখলে চলবে না, শুধু চাইবে—ভবিষ্যতে যেন সে-আঘাতে কম ব্যথা পাও আরো আত্মস্থ হ'য়ে—আরো, আরো, আরো। ব্যস্। তারপর ছেড়ে দাও নিজেকে তাঁর পায়ে। জীবনে যা কিছু আসে অনিবার্যের রূপ ধরে, তাদের প্রত্যেকটিকে যদি বরণ করো তাঁর বিধান ব'লে—দেখতে পাবে মা, শাপও হবে বর। তবে এ উপলব্ধি সব চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয় সাধনা নিলে তবে—কিনা এই পণ নিলে যে আমি সংসারে থেকেও বিষয়ী হব না হব যোগী—কৃষ্ণৈকান্ত।"

সাবিত্রীর কাছে অসময়ে এ-উপদেশ এসেছিল কথার কথা হ'য়ে না!—আলোর আলো হ'য়ে। তাই ও ক্রমশঃ দেখতে শিখল—কী ভাবে সাধনার পথে পদযাত্রা ওর কাছে সহজ হ'য়ে এসেছে এই দুঃখের মধ্যে দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ও মুক্তির পূর্বাস্বাদও পেতে আরম্ভ করল একটু একটু ক'রে। সবার উপর আনন্দ—যে, ও সন্তানবতী হ'তে চলেছে আর দুতিন মাসের মধ্যেই দেবতার বর আসবে ঘর আলো ক'রে। আনন্দে, গৌরবে কৃতজ্ঞতায় ওর মুখে ফুটে ওঠে এক নব দীপ্তি। গৌরী একদিন এসে বলে: ও মৈ! তোর রূপের এমন জেল্লা তো কই দেখি নি এর আগে? কাকে পেটে ধরেছিস লো?" সাবিত্রী লজ্জা পেয়ে বলে: "বীর হনুমান্ ছাড়া আর কে হ'তে পারে দিদি? কেবল দুঃখ এই যে পাঁচজনে মুখপোড়াকে দগ্ধানন ছাড়া আর কোনো উপাধি দিতে চাইবে না।" মনুভাই রসিক তো, একথায় একগাল হেসে বলে: "গুরুর কৃপায় তোমার কুক্ষিতে মহাবীর এসে হাজির হয়েছেন কি না একসরে না ক'রে বলতে পারব না বোঠান, তবে তোমার জিভে যে সাক্ষাৎ সরস্বতী দেবী ফর্মায়তে—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।" গৌরী সক্রভঙ্গে বলে: "চুপ্ চুপ্! গুরুর নাম নিয়ে প্রগল্‌ভতা করতে নেই। কিসে কী হয় কিছু খবর রাখো তুমি?—"

যাই হোক এই ভাবে ওদের দিন কাটে। মনুভাইয়ের আচরণে নানাসময়ে বেসুর বেতালের আমদানী হ'লেও গৌরী-প্রহ্লাদ-সাবিত্রীর মিতালিতে তথা দেড়বছরের অপরূপা রমার আধ আধ কথায় ওদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা সব ছন্দপতন সুরচ্যুতিকে দাবিয়ে উত্তরোত্তর গুরু-

ভক্তি ও সাধনভজনের পথে সুষমিত ও সুরেলা হ'য়ে ওঠে। প্রহ্লাদ রোজই সন্ধ্যায় ভজনের আসর জমায় পূজার ঘরে। গৌরী করে আরতি। ক্রমশঃ পাড়াপড়শী এসে যোগ দেয়। কয়েকটি সাগরেদও হয়—পুনা থেকে এসে গান শেখে। মহাদেব মাসে তিনশো টাকা পাঠাতেন। কিন্তু তবু সাবিত্রী ও প্রহ্লাদ অনেক চেষ্টা ক'রেও বেগ পেত সংসার চালাতে। একটা কারণ—গুরুদেবের আদেশ ছিল সাধু ও ধর্মার্থীরা অতিথি হ'য়ে এলে তাদের "না" বলতে পারবে না। দেহু তীর্থে বহু তীর্থযাত্রী আসত—আর তাদের মধ্যে অনেকেই প্রহ্লাদের গানে আকৃষ্ট হ'য়ে ওদের আতিথ্যে বেশ দু-চারদিন কাটিয়ে যেত। পুণ্যভূ ভারতে পুণ্যলোভী অতিথিরা কবে গৃহকর্তার কোষাগারের কথা ভাবে? যে একবার উড়ে আসে সে বেশ দুচারদিন জুড়ে না ব'সে ছাড়ে না। তাছাড়া প্রাত্যহিক প্রসাদ বিতরণের খরচও তো কম নয়। মাঝে মাঝে প্রহ্লাদ ভাবত নবজাতক এলে যখন আরো খরচ বাড়বে তখন সংসার চালাবে কী ক'রে? শেষে ভাবিত হ'য়ে একবার গুরুদেবকে লিখল ওর প্রবর্ধমান দুর্ভাবনার কথা—অতিথিরা কী ভাবে বেগ দেয় খোলাখুলি জানিয়ে। তাতে তিনি তিরস্কার ক'রে লিখলেন: "আমি কি হাজার বার বলি নি যে, তোমাদের আমি বিষয়ী সংসারী হবার দীক্ষা দিই নি, চেয়েছি—তোমরা গৃহী যোগী হবে? সংসারী বিষয়ীর ভর নিজের সামর্থ্য বা পৌরুষের 'পরে। গৃহী যোগীর অবলম্বন শুধু ঠাকুরের করুণা। তোমাকে পদে পদে পরিণামচিন্তা ছেড়ে শুধু ঠাকুরের উপরেই সব ভার ছেড়ে দিতে শিখতে হবে। খৃষ্টদেবের কথা নিরন্তর জপ করবে: 'দেখ ঐ মাঠের লিলির দিকে চেয়ে তারা ফুটেই খুশি, কালকের কথা ভাবে না একবারও।"

ছয়

এমনি সময়ে—সাবিত্রীর প্রসবের দিন পনের আগে—এল ফের গুরুপূর্ণিমা। প্রহ্লাদ ওর বসবার ঘরে একলা ব'সে—গুরুদেবকে একটি বড় চিঠি লেখা সুরু করেছে—হঠাৎ চমকে উঠল গৌরীর কণ্ঠস্বরে।

গৌরী (হাসিমুখে): গুরুপূর্ণিমার দিনে গুরুদেবকে প্রণাম জানাচ্ছিল? বেশ বেশ। বড় খুসি হ'লাম।

প্রহ্লাদ (চমকে উঠে): আজ গুরুপূর্ণিমা না কি? ভাগ্যে মনে করিয়ে দিলে দিদি? আমি কিছুতেই মনে রাখতে পারি না তিথি নক্ষত্র লগ্নের কথা।

গৌরী (হেসে): পুরুষ মানুষদের কীই বা মনে থাকে ভাই? তোমার দাদা মহাপ্রভুর মনের বাজারে তো কেবল পাইপের আর ইটচুন সুরকির দরের কথা ছাড়া আর কিছুই ঠাঁই পায় না।

প্রহ্লাদ (হেসে): তুমি গুরুমার একটি প্রায়োক্তি মনে করিয়ে দিলে দিদি—সব শেয়ালেরই এক রা।—কিন্তু সে যাক্। শুনছি দাদার মেজাজ আজকাল একটু ভালোর দিকে?

গৌরী (ভুরু তুলে): মেজাজী মানুষের মেজাজের কথা ভাই না তোলাই ভালো। তবে (ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সুরে) আমি আজকাল আদৌ মাথা ঘামাই না ও কী ভাবে না ভাবে নিয়ে। মাঝে মাঝে বাধে আমাদের মধ্যে (একটু থেমে সকুণ্ঠে) এ ও তা নিয়ে—সে তোর কাছে বলার জিনিষ নয়।

প্রহ্লাদ (মুখ নিচু ক'রে): জানি দিদি। বৌ বলেছে।

গৌরী (লজ্জা চেপে): বৌ যেন কী!—এত পই পই ক'রে মানা ক'রে দিলাম তোকে বলতে—সাধে কি ধর্মপুত্র কুন্তীকে শাপ দিয়েছিলেন "ন গুহ্যং ধারয়িষ্যন্তি" ব'লে।* কিন্তু বাজে কথা থাক—আমি এসেছি শুধু বলতে যে, পাড়াপড়শীদের নিমন্ত্রণ করেছি আজ আমার ওখানেই তোর ভজন হবে ব'লে। উনি অবশ্য বলেছিলেন আগে তোকে জিজ্ঞাসা ক'রে তবে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাতে।

"আমার অসাক্ষাতে কুটুট-কাটুস ক'রে কে আমার নিন্দে করছে শুনি?"—ব'লে ওদের চমকে দিয়ে হাসিমুখে মন্টুভাইয়ের আকস্মিক অভ্যুদয়।

---

* মেয়েরা গোপন কথা গোপন রাখতে পারবে না। কিন্তু আমি দুদিন পুনায় ছিলাম ব'লে সময় পাই নি তোকে জিজ্ঞাসা করবার। (হাসিমুখে) তা তোর উপরেও যদি একটু জোর না খাটাই তবে খাটাব কার উপরে বল্। উনি এই কথাটা কিছুতেই বুঝতে চান না—উঃ, কী যে খুঁৎখুঁতে কেতাদুরস্ত মানুষ!

গৌরী টুপ ক'রে বলে: "ব্যাঙের চার পারও যদি নিন্দে না করি তাহ'লে হাতীর চার পার গুণগান করি কী ক'রে বলো?"

মনুভাইয়ের মুখে হাসি মিলিয়ে যায়, বলে বিরস কণ্ঠে: "দেখলি তো প্রহ্লাদ?—তোকে কালই বলছিলাম না? আরো, তোকেই সালিশি মানছি। আমি কি সত্যি অন্যায় কিছু বলেছিলাম? শুধু বলেছিলাম তোকে আগে কন্‌সাল্ট ক'রে তবে পাঁচজনকে বলতে।

প্রহ্লাদ (তৎক্ষণাৎ): না না—দিদি ঠিকই করেছে দাদা! আমাকে আবার কন্‌সাল্ট করবে কি? অন্য কেউ হ'লে বলতে পারতে—দিদির কথা আলাদা।

মনুভাই (ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে): দিদির বুঝি সাত খুন মাপ? A king can do no wrong?

প্রহ্লাদ (সঙ্গে সঙ্গে): বটেই তো। দিদি তো আমার শুধু দিদি নয়—মার অভাব কোনোদিন টের পাই নি কার করুণায়?

গৌরী (হঠাৎ চোখে জল): কী যে বলিস তুই প্রহ্লাদ, আমি কী এমন আহা মরি দিদি শুনি?

প্রহ্লাদ: নও তো কি? শুধু তোমার জন্যেই তো গুরুদেবকে পেয়েছি। মীরার একটি গান আছে "জনম জনম কী টূটী হরিসঙ্গ সদগুরু আন মিলাই"—জন্মে জন্মে যে-হরিকে পাওয়া যায় না তাকে গুরুই মিলিয়ে দেন। আমি গাই (হেসে, সুর ক'রে)

জনম জনমকী টূটী গুরুসঙ্গ দিদিজী আন মিলাই!

মনুভাই (গম্ভীর হ'য়ে): দেখ্ প্রহ্লাদ, আমি তোদের বরাবরই ব'লে এসেছি—don't gush and lose your head! কোনো কিছুতেই বেশি বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

গৌরী (অপ্রসন্ন): বাড়াবাড়ি আবার কোথায় হ'ল শুনি?

মনুভাই (আতপ্ত কণ্ঠে): কোথায় নয়—তাই বলো। অষ্টপ্রহর গুরু গুরু গুরু! আর এর net result ও তো দেখতে পাচ্ছি: পদে পদেই এর সঙ্গে ওর বাধছে খিটিমিটি—গুরুই কেবল দেবতা—আর সবাই নগণ্য—যেমন হাতীর তুলনায় ব্যাং। দেব্‌তা, না fiddlesticks!

চেঁচামেচি শুনে সাবিত্রী ছুটে এল ভয় পেয়ে।

গৌরী (ঝংকার দিয়ে]: গুরুদেবকে ঠেশ দিয়ে কথা কোয়ো না বলছি। কার সঙ্গে কার বাধছে শুনি? আর খিটিমিটির মূলে কে—তুমিও জানো, আমিও জানি। গুরুদেবের একটা কথা আজকাল আমার প্রায়ই মনে হয়: যখন সারা সংসারটাকেই হলদে মনে হয়, তখন জেনো—হলদে হয়েছে—সংসার নয়—তোমার ন্যাবা চোখ।

মনুভাই: এই দেখ্ প্রহ্লাদ—কী টোনে আমার সঙ্গে কথা কন আজকাল গ্র্যাণ্ড গুরুবাদিনী! আগে আগে বলতেন "পতি পরম গুরু"—আমাকে প্রণাম না ক'রে কোনোদিন জলগ্রহণ করতেন না। আর আজ-কাল? গুরু গুরু ক'রে হুক্কাহুয়া করতে করতে ভুলেই বসে আছেন মহাসতী যে ধর্মপথে পতিরও কিছু প্রাপ্য আছে।

সাবিত্রী (ত্রস্ত হ'য়ে): দাদা, আজ গুরুপূর্ণিমা, কেন এমন চড়া চড়া কথা বলছেন? দিদি আপনাকে আজো তেমনিই ভালোবাসেন।

মনুভাই (সব্যঙ্গে): The wearer knows where the shoe pinches,—তোমরা কী জানবে ও আমাকে কেমন নেকনজরে দেখে? না, শোনো বোঠান, এ আমার রাগের কথা নয়—আর আমি চোখে ঠুলি প'রে পথ চলি না তো, তাই দেখতেও পাই তোমাদের চেয়ে একটু বেশি দূর। অবিশ্যি বাইরে গুরু গুরুর কাঁসর বাজিয়ে কান ঝালাপালা ক'রে ভিতরে ভিতরে কে কতটা এগিয়েছে তার খবর রাখি না। তবে চর্মচক্ষে যা দেখি তাতে তো মনে হয় শুধু ডিসহার্মনি—বেবনতিই বেড়ে চলেছে।

সাবিত্রী: আপনি কী বলছেন দাদা? দিদি গত রবিবারেও আমার কাছে বলছিল আপনার অনুমতি পেয়েছিল ব'লেই সে গুরুদেবের কাছে যেতে পেরেছিল।

প্রহ্লাদ (মনুভাইয়ের কাঁধে হাত রাখে): ঠিক কথা দাদা। আর সব চেয়ে বড় কথা এই যে গুরুর আশীর্বাদ থাকলেও (হেসে) তোমার সহযোগ না থাকলে তো আর রমা আসতো না ঘর আলো ক'রে?

মনুভাই (সবিদ্রূপে): গৌরীকে জিজ্ঞাসা করে দেখ্ না একবার। ও বলবেই বলবে—ব্যাঙের সহযোগে জন্মায় কেবল ব্যাঙাচিই।

সাবিত্রী (লজ্জাপেয়ে কানে হাত দিয়ে): কী সব অলুক্ষুণে কথা বলছেন দাদা আজ গুরুপূর্ণিমার দিনে ?

মনুভাই (উত্যক্ত) : ঐ-ঐ-ঐ—ঘুরে ফিরে সব তাতেই সেই গুরু গুরু গুরু ! স্বামীর দামও ধরতে হবে গুরুর কাছে যাচিয়ে নিয়ে তবে। (তিক্ত কণ্ঠে) খিটিমিটি বাধছে আমার জন্যে নয় বোঠান—তোমাদের এই সার্বজনীন গোঁড়ামির জন্য। তাই তো আমার সংসারেরও আজ এই হাল—স্বামী আর কর্তা নয়—শুধু রোজগেরে রসদদার—কমিসারিয়েট। (গৌরীকে) তোমার গুরু মহাপ্রভু প্রায়ই খৃষ্টদেবের নজির দেন না ? তাঁকে একবার জেরা ক'রে দেখই না—খৃশ্চানদের You cannot serve two masters মন্ত্র তিনি মানেন কি না ?

গৌরী (উদ্দীপ্ত কণ্ঠে): গুরুদেব আমার সত্যিই মহাপ্রভু। তবে এ প্রশ্ন তাঁকে করার দরকার দেখি না, কারণ শুধু যে তিনিই একথা মানেন তাই নয়, আমিও মানি মনে প্রাণে। তাই আমি আজ গুরুকেই মানি—শুধু মহাপ্রভু ব'লে না, প্রাণের প্রভু ব'লে।

মনুভাই : আর আমি শুধু দেহের প্রভু—বলো ব'লে চলো, থামলে কেন ? যা আড়ালে বলে সাধ মেটে না হয়ত হাটে বাজারে ব'লে বেড়ালে সবাই বলবে ব্রাভো ! কী গুরুভক্তি রে !

সাবিত্রী (ত্রস্ত): দাদা, এত রাগ করতে নেই আজ শুভদিনে—ঠাণ্ডা হোন। চলুন একটু ওঘরে। গ্রামোফোনে সবে বেরিয়েছে গুরুদেবের একটি কীর্তন—কী সুন্দর যে—শুনবেন চলুন—

মনুভাই (জ্বলে উঠে): রাখো তোমার গুরু গুরু বোঠান ! ও কীর্তন ফীর্তনের নাকে কান্না আমার ভালো লাগে না। ও শুনে প্রহ্লাদের সঙ্গে তোমারাই কোরাসে কেঁদে চোখের সঙ্গে নাকের জল বইয়ে দাও—আমি ওতে নেই।

প্রহ্লাদ (হেসে): আমার উপর কেন রাগ করছ দাদা ! আমি কী দোষ করলাম শুনি ?

মনুভাই : কী দোষ করলি ? তুইই তো যত নষ্টের গোড়া। তোর আস্কারা পেয়েই তো ও আজ এমন রণচণ্ডী হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু যে জেগে ঘুমোয় তাকে কে জাগাবে বল ? যে দেখেও দেখতে পায় না—কার দোষে স্নেহময় বাপ বুড়ো বয়সে গৃহ থাকা সত্ত্বেও এক্‌সাইল্‌ড্‌ হ'য়ে আছেন দূরে প্রবাসে। কে বুঝেও বুঝতে চায় না যে গুরুর চরণে দাসখৎ লিখে ক্রমাগত নাকখৎ দেওয়ার নাম আর যাই হোক ধর্ম নয়।

প্রহ্লাদ (আহত স্বরে): দাদা—

গৌরী (বাধা দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে): কী বকছ সব আবোল তাবোল ! আজ সকালবেলাই টেনেছ না কি !

সাবিত্রী (গৌরীর মুখ চেপে ধরে): তুমি থামো দিদি, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি। দাদা মদ খেলেও মাতাল তো কোনোদিনই হন না।

মনুভাই : কিন্তু সে কথা ওকে কে বোঝাবে বোঠান ? ধর্মের ভড়ঙে সাধুরা গাঁজা খেয়ে ক্ষেপলেও ও বলবে এর নাম গঞ্জিকাসিদ্ধি। সিনার অফ সিনার্স হ'ল কেবল সেই বেচারি যে সারাদিন হাড়ভাঙা খেটে সন্ধ্যায় দু পেগ খেয়ে একটু চাঙ্গা হ'তে চায়।

গৌরী : শুধু দু পেগ ! সেদিন পুনা ক্লাবে কিনি কী চলানটা চলিয়েছেন সে-খবর কি কেউ পায় নি ভাবো না কী ?

সাবিত্রী (সান্ত্বনয়ে): ও দিদি ! তুমি চুপ করো—আজকের শুভদিনে—

মনুভাই (জ্বালাময় স্বরে): চুপ করবে ? ও কি সেই পাত্রী না কী ? সবারই মুখে দিনরাত শুনছে ওর গুরুভক্তির গুণগান। শুধু মদেই মাতাল হয় না মানুষ—স্তবগানও goes to the head !

প্রহ্লাদ : দাদা ! লক্ষীটি—রাগের মাথায় যা মুখে আসে তাই বোলো না। পরে পরিতাপ করতে হবে। মনে রেখো যে, তুমিও দীক্ষা নিয়েছ। আর গুরুদেব বলেন—দীক্ষার প্রথম পাঠ হ'ল সংযম।

মনুভাই (উঠে দাঁড়িয়ে): রাখ্‌ তোর গুরুদেব আর দীক্ষার কথা। (গৌরীকে দেখিয়ে) ও ভালো করেই জানে আমাকে কেন দীক্ষা নিতে হয়েছিল। গলা টিপে ধরে নাম-সই করালে তাকে আইনেও মানে না।

গৌরী : মদ খেয়ে মাৎলামি বোঝা যায়—কিন্তু গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে মিথ্যুক হ'য়ে বলা যে আমি তোমাকে গলা টিপে ধ'রে দীক্ষা নিইয়েছিলাম—এ তোমাতেই সম্ভব বলিহারি !

সাবিত্রী (আরো ভয় পেয়ে) : দিদি—দিদি—

মনুভাই : কাকে বোঝাচ্ছ বোঠান ? মদ না খেয়েও মাতাল হয় কেউ কেউ—শুধু গুরু নামের গাঁজাখুরি গল্পে। সাধে কি আমি তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছি ? আমি মানুষ তো !

গৌরী। আর আমি বুঝি বাইরে-থাকা-আনা ধুলো-কাদা মুছবার পাপোষ ?

মনুভাই (হাত নেড়ে চেঁচিয়ে) : কে কার পাপোষ পাড়াপড়শীরা সবাই চাক্ষুষ করেছে, বুঝলে ? কেবল অন্ধই দেখতে পায় না যে গুরু গুরু ক'রে ধিঙ্গি হ'য়ে নেচে বেড়ালেই মেয়েরা রাতারাতি ম্যাডনা ব'নে যায় না। মামাবাবু সেদিন কী লিখেছেন জানো ? ভেবেছিলাম বলব না, কিন্তু আজ বলতেই হচ্ছে। লিখেছেন—অতিভক্তির ফলে মানুষ কী ভাবে ক্ষেপে যায়—stark staring mad !—সিংহলে বুদ্ধদেবের দাঁত নাকি ওরা বাক্সে বাঁধিয়ে রেখেছে—বৌদ্ধেরা যায় আর বাক্সের সামনে গড়াগড়ি দিয়ে ভাবে নির্বাণ লাভ ক'রে বুঁদ হ'য়ে থাকবে। আমার মনে হয় গৌরী আর এক কাঠি যাবে বৌদ্ধদের তুয়ো দিতে—গুরুজি গতাসু হ'লে তাঁর নাককান কেটে embalm ক'রে ওর পূজাঘরের ম্যুসিয়মে সাজিয়ে রেখে ধূপ ধুনো দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে বলবে : তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

গৌরী (রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে) : তোমার এত বড় আস্পর্ধা—গুরুদেবের অপমান করো আজ গুরুপূর্ণিমার দিনে ! যাও তুমি—ব'লে দাও পাড়াপড়শীকে—সবাই জানুক—আজ থেকে তুমি আমার কেউ নও। আমি কালই কাশী চ'লে যাব। তুমি মেম বিয়ে ক'রে মদ খেয়ে বলডান্সের ঢলাঢলির ব্যবস্থা করো ধর্ম আচার নীতি পুজোঅর্চা সব বাতিল ক'রে। আমি—

প্রহ্লাদ : দিদি ! দিদি ! লক্ষ্মীটি ! চুপ করো—আমি—আমি—

কিন্তু মুখের কথা মুখেই র'য়ে গেল—সাবিত্রী নেতিয়ে পড়ল। গৌরী এসে ধরল।

মনুভাইয়ের গোলাপী নেশা বহুক্ষণই ছুটে গিয়েছিল, এখন হন্তদন্ত হ'য়ে নিজের বাড়িতে গিয়ে টেলিফোন ধরল—ডাক্তারকে তলব ক'রে।

সাত

কিন্তু সাবিত্রীর মূর্ছা ভেঙেও ভাঙতে চায় না। ঘণ্টাখানেক পরে যদি বা চেতনা এক একবার অল্পক্ষণের জন্যে ফিরে আসে তো তার পরেই ফের দুম্ ক'রে মাটিতে প'ড়ে গেল। গৌরী ভয় পেয়ে কমলা দেবীকে টেলিফোন করল সংক্ষেপে মূর্ছার ইতিবৃত্ত দিয়ে। কমলা দেবী তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি ক'রে রওনা হয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দেহু এসে পৌছলেন। মেয়ের শিয়রে দাঁড়িয়েই প্রহ্লাদকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন : "গুরুদেবকে টেলিফোন করা হয়েছে যে ওর প'ড়ে গিয়ে চোট লেগেছে ?"

গৌরী : না, তার করা হয়েছে।

কমলাদেবী : আজকাল তার অনেক সময়েই দেরীতে পৌছয়, হয়ত কাল সন্ধ্যায় পৌছবে কাশী—কে জানে। এক্ষণি ট্রাংক কলে গুরুদেবকে জানিয়ে দাও।

গৌরী অগত্যা নিজের বাড়ি ফিরে গেল। মনুভাই মোটরে পুনা গিয়েছিল ধাত্রী আনতে। এক ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রে তবে যোগাযোগ হ'ল। ধ্রুব ফোন ধরেছিল, গৌরী বলল গুরুমাকে ডেকে দিতে। গুরুমা ফোন ধরতেই গৌরী অকুণ্ঠে সব বলল তাঁকে—কিছুই গোপন না ক'রে। শেষে বলল : "বৌয়ের মূর্ছা ভেঙেও ভাঙছে না মা, ডাক্তার কিছুই বুঝতে পারছে না। তবে মনে হয় প'ড়ে গিয়ে পেটে কোথাও লেগেছে। উনি পুনা গেছেন ধাত্রী আনতে। কিন্তু কমলা দেবী দেখেই বললেন : এ ধাত্রী ডাক্তারের কাজ নয়। তিনি নিজে ধাত্রী, তাই আমরা আরো ভয় পেয়ে গেছি। গুরুদেব ও আপনার আশীর্বাদই ভরসা।" গুরুমা আশীর্বাদ ক'রে শুধু বললেন : "দয়াময়কে বলছি। যা করার তিনি করবেন, ভয় পেয়ো না। শুধু তোমরাও মনে মনে কেবল গুরুচরণে প্রার্থনা জানাও। গুরুর অপমান কানে শুনতে নেই। জানি সাবিত্রীর দোষ ছিল না বেশি। তবে গুরুর নিন্দা সুরু হ'তেই সে চ'লে এলে এ বিপদ হ'ত না। যাক যা হ'য়ে গেছে তার তো আর চারা নেই। দয়াময় সব জানেন। তিনি মনুভাইকেও ক্ষমা করবেন, তুমি ভেবো না মা। কেবল তার কপালে দুঃখ আছে। গুরুকৃপা ক্ষমা করলেও কর্মফল ফলেই ফলে তার নিজের নিয়মে। দীক্ষা নিয়ে শিষ্য হ'য়ে তার পরে গুরুদ্রোহী হবার প্রত্যবায়ের কাটান্ নেই মা।" এর পরে

গৌরী কী বলবে? সে যে জানত—গুরুমা সব ক্ষমা করতে পারেন, কেবল গুরুনিন্দা বাদ।

গৌরী ফিরে এসে প্রহ্লাদকে একান্তে ডেকে সব বলল। প্রহ্লাদ মুখ নিচু ক'রে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল: "আমারই দোষ হয়েছিল—মন্নুদার মুখে গুরুদেবের নিন্দা শোনামাত্র তাকে ঠাণ্ডা করতে না চেয়ে কানে আঙুল দিয়ে আমার স্থানত্যাগ করা উচিত ছিল সাবিত্রীকে নিয়ে। আমি কেবল ভাবছি—"

এমন সময়ে পুনা থেকে ধাত্রী নিয়ে মন্নুভাই ফিরে এল তার মোটরে। ধাত্রীকে গৌরী সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল সাবিত্রীর ঘরে। প্রহ্লাদ উঠে গিয়ে বিষ্ণুঠাকুরের ছবির বেদীমূলে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ছবির দিকে। মন্নুভাই ওর পিছনে পিছনে গিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে উশখুশ ক'রে অবশেষে বলল: "মামাবাবুকে একটা তার ক'রে দিই তোর নামে?"

প্রহ্লাদ (মুখ না ফিরিয়েই): প্রয়োজন নেই।

মন্নুভাই: এ তোর অন্যায় প্রহ্লাদ।

প্রহ্লাদ (ফিরে মন্নুভাইয়ের চোখে চোখ রেখে): না। তার করলেই অন্যায় হবে।

মন্নুভাই (কাষ্ঠহাসি হেসে): শোন্ প্রহ্লাদ, অবুঝ হোস নি। এ রাগারাগির কথা নয়—কমনসেন্সের কথা।

প্রহ্লাদ: দীক্ষা নেবার পরেও আমি আর কোনো সেন্সের হুকুমে চলতে চাই না। শুধু এই প্রার্থনাই করি: স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

মন্নুভাই (চটুল সুরে): সাবাস্! কিন্তু শুভবুদ্ধির সঙ্গে তোর মগজকে জুড়ে দেবেন কিনি শুনি? পুণ্ডরীকাক্ষ?

প্রহ্লাদ (নির্বিচল): তিনিই। তবে গুরুবরণ করার পরে তিনি সচরাচর গুরুকেই তাঁর প্রতিনিধি বহাল ক'রে থাকেন।

মন্নুভাই (রাগ চেপে): পাগলামি করিস নে মিথ্যে গোঁ ধ'রে। গুরুদেবকে স্বর্গে তুলতে হ'লে পিতৃদেবকে জাহান্নমের জিম্মায় দিতে হবে এ শুভবুদ্ধির কথা নয়, দুর্বুদ্ধির কথা? For the sake of conscience—বিবেক—

প্রহ্লাদ: মন্নুদা, মিথ্যে তর্কাতর্কি ক'রে কী হবে? তোমার বিবেক আর আমার বিবেক এক পথের পথিক নয়। আমি যে-ডাক শুনেছি, সেই পথেই আমাকে চলতে হবে।

মন্নুভাই: লম্বা লম্বা কথা ছাড়্। গুরুদেবকে টেলিফোন করতে তোর বিবেকে বাধল না, বাধছে কেবল পিতৃদেবকে তার করতে? ননসেন্স! এই আমি চললাম মামাবাবুকে তোর নাম দিয়ে তার ক'রে দিতে।

প্রহ্লাদ (রুক্ষ স্বরে): না মন্নুদা, তাহ'লে আমি ফের তার করব তোমার তার পাল্টে দিয়ে।

মন্নুভাই: এত রাগ যোগীকেই মানায় বটে! শুনি—মামাবাবু কী এমন অপরাধ করেছেন?

প্রহ্লাদ: করেন নি? গুরুদেবের অপমান কে করেছে বুদ্ধদেবের দাঁতের প্রসঙ্গে? যে-গুরুনিন্দা আমি তোমার মুখে শুনেও কানে আঙুল দিয়ে বৌকে নিয়ে স্থানত্যাগ করি নি, সেই পাপেই আমাদের আজ এ-শাস্তি।

মন্নুভাই (একটু চুপ ক'রে থেকে): কিন্তু তাঁর তরফের কথাটাও একটু বুঝতে চেষ্টা করা উচিত নয় কি তোর? In the name of good sense—

প্রহ্লাদ (আতপ্ত): তাঁর তরফের কথাটা আবার কী শুনি? আমি কি চুরি ডাকাতি করেছি, না পরস্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছি যে আমার মুখদর্শন পর্যন্ত না ক'রে—আমার কি বলবার আছে না শুনে—তিনি চ'লে গেলেন আমাকে ত্যাজ্য পুত্র ক'রে? খুনী আসামীকেও ফাঁসি দেবার আগে তার কী সাফাই আছে বলবার সুযোগ দেওয়া হয়—আমাকে তিনি তাও দিলেন না! (হঠাৎ) তবে হ্যাঁ, আমি তাঁকে আজ তার করব—জানিয়ে যে তাঁর মাসোহারা আমি চাই না। তুমি তার ক'রে দিতে পারো—সাবিত্রীর প্রসবের পর আমরা এ-বাড়ি ছেড়ে দেব। নিজের পায়ে আমাকে দাঁড়াতেই হবে। মিথ্যার সঙ্গে রফা আর না। গুরুবাদী হ'য়েও সুবিধাবাদী হ'লে আমার নরকেও স্থান হবে না।

আট

মন্নুভাই মোটরে হর্ণ বাজাতে বাজাতে সোজা পোস্টাফিসে গিয়ে মহাদেবকে তার ক'রে দিল—

সাবিত্রীর মূর্ছা ভাঙছে না, গর্ভপাত হ'লে প্রাণসংশয়। এখুনি ফিরে আসুন আকাশপথে—ইতি অনুতপ্ত প্রহ্লাদ।"

তার ক'রে দিয়ে বাড়ি ফিরেই দেখে: প্রহ্লাদ অপেক্ষা করছে। মুখে হাসি টেনে বলে: "কী রে প্রহ্লাদ? ধাত্রী বোঠানকে দেখে কী বললেন?"

প্রহ্লাদ: ঠিক বুঝতে পারছেন না। শুধু বললেন—এ অবস্থায় মূর্ছা এতক্ষণ থাকা ভালো না—কিন্তু সে কথা থাক। তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

মনুভাই (এড়িয়ে): এই এমনি—একটু কাজে।

প্রহ্লাদ: আচ্ছা, মিথ্যে বলতে কি তোমার এতটুকুও বাধে না মনুদা?

মনুভাই (রাগের ভান ক'রে): মিথ্যে!

প্রহ্লাদ: নয় তো কি? পোস্টাফিসে গিয়ে আমার নামে বাবাকে তার ক'রে দাও নি তুমি? শোনো মনুদা, অনর্থক আবার একটা মিথ্যা কথা ব'লে পাপের বোঝা বাড়িয়ো না—যখন আমি জানি তুমি কী লিখেছ।

মনুভাই (সব্যঙ্গে): যোগ বলে না কি?

প্রহ্লাদ: আমি গুরুদেবের আশীর্বাদে সময়ে সময়ে সত্যিই দূরে কী ঘটছে দেখতে পাই—তোমার পিণ্টো যাকে বলেন—ক্লেয়ারভয়ান্স। বলব—তুমি কী তার করেছ?

মনুভাই: গুরুর আশীর্বাদ! Fiddlesticks! Fell that to the Merines!

প্রহ্লাদ (সভ্রূভঙ্গে): তবে শোনো। তুমি লিখেছ: "সাবিত্রীর মূর্ছা ভাঙছে না। গর্ভপাত হ'লে প্রাণসংশয়। এখুনি ফিরে আসুন আকাশপথে—অনুতপ্ত প্রহ্লাদ।"

মনুভাই (খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে ঢোঁক গিলে): আমি—আমি—বেশ করেছি। আমি তোদের মতন গুরুর ধামাধরা নই—

প্রহ্লাদ (কানে আঙুল দিয়ে): চললাম। তুমি আর এসো না আমার এখানে।

মনুভাই (নরম হ'য়ে প্রহ্লাদের হাত চেপে ধরে): লক্ষ্মীটি ভাই, রাগ করিস নি। আমি তোর গুরুদেবের সম্বন্ধে আর কোনো কথাই বলব না—কথা দিচ্ছি। কিন্তু তোকে শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করি—প্রত্যেকেরই তার নিজের মতে চলার অধিকার নেই কি?

প্রহ্লাদ: আছে, কিন্তু আর একজনের অধিকারকে ডিঙিয়ে নয়। তুমি নিজের নামে একটা কেন পঞ্চাশটা তার করো না যদি চাও। কিন্তু আমার নাম জাল করতে পারো না। আমি কি এইমাত্র বলি নি যে, বাবার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই আমি রাখতে চাই না।

মনুভাই (রুষ্ট): রোখ ক'রে কুপুত্র হবার চেয়ে সদুদ্দেশ্যে মিথ্যাবাদী হওয়া ঢের ভালো—পিণ্টো ঠিকই বলে।

চললাম আমি তার সঙ্গে এ বিষয়ে একটা খোলাখুলি ডিস্কাসন করতে।

ব'লেই ঘর থেকে বেরিয়ে মোটরে চেপে হর্ণ দিয়ে উধাও।—পুনায় পিণ্টোর সঙ্গে পরামর্শ না করলেই নয়। ব্যাপারটা দেখতে দেখতে কী-ভাবে ঘোরালো হ'য়ে উঠল—ভাবতে ভাবতে প্রহ্লাদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে মনে মনে বলল: "কোত্থেকে যে এই পিণ্টোটা এল—ওর শনি!"

ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং···

নয়

প্রহ্লাদ (টেলিফোন ধ'রে): কে?

টেলিফোনে: আমি—শ্রীবিষ্ণুশর্মা—কাশী থেকে কথা বলছি।

প্রহ্লাদ (কপালে ডান হাত ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে): গুরুদেব?

টেলিফোনে: প্রহ্লাদ? তোমাকেই চাইছিলাম—তুমি আর গৌরী ঘণ্টাখানেক আগে আমাকে তার করতে চেয়েছিলে ব'লে।

প্রহ্লাদ (বিস্ময় চেপে): হ্যাঁ গৌরীও বলছিল আপনাকে তার ক'রে দিতে যে—পুনার ধাত্রী ও ডাক্তার এসেছিল—কিন্তু তারা ধরতে পারছে না কী হয়েছে। মূর্ছা ভেঙেও ভাঙছে না। দিদি মা-কে—মানে কমলা দেবীকে—টেলিফোন ক'রে আনিয়েছে।

টেলিফোনে: জানি। গুরুমা বলেছেন সব। শোনো। ভয়ের কোনো কারণ নেই—কেবল মনে রাখা চাই দুটি জিনিষ: এক, তোমরা সংসারী নও, গৃহী যোগী; দুই যোগীর মনে রাখা চাই যে বিপদে আপদে তার একমাত্র অবলম্বন ঠাকুরের কৃপা।

প্রহ্লাদ: মনে রাখতে চেষ্টা তো করি গুরুদেব, কিন্তু বিশ্বাস যে এখনো দুর্বল কী করব? তার উপর আর এক অশান্তি এসেছে—মন্টুভাই কলম্বোয় পিতৃদেবকে তার করে দিয়েছে আমার নামে—"ফিরে আসুন, অনুতপ্ত প্রহ্লাদ" ব'লে।

টেলিফোনে: ও যা করে করুক—ভুগবে কর্মফল। উপস্থিত ও অন্ধকারের চরদের সঙ্গে মিতালি করেছে—ওর উপর রাগ ক'রে ফল নেই। যে গুরুদ্রোহী হ'য়ে একবার ঢালুপথে গড়াতে সুরু করেছে, সে শেষ পর্যন্ত না গিয়ে প্রায় থামতে পারে না। কিন্তু তাই ব'লে তোমরা অধীর হ'লে পার পাবে না, ভুললে চলবে না, যে এইভাবেই পরীক্ষা আসে নানা দিক থেকে অভাবনীয় রূপে। গৌরীকে তাই বলবে রাগ সামলাতে, তাকে মনে রাখতে হবে যে সে কৃপা পেয়েছে—আর কৃপা যে পায় তার দায়িত্বও বেশি।

প্রহ্লাদ: বলব, গুরুদেব। শুধু একটা কথা—আমি কী ভাবে চলব—ধরুন যদি পিতৃদেব ফিরে আসেন তার পেয়ে?

টেলিফোনে: তর্কাতর্কি কোরো না তাঁর সঙ্গে।

প্রহ্লাদ: যদি তিনি গুরুনিন্দা করেন?

টেলিফোনে: স্থান ত্যাগ করবে—কিন্তু কটূক্তির উত্তরে কটূক্তি কোরো না ভুলেও। মনে রেখো—ঠাকুর শুধু যে ভুলচুক অপরাধকেই কাজে লাগান তাই নয়—মহাপাপীকেও বার বার ক্ষমা ক'রে সুযোগ দেন আত্ম-শোধন করবার। তাই কে বলতে পারে যে তোমার বাবার সুমতি হবে না? ঠাকুরের চাল কে বুঝবে বাবা?

প্রহ্লাদ: শুধু একটা কথা গুরুদেব—

টেলিফোনে: Time's up, please! Sir minutes.

ক্রমশঃ

কৈশোরের কাশী

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

(জীবন স্মৃতি)

'বৃদ্ধের বারাণসী'। ছোট্-ঠাকুমা ওই হিসেবে কাশী বাস করবার জন্যে চলে গেলেন; কিন্তু তাতে তিনি আমার জীবনেরও একটা নতুন দ্বার খুলে দিলেন। সে দ্বার হোল—আমার কৈশোরের কাশী যাত্রার দ্বার। সুতরাং আমার বন্ধনমুক্ত চঞ্চল কিশোর মন কাশী যাবার জন্যে অস্থির হোয়ে পড়লো। একটা পেছ-টান ছিল—পরীক্ষা; কিছু-দিন পরে সেটা চুকে গেলেই, একদিন সন্ধ্যায় ছ'টাকা চার আনা দিয়ে, কাশীর একখানা তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট কিনে গাড়ীর বেঞ্চে গিয়ে বসলুম।

কাশীতে ছোট্-ঠাকুমার ঠিকানা ছিল—হরিনারায়ণ চাকলানবীশের বাড়ী, রানামহল, বাঙ্গালীটোলা। আমি একা এবং আমার একটা ছোট্ট বিছানার গাঁটরিও একা, সুতরাং আমার 'এক্কা' বড় রাস্তা দিয়ে বরাবর ছুটে এসে দশাশ্বমেধ ঘাটের সামনে আমাকে নামিয়ে দিলে। সেখান থেকেই সুরু হোল—গলি। সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে খালি গলি—গলি—গলি। ছিলুম কোলকাতায়, তার চেহারা এক, সে-চেহারায় কখনো কোন বৈচিত্র্য মনের ওপর দাগ কাটেনি, তবে আবাল্যের সেই প্রিয় ও পরিচিত মাটি—, তার বুকের ভেতর থেকে যেন দু'খানা স্নেহ মধুর হাত বার কোরে আমাকে গভীর আদরে জড়িয়ে রেখেছিল। তারপর দেওঘরে গিয়ে মনে হল, জনাকীর্ণ শহরের সোরগোল থেকে দূরে সরে এসে প্রকৃতি জননী এখানে নির্জন কোলাহলশূন্য শাল-মহুয়ার তলায় এসে তার মুখের অবগুণ্ঠন খুলে বসেচে। কাশীর রূপ আবার ভিন্ন রকমের। জনাকীর্ণও বটে, সোরগোলও বটে, কিন্তু চির-পরিচিত ঐ দুটো জিনিসই এখানে একটা অপূর্ব ভাবে ভরা। সেভাব কিশোর মনে এসে বিচিত্র এক তরঙ্গ তুলেছে, সে তরঙ্গে মন প্রাণ নেচে উঠেছে, কিন্তু কেন এবং কি জন্যে তা তখন কিছুই বুঝতে পারিনি।

এক এক বিষয়ে কাশীর রূপ এক এক রকমের। তার

প্রত্যেক রূপের ভেতরেই অসাধারণত্ব এবং বৈচিত্র্যে ভরা। গঙ্গার এক রূপ, দেবায়তনের এক রূপ, তার পরিবেশ ও পূজার্চনাদির এক রূপ, রাস্তা-ঘাট অলিগলির এক রূপ, কাশীবাসীর এক রূপ, লোক-জনের একরূপ, দোকান-পশার-বাজারের এক রূপ, বাগান-বাগিচার এক রূপ, গঙ্গার অসংখ্য শ্রেণীবদ্ধ ঘাটের এক রূপ। জগতের সব রকম রূপের যেন কাশীতে মহামিলন ঘটেচে। রূপময় কাশী। অনাদি-কালের কাশী। ইতিহাস এর পুরো নাগাল পায় না, পুরাণ একে আঁক্‌ড়ে পায় না।

পঞ্চ-ক্রোশী কাশী। 'বরুণা' থেকে 'অসি'—এই নিয়ে বারাণসী। গঙ্গা এখানে অর্দ্ধবৃত্তাকারে কাশীকে বেষ্টন করে প্রবাহিত। তীরে অসংখ্য পাথর বাঁধানো ঘাট। ঘাটের পর ঘাট। এক ঘাটের পাশ থেকে আর একঘাট তৈরী, মধ্যে এক ইঞ্চি মাটি নেই। ভারতবর্ষের যত রাজা মহারাজা, সবারই নির্মিত ঘাট কাশীতে। প্রত্যেক ঘাটের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত অসংখ্য সিঁড়ি। এ সম্বন্ধে একটা লোকপ্রবাদ আছে—

'ষাঁড়, সিঁড়ি, সন্ন্যাসী—
তিন নিয়ে কাশী।'

এই সব সিঁড়ি ভেঙ্গে গঙ্গাবক্ষে নামা যতটা সহজ, ওঠা ততটা সহজ নয়, বিশেষতঃ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পক্ষে। কিন্তু তবু তাঁরা নামেন এবং ওঠেন। তাঁরা বলেন, বিশ্বনাথের দয়া।

আমাদের 'রাণা-মহল'য়ের প্রবেশমুখ গলির দিকে, অন্য মুখ গঙ্গার দিকে। দু'মুখে দুই দ্বার। প্রবেশ দ্বারের ওপর ঘর; সে ঘরে থাকে দ্বার-রক্ষী-চৌকিদার। রাত দশটায় দু'মুখের দুই দ্বারে তালা চাবি লাগানো হয়। ভোর পাঁচটায় আবার খুলে দেওয়া হয়। তবে রাত্রের মধ্যে হঠাৎ কারো আবশ্যক হোলে, চৌকিদার দ্বার খুলে দেয়।

প্রবেশ-দ্বারের মুখোমুখী, গলির বিপরীত দিকে বেহারীবাবুর ছোট্ট একরত্তি ষ্টেশনারী দোকান। বেহারী-বাবুর বয়স বছর ৩৫।৩৬, গৌরবর্ণ, মধ্যমাকৃতি। নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। সকলের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ও কথাবার্তা ছিল অতি ভদ্র এবং নম্র। রোজ সকালে খানিকক্ষণের জন্যে তাঁর দোকানে গিয়ে না বসলে তৃপ্তি হোত না। গলি-পথ দিয়ে নানা ধরণের লোক চলাচল হোত, তাই দেখতুম।

"এটি কে হে, বেহারীবাবু?"

মুখ তুলে প্রশ্নকর্তার দিকে চাইলুম। অসামান্য রূপ-বান; হাতে একটা সামান্য ও অতি সাধারণ লাঠি। বেহারীবাবু বললেন—"ওকে তুমি চিনবে না, ঠাকুদ্দা। ওঁর ঠাকুমা কাশীবাস করতে এখানে এসে আছেন, তাঁর কাছে এসেচে, এখানে বেড়াতে, নাম বোলে বেহারীবাবু আমার নামটা বললেন। আমার হাতে একখানা 'মুকুল' মাসিকপত্র ছিল। বেহারীবাবুর ঐ ঠাকুদ্দা আমার হাতের 'মুকুল'খানার দিকে চেয়ে দেখলেন, তারপর যেন চম্‌কে উঠে বললেন—"অদ্ভুত জুতো! বাঃ চমৎকার!" বলবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঠাকুদ্দা আমার হাতটা ধরে হিড়্-হিড়্ কোরে টেনে নিয়ে গেলেন—'পুষ্পদন্তেশ্বর'য়ের ঐ দিকে তাঁর বাড়ীতে।

ঠাকুদ্দার চেহারাটি অতি রমণীয়। গায়ের রং ধব ধবে ফর্সা, মুখশ্রী অতি সুন্দর ও মহিমামণ্ডিত। সবার ওপর তাঁর চোখ দুটি। সে চোখের চাহনীতে কি এক স্বর্গের সুষমা যেন বাসা বেঁধে আছে; যেন রৌদ্রোজ্জ্বল সাগরের খানিকটা নীলাভ স্বচ্ছ জল চোখ দুটির মধ্যে টল্ টল্ করচে। মাথায় এক মাথা কার্লিং বাব্‌রি চুল গুচ্ছে গুচ্ছে ঘাড়ে, কাঁধে আর কানের পাশে ছড়িয়ে পড়েচে। ঠিক এই রকম চুল, এই রকম মুখ, এই রকম চোখ আর সে চোখের এই রকম মায়া-মধুর চাহনি আর একজনের দেখেছিলুম! দেখেছিলুম ছবিতে। সে ছবি রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের ফটো-চিত্র।

ঠাকুদ্দার বয়স কিন্তু ৭০য়ের নীচে। ষাটেরও নীচে। এমন কি ২৫।৩০য়েরও নীচে। আমার চেয়ে মাত্র এক-আধ বছরের বড়। অথচ তিনি ঠাকুদ্দা; মানে—তখনকার কাশীর স্থায়ী বাঙ্গালী পরিবার মাত্রেরই ঠাকুদ্দা। একদিকে তাঁর গভীর জ্ঞান ও বিদ্যার এবং আর একদিকে সবার প্রতি তাঁর প্রীতি ভালোবাসা তাঁকে সকলের প্রিয় করে তুলেছিল। ঠাকুদ্দার একটা নাম আছে নিশ্চয়ই এবং সে নাম হোল—ক্ষিতিমোহন সেন। ভবিষ্যতে শান্তি-নিকেতনের পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। আশা করি, এর পর আর তাঁর পরিচয়ের কোন আবশ্যক নেই।

সেদিন থেকে ক্ষিতি আর সকলের মত আমারও হলেন ঠাকুর্দা ; আর আমি হলুম তাঁর 'অদ্ভুত জুতো'। কথাটার একটু মানে বুঝিয়ে দি। ছোটদের নাম-করা পত্রিকা তখন 'মুকুল'। মুকুলের প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার, কিন্তু সম্পাদক বোলে তাঁর নাম থাকতো না। প্রসিদ্ধ ডাক্তার নীলরতন সরকারের তিনি সহোদর ভাই। শিশুসাহিত্যের স্রষ্টারূপে তাঁকেই আমরা প্রথম দেখি। 'হাসি খুসি', 'রাঙ্গা ছবি', 'খুকুমণির ছড়া' প্রভৃতি বহু শিশুগ্রন্থ তিনি লিখে গেছেন। 'হারাধনের দশটি ছেলে'র লেখক তিনিই। তাঁর সম্পাদিত ঐ 'মুকুল' পত্রিকার সে সময় খুব প্রচার ছিল। ঐ সময় 'মুকুলে'র একটা গল্প-প্রতিযোগিতায় আমার লেখা একটা গল্প প্রথমস্থান লাভ করেছিল। সেই আমার জীবনে প্রথম লেখা গল্প। সম্ভবতঃ বাংলা ১৩০৬ সালের অঘ্রাণ মাসের 'মুকুলে' ঐ গল্পটা অনেকগুলো ছবিসহ প্রকাশিত হয়। গল্পটীর নাম 'অদ্ভুত-জুতা'। ইতিপূর্বে স্থানান্তরে আমি এ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। পুরস্কারটা আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে—আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়। পূর্বেকার রচনায় আমি এসব কথা সবিস্তারে লিখেছি। আমার ঐ 'অদ্ভুত জুতা' গল্পটি অনেকেই সে সময় পড়েছিলেন ; ক্ষিতিও পড়েছিলেন, তাই আমাকে ঐ নামেই ডাকতে সুরু করেন।

কাশীতে ঐ সময় আরো কয়েকজন সমবয়সী বন্ধু পেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে পেয়ে বোসেছিলেন সব-চেয়ে বেশী ক্ষিতি। উদয়াস্ত ক্ষিতি আমাকে তাঁর সঙ্গ থেকে সরে আসবার ফাঁক দিতেন না। না, তারও বেশী ; উদয়েরও ঘণ্টাখানেক আগে—অর্থাৎ ভোর পাঁচটা থেকে, আর অস্তেরও ঘণ্টা-তিনেক পরে—অর্থাৎ রাত নয়টা পর্যন্ত ক্ষিতি আমাকে তাঁর কাছে আট্‌কে রাখতেন—দুপুরের কয় ঘণ্টা বাদে। ও সময়টায় আমারও স্নানাহারের দরকার, আর ওঁরও কলেজ যাবার তাগিদ। বেনারস কলেজের ছাত্র। ছাত্রটিকে কিন্তু আমি কখনো বাড়ীতে পড়তে দেখিনি। অথচ কলেজের মধ্যে মেধাবী ছাত্র বলে খুব সুনাম। ক্ষিতি বেনারস কলেজ থেকেই সংস্কৃতে এম, এ. পাশ করেন। কিন্তু পাশ করার বহু আগে থেকেই ওঁর সংস্কৃতে গভীর জ্ঞান এবং কাব্য-সাহিত্য-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত প্রভৃতিতে অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য। সেই বয়সেই দাদু, কবীর, নানক, রামদাস প্রভৃতির বিষয়ে ক্ষিতির অসাধারণ জ্ঞান ছিল।

কিছুদিন ধরে ভোর পাঁচটার সময় আমরা দু'জনে 'গৈবী' যেতাম। আমাদের বাঙ্গালীটোলা থেকে 'গৈবী' প্রায় আড়াই মাইল দূর। ওখানে একটা কুয়া আছে, যার জল খুব উপকারী। প্রত্যুষে গিয়ে পেট ঠেসে ওই জল খেতে হয়। আমরা দু'জনে ওখানে গিয়ে, একটু জিরিয়ে নেবার পর, কুঁতিয়ে-কুঁতিয়ে এক পেট জল খেতুম। একদিন জল খাবার পর বললুম—"ঠাকুর্দা, আজ এত জল খেয়েছি যে নড়তে পাচ্ছি না, তুমি বাড়ী যাও, আমি এইখানেই আজ মাটি নিয়ে শুয়ে থাকি।" ক্ষিতি বললেন —"সত্যিই আমার ইচ্ছে করে, এইখানে একখানা কুঁড়েঘর বানিয়ে বরাবর থাকি। ঋষিদের আশ্রম হে! কী শান্ত, কী সুন্দর, কী পবিত্র, কী মহান!" বাস্তবিকই স্থানটি অতি সুন্দর ; শান্ত-গাম্ভীর্য ও পবিত্রতায় ভরা। কুয়ার কাছেই একটি ঘন শাখা-প্রশাখাযুক্ত তরুণ বটগাছ, তার থেকে খানিকটা দূরে দু'একটা নিম ও আমলকী গাছ। ওপাশে প্রকাণ্ড একটা বকুল, তারপরে কয়েকটা বড়-বড় আম গাছ। সেই সব গাছের পাতার আড়াল থেকে দু'চার রকম পাখীর মধুর ডাক শুনতে পাওয়া যেত। প্রভাতী-সূর্যের প্রথম কিরণ, মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ বাতাস। এইরকম শান্ত-গম্ভীর স্থান, পাখীর এইরকম ডাক—জানি না, দেবতাদের স্বর্গ কি এর চেয়েও সুন্দর ?

এই 'গৈবী'তে বোসেই ক্ষিতি সমস্ত 'মেঘদূত'খানা আমাকে শুনিয়েছিলেন ও ব্যাখ্যা কোরে আমাকে বুঝিয়েছিলেন। আশ্চর্য্য মেধা আর স্মরণশক্তি! মেঘদূতের কোথায় সৌন্দর্য্য, সে সৌন্দর্য্যের গভীরতা কতখানি। উজ্জয়িনী, তার ভৌগোলিক অবস্থান, মহাকালের মন্দির, তাঁর আরতি, দেবদাসী প্রভৃতি সবকিছু বিস্তারিত অথচ সহজ সরল কোরে আমাকে বুঝিয়ে দিতেন। সেই বয়সে ক্ষিতির জ্ঞান আর পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হোয়েচি, মনে চমক লেগেচে, কিন্তু তখন কিশোরবয়সে সে জ্ঞান আর পাণ্ডিত্যের ঠিকমত পরিমাপ করবার ক্ষমতা ছিল না, সে শক্তি তখনো হয় নি। ভবিষ্যতে তা মাপ করতে গিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে গিয়েচে, নিজেকে ভাগ্যবান্ বলে মনে করেচি।

এক একদিন বিকেলের দিকে কোন কারণে ক্ষিতিকে পাওয়া যেত না; সেদিন একলাই কাশীর নানাদিকে বেড়াতে যেতুম। যেদিন 'চক্'য়ের দিকে যেতুম সেদিন সেখানকার চতুষ্পার্শ্ববর্তী দোকানে-দোকানে নানারকম সুগন্ধি ফুলের সমারোহ দেখে মন যেন বহুদূরান্তরের অন্য কোন অদেখা দেশের মধ্যে গিয়ে পড়তো। সে দেশ যেন শৈশবের স্বপ্নভরা, যেন রূপকথায় শোনা—বহুদূর-দূর-দূরের দেশ। সে দেশের রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে পাতালপুরীর রাজকন্যার খোঁজে বেরিয়েছিলেন। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। চারিদিক ফুলে ফুলে ফুলের গন্ধে ভরা। চারিদিকের দোতালা বাড়ীগুলোর আলো জ্বলে উঠেচে। সেখানে ঘরে-ঘরে বাইজীদের মধুর কণ্ঠের সুরলহরী, ফুলের জমাট গন্ধের ওপর তরঙ্গ তুলে নেচে বেড়াচ্ছে। মন তখন যুগ-যুগান্ত পেরিয়ে পেছনের দিকে ছুটে যায়। হাজার হাজার বছর পার হোয়ে ছুটে যায় সেই হারুন অল-রশীদের বোগদাদ সহরে—তার সন্ধ্যার আলো-ঝলমল্ গন্ধ-পাগল চক্-মহলে। পরমুহূর্তেই সম্বিৎ ফিরে আসে, বাঙ্গালীটোলার পথে পা বাড়াই।

কোন-কোন দিন অপরাহ্নের দিকে আবার নৌকো ভাড়া কোরো কাশীর গঙ্গায় ভাসতুম। তখন নৌকা ভাড়া খুব সস্তায় হোত; ঘণ্টাদুই ধরে বেড়ানো চার আনা কি ছ' আনাতেই হোত। গঙ্গাবক্ষ থেকে কাশীর দৃশ্য অপূর্ব। দৈবাৎ কথনো এক আধ জন ইউরোপীয়ানকে নৌকো থেকে মানমন্দির ও অন্যান্য বাড়ীর ফটো নিতেও দেখা যেত। কাশীর গঙ্গাবক্ষ—তার আর তুলনা নেই। কাশীর সব কিছুই অপূর্ব, সব কিছুই অসাধারণ, সব কিছুই মাধুর্যময়, সব কিছুই গৌরবমণ্ডিত। কাশী যেন ভারতের অন্য সব দেশ থেকে আলাদা, সাধারণ জগতের সঙ্গে তার যেন কোন যোগ নেই, তা থেকে যেন সে অনেক উর্দ্ধে। পৌরাণিক কাহিনী ছেড়েদি, ঐতিহাসিক গৌরবে কাশী জগতের শ্রেষ্ঠ। মহাভারতের সমস্ত মহাপ্রাণের কাশীর মাটিতেই মহামিলন ঘটেছিল। এখানেই গৌতম বুদ্ধের প্রিয় 'মৃগদাব'—সারনাথ। তাঁর প্রথম পঞ্চশিষ্য এই-খানেই উপসম্পদা পেয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্যের স্মৃতি এখানকার মাটিতে-আকাশে মিশে রয়েছে। ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি শত শত সাধকের অমৃতবাণী এখান থেকেই চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হোয়েছে। কাশীর 'মানমন্দির' 'বেণীমাধবের ধ্বজা' যুগযুগান্তের বিস্ময়! এককথায় বলা যায়, সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারত শ্রেষ্ঠ, আর ভারতের মধ্যে কাশী শ্রেষ্ঠ।

কি সুখেই যে কাশীর তখনকার দিনগুলো কেটেচে! কৈশোরের সেই সব দিন কি আর ফিরে পাওয়া যায় না? না,—অসম্ভব; জগৎপদ্ধতির তা নিয়ম নয়। জগৎ পদ্ধতি নিষ্ঠুর।

রোজ সন্ধ্যার পর ক্ষিতিমোহনের পড়বার ঘরে কিছুক্ষন ধরে কাটিয়ে আসা আমার পক্ষে অনিবার্য্য ছিল। কোনকারণে কোনদিন বিকেলের দিকে যেতে না পারলে, সন্ধ্যার পর আমি যেতুমই। এই অবিচ্ছেদ্য যাওয়ার মধ্যে শুধুমাত্র যে ক্ষিতির প্রীতির টান ছিল, তা নয়; টান ছিল আর একটি জিনিসের। সেটি হোল, প্রায় নিত্যই ঐ সময় ক্ষীর ও ছানার তৈরী নানারকম উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন আমাকে খেতে দেওয়া হোত—বরফি, পেঁড়া, সন্দেশ, গুজিয়া ক্ষীরপুলি, চম্ চম্ প্রভৃতি। ঐসব মিষ্টান্ন এত ভালো লাগতো যে থালাখানার কোথায়ও সে সবের একরত্তিকণাও পড়ে থাকতো না; পিঁপড়ে এলে তাকে কেঁদে ফিরতে হোত। ঐ সমস্ত মিষ্টান্ন কোথা থেকে আসতো, একথা জানবার ইচ্ছা হোলেও সে সময় জিজ্ঞাসা করিনি; জিজ্ঞাসা করলে পাছে কোনো কারণে, মনস্তত্ত্বের কোনো অজ্ঞাত নিয়মে ঐ মিষ্টান্ন আসা বন্ধ হোয়ে যায়। সুতরাং যে অমিয়স্রোত স্বতঃই বইচে, তাতে নাড়া-চাড়া দিতে যাওয়া উচিত মনে করলাম না। মিষ্টান্ন যেমন আসতো, তেমনি আসতে লাগলো এবং আমিও যেমন যেমন খেয়ে যাচ্ছিলাম, তেমনি খেয়ে যেতে লাগলাম। ভবিষ্যৎ জীবনে অন্যান্য কথার সঙ্গে এ কথাটাও ক্ষিতিকে জিজ্ঞাসা করে চিঠি দিয়েছিলাম। তাতে ক্ষিতির কাছ থেকে যা উত্তর পেয়েছিলাম, তা এখানে উদ্ধৃত কোরে দিলুম—

১।১১।৫৪

* * * * * কাশীতে গৌরীকুণ্ড আমাদের বাড়ী থেকে ২॥ মাইল দূরে। * * সন্ধ্যার পর প্রায়ই যে ভালো ক্ষীরের মিষ্টি খেতে তা আমার মার হাতে

ঘরের তৈরী। সি, আর, দাশের জ্যেঠতুতো ভাইয়ের স্ত্রী আমার মাসীমা; তাঁর শ্বশুর ৺কালীমোহন দাশের বাড়ীতে এখন চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন। কাশীর মহারাজার পার্শন্যাল এসিস্ট্যাণ্ট ৺শ্যামাচরণ সেনের দুই ছেলে আমার বন্ধু ছিলেন—৺ললিতবিহারী সেনরায় ও ৺বিনোদবিহারী সেনরায়। * * তোমার স্মৃতি-কথা বের হোলে আশাকরি দেখতে পাব। শরীরে শক্তি কম। তোমার সাক্ষাৎ কামনা করি। * * ইতি।"

চিঠিতে উল্লিখিত ৺ললিতবিহারী সেনরায়ের সঙ্গে ক্ষিতিমোহনের মাধ্যমেই আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হোয়েছিল। ললিতবিহারী যে কাশীরাজের পার্শন্যাল এসিস্ট্যাণ্টের পুত্র সেটা আমি জানতুম, কিন্তু তবু ৬৩ বছর পূর্বের স্মৃতির, ওপর নির্ভর না কোরে, ক্ষিতিকে লিখে নিঃসন্দেহ হই।

এই ভাবে দিন যেতে যেতে হঠাৎ একদিন আমি দল পালালুম, অর্থাৎ সেদিন সকাল-বিকাল সন্ধ্যা কোন সময়ই ক্ষিতির সঙ্গে দেখা করলুম না বা ওঁদের বাড়ীতে গেলাম না। পরের দিন সকালে ওঁদের বাড়ী যেতে যেতে বাঁক ঘুরে বরাবর অন্য পথে চলে গেলুম এবং গঙ্গার এক নির্জন স্থানে গিয়ে বেলা দশটা পর্যন্ত সেখানে বোসে কাটালুম। বিকেলের দিকে মনের এক খেয়ালে, একটা অজানা পথ ধরে অনেক দূর চলে গেলুম। সেদিকটায় কখনো কোনদিন যাইনি। কাশীর প্রান্তসীমা। বেশ লাগলো জায়গাটা। অনেকটাই হেঁটেছিলুম, ক্লান্ত হোয়ে বাসার পথে ফিরলুম। দশাশ্বমেধ বরাবর যখন এলুম, সন্ধ্যাপূর্বের গোধূলি তখন পৃথিবীতে নেমে পড়েছে; গঙ্গা-বক্ষে সায়াহ্নের মৌন মধুর-ছায়া পড়েছে। গলিতে না ঢুকে, দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে বসলুম। খানিক পরেই দোকানে-দোকানে, ঘাটে-ঘাটে আলো জ্বলে উঠলো; চারিদিককার দেবমন্দির থেকে সন্ধ্যার নহবৎয়ের সুর আকাশ-বাতাসকে মধুর ও মহিমময় করে তুললো।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

নবদ্বীপ কোথায় ?

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সমুদ্র যখন হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল সেই সময়ে পূর্ব্বসমুদ্র বা বঙ্গোপসাগরে একটি সংকীর্ণ পয়ঃ-প্রণালীর ব্যবধানে পাশাপাশি দুইটি দ্বীপ ছিল। তাহাদের একটির নাম গৌড়, অপরটির নাম সুহ্ম। আর ঐ দ্বীপের উত্তরে হিমালয় পাদদেশের নিম্নে গণ্ডকী নদীর ব্যবধানে একটি দ্বীপ বা উপদ্বীপ ছিল তাহার নাম মিথিলা।

ঐ দ্বীপ তিনটির উভয় পার্শ্বে দুইটী উপদ্বীপ ছিল। একটির নাম পূর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্ত এবং অপরটির নাম পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্ত। কিছুদিন পরে বঙ্গোপসাগরে আরও কতক-গুলি দ্বীপের উদ্ভব হয়। তন্মধ্যে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্র প্রধান। ইতিহাসে অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু গোলমাল নাই। কিন্তু পুণ্ড্র প্রসঙ্গে বহু গোলমাল আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রদেশ (বর্ত্তমান জলপাইগুড়ি) হইতে আরম্ভ করিয়া কলিঙ্গের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগই পুণ্ড্রভুক্তি; কিন্তু তাহা সত্য নহে। ঐ সমগ্র ভূভাগের উত্তর সীমান্তে, দক্ষিণ সীমান্তে ও মধ্যে মোট তিনটি পুণ্ড্র আছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পুণ্ড্রদ্বীপটি আদি। দ্বিতীয় পুণ্ড্র হইতেছে বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার পশ্চিম সীমান্ত হইতে ছোটনাগপুরের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত ভূভাগ।

ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রগণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। তাঁহারা ঐ প্রদেশের দস্যুদলের সহিত মিলিত হইয়া পুণ্ড্রবৃত্তি (দস্যুবৃত্তি) অবলম্বন করেন এবং ঐ দস্যুগণের সহিত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা উদ্দেশ্যে নিজেদের নাম রাখেন সুপুণ্ড্রক এবং ঐ প্রদেশের নাম রাখেন সুপুণ্ড্র। ইহা রামায়ণের যুগের কথা। আর তৃতীয় পুণ্ড্র হইতেছে প্রাগ্‌জ্যোতিষের দক্ষিণ সীমান্ত ও পূর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর সীমান্ত (বর্ত্তমান দিনাজপুর ও রংপুর জেলার উত্তর সীমান্ত)।

পুণ্ড্ররাজ নামক জনৈক শকবংশীয় রাজা ঐ স্থানে

রাজত্ব করিতেন। তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহারই নামানুসারে ঐ অংশের নাম হয় পুণ্ড্র। ইহা মহাভারতের যুগের কথা।

মিথিলা, গৌড়, সুহ্ম, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রসহ ৭টি দ্বীপের নাম পাওয়া গেল। গৌড়ের পূর্ব্বপার্শ্বে একটি দ্বীপ ছিল। প্রথমে ঐ দ্বীপটির নাম হয় গোপতিপুর, তৎপরে উহার নাম হয় গোমেদ, তৎপরে নাম হয় গোপিনাথপুর (বর্ত্তমান ভোলাহাট)। আর গৌড়ের দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল, তাহার নাম ছিল চৌডলা (চৌ অর্থে চারি এবং ডলা অর্থে বেলা অর্থাৎ যে স্থান চতুর্দ্দিক বেলা-বেষ্টিত তাহারই নাম চৌডলা)। পরে ঋষি শুক্রাচার্য্য ঐ দ্বীপে আশ্রয় লইলে উহার নাম হয় "শুক্রবাড়ী চৌডলা।" আদিযুগে সর্ব্বসমেত ঐ ৯টী দ্বীপের উদ্ভব হয়। অনুমান, ইহা ছাড়াও বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ সীমান্তে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল। তাহাই বর্ত্তমান কপিলাশ্রম। সেনরাজাদের সমসাময়িককালে গৌড়ের দক্ষিণে মৌরসুধাবাদ এবং মৌরসুধাবাদের দক্ষিণে দ্বিতীয় নদীয়ার উদ্ভব হয়। কালক্রমে ঐ দ্বীপ দুইটী একত্রযোগে নাম গ্রহণ করে বগড়ী।

মহাভারতের যুগে পুণ্ড্র, গৌড়, সুহ্ম, গোমেদ ও চৌডলা একত্রযোগে নামগ্রহণ করে মৎস্য দেশ। ইহা দ্বিতীয় মৎস্য। আদি মৎস্য হইতেছে আরব সাগরের উপকূলভাগ (প্রভাসতীর্থ ও আদি দ্বারকা)। তৃতীয় মৎস্য হইতেছে বর্ত্তমান মেদিনীপুর। আদি মৎস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল স্বায়ম্ভুব মনুর সময়ে। দ্বিতীয় মৎস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল মহাভারতের যুগে আর তৃতীয় মৎস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল মহাভারতের পরবর্ত্তী যুগে, কলিঙ্গ দ্বীপ পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তের সহিত যুক্ত হইলে পর।

ইতিপূর্ব্বে তিন পুণ্ড্রের কথা আলোচিত হইয়াছে, এস্থানে তিন মৎস্যের কথাও আলোচিত হইল। এখন পঞ্চগৌড় সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা উচিত, নচেৎ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের দর্শন লাভ সম্ভব নহে।

আদি যুগে আর্য্য ঋষিগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি ভাগের জন্য এক একটি চারণক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। কাজেই আদি যুগে ঐ পঞ্চ বিভাগের জন্য ৫টি গৌড় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৩টী গৌড় ছিল পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তে, একটি দাক্ষিণাত্যে আর বাকীটি ছিল পূর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্তের অধীন বর্ত্তমান মালদহে। ইতিহাসে মালদহের গৌড়ই স্থানলাভ করিয়াছে, অন্যগুলির স্থান ইতিহাসে একেবারেই নাই। বিশ্বকোষ বলেন—

"গৌড় নামক জনপদ একটি ছিল না, সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটি। তন্মধ্যে সরস্বতী নদী প্রবাহিত কুরুক্ষেত্রে একটি, আলাহাবাদ ও কাণ্যকুব্জের মধ্যে একটি, অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে একটি। মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যে একটি এবং বর্ত্তমান উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত গোণ্ডাবানার মধ্যে একটী, এই পাঁচটি গৌড় ছিল। এই পঞ্চগৌড়ের অধিবাসী ব্রাহ্মণেরাই পরবর্ত্তীকালে সারস্বত, কাণ্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল নামে বিখ্যাত হন। উক্ত পঞ্চ গৌড়ের মধ্যে মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যবর্ত্তী গৌড়-রাজ্য সকলের নিকট পরিচিত। ইতিহাসে এই গৌড়-রাজ্যই প্রসিদ্ধ, অপর গৌড়ের উল্লেখ নাই।" (বিশ্বকোষ গৌড় শব্দ)

বিশ্বকোষ স্কন্দপুরাণীয় সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত মূল শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতে অনুমিত হয় যে, উক্ত পুরাণরচনাকালে অঙ্গপ্রদেশ গৌড়ের অন্তর্গত হইয়াছিল। তজ্জন্যই মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যে ফেলা হইয়াছে।

অনেকে মনে করেন যে কাশ্মীররাজ জয়াদিত্যের সাহায্যে গৌড়াধিপ জয়ন্ত বা আদিশূর ঐ পঞ্চগৌড় অধিকার করিয়াছিলেন। আমার অনুমান স্বতন্ত্র, কেননা তিনি যদি ঐ পঞ্চগৌড়েরই অধীশ্বর হইতেন তাহা হইলে, তিনি বিশাল রাজ্যের রাজা হইতেন, এমন কি যাঁহার বাহু-বলে তিনি রাজ্যলাভ করেন, তাঁহাকেও তাঁহার অধীন হইতে হইত। অনুমান, পুণ্ড্র, গৌড়, সুহ্ম, অঙ্গ ও মিথিলা ইহাই আদিশূরের পঞ্চ-গৌড়। তিনি পুণ্ড্রবর্দ্ধনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জয়াদিত্যের বাহুবলে ঐ রাজ্যগুলি জয় করিয়াছিলেন।

মহারাজ শশাঙ্কদেবের পর গৌড়রাজ্য কামরূপ-পতির অধীন হইয়া পঞ্চবিভাগে পরিণত হয়। প্রত্যেকটি বিভাগ কামরূপপতির অধীনে সামন্ত শাসনে পরিণত হয়। তৎপরে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের গৌড় আক্রমণের ফলে ঐ সামন্তবর্গ স্বাধীনতা অর্জ্জন করেন। পরে আদিশূর

*

'সূর্য্য গেল অস্তাচলে'

*

ফটো :

*

হ্যালো…

*

ফটো : রণেন্দ্রশেখর সে

জয়াদিত্যের সাহায্যে ঐ পঞ্চ বিভাগ মধ্যে গৌড়, সুহ্ম, অঙ্গ ও মিথিলা অধিকার করেন। কাজেই তিনি নিজ-রাজ্য পুণ্ড্র সহ পাঁচটি রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সুতরাং আদি যুগের পঞ্চগৌড় আর মধ্যযুগের পঞ্চ গৌড় এক নহে।

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, আদিশূর বঙ্গ ও রাঢ় প্রদেশেরও রাজা ছিলেন। যেমন—"ইতি-পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে আদিশূর পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়া-ছিলেন, তাঁহার সময়ে বঙ্গ ও রাঢ় গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।" (বিশ্বকোষ, গৌড়শব্দ)। আমার অনুমান স্বতন্ত্র, তিনি গৌড়ের ঐ পঞ্চ বিভাগেরই শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বঙ্গ ও বর্ত্তমান রাঢ় তাঁহার অধীন ছিল না। বঙ্গে সেই সময়ে খড়্গ বংশ ও বর্ম্ম বংশ প্রবল হইয়াছিল, আর রাঢ় প্রদেশ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরই মগধের গুপ্তবংশীয় আদিত্য সেনের হাতে যায়। অনুমান পাল রাজাদের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাঢ় প্রদেশ মগধের অন্তর্গত সামন্ত রাজ্য ছিল। তবে ঐ প্রদেশের কোন কোন অংশ হয়ত সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের সাহায্যে তিনি অধিকার করিয়া-ছিলেন। আমার কথায় হয়ত অনেকে পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃত অংশকে লইয়া বিতর্কের সৃষ্টি করিতে পারেন। কাজেই তাহার সমাধান প্রয়োজন। ঐ সময়ে বরেন্দ্র আর বঙ্গের মধ্যে একটা বিভ্রমের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার দরুণ উত্তর বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ অর্থাৎ পূর্ব্ব আর্য্যা-বর্ত্তসহ পুণ্ড্রের দক্ষিণ অংশ নাম গ্রহণ করিয়াছিল বাঙ্গাল বা বঙ্গাল (বঙ্গের আল বা সীমা)। এখনও মালদহের লোকে ঐ প্রদেশকে বাঙ্গাল বলে। সেই অনুসারে তিনি বঙ্গের অধিপতি হইয়াছিলেন। আর মহানন্দার পূর্ব্বপার বরেন্দ্র নামে অভিহিত হওয়ার দরুণ কোন কোন পুরাণ-কারক বা ঐতিহাসিক মহানন্দার পশ্চিম প্রদেশকে রাঢ় মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। সেই হিসাবে তিনি রাঢ়েরও অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

বল্লাল সেনের পঞ্চ গৌড় আবার আদিশূরের পঞ্চ-গৌড় হইতে স্বতন্ত্র। বিশ্বকোষ বলেন,—"বল্লাল সেন, রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী, বঙ্গ ও মিথিলা এই পঞ্চ গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন।" (বিশ্বকোষ, বল্লাল সেন শব্দ)

ঐ প্রসঙ্গে নানা মুনির নানা মত দৃষ্ট হয়। আমার অনুমান, বল্লালসেন তাঁহার রাজ্যকে পঞ্চ বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগে এক একটি সমাজ শাসন প্রদেশ গঠন করিয়াছিলেন। তাহার সমর্থনও পাওয়া যায়। যেমন "সমাজ শাসন করিবার জন্য বল্লাল সেন উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গ এই সকল স্থানেই এক একটি রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।" (বিশ্বকোষ, বল্লাল সেন শব্দ)

উক্ত উদ্ধৃত অংশে বগড়ী ও মিথিলার নাম নাই। অনুমান, বগড়ীর কিয়দংশ ঐ সময়ে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং উহার কেন্দ্র দ্বিতীয় নবদ্বীপ বা বর্ত্তমান মায়াপুরে স্থাপিত হইয়াছিল। আর উত্তর রাঢ় বলিতে তখন গৌড় মণ্ডলকেই বুঝাইত। সুতরাং গৌড় হইতে মিথিলা পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ গৌড়কেন্দ্রেরই অধীন ছিল।

এইস্থানে মায়াপুরকে আমি দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। এখানেও বিতর্কের সম্ভাবনা আছে। কাজেই তাহারও সমাধান প্রয়োজন। বর্ত্তমান নবদ্বীপ তৃতীয় নবদ্বীপ। দ্বিতীয় নবদ্বীপ নদী গর্ভে ধ্বংস হইলে পর বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরের পত্তন হয়। যতদূর সম্ভব মুর্শিদাবাদের নবাবী আমলের শেষ দিকে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর দ্বিতীয় নবদ্বীপ মায়াপুরের উদ্ভব হইয়াছিল সেন রাজাদের সমসাময়িককালে। তাহার যথেষ্ট সমর্থন মিলে। যেমন, "সেন রাজগণের পূর্ব্বে নবদ্বীপ নগরীর অস্তিত্ব ছিল কি না তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ অঞ্চলের ভূতত্ব পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, পূর্ব্বে এ অঞ্চল সমুদ্রময় ছিল, খৃষ্টীয় ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে সমুদ্র সরিয়া গেলে চরে পরিণত হয়।"

(বিশ্বকোষ, নবদ্বীপ শব্দ)

এই ত গেল দ্বিতীয় ও তৃতীয় নবদ্বীপের কথা, এইবার আদি নবদ্বীপের কথা বলা যাক। সেন রাজাদের সময়ে কুব্জদ্বীপ চতুর্দ্দিক নদীবেষ্টিত হইয়া নাম গ্রহণ করে নদীয়া। ঐ প্রসঙ্গে বিশ্বকোষ বলেন,—"তবকৎ-ই-নাসিরী নামক ইতিহাসে লিখিত আছে, লক্ষণাবতী নামক রাজ্যের অন্তর্গত নদীয়া নগর রায় লছমনিয়ার রাজধানী। গঙ্গানদীর উভয় কূলে ঐ রাজ্যের দুইটি বাহু আছে।" [বিশ্বকোষ, বঙ্গদেশ (খিলিজি বংশ) ৪২৮ পৃঃ রায়

সাড়ী] এইস্থানে গঙ্গা অর্থে আদি ভাগীরথীকে বুঝাইতেছে, যাহা গৌড় ও সুহ্মের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কাজেই গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী এবং সুহ্ম বা আদি নদীয়াকে উহার দুইটি বাহু বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। তবকৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থ গৌড়কে বরেন্দ্র মধ্যে এবং সুহ্ম বা আদি নদীয়াকে রাঢ় মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে অনেকেই সেন রাজাদিগকে মায়াপুর বা বর্ত্তমান নবদ্বীপে লইয়া যাইতে প্রস্তুত। কিন্তু বিশ্বকোষ বলেন, "লক্ষ্মণাবতী বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী, ইহার অপর নাম গৌড়। গৌড়েশ্বর মহারাজ লক্ষ্মণ সেন (মতান্তরে সেন বংশীয় শেষ রাজা লছমনিয়া) গৌড় রাজধানীর নানাবিধ সংস্কার সাধন করিয়া 'লক্ষ্মণাবতী' নাম রাখিয়াছিলেন।"

(বিশ্বকোষ, লক্ষ্মণাবতী শব্দ)

এইস্থানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে লক্ষ্মণ সেন গৌড়েরই নাম লক্ষ্মণাবতী রাখিয়াছিলেন, নবদ্বীপের নাম নহে।

ঐতিহাসিকদের মতে দেখা যায় যে, লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী হইল গৌড়ে, অথচ তিনি নবদ্বীপ হইতে কিরূপে পলায়ন করিলেন? অনুমান তিনি নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করেন নাই, তিনি নয়টি দ্বীপ সমন্বিত রাজ্যের রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী হইতেই পলায়ন করিয়াছিলেন। তাহার স্মৃতি এখনও রক্ষা করিতেছে—"খিড়কী ঘাট" যাহা গৌড় রাজপ্রাসাদের পশ্চিমে অবস্থিত আছে।

ঐ নয়টি দ্বীপ হইতেছে—মিথিলা, অঙ্গ, পুণ্ড্র, গৌড়, সুহ্ম (আদি নদীয়া), চৌডলা, গোমেদ, মৌরসুধাবাদ (বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ) এবং দ্বিতীয় নদীয়া (বর্ত্তমান নদীয়া)। এই নয়টি দ্বীপের কেন্দ্র ছিল গৌড়, কাজেই গৌড়ই আদি নবদ্বীপ।

একটি ফুল

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

চাষ ক'রেছিলাম আপন মনে;
প্রতিটি ফাল্গুনে
ফলেছিল সেখানে অনেক ফসল
সোনালী রঙএর কচি কচি ভাষা
সুদূরে প্রসারিত সবুজের আশা
তারি এক কোণে
সাজানো বাগানে
ফুটেছিল কবে ছোট একটী ফুল;
একদিন নীরবে নত হ'য়ে
বিলাল সে অনেক গন্ধ,
শোনাল সে অনেক গান;
—তারপর?...
হঠাৎ দমকা হাওয়া, মেঘলা আকাশ,
ঝরল বৃষ্টির অজস্র কান্নাধারা,
ছোট্ট ফুল হারাল তার প্রাণ;
যেন গুলিবিদ্ধ ছোট একটী পাখী—
মিথ্যাই পৃথিবীর সব ডাকাডাকি,
তবুও রেখে গেল সে জীবনের ভাষা
যেন আমারই গোপন একটী আশা,
হয়তো কঠিন, হয়তো-বা সর্ব্বনাশা!!

কাকাবাবু
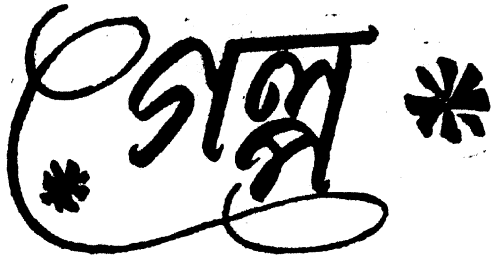
অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

বাংলাদেশের পাবলিক লাইব্রেরী অর্থাৎ পাঠাগারে সভ্য হয়ে যে সমস্ত 'খোকাখুকীরা' বেপরোয়া নাটক নভেল পড়তে সুরু করে এবং সুবিধে না পেলেও চেষ্টা করে ছবি দেখতে ঢুকে পড়ে সিনেমা হলে, তারা অচিরাৎ এমন একখানা রোমান্টিক মনের অধিকারী হয়ে বসে যে, প্রেমে তাদের পড়তেই হয়, অন্ততঃ প্রেমে পড়বার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা তারা করে, যেমন করেছিল উল্টোডিঙ্গির রামলোচনবাবুর একমাত্র ছেলে পতাকীকুমার। পতাকী হায়ার-সেকেণ্ডারী পরীক্ষার আগে থেকেই 'আউটবুক' পড়তে সুরু করেছিল এবং আউটবুকের ধাক্কা সত্ত্বেও পরীক্ষা থেকে একেবারে 'আউট' হয়ে যায় নি, কোন মতে তলার দিকে নম্বর পেয়ে এবং রি-একজামিন ও গ্রেস্মার্কের ক্রাচ বগলে দিয়ে সেকেণ্ডারী বোর্ডের সীমানা টপ্‌কে কলেজে এসে ঢুকেছিল এবং এক বছর পরে যথারীতি সেকেণ্ড-ইয়ারের খাতায় নামও তুলিয়েছিল। ছেলে প্রোমোশন পাওয়ায় রামলোচনবাবু খুসিই ছিলেন। তিনি বোধ হয় জানতেন না যে, কলকাতায় এমন একটি কলেজে তার ছেলে পড়ছে যে কলেজে ছেলেরা প্রোমোশন পায় না, পায় তাদের বাবারা অর্থাৎ কলেজের অফিসে নিয়মমত মাইনে জমা পড়লে বার্ষিক পরীক্ষায় ছেলেদের ক্লাসে ওঠাতে কোন বাধাই থাকে না।

কিন্তু কিছুদিন যাবৎ পতাকীকুমার বড়ই চঞ্চল হয়ে পড়েছে। গড়ে দৈনিক একখানা হিসেবে নভেল সে পড়ছে, কিন্তু আকাশ পাতাল খোঁজ করে 'প্রেমিক্' অর্থাৎ প্রেমে পড়ার উপযুক্ত কোন মেয়ে সে এখনও পর্য্যন্ত আবিষ্কার করতে পারছে না। যতই দেখছে ততই সে হতাশ হয়ে পড়ছে। একবার এক সহপাঠীর বাড়ীতে গিয়ে তার ছোট বোনকে দেখে সে ভাবলে, এইখানে "লভ্" করা যেতে পারে—কিন্তু যেমনই শুনলে তার ঠাকুরমা তাকে পদী বলে ডাকে অমনি ওর মনটা বিগড়ে গেল। পদী বলে ডাকলে যে-মেয়ে সাড়া দেয়, তাকে ধমক দেওয়া যায়, চাঁটী মারাও চলতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে প্রেম করা অসম্ভব। বিশেষতঃ সেই পরম অশুভক্ষণে কুমারী পদীর আঙুলে ছিল অনেকখানি কালির দাগ এবং ভাঙ্গা ঝরণা কলম নিঃসৃত ব্লু-ব্ল্যাক কালি কুমারীর আঙুল থেকে নাসিকায় এবং কতকাংশ গালে ও কপালে লেগেছিল। অতএব মন-মরা অবস্থায় পতাকী সেখান থেকে বেরিয়ে এল। এরপর আর একদিন পতাকী উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। ওদের বাড়ীর ঠিকে ঝি পারুলের মা নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ায় মেয়ে পারুলকে বাসন মাজতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এই পারুল সম্বন্ধে পতাকী আগে কিছু গল্পও শুনেছে। পারুলের নাকি একবছর আগে বিয়ে হয়েছিল—কিন্তু পারুলের স্বামী বিয়ের পরেই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কথাটা শোনার পর থেকেই পতাকী অদেখা-পারুলের অচেনা স্বামীকে হাজার বার ধিক্কার দিয়েছে। সেই পারুল যখন তারই বাড়ীতে আজ সশরীরে উপস্থিত তখন পতাকী স্থির করলে যে, সুযোগ পেলেই সে, কলতলাতেই হোক অথবা সিঁড়িতেই হোক, যেখানেই একটু নিরিবিলি পাবে সেখানেই সে পারুলকে আজই জানিয়ে দেবে যে, শ্রীমতী পারুল স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্তা এবং পৃথিবীর কাছে উপেক্ষিতা হলেও দুনিয়ার সর্ব্বত্রই সে অবাঞ্ছিতা নয়; এই বাড়ীতেই এমন একটি হৃদয়বান্ যুবক আছে যে তার দুঃখে পরিপূর্ণভাবে সহানুভূতিশীল—যে তাকে—যে তাকে—

দাদাবাবু মা তোমায় ডাকছেন।

দরজার দিকে পেছন ফিরে পতাকী একখানা যৌন-বিজ্ঞানের বাংলা বই হাতে নিয়ে যখন আপন মনে পারুলের

বিষয় চিন্তা করছিল ঠিক সেই সময় ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় পেছন থেকে কে যেন বললে—দাদাবাবু, মা তোমাকে ডাকছিলেন।

তবে কি এই সেই পারুল! উৎফুল্ল হয়ে খুব একটা মিষ্টি উত্তর কি দেওয়া যায় তাই ভাবতে ভাবতে দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে—ওরে বাবা, মানুষের দাঁত যে হাতীর দাঁতের মতো; ঠোঁট চাপা দিয়ে দাড়ি পর্য্যন্ত এসে পড়তে পারে এবং অনবরত পান দোক্তা খাওয়ার ফলে সেই দাঁতের চেহারা যে কি ভয়ানক রাক্ষুসে-মার্কা হতে পারে—একথা কোন উপন্যাসে এ পর্য্যন্ত কেউ লিখেছে বলে পতাকী স্মরণ করতে পারলে না। পারুলকে মিষ্টি কি তেতো কোন উত্তরই না দিয়ে কোনমতে টলতে টলতে পতাকী রান্নাঘরে মায়ের কাছে এসে উপস্থিত হোল এবং খানিক পরে তার সহজ জ্ঞান ফিরে এলে সে পারুলের স্বামীর জন্য বেশ একটা অনুকম্পা বোধ করলে। অতঃপর পারুলের স্বামী বেচারা পতাকীর নীরব অভিশাপ থেকে চিরদিনের মত অব্যাহতি পেয়েছিল।

এমনিভাবে পতাকী যখন প্রেমের বাস্তবতা সম্বন্ধে একরকম হতাশ হয়ে অলীক-কাহিনী-বিতরণকারী উপন্যাস-গোষ্ঠীর ওপোর প্রায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছিল, তখন সেই নিস্তরঙ্গ সময়ের এক রঙিণ অপরাহ্ণে ঠেলাগাড়ীর ওপোর ময়লা তক্তপোষ, পায়া-ভাঙ্গা পুরানো চেয়ার, মরচেধরা লোহার তোরঙ্গ, তেলচিটে তোষক জড়ানো বেঢপ সাইজের ঝল্‌ঝলে বিছানা, তোলা-উনুন, এলুমিনিয়ামের তোব্‌ড়ানো হাঁড়ী ইত্যাদি একরাশ গৃহস্থালীর জিনিষপত্র নিয়ে একতলায় নতুন এক ভাড়াটে এসে হাজির হলেন। শোনা গেল, ওঁরাও মুখার্জ্জী অর্থাৎ পতাকীদের স্বগোত্র এবং দেখা গেল যে কর্ত্তার বড় মেয়েটি কালো হলে কি হয়, বেশ রোগা অর্থাৎ পতাকীর ভাষায় 'স্লিম্ ফিগার', এবং নামটি তার বড় মিষ্টি, কঙ্কা।

পতাকীর বাবা-মার সঙ্গে কঙ্কার বাবা-মার প্রথম দিনেই আলাপ হয়ে গেল এবং দু' একদিনের মধ্যেই কঙ্কার বাবা পতাকীর খুব সুখ্যাতি করলেন—'বাঃ, বেশ ছেলে ত আপনার, এই বয়সে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছে, এক বছর পরেই গ্রাজুয়েট হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কথায় কথায় তিনি বল্লেন, আপনার আর ভাবনা কি মশাই, আপনার একটিমাত্র ছেলে, তাও প্রায় তৈরী হয়ে এসেছে, কিন্তু আমার দেখুন, বড় হচ্ছে মেয়ে, তারপর পর-পর দুই ছেলে, শেষে আবার উপরি-উপরি তিন মেয়ে। বড় মেয়ে ক্লাশ টেন্-এ পড়ে, তারপর চারটিকে পর-পর ইস্কুলে দিয়েছি। ওদের ইস্কুলের মাইনে দিতে আর বই খাতা কিনতে—

পতাকী আর শোনে নি, শুধু এইটুকু শুনলে যে বড় মেয়ে ক্লাশ টেন-এ পড়ে। বাঃ, বেশ ত। আচ্ছা,'এমনও ত হতে পারে যে, একদিন ও এসে হয়ত বলবে, পতাকীদা, এই অঙ্কটা একটু বুঝিয়ে দিন না। কিন্তু সর্ব্বনাশ! অঙ্ক ত পতাকী ভালো জানে না। স্কুল ফাইন্যালে কোনরকমে গ্রেস নম্বরের জোরে ও পাশ করেছিল। তা হলে? নাঃ, অঙ্কয় সুবিধে হবে না। তবে, তবে কি ইংরাজী পড়া? নাঃ, সেও সুবিধের নয়। ও যদি ভালো মেয়ে হয়, আর মেয়েরা সাধারণতঃ ইংরেজীতে ভালো হয় বলেই পতাকীর শোনা ছিল, তা'হলে ওই ত পতাকীর ভুল ধরে বসবে। ওঃ, লেখাপড়ায় ফাঁকী দিয়ে পতাকী যে কী অন্যায়ই করেছে! তবে হ্যাঁ এমনও হতে পারে, কোন ভালো সিনেমা দেখে এসে কঙ্কা বলতে পারে, পতাকীদা, আপনার লাইব্রেরী থেকে বইটা এনে দিন না, একটু পড়ব। তাহলে সেইদিন—

কিন্তু এরকম কোন পরিস্থিতিই হোল না। একদিন দুদিন করে পুরা একমাস কেটে গেল। পতাকীরা দোতলায় থাকে, ওদের সিঁড়ির তলা দিয়ে কঙ্কাদের একতলার ফ্ল্যাটে যাতায়াতের দরজা। সিঁড়ির মুখে সামনা-সামনি দেখা হয়েছে কয়েকদিন, কিন্তু মেয়েটা ভালোভাবে চেয়েও দেখে নি। কঙ্কা যেন কী রকম! ওর ছোট ছোট ভাইবোনগুলো ওপোরে পতাকীর মায়ের কাছে এলে কঙ্কা তাদের নিয়ে যাবার জন্য মধ্যে মধ্যে ওপোরে আসে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। কথা-টথা তেমন কয় না। কইলেও মায়ের সঙ্গে কথা কয়, পতাকীর সঙ্গে নয়। এ অবস্থায় কি করা যায়!

অথচ এ বিষয়ে কারুর সঙ্গে পরামর্শ করাও চলে না। বন্ধুরা যে শুনবে সেই ঠাট্টা করবে। [illegible] গভীরতা কি কেউ দরদ দিয়ে দেখে! [illegible] প্রেম যে দুনিয়াভোর যেখানে [illegible]

আছে সবাই সেই অবৈধ প্রেমে একেবারে মশগুল! বরঞ্চ উল্টো, তরুণ-তরুণীর প্রেম বাইরের লোক যেই টের পাবে, অমনি ঠেঙা-লাঠি নিয়ে সবাই তেড়ে আসবে, শেষে পুলিশ-আদালত-জেল পর্য্যন্ত গড়িয়ে সেই প্রেমের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিঁড়ে ছত্রখান করবে। কাজেই এ-সব একেবারে কন্‌ফিডেন্সিয়াল, টপ্-লেভেল-সিক্রেট!

কিন্তু কি করা যায়! মেয়েটা কথাই কয় না যে পতাকী দুটো কথা একটু গুছিয়ে বলে। কি ভাবে কোন্ কথা কারপর কি রকমে গুছিয়ে বলবে পতাকী সেটা এই একমাস ধরে অন্ততঃপক্ষে একশবার মকশো করে নিয়েছে। বহুবার নিজের মনে নিজেই রিহার্সাল দিয়েছে, বক্তব্যকে কতবার ভেঙ্গেছে এবং গড়েছে তার কোন সংখ্যাই নেই, কিন্তু কার জন্য তার এই চেষ্টা, কন্যা ত নির্ব্বিকার!

ভাবতে ভাবতে পতাকী পথ আবিষ্কার করলে। ঠিক করলে, মুখে কিছু বলার সুযোগ যখন হবে না, তখন চিঠি লিখবে। কিন্তু চিঠি লেখা, ওরে বাবা—কোন মতে তার হাতের লেখা যদি পিতাস্বর্গের হাতে পড়ে যায়, বাস্, তাহলেই চিত্তির!

ভাবতে ভাবতে এর উপায় আবিষ্কার হোল! এমন ভাবে চিঠি লিখতে হবে যে কন্যা যদি সেই চিঠি নিয়ে প্রকাশ করে দেয়, কি বাবাকে বলে দেয়, তাহলে পতাকী স্রেফ্ অস্বীকার করবে। কিন্তু হাতের লেখা। নাঃ, সেজন্য কোন ভয় নেই। ধরে-ধরে এমনভাবে লিখবে যে বাবা, কি অন্য কেউ, কিছুতেই বুঝতে পারবে না যে ওটা পতাকীর লেখা। তাহলে এবার সে চিঠিই লিখবে।

পাঁচ সাত রকম ভাবে পাঁচ সাত পাতা লেখা হয়ে গেল। লেখা আর কাটা, শেষে আবার লেখা, কিন্তু কিছুতেই মনঃপূত হোল না। তারপর আর এক কথা, চিঠি বড় হলে কাঁহাতক ধরে ধরে অত লিখবে সে! উঃ, এ কি বিপদই যে হোল? যার সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস, সকাল থেকে যার সঙ্গে নানা ছুতায় দু' একবার দেখাও হয়ে যায়, তাকে একটা সোজা কথা জানাবার জন্যে এ কি এক বিরাট সমস্যাতেই যে পড়ল সে। পতাকীর কান্নাও ছুটে গেল। সে এখন হলফ্ করে বলতে পারে যে কোন বেটা নায়ক তার আগে এরকম ফ্যাসাদে কখনও পড়েছে কি! কিন্তু কি করতে পারে সে! সমস্যা ত রয়েই গেল। এক একবার মনে হয় ওদের একটা বাচ্ছাকে সিঁড়ি দিয়ে ঠেলে নিচে ফেলে দেয়, তারপর তার শুশ্রূষা করার অজুহাতে ওদের ঘরে দিনরাত থাকার অন্ততঃ বারে বারে খবর নিতে যাবার সুযোগ সে করে নেবে তাতে যদি সেই বাচ্ছাটার একটা হাত কি পা ভেঙ্গেও যায় তাতেই বা কি ক্ষতি! ওদের আধ ডজন বাচ্ছার দু' ডজন হাত-পা আছে। চব্বিশখানা হাত পায়ের মধ্যে এক আধখানা গেলে আর এমন কি ক্ষতি হবে! কিন্তু নাঃ, সবটাই কল্পনা, সবটাই আকাশ-কুসুম। কোন কিছুতেই সাহস হয় না। শেষে ঠিক করলে, চিঠিই লিখবে, কিন্তু কবিতায়। বেশ ছোট্ট একখানি চার লাইনের কবিতা। লিখতেও সুবিধে, ধরে-ধরে হাতের লেখা ভাঁড়িয়ে লেখা যাবে, আর তাতে কোন নাম-টাম থাকবে না। কে-না-কে কাকে-না-কাকে লিখেছে। সেই ভালো, কিন্তু চার লাইন লিখতে গিয়ে চার শো লাইন লেখা হোল, কিছুতেই জুৎ হচ্ছে না। শেষে অনেক কষ্টে লেখা শেষ করলে। পতাকী লিখলে,

> শুন মোর কন্যে
> তুমি যে অনন্যে
> হয়ে আছি হন্যে
> শুধু তোরই জন্যে

লেখাটা বার বার বার পড়ে তার কেবলই মনে হতে লাগল, একবার তুমি একবার তুই, এটা কি ভালো হোল! অথচ তা না হলে ছন্দও মেলে না। শেষে মনে জোর এনে পাতকী বল্লে, যাক্‌গে, মরুক্‌গে, এ খুব ভালই হয়েছে। 'তুমি' বলে আরম্ভ করে শেষে 'তুই' বলতে ঘনিষ্ঠতা আরও অনেক বেড়ে গেছে। আর সব চেয়ে ভালো হোল, কোন নাম নেই। করুক ওর যা ইচ্ছে, দেখাক্ যা যাকে খুসি। কে কাকে লিখেছে তার জন্য কি পাতকী দায়ী হবে? ঠিক আছে, ভালো কাগজে বড় বড় করে লিখে এই চিঠিই সে পাঠাবে।

ঠিক দশটায় সময় কন্যা স্কুলে যায়। সেই সময় সিঁড়ির তলায় পতাকী অপেক্ষা করতে লাগল। পিঠে বিনুনি ঝুলিয়ে বুকের ওপোর এক রাশ বই চেপে ধরে ডান হাতের মুঠোয় কলম নিয়ে ও যেমন সিঁড়ির তলায় [illegible] [illegible] বেড়িয়েছে অমনি পতাকী দুরু দুরু বুকে এদিক-ওদিক

চেয়ে একটু এগিয়ে গেল। ভেবেছিল, দুটো কথা মিষ্টি করে বলে কাগজখানা হাতে দেবে। কিন্তু কি রকম যেন গুলিয়ে গেল, কোন কথাই মুখে এল না। অথচ কঙ্কা নির্ব্বিকার চিত্তে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। এ অবস্থায় মরিয়া হয়ে পতাকী শুধুমাত্র কাগজটা এগিয়ে ধরে জোর করে বলে ফেল্ল একটা চিঠি। বুকের ভেতরটা তখন ভীষণ কাঁপছে, গলার আওয়াজটাও কেমন যেন অস্বাভাবিক রকম কেঁপে উঠল।

কঙ্কা সহজভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে কলম ধরা ডান হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে যেন কিছুই হয় নি এমনই ভাবে নিজের পথে চলে গেল।

এক দৌড়ে ওপোরে উঠে পতাকী অনেকক্ষণ ধরে হাঁপাতে লাগল। এই হাঁপানী তার সহজে সারল না। দু'তিন দিন ধরে ক্রমাগত পতাকীর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করেছে। এই বুঝি ধরা পড়ে গেল। এই বুঝি অনেকগুলো রক্তচক্ষু এক সঙ্গে কৈফিয়ৎ চাইতে আসছে। ওপোরে বা নিচে কেউ কোন কথা কইলেই মনে হোত, বোধ হয় ওর কথাই হচ্চে। কিন্তু না, তিন-চার দিন পার হয়ে গেল, কোন সাড়া শব্দ নেই। তাহলে সেই চিঠির হোল কি? কঙ্কা ছেলেমানুষ, ও কি চিঠির কোন মানে বুঝল না? কি জানি? তা হলে কি আর একটা চিঠি দেওয়া উচিত? না তার চেয়ে এবার একদিন মুখে জিজ্ঞাসা করা উচিত, যে—কিন্তু কথা বলা যে কি দুরূহ ব্যাপার তা সে জানে!

পাঁচদিনের দিন সাহসে বুক বেঁধে পতাকী সিঁড়ির তলায় বেলা দশটা নাগাধ এসে দাঁড়ালো, আজ একটা যা হয় কিছু বলতেই হবে। বুকের ভেতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে, কিন্তু না, মুখ বুজে লুকিয়ে থাকলে চলবে না। যা হয় একটা কিছু বলতেই হবে এবং উত্তর একটা অবশ্যই চাই। কপাল দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরতে লাগল, কিন্তু না, ভয় করলে চলবে না, নায়মাত্মা বলহীনেন ইত্যাদি।

ঠিক দশটার সময় কঙ্কা বেরিয়ে এল। কথা বলতে গিয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ। কিন্তু কথা তাকে বলতেই হোল না। সহজ ভাবে হাঁটতে হাঁটতে কঙ্কা একটা কাগজ পতাকীর দিকে এগিয়ে দিয়ে ঠিক যেমন সুরে পতাকী সেদিন বলেছিলো, তেমনি সুরে বল্লে, একটা চিঠি। তারপর যেন কিছুই হয় নি এমনই ভাবে সহজ গতিতে বেরিয়ে গেল।

পতাকীর শোনা ছিল যে, জেলখানায় কয়েদীরা বড় বড় হাতুড়ী দিয়ে পাথর ভাঙ্গে। সেটা শোনা কথা, কিন্তু সেদিন পতাকীর বুকের ভেতর একশ' কয়েদী এক সঙ্গে যেন একটা পাহাড় ভাঙ্গতে সুরু করে দিয়েছিল। কাগজখানা হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে একেবারে ওপোরে এসে নিজের ঘরে ঢুকে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে চিঠিখানাকে সে চোখের সামনে মেলে ধরলে। কি সুন্দর লেখা! কিন্তু চোখ কি খারাপ হয়ে গেল নাকি? কিছু পড়তে পারছে না। শেষে একটা একটা অক্ষর যেন চোখের সামনে ফুটতে লাগল। দেখে, কঙ্কাও এক কবিতা লিখে পাঠিয়েছে। ঠিক তারই মত লেখা। সে লিখেছে,—

শুন ওহে বন্য
তুমি যে নগণ্য;
দাম দেব শূন্য
পথ দেখ অন্য।

বাঃ—বাঃ—এই ত পেয়েছে! এ-ত পতাকীরই উপযুক্ত উত্তর। ভগবান কি কঙ্কাকে ওরই জন্য তৈরী করেছেন। কতখানি ভালোবাসলে, কতটা আপনার বলে মনে করলে তবে 'বন্য', 'নগণ্য' এই সব আন্তরিক সম্বোধনগুলো লিখতে পারে। কিন্তু—কিন্তু সে লিখছে, 'পথ দেখ অন্য'। তা—তা ত সে বলবেই, নইলে প্রথম দিনেই কি আর শাঁখা সিঁদুর পরে ঘর করতে আসবে? সেটা আসে বিয়ে-করা বউরা, কারণ বিয়ে করা বউ হচ্চে বাজারের মাছ। ওজোন কর, দাম দাও, দড়ি বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলে এস। কিন্তু প্রেমিকা যে পুকুরের মাছ। চার ফেল, টোপ দাও, তারপর খেলিয়ে তুলতে পারো ত পাবে, না হলে সুতো ছিঁড়ে পালাবে। পালিয়ে যাওয়া কোন মাছের মুখে হয়ত বা বঁড়শীর একটুখানি চিহ্ন থাকে, হয়ত বা তাও থাকে না, সব দাগ বেমালুম মিলিয়ে যায়। কিন্তু মোদ্দা কথা, চিঠির যে জবাব দিয়েছে, এতেই বোঝা যায় সে ওকে পাবে, পাবে, পাবে।

কিন্তু এর একটা ভালো জবাব দিতে [illegible] সেই জবাবে পতাকী এবারে ওর [illegible]

না ও সাড়া দিয়েছে। প্রথম বারেই চিঠি যখন বাবা মা কাউকে দেখায় নি এবং জবাবটা কবিতায় ওরই মতো করে দিয়েছে, তখন ভবিষ্যতেও সে কোন গোলমাল করবে না। আর বাস্তবিক পতাকী ছেলে ত মন্দ নয়। কলেজে পড়া ছেলে সে, এক বছর পরেই সে গ্রাজুয়েট হবে, কঙ্কার বাবাই এ কথা বলেছে, হয়ত এ সব কথা বাড়ীতেও হয়েছে, তার ওপোর দেখতে শুনতেও সে খারাপ নয়, সেই জন্তেই কঙ্কা—

সারাদিন ভেবে ভেবে শেষে রাত বারোটার সময় পতাকীর জবাব লেখা শেষ হোল। ঠিক আগের ছন্দটাই সে বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারে নি। লাইন-গুলো একটু বড় হয়ে গেল। তা হোক, লেখাটি এবার সুন্দর হয়েছে, খুবই সুন্দর। কঙ্কা পতাকীকে শূন্য বলেছে, তা বলুক, তাতে কি পতাকী পেছুবে নাকি? 'রবিবারের যুগান্তরে' পতাকী শূন্যতত্ত্ব নামক নক্সাটা পড়েছে। সেই নক্সাকে অনুসরণ করে পতাকী লিখলে,—

শূন্যের বামদিকে বসাইয়া সংখ্যা
শূন্য সে কোটী হয় বাজাইয়া ডঙ্কা;
বাঁদিকের আসনেতে এসে বস কঙ্কা
ডুনিয়ারে জয় করি, নাহি তাতে শঙ্কা।

পূর্ব্বের পথ দিয়েই কাগজখানা কঙ্কার হাতে চলে গেল। মুখে বল্লে, তাড়াতাড়ি উত্তর চাই। এবার কিন্তু গলা তেমন কাঁপেনি, শুধু এদিক ওদিক একবার দেখে নিয়েছিল মাত্র। কঙ্কাও গম্ভীরভাবে কাগজটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল, খুসি হোল কি বিরক্ত হোল ঠিক বুঝা গেল না, বোধ হয় খুসিই হয়েছে, অন্ততঃ পতাকীর সেই রকমই বিশ্বাস।

পরের দিনই উত্তরের প্রত্যাশায় যথা সময়ে সিঁড়ির তলায় পতাকীকুমার দাঁড়িয়ে রইল। মেয়েটা যেতে যেতে অস্ফুটকণ্ঠে বল্লে, কাল।

ওঃ, হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরীর মত নাচেরে। কী ফুর্ত্তিই যে হোল! পতাকীর সারাটা দিন এবং সারাটা রাত যেন হাওয়ায় হাওয়ায় উড়তে লাগল, কিন্তু ঘোড়ার ডিমের দিন শেষ হয় ত রাত শেষ হয় না, আবার রাত যদি পোহাল ত স্কুল যাবার সময় যেন আর আসে না। শেষে ঘড়ি তার নিয়মিত সময়ে ঘণ্টা বাজালে। কঙ্কা বই নিয়ে বেরিয়ে মুচকী হেসে পতাকীর হাতে একটা কাগজ দিয়ে ঘাড় হেঁট করে চলে গেল।

দৌড়ে ওপরে এসে ঘরে ঢুকে কাগজখানা খুলে চোখের সামনে মেলে ধরল নবীন নায়ক। ঠিক তারই ছন্দে কঙ্কা লিখেছে,—

ডুনিয়া জয়ের আগে পুলিশের কথা কি
ভুলে গেছ একেবারে, বিগ্‌ড়েছে মাথা কি?
মন দিয়ে লেখাপড়া কর ছেড়ে চালাকী
না হলে বাবাকে বলে দেব শোন পতাকী।

সর্ব্বনাশ, এ কি রে বাবা! পুলিশের ভয় দেখিয়েছে, বাবাকে বলে দেব বলছে, এ কি সত্যি না কি? দ্বিতীয় চিঠিতে ওর নাম ধরে লেখা হয়েছে, তা হলে ও কি সত্য-সত্যই বিপদে ফেলবে? কিন্তু তাই বা কি করে হবে? কাগজটা দেওয়ার সময় ও ত রাগ করে নি, বোধ হয় যেন মুচ্‌কে হেসেছিল। এ হাসির মানে কি? এক মানে হতে পারে, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি? আবার এও হতে পারে যে—সে পতাকীর সাহস পরীক্ষা করছে। হাজার হোক নারী বীর্য্যশুল্কা ত! নায়কের সাহস ও শক্তি পরীক্ষা না করে নায়িকা কি অচেনা নায়কের হাতে নিজের সর্ব্বস্ব তুলে দিতে পারে?

কিন্তু যাই হোক, এবার একটু সাবধানে চলতে হবে। ওঃ, যদি এমন হয় যে ও একদিন পথ চলতে গুণ্ডাদের পাল্লায় পড়ে যায় আর সেই সময় পতাকী ওকে উদ্ধার করে—কিম্বা যদি কোন গাড়ীর ধাক্কা লেগে ও পড়ে যায় এবং পতাকী ওকে তুলে নিয়ে একেবারে হাসপাতালে যেতে পারে, কিম্বা—কিম্বা—। নাঃ, হতে ত অনেক কিছুই পারে, কিন্তু হয় না ত কিছুই।

আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে পতাকী বড় মন-মরা হয়ে গেল। বাবারা খেয়ে-দেয়ে নটার সময় অফিসে যায়, মায়েরা বেলা দুটো অবধি ঘরের কাজ সারে, ঠিকেঝি নিয়ম-মত বাসন মেজে চলে যায়, বেরাল সুযোগ পেলেই ঢাকা খুলে মাছ খায়, নিচে কঙ্কার ভাই-বোনেরা ঝগড়া করে মারা-মারি করে, কাঁদে, নালিশ করে আবার হাসে, নাচে, লাফায়। সকলের দিনই স্বচ্ছন্দগতিতে বেয়ে চলে, কেবল পতাকীর দিনই অচল হয়ে পড়েছে। দু'তিন দিন অহো-

রাত্র অস্বস্তি ভোগ করে শেষে বুক ঠুকে একখানা উত্তর তৈরী করে পতাকী। সে লিখলে,—

বাবাকে বলিবে তুমি তাই বল সত্বর
না হলে বলার কাজে আমি হব তৎপর :
চাই আমি তাঁহাদের অনুকূল উত্তর
না হলে চলিয়া যাব এখনই দেশান্তর।

নাঃ, এই চারটে লাইন বড় 'খেলো' বলে মনে হোল। এ একেবারেই গল্প। আর তারপর যদি কোন কারণে, আর কারণ ত রয়েইছে, তারা স্বগোত্র, যদি এ জন্য কর্ত্তাদের মত একান্তই না হয়, তা হলে কি সত্যিই দেশান্তরে যেতে হবে নাকি? কোথায় থাকবে, কি খাবে, কোথায় ঘুরে ঘুরে মরবে সে। ওসব ভালো নয়, ঝোঁকের মাথায় এই সব লিখে শেষটা যদি নিরুদ্দেশ হতে না পারে, আর কঙ্কা যদি দাঁত বার করে হাসে তখন—

মনে মনে খুব রাগ হোল। ইস্, ভারী ত একটা কালো-কোলো মেয়ে যে তার জন্যে দেশান্তরী হতে হবে। তার চেয়ে বি-এটা পাশ করে একটা ভালো চাকরী জুটিয়ে নিতে পারলে কত ভালো ভালো মেয়ের বাপেরা এসে সেধে কন্যাদান করবে। ওঃ, দুনিয়ায় যেন মেয়ে আর নেই যে, ওঁর জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে।

ভাবতে ভাবতে পতাকীর ভারী লজ্জা হোল। গোড়ায় ত সেই চিঠি লিখেছিল। কেন মরতেই যে লিখতে গেল। ওর কাছে সত্যই যেন পতাকী ছোট হয়ে গেছে। একটা ক্লাস টেনের ছাত্রী, এখনও কলেজের মুখ দেখে নি, সে কোথায় পতাকীকে দেখে সমীহ করে চলবে, না ওই তার জন্যে সিঁড়ির তলায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে, আর সে মুচকী হেসে গট্‌গট্ করে চলে যায়!

হঠাৎ পতাকীদের রান্নাঘরে একটা সোরগোল শোনা গেল। পতাকীর বাবা এবং কঙ্কার বাবা দুজনে পতাকীর মায়ের কাছে চিৎকার করে কি যেন বলছে। কঙ্কারা বাড়ীতে এসেছে প্রায় দু'মাস হতে চল্লো, কিন্তু এর মধ্যে পতাকীর মা কি কঙ্কার মা এদের দুজনের কেউই কর্ত্তাদের সামনে কোনদিনই বেরোন নি, কথা বলা ত দূরের কথা। পতাকীর বাবা এগুলো পছন্দও করতেন না, কিন্তু সেই পতাকীর বাবা কঙ্কার বাবাকে সঙ্গে করে এনে পতাকীর মায়ের রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কথা কইছেন—

বুকের ভেতরটা পর্য্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল। নিশ্চয়ই কঙ্কা সব ফাঁসিয়ে দিয়েছে এবং এখুনি সমস্ত ধাক্কা এসে পতাকীর ওপোর পড়বে। একবার ভাবলে, পালানো উচিত, কিন্তু পালাবারও পথ নেই। সিঁড়ির সামনেই রান্নাঘর এবং সেই রান্নাঘরের দরজাতেই জবল্ বাবা শুম্ভ নিশুম্ভের মূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে যত দেবতার নাম মনে পড়ল—কাতরভাবে তাদের সকলকেই সে ডাকতে লাগল, কিন্তু বিপদের সময় কেউ কি আর মুখ তুলে চাইবে?

এর মধ্যে ওদের কথা সব কিছু কিছু কানে এল। কিন্তু কই খুব একটা রাগারাগির ব্যাপার বলে কিছু ত মনে হচ্চে না। বরঞ্চ বেশ যেন হাসাহাসি হচ্চে। স্পষ্ট শোনা গেল, মাকে ডেকে বাবা বল্লেন, এই সুসংবাদটা এম্‌নি এম্‌নি শুনলে হবে না, আজ একটা ভালো কিছু তৈরী করে আমাদের সকলকে খাওয়াতে হবে কিন্তু।

পতাকীর মা বল্লেন, নিশ্চয়ই, সে ত খুব আনন্দের কথা! কিন্তু রবিবার হলেও বেলা একটা বেজে গেছে। দোহাই তোমাদের আর দেরী কোরো না, এবেলার মত এখন ডালভাত খেয়ে আমাকে ছুটী দাও, সন্ধ্যেবেলা আমরা দুই শাশুড়ী বউএ খুব ভালোভাবে রান্না-বাড়া করে তোমাদের দমভোর খাওয়াব।

জেলখানার সেই একশ কয়েদী বুকের মধ্যে ফের যেন পাহাড় ভাঙ্গতে লাগল। উঃ, এতদূর এগিয়ে গেছে! কঙ্কা ত বেশ কাজের মেয়ে আছে। ধন্য আমি, ধন্য কঙ্কা! কিন্তু কি করে এত তাড়াতাড়ি সকলের এমন ভাবে মত হয়ে গেল। একই বাড়ীতে থেকে পতাকী ঘুণাক্ষরেও কিচ্ছুটি টের পায় নি ত!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পতাকী, তবে ঘর থেকে বেরুতে ভারী লজ্জা হতে লাগল। অথচ দৌড়ে কঙ্কার কাছে গিয়ে তাকে কত কি সব বলতে ইচ্ছে হচ্চে, আর কেবলই জানতে ইচ্ছে হচ্চে কিসের জোরে কঙ্কা এই এতবড় একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার এত সহজে সুসম্পন্ন করেছে। পতাকীর মনে পড়ল, বাবা সকালে মুদির দোকান থেকে ফিরে এসে মায়ের সঙ্গে কি সব কথা বলে—বললেন, [illegible] যাই একবার, ওদের ঘরে অনেকদিন যাওয়া [illegible] নি, আর গিয়ে একটু গল্প করে আসি। মা [illegible]

বেশী দেরী কোরো না। তারপর এই দু'এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কি এমন ঘটনা ঘটল—

মা ডাকলেন; পতা, এই পতা, বলি চান-টান করতে হবে না। বেলা যে একটা বাজতে চল্লো।

যাই মা, ঘর থেকে লক্ষ্মীছেলের মত পতাকী সুর সুড়িয়ে বেড়িয়ে এল। কারুর মুখের দিকে চেয়ে দেখতে বেশ যেন লজ্জা-লজ্জা করছে কিন্তু তবুও সে রান্নাঘরের আশে পাশে ঘুরতে লাগল, যদি কিছু ভালো কথা শুনতে পায়, কিন্তু কেউই কিছু বল্লে না।

বেলা দুটো নাগাদ পতাকীর মায়ের খাওয়া হয়ে গেল। বাবা বারাণ্ডায় ক্যাম্বিশের চেয়ারে শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। মুখে পান দিয়ে মা এসে বাবাকে বল্লেন, তাহলে একবার নিচে যাই, আমার নতুন বৌমার কাছে গিয়ে গল্পগাছা করে ওদের রাত্তিরে খাওয়ার নেমন্তন্ন করে আসিগে। আর তুমি একটু পরে গিয়ে মাংসটা এনে দিও। রাত্রে লুচি আর মাংস করব, কি বল? বাবা বল্লেন, ঠিক আছে।

কেমন একটা আবেগের ভেতর দিয়ে সারাটা বিকেল পতাকীর কেটে গেল। সন্ধ্যের সময় মাংস চড়িয়ে মা বল্লেন পতা, একবার দোকানে যেতে হবে। কাঁচা পেঁপে, টক দই, মিঠে পান, ছোটএলাচ, লবঙ্গ, ডাল-চিনি ইত্যাদি অনেকগুলো খুচরা জিনিষের নাম করে বল্লেন, সব গুছিয়ে নিয়ে আয়, যেন দেরী করিস নি। পয়সা ও বাজারের থলে হাতে পতাকী রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যেবেলা রাস্তাটা যেন নতুন নতুন লাগছে। পতাকী স্পষ্ট অনুভব করলে যে রিক্সাওয়ালা থেকে আরম্ভ করে মুটে মজুর সকলেরই কেমন যেন হাসি-হাসি মুখ। ফুটপাতের ওপোর শুয়ে নিভাঁজ কালো ষাঁড়টা কেমন হাসিমুখে জাবর কাটছে এবং যে-বাজারে যেতে পতাকীর কোনদিনই ভালো লাগত না সেই বাজারে আজ যেন সে হাওয়ায় ভর করে উড়তে উড়তে চলে এল!

সব জিনিষ গুছিয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরে পতাকী দেখে কঙ্কার মা পতাকীদের রান্নাঘরে পতাকীর মায়ের কাছে বসে নানাবিধ গল্প করতে করতে বাটনা বাটছেন। পতাকীর মনটা ভরে গেল। তাহলে হবে হ'ত, দুই বেয়ানে এই রকম ভালভাই ত হয়।

বাজারের থলেটা নামিয়ে দিয়ে পতাকী যেমনই ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে হঠাৎ সে শুনতে পেলে কঙ্কার মা কাকে যেন লক্ষ্য করে ডাকছেন, ঠাকুরপো, অ ঠাকুরপো, শোন ভাই, পালিও না—

পতাকী অবাক! এর ভেতর ঠাকুরপো আবার কে এল। হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে সে বেচারা মাথা চুলকোতে লাগল। কঙ্কার মা পতাকীর মাকে বল্লেন কাকীমা, আপনি বুঝি ঠাকুরপোকে কিছুই বলেন নি?

মা বল্লেন, কখন বলব? ও ত রাতদিন বই মুখে দিয়ে নিজের ঘরে বসে থাকে। সংসারের কোন খবর রাখে কি?

বলতে বলতেই এক ঠোঙা সন্দেশ ও এক হাঁড়ি দই নিয়ে কঙ্কার বাবা শব্দ সাড়া করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে ওপোরে এসে বল্লেন, খুড়ীমা, আপনাদের ভোজসভায় আমি কিছু চাঁদা নিয়ে এসেছি।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে পতাকীর মা বল্লেন, শুধু চাঁদায় চলবে না, আসছে রবিবার তোমাদের ভোজসভায় আমরা যাব।

তিনি বল্লেন, নিশ্চয় নিশ্চয়, কিন্তু খুড়োমশাই গেলেন কোথায়?

কঙ্কার মা ফোঁস্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লেন, আবার খুড়ী-মা, খুড়োমশাই! ও সব পাড়াগেঁয়ে বুলি ছাড়ো। কেন, কাকীমা কাকাবাবু বলতে পারো না?

কঙ্কার বাবা নালিশ করার ভঙ্গীতে পতাকীর মাকে বল্লেন, দেখুন দেখুন খুড়ীমা, আপনার এই নিরীহ ছেলেটাকে যদি আপনার দজ্জাল বউয়ের শাসন থেকে না বাঁচাতে পারেন তাহলে ছেলে কিন্তু বিবাগী হয়ে—

পতাকীর মা হাসতে হাসতে রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। বারাণ্ডায় পাতা ক্যাম্বিশের চেয়ারটায় কঙ্কার বাবা চেপে বসে বল্লেন, পতাকী ভাই, তুমি একটা চেয়ার বার করে এনে এইখানে বোসো।

পতাকী অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল। তিনি বল্লেন, আরে আমি যে তোমার দাদা হই, সে খবর এখনও পাওনি বুঝি?

কঙ্কার মা বল্লেন, ও ত তোমার মত আড্ডাবাজ নয় যে, কে কার দাদা, কে কার খুড়ো সেই ধান্দায় সারাদিন

ঘুরবে? ওকে পাশের পড়া পড়তে হয়, কি বল ভাই ঠাকুরপো।

প্রহেলিকার মধ্যে যখন পতাকীর মাথা ঠিক রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন সময় পতাকীর বাবা এসে হাজির হলেন। জামাটা খুলে আর একখানা চেয়ার বার করে বসে কথায় কথায় তিনি বল্লেন, ওরে পতা, তুই বুঝি আমাদের সম্বন্ধের কথা এখনও শুনিস নি। তবে শোন, এই যজ্ঞেশ্বরবাবু, বলেই তার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, আর বাবু বলব না, এই যজ্ঞেশ্বর হচ্চে আমার বৈমাত্রেয় দাদা পদ্মলোচন মুখুজ্জের বড় ছেলে। আমার বাবার প্রথম পক্ষের বড় ছেলে হল পদ্মলোচন আর দ্বিতীয় পক্ষের হলুম একমাত্র আমি।

বেচারা পতাকী বড় বড় চোখ তুলে চুপ করে চেয়ে রইল।

বাবা বল্লেন, এই আজ সকালেই কথায় কথায় পরিচয়টা বেরুল। বাস্তবিক, আমার জন্মের পূর্ব্বেই পদ্মলোচন দাদা পাঞ্জাবে চাকরী করতে গিয়েছিল, তা ছাড়া বাবা দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করাতে ওরা এমন হাড়ে চটে যায় এবং বাবাও ওদের অসভ্যতায় এমন বিরক্ত হয়েছিলেন যে বাপ-ছেলের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তা যাক্, এখন যখন আত্মীয়কে আবার খুঁজে পেলুম তখন আমাদের অজানা সেই পুরাণো ঝগড়াটা—

লুচি আর মাংসের ঝোল দিয়ে চাপা দেওয়া যাক, পতাকীর বাবার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কন্তার বাবা শেষাংশটুকু পূরণ করলেন।

এমন সময় কন্তা তার ভাইবোনদের সঙ্গে নিয়ে ওপোরে উঠে এল। যজ্ঞেশ্বরবাবু ছোটদের ডেকে বল্লেন, সকলকে প্রণাম কর, দাদু, দিদি, কাকাবাবু সকলকে।

ছেলেদের সঙ্গে দাদু দিদিকে প্রণাম করে কন্তা পতাকীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার সময় এক মোক্ষম্ চিম্‌টি কেটে দিলে।

বেচারী পতাকী বাধ্য হয়ে কন্তাকে আশীর্ব্বাদ করলে বলে মনে হোল। কিন্তু আশীর্ব্বাদ করার অনেক পরে তার মনে হয়েছিল, আশীর্ব্বাদের ছলে কন্তার পিঠে একটা কিল মারলেই চিমটি কাটার উপযুক্ত প্রতিশোধ হোত। কিন্তু নায়ক পতাকী সব বিষয়েই দেরী করে ফেলে, নইলে পুরাণো সম্বন্ধটা প্রকাশ পাবার আগেই যদি সে নতুন সম্বন্ধটা পাকা করতে পারত, তাহলে—

শান্তিনিকেতন শিক্ষা-প্রণালী

ডঃ প্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ, পি-এইচ-ডি. ডিপ-এড

জগতের নবীণ ও বিচিত্র জীবনপ্রবাহ এক প্রেমময় বিশ্বসত্তার পার্থিব প্রতিচ্ছবি। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব মানুষ মনন ও সৃজনশীলতার মধ্যে দিয়েই আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা চায়। তাই অনুরূপ পরিবেশ মাঝে চেতনার অন্তরালে অবচেতনার দেশের এক বিরাট নিস্তব্ধতার মাঝে নিদ্রিত মানবশিশু মনকে জাগিয়ে তুলে ক্রমবিকশিত করতে হবে; চরিত্রের গঠন আমাদের অবচেতন স্তরেই আমাদের অগোচরেই ঘটনাচক্রের ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গেই হয়। রবীন্দ্রনাথই প্রথম শুনালেন—সেকথা এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর অধ্যাপক স্তর গডফ্রে টমসনই সেখানকার এডুকেশন সোসাইটির সভায় বলেন। এই অন্তরের মানুষটিকে জাগিয়ে তোলা সোজা কথা নয়; তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন "Children have their active subconscious mind, which like the tree has the pover to gather its food from the surrounding atmosphere For them the atmosphere is a great deal more important than [illegible] methods, buildings, teaching [illegible] books. × × × (A Poets' school) [illegible]

পরিবেশ ও পাঠদান—এই তিনের সার্থক সমন্বয়ে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষায় তিনি এক নবধারা প্রবর্তনে সহরের কৃত্রিমতা থেকে দূরে প্রকৃতির ক্রোড়ে এক শিক্ষাশ্রম স্থাপন করলেন। তিনি কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থের মত মানব ও প্রকৃতির মধ্যে নিবিড় ঐক্যবোধের কল্পনায় অনুপ্রাণিত। প্রকৃতির বৈপরীত্য ও রূঢ়তার মাঝে শিশু-চিও শক্ত হয়ে গড়ে ওঠে, রুশোর মত তিনি এ মতের পরিপোষক ছিলেন না। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদীদের মতই তিনি ভাবতেন—প্রকৃতি মানবমনের সমব্যথী সহচর। তাই প্রার্থনারঞ্জিত উষার নির্মলতামাখা সারা প্রকৃতির বিভূবন্দনা-গীতি মাঝে সচকিত, শিহরিত ধ্যান সমাহিত তরুরাজি-অবলোকিত করুণায় মেদুরিত প্রাতরাকাশতলে তিনি অপূর্ব এক বাণী পেলেন—সারা নীলাকাশ যদি তাঁর করুণায় ভরপুর না হত তো আমাদের জীবন স্তব্ধ ও অসম্ভব হত।

রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতীয় সভ্যতার মূলশক্তি আহরিত হয়েছে বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত আত্মার মিলনে ও বিকাশে; তাই তাঁর শিক্ষাশ্রমে ছাত্র তার হৃদয়ের স্পন্দন প্রকৃতির অন্তরে খুঁজে পেয়েছে। তপোবন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তনের মূলে ছিল তাঁর ধারণা, বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম; তার শিক্ষকতা থেকে বিচ্ছিন্ন, বঞ্চিত হয়ে থাকলে আমাদের প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে এক অব্যক্ত অধ্যাত্মচেতনা খেলা করে বেড়াচ্ছে, তার কল্যাণকর প্রভাব-সন্নিপাত আমাদের জীবনে অনস্বীকার্য্য। সেজন্যই তিনি জীবন্ময় পরিবেশ মাঝে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমন্বয়ে উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা-মণ্ডিত জীবনের বৃহত্তর মূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করে ভুবনডাঙ্গার ঢেউখেলান শাল, তমাল, মহুয়া, আমলকী ও আম্রকুঞ্জবিচিত্র রাঙা মাটির মাঠে মহর্ষির ধ্যানময় পরিবেশ মাঝে ইতস্ততঃ ছড়ান ছোট ছোট কুটিরে শান্তিনিকেতন শিক্ষায়তন গড়ে তুললেন। বৈচিত্র্যময় স্বাভাবিক জীবন মাঝে—কৃত্রিমতা থেকে তফাতে রেখে শিশু জীবন বিকাশের অবারিত সুযোগ দিলেন। এইচ, জি, ওয়েল্‌স্ ছিদ্রিহাণক খেলনা দিয়ে পাঠ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন—তিনি রঙের উপর তেমন জোর দেন নি। কিণ্ডারগার্টেনে দেখিয়েছেন সূর্য্য, চাঁদ, বল, বাক্স, ফুল, শ্লেট প্রভৃতি দেখা জিনিসের মডেল তৈয়ারীর উপর ঝোঁক দেন; তাছাড়া নানান্ রকম জ্যামিতিক রূপ ও সংখ্যা শিখানও বস্তুতন্ত্র প্রণালীতে হয়। বেলজিয়মের ডিক্রোলির ব্যবস্থায় ফুল, ফল, গাছপালা, ছোট জীবজন্তু প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার রীতি আছে। কিন্তু আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঋতু ও রঙের আকর্ষণ ও প্রাণাবেগ ও সুরের সংকর্ষণের মধ্যে শিশুশিক্ষার সূত্র পেলেন। তিনি প্রকৃতির বহুবিচিত্র রঙের খেলায় জীবনছন্দের সন্ধান পেলেন। তাই উপযুক্ত গুরুর হাতে পুঁথিগত বিদ্যার দিকে বইএর বোঝা কম রেখে মানুষের নিভৃত অন্তরের শাশ্বত গান ছবি আঁকা, নাচগান নাট্যাদি ছাড়াও সেবা প্রবৃত্তির সুযোগ দানের মাধ্যমে এইভাবে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির শাশ্বতসুরের ঝঙ্কারের সঙ্গে। বিচিত্র আনন্দ উপকরণের সমাবেশে উচ্ছল জীবনাভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে পড়াশুনার নীরস-প্রণালী তাই কোন যাদুস্পর্শে বর্ণবিচিত্র হয়ে উঠল, মানব ভাবতরঙ্গ গানের মাঝে শব্দের ছন্দ ও ছন্দও নৃত্যের অঙ্গভঙ্গিমায় মুক্তিলাভ করে। এতে স্মৃতি, একাগ্রতা, অনুভূতিবোধ ও ছন্দশ্রী চেতনা জাগে। জেনেভার অধ্যাপক ডালক্রোজের গীতিছন্দ বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীতে কিশোরীর সুচারু ভাববৃত্তি, স্নায়বিক সংযম, পেশীগত সহযোগিতা, দেহশ্রী ও নমনীয়তার অপূর্ব বিকাশ লক্ষ্য করি। রবীন্দ্র শিক্ষা প্রণালীতে যে নাচগান ছবি আঁকাকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে তার মূলে রয়েছে গভীর উপলব্ধি। প্রকৃতিতে মানুষের অন্তরের গান নিরন্তর উৎসারিত হয়ে বিশ্বসৃষ্টির অন্তরে ধ্বনিত সেই শাশ্বত অনাদিধ্বনির সঙ্গে মিলিত হচ্ছে।

"আত্মসংযম যজ্ঞাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞান দীপিতে"—দুঃখবরণোজ্জ্বল সংযত তপোবনজীবনের সাধনাকে গুরুজ্ঞানদীপে আত্মদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে সার্থক করতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মতই তিনিও তপশ্চারণ ও দুঃখবরণে জ্ঞানার্জন ও চরিত্র গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। হৃদয়হীন, নির্মম শিক্ষকের একান্তই বিরোধী তিনি, উপদেশ ও স্নেহের দ্বারাই শাসনে বিশ্বাসী ছিলেন। নবমানুষ গঠনে কঠোর ত্যাগব্রতে দীক্ষিত সেবা-উজ্জ্বল-অর্পিত প্রাণ শিক্ষক তৈয়ারীর চিন্তা তাঁকে বেশী উদ্বিগ্ন করে; তাই ভাবতেন, "যদি দুঃখে দহিতে হয়, তবু নাহি ভয়-নাহি

তন্ত্র। সত্যের তরে প্রাণ মোরা করিব সমর্পণ।"—এই মন্ত্র হবে শিক্ষকের জপমন্ত্র। পরীক্ষা তিনি কোন দিনই পছন্দ করেন নি; ক্লাশের রেকর্ড দেখে প্রমোশনের ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি—১৯১৯ সালের আগে হতেই এ ব্যবস্থা তিনি প্রবর্ত্তিত করেন, আর সাফল্যের সঙ্গে রেকর্ড রাখা বাইরের স্কুল সমূহে এখনও সম্ভব হল না —যদিও সংস্কারের ঢক্কানিনাদে দিক মুখর! ক্লাশে তিনি কোন দিনই বেশী ছেলেমেয়ে পছন্দ করেন নি। জোর ১৪ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে তাঁর ক্লাশ হত গাছতলাতে—ঘাসের ওপর আসন পেতে আর গুরুরূপে তিনিও বসতেন বৃত্তাকারে উপবিষ্ট ক্লাশের একধারে মাঝখানে। এখানে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব শিক্ষাদানের পদ্ধতিটা কিরকম দেখা যাক্। একদিন সবুজপাতাঘন একটি চারা বটতলার চাল ছাওয়া ছোট একটি মণ্ডপে ক্লাশ নাইনে ওয়ার্ডসোয়ার্থের "ম্যাটিল্‌স" কবিতাটি পড়াতে বসলেন। প্রথমে বাংলা শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ ছেলেমেয়েদের মুখ থেকে একটি একটি করে আদায় করে নিয়ে ইংরাজী কবিতার মালা গেঁথে দিলেন, প্রতি ছাত্রছাত্রীরই খাতার পাতায় পাতায়—নিজ নিজ লেখার মধ্যে দিয়ে। তারা তখন তাই পড়ে অবাক! "গুরুদেব কবির চেয়ে শিক্ষক হলেই ভাল ছিল!"—বলে ফেললেন ঐতিহাসিক, দর্শক রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়। পাঠ্য ও জ্ঞাতব্য ছাত্রের মনে সঞ্চারিত করে দেওয়ার দুর্লভ ক্ষমতা ছিল গুরুদেবের। সুরুলভিলায় বনভোজনে গিয়ে খাওয়া দাওয়ার আগে তাই শিশুদের নিয়ে তাদের মাঝে বসে গল্প বলেছিলেন। গল্প বলেছেন আর থেকে থেকে "আরে বল্ না রে—বল্ না রে!"—বলে আদায় করেছেন—তা কত সুন্দরভাবে।

"আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী"; আবৃত্তিকে তাই তিনি তাঁর শিক্ষাতন্ত্রে বিশেষ স্থান দিয়েছেন। আষাঢ়ের এক বৃষ্টিঝরা দিনে শান্তিনিকেতনভবনে ফরাসের ওপর অর্দ্ধশায়িত কিশোরকবি নিবিষ্টমনে মেঘদূত পড়ছিলেন—কালো মেঘেরতলে কোপাই নদীর তীরে কদম ফুলের শিহরণ লেগেছিল। মেঘদূতের সব যায়গা না বুঝলেও তার ভাব যেন আপনা হতেই উদয় হয়ে মন ছাপিয়ে ফেলত।

মাটির পরশ ও প্রকৃতির স্পন্দনস্ফূর্ত্ত বিলাসের মোহ বর্জ্জিত আহারের লোভসংযত আশ্রমিকের কষ্টসহ সাদাসিদে জীবন তাঁর বাঞ্ছিত ছিল। তাঁর প্রিয় মহাত্মার দুঃখবরণের বাণী যেন আত্মরূপ দেখে মুগ্ধ, অনুরণিত হচ্ছে তাঁর আশ্রমে।

শিক্ষায় বিলাসিতা অনভিপ্রেত বলে শান্তিনিকেতনে ঘর ঝাঁট দেওয়া, কাপড়কাচা, নিজের নিজের থালাবাসন ধোওয়া, বিছানা করা প্রভৃতি দৈনন্দিন দায়িত্ব ছাত্রদের উপরই ন্যস্ত।

সকলে সকালের অন্ধকার থাকতেই বিছানা হতে উঠেই ঘর পরিষ্কার করে হাতমুখ ধুয়েই প্রাতরুপাসনায় চলে যায়—শালগাছতলায় বা পলাশমূলে। তারপর শালবীথিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে সকলে মিলে 'বারিষ ধরা মাঝে শান্তি বারি। শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে উর্দ্ধমুখে নরনারী।"—প্রভৃতি প্রার্থনা সঙ্গীতে প্রাতরুপাসনা শেষ করে গাছতলাতে তাদের ক্লাশে ক্লাশে গিয়ে আসনে বসে। এক ঘণ্টা ক্লাশের পর প্রাতরাশ রান্নাঘরে—সকলে বাটি হাতে নিয়ে সারি দিয়ে যায়। কখনও বা গুড়মুড়ি, আবার কখনও চিঁড়ে দুধ বা মোহনভোগ দেওয়া হয়। তারপর আবার ক্লাশ সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত। পরে স্নান ও কাপড়কাচা আর মধ্যাহ্ন ভোজন রান্নাঘরের হলে শালপাতা পেতে। আশ্রম জীবনে ছেলেদের ত্রুটি বিচ্যুতি বিষয়ে উপদেশাদি ঐ হলে দাঁড়িয়েই শিক্ষক-বিশেষ দেন। এইটিই ভাল সংশোধন ব্যবস্থা বলে মনে হয়। দুপুরে গাছের ডালে বসেও সময়ে সময়ে ছেলেরা কোচিং ক্লাশে কাজ করে —শিক্ষক মহাশয় তখন নীচে বসে থাকেন। কোন কিছু দেখাতে বা বুঝতে হলে তাদের নীচে নামতে হয়। বিকালে ড্রয়িং বা বিজ্ঞান ক্লাশ, কখনও বা নাচ, ব্যায়াম ও ড্রিলের ক্লাশও নেওয়া হত।

এখানে পাঠদানের প্রণালী সম্বন্ধে একটু বলি। পাঠদানের সময়ে একই প্রশ্নের সমস্বরে উত্তর দিতে তিনি সকলকে উৎসাহিত করতেন; বলতেন এতে যারা লাজুক তাদেরও মুখ ফুটবে। পুনরনুবাদ বা 'double translation এর' প্রথা তিনিই প্রবর্ত্তন করেন। শিশুমনের উপর ঋতুর আকর্ষণ বিবেচনা করেই তিনি বিভিন্ন ঋতুরঙ্গ উৎসবের আয়োজন করেন। পূর্বজ্ঞান পরীক্ষাতে তার [illegible] পরিবেশিত জ্ঞানের যোজনা পাশ্চাত্য শিক্ষা[illegible]

কিন্তু আমাদের তা নয়; নব জ্ঞান যোজনায় জ্ঞানপিপাসায় উদ্রেকের অপেক্ষা করতে হবে; প্রয়োজনবোধ না করলে জ্ঞানদানের নিয়ম আমাদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথও শিক্ষায় প্রয়োজনবোধের উপরেই বেশী জোর দিতেন।

তপোবন শিক্ষাপ্রণালীর উপাসনার দিন একটা বড় দিন। তার কথা না বললে আধ্যাত্মিক জীবনের দুয়ার খোলা হয়না। বুধবারের দিন সকাল বেলা। ধীর উদাত্ত একটানা সুরে থেমে থেমে মন্দিরের ঘণ্টা বাজাচ্ছিলেন গুরুদেব—সাপ্তাহিক উপাসনার শান্তিময় আহ্বানের প্রতিধ্বনি সকলের প্রাণে তুলে। আমরা সেদিনের বিশেষ প্রাতরাশ—প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ আশ্রমের রান্নাঘরে তৈয়ারী চারিখানা করে টাট্‌কা বালুসাই—সমাধা করে রঙীণ কাচের উপাসনা মন্দিরের দিকে এগিয়ে যেতাম। দেখতে পেতাম মৃদু হাস্যজড়িত গুরুদেবের করুণোজ্জ্বল রস-মূর্ত্তি মার্বেলের পাদপীঠে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ঘণ্টার দড়ি টানছেন। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য! খানিক পরে তিনি মন্দিরের আসনে বসে ধ্যানস্থ হলেন। সে সময়ে প্রভাতী সূর্য্যের কনকরশ্মিজাল রঙীণ কাচের ফলকে বিচ্ছুরিত হয়ে গুরুদেবের স্বর্ণশ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডলে বিচিত্র আভার সৃজন করত। ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিত তাঁর সেই ধ্যানমূর্ত্তি দেখে মনে হত অতীতের কোন ঋষি যেন ধরায় আবার এসেছেন! আর তখন হয়তো দীনেন্দ্রনাথ উদাত্ত সুরে পিয়ানো-যোগে গেয়ে উঠতেন "তুমি কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জালিয়ে ধরায় আস।" সে স্তব্ধনীরব সভাগৃহে রঙীণ কাচের দেওয়ালে সে সুর মূর্চ্ছনা ঝঙ্কৃত হতে থাকত। তারপর ধ্যানতন্ময়তা ভঙ্গ করে কবিগুরু মৃদুমন্দ্রিত কণ্ঠে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করলেন। পরিশেষে আশ্রমজীবন সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশামৃত পরিবেশনের পর প্রার্থনা সে সপ্তাহের মত সমাপ্ত হল। সপ্তাহের এই মধুর দিনটী ছোট বড় সকলেরই প্রাণে গভীর রেখাপাত করত।

গঙ্গার প্রতি

শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

দু'ধারে অসংখ্য গিরি বনভূমি গ্রাম ও শহর
মধ্যে তুমি উচ্ছলিত জ্যোতির্ময়ী বিগলিত ধারা—
ভীষণ সুন্দররূপা, কভু শান্ত—উন্মাদিনী-পারা.
প্রাবৃট্-যৌবন-ঝঞ্ঝা শীত-শীর্ণা অলস-মন্থর!

যুগ হ'তে যুগান্তরে সে-কী স্বপ্ন আশ্চর্য্য গভীর—
অমোঘ আশিসে তব প্রাণ-দৃপ্ত অযুত-নিযুতে,
স্নিগ্ধশ্যাম শস্যশীর্ষে যান্ত্র-চক্র-বিজ্ঞান-বিত্ততে
স্নেহাঙ্কিত স্মিতচ্ছবি সহজিয়া নিগূঢ় নিবিড়!—

ঈপ্সিত আনন্দ-ঘন নৃত্যছন্দ উন্মুক্ত অম্বরে
বেজে যায়—গেয়ে' যায় পুঞ্জফেন উর্ম্মি-আলোড়নে,—
অমুক্ত ভাবের-ভঙ্গি স্ফূর্ত্ত-লীন নিত্য রাত্রিদিন
রুদ্রের বীণার সুরে বক্ষে তব কুলু-কলস্বরে,—

ঢালো প্রাণে সেই সুর, দাও ভাষা ভাব প্রকাশনে,
'হর-হর' মহামন্ত্রে সাবিত্রী সে যথা সমাসীন!

ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনায় বেকার সমস্যা

অণিমা রায়

আমাদের জাতীয় পরিকল্পনাগুলিতে সবচেয়ে মুস্কিলের ব্যাপার হচ্ছে দেশের বেকার সমস্যা দূরীভূত করা ও প্রতি-বছর যে সমস্ত যুবক প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে নতুন কর্মপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাদের কর্মসংস্থান ক'রে দেওয়া বা সৎভাবে জীবনযাত্রা চালাবার সুযোগ দেওয়া। এই বেকারসমস্যা অবশ্য আমাদের দেশে বহুকাল থেকে রয়েছে, কিন্তু জাতীয় পরিকল্পনাগুলিতে এই বেকার সমস্যার সমাধান করতে না পারলে আমাদের যেটি প্রধান লক্ষ্য—দেশে সাম্যবাদী সমাজ ও জনকল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা—সেই মহান্ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ভারতের জনসংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনাটি শুরু হবার আগে অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালের শেষে ভারতে লোক সংখ্যা দাঁড়াবে ৪৩'১ কোটি। যে হারে জাতীয় আয় বাড়ছে তাতে আশা করা যায় যে ১৯৬০ সালের জিনিষপত্রের দামের উপর ভিত্তি করে ১৯৬০-৬১ সালের শেষে জাতীয় আয় দাঁড়াবে ১৩,৫০০ কোটি টাকা এবং ১৯৬০-৬১ সালে কর্মীর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১৮'১ কোটি। গড়ে প্রতি কর্মীর বাৎসরিক আয় হবে মাত্র ৭৪৬১ টাকা। জাতীয়সঞ্চয় ও নতুন কাজে অর্থ নিয়োগ যদি এখনকার মত জাতীয় আয়ের ১১'৩ শতাংশ হয়, তাহলে ১৯৬০-৬১ সালের শেষে তৃতীয় পরিকল্পনার শুরুতে জাতীয় সঞ্চয় বাবত ১,৫৩০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে।

দেশের এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ শুরু হবে। দেশে নানাবিধ বড় শিল্প স্থাপন করা হয়েছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও অনেক বড় বড় শিল্প স্থাপিত হবে। কিন্তু এই শিল্পগুলি প্রায়ই অর্থভিত্তিক (Capital intensive) শ্রমিক ভিত্তিক (Labour intensive) নয়। অর্থাৎ এই সব শিল্পে অধিকতর উৎপাদনের অনুপাতে অধিক সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হবে। বহুমূল্য কলকারখানা বসিয়ে অল্প সংখ্যক শ্রমিক নিয়ে সুলভ মূল্যে জিনিষপত্র উৎপাদন করা হবে। বিদেশী যে সব দেশের অনুকরণে এই সব শিল্প গঠিত হচ্ছে সে সব দেশে এ রকম বেকার সমস্যা নেই। প্রয়োজনের অনুপাতে শ্রমিকের সংখ্যা সে সব দেশে কম। সুতরাং এই সব বড় শিল্পের দ্বারা আমাদের দেশে বেকার সমস্যা খুব বেশি কমবে না।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই সব বড় শিল্প বেকার-সমস্যা কমান ত দূরের কথা—আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে আধুনিক পরিবহনের ব্যবস্থা করে, অর্থাৎ লরী, বাস প্রভৃতি আমদানি করে, দেশের সনাতন পরিবহনে যত লোক খাটত তার বোধহয় অর্ধেক লোকও কর্মসুযোগ পায় না। অপরদিকে এখন-কার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশের লোকের জীবন-যাত্রার মান এমন কিছু দ্রুততালে উঁচুর দিকে যাচ্ছে না যাতে অদূরভবিষ্যতে আরও বহু সংখ্যক লোক ব্যবসা-বাণিজ্য বা দোকানদারী করে জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। এই জন্য নানারকম কুটির শিল্পোন্নয়নে জাতীয়সরকার ও বিভিন্ন রাজ্যসরকার মনোযোগী হয়েছেন কেননা সেগুলি শ্রমিক ভিত্তিক এবং বহুলোককে কর্মসুযোগ দিতে পারে।

ভারতে কর্মনিয়োগ প্রণালী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভারতবাসীর মধ্যে শতকরা প্রায় সত্তরজনের জীবিকার্জন নির্ভর করে গ্রামাঞ্চলে কৃষি বা কৃষিসম্পর্কিত কাজের উপর। তা ছাড়া প্রতি গ্রামেই পূর্ণবেকার অবস্থায় বহু লোক থাকে যাদেরকে অন্যের উপর খাওয়াপরার জন্য নির্ভর করতে হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নানাবিধ চেষ্টা করা সত্ত্বেও কৃষির উপর এত লোকের নির্ভরতা কমান যায়নি। আরেকটি মুস্কিলের কথা যে জাতীয় আয় যেখানে তিন বছরে শতকরা ৩½ টাকা বাড়ছে, সেখানে কৃষিফসল উৎপাদন বাড়ছে শতকরা ২½ ভাগ মাত্র। অথচ দেশে লোকসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি [illegible]

সংখ্যা প্রতি বছরে এমন ভাবে বেড়ে চলেছে যে তাদেরকে কর্ম-সুযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে অনেককে জমির উপর নির্ভর করতে হ'চ্ছে। ভারতে কৃষি ও তৎসংক্রান্ত কাজে মোট শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১২'৩ কোটি ধরা যেতে পারে। অন্যান্য কাজে মোট শ্রমিকের সংখ্যা ৫'৮ কোটির বেশি হবে না। ফলে কৃষি-কার্যে মাথা পিছু আয় কমে যাচ্ছে এবং কৃষক ও অন্যান্য শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানে পার্থক্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কাজেই বহুলোক যারা গ্রামে প্রচ্ছন্ন-বেকার বা অর্দ্ধ-বেকার অবস্থায় কাটাত, তারা বাধ্য হয়ে শহরে এসে পূর্ণ বেকারের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এবং তারপরে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থায় যে সব অসামঞ্জস্য (যথা—খাদ্যাভাব প্রভৃতি) এসে পড়ছিল সেগুলি সংশোধন করবার প্রচেষ্টাই প্রথমপরি-কল্পনার প্রধান লক্ষ্য হয়েছিল এবং বেকারসমস্যার উপর খুব বেশি ঝোঁক দেওয়া হয়নি। তা হলেও প্রথম পরি-কল্পনার ৫৫ লক্ষ নতুন কর্ম সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনায় মাঝামাঝি আরও বেশি কর্মসৃষ্টির কথা চিন্তা করা হয় বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঐ ৫৫ লক্ষ নতুন কর্ম সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল। এই ৫৫ লক্ষ নতুন কর্ম-সংস্থান প্রয়োজনের অনুপাতে খুবই কম এবং প্রথম পরি-কল্পনার পাঁচ বছরে যে সব নতুন কর্মী কর্মের অন্বেষণে উপস্থিত হয়েছিল, তাদের পক্ষেও পর্যাপ্ত ছিল না। পূর্বেকার বেকারদের অবস্থা পূর্ববৎই রইল এবং পরিকল্পনার শেষে বেকারের সংখ্যা বেড়ে গেল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা যখন সুরু হ'ল দেশে তখন প্রায় ৫৩ লক্ষ বেকার এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচবছর মেয়াদে আরও এককোটি নতুন কর্মী কর্মপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াবে। তখনই বোঝা গিয়েছিল যে এই মোট এককোটি ৫৩লক্ষ লোকের জন্য কর্মসংস্থান করা দ্বিতীয় পরিকল্পনার অসাধ্য। তখন স্থির করা হ'ল যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচবছরে বেকারের সংখ্যা যেন আর বৃদ্ধি না পায় এবং মোট ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান করা হবে। পরিকল্পনা কিছুদূর অগ্রসর হবার পর নানাকারণে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়ের মাত্রা সরকারী ও বেসরকারী উভয়ক্ষেত্রেই কিছু কমিয়ে ফেলতে হয়; ফলে কর্মসংস্থানের লক্ষ্য ১ কোটি থেকে ৮০ লক্ষ দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম চার বছরে কৃষি বা তৎসংক্রান্ত কাজে ১৫ লক্ষ লোকের এবং অন্যান্য কাজে আরও ৪৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বছরে, অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালে, বাকি ২০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করতে পারা যাবে বলে আশা করা যায়। তাহলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশে অন্ততঃ ৭৩ লক্ষ লোক বেকার থাকবে।

অনুমানে বোঝা যায় যে তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচবছরে অর্থাৎ ১৯৬১—৬৬ সালের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক নতুন কর্মী কর্মপ্রার্থী হয়ে কাজে নামবেন। পূর্বেকার ৭২।৮০ লক্ষ বেকার ধরলে অন্ততঃ ২ কোটি ২০ লক্ষ লোকের জন্য নতুন কর্মসৃষ্টি করতে পারলে তৃতীয়-পরিকল্পনায় দেশে বেকারসমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু তৃতীয় কল্পনায় এত কর্মসৃষ্টি হওয়া অসম্ভব মনে হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষে দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৩ লক্ষ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বেকারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৩ লক্ষ। প্রতি পরিকল্পনার শেষে দেশে বেকারের সংখ্যা যদি এইভাবে বেড়ে চলে, তাহলে দেশের মঙ্গল হবে না। তৃতীয় পরিকল্পনায় বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে যাতে পরিকল্পনায় শেষে ২ কোটি ২০ লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থান করতে না পারলেও দেশে বেকারের সংখ্যা খুব বেশি আর না বাড়ে। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হয় যে সুদূরপ্রসারী চেষ্টার ফলে দেশের বেকারসমস্যার মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব—কিন্তু পাঁচ, সাতটি পরিকল্পনায় তা আশা করা অসঙ্গত।

নয় দিনের রাণী

(লেডি জেন গ্রে)

শ্রীকালিদাস রায়

অনেক রানীর কথা পড়িয়াছি নানা ইতিহাসে
নিয়তির পরিহাসে স্বজনের ক্রূর অভিলাষে,
তোমার মতন দশা হয়নিক কাহারো করুণ,
দিয়া অসাধারণ বিদ্যা, রূপ, গুণ, বয়স তরুণ,
ষোল বসন্তের মালা গাঁথিল বিধাতা কার তরে ?
দুলাইতে দশদিন সিংহাসন কীলকের পরে ?
শূল হলো তব বক্ষে কাহাদের মারাত্মক ভুল !
কি লাভ করিল তারা যারা তোমা বানায় পুতুল
খেলিল ক্ষমতা লোভে রাজারানী খেলা,
রক্তসিন্ধু তরিল কি তব দেহে বানাইয়া ভেলা ?
রাজ্ঞীর গৌরব যোগ্য ছিলনা তোমার চেয়ে কেহ,
কে করিবে ইহাতে সন্দেহ ?

তুমি রূপ কথার অপ্সরী
বিদ্যাধরী অথবা কিন্নরী
অভিশপ্তা ? রাজহস্তী শুণ্ডে তুলি নিজ পৃষ্ঠোপরি
বসাইবে স্বর্ণ সিংহাসনে,
স্বপ্নলোক বিহারিণী, কোনদিন ভাবনি তা মনে।
শান্তিময় গৃহাশ্রমে পতিপ্রাণা আদর্শ ললনা-
রূপে তুমি আবাল্য করিতেছিলে নিজেরে রচনা।
তুমি ছিলে ঋজুচিত্তা বালিকা তখন,
উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিকৃতমতি যত গুরুজন
দেবীত্বের স্বর্গ হতে রসাতলে তোমা টেনে আনি
নাগলোকে ফণাসনে বানাইল তোমা মহারাণী।

সমুদ্রের পর পারে আরেক রাণীর কথা স্মরি,
যার শিরশ্ছেদ হেরি সারা বিশ্ব উঠিল শিহরি।
প্রতিদিন [illegible] করিয়া সিনান
করিত যে প্রসাধন তার অনিবার্য অবসান
ব্যথিত করেনা চিত্ত। সেই রক্তে হইয়া রঞ্জিত
উঠিল আরেক পূর্বে নবসূর্য করিয়া ব্যঞ্জিত।

রূপবতী বিদ্যাবতী আরেক রানীরে পড়ে মনে,
[illegible] শির ছিন্ন হলো আর এক রানীর শাসনে
অজস্র গুণের পোত মগ্ন যার দোষের পাথারে।
নিজ পতি-ঘাতকেরে করি নির্বাচন
তৃতীয় পতিত্বে তারে দর্পভরে করিল বরণ।
তার এই প্রায়শ্চিত্ত হইবারই কথা।
তার তরে কে পেয়েছে ব্যথা ?
প্রাপ্য তার ছিল খড়্গাঘাত
করেনি প্রকাশ্যে কেহ তার পরিণামে অশ্রুপাত।

মহাপ্রাণ বিশপের জ্ঞান উপদেশ
সার্থক করিলে তুমি, ভাবো নাই এ জীবনই শেষ।
নিজের জীবনাদর্শ ধর্মমত করনি বর্জন,
বাঁচাইতে অমূল্য জীবন।
করেছিলে মৃত্যুভীতি জয়
একমাত্র ছিল চিত্তে পতি সহ বিচ্ছেদের ভয়।
সে ভয় রহেনি শেষে, বড় দয়া হইল মেরির
একই খড়্গে ছিন্ন হল একই দণ্ডে দুজনের শির।

হে ষোড়শি, যে জল্লাদ তব কণ্ঠে হানিল কুঠার
দুর্ভাগ্য সে কত বড় ! বিনা দোষে কেন দণ্ড তার
বক্ষ তার কাঁপে নি কি ? চক্ষু তার হয়নি সজল ?
এক কোপে হলো সারা ? হস্ত তার হয়নি দুর্বল ?
জল্লাদ যদিও হায় অসহায়ে, তবু সে মানুষ
জানিত সে তব চিত্ত পদ্ম-সম শুচি নিষ্কলুষ।

হে বিদুষী মহীয়সী, আমি তোমা জানি
সমস্ত সৌন্দর্যলোকে চিরন্তনী রাণী,
মেরি বা এলিজাবেথ যুগে যে আসনে
সে আসন নয় তব। তাই ভাবি মনে,—
ইতিহাসে তাহাদের অনিত্য জীবন,
সাহিত্যে তোমার স্থান নিত্য চিরন্তন।
বিধাতা কি ভুলিয়েছে, অথবা কি তুমি [illegible]
সবার মাঝারে তুমি বিরাজিছ [illegible]।
সবারে ভুলিয়া গেছি পারি নাই তোমারে [illegible]
[illegible]

আকাশ ও পৃথিবী

উপানন্দ

আমাদের সামনে সুশৃঙ্খল বিশ্ব। এটি চলছে কতকগুলি প্রকৃতির বিধানে। সে বিধানের কখনও পরিবর্তন হয় না। আশ্চর্য নয় কি? আইনষ্টাইন বলেন, কোন বস্তুর গতি-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার বর্দ্ধিত ভর উৎপন্ন হয়। শক্তি-মাত্রেরই ভর আছে, আর ভর শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। পরমাণুর নিউক্লীয়াসে যে শক্তি নিহিত আছে, এ সত্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন আইনষ্টাইন। ওঁর তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে আজ আমরা মহাকাশের পথে যাবার অবস্থায় এসেছি। এজন্যে তিনি আমাদের চিরনমস্য। তিনিই বিজ্ঞানের যুগাবতার, রবীন্দ্রনাথের মত জীবনের পুরোহিতও বটে। তিনিই আমাদের দিশারী। তোমরা জানো, এ জগৎ বস্তুতান্ত্রিক। বস্তু-বিশ্বের খেলা ঘরে আমরা আছি। কিন্তু একে জানবার জন্যে আমাদের অদম্য প্রচেষ্টা চলেছে যুগে যুগে। আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে এ জগৎ বৃহৎ হোতে বৃহত্তর, এর অধিবাসীরা সীমার বাইরে গিয়ে অসীমের সন্ধান করছে। অন্তহীন মহাবিশ্ব। মহাশূন্যের নির্জনতায় আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবী যেন একটি ধূলিকণা।

অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রখচিত মহাকাশ। আমাদের কাছে এই মহাকাশ তুলে ধরেছে একখানি বিরাট জ্ঞানগ্রন্থ। দুঃখের বিষয়, এর এক বর্ণও বুঝবার ক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু আমাদের ঋষিদের ছিল। তাঁরা যন্ত্রের সাহায্য নেননি, যোগবলে জ্ঞানগ্রন্থ পাঠ করেছেন, আর উপলব্ধি করেছেন সৃষ্টির রহস্য, আর জেনেছেন স্রষ্টাকে।

মহাশূন্যের দূরত্ব পরিমাপের পক্ষে আমাদের পার্থিব কোন মাপকাঠি নেই। তাই আলোকবর্ষকে করেছি অবলম্বন মহাশূন্যের দূরত্ব পরিমাপের মানস্বরূপ। সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার গতিবেগে এক বছরে আলো যতটা পেরিয়ে চলে যায়, তাকে আমরা বলি আলোকবর্ষ।

এক আলোকবর্ষ দশ মিলিয়ন কিলোমিটারের সমান। তা হোলে তোমরা বুঝে দেখ, এ রকম বিশাল দূরত্বের কথা কল্পনা করাও সাধ্যের অতীত। তবু আমাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। আমরা জানি, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই চলমান। আমরা আছি ছায়াপথে। যে ছায়াপথে আমরা বেঁধেছি বাসা, সেটাও অবিরত ঘুরছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বিরামহীন দুরন্তগতিতে ছুটে চলেছে তারই অন্তর্ভুক্ত হাজার হাজার গ্রহ নক্ষত্র, আর ঐ নক্ষত্রমণ্ডলান্তর্গত গ্যাস ও ধূলোর মেঘ।

অসীম মহাকাশে কত নক্ষত্র আছে, তা বলাও এক-প্রকার অসম্ভব। স্যার জেমস জীনস্ বলেছেন—পৃথিবীর সকল সমুদ্র তীরে যত বালুকণা আছে, মোট নক্ষত্রের সংখ্যা সম্ভবতঃ ততগুলি হবে। আজ তৈরী হয়েছে শক্তি-সম্পন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্র। এর সাহায্যে কোটি কোটি নক্ষত্রের আলো আমাদের নজরে আসে। এগুলি যেন অসীম মহা-

সমুদ্রের বুকে বিচ্ছিন্ন আলোক তরণীর মত দেখা যায়। ভারী সুন্দর এদের দীপ্তি। বহুকাল থেকে আমরা জেনেছি যে, মানুষ বায়ু-সমুদ্রের তলদেশে বাস করে। এই বায়ু-সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরের ভেতর দিয়ে মহাবিশ্বের দিকে তাকাতে হয়, এজন্যে মানুষের দৃষ্টির সামনে ফুটে ওঠে মহাবিশ্বের রূপ বিকৃতভাবে। যে স্বচ্ছ নিত্যগতিশীল বায়ুমণ্ডল আমাদের ঘিরে আছে, তা মাইলের পর মাইল বিস্তৃত। কিন্তু পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে যে বায়ু স্তর, সে আমাদের কল্যাণ করে, আমাদের জীবনধারণের ব্যবস্থা করে। শুধু তাই নয়, এই বায়ু স্তর আমাদের জীবনকে রক্ষা করে আর বিপন্মুক্ত রাখে। এই স্তর আবহাওয়া সৃষ্টি করে, আর পাথরকে ক্ষয় করে কৃষিকার্য্যের উপযোগী মৃত্তিকায় পরিণত করে।

বায়ুকণার জন্যে আমরা আকাশকে নীল দেখি। এই কণাগুলি এত বড় যে সূর্য্যের নীল ক্ষুদ্ররশ্মি তাতে প্রতিহত হয়ে দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য তা কেবল নিম্ন স্তরেই ছড়ায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে উনিশ কিলোমিটার উপর পর্য্যন্ত এই নিম্নস্তর প্রসারিত। তার ওপরের আকাশ বেগুনী। বায়ুমণ্ডলের ওপরের বায়ুশূন্য আকাশ শুধু অন্ধকার, অতল অন্ধকার। ধরো তোমরা যদি চাঁদে যাও, তাহোলে সেখান থেকে তোমরা আকাশকে দেখবে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, দিনের বেলাতে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণ সত্ত্বেও।

আমাদের এই বায়ুমণ্ডলের বাইরে পৃথিবী তার নিজের তৈরী বিপুল মহাজাগতিক মেঘে আচ্ছন্ন বলে মনে হয়। প্রধানত জলীয় বাষ্প আর জৈব বস্তুর ক্ষয় থেকে ওঠে মিথেন বা মার্স গ্যাস। এই গ্যাসই সৃষ্টি করে মেঘ। মেঘ উঠে যায় বহু ঊর্দ্ধে। তখন সূর্য্যালোকে এর অণুগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে হাইড্রোজেন পরমাণুর সৃষ্টি করে। ছাড়া পেয়ে সেই অতি লঘু হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি বায়ুমণ্ডলের ওপর উঠে যায়, আর ক্রমশঃ পৃথিবীর মহাকর্ষের টান থেকে মুক্ত হয়। পরে তারা সূর্য্য থেকে উদ্ভূত অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণ হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হয়। এই ভাবে গঠিত বিশাল মেঘ সূর্য্যের চারদিকে তার নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। আর সূর্য্যের উপরিতলে হাইড্রোজেন মেঘ থেকে যে অতি বেগুনী রশ্মি বিকীর্ণ হয়—ছাঁকনির মত সেই রশ্মিকে প্রতিহত করে,তা থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে।

গত বিশ বছরের মধ্যে এক নতুন বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়েছে যার ফলে বায়ুমণ্ডলের আবরণ ভেদ করে বহু দূর অবধি দেখবার সুযোগ পেয়েছি আমরা। এর ফলে যে তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে এ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রে আর ফটোগ্রাফিক বা আলোকচিত্রগ্রহণ সংক্রান্ত পদ্ধতিতে, সে তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব ছিল না। বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, ফলে আকাশের নতুন গবাক্ষ পথ দেখবার সুযোগ হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় রডার সম্পর্কে প্রভূত গবেষণার ফলে এই বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি ঘটেছে। পৃথিবীর নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৃহদাকারের বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র, এই সব যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বেতারশক্তিসম্পন্ন বহু মহাজাগতিক উৎস আবিষ্কার করেছেন, আর ঐ উৎসগুলির অবস্থান ঠিক কোথায়, তা নির্দ্ধারণ করার চেষ্টাও করেছেন।

মহাকাশের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে চলেছে দ্রুত পদক্ষেপ। ফলে বহু তথ্যাদি জানা গেছে। আগে ধারণা ছিল, পৃথিবী আর সূর্য্যের মাঝখানে শুধু শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই। এখন সে ধারণা পাল্‌টে গেছে। এখন ধারণা হয়েছে পৃথিবী সৌর আবহাওয়ার বহিঃপ্রান্তে রয়েছে। তোমরা বিজ্ঞানের সাধনায় আত্মসমাহিত হও, তা হোলে পৃথিবীর বহু রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবে, আর নব নব আবিষ্কার করে স্বদেশের বহু উপকার সাধন করতে সক্ষম হবে। আশা করি এদিকে তোমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবে না।
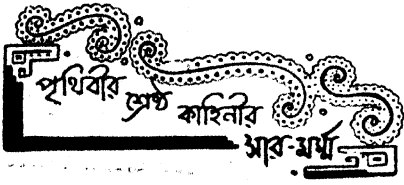
কাউণ্ট লিও টলষ্টয়
রচিত

দি লঙ্ এক্সাইল্

(The Long Exile)

সৌম্য গুপ্ত

[জগত-বিখ্যাত রুশ-সাহিত্যিক কাউণ্ট লিও টলষ্টয়ের (Count Leo Tolstoy) সংক্ষিপ্ত-পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই তোমাদের জানিয়েছি। এবারে তাঁর রচিত আরেকটি সুপ্রসিদ্ধ-কাহিনীর সার-মর্ম্ম তোমাদের উপহার দিচ্ছি। রুশীয় 'জার্'-শাসকদের (Czarist Era) আমলে বিত্তশালী অভিজাত-বংশে জন্মগ্রহণ করেও ঋষিতুল্য-মনীষী টলষ্টয় মনে-প্রাণে ভালবাসতেন তাঁর দেশকে আর দেশের নিপীড়িত-জনসাধারণকে···উচ্ছৃঙ্খল বিলাস-আড়ম্বর আর সামাজিক দুর্নীতি এবং অন্যায়-অনাচারের উচ্ছেদ-সাধন করে মানুষের জীবন যাতে সহজ-সরল, নির্ম্মল-সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্য-সুখে ও আনন্দ-শান্তিতে ভরে ওঠে, এই ছিল তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মূলমন্ত্র···মানব-মনে শাশ্বত-সত্যের এই মহান্ আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই তিনি আজীবন লেখনী-চালনা করে গেছেন। টলষ্টয়ের নিপুণ-লেখনী-প্রসূত এবারের এই অপরূপ-কাহিনীটিতে তোমরা তাঁর মানব-দরদী মনের সুস্পষ্ট-পরিচয় পাবে।]

সুবিশাল রুশ-সাম্রাজ্যে তখন 'জার্'-শাসকদের (Czar)-দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ···রাজানুগৃহীত অভিজাত-সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয় লোকজন ছাড়া দেশের সাধারণ-অধিবাসীদের দিন কাটে নিদারুণ দুরাবস্থায়···দুঃখ দৈন্য, অন্ন-বস্ত্রের অভাব তো নিত্য লেগেই রয়েছে, উপরন্তু, কারণে-অকারণে রাজ-অনুচরদের নির্ম্মম পীড়ন-অত্যাচারের আতঙ্কে-উপদ্রবে রাজ্যের প্রজাদের জীবন নিতান্তই দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে···এমনি শোচনীয় অবস্থা সারা রাশিয়া জুড়ে!

সেই আমলে রাশিয়ার ভ্লাদিমির (Vladimir) শহরে বাস করতো এক তরুণ সদাগর···তার নাম—আক্শ্যেনক্ (Akshenok)। বয়সে তরুণ হলেও, আক্শ্যেনকের অবস্থা মোটামুটি ভালোই···ব্যবসা-বাণিজ্য জমিয়ে তুলে সে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ধন-দৌলত-সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠেছিল। ভ্লাদিমির শহরের বুকে দু'দুটো বড় দোকান ছাড়াও, তার ছিল দিব্যি ছিমছাম্-সুন্দর ছবির মতো সাজানো একখানি বাড়ী।

আক্শ্যেনকের চেহারাটিও ছিল ভারী সুশ্রী-সুন্দর··· টক্‌টকে সোনার মতো রঙ···মাথায় এক রাশ কোঁকড়ানো চুল···পরিপাটি-নিখুঁত দেহের গড়ন—একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না—এমন অপূর্ব্ব-মনোহর তার রূপ! রূপের মতোই, তরুণ আক্শ্যেনকের স্বভাবটিও ছিল ভারী মধুর···সে ছিল যেমন সৌখিন, তেমনি আমুদে-মজলিশি মানুষ···গান-বাজনার দিকেও তার ছিল রীতিমত ঝোঁক! নাচ-গান আর 'বালালাইকা' (Balalaika—গীটার-জাতীয় রুশদেশের একধরণের বাদ্যযন্ত্র) বাজানোতে আক্শ্যেনকের ছিল অসামান্য দক্ষতা। তবে, তখনকার আমলে অধিকাংশ সৌখীন-মানুষের যেমন দু'একটা বদ-খেয়ালীর নেশা থাকতো, আক্শ্যেনকেরও ছিল তেমনি মদ্যপানের ঝোঁক। বয়স যখন কাঁচা ছিল, আক্শ্যেনক্ তখন প্রায়ই মদের নেশায় বেসামাল্ হয়ে অল্প-বিস্তর হৈ-হল্লা কাণ্ড বাধিয়ে বসতো···কিন্তু বিয়ে করবারপর থেকে কেউ আর তাকে কখনো এমন মাতাল হতে দেখেনি··· মাঝে-মাঝে বিশেষ কোনো পাল-পার্ব্বণের উৎসব উপলক্ষ্যে সে অবশ্য এক-আধ চুমুক মদ খেয়ে একটু আধটু স্ফুর্ত্তি করতো···এই ছিল একমাত্র বদখেয়ালীপণা!

প্রতি বছর যেমন রেওয়াজ, সেবার গ্রীষ্মকালেও তেমনি ভ্লাদিমির শহর থেকে অনেক দূরে, নীজ্‌নিহিব্ (Nijnheer) শহরে বিরাট মেলার আয়োজন হয়েছিল। মোটা টাকা রোজগারের আশায় আক্শ্যেনক্ মতলব

করলে, দিনকয়েকের জন্ত বাড়ী ছেড়ে নীজ্‌নিহির শহরের মেলাতে গিয়ে তার সদাগরী-জিনিষপত্র বেচে আসবে। এই ভেবে সে মহা-উৎসাহে নানারকম সুন্দর-সুন্দর সৌখিন-জিনিষপত্র গুছিয়ে নীজ্‌নিহির শহরের মেলায় যাবার উদ্যোগ-আয়োজন করতে লাগলো।

যাত্রার দিন সকালে মস্ত এক ঘোড়ার গাড়ীতে রাশি-রাশি সদাগরী-মালপত্র বোঝাই করে, আক্‌শ্যেনক্ বাড়ীর ভেতর এলো, তার স্ত্রী আর ছেলে মেয়েদের কাছে বিদায় নেবে বলে। বিদেশে যাবার আগে ছেলে-মেয়েদের আদর করে, স্ত্রীর কাছে বিদায় নেবার সময় আক্‌শ্যেনকের বৌ কাতর-কণ্ঠে স্বামীকে মিনতি জানালো,—ওগো, আজই তুমি বাড়ী ছেড়ে কোথাও বেরিয়ো না!

বৌয়ের কাতর-অনুরোধে আক্‌শ্যেনকের কেমন কৌতূহল জাগলো···সে প্রশ্ন করলে,—হঠাৎ এ কথা বলছো?···এর মানে?···

আক্‌শ্যেনকের বৌ বললে,—কাল রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেছি···আজ পথে বেরুলেই তুমি বিপদে পড়বে···কি যেন একটা অমঙ্গল ঘটবে তোমার!···তাই বলছি···আজ না বেরিয়ে, বরং কাল যদি যাত্রা করো তো···

বৌয়ের কথা শুনে আক্‌শ্যেনক হেসে উঠলো···বললে,—বটে!···কি এমন দুঃস্বপ্ন দেখলে তুমি কাল রাত্তিরে, যে হঠাৎ ভয় পেয়ে আমায় বাড়ীতে আটকে রাখতে চাইছো?···

আক্‌শ্যেনকের বৌ বললে,—স্বপ্ন দেখলুম···তুমি যেন নিজ্‌নিহির-শহরের মেলা থেকে বাড়ী ফিরে এসেছো···বাড়ী ফিরে এসে যেই তুমি তোমার ঐ মাথার টুপিটা খুলেছো, অমনি দেখলুম, এই কদিনের মধ্যেই তোমার মাথার ঘন-কালো একরাশ সুন্দর চুল সব যেন একেবারে শণের গোছার মতোই শাদা-ধব্‌ধবে হয়ে গেছে।

স্বপ্নের কাহিনী শুনে আক্‌শ্যেনক হেসে গড়িয়ে পড়লো···ঠাট্টা করে বললে,—এ তো রীতিমত সুলক্ষণ!·· বিদেশের বাজারে বেশাতী বেচতে গিয়ে এমন দারুণ মাথা খাটিয়েছি যে বুদ্ধির গোড়ায় পাক্ ধরে মাথার কালো-চুল সব বেবাক্ শাদা হয়ে গেছে এই কদিনের মধ্যেই! কাজেই, মিথ্যে দুশ্চিন্তা করছো কেন তুমি?···

স্বামীর রসিকতা শুনেও আক্‌শ্যেনকের বৌয়ের মনের ভাব কিন্তু বদলালো না এতটুকু···দু'চোখে তার অশ্রুর ধারা···ব্যাকুল-কণ্ঠে মিনতি জানিয়ে সে বললে,—না, না···ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিও না কথাটা···কি জানি বাপু···আমার মন বলছে···আজ পথে বেরিয়ে যদি তোমার কোনো বিপদ-আপদ ঘটে···

বাধা দিয়ে অ্যাক্‌শ্যেনক্ তার স্ত্রীকে বুঝিয়ে বললে,—ছিঃ মিছে মন খারাপ করো না!···আজ যাত্রা করলে, পথে আমার কোন বিপদই ঘটবে না!·· তাছাড়া এই তো ক'টা দিন মাত্র···দেখতে দেখতেই কেটে যাবে!···ক'দিন পরেই তো আবার বাড়ী ফিরে আসছি!···দ্যাখো না···নীজ্‌নিহিরের মেলায় চড়া-দামে ঐ গাড়ী-বোঝাই বেশাতী বেচে কত টাকা···কত কি সুন্দর-সুন্দর জিনিষপত্র কিনে আনবো তোমাদের সবাইকার জন্য!···কি মজাই না হবে তখন!···লক্ষীটি···যাবার সময় এমন মিথ্যা মন খারাপ করো না!·· বিদেশে গিয়ে আমারও মনটা তোমাদের চিন্তায় কতখানি আকুল হয়ে থাকবে—ভাবো তো একবার!···নাও···চোখের জল মোছো!···আমি তাহলে এখন আসি!···

এই বলে স্ত্রীকে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে, আর ছেলে-মেয়েদের কোলে তুলে আদর করে চুমু খেয়ে আক্‌শ্যেনক বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে এসে সদাগরী-মালপত্র বোঝাই-করা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে সুদূর নীজ্‌নিহির-শহরের মেলার পথে রওনা হলো।

পথে গাড়ী ছুটিয়ে চলবার সময়, আক্‌শ্যেনকের সঙ্গে দেখা হলো নীজ্‌নিহির-শহরের মেলার যাত্রী আরেক সদাগরের। সে সদাগরটি ছিলেন আক্‌শ্যেনকের পরিচিত···তাছাড়া দুজনেই এক পথের পথিক···কাজেই পরস্পরের আলাপ জমে উঠতে বিশেষ বিলম্ব হলো না।

সুদীর্ঘ পথ গাড়ী ছুটিয়ে এসে, সন্ধ্যার সময় দুজনেই সে রাতের মতো আশ্রয় নিলেন ছোট্ট একটি গ্রামের সরাইখানায়। সারাদিন পথশ্রমের ক্লান্তিতে দুজনেই কাহিল···কাজেই চটপট খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকিয়ে আক্‌শ্যেনক ও তাঁর সহযাত্রী সে রাতের [illegible] সরাইখানার দুটি পাশাপাশি-কামরায় বিশ্রাম আর [illegible] আশায় শয্যাগ্রহণ করলো।

সরাইখানার নরম বিছানাতে শুয়েও কিন্তু রাতে আকৃষ্ণেনকের চোখে একফোঁটা ঘুম নেই…কি যেন অজানা চিন্তায় তার মাথা হঠাৎ ভারী হয়ে উঠলো! নিশুতি-রাতে বিছানা ছেড়ে সে সটান্ চলে এলো বাইরে…সরাইখানার দেউড়ীতে…দেউড়ীর একধারে ঘোড়ার গাড়ীর পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল তার গাড়োওয়ান…ঘুমন্ত-গাড়োওয়ানকে ডেকে তুলে আকৃষ্ণেনক তখনি আবার পথে পাড়ি দেবার জন্য গাড়ীতে ঘোড়া জুত্‌তে বললে। রাত দুপুরে আচমকা মনিবের এই বেয়াড়া ফরমাশ শুনে গাড়োওয়ান তো অবাক! তার মুখের ভাব দেখে আকৃষ্ণেনক বললে,—দিনের বেলা কড়া-রোদ্দুরে পথে পাড়ি দিতে কষ্ট হবে…তাই রাত থাকতেই ঠাণ্ডায়-ঠাণ্ডায় এখুনি বেরিয়ে পড়তে চাই! কাজেই মিথ্যা সময় নষ্ট করে লাভ নেই…চটপট গাড়ী ঠিক করে ফ্যালো…আমি ততক্ষণ সরাইওয়ালার হিসাবপত্র মিটিয়ে দিয়ে আসি।

এই বলেই আকৃষ্ণেনক চলে গেল সরাইওয়ালার হিসাব মেটাতে…গাড়োওয়ানও ইতিমধ্যে গাড়ী-ঘোড়া ঠিকঠাক করে নিলো। তারপর সরাইখানার ঘরে শয্যায়-ঘুমন্ত পথের বন্ধু সেই সহযাত্রীকে কোনো কিছু না বলেই, নিশুতি রাতের অন্ধকারেই ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে আকৃষ্ণেনক আবার পাড়ি জমালেন নীজ্‌নিহির-শহরের পথে!

সারারাত নিরালা-অন্ধকার পথে গাড়ী ছুটিয়ে পরের দিন সকালে আকৃষ্ণেনক এসে হাজির হলো আরেকটি মফঃস্বল-শহরের সরাইখানায়! সেখানে আশ্রয় নিয়ে, নিশ্চিন্তে আহার সেরে সারা দুপুর আরামে বিশ্রামের পর, বিকেল-বেলায় আকৃষ্ণেনক সবেমাত্র তার সঙ্গের-সাথী প্রিয় 'বালালাইকা' বাদ্যযন্ত্রটিতে সুর বাঁধতে সুরু করেছে, এমন সময় হঠাৎ সজোরে ঘণ্টার শব্দে সারা মহল্লা কাঁপিয়ে তুলে সরাইখানার দেউড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো সরকারী-পুলিশের গাড়ী! সে গাড়ী থেকে গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা হাতে নেমে এলেন সরকারী-পুলিশের এক হোমরা-চোমরা দারোগা…সঙ্গে উর্দিধারী দুই জবরদস্ত পাহারাওয়ালা! গাড়ী থেকে নেমেই সটান্ সোজা এসে হাজির হলো সরাইখানার ভিতরে…আকৃষ্ণেনকের কামরায়! দিন-দুপুরে সরাইখানায় এমন আচম্কা পুলিশের আবির্ভাবে আকৃষ্ণেনক তো অবাক… তবু [illegible] দিলো না। আকৃষ্ণেনকের সঙ্গে দেখা হতেই সরকারী-দারোগামশাই নিতান্ত কাঠখোট্টাভাবে তার নাম-ধাম-পরিচয় জানতে চাইলেন। কোনো ওজর-আপত্তি না তুলে আকৃষ্ণেনক স্পষ্টভাবেই দারোগার প্রশ্নের ঠিকঠাক জবাব দিলে…এমন কি, একত্রে বসে চা-পানের জন্যও পুলিশের লোকজনদের সাদরে আমন্ত্রণ জানালো! কিন্তু আকৃষ্ণেনকের আতিথেয়তার জবাবে দারোগামশাই সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন,—কাল রাত্তিরে কোথায় ছিলে হে বাপু? আকৃষ্ণেনক অসঙ্কোচে জবাব দিলো—পথের ধারে গ্রামের সেই ছোট্ট সরাইখানায়!

হুঙ্কার দিয়ে দারোগামশাই জিজ্ঞাসা করলেন,—সেখানে আর কেউ ছিল তোমার সঙ্গে?…

আকৃষ্ণেনক বললে,—হ্যাঁ…পথে এক সঙ্গীর দেখা পেয়েছিলুম—আমারই জানাশোনা এক সদাগর-বন্ধু…চলেছিল ঐ নীজ্‌নিহির-শহরের মেলায় বেসাতী বেচতে…আমরা দুজনেই কাল রাত্তিরে একসঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলুম গ্রামের সেই ছোট্ট সরাইখানায়…পাশাপাশি দুটি কামরায়।

আকৃষ্ণেনকের জবাব শুনে দারোগামশাই ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করলেন…তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—হুঁ! বটে!…তারপর?…আজ সকালে গ্রামের সরাইখানা ছেড়ে এখানে চলে আসার সময় সেই পথের বন্ধুটির সঙ্গে আর দেখা হয়েছিল তোমার?…

দারোগামশাইয়ের বেয়াড়া-ভাবভঙ্গী দেখে আর চ্যাটাং-চ্যাটাং কথাবার্তা শুনে আকৃষ্ণেনক রীতিমত সচকিত হয়ে উঠলো…কৌতুহলভরে জিজ্ঞাসা করলে,—তার মানে?…

ব্যঙ্গের হাসি হেসে টিপ্পনী কেটে দারোগামশাই ধমকে উঠলেন,—সেই মানেটাই তো এতক্ষণ জানতে চাইছি যাদু, তোমার কাছে!…নাও…ছলনা রেখে চটপট আসল কথাটা বলে ফ্যালো দেখি, চাঁদ! নইলে ঘুঘু দেখেছো…কিন্তু ফাঁদ ছাখোনি এখনো…মজাটা এখুনি টের পাইয়ে দিচ্ছি তোমায়! পাজী, বদমাশ্ কোথাকার!…বল্ শিগগীর…সব কথা খুলে!…নইলে…এখুনি তোকে পিছ্‌মোড়া করে বেঁধে কয়েদখানায় পুরবো!…

দারোগার ধমকধামকে আকৃষ্ণেনকের মাথার রক্ত গরম

হয়ে উঠলো ··বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে সে বললে,—এ সব কি যা তা বলছেন আপনি হঠাৎ !···চোর নই···ডাকাত নই···মানুষ খুনও করিনি···চলেছি মেলায়—নিজের কাজ-কারবারের ধান্ধায়···খামকা আমার উপর চড়াও হয়ে পড়ে এমন অকারণ গাল-মন্দ-অপমান !···

কোর্টের পকেট থেকে গ্রেপ্তারী-পরোয়ানাখানা সামনে মেলে ধরে দারোগামশাই গর্জে উঠলেন,—বটে ! ··এই ছাখো—গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা···জ্বল্‌জ্বলে কালির আঁচড়ে তোমার নাম লেখা রয়েছে !···কাল রাত্তিরে গ্রামের সরাইখানায় তোমার ঘরের পাশেই পথের সঙ্গী সেই যে সদাগরটি ছিলেন···তাঁর ছোরা বসিয়ে কে যেন তাঁকে খুন করেছে···আজ সকালে তাঁর লাশ্ পাওয়া গেছে, তবে ছোরাটির সন্ধান মেলেনি। এমন কি, খুনী আসামীরও কোনো পাত্তা নেই···খুন করেই কোথায় যে নিখোঁজ হয়েছে সে হতভাগা !···তাই আমরা বেরিয়েছি সেই খুনী-আসামীর খোঁজে···তাকে গ্রেপ্তার করবো বলে !···দেখি, তোমার জিনিষপত্র সব···খোঁজ-তল্লাস করে দেখবো—কোথাও যদি সেই নিরুদ্দেশ-খুনীর কোনো সন্ধান মেলে !···

এই বলেই পাহারাওয়ালাদের পানে তাকিয়ে দারোগা-মশাই হুকুম দিলেন,—ওরে, আর দেরী নয় !···এর বাক্স-তোরঙ্গ, মালপত্র সব আগাগোড়া তল্লাস করে ছাখ্···কোথাও যদি সেই খুনীআসামীটার কোনো কুল-কলঙ্কীর ঠিকানা খুঁজে পাস্ !··· [ক্রমশঃ

—

চিত্রগুপ্ত

ছুটির দিনে আর নিত্যকার পড়াশোনার অবসরে, নিজেদের বাড়ীর উঠানে, ছাদে, বারান্দায় কিম্বা সুপ্রশস্ত 'কম্পাউণ্ডে' (Compounds)—জমিতে কিম্বা টবে, দেশী-বিদেশী নানা রকমের সৌখিন-সুন্দর গাছপালা-উদ্ভিদ সাজিয়ে অপরূপ-ছাঁদে বাগান রচনা করার ঝোঁক তোমাদের অনেকেরই আছে। তাই আজ তোমাদের ভারী মজার এবং রীতিমত আজব-প্রথায় অভিনব-বিচিত্র এক-ধরণের বাগান রচনা করবার কলা-কৌশলের কথা বলছি। শুনলে তোমরা হয়তো অবাক হবে—এই আজব-বাগান রচনার জন্য, সচরাচর সবাই যেমন উদ্ভিদ-জাতীয় গাছপালার বীজ, চারা, গেঁড় কিম্বা 'কলমের ডাল' ব্যবহার করে, তেমন কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। এ বাগান রচনা করতে হলে, চাই—কয়েকটি আজব উপাদান···অর্থাৎ, নীচের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি ধরণের স্বচ্ছ-কাঁচের তৈরী (Transparent Glass-made) বড় কিম্বা মাঝারি আকারের কানা-উঁচু একটি 'বোয়েম্' (Jar) অথবা 'ওয়েট-সেল্ ব্যাটারীর (Wet-Cell Battery) জন্য চৌবাচ্চার-মতো-গড়নের পাত্র (Container), খানিকটা বালির গুঁড়ো (Sand), 'কপার্-সাল্‌ফেটের' (Copper Sulphate) কয়েকটি দানা, সিরাপের মতো ঘন-থকথকে চেহারার এক বোতল 'সোডিয়াম সিলিকেট' (Sodium Silicate), এক বোতল 'ডিষ্টিল্‌ড্ ওয়াটার' (Distilled Water), কয়েক মুঠো এ্যাল্‌-মিনিয়ামের ভাঙাচোরা-টুকরো, কয়েকটি লোহার তৈরী পেরেক কিম্বা ঐ ধরণের অন্য কোনো টুকিটাকি-জিনিষ-পত্র, আর সচরাচর ল্যাবরেটারিতে রাসায়নিক-পদার্থ (Chemicals) নিয়ে পরীক্ষা-গবেষণা করবার সময় যেমন কাঁচের-তৈরী চামচ আর 'বিকার' (Beaker) ব্যবহার করা হয়, তেমনি-ধরণের এক-একটি সরঞ্জাম। তোমাদের
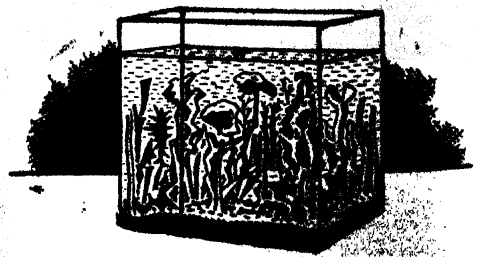
মধ্যে যারা শহরে বাস করো, তাদের পক্ষে, উপরের ছক-মতো এ সব উপকরণ জোগাড় করা [illegible] [illegible] জায়গা

ব্যাপার নয়···সামান্য চেষ্টা করলেই অনায়াসেই বাজারে যে কোন বড় দোকানে আর ডাক্তারখানায় অল্প ব্যয়ে এ সব জিনিষ কিনতে পারবে। তবে যারা মফঃস্বলে থাকো, তাদের পক্ষে অবশ্য এ জিনিষগুলি জোগাড় করা নিতান্ত সহজ কাজ হয়ে উঠবে না। তাহলে বাড়ীতে বসে হাতে কলমে পরখ করে দেখবার জন্য, তোমরা কেউ যদি কাঁচের পাত্রের ভিতরে এমনি ধরণের আজব-বাগান গড়ে তুলতে চাও তো উপরের ফর্দমতো উপকরণগুলি নিজেদের সুযোগ-সুবিধা অনুসারে সংগ্রহ করে নিও।

যাই হোক সাজ-সরঞ্জামের হদিশ তো পেলে, এবারে শোনো—এসব বিচিত্র উপকরণের সাহায্যে কাঁচের পাত্রের ভিতরে কি অভিনব রাসায়নিক-উপায়ে (Chemical Processing) তোমরা এমনি-ধরণের আজব-বাগান গড়ে তুলতে পারবে—তারই রহস্যময় কলা কৌশলের কথা।

উপরের ফর্দমতো সাজ-সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ হবার পর, প্রথমেই কানা-উঁচু কাঁচের পাত্রটির তলায় অন্ততপক্ষে ইঞ্চি দুয়েক পুরু করে বালির গুঁড়ো ভরে রাখো—সচরাচর বাড়ীতে লাল-মাছের চৌবাচ্ছা সাজানোর ব্যাপারে যে রীতি অনুসরণ করা হয়—অবিকল সেই ধরণে। এ বিষয়ে আরো সুস্পষ্ট হদিশ পাবে তোমরা উপরের ছবিটি দেখলেই। এমনিভাবে কাঁচের পাত্রের তলায় পরিপাটি-ভাবে বালির স্তর রচনা করে নেবার পর, সেই বালির উপরে 'কপার সাল্‌ফেটের' (Coppers ulphate) কয়েকটি দানা, লোহার পেরেক ও টুকিটাকি জিনিষপত্র আর এ্যালুমিনি-য়ামের ভাঙাচোরা টুকরোগুলিকে ইতস্তত ছড়িয়ে রেখে, সেগুলিকে, আগাগোড়া বালির গুঁড়োর সঙ্গে বেশ ভালো করে মিশিয়ে নাও। এ কাজ সারা হলে, কাঁচের তৈরী 'বিকার' (Beaker) পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে খানিকটা ঐ চিনির রসের মতো ঘন 'সোডিয়াম্ সিলিকেট' (Sodium Silicate) সিরাপ ঢেলে, সেই সিরাপের তিনগুণ বেশী মাপে 'ডিষ্টিল্‌ড্-ওয়াটার' মেশাও। এবারে 'বিকারে' ঢালা ঐ 'সোডিয়াম্ সিলিকেট' আর 'ডিষ্টিল্‌ড্-ওয়াটার' মেশানো সিরাপটিকে কাঁচের চামচের সাহায্যে কিছুক্ষণ বেশ ভালো করে নেড়েচেড়ে নাও। তবে এ কাজের সময়, নজর রেখো—চামচ দিয়ে নাড়াচাড়ার ফলে, তরল পদার্থ দুটি যেন শেষ পর্যন্ত মিলে-মিশে আগাগোড়া একাকার হয়ে যায় এবং 'মিশ্রণটি' (Mixture) যেন পরিমাণে এমন বেশী হয় যে, সেটিকে কাঁচের 'বোয়েমে' ঢাললে পাত্রের প্রায় ¾ অংশ ভর্ত্তি করে তোলে···অর্থাৎ, বাড়ীতে লাল-মাছ রাখবার চৌবাচ্ছায় জল ভরবার সময় যেমন রীতি অনুসরণ করো, ঠিক তেমনিভাবেই এ কাজটি সারতে হবে।

এবারে বালির স্তর আর লোহা-এ্যালুমিনিয়ামের টুকি-টাকি জিনিষ সাজিয়ে-রাখা বড় কাঁচের 'বোয়েমের ভিতরে, 'বিকারে' সদ্য-তৈরী 'সোডিয়াম্-সিলিকেট' আর 'ডিষ্টিল্‌ড্-ওয়াটার' মেশানো ঐ তরল-পদার্থটিকে খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ঢালতে সুরু করো। তবে হুঁশিয়ার···ঢালবার সময় খেয়াল রেখো—তরল-পদার্থের তোড়ের ধাক্কায় বালির স্তরের উপর সাজানো লোহা আর এ্যালু-মিনিয়ামের টুকরোগুলি যেন নড়েচড়ে কাঁচের পাত্রের আশেপাশে সরে গিয়ে এলোমেলো-ভাবে ছড়িয়ে না যায়।

এমনিভাবে কাঁচের 'বোয়েমের' ভিতরে বালির স্তরে সাজানো লোহা আর এ্যালুমিনিয়ামের টুকিটাকি টুকরো-গুলির উপরে 'সোডিয়াম্-সিলিকেট' আর 'ডিষ্টিল্‌ড্-ওয়াটার' মেশানো তরল-পদার্থটুকু নিঃশেষে ঢেলে দেবার পর, কাঁচের ঐ পদার্থটিকে কয়েকদিন সযত্নে সরিয়ে রেখে দাও ঘরের এক কোণে···তবে হুঁশিয়ার···দেখো, কেউ যেন এ ক'দিন কোনোমতেই এতটুকু নাড়াচাড়া না করে ঐ কাঁচের পাত্রটিকে। তাহলেই সব পণ্ড···এত পরিশ্রমের ফলে, রহস্যময় রাসায়নিক-প্রক্রিয়ায় (Chemical-process) যে অপরূপ-বিচিত্র আজব-বাগান গড়ে তুলতে চাও, সে কাজও সফল হয়ে উঠবে না পুরোপুরি! কাজেই এদিকে নজর রাখতে ভুলো না যেন!

কয়েকদিন পরে, ঘরের কোণে সযত্নে রেখে-দেওয়া এই কাঁচের পাত্রের সামনে এসে দাঁড়ালেই অবাক-বিস্ময়ে তোমরা দেখবে—বিজ্ঞানের যাদু বলে আর রহস্যময় রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার ফলে, কাঁচের পাত্রে তরল পদার্থের ভিতরে রাখা লোহা আর এ্যালুমিনিয়ামের ভাঙাচোরা-টুকরোগুলি বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে···তাদের জায়গায় সদর্পে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে আজব-বাগানের আজব-ছাঁদের অদ্ভুত সব গাছপালা···যার নমুনা

দুনিয়াতে কোথাও কোনো বাগ-বাগিচা বা বনে-জঙ্গলে চোখে পড়ে না কারো কোনোদিন।

এমন আজব কাণ্ড কেন ঘটে, জানো ?···সম্ভব হয়—বিজ্ঞানের বিচিত্র নিয়মে···রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার ফলে, লোহা আর এ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থের অভিনব রূপান্তর ঘটে বলেই। এই হলো—বৈজ্ঞানিক-প্রথায় রাসায়নিক-প্রক্রিয়ায় আজব-বাগান সৃষ্টি করবার আসল রহস্য।

যাই হোক, রহস্যের সন্ধান তো পেলে, এবার তোমরা ছুটির অবসরে বাড়ীতে বসে নিজের হাতে পরখ করে ছাখো—বিজ্ঞানের এই বিচিত্র-মজার খেলাটি !

মনোহর মৈত্র

১। অঙ্কের হেঁয়ালি ঃ

বলতে পারো—কোন সংখ্যাকে (যার অঙ্কের সংখ্যা) ১০ দিয়ে ভাগ করলে বাকী থাকবে ৯ ; ৯ দিয়ে ভাগ করলে বাকী থাকবে ৮ ; ৮ দিয়ে ভাগ করলে বাকী থাকবে ৭; ৭ দিয়ে ভাগ করলে বাকী থাকবে ৬ ; ৬ দিয়ে ভাগ করলে বাকী থাকবে ৫ ; ৫ দিয়ে ভাগ করলে বাকী থাকবে ৪ ; ৪ দিয়ে ভাগ করলে বাকী থাকবে ৩ ; ৩ দিয়ে ভাগ করলে বাকী থাকবে ২ ; আর ২ দিয়ে ভাগ করলে বাকী থাকবে ১ ?

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি' ঃ

২। দু' অক্ষরের এমন একটি জিনিষের নাম করো, যা জলে থাকে, জলেই জন্মায়। তার প্রথম অক্ষরে বোঝায়—মানুষের দেহের বিশেষ একটি অংশ ···এবং শেষ অক্ষর কখনও 'হাঁ' বলে না।

রচনা : শ্যামলী চৌধুরী (ফুটিগোদা)

৩। তিন অক্ষরে নাম তার,
ফলের নামে যায়,
প্রথম বর্ণে হয় পানীয়—
সবে আনন্দে খায়,
শেষাক্ষর ত্যজিলে তাহা,
প্রধান খাদ্য হয়,
শেষ দুই নিলে পরে,
বনের মধ্যে রয়।

রচনা : দিলীপকুমার দত্ত (বাঁশবেড়িয়া)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ

১। ১নং ছবিতে গাছের পিছনে সূর্য্যালোক দেখা গেলেও, সামনের জমিতে গাছের কোনো ছায়া পড়েনি। ২নং ছবিতে কাঁকড়ার দশটি দাড়া আঁকা হয়নি। ৩নং ছবিতে ইলেকট্রিক-বাল্বের ভিতরে কোনো 'ফিলামেন্ট' বা 'তার' আঁকা নেই। ৪নং ছবিতে পিস্তলের 'ট্রিগার' বা ছোড়বার-হাতলটি নেই।

২। ফুটবল

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

কুলু মিত্র (কলিকাতা), কবি ও লাড্ডু হালদার (কোরবা), পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), দেবাশীষ মৈত্র (কলিকাতা), দিলীপকুমার দত্ত (বাঁশবেড়িয়া), কৃষ্ণা, গীতা ও চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), প্রণীতা ও যশোজিত মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই), পুতুল, মুন্না, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), সত্যেন, সঞ্জয়, মুরারী ও সুনীল (ভিলাই),

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

অজিত চট্টোপাধ্যায় (রঘুনাথপুর), [illegible] ও কেতকী সর্বাধিকারী ([illegible]), [illegible] (কলিকাতা)।

জলযানের কাহিনী

দেবশর্মা চিত্রিত

পাশ্চাত্যবাসীদের মতো ভারতের অধিবাসীরাও সুপ্রাচীনকাল থেকেই নৌ-বিদ্যা আর বিবিধ ধরণের জলযান নির্ম্মাণে রীতিমত পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। ইতিহাসেও প্রচুর প্রমাণ মেলে যে অতি প্রাচীন যুগের ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্রাট-শাসকদের রাজত্বকালে এদেশের বিচিত্র-ধরণের বাণিজ্য-পোত দুরন্ত-সাগরের বুকে পাড়ি জমিয়ে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের বহু সুদূর রাজ্যে যাতায়াত করতো নিত্য-নিয়মিতভাবে। মোগল-আমলে ভারতে জলযান-নির্ম্মাণ রীতিমত উন্নতিলাভ করেছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে মোগলেরা যে সব জলযান তৈরী করতেন, সেগুলি ছিল পাল-তোলা, কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো.... যেমন সুদৃঢ়-মজবুত, তেমনি কার্য্য-উপযোগী, ছোট-বড় নানা ছাঁদের। ছবিতে যে বিরাট জলযানটি দেখছো, সেটি হলো — মোগল-আমলের এক-ধরণের রণতরী... এ সব তরী নির্ম্মিত হতো সেকালে বাঙলার সপ্তগ্রাম বন্দরে

ফুলটন সাহেবের আবিষ্কৃত 'বাষ্প-চালিত জাহাজ' বা 'STEAM-SHIP' প্রচলিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রতীচ্য-দেশের নানা অঞ্চলে উন্নত-ধরণের এই দ্রুতগামী জলযানের ব্যবহার সুপ্রসারিত হলো... শুধু সাগর-পারাপারেই নয়, দুরন্ত নদীপথে যাত্রী ও মালপত্র পরিবহনের সুবিধার্থে ক্রমশঃ সুব্যবস্থা হলো নানা ধরণের ছোট-বড় 'বাষ্পীয়-তরী' অর্থাৎ, 'STEAMER' চলাচলের -এর [illegible] হয় এমন [illegible]... [illegible] পথে, বিভিন্ন দূরত্ব যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্য করাও রীতিমত সহজ-সরল আর অনায়াসসাধ্য হয়ে উঠলো অচিরেই। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের প্রথম মাঝামাঝি আমল থেকেই আমেরিকা ও ইউরোপের বড়-বড় নদীপথে নিয়মিত চলাচল সুরু হলো এমনি ধরণের বিরাটাকার 'বাষ্প-চালিত খেয়া-তরী' বা 'FERRY STEAMER'। এ সব জলযান চালানোর ব্যবস্থা ছিল — বাষ্পীয়-শক্তির (STEAM-DRIVEN PADDLE) সাহায্যে [illegible] ঘুরিয়ে[illegible]

১৮০৭ সালে সাগর-জলে পাড়ি জমাতে সুরু করলো ফুলটনের (FULTON) তৈরী বিচিত্র ছাঁদের এই 'বাষ্পীয় জাহাজ' — অর্থাৎ, ইংরাজী ভাষায় যাকে বলা হয় 'STEAM-SHIP'। আধুনিক যুগে যেমন নানা ধরণের বিরাট-আকারের জাহাজ দেখতে পাওয়া যায়, সেকালে-রচিত ফুলটন সাহেবের এই অভিনব জলযান কিন্তু তেমনটি ছিল না। তবে [illegible] দিক দিয়ে [illegible] এই '[illegible]' একটি বিস্ময় [illegible] করেছিল। তাছাড়া উন্নত-[illegible]

শ্রমিক-বিজ্ঞান

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২

[ব্যস্ততা ও ক্ষিপ্রতা, স্বভাব-ক্লান্তি, কৃত্রিম-ক্লান্তি, কর্ম্মতাল—স্বভাব ও আহৃত, কর্ম্মকাল—নির্দ্দিষ্ট ও প্রকৃত, মন্থর ও দ্রুতগতি, কর্ম্ম-বিরাম—স্বল্পস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী, বিশ্রাম-ক্ষণ বা রেষ্টপস্ নির্বিরাম শ্রমকাল বা ওয়ার্ক স্পেল, বিশ্রাম—অনুমোদিত ও অ-অনুমোদিত, উৎপাদক ও অনুৎপাদক শ্রম, উৎপাদন—নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট]

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে ব্যস্ততা ও ক্ষিপ্রতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এক্ষণে উহাদের বিশদ ব্যাখ্যায় প্রয়োজন। ব্যস্ততা ও ক্ষিপ্রতা এক বস্তু নয়। ব্যস্ত বা শশব্যস্ত হয়ে শ্রমে নিযুক্ত হলে উৎপাদনের হ্রাস ঘটে। এখানে শশব্যস্ত অর্থে ভীতিমিশ্রিত ব্যস্ততা বুঝায়। অযথা তাড়াতাড়ি কায করলে ফল কখনও ভালো হয় নি। অতিব্যস্ততা ভ্রম এনে কার্য্যপণ্ড করেছে। এই সব ভুল শুধরে নেওয়ার জন্য বহু পণ্ডশ্রম হয়েছে। এইজন্য আশানুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী নির্ম্মিত হয় নি। এমন কি নির্ম্মীয়মান দ্রব্যসামগ্রীর উৎকর্ষতা কমে গিয়েছে। এই অতিব্যস্ততার মধ্যে কার্য্য করায় শ্রমিকদের মধ্যে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য এনে আখেরে তাদের অকেযো করে তুলেছে। প্রায়শঃক্ষেত্রে ব্যস্তবাগীশ তদারকী-কর্ম্মচারীদের অকারণ ব্যস্ততা শ্রমিকদেরও অযথা ব্যস্ত করে তুলে তাদের কর্ম্মতালে মুহুর্মুহু ছেদ ঘটিয়ে থাকে। এই সব ব্যস্ত-প্রাণ তদারকী কর্ম্মীদের অনেকে নিজেরা হাতে-কলমে কায করেন নি। বরং বহুক্ষেত্রে এঁরা অশ্রমিককুলের মানুষ এবং ম্যানেজার বা মালিকদের ব্যক্তিগত অনুগ্রাহী ব্যক্তি। এরা শুধু উৎপাদনের হার দেখে শ্রমিকদের কর্ম্মশক্তি বিচার করে থাকেন। এঁদের অনেকেরই নিজেদের যন্ত্রপাতি ও উহাদের ব্যবহার-চাতুর্য্য সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান নেই। এর ফলে এই সকল তদারকী কর্মী অকারণে ব্যস্ততা এনে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষিপ্রতা নষ্ট করে উৎপাদনে হ্রাস ঘটিয়েছেন। এই ক্ষিপ্রতা-উদ্যোগও কুটীর-শিল্পের অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু।

ব্যস্ততা সম্বন্ধে বলা হলো, এবার ক্ষিপ্রতা সম্বন্ধে বলবো। এই প্রয়োজনীয় ক্ষিপ্রতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র আছে। শ্রমের কর্ম্ম-তালের সঙ্গে ইহার অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ। এই কর্ম্মতাল [Rythm] কেহ কেহ অভ্যাস দ্বারা আহৃত করে [Acquired]. আবার কারও মধ্যে স্বভাবগত ভাবে এসে গিয়েছে। এইজন্য কর্ম্মতালকে দুইটী ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা, (১) আহৃত কর্ম্মতাল এবং (২) স্বভাব কর্ম্মতাল। প্রায়ই দেখা গিয়েছে এক এক দল মানুষ আদিষ্ট বা বাধ্য না হয়েও স্বতস্ফূর্ত্তভাবে অনাবিলভাবে ভাবসাম্য রেখে একটি বিশেষ কায়দায় লিখতে, বক্তৃতা দিতে ও ভ্রমণ করতে পারে। এই বিষয় গবেষণা করে আমিও দেখেছি যে, এক এক জন্য ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে এক এক ধরণের স্বভাবগত কর্ম্ম-ক্ষিপ্রতার অধিকারী বা অধিকারিণী। এই সকল মানুষের মধ্যে পরিদৃষ্ট স্বভাবক্ষিপ্রতার তারতম্য ও গুণানুযায়ী এদের এক একটি দলে বিভক্ত করা যেতে পারে। এই-ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এদের একটী দল দ্রুতগতি সম্পন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষে উপযোগী এবং এদের অপর একটী দল কেবলমাত্র ধীরগতিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণের উপযোগী। আরও দেখা গিয়েছে যে এক ব্যক্তি একটি বিশেষ যন্ত্র পরিচালনে দক্ষতা দেখালেও অন্য অপর এক ধরণের যন্ত্র পরিচালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এখানে পরীক্ষা করে দেখা দরকার যে শ্রমিক-বিশেষের গতিপ্রবণতার সহিত যন্ত্রবিশেষের গতির সহিত কোনও সামঞ্জস্য বা সমতল আছে কিনা। শ্রমিক নিয়োগকালে এইরূপ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শ্রমিকদের

দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তিজনিত ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষা করবে। এইভাবে পূর্ব্বাহ্নে পরীক্ষিত হলে উহাদের কর্ম-অবলম্বন জনিত দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের হ্রাস ঘটে না। এইরূপ কোনও এক স্থিরসিদ্ধান্তে আসতে হলে গবেষকদের উচিত হবে শ্রমিকদের গতি সম্পর্কীয় [Movement] গবেষণায় ব্যাপৃত থাকা। বহুক্ষেত্রে তড়িৎগতি কর্মকালে শ্রমিকদের সৃষ্ট গতির হার চর্মচক্ষে ধরা পড়ে না। এই ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারের জন্যে সিনেমা-ক্যামেরা ব্যবহার করা উচিত হবে। এইক্ষেত্রে শ্রমিকগণ তাদের হাত পা দেহের কোন অংশ স্বল্পাধিক নিযুক্ত করছে তা বুঝা যায়। এই সিনেমা পটে পর্দ্দার গাত্রে প্রস্ফুটিত করে জানা যাবে—কি কারণে কোন শ্রমিক অধিক সম্পদ উৎপাদনে সমর্থ হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য যে প্রতিটী শ্রমিকের দেহের ও মনের উৎকর্ষতা একরূপ হয় না। এই জন্য শ্রমিকবিশেষের মানসিক ও দৈহিক উৎকর্ষতার বিরুদ্ধে তাকে নিয়োগ করলে তাদের মধ্যে মুহূর্মুহূ শ্রম-বিরাম আসতে বাধ্য। সাধারণ মানুষের কসরৎবাজী [gymnastic trick] সেনাবাহিনীতে দৃষ্ট কসরৎ [ফৌজী কসরৎ] বহির্দৃষ্টিতে একতালভুক্ত হলেও বৈজ্ঞানিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করলে দেখা যাবে যে উহারা কদাচ এক মন প্রাণ বা তালের অধিকারী হয়েছে। শ্রমিকদের তদস্বরূপ একীভূত করার নির্মম বলপ্রয়োগে প্রচেষ্টা বাঞ্ছনীয়ও নয়, সম্ভবও নয়। অতীতে বেত্রাঘাতের এবং বোনাস প্রদানের প্রলোভন দ্বারাও ইহা সম্ভব হয় নি। এই জন্য আমি শ্রমিকদের দৈহিক ও মানসিক গঠন অনুযায়ী নিয়োগার্থে তাদের বিভক্ত করার পক্ষপাতী।

শ্রমিকদের স্বকীয় স্বভাবের প্রতিকূল কোনও কর্ম্মে তাদের কিছুটা দূর তাড়িয়ে নিতে পারলেও তাদের ঐ দিকে বেশী দূর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। জন্তু জীবের ন্যায় মনুষ্যকুলেরও কৃত্রিম কর্ম্মতৎপরতা একটী বিশেষ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকার পক্ষপাতী। এই গণ্ডির ওপারে তাদের কর্ম্মশক্তি প্রয়োগে বাধ্য করলে তাদের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

উপরোক্ত কারণে শ্রমিকদের স্বকীয় পছন্দাপছন্দ এবং তাদের কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধে প্রথমে অবহিত হওয়া প্রয়োজন আছে। তাদের স্বভাবগত কর্ম-তালের হার অনুযায়ী তাদের কর্ম্মবিশেষে নিয়োগ করা উচিত। উপরন্তু আমাদের দেখতে হবে যে তাদের স্বাভাবিক কর্ম্মতাল অব্যবস্থার বা ক্ষুদ্র যন্ত্রের স্বল্পতার জন্য বারে বারে ব্যাহত না হয়। শ্রমিকদের মধ্যে কর্ম্মক্লান্তি দুই প্রকারে এসে থাকে। পরিশ্রমজনিত স্বাভাবিক স্বাস্থ্যপ্রদ ক্লান্তির ন্যায় অস্বাভাবিক ক্লান্তিরও অস্তিত্ব আছে। এই শেষোক্ত ক্লান্তি অসুবিধা, ক্রোধ ও বিরক্তি হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই উভয়বিধ ক্লান্তি শ্রমিকদের কর্ম্মতাল ও তৎজনিত ক্ষিপ্রতা বিনষ্ট করে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের বিঘ্ন ঘটিয়ে থাকে। এই শিল্পকর্ম্মে ক্ষিপ্রতা অব্যাহত রাখার জন্যে কয়টী বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। গতিশীলতা একজন হতে অপরজনে অনাবিলভাবে প্রবাহিত হওয়া উচিৎ। যে সকল দুরূহ কার্য্যে একাধারে সুপ্রযুক্ত গতি ও বিচার শক্তির প্রয়োজন, সেই সকল কার্য্যে প্রথমে মন্থরগতিতে কার্য্যে সুরু করে পরে দ্রুতগতি আনলে সুফল ফলবে। 'শ্লো ও স্টেডি' প্রবাদটী আমরা মুখে প্রচার করলেও কার্য্যে তা কম ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেছি। কিন্তু আখেরে ইহা আমাদিগকে স্বচ্ছন্দগতি-সম্পন্ন করে তুলে আমাদের সময়ের ও কর্ম্মশক্তির অপচয় নিরোধ করে থাকে।

কর্ম্মতাল যে কর্ম্মশক্তির প্রধানতম উৎস তা পরীক্ষালব্ধ রেখাঙ্কন হতে বুঝা যায়। এই পরীক্ষা বহু ফ্যাক্টরীতে উৎপন্ন দ্রব্যের সমীক্ষা দ্বারা সমাধা হয়েছে।
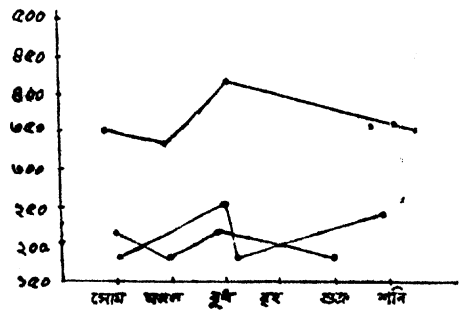
এই সব তালিকাতে পরিদৃষ্ট হবে যে একজন ওস্তাদ বা দক্ষ কারিগরের নির্ম্মিত দ্রব্যাদির সংখ্যা সারা সপ্তাহ সমান ভাবে ও তালে বর্দ্ধিত হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষানবীশগণ মাত্র

একদিন অত্যাধিক দ্রব্য উৎপাদন করতে পারলেও বাকি দিনগুলিতে তার উৎপাদনের হার ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্তি হয়েছে। কর্ম্মতালের অভাবের জন্য এদের কর্ম্মক্ষিপ্রতা সারা সপ্তাহ একভাবে থাকে। অনুসন্ধান দ্বারা আরও জানা যায় যে কর্ম্মতালের অভাবে এদের মধ্যে ধীরে অবসাদ [ক্লান্তি] এসে গিয়েছিল। প্রতিদিন সমান-ভাবে সমধিক দ্রব্যাদি উৎপন্ন না হওয়ার ইহাই ছিল অন্যতম কারণ। অবসাদ বা ক্লান্তির সহিত যে কর্ম্মতাল অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত তা এই পরীক্ষা প্রমাণ করে। অন্য-দিকে এই কর্ম্মতালের সঙ্গে শিল্প কর্ম্মের ক্ষিপ্রতার অবি-চ্ছেদ্য সম্বন্ধ থেকে গিয়েছে।

বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিকরা একটি মাত্র কর্ম্মে নিজেদের নিয়োগ করে। কিন্তু এইখানে সম্ভবমত দুই হস্ত নিয়োগ করলে কর্ম্মক্লান্তি কম আসে, সুবিধা মাত্র দুইটি হস্ত প্রয়োগ করলে কর্ম্মতাল এবং কর্ম্মশক্তি বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়। সাধারণতঃ শ্রমিকরা ভারি দ্রব্য উত্তোলনের সময় দুইটি হস্ত নিয়োগ করে থাকেন। কিন্তু অন্য বিষয়েও এদের প্রয়োজন না থাকলেও দুইটি হাত একত্রে বা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা উচিৎ হবে। এতে অযথা দেহের একদিকে চাপ না পড়ায় দেহের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এর ফলে কর্ম্মক্লান্তি শ্রমিকদের [Fatigue] ভারাক্রান্ত করেনি।

এই কর্ম্মক্লান্তি বর্দ্ধনের সঙ্গে কর্ম্মতৎপরতা কমে গিয়ে থাকে। বলা বাহুল্য যে অধিক পরিশ্রমের ইহা একটি স্বাভাবিক পরিণতি। এই জন্যে কর্ম্মে ক্ষিপ্রতা অব্যাহত রাখার জন্যে বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি যে মধ্যে মধ্যে কর্ম্মবিরাম [Rest Pause] দ্বারা এই অবশ্যম্ভাবী আপদ হতে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। কিন্তু সাধারণ কর্ম্মক্লান্তির সহিত শ্রমীণ কর্ম্মক্লান্তির [Indus-trial fatigne] প্রভেদ আছে। প্রথমে এই শ্রমীণক্লান্তি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। শ্রমীণ-অবসাদ যথাক্রমে শ্রমিকদের পেশীসমূহে স্নায়ুতে এবং মনে বিপর্য্যয় এনেছে। এর কারণ অধিক পরিশ্রম মানুষের পেশী সমূহে ক্ষতিকর ল্যাকটিক এসিড সৃষ্টি করে থাকে। শ্রমিকদের পেশীসমূহে অত্যধিক ল্যাকটিক্ এসিড জন্মালে উহাদের ঐ পেশী তাহা অধিকক্ষণ ধারণ করতে অক্ষম হয়। এই অবস্থায় অধিক শ্রমজনিত অত্যধিক ল্যাক্টীক্ এসিড পেশী-সমূহে দ্রুত গ্লিসেকোজেন বা অম্লজানে [oxidised] পরিণত করবার ক্ষমতা হারালে সমস্যা আরও কঠিন। এমতাবস্থায় এই পেশীর সহিত সংযুক্ত স্নায়ু-মুখ আক্রান্ত হয়ে মূল স্নায়ুদণ্ডকেও প্রপাবিত করে। এর ফলে এই উভয়বিধ কর্ম্মক্লান্তির সহিত মানসিক ক্লান্তিও যোগ দিয়ে থাকে। মানসিক ক্লান্তির কারণে মনের বিরাগ ও উচ্ছ্বাস শ্রমিকরা চেপে রাখতে পারে নি। এতদ্ব্যতীত দীর্ঘকালীন অনাবিল মনোযোগ শ্রমিকদের মধ্যে বিরক্তি ও দুর্ভাবনা এনেছে। অপর দিকে কোনও কর্ম্মবিশেষে স্বল্প-কালীন মনোযোগ শ্রমিকদের মধ্যে এক-ঘেয়েমীর [Bore-dom] সৃষ্টি করেছে। শ্রমিক কর্ম্মক্লান্তির [Fatigue] মধ্যে আমরা এই তিন প্রকারের ক্লান্তির অবস্থান দেখতে পাই। এই তিন প্রকারের কর্ম্মক্লান্তিকে যথাক্রমে বলা হয়ে থাকে, পেশীর ক্লান্তি, স্নায়ুর ক্লান্তি এবং মনের ক্লান্তি। এই ত্রিবিধ কর্ম্মক্লান্তি বা অবসাদকে একত্রে বলা হয় শ্রমিক ক্লান্তি বা ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল ফেটীগ্। এই ফেটীগ্ বা কর্ম্মক্লান্তি হতে অব্যাহতি পেতে হ'লে মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। অন্যথায় শ্রমিকরা তাদের এই ক্লান্তির বর্দ্ধনের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে মন্থরগতি হয়ে পড়ে থাকে। পরিশেষে তারা প্রতিদিনের প্রতিটি ক্ষণে মন্থরগতি থেকে যায় এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শিল্প-সামগ্রী উৎপাদনের হ্রাস ঘটেছে। মন্থরগতি কর্ম্ম [Go slow work] প্রতিটি ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত হয়নি। মালিক ও ম্যানেজারদের শ্রম-মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের ইহা পরিণতি মাত্র। অথচ রেষ্টপস্ বা শ্রম-বিরাম দ্বারা এই ফেটিগ্ বা কর্ম্ম-ক্লান্তি কমানো সম্ভব। এমন কি কর্ম্মক্ষেত্রের পরিবেশ এবং কর্ম্মপদ্ধতির উন্নতিসাধন করে এই শ্রমিক-কর্ম্মক্লান্তির অবসান ঘটানো সম্ভব।

উপরোক্ত কারণ ব্যতীত এই ফেটীগ্ বা কর্ম্মক্লান্তি সৃষ্টির অন্য কোনও কারণ আছে কিনা তা'ও দেখা দরকার। এখানে ফেটিগ ও ইন্‌হিবিসন এবং দীর্ঘ ও স্বল্প ফেটিগ-এর মধ্যে প্রভেদ কি তা'ও নির্দ্ধারণ করা উচিত। বারে বারে কোনও একটি বিষয়ে মনোযোগ দিলে কিংবা একটা কৃত্রিম মনোভাব বহুক্ষণ কার্য্যকরী রাখলেও ক্লান্তি বা অবসাদ আসে। এতদ্ব্যতীত

উত্তেজনাভীতা স্নায়ুদৌর্ব্বল্য [nervousness] বাক্ প্রয়োগ [suggestion] প্রভৃতিও কর্ম্মক্লান্তির অন্যতম কারণ বলে মনে হয়। এই কর্ম্মক্লান্তি কোনও মনোবিজ্ঞানী যন্ত্র দ্বারা পরিমাপ করা সম্ভব হয় নি। এর কারণ শ্রমিকরা সাধারণত যন্ত্রাবদ্ধ অবস্থায় তাদের যথাযথ মনোভাবের অভিব্যক্তি [Introspection] দেয় নি। এই জন্য এই ফেটিগ বিষয়ে গবেষণা করতে হলে শিল্প ক্ষেত্রে উহার কার্য্যকারণ ও ফলাফলের উপর নির্ভর করতে হবে। এই কার্য্যকারণ ও ফলাফলের পরিসংখ্যান কিভাবে সংগ্রহ করা উচিত সেই সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করা যাক্।

আমি দেখেছি যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে ও হারে কার্য্যকাল ও বিশ্রামক্ষণ বিভক্ত করা হয়ে থাকে। এই দেশের আরক্ষ-বাহিনীতে (police) সিপাহী বা কনেষ্টবলদের প্রতিদিন আট ঘণ্টা কর্ম-বিরাম দেওয়ার রীতি আছে। কোনও কোনও ফ্যাক্টরীতে দ্বারবানরা অষ্টঘণ্টা বিশ্রামের পর আটঘণ্টা পাহারা দেয়। এরপর তারা পুনরায় আটঘণ্টা বিশ্রাম পেয়ে থাকে। কোনও কোনও প্রতিষ্ঠানে চারিঘণ্টা ডিউটী দেওয়ার পর চারি ঘণ্টা বিশ্রাম দেওয়ার নিয়ম। এই ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যে পুরা আটঘণ্টা মনোনিবেশ সহকারে কঠিন ডিউটী দেওয়া সম্ভব নয়। পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে, মধ্যে আটঘণ্টা বিশ্রাম না পেলে শ্রমিকরা ব্যক্তিগত কাযকর্ম্মে মন দিতে সময় পায় না। কারণ নিয়োগকারী মালিকদের প্রতি কর্ত্তব্যের ন্যায় তাঁদের বহু পারিবারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্যেও তারা মনোনিবেশ করতে বাধ্য। অন্যথায় তাদের মন অযথা ভারাক্রান্ত হয়ে মানসিক ক্লান্তি বা অবসাদের সৃষ্টি করবে। শিল্পক্ষেত্রগুলিতে শ্রমিকগণ প্রতিদিন আটঘণ্টার বেশী পরিশ্রম সাধারণতঃ করে না। উপরন্তু প্রতি সপ্তাহে তাঁরা পুরা একটি দিন বিশ্রাম পেয়ে থাকেন। উপরন্তু সওদাগরী অফিসসমূহের কেরাণীরা প্রতিমাসে শনিবার একটা পুরা দিনের ছুটী উপভোগ করছেন। এ ছাড়া মধ্যে বহু পরবীয় ছুটীও তাদের উপভোগ করার সুবিধা আছে। এখন গবেষণার কারণে দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক কর্ম্মবিরামের ঘণ্টাসমষ্টি নির্ণয় করা উচিত হবে কিনা তাহা বিবেচ্য। এতদ্ব্যতীত শ্রমিকরা ওভার-টাইম বা অতিরিক্ত কর্ম্ম করে থাকে। এমন কি তারা শিল্পপ্রতিষ্ঠানবহির্ভূত ব্যক্তিগত কার্য্যেও শ্রম ব্যয়িত করছে। যুদ্ধের সময় শ্রমিকরা দিবারাত্র পরিশ্রম করে উৎপাদন বৃদ্ধি করে থাকে। কিন্তু শান্তির সময় তারা কর্ম্মের অবশিষ্টকাল জীবিকার জন্য শিল্পকর্ম্ম ব্যতীত গৃহকার্য্য ও আমোদপ্রমোদেও ব্যয়িত করছে। এই জন্য আমরা কেবলমাত্র বাৎসরিক গড়ে শ্রম বিরামের কার্য্যকারিতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসতে চাই। তবে এই সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক গড়ে বিশ্রাম কালেরও হিসাব রাখা উচিত হবে। এইরূপে হিসাবের গড় অনুযায়ী পরিসংখ্যান হতে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে।

সমধিক কর্ম্ম-বিশ্রামের অভাবের কুফলস্বরূপ শ্রমিকদের দ্বারা নির্ম্মিত নিকৃষ্ট বা অকেযো দ্রব্য-সামগ্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে থাকে। উপরন্তু তাদের মধ্যে দুর্ঘটনা, রোগভোগ, অনুপস্থিতির প্রাচুর্য্যে দেখা যায়। কিন্তু শ্রমিকদের সমধিক কর্ম্মবিশ্রাম দিলে ফ্যাকটরী-সমূহেএর বিপরীত ফল এনে দিয়েছে। সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে দৈনিক কায কম হলে কম দুর্ঘটনা [Accident] ঘটেছে, কিংবা একটিও দুর্ঘটনা ঘটে নি। এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে দৈহিক; সাপ্তাহিক বা মাসিক কর্ম্মবিশ্রাম-কাল প্রকৃতপক্ষে ফলপ্রসূ কিনা? পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে দৈনিককর্ম্মকাল হ্রাস ঘটালে দুর্ঘটনার সংখ্যা সেই অনুপাতে কমে গিয়েছে। উপরন্তু আরও দেখা গিয়েছে যে দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস যে দৈনিক কর্ম্মকালের হ্রাসের উপর নির্ভর করে তা ঠিক নয়। উহা একনাগাড়ে কর্ম্ম-কালের হ্রাসের উপরই সমধিক নিভর করে। • এই জন্য দীর্ঘকালীন কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে স্বল্প বিশ্রাম মাত্র শ্রমিকদের মধ্যে দুর্ঘটনা নিবারণে সক্ষম। এই দুর্ঘটনা-সংখ্যার হ্রাসের সহিত শ্রমিকদের দ্বারা নির্ম্মিত নিকৃষ্ট সামগ্রী সংখ্যাও কমে গিয়েছে। এই দিক থেকে বিচার করলে এই ব্যবস্থায় শিল্পপতিরাও বহু গুণে লাভবান হয়ে থাকেন। সাধারণতঃ স্ত্রী-কর্ম্মীরাই পুরুষ-কর্ম্মী অপেক্ষা অধিক দুর্ঘটনাতে পতিত হয়ে থাকেন। কোনও এক ফ্যাক্টারীতে বারো ঘণ্টার স্থলে দৈনিক দশ

ঘণ্টা কর্ম্মের ব্যবস্থা করলে দেখা গিয়েছে যে দুর্ঘটনার সংখ্যা অভাবনীয়ভাবে সত্তর ভাগ কমে গিয়েছে। কোনও একটী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের কারখানা প্রতিদিন পনেরো ঘণ্টা চালিয়ে দেখেছেন যে চার মাসের মধ্যে তাদের নির্ম্মিত নিকৃষ্ট ও অকেযো সামগ্রীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। অধিকন্তু তাদের সামগ্রীর উৎপাদনের হার শতকরা দশ ভাগ অভাবনীয়ভাবে কমে গিয়েছে। এই জন্যে যারা দৈনিক আট ঘণ্টার বেশী একই দল শ্রমিকদের বাড়তি শ্রমের জন্য অর্থ দান করে খাটিয়েছেন তারা আথেরে নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছেন।

দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি শ্রমিকদের কর্ম্মকালের উপর নির্ভর করে থাকে—এইরূপ বিশ্বাস সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে সমভাবে দেখা গিয়েছে। এই কর্ম্মকালকে আমরা দুইটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত করতে পারি যথা (১) নির্দ্দিষ্ট শ্রম-কাল এবং (২) প্রকৃত শ্রমকাল। মালিকদের দ্বারা নির্দ্ধারিত শ্রমকালকে নির্দ্দিষ্ট শ্রমকাল বলা হয়ে থাকে। আজকাল ফ্যাক্টরী ও মিল-সমূহে দৈনিক আট ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট শ্রমকাল নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই আটঘণ্টা শ্রমকালের প্রতিটি ক্ষণ স্বভাবতঃই ব্যয়িত হয়নি। বিলম্বে কর্ম্মে যোগ, হঠাৎ পীড়িত হওন, ইচ্ছাকৃত কর্ম্ম বিরাম বা কর্ম্ম সময় চুরি প্রভৃতির জন্যে এই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকালের বহু সময় অপচয় হয়। এই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকাল হতে এই অপচয়ের কাল বাদ দিলে যে সময় অবশিষ্ট থাকে উহাকে আমরা ব'লে থাকি প্রকৃত কর্ম্মকাল।

সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে, এই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-কাল বেড়ে গেলে প্রকৃত কর্ম্মকাল বেড়ে যাবে। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে, বরং নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকাল কমালে প্রকৃত কর্ম্মকাল [Actual work] বেড়ে গিয়ে থাকে। এই প্রকৃত এবং নির্দ্ধারিত কর্ম্মকালের আনুপাতিক হ্রাসবর্দ্ধন সম্পর্কে বহু তালিকা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এই তালিকা বিভিন্ন ফ্যাক্টরী ও মিল-সমূহ হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

[একটি প্রতিষ্ঠানে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকাল 63½ ঘণ্টা হইতে কমাইয়া 54 ঘণ্টা করিলে উহার প্রকৃত কর্ম্মকাল 56 ঘণ্টা হইতে 51 ঘণ্টাতে কমে যায়। কিন্তু অপর একটী বিদেশী ফ্যাক্টরীতে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকাল 62, 3 ঘণ্টা হইতে 56·5 ঘণ্টায় কমালে উহার প্রকৃত কর্ম্মকাল 50·5 ঘণ্টা হইতে 51-2 ঘণ্টায় বর্দ্ধিত হয়। কলিকাতার নিকটস্থ একটি ফ্যাক্টরীতে পরীক্ষা করে আমি দেখেছি যে উহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকাল যথাক্রমে 50 হতে 48 ঘণ্টায় কমালে উহাদের প্রকৃত কর্ম্মকাল 40 হইতে 48 ঘণ্টা বেড়ে গিয়েছে। আমার নিজের ফ্যাক্টরীতে দৈনিক আট ঘণ্টা হতে নির্দ্দিষ্ট ৬ ঘণ্টা কর্ম্মকাল কমালে দেখা যায় যে প্রকৃত কর্ম্মকাল ৫ ঘণ্টা হতে ৬ ঘণ্টায় বেড়ে গিয়েছে।

কলিকাতা ও উহার সহরতলীতে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহে আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি যে, সেই সকল স্থানে দুইটি সিফট একই দল দ্বারা চালানো হয়ে থাকে। এইখানে এক এক সিফটে ৬০+৬০=১২০ টাকা বেতন পাওয়াতে শ্রমিকরা এতে গররাজী হয়নি। কিন্তু এক এক দল দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে এক সিফট চালু করে দেখা গিয়েছে যে এতদ্বারা শতকরা ত্রিশ ভাগ উৎপাদন বেড়ে গিয়েছে। এই পরীক্ষা দ্বারা বুঝা যায় যে ওভার-টাইম মালিকদের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর। এতে অযথা বিদ্যুৎশক্তি অপচয় হলেও প্রয়োজনীয় উৎপাদন বৃদ্ধি না পেয়ে বরং উহার হ্রাস ঘটেছে। শ্রমিকদের অধিক পরিশ্রম-জনিত শ্রমক্লান্তি [Fatigue] ইহার অন্যতম কারণ।

শ্রমের নিষ্ফল কাল (Lost Time) শ্রম খাটার (Hours) হ্রাস বৃদ্ধির সহিত যে সংশ্লিষ্ট, এ কথা ঠিক। এমন কি উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধিও ইহা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে উৎপাদন কেবলমাত্র 'নির্দ্দিষ্ট কালের' উপর নির্ভর করে না। উহা বহুলাংশে কার্য্যের দ্রুতগতির (Rate of work) উপরও নির্ভর করে থাকে। ইহা দেখা গিয়েছে যে শ্রমকাল উচিৎ-গতির মধ্যে (Limit) রাখলে ইহার ঘণ্টাপ্রতি উৎপাদন এত বেশী বাড়ে যে, ঐ অনুপাতে দৈনিক উৎপাদনও বেড়ে গিয়েছে।

আমি আমার নিজের ফ্যাক্টরীতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে দৈনিক কম কায দিলে ঘণ্টা প্রতি কাযের গতি বহু গুণে বেড়ে যায়। এই স্বচ্ছন্দ দ্রুত-গতি দ্বারা শ্রমিকরা কম সময়েও অধিক উৎপাদন করতে সক্ষম। অধিক ঘণ্টা যাবৎ শ্রমের কুফল কর্ম্মকালের

প্রথমাংশে দেখা যায় না। প্রথম কয়েক ঘণ্টা তারা দ্রুত গতিতে কর্ম্ম সুরু করে, কিন্তু দিবসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে তাদের শ্রমের গতি ক্লান্তিজনিত কমে যায়। এই ভাবে প্রতিদিন কায করলে আখেরে দেখা যায় যে তাঁদের দেহ চব্বিশ ঘণ্টাই ক্লান্তিতে ভরপুর থাকে। এইভাবে মাসাধিককাল গত হলে প্রতিদিন সুরু হতে শেষ পর্য্যন্ত তারা মন্থরগতিতে কায করে থাকে। এই অবস্থায় সেবার কষ্ট বা শ্রমিকদের বেতন এবং বিদ্যুৎশক্তি খরচ সমান থাকে। কিন্তু ক্লান্তি-জনিত শ্রমের গতির হ্রাসের কারণে উৎপাদন কম হয়। এতে মালিকদের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকে।

এইখানে আরও বিবেচ্য বিষয় যে, শ্রম-ঘণ্টার সংখ্যা কার্য্যের টাইপ বা স্বরূপ অনুযায়ী নিদ্ধারিত হওয়া উচিৎ কি'না। এমন বহু কার্য্য আছে যাহা মূলতঃ মেশিন দ্বারা সমাধা হয়। এই ক্ষেত্রে শ্রমিকদের 'বোতাম' বা সুইচ টিপে মাত্র বসে থাকতে হয়। কোন কার্য্যে অতি শীঘ্র ক্লান্তি আসে এবং কোনও সহজ কার্য্যে ক্লান্তি একটু দেরিতে এসে থাকে। দৈনিক শ্রম ঘণ্টার নির্ণয়ে উপরোক্ত তথ্যসমূহও বিবেচনা করা উচিৎ হবে।

উপরোক্ত পরীক্ষানিরীক্ষা দ্বারা নিম্নোক্তরূপ কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে, তবে ইহা বিশেষ ক্ষেত্রে অদল বদল করাও উচিৎ হবে। এক্ষণে এই সিদ্ধান্তসমূহ পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখিত হলো, যথা: (১) দৈনিক কর্ম্ম ঘণ্টা হ্রাস হলে দুর্ঘটনা, রোগভোগ, নিকৃষ্ট ও অকেযো উৎপাদন এবং অনুপস্থিত শ্রমিকের সংখ্যা কমে যায়। (২) দৈনিক শ্রম-ঘণ্টা বারো হতে দশ কমালে শ্রমিকদের ঘণ্টা প্রতি তথা দৈনিক উৎপাদন নিশ্চিত রূপে বর্দ্ধিত হয়ে থাকে (৩) দৈনিক শ্রমঘণ্টা দশ হতে আটে নামালে আনুপাতিক ভাবে ঘণ্টাপ্রতি তথা দৈনিক উৎপাদন আরও বেড়ে যায়। অবশ্য উৎপাদন একান্তরূপে মেশিন বা যন্ত্রের গতির উপর নির্ভরশীল হলে এই সিদ্ধান্ত পুরাপুরি প্রযুক্ত না হতে পারে। (৪) দৈনিক শ্রমঘণ্টা আট ঘণ্টার নিচে নামলে ঘণ্টা প্রতি উৎপাদন বাড়লেও দৈনিক উৎপাদন তদনুযায়ী সকল সময় বেড়ে যায় নি। এই জন্য আমি মনে করি যে দৈনিক শ্রম ঘণ্টা আট ঘণ্টার নিচে নামানোর কোনও সার্থকতা নেই।

শ্রমিকদের শ্রমক্লান্তির প্রতিবেধক শ্রমবিরাম [Rest pause] সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে বলা হয়েছে। এক্ষণে এই শ্রম-বিরাম সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা যাক। একটি দিনের কর্ম্মকাল এবং উহাদের পরদিনের কর্ম্মকালের মধ্যবর্ত্তী বিশ্রাম কাল শ্রমক্লান্তি বা ফেটিগ দূরীভূত করার মত উপযুক্ত হওয়া চাই। উপরন্তু দৈনিক কর্ম্মকালের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ক্ষণেরও প্রয়োজন আছে। দৈনিক কর্ম্মকালের মধ্যবর্ত্তী বিশ্রাম [Rest pause] সম্পর্কে বহু গবেষণা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। এ জন্য বহু অফিসে ও প্রতিষ্ঠানে টিফিন টাইমের প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। আমার মতে দৈনিক কর্মকাল আট ঘণ্টা হলে চার ঘণ্টা যাবৎ নিরাবিল শ্রমক্ষণের [Work spell] পর শ্রমিকদের পুরা এক বা অর্দ্ধ ঘণ্টা বা পনেরো মিনিট বিশ্রাম দেওয়া উচিৎ হবে। অভিজ্ঞতা হতে দেখা গিয়েছে যে সুদীর্ঘ নিরাবিল শ্রমকালের মধ্যে কোনও বিশ্রাম শ্রমিকদের না দিলে তারা এমনিতেই অাদেশের অপেক্ষা না রেখে বিশ্রাম নিয়ে থাকে। এমন কি নিষ্ঠুর নিয়মা-নুবর্তিতা প্রয়োগ করেও কেহ মানুষের দৈহিক ক্লান্তি-জনিত অবসাদ প্রতিরুদ্ধ করতে পারে নি। আরও দেখা গিয়েছে যে এই যে, আইনী অ অনুমোদিত বিরামের স্থলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত বিরাম কাল উৎপাদন বৃদ্ধিতে অধিকতর সহায়ক হয়েছে। কোনও কোনও মালিক বা ম্যানেজার মনে করেন যে কলকব্জা বা মেসিন বিগড়ানো ও কাঁচা মাল আনার বিলম্ব হেতু এমনিতেই শ্রমিকরা যথেষ্ট বিরাম পেয়ে থাকে। এই জন্য তাঁরা দৈনিক শ্রম-কালের মধবর্ত্তী কালে কোনও বিরাম দেবার পক্ষপাতী নন্। কিন্তু এই বিরাম এমন সময় আসে, যে সময় তারা বিরাম চান নি বা উহার তাদের প্রয়োজনও হয় নি। বরং নিষ্প্রয়োজনে এই বিরাম এলে ইহা তাদের বহু বিরক্তির কারণ হয়েছে। শ্রমক্লান্তি বিদূরণে ঘটনাপ্রসূত বা অনিয়-ন্ত্রিত বিরামের মূল্য যৎসামান্য মাত্র। পরীক্ষান্তে দেখা গিয়েছে যে এই অনিয়ন্ত্রিত বিরামের মূল্য সুনিয়ন্ত্রিত বিরামের মূল্য অপেক্ষা এক-পঞ্চমাংশেরও কম। মন-স্তাত্বিক কারণে শ্রমিক মাত্রেই তাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিরামের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকে। এই নিয়মিত বিরাম তাকে পরবর্তী কর্ম্মকালে অধিকতর কর্ম্মোদ্যোগী করে তুলেছে।

এইবার আমি এই বিরাম কাল বা রেষ্টপস্ কতক্ষণ হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে আমি আলোচনা করবো। ইহা শ্রমগতি ও তৎজনিত উৎপাদন সংখ্যার সম্যক অবলোকনের উপর নির্ভর করে স্থির করা হয়। কিন্তু এই দুরূহ কার্য্য কিরূপে সমাধা হতে পারে বা তা করা যেতে পারে কি'না' সেই সম্বন্ধে মতভেদের যথেষ্ট কারণ আছে। রেখা বা কার্ভ টেনে তার উঠানামা বিচার করে পণ্ডিতেরা এই বিরামকাল নিরূপণের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা অবলোকন করতে পারি যে একজন চকলেট বা সিগারেট প্যাকার কর্ম্মকালে প্রথমে ঘণ্টা পিছু উহাদের কতো প্যাকেট বা টিন্-প্যাকড বা টিনবন্দী করতে পেরেছে। এইরূপে উহাদের কর্ম্মকালের প্রথমার্দ্ধে ও শেষার্দ্ধে ঘণ্টা পিছু তারা এই ভাবে কতো প্যাকেট্ তৈরী বা টিন্-ভর্ত্তি করতে পারলো তা জানা যেতে পারবে। বলা বাহুল্য যে, শ্রম-ক্লান্তি বা ফেটিগ আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা পিছু তাদের উৎপাদনে হারও কমে গিয়ে থাকে। কিন্তু সকল শিল্প-ক্ষেত্রে এই পন্থায় শ্রমের পরিমাপ করা সম্ভব হয় নি। এই বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ রজক-শিল্প [Laundry] সম্পর্কে বলা যেতে পারে। এইখানে রজক এক প্রকারের ও ধরণের বস্ত্রাদি ইস্ত্রি করে নি। এক এক প্রকার ও-ধরণের বস্ত্র ইস্ত্রি করার জন্যে কমবেশী সময় তারা ব্যয় করেছে। তবে এইখানে একই প্রকারের ও-মাপের বস্ত্র পর পর তারা ইস্ত্রি করেনি। উপরন্তু শ্রম-শিল্পে মুহুর্মুহু অনুৎপাদক শ্রমের ব্যবস্থা থাকায় এইরূপ অনুসন্ধানে আরও ব্যাঘাত উপস্থিত হয়েছে। বহু-ক্ষেত্রে অন্য কারণে মেসিনও থেকে থেকে বন্ধ থাকে। এই ক্ষেত্রে বিদ্যুৎশক্তির মিটারের ইউনিট দেখে এই মেসিন বিরামকাল সম্বন্ধে একটা ধারণা করে, মূল শ্রম-কাল হতে উহা বাদ দিলে প্রকৃত উৎপাদনকাল নির্ণয় করা যায়। আমার মতে এইভাবে উৎপাদক বা ফলপ্রসূ শ্রমের বদলে উহাদের অনুৎপাদক বা নিষ্ফল শ্রম পরিমাপ করা আরও সহজ। এই অনুৎপাদক শ্রমের দৈনিক হার পরীক্ষা করে আমরা বহু শিল্পে দৈনিক শ্রম-বিরাম কতক্ষণ হওয়া উচিত তা নির্ণয় করতে পারি। এইভাবে' আমরা দেখতে পাবো যে এই বিশেষ অনুসন্ধান ক্ষেত্রে শিল্পের প্রকার ভেদ-অনুযায়ী আমরা অনুৎপাদক কিংবা উৎপাদক শ্রমের হার অনুযায়ী খাতার পাতায় বক্ররেখা বা কার্ভ সৃষ্টি করে অঙ্ক কষে বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকদের দৈনিক বিশ্রামকাল কতক্ষণ ও কোন সময়ে হওয়া উচিৎ, তা নির্দ্ধারণ করতে পারি।

এই উৎপাদক ও অনুৎপাদক সময় নিরীক্ষণ দ্বারা সৃষ্ট এই সকল বক্র রেখা বা কার্ভ বিবিধ শ্রম বা কর্ম্ম অনুযায়ী বিভিন্নরূপের হয়ে থাকে। কঠিন ও ভারী শিল্প সম্পর্কীয় শ্রমিকদের শ্রমের কার্ভ বা রেখা হাল্কা শিল্পে নিয়োজিত কর্ম্মীর কর্ম্মের কার্ভের তুলনায় ভিন্নরূপ ধারণ করে। একই প্রকারের কর্ম্মের কার্ভ বা রেখা নূতন পরিবেশে বিভিন্নরূপধারণ করেছে। এই জন্য এই সকল কার্ভ বা রেখার নক্সার একটি অনুপাতিক হার [Mean] গ্রহণ করে কোনও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে আসা আমাদের উচিৎ হবে।

কখনও কখনও ব্যক্তিগত উৎপাদন হ্রাসজনিত ভয় বা লজ্জা শ্রমিকদের সাময়িকভাবে অধিকতর উৎপাদনে উত্তেজিত [worn up] করেছে। কিন্তু জোর করে এইভাবে পরিশ্রম করায় পরিশেষে তার উৎপাদন-শক্তি বহুল পরিমাণে কমে গিয়েছে। এই অসাফল্য তার মনে যে প্রতিক্রিয়া আনে তা আরও বেশী ক্ষতিকর। এই অবস্থায় তার শরীর মন দুইই একত্রে ভেঙে পড়তে পারে।

পরীক্ষান্তে দেখা গিয়েছে যে নিরাবিল কর্ম্মকাল [working spell] উহার দৈর্ঘ্য অনুযায়ী নির্দ্ধারিত হয় নি। মানসিক পরিশ্রমে নিবারিল কর্ম্মকাল এক ঘণ্টা স্থায়ী হলে চল্লিশ মিনিট পর দুই মিনিট বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। কিন্তু উহা দুই ঘণ্টা যাবৎ স্থায়ী হলে আশী মিনিট শ্রমের পর পাচ মিনিট বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। বলা বাহুল্য যে এই শ্রম-বিরাম ব্যতিরেকে লোভ ও ভীতির দ্বারা উত্তেজনা সৃষ্টি করে শ্রম আদায় করে যে উৎপাদন বাড়ানো হয় তাহার কার্য্যকারিতা অতীব সাময়িক ও সামান্য এবং আখেরে উহা শ্রমশিল্পের স্থায়ী ক্ষতিসাধন করেছে।

এই শ্রম বিরামের উপকারিতা সম্বন্ধে আমি নিজেও কয়েকটি পরীক্ষা করেছি। আমি সব ক্লান্তিবিশিষ্ট

শ্রমিকদের দুইটি দলে বিভক্ত করে নিই। এদের একটি দলকে বিশ্রাম না দিয়ে একদিন আট ঘণ্টা কায করাই। পরের দিন অপর দলটিকে আট ঘণ্টা শ্রমবিরাম বাদে কায করাই। এই ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে শ্রম-বিরামপ্রাপ্ত শ্রমিকরা শতকরা পঁচিশ ভাগ অধিক টেপ্ বা ফিতা উৎপাদন করতে পেরেছে। এর পর আমি এই উভয় দলকে শ্রন-বিরাম প্রদান করে দেখেছি যে গৃহ-শিল্পের উৎপাদন শক্তি আশাতীতভাবে বর্দ্ধিত হয়েছে। কিন্তু এমনও ঘটেছে যে কোন কোন দিন আশানুযায়ী উৎপাদন হয়নি। এই ক্ষেত্রে অনুসন্ধানে আমি জানি যে কয়েকজন শ্রমিক কর্মকালের পর স্ব-বাটীতে ভারী কর্ম্মে নিযুক্ত থেকেছে। তবে এইরূপ দৃষ্টান্ত একান্তরূপেই কম দেখা গিয়েছে। এই জন্য ফ্যাক্টারীসমূহে যারা কায করে তাদের অন্যত্র বাড়তি কায করতে দেওয়া উচিৎ হবে না। ভর্ত্তিকালে এই সম্পর্কে তাদের নিকট হতে একটা মুচলেখা নিতে পারলে সুফল ফলবে ব'লে আমি মনে করি।

এই বিরামক্ষণ বা রেষ্টপস্ নির্দ্ধারণ করবার জন্যে একটি প্রকৃষ্ট পন্থা বা রীতি আমরা গ্রহণ করতে পারি। শ্রমিকদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকালের মধ্যে যে সময় উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর সংখ্যা চরমে উঠে, ঠিক সেই সময়েই শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকদের বিশ্রাম-ক্ষণ প্রদানের উপযুক্ত কালরূপে আমাদের বেছে নেওয়া উচিৎ হবে। ইহা অপেক্ষা নির্ভুল ও সহজ বৈজ্ঞানিক পন্থা এখনও আমি আবিষ্কার করতে পারি নি। এ দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় ডাটা সংগ্রহের পর নক্সা কাগজে বক্র-রেখা বা কার্ভ এঁকে এই বিশ্রামকাল নির্ণয় করা বহু ব্যয়সাধ্য। এই জন্য উপরোক্ত সহজ পন্থাটি মিল ফ্যাকটারী ও কুটীর শিল্পের মালিক ও ম্যানেজারদের প্রবর্ত্তন করতে আমি অনুরোধ করেছি।

শ্রমশিল্পের এই বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষার্থে একটি বিষয়ে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন আছে। সাধারণতঃ ভালো মন্দ নির্ব্বিশেষে কোনও নূতন প্রথা সৃষ্ট করলে উহার সঙ্গে নিজেদের দেহ ও মনকে খাপ খাইয়ে নিতে কিছুটা সময় নিয়ে থাকে। এই জন্যে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম কাল বিজ্ঞানসম্মত রূপে কমালেও শ্রমিকরা কয়েকদিন বা কয়েক ঘণ্টা পরে উহার সুফল দেখাতে পেরেছে। পূর্ব্ব অভ্যাস ত্যাগ করে নূতন অভ্যাসে অভ্যস্ত হতে স্বভাবতঃই তারা স্বল্লাধিক সময় নিয়ে থাকে। ক্রমশঃ

বিবেকানন্দকে স্মরণ করে

সন্তোষকুমার অধিকারী

মৃত্যুর মতন এক কুয়াশায় আলোর সূর্য্যকে—
যদি দেখে থাকো, তবে এ'দিনের ধূম কণ্টকিত
মেঘের আড়াল ভাঙো। বল—
আমি মানুষের চোখে
দেখেছি পৃথিবী, তাই মূর্খ-দীন অস্পৃশ্য পতিত
মানুষকে জেনেছি আমার রক্ত বলে। বল—এই
মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, এ' দেশ আমার মহাদেশ
আমার ধ্যানের সত্য, এ'র চেয়ে বড় সত্য নেই ;
হৃদয়ের অন্ধকারে রূপময় সুন্দর অশেষ।

• •

অপ্রেমের ছায়ালোকে বিপথে গিয়েছে যারা চ'লে
ধর্মের অন্ধতা আর বিভেদের ক্লেদাক্ত হিংসায় ;
বল তাহাদের ডেকে—সত্য নেই দম্ভের অতলে,
পাণ্ডিত্যে, অথবা ধ্যানে, ক্ষুধার্ত্তের দীন বঞ্চনায়।
বল এ' জীবন মোর বাঁধা চির ত্যাগের শৃঙ্খলে,
অমেয় প্রেমের মন্ত্রে—যে প্রেমে জগৎ জানা যায়।

একটি কফিনের জন্যে

(পোলিশ গল্প)

—আডলফ্ দিগাসিনস্কি

অনুবাদক ঃ শ্রীঅরুণকুমার হালদার এম-এ

[ঊনবিংশ শতাব্দীতে পোল্যাণ্ডের জাতীয় জীবন যখন বিপর্যস্ত, পোলিশ সাহিত্যের তখন নবযুগ। আডলফ্ দিগাসিনস্কি এই যুগের সামাজিক বৈষম্য ও দরিদ্র জনগণের মর্মবেদনা নিপুণ তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পটির রচনাকাল ১৮৯৯, কিন্তু এর আবেদন সকল দেশে সকল কালে চিরন্তন হয়ে থাকবে।]

সেরকের কাছেই দুটি নদী দুলছে, বাগ আর নেরুই। ঘন আসমানী রঙের দুটি ফিতে যেন। বসন্তকালে জলের এই ফিতে দুটি ফুলে উঠে যতদূর চোখ যায় সব ভাসিয়ে দেয়, বিকট চীৎকারে পাক খেতে খেতে দৌড়তে থাকে।

বাগ ও নেরুই নদীর মাঝের জায়গাটায় সুন্দর সব মাঠ আর পাইন গাছের জংগল, মাঝে মাঝে চাষীদের ছাওয়া ঘর।

বসন্তের বন্যার জল তখনও সবটা সরে যায় নি, চারদিক থেকে জলের গর্জন শুনতে পাওয়া যায়। একদিন বিকেলে আমি বাগ নদীতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। ভীষণ স্রোত বইছিল, মাথার ওপরে চীৎকার করতে করতে উড়ছিল গাঙ্চিল, আর সেই বিশাল জলরাশির ওপরে এখানে-ওখানে জেলেদের ছোটো ছোটো নৌকোগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

হঠাৎ চোখে পড়ল, উঁচু পাড়ের ওপরে একজন লোক বসে আছে। খালি মাথা; গায়ে হাতা-ওলা জামা, দু' হাতে চিবুকটা ভর দিয়ে জলের দিকে চেয়ে কী ভাবছে। আকাশের পটভূমিকায় দূর থেকে তাকে প্রতিমূর্তির মতো দেখাচ্ছে। দেখে মনে হয় যে, লোকটা যেন নদীতে আত্মহত্যা করবার আগে সমস্ত জীবনটাকে ভেবে দেখছে!

দু' দুবার তার পাশ দিয়ে এলুম গেলুম; নজর রেখেছি তার ওপরে। হঠাৎ সে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল; জামাটা খুলে ফেলে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি চেঁচিয়ে উঠলুম। ফাঁকা জায়গা, শোনবার কেউ নেই; আরো জোরে চেঁচালেও জলের গর্জনে শুনতে পাওয়া যাবে না। জলের দিকে চাইতেই বুঝলুম, যার জন্যে অত ভয় হচ্ছিল, সে একজন পাকা সাঁতারু। অত তীব্র স্রোতেও যথেষ্ট সাহস নিয়ে সাঁতার কেটে চলেছে। এবার ভালো করে দেখতে পেলুম, জলে যে তক্তাটা ভাসছে, সেইটাকে নেবার জন্যেই লোকটা যাচ্ছে। একটু পরেই সে তক্তাটাকে ধরে ফেললে; তারপর সাঁতরে তীরে এসে পৌছল। আমি ভাবলুম এই সামান্য কাঠটুকুর জন্যে প্রাণ বিপন্ন করবে আর কে? চাষী নিশ্চয়ই।

লোকটা তক্তাটা নিয়ে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম, সেখানে এসে উঠল।

"তুমি বুঝি এ অঞ্চলেই থাক! চাষবাস করা হয় তো?" আমি জিগ্যেস করলুম।

"না, আমি চাষী নই," সে বললে, "জ্নাহোম্বির ভাঁটিখানায় মজুর খাটি।"

"তক্তাটা বেশ। একটু ছোটো, এই যা।"

"ভগবানের অনেক দয়া। কোনো লোককেই তিনি ফেলে দেন না।"

"কী করবে তক্তাটা দিয়ে? টেবিল, না বেঞ্চি, না তাক?"

"ও সবে আমার কী হবে?" গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে বললে, "না বাবু, এ দিয়ে কফিনের ঢাকনা তৈরী করব।"

কথাবার্তার এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনে একটা আঘাত খেলুম। খানিকক্ষণ কিছু বলতে পারলুম না। শেষকালে বললুম,—

"তোমাকে দেখে বেশ শক্ত সমর্থ লোক বলে মনে হচ্ছে। অত ভীষণ স্রোতের মধ্যেও সাঁতরে এসে দেখলুম। গায়ে জোর না থাকলে এত স্রোতে সেই সেরক পর্যন্ত ভেসে যেতে। কফিনের জন্যে কোনো ভাবনা-চিন্তা থাকা উচিত নয়।"

"না বাবু, একটুও জোর নেই গায়ে, বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছি। সাতষট্টি বছর বয়স হোল, হাড়ভাঙা খাটুনী খেটে খেটে এই হাড় ক'খানা আছে। হা ভগবান, গায়ে যদি জোরই থাকত, তবে আমার মেরিসিয়া এখনও বেঁচে থাকত।"

"কেউ মারা গেছে নাকি তোমার?"

"আমার মেয়েটি মারা গেছে।" সে কাঁপতে লাগল, যেন হিমেলী হাওয়া লেগেছে। নদীর পাড়ে আবার সে বসে পড়ল। মাথায় হাত দিয়ে তাকিয়ে রইল জলের দিকে। আবেগ-ঝরা গলায় বললে, "মেয়েটা মারা গেল, ওই একটি মাত্তর সন্তান ছিল আমার। বাছা আমার··· আমার সোনা-ধন, আমার ছোট্টো তারাটি—বাতির মতো এক ফুঁয়ে নিবে গেল, গাছ থেকে পাতাটা ছিঁড়ে গেল, মিলিয়ে গেল সুন্দর ফুলের মতো, অভাগা, বাছা আমার···"

আমি মুখ খুলতে সাহস করলুম না। সে এক মুহূর্ত থেমে আবার তার করুণ কাহিনী আরম্ভ করলে।

"এই সেণ্ট মেরীর দিনে তার ভরা উনিশ বছর হোত ···কিন্তু বাঁচল না···পাইন গাছের মতো রোগাটে মেয়ে, ভারী সুন্দর দেখতে, গোলাপের কুঁড়ির মতো···লোকে হিংসে করত আমায়···সে মারা গেল···আর আমি বুড়ো, যমের বাড়ি যাবার বয়স হয়েছে, আমি বেঁচে রইলুম। ওঃ—"

বুড়োর গাল বেয়ে জল পড়তে লাগল, ঠোঁট দুটো এমন করে কাঁপতে লাগল যেন তক্ষুণি কান্নায় ফেটে পড়বে। আমার মনে হোল যে, প্রকৃতি নিজেই তার এই নিকলুষ দুঃখের ভাগী হয়েছে, আমার সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা। তক্তাটা কাঁধে নিয়ে টলতে টলতে সে অন্য জায়গায় চলল, এত বড় শোকে সে যেন একটু নিরিবিলিতে থাকতে চায়। আমি নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলুম: ভাবলুম, তাকে সাহায্য করব।

নদীর ধারে একটা জায়গায় এসে সে যখন ভারী তক্তা-খানা নামাচ্ছিল, আমি গিয়ে একটু ধরলুম।

"ভগবান আপনার ভালো করুন।" "এই বুড়োটার হয়ে মেয়েটাই এই কাজ করত। এই করতে গিয়েই চোট লেগে সে মারা গেল। আমিই তাকে খাটিয়ে খাটিয়ে মরতে দিলুম। ভাটিখানায় পেষবার জন্যে আলুর বস্তা বইত সে। আমি তো আর অমন করে বস্তা তুলতে পারতুম না। কুড়ি বচ্ছর চাকরি করার পর ভাটিখানা থেকে তো আমায় ছাড়িয়েই দিচ্ছিল! ছাড়িয়ে আমায় দিতই, যদি না মেরীসিয়া থাকত। বাছা আমার খেটে খেটে নিজেকে মেরে ফেললে, তার কফিনের জন্যে এই তক্তাটাও বয়ে নিয়ে যাই। কাল সকালে মোরগ ডাকা ভোরে সে মারা গেল···"

আমি বললুম, "কিন্তু কফিনের জন্যে ক'খানা তক্তা তালুক থেকে আনতে পারতে, ওরা নিশ্চয়ই কিছু বলত না।" আমি চেষ্টা করছিলুম, বুড়োকে যাতে নদীর ধার থেকে সরিয়ে আনা যায়। নদী দেখে ও আত্মহত্যা করে বসবে।

সে মাথা নাড়ল। বললে,—

"আমি আজ সকালে তালুকে গিয়ে বাছার জন্যে ক'খানা তক্তা চেয়েছিলুম। দিলে না ওরা। ম্যানেজার-বাবু বললেন, 'তুমি তো বড্ড বুড়ো হয়ে পড়েছ, কাজ করতে পারো না। তক্তার দাম তুমি খেটে শোধ করতে পারবে না'। ঠিক কথাই বলেছেন। তাই দুপুরের দিকে গোলাঘরের কাছে কেউ নেই দেখে চুপিসাড়ে ঢুকে পড়লুম, ভাবলুম একটা পুরানো ঝোড়া হাতানো যাবে। কী হোল জানেন? দরোয়ান আমায় ধরে টুপি আর কোটটা কেড়ে নিলে। আর একটা তালুকে চাইতে গেলুম, ম্যানেজারবাবু কোথায় বেরিয়ে গেছে। ··তারপর ভগবান নদীর জলে এই তক্তাখানা পাঠিয়ে দিলেন। দাঁড়িয়ে আছি, হয়ত আরো একখানা পাঠিয়ে দেবেন।"

বলতে বলতে সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জলের দিকে দৌড়ল।

"আমি তোমায় ক'খানা তক্তা দেব'খন, চলে এস।" চেঁচিয়ে বললুম।

বুড়ো তখন ছোটো ছেলের মতো দৌড়োচ্ছে—জলের ওপর কয়েকখানা তক্তা দেখতে পেয়েছে সে। দরকারের সময়ে ভগবান তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এবারে কিন্তু সাঁতারুর আর কপাল জোর নেই। খরস্রোতে একটা ঘূর্ণির মধ্যে গিয়ে পড়ল সে। সেইখানেই তার জীবন আর তার দুঃখের ইতি।

কলিকাতায় চিন্তাবিদ্ সম্মিলন—

গত ১লা জুলাই সন্ধ্যা ৬টায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু কলিকাতা মহাজাতি সদনে কলিকাতা সংস্কৃতি ভবনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত চিন্তাবিদ্ সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। সম্মিলনের সম্পাদক শ্রীবিনয় সরকারের সম্পাদকীয় বিবরণ পাঠের পর শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্র নাথ চৌধুরী অভ্যর্থনাসমিতির পক্ষ হইতে সকলকে স্বাগত জানান, জাতীয় অধ্যাপক শ্রীএস, কে, মিত্র সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীবিধুভূষণ মল্লিক সকলকে ধন্যবাদ জানান। সভায় কলিকাতার বহু খ্যাতনামা মনীষী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীনেহরু ৪৫ মিনিট ধরিয়া বক্তৃতায় বলেন— শুধু ভারতের অতীত গৌরবকথার পুনরুক্তি না করিয়া বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানে সমুন্নত ও সমৃদ্ধ বর্তমান পৃথিবীর সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিবার জন্য দেশবাসীকে সর্বতোভাবে উদ্যোগী হইতে হইবে। শ্রীনেহরু ১লা ও ২রা জুলাই ২ দিন কলিকাতায় থাকিয়া বহু অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে এই চিন্তাবিদ্ সম্মিলনে তিনি কলিকাতাবাসী কোবিদদিগের সহিত মিলিত হন।

বাংলা কংগ্রেসের নূতন সভাপতি—

গত ৭ই জুলাই রবিবার সকালে কলিকাতা তথ্য-কেন্দ্রে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশকংগ্রেস কমিটীর নব-নির্বাচিত সদস্যদের প্রথম অধিবেশনে হাওড়ার খ্যাতনামা কংগ্রেস-নেতা শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীনির্মলেন্দু দে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রদেশ কংগ্রেসের বিদায়ী সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রদেশ কংগ্রেসের ৪৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৩০২ জন সদস্য সভায় যোগদান করেন। শ্রীমতী বিভা মিত্র, শ্রীবীরেন মৈত্র ও শ্রীসুহৃদ রুদ্রের নাম প্রদেশকংগ্রেসের সম্পাদক বলিয়া ঘোষণা করা হয়। শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীমতী লাবণ্য প্রভা দত্ত ও শ্রীএস, এম, ফজলর রহমন সহ-সভাপতি এবং শ্রীবিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। নিম্নলিখিত ২৫ জন প্রদেশকংগ্রেসের কার্য্যনির্বাহক সমিতির সদস্য হইয়াছেন—(১) নির্মলেন্দু দে (২) শ্রীমতী বিভা মিত্র (৩) সুহৃদ রুদ্র (৪) প্রফুল্লচন্দ্র সেন (৫) বিজয় সিং নাহার (৬) স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (৭) শান্তিগোপাল সেন (৮) দুর্গাপদ সিংহ (৯) মহারাজা বসু (১০) বীজেশ চন্দ্র সেন (১১) সত্যনারায়ণ মিশ্র (১২) বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (১৩) অমরেন্দ্রনাথ সরকার (১৪) কালীকিঙ্কর কুণ্ডু (১৫) অর্দ্ধেন্দু শেখর নস্কর (১৬) ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (১৭) খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮) এন-বি-গুরুং (১৯) বিষ্ণুচরণ ব্যানার্জ্জি (২০) অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় (২১) নারায়ণ চৌধুরী (২২) হংসধ্বজ ধাড়া (২৩) শ্রীমতী আভা মাইতি (২৪) নির্মল ঘোষ ও (২৫) বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র। নূতন কংগ্রেসসভাপতি শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ এম-এল-সির বয়স ৫৩ বৎসর—তিনি এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া হাওড়া জেলা আদালতে ওকালতি করেন। তিনি প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা ৺চারুচন্দ্র সিংহের পুত্র। পূর্বে তিনি হাওড়া জেলা-কংগ্রেসের সভাপতি ও হাওড়া মিউনিসিপলিটীর চেয়ার-ম্যান ছিলেন। তিনি ভাল বক্তা বলিয়া সুপরিচিত—গত ৩০ বৎসর কাল তিনি কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত যুক্ত আছেন। সাধারণ সম্পাদক শ্রীনির্মলেন্দু দে ১৯২৪ সালে কলিকাতা হরিতকী বাগানের সুপ্রসিদ্ধ দে বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থা হইতে তিনি রাজনীতির সহিত যুক্ত এবং গত কয়েক বৎসর প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক-রূপে কাজ করিতেছেন। তিনি কলিকাতায় বহু গঠনমূলক কার্য্যের সহিতও যুক্ত আছেন। আমরা নূতন কর্মকর্তা-দের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

এশিয়ার প্রথম আণবিক বিদ্যুৎ কারখানা

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত মোট ৯ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার (৪৫ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা) ঋণ পাইয়া বোম্বায়ের ৬৫ মাইল উত্তরে আরবসাগরের উপর তারাপুরে এসিয়ার প্রথম আণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে স্থির হইয়াছে। ৩ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী তারাপুর কেন্দ্রের জন্য মোট ব্যয় হইবে ৬১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি উহার নির্মাণ কার্য্য শেষ হইবে। ৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার ইন্ধন সরবরাহ ঐ কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে। আজ ভারতে বিদ্যুৎ শক্তি অভাবের জন্য বহু স্থানে বহুকাজ আটকাইয়া যাইতেছে। সাধারণ মানুষ তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইবার জন্যও প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি পাইতেছে না। এ সময়ে অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। তবে বহু স্থানে বহু ঋণের টাকা অপব্যয় হইতেছে বলিয়া খবর পাওয়া যায়। তারাপুরে যাহাতে তাহা না হয় প্রথম হইতে সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

বিদেশে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক—

স্বাধীনতা লাভের পর হইতে গত কয় বৎসরে প্রায় ৭ হাজার খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ভারত হইতে বিদেশে চলিয়া গিয়াছেন এবং তথায় কাজ করিতেছেন। একদিক দিয়া ইহা গৌরবের কথা যে—ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা বিদেশে যাইয়া অধিক অর্থ উপার্জন করেন ও অধিক সম্মান লাভ করেন। কিন্তু ভারতে এখনও বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন কমে নাই। সে জন্য এই সংবাদে ভারত সরকারের কর্তৃপক্ষ চিন্তান্বিত হইয়াছেন। অধিক জ্ঞানলাভের জন্য বা অন্য নানা কারণে যে সকল বৈজ্ঞানিক ভারত হইতে বিদেশে যান তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সে দেশের আরামদায়ক জীবনযাত্রা প্রণালী ও অধিক বেতনের কাজের লোভে সেখানে থাকিয়া যাইতেছেন—ফলে ভারতের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এ বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করিয়াও কোন ফল হয় না। কাজেই এ সমস্যা থাকিয়াই যাইতেছে।

দানবীর রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

কলিকাতা চোরবাগান নিবাসী দানবীর রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৪ঠা জুন ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি হুগলী জেলার তারকেশ্বরের নিকটস্থ বৈদ্যপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং স্বোপার্জিত

দানবীর রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্থের বহু টাকা গ্রামোন্নয়নের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। তারকেশ্বর থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ২০ বিঘা জমি ও ৬০ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। তিনি নিজ ব্যয়ে বাসুদেবপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ও তারকেশ্বর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানভবন নির্মাণকল্পে ৫ হাজার টাকা প্রদান করেন। বৈদ্যপুরেও তিনি নিজ ব্যয়ে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও প্রসূতি-ভবন স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পিতা সারদাপ্রসাদের নামে আর জি কর হাসপাতালে তিনি একটি শয্যা দান করেন। সারা জীবনে তাঁহার বহু দান ছিল। তিনি ভারতবর্ষ-প্রতিষ্ঠাতা ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম জামাতা। আমরা তাঁহার স্বজনবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—

সৎসঙ্গের সভাপতি ও ঋত্বিগাচার্য্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি ৬৯ বৎসর বয়সে দেওঘর সৎসঙ্গ আশ্রমে পরলোকগমন করিয়াছেন। যৌবনে পদার্থবিদ্যায় এম-এ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রসন্ন কিছুকাল আচার্য্য সি-ভি-রমনের সহকারী রূপে কাজ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি পাবনা-হিমাইতপুরে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সান্নিধ্য লাভ করিয়া সৎসঙ্গ আশ্রমে থাকিয়া সারাজীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি আশ্রমের প্রধানতম ব্যক্তি ছিলেন এবং অনুকূলচন্দ্রের সকল কার্য্যের প্রধান পরামর্শদাতা ও সহায়ক ছিলেন। কৃষ্ণপ্রসন্নের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও কর্মনৈপুণ্য সৎসঙ্গ আশ্রমকে সর্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। দেশবিভাগের পর আশ্রম দেওঘরে আনিয়া তিনি তাহাকে একটি জনহিতকর সর্বাঙ্গ-সুন্দর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। তিনি সারা-জীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া কাজ করিতেন।

কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন—

গত ২৯শে জুন বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের নবনির্বাচিত কার্য্য নির্বাহক সমিতির প্রথম সভায় নিম্নলিখিতরূপ কর্ম-কর্তা নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সহ-সভাপতি ৫জন—কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ইন্দুভূষণ রায়, মন্মথ রায় ও কুমারেশ ঘোষ। সাধারণ সম্পাদক—সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী—সম্পাদক ৩ জন—শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন ও সৌরীন্দ্রকুমার দে। কোষাধ্যক্ষ—প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত। কার্য্যকরী কমিটির সদস্য—কেশব মুখোপাধ্যায়, শম্ভুচরণ পাল, উৎপল হোমরায়, প্রভাসরঞ্জন দে, হেমন্ত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরকুমার মিত্র, সন্তোষকুমার রায়-চৌধুরী, মুরারীমোহন দে ও ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। প্রথম সভায় নিম্নলিখিত ৫ জনকে কার্য্যকরী সমিতির সদস্য রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে—উপাধ্যক্ষ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী, অক্ষয়কুমার মিত্র, সন্তোষ রায় ও নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের মনোনীত একজন। কলিকাতা—৬, ২০৩।২ বি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সম্মিলনের কার্য্যালয় অবস্থিত।

২৪পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ—

কিছুকাল পূর্বে কাঁচরাপাড়ায় ২৪পরগণা জেলা সাহিত্য সম্মিলনে একটি জেলা সংস্কৃতি পরিষদ গঠিত হইয়াছিল। গত ২৬শে জুন কলিকাতা সরকারী দপ্তর-খানায় শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর ঘরে পরিষদের এক সাধারণ সভায় কর্মকর্তা নির্বাচন হইয়া গিয়াছে—নিম্নলিখিত রূপ কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে—শিক্ষা মন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সভাপতি, অশোককৃষ্ণ দত্ত কার্যকরী সভাপতি, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহ-সভাপতি, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কোষাধ্যক্ষ, সজীবকুমার বসু সাধারণ সম্পাদক, অতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, সম্পাদক। কার্য্যকরী সদস্য হরলাল হালদার খগেন্দ্রনাথ নস্কর, গোপালচন্দ্র সাধু, বীরু সরকার, শ্রীমতী উমা গাঙ্গুলী, অশোককুমার মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রচন্দ্র রায়, বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য, অমিয়নাথ মিশ্র ও সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য। উপদেষ্টা বোর্ডের সভানেত্রী শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়। সংস্কৃতি পরিষদ জেলার ইতিহাস রচনায় অবহিত হইয়াছেন এবং সমগ্র জেলার ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া একটি জেলা মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবেন।

বারাকপুরে জওহরলাল নেহরু—

গত ২রা জুলাই মঙ্গলবার সকাল ৯টার সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বারাকপুর যাইয়া তথায় আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার, শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান ও ডাঃ বি-সি-রায় শিশুসদন কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠিত বিরাট টি·বি-ক্লিনিকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবং তথায় একটি নূতন যক্ষ্মা হাসপাতাল গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। সেদিন ঐ উৎসবে বারাকপুর মহকুমার ও কলিকাতার বহু অধিবাসী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীনেহরুর সহিত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ও মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রীবিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তথায় গিয়াছিলেন। শ্রীনেহরু তাঁহার ভাষণে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ আজীবন সমাজসেবায় নিযুক্ত কর্মী শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের কার্য্যের বার বার প্রশংসা করেন এবং তাঁহার কার্য্যে সহায়তার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান। শ্রীমতী ফুলকুমারী দাউ বারাকপুরের ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য ১২ বিঘা জমি দান করায় তাঁহার কার্য্যেরও প্রশংসা করা হয়। নিঃস্বার্থ-কর্মী শম্ভুবাবুর সারা জীবনব্যাপী সাধনার ফলে বারাকপুর মহকুমার লোক যেরূপ উপকৃত হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ দেখা যায় না। আমাদের বিশ্বাস, নূতন যক্ষ্মা হাসপাতালের জন্যও অর্থাভাব হইবে না।

ভারতে নূতন ৪টি রাজ্য—

গত ১লা জুলাই ভারতের কেন্দ্রশাসিত ৪টি অঞ্চলের শাসনভার জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসভার উপর অর্পণ করিয়া ৪টি নূতন রাজ্য গঠন করা হইয়াছে—(১) হিমাচল প্রদেশ (২) মণিপুর (৩) ত্রিপুরা ও (৪) পণ্ডিচেরী। সিমলা, ইম্ফল, আগরতলা ও পণ্ডিচেরীতে ঐ দিন অনুষ্ঠানের পর মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতে শাসনভার তুলিয়া দেওয়া হয়। শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ত্রিপুরার, শ্রীই, গুবাট পণ্ডিচেরীর, শ্রীকৈরল সিং মণিপুরের ও ডাঃ ওয়াই-এস-পারমার হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রূপে কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সর্বত্র বিধানসভা গঠন করা হইবে এবং বিধানসভার পক্ষে মন্ত্রিসভা কাজ করিবেন। এত দিন এ সকল অঞ্চল কেন্দ্র কর্তৃক শাসিত হইত। তাহার ফলে জনগণের সহিত সংযোগ কম হইত। এখন নূতন ব্যবস্থায় সকল স্থানের অধিবাসীরাই সন্তুষ্ট হইবেন।

পদ্মা কোল্ড ষ্টোরেজ-এর ভিত্তি স্থাপন—

গত ১লা জুলাই ১৯৬৩, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীআর, ঘোষ আই·এ-এস হুগলী জেলার সিঙ্গুর নামক স্থানে পদ্মা কোল্ড ষ্টোরেজ এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি বলেন, আলু উৎপাদন-

দি কোল্ড ষ্টোরেজ-এর ভিত্তি স্থাপন

কারীদের সাহায্যকল্পে কোল্ড ষ্টোরেজ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রে হুগলী জেলার স্থান সর্বপ্রধান। এখানে একর প্রতি আলুর উৎপাদন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী। সিঙ্গুরেই উৎপন্ন হয় প্রচুর আলু, কিন্তু বর্তমানে এখানে রয়েছে মাত্র একটি কোল্ড ষ্টোরেজ। এখানে বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে আরও অনেকগুলি কোল্ড ষ্টোরেজ স্থাপনের। এই

পদ্মা কোল্ড ষ্টোরেজ কৃষকদের বিশেষ সহায়তা করবে। আমরা কামনা করি এর উদ্যোক্তাদের সর্ববিধ সাফল্য।

সাংবাদিক সম্বর্দ্ধনা—

গত ২৩শে জুন রবিবার সন্ধ্যায় ২৪পরগণা জেলা সাংবাদিক সংঘের এক সভায় বারাসতবার্তা সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার ও তাঁহার সহকর্মীদিগকে তাঁহাদের কর্মসাফল্যের জন্য নববারাকপুর নূতন সহরের নিকট সাহারায় খ্যাতিমান দেশসেবক শ্রীহরিপদ বিশ্বাসের গৃহে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। সংঘের সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বারাকপুর, বসিরহাট, বনগাঁ, বজবজ, ক্যানিং, জয়নগর প্রভৃতি স্থানের বহু সাংবাদিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ও দাদাঠাকুরের আদর্শ গ্রহণ করিয়া নিষ্ঠার সহিত যেভাবে বীরেন্দ্রবাবু কাজ করিতেছেন, উপস্থিত সাংবাদিকগণ সকলে তাহার প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করেন এবং বারাসতবার্ত্তার দীর্ঘজীবন ও কর্মসাফল্য কামনা করেন। হরিপদবাবুর উৎসাহে এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় সকলে তাঁহারও প্রশংসা করেন। নববারাকপুর বর্তমান যুগের গঠন কার্য্যের তীর্থ স্বরূপ—সভাপতি মহাশয় সকলকে নববারাকপুর দর্শন করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীবীরু সরকারের প্রতি সাংবাদিকগণ ও সাহিত্যিকগণের শুভেচ্ছা অর্পণ সভা

সাহিত্যায়নের সমাবর্তন—

দক্ষিণ কলিকাতার বিজয়গড় পল্লীতে বিশ্বভারতী লোক শিক্ষা কেন্দ্রের একটি শাখা আছে, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে—সাহিত্যায়ন। গত ১৫ বৎসর ধরিয়া সাহিত্যায়নের পরিচালকগণ উৎসাহ ও আড়ম্বরের সহিত সমাবর্তন উৎসব করিয়া থাকেন এবং সেই উৎসবে প্রতি-বৎসর কয়েকজন করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিকে আনিয়া সম্মানিত করা হয়। এ বৎসর গত ২রা জুন বিজয়গড়ে জ্যোতিষ রায় কলেজ হলে বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উৎসবে আচার্য হন, খ্যাতিমান্ কবি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র সমাবর্তন ভাষণ দান করেন, শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক বিভাস রায়-চৌধুরী বক্তৃতা করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে এই প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা

করেন। সাহিত্যায়নের মত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি নূতনভাবে শিক্ষাসংস্কারে অগ্রসর হওয়ায় তাহার কর্মীদের অভিনন্দিত করেন। বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে যে শিক্ষাপ্রচার কার্য্য করিতেছেন, শ্রীমিত্র তাহার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আশা করেন, দেশের নানাস্থানে এই ধরণের আদর্শ প্রচারিত হইবে। বিশেষ অভিনন্দনের উত্তরে বাগল মহাশয় তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের বিবরণ দান করিয়া তাহার অল্পাবস্থা সত্ত্বেও সাহিত্যায়ন তাঁহাকে চরম সম্মান দান করায় আন্তরিক প্রীতি প্রকাশ করেন এবং বলেন—এ সম্মান তাঁহার ব্যক্তিগত সম্মান নহে, তাঁহার আজীবন সাহিত্য-সাধনার সম্মান। তাঁহার দান যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, তাহা যে দেশবাসীকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, ইহাই তাহার জীবনের গৌরবের বিষয়। সুধাংশুবাবু ও অধ্যাপক রায়চৌধুরী তাঁহাদের ভাষণে সাহিত্যায়নের প্রধান কর্মী শ্রীসুনীলময় ঘোষ মহাশয়ের এ বিষয়ে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার প্রশংসা করেন ও বলেন—এক একটি প্রতিষ্ঠান এক একজন পরহিতব্রতী কর্মীর মধ্য দিয়াই জীবিত থাকে। সাহিত্যায়নও সুনীলময়ের কর্ম নৈপুণ্যের মধ্য দিয়া দিন দিন উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে। আচার্য্য ফণীন্দ্রনাথ সবশেষে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটির কথা আলোচনা করিয়া আদর্শ আশ্রমিক শিক্ষা পদ্ধতির কথা বলার পর সকলকে ধন্যবাদান্তে উৎসব অনুষ্ঠান শেষ হয়।

নূতন খাল খনন—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নূতন হলদিয়া বন্দর হইতে মেদিনীপুর জেলার পাশকুড়া পর্য্যন্ত ৩২ মাইল দীর্ঘ একটি খাল খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। কংসাবতী নদীর খাত খালের স্থান হইবে—পাশকুড়ার উত্তরে একটি জলাধার এবং দক্ষিণে কেলেঘাই ও কপিলেশ্বর নদের সংযোগ স্থলে আমগাছিয়ায় একটি জলাধার খনন করিয়া খালে জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিবে। এই খাল খনন করা হইলে মেদিনীপুর জেলার লোক নানাভাবে উপকৃত হইবে। পথের উপর দিয়া ট্রাকে মাল চলাচল ছাড়াও আজ আবার পূর্বের মত জলপথে মাল চলাচলের ব্যবস্থা হইলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়িবে।

দ্রুত কয়লা বহনের পথ—

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দ্রুত কয়লাবহনের নূতন পথ নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি নূতন সংস্থা গঠনে মনোযোগী হইয়াছেন। এ জন্য প্রথম দফায় সাড়ে ১০ কোটি টাকা ও পরে আরও সাড়ে ৩ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। কয়লা খনি এলাকা হইতে জি-টি রোড পর্য্যন্ত কয়েকটি রাস্তা হইবে—তাহার মোট দৈর্ঘ্য ২ শত মাইল। তাহা ছাড়া আরও কয়েকটি ছোট ছোট রাস্তা—মোট ১০০ মাইল হইবে। জি-টি-রোডকে দুই পাশে ২৩ ফিট চওড়া করা হইবে। সত্বর এ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলে দেশবাসী উপকৃত হইবে।

উপমন্ত্রী রাধারাণী মহাতাব—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারাগার ও সমাজকল্যাণ বিভাগের উপমন্ত্রী, বর্দ্ধমানের মহারাণী রাধারাণী মহাতাব গত ৩০শে জুন সকালে কলিকাতায় মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। কখনও রাজনীতির সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল না, তথাপি ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে তিনি কম্যুনিষ্টপ্রার্থীকে পরাজিত করিয়া এম-এল-এ হন ও উপমন্ত্রী নিযুক্ত হন। রাজপ্রাসাদের বিলাসে তিনি নিজেকে নিমগ্ন না রাখিয়া সারাজীবন দরিদ্র জনগণের সেবা করিতেন এবং সর্বসাধারণের নিকট শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের ধনী কংগ্রেস নেতা লালা দুনীচাঁদের কন্যা ছিলেন ও ১৯২৬ সালে বর্দ্ধমানের রাজবধূরূপে বর্দ্ধমানে আসেন। তাঁহার স্বামী বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীউদয়চাঁদ মহাতাব সর্বজনপরিচিত।

ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়—

কলিকাতার খ্যাতনামা শল্যচিকিৎসক ও কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শল্যচিকিৎসা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় গত ২২শে মে বুধবার তাঁহার কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হইয়াছিল - তাঁহার ৫ কন্যা বর্তমান। ১৮৯২ সালে হাওড়া জেলার বালীতে তাঁহার জন্ম হয়—১৯১৭ সালে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম-বি পরীক্ষায় পাশ করেন ও ১৯২০ সালে তিনি আর-জি-কর মেডিকেল কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। তিনি ১৯২৮ সাল হইতে ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শল্যবিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২০ সালে বিলাত যাইয়া তিনি এডিনবরা হইতে এফ-আর-সি-এস হইয়া আসিয়াছিলেন। সারা জীবন তিনি সদয় ও আত্মীয়স্বজনের বান্ধব ছিলেন। তাঁহার বিরাট গ্রন্থাগার তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ও সুখলাল কারণানি হাসপাতালে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন এবং সকল ধর্মানুষ্ঠানে অর্থ সাহায্য-দান করিতেন।

ঠাকুরঝি'র বিয়ে
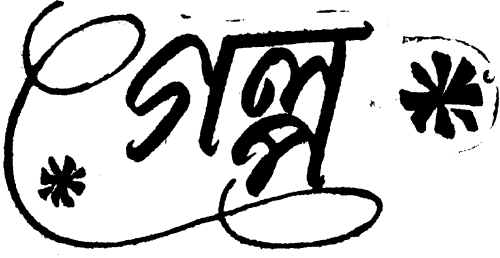
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৩৬

পরের রবিবারে সুরেশ অজিতের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। অজিত তখন তাহার বৈঠকখানাতেই ছিল। সেখানে অজিতের একজন বন্ধু ছিল। সুরেশকে আসিতে দেখিয়া কোন গোপন কথাবার্তা আছে অনুমান করিয়া বন্ধুটিকে ইঙ্গিতে যাইতে বলিয়া দিয়া সুরেশকে বলিল, এই যে আসুন। বহুকাল পরে দেখা। ভাল আছেন? বাড়ীর সব খবর ভাল?

সুরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ, ভালই।

অজিত। বেশ, বেশ। তারপর বলুন, কি খবর?

সুরেশ। শুনেছি, আপনিই বাড়ীর কর্তা।

অজিত। কর্তা না হ'লেও কর্তাই বলতে পারেন, বাবা একরকম অথর্ব। তিনি কোন কাজ করতে পারেন না, বা কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারেন না। মা নেই তা বোধ হয় জানেন। কি দরকার, আমাকেই বলতে পারেন।

সুরেশ! মানে, একটু বিশেষ দরকারী কথা।

অজিত। বলুন।

সুরেশ। শুনেছিলুম, আপনার নাকি বিয়েতে মত হয়েছে?

অজিত। বিয়েতে আমার কোনদিনই মত নেই। তবে ইদানীং বাবা একটু জেদ করছেন—

সুরেশ। হ্যাঁ, আপনার বিয়ের উপযুক্ত বয়স হয়েছে। এখন যদি আপনার মত পাই—

অজিত। কেন, মেয়ের খবর আছে না কি?

সুরেশ। মানে, আমার একটি বোন আছে। আপনি দেখেছেন তাকে। হ্যাঁ, ছোটবেলা থেকেই দেখেছেন।

অজিত। দেখেছি মাঝে মাঝে রাস্তায়। বোধ হয় কোন অফিসে-টফিসে ঢুকেছে।

সুরেশ। চাকরি করতে দেওয়া আমাদের মত নয়। মানে, তেমন সম্বন্ধও খুঁজে পাচ্ছিনে। শুধু শুধু বাড়ীতে বসে বসে মন খারাপ করে। তার চেয়ে একটু কাজ-টাজ নিয়েই থাকবে—তাই। মানে আমার কোন দিনই ইচ্ছে নয়, মেয়েরা অফিসে-টফিসে কাজ-টাজ করে।

অজিত। তাতে কি? আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে। কেমন চট-পটে হয়, স্মার্ট হয়। পাঁচজনের সঙ্গে কেমন মিশতে পারে। ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, কুনো থাকাটা কি ভাল?

সুরেশ। আজ্ঞে, আপনি যা বলেন। তা, আমার বোনটিকে একবার দেখুন না।

অজিত। তাকে তো দেখেছি। প্রায়ই তো দেখি। আর দেখবার দরকার আছে কি?

সুরেশ। আপনি যা বলেন।

অজিত। আমি বলছি, আমার তেমন অমত নেই। তবে বাবাকে একবার বলতে হবে। আমি জানি, তিনি আমার মতেই মত দেবেন।

সুরেশ। আচ্ছা. তা হ'লে ভেবে চিন্তে একটা দিন ঠিক করা যাবে। আশ্বিন কার্ত্তিকে তো হবে না। সেই অঘ্রাণ কিংবা মাঘ।

অজিত। আমার ও সব কুসংস্কার নেই। সব মাসই সমান।

সুরেশ। তা তো বটেই। তবে বোঝেন তো, মেয়েদের—আত্মীয়-স্বজনের আবার একটু সংস্কার আছে কি না।

অজিত। সেটা আপনারা দেখুন। এমন তাড়াতাড়িই বা কি ?

সুরেশ। নাঃ, তাড়াতাড়ি আর কি ? তবে কথায় আছে, শুভস্য শীঘ্রং।

অজিত। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

সুরেশ। আচ্ছা, আজ উঠি তা'হ'লে। এর পরে আসব একদিন দিন স্থির করতে। দেখুন, একটা কথা বলব ? অবশ্য বলবার কোন দরকার নেই। তবু, বলতে হয়।

অজিত। কি, বলুন।

সুরেশ। আমাদের অবস্থা তো জানেন ?

অজিত। বিলক্ষণ। সে সব কথা মনেও ভাববেন না। শাঁখা শাড়ী ছাড়া আমি কিছুই চাইনে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সুরেশ। বিশেষ ধন্যবাদ।

অজিত। আজ আর আপনাকে ধরে রাখব না। আমাকে এখুনি একটু বেরুতে হবে। আবার যখন আসবেন, একটু মিষ্টি মুখ না করে উঠতে পারবেন না।

সুরেশ। একবার কেন, একশ বার মিষ্টি মুখ করব। এখন ভালয় ভালয় শুভকাজ হয়ে গেলেই হয়। আচ্ছা, নমস্কার।

অজিত। নমস্কার।

সুরেশ বেশ একটু হৃষ্ট মনেই বাড়ী ফিরিল।

৩৭

লীলা অফিসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। অপর্ণা হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, এখনও অফিস ?

লীলা। কেন, অফিস বন্ধ করার কি কারণ হ'ল ?

লীলার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর।

অপর্ণা। সব শুনেছি।

লীলা। কি শুনেছ ?

অপর্ণা। আহা, কিছুই জানেন না যেন !

লীলা। জানিই তো না।

অপর্ণা। কেন, অজিতবাবুর সঙ্গে ঠিক হয়ে গেছে না ?

লীলা। সেই রকম শুনেছি বটে।

লীলা আরও গম্ভীর।

অপর্ণা বলিল, ওমা, আমি এলাম কন্‌গ্রাচুলেট করতে—আর তুমি বলছ শুনেছি বটে। জানিনে বাবু, তোমার মনের কথা কি।

লীলা। কি করে জানবে ? আমার মত অবস্থায় পড়লে জানতে।

অপর্ণা আর কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

লীলা বাড়ীর বাহির হইবার সময়ে স্বাতী বলিল, অফিস থেকে ফিরবার সময়ে ওদের জন্য এক কৌটা বিস্কুট নিয়ে এস।

লীলা কোন উত্তর না দিয়া অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বাহির হইয়া গেল।

লীলার এই গাম্ভীর্য লক্ষ্য করিয়া সুরেশ স্বাতীকে বলিল, শোন !

স্বাতী। কি বলছ ?

সুরেশ। অজিতের সঙ্গে সম্বন্ধ করাটা কি ভাল হ'ল ?

স্বাতী। কেন, মন্দটা কি হ'ল ?

সুরেশ। দেখছ না; লীলা কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। ওর যেন মোটেই মত নেই, মনে হচ্ছে।

স্বাতী। আবার ভাবছ ওর মতামতের কথা ? ওসব ঠিক হয়ে যাবে।

সুরেশ একটু মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল।

স্বাতী বলিল, তোমার অফিস নেই।

'হু' বলিয়া সুরেশ গম্ভীর মুখে উঠিয়া স্নানের জন্য প্রস্তুত হইল। সুরেশ বাথরুমে যাইবে, এমন সময়ে ঘরে ঢুকিল রণেন।

স্বাতী ও সুরেশ প্রায় এক সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, কি রে, কি খবর ? হঠাৎ এমন সময়ে !

রণেন। দাদা আসছেন।

স্বাতী চেঁচাইয়া উঠিল, কবে, কবে ?

রণেন। আসছে বুধবারে।

স্বাতী। এখনই আসছেন যে। আরো কিছুদিন পরে আসবার কথা ছিল না ?

রণেন। হ্যাঁ, লিখেছেন, হাতের কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। তাই আর দেরি না করে চলেই আসছেন। তাছাড়া এখানে একটা ভাল চাকরি পেয়েছেন, সেখানেও

এখনই যোগ দিতে হবে। আচ্ছা, আমি আসি। এই খবরটা দেবার জন্য ছুটে এলুম।

সুরেশ আবার গম্ভীর হইয়া পড়িল।

স্বাতী বলিল, কি ভাবছ?

সুরেশ। না, ভাবছিলাম—

স্বাতী। কি ভাবছিলে?

সুরেশ। তুমি বুঝতে পারছ, অজিতের সঙ্গে বিয়েতে লীলার একেবারেই মত নেই। শুধু আমাদের পীড়াপীড়িতেই মত দিয়েছে।

স্বাতী। তা কি হয়েছে? অত মতামত নিতে গেলে কোনকালেই কারো বিয়ে হ'ত না।

সুরেশ। তুমি ওর মনের কষ্টটা বুঝতে পারছ না।

স্বাতী। খুব বুঝতে পারছি। এখন, তুমি কি ভাবছ, বল।

সুরেশ। ভাবছিলুম, তোমার দাদা বিলেত থেকে ফিরেছে, ভাল চাকরি নিয়ে। তুমি একবার এক সময়ে ওর কাছে লীলার কথাটা বলে দেখো না। অমন গুণের মেয়ে, কেউ অপছন্দ করতে পারে না। তোমার দাদার নিশ্চয় পছন্দ হবে।

স্বাতী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, তোমার বোনের মত অমন গুণবতী মেয়ে গণ্ডায় গণ্ডায় পাওয়া যায়। আমার দাদা বিলেত থেকে পাশ করে এসেছেন, বড় চাকরি পেয়েছেন, তিনি কেন বিয়ে করতে যাবেন একটা হা' ঘরের মেয়েকে? কত বড় বড় লোকের বাড়ী থেকে সম্বন্ধ আসবে দেখো। আমার দাদার সম্বন্ধে তুমি যে এমন একটা অদ্ভুত প্রস্তাব আনলে কেমন করে, তাই ভাবছি।

সুরেশ এ কথার আর কি উত্তর দিবে? খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গামছা কাঁধে করিয়া বাথরুমের দিকে অগ্রসর হইল।

৩৮

বিকালে চায়ের টেবিলে বসিয়া সুরেশের সামনেই স্বাতী বলিল, দাদা এলে এবার তার বিয়ের সম্বন্ধ দেখতে হবে। মার ভারি ইচ্ছে, এখনই একটা বউ আসুক ঘরে।

সুরেশ বলিল, এ ইচ্ছে খুবই স্বাভাবিক।

স্বাতী। কত বড় বড় লোকের বাড়ী থেকে সম্বন্ধ আসবে। তোমাকেই কিন্তু যেতে হবে মেয়ে দেখতে।

সুরেশ। যাবই তো।

স্বাতী। আমিও যাব সঙ্গে।

সুরেশ। যেও।

স্বাতী। নিখুঁত সুন্দরী চাই কিন্তু।

সুরেশ। নিশ্চয়ই।

স্বাতী। আর অন্তত গ্রাজুয়েট হওয়া চাই।

সুরেশ। নিশ্চয়।

স্বাতী। গান জানা চাই। নাচ জানলে আরো ভাল।

সুরেশ। নিশ্চয়ই। আজকাল নাচ গান না জানলে চলবে কেন?

লীলা চুপ করিয়া সব শুনিতেছে। কোন কথাতেই তার কোন উৎসাহ নেই।

স্বাতী। আর দেখ, মেয়ে ছবি-টবি আঁকতে পারে কি না—তাও জিজ্ঞেস করতে হবে।

সুরেশ। হবে, হবে। এখনও তোমার দাদা কলকাতায় পদার্পণ করলো না। এখনই—

স্বাতী। এলেই মা বলবেন।

সুরেশ। যখন বলবেন, তখন আমরাও লেগে যাব।

চা-পর্ব শেষ হইল। স্বাতী লীলাকে বলিল, ওদের একটু দেখো। আমি যাচ্ছি একটু ও-বাড়ীতে। মা'কে ক'দিন দেখিনি। একটু ঘুরে আসি।

লীলা একেবারেই নীরব। তাহার বিবাহের কথা স্থির হইবার পর হইতেই সে প্রায় নির্বাক্ হইয়া গিয়াছে।

স্বাতী ও-বাড়ীতে গিয়া বিভাবতীকে বলিল, শুনলুম, দাদা আসছেন।

বিভাবতী। হ্যাঁ, কি ভাবনাই যে আমার হয়েছিল। ওদেশে বেশিদিন থাকলে কত রকম বিপদ-আপদ হতে পারে।

স্বাতী। শুনলুম এখানে একটা ভাল চাকরি পেয়েছেন।

বিভাবতী। তাই তো লিখেছে।

স্বাতী। এখানে এলেই কিন্তু দেখে শুনে একটা বিয়ে দিতে হবে।

বিভাবতী। তা তো হবেই। ওর বিয়ের বয়স হয়েছে। আমার শরীরও ভাল না। বিয়ে এখনই দিতে হবে বৈ কি।

স্বাতী। হ্যাঁ, খুব ভাল দেখে একটা মেয়ে। মেয়ের অভাব কি! কত বড় বড় ঘর থেকে সম্বন্ধ আসবে।

বিভাবতী। বড় ঘর-টর বুঝি নে আমি। মেয়েটি ভাল হলেই হ'ল।

স্বাতী। তাই বলে যেখানে সেখানে দাদা বিয়ে করতে পারবেন না।

বিভাবতী। যেখানে সেখানে কেন করবে?

স্বাতী। দেখ মা, তোমাকে একটা কথা কিন্তু এখনই বলে রাখছি। তোমার জামাই কিন্তু বলতে পারেন ঠাকুরঝি'র কথা। কক্ষণো মত দেবে না। দাদা কেন বিয়ে করতে যাবে অমন একটা হা' ঘরের মেয়েকে?

বিভাবতী। তা তুমি যাই বল, লীলাকে আমার খুব ভাল লাগে। যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনই মিষ্টি কথাবার্তা, তেমনি মায়ামমতা। দাদা-অন্ত প্রাণ। দাদার জন্য, দাদার সংসারের জন্য, দাদার ছেলে-মেয়ের জন্য, ও যত স্বার্থত্যাগ করেছে, তা আমি জীবনে আর কোথাও দেখিনি। এমন একটা মেয়ে পাওয়া ভাগ্যের কথা।

স্বাতী। সে সব হবে না, আমি আগেই বলে রাখছি। সেইজন্যই আমি আজই এলুম দৌড়ে তোমাকে বলতে। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি মা, তুমি এসবের মধ্যে থেকো না। দাদার বিয়ে আমিই দেব।

বিভাবতী। বেশ তো, তোমরা দেখে শুনে দিও। আমি কি আর তোমাদের মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে যাব?

স্বাতী। হ্যাঁ। তাই মনে থাকে যেন। দাদার বিয়ে নিয়ে যেন একটা অশান্তির সৃষ্টি কর না। আমি রয়েছি, তোমার জামাই রয়েছে, আমরাই সব করব'খন। তাছাড়া একটা কথা তোমাকে এতদিন বলিনি. লীলার বিয়ে এক রকম ঠিকই হয়ে গেছে। শুধু দিনটা ঠিক করতে বাকি। তোমার জামাই এখন কাউকে বলতে বারণ করেছেন। কাজেই ঠাকুরঝির সঙ্গে দাদার বিয়ের কথাই আর উঠতে পারে না।

বিভাবতী। আচ্ছা, যা হয় তোমরাই করবে। এখন ও-বাড়ী এসে পৌছক। কতদিন ওকে দেখিনি, বল ত?

এই কথা বলিয়া বিভাবতী চোখ মুছিলেন।

স্বাতী। কেন আর মন খারাপ করছ? দাদা আসছেন। এখন আনন্দ কর। আজ আসি মা।

বিভাবতী। এস।

স্বাতী বাড়ী ফিরিল।

৩৯

সুরেশের বাড়ীতে গুণেনের চায়ের নিমন্ত্রণ। চায়ের টেবিলে চারজন বসিয়াছে। প্রত্যহ লীলাই পরিবেশন করে। আজ স্বাতী লীলাকে বসিতে বলিয়া নিজেই পরিবেশন করিতেছে।

স্বাতী বলিল, ও-দেশ থেকে এসে এখানে সব কেমন কেমন লাগছে, না?

গুণেন। কেমন আবার লাগবে? বেশ ভাল লাগছে। নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে এলে কার না ভাল লাগে?

সুরেশ। এখানে কাজে যোগ দিয়েছ কবে?

গুণেন। যেদিন এলাম, তার পর দিনই।

সুরেশ। কেমন, অফিস ভাল?

গুণেন। ভালই মনে হচ্ছে। উন্নতির পথ আছে।

সুরেশ। তুমি নাকি গাড়ী কিনেছ?

গুণেন। ওখান থেকেই নিয়ে এসেছি। নূতন গাড়ী ওখান থেকে আনা খুব মুস্কিল। তাই ওখানেই ব্যবহার করে পুরোনো করে নিয়ে এসেছি। কাল গাড়ী এসে পৌছুবে।

সুরেশ। বেশ, তোমার এত দেরি দেখে আমরা ভাবছিলুম, ওখানেই বুঝি থেকে গেলে।

গুণেন। কি যে বল, দেশ ছেড়ে যাব আমি?

সুরেশ। হয়তো একটা বিয়ে-টিয়েই করে ফেললে।

গুণেন। হাঃ হাঃ হাঃ।

সুরেশ। হাসবার কি কথা। কতজনই করে।

স্বাতী। সবাই কি আর একরকম? আমাদের লীলার বিয়ে হয়ে গেছে. শুনেছ বোধ হয়।

গুণেন। কই না, কিছু শুনিনি।

লীলা এতক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল। এখন টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিল। বিবাহের প্রসঙ্গ তাহার ভাল লাগিল না।

স্বাতী বলিল—হ্যাঁ। ওর ভাগ্য ভাল। বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। ছোটবেলা থেকেই এ পাড়ায় আছে। লীলাকে ছোটবেলা থেকেই দেখেছে।

গুণেন। বেশ, বেশ। দিন ঠিক হয়েছে?

স্বাতী। অনেকটা ঠিক, তবে একেবারে ঠিক হয় নি।

গুণেন। সেইজন্যই বুঝি উনি টেবিল ছেড়ে পালালেন?

স্বাতী। বিয়ের কনে'র একটু লজ্জা হবেই তো। খুবই স্বাভাবিক।

গুণেন বলিল, আচ্ছা, উঠি তাহলে।

স্বাতী বলিল। বস না একটু, ওদেশের গল্পটল্প শুনি।

গুণেন। আর একদিন হবে।

স্বাতী। এখন কোথায় যাবে?

গুণেন। যাই, গাড়ীখানাকে ঠিক ঠিক করি গে। দেখি সব পার্টটার্ট ঠিক আছে কি না। আজ আসি তা হ'লে।

সুরেশ বলিল, লীলার বিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে এস। দেখাশোনা কর। একটু-আধটু আয়োজন যা হয়, তোমাকেই খাটাখাটনি করতে হবে।

গুণেন। নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। এ তো অতি আনন্দের কথা। আচ্ছা, আজ আসি। ক্রমশঃ

রাশিচক্রে গ্রহ যোগাযোগের ফল

উপাধ্যায়

লগ্ন থেকে পঞ্চম স্থানে শনি ও রাহু একত্র থাকলে অস্ত্রাঘাতে সন্তানের মৃত্যু হয়। রাহু দ্বিতীয় স্থানে থাকলে অস্ত্রাঘাতের আশঙ্কা আছে। অষ্টমে রাহু ও চন্দ্র থাকলে অস্ত্রাঘাতপ্রাপ্তি। বৃশ্চিকরাশিগত মঙ্গল বা শনি হোলে অস্ত্রাঘাত। চন্দ্র মঙ্গল বৃহস্পতি ও শনি একত্র থাকলে জাতক উন্মাদ হয়। রবি, চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি এবং শনি একত্রে থাকলে জাতকের মস্তিষ্কবিকৃতি হয়। লগ্নে বৃহস্পতি ও সপ্তমে মঙ্গল, কিম্বা লগ্নে শনি ও পঞ্চম সপ্তম বা নবমে মঙ্গল, অথবা লগ্নের দ্বাদশে ক্ষীণচন্দ্র ও শনি থাকলে জাতক উন্মাদ হয়। শনি বৃশ্চিক রাশিতে থাক্‌লে কারাবরোধ। লগ্নে চন্দ্র, পঞ্চমে রাহু ও দ্বাদশে বুধ শুক্র থাকলে কারাবরোধ। তৃতীয় স্থানে শনি যদি রাহুযুক্ত বা দৃষ্ট হয় তা হোলে জাতককে কারাবরণ করতে হবে। যার জন্মকুণ্ডলীতে লগ্নে শনি, দ্বিতীয়ে ক্ষীণ চন্দ্র, পঞ্চমে রবি আর নবমে মঙ্গল আছে তাকে শত্রুরা কেটে কেটে বা কুপিয়ে কুপিয়ে মেরে ফেলে। খনা বলেছেন, সপ্তমে শনি থাকলে জাতক খঞ্জ হয়। চতুর্থাধিপতি ষষ্ঠস্থানে থাকলে চোরের হাতে মৃত্যু। লগ্নাধিপতি ষষ্ঠস্থানে ও রাহু বা কেতু তার সঙ্গে একত্র থাকলে চোরের উপদ্রব হয়। পঞ্চমে শনি ও রাহু একত্র থাকলে, কিম্বা শনি দ্বাদশে থাকলে অথবা সপ্তমে লগ্নে রবি ও চন্দ্র থাকলে, কিম্বা লগ্নে রবি ও মঙ্গল থাকলে জলমগ্ন হবার যোগ। ষষ্ঠে বা অষ্টমে চন্দ্র মঙ্গল থাকলে সর্পদংশনযোগ। স্ত্রীলোকের জন্মকুণ্ডলীতে সপ্তমস্থানে তিনটি গ্রহ থাকলে জাতিকা কুলটা হয়। সপ্তমে চন্দ্র মঙ্গল ও শনি থাকলে পরস্ত্রীসংসর্গহেতু মৃত্যু। ষষ্ঠে বা লগ্নে শনি রাহু থাকলে ভূতে পাওয়ার যোগ বা পিশাচ পীড়া। সপ্তমে বুধ ও শুক্র থাক্‌লে বিবাহ হয় না, তবে শুভগ্রহের দৃষ্টি পেলে বেশী বয়সে বিবাহ। হয় যে নারীর কোষ্ঠীতে লগ্ন বা চন্দ্রের সপ্তমে শনি থাকে আর ঐ শনিকে পাপগ্রহরা দৃষ্টিকরে, সেই নারী ভাগ্যহীনা ও দুশ্চরিত্রা। লগ্নে শনি ও ত্রিকোণে মঙ্গল থাকলে স্ত্রী সম্বন্ধে উন্মাদবুদ্ধি। লগ্নের নবম স্থানে চন্দ্র ও শুক্র একত্র থাকলে জাতক কুলটার পতি হয়। রবি শুক্র ও শনি একত্র থাকলে চরিত্রহীন। যার রাশিচক্রে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও শনি একত্র থাকে, সে কুলটার পতি হয়। শুক্রের ষষ্ঠে বা দ্বাদশে শনি থাকলে ক্লীবাকৃতি। শনি ষষ্ঠে বা দ্বাদশে ক্লীবরূপ। রবি বা মঙ্গল চতুর্থে নীচস্থ বা শত্রুগৃহগত হোলে গৃহনাশ। চতুর্থপতি ও লগ্নপতি ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে থাকলে গৃহ নাশ। সপ্তমে রবি ও বুধ থাকলে জাতক ধ্বজভঙ্গ হয়। লগ্নপতি, ষষ্ঠপতি ও বুধ একত্র থাকলে চিত্তরোগ হয়। মেষস্থ চন্দ্রকে শনি দৃষ্টি করলে জাতক চোর হয়। লগ্নে বুধ ও মঙ্গল একত্র থাকলে জাতক চোর হয়। লগ্নে চন্দ্র এবং তৃতীয়ে মঙ্গল ও শুক্র থাকলে জাতক জারজ। কেন্দ্রে তৃতীয়াধিপতি থাক্‌লেও জারজ যোগ। সপ্তমপতির দ্বিতীয়ে কেতু থাকলে জাতক তোতলা হয়। যে নারীর সপ্তমে শনি ও বুধ থাকে সে দুর্ভাগ্যবতী ও বন্ধ্যা হয়। দ্বিতীয়ে চন্দ্র ও মঙ্গল থাকলে জাতক ধননাশক হয়। দশমে শুক্র ও শনি থাকলে জাতক

নপুংসক হয়। সিংহস্থ রবিকে শনি দেখলে জাতক নপুংসক। যে স্ত্রীলোকের সপ্তমে রবি অবস্থিত এবং শত্রু গ্রহ দ্বারা রবি দৃষ্ট, সে স্ত্রীলোক পতিত্যক্ত হয়। সপ্তমে তিনটি পাপগ্রহ যে নারীর জন্মকুণ্ডলীতে দেখা যায়, সে পতিঘাতিনী। যে স্ত্রীর লগ্নে বা চন্দ্রের সপ্তমে বুধ বা শনি অবস্থিত, সে স্ত্রীর স্বামী ক্লীব। মঙ্গলের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের লগ্ন হোলে, আর সেখানে শুক্র মঙ্গল একত্র থাকলে সে স্ত্রীলোক পতিদ্বেষিণী হবে। রবি চন্দ্র ও শুক্র একত্র থাকলে জাতক পরদাররত হয়। সপ্তমে বুধ বৃহস্পতি বা চন্দ্র শুক্র থাকলে জাতক বহুস্ত্রীরত হয়। মঙ্গল বা বুধ সপ্তমে থাক্‌লেও জাতক পরদাররত হয়। দ্বাদশে শুক্র পরদাররত করে। সিংহে রবি ও শনি একত্র থাকলে জাতক মহাপাপী হয়। লগ্নে শুক্র ও মঙ্গল থাকলে জাতক বেশ্যাসক্ত হয়। সপ্তমপতি লগ্নে বা সপ্তমে থাকলে জাতক ব্যভিচারী হয়। সপ্তমপতি দ্বাদশে বা দ্বিতীয়ে থাকলে জাতক নানা স্ত্রীগামী হয়। দ্বাদশে রবি থাকলে জাতকের পুরস্ত্রীর অমিতব্যয় ও ব্যসনাঢ্য হয়। যে নারীর জন্মকুণ্ডলীতে সপ্তমে দুইটী পাপগ্রহ, সে নারী বিধবা ও কামাসক্তা হয়। লগ্নপতি নীচস্থ এবং নবমে শনি ও চন্দ্র থাকলে জাতক ভিক্ষাজীবী হয়। চন্দ্র নীচস্থ হোলে জাতক ভাগ্য যোগ হীন হয়। নবমে চন্দ্র ও শনি থাকলে মাতাকুলচ্যুতা। চন্দ্রের দশমে শনি থাকলে শোকসন্তপ্ত। কেন্দ্রে মঙ্গল ও সপ্তমে রাহু থাকলে ইচ্ছামৃত্যু। মঙ্গল ও শুক্র একত্র থাকলে জাতক গণিতজ্ঞ হয়। শনি ও শুক্র একত্র থাকলে জাতক লিপি,পুস্তক ও চিত্রবেত্তা হয় এবং যুবতীর আশ্রয়ে ধনবৃদ্ধি। সিংহ ধনু মীন মেষ কর্কট বা বৃশ্চিক রাশিতে রবি ও মঙ্গল একত্র থাকলে জাতক ধনী হয়। স্বক্ষেত্রে, পঞ্চমে বা একাদশে শনি থাকলে জাতক ধনী হয়। তৃতীয়পতি ও বৃহস্পতি একত্র থাকলে জাতক ধীর ও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হয়। বৃহস্পতি পঞ্চমে এবং পঞ্চমপতি কেন্দ্রে থাকলে বত্রিশ তেত্রিশ বর্ষে পুত্রলাভ। একাদশে রাহু থাকলে বার্দ্ধক্যে পুত্র লাভ। পঞ্চমে শুক্র এবং চতুর্থে রাহু থাকলে একত্রিশ বা তেত্রিশ বর্ষে বিবাহ। তৃতীয় পতি ও রবি একত্র থাকলে জাতক বীর হয়। মকর ভিন্ন রাশিতে বৃহস্পতি লগ্নে থাকলে জাতক ভাগ্যবান হয়। লগ্নপতি তৃতীয় পতির মিত্র হোলে ভ্রাতার সঙ্গে মিল থাকবে। লগ্নে রবি ও মঙ্গল থাকলে জাতক মহাবীর হয়। তুলাস্থ চন্দ্রকে বুধ দেখলে জাতক রাজা হয়। বৃহস্পতির গৃহে শুক্র থাকলে জাতিকা সাধ্বী হয়। যে নারীর লগ্নে বুধ ও শুক্র একত্র থাকবে, সে সুভগা, ঐশ্বর্য্যশালিনী, সুন্দরী ও কলাবতী হয়। তৃতীয়পতি ও চতুর্থপতি একত্র থাকলে জাতক সেনাপতি হয়। লগ্নপতি ও সপ্তমপতি একত্র থাকলে স্ত্রী যুবতী হয়। বুধ, শুক্র ও শনি একত্র থাকলে স্ত্রীর প্রিয় হয়। বুধ ও শুক্র থাকলে জাতক হাস্যরসিক হয়। লগ্নে বৃহস্পতি ও শুক্র থাকলে হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। লগ্নে বা দশমে বুধ থাকলে জাতক বিশেষরূপে বক্তৃতাশক্তিসম্পন্ন হবে, আর হবে সংসাহিত্যের স্রষ্টা। বুধের সঙ্গে হার্শেলের অশুভ সংযোগ হোলে জাতক বিপ্লবী হয়। বুধের সঙ্গে নেপচুনের অশুভ সংযোগ হোলে আত্মহত্যা করবার প্রবৃত্তি হয়। দ্বিতীয় স্থানে যদি মঙ্গল থাকে, আর এখানে যদি বুধের যোগ বা দৃষ্টি হয় অথবা যদি বুধ কেন্দ্রস্থলে থাকে তাহোলে জাতক হিসাবী বা গণিতজ্ঞ হয়। লগ্নগত রাহু সম্মান, অর্থ, পদগৌরব, ধর্ম্ম, শিক্ষা অথবা বৈজ্ঞানিক বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে উন্নতি বা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি শুভ ফল দাতা। লগ্নগত কেতু জাতককে স্বল্পায়ু করে, মুখ বা চক্ষুতে বিপত্তি আনে, ক্ষতি হানি নিন্দার এবং বহু দুঃখের কারণ হয়।

——

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশিরফল

মেষরাশি

ভরণীনক্ষত্রজাত ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বোত্তম সময়। অশ্বিনীজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির পক্ষে অধম—শারীরিক দুর্ব্বলতা, সন্তানদের পীড়া, পারিবারিক শান্তি সুখ স্বচ্ছন্দতা। পরিবার বহির্ভূত স্বজন ও বন্ধুবর্গের সহিত মনোমালিন্য। আর্থিক স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত। কিছু কিছু আর্থিক ক্ষতি। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে কলহ বিবাদ, গোল যোগ এমন কি মামলা মোকর্দ্দমার উদ্ভব! বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী

ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম। অনুকূল আবহাওয়া উন্নতির পথে। উপরওয়ালার প্রীতিলাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী অনুকূল নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক।

বৃষ রাশি

রোহিণীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। মৃগশিরাজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। কৃত্তিকা জাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। শারীরিক অসুস্থতা। উদরাময়, আমাশয় এবং হজমের গোলমাল। পুরাতন জ্বর রোগীর সতর্কতা আবশ্যক। কোন প্রকার মহামারীর প্রাদুর্ভাবে সন্তান গণের আক্রান্ত হবার আশঙ্কা। অনেকটা পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, যদিও পরিবার বহির্ভূত স্বজন বর্গের সঙ্গে কলহের সম্ভাবনা। আর্থিক অবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়। প্রতারণা ও ক্ষতির জন্য কিছু অর্থনাশ। কারো জন্য জামিন হওয়া বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না, বহু ঝঞ্ঝাট ভোগ। চাকুরি জীবির পক্ষে মাসটী অনুকূল। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটী মোটামুটি ভালোই। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

মিথুন রাশি

আর্দ্রা জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম ফলাফল। পুনর্ব্বসুর পক্ষে মধ্যম। মৃগশিরার পক্ষে অধম। স্বাস্থ্যের অবনতি, রক্তের চাপবৃদ্ধি, পেটের গোলযোগ। পরিবার বহির্ভূত স্বজন বর্গের সঙ্গে মনান্তর ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। আর্থিক ক্ষেত্রে সক্রিয় অবস্থা মধ্যে মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতি, এতদসত্ত্বেও অর্থাগম সন্তোষজনক। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে ভালো মন্দ দুই প্রকার ফল দেখা দেবে। মামলা মোকর্দ্দমার আশঙ্কা। চাকুরি জীবির উত্তম সুযোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটী একই প্রকার। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসু ও অশ্লেষা জাত ব্যক্তির পক্ষে একই প্রকার ফল। পুষ্যা জাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। উদর ও গুহ্য প্রদেশে পীড়া। রক্তের চাপ বৃদ্ধি। পারিবারিক সুখ শান্তি। সন্তানদের স্বচ্ছন্দতা। পরিবারের সঙ্গে সামান্য কলহ বিবাদ যোগ। আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা। অপরিমিত ব্যয়, এজন্য ঋণের সম্ভাবনা। স্বজন বন্ধুবর্গের প্রতি সহিত সাময়িক মনোমালিন্য। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি নৈরাশ্য জনক। চাকুরির ক্ষেত্র কিছুটা অনুকূল। অনুকূল আবহাওয়া এবং উপরওয়ালার প্রীতিলাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে সময়টা সাধারণ ভাবেই যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্পূর্ণ ভালো বলা যায় না, নানা প্রকার সমস্যা ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের প্রবণতা আছে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

সিংহ রাশি

পূর্ব্ব ফল্গুনী জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। মঘার পক্ষে মধ্যম। উত্তর ফল্গুনী জাতব্যক্তির পক্ষে অধম। রক্ত দুষ্টি পিত্ত প্রকোপ বায়ুবৃদ্ধি প্রভৃতি সম্ভব। ভ্রমণ কালে দুর্ঘটনা বিপত্তি। স্ত্রী ও সন্তান বর্গের স্বাস্থ্যের অবনতি। আর্থিক ক্ষেত্র সন্তোষ জনক, নানাপ্রকারে অর্থাগম। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে প্রথমে কিছুটা অসুবিধা হোলেও শেষপর্য্যন্ত ভালোই যাবে। চাকুরি জীবির ভালো সময়, তবে পদোন্নতির যোগ নেই। মধ্যে উপরওয়ালার অসন্তোষের দরুণ কিছুটা মানসিক কষ্ট। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে সময়টী আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ শুভ সময়, মাসের শেষের দিকে শরীরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিছু খারাপ হোতে পারে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা ও নৈরাশ্য জনক পরিস্থিতি।

কন্যারাশি

হস্তাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। চিত্রা জাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। উত্তর ফল্গুনীর পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে অন্তরায় ঘটবেনা তবে সামান্য পীড়াদি সূচিত হয়। উচ্চ রক্ত চাপবৃদ্ধি, পিত্ত প্রকোপ ফুসফুস সংক্রান্ত রোগে যারা আগে থেকেই ভুগছে তাদের সতর্কতা আবশ্যক। পারিবারিক অবস্থা ভালোই যাবে। আত্মীয় স্বজন অতিথি অভ্যাগতের সমাবেশ। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। আর্থিক ক্ষেত্র সন্তোষ জনক ও বৃদ্ধি বিস্তারের সম্ভাবনা।

অপ্রত্যাশিত ভাবে সৌভাগ্যবৃদ্ধি ও লাভের যোগ। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মধ্যম সময়। চাকুরিজীবীর সময় ভালো যাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে সন্তোষজনক পরিস্থিতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে (বিশেষতঃ তরুণীদের) অতীব উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

তুলা রাশি

স্বাতীজাতগণের উত্তম সময়। বিশাখাজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। চিত্রার পক্ষে অধম। শরীরের অবস্থা মোটামুটি। ভ্রমণজনিত অবসাদ অথবা ছোটখাটো দুর্ঘটনা। পারিবারিক কলহ (বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের সহিত)। আর্থিক ক্ষেত্রে মিশ্রফল। ব্যয়াধিক্যহেতু সংসারে বিশৃঙ্খলা। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীদের কিছু লাভ। কৃষিজীবীর পক্ষে কিছুটা ক্ষতি। চাকুরিজীবীর সময় সম্পূর্ণ ভালো বলা যায়না। উপরওয়ালার সঙ্গে কাজের ব্যাপারে সতর্কতা আবশ্যক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর সময় একভাবেই যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মোটামুটি ভালো বলা যায়।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখা ও জ্যেষ্ঠাজাত ব্যক্তিগণের ভালোমন্দ ফল একই প্রকার। অনুরাধাজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। মাসটি সাধারণভাবে যাবে। স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে না। রক্তের চাপবৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্ত্রী ও সন্তানদের স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। পারিবারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা, সংসারে সামান্য কলহবিবাদ, আর্থিক অবস্থা শুভ, অর্থ লগ্নীতে লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে অনুকূল। চাকুরিজীবীর পক্ষে ভালোমন্দ মিশ্রিত। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর উন্নতি সূচিত হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মিশ্রফলদাতা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

ধনু রাশি

পূর্বাষাঢ়াজাত ব্যক্তিগণের উত্তম। মূলাজাত ব্যক্তির মধ্যম, উত্তরাষাঢ়াজাত ব্যক্তির অধম। শারীরিক অবস্থার অবনতি, অজীর্ণ, গুহ্যদেশে পীড়া, আমাশয়, জ্বর, ভ্রমণে ক্লান্তি, দুর্ঘটনা বা বিপত্তি, শরীরের দুর্বলতা, রক্তের চাপবৃদ্ধি, পারিবারিক কলহ। আর্থিক ক্ষেত্র অনুকূল নয়, অপরের জন্য জামিন হওয়া অনুচিত, স্বজনবিয়োগ, মিথ্যা অপবাদ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়। চাকুরিজীবীর পক্ষেও মাসটী অনুকূল নয়। উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীরা কিছু শুভফল আশা করতে পারে। স্ত্রীলোকেরা এ মাসে নানাপ্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ সময়।

মকর রাশি

শ্রবণাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। ধনিষ্ঠার পক্ষে মধ্যম। উত্তরাষাঢ়াজাত ব্যক্তির পক্ষে অধম। রক্তহানি, জ্বর, দুর্ঘটনায় রক্তপাত, শারীরিক দুর্বলতা, পারিবারিক অশান্তি। আর্থিক অবস্থা সুবিধাজনক নয়। ব্যয়াধিক্য, নগদ টাকার টান ধরবে। স্ত্রীলোক নিমিত্ত দুর্ভোগ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক, ক্রয়বিক্রয়ে প্রতারণাজনিত ক্ষতি। চাকুরিজীবীরা নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করবে, অনুকূল পরিস্থিতির অভাব। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মিশ্র ফল। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধফল।

কুম্ভ রাশি

শতভিষাজাত ব্যক্তির উত্তম। পূর্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তির মধ্যম। ধনিষ্ঠাজাত ব্যক্তির অধম। দুর্ঘটনা, উদরঘটিত পীড়া, অজীর্ণতা, চক্ষু পীড়া, শারীরিক ক্লান্তি। স্ত্রী ও সন্তানবর্গের সহিত কলহ। আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। মাত্রাধিক্য আয় হোলেও অপরিমিত ব্যয় হেতু সঞ্চয়ের অভাব। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মিশ্রফল। চাকুরির ক্ষেত্রে বিশেষ কোন আশাপ্রদ লক্ষণ দেখা যায় না। নানাপ্রকার বাধা বিপত্তি, পদোন্নতি যোগের অভাব, উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার আশঙ্কা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে শুভ সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ সময়, অনেকে গর্ভবতী হবে, প্রসূতিগণের কন্যাসন্তান। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি মন্দ নয়।

মীন রাশি

পূর্বভাদ্রপদ ও রেবতীজাতগণের পক্ষে একইপ্রকার। উত্তরভাদ্রপদ জাতগণের নিকৃষ্ট ফল। স্বাস্থ্যের অবনতি। অজীর্ণ, চক্ষুঘটিতপীড়া, রক্তস্রাব, সামান্য আঘাতও দুর্ঘটনা, সন্তানাদির স্বাস্থ্য হানি বা পীড়া। সামান্য পারিবারিক কলহ। আর্থিক ক্ষেত্র আশাপ্রদ নয়, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মধ্যম সময়, চাকুরিজীবীর পক্ষে প্রথমার্দ্ধ শুভ, শেষার্দ্ধ প্রতিকূল। শেষার্দ্ধে বেকার ব্যক্তিদের চাকুরি লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মধ্যম। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়—বিশেষতঃ যারা সঙ্গীত কলা, নৃত্য, মঞ্চ ও চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাদের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নফল

মেষ লগ্ন—

শারীরিক অবস্থা ভালো যাবে না। ধনাগম ও সুখ্যাতির

আশা আছে। সহোদরভাব শুভ নয়, অসদ্ভাব ও মনোমালিন্য। পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা। সন্তানের বিদ্যায় উন্নতি। গুপ্তশত্রু বৃদ্ধি যোগ। পত্নীর স্বাস্থ্যহানি ও পীড়াদি। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষ লগ্ন—

স্বাস্থ্যের অবনতি। ধন লাভ। সহোদরভাব শুভ। সম্বন্ধ লাভ। পারিবারিক ঝঞ্ঝাট। কর্ম্মোন্নতি। অধীনস্থ ব্যক্তি দ্বারা প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা। পত্নীভাব শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যবিধ ফল, সন্তানাদির বিবাহ যোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে কৃতকার্য্যতা লাভ।

মিথুন লগ্ন—

দৈহিক ও মানসিক কষ্ট। অর্থ ব্যয়। আকস্মিক দুর্ঘটনা। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি। ভাগ্যোন্নতি। কর্ম্মস্থলে বাধাবিঘ্ন। বন্ধুবিয়োগ। আত্মীয় বিরোধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা ও নিকৃষ্ট ফল।

কর্কট লগ্ন—

দেহপীড়া। বাতবেদনা, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা। সহোদরভাব শুভ। পত্নীভাবের ফল শুভ নয়। ভাগ্যোন্নতি। বেকার ব্যক্তির কর্ম্মলাভ। কর্ম্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি। সন্তানের রোগভোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

সিংহ লগ্ন—

স্বাস্থ্য স্বাভাবিক। ব্যবসায়ে উন্নতি যোগ। স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি বা পীড়া, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা। বন্ধুভাবের ফল শুভ। যশোভাগ্য। মোকর্দ্দমার আশঙ্কা। কর্ম্মোন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যবিধ ফল। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আংশিক ক্ষতি।

কন্যা লগ্ন—

শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতা। ধন লাভ। বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতির অভাব। পারিবারিক অশান্তি। সন্তানের স্বাস্থ্যহানি ও পরীক্ষায় সুফলের অভাব। দাম্পত্যপ্রণয় অটুট থাকবে। ভাগ্যোন্নতি। কর্ম্মস্থানে বাধা বিঘ্ন। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

তুলা লগ্ন—

দৈহিক ও মানসিক কষ্ট। স্নায়ুগতপীড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভ্রাতৃভাবের ফল আশঙ্কাজনক। সন্তান সন্ততির পীড়াদি কষ্ট, স্বাস্থ্যের অবনতি ও লেখাপড়ায় বিঘ্ন। ভাগ্যোদয়ে বাধাবিপত্তি। স্ত্রীর পীড়া। কর্ম্মোন্নতির আশা কম। গৃহাদিনির্ম্মাণ বা সংস্কারে ও ধর্ম্মকার্য্যে বিশেষ অর্থব্যয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়। শত্রুবৃদ্ধি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাভঙ্গ।

বৃশ্চিক লগ্ন—

শারীরিক অবস্থার আংশিক উন্নতি। ধনব্যয় যোগ। ভ্রাতার সহিত মতানৈক্য। সন্তানসন্ততির স্বাস্থ্যোন্নতি। বেকার ব্যক্তির চাকুরিলাভ। কর্ম্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। কর্ম্মস্থলে গুপ্তশত্রু বৃদ্ধি। ভাগ্যোন্নতি যোগ। ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি। পত্নীর স্বাস্থ্যোন্নতি। দাম্পত্য প্রণয়। চিকিৎসকের সুবর্ণ সুযোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ধনু লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক শান্তির অভাব। ধনাগমে বাধা বিঘ্ন। সহোদরভাব শুভ। বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতিতে কিছু কিছু অর্থলাভ। পত্নীর শারীরিক অসুস্থতা ও হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা। ভাগ্যোন্নতির যোগ। বাসগৃহের জন্য নূতন জমিসংগ্রহ। পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা। কর্ম্মোন্নতিতে বাধা। স্ত্রীলোকের শুভসময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মকর লগ্ন—

দেহপীড়া। পাকযন্ত্রের পীড়া, রক্তঘটিত পীড়া এবং হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা। রক্তের চাপবৃদ্ধিজনিত কষ্ট। সহোদরের সাহায্যে আর্থিকোন্নতি সম্বন্ধলাভ। কর্ম্মস্থলে পরিবর্ত্তনের যোগ। স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি। স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর রোগ ভোগ, দাম্পত্যকলহ ও প্রীতিভঙ্গ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কুম্ভ লগ্ন—

শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। বাতবেদনা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও হঠাৎ আঘাতপ্রাপ্তির যোগ। ব্যয়বৃদ্ধি। ধনভাব শুভ। আর্থিক উন্নতি। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। কর্ম্মখ্যাতি। পারিবারিক অবস্থা আশাপ্রদ। সন্তানাদির পড়াশুনার ফল ভালো নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ সময়। বিদ্যার্থীর পক্ষে সাফল্য লাভ।

মীন লগ্ন—

শারীরিক অবস্থা ভালো যাবে। কিন্তু বেদনাসংযুক্ত পীড়া বা রক্তসম্বন্ধীয় পীড়া সাময়িকভাবে কষ্টপ্রদ হোতে পারে। বন্ধু লাভ। সন্তান সন্ততির লেখাপড়ায় আশাপ্রদ ফলের অভাব। পত্নীর স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা নেই। পুত্রকন্যার বিবাহে বাধা সৃষ্টি। ভাগ্যোন্নতি যোগ। মাঝে মাঝে পারিবারিক কলহ। কর্ম্মস্থলে অশান্তি ও ক্ষতির আশঙ্কা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ ফল নেই। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাতৃরিষ্টি, পারিবারিক অশান্তি ও নানা দুর্ভোগ।
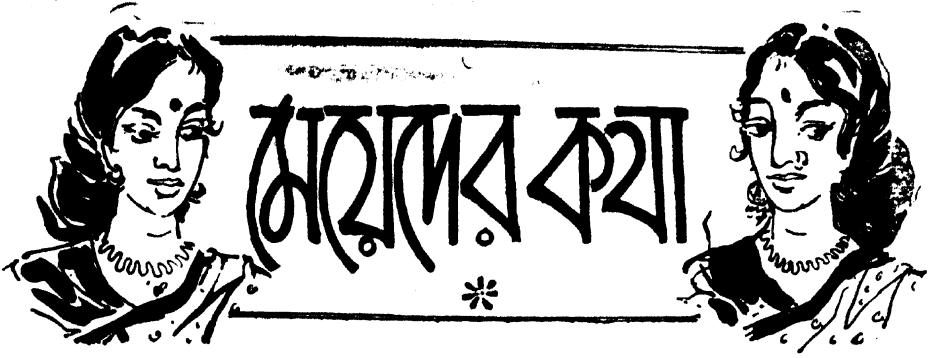
আমরা ও আমাদের নারীসমাজ

শ্রীমতী মীরা দাস

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

নারীর জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ তাহার মাতৃত্ব। মাতার সুশিক্ষার উপর শিশুর ভবিষ্যৎ গঠিত হইয়া থাকে। আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ এই শিশু। এই শিশুকে সু-নাগরিক করিয়া তুলিতে হইলে প্রথমে প্রয়োজন সকল প্রকারের সুশিক্ষা। এই শিক্ষা মাতৃক্রোড় হইতেই সুরু হইয়া থাকে। গুণবতী মাতাই শিশুকে নানা প্রকার সদ্গুণে ভূষিত করিতে সমর্থা। সুশিক্ষিতা বলিতে কোন প্রকার ডিগ্রীর অধিকারিণী হওয়ার প্রয়োজন হয় না। ধৈর্য্য, ক্ষমা, স্নেহ, মমতা এই সকল গুণ থাকিলেই নারীর শিক্ষা হয় সম্পূর্ণ এবং তিনিই কেবল দেশকে রত্নস্বরূপ সন্তান উপহার দিতে সক্ষম। এই জন্যই নেপোলিয়ন বলিয়াছেন, "Give me good mothers and I will give you good nations". এই গেল নারীর মাতৃরূপের কর্ত্তব্য।

যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমাজের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন যেন অধঃপতনের দিকে না যায়। আজ আমাদের সমাজ এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মাঝে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; নানা জটিল সমস্যায় আজ আমরা জর্জ্জরিত; কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা আমাদের ছেলেমেয়েরা। অধিকাংশই আজ মানসিক সুস্থতা হারাইয়া ফেলিতেছে। আর্থিক অনটনের জন্য অনেক ছেলেমেয়ে উত্তমরূপে লেখাপড়া করিতে পারেনা। তাহাছাড়া পূর্ব্বের মতো ছেলেমেয়েদের মধ্যে সেইরূপ একনিষ্ঠ সাধনা মহান আদর্শবোধ নাই। তাহারা নানাকারণে দিক্‌ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। ফলে তাহারা হইয়া উঠিতেছে বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল। অভিভাবকগণ ব্যক্তিগত জীবনযুদ্ধে বিপর্য্যস্ত, বিভ্রান্ত। তাহারা সম্যক্‌রূপে ইহাদের প্রতি দৃষ্টি দিতে অক্ষম, সুতরাং বর্ত্তমানে প্রয়োজন সেইরূপ নারীর যাঁহারা তাহাদের কল্যাণহস্তে হাল চালনা করিয়া সুপথে তাহাদের চালিত করিতে পারেন। ভাগ্যচক্র বাঙ্গালীকে আজ সর্ব্বক্ষেত্রে প্রতিহত করার চেষ্টা করিতেছে। মানচিত্রে বাংলার স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। বাঙ্গালীর কণ্ঠ আজ ক্রমেই রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যখন ভারতে অন্যান্য প্রদেশগুলিতে শিক্ষাবিস্তার তেমন ঘটেনাই, তখন বাঙ্গালী শিক্ষিত হইয়া ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর সাধনার দান অপরিমিত। রোঁমা রোঁলা, বার্ণার্ড শ' প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য মনীষীগণ ইহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। সুতরাং মহামানবগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের আবার তাহাদের পূর্ব্বগৌরবে অধিষ্ঠিত করিবার দায়িত্ব নারীকেই গ্রহণ

করিতে হইবে। তাহা হইলেই হইবে নারীর অভিভাবিকার কর্ত্তব্যে সার্থক উত্তরণ।

নারী পুরুষের শক্তির উৎস স্বরূপ। জায়ার সাহচর্য্যে, জীবনেয় বাৎসল্যে, কন্যার সেবায়, ভগিনীর স্নেহে, সকল সম্পর্কে, সকল অবস্থায় নারী পুরুষকে মাধুর্য্য দান করিয়া প্রেরণা দিয়া থাকে। সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বযুগে নারী পুরুষের সকল চিন্তায়, কর্মে, কর্ত্তব্যে অংশীদার হইয়া তার ভার লাঘব করিতে চায়। এইজন্য কবিগুরু বলিয়া গিয়াছেন যে "দেবী বলিয়া পুরুষের পূজা সে কামনা করে না, অবহেলিত হইয়া দূরে থাকিতে সে ঘৃণা করে। সে চায় পাশে থাকিবার অধিকার।" সেই অধিকার মেয়েদের নিজেদেরই অর্জন করিতে হইবে। অধিকার কেহ হাতে তুলিয়া দেয় না, অধিকারের যোগ্য হইতে হয়।

নারীর দায়িত্ব, কর্ত্তব্য, বর্ত্তমানে পূর্ব্বাপেক্ষা বহু বাড়িয়াছে। এখন কেবল গৃহের মধ্যেই তার জগৎ সীমাবদ্ধ নয়। বর্ত্তমানে অর্থসঙ্কটের দিনে আমাদের সমাজের বহুমেয়ে বাধ্য হইয়া অর্থোপার্জনের পথে বাহির হইয়াছেন। আজ ঘরে ঘরে স্বাবলম্বী নারীরই প্রয়োজন। তাহা হইলেই পিতামাতার সংসারে কন্যা দায় না হইয়া সঞ্চয় হইয়া দাঁড়াইবেন। স্বামীর সংসারকে যৌথ উপার্জনে সুন্দর, সুস্থ ও উন্নত করিতে সক্ষম হইবেন। অর্থলোভী পাত্রপক্ষের হাত হইতে বিব্রত পিতাকে বাঁচাইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবেন। মেয়েদের স্বাবলম্বন ব্যতীত সমাজের এই ঘৃণ্য পণপ্রথা দূরীভূত হওয়াও সম্ভব নয়, বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনটিও হইবে হাস্যকর ব্যর্থপ্রচেষ্টা।

জীবনের প্রয়োজনেই জীবিকার আয়োজন। কাজেই এই জীবনকে সুন্দর, স্বচ্ছল, উন্নত করিতেই নারীর এই কঠোর পরিশ্রম। ঘর এবং বাহির এই দুই কুলকে রক্ষা করিয়া এবং সমতা বজায় রাখিয়া চলিতে পারিলেই হইবে তাহার পরিশ্রম সার্থক—না হইলে তাহা হইবে বিড়ম্বনা মাত্র। এ যুগের শিক্ষা হচ্ছে চিত্তের দৃঢ়তায় রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে অবস্থা মানাইয়া লওয়ার শিক্ষা। আজ যেমন পুরুষের মতো শিক্ষা মেয়েরা গ্রহণ করিতেছে, সেই সঙ্গে পুরুষের মতো দায়িত্বও বহন করিবার ক্ষমতালাভ করিবে। ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্যমূল্যের ঝঞ্ঝায় সংসারতরণীকে বাঁচাইয়া চলিতে হইবে নারীকেই। কাজেই বর্ত্তমানে মেয়েদের শক্ত ও দৃঢ়চিত্ত হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সেইস্থলে যখন অনেক নারীর বেশভূষায় দেখা যায় সিনেমার অন্ধ অনুকরণের নির্লজ্জ প্রকাশ এবং চলনে উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত আচরণ তখন নিরুপায় নৈরাশ্যে মন আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং মনে হয় আজকের নারী কোন্ পথে? নিজেদের মূল্য নিজেই বিনষ্ট করিয়া নিজেকে তথা সকল নারীকেই উপহসিত করিতেছে। অতিআধুনিকতার মোহের উদ্‌ভ্রান্ত তাড়নায় সভ্যতা, শালীনতা, আদর্শ, আত্মসম্ভ্রম সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে এদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই, সব ভুলিয়া কেবল মোহময়ী বিলাসিনীতে পর্য্যবসিত হইতেছে। ইহারা সমগ্র নারী-সমাজের কলঙ্কস্বরূপ।

নারীর চিরন্তনী রূপ একটি শান্তির নীড় রচনা করা। সকলেই সংসারে একটী স্নেহময়ী নারীকে কামনা করিয়া থাকে। কারণ গৃহিণীকে কেন্দ্র করিয়াই গৃহ। গৃহিণীর উপরই গৃহের শান্তি ও সুখ বহুলাংশে নির্ভর করিয়া থাকে। কাজেই নারীকে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্না হইতে হইবে। তিনি নিজ বুদ্ধিমত্তায়, অটুট ধৈর্য্যে; অপরিসীম ক্ষমায় অক্লান্ত সেবায় আত্মীয়-পরিজনকে স্নেহের ডোরে বাঁধিয়া রাখিবেন। এইরূপ কল্যাণী নারীই হইবেন সুগৃহিণী।

আমরা যদি আমাদের কার্য্যকলাপে, কর্ত্তব্য কর্মে, সাধনায় ক্রটী রাখি তাহা হইলে সারা জীবনেও সে লজ্জা সে গ্লানি মুছিয়া ফেলিতে পারিব কি? আজ আমাদের সমাজের প্রতিটি নারী নূতন ব্যক্তিত্ব ও চেতনা লইয়া জাগিয়া উঠুন, নারী প্রগতি শীলতায় দৃঢ় সবল পদক্ষেপে এগিয়ে চলুক এই প্রার্থনা করি এবং তাহা হইলেই আমরা আমাদের নব জাগরণে ভগবানের পুণ্য আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া সার্থক হইব।

আইহোরাণীর বেদী

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

আইহোরাণীর বেদী !

কে বলবে এই বেদীর অবস্থান যে গ্রামে সেখানে একদিন এক সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। এখনকার মালদহের এই ক্ষুদ্র গ্রামের সাথে অতীতের সমৃদ্ধির কোন মিলই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। চণ্ডীপুর আজ জঙ্গলে ঘেরা। তার সেই বড় বড় দীঘিতে এখন আর জল টলটল করে না, কলমী শাক আর কচুরীপানায় জল আর দেখাও যায় না। পুকুরঘেরা ফুলের বাগান আর চাঁদের আলোয় হেসে ওঠে না—তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে মস্ত মস্ত বটগাছ আর বাঁশের ঝাড়। এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে শুধু ভাঙ্গা ইটের স্তূপ।

এখনকার এই জঙ্গলে-ঘেরা আঁধারে-ঢাকা প্রাচীন জনপদের মধ্যে অতীতের এক কাহিনী আজও রমণী বীরত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে রয়ে গেছে। তার স্মৃতি চিহ্নই "আইহোরাণীর বেদী !"

কোন মূর্ত্তি নাই, ভাস্কর্য্যের কোন চিহ্ন নাই—শুধু একটা মাটীর বেদী। এই বেদী যে ঘটনাকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে তার ঐতিহাসিক বয়স নির্ণয় করা এখন আর যায় না। কেউ বলেন—চারশ' বৎসর আগেকার কথা—আবার কারও মতে—প্রায় সাতশ' বৎসর আগে ঘটেছিল সেই ঘটনা। ইতিহাসের বয়স যাইহোক, আজিও সে ঘটনা শুনে চমকে ওঠে সকলে; সারাদেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে ভয়ে, বিস্ময়ে আর এক অপার্থিব পুলকে।

বাংলার রাজধানী গৌড় নগর থেকে কতদূরই বা পথ! বোধহয় বার ক্রোশ মাত্র হবে। ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়িয়ে গৌড়ের রাজকুমার প্রাতভ্র্মণ করে আসছেন। বকের পালকের মত সাদা ধবধবে আরবী ঘোড়া টগবগিয়ে চলেছে। চণ্ডীপুর গ্রামে ঢুকবার পথেই একখানা সুন্দর মুখ দেখে চমকে উঠ্‌লেন রাজকুমার। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়লো লাগামের টানে।

ফুলের সাজি হাতে নিয়ে রক্তজবাগাছ থেকে ফুল তুলছিল এক সুন্দরী কিশোরী। আগুনের শিখার মত তার রূপ। জলন্ত আগুনের দেদীপ্যমান আভা তার মুখে। বড় বড় দুটী চোখে তন্দ্রার মায়া। দুগ্ধধবল দেহে বিকশিত গোলাপের রক্তিম আভা। মানবীর দেহ নয়, যেন একটি ফুটন্ত ফুল।

ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে উৎসুক নয়নে সেইদিকে তাকালো; কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই নত হ'য়ে পড়লো কিশোরীর দৃষ্টি। ঘোড়ার পিঠে বসে মুগ্ধের মত তার দিকে তাকিয়ে আছেন গৌড়ের রাজকুমার।

অকস্মাৎ যেন একরাশ লজ্জা এসে জমা হ'লো কিশোরীর সুন্দর মুখে। সঙ্কোচে জড়িয়ে গেল তার পা দুখানি। চকিত নয়নে আর একবার অশ্বারোহীর দিকে চেয়ে আড়ালে চলে গেল সে।

প্রতিদিনই প্রভাতে আর সন্ধ্যায় চণ্ডীপুরে একবার করে বেড়াতে আরম্ভ করলেন রাজপুত্র। সুসজ্জিত ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হ'য়ে দীন-দরিদ্র এক পুরোহিতের বাড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন। অনিমেষ নয়নে চেয়ে থাকেন কিশোরীর গোলাপের কুঁড়ির মত দেহের দিকে। মুখ ফুটে বলবার বা হাত পেতে চাইবার সুযোগ তখনও পান নি।

লক্ষ্য করে কিশোরী। বুঝতে পারে সে—কিসের-আশায় তৃষ্ণাতুর চোখে তাকিয়ে থাকেন রাজপুত্র দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটীরের দিকে। সে অনুভূতিতে বিস্ময় থাকে, বেদনাও থাকে এবং বোধহয় সলজ্জ একটি তিরস্কারও মিশে থাকে। এই কি গৌড় রাজপুত্রের উপযুক্ত ব্যবহার? এক নারীর মুখের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে থাকা ভিন্ন আর অন্য কোন কাজ তার নাই? তবুও যেদিন রাজপুত্রের পৌঁছুতে দেরী হয়, সেদিন কেন যেন বিচলিত হয়ে ওঠে কিশোরী মন। বারবার একবার ঘর ও একবার বাগান করতে থাকে সে। কিছুদিন পরে নিজের মনে বুঝতে পারে সে, যে তার নিজেরও ভাল লাগে দেখা পেতে ও দেখা দিতে; বুঝতে পারে সে নিজের অগোচরে হারিয়ে বসেছে তার নিজের মন।

সতর্ক হয় কিশোরী। অনুভব করে যে গৌড়রাজ-পুত্রের বধূ হবার যোগ্যতা নাই সামান্য এক পুরোহিত-

ব্রাহ্মণের কন্যার। ভয় পায় কিশোরী। শেষে কি হৃদয়ের দুর্ব্বলতায় রাজপুত্রের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেবে সে বিলাসের সহচরীমাত্র হয়ে? না, এমন অসম্মানের জীবন বরণ করতে পারে না ব্রাহ্মণকন্যা।

উষার প্রথম আলোকরেখা সবেমাত্র উদয়াচল থেকে আকাশের কিনারায় ছড়িয়ে পড়েছে। গাছের মাথায় শাখায়-পাতায় লেগে রয়েছে অ লো-আঁধারে মেশা একটা ছায়া। দূর আকাশের গায়ে তখনো দু' একটা তারা শুধু মিট্ মিট্ করে জ্বলছে। পৃথিবী থেকে ঘুমের ঘোর তখনো কাটেনি; পাখীর কাকলী সুরু হ'য়েছে মাত্র।

ঘুম থেকে জেগে কিশোরী অলিন্দে এসে দাঁড়িয়েছে। কী ভাবছে সে? কী দেখছে সে? অকূল যেন তার ভাবনার সমুদ্র—তার আদিও নাই; অন্তও নাই। যার প্রলুব্ধ দু'চোখের মায়ায় সে আজ আবদ্ধ হ'য়ে প'ড়েছে, তার দিকেই এগিয়ে যাবে লঘুপায়ে, না জীবনের মোড় ঘুরিয়ে নেবে সে বংশগরিমার কথা ভেবে?

হঠাৎ তার চিন্তার ধারা ভেঙ্গে গেল। দেখলো দূরে কালিন্দীর ঘাটে প্রত্যুষের স্নানকারী নরনারীর দল আসতে আরম্ভ ক'রেছে। নদীর বুকে পারাপারের খেয়া আর জেলে-ডিঙ্গি ভাসছে।

অস্ফুট একটা শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখে অলিন্দের নীচে একজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে।

চমকে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌তে চায় কিশোরী। কিন্তু সম্বিত ফিরে পেয়ে অনেক চেষ্টায় কণ্ঠরোধ করে সে—যেন কেউ শুনতে না পায় তার কণ্ঠস্বর। বুঝ্‌তে পারে সে —অলিন্দের নীচে এসে দাঁড়িয়েছে কে?

রাজপুত্র ডাকেন—"এসো।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করে—"কোথায়?"

—"যেখানে আমি নিয়ে যাব।"

—"কেন?"

—"তোমাকে ভালবাসি বলে!"

আনন্দে বিগলিত হয় কিশোরীর মন। তার দয়িত এসে তাকে বলছে—"ভালবাসি।" সকল সঙ্কোচ ভুলে সে দু'পা এগিয়ে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সচকিত হ'য়ে সে ফিরে আসে। একি ক'রছে সে? ধর্ম্ম মতে বিবাহ ভিন্ন নারীর আত্মদান যে অশ্রদ্ধেয়।

কিশোরী বলে ওঠে—না। তার কণ্ঠস্বর ও গ্রীবাভঙ্গী সহসা কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু তার মনের কথা বুঝতে পারেন না রাজপুত্র; সে চেষ্টাও করেন না। সাময়িক-ভাবে অগ্রসর-মান দেহের ইঙ্গিতকেই মনের কথা মনে ক'রে কিশোরীর হাত চেপে ধরেন অপহারকের লুব্ধতায়।

কিশোরী চমকে উঠে মরণোন্মুখ ভঙ্গীতে পিছনের গৃহ-দ্বারের দিকে তাকালো। কেউ দেখে ফেললো না তো!

আর ভাবতে পারে না সে।

পুরুষের পেষল হাতের স্পর্শে তার মনে রোমাঞ্চ লেগেছে;—হৃদয় যেন গ'লে যাচ্ছে। কিশোরীর চেতনা থেকে আর সব তখন বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। অতীত গেছে মুছে। ভবিষ্যৎ অনির্দ্দিষ্ট অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তার মনের আকাশে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মুছে গিয়ে ফুটে উঠেছে নূতন ভোরের আলো!

অকস্মাৎ চমক ভাঙ্গলো কিশোরীর। হঠাৎ অনুভব করলো সে, তার কটিবেষ্টন করে কে যেন তাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিচ্ছে।

মন তার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে সহসা।

না। না। এ তার প্রেমের অপমান। তার কুমারী জীবনের অপমৃত্যু। তার নিষ্কলুষকুলের অপযশ।

আর্ত্তস্বরে চিৎকার ক'রে উঠ্‌লো কিশোরী—"এ কি ক'রছো তুমি? ছেড়ে দাও।"

বেশ স্পর্দ্ধার সঙ্গেই বললো রাজপুত্র—"ছেড়ে দেব বলে ত আসিনি।"

কিন্তু অভাবনীয় ভাবেই তার উদ্ধার মিললো।

কিশোরীর আর্তকণ্ঠের আহ্বানে নদীর ঘাটে সাড়া জাগলো—"ভয় নাই—আমরা আসছি।"

জেগে উঠ্‌লো কোলাহল, কলরব আর শতকণ্ঠের সমবেত আশ্বাসধ্বনি।

ভয়ে কেঁপে উঠ্‌লো রাজপুত্র। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমে কিশোরীকে আকর্ষণ ক'রে সে নিচে নামিয়ে দিল। পর মুহূর্ত্তেই আবার ঘোড়ার সওয়ার হ'য়ে জোর-কদমে ছুটিয়ে দিল।

স'রে এলো কিশোরী নির্জ্জন গৃহ মাঝে। জনতার সন্ধানী দৃষ্টি যেন সন্দেহের কারণ খুঁজে না পায়। কিন্তু

শরীর তার কাঁপছে তখন থর থর ক'রে—দু'হাতে বুক চেপে ধ'রে ঘরের কোণে বসে পড়লো সে।

অকস্মাৎ তার দু'চোখ দিয়ে ধারায় জল গড়িয়ে পড়লো "একি করলাম আমি? কেন প্রিয়তমের মধুর আহ্বানে এগিয়ে গেলাম না?"

আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে তার মনে—প্রেম বড়, না ধর্ম বড়? ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হ'লো না যে প্রেম, তাতে কি সার্থকতা আছে?

ব্যর্থতা বাড়ায় আক্রোশ। অসহায়তা ক'রে তোলে মানুষকে দুঃসাহসী।

সেদিনের ব্যর্থ অভিসারের আক্রোশ বুকে নিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে রাজপুত্র। পলায়নের লজ্জা তাকে আরও বেপরোয়া ক'রে তোলে। রাজপুত্রের কামনা এত সামান্য বাধাতেই অতৃপ্ত থাকবে!

উন্মত্ত আক্রোশে ঘরের মেঝেয় পায়চারী ক'রতে করতে রাজপুত্র কিঙ্করীকে আদেশ দিলেন:—শরাব।

পরিপূর্ণ এক পাত্র এক চুমুকে নিঃশেষ ক'রে একটা আরামের অস্ফুট শব্দ করলেন। এক মুঠো মশলা গালে ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে বাইরের দিকে চল্লেন।

দুপুর পেরিয়ে গেছে। পথে লোক চলাচল বেশী নেই। জনবিরল পথ দিয়ে আবার চণ্ডীপুরের দিকে এগিয়ে চলেন রাজপুত্র।

দূর থেকে বহুবার তিনি দেখা পেয়েছেন কিশোরীর। দূরের দেখায় তৃপ্তি নেই—চোখ জালা করে, কামনার তৃষ্ণা বেড়ে ওঠে।

রাজপুত্রের কণ্ঠে মরুর তৃষ্ণা। কয়েক মুহূর্তের জন্য কিশোরীর দেহ স্পর্শ ক'রে তৃষ্ণা বেড়ে উঠেছে আরও বেশী। অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়েই কি ফিরতে হবে আবার?

না। হাতগুটিয়ে বসে থাকা আর নয়! সতর্ক পায়ে পুরোহিত ব্রাহ্মণের কুটীরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো আসব-মত্ত রাজপুত্র।

সাঁঝের অন্ধকার নেমে এসেছে গ্রামে। গাছের মাথায় শাখায়-পাতায় অস্ত রবির দু'একটা রশ্মি দেখা যায়, নীচে নেমে এসেছে আলো-আঁধারে মেশা একটা ছায়া।

তুলসীতলায় সন্ধ্যা-প্রদীপ দিচ্ছিলো কিশোরী। ধীরে তার সামনে এসে দাঁড়ালো রাজপুত্র।

বিস্ময়ে চোখ তুলে রাজপুত্রের দিকে তাকালো কিশোরী—মদ্যপায়ী রাজপুত্রের কামনা-কুটিল-চোখের দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হলো সে।

একজোড়া স্বর্ণ কঙ্কণ হাতে নিয়ে কিশোরীর সামনে মেলে ধরে রাজপুত্র অট্টহাসি হেসে উঠলো নির্জন কুটীর কাঁপিয়ে। বললো—"এবার মন উঠবে তো? সোনার পয়জার না হ'লে নাকি মেয়েদের মন ওঠে না।"

ঘৃণায়, বিভীষিকায়, আতঙ্ক ফুটে উঠলো কিশোরীর চোখে। ভয়ে পিছিয়ে এলো সে।

দিনের পর দিন যার মুখ দেখে প্রেমে মুগ্ধ হয়েছে কিশোরী, একি বীভৎস রূপ নিয়ে এসে উপস্থিত হ'য়েছে সে?

আসব-মত্ত রাজপুত্র স্খলিত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলো কিশোরীর কাছে। কিশোরীর ভয় হলো—একটা কামান্ধ-পশু যেন তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে আসছে। থর থর ক'রে কেঁপে উঠলো তার দেহ মন।

বলিষ্ঠ দুটি হাত তখন তাকে ধ'রে ফেলেছে। আতঙ্কে চিৎকার ক'রে উঠলো বালিকা। ছাড়া পাবার জন্য প্রাণ-পণে চেষ্টা করলো।

রাজপুত্রের দেহে তখন পশুত্ব জেগে উঠেছে। ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় সব কিছু তার লোপ পেয়েছে তখন। তার আকর্ষণে ছিন্ন-ভিন্ন হলো কিশোরীর বেশ-বাস। ছিঁড়ে গেল তার বক্ষের কাঁচুলি—ভেঙ্গে গেল শঙ্খের বালা।

অকস্মাৎ আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো রাজপুত্র। দেখলো অসহায়া কিশোরী মরিয়া হ'য়ে দাঁতের কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে তার বাহুর এক খাবলা মাংস। যন্ত্রণায় অধীর হ'য়ে আলিঙ্গন শিথিল করলো সে।

একটু ছাড়া পেতেই মুহূর্ত্তের মধ্যে কটিবন্ধের গুপ্ত কৃপাণ বের করে রাজপুত্রের বুকে বসিয়ে দিল কিশোরী; একবার, দু'বার, তিনবার।

মরণাহতের চিৎকার শুনে চারিদিক থেকে ছুটে এলো পাড়াপ্রতিবেশী। দেখলো রক্তাক্ত ছোরা হাতে নিয়ে বিহ্বলের মত দাঁড়িয়ে আছে বিস্রস্তবসনা কিশোরী। আর তার পায়ের কাছে লুটিয়ে প'ড়ে আছে রাজপুত্রের রক্তাক্ত মৃতদেহ! তুলসীতলা রক্তের ধারায় লাল হয়ে গেছে।

সহসা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো কিশোরী। তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা ঝরতে লাগলো।

নিজের মনেই যেন বলল কিশোরী—"তোমাকে আমি সত্যই ভালবেসেছিলাম রাজপুত্র। মনের গভীরে প্রেমের আসনে বসিয়েওছিলাম তোমাকে।...কিন্তু এই কি তোমার স্বরূপ? এত ক্ষুদ্র তুমি? এত হীন? প্রেম নয়—নারী-মাংসই শুধু তোমার কাম্য!"

পরক্ষণেই রাজপুত্রের বুক থেকে কৃপাণখানা তুলে নিয়ে সজোরে বসিয়ে দিল সে নিজের বুকে। রাজপুত্রের মৃতদেহের পাশেই লুটিয়ে পড়্‌লো কিশোরীর রক্তাক্ত দেহ।

আজ আর কেউ বল্‌তে পারে না—কি নাম ছিল গৌড়ের সেই কামোন্মত্ত রাজপুত্রের। একথাও কেউ বলতে পারে না এখন, কি নামই বা ছিল অপরূপা সেই কিশোরী বালিকার। আজ শুধু দেখা যায়, চণ্ডীপুর গ্রামের এক প্রান্তে জংলা গাছ আর বকুলের ছায়ায় ঘেরা একটা মাটির বেদী;—তেল সিঁদুরে রক্তিম বর্ণ। লোকে বলে 'আইহোরাণীর বেদী', এয়োস্ত্রীদের একান্ত প্রিয় পীঠস্থান। নিজের জীবন দিয়েও সতীত্ব রক্ষা করেছিলেন তিনি, সেই কিশোরী বালিকার স্মৃতি দেবীত্বে পরিণত হয়ে আজও পূজা পাচ্ছে এখানে সকলের কাছে।

শত শত নরনারী এখনও 'আইহোরাণীর' বেদীর সম্মুখে পূজার উপচার ও নৈবেদ্য নিয়ে আসে। পূজার শেষে ভক্তিভরে প্রসাদ নেয় সকলে। এখানে পূজা দিতে আসে দূর দূরান্তর থেকে নিঃসন্তান ও মৃতবৎসা জননীর দল। লোকে বলে 'আইহোরাণীর পূজা দিলে সন্তান আসে, বাঁচেও মায়ের কোল জুড়ে।

বেদীর সম্মুখে যখন আরতির দীপ-জ্বলে তখন একথা মনে না হ'য়ে পারে না যে, জীবনের মূল্য দিয়ে সতীত্বের আলোকটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য প্রেমাস্পদের জীবন আহুতি দিতেও যিনি পিছিয়ে পড়েন নি, তাঁর জন্য পূজার উপচার সত্যই প্রয়োজন এবং সে পূজা সার্থক। সেই সাথে মনে হয় বাংলার গ্রামে গ্রামে এরকম কত সতী রমণীর আত্মদানের কাহিনীই ত ছড়িয়ে আছে, কিন্তু তা সংগ্রহ করে কে?

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

আধুনিক-সমাজে সৌখিন পোষাক-পরিচ্ছদ রচনার জন্য আজকাল নানা ধরণের বিচিত্র-সুন্দর নক্সাদার-রঙীণ সুতী ও রেশমের ছাপা-শাড়ী আর ছিটের-কাপড় ব্যবহার করার রীতিমত রেওয়াজ হয়েছে। সৌখিন-নক্সাদার রঙ-বেরঙের এই সব ছাপা-শাড়ী আর ছিটের-কাপড় লোকে সচরাচর বাজারে-হাটে ছোট বড় দোকান থেকেই কিনে থাকেন...তবে সখ থাকলে, যে কোনো সুগৃহিণী সামান্য একটু পরিশ্রম করলেই, সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্মের অবসরে স্বল্প-ব্যয়ে এং অল্প কয়েকটি সাজসরঞ্জামের সাহায্যে বাড়ীতে বসেই নিজের হাতে কারু-শিল্পের কাজ করে অনায়াসে এমনি ধরণের নানা রকম রঙীণ ও নক্সাদার ছাপা-শাড়ী পোষাক-পরিচ্ছদ বানানোর উপযোগী ছিটের-কাপড় রচনা করতে পারেন। কি উপায়ে বাড়ীতে বসেই নিজের হাতে কারু-শিল্পের কাজ করে এমনি ধরণের বিচিত্র-সুন্দর রঙীণ-নক্সাদারছাপা-শাড়ী আর ছিটের-কাপড় বানানো সম্ভব, এবারে তারই অভিনব কলা-কৌশলের কথা বলছি। কিন্তু কলা কৌশলের কথা আলোচনা করার আগে, এ কাজের জন্য যে সব সাজ সরঞ্জাম প্রয়োজন—তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি।

গোড়াতেই বলেছি—বিভিন্ন রঙে ও বিভিন্ন ছাঁদের নক্সায় শাড়ী ও জামার কাপড় ছাপানোর জন্য বেশী কিছু সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই...অর্থাৎ, কাপড়ের উপর এ-ধরণের কারুশিল্পের রঙীণ-নক্সা ছাপার জন্য চাই—নক্সার ছাপ-তোলার উপযোগী প্রয়োজনমতো মাপের কাপড়, বেশ বড়-সাইজের কাঠের তৈরী একখানা সমতল 'পাটা' (Wooden Board) অথবা 'পিঁড়ে', জামার

কাপড় ও শাড়ীর পাড় আর জমিতে নক্সা-ছাপার উপযোগী কয়েকটি কাঠের তৈরী বিচিত্র নক্সার প্রতিলিপি খোদাই করা 'ব্লক' (Wooden-Blocks with Engraved Designs), নক্সার প্রতিলিপি খোদাই-করা কাঠের 'ব্লকে' রঙ-মাখানোর উপযোগী চৌকোণা-কাপড়ের টুকরোর মধ্যে বেশ পুরু তুলো-মোড়া গোটাকয়েক ছোট-বড় ও মাঝারি সাইজের 'পুঁটলি' বা 'প্যাড্' (Ink-pad), একশিশি গঁদের আঠা (Arabic Gum Glue), খান দুই-তিন বড় 'ব্লটিং পেপার' (Blotting Paper), কাপড়-ছাপানোর উপযোগী কয়েক কৌটা লাল, নীল, হলদে, সবুজ, বেগুনী, বাদামী, কালো প্রভৃতি গুড়ো-রঙ (Textile Fabric Dyeing Powder Colour), বিভিন্ন রঙ গোলবার জন্য কয়েকটি কাঁচের, এনামেলের অথবা চীনামাটির বাটি, ভালো একটি 'স্কেল' (Scale) অথবা 'রুলার' (Ruler), একটি মাপ নেবার ফিতা (Measuring Tape), একটি পেন্সিল, খানকয়েক পুরোনো খবরের কাগজ, এবং রঙ-মাখা অপরিস্কার হাত আর নক্সা খোদাইকরা কাঠের ব্লক ধুয়ে সাফ করবার জন্য এক গামলা জল, আর হাত মোছবার উপযোগী একটি শুকনো গামছা কিম্বা তোয়ালে। জামার কাপড় এবং শাড়ীর পাড় ও জমির উপর ছাপ-তোলার জন্য নক্সা-খোদাই-করা কাঠের ব্লক ছাড়া, ফর্দ্দমতো বাকী সাজ-সরঞ্জামগুলি জোগাড় করা খুব একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়··· সামান্য চেষ্টা করলেই শহরের দোকানে-বাজারে এসব জিনিষ সহজেই মিলবে। তবে নক্সা খোদাই-করা কাঠের ব্লক সংগ্রহ করার ব্যাপারে হয়তো অসুবিধা ঘটবে। অনেকেরই —বিশেষ যাঁরা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন, তাঁদের ধারণা, এ-ধরণের কাঠের ব্লক বড়-বড় শহর ছাড়া, মফঃস্বল-অঞ্চলে জোগাড় করা খুবই মুস্কিল। যাঁরা কলিকাতায় বাস করেন, তাঁরা অবশ্য বড়বাজার এলাকায় খোঁজ নিলেই অনায়াসে সুলভ-মূল্যে প্রয়োজনমতো ছোট-বড় বিভিন্ন ছাঁদের কাপড়ে ছাপ-তোলার উপযোগী নক্সা-খোদাই-করা কাঠের ব্লক কিনতে পারবেন। তবে যাঁরা মফঃস্বলের বাসিন্দা, তাঁরা যদি অল্প-বিস্তর কষ্টস্বীকার করে কারো সহায়তায় কলিকাতার বড়বাজার-অঞ্চল থেকে প্রয়োজন-মতো ছাঁদের নক্সা-খোদাই-করা কাঠের ব্লকগুলি সংগ্রহের সুব্যবস্থা করেন তো শিল্পচর্চার বিশেষ কোনো অসুবিধা ঘটবে না। এ ব্যাপারেও কারো যদি কোনো অসুবিধা ঘটে, মফঃস্বল-অঞ্চলের কুশলী-সূত্রধরের সহায়তায় তিনি সহজেই প্রয়োজনমতো-ছাঁদে বিভিন্ন ধরণের নক্সা খোদাই-করা কাঠের ব্লক বানিয়ে নিতে পারেন। কাজেই, ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা অনুসারে এ সম্বন্ধে যথাবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত হবে বলে আমাদের ধারণা।

উপরের ফর্দ্দ-অনুযায়ী উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, কাপড়ের বুকে রঙীণ-নক্সার ছাপ-তোলার পালা। এ কাজে হাত দেবার আগে, নক্সার রঙীণ ছাপ-তোলার উপযোগী কাপড়টিকে ভালোভাবে সাবান-জলে কেচে, রোদে শুকিয়ে আগাগোড়া বেশ সমান ও পরিপাটিভাবে 'ইস্ত্রি' (Ironing) করে নেবেন। কারণ, 'ধোয়া-কাপড়ে' (Washed and bleached cloth) নক্সার রঙীণ ছাপ যেমন সুস্পষ্ট-সুন্দর ফুটে ওঠে, 'কোরা-কাপড়ে' (Unbleached and unwashed cloth) তেমনটি হয় না। তাছাড়া আগা-গোড়া সমান ও পরিপাটিভাবে 'ইস্ত্রি' করা কাপড়ের উপরে নক্সা-খোদাই-করা কাঠের 'ব্লকের' রঙীণ-ছাপ যতখানি নিখুঁত-সুন্দর রূপে ফুটে ওঠে, কোঁচকানো-অসমান কাপড়ে কিন্তু তেমনটি দেখায় না···ফলে, শিল্পকারুর নিদর্শনটিও চোখে রীতিমত অসুন্দর ঠেকে। তাই কাপড়ের উপরে রঙীণ-নক্সার ছাপ-তোলার সময়, এ বিষয়ে সজাগ-দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

নক্সার প্রতিলিপি-খোদাই-করা কাঠের ব্লকে রঙের প্রলেপ-লাগানোর উদ্দেশ্যে, 'প্যাড্' বা 'পুঁটলি' রচনার জন্য —বেশ পুরু-খানিকটা তুলো নিয়ে, সেটিকে চৌকোণা (Square) ছাঁদে ছেঁটে, পরিস্কার এক টুকরো কাপড়ে মুড়ে দেবেন। তাহলেই দিব্যি-সুন্দর রঙ-লাগাবার 'প্যাড্' বা পুঁটলি' তৈরী হয়ে যাবে। তবে 'নজর রাখবেন—এমনি ধরণের 'প্যাড্' বা 'পুঁটলির' মাপ যেন সর্ব্বদা নক্সার প্রতি-লিপি খোদাই-করা কাঠের 'ব্লকের' চেয়ে ঈষৎ-বড় হয়··· নাহলে কাপড়ের উপরে নক্সার ছাপ-তোলার সময়, ব্লকের সব জায়গায় আগাগোড়া সমান ও ঠিকমতো রঙের প্রলেপ লাগানো সম্ভব হয়ে উঠবে না।

এতক্ষণ যা কিছু বলেছি সে সবই হলো—কাপড়ের

উপরে রঙীণ-নক্সার ছাপ-তোলার আয়োজন-পর্ব্বের কথা। স্থানাভাবের কারণে, আপাততঃ এই শিল্প-কাজের অভিনব কলা-কৌশলের বিশদ পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠলো না···তাই, আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে সবিস্তারে আলো না করার বাসনা রইলো। (ক্রমশঃ)

——

স্মধীরা হালদার

এবারে বলছি—ভারতের উত্তরাঞ্চলের বিশেষ জনপ্রিয় ও পরম-উপাদেয় একটি মোগলাই-খাবার রান্নার কথা। সুস্বাদু-মুখরোচক এই অভিনব মোগলাই-খাবারটি আমিষ-জাতীয়···নাম—'শামি-কাবাব'। গৃহে কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অতিথি-অভ্যাগত এবং প্রিয়জনদের পাতে সযত্নে এ মোগলাই প্রথায় রান্না খাবারটি পরিবেষণ করে অনায়াসেই সবাইকে খুশী ও পরিতৃপ্ত করে তুলতে পারবেন।

শামি-কাবাব ঃ

উত্তর-ভারতীয় প্রথায় অন্ততপক্ষে ছয়-সাত জনের আহারোপযোগী 'শামি-কাবাব' রান্না করতে হলে যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। এ খাবারটি রান্নার জন্য চাই—একপোয়া মাংসের কিমা, চায়ের পেয়ালার আধ পেয়ালা ছোলার ডাল, একটি বড় কিম্বা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ, গোটা তিনেক কাঁচা লঙ্কা, আধ-ইঞ্চি মাপের একটুকরো আদা, তিনকোয়া রসুন, চার-পাঁচটি গোল-মরিচ, চায়ের চামচের শিকি-চামচ শুকনো-লঙ্কার-গুঁড়ো, চায়ের চামচের শিকি-চামচ গুঁড়ো-জীরা, চায়ের চামচের আধ-চামচ ডালচিনির গুঁড়ো, গোটা চার-পাঁচ লবঙ্গ, প্রয়োজনমতো-পরিমাণে খানিকটা নুন আর ঘি, এবং সেই সঙ্গে চায়ের চামচের শিকি-চামচ শুকনো লেবুর খোসার গুঁড়ো।

উপকরণগুলি জোগাড় হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে, ছোলার ডালটুকু বেশ ভালোভাবে ধুয়ে সাফ্ করে নিয়ে, পরিষ্কার একটি গামলা বা ডেকচিতে রেখে অন্ততপক্ষে ঘণ্টা-ছয়-সাতেক সময় জলে ভিজিয়ে রাখুন। এইভাবে আগাগোড়া ভিজিয়ে নরম করে নেবার পর, ডালটুকু জল থেকে তুলে পরিষ্কার একটি শিলায় মিহি-ছাঁদে বেটে ঘন-থকথকে 'লেই (Paste) বানিয়ে ফেলুন। এবারে পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচালঙ্কা ও আদার টুকরো মিহি-ধরণে কুচিয়ে নিন এবং এ সব উপকরণের বাকী কতকটা অংশ পরিষ্কার শিলায় পিষে লেইয়ের মতো ঘন-থকথকে করে বেটে সযত্নে একটি পাত্রে তুলে রাখুন। তারপর থকথকে ডাল বাটার সঙ্গে, পরিপাটিভাবে জলে ধুয়ে সাফ্-করা মাংসের কিমা, আন্দাজমতো পরিমাণে খানিকটা নুন, সদ্য-কুচানো পেঁয়াজ, আদা, রসুন ও রান্নার বাকী মশলাগুলিকে (লেবুর খোসার গুঁড়ো বাদে) বড় একটি গামলায় বা ডেকচিতে রেখে বেশ ভালোভাবে একত্রে মিশিয়ে, সেই 'মিশ্রণটিকে' (Mixture) আগাগোড়া মিহি-ধরণে বেটে 'লেই' বানিয়ে ফেলুন।

এবারে ঐ 'মিশ্রণটিকে আগাগোড়া লুচি বা রুটি-বানানোর সময় ময়দার 'লেচীর' ছাঁদে কিম্বা বড়ার মতো ছোট-ছোট আকারে বিভক্ত করে নিন এবং সিঙাড়া-কচুরী রান্নার সময় সেগুলির ভিতরে মশলার 'পুর' ভরে দেবার যেমন রীতি, ঠিক তেমনিভাবেই এই 'মিশ্রণের' প্রত্যেকটি ছোট-টুকরোর মধ্যে অল্প-অল্প পরিমাণে, ইতিপূর্ব্বে বানিয়ে-রাখা পেঁয়াজ, রসুন, আদা ও কাঁচা-লঙ্কার কুচো আর শুকনো লেবুর-খোসার গুঁড়ো ভরে দিয়ে, 'মিশ্রণের' টুকরোগুলিকে বড়ার মতো গোল-চ্যাপ্টা ছাঁদে গড়ে তুলুন।

এ কাজ সারা হলে, উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সে পাত্রে আন্দাজমতো ঘি ঢেলে, গরম-ঘিয়ে গোল-চ্যাপ্টা বড়ার মতো ছাঁদের 'মিশ্রণের' টুকরো-গুলিকে ভেজে নিন···ভাজার ফলে, টুকরোগুলির চেহারা বেশ বাদামী-রঙের হয়ে উঠলেই, সেগুলিকে হাতা, চামচ

সানলাইট—উৎকৃষ্ট ফেনার, খাঁটি সাবান

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

বা খুন্তীর সাহায্যে উনানের আঁচে বসানো রন্ধন-পাত্র থেকে তুলে নিয়ে সযত্নে অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে সরিয়ে রাখুন। তাহলেই উত্তর-ভারতীয় প্রথায় 'শামি-কাবাব' রান্নার কাজ শেষ হবে। তবে প্রিয়জনদের পাতে বিচিত্র এই মোগ্‌লাই-খাবারটি পরিবেষণের আগে, সযত্নে তৈরী 'শামি-কাবাবের' টুকরোগুলির উপর কিছু কাঁচা-পেয়াজের ও কাঁচা-লঙ্কার কুচো ছড়িয়ে দেবেন···খাবারটি খেতে তাহলে আরো অনেক বেশী সুস্বাদু মুখরোচক হয়ে উঠবে।

উত্তর-ভারতীয় প্রথায় 'শামি-কাবাব' রান্নার এই হলো, মোটামুটি নিয়ম।

পরের সংখ্যায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আরো কয়েকটি বিচিত্র-উপাদেয় জনপ্রিয় খাবারের রন্ধন-প্রণালীর হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

বাস-কণ্ডাকটার—আহা, নামুন···নামুন মশাই চট্‌পট্‌···'লেট্‌' (Late) হয়ে যাচ্ছে!···দেখছেন না, কত লোক ওঠবার জন্য···

নামন্ত-আরোহী— কিন্তু, কোথায় নামবো?···ওঁদের মাথার ওপর!···বাসে ওঠানোর সময় তো মহা-খাতির···আর নামানোর সময়েই যত গণ্ডগোল!···

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

❋ শতবর্ষ পরে ❋

ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকার সেবকগণ মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়কে ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে প্রতি বৎসর তাঁহার আষাঢ় সংখ্যায় শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে এবং কোটি কোটি প্রণতি জানাইয়া ভারতবর্ষ সম্পাদন-কার্যে তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। ৫০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার ২ মাস পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতবর্ষ কাগজের লেখার প্রুফ সংশোধন করিবার সময় সহসা সন্ন্যাস রোগে সাধনোচিতধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন। আমরা ভারতবর্ষের জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসবে নানাভাবে তাঁহার কথা স্মরণ করিয়াছি। গত ১৯শে জুলাই তাঁহার জন্মের শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব উপলক্ষে কবিবরের কথা সর্বত্র স্মরণ করা হইয়াছে।

কবিপুত্র শ্রীদিলীপকুমার রায় ও কবিকন্যা শ্রীমতীমায়া বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও পত্রপত্রিকায় কবির কথা শুনাইয়াছেন। কবি-পুত্র দিলীপকুমার সঙ্গীত রচনায় যেমন সিদ্ধহস্ত, তেমনই তাঁহার সুকণ্ঠে কবির সঙ্গীতও সর্বদা গীত হইয়া থাকে। তিনি ১৭ই জুলাই নেতাজীভবনে নেতাজীর কথা স্মরণ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের গানও শুনাইয়াছেন। কবি-কন্যা শ্রীমতীমায়া দেবী দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ কবিতাটি বার বার আবৃত্তি করিয়া সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তাহা এইরূপ—

> খুলে দিও দ্বার হেসে
> মুখে যেন পড়ে এসে,
> উন্মুক্ত বাতাস আর আকাশের আলো
> দেখি যেন শ্যামধরা
> শস্যভরা বসুন্ধরা
> এতদিন যাহাদিগে বাসিয়াছি ভালো।

১৯শে জুলাই শুক্রবার হইতে কলিকাতা মহাজাতি সদনে সাতদিনব্যাপী দ্বিজেন্দ্র-উৎসব করিয়াছেন—দ্বিজেন্দ্র শতবার্ষিক কমিটী। প্রথম দিনে আচার্য ডাঃ কালিদাস নাগ সভাপতিত্ব করেন, অধ্যক্ষ শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী মঙ্গলাচরণ করেন, পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সংস্কৃত ভাষায় স্বরচিত দ্বিজেন্দ্রপ্রশস্তি পাঠ করেন এবং কবিপুত্র শ্রীদিলীপকুমার রায় দ্বিজেন্দ্রলালের বহু সঙ্গীত গান করিয়া সমবেত সুধীবৃন্দের মনোরঞ্জন করেন।

কয়দিন ধরিয়া বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে বহু মন্তব্য ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়ায় দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মের শতবর্ষ পরে পাঠকগণ দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে বহু নূতন সংবাদের সন্ধান পাইয়াছেন। গত এক বৎসরকাল আমরাও ভারতবর্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে বহু মনীষীর রচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া পাঠকগণকে তাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছি। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর দ্বিজেন্দ্রলালের পিতৃভূমি ও জন্মভূমি। অবশ্য যে ভিটায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া বিক্রীত হওয়ায় সে ভিটার চিহ্নও আজ নাই। কৃষ্ণনগর হইতে তরুণ সাহিত্যিক ও দেশসেবক শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায় জানাইয়াছেন—দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম ভিটার বুক চিরে রেলষ্টেশন যাবার নূতন রাস্তা হইয়াছে। তাহার পাশে এক-খণ্ড জমী সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণনগরে গঠিত দ্বিজেন্দ্রস্মৃতিরক্ষা সমিতি 'দ্বিজেন্দ্রভবন' নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন ; ঐ জমীর উপর গত বৎসর দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মদিনে দ্বিজেন্দ্র-কন্যা শ্রীমতী মায়া দেবী একটি স্মৃতি স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিয়া আসিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগর দ্বিজেন্দ্র-জন্ম-শত-বার্ষিকপরিষদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের সুলভসংস্করণ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যসাহিত্য আলোচনার জন্য দ্বিজেন্দ্র-অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করিতেও আবেদন জানাইয়াছেন। কৃষ্ণনগরের নিকট জলঙ্গী নদীর উপরে যে নূতন পুল নির্মিত হইয়াছে, তাহার নামও দ্বিজেন্দ্র-সেতু রাখার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে। কৃষ্ণনগর সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত বিখ্যাত বাগ্মী লালমোহন ঘোষের বাসগৃহ সরকার হইতে ক্রয় করিয়া তাহা দ্বিজেন্দ্রভবনে পরিণত করার জন্যও চেষ্টা করা হইতেছে। খ্যাতিমান্ শিল্পী শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাল দ্বিজেন্দ্রলালের এক মূর্তি নির্মাণ করিতেছেন। তাহাও কৃষ্ণনগর সহরের কেন্দ্রস্থলে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হইবে। দ্বিজেন্দ্রভবন

আবির্ভাব—১৯শে জুলাই, ১৮৬৩ তিরোভাব—১৭ই মে, ১৯১৩

প্রতিষ্ঠিত হইলে তথায় দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের পাঠাগার, সংগ্রহশালা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া দ্বিজেন্দ্রসাহিত্য গবেষণার কেন্দ্র করার চেষ্টা করা হইবে। মোটের উপর কৃষ্ণনগরবাসীরা গত একবৎসর ধরিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিরক্ষার জন্য নানাভাবে উৎসাহের সহিত কাজ করিতেছেন।

কলিকাতা সহরে দ্বিজেন্দ্রলালের বাসগৃহ ছিল। এখন সে গৃহ পরহস্তগত। একটি ছোট পথের নাম ডি-এল রায় ষ্ট্রীট করিয়া কলিকাতাবাসীরা তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। যাঁহাদের চেষ্টায় সপ্তাহব্যাপী দ্বিজেন্দ্রসাহিত্য ও সঙ্গীতের আলোচনা সম্ভব হইয়াছে, তাঁহারা চেষ্টা করিলে কলিকাতা সহরেও চারণকবি দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্পাদিত হইতে পারে—আমরা এবিষয়ে দ্বিজেন্দ্র-ভক্ত তরুণের দলকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

কলিকাতার কোন প্রকাশ্য স্থানে দ্বিজেন্দ্রলালের মূর্তি স্থাপিত হইলে প্রতিবৎসর তাঁহার জন্মদিনে লোক তথায় সমবেত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইবে, এ বিষয়ে কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হইলে সহজেই এ কাজ সুসম্পাদিত হইতে পারে। কলিকাতা সহরের লোকসংখ্যা যেভাবে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে সহরের নূতন এলাকাগুলিতে বহু কেন্দ্রীয় পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন হইবে। এইরূপ একটি নূতন এলাকায় একটি নূতন পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের নামে নামাঙ্কিত করিলে ও তথায় দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের সংগ্রহ রক্ষা করিলে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইবে। কলিকাতা সহরের নূতন এলাকায় এখনও বহু বড় রাজপথের নামকরণ করা হয় নাই—আমরা কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে সেরূপ একটি বড় রাস্তার নাম 'দ্বিজেন্দ্র পথ' রাখিতে অনুরোধ করি।

কৃষ্ণনগর বাংলাদেশের সংস্কৃতির কেন্দ্রস্বরূপ। সেখানে একাধিক কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। একটি কলেজের নাম 'দ্বিজেন্দ্র কলেজ' রাখা যাইতে পারে। বাংলার সংস্কৃতি ও স্বাধীনতাসংগ্রামের উৎসাহদানে দ্বিজেন্দ্রলালের দানের কথা বাংলার লোক যাহাতে সর্বদা স্মরণ করে সে জন্য নানাভাবে ব্যবস্থা হইতে পারে। সুখের কথা, চীন-যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে প্রত্যহ জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম প্রচারের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে প্রায় প্রত্যহই দ্বিজেন্দ্রলালের গান গীত হওয়ায় জনসাধারণ বিস্মৃতপ্রায় গানগুলি আবার স্মরণ করিয়া আবৃত্তি করিতেছে। তাঁহার দেশাত্মবোধক ভাবে পরিপূর্ণ নাটকগুলির অভিনয়ও সুপ্ত দেশবাসীর মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করিতে সাহায্য করিবে। কবিতা, গান, নাটক প্রভৃতির মধ্য দিয়া দেশবাসী সর্বদা দ্বিজেন্দ্রলালের কথা স্মরণ করুক, তাহা হইলে জনগণের মধ্য হইতে ক্লৈব্য ও ভীরুতা দূর হইবে, জাতি সাহস, বল ও বীর্য লাভ করিয়া জাগ্রত হইতে সমর্থ হইবে।

কবিবরের এই কথা যেন আমরা সর্বদা মনে রাখি —

'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা
মানুষ আমরা, নহি ত মেষ।'

কবিবরের জন্ম শত-বার্ষিক পূর্তি উৎসব উপলক্ষে বার বার যেন তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে কোটি কোটি প্রণতি জানাই।

* * *

কাব্য-কণা

"ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ,
—ওমা তোমার চরণ দুটি, বক্ষে আমার ধরি।
আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি।"

* * *

"ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছল জলদল কলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদু হাসি
ভেসে আসে পাপিয়ার তান
আজি এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল,
সে মরণ স্বরগ সমান।"

* * *

"সাঙ্গ আমার ধুলা খেলা, সাঙ্গ আমার বেচা-কেনা
এয়েছি করে হিসেব নিকেশ, যাহার যত পাওনা দেনা,
আজি বড়ই শ্রান্ত আমি, ওমা কোলে তুলে নে মা,
যেখানে ঐ অসীম পাহাড়, মিশেছে ঐ অসীম কালো।"
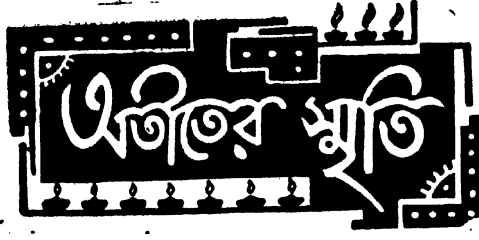
সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে, কলিকাতা শহরের বুকে বিলাতী-কেতায় রঙ্গালয়-থিয়েটারগুলি কিভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল, তার কিঞ্চিৎ পরিচয় মেলে সেকালের সমানভাবে 'কুখ্যাত ও বিখ্যাত, ইংরাজ সাহিত্যসেবী-সাংবাদিক, বিলাসী-উচ্ছৃঙ্খল উইলিয়াম হিকি (Willam Hicky) সাহেবের সত্য-মিথ্যার বিবিধ রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক তথ্য-সম্পদে ভরা পরম-উপভোগ্য বিচিত্র 'স্মৃতি-কাহিনী' থেকে। যদিও একালের কোনো কোনো সুধী-গবেষকের মতে, উইলিয়াম হিকি সাহেবের এই 'স্মৃতি-কাহিনীর' বহু বিবরণই ঐতিহাসিক-তথ্যের এবং সত্যের অপলাপে পরিপূর্ণ··· শস্তা সাংবাদিকতার অপকৌশল আর নিছক আত্ম-প্রচারের দুরভিসন্ধি-প্রসূত···অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট, তবু তাঁর ঘটনা-বহুল জীবনেরছোট বড়, ভালো-মন্দ যে সব বিচিত্র কৌতূহলোদ্দীপক চিত্রের নমুনা পাওয়া যায়, তাই থেকে সেকালের দেশী ও বিলাতী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নর-নারীর চরিত্র, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, বিলাস-আড়ম্বর আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রচুর জ্ঞাতব্য উপাদানের সন্ধান মেলে। হিকি সাহেবের 'স্মৃতি-কাহিনীর' পাতায় এমনি নানান্ উপাদানের মধ্যেই সন্ধান পাওয়া যায়—সেকালে এদেশের বিলাতী-রঙ্গমঞ্চের গঠন ও পরিচালনার কাজ কিভাবে চলতো, তারই পরম-উপভোগ্য একটি প্রতিচ্ছবির টুকরো।

* * *

(উইলিয়াম হিকি রচিত 'স্মৃতি-কথা' (Memoirs) হইতে)

Upon my return to Bengal in 1783 I immediately became intimate with Mr. Francis Rundell, who had, during my absence in Europe, come out as an assistant surgeon in the Company's service. He was a fine dissipated fellow, and although in years not more than twenty-five, in constitution he was double that from early and continued excess. Both his features and person were uncommonly fine, eyes more piercingly expressive than even Garrick's, with a voice of perfect harmony and great strength at the same time. Altogether, no man was ever more admirably calculated for the stage, and the possession of such qualifications probably first occasioned his turning his turning thoughts to the sock and buskin. He was greatly attached to everything theatrical, having performed several characters in England for his own amusement or to serve actors of his acquaintance. His family violently opposed his

making the stage a profession to live by, in consequence of which he served under a man of eminence for several years.

At the time of Mr. Rundell's arrival in Calcutta there was a most capital and complete theatre supported by voluntary subscriptions. A schism had recently occurred amongst the gentlemen performers originating in a contention about filling the firsi-rate parts, each individual supposing himself the best qualified. This dispute had been carried to so great a length that some duels had been in consequence, and at last they could muster a sufficient number to act any play, besides which from a general profusion and extravagance in fine dresses the theatre become involved in debt to the amount of upwards of thirty thousand sicca rupees

Mr. Rundell in a few weeks after becoming an inhabitant of Calcutta made an offer to the proprietors or subscribers to undertake the sole and entire management of the theatr on his own account, agreeing to find performerts and get up plays at leat once a week during the months of November, December, January and February. He further proposed, provided the proprietors would allow him to receive the admission money of one gold mohur each person, or for a box ticket, which was the price that always had been paid, and eight sicca rupees for the pit, he would bind himself to pay off the whole amount of debt due from the theatre. and never call upon the proprietors for any supplies of cash under any pretence whatsoever. A general meeting of the proprietors was thereupon summoned; before whom Mr. Rundell's proposal being laid, it was debated upon and finally unanimously accepted. A deed was prepared between the parties and executed, and Mr. Rundell forthwith put into possession of the entire premises. There was a very good dwelling-house upon the ground in which he resided.

The settlement soon found the advantages arising from this grant not only in an increase of their favourite amusement, but also that theatrical performances were got up and acted in a style therefore unknown in India. Mr. Rundell's convival disposition, his uncommonly pleasing and conciliating manners and superior abilities rendered him extremely popular so that everyone who had stood aloof under the old system were now ready and willing to come forward and lend their individual aid in the way best adapted to their capacities, of which, the new manager was perfectly competent to decide, besides which these voluntary performers had the benefit of receiving his advice and instructions whereby the style of acting was greatly improved.

So pleased and gratified were the settlement at the extra-ordinary alteration that the house was crowded whenever opened, and Mr. Rundell soon found he was likely to have an admirable good thing of it. In the course of the first season he cleared off the whole of the debts due from the theatre, the subsequent profit going into his own pocket. The disbursements, however were unavoidably very large, for Mr. Rundell prudently and sagaciously adopted every measure he thought likely to please and gratify those gentlemen who assisted him in "strutting and fretting their hour upon the stage". He not only paid without a murmur for whatever dresses they chose to make up for the different characters they represented, but on the nights of performance, after all was over, gave a splendid supper upon the stage, where claret, champagne and burgundy were most liberally dealt out, many of the guests continuing at the table until daylight. I have know him more than once pay eighty sicca rupees a dozen for the champagne. As from long habit and a strong head he could bear a great deal of wine he always contrived to make his young heroes gloriously drunk, and by so doing became the most popular man in Bengal.

Mr. Rundell's talents as an actor were

certainly of the first rate. Upon Mr. William Burke seeing him perform '*Hamlet*', he declared to me he thought him quite equal to Garrick, a high complement from a man of Mr. Burke's judgement and who had always been enthusiastic admirer of our English Roscius. The fact is that really nothing could surpass Rundell's mode of acting several parts, especially those of *Hamlet*, Jaffier or Pierre in *Venice Preserved*; King Lear, Othells, Richard the Third, Oresten in *The Distressed Mother*, Leom in *Rule a Wife and Have a Wife*, and Lord Townly in *The Provoked Husband*, in all of which characters, except Othello, Mr, Garrick shone conspicously.

Mr. Rundell, not withstanding all his drawbacks, finding that his emoluments far surpassed his most sanguine expectation, determined to send to England for some second-rate actors, both male and female, for theretofore all women characters had been filled by male-sex, and although there were two gentlemen, Mr. Bride and Mr, Norfar, who excelled in female parts, still the want of women was materially felt. He ultimately succeeded in getting three very tolerable femalee performers from London and some male understrappers.

* * *

বাণিজ্য-তথা-সাম্রাজ্যউপনিবেশ-প্রসারী সেকালের ভারত-প্রবাসী বিলাতী-সাহেবদের নব-প্রবর্ত্তিত ভাবধারা-আদর্শে উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত শিক্ষিত-অভিজাত কলিকাতার প্রগতিশীল-বিলাসী অধিবাসীদের অনেকেরই মনে ক্রমশঃ প্রবল উৎসাহ জেগে উঠেছিল—পাশ্চাত্য-রীতি অনুকরণে ছোট-বড় সৌখিন-রঙ্গমঞ্চ গড়ে তুলে বিভিন্ন ধরণের নাটকাভিনয়ের আয়োজন করার দিকে। সেকালের এ সব নাটকাভিনয়ের আসর গড়ে উঠেছিল তখনকার আমলের বিলাসী-বিত্তশালী কলারসিক-অভিজাত অধিবাসীদের সখের খাতিরে ও পৃষ্ঠপোষকতার দৌলতে। বাঙলা দেশে দেশীয়-ভাষায় নাটকাভিনয়ের জন্য পেশাদারী রঙ্গালয়ের সূত্রপাত—খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়েরও কিছু পরে। তবে ইংরাজী-ভাষায় রচিত দেশী নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে, কলিকাতায় বিলাতী-কেতার সর্ব্বপ্রথম রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল—১৭৯৫ সালে ২৭শে নভেম্বর তারিখে...অর্থাৎ, এ শহরে ইংরাজ-শাসকদের ভারতীয়-সাম্রাজ্যের রাজধানী আর প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত হবার প্রায় একুশ বছর বাদে। এ রঙ্গালয় সৃষ্টি করেছিলেন একজন পাশ্চাত্য অধিবাসী... সেকালের ভারত-প্রবাসী বিলাতী-সমাজের লোকজনের আনন্দ-বিধানের উদ্দেশ্যে, ইংরাজী-ভাষায় দেশী-নাটকের কিছু-কিছু দৃশ্য অনুবাদ করে, তারই অভিনয় দেখানোর অভিনব ব্যবস্থা হয়েছিল এখানে। কথাটা শুনলে হয়তো অবাক হবেন—সেকালের এই অভিনব রঙ্গালয়টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—হেরাসিম্ লেবেডেফ্ (Herasim Lebedeff) নামে ভারত প্রবাসী এক রুশীয় Russian) নাট্যকলাবিদ...এদেশের কোনো অধিবাসী নয়। এদেশে লেবেডেফ্ সাহেবের রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠার বিচিত্র-বিবরণ আর বাঙলা নাটকাভিনয়ের ক্রমোন্নতির ইতিহাস পরে যথাসময়ে বিশদভাবে আলোচিত হবে...তাই আপাততঃ সে-প্রসঙ্গের বিস্তারিত-আলোচনা মুলতুবী রেখে, বিগত-যুগের সুপ্রসিদ্ধ নট-নাট্যকার ও বিশিষ্ট-সাহিত্যিক স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের রচিত 'কৌতুক-যৌতুক' গ্রন্থ থেকে 'থিয়েটারে পিসু' নামে অনবদ্য রস-রচনার কতকাংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো...এই উদ্ধৃতাংশটি থেকে একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠকপাঠিকারা সেকালের বাঙলা-রঙ্গমঞ্চে নাটকাভিনয়ের কতকটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাবেন।

* * *

প্রাচীন কলিকাতার প্রথম রঙ্গালয়-ভবন

(অমৃতলাল বসু রচিত 'থিয়েটারের পিছু কাহিনী হইতে)

মহাষ্টমীর দিন সন্ধ্যার সময় বিধুমুখী-হোটেলে ডিনার খেয়ে মামা-ভাগ্নে থিয়েটার উদ্দেশ্যে দুর্গা বলে যাত্রা ক'রলেন।

... ...

দীপাবলীতেজে উজ্জ্বলিত দ্বারে উপস্থিত হ'য়ে দেখি যে বোর্ডে-মারা এক একখানা পোষ্টারের সামনে হবু দর্শকের এক একটা ভিড় জ'মে গেছে; তারা প্লাকার্ড প'ড়্‌ছে আর নম্বর গুণ্‌ছে—এ থিয়েটারে যাবে কি অন্য থিয়েটারের টিকিট কিন্‌বে, তা ঠিক ক'র্‌তে পার্‌ছে না। কারুর মত এইখানে-ই যাওয়া যাক্, ভেট্রিনারি ট্রেজি-ডিয়ান যাদু জানা আজ এখানে হিরোর পার্ট নেবে—ঐ দেখ্ ক্যাটালগে লেখা র'য়েছে সে যা এক্ট করে, বুঝেছিস্—ষ্টেজের উপর চর্‌কী ঘুরিয়ে দেয়, আওয়াজ যায় বোধ হয় ও-পারে ঘুসুড়ির চড়া অব্‌ধি। আর এক জন ব'ল্লে, "আমার সঙ্গে আয় দেখি, আমি যেখানে নিয়ে যাব, সেখানে ৬নং পালা আছে, তার উপর গালবাঁকা ভৃতির নাচ, সোমের মুখে যখন এক একটা লাফ মারবে, তখন একেবারে চক্ষু স্থির হ'য়ে যাবে।"

এদের তর্ক-বিতর্ক হ'তে লাগ্‌লো—আমরা দু'জন টিকিটঘরে গিয়ে দু'খানা টিকিট চাইলুম্, টিকিটবাবু গম্ভীরভাবে ব'ল্লেন, "ফিল্ডাপ' (filled-up)।" আমরা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, "দু' টাকা?" টিকিটবাবু ব'ল্লেন, "এখন-ও পেলে পেতে পারেন।"

পরে বুঝেছিলুম্, টিকিটবাবু যদু জানার চেয়ে-ও বড় এক্টার, কেন না, এক টাকার যায়গায় তখন ও দু'খানা বেঞ্চি পুরো খালি আছে, আর দু'টাকায় জন ২৫।৩০ লোক মাত্র। বোধ হয়, অভিনয়ের বেজায় আওয়াজ শোন্‌বার জন্যে আগে থাক্‌তে আমাদের শ্রবণশক্তিকে শানিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে-ই রঙ্গালয়ের প্রাঙ্গণে হট্ টি, পান, চুরুট্, সিগেরেট্, বিড়ি, আইস্, লেমনেড্, ঘোলের সরবৎ প্রভৃতি শব্দ; পিকুলো, ট্রেমেলো, প্রোপেলো, বাস্ প্রভৃতি উদারা মুদারা তারা গ্রামনির্গত স্বরবৈচিত্র্যে একটা অভিনব হরিবল্ হারমনির সৃষ্টি ক'র্‌ছে। এমন সময়ে স্কুল বস্‌বার সঙ্কেতস্বরূপ একটা পেটাঘড়ী ভয়ঙ্কর "ঢং" ক'রে বেজে উঠ্‌ল, আমাদের শ্রবণশক্তি-ও আর এক পর্দ্দা সাউণ্ড্-প্রুফ হ'ল। ভাল যায়গা বেছে নেবার জন্য চেয়ার দখল ক'রে দেখি যে ড্রপ্‌সিন্‌খানিতে যে চিত্রটি আঁকা হ'য়েছে, তা' সম্পূর্ণ সাহিত্যসঙ্গত। পর্দ্দাখানির উপর বর্ণমালার খেলায় যেন চড়কের মেলা ব'সে গেছে। সুপারি, দেশালাই, শেলায়ের কল, জলধর ছাতা, স্বদেশী-সাবান, জলদোষ, বালাপোষ, মনতোষ তৈল প্রভৃতি কত লেখা-ই না লিখেছে; ভাব্‌লেম্, আর্টের এ একটা নতুন নমুনা বটে! যখন পয়সা দিয়ে টিকিট কিনেছি, তখন দশ মিনিট ধ'রে বার চেরেক এই বিজ্ঞাপন প'ড়্‌তে-ই হবে।

কন্‌সার্ট্ বাজ্‌লো, গ্যালারির দর্শকরা বস্‌বার যায়গা নিয়ে যন্ত্রবাদনের সঙ্গে কণ্ঠস্বর যোগ ক'রে দিলে।

এইবার অভিনয় আরম্ভ। পর্দ্দা উঠ্‌লো, রাজসভায় ধূলো উড়্‌লো, বোধ হয়, সিফ্‌টাররা এইমাত্র একবার বুরুস বুলিয়ে গেছে। সিংহাসনে রাজা উপবিষ্ট, রাজার পিছনে হলে সাদা কালো পাথর তুলিকা-সম্পাতে বিন্যস্ত, কিন্তু সিংহাসনখানির আধ ইঞ্চি তক্তার উপর দেড় ইঞ্চি ধূলোর তোষক, সিংহাসনের উপর একখানি সখীর সবুজ রংকরা চুম্‌কী বসানো ওড়্‌না ঢাকা; ক্ষত্রিয় রাজা ধনুর্দ্ধর সিংহ তার উপর উপবিষ্ট, দক্ষিণে মন্ত্রী, বামে সেনা-পতি, তিন জন সভাসদ্ দু'দিকে দাঁড়িয়ে। রাজা একবার সিংহাসন থেকে উঠে এসে দাঁড়ালেন, বোধ হয়, তাঁর সমস্ত সাজগোজ দর্শকদের দেখাবার জন্য। রাজার মাথায় বাব্‌রি চুল, তেল-মাখানো তালগাছের জটার মত দু'দিকে ঝুল্‌ছে, তার উপর ডাক-বসানো টিনের মুকুট, মুকুটখানির ১০।১২টি শিং বেরিয়েছে। নটের কর্ত্তব্যবোধে রাজা মুখে রং মেখেছেন, তাতে তাঁকে অনেকটা স্যাক্‌সান্‌জাতীয় লোক ব'লে-ই বোধ হয়। কিন্তু হাতের কব্জীর দিকে নজর প'ড়লে ই ইথিওপিয়া মনে আসে। রাজার পায়ে এক জোড়া পুরাতন জুতো, জরি সব খ'সে গিয়েছে, তার উপর লাল মেজেন্টা রংকরাফুল-মোজা, তার উপর এক জোড়া নি-ব্রিচ্ হাঁটুর নীচে ইলাস্‌টিক্ দিয়ে আঁটা, গায়ে সলমা-চুম্‌কির কায করা একটি কোলকাটা কোট, কোটের নীচে তিন দিকে কালোর লাগানো চতুষ্কোণ

ক্রিমেশনদিগের ব্যবহার-উপযোগী চীর-খণ্ড। রাজার কণ্ঠে, গলায়, কাণে, মোগলাই পাগ্‌ড়ীতে, মণিবন্ধে, কাঁকালে, কোমরে, যত বড় বড় মুক্তা ঝল্‌মল্‌ কর্চ্ছে; সে রকম এক সাইজের অমন বড় মুক্তা পঁচিশটে পেলে হায়দ্রাবাদের নিজাম ও আপনাকে ধন্য মনে করেন। মুক্তাক্রয়ে থিয়েটারের ম্যানেজারেরা একেবারে মুক্তহস্ত। সেনাপতিকে দেখ্‌লে-ও বডি-অফ-অল্‌-নেশন ব'লে মনে হয়, জগতের সমগ্র জাতির বিজয় নিশান তিনি স্ব-শরীরে বহন করে আছেন। মন্ত্রী বেচারী-ই খালি একরাশ সিরাজগঞ্জ পাট মাথায় মুখে জড়িয়ে একটা ময়লা খিড়কি-দার পাগ্‌ড়ী আর তদবস্থ জোব্বা প'রে ছিলেন। সভাসদ্‌ দু'জন বোধ হয়, এতক্ষণ বাইরে পান-বিড়ি বেচ্‌ছিল, তাড়াতাড়ি এসে দু'টো ক্রিটোনের ঝল্‌ঝ'লে আল্‌খাল্লা প'রে এ্যাপিয়ার হ'য়েছে। এক জন পাগ্‌ড়ী বেঁধে নিয়েছিল, আর এক জন তখন-ও বাঁধছিল।

এখানেই বলে রাখি, ১৯১৯এর অভিনেতারা, অন্ততঃ বড় বড় অভিনেতারা, যাঁরা ভেটারেন্‌ বা ভেট্রেনারি ব'লে নিজেদের নাম বিজ্ঞাপিত করেন, তাঁরা নিজের নিজের পোষাক নির্ব্বাচনে দেশ কাল পাত্র সব বিচার ত্যাগ ক'র্‌তে প্রস্তুত, যদি তাঁদের আর্শি তাঁদের বলে, 'এই যে সাজ্‌ সেজেছ, এতে-ই তুমি রমণী-মোহন'। দেখ্‌লুম, কোন অভিনেতা-ই মাথার পাগড়ি কপালের উপর পরেন নাই, পাছে অত কষ্টের জল দিয়ে পাতাকাটা সিঁথেটুকু ঢাকা পড়ে।

যা হোক্‌, অভিনয় আরম্ভ হ'ল; প্রোগ্রামে দেখ্‌লুম, বেগে দূতের প্রবেশ, প্রোগ্রামের বেগ্‌টা প্রথমে সাম্‌লে নিয়েছিলুম, তবে দূত যখন ষ্টেজে বেগে প্রবেশ ক'র্‌লে, তখন একটু চম্‌কে উঠ্‌তে হ'য়েছিল। দূতটি জীর্ণ-শীর্ণ কালো কোলো, তেলচুকচুকে আর একেবারে স্প্রিংয়ে গড়া; সেকালে ছেলেদের খেল্‌না তালপাতার সেপাই বিক্রী হ'ত, কাঠিটে ঘোরালে-ই সেপাই একেবারে দু'হাত দু'পা এঁকিয়ে বেঁকিয়ে দুম্‌ড়ে ছেলেদের আনন্দবর্দ্ধন ক'র্‌ত; দূতরাজ-ও বোধহয় সেইরূপ সাফল্য লাভ ক'রেছিল, কেন না, উপরের মহিলাসনে একটি খোকা না খুকী অনেকক্ষণ থেকে কাঁদছিল, দূতের অভিনয় আরম্ভ হতেই কিন্তু শিশু নীরব হয়ে গেল। দূতের ভূমিকায় বেশী কথা ছিল না, দূত যে কথা কয়টি ব'ল্‌লে, তার ভাবার্থ এই যে শিপ্রানদীর অপর পারে মবারকদ্দৌলা খাঁ এসে সসৈন্য শিবির সংস্থাপন ক'রেছেন, শীঘ্রই নগর আক্রমণ ক'র্‌বেন।

বলা বাহুল্য, নাটকের ঘটনাস্থল মাড়োয়ার প্রদেশ, কিন্তু কবি তাঁর কাব্যকে ফুটিয়ে তুল্‌তে মিউনিসিপ্যালিটী থেকে লাইসেন্স নিয়ে উজ্জয়িনী হ'তে শিপ্রানদী মাড়োয়ারের মরুভূমিতে চালান ক'রেছেন। দূত এপ্রেন্টিস, কাজে ঢুকেই প্রথমে একখানি সামাজিক নাটকে দুর্ভিক্ষের পার্ট পায়, তাতে একটি-ও কথা ছিল না, কিন্তু তার নগ্ন দেহের উপরার্দ্ধে পঞ্জরশোভা দেখে দর্শকরা একেবারে বিস্ময়ে বিমোহিত হ'য়েছিলেন, আর সদানন্দ শীল মহাশয় দুর্ভিক্ষকে একটি রূপার মেডেল প্রদান করেন, সেই অব্‌ধি সকলে তাকে দুর্ভিক্ষ ব'লে ডাক্‌তো, আর সে-ও ঐ নামে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে ক'র্‌তো। তাকে একটি ছোটখাটো দূতের পার্ট দেওয়াতে সে বড়-ই চ'টে গিয়েছিল, সেইজন্য তার পার্টের গোটা আষ্টেক লাইন কথা ব'লতে এমন মুখব্যাদান, চক্ষুর ঘূর্ণায়মান, হস্তপদ সঞ্চালন, বক্ষে মুষ্ট্যাঘাত ক'র্‌লে যে তার মনে মনে হ'ল যেন লোক বুঝ্‌তে পারে যে পার্ট পেলে সে যদু জানাকে-ও ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারে। কিন্তু তা-ও বলি, উপর থেকে মেয়েরা খল্‌খল্‌ ক'রে হেসে উঠ্‌লে-ও দূতের হাত-পা নাড়া আর ওঃ ওফ্‌ শব্দ শুনে ভাল ভাল দর্শকরা-ও ঘন করতালিধ্বনি ক'রেছিলেন।

দূতের মুখের বার্ত্তা পেয়ে মহারাজ ব'ল্লেন, পামর মবারকদ্দৌলার এতবড় স্পর্দ্ধা যে আমার রাজ্য আক্রমণ ক'র্‌তে আসে? মন্ত্রী এখন কি করা যায়!' রাজার স্বর গম্ভীর কর্কশ তীব্র ছাদস্পর্শী! মন্ত্রী উত্তর দিলেন, দেখা যাক্‌, সেনাপতি মহাশয় কি বলেন।' মন্ত্রীর গলার সুর স্বভাবতঃ পিয়ানোর উপর পৌছায় না, তার উপর আবার একটু আর্টের-ও আভাস আছে, কেন না বাৎস্যায়নের মতে মন্ত্রীর মন্ত্রণা রাজার কর্ণাগ্রমাত্রে-ই প্রবেশ ক'র্‌বে, অন্যত্র তাহার গতি নিষেধ। তখন রাজা সেনাপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'র্‌লেন, সেনাপতি চক্ষু ফেরালেন দূতের দিকে, চক্ষু যে কেবল ফিরালেন, তা নয়, সেই বড় বড় সুগোল চক্ষু দুটি বার দুই তিন ঘুরিয়ে নিলেন এবং সেই ঘূর্ণনলীলা যাতে কোন দর্শকের-ই

লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, সেই জন্য মিলিটারিচালে ফুট্-লাইটের কাছ পর্য্যন্ত এগিয়ে এলেন। তার পর পীটস্থ বন্ধু-বিশেষের প্রতি দৃষ্টি রেখে দূতকে উদ্দেশ ক'রে বল্লেন—

রে দূত,
ভূতগ্রস্ত হইয়াছ তুমি,
মনে মনে কুৎ করি আমি।

আমার ন্যায় জনকতক দর্শক ভাব্‌লেন যে দূতটি একটু আগে ষ্টেজে দাঁড়িয়ে যে রকম হাত-পা খিঁচেছিলেন তাই লক্ষ্য ক'রে-ই সেনাপতি মহাশয় তাকে ভৎসর্না ক'চ্ছে্ন, কিন্তু পশ্চাদ্বর্ত্তী পংক্তি সে ভ্রান্তি দূর ক'রে দিলে,—

কিম্ভূতকিমাকার এ কি সমাচার!
কর্ত্তা-কর্ম্ম-ক্রিয়া-হীন
বার্ত্তা দেহ তুমি!
পূর্ব্ব-পরাজয় হয় নি স্মারক;
সে জঘন্য মবারক
রণে আসে পুনঃ, অগণ্য সৈন্য সাথে।
কার বলে বলীয়ান্ পালোয়ান-কুলাধম,
আসে হানা দিতে?
জানে না বিপক্ষ, দক্ষ নলিনাক্ষ
সেনানী-প্রধান জাগে এ দুয়ারে।
হনু যথা রাঘব-শিবিরে।

(মহারাজকে লক্ষ্য ক'রে কিন্তু চক্ষুর্দ্বয় অডিয়েন্সের দিকে রেখে)

কি ভয় কি ভয় রাজন্,
ভজন ভজন সৈন্য দুরজন,
বাজায়ে বাজন, করিবে সাজন,
প্রাণ দিতে স্বদেশের হিতে।
সপ্তকোটি কণ্ঠ ক'রে কল কল
ফুলাইবে গলদেশ,
দ্বিসপ্তকোটি ভুজে, চক্ষু বুজে,
লেগে যাবে লুটিতে ভাণ্ডার।
উপাড়ি' ফেলিব দুই করে
হিমাদ্রি সাগর;
নিষ্কণ্টক ক'রে দিব এ্যাট্‌লাণ্টে।
কাঁপিবে সিজার ম্যালেরিয়া-জ্বরে
বসি' রোম-সিংহাসনে;
দুয়ো দুয়ো দিবে লোক
নেপোলিয়ো বীরে;
মর্ম্মাহত জার্ম্মাণ, বুঝিবে শর্ম্মার বল,
বসি' রম্য হর্ম্ম্যতলে।

মন্ত্রী আর সহ্য ক'র্ত্তে পার্‌লেন না মিহিস্বরে ধীরে ধীরে ব'ল্লেন,...

হে কার্য্যদক্ষ নলিনাক্ষ,
তব বলবীর্য্য বিখ্যাত জগতে,
বহু দিন হ'তে তাহা জানিত এ মূঢ়;
কিন্তু নাট্যাচার্য্য তুমি, কবিত্বে নিপুণ,—
এত গুণ তব নাহি জানিতাম,
হায় রে, বলিতে কি মাইরি!

রাজা। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও দোঁহে,
জানি আমি সেনাপতি,
অগতির গতি তুমি
গুণবতী বীরত্ব বর্ণনে।
বিশ্বাস আমার, প্রশ্বাস তোমার
পশিয়াছে শত্রুর শিবিরে।
ভয়ে মূর্চ্ছাপন্ন বিপক্ষের সৈন্য,
দৈন্যভাবে নিদ্রা যায় শুইয়া কম্বলে—

রাজার স্পীচ্ আর শেষ ক'রতে হ'ল না, আলুলায়িত পক্ককেশী এক জন বৃদ্ধা ঝড়ের বেগে প্রবেশ ক'রে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো,—

"মহারাজ, মহারাজ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।
দুরাত্মা যবনরা—
নারীহৃদি জলনিধি করিয়া মন্থন,
সতীত্বরতন মোর করে রোমন্থন।"

সেনাপতির স্পীচের পর যা ক্ল্যাপ প'ড়েছিল, এই সতীত্বহরণ সংবাদে করতালির ধ্বনি তার চেয়ে বেশী হ'ল,

নাট্যকারের ড্রামাটিক্ আর্টের প্রথম পরিচয় লোক এইখানে পেলে; কেন না, সতীত্বহরণের দৃশ্য না দেখালে যবনাগমন বেল্‌কুল্ জমে না।

রাজা। (সক্রোধে) আর না, আর না,
যমের আতিথ্য কেবা করিবে স্বীকার,
নারীর সতীত্ব স্বত্ব করিয়া সংহার!
ডায়েনা-দমনা জন্মে দ্রৌপদী যে দেশে,
একাদশী করে নারী জ্যৈষ্ঠ মাসে হেসে,
সেই দেশে আসে কি না সেখ্ মবারক,—
দুর্গার দালানে যেন কৃষ্টম্যাস্‌কেক্।

চল চল, সাজ সাজ, গজবাজী উষ্ট্র যণ্ডে দেশ লণ্ডভণ্ড কর। উড়ে যাও নভস্থলে, ডুবে যাও সিন্ধুজলে! এই প্রাচীনার সতীত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ভাণ্ডারের এই অমূল্য নিধি যে তস্কর চুরি করে নে যেতে চায়, তাকে হাতে হাতকড়ি দিয়ে হুগ্‌লীর জেলে না পাঠিয়ে আমি আজ জলগ্রহণ পর্য্যন্ত ক'র্‌বো না। কিন্তু একটা কথা ভাব্‌তে হ'চ্ছে—

(রক্তবস্ত্রপরিহিতা, আলুলায়িতকেশা পরিচারিকার অসি করে মল্ল নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ)

পরি। আরে নরাধম, ভীরু কুলকলঙ্ক, শত্রুপক্ষ সশস্ত্র তোরণে দণ্ডায়মান, আর তুই কি না এখন-ও ব'লছিস্ 'কিন্তু!' তোর কাপুরুষ বদন এখন-ও কি না ব'ল্‌ছে, 'ভাব্‌তে হবে!' সিংহাসনের কুক্কুর, নেবে বোস্! শোন মন্ত্রী, শোন সেনাপতি, আমি ব'ল্‌ছি, এই রাজবাটীর সামান্য পরিচারিকা হ'লে পরে-ও আমি বীরাঙ্গনা আমার অনুমতি, এখন-ই যুদ্ধযাত্রা কর। ঘোড়া, ঘোড়া, আমার জন্য একটা ঘোড়া!

ওরে বাবা রে বাবা, কি হাততালি রে হাততালি! বাড়ি বুঝি ভেঙ্গে পড়ে! ড্রেস সার্কেল, বক্স, ষ্টল, পিচ্ গ্যালারি একেবারে চড়্‌বড়্, চড়্‌বড়্, চড়্‌বড়্! কেবল মহিলাসনের সেই খোকাটি ঘুম ভেঙ্গে আবার কেঁদে উঠ্‌ল, আর মেয়েদের সঙ্গে যে কয়জন ঝি এসেছিল, তারা এম্‌নি চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "বেশ ব'লেছে, খুব ব'লেছে, মাগী ঝিয়ের মতন ঝি বটে, রাজা টাকে খুব শুনিয়ে দিয়েছে।" —যে আওয়াজ নীচে থেকে পুরুষরা পর্য্যন্ত শুন্‌তে পেলে।'

ফকির মামা বল্লেন, "পিস্ত প্লে দেখে আমার-ও বীররস কণ্ঠাগত, বাইরে গিয়ে একটু চা খেয়ে টেম্পারে-চারটা ঠাণ্ডা ক'রে নি।"

রাত্রি

জয়শ্রী বসু

স্তব্ধ রাত্রির পানে চেয়ে আছি:
মনে হয় মৃত্যুর কাছাকাছি!
এই কালো অন্ধকার ঢাকা
বিস্তীর্ণ আকাশব্যাপী পূর্ণ নীরবতা
কোন্ মহাশান্তি বাণী করিছে ঘোষণা?
মহাসুখ মহাদুঃখ এক সাথে মিশে
কি বিচিত্র অনুভূতি করিছে রচনা!
এ কালো আঁধার ভরা চরম বিস্ময়
শূন্যভরা পূর্ণের বিপুল সঞ্চয়—
সংগ্রহ করেছি মনে মনে;
গ্লানি সিক্ত দিবসেরে ভরে দিব
এ রাত্রির ধনে।

শ্রী 'শ'—

॥ উন্নত চিত্র ॥

মাদ্রাজে কেন্দ্রীয় ফিল্ম উপদেষ্টা কমিটির একটি সভায় ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ডঃ গোপাল রেড্ডী বলেছেন যে যে সব চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠান হবে সেগুলি নির্বাচনের জন্য একটি কার্য্য-করী পন্থা অবলম্বনের বিষয় ভারত সরকার চিন্তা করছেন।

ডঃ রেড্ডী আরও বলেছেন যে যে সব ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্পূর্ণ ভারতীয় পটভূমিকায় ও ভারতীয় ঐতিহ্যে মণ্ডিত হয়ে নির্ম্মিত হয়, দেখা যায় সেই সব চিত্রই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবগুলিতে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। মার্কিন ও ব্রিটিশ চিত্রের অনুকরণে নির্ম্মিত ভারতীয় চিত্রগুলি কিন্তু বিদেশী চিত্রোৎসবের দর্শকেরা বিশেষ পছন্দ করেন না।

ডঃ রেড্ডীর এই কথাগুলি আশা করি ভারতীয় চিত্রনির্ম্মাতারা মান রাখবেন। বিশেষ করে বোম্বাইএর হিন্দী ফিল্ম নির্ম্মাতারা এই কথামত কাজ করলে ভারতীয় চিত্রের মান উন্নয়ন সহজতর হবে। বোম্বাইএর বাবুরা চিত্রনির্ম্মাণে অজস্র অর্থ ব্যয় করে থাকেন সত্য, কিন্তু সেই সব চিত্রের বেশির ভাগই নিম্নমানের হলিউড-চিত্রের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যে শ্রেণীর
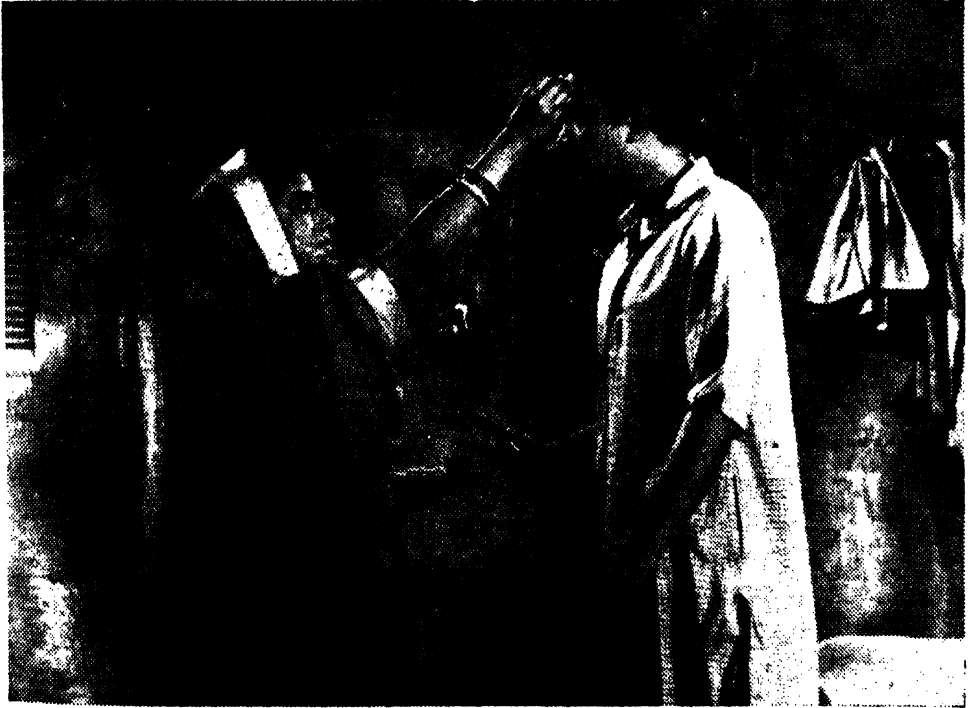
আর-ডি-বি নিবেদিত জেনিথ পিকচার্সের "বিভাস" চিত্রে উত্তমকুমার ও অনুভা গুপ্ত

দর্শকরা এই সব চিত্র দেখে আনন্দ লাভ করে তারা সাধারণতঃ বিদেশী চিত্র দেখতে অভ্যস্ত নয়। তাই তাদের কাছে এই সব অনুকরণ চিত্রগুলিই মৌলিক বলে মনে হয় এবং তারা এই সব চিত্র অর্থব্যয় করে দেখে আনন্দ লাভও করে। এই শ্রেণীর দর্শকের সংখ্যাই কিন্তু বেশী এবং এরাই হিন্দীচিত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তবে এদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই শ্রেণীর হিন্দীচিত্রগুলি বক্স-অফিসের দিক দিয়ে সাফল্য লাভ করলেও, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিন্তু এই শ্রেণীর অনুকরণ চিত্রের কোনও দামই শুধু নেই—এদের প্রদর্শনে দেশের চলচিত্র-মানের অবনতিই প্রকাশ পায়। ভারতীয় চিত্রের মধ্যে একমাত্র বাংলা চিত্রই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মানলাভ করে এসেছে এবং তার কারণও পরিস্কার। বাংলা চিত্রেই বাঙ্গালী পরিচালকদের উন্নত মননশীলতার জন্য ভারতীয় পটভূমিকায় ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু অন্য ভাষাভাষি চিত্রগুলিতে তা বড় একটা হয় না। অথচ অর্থব্যয় করতে হিন্দী চিত্র নির্ম্মাতারা কার্পণ্য করেন না। তাঁরা যদি ঐ সব সস্তাদরের অনুকরণ চিত্র নির্ম্মাণে টাকা না ঢেলে উন্নত ধরণের ভারতীয় ঐতিহ্য মণ্ডিত চিত্র নির্ম্মাণে আগ্রহী হন তাহলে তা দেশের পক্ষেই যে শুধু কল্যাণকর হবে তাই নয়, বিদেশেও ভারতীয় চিত্রের মূল্য বাড়াতে সাহায্য করবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আমাদের এই বিরাট দেশে এমন বহু বিচিত্র কিছু আছে যা ঠিকমত চিত্রায়িত করতে পারলে দেশকেই শুধু জানা হবে না বিদেশেও আমাদের চিত্রের দরবৃদ্ধি হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি অধুনা কলিকাতায় প্রদর্শিত "ফ্লুট এণ্ড দি এরো" ("Flute And The Arrow") চিত্রটিকে। চিত্রটি পরিচালনা করেছেন সুইডিস্ পরিচালক Arne Sueksdorff. এই চিত্রটি নির্ম্মাণের জন্য Mr. Sueksdorff'কে দীর্ঘ দুই বৎসর ভারতে অতিবাহিত করতে হয়েছে এবং তিনি চিত্রায়িত করেছেন অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে ভারতের বস্তার জঙ্গলের বাসিন্দা 'মুরিয়া' উপজাতিদের দৈনন্দিন জীবন একটি ছোট্ট ও উপভোগ্য গল্পের মাধ্যমে। বিদেশীর চোখে আমাদের দেশের অনাস্বাদিত সম্পদ ধরা পড়ে এবং তারা অকুণ্ঠ অর্থব্যয়ে তা চিত্রায়িতও করে, কিন্তু আমাদের দেশীয় চিত্র নির্ম্মাতারা ব্যস্ত থাকেন শুধু নৃত্য-গীত, হাস্য-কৌতুক, খুন-জখম, ও অদ্ভুত-অবাস্তব ঘটনা সম্বলিত চিত্র নির্ম্মাণে এবং এর দ্বারা তাঁরা একশ্রেণীর দর্শকের চিত্তবিনোদন করে অর্থোপার্জ্জনও করে থাকেন। তবে আশার কথা বাংলার চিত্রনির্ম্মাতারা এ বিষয়ে কিছুটা আগ্রহী। কিন্তু তাঁদের কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও স্বীকৃতি লাভ করে সন্তুষ্ট থাকলেই চলবে না, আরও উন্নত করতে হবে বাংলা চিত্রকে উৎকৃষ্ট গল্প, উন্নত পরিচালনা, উচ্চমানের অভিনয় ও অকুণ্ঠ অর্থব্যয়ের দ্বারাই শুধু নয়, গল্পের মধ্যে অভিনবত্বও আনয়ন করতে হবে একঘেয়েমী নাশ করে। আর তবেই বাংলা চিত্র ভারতের মধ্যে শীর্ষস্থানে থাকবে অন্য ভাষাভাষী চিত্রের আদর্শ স্বরূপ হয়ে এবং হয়ত অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হয়েও বিরাজ করবে। আমরা সেই আশাই করি।

* * *

খবরাখবর ঃ

'উত্তমকুমার ফিল্মস'-এর দ্বিতীয় নিবেদন "উত্তর ফাল্গুনী" চিত্রে শ্রীমতী সুচিত্রা সেন মাতা এবং কন্যার দ্বৈত-ভূমিকায় অভিনয় করছেন। নায়কের ভূমিকায় উত্তম কুমারই আছেন এবং অন্যান্য ভূমিকায় বিকাশ রায়, জহর গাঙ্গুলী, ছায়া দেবী প্রভৃতি রয়েছেন। ডঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তর একটি উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। পরিচালনা করছেন অসিত সেন এবং সুর দিচ্ছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

* * *

'জে জে, ফিল্ম কর্পোরেসন্'-এর হিন্দী চিত্র "বলিদান" এর চিত্রগ্রহণ ক্যাল্‌কাটা মুভিটোন্ ষ্টুডিওতে আরম্ভ হয়ে গেছে। মাধবী মুখোপাধ্যায় নায়িকার ভূমিকায় নামছেন এবং নায়করূপে সঞ্জয় নামে এক নতুন অভিনেতাকে দেখা যাবে। বলিদানের লেখক, প্রযোজক ও পরিচালক হচ্ছেন রাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালা এবং সুরকার হচ্ছেন বেদপাল।

* * *

আর, ডি, বনশল প্রযোজিত "মহানগর" চিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

'সিল্ভার স্ক্রীন্ প্রোডাক্সন্স'-এর প্রথম প্রচেষ্টা "অশান্ত ঘূর্ণি"-র কাজ আরম্ভ হয়েছে। প্রধান ভূমিকাগুলিতে আছেন অনিল চ্যাটার্জ্জী, দিলীপ মুখার্জ্জী দীপক মুখার্জ্জী, জহর রায়, গীতা দে, রেণুকা রায় এবং নবাগতা জ্যোৎস্না বিশ্বাস প্রভৃতি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দু'টি গান রবীন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় রেকর্ড করা হয়ে গেছে। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে চিত্রটি নির্ম্মিত হচ্ছে এবং এর পরিচালনা করছেন পিনাকী মুখোপাধ্যায়।

* * *

দেশে-বিদেশে ঃ

বিশ্বখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর "দুই কন্যা" চিত্রের জন্য দ্বিতীয়বার Selznick Golden Laurel Medal লাভ করেছেন। শ্রীরায় তাঁর "পথের পাচালী" চিত্রের জন্যে ১৯৫৭ সালে প্রথম এই পুরস্কার লাভ করেন।

* * *

মস্কোয় সদ্য সমাপ্ত তৃতীয় আন্তর্জাতিক চিত্রোৎসবে "সাত পাকে বাঁধা" চিত্রটিকে পুনঃ-সম্পাদিত করে পাঠান হয়েছিল এবং সেখানে "Sovexportfilm" কর্তৃক সাব-টাইটেলযুক্ত হয়ে প্রদর্শিত হয়। চিত্রটি ঐ চিত্রোৎসবে শুধু বিশেষ প্রশংসাই লাভ করেনি, নায়িকা সুচিত্রা

সেনের অভিনয় দর্শক ও বিচারকদের এতই মুগ্ধ করে যে শ্রীমতী সেনকে চিত্রোৎসবের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মান দেওয়া হয়।

আমরাও শ্রীমতী সেনকে তাঁর এই বিশেষ সম্মানের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।

* * *

আগামী ২৪শে আগষ্ট থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর ভেনিসে যে চিত্রোৎসব হবে তাতে পাঠানর জন্য বি, আর, চোপ্‌রা-র "Gumrah" চিত্রটি নির্ব্বাচিত হয়েছে। চিত্রটির একটি ছোট সংস্করণ পুনঃ-সম্পাদিত হয়ে এবং ফরাসী ভাষায় সাব্-টাইটেল্ যুক্ত হয়ে ঐ চিত্রোৎসবে প্রদর্শিত হবে।

* * *

বিদেশী খবর ঃ

Federal Republic of Garmanyতে একটি যুবকের শোচনীয় মৃত্যুর সত্য ঘটনা অবলম্বনে একটি পূর্ণ দৈর্ঘের চিত্র নির্ম্মিত হচ্ছে। নিহত যুবকের নাম Peter Fecher. যুবকটি গত বৎসর কুখ্যাত বার্লিন প্রাচীরের (Berlin Wall) ওপর পূর্ব্ব বার্লিন পুলিশের মেসিন্-গানের গুলিতে নিহত হয় যখন সে ঐ প্রাচির টপকে পশ্চিম বার্লিনে মুক্তির আশায় পালিয়ে আসবার চেষ্টা করছিল। এই চিত্রটিতে পূর্ব্ববার্লিনে অবরুদ্ধ বহু জার্ম্মানের মুক্তির আশায় কম্যুনিষ্ট প্রহরীদের গুলীবৃষ্টির মধ্যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের প্রচেষ্টা ও তার পরিণাম প্রভৃতিও দেখান হবে। চিত্রটির নামকরণ করা হবে "Kain-1962" এবং সর্ব্বদেশেই চিত্রটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।

* * *

বৃটেনের সিনেমায় এখন মন্দা পড়েছে। ১৯৫৬ সাল থেকে গত বৎসরের মধ্যে ১,১০১,০০০,০০০ থেকে ৪১৫, ০০০,০০০ দর্শক সংখ্যা নেমে গেছে বলে National Film Finance Corporation-এর রিপোর্টে জানা গেছে।

এই সময়ের মধ্যেই বক্স-অফিসের প্রাপ্যও পড়ে গেছে ১০৪,২০০,০০০ পাউণ্ড থেকে ৫৮,৯০০,০০০ পাউণ্ডে।

১৯১৬ সাল থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে গড়পড়তা সিনেমার সংখ্যাও ৪৩৯১ থেকে ২৪২৯এ নেমে গেছে।

* * *

আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত চলচ্চিত্র নির্ম্মিত হয়েছে তার মধ্যে সব চেয়ে ব্যয়বহুল ও বহু আলোচিত চিত্র "ক্লিওপেট্রা" নিউ ইয়র্কে মুক্তিলাভ করেছে। মিশর সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুন্দরী অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলর এবং তাঁর বিপরীতে মার্ক এণ্টনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিখ্যাত অভিনেতা রিচার্ড বার্টন, আর সিজারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন খ্যাতনামা অভিনেতা রেক্স হ্যারিসন্। চিত্রটির নির্ম্মাণে খরচ পড়েছে প্রায় ১৩,০০০,০০০ পাউণ্ড।

ডেলি মেল্, ডেলি টেলিগ্রাফ্, ইভিনিং নিউজ্ প্রভৃতি পত্রিকার চিত্র সমালোচকরা এবং ইতালী ও আমেরিকার সমালোচকরা চিত্রটির কিন্তু মিশ্র সমালোচনাই করেছেন। কেউ বলেছেন এলিজাবেথ টেলরের অভিনয়ের চেয়ে তাঁর সাজ পোষাকের আড়ম্বরই চোখে পড়ে। কেউ বলেছেন তাঁর স্নানের দৃশ্যগুলি অনেকেরই চোখ ঘুরিয়ে দেবে। আবার কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন সিজারের ভূমিকায় রেক্স হ্যারিসনের পাকা অভিনয়ের কাছে মার্ক এণ্টনীর ভূমিকায় রিচার্ড বার্টনকে যেন দুর্ব্বল ও দয়ার পাত্র বলে মনে হয়। এলিজাবেথ টেলরের অভিনয়ের প্রশংসা করলেও কেউ কেউ বলেছেন তিনিই ক্লিওপেট্রার শেষ সংস্করণ নন। ইতালীয় সমালোচকরা চিত্রটিকে চোখে লাগবার মতন বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ হলেও গভীর অনুভূতি সম্পন্ন নয় বলে মত দিয়েছেন। ডেলি টেলিগ্রাফের সমালোচক বলেছেন যে এটা নিশ্চিতই যে এই "ক্লিওপেট্রা" চিত্রটি এ পর্য্যন্ত সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে চলচ্চিত্র ইতিহাসে স্থান পাবে না, এবং আরও বলেছেন যে আমরা খুব সম্ভবতঃ খুব বেশীই আশা করেছিলাম। আমাদেরও তাই মনে হয়। বহু বিজ্ঞাপিত কিছুর ওপর লোকে অনেক বেশীই আশা করে থাকে এবং পরে যখন তা ঘটে তখন আর তত ভাল লাগে না। "ক্লিওপেট্রার" ক্ষেত্রেও বোধ হয় তাই হয়েছে। অবশ্য অভিনয়ের ভাল মন্দের তারতম্য নিশ্চয়ই বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করে না,—সে ক্ষেত্রে সমালোচকদের মন্তব্য মানতেই হবে।

আশাকরি এই বহু বিজ্ঞাপিত চিত্রটি শীঘ্রই এ দেশেও প্রদর্শিত হয়ে দর্শকদের আকাঙ্খা মেটাবে

সম্পাদনা: শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়
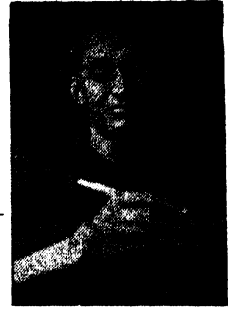
৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

উইম্বলডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

১৯৬৩ সালের উইম্বলডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা (অল্ ইংল্যাণ্ড লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার প্রচলিত নাম) গত ২৪শে জুন আরম্ভ হয়ে ৭ই জুলাই শেষ হয়েছে। ৬ই জুলাই ছিল খেলা শেষ হওয়ার নির্দ্দিষ্ট দিন; কিন্তু বৃষ্টির দরুণ ৬ই জুলাই তারিখে খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে নির্দ্দিষ্ট তারিখে খেলা শেষ হয়নি, এরকম ঘটনা বিরল।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় অনেক অঘটন ঘটেছে। প্রতিযোগিতা আরম্ভের পূর্ব্বে প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি ক্রমপর্য্যায় তালিকা প্রতি বছর প্রকাশ করা হয়। খেলোয়াড়দের পূর্ব্ব সাফল্য বিচার ক'রে এই তালিকাটি টেনিস খেলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারাই প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু প্রতিবারের মত এবারও সেই ক্রমপর্য্যায় তালিকার পূর্ণ মর্য্যাদা শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকেনি। তালিকার উপরের দিকের অনেক বাছাই খেলোয়াড় নীচের দিকের বাছাই খেলোয়াড়দের কাছে, এমন কি অবাছাই অর্থাৎ তালিকায় স্থান পাননি এমন খেলোয়াড়দের কাছেও পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত: পুরুষ বিভাগের সিঙ্গলসের বাছাই তালিকায় অষ্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সনকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছিল। চলতি বছরে রয় এমার্সন অষ্ট্রেলিয়ান এবং ফ্রেঞ্চ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব নিয়ে তালিকায় তাঁর প্রথম স্থান লাভের যোগ্যতা প্রমাণ করেছিলেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কোয়ার্টার-ফাইনাল খেলায় এক নম্বর খেলোয়াড় রয় এমার্সনকে পরাজিত করেছিলেন অবাছাই খেলোয়াড় অখ্যাত জার্মানীর হ্বিলহেলম বুন্‌গের্ট।

অবাছাই খেলোয়াড় ফ্রেড স্টোলে (অষ্ট্রেলিয়া) দ্বিতীয় রাউণ্ডে ৩নং বাছাই খেলোয়াড় কেন্ ফ্লেচার (অষ্ট্রেলিয়া) এবং সেমি ফাইনালে ২নং বাছাই খেলোয়াড় ম্যানুয়েল সান্তানাকে (স্পেন) পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছিলেন। এবং ফাইনালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ৪নং বাছাই 'চাক' ম্যাকিনলে (আমেরিকা)। মহিলাদের সিঙ্গলসের ক্রমপর্য্যায় তালিকা অনুযায়ী এক নম্বর বাছাই মার্গারেট স্মিথ (অষ্ট্রেলিয়া) শেষ পর্য্যন্ত সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন। কিন্তু ফাইনাল খেলায় তাঁর সঙ্গে খেলেছিলেন অবাছাই খেলোয়াড় বিলি জিন মোফিট (আমেরিকা)। এই অবাছাই খেলোয়াড় বিলি জিন মোফিট গত বছর প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউণ্ডে এক নম্বর বাছাই কুমারী মার্গারেট স্মিথকে পরাজিত ক'রে

যে 'জায়েণ্ট কিলার' আখ্যা লাভ করেছিলেন আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় তিনি সেই খেতাব একাধিকবার অক্ষুণ্ণ রাখেন। চতুর্থ রাউণ্ডে মোফিটের হাতে পরাজিত হ'ন ২নং বাছাই লেসলী টার্নার (অষ্ট্রেলিয়া), কোয়ার্টার ফাইনালে ৭নং বাছাই ব্রেজিলের ম্যারিয়া ব্যুনো (১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালের বিজয়িনী) এবং সেমি-ফাইনালে ৩নং বাছাই অ্যান হেডন-জোন্স (বৃটেন)। ফাইনালে অবিশ্যি তিনি কোন অঘটন ঘটাতে পারেননি। পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে এবার কোন বাছাই জুটি উঠতে পারেনি। মহিলাদের ডাবলস খেতাব পেয়েছেন এবারের ২নং বাছাই জুটি এবং গত বছরের ডাবলস বিজয়িনী ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) এবং মেরিয়া ব্যুনো (ব্রেজিল)। তাঁদের হাতে পরাজিত হয়েছেন ১নং বাছাই জুটি রবিন এব্বার্ণ এবং মিস মার্গারেট স্মিথ। মিক্সড ডাবলস খেতাব পেয়েছেন ২নং বাছাই জুটি মিস মার্গারেট স্মিথ এবং কেন ফ্লেচার (অষ্ট্রেলিয়া); কিন্তু ফাইনালে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন অবাছাই জুটি।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য অপ্রত্যাশিত ফলাফল, এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় রয় এমার্সনের পরাজয়। এই পরাজয়ের ফলে এমার্সন একই বছরে বিশ্বের চারটি অন্যতম সিঙ্গলস খেতাব (অষ্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন ও আমেরিকান) লাভের দুর্লভ সম্মান থেকে বঞ্চিত হলেন। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য, চার নম্বর বাছাই 'চাক' ম্যাকিনলের (আমেরিকা) সিঙ্গলস খেতাব লাভ। আমেরিকার পক্ষে পুরুষ বিভাগে শেষ সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন টনি ট্রাবার্ট ১৯৫৫ সালে। সুতরাং ম্যাকিনলে আমেরিকাকে বিশ্ব লন্ টেনিস মহলে পুনরায় যোগ্যতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে এ পর্য্যন্ত পাঁচজন অবাছাই খেলোয়াড় খেলেছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন অবাছাই খেলোয়াড়ই সিঙ্গলস খেতাব নিতে পারেননি। এবার মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন এক নম্বর বাছাই কুমারী মার্গারেট স্মিথ (অষ্ট্রেলিয়া)। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে মহিলাদের সিঙ্গলসে এই প্রথম খেতাব লাভ। কুমারী মার্গারেট স্মিথ এবছর তিনটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে উঠে দুটিতে খেতাব পান।

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : চার নম্বর বাছাই খেলোয়াড় 'চাক' ম্যাকিনলে (আমেরিকা) ৯-৭, ৬—১, ৬-৪, গেমে অবাছাই খেলোয়াড় ফ্রেড ষ্টোলেকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : রাফেল ওসুনা এবং এণ্টোনিয়ো প্যালাফক্স (মেক্সিকো) ৪ ৬, ৬-২, ৬-২ ও ৬-২ গেমে জে সি বার্কলে এবং পিয়ের দারমঁকে (ফ্রান্স) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : এক নম্বর খেলোয়াড় কুমারী মার্গারেট স্মিথ (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ও ৬-৪ গেমে অবাছাই খেলোয়াড় বিলি জিন মোফিটকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : গত বছরের বিজয়িনী ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) এবং মেরিয়া বুনো (ব্রেজিল) ৮-৬ ও ৯-৭ গেমে রবিন এব্বার্ন এবং মার্গারেট স্মিথকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : কুমারী মার্গারেট স্মিথ এবং কেন ফ্লেচার (অষ্ট্রেলিয়া) ১১-৯ ও ৬-৪ গেমে বব হিউইট (অষ্ট্রেলিয়া) এবং কুমারী ডার্লিন হার্ডকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

১৯৬৩ সালের ক্রম-পর্যায় তালিকা

পুরুষ বিভাগ

সিঙ্গলস : ১। রয় এমার্সন (অষ্ট্রেলিয়া) ২। ম্যানুয়েল সান্তানা (স্পেন), ৩। কেন ফ্লেচার (অষ্ট্রেলিয়া) ৪। 'চাক' ম্যাকিনলে (যুক্তরাষ্ট্র), ৫। মার্টিন মুলিগ্যান (অষ্ট্রেলিয়া—গতবারের রানার্‌-আপ), ৬। পিয়ের দারমঁ (ফ্রান্স), ৭। জান এরিক লুণ্ডকিষ্ট (সুইডেন), ৮। মাইক সাঙ্গষ্টার (বৃটেন)।

ডাবলস : ১। বব হিউইট এবং ষ্টোলে (অষ্ট্রেলিয়া); ২। রয় এমার্সন এবং ম্যানুয়েল সান্তানা (স্পেন), ৩। চাক ম্যাকিনলে এবং ডেনিস র‍্যালষ্টন (যুক্তরাষ্ট্র); ৪। বোরো জোভানভিক এবং নিকোলো পিলিক (যুগোস্লাভিয়া)।

মহিলা বিভাগ

সিঙ্গলস : ১। মার্গারেট স্মিথ (অষ্ট্রেলিয়া), ২। লেসলী টার্নার (অষ্ট্রেলিয়া), ৩। মিসেস অ্যান হেডন জোন্স (বৃটেন), ৪। ডার্লিন হার্ড (যুক্তরাষ্ট্র), ৫। জান লেহান (অষ্ট্রেলিয়া), ৬। মিসেস ভেরা স্লকোভা (চেকোশ্লোভাকিয়া), ৭। ম্যারিয়া ব্যুনো (ব্রেজিল), ৮। রেনি স্কারম্যান (দক্ষিণ আফ্রিকা)।

ডাবলস : ১। রবিন এব্বার্ন এবং মিস মার্গারেট স্মিথ (অষ্ট্রেলিয়া), ২। মিস ম্যারিয়া ব্যুনো (ব্রেজিল) এবং মিস ডার্লিন হার্ড (যুক্তরাষ্ট্র), ৩। মিস লেহান ও মিস টার্নার (অষ্ট্রেলিয়া), ৪। মিসেস এ জোনস এবং মিস স্কারম্যান।

মিক্সড ডাবলস : ১। ফ্রেড ষ্টোলে এবং মিস টার্নার (অষ্ট্রেলিয়া), ২। কেন ফ্লেচার এবং মিস মার্গারেট স্মিথ, ৩। ডেনিস র‍্যালষ্টন (যুক্তরাষ্ট্র) এবং মিসেস এ জোন্স (বৃটেন), ৪। বব হো (অষ্ট্রেলিয়া) এবং মিস ম্যারিয়া ব্যুনো (ব্রেজিল)।

ইংল্যাণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট ঃ

দ্বিতীয় টেষ্ট—লর্ডস

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৩০১ (কানহাই ৭৩ এবং সলোমন ৫৬ রান। ট্রুম্যান ১০০ রানে ৬ এবং স্টাকলটন ৯৩ রানে ৩ উইকেট পান)।

ও **২২৯** রান (বুচার ১৩৩ রান। ট্রুম্যান ৫২ রানে ৫ এবং স্টাকলটন ৭২ রানে ৪ উইকেট পান)।

ইংল্যাণ্ড ২৯৭ রান (ব্যারিংটন ৮০, ডেক্সটার ৭০ এবং টিটমাস ৫২ (নটআউট) রান। গ্রিফিথ ৯১ রানে ৫ এবং ওরেল ১২ রানে ২ উইকেট পান)।

ও **২২৮** রান (৯ উইকেটে। ক্লোজ ৭০ এবং ব্যারিংটন ৬০ রান। হল ৯৩ রানে ৪ এবং গ্রিফিথ ৫৯ রানে ৩ উইকেট পান)।

লর্ডস মাঠে ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের একাদশ টেষ্ট সিরিজের দ্বিতীয় টেষ্ট ক্রিকেট খেলাটি প্রবল উত্তেজনা এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত নাটকীয়ভাবে অমীমাংসিত থেকে গেছে। খেলার ফলাফল সম্পর্কে দর্শকদের আক্ষেপ করার কিছু নেই। কারণ তাঁরা পুরোমাত্রায় খেলা দেখে আনন্দ উপভোগ করেছেন। উত্তেজনা এবং উদ্বেগের দিক থেকে আলোচ্য দ্বিতীয় টেষ্ট খেলাটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রকৃত ক্রীড়ারসিকদের মতে খেলার অমীমাংসিত ফলাফল ঠিকই হয়েছে বরং অন্যরকম হ'লে ক্রিকেট খেলার ঐতিহ্য নষ্ট হ'ত।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টসের ডাকে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার এই নিয়ে ২২টা টেষ্ট খেলায় অধিনায়কত্ব ক'রে টসে পরাজিত হলেন ১৫ বার।

প্রথম দিনের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৬টা উইকেট খুইয়ে ২৪৫ রান করে। বৃষ্টির দরুণ আধঘণ্টা দেরীতে খেলা আরম্ভ হয়।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বাকি চারটে উইকেট পড়ে মাত্র ৫৬ রান যোগ হয়। তাদের প্রথম ইনিংস ৩০১ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিনে ইংল্যাণ্ড ৭টা উইকেট খুইয়ে ২৪৪ রান শোধ দেয়। ইংল্যাণ্ডের খেলার সূচনা ভাল হয়নি। ২০ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে। শেষে ৩য় উইকেটের জুটিতে ডেক্সটার এবং ব্যারিংটন ৮২ রান তুলে দেন। ডেক্সটার ৮০ মিনিট পিটিয়ে খেলে তাঁর ৭০ রান করেন। ব্যারিংটন করেন ৮০ রান।

তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৯৭ রানের মাথায় শেষ হ'লে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ মাত্র ৪ রানের ব্যবধানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনা থেকেই ভাঙ্গন দেখা দেয়। ১৫ রানের মাথায় ১ম ও ২য় এবং ৬৪ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ে যায়। একমাত্র বেসিল বুচার দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে এইদিনে নিজস্ব ১২৯ রান ক'রে নট আউট থাকেন। খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ে রান দাঁড়ায় ২১৪, ৫টা উইকেট পড়ে।

চতুর্থ দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে ইংল্যাণ্ড বেশীক্ষণ ব্যাট ধরে রাখতে দেয়নি। মাত্র ১৫ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বাকি ৫টা উইকেট পড়ে যায়। ২২৯ রানের মাথায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। ফলে খেলার মোড় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ায়।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৩৪ রান তুলতে ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। হাতে প্রচুর সময়। কিন্তু বৃষ্টি এবং আলোর অভাবের দরুণ এইদিন কয়েকবার খেলা বন্ধ রাখতে হয়; এমন কি এই কারণে খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই এই দিনের মত খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের রান দাঁড়ায় ১১৬, ৩টে উইকেট পড়ে।

হলের বলে কাউড্রের হাতের কব্জির হাড় ভেঙ্গে যায়। তিনি ১৯ রান করে খেলা থেকে অবসর নিতে বাধ্য হ'ন। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে দেখা গেল, ইংল্যাণ্ডের জয়লাভ করতে ১১৮ রানের প্রয়োজন। হাতে ৭টা উইকেট এবং পুরো একদিনের খেলা জমা।

শেষ দিনে বৃষ্টির দরুণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে খেলা আরম্ভ হয়। ইংল্যাণ্ড মাত্র ২০০ মিনিট খেলার সময় হাতে পায়। আহত কাউড্রেকে নিয়ে সাতজন খেলোয়াড় আউট হ'তে বাকি ছিলেন। চা-পানের সময় ইংল্যাণ্ডের রান দাঁড়ায় ১৭১, ৫টা উইকেট পড়ে। আর ৬৩ রান তুলতে পারলেই ইংল্যাণ্ডের জয়। সমস্ত মাঠের দর্শকেরা উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছেন--খেলা ভাঙ্গতে আর ৫৫ মিনিট বাকি—দলের ২০৩ রান, ৫টা উইকেট পড়ে—জয়লাভের আর মাত্র ৩১ রানের প্রয়োজন। এই অবস্থায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ফাষ্ট বোলার ওয়েসলি হল মোক্ষম বল দিলেন; তাঁর উপর্যুপরি বলে ইংল্যাণ্ডের এই ২০৩ রানের মাথায় দুটো উইকেট পড়ে গেল।

শেষ ওভারের খেলা। খেলায় জয়লাভ করতে ইংল্যাণ্ডের আর মাত্র ৮ রানের প্রয়োজন। শেষ ওভারে বল দিতে নামলেন ওয়েসলি হল। এদিকে ইংল্যাণ্ডের হাতে জমা মাত্র দুটো উইকেট। সমস্ত মাঠ নিস্তব্ধ। হলের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বলে ইংল্যাণ্ডের একটা ক'রে রান যোগ হল। স্যাকলটন হলের চতুর্থ বলটা মেরেই চোখ কান বুজে প্রাণপণ ক'রে বিপরীত দিকের উইকেট লক্ষ্য ক'রে দৌড় দিলেন; কিন্তু তিনি লক্ষ্যস্থলে পৌছবার আগেই তাঁর উইকেট ভেঙ্গে গেল। স্যাকলটন রান-আউট হয়ে বিদায় নিলেন। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের রান ছিল ২২৮, জয়লাভের জন্যে প্রয়োজন ছিল মাত্র ৬ রানের। শেষ ওভারের তখন মাত্র দুটো বল দিতে বাকি। ভাঙ্গা হাতে প্লাস্টার লাগিয়ে কাউড্রে খেলতে নামলেন স্যাক-লটনের শূন্য উইকেটে। কাউড্রেকে আর হলের বল খেলতে হয়নি। স্যাকলটনের সঙ্গে রান নিতে গিয়ে হলের বলের মুখে চলে গিয়েছিলেন ডেভিড এ্যালেন। কাউড্রে ব্যাট ধরে দাঁড়ালেন মাত্র। আর হলের শেষ দুটো বল এ্যালেন ঠেকিয়ে দিলেন—কোন রকম ঝুঁকি নিলেন না। তখন ইংল্যাণ্ডের মনের অবস্থা মানে মানে খেলাটা ড্র গেলেই যথেষ্ট।

তৃতীয় টেস্ট—এজবাস্টন

ইংল্যাণ্ড: ২১৬ রাণ (ক্লোজ ৫৫ রান। সোবার্স ৬০ রানে ৫, হল ৫৬ রানে ২ এবং গ্রিফিথ ৪৮ রানে ২ উইকেট পান)।

ও ২৭৮ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ফিল সার্প ৮৫ (নট-আউট), ডেক্সটার ৫৭ এবং টনি লক ৫৬ রান। গিবস ৪৯ রানে ৪ এবং গ্রিফিথ ৫৫ রানে ৩ উইকেট পান)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ: ১৮৬ রান (ক্যারু ৪০ রান। ট্রুম্যান ৭৫ রানে ৫ এবং ডেক্সটার ৩৮ রানে ৪ উইকেট পান)।

ও ৯১ রান (কানহাই ৩৮ রান। ট্রুম্যান ৪৪ রানে ৭ এবং স্যাকলটন ৩৭ রানে ২ উইকেট পান)।

বার্মিংহামের এজবাস্টন মাঠের তৃতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ২১৭ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে পরাজিত করায় আলোচ্য টেস্ট সিরিজের ফলাফল বর্ত্তমানে সমান দাঁড়াল। উভয় দলেরই একটা ক'রে জয়। এখন বাকি দুটো টেস্ট খেলা। ওল্ড-ট্রাফোর্ডের প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১০ উইকেটে জয় লাভ করেছিল। লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় খেলা ড্র ছিল।

ইংল্যাণ্ড টসে জয়লাভ ক'রে প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যাণ্ড ৫টা উইকেট খুইয়ে ১৫৭ রান করে। দ্বিতীয় দিনের শেষ সময়ে ইংল্যাণ্ডের ২১৬ রানের মাথায় প্রথম ইনিংস শেষ হয়। এই দিনে আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের খেলায় ৪টে উইকেট খুইয়ে, ১১০ রান করে। চতুর্থ দিনে

১৮৬ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হলে ইংল্যাণ্ড ৩০ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। এই দিনে ইংল্যাণ্ডের ৮টা উইকেট পড়ে ২২৬ রান দাঁড়ায়। সার্প (৬৯ রান) এবং লক (২৩ রান) এই দিনের মত অপরাজিত ছিলেন।

খেলার শেষ দিনে ইংল্যাণ্ড ২৭৮ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ইংল্যাণ্ডের নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় ফিল সার্প ৮৫ রান ক'রে নট-আউট থাকেন। নবম উইকেটের জুটিতে সার্প এবং লক ৮৯ রান তুলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় নবম উইকেট জুটির পূর্ব্ব রেকর্ড (৬২ রান) ভঙ্গ করেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ২৮০ মিনিট খেলার সময় হাতে নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। জয়লাভের জন্যে তাদের ৩০৯ রানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মাত্র ৯১ রানের মাথায় তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। টু্ম্যানের বলেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের এই হাঁড়ির হাল দাঁড়ায়। লাঞ্চের সময় পর্য্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের এই বিপর্য্যয়ের আভাস পাওয়া যায়নি। লাঞ্চের সময় তাদের রান ছিল ৫৫, ৩টে উইকেট পড়ে। লাঞ্চের পরের খেলায় ভেল্কি দেখলেন ফ্রেডী টু্ম্যান। শেষ ২৪টা বল ক'রে মাত্র ৪ রান দিয়ে টু্ম্যান ৬টা উইকেট পান। এই খেলাতে টু্ম্যান ১২টা উইকেট পান ১১৯ রানে—প্রথম ইনিংসে ৭৫ রানে ৫টা এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৪ রানে ৭টা উইকেট। লাঞ্চের পর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল মাত্র ৫৫ মিনিট খেলে দলের বাকি ৭টা উইকেট খুইয়ে ৩৬ রান যোগ করেছিল।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে আলোচ্য টেস্ট সিরিজের তিনটে টেস্ট খেলায় টু্ম্যান ২৫টা উইকেট পেলেন ৩৬৬ রান দিয়ে। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ফ্রেডী টু্ম্যানের বোলিং পরিসংখ্যান বর্ত্তমানে দাঁড়িয়েছে: টেস্ট খেলা ৫৯ এবং ৫৭৬১ রানে ২৭৫ উইকেট—টেস্ট ক্রিকেটে সর্ব্বাধিক উইকেট লাভের বিশ্ব রেকর্ড। গত ১৫ই মার্চ্চ তারিখে ফ্রেডী টু্ম্যান নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে তৃতীয় অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলায় তাঁর ২৪৩তম উইকেট পেলে ইংল্যাণ্ডের ব্রায়ান স্ট্যাথাম প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বাধিক উইকেট পাওয়ার বিশ্বরেকর্ড (২৪২টি উইকেট) ভঙ্গ হয়।

ক্যালকাটা চ্যাম্পিয়নসিপে লাহিড়ীর সাফল্য ঃ

ভূতপূর্ব্ব বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন (বর্ত্তমানে বাঙ্গলার ৪ নম্বর খেলোয়াড়) বি, এন, লাহিড়ী, বাঙ্গলার অন্যতম পুরাতন প্রতিযোগিতা 'ক্যালকাটা চ্যাম্পিয়নশিপে' বাঙ্গলার উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড় মলয় ভট্টাচার্য্যকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন। পুরাতন অভিজ্ঞ

বি, এন, লাহিড়ী

খেলোয়াড় লাহিড়ীর পুনরাবির্ভাব বাঙ্গলার টেবল টেনিস মহলে আনন্দের সঞ্চার করেছে। বিশেষ করে বাঙ্গলার ১ নম্বর খেলোয়াড় হ্যারী অ-এর অভাবে বাঙ্গলা দল এবার স্বভাবতই শক্তিহীন হয়ে পড়বে। এই সময় লাহিড়ীর সাফল্য নিঃসন্দেহে আনন্দের। ফাইনালে বি, এন, লাহিড়ী মলয় ভট্টাচার্য্যকে ১৪-২১ ; ২১-১৭ ; ২১-১৭ ; ২১ ১৭ পয়েন্টে পরাজিত করেন, মহিলাদের সিঙ্গলসে রবিনা রায়, তপতী মিত্রকে ৩-২ গেমে পরাজিত করেন। এই

প্রতিযোগিতায় তরুণ খেলোয়াড় অমৃত খোশলার তিনটি বিষয়ে সাফল্য বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই তরুণ খেলোয়াড়টি বালকদের সিঙ্গলসে, ছাত্রদের সিঙ্গলসে এবং জুনিয়র সিঙ্গলসে জয়লাভ করে।

ফুটবল লীগ ঃ

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় ফিরতি খেলা (রিটার্ণ ম্যাচ) আরম্ভ হয়ে গেছে। বর্ত্তমানে (২১শে জুলাই) লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে আছে গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান—২০টা খেলায় তাদের ৩৪ পয়েণ্ট উঠেছে। পরাজয় মাত্র একটা বি এন আর দলের কাছে লীগের প্রথম খেলায়। ফিরতি খেলায় মোহনবাগান ১—০ গোলে বি এন আর দলকে পরাজিত ক'রে পূর্ব্ব-পরাজয়ের শোধ নিয়েছে। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছে গত বছরের রানার্স-আপ ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব—১৯টা খেলায় ৩০ পয়েণ্ট। সম্প্রতি তারা তৃতীয় স্থান থেকে দ্বিতীয় স্থানে উঠেছে। বি এন আর দল দ্বিতীয় স্থান থেকে তৃতীয় স্থানে নেমেছে—১৯টা খেলায় ২৯ পয়েণ্ট। ইষ্টার্ণ রেল দল গত দু' সপ্তাহ ধরে চতুর্থ স্থানেই আছে—১৯টা খেলায় ২৬ পয়েণ্ট। বর্ত্তমানে এই চারিটি দলের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের লড়াই সীমাবদ্ধ হয়েছে।

দ্বিতীয় বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতায় বর্ত্তমানে শীর্ষস্থান দখল ক'রে আছে কালীঘাট—১৩টা খেলায় ২২ পয়েণ্ট। গ্রীয়ার আছে দ্বিতীয় স্থানে—১২টা খেলায় ১৯ পয়েণ্ট।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত রহস্যোপন্যাস "একটি অদ্ভুত মামলা"—৫.০০

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "মেবার-পতন" (২৪শ সং)—২.৫০, "সাজাহান" (৩৭শ সং)—২.৫০

নরেন্দ্র দেব-সম্পাদিত "ওমর খৈয়াম" (১৭শ সং)—৭.০০

ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী প্রণীত "জাহানারার আত্মকাহিনী" (৫ম সং)—৩.৫০

শ্রীমায়া বসু প্রণীত উপন্যাস "অগ্নিবলয়"—২.৭৫

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নাটক "প্রফুল্ল" (নবপর্যায়—২য় সং)—২.৫০, "নল-দময়ন্তী" (নবপর্যায়—১ম সং)—২.০০

নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "নাট্যগুচ্ছ" ('রাতকাণা'—'বীররাজা'—'মুখের মত' একত্রে)—৪.৫০

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত শিশু-উপন্যাস "পাথরের পদ্মফুল"—১.৫০

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ২৬।৭।৬৩ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষের সূচী

একপঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—তৃতীয় সংখ্যা

ভাদ্র—১৩৭০

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্রসূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

— বন-চম্পা —

শিল্পী—সতীন্দ্রনাথ

সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস

আধুনিক সভ্যতার মেকী আড়ম্বরের পিছনে
যে বিরাট ফাঁকি আত্মগোপন
করে রয়েছে
ঊর্মিলার পক্ষে তার করুণতম আবিষ্কার তাকে
যেন এক বলিষ্ঠ-সুন্দর প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে
উত্তীর্ণ করে দিল।

শ্রদ্ধা এবং সমবেদনার অপূর্ব সমন্বয়ে
রূপদক্ষ শিল্পী সুধীরঞ্জন
বর্তমান সমাজ-জীবনের যে চিত্র
এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন—
আধুনিক সাহিত্যের
ইতিহাসে
তার তুলনা বিরল।

দাম—পাঁচ টাকা

রথীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্

কপালকুণ্ডলা

মূলগ্রন্থ, ১১৭ পৃষ্ঠাব্যাপী কপালকুণ্ডলা-পরিচি
৫২ পৃষ্ঠাব্যাপী শব্দটীকা ও টিপ্পনী এবং
বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ
সুমুদ্রিত প্রামাণ্য সংস্করণ।

দাম—২·৫০

রাধারাণী

বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্র, সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং গ্রন্থখানি
সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনাসহ নূতন সংস্করণ।
উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। দাম—এক টাকা

শ্রীকান্ত-পরিচিতি (১ম পর্ব) ২৲

ডাঃ রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

হোমিওপ্যাথিক
সরল ভৈষজ্যতত্ত্ব
বা
মেটিরিয়া মেডিকা

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে হইলে ভৈষজ্যজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। অথচ এই জ্ঞান পরিপূর্ণরূপে আহরণের জন্য যে সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করা আবশ্যক—সাধারণ চিকিৎসকগণের পক্ষে তাহা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এই অভাব পরিপূরণার্থ এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। সমুদয়খানি ইংরাজি ভাষায় লিখিত ভৈষজ্য-গ্রন্থ একত্রে তুলনা করিয়া পাঠ করিলে যে ফল পাওয়া যায়—এই একখানি পাঠে সেই ফল পাওয়া যাইবে।

ভাদ্র—১৩৭০

প্রথম খণ্ড | একপঞ্চাশত্তম বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

প্রণব বা অনাহত-ধ্বনি

শ্রীপ্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন দেশ, কাল, গ্রহতারা, রবি, শশী কিছুই ছিল না, তখন একমাত্র ব্রহ্মই নির্গুণ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। এখানে জ্ঞাতা জ্ঞেয় নেই, নাম-নামী নেই, তিনি স্থিরধী। ইহা এক মহাশূন্যবৎ অবস্থা। ক্রিয়াহীন, নির্বাক, নিষ্কম্প। ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ—'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্।' ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপই বলা হয়।

এখন প্রশ্ন এই নির্গুণ-ব্রহ্মে সগুণের উৎপত্তি কিভাবে হল? অব্যক্ত নির্গুণ-ব্রহ্মে যখন স্রষ্টার সৃষ্টির ইচ্ছা জাগল, এক যখন বহুধা হয়ে লীলায় ইচ্ছান্বিত হলেন, তখনই নিষ্ক্রিয় নিস্পন্দ সত্তা হইতে একটি শব্দ ওম্‌কার-রূপে ব্যক্ত হইল। এই ওম্‌কারই হল সগুণ ব্রহ্মের সক্রিয় বা স্পন্দিত অবস্থা। ইচ্ছা হইতে ক্রিয়ার সৃষ্টি, আবার ক্রিয়া হইতে স্পন্দনের সৃষ্টি, স্পন্দন হইতে ধ্বনির সৃষ্টি। জগতে যত কিছু শব্দ হয় দুটি বস্তুর সংঘাতে। কিন্তু জগতের আদিশব্দ বস্তুহীন হয়ে পদার্থহীন হয়ে আপনিই আপন সুরে বেজে উঠেছে অনাহতভাবে। তাই প্রণবের অপর নাম অনাহত ধ্বনি। এই শব্দ অব্যক্ত ছিল, লীন ছিল নির্গুণ ব্রহ্মে। স্রষ্টার ইচ্ছায় সৃষ্টি হল এই ওম্‌কার ধ্বনি। এই ওম্‌কারই ভগবানের প্রকাশিত শক্তি এবং তাঁহা হইতে অভেদ। যেমন অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তি

অভিন্ন। ইহাই প্রকৃতি। ইহা এমন একটি ধ্বনি যাহা জাতিগতভাবে, ভাষাগতভাবে ভিন্ন নয়, কোন ভাষাই নয়। ইহাকে বলা হয়, "First prime ordeal sound"—প্রথম ব্যক্ত আদিশব্দ বা ধ্বনি। এই শব্দ অপৌরুষেয়। বাইবেল বলেন, "At first there was word and the word was with God and the word is God" এই প্রণব সব সুরেরই মূল সুর, সব সাড়ারই মূল সাড়া, সমস্ত সৃষ্টির মূল উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ। সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি ইত্যাদি সপ্তসুরে বাঁধা এই বিশ্বপ্রকৃতি এক ঐকতানে বাঁধা এই মূলসুরে। এই প্রণব হল জীবের পরমাত্মা বা Higher self—ইহা লাভ করাই মানবজীবনের কাম্য। পাতঞ্জল দর্শন বলেন, "প্রণবঃ তস্য বাচকঃ" অর্থাৎ প্রণবই অব্যক্ত ব্রহ্মের প্রকাশ-রূপ। ইহাই আদ্যাশক্তি বা প্রকৃতি এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। একই আদ্যাশক্তি "ওম্" তিন ভাবে অ, উ, ম, আকারে স্পন্দিত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়শক্তিরূপে পরিণত হইয়া এই বিশ্বকে প্রকাশ, স্থিতি ও লয় করিতেছেন। সৃষ্টির সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই ওম্‌কারধ্বনি সমস্ত বিশ্বে ঝংকৃত হয়ে প্রলয়ে সমস্ত বিশ্বসহ পুনঃ মিলিত হয় নির্গুণ ব্রহ্মে। এই ধ্বনিরই বাঙ্‌ময়মূর্ত্তি বেদ আর প্রাপঞ্চিক মূর্ত্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। অনাদিকাল হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়রূপ আনন্দলীলা চলিতেছে। স্বয়ং ব্যাসদেব লীলাপ্রসঙ্গে বলেছেন, 'লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্'। প্রণবই হচ্ছে পরমপুরুষের বুকে প্রকৃতির লীলা, মহাকালের বুকে মহাকালীর নৃত্য, নিস্পন্দ পরব্রহ্ম বা static force এর উপর পরমাপ্রকৃতি বা Dynamic force এর ক্রিয়া।

ত্রিগুণা প্রকৃতির তিনটি গুণ সত্ত্ব, রজঃ ও তম। ত্রিগুণের বিভিন্ন সংমিশ্রণে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি। দেবদেবী, গ্রহনক্ষত্র থেকে আরম্ভ কোরে ক্ষুদ্র পরমাণু পর্য্যন্ত ব্রহ্মের স্পন্দন হইতে জাত এবং স্পন্দনের মাত্রানুসারে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত। এই স্পন্দনের এক বিশেষ অবস্থা আমাদের ভাষা। ইচ্ছা বা মনের স্পন্দন যখন বাহ্যপ্রকাশ করি, তখনই ভাষা বলা হয়। জীবগণ যে বংশবৃদ্ধি করেন তাহাও মূলতঃ কাম বা মনের স্পন্দন। এই স্পন্দন মাত্রানুসারে বিভিন্ন ফল দান করেন। সত্ত্ব রজঃ ও তম এই ত্রিগুণভেদে ভিন্ন ভিন্ন আধারে সুকর্ম ও কুকর্ম-জনিত কার্য্য দ্বারা স্পন্দনের মাত্রানুসারে কর্মফল সৃষ্টি হইয়া থাকে। পূর্বার্জিত কর্মফল ইহারই ফল এবং ইহাই ভবিষ্যৎ সূচনা করে। এই ব্রহ্ম-চৈতন্য বহুভাবে স্পন্দিত হইয়া প্রত্যেক ব্যষ্টি জীবের মধ্যে তিনি জীবাত্মা রূপে কর্ম করিতেছেন এবং কর্মফল ভোগ করিতেছেন। আবার এই ব্রহ্মচৈতন্যই নির্লিপ্ত হয়ে দ্রষ্টারূপে জীবের কর্ম দেখিতেছেন এবং ভোগরূপে দিতেছেন।

প্রকৃতি আপনসুরে, আপন ছন্দে, আপন গতিতে ভরপুর হয়ে চলেছে জীবজগৎসহ পরিপূর্ণতার দিকে। এই ব্রহ্মসুরে গতির ছন্দে যে আপন সুর মিলাতে পারে সেই জ্ঞানী, তারই জীবন্মুক্তি হয়। এই প্রকৃতির সুরে সুর মেলান বা In tune with Infinite Nature কথার অর্থ হল প্রকৃত ধর্মোপলব্ধিতে চলা বা প্রকৃতির নিয়মে চলা। সেজন্য প্রয়োজন নিষ্কামভাবে সত্যসাধনা। ব্যষ্টি সত্ত্বার 'আমিত্বের' লোপসাধন করিয়া উপাস্য ও উপাসকের ঐক্যসাধন করা। এই ক্ষুদ্র আমিত্বই হল 'অহং'। 'সোঽহং' উপলব্ধিতে নিজেকে স্থাপিত করাই হল জীবের লক্ষ্য। তবে অজপা সোঽহং' মন্ত্র যদি সদ্‌গুরুশক্তি সমন্বিত না হয় এবং উহার যে লক্ষ্য 'জীব ব্রহ্মে অভেদ' ইহা যদি চিন্তা, ভাবনা বা মনন না করা হয় ত সঠিক ফললাভ হয়না। সকল শাস্ত্রই বলে "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। ইহার অর্থ হল যে যেমন ভাবনা করে তাহার সেরূপ ফল হয়। সুতরাং অর্থবোধে মন্ত্র ও জপের সাধন প্রয়োজন। এই শক্তিসম্পন্ন চুম্বক যেমন অসংখ্য বিক্ষিপ্তভাবে ন্যস্ত লৌহকণা বা Molecule কে একই দিকে বরাবর আকর্ষিত কোরে চুম্বকশক্তি দান করে সেইরূপ সাধন মন্ত্র এবং পরমাপ্রকৃতির সাধনা মূলধারা থেকে সহস্রারে দেয় টান, জীবকে মিথ্যাবন্ধন ও সংস্কার থেকে মুক্ত কোরে উজ্জ্বল আত্মালোকে উদ্ভাসিত করে ও ব্রহ্মে সংযুক্ত করায়। মদীয় গুরুদেব শ্রীশ্রীবালকব্রহ্মচারী মহারাজ বলেন যে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হয় তাহা প্রকাশ পায় সংস্কার অনুযায়ী। মনের সংস্কারই মন। সমস্ত দৃশ্য-বস্তুই মন। আমাদের মনই দেহের আকার লইয়াছে নিজস্ব কর্মসংস্কার অনুযায়ী। সুতরাং কর্মসংস্কার মুক্ত না হইলে আত্মার মুক্তস্বভাব ব্যক্ত হইবে না। প্রণবের

এমন একটা শক্তি আছে যাহা আমাদের অন্তর ও বাহিরের সমস্ত সংস্কার ও চিন্তারাশিকে আকর্ষণপূর্ব্বক নিজের মধ্যে এক কোরে দেয়। সেজন্য মুক্তির জন্য প্রণবজপের নিতান্তই আবশ্যক। ব্রহ্মচারীজী আরও বলেন, দেহের খোরাক যেমন অন্ন, মনের খোরাক যেমন স্বাধ্যায়, সেইরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের খোরাক হচ্ছে প্রণব। এই প্রণব উচ্চারণে উদারতা বর্দ্ধিত হয়, প্রণব ক্রমশঃই বিস্তার লাভ করে। বাহিরে যাহা পদার্থরূপে দেখি উহা কোন জড়পদার্থ নয়. উহা আমাদের মনেরই বহির্বৃত্তিরূপে প্রকাশ, আর অন্তরে যাহা প্রকাশ পায় তাহা মনের বা চিত্তেরই অন্তর্বৃত্তিরূপে প্রকাশ। চঞ্চলমনে অন্তরে যাহা উত্থিত হয় তাহার নাম চিন্তা, আর বাহিরে যাহা প্রকাশ পায় তার নাম পদার্থ। চিত্তের বৃত্তিই প্রকাশ পাইতেছে চিন্তা ও জড়পদার্থাকারে। পাতঞ্জল দর্শন বলেন, "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ" অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি যখন নিরোধ হয় তখনই যোগ হয় অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন হয়। বিশুদ্ধমনে ভগবান্ প্রকাশিত হন। প্রণব-জপে প্রণবের শক্তি সমস্ত বাহ্যদৃশ্য ও অন্তরের চিন্তা নিজের মধ্যে আকর্ষণ কোরে লয়, কোরে দেয়। সমস্ত বিশ্বটা প্রণব ঝংকারে এক অখণ্ডনাদরূপে প্রকাশ পাওয়ায় দেহাত্মবোধ পরমাত্মবোধে পরিণত হয় ও জীবের মুক্তি হয়।

মুকুর

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

এই সে মুকুর,—লুকাইয়া যাহে দেখিবারে চাঁদমুখ
যদি যেতে প'ড়ে কভু ধরা,—
অমনি হানিতে শাণিত অস্ত্র—নয়নের কার্ম্মুক
পরাণ-পাগল-করা!
তোলা একখানি খোঁপা বেঁধে চুলে পরি' কাঁচপোকা টীপ
আল্‌তা লাগায়ে পায়,
ডুরা শাড়ীর আঁচল গলায় জালিতে মাটির দীপ
যেতে তুলসীর আঙিনায়।
তার আগে পান-রাঙা ঠোঁটখানি বারেক দেখিতে চাহি
এই মুকুরের বুকে।
তন্বী সন্ধ্যা হেলিয়া দুলিয়া দূর ছায়াপথ বাহি'
ধরায় নামিত সুখে;
বনের ব্যাকুল বীণায় বাজিত ঝিল্লির কলরোল,
কতো ফুটিত মতিয়া বেলী,
'পিউ কাঁহা' বলি' করিত পাপিয়া উন্মাদ উতরোল
সঙ্গীত-কলাকেলি!
ধীরে গ্রামখানি হত নিরজন—নিশ্চুপ থল জল
ঘুমের আমেজ-মাখা,
গগন-সায়রে মগন চন্দ্র—প্রস্ফুট শতদল
সোনার কিরণ-ঢাকা।
গোপন পুলকে রহিতাম শুয়ে শূন্য শয্যা 'পরে
নিদ্রার ছলে জাগি',
'কখন কাঁকন বাজাইবে এসে শিয়রে মধুর স্বরে,—
মন চঞ্চল তারি লাগি'।
সহসা কখন ফুটিত মুকুরে তোমার অধরখানি
সুখ স্বপ্নের মতো;—
তারপর?—সেই সনাতন-লীলা—গুঞ্জন কানাকানি
হাস্যলাস্য কতো!
মুকুর তেমনি আজো আছে পড়ে—কোথা গেল সেই মুখ
হায় মিলাইয়া ছায়াসম?
আজি এ শূন্য গৃহের আঁধারে খুঁজি' আমি উৎসুক
এই ভাঙা বুক নিয়ে মম।
তোমার স্নিগ্ধ সন্ধ্যা-প্রদীপ জলিবে না কভু আর
ঐ তুলসীমঞ্চ তলে,
আমার সন্ধ্যা আসে ধীরে নিয়ে নিবিড় অন্ধকার,—
মোর মন বলে—মন বলে!

অভিশপ্তা

চারুলতা রায় চৌধুরী

অমাবস্যার রাত্রি, তার ওপর ঘোর দুর্যোগ। এমন দিনে পথে বার হবার তাগিদ তাদেরই থাকে যাদের নিতান্ত প্রয়োজন। সহরের প্রান্তে ছিল একটি প্রতিষ্ঠান। দুর্দ্দিনকে অগ্রাহ্য কোরে তারি উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে একটি মটর গাড়ী। আরোহী মাত্র দুইজন, দুটি নারী। একটি যুবতী, অপরটি প্রৌঢ়া। কাহারও মুখে কথা নেই। প্রৌঢ়া একটি কোণ অধিকার কোরে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন কোরছেন। যুবতী আনমনা অথবা নিজের চিন্তায় মগ্ন।

বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের মহিলা। একজন মা, অপরটি মেয়ে। কৈশোর পার হতেই প্রৌঢ়ার বিবাহিত জীবনের সুরু হয়। অনেকগুলি সন্তানের মা হবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। এটি কনিষ্ঠা তাই বাড়ীশুদ্ধ সবাইকার অত্যন্ত আদরের। সদাপ্রফুল্ল বুদ্ধিদীপ্ত মুখাকৃতি, অতি অস্থির চিত্ত। মা সোহাগ কোরে নাম দিয়েছিলেন ইন্দ্রাণী, ডাকতেন রাণী বোলে। বাপের আদরের ডাক ছিল "চঞ্চলা লক্ষ্মী"।

অল্প বয়সে যে ব্যবহারটা মধুর লাগে একটু বয়স হ'তেই মানুষ তার বিচার কোরতে সুরু করে। ইন্দ্রাণীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হল না। যতদিন সে ছোট ছিল ততদিন তার চঞ্চলতা কারোও দৃষ্টিকটু লাগেনি—কিন্তু যেই একটু বয়স বাড়ল অমনি সেটা মার চোখে লাগল। তিনি বোললেন, মেয়ে মানুষের অত অস্থিরতা ভাল নয়। মেয়ে অত সহজে পরের কথা মেনে নেবার পাত্রী ছিল না। সে বোললে, কেন ভাল নয়? মা বোললেন, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক কোরব নাকি? যা বোলছি তা মেনে নাও, বড়দের মুখের ওপর কথা বোল না।

ইন্দ্রাণীর মা গড়ে উঠেছিলেন অত্যন্ত ধার্ম্মিক পরিবেশের মধ্যে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে সব কিছু অনুষ্ঠানকে মেনে নেওয়া তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর প্রত্যেকটি সন্তান তাঁর এই আদর্শ অনুসরণ কোরবে। এদিক দিয়েও ইন্দ্রাণী তাঁকে নিরাশ কোরেছিল। ধর্ম্ম নিয়ে সে তাঁর সঙ্গে তর্ক কোরত। লৌকিক অনুষ্ঠানগুলির বিশ্লেষণ কোরে সে সম্বন্ধে রসিকতা কোরতেও দ্বিধা কোরত না। মা ক্ষুন্ন হলে বা দুঃখ প্রকাশ কোরলে অসঙ্কোচে বোলত—তুমি যা পুণ্য সঞ্চয় কোরেছ তাতেই আমাদের বাড়ীশুদ্ধ সকলের স্বর্গলাভ হবে। নাই বা মানলাম আমি কিছু।

মায়ের আর এক সঙ্কট হল মেয়ের বন্ধুর দল নিয়ে। তাদের সংখ্যা যত, প্রকার ভেদও তত। ভাল লাগলেই হল। অমনি ইন্দ্রাণী তাকে কাছে টেনে নিত—স্ত্রী, পুরুষ নির্ব্বিশেষে। প্রাচীনপন্থী মায়ের চোখে এটা ভাল ঠেকল না। তিনি বোললেন, এ চলবে না।

মেয়ে প্রশ্ন কোরলে, কি চলবে না?

মা—এই তোমার যতরাজ্যের বাজে লোক নিয়ে এসে বাড়ীতে হুজুগ করা। তুমি বড় হচ্ছ সেটা মনে রেখ। তোমার বয়সে পুরুষদের সঙ্গে ঐ ভাবে মেলা-মেশা শোভন দেখায় না।

ইন্দ্রাণী—কেন তাতে দোষটা কিসের? মেয়ে বন্ধু যদি থাকতে পারে, পুরুষ বন্ধু থাকতে পারে না কেন শুনি?

মা এবার ক্রোধ প্রকাশ কোরে বোললেন—দেখ, রাণী, তোমার কাছে সব কথার কৈফিয়ৎ আমি দিতে পারব না। তোমার ঐ লক্ষ্মীছাড়ার দল নিয়ে আমার বাড়ীতে হল্লোড় করা চলবে না, এই আমি তোমায় বোলে দিলাম্। তুমি যদি তাদের আসা বন্ধ না কোরতে পার তা'হলে আমাকেই সে ভার নিতে হ'বে।

সেদিনকার ঐ কথোপকথনের পর ইন্দ্রাণীর বন্ধুদের আর বাড়ীর নাগালে দেখা যায় নি। কিন্তু সেই সঙ্গে ইন্দ্রাণীর কাছে বাড়ীর বন্ধন অপেক্ষা বাইরের আকর্ষণ হল বড়। মা বুঝলেন এ মেয়েকে বশে আনা সহজসাধ্য নয়। স্বামীকে গিয়ে বোললেন—মেয়েকে আর বেশী দিন ঘরে রাখা চলবে না, পাত্রের সন্ধান কর। মনোমত পাত্র এসে পৌছবার আগেই ঘটে গেল একবিপর্যয় কাণ্ড। বয়স যখন সবে ইন্দ্রাণীর কানে চুপি চুপি রসের কথা বলা সুরু কোরেছে, সুযোগ বুঝে সেই সময় কতকগুলি চাটুকার এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদেরই কোন একজনের সোনার কাঠির স্পর্শে তার ঘুমন্ত যৌবন জেগে উঠল। অসতর্ক মুহূর্তে দিলে সে নিজেকে বিলিয়ে। ফলে মা হবার ছাড়পত্র পাবার আগেই মাতৃত্বের অঙ্কুর তার দেহে বাসা বাঁধল। মা জানতে পেয়ে কেঁদে বোললেন, সর্বনাশী এ তুই কি কোরলি? লোকসমাজে এরপর আমি মুখ দেখাব কি কোরে?

মেয়ে এ তিরস্কার বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ কোরতে পারলে না। সে বোললে,—তুমি মা হ'লে দোষ হয় না, আমি মা হলেই বুঝি যত দোষ!

মা বোললেন,—ওরে হতভাগী, তোদের যে বাবা আছেন। তোর সন্তানের পিতৃপরিচয় তুই কি দিবি?

এতক্ষণে সে বুঝল গলদ কোথায় এবং এইবার সে ভয় পেলে।

মেয়ের এই লাঞ্ছনা বাপের বুকে কঠোর হয়ে বাজল। তিনি বোললেন,—কান্নাকাটি কোরে হাট বসালে বা মেয়েকে গালমন্দ কোরলে যা হয়ে গেছে তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। যাতে এর প্রতিকার হয় তারি ব্যবস্থা কোরতে হবে। খোঁজ নিয়ে জেনেছি এই রকম অভাবনীয় ঘটনার জন্ম "মাতৃমন্দির" নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। মেয়েকে সেইখানে রেখে এস।

তাঁরই পরামর্শ অনুসারে দুর্যোগকে অগ্রাহ্য কোরে মা ও মেয়ের ঐ অভিযান।

যথাসময় ইন্দ্রাণীর একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হল। প্রথম মাতৃত্বের আনন্দে সে তার সব দুঃখ ভুলে গেল। অতি আদরে মেয়েকে বুকে টেনে নিলে। ছোট্ট, তাই মেয়ের নাম রাখলে কণা। মাতৃমন্দিরের নিয়ম অনুসারে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর ছমাস কাল পর্যন্ত মাকে তার শিশুর পরিচর্যায় থাকতে হয়। তারপর সে নিজের স্থানে ফিরে যেতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ের পর ইন্দ্রাণীর মা এলেন তাকে নিতে। সে বোললে, কণাকে না নিয়ে আমি যাব না। মা বোললেন,—গোল করিস নে রাণী। নিজের ইচ্ছামত চলে যত দুঃখ পেলি তত দুঃখ আমাদের দিলি, আর দুঃখ বাড়াস নে। মেয়েকে নিয়ে গেলে সমাজে তোর স্থান হবে না। ওর তো নয়ই। তার চেয়ে এখানে সে অনেক ভাল থাকবে। ইন্দ্রাণী মেয়েকে জড়িয়ে ধরে খুব খানিক কাঁদলে—তারপর মার সঙ্গে চলে গেল।

মাতৃমন্দিরে আট বৎসরের অধিক বয়স্ক শিশুদের রাখার ব্যবস্থা ছিল না। যে সব শিশুদের আত্মীয়েরা তাদের বাড়ী নিয়ে যেতে চাইতেন তারা চলে যেত। যাদের সে সুবিধা ছিল না তাদের মাতৃমন্দির সংশ্লিষ্ট অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেওয়া হত। সেখানে তাদের ক্ষমতা ও বুদ্ধি অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থাও হত। কণা যে প্রতিষ্ঠানটিতে গেল তার অভিভাবিকাকে মেয়েরা মা-মণি বোলে ডাকত। তিনি জানতেন তারা মা-হারা—তাই তাদের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক একটা করুণা ছিল। কণার স্বভাবটি ছিল মিষ্টি, দেখতে সুশ্রী এবং বুদ্ধি তীক্ষ্ণ; তাই প্রথম দর্শনেই তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং অন্যদের অপেক্ষা তাকে একটু বেশী কাছে টেনে নিলেন। অন্য মেয়েদের তাতে হিংসা হল। তারা বোললে, কণা সুন্দরী কিনা তাই মা-মণি ওকে বেশী ভালবাসেন। কণা মাথানেড়ে পাকা বুড়ির মত বোললে,—কক্ষণো না, আমার যে মা নেই।

এই কথায় বড় মেয়েরা সবাই হেসে উঠে বোললে,—আহা, কি বুদ্ধি মেয়ের! আমাদের বুঝি মা আছে? মা নেই বোলেই তো আমরা এখানে আছি। মা থাকলে বুঝি কেউ আসে? কণা চুপ কোরে কি যেন ভাবল, কিছু বোললে না। কথাটা যখন অভিভাবিকার কাছে পৌছল তিনি চিন্তিত হলেন। মেয়েদের মধ্যে হিংসা আসা স্বাভাবিক কিন্তু শুভ নয়। এই ভাবটিকে প্রশ্রয় দিতে তিনি চাইলেন না, তাই অতি সত্বর এর নিষ্পত্তির একটি উপায় উদ্ভাবন কোরে ফেললেন। কর্তৃপক্ষকে জানালেন—একটি মেয়ে প্রতিপালন করবার সাধ তাঁর

অনেকদিন থেকে আছে। তাঁদের আপত্তি না থাকলে কণার লালন পালনের ভার তিনি গ্রহণ কোরতে ইচ্ছা করেন। কর্তৃপক্ষের একটি খরচ কমল, সুতরাং তাঁরা সহজেই রাজি হয়ে গেলেন।

এখন থেকে কণার পরিচয় হল 'মা-মণির মেয়ে!' তাঁর ঘরেই সে থাকে। লেখা পড়ার দিকে তার উৎসাহ প্রকাশ পাওয়ায় তিনি তাকে স্কুলে ভর্ত্তি কোরে দিলেন। তার গান ও সেলাই শেখার ব্যবস্থা কোরলেন। কণার সরল ব্যবহারে মেয়েরাও তাকে ভালবাসতে সুরু কোরেছিল তাই এ নিয়ে মেয়েদের মধ্যে আর কোন আলোচনা হ'ল না। অভিভাবিকা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এরপর থেকে কণা তাঁকে শুধু মা বা মাগো বোলে ডাকত, অন্যদের মত মা-মণি বোলত না।

কণা মেধাবী ছাত্রী, সুতরাং যথাসময় স্কুলের কোঠা শেষ কোরে সে কলেজে উঠল। সেখানে সুলেখা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিশেষ বন্ধুত্ব হল। কলেজের পর সুলেখা মাঝে মাঝে তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফেরে এবং সন্ধ্যার পর তার স্থানে পৌঁছে দেয়। কণা যখন বি, এ, পড়ছে তখন সুলেখার আত্মীয় সুবীরের সঙ্গে তার পরিচয় হ'ল। সুবীররা দুজন—সে আর তার বোন মায়া। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। সে থাকে তার নিজের সংসারে। সুবীর থাকে তার মাকে নিয়ে। বাবা মারা গেছেন বছর দুই আগে। সুবীর নিজে সরকারী অফিসে ভাল চাকরী করে। ছাত্র হিসাবে সুনাম ছিল, কাজ পেতে কষ্ট হয় নি। উপযুক্ত সুপারিশও মিলেছিল, সঙ্গতিপন্ন অবস্থা। মার ইচ্ছা ছেলের বৌ এনে তার ওপর সংসারের ভার দিয়ে নিজে ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিয়ে থাকেন। এই নিয়ে ছেলে ও মায়েতে প্রায়ই কথা-কাটাকাটি হয়। ছেলে বলে—কাকে বিয়ে কোরব? যত সব ন্যাকানেকির দল।

মা রুষ্ট হয়ে বলেন,—তোর ঐ এক কথা! খুঁজলে নাকি ভাল মেয়ে পাওয়া যায় না। বলিস্ তো আমি সম্বন্ধ করি।

ছেলে বোলত,—দোহাই মা, ঐ কাজটি কোর না। তোমরা যাকে ইচ্ছে ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে, আর আমি মুখটি বুজে সে ভার গ্রহণ কোরব সে আমি পারব না।

এর কিছুদিন পরের কথা। সুবীর মাকে কাছে থেকে টেনে নিয়ে এসে বোললে বস কথা আছে।

মা—কি এমন কথারে যে এখুনি না বোললে নয়?

সুবীর—ভয়ানক জরুরী কথা! তোমার বৌ ঠিক কোরে ফেলেছি।

মা (উৎফুল্ল হয়ে)—সত্যি বোলছিস? কে সে? কি রকম দেখতে? কার মেয়ে? কোথায় বাড়ী? ইত্যাদি একরাশ প্রশ্ন কোরে ফেললেন।

সুবীর—ওরে বাবা, এতগুলা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে? দাঁড়াও; একে একে বলি। মেয়েটির নাম কণা, আমাদের সুলেখার বন্ধু। দেখতে বেশ, তবে আহা মরি সুন্দরী নয়। একটা কথা তুমি জিজ্ঞাসা করনি সেটা আমি বলি, স্বভাবটি আমার মায়ের মত নরম, উগ্রচণ্ডী নয়, তাঁর বৌ হ'লে মানাবে ভাল। কিন্তু অন্য দুটি প্রশ্নের তো উত্তর দিতে পারছি না। কার মেয়ে জানিনা, কোথায় বাড়ী তাও জানিনা। মেয়েটিকে ভাল লেগেছে তাই ঘরে আনতে চেয়েছি, ওসব খোঁজ নেবার তো প্রয়োজন বোধ করিনি।

মা—সে কি রে? জাতি, কুল, মান কিছুর খোঁজ না কোরেই বিয়ে ঠিক কোরলি? একেই বলে ছেলে-মানুষী কাণ্ড!

সুবীর—এসব খোঁজ নেবার কথা তো ছিল না। যাকে আমি পছন্দ কোরব তাকেই বরন কোরে নেবে—এই ছিল কথা।

মা—তা বোলে বংশের খোঁজ নিতে হ'বে না? এ আবার কোন দেশী কথা?

সুবীর—বেশ, তাহ'লে বল বিয়ে ভেঙ্গে দি।

মা—ঐ দেখ, তাই কি বোলছি নাকি? মেয়ের বাপ-মার কাছে গেলেই তো সব খোঁজ পাওয়া যাবে।

সুবীর—মেয়ের বাবা নেই।

মা—মা তো আছেন। তাঁর কাছেই যা। তুই না পারিস, কোথায় থাকেন বল্, আমিই না হয় তাঁর কাছে যাই।

পরদিন সুবীর সুলেখাকে গিয়ে বোললে—কণাকে বলিস আজ বিকেলে তোর সঙ্গে যেন আসে। দরকারী কথা আছে।

সুলেখা মুচ্‌কি হেসে বোললে,—দরকারী যখন নিশ্চয়

বোলব। কিন্তু তুমি ডাকছ জানলে দরকারী না হ'লেও সে আসবে।

কণা এলে সুবীর বোললে, মার হুকুম আমাকে তোমার মার কাছে যেতে হ'বে। কখন গেলে সুবিধা হ'বে বল।

কণা একটু সলজ্জ হেসে বোল্‌লে,—মাকে বোলেছি। তিনিও তোমার সঙ্গে দেখা কোরতে চান।

ঠিক হল—তার পরদিন সন্ধ্যার দিকে সুবীর কণার মার কাছে যাবে।

সুবীর যখন এল, কণা তখন বাড়ী ছিল না। কিছু একটা উপলক্ষ্য কোরে অভিভাবিকা তাকে বাইরে পাঠিয়েছিলেন। সুবীরকে সাদরে অভ্যর্থনা কোরে তিনি বোললেন,—এস বাবা বস। তোমার কথা আমি কণার কাছে অনেক শুনেছি।

সুবীর—আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে কোরতে ইচ্ছা করি সে কথাও তাহলে শুনেছেন নিশ্চয়। অভিভাবিকা—শুনেছি বৈকি। সেইজন্যই তো তোমাকে আজ ডাকার প্রয়োজন হয়েছে। তারপর একটু থেমে বোললেন, তুমি এসেছ তার মায়ের খোঁজে। কণা আমার মেয়ে নয়—একথা আমি প্রাণ থাকতে বোলতে পারব না, কিন্তু সে আমার গর্ভজাত সন্তান নয়। কণার জন্মের একটা ইতিহাস আছে সেটা না জানিয়ে কণাকে আমি কারো হাতে দিলে সেটা আমার পক্ষে অন্যায় হ'বে এবং তারও তাতে কল্যাণ হ'বে না। তার জন্ম-কাহিনী অন্যের সঙ্গে আলোচনা করা আমার পক্ষে সহজ নয়, তবু আজ তা আমায় কোরতে হ'বে। এ মেয়েকে যে গ্রহণ কোরবে সে ঠক্‌বে না—কণার পক্ষ নিয়ে এইটুকু শুধু আমি বোলতে পারি।

সব শুনে সুবীর গম্ভীর হয়ে গেল। সে বোললে, এসব কথা কণার আমাকে আগে বলা উচিত ছিল।

অভিভাবিকা—তার প্রতি অবিচার কোর না বাবা। কণা এসবের কিছুই জানে না। সে শুধু জানে জন্মকাল থেকে সে মাতৃ-পিতৃহীন। আমি তার মা, অন্য কোন মা সে জানে না।

এরপর কথা আর জমল না। সুবীর বোললে, আজ তা'লে আমি যাই। এ বিষয়ে অনেক কিছু ভাববার আছে। আমি একা নই, আমার মা আছেন। যতদূর জানি, বংশমর্য্যাদার দাম তাঁর কাছে খুব বেশী। আমি তাঁর একমাত্র পুত্র, আমাকে ঘিরেই তাঁর সব কিছু আশা।

দিন দশেক পরে কণার নামে একটি চিঠি এল। সেটি পড়ে কণার মুখে যে ভাববৈলক্ষণ্য ফুটে উঠল—সেটি মার চোখ এড়াল না। সুবীরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে একটা আশঙ্কার মধ্যেই তাঁর দিন যাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা কোরলেন,—কার চিঠি রে? সুবীরের বুঝি? কণা শুধু বোললে,—হ্যাঁ।

মা—চিঠি এল যে? দেখা হয়নি তোর সঙ্গে? কণা ঠোঁট কামড়ে বোল্‌লে—না হয়নি, হবেও না আর কোনদিন। তাৎপর চোখের জল সামলাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

মা বুঝলেন সবই, স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

নিজের সহ্যশক্তিকে যখন আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারলে তখন ফিরে এসে কণা বোললে, মা একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবার আছে আমি জারজ, আমার কোন বংশপরিচয় নেই, একথা তুমি আমায় আগে বলনি কেন? তাহ'লে আজ তো আমায় এ লাঞ্ছনা সইতে হত না।

মা—বলা যে কঠিন মা, তাই বলিনি। ভেবেছিলাম না বোললে যদি চলে, তবে কেন বলা। সমাজের তাড়না থেকে তোকে রক্ষা কোরতে পারি সে ক্ষমতা আমার নেই জেনেও চেষ্টা কোরেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হার মানতে হল। তোর এই ব্যথা আমার বুকে কম বাজেনি কণা। খানিক চুপ কোরে থেকে বোল্‌লেন,—কোন্ ছোটবলায় স্বামী হারিয়েছি মনেই নেই। সারাটা জীবন কাজ নিয়ে ভুলেছিলাম। পারবি নে তুই আমার মত থাকতে?

কণা করুণ হাসি হেসে বোললে, দেখি।

এই ঘটনার পর সদাহাস্যময়ী কণার মুখের হাসি গেল মিলিয়ে। লেখাপড়ায় যে এত উৎসাহ, সেও গেল ঝিমিয়ে। কয়দিনেই মেয়ে যেন একেবারে বদলে গেল। মা ভয় পেলেন, বুঝলেন, প্রচণ্ড একটা ধাক্কা সে খেয়েছে। মেয়ের মনের যখন এমনি ধারা অবস্থা হঠাৎ একদিন কলেজ থেকে ফিরতে অস্বাভাবিক রকম দেরী হওয়ায় তিনি চিন্তিত হ'লেন। খবর নিয়ে জানলেন, কলেজ অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। আগে মাঝে মাঝে এরকমটি ঘটেছে। কণার বলা ছিল দেরী হ'লে ভেব না, জেনো

স্নলেখা ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু এখন তো সে সম্ভাবনা আর নেই। তবে? অন্যমনস্কভাবে কণার খাতাপত্র নাড়াচাড়া কোরতে গিয়ে দেখতে পেলেন বইয়ের আড়াল থেকে একটি চিঠি মাথা উঁচু কোরে রয়েছে। সেটি তুলে নিয়ে দেখেন তাঁকেই লেখা কণার হাতের চিঠি। ক্ষুদ্র কয়েকটি লাইন মাত্র।

মাগো,

অনেক চেষ্টা কোরলাম মনকে দৃঢ় কোরতে কিন্তু পারলাম না। যে সমাজের কোথাও আমার স্থান নেই, বিনা দোষে আমি ঘৃণ্যা, অস্পৃশ্যা, সে সমাজে বাস করবার প্রবৃত্তি আমার হ'ল না। তাই বিদায় নেওয়াই স্থির কোরলাম। খুঁজে বার করবার চেষ্টা কোর না, পৃথিবীর কোথাও আমায় খুঁজে পাবে না। তুমি ভিন্ন অন্য মা আমি চিনি না। তোমার মনে ব্যথা দিয়ে গেলাম এই আমার একমাত্র ক্ষোভ, পার যদি ক্ষমা কোর। ইতি

—তোমার অভিশপ্তা কণা।

ব্রাউনিং—জীবন ও কাব্য

অরুণ দে

ছেলেটাকে দেখলেই চোখে পড়ে। একমাথা ঝাঁকড়া চুল। ফুটফুটে চেহারা। গভীর নীলাভ চোখে ভাবুকের তন্ময়তা।

গালে হাত দিয়ে আগুনের চুল্লীর কাছে বসে আছে। মুখে বিষাদের ছায়া। আগুনের চুল্লীতে খাতাটা পুড়ছে। কবিতার খাতা। ছেলেটা ঐ খাতায় অনেক কবিতা রচনা করেছিল। ভেবেছিল বিখ্যাত কবি হবে। কিন্তু কোন প্রকাশকই তার কবিতা প্রকাশ করতে রাজী হয় নি। সবাই বলেছে বাজে লেখা। কবিতা নয় পদ্য। তাই আঘাত লেগেছে কিশোর-প্রাণে। রাগে-দুঃখে সে নিজেই কবিতার খাতাটা আগুনের চুল্লীতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। খাতাটা পুড়ছে। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে কিশোর কবি। খাতাটা জ্বলছে। তারই সঙ্গে পুড়ে যাচ্ছে তার মনের আশা; জ্বলছে হৃদয়।

তবু ব্যর্থ হয় নি কিশোরের চেষ্টা। সাধনার বলে এই কিশোরের ব্যর্থ প্রাণের বেদনা একদিন ফুল হয়ে ফুটেছিল। এই অবজ্ঞাত কিশোর কবিই পরবর্তী জীবনে রবার্ট ব্রাউনিং নামে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে ব্রাউনিং জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কীটস্ তখন সবে সতের বছরের ছেলে, শেলী বিশ বছরের তরুণ, বায়রণ চব্বিশ বছরের যুবক, আর ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ।

ব্রাউনিংএর জীবনে তার মা-বাবার প্রভাব কম নয়। সাহিত্যের স্বাদ ব্রাউনিং প্রথম পেয়েছিলেন তার বাবার কাছ থেকে। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা ও সাহিত্যরসিক। আর ব্রাউনিং-এর কাব্যে যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ঈশ্বর-বিশ্বাস লক্ষিত হয় তার বীজ বপন করেছিলেন ব্রাউনিং-জননী।

ব্রাউনিং জন্মেছিলেন কাম্বারওয়েল শহরে। লণ্ডনের দক্ষিণদিকের এই শহরটি তখন সংস্কৃতি ও ফ্যাসনের কেন্দ্রস্থল। মনোহর প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য সুন্দরী নগরী বলেও তার খ্যাতি ছিল। এই শহরের বিচিত্র মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ কিশোরকবির প্রাণে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। সে পরিচয় তার পরবর্তী কালের রচনায় পাওয়া যায়।

আর দশটা ছেলের মতই ব্রাউনিংকে ছেলেবেলায় স্কুলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু স্কুলের জীবন তার ভাল লাগে নি। এদেশের রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি ছিলেন স্কুল-পালানো ছেলে চোদ্দ বছরের মধ্যে তাকে দুটি স্কুল বদলাতে হয়। নতুন স্কুলে গিয়েও মন টিকল না। শেষ পর্যন্ত স্কুল ছেড়ে দিয়ে তিনি বাড়ীতেই পড়াশুনা আরম্ভ করলেন। তাঁর বাবার ঘরেই বিরাট লাইব্রেরী ছিল। কবি সেখানে বসেই তার জ্ঞান-তৃষ্ণা মেটাতেন। নিজের চেষ্টায় তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন।

তার বাবা তাকে জীবিকার জন্য ডাক্তারী শেখাবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সে পথে গেলেন না, কবির জীবনই বেছে নিলেন।

তার প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে। বইটির নাম—Pauline'। এই বইটিতে শেলীর প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে। তিনি সে সময়ের পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেন না। দ্বিতীয় কবিতার বই—Paracelsus প্রকাশিত হল ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে। এই বইটি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কারলাইলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও ব্রাউনিং জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারলেন না। বহু পত্রিকায় তিনি 'দুর্বোধ্য কবি' বলে নিন্দিত হলেন। ব্রাউনিং এর স্পর্শকাতর কবিচিত্ত নিন্দায় ব্যথিত হলেও তিনি ভেঙ্গে পড়লেন না। কারণ তিনি ছিলেন তার নিজের ভাষায়

"One who never turned his back, but
marched breast forward.
Never doubted clouds would break,
Never dreamed, tho' right were worsted,
wrong would triumph
Held we fall to rise, are baffled to fight better,
sleep to wake."

তিনি আবার কবিতা রচনা আরম্ভ করলেন। Straffad প্রকাশিত হল ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তার Sordello বইটি নিয়ে সাহিত্য-মহলে বিতর্কের ঝড় উঠল। কেউ বললেন,'উদ্ভট',কেউ বললেন—'দুর্বোধ্য'—কেউ বা উপহাস করে বললেন—"a piece of pure bewilderment"। এমন কি বিখ্যাত কবি টেনিসন উপহাস করে বললেন যে তিনি বইটির প্রথম ও শেষ লাইন দু'টি ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারেন নি। প্রবন্ধকার কারলাইল জানালেন যে তার স্ত্রী বইটি পড়েছেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন নি যে Sordello জিনিষটা কি? মানুষ, না শহর, না বই—কোনটা? Sordello বইটির সম্পর্কে একটা মজার গল্প আছে।

ডগলাস জেরাল্ড নামে এক ভদ্রলোক বহুদিন অসুস্থ থাকার পর ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করছিলেন। ডাক্তার তাকে বলেছিলেন যে তিনি কিছুটা সুস্থ হয়েছেন। অতএব ইচ্ছে হলে দিনের বেলায় বই পড়ে সময় কাটাতে পারেন। জেরাল্ডের শয্যার পাশে অনেক বই ছিল। তিনি একদিন সেই স্তূপীকৃত বইগুলি থেকে একটি বই পড়ার জন্য বেছে নেন। বইটি Sordello'। কিন্তু বইটি পড়তে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি চীৎকার করে উঠলেন—"হায় ভগবান্। আমার শরীর সুস্থ হয়েছে কিন্তু আমার মনের বোধশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। আমি কবিতার পরপর দুটি লাইনও বুঝতে পারছি না।" তার চীৎকার শুনে আত্মীয়-স্বজন ছুটে এল। তিনি তখন তাদের বইটি দিলেন। দেখলেন, বইটি পড়ে তাদের মুখেও হতবুদ্ধির ছায়া পড়েছে। তখন তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন।

শুধু ব্রাউনিং কেন, অনেক খ্যাতনামা কবিকেই প্রথম জীবনে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ শুনতে হয়েছে। এযুগে এলিয়ট ও রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে দুর্বোধ্য কবি বলেই পরিচিত ছিলেন। যারা সাহিত্যের মধ্যে কেবল হালকা ও সস্তা আনন্দ খোঁজেন, ব্রাউনিংএর কবিতা তাদের জন্য নয়। তাদের কাছে তার চিন্তার গভীরতা ও প্রকাশভঙ্গিমা জটিল মনে হওয়া স্বাভাবিক। ব্রাউনিং তার কাব্যের দুর্বোধ্যতার প্রসঙ্গে W. H. Kingslandকে চিঠিতে লিখেছেন—

"I never designedly tried to puzzle people, as some of my critics have supposed. On the other hand, I never pretended to offer such literature as should be substitute for a cigar or a game of dominoes to an idle man."

Sordello প্রকাশিত হবার কিছুকাল পরেই ব্রাউনিংএর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কবি হিসাবে নয়, অন্য কারণে। সেই কারণটা বলি। সে সময়ে মিস্ এলিজাবেথ ব্যারেট ছিলেন জনপ্রিয় মহিলা-কবি। ব্রাউনিংও তার কবিতা ভালবাসতেন। তিনি মিস্ ব্যারেটকে একটা চিঠিতে জানালেন—"আমি শুধু আপনার কবিতা ভালবাসি না, আপনাকে ভালবাসি।" চিঠি পেয়ে রাগ করেননি মিস্ ব্যারেট, বরং নিমন্ত্রণ করলেন তরুণ কবিকে। দুজনার পরিচয় হল। সেই পরিচয় ভালবাসায় পরিণতি লাভ করল। কিন্তু দুজনের মিলনে মিস্

ব্যারেটের বাবার মত ছিল না। অস্থবিধা দেখে ব্রাউনিং তার প্রিয়তমাকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন সুদূর ইতালীতে।

জনপ্রিয় মহিলা-কবি ব্যারেটের পালিয়ে যাবার মুখরোচক গল্প চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আর সেই গল্পের নায়ক হিসাবে ব্রাউনিং সুপরিচিত হয়। জনসাধারণ নতুন করে তার কাব্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। তার কবিতা তখনও হেঁয়ালী ও দুর্বোধ্যতার অভিযোগে অভিযুক্ত।

ব্রাউনিং ছিলেন গতানুগতিকতার বিরোধী। শব্দের চয়নে ও বয়নে, প্রকাশভঙ্গিমায় ও শিল্পচাতুর্যে তার মৌলিকত্বই সে সময়ে তাঁর কাব্য দুর্বোধ্য মনে হওয়ার একটি কারণ। ব্রাউনিংএর কালে মানুষের জীবন নানা জটিলতায় পূর্ণ ছিল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পথে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। নতুন দার্শনিক চিন্তা ও রাজনৈতিক বিপ্লব তখন সমাজের গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছে। কবির কাব্যে যুগমানবিকতার ছায়াপাত হয়েছিল। তাছাড়া ব্রাউনিংএর পাণ্ডিত্যও সাধারণের কাছে তার কবিতাকে কিছুটা দুর্বোধ্য করে তুলেছিল। তিনি তার কাব্যে নানাদেশের উপকথা ও বিষয়ের যে সব উল্লেখ করতেন, তা জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত ছিল না। তার কাব্যসৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন—

"So I will sing on fast as fancico come ;
Rudely, the verse being as the mood it paints"

এই যার উদ্দেশ্য, তার কবিতা কিছুটা হেঁয়ালী হবে না কি? এ প্রসঙ্গে Aprilএর মুখে সমালোচকদের বিরুদ্ধে ব্রাউনিংএর উক্তি স্মরণ করতে পারি—

"Knowing ourselves, our world, our task so great. Our time so brief, 'tis clear if we refuse

* * *

To execute our purpose...and leave our task undone.
—What though our work
Be fashioned in despite of their ill service
Be crippled every way ?"

এ যেন সমালোচকের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের "নিন্দুকের প্রতি নিবেদন।"

"দুর্বল মোরা, কত ভুল করি, অপূর্ণ সব কাজ
নিহারি আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা আপনি যে পাই লাজ
তা বলে যা পারি তাও করিবনা? নিষ্ফল হব তবে?"

যার মধ্যে শক্তি আছে, আছে প্রতিভা—তাকে নিন্দুকেরা চিরকাল দমিয়ে রাখতে পারে না। ব্রাউনিংকেও পারেনি। কিছুকালের মধ্যেই আপন জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে তিনি সাহিত্যগগনে উদিত হলেন।

ব্রাউনিং তার পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক কবিদের থেকে কিছুটা ভিন্নপথ ধরলেন। ইতিপূর্বে প্রধানতঃ মহত্ব, বীরত্ব প্রভৃতি কাব্যের বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হচ্ছিল। হোমার দেব দেবীকে তার কাব্যে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। মিলটনের কাব্য গড়ে উঠল "Empyrean, cosmos, Heaven & Hell. Angelo and well known Biblical personages"দের কেন্দ্র করে। মধ্যযুগের কাব্যে ছিল রাজকুমারী, রূপসী নারী ও নাইট। রণদামামা ও নগরাদি অবরোধের চীৎকারে তা' মুখরিত ছিল। এমন কি ব্রাউনিংএর যুগের কবি টেনিসনও "Knights of Round Table, Arteur & Guenever" এর জন্য তার কাব্যের রাজত্বের অনেকটা স্থান ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ব্রাউনিং যা কিছু ক্ষুদ্র, সামান্য ও অবহেলিত, তাকে কাব্যে স্থান দিলেন। অবশ্য এদিকে তার আগে দৃষ্টি দিয়েছিলেন কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। কীটস্‌ সন্ধান করেছিলেন আদর্শসৌন্দর্যের। কোলরিজের রাজত্বে প্রাধান্য পেল অপ্রাকৃত রহস্য ও রোমান্স। শেলী তার স্কাইলার্কের মত "beating in the void his luminous wings in vain" খুঁজে বেড়ালেন আদর্শ সৌন্দর্য ও আনন্দ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির তুচ্ছ পদার্থের দিকে দৃষ্টি ফেরালেও তার মধ্যে ছিল "passive wiseness"। ম্যাথু আরনল্ড ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পথ ধরে কিছুটা এগোলেন। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ণতা লাভ করল ব্রাউনিং এর কাব্যে। যা কিছু ক্ষুদ্র ও আপাত তুচ্ছ তার মধ্যে তিনি গভীর তাৎপর্য খুঁজে পেলেন। অবহেলিতকে স্থান দিলেন সাহিত্যের প্রাঙ্গণে। রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি অনুভব করেছিলেন—

"ক্ষুদ্র যাহা ক্ষুদ্র তাহা নয়
সত্য সেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়।"

তার নিজের ভাষায়—

Small, great are merely terms we
fancy here,
Since to the spirit's absoluteness all
Are equal"

এ ক্ষেত্রে ভাব ও কিছু পরিমাণে ভাষার প্রকাশভঙ্গিমার দিক থেকে দুই কবির মিল লক্ষ্যণীয়।

ব্রাউনিং এর মতে এই পৃথিবীর কোন কিছুই নিখুঁত ভাল বা একেবারে খারাপ নয়। সাধুতার প্রতিমূর্তি যেমন মানুষের মধ্যে নেই, তেমন কোন মানুষই নিছক মন্দ হতে পারে না। এই ধারণার জন্যেই কবি সাদরে নিন্দিতব্যক্তিদের হৃদয়ে স্থান দিতেন। এ বিষয়ে তার মত কবির নিজের ভাষায়ই বলি—

"Best people are not angels quite
while not the worst of people's doing
scare the devil."

অথবা

In the unconventional world
All service ranks the same with God
With god, whose puppets, best or worst
Are we there is no last or first."

ব্রাউনিং মনে করেন যে ভগবানের কাছে সকলেই সমান। নীচ বা মহৎ ব্যক্তিকে তিনি একই দৃষ্টিতে দেখেন। মানবজীবনের সুখ ও দুঃখ উভয়ই ব্রাউনিংএর কাছে প্রিয় ছিল। জীবনের কলরবে যোগ না দিয়ে বৈরাগ্য-সাধনায় তার কোন উৎসাহ ছিল না। তাই তিনি বলেছেন—

"Others may need new life in heaven

* * *

Let earth's old life once more enmesh us
You with old pleasure, me old pain
So we but meet nor part again."

রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"স্বর্গে তব বহুক অমৃত
মর্ত্তে থাক সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজল চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।"

রবীন্দ্রনাথ ও ব্রাউনিং এর চিন্তাধারার ঐক্য নিম্নলিখিত লাইনগুলিতেও আছে।

ব্রাউনিং বলেন,

"Why, where's the need of Temple,
When the walls
O' the world are that."

রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"কাজ কি আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়
পাতব আসন আপন মনের একটি কোণায়।"

সুখদুঃখের রৌদ্রছায়াময় মানবজীবন কবির কাছে অতি প্রিয় ছিল। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে পৃথিবী ও জীবনের বন্দনা করেছেন—

"How good is man's life, the mere living
how fit to employ
All the heart and the soul and the senses
for ever in joy
I have lived, seen God's thro' a life time
and all was for best"

অথবা

"Perfect I Call thy plan
Thanks that I was a man."

কিংবা

"O world, as God has made it! All is
beauty.
And knowing this is love and love is duty.

ব্রাউনিংএর মতে মানুষের জীবন একটি শিক্ষাক্ষেত্র। এই পৃথিবীতে আমরা শিক্ষানবীশ। এখানে দুঃখ, ব্যর্থতা, রোগ প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা ক্রমশ শক্তিশালী ও পবিত্র হয়ে উঠছি এবং তারই ফলে বৃহত্তর জীবনের উপযুক্ত হই। তার ভাষায়

"This life is training and passage

* * * *

Life is probation and the earth no goal
But starting point of man."

মানবজীবন হল অসম্পূর্ণতা থেকে পূর্ণতার পথে মহাযাত্রা। আমাদের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি মহাজয়ের পথে; উন্নতি ও পূর্ণতার পথনির্দেশ করছে সাময়িক পতন। আঘাত বরণ করে জীবনের পথে এগিয়ে চলাই মনুষ্যত্ব। কবি বলেন—

"Then welcome each rebuff
That turns earth's smoothness rough
Each sting that bids nor sit nor stand
but go
Be our joys three-parts pain
Strive and hold cheap the strain."

আশাবাদী কবি ব্রাউনিং জীবনের ব্যর্থতা বা হতাশায় বিশ্বাস করেন নি। তিনি বলেন—

"Strive and thrive ! cry speed figh on,
fare ever
There as here"

মানুষকে বিচার করতে হবে তার চেষ্টা বা সাধনার মাপ কাঠিতে। মহৎ কার্যে যিনি ব্রতী, তিনি জাগতিক সফলতা লাভ না করলেও তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ নয়। জীবনের তথা কর্মীর সার্থকতা রয়েছে কর্ম বা সাধনার মধ্যে, কীর্ত্তিতে নয়। তাই।

"Better have failed in high aim as I
Than valgarly in low aim succeed."

ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতার গ্লানিতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কারণ,

"All men strive and who succeeds ?"
What hand and brain rest ever paired ?"

যদি বিফলতাকে ব্যক্তিজীবনের খণ্ডতার মধ্যে দেখি, তবেই তা দুঃখের কারণ হয়। আমরা ভুলে যাই—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

"হেথা যারে মনে হয় শুধু বিফলতাময় অনিত্য চঞ্চল
সেথায় কি চুপে চুপে অপূর্ব্ব নূতন রূপে হয় সে সফল"

* * *

নাই তোর নাই রে ভাবনা
এ জগতে কিছুই মরে না।"

ব্রাউনিং এই একই বিশ্বাস অন্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন —

"Oh yet we trust somehow good
Will be the final goal of ill.

* * *

All we have willed or hoped or dreamed
Of good, shall exist.

কিংবা

And what is our failure here but a
triumph evidence
For the fulness of the days ?"

ব্রাউনিংএর দৃঢ় আশাবাদ তার গভীর ঈশ্বর-প্রীতিরই এক ভিন্ন রূপ।

ব্রাউনিংএর জীবনকথার আলোচনা আরম্ভ করে আমরা তার জীবনদর্শনের আলোচনায় এসে পড়েছি। কারণ বাইরের ঘটনা সাজিয়ে কোন শিল্পীরই পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। অন্তরের অনন্তলোকে তার সত্যকার ইতিহাস লুকিয়ে থাকে। কাব্যই কবির সত্যকার জীবন, বহির্ঘটনা নয়। তথাপি ব্রাউনিংএর জীবনের শেষ অধ্যায় স্মরণীয়।

এলিজাবেথ ব্যারেটের সঙ্গে বিয়ের পর কবির জীবনে তথাকথিত রোমাঞ্চকর আর কোন ঘটনা ঘটেনি। পনের বছর সুখী বিবাহিত জীবন তিনি ইতালীতেই কাটিয়েছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি রচনা করেন Christmas Eve and Easter Day এবং Men and Women.

এলিজাবেথ ব্যারেটকে ভালবেসেই বোধ হয় ব্রাউনিং জীবনে প্রেমের অমিতদীপ্তি উপলব্ধি করেছিলেন। উদাত্তকণ্ঠে তিনি প্রেমের বন্দনা করেছেন। কবির মতে প্রেমের মধ্যেই মানবজীবনের চরম সার্থকতা রয়েছে। প্রেম শাশ্বত; জন্মান্তরেও তা অপরিবর্তনীয় থাকে। প্রেমের শক্তিতেই মানুষ জীবনের কলুষতা থেকে মুক্তি পেয়ে উন্নত ও মহৎ জীবনের আস্বাদ পায়। তিনি আরও বলেছেন, প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বলে কিছু নেই। কারণ প্রেমেই প্রেমের তৃপ্তি। প্রকৃত প্রেম প্রতিদানের

অপেক্ষা করে না। বসন্ত ও আনন্দের প্রতীক এই প্রেম সর্বগ্রাসী ও সর্বদুঃখজয়ী অমৃত। কবির প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে "One way of love, Last Ride Together, The lost Mistress, Christina, Evelyn Hope প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ব্রাউনিং মনে করতেন যে জীবনের উদ্দেশ্যই হল প্রেমের সাধনা। জীবনের চরম মঙ্গল প্রেমের মধ্যেই উপলব্ধি করা যায়। জীবনতৃষ্ণার পরম ফলস্বরূপ এই প্রেমই সংসারের সারবস্তু। তাই কবি বলেছেন—

"Truth that's brighter than gem
Trust that's purer than pearl,
Brightest truth, purest twist in the universe—all were for me
In the kiss of one girls"

ব্রাউনিং দেহনিরপেক্ষ অতীন্দ্রিয় প্রেমের পূজা করেন নি। দেহকে অবলম্বন করেই তার প্রেমের ভাবকল্পনা দেহাতীতের আরাধনা করেছে। তার কাব্যে যেমন রক্তমাংসের উষ্ণতা ও হৃদয়াবেগ আছে, তেমনই দেহোত্তীর্ণ প্রেমের বন্দনাও আছে। তাই দেখি, Two in the campagna কবিতায় প্রেমিক তার প্রিয়তমার সঙ্গে নিবিড় মিলনের পরেও অনুভব করেছে—

"Infinite passion and the pain
of finite hearts that yearn."

স্ত্রীর প্রতি গভীরপ্রেম তাকে মহৎ প্রেমের সন্ধান দিয়েছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি আবার ইংলণ্ডে ফিরে আসেন। তার পর Dramatis personal ও The Ring of the book রচনা করেন। তার শেষ বই Asolando যেদিন প্রকাশিত হয় সেদিনই, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর তার মৃত্যু হয়।

পনেরই আগষ্ট

সৈয়দ মহম্মদ বাবর

পনেরই আগষ্ট স্বাগতম্ তব
জানাই হৃদয় ভরি
বরষে বরষে পুণ্য তিথিতে
ধন্য তোমায় বরি
দু'শ বছরের ধ্বংস চিতার
তুমি মহা নির্ব্বাণ
মৃত্যু তুহীণ তিমির ভেদিয়া
দীপ্ত দীপ্যমান
পরায়েছ তুমি ভারত ললাটে
উজ্জ্বল জয় টীকা
যুগ যুগান্তের পরাধীন প্রাণে
মুক্তির স্বরণিকা
বিস্মৃতি হতে মণি দীপে
দিলে তুমি সন্ধান
জননী-ভারত, গরবে তোমার
গরীয়ান মহীয়ান

জনমে জনমে পরম লগনে
তোমায় যেন গো স্মরি
পনেরই আগষ্ট ইতিহাস নহ
জাতির জীবন তরী
প্রাণের পদ্মে অর্ঘ্য সঁপিয়া
তোমার আবাহনে
ফাঁসীর মঞ্চ মুখরিত হলো
যাদের জয়গানে
নিভৃতে দান করিয়াছে যারা
মহাপ্রাণ অবহেলি
পনেরই আগষ্ট রাখিও স্মরণে
যেওনা তাদের ভুলি
তাদের তরে জানাই প্রণতি
বেদনার স্বাগতম্
নন্দিত করি বন্দনা গীতে
বন্দেমাতরম্।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নারাণঠাকুর একমনে আসছে মাঠ থেকে। জমি বেহাত হবার দুঃখটা মনে পাথরের মত জমে বসেছে। কি করে ভাজবৌ এমন কাজ করতে পারে জানে না সে। এত কষ্ট এত আশা করে সে টিকিয়ে রেখেছে এ সব। ভাষা নেই তার—কিন্তু আর সব ইন্দ্রিয়গুলো তাই অসাধারণ তীক্ষ্ণ—সচেতন।

ভাইপো সনাতন-এর সম্পত্তি তাকেই মানুষ করেছে। তার দাদার শেষ চিহ্ন, কত আশা তার। চাকরী করছে। এইবার বিয়ে থা দেবে। সেদিন গোপগা থেকে হরষিত চৌধুরী এসেছিল -তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার কথাও নাকি বলেছে।

খুশীতে ধরে না নারাণের।

নিজেই ছোট্ট গামছাখানা মাথায় ঢাকা দিয়ে বৌ-এর মত ঘোমটা দিয়ে ডানহাতে বৌ-এর উচ্চতার একটা আন্দাজ দেখিয়ে অনেককেই বলেছে সনাতন এর বিয়ের কথা।

বৌ আসবে। নোতুন বৌ।

কিন্তু সব যেন তার ভেস্তে যায়। ওই বাকুড়িখানা বেহাত হয়ে যেতে দেখে মাথা গরম হয়ে উঠেছে।

...বাড়ীর কাছে এসে একটু দাঁড়াল। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নেয় কি ভাবে জানাবে কথাটা। চোখ দিয়ে তখনও জল বের হচ্ছে।

ছাহু দাস ওর হাতধরে ধাক্কা দিয়ে মাঠ থেকে সরিয়ে দিয়েছে—ঘাড়গুজে পড়েছিল আলের মাথায়। মারতো আরও ছাহু দাশ, কিন্তু ওরা এসে থামিয়ে দিয়েছে।

—অ্যাঁ!...

জৈবিক ভাষাহীন আর্তনাদ ওঠে।

...উঠোনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে নারাণ ঠাকুর। কোন সাড়া নেই। কেউ কোথাও নেই। শূন্য ঘর উঠোন। সব ফাঁকা—জনমানব নেই। ভাজবৌ—সনাতন! সবাই চলেগেছে।

রান্নাঘরের খোলা আগুড়ের পাশে পড়ে আছে ভাত রাঁধার কালিমাখা মেটেহাড়ি দু একটা সরা মাত্র। ওদিকে মাটির কলসী। আর সব ফাঁকা। উধাও।

...কেমন কাঁপতে থাকে নারাণ।

অস্ফুটকণ্ঠে আর্তনাদ করছে। সবাই তাকে ফেলে চলে গেছে—সরে গেছে। চারিদিকে দিনের আলো অন্ধকার হয়ে আসে—কেমন স্তব্ধতা আর হতাশার রাজ্য—চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের দিনগুলো। ওইখানে!—তার দাদার শেষ দৃশ্য মনে পড়ে—কেমন করুণ কাতর আবেদন-ভরা চোখে ভাষাহীন নারাণের দুটোহাত চেপে ধরেছিল, তুলে দিয়েছিল সনাতন আর ভাজবৌএর ভার।

কই সে তো ভুল করেনি—প্রাণপাত পরিশ্রম, দুঃসহ অপমান সব সয়েছে কিন্তু শেষকালে তারাই ফেলে গেল

তাকে নিশ্চিত অনাহার আর অতল দুঃখবেদনার একাকিত্বের মাঝে।

…কাঁপছে ভাষাহীন নারাণ ঠাকুর।

সারা শরীরের অতলথেকে যেন উঠছে একটা অব্যক্ত চীৎকার—দূরের আকাশের দিকে চেয়ে আর্তনাদ করছে নারাণ।

মাথা ঠুকছে শক্ত মাটিতে—ঠুই ঠুই ঠুই।

…একটা জড় পদার্থের আছাড় খাওয়ার মত শব্দ উঠছে। দুচার জন প্রতিবেশী এসে জুটেছে।

—আহা! অবলামানুষটাকে ফেলে গেল!

—সমবেদনা বোঝবার ভাষা তার জানা নেই।

নারাণ ঠাকুর চীৎকার করছে একটানা ভাষাহীন একটা আর্তনাদ। ভয়ে আতঙ্কে অসহায় রাগ আর ক্ষোভে ওর বুকফেটে যাচ্ছে।

কতক্ষণ আর্তনাদ করেছিল জানেনা নারাণ ঠাকুর।

বেলা পড়ে আসছে। বোধহয় সারাটা দিনই এক ভাবে বসে আছে দাওয়ায় খুঁটি হেলান দিয়ে।

কোথায় দুর্গাপুরে চলেগেছে ভাজবৌ সোনাকে নিয়ে, আর বোধহয় ফিরবেনা।

তার সব আশা স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। খাঁ খাঁ করছে ঘরখানা—দুটো কাক রান্নাঘরে মাটির হাড়িটায় ঠোকর মেরে জলদেওয়া ভাতগুলো ছিটিয়ে ছত্রাকার করেছে। ভাজবৌ হাড়িতে একবেলার খোরাকও রেখেগেছে দয়াকরে। কিন্তু মুখেদেবার সামর্থ্য তার হয়নি।

বুক ফেটে যেন হু হু কান্না আসে।

সাজানো ঘরবাড়ী, মা বাবা—দাদা—বৌদি কত লোক কত আনন্দের দিন তার বুকের অতলে এই বাড়ীর সঙ্গে একটি মধুর স্মৃতি হয়ে মিশেছিল!

কিন্তু!

…হু হু করে ওঠে বুক। কেমন একটা অসহ্য জ্বালা। চাপড় মারতে থাকে বুকে।…কেমন একটা তীব্র যন্ত্রণা দুচোখ বেয়ে জল আসে।

হঠাৎ কাকে আসতে দেখে ওর দিকে চেয়ে থাকে। দেখছে ওকে। ওর দুচোখ—মুখ তন্ন তন্ন করে।

অবাকও হয়েছে নারাণ ঠাকুর।

মিষ্টি লোহার ঢুকছে।

—ঠাকুর! অ ঠাকুর!

একজনের বেদনা আর একজনের মনের অতলে কোন নিভৃতে স্পর্শ করেছে। একজনের ঘরবাঁধা হয়েছে, ব্যর্থ অন্তর তাই শূন্য। অন্যজনের ঘর ভেঙ্গে গেছে কোন নিদারুণ ঘূর্ণিঝড়ে তাই বুক ফাটিয়ে কাঁদে।

—চুপ দাও ঠাকুর, কেঁদে কি হবেক?

মিষ্টি এসে পাশে দাঁড়াল ওর।

ভাষা বোঝে না নারাণ। ওর দিকে অবাক বেদনাহত চাহনি মেলে চেয়ে থাকে।

মিষ্টি সান্ত্বনা দেয়—একটা প্যাট যমন তেমন করে চলে যাবেক। কেঁদোনা অমন করে।

…চোখ মোছে নারাণঠাকুর।

সান্ত্বনা সমবেদনা জানাবার ভাষা বোধহয় ফুটে ওঠে সর্বপ্রথম চোখের চাহনিতে, মূকবধির ওই অর্দ্ধনরটির কাছেও তা প্রকাশ পেতে দেরী হয় না।

গজগজ করে মিষ্টি-ঘরের খাবারও কিছু রেখে যায় নি? ঠাকরুণ কি লক্ষ্মীর হাঁড়ির ধান পাইটাও খুঁটে বেঁধে লিয়ে গেছে। মরণ! বাসাকে গেছে—পাখীর বাসা। ঝাঁটা মার মুয়ে।

…খুঁট থেকে একটা টাকা বের করে দেয়। ইসারা-করে দেখায়—চাল ডাল যা হয় আন, খেতে তো হবেক?

মাথা নাড়ে নারাণ, খিদে তার নেই।

খিদে তেষ্টা সব যেন ভুলে গেছে সে নিদারুণ এই নীচতায়।

আপনজনের দেওয়া কঠিন আঘাতটা তার বুক পাথর করে দিয়েছে। কেমন ঘৃণা বিতৃষ্ণা এসেছিল মানুষের উপরই। কিন্তু মনে হচ্ছে পানু দাস—ছানু—ভাজবৌ—সোনা—এরা ছাড়াও মানুষ আছে গ্রামে।

…অনেক ভালো মানুষ আছে।

এ বিশ্বাসটুকু ফিরে পেয়েও আনন্দিত হয়েছে সে। তাই বোধহয় চোখের জল মোছে।

আবার সোজা হোয়ে বসে নারাণঠাকুর। কোথায় যেন ভরসা পায়।

মিষ্টি বলে ওঠে—ছানু মেরেছে?

মাথা নাড়ে নারাণ।

…সে মায়ের চেয়ে অনেক বেশি বেজেছে ওই ভাজ-বৌএর ব্যবহার—সনাতনের বিশ্বাসঘাতকতা।

…বৈকালের আলো ম্লান স্পর্শ লাগায় বেণু বনসীমায়, পাখী ডাকা বৈকাল, দিন শেষ হয়ে আসছে রাত্রি।

কেমন নিস্তব্ধ হয়ে ওঠে গ্রামসীমা - আকাশে জেগে ওঠে দু-একটা সন্ধ্যাতারা।

…নারাণঠাকুর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, কোথায় সব তার হারিয়ে গেল।

রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে গ্রামসীমানা, স্তব্ধতা আর অন্ধকার নেমে এসেছে ওর বুকে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকা জোনাকীজ্বলা রাত্রি।

পশ্চিমদিকের অন্ধকার উল্‌সে উঠে আলো জ্বলছে—দুর্গাপুর—নদীর বুকে শালবনের অন্ধকারে আলোগুলো আকাশ-কাল ভরে তুলেছে।

বিচিত্র শব্দ উঠছে, নানা যন্ত্রপাতির। ব্রিজের উপর আলো জেলে ওরা রাস্তা বাঁধাচ্ছে, রিবেট করছে লোহার বিশাল স্লুইস গেট, গার্ডারগুলো। ওদিকে উঠছে লোহা-কারখানার শেড।

…আলো আর আলো।

আদিম আরণ্যক অন্ধকারকে নিঃশেষে জয় করেছে ওরা।

তারই চারিপাশে কালো ছায়ায় মত মানুষ—দিনরাত নেই। ওই যন্ত্রদানবের হুকুম যেন চরকির মত পাক দিচ্ছে, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে ওর হুঙ্কারে।

মাথা নীচু করে কাষ করছে ওর কেনা গোলামের মত।

দূর দূরান্তরের কোন ছায়াঘন গ্রাম—ঘরবাড়ী, পরিবার পরিজন ছেড়ে তারা এসেছে ওই বন্দীশালার কর্মকুণ্ডে। আরও কারা যাবে—কতজন তার হিসাব নেই।

…দূরের আকাশের দিকে চেয়ে থাকে নারাণঠাকুর।

ওই আলো—ওই কর্মব্যস্ততা—ওই কঠিন বেষ্টনীর মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে তার ঘরবাড়ীর স্বপ্ন—সবুজের স্পর্শ—তার অতীতের সেই দিনগুলো।

সবকিছু।

সনাতন ও হারিয়ে গেল সেই সঙ্গে।

জীবনরত্ন সেই ঘটনার পর থেকে কেমন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। চোখের সামনে আজ নোতুন করে সমস্যা-গুলো কঠিন হয়ে উঠেছে। এতদিন পিছনে ফিরে চায়নি। চাইবার দরকারও বোধ করেনি।

কিন্তু দেখেছে—বাবা কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে চারিদিকে প্রকৃতি তার পরিবেশ। গ্রামের রূপও সেই সঙ্গে। বড় বিশাল বাড়ীটা এতদিন অনেককিছু ঝড় ঝাপটা সহ্য করে দাঁড়িয়েছিল, একবার সেই ফাটল ধরার পর থেকে ক্রমশঃ তা বেড়ে চলেছে। চারিদিকে চূণবালি খসছে, চূণকাম অভাবে কালো শেওলাধরা বাড়ীটা দিনের আলোতেই কেমন থমথমে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে. রাত নির্জনে মনে হয় প্রেতপুরী।

‥ চারিদিকের বিশাল প্রাচীর ধ্বসে পড়ছে, একসঙ্গে সব কিছু যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে তাদের বিরুদ্ধে।

শেষ কথা সেদিন রমণ ডাক্তারও শোনায়।

…খুকীর অসুখ বেড়েই চলেছে।

…ছোট বাচ্চাটা কেমন নেতিয়ে পড়ে। জীবনরত্নের একমাত্র সন্তান, তারকরত্নের বংশের ওই একটি প্রদীপ।… রমণ ডাক্তার দেখেশুনে বলে—

—জগন্নাথপুরের ডাক্তারেও কুলোবে না, মনে হচ্ছে নেফ্রাইটিস বা অন্য কিছু ; একবার সদরে দেখাও। ভাল চিকিৎসার দরকার।

জীবন সেদিন অনুভব করে ক্যাসবাক্সের অবস্থা।

বাবাকে কিছু বলতে সাহস করে না।

কোন রকমে সদরে নিয়ে যায়, কিন্তু ওষুধপথ্য আর মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করার যা ধমক এবং খরচ তা জোগাবার ভাবনাতে শিউরে ওঠে।

মণিমালা স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে। তার গহনা-পত্রও গেছে লাটের কিস্তী মিটিয়ে জমিদারী বাহাল রাখতে। তবে যদি ক্ষতিপূরণ পায়।

বাবাকে বলবো? মণিমালার কণ্ঠে কাতর অনুনয়ের সুর।

—না।

জীবন বাধা দেয়। তার সম্মানে বাধে।

—তবে?

পাছু জানতো এমনি করেই চাকাঘুরবে। একদিন রাতের অন্ধকারে সে প্রায়ই গেছে বড়বাবুর দরবারে

আবেদন জানাতে। প্রেসিডেন্ট হাকিম—তার হাতেই তখন এমুলুকের সব'ার—কনট্রোলের দোকান পারমিট ইস্যু করা সবই তাঁর মর্জি, তাছাড়া কিছু জমি জারাত করেছে, বড়বাবুকে খুশী করার প্রয়োজন তার হয়েছিল।

আজ জীবন যে আসবে তা যেন অনুমানই করেছিল পান্নু। কলঘরের একপাশে তার নিজের বসবার ঘর বানিয়েছে—রাস্তার ধারের আগেকার সেই পরিবেশ বদলে গেছে।

রাস্তার আয়তন বেড়েছে। পিচ পড়েছে খোয়াওঠা বিশ্রী পরিত্যক্ত রাস্তায়।···দুপাশের ডাঙ্গায় বসেছে চাএর দোকান, নানা রকমারি দোকান, আড়তও। শোনা যাচ্ছে নাকি সিনেমা হাউসও তৈরী হবে। মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে ইলেকট্রিক লাইন। সব কিছুর মাঝে জাঁকিয়ে বসেছে বিরাট এলাকা জুড়ে প্রাণবল্লভ দাসের ধানকল।

···দুটো ট্রাকও কিনেছে,···ওপাশে মিস্ত্রী আনিয়ে বস্তি তৈরী হচ্ছে। আরও দু একটা শেড উঠছে সেখানে, না জানি আরও কি কারখানা বসাবে পান্নু।

···কোন রকমে চুপিসাড়ে গিয়ে ঢুকল জীবন পান্নুর ঘরে। বিজলীবাতি তখনও পায়নি, হেসাক জ্বলছে।

ওপাশেই শালবনের সীমানা। জনমানবহীন শ্বাপদ-সঙ্কুল স্থান যে এমনি জাঁকালো হয়ে উঠবে কে তা ভেবে-ছিল।

পান্নু একাই হিসেবপত্তর দেখছিল। ওকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানায়—আসুন, আসুন। কি মনে করে? বসুন। একটু চা হোক। ওরে—

জীবন সঙ্কুচিত হয়ে তক্তপোষের একপাশে বসল। আজ মাথা উঁচু করবার সামর্থ্য যেন নেই তার। বলি-রাজার কাছে বামন হয়ে বিষ্ণুকে যেতে হয়েছিল ভিক্ষা চাইতে, উঁচু হয়ে নয়।

তেমনি আজ জীবনও যেন পঙ্গু হয়ে উঠেছে। আমতা আমতা করে—না, না। চা খেয়ে এসেছি। একটু কথা ছিল পান্নুবাবু।

—পান্নু ওর দিকে চাইল। বেশ অনুভব করে, জীবনের আজ পান্নু বলবার সাহসটুকু নেই। পান্নুবাবুই বলতে হয়।

মনে মনে একটু খুশীই হয় পান্নু।

—বলুন?

—কিছু টাকার দরকার ছিল। ধর শ'খানেক। বাড়ীতে মেয়েটার অসুখ। হাতেও কিছু নেই।

—বড়বাবু জানেন?

পান্নু কি যেন সন্দেহ করছে জীবনকে। ওর আগে-কার পরিচয় জানে পান্নু। ওই টাকা নিয়ে কে জানে কি বদখেয়ালে উড়োবে, না হয় গোকুলের জুয়োতেই এড়ে দেবে, ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

একবার বেদনাহত দৃষ্টি মেলে চাইল জীবন।

—বাবাকে বলিনি। তাঁরও মন মেজাজ ভালো নেই। শরীরও খারাপ।

পান্নু কি ভাবছে।

দূরের কথাই ভাবছে সে। ক্রমশঃ তার মন আজ সব কিছু গ্রাস করতে চায়। আজ তারকবাবুকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ভাবে না। অনুকম্পা করে তার সহযোগিতাই চায় সে এবং একটা যোগাযোগের সূত্রও খুঁজে পেয়েছে যেন।

কি ভেবে ক্যাশ বাক্স খুলে দশখানা নোট গুণে দেয় জীবনের হাতে।

···একটু অবাক হয় জীবন।

···পান্নুই ছোট্ট হাতচিটায় একটা সই করিয়ে নেয়।
—ওটা মামুলী ব্যাপার মাত্র। আসবেন মাঝে-মাঝে।

একদিন কত্তাবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসবো।

—বেশ ত!

জীবন উঠে পড়ে। বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

পান্নু কি ভাবছে। আলোছায়ার সংমিশ্রণে উঠোনের কেঁদ গাছটা কেমন বিচিত্র একটা রূপে পরিণত হয়েছে। পান্নু ওরই দিকে চেয়ে থাকে।

বাইরে থেকে কে যেন এতক্ষণ উঁকি-ঝুঁকি মারছিল, জীবন বের হয়ে যেতেই সে ঘরে ঢোকে। এদিক ওদিক চাইছে।

পান্নুও একটু সাবধানী হয়ে ওঠে—কি ভেবে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল। ভুবন কামারও একটু সহজ হয়ে ওঠে। একপাশে চেপে বসলো।

পান্নু তখনও আজকের চালানী বিলের হিসাব কর-ছিল।

—তারপর ?

পান্নু যেন নেহাৎ গরজের সুরেই কথাটা বলে। উৎসাহিত হয়ে ওঠে ভুবন।

—ওদিকের সব ব্যবস্থাও ঠিক করে ফেলেছি পান্নু-বাবু।

—শেষকালে খরচাপাতি করে ভাইপো সাজবো নাতো ভুবন। দেখো আবার।

পান্নু কি যেন ইঙ্গিত করে। ভুবন বাধা দিয়ে ওঠে।

—কি যে বলেন পান্নুবাবু। ভুবন কামার কাউকে ডরায় না। যা বলেছি তা করবোই। মতে মিললনা তবু পড়ে থাকতে হবেক কেনে? পান্নু বিশেষ উৎসাহ দেখায় না। বলে ওঠে—তোমার কথা তুমি ভাবোগে ভুবন। আমার দিক থেকে কথাটা বলছি, ধর—যন্ত্রপাতি, বিজলী মিস্ত্রী, কাঁচামাল—এসব কিনে এনে শেষকালে তোমাকে আর পাবো না?

ভুবন বেশ জোরের সঙ্গেই বলে ওঠে—মানুষের বাচ্চা আমি পান্নুবাবু!

—সেইটা যেন ঠিক থাকে।

—দেখে লিবেন।

ভুবন বেশ জোরের সঙ্গেই কথাটা বলে। ইতিকর্তব্য সে স্থির করে ফেলেছে।

মনে মনে কিছুদিন থেকেই সে আঁচ করেছিল, ওই সমবায় আর অন্য কিছু করে যা পাচ্ছিল, তা যেন তার তুলনায় অনেক কম। পান্নুদাসও মাঝে মাঝে বলতো কথাটা, এক সঙ্গে ব্যবসা করি ভুবন। তোর গতর আর আমার মুলধন। অবশ্য মূলধন—কাঁচামাল কে দেবে তা জানে পান্নু। আসবে সদরের মহাজনের মোকাম থেকেই।

বিজলী শান পালিশ—র‍্যাদা বসাবে। অল্প খরচে বেশী মালও তৈরী হবে এবং দরও সুবিধা পড়বে। কিছুদিন একটু দর নামালেও ক্ষতি নেই, ওদের সমবায়ও ঘা খেয়ে যাবে—ব্যাঙের পুঁজির সমবায়। তাছাড়া ওদের আঘাত করা দরকার। মাথা তুলছে বিরাট একটা পুঞ্জীভূত শক্তি—সেই নবজাগ্রত চেতনাকে বাধা দেওয়া দরকার।

কথাটা পান্নুর নয়; ওটা সদরের বাবুদের। মহাজন রাধী প্রশান্তবাবু ওদের কথা। সেদিন ধান কলে বসে তাঁরাই বলে গেছলেন।

তারপর অনেক ভেবে চিন্তে দেখেছে পান্নুদাসও—হক্ কথা। তাই সরষের মধ্যেই ভূত ঢোকাবার চেষ্টা করেছে।

ভুবনকে তাই বোধহয় মন্ত্রণা দেয়—ওর নোতুন কারখানার ম্যানেজার হবে ভুবন। ম্যানেজার সাহেব। দুশো টাকা মাইনে মাসিক।

কথাটা ভুবন প্রথমে শুনে হকচকিয়ে গেছল—

—কাউকে ভাঙ্গিস না এখন ভুবন, অনেকেই চাকরীর লোভে এসে পড়বে।

ভুবন মাথা নাড়ে—না গো বাবু।

আস্তে আস্তে কেমন যেন ভুবনকে গ্রাস করেছে ওই চাকরীর মোহ; ব্যবসায় লাভএর অংশও একটা থাকবে। তাছাড়া নোতুন বাসা দেবে পান্নুবাবু এই দিকে। পাকা বাড়ী।

ওই ঘিঞ্জি নোংরা পরিবেশ থেকে সরে আসবে। বদলাবে তার জীবনযাত্রা—সব কিছু।

…ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে ভুবন। পান্নুদাসকে বিশ্বাস করতে সুরু করেছে। আয়োজনও চলেছে তার গোপনে গোপনে।

নোতুন শেড উঠছে—যন্ত্রপাতিও আসছে। ভুবন তলায় তলায় অন্য কারিগরদের সমবায় থেকে ভাঙ্গিয়ে আনবার যোগাড় করছে। ভালো মাইনে—অমন হাঁ করে বিক্রী হলে পয়সা পাবার জন্য ধারকর্জের ভাবনা ভাবতে হবে না। খাটো—হপ্তাহে রোজ মিলবে নগদ টাকা।

অনেকেই ভাবছে কথাটা।

পান্নুদাসও তোড়জোড় করছে। ভুবন বের হয়ে এল—রাত তখন অনেক।

এই এলাকাটা বেশ ভালো লেগে গেছে ভুবনের। খড়ো চালের ঘিঞ্জীবস্তী নেই এখানে, শালের পোড়া কয়লা ঢাকা পথটাও নয়; এখানকার মানুষগুলো হাঁটুর উপর ছহাতি কাপড় গুটিয়ে বিশ্রীভাবে কথা বলে না।

ট্রাকের ড্রাইভার দুজন পাকুড়গাছতলায় বসে মেরামতি কাষ তদারক করছিল, ওদিকে—ধানকলের মিস্ত্রীও আড্ডা জমিয়েছে—ওদের দলে ভিড়েছে গোকুলও।

ট্রাকেই থাকে—ধুতি ছেড়ে ইদানীং একটা তেলকালি মাখা প্যাণ্ট পরে মটরের কাষ শিখছে।

ভুবনকে বের হয়ে যেতে দেখে ডাকে নন্তমিস্ত্রী।

—আরে ও দাদা। ভুবনদাদা।

ভুবন দাঁড়াল। কি ভাবছে।

—এসো না! একটু না বসেই চলে যাবা?

ভুবনও এখানেই আসছে—এদের নিয়েই কায সুরু করতে হবে। তাই ওদের সঙ্গে মেশামিশিও করছে কিছুদিন। মাঝে মাঝে ট্রাকে করেও বেড়িয়ে আসে নদীর ধার অবধি—এলাহি ব্যাপার, কাযকর্মও দেখে। কেমন একটা যোগাযোগ গড়ে উঠেছে।

প্রাণখোলা লোক ওই নন্ত—বলরাম ড্রাইভার। এগিয়ে আসে ভুবন।

…ওরা শুধুমুখে বসে নেই। মাঝখানে কয়েকটা বোতলও নামালো।…ভুবনের ও মন্ত্রেও দীক্ষা হয়ে গেছে। তবু কেমন যেন এখনও ভয় ভয় করে। ভয় আর লজ্জা।

—না নন্ত, বাড়ী যাই। রাত হয়েছে।

হাসে নন্ত—তোমার বাড়ীতেও লোক আছে। জাড়ের রাত কাটাবার লোক, আর আমাদের! বসো—একটু গা তাতিয়ে লিয়ে যাও। দে রে গোকুল—

গোকুলও যেন তৈরী ছিল। কলাইকরা গেলাসে খানিকটা ঢেলে এগিয়ে দেয় ওর দিকে।

কি ভাবছে ভুবন। ইদানীং কেমন লোভও লাগে। ঝাঁঝা ও পানীয়টা গলা-বুক জ্বালিয়ে নামে, শরীরের সমস্ত শিরা তন্ত্রী দেহকোষ সমস্ত যেন কবোষ্ণ একটি মনোরম অনুভূতির চাঞ্চল্যে ভরে ওঠে। একটা নোতুন স্বাদ—রোমাঞ্চ আনা, জীবনের উপভোগের নোতুন সাড়া।

…হাসছে নন্ত।

—কদ্দিন আর ওই আঁধার গায়ের ভেতর শাল ঠেঙাবা দাদা। এসে পড়ো। এখন তো হাতের কাযেরই দাম। কল-কারখানার দিন।

গলায় ওটা ঢেলে ভুবন কয়েকটা বাসি বেগুনী চিবুতে চিবুতে ওদের দিকে চেয়ে থাকে। মনে মনে একটা খুসীর আমেজ। বলে ওঠে—আসবো ইবার

—মাইরী!

বলরাম ড্রাইভার কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারে না। বলে ওঠে নন্ত—বৌদি এলে সত্যি ইমাটি সাজন্ত হয়ে উঠবেক।

—নয়তো কি?

হাসছে ভুবন।

রাত নেমেছে। শীতের রাত্রি। নিরব নিস্তব্ধ গ্রাম-সীমা। নিশুতি চারিদিক। কামারপাড়ার সরু পথটায় অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। চুপি চুপি এগিয়ে আসছে ভুবন। পকেটে ক'টা টাকা। পাহুদাস তাকে দিয়েছে। বাসায় যাবার জিনিষ-পত্তর কিনতে যাবে কাল, সদরে বলরামের ট্রাকে।

সারা দেহে একটা উষ্ণ মাদকতা। পা দুটো বেশ সাবধানে ফেলে আসছে। মাটিটা বার বার একটু একাত-ওকাত হচ্ছে যেন স্ফূর্তিতে গান আসছে। গান গাইতে ইচ্ছে করে।

দূর ছাই—গানও কি জানে এক কলি? ওসব কিছুই এতদিন জানেনি। জানবার সময়ও হয়নি—মরার মত দিনরাত নেংটি পরে শালের আগুনের সামনে বসে লোহা পিটেছে।

সারা শরীরে একটা কেমন বিজাতীয় নবজাগ্রত ক্ষুধা তীব্রতার পরিমিতি। কদমের কথা মনে পড়ে।

আবছা অন্ধকারে দরজাটা ঠেলে বাড়ী ঢুকলো। খক্ খক্ কাশির শব্দ ভেসে আসে।

—কে? অতুল কামারের গলা শোনা যায়। বয়স হয়ে গেছে—কেমন অথর্ব হয়ে এসেছে সেই সঙ্গে। চোখের দৃষ্টিও কমে গেছে। রাতেও ঘুম হয় না। অতন্দ্র প্রহরীর মত বসে আছে রাত্রি দিন—মহাশূন্যে বুজে আসা চোখের সন্ধানী দৃষ্টি মেলে, আকাশ বাতাসে কান পেতে আছে—শোনে কোন মহাকালের পদধ্বনি। আর কাস্‌ছে।

বিরক্তিভরা কণ্ঠে জবাব দেয় ভুবন—আমি।

—অ! তা এত আত অবধি ছিলি কুনখানে?

জবাব দিলনা ভুবন। দেবার দরকার বোধ করে না। উঠে গেল ঘড়ের চালের নীচু দাওয়া পেরিয়ে ওর খুপরীর দিকে। পা দুটো টলছে, টাউরি খেয়ে পড়ছিল কোন রকমে খুটি ধরে সামলে অন্ধকারে এগিয়ে যায়।

…কদমও ঘুমোয় নি। চুপ করে বিছানায় পড়েছিল। কিছুদিন ধরে সেও দেখছে কি যেন একটা বেসুর উঠছে

এ বাড়ীতে। ভুবনকে ও দেখে এসেছে এতদিন। একটা শান্তশিষ্ট গোবেচারা ভালমানুষগোছের একটি জীব। কতবার চেষ্টা করেছে তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে মানুষ করে তুলতে। যত্ন করে চিরুণী দিয়ে ওর অগোছাল চুলগুলোকে আঁচড়াতে গেছে। বাধা দিয়েছে ভুবন।

—ওসব তুই কর বাপু, মানাবে তুকে। খাটিয়ে মরদের উসব বাহার সাজেনক। তু সোন্দর তুকে উসব মানাবে।

—আমি আবার সোন্দর কুনখানে গো ?

—হাসে কদম। সলজ্জ সুন্দর সুঠাম একটি নারী—কামনাময়ী দৃষ্টি তার দুচোখে। বলিষ্ঠ ভুবন ওকে দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে—লোস আবার। আরসীতে দেখ কেনে ?

—ছাই।

কদমের এত রূপ গুণ—তবু বুক জুড়ে সেই চাপাপড়া ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ওঠে।

ভুবন তা বুঝেছে—হয়তো বোঝবার মত বুদ্ধি তার ঘটে নেই। তবু ভালোই ছিল কদম। কিছুদিন থেকে অনুভব করেছে কোথায় যেন ভুবনের মনে অন্য কি একটা ঝড় উঠছে।

বাইরে এর-ওর সঙ্গে ঝগড়ার খবরও আসে। সেদিন ছোটবাবুর সঙ্গে নাকি শালে বসে তুমুল ঝগড়া করেছে ইস্কুলের ব্যাপারে, কালী ঠাকুরপোকে ও দেখতে পারে না।

ঘরেও দেখেছে কদম—কেমন যেন বদলে গেছে মানুষটা। সরে গেছে অনেক দূরে।

নিজের মনের শূন্যতা তবু এতদিন ওকে কেন্দ্র করে ভুলেছিল। তারই মাঝে ঝড় উঠেছে মনে।

…কেমন অতি বড় দুঃখের মাঝে বাঁধন ছেঁড়ার ঝড় জেগেছে। ব্যর্থ বঞ্চিত জীবনে সে দেখেছে মিষ্টিকে। দেখেছে প্রীতিকে—ওদের মনের সুর মিশেছে তার মনে—একজনকে কেন্দ্র করে মনের গহনে সেও কি এক দুর্বার স্বপ্ন দেখেছিল তার সব ব্যর্থতার মাঝে। মাঝে মাঝে মন চেয়েছে বিদ্রোহী হতে ব্যর্থ বঞ্চিত মন ভোগের দুর্বার কামনায় অতন্দ্র রাতে মেতে উঠেছে, চুপিসাড়ে কবে যেন এগিয়ে যেতে চেয়েছে অভিসারে ; সেই সন্ধ্যারাত্রের কথা ভোলেনি—প্রীতিকে অশোকের ওখানে দেখে ফিরে এসেছিল কি এক অপরিসীম বেদনার জ্বালা নিয়ে। ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল রাগ আর অভিমানে তার সামান্য সেই প্রীতির চিহ্ন কাজলদিঘীর গহন জলে রাত নির্জনে।

ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিল তার সব দুরাশার অশান্তি—কিন্তু পারেনি। মনকে বোঝাতে চেয়েছে—বামন হয়ে চাঁদ ধরার কল্পনা।

…দূর থেকেই চাঁদকে দেখতে চায়—মাখতে চায় তার হিমসুরভিত আলো সারা অঙ্গে অঙ্গে। কাছে থেকে পেতে গেলে অনেক জ্বালা।

…তাই অশোককে ঘিরে যে স্বপ্ন—তা মনের অতলেই লুকিয়ে রেখে দিন কাটিয়েছে !

হেসে কথা বলেছে ওর সঙ্গে—যে মুহূর্তে গহন নির্জনে সেই ব্যাকুল মন ঠেলে উঠতে চেয়েছে–সরে এসেছে কদম বৌ। রহস্যময়ী কোন আদিম নারী। শিউরে উঠেছে মনের এই ব্যাকুল প্রকাশ-বেদনায় কেঁদেছে অন্তরালে। কেঁদেছে শুধুই।

তাই প্রীতির বিয়ের খবরে খুশীই হয়েছিল সেদিন। অশোককে প্রশ্ন করে—তাহলে বিয়ে করবে না ?

হাসে অশোক—এখনও ঠিক করিনি।

ওর দিকে চেয়ে থাকে কদম। স্তব্ধ দুপুরের ম্লান রোদ গড়িয়ে পড়েছে আতা গাছের সবুজ পাতায়, কোথায় বাঁশ বনের ছায়াঘন অন্ধকারে শালিখ পাখী কিচমিচ করছে।

বাতাসে আতা ফুলের তীব্র মদির সৌরভ শান্ত গ্রাম-সীমায় কি এক বিষণ্ণতার আভাস আনে। বলে ওঠে কদম।

—সেই ভাল। বিয়ে না করাই ভাল।

—কেন ? তুমি কি এই কথা বলো ?

কদম চমকে ওঠে, ওর কালো দুচোখের চাহনিতে সেই অধরা নারীর ব্যাকুল কান্না যেন নীরব হয়ে ফুটে ওঠে—অজানতেই কেমন অসতর্ক মুহূর্তে চকিতের জন্য হারিয়ে ফেলে নিজেকে।

বলিষ্ঠ যৌবনপুষ্ট দেহের নিঃশেষ মাদকতা প্রকট হয়ে ওঠে—অশোকও চমকে উঠেছে।

একটি মুহূর্ত। সারা জীবনের চরম প্রকাশের কয়েকটি বিশেষ সন্ধিলগ্নের একটি।

…উঠে গেল কদম। উঠে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

এড়িয়ে গেল—সরিয়ে নিয়ে গেল নিজেকে ওর সন্তজাগ্রত কোন দৃষ্টির সামনে হতে।

…চমকে উঠেছে ঘরের মধ্যে আরসীতে নিজের মুখ-খানা দেখে। এ যেন কোন অন্য কদম—একে নিজেও চেনেনি সে এতদিন। ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা করে। বাড়ী-ঘর স্বামী কত কামনা—সব কিছুর বাধা ভেদ করে এ যেন ক্ষণে ক্ষণে ঠেলে উঠতে চায়।

ডুকরে কাঁদতে চায়। পারে না।

…কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিল জানে না, কদম বের হয়ে আসে। বৈকালের আলো নেমেছে ঘরের চালে। পাখীর ডাক থেমে গেছে।

…উঠানে অশোককে ও দেখতে পায় না। কখন চলে গেছে অশোক।

·· যাক্।

…কদিন তারপর দেখাই করেনি কদম। বাইরের দিকে ওর গলা শুনেছে—ঘরের বের হয়নি।

ভুবন হাসে—কলাবৌ হবি নাকি অ্যাঁ। শোন!

…কায আছে। কাযের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছে নিজেকে। মনে হয়েছে জোর গলায় শুনিয়ে দেয় অশোককে—তুমি এ বাড়ীর ভেতর আর এসো না ছুটবাবু। কিন্তু পারেনি। ভয় করেছে। কি যেন হারাবার ভয়, ভুবন এ খবরও রাখেনি।

তাই সেদিন মিথ্যা ওই কলঙ্কের কথায় ভুবনকে চটে উঠতে দেখে রেগেছিল কদম। গোকুল আদালতে স্বীকার করেছে—কদমের সঙ্গে তার ঘটনা আছে। চোরা গোকুল —আর তাই ভুবন বিশ্বাস করে নিয়েছিল।

…কদম সেদিন দেখেছিল ভুবনের ভালবাসার পরিমাণ।

…লোকটা খায়নি সারাদিন, ঠায় বসেছিল। চটে উঠেছিল দারুণভাবে কদমের উপর।

চুপ করে সয়েছে সেই দারুণ অপমান। ভুবনের কাছে সেদিন নির্দোষিতা প্রমাণ করে সাধুতা বজায় রাখতে চায়নি—কি হবে ওকে কৈফিয়ৎ দিয়ে।

…অশোক ওর দিকে চেয়েছিল। কেঁদে উঠেছিল কদমবৌ।

—তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি ছুটবাবু।

—থাক। জানি ওসব মিছে কথা। তুমি শান্ত হও কদম।

…কদম জলভরা চোখে সেদিন ওর কাছেই নির্দোষ প্রমাণ করতে দাঁড়িয়েছিল।

—কেমন যেন মনের সেই বিচিত্র গতিপ্রকৃতির খবর জানতে পারেনি বিচিত্র রহস্যময়ী সেই নারী। ভুবন হয়তো ভুলেছে সে কথা, আবার মেতে উঠেছে নিজের কাযে।

…তবু কদম ক্ষমা করতে পারেনি তাকে।

ক্রমশঃ দেখেছে ভুবন কেমন নীরবে তাকে অবহেলা অগ্রাহ্য করে চলেছে কিসের মোহে, দুর্বার আকর্ষণে সে ঘরের মায়া ভুলেছে।

বুড়ো অতুল কামার গজগজ করে।

—কুথা থাকে সে শালো—ও বৌ।

—জানি না। কদম ছোট্ট করে জবাব দেয়।

অ! শালোর যেন কি মনে আছে কে জানে। পয়সার নেশা লেগেছে উকে—দুর্গাপুরের কলে যাবেক নাকি শেষতক—হা বৌ।

—কি করে বলবো? কদমও ঠিক জানে না।

কদমেরও ভয় হয়।

…গ্রামের সেই জীবন কেমন বদলে যাচ্ছে। কেমন বদহাওয়া লেগেছে সবাই যেন ওই দুর্গাপুরের আলোর দিকেই চেয়ে আছে। এ বাড়ী ও বাড়ীর. এ পাড়া—ও পাড়ার অনেকেই চলেছে—গেছেও অনেকে।

কেমন যেন ফাঁকা হয়ে আসছে গাঁ।

মনের ভেতরও তার কেমন একটা শূন্যতা জাগে।

রাতে ও তাই সেদিন জেগে রয়েছে।

ডাকছে ভুবন। কড়াটা নাড়ছে।

চমকে ওঠে হঠাৎ ওই কড়ানাড়ার শব্দে। উঠে যায় পিদীমটা জেলে।

ঘরের মধ্যে নীলাভ ম্লান আলোটা জলছে। কেমন ঘুম-জড়ানো অলস একটা পরিবেশ।

দরজা খুলে দেয়—হঠাৎ ভুবনকে দেখে চমকে ওঠে।

—তুমি! এত রাতে!

…হাসছে ভুবন। ওর মনে অন্য জগতের স্বপ্ন। পাকাবাড়ী—বিজলীবাতি—মাসে মাইনে। মনটা বেশ

খুশী হয়ে উঠেছে। সারা শরীরে সেই উদগ্র কবোষ্ণ অনুভূতি।

…এগিয়ে আসে। কদমের দিকে চেয়ে থাকে নেশা-ভরা চাহনিতে। আদুড় গা—নিটোল পুরুষদেহে লেগেছে প্রদীপের নগ্ন কামনাময় আলো।…

কদমকে কাছে টেনে নেয়।

পিদীমের শিষ কাঁপছে রাত নির্জনে। ওরই উত্তাপ ভুবনের দেহে। বলিষ্ঠ মদিরবন্ধনে পিষে ফেলতে চায়।

চমকে ওঠে কদম।

ওর দুচোখের চাহনিতে লাল কেমন হিংস্র চাহনি, মুখে সেই বিশ্রী গন্ধ। সারাদেহের বলিষ্ঠ নিক্ষেপণে কেমন জঘন্য লালসার কদর্য ছায়া।

—মদ খেয়েছ?

কথার জবাব দেয় না ভুবন। দুর্বার আক্রমণে আজ নোতুন ভুবন ঘোষণা করতে তার নবজাগ্রত পৌরুষের দখলনামা।

শিউরে ওঠে কদমবৌ—ছাড়! লাজ লাগে না।

—লাজ! গজরাচ্ছে ভুবন।

সমস্ত শক্তি দিয়ে আজ সে পিষে ফেলতে চায় কদমকে। সে শুধু ভোগ করতে চায়—দখল জানাতে চায়।

অসহায় নারী চীৎকার করতে যাবে—প্রতিবাদের চীৎকার। ওর মুখটা টিপে ধরেছে ভুবন। ছিটকে পড়ে দুর্বার আক্রমণে স্তব্ধ পরাস্ত কদমবৌ। কাঁদছে! অসহায় কান্না।

…পিদীমটা নিভে গেছে। আবছা অন্ধকারে ভুবনের দুটো চোখ জলছে বুভুক্ষু জানোয়ারের মত—নীলাভ দীপ্তিতে। অন্ধকারে সে যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

…অসহায় কদমবৌ শিউরে উঠেছে আতঙ্কে—ঘৃণায়।

…নিদারুণ বিজাতীয় সেই ঘৃণা। কেমন অবশ হয়ে আসে সারা দেহ। চোখের উপর নেমে আসছে পুঞ্জীভূত জমাট অন্ধকার।

…কোথায় ডাকছে রাতজাগা একটা পাখী। ভোর হয়ে আসছে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত পঙ্কিল দেহ নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল—ঘরে থাকতে যেন ঘৃণা আসে। ভুবন তখনও অসাড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে।

ওর দিকে চাইতেও কেমন লজ্জা পায় কদমবৌ।

…অতুলকামার তখনও কাস্‌ছে। থক্ থক্ থক্।

জীবনরত্ন টাকাগুলো এনে মণিমালার হাতে তুলে দেয়।

রাত হয়ে এসেছে। থমথমে আঁধার ঢাকা বাড়ীখানা বুকচাপা স্তব্ধতার অতলে যেন মুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। কোথাও কোন আলোর নিশানা নেই। ভাঙ্গা দেউড়ি আজ শুধু খসে খসে পড়ছে—চারিদিকে ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে আছে ইটের স্তূপ। দরজাভাঙ্গা সারি সারি ঘরগুলো আগে আমলা-ফৈলা—দরওয়ানদের কলরবে ভরে থাকতো—আজ সেখানে চামচিকে আর বাদুড় বাসা বেঁধেছে, পায়ের শব্দে আঁধারে ওরা বিরক্তিভরে উড়ে গেল, বাতাসে একটা চিম্‌সে বদগন্ধ।

জীবনরত্ন ওই পথ দিয়ে উঠে এসেছে অন্ধকারে, দোতালার ঘরে বাতিটা জলছে। তারকরত্নের মহলে আলো নেই, সকালসকালই শুয়ে পড়েছে সে।

মণিমালা জীবনের দিকে চেয়ে থাকে। শুকনো কণ্ঠে জীবন বলে ওঠে—রাখো টাকাগুলো।

…অনেক কষ্টের টাকা। জীবন আজ বহুমূল্য দিয়ে ক্রমশ: নোতুন করে অনুভব করছে সব কিছু। এমন দিন গেছে সেদিন ওই টাকা একদানে জুয়োর বাজীতে এড়েছে। হার জিতের কথাও ভাবেনি।

ছিটিয়ে দিয়েছে এক রাতে সহরে কোন বিশেষ এলাকায় স্ফূর্তি করতে গিয়ে। এখানেও বাউরীপাড়ার স্বৈরিণী ভাবিবাউরীকেই কিনে দিয়েছে পঞ্চাশ টাকার ঝুমকো শাড়ী। আরও কত জনকে—

আজ মনে হয় সব সেই বেহিসেবী খরচাগুলোর জবাব পাচ্ছে! রুগ্ন মেয়েটি বিছানায় মিলিয়ে গেছে—ওষুধ নেই, পথ্য বলতে মিছরি আর সামান্য গ্লুকোজ—না হয় পানুর দোকানের একটু বার্লি।

…তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে আসছে তার জীবনীশক্তি, মণিমালার দিকে চাইতে পারে না। সুন্দরী রূপবতী সেই মেয়েটি আজ কি এক চরম নিগ্রহ সইছে মুখ বুজে।

—কোত্থেকে আনলে এ টাকা?

মণিমালার কণ্ঠে কেমন যেন চাপা আতঙ্কের ছায়া। স্বামীকে সে কিছুটা জানে। এই অন্ধকার রাত্রে টাকা আনার পিছনে কে জানে কি ইতিহাস লুকোনো রয়েছে। তাই এ আতঙ্ক।

হাসে জীবন। মলিন ক্লিষ্ট একটু হাসি। জবাব দেয় —ধার করে আনলাম। শোধ দিয়ে দোব।

—শোধ দেবে ?

মণিমালার কণ্ঠে সংশয়। ওরা ধার করে—করেছেও। কিন্তু শোধ কাউকে এতাবৎ দেয় নি। কারোও প্রতি কোন কৃতজ্ঞতার ঋণও শোধ দেয়নি ওরা।

জীবন চুপ করে স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকে। বলে ওঠে। —বিশ্বাস হল না কথাটা ?

—না, তা নয়।

বলে ওঠে জীবন—না হবারই কথা। কিন্তু এবার থেকে বিশ্বাস করতে পারো আমাকে মণি।

মণিমালা কথা বলে না।

রাত্রি নেমেছে। ঘন আঁধার ঢাকা রাত্রি। জানলা দিয়ে চোখ মেলে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। আঁধার আকাশ-সীমা লাল হয়ে উঠেছে আলোর আভায়। দুর্গা-পুরের আকাশ বাতাস ঝলসে উঠেছে আলোয়। বাতাসে ভেসে আসে যন্ত্রপাতির গুরুগর্জন।

…কি ভাবছে জীবন। কথাটা ক'দিন থেকেই ভাবছে। আজ ওই টাকাগুলো এনেছে—নীরব কোন শপথ জেগে ওঠে মনে। মণিমালাও মনে মনে তাকে অবিশ্বাস করে। পানুও করে—মুখফুটে বলেনি। এ সবের জবাব সে দেবে। পথের নিশানা যেন সে পেয়েছে ওই আঁধার ভাঙ্গা-আলোর ইঙ্গিতে।

—খাবে না ? রাত হয়েছে।

—জবাব দিল না জীবন। মনে তখনও তার নোতুন কোন কল্পনার সম্ভাজাগরণের সাড়া। এসব কথা সে ভুলে গেছে।

স্ত্রীর ডাকে চমক ভাঙ্গে।

—ও, হ্যা।

[ক্রমশঃ

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেম—সঙ্গীতে ও কাব্যে

নিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মাধ্যমে। আমাদের শৈশবের স্বপ্নলোক দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয়সঙ্গীতের মোহে আচ্ছন্ন। কৈশোরে যখন সমবেত কণ্ঠে সুর মিলিয়েছি—

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সেযে আমার জন্মভূমি"—তখন এক অপূর্ব রোমাঞ্চ অনুভব করেছি, জন্মভূমির এই রাজ-রাজেশ্বরী মূর্ত্তিটি কল্পনায় আঁকবার চেষ্টা করেছি। কল্পনার আশ্রয় খুব বেশী নেবার প্রয়োজন হয়নি, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠে জননী জন্মভূমির এই সালঙ্কারা মূর্ত্তি এঁকে রেখেছিলেন। কিন্তু সে তো ভবিষ্যতের কথা। বিদেশী শাসকের রথচক্রতলে নিষ্পেষিতা শৃঙ্খলিতা ভারতজননীর করুণকাতর মূর্ত্তি আঁকলেন কবি তাঁর, "ভারত আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ"—এই গানটিতে। এই গানটি গাইবার সময় মাতৃভক্ত দেশপ্রেমিক সন্তানদের চোখে যে অশ্রুবিন্দু দেখেছি সেই অকৃত্রিম দেশপ্রীতির প্রকাশ আজকের দিনে বিরল। উনিশ শ' ছেচল্লিশের বিরাট নরমেধযজ্ঞের পর দেশ হ'ল স্বাধীন, ঘুচলো ভারতজননীর পায়ের শৃঙ্খল। বন্ধনমোচনের আকস্মিক উল্লাসে আমরা ভুলে বসলাম দেশজননীর মলিনমুখ, আর সেই সঙ্গে ভুললাম তাঁর চারণকবি দ্বিজেন্দ্রলালকে। কতকাল এ বিস্মৃতি থাকতো জানিনা, কিন্তু রুদ্রের প্রসাদের মত নেমে এলো আমাদের মাথার ওপরে বিদেশীর আগ্নেয় অস্ত্র, আত্মবিস্মৃত ভারতসন্তানেরা চমকে জেগে উঠে খুঁজতে লাগলো তাঁদের, যাঁরা একদিন দেশপ্রেমের উদার আহ্বান

জানিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গীতের মাধ্যমে, মেষশাবকদের মানুষ হবার প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। আবার সভায়, সমিতিতে, বেতারে সর্বত্র শোনা গেল দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সঙ্গীত। সুখের দিনে যাঁকে ভুলেছিলাম, দেশের দারুণ দুর্দিনে তাঁকেই মনে পড়লো সকলের আগে।

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেম ছিল খাঁটি—সহজ মনের সরল অনাড়ম্বর প্রকাশ। দেশের সকল স্তরের মানুষের মনে এই জন্যই তিনি একটি স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছিলেন। সঙ্গীত ছাড়াও তাঁর কাব্য এবং নাটকের মূল সুরটিও এই দেশপ্রেম। তাঁর প্রেম এবং প্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি ছাড়া অন্য সর্বত্রই এই দেশপ্রেমের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য বিশ্লেষণ করলে আমরা প্রধানতঃ তিনটি ধারা দেখতে পাই। প্রথম এবং প্রধান ধারাটি দেশপ্রেমের, দ্বিতীয়টি ব্যঙ্গবিদ্রূপের, তৃতীয়টি গীতিকবিতার। আমাদের দৃষ্টিকে একটু প্রসারিত করলে দেখতে পাবো দ্বিতীয় ধারাটির অন্তর্নিহিত সুরও দেশপ্রেম থেকেই উদ্ভূত। নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম দেশাত্মবোধের প্রকাশ দেখা যায় 'প্রতাপসিংহ' নাটকে। পরাধীনতার যে তীব্র বেদনা তিনি অনুভব করতেন, তা তিনি এই ঐতিহাসিক নাটকটির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রধান নাটকগুলি সবই ঐতিহাসিক, অথচ প্রায় সব নাটকেই তিনি ব্রিটিশপদানত ভারতভূমির দুর্দশার কথা কৌশলে বর্ণনা করেছেন। পরাধীনতার বেদনা দ্বিজেন্দ্রলালকে যে কী তীব্র আঘাতে জর্জরিত করে রাখতো, তার প্রমাণ এই ঐতিহাসিক নাটকগুলির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। একটা উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

সাজাহান নাটক মোগল যুগের কাহিনী। সেখানে সম্রাট সাজাহানের কন্যা জাহানারা বলছেন :

যখন একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে হর্ম্যরাজি ভেঙ্গে পড়ে, তখন অসূর্যম্পশ্যরূপা মহিলা যে—সেও নিঃসঙ্কোচে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়, আজ ভারতের সেই অবস্থা। আজ একটা বিরাট অত্যাচারে একটা সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়েছে। আজ যে অন্যায় নীতির মহাবিপ্লব, যে দুর্বিষহ অত্যাচার ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে যাচ্ছে তা এর পূর্বে বুঝি কুত্রাপি হয়নি। এত বড় পাপ, এত বড় শাঠ্য, আজ ধর্মের নামে চলে যাচ্ছে। আর মেষশাবকগণ শুদ্ধ অনিমেষনেত্রে তার পানে চেয়ে আছে। ভারতবর্ষের মানুষগুলো আজ কি শুধু চাবুকে চলেছে? দুর্নীতির প্লাবনে কি ন্যায়, বিবেক মনুষ্যত্ব, মানুষের যা কিছু উচ্চপ্রবৃত্তি সব ভেসে গিয়েছে? এখন নীচ স্বার্থসিদ্ধিই কি মানুষের ধর্মনীতি।"

জাহানারার এই উক্তি শুধু মোগলযুগের কথাই নয়, বৃটিশের পদানত ভারতবাসীর মেষসুলভ কাপুরুষতাকে ধিক্কার দিয়েই নাট্যকার একথা লিখেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকে অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে দেশপ্রেমের পরিচয় প্রায় প্রথম থেকেই পাওয়া যায়। প্রথম কাব্য আর্য-গাথার শেষ অংশ আর্যবীণা; এই অংশের প্রায় সব কবিতাই দেশাত্ম-বোধক। দেশের বর্তমান দুরবস্থার সঙ্গে অতীতগৌরবের তুলনা করে কবি বলছেন :

"রেখে দাও রেখে দাও প্রেমগীতি স্বরে রে,
কেন ও কুহক আর ভারত ভিতরে রে।"

এই কাব্যটিতে কবি স্বদেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন জাতিভেদ ভুলে জাতীয় ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ভারতের লুপ্তগরিমা পুনরুদ্ধার করবার জন্য। শিশুর প্রথম উচ্ছ্বসিত 'মা' ডাকের মত দ্বিজেন্দ্রলালের এই প্রথম মাতৃবন্দনা কিছুটা অপরিণত ও উচ্ছ্বাস প্রবণ হ'লেও অকৃত্রিম।

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'আষাঢ়ে' এবং 'আলেখ্য' এর কয়েকটি কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থে 'রাজা' কবিতাটিতে বাংলার নিপীড়িত চাষী, তাঁতী, প্রভৃতি শ্রমজীবীদের প্রতি কবির যে সহানুভূতি ফুটে উঠেছে তা সত্যিই সেযুগে অসাধারণ। এরাই দেশের প্রকৃত রাজা এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করে কবি লিখেছেন :

"ওরে ও ভাই চাষী ওরে ও ভাই তাঁতী
পড়িস নাক নুয়ে, জানিস এসব ফাঁকি
তোদের অন্নে পুষ্ট তোদের বস্ত্র গায়ে
করবে তোদের উপর রক্তবর্ণ আঁখি!"

'আষাঢ়ে' কাব্যগ্রন্থে ব্যঙ্গের মাধ্যমে কবির যে দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় তারই পরিণতি 'হাসির গানে'। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন মেকীর শত্রু, ভণ্ডামি ছিল তাঁর কাছে অসহনীয়। তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে বলেছেন :

> "ব্যঙ্গ-কবি আমি ? ব্যঙ্গ কবি শুধু ?
> নিন্দা করি শুধু সকলে ?
> কভু না ; 'আসলে' ভক্তি করি আমি,
> ঘৃণা করি শুধু—'নকলে'।"

আসলের তিনি ছিলেন সত্যিকার ভক্ত, আর নকলের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম ঘৃণা। আষাঢ়ে কাব্যগ্রন্থে ব্যঙ্গের মাধ্যমে তিনি বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের যে দুঃখদুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন, তাতে কৌতুক নয়, কবির গভীর সহানুভূতিই ধরা পড়েছে। আবার যেখানে দুঃখের বিলাস, দেশপ্রেমের ভণ্ডামি, সেখানে তাঁর ব্যঙ্গের চাবুক তিনি নির্মম হাতেই চালিয়েছেন। বিলেত থেকে ফিরে এসে দ্বিজেন্দ্রলাল দেশের যে অবস্থা দেখলেন—"তখন কেবল বচনের আস্ফালন ছিল ; নব্যহিন্দু কেবল আর্যামির আস্ফালন করিতেছিলেন, উন্নতিশীল শিক্ষিত-সম্প্রদায় সমাজসংস্কারের দোহাই দিয়ে কেবল স্বেচ্ছাচারের আস্ফালন করিতেছিলেন এবং রাজনৈতিক সম্প্রদায় কংগ্রেসের বিশালতায় আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া কেবল একতার আস্ফালন করিতেছিলেন। ন্যাকামির প্রভাব চারিদিকে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল।"—এই 'ন্যাকামি' ও 'ভণ্ডামি'র বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল অভিযান চালালেন তাঁর হাসির গানের মাধ্যমে, অস্ত্র হ'ল তীব্র ব্যঙ্গের চাবুক।

সমাজের যেখানে গলদ সেখানেই পড়েছে তাঁর চাবুকের নির্মম কশাঘাত। কিন্তু এই কশাঘাতের দণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডদাতাও সমান আঘাতে কেঁদেছেন, নইলে এ তাঁর অনধিকারচর্চা হ'ত। তাঁর দেশপ্রেম ছিল খাঁটি, যুগের 'ফ্যাসন' নয়। দেশকে ভালবাসার অর্থ তাঁর কাছে ছিল দেশের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার এমনকি পোষাকটি পর্যন্ত ভালবাসা। নিজে বিলেত ফেরত হলেও ধুতি, পাঞ্জাবী আর চাদরই ছিল তাঁর প্রিয় সাজ। পরানুকরণপ্রিয় দেশী সাহেবদের লক্ষ্য করে তিনি লিখেছেন :

> "আমরা বিলেত ফের্তা ক'ভাই,
> আমরা সাহেব সেজেছি সবাই,
> তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
> করিয়াছি সব জবাই।
> আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি,
> আমরা শিখেছি বিলাতি বুলি···
> রাম, কালীপদ, হরিচরণ,
> নাম—এসব সেকেলে ধরণ,
> তাই নিজেদের সব ডে, রে, মিটার
> করিয়াছি নামকরণ।
> আমরা বিলিতি ধরণে হাসি
> আমরা ফরাসি ধরণে কাশি
> আমরা পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে
> বড্ডই ভালবাসি।······
> আমাদের সাহেবিয়ানার বাধা
> এই যে রংটা হয় না সাদা,
> তবু চেষ্টার ক্রটি নেই—ভিনোলিয়া
> মাখি রোজ গাদা গাদা।
> আমরা বিলেত ফের্তা কটাই
> দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই
> আমাদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু ঐ
> সাহেবগুলোই চটাই।
> আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি
> স্পীচ্ দেই ইংরাজি খাঁটি
> কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালীর মত
> চম্পট পরিপাটি।"

এই বিলাতফের্তাদের মেকী স্বদেশীয়ানার প্রতি দ্বিজেন্দ্র-লালের ছিল অসীম ঘৃণা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সাহেবিভাবধারাপুষ্ট এই কপট স্বাদেশিকতাকে তিনি বিদ্রূপের বাণে জর্জরিত করেছেন। সেই যুগের নূতন আলোকপ্রাপ্তা যে সব মহিলা শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রকৃত আদর্শ গ্রহণ না করে তার বাইরের চাকচিক্যের মোহে ভুলেছিলেন তাঁদেরও তিনি রেহাই দেননি। নবকুল-কামিনী গানটিতে লিখেছেন :

> "ঐ নবকুলকামিনী
> [illegible]।

জানি জুতা মোজা কামিজ পরিতে
চেয়ারে ঠেসিয়া গল্প করিতে,—
পারত পক্ষে উপর হইতে নীচের তলায় নামিনে।"

এই আলোচনা থেকে কেউ যদি মনে করেন দ্বিজেন্দ্রলাল প্রগতির বিরোধী ছিলেন, তবে তিনি ভুল করবেন। তিনি ছিলেন অন্যতম যুগপ্রবর্তক, কাজেই তিনি প্রগতি-বিরোধী হতে পারেন না। তাঁর এই কবিতাগুলির উদ্দেশ্য ছিল বিপথগামী শিক্ষিত তরুণ তরুণীদের পরানুকরণ থেকে নিবৃত্ত করে স্বদেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা। রক্ষণশীল হিন্দুদের গোঁড়ামির প্রতিও তাঁর ব্যঙ্গ কম নির্মম ছিল না। তিনি এদের উদ্দেশ করে লিখেছেন :

"তোমরা হিন্দুধর্ম প্রচার করেই হতে চাও যে ধন্য,
—তা সে হবে কেন ?
তোমরা মূর্খ হয়েও হতে চাও যে বিশ্বে অগ্রগণ্য
—তা সে হবে কেন ?
তোমরা বোঝাতে চাও হিন্দুধর্মের অতি সূক্ষ্ম মর্ম,
তীক্তাটা আধ্যাত্মিক আর কুঁড়েমিটা ধর্ম
অমনি তাই বুঝে যাবে কত শ্বেতচর্ম,
—তা সে হবে কেন ?"

হিন্দুয়ানীর ভণ্ডামির প্রতি বিদ্রূপাত্মক গানটি—

"এবার হয়েছি হিন্দু, করুণাসিন্ধু গোবিন্দজীকে
ভজি হে"—

সর্বজনপরিচিত। কবির বিদ্রূপের কশাঘাত নবীন ও প্রবীণ যার ওপরেই পড়ুক না কেন, তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল দেশের মঙ্গল সাধন। তিনি যথার্থই বুঝেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবাহ কেউ রোধ করতে পারবে না। রোধ করা উচিতও নয়। কিন্তু তাকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে পারলে তবেই তা স্বদেশের মঙ্গলের কারণ হবে, অন্যথায় দেশে কিছু 'বিলাতী-বাঁদর' তৈরী হওয়া ছাড়া আর কোন কাজই হবে না।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন :

"কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া"—

সেই ঐতিহ্যকে বহন করে, সেই পথ ধরে এলেন রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রজনীকান্ত। কান্তকবি গাইলেন—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই'। দ্বিজেন্দ্রলালও এই পথের পথিক। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, তাঁর দেশপ্রেম বিশ্বমানবতার বিশাল সাগরে পরিণতি লাভ করেছে। রবীন্দ্রযুগের প্রখর সূর্যালোকের মধ্যে থেকেও দ্বিজেন্দ্রলালের সহজ সরল দেশাত্মবোধক সঙ্গীত এবং কবিতাগুলি যে দেশের লোকের মনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিতে পেরেছিল, দেশের জনসাধারণকে দেশপ্রেমে মাতিয়ে তুলতে পেরেছিল এবং এত দীর্ঘদিন পরে আবার আজও তাদের দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পেরেছে—দ্বিজেন্দ্রলালের আন্তরিকতা এবং স্বকীয়তার এটাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কবি-বন্দনা

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র এম-এ

আর্ত হৃদয়ের স্পন্দনে স্পন্দনে তোমারে স্মরণ করি,
তোমারে স্মরণ করি উদ্ভাসিত রূপের প্লাবনে।
মেঘে ঢাকা দুর্যোগের ঘন অন্ধকারে, খুঁজে মরি
আলোকের পথ, ফিরে যেতে ভয়মুক্ত জ্ঞানের অঙ্গনে—

তোমারে পরাব বলে যতবার গাঁথিয়াছি অর্ঘ্যের মালিকা
বিস্ময়ে হেরেছি কবি! সে তোমার দেওয়া ফুলদল—
তোমারি কানন হতে সঞ্চয়িত ঝরা শেফালিকা,
তোমারি ছন্দের সূত্রে বাঁধা পড়ে হয়েছে [illegible]।

জানি সেথা সুর তব প্রেমের সৌরভে—
[illegible] কবিতার পল্লবে পল্লবে।

অমর জ্যোতির লোকে বিরাজিত, [illegible]
মোদের প্রণাম লহ [illegible]

মানকুমারী বসু শতবার্ষিকী

শৈলেনকুমার দত্ত

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিক উৎসবের জের কাটতে না কাটতে বাংলাদেশে আরও কয়েকজন স্রষ্টার শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে বা হবে। বিস্মৃতপ্রায় কবি মানকুমারী বসু (১৮৬৩—১৯৪৩) এঁদের মধ্যে একজন। বাংলা সাহিত্যে মানকুমারী বসু আজ অবহেলিত, পাঠকবর্গও তাঁকে ভুলতে বসেছেন। কিন্তু কোন নিরপেক্ষ সমালোচক যদি আজও একটু গভীরভাবে তাঁর কাব্যপাঠ করেন তাহলে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করবেন না। "আমার অতীত জীবন" নামে মানকুমারী যে আত্মচরিত লেখেন তাতে তাঁর জন্মসাল ১২৭১ বলে লিখিত আছে। কিন্তু এটি ভুল। কবির মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা শ্রীচারুচন্দ্র নাগ প্রমাণ করেছেন যে প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্ম তারিখ ১৩ মাঘ, ১২৬৯—,১২৭১ নয়। (১)

মানকুমারী বসুর প্রথম আত্মপ্রকাশ হয় সংবাদ-প্রভাকরে। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে অমিত্রাক্ষর ছন্দেতে লেখা 'পুরন্দরের প্রতি ইন্দুবালা' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠকদের বিশেষ সমাদর লাভ করে। পিতৃব্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিনি যে যোগ্য উত্তরসূরী তার নমুনা এ কবিতাটির ছত্রে ছত্রে—

> দুরন্ত যবন যবে ভারত ভিতরে
> পশিল আসিয়া পুরন্দর মহাবলী
> কেমনে সাজিলা রণে, প্রিয়তমা তার
> ইন্দুবালা কেমনে বা করিলা বিদায়?
> কৃপা করি কহ মোরে হে কল্পনা দেবী।
> কেমনে বিদায় বীর হল প্রিয়া কাছে।

কবিতাটির মধ্যে ভবিষ্যৎ-স্রষ্টার সম্ভাবনা যে প্রচ্ছন্ন, স্থিতধী পাঠক মাত্রেই সেটি উপলব্ধি করবেন। এই কবিতার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপ্রভাকরে যে সম্পাদকীয় টীকা লেখা হয়, সেটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়: "আমরা অবগত হইলাম, লেখিকা কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী; ইনি পিতৃব্য-সৃষ্ট বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষরে যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার গলায় আমরা প্রশংসার শতনরী হার পরাইলাম। চর্চ্চা থাকিলে ইঁহার মধুময়ী লেখনী কালে অমৃত প্রসব করিবে।" সম্পাদকের এ দূরদর্শিতার কথা পরবর্তীকালের পাঠকগণ বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। তাঁর আরও একটি বাল্যরচনার মধ্যে যে ঈশ্বরবিশ্বাসী সত্তাটি প্রস্ফুটিত হতে শুরু করেছিল তার মধ্যেও তাঁর কবিচিত্তটি নির্ধূম অগ্নিশিখার মতো সদা ভাস্বর—

> রাখ রাখ সবে ভাই বচন আমার
> ঈশ্বরের পদে কর কর নমস্কার।

মানকুমারী বসু স্বভাবকবি। আত্মজীবনীতে যে তিনি গোবিন্দদাস, গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন—এ স্বীকারোক্তিতেও ওপরের সব চিহ্নগুলি সুস্পষ্ট। 'পলে পলে যে মমতা জীবনী জাগায়' সেই মমতাতে সঞ্জীবিত তাঁর কবিহৃদয়। তাই তাঁর ভাব এত প্রাণস্পর্শী, ব্যঞ্জনা এত হৃদয়বিদারী।

২

বিভিন্ন কবির বিশিষ্টতার কথা উল্লেখ করে একজন আধুনিক সমালোচক কয়েকটি সুন্দর কথা বলেছেন, "The ballad poet is identical with the world he lives in. The humanist poet is the nucleus of his world, the focus of intelligence and intellectual progress. The religious poet lives at the peripheny of his world—at the point where his world is in contact with the infinte universe. (২) মানকুমারী বসু পুরোপুরি কোন্ নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত না হলেও প্রতিটি গুণই তাঁর কাব্যে বর্তমান। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যসংকলন কাব্যকুসুমাঞ্জলির (১৮৯৩)

মধ্যে একদিকে যেমন ফুটে উঠেছে একটি খাঁটি মন, তেমনি অন্যদিকে আমরা দেখেছি একটি ঋজুহৃদয় এবং একটি সত্ত্বগুণের প্রতিমূর্তি। কাব্যকুসুমাঞ্জলি পাঠ করে রাজনারায়ণ বসু যে পত্র (৭ কার্তিক, ব্রহ্মশক ৬৪) লেখেন তার বক্তব্যটুকু খুবই মূল্যবান: "কবি যেমন হাস্য-উদ্রেক করিতে পটু, তদপেক্ষা করুণ রসের উদ্রেক করিতে অধিক পটু। দেবতার প্রতি ভক্তিভাব, পিতামাতার স্নেহ, প্রেমাস্পদ ও প্রেমাস্পদার আন্তরিক প্রেমভাব, দারিদ্র্যের দুঃখ জন্য বিষম আক্ষেপ, বালিকা বিধবার চির-বৈধব্য ও কৌলীন্যপ্রথা প্রচারের জন্য শোক প্রকাশ করিতে কবি যেমন সক্ষম, এমন অতি অল্প কবি বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া যায় বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না।" (৩) এবং কাব্যকুসুমাঞ্জলি ছাড়াও তাঁর কনকাঞ্জলি (১৮৯৬), বীরকুমারবধকাব্য (১৯০৪), বিভূতি (১৯২৪) এবং সোনার সাথী (১৯২৭) কাব্যের মধ্যেও আমরা তাঁর এই করুণরস সৃষ্টির সার্থক প্রয়াস দেখতে পাই।

বস্তুত তাঁর কাব্যে যে করুণরসের এত প্রাধান্য, এর মূলে আছে তাঁর জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত। মাত্র উনিশ বছর বয়সে বিধবা হয়ে তিনি আজীবন যে দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন তার প্রভাব প্রতিটি কবিতার ছত্রে ছত্রে—

> পোড়া কপালের ভোগ ভুগিলাম ঢের
> মানব জীবন ছাই বড় বিবাদের! (কাব্যকুসুমাঞ্জলি)

নিজের জীবন দিয়ে তিনি যে কষ্টের মধ্যে কাব্য সাধনা করেছেন তার মধ্যেও তাঁর সে সংশয় কাটেনি—

> আমি যদি সোনা ধরি
> ছাই হয়, ভয়ে মরি।
> কপাল এমনি পোড়া হীন অভাগার! (কনকাঞ্জলি)

অল্পবয়সে স্বামীকে কবিতা শুনিয়ে তিনি যে উৎসাহ পেতেন, সে উৎসাহ তাঁকে পরবর্তীকালে কে দেবেন! তাই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে—

> একা আমি, চিরদিন একা
> সে কেন দু'দিন দিল দেখা? (কাব্যকুসুমাঞ্জলি)

এ ক্ষণিকের দেখা তাঁকে অত্যন্ত বেশী শোকগ্রস্ত করেছে। তিনি বুঝেছেন 'কপালে লিখিতে 'সুখ' হয়েছিল ভুল'; আর মর্ম দিয়ে উপলব্ধি করেছেন 'অসহ্য বেদনা বৈধব্য-যন্ত্রণা!' কিন্তু এ যন্ত্রণা তো তাঁর স্বপ্নেও ছিল না!

> ঘর বেঁধে মহাবনে
> ভেবেছিনু মনে মনে
> "আনন্দ আশ্রম" মম সোনার আগার!
> অকস্মাৎ মহাঝড়ে
> সে ঘর ভাঙিয়া পড়ে
> মাটিতে মিশিল হায়! হয়ে চুরমার। (কনকাঞ্জলি)

নিজের জীবন থেকে তাঁর এ সমস্ত স্বীকারোক্তি যেন স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। মহাকাব্যসৃষ্টির মধ্যে নিজেকে ভুলে গিয়েও তাঁর মনে প্রশ্ন এসেছে—

> নারীর হিয়া কি দিয়া গড়িলে?
> লৌহ পিণ্ড দ্রবে তাপে, অশনি আঘাতে
> গিরিচূড়া হয় গুঁড়া, কিন্তু রে অবলা
> বজ্রাধিক বজ্রপাতে মরিয়া মরে না!
> (বীরকুমারবধ কাব্য)

'মরিয়া যে মরে না'—এ প্রমাণ তাঁর জীবনেও আমরা দেখেছি। বাল্য বৈধব্য নিয়ে তিনি যে শুধু একাশী বৎসর বেঁচেছিলেন তা নয়—একে একে বাবাকে হারিয়েছেন, স্বামীকে হারিয়েছেন, এমন কি শেষ পর্যন্ত একমাত্র কন্যা প্রিয়বালাকেও। এই নিদারুণ দুঃখ তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করেছে; 'প্রিয়বালা', 'ভিখারিণী মেয়ে' 'অভাগিনী' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে তাই যেন ঝরে পড়েছে তাঁর কোমল অন্তরের নির্যাস। কিন্তু তাঁর এই কাব্যসৃষ্টির মধ্যে একটি জিনিস বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে তিনি নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কাব্যরচনা করলেও তিনি দুঃখবাদী কবি নন। মৃত্যুর অনতিকালপূর্বে তিনি 'আর কেন?' নামে যে কবিতা লেখেন তার মধ্যেও সে সুর সুস্পষ্ট—

> আজি বৈতরণী নীরে তরণী লাগিছে তীরে
> ডাকিছে পারের মাঝি,—সবে সুখে থাকো
> বিদায় বিদায় ভাই! আর কেন রাখো!

মানকুমারী বসুর কাব্যসাধনার সার্থকতা এইখানেই। জীবনে নিজের এবং অপরের দুঃখ দেখে তিনি বিচলিত হয়েছেন, হয়তো বিপর্যস্তও হয়েছেন, কিন্তু তবু [illegible] মূল সুরটিকে তিনি কখনও ব্যাহত হতে দেননি। [illegible] কষ্টের মোড়কের মধ্যে যেন সুখের [illegible] কেন্দ্রীভূত করে রেখেছেন।

৩

মানকুমারী বসুর মধ্যে কিন্তু কবিসত্তাটিই সর্বস্ব নয়। তাঁর মধ্যে একটি সমাজকল্যাণকামী অন্তরও ছিল। জীবনে, সমাজে তিনি যে কুসংস্কার, শোচনীয় শাস্তির নমুনা দেখেছেন, কাব্যেও ঠিক তেমনি তার চিত্রটি তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের অপরিণত কিশোরীদের নিয়ে যে জীবনের জুয়াখেলা, তাদের শাস্তির জন্যে যে বিবিধ সংস্কার—তারই বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন—

> খেতে খেতে যায় ছুটি,
> হেসে হয় কুটি কুটি
> তার তরে একাদশী কি বলিস্ ছাই !
>
> (কাব্যকুসুমাঞ্জলি)

তাঁর সংসারী মন শুধু যে এখানেই দৃষ্টি ফেলেছে তা নয়—পতিতা নারীদের যে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট তার জন্তেও তাঁর অন্তর ভরে উঠেছে সহানুভূতিতে—

> তার তরে নাই—ক্ষমা করুণা আশ্বাস,
> আছে শুধু পদাঘাত, গালি। (কাব্যকুসুমাঞ্জলি)

কাব্য ছাড়াও তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ বনবাসিনী (১৮৮৮), প্রিয়প্রসঙ্গ (১৮৮৪), শুভ সাধনা (১৯১১) এবং পুরাতন ছবির (১৯৩৬) মধ্যেও আমরা তাঁর এই অন্তরের পরিচয় পেয়েছি বারবার। এই অন্তর্দৃষ্টি, এই গভীর জীবনবোধের সঞ্জীবনী মন্ত্রই তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে গল্প রচনায় এবং অধিকাংশ গল্পই জয় করেছে জনহৃদয়, পুরস্কৃত হয়েছে বারবার। জীবনে তিনি দেখেছেন অনেক, দুই শতাব্দীর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে প্রাচীন এবং আধুনিক সমাজের গতি-প্রগতি উত্থানপতন সমস্তই লক্ষ্য করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। দেশকালের সম্মান পেয়েছেন অনেক, সুধীজনেরা সাধুবাদ জানিয়েছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক এবং ভুবনমোহিনী স্বর্ণ পদক দিয়ে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অনেক কর্তব্য এখনও বাকী আছে। জীবন-সন্ধানী অনুভূতিপ্রবণ এবং সত্যদর্শী কবি মানকুমারী বসুকে নতুন করে স্মরণ করার দিন এসেছে আবার।

---

(১) সাহিত্য-সাধক চরিত মালা (৫ম খণ্ড) :
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) Phases of English Poetry :
Herbert Read.

(৩) বীরকুমারবধ কাব্য (৩য় সংস্করণ)—
পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দশ

ষাট পেরিয়ে গেলেও মহাদেবের স্বাস্থ্য ছিল যেমন অটুট, মনও তেম্নি বলিষ্ঠ। চিরকাল সংযত জীবন যাপন ক'রে এসেছেন, তাছাড়া স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে ব্রহ্মচর্যের নিয়ম মেনে চলার ফলে তাঁর ইচ্ছাশক্তিতে এতটুকুও ভাঙন ধরে নি। তিনি দুর্বল ছিলেন শুধু মাতৃহারা পুত্রের সঙ্গে লেনদেনে। তাকে শিশুকালে ডাকতেন "নয়নমণি" ব'লে। নিজে হাতে মানুষ ক'রে রাগসঙ্গীতে তালিম দিয়ে, বিবাহ দিয়ে সুখীও হয়েছিলেন মনের মতন পুত্রবধূ পেয়ে। অবশ্য পুত্রের আকস্মিক কৈশোর-বৈরাগ্যের অশুভ সূচনায় প্রথমটা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন বৈ কি, কিন্তু মমতা গাঢ় হ'লে মানুষ স্নেহপাত্রের স্খলনের জন্যেও তাকে প্রাণ ধ'রে দায়িক করতে পারে না তো। তাই তিনিও সবশেষ দোষ চাপিয়েছিলেন আমাদের বৈরাগ্যতন্ত্রী সাধু ও শাস্ত্রীদের 'পরে। ভগবানে তিনি বিশ্বাস করতেন, কিন্তু ঠিক যেমন আর পাঁচটা বিষয়ী করে—ঠাকুরঘরে ফুল সাজাও, ঘণ্টা বাজাও, ধূপদীপ জ্বালাও, একটুআধটু স্তবস্তুতি করো—কিন্তু র'য়ে স'য়ে। ভগবানকে তলব করো, কিন্তু তুতিয়ে পাতিয়ে সংসারের কাজে লাগাতে, গৃহস্থালির চাকায় তেল দিতে। ঐ একটু আধটু "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ঃ"—এই তো বেশ! ঠাকুরও তো এর বেশি অর্ঘ্য চান নি দ্বাপর যুগেও, তবে কলিযুগেই বা তাঁর বাড় বাড়বে কেন? না, তিনি থাকতে চান বেশ তো, থাকুন না তাঁর খাসতালুকে অক্ষয় হ'য়ে—মানে ঐ পাথরের বেদীর উপর ত্রিভঙ্গ হ'য়ে। কালে ভদ্রে হৃদয় মন্দিরে এসে একটু আধটু উঁকি দিলেও "আজ্ঞাজ্ঞে হোক" বলতে বাধবে না—যদি শুধু তিনি কথা দেন যে তারপরেই তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করবেন—কি না তীর্থে, মন্দিরে কৈলাসে কি শ্মশান পীঠে। এ-পর্যন্ত তাঁর গৃহ-বিগ্রহ বিঠোবা ছিলেন পরিপাটি সুবোধ বালক—অল্পেই আহ্লাদে আটখানা—কাজেই সংসারে ছিল শান্তি, ছিল সুখ—সবচেয়ে বড় হ'য়ে ছিল আশা—যে কুলতিলক শুধু বংশরক্ষা ক'রেই পিতৃঋণ শোধ করবে না, পিতার গদিতে গদীয়ান্ ওস্তাদ ব'লে দেশের দশের একজন হ'য়ে কুলের মুখোজ্জ্বল করবে। অভিমানী পিতা কেবল পুত্রের কাছেই সাগ্রহে হার মানতে চাইতেন, বলতেন তাকে প্রায়ই স্নিগ্ধ হেসে: "বাবা! সর্বত্র জয়মন্বিষ্যেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্"—মুনি ঋষিরা সবাই একমত যে, কেবল পুত্রের আর শিষ্যের কাছে হার মানা চলে। আর তুই তো বাপ্‌কা বেটা—তোর মাষ্টারেরাও তোকে প্রতিভাধর উপাধি দিয়েছে···ইত্যাদি সে কত স্নেহভাষ!

এহেন পুত্র তাঁর কথার অবাধ্য হ'য়ে তাঁকে লুকিয়ে চলে গেল—শুধু গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে নয়, গুরুর এমন রায়ও শিরোধার্য করতে যে বাপের চেয়ে গুরু বড়! আশা যেখানে অভ্রভেদী, সেখানে তার ভিৎ হয় অপলকা। তাই এই একটি আঘাতে মহাদেবের স্বপ্নসৌধ ঝোড়ো ঝাপটায় তাসের ঘরের মতনই ধ্বসে পড়ল।

কিন্তু যে-মানুষ স্বভাবে সবল তার সামলে উঠতে খুব বেশি দেরি হয় না এবং প্রকৃতিস্থ হবার পরে দুর্বলের মতন ব্যবহার করলে তার লজ্জার মাথা কাটা যায়। মহাদেব পুত্রের উপর যদি রাগ করে থাকেন, তবে নিজের

উপর হয়ে উঠলেন অগ্নিশর্মা। গীতার একটি শ্লোক তাঁর অতিপ্রিয় ছিল—আরো গর্বের খোরাক জোগাত ব'লে: "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে, ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ!" ক্লৈব্য ও হৃদয়দৌর্বল্যকে জয় ক'রে উঠতেই হবে। তাই যতই তাঁর প্রাণ কাঁদত স্নেহে গ'লে ছেলেকে ক্ষমা ক'রে বুকে জড়িয়ে ধরতে—ততই তিনি উচ্ছ্বাসের লাগাম কষতেন বহু-লালিত অহমিকার রোখালো অনুশাসনে।

কলম্বোয় চ'লে এসেছিলেনও তিনি ঝোঁকের মাথায় নয়—ভেবেচিন্তেই। কাছাকাছি কোথাও প্রস্থান করলে যদি সে-মহাপ্রয়াণ অগস্ত্যযাত্রা না হয়—কে জানে যদি মন ফের নরম হ'য়ে আসে? কোনো প্রিয় অঙ্গকেও কেটে বাদ দিতে হ'লে এক কোপেই কাটা ভালো—একটু একটু ক'রে ত্যাগ করা যায় না। ষাটবছরের সংসারী তিনি—বিচক্ষণ বিষয়ী হ'য়েই গ'ড়ে উঠেছিলেন তো, তাই জানতেন বিলক্ষণই—কিসে কী হয়। তাছাড়া পুত্রের গুণকীর্তনে যখন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতেন তখনও নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতনই থাকতেন—জানতেন মনে মনে যে পুত্রকে তিনি বহির্জীবনের ভারকেন্দ্র ক'রে দাঁড় করিয়েছিলেন অন্তরে—নিজের নানা ভার তাঁর কাছে ক্লান্তিকর হ'য়ে উঠেছিল ব'লেই।

সংসারে প্রত্যাশা থেকেই আসে সংঘাত—এযে তিনি জানতেন না এমন নয়। কিন্তু মমতা যেখানে বেশি টানে, সেখানে মানুষ যেন খানিকটা ইচ্ছা ক'রেই দৃষ্টির পরিধি কমিয়ে ভাবে ঠিক দেখছে। তাই তিনি এত আশা করেছিলেন যে সাবিত্রীর রূপগুণ লালিত্যের প্রভাবে প্রহ্লাদের বৈরাগ্যের নেশা ছুটে যাবে। রক্তমাংসের বিগ্রহের প্রতাপ কাঠপাথরের বিগ্রহের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো, একথা তিনি সত্যিই বিশ্বাস করতেন। তাই দেখেও দেখতে চান নি যে, যৌবনেও নূতনত্বের জোয়ার ভাঁটিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাংসের প্রবল টানও কমে আসেই আসে একটু একটু ক'রে।

তাছাড়া প্রহ্লাদের একটি প্রবণতা তিনি কোনোদিনই পুরোপুরি বুঝতে পারেন নি—বৈরাগ্য কী বস্তু তিনি কস্মিন্‌কালেও উপলব্ধি করেন নি তো, তাই তার অন্তঃশক্তির স্থায়িত্বের খবর রাখতেন না—সাবিত্রীর মতন রূপগুণবতী পুত্রবধূ বরণ ক'রে ঘরে আনার সঙ্গে সঙ্গেই ধরে নিয়েছিলেন—বৈরাগ্য-শয়তান মোহিনী নববধূর হাবভাবের কাছে হার মেনেছে চিরকালের ম'ত। ভাবতে পারেন নি—বিবাহের পর যৌবনে কামনার তুলি প্রাণের পটে যে-সব রোমান্টিক রামধনুর ছবি এঁকে চলে, তাদের রূপরাগ ম্লান হ'য়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভুলে-যাওয়া ধূসর বৈরাগ্য ফের জেগে উঠতে পারে। এই গোড়ার কথাটি বুঝতে পারেন নি ব'লেই তাঁকে অত বেজেছিল প্রহ্লাদের লুকোচুরি। ভেবে দেখতেও ইচ্ছা হয় নি—কেন প্রবর্ধমান বৈরাগ্যকে ঠেকিয়ে রাখতে না পারার দরুণই সে লুকোচুরি করতে বাধ্য হয়েছিল—যার ফলে তাঁর বজ্র-আঁটুনির গেরোও ফস্কে না গিয়েই পারে নি। আর এ আঘাতে অন্তরে ব্যথা অত্যধিক বেজেছিল ব'লেই অভিমানের বেদনা কমলেও ক্ষোভের ঘা শুকিয়েও শুকোতে চাইছিল না।

কিন্তু চলমান জগতে কিছুই স্থির থাকে না। সাত আট মাস বাদেই তাঁর মন একটু একটু ক'রে ফের দুর্বল হ'য়ে এল। কলম্বোয় বড় ওস্তাদ হ'য়ে তাঁর সত্যিই নাম-ডাক হয়েছিল। শুধু অর্থাগমই নয়, গান গেয়ে আনন্দ পেতেনও যথেষ্ট। কিন্তু বিষয়ী মানুষের সংসার গৃহকেই কেন্দ্র করে। গৃহের কেন্দ্র যৌবনে—স্ত্রী, বার্ধক্যে—পুত্রকন্যা বিশেষ ক'রে পুত্র। আর এমন পুত্র! কটা বাপ পায় এমন কুলতিলক—বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, চরিত্রবান্—সর্বোপরি, প্রতিভাবান্! প্রহ্লাদ যখনই রেডিওতে গাইত শুনতেন তিনি সাগ্রহে, তার প্রতি বিজলি তানে তাঁর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠত। এ সবেরই তালিম যে সে তাঁরই কাছে পেয়েছিল—রেয়াজের পথে তাকে এগিয়ে দিয়েছিলেনও তো তিনিই। তাই তো নানা সঙ্গীতসভায় জ্ঞানিগুণীর সংসদে প্রহ্লাদের প্রথম স্থান অধিকার ক'রে নানা উপাধি পাওয়ার খবর কাগজে পড়তে না পড়তে তাঁর বুকের ভিতরটা আরো খালি খালি লাগত। অভিমান উড়ে এসে জুড়ে ব'সে পূর্ণ করতে চায় সে-শূন্যতা। পারে না, হার মেনেও মানে না যে! কই প্রহ্লাদ তো একবারও এল না ক্ষমা চাইতে! বৌমাও তো একটা চিঠি লিখল না গত ছ সাত মাস! এই রকম ক্ষোভের আঁধারেই মানুষ দেখেও দেখতে চায় না—কবে কোন্ আলোকরশ্মিকে দুয়ার বন্ধ দেখে ফিরে যেতে হয়েছে

তাই না তিনি ভুলে গেলেন যে মনুভাইকে তিনি নিজেই লিখেছিলেন পুত্র ও পুত্রবধূকে বলতে—যেন তারা চিঠি না লেখে। গর্বী মানুষ কবে নিজের ত্রুটিচ্যুতি দুর্বলতা স্বীকার করতে চায়? এই সব কারণে মন তাঁর যতই দুলে উঠত, ততই তিনি প্রহ্লাদের অপরাধের 'পরেই সমস্ত দায় চাপিয়ে দিয়ে মনকে শাসন করতেন কঠিন হয়ে: না, আগে ওরা নত হোক—তবে আমি ক্ষমা করব বিজয়ী হ'য়ে। তাছাড়া এত রোখ ক'রে চ'লে এসেছেন—ফিরবেন এখন কোন্ অজুহাতেই বা?

এম্‌নি সময়ে তাঁর কাছে তার পৌঁছল বিকেল পাঁচটায়। সাবিত্রী—তার আদরিণী পুত্রবধূ—মরণাপন্ন! আর প্রহ্লাদ তার করেছে নিজে! তাঁর সব সঞ্চিত ক্ষোভের ফোঁশফোঁশানি গ'লে গিয়ে কোমল উৎকণ্ঠায় বেজে উঠল স্নেহের জলতরঙ্গ।

বন্ধুকে বললেন—বন্ধু উদ্বিগ্ন হ'য়ে বিমানঘাঁটিতে ফোন করলেন—মাদ্রাজের নাইট প্লেনের খবর চেয়ে। উত্তর এল: আগামী তিন দিনের মধ্যে একটি সীটও খালি নেই।

মহাদেব পলুস্কর অধীর হ'য়ে রিসীভার কেড়ে নিয়ে বললেন: "আমার বাড়িতে অসুখ, আজ রওনা হ'তেই হবে আমাকে।" উত্তর এল: দুঃখিত—তিন চার দিনের মধ্যে একটি সীটও পাওয়া যাবে না। ওয়েটিং তালিকায় দশবারোজন ক্রমাগত ফোন করছে।"

মহাদেব বললেন: "আমি মহাদেব পলুস্কর—আমার নাম হয়ত শুনে থাকবেন।"

ম্যানেজারের সুর বদলে গেল, বললেন: "ওস্তাদজি? আচ্ছা একটু দাঁড়ান, দেখি।" একটু বাদে: "কাল ভোরে একটি সীট পেতে পারেন এই মাত্র খবর এসেছে—একজন আসতে পারবেন না!"

মহাদেব: "ধন্যবাদ। তবে আমার নামে এ-সীটটি রিজার্ভ ক'রে রাখুন—আমি এখনি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ম্যানেজার (টেলিফোনে হেসে): "টাকা আপনি কাল ভোরে দিলেও চলবে।"

মহাদেব: "ধন্যবাদ। কেমন—মনে থাকবে তো?"

ম্যানেজার: "ওস্তাদজি, আপনার গান যে একবার শুনেছে সে কি আর ভুলতে পারে? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। It is my privilege to serve you!"

এত দুঃখেও মহাদেবের মন খুসি হ'য়ে উঠল: স্বধর্মে তথা স্বভাবে "ওস্তাদজি" তো! প্রশংসা পেতে না পেতে বুকে তাঁর আত্মপ্রসাদের মৃদঙ্গ বেজে উঠত—যেমন বেজে ওঠে বালকের বুকে। বড় শিল্পীদের মন প্রবীণ হ'য়ে উঠলেও প্রাণ যে কেমন ক'রে থেকে যায় চিরনবীন, তারা নিজেও জানে না।

এগারো

সন্ধ্যাবেলা মহাদেবের মন অশান্ত হ'য়ে উঠল। হঠাৎ মনে হ'ল—মনুভাইয়ের টেলিফোন আছে। ট্রাংক কলে ডাকতেই ওরা বলল—ঘণ্টাখানেক লাগবে যোগাযোগ হ'তে—দেহু থেকে বম্বে, বম্বে থেকে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ থেকে কলম্বো—তিনটে লাইনের সহযোগিতা পাওয়া সময়সাপেক্ষ। মহাদেব অধীর হ'য়ে পাশে গাড়ীবারান্দার ছাদে একটি আরামকেদারা টেনে নিয়ে শুয়ে একমনে বিঠোভাকে ডাকতে লাগলেন—ঠাকুর আমি অন্যায় করেছি, কিন্তু সে-পাপে বৌমা যেন আমাকে ছেড়ে চ'লে না যায়—তাকে তুমি বাঁচাও আজ…প্রার্থনা করতে করতে হঠাৎ মনে হ'ল—প্রহ্লাদ বরাবর সকাম প্রার্থনার বিপক্ষে ছিল, বলত ঠাকুরের কাছে ভক্তি জ্ঞান চিত্তশুদ্ধি চাইতে হয়, সম্পদে ঠাকুরকে একঘরে ক'রে রেখে বিপদে পড়তে না পড়তে তাঁকে ডাকাডাকি, সাধাসাধি—এ বড় হীন মনোবৃত্তি। হঠাৎ প্রহ্লাদের প্রতি কেমন যেন একটা সম্ভ্রমের ভাব জেগে মহাদেবের গায়ে কাঁটা দিল। এ-যাবৎ তার তরফের কথাটা কেন একটিবারও ভেবে দেখতে চান নি। সে প্রতিভাবান্ শুদ্ধচরিত্র বিদ্বান্ জেনেও কেন তার দৃষ্টিভঙ্গিকে শুধু অবজ্ঞার চোখেই দেখে এসেছেন এতদিন? আজ সে কেমন আছে? তার প্রিয় বিঠোভার কাছে কি আকুল হ'য়ে সাবিত্রীর জন্যে প্রার্থনা করতে বসেছে? উঁহুঁ! প্রহ্লাদ সকাম প্রার্থনা করতে রাজি হবে না কিছুতেই। সঙ্গে সঙ্গে যেন এক মুহূর্তে তার মহত্ত্বের দিকটায় আলো পড়ল, দেখতে পেলেন যা অন্ধকার ছিল এতদিন—সে ঠিক গড়পড়তাদের মনের ধাঁচ নিয়ে জন্মায় নি। মনে পড়ল বদরীনারায়ণের সন্ন্যাসী বলেছিলেন প্রহ্লাদের মাকে: "মাঈ! মহাত্মা ভক্তকী আপকা গর্ভমে জনম লেগে।"

ভাবতে ভাবতে কেমন যেন ঘুম এল—ঠিক ঘুম না

—কারণ গাড়ীবারান্দার ওপাশে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছিল, তার রেশ কানে আসছিল। আধজাগা ঘুমঘোর মতন একটা অবস্থায় একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন—স্বপ্ন ছাড়া কী নামই বা দেওয়া যায় সে-মূর্তির ?

বড় অপরূপ মূর্তি! সেই উজ্জ্বলকান্তি সাধু—যাকে একবার দেখেছিলেন গৌরীর ঘর থেকে ফিরেই—সাদা দাড়ি, সাদা চুল! কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন: "সব পাপ কাটে অনুতাপে।" সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুকের মধ্যে ভক্তি জেগে উঠল। তিনি সাধুর পায়ে মাথা রেখে বললেন: "আমার অপরাধের জন্যে আমাকেই শাস্তি দিন প্রভু, কিন্তু আমার লক্ষ্মীপ্রতিমার গায়ে যেন আঁচ না লাগে। সে পুণ্যবতী সতী সাধ্বী, পাপ তাকে ছুঁতেও পারে নি কোনোদিন।" সাধু উত্তরে কোনো কথা না ব'লে শুধু তাঁর মাথায় হাত রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে কেমন যেন একটা ওলটপালট হ'য়ে গেল—থর থর ক'রে কেঁপে উঠে চোখ মেললেন—দেখলেন চোখের পাতায় জল!

উঠে তিনি ফের প্রার্থনা করতে বসলেন: "তুমি যে-ই হও—আমার পাপের জন্যে বৌমাকে দণ্ড দিও না, তাকে বাঁচাও প্রভু!"

ক্রিং ক্রিং ক্রিং…

বারো

মহাদেব (টেলিফোনে): কে ?

টেলিফোন: দেহু থেকে কথা কইছি। আপনি কে ?

মহাদেব: মনুভাই ?

টেলিফোন: কে ? মামাবাবু ?

মহাদেব: হ্যাঁ, প্রহ্লাদের তার পেয়েছি। বৌমা এখন কেমন ?

টেলিফোন: সেই একই অবস্থা, নিঃঝুম। আপনি চ'লে আসুন এক্ষুণি—কালবিলম্ব না ক'রে।

মহাদেব: আমি কাল ভোরেই রওনা হচ্ছি। তার আগে কোনো প্লেন নেই। বম্বে পৌঁছতে বেলা ছুটো হবে বলল ওরা।

টেলিফোন: বাঁচলাম। কিন্তু ঠিক আসছেন তো ? মানে, সীট পেয়েছেন ?

মহাদেব: হ্যাঁ—অনেক কষ্টে। কিন্তু শোনো, বৌমার নিঃঝুম অবস্থা মানে কি ?

টেলিফোন: মূর্ছা হয়েছিল—ভাঙল ঘণ্টা দুই পরে, কিন্তু ঠিক সজ্ঞান অবস্থা নয়।—ঐ গৌরী ডাকতে এসেছে —চললাম। আমি আপনার জন্যে মোটর নিয়ে সান্টা-ক্রুজে অপেক্ষা করব।

তেরো

মনুভাই মহাদেবকে তার করবার সময়ে নিজেকে বুঝিয়েছিল—যেমন গড়পড়তা মানুষ অনেক সময়েই ক'রে থাকে—যে তার বোঠানের জন্যে প্রাণ কাঁদছে ব'লেই সে থাকতে পারে নি। সংসারে মানুষ যখন প্রতিবেশীর উপকার করতে এগিয়ে আসে তখন অনেক সময়েই সে এই ভাবেই নিজের মনকে ভোলায় খানিকটা নিজের চোখে বড় হয়ে উঠতে। মনুভাই যে আদৌ সাবিত্রীর রোগমুক্তি চায় নি—এমন কথা বললে অত্যুক্তি হবে, কিন্তু সে তার করেছিল মুখ্যতঃ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই, সাবিত্রীর প্রতি দরদ ছিল মাত্র গৌণ হেতু।

এ-স্বার্থের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে—অর্থাৎ গৌরীকে কাছে পাওয়ার প্রবল লোভ। সে-ইতিহাস একটু জটিল ব'লে গৌরীর তরফের কথা আর একটু খুলে বলা দরকার।

দীক্ষার পরে গৌরীর মনে গুরুভক্তি ও সাধননিষ্ঠার জোয়ার দিন দিন প্রবর্ধমান হ'য়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওর মধ্যে একটা পরিবর্তন ক্রমশই বাদ সাধা সুরু করে: দেহাসক্তির ক্ষণিক তীব্র উত্তেজনার পরেই চিত্তগ্লানি, অবসাদ ও পরিতাপ ঘনিয়ে উঠতে থাকে। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, দীক্ষা নেবার পরে সাধিকার সাধনায় একবার মন বসলে এই ধরণের পরিণতিই হ'য়ে থাকে এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক তথা বাঞ্ছনীয়। তাহ'লে ওর কী কর্তব্য জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি খুব জোর দিয়েই ওকে বলেছিলেন যে, ওরা যখন দীক্ষা নিয়েছে তখন সন্তান আসার পর ব্রহ্মচর্যের বিধিবিধান মেনে চলতেই হবে: অর্থাৎ ব্রতনিষ্ঠার পথ নেওয়ার পরে উত্তরোত্তর সংযমের রাশ কষতে কষতে চাইতে হবে শেষে নিরোধ বা বর্জন। গুরুমা ওকে বলেছিলেন যে বিবাহের পর স্বামিসহবাসে একটি ছুটি সন্তান আসার পরে সাধারণতঃ পূর্ণ ব্রহ্মচর্যে স্থায়ী হওয়া মেয়েদের পক্ষে পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি

সহজ হ'য়ে আসে শুধু এই জন্যেই নয় যে সাধারণতঃ স্বভাবে পুরুষের চেয়ে বেশী সংযমী, এ জন্যেও বটে যে তারা সন্তানকে ভালোবেসে ও লালন ক'রে গভীর তৃপ্তি পায়। তাই তাদের দেহসুখের কামনা নিরস্ত না হ'লেও লালসা তেমন অশান্ত করে না, যেমন করে পুরুষকে। গুরুমা আরো বলেছিলেন যে, এই কারণেই বিবাহের পর স্ত্রীর অনুরাগী হ'য়েও স্বামী যত সহজে পরস্ত্রীর দিকে ঝুঁকতে পারে—স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসার পরে কিছুতেই পারে না তত সহজে পরপুরুষের টানে অসতী হতে।

রমা আসার পর থেকে গৌরী এ সত্যকে উপলব্ধি করেছিল কয়েকমাসের মধ্যেই। তাই ও প্রায় স্বামীকে মনে করিয়ে দিত: "আমরা দীক্ষা নিয়েছি, গুরুদেবকে কথাও দিয়েছি যে ক্রমে ক্রমে সংযমী হ'য়ে শেষে পুরোপুরি ব্রহ্মচর্যের ব্রত পালন করব—মনে রাখব আমরা বিষয়ী সংসারী নই, গৃহী যোগী।" মনুভাই রেগে বলত: "তুমি কথা দিয়ে থাকতে পারো, আমি কথা দিই নি। ননসেন্স! গৃহী যোগী, সংযম, গুরুদাস হওয়া—এসবের মানে কি? যত সব হাম্বাগ—টল টক। আর ব্রহ্মচর্য! রাবিশ্! নর্মাল মানুষ চলবে স্বভাবের পথে এই-ই ল-অফ নেচার। উদ্ভট হয় কেবল যারা পাগল কিম্বা দেবতা। আমি পাগলও নই দেবতাও নই, আর তুমিও কিছু প্রেমদাসী মীরাবাই কি শ্রীরামকৃষ্ণের চিরকুমারী স্ত্রী নও। তাছাড়া আমি দীক্ষা নিয়েছিলাম তোমার আবদারে—একলা দীক্ষা নেওয়ার ফলে পাছে তুমি হাতছাড়া হ'য়ে যাও এই ভয়ে। তাই এ-ব্ল্যাকমেল ছাড়ো। আমাকে ব্রহ্মচর্য ব্রহ্মচর্য ক'রে শাসালে ভালো হবে না ব'লে রাখছি। এ-যুগে পতিব্রতা বিরল হ'লেও মোহিনী ললনাকে ছলনা না ক'রেও পাওয়া যায় অজস্র। তাই সাবধান!…" ইত্যাদি।

গৌরী ভয় পেত বৈ কি। স্বামীর দুর্বলতা যে তাকে টেনে কত নিচে নামাতে পারে সে হাড়ে হাড়ে জানত। তাছাড়া আকৈশোর তার চলনবলনের ছন্দ ছিল ভদ্র, শান্ত, সংযমী, ধর্মভীরু। কেলেঙ্কারি হবে ভাবতেও তার সুকুমারী প্রবৃত্তি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেত যেন। তাই ইচ্ছা না থাকলেও স্বামীকে উন্মার্গগামী হওয়া থেকে ঠেকানোর জন্যেও তার কাছে ধরা দিতে হ'ত তাকে।

কিন্তু সাড়া না পেলে ভোগ হ'য়ে ওঠে দুর্ভোগ। কাজেই অতৃপ্তির ফলে মনুভাই একটু একটু ক'রে গুরু-বিমুখ হ'য়ে উঠল। তার স্বপক্ষে যে কিছুই বলার ছিল না এমন নয়। যে মানুষ নিঃসন্তানা—স্ত্রীর কাছে বছর তিনেক আগেও ষোলো আনা নাহোক বারো আনা নগদ বিদায় পেয়েছে, সে সন্তানবতী শয্যাসঙ্গিনীর কাছে ক্রমশই দেহদক্ষিণা কম পেতে পেতে শেষটায় ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠবে এ আর আশ্চর্য কি? আর শুধু দেহের কামনা অতৃপ্ত থাকার জন্যে অশান্তিই তো নয়—তার উপরে পুরুষের আত্মাভিমানে ঘা পড়ে যে প্রতিপদে! কী! আমি কর্তা না গুরু কর্তা?—এই ক্ষোভের দাপটে তার অসন্তোষ ক্রমশঃ হ'য়ে উঠল আক্রোশ। দেখে শুনে গৌরীর মনও ক্রমশঃ ওর প্রতি বিমুখ হয়ে উঠল—শেষে ভালোবাসার প্রধান ভিৎ শ্রদ্ধা হারিয়ে তার মনে বিতৃষ্ণা এমনই ঘনিয়ে উঠল যে, সে ব'লতে বাধ্য হল: "কোমর বেঁধে কেলেঙ্কারি করতে চাইলে আমি নাচার। কিন্তু আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে তোমার জুলুম-জবরদস্তি। আর না, পূর্ণচ্ছেদ।"

ফল—যা হবার: মনুভাইয়ের মনে গুরুদ্রোহ সেই অনুপাতেই ফুলে উঠল যে-অনুপাতে গৌরীর মনে গুরু-ভক্তি দল মেলল আনন্দের সহজ আবেগে। যে-বিস্ফোরণের ফলে সাবিত্রীর দেহে মনে দারুণ চোট লাগে বাইরে থেকে দেখতে তাকে আকস্মিক মনে হ'লেও তার বারুদ জুগিয়েছিল দিনে দিনে স্বামীস্ত্রীর রুচিভেদ থেকে মতানৈক্য, মতানৈক্য থেকে চলার ছন্দবদল—শেষে এই শোকাবহ উপলব্ধি যে, ওদের মধ্যে আর নেই সেই আন্তর-মিল যার আনুকূল্য বিনা ঘরকন্না হ'য়ে দাঁড়ায় বিড়ম্বনা। গুরুপূর্ণিমার দিনে "সীন" করার জন্যে মনুভাই গৌরীর কাছে অবশ্য ক্ষমা চেয়েছিল, কিন্তু মনে মনে অনুতপ্ত হয় নি তো, তাই আরো চেয়েছিল এই অজুহাতে মহাদেবকে ফিরিয়ে আনতে। গৌরীকে একথা সে খোলাখুলিই বলেছিল: "আমি একা, তোমরা তিনজন—it's an un-equal fight—মামাবাবু আসুন, তারপর দেখা যাবে, কারণ তিনি হবেনই হবেন আমার দিকে—মনে রেখো।"

গৌরী একথায় একটু ভয় না পেয়ে পারে নি। কারণ সে জানত—মনুভাইয়ের এখানে অন্ততঃ ভুল হয় নি, এ

চালে সে বাজিমাৎ করতে না পারলেও ওকে খানিকটা কোণঠেশা করতে পারবে বৈ কি। তাই সে নিরন্তর প্রার্থনা করত যে, তারা তিনজনেই মনে জোর না পাওয়া পর্যন্ত মামাবাবু যেন না ফেরেন কলম্বো থেকে।

মন্নুভাই যখন ওকে ডেকে পাঠালো মামাবাবু আসছেন খবর দিয়ে—তখন পণ নেওয়া সত্ত্বেও ওকে প্রহ্লাদের আশ্রয় ছেড়ে ফিরতে হ'ল স্বামীর আশ্রয়ে। বাইরে যতই কেন না বেপরোয়া হবার আস্ফালন করুক, সংসারে থাকতে হ'লে যে একটানা রোখের পাল তুলে তরী বাওয়া চলে না, রফার নির্দেশে দাঁড় টেনে ঠাট বজায় রাখতে হয় পদেপদেই—এ-সত্যকে ও হাড়েহাড়ে উপলব্ধি করেছিল। তাই শেষে আপোষ হ'ল—ও ফিরবে কিন্তু স্বামীর সহধর্মিণী হ'তে, শয্যাসঙ্গিনী না। আলাদা ঘরে আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করতেই হবে নৈলে, মানে জবরদস্তি করলে ও সব ছেড়ে কাশী চলে যাবে গুরুদেবের আশ্রয়ে। এ-প্রস্তাবে মন্নুভাই মনে মনে আগুন হ'য়ে উঠলেও ভেবেচিন্তে রাজি হল, কারণ ওর ভয় ছিল গৌরী একবার রুখে উঠে কাশী গেলে আর ফিরবে না। তাই গৌরীর এই সর্তে ওর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লেও এ-নিষ্পত্তিকে মেনে নিয়ে ও আথাল-পাথাল ভাবতে লাগল—কী ক'রে মহাদেবের সহায়তাকে খাটিয়ে ষোলো-আনা নিজের স্বার্থসিদ্ধির ভিত্তিতেও আদায় করা যায়—কোন্ কিস্তিতে গৌরীর চালকে ব্যর্থ করা যায়।

মহাদেবকে ও দুতিনটি চিঠিতে ওর দাম্পত্য জীবনের এ শোকাবহ পরিণতির আভাষ দিয়েছিল। উত্তরে তিনি ওকে উপদেশ দিয়েছিলেন দেহু ছেড়ে পুণ য় গিয়ে বসবাস করতে। কিন্তু গৌরী সাফ জবাব দিল: "দেহু যদি ছাড়তেই হয়, তবে তুমি যেখানে চাও যাও—কিন্তু আমি চ'লে যাব সোজা কাশী—ব'লে রাখছি সুরুতেই। ভেবো না তোমার কূটচাল আমি বুঝি না। কিন্তু সাবধান, আমাকে আমার গুরুভাই বোনদের কাছছাড়া করে অসহায় করতে চাইলে আমি ধরব খোদকর্তাকে আঁকড়ে—ভাগবতে যাঁকে বলেছে 'সর্বদেবময়ো গুরুঃ'। তাঁর কাছে চলবে না তোমার জারিজুরি—মনে রেখো।"

মন্নুভাইয়ের কিস্তি ফের ব্যর্থ হ'ল। শেষে অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করল—মোকদ্দমাটা যখন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে রীতিমত সঙিন, তখন এখন থেকে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে চলতেই হবে, নৈলে সব ভেস্তে যাবে।

ও সাগ্রহেই মোটর নিয়ে গেল মামাবাবুর নাম জপতে জ'পতে। কত প্ল্যান কত ফন্দি—মুঠোর মধ্যে-বন্দী জলকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গ'লে যেতে দেবে? কখনই না। "গৌরী যদি হয় বুনো ওল"—মন্নুভাই জপল—"আমি হব বাঘা তেঁতুল।"

চোদ্দ

সান্টাক্রুজে বিমান থেকে নেমে মন্নুভাইকে আলিঙ্গন ক'রেই মহাদেব বললেন: "বৌমা কেমন আছে বাবা?"

মন্নুভাই (কাষ্ঠহাসি হেসে): মূর্ছা ভেঙ্গেছে। কিন্তু পুরো সাড় আসে নি।

মহাদেব (উদ্বিগ্নকণ্ঠে): কী হয়েছে? কোনো রক্তকোষ-টোষ ছিঁড়ে যায় নি তো?

মন্নুভাই: পুনার ডাক্তার ধাত্রী বলতে পারছে না। আজই বিকেল সাড়ে চারটেয় বম্বের সব চেয়ে বড় গাইনো-কোলজিষ্ট ডাক্তার পিয়ার্সন আসছেন আমেদাবাদের সাইকিয়াট্রিষ্ট সিলভিয়া ক্যাম্পবেলকে নিয়ে। তবে আমার কী ভয় হয় জানেন মামাবাবু?—চলুন, বলছি সব মোটরে। আপনাকে সব কথা আর খোলাখুলি না জানালেই নয়।

* * *

মোটরে গৌরীর কীর্তি ও সর্তের কথা শুনতে না শুনতে মহাদেবের মন ফের বিষিয়ে উঠল। মন্নুভাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝালো—বিষ্ণুঠাকুর তুক্-তাক জানেন। মহাদেব তুকতাকে কোনোদিনই বিশ্বাস করেন নি, কিন্তু মনের উদ্বিগ্ন অবস্থায় বিশ্বাস সহজেই পালটে যায়, তাই তিনি মন্নুভাইয়ের নিদান মেনে নিয়ে বললেন: "আমি সম্পূর্ণ তোমার দিকে বাবা। কেবল তুমি ঠিকই বলেছ—এখন থেকে আমাদের দুজনকেই খুব মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলতে হবে। খুব সাবধান! একটু বেচাল হ'লেও শেষরক্ষা হবে না—মনে রেখো।" বলে করুণ হেসে "আমরা দুজনেই রগচটা মানুষ! কিন্তু যারা তুকতাক ভেল্কি জানে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে হলে সব আগে চাই দেঁতো হাসি। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। এও বুঝলে না?"

কলম্বোয় গতকাল স্বপ্নে জ্যোতির্ময় সাধুর মূর্তি দর্শনের পরে তাঁর মনে সাধু সন্তের পরে যে-একটু শ্রদ্ধা ও সমীহের ভাব এসেছিল মন্নুভাইয়ের অশ্রদ্ধার ঝাঁঝে সে-ভাব উবে গেল। মনে পড়ল মূর্তির উপদেশ: "অনুতাপে তনুমন শুদ্ধ হয়।" কিন্তু রুখে উঠে সে-চিন্তাকে মহাদেব বরখাস্ত করলেন। এই সুবিধাবাদী যুক্তিতে যে-এরই নাম তুকতাক। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বললেন ঝাঁঝালো সুরে: "অনুতাপ? অনুতাপ করব কী দুঃখে? পাপ যদি কেউ ক'রে থাকে তো সে ঐ—ঐ যত নষ্টের মূল গুরু যে স্ত্রীকে উপদেশ দেয় স্বামীকে ছেড়ে গুরুর আশ্রয় নিতে। এ সুবুদ্ধির যুগেও এ কী মতিচ্ছন্ন সেকেলিয়ানা শুনি? স্বামীকে ছেড়ে গুরুর স্তাবকতা? ধিক্! পতিব্রতা বড় না গুরুদাসী? মন্নুভাই ঠিকই বলেছে—আমাদের প্রধান শত্রু ঐ ভেল্কিবাজ তান্ত্রিক, ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান, ভদ্র ভাষায়—ভণ্ড গুরু, স্বাধিকারপ্রমত্ত—না, তারও বেশি: কুচক্রী, পরান্নভোজী, সমাজদ্রোহী।"

পনেরো

প্রহ্লাদকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে মহাদেবের সে কী কান্না! তাঁর মতন ভারিক্কি মানুষ যে এ-ভাবে বিহ্বল হ'য়ে কান্নাকাটি করতে পারে প্রহ্লাদ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। হয়ত সেই জন্যেই ওর মনেও ছোঁয়াচ লাগে পিতার ভাবাবেগের, চোখে জল আসে। কেবল কান্নার সময়েও কার যেন স্বর ওকে টোকে: "এ তুমি করছ কি? সাধক হ'য়েও সংসারীর মতন আচরণ! ছি ছি!" হঠাৎ মনে প'ড়ে যায়—গুরুদেব প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন খৃষ্টের একটি বিখ্যাত উক্তি: "No man can serve two masters" ও মনকে সান্ত্বনা দেয়—পিতা তো আর এখন প্রভু বলতে যা বোঝায় তা নেই—শুধু ব্যথার ব্যথী—তাছাড়া, মানুষ হয়ে কি অমানুষের মতন আচরণ করা চলে?···ইত্যাদি। কিন্তু স্বস্তি পায় না—মানস নেত্রে ক্ষণে ক্ষণেই ভেসে ওঠে একটি পরিচিত দৃষ্টি—ঈষৎ ব্যথাসজল, তিরস্কারে ভরা; কাণে শোনে মৃদু অনুযোগ: "এরই মধ্যে ভুলে গেলে বাবা যে, তুমি বিষয়ী সংসারী নও, গৃহী যোগী—যার কাছে গৃহ আশ্রয় নয়—আশ্রম, চিরনিলয় নয়—পান্থশালা?"

ও চোখ মুছে জোর ক'রে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। মহাদেব বলেন: "বৌমা এখন কেমন?"

প্রহ্লাদ: মন্দের ভালো। আজ দুপুরবেলা প্রথম মুখে কথা ফুটেছে। এখুনি দুজন বড় ডাক্তারের পৌঁছবার কথা বম্বে ও আমেদাবাদ থেকে। (দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে) পাঁচটা তো বেজে গেছে—দেরি হচ্ছে কেন?

কমলা (ঘরে ঢুকেই মহাদেবকে প্রণাম ক'রে): এই যে আপনি! কেবলই ভাবছি কখন আসবেন? এখন আমি নিশ্চিন্ত। (হাসিমুখে) এই দেখুন না—আপনি আসছেন খবর পেতে-না-পেতে মেয়ের মুখের কথা ফুটল! আহা, যদি দুমাস আগেও আসতেন তো এ বিপদ হ'ত না।

মহাদেব (প্রসন্ন হেসে): আমাকে কি ওরা ডেকেছিল? আমি ভেবেছিলাম—বুড়ো বাপ শ্বশুরকে কেই বা চায়—তাদের দূরে দূরে থাকাই ভালো।

কমলা (জিভ কেটে): ছি ছি। অমন কথা বলে! অমঙ্গল হয় ওতে। আপনি ওদের আশীর্বাদ না করলে করবে কে শুনি? এই যে গৌরী মা—দেখ মা কে এসেছেন দেবদূত হ'য়ে।

গৌরী (ঢুকে ঢিপ্ ক'রে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে): আপনি বড় সময়েই এসেছেন মামাবাবু। শুনে বৌ কী যে খুসি! এত দুর্বল তো—তবু আপনি আসবেন খবর শুনতে না শুনতে ওর মুখে আলো, চোখে হাসি ফুটে উঠল। বলছি এইমাত্র যে ওর ফাঁড়া কেটে গেছে।

কমলা (উজিয়ে উঠে): তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মা, কেবল ফাঁড়া তো একটা নয়—অগুন্তি। (গলগল্ ক'রে) এই দেখ না কেন, প্রসাদী ফুল এখনো এলো না। (প্রহ্লাদকে) কাশীতে টেলিফোন করেছিলে তো ফুল পাঠাতে?

মহাদেব (চমকে): ফুল? কার?

মন্নুভাই (ঠেশ দিয়ে): ওঁদের গুরুদেবের আর কার?

গৌরী (সভ্রভঙ্গে): "আমাদের" গুরুদেব মানে? কাশীতে তুমিও কি দীক্ষা নাও নি—গুরুমন্ত্র জপ করো নি, তাঁর ছবির সামনে দিনের পর দিন?

মহাদেব (বিরসকণ্ঠে মন্নুভাইকে): তুমিও? ছিঃ

মোটরে আর সব খবর দেবার সঙ্গে এ খবরটা তো দাও নি ?

মন্থভাই (বিপন্ন) : আমি—আমি—পরে বলব সব ব্যাপার। আপনি আগে আপনার বৌমাকে—

কমলা : হ্যাঁ হ্যাঁ—আপনি তাকে আগে আশীর্বাদ ক'রে আসুন, পরে কথা হবে।

মহাদেব (উঠে দাঁড়িয়ে শুষ্ক কণ্ঠে) : এর পরে আর আমার আশীর্বাদের কী দরকার ?

কমলা (গালে হাত দিয়ে) : ও মা ! সে কি কথা ? আপনি হ'লেন সবার বড়—আপনার আশীর্বাদ—

মহাদেব : আপনার ভুল হয়েছে বেহান, কিন্তু এদের হয় নি—এরা জানে কে সবার বড়।

প্রহ্লাদ (করজোড়ে) : বাবা ! আমাদের সব অপরাধ ক্ষমা ক'রে চলুন ভিতরে—ও এইমাত্র বলছিল কখন আপনি আসবেন ? আপনার ও পথ চেয়ে কাছে। আপনি না গেলে ও ফের পড়বে।

মহাদেব (উপশান্ত) : আচ্ছা, চলো দেখে আসি—এই যে—

গেট দিয়ে শ্-শ্ শব্দে ঢুকল একটি মস্ত ক্যাডিলাক।

ষোলো

ডাক্তার পিয়র্সন ও সিলভিয়া ক্যাম্পবেলকে নিয়ে সবাই সাবিত্রীর ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে মন্থভাই মহাদেবকে ডেকে একটু একান্তে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলল : "এরা সবাই···মানে বুঝতেই তো পারেন···একটু···অর্থাৎ অন্তরকম হ'য়ে গেছে গৌরী বলছিল···দুচারদিনের মধ্যে নাকি ওদের গুরুদেব এ অঞ্চলে আসবেন—বিশেষ ক'রে দেহুতে তুকারামের স্মৃতিমন্দির দেখতে।"

মহাদেব (তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে) : "ওদের" গুরুদেব মানে ? তুমি নিজেও তো দীক্ষা নিয়েছ শুনলাম।

মন্থভাই (মরীয়া হ'য়ে) : তার নাম দীক্ষা নয় স্যর—blackmail—duress—গৌরী হাতছাড়া হ'য়ে যায় দেখে বাধ্য হ'য়ে—

মহাদেব : হাতছাড়া হ'য়ে যায় ? কর্তা যদি সত্যি মরদ হয় তবে স্ত্রী কি টুঁ শব্দটি করতে পারে ? আমাকে ছেলে ভুলোচ্ছ ?

মন্থভাই : না স্যর। আমি···আমি···আপনাকে সব তো বলা হয় নি···আগে একটু নিশ্বাস ফেলতে দিন আমাকে—তবে মোদ্দা কথাটা কী জানেন ? আমি শুধু একটা চাল চেলেছিলাম—দীক্ষাফীক্ষা আবার কি শুধু একটা মন্ত্র কানে জপলেন সাধু ঠাকুর—ভাবলাম ক্ষতি কী —গৌরী মেয়েছেলে তো—একটুতেই উদোম ছোটে—a woman will be a woman as boys will be boys, এও বুঝলেন না স্যর ?

মহাদেব : মেয়েছেলেদের ঢং মেয়েলি হবে এটা বুঝতে আমি বেগ পাই নি। বেগ পাচ্ছি তোমার এই আশ্চর্য ওজরে যে, একটা বাজে মন্ত্র কেউ তোমার কানে জপলেই তাকে আওড়াতে হবে তোমাকে দিনের পর দিন ! তুমি সাহেব মানুষ—কথায় কথায় ইংরেজি বুকনি মারো। তাই মনে করিয়ে দিচ্ছি সাহেবপুরাণের একটি প্রবচন : "you cau take a horse to the water, but you cannot make him drink." তুমি তো দেখছি ঘোড়ারও বাড়া—সুবোধ বালক, যা পাও তাই খাও। (সুর বদলে) কিন্তু সে যাক্—শোনো বাবা ! তোমাকে বলছিলাম না যে আমাদের খুব মাথা ঠাণ্ডা ক'রে কাজ করতে হবে ?

মন্থভাই (সোৎসাহে) : Exactly sir—আমিও—

মহাদেব (বাধা দিয়ে) : Exactly নয় বাবা—ugly ugly—বুঝলে ? ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে রীতিম'ত বিশ্রী—সঙিন। আর এর জন্যে খানিকটা দায়ী নিশ্চয়ই তোমার ঐ মন্ত্র নেওয়া। সাহেবরা বলে না—thin end of the wedge ?—এ তাই। মানে ঐ মন্ত্রের কাঠির এ-দিকটা সূক্ষ্ম হ'লেও ওদিকটা বিশাল। জোঁকের উপমা আরো ভালো—বসাও যখন বোঝাই যায় না—কিন্তু ফল কী হয় জানোই তো ? সমস্ত রক্ত শুষে নেয় সে অজান্তে।

মন্থভাই (সোৎসাহে) : বিলক্ষণ ! জানি না তো কী ? জেনে জেনে পাঁজরা ঝাঁঝরা হ'য়ে গেল, স্যর ! আমি কেবল আপনার ফেরার পথ চেয়েছিলাম। কারণ এটুকু আপনি নিশ্চয়ই জানবেন—to be fair to me—যে আমি একলা মানুষ করি কী ? (হেসে) গৌরী কথা-মৃতের একটা উপমা প'ড়ে শোনাচ্ছিল :

উত্তরে কলাগাছ দক্ষিণে পুঁই,
একলা কালো বেরাল, কী করব মুই ?

হা হা হা—

মহাদেব (হেসে উঠে) : বেশ বলেছ বাবা। তোমার দুরবস্থার কথা যে আমি বুঝি না তা নয়—তবে কি জানো? এই মন্ত্র তন্ত্র—ফুল টুল—

কমলা (দ্রুতপদে ঘরে ঢুকে) : কই ? আপনি আসুন। মেয়ে আপনার পথ চেয়ে রয়েছে যে !

মহাদেব : পরীক্ষা হয়ে গেছে ?

কমলা (সানন্দে) : হ্যাঁ। ওঁরা বললেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই—সামান্য হিষ্টিরিয়া। (হেসে) কিন্তু আমি জানি—এ সামান্য হিষ্টিরিয়া নয়—শুধু আপনি আসাতেই মেয়ে সাম্‌লে উঠেছে। চলুন এখন।

মহাদেব (প্রসন্ন) : চলুন যাচ্ছি—কেবল—একটি কথা—বৌমার সম্বন্ধে কী করতে হবে না হবে আগে আমাকে জানাবেন—আমি সব ব্যবস্থা করব। কেমন ?

কমলা (একগাল হেসে) : ও মা ! আপনি হ'লেন মাথা—আমরা তো মাত্তর হাত পা নখ আঙুল। আপনি ব্যবস্থা না করলে করবে কে শুনি ?

মহাদেব (হেসে) : আপনি সরল মানুষ বেয়ান !

কমলা (খুসি) : কলকাতায় আমাকে সবাই ডাকত—বরের ঘরে মাসি কনের ঘ'রে পিসি—ব'লে।

মহাদেব : মানে ?

মনুভাই : মানে আর কি শুর ? আপনার ভাষায়—সাহেবপুরাণে যাকে বলে hunt with the hound and run with the hare—হা হা হা !

* * *

সতেরো

সাবিত্রীর ক্লান্তমুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল, বলল : "এতদিনে মেয়েকে মনে পড়ল, বাবা ?"

মহাদেবের বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল। সাবিত্রীকে তিনি কখনো ভুলেও একটি কড়া কথা বলেন নি। চোখের জল অতিকষ্টে সাম্‌লে তার মাথায় হাত রাখলেন, কিন্তু কোনোমতেই মুখে কথা ফুটল না। সাবিত্রী দুহাতে হাতটি মাথায় চেপে ধ'রে চোখ বুজল, নিমীলিত নেত্রের দুধার দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে অঝোরে।

মহাদেব (গাঢ় কণ্ঠে) : কাঁদে না মা !

সাবিত্রী (জলভরা চোখে তাকিয়ে) : আশীর্বাদ করুন বাবা, আপনি এলেন, এবার সব অমঙ্গল কেটে যাক।

মহাদেব (এক হাত সাবিত্রীর মাথায় রেখে আর এক-হাতে ঝটিতি চোখ মুছে) : যাবে বৈ কি মা ! তুমি ঘরের লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর কাছে কি অমঙ্গলের ছায়াও আসতে পারে কখনো ?

কমলাদেবী (ঘরে ঢুকে হাসিমুখে) : এই নে মেয়ে ! গুরুদেবের ফুল, গুরুদেবের ফুল—ক'রে বাড়ি মাথায় করছিলি—দেখ তিনি কী পাঠিয়েছেন : নীলপদ্ম, বেলফুল আর রাধামাধবের চরণতুলসী।

ব'লেই একটি মোটা খাম থেকে ফুলও তুলসীমালা বার ক'রে ওর মাথায় ঠেকিয়ে বালিসের পাশে রেখে দিলেন।

সাবিত্রী (ঝরঝর ক'রে কেঁদে) : জয় গুরু জয় ! কত কৃপা…ও কী বাবা ? কোথায় যাচ্ছেন ?

মহাদেব "আসছি" ব'লেই বেরিয়ে গেলেন। মুখে তাঁর সব আলো নিভে গেছে মুহূর্তে। [ক্রমশঃ
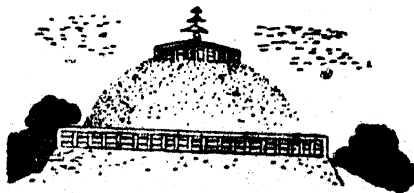
ত্রিপুরায় কয়েকদিন

ডক্টর শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য এম-এ (লণ্ডন), পি-এইচ, ডি (লণ্ডন)

যাযাবর মনটা হঠাৎ জেগে উঠল। হঠাৎ ত্রিপুরার দিকে মন টানল। কোনদিন বাংলার এই উত্তর অঞ্চলটির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়নি। Indian airlinesএর যাত্রীবাহী কোচ পৌঁছে দিল দমদম বিমান-ঘাঁটিতে। সে দিন পাশ্চাত্য খণ্ড থেকে ফিরেছি। এই বিমানই পশ্চিমের থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বিরহের মুহূর্তকে আসন্ন ক'রেছে। তাই বিমানের ওপর মনে মনে একটা অভিমান জমে উঠেছিল। যাইহক, ডাক পড়ল আমাদের প্লেনের আসন নেবার জন্তে। গিয়ে ব'সলাম যে কোন একটি আসনে। সেদিনকার কথা মনে পড়ল যেদিন আমাকে সব কিছু পিছনে ফেলে হৃদয়কে রুদ্ধ ক'রে বিমানের নির্দ্দিষ্ট আসন নিতে হয়েছিল। মনটা মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় চ'লে গেছে। হঠাৎ দেখি, মাটীর নীড় ছেড়ে শূন্যলোকে ভেসে চ'লেছি। নীচের গাছপালা, পথঘাট কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। চারিদিকে নিঃসীম মহাকাশ। মাঝে-মাঝে মেঘেরা পাল তুলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ভেসে উঠল ধরণীর স্নিগ্ধ শ্যামল ছবি। এত নিবিড় শ্যামলিমা আগে ত কোথাও দেখিনি। পূর্ব্ববঙ্গের উপর দিয়ে তখন আমরা উড়ে চ'লেছি। গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জ, ছায়ানিবিড় মায়াঘেরা বনবীথি—আর আঁকাবাঁকা অজস্র নদীনালা যেন রত্নহারের মত শোভা পাচ্ছে। মনে পড়ল ঋষি বঙ্কিমের মাতৃবন্দনা—

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্

মাঝে মাঝে ঝিল্লীমুখর পল্লী দেখে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গল airhostessএর ডাক শুনে—দেখি চটুল চাহনি—মুখে শুক্লাদ্বিতীয়ার চাঁদের মত একফালি হাসি। টিকোলো মুখে চল চল চোখ দুটির মধ্যে কোথাও যেন মাদকতা আছে। কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে তার লক্ষ্যহারা দৃষ্টি। আমি কফি চাইলাম চায়ের বদলে। আর জুচিকেক, স্যাণ্ডউইচ, কলা আরও অনেক অনুপান। আর মিলল—কোন অপরিচিত হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস। প্লেনে যিনি আমাদের আদর আপ্যায়নের ভার নিয়েছিলেন—সব সংকোচ কাটিয়ে মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলাম—আগরতলা পৌঁছতে আর কত দেরী। একটু চটুল চাহনিতে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে বিদায় মুহূর্ত্ত আসন্ন। ভাবছিলাম একি বিচিত্র মানুষের মন। সবখানেই মায়ায় জড়াতে চায়। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে Plane আবার মাটির বুকে লুটিয়ে পড়ল। আবার পথ চলা। আগরতলা বিমান ঘাঁটিটি ছোট হ'লেও যাত্রী সমাগমে মুখর। বিমান ঘাঁটি থেকে যখন শহরে আসছিলাম তখন চোখে পড়ল দুটি জিনিষ। একটি এদের ঘরবাড়ী, আর একটি এদের আনারস কাঁঠাল, যেখানে সেখানে প্রকৃতির অকৃপণ হস্তের দান। শহরের কেন্দ্রে পৌঁছতে প্রায় আধঘণ্টা লেগে গেল। মাঝে মাঝে মাটির ঘর। কিন্তু বেশ পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন। পাতা ও খড়ের ছাউনি—কিন্তু বৈচিত্র্য আছে—কোনটা চারচালা, কোনটা বা বেশী। মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা হ'ল হোটেলে। শিক্ষা বিভাগের দপ্তরে যাবার ইচ্ছে হ'ল। ভাবলাম—একবার অন্ততঃ—এখানকার তীর্থদর্শন করি।… ব্যক্তিত্বের গুণে তিনি আমাকে আকৃষ্ট ক'রেছিলেন। নানা শিক্ষা ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা হ'ল। সেখান থেকে ঠিক হ'ল এখানকার মহাবিদ্যালয় ও বুনিয়াদী শিক্ষণ বিভাগ দেখতে যাওয়ার। জিপে ক'রে রওনা হ'লাম। পথের দু'ধারে বহু পুরানো ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘরবাড়ী রাজ-প্রাসাদ। মাঝে মাঝে বিলাস-উদ্যান প্রমোদ-সরোবর। বুঝলাম আগেকার রাজাদের কল্পনা-বিলাসের কথা! কয়েকটি রাস্তা আবার রাঙামাটির পথ। দুপাশে সবুজ ধানক্ষেত। মাঝে মাঝে

ঢালু খাদ। বন্ধুর উপত্যকায় ছোট ছোট গ্রামও—গ'ড়ে উঠেছে। ছোট ছোট পাতায় ঢাকা ঘর—যেন শান্তির সংসার।

এম, বি, বি কলেজের পরিবেশটি বেশ প্রশান্ত ও প্রশস্ত। চারিদিকে ঘাসে ঢাকা প্রাঙ্গণতল—মাঝে লতা-গুল্ম। কলেজের সামনে বড় বড় থাম দেওয়া দেখে সম্ভ্রম জাগে। কলেজের কাছেই অধ্যাপকদের আবাস। অধ্যক্ষ মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় প্রেরণা পেলাম। Basic Training Collegeএ যাবার সঙ্কল্প নিলাম। শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে। ছবির মত এ বাণী-তীর্থটি। বিরাট জায়গা নিয়ে এর পরিকল্পনা। একধারে ফুলের বাগিচা-লিলিপুল। তার মধ্যে আবার উঁচু একটা বেদী। ছত্রছায়ে চক্রাকারে ব'সবার ব্যবস্থা। দূরান্তের শৈলশ্রেণীর হাতছানি মনকে ঘরছাড়া ক'রে দেয়। কোথাও ঢালু খাদ, কোথাও ধানক্ষেত আবার কোথাও বা আঁকা-বাঁকা হ্রদ। মাঝখানে একটি গ্রাম ছোট পাহাড়ের মত জায়গার ওপর।

সবচেয়ে ভাল লাগে কলেজের জীবনে প্রাণের স্পর্শটুকু। চারিদিক আনারস, লিচু, কাঁঠাল ও পেয়ারার বন। কলেজের একপাশে আবার মৃগশাবক, গিনিপিগ, পাখী। আমাকে দেখে মৃগশাবকটি যেন এগিয়ে এল। করুণ তার চাহনি। আশ্রমমৃগটিকে দেখে মনে প'ড়ল কণ্বমুনির আশ্রমের কথা। তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। দূরান্তের পাহাড়ের বর্ণান্তর দেখলাম। সেই পরিচ্ছন্ন নীলিমার রাজ্যে সন্ধ্যাবেশ নামতে শুরু ক'রেছে। যেন একটা রহস্যের আবরণ গিরিশ্রেণীকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল। আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে সে যেন মেঘেরই মত রূপ নিল। জ্বলে উঠল দূরান্তের বুকে দুই একটি স্তিমিত দীপালোক। কোথাও বা জোনাকীর হাট। অদ্ভুত লাগছিল এই বিচিত্র প্রকৃতিকে—নীলশ্যামলের মিলন-বাসরে—গিরিপ্রান্তর সব যেন পটে আঁকা ছবির মত মনে হচ্ছিল। তারার আলোয় অস্পষ্ট মায়ারাজ্যের মত। কলেজের দুচারজন ছেলেমেয়ের গানের রেওয়াজ তখনও কানে ভেসে আসছিল। বোধহয় তখনও রিহার্সাল চলছিল। সেই চোখজুড়ানো রূপের মাধুরি কখন যে আমার মনকে কেড়ে নিয়েছিল বুঝতে পারিনি। নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম। বুঝলাম প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের কতখানি আত্মীয়তা।

আগরতলা শহরের কেন্দ্রে বহুদিনের রাজপ্রাসাদ—চারিদিকে তোরণ দুয়ার। প্রাসাদের চারিদিকে বিরাট বিরাট দীঘি। তারই জলে ছায়া পড়ে প্রাসাদপুরীর। মাঝে মাঝে গম্বুজ উঠে গেছে। বীর মাণিক্যের প্রচেষ্টায় এই পুরীর পত্তন হ'য়েছিল এই নিভৃত উষর প্রান্তরে।

সংস্কৃতির সৌরভ আজও বহন ক'রছে এই সব রাজ-প্রাসাদ। কতদিনের ইতিহাস জড়িয়ে আছে এদের সঙ্গে। ছোট্ট রাজ্য হ'লেও ত্রিপুরার সমারোহের অভাব ছিল না। শোনা যায় এইরাজ্য এককালে আসাম ও ব্রহ্ম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উপজাতি অঞ্চলগুলিকে একই সূত্রে বাঁধবার স্বপ্ন নিয়ে ত্রিপুরাধিরাজ রাজ্যের বিস্তার ক'রেছেন।

আগরতলা থেকে মাত্র কয়েক মাইল গেলেই এইসব উপজাতি অঞ্চলে এসে পড়া যায়। যেন নতুন একজগৎ আধুনিক সভ্যতার ঢেউ পৌছয় নি। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এ অঞ্চলের মানুষ। আজও আদিম সভ্যতার ক্ষীণধারাটুকু বজায় রেখে চ'লেছে। অনাড়ম্বর এদের জীবন। পাতার ঘর—অথচ পরিপাটি, চাষবাসই প্রধান উপজীবিকা। মাঝে মাঝে শহরে এসে কৃষিজাতপণ্য বিক্রয় করে—কিছু সওদা ক'রে যায়। তাতে এদের ঠক্‌তেও হয় যথেষ্ট। শহরের আধুনিক সভ্যতায় দীক্ষিত লোক এইসব সারল্যের সুযোগ নিতে ছাড়ে না।

আজ এদের সংখ্যা ক'মে আসছে। বাইরের সভ্যতার চাপে এদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। তবুও কয়েকটি লোকাচার···আদিম হ'লেও খুব বাস্তবধর্মী। যেমন এদের বিবাহ সম্পর্কে প্রচলিত প্রথা।

এখানে বরকে কন্যাগৃহে গিয়ে দুবছর কাজ ক'রতে হয়। তারপর দুবছর পর কন্যার অভিভাবক পাত্রকে যোগ্য মনে ক'রলে তবে বিবাহ অনুমোদন ক'রেন। এই প্রথা আদিম হ'লেও এর মধ্যে প্রগতির যথেষ্ট ছাপ রয়েছে।

এমনি আরও প্রগতিবাদের বীজ ছড়িয়ে আছে তথাকথিত সভ্যজগতের বাইরে। আজ তাই তাদের দিকে মন টানে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও নব বেদান্ত *

অধ্যাপক শ্রীঅধরচন্দ্র দাস এম-এ, পি-এইচ-ডি

আজ থেকে বহুদিনপূর্বে একজন মনীষী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ কি কোন নূতন সত্য প্রচার করেছেন ?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "কিছুই না।" তাঁর মতে শ্রীরামকৃষ্ণের মূল শিক্ষা 'যত মত তত পথ'—এটি কোন নূতন কথা নয়। ইহা ঋগ্বেদে ঘোষিত 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি 'বাণীরই নব্য ভাষ্য। অথবা ভাগবদ্গীতায় যে পরম বাণীর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়—"মানুষ যে ভাবে আমার কাছে আসে, সেই ভাবেই আমি তাকে গ্রহণ করি; সকলভাবেই মানুষ একমাত্র আমাকে অনুসরণ করছে"—এই সত্যেরই আধুনিক ভাষ্যরূপ হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ বাণী।

অপরদিকে, রামকৃষ্ণমিশনের দৃষ্টিভঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন শঙ্করাচার্য প্রচারিত অদ্বৈত-বেদান্তী সাধক। কয়েক বছর পূর্বে, আমি আমেরিকার লস্ এঞ্জেলেস্স্থিত 'বেদান্ত এণ্ড দি ওয়েষ্ট' নামক রামকৃষ্ণ মিশনের এক মুখপত্রে একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলাম। সেই প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম, "যদি কেউ হিন্দুধর্মের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতে চান, তবে বেদ এবং উপনিষদে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা রয়েছে, তাঁকে তা বুঝতে হবে। সেই সঙ্গে তাঁকে এ-ও উপলব্ধি করতে হবে যে, কালক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের মধ্যে কীভাবে সেই ঈশ্বরানুভূতি বিকাশ লাভ করেছে।"

সম্পাদক প্রবন্ধটি ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন এবং কারণ হিসাবে সবিনয়ে জানিয়েছিলেন যে, সেই প্রবন্ধটি পত্রিকাটির ভাবগত আদর্শের অনুরূপ নয়। সেই সঙ্গে তিনি আরও একটি বিষয় উল্লেখ করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন একজন শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদী এবং বেদান্ত-সাধক, তিনি মোটেই ঈশ্বরবাদী ছিলেন না।

এই মতবাদ আমাকে আলোড়িত করে, এবং কয়েক বছরের অধ্যয়ন ও গবেষণার পর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করি। গ্রন্থটির নাম "এ মডার্ণ ইনকারনেশন্ অফ্ গড্—এ কমেণ্টরি অন্ দি লাইফ্ এণ্ড টীচিং অফ্ শ্রীরামকৃষ্ণ"। বইটি ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে আমি এই তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অনুভূতি অতি গভীর এবং সেই কারণে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা জগতের সমস্ত ধর্মগ্রন্থকে ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর মতে ঈশ্বর হচ্ছেন সেই পরম ভাগবতী সত্তা—যাঁর উপরে আর কিছুই নেই এবং অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্ম হচ্ছেন সেই ভগবানেরই একটি দিক্। এই গ্রন্থে আমি রামকৃষ্ণের ভগবৎ-ধারণা সম্পূর্ণভাবে ও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। গ্রন্থটি থেকে কিছু আলোচনা এখানে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যেতে পারে।

"ভগবান্ ও পূর্ণব্রহ্ম"—সেই চরম সত্তারই দুটি নাম। আমরা একথা বলতে পারি না যে তিনি কেবলমাত্র ইহা অথবা কেবলমাত্র উহা। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিটি ঘটনাই তাঁর জন্যে সম্ভব হচ্ছে। তিনি সর্বশক্তিমান্ এবং ভাষার অতীত। তিনিই সকল বিধির আধার এবং সকল শক্তির উৎস। পূর্ণ ঐশীশক্তি পরমপুরুষ ঈশ্বর ভক্তকে প্রেম, ভক্তি, প্রার্থনা, আত্মনিবেদন প্রভৃতি দান করেন, ভক্তকে 'অহং' বুদ্ধির পাশ থেকে মুক্ত করে জ্ঞানরাজ্যে নিয়ে আসেন এবং তাকে তাঁর সকল কার্যের যন্ত্রে পরিণত করেন। আবার সেই পরমা শক্তি যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে তিনি ভক্তকে নির্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞান প্রদান করেন এবং তার অহংকে বিশুদ্ধরূপে রাখেন এবং ইহার মাধ্যমে তাকে ভাগবতী মহিমা ও শান্তি উপভোগ করান। (পৃঃ—১৯১)

"এ কথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, ঐশীশক্তি অসীম, তা

* জনৈক প্রাক্তন ছাত্র কর্তৃক মূল ইংরাজী হইতে অনূদিত।

কখনও কোন সীমিত শক্তি বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারা নিঃশেষিত হয় না। সেই অসীম নিজেকে 'সগুণ ও নির্গুণ'—এই উভয় রূপেই প্রকাশ করেন। প্রথমরূপে তিনি ভক্তের নিকট প্রকাশমান এবং দ্বিতীয় রূপটি তাঁদেরই নিকট প্রকাশিত যাঁরা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

(পৃঃ—১৯১)

"শ্রীরামকৃষ্ণদেব বারবার একথা বলেছেন যে, যাঁরা বিজ্ঞানী তাঁদের ভাব ও অবস্থা জ্ঞানীদের অর্থাৎ যাঁরা নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপলব্ধি করতে সমর্থ, তাঁদের অবস্থার থেকেও অনেক উচ্চস্তরের।

"নরেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হন, তিনিও ছিলেন প্রথমে শঙ্করের অদ্বৈত-ভাবাপন্ন। তিনি রামকৃষ্ণদেবের কাছে প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন সর্বদা সমাধিতে মগ্ন থাকতে পারেন। উত্তরে তাঁর গুরু তাঁকে সস্নেহ তিরস্কারে বলেছিলেন, "তুই তো দেখছি ভারী নীচমনা। এর থেকেও যে অনেক উচ্চ অবস্থা আছে রে।" স্পষ্টতঃই তিনি এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য করেই একথা বলেছিলেন—যাঁরা নির্বিকল্প সমাধির স্তর অতিক্রম করেন এবং বিশ্বজগৎ পরমপুরুষেরই প্রকাশরূপে উপলব্ধি করেন।

(পৃঃ-১৯৫-৯৬)

"তিনি দেখিয়েছেন যে, ভগবান্ যিনি—উপরিউক্ত দুটি ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন—তিনি সবিশেষ ও নির্বিশেষ, সগুণ ও নির্গুণ, সব কিছু থেকেই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই দুটীরূপ ছাড়া ভগবানের স্বরূপ কি—একথা কেহই বলতে পারে না। এই চরম রহস্যের মর্মস্থলে কোন মরমীয়া সাধক বা মিষ্টিক্ প্রবেশ করতে পারেন নি।"

(পৃঃ ২৯২—৯৩)

এইভাবে এই গ্রন্থে আমি সংক্ষেপে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের দিক্ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও শিক্ষা বৈপ্লবিক। আমি এই দর্শনের কোন নাম দিই নি। তবে যদি কোন নাম প্রয়োজন হয় তবে আমার মতে তা হওয়া উচিত—'Neo-personalism' বা 'নব ঈশ্বরবাদ।'

এই গ্রন্থটি যথেষ্ট প্রচারিত এবং ভারতবর্ষের কয়েকটি পত্রিকায় এর সমালোচনাও হয়েছে। গ্রন্থটি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এইচ, এইচ, প্রাইস্ বলেছেন—"আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বইটি পাঠ করেছি। দুঃখের বিষয় এই যে, উইলিয়ম জেমস্ যখন "ভ্যারাইটিস্ অফ্ রিলিজিয়াস্ এক্সপিরিয়েন্স" গ্রন্থটি রচনা করেন তখন তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানিতেন না। আমার মতে, বইটি একাধারে চিত্তাকর্ষক ও জ্ঞানপ্রদ।" বইটির সমালোচনায় ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্টের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় লেখা হয়েছে: "আমরা আর কখনও এরূপ উচ্চস্তরের গ্রন্থের পরিচয় পাই নি।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও দর্শনশাস্ত্রের প্রধান ডক্টর সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জি আমার প্রাক্তন শিক্ষক ও সহকর্মী। তিনি সদ্য "এনটিসিপেশনস্ অফ্ নিউ বেদান্তইজম্ ইন্ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেছেন। সেটি 'বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা প্রবুদ্ধভারত পত্রিকায় গত মে মাসে প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন (উদ্ধৃতিগুলি মূল ইংরাজী হতে অনূদিত):

"......শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় ব্রহ্ম ও শক্তি বা কালী (মায়া) পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন দুটি পৃথক বস্তু নয়। এ দুটি আবার বস্তু ও গুণের দিক দিয়ে অবিচ্ছিন্নরূপেও সম্পর্কিত নয়। এ দুটি একই সত্যের দুটি দিক্, একই তত্ত্বের দুটি (two aspects of the same reality) অবস্থা এবং সেইজন্য অভেদ।"

(পৃঃ—২১৬)

"আরও বোঝা যায় যে, ঈশ্বর ব্রহ্মের একটি মায়াচ্ছন্ন অলীক (illusory) অথবা এক নীচস্তরের রূপ নন, যে ব্রহ্মকে, নির্গুণ ও নির্বিশেষ হয়েও মায়া বা অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন অবস্থায় সগুণ ও সবিশেষ ভাবে (পৃঃ—২১৭) প্রতিভাত হন বলিয়া কল্পনা করা হয়।

"শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে, জ্ঞানী বা দর্শনে অনুরাগী ব্যক্তিদের নিকট যা নামহীন ও রূপহীন ব্রহ্ম তাই যোগী বা ধ্যানীদের নিকট আত্মা এবং ভক্তের নিকট ভগবান্।

(পৃঃ—২১৭)

"এর থেকেই বোঝা যায় যে, আমরা অনুভূতির বিভিন্ন স্তরে প্রকৃত সত্যের রূপটিকে বিভিন্নভাবে [illegible]

এবং চরম অবস্থায় সমগ্র বস্তুজগৎ একটি সর্বব্যাপক চৈতন্যের মাঝে লীন হয়ে যায়।* (পৃঃ—২১৭)

"সুতরাং বিজ্ঞানী বা সম্পূর্ণ জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট পৃথিবী নাস্তিত্ব অস্তিত্বের এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হয়। এইরূপে অতি চমৎকারভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ যে আধ্যাত্মিক সত্যের ব্যাখ্যা করেছেন তা সকল যুক্তিতর্কের অতীত।"

(পৃঃ—২১৭)

"শঙ্করবাদীগণের মতে ব্রহ্ম সত্য, আর সবই মিথ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, ব্রহ্ম বিভিন্নরূপে ও ভাবে সকলের মধ্যেই বিরাজমান।"

(পৃঃ—২১৮)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, ডক্টর চ্যাটার্জী আমার লিখিত গ্রন্থের মূল তত্ত্বটি গ্রহণ করেছেন, যদিও তিনি এ সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সম্পূর্ণ আলোচনা করেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মতে ঈশ্বর যে এক পরম রহস্য ও পরম তত্ত্ব—একথা তিনি অবশ্য বুঝতে যত্নবান্ হন নি। যাই হোক, আমি একথা ভেবে আনন্দিত ও উৎসাহিত বোধ করছি যে, অন্তত একজন ভারতীয় পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার লিখিত তত্ত্বটি মোটামুটি সমর্থন করেছেন। তবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে ডক্টর চ্যাটার্জী তাঁর প্রবন্ধে রামকৃষ্ণসম্বন্ধীয় আমার গ্রন্থটির (১৯৫৮ সালে প্রকাশিত) কোন উল্লেখই করেন নি। যখন আমার বইটি প্রকাশিত হয় সেই সময় ডক্টর চ্যাটার্জী তাঁর নিজের জন্যে সেই গ্রন্থের একটি কপি চেয়েছিলেন এবং আমি নিজেই তাঁকে উহা উপহার দিয়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে তখন তিনি দর্শনশাস্ত্রের কয়েকজন শিক্ষকের সম্মুখে বইটি সম্বন্ধে বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করেন। শিক্ষকেরা এই ঘটনার সাক্ষী হিসাবে আজও বর্তমান। ডক্টর চ্যাটার্জী একজন পুরাপুরি শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদী এবং সেই কারণে বইটির সমালোচনা করা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। অথচ দেখতে পাচ্ছি, তিনি কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মত সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলেছেন। আমার লিখিত যে তত্ত্বটির তিনি পূর্বে বিরোধিতা করেছিলেন এখন সেটিই তিনি মেনে নিচ্ছেন। পাঠকগণই এখন বিচার করুন—কে বা কি তাঁর মধ্যে এই পরিবর্তন সাধন করেছে।

আমার গ্রন্থে আমি পরাতত্ত্ব সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের উপমাবলীর বিশদ বিশ্লেষণ করেছি। সেই সঙ্গে গিরগিটী ও বেল ও ষট্‌চক্রের উদাহরণের সাহায্যে ভগবানের সঙ্গে পৃথিবীর কি সম্পর্ক সেই প্রসঙ্গও আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা সংক্রান্ত যে সকল প্রামাণিক ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য আছে, সেগুলিরও সাহায্য নিয়েছি। (আমার গ্রন্থের পৃঃ—১৯৩, ১৯৬, ২০০ দ্রষ্টব্য) ডক্টর চ্যাটার্জী নিঃসন্দেহে আমার লিখিত এই সকল তথ্যের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোন্ উৎস থেকে তিনি এগুলি পেয়েছেন সে কথার কোন উল্লেখ করেন নি। অথচ মনে হয় যেন তাঁর প্রবন্ধটি লিখবার সময় আমার গ্রন্থটি ডক্টর চ্যাটার্জীর হাতেই ছিল।

ইহা পরিতাপের বিষয় যে, ডক্টর চ্যাটার্জী তাঁর সিদ্ধান্তে বলতে চেয়েছেন যে রামকৃষ্ণের শিক্ষার মধ্যে তিনি এক নূতন আবিষ্কার করেছেন এবং তিনি ইচ্ছা করেন, "অন্যান্য উপযুক্ত ও কৃতী গবেষকগণ তাঁর কার্য গ্রহণ করবেন ও তাঁর পথ অনুসরণ করে অগ্রসর হবেন।" এটা সত্যই হাস্যকর যে ডক্টর চ্যাটার্জী এ ক্ষেত্রে "এ মডার্ণ ইনকারনেশন্ অফ গড্" বা "এ কমেণ্টারী অন্ দি লাইফ্ এণ্ড টীচিং অফ্ শ্রীরামকৃষ্ণ" বইটির কোন উল্লেখ করেন নি। সম্ভবত: তিনি নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার ব্যাখ্যাকার হিসাবে পথিকৃৎরূপে বর্ণনা করতে চান। কিন্তু পাঠকগণের লক্ষ্য করা উচিত যে, আমার গ্রন্থটি ডক্টর চ্যাটার্জীর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পাঁচ বছর পূর্বেই প্রকাশিত হয় এবং তিনি সেই বই ও একখানি পেয়েছিলেন। এটি খুবই দুঃখের বিষয় যে, ডক্টর চ্যাটার্জীর প্রবন্ধটির প্রারম্ভে প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর ব্যাখ্যার ব্যাপারে বর্তমান যুগে কোন প্রচেষ্টাই হয়নি। আমি এ ক্ষেত্রে আরও একটি কথা বলতে চাই যে, ১৯৫৯ সালের মে মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারতে' আমার বইটির মূল ভাবটির বিরুদ্ধ সমালোচনামূলক মতবাদ প্রকাশিত হয়। যাই হোক প্রখ্যাত

---

* এই উক্তিটি ইহার পূর্ববর্তী উক্তির সহিত সঙ্গতি-বিহীন।

দার্শনিক উইলিয়ম জেমসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ধৃতি দিয়ে আমি উপসংহারে আসতে চাই। তিনি 'দি ক্লাসিক স্টেজেস্ অফ্ এ থিওরীস্ ক্যারিয়ার' এর সমালোচনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একটি মতবাদের কয়েকটী ধ্রুব-স্তরের কথা বলেছেন,—"আমরা জানি, প্রথমে একটি নূতন থিওরীকে অবাস্তব বলে আক্রমণ করা হয়, তারপর সেটিকে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়: অবশেষে এটিকে এত মূল্যবান্ বলে মনে হয় যে, বিরোধীরাই এটিকে নিজেদের আবিষ্কার বলে দাবী করেন।"

মনে হয়, "এ মডার্ণ ইন্কারনেশন্ অফ্ গড্" গ্রন্থে পরিবেশিত থিওরীটিও তৃতীয় স্তরে এসে পৌঁছেচে। আমার বিরোধীরা শুধু যে এ তত্ত্ব মেনে নিয়েছেন তা নয়, তাঁরা এখন এটিকে নিজেদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব বলে দাবী করছেন।

শরৎ স্মরণে

শ্রীসুধীরচন্দ্র বাগচী

ধন্য হে তুমি শরৎচন্দ্র গল্প কাহিনী তব
উপন্যাসের যত চরিত্র সৃষ্টি সে অভিনব।
মানব মনের গভীর বাসনা নিগূঢ় বেদনা ভরা,
স্রষ্টা হে তব সৃষ্টির মাঝে সকলি দিয়েছে ধরা।
কথা সাহিত্যে সৃষ্টি করেছ চরিত্র নব নব।
বেদনা-পুলক আবেগ উছল মানুষ অভিনব।
মানুষেরে তুমি এঁকেছ মানুষ স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে
চলেনি তাহারা নীতি আদর্শের কল্পিত
পথ দিয়ে।
বাস্তবতার রাজপথে চলি' হইয়াছে সুন্দর
সৃষ্টি করেছে শিল্পী হে তব দরদীয়া অন্তর।
জীবনের পথে চলিতেছে নারী চলিতেছে নর কত,
ঘটিতেছে নিতি কত না ঘটনা সংসারে অবিরত।
তুলিয়াছে তারা বেদনা হিয়াতে আনন্দ শিহরণ
শিল্পী হে তব উদার মনেতে অনুভূতি আলোড়ন।
সূক্ষ্ম গভীর অনুভূতি, আর ব্যথার পরশ মাখা
সহানুভূতির তুলির স্পর্শে দরদ ঢালিয়া আঁকা।
তোমার সৃষ্ট যত চরিত্র উছল মুকুতা সম
দিতেছে দীপ্তি তব সাহিত্যে সুন্দর অনুপম।
রহস্যে ভরা নর-নারী-হিয়া অতলস্পর্শী কত
ঘাত প্রতিঘাতে হৃদয় সাগরে ঝঞ্ঝা তুলিছে শত;
ভাল ও মন্দ রহে পাশাপাশি; কভু লাগে সংঘাত
শিল্পী হে তুমি সেই রহস্যে করেছ আলোক পাত।
আপনার মন আপনি জানে না দুর্জ্ঞেয় নারী মন
'গৃহদাহে' তব অচলা সে কথা করেছে উদ্‌ঘাটন।
নারী হৃদয়ের দ্বৈধ-স্রোতের বিরোধ, বিশ্লেষণ
অচলা জীবন ট্র্যাজেডি হেরিলে বিস্ময়ে ভরে মন।
'দেনাপাওনায়' ষোড়শীর মাঝে সুপ্ত অলকা জাগে
পশ্চাতে যারে ফেলে এসেছিল বিশ বৎসর আগে।
সমাজ যাদের ঠেলিয়া দিয়াছে পঙ্কিলতার মাঝে
সেথা সাবিত্রী প্রেমনিষ্ঠার হৃদয় লইয়া রাজে।
রাজলক্ষ্মীর পরিচয় শুধু পিয়ারী বাঈজী নয়
তাহারও হৃদয়ে শুচি-শুভ্রতা রুদ্ধ ধারায় বয়।
প্রেমনিষ্ঠা ত্যাগের শুচিতা রয়েছে ধর্ম ভয়,
মাতৃহৃদয় স্বীয় মহিমায় হয়েছে সমন্বয়।
নারী হৃদয়ের পাষাণ প্রাচীর চিরাগত সংস্কার
হৃদয় কামনা স্রোতে তুলিয়াছে সংঘাত বার বার।
সমাজ শাসন মিশিয়া গিয়াছে হৃদয় বৃত্তি মাঝে
রমার হৃদয় দ্বন্দ্বে সে কথা 'পল্লী সমাজে' রাজে।

প্রেম চলে তা'র আপনার পথে পরাণের দাবী মানি।
না করে হিসাব কি বলে সমাজ কি বলে ধরম বাণী।
প্রেমিক-প্রেমিকা পিছে পড়ে থাকে সমাজ শাসন তারে
তাই সংঘাত জীবনে তা'দের দেখা দেয় বারে বারে।
পাপ পুণ্যের মাপকাঠি যাহা সমাজ বিধান মতে
ক্ষমাহীন সে যে,—লভেনি জনম পরাণের দাবী হ'তে।
জীবনের এই অসঙ্গতির বেদনা করুণ ছবি
সজীব হইয়া ফুটেছে তোমার লেখনী প্রবল অভি'।
তাই যে পেয়েছে তব সাহিত্য বিশ্ব-আসরে স্থান
তাই রচিয়াছে হৃদয় আবার তোমারি লাগিয়া গান।
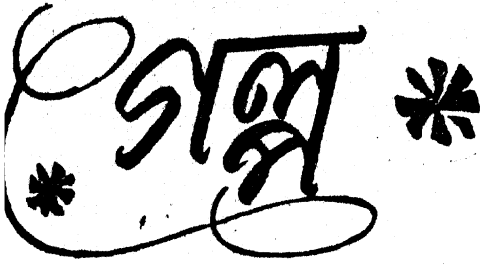
সুপাত্র

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অর্দ্ধভুক্ত স্বামী ওঠবার উপক্রম করতেই প্রভাবতী ছুটে এসে ব'ল্লেন, "আমার সব দেওয়া হ'লনা এখনই উঠছো যে? আহা! খাওয়ার কি ছিরি! ডালেতে ঝোলেতে—তাও' অর্দ্ধেক ফেলে উঠে পড়া হ'চ্ছে। তোমার মাথা-ফাতা কি খারাপ হ'য়ে গেল নাকি?"

পুনরায় আহারে মনঃসংযোগ করে বীরেশবাবু ব'ল্লেন, "এখনও হয়নি—তবে আরও কিছুদিন এমনিভাবে চ'ল্লে হয়ত হ'তে পারে।"

পাতে আরও কিছু ভাত দিয়ে প্রভা রাগতভাবে বল্লে, "তুমিই ত চেষ্টা করে মাথা খারাপের যোগাড় ক'রছ। মাস কয়েক পরে মেয়েটা পরীক্ষা দেবে আর তুমি তাকে কলেজ ছাড়িয়ে দিলে, কিন্তু কেন বল দেখি?

কর্ত্তা গম্ভীরভাবে হুঁ করে আহার করতে লাগলেন। দুধের বাটিটা থালার সামনে এগিয়ে দিয়ে গৃহিনী ব'ল্লেন, কি? হুঁ কি? ছাড়ালে কেন?

—"কলেজে গেলে প্রায় দুটো পড়ার চাপ এক সঙ্গে পড়ে বলে ছাড়িয়ে দিয়েছি।"

—"তার মানে?"

—"তার মানে তুমি বুঝতেই পারছ—ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে যাবার সময় তুমি কলেজে পড়ি কি প্রেমে পড়ি যখন ক'রছ, ঠিক সেই সময় তোমার বাবা আমায় পাত্র ঠিক করে সব দিক বজায় রাখলেন।"

ঝঙ্কার দিয়ে প্রভা ব'ল্লে, "ওঃ কি আমার সুপাত্তররে! আমার অকূলের কাণ্ডারি এসে দুকূল বজায় করলেন। বলে আমার সারা জীবনটা ধরে হাড় ভাজা ভাজা করে ছাড়লে। মেয়েটা কেঁদে কেঁদে আহার নিদ্রা বন্ধ করে দিয়েছে' এখন কোন কঠিন অসুখে না পড়ে তা'হলেই বাঁচি। উনি বাপ" অসমাপ্ত কথার মাঝে বীরেশবাবু ব্যস্ত হ'য়ে বল্লেন, "পূর্ব্ব যোগসূত্র টেনে আর দ্বন্দ্বে আহ্বানের দরকার নেই—ঐ যে বল্লে কেঁদে সারা, কঠিন রোগ হ'তে পারে এই জন্যই আমার ব্যস্ততা এত বেশী। অনু ছেলেটার কাছে কি প্রতিজ্ঞা করেছ জান? ঐ ছেলেটার সঙ্গে বিয়ে হয়ত বিয়ে সে করবে, নইলে সে আজীবন কুমারী থেকে যাবে।"

গৃহিনী বিস্ময়ের সুরে বল্লেন, "তুমি এত খবর জানলে কি ক'রে?"

—"খবর খুঁজে নিতে হয়নি ঘটনাক্রমে আপনি এসে ধরা দিয়েছে"।

"—কি রকম।"

—"ঐ যে গেল রবিবারে একটা ঘটক এসেছিল না? সব জেনে-শুনে গেল—সেই যোগসূত্র। পাছে বিয়ে না হয় সেই জন্য উমেশকে গিয়ে আবার ধরেছে—সেখানে প্রকাশ হ'য়ে প'ড়েছে—একশ' টাকা কণ্ট্রাক্টে সে এ বিয়ের ঘটকালি হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে মনে হয় অনুর আর সেই ছেলেটার একযোগে চেষ্টা আছে। পাত্রটি কে জান?—সুকান্ত বাঁড়ুজ্যে—ঐ রায়টের সময় আমরা যে বাড়ীটা ভাড়া করেছিলাম, ঠিক পাশের বাড়ীতে সেই যে কালো ছেলেটি—"

সোৎসাহে প্রভা দেবী বল্লেন, "বুঝেছি—বুঝেছি—আহা! ও যে আমাদের পাল্টা ঘরগো—আর কালো ছেলেটি বলছ কেন? বল শ্যামবর্ণ"।

কর্ত্তা বিরক্তভাবে বল্লেন, "আহা! হ'ল তোমার সেই ঘনশ্যাম, মদনমোহন ছেলেটি কিন্তু ছেলেটি, কি করে শোন—ফোর্থইয়ারে তার কলেজে নাম আছে বটে কিন্তু আজ প্রায় বছর দুই হ'ল সে কিম্ব আর্টিষ্ট হ'য়ে কাজ করছে—

অসমাপ্ত কথার মাঝে গৃহিনী বল্লেন, "আহা ওর বাপের অনেক টাকা আমি ত সবই জানি।"

কর্ত্তা বল্লেন, "ছেলেটার চরিত্র কেমন কিছু শুনেছ? যদি ছেলে ভাল না হয়—বাপের লক্ষ টাকা যেতে ক'দিন লাগে? আর ওরা ত ছয় ভাই। মেয়েটা মোহের ঘোরে বিপথে পড়ে কষ্ট পায় এটা কি তুমি চাও? কিছু করবার আগে ভাবতে হবে—এই সম্বন্ধটা নিয়ে আমি কত খোঁজ খবর নিয়েছি জান? মোট কথা অনুর একটি সুপাত্র চাই আর সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল। কারণ বিদুষী মেয়েরা রোমান্স করে মরতে চায়—সেটা আমি মোটেই চাই না।"

বিষাদক্লিষ্ট স্বরে প্রভাবতী ব'ল্লেন, "তুমি কি কিছু ঠিক ক'রেছ?"

বীরেশবাবু মুখ ধুতে ধুতে বল্লেন, "আমাকে আজ ১·২৫ মিনিটের ট্রেনে চুঁচড়ো যেতে হবে সুনীল বাঁড়ুয্যের কাছে।"

বিহ্বল দৃষ্টিতে প্রভা মুখের দিকে চাইতে বীরেশবাবু বল্লেন, "আহা! মনে নেই দাদার বন্ধু সাবজজ সুনীলকে? ওর ঐ এক ছেলে—নাম বিনয়, এবার এম, এ পরীক্ষায় ইকনমিক্সে ফার্ষ্টক্লাস সেকেণ্ড হ'য়েছে। এখন বিজ্‌নেস ক'রছে—একটা মাইকা-মাইন কিনেছে – মনে নেই সুনীল-দাকে? একেবারে কন্দর্পের মত চেহারা, তার ছেলে—সুপুরুষ হবে ব'লেই আশা করা যায়—শুনেছি ছেলেটি নাকি খুব চরিত্রবান"।

দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে প্রভা দেবী বল্লেন, "দুদিন থাকনা এর মধ্যে এমন তাড়াতাড়ি কেন? বরং এর মধ্যে ওদের একখানা চিঠি দিয়ে মনোভাবটা বুঝে নেবার চেষ্টা করনা। বীরেশবাবু বিরক্ত ভাবে বল্লেন, তোমাদের সব তাইতে খুঁত খুঁত একটু চাই—চিঠির মারফৎ কি হাতে-পায়ে ধরা যাবে? আমি নিজে যাব, দরকার হ'লে হাতে-পায়ে ধরব। অমন সুপাত্র, আমাদের টাকা কোথায়? তবে যদি ভগবান্ মুখ তুলে চান তবেই সব।"

দ্বিতীয়

মানুষ যখন ভবিষ্যতের কর্ম্মসূচি মনে মনে গড়ে' কাজ করবার চেষ্টা করে তখন সে অদৃষ্টশক্তির ওপর আস্থা না রেখেই আত্মনির্ভরশীল থাকে কিন্তু দৈববিড়ম্বনা এসে পড়লে নিজের শক্তিকে বড় দুর্ব্বল বলে মনে করে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও অনিমার ঠিক ছিল অনিমা তার মামার বাড়ীতে কয়েকদিন থেকে মনটাকে একটু হাল্কা করে বাড়ী ফিরে আসবে। মনের সঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে করে সে হাঁফিয়ে উঠেছে। চায় সে মুক্তি। প্রাচুর্য্যের মধ্যে থেকে মনের কোণে কিসের হাহাকার প্রকট হয়ে উঠেছে। বিশাল অট্টালিকায় সোনার-খাঁচার মধ্যে থেকে বাছা বাছা পাকা ফল খেয়ে হ'য়েছে তার অরুচি। তাই পরিবেশের পরিবর্ত্তনে চায় সে সাময়িক মুক্তি। মন নিয়ে মুক্তি পাবার কোন যুক্তি আছে কিনা সে দেখেনা। আসবার সময় বিনয়বাবু ব'লেছিলেন, অনু, বেশীদিন সেখানে থেকোনা। দুদিনের মধ্যেই ফিরে এস, বরং গাড়িখানা নিয়ে যাও আর শাস্তা, রামদীন সেখানেই থাকুক ঐ গাড়ি করেই দু'দিনের মধ্যে ফিরে আসতে পারবে।

অনিমা হাসতে হাসতে বলেছিল "দরদ আমার ওপর এত বেশী জানলে মনটা খুব খুশী হয় বটে কিন্তু তাতেও ত তুমি কৃপণ; আমি ভেবেছিলাম আমি গেলে তুমি বরং একটু নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে।

"কেন? এ কথা বলছ কেন?"

"তুমি বেশী কাজের লোক কিনা তাই।" বিনয়বাবু হেসে বলেছিলেন, "তোমার ঐ এক কথা"।

অকস্মাৎ ঐ রকম অপ্রত্যাশিতের দর্শনে মনের ভাবগুলো যে ভাবে জট পাকিয়ে যায় অনিমা তা' মুখে বলতে পারে না শুধু নিজের হৃদ্‌পিণ্ডের ঢিব্ ঢিব্ আওয়াজটা নিজের কানে স্পষ্ট করে শুনতে লাগলো। বর্ষীয়সী নারী খপ করে অনিমার হাত ধরে বল্লেন, "ওমা অনু যে! এই তোর মামার বাড়ী? আঃ কদ্দিন পরে দেখা, ভাল আছিস ত' মা? আয় আয় ওপরে চল, সুকু ওপরে আছে। তোকে দেখে কি খুশীই-না হবে সে।" প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রেখে মহিলাটি তাকে ওপর তলায় টেনে নিয়ে চ'ল্লেন।

অনিমার মামাত বোন নীলিমা বল্লে ও-মাসিমা! আমাদের সকলের যে টিকিট কাটা হয়ে গেছে। সিনেমায় যাবার সময় হ'য়ে গিয়েছে এখন ওকে ছেড়ে দিন বরং কাল ওকে নিয়ে বসে এক সুমুদ্দুর গল্প করবেন এখন। অনিকে চিনলেন কোত্থেকে? মাসীমা হেসে বল্লেন, "আহা ওরা আমাদের পাশের বাড়ীতে ছিল যে। ওর মায়ের সঙ্গে আমার কত আলাপ। [illegible]

আর অনু এক ক্লাসে না হ'লেও এক কলেজে প'ড়েছে দুজন।'

নীলিমার বোন আভা বিরক্তির স্বরে ব'ল্লে, "কি করবি অণি যাবি ? আর ত মোটেই সময় নেই।"

মাসীমা তার জবাব দিলেন, "এতদিন পরে দেখা, ও থাক না, সুকু বরং কাল তোমাদের সকলের সিনেমা দেখার ব্যবস্থা ক'রে দেবে।"

নীলিমা বল্লে, "আপনারা যখন কালও আছেন গল্পটা ত কালও হ'তে পারবে—কিন্তু আর সময় নেই।"

বিমূঢ়ের মত অণিমা বল্লে, "না কাল আর আমি এখানে থাকবো না।"

বিরক্তভাবে নীলিমা বল্লে, "এ আবার কি কথা ? ক'দিন থাকবি বলে এলি—ক'দিনের প্রোগ্রাম সব মাটি হ'য়ে গেল। কেন জামাইবাবুর অমতে এসেছিস্ না কি ?

অণিমা মৃদু স্বরে ব'ল্লে, "হ্যাঁ, এক রকম তাই।"

আভা হো হো করে হেসে বল্লে, "দুদিন বিয়ে না হতেই দুজনের চটাচটি আর—"

ধমক দিয়ে অণিমা বল্লে, "যা ফাজলামি করিসনি" তারপর ধীরে ধীরে মহিলার হাত ধরে উপরে উঠতে লাগল। পথে যেতে মহিলা বলতে লাগলেন "আহা! অনু তোর জন্যে সুকু আর বিয়েই ক'রল না, তোকে বিয়ে দেবার পর তোর বাবা আর মা কোথায় যে উঠে গেলেন জানতে পারলাম না। তারপর শুনেছি সব ছেলে রূপবান্, বিদ্বান্ খুব বড়লোকের ঘরে পড়েছিস্। বাড়ীর সবাই ত ভালবাসে তোকে ?

ছোট্ট কথায় উত্তর দিল অণিমা—"হ্যাঁ।"

বারান্দায় পা দিয়ে বর্ষীয়সী ডাকলেন, "ওরে ও সুকু—সুকু, কা'কে সঙ্গে করে এনেছি দেখ।"

সুকান্ত বোধহয় ওদের কথা আগেই শুনে থাকবে, বিষাদ গম্ভীর স্বরে বল্লে, "এই যে অণিমা দেবী—তারপর হঠাৎ এ পথে যে—"

সারা দেহের সমস্ত রক্তটা বুকের ওপর আছড়ে পড়ে অণিমাকে এমন অসাড় করে দিল যে কোন রকমে রেলিংটা ধরে সে নিজেকে প্রাণপণে সামলে নিল।

মাসীমা সোৎসাহে বল্লেন, "যা অনু ঘরে গিয়ে বস্ আগে যেমন করে দিতাম, ঠিক তেমনই করে আজ তোকে খাবার তৈরি ক'রে দি।"

সুকান্ত অনুনয়ের স্বরে ব'ল্লে, "ঘর চল অনু—বারান্দায় নয়। ভয় নেই, আমি মানুষ। তুমি যে আজ আমার নও—সে জ্ঞান আমার আছে।"

অণিমা কোন রকমে গিয়ে আচ্ছন্নের মত একটা চেয়ারে বসে পড়লো।

সুকান্ত জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন আছ অনু ?"

বিষাদের সুরে অণিমা বল্লে, "বেশ আছি সুকান্তদা।"

অস্ফুটকণ্ঠে সুকান্তের মুখ দিয়ে বেরুল "সুকান্তদা।"

অপরাধীর কণ্ঠে অণিমা ব'ল্লে, "মাসীমার ছেলে তুমি —কি বলবো ? সুকান্তবাবু ?—আপনি ? এসব বল্লে কি ভাল শোনাবে ?"

সুকান্ত বল্লে, "মুখে বেশ আছি বল্লে—বটে শরীর ত নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি, আমার বিশ্বাস মনেও বোধ হয় বেশ তুমি নেই।"

—"কেমন ক'রে বুঝলে ?"

—"বোঝবার জন্যে কষ্ট করতে হয়না, নিজের অন্তর দিয়ে তার পরখ করা যায়। তোমায় সত্য কথা ব'লতে কি অনু—তোমায় অন্য রকম দেখলে আমি সুখী হ'তে পারতাম না, তবে ভেব না যে তোমার অসুস্থতায় আমার সুখ—ও অনেকটা কি রকম জান—শীতল অনল।"

মিনতি স্বরে অণিমা বল্লে, "ওসব আমার কাছে বলো না সুকান্তদা—ওসব এখন আর আমার শুনতে নেই।"

সুকান্ত দৃপ্তস্বরে বল্লে, "ওসব শুনতে নেই—কেন বল ত ?—সমাজ-শাসন বড় হবে মানবিকতার চেয়ে ? —শাস্ত্রকারের অবোধ্য কচকচানি দাবিয়ে রাখতে পারে মনের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিকে ? একটা কথা আমি স্পষ্ট করে জানতে চাই—তুমি কি তবে এতদিন ধরে আমায় নিয়ে খেলিয়ে বেড়িয়েছ—যেমন ক'রে বিড়ালী তার শিকার নিয়ে খেলায় ?"

জল-ভরা চোখে শান্ত স্বরে অণিমা ব'ল্লে, "কোনদিনও খেলাইনি—একদিনের জন্যও নয়।"

রুষ্টস্বরে সুকান্ত বল্লে, "তবে ? তোমার বাবা যখন

আমার অপাত্র বলে বিয়ের প্রস্তাব ভেঙ্গে দিলেন—তখন ডুবে মরবার মত জলও কি গঙ্গায় ছিল না ?”

অণিমার চোখে অবিরল ধারায় অশ্রু দেখে সুকান্ত শান্ত স্বরে বল্লে, “আচ্ছা, বিনয়বাবু লোকটি নাকি শুনেছি রূপবান্, গুণবান্ ইত্যাদি অনেক কিছু—আচ্ছা তোমার চোখে ? মনের আঁকা ছবিই চোখের ওপর ভাসিয়ে তোলে সেই জন্যই এ কথা বলছি—এ কথাটা আজ অনুনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করছি—তোমার সদুত্তরে বিশ্বাস পেয়েছি ব'লেই। অণিমা ধীর কণ্ঠে উত্তর দিল, “একেবারে বিবেক সংস্কারমুক্ত মানুষের মন ঝোড়ো বাতাসে ঘুরে বেড়ায় না সুকান্তদা, আমি তাঁকে রূপবান গুণবানই দেখি, যাক্ আমি অসুস্থতা বোধ করছি আমি উঠি—”

অনুনয়ের স্বরে সুকান্ত বল্লে, “আমার প্রার্থনা—আর প্রার্থনা শুধু কেন মিনতি বলেই ধর—আর কয়েকটি কথার ঠিক উত্তর দাও—ও' রকম হেঁয়ালি করে ব'ল না। তোমায় তিনি ভালবাসেন বলে মনে কর ?”

“আমার জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে মনে হয় ভালবাসেন।”

কর্কশ কণ্ঠে সুকান্ত বল্লে, “আর তুমি ?”

—“অমন প্রাণঢালা ভালবাসা—অমন সদাশিব লোককে সকলেই বোধ হয় ভালবাসে।”

আর্দ্র স্বরে সুকান্ত বল্লে, “আমাদের যেমন অবসর সময় কাটতো তেমনি ক'রে ?” সুকান্তের কণ্ঠরুদ্ধ হ'য়ে গেল।

অণিমা আত্মগতভাবে বল্লে, “অবসর ? অবসর তাঁর কম বটে—আমি উঠি সুকান্তদা, তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমার ভালোর জন্যে ভাবলে তুমি তা' পারবে। অণিমা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। তারপর আচ্ছন্নের মত ধীর মন্থর পদে অণিমা নেমে গেল। মাসীমা ঘরে ঢুকে দেখলেন—চেয়ারে চোখ বুজে আচ্ছন্নের মত পড়ে সুকান্ত—অণিমা চ'লে গিয়েছে।'

তৃতীয়

এখন আর অণিমা চলা-ফেরাও করতে পারেনা। শেষ শয্যা আশ্রয় করে নিতে পেরেছে বলে একটা উৎকট আত্মপ্রসাদ তাকে নেশার মত পেয়ে বসেছে। আর সেই নেশার ঘোরেই সে যেন চ'লেছে ধীরে ধীরে মরণের তীরে। শ্বশুর-শাশুড়ীর একমাত্র পুত্রবধূ, তাঁদের যত্নের পরিসীমা নেই, স্থানে স্থানে তা' আতিশয্য রূপেই দেখা দেয়। অজস্র অর্থব্যয়, অক্লান্ত সেবা, অপরিসীম পরিচর্য্যা কিছু দিয়েও পুত্রবধূর স্বাস্থ্য আর মনের প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনা যায় না! নিদ্রাচ্ছন্ন স্বামীর ব্যথা-ক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কত কথাই না মনে পড়ে অণিমার—আজ তিন বৎসর বিয়ে হ'য়েছে—একান্তে বসে স্বামী তাকে একটু সোহাগ একটু খোস-গল্প কিছুই ত করেন নি। তার শেষ শয্যাগ্রহণের পর আজ একমাস সমানে স্বামী তার কাছ ছাড়া হ'তে চায় না। লোকটা যেন বদলে গিয়েছে। ডাক্তারের বার বার নিষেধ সত্বেও মায়ের কাতর মিনতি, কঠোর অনুরোধ, কঠিন আদেশ সত্বেও ভয়ে ভয়ে স্বামী তার কাছে থাকতে চায়। মাতৃভক্ত সন্তান তাই মায়ের আদেশ অমান্য করার অপরাধের ভয় নিজের প্রাণের মায়ার জন্য ত এতটুকু দেখিনা—আচ্ছা, একেও কি ব'লবনা ভালবাসা ? ' যার প্রভাব আজ আত্মভোলা মানুষটিকে, ঐ কাজে আত্মহারা কর্ম্মবীরকে স্থাণুর মত করে আটকে রেখেছে আমার কাছে ? প্রায় সারারাত ধরে আমার কাছে থাকে। একটু কাছে থাকবার জন্যে নার্শের কাছে কি কাকুতি! ভাবতাম কি অদ্ভুত প্রকৃতির এই লোকটি! স্ত্রীকে নিয়ে বসার আকাঙ্ক্ষা এঁর নেই অথচ সোহাগ ক'রতে জানেনা বল্লে মিথ্যা বলা হবে—তবে কি সবটা এর অভিনয়? রূপবান, অর্থবান, বিদ্বান তার এমন অনাসক্তভাব—সংশয়ে, সন্দেহে আমায় যেন পাগল করে তুলেছিল। গভীর রাত পর্য্যন্ত থাকে কোথায় ? ঘুমের ভাণ করে বিছানায় পড়ে থাকি একটু জাগিয়ে তোলে না—নিঃশব্দে চোরের মত শুয়ে রাতটা কাটিয়ে যায়। কতদিন উঠে ঘুরে দেখে এসেছি গভীর রাতে প্রদীপ্ত আলোর মাঝে একরাশ কাগজের মধ্যে বসে কি লিখছে কর্ম্মবীর। ইচ্ছে হত একদিন আগুন জ্বেলে দি ঐ কাগজপত্রে। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখেছি কোন কালিমা, কোন দোষ প্রকটিত দেখি না ঐ সন্ন্যাসীটির মুখের ওপর। [illegible] তবে এ কি ? সমস্ত সোহাগটুকু নিঙড়ে অণিমার [illegible] কোমল আঙুলগুলি চলতে লাগল নিদ্রিত স্বামীর [illegible] বিনয়বাবু—এঁ্যা—কি। বলে নিদ্রোত্থিত [illegible] অণিমা গলায় সোহাগ ঢেলে বল্লে, “[illegible] পেটে এখানে চুপ করে শুয়ে থাক ডাক্তার [illegible]

মনে নেই? হঠাৎ আচম্বিতে দেহের সমস্ত শক্তিদিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে দৃপ্তস্বরে অণিমা বল্লে, "ছিঃ ছিঃ—কি কর বলত? অমন করলে তোমার—

অসমাপ্ত কথার মাঝে অপরাধীর মত বিনয় বল্লে, "কি অপরাধ করেছি অনু? নিজের স্ত্রীকে আমার—এতটুকু দাবিও কি তার ওপর থাকতে পারে না?

অণিমা অত্যন্ত কুণ্ঠিত স্বরে বল্লে, "না না ভুল বুঝনা। আমার সমস্ত সত্তা তোমার স্পর্শে সার্থক হ'য়ে উঠে। সে কথা আমি বলিনি—তবে কেন তুমি নিজের ভাল বোঝ না? কত বড় মারাত্মক এইযক্ষা রোগ—তুমি কি জাননা? আর তুমি কিনা—একেবারে অণিমা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। অপ্রস্তুত হ'য়ে বিনয় বল্লে, "অনু, যে প্রেরণা আজ আমায় অনুপরমাণু নিয়ে আকৃষ্ট করে রেখেছে তোমার দিকে, সে যে মৃত্যুঞ্জয়—তোমার সঙ্গে চলে যেতে ভয় আমার নেই বরং, তারপরে বেঁচে থাকতেই ভয়। তুমি আমার দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করনা।" অণিমা হেসে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বল্লে, "আহা কে কাকে সরিয়ে রেখেছে গো? বরং তুমিই—আচ্ছা একটা কথা আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে—বলত তুমি আমায় অমন দূরে সরিয়ে রাখতে কেন?

স্মিত হাস্যে বিনয় বল্লে, "কাজ করার নেশা আপাত-দৃশ্যে একটা ব্যবধান হ'য়েছিল বটে, কিন্তু অন্তরের পরি-সীমার মধ্যে দূরত্ব তার এতটুকু ছিল না। কথাটা বিশ্বাস করবে কি না জানিনা অনু, ছোট বেলা থেকেই আমার শিক্ষা আর পরিবেশ আমায় এমন অদ্ভুত জীব গড়ে ছিল যে বোয়ের চেয়ে বইএর নেশায় আমায় মাতাল করে রেখেছিল। ভরা-যৌবনে যখন যুবকের দল প্রিয়ার সান্নিধ্য লাভের জন্য পাগল, আমি তখন হয়ত Smile's এর Character-এর মধ্যে খুঁজছি নীরস উপাদান। নিগমানন্দ স্বামীর ব্রহ্মচর্য্যসাধন আর অশ্বিনীকুমারের ভক্তিযোগ তখন আমার যোগ সাধনার অঙ্গ। তারপর আজ তিনবৎসর হল জীয়ন কাঠির স্পর্শে অবচেতন থেকে উঠে এল আমার সজীব মন-মুকুর-ফলকে—আমার অপরূপ রূপ দেখে আমি ত অবাক। কথার মাঝে সোৎসাহে বিনয়ের হাতখানা টেনে নিয়ে অনু বল্লে, "আচ্ছা, সত্যি করে বল আর অন্য কিছু ত না?" বুঝতেই ত পারছ আমি আর বাঁচবনা! তবে যবনিকা পড়বার ঠিক আগেই এ দৃশ্যপটটা চোখের সামনে ধরলে কেন? বিনয় অণিমার গায়ে হাত বুলুতে বুলুতে বিমূঢ় ভাবে বল্লে, "ঠিক বুঝলাম না অনু, বেশ খুলে বল।" ব্যস্ত হ'য়ে অণিমা বল্লে, "না না—আমি বলছিলাম, আমি যাবার পরই দুদিন না যেতে আবার ত বিয়ে করে বসবে—তবে আর এসব শুনে কি হবে?"

আর্দ্রস্বরে বিনয় বল্লে, "জানিনা অনু ঈশ্বরের কি ইচ্ছা। কি যে করব তা'ও বুঝতে পারিনা। ভবিষ্যতে আমার জন্যে কি জমা হ'চ্চে তা'ও জানিনা। তবে আমার বিশ্বাস সত্যিকার ভালবাসা কখন মরেনা। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়ে মানুষকে হয় চাপা দিয়ে রাখতে হয়, নয়ত অবস্থার-কঠিন নিষ্পেষণে কালের প্রবাহে মনের গহিনে গিয়ে আত্ম-গোপন করে বাস করে। তবে আমার মনে হয় আমাকে ঠিক ভালবাসতে পারনি অনু—নইলে অনুরোধ, উপরোধ গ্রাহ্য না করে স্বেচ্ছায় আত্মঘাতী হ'তে চেয়েছ কেন? আমার অপরাধ অনু কি আমাকে জানতে না দিয়ে অহেতুক শাস্তির কঠোরতা বাড়াতে চাও? ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে অনু হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে, ''উঃ আর পারিনা, ভালবাসা—মরেনা। স্ত্রী কি ভাবে স্বামীকে পেতে চায়, পুরুষ কি তা বোঝে না?" একটা উদ্ভত কাশির ধমক এলো অণিমা ব্যথায় চীৎকার করে ঢলে পড়লো বিনয়ের কোলে। তার মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো এক ঝলক তাজা রক্ত।

চতুর্থ

হরিদ্বার থেকে বেরিয়ে গেছে সোজা কন্খলের পথ। ষ্টেশন থেকে বেশী দূরে নয়, সেই পথের ওপর পড়ে সুন্দর একখানি নূতন দ্বিতল বাড়ী। দূরে হিমালয়ের বিরাট অভেদ্য প্রাচীর দিগন্তপ্রসারী নিপুণ চিত্রকরের নিখুঁত করে আঁকা ছবি। কিছুদূরে প্রবাহিত স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা নদী। এত স্বচ্ছ যে জলে ডুব দিলে জলতল থেকে তাকে স্পষ্ট দেখা যায়। ঘোলা জলের ঢাকা ঢাকা কিছু নেই, একেবারে অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত এক নিমিষে নজরে পড়ে। বিনয়বাবু একটা দনে ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একখানি কাগজ পড়ছেন। পরেশবাবু অনুযোগ করে বল্লেন, 'আর দুটো দিন থাক না ভাই বিনয়, তারপর মুসৌরি এখান থেকে বেশী দূরের পথ নয়, গেলেই হল।

আর কাকীমা দেখছি ভয়ানক মুসড়ে পড়েছেন, বিশেষ করে তোমার এই অসুখটা তাঁকে যেন পাগলের মত ক'রেছে।"

কাগজখানা এক ধারে সরিয়ে রেখে বিনয় বল্লে, "পরেশ, তুমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু—তোমায় বলতে কি—মা যে এতদিনে পাগল হ'য়ে যান নি, সেটা ভগবানের বিশেষ দয়া বলতে হবে। আমার এই দুরারোগ্য রোগ তার কারণ বটে, কিন্তু আমার মনে হয় অনু চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মা একেবারে ভেঙে পড়েছেন। তার ওপর আমার অসুখ সেটাও বটেই। অনু যে আমাদের প্রত্যেকের কাছে কি ছিল সেটা মুখে বলা যায় না।" পরেশ ব্যথিত কণ্ঠে বলে, "বৌদির অসুখটা diagnosed হতে কি দেরি হ'য়ে গেল।"

বিষাদক্লিষ্ট মুখে নিমীলিত চোখে বিনয় বল্লে "না ভাই, ডাক্তারেরা ঠিক সময় রোগ ধরতে পারলেও এবং তার উপযুক্ত চিকিৎসা হ'লেও অনুর স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ, আর আমার মনে হয় আমিই তার কারণ।" উৎকণ্ঠায় পরেশ জিজ্ঞাসা করলে "তার মানে।" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিনয় বিষণ্ণ স্বরে বল্লে, "সে যে চলে যাবে একথা ভাবতেই পারিনি আমি। কাজের মধ্যে ডুবে থাকতাম—কত অনুযোগ করেছে আমায় একটু অবসর নিতে। আমার সঙ্গসুখের তীব্র আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে তার মনে এনে দিয়েছিল দারুণ প্রাণঘাতী অভিমান। শুধু আমার নয়, বাড়ী শুদ্ধ সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে সে নিজের শরীরকে এত অবহেলা করতে সুরু করলে যে উৎকট মারাত্মক রোগ বাধিয়ে বসল। শেষে মরণপণে তার একগুঁয়েমি বজায় রাখল, অথচ সত্য কথা বলতে কি—কি মধুর স্বভাব ছিল তার! কি যে সেবাযত্ন কি আর বলব! আর আমার জন্য সকল সময় সতর্ক দৃষ্টি ছিল—তার তুলনা মেলে না—তার তুলনা মেলেনা পরেশ, আর আমিই কিনা"—বিনয়ের পাণ্ডুর মুখের ওপর পেশীগুলি আকস্মিক সঙ্কুচিত হ'য়ে তারকণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল—শুধু চোখের কোলে টল টলে জল তার আবেগের গভীরতার পরিচয় দিল।

বাড়ীর ফটকের সামনে গেরুয়া বেশধারী জনৈক যুবক পরেশবাবুর নাম ধরে ডাকতে ত্রস্তপদে পরেশবাবু তাঁকে নিয়ে এসে লনের একধারে একটা চেয়ার পেতে দিলেন। পরেশবাবু উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলেন, "আরে গেরুয়া-বসনধারী দেখে আমি প্রথমে চিনতেই পারিনি। শুনে ছিলাম, চিত্রজগতে আছ এখন দেখছি একেবারে ভোল পাল্টে স্বামিজি, না এ তোমার কোন নাটকের makeup মাত্র—সত্যই কিছু বুঝতে পারছি না সুকান্ত। বলি, পরিব্রাজকরূপে বেরিয়েছ না কোন উদ্দেশ্য নিয়ে? সুকান্ত হেসে বল্লে, "হ্যাঁ, পরিব্রাজক রূপেই ধরণা কেন, তবে আমাদের নিরাশ্রয় আশ্রমের প্রধান কার্যালয় এই কলকাতে আর এক শাখা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেছি মধুপুরে নিছক এটা বাঙালি প্রতিষ্ঠান। নাট্যজগতে ছিলাম বটে, কোন দিন আজ প্রায় এক বৎসর সন্ন্যাসী। মায়ের জন্য কিছু সংস্থান রেখে আমার বিষয়সম্পত্তি বেচে বাকি টাকাটা এই প্রতিষ্ঠানে দিয়েছি। তবে আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-পুরণের জন্য মধুপুরে একটা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করব। তুমি এখানে আজ আছ শুনে চ'লে এসেছি তোমার কাছে। পরেশ সাহাস্তে জিজ্ঞাসা করল "উদ্দেশ্য?" সুকান্ত সোৎসাহে বল্লে, "তুমি একজন ডিরেক্টর হবে তাই, মোট কথা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তোমায় জড়িত থাকতে হবে। এই প্রসপেক্টাসটা পড়ে দেখ অনেকখানি জানতে পারবে।" চায়ের কাপে মুখ দিয়ে সুকান্ত বল্লে, "আর তুমি যদি আজ"—

প্রসপেক্টাসটাকে সামনে ধরে পরেশ বলে, কি লেখা আছে "অণিমা বালিকা বিদ্যালয়"। ইজিচেয়ারটায় হেলান দিয়ে নিমীলিত চোখে বিনয়বাবু আগন্তুকের কথা শুনছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত নামটা শুনে চোখ দুটো তাঁর হঠাৎ জলন্ত ভাঁটার মত আগন্তুকের দিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। পর মুহূর্তে একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে চোখ আবার নিমীলিত হ'য়ে পড়ল।

পরেশবাবু বল্লেন, "বেশত, সুকান্ত এস আমি তোমায় আমার ফ্রেণ্ড বিনয় বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। বিনয় এখন অসুস্থ। সুস্থ থাকলে নিজের উৎসাহে তোমার এই বালিকা বিদ্যালয়ের একজন ডিরেক্টার হতে পারতেন, অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইনি জড়িত আছেন। বিনয়—ঘুমিয়েছ না কি?"

নিদ্রোত্থিতের মত হ্যাঁ বল্লে বিনয়বাবু, চোখ খুলতেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। গরম চায়ের কাপ হাত থেকে

সুকান্তের কোলে পড়ে গিয়ে সুকান্ত নিজেও যেমন অপ্রস্তুত হলেন, পরেশবাবুও নিতান্ত ব্যস্ত হয়ে ডাক দিলেন—"এই হরুয়া"

কম্পিত হাতে চায়ের কাপটা সরিয়ে রেখে সুকান্ত অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, "কাপটা কেমন করে স্লিপ করেছে।" তারপর বিনয়কে নমস্কার করলে বিনয় বিস্ফারিত চোখে সুকান্তের দিকে চেয়ে রইলেন।

পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন হল না। সুকান্ত ধীরকণ্ঠে বল্লে, আপনিই বিনয়বাবু? সন্ধান করে আপনার বাড়ীতে গিয়ে শুনেছিলাম, আপনিও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হ'য়ে দেওঘরে আছেন। সংবাদটা পেয়ে কি দারুণ মর্ম্মব্যথা পেয়েছি অন্তর্যামী জানেন। মাঝে মাঝে গিয়ে আপনার খবরটা নিয়ে আসতাম। তারপর এখন আছেন কেমন? এখানেই কি থাকবেন?" বিনয় মুখে হাসি টেনে ব'ল্লে, "আজই মুসৌরি যাব ঠিক ক'রেছি। ডাক্তারদের মতে অনেকখানি এগিয়ে আসতে পেরেছি—অর্থাৎ advanced stage, cavity form করেছে অনেকদিন।" তারপর বিস্ময়ের সুরে ব'ল্লে, "আমার খবর নিতে চুঁচড়ো পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন—কেন বলুন ত সুকান্তবাবু? আপনার আমার মধ্যে চাক্ষুষ পরিচয় কারও হয়নি, তবে কার মাধ্যমে আমার কথা শুনলেন? আর পরিচয়ের এমন কি যোগসূত্র যাতে আত্মীয়ের মত বা অন্তরঙ্গের মত মাঝে মাঝে আপনাকে আমার জন্য তাই চুঁচড়ো পর্য্যন্ত ছুটতে হ'য়েছে?"

একটা অস্ফুট কাতরশব্দ করে সুকান্ত চেয়ারখানা নিয়ে বিনয়ের সামনে বসে বল্লে, যার জন্য প্রথমে আপনার কাছে ছুটেছিলাম তা' যখন আমায় বলতে হবে তখন পরিচয়ের মধ্যেও কোন আবিলতা রাখবো না। আপনার বিবাহ আমাদের উভয়ের পরিচয়ের যোগসূত্র। চমকে উঠবেন না বিনয়বাবু, আজ যদি অণিমাদেবী বেঁচে থাকতেন হয়ত আপনার আমার পরিচয়ের আদান-প্রদানের আজ কোন প্রয়োজনই হ'ত না। যদি কখনও দৈববশে প্রয়োজনীয়তা আসতো, এই হতভাগাকে দিয়ে আপনাদের উপকারই হত বলে মনে হয়। যাক্ সব ভগবানের হাত।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিনয়বাবু বল্লে, "ঠিক বলেছেন সুকান্তবাবু সবই ভগবানের হাত,নইলে অন্য এই সুপাত্রের হাতে না প'ড়লে হয়ত বেঁচে থাকতে চাইত, হয়ত বা বেঁচে থাকতে পারত।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সুকান্ত বল্লে, "ওকি! আপনি ও কথা বলছেন কেন?"

—"আমার শ্বশুরমশায় বার বার ব'লেছিলেন, সুপাত্রের হাতে দিতে পেরেছি—তাই বলছি ও কথা।"

সুকান্ত আত্মগতভাবে বল্লে—"সুপাত্র নয়? সুপাত্র নয় কিসে?" তারপর বল্লে, "আচ্ছা বিনয়বাবুর নাম আপনারা শুনেছিলেন, পরিচয়ও আপনি নিশ্চয় পেয়েছিলেন—কিন্তু কত দিন হল!"

বিনয় বল্লে, "আপনি সুধাংশু দত্তকে চেনেন? আমার বন্ধু সে—শুনেছিলাম আপনার সঙ্গেও তার অন্তরঙ্গতা আছে।"

—"হ্যাঁ আমরা এক ক্লাসে পড়েছিলাম"।

বিনয় বিষাদ গম্ভীর স্বরে বল্লে, "আমার বিয়ের দু'মাস পরে সেই আমায় বলেছিল, আপনারা উভয়ে বিবাহ-সূত্রে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন।"

একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে সুকান্ত বল্লে, "তবে শুনুন বিনয়বাবু, আমার অকপট সত্য কথায় আপনি বিশ্বাস করবেন—পৃথিবীর মাটি যদি পায়ের তলা থেকে সরে যায়—শূন্য আঁকড়ে ধরে—কেউ থাকতে চায় না। আপনার বিবাহের পরে অণিমা দেবীর মৃত্যুর পাঁচ মাস আগে একবার পাঁচদশ মিনিটের জন্য অণিমা দেবীর সঙ্গে আমার দেখা হয় তাঁরই মামার বাড়ীতে, আমার মায়ের সঙ্গে সেখানে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তাঁর কথায় বুঝেছি আপনি তাঁর কাছে সাক্ষাৎ দেবতা, তাঁর আর অন্য দেবতা নেই—এক কথায় বলতে গেলে তিনি অনন্যসাধারণ—তিনি দেবী"—উদ্গত চোখের জল রোধ করতে না পারায় দুফোঁটা চোখের জল মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। বাষ্পাকুলচোখে সুকান্ত বল্লে, "আপনাদের বিবাহের পরে ঐ আমার প্রথম দেখা—আর ঐ শেষ। তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে একখানা চিঠি আমায় দিয়েছেন সেইজন্য আমার বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা—আর ঐ জন্যেই চিঠিখানা নিয়ে চুঁচড়োতে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়েছিলাম। চিঠিখানা আমার সুটকেশে আছে দেখাচ্ছি।"

'চিঠিখানা নিয়ে এসে বিনয়ের হাতে দিতে বিনয় বল্লে, পরেশ তুমিই চিঠিখানা পড়ে শোনাও।"

পরেশবাবু এতক্ষণ স্থাণুর মত নিশ্চল হ'য়ে দুজনের কথা শুনছিলেন—চমকভাঙ্গা হ'য়ে বল্লেন, "আমি পড়বো ?"

—হ্যাঁ পড়না, তুমি ত সব কথাই শুনলে, আর তা'ছাড়া তুমি ত আমার "অন্তরঙ্গ বন্ধু" ।—

শ্রীচরণেষু,

বিয়ের পর আকস্মিকভাবে তোমার সঙ্গে ঐ প্রথম দেখা—মুহূর্ত্তের জন্য। ঐটেই যেন শেষ দেখা হয়, কারণ পৃথিবীর বুকে বাস করবার কামনা আমার মোটেই ছিল না—কেবলই মনে হত এমন কোন স্থান আছে—যেখানে পাথরের মত পড়ে থাকা যায় একেবারে অনুভূতিহীন নিশ্চল হয়ে, যেখানে সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাত স্পর্শ করতে পারে না। অনেক জিনিসই ত আমরা ভেবে থাকি—কিন্তু ঘটে কি ভাবার মত ? সেটা কি মানুষের হাতের মধ্যে ? তবে এ দোষ দেবে কাকে ? আমি ত দেখছি অবস্থার দাসত্ব করতে মানুষ বাধ্য—তা'তে কেউ বাদ যায় না। গঙ্গায় জল ছিল বটে, তবে যাবার মত অনুকূল অবস্থা ঘটেনি। বোধ হয় অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পারলে এ পৃথিবীতে তার স্থান হয় না ! অবস্থার ফের যদি না হবে—বাবা সুপাত্র বলে যাঁর হাতে আমায় দিলেন, বিদায় চাই বলে সেখানেও ব্যগ্রতা এল কেন ? আর যাব যখন একেবারে ঠিক হয়ে গেল, তখন আবার মানুষটা বদলে গেল কেন ? এই কেনর কি সঠিক উত্তর কিছু আছে বলতে পার ? যদিও বা মন-রাখা একটা উত্তর পাওয়া যায়—কিন্তু উপায় কি কিছু আছে বলতে পার ? তুমি কি অন্তর দিয়ে চাও আমার অমঙ্গল ? আমাকে দেখতে চাও কি—স্বামীর চোখের সামনে দ্বিচারিণী হ'য়ে ঘোরাফেরা ক'রতে ? মুহূর্ত্তের দেখায় বলেছিলাম—তুমি যখন আমায় ভালবাস আমার মঙ্গলের জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে, একদিন তাঁর মুখে শুনেছিলাম ভালবাসা কখন মরে না—মনের অবচেতন অবস্থায় আত্মগোপন করে থাকে মাত্র। সত্যকে উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ ও ভয় হ'য়েছিল। তবে আমার কথা ইনি সব শুনেছেন নাকি ? সঠিক উত্তর পাবার জন্য প্রশ্ন করেও ঠিক উত্তর পাইনি। যাক্ আমার এই শেষ পত্র তোমার কাছে। পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে আর বেশীদিন নেই, তাই তোমায় একটা বাসনার কথা জানাচ্ছি। বাবা কলেজ ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ে করার পর ভেবেছিলাম আমার আর লেখাপড়া হ'ল না, মেয়ে হ'লে তাকে শেখাব। তোমায় বলে যাই—একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে তুমি সেখানে তাদের শিক্ষার ভার নেবে। তোমার শান্তির জন্য কায়মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি। মানুষের ঐকান্তিক প্রার্থনা যদি তাঁর কাছে পৌছায়, তিনিই তার ব্যবস্থা করবেন। বড় কঠোর অভিজ্ঞতা নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি, বড় সংশয়ে আচ্ছন্ন মন নিয়ে যেতে হল—আমি যাবার পর একটু লক্ষ্য রেখে দেখ—তিনি আবার কাজের মধ্যে ডুবে যান—না—অন্য কিছু—আমায় জানাতে ত পারবেনা জানি—তবু দেখ কি পাগলামি। আচ্ছা, পুরুষ কি বোঝেনা নারী কি চায় ? ভালবাসার ঠিক রূপটা কি বুঝলাম না। ওঃ, বুকটায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে—আর লিখতে পারলাম না। ডাক্তারে শেষ জবাব দিয়েছে কঠিন যক্ষ্মা রোগ এখন তাদের হাতের বাইরে।

তোমার চরণে প্রণাম জানাচ্ছি

হিতাকাঙ্ক্ষিণী অণিমা।

চিঠিখানা পড়া শেষ হ'তেই সুকান্ত অস্থিরভাবে বল্লে, "পরেশ, শিগ্‌গির এস, বিনয়বাবু অজ্ঞান হ'য়ে চেয়ার থেকে পড়ে গেছেন। জল—জল—শিগ্‌গির জল নিয়ে এস।"

পাইওনিয়ার বিনয় সরকার

শ্রীদিলীপ মালাকার

পাইওনিয়রের বাংলা অগ্রদূত। ইউরোপের এক এক দেশে এক এক ভাষা। সব ইউরোপীয় ভাষায় পাইওনিয়র কথাটি চালু। পাইওনিয়র কথাটি আমাদের দেশেও বেশ চালু। তাই অগ্রদূত শব্দটি ব্যবহার না করে পাইওনিয়র কথাটি ব্যবহার করলাম। যিনি সবার আগে চলেন বা ভাবেন তিনিই পাইওনিয়র। স্বর্গীয় অধ্যাপক বিনয় সরকারের ক্ষেত্রে এই শব্দটি পুরোপুরি খাটে। বাঙ্গালী বা বাংলা দেশের দিগ্বিজয় নিশান ওড়াতে যে সব মনীষী অগ্রণী, বিনয় সরকার তাঁদের অন্যতম। আগামী কালের ঐতিহাসিকেরা তার চুলচেরা গবেষণা করবেন।

আজ ভারতের সমগ্র উত্তর-প্রান্তর চীনা আক্রমণে জর্জরিত। চীনারা বছর পাঁচেক ধরে একটু করে তিব্বত, তারপরে ভারতের উত্তরাঞ্চল তার হিংস্র থাবায় ক্ষতবিক্ষত করেছে; ভারতের হাজার হাজার মাইল আজ চীনের কবলে। সাম্রাজ্যবাদী চীনকে বুঝতে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের সময় লাগল পাঁচটি বছর। বাংলা প্রবাদে বলে, কেউ দেখে শেখে, আর কেউ ঠেকে শেখে। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের ঠেকে শিখতে হল। সাধারণতঃ রাজনীতি-বিদেরা দেখে শেখে। আমাদের দেশে সবই বিচিত্র। চীনের রাজনৈতিক মনোভাব বুঝতে আমাদের নেতাদের লাগল দশ বছর। যাই হোক, বিনয় সরকার আমাদের বলতেন যে, রাজ-নীতিতে শত্রু মিত্র বলে কিছু নেই। আজ যে মিত্র কাল সে শত্রু, আর আজ যে শত্রু কাল সে মিত্র সবই দেশের স্বার্থে।

বিনয় সরকার বলতেন যে, দেশের স্বার্থে বিদেশী বা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোকে চিনে রাখা ভাল। শুধু চিনে রাখা নয় প্রতিটি দেশ সম্বন্ধে চাই বিশেষজ্ঞ। ইউরোপ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ভারতে এখন নগণ্য নয়। কিন্তু এশিয়ায় আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সত্যই নগণ্য। তার জলন্ত দৃষ্টান্ত চীন। প্রাচীন চীনের সভ্যতা সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ আছেন কয়েকজন, কিন্তু একালের চীন সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল নগণ্য। শুধু চীন নয়, এশিয়ার প্রতিটি রাষ্ট্র সম্পর্কে বিনয় সরকার চেয়েছিলেন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ। তাই তিনি ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গীয় এশিয়া-পরিষদ। এশিয়া পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ার প্রতিটি রাষ্ট্র সম্পর্কে পঠন-পাঠন ও গবেষণা চালান। সর্বশেষে বিশেষজ্ঞ তৈরী করা। বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষদ, বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের ন্যায় বঙ্গীয় আন্তর্জাতিক পরিষদের কায়েম করেন তিনি ১৯৩২ সালে। উদ্দেশ্যটা বিনয় সরকারের নিজের কথায় বলা যায় "ভারতের জন্য ও আমি চাই ইউরোমেরিকা বিষয়ক গবেষণার কেন্দ্র, গবেষক, পর্যটক ও লেখক। ভারতবাসীরা ইউরোমেরিকান নৃতত্ত্ব, সমাজ-ব্যবস্থা, ভাতকাপড়, ঘর-কন্না, ধর্মকর্ম, রীতিনীতি,ধরণ-ধারণ, সৌজন্য-শিষ্টাচার, আইন-কানুন, আন্তর্জাতিক লেনদেন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ গড়ে তুলবার জন্য সচেষ্ট হোক। রামমোহন রায়ের আমল হ'তে আজ পর্যন্ত বাংলা দেশের অথবা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এই ধরণের ইউরোমেরিকান সভ্যতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অথবা গবেষণাপরিষদ গড়ে তুলবার উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করা হয়নি! সেই চেষ্টায় আজ যুবক ভারত অগ্রসর হোক। চাই ভারতে বিদেশ-দক্ষ লোকজন।" ঠিক এমনি ভাবিত হয়ে তিনি বঙ্গীয় এশিয় পরিষদ কায়েম করেন ১৯৩৮ সালে। সেকালে ভারতে অমন কোন পরিষদ ছিল না। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, একাধারে চীন-জাপান ও অন্যধারে আরব রাষ্ট্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া।

এক প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রদার্শনিক বলেছিলেন যে, শত্রুকে আঘাত করার পূর্বে জানা উচিত শত্রু সম্বন্ধে বিশেষ করে তার হালচাল। চীনের সাথে আমাদের লড়াই এখনও আছে; সুতরাং চীনকে আমাদের ভাল করে জানা উচিত। জানা উচিত তার সত্য পরিচয়। রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা নয়। কারণ কোনো দেশকে

ছোট বা বড় করে না দেখে তাকে বিচার করা উচিত সত্যরূপে। তাতে আমাদেরই লাভ হবে।

চীন সম্বন্ধে ভারতে আলোচনা বা গবেষণা ভারতে খুব বেশী দিনের নয়। যে সব ভারতবাসী একালের চীন সম্বন্ধে পর্যালোচনা করেছেন তাঁদের সংখ্যা কম। বিনয় সরকার প্রায় বছর তিনেক চীনে কাটান। সেই সময়ে চীন সম্বন্ধে তাঁর লেখাগুলো উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে অন্যতম হল ইংরাজীতে "চাইনিজ রিলেজান থ্রু হিন্দু আইজ" শাংহাই, ১৯১৬; "চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ" কলিকাতা ১৯২২; "বর্তমান যুগের চীন সাম্রাজ্য" কলিকাতা ১৯১৮। এর আগে ও পরে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন একালের চীন সম্বন্ধে ভারতীয়দের ওয়াকিবহাল করে তোলার জন্য। চীন সম্বন্ধে যারা বিশেষজ্ঞ হতে চান তাঁদের বলেছেন তিনি, অনেক কিছুর প্রচারক বা প্রবর্ত্তক এই অধম। তবে একমাত্র চীন নিয়ে কারবার করা আমার পেশা নয়! চীন-বিশেষজ্ঞ চাই। চীনা ভাষায় আর সংস্কৃতিতে ওস্তাদ হওয়া চাই। খোদ চীনা বই থেকে তর্জমা করবার ক্ষমতা থাকা চাই। চীন সম্বন্ধে আমার বই লেখা যে ১৯১৫-১৬ সালে। ইউয়ানথ কাইয়ের বিরুদ্ধে সান-ইয়াৎ সেনের দল বিদ্রোহী। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের দ্বিতীয় বৎসর চলছিল। তার আগে বেরিয়েছিল রামলাল সরকার প্রণীত "চীন-বৃত্তান্ত"। তাঁর রচনায় পাওয়া যায় মাংচু বিরোধী সান-প্রবর্ত্তিত বিপ্লব ও লড়াইয়ের কথা (১৯১১-১২)। তার আগেও লেখা হয়েছিন "চীন-ভ্রমণ।" ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক ছিলেন গ্রন্থকার। তাঁর রচনায় আছে ১৯০০-০১ সালের বিদেশী বিরোধী যুবক চীনের বিদ্রোহ বৃত্তান্ত। আমি চীনে ছিলাম ১৯১৫-১৬ সালে। রবীন্দ্রনাথের অভিযান ঘটেছিল বোধ হয় ১৯২২-২৩ সালে (বিনয় সরকারের বৈঠকে দ্বিতীয় ভাগ পৃঃ ৩২২-৩২৪)

প্রথম মহাযুদ্ধকালে চীন গৃহযুদ্ধে চীনের অন্যতম নেতা সান-ইয়াৎ-সেন কিছুকাল জাপানের তোকিও শহরে নির্বাসন যাপন করেন। সেই সময়ে বিনয় সরকারের সাথে সান-ইয়াৎ-সেনের হৃদ্যতা জন্মে। তাই বিনয় সরকার আমাদের বলতেন যে, তিনি সান-ইয়াৎ-সেনের সাথে এক মাদুরে শুয়েছেন। অর্থাৎ দুই বিপ্লবী একই উদ্দেশ্যে মিলিত হতেন। একালের চীনকে জানা ও জানান ছিল তাঁর ব্রত। বিনয় সরকারের চিন্তাধারা একালের চীনকে জানতে হলেও প্রযোজ্য।

পাইওনিয়র বিনয় সরকার অনেক বিষয়েই পাইওনিয়র। ধনবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও ইতিহাস ছেড়ে দিলেও আমরা সাংবাদিকেরা বিনয় সরকারকে পাইওনিয়র বলতে পারি। বাংলা দেশে নয়, ভারতের সংবাদপত্র ইতিহাসে ভারতীয় সংবাদপত্রের বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসেবে বিনয় সরকার অগ্রদূত। সে সংবাদ অনেকেই রাখেন না। বিনয় সরকারের নিজের ভাষায় বলতে হয়, "তখন সাইট-সারল্যাণ্ডে ছিলাম। লুগানো শহরে বা পল্লীতে। হঠাৎ (নেতাজী) সুভাষ বসুর টেলীগ্রাম পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের "ফরোয়ার্ড" দৈনিক তখন সবে বেরিয়েছে বা বেরোয় বেরোয় হয়েছে। ১৯২৩ সাল। "ফরোয়ার্ড" এর জন্য এই অধমকে "বিদেশী সংবাদ-দাতা" বহাল করা হয়েছিল। আমার ওপর ভার ছিল—ফরাসী, ইতালিয়ান আর জার্মাণ ভাষায় প্রচারিত বিশ্ব-সংবাদ টেলিগ্রামে "ফরোয়ার্ড"কে পাঠাবার। চিঠিতে লেখা ছিল-"রয়টারকে হারাতে হবে।"—এই কথাটায় খুব খুশী হয়েছিলাম। বুঝলাম-বাঙ্গালীর বাচ্চারা এতদিনে সজ্ঞানে বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহারে ঝুঁকেছে। কম সে-কম্ সংবাদপত্র-সেবায় বাংলায় যুগান্তর এসেছে বা আসছে। তারপর থেকে ফী সপ্তাহে সপ্তাহে একটা করে চিঠি ছেড়েছে যতদিন বিদেশে ছিলাম। ১৯২৩ সালের নভেম্বর ডিসেম্বর হতে ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাইশ-তেইশ মাস এই অধমের চিঠি নিয়মিত বেরিয়েছে ফরোয়ার্ডে। সেই সব কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি শহরের নানা কাগজে উদ্ধৃত হতো। সুতরাং বলতে বাধ্য যে, প্রায় বছর দুয়েক আমি পারিভাষিক হিসেবেও সাংবাদিকের বড়দা। "ফরোয়ার্ড" ই বোধ হয় বাঙ্গালীদিগের ভেতর বাঙ্গালীর বাচ্চাকে সর্ব্বপ্রথম "বিদেশী-সংবাদদাতা" বহাল করেছে। এই অধমই বোধ হয় বাঙ্গালী সাংবাদিকদের ভেতর কাল হিসেবে সর্বপ্রথম বিদেশী সংবাদদাতা (বিনয় সরকারের বৈঠকে, দ্বিতীয় ভাগ, (পৃঃ ২৩০—২৩৫, ১৯৪৫)।

গত দু-বছর উদ্‌যাপিত হয়েছে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী।

শুধু বাংলা দেশ নয় জগৎ জুড়ে চলেছে রবীন্দ্রোৎসব। হয়েছে বাংলা দেশের প্রতিটি জনপদে রবীন্দ্র বন্দনা। এ-কালের ভারতবাসী রবীন্দ্রনাথের নামোচ্চারণে মাথা নত করেন। কিন্তু এমন সবদিন গেছে—যখন রবীন্দ্রনাথকে পদে পদে অপমানিত হতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন সে কথা তাঁর বিভিন্ন লেখায়। এত বড় একজন শক্তিধর সাহিত্যিকের স্বীকৃতি নোবেল পুরস্কারে না পেলে বোধ হয় আমাদের হিংসুটে সমাজের দাপটে ধামা চাপা পড়ে যেত। আজকাল ভারতের ছোটখাট সাহিত্যিকদের নিয়েও সমালোচনামূলক বই বেরুচ্ছে। কিন্তু যখন রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবেন বলে স্থির হয়েছে, ঠিক সেই সময়ে কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে কোনো বই বেরোয়নি। রবীন্দ্রনাথের ওপর সমালোচনামূলক বই সর্ব-প্রথম লেখেন বিনয় সরকার। তার আগে পুস্তকাকারে ইংরাজী বা বাংলায় কোনো বই বেরোয়নি। একটি মাত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে একালের রবীন্দ্র-সাহিত্যের গবেষকরা ভাল বলতে পারবেন। এই বিষয়ে বিনয় সরকার পাইওনিয়র। বিনয় সরকারের নিজের ভাষায় বলতে হয়, "১৯০২-০৩ সালে ডন সোসাইটিতে সতীশ মুখোপাধ্যায়ের চেলা হবার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্র-রসে মাতোয়ারা হতে থাকি। যুবক বাংলা রবির মুখে "স্বদেশী সমাজ" (১৯০৪) শুনে নয়া দুনিয়ার সন্ধান পেয়েছিল। গৌরবময় বঙ্গ বিপ্লবের অন্যতম সূত্রপাত এই বক্তৃতায়। ১৯০৫ সালে খোদ রবিবাবুর কাছে আমরা ডন সোসাইটির ঘরে (একালের বিদ্যাসাগর কলেজের সামনের দোতলায়) তাঁর নিজের তৈরী গান শিখেছিলাম। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে" এই গানটা মনে পড়ছে। আর একটা মনে পড়ছে। সে হচ্ছে—"তোর আপন জনে ছাড়বে, তা বলে ভাবনা করা চলবে না।"··· সেকালের কথা আগে বলি। বঙ্গ বিপ্লবের যুগের রবি সম্বন্ধে কোন 'বই' ছিল না। ১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশ বৎসর। সেই উপলক্ষে আমরা রবীন্দ্র-পূজার ব্যবস্থা করি। মহাসমারোহে সেই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় টাউন হলে, সাহিত্য-পরিষদে। এই হৈ-হৈ রৈ-রৈ'র দিনেও রবি সম্বন্ধে কোন 'বই' দেখিনি। রবীন্দ্র-শিষ্য, অজিত চক্রবর্তী একটা বড় গোছের প্রশস্তি প্রবন্ধ লিখে-ছিলেন। সর্বপ্রথম প্রকাশিত বই, কোনটা বলতে পারবে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা, সন তারিখের কারবার যারা করে। এই অধমের "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী" বেরোয় প্রবন্ধাকারে। 'গৃহস্থ' পত্রিকার সেই সংখ্যাটার নাম ছিল রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয় সংখ্যা। বই বেরোয় ১৯১৪ সালের প্রথম দিকে। (বিনয় সরকারের বৈঠকে, প্রথম ভাগ পৃঃ ২৩০-৩১ ; ৬০৫-৬০৭)।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিনয় সরকার ১৯১৩ সালে "রবীন্দ্র সাহিত্যে ভারতের বাণী" বইটা লিখে ফেলেন। সেটি ওই বছরে 'গৃহস্থ' পত্রিকায় ছাপা হয় এবং ১৯১৪ সালের গোড়ায় বইএর আকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে ওইটিই সর্বপ্রথম বই। এই বিষয়েও বিনয় সরকার পাইওনিয়র।

নীল লোহিতের সেবাইত

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নীল লোহিতের সেবা করি আমি—
তিনিই সর্ব্ব দেবময়,
তাঁর খাই পরি' গৌরব করি,
তিনিই আমার পরিচয়।
কেহ বলে মোরে কিছু নাই তাঁর,
তিনি নিজে শুধ্ পাথরের,
আমি যে চকোর সুধা পাই তাঁর—
পায় না কি তারা কিছু টের?
অজয় আমার ভবনে অতিথি,
সপ্ত সাগর উথলে,
ভুবন আমার ভবনে অতিথি,
জানি কি যে ঘটে ভূতলে।
সকল তরুকে কল্পতরু যে—
করিতে পাবেন তিনি গো।
লয়ে কুবেরের মুক্তা মাণিক
আমি খেলি ছিনিমিনি গো।
এই গ্রাম আর এ ঠাকুর ছেড়ে
কোনোখানে আমি যাবো না,
আমি থাকি বটে পর্ণ কুটীরে,
ত্রিভুবনে ঘোরে ভাবনা।
স্নান করি আমি ক্ষীরোদ সাগরে,
মন্দাকিনীতে সাঁতারি,
সরযূতে যাই, গণ্ডকী নীরে,
শালগ্রাম আমি হাতাড়ি।

অমরনাথের তুষারেতে কাঁপি,
ছুটে যাই জ্বালামুখীতে
আমার মতন দুখী নাই বটে—
আমা চেয়ে বেশী সুখী কে?
অবিরাম ঘুরি তীর্থে তীর্থে—
থামি নাক কথা কহিতে,
এক ঠাঁয়ে আমি সব পাই এসে
হেরি যবে নীল লোহিতে।
হুলিয়ারা মোরে পুরীধামে ডাকে;
মিশমি, নাগারা, কোহিমায়
কাশ্মীরে মো'রে ডাকে ডোগ্‌রারা,
নেপালে গুর্খা মোরে চায়।
কোল্ ভীল্ কুকি, ভাবেনাক পর,
জংলী পাহাড়ী ডুবারি,
সব প্রিয়জনে ভক্তি ভারত
জানিয়া এসেছি উথারি।
প্রতি ধূলিকণা ভারতবর্ষ,
জল-বিন্দুরা-গঙ্গা,
কালিচন্দ্রের আলোকেতে থাকি
মনে নাই দ্বিধা শঙ্কা।
অনেক অভাব অনটন আছে
সে সব ব্যাপার তুচ্ছ,
নীল লোহিতের কুপোষ্য আমি
যে সে নই তাতো বুঝছো।

ক্ষীরোদপ্রসাদ জন্মশতবার্ষিকী দিনে আলোচনা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

এবার বর্ষের প্রথম পদক্ষেপে ক্ষীরোদপ্রসাদের শততম জন্মদিনের এলো পরম লগ্ন। আজ তিনি মর্ত্ত্যকায়ায় নেই, আছেন জাতীয় নাট্যসাহিত্যের পুরোভাগে, আছেন নাট্যমঞ্চের পাদপীঠের সম্মুখে বিগ্রহের মত। তাঁর আবির্ভাব ১৮৬৩ সালের ১২ই এপ্রিল, তাঁর তিরোভাব ৬৫ বৎসর বয়সে ১৯২৭ সালের ৪ঠা জুলাই। জাতির চরম দুর্দ্দিনে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিনি মহাপ্রস্থান করেছেন, আরও কিছুকাল তিনি আমাদের মধ্যে থাকলে আমরা লাভ করতাম অমূল্য নাট্যসম্পদ। তিনি দিয়ে যেতে পারতেন আরও কিছু দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক। আমাদের দুর্ভাগ্য, তাঁর মত একজন বনস্পতিকে হারিয়েছি।

ক্ষীরোদপ্রসাদের শতবার্ষিকী জন্মজয়ন্তীর পরম দিনটিকে অভ্যর্থনা করেনি সমগ্র জাতি। এটা অবশ্য গভীর দুঃখের বিষয়, করেছে মুষ্টিমেয় সারস্বত চর্চ্চাকেন্দ্র। প্রত্যাশা করা গিয়েছিল ব্যাপকভাবে উৎসব সমারোহ, সে আশা ফলবতী হয় নি। ইতিহাসের এই অবিস্মরণীয় মুহূর্ত্তকে উদাসীনতায় উপেক্ষার ভেতর দিয়ে প্রত্যক্ষ হয়েছে জাতির মারাত্মক মানসিক আলস্য। আজ যদি এসে থাকে সময় —কল্পনা পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে জাতির অন্তর্নিহিত মহৎ সম্ভাবনাকে সত্য করে তুলতে, জাগ্রত করে তুলতে, তাহোলে ব্যষ্টি মাত্রেরই সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য ক্ষীরোদপ্রসাদের মত জাতির পথিকৃৎগণেরও স্মৃতিপূজা করা। দেশের দলকেন্দ্রিকতা পরিচালনা করে নিয়ে চলেছে সমাজের রথ। এইসব দল কেন্দ্রিক নরপুঙ্গবের ভাগ্যে যাঁরা রথী মহারথী ন'ন, তাঁদের তালিকার বহির্ভূত মনস্বীদের স্থান যেন আজ নেই। প্রসঙ্গ উত্থাপিত হোলে হয়তো আসে উত্তর—'ইহ বাহ্য, আর কহ—'

জানি জাতির বিরাট ঐক্যতানের মধ্যে কোথায় যেন একটা বে-সুর বেজে চলেছে—হয়তো একটা ছোট কড়িকোমলের গোলমালে হারিয়ে যেতে বসেছে সমস্ত সঙ্গীতের মাধুর্য্য। যে উল্লাস জাতির ভিতর থেকে স্বভাবতই বিস্ফুরিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা করা যায়, সে উল্লাস ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দেখা গেল না। এই মহান্ নাট্যকারের উদ্দেশে প্রাণের প্রণাম জানাই। নাট্যাভিনয়ের যুগপ্রবর্ত্তক শিশিরকুমার তাঁরই নাটকে ভূমিকা গ্রহণ করে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলেন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে।

চব্বিশপরগণার অন্তর্গত খড়দহ গ্রামে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের জন্ম। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে বংশের প্রসিদ্ধি আছে খড়দহের গুরুবংশরূপে। পিতার নাম গুরুচরণ ভট্টাচার্য্য শিরোমণি। এঁদের সাবেক উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম বিদ্যাভ্যাস সুরু হল গ্রামের পাঠশালায়। তারপর প্রবেশ করেন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে। ১৮৮১ সালে সতেরো বছর বয়সে বারাকপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জ্জনের জন্যে আসেন কলিকাতায়। অধ্যয়ন আরম্ভ করেন জেনারেল এসেম্ব্লিজ্ ইনিষ্টিটিউশন্ নামক মহাবিদ্যালয়ে। ১৮৮৯ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে রসায়ন বিদ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর এম, এ উপাধি লাভ করেন। এরপর সুরু হয় তাঁর কর্ম্মজীবন অধ্যাপনাবৃত্তি অবলম্বন করে। তাঁর অধ্যাপকীয় কার্য্যকালে (১৮৯২-১৯০৩) সাল জেনারেল এসেম্ব্লিজ্ ইনষ্টিটিউশনে (বর্ত্তমানে স্কটিশচার্চ্চ কলেজ)। বিজ্ঞানের অধ্যাপনার মাধ্যমে নিজের বিদগ্ধতার পরিচয় দিতে থাকেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল বঙ্গভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করা। বি-এ, পরীক্ষা দেবার পূর্ব্বে (ইং ১৮৮৫) তিনি 'রাজনৈতিক সন্ন্যাসী' লিখে তা প্রকাশ করেছিলেন। বস্তু-

বিশ্বের রসায়ন তাঁকে বিজ্ঞানের রাজ্যে পরিক্রমা করিয়েছে বটে, কিন্তু তাঁকে নেশায় প্রমত্ত করতে পারেনি, ভাব-জগতের রসায়নে তিনি হয়েছিলেন প্রমত্ত, তাই আমাদের ভাগ্যে লাভ হয়েছে তাঁর অপূর্ব্ব সৃষ্টি—প্রত্যক্ষ করেছি ঘটনাবিন্যাসে যেমন তাঁর দক্ষতা, শব্দ-সংযোজনায় তেমনই পারিপাট্য। পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচিতি থাকা সত্বেও তিনি ইংরাজী-ঘেঁষা বাংলা শব্দ দিয়ে নাটক রচনা করেননি। তাঁর প্রতিভা অনন্যসাধারণ। তিনি ছিলেন দীর্ঘাকৃতি, শীর্ণদেহ, বিরলকেশ ও ভাবপ্রবণ। আমরা তাঁকে দেখেছি। প্রণাম করে ধন্য হয়েছি। অধ্যাপনাকালে তিনি থিয়েটারের জন্য নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর সর্ব্বজনপ্রিয় 'আলিবাবা' নাটক এই সময়ে লিখিত হয়। গীতিনাট্য রচনায় ছিল তাঁর মৌলিকত্ব। নাট্যসাহিত্যে গীতিনাট্য হিসাবে আলিবাবার মত প্রসিদ্ধি আর দেখা যায় না। আলিবাবার মত তাঁর 'কিন্নরী'ও অবিস্মরণীয়। তাঁর প্রথম নাট্যগ্রন্থ 'ফুলশয্যা' (মে, ১৮৯৪) এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হয়।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী স্বর্গত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। নাট্যশিল্পকলা ও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের বিশেষতঃ হরিদাসবাবুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যোগাযোগ ছিল। তাঁর মুখে শুনেছি, ক্ষীরোদপ্রসাদ একটানা লিখে পাণ্ডুলিপি দিয়ে দিতেন, কখন দ্বিতীয়বার পাণ্ডুলিপির পাতাগুলি দেখতেন না, পরিবর্জ্জন, পরিবর্দ্ধন বা সংশোধনের প্রসঙ্গ উঠলে বলতেন—'যা লিখে দেবার লিখে দিয়েছি, তোমরা দেখে শুনে যা হয় করে নেওগে—' নেহাৎ চাপে না পড়লে তাঁর একটানা লেখা নাটকের কোন শব্দ, সংলাপ, দৃশ্য বা চরিত্রের অদলবদল করতেন না। নাট্যরচনাকালে দ্রুত লেখনী চলেছে তাঁর, চরিত্র-গুলি যেন আপনা আপনি চলে এসে নিজেদের অংশ গ্রহণ করছে—তাঁর ঘটনা সৃষ্টির পরবর্ত্তী কল্পনার আমন্ত্রণে।

তাঁর নাট্যরচনা এরূপ সাফল্য গৌরব লাভ করলো যে, বাধ্য হয়ে তাঁকে অধ্যাপনা বৃত্তি ত্যাগ করে নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আসতে হোলো। অবশিষ্ট জীবন নাট্যসাহিত্য নিয়েই তিনি সময় অতিবাহিত করেছেন। তাঁর কাব্যানুরাগও ছিল। ১৩১১ সালে 'জাহ্নবী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কবিতা 'দধীচির অস্থিদান' তদানীন্তন কালে প্রশংসা অর্জ্জন করেছিল।

ভাষাসম্পদ ক্ষীরোদপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য। সাহিত্য সাধনায়ও তিনি দেখিয়েছেন বিশেষ কৃতিত্ব। ১৩১৬ সালে বৈশাখ মাস থেকে 'অলৌকিক রহস্য' নামে একটি মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করে তার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন এবং উক্ত পত্রিকা ছয় বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। তিনি পাঁচশত টাকা মাসিক বেতনে ম্যাডান্ থিয়েটারের কর্ম্মভার গ্রহণ করেন, এরূপ বেতন তদানীন্তনকালে কোন নাট্যকারের ভাগ্যে ঘটেনি। তত্ত্ববিদ্যাপ্রচার ও বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নয়নকল্পে তিনি একনিষ্ঠ সাধনা করে গেছেন। এজন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতি তাঁর কাছে চিরঋণী। কথা-শিল্পী হিসাবেও তিনি প্রতি[illegible] অর্জ্জন করেছিলেন, কিন্তু দেশবাসীর কাছে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার রূপেই।

ঘটনাবিন্যাসের পরেই ভাষা নাটকের নাটকত্ব সম্পূর্ণ বজায় রাখে। নাটকের নিজস্ব ভাষা আছে। প্রবন্ধ উপন্যাস প্রভৃতির ভাষার সংমিশ্রণে উদ্ভূত হোলেও তার অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য অভিনব। 'এ্যাক্‌সানের' উপর নাটকের জীবনীশক্তি—'ওয়ার্ডসেটিং' বা শব্দ যোজনার আনুকূল্য সাপেক্ষ। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকগুলিতে কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে 'ওয়ার্ডসেটিং' বা শব্দ যোজনায়। এই বিশেষত্বের সম্মুখে ক্ষীরোদপ্রসাদের স্থান অদ্বিতীয়। সেক্‌সপিয়ার তাঁর নাটকগুলিতে এ সম্পর্কে দৃষ্টি আবৃত রাখেন নি। 'ওয়ার্ডসেটিং' এর দিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

গৈরিশীযুগে লিখিত ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকগুলিতে বাহুল্য দোষ থাকলেও ছিল অতুলনীয় ভাষাসম্পদ। অল্প কথার মধ্যে বক্তব্যকে রূপ দেওয়াই প্রথম শ্রেণীর নাট্য-রচয়িতার রীতি, অথচ সেগুলি যেমন জোরালো, তেমনই সহজ, সুবিন্যস্ত ও যথোপযুক্ত। ক্ষীরোদ প্রসাদের শেষ বয়সের নাটকগুলি অপূর্ব্ব ও অতুলনীয়। লিখন ভঙ্গীর দ্বারা ভাবপ্রকাশের সার্থকতা নাটকীয় ভাষায় এনে দেওয়া কম কৃতিত্ব নয়, ক্ষীরোদপ্রসাদ এদিকে ঐন্দ্রজালিকতা প্রকাশ করেছেন। 'এ্যাক্‌সন' নাটকের একটি প্রধান অঙ্গ। অর্থ খুব বিচিত্র বা মহান্ না হোলেও লিখন-কৌশলে 'এ্যাক্‌সনে'র রূপ পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলাই নাট্য-

কারের কৃতিত্ব। নাটকে উপন্যাসের মত দীর্ঘ বিস্তারের অবকাশ নেই, এজন্যে তার ভাষা সংক্ষিপ্ত—অথচ থাকে একটা এ্যাক্‌সন প্রকাশ করার অন্তর্নিহিত কৌশল—ঘটনার পরিবেশসৃষ্টির পক্ষে ভাষা প্রয়োগ প্রয়োজন। প্রথম শ্রেণীর নাট্যরচয়িতাদের লিখন কৌশল এই সত্যই উদ্‌ঘাটিত করেছে। ক্ষীরোদ নাট্য-সাহিত্যে এসব প্রসাদ-গুণের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে, চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, দৃশ্যাদির যথাযথ সংযোজনে, প্রতি চরিত্রে রূপদানের বৈশিষ্ট্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকগুলি পূর্ণ। তাঁর শেষ বয়সের নাটকগুলি, যেমন, নর-নারায়ণ, বিদুরথ, আলমগীর, জয়শ্রী, গোলকুণ্ডা, ভীষ্ম প্রভৃতি সর্ব্বোত্তম ও সর্বজন-সমাদৃত। এরা বাংলা নাট্যসাহিত্যের অপূর্ব্ব অবদান। ক্ষীরোদপ্রসাদের লিখন শৈলীর বৈশিষ্ট্য আছে, তাঁর লিখন চাতুর্য্যে নাট্যামোদিগণের ভাববার অবসর আছে,—যে নাটকে চিন্তার খোরাক নেই, সে নাটক রসসৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নয়। মনস্তত্ত্বমূলক নাটকের পথপ্রদর্শক ক্ষীরোদ-প্রসাদ। এর স্বপক্ষে যুক্তি অবতারণা করতে হোলে তাঁর সমকালীন ও তাঁর কিছু পূর্ব্বকালীন বিভিন্ন নাট্যকারগণের রচিত নাটকগুলির ধারাবাহিক পর্য্যালোচনার প্রয়োজন আছে। পরবর্ত্তী দৃশ্যে যে ঘটনা সংঘটিত হবে, তার কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী দৃশ্যে অবতারণা করার ব্যবস্থা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে। ক্ষীরোদপ্রসাদ তা লক্ষ্য করেছিলেন, এজন্যে সেরূপ দৃষ্ট তাঁর নাটকে নেই বললেই চলে।

কোশল সম্রাট প্রসেনজিতের পুত্র বিদুরথ। এর কাহিনী অবলম্বন করে ক্ষীরোদপ্রসাদ একটি উচ্চাঙ্গের মনস্তত্ত্বপূর্ণ নাটক 'বিদুরথ' রচনা করে গেছেন। তাঁর বিভিন্ন নাটকের নায়ক নায়িকারা আজও আমাদের মনে দোলা দেয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আলমগীর'-এ আলমগীর কামবকস্, বিদুরথে প্রসেনজিৎ, অশোকে ধারিণী, বঙ্গে-রাঠোরে ভোলাই রঙ্গলাল, পলাশীর প্রায়শ্চিত্তে মীরজাফর প্রভৃতি। তাঁর সৃষ্ট ক্ষুদ্র চরিত্রগুলিও আমাদের মনে থাকে, প্রধান ভূমিকাগুলির সংস্পর্শে বা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তারা হারিয়ে যায় না। তাঁর আলমগীরে কাম-বকস, বিদুরথে প্রসেনজিৎ, রঘুবীরে সাজাহান, কৌলভে ছুনিয়ায় বেলা, অশোকে কুনাল, প্রতাপাদিত্যে রডা প্রভৃতি ক্ষুদ্র চরিত্রগুলিও আমাদের মনে রেখাপাত করে।

তাঁর নাটকের পুরুষ ও নারীচরিত্রগুলি বলিষ্ঠ। এদের মধ্যে ফুটে উঠেছে বীরত্বব্যঞ্জক কার্য্যকলাপ, আর কথা-বার্ত্তা। নারী যে অবলা নয়, সবলা, কোমলা হোলেও কঠিনা, পরনির্ভরশীলা হোলেও শক্তিময়ী, তারও যে তেজস্বিতা আছে, নির্ভীকতা আছে, পুরুষের মত পৌরুষ আছে, ক্ষীরোদপ্রসাদ তা দেখিয়েছেন বহু নারীচরিত্রে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলমগীরে উদিপুরী, পদ্মিনীতে নসীবন, পলিনে রাণী আহরিণ, বঙ্গেরাঠোরে কলি বেগম প্রভৃতি। প্রত্যেক চরিত্র জীবন্ত। তাঁর প্রতাপাদিত্য, রঘুবীর প্রভৃতি নাটক অপূর্ব্ব।

গীতিনাট্যে, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাট্যে, ভক্তিমূলক নাট্যে, রোমান্টিক নাট্যে ক্ষীরোধপ্রসাদ তাঁর প্রতিভার শাশ্বত স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বাংলার নাট্যসাহিত্যের স্বর্ণযুগস্রষ্টাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। গিরীশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ এই ত্রয়ী প্রতিভার ত্রিস্রোতী মিলনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে নাট্যজগতে ত্রিবেণীসঙ্গম। এই সঙ্গমে অবগাহন স্নান করে বাঙ্গালী আজও তীর্থপুণ্য-সঞ্চয় করে চলেছে।

তিনি প্রায় আটান্নখানি গ্রন্থ লিখে গেছেন। তার মধ্যে সাত আটখানি উপন্যাস, তন্মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য নিবেদিতা। কিছু ছোট গল্পও লিখে গেছেন। গল্প গ্রন্থের নাম বিরামকুঞ্জ। মনস্তত্ত্বমূলক নাটক রচনায় ক্ষীরোদ-প্রসাদ গিরিশচন্দ্রকেও অতিক্রম করে গেছেন। গিরীশ প্রতিভার দীপ্তির সম্মুখে তাঁর নাট্যজীবনের প্রথম অধ্যায় ভাস্বর নয়। কিন্তু প্রতিভাকে আবরণের মধ্যে চেপে রাখা যায় না, তাই ক্ষীরোদপ্রসাদকে চেপে রাখা সম্ভব হয়নি। তাঁর অনেক রচনা সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রয়েছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের চাঁদবিবি চরিত্রই সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী তারাসুন্দরীকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা দান করে। এই নাটকখানি প্রথম কোহিনুর রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় ১৯০৭ সালের ১১ই আগষ্ট। এটা ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রসিদ্ধ নাটক। আহম্মদনগরের সুলতান ইব্রাহিম। তাঁর সঙ্গে বিজাপুরের সুলতান আদিলশার কোন কারণে মনোমালিন্য হয়। ফলে আদিলশা ও তাঁর পিতৃব্যপত্নী চাঁদবিবি আহম্মদনগর

আক্রমণে উদ্যত হোলে আহম্মদনগরের বিশ্বাসঘাতক উজীর দেশরক্ষার ছলে মোগল সৈন্যের সহায়তায় বিজাপুর-পতিকে পরাস্ত ও শেষে ইব্রাহিমকেও দূরীভূত করে স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করবেন, এরূপ অভিপ্রায় করলেন। কিন্তু চাঁদবিবি যখন দেখলেন যে মোগল সৈন্য আহম্মদনগর প্রবেশে উদ্যত, তখন বৈরিতা ভুলে গিয়ে তিনি আহম্মদ-নগরের রক্ষায় বদ্ধপরিকর হোলেন, বীররমণী অসীম বীরত্ব দেখিয়ে বিশ্বাসঘাতক উজীর ও মোগলের আক্রমণ থেকে দেশরক্ষা করলেন, যুদ্ধ শেষে বিফলকাম উজীরের গুপ্ত অস্ত্রাঘাতে তাঁর জীবনান্ত হোলো। আহম্মদ-নগরের সুলতান ইব্রাহিম খাঁ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁর শিশুপুত্র বাহাদুরকে সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে মহা-প্রস্থান করলেন বীর্য্যবতী মহীয়সী নারী চাঁদবিবি। এই চাঁদবিবি ক্ষীরোদপ্রসাদের অপূর্ব্ব অবদান।

সন ১৩২৫-১৩৩০ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ শেষ জীবনে বাঁকুড়া সহরের কাছে বিক্না গ্রামে গৃহ নির্ম্মাণ করে সেখানে মধ্যে মধ্যে নির্জ্জন বাস করতেন।

আজ ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সারা দেশব্যাপী জয়ন্তী উৎসবের প্রয়োজন আছে। এর মহত্তম দায়িত্ব দেশবাসীর। এদিকে নির্ম্মম উদাসীনতাই যেন প্রতিদিন সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমাদের উচিত তাঁর রচনাগুলি অনুধাবন করা, তাঁর নাটকগুলি ব্যাপকভাবে পল্লীতে সহরে মঞ্চস্থ করা, তাঁর নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা—আর তাঁর স্মৃতিপূজা করা, তবেই সে দায়িত্ব পালন সার্থক হয়ে উঠবে। আজ ক্ষীরোদপ্রসাদ ও তাঁর প্রতিভাই হোক আমাদের প্রধান বক্তব্য। তিনি জাতির চিরনমস্য, তাঁর উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা থেকে নিজেকে অপসারিত করলাম।

বৃষ্টি 'বাতাস' কালো রাত-এর প্রতি

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

ও বৃষ্টি ঝুরুঝুরু
এখনি ভেঙোনা আঁখি-ভুরু,
একটু দাঁড়াও
নোঙর নামাও ;
সে আসছে, ঐ সে আসছে সাড়া পেয়ে
রোদ থমকিয়ে আছে একপাশে চেয়ে।

ও বৃষ্টি, থাকো অবনত মুখ।
সে আসুক—
সে এলে, সে এসে গেলে
খুশীমত ডানা মেলে
তারপর যেও উচ্ছল বারি ঢেলে।

ও বাতাস, ও ঝোড়ো বাতাস
তোমার শিথিল কেশপাশ
দু'হাতে গুটিয়ে
একটু জুড়িয়ে
নাও না!
সে আসছে, ঐ সে আসছে—তুমি চাওনা?
সে আসছে তুমি জানো নাকি?—
গাছ লতাপাতা নত আঁখি।

ও রাত, ও কালো রাত
তোমার ভ্রূকুটি দৃক্‌পাত
রাখো তাঁবে।
সে আসছে, ঐ সে আসছে এই পথে যাবে।
সে আসছে—এই সুখবর
হাওয়ায়-হাওয়ায় থরোথর
ফুল ফোটে বন-মর্মর।

বৃষ্টি বাতাস কালো রাত
—ও ভাই দাওনা হাতে হাত।

ঠাকুরঝি'র বিয়ে
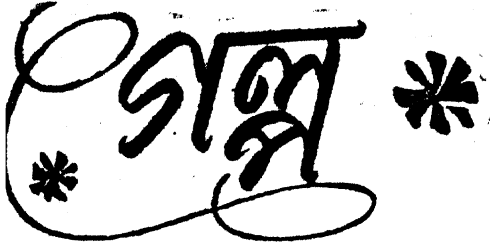
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৪০

ধর্মতলার মোড়। অফিসের ছুটীর পর খানিকটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া লীলা বাসে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। পর পর কয়েকখানি বাস চলিয়া গেল। অসম্ভব ভীড়। লীলা উঠিতে পারিল না। হতাশভাবে লীলা দাঁড়াইয়া আছে ফুটপাথে। এমন সময়ে একখানি চকচকে গাড়ী আসিয়া থামিল তাহারই সম্মুখে। গাড়ীর ভিতর হইতে গুণেন বলিল, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন ?

লীলা হঠাৎ এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। পর-ক্ষণেই একটু অগ্রসর হইয়া গাড়ীর পাশে দাঁড়াইয়া বলিল, ও আপনি ! এই গাড়ী বুঝি এনেছেন বিলেত থেকে ?

গুণেন। হ্যাঁ।

লীলা। এই দেখুন না, কি ভীষণ ভিড় বাসগুলোতে। চার পাঁচখানা বাস চলে গেল। একখানাতেও উঠতে পারলুম না।

গুণেন। আসুন আমার গাড়ীতে।

লীলা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

গুণেন আবার বলিল, উঠে পড়ুন। এখানে বেশিক্ষণ থামা যাবে না।

লীলা। উঠছি না হয়। কিন্তু একথা আপনি আপনার বাড়ীতে বা আমাদের বাড়ীতে ঘুণাক্ষরে বলতে পারবেন না।

গুণেন। কেন, এতে দোষ কি আছে ?

লীলা। সে কথা এখন আলোচনা করবার সময় নেই। বলুন রাজি আছেন ? নইলে আমি আপনার গাড়ীতে উঠব না।

গুণেন। আচ্ছা, আচ্ছা, রাজি আছি। উঠুন।

লীলা গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, গুণেনের পাশেই।

গাড়ী খানিক দূর যাইতেই গুণেন বলিল, সোজা বাড়ী যাবেন, না, গঙ্গার ধার দিয়ে একটু ঘুরে যাবেন। সারাদিন তো অফিসের ঘরে বন্ধ ছিলেন।

লীলা। আপত্তি নেই। কিন্তু একটা সর্তে।

গুণেন। আবার সর্ত ?

লীলা। হ্যাঁ, বিশেষ কঠিন সর্ত নয়।

গুণেন। বলুন।

লীলা। আপনি সর্বদা মনে রাখবেন, আমি একটা বিয়ের কনে। থাকবে তো মনে ?

গুণেন। থাকবে, থাকবে।

উহারা কোর্টের পাশে গিয়া গঙ্গার ধারে গাড়ী থামাইল। দুজনাই খুব খুশী।

গুণেন বলিল, তাহ'লে আপনার বিয়েটা হয়েই যাচ্ছে ?

লীলা। যাচ্ছে।

গুণেন। আপনি বেশ খুসি হয়েছেন ?

লীলার মুখ ক্রমশ গম্ভীর হইয়া উঠিল। বলিল, খুশী আর অখুশী কি ? বিয়ে করা দরকার. বিয়ে ঠিক হয়েছে, বিয়ে হবে, বাস।

লীলার গম্ভীর মুখ দেখিয়া গুণেন আর ও প্রসঙ্গ তুলিল না। বলিল, দেখছেন, কতগুলো জাহাজ এসে ভীড় করেছে এখানে। ওই—ওই জাহাজটা বোধ হয় জার্মেনি থেকে এসেছে। আর ওই—ওপাশের ওটা—জাপান থেকে।

লীলা নীরব। শুধু বলিল, আমার বেশ লাগছে এই জায়গাটা। গাড়ী না হ'লে এসব জায়গায় আসা খুব অসুবিধে।

গুণেন। আপনার বরের তো গাড়ী আছে। রোজ আসবেন বেড়াতে।

লীলার মুখখানি একেবারে শুকাইয়া গেল। গুণেন

ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, আচ্ছা এবার চলুন। আর একটু ড্রাইভ করা যাক।

গাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া উহারা রেড রোডে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে নামিয়া ফুটবল খেলার পর যে লোকসমুদ্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহার অবশিষ্টাংশের ইতস্তত গতিবিধি দেখিতে লাগিল। লীলা বলিল, কি সুন্দর জায়গা? আমার বেশ লাগছে। আপনার ভাল লাগছে না?

গুণেন। নিশ্চয়ই। খুব ভাল লাগছে।

তারপর তাহারা গাড়ীতে উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

বাড়ী হইতে খানিকটা দূরে গাড়ী থামিল। লীলা নামিয়া গেল। যাইবার সময়ে গুণেন বলিল, পরশু আবার ঠিক সেইখানেই দেখা হবে।

এই কথা বলিয়াই গুণেন গাড়ী লইয়া অদৃশ্য হইল।

বাড়ী পৌঁছিতেই স্বাতী বলিয়া উঠিল, এত দেরী যে?

লীলা কোন উত্তর দিল না।

স্বাতী আবার বলিল, আজ এত দেরি হ'ল কেন?

লীলা সংক্ষেপে বলিল, এমনি।

স্বাতী বলিল, স্বাধীন হয়েছ বুঝি? বিয়ে না হতেই এই! বিয়ে হ'লে না জানি কি করবে।

লীলা কোন কথার উত্তর না দিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

৪১

পরদিন। অপর্ণা আসিয়া লীলাকে জানাইল, আমি ভাই একটু বেরিয়েছিলুম একখানা শাড়ী কিনতে। দেখলুম, অজিতবাবুও গেছেন কাপড় কিনতে। আমি একটু চেয়ে রইলুম। মা গো! কি ভীষণ দামী দামী শাড়ী সব খুলে খুলে দেখছেন।

লীলা নীরব।

অপর্ণা বলিল, দেখো, বিয়ের সময়ে কি কাণ্ড করেন। এত কাপড় জামা আসবে, যে তুমি তার হিসেবও রাখতে পারবে না।

লীলা। খানকতক না হয় তোমাকে দিয়ে দেব।

অপর্ণা। ইস্, ভারি যে গরব।

ইতিমধ্যে স্বাতী আসিয়া অপর্ণাকে বলিল, কি বলছিস?

অপর্ণা। এমন কিছু না। দেখলুম, অজিতবাবু ভীষণ দামী দামী শাড়ী-টাড়ি কিনছেন লীলাদির জন্য।

স্বাতী। তা কিনবেনই তো। লীলার কত বড় ভাগ্য!

অপর্ণা বলিল, সেদিন দেখলুম, ওঁর সেই পুরোণো গাড়ীখানার বদলে একখানা চমৎকার চকচকে গাড়ী এসেছে।

স্বাতী এক গাল হাসিয়া বলিল, শুনছ ওগো ননদিনী, তোমার বর তোমাকে রাণীর মত করে রাখবে। হুঁ, তখন আর আমাদের চিনতেই পারবে না। কি বল অপর্ণা?

অপর্ণা। তা না তো কি? অমন বর পেলে কি কারো আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে থাকে? কি—লীলা যে কোন কথাই বলছে না।

লীলা তথাপি নীরব। শুধু বলিল, যা বলবার তোমরা সব বলছ। আমি আর বেশি কি বলব?

স্বাতী বলিল, সত্যি, বিয়ের কনে, ও আবার কি বলবে?

অপর্ণা বলিল, আচ্ছা, আমি ভাই, দেখলুম নিজের চোখে লীলাদির জন্য কেমন সব দামী দামী শাড়ী কেনা হচ্ছে, তাই খবরটা না দিয়ে পারলুম না। লীলাদি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। একটু আনন্দ নেই। একটু খুসীখুসী ভাব নেই।

স্বাতী বলিল, সব আছে। একটু চাপা স্বভাব কিনা। বাইরে কিছু প্রকাশ করে না।

অপর্ণা। আজ আসি ভাই।

স্বাতী বলিল, এস। রোজ একবার আসবে। যতদিন বিয়েটা হয়ে না যাচ্ছে, রোজ আসবে, খোঁজ খবর নেবে—বুঝলে? আর বিয়ের সময়ে—সে আর আগে থেকে বলবার কি আছে? সমস্ত দিন থাকবে, খাবে-দাবে, খাটা-খাটনি করবে, আনন্দ করবে। আচ্ছা, এস।

অপর্ণা যাইতে উদ্যত হইল।

স্বাতী বলিল, সুনন্দাকে পাঠিয়ে দিও। লোকজন আসা যাওয়া না করলে কি বিয়ে বাড়ীতে ভাল লাগে?

অপর্ণা। বৌদি নিজেই আসবেন। কাউকে বলতে হবে না। আচ্ছা আসি।

স্বাতী। এস।

৪২

নির্ধারিত সময়ে লীলা নির্ধারিত স্থানে গুণেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। গাড়ীতে করিয়া খানিকটা বেড়াইয়া একটি হোটেলের সামনে আসিয়া গাড়ী থামিল। গুণেন বলিল, চলুন, একটু চা খাওয়া যাক।

চায়ের টেবিলে বসিয়াই লীলা গুণেনকে তাহার দুইটি সর্তের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। বলিল, সর্ত দুটো মনে আছে ত?

গুণেন। নিশ্চয়ই।

গুণেন বলিল, হোটেলটা মন্দ নয়, কি বলেন? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে।

লীলা। হ্যাঁ।

গুণেন। কি খাবেন?

লীলা। আপনি যা বলবেন। তবে বেশি কিছু অর্ডার দেবেন না। অসময়ে বেশি কিছু খাওয়া ঠিক হবে না। বাড়ী গিয়ে ভাত খেতে হবে।

গুণেন। আচ্ছা অল্পই অর্ডার দেব।

ইহার পর খাওয়া এবং দুই একটি সাধারণ কথাবার্তা ছাড়া আর বেশি আলাপ হইল না। লীলা শুধু বলিল, আজ সন্ধ্যেটা বেশ কাটল।

হোটেল হইতে বাহির হইয়া তাহারা বাড়ীর দিকে চলিল। পূর্বদিনের মতই লীলা বাড়ী হইতে খানিকটা দূরে নামিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিতেই স্বাতী তাহাকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিল। বলিল, ছিঃ ছিঃ, বিয়ের কনে—এমন কাণ্ড দেখি নি। ভর সন্ধ্যায় কোথায় টো টো করে বেড়ায়। যত সব অনাছিষ্টি!

খোকা ছুটিয়া আসিয়া লীলার হাঁটু জড়াইয়া ধরিয়া চেঁচাইতে লাগিল, পিসি, পিসি।

স্বাতী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, আর পিসি! তোদের পিসি কি আর সেই পিসি আছে? দেখলিনে, অফিস করে সারা সন্ধ্যে কোথায় টো টো করে এখন বাড়ী ফিরছে। যা এখান থেকে। আর পিসি পিসি করতে হবে না।

লীলা খোকাকে কোলে করিয়া লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। স্বাতীর কথায় কোন উত্তর দিল না।

একটু পরেই আসিল সুনন্দা। বলিল, ভাই স্বাতীদি, একটু কথা আছে তোমার সঙ্গে। লীলা কোথায়?

স্বাতী। আছেন তাঁর ঘরে। সংসারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আর আছে নাকি?

সুনন্দা। আমরাও সেই কথাই বলাবলি করছিলাম। ওর মাথা-টাথা খারাপ হয় নি তো?

স্বাতী। তার আর আশ্চর্য কি? বড় লোকের বউ হবে, গরবে রাণীর মাটিতে পা পড়ছে না।

সুনন্দা। তা না হ'য় হল। কিন্তু এসব কি?

স্বাতী। কি বলছ তুমি?

সুনন্দা। এই যে রোজ এত রাত্রি করে বাড়ী ফেরা। কে নাকি দেখেছে, কে এক ছোকরা রোজ গাড়ী করে নিয়ে এসে দূরে নামিয়ে দিয়ে যায়। শেষে লীলার মনে এই ছিল? ওকে আমরা দেবতার মত শ্রদ্ধা করেছি, কি হ'ল ওর?

স্বাতী। জানিনে বাবু! কিসের থেকে যে কি হয়ে পড়ে কে জানে? এই কটা দিন কাটলে যেন বাঁচি। একবার সাত পাক ঘুরিয়ে ছেড়ে দি। তারপর বুঝুক গে ওরা। আমার আর দায়িত্ব থাকে না।

সুনন্দা বলিল, বাপু, একটু চোখে চোখে রেখো এ কটা দিন। ও কখনও তোমার অবাধ্যতা করে নি। তুমি একটু ধমকে দিও। বুঝলে?

স্বাতী। জানিনে বাপু।

সুনন্দা। আচ্ছা, আমি আসি।

একটু পরেই আসিল একজন পুরোহিত। বলিল, ও বাড়ী থেকে পাঠিয়ে দিলেন। লগ্ন, সময়-টময়, ঠিক করে আসতে। সুরেশবাবু বাড়ী আছেন?

স্বাতী। না, উনি তো বাড়ী নেই। বোধ হয় ডাক্তারের কাছে গেছেন। কারো কি কথার ঠিক আছে। সময় মত সব এসে পৌঁছুলে হয়।

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, আচ্ছা, আজ তা হ'লে আসি। কাল সকালে আসব।

স্বাতী। তাই আসবেন।

পুরোহিত মহাশয় চলিয়া গেলেন।

সুরেশ ফিরিবামাত্রই স্বাতী তাহাকে ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অপর্ণা ও সুনন্দা যাহা যাহা বলিয়াছে,

সব জানাইল। পুরোহিত মহাশয়ের কথাটাও বাদ দিল না।

সুরেশ গম্ভীর হইয়া রহিল। বলিল, জানিনে, অদৃষ্টে কি আছে।

আর কোন কথা হইল না। সুরেশ লীলাকে ডাকিয়া সঙ্গে লইয়া খাবার টেবিলে গিয়া বসিল। খাইবার সময়ে কথা খুব কম হইল।

লীলা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে স্বাভাবিক হইতে। কিন্তু তাহার বিবর্ণ মুখের কাতরতা সুরেশের চোখ এড়াইতে পারিল না। সুরেশ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া টেবিল হইতে উঠিল।

৪৩

লীলার প্রায়ই বাড়ী ফিরিতে দেরি হইতেছে। গুণেনের সহিত সপ্তাহে তিন চার দিন করিয়া সাক্ষাৎ হইতেছে।

সেদিন গুণেন বলিয়া ফেলিল, আজ চলুন একটু সিনেমায়। ঐ হলে একটা ভাল ইংরেজি ছবি আছে।

লীলা। নেহাতই যাবেন?

গুণেন। হ্যাঁ, চলুন।

লীলা। সর্ত মনে আছে তো? প্রথম সর্ত, একথা কাউকে বলবেন না। আর দ্বিতীয় সর্ত, ভুলবেন না যে আমি বিয়ের কনে।

গুণেন। সব মনে আছে।

তাহারা সিনেমায় ঢুকিল। সিনেমা শেষ হইতেই তাহারা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া দরজার কাছে আসিতেই লীলা, দোতলার সিঁড়ির দিকে চাহিয়া চমকাইয়া উঠিল। ঠিক যেন সামনে একটা সাপ দেখিয়াছে। সে গুণেনের হাতে একটু টান দিয়া তাহাকে থামিতে ইঙ্গিত করিল এবং সামনে প্রায় সাত আট হাত দূরে সিঁড়ির নীচের ধাপে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, একটা মোটা-সোটা ফিরিঙ্গি মেয়ে গলা-কাটা, বুক-কাটা, পিঠ-কাটা একটা জামা পরিয়া চলিয়াছে, এবং তাহার বাঁ হাতের সঙ্গে হাত জড়াইয়া চলিয়াছে অজিত। অজিতের অবস্থাটা ঠিক প্রকৃতিস্থ মনে হইল না।

লীলা গুণেনকে বলিল, দেখেছ ঐ ফিরিঙ্গি মেয়েটাকে?

গুণেন। দেখছি তো।

লীলা। ওঁর সঙ্গে যিনি যাচ্ছেন, উনিই আমার ভাবী বর!

'অ্যাঁ' বলিয়া গুণেন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া ষ্টার্ট দিল। একটু অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তার পাশে গাড়ী থামাইয়া গুণেন বলিল, কি ভয়ানক।

লীলা নীরব।

গুণেন বলিল, এখন বুঝেছি, বিয়ের কনে কেন এত বিষণ্ণ, এত গম্ভীর, এত বিরস! হুঁ, এবার যাও, কেমন?

লীলা বলিল, কোথায় যাব, আমার যাবার স্থান নেই।

গুণেন। আজকের মত চল। আমাকে একটু ভাবতে দাও।

গুণেন গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

৪৪

লীলা বাড়ী ফিরিতেই স্বাতী একেবারে ফাটিয়া পড়িল। বলিল, কোথায় যাওয়া হয়েছিল, শুনি?

লীলা নীরব।

স্বাতী বলিল, বলতেই হবে। চুপ করে থাকলে চলবে না।

লীলা নীরব।

স্বাতী। এত বড় আস্পর্দ্ধা। কথার জবাবই নেই? মাথা খারাপ হয়েছে? কি হয়েছে, বলতেই হবে তোমাকে।

সুরেশকে স্বাতী বলিল, এর একটা বিহিত করতেই হবে।

সুরেশ বলিল, রাত হয়ে গেছে। এখন যাও, শোও গে। কাল সকালে শোনা যাবে'খন।

স্বাতী বলিল, না, না। কাল নয়। আজই, এখনই এর সদুত্তর চাই। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! পাড়ার লোকের কাছে মুখ দেখানর যো নেই। ঘরে বাইরে এ কি অপমান! তোমার বড় গুণের বোন না? এখন কি করি আমি? এমন মেয়েকে আমি বাড়ী থাকতে দেবো না।

ডাল হ্রদ (কাশ্মীর)

জলপথ

ফটো : তুষার রায়চৌধুরী
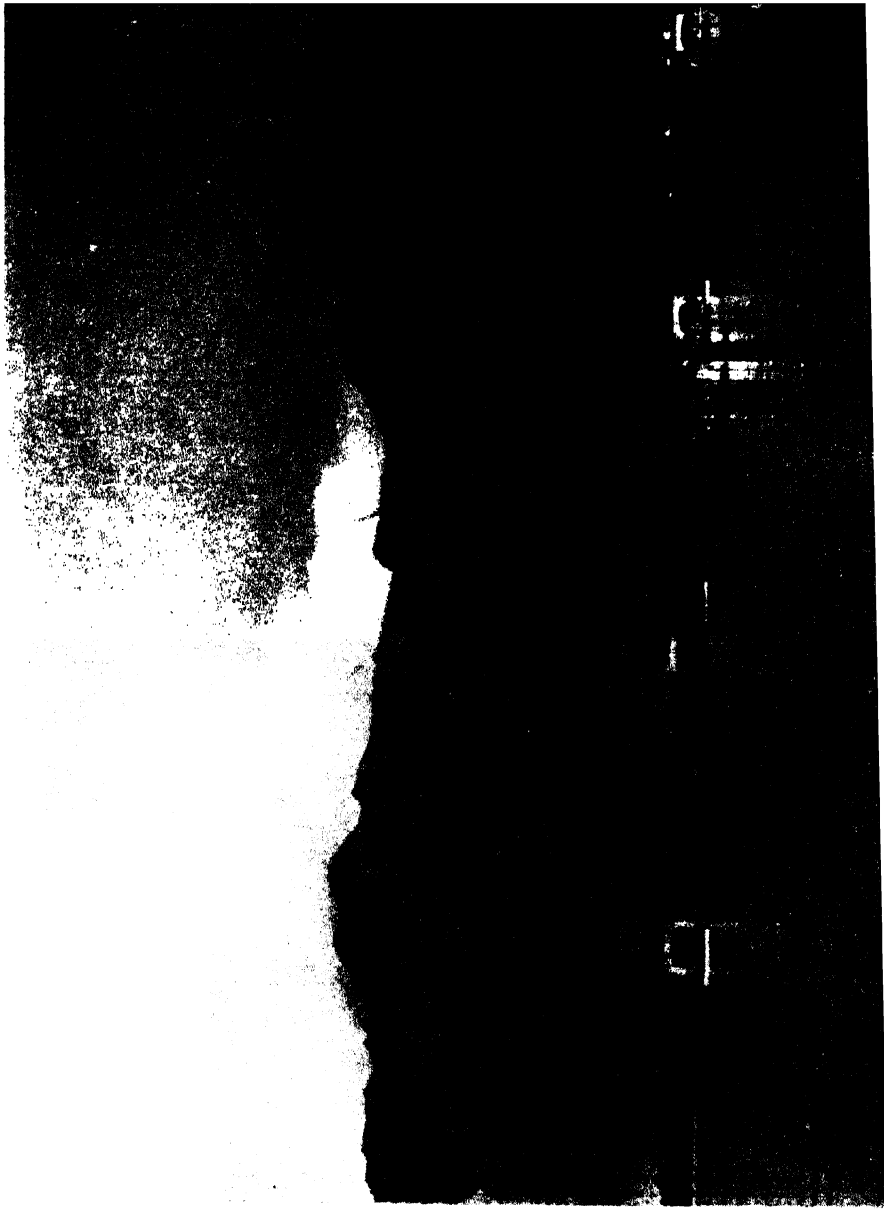
সুরেশ বলিল, যা হয়, কাল ভেবে দেখা যাবে। এখন যাও। খাবে-টাবে চল। কত রাত হয়ে গেল।

স্বাতী যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছে। বলিল, না, না, না। আমি খেতে-টেতে যাব না। এর একটা বিহিত এক্ষুণি করতে হবে।

লীলা নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সুরেশ ও স্বাতী কেহই খাইতে গেল না। কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া তাহারাও ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

রাত্রি তখন অনেক। সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ। লীলা একটি ছোট অ্যাটাচি-কেসে দুইখানি শাড়ী আর একটি পেটি-কোট ভরিয়া লইয়া ব্যাগ হাতে করিয়া খুব সন্তর্পণে দরজা খুলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। খানিকটা পথ হাঁটিয়া গিয়া ট্রাম ধরিয়া একটি হোটেলের কাছে গিয়া নামিল। হোটেলে ঢুকিয়া উপস্থিত কর্মচারীটিকে বলিল, এখানে আমি থাকতে চাই দুই এক দিন। ঘর আছে?

কর্মচারীটি সন্দিগ্ধচিত্তে মহিলাটির দিকে চাহিয়া ম্যানেজারকে ডাকিয়া আনিল। লীলা বলিল, দয়া করে আমাকে দুই এক দিন এখানে থাকতে দিন। একটু বিপদে পড়েই এসেছি।

ম্যানেজার। আপনি কি একা থাকবেন?

লীলা। আপাতত একা। কাল আর একা থাকব না।

একটু চিন্তা করিয়া ম্যানেজার বলিলেন, তাই তো, এত রাত্রে কোথায়ই বা যাবেন একা একা? দিচ্ছি একটা ঘরের ব্যবস্থা করে।

এই কথা বলিয়া কর্মচারীটিকে বলিলেন, যাও, তের নম্বর ঘরটা খালি আছে, সেই ঘরে নিয়ে যাও।

লীলাকে ম্যানেজার বলিলেন, আপনার খাওয়া হয় নি নিশ্চয়ই।

লীলা। না, তবে বেশি কিছু খাব না। অল্প কিছু খাবার পাঠিয়ে দিন। আর একটা কথা। রাত্রে আমার ঘরে শোবার জন্ত একটা ঝি চাই কিন্তু।

ম্যানেজার। কিছু দরকার নেই।

লীলা। তবু আমি চাই। ভাল বকশিস দেব।

ম্যানেজার। আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে। আপনি ঘরে যান। মুখ-হাত ধুয়ে কিছু খেয়ে নিন।

লীলা ঘরে গিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া পাশের ঘরে মুখ ধুইয়া ফিরিয়াই দেখিল, টেবিলের উপরে খাবার সাজানো হইয়াছে। অল্প কিছু খাইয়া মুখ ধুইয়া আসিতেই একটি ঝি আসিয়া বলিল, আমি থাকব'খন এঘরে। বখশিস চাই কিন্তু।

লীলা বলিল, সে হবে'খন। থালা-টালাগুলো সরিয়ে রেখে এস।

সব ঠিক-ঠাক করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ঝি'টি মাটিতে একটা শতরঞ্চি পাতিয়া শুইয়া পড়িল। লীলাও খাটের উপর উঠিল।

লীলা শুইয়া শুইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে। যদি গুণেনের মত না হয়? যদি সে বাড়ীতে মা'র মত জিজ্ঞাসা করিতে যায়? যদি স্বাতী জেনে ফেলে যে আমি গুণেনের সঙ্গেই মোটরে বেড়াতে যেতাম। গুণেন কি সকলকে অসন্তুষ্ট করে আমাকে বাঁচাবে? এই সব ভাবিতে ভাবিতে লীলা ঘুমাইয়া পড়িল।

৪৫

পরদিন সকালে যখন দেখা গেল, লীলা ঘরে নাই, বাড়ীতেও নাই, তখন স্বাতী ও সুরেশ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সুরেশ বলিল, কি করি বলত? পুলিশে খবর দেব?

স্বাতী। উহুঁ, দুই একদিন দেখা যাক।

উহারা অচলাকে বলিয়া দিল, কেহ লীলার কথা জিজ্ঞেস করলে কিছু বলবি না, বুঝলি? দশটার পর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবি, অফিস গেছে। তা ছাড়া, কে আর আসছে, সাত-সকালে খবর নিতে?

স্বাতী সুরেশকে ঘরের মধ্যে ডাকিয়া লইয়া চাপা গলায় বলিল, নাও, এখন সামলাও তোমার গুণবতী বোনকে?

সুরেশ। দেখি, একটু খোঁজ-টোঁজ করে। তোমাদের বাড়ীতে যায়নি তো?

স্বাতী। নিশ্চয়ই না।

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সুরেশ ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল।

স্বাতী বলিল, ছিঃ ছিঃ, এমন কাণ্ড কেউ কখনো দেখেছে? আমাদের মান গেল, সম্ভ্রম গেল। আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে।

সুরেশ। একটু সাবধানে কথাবার্তা বল। কত দূরে আর যাবে? বোধ হয় কোন বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী গেছে।

সুরেশ ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। স্বাতী খুকীকে কোলে লইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিল।

৪৬

লীলা সকালে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া হোটেলের চা ও খাবার খাইতেছে। ম্যানেজারবাবু আসিয়া বলিলেন, আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?

লীলা। না; কোন অসুবিধে নেই।

ম্যানেজার। এ কি, শুধু টোষ্ট দিয়ে গেছে বুঝি? ওরে, কে আছিস। শিগ্‌গির একখানা ভাল ওমলেট ভেজে এনে দে। বুঝলি?

লীলা। না, ম্যানেজারবাবু, আমি আর কিছু খাবনা। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

ম্যানেজারবাবু চেঁচাইয়া বলিলেন, ওরে, থাক্, থাক্। লীলাকে বলিলেন, আপনার কোথায় থাকা হয়? আমাদের খাতায় আবার সব কিছু লিখতে হয় কিনা। কাল রাত্রিতে তাড়াতাড়িতে কিছুই লেখা হয়নি।

লীলা। আচ্ছা, আপনি কিছু ব্যস্ত হবেন না। আমি আজ বিকেলেই সব লিখিয়ে দেব। আর দেখুন, একটু গরম জল পাঠিয়ে দেবেন। আমি একটু সকাল সকালই স্নান করব।

ম্যানেজার। বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! আমি এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আপনি সকালে, মানে দুপুরে কি খাবেন?

লীলা। ভাতই খাব।

ম্যানেজার। কেন, দু'টো ঘি' ভাত করে দিক। আর একটু মাটন কোর্মা। এখানে কোন অসুবিধে নেই। আপনার মুখের কথা পেলেই হ'ল।

লীলা। ওসব কিছু দরকার নেই। ভাত, মাছের ঝোল, আর একটু দই হলেই হবে।

ম্যানেজার। আচ্ছা, আচ্ছা, সে আমি দেখব'খন। আপনি কোন রকম লজ্জা করবেন না। হেঁ হেঁ। যাচ্ছি, আমি গরম জল পাঠিয়ে দিচ্ছি। একখানা ভিনোলিয়া সাবান পাঠিয়ে দেব?

লীলা বলিল, আচ্ছা দেবেন।

গরম জল আসিলে লীলা স্নান সারিয়া চুল ঠিক করিয়া, অ্যাটাচি-কেসের ভিতর হইতে একখানি কমলা-নেবু রংএর ঢাকাই শাড়ী পরিয়া, ম্যানেজারবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইল। ম্যানেজারবাবু আসিলে লীলা বলিল, আপনাদের এখানে নিশ্চয়ই টেলিফোন আছে?

ম্যানেজার। বিলক্ষণ! টেলিফোন নেই, এ কখনো হ'তে পারে? আমার এই চৌত্রিশ বছরের পুরোণো হোটেল। এখানে কে না এসেছে? সেবার দু'জন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এসে হাজির এখানে। হেঁ হেঁ।

লীলা বলিল, আমি সাড়ে দশটার সময়ে একটা টেলিফোন করব। তখন সেখানে আর কেউ না থাকলেই ভাল হয়।

ম্যানেজার। বেশ, আমি ঠিক সময় মত আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব।

ম্যানেজার ওই অবেশা সদ্যস্নাতা তরুণীটির দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তাহার দৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করিয়া লীলা ধীরে ধীরে দরজাটা ভেজাইতে ভেজাইতে বলিল, ঠিক সময়ে ডাকবেন কিন্তু। আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, আমাকে ডেকে তুলবেন।

ঠিক সাড়ে দশটার সময়ে ম্যানেজারবাবু আসিয়া লীলাকে ডাকিয়া টেলিফোনের কাছে লইয়া গেলেন। লীলা দেখিল সত্যই সেখানে আর কেউ নেই। টেলিফোন ডায়াল করিতেই ওদিক হইতে সাড়া আসিল, স্মিথ এণ্ড কোম্পানি—

লীলা। ও, ওখানে গুণেনবাবু বলে কেউ কাজ করেন?

ফোন। হ্যাঁ।

লীলা। তিনি এসেছেন অফিসে?

ফোন। হ্যাঁ।

লীলা। একটু দয়া করে ডেকে দেবেন?

ফোন। নিশ্চয়ই, ধরুন।

একটু পরেই ফোনে শব্দ হইল, হ্যালো?

লীলা। আপনি কি গুণেনবাবু?

ফোন। হ্যাঁ, আপনি ?

লীলা। আমি লীলা।

ফোন। লীলা! কোথা থেকে ফোন করছ ?

লীলা। দয়াময়ী হোটেল থেকে।

ফোন। সে কোথায় ?

লীলা। ১৮নং বাবুবাগান ষ্ট্রীট।

ফোন। তারপর, কি খবর ?

লীলা। আপনি এখুনি একবার আসুন এখানে।

ফোন। একটু কাজ ছিল যে!

লীলা। কাজ থাকলে চলবে না। এখুনি আসুন, এখুনি।

এই কথা বলিয়া লীলা ফোন ছাড়িয়া দিল।

গুণেন তখন অফিসে বলিল, একটু দরকারী কাজে বেরিয়ে যাচ্ছি, ফিরতে দেরি হতে পারে।

গুণেন গাড়ী লইয়া দয়াময়ী হোটেলে পৌছিয়া তের নম্বর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। লীলা তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

গুণেন প্রায় হাঁফাইতেছিল। বলিল, আপনি এখানে কেন ?

লীল। বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মানে, সেখানে থাকা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর গুণেন বলিল, একটা কথা আজ আর তোমাকে না বলে পারছি নে। আমি বিলেত থেকে ফিরবার আগে থেকেই ঠিক করে এসেছিলাম, ফিরে এসে, অবশ্য যদি ততদিন তোমার বিয়ে না হয়ে যায় আর তোমার মত থাকে, তাহ'লে তোমাকেই আমার চিরসঙ্গিনী করে নেব। কিন্তু এখানে এসে যখন শুনলাম, বড় ঘরে তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, তখন আমি আমার মনের কথা আর প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করলুম না। তবু আশা ছিল, হয়তো তুমি তোমার মত বদলাতে পারো। সেই আশাতেই আমি বিয়ের কনে'কে নিয়ে মোটরে বেড়াতে দ্বিধা করি নি। নইলে এটুকু কাণ্ডজ্ঞান আমার আছে, যে পরস্ত্রীকে নিয়ে বেড়ান কোন ভদ্রলোকের পক্ষে উচিত নয়। তারপর কয়দিনে তোমার মনের ভাব যা বুঝেছি, আর কাল রাত্রে সিনেমার সামনে যা দেখলাম, তাতে আমার মনের কথা বলতে আর কোন বাধা নেই। তুমি আমার হবে, লীলা ?

লীলা বলিল, আমার মনের কথা তুমি এখনও বোঝনি ? প্রতিদিন স্বাতীর গঞ্জনা সহ্য করে আর কুৎসিত কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে আমি কোন্ সাহসে তোমার সঙ্গে বেড়িয়েছি এতদিন ? আমি জানতুম, মনে মনে নিশ্চিত জানতুম, তুমি আমারই হবে।

এই কথা বলিয়া লীলা মুখ নীচু করিল।

গুণেন বলিল, তাই হব, লীলা।

৪৭

গুণেন ম্যানেজারবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইল। বলিল, একটা অত্যন্ত জরুরী কথা আছে, আপনার সঙ্গে।

ম্যানেজার। বলুন।

গুণেন। আপনাকে আজই, এই দুপুরের মধ্যে, মানে আর দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে এইখানে আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

ম্যানেজারবাবু ভড়কাইয়া গেলেন। বলিলেন, এ আবার কি কথা আপনারা বলছেন ? শেষে পুলিশ-টুলিশ আসবে না তো ? মশাই আমি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। ও সব ঝামেলার মধ্যে আমি নেই।

গুণেন বলিল, কিছু ভাববেন না। কোন গোলমাল নেই এর মধ্যে। পুলিশ-টুলিশ আসবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এই নিন, বলিয়া গুণেন একখানি এক শত টাকার নোট ম্যানেজারবাবুর হাতে দিয়া বলিল, এই দিয়ে ব্যবস্থা করে ফেলুন। দরকার হ'লে বলবেন, আরো কিছু লাগলেও কোন অসুবিধা হবে না।

ম্যানেজার। পুরুত লাগবে ?

গুণেন। নিশ্চয়ই। সব লাগবে। পুরুত, নাপিত, টোপর, শাখা, শাড়ী, ফুলের মালা, ধুপ, চন্দন—বুঝলেন সব লাগবে। পুরুত মশায়কে দিয়ে ফর্দ্দ করে এখুনি সব আনিয়ে নিন।

ম্যানেজার। বুঝেছি, আমাকে আর বলতে হ'বে না। কত গণ্ডা বিয়ে দিলাম। তবে, হ্যাঁ, এমন দু'ঘণ্টার মধ্যে বিয়ে কখনো দিই নি।

কলিকাতা শহর। এক ঘণ্টার মধ্যেই সব আয়োজন হইয়া গেল।

ইহাদের আয়োজন দেখিয়া অন্যান্য ঘরের মহিলা অধিবাসিনীরা কৌতূহলবশে তের নম্বর ঘরে এবং তাহার

পাশে আসিয়া জমা হইলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা এই বিবাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। হুলুধ্বনিতে হোটেল ভরিয়া উঠিল।

বিবাহের পর পুরুত, নাপিত তাহাদের প্রাপ্য লইয়া বিদায় হইল। বরক'নে খাইতে বসিল। ম্যানেজারবাবু ইহাদের জন্য বিরাট চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজের আয়োজন করিয়াছেন।

আহার পর্ব শেষ হইলে বরকনে উঠিয়া আবার ভাল করিয়া বরকনে'র সাজ পরিলেন। অন্যান্য বোর্ডাররাও পরম আনন্দে যোগদান করিলেন।

গুণেন ম্যানেজারবাবুর হাতে আর একখানি এক শ' টাকার নোট দিয়া বলিলেন, আমরা এখন যাব। আপনাকে অনেক বিরক্ত করলুম, কিছু মনে করবেন না। আজ রাত্রে এখানকার বোর্ডারদের ভাল করে পোলাও আর মাংস খাইয়ে দেবেন।

ম্যানেজার। বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! কি আনন্দ যে আমার হচ্ছে! তবে কি না, এখানে অনেক বোর্ডার রয়েছেন—

এই কথা বলিয়া ম্যানেজারবাবু একটু মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

গুণেন আরো পঞ্চাশ টাকা ম্যানেজারবাবুকে দিয়া লীলার অ্যাটাচি-কেস হাতে করিয়া সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

লীলা কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল, এত টাকা পেলে কোথায়?

গুণেন। তোমার কোন বিপদ হয়েছে মনে করে অফিস থেকে ধার করে নিয়ে এসেছিলাম। বিপদ কেটে গেছে, কেমন?

বোর্ডারগণ ইহাদিগকে ভাল করিয়া বরকনে'র বেশে সাজাইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিল। মহিলারা হুলুধ্বনি করিলেন।

৪৮

যে সময়ে গুণেন প্রত্যহ অফিস হইতে ফেরে, প্রায় ঠিক সেই সময় আজও গুণেনের গাড়ী বাড়ীর দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

লীলা ইচ্ছা করিয়াই ঘোমটা একটু বেশি করিয়া দিয়াছিল, যাহাতে প্রথমদৃষ্টিতেই তাহাকে চেনা না যায়।

রণেন দরজা খুলিয়াই অবাক হইয়া গেল। বলিল, কে, দাদা?

গুণেন। হ্যাঁ রে, মা কোথায়? মাকে ডাক।

বিভাবতী আসিয়া উহাদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, একি? ব্যাপার কি? আমি যে কিছু বুঝতে পারছি নে!

গুণেন। হঠাৎ বিয়ে করে ফেলেছি!

বিভাবতী সবিস্ময়ে উচ্চারণ করিলেন, হ-ঠা-ৎ বি-য়ে ক-রে ফেলেছিস? যা করেছিস, তা করেছিস। আয়, ঘরে গিয়ে বোস। আর সব লোকজন কই?

গুণেন। আর কেউ নেই।

বিভা। বলি কনে'র বাড়ীরও কেউ নেই?

গুণেন। না, মা।

লীলা ভূমিষ্ঠ হইয়া বিভাবতীকে প্রণাম করিল। তারপর বিভাবতী উভয়কে লইয়া ঘরে দুইখানি চেয়ারে পাশাপাশি বসাইলেন। লীলার মুখ তখনও ঘোমটায় ঢাকা।

বিভাবতী বলিলেন, বিয়ে করে বউ আনলি, একটু খবর দিতে হয়। বউকে বরণ করে তুলতে হয়। আচ্ছা, তোমরা একটু ব'স। রণেনকে বলিলেন, শিগগির যা, স্বাতীকে আর সুরেশকে ডেকে নিয়ে আয়। সুরেশ এতক্ষণ নিশ্চয়ই অফিস থেকে ফিরেছে। ওরাই এসে যা করবার, করবে'খন।

রণেন ছুটিতে ছুটিতে গিয়া সুরেশ আর স্বাতীকে লইয়া আসিল। সুরেশ বলিয়া উঠিল, ভায়া, এ কোন দেশি বিয়ে বলত?

গুণেন ও লীলা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। স্বাতী ঘরে উঠিয়াই চিৎকার করিয়া উঠিল, দাদা, তোমার এই কাণ্ড! এ যে বিশ্বাস করতে পারছি নে। কোথা থেকে কি একটা ঘাড়ে করে নিয়ে এলে। দেখি বউয়ের মুখ! দেখি, কি রূপ দেখে মজে গেলে!

এই কথা বলিয়া স্বাতী লীলার কাছে গিয়া তাহার ঘোমটা খুলিতেই 'অ্যাঁ' বলিয়া প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পিছন দিকে চিৎ হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল। তাড়াতাড়ি সুরেশ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া পাশের খাটের উপর লইয়া গিয়া বসাইয়া দিল।

বিভাবতী একগাল হাসিয়া বলিলেন, এই ছিল তোদের মনে মনে? তা খুলে বললেই হ'ত। এর জন্য এত লুকোচুরি কেন?

উপস্থিত সকলেই হাসিয়া আকুল হইল।

বিভাবতী লীলাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার চিবুক ধরিয়া আদর করিতে লাগিলেন। স্বাতী ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া লীলার মাথাটা বুকের মধ্যে লইয়া বলিল, বোনটি আমার!

শেষ

গান

আমি নৃত্য পাগল ঝরণা ধারার জল,
আপনার মনে বয়ে চলি কলকল।
পাহাড়ের বুক টুটিয়া
চলেছি মাটিতে ছুটিয়া
এ নয় হেঁয়ালী, নয় গো এ মোর ছল।
স্বপ্নের পথে আমি যে গো অভিযাত্রী
আঁধারে আলোক, আলোকে আমার রাত্রি।
কুসুমিত বনপথে,
মুক্তির মনোরথে,
ছুটে চলি অবিরাম আনন্দে উচ্ছল—
কাঁকর বিছানো পথের দুদিক্
আমি চিরচঞ্চল॥

কথা : গোপাল ভৌমিক

সুর ও স্বরলিপি : বুদ্ধদেব রায়

গা গা II গা -া মা | পণা পণা -া | গা -া মা | পণা পণা -া I
আমি নৃ ০ ত্য পা গ ল ঝ র্ ণা ধা রা র

মা -া -া | -া -া -া | গা মা পা | র্সা সনা র্রসা I
জ ০ ০ ০ ০ ল আ প না র ম০ নে০

র্সা ণা ধা | পা মা গা | মা -া -া | -া -া -া II
ব য়ে চ লি ক ল ক ০ ০ ০ ০ ল্

II পা মা পা | না না -া | র্সা না র্রসা | -া -া -া I
পা হা ড়ে র বু ক্ টু টি য়া০ ০ ০ ০

পা না না | না র্সা র্সা | ণা ণা ধা | -া -া -া I
চ লে ছি মা টি তে ছু টি য়া • • •

ধা ণা ধা | পা ধা পা | মা -া পা | পা মা পা I
এ ন য় হেঁ য়া লী ন য় গো এ মো র

মগা -া -া | -া -া -া II
ছ০ ০ ০ • ০ ল্

ঝর্ণা ধারার জল........

II গা গা গা | মা মা মা | গা মা গা | মা সা সা I
স্ব প্ নে র প থে আ মি যে গো প ভি

সজ্ঞা সজ্ঞা -া | সা -া -া | ণ্া সা গা | গা মা -া I
যা০ ০০ ০ ত্রী ০ ০ আঁ ধা রে আ লো ক

গা মা গা | পা মা গা | মা -া -া | মা -া -া II
আ লো কে আ মা র রা • ০ ত্রি ০ ০

II গা মা পা | না না -া | না র্সা -া | -া -া -া I
কু সু মি ত ব ন প থে • ০ ০ ০

পা না না | র্সনা র্রর্সা -া | ণা ধা -া | -া -া -া I
মু ক্ তি র ম ন র থে ০ ০ ০ •

ধা ণা র্সা | র্রা র্গা র্মর্গা | র্রা -া র্জ্ঞর্রা | র্সা -া -া I
ছু টে চ লি অ০ বি০ রা ০ ০০ ০ ০ ম্

না র্সা না | র্রর্সা ণা -া | ধা -া -া | -া -া -া I
আ ন ন্ দ০ উ • ছ ০ • • ০ ল্

ধা ণা ধা | পা ধা পা | মা পা ধপা | মা গা -া I
কাঁ ক র বি ছা নো প থে বৃ০ দু দি ক্

গা মা পধা | পা মা গা | মা -া -া | মা -া -া II
আ মি চি০ র চ ন্ চ ০ ০ ০ • ল্

ঝর্ণা ধারার জল......

নাগর স্থাপত্যের আদি কথা ভুবনেশ্বর

শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী

বহু বছর আগে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহ। গ্রীষ্মাধিক্যে বৃন্দাবন থেকে পালিয়ে এসে, সকালের ট্রেণে হাওড়াতে নামি। কিন্তু কলিকাতাতে-ও তখন অসহ্য গরম। তাপের মাত্রা শতের কোঠা পেরিয়ে বহু উচ্চে উঠে গিয়েছে। তাই স্থির হয়, সেই দিনই সন্ধ্যার ট্রেণে পুরী যাত্রা করা হবে। জিনিষপত্র ষ্টেশনে রেখে, বাড়ী থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে এসে, পুরী এক্সপ্রেসে চড়ে পুরী রওনা হই। পরের দিন ভোরে, পুরীতে উপনীত হই। সঙ্গে যান স্ত্রী। জিনিষপত্র হোটেলে রেখে সমুদ্র সৈকতে গিয়ে পৌছাই। সেই দিন ছিল আমার জীবনের পরম স্মরণীয় দিনের অন্যতম, দেখি প্রথম সমুদ্র। দর্শন করি মহাপবিত্র পুরুষোত্তমক্ষেত্রের সমুদ্র-সৈকতে দাঁড়িয়ে বঙ্গোপসাগরকে।

দেখি উত্তাল তরঙ্গ বুকে নিয়ে, উন্মত্ত আবেগে, সহস্র ফণা বিস্তার করে, ছুটে আসেন সাগর। আসেন প্রচণ্ড গর্জনে। প্রতিহত হন কূলে। ছড়িয়ে পড়ে তাঁর শীকর লক্ষ শত ধারায়। প্লাবিত হয় ধরিত্রীর বুক, সোহাগে, আদরে, চুম্বনে আর শুভ্র কলহাস্যে। পরমুহূর্তেই পরিবর্তিত হয় তাঁর রূপ। আসেন তিনি বুক-ভরা স্নেহ নিয়ে, মন্থর তাঁর গতি। বুলিয়ে দেন স্নেহের স্পর্শ বসুন্ধরার অকলঙ্ক ললাটে। ধন্য হয় বসুন্ধরা। বিরামহীন এই খেলা শাশ্বত, চলেছে লক্ষকোটী বৎসর ধরে। সাক্ষী তার একমাত্র, নীলাচলে, মন্দিরে উপবিষ্ট, জগন্নাথ দেব, দারুরূপী ভগবান। তিনিই বলতে পারেন, কবে হবে এর সমাপ্তি। দেখি, বিস্তৃত তাঁর নীল অঞ্চল দিক্‌চক্রবালে, মিশে যায় নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র; হারিয়ে ফেলে তাদের পৃথক সত্তা।

দেখি, মুগ্ধবিস্ময়ে সমুদ্রের এই অপরূপ রূপ। উঠে আসে এক গতির-তরঙ্গ সাগরের বুক থেকে; প্রতিফলিত হয় আমার সর্বাঙ্গে, প্রবেশ করে আমার শিরায় উপ-শিরায়। এক অদম্য তীব্র বাসনা জাগে অন্তরের অন্তর-তম প্রদেশে। ইচ্ছা হয় ঝাঁপিয়ে পড়তে সমুদ্রের বুকে, বিলুপ্ত হ'তে সিন্ধুতে, মিশে যেতে তার গতির তরঙ্গের সঙ্গে, এক হ'য়ে যেতে একেবারে। বাসনা জাগে, ভ্রমণ করতে তাঁর সঙ্গে, নতুন নতুন দেশে, মিশরে, ইরাকে, ইরাণে, তুরস্কে, ইউরোপে, আমেরিকায়, চীনে, জাপানে ও আরও কত দেশে, উপনীত হয়েছে যারা সভ্যতার শ্রেষ্ঠ শিখরে, প্রদীপ্ত যারা সংস্কৃতির আলোকে, মহিমান্বিত যারা কৃষ্টির দ্যুতিতে। উপনীত হতে দক্ষিণ আর উত্তর মেরুতেও। যেতে সেই সবদেশে, যা আজও, হয় নি সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত, রয়েছে অর্দ্ধ আবিষ্কৃত, আর অনাবিষ্কৃত অবস্থায়।

তার পরেও দেখেছি সমুদ্রকে। দেখেছি বঙ্গোপ-সাগরকে। আরবকেও দেখেছি। দেখেছি এই মহা-ভারতের প্রায় সবগুলি সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে, কলিঙ্গের, অন্ধ্রের, তামিলনাদের, চোল মণ্ডলের, কেরলের, বোম্বাইয়ের আর সৌরাষ্ট্রের। দেখেছি কন্যাকুমারীতে, তিনসমুদ্রের মিলন ক্ষেত্রে, বঙ্গোপসাগরকে উদ্দাম বেগে, ছুটতে ছুটতে এসে, শান্ত সৌম্য আরবের সঙ্গে মিশে যেতে। তারপর দুজনের, প্রশান্ত গম্ভীর অচঞ্চল ভারতের বুকে আশ্রয় নিতে, এক হ'য়ে যেতে একেবারে, হারিয়ে ফেলতে তাদের নিজস্ব রূপ।

দেখেছি সিন্ধুকে সহস্রবার। দেখেছি প্রত্যূষে, সকালে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে; সায়ংকালে আর রাত্রিতে। দ্বিপ্রহরে বাতায়নে দাঁড়িয়ে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে, দেখেছি। গভীর রাত্রিতে নিদ্রাথেকে উঠে এসে, আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে বসেও দেখেছি।

দেখেছি তাঁকে কত শত রূপেও। কখনও তিনি

উদ্দাম গতিতে উত্তাল তরঙ্গ বুকে নিয়ে, অমিত বিক্রমে, ধরিত্রীকে গ্রাস করবার জন্য ছুটে আসেন। লক্ষশত ফণা বিস্তার করে, ঝাঁপিয়ে পড়েন তার বুকের উপর। কূলে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে যান। আবার কথনও, উন্মত্ত আবেগে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে, সহস্রবাহু বিস্তার করে, তার কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরেন। সোহাগে, আদরে, চুম্বনে আর শুভ্র কলহাস্যে প্লাবিত হয় তার ললাট। সহ্য করতে পারে না সে আবেগ বসুন্ধরা, হাঁপিয়ে উঠে, চীৎকার করে কেঁদে উঠে। লজ্জিত হ'য়ে ফিরে যান জননী সিন্ধু, যান নীরবে সন্ত্রস্ত পদক্ষেপে। স্তব্ধবুকে পড়ে থাকে ধরিত্রী। কথনও উদ্দাম গতিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েন লক্ষশত ধারায়, শাসনের বেত্রদণ্ড নিয়ে। আবার পরমুহূর্তেই বুকভরা স্নেহ নিয়ে এসে, বুলিয়ে দেন স্নেহের স্পর্শ তার ললাটে, মুছে যায় শাসনের জ্বালা। কথনও তিনি মৌন ধ্যান গম্ভীর। কথনও নিস্তব্ধ, নীরব, নিশ্চল, বিশ্রাম করেন দিগন্তের বুকে, স্থাপিত তাঁর পদ ধরিত্রীর অঙ্কে। কিন্তু যত বার তাঁকে দেখেছি, যে রূপেই দেখেছি, প্রতিবারেই অভিনব মনে হয়েছে তাঁকে। উপলব্ধি করেছি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে, নিত্য নতুন স্পন্দন, নতুন আবেগ, নব উন্মাদনা লাভ করেছি, মহাশান্তিও। এক প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়েছে সারা অন্তঃকরণ।

বহুকীর্তিত এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, পরিচিত শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র নামেও। বিরাজ করেন এখানে নীলাচলে, মন্দিরে, সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীজগন্নাথ, সঙ্গে নিয়ে ভ্রাতা বলরাম আর ভগিনী সুভদ্রাকে দারুময় মূর্তিতে। এই উৎকলেই পতিত হয় সতীর নাভীও, বিরাজ করেন এখানে বিমলাদেবী। তাই পরিচিত পুরুষোত্তম, বিরাজ ক্ষেত্র নামেও। আবার এইথানেই, পর্যায় ক্রমে, দশাবতারে লীলা করেন ভগবান। তাই খ্যাতি লাভ করে এই স্থান দশাবতার ক্ষেত্র নামেও। পরিণত হয় মহাতীর্থে। এই জগন্নাথ ক্ষেত্রেই, প্রচার করেন জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য তাঁর অদ্বৈতবাদের বাণী, প্রতিষ্ঠা করেন গোবধন মঠ পুরীধামে, অন্যতম তাঁর প্রতিষ্ঠিত চারিধামের চার মঠের।

দশ যোজন পরিধি নিয়ে বিস্তৃত এই মহাপবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, বিভক্ত চার মণ্ডলে। বিস্তৃত শঙ্খমণ্ডল পঞ্চক্রোশ, একদিকে তার নীলাচল, অপরদিকে সাগর। মহানদী তীরে, ভুবনেশ্বরে, চক্রমণ্ডল। বৈতরণীতীরে, যাজপুরে, গদামণ্ডল। চন্দ্রভাগাতীরে, অর্কক্ষেত্রে, পদ্মমণ্ডল।

প্রাচীনতম দেশ ভারতের এই কলিঙ্গ। উল্লিখিত আছে তার নাম পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য হিন্দুগ্রন্থে। বিস্তৃত কলিঙ্গ ভারতের পূর্ব উপকূলে, বৈতরণীর তীর থেকে, গোদাবরী, অম্বকা আর মূলাকা পর্যন্ত। স্বাধীন এই রাষ্ট্র, মহা-পরাক্রমশালী তার অধিবাসীরা।

লেখা আছে একটি প্রাচীন শিলালিপিতে, মগধ-সম্রাট মহাপদ্ম নন্দ, নির্মাণ করেন কলিঙ্গদেশে, একটি পয়ঃ-প্রণালী। তাই মনে হয়, পরাজিত হন সমসাময়িক কলিঙ্গরাজ মহারাজ নন্দের কাছে। কিন্তু অবিলম্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করে কলিঙ্গ। স্বাধীন তারা মৌর্য-সম্রাট বিন্দুসার আর চন্দ্রগুপ্তের আমলেও, মহাপরাক্রম-শালীও, বিস্তৃত তাদের প্রভাব আর প্রতিপত্তি ভারতের রাষ্ট্রিক গগনে, লেখেন গ্রীক গ্রন্থকারেরা। তোসালীতে তাদের মহাসমৃদ্ধিশালী রাজধানী, পরিপূর্ণ ধনে জনে, কেন্দ্র স্থল কলিঙ্গ সভ্যতারও।

রাজ্যাভিষেকের আট বছর পরে, সম্রাট অশোক কলিঙ্গবিজয়ের অভিযানে অগ্রসর হন। পরাজিত হন কলিঙ্গরাজ। কিন্তু নিহত হয় লক্ষেরও বেশী লোক, আহত হয় দেড় লক্ষ, হয় গৃহহীন। সমূহ ক্ষতি হয় আরও অনেকের। কলিঙ্গ মগধের অধিকারে আসে, অধিকারে আসে মৌর্য সম্রাট অশোকের। সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে প্রবর্তিত; মগধসম্রাট বিম্বিসারের, মগধকে কেন্দ্র করে, রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি। লাভ করে পূর্ণ পরিণতি। প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম সার্বভৌম সাম্রাজ্য ভারতে।

কিন্তু ক্ষণস্থায়ী মগধের কলিঙ্গে আধিপত্য। স্বাধীনতা ঘোষণা করে কলিঙ্গ কিছুদিন পরেই, পরিণত হয় এক স্বাধীন সার্বভৌম মহাশক্তিশালী রাষ্ট্রে, চেতবংশের প্রবল পরাক্রান্ত খারবেলের নেতৃত্বে, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে। তাঁর অধীনস্থ হন পশ্চিমের মূষিক নগরের অধিবাসীরা, দাক্ষিণাত্যের রথিকরা, হন ভোজকরাও। উত্তরে, পরাজিত হন তাঁর কাছে রাজগৃহের নৃপতি, বৃহস্পতিমিত্র। খুব সম্ভব তিনিই পাটলীপুত্রের অধিপতি পুষ্যমিত্র। তাঁর অধীনস্থ হন অঙ্গ আর মগধরাজ, বিজয়বাহিনী তাড়িয়ে

পর্যন্ত প্রবেশ করে। লেখা আছে তাঁর বিজয়ের কাহিনী হাতীগুম্ফার শিলালিপিতে। নিবদ্ধ থাকে না তাঁর কীর্তি শুধু রাজ্য জয়েই, তিনি সংস্কার করেন রাজধানী কলিঙ্গ-নগরের দুর্গ, প্রাচীর আর তোরণ। সংস্কৃত হয় মহারাজ নন্দনির্মিত পয়ঃ প্রণালীটিও। রচিত হয় একটি জয়স্তম্ভও কুমারী পর্বতের শীর্ষদেশে। পরিগণিত হন তিনি প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতিরূপে।

তারপরের ইতিহাস। ইতিহাস এক উত্থান আর পতনের, জয়ের আর পরাজয়ের, স্বাধীনতার আর পরাধীনতার, গৌরবের আর অগৌরবের। কখনও শক্তি-শালী হন কলিঙ্গরাজারা, স্বাধীন হয় কলিঙ্গ, মহাসমৃদ্ধিশালী হয় কলিঙ্গদেশ, পরিণত হয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে, কেন্দ্রস্থল হয় সংস্কৃতির আর কৃষ্টিরও। গড়ে ওঠে কত অসংখ্য মন্দির কলিঙ্গের বুকে; অঙ্গে নিয়ে প্রকৃষ্টতম স্থাপত্যের নিদর্শন, নিদর্শন এক মহা গৌরবময় সৃষ্টির, কত বিভিন্ন শিল্পও অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম কারুকার্য। এমনই করেই একদিন প্রতিষ্ঠিত হয় কররাজবংশ কলিঙ্গ দেশে, রাজত্ব করেন তাঁরা মহাপরাক্রমে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে। আদি স্রষ্টা তাঁরা কলিঙ্গের, সাজান পবিত্র ভুবনেশ্বরের বুক সুন্দরতম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় কলিঙ্গ দেশে—মহাশক্তিশালী কেশরীবংশ স্থাপন করেন যযাতি অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে। অলঙ্কৃত করেন কলিঙ্গের সিংহাসন কেশরীবংশের চল্লিশ জন রাজা। শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরাও অলঙ্কৃত করেন ভুবনেশ্বরের বুক কত শত মহামহিমময় আর সুন্দরতম মন্দির দিয়ে। পরিণত হয় ভুবনেশ্বর মন্দিরময় নগরে। আবার কখনও মুহ্যমান কলিঙ্গ অধীনতার পাশে, কলঙ্কিত পরাধীনতার আর অগৌরবের গ্লানিতে। পরাধীনতা স্বীকার করতে হয়—অন্ধ্র সাতবাহনদের কাছে, রাষ্ট্রকূট দন্তিদুর্গের কাছে, বেঙ্গীর চালুক্য রাজাদের কাছে, বঙ্গাধিপ শশাঙ্ক আর দেবপালের কাছে। পরাজয় স্বীকার করতে হয় মগধের গুপ্ত সম্রাটদের, কনৌজের হর্ষবর্দ্ধনের আর কাশ্মীরের ললিতাদিত্যের কাছেও। কিন্তু জন্মান না কোন খার-বেলের মত শ্রেষ্ঠ নৃপতি, কোন দিগ্বিজয়ী বীর কলিঙ্গের রঙ্গমঞ্চে, চিরস্মরণীয় হন না কোন কলিঙ্গনৃপতি ইতিহাসের পাতায়, হন নাই বরণীয়ও।

এমনই করেই অতিবাহিত হয় দীর্ঘ সহস্র বৎসর। শেষে, ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, স্থাপিত হয় চোড়গঙ্গ বংশ কলিঙ্গ দেশে (উৎকলে), স্থাপন করেন মহাপরাক্রমশালী অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গ, মাতা তাঁর চোলরাজা রাজেন্দ্র চোলের কন্যা রাজসুন্দরী। রাজত্ব করেন তিনি ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনিই সুরু করেন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের মন্দিরনির্মাণ। মহাপরাক্রমশালী তাঁর পুত্র অধিনায়কও, পরিচিত প্রথম অনঙ্গভীম নামেও, রাজত্ব করেন ১১৭০ থেকে ১২০২ পর্যন্ত। তিনিই নির্মাণ করেন জগন্নাথের মন্দিরে একটি নিভৃত কক্ষ, নির্মিত হয় বহু ঘাট, আর সেতুও সারা কলিঙ্গদেশে। উপনীত হয় কলিঙ্গদেশ সমৃদ্ধির চরম শিখরে। মহাশক্তিশালী রাজা নরসিংহও, রাজত্ব করেন ১২৩৮ থেকে ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি ব্যাহত করেন উৎকলে মুসলমান আক্রমণ। তিনিই নির্মাণ করেন কোণারকের প্রখ্যাত সূর্যমন্দির, অন্যতম শ্রেষ্ঠমন্দির ভারতের। পরিসমাপ্ত হয় জগন্নাথের মন্দিরও তাঁর প্রচেষ্টায় ও অর্থে।

স্থাপিত হয় উৎকলে গজপতিবংশ ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাতা তার কপিলেন্দ্র, এক মহাশক্তিশালী নৃপতি। তাঁর বিজয় অভিযান অতিক্রম করে বহুদেশ, উপনীত হয় বিজয়নগরে, বিদরে আর উদয়গিরিতে। কাঞ্চী তার অধিকারে আসে। গৌরবান্বিত হয় উৎকল, বাড়ে রাজ্যের সীমানাও, বিস্তৃত হয় গঙ্গা থেকে কাবেরী পর্যন্ত। রাজত্ব করেন পুরুষোত্তম ১৪৭০ থেকে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। অধিকার করেন তাঁর রাজ্যের কিছু অংশ বিজয়নগরের নরসিংহ শালুব আর বাহমনীর সুলতানেরা। তাঁর পুত্র প্রতাপরুদ্র দেব, রাজত্ব করেন ১৪৯৭ থেকে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা মেদিনীপুর থেকে গুণ্টুর জেলা পর্যন্ত। পরমভক্ত তিনি যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের, পৃষ্ঠপোষক গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের, অমরত্বলাভ করেন তিনি তাদের সাহিত্যে। এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রেই শ্রীচৈতন্যদেব অতিবাহিত করেন বহু বৎসর, এইখানেই হয় তাঁর মহাপ্রয়াণ। মুকুন্দ হরিচন্দন, এই বংশের শেষ নৃপতি, রাজত্ব করেন ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভোই রাজবংশ অধিকার করেন, উৎকলের সিংহাসনে রাজত্ব করেন। ভোই রাজবংশ মাত্র আঠার বৎসর। ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিতাড়িত

হন ভোইরাজ, গজপতি মুকুন্দ হরিচন্দন উদ্ধার করেন তাঁর হৃত সিংহাসন। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, বাংলার মুসলমান নবাব, সুলেমান কররাণী উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন মুকুন্দ। উড়িষ্যা আসে মুসলমানদের অধিকারে। সুলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড় ধ্বংস করেন জগন্নাথদেবের মহাপবিত্র মন্দির। পরিসমাপ্ত হয় উৎকলে হিন্দুশাসন, সঙ্গে নিয়ে হিন্দু সভ্যতা, হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দুকৃষ্টি। সুরু হয় আফগান আর মুঘলে সংঘাত উড়িষ্যার অধিকার নিয়ে।

পরের দিন ভোরে উঠে, চা পান ও প্রচুর জলযোগ করে, আমরা ষ্টেশন ওয়াগনে চড়ে, ভুবনেশ্বর অভিমুখে রওনা হই। আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে আমাদের মোটর সর্পিল গতিতে ছোটে। সহর অতিক্রম করে, কটক রোডে উপনীত হয়। আবার নক্ষত্র গতিতে ছোটে। রাস্তার দু'পাশে দেখা যায় ঘন বসতি, দেখি কত গ্রাম। ক্রমে বিরল হয় গ্রামের সংখ্যা—পরিবর্তিত হয় রাস্তার রূপও। দেখি দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর, তাদের ফাঁকে ফাঁকে নারিকেল ও কলাগাছের ঝাড়। আমরা অতিক্রম করি কত প্রান্তর, কত ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী, কত উপবন, স্পর্শ করে যাই পবিত্র সাক্ষীগোপালের পদতল। দেখে মুগ্ধ হই এক ক্ষুদ্র মন্দির, অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম শিল্পসম্ভার, আর দেবতা সাক্ষী-গোপাল। বাৎসল্যরসের ব্যঞ্জনার অপরূপ এই মূর্তিটি।

আবার বদলে যায় রাস্তার রূপ। বর্দ্ধিত হয় গ্রামের সংখ্যা, প্রশমিত হয় প্রান্তরের আকারও। দেখতে দেখতে, ভুবনেশ্বর শহরে প্রবেশ করে, লিঙ্গরাজের মন্দিরের সামনে এসে আমাদের মোটর থামে। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি এক মহামহিমময় মূর্তিতে শহরের কেন্দ্র স্থলে, বুকে নিয়ে আছে সমস্ত শহর।

এই ভুবনেশ্বরই বুকে নিয়ে আছে নাগরস্থাপত্যের অন্যতম প্রাচীনতম নিদর্শন, শ্রেষ্ঠ নিদর্শনও। বুকে নিয়ে আছে প্রাচীনতম নিদর্শন আইহোলের দুর্গামন্দির, নির্মাণ করেন চালুক্যরাজারা ষষ্ঠ শতাব্দীতে। কিন্তু এইখানেই তার প্রকৃত সুরু, ক্রমোন্নতি, আবার এই কলিঙ্গ দেশেই, লাভ করে সে পূর্ণ পরিণতি। উপনীত হয় নাগর স্থাপত্য-পদ্ধতি উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, পায় সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠরূপ কোণারকের সূর্য মন্দিরে। হয় বিশ্বজিৎ।

নিবদ্ধ থাকে নাই নাগরস্থাপত্যপদ্ধতি শুধু কলিঙ্গ দেশে। বিস্তৃত হ'য়ে আছে উত্তর ভারতের তিন চতুর্থাংশ ভূভাগ নিয়ে। আছে পাঞ্জাবে, হিমালয়ে—মসরুরে, কাংড়াতে, হাটে রাজৌরাতে—আর কুলুতে, অঙ্গে নিয়ে গণেশ, বিষ্ণু ও দুর্গার মূর্তি। পাঞ্জাবে, গঙ্গার উপত্যকায়—কালারে আর সাপুরে। বাংলায়, বাঁকুড়া জেলায়—বাহুলাড়ায়, সোনাতপনে, বর্ধমান জেলায়—বরাকরে, সুন্দরবনে আর দেহারে। উত্তরপ্রদেশে, ফতেপুর জেলায়। রেওয়াতে, মালোয়াতে আর গোয়ালিয়রেও আছে। জেজাকভুক্তিতে (বর্তমান বুন্দেলখণ্ডে), রাজপুত, চান্দেল্ল বংশের রাজধানী খাজুরাহোতে। আছে সৌরাষ্ট্রে আর পশ্চিম ভারতেও। দাক্ষিণাত্যে, কৃষ্ণা তুঙ্গভদ্রা অববাহিকা পর্যন্ত। তাই সম্ভব নয় তাদের রাজবংশ হিসাবে ভাগ করা। বিস্তৃত হ'য়ে আছে তারা এক একটি অঞ্চল নিয়ে, বুকে নিয়ে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় মন্দির নির্মাণ পদ্ধতিকে, শিল্পশাস্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত করেন—নাগর, বেসর আর দ্রাবিড়। বিভক্ত করেন মনীষী ফার্গুসনও তিন ভাগে—আর্যাবর্তে, চালুক্যে আর দ্রাবিড়ে।

নাগর স্থাপত্য রূপ পরিগ্রহ করে রেখ্ দেউলে। বলা হয় শিখর দেউলও। অনুভূমিক, ঈষদ্‌বক্র এই সব দেউলের গর্ভগৃহের ছাদ, অনুরূপ শুকপাখীর নাসিকার মত, শিখরাকৃতিতে, সোজা উপরের দিকে উঠে যায়। রচিত হয় আমলক আর চূড়া, শিখরের শীর্ষদেশে। রচিত হয় মূল বা প্রধান শিখরের চারিপাশে কতকগুলি শিখরও, পরিচিত অঙ্গশিখর নামে। বিভিন্ন তাদের গঠনরূপ বিভিন্ন অঞ্চলে। বিভিন্ন বাংলার বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরের, আর সুন্দরবনের জটার দেউলের অঙ্গ, শিখরের গঠন রূপও, বৈশিষ্ট্য বাংলার স্থাপত্যের, বুকে নিয়ে আছে তার নিজস্ব রূপ। রচিত হয় গর্ভগৃহের সামনে কোথাও মণ্ডপ, কোথাও অলিন্দ। বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে, ভারতের শ্রেষ্ঠ স্বর্ণযুগ, স্তূপযুগের সমতল ছাদবিশিষ্ট হিন্দুমন্দির। তারা বৌদ্ধস্তূপের অনুকরণে রচিত, তাই শিখরবিহীন।

নির্মিত হয় দ্রাবিড় মন্দিরে, আয়তক্ষেত্র গর্ভগৃহ। তার উপর পিরামিডের আকৃতিতে, ক্রমহ্রস্বায়মান ছাদ বা বিমান। বিমানের উপরে, অষ্টভুজ অথবা [illegible] শিখরা

বা চূড়া। প্রবেশ দ্বারে, শোভা পায় সুউচ্চ ক্রমহ্রস্বায়মান গোপুরম্। স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপও নির্মিত হয়।

নিবদ্ধ এই স্থাপত্যপদ্ধতি, ভারতের দক্ষিণপ্রত্যন্ত প্রদেশ। বুকে নিয়ে আছে দ্রাবিড় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, মহাবলীপুরম, কাঞ্চীপুরম, ভেলুর, চিদাম্বরম, তাঞ্জোর, কুম্ভকোণম, শ্রীরঙ্গম, জম্বুকেশ্বর, মাদুরা, সুচিন্দ্রম, বিজয়নগর আর রামেশ্বরম।

বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ বিমান, তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের মন্দির, ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে, চোল নৃপতি, রাজা রাজদেব চোল নির্মাণ করেন। বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ বিমানের নিদর্শন গঙ্গাইকোণ্ডাপুরমের মন্দিরও নির্মাণ করেন ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র চোল। চতুর্দশতল এই বিমান দুইটি, সোজা চতুষ্কোণ পিরামিডের আকারে উঠে গিয়েছে, শীর্ষে নিয়ে এক একটি সুবৃহৎ গম্বুজ, অঙ্গে নিয়ে সংক্রম। দাঁড়িয়ে আছে এক মহামহিমময় মূর্তিতে, উন্নত করি শির। তাদের শত বৎসর পূর্বে, আরও একটি প্রকৃষ্টতম বিমান, শ্রীবাসানালুরে, কোরঙ্গনাথের মন্দিরে নির্মিত হয়। চোল রাজারাই নির্মাণ করেন। রাজত্ব করেন তাঁরা দক্ষিণভারতে, ৮৫০ থেকে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

পাণ্ড্যরা প্রবল হন দক্ষিণ ভারতে, রাজত্ব করেন ১১০০ থেকে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে গোপুরম দ্রাবিড় স্থাপত্যে, পরিণত হয় স্থপতির মধ্যমণিতে। বর্ধিত হয় গোপুরমের আকার, আর তার অঙ্গের শিল্প সম্ভার; প্রশমিত হয় বিমানের আকার, ম্লান হয় তার অঙ্গের শিল্পসম্ভারও। লুকায়িত থাকে বিমান, মন্দিরের সুউচ্চ প্রাচীরের আর প্রাঙ্গণের অন্তরালে। দাঁড়িয়ে থাকে প্রবেশ দ্বারে, গোপুরম, মহামহিমময় মূর্তিতে, রূপ পরিগ্রহ করে চোল রাজাদের বিমানের, উচ্চতায় ও অঙ্গের শিল্প-সম্পদে। পাণ্ড্যরাজাদের নির্মিত গোপুরমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বুকে নিয়ে আছে চিদাম্বরম, কুম্ভকোণম, শ্রীরঙ্গম ও তিরুভান্নমালাই।

নির্মিত হয় দ্রাবিড় মন্দিরে, সুন্দরতম স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ। বিজয়নগরের হিন্দু রাজারা নির্মাণ করেন। মহাপরাক্রমশালী হন তাঁরা দক্ষিণ ভারতে, রাজত্ব করেন ১৩৫০ থেকে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বুকে নিয়ে আছে বিজয়নগরের রাজাদের রচিত স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, কাঞ্চীপুরমের একাম্বরনাথের মন্দির, বিজয়নগরের বিঠাল স্বামীর মন্দির, আউভাইয়ারের মন্দির, আর ভেলুরের কল্যাণ মণ্ডপ। রাজত্ব করেন কৃষ্ণদেব রায়, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বিজয়নগরের; সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টাও দক্ষিণ ভারতের, ১৫০৯ থেকে ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। উপনীত হয় বিজয়নগর উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, মহাসমৃদ্ধিশালী হয় বিজয়নগর। তিনিই ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে, নির্মাণ সুরু করেন বিঠল স্বামীর শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম মন্দির বিজয়নগরে, অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির দক্ষিণ ভারতেরও। অপরূপ এই মন্দিরের স্তম্ভযুক্ত কল্যাণমণ্ডপ, সুন্দরতম এই মন্দিরের একপ্রস্তর রথটি। সমসাময়িক এই মন্দিরটি রাজঅন্তঃপুরের হাজারামের মন্দিরের। রচিত হয় তাদের ভিতরের প্রাচীরের গাত্রে, মূর্তি দিয়ে রামায়ণের কাহিনী। বিজয়নগর যুগের সুন্দরতম গোপুরম বুকে নিয়ে আছে তদপত্রিয় মন্দির, আছে কাঞ্চীপুরমের একাম্বরনাথের আর চিদাম্বরমের নটেশের মন্দিরও। সম্পূর্ণ রূপ লাভ করে স্তম্ভের শীর্ষদেশের লম্বিত পদ্মাকার বন্ধনী। গড়ে ওঠে অপরূপ স্তম্ভ, বুকে নিয়ে মহাপরাক্রমশালী অশ্ব, পৃষ্ঠে নিয়ে আরোহী। সঙ্গের বাহন সিংহ আর গজলক্ষ্মীও লাভ করে বিচিত্র রূপ। কল্পনাতীত সেই রূপ।

পতন হয় বিজয়নগরের, নায়করা প্রবল হন দক্ষিণ ভারতে। প্রতিষ্ঠা করেন এক স্বাধীন রাজ্য। মাদুরাতে স্থাপিত হয় তার রাজধানী। তিরুমল নায়ক শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, রাজত্ব করেন ১৬২৩ থেকে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তিনিও, দক্ষিণভারতের নির্মাণ করেন মাদুরাতে, মীনাক্ষী মন্দিরের বিপরীত দিকে সুন্দরতম পতুমণ্ডপম, পরিচিত বসন্তমণ্ডপম নামেও। একটি সমতল ছাদবিশিষ্ট দরদালান, এই মণ্ডপমটি, অনবদ্য স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে তিনটি গলিপথে বিভক্ত। তিনিই রচনা করেন মীনাক্ষীর মহামহিমময় মন্দিরে, সুন্দরতম সহস্রস্তম্ভযুক্ত মণ্ডপমটি। রচিত হয় অনবদ্য স্তম্ভ ও অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ মূর্তিসম্ভার, মূর্তি দেবদেবীর, মূর্তি তাঁর নিজের ও দুই পত্নীরও। প্রমাণ আকৃতির এই মূর্তিগুলি। তাঁরই প্রচেষ্টায় ও অর্থে, রচিত হয় শ্রীরঙ্গমে, রঙ্গনাথের মন্দিরে, শেষাগিরি রাতয়ের মণ্ডপম, সুন্দরতম মণ্ডপ দক্ষিণ ভারতের, বুকে নিয়ে আছে এই মণ্ডপটি

শ্রেষ্ঠ অখণ্ডস্তম্ভের নিদর্শন। অপরূপ সুন্দরতম নায়কযুগের রামনাদের, সেতুপতি বংশের রাজা উদয়নের নির্মিত রামেশ্বরমের মন্দিরের মহামহিমময় অলিন্দটি। অনুপম কিন্তু নায়কযুগের রচিত সুব্রমোনিয়ামের ক্ষুদ্র মন্দিরটি, দাঁড়িয়ে আছে তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের মহামহিমময় বিমানের পাশে। সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম এই মন্দিরের অঙ্গের শিল্পসম্ভার। অনবদ্য, তুলনাহীন তার গাত্রের অলঙ্করণও। ভূষিত করেন মহা-অভিজ্ঞ স্বর্ণকার, প্রস্তরের কঠিন বুক অপরূপ সূক্ষ্মতম ভূষণে। রচিত হয় এক অনবদ্য, সুন্দরতম সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠকীর্তি এক মহাগৌরবময় যুগের।

অস্তমিত হয় নায়কদের ক্ষমতা দক্ষিণ ভারতে, পরিসমাপ্তি হয় বৃহৎ মন্দির নির্মাণেরও। কিন্তু মৃত্যুহীন দ্রাবিড় স্থপতি আর শিল্পী, আজও বুকে নিয়ে আছেন তাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষের অতীত গৌরবের স্মৃতি। জাতিতে তাঁরা কাম্মালার, কিন্তু মর্যাদায় ব্রাহ্মণের সমান। ভূষিত তাঁদের পূর্বপুরুষ বিভিন্ন মহাসম্মানিত উপাধিতে। নিযুক্ত তাঁরা মন্দির নির্মাণে, বংশ পরম্পরায়, নির্মাণ করেন মন্দির শিল্পশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী। উত্তরসাধক তাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষের, তাই নাই কোন পরিবর্তন তাঁদের পদ্ধতিতে, আর তাঁদের পূর্বপুরুষ মহা-অভিজ্ঞ ও সুনিপুণ শিল্পী ও স্থপতির পদ্ধতিতে।

নাগর আর দ্রাবিড় স্থাপত্যের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে বেসর স্থাপত্য, বুকে নিয়ে তাদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা।

নির্মাণ সুরু করেন, বেসর পদ্ধতিতে মন্দির, পরিচিত পরবর্তী চালুক্য পদ্ধতি নামেও, পরবর্তী চালুক্যরাজারা। প্রবল হন তাঁরা দাক্ষিণাত্যে, দাক্ষিণাত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা রাষ্ট্রকূটদের পতনের পর, রাজত্ব করেন ৯৭৩ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সাজান ধারোয়ারের, মহীশূরের ও দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল মন্দির দিয়ে নির্মিত নাগর ও দ্রাবিড় পদ্ধতিতে। তাদের যুক্তপদ্ধতিতে অঙ্গে নিয়ে তাদের নিজস্ব রূপ, আপন বৈশিষ্ট্য।

অনুচ্চ এই মন্দিরগুলি, নিম্নতর নাগর দেউলের ও দ্রাবিড় বিমানের তুলনায়। কিন্তু বিস্তৃততর, তারকার পদ্ধতিতে নির্মিত। বেষ্টিত তাদের মহামণ্ডপম বা কেন্দ্রস্থলের সভাগৃহ, তিনটি পৃথক্ গর্ভগৃহ আর বিমান দিয়ে। রচিত হয় বিমানের উপর শিখর, পিরামিডের আকৃতিতে। কিন্তু নয় তারা দ্রাবিড় শিখারার মত তলবিশিষ্ট, থাকে থাকে উঠে যায় শিখারা নীচের গর্ভগৃহের উপরে। অঙ্গে নিয়ে আছে এই মন্দিরগুলি বহু গবাক্ষ, মন্দিরের গাত্রের প্রস্তরের অঙ্গ কেটে তৈরি। বুকে নিয়ে আছে অনবদ্য মসৃণ স্তম্ভের শ্রেণী। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরগুলি সুউচ্চ ভিত্তির উপর, মহামহিমময় মূর্তিতে। বিভক্ত এই ভিত্তি বহু থাকে। অঙ্গে নিয়ে আছে তারা সুন্দরতম অনবদ্য শিল্প সম্ভার, ভূষিত হ'য়ে আছে জীবন্ত সুষ্ঠুগঠন মূর্তিসম্ভারেও। কিন্তু শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই সব মন্দিরের, তাদের সর্বাঙ্গের পর্যাপ্ত অনবদ্য, বৃহৎ মূর্তিসম্ভার, তুলনাহীন এই মূর্তিসম্ভার, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি চালুক্য ভাস্করের, সৃষ্টি এক মহাগৌরবময় যুগের।

বুকে নিয়ে আছে বেসর স্থাপত্যের সুন্দরতম ও প্রকৃষ্টতম নিদর্শন ধারোয়ার জেলার ইতাগী আর সভাসের নিকটের শৈব মন্দির, নির্মিত হয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে। নির্মিত হয় দ্বাদশ শতাব্দীতেও, দোদ্দাবাস ভান্নাতে একটি মন্দির, অঙ্গে নিয়ে গর্ভগৃহ আর মণ্ডপ। রচিত তারকার আকৃতিতে, অপরূপ এই মন্দিরের নির্মাণ কুশলতা, সুন্দরতম অনুপম আর বহুবিস্তৃত এর অঙ্গের মূর্তির সম্ভার। তাই এই মন্দিরটি লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন পশ্চিম ভারতে।

লাভ করে পূর্ণ পরিণতি, উপনীত হয় উন্নতির চরম শিখরে বেসর স্থাপত্য পদ্ধতি হোয়সল রাজাদের আমলে। প্রবল পরাক্রান্ত হন তাঁরা দক্ষিণাত্যে, মহীশূরে, চালুক্য রাজাদের পতনের পর, রাজত্ব করেন ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। মহাপরাক্রমশালী, বিষ্ণু-বর্দ্ধন, অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা ভারতেরও, সুন্দরতম মন্দির দিয়ে শোভিত করেন রাজধানী দ্বারসমুদ্রকে (বর্তমান হলেবিদ)। সুন্দরতম মন্দির দিয়ে শোভিত হয় দোদ্দাসদাবল্লি, সোমনাথপুর আর বেলুড়ও। দাঁড়িয়ে আছে সোমনাথপুরে, কেশবের মন্দির, বুকে নিয়ে—তিনটি গর্ভগৃহ, সংযুক্ত মহামণ্ডপম দিয়ে। বেষ্টন করে আছে সমস্ত মন্দিরটি, একটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ। বেলুড়ে, দাঁড়িয়ে, আছে পাঁচটি মন্দিরের সারি সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি উপমন্দির। বেষ্টিত হ'য়ে আছে

সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে। পূর্বদ্বারে শোভা পায় দুইটি গোপুরম, অঙ্গে নিয়ে অনুপম শিল্পসম্ভার। অপরূপ প্রধান মণ্ডপের বাতায়নের অঙ্গের মূর্তিসম্ভার—আর অলঙ্করণ, বহু বিস্তৃতও। সুন্দরতম বালাসামি আর দ্বারসমুদ্রের কেদারেশ্বরের অঙ্গের ভূষণও মহাসমৃদ্ধিশালী। এই অলঙ্করণ আর অঙ্গের ভূষণ পৌচেছে চরমে, উপনীত হ'য়েছে উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, পেয়েছে শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম রূপ দ্বারসমুদ্রের হোয়সনেশ্বরের অসমাপ্ত মন্দিরে। এক বিশিষ্ট প্রস্তরে নির্মিত এই মন্দিরটি। নমনীয় থাকে প্রস্তর, সদ্যখনিত যখন পাহাড় থেকে। ক্রমে রূপান্তরিত হয় কঠিন প্রস্তরে, বাইরের বাতাসে ও আলোকে। তাই সম্ভব হয় ভাস্করের মন্দিরের প্রতিটি অঙ্গে সুন্দরতম লতাপল্লব আর মহামহিমময় মূর্তির সম্ভার রচনা করা। ভূষিত করা তার সর্বাঙ্গ অনবদ্য অলঙ্করণে আর মহাসমৃদ্ধিশালী ভূষণে। বিভিন্ন জীবন্ত জন্তুর শ্রেণী দিয়ে রচিত হয় ভিত্তির গাত্রে, সর্ব নিম্নপাড়। আছে তাদের মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, অশ্ব, পৃষ্ঠে নিয়ে আরোহী। তার উপরে, মূর্তি দিয়ে রামায়ণ আর মহাভারতের কাহিনী। তাদের ফাঁকে ফাঁকে, লতা আর পুষ্পের পাড়। সবার উপরে, গভীর কুলুঙ্গির ভিতর, বিচিত্র কারুকার্যখচিত চন্দ্রাতপের নীচে, দুপাশের বাতায়নের আর উদ্গত স্তম্ভের মধ্যে, দেবতারা আর দেবীরা বিরাজ করেন। ভূষিত তাঁরা বহুমূল্য শিরোভূষণে আর মূল্যবান অলঙ্কারে, বিরাজ করেন বিভিন্ন ভঙ্গীতে। অপ্সরাও নৃত্যের ছন্দে দাঁড়িয়ে আছেন। মহামহিমময় তাঁদের মূর্তি। কল্পনাতীত এই সৃষ্টি, কীর্তি এক মহাগৌরবময় যুগের।

মন্দিরময় নগর ভুবনেশ্বর কলিঙ্গদেশের, মহাতীর্থ হিন্দুদের, বেষ্টিত হ'য়েছিল তার মহাপবিত্র সরোবরগুলি সপ্তসহস্র মন্দির দিয়ে। আজও দাঁড়িয়ে আছে পাচ শত মন্দির, ত্রিশটি অক্ষত, অবশিষ্ট অর্দ্ধভগ্ন আর ভগ্ন। প্রতীক তারা তার পূর্ব গৌরবের। নির্মিত হয় তাদের মধ্যে প্রাচীনতম মন্দির ষষ্ঠ শতাব্দীতে, সব শেষের মন্দির ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। অব্যাহত থাকে মন্দির নির্মাণের কাজ দীর্ঘ সাত শত বৎসর।

বিভক্ত এই যুগ, তিনটি সুনির্দিষ্ট ভাগে—আদিযুগ ৫০০ থেকে ৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, মধ্যযুগ ৭০০ থেকে ৮৯৯, পরবর্তী যুগ, ৯০০ থেকে ১২৫০। নির্মিত হয় আদি যুগে, পরশুরামেশ্বর, বৈতাল দেউল, উত্তরেশ্বর, ঈশ্বরেশ্বর, শত্রু গণেশেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর আর ভাস্করেশ্বরের মন্দির, সবগুলিই ভুবনেশ্বরে। মধ্যযুগে, মুক্তেশ্বর, লিঙ্গরাজ, ব্রহ্মেশ্বর আর রামেশ্বরের মন্দির ভুবনেশ্বরে। পরবর্তী যুগে, অনন্তবাসুদেব, সিদ্ধেশ্বর, কেদারেশ্বর, যমেশ্বর, মেঘেশ্বর, সারিদেউল, সোমেশ্বর আর রাজা রাণীর মন্দির ভুবনেশ্বরে, ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পুরীতে শ্রীজগন্নাথের মন্দির, কোণারকে সূর্য মন্দির নির্মিত হয় ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে।

বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরগুলি উড়িষ্যার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, আছে উড়িষ্যার মন্দিরের প্রতিটি অংশের বিভিন্ন বিশিষ্ট নামও।

গর্ভ গৃহের উপরে, নির্মিত হয় নাগর পদ্ধতিতে, রেখ্ বা শিখর দেউল। ঈষৎ বক্র রেখায় তার চাল শিখরাকৃতিতে সোজা উপরের দিকে উঠে যায়, শীর্ষে নিয়ে আমলক। আমলকের উপরে শোভা পায় কলস, সবার উপরে, শৈব মন্দিরে ত্রিশূল, বিষ্ণু মন্দিরে চক্র, শিব আর বিষ্ণুর প্রতীক। নিম্নতম ঋজু অংশ বাঢ় নামে পরিচিত, তার উপরের ঈষৎ বক্র অংশকে রথক বা রেখ নামে। বিভক্ত এই অংশ পর্যায়ক্রমে ভূমি আর আমলক দিয়ে। শীর্ষদেশের সমতল শিরাযুক্ত শিলাখণ্ডকে আমলক (আমলকী) বলা হয়। আমলকের নীচে, গ্রীবা বা বেঁকি, উপরে আচ্ছাদন বা কর্পূরি। সবার উপরের অংশ কলস।

নির্মিত হয় গর্ভগৃহের সামনে চতুষ্কোণ মণ্ডপ পরিচিত জগমোহন নামে। ক্রমশীর্ণমান পোতল বিভক্ত পিরামিডের আকৃতিতে উপরের দিকে উঠে যায়—তার ছাদও, পরিচিত পীঢ় নামে। পীঢ়ের উপরে ঘণ্টাকৃতি কলস, পরিচিত ঘণ্টাকলস নামে। তার উপরে আমলক। আমলক শিলার নীচে বেঁকী উপরে কর্পূরি। সবার উপরে ত্রিশূল অথবা চক্র। নীচের ঋজু অংশ বাঢ় নামে পরিচিত। পীঢ় দেউল নামে পরিচিত হয় জগমোহন। সম্পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে উড়িষ্যার মন্দির। দাঁড়িয়ে থাকে মন্দির আর জগমোহন একটি ভিত্তির উপর। পীঠ বা পৃষ্ঠ নামে পরিচিত সেই ভিত্তি।

ভিত্তিগাত্র থেকে উদ্গত চতুষ্কোণ স্তম্ভ পাগ নামে পরিচিত। কেন্দ্রস্থলেরটি রাহা পাগ, প্রান্তদেশের কোণক পাগ আর

অন্তরবর্তীকে অনর্থ পাস। এই পাসের ব্যবহারের উপরই মন্দিরের শ্রেণী বিভাগ নির্ভর করে, বিভক্ত হয় তারা এক রথে, ত্রি-রথে, পঞ্চরথে, সপ্তরথে ও নবরথে। নাই কোন পাস একরথ দেউলের। রচিত হয় ত্রি রথের দুই প্রান্তে দুই কোণক, আর কেন্দ্র স্থলে একটি রাহা পাস। অঙ্গে নিয়ে আছে পঞ্চরথ একটি রাহা, দুইটি কোণক ও দুইটি অনর্থ পাস। সপ্তরথের একটি রাহা, দুইটি কোণক ও চারিটি অনর্থ পাস। পরিচিত তাদের মধ্যে দুইটি পরিণথ পাস নামে। বুকে নিয়ে আছে নবরথের একটি রাহা, চারিটি কোণক—তাদের মধ্যে দুইটি পরিকোণক আর চারিটি অনর্থ পাস। বৈতাল দেউল আর পরশুরামেশ্বরের মন্দির এক রথের পর্যায়ে পড়ে। তার বিমান ত্রিরথের লিঙ্গরাজের, অনন্ত বাসুদেবের, রাজারাণীর, ব্রহ্মেশ্বরের, মেঘেশ্বরের, ভাস্করেশ্বরের, রামেশ্বরের, সিদ্ধেশ্বরের আর যমেশ্বরের মন্দির পঞ্চরথের। সারিদেউলের বিমান ও জগমোহন সপ্তরথের। নাই কোন নিদর্শন নব রথ দেউলের। পরিচিত মন্দির রেখ সপ্ত রথ দেউলে, পীঢ় সপ্তরথ দেউলে, রেখ পঞ্চরথ, পীঢ় পঞ্চরথ দেউলে।

বিভক্ত পীঢ়দেউল ও (জগমোহন) দুইটি শ্রেণীতে, কাঠ আর নাহা ছালিয়াতে। নির্ভর করে এই শ্রেণী-বিভাগ পিরামিডাকৃতি শিখরের উচ্চতার উপর। হয় যদি ঋজু অংশের দুই-তৃতীয়াংশ পরিচিত হয় কাঠছালিয়া পীঢ় দেউল নামে। নাহাছালিয়া পীঢ় দেউলের উচ্চতা, বাঢ়ের উচ্চতার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ। নাহাছালিয়ার নিদর্শন বুকে নিয়ে আছে মুক্তেশ্বরের জগমোহন, কাঠ ছালিয়ার লিঙ্গরাজের আর অনন্ত বাসুদেবের। বিভক্ত তারা ঘণ্টা শ্রীমোহন, নাড়ুমোহন আর পীঢ়মোহনেও। ঘণ্টাশ্রীমোহনের শীর্ষদেশে, থাকে আমলক, শ্রী, ত্রিপদধারা আর কলস। দৃশ্যমান নয় নাড়ুমোহনের কাঁটি, নাই শীর্ষদেশে শ্রী আর আমলক, শোভিত শুধু কলস দিয়ে। পীঢ়মোহনের নাই আমলক, নাই কলসও শুধুই নিরাভরণ পীঢ়।

বিভক্ত নীচের ঋজু অংশও (বাঢ়) পাঁচ ভাগে, জঙ্ঘা, বারাণ্ডি, বন্ধন, উর্ধ্ব বারাণ্ডি ও উর্ধ্ব জঙ্ঘাতে।

বাঢ়ে মন্দিরের আকার রচিত হয় একই অঙ্কে, পৃষ্ঠের উপর পীঢ় দেউলের সম্মুখে নাটমন্দির, নাট মন্দিরের সামনে ভোগ মন্দির। দুই ভাগে বিভক্ত তাদের চালও, ঘনক্ষেত্র তাদের নীচের অংশ, পরিচিত বাঢ় নামে, পিরামিডাকৃতি তাদের উপরাংশ পরিচিত পীঢ় নামে। একতল এই মন্দির-গুলি, একতল জগমোহনও।

বেলেপাথরের তৈরী এই মন্দিরগুলি। মুক্তেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর আর বৈতাল দেউল ছাড়া, নাই তাদের অভ্যন্তরে ভাস্করের হস্তের স্পর্শ, নাই মূর্তির সম্ভার, কোনকারুকার্যও নাই। বিরাজ করেন সেখানে মন্দিরের দেবতা, নিভৃতে, স্বল্পালোকে, এক রহস্যময় অলোকসুন্দর পরিবেশে।

স্তম্ভবিহীন এই মন্দিরগুলি। স্তম্ভের পরিবর্তে রচনা করেন উড়িষ্যার মহা-অভিজ্ঞ স্থপতি, মন্দিরের ঋজু অংশে, বারাণ্ডির অঙ্গে, উদ্গত স্তম্ভ অথবা পাস, শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য উড়িষ্যার মন্দিরের। মূর্তি আর লতাপুষ্প দিয়ে শোভিত করেন তার সর্বাঙ্গ উড়িষ্যার সুনিপুণ ভাস্কর, নিঃশেষ করে দিয়ে হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য, মিশিয়ে দিয়ে মনের সবখানি মাধুরী। রচিত হয় এক একটি সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, স্বর্গপুরী, ইন্দ্রলোক। কেউ বলেন, অবলম্বন করেন তাঁরা মানসারের পদ্ধতি, কেউ বলেন, মানসারের নয়, শিল্প-শাস্ত্রের।

রচিত হয় মন্দিরের তিন গাত্রে, দক্ষিণে, বামে আর পশ্চাতে, কেন্দ্রস্থলের উদ্গত স্তম্ভের (রাহপসের) অঙ্গে তিনটি সুবৃহৎ আর সুগভীর কুলুঙ্গি। সাজান তার চারি-পাশ ও শীর্ষদেশ, সুন্দরতম বিভিন্ন লতাপুষ্প আর অনবদ্য ঝালর দিয়ে। দোদুল্যমান হারের অঙ্গ থেকে বিলম্বিত হয় একটি পদ্মও শীর্ষদেশে। নির্মিত হয় এই সব কুলুঙ্গিতে, এক একটি মহামহিমময় পার্শ্বদেবতার মূর্তি। শৈব মন্দিরে, পিছনের প্রাচীরের গাত্রে, কার্তিকেয়, দক্ষিণে গণেশ ও বামে পার্বতীর মূর্তি। বিষ্ণুমন্দিরে, নরসিংহ, বামন আর কল্কীর মূর্তি, মূর্তি বিষ্ণুর তিন-অবতারের। শাক্তমন্দিরে, হরগৌরী, দুর্গা আর ভৈরবীর। সূর্য মন্দিরে, তিন সূর্যের, বিভিন্ন তাঁদের ভঙ্গী। অপরূপ এই মূর্তিগুলি, সুষ্ঠু গঠন, জীবন্ত। অনুপম, অনবদ্য কুলুঙ্গির অঙ্গের শিল্প সম্ভারও, প্রতীক উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের। তাদের দুই পাশে, অনর্থ পাগের অঙ্গে, আটটি ক্ষুদ্রতর, অগভীর কুলুঙ্গির মধ্যে, অষ্ট দিক্‌পালের মূর্তি, সঙ্গে নিয়ে তাঁদের বাহন। উত্তরে, ধনাধিপতি কুবের, সপ্ত কলসের যানবাহনে। উত্তর-পূর্বে, হরিণবাহনে বায়ুর অধিপতি পবন। উত্তর-পশ্চিমে,

মকরবাহনে জলাধিপতি বরুণ। দক্ষিণ পশ্চিমে, নরবাহনে নৈঋত। দক্ষিণ-পূর্বে, মহিষবাহনে মৃত্যুদেবতা যম। মেষ বাহনে অগ্নি, ঐরাবতের পৃষ্ঠে দেবরাজ ইন্দ্র, বৃষ বাহনে ঈশান বা মহাদেব। অধিকার করে আছেন তাঁদের পুরাণে বর্ণিত দিক। অনর্থ পাসের অঙ্গে, বৃক্ষের নীচে, অষ্টসখীর মূর্তি। নির্গত তাদের অঙ্গ বারাণ্ডি থেকে। অপরূপ এই মূর্তিগুলি, দাঁড়িয়ে আছেন কত পীনোন্নত-বক্ষা,যৌবনমদেমত্তা লাস্যময়ী নারী,বিভিন্ন অনবদ্য ভঙ্গীতে। বাদ যায় না নাগ আর নাগিনীর মূর্তিও। সর্পের পূজারী হিন্দুরা, পূজা করেন মনসা, তক্ষক, অনন্ত,বাসুকি ও আরও কত সর্পকে, তাই অধিকার করে এক বিশিষ্টস্থান নাগ আর নাগিনীরা উড়িষ্যার মন্দিরের অলঙ্করণে। তারা কেউ একফণাযুক্ত, কারও শীর্ষে শোভা পায় একাধিক ফণা।

ব্যবহৃত হয় জন্তু ও মন্দির অলঙ্করণে। প্রধান তাদের মধ্যে শার্দুল। দাঁড়িয়ে আছে বীরদর্পে তারা হস্তীর পৃষ্ঠের উপর, পৃষ্ঠে উপবেশন করে, চালনা করেন সেই হস্তী কোথাও নর,কোথাও নারী। লাগামের অঙ্গ থেকে বিলম্বিত হয় বহুমূল্য ঝালর। দাঁড়িয়ে থাকে তারা বিমান আর জগমোহনের সন্ধি স্থলে, কলুঙ্গির মধ্যে। দাঁড়িয়ে আছে শৃঙ্গী, উন্নতকর্ণ কেশরী, মন্দিরের প্রধান প্রবেশপথের দুই পাশে, মুখ বাড়িয়ে আছে বিমানের অঙ্গ থেকে শোভাকরে আছে জগমোহনের শীর্ষদেশ। আছে কত বিভিন্ন স্থানে, কত বিভিন্ন রূপে।

সিংহের পরেই হস্তীর স্থান। বাহন তারা শার্দুলের। রচিত হয় হস্তীর সারি জঙ্ঘার অঙ্গে। দাঁড়িয়ে আছে এক প্রস্তর হস্তী অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে, সারি দেউলে আর কোণারকের সূর্যমন্দিরে। অপরূপ, জীবন্ত এই হস্তীগুলি, শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে কোণারকের হস্তীটি। হস্তীর পরেই অশ্ব। দাঁড়িয়ে আছে, পীরের অঙ্গে। শ্রেষ্ঠ অশ্ব বুকে নিয়ে আছে কোণারকের সূর্যমন্দির। মহাপরাক্রম শালী এই অশ্বগুলি, অপরূপ, সুষ্ঠু গঠন, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের। আছে বৃষ, গরু, হরিণ, খরগোস, রাজহংস, বানর আর মকর ও। জীবন্ত তারাও। সুন্দরতম লিঙ্গরাজের মন্দিরের এক প্রস্তর দেবতার বাহন বৃষ্টি। অপরূপ এই মকরের মূর্তিও, বিকশিত তাদের দণ্ড, বিস্তৃত পক্ষ ও পুচ্ছ, অনুরূপ চালুক, ভাস্করের রচিত-মকরের মূর্তির।

সাজান উড়িষ্যার ভাস্কর মন্দিরের প্রবেশ পথও অনুপম সাজে। অলঙ্কৃত করেন তাদের সম্মুখভাগের তিন দিক, তিন শ্রেণীর লতা দিয়ে কেউবুকে নিয়ে আছে পুষ্প, কেউ পুষ্প আর নর অথবা জন্তুর মূর্তি। সুন্দরতম তাদের পরিকল্পনা, অনবদ্য রূপদান। এই লতার পুষ্প দিয়েই রচিত হয়, দ্বারের অঙ্গের কাঠামো, অলঙ্কৃত করা হয় তার সর্বাঙ্গ। শোভিত হয় চৌকাঠের অঙ্গ, কোথাও লতা কোথাও বা নর ও নারীর কাল্পনিক দৃশ্য দিয়ে। কোথাও বা শোভাপায় সারি সারি উড়ন্ত অপ্সরা; অপরূপ এই মূর্তিগুলি। ঊর্দ্ধ চৌকাঠের কেন্দ্রস্থলে, প্রক্ষিপ্ত শিলার উপর, রচিত হয় মহামহিমময়ী লক্ষ্মীর মূর্তি। মূর্তি গজ-লক্ষ্মীর, মূর্তি মহালক্ষ্মীরও। একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর উপবিষ্টা গজলক্ষ্মী, বিলম্বিত তাঁর দক্ষিণ পদ। তাঁর দুই পাশে, দুই হস্তী, উত্তোলিত তাদের শুণ্ড দেবীর মস্তকের উপর, নিযুক্ত তাঁর শিরে বারি সিঞ্চনে। প্রস্ফুটিত পদ্মাসনে উপবিষ্টামহালক্ষ্মী, কিন্তু নাই তাঁর দুই পাশে, দুই গজ, সহচর গজলক্ষ্মীর। বাজুর দুই পাশে, পীড় দেউলের প্রতীক। তাদের দক্ষিণে মকরবাহনে গঙ্গা আর কূর্ম-বাহনে যমুনা, বামে মহাকাল আর নন্দী। প্রবেশ পথের পুরোভাগে নবগ্রহের মূর্তি খোদিত হয় মূর্তি—রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, কেতু আর রাহুর। কল্যাণ-দাতৃ তাঁরা মানবের, দান করেন স্বাস্থ্য, সম্পদ ও সমৃদ্ধি। অলঙ্কৃত হয় নবগ্রহের মূর্তি দিয়ে শ্রীদেউলের, আর জগ-মোহনের সন্ধিস্থলের প্রবেশ পথও।

রচিত হয় মন্দিরের গাত্রে, জালির বাতায়ন ও। বিভিন্ন তাদের আকৃতি কেউ চতুষ্কোণ, কেউ অষ্ট, কেউ আয়ত ক্ষেত্র। কেউ কারুকার্যবিহীন, শোভিত কারও অঙ্গ লতাপুষ্প আর মূর্তি দিয়ে। শোভিত মন্দিরের গাত্র ও বিভিন্ন, অনবদ্য পুষ্প সম্ভার দিয়ে।

লাভ করে উড়িষ্যার মন্দিরের প্রতিটি অঙ্গ, মহা-অভিজ্ঞ ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শ, সিঞ্চিত হয় তাঁর মনের অপরিসীম মাধুর্যে, মহিমান্বিত হয় হৃদয়ের অন্তহীন ঐশ্বর্যে, প্রাণবন্ত হয়, বাঙময় হয়। পরিণত হয় শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম সৃষ্টিতে, এক অমর কীর্তিতে। পায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের ভাস্কর্যের দরবারে, হয় বিশ্বজিৎ।

স্বামীজি স্মরণে

গোবিন্দ হালদার

শতাব্দীর অন্ধকার ভেদ করি উদিলে আবার
হে অনন্ত মহাসূর্য্য! তোমারে প্রণমি বারে বারে।
ত্যাগের প্রতীক তুমি বহ্নিদীপ্ত চির জ্যোতিষ্মান্।
শাশ্বত ভারত আত্মা তোমাতে হয়েছে মহীয়ান্।
রূপমূর্ত্তি তুমি শুধু ওজঃ বীর্য্য তেজঃ স্বরূপের।
বজ্রকণ্ঠে নির্ঘোষিয়া জয়গাথা গাহিলে প্রেমের।
যেজন সেবিছে জীবে ঈশ্বরের সেবা করে সেই।
অমৃতের পুত্র নর, মৃত্যু তার কোনোখানে নেই।
বেদান্ত ঘোষিত বাণী দীপ্ত সুরে করিলে ভাস্বর।
সাম্যের নতুন মন্ত্র শুনিল সমগ্র চরাচর।
'কিবা মুচি, কী মেথর, কী দরিদ্র,
কিবা সে পণ্ডিত,—
ভ্রাতৃজ্ঞানে ডাকো সবে ক্ষুদ্রতার হইয়া অতীত:
বলেছিলে হে সন্ন্যাসী, আসমুদ্র হিমাচল হ'তে
ভাসাতে জগত জনে আত্মত্যাগ চির সেবা ব্রতে।
'প্রেম দিয়ে জয় কর, ভালবেসে হও মহীয়ান্'—
জাগ্রত বিবেক আত্মা আনন্দে করেছে সবি দান।

অহমত্ত পশ্চিমের ভ্রূকুটিরে করনিকো ভয়।
শাশ্বত বেদান্তবাদ প্রচারিলে হে চির নির্ভয়।
জড়বাদী মানুষের অবিশ্বাসী দৃষ্টির সম্মুখে
সমুন্নত শির তুলি দাঁড়ায়েছ অকম্পিত বুকে।
সিংহনাদে ঘোষিয়াছ ভারতের চিরকীর্ত্তি গাথা।
স্তব্ধবাক্ বিশ্ববাসী সবিস্ময়ে শুনি সে বারতা
কণ্ঠে তব তুলি দিল বিজয়ের বরমাল্যখানি।
সে মাল্য তুমি ত' বীর জননীরে ফিরি
দিলে আনি।

শৃঙ্খলিত দেশমাতা চোখে যার বহে অশ্রুনীর—
ঘুচাতে [illegible] আজীবন রহিলে অধীর।

ঘরে ঘরে বলে গেলে যৌবনের বহ্নিদীপ্ত বাণী—
জড়তা জড়িত ঘুমে শুধু তীব্র কষাঘাত হানি:
'ওঠ, জাগো, তেজ বীর্য্যে, আত্মত্যাগে হও মহীয়ান্।
মৃত্যুজয় করি' চির অমৃতের করহ সন্ধান।'
মন্ত্রিত তোমার ভেরী বজ্রসম ঘোষি' দিকে দিকে
আঁধার দিগন্তে গেল অরুণের রক্তলেখা লিখে।
প্রভাত আসিল কবে তুমি চলে গেলে বহু দূর।
কোটী কণ্ঠ উচ্চারিল জীবনের মহামুক্তি সুর।
সম্মুখের যাত্রী যারা শিহরিল তব মন্ত্র স্বরে।
ওই মূর্ত্তি দীপ্যমান অভ্রভেদী মহিমা শিখরে।
আজো সে প্রেরণা বহ্নি জ্বলিতেছে অনির্ব্বাণ হ'য়ে
শতাব্দী পুঞ্জীত ঘন অন্ধকারে 'চির জ্যোতি লয়ে'।

দুর্য্যোগের ঘনঘটা আজ পুনঃ হেরি যে আকাশে।
নাগিনীর বিষশ্বাস ফেনায়িত নির্মল বাতাসে।
শান্তির শিবির ছিন্ন, অস্ত্রে শান্ দেয় শত্রু পিছে।
সত্য, ধর্ম্ম, মহাপ্রেম—অপমানে গুমরি মরিছে।
তোমার অমোঘ বাণী আরবার ঘোষিতে সবলে
শক্তি দাও মহাযোগী—এসেছি তোমার ছায়াতলে।
তোমার ত্যাগের বর্ম্মে আচ্ছাদিত কর দেহখান্।
মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরে উজ্জীবিত করি শত প্রাণ।
ঘরে ঘরে ডাক দিয়ে বলে যাই: 'ওঠো, জাগো সবে
অমৃত সন্ধান লাগি যেতে হবে মৃত্যুর উৎসবে।'

ব্রত শেষ করি যবে তব পায়ে লভিব বিশ্রাম—
সেদিন তোমারে দেব মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মার প্রণাম।
আজ শুধু রুদ্রতেজে বহ্নিদীপ্ত করি [illegible]
তোমার বিবেক মাঝে ছেড়ে দাও [illegible]
তব বাণী কণ্ঠে নিয়ে যারে যাবে [illegible]
অন্ধকার শুধু নয়, রাত্রিশেষে [illegible]
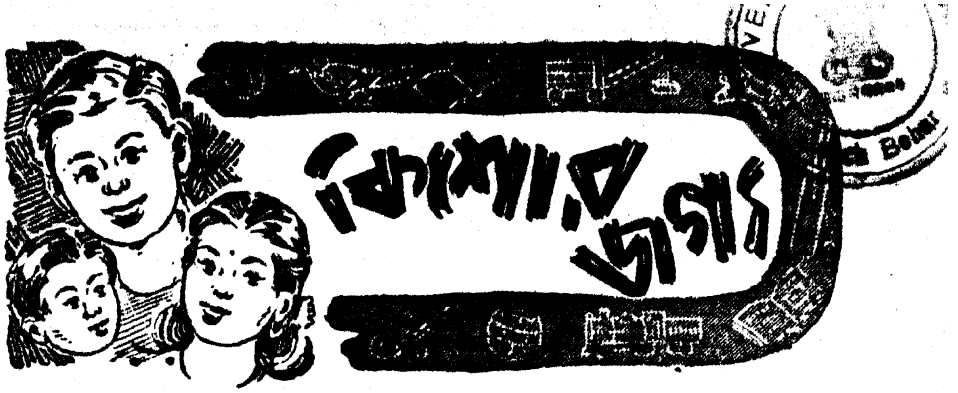
মহাকাশের কথা

উপানন্দ

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের গড় আয়ু হিসেব করেছেন। তাঁরা বলেন বর্ত্তমান মহাকাশে যে সব নক্ষত্র আমাদের নজরে পড়ছে, তাদের অধিকাংশই দেখা দিয়েছে গত পাঁচশত কোটি বছর আগে। প্রত্যেক নক্ষত্রই চলেছে নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্য দিয়ে। নতুন নক্ষত্র জন্ম নেবার পরে চলে একটা সুনির্দ্দিষ্ট জীবন ধারায়। কোটি কোটি বছর ধরে কোনরূপ মৌলিক পরিবর্ত্তন ছাড়াই চলতে থাকে নক্ষত্রের দীপ্যমান জীবন, একটি জলন্ত তাপ-কেন্দ্রিক চুল্লী হিসেবে। ক্রমে শেষ হয়ে আসে চুল্লীর হাইড্রোজেন জ্বালানি। নক্ষত্রও শীতল এবং প্রসারিত হোতে সুরু করে, আর বিরাট আকার ধারণ করে। পঞ্চাশ এমন কি শতগুণ বড় হয়ে যায় আকারে। তখন সে হয়ে ওঠে একটি বিরাটকায় রক্তবর্ণ দানব। এই অবস্থায় সে কোটি কোটি বছর থাকতে পারে। তারপর দ্রুতগতিতে যখন নিঃশেষ হোতে থাকে হাইড্রোজেন জ্বালানি, তখন তার আভ্যন্তরীণ চাপও হ্রাস পেতে থাকে ; সঙ্কুচিত হয়ে আসে তার স্ফীত বহির্ভাগ। এ অবস্থায় চলার সময়ে নক্ষত্রে কম্পন সৃষ্টি হয়। কালক্রমে তার বহির্ভাগের কোন কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আর খসে পড়ে, হ্রাস পেতে থাকে বস্তু-ভার। তা ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে হোতে থাকে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। এর ফলে পূর্ব্বের তুলনায় নক্ষত্র বহুগুণ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু এরূপ বিস্ফোরণ সচরাচর হয় না। এধরণের বিস্ফোরণের দরুণ নক্ষত্রের বাইরের স্তর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মহাকাশে। এ রকম অবস্থায় নক্ষত্রটিকে বলা হয় 'নোভা' বা 'সুপার নোভা'। এই ভাবে ছড়িয়ে-যাওয়া নিক্ষিপ্ত ধূলিকণা থেকেই আবার জন্মলাভ করে নতুন নক্ষত্র। সেই নতুন নক্ষত্র চলতে থাকে কোটি কোটি বছর ধরে, বিবর্ত্তন ধারার মধ্যদিয়ে অতিক্রান্ত হোতে থাকে, শেষে কয়েক শত কোটি বছরের ভেতর তার মৃত্যু ঘটে, নিজেই আবার যে ধূলা থেকে জন্ম নিয়েছিল, সেই ধূলিকণায় পরিণত হয়।

নক্ষত্রের স্তর যত সঙ্কুচিত হয়ে আসে, ততই বৃদ্ধি পায় তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। নক্ষত্রগুলিকে আমরা আকাশে দেখি কত সুন্দর, কিন্তু এরা এক একটি গর্জ্জন-মুখর অগ্নি-কুণ্ড বিশেষ। পৃথিবীতে আমরা যতরকম রাসায়নিক যৌগের সঙ্গে পরিচিত, সব গুলিরই জন্মক্ষেত্র এই সব অগ্নিকুণ্ডে। ঐ কুণ্ড থেকে ওরা ছিটকে গিয়ে পড়ে মহাশূন্যে, বিভিন্ন তারার মাঝখানে গিয়ে ধূলিকণার সঙ্গে মিশে যায়, আর নিজেদের দল বৃদ্ধি করে। নক্ষত্রের জীবনকাল প্রধানতঃ নির্ভর করে তার ভরের ওপর। বিরাট নক্ষত্র-গুলি যা চোখে পড়ে ক্ষুদ্র নক্ষত্রদের চেয়ে তাড়াতাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

একদিন আমাদের যেদিন সূর্য্যকে দেখা যাবে কৃষ্ণবর্ণ

প্রেতের মত। যে সব গ্রহ উপগ্রহ সেই সময় পর্য্যন্ত টিঁকে থাকবে সেগুলিও নিয়মিত ভাবে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে সূর্য্যকে। কিন্তু এ সব ঘটনা ঘট্‌বার আগেই হয়তো পৃথিবীর কায়কল্প হবে। তার প্রাচীনত্ব চলে যাবে, লাভ করবে সে নব জীবন। যে সব অনন্তসাধারণ ঘটনায় যোগাযোগে একদা সৃষ্টি হয়েছিল এই পৃথিবী, সেগুলির পুনরাবৃত্তি হবে সূর্য্যের নিষ্প্রভ হবার পথে তাঁর পাণ্ডুর আলোকে। আবার সৃষ্টি হবে নতুন সমুদ্র, হয়তো প্রবল বারি বর্ষণের ফলে। সমুদ্রের জল থেকে উঠ্‌বে প্রচুর জলীয় বাষ্প। তারা সূচনা করবে প্রাণধারণের উপযোগী জীবনরক্ষাকারী বায়ু মণ্ডল। নতুন করে জেগে উঠ্‌বে প্রাচীন পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ, জাগ্‌বে নতুন কম্পন, সৃষ্টি হবে নতুন নতুন পাহাড় পর্ব্বত।

সে দিন থাকবেনা আমাদের পরিচিত পর্ব্বত শিখর-গুলি। এরা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এরা চলে যাবে, আসবে আগ্নেয় গিরি। তা থেকে হবে অগ্ন্যুৎপাত। এই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে জন্ম নেবে নতুন পর্ব্বত। তারা আবার হবে নভো চুম্বী। আবার হয় তো সমুদ্রের অতল গহ্বর থেকে জেগে উঠবে নতুন নতুন মহাদেশ। সেখানে বাস করবে আগামী দিনের নতুন নতুন মানব জাতি।

গণিতের সূত্রের সাহায্যে প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা চলে। এই সূত্র গণিতের পরিভাষায় সমীকরণ ও বিমূর্ত্তণ (equations and abstradis)। কিন্তু ব্যাখ্যা সব সময় খাটে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় কোয়াণ্টাম, পদার্থ বিজ্ঞান তার তত্ত্বে বলা হয়েছে প্রকৃতি অবিরাম গতিতে এগিয়ে যাচ্ছেনা, লাফিয়ে বা ঝাঁকুনি দিয়ে চলছে একটু একটু করে। এই ভাবে লাফিয়ে বা ঝাঁকুনি দিয়ে চলার জন্যে নামকরণ হয়েছে 'কোয়ান্টা'। আইনষ্টাইন দেশ কাল ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গঠন সম্পর্কে অভিনব ধারণা প্রকাশ করে আধুনিক বিজ্ঞানের সমগ্র গতিই আকস্মিক ভাবে পাল্টে দিয়েছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী গণিত সূত্রের সাহায্য নিয়ে আমরা প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে পর্য্যবেক্ষণ করে চলেছি।

যে বস্তু-বিশ্ব আমাদের চোখের সামনে ভাসে, বিজ্ঞান তাকে ছায়া রূপকে পরিণত করেছে। এই জগতে যে গভীরতর পদার্থের অস্তিত্ব আমরা দেখ্‌তে পাই, বিজ্ঞান বলে—তারা আমাদের অনুভূতির অনধিগম্য এক গভীরতর বাস্তব সত্তার প্রতীক। এ সত্তা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। কারণ আমাদের ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল। তাই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উন্নতির প্রতি ধাপে প্রশস্ততর ও গভীরতর হয়ে উঠ্‌ছে মানুষ আর যন্ত্রবিজ্ঞানের দুনিয়ার মধ্যে ব্যবধান।

যে স্থানে (Space) আমরা বাস করছি আর চলা ফেরা করছি—আর যে সময়ের (Time) দ্বারা আমাদের কাজ কর্ম্ম ও জীবন কালের পরিমাপ হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে 'স্থান' ও 'সময়ের' নিজস্ব কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। আমরা বস্তুপুঞ্জের বিন্যাস দেখি, আর তা থেকেই জাগে আমাদের স্থানের ধারণা। যে ঘটনা পরম্পরার দ্বারা আমরা সময়ের পরিমাপ করে থাকি তা থেকে আলাদা করে দেখলে সময়ের কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না। প্রকৃত পক্ষে আমরা সাধারণতঃ সময়ের যে পরিমাপ করে থাকি তা আসলে কিন্তু মহাশূন্যেরই পরিমাপ। আর এই মহাশূন্য আর সময় সৌরজগতের গতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

আলোর গতিকে প্রকৃতির একটি ধ্রুবক হিসেবে নিয়েছেন আইনষ্টাইন। এর মাধ্যমে তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। কোন দ্রুত চলমান বস্তুর সঙ্গে একটা ঘড়ি বেঁধে দিলে সেই ঘড়ি একটা স্থিতিশীল ঘড়ি থেকে আলাদা তালে চলতে থাকবে। সেই বস্তুর গতি যত বাড়বে, ঐ ঘড়ির কাঁটার গতি ও তত কমবে। বিশ্বে আলোকের গতি সব চাইতে বেশী। চলমান বস্তুটি সেই গতিতে পৌঁছুলে ঐ ঘড়িটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে।

অনুরূপ ভাবে কোন ব্যক্তি যদি ঐরকম জোরে চলতে থাকে, তবে তাঁর শরীরের অন্যান্য ক্রিয়াপ্রক্রিয়া এবং হৃৎস্পন্দনের গতিবেগ ও কমে আসবে। কিন্তু তার হাতে বাঁধা ঘড়িটার গতি ও সেই অনুপাতে কমে যাবে বলে চলমান ব্যক্তি এই পরিবর্ত্তন বুঝতে পারবে না। কোন স্থিতিশীল পর্য্যবেক্ষকের কাছেই কেবল তা ধরা পড়বে। যদি এইভাবে বেশ কয়েক বছর ধরে কোন [illegible] থাকে তবে সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে [illegible] একই সময়ের ব্যবধানে স্থিতিশীল [illegible] চলমান ব্যক্তিকে দেখাবে [illegible]।

আইনষ্টাইন যুক্তি দিয়েছেন—কোন বস্তুর গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ভরের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। অতএব শক্তিমাত্রেরই ভর আছে, আর ভর শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যে বিরাট শক্তি নিহিত থাকে, আইনষ্টাইনের এই তত্ত্বই সেই সূত্রের সন্ধান দিয়েছে। এক কিলোগ্রাম কয়লাকে সম্পূর্ণ ভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে তা থেকে পাওয়া যাবে ২৬ হাজার মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎশক্তি।

আইনষ্টাইন যে নিরবকাশ বিশ্বের কল্পনা করেছেন, তার কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নেই। সে মহাবিশ্ব, সে সসীম। সসীম বটে, কিন্তু চেষ্টিত নয়। সে অনন্ত। এই মহাবিশ্ব চতুর্মাত্রিক। সময় হচ্ছে এর চতুর্থ মাত্রা। এই মাত্রা মহাবিশ্ব সীমার মাঝে অসীম। আপন গণ্ডিতে আপনি ঘেরা। বক্রাকৃতি। এতে যে অগণিত পদার্থ রয়েছে, তার সঙ্গে মহাবিশ্বের আয়তনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। এই অন্তহীন মহাবিশ্বের বিপুল পরিধিতে ছড়িয়ে আছে অগণিত পরিমাণ হালকা গ্যাস, লৌহ ও প্রস্তরপিণ্ডের শীত মণ্ডল, মহাজাগতিক ধূলি কণা আর লক্ষ লক্ষ তারকাপুঞ্জ—যার এক একটিতেই রয়েছে লক্ষ লক্ষ তারা।

গাছপালার কাছে আমরা ঋণী। এরা কার্বনডাই-অক্‌সাইড গ্রহণ করে, আর অক্সিজেন বায়ু মণ্ডলে ফিরিয়ে দেয়। আর প্রাণীরা শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ঐ অক্সিজেন গ্রহণ করেই বেঁচে থাকে। গাছপালা পৃথিবীতে না থাকলে আমরাও থাকতে পারতাম না। প্রাণীজগতের উদ্ভব হোতো না। তোমরা বিজ্ঞান পড়লে মহাকাশের কথা বুঝতে পারবে।

কাউণ্ট লিও টলষ্টয়
রচিত

দি লঙ্‌ এক্সাইল্

(The Long Exile)

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দারোগা-মশাইয়ের হুকুম পাবামাত্র পাহারাওয়ালারা তখনি আক্‌স্তেনকের বাক্স-তোরঙ্গ, পোঁটলা-পুঁটলি ঘেঁটে জিনিষ-পত্র সব সরাইখানার ঘরময় ছড়িয়ে সোৎসাহে খুনী-আসামীর কুল-কুলুজীর সন্ধানে কড়া-তল্লাসী সুরু করে দিলে। উদ্বেগ-আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে আক্‌স্তেনক একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাদের কাণ্ড-কারখানা দেখতে লাগলো।

খানিকক্ষণ খোঁজ-তল্লাসের পর, দারোগা-মশাই স্বয়ং আক্‌স্তেনকের তোরঙ্গের ভিতর থেকে টেনে বার করে আনলেন—টাট্‌কা-রক্তের ছোপ-ধরা একখানা ছোরা! ব্যাপার দেখে আক্‌স্তেনক তো বিস্ময়ে হতভম্ব!...বাড়ী ছেড়ে বিদেশে সওদা বেচতে যাবার সময় নিজের হাতে প্রত্যেকটি বাক্স-তোরঙ্গ, পোঁটলা-পুঁটলি গুছিয়ে এনেছে সে...পথে আসবার সময় এ সব বাক্স-তোরঙ্গ কোথাও কেউ খোলেনি একবার...অথচ সেই তোরঙ্গের ভিতর থেকে পুলিশের দারোগা-মশাই খুঁজে বের করলেন এই রক্তমাখা-ছোরা!...খুবই তাজ্জব-ব্যাপার!...তার তোরঙ্গের মধ্যে এ রক্তমাখা-ছোরা এলো কোথা থেকে...রাখলোই বা কে...আর কখন? ভয়ে-ভাবনায় আক্‌স্তেনকের মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগলো। নিমেষের মধ্যেই তার চোখের সামনে দুনিয়ার আলো নিভিয়ে সব যেন অন্ধকার হয়ে গেল!

সদ্য-খুঁজে-পাওয়া রক্তমাখা-ছোরাখানা আক্‌স্তেনকের মুখের সামনে উঁচিয়ে ধরে পুলিশের দারোগা-মশাই সদর্পে গর্জ্জে উঠলেন,—কি হে, বাছাধন···দিব্যি সাধু সেজে এতক্ষণ খুব যে গলাবাজী করে সাফাই গাইছিলে···এখন? ···বলো, এবারে কি জবাব দেবে?···কার রক্ত লেগে রয়েছে এ ছোরায়?···কাকে খুন করে এসেছো এই ছোরা বুকে বসিয়ে?···জবাব দাও শীগগির!

বেচারী আক্‌স্তেনক!···কি জবাবই বা দেবে সে পুলিশের দারোগা-মশাইকে! তবু নিতান্ত অসহায়ভাবে আমৃতা-আমৃতা করে সে দারোগা-মশাইকে বোঝাতে লাগলো,—"সত্যি বলছি, এ ব্যাপারের কিছুই জানি না আমি! তাছাড়া, ও ছোরাখানাও আমার নয়, অন্য কারো ···কখন কোথা থেকে কি ভাবে কোন লোক যে অজান্তে ঐ রক্তমাখা-ছোরাখানা আমার তোরঙ্গের ভিতরে লুকিয়ে রেখে গেছে, তাও বিন্দু-বিসর্গ জানতে পারিনি!···দোহাই আপনার···বিশ্বাস করুন···সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ আমি···ও ছোরা দিয়ে কাউকেই খুন করিনি!

পুলিশের দারোগা-মশাই কিন্তু নাছোড়বান্দা! আক্‌স্তেনকের কৈফিয়ৎ শুনে তিনি হুঙ্কার দিয়ে শাসিয়ে উঠলেন, —বটে! ভাজা-মাছটিও যে উল্‌টে খেতে জানো না দেখছি!···বাজে কথা ছাড়ো! আজ সকালে পাশের গ্রামের সরাইখানায় তোমার পথের সঙ্গী সেই সদাগরকে বিছানায় খুন হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে···তার পাশের কামরাতেই তুমি ছিলে গত রাত্তিরে···তাছাড়া তোমার তোরঙ্গ তল্লাস করে পাওয়া গেছে টাট্‌কা-রক্তের ছোপ-ধরা এই ছোরা! সুতরাং তুমি ছাড়া আর কোনো লোক যে তাকে খুন করেনি, তারও সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলছে! উপরন্তু, তোমার ঐ ভয়-ভাবনা-চিন্তায় ভরা মুখখানা দেখে বেশ ভালোই বুঝতে পারছি যে, এ কাজ তুমিই করেছো···এবং পাছে ধরা পড়ে যাও, সেই ভয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য গতকাল নিশুতি-রাতেই তুমি তাড়াতাড়ি তোমার মালপত্তর সব গাড়ী-বোঝাই করে, নিঃশব্দে ভিন্-গ্রামের সে সরাইখানা থেকে সট্‌কে দূরে এখানে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছো এই সরাইখানার কোটরে!···পাজী শয়তান কোথাকার···এতকাল ধরে রাজ্যের যত দাগী-আসামীকে শায়েস্তা করে বেড়াচ্ছি···আর আজ মানুষ খুন করে পালিয়ে এসে আমার চোখে ধূলো দেবে তুমি! ঘুঘু দেখেছো, কিন্তু ফাঁদ এখনো দ্যাখোনি, বাছাধন! মজাটা টের পাওয়াচ্ছি এবারে···হাতে নাতে পাকড়েছি তোমায়!···বল্ শীগগির···কেন সেই সদাগরকে খুন করেছিস্?···কিসের লোভে?···হীরে-জহরৎ?···সোনা-দানা?···টাকাকড়ি?···এ সবের জন্য···না, অন্য কিছু?

দারোগা মশাইয়ের ধমক-শাসানী সত্বেও, আক্‌স্তেনক কাতর-কণ্ঠে শপথ করে বললে,—সত্যিই বলছি, এ খুনের ব্যাপারে বিন্দুবাষ্পও আমি জানি না! গত রাত্তিরে ভিন্-গ্রামের সেই সরাইখানায় দুজনে একত্রে বসে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে, আমরা যে যার কামরায় শুয়ে ঘুমুতে গিয়েছিলুম। কাজেই পথের সঙ্গী সেই সদাগরের সঙ্গে তারপর আদৌ আমার আর দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি···এমন কি, মাঝ-রাতে যখন মালপত্র সব গাড়ীতে তুলে ঐ সরাই-খানা ছেড়ে চলে এলুম, তখনও তাকে অকারণ ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে চকিতের জন্য একবার দেখাও করিনি, বা কোনো কথাও বলে আসিনি! আর খুনের কাহিনী ···সে তো এইমাত্র—আপনার মুখে শুনলুম!

আক্‌স্তেনকের কৈফিয়ৎ শুনে রক্তমাখা-ছোরাখানা দেখিয়ে ভুরু-কুঁচকে দারোগা-মশাই খিঁচিয়ে উঠলেন,— বটে! তাহলে বলতে চাস্ ভোজবাজীর মন্ত্র-তন্ত্রে এই রক্তমাখা-ছোরাখানা বুঝি আপনা আপনি শূন্য থেকে উড়ে এসে সটান্ গিয়ে সেঁধুলো চাবি কুলুপ-আঁটা তোর ঐ মাল-পত্র-ঠাসা তোরঙ্গের মধ্যে!···

অসহায়ভাবে আক্‌স্তেনক জবাব দিলে,—আজ্ঞে বললুম তো···ছোরাখানা আমার নয়···আর সত্যিই আমি সেই সদাগরকে খুন করিনি!

দারোগা মশাই কড়া লোক···আক্‌স্তেনকের কাতর-আবেদনে তাঁর মন ভিজলো না···বরং সন্দেহ আরো গাঢ় হয়ে উঠলো! বৃথা সময় নষ্ট না করে পাহারাওয়ালাদের ডেকে তিনি হুকুম দিলেন,—বুঝেছি, যেমন কুকুর, তেমনি মুগুরের ব্যবস্থা করা চাই নইলে সহজে দোষ কবুল করবে না! বেশ···আর দেরী নয়!···এখুনি এই খুনী আসামী ব্যাটাকে শেকল দিয়ে পিছ্‌মোড়া করে বেঁধে গাড়ীতে তোল্···তারপর থানার গারদে পুরে আচ্ছা করে পিটুনী দিলেই বাছাধনের জারীজুরী সব বেমালুম ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!

দারোগা-মশাই হুকুমজারী করবার সঙ্গে সঙ্গেই ষণ্ডামার্ক পাহারাওয়ালারা বেচারী আকৃস্তেনকের হাতে-পায়ে লোহার বেড়ী এঁটে, আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি-শিকল জড়িয়ে তাকে পিছ্‌মোড়া করে বেঁধে সরকারী-পুলিশের গাড়ীতে তুলে থানায় নিয়ে চললো! নিরুপায় হয়ে চোখের জল ফেলে আকৃস্তেনক পুলিশের দারোগা-পেয়াদাদের কাকুতি-মিনতি করে কত বোঝালো···কিন্তু ভবি ভোলবার নয়! দারোগা-মশাইয়ের কড়া হুকুমে পুলিশের পেয়াদারা শেষ পর্যন্ত অসহায় আকৃস্তেনককে খুনের আসামী হিসাবে গ্রেপ্তার করে সরাসরি টেনে নিয়ে গেল—সরকারী-বন্দী-শালার অন্ধকার-হাজতে। খুনী-আসামী সাব্যস্ত হবার ফলে, আকৃস্তেনকের সঙ্গে সদাগরী-মালপত্র, টাকাকড়ি, জামা-কাপড়, যা কিছু ছিল, সরকারী-আদেশে সে সবই বাজেয়াপ্ত হলো বন্দীশালার দপ্তরের হেফাজতে।

বন্দীশালার আলো-বাতাসহীন স্যাঁতসেঁতে-অন্ধকার খুপরি হাজত-ঘরে নিতান্ত নিরুপায়-অবস্থায় একা-একা বসে আকৃস্তেনক মনে মনে কেবলই ভাবে—স্ত্রীর কথা না শুনে সেদিন কি কুক্ষণেই সে বাড়ী ছেড়ে বিদেশের পথে বেরিয়েছিল···এতখানি দুর্ভোগ-দুর্দ্দশা-অপমান···এ সব তারই পরিণাম! কি যে মতিভ্রম হয়েছিল তার তখন··· স্ত্রীর কথা শুনে সেদিন বিদেশ-যাত্রা মুলতুবী রেখে বাড়ীতে থাকলে হয়তো এমন বিপদ ঘনিয়ে আসতো না তার বরাতে!

খুনী-আসামীকে গ্রেপ্তারের পর, তার সম্বন্ধে আরো বিশদ-পরিচয় জানবার জন্য, দারোগা-মশাইয়ের হুকুমে পুলিশ-পেয়াদা ছুটলো ভ্লাদিমির শহরে—আকৃস্তেনকের বাড়ীতে আত্মীয়-পরিবার আর পাড়া-পড়শী-বন্ধুদের কাছে তার স্বভাব-চরিত্র, হালচাল আর কাজ-কারবারের খুঁটিনাটি সব খোঁজ-খবর নিতে। ভ্লাদিমির শহরের লোকজনের কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে সরকারী-পেয়াদারা জানতে পারলো যে—পাল-পার্ব্বণের উৎসবে মাঝে মাঝে মদ খেয়ে হল্লা-হৈচৈ করলেও, আকৃস্তেনক বরাবরই ছিল নির্দোষ নির্মল-চরিত্রের নিরুপদ্রব-মানুষ··· আত্মীয়-বন্ধু, পাড়াপড়শী আর কারবারী-মহলের প্রত্যেকটি লোকই তাকে সজ্জন বলে মানতো, বেশ ভালোবাসতো আর যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতো! সে যে হঠাৎ কাকেও এভাবে খুন করে বসবে—এমন কথা ভ্লাদিমির শহরের লোকজন কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি কখনো!

যাই হোক, ভ্লাদিমির শহরের লোকজনের কাছে আকৃস্তেনকের খুটিনাটি খোঁজ-খবর নিয়েও কিন্তু পুলিশের কর্ত্তাদের মনের সন্দেহ ঘুচলো না। খুনের দায়ে দায়ী করে বেচারী আকৃস্তেনককে তাঁরা বিচারের জন্ম হাজির করলেন সরকারী-আদালতে—আসামীর কাঠগড়ায়।

পুলিশের জবানবন্দী শুনে আর মামলার যাবতীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ পরীক্ষা করে দেখে, সরকারী-আদালতের বিচক্ষণ হাকিম ধারণা হলো যে আসামী আকৃস্তেনক বিদেশ-যাত্রার সময় ভিন-গ্রামের নিরালা সরাইখানার কামরায় পথের সঙ্গী সেই নিরীহ সদাগরকে নিশুতি-রাতে ছোরার আঘাতে নির্ম্মমভাবে খুন করেছে। শুধু তাই নয়, উপরন্তু আকৃস্তেনক সেই সদাগরের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে বিশ হাজার টাকা (রুবল) অপহরণ করার গুরুতর অপরাধেও অপরাধী! কাজেই আসামী উচিত শাস্তি দেওয়া দরকার!

স্বামীর বিরুদ্ধে সরকারী-আদালতের এই গুরুতর-অভিযোগের খবর পেয়ে আকৃস্তেনকের স্ত্রী রীতিমত চিন্তাকুল হয়ে উঠলো! সঙ্গীণ এই বিপদের কবল থেকে কি উপায়ে সে আকৃস্তেনককে বাঁচাতে পারবে—সারাক্ষণ এই তার একমাত্র ভাবনা!

কিন্তু দুর্ভাগ্য কখনো একা আসে না···খুনের দায়ে বন্দী-অভিযুক্ত হবার ফলে, আকৃস্তেনকের সংসারে দেখা দিলো—অর্থাভাব···অন্নকষ্ট···দারিদ্র্য-দুর্দ্দশা! কাজ-কারবারেরও রীতিমত বিশৃঙ্খলা ঘটলো···দিন চলা দায়! দৈবদুর্ব্বিপাকের এই আকস্মিক ঝড়ের দাপটে আকৃস্তেন-কের সুখী-সুন্দর সাজানো সংসার যেন নিমেষের মধ্যেই আগাগোড়া তছনছ ও ধুলিসাৎ হয়ে গেল! বিদেশে সরকারী-হাজতে খুনের দায়ে বন্দী-আসামী স্বামী···আর ঘরে দারিদ্র্য-অভাব-অনটনের দুর্দ্দশার মধ্যে কোনোমতে শিশু-সন্তানদের প্রাণে বাঁচিয়ে রাখার কঠোর-দায়িত্ব···এ দুটি চরম-বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিতান্ত নিরুপায়-অবস্থায় আকৃস্তেনকের স্ত্রী শেষে দিশেহারা হয়ে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ছুটে গেলেন দূরে অজানা শহরের সরকারী-বন্দীশালায়—স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে।

সরকারী-বন্দীশালার বিধি-নিয়ম খুবই কড়া···খুনী-আসামী কয়েদীর সঙ্গে চকিতের দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ অনুমতি সহজে মেলে না কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে! চোখের জল ফেলে বহু কাতর-অনুনয়, আর আবেদন-নিবেদনের পর, আক্‌স্লেনকের স্ত্রী, অবশেষে সরকারী-হাজতে বন্দী স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেলেন···তবে শুধু তিনি একা·· ছেলেমেয়েরা কেউ দেখা করতে পারবে না তাদের বাবার সঙ্গে···এবং আক্‌স্লেনকের স্ত্রীকেও স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতে হবে বন্দীশালার সরকারী-পাহারাওয়ালার নজরবন্দী হয়ে! (ক্রমশঃ)

—
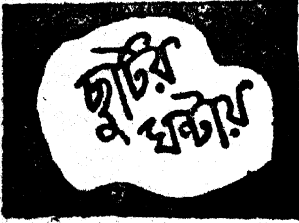
চিত্রগুপ্ত

গতবার বিজ্ঞানের অভিনব রাসায়নিক-পদ্ধতিতে কাঁচের চৌবাচ্ছা (Tank) বা 'বোয়েমের' (Jar) ভিতরে আজব-বাগান রচনার যে বিচিত্র মজার কলা-কৌশলের কথা বলেছি, এবারেও অনেকটা ঠিক তেমনি-ধরণের প্রক্রিয়ায় সামান্য কয়েক টুকরো টিন, দস্তা আর কর্পূরের সাহায্যে কাঁচের বোতলের ভিতরে নানা অপরূপ-ছাঁদের কৃত্রিম-গাছপালা সৃষ্টি করার আরো দু-তিনটি রহস্যময়-উপায়ের হদিশ দিচ্ছি।

তবে সেই আজব-গাছপালা সৃষ্টির কলা-কৌশলের বিচিত্র রহস্য-কাহিনী বলবার আগে, এ খেলাটি দেখানোর জন্য যে সব উপকরণ দরকার তার একটা মোটামুটি ফর্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, প্রথম-পদ্ধতিতে খেলাটি দেখানোর জন্য চাই—ঢাকনী সমেত বড়-মুখওয়ালা একটি কাঁচের বোতল, একটি কাঁচের গামলা, এক বোতল 'ডিষ্টিল্‌ড্‌-ওয়াটার' (Distilled water) কিম্বা পরিষ্কার একটি বালতি অথবা গামলাতে সযত্নে সঞ্চয়-করে রাখা বৃষ্টির জল এবং একছটাক লেড্‌-এ্যাসিটেট' (Lead Acetate)।

এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, বড়-মুখওয়ালা কাঁচের বোতলটির ভিতরে অন্ততঃপক্ষে নয়-ছটাক পরিমাণ 'ডিষ্টিল্‌ড্‌-ওয়াটার' অথবা বৃষ্টির জল ভরে সেই জলের সঙ্গে এক-ছটাক 'লেড্‌-এ্যাসিটেট' মিশিয়ে, বোতলটিকে কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে জলীয় এই 'মিশ্রণটি' (Mixture) পরিষ্কার একটি মিহি-কাপড়ের সাহায্যে বেশ ভালোভাবে ছেঁকে নিয়ে কাঁচের গামলাতে ঢেলে রাখো। 'মিশ্রণটি' কাঁচের গামলাতে ঢেলে রাখার পর, বড়-মুখওয়ালা কাঁচের বোতলটিকে বেশ ভালো করে পরিষ্কার-জলে ধুয়ে সাফ্‌ করে নাও—বোতলের কোথাও যেন একটুও তৈলাক্ত-ভাব না থাকে। বোতলটি ধোয়া হয়ে গেলে, ঐ বোতলের মুখে আরেক টুকরো পরিষ্কার মিহি-কাপড় চাপা দিয়ে, কাঁচের গামলাতে রাখা 'মিশ্রণটিকে' ভালোভাবে ছেঁকে পুনরায় বোতলের ভিতরে ভরো। 'মিশ্রণটুকু' কাঁচের বোতলের ভিতরে ভরে নেবার পর, সেটির মধ্যে কয়েকটি দস্তার টুকরো ফেলে দিয়ে, বোতলের মুখ পাকাপোক্তভাবে ঢাকনী এঁটে বন্ধ করে সযত্নে ঘরের কোণে কোনো নিরিবিলি-জায়গায় সরিয়ে রাখো ঘণ্টাকতক। তবে হুঁশিয়ার, এভাবে সরিয়ে রাখার সময় কেউ যেন আদৌ এই 'মিশ্রণ'-ভরা বোতলটিকে এতটুকু নাড়াচাড়া না করে।

'মিশ্রণ'-ভরা বোতলটিকে এমনিভাবে সযত্নে সরিয়ে রাখার বেশ কয়েক ঘণ্টা বাদে, দেখতে পাবে—বিজ্ঞানের আজব রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার ফলে, কাঁচের বোতলের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিচিত্র-ছাঁদের অদ্ভুত সব গাছপালা—যার নমুনা, পৃথিবীর মাটিতে কোথাও কোনোদিন কারো নজরে পড়ে না!

এ তো হলো—রাসায়নিক-প্রক্রিয়ায় বস্তার-গাছপালা সৃষ্টি করার কলা-কৌশল। কাঁচের বোতলের মধ্যে রূপোর-গাছপালা সৃষ্টি করার পদ্ধতিও অনেকটা ঠিক এমনি ধরণের…তবে তার মাল-মশলা কিন্তু আলাদা।

রাসায়নিক-প্রক্রিয়ায় কাঁচের বোতলের মধ্যে 'রূপোর-গাছপালা' সৃষ্টি করতে হলে—'ডিষ্টিল্ড্-ওয়াটারের' সঙ্গে, 'লেড্-এ্যাসিটেটের' বদলে, সামান্য একটু 'সিল্ভার্নাইট্রেট' (Silver Nitrate) মিশিয়ে, 'মিশ্রণটিকে' এতটুকু নাড়াচাড়া না করে কিছুক্ষণ ঘরের কোণে নিরিবিলি-জায়গায় সযত্নে আলাদা সরিয়ে রেখে দাও। তারপর জলে যতখানি পরিমাণে 'সিল্ভার্-নাইট্রেট' ঢেলে নিয়েছিলে, ঠিক তার অর্দ্ধেক-মাপের 'মেটালিক্-মার্কারী' (Metallic Mercury) অর্থাৎ, 'সাধারণ পারা' নিয়ে ঐ বোতলের 'মিশ্রণের' সঙ্গে মিশিয়ে দাও। তাহলেই দেখবে,—কিছুক্ষণ বাদেই ঢাকনী-আঁটা কাঁচের বোতলের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে—অপরূপ-ছাঁদের ও রূপোলী-রঙের বিচিত্র-অদ্ভুত সব গাছপালা।

এমনি উপায়ে, 'কর্পূরের-গাছপালা' সৃষ্টি করতে হলে, কাঁচের বোতলের ভিতরে খানিকটা 'স্পিরিট্স্ অফ্ ওয়াইন্' (Spirits of Wine) ঢেলে, তার সঙ্গে কয়েক টুকরো কর্পূর (Camphor) মিশিয়ে দাও। এ কাজ সারা হলে, আগেকার মতো নিয়মে, বোতলটিকে নাড়া-চাড়া না করে সযত্নে সরিয়ে রাখো ঘরের নিরিবিলি কোণে।

কিছুক্ষণ এমনিভাবে রাখার ফলে, বোতলের ভিতরকার 'স্পিরিট্স্ অফ্ ওয়াইন্' আরকে কর্পূরের টুকরোগুলি আগাগোড়া গলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই, 'মিশ্রণটুকু' শীতল ও পরিচ্ছন্ন একটি কাঁচের গামলাতে… ঢেলে ফেলো। তাহলেই দেখবে—তোমাদের চোখের সামনে খানিকক্ষণ বাদেই ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠতে সুরু করেছে বিচিত্র-ছাঁদের অদ্ভুত মজার সব 'কর্পূরের-গাছপালা'!

এই হলো—রাসায়নিক-পদ্ধতিতে আজব-গাছপালা সৃষ্টির রহস্যময় কলা-কৌশল। কলা-কৌশল তো শিখলে, এবারে তোমরা নিজের হাতে পরখ করে ভাখো বিজ্ঞানের আজব-মজার এই খেলাগুলি।

আগামী সংখ্যায় বিজ্ঞানের এমনি বিচিত্র-মজার আরেকটি রহস্যময়-খেলার আজব কলা-কৌশলের কাহিনী জানাবার বাসনা রইলো।

—

মনোহর মৈত্র

১। লুকোনো-নামের হেঁয়ালি

স্কুলের পরীক্ষার ক'দিন আগে, ইতিহাসের মাষ্টার-মশাই বরদাবাবু ক্লাশে এসেই দেয়ালে টাঙানো ব্ল্যাক-বোর্ডের উপর খড়ির আঁচড় টেনে এলোমেলোভাবে অক্ষর সাজিয়ে হেঁয়ালির মতো ধরণে পরপর ছয়টি লাইন লিখে ফেল্লেন। তারপর ক্লাশের ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বরদাবাবু বললেন,—"সামনেই তো পরীক্ষা আসছে… দেখি, তোমাদের কার কতখানি পড়াশোনা হয়েছে—ইতিহাসের বিষয়টিতে!…সামনের বোর্ডে হেঁয়ালির-ধরণে এলোমেলো-সাজানো ঐ আজোকটি লাইনে লিখে রেখেছি —ভারতবর্ষের অতীত-ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ এক-

একজন লোকের নাম। বোর্ডে লেখা প্রত্যেকটি লাইনে এলোমেলোভাবে লেখা ঐ অক্ষরগুলিকে ঠিকমতো বেছে নিয়ে সাজিয়ে তোমরা যদি ভারতবর্ষের ইতিহাস-বিখ্যাত এক-একজন চরিত্রের নাম খুঁজে বার করতে পারো তো বুঝবো যে এবারের পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেতে কোনো অসুবিধা ঘটবে না!…বরদাবাবুর 'লুকোনো-নামের' হেঁয়ালিটি 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের দরবারে পেশ করলুম—ছাখো তো চেষ্টা করে, তোমরা কেউ এ হেঁয়ালির সঠিক মীমাংসা করতে পারো কি না!

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

ভারতবর্ষের এমন একটা শহরে গেলাম যে তার নাম উল্টে দিলেও, বদলায় না। সেখানে গিয়ে এমন একটা রোগ হলো যে তার নাম উল্টে দিয়েও, বদলায় না। আর সেই রোগ সারানোর জন্য এমন ওষুধ ব্যবহার করলাম যে তার নাম উল্টে দিলেও, বদলায় না!…বলো তো, সেই শহর, সেই রোগ আর সেই ওষুধ—এ তিনটির সঠিক নাম কি?

রচনা—মুরারী চৌধুরী (ফুটিগোদা)

৩। আদি-অন্তে তিক্ত, মধ্য-অন্তে মিষ্ট-কষায়, পুরো নামটিতে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ধনীকে বুঝায়! বলো তো, এ ধাঁধার সঠিক উত্তর?

রচনা—কণিকা দত্ত (আসানসোল)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ

১। ২৫১৯
২। পানা
৩। চালতা

গতমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

কুলু মিত্র (কলিকাতা), রিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই), শর্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), কবি ও লাড্ডু হালদার (কোরবা), পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), সত্যেন, মুরারী, সঞ্জয় ও সুনীল (ভিলাই), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), প্রদ্যোতকুমার সরকার (বেলোনিয়া), দীপিকা দাশ বড়ুয়া (জামশেদপুর), চৈতালী ও মিঠু বসু (কলিকাতা), অঞ্জনকুমার বসু (বারাণসী), আশীষকুমার কুণ্ডু (রাণাঘাট), কল্পনা, গীতা ও চন্দন বন্দোপাধ্যায় (লাভপুর), কিশলয়, কাকলী ও কেতকী সর্ব্বাধিকারী (পূর্ণিয়া)।

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

মিধু ও বুবু গুপ্ত (কলিকাতা) পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), প্রণব, প্রমোদ, দেবী ও বনলতা চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), ধর্মদাস রায় (বিদ্যাধরপুর), গাব্বু, খট্টু, টুটু, টুকি সিংহ, দেবু ও ডলি মিত্র, সন্তু ও মন্টি সিংহ (গয়া), তারকনাথ নন্দন (বাঁশবেড়িয়া), পুতুল, কেবি, টলি, আলাল, বুলাল, তুলাল, বেগম, সেনাল লীনা (কয়থা), ছায়া, তুক, মিন্টু ও পরী (ফুটিগোদা), মিংকু ও রিংকু ঘোষ (কাটিহার), জয়শ্রী দে (শিবপুর), গৌতম, নীতা, কল্পনা, অশোক (কলিকাতা), দিলীপকুমার দত্ত (বাঁশবেড়িয়া), নারায়ণপ্রসাদ নারসারিয়া (পুরুলিয়া), দোলগোবিন্দ দাস (বাঁশবেড়িয়া)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

রাণা ও বুনা দেবশর্ম্মা (কলিকাতা), মদনমোহন মিশ্র, গৌরীবালা দেবী ও অনিলকুমার রায় (নাগপুর)।
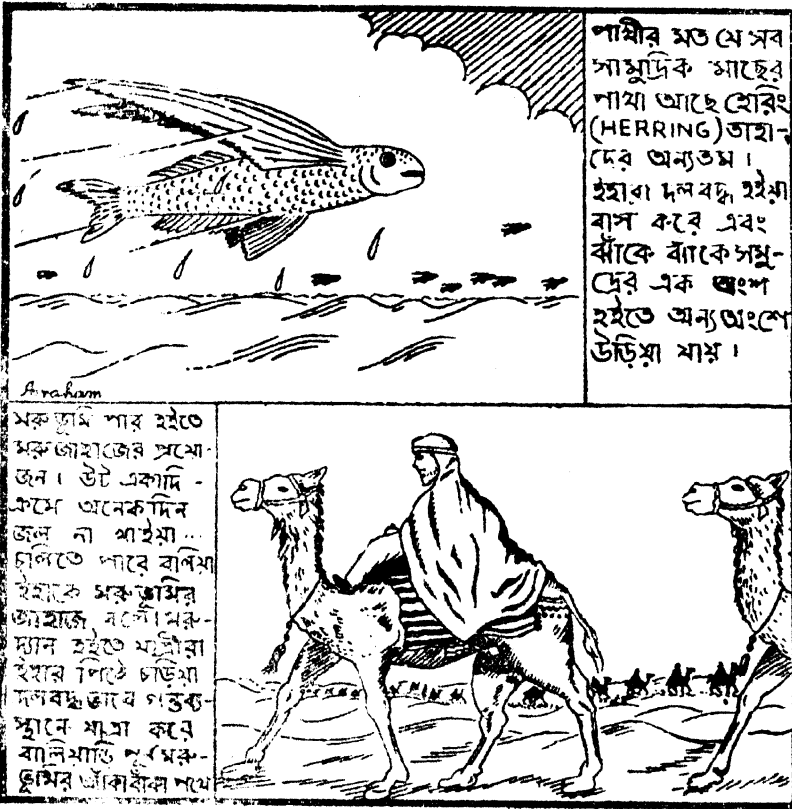
জলে-ডাঙ্গায়

রাখাল ছেলে

বিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়

পূবের গগনে রাঙিয়ে আকাশ সূয্যিমামা উঠে।
তারি সাথে মোর ধেনুগুলি ল'য়ে আমি চলি রোজ মাঠে॥
চরিয়ে ধেনু বনে বনে,
আমি বেড়াই আপন মনে,
কখনো আবার বেণু বাজাই গাছের 'পরে উঠে।
আমি গাহি আপন মনে, ধেনু চাহে উর্দ্ধপানে।
তাই দেখে গো ছোট্ট কোকিল ভাবে মনে মনে॥
হাল্কা হাসি তাহার ঠোঁটে,
উদাসী গান গেয়ে ওঠে,
তাইতো আমার হৃদয়ভরে তাহার মিষ্টি গানে।

হাম্বা রবে ধেনু আমার শ্যামল মাঠে চরে।
আমি তখন ডাকি তা'দের জলটি খাবার তরে॥
আমি ডাকি বাঁশির গানে,
ধেনু শুনে আপন মনে,
বেণুর আওয়াজ পেয়ে ধেনু আমার পানে ফিরে।
সূয্যি মামার সাথে আমি সকল কাজ সারি।
তাঁরি মতো সন্ধ্যা এলে গৃহের দিকে ফিরি॥
সে-ও যখন যায় গো পাটে,
ধেনুও মোর ফিরে গোঠে;
নীড়ের পাখি নীড়ে ডাকে মাতার হৃদয় ভ

জলযানের কাহিনী

দেবশর্ম্মা বিরচিত

এই শতকের ইউরোপীয় উপন্যাস

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব তার আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ নিয়ে নেমে এল। সমাজ ব্যবস্থা, পরিবার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সুরু হ'য়েছে, নগর আর কারখানা গড়ে উঠ্‌ছে। মানুষ সমাজ ও পরিবারের বন্ধন ছেড়ে এসে একাকী দাঁড়ালো পৃথিবীর বুকে। যান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্ববাদ ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সবল ও সক্রিয় হ'য়ে উঠলো। সাহিত্য সমাজের প্রতিচ্ছবি। মানুষের মন পারিপার্শ্বিকতার মাঝে গড়ে ওঠে,—সাহিত্য গড়ে ওঠে মানুষের মন থেকে। মানব অন্তর এই বিপ্লবের আশা-আনন্দ দুঃখ-বেদনা বুঝতে শিখলো। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও রোমাণ্টিসিজমের যুগ থেকে পা বাড়ালো রিয়ালিজমের দিকে। যান্ত্রিক জীবনে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিবাদের সঙ্গে সঙ্গে এল জীবনের একাকীত্ব। এই বাস্তব জীবনের ধ্বনি শুনতে পাই আমরা ফ্লবার্টের মাদাম্ বোভারী থেকে,—ব্যালজাক, জোলা, শেখব, ডষ্টেয়ভস্কির মধ্য দিয়ে গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি ও রোঁমা রোঁলা পর্য্যন্ত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে মানুষের চিন্তাধারা নতুন পথে চলতে সুরু করে। যার ফলে এই যান্ত্রিক সভ্যতার ভোগলালসার প্রতি চিন্তানায়কগণের বিশ্বাস ভেঙ্গে পড়তে সুরু করে। যান্ত্রিক সভ্যতার নিষ্পিষ্ট হামসুনের "গ্রোথ অব্ দি সয়েল," টমাস ম্যানের 'ম্যাজিক মাউণ্টেন'এর মধ্যে এই রুগ্ন পৃথিবীর প্রতি একটা ঘোর অবিশ্বাস ধ্বনিত হয়। একদিকে গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির 'ফরসাইট সাগা,' রোঁমা রোঁলার, 'জিন ক্রিস্টোফ্' টমাসম্যানের 'বাডেনব্রুক', ডেনিস্ সাহিত্যিক কুপারাসের "দি বুক অফ্ দি স্মল সোলস্" অষ্ট্রেলিয়ার রিচার্ডসনের "দি ফরচুন অব রিচার্ড সেহনি" মার্টিন-ডু-গর্ডএর 'থিবল্ট' প্রভৃতি পারিবারিক উপন্যাসে এই রুগ্ন পৃথিবীর মধ্যে মানব মনের বিবর্ত্তন রূপায়িত হয়েছে। যান্ত্রিক সভ্যতার রুগ্ন জীবনের মাঝে এঁরা মানবাত্মার ক্রন্দন শুনেছেন। খুঁজেছেন তার মুক্তির পথ। সুইডেনের Hellstrom Guslavএর "Lace Maker Lekholm has an idea" এই মুক্তি পথের আর এক পথিক। অন্যদিকে যন্ত্রপীড়িত মানব মন আকাশ আর মাটির মাঝে, কৃষক জীবনের সারল্য, প্রকৃতির সাহচর্য্য ও উদারতার মধ্যে ফিরে যেতে চায়। আশার বাণী নিয়ে গড়ে ওঠে কৃষক জীবনকাহিনী। বিংশ শতকের গোড়ায় নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হয়। ১৯০৯ সালে সেলমা লগারলফ তার "জেরুসালেমের" জন্য পুরস্কৃত হন। ১৯২০ সালে হামসুন 'গ্রোথ অব দি সয়েলের' জন্য, ১৯২৪ সালে পোলিশ লেখক রেমণ্ট 'দি পেজেণ্টে'র জন্য, ১৯৩৮ সালে পার্লবাক 'গুড আর্থে'র জন্য এবং ১৯৩৯ সালে ফিনিশ লেখক সিল্লানপা 'মিক হেরিটেজে'র জন্য পুরস্কৃত হন। এর সবগুলিই কৃষক জীবনের কাহিনী, আকাশ, মাটি আর পৃথিবীর কাহিনী। এঁরা রুগ্ন যান্ত্রিক জীবন থেকে ফিরে যেতে চেয়েছেন প্রকৃতির কোলে। হামসুন তাই বলেছেন, কৃষকই "The necessary ones of the earth"। পক্ষান্তরে চীনা লেখিকা হান সুইনের "ডেষ্টিনেশন চাংকিং" বা গর্কীর কৃষক শ্রেণী বা ইটালীয় লেখক ইলিও ভিট্টোরিনির 'ইন সিসিলি'র কৃষকের মাঝে মানবতার নবজাগরণের বাণী ধ্বনিত হয়ে ওঠে। এই বাণী পুনরায় জেগে উঠেছে এমন কি আমেরিকায় হেমিংওয়ের 'ফর হুম দি বেল টোলস্'এর মাঝেও।

আর একদল ফিরে যেতে চাইলেন অতীতে। বর্ত্তমানকে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে নতুন করে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে সুরু করলেন নতুন সুরে। জার্মান লেখক ফচ্‌ওয়াংগার এই দলের পুরধা। তাঁরা লিখলেন,—"historical fiction to throw light upon the present"। এই দলে নরওয়ের আনড্‌সেট সিগ্‌রিড,

ইংলণ্ডের রবার্ট গ্রেভস্‌এর নাম করা যায়। গ্রেভস্ রোমান সাম্রাজ্যের ক্লডিয়াসের রাজত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, ফয়্‌ওয়াংগার প্রথম থেকে আঠারো শতকের, এবং আনডসেট চোদ্দ শতকের পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছেন বর্তমানের রূপ। মানুষ মানুষই, বাইরে বুদ্ধির লড়াই যতই বাড়ুক, যন্ত্রের ক্রিয়া যতই রহস্যময় হোক্—তার চাওয়া-পাওয়া, দুঃখ-বেদনা, মনোবৃত্তির ভিত্তিভূমির ক্ষয় হয়নি আজও।

বিংশ শতকে উপন্যাস লিখনপদ্ধতি তথা technique-এরও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৩৮ সালে ইংরেজ লেখিকা স্টরম জ্যামসেন তদানিন্তন উপন্যাস সম্বন্ধে বলেছিলেন—নরনারী সমসাময়িক সমাজ স্রোতের মাঝে যে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ভোগ করে, যে সংগ্রাম সংঘাতে তার জীবন চলে, তার প্রকাশই উপন্যাস—চরিত্র এই সমাজের পটভূমিকায়ই বিচরণ করে। এই-ই "essential form the novel" এই প্রকাশ ব্যালজাকের পদ্ধতিতে বা অন্য যে কোন পদ্ধতিতে করা চলতে পারে। চরিত্রকে বৃহত্তর করে তার মাঝে সমাজের ছবিকে প্রতিভাত করা যায়, অথবা সমাজের মাঝে ব্যক্তির মূল্য নিরূপণ বা ব্যক্তির মাঝে সমাজের মূল্য নিরূপণ উভয়ই চলতে পারে The special meaning of the groups as well as individuals, the collective as well as the private life of man" রূপায়িত করবার জন্য উপন্যাসের নতুন আঙ্গিকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যার ফলে এই শতকে দুইটি বিশিষ্ট আঙ্গিকের উদ্ভব হয়েছে। একটি জার্মাণ আঙ্গিক "Bildungsroman" আর একটি ফরাসী "le roman fleuve." একটি গেটের উইলহেলম মিষ্টার এর পুরাতন আঙ্গিক, জীবনের মাঝে মানুষের শিক্ষা যার পূর্ণপ্রকাশ হয়েছে ম্যানের ম্যাজিক-মাউন্টেনের মধ্যে। এ আঙ্গিকের মধ্যে গল্পের কাঠামো বিচ্ছিন্ন, কিন্তু চিন্তায় সাবলীল স্বাধীনতা বর্তমান। এই আঙ্গিকের নামকরা যায় শিক্ষামূলক বিশ্লেষণ। দ্বিতীয়টি প্রবহমান নদীস্রোতের মত। রোঁমা রোঁলার জিন ক্রিষ্টফ্‌এর উদাহরণ; রোঁমাকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল তার এই বই উপন্যাস কিনা? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—It was a man, he was creating and he thought of the life of his hero and the book as a river, we voyage down the river of a man's life" আমেরিকান লেখক ডস্ পোসেস্ এর 'থ্রি সোলজার্স' (১৯২১) আর একটি উদাহরণ। কিন্তু "Mann's is within the tradition of the bildungsroman, Dos Possos's is boldly experimental. Both have as theme the decay or sickness of civilization" অলেটন সিনক্লেয়ায় বা সিনক্লেয়ার লুই উভয়ই এই রুগ্ন সভ্যতার সমালোচক, কিন্তু গোর্কীর মত তাঁরাও আশাবাদী। প্রকৃতিকে পিছনে ফেলে মানুষ যন্ত্রযুগে নগরে এসেছে এবং ভূয়া সভ্যতার মোহে অন্ধ। কিন্তু তার বেদনার লাঘব হয়নি, পৃথিবী তেমনি দুঃখময় রয়ে গেছে। ওয়াজার ম্যানের 'লাইফ্ এ্যাজ জার্মান এ্যাণ্ড এ্যাজ এ জু" জীবনের এই গভীর বেদনাময় একাকীত্বকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে। এই সুন্দর পৃথিবী নীলাকাশ, প্রকৃতির আশীর্বাদ—কিন্তু তার তলায় রয়েছে ভয়, দুঃখ, বেদনা, নির্দ্দয় দুর্দ্দশা। ফরাসী লেখক জুলস রোঁমা বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে যে নির্দ্দয় ব্যক্তিবাদ গড়ে উঠেছে তাকে সমর্থন করতে পারেন নি—তিনি মানুষের সমষ্টিগত জীবন প্রকাশের মধ্যে এই দুঃখের পরিসমাপ্তি কল্পনা করেছেন।

যান্ত্রিক সভ্যতা এগিয়ে চলেছিল অপ্রতিহত গতিতে। প্রথম আঘাত পেল সে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। মানুষের মন চমকে উঠে নতুন ভাবে ভাবতে সুরু করল। এই নবসভ্যতা মাঝে প্রকট হ'য়ে উঠল ব্যক্তি ও সমাজের তথা শ্রেণীর সংঘাত। বিংশ শতকের সাহিত্যে তাই লেখকগণ কেউ নিরাশা নিয়ে ফিরে যেতে চেয়েছেন আকাশ আর মাটির কোলে, কেউ বা আশাবাদী হ'য়ে চেয়েছেন মানুষের একাত্মবোধ, মানবতার জাগরণ। আরও দুইটি বৈপ্লবিক ঘটনা এই শতকের সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে—একটি রাশিয়ার গণ অভ্যুত্থান ও সাম্যবাদ এবং আর একটি ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব। সাম্যবাদের জয় নিষ্পিষ্ট মানুষকে আশায় উজ্জীবিত করেছে, ফ্রয়েড ব্যক্তিমানসকে গভীরভাবে চিনতে শিখিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে ফ্রয়েডের আবিষ্কারের পরেই ডষ্টেয়ভস্কির লেখা ইউরোপে আদৃত হয়। তার পূর্ব্বে তার 'দ্বিত্ব-ব্যক্তিত্ব' পাঠকের কাছে অবিশ্বাস্য রহস্য হ'য়েই ছিল।

এ ছাড়াও বহু রকমারী সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এই শতকে। ইংরাজিতে যাকে pot boiler বা Escape literature বলে, তার সংখ্যা বাংলার বর্তমান সাহিত্যের মত ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই। মানুষের চিন্তাধারা কোন যুগে কাব্যে, কোন যুগে নাটকের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করেছে, কিন্তু বিংশ শতকের চিন্তাধারা প্রধানতঃ উপন্যাসের মাধ্যমেই সৃষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে Fantasy বা কাল্পনিক রসসাহিত্য একটি নূতন উপভোগ্য শাখা। আনাতোল ফ্রাঁর পেন্‌গুইন আইল্যাণ্ড, ওয়েলসের বৈজ্ঞানিক কল্পকথা, উল্লেখযোগ্য। ষ্টার্ণএর ট্রিষ্টাম স্যাণ্ডি, ফরষ্টারের সিলেশ্চিয়াল অমনিবাস, রবার্ট ন্যাথমের ওয়ান মোর স্প্রিং, কারেল কাপেকের (চেক) দি এ্যাবসলিউট এ্যাট লার্জ, জন এরস্কিনের (আ) প্রাইভেট লাইফ্‌ অফ্‌ হেলেন অফ্‌ ট্রয় উপভোগ্য সৃষ্টি।

যুদ্ধবিষয়ক কতকগুলি উপন্যাসও যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছে। যদিও টলষ্টয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পিস' বা জোলার 'ডাউনফল' এর পূর্ব্বপুরুষ, তথাপি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার মাঝে মানুষ আপনার প্রতিচ্ছবিকে নতুন করে চিনতে চেয়েছে। একদিকে মানুষের নগ্নপশুত্ব, অন্য দিকে মানবতার জাগরণে এই উপন্যাসগুলি নূতন ও নূতন-চিন্তার উপাদান। রেমার্কএর অল কোয়ায়েট, রোড ব্যাক, আর্ণোল্ড যুইকের (জার্মাণ) কেস অফ্‌ সার্জ্জেন্ট গ্রিচা, জারোস্লাভ হাসেকের (চেক) দি গুড সোলজার স্কিউইক, ডস্‌ পাসোসের থ্রি সোলজারস্‌, নর্মাণ মেইলার (আমে) এর দি নেকেড এ্যাণ্ড দি ডেড্‌, হেমিংওয়ের ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্‌, জোসেফ কেসেলের (ফ্রেঞ্চ) আর্মি অব স্যাডোজ, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের ভয়াবহতা ও ভীষণতাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসগুলি গড়ে উঠেছে বটে, কিন্তু এই মানবকৃত বিপর্যয় মানুষের অন্তরকে গভীরভাবে দেখবার সুযোগ দিয়েছে।

কয়েকজন লেখক জাতীয় বা আন্তর্জাতীয় সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্বমানবিকতার একটি দিককে চিন্তাশীল সমাজে তুলে ধরেছেন। আফ্রিকার সাদা কালোর বিভেদ ও সংঘর্ষনিয়ে গভীর মানবতা ও দূরদৃষ্টির সঙ্গে আলান প্যাটন (বৃ) ক্রাই, দি বিলভেড কান্ট্রি লিখেছেন। এই প্রসঙ্গে সারা গার্ডউডের (বৃ) গডস্‌ ষ্টেক চিলড্রেন, ল্যাংষ্টন হিউজেসের (আ) নট্‌ উইদাউট এ লাফটার লিলিয়ান স্মিথের (আ) ষ্ট্রেন্‌জ ফ্রুট, ফরষ্টারের প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়ার নাম করা যায়, যদিও সকলেরই দৃষ্টিভঙ্গি খুব স্বচ্ছ নয়, এবং স্বজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিও অনেকে ত্যাগ করতে পারেননি।

বর্তমান যুগে facts ও fiction এর পার্থক্য ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হ'য়ে আস্‌ছে। সত্যঘটনা উপন্যাস হ'য়ে উঠ্‌ছে, উপন্যাসও সত্য হয়ে উঠ্‌ছে—তার ফলে ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিকের মধ্যের দূরত্বও ক্ষীণতর হ'য়ে এসেছে। বর্তমান নাটকীয় জগতে সংবাদসাহিত্য উপন্যাসের পর্য্যায়ে উন্নীত হ'তে চলেছে এবং বাস্তববাদী উপন্যাসও বাস্তব জগতে নেমে সংবাদসাহিত্য হতে চলেছে। জন হার্‌সের (আ) বেল ফর এডোনা (১৯৪৪), আন্না সেগার (জা) এর দি সেভেনথ্‌ ক্রস্‌ (৪২) ওয়াণ্ডা ওয়া-সিলেস্কার (পোল) রেন্‌বো (৪৪) কার্য্যকারণ বিশ্লেষণে এবং বিভিন্ন সমসাময়িক সমাজশক্তির সংঘর্ষের পরিণতি চিত্রণে এই উপন্যাসগুলি বর্তমান শতকে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছে।

সাধারণভাবে এই বিভাগের বাইরে অনেক কিছু জানবার বা পড়বার নিশ্চয়ই আছে। তবে শিল্পবিপ্লব, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, রাজনৈতিক মতবাদের ভিত্তিতে মানুষের চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ পৃথিবীকে, তার সভ্যতাকে, মানুষের সম্পর্ককে নতুন চোখে দেখেছে। কোন লেখকের চোখে নৈরাশ্যের অঞ্জন, কারও চোখে আশার আলো। আজ সভ্য-জগতের জটিল জীবনের ব্যাখ্যানও জটিলতর হ'য়েছে। কিন্তু এর মধ্যেও কয়েকজন আধুনিক লেখক নিজস্ব বিশিষ্ট আঙ্গিক ও চিন্তাধারা নিয়ে আলাদা হ'য়ে আছেন। তার মধ্যে নাম করা যায় James Joyce এর। ভিক্টোরিয়া যুগের উপন্যাসের আঙ্গিকের সঙ্গে পাঠকগণ পরিচিত আছেন, কিন্তু জয়েসের পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার লেখায়, "The essentiai character is more likely to be discovered through the reverie, based chiefly on joyce's work a phrase has come into great prominerce in our time – the stream of consciousness, method of revealing character

...we may say that this method is a more natural manipulation of dramatic soliloquy" তাঁর ছোট গল্প arabyতেই প্রথম এই চরিত্রচিত্রণ পদ্ধতি দেখা যায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস a portrait of the artist as a young man (১৯১৩) এর নায়ক stephen dedulas এর অন্তর শিল্পীজীবন চেয়েছিল, অন্তরে তার বিশ্বাস ছিল সে সার্থক শিল্পী হবে। শিল্পীরা সাধারণতঃ আত্মকেন্দ্রিক, অহংভাবাপন্ন-নিষ্ঠুর হয় এই সত্য নায়ককে বহু সংঘাত ও সংগ্রামে শিখতে হয়। সে বুঝতে পারে, দেশাত্মবোধ, মাতৃভাষা, ধর্ম্মপরিবার—সবার উর্দ্ধে তার আত্মার প্রকাশ। তাঁর জটিলতর উপন্যাস ulyses, জীবনের নানাদিক ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করেছে। হোমারের অনেক চরিত্রের সঙ্গে আধুনিক ওডিসাস নায়ক লিওপোল্ড ব্লুমের অনেক সাদৃশ্য আছে। অর্দ্ধেক আইরিশ ও অর্দ্ধেক জু এই চরিত্রটি আয়ারল্যাণ্ড ও প্যালেষ্টাইন কোথায়ও স্বস্তি পায়নি। আত্মবিশ্লেষণ-মূলক চরিত্রসৃষ্টি জয়েসের নূতন সৃষ্টি। কল্পনা ও বিশ্লেষণ নতুনভাবে নতুনরূপে ইউলিসিসে দেখা গিয়েছে'—"Here we have 170 pages of blooms nightmare—this represents the dark night of the soul of bloom and stephen" এই উপন্যাস-খানি প্রথমে অশ্লীলতার দায়ে বাজেয়াপ্ত হয় কিন্তু পরে বিচারে তাকে "sincere and honest work" বলে মুক্তি দেওয়া হয়। এর অন্যতম প্রসিদ্ধ উপন্যাস—Finnegan's wake.

ফ্রান্সের marcel pronst আর একজন কৃতি লেখক। তাঁর remembrance of the past প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। লেখক নয় বৎসর বয়স থেকেই হাঁপিতে ভুগছিলেন। পনর বছর থেকে তিনি প্যারির সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশতেন এবং ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। তিনি অকরুণ ব্যঙ্গে এই অভিজাত সমাজকে জর্জ্জরিত করেছেন। একটি নিভৃত নিঃশব্দ ঘরে বসে তিনি সাহিত্য সাধনা করতেন, দিনে ঘুমুতেন রাত্রে লিখতেন। প্রসিদ্ধ সমালোচক krutch বলেছেন,—his life was a retirement, stepby step from life, a penetration step by step into particular world of art which was his." তার বর্ণনা পদ্ধতিকে "Technique of memory recall" বলা হয়। অতীত স্মৃতিচারণ আমাদের সজ্ঞান মনের চেষ্টাপ্রসূত নয়; সামান্য গন্ধ, একটু কথা, একটা ভঙ্গি উপলক্ষ করেই অতীতকে আমরা স্মরণ করতে চাই। কিন্তু এই স্মৃতিচারণ আমরা করতে চাই কেন? তার উত্তরে বলা যায়—"He was seeking his own salvation or to put in another way, he was seeking values not to be destroyed by time and change". তার গভীর ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের অর্থ সুপরিষ্কার হ'য়ে ওঠে ১৯৩০ সালে যখন পৃথিবীতে পাশ্চাত্য সভ্য-জগতের উপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে আসে। তখন Edmund wilson বলেন proust's world—the heartbreak house of capitalist culture."

আর একজন ফরাসী লেখক সাহিত্যে যুগান্তর এনেছেন, তিনি Andre gide—তার লিখন পদ্ধতি আলডাস্ হাক্সলির পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্টের সহিত তুলনীয়। তার চরিত্রগুলি দেখে, শোনে, ঘটনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করে এবং এই পর্য্যবেক্ষণের মাঝেই চরিত্র আপনাকে সৃষ্টি করে চলে। তার বিখ্যাত উপন্যাস—কাউণ্টার ফিটারস্। প্রধান চরিত্র এডওয়ার্ড তার জীবনের সঙ্গে পরিচিত মানুষকে বুঝতে চায়, তাদের জীবনের প্রয়োজনকে উপলব্ধি করতে চায়, তাদের সঙ্গে মানুষের ভগবানের সম্পর্ক নিরূপণ করতে চায়। অনেকে বলেন তার Direct presentation পদ্ধতি Joseph conard এর Typhoon অনুসৃত। তার ভাবধারার মধ্যে মানবজীবনের একটা গভীর সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। নিষ্ঠুর অকরুণ বাস্তবকে আমরা জীবনের অসাফল্য ও অক্ষমতার জন্যে মনে মনে অস্বীকার করি, মনের স্বপ্নজগত ও আদর্শবাদের পক্ষে বাস্তব অতি কঠিন, সেইজন্য মানুষ শামুকের মত একটা নিজস্ব স্বপ্নজগতের কঠিন আবরণের মধ্যে বাস করে এবং তার মধ্যেই তার জীবনের সান্ত্বনা। "we try to pass ourselves off, to ourselves and others, as some thing that we really are not. It is difficult to know and accept ourselves for what we are and this duality produces tensions and emotions that furnish the drama of our life". মানুষের প্রতিটি ব্যবহার উদ্দেশ্যমূলক, কিন্তু

এই উদ্দেশ্য আমাদের ঐ স্বপ্নজগত নিয়ন্ত্রিত মানুষ তার জীবনে তাই জালিয়াৎ মাত্র। জার্মান লেখক Franz kafka (১৮৮৩-১৯২৪) একজন বিশিষ্ট শ্রেণীর লেখক। ১৯৩৮ সালের কাছাকাছি তার খ্যাতি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বর্ত্তমানের উপন্যাস ও নাটক তাঁর সাহিত্যধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। তাঁর নাম থেকেই kafkaesque বা kafkalike কথাটি এসেছে। তার সাহিত্য একটি স্বপ্নজগৎ যার আদি-অন্ত নেই। মনে হয় কাল্পনিক অবিশ্বাস্য, কিন্তু তার স্বরূপ এমন ভাবে প্রতিভাত যে পাঠকের কাছে তা সত্য বলেই প্রতিভাত হয়। তার পরে প্রশ্ন আছে এই দুঃস্বপ্নের অর্থ কি ? তার সাহিত্য রূপক শ্রেণীভুক্ত। Pilgrims processও একটি রূপক—ধ্বংস নগরী থেকে স্বর্গরাজ্যে আত্মার জয়যাত্রা। কিন্তু লেখকের স্বপ্নরাজ্য ও রূপক ভিন্ন। তাঁর রূপকের ব্যাখ্যা অনেকে অনেক ভাবে করেছেন। টমাস ম্যান মনে করেন, তার লেখা the castle জীবনের প্রতীক, মানবাত্মা তার মাঝে মুক্তি পেতে চায়। Harry slochwer মনে করেন তার the castle বা the trial মানুষের কলঙ্কিত আত্মার মুক্তি সংগ্রাম।

তিনি প্রাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা জু এবং অবস্থাপন্ন। তখন জুরা ঘেটো সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা চেক জাতির জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। জীবনের এই একাকীত্বের থেকে মুক্তি পেতে তিনি রহস্যময় জগতে বিচরণ করেছেন। তিনি আইন অধ্যয়ন করে একটি কোম্পানীর কাজ করেন। সেখানে একটা ধর্ম্মঘট মীমাংসা করতে তিনি পারেন না, তার একমাত্র কারণ তিনি জার্মানভাষী। তারপর থেকেই তার মন এই সামাজিক অবিচার, পাপ ও মানুষের অসহায় অবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। ঘরের কর্ত্তৃত্ব, সরকারী কর্ত্তৃত্ব, ধর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব—সকল কর্ত্তৃত্ব মিলে মানুষের জীবনকে আত্মার বধ্যভূমি করে তুলেছে। মানবাত্মা মুক্তির জন্য চীৎকার করছে দেহের কারাগারে। কাফ্কা এই বন্দী মানবাত্মার মুক্তি চেয়েছেন তার রহস্যময় রূপকজগতে। If we read the trial. 'the castle, the penal colony, we wonder, if we have strayed into kafka's Fantastic world."

বিপ্লবোত্তর রুশ সাহিত্যে বহু শক্তিশালী লেখক গণসংগ্রাম ও জনজাগরণকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লিখছেন। সে সাহিত্য রাশিয়ার বাহিরে নানা রকম ভাবে গৃহীত হ'য়েছে। রাজনৈতিক মতবাদপ্রভাবিত সাংবাদিকতার মাধ্যমে পাঠকের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে। তারা সুস্থ দৃষ্টি দিয়ে রুশ সাহিত্যকে গ্রহণ করেন নি, তথাপি তার মধ্যে শোলোখব উন্নতশীর্ষ বনস্পতির মত পরিদৃশ্যমান। তিনি ১৯০৫ সালে ডন নদীর অববাহিকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা অর্দ্ধেক কশাক ও অর্দ্ধেক কৃষক রমণী, তাঁর পিতা কৃষক ও পশু ব্যবসায়ী। ১৯১৮ পর্য্যন্ত পড়াশুনো করে লাল-বাহিনীতে যোগদেন। পরে সুপ্রিম সোভিয়েটে তার জেলা প্রতিনিধি হন।

পূর্ব্বে কোন কশাককে কৃষক বললে অপমান করা হত। কশাক যোদ্ধাজাতি; বীরত্ব উদারতা নিষ্ঠুরতা সহিষ্ণুতার জন্যে তাদের প্রসিদ্ধি ছিল, তাই কৃষক বললে তারা অপমানিতবোধ করত। গৃহযুদ্ধের সময় কশাকগণ দুইভাগে ভাগ হ'য়ে জার ও লালবাহিনীর পক্ষ সমর্থন করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব থেকে টলষ্টয়ের ওয়ার এ্যাণ্ড পিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শোলোখব কশাক জাতির যুদ্ধ ও জীবনের ঐতিহাসিক এই প্রতিকৃতি আঁকেন। গ্রিগর ও আকসিনিয়ায় চরিত্রের প্রাধান্য থাকলেও, তার কোয়ায়েট ডন কশাক জাতির এক সামগ্রিক চিত্র,—সমগ্রতার মধ্যে ব্যক্তির বিলোপ হ'য়েছে। আধুনিক যুগে Andreyev, Bunin, 'Fadayev, leonov, Pilnyak খ্যাতিমান লেখক।

বর্ত্তমান যুগের আর একজন কৃতি লেখক William Falkner (Faulkner) তিনি আমেরিকার দক্ষিণাংশের লোক, দক্ষিণের সাদাকালো সমস্যার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। তার চরিত্রগুলি অনেক সময়েই অদ্ভুত, বায়ুগ্রস্ত, অস্বাভাবিক, পাপবোধে বিকল এবং হতাশায় ভয়াবহ। সাধারণ বর্ণনার রীতিতে লিখলে তার উপন্যাস হয়ত অত্যন্ত অবিশ্বাস্য ও অস্বাভাবিক হ'ত। কিন্তু তিনি জেমস্ জয়েসের "Stream of consciousness" আঙ্গিক অবলম্বনে নিজস্ব একটি লেখার আঙ্গিক সৃষ্টি করেছেন—যা তার অদ্ভুত চরিত্রকে স্বাভাবিক করেছে—"the intricate and torturing emotions, twisted and

obscure, of obsessions and fixations and depravities are most difficult to express and to explain in words, yet it is these inexpressibles that Falkner succeeds at his best, in making the reader believe and understand." তার প্রসিদ্ধ পুস্তক "The sound and the Fury (১৯২৯), Intruder in the Dust (১৯৪৮)এ তার লেখা সাদা-নিগ্রো সমস্যা অত্যন্ত সমবেদনা ও বুদ্ধির দীপ্তি নিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। এই সমস্যাকে তিনি জাতীয় বৃহত্তর মানবতার সমস্যায় উন্নীত করেছেন।

এই শতকের সমগ্র সাহিত্যের আকাশে টমাস ম্যান এক স্বতন্ত্র জ্যোতিষ্ক। পাঠকগণ তাকে দুর্বোধ্য ও জটিল বলে পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু এই কাঠিন্য অনেকটা জার্মান থেকে ইংরাজীর অক্ষম অনুবাদ প্রসূত। দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও পৌরাণিক পরিবেশে পাঠক বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, কিন্তু ম্যানের ন্যায় আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন আর্টিষ্ট দুর্লভ। তাঁর "Sketch of my life" (১৯৩০) এ তার নিজস্ব লেখায় সমালোচনা ও অভিমত তার উপন্যাসের জটিলতাকে সরল করেছে। তিনি বলেন তাঁর ছোট উপন্যাস Tonio Kroger (১৯০৩) ভাষা ও সঙ্গীতের (Music) এক ছন্দকে ধরতে চেষ্টা করেন। পরে Magic Mountainএ এই রীতির পূর্ণ ব্যবহার করেন। Davosএর স্যানিটোরিয়ামে যখন তার স্ত্রী রোগী হিসাবে ছিলেন তখন সেখানে তিনি তিন সপ্তাহ থাকেন। সেই সময়ে প্রথম তার মনে Magic Mountainএর idea আসে। এটিকে ছোট হাস্যরসাত্মক গল্প রূপে কল্পনা করেন—"and was to express the fascination of death, the triumph of disorder over life, founded upon order and consecretated to it", কিন্তু পরে এই সামান্যই "dangerous Concentration of association" হয়ে ওঠে এবং দীর্ঘ বার বৎসর এই বৃহৎ উপন্যাস রচনা করেন। এই সমস্যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বেই তাঁর মনে ছিল "bathed in the lurid and desolate light of the Conflagration" সেটা উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। তার লেখা প্রবন্ধগুলিই তার উপন্যাসের পথপ্রদর্শক। তিনিই বলেন, "my essay writing proclivities seem fated to accompany and act as critique upon my more creative work."

১৯৪৮এ প্রকাশিত তার Dr, Faustus তার নবতম অনবদ্য সৃষ্টি। ম্যানের বৈশিষ্ট্য তিনি এককথা দুইবার বলেন নি কখনও, প্রত্যেকটি সৃষ্টি নূতন, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তার 'Freud and Future' প্রবন্ধে Dr. Faustusএর মূল সুরটি ব্যাখ্যা করেছেন। জীবনের সমস্যা হচ্ছে "irrational, the instructive, the dark night forces in human nature" কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন, মানুষের বিবেক একদিন তার অন্ধ মূঢ়তাকে জয় করে তাকে বশীভূত করবে, জীবনকে সুন্দর ও সত্য করে তুলবে। তার জিজ্ঞাসা, "when will the light of hope dawn ?"

ওরা কারা

শ্রীঅমরচাঁদ মুখোপাধ্যায়

শীর্ণ শরীরে, ক্লান্ত দেহে, ম্লান মুখে, ওরা কারা
গৃহ হারায়ে, পথ হারায়ে, ভ্রমিছে পৃথিবী সারা।
চোখেরি জলে বুক ভাসায়ে কেন ওরা আজ যাচে
মান-অপমান করে অবসান যাযাবর সম বাঁচে।
কার অপরাধে, কোন অভিশাপে হেন অপমান স'বে—
কে পরাল তারে ভিখারীর সাজ কে আমারে
আজি কবে।
তাদের এ দুঃখে কেন মোর বুকে কঠোর আঘাত পাই
তারা কি আমার রক্তের ধারা—তারা কি আমার ভাই।
আমিও ভিখারী ওদেরি মত, ওদেরই মত হীন
আপন ভায়ের দুঃখ ঘোচাতে তাই কি হয়েছি ক্ষীণ।
বীর নহি আমি, নহিক ধনী, নহি আমি সন্ন্যাসী
তবু দিব আজ মোর সবটুকু ওদেরি উল্লাসি।
ওরা যে নালিশ পাঠায়েছে আজ বিশ্ব-পিতার কাছে
আমারো দু-ফোঁটা আঁখিজল জানি তাহাতে
মিশান আছে।

রোজ পরার কাপড়
সানলাইটে কেচে
কত ফরসা, ঝলমলে !
SUNLIGHT
SOAP

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অঙ্কটা বাইরে ব'সে ব'সে-ই কাটিয়ে দিলুম। চা-টা যেন একটু অল্প অল্প তেতো লাগ্‌লো, ভাব্‌লুম, বড় কড়া ক'রে ফেলেছে। তারপর একটু এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে দেখি নিকটে-ই যে একটা মাঝারি নিমগাছ ছিল, তার তলায় সন্ধ্যার পর যে হ'ল্‌দে পাতাগুলো ছড়ানো দেখেছিলুম, তা প্রায় পরিষ্কার হ'য়ে গেছে, চায়ের দৌলতে একটা নতুন সাইকলজিক্যাল তথ্য শিখে ফেল্‌লুম্, যথা—থিয়েটারে যখন চিরবসন্ত, তখন হেমন্তেও (কার্ত্তিকে) নিম্বভোজনম্।

পূজার রাত্তিরে ১১টার আগে বাসায় ফিরে গিয়ে কি ক'র্‌ব, ঘুম ত' হবে-ই না, বন্ধুরা সব প্রায় দেশে গেছে, তাদের কারুর ওখানে গিয়ে যে খানিকটা হুইষ্ট খেলে সময় কাটাবো, তার-ও উপায় নেই। আবার নগদ টাকা দিয়ে দু দু খানা টিকিট কিনেছি, আর থিয়েটারের ম্যানেজারেরা এক অঙ্ক দেখিয়ে ঠকিয়ে টাকাটা গ্রাস ক'র্‌বে, তা-ও প্রাণে সহ্য হ'চ্ছে না।

লোহার রেল ভাঙার উপর হাতুড়ী পেটার আওয়াজ, আর সঙ্গে সঙ্গে গোলাপী সিগারেট্, পান-বিড়ি—আওয়াজ্ উঠ্‌তে-ই বুঝ্‌তে পারা গেল, দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হ'ল; তারপর কনসার্ট অর্থাৎ ঐক্যতান বাদন; বেহালা যদি বাজ্‌ছে সি সার্প, বম্বার্ডেন ডি, ক্লারিয়নেট্ এফ্; প্রত্যেক যন্ত্রী-ই যেন ব'ল্‌ছেন, 'আমি যে সুর ধরেছি, তাতে-ই সবার ঐক্য হওয়া উচিত, তা হ'লে-ই ঐক্যতান বাদন হবে, আর অন্যান্য যন্ত্রীরা সঙ্গে সঙ্গে-ই ব'ল্‌ছেন যে এই স্বাধীনতার দিনে আমরা কার-ও তাঁবেদার হ'য়ে পদানুসরণ ক'রতে প্রস্তুত নই, আমাদের-ও ফ্রি-উইল অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা আছে। এর উপর ষ্টেজে-ও যখন বীররস গর্জ্জন ক'রেছে, আমরা-ই বা তবে কেন পেছিয়ে প'ড়ে চেপে থেকে একটা স্কেলের গোলামী ক'রবো।

দর্শকরা বাইরে এসে স্বদেশী সিগারেট্, স্বদেশী বিড়ি, স্বদেশী ন্যাকড়ানিঙড়িত স্বদেশী চা, স্বদেশী কেক্ বিস্কুট ও স্বদেশী তেলে ভাজা ক্রুকেট্ পান-ভোজন ক'র্‌ছেন, আর অভিনয়ের তারিফ্ ক'রছেন; কেউ বা নাচের পক্ষপাতী, কেউ বা গানের, কেউ বা প্রমাণ ক'রে দিতে রাজী আছেন যে চম্বোলীর রাজপথ হুবহু ওল্ড কোর্ট্ হাউস ষ্ট্রীটের মত হ'য়েছে, আর ঐ রাজপথে ইলেকট্রিক পাখা ঘোরায় সপ্তদশ শতাব্দীতে-ও আমাদের ভ্রাতা রাজপুতরা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উন্নতি কতদূর ক'রেছিলেন, তা বোঝা যাচ্ছে; কিন্তু এক বিষয়ে সমস্ত দর্শক একমত দেখা গেল যে কবি যা বীররসপ্রসবিনী স্বদেশহিতৈষিনী ঝিয়ের চরিত্র সৃষ্টি ক'রেছেন, তা কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর ইম্পসিব্‌ল্। নাটকের নাম "জলধির স্থলপদ্ম" না দিয়ে ঐ ঝিয়ের নামে "অমিতা" হ'লেই ঠিক হ'ত

তা'ছাড়া তৃপ্তি কি একট্-ই ক'রলে! বন্ধু উত্তর দিলেন, "কেমন—কেমন! ব'লেছিলুম ত! তুমি যে 'ভারাক্রান্ত ভারত' দেখ্‌তে চাচ্ছিলে, সেখানে গেলে কি তৃপ্তির এই একটিং দেখ্‌তে পেতে? তৃপ্তি হ'চ্ছে বাঙলার সারা বার্ণার্ড স্মিথ, ও বিলেতে জন্মালে কোন্ কালে সার্ টাইটেল্ পেত'।"

অভিনয়ের চেয়ে সমালোচনা আমাদের বেশী মিষ্টি লাগ্‌ছিল, কিন্তু থিয়েটার-দ্বীপের অপর প্রান্ত হ'তে ঝামাঘসা বামাকণ্ঠনিঃসৃত "ও গো পটোলডাঙার শোয়ারী —শ্যামবাজারের শোয়ারী কোথা গো, নেমে এস" —"ও তালতলার শোয়ারী, সিঙ্গীদের বাড়ী গো, সিঙ্গীদের বাড়ী," "মুখুয্যেদের কে এসেছ, এস গো", এই রকম দক্ষিণেশ্বর থেকে কালীঘাট পর্য্যন্ত নগর উপ-নগরের যত পল্লী আছে, আর বাঙালীর যত রকম পদবী আছে, সব উচ্চারণ ক'রে থিয়েটারের ঝি যে ষ্টেজের ঝিয়ের আগে মেডেল ও নাইট্ উপাধি পাবার উপযোগী, তা প্রমাণ ক'রে দিচ্ছিল, তাইতে-ই আমাদের কাণের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কে কতকটা ডুব্‌খুর চিড়িক্ প্রবেশ ক'র্‌ছিল।

এমন সময় যাদব আমাদের চায়ের টেবিলের কাছে একখানা চেয়ারে ব'সে প'ড়্‌লো, আমি ব'ল্লুম, "কি হে যাদব, তালতলার শোয়ারীর বাবু তুমি না কি?" যাদব ব'ল্লে, "হ্যাঁ, আর ব'লো না ভাই, বাড়ীর ওঁদের সঙ্গে না আন্‌লে আস্‌বার-ও যো নেই, আবার আন্‌লে থিয়েটার দেখা চুলোয় যা'ক্, ওঁদের-ই কেবল তদ্বির।" আমি ব'ল্লুম, "পানটানের জন্যে যে খরচা হয়, তা আগে থাক্‌তে দিয়ে দাও না কেন, ঐ চীৎকারে বাড়ী মাত্ ক'রে ভিড় ঠেলে তেতালা থেকে নামিয়ে আনার দরকার কি?" যাদব ব'ল্লে, "টাকাকড়ি ত' ওঁদেরই কাছে থাকে, আমি আবার দোষ কি? নামিয়ে এনে খালি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, 'বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছ ত? ঝি কি রকম এক্ট্ ক'র্‌লে বল", বস্ এই পর্য্যন্ত।" আমি—"ইরির জন্যে এই হাঙ্গাম?" যাদব—"ঐটুকু যদি ফি ড্রপ্‌সিনের পর না করি, তা হ'লে বাড়ী গিয়ে শুন্‌তে হবে যে একেবারে মগ্ন হ'য়ে থিয়েটার দেখ্‌ছিলে, আমরা মরি কি বাঁচি, তার খবর নেই।" আমি—"যত দোষ বুঝি তাঁদেরই, স্পষ্ট ব'ল্‌তেই ত' পার, আকাশ থেকে চাঁদ নামিয়ে মাঝে মাঝে সাম্‌নে না দাঁড় করালে প্রাণটা ঠাণ্ডা হয় না? যাক্, তোমার সঙ্গে নিবারণবাবুকে দেখেছিলাম না, তিনি কোথায়?" যাদব—"নিবারণবাবুর অন্যত্র একটু বরাত আছে, ঘরে ফির্‌তে ভোর হবে, বাড়ি গিয়ে দেখাবেন ব'লে এখান থেকে একখানা প্রোগ্রাম পকেটে ক'রে নিয়ে গেলেন।"

ঢং! 'ড্রপ্ উঠেছে, ড্রপ্ উঠেছে' একটা শব্দ হ'ল, দ্বারে দ্বারে পুনঃপ্রবেশের ভিড়; দশ আনা নিজের ইচ্ছা, ছ আনা যাদবের অনুরোধ, আমরা-ও গিয়ে ষ্টলে ঢুকে একটা যায়গা যোগাড় ক'রে ব'সে প'ড়্‌লুম।

প্রথম দৃশ্যে-ই দু-জন সৈনিক কথা ক'চ্ছে;—

১ম সৈ। তার পর আমরা সেনাপতির আদেশে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে অগ্রসর হ'তে হ'তে—

২য় সৈ। অন্ধকার নিশীথে মাত্র, তারকালোকে—

১ম সৈ। দুর্গের পশ্চাতে গিয়া—

২য় সৈ। উপনীত হ'লেম।

১ম সৈ। পশ্চাতের প্রাচীর দুর্ব্বল ছিল, সুতরাং—

২য় সৈ। সমবেত সৈন্যের পদাঘাতে—

১ম সৈ। হুড়্‌মুড়্ শব্দে তা' ভূমিসাৎ হ'ল।

২য় সৈ। তখন রাজ-জামাতা গন্ধর্ব্ব সিংহ—

আমি ব'ল্লাম, "ও যাদব, দু'জনে-ই ত' দেখ্‌ছি সব জানে, তবে আবার বলাবলি ক'র্‌ছে কেন?" ফকির মামা ব'ল্লে, "দূর মুখ্যু, ওরা যেন জানে, তুই জান্‌তিস্ কি? ঐখানে-ই হ'চ্ছে আর্ট।"

দ্বিতীয় দৃশ্যে আট বছর থেকে আরম্ভ ক'রে ব'ল্‌তে-নেই-অবধি বয়স পর্য্যন্ত অবস্থার পৌনে দু'ডজন সখী সার বেঁধে ষ্টেজে ঢুকে অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে কাত হ'য়ে শুয়ে প'ড়্‌ল; ভাব্‌লেম্, এরা-ই বুঝি স্থলপদ্ম, আপাততঃ ভূঁইচাঁপাতে পরিণত হ'য়েছে; তার পর সখীরা ঐ শায়িত অবস্থাতে-ই এক একখানি হাত খানিকটা তুলে আঙুল-গুলি এঁকিয়ে বেঁকিয়ে ঘোরাতে লাগ্‌লেন, বোধ হয়, পাপ্‌ড়ি-নাড়ার অভিনয়, তারপর যেই নেপথ্যের তব্‌লায় তেহাই প'ড়্‌লো, অমনি সখীরা হুড়্‌মুড়্ ক'রে ঝাড়াক্‌সে না উঠে নাচ্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে। দু'হাতের চেটো সাপের মত ফণাধরা, শেষে দমবন্ধ-করা মুখে জোরে চেপেধরা ঠোঁট, তার মধ্যে গুটি পাঁচেক সখীর বিদ্রোহী দাঁত

কিছুতে-ই পর্দ্দার আড়ালে থাক্‌তে চায় না, আর ডিঙী মেরে মেরে তালে-বেতালে চলা, যেন সৌন্দর্য্যের স্রোত বহিয়ে দিলে; বোঝা গেল যে 'গায় গলা আর নাচে রূপ' এ কথা সত্য বটে। গলা-ও গাইলে। বাঙ্‌লার ভোজে মাছের কাঁটা থেকে আরম্ভ ক'রে লাউয়ের বাক্‌লা পর্য্যন্ত মিশ্রিত 'ছ্যাচড়া'র মত মিষ্টি তরকারী আর নেই, আর বাঙ্‌লার আজকালকার গানে বাগেশ্রী থেকে আরম্ভ ক'রে লুম্‌-ঝিঁঝিট, থাম্বাজ, টৌরী, অহং ইত্যাদি মিশ্রিত জংলার মতন ওস্তাদী রাগিণী আর কিছু নেই। তার পর গানের কথার মধ্যে বার্ডেনটা বোধ হ'ল, আর বোঝা-ও গেল— "এ নব যৌবন-ভার, বহিতে না পারি আর," ৮।৯ বছরের মেয়ে-কটির যৌবন-ভার বোঝা গেল তাদের পায়ে-ই নেমেছে, দেড় ছটাক ওজনের দুখানি পায়ে সাত পো ওজনের ঘুমুর জড়ানো দেখে; আর একটি মহিয়সী মহিলার বোধ হয়, প্রায় ৪৮ বৎসরের সঞ্চয়ে এত দূর বেড়েছে যে তাঁকে কাঁটায় চড়ালে অন্ততঃ ৩॥০ মণের কমে দাঁড়াবে না; বক্স থেকে একটি বাবু এই মহিলার নৃত্যে মোহিত হ'য়ে তাঁর চরণ উদ্দেশ্যে একটা ২॥০ সের ওজনের তোড়া ফেলে দিয়ে নিজের সৌন্দর্য্যবোধশক্তির পরিচয় দিলেন। দর্শকমণ্ডলী ঘন ঘন করতালি দিলেন, গ্যালারি থেকে একটা জোর শিশ্‌ উঠ্‌লো।

আমি এক রকম ছেলেবেলা থেকে-ই থিয়েটার দেখ্‌ছি; ক'ল্‌কেতায় ত' অনেক থিয়েটার অনেকবার দেখেইছি, সখের থিয়েটারে-ও নিমন্ত্রণ পেয়ে গেছি, তার পর ঢাকা, কুমিল্লা, রংপুর, খুল্‌না, নৈহাটী, বহরমপুর,—একবার লক্ষ্ণৌ গিয়ে একটা থিয়েটার দেখি, সব যায়গায়-ই দেখেছি যে হাততালি প'ড়লে-ই জোরে একটা শিশ্‌ ওঠে; এতে আমার বিশ্বাস যে, এই ভারতবর্ষে একটিমাত্র লোক আছে, যার জীবনের কার্য্য হ'চ্ছে থিয়েটার যেখানে হয়, সেখানে গিয়ে শিশ্‌ দেওয়া। ইনি সখে এ কাজ করেন কি পেশাদার? যদি পেশাদার হন, তা হ'লে এঁর বেতন দেয় কে, এ কথা কেউ ব'লে দিতে পারেন?

পট-পরিবর্ত্তন

চম্বোলি নগরের উপকণ্ঠস্থ পথ।

সিন্‌খানির সাম্‌নে প্রথমে একটি নদী, নদীর ধারে এক-সার ঝাউগাছ, তারপর লাল সুর্‌কী বাঁধানো রাস্তা, রাস্তার পরপারে প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যান, কলের উচ্চ চিম্‌নী দেখা যাচ্ছে, আন্দাজ হ'ল অনেকটা যেন ক'ল্‌কেতার অপর পারে ঘুষ্‌ড়ীর ষ্টল্‌কর্ট্‌ সাহেবের বাগান ও কলের সাম্‌নের রাস্তার মত; কিন্তু পটু চিত্রকর তাঁর কলাবিদ্যার কৌশলে হিন্দুস্থানের প্রাচীন কোন রাজ্যের ভাব দর্শকের মনে জাগরিত কর্‌বার জন্য ঐ দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে কাশীর বিশ্বনাথের সুবর্ণমণ্ডিত মন্দিরের অগ্রভাগ ও তাজমহলের গম্বুজ চিত্রিত ক'রে দিয়েছেন, এটা অলঙ্কার-শাস্ত্রমতে যেমন কবিপ্রসিদ্ধি বা পোয়েট্‌-লাইসেন্স্‌ আছে, তেমনি পেণ্টার্স-লাইসেন্স্‌। পটখানি প্রকাশ হবা মাত্র ঘন করতালিধ্বনি ও এন্‌কোর শব্দ উত্থিত হ'ল। শিশ্‌ওয়ালাও আপনার চাকরীর মর্য্যাদা বজায় রাখ্‌লে।

(পলায়নপর সৈনিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অপর সৈনিকের প্রবেশ ও তাহাকে ধৃতকরণ)

২য় সৈ। ভীরু, পলায়ন ক'র্‌ছ?

১ম সৈ। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, ভাল লাগে না এখন।

২য় সৈ। ছেড়ে দেব? কোথায় যাচ্ছ এখন, লজ্জা করে না, পালাচ্ছ?

১ম সৈ। কে ব'ল্লে আমি পালাচ্ছি?

২য় সৈ। তবে কোথায় যাচ্ছ?

১ম সৈ। বাড়ী যাচ্ছি।

২য় সৈ। কার আজ্ঞায় বাড়ী যাচ্ছ?

১ম সৈ। কার আজ্ঞা? পেটের আজ্ঞা, ক্ষিদের আজ্ঞা, বেলা সাড়ে তিনটে বেজে গেছে, এখন-ও মুখে একটু জল পড়ে নি, চা-টা পর্য্যন্ত খাওয়া হয় নি।

২য় সৈ। শত্রুপক্ষ ঘন গোলাবর্ষণে আমাদের সৈন্য-গণকে ধরাশায়ী ক'র্‌ছে, এখন-ও যুদ্ধ শেষ হয় নি; আর ভীরু, রণস্থল ছেড়ে পলায়ন ক'র্‌ছিস?

১ম সৈ। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত 'অপিক্কে' ক'র্‌লে কি আমি থাক্‌ব?

২য় সৈ। ভীরু, দেশের জন্য—স্বাধীনতার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে কাতর হ'চ্ছিস! (দর্শকগণের ঘন করতালি)

১ম সৈ। প্রাণ-ই যদি যাবে, স্বাধীনতা নিয়ে ভোগ ক'র্‌বে কে বাবা! (দর্শকগণের উচ্চহাস্য)

যাদব ব'ললে, "আর্টটা দেখ্‌লে একবার? সিরিও-কমিকে কি হারমোনিয়াস্, ভরিফিকেশন্!"

২য় সৈ। কাপুরুষ, আমারই কি প্রাণ নেই? তবে তোর মত আমার প্রাণে ভয় নেই।

১ম সৈ। তা জানি বাবা, দু'বার গলায় দড়ি আর একবার ডুবে ম'র্‌তে চেষ্টা ক'রেছিলে। তা কি জান বাবা, তোমার বাড়ীতে-ও যুদ্ধক্ষেত্র, বাইরে-ও যুদ্ধক্ষেত্র, সুতরাং তুমি নিষ্পরোয়া। আমার বাড়ীতে যা হোক্ মাগী রেঁধে দু'টি ভাত-ও দেয়, দু'টো আত্তি ক'রে কথা-ও কয়, সুতরাং প্রাণটার ওপর একটু দরদ আছে।

২য় সৈন্য। ধিক্ ধিক্ নরাধম,
ইচ্ছা হয়, দমাদ্দম প্রহারি তোমারে
ধরিয়ে চুলের ঝুঁটি।
ছুটিতেছ প্রাণভয়ে?
মৃত্যু সদা বীরবাঞ্ছনীয়।
কেহ মরে জ্বরে,
কেহ বা উদরে প্লীহার পীড়নে।
ক'রে দয়া, ধরে ম্যালেরিয়া,
কালাজ্বর সূত্রে, কেহ বহুমূত্রে,
থাইসিসে নিঃশ্বাস রোধ কাহার-ও বা হয়।
ব্রাণ্ডীবট্‌ল্ ব্যাভারে পটোল তোলে বা কেউ—
মরণের ঢেউ সদা উঠে সংসার-সাগরে।

(বাঃ বাঃ—ব্রভো—ব্রভো)

কিন্তু অবহেলে যুদ্ধস্থলে
প্রাণ দেয় যেই জন,
বুদ্ধিমান সেই, না ভোগে
রোগের যন্ত্রণা শুয়ে।
বিশেষতঃ মায়ার প্রপঞ্চ এই রঙ্গ-মঞ্চে
কোন্ নর নাহি চায়
চট্ ক'রে প্রাণ পরিত্যাগ?
এ দারুণ গ্রীষ্মে, প্রতি দৃশ্যে দৃশ্যে
প্রবেশিয়া, করি' অসি আস্ফালন,
সজোরে গর্জ্জন, প্রাণ বিসর্জ্জন হ'লে বাঁচি।
তৃতীয় অঙ্কেতে যমের অঙ্কেতে
মুদিয়ে নয়ন, করিলে শয়ন,
ফেলিব নিঃশ্বাস, পার্ট হবে শেষ;
ফেলি' পরচুলা তুলাভরা জামা,
ছদ্ম গোঁপ-দাড়ী ছাড়ি'
পাড়ি দিব যে যার বাড়ীতে সকাল সকাল;
তবে কালভয়ে ভীত কেন রে দুর্জ্জন?

(বিউটীফুল, বিউটীফুল ও করতালি)

১ম সৈ। বাখানি সাহস তোর,
বলিহারি বীরপণা!
সত্য বটে যমে না ধরিলে জটে
নটের নিস্তার নাই।
চল ফিরে শিবিরেতে যাই;
প্রবেশ প্রস্থান দু'-এক ক্ষেপ,—
না করি আক্ষেপ,
পটক্ষেপ না হইবে যতক্ষণ।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(গ্যালারি হইতে এন্‌কোর এন্‌কোর ও শিশ্)

(মন্ত্রি-পুত্রের প্রবেশ)

ম-পু। যুদ্ধ বেধেছে, স্বদেশের জন্য—স্বাধীনতার জন্য সহস্র সহস্র দেশহিতৈষী এই সময়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে! কি বীরত্ব! কি মহত্ত্ব! গৌরবে—গরিমায়—ত্যাগের মহিমায় আমার হৃদয় স্ফীত হয়ে উঠ্‌ছে। তরুণ অরুণ তার সিন্দুরবর্ণে আমার শয়ন-মন্দির রঞ্জিত ক'র্‌ছে! কামিনী-রঞ্জন শশধরের শুভ্র হাসিরাশি বাসন্তী-পবনে মিশাইয়া গিয়া যেন মরমে আমার বেহাগে মূলতান বাজাইতেছে। স্বাধীনতা, তোমার জন্য আমি কি না ক'র্‌তে পারি? মাতর্জ্জন্মভূমি, তুমি অনুমতি দিলে আমি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, অলস-বিলাস, শয়ন-ভোজন, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারি। কিন্তু—

তা ব'লে কি হায়,
সত্য সত্য ম'র্‌তে যেতে পারি
আমি কামানের মুখে ?
অসির ঝলক্‌,
নলকে দামিনী সম
কম কবিতায়।
তা ব'লে কি হায়, নিজের গলায়
পড়ে যদি সে অসির কোপ্‌,
তোপে উড়ে যায়
পৈতৃক মস্তক অথবা শরীর,
কোন্‌ বীর পারে, স্থির থাকিবারে
সমর-প্রাঙ্গনে ?
দাঙ্গা-হাঙ্গামার মাঝে
ভদ্রলোকে কভু কি বিরাজে ?
পদ্যে কিংবা গদ্যে,
শুইয়া মশারিমধ্যে,
বিপক্ষে বধিতে পারি
করিতে বক্তৃতা।
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় !
কথা অতি মধুময়,
কিন্তু বড় সোজা নয়,
সে জয়ের দায়ে
ধেয়ে গিয়ে কষ্ট পাওয়া
হাঙ্গামার মাঝে।
ধিক্‌ ধিক্‌ মহারাজ,
শত ধিক্‌ জনকে আমার ;
মন্ত্রি-পদে বসি',
মাসিক বেতন গণি',
বংশের কেতনে,
অম্লান বদনে, আজ্ঞা দেন,
যেতে মারামারি কাটাকাটি
লাঠালাঠি-পূর্ণ রণস্থলে।
ওহো—হো—হো—
মুখে বন্দেমাতরং
ভয়ে বুক কাতরং,
নবনী-গঠিত এই বঙ্গ-গতরং,
নহে খোট্টা সম পাথরং,
কিংবা দুলে বাগ্‌দী ইতরং,
তদুপরি প্রিয়া পূর্ণ সতেরং,
সুকেশাং সুবেশাং
মৃদু-হাস্যবিমলাং
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ছেড়ে হেন কামিনীং

কি দুঃখে বিপক্ষ-মাঝে
যাব আমি আত্মহত্যা তরে অগত্যা ?

(দর্শকগণের করতালি)

(রণসজ্জায় সজ্জিতা মন্ত্রি পুত্র-বধূ নগেন্দ্রবালার প্রবেশ)

(দর্শকগণের উচ্চ করতালি)

প্রিয়ে—প্রিয়ে !
বিদায়—বিদায় !

নগেন্দ্র। চল—চল,
প্রাণেশ্বর—বীরবর,
অগ্রসর—অগ্রসর—
রণে হও অগ্রসর।

ম-পু। প্রিয়ে ! তবে বিদায়।
আর এ জনমে তোর
চাঁদিয়া বদন
করিব না নিরীক্ষণ,
কালো কেশরাশি
হাসি' হাসি' না দিব দুলায়ে।
মানে মুখ থাকিলে ফুলায়ে
চরণে বুলায়ে কর
করিব না আরাধনা ;
বেদনা বাজিলে বুকে,
চুমায়ে ও মুখে
ঘুমায়ে না পড়িব তোমার পাশে।

নগেন্দ্র। ধিক্‌ ধিক্‌ প্রাণনাথ,
শুনিয়া তোমার বাৎ
ধাত ছেড়ে যায় যেন হ'য়েছে লক্ষণ।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত শিরে,
নয়নের নীরে ডেকেছে
প্রবল বান,
খান্‌ খান্‌ লবেজান্‌
এ জান আমার।
এ বিশ্ব-সংসার
এখনো যে ছারখার
কেহ নাহি করিল গমন !
অরিরে না করিয়ে দমন
পতি মোর প্রেম-কথা কয় !
শমনের আবাহন
নাহি শোনে কানে !

ম-পু। হা প্রিয়ে !
কোথায় নয়নে জল,

বিমলিন বদন-কমল,
বারে বারে কোথায় বারণ,
সজোরে দু'করে ধারণ,—
ধরিয়া রাখিতে মোরে
গৃহের পিঞ্জরে
কিংবা বক্ষের-পঞ্জরে !
না হ'য়ে লজ্জিতা,
সজ্জিতা পুরুষ-বেশে ?
চূড়াবাঁধা কেশে পাগ্‌ড়ী জড়ায়ে
লড়ায়ে যাইতে যেন
হ'য়েছ উদ্যতা।
। হ্যাঁ—হ্যাঁ।
বাটী-ত্যাগ, শাটী-ত্যাগ,
পরিত্যাগ পরিপাটি কবরী-বিন্যাস।
অবলার অহঙ্কার
অলঙ্কার-ভার,
এ অঙ্গে সহে না আর।
যুগযুগান্তর
কেটে গেছে নারী-ভাবে,—
অন্তরে নূতন মন্ত্র
এবে দিয়েছে স্বদেশ।
বন্দিনী রন্ধন-ঘরে না রহিব আর,
না করিব
সন্ধ্যায় চন্দন-চর্চ্চা, বেণীর বাহার।
ভাঙিয়াছে ভ্রম,
বৃথা পণ্ডশ্রম—
সন্তান পালন
ছলনা বুঝেছি সার।
কহি সত্য সত্য
বুঝে নেব নিজ স্বত্ব,
পূর্ণ পুরুষত্ব করি' অধিকার।
দাড়ী করি' লোপ,
মুড়াইয়া গোঁপ,
যামিনী কামিনী নামে
সম্ভাষি' পুরুষে,
বীর-রসে নারী
এ বিশ্ব ভাসাবে ;
সমাজ হাসাবে,
স্বামীরে শাসাবে,
ন্যায্য অধিকার
গ্রাহ্য হবে তার।
সাম্রাজ্য স্থাপনে,
স্থপতি-বিদ্যায়,
হবে নারী ইঞ্জিনীয়ার।

ম-পু। সে কি ?
নগে। আর সে কি !
এই দেখ রণে আগুয়ান্
রমণী জোয়ান।
(অসি কোষমুক্ত করিয়া)
এই অসি ঝলে করে,
কটাক্ষ ঠিকরে
বৈদ্যুতিক হুতাশন,
হ্রস্ব দীর্ঘ না রাখিয়া জ্ঞান,
অশ্বপৃষ্ঠে হব অধিষ্ঠান।
... ...

অজ্ঞান হ'য়ে আমরা এই দেখ্‌ছিলেম, ঘন ঘন করতালি ছাপাইয়া রঙ্গস্থল কাঁপাইয়া, মাতৃক্রোড়স্থ শিশুগণকে কাঁদাইয়া ফোঁপাইয়া নাট্যকলার এই অপূর্ব্ব বিকাশ, স্বদেশ-বাৎসল্যের এই ভীষণ উচ্ছ্বাস, নারীমহিমার এই গোলাপনির্য্যাস সকলের নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। চক্ষু মুদ্রিত ক'রে কলার আলাপ শুন্‌ছিলেম। চোখ খুলে দেখি, মন্ত্রিপুত্র বক্ষঃস্থল হ'তে একটি দুই ড্রাম শিশি বার ক'রে ব'ল্‌ছেন ;—

জীবনের সুখস্বপ্ন ভেঙে দিলি মোর !
ওলো মনচোর,
প্রেমঘোর কেন দিলি কাটাইয়ে ?
লুটায়ে চরণে
শুভ্রবরণে, প্রেমের কারণে,
পড়িয়াছি বারে বার,—
তার প্রতিদান
দিলি কি লো বীর-রসে ?
আর না ধ'রিবি
অধরে আমার প্রভাতে চায়ের বাটি ?
সন্ধ্যায় শীতল-পাটী বিছাইয়া ছাতে,
তাতে-পোড়া পতিরে তোর
না শোয়াবি আর ?
এলে আলস্যে জৃম্ভণ
চুম্বনে না জাগাইবি মোরে,
গহনার তরে বাহানায় না করি' দহন
কাহন কাহন কথা
কহি' সারা নিশি ?
রূপসি, পাগলিনী প্রায়
ধেয়ে যাবি সমর-প্রাঙ্গণে ?
তবে এস হলাহল,
এমন সংসারে না রহিব আর ;
এ বিজ্ঞানের যুগে,
না মরিব অস্ত্রাঘাতে,

হইব অজ্ঞান
রসায়নশাস্ত্রমতে।

(হলাহল পান ও পতন)

'প্রিয়ে, তবে বিদায়, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, ধূমকেতু, তরু, লতা, গুল্ম, তৃণ, অর্কিড, শিশির, নীহার, বৃষ্টিজল, নদীর স্রোত, সমুদ্রাম্বু, বরফ, ভাত, ডাল, মাছ, তরকারী, লুচি, সন্দেশ, চপ্, কাট্‌লেট্, পুডিং, পিক্‌ল্, হ্যাট্‌কোট্, নেকটাই, সিগারেট্ চা, জন্মের মতন বিদায়। প্রি—য়ে! ন—গে—ন্দ্র—বা—লা ত—বে আ—সি চি—র—বিদায়। হ—রি—দী—ন—বন্ধু স্ব—দে—শ চ—ব্—কা—

(মৃত্যু)

টিকিট কেনা সার্থক হ'ল, দু'টাকা দিয়ে দশ টাকার আনন্দ পেলুম্। ভাব্‌লুম্, একেই বলে ন্যাচার্‌ল্ প্লে! যাদব মনে হ'ল যেন একটু মুস্‌ড়ে গেছে। তার সত্যভামা স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে এই অভিনয় দেখেছেন, এইবার তাঁকে নামিয়ে গাড়ীতে তুল্‌বেন্, তাই বোধ হয় ভাব্‌ছেন, বিজ্ঞান-সাহায্যে তাঁর-ও এই জগৎ ত্যাগ ক'র্‌তে হবে কি না।

* * *

রসরাজ অমৃতলাল বসু রচিত অভিনব এই রঙ্গ-রচনাটি শুধু যে অপরূপ কৌতুকপ্রদ তাই নয়, এ থেকে বিংশ-শতাব্দীর গোড়ার আমলে বাঙলা-রঙ্গালয়ে নাটকাভিনয়ের আসরের একটি পরম-উপভোগ্য নিখুঁত-চিত্রেরও সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। তখনকার যুগে সহজেই দর্শক-সাধারণের মনোরঞ্জন সাধনের উদ্দেশ্যে, সচরাচর বীর-রস, করুণ-রস, ভক্তি-রস, লাস্যকলাময় নৃত্য-গীত, স্থূল-রসিকতা পরিবেশন আর স্বদেশ-প্রেমের শস্তা-চটকদার আদর্শ-প্রচারের দিকে নজর রেখে বিভিন্ন ধরণের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক কাহিনী অবলম্বনে নাটকের বিষয়-বস্তু রচনা আর অভিনব করাই ছিল রেওয়াজ। কিন্তু তাই বলে সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে রচিত নাটক যে সেকালে একেবারেই অপ্রচলিত ছিল—এমন ধারণা রাখাও ঠিক নয়। সেকালে নাটকের ভাষা অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই ছিল কাব্য-গন্ধী···যাত্রার ঢঙেও 'গুরু-চণ্ডালী' রীতি-অনুসারে রচিত। এই বিশেষ-ধরণের ভাষায় রচিত

সেকালের রামগানী-নর্ত্তকী
(প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি হইতে)

হতো বলেই, সেকালের ছোট-বড় সকল শ্রেণীর অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই রঙ্গালয়ে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকাভিনয়ের সময় 'আবৃত্তি' (Recitation) আর অভিনয় (Acting) কলা-নৈপুণ্যের দিকে রীতিমত নজর দিতেন। তাছাড়া তখনকার দর্শক-সমাজে, অধুনা-সুপ্রচলিত বাস্তবধর্ম্মী-অভিনয়ের (Realistic-mode of acting) চেয়ে 'মেলোড্রামা' (Melodramatic-mode of acting) বা 'অতি-নাটকীয়' ধরণের অভিনয়-কলার কদরই ছিল বেশী। তাই সেকালের অধিকাংশ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকে যাত্রার-ঢঙে রচিত 'কাব্য-গন্ধী', 'গুরু-চণ্ডালী' ভাষারই আধিক্য চোখে পড়ে। (ক্রমশঃ)

লাকু

শ্রীঅনিল মজুমদার

বিয়ারের বোতলটা তখনও শেষ হয়নি, গ্লাসেও খানিকটা পড়েছিল, ও দিকে হুল্লোড় শুরু হয়েছে; দারুণ হৈ হুল্লোড়।

প্লাটফর্মে একজন ইরাকি মেয়ে নাচতে শুরু করেছে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে, ক্ষেপে উঠেছে মানুষগুলো, উল্লাসে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে একেবারে।

যুদ্ধের দিন।

মানুষ ত আর নেই, সব বনেছে পশু—সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তাদের দেহের মনের, হন্নে হয়ে ঘুরে বেড়ায় সারাক্ষণ তারই নিবৃত্তিতে, যে কোন ভাবে, যে কোন উপায়ে। এখানেও ভীড় করেছে তারই আশায়।

আকাশে চাঁদ হাসছে, কিন্তু সে হাসিতে মধু নেই, আছে বিষাদ, বড় বিষাদমগ্ন চাঁদ। কে দেখে তাকে? কেউ না, দেখবার সময়ই বা কোথায়? সবাই চেয়ে আছে ওই অর্দ্ধ-উলঙ্গ নৃত্যরতা মেয়েটির পানে। সেই ত দেয় আনন্দ, চাঁদের কি আছে?

ধীরে ধীরে চাঁদ পশ্চিমে ঢলে পড়ে, একে একে মানুষও ঢলে পড়ে নেশাচ্ছন্ন হয়ে, অবসাদ নামে তার দেহে, তার মনে, প্লাটফর্মের আলো নিভে যায়, নিভে যায় মানুষের সমস্ত উত্তেজনা, থেমে যায় উন্মত্ত কোলাহল, নিঝুম নিঃসাড় হয়ে পড়ে উন্মুক্ত ক্যাবারেগুলো।

এই তো ক্যাবারের দৈনন্দিন জীবন। বোগদাদের এক ক্যাবারেতে বসে এই সবই ভাবছিলাম। যাব মশুল।

বোগদাদে ট্রেন বদল করতে হয়। মশুলের ট্রেণ ছাড়ে গভীর রাত্রে। তাই কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের সময় মেলে। বোগদাদে এসে পৌঁচেছি বিকেল বেলা। লাকুকে ষ্টেশনে আসতে লিখেছিলাম কিন্তু সে আসেনি। সারাদিন ট্রেণে কাটিয়েছি, মাথা ভর্ত্তি ধুলো আর বালি, শরীর এমনিতে ক্লান্ত—তার ওপর যখন লাকুকে ষ্টেশনে পেলাম না, তখন মনও গেল খিঁচড়ে। কি করি, শেষ পর্য্যন্ত এসে জুটলাম এই ক্যাবারেতে, শরীর ও মন দুটোকেই একটু চাঙ্গা করে নিতে।

লাকু এলনা, এত করে লিখলাম তাকে তবু সে এলনা, কেন, কে জানে। চিঠি কি সে আমার পায়নি? হতেই পারে না, নিশ্চয়ই সে পেয়েছে, ইচ্ছে করেই সে আসেনি।

হয়, এমনিই হয়, দূরে গেলেই মানুষ সব ভুলে যায়। লাকুও ভুলেছে, সব কিছু ভুলেছে সে, পুরোণো দিনগুলোর কথা সে হয়ত মন থেকে মুছে ফেলেছে একেবারে।

অসম্ভব কি? দুনিয়াতে অসম্ভব বলে কি কিছু আছে এখনও? বড় আশা ছিল সে আসবে, না আসতে মনে একটু দুঃখ হল বৈকি।

লাকু আমার বন্ধু, আমারই সমবয়সী। যুদ্ধেই তার সঙ্গে আলাপ। জাতে মারাঠী ব্রাহ্মণ, আসল নাম লক্ষ্মণদাস আপ্তে, যদিও আমার কাছে সে লাকু বলেই পরিচিত।

ধবধবে ফর্সা রঙ, টিকলো নাক, মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল, লম্বা দোহারা চেহারা, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, মুখে সব সময় হাসি। প্রথম দর্শনেই তাকে ভাল লেগেছিল আমার। দিল্লী কান্টনমেন্টের কাঠ ফাটা রোদ্দুরে যখন আমি দিশেহারা হয়ে ব্রিগেড অফিস খুঁজে বেড়াচ্ছি, তখনই তার সঙ্গে দেখা। সেই-ই আমায় নিয়ে যায় ব্রিগেড অফিসে। সেই থেকেই আলাপ। তারপরে দুজনে এসেছি বসরায়, দুটো পুরো বছর কাটিয়েছি সেখানে, অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে, কোনদিনও কোন সংঘাত হয়নি, বরং বন্ধুত্বটাই আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে। আস্তে আস্তে জানতে পেরেছি তার সব খবর, তার আত্মীয়-পরিজনের, বন্ধু-বান্ধবের, তার আশা ভরসার।

বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান, মা মারা যান অতি অল্প বয়সে, বাপই তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেন একরকম। বাপকেও অত্যন্ত ভালবাসে লাকু, একদিনও ছেড়ে থাকতে পারেনা কোথাও, কিন্তু বিধি বাম, এমন সুখের সংসারেও একদিন শনির দৃষ্টি পড়ে। লাকু যখন কলেজে পড়ে, তখন তার সঙ্গে আলাপ হয় একটি মেয়ের—যার নাম সাবিত্রী। চার বছরের ঘনিষ্টতায় আলাপটা শেষ পর্য্যন্ত ঠেকে গিয়ে প্রেমের পর্য্যায়ে পড়ে। কথা হয় লাকু বি-এ পাশ করার পর একটা কিছু হলেই তাদের হবে বিয়ে, কিন্তু মজাই এমনি যেই বিয়ের সময় এল, প্রেমও তখন একটু থমকে দাঁড়াল। সাবিত্রীর বাবা নাগপুরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার, আর লাকুর বাবা সামান্য একজন চাকুরীজীবী—আর লাকুও তাই। এমন বিয়ে আইনে বাধেনা, কিন্তু বোধহয় সম্মানে বাধে,তাই সাবিত্রীর বাবা তুললেন ঘোর আপত্তি, আর সাবিত্রীও তেমন কিছু জোর করলেনা। ইতিমধ্যে লাগল যুদ্ধ—সাবিত্রী লাকুকে বোঝালে—যুদ্ধে গেলেই উন্নতি অবধারিত এবং মোহাচ্ছন্ন লাকুও তাই বুঝলে এবং যুদ্ধেও নাম লেখালে তার কথায়। কথা হল, যুদ্ধের শেষে লাকু যখন একটা কেউকেটা হয়ে ফিরবে তখনই হবে তাদের বিয়ে এবং সাবিত্রীও ততদিন তার জন্যে অপেক্ষা করবে। মন্দ ব্যবস্থা নয়, কিন্তু লাকুর বাবার এতে মোটেই মত ছিলনা, ছেলেকে তিনি অনেক বোঝালেন, অনেক অনুনয় বিনয় করলেন, কিন্তু ফল হলনা কিছুই। অগত্যায় একদিন গ্রীষ্মের নীরব সন্ধ্যায় ভারাক্রান্ত মনে অশ্রুসিক্ত চোখে লাকুকে তিনি বিদায় দিলেন নাগপুর ষ্টেশনে।

লাকু এল দিল্লী।

বৃদ্ধ বাপ বসে রইলেন নাগপুরে ছেলের প্রত্যাগমনের পথ চেয়ে।

—কিন্তু রইলেন না বেশীদিন। এ দুঃখের বোঝা বেশীদিন বইতে পারলেন না আর, হঠাৎ একদিন হার্টফেল করে মারা গেলেন তিনি।

লাকু তখন বসরায়।

এ খবর যখন তার কাছে এল, তখন সে শোকে দুঃখে একরকম পাগল হয়ে উঠল, হাহাকার করে সে বললে, আমার যে আপন বলতে আর কেউ রইলনা জগতে।

সত্যিই তাই।

বছর দেড়েক বয়স, তখনও সে ভাল করে হাঁটতে পারেনা, বাপই তাকে হাতে ধরে হাঁটতে শেখান, কিছু খেতে জানেনা, নিজের হাতে খাইয়ে দেন—ভয় পেলে বুকে ধরে আদর করেন তিনি। সংসারে অভাব ছিলনা, লোকজনও ছিল প্রচুর, তবু কারও হাতে তাকে ছেড়ে দিতে তিনি ভরসা পেতেন না, তার যা কিছু কাজ সব তিনি নিজেই করতেন, সব সময়েই চোখে চোখে রাখতেন তাকে। লাকু যে দিন স্কুল ছেড়ে কলেজে গেল, সেদিন তাঁর কি আনন্দ, মন খুসীতে ভরে উঠল, চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল দুফোঁটা আনন্দাশ্রু—চোখের সামনে দেখলেন তার এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, এক গৌরবময় জীবন, আশার আলোকে ঝলমল করছে। কিন্তু তাঁর সব আশা সব আকাঙ্ক্ষা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল সেইদিন, লাকু যেদিন সাবিত্রীর কথায় যুদ্ধে নাম লেখালে। বাধা দিয়েও তিনি তেমন করে বাধা দিতে পারলেন না, পাছে লাকু দুঃখ পায়, সে দুঃখের ভার তিনি নিজেই নিলেন বুকে করে এবং তার মধ্যেই নিজেকে নিঃশেষ করে দিলেন একদিন।

সেদিনকার কথা আজও আমার মনে পড়ে, লাকুর সেই বেদনাবিধুর মুখখানা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। কত বোঝাবার চেষ্টা করেছি তাকে—কিন্তু কিছুই বোঝেনি সে, বার বার চোখের জল ফেলেছে আর বলেছে, ভুল করেছি, ভুলের মাশুল আমাকেই দিতে হবে। অনুতপ্তকে বোঝাতে যাওয়াই ভুল—তাতে অনুতাপের মাত্রাই বাড়ে শুধু।

এর পরে অনেকদিন কেটেছে, লাকুও আস্তে আস্তে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে—কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তার যুদ্ধে আসা তার কোন সুরাহা হয়নি। ক্রমেই ভেঙ্গে পড়েছে সে, আশা হয়েছে মরীচিকা, অনুতাপও দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এসেছে তার কাছে।

দিনের পর দিন গেছে বয়ে, মাসের পর মাস মরুভূমির উত্তপ্ত বাতাসে দেহ গেছে পুড়ে, রাত্রি এনে দিয়েছে শান্তির প্রলেপ, কিন্তু নতুনের কোন সন্ধান আসেনি। জীবন কেটে গেছে সেই একই ধাঁচে, একই ছাঁদে।

তারপরই এসেছে ভাঙ্গন। বসরায় জীবন ভেঙে পড়েছে একদিন, কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, লাকু গেছে

বোগদাদ, আমি তুরুদ। ব্যবধান অনেকখানি, দুটো দেশই বিভিন্ন, তবু চিঠির মাধ্যমে যোগসূত্রটি বজায় রেখেছিলাম কিছুদিন—কিন্তু টেকেনি বেশীদিন, সেও আস্তে আস্তে ছিঁড়ে পড়েছে। তবু সেই পুরোনোদিনগুলোর কথা ভুলতে পারিনি এখনও, প্রায়ই সে এসে মনের কোণে উঁকি দেয়, পুরোনো কথা বলতেও ভাল লাগে। লাকুকে সেই উদ্দেশ্যেই আসতে বলেছিলাম—কিন্তু সে এলনা, সত্যিই বিস্ময়কর। বলবারও কিছু নেই। গ্লাসে যেটুকু ছিল, শেষ করে ফেলি। বোতল থেকেও আর খানিকটা ঢেলেনি।

মন্দ লাগেনা। শরীর ও মনে সত্যিই একটু জোর খুঁজে পাই। আর একটা সিগারেট ধরাই।

সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে অনেকক্ষণ, আকাশে তারা জ্বলছে কিন্তু বাতাসে সেই আগুনের হলকা শরীর পুড়িয়ে দিচ্ছে যেন। মরুভূমির দেশের মজাই এই, সূর্য্য অস্ত গেলেও আগুন নেভেনা, তার রেশ থাকে বহুক্ষণ। বাতাসে আগুন, নিশ্বাসে আগুন, দেহে আগুন। আগুন হয়ে আছে ক্যাবারের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। সিগারেটের ধোঁয়া উড়ছে, মদ উড়ছে, হাল্কা আনন্দে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। একজন নারীকে ঘিরে বসে আছে দশজন পুরুষ, কে আগে পায় তারই প্রচেষ্টায়।

যুদ্ধ। বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের দামামা বাজছে, তারই লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ছে একদিক থেকে অন্যদিকে। কোথাকার মানুষ কোথায় এসেছে, কোথায় যাবে কেউ তা জানে না।

জীবন হয়েছে ক্ষণস্থায়ী, আজ আছে কাল নেই, প্রবৃত্তি গেছে বদলে, রুচি হয়েছে স্থূল। অতীতকে ভুলতে বসেছে সবাই, ভবিষ্যতের চিন্তা নেই কারও, বর্ত্তমানই সব, তাতেই গা ভাসিয়ে দিয়েছে সকলে। যা পাওয়া যায় সেই ত ভাল, যেটুকু ভোগ করে নেওয়া যায় তাইতো থাকবে, বাদ বাকি সব ফেলা, সব মিথ্যে, সব ভুল। চুপচাপ বসে থাকি। মাঝে মাঝে গ্লাসে চুমুক দি, ফুরিয়ে গেলে আবার ভরেনি।

রাত্রি বাড়ে, মানুষেরও ভীড় বাড়ে। এত মানুষ আছে এখানে? অবাক হয়ে ভাবি। আসার যেন শেষ নেই, ক্রমেই ভীড় বাড়ছে।

টেবিলগুলো সব আস্তে আস্তে ভর্ত্তি হয়ে যায়। বয়-গুলো ব্যস্ত হয়ে ছুটে বেড়ায় সারাক্ষণ। বোতল ফুরুচ্ছে, নতুন বোতল দিয়ে যাচ্ছে তারা, দেশী বিলিতি সব কিছুরই চাহিদা, সেই চাহিদা মেটাতে মেটাতে হয়রাণ হয়ে ওঠে বয়গুলো। তবু তারা জোর করে মুখে হাসি টেনে রাখে, আশা আছে তাদের, মাতালের মন বড় দরাজ, পয়সারও দাম নেই কোন।

একা বসে থাকতে ভাল লাগেনা বেশীক্ষণ। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি চেনা পরিচিত কাউকে পাই কিনা। মদ খেতেও মানুষের প্রয়োজন হয়। হঠাৎ নজরে পড়ে দূরে আর একটা টেবিলে লাকুর মত একজন কে বসে।

লাকু নয়তো? অসম্ভব কি? মনে একটু কৌতূহল জাগে। এগিয়ে যাই সেই দিকে। ঠিকই অনুমান আমার, মিথ্যে নয়, লাকুই বসেছিল সেখানে, আমার মত একাই বসে বসে সে আরক ওড়াচ্ছিল। সামনে গিয়ে দাঁড়াই তার।

—মিঠু, তুই এখানে?

বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত করে বলে লাকু—অবাক হচ্ছিস? আমার চিঠি পাসনি?

—কৈ নাতো।

আশ্চর্য! লাকু আমার চিঠি পায়নি তাহলে? এমন তো হয়নি কখনও, অবাক করলে লাকু।

যাক, এ নিয়ে তর্ক তুলে কোন লাভ নেই। উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, তাকে পেয়েছি তাতেই যথেষ্ট। কিন্তু অবাক হয়ে যাই তার চেহারা দেখে, কি ছিরি হয়েছে তার। অমন সোনার মত রঙ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, চোখ হয়েছে কোটরাগত, মুখ শুকনো, মাথায়ও বোধ হয় তেল পড়েনি বহুদিন।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকি তার পানে।

—কি দেখছিস এত?

—তোকেই দেখছি, চেহারাটা কি করেছিস?

—বিশ্রী হয়ে গেছে, না?

ম্লান হাসি হাসে লাকু। তারপরই কাঁধ দুটো একটু ওপরে তুলে বলে, মানুষ কি চিরকালই এক রকম থাকে? বোস্, আর দাঁড়িয়ে থাকবি কতক্ষণ? কি খাবি বল, আরক চলবে?

—না।

আরক ওখানকার তৈরী দেশী মদ, অত্যন্ত কড়া। খাওয়া অভ্যাস না থাকলে খাওয়া শক্ত। তাই বারণ করি।

—তাহলে একটা বিয়ার ?

—আপত্তি নেই কিছু।

একখানা চেয়ার টেনে বসি। বয় এসে তখনই একটা বিয়ারের বোতল দিয়ে যায় ; তার থেকে খানিকটা গ্লাসে ঢেলে নি। চুমুক দিতে দিতে বলি, তুই আবার আরক খেতে শিখলি কবে থেকে ?

—বোগদাদে এসে। এখন আরক ছাড়া আর কিছুতেই আমার নেশা জমে না।

—বলিস কি, অনেক উন্নতি হয়েছে বল।

—তা হয়েছে। হাসে লাকু। হাসিটি তখনও তার মুখ থেকে অন্তর্হিত হয়নি। নিজের গ্লাসেও যেটুকু ছিল শেষ করে ফেলি। একটা সিগারেট ধরাতে যাব—নজরে পড়ে একটি ইরাকি মেয়ে। সত্যিই অপরূপ সুন্দরী, গোলাপ ফুলের মত রং, যেমনি চোখ, তেমনি নাক। বছর বাইশ তেইশ বয়েস, অটুট স্বাস্থ্য, উচ্ছলিত যৌবন উপছে পড়ছে সারা অঙ্গে। চোখ ফেরানই দায়। তাকিয়ে থাকি সেই দিকে।

মেয়েটি কাছে এগিয়ে আসে, তারপরই অন্যধারে চলে যায়। যাবার আগে একবার সে আড়নয়নে লাকুকে দেখে, আমার পানেও একটুখানি চোরা দৃষ্টি হানে, কিন্তু তেমন কোন সাড়া পায় না বলেই বোধহয় অন্যধারে সরে যায়। খদ্দেরের ত অভাব নেই। কোন্‌দিকে গেল সেইটেই লক্ষ্য করছিলাম, চোখ ফেরালাম লাকুর প্রশ্নে।

—মেয়েটাকে তোর পছন্দ হয়, মিণ্ঠু ?

অদ্ভুত প্রশ্ন লাকুর। কখনও আশাই করিনি তার কাছ থেকে। চিরকাল জানি সে এসবের বাইরে, তাই একটু অদ্ভুত ঠেকে।

—মেয়েটা কিন্তু বড় ভাল।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে লাকু।

—কাল ওকে নিয়ে সারারাত্রি কাটিয়েছি। কিন্তু আজ আর ওর ওপর আমার কোন মোহ নেই।

চুপ ক'রে লাকু।

তখনই আর এক গ্লাস আরক মুখে ঢেলে দেয়।

অবাক হয়ে দেখি, ভেবে পাইনা কিছুই।

সত্যি কথা বলছে লাকু—না এ আরকের প্রতিক্রিয়া, না, অন্যকিছু। যদি সত্যিই বলে থাকে তবে একি সম্ভব ? এতখানি অধঃপতন হয়েছে তার ? অথচ বছরখানেক আগেও তাকে দেখেছি এসব শুনলেও সে লজ্জা পেত। ধারণায় আসে না।

ভুল, এ আমারই ভুল। এ হতেই পারে না। এ সব মদের ঝোঁকেই বলছে লাকু—কিম্বা আমায় সে এই করে বেকুফ বানাতে চায়। তাতেই বা লাভ কি তার ? চুপ করে ভাবি, লাকুও আরকের পর আরক গিলে যায়।

নীরবতার মধ্যেই কেটে যায় কিছুক্ষণ।

—জীবনটাকে একটু ভোগ করে নিচ্ছিরে মিণ্ঠু, না করলে যে মস্ত ভুল করা হবে। চিরদিনই একটা আপশোষ থেকে যাবে মনে।

আবার বলে লাকু। কণ্ঠে নেই কোন জড়তা, মুখেও নেই কোন লজ্জার ভাব। সব কিছুরই বাইরে চলে গেছে সে।

অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করি।

লাকুর সেইসব অর্থপূর্ণ হেঁয়ালীগুলোতে সত্যিই আমার মনে দারুণ বিরক্তির উদ্রেক করে।

বিরক্তি সহকারেই বলি, ঐ নচ্ছার মেয়েগুলোর সাথে রাতকাটাতে তোর লজ্জা হয়না, লাকু ?

লজ্জা !

হো হো করে হেসে ওঠে লাকু। কি বিকট সে হাসি, পাশের টেবিলের লোকগুলোরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাতে, লজ্জায় মরে যাই আর কি।

হঠাৎ সে আমার একখানা হাত জড়িয়ে বলে, অমন কথা আর মুখে আনিস না মিণ্ঠু, ওরা শুনলেও লজ্জা পাবে। জানিস না ওরা কত সুন্দর, কত আনন্দ দেয়, কেমন গলা জড়িয়ে বলে—তোমায় পেয়ে আমার কি না আনন্দ হল আজ। আর আমায় ছেড়ে যাবে নাত কোন দিন। শুনতেও কত ভাল লাগে বলত ?

—সে ত শুধু অভিনয়।

—হ্যাঁ, অভিনয়ই।

হাত ছেড়ে দেয় লাকু।

আর এক গ্লাস আরক মুখে ঢেলে দেয়।

—যারা অভিনয় করে তারাই ত জগতে সবার চেয়ে সুখী মানুষ। তারা পায় সব, দেয় না কিছুই। আমিও আজকাল সেই পথই ধরেছি, ভাল করিনি ?

কি উত্তর দেব তার। মুখে কোন কথা জোগায় না, মূক হয়ে বসে থাকি শুধু।

এত অধঃপতন হয়েছে লাকুর, এতখানি নীচে নেমে গেছে সে। শুধু চরিত্রে নয়, মনেও। মানুষকেও প্রবঞ্চনা করতে শিখেছে সে। জানি না সাবিত্রী এখন কোথায় ?

জানি না এখনও সে তার পথ চেয়ে বসে আছে কিনা। যদি থাকে, তবে তার মত মূর্খ আর জগতে কেউ নেই। রাগে গা রি রি করতে থাকে, মুখ দিয়েও কোন কথা ফোটে না, শরীরেও কিসের একটা জ্বালা অনুভব করি।

লাকুও নীরব, চোখ বুঁজে অবসন্নের মত বসে থাকে, বাতাসেও সেই আগুনের হলকা।

পরে তাকে বলি, একটু কড়া স্বরেই তাকে বলি, তুই ত দেখছি গোল্লায় গেছিস্—কিন্তু আর একজন যে আছে তার কথা কি একটু ভেবেছিস কোনদিন ?

—কার কথা বলছিস্ তুই ?

চোখ মেলে প্রশ্ন করে লাকু।

—কেন, সাবিত্রী ?

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে গাছের ডালপালা-গুলোকে যেমনভাবে নাড়িয়ে দিয়ে যায়, তেমনি করেই নড়ে ওঠে লাকু, কিন্তু তারপরই স্থির হয়ে যায়।

আর এক ঢোক আরক গিলে সে বলে, কেন, তুই জানিস না, সেত মরে গেছে ?

—মরে গেছে ?

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি তার মুখের পানে।

—হ্যাঁ, সে মরেই গেছে। আমার কাছে সে চির-দিনের মত মরে গেছে।

—কি বলছিস স্পষ্ট করে বল।

—দিব্যি সংসার করছে ?

—সংসার করছে সাবিত্রী ?

স্বপ্নেও বোধহয় এমনি করে চমকে উঠিনি কোনদিন। বিশ্বাসও করতে পারিনা সে কথা।

—বিয়ে করেছে সাবিত্রী ?

—কেন, অন্যায় করেছে কি কিছু ? মানুষ মাত্রই চায় মানসম্মান, সুখশান্তি, সেও চেয়েছিল, পেয়েছেও তাই। স্বামী ব্যারিষ্টার, অগাধ টাকা, বিশাল সম্পত্তি, লোকজন, প্রতিপত্তি, কোন কিছুরই অভাব নেই তার। সুখী হয়েছে সাবিত্রী, আর কি চাই। আমি ত তাকে দোষ দিই না কোন।

বেশ সহজকণ্ঠেই কথাগুলো বলে যায় লাকু। ভুলেও একবার তার গলা কাঁপে না, আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হয় না, মনে হয় সে যেন একটা পাষাণ বনে গেছে।

মনে পড়ে অতীতের লাকুর সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি, খুসীতে ভরপুর, লাবণ্যে ঢলঢল, কত আশা তার, কত মধুর কল্পনা সাবিত্রীকে ঘিরে। কি ভাবে প্রতিটি দিন তাদের কাটবে, কি ভাবে জীবনটাকে গড়ে তুলবে তারা, নতুন ছন্দে, নতুন সুরের পরশ দিয়ে কত হিসেব-নিকেশ, কত মধুর পরিকল্পনা।

সব শেষ, সব ভুয়ো। সেদিনও তাকে দেখেছি, আজও দেখছি, কিন্তু যেন দুটো সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ, হাবভাবে, আচরণে সব কিছুতেই।

দিনই শুধু বদলায় না, মানুষও বদলায়, ফোটা ফুল শুধু গলাতেই শোভা পায়না, পায়েও দলিত হয়। হতবাক হয়ে বসে থাকি।

গলা শুকিয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টিও যেন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মনে হয় পৃথিবীর সব আলো গেছে নিভে; সুর গেছে থেমে, নৈরাশ্যে ভরে আছে দশদিক। বাতাসেও নেই সেই উত্তপ্ত ব্যঞ্জনা, চাঁদেও নেই কোন সুরের উৎস; মানুষের কোলাহলের মধ্যেও নেই কোন মধুর গুঞ্জন। সব থেমে গেছে, সব নিভে গেছে; স্তব্ধ, মৌন, শান্ত হয়ে গেছে মুখর পৃথিবী।

লাকুর পানে তাকাতেও ভয় হয়। নিঃশব্দে সে আরক উড়িয়ে চলে। আমারও বিয়ারের বোতল শেষ হয়ে যায়। হঠাৎ ক্যাবারের সমস্ত আলো নিভে যায়। একটা তীব্র আলো জ্বলে ওঠে সেই ঘেরা প্লাটফর্মে, একটি প্রায় উলঙ্গ তন্বী ইরাকি সুন্দরী নাচতে সুরু করে লীলায়িত ভঙ্গীতে, মানুষগুলোও সব মেতে ওঠে, পাগলের মত ছুটে গিয়ে সার বেঁধে দাঁড়ায় তারই আনাচে কানাচে, তার সঙ্গে চলে তুমুল হর্ষধ্বনি আর ঘন ঘন করতালি। সেই দিকে চেয়ে

থাকি। দৃষ্টিতে নেই কোন মোহ, রক্তেও নেই কোন শিহরণ।

লাকু তখনও মদ গিলে চলেছে। অন্ধকারের মধ্যেও গ্লাসে মদ ঢালার আওয়াজ কানে আসে। বাধা দিই না কোন, দিতে ইচ্ছেও হয় না, থাক, সে, যত পারুক থাক্ সে, খেয়েই যদি সে শান্তি পায়। চুপচাপ থাকি।

প্লাটফর্মে সুন্দরী নাচছে নানান অঙ্গভঙ্গী করে, মানুষ-গুলোও উল্লাসে করতালি দিচ্ছে, দেহের রক্তও হয়ত টগ্‌-বগ্‌ করে ফুটছে তাদের।

ওরাও কি প্রবঞ্চিত? ওরাও কি সব মনের জ্বালায় জ্বলছে? ওরাও কি জীবনের সুখ শান্তিগুলোকে হারিয়ে ফেলেছে একেবারে?' ওকি তাদের আনন্দ উল্লাস—না হতাশার আর্ত্তনাদ? মনে মনে ভাবি।

হঠাৎ একবার লাকুর গলার স্বর কানে আসে, অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠের আওয়াজ, কি যেন একটা বলতে চায়, কিন্তু বলা আর হয়না, নেশাচ্ছন্ন হয়ে টেবিলে ঢলে পড়ে সে, কোন হুঁস্ নেই, কোন সাড়া নেই।

অচৈতন্য লাকু, ধরে তুলে নিয়ে যাই সেখান থেকে।

* * * *

ট্রেণ চলেছে, মণ্ডলগামী ট্রেণ, উষর মরুভূমির বক্ষ ভেদ করে। মরুভূমি এখন শান্ত, নিঃচেতন, অসাড়। ঘুমিয়ে আছে একেবারে।

আকাশে চাঁদ হাসছে, ত্রয়োদশীর চাঁদ, আলো ঠিকরে পড়ছে মরুভূমির বুকে, আলোয় আলোয় ছেয়ে আছে দশদিক, কামরার দুই সাথী মনের আনন্দে গান ধরেছে,—

'পিয়ে যা, পিয়ে যা,

পিয়ে যা, পিয়ে যা,
সরাবী সব দুখ পিয়ে যা পিয়ে যা।'

এ গান কি শুনেছে লাকু?
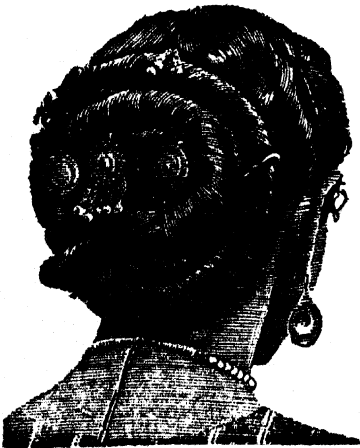
বন্ধ্যাত্বের সেকাল ও একাল
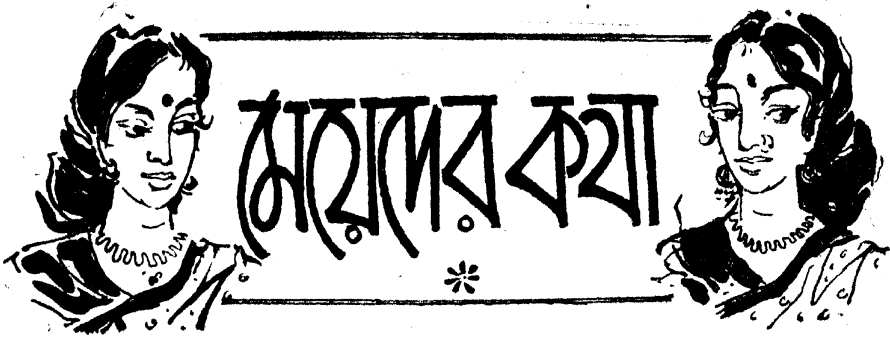
নমিতা গঙ্গোপাধ্যায়

বন্ধ্যা পৃথিবী সূর্য্যের নাড়ী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেদিন পৃথিবী আপন অস্তিত্ব ঘোষণা কোরলো সারা বিশ্বে, সেদিন সে ছিল সত্যিই বন্ধ্যা। তারপর কেটে গেল কোটি কোটি বছর—বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বসুন্ধরা হল জননী। ঘুচে গেল তার বন্ধ্যাত্বের অপবাদ।

কিন্তু নারী তুমি বন্ধ্যা, তোমার বন্ধ্যাত্বের অপবাদ ঘোচেনি আজও। তুমি মুখ বুজে সহ্য কর সব লাঞ্ছনা, অপবাদ আর নির্য্যাতন। আজও ঘরে ঘরে শুধু শুনতে পাওয়া যায় পুরোণ কথার প্রতিধ্বনি—নারী তুমি বন্ধ্যা। পুরুষ চালিয়েছে নারীর ওপর অকথ্য—নির্য্যাতন, দৈহিক ও মানসিক। নিজের দুর্ব্বলতা ঢেকে রাখতে সে বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করেছে 'নারী তুমি বন্ধ্যা।' পুরুষ বন্ধ্যা হতেই পারেনা এই ছিল অন্ধসমাজের ধারণা। কিন্তু আজ বিজ্ঞান শিখিয়েছে নারী তুমি একাই বন্ধ্যা নও, পুরুষও বন্ধ্যা হয়। এতদিন তোমার ওপর যে অপবাদ ছিল আজ তার দ্বিগুণ অপবাদ প্রাপ্য ঐ পুরুষের। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে—বন্ধ্যা পুরুষের অপরাধে নারী হয়েছে নির্য্যাতিতা।

শুধু পুরুষ কেন, নারী হয়ে খনা তাঁর বিভিন্ন শ্লোকে নারীর যে বর্ণনা দিয়েছেন সেখানেও শুধু বন্ধ্যা নারীর কথাই বলা হয়েছে, পুরুষের কোন উল্লেখ নেই। যদিও "নারী বন্ধ্যা" এ ধারণা মধ্যযুগের অন্ধকারের ইতিহাস, তবুও সেই ধারণাই লতায় পাতায় জড়িয়ে আজও স্থায়ী আসন নিয়ে আছে বাংলার ঘরে ঘরে। তাই "বন্ধ্যাত্বের সেকাল ও একাল" আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে সাময়িক-ভাবে প্রসঙ্গান্তরে যেতে হবে, আলোচনা কোরতে হবে অপ্রাসঙ্গিক কিছু। আমরা বর্ত্তমান যুগের মানুষ মেনে নিয়েছি যে সাহিত্য হয়েছে সমাজের প্রতিচ্ছবি। সাহিত্যের মধ্যে আমরা সমাজ খুঁজি, আর সমাজের মধ্যে সাহিত্য বা ইতিহাস। সাহিত্যের প্রতিবিম্বে আমরা চিনতে পারি তৎকালীন সমাজকে, বুঝতে পারি স্ত্রী চরিত্র, পুরুষ-চরিত্র আর নারীপুরুষের মনস্তত্ব। রামায়ণ মহাভারত শাশ্বত সাহিত্য। আমরা অনেকে বিশ্বাস করি রামায়ণ মহাভারতের ঘটনাগুলি সত্য। যদি সব ঘটনাগুলিকে মেনে নেওয়া না যায়, তাহলেও গ্রন্থদুটি যে সাহিত্য এবং সাহিত্য সমাজের প্রতিরূপ—এ কথা একবাক্যে মেনে নেবে বর্তমান সমাজ এটুকু আশা করা যায়।

সেই বিস্মৃত অতীত যুগে অযোধ্যার রাজা দশরথ সন্তানহীন। একে একে তিনটি রাণীকে গ্রহণ করার পর তিনি বুঝেছিলেন তাঁর কোন সন্তান হবেনা। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি কর্তৃক রাণীত্রয়কে চরু প্রদান এবং রাণীগণ সেই চরু-গ্রহণের পর হলেন গর্ভবতী। জন্মগ্রহণ কোরলেন, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। এই ঘটনার দুটি মাত্র ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায়। প্রথমে যদি মেনে নেওয়া যায় সে 'চরু'

ওষুধের নামান্তর মাত্র, তবে এটাই ঠিক যে ওষুধ খাওয়া মাত্র রাণীরা গর্ভধারণের ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। এটাই শোভন ও স্বাভাবিক। তবু মনে খটকা লাগে যে, দশরথের ভাগ্যে পর পর তিনটি রাণীই কি জুটেছিলেন বন্ধ্যা? দৃষ্টিভঙ্গীর একটু পরিবর্তন কোরলে অপর ব্যাখ্যাটি সুস্পষ্ট অর্থাৎ দশরথ নিজেই ছিলেন বন্ধ্যা, যদিও রামায়ণের মধ্যে স্পষ্ট করে সে কথা কোথাও বলা হয়নি। মহাভারতের যুগে দেখা যায় দ্বিধাহীন সুস্পষ্ট উক্তি। পাণ্ডু-তনয় পঞ্চপাণ্ডব কেউই পাণ্ডুতনয় নয়। পাণ্ডু হীন-বীর্য্য ছিলেন, স্ত্রী সঙ্গমে অক্ষম। কিন্তু তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত রাজসন্তান। নারীর মনস্তত্ত্ব তিনি অনুধাবন কোরতে পেরেছিলেন। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি কোরেছিলেন যে জননীত্ব নারীর শ্রেষ্ঠ রূপ। সম্ভবতঃ নারী মনস্তত্ত্বের এই গভীর নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি তাঁর স্ত্রী কুন্তী ও মাদ্রীকে দেবাঙ্ক-শায়িনী হয়ে পুত্র উৎপাদনে অনুমতি দিয়েছিলেন। তাইনা যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ? এ কথা সত্যি যে পাণ্ডুকে কোথাও বন্ধ্যা বলা হয়নি। মুনির অভিশাপে তিনি হয়েছিলেন হীনবীর্য্য অর্থাৎ বন্ধ্যা।

শ্রীরাধিকার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু তাঁর স্বামী আয়ানদেব। এখানেও গীতিকার ও পুরাণকারগণ স্বীকার করেছেন যে আয়ান ছিলেন নপুংসক। বর্তমানের বৈজ্ঞানিক বিচারে আমরা দাবী কোরতে পারি যে আয়ান ছিলেন বন্ধ্যা। আর নপুংসকত্বও তো বন্ধ্যাত্বই।

আমাদের স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, সেই বিগত প্রাগৈতিহাসিক যুগেও পুরুষের বন্ধ্যাত্ব স্বীকার করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগেই দেখেছি নারীর লাঞ্ছনা সর্বাধিক। কোন পুরুষ পর পর তিনবার বিবাহ কোরলেন। দেখতে দেখতে কেটে গেল চোদ্দ পনেরো বছর—তিনি পিতা হতে পারলেন না। তাই বলে তিনি দেবতার অভিশাপ বা ভাগ্যকেও মেনে নিতে পারলেন না। তাঁর তিনটি স্ত্রীই বন্ধ্যা তাই তিনি অকথ্য নির্য্যাতন চালাতে লাগলেন স্ত্রীদের ওপর। একবার ঘুণাক্ষরেও অন্ধ নির্বিকার সমাজ জানতে চাইল না যে সত্যিই স্ত্রীরা বন্ধ্যা না স্বামীই বন্ধ্যা? স্বামী সমাজের নির্দেশে বিবাহ কোরলেন চতুর্থবার, কিন্তু আশ্চর্য্য যে এই চতুর্থ স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব কোরলেন, কিন্তু এর কোন ব্যাখ্যা হয় না।

তারপর এলো মাদুলী, কবজ, তাবিজের যুগ। এর সঙ্গে সম পদক্ষেপে এসেছিল 'ধর্ণা'-র যুগ। অর্থাৎ পঞ্চাননের দোর ধরা, বাবা তারকেশ্বরের দোর ধরা ইত্যাদি। নিঃসন্তান জীবন কাটাচ্ছেন এক দম্পতি। ধনী কিন্তু অসুখী, একটি সন্তান চাই তাদের, পুরোহিত বিধান দিলেন বাবা তারকেশ্বরের কাছে ধর্ণা দিতে। অন্ধকার-রাতে তারকেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে ধর্ণা দিয়ে শুয়ে থাকতে হবে। নির্ভয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে। নারী পুরোহিতের নির্দেশ পালন কোরলেন এবং বাবার স্বপ্নাদেশে তিনি গর্ভবতী হলেন। এটা আমার মাতামহীর কাছে শোনা কাহিনী। আমার কিছু বক্তব্য আছে তাই এই অবান্তর কাহিনীর অবতারণা। আমি যাঁদের উত্তরপুরুষ অথচ সেই পূর্বপুরুষের সমালোচনা কোরতে উদ্যত—তাঁদের কাছে পূর্বেই ক্ষমা প্রার্থনা কোরছি। নারী জাতির কাছে ক্ষমা চাইছি তাঁরা যেন এই প্রবন্ধের অপব্যাখ্যা না করেন। তাঁরা যেন মনে না করেন যে আমি নারীর কলঙ্ক প্রকাশ কোরছি। যদি একটা সত্যকে প্রকাশ কোরতে গিয়ে তাদের সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আমি প্রকাশ করি, তাহলে তাঁরা যেন বুঝতে পারেন একটা সত্যের প্রয়োজনে আমি আর একটা সত্য প্রকাশ করেছি মাত্র। বর্তমান সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি পঞ্চানন্দের দোরধরার বিচার করি তাহলে আমরা কী পাবো? কে হলফ কোরে বলতে পারে যে সেই কথিত চতুর্থা স্ত্রী লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে অথবা আপন সন্তান ধারণ ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্যে সাময়িক মোহ বা ভুলক্রমে অন্য কোন পুরুষের অঙ্কশায়িনী হননি? হওয়া তো অসম্ভব নয় যে চতুর্থা স্ত্রী স্বামীর বীর্য্য-হীনতার পরিচয় পেলেন এবং অন্যান্য সপত্নীদের সঙ্গে বাক্যালাপ করে ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সন্তান কামনা তাকে পাগল কোরে তুললে তিনি অন্য সুযোগ গ্রহণ করেন। আর নিরুপায় স্বামী নবাগতকে আপন সন্তান বলে গ্রহণ করেন নিজের অক্ষমতা ঢাকবার জন্যে। কে কৃতনিশ্চয় হয়ে বলতে পারে যে নির্য্যাতিত নারী রাতের অন্ধকারে মাদুলী-দাতার পাশে

মিলিত হননি। জননী হওয়ার একমাত্র কামনা হয়তো তার মনে ভ্রম সৃষ্টি করেছিল। তৎকালীন অন্ধ সমাজ এ বিষয়ে হয়তো অন্ধ থাকতে বাধ্য হয়েছিল আপন প্রয়োজনে। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের আশীর্বাদে আমরা অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছি, তাই আমরা মাদুলী আর দোরধরা বিশ্বাস করিনা। মনে করুন যদি এমন হয় যে বিবাহের পর নবদম্পতি সন্তান আশা করলেন কিন্তু তিন বৎসর কেটে গেলেও তাদের সন্তান হল না। স্বামীটি স্বভাবতই স্ত্রীকে ডাক্তারের কাছ থেকে পরীক্ষা করিয়ে আনলেন—স্ত্রী সন্তান-ধারণের সমস্ত ক্ষমতা রাখেন, সন্তান তার হবেই, কিন্তু আরও দু বছর অতিবাহিত হ'ল কোন সন্তান এলো না ঘর আলো করে। এবার স্বামীটি গোপনে ডাক্তারের কাছে আত্মসমর্পণ কোরলেন। ডাক্তার বললেন "আপনার কোন সন্তান হবে না।" এদিকে মাদুলী আর দোরধরায় স্ত্রী হলেন সন্তানবতী।

বর্তমান সাহিত্যে নারী মনস্তত্ত্ব নিয়ে অনেক কাহিনী আর অনেক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। অধুনা কোন এক তথাকথিত বন্ধ্যা নারী পার্শ্ববর্তী ফ্ল্যাটের গৃহিণীর অনুপস্থিতির সুযোগে গৃহকর্তার সহিত মিলিত হন! কিন্তু পাছে তার স্বামী সন্দেহ করেন তাই তিনি ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি আপন স্বামীকে উক্ত গৃহকর্তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন এবং নিজেও স্বামীর সামনে তাকে অপমান করেন। অতঃপর ঐ বাসা বদল কোরে তারা চলে যান। যথাসময়ে সেই মহিলা পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। এক বিখ্যাত লেখকের রচনায় পেয়েছি যে স্ত্রী একে একে তিনটি সন্তান প্রসব করলেন, কিন্তু স্বামী নিজে জানেন যে তিনি নপুংসক। তাই তিনি ক্রোধে হত্যা করলেন স্ত্রী, পুত্র ও উক্ত পুত্রের জনককে। যদিও এই রকম বহু ঘটনার উল্লেখ করা যায়, তবুও উক্ত দুটি ঘটনাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

বিজ্ঞান আজ অনেকদূর এগিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে এসেছে চিকিৎসা-শাস্ত্রও। সেই আধুনিক চিকিৎসার স্মরণ নিয়ে অনেক বন্ধ্যা নর-নারী আবার সুখী হতে পারেন—সন্তান মুখ দর্শন করে। তাঁরা যেন সেই চেষ্টাই করেন, অন্য চেষ্টা অবলম্বন না করে।

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

গত সংখ্যায় আলোচনাপ্রসঙ্গে, কাপড়ের উপর রঙীণ নক্সার ছাপ মুদ্রণের (Textile-fabric Printing-craft) শিল্প-কাজ করতে হলে, যে সব সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন—তার মোটামুটি হদিশ দিয়েছি। এই সব সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে কি উপায়ে কাপড়ের উপরে সৌখিন-সুন্দর রঙ-বেরঙের নক্সার ছাপ-তোলা যায়, এবারে তারই সহজ-সরল অনায়াসসাধ্য কলা-কৌশলের কথা বলছি। তবে সে কথা আলোচনার আগে, কাপড়ের উপরে নক্সার ছাপ মুদ্রণের (printing) জন্য সচরাচর যে-ধরণের কাঠ-খোদাই-করা 'ছাঁচ' বা 'ব্লক' (Engraved wooden block) ব্যবহারের রীতি প্রচলিত আছে, নীচের ১ নং চিত্রে তারই 'নমুনা' দেখানো হলো।

মুদ্রণ-শিল্পীর ব্যক্তিগত-অভিরুচি অনুসারে, উপরের ছবিতে দেখানো 'নমুনামতো' কাঠ-খোদাই-করা 'নক্সার-ব্লক' ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা সামান্য চেষ্টাতেই ছোট-বড় নানা রকম কাপড়ের উপর সুচারু-ছাঁদের রঙীণ-নক্সার ছাপ তুলতে পারবেন। কারুশিল্প-বিশেষজ্ঞদের অনেকেরই মতে, কাপড়ের উপরে রঙীণ নক্সার ছাপ-

মুদ্রণের কাজের পক্ষে—'ধাতু'-নির্ম্মিত' (matel-made) সুকঠিন (hard) 'ব্লকের' চেয়ে উপরের নমুনামতো 'কাঠ-খোদাই-করা' নরম (Soft) 'ব্লক' ব্যবহার অনেক বেশী সুবিধাজনক, সুলভ ও উপযোগী। তাই কাপড়ের উপরে রঙীণ নক্সার ছাপ-তোলার কাজে অভিজ্ঞ-নিপুণ পেশাদার কারুশিল্পীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'ধাতু-নির্ম্মিত সুকঠিন ব্লকের' পরিবর্ত্তে, 'কাঠের-তৈরী নরম-ব্লক' ব্যবহার করার বিশেষ রীতিটিকে পরম-আগ্রহভরে বেছে নিতে দেখা যায়।

কিন্তু এ সব আলোচনা ছেড়ে, আপাততঃ কাপড়ের উপরে রঙীণ-নক্সার ছাপ-তোলার বিচিত্র কলা-কৌশলের কথা বলি।

ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত ফর্দ্দ-অনুসারে, বিচিত্র-অভিনব এই 'বস্ত্র-মুদ্রণ শিল্পকলার' (The craft of textile-fabric printing) প্রত্যেকটি সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ হবার পর, নীচের ২নং চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে কাঠের সমতল 'পাটা' (Flat wooden Board) বা 'পিঁড়ের' উপর আগাগোড়া সমান ও পরিপাটিভাবে খবরের কাগজ বিছিয়ে দিন। কাঠের 'পাটা' বা 'পিঁড়ের' উপর আগাগোড়া সমানভাবে খবরের কাগজ পেতে রাখার পর, সেই কাগজের উপরে সমান ও পরিপাটি-ছাঁদে বেশ বড়-সাইজের একখানি পরিষ্কার ব্লটিং (Blotting paper) বিছিয়ে নেবেন। এ কাজ সারা হলে, যে কাপড়ে
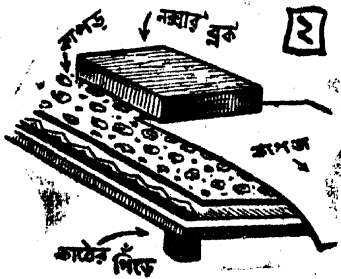
রঙীণ নক্সার ছাপ তুলবেন, সেখানিকে ঐ 'ব্লটিং-পেপারের' উপরে আগাগোড়া সমতল ও বেশ 'টানটান-ধরণে' বিছিয়ে রাখুন। তারপর নক্সা-খোদাই-করা কাঠের 'ব্লকটিকে' রঙের পুঁটলী' বা 'প্যাডের' উপর রেখে, সেটিকে আগাগোড়া রঞ্জিত করে নিন।

এবারে কাপড়ের যে-অংশে নক্সাদার-ব্লকের ছাপ মুদ্রণ করবেন, সেই অংশটি বাঁ-হাতে চেপে ধরে রেখে তার উপরে রঙের-প্রলেপ মাখানো কাঠ-খোদাই-করা নক্সার-ব্লকটিকে বেশ চাপ দিয়ে বসিয়ে রাখুন···তাহলেই কাপড়ের সেই জায়গাটিতে দিব্যি সুস্পষ্টভাবে কাঠ-খোদাই-করা নক্সার রঙীণ-ছাপ ফুটে উঠবে।

কাপড়ের উপর রঙীণ-নক্সার ছাপ তোলার সময়, প্রথমেই কিনারার পাড়ের অংশটিকে ছেপে নেবেন··· তারপর ভিতরকার জমীর অংশে নক্সার প্রতিলিপি মুদ্রণ করাই হলো—এ কাজের চিরাচরিত রীতি। এই রীতি অনুসারে পরিপাটিভাবে কাপড়ের কিনারায় 'পাড়ের ছাপ-তোলার কাজ শেষ করে, ভিতরের জমীর একপ্রান্ত থেকে অপর-প্রান্ত অবধি বরাবর সমান-সারিতে (Line) নক্সার 'ব্লকের' সাহায্যে মুদ্রণ-কার্য্য চালিয়ে যেতে হবে। এ কাজের সময় অসাবধানতার ফলে, নক্সার 'ব্লক' যদি কোনো কারণে এতটুকু বেলাইন হয়ে ঠাঁই-নাড়া অথবা সরে যায় তো, কাপড়ের উপরের ছাপটি রীতিমত বেয়াড়া ও অসুন্দর দেখাবে। তাছাড়া মুদ্রন-কার্য্যের জন্য যদি পাকা রঙ ব্যবহার করে থাকেন তো সে ত্রুটি সংশোধন করা শেষ পর্যন্ত খুবই পরিশ্রম ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই কাপড়ের উপর রঙীণ-নক্সার ছাপ-তোলার সময়, এদিকে নজর রাখা বিশেষ প্রয়োজন। তবে বলা বাহুল্য, কাপড়ের উপর নক্সা-মুদ্রণের কাজে কাঁচা-রঙের চেয়ে পাকা রঙ ব্যবহার করাই ভালো। এমনি উপায়ে কাপড়ের উপর প্রত্যেকবার রঙীণ নক্সার 'ব্লকের' ছাপ-তোলার পর সেটিকে ভালোভাবে শুকিয়ে নেবেন। কারণ, রঙের ছাপ 'কাঁচা' বা 'ভিজা' থাকলে, তার ছোপ লেগে কাপড়টি বিশ্রী-দাগী হয়ে যাবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

এ পদ্ধতিতে আগাগোড়া পরিপাটিভাবে নক্সা-মুদ্রণের কাজ শেষ হলে, কাপড়টিকে সাবান-জলে ধুয়ে সাফ এবং ইস্ত্রি করে নেবেন। তাহলেই ঘরে বসে নিজের হাতে শিল্প-কাজ করে অনায়াসেই দিব্যি সৌখিন-সুন্দর ছাপানো কাপড় বানিয়ে তোলা যাবে।

—

সেলাইয়ের নক্সা

সুলতা ভরদ্বাজ

সংসারের কাজকর্ম্মের ফাঁকে যে সব মহিলাদের নিজের হাতে সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ করে নানা রকম সৌখিন-সুন্দর সূচীশিল্প-সামগ্রী রচনার বিশেষ ঝোঁক আছে, তাঁরা নিত্যই নতুন নতুন ছাঁদের বিচিত্র সব 'আলঙ্কারিক-নক্সার' (Decorative-Motifs) নমুনা বা 'প্যাটার্ণ' (Pattern-designs) সংগ্রহ আর বিভিন্ন-ধরণের 'ফোঁড়-তোলার' (Stitch) কলা-কৌশল শেখবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত থাকেন। তাঁদের এই আগ্রহ-অনুশীলনের ফলে, বাঙলার ঘরে ঘরে মহিলা-সমাজে আজকাল গুজরাটী, কাথিয়াবাড়ী, কাশ্মীরি, লক্ষ্ণৌ, অসমিয়া, কটকী, প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিনব সীবন-পদ্ধতি অনুসরণের রীতিমত রেওয়াজ দেখা দিয়েছে। ভারতীয় সীবন-পদ্ধতির প্রতি মহিলাদের এতখানি অনুরাগ জেগেছে দেখেই, এবারে সুবিখ্যাত 'লক্ষ্ণৌ-প্রথায়' (Lucknow-Stitch) সরল-সূক্ষ্ম সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে সূতী, রেশম ও পশমের কাপড়ের উপর অপরূপ-বিচিত্র 'আলঙ্কারিক-নক্সা' রচনার একটি 'নমুনা' (Pattern) প্রকাশিত হলো।
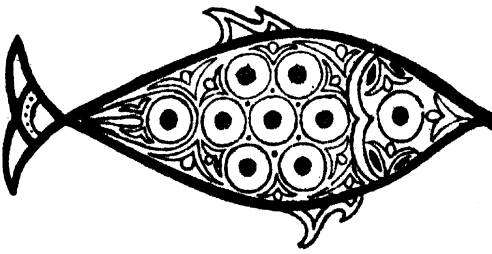
উপরে চিত্রবিচিত্রিত মাছের চেহারার যে নক্সা-নমুনাটি দেওয়া হয়েছে, সেটি মহিলাদের ব্লাউশ, চোলী, শাল, 'স্কার্ফ' (Scarf) প্রভৃতি বিবিধ পরিচ্ছদ-অলঙ্করণের কাজে ব্যবহার করা চলবে। সামান্য চেষ্টাতেই 'লক্ষ্ণৌ-প্রথায় সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে, সূতী, রেশম ও পশমের কাপড়ের উপর অনায়াসেই এই 'আলঙ্কারিক-নক্সার' নমুনাটিকে পরিপাটিভাবে রূপদান করা সম্ভব। মেয়েদের ব্লাউশ ও চোলীর হাত ও পিঠের অংশ অলঙ্করণের পক্ষে উপরের নক্সা-নমুনাটি বিশেষ উপযোগী হবে। তাছাড়া নিপুণ কৌশলে পাশাপাশি সমান-লাইনে সাজিয়ে মাছের এই বিচিত্র নক্সাটি দিয়ে মেয়েদের অঙ্গ-আবরণী শালের পাড় ও চারিদিকের 'কোণ' (Four Corners of a Lady's Shawl) ও জমির বিস্তৃত অংশ সুসজ্জিত করা যেতে পারে। 'স্কার্ফের' কাপড়ের উপরেও এ নক্সাটিকে অনুরূপ-ভাবে ফুটিয়ে তোলা চলবে।

রঙীণ সূতী, রেশমী কিম্বা পশমী কাপড়ের উপর 'লক্ষ্ণৌ-প্রথায়' সেলাইয়ের ফোঁড়ের কাজ করবার সময়, গোড়াতেই পছন্দমতো ও মানানসই রঙের মিহি-সুতো এবং মজবুত-গড়নের গোটাকয়েক সরু-ছুঁচ বেছে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ, এ প্রথায় সেলাইয়ের ফোঁড় যত সূক্ষ্ম-সরল আর পরিপাটি-ছাঁদের হবে, সূচী-শিল্পের নক্সাটি তত সুন্দর ও মনোরম দেখাবে···এই হলো এ কাজের প্রবীণ-রীতি। দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরে নেওয়া যাক—উপরের ঐ চিত্রবিচিত্রিত মাছের নক্সাটি ফুটিয়ে তোলা হবে হাতীর দাঁত (Ivory Colour) অথবা ঘীয়ের (Cream Colour) মতো রঙীণ কাপড়ে। কাজেই পীতাভ শাদা-ধরণের কাপড়ের জমির উপরে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে নক্সা-রচনার জন্য—ঐ রঙের সঙ্গে মানানসই দেখায়, এমনি কয়েকটি রঙীণ-সুতোর গুচ্ছ ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ, উপরের নক্সায় চিত্রিত—মাছের গায়ের 'আঁশ' (Scales) বা বাইরের বড় 'চক্রগুলি' (Circles) রচনা করতে হবে, ফিকে-বাদামী রঙের সুতোর সাহায্যে এবং ভিতরের ছোট 'চক্রগুলি' ভরে তুলবেন গাঢ়-হলুদ কিম্বা কমলা রঙের সুতো ব্যবহার করে। মাছের দেহের মাঝেমাঝে ও 'চক্রাকৃতি-চোখের' আশেপাশে পত্রাকারে-রচিত যে সব ছোট 'পাপড়ি' রয়েছে, সেগুলি ফুটিয়ে তোলার জন্য বেছে নেবেন—হাল্কা-সবুজ রঙের সুতো। পাপড়িগুলির কিনারে পাতার মতো ছাঁদের ও কালো-রঙে ভরাট ছোট-ছোট যে সব নক্সা রয়েছে, সেগুলি রচনা করবেন—নীল-রঙের সুতো দিয়ে···এবং পাপড়ি-গুলির মাঝে শাদা-রঙের ছোট ছোট যে সব 'কলি' বা 'কুঁড়ি' অঙ্কিত রয়েছে, সেগুলি ভরাট করে তুলবেন

গাঢ়-লাল রঙের সূতোর সাহায্যে। মাছের ল্যাজের প্রান্তভাগের অংশ দুটিও রচিত হবে—গাঢ়-লাল রঙের সূতো দিয়ে···ল্যাজের ভিতরকার অর্দ্ধ-গোলাকৃতি জায়গাটির জন্ম ব্যবহার করবেন—কমলা-রঙের সূতো এবং বিন্দু-চিহ্নগুলি ফুটিয়ে তুলবেন গাঢ়-লাল রঙের সূতোর সাহায্যে। ল্যাজের উপরার্দ্ধের ত্রিকোণাকার-অংশটি ভরাট করবেন—গাঢ়-লাল রঙের সূতো দিয়ে। তারপর মাছের দেহের চারিপাশের কিনারার ও দেহাভ্যন্তরের রেখাগুলিকে ফুটিয়ে তুলবেন—গাঢ়-বাদামী রঙের সূতো ব্যবহার করে। মাছের পাখনার ভিতরের ত্রিকোণাকার-অংশ ভরে নিতে হবে—কমলা-রঙের সূতোয় এবং বাইরের ত্রিকোণাকার-অংশটি রচনা করবেন গাঢ়-লাল রঙের সূতোয়। তাহলেই 'লক্ষ্ণৌ-প্রথায়' সেলাইয়ের কাজ করে সহজেই কাপড়ের উপরে সূচীশিল্পের বিচিত্র-নক্সা-নমুনাটিকে নিখুঁত-সুন্দর ও পরিপাটি-ছাঁদে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন।
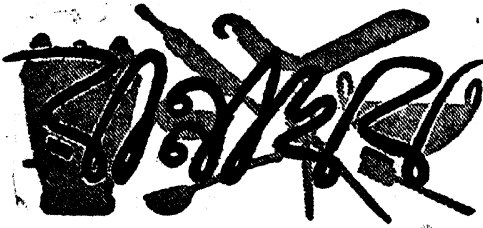
সুধীরা হালদার

এবারে আমিষ-জাতীয় অভিনব মুখরোচক একটি দক্ষিণ-ভারতীয় খাবার রান্নার কথা বলছি। এ খাবারটির নাম—"সোথী"।

সোথী:

পাঁচ-ছয়জনের আহারোপযোগী 'সোথী' রান্নার জন্ম উপকরণ চাই—আধসের মাছ, একটি নারিকেল, ছয়টি পেঁয়াজ, চারটি কাঁচা লঙ্কা, চায়ের চামচের আধ-চামচ হলুদ-গুঁড়ো, চায়ের চামচের আধ-চামচ গুঁড়ো-সরিষা, প্রয়োজনমতো পরিমাণে নুন, চায়ের চামচের এক-চামচ ঘী এবং গোটাকয়েক তেজপাতা।

উপকরণগুলি জোগাড় হলে, রান্নার কাজ সুরু করবার আগে মাছটিকে টুকরো করে কুটে পরিষ্কার জলে আগাগোড়া বেশ ভালভাবে ধুয়ে সাফ্ করে নিন। এ কাজ সেরে পাঁচটি পেঁয়াজ নিয়ে ছুরি বা বঁটির সাহায্যে প্রত্যেকটিকে চার ফালি করে কেটে ফেলুন। এবারে যে পেঁয়াজটি বাকী রইলো, সেটিকেও বেশ মিহি-ছাঁদে কুচিয়ে নিন এবং কাঁচা-লঙ্কাগুলিকেও লম্বালম্বিভাবে দু'টুকরো করে চিরে রাখুন। তারপর কুরুণীর সাহায্যে নারিকেলটিকে কুরে নিয়ে, সেই নারিকেল-কোরা থেকে চায়ের পেয়ালার আড়াই-পেয়ালামতো 'দুধ' বা 'রস' (cocoanut-milk) সংগ্রহ করুন।

রান্নার এ সব প্রাথমিক আয়োজন সেরে, উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সে পাত্রে আন্দাজমতো জল দিয়ে মাছের টুকরোগুলিকে ফুটিয়ে আধ-সিদ্ধ করে নিন। মাছের টুকরোগুলি আধ-সিদ্ধ হলেই, সেগুলিকে রন্ধন-পাত্র থেকে নামিয়ে পরিপাটি-ছাঁদে ছাড়িয়ে প্রত্যেকটি কাঁটা বাদ দিয়ে, পরিষ্কার একটি গামলা বা থালায় রেখে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে চটকে নিন। তারপর আবার উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সে পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে ঘী দিয়ে পেঁয়াজের কুচো বাদামী-রঙে ভেজে ফেলুন। এমনিভাবে পেঁয়াজের কুচো ভেজে নেবার পর, সেগুলিকে রন্ধন-পাত্র থেকে তুলে অন্য একটি পরিষ্কার-পাত্রে আলাদা সরিয়ে রাখুন।

এবারে পুনরায় উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সে পাত্রে, সদ্য-ভাজা পেঁয়াজ-কুচো আর চায়ের পেয়ালার আধ-পেয়ালা পরিমাণ নারিকেল-দুধ বাদ রেখে, চায়ের পেয়ালার দুই-পেয়ালা পরিমাণ নারিকেল-দুধ ও সেই সঙ্গে রান্নার বাকী উপকরণগুলি দিয়ে 'মিশ্রণটিকে' কিছুক্ষণ ফুটিয়ে সুসিদ্ধ করে নিন। এমনিভাবে 'মিশ্রণটিকে' ফোটানোর পর, রন্ধন-পাত্রে বাকী নারিকেল-দুধটুকু ঢেলে দিয়ে আরো খানিকক্ষণ উনানের আঁচে ফুটিয়ে নিলেই রান্নার কাজ শেষ হবে।

এবারে, উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটি নামিয়ে, পরিষ্কার একটি পাত্রে সদ্য-রাঁধা খাবারটি সযত্নে তুলে রাখুন। তারপর সযত্নে-সঞ্চিত ঐ খাবারটির উপরে ইতিপূর্ব্বে-ভেজে-রাখা বাদামী-রঙের পেঁয়াজের কুচো ছড়িয়ে দিন। তাহলেই দক্ষিণ-ভারতীয় প্রথায় 'সোথী' খাবারটি প্রিয়জনদের পাতে পরিবেষণের উপযোগী হয়ে উঠবে।

॥ সমৃদ্ধি ॥
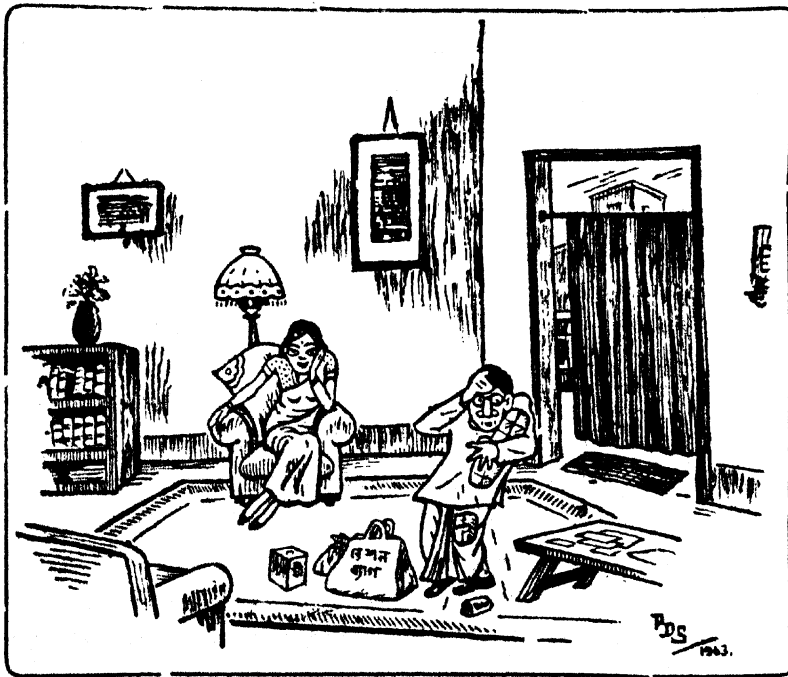
স্ত্রী: তাই তো মহা ভাবনার কথা হলো! কি যে হবে?···চালের দাম বাড়ছে, চিনির দাম বাড়ছে, মাছের দাম বাড়ছে, তর-তরিকারী, জামা-কাপড়, ওষুধপত্তর, রেলের ভাড়া, বাসের ভাড়া, ট্যাক্সো, কয়লার দাম···তার ওপর তোমাদের এই বাধ্যতামূলক সঞ্চয়···সবই বেড়ে চলেছে!···

স্বামী: বাড়বেই তো!···বয়সও বাড়ছে···অভিজ্ঞতাও বাড়ছে···সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা-চিন্তাও বাড়বে!

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

চীন ও পাকিস্তান—

আজ ভারতবর্ষ বিপন্ন—এক দিকে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের আশঙ্কা—অন্য দিকে পাকিস্তান কর্তৃক নিত্য ভারতের সহিত বিবাদ ও সে জন্য অর্থব্যয়। গত বৎসর ১৯৬২ সালে হঠাৎ বহু দিনের বন্ধু চীন দেশ ভারতের উত্তরপ্রান্ত আক্রমণ করিয়া ভারতের কয়েক হাজার মাইল জমী জোরপূর্বক দখল করে—ভারত প্রস্তুত ছিল না—সে জন্য প্রতি-আক্রমণ করিতে বিলম্ব হয় এবং পরে চীন পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। ভারত দ্রুত অগ্রসর হওয়ার ফলে বহু চীনা ও ভারতীয় সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায় ও শেষ পর্য্যন্ত চীনারা ভারতভূমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তাহার পর গত দুই মাস ধরিয়া চীনারা আবার ভারতের উত্তর সীমান্তে কয়েক হাজার মাইল লম্বা স্থানে তাহাদের এলাকায় সৈন্য আনয়ন ও অস্ত্র আমদানী করিয়া ভারতকে আবার আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে! এবার ভারত প্রস্তুত হইয়া আছে—নিজেদের সৈন্য এবং অস্ত্র প্রস্তুত আছেই, তাহা ছাড়া আমেরিকা, বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, এমন কি রাশিয়া হইতে অস্ত্র সাহায্য লাভ করিয়া ভারত চীন আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে! শান্তিকামী ভারত মনে করিয়াছিল যে, সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত না হইয়া নিজের দেশকে সমৃদ্ধ করিবার ব্যবস্থায় মন দিবে। সে জন্য ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধিপূর্ণ করার ব্যবস্থায় মন দিয়াছিল। কিন্তু চীন কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভারতকে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থায় মন দিতে হইয়াছে! সে জন্য চাই অর্থ ও মানুষ। ভারতে মানুষের অভাব নাই—তবে যুদ্ধ কার্য্যে শিক্ষা দিয়া তাহাদের প্রস্তুত করা প্রয়োজন। সে জন্য সর্বত্র যুদ্ধ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতেছে—প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ভারতবাসীকে এখন যুদ্ধ শিক্ষা করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলেই যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। সে জন্য ভারতের নেতা শ্রীজহরলাল নেহরু সকলকে আহ্বান জানাইয়াছেন। সর্বত্র দেশের মানুষ তাহার নিজ দেশকে রক্ষা করিবার জন্য ও সে জন্য প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিবার জন্য তৈয়ার হইতেছে—আশার কথা বর্তমানে ভারতবাসী আর যুদ্ধ-বিমুখ নহে—সকলেই যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত। সে কাজে দেশবাসী সকলেরই আগ্রহ আরও অধিক বর্দ্ধিত হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন—অর্থের। টাকা না হইলে যুদ্ধ করা যাইবে না—সে জন্য প্রতি ভারতবাসীর নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এখন সকলকে সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যয় কমাইয়া প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অর্থদানের কথা চিন্তা করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাভাবে সরকার অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। বহু লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ ভাণ্ডারে অর্থদান করিতেছেন। যুদ্ধ লাগিলে মানুষকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহা ইতিহাসের পাঠকগণের অবিদিত নাই। সে জন্য যাহাতে যুদ্ধ না লাগে—আমাদের প্রস্তুতি দেখিয়া শত্রু আর অগ্রসর হইবার সাহস না করে—সে জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতিকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস—ভারতের মানুষ প্রয়োজনীয় অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এই বিপদে সকলকে রক্ষা করিবে।

পাকিস্তান রাজ্য মাত্র ১৬ বৎসর পূর্বে গঠিত হইয়াছে। নেতারা ভাবিয়াছিলেন, পাকিস্তান ও ভারত দুইটি পৃথক রাজ্য গঠিত হইলে উভয় রাজ্য মিত্রভাবে বাস করিবে ও পরস্পর অপরকে সাহায্য করিবে। কিন্তু গত ১৬ বৎসর ধরিয়া তাহার বিপরীত ফল দেখা যাইতেছে। চীন ভারতকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে আমরা ভাবিয়াছিলাম, প্রতিবেশী পাকিস্তানরাজ্য সে আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করিতে সাহায্য করিবে। কিন্তু দেখা গেল

—পাকিস্তানের কর্তারা এই সুযোগ লইয়া চীনের সহিত মৈত্রী করিয়া ভারত যাহাতে চীন কর্তৃক আক্রান্ত হয়, সে জন্য চীনকে উত্তেজিত করিতেছে। তাহা ছাড়া গত ১৬ বৎসর ধরিয়া সে ভারতের সহিত তাহার বিবাদ মিটাইতে আসে নাই। যতই শ্রীনেহরু তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ততই পাকিস্তান ভারতকে নানাভাবে বিপন্ন করার ব্যবস্থায় মন দিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৪ দিকেই ভারত রাজ্য—এত দীর্ঘ সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করা বহু ব্যয়সাধ্য। ভারত কোন দিন পাকিস্তানকে আক্রমণ করে নাই বা করিবার ইচ্ছাও করে না। তাহা জানিয়া পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ এই বিরাট সীমান্ত অঞ্চলে দিনের পর দিন আক্রমণ চালাইতেছে—অধিকাংশ সময় তাড়া খাইয়া আক্রমণকারীদের পলায়ন করিতে হয়—তথাপি সুবিধা পাইলেই পাকিস্তানীরা ভারতে প্রবেশ করে—জমী দখল করে, লুঠতরাজ করে ও আবার আক্রান্ত হইলেই পলাইয়া যায়। এই ভাবে পাকিস্তান ভারতকে বিব্রত করে ও সে জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ভারতকে অযথা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়। এত দীর্ঘ সীমান্ত রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যে কিরূপ ব্যয়সাধ্য তাহা সকলেই জানেন। সে ব্যয় অযথা করিয়া ভারত নিজের শক্তিক্ষয় করিতে চাহে না। কিন্তু পাকিস্তান তাহাকে সে ব্যবস্থা করিতে বাধ্য করায় ভারত পাকিস্তান সীমান্ত রক্ষায় মনোযোগী হইতে বাধ্য হইয়াছে। সম্প্রতি পাকিস্তানীরা সর্বত্র ভারত সীমান্তে সৈন্য ও অস্ত্র সমাবেশ করিয়া ভারতের সহিত বিবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। তাহারা হয় ত মনে করে, চীন আবার ভারত আক্রমণ করিলে সেই সময় সুযোগ বুঝিয়া পাকিস্তানও ভারত আক্রমণ করিবে। কিন্তু দেশবাসীর আজ জানা প্রয়োজন—ভারতও পাকিস্তানের আক্রমণে বাধা দিবার জন্য সর্বত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এ বিষয়েও দেশবাসীর সহযোগিতা প্রয়োজন। যে সকল ভারতবাসী সীমান্ত অঞ্চলে বাস করে, তাহাদের আত্মরক্ষা করিতে হইলে তাহার পূর্বে দেশরক্ষা করিতে হইবে। সেজন্য সকল সীমান্তবাসীকে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। প্রয়োজনমত পাকিস্তানের আক্রমণকে বাধা দিয়া, এমন কি পুনরাক্রমণ করিয়া দেশকে রক্ষা করিতে হইবে। এ বিষয়েও আমরা সকল দেশবাসীকে আহ্বান জানাই এবং বিশ্বাস করি, দেশবাসী আজ দেশের তথা নিজেদের বিপদের কথা স্মরণ করিয়া কর্তব্য সম্পাদনে সর্বদা অবহিত থাকিবেন।

খাদ্য পরিস্থিতি—

গত ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ষোড়শ-বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে উৎসবে যে সকল ভাষণ দেওয়া হইয়াছে, প্রায় সর্বত্র বর্তমান শঙ্কাজনক খাদ্য পরিস্থিতির কথা আলোচিত হইয়াছে। গত ১৬ বৎসরে স্বাধীন ভারতের শাসকগণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথ, সেতু, রেল, যানবাহন প্রভৃতি ব্যাপারে লোকের নানাপ্রকার সুখসুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতের অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। আজ দেশে চাউলের মূল্য ৪০ টাকা মণ, মাছের কিলো ৭ টাকা, বিদেশ হইতে গম আমদানী করিতে হয়, দেশে দুধ পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও জলমিশ্রিত দুধ টাকায় ১ সের। এ সমস্যার সমাধান কে করিবে? ১৬ বৎসর ধরিয়া সরকার অধিক পরিমাণে খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রচার ও আন্দোলন করিয়াছেন। কিন্তু সে কথায় কেহ কর্ণপাত করে নাই। একদিকে যেমন অধিক ফসল উৎপাদন চেষ্টা আশানুরূপ হয় নাই, অন্যদিকে তেমনই চাষের জমির পরিমাণ কমিয়াছে। সেচের জন্য বহু কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু দেশবাসী সেচের জল পায় নাই। সারের কারখানা করিয়া প্রচুর সার উৎপাদন করা হইয়াছে, কিন্তু সরকারী বন্টন ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য চাষী যথাকালে সার পায় নাই—ও তাহা কাজে লাগাইতে পারে নাই। সরকারী কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বিভাগ পুস্তিকা ও তথ্য প্রকাশে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছে—কিন্তু প্রকৃত কৃষকের কাছে যাইয়া তাহাকে উপযুক্ত পরামর্শ ও সাহায্য দান করে নাই। তাহার উপর দালাল ও মুনাফা-খোরদিগকে কোথাও কোনরূপ শাস্তি দেওয়া হয় নাই। একদিনে বাজার হইতে চিনি অদৃশ্য হইল—কালোবাজারে অধিক দাম না দিলে চিনি মিলিল না—সরকারী কর্মচারীরা তথা পুলিশ তাহা দেখিয়া ও দেখিল না—মানুষ অশেষ দুঃখ পাইল। কাপড়ের বাজারেও ১২ মাস চোরা-কারবার লাগিয়া আছে, তাঁতি সুতা পায় না—কাপড়ের

কলওয়ালারা সকলেই দালালের করতলগত—ফলে ক্রেতারা দ্বিগুণ দামে কাপড় কিনিতে বাধ্য হয়। সারা ভারতবর্ষে চাহিদার তুলনায় কম চাউল উৎপন্ন হয়—সে জন্য চাউলের দাম কমে না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বাঙ্গালীকে আটা ও আলু খাইয়া জীবনধারণ করিতে বলেন—কিন্তু কেহ সে কথায় কান দেয় না। অবশ্য চেষ্টা করিলে বাঙ্গালী ভাতের বদলে রুটি খাওয়া অভ্যাস করিতে পারে—কিন্তু সেজন্য বাঙ্গালীকে অবহিত করার লোক নাই। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ-সম্বলিত পুস্তিকা ছাপিয়া কর্তব্য শেষ করেন—প্রচার বিভাগ সেগুলি ভাল করিয়া বিতরণের বা সাধারণকে বুঝাইবার ব্যবস্থা করেন না। খাদ্য যে নাই, তাহা নহে—যাহা আছে তাহা ধনী ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের হাতে—কাজেই দাম কমে না। পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর আলু উৎপন্ন হয়—বহু ঠাণ্ডাঘর নির্মিত হইয়াছে, সেখানে রাখা হয়—কিন্তু বাজারে আলুর দাম—২৫ নয়া পয়সা সের না হইয়া ৫০ নয়া পয়সায় বিক্রীত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যমন্ত্রী মাছের সরবরাহের বৃদ্ধি ও সুব্যবস্থার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াও কিছু করিতে পারেন না—কারণ সরকারী কর্মচারী ও পুলিশ বিভাগ নিষ্ক্রিয়—দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা হয় না। যুদ্ধ লাগায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য সরকার যে ভাবে গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া কর্তব্যের কথা দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—সেই ভাবে খাদ্যাবস্থার কথা বুঝাইয়া লোক যাহাতে এ বিষয়ে কর্তব্য পালন করে—অর্থাৎ বেশী ভাত না খাইয়া বেশী রুটী খায়—প্রত্যেকে নিজ নিজ জমীতে কিছু না কিছু খাদ্য উৎপাদন করে, খাদ্যের অপচয় কমাইয়া দেয়, খাদ্য ব্যবসায়ীরা অন্যায় করিলে তাহাদের কঠোর শাস্তিবিধানে সাহায্য করে—এইরূপ কর্তব্য ভাল করিয়া অধিক পরিমাণে সম্পাদন করে—সেজন্য কি ব্যবস্থা করা যায় না। আমরা বহুবার একটি কথা বলিয়াছি—পশ্চিমবঙ্গে এখন বহুসংখ্যক কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে—সকল কারখানার মালিক যদি নিজ নিজ কারখানার কর্মীদের জন্য ধান, তরিতরকারী, দুধ, মাছ, মাংস প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যবস্থা করে, তবে এ সমস্যা অনেকটা মিটিয়া যাইবে। কারখানাগুলির শ্রমিকদের অভাব নাই, প্রয়োজনমত অর্থ সংগ্রহ করা কষ্টকর নহে—যানবাহনের অভাব নাই—সার, জল, ভাল বীজ প্রভৃতি সংগ্রহের সুবিধা অনেক—কাজেই সামান্য একটু চেষ্টা করিলে অল্প ব্যয়ে অধিক খাদ্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবেন। ডিম, মাংস প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন ও সরবরাহ তাঁহাদের পক্ষে আদৌ কষ্টকর নহে। সমবায় সমিতির উপকারিতা আমরা বুঝিলেও কার্য্যক্ষেত্রে সমবায়-কৃষি প্রচেষ্টা প্রায় সাফল্য-মণ্ডিত হইতে দেখি না—সেজন্য আপাততঃ খাদ্য উৎপাদনের ভার ধনী মিল মালিকদের উপর অর্পণ করিলে সত্বর সুফল লাভ করা সম্ভব। একদল মানুষকে অধিক লাভের লোভ সম্বরণ করিতে হইবে এবং খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য কিছু স্বার্থত্যাগ করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সরকারী ব্যবস্থায় দুগ্ধ উৎপাদন এত অধিক ব্যয় সাধ্য যে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হওয়া অসম্ভব। ব্যবসায়ীদের হাতে এই দুগ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থার ভার দিলে অনেক অল্প খরচে দুধ উৎপাদন সম্ভব হইতে পারে। তবে মুনাফাখোরদের হাত হইতে, অসৎ ব্যবসায়ীর কবল হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করার কঠোরতর আইনের প্রয়োজন। বর্তমান আইন যে সে বিষয়ে ঠিক কাজ করে না, তাহা সর্বত্র দেখা যাইতেছে। আমরা এ সকল বিষয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষের ও নেতৃস্থানীয় দেশবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। প্রত্যেক দেশবাসী যদি এ বিষয়ে সচেষ্ট হন—শুধু সরকারকে গালি দিয়া কর্তব্য শেষ না করেন, তাহা হইলে অবশ্যই খাদ্য সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—

খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৬ই আগষ্ট বিকালে ৭৮ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা ক্রিষ্টোফর রোডের বাসা বাড়ীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কয় বৎসর স্থায়ীভাবে কাশীধামে বাস করিতেছিলেন—১১ই আগষ্ট রবিবার তিনি একমাত্র পুত্র শ্রীজ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত দেখা করিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন—তাঁহার পত্নী, এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান। ১৮৮৬ সালে ১১ই আগষ্ট ২৪ পরগণার মণিখালি কৃষ্ণনগরে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়—আড়িয়াদহের প্রসিদ্ধ চট্টোপাধ্যায় বাড়ীতে তাঁহার

বিবাহ হয়। প্রথম জীবনে তিনি স্বর্গত খ্যাতিমান্ অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নাট্যমন্দির মাসিকপত্রের সহ-সম্পাদক ছিলেন—সে সময়ে তাঁহার বাজিরাও নাটক সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হয়। পরে তিনি কাশী যাইয়া দীর্ঘকাল রেশমের ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থোর্জন করেন—পুত্র-কন্যার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার ব্যবসা নষ্ট হয় ও তিনি প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে আবার কলিকাতায় আসিয়া ভারতবর্ষ, বসুমতী প্রভৃতি কার্যালয়ে কাজ করিতে বাধ্য হন এবং ঐ সময়ে বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার স্বয়ংসিদ্ধা, অদৃষ্টের ইতিহাস, দুঃখের পাঁচালী, অপরাজিতা, রাগিণী প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠকসমাজে সমাদৃত। ঐ সময়ে তাঁহাকে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হয় এবং কয়েকটি কন্যার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হন। ভারতবর্ষ মাসিকপত্র ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের সহিত তাঁহার দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমরা তাঁহার পরলোকগমনে স্বজন-বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছি এবং পরিবারবর্গকে—বিশেষ করিয়া বৃদ্ধা পত্নীকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সাহিত্য বাসরের সম্বর্দ্ধনা সভা—

গত ১৭ই আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ হলে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে সাহিত্য বাসরের এক সম্বর্দ্ধনা সভা হইয়াছিল। তথায় বাসরের সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথি ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, উদ্বোধক শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ, শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট অতিথি শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক, শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, শ্রীইন্দুভূষণ সেন, শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, শ্রীকুমারেশ ঘোষ প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

স্বাধীনতা দিবস উৎসব—

প্রতি বৎসরই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কয়েক দিন উৎসব করিয়া পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী দেশের গুণিজন সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকেন। এ বৎসর গত ১৮ আগষ্ট রবিবার বিকালে কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের সভাপতিত্বে দমদম, নাগের বাজার, তেলিপুকুর ময়দানে ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটী ঐরূপ এক উৎসব করিয়া জেলাবাসী নিম্নলিখিত ৮জন গুণিজনের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন—(১) সাহিত্যিক শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী (২) সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (৩) পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (৪) প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীকালিদাস দত্ত (৫) বয়নশিল্পী শ্রীনিতাই-চাঁদ বসাক (৬) খেলোয়াড় শ্রীকৃষ্ণ পাল (৭) সাংবাদিক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও (৮) ব্যায়ামবিদ্ শ্রীতারাচরণ মুখোপাধ্যায়। শ্রীহংসধ্বজ ধাড়া, জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্লা, শ্রীদীনবন্ধু দাস, শ্রীশোভেন বসু মল্লিক প্রভৃতির চেষ্টায় উৎসব সাফল্য-মণ্ডিত হয়। গুণিগণ ছাড়াও সভায় সভাপতি ঘোষ মহাশয় ও মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ সময়োপযোগী ভাষণ দিয়াছিলেন।

মুনাফা শিকারীদের সায়েস্তা—

গত ২০শে জুলাই নয়াদিল্লী হইতে কেন্দ্রীয় সরকার এক আদেশ প্রচার করিয়া খাদ্যশস্য ও চিনির কালো-বাজারের উচ্ছেদ-সাধনের উদ্দেশ্যে ভারতরক্ষা বিধি প্রয়োগের জন্য রাজ্যসরকার সমূহকে নির্দেশ দিয়াছেন। সংবাদটি আনন্দের হইলেও দুঃখের কথা—তাহার পর গত এক মাসেও রাজ্য সরকারগুলি ঐ নির্দেশ পালনে অগ্রসর হন নাই। চাল, চিনি, মাছ প্রভৃতির বাজারে কালো-বাজারীর কাজ এখনও চলিতেছে। যদিও অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে—কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনবধানতা ও নিষ্ক্রিয়তার জন্য অপরাধী-দের শাস্তির কোন ব্যবস্থাই হইতেছে না। এ বিষয়ে আমরা সকল সরকারী কর্মচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। অত্যধিক লাভের ব্যবস্থা বন্ধ করা হইলেই বাজারের খাদ্যমূল্য আপনা হইতে কমিয়া যাইবে ও লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে।

অন্যায়ের শাস্তি কোথায় ?—

বিধান সভায় মন্ত্রীদের টেলিফোন খরচ সম্বন্ধে যে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআশুতোষ ঘোষের গত ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই হইতে

১৯৬৩ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ১২ মাসে নিজ বাড়ীর টেলিফোনের জন্য সরকারকে ৬৪৯৮ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। ঐ সময়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের বাড়ীর টেলিফোনে ব্যয় হইয়াছে ৩৯৬০ টাকা। মুখ্যমন্ত্রীকে সর্বাপেক্ষা অধিক কাজ করিতে হয়—আর ঘোষ মহাশয় দার্জিলিংয়ে মন্ত্রী বৈঠকে আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তাঁহার বিভাগীয় মন্ত্রী কাজ করিতে দেন না। কাজ না করিয়া যদি টেলিফোন বিল ঐরূপ হয়, তবে কাজ করিলে কি হইত? শ্রীঘোষের এই কার্য্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রী কি তাঁহার কোন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন না? কঠোর শাস্তি না দিলে লোক ভবিষ্যতে সাবধান হইবে না।

চারুশিল্প সাধক সম্বর্দ্ধনা—

গত ২৬শে জুলাই কলিকাতা চারুকলা একাডেমী ভবনে কলিকাতার প্রবীণ ও খ্যাতিমান চারুশিল্পসাধক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর সভানেত্রীত্বে সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাম্রপত্র ও অঙ্গবস্ত্র দান করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও গবেষণা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীহুমাউন কবীরও শিল্প-সাধক গাঙ্গুলী মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা জানান। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপকরূপে বাংলার চারুশিল্পের উন্নতির জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা এই উপলক্ষে তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জানাই।

সূর্য্যোদয়

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

একটি করিয়া নিমেষ ঝরিছে প্রহর গণিছে শর্ব্বরী,
তামসী যামিনী-অঞ্চলতলে ঘন হ'য়ে আসে নিচুলি রাত;
আসমানী হাওয়া শ্বাস ফেলে যায় অশথের শাখা মর্ম্মরি',
নীরব, নিশুতি ত্রিযামা সহিছে মহাবেদনার কী অভিঘাত!

আকাশের কালো সামিয়ানা তলে তারকার আঁখি
নির্নিমেষ,
ধরণীর বুকে গুমরিয়া কাঁদে বেদনায় হত এ মহানিশা;
স্পন্দন যেন কানে আসে তা'র, ঝিল্লীর সুরে তাহারি রেশ,
মৌন, নীরব কান্নায় ভরি' একাকার আজি সকল দিশা।

এলো যে নিশীথ-গভীর লগ্ন—থমথমে রাত্রি মূর্চ্ছাহত,
ধ্রুব তারকার রশ্মিলেখায় মাভৈঃ বাণীর কী আশ্বাস;
'সার্থক হবে এই তপস্যা'—উঠিতেছে ধ্বনি লক্ষ শত,
জোনাকির আলো-আঁধার দীপ্তি জাগায় চিত্তে এ বিশ্বাস।

ঘোষিল প্রহর যামঘোষযূথ শেষ প্রহরের নিশানা কি?
নিবিড় নিকষ-তমসার বুকে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ আলোর রেখা,
পূর্ব্ব আকাশে কালো যবনিকা কাঁপিতেছে যেন—
তাই না কি?
বেদনার শেষ—রাত্রির বুকে সূর্য্যের দূতী ঊষার লেখা!

উদয় অচলে নবীন সূর্য্য রাত্রির মুখে ফুটিল হাসি,
জননীর আঁখি পুলকে উছল তারি পানে চায় নিমেষ-হত;
পৃথিবীর তুমি মানবী কন্যা যামিনীর সম উঠিলে ভাসি'
ভরা আনন্দে, আজ মহীয়সী সন্তান তব দৈবাগত।

শ্রমিক-বিজ্ঞান

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্বপ্রকাশিতেরপর)

[সম্পর্ক—মালিক ও শ্রমিক, অনুরাগ, বীতরাগ, কর্ম্মপ্রেরণা, অবক্লান্তি, শিল্পবোধ, কর্ম্মবোধ, ব্যষ্টিবোধ, সমষ্টিবোধ, শ্রমিক সন্তোষ, আদেশদান, হুকুম তামিল, মনোজট বা কমপ্লেক্স, আত্মোদ্যোগ, সুনামস্পৃহা, ক্ষমতা, স্পৃহা—শোণিতত্বক ও সম্পর্ক্তিক, মনোবৃত্তি—আক্রমণাত্মক এবং পলায়নত্বক। পলায়ন—দৈহিক ও মানসিক, কর্ম্মদ্যোগ ভীতিপ্রদর্শন সমষ্টিবোধ, ব্যষ্টিবোধ গণ-বাক্-প্রয়োগ, মালিকানা বোধ, দায়িত্ব বোধ।]

মালিক শ্রমিক সম্পর্কের স্থায়ী মধুর সম্পর্ক ব্যতীত শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি শিল্পোদ্যম (inceptive) ব্যাহত হতে বাধ্য। এই জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই উভয় শ্রেণীর সম্পর্কের উন্নতিসাধন সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

ক্ষুদ্র বা বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান মাত্রে দেখা গিয়েছে যে, কর্তৃপক্ষ যন্ত্রপাতির উৎকর্ষতা সম্পর্কে চিন্তা করলেও মানুষ তথা মনুষ্যত্বের মূল্য সম্বন্ধে চিন্তা করেন নি। তারা ভুলে যান যে যন্ত্রকে ইচ্ছানুযায়ী পরিচালনা করা গেলেও মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়ে মানুষকে পরিচালনা করা যায় না। এই মনুষ্যত্বের প্রকৃত মূল্যায়নের উপর মালিকশ্রমিকের মধুর সম্পর্ক নির্ভর করে। শিল্পক্ষেত্রে মালিকশ্রমিক সম্পর্ক কয়েকটী বিশেষ মনোভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। উহাদের যথাক্রমে—অনুরাগ (interest) বীতরাগ, প্রেরণা, ভাবপ্রবণতা হিংসা ক্রোধ, অবক্লান্তি (Boredom) প্রভৃতির বিষয় বলা যেতে পারে। বহু ক্ষেত্রে এই সকল দোষগুণ যে শ্রমিকদের থাকতে পারে, তাও বহু কর্তৃপক্ষ মেনে নিতে রাজী হন না। তাঁরা কেবলমাত্র উন্নত ও পর্য্যাপ্ত দ্রব্য উৎপাদনে বিষয় ভেবেছেন কিন্তু শ্রমিক ব্যতীত শুধু মেশিন যে তাদের অভিলাষ পুরণ করতে পারেনা, তা ভাবেন নি। এই জন্য তারা আশানুযায়ী সুফল লাভ করতে তো পারেনইনি ; উপরন্তু তাঁরা ইচ্ছে করে নিজেদের ও শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দ্দশা ও বিপদের কারণ ডেকে এনেছেন। শিল্পীকে বাদ দিয়ে শিল্প-স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি, যন্ত্রীকে বাদ দিয়ে যন্ত্র সম্বন্ধে চিন্তা করলে শিল্প ক্ষেত্রে বহু বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী।

এখানে সকলেই স্বীকার করবেন যে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে মধুরতম সম্পর্ক থাকা উচিত। কিন্তু এই মধুরতম সম্পর্ক স্থাপনে প্রকৃত বাধা কোথায়? এই দুরূহ বিষয় বুঝতে হলে শ্রমিক মনো-বিজ্ঞানে জ্ঞান দরকার। কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠান বিশেষের ম্যানেজার ও শ্রমিকদের দৈহিক শক্তি ও মানসিক সুস্থতা পরিমাপ করে উভয় পক্ষের সম্পর্ক উন্নত করা যায় না। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ফোরম্যানের ও অধীনস্থ শ্রমিকের এবং একজন শ্রমিকের সঙ্গে অপর শ্রমিকের সম্পর্কও উন্নততর করা চাই। কিরূপে ইহা সম্ভব হতে পারে সেই সম্বন্ধে এইবার আমি আলোচনা করবো। ভুলে গেলে চলবেনা যে পৃথিবীব্যাপী উদ্যোগশিল্পসমূহ কেবল মাত্র মুনাফা-খোরী ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু উহা মনুষ্যচরিত্র অভিজ্ঞ দরদী বুদ্ধিমান ধীরমস্তিষ্ক সৎ ব্যক্তিদের দ্বারা উত্তমরূপে পরিচালিত হতে পারে।

বহু শ্রমিকদের মনে শিল্পবোধ এবং তদারকী কর্ম্মীদের মনে কর্ম্মবোধ—এই দুইটি মনোজট (Complex) আছে। এই কর্ম্মবোধ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। এক্ষণে শিল্প বোধ সম্বন্ধে (Craftmanship) আলোচনা করা যাক। সৃষ্টির আনন্দ বা অভিমান থেকে এই শিল্প বোধের

উৎপত্তি। একক শিল্পের ন্যায় যৌথ শিল্পেও এই শিল্পবোধ স্থান পেয়েছে। ফ্যাক্টারী প্রভৃতিতে শিল্পোৎপাদনে ব্যক্তি অপেক্ষা ব্যষ্টির (Group) প্রাধান্য অধিক। এখানে ব্যক্তিগত কলাকৌশল যৌথ অবদানের মধ্যে নিঃশেষে হারিয়ে গিয়েছে। এই ক্ষেত্রে কোনও উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে একান্তরূপে ব্যক্তিগত কৃতিত্ব আরোপ করা যায় নি। তথাপি দেখা যায় যে শ্রমিক মনে করে—তাদের দল বা গোষ্ঠীদ্বারা এই ধরণের উন্নত দ্রব্যোৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এইরূপ ক্ষেত্রে অবচেতন মনে এই উৎপাদিত দ্রব্যের উপর তাদের মালিক-সুলভ দরদ ও গৌরব পরিবেশিত হয়। এই ক্ষেত্রে অধিক ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদনে এমন একটা প্রেরণা শ্রমিকদের পেয়ে বসে যে উহাদের তখন উহা হবি'তে (Hoby) পরিণত হয়। এই মনোবৃত্তির অভাবে শ্রমিকদের মন শিল্পবোধবিযুক্ত হলে তারা নিকৃষ্ট দ্রব্য সৃষ্টি করে থাকে। এদের দ্বারা অধিক ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করাতে হলে ক্ষুদ্র শিল্পে এদের এই ব্যষ্টিজ্ঞান এবং বৃহৎশিল্পে এদের গোষ্ঠীজ্ঞান বজায় থাকা দরকার। সশস্ত্র বাহিনীতেও দেখা গিয়েছে যে উহাদের এক একটি রেজিমেণ্ট আপন আপন ঐতিহ্য (Tradition) অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে। সেনা বাহিনীর ন্যায় শ্রমিক দলও আপন আপন গোত্র-বোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়ে থাকে। এই অবস্থায় শ্রমিকরা নিজেদের সৃষ্ট দ্রব্য বিষয় সম্পর্কে গর্ব্ব বোধ করে থাকে। এক্ষণে এই বিশেষ শ্রমিক-প্রেরণা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে মাত্র দুইটী সহজ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। যথা—(১) উহাদের চাকুরীর স্থায়িত্ব। পুত্র পুত্রাদিকে এতৎ প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর দাবী। (২) জীবন ধারণের উপযুক্ত বেতন এবং ম্যানেজার ও ফোরম্যানদের সৎব্যবহার। (৩) অন্য কোনও অসন্তোষের কারণ থাকলে আলোচনা দ্বারা শ্রমিকদের মন হতে তা দূর করা। ক্ষুদ্রশিল্পে মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে পরিচয় থাকে। এঁরা একটা যৌথ পারিবারিক মনোবৃত্তির সৃষ্টি করে এদের সম্পর্ক মধুরতম করে তুলেন। কিন্তু বৃহৎ শিল্পের মালিক বা ডিরেক্টরের সাক্ষাৎভাবে অগণিত শ্রমিকদের সংস্পর্শে আসা সম্ভব নয়। এই জন্য প্রত্যেক ম্যানেজার এবং ফোরম্যানকে শ্রমিক মনোবিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তুলা উচিত হবে। এই সকল ম্যানেজার ও ফোরম্যানদেরও শ্রমিকদের শিল্প-বোধের ন্যায় একটী প্রেরণাগত কর্ম্মবোধের সৃষ্টি করা উচিত। উন্নতির আশা, আনুগত্য এবং কর্ম্ম-দক্ষতা এই কর্ম্মবোধের ভিত্তি। কিন্তু শ্রমিকদের শিল্প-বোধও তদরাকী অফিসারদের কর্ম্মবোধের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য থাকা দরকার। এই কর্ম্মবোধ মালিকদের স্বার্থে প্রযুক্ত হয় বলে উহার সহিত শ্রমিকদের শিল্পবোধের সংঘাত হওয়া কদাচ উচিত হবে না। তদারকী অফিসারদের নিজেদের শিল্পবোধ থাকলে এইরূপ অকারণ সংঘাতের কোনও কারণ নেই। এই জন্য তদারকী অফিসারদেরও কিছুকাল সাধারণ শ্রমিকের কাজ করা উচিত হবে। এইরূপ ক্ষেত্রে এঁরা সাধারণ শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ বুঝবেন এবং শ্রমিকের শিল্প-বোধ তাদের মুগ্ধ করবে। একমাত্র এইরূপ এক পরিস্থিতিতে গুণগ্রাহী তদারকী অফিসার এবং কৃতী শ্রমিক পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করবে। এর ফলে স্বাভাবিক নিয়মে মালিক শ্রমিক সম্বন্ধ উন্নততরও হয়ে উঠবে।

[সাধারণতঃ তদারকী অফিসাররা মালিক বা ম্যানেজারকে কাজ দেখাবার জন্যে কিংবা কয়েকজন দক্ষ শ্রমিককে তাঁবে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের সহিত সৎ ব্যবহার করলেও অন্যান্য শ্রমিকদের প্রতি ভালো ব্যবহার করে তাদের সুশিক্ষা দ্বারা তাদের দক্ষ শিল্পী করে তুলবার ব্যবস্থা করেন নি। অন্যদিকে তাঁরা একদল দক্ষ শ্রমিকদের হস্তে ক্রীড়ার-পুতুল হয়ে তাঁরা অবশিষ্ট সাথী শ্রমিকদের অবজ্ঞা করেছেন। এইভাবে তাঁরা একজন বা একদল শ্রমিকের সহিত অপর জন বা অপর দল শ্রমিকের বিভেদ সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠান বিশেষের সামগ্রিক্ ক্ষতি করেছেন।]

শ্রমিকদের উপর মালিকের হুকুম দেবার রীতিনীতি ও ভঙ্গিমা, উর্দ্ধতনদের অধস্তনদের প্রতি ব্যবহার, শ্রমিক ভর্ত্তি ও বরখাস্তের পদ্ধতি ও বেতন প্রদানের নিয়ম, প্রভৃতির উদ্যোগ ও কুটীর-শিল্পের কর্ম্মদক্ষতা বহুলাংশে নির্ভর করে। এই সব দৈনিক কাজে পূর্ব্বাপর বহুবিধ কার্য্যকারণ ও মনোবৃত্তি শ্রমিক ও মালিকদের সমভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এইখানে উভয়পক্ষ তাদের আহৃত মনোজট (Complex) হতে মুক্ত হয়ে বিজ্ঞানোচিতভাবে পরস্পর পরস্পরের সহিত ব্যবহার করলে সমস্যার সমাধান

হবে। কিন্তু একথা ঠিক যে প্রতিটি শ্রমিককে মনো-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, সেই হেতু মালিক, ম্যানেজার ও ফোরম্যানের এই শ্রমিক-বিজ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে শ্রমিকদের প্রতি তাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

আত্মোদ্যোগ (self assertion) পদোন্নতিপ্রয়াসী শ্রমিক এবং তদারকী কর্ম্মীদের একটি বিশেষ ধর্ম্ম। আত্মোদ্যোগ'কে দুইটী উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে, যথা (১) ক্ষমতাস্পৃহা এবং (২) সুনামস্পৃহা। ক্ষমতাস্পৃহা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করবো। এক্ষণে সুনামস্পৃহা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। এমন বহু শ্রমিক আছে যারা সবচীন হতে ইচ্ছা করে। এই একটি মাত্র কারণে (Love of prominence) তারা অত্যধিক কায দেখায় এবং অপরের কাযে ভুল ধরে। এরা সর্ব্বজন অপেক্ষা পৃথকভাবে আত্মপ্রকাশ করতে উদ্‌গ্রীব। এই সৃষ্টি করে সুনামপ্রয়াসী মনোভাবের সুযোগ নিয়ে মালিক এবং ম্যানেজারগণ বিভিন্ন শ্রমিক দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা উৎপাদন বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রথমে তাদের এই প্রচেষ্টা সফল হলেও আখেরে শ্রমিকদের মধ্যে শ্রম-ক্লান্তি আসায় উৎপাদনের হ্রাস ঘটেছে। তবে যথোচিত ভাবে সাবধানে শ্রমিকদের এই বিশেষ মনোভাব কাযে লাগানো যেতে পারে কিনা তাহা বিবেচ্য। এই সম্বন্ধে ফলাফল সম্পর্কে আমি এখনও গবেষণা করছি। সাধারণতঃ ফ্যাক্টরীসমূহে পদোন্নতি কালে শ্রমিকদের এই সুনাম-স্পৃহা মালিক ও ম্যানেজারদের অধিক আকৃষ্ট করেছে। এইজন্য বহু শ্রমিক কাজ না করেও কায করার ভাণ করেছে। কিংবা তারা পদোন্নতির আশায় মালিক ও ম্যানেজারের পারিবারিক বিষয়ে সাহায্য করে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য অধিক চেষ্টা করেছে। এই ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর শ্রমিক ও তদারকী কর্ম্মীদের কার্য্যের উৎকর্ষতা এবং উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া উচিত হবে।

সুনামস্পৃহা সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার ক্ষমতাস্পৃহা সম্বন্ধে বলবো। এই ক্ষমতাস্পৃহা প্রায়শঃক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিকের সম্পর্কের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এই ক্ষমতাস্পৃহার দুইটী উপশ্রেণী আছে, যথা বস্তুগত বা সাম্পত্তিক এবং ব্যক্তিগত বা শোণিতাত্মক। প্রথমে সাম্পত্তিক ক্ষমতাস্পৃহা সম্বন্ধে বলা যাক। কোনও শ্রমিকের এই ক্ষমতাস্পৃহা দুরূহ মেসিন বা সম্পত্তি করায়ত্ত করে অবচেতন মনে নিবৃত্ত হয়। অন্য ক্ষেত্রে এক মানুষ অপর মানুষের উপর স্বকীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চেয়েছে। এই প্রকারের ক্ষমতামত্ততা মানুষের চেতন মনে এলে তাদের ক্লীক্‌বাজ্ বুলিতে [উপদল-বিলাসী ভীতিপ্রদর্শক] পরিণত করে দিয়ে থাকে। এই প্রথমোক্ত শ্রেণীর ক্ষমতাস্পৃহাকে সাম্পত্তিক ক্ষমতাস্পৃহা বলা হয়ে থাকে।
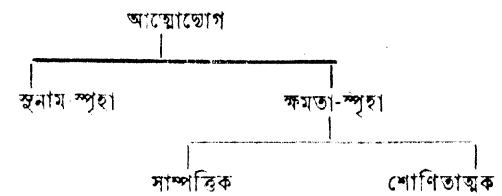
উন্নতিপ্রয়াসী (Ambitious) ব্যক্তিদের মধ্যে শোণিতাত্মক ক্ষমতাস্পৃহাসম্পন্ন মানুষ প্রায়শঃক্ষেত্রে নিজেদের ও অপরের বিপদ ডেকে এনেছে। মালিক, ম্যানেজার, ফোরম্যান, তদারকী কর্ম্মীদের ন্যায় শ্রমিক-সঙ্ঘের নেতারাও তাদের সঙ্ঘের কর্ত্তৃত্ব করায়ত্ত করার প্রয়াসী হয়ে এই একই রোগে ভুগে থাকে। এদের এই উন্নতি-প্রয়াস কার্য্যগতিকে ব্যর্থ হওয়া মাত্র এরা ক্ষিপ্ত হয়ে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ক্ষুন্ন তো করেছে। উপরন্তু এরা নিষ্প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যেও বিভেদ এনে সামগ্রিক ভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মহা ক্ষতির কারণ ঘটিয়েছে। এক্ষণে এই শোণিতাত্মক ক্ষমতাস্পৃহা প্রারম্ভে প্রদমন করতে হলে উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকার প্রয়োজন আছে। এইজন্য উহার উৎপত্তি ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধে এবার আমি আলোচনা করবো।

যুদ্ধংদেহী রূপ মনোভাব এবং আক্রমণাত্মক প্রেরণা বা স্বভাব হতে এই শোণিতাত্মক ক্ষমতাস্পৃহা উপগত হয়ে থাকে। কিন্তু এইরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষমাত্রেরই মধ্যে ইহার প্রতিষেধক রূপে আত্মরক্ষামূলক পলায়ন প্রবৃত্তি রূপ একটি প্রেরণা এই একই সঙ্গে এসে গিয়ে থাকে। এইজন্য এই শোণিতাত্মক ক্ষমতাস্পৃহার মধ্যে

আমরা আক্রমণাত্মক এবং পলায়নাত্মক এই উভয় বৃত্তি বা স্বভাব দেখতে পেয়ে থাকি।
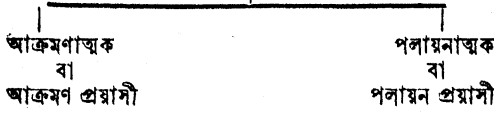
এইখানে বলা যেতে পারে যেএই শোণিতাত্মক ক্ষমতা স্পৃহা মনোবিকৃতির কারণে ধ্বংসাত্মক হলে এই স্পৃহার অধিকারী মানুষের মধ্যে প্রথমে আক্রমণাত্মক স্বভাব এবং পরে তাহার মধ্যে আত্মরক্ষামূলক পলায়নাত্মক স্বভাব স্থান পেয়ে থাকে। প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে সাম্পত্তিক ক্ষমতাস্পৃহা গঠনমূলক এবং শোণিতাত্মক ক্ষমতাস্পৃহা ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করে থাকে। এই কারণে উপকারী সাম্পত্তিক ক্ষমতাপ্রিয়তা'কে উৎসাহ দিয়ে শোণিতাত্মক ক্ষমতাপ্রিয়তার হ্রাস ঘটানো উচিত। এই দুইটি স্পৃহা একটি মানদণ্ডের (Pole) দুই মুখে অবস্থান করে। এই জন্য একটির বৃদ্ধি হলে অপরটির স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস ঘটে থাকে। এই শোণিতাত্মক ক্ষমতাস্পৃহা দুইটি উপশ্রেণী —(১) আক্রমণ এবং (২) পলায়ন—সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা যাক। প্রভুত্ববিস্তারপ্রয়াসী শোণিতাত্মক ক্ষমতাস্পৃহা অন্য মানুষকে বিবিধ কষ্ট প্রদান করে মাথা নীচু করে বশ্যতাস্বীকারকরতে বাধ্য করতে চায়। ইহার মধ্যে কষ্টপ্রদায়ক ও বশ্যতাস্বীকারী [hunter] মনোভাব দেখা গিয়েছে। এবংবিধ আত্মোদ্যোগের [Self Assertion] মধ্যে এই পরম দোষযুক্ত না থাকলে উহা অপরের পক্ষে এতো ক্ষতিকর নিশ্চয় হতো না। আক্রমণ স্বভাবের বিষয় বিবৃত করা হলো। এইবার পলায়ন স্বভাবের বিষয় বলা যায়। এই পলায়নী স্বভাব মানুষের ভীতি ও কষ্টবোধ, ক্লিষ্টাক্লিষ্ট [Pleasant or unpleasant] বোধ, আর্থিক ক্ষতি অপমানের আশঙ্কা এবং আঘাত-বোধ হতে উৎপত্তি হয়ে থাকে। এক্ষণে উল্লেখযোগ্য এই যে শোণিতাত্মক আক্রমণাত্মক স্পৃহা অবচেতন মনে থাকলে উহাতে সংযুক্ত এই আক্রমণ ও পলায়ন স্বভাব পৃথক পৃথক ভাবে বা পরপর একত্রে উপগত হওয়া সম্ভব। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আক্রান্ত পক্ষ ভীতুস্বভাব বা পলায়নী স্বভাবের হলে মানুষের এই আক্রমণাত্মক স্পৃহার বর্জন ঘটে। কিন্তু উহা বারে বারে বাধাপ্রাপ্ত হলে উহাদের মধ্যে পলায়ন স্পৃহা স্থান পায়। উপরন্তু এই উভয় স্পৃহা কার্য্যকরী করতে না পারলে বহু ক্ষেত্রে উহারা অবনমিত [Suppressed] হয়ে অবচেতন মনে থেকে গিয়েছে। বহুক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির কারণেও এই স্পৃহাদ্বয়ের একটী বা অপরটী চেতন মনে এসে কার্য্যকর হয়ে থাকে। এই জন্যে মানুষের অসুবিধা হলে তাদের কেউ কেউ নীরবে ফ্যাক্টারী ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে। আবার এদের কেউ কেউ সরব হয়ে আক্রমণাত্মক স্বভাব দ্বারা নানারূপ বিভ্রাটের সৃষ্টি করেছে।

এই পলায়নস্পৃহাসম্পন্ন শ্রমিকরা যে সকল ক্ষেত্রে ফ্যাক্টারী পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে পেরেছে তাও নয়। তাদের চাকুরীক্ষেত্রের পরিবেশ অপছন্দ হলেও অন্য কোনও উপযুক্ত চাকুরীর অভাবে তাদের এই পলায়নস্পৃহা তারা কার্য্যকরী করতে পারে নি। এই ক্ষেত্রে তাদের দেহটি তাদের এই অসুবিধাকর কর্ম্মে বদ্ধ থাকলেও তাদের মন তাদের আশাআকাঙ্খার কর্ম্মক্ষেত্রে পলায়ন করে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরা প্রতিনিয়তই অন্যত্র চাকুরীর সন্ধান করতে থাকায় স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রে দক্ষ কারীগররূপে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়নি। এই পলায়ন স্বভাবের ব্যক্তিরা মনোমত কর্ম্ম না পাওয়া পর্য্যন্ত এক ফ্যাক্টরী হতে অন্য ফ্যাক্টরীতে মুহুর্মুহু বদলী হয়েছে বা নূতন চাকুরী নিয়েছে। এই অবস্থায় এই সকল অনির্ভর-যোগ্য অক্ষম শ্রমিকদের দ্বারা দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়নি। এই জন্য ভর্ত্তির সময় মালিকদের জানা উচিত যে এই শ্রমিক বৎসরের মধ্যে কতো জায়গায় চাকুরী গ্রহণ করে পরে তা পরিত্যাগ করে চলে এসেছে। অন্যদিকে আক্রমণাত্মক স্বভাবসম্পন্ন শ্রমিকদের মধ্যে উপগত এই বিশেষ স্বভাবের হেতু সম্বন্ধে মালিক বা ম্যানেজার বা ফোরম্যানদের অবহিত হওয়া দরকার। এমন কি আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা তাঁরাও এইরূপ স্বভাবের অধিকারী হয়েছেন কিনা তাও জানা দরকার। এই আক্রমণাত্মক স্বভাবমূলতঃ প্রকৃত অভাবঅভিযোগ হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে তাদের মন প্রশাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত বিরূপ থেকেছে। এই অবস্থায় এরা সুবিধা পা

সুযোগ পাওয়া মাত্র অকারণে ধর্মঘট প্রভৃতিতে যোগ দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। মিল ফ্যাক্টারীতে এইরূপ স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা যে স্বল্প থাকে সে কথা ঠিক। কিন্তু এদের সাহসে সাহসী হয়ে পূর্ব্বোক্ত পলায়নোন্মুখ অথচ পলায়নে অক্ষম শ্রমিকগণও তাদের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত্ত-ভাবে যোগ দিয়ে থাকে। এইরূপ বিবিধ মনোবৃত্তিসম্পন্ন শ্রমিকদের অভাবঅভিযোগ সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে মনোনিবেশ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করলে বহু অঘটন হতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হবে। ইতিপূর্ব্বে আমি তদারকী কর্মীদের কর্মোদ্যোগপ্রসূত ভীতিপ্রদর্শন [Bully] এবং উপদল সৃষ্টির [clique] প্রয়াস সম্বন্ধে বিস্তারিত বলেছি। প্রতিটী ভালো বা মন্দ কার্য্যের একটি প্রতিফল [Re-action] থাকে। উর্দ্ধতনদের এই উপদলসৃষ্টির প্রয়াস, অযথা ভীতিপ্রদর্শন, ধ্বংসাত্মক তদারকী শ্রমিকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাদের মধ্যে আক্রমণাত্মক স্বভাবের সৃষ্টি করেছে। এইরূপ অবস্থার জন্য পর্দ্দানশীন কিংবা চেয়ারবিলাসী মালিক ও ম্যানেজারদের বিশেষ করে দায়ী করা যেতে পারে।

মালিক শ্রমিক সম্বন্ধের ক্ষতিকর এই আক্রমণাত্মক স্বভাবের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। কলিকাতার বিগত সভ্যতাবিরোধী মহাদাঙ্গার সময় শ্রমিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক মতবাদের এবং রাজনৈতিক মতবাদের বহু উর্দ্ধে সাম্প্রদায়িক মতবাদ স্থান পেয়েছিল। এমন কি এই সকল বহু জটিল প্রশ্নের সুমীমাংসা না করতে পেরে বহু শ্রমিক-সমিতি ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হওয়ায় উহা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এইখানে দেখা যায় যে বিভিন্ন স্বার্থে মানুষ বিভিন্ন দলে যোগ দিয়ে থাকে। কিন্তু পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী উহাদের একটি বা অপরটি প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। এক্ষণে মানুষের এই ব্যক্তিগত এবং দল-গত মন সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

মানুষের সমষ্টি কেবল মাত্র কয়েক ব্যক্তির সমষ্টি নয়। দলবদ্ধ মানুষের পক্ষে একদেহী হওয়া সম্ভব না হলেও উহাদের একাত্মা হওয়া সম্ভব। এই ক্ষেত্রে মানুষের স্বকীয় ব্যক্তিত্বের অল্পবিস্তর হানি ঘটে থাকে। এইখানে দলের স্বরূপ অনুযায়ী দলবদ্ধ মানুষ তাদের বহু কমবেশী ব্যক্তিগত চেতনা বিদূরিত করে একটি একক মানুষের ন্যায় ব্যবহার করে থাকে। এ' অবস্থায় তাদের চিন্তা, অনুভূতি এবং কর্ম্মসমূহ তাদের ব্যক্তিগত চিন্তা, অনুভূতি ও কর্ম্ম হতে বিভিন্ন রূপের হয়ে থাকে। এরা দল হতে বার হয়ে পৃথক সত্তা ফিরে পেলে পুনরায় তাদের চিন্তাধারা ও কর্ম্মপ্রবাহ পূর্ব্ব খাতে চলতে সুরু করেছে। এর কারণ দলীয় মনে ব্যষ্টি মনের মত ভয় ও লজ্জা ও সংকোচ থাকে না। এইখানে ক্ষমতা, মদমত্ততা বা অত্যধিক-রূপ শক্তি-বোধ এদের মনে উপগত হয়ে এদের নির্লজ্জ, সাহসী, হিংস্র, স্বার্থান্ধ এবং অকৃতজ্ঞ করে তুলেছে। এই সময় তারা স্থূল বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় এরা উচিত অনুচিত বোধ হারিয়ে ফেলে এবং অপরে এদের অপকার্য্য কিরূপ ভাবছে বা না ভাবছে, তা তাদের মনে স্থান পায় না। অথচ স্বকীয় ব্যক্তিত্ব ফিরে পাওয়া মাত্র এরা সূক্ষ্মবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় এরা পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে মানুষোচিত বৃত্তি ও কর্ম্মের অধিকারী হয়ে উঠে। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে গণ-বাক্-প্রয়োগ [Mass Suggession] দ্বারা শ্রমিককুল তাদের ব্যষ্টি ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে। রাজ-নৈতিক জনসমাবেশে আগত মানুষের ন্যায় তারা পরস্পর পরস্পরকে বাক-প্রয়োগ দ্বারা প্রভাবিত করে তাদের স্ব স্ব পৃথক সত্তা লুপ্ত করে দিয়ে একটি মাত্র মানুষ হয়ে উঠেছে। এই গণবাক প্রয়োগের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অন্য এক পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে। আমার মতে উত্তেজনা ও প্রলোভনের কারণে মনুষ্যদেহের ক্ষরিত অনুপকারী হরমন ধমনীর মধ্যমে প্রবাহিত হয়ে মানুষের মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম স্নায়ু সাময়িক ভাবে স্তিমিত বা ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই অবস্থায় ঐ সূক্ষ্মস্নায়ুর আধার-ভূত প্রতিরোধ শক্তিসমূহও সাময়িকভাবে অপসারিত হওয়ায় তৎনিম্নস্থিত স্থূলবৃত্তিসমূহ বিনা বাধায় মনের উপরিভাগে এসে মানুষের ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে থাকে। এইক্ষেত্রে প্রতিরোধ শক্তির অবসান ঘটায় যে সকল কার্য্য করতে মানুষ ভয় পেত বা লজ্জা পেত, তা তারা নির্ব্বিবাদে বলে ফেলেছে বা করে ফেলেছে। এইরূপ দলীয় মনোবৃত্তি প্রখরতম হলে উহা ক্রাউড্ হতে আরও ভয়ঙ্কর মব্-এ পরিণত হয়ে গিয়ে থাকে। এই অবস্থায় খুন জখম, অগ্নিপ্রদান প্রভৃতি বহু সাংঘাতিক অপরাধও

তারা অকুণ্ঠচিত্তে করে যেতে পারে। এইক্ষেত্রে এদের পৃথক ব্যক্তিত্বসুলভ দায়িত্ববোধের অভাবে এরা ব্যক্তিগত পছন্দাপছন্দে বহির্ভূত বহু কার্য্য অনায়াসে সমাধা করে। এই সমষ্টি ও ব্যষ্টিবোধের মধ্যে দল ও সঙ্ঘের স্বরূপ অনুযায়ী যৌথ-ব্যক্তিত্বের তারতম্য ঘটে। এই ব্যষ্টি-ব্যক্তিত্ব এবং যৌথ-ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। যৌথ ব্যক্তিদের প্রকারভেদে আমি নিম্নোক্ত তালিকাটি তৈরী করে নিয়েছি। উহাদের যথাক্রমে বলা যেতে পারে, যথা (১) ক্লাব-টাইপ্ (২) য়ুনিয়ন টাইপ (৩) সাম্প্রদায়িক (৪) সামাজিক এবং (৫) জাতিবোধাত্মক। প্রতিটি শ্রেণীর যৌথব্যক্তিত্ব ব্যষ্টিব্যক্তিত্বের হ্রাসের পরিমাপ অনুযায়ী নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে। এইজন্য উহাদের একটি শ্রেণী অপর একটি অপেক্ষা স্বভাবতঃই শক্তিশালী হয়ে থাকে। এই প্রকারের প্রতিটি যৌথ ব্যক্তিত্বকে সমাজবদ্ধ মানুষের স্বাভাবিক মনের সন্ততি বলবো। কিন্তু উহাদের উত্তেজনাপ্রসূত অস্বাভাবিকতা প্রথমে উহাদের স্বল্প ক্ষতিকর ভীড় ভাড়ে (Crowd) এবং আরও পরে অধিকতর উত্তেজনাতে জনতাতে (Mob) পরিণত হয়ে গিয়ে থাকে।

বহুমুখী উদ্যোগশিল্পসমূহ সুষ্টুভাবে পরিচালিত করতে হলে প্রতিটি ব্যক্তির পৃথক ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণরূপে কার্য্যকরী করলে ক্ষতিকর হয়ে থাকে। এই সকল যৌথ উদ্যোগে মালিক ও শ্রমিক এই উভয় কুলেই স্বকীয় ব্যক্তিত্বের কিছু কিছু যৌথ স্বার্থ ত্যাগ করা উচিত হবে। এখন স্বকীয় ব্যক্তিত্বের কতোখানি সামগ্রিক স্বার্থে ত্যাগ করা উচিত তাহা বিবেচ্য। আমার মতে মালিক ও শ্রমিককুলের মাত্র কমিউনিটি টাইপ [সমাজ] যৌথ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া উচিত। কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে স্বল্প হতেই ধীরে ধীরে 'বিস্তারের' সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই যৌথবোধ তথা যৌথ দায়িত্বে অভ্যস্ত করতে হলে ক্লাবটাইপ যৌথ ব্যক্তিত্ব হতে সুরু করা উচিত হবে। এইভাবে এদের সুস্থ দায়িত্ববোধের বৃদ্ধি ঘটিয়ে এদের মধ্যে সামাজিক চেতনার আবির্ভাব ঘটানো সম্ভব হবে। এই জন্যে আমি প্রতিটি উদ্যোগশিল্পের শ্রমিকদের স্বকীয় কর্তৃত্বাধীনে বিবিধ সৎপ্রতিষ্ঠান সৃষ্টির আমি পক্ষপাতী। শ্রমিকদের মধ্যে এইবিশেষ মনোভাবে অভাবের দেখা যায়। এই কারণে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের যৌথ ইচ্ছার বদলে ব্যক্তিগত ইচ্ছায় পরিচালিত হয়ে থাকে। এই অবস্থায় শ্রমিকরা এতো অসহায় হয়ে উঠে যে তারা অনিচ্ছা স্বত্বেও নেতাদের অন্যায় নির্দ্দেশ মেনে চলতে বাধ্য হয়ে থাকে। শ্রমিকদের মধ্যে সাধারণতঃ আমরা ক্রাউড টাইপ যৌথ ব্যক্তিত্ব দেখে থাকি।

এই ক্রাউড্ টাপড্ যৌথ দায়িত্বে দেখা যায় যে নিতান্ত সংখ্যালঘু লড়ায়ে মনোবৃত্তিসম্পন্ন দল দলবদ্ধ হয়ে অক্ষম সংখ্যাগুরু শ্রমিকদের ভীতি প্রদর্শন দ্বারা স্বমতে আনয়ন করে থাকে। উদ্যোগশিল্পসমূহে এইরূপ ক্ষতিকর পরিস্থিতি কল্পনাও করা যায় না। শ্রমিকদের মধ্যে এক-মাত্র কমিউনিটি [সামাজিক] টাইপড্ যৌথ দায়িত্বই শ্রমিক মালিক উভয়ের মঙ্গলসাধন করতে সক্ষম। এই জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি মাত্র এই সামাজিক যৌথ-দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই।

প্রতিটি সামাজিক যৌথ ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি পরম্পরাগত (Continuity) ঐতিহ্য বর্ত্তমান থাকে। এই অবস্থায় দল বা গোষ্ঠী বিশেষের প্রতিটি সদস্য একটি গোষ্ঠীয় মনোভাবের সৃষ্টি করে ঐ গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার জন্যে গর্ব্ব অনুভব করে থাকে। এই দলগত গর্ব্ব দুইটি বিশেষ ধারায় প্রবাহিত হয়ে থাকে, যথা (১) নৈতিক গর্ব্ব ও (২) বস্তুগত গর্ব্ব। তাদের সৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রীর উৎকর্ষতা ও সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে যখন তারা গর্ব্ব অনুভব করে—তখন উহাদের বলা হয়ে থাকে বস্তুগত গর্ব্ব এবং যখন তারা তাদের দলগত নৈতিক মান ও অন্যান্য শক্তিমত্তা সম্বন্ধে গর্ব্ব অনুভব করে তখন উহাকে আমরা নৈতিক গর্ব্ব বলে থাকি। এই সামাজিক যৌথ-বোধ নিম্নোক্ত কয়েকটি উপায়ে সৃষ্টি করা যেতে পারে। প্রথমতঃ একটি নির্দ্দিষ্টসংখ্যক শ্রমিকদের বেছে উপযুক্ত পরিবেশে ও কর্ম্মে তাদের দলবদ্ধ হবার সুযোগ দিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ তাদের দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর একত্রে কর্ম্ম করার সুযোগ দিতে হবে। তৃতীয়তঃ লক্ষ্য রাখতে হবে যে কৃষ্টিগত সমাজবোধের অভাবে এদের পারস্পারিক সহযোগিতা ক্ষুণ্ণ না হয়ে বর্দ্ধিত হচ্ছে। চতুর্থতঃ এই জন্য এই শ্রমিকদল বাছবার সময় সমরুচি ও সমানবোধসম্পন্ন মানুষদের মাত্র একত্রিত করতে হবে।

অন্যথায় ঐতিহ্যবাহী দায়িত্ববোধশীল যৌথ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করা সম্ভব হতে পারে না। এই সম্পর্কে শ্রমিক ভক্তিপন্থা শীর্ষক নিবন্ধে আমি বিশদরূপে আলোচনা করবো, এই ভাবে একটি যৌথব্যক্তিত্বসম্পন্ন গোষ্ঠী সৃষ্টি করার পর উহাদের আরও দুইটি বিশেষ গুণে ভূষিত হবার সুযোগ দিতে হবে। নচেৎ এইভাবে সৃষ্ট গোষ্ঠী কর্তৃপক্ষের সহায়ক না হয়ে উহাদের বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। এই দুইটি বিশেষ গুণকে যথাক্রমে বলা যেতে পারে, (১) মালিকানা-বোধ এবং দায়িত্ব-বোধ। দৈনিক, সাপ্তাহিক মাসিক বা বাৎসরিক মুনাফার কিছু অংশ বেতন-ভুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করলে প্রতিষ্ঠান বিশেষের উপর একটি মালিকানা-বোধ এনে দেয়। কর্ম্মরত শ্রমিকদের পুত্রাদি ও নিকটাত্মীয়দের কর্ম্মসংস্থান অগ্রাধিকার এই মালিকানা-বোধ আরও শক্তিশালী করে, সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠান বিশেষের উপর উহাদের দরদী করে তুলে। এই মালিকানা-বোধ সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার দায়িত্ব-বোধ সম্বন্ধে বলা যাক্। প্রতিষ্ঠানসমূহে মালিক-শ্রমিকের সমবেত ওয়ার্কস্ কমিটীসমূহে এই দায়িত্ব-বোধের শিক্ষার সূচনা করা যেতে পারে। এরপর এদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতিষ্ঠান পরিচালক সমিতিতে গ্রহণ করলে এদের মধ্যে প্রকৃত দায়িত্ব-বোধ এমনিতেই এসে যাবে। বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এই প্রথা চালু হলেও ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এই ব্যবস্থার সৃষ্টি এখনও করা হয় নি। আমার নিজস্ব ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে এই সুব্যবস্থার প্রচলন করে আমি দেখেছি যে এতে উৎপাদনের হার বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়ে গিয়েছে।

আমি একদিকে কয়টি বৃহৎ শিল্পে সংযুক্ত যেমন থেকেছি, তেমনি একটি ক্ষুদ্রশিল্পের মালিকরূপে উহা গড়ে তুলেছি। এই উভয় শিল্পের কর্মীদের মনস্তত্ত্ব অবলোকন করে আমি মনে করি যে আমি নির্ভুলরূপে উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হতে পেরেছি।

এইখানে শ্রমিক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অপর একটি বিশেষ দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত হবে। এই বিশেষ দিকটা বুঝাতে হলে কৃষক ও শ্রমিক'দের' নিজস্ব মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এদেশে প্রত্যেক কৃষককে দিনমজুর বলা যায় না। এদের অনেকেরই অন্ততঃ দুই এক বিঘা বা একর নিজস্ব জমি আছে, এই সকল কৃষকদের মধ্যে এই জমী সম্পর্কীয় মালিকানা বোধ থাকতে তারা খুশীমনে জমীদারকে খাজনা প্রদান করেছে এবং তাদের স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ না করলে এরা আক্রমণাত্মক স্বভাবের পরিচয় দেয় নি। এমন কি অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির জন্যে ফসল না ফললে তারা এ জন্য মাত্র নিজেদের ভাগ্যকে দায়ী করেছে। কোনও অবস্থাতেই তারা এ জন্য জমিদার বা সরকারকে দায়ী করে নি। এদের পারিবারিক শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকায় এরা স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকতে পেরেছে। কিন্তু শ্রমিকগণ তাদের পরিবারবর্গ হতে দূরে বাস করতে বাধ্য হওয়ায় নৈতিক চরিত্রে পঙ্কিলতা এনেছে। কঠোর পরিশ্রমের পর বাটী ফিরে তারা কোনও সান্ত্বনা না পেয়ে তাদের মন বিষিয়ে উঠেছে, উপরন্তু কৃষকদের ন্যায় তাদের পরিশ্রমের ফল নিজেরা ভোগ করতে পারে নি। তাদের কষ্টার্জিত দ্রব্যাদি অপরের ভোগে লেগেছে। অজ্ঞতার জন্য মূলধনের পারিবারিক সুখসুবিধা ও উপকারিতা-সম্পর্কীয় কোনও জ্ঞান তাদের না থাকায় মালিকদের প্রতি তারা বিরূপ থেকেছে। এদের কেউ বুঝাতে চেষ্টা করে নি যে, মালিকের মূলধন এবং তদারকী কর্ম্মীর টেকনিক্যাল জ্ঞান না থাকলে এখানে তাদের রুজী-রোজগার করা সম্ভব হতো না। এই সব করলে কৃষকদের কোনও লড়ায়ে য়ুনিয়ন না থাকলেও তারা স্ব স্ব অবস্থাতে খুশী, কিন্তু শ্রমিকদের অভিযোগ মুখর য়ুনিয়ন থাকা সত্ত্বেও তারা অসুখী।

এতদ্ব্যতীত মনস্তাত্ত্বিক দিক্‌থেকে কৃষকরা ভূমি হতে শস্য অপহরণ করে থাকে। এইভাবে তাদের অবচেতন মন হতে বাড়তি স্পৃহা বহিষ্কৃত হয়ে তাদের সৎ ও সন্তুষ্ট রাখে, কিন্তু শ্রমিকদের সম্পর্কে ঠিক বিপরীত পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই জন্য কোনও বালকের মধ্যে অপস্পৃহা দেখা গেলে তাকে শ্রমশিল্পে নিযুক্ত করলে তার অপস্পৃহা প্রশমিত না হয়ে আরও বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু তাকে গ্রাম্য পরিবেশে এনে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করলে তার এই স্বভাব-অপস্পৃহা পুনরায় অন্তঃমুখী হয়ে তাকে নিরপরাধীতে পরিণত করেছে। গত মহাযুদ্ধের সময় বাংলায় দুর্ভিক্ষ হলে এই কৃষককুল শহরে এসে মিষ্টির দোকানের তলায় শুয়ে অনাহারে মৃত্যু বরণ করলেও ঐ

সকল দোকান লুঠ করে খাদ্যসংগ্রহের চিন্তামাত্রও করে নি। কিন্তু ঐ সময় যুদ্ধের জয়লাভার্থে সরকার বাহাদুর শ্রমিক-শ্রেণীর জন্য খাদ্য-রেশন প্রথার প্রবর্ত্তন করে তাদের মধ্যে খাদ্যাভাব ঘটতে দেয়নি। আমার বিশ্বাস এদের মধ্যে খাদ্যাভাব ঘটলে এরা নিশ্চয় কৃষকদের মত নীরবে মৃত্যু-বরণ না করে এ সকল দোকানপাট লুঠ করে নিজেদের জন্যে খাদ্যসংগ্রহ করতো! এই ভাবে আমরা দেখতে পাবো যে কয়েকটি কারণে কৃষককুল অপেক্ষা শ্রমিকদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতার আধিক্য দেখা গিয়েছে। এইরূপ অবস্থায় সামান্যমাত্র বাহিরের প্ররোচনা এই শ্রমিক—মালিকের স্বাভাবিক মধুর সম্পর্ক বিনষ্ট করে দিতে সক্ষম। এই জন্য কৃত্রিম উপায়ে যথাসম্ভব এদের জন্য কৃষককুলের মত সুপরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত হবে। অধুনা কালের কুলিলাইনগুলি তাদের পঙ্কিল পরিবেশের জন্য আশানুযায়ী ফল প্রদান করতে পারে নি। আমার মতে কুলি লাইনের বদলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকটে শ্রমিক গ্রাম সৃষ্টি করে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। ছোট ছোট বাগিচা পরিবৃত কুটীরে সপরিবারে বাস করতে পারলে শ্রমিকরা স্বভাবতঃই ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ হয়ে উঠবে।

(ক্রমশঃ)

প্রতিহত

এলেন বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার উছলি' ওঠে এই দেহ মন :
রক্তিম ফাগুন যেন অশান্ত উল্লাস
সুরার গোলাপী নেশা ফেনিল যেমন
বারে বারে নিয়ে যায় সাকীর সকাশ।

তুমি ত দেখনা ফিরে, ফিরাইয়া দাও ;
নিষ্ঠুর কঠিন প্রাণ মর্ম্মরে স্থবির।
আমি যেন ছেঁড়া মেঘ শরতে উধাও,
আবার আষাঢ়ে আসি সজলে অধীর।

এই এত আসা-যাওয়া, এই পদক্ষেপ
হৃদয় বালুকা-তটে জলরেখা মত
বারে বারে মুছে দিয়ে উদাসীন তুমি।
অশান্ত ঢেউয়ের মত আমার আক্ষেপ
তোমার পাষাণ বুকে হয়ে প্রতিহত
কামনা-সমুদ্রতলে খুঁজে ফেরে ভূমি।

এ' জীবন

গৌরী দে

জীবন দিয়েছি তাকে আমি—
পছন্দ বা অপছন্দ অবান্তর কথা
আমি শুধু এইটুকু বলি,
ছবি আঁকে যেই রঙ তুলি
সে কি জানে আঁকিয়ের অন্তরের ব্যথা ?

তাই আমি রঙ কিংবা তুলি হয়ে বলি,
আমি যদি বাঁকা কিংবা সোজা পথে চলি,
তার সব দোষ গুণ তারই
আমি আর কি করতে পারি ?

স্নিগ্ধ সেই শিশুকাল, অথবা যৌবন জ্বালাময়—
নিদ্রাহর রাত্রির বঞ্চনা
এ সবই কালের গর্ভে ফেলে
আমি শুধু আশা দীপ জ্বেলে
চেয়ে থাকি তারই প্রতীক্ষায়
সে আমাকে হাসায়, কাঁদায়, এ' জীবনময়।

গ্রহ-পর্য্যালোচনা
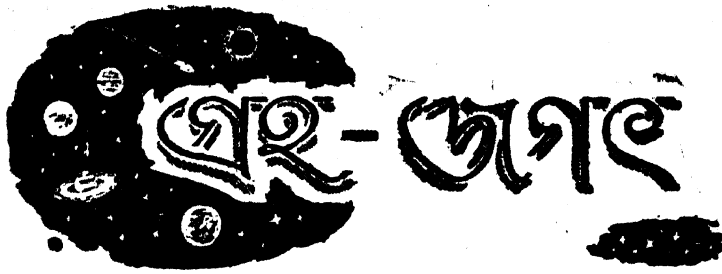
উপাধ্যায়

রবি ও চন্দ্র একত্র থাকলে জাতক স্ত্রৈণ, ক্রিয়ানিপুণ বিনীত যুবতীদের বশীভূত, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন এবং আসব-দ্রব্যাদি বিক্রয়কুশলী হয়। রবি ও মঙ্গল একত্র থাকলে জাতক তেজস্বী, সাহসী, মূর্খ, মিথ্যাবাদী, বধনিষ্ঠ ও পাপী হয়। রবি ও বুধ একত্র থাকলে জাতক বিদ্যারূপবলান্বিত, স্থিরমতি, সেবা হৃদয় ও যশস্বী এবং তার কথাবার্ত্তা মনোজ্ঞ হয়। রবি ও বৃহস্পতি একত্র থাকলে জাতক শ্রদ্ধাভাজন কর্ম্মতৎপর, নৃপপ্রিয়, ধনী, ধার্মিক, রাজমন্ত্রী এবং সমৃদ্ধিমান ব্যক্তি হয়। রবি শুক্র একত্র থাকলে শাস্ত্রপ্রহরণকুশলী শক্তিযুক্ত, চপল ও নেত্রদুর্ব্বল। স্ত্রীলোকের সঙ্গলাভের আনুকূল্যে বন্ধুলাভ এবং প্রাজ্ঞ হয়। রবি ও শনি একত্র থাকলে নিজবংশ-গুণ ও মর্য্যাদালাভ হয়। স্ত্রীপুত্রহানি, স্বকর্ম্মনিরত, ধাতুজ্ঞ, ও ধর্ম্মময় হয়। রবি উত্তম হোলে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হয়। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, সেরিফ, মেয়র, নগরপাল, উচ্চরাজকর্ম্মচারী, বীর ও চিকিৎসক হোতে পারে। পদ-বৃদ্ধি, যশোলাভ ও উন্নতি হয়। রবি অশুভ হোলে চক্ষুরোগ, হৃদ্‌রোগ, মস্তিষ্কের রোগ, রক্তঘটিত রোগ, দাহক জ্বর সর্দ্দিগর্মি, পৈত্তিক জ্বর, শিরঃপীড়া ও মহামারী ইত্যাদি ব্যাধিতে জাতক আক্রান্ত হোতে পারে। রবির শুভ সংখ্যা (Lucky number)—১

চন্দ্রগ্রহ যে বড় বড় জাহাজের সমুদ্রে বিপত্তির কারণ ঘটিয়েছে তা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। ষোড়শী থেকে বিংশবর্ষীয়া যুবতীর ওপর চন্দ্রের প্রভাব বেশী। চন্দ্র জন্মকুণ্ডলীতে উত্তম হোলে ক্রয়বিক্রয়ে বস্ত্রের ব্যবসায় ও কৃষিকার্য্যে বিশেষ অর্থাগম হয়। নৃপপ্রসাদলাভ, ভ্রমণ ও জলযাত্রা ঘটে। বিবাহ ব্যাপার চন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। চন্দ্রের সঙ্গে মঙ্গলের যোগ হোলে জাতক শূর, রণপ্রতাপী, সংকুলধর্ম্মবিত্তগুণবান, মৃৎচর্ম্ম ধাতু-শিল্পী ও কূটজ্ঞ হয়। চন্দ্রের সঙ্গে বুধের যোগাযোগ হোলে জাতক বিশিষ্টগুণসম্পন্ন সুদর্শন, স্মিতবদন কাব্যকথা-শিল্পে নিপুণ, ধনবান ও শাস্ত্রপরায়ণ হয়। চন্দ্রের সঙ্গে বৃহস্পতি থাকলে জাতক বিনীত, শুভশীল, সুবুদ্ধিসম্পন্ন, বিদ্যারত, সম্মানিত ও বিত্তবান হয়। চন্দ্রের সঙ্গে শুক্রের যোগ হোলে জাতক ক্রয়বিক্রয়কুশলী, পাপাত্মা ও ভোগবিলাসী হয়। চন্দ্রের সঙ্গে শনির যোগাযোগ হোলে জাতক পরাত্মজ, কুস্ত্রীযুক্ত, পিতৃদ্বেষী, অর্থাভাব-গ্রস্ত মলিন বসনভূষণ প্রভৃতি দেখা যায়। চন্দ্রের শুভ সংখ্যা (lucky number)—২, ৭ চন্দ্র অশুভ হোলে পালাজ্বর, গলগণ্ড, গলরোগ, সর্দ্দি, জলোদরী, দলদোষ, হাঁপানি, বক্ষরোগ, মূত্রাতিসার, যক্ষ্মা, গলা, বক্ষস্থল, বাম-চক্ষু, কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে রোগাধিকার ঘটে। রক্তসার রোগেও আক্রান্ত হয়।

মঙ্গলের ক্ষেত্রে বা প্রভাবে যে সব নারী জন্মগ্রহণ করে, তারা সংগঠননিপুণা, উত্তম শিল্পী, উত্তম স্ত্রী ও উপ-সেবিকা এবং সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে লড়ে জয়ী হোতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় মঙ্গলের মহাশক্তি প্রকাশ পেয়েছিল। যার জন্মকুণ্ডলীতে মঙ্গল

নষ্টবলী অথবা দুঃস্থানগত বা অন্য প্রকারে দুর্ব্বল সে ব্যক্তি অত্যন্ত অলস, ভীরুস্বভাব, হীনমতি, নিষ্ঠুর ও পশুপ্রকৃতি সম্পন্ন একটু লক্ষ্য করলেই বেশ বুঝতে পারা যাবে। যার জন্মকুণ্ডলীতে মঙ্গল প্রবল, তার ভালোমন্দ করবার শক্তি অসীম। কোন ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ হোলে সে ব্যক্তিকে সে কখন ভোলেনা, আর তার অনিষ্ট করতেও ছাড়েনা। মেষ ও ধনু উভয় রাশিই অগ্নিরাশি এবং অত্যন্ত স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়।

কার্টার বলেছেন—hiery signs are usually the most explosive.

রবি ও মঙ্গল একত্র থাকলে জাতক তেজস্বী, মিথ্যাবাদী, বলসংযুক্ত ও পাপী হয়।

চন্দ্র ও মঙ্গল একত্র থাকলে জাতক শূর, সংকুলজাত ও ধর্ম্মবিত্ত গুণবান হয়।

বুধ ও মঙ্গলের একত্র সংযোগে জাতক বাগ্মী, শিল্পী শাস্ত্র কুশলী ও সৌম্য হয়।

বৃহস্পতি ও মঙ্গলের যোগাযোগে জাতক কামী পূজ্য গুণান্বিত ও গণিতজ্ঞ হয়।

শুক্র ও মঙ্গলের সংযোগে জাতক ধাতুবাদী প্রপঞ্চরসিক ও ধূর্ত্ত হয়।

শনি ও মঙ্গলের সংযোগে জাতক জড়মতি, বাগ্মী ও গানবাজনাপ্রিয় হয়। মঙ্গলের অশুভ সংযোগে হাম, বসন্ত, উৎকট জ্বর, ক্ষতব্রণ, রক্ত আমাশয়, অর্শ, কলেরা। দদ্রু ও নানাপ্রকার রক্তদোষজনিত পীড়া হয়।

মঙ্গলের শুভ সংখ্যা ৪

সর্ব্বার্থ চিন্তামণি গ্রন্থে বলা হয়েছে—

'সঙ্গীত সাহিত্য হাস্যরসাদ্ভুত মদন যুবতি রতি
কেলি বিলাস
বিচিত্র চিত্রকান্তি সৌন্দর্য্য যুবতি রাজ বশীকরণ
রাজমুখ…
অণিমাদ্যৈশ্বর্য্য কাব্যকলা সম ভোগ কলত্র কারক:
শুক্রঃ।'

মেজর সি, জে, এডাম বলেছেন—

'The planet venus is sometimes called the planet of Love and Beauty, but this love, must not be confused with ordinary love or affection ; it is indeed the love aspect of thc deity known as iove, intellect or creative activity.

যার জন্মকুণ্ডলীতে শুক্র শুভ, তার পক্ষে বিজ্ঞান-বিদ্যালাভ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। এই শুক্রের আনুকূল্যে উর্দ্ধরেতা হোতে পারলে অণিমা লঘিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি লাভ করে মানুষ সংসারে দেবতার স্থান অধিকার করতে পারে। শুক্র মন্ত্রীকারক ও যানবাহনকারক গ্রহ।

রবি ও শুক্র একত্র থাকলে জাতকের স্ত্রীলোক সম্পর্কে বহু ইয়ার জোটে, জাতক রঙ্গরসপটু, প্রাজ্ঞ, মানী, চপল, দুর্ব্বলদৃষ্টিসম্পন্ন ও বলবান হয়। চন্দ্র ও শুক্রের একত্র সমাবেশে জাতক কলহপ্রিয়, ক্রয়বিক্রয়কুশলী অতিভোজনপ্রিয়, উত্তমবসনপ্রিয় ও পাপাত্মা হয়। মঙ্গল ও শুক্র একত্র থাকলে জাতক পাটির নেতা ও পূজনীয়, ধূর্ত্ত, পরকীয়াসক্ত, শঠ, মিথ্যাবাদী, ও গণিতজ্ঞ হয়। বুধ ও শুক্র একত্র থাকলে জাতক গীতিজ্ঞ, মিষ্টভাষী, বিলাসী, বহু শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন, রাজনীতিবিশারদ ও অতিশয় ধনবান হয়। শুক্র অশুভ হোলে ধাতুঘটিত রোগ, বহুমূত্র, শুক্রতারল্য, ধ্বজভঙ্গ, বহুমূত্র, মেহ, উপদংশ, প্রদর শোষ প্রভৃতি আনে।

শুক্রের শুভ সংখ্যা ৬

বাগীশ বুধ জীবেষু—নির্ব্বিঘ্নো নাশকেষু চ। দ্বিতীয় পতি বুধ ও বৃহস্পতি দুঃস্থানগত, বা দুর্ব্বল হোলে মানুষ বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন হয়। চিন্তাশীলতা ও যুক্তি-তর্কের কারকগ্রহ বুধ। বোধের দ্বারা মননের দ্বারা এই বুধ মানুষকে বোধিসত্ত্ব করে। শনির সঙ্গে বুধের শুভ সম্বন্ধ হোলে জাতক জড়বিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী হয়। লগ্নগত অথবা দশমগত বুধ বিশেষরূপে বক্তৃতা শক্তি প্রদান করে আর সৎসাহিত্যের স্রষ্টা করে তোলে জাতককে। মঙ্গল অথবা হার্শেল বুধকে পীড়িত করলে জাতকের স্নায়বিক উত্তেজনা এবং বধিরতা ঘটে। বুধের সঙ্গে নেপচুনের শুভ সংযোগে মানুষের অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বা দর্শন লাভ হয়। জন্মকুণ্ডলীতে ষষ্ঠস্থানে বুধ পাপপীড়িত হোলে মানুষের আত্মহত্যার দিকে ঝোঁক হয়। কার্টার সাহেবের মতে 'A prominent Saturn afflicting Mercury will often tend to destray Conversational

power' কোষ্ঠীতে বুধ অশুভ হোলে জাতক মিথ্যাবাদী, শঠ, ধূর্ত্ত, প্রতারক, ঘুষখোর, চোর, বাচাল, উন্মাদ ও ভাঁড় হয়। ত্বক পাণি ও জিহ্বার রোগাধিকার ঘটে। শিরঃপীড়া, মৃগীরোগ, জিহ্বারোগ, শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, মস্তিষ্কবিকৃতি, মূকতা, স্মৃতিহীনতা, বমনরোগ, অস্ফুট বাক্য প্রভৃতি ব্যাধির প্রভাব দেখা যায়।

বুধের শুভ সংখ্যা—(Lucky number) ৫

বৃহস্পতি জ্ঞান ও ধর্ম্মকারক। জ্ঞানই আধ্যাত্মিক তেজঃ—আলোক। বিজ্ঞানাত্মাই ব্রহ্ম। সাধনা বলে জ্ঞানের যত বৃদ্ধি হয়, 'রবি' তত অভিভূত হয়। বৃহস্পতির অনুকম্পা না হোলে বিজ্ঞতা এবং প্রকৃত ধর্ম্মভাব লাভ করা যায় না। বৃহস্পতির আনুকূল্যে মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক. ডাক্তার, জজ, আইনজ্ঞ, ব্যবস্থাপক, ধর্ম্মযাজক, ব্যাঙ্কার, গুরু, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, প্রভৃতি হয়। বৃহস্পতি ও শনির যোগে জাতক শূর, সমৃদ্ধিশালী, নগরের অধিপতি, যশস্বী এবং শ্রেণীবিশেষের সভা বা গ্রামের প্রধান হয়। বৃহস্পতি অশুভ হোলে জাতক ভণ্ড, অতিশয় অভিমানী, অপরিমিত ব্যয়ী ও কপটাচারী হয়। শ্বাসযন্ত্রের রোগ, তালু রোগ, বমন, উদরাময়, হাঁপানি, গুল্ম রোগ, যকৃতের দোষ, মেদ বৃদ্ধি, ন্যাবা প্রভৃতি ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

বৃহস্পতির শুভ সংখ্যা (Lucky number)—৩

জ্যাডকিল তাঁর Handbook of Astrologyতে বলেছেন যে, মঙ্গলের ক্রিয়া যেন ঠিক প্রচণ্ড জ্বরের মত তীব্র কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। শনির আক্রমণ ঠিক ক্ষয়রোগের মত অতি মন্থরগতি কিন্তু মানুষের শত চেষ্টায়ও তা নিবারিত হয়না। তুলা, মকর, কুম্ভ ভিন্ন অন্ত রাশিতে লগ্ন হোলে আর সেখানে শনি থাকলে, জাতকের জীবনে নানা দুর্ঘটনা ঘটে, পতন, আঘাত, বাত, পঙ্গু'তা শ্লেষ্মাজনিত পীড়ায় মানুষ বহু দুঃখকষ্ট পায়। অসাবধানতা, অমনোযোগিতা, ঔদাসীন্য, শঠতা, কালক্ষেপ হেতু অকৃতকার্য্য হওয়া প্রভৃতি দুর্ব্বল অথবা অশুভ শনির ফল। শনিই মানুষকে যানচালক, দাসদাসী, বৃদ্ধ, কৃষক, ব্যাধ, খল, অবরুদ্ধ ব্যক্তি, তস্কর, বাতুল, যোগী ও বিধবা করে। শনি বিরূপ হোলে শূলরোগ বাত, কৃমি, যক্ষ্মা, পক্ষাঘাত, শরীর কম্পন, বধিরতা, প্লীহা ও শ্বাস রোগ হয়। শনি দূর ভ্রমণ কারক।

রাহুর দশায় জাতকের দেহে ও মনে মলিনতা, অশুচি এবং সৌন্দর্য্য ও মধুরতার অভাব—আর রুচি বিকার দেখা যায়। বৃহস্পতি যদি রাহুদৃষ্ট বা যুক্ত হয়, তা হোলে বৃহস্পতির প্রভাবও নষ্ট হয়ে যায় অথচ রাহু ও বিশেষ উন্নত হয় না। ধনভাবগত রাহু তুঙ্গাদি গুণযুক্ত হোলেও দেখা যায় সে বহু অর্থদাতা হয়, কিন্তু একটা পয়সাও জাতকের সঞ্চিত হোতে দেয়না। যখন অর্থ দেয়, প্রচুর পরিমাণে দেয়—তারপর সব কেড়ে নিয়ে যায়। রাহু জায়াভাব গত হোলে বহুরমণী সংসর্গ হয়, কিন্তু নারীর গুণগুলি দেখবার অবকাশ হয় না, বরং প্রত্যেকের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে মানুষ বিদ্বেষী হয়। কর্ম্মস্থানগত রাহু মানুষকে উচ্চপদ, প্রচুর ধন, সর্ব্বকর্ম্মে সিদ্ধি প্রভৃতি দিলেও জাতককে এক কর্ম্মে স্থির থাকতে দেয় না। অষ্টমে চন্দ্ররাহু থাকলে মস্তকচ্ছেদ হয়, দ্বাদশে রাহু থাকলে অঙ্গহানি হয়।

শুভ ফলদাতা রাহু দশা ভোগকালে বিবিধ সুখ, স্ত্রী পুত্র ধন ধান্যাদি সম্পদলাভ, নূতন গৃহ নির্ম্মাণ, পুণ্য তীর্থাদি পর্য্যটন, বিদেশে রাজসম্মান, দেশাধিপত্য, পুরাণাদি শ্রবণ প্রভৃতি ফল সাধারণতঃ আশা করা যায়। অশুভ স্থানাদি গত হোলে বিষজ পীড়া, প্রমেহ, ক্ষয়, গুল্ম পিত্ত রোগ, ত্বক দোষ, অস্ত্রাঘাত, চৌরাগ্নিরাজভয়, গুরু বন্ধু স্ত্রী পুত্র নাশ, বিদেশ গমন, বুদ্ধিনাশ সর্পভীতি, ক্ষেত্রার্থ নাশ কুভোজন, দেহের কৃশত্ব, কুপুত্রলাভ, কর্ম্মহানি প্রভৃতি কুফল দেয়। শুভকেতুর দশা ভোগ কালে ম্লেচ্ছ ও ভূম্যধিকারীদের কাছ থেকে লব্ধ ভাগ্য, রাজার অনুগ্রহলাভ, দেশাধিপত্য, পুত্রদার সৌখ্য, দেশান্তরে গমন, দুঃখ ভোগ, শত্রুক্ষয়, বিজয় ইত্যাদি ফললাভ হয়। অশুভ হোলে মহৎ কষ্ট, জ্বর কম্পন, বন্ধুনাশ স্থানচ্যুতি, মনোভঙ্গ, নানা রোগ ভোগ, যানাদি হতে পতন ও বিপত্তি, কলহ, শস্ত্রাঘাত, বিষজ পীড়া, বিসূচিকা ইত্যাদি। রাজকোপ, বিফলক্রিয়া, সুত দারার্থনাশ, কুৎসিত ভোজন, বুদ্ধিনাশ, মানহানি প্রভৃতি বহুবিধ অনিষ্ট ফল ঘটে। কেতুযুক্ত বুধ বাক্যস্ফুরণে বাধা আনে।

কোষ্ঠী বিচারের সময় গ্রহদের অবস্থান ভেদে ফলগুলি দেখার আবশ্যকতা আছে। অনেকে বলেন, ভাবাধিপতি গ্রহ স্বক্ষেত্র থেকে সপ্তমে এলেও নীচস্থ গ্রহের মত

ভাব ফল বিষয়ে ঝঞ্ঝাট আনে। কোনও ভাব পাপমধ্যগত হোলেও সেই ভাবের শুভ ফলের হ্রাস হয়। কখন কখন দেখা যায় যে বিচার্য ভাবের সপ্তমস্থান পাপ মধ্য গত হোলেও ভাবের অনিষ্ট হয়ে থাকে। ফল বিচারের সময় এ গুলিও লক্ষ্য করা উচিত।

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফল

মেষ রাশি

ভরণী জাত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম। অশ্বিনী জাতগণের পক্ষে মধ্যম। কৃত্তিকা নক্ষত্রাশ্রিতগণের অধম সময়। মোটামুটি শরীর ভালোই যাবে। সন্তানাদির পীড়া। পারিবারিক শান্তি। প্রথমার্দ্ধে কলহাদির সম্ভাবনা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে এরূপ অবস্থা থাকবে না। বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি লাভ। প্রিয়বন্ধু সমাগম। মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠান। ধনভাব শুভ, কিন্তু কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল। আয়বৃদ্ধি ও সাফল্য হোলেও ব্যয় বৃদ্ধির জন্য অর্থের চাপ আসতে পারে। এমনকি পাওনাদারের তাড়নায় বিব্রত হবার সম্ভাবনা। এটি প্রথমার্দ্ধে ঘটতে পারে। স্পেকুলেশন চলবেনা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে একই ভাব যাবে। যাদের জন্মকুণ্ডলীতে দশান্তর্দশা প্রতিকূল, তাদের বিষয় সম্পত্তি হানি বা বিক্রয় হোতে পারে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটী সুপ্রসন্ন। চাকুরিপ্রার্থীরও সাফল্য লাভ। কোন কোন ক্ষেত্রে পদোন্নতি ও আশাতীত সাফল্য। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে সময়টা সমভাবে যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী অনুকূল। পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যোগদান। বিদ্যাচর্চ্চার দিকে মনোনিবেশ। সর্ব্বতোভাবে আনন্দপ্রদ মাস। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষ রাশি

রোহিণীজাতগণের পক্ষে উত্তম। কৃত্তিকা ও মৃগশিরা জাতগণের পক্ষে মধ্যম। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। সন্তানদের পীড়ার সম্ভাবনা। পরিবার বর্গের শারীরিক কষ্ট ভোগ। পারিবারিক শান্তি ঐক্য ও শৃঙ্খলতা। স্বজন ও বন্ধুবর্গের সহিত সামান্য কলহাদি। আর্থিক অবস্থা উল্লেখযোগ্য নয়, তবে নানা প্রকারে লাভ ও আর্থিক স্বচ্ছন্দতার যোগ আছে। শেষার্দ্ধে আর্থিক চাপ আসতে পারে। স্পেকুলেশনে সাংঘাতিক ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়। টাকাকড়ি লেনদেন, বিষয় সম্পত্তি ক্রয়, লগ্নী কার্য্য, জমিজমা বিক্রয় প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। পদোন্নতি বা নূতন পদমর্য্যাদা লাভ সূচিত হয়। কর্ম্মপ্রার্থীর সুযোগ ও সাফল্য। ব্যবসায়ীও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী উল্লেখ যোগ্য নয়, লভ্যাংশ আশানুরূপ নয়। স্ত্রীলোকের মাসের প্রথমার্দ্ধ প্রতিকূল ও নৈরাশ্য জনক। শেষার্দ্ধ অনুকূল ও আশাপ্রদ। সামাজিক, শিক্ষা, বৃত্তিও চাকুরির ক্ষেত্রে মাসটী সাফল্যজনক। বিদ্যার্থীর ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মিথুন রাশি

আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসুর পক্ষে উত্তম। মৃগশিরার পক্ষে অধম। উদর ও গুহ্য প্রদেশে পীড়া। সন্তানের পীড়া। পারিবারিক ঐক্য, শান্তি ও শৃঙ্খলা। আর্থিকক্ষেত্র সন্তোষজনক বলা যায় না। শেষার্দ্ধ কিছুটা আশাপ্রদ। বন্ধু দ্বারা প্রতারণা, অর্থক্ষতি প্রভৃতি সম্ভব। স্পেকুলেশন ও বিভিন্ন পরিকল্পনা বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। প্রথমার্দ্ধ চাকুরিজীবীর পক্ষে অনুকূল নয়। উপরওয়ালার সঙ্গে মতভেদজনিত অশান্তির সৃষ্টি। শেষার্দ্ধ উন্নতির পক্ষে অনুকূল। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে আশাপ্রদ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী শুভ ও আশাপ্রদ। কিন্তু শেষ দশদিন নৈরাশ্য ও দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে চলবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা ও নৈরাশ্যজনক।

কর্কট রাশি

পুষ্যাজাতগণের পক্ষে উত্তম। অশ্লেষার পক্ষে মধ্যম। পুনর্ব্বসুর পক্ষে অধম। উদর, হৃদয় অথবা ফুসফুস সংক্রান্ত পীড়া। চক্ষুপীড়া ও রক্তের চাপবৃদ্ধি যোগ আছে। পরিবার বহির্ভূত আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য। পারিবারিক সুখশান্তি অব্যাহত থাকবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীগণের পক্ষে মধ্যম।

মামলা মোকর্দ্দমার সম্ভাবনা। চাকুরিজীবীর পক্ষে বিশেষ ভালো বলা যায় না। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। সর্ব্ববিষয়ে সাফল্য। অনেকে সন্তানবতী হবে। ছায়া ছবি ও রঙ্গমঞ্চে যারা আছে তাদের পক্ষে উত্তম। চাকুরিজীবী ও বৃত্তিজীবী নারীও সাফল্য লাভ করবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

সিংহ রাশি

পূর্ব্বফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। মঘার পক্ষে মধ্যম। উত্তরফল্গুনীজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। তবে হজমের গোলমাল, ফুসফুস, বক্ষ প্রভৃতি সম্পর্কে সামান্য কষ্টভোগ। পারিবারিক ঐক্য ও শান্তি। আয়বৃদ্ধি যেরূপ হবে, ব্যয়ও হবে ততোধিক। প্রতারণাজনিত ক্ষতির সম্ভাবনা। ভ্রমণ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি একভাবেই যাবে। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ, তবে কিছু বাড়তি কাজ করতে হবে, দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য বেশী সময় খাটতে হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে প্রথমার্দ্ধ সন্তোষজনক নয়, শেষার্দ্ধ অপেক্ষাকৃত ভালো। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি অনুকূল। প্রথমার্দ্ধে মেলামেশা সম্পর্কে সতর্কতা আবশ্যক। ছায়াছবি ও মঞ্চে নিযুক্তা নারীর পক্ষে উত্তম। তাছাড়া যারা সখের বা পেশাদারী অভিনয় করে, তাদেরও সময় ভালো যাবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

কন্যারাশি

হস্তাজাতগণের পক্ষে উত্তম। উত্তরফল্গুনী ও চিত্রার পক্ষে মধ্যম। শারীরিক অবস্থা কিছু খারাপ যাবে। উদর, বক্ষ ও ফুসফুস সংক্রান্ত কষ্টভোগ। পিত্তাধিক্য। মারাত্মক পীড়ার ভয় নেই। ঘরে বাইরে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের সঙ্গে সম্প্রীতি। স্বজনবর্গের সঙ্গে সামান্য মতভেদজনিত চিত্তের বিক্ষোভ। প্রথমার্দ্ধ আর্থিক উত্তম, আকস্মিক অপ্রত্যাশিত অর্থাগমের সম্ভাবনা আছে। ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির সংস্পর্শে এজন্যই আসার দরকার। শেষার্দ্ধে অপরিমিত ব্যয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মন্দ নয়। আদালতে মামলা মোকদ্দমা রুজু হবার আগেই নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। মাসের প্রথমার্দ্ধ চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম, পদোন্নতি প্রভৃতির সম্ভাবনা। উপরওয়ালার প্রশংসা অর্জ্জন। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে একই ভাব। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। ভ্রমণাদি যোগ। ব্যবসায়ে বৃত্তিক্ষেত্রে বা চাকুরিতে যারা আছে, তাদের আর্থিক উন্নতি। স্বামীর কর্ম্মোন্নতি ও সম্মানবৃদ্ধি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

তুলা রাশি

স্বাতী ও বিশাখাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। চিত্রার পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। স্বাস্থ্য মোটের উপর ভালো যাবে। পারিবারিক সুখ শান্তি যোগ। পরিবার বর্হিভূত ব্যক্তিরা অশান্তি সৃষ্টি করবার চেষ্টা করবে। আর্থিক স্বচ্ছন্দতার সম্ভাবনা আছে। অর্থ এলেও ব্যয়াধিক্য ঘটবে। নানা দিক দিয়ে লাভের যোগ। উপঢৌকনাদি প্রাপ্তি হোতে পারে। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীদের পক্ষে অনুকূল। সম্পত্তিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। বন্ধকী কারবারের পক্ষে সুবিধাজনক পরিস্থিতি। চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। বহুদিনের আশাআকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে পদোন্নতি ঘটতে পারে। চাকুরীপ্রার্থীদেরও শুভযোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ শুভ সময়। জনপ্রিয়তা, খ্যাতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। ছায়াচিত্র ও মঞ্চাভিনেত্রীদের অতীব উত্তম সময়, নানা প্রতিষ্ঠান থেকে আসবে আহ্বান। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে আশাপ্রদ।

বৃশ্চিক রাশি

অনুরাধাজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম, জ্যেষ্ঠার পক্ষে মধ্যম আর বিশাখার পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। স্বাস্থ্য ভালো ও সন্তোষজনক হবে। এই মাস থেকে ব্যায়াম চর্চ্চা বা আসনাদি যৌগিক প্রক্রিয়া সুরু করলে শক্তিসঞ্চয়ের পক্ষে অনুকূল হবে। পারিবারিক আবহাওয়া অনুকূল। বিলাস-ব্যসন দ্রব্যাদিপ্রাপ্তি। আর্থিক ক্ষেত্র বিশেষ শুভ। বাড়ীওয়ালা কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটী উত্তম। চাকুরীর ক্ষেত্রেও উন্নতি সূচিত হয়। উপরওয়ালার অনুগ্রহ লাভ। বিদ্যার্জ্জনে উন্নতি ও সাফল্য। চাকুরিপ্রার্থীদের নিয়োগকর্ত্তার সহিত সাক্ষাতে কার্য্যসিদ্ধি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের অতীব উত্তম সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম সময়। কেউ কেউ সন্তানবতী, কারো বা সন্তান সম্ভাবনা। অবিবাহিতাদের বিবাহ প্রসঙ্গ। ছায়া চিত্র ও মঞ্চাভি-

নেত্রীদের পক্ষে মাসটী অতীব উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের সাফল্য।

ধনু রাশি

পূর্ব্বাষাঢ়াজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, মূলাজাতগণের পক্ষে মধ্যম, উত্তরাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য ভালো বলা যায় না। দুর্ব্বলতা, রক্তের চাপবৃদ্ধি, শারীরিক প্রদাহ। বিশেষ মারাত্মক পীড়ার সম্ভাবনা নেই। স্ত্রী ও সন্তানাদির কিছু দৈহিক কষ্ট। পারিবারিক শান্তি, ঐক্য ও শৃঙ্খলা অটুট থাকবে। কোন আত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি। আর্থিক অবস্থা একই প্রকার। কিছু কিছু প্রচেষ্টায় সিদ্ধিলাভ, কয়েকটি ব্যাপারে ক্ষতির ও আশঙ্কা। এক্ষেত্রে বড় কিছু ব্যাপার নিয়ে হস্তক্ষেপ না করাই ভালো। নিজেকেও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখাই উচিত। ব্যয়বৃদ্ধি এবং অর্থের চাপ। প্রতারণায় ক্ষতি। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী একভাবেই যাবে, চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটি প্রতিকূল। নানা প্রকার পরিস্থিতি হেতু অশান্তিও উদ্বেগ আর উপরওয়ালার বিরাগ-ভাজন হবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি মন্দ যাবেনা। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসের প্রথমার্দ্ধ নৈরাশ্যজনক। ছায়া ও মঞ্চাভিনেত্রীদের পক্ষে সুবিধা জনক নয়। মাসের শেষার্দ্ধে কোন কোন নারী সন্তান প্রসব করবে। বিলাসিতা বৃদ্ধি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

মকর রাশি

শ্রবণাজাতগণের পক্ষে উত্তম। উত্তরাষাঢ়া ও ধনিষ্ঠার পক্ষে অধম। স্বাস্থ্যের অবনতি। উদর ও গুহ্য প্রদেশে পীড়া। শেষার্দ্ধে রক্তের চাপবৃদ্ধি। ধারালো অস্ত্রে শরীরের কোন স্থান কেটে যেতে পারে। পারিবারিক শান্তি ঐক্য ও শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ হবে না। আর্থিক ক্ষেত্রে মোটামুটি একই ভাবে যাবে। অনেক সুযোগ সুবিধা আসবে, কিন্তু এগুলিকে ধরে নেওয়া সম্ভব হবে না। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী অনুকূল। চাকুরিজীবীর পক্ষে কোন অনুকূল আবহাওয়া দেখা যায় না, কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। উপরওয়ালার প্রতিকূল মনোভাব, স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধ বিরুদ্ধ, শারীরিক মানসিক ও পারিবারিক কষ্ট, ফলে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া সম্ভব হবেনা। শেষার্দ্ধ ভালোই যাবে। ছায়া চিত্র ও রঙ্গমঞ্চাভিনেত্রীদের পক্ষে শেষার্দ্ধটী বিশেষ শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

কুম্ভ রাশি

শতভিষার পক্ষে উত্তম। পূর্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। ধনিষ্ঠার পক্ষে অধম। শেষার্দ্ধে কিছু শারীরিক কষ্ট। অজীর্ণতা, মূত্রাশয় ও গুহ্য প্রদেশে পীড়া। আমাশয়, প্রস্রাব কালে দারুণ কষ্ট। দুর্ঘটনার আশঙ্কা। স্ত্রীর সহিত কলহ। আর্থিক ক্ষেত্র সুবিধাজনক নয়। নানা দিক দিয়ে লাভ। মাসের শেষে অপরিমিত ব্যয়। এজন্যে অর্থকৃচ্ছ্রতা। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটি একভাবেই যাবে। মামলা মোকর্দ্দমার আশঙ্কা আছে। চাকুরির ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে বিশেষ ভালো। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ মিশ্রফল। ভ্রমণের সম্ভাবনা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ সময়।

মীন রাশি

উত্তরভাদ্রপদজাতব্যক্তির পক্ষে উত্তম। রেবতীজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। পূর্ব্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে অধম। উদর ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট। শারীরিক দুর্ব্বলতা। পারিবারিক অশান্তি। স্ত্রীর সন্তানাদি ও স্বজনবর্গের সহিত মনোমালিন্য। প্রথমার্দ্ধে এইসব ঘটনার প্রাবল্য, দ্বিতীয়ার্দ্ধে হ্রাস পেয়ে শেষে শান্তি লাভ। আর্থিকক্ষেত্র বিশেষ শুভ। নানাভাবে অর্থস্ফীতি। এতদসত্ত্বেও কিছু অর্থক্ষতি। বিরাট পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ বর্জ্জনীয়। বন্ধুদের সাহায্য লাভ। কারো জন্যে জামিন হোলে বিপত্তির কারণ ঘটবে। বাড়ী-ওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে একভাবেই সময় যাবে। মামলা মোকর্দ্দমার সম্ভাবনা আছে। চাকুরিজীবীর পক্ষে মোটামুটি ভালো। দ্বিতীয়ার্দ্ধে পদনিয়োগ কর্ত্তার সম্মুখে যাওয়া, পরীক্ষা দেওয়া প্রভৃতি চাকুরিপ্রার্থীর পক্ষে আনুকূল্য ও সাফল্য লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি সুবিধাজনক নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধ শুভ, শেষার্দ্ধ অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ ও উন্নতির যোগ।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নফল

মেষ লগ্ন—

বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে সহোদরের সহিত মানোমালিন্য, আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবাসী থেকে ইষ্টসিদ্ধি। পুস্তকাদি লিখন বা মুদ্রাঙ্কন থেকে লাভ। স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। গুপ্তশত্রু বৃদ্ধির যোগ। অধীন ব্যক্তির দ্বারা প্রতারণা লাভ। ক্রয়বিক্রয়েসাফল্য। কলহাদি [illegible]

ও ধনলাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

বৃষ লগ্ন—

অর্থাগম, কিন্তু ব্যয়বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যের অবনতি। সম্বন্ধ লাভ। ক্রয়বিক্রয়ে সিদ্ধি। ধনভাব শুভ। সন্তানাদির লেখাপড়ায় উন্নতি। ভাগ্যোদয়ে বাধা বিপত্তি। কর্ম্মক্ষেত্র মোটামুটি ভালো, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, পুত্রকন্যাদির বিবাহ প্রসঙ্গ। বাসস্থান সংক্রান্ত গোলযোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মিথুন লগ্ন—

নানাপ্রকার বাধা। বুদ্ধিভ্রংশহেতু কর্ম্মে অশান্তি। স্বাস্থ্যের অবনতি। দুর্ঘটনা। বেদনাজনিত পীড়া। চৌরাগ্নি ভয়। ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। অর্থ ও সম্মান। বৈজ্ঞানিক বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে উন্নতি। ধর্ম্মপ্রবণতা। সম্পত্তি বিষয়ে জটিল সমস্যা। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি। সাংসারিক অশান্তির প্রাবল্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কর্কট লগ্ন—

অঙ্গহানি বা দেহে আঘাতপ্রাপ্তি। উচ্চস্থান থেকে পতন। দেহ পীড়া। ভাগ্যোদয়। পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি। নানাপ্রকারে উন্নতির সূচনা। কোন নারীর জন্য ক্ষতিযোগ। সম্পত্তি লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। সঞ্চিত অর্থনাশ ও প্রতারণার কারকতা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

সিংহ লগ্ন—

প্রতিযোগিতামুলক কার্য্যে জয়লাভে বাধা। স্বজন বিরোধ। তীব্র মানসিক আঘাতপ্রাপ্তি। পীড়াদি যোগ। আকস্মিক ধনলাভ। ধনাগম যোগ। পত্নীর অসুস্থতা বিশেষতঃ হৃদ্রোগের আশঙ্কা। অপরিমিত ব্যয়। প্রগল্‌ভতা ও কপটাচার। শ্বাসযন্ত্রের রোগ। ব্যবসাবাণিজ্যে কিছু কিছু লাভ। চিত্র ব্যবসায়ীর ক্ষতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, সঞ্চয়ের সুযোগ। কারো ওপর বিশ্বাসের জন্য প্রবঞ্চিতা হবার যোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

কন্যা লগ্ন—

সুযোগান্বেষী ব্যক্তির দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা। চৌর্য্য ভয়। পৃষ্ঠ, উদয় ও মজ্জায় রোগাধিকার। সম্পত্তি বিষয়ে শুভ। চাকুরিক্ষেত্রে বিরুদ্ধ পরিবেশ। নূতন সম্পত্তি লাভে বিঘ্ন। সন্তানের স্বাস্থ্যহানি ও পরীক্ষাদিতে সুফলের অভাব। কর্ম্মস্থলে বাধা বিঘ্ন। বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতির অভাব। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। অযথা অর্থব্যয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

তুলা লগ্ন—

শারীরিক অবস্থার অবনতি। স্নায়ুগত পীড়া। সন্তান সন্ততির পীড়া ও লেখাপড়ায় বিঘ্ন। আশাপ্রদ ফলের অভাব। ভাগ্যোদয়ে বাধা বিপত্তি। স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতা। কোন সুযোগ নষ্ট হওয়ার ফলে উন্নতি বিলম্বিত। নূতন ঋণের সম্ভাবনা। চাকুরি ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। প্রতারণাও প্রণয়ে অসাফল্য। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

বৃশ্চিক লগ্ন—

দেহভাব মধ্যম। শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতার বাধা। ধনব্যয় যোগ। বৈষয়িক ব্যাপারে ভ্রাতার সহিত মতানৈক্য। চাকুরিপ্রাপ্তি। চাকুরির ক্ষেত্রে পদোন্নতি। সন্তান সন্ততির শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতা ও পরীক্ষায় সুফলের আশা। ভাগ্যোন্নতি যোগ। পত্নীর স্বাস্থ্যোন্নতি। বিদেশ গমন। ধর্ম্মার্থে অর্থব্যয়। দাম্পত্য প্রণয়। স্ত্রীলোকের পথে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ধনু লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক বিষয়ের ফল কিছু ভালো। ধনাগমে বাধা বিঘ্ন। সম্বন্ধলাভ। পত্নী পীড়া। মুখ বা, চক্ষুতে বিপত্তির আশঙ্কা, মানহানি ও বিফল ক্রিয়া। পিতার উন্নতি। কর্ম্মস্থল স্বাভাবিক। বন্ধুদ্বারা কর্ম্মোন্নতি। নিজের শৈথিল্য হেতু একাধিক সুযোগ হস্তচ্যুত হবে। চিত্র ও মঞ্চ ব্যবসায়ীর উন্নতিলাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অশুভ।

মকর লগ্ন—

স্বাস্থ্য ভঙ্গ, ভাগ্যলাভে বাধা। কর্ম্মপরিবেশের মধ্যে শত্রু বৃদ্ধি। স্ত্রীর জীবন সংশয় পীড়া। পারিবারিক অবস্থা মোটামুটি ভালো চলবে। আর্থিক ক্ষেত্র অসুবিধা জনক। কর্ম্মস্থলে পরিবর্ত্তন। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। স্বামীর পীড়া, দাম্পত্য কলহ ও প্রীতিভঙ্গ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

কুম্ভ লগ্ন—

সাংসারিক অশান্তির প্রাবাল্য। সন্তানের পীড়াভোগ। অযথা অর্থব্যয়। শারীরিক অসুস্থতা। বাতবেদনা। ধনাগম যোগ। বন্ধুস্থানের ফল শুভ। প্রতিযোগিতা মুলক ব্যাপারে সাফল্য। বিক্রয় বাণিজ্যে অধিকতর লাভ, চাকুরি ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর ঘটনার সমাবেশ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ, যশোহানি যোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মীন লগ্ন—

নিকটাত্মীয় বিয়োগ। দুর্ঘটনার আশঙ্কা। অর্থাগম সত্বেও ব্যয়াধিক্য। বুদ্ধি দোষে ক্ষতির সম্ভাবনা, ব্যবসা ক্ষেত্রে দ্রব্যনাশ। শারীরিক অবনতি। সন্তান সন্ততির লেখা পড়ায় বিঘ্ন। ধনলাভ যোগ। কর্ম্মস্থানে অশান্তি। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। সাংসারিক তীব্র অশান্তি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

॥ অশ্লীলতা ॥

ভারতীয় চলচ্চিত্রের স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ক্যালকাটা ইন্‌ফরমেশন্‌ সেণ্টারে যে স্থির চিত্রের প্রদর্শনী হয়েছিল তার থেকে কয়েকটি ছবিকে হঠাৎ অপসারিত করায় অনেক চিত্রামোদীই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। কারণ হিসাবে নাকি জানান হয়েছে যে ছবি কয়টি অশ্লীলতার পর্য্যায়ে পড়ে বলেই নাকি সেগুলি অপসারিত করা হয়েছে। কিন্তু অশ্লীল কি না এর চূড়ান্ত বিচার কে করবে? আর এর মাপকাঠিই বা কি?—এ প্রশ্ন থেকে যায়। বিশেষ করে আর্টের ক্ষেত্রে এই বিচার করা খুবই শক্ত এবং এর কোনও সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মও নেই। নারী দেহের অংশ বিশেষের প্রদর্শনই যদি অশ্লীলতার পর্য্যায়ে পড়ে তাহ'লে বিশ্বের বিখ্যাত সৃষ্টি "ভীনাস্‌" অশ্লীলতার পর্য্যায়ে পড়ে যাবে এবং বহু বিখ্যাত শিল্পীর শাশ্বত সৃষ্টিও অশ্লীল বলে গণ্য হবে, আর তাতে কি মানব সমাজ আরও সভ্য হয়ে উঠবে, না শিল্পের অপমৃত্যু ঘটবে? ভারতের মন্দির গাত্রের বহু ভাস্কর্য্যকেই তো তাহ'লে ভেঙ্গে ফেলতে হয়,—'খাজুরাহো', 'কোনারক' তো দর্শকদের পক্ষে নিষিদ্ধ করা উচিত।

সংযম থাকা ভাল; কিন্তু সব কিছুরই অতিরিক্ত যেমন ভাল নয়, তেমনি এরও অতিপ্রয়োগ স্থান, কাল ও পাত্র বিশেষে দোষনীয় হয়ে ওঠে।—এটা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র 'সেন্সার' সম্বন্ধেও এ কথাটা খাটে—বিশেষ করে বিদেশী চিত্র সেন্সারের ব্যাপারে। সেন্সারের কাঁচি যে দৃশ্যকেই অশ্লীল বলে মনে করে তাকেই নির্ম্মম হাতে ছাঁটাই করে, আর তাতে গল্পের ভাবধারা ও গতি খাপছাড়া হয়ে গিয়ে দর্শকদের বিরক্তিই উৎপাদন করে। এঁরা শুধু দৃশ্যের দিকেই সজাগ-সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকেন, অথচ যে সব চিত্রে অশ্লীল দৃশ্য কোথাও নেই কিন্তু সমগ্র চিত্রটিরই প্রদর্শন বন্ধ করা উচিত ছিল, সেদিকে অনেক সময়েই দৃষ্টি দেন না। বিমাতার সঙ্গে সপত্নীপুত্রের অস্বাভাবিক সম্পর্ক, ধনী বিধবাদের বিদেশে গিয়ে, যেখানে দালালের মারফৎ সুদর্শন যুবকদের পাওয়া যায়, সেখানে তাদের নানা ব্যাপারের চমকপ্রদ ঘটনা ইত্যাদির প্রদর্শন ভারতীয় আদর্শের পরিপন্থী। কিন্তু এসব চিত্র তো প্রদর্শিত হয়। উৎকট রাজনৈতিক মত প্রচারকারী চিত্রও মধ্যে মধ্যে প্রদর্শিত হয়েছে, আর খুন-জখম ও অশ্লীল নৃত্যভঙ্গীমাপূর্ণ চিত্র তো আছেই। সেন্সর বোর্ডের শ্যেন চক্ষু এদিকেও থাকা উচিত বলে মনে করি, আর অশ্লীল কি না তার বিচারও বিশেষ করে ভেবে তবে করাই যুক্তিযুক্ত।

খবরাখবর ঃ

মস্কো চলচ্চিত্রানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠান অনেক স্থলেই উদ্‌যাপিত হয়েছে এবং এরূপ সম্বর্দ্ধনার প্রয়োজনও ছিল। বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম ও ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে দ্বিতীয় হয়ে, এই আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে, তিনি বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের মান যে উদ্ধগামী ও বিশ্ব-মানের সমতুল্য, তা প্রমাণ দিলেন। ১৯৫৯ সালে কার্লোভী ভ্যারি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে শ্রীমতী নার্গিস "মাদার ইণ্ডিয়া" চিত্রে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কারে ভূষিতা হন। তিন বৎসর পরে বাংলার বধূ শ্রীমতী সেন সেই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার জয় করে বাংলার চলচ্চিত্রকে উপহার দিলেন। আমরা শ্রীমতী সেনের দীর্ঘজীবন ও উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

এই সঙ্গে উল্লেখ করি আর, ডি, বনশাল্‌ কোং শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের সম্মানে যে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তাতে শ্রীমতী সেনের পোষাক সম্বন্ধে কিছু বিরূপ আলোচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। বেশীর ভাগ আলোচনাই সংবাদপত্রের ছবি দেখেই করা হয়েছে।

'ছায়াসূর্য্য' চিত্রের নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর

কিন্তু সেদিনকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে চাক্ষুষ শ্রীমতী সেনকে দেখলে তাঁর পোষাকে অশালীন কিছু দেখা যেত না। শিল্পীর সজ্জা বা সাজ সাধারণের মতন না হতে পারে কিন্তু তাই বলে অশালীন নয়, আর অতি-আধুনিক হলেও তা অশ্লীলতার পর্য্যায়ে পড়ে না।

* * *

এই সঙ্গে আমরা বিশ্বখ্যাত ভারতীয় চিত্র-পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়কেও আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, বার্লিন চলচ্চিত্রোৎসবে তাঁর দ্বিতীয়বার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার "সেলজ্‌নিক গোল্ডেন লরেল্‌" লাভের জন্য। উল্লেখযোগ্য যে একমাত্র সত্যজিৎ রায়ই এই পুরস্কার দুইবার পেলেন।

* * *

"মহানগর"-এর পর সত্যজিৎ রায়ের পরবর্ত্তী ছবি হবে রবীন্দ্রনাথের "নষ্টনীড়"। প্রধান ভূমিকা দুটিতে থাকবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়।

* * *

'উত্তমকুমার ফিল্মস'-এর দ্বিতীয় প্রয়াস "উত্তর ফাল্গুনী"-তে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না সুচিত্রা সেন মা ও মেয়ের দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করছেন। আশা হয় চিত্রটি তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। ছবিটি পরিচালনা করছেন অসিত সেন।

* * *

'উত্তমকুমার ফিল্মস'-এর তৃতীয় প্রচেষ্টা হবে "জতুগৃহ"। শ্রীসুবোধ ঘোষের গল্প অবলম্বনে ছবিটি তুলছেন পরিচালক তপন সিংহ। প্রধান চরিত্রগুলিতে রূপ দিচ্ছেন উত্তমকুমার, অরুন্ধতী দেবী, বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

* * *

বাংলা চিত্র "না"-এর হিন্দী সংস্করণে নায়িকার অভিনয় করবেন শর্ম্মিলা ঠাকুর। চিত্রটি বোম্বাইতে মোহন শেগাল নির্ম্মাণ করবেন। প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায় বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের "রূপ হল অভিশাপ" নামক গল্প অবলম্বনে যে হিন্দী চিত্রটি নির্ম্মাণ করবেন, তাতেও শর্ম্মিলা অভিনয় করবেন বলে জানা গেছে।

* * *

"অগ্নিবন্যা" চিত্রটির সুটিং শেষ হয়ে গেছে। নায়ক বিশ্বজিৎ-এর বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায় রয়েছেন সন্ধ্যা রায় এবং অন্যান্য ভূমিকায় আছেন মঞ্জু দে, কমল মিত্র, অসিতবরণ, তরুণকুমার, অমর মল্লিক, ভারতী দেবী প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন গোপেন মল্লিক।

* * *

'মহাশ্বেতা চলচ্চিত্রম'-এর "ন্যায়দণ্ড" চিত্রের কাজ শেষ হয়ে গেছে। ছবিটি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে। জরাসন্ধের ঐ নামের উপন্যাসটিই চিত্ররূপ লাভ করেছে মঙ্গল চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ, রাধামোহন ভট্টাচার্য্য, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, তন্দ্রা বর্ম্মণ প্রভৃতি।

* * *

বনফুলের দু'টি গল্প 'অর্জ্জুন মণ্ডল' ও 'যুধিষ্ঠির কাকা' অবলম্বনে "আরোহী" নামে যে চিত্রটি নির্ম্মিত হবে সেটি পরিচালনা করবেন তপন সিংহ এবং প্রযোজনা করবেন অসীম পাল, আর সঙ্গীত রচনা করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

* * *

'এম, আর, বি, প্রডাকসন্স' তাঁদের প্রথম চিত্র "লাল পাথর"-এর মহরত্‌ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন। প্রশান্ত চৌধুরীর গল্প অবলম্বনে চিত্রটি নির্মিত হবে এবং পরিচালনা করবেন সুশীল মজুমদার।

* * *

"পঞ্চদীপ" প্রডাকসন্স'-এর প্রথম চিত্র "বিংশতি জননী" এখন সমাপ্তির পথে। পরিচালনা করছেন খগেন রায়।

'এ. এস, ফিল্মস'-এর প্রথম হাস্যরসাত্মক চিত্র "ডুনৌকায়"-এর শুভ মুহূর্ত্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেছে।

* * *

দেশে বিদেশে ঃ

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের তাশখন্দে যে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাতে প্রত্যেকটি ছবির প্রদর্শনীতে বিপুল জনসমাগম হয়। সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি অনুযায়ী এই ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব উজ্‌বেকিস্তানের রাজধানী

তাশখন্দে অনুষ্ঠিত হবার পর বর্ত্তমানে জর্জ্জিয়ার রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর পর কয়েকটি প্রধান প্রধান সোভিয়েত শহরে প্রদর্শিত হবে। অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে আছে—'অপুর সংসার,' 'কাবুলিওয়ালা,' 'জিস্ দেশমে গঙ্গা বহতি হ্যায়,' ও আরও দুইটি ছবি। আগামী নভেম্বর মাসে ভারতের কয়েকটি প্রধান প্রধান শহরেও সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

*   *   *

যে মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে "সাত পাকে বাঁধা" চিত্রটি প্রদর্শিত হয়ে সুচিত্রা সেনকে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মানে ভূষিত করল সেই চিত্রোৎসবে যে চিত্রটি প্রথম পুরস্কার পেয়েছে সেটি হচ্ছে ফেদোরিকো ফেলিনির "এইট্ এণ্ড এ হাফ্" (Eight And A Half) চিত্রটি। এক চিত্র-পরিচালকের মনযন্ত্রণা, কি তিনি দর্শকদের বলতে চান—এই হচ্ছে চিত্রটির বিষয়বস্তু। চিত্রটি ইতিমধ্যেই বহুদেশে সাড়া জাগিয়েছে। এই উৎসবে প্রদর্শিত অন্যান্য ছবিগুলির বেশীর ভাগই গত যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে রচিত। স্বর্ণ পুরস্কার প্রাপ্ত চেকোশ্লোভাকিয়ার চিত্র "ফর উই ট্ ক্যানট্ ফরগিভ্"ও যুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালের ঘটনা নিয়ে রচিত। পূর্ব্ব জার্ম্মানীর বিশেষ প্রশংসা লাভ করা চিত্র "নেকেড্ অ্যামং দি উল্ভস্" চিত্রের পাত্রপাত্রীরা এক বন্দীশিবিরের দল। কুখ্যাত গেষ্টাপোর বিরুদ্ধে এদের প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। "দি গ্রেট্ এস্কেপ্" নামক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে চিত্রটিতে অভিনয় করে ষ্টিভ্ ম্যাকুইন্ শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান লাভ করেছেন, সেই চিত্রটির পটভূমি হচ্ছে এক নাৎসী বন্দীশিবির।

যুদ্ধ পরবর্তী কয়েক বছরের পটভূমিকাতেও রচিত হয়েছে কয়েকটি ছবির কাহিনী। যেমন রৌপ্য পুরস্কারে সম্মানিত হাঙ্গেরীর চিত্র "টেলস্ অন্ এ ট্রেন্" এবং বুল-গেরিয়ার চিত্র "নো ডেথ্"।

*   *   *

মস্কোর দর্শকেরা কিন্তু পছন্দ করেন আমুদে চিত্রই। সেজন্যই কিছু চিত্তবিনোদনের উপযোগী সহজ ছবিই এই চলচ্চিত্র উৎসবে অভিনন্দিত হয়েছে। কিন্তু গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়বস্তু নিয়ে গঠিত কয়েকটি ছবি উপযুক্ত প্রশংসা পায় নি। এমন কি অন্যান্য দেশে ভালো বলে প্রশংসিত গম্ভীর বিষয় নিয়ে রচিত একটি বৃটিশ চিত্রকে এই উৎসবে মন্দও বলা হয়েছে। মস্কোর লোকেরা হাল্কা ছবিই যে ভালবাসে এর থেকেই তা বোঝা যায়। মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম বিচারক শ্রীসত্যজিৎ রায় এই মতই পোষণ করেন।

*   *   *

দিল্লীর পটভূমিতে যুদ্ধকালীন কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে লিখিত হাওয়ার্ড ফষ্টের "দি উইনষ্টোন্ অ্যাফেয়ার" নামক উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়েছেন বৃটেনের খ্যাতনামা নাট্যকার কাথ্ ওয়াটারহাউস্ ও উইলিস্ হল্। এখন গল্পটি চিত্রায়িত হচ্ছে ইঙ্গ-মার্কিণ ব্যবস্থাধীনে। পরিচালনা করছেন বৃটিশ পরিচালক হ্যামিলটন্ এবং প্রযোজনা করছেন প্রখ্যাত মার্কিন প্রযোজক ওয়াল্টার সেইট্জার। আমেরিকান সেনাবাহিনীর একজন অফিসার চিত্রটির নায়ক এবং এই ভূমিকায় অভিনয় করছেন বিখ্যাত হলিউড অভিনেতা রবার্ট মিচাম্। একটি বৃটিশ সামরিক অফিসারের ভূমিকায় রূপ দিচ্ছেন খ্যাতনামা অভিনেতা ট্রেভর হাওয়ার্ড। কিছুদিন আগে চিত্রগ্রহনের জন্যে এই দলটি দিল্লীতে এসেছিলেন। দিল্লীর দৃশ্যগুলিতে অংশ গ্রহণ করেন রবার্ট মিচাম্। দিল্লীর মেডেন্ ও সুইস্ হোটেলকে কেন্দ্র করেই দৃশ্যগুলি গৃহীত হয়। বর্ত্তমানে ছবিটি লণ্ডনে গৃহীত হচ্ছে।

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

আমেরিকা—ইংল্যাণ্ড ক্রীড়ানুষ্ঠান ঃ

লণ্ডনের হোয়াইট সিটি স্টেডিয়ামে আমেরিকা বনাম ইংল্যাণ্ডের বাৎসরিক দ্বৈত ক্রীড়ানুষ্ঠানের পুরুষ বিভাগে আমেরিকা এবং মহিলা বিভাগে ইংল্যাণ্ড পয়েন্টের ভিত্তিতে শীর্ষস্থান লাভ করেছে। পুরুষ বিভাগে আমেরিকার পয়েন্ট ১২০ এবং ইংল্যাণ্ডের ৯১ পয়েন্ট। মহিলা বিভাগে ইংল্যাণ্ড পায় ৬৫½ পয়েন্ট এবং আমেরিকা ৫১½ পয়েন্ট। দুটি অনুষ্ঠানে বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে—পোলভল্ট এবং মহিলাদের ৪×১১০ গজ রিলে রেসে। আমেরিকার বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র জন পেনেল ১৬ ফিট ১০¾ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম ক'রে নিজেরই প্রতিষ্ঠিত পোলভল্টের বিশ্ব রেকর্ড (১৬ ফিট ৮ ইঞ্চি) ভেঙ্গেছেন। মহিলাদের ৪×১১০ গজ রিলে রেসে ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধি দল ৪৫.২ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন।

ডেভিস কাপ—ইউরোপীয়ান জোন ঃ

১৯৬৩ সালের আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা—ডেভিস কাপের ইউরোপীয়ান জোন ফাইনালে ইংল্যাণ্ড ৩—২ খেলায় সুইডেনকে পরাজিত ক'রে ইন্টার জোন-সেমি-ফাইনালে উঠেছে। সুইডেন গত বছর ইউরোপীয়ান জোন-ফাইনালে ৪—১ খেলায় ইতালীকে পরাজিত ক'রে শেষ পর্যন্ত ইন্টার জোন-ফাইনালে ২—৩ খেলায় মেক্সিকোর কাছে পরাজিত হয়েছিল।

১৯৬৩ সালের ইউরোপীয়ান জোন-ফাইনালে ইংল্যাণ্ডের জয়লাভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, দীর্ঘ ২৯ বছর পর ইংল্যাণ্ড ইউরোপীয়ান জোন ফাইনালে জয় লাভ করলো। তাদের শেষ জয় ১৯৩৩ সালে। ইংল্যাণ্ড ১৯৩৩ সালে ইউরোপীয়ান জোন-ফাইনালে জয় লাভ ক'রে শেষ পর্যন্ত ডেভিস কাপ জয় করে। ইংল্যাণ্ড উপর্যুপরি চার বছর (১৯৩৩—৩৬) ডেভিস কাপ জয় করায় প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুসারে তারা পরবর্তী চারবছর (১৯৩৪—৩৭) সরাসরি চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেছে, অন্য কোন রাউণ্ডে তাদের খেলতে হয়নি। আবার দ্বিতীয় মহা যুদ্ধের দরুণ উপর্যুপরি ৬ বছর (১৯৪০-৪৫) প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। সুতরাং হিসাবে দেখা যায়, গত ২৯ বছরে ইংল্যাণ্ড ১৯ বার ইউরোপীয়ান জোনে খেলেছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য, ইংল্যাণ্ড এ পর্য্যন্ত ৯ বার ডেভিস কাপ পেয়েছে। ইংল্যাণ্ড ছাড়া ডেভিস কাপ পেয়েছে মাত্র আর তিনটি দেশ—আমেরিকা ১৯ বার, অষ্ট্রেলিয়া ১৯ বার এবং ফ্রান্স ৬ বার।

১৯৬৩ সালের ইন্টার জোন সেমি ফাইনালে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলবে আমেরিকান জোন বিজয়ী দেশ। এবং এই খেলায় বিজয়ী দেশ খেলবে ইন্টার-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষের সঙ্গে। আবার ইন্টার জোন ফাইনালের

বিজয়ী দেশ চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে গত চার বছরের (১৯৫৯-৬২) ডেভিস কাপ বিজয়ী দেশ অস্টেলিয়ার সঙ্গে খেলবে। এই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলাই হ'ল শেষ বা চূড়ান্ত পর্য্যায়ের খেলা।

ইংল্যাণ্ড—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট ঃ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ: ৩৯৭ রান (সোবার্স ১০২, কানহাই ৯২ এবং সলোমন ৬২ রান। ট্রুম্যান ১১৭ রানে ৪ এবং লক্ ৫৪ রানে ৩ উইকেট পান)

ও ২২৯ রান (বুচার ৭৮ এবং সোবার্স ৫২ রান। টিটমাস ৪৪ রানে ৪, শ্যাকলটন ৬৩ রানে ৩ এবং ট্রুম্যান ৪৬ রানে ২ উইকেট পান)

ইংল্যাণ্ড: ১৭৪ রান (লক ৫৩ রান। গ্রিফিথ ৩৬ রানে ৬ এবং গিবস ৫০ রানে ৩ উইকেট পান)

ও ২৩১ রান (পার্কস ৫৭, ক্লোজ ৫৬ এবং বোলাস ৪৩ রান। গিবস ৭৬ রানে ৪, গ্রিফিথ ৪৫ রানে ৩ এবং সোবার্স ৯০ রানে ৩ উইকেট পান)

লিডস মাঠে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের একাদশ টেস্ট সিরিজের চতুর্থ টেস্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২২১ রানে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত ক'রে আলোচ্য সিরিজে ২—১ খেলায় অগ্রগামী হয়েছে। আর একটা টেস্ট খেলা বাকি—ওভালের পঞ্চম টেস্ট।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম দিনের খেলায় ৫টা উইকেট খুইয়ে ২৯৪ রান করে। লাঞ্চের সময় রান ছিল ৯৫ (৩ উইকেটে)। কানহাই এবং সোবার্সের ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ১৬০ মিনিটের খেলায় ১৪৩ রান যোগ হয়। দলের ১১৪ রানের মাথার কানহাই নিজস্ব ৯২ রান করেন। কানহাইয়ের পাথর-চাপা কপাল—প্রথম টেস্ট খেলাতেও তিনি ৯০ এর ঘরে পা দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত সেঞ্চুরী হাত-ছাড়া ক'রে ছিলেন ১০ রানের জন্যে।

চতুর্থ টেস্ট খেলার নায়ক গারফিল্ড সোবার্স ১০২ রান ক'রে আউট হ'ন। ভাঙ্গা আঙ্গুলে প্লাস্টার লাগিয়ে সোবার্স দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিলেন। সোবার্স তাঁর ৮২ রানের মাথায় টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ৪০০০ রান পূর্ণ করেন। সোবার্সকে নিয়ে এ পর্য্যন্ত ১১জন খেলোয়াড় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ৪০০০ অথবা তার বেশী রান করলেন। এই এগার জন খেলোয়াড়ের মধ্যে আছেন ইংল্যাণ্ডের ৭ জন, অস্ট্রেলিয়ার ২ জন এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২ জন খেলোয়াড়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে প্রথম ৪০০০ রান পূর্ণ করেন এভার্টন উইকস (৪৮ খেলায় ৪৪৫৫ রান)। বর্ত্তমানে সোবার্সের ৪০৭২ রান দাড়িয়েছে—৪৬টা টেস্ট খেলায়। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ৩০০০ রান এবং ১০০ উইকেট পাওয়ার রেকর্ড এ পর্য্যন্ত কেউ করতে পারেননি। সোবার্সই সেই রেকর্ড প্রথম করবেন। ১০০ উইকেট পূর্ণ করতে আর তাঁর মাত্র ৭টা উইকেট দরকার।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ৩৯৭ রানের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যাণ্ড এই দিন প্রথম ইনিংসের খেলায় ৮ টা উইকেট খুইয়ে ১৬৯ রান করে। ফলো-অন থেকে ছাড়ান পেতে তখনও ইংল্যাণ্ডের ২৯ রান তুলতে বাকি ছিল।

তৃতীয় দিনের খেলায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ১৭৪ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিনে বাকি তুটো উইকেট খুইয়ে ইংল্যাণ্ড মাত্র ৫ রান তুলতে পারে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ইংল্যাণ্ডকে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য না ক'রে দ্বিতীয় ইনিংস খেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২২৩ রানে অগ্রগামী থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ২২৯ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। ইংল্যাণ্ড ৪৫৩ রানের পিছনে থেকে তৃতীয় দিনের বাকি সময়ে ৪টে উইকেট খুইয়ে ১১৩ রান করে। ফলে ইংল্যাণ্ডের হাতে জমা থাকে আর ৬টা উইকেট এবং তারা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের থেকে ৩৩৯ রানের পেছনে পড়ে থাকে।

চতুর্থ দিনে ২ঘণ্টা ২০ মিনিট সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২৩১ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস নামিয়ে দেয়। এই সময়ে বাকি ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ইংল্যাণ্ড তৃতীয় দিনের ১১৩ রানের (৪ উইকেটে) সঙ্গে ১১৮ রান যোগ করে।

এই চতুর্থ টেস্ট খেলায় নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন গারফিল্ড সোবার্স। তিনি ডান হাতের ভাঙ্গা আঙ্গুলে প্লাস্টার জড়িয়ে নেমেছিলেন। কিন্তু চৌকস খেলোয়াড় সোবার্সের ক্রীড়া-নৈপুণ্য তার জন্যে স্তিমিত হয়নি। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরী (১০২ রান) এবং দ্বিতীয় ইনিংসে অর্দ্ধ সেঞ্চুরী (৫২ রান) করেছিলেন সোবার্স। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ৯০ রানে ৩টে উইকেট পান। সোবার্সের পর চার্লি গ্রিফিথের ক্রীড়া-নৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য। গ্রিফিথ এই খেলায় ৮১ রানে ৯টা উইকেট পান (৩৬ রানে ৬ ও ৪৫ রানে ৩)। এই তু'জনের পর কানহাইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথম ইনিংসে ৯২ রান করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের চতুর্থ টেস্ট খেলায় জয়লাভের মূলে ছিলেন প্রধাণতঃ এই তিন জন খেলোয়াড়।

ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা:

১৯৬৩ সালের ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার চারটি বিভাগেই চ্যাম্পিয়ানসীপ নির্দ্ধারণ হয়ে গেছে।

প্রথম বিভাগে গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহন বাগান ক্লাব ২৮টা খেলায় ৪৭ পয়েন্ট সংগ্রহ ক'রে

চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করেছে এবং গত বছরেরই রানার্স-আপ ইষ্টবেঙ্গল দল এবারও রানার্স-আপ হয়েছে মোহন বাগানের থেকে মাত্র এক পয়েন্ট কম পেয়ে। মোহনবাগান এই নিয়ে ১১ বার লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেল। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এত বার কোন দলই লীগ জয় করতে সক্ষম হয়নি। মোহনবাগানের কাছাকাছি আছে মহমেডান স্পোর্টিং ৯ বার, ক্যালকাটা ৮ বার এবং ইষ্টবেঙ্গল ৭ বার। ক্যালকাটার পক্ষে মোহনবাগানের নাগাল ধরা সম্ভব নয়, তারা বর্ত্তমানে তৃতীয় বিভাগে খেলছে। মোহনবাগানের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী মহমেডান স্পোর্টিং এবং ইষ্টবেঙ্গল।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোহন বাগান ক্লাব গত দশ বছরের খেলায় (১৯৫৪-৬৩) নিজের প্রাধান্য অটুট রেখেছে। এই দশ বছরে মোহনবাগান লীগ পেয়েছে ৭ বার এবং বাকি ৩বার পেয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং (১৯৫৭), ই আই আর (১৯৫৮) এবং ইষ্টবেঙ্গল (১৯৬১)। এবং গত পাঁচ বছরে (১৯৫৯-৬৩) মোহনবাগানের লীগ জয় ৪বার প্রথম বিভাগের লীগ খেলায় উপর্যুপরি তিন বছর লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার রেকর্ড করে ডারহামস (১৯৩১-৩৩)। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব উপর্যুপরি পাঁচ বছর লীগ জয় ক'রে ডারহামসের রেকর্ড ভেঙ্গে যে নতুন রেকর্ড করে তা আজও কোন দল স্পর্শ করতে পারেনি। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের এই রেকর্ডের পর মোহনবাগানের উপর্যুপরি তিন বছর (১৯৫৪-৫৬) লীগ জয় নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মোহনবাগান আরও ৩বার উপর্যুপরি তিন বছর লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল; কিন্তু ১৯৪৫ ও ১৯৬১ সালে ইষ্টবেঙ্গল এবং ১৯৫৭ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব লীগ জয় ক'রে তাদের আশা পূর্ণ হ'তে দেয়নি। লীগের খেলায় মোহনবাগানের একটা উল্লেখযোগ্য রেকর্ড করতে বাকি—অপরাজয় অবস্থায় লীগ জয়। ভারতীয় ক্লাবগুলির মধ্যে এ রেকর্ড করেছে মহমেডান স্পোর্টিং (১৯৪৮) এবং ইষ্টবেঙ্গল (১৯৫০)। তবে ১৯৪৬ সালে কোন খেলায় পরাজয় স্বীকার না ক'রে মোহনবাগান রানার্স-আপ হয়েছিল। ১৯৬৩ সালে প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার ফলে মোহনবাগান একই বছরে লীগ-শীল্ড জয়ের সুযোগ পেল। ইতিপূর্ব্বে একই বছরে মোহনবাগান প্রথম বিভাগের লীগ কাপ এবং আই এফ এ শীল্ড জয় করেছে চারবার (১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬২)

প্রথম বিভাগের লীগ তালিকায় সর্ব্বনিম্ন স্থান পেয়ে পুলিস দ্বিতীয় বিভাগে নেমেছে।

ক্যালকাটা লীগ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বিভাগে কালীঘাট (২৮ পয়েণ্ট) তৃতীয় বিভাগে কুমারটুলি (২৬ পয়েণ্ট) এবং চতুর্থ বিভাগ ইউনিয়ন স্পোর্টিং দল (২৫ পয়েণ্ট) চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

প্রথম বিভাগের লীগ তালিকা

লীগ কোঠায় উপরের চারটি দল

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মোহনবাগান	২৮	২১	৫	২	৫৯	৮	৪৭
ইষ্টবেঙ্গল	২৮	২১	৪	৩	৪৫	১০	৪৬
বি এন আর	২৮	২০	২	৬	৫৫	১১	৪২
ইস্টার্ণ রেল	২৮	১৬	৮	৪	৪৪	১৬	৪০

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নাটক "বিল্বমঙ্গল ঠাকুর" (নব পর্যায়—১ম সং)—১'৫০

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক উপন্যাসাকারে গিরিশচন্দ্রের কাহিনী "প্রফুল্ল"—৩'০০

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ২৬।৮।৬৩ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষের সূচী

একপঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—চতুর্থ সংখ্যা

আশ্বিন—১৩৭০

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্রসূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

বিপদ-শৃঙ্খলের
অপব্যবহার হচ্ছে…
…এই ট্রেনেই দিনে অন্ততঃ পঞ্চাশবার…
ফলে ট্রেনের দেরী অবধারিত। আপনার হয়ত আজ কোন তাড়াহুড়ো নেই, কিন্তু অন্য কেউ নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কেউ হয়ত পরীক্ষায় উপস্থিত হ'তে পারলেন না, কেউ চাকরী হারালেন, এমন কি ঠিক সময়ে ডাক্তার না আসায় কোন রোগীকে হয়ত বাঁচানো গেল না।
অন্যায়কারীদের ঠিক সময়ে বাধা দিয়ে থামাতে পারেন শুধু আপনিই, কারণ প্রত্যেক ট্রেনের প্রতিটি কামরায় পুলিশ মোতায়েন করা কোন রেলওয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়।
আপনার সহযাত্রীদের মতোই
রেলওয়েও চায় এই সমস্ত
ক্ষেত্রে
আপনি সর্বদা সতর্ক থাকবেন
পূর্ব রেলওয়ে

ভারতবর্ষ
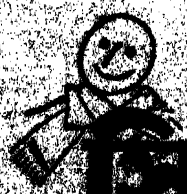
আশ্বিন—১৩৭০

প্রথম খণ্ড | একপঞ্চাশত্তম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

জন্মবন্ধ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

"জন্মবন্ধ" শব্দটি শাস্ত্রে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান জন্ম হইতে তৎসংলগ্ন যে বন্ধনদশা উৎপন্ন হয় তাহাকেই জন্মবন্ধ বলা হয়। গীতায় এই শব্দটি প্রয়োগ করিয়া বলা হইয়াছে, জন্মবন্ধ হইতে বিনির্মুক্ত হইলে সাধকগণ অনাময় পদ (অবস্থা) প্রাপ্ত হন (২।২১)। শুধু এই দিকে গীতার পথ ধরিয়া অনুধাবন করিলে জন্মবন্ধ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায় ও পরিশেষে উপনিষদের সঙ্গে গীতার শিক্ষাও বুঝা যায়।

ইহজন্মেই মানুষ নিজের অবস্থা কতক নিজেই প্রস্তুত করিয়া থাকে। দেখা যায়, তাহার কর্ম্মের ফল তাহাকে নূতন নিগড়ে বাঁধিতে পারে। অতএব গীতাপ্রণোদিত পদ্ধতি অনুসারে যদি সমস্ত কর্মফল অকাতরে এই খানেই ত্যাগ হইয়া যায়, তাহা হইলে নূতন অবস্থার আর গোড়াপত্তন হয় না, এবং সেই হেতু অবস্থা হইতে অবস্থান্তর-প্রাপ্তি হয় না বলিয়া, নূতন আরম্ভ না হওয়ায়, নূতন জন্মবন্ধের দশা ঘটিতে পারে না। ইহকালেই যখন হয় না, তখন পরকালের জন্য নূতন করিয়া জন্মবন্ধ জমা হইতে পারে না।

আবার এ কথাও সত্য যে মানুষের হাতে কর্ম্ম করা বা না করা সব সময়ে নির্ভর করে না। পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত

কর্ম্মফল প্রণীত, প্রকৃতির বশে সে কর্ম্ম করিয়া বসে। প্রকৃতির পক্ষ হইতে যে তিনটি গুণ মানুষের জীবনে চক্রবৎ ধারাবাহিকরূপে অবিরাম ঘুরিতেছে, তাহারা অব্যয় দেহীকে দেহের সঙ্গে সতত বাঁধিয়া রাখিয়াছে (১৪।৫) এবং এই তিন গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমকে, জাগতিক দৃষ্টি হইতে জন্মবন্ধ বলা চলে। প্রকৃতি নিজ কার্য্য চালাইবেই। প্রকৃতির নিত্যসহচর পুরুষ, যিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজাত গুণগুলি ভোগ করেন, বিমুখ হইলেই, প্রকৃতির নিজ কাজে উদ্যোগও কমিয়া যায়। পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গ যত কম করিতে থাকে জীবের নূতন জন্মের সম্ভাবনা ততই কম হইয়া যায় (১৩।২১)। তখন পুরুষ অন্তরমুখীন হইয়া পরমেশ্বরের খোঁজে তৎপর হয়। তাহার এই অনুসন্ধান ভক্তিতে পরিণত হয়। সে পরমেশ্বরকে নিজ উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বররূপে বরণ করিয়া লয় (১৩।২২)। যতই পরমেশ্বরের সান্নিধ্য সে পায়, প্রকৃতির সংস্পর্শ শিথিল হইয়া যায়। প্রকৃতি ও তাহার নিজসাধন অর্থাৎ কার্য্যকরণের কর্ত্তৃত্বে আলগা দেয়। পুরুষ এইভাবে গুণের সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিতে থাকিলে, মানুষ গুণাতীত হয়। তখন প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ, যাহা তিনগুণ হইতে উৎপন্ন হয়, কোনটার প্রতি মানুষের কোন দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না। পরমেশ্বরের কৃপায় মানুষের অন্তরে ভক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সাধক তখন "জন্মমৃত্যু, জরা ও দুঃখ" হইতে অব্যাহতি পান (১৪।২০)। এ কথার তাৎপর্য্য পরিশেষে বলা হইবে। এক্ষণে বুঝা গেল, জীবন থাকিলেও প্রকৃতিজাত জন্মবন্ধ আর বিরক্ত করিতে পারে না এবং পরমেশ্বরের সঙ্গে লীলা অবাধে চলিতে থাকে।

জীবন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ চিন্তাশীল মনুষ্যের ভাবনা হয় যে জন্ম সম্বন্ধে জ্ঞানও এক প্রকার জন্মবন্ধ হইতে পারে। তাহার কেমন করিয়া নিবৃত্তি হয়? জন্ম সম্বন্ধে জ্ঞান তখনই কমিতে পারে, যখন জন্মসূত্র হইতে যে উপাধির জ্ঞান মানুষের অন্তরে জন্ম লয় তাহা যদি মুছিয়া যায়। জন্মসূত্র হইতে যে উপাধিগুলি মানবসত্তায় সঞ্চারিত হয় তাহা মানুষ উত্তরাধিকারীরূপে পিতামাতার নিকট হইতে পাইয়া থাকে। আত্মপরীক্ষার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, পিতার নিকট হইতে নাম ও মাতার মারফৎ রূপ আমরা পাইয়া থাকি। নাম ও রূপের উল্লেখ উপনিষদেও আছে। মুণ্ডক উপনিষদে কথিত আছে, নদীসকল যেমন স্বীয় নাম ও রূপ বিসর্জ্জন দিয়া সমুদ্রে গিয়া মিশিয়া থাকে সেইরূপ প্রকৃত জ্ঞানীপুরুষ নিজ নাম ও রূপ ত্যাগ দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে লীন হন। কথাটি বড় গম্ভীর, কিন্তু মানব জীবনে ইহা খুব সহজে ও ক্রমে ক্রমে হইয়া যায়। বর্ত্তমান পরিবেষ্টনের মধ্যে, আমাদের জীবনে ইহা কিভাবে হয় বা হইতে পারে তাহা লক্ষ্য করিতে চাই। বিষয়টি বেশ কৌতুকপ্রদ বলিয়া মনকে দার্শনিক চিন্তা হইতে একটু বিরতি দিতে পারিবে।

প্রথমে মেয়েদের কথা বলি। আমরা দেখিতে পাই, হিন্দুসমাজের মেয়েরা যখন পিত্রালয় ছাড়িয়া স্বামীর গৃহে যান, তখন পিতার দেওয়া পদবীটি সেইখানেই ছাড়িয়া যান। প্রথমে অমুকের স্ত্রী এবং পরে অমুকের মাতা বলিয়া সমাজে তাঁহাদের অভিহিত করা হয়। এইরূপে নামের নোঙ্গর আর তাঁহাদের জীবন-তরণীকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। পদবী ছাড়া নিজস্ব নামেরও তেমন মর্য্যাদা থাকে না। জীবনের প্রিয়তম ও শ্রেয়তম যিনি, তিনিও "ওগো" "হাঁগো" বলিয়া কাজ সারেন। যে সব চেয়ে আপন, নিজের অংশ বলিলেও হয়, তাহাকে আবার নাম ধরিয়া পর করা যায় কেমন করিয়া? তাইত স্বর্গীয় কবি সত্যেন দত্ত তাঁর কবিতায় জানাইয়াছেন, "বাংলা ভাষা সকল ভাষার সেরা, মিষ্ট মধুর 'ওগো'। এইরূপে নামের বাঁধন শিথিল হইতে থাকিলে রূপের প্রতি দৃষ্টিও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। পিতামাতার দেওয়া অলঙ্কার, শাড়ী প্রভৃতি, রূপের জলুস বর্দ্ধন করিতে পারিলেও ক্রমশঃ বাক্সে বন্ধ রহিয়া যায়। স্বামীর দেওয়া আভরণ অঙ্গে ধারণ করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে ভাললাগে। পিতামাতার দেওয়া রূপের রসদ নিশ্চয়ই প্রিয়, কিন্তু স্বামীর কাছে পাওয়া প্রসাধন সামগ্রী সত্যই শ্রেয়। প্রিয়কে ছাড়িয়া শ্রেয়ের অনুগমন করিতে কোন্ স্ত্রীলোক না চায়? শাস্ত্র হিসাবে ইহাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। ইহার পর আসে মা'র মারফৎ পাওয়া শারীরিক ও মানসিক লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য। জীবনে ক্রমশঃ জানা যায়, মাতার কাছ হইতে যে দৈহিক ও মানসিক সম্পদ আমরা, স্ত্রীলোক ও পুরুষ

উভয়েই, পাইয়া থাকি, যেমন আকৃতি ও রং, অশন বসন, ভাব ও ভাষা, শিক্ষা ও দীক্ষা ও এমন কি সংস্কৃতি পর্য্যন্ত, সমস্তই মা'র ভিতর দিয়া মাতৃভূমির নিকট হইতে পাই। তখন জননী জন্মভূমিশ্চ সকল রকমে গরীয়সী হইয়া উঠেন ও জননীর উর্দ্ধে জন্মভূমির আসন দেখিয়া, মাতৃভূমির যথার্থ রূপ গ্রহণ ও স্বীকার করিতে স্বতঃই মন উতলা হয়। ভারত ইতিহাসের রামচন্দ্র, ভীষ্ম পিতামহ, ঋষিকুল, দেবতাবৃন্দ ও এমন কি ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুর অন্তিম শয্যা, গঙ্গামাতার শান্তিপ্রদ ক্রোড় পর্য্যন্ত সবই মায়ের দেওয়া রূপের চেয়ে মাতৃভূমির দেওয়া অমূল্য বৈভব অধিক বরণীয় হয়। মাতাপিতাকে কেহ ভুলিতে পারে না, কিন্তু তাঁহারা নিজেরাই যেন নেপথ্যে অদৃশ্য হইয়া সন্তানদের দেশমাতার হস্তে তুলিয়া দিয়া নিজের জীবন সার্থক জ্ঞান করেন।

স্থান ও কালের ভিতর দিয়া মেয়েদের জীবনে কিরূপ পরিণতি আসে ও তাহার অনেকটা যে ছেলেরাও নিজ জীবনে উপলব্ধি করেন তাহা ত বুঝিলাম। এইবার বলিব, ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে ছেলেরা যখন গুরুকুলে যাইতেন, তখনও তাঁহাদের জীবনে এই প্রকার পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ ঘটিত। বলা বাহুল্য, সকল স্বাধীন দেশেই শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ, প্রত্যেক বালককে তাহার পারিবারিক আবেষ্টন হইতে মুক্ত করিয়া সম্পূর্ণভাবে নিজ প্রতিভা অনুসারে স্বদেশের সেবায় নিযুক্ত করা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সমগ্র দেশের স্বাধীনতা যে পূর্ণ স্বাধীনতার দুইটি অভিন্ন অঙ্গ—তাহা তখন স্পষ্ট হইয়া যায়।

কেহ যদি বলেন, আমরা বিশ্বমাতার নিকট হইতে কি কোন বিশেষ রূপমাধুর্য্য পাইনা? তাহার উত্তরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি কথা অন্তরে জাগে। নিজ "দেশের মাটিতে" যখন "মাথা ঠেকাই," তখন সেথায় দেখি "বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা"। বস্তুতঃ স্বদেশের সম্পর্কেই বিশ্বজগতের অস্তিত্ব। তাহা না হইলে জগৎ অনেকটা বস্তুতন্ত্রহীন হইয়া যায়।

ঋষিদের বাণী অনুসারে, অবশ্য, সকল মাতার উর্দ্ধে ছন্দরূপিণী গায়ত্রী মাতার স্থান, যাঁহার শরণ লইলে ত্রিভুবন জয়ী হওয়া যায়। যাঁহার স্থান বিশ্বকেন্দ্রে সূর্য্যমণ্ডলে এবং সেই কারণে তাঁহাকে সবিতা দেবী নাম দেওয়া হয় ও "ব্রহ্মযোনি" বলিয়া স্তুতি করা হয়। সেই মাতা-সবিতার কিরণে প্লাবিত হইয়া জগৎ নিত্য নূতন জীবন পাইতেছে। আবার সূর্য্যকিরণরূপিণী মাতাকে আমরা দেখিয়াও দেখিতে পাই না। যদিও তাঁহার দ্বারাই জগতের যাহা কিছু সমস্তই উদ্ভাসিত হইয়া নয়ন গোচর হইতেছে। মাতা অদৃশ্যময়ী, সকলের "অচিন্ত্যরূপম্" হইয়া, বৃক্ষ, লতা, পশুপক্ষী, জীবসমূহ, সকল সন্তানসন্ততির জীবনে নিজকে প্রতিভাত করিতেছেন। অরূপ মাতার রূপের জাল এই ভাবে বিস্তার পায় দেখিয়া ঋষিরা তাঁহাকেই আদিমাতা বলিয়া ধার্য্য করেন এবং অরূপের সোনার কাঠিই যে সকলের জীবনে পরশ বুলাইয়া অমৃত সঞ্চার করিতেছে তাহা জানিয়া সেই ঐক্যের মধ্যে সকল ভেদভাব তাঁহারা ভুলিয়া যান। ভেদ যখন রহিল না, তখন রূপের গণ্ডী আর রহিল কোথায়? এইরূপে ঋষিদের পথ ধরিয়া রূপের অন্ত, অনন্তে পাওয়া যায়। মাতৃশক্তি ধন্য হয় এবং রূপের সীমানা সন্তানজীবনে দূরে এবং ক্রমশঃ আরও দূরে অপসারিত হয়।

এইবার নামের গণ্ডী কেমন করিয়া পুরুষ সন্তানেরা পার হইতে পারে তাহা বিবেচ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাম আমরা পাই পিতার নিকট হইতে। এই নামের পিছনে থাকে পিতৃদত্ত সম্পদ, তাঁহার দেওয়া "বর্ণ"। নাম ধুইয়া যায় বর্ণের ছটায়। নাম অত্যন্ত স্থূল, বর্ণ সূক্ষ্ম সামগ্রী, যাহার উৎসাহে আমরা সবাই জীবনে ছুটিয়া চলিয়াছি। বর্ণ জানাইয়া দেয়, মানুষের প্রতিভা কোন্ দিকে, কোন্ কাজে, মহিমান্বিত হইতে পারে। তখন মানুষ আত্মহারা হইয়া জীবনের ব্রতে আনন্দ ও শান্তি লাভ করে। ছেলেরা অপরিণত বয়সে নিজ নিজ প্রতিভা জানিতে বা ধরিতে সব সময়ে পারে না। শিক্ষকদের সে কার্য্যে সাহায্য করিতে হয়। কেমন করিয়া প্রত্যেক ছাত্র নিজ জীবনে স্বীয় প্রতিভার পথে অগ্রসর হইয়া, সেই মত সমাজের সেবা করিয়া, দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারে, তাহাই শিক্ষকের ঐকান্তিক প্রয়াস। মানুষ যখন এইরূপ পথ পায়, তখন শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই কৃতার্থ হন। সে সমাজ ও সে দেশ বিমল প্রতিভার বিকাশে কল্যাণতম হইয়া যায়। তখন পিতৃদত্ত নাম বা বর্ণ তাহার সাধন

শেষ করিয়া মানুষকে আকর্ষণ করে তাঁহার দিকে, যিনি অবর্ণ। ব্রহ্মের বর্ণ নাই। মানুষের জীবনে বর্ণের কাজ ফুরাইলেই অবর্ণ ব্রহ্ম তাঁহার পিতা লইয়া যান। শুধু পিতা নহে, সুহৃদ হইয়া যা'ন এবং তাঁহার (সুহৃদের) সম্পর্কে জগতের সমগ্র মানবকুল তখন সহোদর ও সহোদরা হইয়া যায়। এইরূপে মানুষ পিতৃবংশের গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া অসীম সংসারের যে অবর্ণ পিতা রহিয়াছেন তাঁহারই বংশধর হইয়া যান—যেমন উপরে বর্ণিত উপায়ের দ্বারা মাতার অঞ্চল ছাড়িয়া ব্রহ্মযোনি সবিতা দেবীর সংস্পর্শে উন্নতিশীল মানুষ রূপের সীমা অতিক্রম করিয়া অরূপের আকর্ষণে অভিভূত হন। তখন আবার মাতাপিতার ভেদজ্ঞানও অন্তর হইতে মুছিতে থাকে। যিনি মাতা, তিনিই পিতা। যিনি অরূপ, তিনিই অবর্ণ। বাহিরে রূপ নাই, অন্তরে বর্ণ নাই। অন্তর বাহির নাই। তিনিই পূর্ণ ব্রহ্ম। উপনিষদ্ বলেন, তিনিই মানুষকে তাহার অন্তর বাহির জ্ঞান হইতে মুক্ত করেন এবং সেই কারণে তাঁহাকে আমরা "স্ব" জানিয়া তাঁহার অধীন হইয়া, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলেন, ব্রহ্মকে জানিলে মাতা অমাতা হন, পিতা অপিতা হন, বন্ধু অবন্ধু হন, মন অমন হইয়া যায়। সকল সম্বন্ধ শেষ হইয়া গেলে, মানুষ পূর্ণমাত্রায় ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। আবার সেই সম্বন্ধ কেমন? তাহাকে সম্বন্ধবিহীন সম্বন্ধ বলা হয়, যাহাকে মুণ্ডক উপনিষদে সন্ন্যাস যোগ বলা হইয়াছে। তখন বুঝা যায়, ব্রহ্ম "অগোত্র"। যে সকল সম্বন্ধ মানুষকে ইহজীবনে আকর্ষণ করিতেছে, সে সবই তাঁহাতে লুপ্ত হইয়া যায়। থাকে শুধু স্বাধীনতার জ্ঞান। এই জ্ঞান মানুষের অনন্ত জীবনের চিরপাথেয়।

উপনিষদের পথ অনুসরণ করিয়া জন্ম সম্বন্ধে বিলয়মূলক (যাহাকে নির্ব্বিশেষ বলা চলে) জ্ঞান কিরূপে অর্জ্জন হয় তাহা দেখিলাম। গীতাতেও ইহার উল্লেখ পাই। গীতা বলেন, নিত্য সন্ন্যাসীর জীবনে সকল বন্ধন খুলে ত্যাগ হইয়া যায় (৫।৩)। কিন্তু এই প্রকার নাম ও রূপের ত্যাগ সম্পূর্ণ পথ বা গীতা পোষণ করেন না। কারণ এ পথে ভগবানের নাম ও রূপ পর্য্যন্ত সাধক-অন্তরে হারাইয়া যায় এবং অরূপ ও অনামা ব্রহ্ম তাহাকে পাইয়া বসেন। এ অবস্থা হইলে কর্ম্ম ও ভক্তির পূর্ব্ব অনুশীলনের সার্থকতা থাকে না। জীবন নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে শেষ হয়। যাহাতে সকল দিক্ রক্ষা হয়, জীবন সমন্বয় ধারায় পূর্ণতর হইতে থাকে, গীতা সেইরূপ সমন্বয়মূলক (যাহাকে সবিশেষ আখ্যা দেওয়া যায়) জ্ঞানের পক্ষপাতী। গীতায় এইরূপ জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ কয়েক স্থানে উদ্ভাসিত হয়। নিম্নে তাহারই সঙ্কলিত বিবরণ দেওয়া হইল।

গীতা বলেন, পিতামাতা নিশ্চয়ই আমাদের জীবনের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। কিন্তু কর্তা স্বয়ং উত্তমপুরুষ (১৪।৩-৪)। তাঁর কৃপা ব্যতিরেকে জীবের জন্ম হয় না। জীব সেইজন্য উত্তমপুরুষের সন্তান। আরও একটি কথা আছে। জীবনেরনিমিত্ত ও উপাদান কারণকে তিনি বিবর্ত্তন কারণ দ্বারা গ্রথিত ও বিবশ করিয়া থাকেন। বিবর্ত্তন (Evolution) শব্দের ইঙ্গিত হইতে বুঝা যায়, বিবর্ত্তন কারণ বিবস্বত সূর্য্য ও তৎপর তাঁহার পুত্র বৈবস্বত মনু (৪।১) হইতে উদ্ভব হইয়া সমগ্র জীবজগতে যথাক্রমে ছড়াইয়া পড়ে। তাই পুরুষানুক্রমে জীবজগতে বিবর্ত্তন-কারণের খেলা দেখা যায়।

পরিণামে সাধক যখন স্বীয় জীবনে জন্ম বন্ধ হইতে মুক্ত হইতে চান, তিনি অনুভব করেন যে তাঁহার দেহে পুরুষানুক্রমে জন্মবন্ধের গ্রন্থিগুলি জড়াইয়া রহিয়াছে এবং সে সকল গ্রন্থি উন্মোচন করিবার জন্য পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মানুরাগের শুভপ্রবৃত্তির যথাক্রমে শরণ লইতে হয়। এইরূপে উর্দ্ধতম আদিপুরুষ মনু পর্য্যন্ত নিবর্ত্তন করিতে হইলে (১৫।৪) "কর্ম্মানুসন্ধিনী" অহঙ্কারকে ত্যাগ পূর্ব্বক, যিনি "উর্দ্ধমূলম্" তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীবনবৃক্ষের নিম্নগামী "সুবিরূঢ়" মূল কেন্দ্র "অসঙ্গ শস্ত্রের দ্বারা" বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। তখন যিনি আদিপুরুষ তাঁহারই আদি-প্রবৃত্তি (১৫।৪) প্রাপ্ত হইয়া, সকল ধর্ম্মপথের পুনরাবৃত্তি (Recapitulation) শেষ করিয়া উত্তমপুরুষের নিকট আত্মদান করিলে পর, জন্মবন্ধের আর লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। অথচ পূর্ব্বপ্রয়াসের সঞ্চিত কর্ম্ম ও ভক্তির শুভবিন্যাসগুলি এই জীবনে মহাজীবন লাভের পথে সমন্বিত হইয়া যায়। এইভাবে উত্তমপুরুষ, মাতা, পিতা, প্রভু ও এমন কি পিতামহ পর্য্যন্ত হইয়া যা'ন, তখন তিনিই ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ (৯।১৭)। গীতা বলেন, এই জন্মেই

জন্মজন্মান্তরের নিবর্ত্তন পালা সাঙ্গ হইলে তবে জ্ঞানবান্ পুরুষ এই ভাবে "বাসুদেব"কে জীবনের সব জানিয়া "সুদুর্লভ মহাত্মা" নামে গণ্য হন (৭।১৯)।

গীতায় মহাজ্ঞানীর এইরূপ জ্ঞানকে আমরা সবিশেষ জ্ঞান আখ্যা দিয়াছি। গীতার ভাষায় ইহার স্ফুলিঙ্গগুলি আত্মসংযমের হোমানল প্রজ্জলিত করিয়া আত্মজ্ঞানের মশাল জ্বালায় ও তাহারই সাহায্যে জীবনের পথে চলা সম্ভব হয় (৪।২৭) নির্ব্বিশেষে জ্ঞান কতকটা সাবান গোলা জলের মত, যাহা সারা সত্তায় সকল বন্ধনজাত কলুষ ধুইয়া দেয় (৫।১৭) ও সেই সঙ্গে নিজেও ধুইয়া যায়। মানুষের নিজ স্বভাব অনুযায়ী এই দুই প্রকার জ্ঞানই যে সাধনপথে উপকার দেয়, তাহা বলা বাহুল্য। একটা হাসির উপমা এই প্রসঙ্গে মনে হইতেছে। ব্রহ্মকে অপ্ (up) ট্রেন বলা যায়, লয়পথে এই রথে পথের শেষ হয়। উত্তমপুরুষকে ডাউন (down) ট্রেন বলা চলে, কারণ তিনি সৃষ্টি ছাড়া হইতে চান না ও তাঁহার আনুকূল্যেও ভ্রমণ করিলে অফুরন্ত লীলা আস্বাদন করা যায়। আপ ট্রেনে যাইয়া ডাউন্ ট্রেনে ফিরিয়া আসিলে সনাতন ধর্মের পরিক্রমা করা হয়। গীতায় ইহাই "পরমাগতি"র নির্দ্দেশ (৮।১৩)।

জন্মবন্ধ হইতে মুক্তিলাভের উপায়গুলি যথাসাধ্য বলা হইল। এইবার সংক্ষেপে "বিনিমুক্ত" শব্দের লক্ষ্যার্থ জানা আবশ্যক। কর্ম্মফল ত্যাগ দ্বারা মানুষ জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হয়। পরে ভক্তির দ্বারা গুণাতীত হইলে জন্মবন্ধ হইতে নির্মুক্ত অর্থাৎ নিঃশেষরূপে মুক্ত হয়। পরিশেষে স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানদ্বারা নাম ও রূপকে, উপরিউক্ত নির্ব্বিশেষ অথবা সবিশেষ কিংবা উভয় উপায়ে অতিক্রম করিতে পারিলে, জন্মবন্ধ হইতে বিনির্মুক্ত হওয়া যায় অর্থাৎ এমন ভাবে নির্মুক্ত হওয়া যায় যে আর তাহাতে জড়িত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

এইবার শেষ কথা। "অনাময়" শব্দের অর্থ বুঝিতে হয়। তাহা হইলে জন্মবন্ধ হইতে বিনির্মুক্ত হইবার পথে কিরূপ অবস্থার প্রাপ্তি হয় তাহা ধরা যাইবে। প্রথমতঃ কর্ম্মফল ত্যাগ পূর্ব্বক যথারীতি কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলে তজ্জন্য শোক বা আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। ইহা অনাময় অবস্থার প্রথম চিহ্ন। দ্বিতীয়তঃ ভক্তিসাধন দ্বারা প্রকৃতির কবল হইতে উদ্ধার পাইলে দেহ অনাময় বা রোগরহিত হইবে। এ অবস্থায় দুঃখ, জরা, মৃত্যু বা পুনর্জন্ম (১৪।২০) আর হইবে না। তখন ইচ্ছা পূর্ব্বক বা যোগের অবস্থায় দেহ-ত্যাগ হইবে, রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই। তবে যদি অনাময় পুরুষ জাগতিক হিংসা বৃত্তির দ্বারা শর-বিদ্ধ হন তাহা হইলে তিনি দেহচ্যুত হইতে পারেন। ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ অনাময় পুরুষ যখন "স্বস্থ" হইলেন অর্থাৎ "স্ব"তে পূর্ণভাবে অধিষ্ঠিত হইলেন তখন তিনি "প্রসন্নাত্মা" হইবেন। সে অবস্থায় পরাভক্তি, পরাশান্তি ও পরাজ্ঞান তাঁহাতে আশ্রয় লইবে। আমরা এইরূপ মহানুভব ও পূর্ণকাম মানব-সন্তানের পদধূলির ভিখারী।

কথা ফুরাইল। তবু গীতার সুর শেষ হইবার নহে। উপসংহারে, জন্মবন্ধ সম্বন্ধে গীতার পথনির্দ্দেশের মহামন্ত্র যেমন বুঝিয়াছি, সেইমত হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক, সকলের সাথে বার বার অন্তরে আবৃত্তি করিতে চাহি, "জন্মবন্ধ বিনির্মুক্তাঃ পদম্ গচ্ছন্ত্যনাময়ম্"।
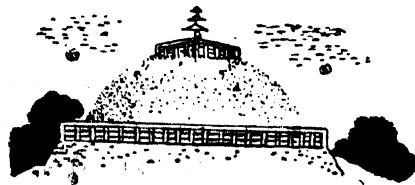
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ধান-কাটা চুকে গেছে। বাউরীপাড়ার ঘরগুলো এবার অনেকখানি খালি হ'য়ে গেছে। কাজ-কর্ম নেই, চাষ-বাসেও মন্দা পড়ে এসেছে, ওরা খাবে কি! অনেক ভেবে-চিন্তে ওরা চলে গেছে কাজের ধান্দায়। বেজা চুপ করে বসে আছে। তামাকও নেই, বুড়ী তখনও বকবক করছে।

—কি করতে যি মাটি কামড়ে পড়ে আছিস্ তুরো কে জানে?

—সাত পুরুষের মাটি যি গো।

টেরি বাউরী জবাব দেয়। বুড়ী মুখ-ঝামটা দিয়ে ওঠে।

—মাটি। তুর বাপের মাটি লা? ওই তো শূয়োর-খুপরী এট্টুন চালা—যি-খানেই যাবি উ হয়ে যাবেক, তবে কিসের মায়া! প্যাট-প্যাট যিথানে ভরবেক সিথানেই ঘর।

বেজাও কথাটা ভেবেছে। এ মাটিতে তার পেটও ভরেনি, ঘরও ভরেনি, দেনা করে বিয়ে করেছিলো ডাবিকে, সেও কোথায় পালিয়েছে।

দেশের লোক যাচ্ছে দুর্গাপুরে—বেনাচিতিতে। কাজের অভাব সেখানে নেই, পয়সা দেয়। ধানের বদলে দৈনিক আড়াই টাকা মজুরি, বেজাও ভেবে ভেবে কিনারা পায়নি।

বাধা দেয় নিতে—যাস্ নে বেজা।

খাব কি ইথানে?

তার জবাব আর নিতাই দিতে পারেনি। কেউ দিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তাই আর বাধা দেয়নি।

ওরা অনেকেই চলে যাচ্ছে—দুর্বার টানে নদী যেমন করে সমুদ্রের দিকে ছোটে, তেমনি কোন দুর্বার আকর্ষণেও ওরা ছুটে চলেছে ওই আলো ভরা কোন নোতুন দিগন্তের দিকে—নোতুন আশায় বুক-বেঁধে।

বেজা বলে ওঠে—ইথানেও উপোস, সিথানেও কাজ না পাই উপোস। তা একবার বরাত-ফিরি করেই দেখে আসি নিতে।

নিতাই ঠাণ্ডা-কল্‌কেটায় কয়েকটা ব্যর্থ টান দিয়ে নামিয়ে বিরক্ত হয়ে দেখতে থাকে। সবই নিভে গেছে।

বলে ওঠে—যা।

বেজা চুপ করে থাকে। কি যেন ভাবছে। বট-গাছের মাথায় আঁধার নেমেছে, পাতাগুলোর রং চাপা অন্ধকার—অনেক দিন থেকে জন্মের প্রথম থেকেই ওরা এই বনস্পতির ছত্রছায়ায় মানুষ হয়েছে। কেমন মায়া পড়ে গেছে ওর উপর—এ মাটির উপর।

—যদি বৌটা ফেরে একটা খপর দিবি নিতে?

নিতাই ওর দিকে চেয়ে থাকে—এখনও বেজা ভোলেনি ডাবিকে। ওর কথা ভাবে—বলে ওঠে নিতে।

—উথানে যি যায় সি আর ফেরে না বেজা। ডাবিও ফিরবেক নাই।

—ফেরে না? যেন মনে মনে চমকে ওঠে বেজা।

জমাট অন্ধকারের মত আতঙ্কের কালো ছায়া মনভরে তোলে। তবু তার না গিয়ে উপায় নেই।

বাঁকেই এতদিনের সংসার—শিকড়-সমেত তুলে ফেলে। ছেঁড়া-তালাই কাঁথা দুটো আর মেটে-হাঁড়িতে চাটি চাল—এই তার এতদিনের সংসারের মূলধন। সংসারে বেঁচে থাকতে গেলে মানুষের প্রয়োজন কতটুকু তা বেজার বাঁকের সংসার দেখলেই বোঝা যায়।

বুড়ী তাগাদা দেয়—চলরে? উরা এগিয়ে গেল যি। ছটফট করছে সে, কখন এ মাটি থেকে বেরুতে পারবে।

—যাচ্ছি গো।

বেজার মন কেমন করে। আঁধার-ঢাকা গাঁ ওই তারা-জলা আকাশ কেমন ছল ছল চোখে যেন তার দিকে চেয়ে থাকে—কি এক না-বলা ভাষায় ডাক দেয়। ডবির কথা মনে পড়ে।

—হঠাৎ কার ডাকে থমকে দাঁড়াল।

বের হয়ে এসেছে টেরি বাউরী—কুৎসিত মুখ আর দুর্বার যৌবনপুষ্ট-দেহ আবছা আঁধারে উদগ্র হয়ে উঠেছে। অবাক হয় বেজা।

—তুই!

আমিও যাবো। লিয়ে চল কেনে?

হাসছে মেয়েটা কেমন নির্লজ্জ হাসি। হঠাৎ কেমন সুন্দর দেখায় ওকে। মনে হয় আপন জন। কাছঘেঁসে এসে দাঁড়িয়েছে টেরি। ওর দেহের উতপ্ত-স্পর্শ লাগে বেজার বুভুক্ষু দেহ-মনে।

—যাবি?

—লয় তো কি মশকরা করছি তুর সাথে?

বেজা ওর বলিষ্ঠ-হাতটা চেপে ধরে, চমকে ওঠে টেরি। কেমন দু'চোখের চাহনিতে ওর অবাক বিস্ময় আর আনন্দ। কাঁপছে অজানা আনন্দের সেই আবেশে, কোথায় যাবে জানেনা বেজা—তবু মনে হয় ওকে একটু নির্ভর। একজন তাকে ঠকিয়েছে—এগিয়ে এসেছে সেই শূন্যতা পূর্ণ করতে অন্যজন।

ওর যৌবনপুষ্ট দেহটা এসে মিশেছে বেজার দেহে, কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে রক্তস্রোত। ঝড় বইছে সারামনে।

হঠাৎ আবিষ্কার করে বেজা আজ—সেও মানুষ—পুরুষ। ডাবিকে ভুলে যেতে চায়—আবার বাঁচবে সে নোতুন করে।

হাঁপাচ্ছে টেরিবাউরী ওর কঠিন নিষ্পেষণে।

ছাড়। খেপে গেলি নাকি তু। হাঁরে। সঙ্গেই তো যেছি।

ছেড়ে দেয় ওকে বেজা—চল।

নির্ভয়ে এগিয়ে চলে টেরিবাউরী এ গ্রাম ছেড়ে অন্য জীবনে। বুড়ী গজগজ করে—মুয়ে আগুন। মুয়ে আগুন খেয়ো কুকুরগুলোর।

ব্যাপারটা তার ছানিপড়া চোখের দৃষ্টি এড়ায়নি—কথাগুলোও কানে গেছে। গজগজ করছে বুড়ী।

—আপনি পায় না—শঙ্করাকে বলে মধ্যে শো।

টেরি অন্য সময় হলে খেঁকি কুকুরের মত ঝাঁ ঝাঁ করে লাগত—এ সময় সেও সাড়া দেয় না, তার মনে কি এক নোতুন জগতের নেশা। মরা হাজা এ গ্রাম ছেড়ে—নোতুন আলোজলা ঝলমল কোন শহরের নেশা।

...বেজার টানে গাঁ ছাড়ল না—সেই রঙ্গীণ নেশার টানে—তা সে ও জানে না।

—বোঝাটা আমাকে দে।

বেজার ঘাড় হ'তে বাঁকটা নিয়ে টেরি চলছে। চলার গতিবেগে দুলছে তার এতদিন ব্যর্থ তৃষিত যৌবন—উদগ্র কামনা যেন উথলে উঠছে সব বাঁধন ছিঁড়ে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে বেজা। মেয়েটাকে এতদিন দেখেনি। শুধু ফিরিয়েই দিয়েছে।

হাসছে টেরি—ওই হোল কি রে তুর?

—কেন?

—হাঁ করে কি ভাবছিস? চল।

টেরি কাপড়চোপড় গুছিয়ে সামলে নিয়ে পথ চলতে থাকে।

...মিষ্টি ওদের দেখছে। গ্রামের অনেককে। ওরা যাচ্ছে—চলে যাচ্ছে গাঁ ছেড়ে ওই নোতুন শহরের টানে। সনাতন—গঙ্গাঠাকরুণ গেছে। গেছে বাউরী কাহার পাড়ার অনেকে। মেয়েমদ্দ বাছবিচার নেই—চলেছে

তারা, আলোর টানে যেমন ছোটে গঙ্গাফড়িং প্রজাপতি, তেমনি ছুটে চলেছে ওরা।

ছানু দাস আজকাল অনেক ভদ্র হয়ে উঠেছে। তেমন গায়ে গতরে মুনিষ মাহিন্দারের মত না খাটলেও চলে, তাই ধুতির উপর একটা ফতুয়া পরে সাইকেল হাঁকিয়ে চাষবাস—কাজকর্ম—আদায়-ওয়াশীল—দোকানের বকেয়ার তাগাদা দিয়ে বেড়ায়। শুকনো কাঠির উপরও শাঁস গজিয়েছে। একটু মাংস চর্বি দানা বেঁধেছে লম্বা তেড়ঙ্গা কাকতাড়ুয়া ওই ছানুর দেহে।

দোকানের বাইরে বসে সেদিন মনি দত্ত অবনী মুখুয্যে বিধুবাবু অনেকেই জটলা করছে। ও জায়গাটা এখনও সেই আগেকার অবস্থাই রয়েছে।

সতীশ ভটচাযকে আসতে দেখে ছানু গড় হয়ে পেন্নাম করে।

—আসুন ভটচায মশায়।

সতীশ গম্ভীরভাবে কুলআঁটি ভরা ঠ্যাংটা তুলে একটা চেয়ারে বসল। অবনী মুখুয্যে একটু ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে। দেখছে সতীশকে।

এই ডামাডোলের বাজারে সতীশ ভটচাযও গুছিয়ে নিয়েছে। সেই লক্ষ্মীপূজো ষষ্ঠীপূজো তন্ত্রধারকবৃত্তি ছেড়ে সতীশ নিয়েছে ভৃগুসংহিতা, সামুদ্রিক জ্যোতিষ আর করকোষ্ঠী বিচার—আর তেজিমন্দার খবর বলার ব্যবসা। বরাত ফেরানোর পাল্লাপাল্লির দিকে ওই ঠিকাদার—দুর্গাপুরের নোতুন আড়তদার ব্যবসায়ীদের মনের অতলের খবরটা ওদের দুর্দম লোভ আর লুণ্ঠনের লালসায় সে ঘৃতাহুতি দেবার পথটাই বেছে নিয়েছে এবং পেরেছেও কিছুটা।

তাই তার বরাতও বদলেছে। পানু তার প্রথম শিষ্য। তার মারফৎই ওর যশসৌরভ বিকীর্ণ হয়েছে গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে সদরের মাড়োয়ারী মহলে—দুর্গাপুরের লুণ্ঠনযজ্ঞের ঋত্বিকদের কাছেও।

পরণে লাল গরদ কাঁধে চাদর। কপালে রক্ত চন্দনের টিপ, গলায় পদ্মবীজের মালা একছড়া। পায়ে শুড়-তোলা পণ্ডিতী চটি।

—একবার দুর্গাপুর যেতে হবে ছানু। মোহন দাস মাড়োয়ারীর গদ্দিতে। ওখান থেকে বাগেড়িয়ার মোকামে।

—ছানু বলে ওঠে—আজ্ঞে বাস এল্ল বলে, আর সেদিন তো নাই যে দিন গেলে দুখানা ছাকড়া গাড়ী,তাও নামিয়ে দিলেক নদীর এপারে—সাঁয়া নদী বালি জল পেরিয়ে ভুবনপুরের মাঠে পরাণ হাতে করে যাও কোপটাক—তবে দুর্গাপুর। এখনতো চাপলাম কি নামলাম একেবারে দুর্গাপুর বাজারে। দিন একেবারে বদলে গেছে কাকা।

সতীশ ভটচায পা নাচাতে নাচাতে রাস্তার দিকে নজর রেখে গম্ভীর ভাবে সায় দেয়—তা ঠিকই বলেছিস বাবা।

অবনী মুখুয্যে বলে ওঠে—তাতো দেখতেই পাচ্ছি। নাহলে—।

ওর কথাটায় যেন কানই দেয়না কেউ। অবনীর সেই প্রতাপ কোথায় হারিয়ে গেছে। সূর্য্যের তাপে তাতা বালির মত তারা ছিল তারকরত্নকে ঘিরে—গ্রামের সবই চালাতো তারা। আজ কোথায় সেই দিন বদলে গেছে, অনেকেই মাথা তুলেছে, স্বস্ব প্রধান হয়ে উঠেছে। বাকী যা কর্ত্তৃত্ব করবার আছে তার বেশীর ভাগই ছড়িয়ে গেছে—খানিকটা পেয়েছে পানুদাস, বাকীটুকুও পাবার আশা করছে সেইই।

সতীশ ভটচায বলে ওঠে—হ্যাঁরে পানু, ইট কিছু কিনতে হবে।

—ইট! কেনে? ছানু কেন অবনীও অবাক হয়। খেতে জুটতো না সেই পেটো ঝাড়া বামুন, আজ চালের খড় এর ভাবনা নয় ইট কেনার ভাবনা ভাবে।

—একটু ঘর তুলতাম রে। বাইরে থেকে দু'পাঁচজন ভক্তশিষ্য আসতে চায়। বসাই কোথায় তাদের। সেদিন মোহনদাসকেও কথাটা বললাম। তা মোহনদাস—বাগেড়িয়া—ঝুনটলাল—ওরা সবাই তখুনিই রাজী হয়ে গেল—গুরুজীর মোকাম বানাতে হবে।

—তাই নাকি? মণি দত্ত কথাগুলো গিলছে।

চুপসে গেছে অবনী, মনে মনে গজরাচ্ছে অসহায় আক্রোশে।

বলে ওঠে সতীশ।

শুনছিলাম বড়বাবু—আমার তারকবাবু নাকি কিছু পুরোনো ইট কাঠ বিচবেন হ্যাহে অবনী?

অবনীর হাতের সেই আনন্দবাজার কাগজও আর নেই। তারকবাবু কাগজ নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

তবু এতটা অসহায় ভাবতে পারেনা তারকবাবুকে। জবাব দেয়—তা একদিন গিয়েই না হয় জিজ্ঞাসা করো তাকে ভটচায। আগেতো ওখানেই পড়ে থাকতে, খেয়েছেও ওদের অনেক।

সতীশ ভটচায উঠে পড়ল, ও প্রসঙ্গ যেন মোটেই শুনতে চায় না। বলে ওঠে যাদের ভাবনা তারাই ভাবুকগে অবনী। দুগ্‌গা দুগ্‌গা, যাই দশটার বাসের আর দেরী নাই।

পায়ের কুলআঁটিগুলো বোধহয় সদরের ডাক্তার দিয়ে ভাল করিয়েছে। এখন বেশ সোজা হয়েই হাঁটে সতীশ ভটচায, পা টেনে চলতে আর হয় না।

অবনী ওর দিকে চেয়ে থাকে। কেমন যেন অনাগত ভবিষ্যতের দিকে পা ফেলে চলেছে একটি নোতুন মানুষ। সত্যের অতীত যাকে স্বীকৃতি দেয়নি—মিথ্যা আর প্রবঞ্চনার ভবিষ্যৎ তাকে বরণ করে নিয়েছে। মূল্য দিয়েছে তার মিথ্যাভাষণের কাঞ্চনমূল্য।

হঠাৎ মিষ্টিকে আসতে দেখে জায়গাটার রূপ একটু বদলে যায়। এখনও সে যেন তেমনিই রয়ে গেছে। সেই লাস্যময়ী নারী। চুলগুলোতে পাকও ধরেনি, বাঁধনও তেমনি অটুট। পরেছে নীলাম্বরী শাড়ী, সদ্যস্নানসেরে মাথার চুলগুলো রোদে শুকোবার জন্য খুলে রেখেছে।

—মুখুয্যে মশায় যি গো?

—হ্যাঁ। যেছি একটু মুলগায়েনের বাড়ী। মুড়ি দিতে।

ছানুই বলে ওঠে—সবাই দুগ্‌গোপুরে যেছে তা হ্যারে তুই যাবিনা? কারিগরকে বল—গেলেই তো চাকরী উর বাঁধা।

হাসে মিষ্টি—কারিগরের কথা কারিগর জানে।

—আর তুই!

হাসে মিষ্টি। সুন্দর নাকমুখ চোখ আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। জবাব দেয় মিষ্টি।

—সহর কে দেখেছি ছানু। কোলকাতা—বর্দ্ধমান অনেক শহর। উথে আর সখ নাই। উ নেশা তুদের পেথম ছান্, তুরোই যা। দাঁড়াল না মিষ্টি, মুড়ির ডালাটা নিয়ে চলে গেল—শাড়ীর আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে। হাসছে ছানু।

—কথায় পারবার যো নাই উটিকে।

—সবচিন্তা যেন ওদের তালগোল পাকিয়ে যায়। অবনীমুখুয্যে সেই ধুয়োতে ফিরে আসে।

—তাহলে এবার চাষ আবাদের কি হবে? মণিদত্ত ভাবছে কথাটা—সত্যিই মহামুস্কিল হলগো। মুনিষ মাহিন্দরতো আর কেউ থাকতেই চায় না।

ছানু বলে ওঠে—থাকবেক কেনে? দুগ্‌গাপুর ওই যে মিষ্টি ঠিকই বলেছে। দুগ্‌গাপুরের নেশা। দিন খাটলেই আড়াই টাকা রোজ। থাকতে খুপরীও দিছে—কে আর রোদে জলে মাঠে গরুবাছুরের সঙ্গে খাটবেক বলো।

তাহলে কি চাষ হবে না? অবনীমুখুয্যের দল এবার সমস্যায় পড়েছে। কমজোরী চাষী তারা—তায় আবার বামুন চাষী। পরের হাতে হাললাঙল সবকিছু। নিজেদের খাটবার সামর্থ্য নেই। মধ্যস্বত্ব—সাজা ধান আদায় এতদিন ছিল, তাই দিয়েই বাইরের ঠাট বজায় থাকতো। তার উপর খাসহালে সেই দাপট আর প্রতিষ্ঠার জোরে মুনিষ দিয়ে চাষ আবাদ করাতো।

এখন বাইরের সেই রোজকার যাবার সঙ্গে সঙ্গে সব গেছে। এখন আর মুনিষ মাহিন্দারও মেলেনা। চলেছে সব গ্রামছেড়ে। অবনী বলে—ব্যাটাদিকে উৎখাত করে দোব, ভিটেছাড়া করবো।

নীলাম্বরবাবুও যাচ্ছিলেন পথদিয়ে, ওদের কথা শুনে দাঁড়িয়েছিলেন। কথাটা তিনিও ভেবেছেন। সারা গ্রামের সব জমি চাষ হবেনা—অনেকেই চলেগেছে কারখানায় কায পেয়েছে।

—ওর কথায় হাসেন তিনি—ওভিটে তো ওদের নামেই সেটেলমেন্ট হয়ে গেছে। ছাড়াবার মালিক আর তুমি নও অবনী। তাছাড়া মনে হয় ও মাটির তোয়াক্কাও তারা করেনা আর।

—তবে? অবনীও কথাটা বুঝতে পারে।

—সেটা আমাদেরই ভেবে বের করতে হবে। জমি চাষ করা দরকার। নীলাম্বরবাবুর কথাটা তারাও ভাবছে। কোন রোজকার নেই, জমির উৎপন্নই ভরসা। সেই জমি অনাবাদী পড়ে থাকলে তাদের অবস্থাও কোনখানে দাঁড়াবে কে জানে।

—একটা সুরাহা নাহলে সমূহ বিপদ।

—তাতো বটেই। সায় দেন নীলাম্বরবাবু।

ছানু দাস কথাটা তত বেশী ভাবেনি। সে জানে যেমন করেই হোক তার মুনিষমাহিন্দার জুটবেই। লোকজন দিয়ে চাষ করিয়ে নিবে। বরং অভাব অনটন একটু বাড়ুক গ্রামে—মধ্যবিত্ত ওই মুখোসধারী লোকগুলোর এতদিনের দাপট কমবে, মাথানীচু করে আঁধার রাত্রে আসবে তারা—ছানু দাস টাকা ধার দিয়ে বিক্রী কোবলা লিখিয়ে নেবে।

—হাঁ, তামাম গ্রামের আধখানা জমি আবার নানা বেনামীকে সে গ্রাস করবে। মনে মনে ওদের অবস্থাটা কল্পনা করে খুশীই হয়।

নীলাম্বরবাবু বলে ওঠেন।

—বিপদ কালে অর্দ্ধেকও ত্যাগ করতে হয় দরকার বুঝে?

—তা সত্যি। মণি দত্ত কথাটায় সায় দেয়।

—ভেবে দেখো, একটা পথ বের হবেই। কিন্তু ইদিকে যে বৈশাখ এসে যাবে। আচ্ছা ভাঙ্গা-জমি চষা, বীজ ফেলা নানা ঝামেলা, আগে থেকে ব্যবস্থা নাহলে?

অবনী আজ সত্যই বিপদে পড়েছে। তারকবাবুর এসবদিকে মন নেই, কেমন একেবারে বদলে গেছে, লোকটা বাজপড়া তালগাছের মত স্তব্ধ নির্বাক হয়ে গেছে।

তাকে ভরসা করা যায় না। ধরণী মুখুয্যে টাকে হাত বুলোয়—মণি দত্তই বলে—দেখুন, নাহয় একবার যাবো আপনার কাছে পরে।

এসো।

নীলাম্বর বাবু চলে গেলেন।

ওরা তখনও বসে আছে। বেলা বেড়ে চলেছে। শীত চলেগেছে। আসছে ঊষর প্রান্তরে খররৌদ্রের বিভীষিকা—সারা মাঠ জুড়ে অসীম শূন্যতার মাঝে ধূসর রোদ আর রোদ। লি লি কাঁপছে রোদের লেলিহান শিখা—সব সবুজ ঘাসগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

বুক জ্বলছে মাটির—ধরিত্রীর কোন দুঃসহ বেদনায়।

—ক'দিন বাইরে বাজাতে গিয়েছিল অবিনাশ। সদরে কোন বিয়ে বাড়ীতে। সবে ফিরেছে।

—সঙ্গে এনেছে অনেক কিছু।

…ওই মূল গায়েন যি গো? ধোঁয়ায় যে ধোঁয়াকার করে ফেলাইছ—মিষ্টিকে দেখে মুখতুললো অবিনাশ। সবে বাড়ী ফিরে চা বসিয়েছে উনুনে।

মিষ্টির কথা শুনে ওর দিকে চাইল। ঘন ধোঁয়ার আবরণ ভেদ করে ও এসে দাঁড়িয়েছে। নীলশাড়ী আদুড় গা ঢেকেছে ওর আঁচলে। মুখে মিষ্টি হাসি, কপালে কাঁচপোকার টিপটা ওই সুন্দর মুখের হাসিটুকুকে রঙ্গীণ বিচিত্র করে তুলেছে।

—ওই মিতেন যি গো!

—তা চোখ যে জলে ভরে উঠেছে। কার শোগে?

—ভিজে কাঠ উনুনে দিয়ে চোখের জল মুছছি ভাই।

অবিনাশ জবাব দেবা' চেষ্টা করে।

মুড়ির ডালাটা নামিয়ে রেখে এগিয়ে আসে মিষ্টি। —সর দিকি, কতবার বললাম একটা মানুষ আনো, মনের মানুষ। নিজেই ফুঁ দিতে থাকে উনুনে। অভ্যস্ত ফুঁ—উনুন জলে ওঠে সহজেই।

—দেখলা?

হাসছে অবিনাশ—মনের আগুন উনুনে লেগেছে।

—মিষ্টি জবাব দেয়।

—কারোও বুকে লাগাতে লারলাম, তাই উনুনেই লাগল। সরো চা দুধ আনো দিকি, বানিয়ে দিই। তা কদিন কোথায় বায়না ছিল?

অবিনাশ ওর দিকে চেয়ে থাকে।

মাঝে মাঝে ওর দিকে চেয়ে কোথায় সুদূরে যেন হারিয়ে যায়, ও একটি সুরের রেশের মতই দূর থেকে শুধু মন ছুঁয়ে যায়, কাঁপিয়ে যায় সারা মন কি এক হিন্দোলে—কাছে থেকে ধরা ওকে যায় না।

রংটা ফর্সা—উনুনের কাঠের আগুনের তাপে একটা দিক লালচে হয়ে উঠেছে। চোখ দুটোও ডাগর—বেশ টানা টানা। কথার সহজ ভঙ্গীটুকু—মনের একটা মিষ্টি সুর ঝরে পড়ে।

অবিনাশ বুঝতে পারে না—কেন সে তার নিজের পাড়া ছেড়ে এইখানে এসে ঘর বেঁধেছে—ঠিক তার বাড়ীর পরিবেশটাই এড়িয়ে এসেছে—তা কারো সান্নিধ্য পাবার কামনাও ছিল মনে মনে।

…অবিনাশ এবার সহরে একেবারে সাহেব সুবোদের মন ভরিয়ে এসেছে সুর দিয়ে।

—বুঝলি স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট তো উঠে এসে আসরের সামনে বসলেন। আরও কত মহাশয় লোক। শোনালাম দরবারী—তারপর ললিত—শেষকালে ভৈরবী ঠুংরী। একেবারে বন্দেজী জিনিষ ফৈয়জ খাঁ সাহেবের ঘরের সেই ঠুংরী, —বাজুবন্ধ খুলু খুলু যায়। একেবারে বিলম্বিত থেকে মধ্য লয়, তার দ্রুতে এসে সোম। আহা!

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মিষ্টি ওর দিকে।

মাঝে মাঝে তার মনে কেমন যেন ঝড় ওঠে। সেই আগেকার দিনগুলো।

অবিনাশ সেই আলো আর সুরের দেশে মানুষ।

অবিনাশ বলে চলেছে—সেবার কলকাতায় বড়ে গোলাম সাহেবের গান শোনলাম মিতেন। আহা! কি জিনিষ। তেমনি ঠুমরী। গজলের কিছু মিশেল আছে কিন্তু সাফ্ দিলমাতানো জিনিষ। তুলেছি, বারবার সাধছি মিতেন। বাইরে এখনও শোনায় নি। ইবার কলকাতায় গিয়ে প্রথম শোনাবো—শোনবা তুমি! গুণ গুণ করতে থাকে সুরটা। ক্রমশঃ সানাইএ ফুটে ওঠে সেই সুর।

আওয়ে না বালম্
ক্যা করু সজনী॥
তড় প্‌ত জিয়া মোর
উনো বিনা তড় পে।
আওয়ে না বালম॥

মিষ্টি ওই কথাগুলো বুঝতে পারে। অনেকদিন সে শুনেছে ওই ভাষা। কেমন বিচিত্র তার সুর।

রৌদ্রতপ্ত উষর ওই গৈরিক প্রান্তর—রোদপোড়া শালমহুয়ার বন—ওই তামাটে দিগন্তসীমা কোথায় হারিয়ে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে শ্যামসবুজ একটু স্বপ্নস্পর্শ। তারই মাঝে পুঞ্জীভূত শ্যামলিমার মত জেগে উঠেছে অবিনাশের মুখখানা—দুচোখে কোন মায়ামদির নীলাঞ্জন রেখা।

—কি হল মিতেন?

অবিনাশও চমকে উঠেছে। কেটলীর জল উপছে পড়ছে—উনুনে। গরম জল। অপ্রতিভ হয়ে ওঠে মিষ্টি—এই যাঃ।

…তাড়াতাড়ি কেটলীটা নামিয়ে কাপে ঢালতে থাকে মাথা নীচু করে। অকারণেই গায়ের কাপড়গুলো ঠিক করে নেয়—কেমন লজ্জা ছেয়ে আসে সারা দেহে।

…একটা জিনিষ ছিল মিতেনঃ উ আর আমার কি কাযে লাগবে। তুমিই নাও।

—কি গো? মিষ্টি প্রশ্ন করে।

অবিনাশ ঘরের ভিতর থেকে প্যাকেটটা এনে দেয়।

—ওখানে বাজনা শুনে বকশিস্ দিলেন কোনবাবু, ভালো বিষ্ণুপুরী শাড়ী। তা তোমার জন্যেই দিলাম। ধরো।

—ওমা! ইযে খাসা গো। বেশ ঢের দাম লাগছে।

—দামী লোকই পরবে। হাসে অবিনাশ।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কল্‌কাদার শাড়ীটা দেখতে থাকে মিষ্টি। দুচোখে ওর খুশীর আভা। হাসছে অবিনাশ।

তার আনন্দের ভাগ আর একজনকে দিতে পেরেছে এই খুশিতে।

—চলি মিতেন বেলা হয়ে গেল।

চলে গেল মিষ্টি। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অবিনাশ।

মনে আসে গুণগুণানি সুর। রুক্ষ বন্ধুর রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরের বুকে যেন শ্যামল ছায়া নেমেছে—দূরে দীঘির টলটলে জলে হাজারো মাণিকের ঝলমল আভা। কথাটা কিছুদিন থেকে কারিগরও ভাবছে।

লোকটা চুপ করে থাকে—কথাবার্তা বলে কম। এতদিন ধরে দেখে আসছে—মিষ্টিকেও দেখেছে, তবু মনে হয় ওই দীঘির কালো অতলজলের মতই ছন্দময়ী রহস্যময়ী কোন নারী। মেঘ জমলে ছায়া কালো হয়ে আসে দীঘির জলে—একটু তারার আলোও স্পর্শ বুলোয় তার বুকে—সূর্য্যের আভায় ঝলমল করে ওর সারা অঙ্গ।

মিষ্টিও যেন ওরই জাত। তবু ওর বুকের তলের খবর থাকে অজানা।

কারিগর দেখছে—গ্রামের সেই শান্ত অলস জীবনযাত্রার গতি বদলে গেছে। আগেকার সেই সামান্য নিয়ে তৃপ্তির স্বপ্ন ওদের মনথেকে মুছে গেছে। অভাব সহ্য করেও চুপ করে থাকেনা, আজ তারা তাই বের হয়েছে বাইরে ও দুর্গাপুরের কারখানার দিকে।

দরকার হয়েছে তাই মাটির টান—যা এতদিন জগদ্দল-পাথরের মত তাদের বুকে চেপে বসেছিল তাকে টেনে

ছিড়ে উধাও হয়েছে—যাযাবরের মত। নিশ্চিন্ততা ছেড়ে অনিশ্চিতের দিকে পা বাড়িয়েছে। ঝরণা যেমন করে বনের সীমানা ছেড়ে লোকালয়ের দিকে এগিয়ে যায়।

…এতদিন সেও বাধাপড়েছে মিষ্টির বাঁধনে। কোথাও কেউ নেই যাযাবর মানুষটা হঠাৎ একদিন ভালবেসেছিল, ঘরও বেঁধেছিল, কিন্তু আজ কেমন ঝড় ওঠে আবার মনে।

সেই ঘরের ভিত্তিমুলে কোথায় নাড়া পড়েছে।

আজ ক্লান্তি এসেছে, দীর্ঘদিনের আলস্যের ক্লান্তি। পানুদাসের কলে সেদিন ডাইনামোটা বিগড়ে গেছে, ভর্তি মরসুমে কাষ বন্ধ। ওদিকে রাশি রাশি ধান অর্দ্ধেক সিদ্ধ হয়ে ভিজছে চৌবাচ্চায়—বেশী ভিজলে চালে গুমো গন্ধ হয়ে যাবে, তাছাড়া পেষাই কলে পড়লে গুড়োহয়ে যাবে অর্দ্ধেক চাল। সমূহ লোকসান।

পানু ব্যস্ত হয়ে পড়ে—সদরে, দুর্গাপুরে লোক পাঠালেও সঙ্গে সঙ্গে মিস্ত্রী মিলবেনা। মহাভাবনা। এমন সময় কারিগরকে দেখে ছানু রসিকতা করে।

—পারবা কারিগর মেসিনটা সারতে। দিনরাত টুং টাং খুট খাট করো। থমকে দাঁড়াল কারিগর। অতীতের বিখ্যাত মিস্ত্রী। কেমন যেন একটা সাংঘাতিক গোলমালের জন্য ইছাপুরের কারখানা থেকে পালিয়ে এসেছিল, আর যায় নি।

অতীতের সেই ফটিক মিস্ত্রীর সত্তা আবার যেন জেগে ওঠে। চুপকরে এগিয়ে যায়। যেন ওর কথাটা শুনতেই পায়নি। কইহে শুধুই কারিগর তুমি!

থমকে দাড়াল কারিগর—চল, দেখি তোমার কল। পানুদাস বলে ওঠে ছাগলদিয়ে ধান মাড়াই হয় না, ছানু তা'লে বলদ কেউ কিনতো না। দেখ কারিগর কথা বলেনা। ডায়নামোটা অভ্যস্তহাতে শ্লাই-রেঞ্চ দিয়ে খুলে-ফেলে নিমিষের মধ্যে ওর হাতে রেঞ্চের ব্যবহার দেখে পানু একটু চমকে ওঠে। জটপাকানো তারগুলো টেনে টেনে দেখে একটা প্লাগকে টাইট করে লাগিয়ে দিয়ে সুইচ অন করে দেয়।

…চলছে, মেসিন। হলারটা ঘুরেছে।

‥কথা না বলে আবার ঢাকনাটা লাগিয়ে নাটবল্টু গুলো টাইট করে দেয়। বলে ওঠে—

—দাস মশাই ও ডাইনামো বেশীদিন চলবেনা, বাজে মাল দিয়েছে তোমায়। ভিতরের মাল সব পুরোনো জ্বলে যাবে ওতারগুলো।

—তাহলে?

—বদলাও ওসব। তার কিনে আনো, নাহয় সদরের ভালমিস্ত্রীদিয়ে কয়েল বদলাও রিওয়ারিং করো।

বের হয়ে এল কারিগর। পানু কি যেন ইসারা করে ছানুকে। ওর পিছু পিছু বের হয়ে এল ছানুও।

ছানু সেই থেকেই পিছু লেগে রয়েছে। অল্পপয়সায় কায করানোর জন্য অকারণেই খাতির করে; কলে নিয়ে যায়—আপ্যায়ন করে।

…কেমন বদলে যাচ্ছে কারিগর। ওই শ্যাক্টের ঘূর্ণায়মান চাকার গতিবেগে আর বিচিত্র শব্দে সেই হারানো ফটিক মিস্ত্রী জেগে উঠছে অতীতের বিস্মরণের প্রস্তরস্তূপ ঠেলে।

…জেগে উঠছে তার স্বাভাবিক সেই প্রবৃত্তিগুলো।

…তেলগ্রিজ আর লুব্রিকেটিং ওয়েল এর গন্ধ তার নাকে লাগে, শ্লাই রেঞ্চ, মঙ্কি রেঞ্চ আর সেই ধাতব পদার্থের কঠিন স্পর্শ তাকে নতুনকরে জাগিয়ে তুলেছে।

রিওয়ারিং—ওয়েলডিং, ডাইনামো ফিটিং সবই করতে সুরু করেছে সে।

হঠাৎ খবরটা মিষ্টির কাছে ধরাপড়ে,এতদিন সব কথাই চেপেছিল কারিগর।

মিষ্টি বাড়ী ফিরছে, মনে তখনও অবিনাশের সেই সুরটা। ঘরে পা-দিয়ে দেখে গরুবাছুরগুলো তখনও জাবনা পায়নি—এদিক ওদিক চাইছে আর ডাকছে কালো চোখ তুলে।

—কারিগর! একটু বিরক্ত হয় মিষ্টি।

কেউ বাড়ীতে নেই। নিজেই জিনিষপত্রগুলো দাওয়ায় নামিয়ে রেখে জল ঢালতে থাকে গরুর পাতনায়। তৃষ্ণার্ত্ত গরুগুলো তাই খাচ্ছে। গজগজ করে মিষ্টি—আহা! লোকটা তো বেশ। অবহেলায় মারবে কেষ্টর জীব-গুলোকে। সখ করে চাষ আবাদ করেছে মিষ্টি। বলদও কিনেছে। খড় ও কাটা নেই, বগল নিজেই বটি নিয়ে। এরপর রান্না বাড়া ঘরের কাষ অনেক বাকী। কদিন ধরেই দেখছে কারিগরের কেমন উড়ু উড়ু ভাব। বাড়ীতেও থাকেনা বিশেষ। আজ মেজাজটা বিষিয়ে ওঠে মিষ্টির।

একটু আগেকার ওই মধুর সুরের রেশ মন থেকে মুছে যায় একেবারে। উনুনের দিকে এগোয় না।

ধূ ধূ করে জলছে আগুনটা।

কতক্ষণ গুম হয়ে বসেছিল জানে না। বেলা পড়ে আসছে। চালের মাথায় বৈকালের সোনারোদ নেমেছে—হঠাৎ কারিগরকে ফিরতে দেখে মুখ তুলে চাইল।

চোখ দুটো লাল—পা টলছে তার। দেখে তেলে-বেগুনে জলে ওঠে মিষ্টি। ওর দিকে চেয়ে থাকে স্থির দৃষ্টিতে।

—ভাত দে!

কারিগর এসে দাওয়ায় বসে হুকুম করে।

মিষ্টির চোখের সামনে একটা কালো কাক যেন নরকের মাঝে থাবলা মারছে। স্থির কণ্ঠে জবাব দেয়।

—ভাত রাখিনি।

—তবে কি ছাই খাবো?—হাঁক পাড়ে কারিগর।

মিষ্টি ওর দিকে চেয়ে থাকে। কাপড়ে তেলকালির দাগ, হাতেও। চোখ দুটো করমচার মত লাল। এ যেন অন্য কোন নোতুন মানুষ বহুকালের বিস্মৃতির ধ্বংসস্তূপ ঠেলে জেগে উঠেছে।

—তাই তো গিলে এসেছিস।

—এ্যাও! খবরদার!

কারিগরের মাথায় যেন রক্ত উঠে পড়ে। অতীতের সেই অভ্যস্ত জীবনযাত্রা; একটা ছোট্ট কোন কুলিধাওড়ায় অভাব আর অভিযোগের নিত্য জ্বালা। সেই তেলকালির গন্ধ ছাপিয়ে কোন বিজাতীয় তীব্র পানীয়ের মাদক-সৌরভ সারা মন ছেয়ে ফেলে। অতীতের একটা স্মৃতি বহুদিন পর আবার ফুটে ওঠে চোখের সামনে।

এতদিন ভুলেই ছিল।

…পাটকলের মিস্ত্রী কে একজন। এমনি মত্ত অবস্থায় চোখের সামনে তার স্ত্রীকেই মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে—লুটিয়ে পড়ে আর্তনাদ করে শীর্ণ বৌটা। রক্ত! তাজা রক্তে ভিজে যায় কুলিবস্তীর মাটি।

…জ্ঞান ফেরে। তারপর থেকেই পলাতক সে। নিজের নামটাও ভুলে গেছে। সে আজ প্রায় দশ বৎসরের কথা। অন্ধকার অতীতের অতল থেকে সেই ছবিটা ভেসে ওঠে।

…আজ কেমন তাই থমকে দাঁড়িয়েছে কারিগর। একই দৃশ্য—একটা ছবির অন্য পিঠ!

—থামলি কেনে?

মিষ্টি গর্জে ওঠে। এতদিন লোকটাকে পুষেছে—খাইয়েছে। ভালবেসে ঘরও বেঁধেছে। শান্ত স্থির একটি ভালমানুষ লোক, সাত চড়ে মুখে রা শব্দ নেই, সেই লোক কেমন বেমালুম বদলে গেছে।

…চটে উঠেছে মিষ্টি।

—কদিন থেকেই দেখছি ডানা উঠেছে তোর। মরবি?

কারিগর কথা বলেনা, পায়ে পায়ে মাথা নীচু করে বের হয়ে গেল। শূন্য ঘরের দাওয়াতে বসে পড়ে মিষ্টি।

আবছা অন্ধকার নামছে, দিন শেষের অন্ধকার।

গরু বাছুরগুলোও কেমন চুপ করে আছে, পাখী ডাকছে—বাসায়-ফেরা পাখপাখালী। কেমন অমনি ক্লান্তি আর হতাশাভরা অন্ধকার সারামনে নেমে এসেছে মিষ্টির।

আজ মনে হয় একটা প্রচণ্ড নির্মম আঘাতে সব ছিটকে পড়ে খানখান হয়ে গেল, এতদিনের সব সাধ আর সাধনা। সেরাত্রে সদরের হাসপাতালে পড়ে পড়ে কেঁদেছিল জীবনের একটা সার্থকতার চরম অপমৃত্যুতে।

মা সে হতে পারেনি, পারবেনা কোনদিন।

আজ কাঁদে—ঘর তার ভেঙ্গে যাবে প্রচণ্ড কোন দুর্বার সর্বনাশা আঘাতে। এত সাধ আর সাধনা দিয়ে গড়া জীবনের একটা শান্ত পরিণতি কোন তীব্র জ্বালা আর নির্মম পরিহাসের অট্টহাসিতে ভরে ওঠে।

…দাওয়াটা নুইয়ে পড়েছে, জীর্ণ খুঁটি আর ঘরের ভার সইতে পারে না! যে কোন মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে ধ্বসে পড়বে। আলো জালাও হয় না। তেল কেনবার সামর্থ্য সঙ্গতি নেই।

উঠোনে গজিয়েছে কালকাসিন্দে আস্‌শেওড়ার ঝোপ, বাঁশবনের ডালগুলো বাতাসে অশরীরী ছায়ামূর্তির মত দোল খায়। তারাজলা আকাশকোলে শুধু আঁধার আর আঁধার।

দূরদিগন্ত লাল হয়ে উঠেছে। রক্ত লাল। তির্যক রেখায় আলোকস্রোত রক্তচক্ষু মেলে রোষপ্রদীপ্ত নয়নে

চেয়ে রয়েছে হারিয়ে-যাওয়া আঁধার-ঢাকা নিশ্চিন্ত গ্রাম-সীমার দিকে।

ওরই দিকে চেয়ে থাকে ওই আজকের দুর্গাপুরের নোতুন লৌহদানব হিংস্র—দাবীদার চোখে। তাই ওর ওই আকাশজোড়া চাহনিতে শুধু জ্বালা আর জ্বালা—ধু ধু লেলিহান শিখা ওঠে রাত আঁধারে সব নিঃশেষ করে চেঁচে মুছে নেবে ওর অতল বুভুক্ষার অনলে।

...কাঁদছে নারাণঠাকুর।

অব্যক্ত ভাষায় আর্তনাদ ওঠে রাতের অন্ধকারে। দাদা—সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। শান্তি আর সন্ধি আর নিশ্চিন্ততা ভরা দিন। ভাজ-বৌ ছোট ভাই গো সনাতন! সব কোন দিকে তছনছ হয়ে গেল।

তার ছোট বাড়ী---গোয়ালের গরুবাছুর—ধানের মরাই, সবুজ ক্ষেত—কাইজোড়ের জলধারার পাশে নবাঙ্কুর সেই ইক্ষুবনের সবুজ স্বপ্ন। সব তার হারিয়ে গেছে। পুড়ে বিবর্ণ ছাই হয়ে গেছে ওই আগুনে।

...কাঁদছে—ঘেংড়ে থেংড়ে কাঁদছে বোবা লোকটা।

জীর্ণ দোতলার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে মণিমালা। খুকীর জ্বর কমবার দিকে নয়—বেড়েই চলেছে। বেহুস হয়ে পড়ে আছে ছোট্ট বাচ্চাটা।

রাত হয়ে গেল নীরব নিশুতি গ্রামসীমা। জীবন তখনও ফেরেনি। গেছে দুর্গাপুরে কি যেন জরুরী কাযে।

কাযটা কি জানেনা মণিমালা, বাবা মায়ের কাছেও বলেনি জীবন। মাঝে মাঝে যাচ্ছে সেখানে।

মণিমালাও দেখেছে জীবনের অন্তরেবাইরে একটা নীরব পরিবর্তনের ছায়া। আগেকার সেই সহজ সুন্দর সুখী মানুষটা কেমন আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করলেও জবাব মেলেনা।

—এতকি ভাবো? হ্যাগো?

—এমনি! জীবন এড়িয়ে যায় তাকে।

নীরব হাহাকারে ভরে ওঠে মণিমালার মন। এসে অবধি সে দেখেছে এদের সংসারের কি এক সমৃদ্ধির ছবি। আজ!

সেই দিন গুলো কোথায় হারিয়ে গেল! তবু মনে মনে খুব অসুখী হয় নি মণিমালা। স্বামীকে কাছে পেয়েছে, নিকট করে পেয়েছে।

এতদিন সে শুধু দূর থেকেই দেখেছে ওদের অন্তরের বিকৃতস্বরূপ—কেমন ঘেয়োকুকুরের মত একটা লোক কদর্য্য দৃষ্টিতে মেয়েজাতটার দিকে লোলুপচোখে চেয়ে রয়েছিল। ভাবি-বৌ গ্রামের আরও ওই জাতের দেখেছে মেয়েদের—দেখেছে জীবনকেও। রাতদুপুরে এসেছে ঘরে মত্তপ—একটি প্রাণী।

...মত্তপ—এক প্রাণী।

ঘৃণায় বিষিয়ে উঠেছে সারামন—তীব্র বিজাতীয় সেই ঘৃণা। এ বাড়ীর হাওয়ায় বিষিয়ে উঠেছে মণিমালার সারা মন। কেমন দমবন্ধ হয়ে আসে।

লেখাপড়া শিখেছে—ম্যাট্রিক পাশও করেছে। কিন্তু এ বাড়ীর এই জগদ্দল পাথরের ভারে আর ওদের বিষ-নিঃশ্বাসে তিলে তিলে শুকিয়ে চলেছে সে। অসহ্য হয়ে উঠেছে এই পরিবেশ।

দূর অন্ধকার আকাশে দেখা দিয়েছে লাল আলোর ঝল্‌কি। দুর্গাপুরে শুরু হচ্ছে লোহা কারখানা—ব্যারেজের কায শেষ হয়ে গেছে। দুর্দম দামোদর বন্দী হয়েছে, বাঁধা পড়েছে সেই উন্মত্ত ধ্বংস দেবতা।

একা নদী আর ষোল কোশ পথ নয়, এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল, চড়াইএর ওপারে একটা উৎরাই পার হয়ে নদীর ওপারেই। টানা বাস আসছে—আসছে ঝক্‌-ঝকে নোতুন ট্যাক্সি, মায় সাইকেল রিক্সাও।

মণিমালার মন সেই পিচ-ঢালা পথ বয়ে এই বননির্জন পল্লী থেকে ছুটে যায় নোতুন সহরের পানে।

[ক্রমশঃ

শচীন সেনগুপ্ত স্মরণে

শ্রীঅমিয়কুমার সেন
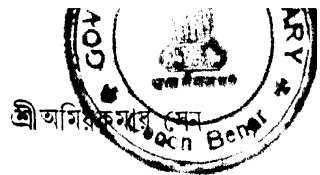
ইংরেজী সাহিত্যে একটা কথা আছে, হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে সেক্সপিয়ারের হ্যামলেট নাটকের কথা চিন্তা করা যায় না। এ কথাটি বলতে গিয়ে যদি বলা যায়, শচীন সেনগুপ্তকে বাদ দিয়ে বর্তমান বাংলার উন্নত ও সমৃদ্ধ নাট্যশালার কথাও আজ চিন্তা করা যায় না, তা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হয় না। কারণ বলতে গিয়ে এই কথা বলা যেতে পারে—বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিস্তৃত অঞ্চলের যে পথে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন, সে পথ ছিল তাঁর আপন প্রতিভার স্পর্শে সমুজ্জ্বল, এবং সেই পথে চলতে চলতে অসাধারণ সৃজনী ক্ষমতায়, সংস্কারমুক্ত মনে ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নাটকের পর নাটক রচনা করে যে রসঘন, চিত্তহারী নাট্য সাহিত্যের বাস্তব রূপটি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, তা যেমন আমাদের সত্যিকার আনন্দ দিয়েছে, বাংলা নাট্য-সাহিত্যের উৎকর্ষতা ও সমৃদ্ধির মূলে তাঁর অবদানও কম স্বীকৃতি পায়নি এবং সব কিছুরই সমন্বয়ে আজ যখন নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে তখনই এই কথাই ভাবি—শচীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরও নাট্যরসজ্ঞ বাঙ্গালী সমাজে শচীন্দ্রনাথ চিরদিনই বরণীয় ও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

শচীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল বিচিত্র জীবন, তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও অসামান্য ব্যক্তিত্বের বিভিন্নধারা বিশ্লেষণ করলে তাঁকে আমরা দেখতে পাই—বিপ্লবী যুগের এক সংগ্রামী পুরুষরূপে; নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, আদর্শনিষ্ঠ সাংবাদিকরূপে; মধুসংলাপী মানব-দরদী বন্ধুরূপে ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মরমী নাট্যকার রূপে।

মাত্র উনসত্তর বছর বয়সে ১৯৬১ সালের ৫ই মার্চ এই প্রতিভাধর ব্যক্তিটি লোকান্তরিত হয়েছেন। এই উনসত্তর বছরের মধ্যে সুদীর্ঘ চল্লিশটি বছর ক্লান্তিহীন, একটানা ক্ষুরধার লেখনী চালনা করে—বিজলী, আত্মশক্তি, নবশক্তি, কৃষক, ভারত, নটরাজ, আন্তর্জাতিক, বৈকালী, ঘরে বাইরে প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক অথবা পরিচালকরূপে; চিঠি, প্রাণ প্রতিষ্ঠা, বাংলার নাটক ও নাট্যশালা, মানবতার সাগর সঙ্গমে, মগজের স্বরাজ প্রভৃতি পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনায়; রক্তকমল, গৈরিক পতাকা, সিরাজদ্দৌলা, স্বামী-স্ত্রী, তটিনীর বিচার প্রভৃতি তিরিশখানি নাটকের মাধ্যমে; বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক বই ও শরৎচন্দ্রের দেবদাস ও পথের দাবীর নাট্যরূপ দানে তিনি একদিকে যেমন অপূর্ব দক্ষতা, জীবনাদর্শ, জ্বলন্ত দেশপ্রেম, মানবিকতাবোধ লেখার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন, অন্যদিকে ফুটিয়ে তুলেছেন নিরপেক্ষতা, সংস্কারমুক্ত স্বাধীন মতবাদ, বিপ্লবী ভাবধারা, ক্লেদপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর আঘাত, শ্লেষ ও ব্যঙ্গ। এই শেষোক্ত চিন্তাধারায় ও আদর্শবাদে তিনি অনুভাবিত ছিলেন বলে বোধহয় ছাত্রজীবনে রাজরোষে পড়ে, আত্মসম্মানে আহত হয়ে স্কুল ছাড়েন, তাই বোধ হয় স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক জীবনযাপন কালে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে চরম অর্থ-সঙ্কটের দিনে জীবনাদর্শের ভিন্নধর্মী উপজীবিকা—মোটা বেতনের সরকারী চাকরী প্রত্যাখ্যান করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তাই বুঝি মিথ্যার দাসত্ব কোনদিন স্বীকার করতে না পেরে সত্যাশ্রয়ী শচীন্দ্রনাথ অপ্রিয় ভাষণে অনেকের বিরাগভাজন হলেও স্বীয় জীবনাদর্শে ছিলেন অবিচলিত, একনিষ্ঠ।

শচীন্দ্রনাথকে নানাভাবে জানি। নাটকের পর নাটক রচনা করা ও বাংলার নাট্যশালার উন্নতি যেমন ছিল তাঁর জীবনের একাগ্র সাধনা, সেই রকম মানবিকতা ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের ভিত্তি। তাই নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের মধ্যে আর এক শচীন্দ্রনাথ ছিলেন—যেটা তাঁর বড় পরিচয়। দেশকে তিনি মনেপ্রাণে ভালবেসেছিলেন। ভালবেসেছিলেন বলেই তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধব, অজস্র সহকর্মী, অনুরাগী, গুণগ্রাহী, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বিশিষ্ট নাগরিক, বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও চিত্রশালার কর্মী—তাঁর নাটকের ভেতর দিয়ে যা পেয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশী পেয়েছে

তাঁর সাহচর্যে, তাঁর অমায়িক মধুর ব্যবহারে, তাঁর আপন-করা স্নেহার্দ্র বাক্যালাপে।

খুলনা সেনহাটির সৌভাগ্য যে অসাধারণ প্রতিভাশালী শচীন্দ্রনাথ এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সদ্যাব-শতকের অমরকবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জন্মস্থান বলে এই গ্রামখানি আজও বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়ে আছে। পণ্ডিত শিরোমণি পূর্ণ-চন্দ্র বেদান্তচঞ্চু, বাল্যবন্ধু সখা প্রবর্তক প্রমদাচরণ সেন, বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক বিখ্যাত ঐতিহাসিক অশ্বিনীকুমার সেন, বহু গ্রন্থপ্রণেতা প্রখ্যাত সাহিত্যিক অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এককালের বহু সুখ্যাত উপন্যাস-লেখক যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং বর্তমান বাংলার প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক ও খ্যাতিমান আইনজীবী শ্রীনীরদ-রঞ্জন দাশগুপ্ত বার-এ্যাট-ল—এই পল্লীমাতার স্নেহময় ক্রোড়েই জন্মগ্রহণ করেন। পশ্চিমবাংলার বর্তমান জন-প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই সেনহাটিরই কৃতী সন্তান ও উজ্জ্বলরত্ন। শচীন্দ্রনাথ জন্মভূমি সেনহাটিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। জীবনের সুদীর্ঘকাল তাঁর কলকাতায় কাটলেও, জন্মভূমি সেনহাটির মায়া তিনি কোনদিনই কাটিয়ে উঠতে পারেন নাই। রাজধানীতে থেকে লিখতে লিখতে যখন তিনি ক্লান্তি বোধ করতেন—শহরের কলকোলাহলের ফেনিল উচ্ছ্বাস তখন আর তাঁর মনকে কিছুতেই আকর্ষণ করতে পারত না। মানসিক সুস্থতালাভের জন্য, শান্তিময় মুক্ত পরিবেশের প্রয়োজনে ছুটে যেতেন জন্মভূমি সেনহাটি গ্রামে। যে কদিন সেখানে থাকতেন প্রাণভরে গ্রহণ করতেন পল্লীর স্নিগ্ধ স্পর্শ—উপভোগ করতেন তার সৌন্দর্য, নিস্তব্ধতা—বাসভূমির প্রান্তবাহী ভৈরব নদের সুশ্যাম স্নিগ্ধ তীরভূমিতে বসে দু-চোখ ভ'রে দেখতেন অপরূপ সৌন্দর্যময় ভৈরবের মায়াময় লীলা চাঞ্চল্য—ওপারের নিবিড় বনানী, আর বৃক্ষ-রাজিশোভিত গ্রামগুলির ঘনশ্যাম সুষমা। এই সৌন্দর্যের মাঝে ডুবে কিছুক্ষণ তিনি আত্মসমাহিত হয়ে থাকতেন। তারপর ধীরে ধীরে সঙ্গীদের সঙ্গে গ্রামের নানা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন—গ্রামবাসীদের সুখ-দুঃখ, অভাবঅভিযোগ, গ্রামের নানা সমস্যা—স্বাস্থ্য, শিক্ষা, লাইব্রেরী, গ্রামের উন্নতির পদ্ধতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং সব বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত সকলেই আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করতেন। তাঁর সঙ্গীরা তখন তাঁকে ভাবতেন গ্রামের একজন প্রকৃত দরদী অধিবাসীরূপে—তাঁরা ভুলে যেতেন তাদের পাশে রয়েছেন—বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক, সম্পাদক, প্রখ্যাত নাট্যকার, শক্তিমান লেখক ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শচীন সেনগুপ্ত।

সভ্যতা-আলোপ্রাপ্ত পৃথিবীর সমস্ত দেশেই বেশভূষার আদর প্রচলিত। বেশভূষার প্রতি সমধিক দৃষ্টি দেওয়া যেন সভ্যতার অঙ্গীভূত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং সভ্য সমাজে যারা যেভাবে পারেন বেশভূষার পারিপাট্য দেখিয়ে তথাকথিত মার্জিত রুচির এবং শিক্ষিত মনের পরিচয় প্রদান করে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণে বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু শচীন্দ্রনাথ জনপ্রিয় লেখক ছিলেন—সভ্য সমাজে ঘুরেছেন, অভিজাত সম্প্রদায়ে মিশেছেন—নৃত্য, নাট্য, সঙ্গীতের কেন্দ্রীয় একাডেমির অন্যতম সদস্য ছিলেন—বিশ্ব-শান্তিসংসদের সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ শান্তিসংসদের সহকারী সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—শান্তি পরিষদের প্রতিনিধিরূপে চীন, রাশিয়া এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন—এতবড় পরিচিতি যাঁর—তিনি জীবনে বাহ্যিক বিলাসবিভ্রাটকে কোনদিনই অনুসরণ করেন নাই—তাই যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন তাঁর জীবনে বিলাসে নিস্পৃহতা ও ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হয়েছে। সহজ, সরল, সাদাসিধা, অনাড়ম্বর জীবনযাপনই ছিল শচীন্দ্রনাথের জীবনের মূলমন্ত্র। এই প্রসঙ্গে অনেকদিন আগের এক-দিনের কথা মনে পড়ে। তখন তিনি কলকাতায় বাসা করেননি। কোন মেসের একটি ঘরে একা থাকতেন। তখনই বাংলার নাট্যাকাশ তাঁর ভাস্বর নাট্যপ্রতিভার দ্যুতিতে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একদিন এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বেলা প্রায় ন'টার সময় তাঁর মেসে তাঁরই রচিত কোন নাটকের অভিনয় দেখবার জন্য পাশ আনতে গিয়ে-ছিলাম। তিনি তখন বোধহয় কেবল ঘুম থেকে উঠেছেন। আমরা যেতেই আমাকে দেখে বললেন—কিরে, বোস, আমি এখুনই আসছি—এই বলে তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন। আমি এর আগেও তাঁর এই মেসে এসেছি। আজও দেখলাম ঘরের সেই বিশৃঙ্খল, এলোমেলো চেহারা,

খাটে খয়রা রং-এর সেই পুরাণো তোষকটাই পাতা—চাদর নেই—বালিশ নেই—তোষকের এক কোণা ভেঙ্গে, একটু উঁচু করে বালিশের মত করা, আলনাতে ইতস্ততঃ ব্যবহৃত কাপড় পাঞ্জাবী ছড়ান; টেবিলে, খাটে এখানে সেখানে খাতাপত্র, বাংলা ইংরেজী নানা বই পত্রিকা পড়ে আছে—প্রায়গুলিই ধুলিমলিন। আমার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুটিও ঘরের চেহারা দেখছিল। সেই প্রথম কথা বলল, 'এই ঘরে, এমনিভাবে তোদের শচীনদা থাকেন?' আমি বল্লাম, 'হ্যাঁ, সারারাত কলম চালিয়ে চালিয়ে একসময়ে রাত্রিশেষে ক্লান্ত হয়ে ঐ তোষকের উপরই, তোষকের ঐ কোণটায় মাথা দিয়ে এলিয়ে পড়েন—বিছানা ঠিক করে পেতে নেবার এতটুকু সময় থাকে না এবং সকাল আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত ঘুমান। কখন বেরিয়ে যান, কখন এসে খান, কোথায় খান, কোন্ সভায় যান, কোন্ নাট্যশালা ঘুরে কখন ফেরেন তার ঠিক নেই।' এইটুকু বলে, একটু থেমে আবার বলে যাই, 'কিন্তু ঐ তোষকের উপর শুয়ে বসে অব্যাহত ধারায় ক্ষুরধার লেখনী চালিয়ে নতুন নতুন পরিকল্পনা দিয়ে রাতের পর রাত, অননুকরণীয় ভঙ্গীতে যিনি নাটকের পর নাটক রচনা ক'রেছেন—ঐ মোটা খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবীই যার সহজ, সরল পোষাক—তিনিই আমাদের শচীনদা—বাংলার যশস্বী, মরমী ও জনপ্রিয় লেখক শচীন সেনগুপ্ত। বন্ধুট একটু চঞ্চল হয়ে বলে উঠল, 'আমাকে মাপ কর ভাই তুই আমাকে আজ একজন খাঁটি মানুষ—খাঁটি লেখককে চিনিয়ে দিলি।

শচীন্দ্রনাথ মূলতঃ নাট্যকার ছিলেন। সাংবাদিক এবং সম্পাদকরূপেও তাঁর প্রসিদ্ধি সর্বজনবিদিত। কিন্তু জীবনের প্রথম থেকেই স্বাদেশিকতার মন্ত্রে তাঁর জীবন অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। ১৯০৫ সালে তিনি যখন রংপুর জেলা স্কুলে পড়তেন, তখনকার দেশশাসক বৃটিশ সরকার স্বদেশী সভায় ছাত্রদের যোগদান নিষিদ্ধ করে দেন। আত্মসম্মানে আঘাতপ্রাপ্ত এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে শচীন্দ্রনাথ সে স্কুল ছেড়ে দেন। তারপর রংপুর জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হলে সেই বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে কলকাতায় এসে জাতীয় কলেজে যোগ দেন। এখানে তিনি দেশভক্ত সখারাম গণেশ দেউস্করের নিকট শিক্ষালাভ করেন। রংপুর ও কলকাতায় থাকাকালীন তিনি বিপ্লবীনায়ক মাখনলাল সেনের সংস্পর্শে আসেন এবং বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা পর্যটন করেন। এক সময়ে তিনি ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন স্থানে আত্ম-গোপন করে থাকেন। ফিরে এসে তিনি তৎকালীন আর, জি, কর মেডিকাল স্কুলে দু'তিন বছর পড়ে কটক মেডিকাল স্কুলে পড়তে যান। কিন্তু রাজনীতিক কারণে তিনি সেখান থেকে বহিষ্কৃত হন। তারপর কটক থেকে ময়মন-সিং গিয়ে তাঁর আত্মীয় বিখ্যাত কবিরাজ প্যারীমোহন সেনগুপ্তের নিকট আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কলকাতায় ফিরে তিনি কবিরাজী ব্যবসা সুরু করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কবিরাজী ব্যবসা তাঁকে আকৃষ্ট করতে না পারাতে, শেষ পর্যন্ত তিনি সাংবাদিকতা বৃত্তিগ্রহণ করেন। কৈশোর ও যৌবনের প্রাক্কালে স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ তাঁর মনের দুয়ারে যে আত্মমর্যাদাবোধজাগ্রত পৌরুষ ও বিপ্লবের দোলা লাগিয়েছিল, তাঁর পরবর্তী জীবনে সে স্পন্দন একটুও স্তিমিত হয়নি—তাই সাংবাদিক-রূপে জাতীয় জীবনের কঠিন অগ্নিপরীক্ষার দিনে তিনি দেশ ও দশের কাছে দেখা দিয়েছিলেন সংগ্রামী পুরুষ ও জ্বলন্ত দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীকরূপে—জাতীয় আন্দো-লনের তিনি অন্যতম পুরোধা ছিলেন বলেই নাট্যকার-রূপে তাঁর কয়েকখানি দেশাত্মবোধক নাটক ভারতের মুক্তি আন্দোলনকে যে অপূর্ব উন্মাদনায় চঞ্চল করে তুলেছিল দেশবাসীর স্মৃতিপট থেকে তা আজও মুছে যায়নি। স্বাধীন ভারতবর্ষে সে সব নাটকের অভিনয়ে দেশের মুক্তি আন্দোলনের বাস্তব রূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

বিচিত্র ভাবধারায় অভিষিক্ত নাটকের পর নাটক রচনা করে শচীন্দ্রনাথ সফল নাট্যকাররূপে পরিগণিত হয়েছেন—বাংলার নাটক ও নাট্যমঞ্চের উন্নতি কল্পে তিনি আমৃত্যু চেষ্টা করে গেছেন—প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাংলার নাট্য-সাহিত্যে যে আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল শচীন্দ্রনাথ ছিলেন তার অন্যতম পথিকৃৎ। এ সব ত গেল নাট্য-সাহিত্য—নাট্য আন্দোলন—নাট্যকারের কথা। কিন্তু শচীন্দ্রনাথ যে একজন সুঅভিনেতা ছিলেন, এ খবর বাংলার অনেকের কাছেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আমরা জানি

নিজগ্রাম সেনহাটিতে তিনি কয়েকটি নাটকে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তার মধ্যে তাঁর দুটি চরিত্রের অভিনয় দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। এক যেবার পতনের গোবিন্দ সিংহ, অন্যটি মিশরকুমারীর আবন চরিত্র। এ দুটি ভূমিকাভিনয়ে তাঁর সহজ স্বচ্ছন্দ Movement ও expression, সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গী, নিজস্ব অভিনয়বৈদগ্ধ চরিত্র দুটিকে আবেগচঞ্চল ও জীবন্ত করে তুলেছিল। প্রতিভাবান নাট্যকারের মাঝে এক প্রতিভাবান নটের আবির্ভাব দেখে বিস্মিত, মুগ্ধ হয়েছিলাম সে দুটি রাত্রির অভিনয়ে—আজও তা ভুলতে পারিনি। আর ভুলতে পারিনি বনফুলের শ্রীমধুসূদনের বেতার অভিনয়ে প্রথম বার এবং পরেও একাধিকবার রাজনারায়ণের ভূমিকায় তাঁর অপূর্ব্ব অভিনয়ের কথা, নিজের নাটক প্রলয়ে সুস্থির ও ভারতবর্ষে পরেশ চরিতের বেতার অভিনয়ে ও তাঁর সার্থক রূপদানের কথা।

শচীন্দ্রনাথের যে বয়স হয়েছিল, সেই বয়সেই শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করে তিনি ইহলোকত্যাগ করে গেছেন। কাজেই তাঁর মৃত্যুতে শোক করার কথা নয়। কিন্তু তবুও আজ তাঁকে আমরা ভুলতে না পেরে শোক করি, বার বার তাঁকে স্মরণ করি এই ভেবে যে আমাদের স্বাধীন দেশে তাঁর প্রয়োজন এখনও নিঃশেষ হয়নি। দেশের স্বাধীনতারক্ষাকল্পে নির্যাতিত মানুষের অধিকার-প্রতিষ্ঠাকল্পে আজও আমাদের গৈরিক পতাকা, সিরাজ-দ্দৌলা, সংগ্রাম ও শান্তির মত নাটকের আরো প্রয়োজন। বর্তমান সমাজজীবনের ও রাষ্ট্রজীবনের অসংযম, ব্যভিচার অব্যবস্থার উপর চরম আঘাত হানতে—আজও প্রয়োজন আমাদের দশের দাবী, রাষ্ট্রবিপ্লব, কালোটাকা, জয়নাদ আর্তনাদের মত আরো নাটকের, ভারতের উপর বর্বর চীনের নির্লজ্জ আক্রমণের বিরুদ্ধে, দেশদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে আজ বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, প্রাচ্য প্রতীচ্যের চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের শাশ্বত মর্মবাণী প্রচারিত 'সবার উপরে মানুষ সত্য'র মত আরো অপূর্ব নাটকের। কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যের সে দিকপাল আজ নেই, নিস্তব্ধ তাঁর সে শাণিত লেখনী। এখনও ভাবি যে প্রতিভার অজস্র আলোককিরণে বাংলার নাট্যাকাশ প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল, যে প্রতিভার সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবনাদর্শের প্রতিচ্ছবি বহু জনের চিত্ত মুগ্ধ করেছিল, যে প্রতিভার পরিণত জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ছিল, মানবতার সাগর সঙ্গমে মিলিত হয়ে ভারতবাসী প্রচার করুক, উপলব্ধি করুক—ভারতের একমাত্র শাশ্বত বাণী—'সবার উপরে মানুষ সত্য'—আজ মহাকাল মৃত্যুর চরম আঘাতে সে প্রতিভা নিশ্চিহ্ন, বিলুপ্ত। তাইত আমাদের শোক! তাইত শচীন্দ্রনাথকে হারিয়ে আমাদের বেদনাচঞ্চল মনে কিছুতেই আজ তাঁকে ভুলতে পারছিনা। ভুলতে পারছিনা তাঁর সেই অতর্কিত মৃত্যু। মৃত্যুর কিছু আগেও তিনি স্বাভাবিক কথাবার্তা বলেন। মৃত্যুর কোন ইঙ্গিত নাই, রোগ যন্ত্রণা তাঁকে স্পর্শ করবার পূর্ব্বেই তিনি চলে গেলেন। মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মার নিকট ব্যাধি ও মৃত্যুর এখানেই পরাজয়বরণ। তাই আজ আমরা বলতে পারি, মৃত্যু, শচীন্দ্রনাথকে নিয়ে গেলেও, মরেছে সে নিজেই, শচীন্দ্রনাথ রয়েছেন আমাদের মনোমন্দিরে জ্যোতির্ময় ভাস্করের ন্যায়। তাই তাঁকে স্মরণ করে আজ আমরা নির্ভয়ে মৃত্যুকে বলতে পারি—

"Peace, peace. He is not dead, he doth not Sleep!
He hath awaken'd from the dream of life,
He has outsoared the Shadow of our night.
He lives, he wakes,—'t is Dead, not he!"

মূক অতীত—মালদহ মিউজিয়াম্

সুধীরকুমার চক্রবর্ত্তী

মালদহ মিউজিয়াম একটি অনাদৃত সম্পদ। এ সম্পদের দিকে ফিরে তাকাবার কেউ নেই। এ শহরের প্রতিভাবানেরা এখানে কেউ আসেন না। এই ভবনের কক্ষমধ্যে যে অমূল্য সম্পদ আবদ্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে বিশ্বের মুক্ত অঙ্গনে তাকে নিয়ে এসে মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটানর কোন প্রচেষ্টাই নেই। অথচ এ স্বপ্নকে হয়ত বাস্তবে পরিণত করা খুব কঠিন হতনা, যদি এই মিউজিয়াম গ্রন্থকক্ষে সমাসীন হ'য়ে ধ্যাননিমগ্ন রিসার্চ্চ ছাত্রেরা এর অতীতের মূক বাণীকে মুখর করে তুলে নতুনভাবে মালদহকে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস-অঙ্গনের এক কোণায় নিয়ে এসে দাঁড় করাতে পারতেন।

এ ভবনের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলে দেখা যায় অতীত গৌড়-মালদহের ধর্ম্ম, ইতিহাস, কারুশিল্প, ভাস্কর্য্য, স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিভিন্ন শতাব্দীর বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং অষ্টমশতক থেকে দ্বাদশশতক পর্য্যন্ত নানান্ শতকের সূর্য্যমূর্ত্তির প্রাচুর্য্য একদিকে যেমন বিস্ময়ের উদ্রেক করে—অপর দিকে তেমনি মহাযানী, হীনযানী, বজ্রযানী বৌদ্ধ দেবদেবীর সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর এই অপরূপ মিলন ক্ষেত্র দর্শককে চমৎকৃত করে ফেলে। এ কক্ষে এসে উপলব্ধি করা যায় যে গৌড়-মালদহ একদিন একদিকে বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত—অপরদিকে বিভিন্ন যানের বৌদ্ধদের লীলাভূমি ছিল। বিশেষতঃ যে এলাকা থেকে মুখ্যতঃ এই মূর্ত্তিগুলি পাওয়া গেছে তা আরও বিস্ময়ের সঞ্চার করে। কারণ উক্ত অঞ্চলে আজ যাদের বসবাস করতে দেখা যায় তাদের সঙ্গে এই ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ সংস্কৃতির কোন ক্ষীণ যোগসূত্রের কল্পনাও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

এই এলাকাটির ভূমিগত, অঞ্চলগত এবং বর্ত্তমান অধিবাসীগত পরিচয় দেওয়া হয়ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অধিকাংশ মূর্ত্তিই পাওয়া গিয়েছে গাজোল থানা এলাকা থেকে। এই অঞ্চলটি বরিন্দ্ নামে পরিচিত। বরিন্দ্ শব্দটি বরেন্দ্র শব্দের দেশীয় অপভ্রংশ। এই বিরাট অঞ্চলটিতে মালদহ জেলার তিনটি সমগ্র থানা—গাজোল, বামনগোলা, হবিবপুর এবং মালদহ থানার পূর্ব্বাংশ—অন্তর্ভুক্ত। হবিবপুর, মালদহ, বামনগোলা থেকেও অনেক মূর্ত্তি পাওয়া গেছে এবং যাচ্ছে। এই অঞ্চলটি মহানন্দা নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত।

এটি ঢেউ-খেলানো লাল মাটির দেশ। এই অঞ্চলের ভূভাগ গঙ্গা-সমতা থেকে কোথাও কোথাও পঞ্চাশ থেকে একশ' ফিট উঁচু। কোচ, প'লে, সাঁওতাল অধ্যুষিত এই অঞ্চলে গ্রামগুলি ছড়ান, ছিটান। চারিদিকে অসংখ্য পুকুর। গাজোল থানার বহু গ্রামের পুষ্করিণীশ্রেণী পথিককে মুগ্ধ বিস্ময়ে তার কালো জলের হাতছানি দেয়। দেশ বিভাগের পরে এই অঞ্চলে কিছু উদ্বাস্তু এসেছে। নইলে গাজোল এলাকায় মুসলমান জোতদারদের এবং হবিবপুর এলাকায় হিন্দু জমিদারদের প্রভাবপ্রতিপত্তি এখনও অপরিসীম।

এর তরঙ্গায়িত ভঙ্গিল মৃত্তিকার বুকেই একদিন পাঠান অশ্বারোহীদের অশ্বক্ষুরের সংঘাত শব্দিত হয়েছিল, এর লাল ধূলায় গগন হয়েছিল সমাচ্ছন্ন। তার অতীত ইতিহাসের স্বাক্ষর আজও সে বহন করছে। আজও এর বুকে মোটরের ধূলা উড়িয়ে বিশ্বের আনন্দসন্ধানী, ইতিহাসপ্রাজ্ঞ পর্য্যটকগণ আদিনা মসজিদ, একলাখি মসজিদ দেখতে আসেন। এরই বুকে ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন আবুল মুজঃফ্ফর আলি শাহ্ রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এর নাম ছিল তখন ফিরোজাবাদ। এই নামের তলদেশে এর পূর্ব্বের কোন্ মহৎ নাম চাপা পড়ে গেছে তা' কে জানে। এর পূর্ব্ব-ইতিহাস নীরব। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বৈদেশিক ধর্ম্মোন্মাদবন্যায় একটি উদার সভ্য সমাজ এবং বিদগ্ধ জাতি যে এই অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে এই মিউজিয়াম কক্ষে এসে দাঁড়ালে তা'

উপলব্ধি করা যায়। যে ইতিহাস একদিন মৃত্তিকার তল-দেশে আশ্রয় নিয়েছিল আজ সে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে। অথচ তাকে পাঠ করবার, জানবার, অপরকে জানাবার মত ছাত্রের একান্ত অভাব। আজ ঐ দেবদেবীর মূর্ত্তিসমূহ যেন মৃদু হেসে বলছে—একদিন তাঁরা ছিলেন, তাঁদের উপাসকদল ছিল; ছিল তাঁদের মন্দির। তাতে আরতির ঘণ্টা বাজত, ঘিএর কর্পূরের প্রদীপ জ্বলত, ভক্তদের সমবেতকণ্ঠে স্তোত্র মূর্চ্ছিত হয়ে উঠত। বাতাস তার সুগন্ধি বয়ে ছড়িয়ে দিত দিকে দিকে। রচনা করত কল্যাণ পরিবেশ।

তাঁরা যেন ডেকে বলছেন—এ অঞ্চলে এক মহানগরী ছিল। এক মহান্ সভ্যতায় তা সমুজ্জ্বল ছিল। বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত, বৌদ্ধ পাশাপাশি বাস করত। তাদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান ছিল। আজও সেই ভাবের সমাহার উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে সভ্যতায়।

কিন্তু একদিন কৃষ্ণ আঁধি উঠে এসেছিল ভারত-ইতিহাসের ঈশান কোণ থেকে। ধুলায় ধুলায় সেই ভয়ঙ্কর আঁধি আচ্ছন্ন করেছিল চারিদিক। দেব দেবীর উপাসকেরা সেদিন সাশ্রুনেত্রে তাঁদের বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন নদীগর্ভে, সরসীনীরে। অসংখ্য মন্দির বিচূর্ণিত হয়েছিল, লুণ্ঠিত হয়েছিল—হয়েছিল মসজিদে রূপান্তরিত। আদিনা মসজিদ, একলাখি মসজিদ আজও তার জীবন্ত সাক্ষ্য বহন করছে। তার চিহ্ন রয়েছে মাতৃস্তনে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, মুণ্ডহীন-হস্তপদ-হীনমূর্ত্তি দেহে, অনবদ্য সুষমামণ্ডিত অলঙ্করণ বিকৃতির স্তরে স্তরে।

মিউজিয়াম কক্ষে এর প্রতিটি চিহ্ন বিধৃত রয়েছে, যা কালের সীমা পার হয়ে আজও তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে।

নাট্যকার কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী

ওগো নাট্যকার, ওগো কবি!
বাঙ্গালীর বহু ভাগ্যে আঁকিয়াছ যে অপূর্ব্ব ছবি
রাঙ্গানো স্বদেশ প্রেমে, তোমার সে
"মেবার পতন"

"দুর্গাদাস" "চন্দ্রগুপ্ত" 'সাজাহান' অরূপ রতন
সে নূরজাহান তব। তোমার 'ভারতবর্ষ' আর
"হে বঙ্গ আমার" গীতি হীরকের নাতনরি হার,
দেশ-মাতৃকার বুকে! আপনার মর্য্যাদা ভুলিয়া
নামিয়াছ রঙ্গমঞ্চে গাহিয়াছ অন্তর খুলিয়া

গিয়াছে দেশ "দুঃখ নাই" আবার তোরা
মানুষ হ"।
তোমার 'আষাঢ়ে' 'মন্দ্র' তোমার হাসির
যত গান
মোহিত করেছে জেনো সর্ব্বভাবে
বাঙ্গালীর প্রাণ!

হে চারণ কবি!
তোমার অঙ্কিত সব ছবি,
সব আবেদন তব স্পর্শিয়াছে অন্তরে সবার
শত বার্ষিকীতে আজি প্রণাম লও হে
বাঙ্গলার।

বন্য বলাকা

পারুল ভট্টাচার্য্য

সুদর্শনাকে আমি কেন বিয়ে করতে চেয়েছিলাম এ প্রশ্ন তুমি আমাকে অনেকবার করেছ নির্মল। আর শুধু তুমি নও, এ প্রশ্ন বোধহয় আরও অনেকের মনেই ছিল। আত্মীয় অনাত্মীয় মহলে এ নিয়ে গবেষণা হয়েছিল প্রচুর। আপত্তি আর প্রতিবাদের ঝড়ও বড় কম ওঠেনি। তবু সেই সমস্ত কিছুকে তুচ্ছ করে, অগ্রাহ্য করেও সুদর্শনাকেই আমি কেন চেয়েছিলাম এ তোমাদের কাছে আজও রহস্য হয়েই রয়ে গেছে। আর বিশেষ করে পূরবীর সঙ্গে আমার বিয়ের যখন সমস্ত একেবারে স্থির হয়ে গেছে তখনই সুদর্শনার মত একটা অতি-সাধারণ মেয়ের জন্য আমার এ উন্মত্ততা যে তোমাদের কারই ভাল লাগেনি, তাও আমি জানি নির্মল।

ব্যারিষ্টার দেবেশ রায়ের মেয়ে পূরবীর তো শুধু রূপই ছিল না। উচ্চশিক্ষার মার্কা ছিল, আর ছিল আভিজাত্যের দামী ছাপ। বিবাহের নেপথ্যে মোটা অঙ্কটাও আমার কাছে বড় কম প্রয়োজনীয় ছিল না।

তুমি তো জান নির্মল, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হয়েও ডাক্তারীটা যে আমি শেষ পর্য্যন্ত পড়ে যেতে পেরেছিলাম সে নিতান্তই আমার ভাগ্যের জোরে। মা মারা গিয়েছিলেন অনেকদিন, দ্বিতীয় কোন ভাই বোনও ছিল না। তাই মরিয়া হ'য়েই বাবা তাঁর যা কিছু উপার্জ্জন সব আমার পিছনেই খরচ করতেন। নিজের অতি মধ্যবিত্ত জীবনের পরিধিটা বোধকরি আমার জীবনে তিনি কাটিয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। তবু এত করেও বিলেত যাওয়া আমার কিছুতেই ঘটে উঠলো না। স্পেশ্যাল সার্জ্জারির সেই স্কলারশিপটা পেলাম না বলেই। ডিসপেনসারী সাজিয়ে স্বাধীন প্র্যাকটিশে বসবার মত টাকা ছিল না। তাই বাধ্য হ'য়ে কোন হাসপাতালের খোঁয়াড়েই ঢোকবার চেষ্টা করছিলাম। সেই সময়েই ব্যারিষ্টার দেবেশ রায়ের সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল আমার। আর কেন জানি না, প্রথম দর্শনেই আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি পড়েছিল তাঁর। আমার অনুকূল ভাগ্যের দরজা আরও একটু খুলে গিয়েছিল। পূরবীর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পেড়েছিলেন তিনি। সঙ্গে মোটা অঙ্কের যৌতুক ছাড়াও বিয়ের পরে জামাইকে বিলেত পাঠাবার উজ্জ্বল ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। আমার বাবার কাছে এ ছিল অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য। আপত্তি হবার কোন প্রশ্নই ছিল না, আপত্তি হয়ও নি কিছু। আমি জানি নির্মল আমার সম্বন্ধে তোমার মনেও একটি গোপন কামনা ছিল। তোমার বোন শান্তার সঙ্গে আমার বিয়ের একটা সম্ভাবনার কথা তুমিও ভাবতে। বোধহয় আমাদের আবাল্যের সখ্যকে এইভাবেই চির-জীবনের আত্মীয়তায় বেঁধে রাখতে চেয়েছিলে। তবু পূরবীর সঙ্গে আমার বিয়ের সম্ভাবনায় তুমি খুশীই হয়েছিলে। বোধকরি আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবেই। তাই যেদিন সেই অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা ফেলে সুদর্শনার মত এক অতি-সাধারণ মেয়ের জন্য আমি পাগল হ'য়েছিলাম, সেদিন তুমিই ক্ষুব্ধ হয়েছিলে সবচেয়ে বেশী। বিস্মিতও হয়েছিলে কম নয়। কারণ পূরবীর সঙ্গে আমার ইদানীংকার ঘনিষ্ঠতার সংবাদটাও তুমি রাখতে, যেটাকে খুব সম্ভব তোমরা ভালবাসা বলে মনে করেছিলে। ভুল নির্মল, ভুল। পরিকল্পনা করে আর যাই হোক. প্রেম হয় না। ব্যারিষ্টার রায় ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন না এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। তিনি স্বীকার করতেন, শিক্ষিত সাবালক ছেলে-মেয়ের বিয়ের আগে কিছুদিন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে মন জানা-জানির। তাই বিয়ের

কথাবার্তা পাকা হয়ে যাবার পর পুরবীর সঙ্গে আমাকে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবার সুযোগ দিয়েছিলেন তিনি। এ যেন পর্দা টাঙ্গিয়ে, আলো জ্বালিয়ে, মঞ্চ সাজিয়ে দিলেন তাঁরা, আর আমি আর পুরবী মুখস্ত করা প্রেমের পার্ট বলতে লাগলুম ড্রয়িংরুমে, কফিখানায়, সিনেমায় কিংবা হোটেলে। ঘনিষ্ঠতা সত্যিই হ'য়েছিল। পরিচয়ের নৈকট্যে নিভৃতির, প্রশ্রয়ে পরিণত যৌবনের তপ্তরক্ত ছলকে উঠেছে অনেকবার, কিন্তু হৃদয়ের দু-কূল ছাপানো, জোয়ার ডাকানো, বিপুল ব্যাকুল সেই বন্যা আসেনি, আসতে পারেনি।

তখন কিন্তু এসব কথা আমি বুঝতে পারিনি নির্মল। পুরবীকে পেয়ে আমি খুশীই হ'য়েছিলাম। সৌভাগ্যই মেনেছিলাম মনে মনে। কিন্তু তখন তো আমি জানতাম না যে আমার জীবনের এই অতি-সহজ পথের সোজা মোড়েও সুদর্শনার মত বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য।

সুদর্শনাকে আমি চিনতাম। ব্যারিষ্টার দেবেশ রায়ের ভাবী জামাতৃপদের যোগ্যতা অর্জ্জনের খাতিরে পুরবীদের হাইয়ার সোসাইটিতে ইদানীং একটু বেশী মেলামেশা করতে হচ্ছিল আমাকে। ডিনার পার্টি, ককটেল পার্টি লেগে থাকতো প্রায়ই। হোয়াইট ইভনিং কিংবা ফ্যান্সি ড্রেসের আড্ডাতেও যোগ দিতে হতো মাঝে মাঝে। এইসব পরিবেশেই সুদর্শনাকে আমি মাঝে মাঝে দেখতাম। আপাদ-মস্তক রংকরা অতি সংক্ষিপ্ত বেশেবাসে শালীনতার সীমানা ছাড়ানো নিত্য নূতন পুরুষের সঙ্গিনী সুদর্শনার দিকে এক নজর চাইলেই বোঝা যেত তার আসল পরিচয়। কিছু টাকার বিনিময়ে যে সব মেয়েদের রাত্রের খরিদ্দার হওয়া যায়, সুদর্শনা ছিল তাদেরই একজন। তবু তাদের একজন হয়েও কি যেন একটুখানি বিশেষত্ব ছিল, যা তাকে ঠিক ঝাঁকের মাঝে মিশে যেতে দিত না। একটু পৃথক করে, একটু স্বতন্ত্র করে রেখে দিত। যখন যতবারই তাকে দেখেছি, তার এই বিশেষত্বটুকু লক্ষ্য না করে আমি পারিনি।

কিন্তু ন-পিসিমার বড়ছেলে সুধাংশুর জন্য পাত্রী দেখতে গিয়ে সীতানাথ বক্সী বাইলেনের অন্ধকার ঘরে যাকে দেখতে পাব, সে যে সুদর্শনা, তা আমি কোন দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করিনি নির্মল। তাই মাথা নীচু করে বসেথাকা পাত্রীর দিকে নজর পড়তেই বিস্ময়ে অস্ফুট কোন শব্দই করে থাকবো বোধহয়। সেই শব্দে চমকে মাথাতুলে চাইলো সে। আর চোক্ষের পলকে শবের মত আড়ষ্ট বিবর্ণ হয়ে গেল তার মুখ। কিন্তু সে শুধু এক মুহূর্ত্ত। তারপরই ঝাঁক বেঁধে রক্ত নেমে এলো সেখানে। ফুলে উঠলো নাকের বাঁশি। বিস্ফারিত হলো কপালের শিরা। কুঞ্চিত ভ্রুভঙ্গিতে সুস্পষ্ট বিদ্রোহের ঘোষণা করে দাঁতে ঠোঁটে চেপে বসে রইলো সে।

আর এই প্রথম আমি এত ভাল করে দেখলাম তাকে। বার কিংবা নাইট-ক্লাবের নির্লজ্জ হল্লায় লাস্যময়ী সুদর্শনা নয়। সীতানাথ বক্সী বাই লেনের বুকচাপা ঘরের অন্ধকারে। ডুরে শাড়ি আর কাঁচের চুড়িতে সাজানো অতি সাধারণ সুদর্শনা। আকর্ণবিশ্রান্ত দুটি পিঙ্গল চোখ। আর পিঠ ছাপানো ঘন চুলের অরণ্য ছাড়া আকর্ষণীয় তার আর কিছু ছিল না। কিন্তু কিছু না থেকেও যে বস্তুটি তাকে বহুর মধ্যে বিশেষ করে রেখে দিত, এই প্রথম আমি বুঝতে পারলাম নির্মল, যে হলো তার প্রখর ব্যক্তিত্ব। একটি উর্দ্ধমুখী বহ্নিশিখার মতো আপন গৌরবে সে যেন আপনি জলছিল।

আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল নির্মল—চারপাশের সেই ভ্যাপসা অন্ধকারে। অসহনীয় দারিদ্র্যপীড়িত সুদর্শনার রুগ্ন বাপের বুক-ফাটা কাশির যন্ত্রণা, আর অনাহারে অপুষ্ট একগাদা ছোট ছোট ভাই বোনের ক্লিষ্ট উপোষী মুখেই সুদর্শনার নিশাচর জীবনযাপনের করুণ কারণটি লেখাছিল।

আমি করুণা অনুভব করেছিলাম নির্মল। কর্ত্তব্যও স্থির করেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। তাই উঠে আসবার আগে সুদর্শনার সামনেই বলেছিলাম, মেয়ে আমাদের পছন্দ হ'য়েছে, বিয়ে হবে। সুদর্শনার বাবা যেন বাড়ী গিয়ে বাকী কথা বলে আসেন। কেন একথা বলেছিলাম সুদর্শনার সত্য পরিচয় জেনেও, নিজের আত্মীয়দের কাছে কেনই বা তা গোপন করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, সেকথা আজ আর তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না। হয়তো অনুকম্পাই হয়েছিল সুদর্শনার উপর। অসুখী পথভ্রষ্ট একটি মেয়েকে ফাঁকি দিয়ে সুখী জীবনের শান্তির

স্বাদ পাইয়ে দিতে চেয়েছিলুম। ঝুঠো মহত্ত্বের মূল্যে কিনে নিতে চেয়েছিলুম তাকে। কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করেছিলুম অসহ দীপ্তির তীব্র আভা হেনে দপ্ করে কি যেন জ্বলে উঠেছিল সুদর্শনার দুই চোখের তারায়। কি সেটা? শ্রদ্ধা, না কৃতজ্ঞতা, না বিস্ময়? অনেক চেষ্টা করেও সেদিন আমি তা বুঝতে পারিনি।

কয়েকদিন পরে অপরিচিত মেয়েলি হস্তাক্ষরে ঠিকানা-লেখা একখানা খাম পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলাম। বিশেষ একটি দিনের বিকেলে আউটরাম ঘাটে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুরোধ, স্বল্প কথার সংক্ষিপ্ত পত্র। অস্বীকার করে লাভ নেই নির্মল, আশ্চর্য্য যত হয়েছিলাম, আনন্দিত হয়েছিলাম তার চেয়েও বেশী। কেমন করে জানি-। ধারণা হয়েছিল সুদর্শনা কৃতজ্ঞতা জানাতে চায়। কারণ ইতিমধ্যেই চেষ্টাচরিত্র করে সুধাংশুর সঙ্গে তার বিয়েটা আমি প্রায় স্থিরই করে ফেলেছি। তার অপরিচ্ছন্ন ইতিহাস বলাবাহুল্য কারও কাছে প্রকাশ করিনি। ঝক্কাট বিশেষ কিছু পোহাতে হয়নি আমাকে। কারণ নামীশ্বশুরের ভাবী জামাতা হবার গৌরবে আত্মীয়-স্বজন মহলে ইদানীং আমার কদরও বেড়ে গিয়েছিল অনেক বেশী। আমার কথা মেনে নিয়েছিলেন সবাই। মনে মনে একটি আত্মপ্রসাদ বোধ করেছিলাম, নীতিভ্রষ্ট একটি মেয়েকে উদ্ধার করার আনন্দ। কল্পনায় সুদর্শনার অশ্রু-গদগদ সকৃতজ্ঞ মুখখানি আমি যেন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম।

কিন্তু ভুল আমার ভেঙ্গে ছিল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। পিঙ্গল চোখে বৈশাখের খর তীব্র জ্বালা জ্বালিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে বসেছিল সে। আর আমি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছিলাম সেই জ্বালাটা শ্রদ্ধার নয়, কৃতজ্ঞতারও নয়, সেটা শুধুই ঘৃণার। শান্ত স্বরেই প্রশ্ন করেছিল সে। সুধাংশু হালদার আপনার ভাই?

বলেছিলাম, হ্যাঁ।

তার সঙ্গে আমার বিয়েতে সম্মতি দিয়েছেন আপনি?

হ্যাঁ।

ইস্পাতের ফলার মত শাণিত দুই চোখের দৃষ্টি আমার বুকের ভিতরে বিঁধিয়ে দিয়ে কঠিন শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করলে সে। কিন্তু আমার সত্য পরিচয় গোপন করে আত্মীয়-স্বজনের কাছে মিথ্যে কথা বলে আমার উপকার করবার এ চেষ্টা আপনার কেন, তা আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি, ডাঃ চ্যাটার্জী? ধারালো একখানা চাবুকের মত প্রশ্নটা যেন সপাং করে সোজা এসে পড়েছিল আমার মুখের উপর। সেই আঘাতে অবাক হয়ে শুধু দাঁড়িয়েই রইলুম, উত্তর দিতে পারলুম না তার কথার। সেই প্রখর দৃষ্টির মর্ম্মচ্ছেদী উত্তাপে আরও একবার আমার আপাদমস্তক ঝলসে দিল সে। কঠিন একটুখানি হেসে বল্লো—অনুগ্রহ করার স্পর্দ্ধাটা সর্বত্র সমান মর্যাদা নাও পেতে পারে। আর আমি কারও অনুগ্রহ নিইনি। এই কথাটাই আপনাকে জানিয়ে দিলাম। উঠে বোধ করি চলেই যাচ্ছিল সে। ব্যাকুল হয়ে আমি বাধা দিলাম। বল্লাম, অনুগ্রহ নয় মিস্ মজুমদার, ভুল তো সকলেরই হয়, কিন্তু—

ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল সুদর্শনা। যেন হিশ করে ফণা তুলে ফুঁসে উঠেছিল এক দীর্ঘদেহ বিষধর। তীক্ষ্ণ শ্লেষে ছুরির ফলার মত কণ্ঠস্বর কেটে কেটে বসেছিল আমার অস্থিতে মজ্জায়। আপনি মহৎ সন্দেহ নেই। কিন্তু মহত্ত্ব দেখাবার আরও অনেক স্কোপ আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। চাইকি একটা মস্ত বড় নেতা-টেতাও হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আমি আপনার সে মহত্ত্বের এক কণাও পেতে চাইনা। ধন্যবাদ--

কণ্ঠের জড়তা কাটাবার চেষ্টা করে বলতে চেয়েছিলাম, ভুল বুঝেছেন মিস্ মজুমদার—ভুল—বাধা দিয়ে আবার হেসে উঠেছিল সে। ভুল আমার খুব কমই হয় ডাঃ চ্যাটার্জী। আমি জানি, আমি কি। সামাজিক অধিকার আমার কতটুকু। আর এও জানি, মিথ্যার উপর ভিত্তি করে যে সম্পর্ক আজ গড়ে উঠ্‌তে চলেছে তার পরিণামই বা কি। অনেক দেখেছি বলেই, ফাঁকি দিয়ে আমি কিছু পেতে চাইনে। আপনার সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ। আশাকরি আর আপনি আমাকে বিরক্ত করবার চেষ্টা করবেন না।

বারবার আঘাত খেয়ে এবার আমিও কঠিন হয়েছিলাম নির্মল। কটুকণ্ঠেই বলেছিলাম, উদ্দেশ্য যদি আপনার এতই মহৎ হয় তাহলে তো আপনার বিয়ের কথা কোন দিনই আসেনা সুদর্শনা দেবী। আপনার সব কাহিনী

জেনেও কোন ভদ্রসন্তান আপনাকে স্ত্রীর মর্য্যাদা দিতে চাইবে নিজেকে এতখানি মূল্যবান্ আশাকরি মনে করেন না। তাহ'লে ঘটা করে কনে সেজে দেখা দেবার অর্থটা কি, সেইটে একটু বলে যাবেন দয়া করে।

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল সে। তারপর পশ্চিম আকাশের সূর্য্যাস্ত আড়াল করে আরও একবার ফিরে দাঁড়িয়েছিল। যা তারপক্ষে একেবারেই অস্বাভাবিক। সেই রকম ভেজা গলায় বলেছিল, ওটা আমার বাবার দুর্ব্বলতা। আশাকরি ঐটুকু আপনারা মার্জ্জনা করে নেবেন। সাধ্যের অভাবে যে মেয়েকে তিনি কোনদিন সুখ দিতে পারলেন না, তারই বিয়ে দেবার সাধ নিয়ে বারবার এই সব আয়োজন করেন তিনি। আপত্তি করলে বাধা পান, অস্থির হন। তাই ইচ্ছা না থাকলেও ব্যথা দিতে পারি না। বোধহয় কুণ্ঠিত বিবেকের কাছে নিজের অক্ষমতার কৈফিয়ৎ এইভাবেই পেশ করে থাকেন তিনি।

বলতে বলতে তার সেই কঠিন মুখের উদ্ধতভঙ্গী শিথিল হলো। পিঙ্গল চোখের বৈশাখী দাহ নিভিয়ে আন্তরিক বেদনার ছায়া নামলো সেখানে। সেই ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার ম্লান আলোয় দাঁড়িয়ে দারিদ্র্য আর হতাশার অন্ধকারের মধ্যেও টিঁকে থাকা মনুষ্যত্বের আলোটি আমি যেন অম্লান শিখায় জ্বলতে দেখলাম তার মধ্যে। ঘন পাকের নীচে উপ্ত থাকা শতদলের সম্ভাবনার মত অন্ধকারে মুখ-থুবড়ে-পড়া জীবনের পরম সত্যটিকেও আমি সেই প্রথম উপলব্ধি করতে শিখেছিলাম। কি এক অগাধ মমতায় বুক আমার ভরে গেল নির্ম্মল। তার সেই অনেক শ্রান্তির স্বাক্ষরআঁকা ক্লান্ত মুখ খানার পানে চেয়ে তখন—ঠিক তখনই তাকেভালবাসলাম। ঢলনামা পাহাড়ী নদীর মত বিপুল ব্যাকুল সেই ভালবাসার বন্যা আমার হৃদয়ের দুকুল ছাপিয়ে আমাকে অধীর করে, অসাড় করে, ভাসিয়ে নিয়ে গেল, ডুবিয়ে দিয়ে গেল।

নিজেকে আবিষ্কারের সেই আকস্মিক যন্ত্রণায় বোবা হয়ে আমি শুধু দাঁড়িয়েই রইলাম। তাকে আমার কিছুই বলা হলো না। সে যখন চলে গেল, তার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন আমারই বুকখানাকে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে যেতে লাগলো। প্রতি পদক্ষেপে আমার ব্যাকুল হৃদয় যেন তারই-পায়ে মাথা কুটে কুটে মিনতি করতে লাগলো। আর সেই অপার বেদনায় বিক্ষত হয়েও আমি শুধু চেয়েই রইলাম। তাকে আমার কিছুই বলা হলো না নির্মল।

সে রাত্রিটা যে আমার কি করে কাটলো তা আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না নির্মল। এক একটি প্রহর যেন তাদের অনন্ত পরমায়ু নিয়ে এক একখানা ভারী পাথরের মতো আমার বুকের উপর চেপে চেপে বসতে চাইলো। তবু এক সময় সেই অনন্ত রাত্রিরও শেষ হলো। সকাল হতেই পাগলের মতো আমি ছুটে গেলুম তাদের সেই সীতানাথ বক্সী বাই লেনে। সেই স্বল্পালোক ঘরে একাকীত্বে মুখোমুখি হয়ে তার সেই গভীর গহন মর্ম্মভেদী দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে গোপন করবার এতটুকুও সাধ্য আর আমার ছিল না। ব্যাকুল অসহায় আর্ত্তস্বরে তাকে খুলে বল্লাম সব কথা। এবার আর কোন শাণিত বিদ্রূপ ঝল্‌সে গেল না তার চোখে। বরং নিবিড় বেদনার গাঢ় ছায়া নামলো সেখানে। আর তাই দেখে নিজেকে আমি আর ধরে রাখতে পারলাম না। পিপাসিতের মতো উপুড় করে দিলাম তার ওষ্ঠে, অধরে, কপালে, কপোলে।

অনেকক্ষণ ধরে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল সে। অনেকক্ষণ ধরে নির্ব্বাক হয়ে বসে ছিলাম আমিও তার পায়ের কাছটিতে—তার হাঁটুতে মাথা রেখে। আর এতদিনের বরফ-গলানো-বুক চোঁয়ানো তপ্ত জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল তার গাল বেয়ে। ঝরে পড়ছিল আমারই মাথায়।

আর কোন কথা সেদিনও হয়নি নির্মল। অনেকক্ষণ পরে নিঃশব্দেই উঠে চলে এসেছিলাম। আজ আফশোষ হয় কেন এসেছিলাম। কেন তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসিনি। কেন জোর করিনি। শক্ত হতে পারিনি আরও একটু। তাহলে বোধহয় এমন করে চিরকালের মতো তাকে হারাতাম না নির্মল।

শ্রদ্ধার জমিতে বিশ্বাসের গাছে যে আনন্দময় অমৃত ফল ফলে, সেই তো ভালবাসা। সে ফল ফলেছিল নির্মল, কিন্তু আস্বাদন করতে পারিনি। সুদর্শনাকে আমি আর কোনদিন খুঁজে পাইনি।

শ্রমিক-বিজ্ঞান

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এমন দিন পৃথিবীতে ছিল যখন মানুষমাত্রকে নিজ হস্তে আপন আপন প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি সমাধা করতে হতো। অবশ্য পরিবারগঠনের পর পরিবারের সকল ব্যক্তি তাদের প্রধানের নির্দ্দেশে একত্রে কায করেছে। গ্রামগঠনের পর কিছুকাল গ্রামবাসীরা নিঃস্বার্থে পরস্পর পরস্পরের কর্ম্মে সাহায্য করেছিল। ঐ সময় জমির প্রাচুর্য্য থাকায় যে যতোটা পারে নিজেরা জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ আবাদ করেছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে এরা যৌথ ভাবে বা একক এই কাযে এগিয়ে এসেছে। এদের মধ্যে যে একক এই কাজে এগিয়েছিল, সে অবশ্য এই কার্য্যে তাঁবেদার লোকদের সাহায্য নিয়েছে। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত মালিক-শ্রমিকের সৃষ্টি হয় নি। জমির মালিকানা-বোধের সঙ্গে মালিক শ্রমিকের সৃষ্টি হয়। আজিকার দিনের মত সেইদিনও সম্পত্তির নেশা মানুষকে পাগল করে তুলতো। এর অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপ ক্রমবর্দ্ধিত সম্পত্তি একক পরিশ্রমে আহরণ করা সম্ভব হয় নি। জমির আয়তন বৃদ্ধির কারণে প্রথমে মালিক তাকে এই বিষয়ে সাহায্য করবার জন্যে শ্রমিক নিয়োগ করেছে। কিন্তু পরে তদারকী কার্য্যে অধিক ব্যস্ত থাকায় মালিক স্বয়ং পরিশ্রম করার আর সময় পায় নি। এর পর এঁদের প্রতিষ্ঠানসমূহ আরও বড়ো হলে বিভাগে বিভাগে বেতনভুক্ তদারকী কর্ম্মী তাঁরা নিযুক্ত করেছেন। এই ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে মালিকগণ তাঁদের শ্রমিকদের সান্নিধ্য হতে বহু দূরে সরে গিয়েছেন। মানুষ যখন মাত্র কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত ছিল তখন খামারগুলি বড়ো না হওয়ায় এইরূপ অবস্থার কোনও দিন সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু মানুষ কৃষির প্রয়োজনে যন্ত্রপাতি সৃষ্টি ও উৎপন্ন কাঁচা মাল হতে শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস পেলে তাদের সম্পত্তির রূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের হয়ে পড়ে। কৃষির প্রয়োজনে সৃষ্ট কুটিরশিল্প ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয়ে উদ্যোগ-শিল্পে পরিণত হয়। এই উদ্যোগশিল্পে মালিকরা তদারকী কর্ম্মীসহ বহু সাধারণ শ্রমিক নিয়োগ করতে বাধ্য হন।

প্রথম প্রথম মালিকরা মনে করতেন যে বেতনভুক্ কর্ম্মীরা বেতনের বিনিময়ে তাদের ক্রীতদাসত্ব স্বীকার করেছে। এমন কি, এদের কেউ কেউ নিজেকে শ্রমিকদের দেহ ও মনেরও মালিক মনে করতেন। মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও মনে করা হতো যে, এদের যা কিছু সম্পর্ক তা মালিক ও ভৃত্যের সম্পর্ক। তাঁরা ইচ্ছা মত এদের নিয়োগ বা ভর্তি করে বিবিধ সমস্যার সমাধান করতেন। কিন্তু সভ্যতার ক্রমোন্নতির সহিত এখন তাদের সম্পর্ক মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক। ইংরাজীতে ইহাকে বলা হয়—এমপ্লয়ার এবং এমপ্লয়ীর সম্পর্ক। এক্ষণে পাকা ব্যবসায়ীদের ন্যায় নির্দ্ধারিত সর্তাদি অনুযায়ী বেতনের (অর্থের) বিনিময়ে এরা শ্রমদান বা বিক্রয় করে থাকেন। এই নূতন ব্যবস্থায় মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে আইনানুযায়ী শ্রমদান সম্পর্কীয় লেনদেন হয়ে থাকে মাত্র। এর কারণ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটী দেশের সরকার মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন। এই জন্য আজ একের পক্ষে অপরের কোনও ক্ষতি করবার চিন্তা করাও বাতুলতা মাত্র। এক্ষণে উভয়ের সম্মিলিত উদ্যমে জাতীয় স্বার্থে দেশের ধন সম্পত্তির বৃদ্ধি ঘটানো হয়ে থাকে। পূর্ব্বেকার প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক পরস্পরের স্বার্থে এখন সহযোগিতার পর্য্যায়ে উঠে এসেছে।

আজকাল যে কোনও বেতনের বিনিময়ে শ্রম সম্পর্কীয়

এই লেনদেনে মালিক অধিক লাভ করবে এবং শ্রমিকরা যে নিদারুণ ক্ষতি স্বীকার করবে তাহাও কাম্য হতে পারে না। বলা বাহুল্য যে শ্রমের উৎকর্ষতা অনুযায়ী উপযুক্ত মূল্য দেওয়া চাই। পূর্ব্বে শ্রমের এই উৎকর্ষতা পেশাগত পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। কিন্তু আজিকার এই উদ্যোগশিল্পের যুগে শ্রমিকদের জন্য শিল্পপতিগণকে শিল্প-সম্পর্কীয় শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা আপন প্রয়োজনে করে দিতে হয়। অবশ্য এই সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার করা বা না করার জন্য শ্রমিককুলকেই দায়ী করা হয়েছে। আমার মতে মালিকসৃষ্ট শিক্ষায়তন হতে যে মধুর শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক গড়ে উঠে, তার স্থায়িত্ব ও উপকারিতা সুদূরস্পর্শী হয়ে থাকে। এইভাবে যে মালিক-শ্রমিক সহযোগিতা সৃষ্ট হয় তা অতুলনীয়। বলা বাহুল্য যে অধিকসংখ্যক উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি নির্মাণে এই সহযোগিতার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, এই উদ্যোগে শিল্পের মালিক-শ্রমিক সহযোগিতা কেবল মাত্র যে মালিক ও শ্রমিকের জীবিকার জন্য প্রয়োজন ; আছে, তা নয়। দেশের শিল্পের উন্নতির উপর আজ জাতির জীবনমরণ নির্ভর করে। এই কারণে দেশের শিল্পসমূহে সরকার রূপ এক তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। দেশের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্যে এই ত্রয়ী পক্ষেরই এখন একমাত্র চিন্তা কিরূপে দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এইখানে উৎপাদিতদ্রব্যসামগ্রির ব্যবহারকারী জনসাধারণের প্রতিভূ-স্বরূপ তাদের নির্ব্বাচিত সরকার বাহাদুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। এইজন্য জনসাধারণের কেউ নিজেরা প্রতিষ্ঠানসমূহের সেয়ার হোল্ডার না হলে এই উদ্যোগ শিল্পের উৎপাদন সম্বন্ধে তাদের মাথা ঘামাতে চান নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যেকার বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা দ্বারা এই বিষয়ে এদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন।

বর্ত্তমান নিবন্ধে মনোবিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়ারগণ ও দেহ-বিজ্ঞানী পণ্ডিতদের যৌথ প্রচেষ্টাতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন ক্ষেত্রে বহু উন্নতি করতে পারেন —তা অনায়াসে প্রমাণ করা যায়। বস্তুতঃ পক্ষে এদের সম্মিলিত গবেষণায় 'শ্রমিক-বিজ্ঞান' রূপ একটি পৃথক বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। এই শাস্ত্র মূলতঃ শ্রম-মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হলেও দেহ-বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা ইহার অপরিহার্য্য অঙ্গ। শ্রমিক মনো-বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্র দেহবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় দেহ-বিজ্ঞানও এই শ্রমিক-বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। অধিকন্তু যন্ত্রসমূহকে উহাদের চালক শ্রমিকদের দেহের ও মনের উপযোগী করে নির্ম্মাণ করবার জন্য যন্ত্রবিদ্যা-বিশারদদেরও সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এই কারণেই আমি বলেছি যে শ্রমিক বিজ্ঞান গঠন করতে হলে মনোবিজ্ঞানী, দেহ বিজ্ঞানী এবং যন্ত্র-বিজ্ঞানীদের সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে।

এই শ্রমিকবিজ্ঞান পৃথিবীর একটি অধুনাতম শাস্ত্র। এখন আর ইহা মাত্র মনস্তত্ত্বের একটি উপ-বিভাগ নহে। দর্শনশাস্ত্র হতে মনোবিজ্ঞানকে যেমন একদা পৃথকীকৃত করা হয়েছিল, তেমনি এই শ্রমিকবিজ্ঞানকেও মনো-বিজ্ঞান হতে অধুনাকালে পৃথকীকৃত করা হয়েছে। জীব-বিজ্ঞান হতে পৃথকীকৃত হয়ে দেহবিজ্ঞান মাত্র মানুষের দেহ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে থাকেন। তেমনি মনো-বিজ্ঞান হতে পৃথকীকৃত হয়ে এই বিজ্ঞান মাত্র শ্রমিক মন সম্পর্কে বিবেচনা করে। উপরন্তু এই শাস্ত্রে প্রশাসন ও সমাজ-বিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা ও দেহবিদ্যাও আপন প্রয়োজনে স্থান পেয়েছে। অধুনা সৃষ্ট শ্রমিকবিজ্ঞানের সহিত উহার অগ্রজ অপরাধবিজ্ঞানের তুলনা করা চলে। শ্রমিকবিজ্ঞানের ন্যায় অপরাধ বিজ্ঞানকেও একটি অতি-আধুনিক শাস্ত্র বলা যেতে পারে। এই অপরাধ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ মনো-বিজ্ঞান, দেহবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার সাহায্যে গড়ে তোলা হয়েছে। অনুরূপভাবে শ্রমিকবিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান, দেহবিজ্ঞান, প্রশাসনবিদ্যা এবং যন্ত্রবিদ্যার সাহায্যে একটি পৃথক রূপ পেয়েছে। উপরন্তু শ্রমিক-অপরাধ রূপ পৃথক অপরাধও এই নূতন শাস্ত্রে আলোচিত হয়ে থাকে। বহুশ্রুত শাস্ত্র মনোবিজ্ঞানের বহু দিক আছে যথা, অপরাধ মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শ্রম-মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি। উহার এই শেষোক্ত শাখা শ্রম-মনোবিজ্ঞান বা ইনডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজীর উপর ভিত্তি করে এই শ্রমিক-বিজ্ঞান মূলতঃ গড়ে উঠলেও প্রয়োজন-মত যন্ত্র-বিজ্ঞান প্রশাসন-বিদ্যা, দেহ-বিজ্ঞান, প্রভৃতি অন্যান্য-বিদ্যা হতেও উহার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা

হয়েছে। এই শ্রমিকবিজ্ঞান যে কেবলমাত্র ফ্যাকটারি-সমূহের সাধারণ শ্রমিক সম্বন্ধে বিবেচনা করে তা নয়। যে কোনও ব্যক্তি ফ্যাকটারি বা আপিসে কায করে বা সেখানে অপরের কার্য্যের তদারকী করে, তাদের প্রত্যেকের মনস্তত্ব ও উচিত অনুচিত বিষয়শ্রমিক-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। এমন কি প্রতিষ্ঠানসমূহের ম্যানেজার, মালিক, ডিরেকটার এবং যন্ত্রনির্মাতাদের মতিগতি ও উচিত-অনুচিত প্রভৃতিও এই শ্রমিক-শাস্ত্রের বিষয়ীভূত বস্তু।

এই শ্রমিকশাস্ত্র মানুষকে সঠিকভাবে জীবিকার ক্ষেত্র নির্ব্বাচনে উপদেশ দিতে সক্ষম। শুধু তাই নয়, এই শাস্ত্র কোনও এক কার্য্যের স্বরূপ অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যক্তি-রূপে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করলে সুফল ফলবে তাও বলে দিতে পারে। এই শ্রমিকশাস্ত্রে শ্রম-ক্লান্তি [fatigue] এবং অর-ক্লান্তি [Bore-dom] বিদূরিত করে কর্ম্মোদ্যোগ [incentive] আনয়নের প্রকৃত পন্থা, বা উপায় ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে বিবৃত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত এই শাস্ত্রপাঠে শ্রমিককুলের অসন্তোষ, উদ্বেগ, বিতৃষ্ণা ও চাঞ্চল্য প্রভৃতি দূরীভূত করার সদুপায় সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। শ্রমশিল্পে শিক্ষাদানের রীতিনীতি এবং কিরূপে অযথা পরিশ্রম হতে শ্রমিকদের রেহাই দেওয়া যায় তাহাও এই শ্রমিক-বিজ্ঞানের বিবেচনার বিষয়। শিল্পে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সুসমাবেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণ-কৌশল, আলোক বাতাসের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়েও এই নূতন শাস্ত্রে আলোচিত হয়ে থাকে।

অন্যান্য বহুবিধ-বিজ্ঞানের ন্যায় শ্রমিক বিজ্ঞানও প্রথমে রোগের কারণ বাহির করে, তবে ঔষধের ব্যবস্থা করে। এই বিজ্ঞান শ্রমিকদের প্রাণহীন লৌহযন্ত্রের সামিল না করে তাদের মনের অধিকারী মানুষ মনে করেছে। এই শাস্ত্রে যন্ত্র অপেক্ষা যন্ত্রীকেই অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। এর বিপরীত ব্যবস্থা যে কতো ক্ষতিকর, তা আমি স্বকীয় গবেষণালব্ধ ফল হতে প্রমাণ করতে পারি। এইরূপ গবেষণার জন্য আমি যেমন কয়েকটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত থেকেছি, তেমনি নিজেও এই পরীক্ষার জন্য একটি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছি। বস্তুতঃ পক্ষে কিছু কাল পূর্ব্বে এই গবেষণার জন্যে আমি কয়েকটি ইলেকট্রিক টেপ-লুম স্থাপন করেছিলাম। এই পরীক্ষা-লব্ধ ফলাফল নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একবার নিযুক্ত কর্ম্মীদের অর্দ্ধেককে বিদায় দিয়ে বাকী সকলকে ফুরণের কাযে অধিক অর্থ প্রদান করতে থাকি। এর ফলে সত্য সত্যই দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন কর্ম্মীসংখ্যার তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমি ভুলে যাই যে এই বাছায়ের কালে মাত্র অধিক দক্ষ কর্ম্মীদেরই বহাল রাখা হয়েছিল। কিন্তু এইরূপ অধিক পরিশ্রম আখেরে তাদের মধ্যে কর্ম্মক্লান্তি আনে ও যন্ত্রের গতি সম্বন্ধে অমনোযোগী করে তোলে। এর পর প্রতিদিন একটু একটু করে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের সংখ্যা এতো বেশী কমে আসে যে কয় মাস এই শিল্প আমি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হই। এই সময় আমি বুঝতে পারি যে, চাবুক প্রয়োগে অশ্বশকট চালানো প্রথম দিকে সম্ভব হলেও আখেরে ঐ অশ্বকয়টি অকেজো হয়ে পড়ে মূল ব্যবসায়টি বিনষ্ট করে দেয়। অনুরূপভাবে চাকুরী যাবার ভয় এবং বাড়তি উপার্জ্জনের লোভ শ্রমিকদের প্রথমে কর্ম্মতৎপর করলেও আখেরে তাদের অলস করে তুলেছে। এর পর আমি পূর্ব্বের সব কয়টি শ্রমিককে একে একে পুনর্নিয়োগ করে তাদের কর্ম্মক্লান্তির অবসানের ব্যবস্থা করে দেখি যে, এতো দিনে আমি আকাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পেতে আরম্ভ করেছি। এর আরও পরে আমি বুঝেছি যে বাড়তি উৎ-পাদনের জন্য শ্রমিকদের দেহের ন্যায় মনের সহযোগিতাও অপরিহার্য্য। এদের স্বতস্ফূর্ত্ত সহযোগিতা পেতে হলে প্রথমে দেখতে হবে যে এরা কর্ম্ম-ক্লান্তিতে আক্রান্ত না হয়। এই কর্ম্ম-ক্লান্তি [fatigue] দুই প্রকারের হয়ে থাকে—যথা দৈহিক ও মানসিক। এই দ্বিবিধ কর্ম্ম-ক্লান্তি নিবারণের উপায় সম্পর্কে আমি পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ-সমূহে বিশদ আলোচনা করবো। তবে মনে রাখতে হবে যে, শ্রমিকবিজ্ঞান শ্রমিকদের দ্বারা সর্ব্বাধিক উৎপাদন আদায় করার জন্যে সৃষ্ট হয় নি। শ্রমিক বিজ্ঞানে কেবলমাত্র শ্রমিকদের সর্ব্বাধিক সুবিধা-(Comfort) প্রদানের মাত্র ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় দেখা গিয়েছে যে শ্রমিকদের দৈহিক ও মানসিক সুবিধার বিনিময়ে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রতিটি শিল্প

ক্ষেত্রে আশাতীতভাবে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটেছে।

এই শ্রমিক-বিজ্ঞানের সাহায্যে শ্রমিকদের কর্ম্মোদ্যোগ এবং মৌলিকত্ব আনা সম্ভব। জানা কায শ্রমিকরা করতে চাইলেও মৌলিকত্ব আনতে তারা রাজী হয় না। শ্রম-শিল্পে মালিকানা বোধের অভাব এবং নূতনত্বের প্রতি বীতরাগই এর জন্য দায়ী। কিন্তু এই বিষয় তাদের শিক্ষাদীক্ষা ও সুযোগ দিলে তারা এই বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠে থাকে। এই সম্পর্কে আমার নিজস্ব শ্রম-শিল্পের একটা ঘটনা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ঘটনাটি আমি প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

'প্রায় আমি দেখতে পাই যে আমার টেপলুমের সন্নিবেশিত সূতা ছিঁড়ে উৎপাদনের বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। শ্রমিকরা কৈফিয়ৎস্বরূপ বলে যে, গ্রীষ্মের আধিক্যের জন্য এইরূপ ঘটে থাকে। এই সূতা পূর্ব্বাহ্ণে জলে ভিজিয়ে নিতে উপদেশ দিলে তারা বলে যে, এতে মাকুর কাঠ ও লৌহপাতে মরিচা পড়ে অকেজো হবে। আমি নিরস্ত না হয়ে এদের সঙ্গে বন্ধুভাবে আলোচনায় রত হই। এর পর ঠিক হয় যে মাটির মেছলাতে জল রেখে তা সূতোর টানার নীচে রেখে দেওয়া যাক। গ্রীষ্মজনিত গরমে ঐ জল ধীরে ধীরে বাষ্পে পরিণত করলে ঐ বাষ্প সূতায় লেগে উহাদের নরম করে দেবে। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকরা স্বীকৃত হলে দেখা যায় যে, ঐ সূতার সারি ছিঁড়ে বারে বারে বৃথা সময় নষ্টের আর কারণ হচ্ছে না।

এরপর থেকে আমি এই শ্রমিকদের যন্ত্রের উৎকর্ষতার দিকে অধিক মনোযোগী হতে দেখি। এদের মনে নূতনত্ব আবিষ্কারের একটা মোহ এসে গিয়েছিল। আমিও ওই বিষয়ে এদের প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা দিতে কার্পণ্য করি নি। এর ফলে তারা এই টেপলুম্ শিল্পের কয়েকটা আনুসঙ্গিক যন্ত্র নিজেরাই তৈরী করতে পেরেছিল। এই দিক থেকে আমার যথেষ্ট অর্থও আমি বাঁচাতে পেরেছিলাম।"

অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের মত এই শ্রমিক বিজ্ঞানেও কয়েকটি পরিসংজ্ঞা এবং পরিভাষা আছে। এই সকল পরিসংজ্ঞা ও পরিভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে শ্রমিক-বিজ্ঞান অনুধাবনে অসুবিধা হতে পারে। এইজন্য আমি নিজে গবেষক ও পাঠকদের সুবিধার জন্য উহাদের তৈরী করে নিয়েছি। এইগুলি এইবার নিম্নে উল্লেখ করে পৃথক পৃথকভাবে উহাদের ব্যাখ্যা করা হবে। শ্রম-বিজ্ঞানের এই পরিসংজ্ঞার প্রতিপাদ্য প্রণিধান করলে দেখা যাবে যে, উহাদের বিষয়গুলির একটির সঙ্গে অপরটির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ তো আছেই, উপরন্তু উহাদের একটির দোষে বা গুণে একটি হতে অপরটির সৃষ্টি হয়েছে। এই জন্যে মূল শ্রম-বিজ্ঞান পাঠের পূর্ব্বে পাঠকদের এই শ্রম-সংজ্ঞাগুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জ্জন করা উচিত হবে।

(১) নিষ্ফল শ্রম—তদারকী অফিসারদের নির্দ্দেশে ভুল থাকায় বা সাধারণ শ্রমিকদের অমনোযোগিতায় কিংবা স্বইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভুলভাবে কায করায় বা ভুল কাঁচা মাল তৈরী ও প্রদান করার জন্য যে অব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন হয় সেই সকল অকেজো বা নিকৃষ্ট দ্রব্য-উৎপাদনে প্রযুক্ত শ্রমকে বলা হয় নিষ্ফল শ্রম। এই নিষ্ফল শ্রমজনিত উৎপাদিত অনুৎকৃষ্ট ও অকেজো দ্রব্যসামগ্রী মালিকদের লোকসানের অঙ্ক বাড়িয়ে দিয়ে থাকে। অন্যান্য কারণসহ ইহাও মালিক-শ্রমিকের বিরোধের কারণ হয়ে উহাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার হানি ঘটিয়ে থাকে। এই জন্য শ্রমিক মালিকদের সমবেত চেষ্টায় এই নিষ্ফল শ্রমের ক্ষণ অতি সত্বর হ্রাস করা উচিত হবে।

(২) ফলপ্রসূ শ্রম :—শ্রমিকরা তাদের সুনিয়ন্ত্রিত শ্রম দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক উৎকৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য যে সার্থক শ্রম দান করেন সেই শ্রমকে বলা হয় ফলপ্রসূ শ্রম।

(৩) উৎপাদক-শ্রম :—উৎপাদক শ্রমকে ইংরাজীতে বলা হয়ে থাকে প্রোডাক্টীভ্ লেবার। কেবলমাত্র অর্থকরী দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনের জন্য যে শ্রম ব্যয়িত হয় তাকে বলা হয়ে থাকে উৎপাদক শ্রম।

(৪) অনুৎপাদক শ্রম—উৎপাদকশ্রমের মত অনুৎপাদক শ্রমেরও অস্তিত্ব আছে। ইংরাজীতে একে বলা হয়ে থাকে আন্-প্রোডাক্টিভ লেবার। তাঁত-শিল্পে সূত্র সমাবেশে, ছাপাখানার প্রাথমিক ব্যবস্থায়, বৃহৎ-শিল্পে কাঁচামাল আনয়ন ও অপসারণে বহু সময় ব্যয়িত

হয়ে থাকে। তদারকী কর্ম্মীদের পরামর্শ গ্রহণ ক্ষুদ্রযন্ত্র আনয়ন বা আহরণ প্রভৃতিতেও এই অনুৎপাদক শ্রমক্ষণ ব্যয়িত হয়ে থাকে। এইগুলি মূল উৎপাদনের ব্যাপারে অপরিহার্য্য হলেও এই অনুৎপাদক শ্রমের ক্ষণ কমালে উৎপাদক শ্রমের ক্ষণ বেড়ে গিয়ে থাকে। বহুক্ষেত্রে কাঁচামালের অবস্থান ক্ষেত্রের দূরত্ব এবং যন্ত্রাদি সমাবেশের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য এই অনুৎপাদক শ্রমের ক্ষণ বেড়ে গিয়েছে। একই শ্রমিককে এই উভয় প্রকার শ্রম একত্রে করতে হলে অনুৎপাদক শ্রম কমানোর জন্য আরও সুব্যবস্থা করা দরকার হয়। কাপড়ের কল, চটকল প্রভৃতিতে তাঁতীদের এবং ছাপখানা ও অন্যান্য বহু শ্রম-শিল্পে এই রীতি প্রচলিত আছে।

(৫) শ্রম-ক্লান্তি:—শ্রমিকদের এই শ্রম-ক্লান্তিকে 'কর্ম্ম-ক্লান্তি' রূপেও অভিহিত করা চলে। এই শ্রম ক্লান্তি দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা দৈহিক ও মানসিক। কর্ম্ম-বিরাম ব্যতীরেকে এক নাগাড়ে অধিক ক্ষণ কর্ম্ম জোর করে করার প্রচেষ্টা মানুষের দেহে ল্যাকটিক এসিড উৎপাদন ক'রে তাকে কর্ম্ম ক্লান্ত করে তোলে। এই ল্যাকটিক এসিড অপসৃত করার ক্ষমতা সকল মানুষের সমান থাকে না। এই অবস্থায় শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের সংখ্যার ও উৎকর্ষতার হানি ঘটে। এই কর্ম্ম-ক্লান্তিকে ইংরাজীতে বলা হয় ফেটীগ। ফ্যাকটারী গৃহে সমধিক বায়ু তথা অক্সিজেনের অভাব অতি দ্রুত শ্রমিকদের মধ্যে কর্ম্মক্লান্তি এনে দেয়। অযথা পরিশ্রম এড়াতে পারলে এই অবস্থা হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। অন্যদিকে মানসিক শ্রম-ক্লান্তি—অসৎ ব্যবহার, কর্ম্ম-বিশেষে বীতরাগ, সর্বদা চাকুরী যাবার ভয়, প্রয়োজনীয় যন্ত্রের অভাবে অসুবিধা, পারিবারিক চিন্তা, প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব প্রভৃতি হতে উৎপন্ন হয়েছে। এই মানসিক শ্রম ক্লান্তিও সমভাবে দ্রব্য সামগ্রীর সংখ্যা ও উৎকৃষ্টতা হানির জন্য দায়ী হয়ে থাকে। উপরন্তু এই উভয়বিধ শ্রম-ক্লান্তি নিকৃষ্ট দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ক্ষতিরও কারণ ঘটিয়েছে।

(৬) মনো-জট—ইংরাজীতে মনোজটকে কমপ্লেক্স বলা হয়ে থাকে। তদারকী কর্ম্মীদের অসদ্ব্যবহার, চাকুরী যাবার ভয়, মালিকদের প্রতি ঘৃণা ও সন্দেহ, নূতনত্বের প্রতি বিরাগ এবং অন্যান্য বহু সহজ স্পৃহা জোর করে প্রশমিত হলে উহা অবচেতন মনে স্থান করে নিয়ে বহু মনো-জটের সৃষ্টি করে; ইহার ফলে এই প্রশমিত ইচ্ছা শ্রমিকদের মধ্যে নানাবিধ বিকৃত চিন্তা ও ব্যবহারের সৃষ্টি করেছে। এই সকল মনোজটের কারণ তদন্ত দ্বারা অপসারিত করলে মালিক-শ্রমিকের সম্পর্কের উন্নতি ঘটে এবং বহু অকারণ ভুলবোঝাবুঝির দায় হতে উভয় পক্ষ নিস্তার পায়।

(৭) সহযোগিতা:—সহযোগিতা দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা মালিক-শ্রমিক এবং শ্রমিক-শ্রমিক। মালিকদের সহিত শ্রমিকদের সহযোগিতার ন্যায় একজন শ্রমিকের সহিত অপরজন শ্রমিকেরও সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। এই উভয়বিধ সহযোগিতা ব্যতীত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোনও উদ্যোগশিল্পের উন্নতি লাভ করতে পারে নি। বিশেষ করে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে মালিক ও শ্রমিকদের সহযোগিতা ব্যতীত বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন সম্ভব হয় না। শ্রমিকদের মালিকদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ও তাহাদের সুবিবেচনা ও বিচার বুদ্ধির উপর আস্থা এবং মালিকদের শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাস, অনুরাগ, ও তাদের দক্ষতা ও সততার প্রতি আস্থা এই অপরিহার্য্য সহযোগিতার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে। এই সহযোগিতার পরিপন্থী কারণগুলি খুঁজে বার করে অরাজনৈতিক ও প্রকৃত শ্রমিক দরদী শ্রমিক নেতা এবং নবস্থাপিত ওয়ার্কস কমিটিগুলির মাধ্যমে আপোষ আলোচনা দ্বারা দূরীভূত করা যেতে পারে।

কর্ম্ম-বিরাম:—শ্রমিকদের কর্ম্মক্লান্তি বিদূরিত বা নিরোধ করার জন্যে মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক শ্রমের মধ্যে যে বিরাম দেওয়া হয় তাহাকে বলা হয় কর্ম্ম-বিরাম। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে—দিবসের যে সময় উৎপাদন বৃদ্ধি সর্ব্বোচ্চ হয় সেই সময় শ্রমিকদের পনের মিনিট কাল কর্ম্ম-বিরাম দিলে শ্রম-ক্লান্তি এবং অব ক্লান্তির কুফল হতে রেহাই পাওয়া যায়। এই পনর মিনিট শ্রম-বিরামের পর উৎপাদনের হার আর না কমে সমান তালে চলে থাকে। উৎপাদনের সর্ব্বোচ্চ ক্ষণের পর এই শ্রম-বিরাম না দিলে এর পর হতে উৎপাদিত দ্রব্যের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে আরম্ভ করে। পরিশ্রান্ত পেশীসমূহ সৃষ্ট ক্ষতিকর ক্রমবর্দ্ধমান

ল্যাকটিক এসিড্ এই শ্রম-বিরামের সুযোগে লুপ্ত হতে পারায় আগত প্রায় শ্রম-ক্লান্তি অবরুদ্ধ হওয়ায় উহা আর আসে না। এরফলে শ্রমিকগণ একইভাবে কর্ম্মঠ থেকে সারা-দিন সমানভাবে পরিশ্রম করে যেতে পারে। এই দৈনিক কর্ম্ম-বিরামের ন্যায় শ্রমিকদের দেহ ও মনের সুস্থতার জন্যে সাপ্তাহিক এবং মাসিক এবং বাৎসরিক শ্রম-বিরামেরও প্রয়োজন আছে। এইগুলির অভাবে তাদের দেহ ও মন ভেঙ্গে পড়তে পারে। এই কর্ম্ম-বিরামের ক্ষণ কতটুকু হওয়া উচিত তা মূল পুস্তকে আলোচনা করা হয়েছে।

(৮) শ্রম-বিরাম:—এই শ্রম বিরাম দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত। কাঁচামালের যোগানে বিলম্ব জনিত এবং যন্ত্রাদি বিকল হওয়ার জন্যে যে শ্রমক্ষণ অযথা নষ্ট হয় উহাকে অনিচ্ছাকৃত শ্রম-বিরাম বলা হয়। এই প্রকার শ্রম-বিরাম শ্রমিকরা পছন্দ করেনা এবং উহা তাদের বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছে। অন্যদিকে শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় আইনানুযায়ী শ্রম বিরামের ব্যবস্থা না থাকলে তারা কর্ম্মক্লান্তি হতে অব্যাহতি পাবার জন্যে বাধ্য হয়ে অননুমোদিত শ্রম-বিরাম গ্রহণে বাধ্য হয়। এই উভয় প্রকার শ্রম বিরামকে (বৈজ্ঞানিক পন্থায়) অনুমোদিত এবং অ-অনুমোদিত শ্রমবিরাম নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই জন্য বৈজ্ঞানিক ভাষ্যে এই শ্রম বিরামকে দুই প্রকারের বলা হয়ে থাকে। যথা অনুমোদিত শ্রম বিরাম এবং অননুমোদিত শ্রম-বিরাম। দৈব-দুর্ঘটনা:—এই দৈব-দুর্ঘটনার ফলে বহু ফলপ্রসূ শ্রমক্ষণের অপচয় হওয়ায় আনুপাতিক হারে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর সংখ্যা হ্রাসের জন্য মালিকদের লাভের অঙ্ক কমে যায়। এতে মালিকদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থ যেমন দিতে হয়, তেমনি শ্রমিকরাও দেহের ক্ষয়-ক্ষতির জন্য ভুগে থাকে। এতদ্ব্যতীত মালিকদের লাভ এবং শ্রমিকদের বেতনের অর্থ কমে গিয়ে থাকে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পে এইরূপ দৈব-দুর্ঘটনা বা এক্সিডেন্ট প্রায় ঘটে থাকে। সাধারণ ভাবে বলা হয়ে থাকে যে ইহা শ্রমিকদের অমনোযোগিতা, এবং যন্ত্রের ক্রটির জন্যে ঘটে থাকে। শ্রমিকদের এই অমনোযোগিতা ও অসাবধানতার কারণ ও উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রমিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। মনোপসরণ এবং শ্রমক্লান্তি এবং শ্রমবিরামের অভাবাদির জন্যও বহু দৈব দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এই সকল কারণ অপসারিত হওয়া মাত্র দৈব-দুর্ঘটনার সংখ্যা কমে এসেছে। তবে কোনও কোনও শ্রমিকদের বেপরোয়া ভাব বা এড্-ভ্যাঞ্চার স্পৃহা, বেল্লাকিপনা, প্রয়োজনীয় শিক্ষার ও উপ-দেশের অভাব, পারিবারিক অশান্তি প্রভৃতির কারণেও বহু দৈব-দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। দৈহিক কারণে শ্রমিকদের ক্ষণ ক্ষণীয় ফলের (Reaction Time) অবনতিও বহু দৈব-দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী। মেসিনের টাইম রি-এ্যাকসনের সঙ্গে সমান তালে দেহেরও টাইম রি-এ্যাকসন অব্যাহত থাকা চাই—তা না হলে যন্ত্রের গতির সঙ্গে তাল রেখে চাকা ঘুরার সঙ্গে সঙ্গে হাত সরানো সম্ভব না'ও হতে পারে। মনো-বিজ্ঞানী যন্ত্রের সাহায্যে অভ্যাস দ্বারা শ্রমিকরা তাদের এই রি-এ্যাকসন টাইম শক্তিশালী করে তুললে এমনিতেই তারা বহু টাইম রি-এ্যাকসনের হানিজনিত দৈব-দুর্ঘটনা এড়াতে সক্ষম হতে পারে। তবে এই সব মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্র ব্যতিরেকে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা সহ অভ্যাস দ্বারা সরল মনের অধিকারী হতে পারলেও বহু দুর্ঘটনা এড়াতে পারা যায়।

(৯) যন্ত্র-বিরাম:—শ্রমিকদের অমনোযোগিতায় বা ক্ষয় ক্ষতির কারণে বা মেরামতের অভাবে মধ্যে মধ্যে যন্ত্র থেমে গিয়ে থাকে। আবার কাঁচা মাল যোগানোর বিলম্বে বা বস্ত্রশিল্পের ন্যায় সূত্রাদি ছিঁড়ে যাওয়ায় মধ্যে মধ্যে যন্ত্র গতিহীন হয়ে পড়ে। এইরূপ অবস্থা বা ব্যবস্থাকে বলা হয় যন্ত্রবিরাম। এই যন্ত্র-বিরামের কারণ অনুধাবন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অযথা বহু শ্রমফল নষ্ট হয়ে উৎপাদনের হ্রাস ঘটাতে পারে না।

(১০) কর্ম্মোদ্যোগ:—ইংরাজীতে এই কর্ম্মোদ্যোগকে ইনসেনটিভ বলা হয়ে থাকে। কর্ম্মক্লান্তি, অবিচার, অসদ্ব্যবহার প্রভৃতি শ্রমিকদের কর্ম্মোদ্যোগের পরিপন্থী হয়ে থাকে। এই কর্ম্মোদ্যোগ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা প্রকৃত বা স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এদের উপকারী কর্ম্মোদ্যোগ এবং অনুপকারী কর্ম্মোদ্যোগ বলা হয়ে থাকে। অধিক পারিশ্রমিক ভাতা প্রদর্শন দ্বারা যে কর্ম্মোদ্যোগের সৃষ্টি

করা হয় তাকে বলা হয় কৃত্রিম কর্ম্মোদ্যোগ। ইহা আখেরে কর্ম্মক্লান্তি এনে শ্রমিকদের অবসাদগ্রস্ত করে শিল্পোৎপাদনের ক্ষতি সাধন করেছে।

(১০) অবক্লান্তি :—ইংরাজীতে অবক্লান্তিকে বোর-ডাম বলা হয়ে থাকে। একঘেয়ে কাযে শ্রমিকরা একঘেয়ে হয়ে উঠলে শ্রমিকদের মধ্যে এই অবক্লান্তি বা একঘেয়েমী এসে থাকে।

(১১) ক্ষণ-সমন্বয় : যন্ত্রের গতি এবং কাঁচা মাল সরবরাহের মধ্যে গতিগত সমন্বয়কে ক্ষণ-সমন্বয় বলা হয়ে থাকে। এইরূপ সমন্বয় সাধিত হলে কাঁচা মালের জন্য যন্ত্রকে ক্ষণে ক্ষণে থামাতে হয় না।

যন্ত্র-সমন্বয় :—বস্ত্র ও সূতাশিল্প প্রভৃতিতে একটি যন্ত্র যথা সূতা গুটোনো যন্ত্র এবং অপর যন্ত্র, যথা বুনোন যন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় থাকা দরকার। এই ক্ষেত্রে একটী যন্ত্র অপর যন্ত্রের তৈরী কাঁচা মালের যোগানদার যন্ত্র। এইজন্য উভয় যন্ত্র প্রায় সম-গতিসম্পন্ন রূপে নির্ম্মিত হওয়া উচিত হবে। বরং যোগানদার যন্ত্রের গতি উৎপাদক যন্ত্র অপেক্ষা অধিক গতি সম্পন্ন হলে সমন্বয়-ফল আরও উত্তম হবে।

(১২) শ্রম-তাল :—এই শ্রম-তাল বা কর্ম্মতালকে ইংরাজীতে বলা হয়ে থাকে রিথিম্। এই শ্রম-তালের অভাব কর্মীদের অযথা কর্ম্মক্লান্ত করে পরিশ্রান্ত করে তুলে। ইহা দৈহিক এবং মানসিক কর্ম্মক্লান্তি দূর করে শ্রমিকদের বহুক্ষণ কর্ম্মঠ ও উৎসাহী করে রেখেছে। যন্ত্রের সঙ্গে দেহের তাল রেখে বা দুই হাত বা দুই পা সমান ভাবে প্রয়োগ করে এই কর্ম্মতাল অক্ষুন্ন রাখা গিয়েছে। সহজ ভঙ্গিমা ও মৃদু বাদ্য এই শ্রম-তাল রক্ষার সহায়ক হয়ে থাকে। এই শ্রম-তাল শ্রমিকদের মধ্যে ছন্দোবদ্ধ দ্রুত-গতি আনয়নে সক্ষম হয়ে থাকে। যৌথ শ্রমে শ্রমিকরা এই শ্রম তাল আহরণের জন্য সম অর্থ বোধক শব্দ চয়ন করে গান গেয়ে থাকে এবং একই সঙ্গে উত্তোলক ও আহ্বায়ক চাপের সৃষ্টি করে ভারি দ্রব্য টানে বা তুলে।

(১৩) একক শ্রম :—কোনও শ্রমিক যখন একা কোনও যন্ত্রের সাহায্যে বা উহার সাহায্য ব্যতীরেকে কর্ম করে তখন তাহার কর্ম্মজনিত শ্রমকে একক শ্রম বলা হয়ে থাকে। একক শ্রমের শ্রম-ফাঁকী বা ক্ষণ-অপচয় ঐ শ্রমিকের উপর সরাসরি বা অলক্ষ্যে লক্ষ্য রাখলে তা ধরা বা জানা যেতে পারে। ভৎর্সনা বা উপদেশ নিক্ষেপ করে বা শ্রমিকের অসুবিধা দূর করে তার ফলপ্রসূ শ্রমের ক্ষণ বর্দ্ধিত করা সম্ভব।

(১৪) যৌথ শ্রম :—কোনও ভারি দ্রব্য উত্তোলন বা ভারি দ্রব্য আকর্ষণ বা আনয়ন একক প্রচেষ্টার দ্বারা সম্ভব হয় না। এমন কি ঐ প্রচেষ্টা শ্রমিকদের দেহ ও মনের পক্ষে ক্ষতিকরও বটে। এই অবস্থায় ঐ কার্য্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক শ্রমিকদের যৌথ প্রচেষ্টা দ্বারা সমাহিত হয়। এইরূপ শ্রমকে শ্রমবিজ্ঞানে যৌথ-শ্রম নামে অভিহিত করা হয়েছে। যৌথশ্রমে প্রতিটি শ্রমিকের সাধ্যমত সমানভাবে শ্রম-বিতরণের প্রয়োজন। কিন্তু এদের অনেকে হাকিমের কলম চুরীর ন্যায় অলক্ষ্যে শ্রম-চুরিতে অভ্যস্ত। এই অবস্থায় শ্রম-চুরি-দোষে দোষী শ্রমিকদের বেছে নিয়ে তাদের স্থান পরিবর্ত্তন করে দিলে সুফল ফলে থাকে।

(১৫) ব্যবহার : —উৎকৃষ্ট দ্রব্য তৈরী-চাতুর্য্য করতে হলে কেবলমাত্র যন্ত্রের উৎকর্ষতা যথেষ্ট নয়। অতি সাধারণ যন্ত্রও ব্যবহার-চাতুর্য্যের গুণে অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি নির্ম্মাণে সক্ষম হয়ে থাকে। এদেশীয় শ্রমিকগণ এই ব্যবহার-চাতুর্য্যের উপর অধিক নির্ভরশীল হয়ে থাকে। একমাত্র কয়েকটি অটোমেটিক যন্ত্র ব্যতীত যন্ত্র মাত্রের উৎকর্ষতা উহার ব্যবহার চাতুর্য্যের উপর নির্ভর করে।

(১৬) অপসরণ :—এই অপসরণ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা, দেহোপসরণ এবং মনোপসরণ। এক এক প্রকার কার্য্য এক এক জন শ্রমিক অধিক পছন্দ করে। এর কারণ দেহের সঙ্গে মনের দিক হতে এক এক দল এক এক প্রকার যন্ত্র বা কার্য্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এই জন্য সেই সেই কার্য্যে বা যন্ত্রে তারা অধিক দক্ষতা দেখাতে সক্ষম। বহু শ্রমিক তাদের দেহ ও মনের দিক হতে অনুপযুক্ত যন্ত্র বা কর্ম্ম পছন্দ না করায় বা উহা তাদের পক্ষে কষ্টদায়ক হওয়ায় তাদের চাকুরী ছেড়ে কর্ম্মসংস্থানের জন্য অন্যত্র গমন করে। অর্থাৎ তাদের পূর্ব্বকর্ম্ম হতে পলায়ন করে তারা নূতন কর্ম্মে যোগ দেয়। শ্রমিকদের এইরূপ ব্যবহারকে দেহোপসরণ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সুযোগ সুবিধার অভাবে অন্যত্র চাকুরী না পাওয়ায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহে ও পরিবার প্রতিপালনের

জন্য তাদের এই অপছন্দকর ও কষ্টকর কর্ম্মে বাধ্য হয়ে টিকে থাকতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মন সকল সময়েই এই সকল কর্ম্ম হতে পলায়নপর হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাদের দেহ অপসৃত না হলেও মন কর্ম্ম হতে অপসৃত হয়ে থাকে। এই বিশেষ মনো-জট সহ কার্য্যরত থাকার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ কলকারখানায় বহু দুর্ঘটনা বা একসিডেণ্ট হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর শ্রমিকরা শ্রম-তাল (Rythm) আহরণ না করতে পারায় শ্রম-ক্লান্তিতে ভুগে থাকে। কলকারখানায় দুর্ঘটনার জন্যে এই শ্রম-ক্লান্তি (Fatigue) ও অবক্লান্তি (Boredom) বহুলাংশে দায়ী থাকে। এর ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানে অনুৎপাদক শ্রম বেড়ে এবং উৎপাদক শ্রম কমে গিয়ে থাকে এবং এই কারণে ছোট বড়ো সকল শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকর্ষতা ও সংখ্যা বহুগুণে স্বভাবতঃই কমে গিয়েছে। এই কারণে কোনও শ্রমিককে কর্ম্মে বহালের পূর্বে বৈজ্ঞানিক পন্থায় পরীক্ষানিরীক্ষা দ্বারা তাদের মানসিক স্পৃহা ও দৈহিক শক্তি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তবে তাকে উপযুক্ত কর্ম্মে নিয়োগ করা উচিত হবে। শ্রমিক-বিজ্ঞান এই সকল বিষয়ে ছোট বা বড় শিল্পের মালিক বা ম্যানেজারদের উপযুক্ত শ্রমিক ভর্ত্তির বিষয়ে সাহায্য করতে পারে, যেহেতু বর্ত্তমান আইনে কাউকে একবার নিয়োগ করলে তাকে বরখাস্ত করা কষ্টসাধ্য, সেই হেতু ভর্ত্তিকালে শ্রমিকদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেবৈজ্ঞানিক পন্থায় পরীক্ষা না করে ভর্ত্তি করলে সমস্যা জটীল হতে জটীলতর হয়ে উঠে।

(১৭) ব্যস্ততা : বহু ক্ষুদ্র বা বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে যে কর্ম্ম ব্যস্ততা দেখা যায় তাহা কদাচিৎ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ক্ষেত্রে উপকারে এসেছে। এর এই কর্ম্মব্যস্ততা তদারকী কর্ম্মীদের তাড়ন ও ভীতি প্রদর্শন এবং অধিক পারিশ্রমিকের প্রলোভন দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকে। আখেরে শ্রম-ক্লান্তি সৃষ্টিকরে ইহা শ্রমিকদের দক্ষতা বহুগুণে কমিয়ে দিয়েছে। শ্রমিক জগতে ব্যস্ততার সহিত ক্ষিপ্রতার প্রভেদ আছে। এই জন্য ব্যস্ততা মালিক ও শ্রমিকদের অপকার এবং ক্ষিপ্রতা উৎপাদন বৃদ্ধি করে উহাদের উপকার করে থাকে।

(১৮) ক্ষিপ্রতা : শ্রমিকদের কর্ম্মে ক্ষিপ্রতা অর্জ্জন মনোযোগ এবং অভ্যাস সাপেক্ষ। ব্যস্ততার সঙ্গে এই ক্ষিপ্রতার প্রভেদ আছে। কেবল মাত্র দক্ষ শ্রমিককুলই তাদের কর্ম্মে প্রয়োজনীয় ক্ষিপ্রতা আনয়ন করতে সক্ষম। ফুরণের কাযে অধিকসংখ্যক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কিংবা তদারকী কর্ম্মীদের পুনঃ পুনঃ তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে শ্রমিকগণ অযথা কর্ম্ম ব্যস্ততা আনয়ন করে। কিন্তু এই কৃত্রিম ব্যস্ততার কারণে অতিশীঘ্র শ্রম-ক্লান্তি আসায় এদের দক্ষতা কমে গিয়ে থাকে। এই অতি-মানসিক কারণে ব্যস্ততার মধ্যে শ্রম-তাল না থাকায় এদের মধ্যে অনতিবিলম্বে শ্রম-ক্লান্তি এসেছে। কিন্তু ক্ষিপ্রতার মধ্যে শ্রম-তাল অক্ষুন্ন থাকায় ছন্দোবদ্ধ ভাবে শ্রমিকরা অতিদ্রুত দুরুহ কার্য্যাদি সমাধা করে থাকে। বহুস্থলে অনুৎপাদক শ্রম এই ক্ষিপ্রতার দ্বারা শ্রমিকরা বহুগুণে কমিয়ে আনতে পেরেছে। এই ক্ষিপ্রতার কারণে যোগানদার শ্রমিকরা উৎপাদক যন্ত্রের গতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হয়ে থাকে।

উপরোক্ত পরিসংজ্ঞা [Definition] এবং পারিভাষাগুলি হতে বুঝা যায় যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শ্রমিকদের উপর অযথা চাপ হ্রাস করে অনুৎপাদক শ্রম কমানো এবং উৎপাদক শ্রম বাড়ানোর জন্য মূলতঃ শ্রমিক-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। বক্তব্য বিষয়টি সম্যক রূপে বুঝতে হলে নিম্নের শ্রম বিভাগ সম্পর্কীয় তালিকাটি প্রণিধান করার প্রয়োজন আছে।
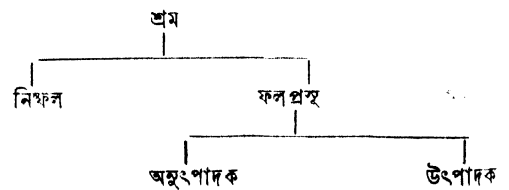
এইখানে নিষ্ফল শ্রম যাহাতে প্রতিষ্ঠানসমূহে আদপে না ঘটে তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করা উচিত। ফলপ্রসূ শ্রমের মধ্যে অনুৎপাদক এবং উৎপাদক—এই উভয়বিধ শ্রমেরই প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে শুধু অনুৎপাদক শ্রম কমাতে এবং উৎপাদক শ্রম বাড়াতে হবে। এইরূপ সুব্যবস্থা শ্রমিকদের দেহ ও মনের উপর অযথা চাপ এনে সমাধা করা যায় না। এই জন্য শ্রমিকদের অবক্লান্তি

শ্রমক্লান্তি দেহোপসরণ মনোপসরণ অকারণ ব্যস্ততা, প্রভৃতির কারণ দূরীভূত করে উহাদের মধ্যে শ্রমতাল, ক্ষিপ্রতা, ক্ষণ-সমন্বয় উপকারী কর্ম্মোদ্যোগ, কর্ম্ম বিরাম প্রভৃতি আহরণ করার প্রয়োজন আছে।

এক্ষণে কি উপায়ে উপরোক্ত দোষ ও গুণ সকল যথাক্রমে বর্জ্জন এবং অর্জ্জন করে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব অথচ এতদ্দ্বারা কি ভাবে শ্রমিকদের দেহ ও মন সুস্থ থাকবে তাহাই শ্রমিক-বিজ্ঞানের একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। এই কারণে শ্রম-মনোবিজ্ঞান, দেহ-বিজ্ঞান, প্রশাসনিক-জ্ঞান এবং যন্ত্র-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে এই অধুনাতম বিদ্যা শ্রমিক-বিজ্ঞান গড়ে তুলতে হবে।

ক্রমশঃ

মীন-রূপসী

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

গঙ্গার জলে এলিয়ে এ মীন-অঙ্গ,
নীরবে ধরিয়া অভ্র-মেঘের সঙ্গ,
আমরা হেরি যে আলো-ছায়া-নাট-রঙ্গ।

(২)

উর্দ্ধে প্রবাহ যদি হয় উৎক্ষিপ্ত
ফেন-চূড় জল হয় রে রৌদ্র-দীপ্ত ;—
সে-জল মাখিয়া মোরা হই পরিতৃপ্ত।

(৩)

সৈকতে জমে পলি শুধু অহোরাত্র,
মমতায় নদী ভরে প্রসাধন-পাত্র ;—
মেজে খুসী হই তাহাতে রূপালী গাত্র।

(৪)

সলিল-সেতারে বাতাস বাজালে ছন্দ
তরঙ্গ-দল নাচে রে মন্দ মন্দ ;—
সম্ভোগে তা'র মোরা পাই মহানন্দ।

(৫)

উর্ম্মি-মালার মধু-মাখা অনুবন্ধে,
কূল-বিলাসিনী জলজ ফুলের গন্ধে,
ঝাঁকে ঝাঁকে মোরা মাতি মিলনের দ্বন্দ্বে।

(৬)

দূরে দিগন্ত যেথায় বিবশ অঙ্গে
ঝিমু-ঝিমু করে গঙ্গার উৎসঙ্গে,—
সে-শান্তিময় দৃশ্যেও ভুলি রঙ্গে।

(৭)

যত দিন আয়ু—স্বপ্নাবিষ্ট চিত্ত ;
রোমাঞ্চময় সময় ; প্রবাহ-বৃত্ত
প্রলুব্ধ করে মোদেরও নিত্য-নিত্য।

(৮)

রূপ নিয়ে ফিরি থই-হারা নদী-বক্ষে,
পলকও পড়ে না চির-রূপাতুর চক্ষে ;
রূপ-হারা হবো কি ক'রে রূপের কক্ষে !

(৯)

রূপ দেখে—মেখে—চেখেও আসে কি শ্রান্তি !
প্রসব করি যা', তা'রও যে রূপালী কান্তি ;
ভ্রান্তি হ'লেও—রূপময় এ কী ভ্রান্তি !
রূপালী মীনের রূপ ছাড়া কিসে শান্তি !

দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ. বিটি. এম,এ (এডিন্)

স্বাধীনতা জন্মগত অধিকার, বঞ্চিত লাঞ্ছিত জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল বেদনা মর্মে মর্মে অনুভব করে। জাতির পরাধীনতার জন্য অন্তর বেদনা মূর্ত্ত হইয়া উঠে যুগন্ধর কবির কাব্যে। দেশপ্রেমিক কবি পরাধীনজাতির নিকট মূর্ত্ত করিয়া তুলেন স্বাধীন মুক্ত দেশের বলিষ্ঠ রূপ, বলিষ্ঠ দেশপ্রেমিক কবি মৃণ্ময়ী দেশমাতৃকার সত্যকারের চিন্ময়ী চিরভাস্বররূপটি জনগণের বোধগম্য ভাষায় রূপায়িত করেন। দেশপ্রেমিক কবির কাব্যে লিরিকের গীতিমূর্চ্ছনা, কল্পনার মোহিনীমায়া, কল্পনার অসীমনভোলোকে বিচরণ অপেক্ষা জাতির বেদনা জাতির অতীত ঐতিহ্য, জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা, জাতির নিষ্পেষিত জনগণের জন্য দুঃখবোধ জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, সর্ব্বোপরি জাতির কর্মশক্তিকে বিশ্বের কল্যাণব্রত পালনে অনুপ্রাণিত করিবার শক্তি থাকে। দেশপ্রেমিক কবি তাঁহার ওজঃশক্তিতে পদাহত নিষ্পিষ্ট জাতিকে মহৎব্রত পালনে উদ্বুদ্ধ করেন। দেশ প্রেমিক চিরতরুণ যুগন্ধর কবি দ্বিজেন্দ্রলালের, দেশপ্রেমিক চারণকবির এই লক্ষণগুলি স্পষ্ট। যুগন্ধর কবি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার অফুরন্ত দেশপ্রেমের মধ্যদিয়া, তাঁহার গানের মধ্যদিয়া জাতীয় সংহতি ও ঐক্য সৃষ্টিতে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। দেশপ্রেমিক কবি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণস্পন্দনে জাতির অন্তরসত্তা স্পন্দিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের ওজঃ শক্তিতে জাতি তাহার সুপ্ত ওজঃশক্তির অসীম সম্ভাবনা অনুভব করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের বিশ্বচেতনাবোধ নাৎসীবাদের সঙ্কীর্ণ সম্ভাবনাকে অসাড় প্রতিপন্ন করিয়াছে। নিষ্পেষিত জনগণের, পদদলিত কৃষকের স্বাধিকার আধ্যাত্মিক কল্যাণের মধ্যে সমন্বয় সূত্রের সন্ধান পাইয়াছে। তরুণের দরদীবন্ধু সবুজের জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছেন।

কবি দ্বিজেন্দ্রলালে যুগপৎ রোমান্টিক ও ক্ল্যাসিক কবিসুলভ মনোভাবের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ধূলার ধরণীর হাসিকান্না, রূপরস শব্দ স্পর্শের আবেদন তাঁহার মনকে নাড়া দিলেও তিনি ভাষার মোহিনীমায়ার কল্পনার তরঙ্গে তরঙ্গে অসীম সৌন্দর্য্যালোকে ভাসিয়া যান নাই। ক্ল্যাসিক্যাল কবিসুলভ ভাষার ওজঃস্বিতা, ঋজুতা, গম্ভীর ভাবদ্যোতনা ও সর্ববিধ কুহেলিকা প্রহেলিকা বর্জিত কাব্য ধারার তিনি সার্থক স্রষ্টা। ধরণীর ধূলির সংস্পর্শ; মানবহৃদয়রসে উষ্ণস্পর্শসঞ্জাত অনুভূতিগুলিকে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার উদাত্ত বলিষ্ঠ প্রহেলিকা বর্জিত সুসংযত ও সুসংহত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এই বৈশিষ্টগুলি তাঁহার কাব্যে প্রতিফলিত। দ্বিজেন্দ্রলালের মানব প্রীতি ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতাই তাঁহার দেশপ্রেমের কবিতাগুলিকে সর্ব্বজন বোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করিয়াছিল। আধুনিক বাংলা কাব্যে যাহারা কাব্যে যুক্তির মূল্য স্বীকার করিয়াছেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাদের অন্যতম।

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমের কবিতাগুলিকে আটটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) মাতৃভাষার বন্দনা, (২) পরাধীনতার শৃঙ্খল ভঙ্গের জন্য বিলাপ, (৩) দেশপ্রেমের জন্য অনুপ্রেরণা দান, (৪) বঙ্গভূমির চিন্ময়রূপ পরিকল্পনা (৫) অখণ্ড ভারতবর্ষের পরিকল্পনা (৬) ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি গভীর অনুরাগ (৭) বিশ্বমৈত্রী ও মানবতার আবেদন, (৮) নিষ্পেষিতের জন্য সহানুভূতি ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা।

দেশপ্রেম প্রকাশের জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল মূলতঃ চারিটি টেকনিকের আশ্রয় লইয়াছেন। প্রথমে তিনি জাতীয় জীবনের বিশৃঙ্খলতা ও বিচ্যুতিগুলিকে প্রকাশিত করিয়া বৃহত্তর মনুষ্যত্বের সাধনায় দেশবাসীকে উদ্বোধিত করিয়াছেন। এজন্য তিনি ব্যঙ্গ ও রঙ্গের আশ্রয়

লইয়াছেন। ব্যঙ্গ কবিতায় জীবনের ইতরতা, ভণ্ডামি, ন্যাকামি, নপুংসকাতার মুখোস খুলিয়া দিয়াছেন। আর রঙ্গ কবিতায় প্রাণখোলা হাসির মধ্য দিয়া জীবনের অসঙ্গতির প্রতি কটাক্ষ হানিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের রঙ্গ ও ব্যঙ্গ কবিতাগুলি তাঁহার একই দেশপ্রেম প্রকাশের ভিন্ন টেক্‌নিকমাত্র। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি "প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস', 'মেবারপতন' 'চন্দ্রগুপ্ত' ইত্যাদি তাঁহার এই দেশপ্রেমের আর একটি প্রকাশরূপ। তিনি দেশপ্রেমমূলক কবিতা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের অনুরণন ও উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছেন। বস্তুতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ও নাটক-গুলিকে বাদ দিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমের আলোচনা অসম্পূর্ণ। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলি তাকিয়া হেলান দিয়া গোলাপীহাস্য করিয়া রঙ্গ কৌতুক উপ-ভোগের সামগ্রী নয়, এই গানের প্রতি স্তবকে স্তবকে ঝরিয়া পড়িয়াছে ব্যথাতুর কবির দেশের দুর্দ্দশার জন্য গভীর মর্মবেদনা, দেশের আপাতঃ মধুর বিষময় জীবনের জন্য গভীর ক্রন্দন, হাসির অন্তরালে দরদীবন্ধুর ব্যথা মর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই দুর্দ্দশার জন্য যে সহানুভূতি ও মূঢ়তার জন্য কবিচিত্তে বিক্ষোভ জাগিয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ধরা পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের মধ্যে কবির হৃদয় রহিয়াছে ও তাহার মধ্য হইতে জ্বালা ও দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতেছে।"

এই ব্যঙ্গ কৌতুকের মূল রহস্য বিশ্লেষণ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিলেন—

"ব্যঙ্গ কবি আমি ? ব্যঙ্গ করি শুধু ! নিন্দাকরি
শুধু সকলে,
কভুনা ! আসলে ভক্তি করি আমি, ঘৃণা করি শুধু
নকলে।
যেথা আবর্জনা, ধরি সমার্জনী, তাই বলে আমি ত
অন্ধ না ;
যেখানে দেবতা, ভক্তি পুষ্পদিয়ে স্তুতিছন্দে করি
বন্দনা।"

দ্বিজেন্দ্রলালের স্যাটায়ারের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া কবিপুত্র সঙ্গীত সুধাকর দিলীপকুমার রায় লিখিয়াছেন, চাই সমাজের সংস্কার, আত্মশোধন, তাই তিনি দেশের সর্ববিধ অসারতাকে সুরু করলেন ব্যঙ্গ, কিন্তু জহরলালের ভাষায় it was a brother's curse নিজেকে দূরে রেখে দেশ-বাসীকে তিনি গালমন্দ করেননি—নিজেও তাদের সঙ্গে এক পংক্তিতেই বসেছেন বরাবর। * * * তার উপর এ বেদনা ছিল কবির বেদনা—বিদ্রূপীর বেদনা নয়। তাই তিনি বিদ্রূপ ছেড়ে ধরেছিলেন নাটক ও দেশাত্মবোধের গান। গেয়েছিলেন "আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা"—চেয়েছিলেন "আবার আমরা মানুষ হই"। আর সুরে কবির কবি প্রাণে স্পন্দন জেগেছিল বলেই সে যুগে দেশে এমন ব্যাপক সাড়া পড়েছিল, আর গানে ও নাটকে—তিনি শুধু বিদ্রূপই হলে কখনও এ ধরণের সাড়া পড়তে পারতো না, অনুভব করার শক্তি আর সে অনুভব অপরের মনে সংক্রামিত করার শক্তি এ দুই আলাদা প্রতিভা। অনুভবের শক্তি অনেকেরই আছে কিন্তু তাকে প্রকাশের মধ্য দিয়ে সক্রিয় করবার শক্তির নামই আর্ট, সাহিত্যের আর্ট, এ শক্তি সবচেয়ে সক্রিয় ও দীর্ঘজীবী হয় কবিত্বে। বিদ্রূপের শক্তিও একটা মস্ত শক্তি একথা অপ্রতিবাদ্য কিন্তু কাব্য শক্তির কৌলীন্য তার নেই থাকতে পারে না। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল বিদ্রূপীবলে শিরোপা দিলে তার শ্রেষ্ঠ রূপটিকেই নামঞ্জুর করা হয়—কারণ তাঁর প্রতিভার শক্তি শিখরে উঠেছিল তাঁর কবিত্বে, বিদ্রূপে নয়। শুধু তাই নয় বিদ্রূপেও তাঁর সেই সব হাসির গান বা ব্যঙ্গ চিত্রই সবচেয়ে রসোত্তীর্ণ হয়েছে যে সব গান বা ছবিতে নিবিড় হয়ে উঠেছে তাঁর কবি-হৃদয়ের গভীরব্যথা—দেশাত্মবোধ, আত্মধিক্কার। আত্মধিক্কার বলছি এই জন্যে যে দেশবাসীকে তিনি ভালবেসেছিলেন তাই তাদের সর্ববিধ অপমান, হীনতা চিত্তদৈন্যকে তিনি গায়ে পেতে নিয়েছিলেন নিজের গ্লানি বলে, তাই না তাঁর শ্রেষ্ঠহাসির গানের হাসি হতে পেয়েছিল "Laughter veiled in tears." !

বস্তুতঃ দেশের প্রাচীন মহত্বের গৌরব, দেশের অব-নতিতে দুঃখ, বাংলা ভাষার জন্য মমতাবোধ, জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির জন্য মমতা, দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় বিশ্বাস ও দেশের কল্যাণের জন্য গভীর নিষ্ঠা ছিল দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের কবি মানসের বৈশিষ্ট্য। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট চাকুরীতে রত থাকিয়া, চাকুরী জীবনে

উন্নতির প্রতিকূল জানিয়াও তিনি স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় সহানুভূতি জানাইয়াছিলেন। এ প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্র জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী লিখিয়াছেন—

"কবিবর তখন কলিকাতা ৫নং সুকীয়া ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। * * * দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহ সমক্ষে আসিয়া (তাঁহাকে দেখিয়াই হোক, অথবা অন্য যেহেতুই হোক)' সহসা সেই অসংখ্য জনসজ্ঘ সংক্ষুব্ধ ও গতিহীন হইয়া পড়িল। তখন দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে, সে ভাবতরঙ্গে ভাসমান হইয়া, একেবারেই প্রকাশ্য রাজপথে নামিয়া আসিয়া স্বয়ং সে গানে যোগদান করিলেন, এবং উর্দ্ধবাহু হইয়া মেঘমন্দ্রবৎ, মুহুর্ম্মুহু "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে অকস্মাৎ অম্বরতলে ভাব রোমাঞ্চ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন।" দ্বিজেন্দ্রলাল কুন্তলীনের সম্পাদক হেমেন্দ্র বসুর অনুরোধে গোল দীঘির প্রকাণ্ড সভার জন্য দেবকুমারবাবুর সম্মুখেই অনধিক দশ পোনেরো মিনিটের মধ্যেই একটি "আশ্চর্য্য রকমের" উৎকৃষ্ট, অগ্নিগর্ভ গান—ঠিক যেন খেলার ছলে—রচনা করিয়া ফেলিলেন; এবং তখনই উহা কুন্তলীন প্রেসে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। অপরাহ্নকালে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং একটি দলের নায়ক হইয়া, বাগবাজার পশুপতিবাবুর সুবিশাল গৃহ প্রাঙ্গণে গমন করিলেন, এবং সেই সম্মিলিত প্রেম ও জন সমুদ্রের মধ্যে স্বরচিত সঙ্গীত-সুধার সঞ্জীবনী স্রোতোধারা প্রবাহিত করিয়া দিলেন।"

১৮৮২ খৃঃ দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমের প্রথম কাব্য "আর্য্য-গাঁথা প্রথম প্রকাশিত হয়, কবির দেশ প্রেমের অঙ্কুর ইহার ভিতরে বেশ পরিস্ফুট। কবি আর্য্য-গাঁথার" ভূমিকায় তাঁহার কাব্যের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া লিখেন—"যদি কাহারও অধঃপতিতা হতভাগিনী মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্রপ্রান্ত কখনও সিক্ত হইয়া থাকে, "আর্য্য গাঁথা" তাঁহারই আদর চাহে," আর্য্য গাঁথায় যে দেশপ্রেমের সূত্রপাত তাহাই পরবর্ত্তীযুগে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মত ভাবের মহিমায়, কল্পনার বৈচিত্র্যে সমস্ত বিশ্বকে আপনার করিয়া লইয়াছে, বিশ্বের সহিত বিশ্বনাথের মিলনসূত্র অঙ্গীকার করিয়াছে। সজীব প্রাণ ইহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। তাঁহার স্বদেশী কাব্য আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ভাষায় "অদৃষ্টের প্রতিকূল আচরণে উপেক্ষা শৌর্য্য ও মরণে আলিঙ্গন ভিক্ষা ভৈরব নিনাদে ধ্বনিত," বস্তুতঃ 'আর্য্যগাঁথায়' যে দেশ প্রেম অঙ্কুরিত তাহা পরবর্ত্তীকালে শব্দের গাম্ভীর্য্যে, সুরের দ্যোতনায়, ভাবের বিদ্যুৎঝলকে, সুসংহত ও সুসংযত প্রকাশে প্রাণময় হইয়াছে। জাতি দ্বিজেন্দ্রের স্বদেশী কাব্যে তাঁহার অন্তরলোকের সন্ধান পাইয়াছে।

'আর্য্যগাঁথা' কবি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম বয়সের কাঁচা হাতের লেখা, কিন্তু ইহাতেই কবির "হতভাগিনী দুঃখিনী মাতৃভূমির জন্য গভীর প্রীতি স্বতোৎসারিত হইয়াছে। কবি "জন্মভূমি" কবিতায় দেশের গভীর অধঃপতনের মধ্যেও জন্মভূমির প্রতি তাঁহার ভালবাসা, নাড়িরটান ব্যক্ত করিতেছেন :

"তোমা বিনা অন্যকারে মা বলে ডাকিতে,
কখন বাসনা মাতঃ নাহি হয় চিতে,
অতুষণ শোভারাশি
মাতঃ তব ভালবাসি ;
চাইনা সুরম্যস্থান নানা অলঙ্কার
স্বর্গীয় মাধুর্য্যময় স্বদেশ আমার।

মায়ের দুঃখদৈন্য কবি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন। জন্মভূমির দুঃখে কবির প্রাণ কাঁদিয়াছে। কবি দেশের দুঃখ দূর করিতে স্থির সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। শুধু ভিক্ষা চাহিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া, ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ঘুরিলে যে মায়ের দুঃখ ঘুচিবেনা কবি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন, দেশ উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন ঐক্য ও স্বার্থত্যাগ। কবির ভাষায়—

"আজ আয় আয় ভাই সব মিলে,
সাধিতে স্বদেশহিত আয়রে সকলে।
চিরদিন দুঃখে বসি কি হবে কাঁদিলে,
একা অসহায় ভাই মোরা ধরাতলে
হয়কি উদ্ধার কাজ এক নাহি হলে,
হয়কি উদ্ধার কাজ প্রাণ নাহি দিলে ;
আয় একবার সবে দ্বেষ হিংসা ভুলে,
আয় এই দুঃখ নিশি দূরে যাবে চলে।"

মেঠো বক্তৃতা অপেক্ষা "প্রাণ দেওয়া" ও "এক হওয়ার" বিশেষ প্রয়োজন কবি সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জাতিভেদ প্রথার সংকীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়া কবি ভারতসন্তানকে আবাহন করিয়া বলিতেছেন :

"আয় ভারত সন্তান হয়ে একপ্রাণ,
কত আর দুখে একা গাবি ভাই দুখগান,
একবার সবে মিলে,
জাতিভেদ যাও ভুলে,
এহীন দশায় আর কেন জাতি অভিমান।"

বিলাত প্রবাসকালে দেশের স্মৃতি কবির হৃদয়ে জাগরূক, "The Lyrics of Ind নামক কাব্যে কবি "The Land of the Sun" বর্ণনা করিয়া লিখিতেছেন :

"There is a land rank and blazing with beauty
Where a radiance perpetual Shines,
Where love's angels sleep pillowedin Terror,
And round Graneur frail loveliness twines
O my land ! Can I cease to adore thee,
Though to gloom and to misery hurled,
O dear Bharat ! my beautiful maiden,
O Sweet Ind ! once the Queen of the world.
And though wrecked is thy pride and thy glory,
Of it nothing remains but the name ;
Yet a beauty and sunshine still lingers,
And yet gleams through the mist of thy shame,"

কবি বাংলা ও বাঙ্গালীকে ভালবাসিতেন। সোনার বাংলার মলিন বেশ কবিকে ব্যথিত করিয়াছে। কবির ভাষায়—

বঙ্গ আমার ! জননী আমার ! ধাত্রি আমার ! আমার দেশ,
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ।
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ ?
সপ্ত কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে "আমার দেশ"—

কিন্তু কবি বাংলার অতীত মহিমা বিস্মৃত নন, বাংলার গৌরবময় স্মৃতি কবিচিত্তে জাগরূক। কবি বাংলার গৌরব মহিমা উদাত্তকণ্ঠে গাহিয়াছেন :—

"উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার,
আজও জুড়িয়া অর্দ্ধ-জগৎ ভক্তি প্রণত চরণে যাঁর ;
অশোক যাঁহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি শেষ,
তুই কি না মাগো তাঁদের জননী, তুই কিনা মাগো তাঁদের দেশ ?"

* * *

উদিল যেখানে মুরজমন্ত্রে নিমাই কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি চণ্ডীদাস গাইল গান ;
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য তুই ত মা সেই ধন্য দেশ !
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্ত লেশ।

কবি শুধু অতীত মহিমার স্মৃতি আঁকড়াইয়া মধু দিবা স্বপ্নে বিভোর নন। আশাবাদী কবি আবার নব জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করিয়া ঘোষণা করিলেন :

"যদিও মা তোর দিব্য-আলোকে ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য ! মানুষ আমরা নহিত মেষ !
দেবি আমার ! সাধনা আমার ! স্বর্গ আমার ! আমার দেশ !"

কবি দেশের শুধু সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুরাগী নন। তিনি বাংলা দেশের মাটি, বাংলার ফলফুল, তরুলতাকে ভালবাসেন। বাংলার এই মধুর হৃদয়গ্রাহী চিত্র কবি অতি অনুপম ছন্দে প্রকাশ করিলেন :

"ধন ধান্যে পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা ;
ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;

* * *

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী ; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী ;
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তারা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে ;

* * *

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।"

কবির অন্তর উপচাইয়া মাধুর্য্য সুধার স্রোত বন্যাপ্রবাহের ন্যায় জনচিত্তে সঞ্চারিত হইতেছে। এ প্রসঙ্গে দেশ-প্রেমিক বিপিন পালের মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য :—

"ধনধান্যে পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা"—ইহা একটি মহান্ সঙ্গীত। কবির এই সঙ্গীতে বিশ্বের ধ্যান আছে। ইহা কেবলমাত্র এই বঙ্গদেশকে লইয়া রচিত নয়। ইহা শ্রবণ করিয়া আমি কেবল মুগ্ধ হই না, তুমি মুগ্ধ হও না, আমি যদি আমার দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালী না হইয়া জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আমার ভাবের সাগরে ঢেউ তুলিত।…বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে দেশভক্তির যে ক্ষীরধারা জন্মলাভ করিয়াছে—দ্বিজেন্দ্র-লালের "আমার দেশে" তাহা প্রবাহিত হইয়া পরিপুষ্ট করিয়াছে।"

কবি শুধু বাংলার মাধুর্য্য ও মহিমার চিত্র আঁকিয়া ক্ষান্ত হন নাই—বিখিল ভারতীয় দৃষ্টি ও সাধনা ছিল তাঁর। ভারতের প্রতি কী গভীর অনুরাগ! কী গভীর শ্রদ্ধা! কবি চিন্ময়ী ভারতমাতাকে "জগত্তারিণী" জগদ্ধাত্রীকে" ভাব-নয়নে দর্শন করিয়া ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে বন্দনা করিলেন :

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি!
ভারতবর্ষ।
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি
মা হর্ষ!
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর
রাত্রি;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি! জগত্তারিণি!
জগদ্ধাত্রি!"

* * *

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি;
জননি, তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ;
জগৎপালিনি। জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

ভারতের মহিমা, ভারতের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ঋষি-কবির অনুপম ভাষায় ঘোষিত হইল :

"ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব
মেলিল নেত্র;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থ ক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননি, দর্শন উপনিষদে দীক্ষা;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম-ভক্তি ধর্ম-শিক্ষা।

* * *

ভগবদ্গীতা গায়িল স্বয়ং ভগবান যেই জাতির সঙ্গে;
ভগবৎ প্রেমে নাচিল গৌর যে দেশের ধূলি
মাখিয়া অঙ্গে।
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র প্রচার করিল নীতির মর্ম্ম;
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস প্রচার করিল সোঽহং ধর্ম্ম।"

দ্বিজেন্দ্রলাল উদাত্তছন্দে ভারতের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য ও জগতের বিবর্ত্তনে তাঁহার আধ্যাত্মিক দানের মহিমা বর্ণনা করিলেন। কিন্তু জীবননিষ্ঠ কবি শুধু অতীতের মধুর স্বপ্নে বিভোর ও তুষ্ট নহেন। তিনি অতীত হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিলেন নবীন ভারতবর্ষ গড়িবার জন্য। এখানে কবি বিপ্লব অপেক্ষা ক্রমবিবর্ত্তনের পক্ষপাতী—তিনি অতীত সভ্যতার সম্পূর্ণ ছেদরেখা টানিতে প্রস্তুত নহেন। কবির ভাষায় :—

"চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই
মহা আদর্শ
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের
ভারতবর্ষ!"

কবি ভারতের অধঃপতনে দুঃখে মগ্ন হইয়াছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক মেবারের পতনে গভীর চিত্তে গভীর হাহাকার জাগিয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিকের জন্য গভীর সহানুভূতি, তাই মেবারের দুঃখে সহানুভূতি জানাইয়া কবি আর্ত্তি প্রকাশ করিলেন :

"ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর, ছিঁড়ে গেছে মোর
বীণার তার।
এ মহা শ্মশানে ভগ্নপরাণে আজি মা কি গান
গাহিব আর।
মেবার পাহাড় হইতে তাহার নেমে গেছে এক
গরিমা হায়!
ঘন মেঘরাশ, ঘেরিয়া আকাশ, হানিয়া তড়িৎ
চলিয়া যায়।

* * *
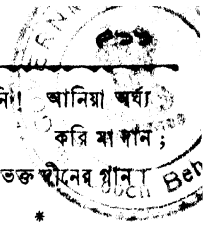
গাহে নাক আর কুঞ্জে তাহার পিকবর আজ
হরষ গান ;
ফোটে নাকো ফুল ; আসে না আকুল ভ্রমর করিতে
সে মধুপান,

* * *

মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার রক্ত নিশান
উড়ে না আর,
এ হীন সজ্জা—এ ঘোর লজ্জা—ঢেকে দে
গভীর অন্ধকার !

আশাবাদী কবি পরক্ষণেই আবার মেবারের উজ্জল ভবিষ্যৎ ভাবলোকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কবির কণ্ঠে আবার মেবারের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুর ধ্বনিয়া উঠিতেছে :

"মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—যুঝেছিল
যেথা প্রতাপবীর,
বিরাট দৈন্য দুঃখে, তাহার শৃঙ্গের সম অটল স্থির।

* * *

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—ধুম্র যাহার তুঙ্গ শির ;
স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া ভাসায় যাহার
কানন তীর।
মাধুরী ধন্য কুসুমে জাগিয়া ঘুমায় অঙ্গে রমণী শ্রীর ;
শৌর্য্যে স্নেহে ও শুভ্রচরিতে কে সম মেবার-সুন্দরীর !
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্ত
পতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছ দর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।"

মানব মনের সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ হয় মাতৃভাষার মাধ্যমে। দেশের কৃষ্টির বিকাশ ও জাতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠে মাতৃভাষার রাখিবন্ধনে। অবচেতন জাতীয় মনের আশা আকাঙ্ক্ষা, সূক্ষ্ম হৃদয় স্পন্দন মাতৃভাষায় যেরূপ ধরা পড়ে বিজাতীয় ভাষায় সেরূপ প্রকাশিত হয় না। শিক্ষা সংস্কৃতি ও জাতীয় ঐক্য সাধনে মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম। এজন্য দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল মাতৃভাষাকে ভালবাসিয়া সমস্ত মনের হৃদয়দুয়ার খুলিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে সুর ধরিয়াছেন :

"আজি গো তোমার চরণে, জননি! আনিয়া অর্ঘ্য
করি মা দান ;
ভক্তি-অশ্রু—সলিল-সিক্ত শতেক ভক্ত দীনের গান।

* * *

পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই তোমার কাছে মা
এসেছি ছুটি,
বাসনা, তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাব তোমার
চরণ দু'টি।
চাহি নাক কিছু, তুমি মা আমার,—এই জানি শুধু
নাহি জানি আর ;
তুমি গো জননী হৃদয়ে আমার, তুমি গো জননী
আমার প্রাণ।"

দেশের প্রতি গভীর ভালবাসা, গভীর নিষ্ঠা ব্যতিরেকে স্বতোৎসারিত হইয়া দেশ প্রেমের কবিতাগুলি এমন বীর্য্যবন্ত, প্রাণময় ও মাধুর্য্য মণ্ডিত হইতে পারে না। কবি ভারতের অবনতির মধ্যেও ভারতের প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গরিমা সম্বন্ধে সচেতন। নিজের দীনতার প্রতি ধিক্কার জাগিলেও "চিরগরীয়সী" মায়ের প্রতি একান্ত অনুগত। "আমরা দুঃখী, আমরা নিঃস্ব" হইলেও দেশজননীর "বিভবে পূর্ণ বিশ্ব" কবির অনুপম ভাষায় :—

"তুমি তো মা সেই তুমি তো মা সেই চির গরীয়সী
ধন্যা অয়ি মা !
আমরা শুধুই হয়েছি মা হীন, হারায়েছি সব
বিভব মহিমা,
তুমি তো মা আছ তেমনি উচ্চ
আমরা শুধুই হয়েছি তুচ্ছ
তোমারি অঙ্কে লভিয়া জনম—জানিনা কী পাপে
এ তাপ সহি মা।
এখনো তোমার গগন সুনীল, উজ্জ্বল তপন তারকাচন্দ্রে
এখনো তোমার চরণে ফেনিল জলধি গরজে
জলদ মন্দ্রে,
এখনো ভেদিয়া হিমাদ্রি জংঘা
উছলি' পড়িছে যমুনা গঙ্গা
ঢালিয়া শতধা পীযুষ পুণ্য তোমার ক্ষেত্রে
যাইছে বহি' মা।

তুমি তো মা সেই সুজলা সুফলা এখনো হরষে
ভাসায়ে নেচে,
পুষ্প তোমার নিবিড় কুঞ্জে শস্য তোমার
শ্যামল ক্ষেত্রে।
তোমার বিভবে পূর্ণ বিশ্ব
আমরা দুঃখী আমরা নিঃস্ব
তুমি কী করিবে তুমি তো মা সেই মহিমা-
গরিমা পুণ্যময়ী মা!"

দ্বিজেন্দ্রলালে কবি ও সুরকারের হরিহর সম্মিলন হইয়াছিল। তাঁহার জাতীয় সঙ্গীতগুলি কানের ভিতর দিয়া শিরায় শিরায় আগুনের তরঙ্গ তুলিয়া মানবকে নির্বীর্য্যতার তমিস্রা ত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল কর্মের জগতে শক্তি সঞ্চার করিত—অসত্য হইতে সত্যে, অসৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্য ও অশিব হইতে জ্যোতির্ময়লোকে উদ্বুদ্ধ করিত।

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রীতিই তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। দেশ, দেশের মাটি, দেশের বনপ্রকৃতি দেশের জীবন্তলোক ও অতীত মহিমা দ্বিজেন্দ্রলালের চোখে এক ভাবঘন রূপে ভাসিয়া উঠিয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত নাটকের যবনিকা উঠিতে না উঠিতেই দেশপ্রেমিক কবি আলেকজাণ্ডারের মুখ দিয়া যেন আত্মতৎ-গতচিত্তে বলিতে সুরু করিয়াছেন :

"সত্য সেলুকস্! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায় আর রাত্রিকালে শুভ্রচন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতির পুঞ্জ যখন এর আকাশে ঝল্‌মল্ করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি গুরু গম্ভীর গর্জ্জনে প্রকাণ্ড দৈত্য-সৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে আসে; আমি নির্বাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদি তুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদনদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছুটেছে। * * * আর সবার উপরে এক সৌম্য, গৌর, দীর্ঘকান্তি জাতি এই দেশ শাসন কচ্ছে। তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্য্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস।"

আবার যে মানব প্রেম দ্বিজেন্দ্রলালকে দেশবাসীর প্রতি অনুরাগী করিয়াছিল, সেই মানব-প্রীতিই যেন তাঁহাকে বিশ্বমানবের প্রীতির দিকে লইয়া গেল। মনুষ্যত্বের পূজারী দ্বিজেন্দ্রলাল 'মেবার-পতন' নাটকে যেন বিশ্বপ্রেম ও অহিংসার বাণী প্রচার করিতে বসিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল 'মেবার-পতন' নাটকের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—"আমি একটি মহানীতি লইয়া বসিয়াছি; সে নীতি বিশ্ব-প্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য, জাতীয়প্রেম, এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্ত্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্বাপেক্ষা গরীয়সী।" দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেম যেন ধীরে ধীরে বিশ্বমৈত্রী ও প্রেমকে আবাহন করিতেছে। ঐ প্রেমের কথাই যেন প্রতাপ-দুহিতা ইরা ঘোষণা করিতেছে—

"না বাবা পৃথিবীই একদিন সে স্বর্গ হবে। যেদিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার, প্রীতি ও ভক্তি বিরাজ করবে, যেদিন অসীম অনন্ত প্রেমের জ্যোতি নিখিলময় ছড়িয়ে পড়বে, যেদিন স্বার্থত্যাগই স্বার্থ লাভ হবে।" এই বিশ্বপ্রীতি বা নব বিবর্দ্ধমান দেশপ্রেম কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমায়িত হইবার নহে। এ দেশপ্রেম সব দেশের সবলোককে কুটুম্ব করিতে চায়। এই প্রেমের বাণী 'মানসী' ঘোষণা করিয়া বলে :—

"যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয়—ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক্"।

পুনশ্চ :—

"ধর্ম ভালবাসা, আপনাকে ছেড়ে ক্রমে ভাইকে জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাসতে শিখ্‌তে হবে। তার পরে আর তাদের—নিজের কিছুই কর্ত্তে হবেনা, ঈশ্বরের কোন অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে আসবে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয় মা, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। যে পথ বঙ্গের শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথে চল মা।"

এই মহাযুগের গাথাই সংশয় চিত্ত, সংস্কারপন্থী ক্ষুদ্র

সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদীকে তাহার লাভ লোকসানের ক্ষুদ্র দুনিয়া হইতে উদাত্ত আহ্বান করিতে পারে :—

কিসের শোক করিস্ ভাই !—আবার তোরা
মানুষ হ'।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই,—আবার তোরা মানুষ হ' ॥
ভুলিয়ে যারে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর,
বিশ্ব তোর নিজের ঘর, আবার তোরা মানুষ হ'।
শত্রু হয় হোক না, যদি সেথায় পাস মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ, তাহারে কর হৃদয় দান।
মিত্র হোক্—ভণ্ড যে—তাহারে দূর করিয়া দে ;
সবার বাড়া শত্রু সে, আবার তোরা মানুষ হ'।
জগৎ জুড়ে দুইটি সেনা, পরস্পর রাঙায় চোখ,
পুণ্য সেনা নিজের কর, পাপের সেনা শত্রু হোক,
ধর্ম যথা সেথায় থাক ; ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ,
*　　*　　আবার তোরা মানুষ হ' ॥

মানুষের প্রতি দরদ ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের স্বভাবগত। এই মানব প্রীতিই তাঁহাকে বাংলার জনসাধারণের সুখ দুঃখের প্রতি সজাগ করিয়াছিল। বাংলার কৃষকের প্রতি ছিল তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা। দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষকের "সবল দেহ, সরল জীবন", "শুভ্র হাসি" "সদানন্দ পরিতৃষ্ট ক্রীড়া" ও "কেঠো মেঠো বাঁশীর" অনুরাগী ছিলেন। কৃষকদিগের জীবনের এই মাধুর্য্যের সাথে সাথে তাহাদের আর্থিক দৈন্য সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি তাহাদের এই দৈন্যের কারণ ও তাহাদের আর্থিক দৈন্য দূর করিবার উপায় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

"আমার বিশ্বাস যে, যতদিন আমাদের দেশবাসীর ভাল আবাসগৃহে আরামে থাকিতে ইচ্ছা না হইবে, ততদিন আমাদের গার্হস্থ্য অবস্থার উন্নতি হইবে না। পরিচ্ছন্নতা ও অন্ততঃ আয়সাধ্য ভাল অবস্থায় জীবনধারণ করা আমাদের জাতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। * * * আমাদের কৃষকের অবস্থার সঙ্গে এখানকার (ইংল্যাণ্ড) কৃষকের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় আমাদের কৃষকরা কি গরীব দুরবস্থাপন্ন। যে দিন যাহা পায় প্রায় সেই দিনেই তাহা ব্যয় করে, সঞ্চিত অর্থ নাই, আরামময় বাসস্থান নাই, তৃণাবৃত কুটীরে শতধা ছিন্ন শয্যায়, শতগ্রন্থিময় বসনে, বহু সন্তানের পিতা, কৃষক দীনভাবে কোন প্রকারে জীবনযাপন করে। দুর্ভিক্ষকালে তাহারা (হতভাগ্য কৃষক!) সপুত্রপরিবারে অনশনে প্রাণত্যাগ করে। ইহার কারণ কি? অন্যান্য কারণও আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে বর্ত্তমানে সন্তোষই তাহার মূল। * * * আমি বলি তাহাদিগের মনে সম্ভোগ-বাসনা দাও, উন্নতির সোপান রচিত হইবে। * * অসন্তোষ উন্নতির মূল। ইহা কার্য্যকে উত্তেজিত করে, সভ্যতার পথ প্রশস্ত করে। কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি পারিবারিক উন্নতি সকলের মূলেই এই অসন্তোষ।"

দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষকের প্রতি শুধু মৌখিক দরদ ও বাণী প্রকাশ করিয়াই শান্ত থাকিবার পাত্র ছিলেন না, প্রয়োজন হইলে নিজের চাকুরী ও স্বার্থ বিপন্ন করিয়া তিনি কৃষকের স্বার্থের জন্য তাহাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতেন। এ বিষয়ে তাঁহার নিজের লেখা হইতে একটি অংশ প্রকাশ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ঘটনাটি এইরূপ :—

"উক্ত (সুজামুটা পরগণার) সেটেলমেণ্ট সংক্রান্ত একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে বঙ্গদেশে একটি উপকার সাধিত হয়। আমার পূর্ববর্ত্তী সেটেলমেণ্ট অফিসারেরা জরীপে জমি বেশী পাইলেই খাজনা বেশী ধার্য্য করিয়া দিতেন। আমি সুজা-মুটা সেটেলমেণ্টে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করি যে, এইরূপ খাজনা বৃদ্ধি করা অন্যায় ও আইনবিরুদ্ধ। প্রজার সহিত যখন পূর্বে জমি বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়, তখন মাপিয়া দেওয়া হয়না, আন্দাজ করিয়া সেই জমির পরিমাণ হস্ত-বুদে লেখা হয়। এমন কি এরূপ হওয়া সম্ভব যে, সেই জমিই এখন জরীপে তাহা অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রতীত হইতেছে মাত্র। তাহার জন্য তাহার নিকট অধিক খাজনা চাওয়া অন্যায়। অতএব রাজা (বা জমিদার) যদি বেশী জমির বেশী খাজনা দাবী করেন ত তাঁহার দেখাইতে হইবে যে, প্রজা কোন জমিটুকু বেশী অধিকার করিয়াছে। আর ড্রেনেজ খাল বন্ধ হওয়ায় জমির বাৎসরিক ফসল কম হইয়া যাওয়ার জন্য আমি প্রজাদিগের খাজনা কমাইয়া দিই।"

*　　*　　*

"(আমার) এই রায় হইতে জজের নিকট আপীল হয়, এবং তাহাতে জজ সাহেব উক্ত রায় উল্টাইয়া প্রজাদিগের

খাজনা বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই সময় স্যার চার্লস এলিয়ট বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন, তিনি উক্তরূপ বিভ্রাট দেখিয়া, উক্ত বিষয় তদন্ত করিবার জন্য স্বয়ং মেদিনীপুর আসেন ও কাগজপত্র দেখিয়া আমাকে যথোচিত ভৎর্সনা করেন। আমি আমার মত সমর্থন করিয়া বঙ্গদেশীয় সেটেলমেণ্ট আইন বিষয়ে তাঁহার অনভিজ্ঞতা বুঝাইয়া দিই। ছোটলাট বলেন, "আমি নিজে সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার ছিলাম। আমি সেটেলমেণ্ট কাজ বেশ বুঝি।"

তদুত্তরে বলি যে, "আপনি পাঞ্জাবে সেটেলমেণ্ট কাজ করিয়াছেন। পাঞ্জাবের সেটেলমেণ্ট আইন এবং বঙ্গ-দেশের সেটেলমেণ্ট আইন এক প্রকার নহে। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে।"

এই উত্তর শুনিয়া ছোটলাট আমার পূর্ব ইতিহাস জানিতে চাহেন ও তাহা অবগত হইয়া কলিকাতায় গিয়া ভবিষ্যতে সেটেলমেণ্ট অফিসারদিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে এক দীর্ঘ মন্তব্য লেখেন এবং তাহাই আইনে (সেটেলমেণ্ট ম্যানুয়েলের নোটের ভিতর) ঢুকাইয়া দেন, এবং কিছুদিন পরে আমার প্রমোশন বন্ধ করেন।"

"ইত্যবসরে জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইল। মহামান্য হাইকোর্ট জজের রায় উল্টাইয়া দিয়া আমার মতের সহিত ঐক্য প্রদর্শন করেন এবং সেই হাইকোর্টের রুলিং অনুসারে এখন সমস্ত বঙ্গদেশে সেটেল-মেণ্ট কার্য্য চলিতেছে। এখন জরীপে জমি বেশী পাইলেই প্রজার অসম্মতিতে আর খাজনা বৃদ্ধি হয় না। ইত্যবসরে হাইকোর্টে আর একটি আপীলে স্যার চার্লস এর উক্ত মন্তব্যও নির্দ্দয়ভাবে সমালোচিত হয়। তাহাতে তিনি সেগুলি সেটেলমেণ্ট ম্যানুয়েল হইতে উঠাইয়া লইতে বাধ্য হয়েন।"—জন্মভূমি পত্রিকা।

কবি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের আত্ম-শক্তিকে জাগাইয়া তুলেন। দ্বিজেন্দ্রযুগে ভারতবর্ষে জন শক্তি বলিতে চাষী-তাঁতিকে বুঝাইত। তথাকথিত অত্যাচারী শাসক, জমিদার শ্রেণী, এই জনগণের উপর অন্যায় অত্যাচার করিত—তাহাদিগকে শোষণ করিত। অত্যাচারী জমিদারশ্রেণী চাষীদিগকে নিষ্পেষণ করিতে ত্রুটি করে নাই। এই অত্যাচার দূর করিবার জন্য কবি কৃষাণভাইদিগকে উদাত্তকণ্ঠে সংগ্রামের ধ্বনি তুলিতে আহ্বান করিলেন। জনগণের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সংগ্রামের নিশান তুলিয়া উদাত্ত আহ্বানে জানাইলেন :

"ওরে ও ভাই চাষী! ওরে ও তাঁতি!
পড়িসনাক নুয়ে; জানিস্ এ সব ফাঁকি;
তোদের অন্নে পুষ্ট, তোদের বস্ত্র গায়ে,
কর্ম্মে তোদের উপর রক্তবর্ণ—আঁখি?
সারিবদ্ধ হয়ে, একবার মাথা তুলে,
দাঁড়া দেখি তোরা সবাই সোজা ভাবে;—
দেখ্‌বি এই যে দম্ভ, দেখ্‌বি এইযে দর্প,
দেখ্‌বি এই যে স্পর্দ্ধা—চূর্ণ হয়ে যাবে।"

এই সংগ্রামের মূলে রহিয়াছে মানবতাবাদ ও সাম্যনীতি। কবি এই নীতি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া জানাইলেন :

"উঠে দাঁড়া দেখি—মানুষ যদি তোরা—
এদের সাম্‌নে কেন মাথা নুয়ে যাবি?
সমস্বরে বল্ এই সকলেরই মাটি;
কারো চেয়ে কারো বেশী নাইক দাবী।"

এই জমির সামাজিক স্বত্ব, সমান অধিকারই ত সাম্যবাদের একটি মূলনীতি—দ্বিজেন্দ্রলাল ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের কথায় :—

"তবে জানু পেতে একবার সমস্বরে,
ডাক্ রে ভগবানে হয়ে বদ্ধ সারি—
বল্‌রে "প্রভু প্রাণে সেই শক্তি দাও, এ
বিশ্বে আবার যাতে মাথা তুল্‌তে পারি।"

ঋষি দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতীয় সাম্যবাদের অন্যতম পথিকৃৎ। আত্মবিশ্বাস, সংগ্রাম, ঈশ্বর ও সাম্যনীতি তাঁহার সাম্য-বাদী চিন্তার বৈশিষ্ট্য, ভারতীয় সাহিত্যে দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে মানবীয় ভাব আরোপ নূতন নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল দেশকে "মা" বলিয়া ডাকিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে মানবীয় রূপ দর্শন করিয়াছেন। মৃণ্ময়ী তাঁহার নিকট চিন্ময়ীরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। কবি দেশপ্রেমমূলক কবিতার মধ্যে মা ও সন্তানের মধ্যে একটি নিবিড় হৃদয়-আলেখ্য আঁকিয়াছেন। আশাবাদী কবি জীবনের এক মহান্ আলোকোজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখিয়াছেন। দেশকে চিন্ময়ীরূপে অঙ্কন করিবার

প্রচেষ্টায় কবির মনে বাংলার শাক্তপদাবলী ও শক্তি-সাধনার প্রভাব পড়িয়াছে।

আদর্শবাদী জীবনপ্রেমিক কবি জীবনের মধ্যে একটি নিবিড় নির্দেশ শুনিতে পাইয়াছেন। তাই তাঁহার দেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলি আদর্শবাদের সহিত মানব-প্রেম ও বিশ্বপ্রেম, ব্যষ্টিজীবনের সহিত সমাজতন্ত্রবাদের মহিমায় প্রোজ্জ্বল।

দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষে। পরাধীনতার পুঞ্জীভূত বেদনা জাতির অন্তরে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল মনের গহনে অবগাহন করিয়া যে নববাণী, যে নবছন্দ লাভ করিলেন, সেই নববাণী নবছন্দকে ইন্দ্রধনুমণ্ডিত সুষমায় রূপদান করিয়া ঘুমন্ত জাতির অন্তরে দেশপ্রেমের মহাভাবতরঙ্গ সঞ্চার করিলেন। মহামানবের মিলন সঙ্গীত তাঁহার উদাত্তছন্দে জাতির অন্তর স্পর্শ করিল। দ্বিজেন্দ্রলাল পরাধীনতার বাঁধন ভাঙ্গার গান গাহিয়া জাতিকে জাগাইয়া তুলিলেন। জাতি পাষাণকারা ভাঙ্গিবার মহাশক্তি লাভ করিল। দ্বিজেন্দ্রলাল জনগণের অবচেতন বাণীকে চিন্ময়রূপ দান করিলেন, মানবপ্রেমিক কবি মৌন মূক কৃষাণের দাবীকে স্বীকৃতিদান করিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতের তদানীন্তনকালীন বৃহত্তর গণশক্তি কৃষকের ন্যায্যদাবী সমর্থন করিলেন। তিনি তাহাদের আত্মপ্রত্যয় জাগাইয়া তুলিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষকদিগকে সক্রিয়ভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। তাহাদের জয় সম্বন্ধেও তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন। এই গণশক্তি ও সমাজতান্ত্রিক শক্তির প্রতিভূরূপে দ্বিজেন্দ্রলাল উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক কবি। দ্বিজেন্দ্রলালের "মেবার পতন" নাটকে দেশপ্রেমের মহৎ আদর্শের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের চোখে দুনিয়ার খণ্ড খণ্ড ভূমিকে অবলম্বন করিয়া মানুষে মানুষে যে ব্যবধানে 'চীনের প্রাচীর' গড়িয়া উঠে, তাহা দুঃসহ, তাহা অবাঞ্ছিত। এ জন্য কবি দ্বিজেন্দ্রলাল চাহিয়াছেন "মনুষ্যত্বের" নীতিকে স্বীকার করিয়া এক আন্তর্জাতিক মানব কুটুম্বপরিবারের সৃষ্টি। ঈশ্বর, ত্যাগ, সেবা, প্রেমই এই নব দেশপ্রেমের সুদৃঢ় বুনিয়াদ। দ্বিজেন্দ্রলালের অফুরন্ত দেশপ্রেমের কবিতার মধ্যে তিনি যদি শুধুমাত্র "তুমি তো মা সেই, তুমি তো মা সেই—চিরগরীয়সী ধন্য অয়ি মা,"

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ,"

"ভারত আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ,"

"ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর ছিঁড়ে গেছে মোর
বীণার তার,"

"ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,"

"মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় শিখরে যাহার উচ্চশির,"

"আজি গো তোমার চরণে জননী আনিয়া অর্ঘ্য করিয়া
দান,"

লিখিতেন, তাহা হইলেও তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমের কবিগণের মধ্যে স্থায়ী আসন লাভ করিতেন। এই কবিতাগুলি যে সুমহান ভাবসম্পদ, যে ছন্দের ওজস্বিতায় প্রাণবন্ত, তাহা সমবেত কণ্ঠে গীত হইলেই এক অনির্বচনীয় মহান্ ভাবলোকের সৃষ্টি করে। এক উদাত্ত ভাবের তরঙ্গ সমবেত জনগণের মনকে উচ্চভাবের জগতে জাগ্রত ও উদ্বোধিত করে। দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, মহীয়ান প্রাচীন সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য, প্রাচীন বীরপুরুষ-গণের শৌর্য্য-বীর্য্য, মহীয়ান ভারতবর্ষ গড়িবার মহৎ সংকল্প এই দেশপ্রেমের সঙ্গীতগুলির প্রাণ। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা লিরিক কবিতাগুলি অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ-সঞ্চার করিয়াছে। এজন্য দেশ অনেকাংশে দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট দেবঋণে আবদ্ধ। জার্মাণ জাতিগঠনে জাতীয় সঙ্গীতের ভূমিকা নিরূপণ করিয়া আনন্দমোহন বসু তাঁহার স্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন—

"Songs are of great importance. They often preach better than sermons, and find their way into the heart. Writing to you from Germany I may tell you that national songs and hymns have done more to unite this country and placed it in the proud position if occupies to-day than its armies. In fact its armies have been the result of the spirit which these songs aroused in the whole Community." জার্মাণ জাতিগঠনে জাতীয় সঙ্গীত যেরূপ সাহায্য করিয়াছে, অস্ত্রবিহীন ভারতবাসীর জাতীয়

সংগ্রামে জাতীয় সঙ্গীত তদপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছে। ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশীসঙ্গীতগুলি প্রাণসঞ্চার করিয়াছে। প্রহেলিকা-বর্জিত কবির হৃদয় স্পন্দনে স্পন্দিত, ওজোমণ্ডিত, সহজ-বোধ্য ও কর্মে উদ্বোধক, হৃদয়গম্য ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত-গুলি জাতির মণিকোঠায় চিরঅক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। এজন্য দেশ ঋত্বিক দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট দেবঋণে আবদ্ধ। এ ঋণ শুধু যোগ ও ক্ষেম দ্বারাই পরিশোধ করা যায়।

একদা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের পিতাকে বলিয়াছিলেন, "কার্ত্তিক, তোমার এ ছেলে একদিন বড়লোক হবে।" পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালকে চিনিতে ভুল করেন নাই। দেশপ্রেমিক মানবতাবাদী বিশ্বপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল তাহার পৌরুষের দৃপ্ত স্পর্শে কবিতা ও নাট্যের মধ্য দিয়া ভাবোন্মাদনা সঞ্চার করিয়াছেন। জাতির জীবনছন্দে গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার দান স্মরণ করিয়া সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু কবি নন, হাস্যরস-সমুজ্জল মধুর-গানের রচয়িতা নন, তিনি আমাদের জাতীয়তার পুরোহিত, তিনি বাঙ্গালীর পথপ্রদর্শক। তিনি স্বদেশী-তন্ত্রের কবি, তিনি একনিষ্ঠ ভগীরথের মত বাঙ্গালীর অবদান হিমাচলে অধিষ্ঠিত দেশাত্মবোধ মহাদেবের জটা-জুট হইতে দেশভক্তি ভাগীরথীর পবিত্র প্রবাহ আনিয়া কোটী কোটী ভারত সন্তানের, জীবমুক্তির সাধন দান করিয়া গিয়াছেন। এ ঋণ কি জাতি কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে ?"

(বাঙ্গালী ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩)

শতবর্ষ আগে ও পরে

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

হে বিশ্বপ্রেমিক ঋষি, আজি হতে শত বর্ষ আগে
এ সুন্দরী ধরণীর অরণ্যের শ্যাম অনুরাগে
কম্পিত হয়েছে তব প্রাণ নব পল্লবের স্তরে,
ঝঙ্কারিত হয়েছিল গান তব নদীকলস্বরে,
সঞ্চারিত হয়েছিল প্রেম তব বিশ্ববাসী তরে।
করেছিলে আশা তুমি, হয়তো বা শতবর্ষ পরে
নদীজলে তব গান শুনিবারে পাবে মর্ত্যবাসী,
উষালোক মাঝে তারা দেখিবে তোমার শুভ্রহাসি ;
বিশ্ববাসী নরনারী সবার হাসিতে সুখে, প্রেমে
দেহহীন প্রাণ তব, প্রেম তব
আসিবে গো নেমে।

হায় কবি, কোথা হেরি প্রাণ তব। শতবর্ষ পরে
আজি যন্ত্র-জর্জরিত, সংগ্রাম-বিধ্বস্ত পৃথ্বী-'পরে
কোথা সুখ, কোথা হাসি, কোথা প্রেম, হে
প্রেমিক কবি,
যেথায় আসিবে নেমে প্রাণ তব,—প্রেম প্রতিচ্ছবি !
অরণ্যের শ্যামলতা, হৃদয়ের কোমলতা, স্নেহ
ধ্বংসপ্রায় সভ্যতার শাপে,—ধ্বংস সুখময় গেহ !
"লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়"
ধ্বংস করিয়াছে আজি বিশ্ব হ'তে সত্য, ধর্ম, ন্যায় !
জান কি তোমার প্রিয় বসুন্ধরা-বুকে আজি হায়,
ভীষণ মারণ-অস্ত্র-পরীক্ষার প্রতিযোগিতায়
সভ্যনামধারী যত বর্বরের দল ওঠে জাগি'
আত্মধ্বংসী, বিশ্বধ্বংসী কী প্রলয়-সংগ্রামের লাগি' ?

তবু আশা জেগে ওঠে রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ মর্মের ক্রন্দনে
মর্ম যবে মুক্তি পায় তব কাব্য-ছন্দের বন্ধনে !

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আঠারো

মন্টুভাইয়ের দুর্বল, অসহায় ভাবটা খানিকটা কেটে গেল মহাদেবকে দরদী পেয়ে। স্বভাববলিষ্ঠ মানুষকে দুর্বলরা আঁকড়ে ধরে নিয়তির ঠিক সেই নিয়মেই—যে নিয়মে লতা আঁকড়ে ধরে গাছকে। মহাদেবও ওর মন্ত্রণাদাতা হয়ে খুসি হলেন—নিজের পৌরুষকে যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করে। কেবল সংসারে মুস্কিল এই যে, গণিতের অব্যর্থ নিয়মে মহাদেব তাঁর গর্বপুষ্ট শক্তিবলে মন্টুভাইয়ের বল যে-পরিমাণে বাড়িয়ে দিলেন সেই পরিমাণে তাঁর নিজের বল গেল ক'মে। ফলে হ'ল কি, তিনি একটু নিচে নেমে গেলেন। স্পষ্টবক্তা ঋজুগামী পথিক ক্রমশ: হ'য়ে উঠলেন খানিকটা কুটিল বঙ্কিম। কুসংসর্গে সত্যবাদী মানুষের সত্যে আঁট অজান্তে এইভাবেই ক'মে আসে তিলে তিলে। মানুষ একটু একটু ক'রে যখন নামে ঘোরানো পথে, তখন সে কিছুতেই বুঝতে পারে না কত দ্রুত কতখানি নেমে এসেছে। মহাদেবও তাই বুঝতে পারলেন না—তিনি কী ভাবে কুটিলতার বাঁকা পথে ধীরে ধীরে নেমে আসছেন তাঁর অভ্যস্ত খোলা আলো হাওয়ার জগৎ থেকে এক অনভ্যস্ত ফন্দিবাজির রসাতলে; আর ভাবতে পারলেন না যে বাইরে একটু উদারতা দেখিয়ে ধীরে ধীরে বৈষয়িকতার স্বাস্থ্যকর ইঞ্জেকশনে প্রহ্লাদ ও সাবিত্রীর মনের গুরুবাদী বিষক্ষয় করাই তাঁর কর্তব্য। মন্টুভাই তাঁর এ-সুমতিকে সাবাস দিয়ে বলল: "এইই তো চাই মামাবাবু। কুচক্রী গুরুর হাতে ওদের ছেড়ে দিলে ওদের সর্বনাশের পথেই রওনা করিয়ে দেওয়া হবে। কেবল খুব সাবধান! Ride softly that you may get home the sooner—পিণ্টো বলে—উঠতে বসতে।

মহাদেব প্রথম প্রথম যে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করতেন না তা নয়, কিন্তু অভিনয় করতে করতে মানুষের বিবেকবুদ্ধি খানিকটা নিস্তেজ হয়ে আসেই আসে। সরলা সাবিত্রী অভিনয়কে অভিনয় বলে চিনতে না পেরে উৎফুল্ল হয়ে উঠল—বিশেষ করে ক্রমশ: গুরুদেবের প্রতি বিমুখতা ক'মে আসতে দেখে। মাঝে মাঝে সে প্রহ্লাদকে একথা বলত সরল আবেগে। প্রহ্লাদও ছিল স্বভাবে সরল—কুটিলতার ধারপাশ দিয়েও কোনোদিন যায় নি তো, তাই সাবিত্রীর এজাহারকে মঞ্জুর করে (নিজেও মহাদেবের অপ্রসন্নতার বিশেষ কোনো আঁচ না পেয়ে) বিষ্ণুঠাকুরকে লিখে দিল: "আপনার গুরুশক্তি ফের অঘটন ঘটালো, গুরুদেব! বাবার মনমেজাজ এত বদ্‌লে গেছে যে কী বলব? বাড়িতে আর অশান্তি হয় না। মন্টুভাইও মনে হয় একটু একটু ক'রে বদ্‌লাচ্ছে। জয় গুরু জয়!"...... ইত্যাদি।

কেবল গৌরীর মন মানত না, মাঝে মাঝে টুকত ওদের দুজনকেই। বলত: "অত উচ্ছ্বাস ধোপে টেঁকে না রে! মনে হয়—কি জানি কেন—too good to be true, বলে না সাহেবরা?

সাবিত্রী (উদ্বিগ্ন হয়ে): কেন দিদি এমন অলুক্ষুণে কথা বলছ?

গৌরী: মামাবাবু ওঁর সঙ্গে রাতদিন কী এত গুজুর-গুজুর করেন বলবি আমাকে? আগে তো কই করতেন না? হঠাৎ আমি এলেই কেমন যেন ভাবান্তর হয়

দেখেছি দুজনেরই। তাছাড়া মামাবাবু আজকাল তো আর কই তেমন প্রাণখোলা হাসি হাসেন না?"

সঙ্গে সঙ্গে ওদের কিছু না ব'লে নিজের সংশয়ের কথা বিষ্ণুঠাকুরকে খোলাখুলি লিখে দিল। উত্তরে তিনি লিখলেন: "তুমি ঠিকই ধরেছ মা। সাবিত্রী ও প্রহ্লাদ তো কুটিলতার খবর রাখে না, তাছাড়া সরল মানুষের মন যা বিশ্বাস করতে ভালো লাগে তাকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করতে ঝোঁকেই ঝোঁকে—বিশেষ ক'রে পারিবারিক মমতার ক্ষেত্রে। এর প্রতিষেধক হ'তে পারো এক তুমি। মানে, তোমাকে আরো বেশি সজাগ থাকতে হবে, বাইরের ঠাট দেখে ভুললে চলবে না।

"কেবল সঙ্গে সঙ্গে একটি কথা বলব: তুমি ভুলেও ওদের চোখ খুলে দিতে চেও না। যারা মোহান্ধ থাকতে চায়, তাদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে ফল শুভ হয় না। সদ্‌গুরুর প্রতি অজ্ঞানদের বিমুখতার মূল কারণ এই। শামুককে আঘাত করলে সে আলো-কে বরণ করে না—ডুব দেয় নিজের অন্ধকারের অতলে। মহাদেব মানুষ খারাপ বলছি না—বাইরে অবিশ্বাসী হ'লেও অন্তরে কুটিল কি নাস্তিক নয়। কলম্বোয় ও একদিন সত্যিই কেঁদে প্রার্থনা করেছিল—সাবিত্রী যেন মৃতবৎসা না হয় তাহ'লে বংশ থাকবে না। সংসারী মানুষ ভগবানকে চাইতে সুরু করেও সচরাচর এই ভাবেই—মানে, অর্থার্থী হ'য়েই। নচিকেতার মতন জিজ্ঞাসুরা ক্ষণ-জন্মা ব'লেই যম বলেছিলেন—তাদৃং নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা—তোমার মতন জিজ্ঞাসুর যেন দেখা পাই আমরা—সদ্‌গুরুর দল। কিন্তু হায় রে! চেতনার অনেক বিকাশ হ'লে তবে মানুষ আন্তরিক জিজ্ঞাসু হয়—সবাই কিছু রাতারাতি সকাম পূজা ছেড়ে নিষ্কাম উপাসনার পথ ধরতে পারে না। ঠাকুর একথা জানেন, তাই সকাম প্রার্থী—কিনা অর্থার্থীদেরও—পায়ে ঠেলেন না, অনেক সময় তাদের ঐহিক প্রার্থনাও পূর্ণ করেন বৈ কি। কেবল তিনি একটি জিনিষ সর্বদাই চান—মূঢ় মোহান্ধরাও ঐহিক চাওয়ার অজ্ঞানলোক থেকে যত শীঘ্র সম্ভব পারমার্থিক চাওয়ার মুক্তিলোকে উত্তীর্ণ হবে। চিরদিন ঐহিক কামনাকেই আঁকড়ে থাকলে মানুষের বিকাশের সব পথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়, ফলে যে-দৈবী কৃপা ঐহিক প্রার্থনার মাধ্যমে আসছিল তারও আর নাগাল পায় না। এত কথা তোমাকে বলতাম না—তবে তোমার সর্বদা সজাগ থাকা সর্বথা বাঞ্ছনীয় ব'লেই লিখলাম। প্রহ্লাদ ও সাবিত্রীকে এখন মহাদেবের সম্বন্ধে কিছু বললে তাদের চোখ খুলতে দেরি হবে। গভীর আত্মিক সত্য সব সময়ে লঘুপাক হয় না, আর যে-সত্য যার কাছে গুরুপাক তার জন্যে নিচু থাকের সত্যের লঘুপথ্যের ব্যবস্থা দেওয়াই ভালো। মন্টুভাইয়ের সম্বন্ধে পরে লিখব। আজ শুধু এইটুকু লিখেই ইতি করি: ঠাকুর সবাইকেই কাছে টানতে চান এবং কাছে আসবার সুযোগও দেন বটে—যার নাম দৈবী কৃপা—কিন্তু যারা কিছুতেই তাঁর ছায়া মাড়াতে চায় না তাদের স্বভাব তিনি জোর ক'রে শোধন করেন না, কেন না তিনি চান মানুষ প্রেমের টানেই আত্মশোধন করতে চাইবে—কোনো ভয়, জোর জুলুম কি সুবিধাবাদের নির্দেশে নয়।"

উনিশ

মহাদেব ফিরে আসার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে ঝুলন-পূর্ণিমার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গুরু-বরে-পাওয়া ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'ল। মহাদেব আনন্দে প্রায় আত্মহারা হ'য়ে উঠলেন। এতদিন প্রহ্লাদ ও সাবিত্রীর পূজার ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত পেরোন নি। আজ গিয়ে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করলেন বিঠোভা-রুক্মিণীর যুগলমূর্তির বেদীমূলে। ও-বেদীর উপরে বিষ্ণুঠাকুরের একটি সমাধিস্থ পট থাকা সত্ত্বেও তাঁর মন আজ বিমুখ হ'ল না। পুরোহিত ডেকে মন্ত্রের পর মন্ত্র আবৃত্তি ক'রে ঠিক দুপুরবেলা পূজা সাঙ্গ ক'রে উঠে বললেন প্রহ্লাদকে আলিঙ্গন ক'রে: "প্রহ্লাদ, পেয়েছি বাবা, পেয়েছি।"

প্রহ্লাদের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, পিতৃদেবের পায়ে গড় হ'য়ে প্রণাম করে ওঠে বললেন: "কী পেয়েছেন বাবা?"

মহাদেব: নাতির দুটি নাম: আনন্দ ও দেবকুমার।

প্রহ্লাদ (একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে): কিন্তু সে তো হ'তে পারে না বাবা!

মহাদেব (বিস্মিত তথা ঈষৎ আহত): হ'তে পারে না? কেন?

প্রহ্লাদ (ইতস্ততঃ ক'রে): আচ্ছা, সে কথা পরে হবে—আমার একটু কাজ আছে।

মহাদেবের বুঝতে বেগ পেতে হ'ল না যে, প্রহ্লাদ প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল। তিনি সোজা গেলেন মন্টুভাইয়ের কাছে। মন্টুভাই তাঁর মুখ অন্ধকার দেখে জিজ্ঞাসা করল : কী হয়েছে মামাবাবু? ফের বেধেছে বুঝি? জানতাম বাধবেই।"

মহাদেব (জোর ক'রে সহজ সুরে): না, ঠিক বাধে নি। এ-শুভদিনে—অশুভ কিছুর ছায়াও যেন না আসে। কেবল ···

মন্টুভাই : কেবল? কী মামাবাবু?

মহাদেব : এমন কিছু নয়, বিশেষ—তবে···থাক্ এখন। কাজ নেই—পরে বলব।

মন্টুভাই (উৎসুক উঠে): না না বলুন। প্রহ্লাদ কিছু বলেছে?

মহাদেব : না না। প্রহ্লাদ আমার তেমন ছেলে নয়।

মন্টুভাই (ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে): কেবল যা গুরুভক্তির রেসে স্বামী বিবেকানন্দকেও হারিয়ে দিতে পারে with a handicap!

মহাদেব (ঈষৎ বিচলিত হওয়া সত্ত্বেও): থাক্ বাবা, থাক্—এ শুভদিনে। আমি হয়ত ভুল বুঝেছি।

মন্টুভাই : কী চাপছেন বলুনই না, শুনি।

মহাদেব : এমন কিছু নয়—আমি···আমি আনন্দ ক'রে নাতির নামকরণ করতে চেয়েছিলাম—আনন্দ আর দেবকুমার—তা প্রহ্লাদ বললে তা হ'তে পারে না। কেন বুঝলাম না। ও এড়িয়ে গেল।

মন্টুভাই (মুখ টিপে হেসে): এড়িয়ে না গিয়ে করে কি বলুন? পিতৃভক্ত পুত্র তো?

মহাদেব (সন্ত্রভঙ্গে): মানে?

মন্টুভাই : ভুলে যাচ্ছেন কেন মামাবাবু যে, নাতি তো আর আপনার নয়, গুরুর বরে পাওয়া—কাজেই গুরুদেবেরই সম্পত্তি—ওখানে tresspass forbridden—beware!

মহাদেব : হেঁয়ালি ছাড়ো। সোজা ভাষায় কথা কও।

মন্টুভাই : জানেন না? আজ সকালে দশটার সময় গুরুদেবের স্বপ্নাদেশে দেবদূতের নামকরণ হ'য়ে গেছে যে।

মহাদেব (বিরক্ত হ'য়ে): কী বলছ যত সব বাজে কথা।

মন্টুভাই : বাজে কথা? আপনার ভাগনীকেই জিজ্ঞাসা ক'রে যাচিয়ে নিন না।

মহাদেব (সবিস্ময়ে): গৌরীকে? সে কী বলবে?

মন্টুভাই (বাঁকা হেসে): ও সারা সকালটাই কমলা-দেবীর সঙ্গে ছিল সাবিত্রীর কাছে। ঠিক বেলা দশটায়—আপনার নাতি তখন ঘুমুচ্ছে ছোট্ট খাটে—আপনার বৌমা চোখের জলে প্রাণপ্রিয়া সখী ও পতিপরমগুরুর সঙ্গে কোরাসে গুরুদেব গুরুদেব ক'রে স্তব করলেন :

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥

বলতে বলতে গৌরী আর এক ক্ষেপ চোখের জল ফেললে আমার কাছে এসে।

মহাদেব (বিরক্ত): কী সব বাজে কথা—

মন্টুভাই : আহা শুনুনই আগে শেষ পর্যন্ত। ড্রামার ক্লাইম্যাক্স কি ঝুপ ক'রে পড়ে গাছ থেকে? ধীরে ধীরে পেকে ওঠে। একগঙ্গা চোখের জলের নদীতে ঠাণ্ডা হ'য়ে ভাসতে ভাসতে বৌমা আপনার ঘুমিয়ে পড়লেন। গৌরী তখন প্রহ্লাদের সঙ্গে আলোচনা করছে কী নাম দেওয়া যায়? হঠাৎ আপনার ব্রহ্মচারিণী বৌমা জেগে উঠে স্বর্গীয় হাসি হেসে বললেন : গুরুদেব শুধু যে নবজাতককে আশীর্বাদ ক'রে গেছেন তাই নয়, সেই সঙ্গে নামকরণও করে গেছেন—দত্তাত্রেয় বামন পলুস্কর। এর পরে প্রহ্লাদ কেমন ক'রে আপনার দেওয়া আনন্দ দেবকুমার নাম মঞ্জুর করে বলুন তো?

কুড়ি

মহাদেবের মুখে সবে-জাগা আলো মিলিয়ে গেল, তিনি খানিকক্ষণ গুম্ হ'য়ে থেকে হাঁকলেন : "গৌরী!"

মন্টুভাই (ভয় পেয়ে): ওকে বলবেন না মামাবাবু!

মহাদেব : চুপ করো। আমি জানতে চাই—এ বাড়ির কর্তা কে?—গৌরী!

গৌরী (ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে ঢুকে): কী হয়েছে মামাবাবু?

মহাদেব (রুক্ষ): তোমাদের গুরুদেব স্বপ্নাদেশে আমার নাতির নামকরণ ক'রে গেছেন একথা কি সত্যি ?

গৌরী (রুষ্টনেত্রে স্বামীকে): তুমি ফের চুকলি কেটেছ তো ? তোমাকে পই পই ক'রে মানা করি নি —কাউকে একথা বলতে ? তুমি কথাও দিয়েছিলে—

মনুভাই (মরীয়া হ'য়ে): তুমি যা বলবে তাই শুনতে হবে না কি ? আর—কথা আমি দিই নি—তুমি আদায় ক'রে নিয়েছিলে।

মহাদেব (বাধা দিয়ে): ও বলেছে তাতে কী অন্যায় হয়েছে ? এত মানা করাকরিই বা কেন ? এ বাড়িতে সবাই এযাবৎ বরাবর সোজাপথেই চ'লে এসেছে,আজ হঠাৎ এত গুজগুজ ফুশফুশ সুরু হ'লই বা কেন ?—শোন্। কী বলেছেন তোদের গুরুদেব—বল্—বলতেই হবে তোকে। নৈলে আমি এক্ষুণি চ'লে যাব ফের।

গৌরী (ঈষৎ ত্রস্ত): গুরুদেব কিছু বলেন নি। বৌ দেখেছে তাঁকে স্বপ্নে। তিনি—মানে ছেলের নামকরণ করে গেছেন—বৌ বলল।

মহাদেব: কী নাম ?

গৌরী (মুখ নিচু ক'রে): বলব না।

মহাদেব (সগর্জে): বলবি না ?

মনুভাই (হাতজোড় ক'রে): এ নিয়ে এখন আর গোলমাল করবেন না মামাবাবু—দোহাই আপনার—মানে অন্ততঃ আপনার বৌমার কথা ভেবে—

গৌরী (রুষ্ট): সে-ভাবনা কি তোমার আগে ভাবা উচিত ছিল না ? সেদিন ডাক্তার তোমার সামনেই ব'লে যায় নি কি—বৌকে যেন সর্বদা প্রফুল্ল রাখা হয়, নৈলে ফের পড়তে পারে ?

মনুভাই: আমি কী এমন করেছি শুনি ?

গৌরী: কী করেছ ? জানো না ? কোথায় চেষ্টা করবে যাতে বাড়িতে শান্তি ফিরে আসে—না কেবল মামাবাবুর কাছে এর-ওর-তার নামে লাগিয়ে চুকলি কেটে —ছি ছি ছি ! কী ছিলে, আর কী হ'য়ে দাঁড়াচ্ছ বলো তো ?

মহাদেব (তপ্তস্বরে): আর তুইই বা কী ছিলি, কী হ'য়ে দাঁড়াচ্ছিস খেয়াল আছে তোর ? কথায় কথায় স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ?

গৌরী (ঝাঁঝালো): ও কেন গুরুদেবের অপমান করবে ?

মহাদেব: আর আমার অপমান বুঝি কিছুই না ?

গৌরী: কেন অনর্থক এত রাগ করছেন মামাবাবু ? ওরা কী করবে বলুন—যদি কোনো সাধু মহাত্মাকে গুরুবরণ করার পরেও আপনার ধনুর্ধর জামাইয়ের মতন গুরুদ্রোহী হ'য়ে ধর্মকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে না পারে ? আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ লোক গুরুকে ভক্তি করে। তাতে কি বাপমার অপমান হয় বলতে চান ?

মহাদেব: গুরুকে ভক্তি করা বুঝতে পারি। গুরু থাকুন না তাঁর এলাকায়। মাঝে মাঝে চ'রে যেতে এদিকে ওদিকে ঢুঁ মারলেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার বাড়িতে কর্তা হবেন তিনি—আমার ছেলেকে বৌমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন এও স'য়ে থাকতে হবে না কি ?

গৌরী: ছিনিয়ে নিয়ে—কী বলছেন মামাবাবু ?

মহাদেব (উত্তপ্ত) নয় তো কী শুনি ? আমার নিজের নাতির—এমন কি নামকরণ করারও আমার অধিকার নেই, অথচ আজই সকালে পুরুভের সঙ্গে প্রহ্লাদ দোয়ার দিল:

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়স্তে সর্বদেবতাঃ॥

গৌরী (মনুভাইকে): দেখছ তো কী বাধিয়ে বসেছ তুমি ? কোথায় ঠাণ্ডা করবে—না আরো ঘরে আগুন লাগাচ্ছ !

মনুভাই (ক্রুদ্ধ): আগুন লাগাচ্ছি—আমি ? চমৎকার ! মামাবাবু তো ঠিকই বলেছেন। তোমার গুরুদেব থাকুন না নিজের গুরুদ্বারে। সেখানে গিয়ে মাঝে মাঝে তোমরা বেশ তো যা প্রাণ চায় পুজো দিয়ে এসো না শিখদের ম'ত—কে আপত্তি করছেন ? কিন্তু সব দেশেই মানুষ নিজের ঘরে কর্তা হ'তে চায়। বিলেতে শুনতাম সাহেবরা প্রায়ই বলত: "An Englishman's home is his own castle."

মহাদেব (তিক্তস্বরে): কাস্‌ল্ না হাতী ! বাড়ী আমার হয়ে উঠেছে আজ জেলখানা। আমি হাঁপিয়ে উঠি কি সাধে ? যে ঘরেই যাই—গুরুদেবের ছবি।

যেদিকেই কান পাতি শুনি জয়ধ্বনি : গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। উঃ! (মন্টুভাইকে) কেন তুমি আমাকে ফিরিয়ে আনলে? আমি কালই ফের চ'লে যাব।

গৌরী (হাতজোড় ক'রে) : লক্ষ্মীটি মামাবাবু! এমন কাজ করবেন না—আপনার দুটি পায়ে পড়ি। বৌয়ের মন নরম, ফের যদি ঘা খায় তাহ'লে হয়ত ও বাঁচবে না। ও কেবলই বলে—আপনি ফিরে আসাতে ওর আনন্দ ও রাখতে পারছে না; এমন কি কাল রাতেই বলছিল—আপনার শূন্য ঘরের দিকে তাকালে ওর বুকের মধ্যে খাঁ খাঁ করত। তাছাড়া আপনার গান ও কী ভালোবাসে আপনি জানেন না নাকি? কথায় কথায় বড় গলা ক'রে বলে: আমার শ্বশুরের মতন শ্বশুর পায় কটা মেয়ে—রূপে গন্ধর্ব, কণ্ঠে কিন্নর!

মহাদেব (একটু উপশান্ত হ'য়ে) : গৌরী! তোকেও কি এটুকু বুঝিয়ে বলতে হবে যে, পাগল ছাড়া কেউ সাধ ক'রে তিন পুরুষের ভিটে ছেড়ে যেতে চায় না—তার একটি মাত্র সন্তানকে ছেড়ে। আমি কেবল চাই—কিন্তু —থাকগে তোমাদের বলা—মানে অরণ্যে রোদন। মনে-প্রাণে যে গুরুবাদী—

গৌরী (শান্ত কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে) : হ্যাঁ মামাবাবু! আমি গুরুবরণ ক'রে গুরুদ্রোহী হবার কথা যে ভাবতেও পারি না তাই নয়, (মন্টুভাইকে দেখিয়ে) ওর মতন মুখে এক মনে এক হ'য়ে বাঁচতেও চাই না। গুরুদেবকে ভক্তি করি, কারণ তাঁর মহত্ত্ব দেখেছি স্বচক্ষে। শুনবেন? না মামাবাবু, উঠবেন না—বসুন, শুনুন একটু—আপনার পায়ে পড়ি। (একটু থেমে) আমি কাশী গিয়েছিলাম শুধু গুরু করতেই নয়। শুনেছিলাম বিষ্ণুঠাকুর মস্ত সাধু, তাঁর কৃপায় বন্ধ্যা মেয়েদেরও সন্তান হয়। ডাক্তারের বড়ির চেয়ে সাধুর পাদোদকে আমার বিশ্বাস বেশি। তাই আমি কাশী গিয়েছিলাম—যার ফলে ঘর আলো ক'রে এলো মেয়ে রমা —দেখলেন তো স্বচক্ষেই।

মহাদেব : ঐ তো। তোদের মেয়েলি যুক্তি। দেখলাম আমি কী শুনি? তোর কোলে এল সন্তান। কিন্তু সে এল গুরুর প্রসাদে—এ তো স্রেফ অনুমান।

গৌরী : কিন্তু ডাক্তারে কি বলে নি যে, আমার ছেলে হ'তে পারে না?

মহাদেব : ডাক্তারের সব কথাই কি বেদবাক্য না কি? কত সময়ে কত ভুল বলে ওরা—

গৌরী : কিন্তু গুরুদেবের কাছ থেকে ফিরেই যে রমাকে পেলাম—

মহাদেব : ও! স্রেফ কাকতালীয়।

মন্টুভাই (সঙ্গে সঙ্গে) : Coincidence—আমিও তো তাই বলি। যত সব ননসেন্স—

গৌরী (অবজ্ঞাভরে স্বামীকে পাশ কাটিয়ে) : মামাবাবু, আপনি বিচক্ষণ, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্—কী উড়ো তর্ক করছেন বলুন তো? তিন তিনটি মেয়েকে জানি আমি, যাদের দশ বারো বৎসর সন্তান হয় নি—কিন্তু কাশী গিয়ে গুরুদেবের আশীর্বাদে তারা মা হয়েছে। বলেন তো চিঠি লিখে তাদের এজাহার এনে দাখিল করতে পারি। আপনি মাথা ঠাণ্ডা ক'রে একটু ভেবে দেখবেন কি দয়া ক'রে? তাছাড়া কাকতালীয়, কোইন্‌সিডেন্স, অ্যাকসিডেন্ট নাম দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তারদের ওষুধকেও তো ডিশমিশ করা যায়।

মহাদেব : না, যায় না। কারণ ডাক্তারের ওষুধের ফল রক্ত পরীক্ষা ক'রে প্রমাণ করা যায়।

গৌরী : বিচক্ষণ হ'য়ে কী সব ছেলেমানুষি যুক্তি দিচ্ছেন মামাবাবু? এ-ও কি আপনি জানেন না যে—অনেক সময়েই শুধু যে রক্তে কিছুই পাওয়া যায় না তাই নয়, অসুখের কারণ বা প্রকৃতি পর্যন্ত বোঝা যায় না। অথচ এমন অসুখও সারতে দেখা গিয়েছে সাধুসন্তের আশীর্বাদে। তাছাড়া প্রহ্লাদ প্রায়ই বলে একটি লাখ কথার এক কথা : যে, সংখ্যা দিয়ে সত্যের বিচার হয় না। আমার এক সখীর বাড়িতে ভূতুড়ে উপদ্রব ঘটছে প্রায় রোজই—থালা বাটি টেবিল স'রে যাচ্ছে, ঢিল পড়ছে বাইরে থেকে—আরও কত কী! এ-ধরণের উপদ্রব হয়ত হাজারে একজন গৃহস্থের ঘরেও হয় না। কিন্তু তাই ব'লে কি বলবেন—যাদের সংসারে ভূতের নৃত্য চলেছে দিনের পর দিন, তাদের সমস্ত এজাহারই নামঞ্জুর? (স্বর নামিয়ে) আর একটি কথা বলি শুনুন। গুরুদেবের শক্তিতে বন্ধ্যারা অনেক সময়ই পুত্রবতী হয়েছে—শুধু এই এজাহারের জোরেই আমি গুরুর মাহাত্ম্য প্রমাণ করতে চাই নি। আমার কথা এই যে, সর্বত্রই যুগে যুগে মানুষ সাধু মহাত্মাদের পূজা ক'রে

এসেছে তাঁদের মহত্ত্ব ত্যাগ, সংযম, অনাসক্তি, ভক্তি, জ্ঞান এই সব দুর্লভ গুণ দেখে আকৃষ্ট হ'য়েই। যা অনেকে পারে না বা খানিকটা পারে বহু কষ্টে—তাঁরা পারেন অনায়াসে—তাঁদের এই কীর্তিই আমাদের মন টানে, প্রাণ দোলায়, মাথাকে তাঁদের পায়ে টেনে নুইয়ে দেয়। আমি গুরুদেবকে ভক্তি করতে শিখি প্রথম তাঁর একটি অপূর্ব মহত্ত্ব দেখে। সে আশ্চর্য কাহিনী একটু শুনুন মামাবাবু, আপনার দুটি পায়ে পড়ি—উঠবেন না।

মহাদেব (বিমুখতা সত্ত্বেও গৌরীর কম্প্রকণ্ঠে একটু নরম হ'য়ে) : আচ্ছা বল্, আমি বসছি।

গৌরী : আমি তখন গুরুদেবের ঘরে অতিথি। ওঁর ছেলে ধ্রুব আমাকে একদিন বলল : "বাবার কত শত্রু জানেন না দিদি! তিনি বড় কি না, তাই হিংসেয় তাদের রাতে ঘুম হয় না।" আমার বিশ্বাস হ'ল না, ভাবলাম এমন মানুষেরও কি কখনো শত্রু থাকতে পারে? ধ্রুব ছেলেমানুষ তো, বাড়িয়ে বলেছে। কিন্তু তার পরেই কী কাণ্ড হ'ল জানেন? আর এ আমার শোনা কথা নয়—স্বচক্ষে দেখা।

গুরুদেবের কাছে মালতী ব'লে একটি বিধবা মেয়ে মাঝে মাঝে আসত। তার শাশুড়ী তাকে যা যন্ত্রণা দিত বলবার নয়। সময়ে সময়ে তার মাতাল দেওর মদ খেয়ে এসে যা মুখে আসে তাই ব'লে অপমান করত, তার কাজে বা আচরণে পান থেকে চুণ খসলে। সে-সব ফলিয়ে বলতে গেলে আজ সারা দিনেও কুলুবে না। হ'ল কি, এই দুঃখিনী মেয়েটি গুরুমার কাছে এসে প্রথম শান্তি পায়। তারপরে সে মাঝে মাঝেই আসত গুরুদেবের ভজন ও হরি-কথা শুনতে। বছর খানেক দোয়ার দিতে দিতে সময়ে সময়ে তার ভাব-সমাধি মতন হ'ত। তাদের ছোট খাপরার ঘর গুরুদেবের আঙিনার ঠিক পাশেই। একদিন সকাল-বেলা দারুণ চিৎকার ও শোরগোল! গুরুমা, আমি ও ধ্রুব তিনজনে ছুটে গিয়ে দেখি—মেয়েটি মাটিতে প'ড়ে ছট-ফট করছে আর তার মাতাল দেওর তাকে বেত মারছে আর বলছে : "আহা, ভা:সমাধির বালাই নিয়ে মরি রে! কেবল ভান আর ভান—ছেনালি আর ভণ্ডামি—কিন্তু সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, বজ্জাত মেয়ে! বুঝলি? আমি একটা কেও কেটা নই, সব জানি ...!" চৌকাঠের ওপাশে দাঁড়িয়ে তখন তিন চারটি মেয়ে ভয় পেয়ে আপ্রাণ চেঁচাচ্ছে, কিন্তু কেউই এগুচ্ছে না।

আমি গুরুদেবকে খবর দিতেই তিনি ছুটে গেলেন। মালতীর দেওরের নাম বিপিন। সে গুরুদেবকে দেখেই বলল : "এই ভণ্ডটার কাছ থেকেই বজ্জাত মেয়েটা ভণ্ডামির দীক্ষা নিয়ে ভাব-সমাধির ভান করে—কাজ ফাঁকি দেবার জন্যে।" গুরুদেব তার কথার উত্তর না দিয়ে মালতীকে গিয়ে বললেন : "চলো মা তুমি আমার সঙ্গে।" বিপিন বাধা দিতে আসতেই গুরুদেব শুধু তার দিকে তাকালেন। বিপিন মাথা ঘুরে মাটিতে ব'সে পড়ল।

মালতী উঠে চ'লে এল। বিপিন আগুন হ'য়ে পুলিশে খবর দিল—ট্রেসপাসের চার্জ। পুলিশ গুরুদেবকে থানায় টেনে নিয়ে গেল। দারোগা ছিল বিপিনের এক গেলাসের ইয়ার, গুরুদেবের নামে জঘন্য চার্জ আনল মালতীকে জড়িয়ে। পাড়ায় ঢিটিক্কার—ভণ্ডগুরুর ডুবে ডুবে জল খাওয়া ধরা পড়েছে। গুরুদেব নির্বিকার—একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করলেন না জামিনে খালাস পাওয়ার পরে।

কিন্তু আদালতে দাঁড়াতে হ'ল তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায়। তিনি শান্তকণ্ঠে শুধু ব'লে গেলেন কি কি হয়েছিল। মালতী নিজে থেকে এসে দেখাল পিঠে ঘাড়ে গালে বেতের দাগ। কেস ফেঁসে গেল। জজ সাহেব দারোগাকে ধমকে বললেন : "এমন জ্যোতির্ময় মহাপ্রাণ সাধুর নামে মিথ্যে কেস আনা—ধিক্!" এর ঠিক দুদিন পরে বিপিন মাতাল অবস্থায় রাস্তা পার হ'তে বেটক্করে এক মোটর চাপা পড়ল। একটা পা হাঁসপাতালে কেটে ফেলতে হ'ল। তার মা—মালতীর শাশুড়ী—শোকে দুঃখে পাগল হ'য়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া ঘুরে গেল—সবাই একবাক্যে বলা সুরু করল : "ঠিক সাজাই তো হ'য়েছে—মেয়েদের গায়ে যে হাত তোলে, নিষ্পাপ মহাত্মার বিরুদ্ধে যে জঘন্য অপবাদ রটায়"—ইত্যাদি।

হাঁসপাতাল থেকে বেরিয়ে বিপিন কোথাও চাকরি না পেয়ে শেষে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করা সুরু করল। পাড়াপড়শীরা বলল : "হবে না শাস্তি—মহাত্মার কলঙ্ক রটায়?" এদের মধ্যে অনেকেই ছিল তারা আর ভণ্ড—দুদিন আগে কারাই কুৎসা রটিয়েছে গুরুদেবের

বিরুদ্ধে। এখন বিপিন আর তার দজ্জাল মার দুর্দশা দেখে ভয় পেয়ে উল্টো সুর গাওয়া সুরু করল—গুরুদেবের ধামাধরা হ'য়ে নামকীর্তনে উঠল উজিয়ে। গুরুদেব একদিন আমাকে হেসে বললেন: "এদের চেয়ে দুর্ভাগা আর কেউ নেই মা, কারণ এরা ভাবে যে-যে-ভণ্ডামিতে মানুষও ভোলে না, তাতে ভগবান ভুলবেন।" কিন্তু সে যাক্। তার পরে কী হ'ল শুনুন।

বিপিনকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাবার পর শোকে দুঃখে বিপিনের মা পাগল হ'য়ে যেতে গুরুদেব তাকে এনে গুরুমার জিম্মায় দিলেন। গুরুমা তার চিকিৎসার সব খরচ দিয়ে আশ্রমেই রাখলেন। মালতী ও আমি ভার নিলাম তাঁর তদারক করতে। কিছুদিন আগে ধ্রুব লিখেছে যে, তিনি সুস্থ হ'য়ে উঠে দীক্ষা নেওয়ার পরে একেবারে বদ্‌লে গেছেন—আজকাল গুরুমার সেবা করেন এমন নিষ্ঠা ভক্তি নিয়ে যে দেখে সবাই অবাক হয়।

মহাদেব (একটু চুপ ক'রে থেকে): আর বিপিন ?

গৌরী: সে আর এক কাহিনী। আষাঢ়ে গল্প নয়—কারণ সে এই মাসেই আসছে গুরুদেবের সঙ্গে. ইচ্ছে করলে তার মুখে স্বকর্ণেই শুনতে পারেন—কীভাবে গুরুদেব তাকে আশ্রয় দিয়ে আশ্রমের নানা দেখাশুনার কাজে বাহাল করেন। সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই।

বিপিন যখন হাঁসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল তখন তার মা গুরুমার আশ্রমে। পুরোপুরি উন্মাদ নয়, তবে লোক চিনতে পারেন না। ডাক্তারে বলল, স্মৃতিশক্তির লোপ—amnesia না কি একটা নাম যেন। বিপিনের অনেক দোষ থাকলেও মাকে সে অত্যন্ত ভালোবাসত। সেই মাকে গুরুদেবের ও গুরুমার আশ্রয়ে একটু একটু ক'রে সেরে উঠতে দেখে সে গুরুদেবের পায়ে মাথা কুটে বলল: "আপনি আমার যে-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করবেন আমি রাজি আছি—যদি বলেন, বুকে হেঁটে হরিদ্বার যেতেও আমি প্রস্তুত, কেবল একবার বলুন যে আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন—আর মালতীও যেন আমাকে ক্ষমা করে। কারণ আমি বুঝতে পেরেছি—আমার পাপেই মার এ-শাস্তি হয়েছে।"

গুরুদেব তাকে ক্ষমা ক'রে আশ্রমে কাজ দিলেন—শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শিখিয়ে। আজ সে গুরুদেবের নানা চিঠিপত্রের খসড়া করে, উত্তর দেয়—তাছাড়া আশ্রমে এ-ও তা দেখাশোনা করে চমৎকার। মদ খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। বিশ্বাস না হয়—আপনার জামাই-কেই জিজ্ঞাসা করুন না—আমি সত্যি বলেছি না মিথ্যে।

মনুভাই (অতিষ্ঠ): আমাকে কেন মিথ্যে টানছ এর মধ্যে ? আমি কাশীতে প্রথমবার মাসখানেক থেকেই ফিরে এসেছিলাম—তুমি ছিলে তিন মাস। তুমি যেসব দেখেছ ব'লে রটিয়ে বেড়াও—সে সব আমি শুধু তোমার মুখেই শুনেছি। তাছাড়া তুমি দ্বিতীয়বার গিয়েছিলে একাই—আমাকে না জানিয়ে।

গৌরী: জানালে কি তুমি যেতে দিতে গো—পতি পরম গুরু ? না, গুরুদেবের সম্বন্ধে এত কথা আমি জানতে পারতাম যদি চার পাঁচ মাস ধ'রে তাঁর পুণ্য সঙ্গ না পেতাম ? (মহাদেবকে) আমার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করবেন মামাবাবু ! আপনার দুঃখ যে আমি বুঝি না তা নয়, কিন্তু গুরুদেবকে যদি আপনি দেখতেন তাহলে হয়ত তাঁর কৃপার স্পর্শে আপনিও এত শান্তি পেতেন যে তাঁর পরে রাগ আর রাখতে পারতেন না ! একবার দেখুনই না তাঁকে। কোনো মানুষকে না দেখে, না চিনে, শুধু লোকের কথা শুনে—বিচার করা কি উচিত বলেন আপনি ? আইনেও তো কোনো আসামীর সাফাই না শুনে কেউ তাকে দণ্ড দেয় না। লক্ষ্মীটি মামাবাবু ! (পায়ে হাত দিয়ে) আপনি একটিবার অন্ততঃ তাঁকে কাছ থেকে দেখুন—তার পরে না হয় অভিসম্পাত দেবেন, যদি মনে হয় তিনি ভণ্ড।

মহাদেব (অনিশ্চিত): হুঁ। আচ্ছা, ভেবে দেখব।

গৌরী (সাহস পেয়ে): শুধু ভেবে দেখা নয়, আমার এ-মিনতি আপনাকে রাখতেই হবে, মামাবাবু ! বলেছিলাম না এইমাত্র যে, গুরুদেব সামনের মাসেই আলন্দি তীর্থে আসছেন—তার পর পন্ধরপুর ও ভীমাশঙ্কর তীর্থ হ'য়ে দক্ষিণে আরো কয়েকটি তীর্থে যাবেন। আপনি রাজি হ'লে আলন্দি যাবার পথে তাঁকে আমাদের এখানে হ'য়ে যেতে বলতে পারি। শুধু তাঁর দিব্যকান্তি দেখেই যে কত পাপী ত'রে গেছে মামাবাবু, জানেন না।

মহাদেব (অসহিষ্ণু) : তোমাদের এই বাড়াবাড়িতেই তো আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠি। নইলে সাধু সন্তকে অপমান করতে কি কেউ চায়? তবে তোরা এই যে যা তা বিশ্বাস করিস—

গৌরী : যা তা?

মহাদেব : নয়ত কি?

গৌরী : যথা বিপিন তাঁর পুণ্য সঙ্গের প্রভাবে সাধু হ'য়ে গেল—এই কাকতালীয়?

মহাদেব : আমি অত বোকা নই। জেলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রভাবে প'ড়ে একজন দাগী চোর চুরি ছেড়ে দেয়। জেল থেকে বেরিয়ে সে তার বিশ্বস্ত চাকর হ'য়েছিল। তোদের গুরুদেবের সম্বন্ধে আজ প্রথম আমার একটু ভালো লেগেছে—বিপিনের আর তার মার কথা শুনে। কিন্তু তাই ব'লে কি বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি আকাশচারী হ'য়ে নানা লোককে দর্শন দেন, বা দূর থেকে কথা কন, বা—

গৌরী : বসুন মামাবাবু—একটার পর একটা সমস্যার নিষ্পত্তি হোক। গুরুদেব আকাশচারী হন আমরা কবে বলেছি?

মহাদেব : বৌমা বলেনি কি তোকে—আজই সকালবেলা?

গৌরী : মোটেই না। প্রহ্লাদ ছেলে হবার খবর দিয়ে গুরুদেবকে তার করেছিল ছেলের একটা শুভ নাম চেয়ে। গুরুদেব বৌয়ের স্বপ্নে এসে তাকে ছেলের নাম দিয়ে গেছেন, এইমাত্র।

মহাদেব : ঐ ঐ—ঐখানেই তো গোলে হরিবোল! প্রহ্লাদ তাঁকে তার করল—বুঝি। কিন্তু বৌমা তাঁকে স্বপ্নে দেখল ও তাঁর কথা শুনল ব'লেই ধরে নিতে হবে যে তিনি নিজে এসে নাম দিয়ে গেছেন? স্বপ্নে মানুষ কত কি দেখে, উদ্ভট জল্পনা কল্পনা—মনগড়া কত কী—

গৌরী : উদ্ভটও নয়—মনগড়াও নয় মামাবাবু—ষোলো আনা সত্যি—আর এই ব'লে রাখলাম—লিখে রাখুন—যে প্রমাণ হবেই হবে দুদিন পরে।

মহাদেব (ব্যঙ্গ হেসে) : এই জন্যেই তো বলি—তোদের মাথা খারাপ হয়েছে। এ বিংশশতাব্দীতেও কি বিশ্বাস করতে হবে গুরুদেব প্রহ্লাদের টেলিগ্রাম পেতে না পেতে হুশ্ করে যোগবলের এয়ারোপ্লেনে উড়ে এসে স্বপ্নের ঘাঁটিতে নেমে বীর হনুমানের মতন কোলে নামফল ফেলে দিয়ে গেলেন টুপ্ করে? স্বপ্নে পাওয়া বাণী? ফুঃ! মনপড়া।

গৌরী (একটু মুস্কিলে প'ড়ে) : অবিশ্যি আপনার একথা আমি এখনি অপ্রমাণ করতে পারি না, কি জোর ক'রে বলতেও পারি না—যে বৌয়ের স্বপ্ন মনগড়া নয়। তবে এটুকু বলতে পারি যে, গুরুদেব অনেক দীক্ষার্থীকেই বহুদূর থেকে স্বপ্নে মন্ত্র দিয়েছেন।

মহাদেব : এই এই এই—এই সব গুজবকেই আমি নাম দিই আষাঢ়ে গল্প। স্বপ্নে মন্ত্র! এত কান-পাৎলা হ'লে চলে?

গৌরী (সহসা) : আচ্ছা, তার করুন না কেন তাঁকে?

মহাদেব : কী তার?

গৌরী : বৌকে তিনি আজ ভোর বেলা স্বপ্নে দত্তাত্রেয় বামন নাম দিয়ে গেছেন কি না।

মহাদেব (উত্যক্ত হ'য়ে উঠে পড়ে) : তোদের মুখে অষ্টপ্রহর এই ধরণের বাজে কথা শুনতে হয় ব'লেই না আমি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠি—আমার তো মাথা খারাপ হয় নি যে, কোথাও কিছু নেই কাশীতে তার করতে যাব! আর লোক হাসাস নে গৌরী।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং……

গৌরী (মনুভাই ধরবার আগেই টেলিফোন ধরে) : কে?…বিপিন বাবু?……গুরুদেব?…হ্যাঁ, সাবিত্রী ভালো আছে।…আচ্ছা, ফুল বৌয়ের মাথার বালিশের নিচে রেখে দেব। কেবল শুনুন—হ্যালো—আমি বলছিলাম কি—দয়া ক'রে একটু দাঁড়াবেন? আমার মামাবাবু একটু কথা কইবেন—(রিসীভার তাঁর হাতে জোর ক'রে গুঁজে দিয়ে) না, আপনি বিপিনকে জিজ্ঞাসা করুন—আমাদেরও ভুল হ'য়ে থাকতে পারে তো—সন্দেহ ভঞ্জন হবে। ভালোই তো! আমিও চাই—একটা এস্পার-ওস্পার হ'য়ে যাক।

মহাদেব (খানিকটা বাধ্য হয়ে) : বিপিনবাবু! আপনার নাম শুনেছি আমি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।……হ্যাঁ, আমি মহাদেব পলুস্কর—কলম্বো

থেকে কদিন হ'ল বৌমার অসুখ শুনে ফিরেছি। শুনুন, আমার প্রশ্নটি এই : আপনার গুরুদেব কি সাবিত্রীর ছেলের কোনো নামকরণ করেছেন আজ?...কী?...করেছেন? কী বললেন? তিনি বলছিলেন?"...হ্যাঁ...নাম...সাবিত্রীকে স্বপ্নে এসে নাম দিয়েছেন? কখন?...ভোর বেলা?...কী নাম বললেন?...দত্তাত্রেয় বামন? ও—। আচ্ছা, হয়েছে হয়েছে (গৌরীকে) ধর্ তুই। (ব'লে উঠে গিয়ে বাইরে ইন্দ্রাণী নদীর দিকে চেয়ে রইলেন—কানে ভেসে আসে গৌরীর কথা।

গৌরী : হ্যাঁ বিপিনবাবু...মামাবাবু কিছুতেই বিশ্বাস করছিলেন না...কী?...তা বটে। কিন্তু তিনি তো গুরুবাদে বিশ্বাস করেন না। তবে আপনার ইতিহাস শুনে তাঁর সত্যিই ভালো লেগেছে বলছিলেন এইমাত্র। এবার যদি গুরুদেব একবার আসেন...কী? আলন্দিতে যাবার পথে?...দাঁড়ান একটু দয়া করে (ব'লেই মনুভাইকে) গুরুদেব আলন্দি যাবার পথে এখানে একদিন থেকে বৌকে ও দত্তাত্রেয়কে আশীর্বাদ ক'রে যেতে চান—অবশ্য তোমার ও মামাবাবুর যদি মত থাকে তাহ'লেই তাঁকে আসতে বলব, নৈলে ব্রিগেডিয়ার দেশাইকে বলব। তাঁর স্ত্রীর ভারি সাধ গুরুদেবকে দেখার।

মনুভাই : না না। এখানে যদি আসেন তবে আমাদের এখানেই উঠবেন বৈ কি। কজন আসবেন ওঁরা?

গৌরী : বলছি। (টেলিফোনে) : গুরুদেবের সঙ্গে কে কে আসবেন? গুরুমা আপনি আর ধ্রুব? (মনুভাইয়ের দিকে তাকাতেই সে সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ে)—আচ্ছা আমার স্বামীর অনুরোধ, গুরুদেব যেন আমাদের এখানেই উঠে আমাদের ধন্য করেন।...হ্যাঁ হ্যাঁ—আমাদের বড় বাড়ি—জায়গা যথেষ্ট আছে। তাছাড়া (মনুভাইয়ের দিকে চেয়ে দুষ্ট হেসে) উনিও তো গুরুভক্তিতে বড় একটা কেওকেটা নন, গুরুদেবের অন্তরঙ্গ শিষ্য—কাজেই এ-অঞ্চলে এসে গুরুদেব আর কোথাও উঠলে সইতে পারবেন কেন বলুন?...কী?...হ্যাঁ হ্যাঁ—চাকরও আসবে বৈ কি। কেবল—শুনুন, মাত্র একটি দিন নয়—অন্তত দিনরাত্রি কাটাতে হবে এখানে। দেহুও তো তীর্থ—তুকারামের মন্দির আছে এখানে। পুণ্য তীর্থে তেরাত্তির না কাটালে চলে?...কী? না, আর তার করতে হবে না। আমি বম্বে থেকে গিয়ে নিয়ে আসব গুরুদেবকে মোটরে করে—আমাদের মোটর—ব্রিগেডিয়ার দেশাইয়ের স্ত্রীও নিশ্চয় যাবেন—তাঁদের মস্ত মোটর—ধ'রে যাবে মালপত্র শুদ্ধু।

একুশ

রাত প্রায় দুটো, তবু মহাদেবের চোখে ঘুম নেই। অনেকক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ ক'রে নিঃশব্দপদ সঞ্চারে বেরিয়ে গেলেন ইন্দ্রাণী নদীর তীরে। এখানে তাঁর পিতৃদেব একটি পাথরের বেদী করেছিলেন—মাঝে মাঝে এসে ধ্যানে বসতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন মহাদেবকে যে নদীর তীরে ধ্যান জপে সহজেই মন বসে।

মহাদেব ছেলেবেলায় এই বেদীতে ব'সে পিতৃদেবের সঙ্গে গাইতেন নানা মারাঠী অভঙ্গ। একটি বিখ্যাত অভঙ্গ তাঁর খুব ভালো লাগত :

কশী জাউঁ মী বৃন্দাবনা
মুরলী বাজবী কান্হা
পৈলতীরী হরী বাজবী মুরলী
নদী ভরলী যমুনা।

এ গানটি প্রহ্লাদ বন্দনাকে শিখিয়েছিল। বন্দনা গানটির বাংলা তর্জমা ক'রে গাইত। ভালো গাইতে পারত না, তবে প্রহ্লাদ তার কাছে শিখে বাংলা গানটিতে নানা তান দিয়ে গাইত—মহাদেব এ-বাংলা গানটি শুনে শুনে শিখে নিয়েছিলেন—কারণ সাবিত্রীর সঙ্গে বাংলা কথা ব'লে তিনিও বাংলা গান মোটামুটি গাইতে পারতেন। আজ এই বাংলা ঘরোয়া সিন্ধুর টপ্পাটি কেবলই তাঁর মনে গুণগুণিয়ে ওঠে :

কেমনে যাব সে বৃন্দাবনে
মুরলী যেথায় বঁধু বাজায়?
যমুনা উঠল, ওপারে তার
বাঁশি ডাকে : 'আয় আয় রে আয়!'
পীতাম্বর শ্রীঅঙ্গে ঝলকে
উজল আনন অলকাতিলকে
কুণ্ডল দোলে শ্রবণে যার
মিলাবে আমায় কে সাথে তার?

মহাদেব একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন ইন্দ্রাণীর চাঁদ-ঝিকিমিকি জলে। এ-নদী সাঁতার দিয়ে কতবারই না তিনি পার হয়েছেন ষাট বছর পেরিয়েও! নদীবিলাসী মানুষ তিনি। জনার্দন, তুকারাম—আরো কত সন্তই গান বেঁধেছেন নদীতীরে। নদীর একটা সুর আছে—কী নাম সে-সুরের? ভাবেন মহাদেব। উদাস···স্নিগ্ধ···ঘুম-পাড়ানি···আরো কত রেশই না জড়িয়ে আছে তার অশ্রান্ত প্রবাহে। সব কিছুই থামে--পল্লবের হিল্লোল, বিহঙ্গের কাকলি, শিশুর হাসি কান্না, যৌবনের জয়ধ্বনি, প্রাণের পুলকোচ্ছ্বাস, আবেগের উচ্ছলতা, মধুস্বপ্নের মাদকতা···থামে না কেবল জলের কলকল্লোল। আকাশের নব নব রঙ্গরাগ ফলিয়ে, কূলের আতিথ্যে থেকে ও অকূলের মুখ চেয়ে চলে সে কেবল চলে···চলে···চলে—অদেখার অভিসারে—ঘননীলের কোলে আত্মবিসর্জনের অনাঙ্গ অভিপ্রায়। সুলভের বেসাতি করে না নদী—চায় দুর্লভের মিলন অচিন পথে এঁকে বেঁকে লক্ষ উপল বাঁধ শিলা গিরি গুহাকে ডিঙিয়ে দাবিয়ে পাশ কাটিয়ে সে শুধু চলে···চলে···চলে—তার লহরীর কুলুধ্বনির আকুল আনন্দ-বেদনা হাসি-অশ্রু আলোছায়ার ডালি চায় নিবেদন করতে—কাকে? কেউ কি জানে? তবু যাকে দেখে নি, চেনে নি, জানে নি, তবু সেই নীলাভ অকূলের ডাকেই কূল ছেড়ে সে কেবল চলে···চলে···চলে। সৃষ্টির অরুণোদয় থেকে চ'লে এসেছে···আজও চলছে সমানে শ্রান্তিহারা গতির সঞ্চিত আশার অর্ঘ্য সঁপে দিতে সেই অচঞ্চলের শান্ত বুকে। শান্তি···শান্তি···শান্তি। মানুষ অশান্ত হ'য়ে চলে দৃপ্ত উল্লাসে নিত্যনব জয়যাত্রার···নির্লক্ষ্য গতির নেশায় ভুলে যায় অটল স্থিতির বাণী, অমর আনন্দের নিথর সুপ্তির কথা। কিন্তু যতদিন যায় দেখে—গতির অন্তিম সার্থকতা স্থিতিতে। ক্ষণ-ক্ষণ-লীয়মান আলোর মেলার পরমমুক্তি অবর্ণ অকাল নিস্তরঙ্গ কালোয়। প্রসাধনের সমাপ্তি নিরাভরণ আত্মনিবেদনে। রাধার প্রার্থনা মনে পড়ে: অঙ্গদ অলঙ্কার ভূষণ বসন—যা কিছু আমার আছে সব নাও নাথ!—কেবল তাতে আমার তৃপ্তি নেই—যদি না আমাকেও সেই সঙ্গে গ্রহণ করো তুমি! কারণ আমার উপাধি যা কিছু সবই বাহ্য—সত্যের সত্য হ'ল আমার নিরুপাধি আমিত্ব। সেই আমির স্বামী কেবল তুমি—যেমন নদীর স্বামী নীলাম্বুধি—যার মধ্যে সে নিজেকে বিকিয়ে দেবার ডাক শুনেছে বলেই সে চলে—চলে—চলে—অদেখার অভিসারে···বুঝি জানে ব'লে যে, নিজেকে যে হারাতে পারে—সীমার কূলের পিছু টান ছেড়ে যে অকূল—উধাও হ'তে পারে—শুধু সেই হয় ধন্য।

তবু এ কেমন মায়া?—যা চাই না তাই বেঁধে রাখে অবোধ প্রাণকে যেন ছেলে ভুলিয়ে। যশ মান গৃহসুখ দেহাসক্তি জয়তিলক এসবে কতটুকু স্থায়ী তৃপ্তি? আজ আছে কাল নেই! কোথায় কবে-পড়া এক নাম-ভুলে-যাওয়া কবির একটি কবিতার দুটি উদাস চরণ বেজে ওঠে মহাদেবের বুকে দীর্ঘনিশ্বাসের মিড়ে:

Even the weariest river

Winds somewhere safe to the sea

সব নদীই কি জানে একথা তার ক্লান্ততম মুহূর্তে: যে, তার ভয় নেই, সমুদ্রের কোলে সে ঠাঁই পাবেই পাবে?

মহাদেবের মনে আজ হঠাৎ যেন বৈরাগ্য আসে ঢেউ তুলে। শ্রান্তির জন্যেই কি? না, শ্রান্ত নদীর সান্ত্বনার কথা ভেবে? কে বলবে? আমাদের মনকে কি আমরা চিনি? ক্ষণে ক্ষণে তা'র রং বদলায় আশপাশের রঙের টিপ প'রে। ঠিক এই নদীরই মতন। ঐ ঐ একটি ছোট্ট শুভ্রশীর্ষ ঢেউ ভেঙে পড়ে তটমূলে ছল-ছল-ছলাৎ। কয়েকটি শাদা ঝিনুক গড়িয়ে আসে এদিকে—তারপরেই ফিরে যায় ফিরতি স্রোতের টানে নদীর দিকে। এইই তো মানুষের জীবন—মনে হয় মহাদেবের—আজ একদিকে উধাও কাল উল্টো মুখে! সান্ত্বনা কেবল এই—কবি ভুল বলেন নি—যে, যে-নদী গতিক্লান্ত, আর চলতে পারে না, তারও বেদনার অভিসার শেষ হবে অক্লান্ত সিন্ধুর অকল্লোল কোলে।

কিসের জন্যে কাড়াকাড়ি হানাহানি দাপাদাপি—যদি এসবেরই পরিসমাপ্তি ক্লান্তিতে? বুঝি প্রাণ আমাদের শান্তিকে পায় না ব'লেই সে এত ক্লান্ত? বুঝি ক্লান্তি শান্তির উল্টোপিঠ, যেমন আঁধার—আলোর, গতি—স্থিতির, গর্ব—প্রণতির? তাই বুঝি মহাদেবের মনপ্রাণ আজ কত উদাস—প্রবৃত্তির পথে চ'লে শ্রান্ত ব'লেই বুঝি চায় উদ্‌ভ্রান্তির নিরসন যমুনার পরপারে যেখানে পীতাম্বরের শ্রীঅঙ্গ প্রেমের বাঁশি বাজিয়ে ডাকছে:

ডাকছে "আয় ওরে আয়!" মহাদেব নিবৃত্তির পথকে বরাবরই উপহাস ক'রে এসেছেন। আজ প্রথম মনে প্রশ্ন জাগে—নিবৃত্তির শান্ত ভরসা না থাকলে কি প্রবৃত্তি হ'য়ে উঠত না দারুণ অভিশাপ? তাই বুঝি পীতাম্বর চিরদিন প্রাণোচ্ছল মুগ্ধ জীবকে খেলার শেষে তাঁর চরণনীড়ে ডাকেন—অতৃপ্তির ঝিকিমিকি কালোকে তৃপ্তির আলোয় মজিয়ে একাকার করে ধন্য করতে?

কিন্তু সত্যি কি জীবন ধন্য হয় এই গতিক্লান্ত শান্তির মিলনে? কে জানে? কোনোদিন এ-প্রশ্ন উদয় হয়নি মহাদেবের মনে, তাই আজ আরো ধাঁধা লাগে যেন। মন বিশ্বাসের খুঁটি পায় না: সত্যি কি পাওয়া যায় সেই স্বপ্নাতীত স্বপ্নকে? শুনি—তিনি ডাকেন বাঁশির সুরে: "আয় আয় আয়!" কেন ডাকেন তিনি—যদি সে-ডাকে সাড়া দিলে গতির শেষে শান্ত স্থিতি অনধিগম্যই থেকে যাবে? তৃষ্ণা কি ছদ্মবেশে জলেরই অঙ্গীকার নয়?

কিন্তু ডাক শোনা এক, পথ খুঁজে পাওয়া আর। তৃষিত অন্তর যমুনার ওপারে পৌছবে কী ক'রে—যখন নেই খেয়া কি সেতু? উত্তর মনে আসে—ঐ গুরু জনার্দনই দিয়ে গেছেন:

রচিব নামের সেতু এখন,
নন্দদুলাল মোহিল মন,
জানে অন্তরে—শ্যাম কেমন
কেবল শ্রীগুরু জনার্দন
আর কেহ তার জানে না মহিমা হায়!

মহাদেবের হঠাৎ মনে পড়ে যায় গৌরীরই একটি মৃদু তিরস্কার: "গুরুদেব বলেন মামাবাবু যে, সন্তানের কাছেও বেশি প্রত্যাশা করতে নেই। কারণ যেখানেই প্রত্যাশা সেখানেই নিরাশা—দাবির উল্টো পিঠে প্রত্যাখ্যান।

গুরুবাক্য···গুরুবাক্য। এইই কি পথ? আর কোনো পথ নেই—আর কেউ তাঁর মহিমা জানে না, আর জানে না ব'লেই কি পায় নি সে-জ্ঞানলভ্য শক্তি?

না। গুরুকরণ—সে ভাবাই যায় না।···তাহ'লে উপায়? মনের উদাস ভাব মিলিয়ে যায়, জেগে ওঠে ফের রুক্ষ পৌরুষ। না, নিজের পায়েই দাঁড়াতে হবে। গুরু আবার কি? কুসংস্কার।

অথচ প্রহ্লাদ সাবিত্রী গৌরী যে পেয়েছে কোনো বিশেষ শক্তি, একথাও তো আজ আর অস্বীকার করা চলে না। হঠাৎ ফের গৌরীর মিনতি মনে পড়ে: "একবার দেখুনই না গুরুদেবকে—না দেখেই বিচার কি সুবিচার হ'তে পারে কখনো? মনের এই অন্তহীন দোলায় অশান্ত হ'য়ে উঠে—সবে-জাগা বৈরাগ্যকে মহাদেবের আজ প্রথম মনে হ'ল মহনীয় না হোক, কমনীয়। মনে হ'ল—কে জানে? হয়ত নিবৃত্তির পথ কাপুরুষের পথ না হতেও পারে·· হয়ত গুরুশক্তি দেয় কিছু পাথেয়—শক্তির, ভরসার, শ্রদ্ধার। কে বলতে পারে?

সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে বিষাদ ভাবটা একটু ফিকে হ'য়ে আসে। মনে প'ড়ে যায় বিশেষ ক'রে বিপিনের কথা। এমন দুর্বৃত্তকে আশ্রয় দিয়ে যিনি ঢেলে সাজতেও পারেন—নামের মন্ত্রে দুর্বৃত্ত অসচ্চরিত্রকেও সংযমের দীক্ষা দিকে পারেন, তাঁর মধ্যে কোনো দৈবী শক্তি কিছু থাকতে তো পারে! অবিশ্বাসের পথে তো শান্তির ছিটেফোঁটাও মেলে নি আজ পর্যন্ত। একবার বিশ্বাসকে আমল দিয়ে পরখ করলে ক্ষতি কি? যিনি দূর থেকে এসে নাম দিয়ে যেতে পারেন তিনি হয়ত শান্তিও দিতে পারেন ভ্রান্তির আবর্তে, কে জানে?

ক্রমশঃ

দ্বিজেন্দ্রলালের একটি অনবদ্য গান

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(আমরা) মলয় বাতাসে ভেসে যাব
শুধু কুসুমের মধু করিব পান।
ঘুমাব কেতকী সুবাস শয়নে, চাঁদের কিরণে করিব স্নান।

কবিতা করিবে আমারে বীজন,
প্রেম করিবে স্বপ্ন সৃজন,
স্বর্গের পরী হবে সহচরী, দেবতা করিবে হৃদয় দান।

সন্ধ্যার মেঘে করিব দুকূল,
ইন্দ্রধনুরে চন্দ্রহার,
তারায় করিব কর্ণের দুল,
জড়াব গায়েতে অন্ধকার :

বাষ্পের সনে আকাশে উঠিব,
বৃষ্টির সনে ধরায় লুটিব,
সিন্ধুর সনে সাগরে ছুটিব
ঝঞ্ঝার সনে গাহিব গান।

The Virgin's Dream

I will float untrammelled on wings of the zephyr
And drink but the honey of rose in my flight :
I will sleep on the couch of violet petals
And bathe in moonbeams night after night.

The Muse will caress me tenderly
And Love shall my dream's inspirer be :
Celestial damsels will court my friendship
And angels surrender their hearts in delight.

The sunset-cloud will shine as my raiment
And rainbows glister as girdles of sheen :
Twinkles of starlets will gleam as my earrings
And shadows as plaids—soft, chequered, serene.

With Vapours I will uprise to the sky,
With showers descend on earth from on high,
Racing with streams I will merge in the ocean
And singing with storms my troth to Him plight.

মা মা II সা গা রা | ন্‌া রা সা | পা ধা পা | পা মা গা I
আম্ রা　ম ল য়　বা তা সে　ভে সে যা　ব ও ধূ

রা গা রা | নরা সা ন্‌া I প্‌া ধ্‌া রা | সা -া -া I সা সা সা | রা রা রা I
কু সু মে　র ম ধু　ক রি ব　পা - ন　ঘু মা ব　কে ত কী

গা গা গা | গা গা গা I মা মা গা | মা রা রা | রা গা রা | পা -া -া II
সু বা স　শ য় নে　চাঁ দে র　কি র ণে　ক রি ব　স্না - ন

সা সা মা | গা গা মা I রা রা পা | হ্মা পা -া I গা -া ধা |
ক বি তা　ক রি বে　আ মা রে　বী জ ন　প্রে - ম
বা য্‌ পে　র স নে　আ কা শে　উ ঠি ব　বৃ ষ্‌ টি

ধা ধা ধপা I হ্মা না ধা | হ্মা পা -া I পা পা র্সা | ধা ধা না I
ক রি বে　স্ব প্‌ ন　সৃ জ ন　স্ব র্‌ গে　র প রী
র স নে　ধ রা য়　লু টি ব　সি ন্‌ ধু　র স নে

পা পা ধা | হ্মা হ্মা পা I গা পা মা | গা রা সা I ন্‌া সা রা | পা -া -া II
হ বে স　হ চ রী　দে ব তা　ক রি বে　হৃ দ য়　দা - ন
সা গ রে　ছু টি ব　ঝ ন্‌ ঝা　র স নে　গা হি ব　গা - ন

সপা -া পা | পা পা গা I গমা মা মা | মা মা রা I রগা -া গা |
স ন্‌ ধ্যা　র মে ঘে　ক রি ব　দু কূ ল　ই ন্‌ দ্র

গা গা সা I সরা -া রা | রা রা ন্‌া I সা সা -া | সা সা ধ্‌া I
ধ নু রে　চ ন্‌ দ্র　হা - র　তা রা য়　ক রি ব

ধন্‌া -া ন্‌া | ন্‌া ন্‌া -া I প্‌া ধ্‌া ন্‌া | সা রা গা I রগা -া রা | সা -া -া I
ক র্‌ ণে　ম ঠু ল　জ ড়া ব　গা য়ে তে　অ ন্‌ ধ কা - র

পিতৃদেবের জীবনের শেষ বৎসরে এ-গানটি তিনি বাঁধেন ও ভীষ্ম নাটকে দেন। গানটির সুরের সামান্য মাত্র মনে আছে, বহুদিন না গাওয়ার দরুণ কেবল অস্তরার কিছু মনে আছে। বাকিটুকুর সুর দিয়েছি—তবে তাঁর সুরভঙ্গি বজায় রেখে। আমার এক বন্ধু এইভাবেই এ অনবদ্য গানটির সুরযোজনা করতে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি এ-গানটি তুলেছেন ও লিখেছেন পিয়ানোয় চমৎকার শোনায়। কোন সুগায়ক যদি গ্রামোফোনে দেন তবে অনেকেই আনন্দ পাবেন। এ-গানটির ইংরাজি অনুবাদও এই সুরে গাওয়া যায়—গায়কেরা গেয়ে খুসী হবেন আশা করি।
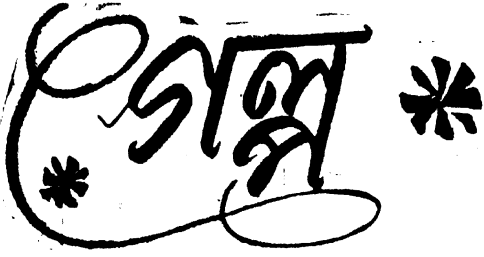
পুষ্প

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এম এ, বি এল,

বাড়ীখানির ভাড়া ষোল টাকা।

বৃদ্ধ বিশ্বনাথবাবু বন্ধু রামলোচন চ্যাটার্জ্জীকে বল্লেন, দেখ রাম, ভাড়া একটু বেশী হোল' বটে কিন্তু উপায় কি! অল্পদিনের জন্য এরকম ভালো বাড়ী এর কমে কোথাও পাওয়া যায় না। তাছাড়া আর একটা সুবিধে, তোমার বাড়ীওয়ালা বাঙ্গালী ভদ্রলোক, তোমাদেরই ব্রাহ্মণ, এবং একেবারে পাশের বাড়ীতেই থাকেন। দিনে রাতে যখনই দরকার হবে তখনই তাঁর সাহায্য পাবে।

রামবাবু বল্লেন, ঠিক আছে ভাই, দু'তিন মাস থাকবো, এর জন্য আর টানাটানি করে কি হবে। এখন ভালোয় ভালোয় শরীরটা যদি সারে তবেই ত বুঝি!

স্থান রাঁচী, কাল ১৯১৫, অগ্রহায়ণের শেষ। বৃদ্ধ রামবাবু তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী স্ত্রী ও সাত বছরের একমাত্র পুত্র মণ্টুকে নিয়ে ডাক্তারের নির্দ্দেশে কলকাতা থেকে হাওয়া বদলাতে রাঁচী এসেছেন। রামবাবুর বাল্য-বন্ধু বিশ্বনাথবাবু রামবাবুর চিঠি পেয়ে তাঁর আসার পূর্ব্বেই এই বাড়ীখানি তাঁর জন্য ভাড়া করে রেখেছিলেন।

বাড়ীখানি মোটের উপর ভালোই। ইটের দেওয়াল, সিমেণ্টের মেঝে, খোলার চাল, ভেতরে কাঠের সিলিং দেওয়া, সামনে অনেকখানি খোলা বাগান। একটু পুরানো হলেও নতুন চুণকাম করে বেশ এক রকম হয়েছে। এ ছাড়া দুখানা তক্তপোষ, তিনখানা কাঠের চেয়ার এবং দুটো বড় বড় জলের ড্রামও বাড়ীওয়ালা ভাড়াটের ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন।

সকালে মণ্টুর মা কাঠের জাল দিয়ে রান্না সুরু করেছেন। সাত বছরের মণ্টু ভাঁড়ার ঘরের জানালায় বসে পাশের বাড়ীর দিকে চেয়ে আছে। পাশের বাড়ী-খানা খুব বড় এবং দেখতে সত্যই ভালো। এ-বাড়ী ও-বাড়ীর মধ্যে কোন পাচিল নেই। ঐ বাড়ীতেই বাড়ীওয়ালা সুধাংশুবাবু থাকেন। খুব অবস্থাপন্ন বলে মনে হয়। বড় রাস্তার ওপোরেই টেনিস লন, লনের দু'পাশে সুন্দর সুন্দর ফুল গাছ। তারপর মোটা মোটা থাম দেওয়া বারাণ্ডা, বারাণ্ডার পরেই মস্ত বড় হলঘর, ঘরের দরজাগুলো যেমন চওড়া তেমনি উঁচু। এ বাড়ীর জানলা থেকে মণ্টু দেখছে, ও বাড়ীর হল ঘরের মেঝেয় সুন্দর রঙিণ কার্পেট পাতা রয়েছে।

মণ্টু আপন মনেই বসে বসে ওদিককার বাড়ীখানা দেখছিল এবং মাঝে মাঝে মাকে তাগিদ দিচ্ছিল—কতক্ষণে মায়ের আলুভাজা হবে, কারণ আলুভাজা নামলেই অন্তত চারখানা আলুভাজা নিশ্চয়ই নেবে, এমন সময় ওবাড়ীর দরজা দিয়ে ওবাড়ীর থামওয়ালা বারাণ্ডায় বেরিয়ে এল ডুরে শাড়ী পরা একটি মেয়ে। ১৯১৫ সালে বাঙ্গালী মেয়েদের ফ্রক্ পরা সুরু হয় নি, তা কলকাতাতেও নয়, এমন কি প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবারেরও নয়। মেয়েটির বয়স হবে বছর দশেক, বেশ চনমনে চটপটে চেহারা, রং ফরসা, মাথার চুলগুলো উঁচু করে ঝুঁটী বাঁধা। মেয়েটি এসেই মণ্টুর জানলার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, তোমরাই বুঝি কাল এসেছ খোকা? তার জিজ্ঞাসা করার ভঙ্গীতে বেশ একটা প্রবীণার ভাব।

মুখে কোন জবাব না দিয়ে মণ্টু ঘাড় নাড়লে। রান্না করতে করতে মণ্টুর মা জিজ্ঞাসা করলেন—কে রে মণ্টি?

মণ্টু বল্লে, ও একটা মেয়ে।

এমন সময় ও বাড়ীর ভেতর থেকে ডাক শোনা গেল, পুষ্প, পুষ্প কোথা রে ?

লাফাতে লাফাতে মেয়েটি বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

দুপুরে আহারাদি শেষ করে মণ্টুর বাবা-মা দু'জনে শুয়েছেন, মণ্টু কলিকাতা থেকে আনা একটা স্প্রিং-এর মটর গাড়ীতে দম দিয়ে বাইরের বারাণ্ডায় আপন মনে চালাচ্ছে, এমন সময় হাতের আঙ্গুলে আঁচলের পাড় জড়াতে জড়াতে পাশের বাগানে বেরিয়ে এল পুষ্প। এসেই ডাক দিলে, মণ্টি।

সাত বছরের মণ্টি নিতান্ত লাজুক গোছের ছেলে। বাপ মায়ের আদুরে বলে তখনও পর্য্যন্ত কোন স্কুলে টুলে যায় নি, অচেনা লোকের সঙ্গে কথা কইতে সে একেবারেই অনভ্যস্ত, কাজেই পুষ্পর ডাকে সে প্রথমে কোন সাড়াই দিতে পারলে না। খেলার মটরটা হাতে তুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

পুষ্প খুব চট্‌পটে। এখনকার ভাষায় যাকে বলে স্মার্ট। সেকালে কিন্তু স্মার্ট শব্দটা বাঙ্গালীদের মুখে তেমন চলিত ছিল না। স্মার্ট হওয়াটাকে তৎকালীন বাঙ্গালীরা তেমন পছন্দ করতেন না, বরং নিন্দা করে বলতেন ছট্‌ফটে। ছট্‌ফটে পুষ্পটা এগিয়ে এসে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে বল্লে, খেলবি ? আমাদের বাড়ী আয় না।

মণ্টু এতক্ষণে সাহসী হয়ে আস্তে আস্তে বল্লে, যাব না, মা বকবে।

পুষ্প বল্লে, সে কি রে! এই ত পাশাপাশি বাড়ী, বলতে গেলে একই বাড়ী। এখানে এলে কেউ বকবে না। আয় না ভাই।

মণ্টু বল্লে, না। সে মোটরটা হাতে নিয়েই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

পুষ্প ঝাঁঝিয়ে উঠে তবে যাঃ, বলে সে তার বাগানের মধ্যেই ঘুরতে লাগল। পুষ্পদের বাগানে বড় বড় চন্দ্রমল্লিকা ফুটেছে। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ মণ্টু বল্লে, আমাকে একটা ফুল দেবে ?

বাগান থেকে মুখ তুলে চেয়ে পুষ্প তার বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বল্লে, আমার বয়ে গেছে। এখানে না এলে কিচ্ছু দেব না।

বাবা-মা'র ঘরের দরজার দিকে একবার চেয়ে দেখে খুব আস্তে আস্তে মণ্টু বল্লে, গেলে দেবে ত ?

পুষ্প বল্লে, হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ—

এক পা এক পা করে মণ্টু এগিয়ে গেল। পুষ্পর কাছাকাছি যেতেই পুষ্প একটা ছোট চন্দ্রমল্লিকা বোঁটা থেকে ছিঁড়ে মণ্টুর দিকে এগিয়ে ধরে বল্লে, এই নে।

মণ্টুর কিন্তু পছন্দ ছিল বড় চন্দ্রমল্লিকা। সেইটের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে সে বল্লে, ঐটে দাও না ভাই।

পুষ্প বল্লে, ইল্লি না কি। অমন ভালো ফুলটা ওঁকে অমনি দিতে হবে।

মণ্টুর মুখটা ভার হয়ে গেল। বল্লে--তবে চাই না।

ওর মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে থেকে পুষ্প বল্লে, তবে নে, দুটোই নে। বলেই বড়টা গাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে ছোট এবং বড় দুটোই মণ্টুর দিকে এগিয়ে ধরে বল্লে, নাও, দুটাই নাও। বাবাঃ, কি রাগ!

হাসিমুখে খেলার মোটরটা বগলে চেপে দুহাত দিয়ে দু'টো ফুল মণ্টু নিয়ে নিলে। পুষ্প ওর বগল থেকে মোটরটা নিয়ে বল্লে, বাঃ বেশ গাড়ীতো। কোথায় কিনলি রে ?

মণ্টু বল্লে, দম দিলে কেমন চলে! ওটা দশ আনা দিয়ে বাবা কলিকাতায় কিনে দিয়েছিল।

গাড়ীটাকে ভালো করে দেখ্‌তে দেখ্‌তে পুষ্প বল্লে, গাড়ীটা ভাই বেশ! আয় বারাণ্ডায় আয়, গাড়ীটা চালাই।

দানবীরের মত মুখ করে মণ্টু বল্লে, চালাও।

পুষ্প বল্লে, তুইও আয়।

এতক্ষণে মণ্টুর ভয় ভেঙ্গেছে। ওরা দুজনে পুষ্পর বারাণ্ডায় স্প্রীং-এর মোটর চালাতে সুরু করলে। তারপর চন্দ্রমল্লিকা ফুল দুটো গাড়ীর দু'কোণে গুজে দিয়ে গাড়ীকে সাজানো হোল এবং পুষ্প দুটো ডেঁয়ে পিঁপড়ে ধরে গাড়ীতে বসিয়ে বল্লে, এরা হচ্ছে যাত্রী, কেমন ভাই মণ্টু!

মণ্টু বল্লে, ভাই, ফুল দিয়ে সাজানো গাড়ীতে চড়ে পিঁপড়েদের বর-কনে আসছে, তাই না ভাই! খাঁটী

আসার ঠিক তিনদিন আগে কলকাতায় মণ্টুদের পাশের বাড়ীতে ফুলদিয়ে সাজানো গাড়ী চড়ে বর-কনে এসেছিল।

মণ্টুর কথায় অনেকখানি উৎসাহ পেয়ে পুষ্প বল্লে, হ্যাঁ ভাই, সেই বেশ, পিঁপড়ের বিয়ে।

কি রে, তোরা কি শেষকালে পিঁপড়ের বিয়ে দিচ্ছিস্—বল্‌তে বল্‌তে একজন স্থূলকায়া যুবতী ঘর থেকে বারাণ্ডায় বেরিয়ে এসে বল্লেন, ও, মণ্টু বুঝি!

পুষ্প বল্লে, হ্যাঁ মা, মণ্টুর কেমন সুন্দর গাড়ী দেখেছ।

পুষ্পর মা মেয়েকে উৎসাহ দিয়ে বল্লেন, বাঃ, বেশ গাড়ীত। বলেই তিনি একখানা বেতের চেয়ার রোদ্দুরে টেনে এনে মাথার আধভেজা চুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে হাই তুলে নিজেই তুড়ি দিতে লাগলেন।

ও বাড়ী থেকে মণ্টুর মা হঠাৎ হাঁক দিলেন, মণ্টু, মণ্টু কোথা রে—

মণ্টু বল্লে, যাই ভাই, মা ডাকছে, বলেই বাড়ীর দিকে ছুট দিলে। ফুল সাজানো মোটরগাড়ী এখানেই পড়ে রইল। পুষ্পর মা বল্লেন, তোমার মাকে ডেকে নিয়ে এস মণ্টু—বলো, আমি ডাক্‌ছি।

কয়েকদিন পরে একদিন দুপুরে মণ্টুরমা ও পুষ্পরমা রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসে বসে গল্প করছেন। মণ্টু আর পুষ্প দু'জনে বাগানে কত কি আবোল-তাবোল বক্‌ছে। মণ্টুর মা বল্লেন, কাল ভাই কি মুস্কিল। বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলুম। ঘুরে ঘুরে হায়রান। একে ওঁর শরীর দুর্ব্বল, আর এমন পোড়া দেশ—একখানা পুস্‌পুস্‌ও পাই না। এদিকে সন্ধ্যে হয় হয়। ভয়ে মরি। শেষে ভগবানের দয়ায় একজন বাঙ্গালীর সঙ্গে দেখা হলো। উনি তাকে বলতে সেই লোকটি আমাদের রাস্তা দেখিয়ে ঐ মোড় পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে গেল, তবে রক্ষে।

পুষ্পর মা বল্লেন, প্রথম অচেনা জায়গায় ও রকম হয়, তা এখানে কোন ভয় নেই। তবে তুমি এক কাজ কর না কেন ভাই, বিকেলে যখন তোমরা বেরুবে তখন পুষ্পকে সঙ্গে নিয়ে যেও। বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ও এখানকার রাস্তা পথ সমস্ত চেনে।

মণ্টুর মা বল্লেন, ওর বাবাকে ত ক'দিনের মধ্যে একবারও দেখলুম না, তিনি কোথায়?

পুষ্পর মা বল্লেন, তোমরা আসার আগের দিন সে লোহারডাগায় গেছে। ঐ ফরেষ্টেই ত আমাদের আসল কাজ কি না।

বাগানের মধ্যে মণ্টু বল্লে—কেমন মজা, এবার থেকে রোজ বিকেলে তুই আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবি। তোতে আমাতে একসঙ্গে বেড়াব, কেমন, যাবি ত?

হ্যাঁ, পুষ্প সাগ্রহে প্রস্তাবটা গ্রহণ করলে।

১৯১৫ সালের রাঁচীর পাথুরে রাস্তায় মণ্টুর বাবা মা ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকেন। ওঁদের অনেক আগে আগে মণ্টু ও পুষ্প লাফাতে লাফাতে চলে। মধ্যে মধ্যে ক্বচিদ্ কখনও একটা মানুষে ঠেলা পুস্‌পুস্ গাড়ী, কখনও বা এক জোড়া সাহেব মেম, মাঝে মাঝে দল বেঁধে কোল-সাঁওতাল গান গাইতে গাইতে যায়। বহুদূরে পথের বাঁকে ছোট্ট চালা ঘরে হয়ত বা একটা দোকান, কখনও বা পাশে পড়ে অনেকখানি জমির মধ্যে সুন্দর ফুলবাগান-ঘেরা ছোট্ট একটি একতলা বাংলো বাড়ী, মাথার ওপোর হেমন্তের নীল আকাশ, পশ্চিম দিগন্তে ছোট বড় পাহাড়ের পিছনে অস্তায়মান সূর্য্য,—চলিষ্ণু জগতের চিরপরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে রাঁচীর এই একখানি অতি ক্ষুদ্র দৃশ্যপট অর্দ্ধশতাব্দীর সমস্ত প্রবাহ স্তব্ধ করে নিশ্চল ও সুস্পষ্টভাবে মণ্টুর মনে স্থায়ী হয়ে এখনও জেগে আছে।

মণ্টু বল্লে, বাবা, একদিম পুস্‌পুস্ চড়বো।

রামবাবু বল্লেন—হ্যাঁ বাপি, কাল দুপুরে চল, পুস্‌পুসে করে আমরা মোরাবাদি পাহাড়ে বেড়াতে যাব।

চোখ বড় বড় করে মণ্টু বল্লে, ঐ অত উঁচু পাহাড়ে পুস্‌পুস উঠতে পারবে বাবা?

বাবা বল্লেন, তা কি আর উঠে বাপি? পুস্‌পুসে চড়ে আমরা পাহাড়ের তলা অবধি যাব; তারপর পায়ে হেঁটে পাহাড়ে উঠবো, আর পুস্‌পুস নীচে থাকবে। আবার ফেরবার সময় পাহাড় থেকে নেমে পুস্‌পুসে চড়ে বাড়ী ফিরে আসব।

মণ্টুর প্রাণটা আহ্লাদে নেচে উঠলো। বল্লে, পুষ্পকে নিয়ে যাবে বাবা?

বাবা বল্লেন, তোমার ইচ্ছে হয় নিয়ে যেও।

মণ্টু এক ছুটে পুষ্পদের বাড়ী গিয়ে হাজির, পুষ্প, কাল যাবি? দুপুরে?

পুষ্প বল্লে, কোথায়?

পুস্‌পুসে চড়ে, মোরাবাদী পাহাড়ে—

পুষ্প বল্লে, হ্যাঁ, যাব। তোরা যাবি বুঝি?

মণ্টু বল্লে, হ্যাঁ ভাই, এইমাত্র বাবা বল্লে।

বাড়ী ফিরে মণ্টু শুনলে মণ্টুর মা বলছেন—আহা, মন্টির আমার বোন নেই ত, তাই পুষ্পকে একদণ্ড ছাড়তে চায় না। মণ্টু ছুটে এসে মায়ের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে খুব চুপি চুপি বল্লে, মা, মা, পুষ্প যাবে বলেছে।

মা বল্লেন, বেশ ত ভাল। তোমরা এক সঙ্গে পাহাড়ে উঠবে, কিন্তু পুষ্পকে দিদি বল না কেন? মা মণ্টুর মাথার চুলে আঙুল চালাতে লাগলেন। মণ্টু মায়ের আঁচলে মুখ ঢেকে বল্লে—ধ্যেৎ, লজ্জা করে।

পরদিন দুপুরে তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে গরম কাপড়ের ভালো পোষাক পরে মণ্টু ছুটে এল পুষ্পদের বাড়ী। পুষ্প কাপড়চোপড় পরে নে, এক্ষুণি গাড়ী আসবে।

কিন্তু পুষ্পর ঘরে ঢুকেই মণ্টু অবাক! পুষ্প বিছানায় শুয়ে আছে, হাতে অনেকখানি ন্যাকড়া বাঁধা।

পুষ্পর মা বল্লেন, ও কি করে যাবে? আঙুলে সেলাইয়ের কলের ছুঁচ পড়ে আঙুল ফুটো হায় গেছে। ও শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।

ডান হাত দিয়ে চোখের জল মুছে পুষ্প বল্লে, হ্যাঁ, মায়ের যেমন কথা! কই কাঁদছি আমি। না রে মণ্টু, কাঁদি নি আমি।

মণ্টুর সমস্ত উৎসাহ একেবারে নিভে গেল। অতি ধীরে সন্তর্পণে পুষ্পর বিছানায় বসে তার পিঠে হাত দিয়ে বল্লে, খুব লেগেছে বুঝি। মণ্টুর কণ্ঠস্বরে প্রবীণের উদ্বেগ।

জোর করে হাসি এনে পুষ্প বল্লে, না, ও কিছু নয়, দুদিনেই সেরে যাবে।

পুষ্পর মা বল্লেন, বাবাঃ, মন্টিকে পেয়ে তবে ত মেয়ের হাসি ফুটল?

অতি ঈপ্সিত পুস্‌পুস্ দরজায় এসে দাঁড়ালো। মণ্টুর মা তৈরী হয়ে এ বাড়ীতে এসে বল্লেন, কিরে, তোদের এখনো হোল না?

পুষ্পর মা বল্লেন, পুষ্প আজ যাবে কি করে ভাই। তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে মেয়ে সেলাইয়ের কল নিয়ে ওস্তাদি করতে গিয়ে আঙুল সেলাই করে শুয়ে আছে। ঐ দেখ না।

মণ্টুর মা পুষ্পর মোরাবাদি পাহাড়ে যাওয়া হবে না শুনে কিছুক্ষণ হা-হুতাশ করলেন, দুষ্টুমি না করতে উপদেশ দিলেন, শেষে বল্লেন, আজ তবে থাক, আমরা আবার যে দিন রাঁচী পাহাড় দেখতে যাব সেদিন তোমাকে নিয়ে যাব, কেমন পুষ্প?

পুষ্প বল্লে, আচ্ছা।

মণ্টুর মা বল্লেন, আয় রে মন্টি। আমরা এখনই বেরিয়ে পড়ি, নইলে—

মণ্টু ইতস্ততঃ করে বল্লে, আমি আজ যাব না মা, পুষ্পর কাছে থাকি।

মণ্টুর মা বল্লেন, ও মা, সে কি? তুই যাবি না ত কার জন্য দু'টাকা দিয়ে পুস্‌পুস্ ভাড়া করা হোল?

কিন্তু মণ্টু কিছুতেই যাবে না। সব শুনে মণ্টুর বাবা বল্লেন, তবে আজ থাক—অন্যদিন যাওয়া যাবে।

কিন্তু পুস্‌পুস্‌ওয়ালারা ছাড়ে না। তারা না কি অন্য ভাড়া ছেড়ে দিয়ে এসেছে, গরীব আদ্‌মী, এই টাকা না পেলে আজ তাদের খানা হবে না। অতএব টাকা দিতেই হবে, যাওয়া হোক্ আর নাই হোক্। শেষ পর্য্যন্ত মণ্টুর বাবা মা পুস্‌পুস্ চড়ে মোরাবাদি পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন, অথচ পুস্‌পুস্ চড়ে বেড়াতে যেতে না পারার জন্য মণ্টুর মনে এতটুকু দুঃখও হোল না।

*　　*　　*　　*

পঁয়তাল্লিশ বছর পরে ইংরাজী ১৯৬০ সাল। কংগ্রেস সরকারের উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনীয়ার এস্ এন্ চ্যাটার্জ্জী নিজের ষ্টেনোকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে রাঁচী এসেছেন সরকারী কনষ্ট্রাকশনের কি একটা বড় রকম গলদ হয়েছে তারই সরেজমিন তদারক করতে। সরকারী ইঞ্জিনীয়ার মহলে মিঃ চ্যাটার্জ্জী দক্ষতা এবং কড়া মেজাজের জন্য শ্রদ্ধা এবং ভয়—এই দুটোই প্রভূত পরিমাণে পেয়ে থাকেন। ঠিকাদারেরা তাঁকে যমের মত ভয় করে। এই একটি লোক আছে যে, ঘুষ নেয় না, নিখুঁত ভাবে কাজ বুঝে নেয়। ওভারশিয়ার থেকে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার

পর্য্যন্ত সকলেই তটস্থ হয়ে থাকে। পান থেকে চুণ খস্‌লে চ্যাটার্জ্জী সাহেবের কাছে কেউ কখনও রেহাই পায় না। এক এক কলমের খোঁচায় তিনি অনেকের চাকরী খেয়ে দিয়েছেন, কাউকে বা ঘুষ নেওয়ার জন্য আদালতে অভিযুক্ত করেছেন, আবার উপযুক্ত ব্যক্তির যথেষ্ট উন্নতি করেও দিয়েছেন। সারা বিহারের সমস্ত ইঞ্জিনীয়ারিং মহল জানে যে, চ্যাটার্জ্জী সাহেবের সন্ধানী দৃষ্টির সামনে কোন গলদ বা গোঁজামিল লুকিয়ে রাখার জো নেই, এবং চুরি বা ঘুষ বুঝতে পারলে কারুর রক্ষা নেই।

সেই চ্যাটার্জ্জী ইন্‌স্পেকশন বাংলোয় এসে উঠেছেন। সঙ্গে তাঁর বহু বিশ্বাসী ষ্টেনোগ্রাফার। সেই একমাত্র চ্যাটার্জ্জীর প্রিয়পাত্র, একাধারে ষ্টেনো, পিএ, একান্তসচিব, এবং দরকার হলে গাড়ীর ড্রাইভারও বটে। সকাল আটটা থেকে বেলা তিনটে অবধি নানাভাবে সরেজমিন্‌ ইনস্‌পেক্‌সন হোল। শেষে দেখা গেল কণ্ট্রাক্টারের যোগসাজসে ওভারশিয়ার অপূর্ব্ব ব্যানার্জ্জী অনেক কিছু দুষ্কর্ম্ম করেছেন এবং ইঞ্জিনীয়ার মহাশয় হয় কুড়েমি করে কিছু দেখেন নি, কিম্বা কিছু ভাগ পেয়ে চোখ বুজে হরিনাম জপ করেছেন। অফিসের সকলেই পরিণাম চিন্তা করে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। ভাল করে কেস তৈরী করার জন্য চ্যাটার্জ্জীর নির্দ্দেশে অনেকগুলি ফাইল এবং নক্সা চাপরাসী হাতে নিয়ে সাহেবের গাড়ীতে এসে বসল। অন্য কতকগুলো জিনিষ নোট করার জন্য ষ্টেনো তখনও অফিসে রয়েই গেল।

চ্যাটার্জ্জী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি লোক এসে ষ্টেনোকে ঘিরে ধরলে। সকলেরই অনুরোধ, একটা কিছু ব্যবস্থা আপনি করে দিন। এ আপনাকেই করতেই হবে।

ষ্টেনো বল্লে, আমার চোদ্দপুরুষেও পারবে না। সাহেব নিজে সমস্তটি দেখেন এবং আমি কোন কথা বল্লেই তিনি আমাকে এমনভাবে জেরা সুরু করবেন যে, আমি তখন পালাবার পথ পাব না।

অপূর্ব্ব ব্যানার্জ্জী শুষ্কমুখে ষ্টেনোর কাছে এসে বল্লে, স্যার, আমার ব্যাপারটা যা হয় করে চাপা দিয়ে দিন, আমি না হয় চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাই।

ঘাড় নেড়ে ষ্টেনো বল্লে, আপনার কেস্‌ খুব সিরিয়াস্‌। আপনি যে ভাবে এক্‌স্‌পোজড্‌ হয়ে গেছেন, এর পর চাকরী ছাড়লেও আপনার বিরুদ্ধে কোর্টে কেস ফাইল হবেই। মিঃ চ্যাটার্জ্জীকে আমি কিছুতেই সামলাতে পারবো না। আপনি বরঞ্চ কেস্‌ হলে কি ভাবে ডিফেন্স নেবেন, সেই বিষয় চিন্তা করুন।

বাকী কাজ সেরে ষ্টেনো ইনস্‌পেক্‌সন বাংলোয় ফিরে এল। তখন বিকেল পাঁচটা। ফিরে এসে ষ্টেনো দেখলে—চ্যাটার্জ্জী সাহেব চুপ করে বসে বসে পাইপ খাচ্ছেন, ফাইল টাইল বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। ষ্টেনো ভাবলে, এর মধ্যেই কাজ তাহলে শেষ হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে বল্লে, আমার কাজগুলো কি এখন দেখবেন স্যার?

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে চ্যাটার্জ্জী বল্লে, ও সব আর দেখব কি? সব কটাই পয়লা নম্বরের চোর। কিছু কিছু দেখেছি, বাকী সমস্ত কাজ রাত্তিরে করব। চ্যাটার্জ্জী সাহেব পাইপটা আবার মুখে দিলেন।

টেবিলের ওপোর কাগজপত্র রেখে ষ্টেনোগ্রাফার ভদ্রলোক ইতস্ততঃ করতে লাগল। সে ঠিক বুঝতে পারছে না, সে কি করবে। নিজের ঘরে গিয়ে পোষাক ছেড়ে বিশ্রাম করবে অথবা—। কারণ সে জানে, বাইরে বেরিয়ে চ্যাটার্জ্জী সাহেব বিশ্রাম বলে কোন জিনিষের আদৌ প্রশ্রয় দেন না, এবং বিশ্রাম না নেওয়াতেই ষ্টেনো বেয়ারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

পাইপে দু'তিনটে টান দিয়ে চ্যাটার্জ্জী সাহেব ষ্টেনোর দিকে চেয়ে বল্লেন, একটা খবর নিতে পারো, এ বি সি রোডটা কোন দিক দিয়ে যেতে হয়, সেখানে একবার যাওয়া দরকার।

ষ্টেনো কোন উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং প্রায় কুড়ি মিনিট পরে ঘরে এসে বল্লে—স্যার বহুদিন পূর্ব্বে এখানে এ বি সি রোড বলে একটা রাস্তা ছিল, কিন্তু পরে সেই রাস্তাটার নাম বদলে নতুন নাম হয়েছে, ডি ই এফ্‌ রোড। সে রাস্তাটা এখান থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে।

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে চ্যাটার্জ্জী বল্লেন, ড্রাইভারকে বুঝিয়ে দাও, আমি একবার ওখানে যাব। আর সন্ধ্যের পর তুমি রেডি থেকো—ফাইল নিয়ে বসব।

চ্যাটার্জ্জীর গাড়ী গিয়ে ডি ই এফ রোডে ঢুকল, কিন্তু চ্যাটার্জ্জী দেখলে সে রাস্তার চেহারা একেবারে বদলে

গেছে। চার নম্বর একতলা খোলার চালের যে বাড়ীতে মণ্টিরা ১৯১৫ সালে থাকত, সেখানে এখন দোতলা ভাল বাড়ী উঠেছে এবং তার পাশে পুষ্পদের বাড়ীর সামনের বাগান ও টেনিস্ লন আর নেই, সেখানে কংক্রীটের তিন তলা বাড়ী। পাঁচ নম্বর বাড়ীর খোঁজ করে নতুন কংক্রীটের বাড়ীর পাশের সরু গলি দিয়ে চ্যাটার্জ্জী সাহেব ভেতরে ঢুকে গেলেন, পুরাতন পরিচিত থামওয়ালা বারাণ্ডা চুণ বালি-খসা অবস্থায় সামনের নূতন বাড়ীর পেছনে আত্মগোপন করে এখনও টিকে আছে। বারাণ্ডার কাছে গিয়ে চ্যাটার্জ্জী ডাক দিলেন, সুধাংশুবাবু আছেন। উনিশ কুড়ি বছর বয়সের একটি ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এক মুখ বিস্ময় নিয়ে বল্লে—কাকে চান ?

এটা কি সুধাংশুবাবুর বাড়ী ? এস্ এন চ্যাটার্জ্জী জিজ্ঞাসা করলেন।

ছেলেটি বল্লে, হ্যা এটা তাঁরই বাড়ী বটে, কিন্তু তিনি ত অনেকদিন হোল মারা গেছেন।

তাই নাকি ? চ্যাটার্জ্জী একটু অপ্রতিভ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাঁর কে ?

ছেলেটি বল্লে, আমি তাঁর নাতি।

'ও', চ্যাটার্জ্জী একটু থেমে বল্লেন, তাহলে তোমার বাবাকেই একবার ডাক ত !

ছেলেটি বল্লে, বাবাও ত নেই, তিনিও ত মারা গিয়েছেন।

এর পর কি বলা যায় চ্যাটার্জ্জী আর ভাবতেও পারলে না। ছেলেটি বল্লে, আপনি কোথা থেকে আসছেন. মাকে ডাকব ?

ডাকো, অন্যমনস্কের মত চ্যাটার্জ্জী কথাটা বলে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

একটি স্থুলকায়া বিধবা মহিলা দরজা দিয়ে বারাণ্ডায় বেরিয়ে এসে চ্যাটার্জ্জীর দিকে চেয়ে বল্লেন, আপনি কোথা থেকে আসছেন। সম্ভবতঃ তিনি ভেতর থেকে এদের কথাবার্ত্তা শুনছিলেন।

ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে দেখে চ্যাটার্জ্জী বল্লেন, আমি আসছি—আসছি এখন এইখান থেকেই। আমি এই পাশের বাড়ীতে—মানে সুধাংশুবাবুর ভাড়া বাড়ীতে আমরা বহুকাল পূর্ব্বে একবার এসে প্রায় তিন মাস ছিলুম। তাই মনে হোল, একবার পুরানো জায়গাটা দেখে যাই।

ভদ্র মহিলা তীক্ষ্ণভাবে দেখে বল্লেন,আপনার নাম ?

চ্যাটার্জ্জী বল্লেন, আমার নাম এস্, এন্ চ্যাটার্জ্জী। একটু হেসে বল্লেন, আমার ডাক নাম ছিল মণ্টু।

মণ্টু ? একটু ভেবে নিয়ে ভদ্রমহিলা বল্লেন, আচ্ছা, আপনার বাবার নাম কি রামবাবু ?

মুখ তুলে চ্যাটার্জ্জী বল্লেন, হ্যাঁ।

অতিমাত্রায় বিস্মিত হ'য়ে ভদ্রমহিলা বল্লেন, ও, তুমি মণ্টু ? তুমি এমন বুড়ো হয়ে গেছ ? একটু ভেবে বল্লেন—ও তা ত হবেই, সে ত বহুদিনের কথা। তা এস, এস ভেতরে এসো, ভেতরে এস। এই বলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ভদ্রমহিলা বল্লেন, আমাকে চিনতে পারলে না ত, বল ত আমি কে ? বলতে বলতে দুজনেই ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢুকে পেছন ফিরে মণ্টুর দিকে চেয়ে ভদ্রমহিলা বল্লেন, আমি পুষ্প।

পুষ্প ? চ্যাটার্জ্জী তাকে পুষ্পর মা বলে সন্দেহ করছিলেন। পরিচয় পাওয়ার পর বল্লেন, পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার দেখা, কি করে চিনব বল ?

বারাণ্ডার কোলে সেই পুরাতন হল ঘরে চারখানা মাঝারী সাইজের তক্তপোষ। ওরই সামনের খানায় মণ্টুকে বসিয়ে পুষ্প অপর একটায় বসে বল্লে, তা বেশ ভাই বেশ, এত কাল পরে হলেও তবু যে নামটা মনে রেখে খোঁজ নিতে এসেছ—

চ্যাটার্জ্জী বল্লেন, তুমিও ত আমার নাম, আমার বাবার নাম সমস্তই মনে রেখেছ।

পুষ্প বল্লে, তা মনে থাকবে না ? তোমরা চলে যাওয়ার পর তোমার মা ত বহুদিন আমাদের চিঠি-পত্র লিখেছেন। আমার বিয়ের সময় তোমার মা তোমার নাম দিয়ে পদ্য ছাপিয়ে এক বাণ্ডিল পদ্যের কাগজ পাঠিয়েছিলেন এবং আসতে পারবেন না বলে কত দুঃখু করেছিলেন, এ সব কি ভুলে যাবার কথা ! তবে এখন আর সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। তা হ্যাঁ ভাই মণ্টু, তোমার বাবা আছেন ?

পুষ্পর দিকে মুখ তুলে চেয়ে চ্যাটার্জ্জী বল্লেন, না, মা মারা যাবার পাঁচ মাস পরেই বাবা মারা গেছেন।

পুষ্প বল্লে, তোমার বউ ছেলে-মেয়ে সব কোথায় ?

মণ্টু মাথা নীচু করে বল্লে, মেয়ে হয় নি, ছেলে একটি, শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়ছে, আর বউ প্রায় বার বছর আগে বিদায় নিয়েছেন—বলে ওপোর দিকে মুখ তুলে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে মারা গিয়েছে। এতগুলো কথা বলে মণ্টু এবার সহজভাবে পুষ্পকে প্রশ্ন করলে, তোমার খবর কি ? বাড়ী-ঘরের আমূল পরিবর্ত্তন দেখছি—

পুষ্প একটু দুঃখপ্রকাশ করে বল্লে, আর ভাই, সে সব অনেক কথা। আমার বিয়ের পর তোমার মা মারা গেলেন, সে খবর পর্য্যন্ত পেয়েছিলুম, কিন্তু তারপর ত আর কোন খবরাখবর ছিল না। সেই তারপর থেকেই আমাদেরও অবস্থা খারাপ হয়ে এল। বাবা অনেক টাকা খরচ করে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু স্বামী আমার ভালো ছিলেন না। তাঁরাও অবস্থাপন্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁর বদখেয়ালীতে শ্বশুরবাড়ীর সর্ব্বস্ব উড়ে গেল। শেষে দুই ছেলেকে নিয়ে আমি আবার এই বাড়ীতেই ফিরে এলুম। স্বামী মাঝে মাঝে এ বাড়ীতে থাকতেন, মাঝে মাঝে কোথায় চলে যেতেন। শেষে এক বিশ্রী ফৌজদারী মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন। প্রাণের দায়ে সেই মকদ্দমা চালাতে গিয়ে বাবাও প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু শেষ রক্ষে হোল না। মন ভেঙ্গে বাবা সেই বছরের মধ্যেই মারা যান, লোহারডাগার কারবারও বন্ধ হয়। তারপর মা ছিলেন আরও দু'বছর। দুটি ছেলে, আর এ বাড়ীতে এসে একটি মেয়ে হয়েছিল এই তিনটি নাবালক নিয়ে কোন রকমে মূলধন ভেঙ্গে চলছিল, কিন্তু যুদ্ধের বাজারে এমন অভাব হোল যে, একে একে সব বিক্রী করতে বাধ্য হলুম। পাশের বাড়ী, সামনের জমি, সমস্ত গেছে, এখন এ বাড়ী ও পেছনের সমস্তটা ভাড়া দিয়ে এই একখানা ঘর আর একটু রাঁধবার জায়গা নিয়ে কোন রকমে দিন কাটাচ্ছি।

ভেতরের দরজায় কে যেন এসে দাঁড়ালো। পুষ্প বল্লে, আয় না, ভেতরে আয়। লজ্জা কি রে! সেই যে মণ্টুর কথা বলতুম, এই সেই মণ্টু, তোদের মামা।

একটি মেয়ে এসে মণ্টুর পাশে তক্তপোষের ওপোর চা ও জলখাবার নামিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রথম চ্যাটার্জ্জীকে, পরে পুষ্পকে প্রণাম করলে। পুষ্প বল্লে, এই আমার মেয়ে। এবারে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে।

চ্যাটার্জ্জী ওর মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। একেবারে দ্বিতীয় পুষ্প, যে-পুষ্পকে চ্যাটার্জ্জীর পরিষ্কার মনে আছে। আসল পুষ্পকে দেখলে কিচ্ছু চেনা যায় না, কিন্তু এর মধ্যে সেই পুষ্প একেবারে স্পষ্ট, এতটুকুও বদলায় নি। চ্যাটার্জ্জী আর থাকতে পারলে না। বল্লে, তোমাকে ঠিক চিনতে না পারলেও এই পুষ্পকে এবার সঠিক চিনেছি। একেবারে হুবহু মা বসানো।

ম্লান হেসে পুষ্প বল্লে, চা'টা খেয়ে নাও ভাই, জুড়িয়ে যাচ্ছে।

চা ও খাবার খেতে খেতে চ্যাটার্জ্জী বারবার পুষ্পের মেয়ের দিকে দেখতে দেখতে বল্লে, তোমার মেয়েকে দেখে বড় লোভ হচ্ছে কিন্তু। তোমার মেয়েটি আমাকে দাও। চ্যাটার্জ্জীর বিরাট গাম্ভীর্য্য কোথায় তলিয়ে গেছে।

হঠাৎ এ কথার কি উত্তর দেবে পুষ্প ঠিক করতে পারলে না। চ্যাটার্জ্জী তার নিজের কথায় নিজেই উৎসাহিত হয়ে বল্লেন, তোমরা ত আমাদের পাল্‌টী ঘর। তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বেশ মানাবে, আর আমার ছেলেকেও দেখতে মন্দ নয়। তুমি দেখে নিও ভাই পুষ্প, তোমারও কিছু অপছন্দ হবে না।

ম্লান হাসি হেসে পুষ্প বল্লে, এ'ত ওর সৌভাগ্য মণ্টু, নইলে আমার আজ হাঁড়ি চড়ে না ? আমি মেয়ের বিয়ে দেব কোথা থেকে ? কথায় কথায় পুষ্প বল্লে, বড় ছেলের সামান্য চাকরীতে কোন রকমে আজকাল ডাল-ভাত জোটে, আর বাড়ী ভাড়ার টাকায় এদের ভাই-বোনের পড়ার খরচ চালাই। বড় ছেলে মাঝে মাঝে কিছু উপরি পায়—তাই বিপদে পড়ে যা ধার দেনা করেছিলুম তার সুদ দিয়ে কোনরকমে এই বাড়ীটুকু এখনও বাঁচিয়ে রেখেছি। নইলে যে কি হোত, তা ভাবলেও হৃদ্‌কম্প হয়। এতটা বলেই পুষ্প বল্লে, সত্যি ভাই মণ্টু, সেই কতদিন আগে অল্প দু'তিন মাসের পরিচয়, কিন্তু তোমাকে বাইরের লোক বলে মনেই হয় না, মনে হয় তুমি যেন আমাদের কত আপন। বলেই বল্লে, আচ্ছা, তোমার হাতটা দেখি।

চ্যাটার্জ্জী একটু বিস্মিত হয়ে বল্লেন, হাত ? কেন হাতে কি ?
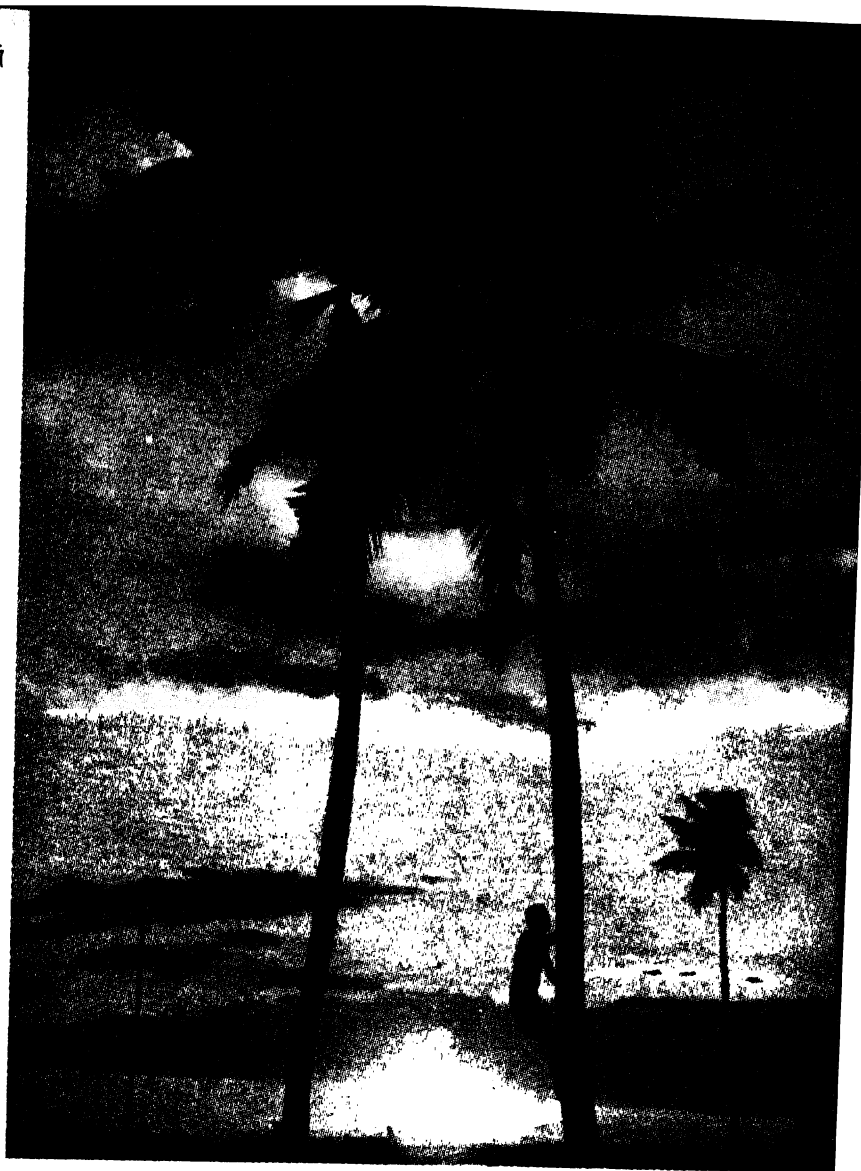
আরোহণ

ফটো : সনৎকুমার

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়া

*

আয়েস

*

ফটো :

পরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
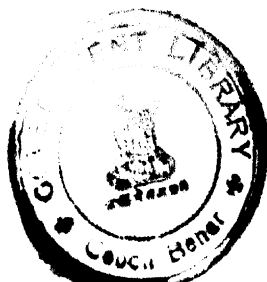
পুষ্প বল্লে, হাতটা দেখি না, আমার দেওয়া সেই ছাপটা এখনও আছে কিনা দেখি।

চ্যাটার্জ্জী বল্লেন—ও, সেই গালার ছাপ? হ্যাঁ, সেটা এখনও আছে।

পুষ্প বল্লে—আমি কিন্তু ভাই ইচ্ছে করে দিই নি। ও কি কেউ ইচ্ছে করে দিতে পারে। তোমরা চলে যাওয়ার দিন দুপুর বেলায় যখন তোমাদের লাগেজ শিলমোহর করা হচ্ছিল তখন হঠাৎ আমার হাত থেকে জ্বলন্ত কালো গালার একটা ফোঁটা তোমার ডান হাতের ওপোর পড়ে গেল। তাতে সকলে মিলে আমাকে যখন বকতে লাগল তখন আমি রাগ করেই বলেছিলুম, ইচ্ছে করে দিয়েছি, তা দেখি—ও মা, এই টীকা দেওয়ার দাগের মতন সে দাগ এখনও বেশ স্পষ্ট আছে দেখছি।

পুষ্পর মেয়ে ঘাড় হেঁট করে অল্প অল্প হাসছে। চ্যাটার্জ্জী বল্লেন—তুমি হাসছ মানে? তুমি কি এসব জানো নাকি?

সে আস্তে আস্তে বল্লে, মায়ের কাছে এ সব গল্প অনেক-বার শুনেছি।

বাইরের বারাণ্ডায় কে একজন এসে পুষ্পর মেজ ছেলেকে কি যেন জিজ্ঞাসা করলে। পুষ্প গলা বাড়িয়ে দেখে বল্লে, ঐ আমার বড় ছেলে এসেছে। তারপর একটু চেঁচিয়ে বল্লে, অপু, দেখবি আয়, কে এসেছে।

অপিসের পোষাকেই অপু ঘরে ঢুকে অপরাধীর মত নিতান্ত জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পুষ্প বল্লে, প্রণাম কর। এই আমাদের মণ্টু।

অপু কোন রকমে নমস্কার সেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরুল না। চ্যাটার্জ্জী সাহেব তার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, তুমি—তুমি পুষ্পর ছেলে?

পুষ্প বল্লে, ওকে চেন না কি মণ্টু?

অন্য দিকে চেয়ে মণ্টু বল্লে—হ্যাঁ, এই আজই দুপুরে চেনা হয়েছে। ঐ ত অপূর্ব্ব ব্যানার্জ্জী। ওদের অপিসের কাজেই ত আমাকে রাঁচী আসতে হয়েছে।

পুষ্প বল্লে—তা হলে ভালই হয়েছে ভাই, এখন বসে তোমরা কথা বল, আমি একবার রান্না ঘরটা ঘুরে আসি।

চ্যাটার্জ্জী সবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, আজ চলি পুষ্প, অনেক কাজ আছে।

পুষ্প বল্লে—ওমা, সেকি? সন্ধ্যের সময় অমনি অমনি যাবে মানে? আজ এখানে খাওয়া দাওয়া করে—

চ্যাটার্জ্জী কিছুতেই রাজী হলেন না। শেষে পুষ্প প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলে যে, কাল দুপুরে মণ্টিকে এখানে ভাত খেয়ে যেতেই হবে।

পরদিন বেলা একটার সময় চ্যাটার্জ্জী সাহেব এ বাড়ীতে ভাত খেতে বসে বল্লেন—অপুর কথা সব শুনেছ?

বিষণ্ণ মুখে পুষ্প বল্লে—হ্যাঁ, ওর কাছে কাল রাত্তিরেই শুনলুম।

চ্যাটার্জ্জী বল্লেন, আমি একটা চিঠি দিয়ে ওকে কল-কাতায় পাঠাবো আমার এক বন্ধু কণ্ট্রাক্টরের কাছে। এখানকার ডবল মাইনে সে দেবে, কিন্তু বারণ করে দিও যেন চুরী-চামারী না করে। আর আজই বিকেলে যেন সে এখানকার কাজে ইস্তফা দিয়ে দেয়। তা হলে ওর ওপোর যা চার্জ্জ হয়েছে, সব উঠিয়ে নেওয়া যাবে।

ভয়ে ভয়ে পুষ্প বল্লে, এখানে কি অন্য কোন কাজ হয় না।—আবার কলকাতায় যাবে—

মুখ তুলে চ্যাটার্জ্জী বল্লেন, এখানকার লোকেরা আমার কথা হুকুম বলে মনে করবে, তাই এখানে কাউকে চিঠি দিয়ে ওর চাকরীর জন্য অনুরোধ করব না। এমন লোককে চিঠি দিলুম যে ইচ্ছে করলে আমার অনুরোধ নাও শুনতে পারে, অথচ আমাকে ভালবাসে বলেই আমার লোককে নেবে। তাই এই অঞ্চলে কোথাও ওকে পাঠাতে পারছি না, কলকাতাতেই পাঠাতে বাধ্য হলুম, বুঝলে।

পুষ্প আর কোন কথা এ বিষয়ে তুল্লে না। অন্যান্য কথার পর আহারাদি সেরে চলে যাবার সময় চ্যাটার্জ্জী বল্লেন, কাল ভোর বেলা রাঁচী থেকে চলে যাচ্ছি। আবার কবে আসব তা এখন বলতে পারি না। তবে কাল যা বলেছিলুম, সেটা ভেবে দেখো। সামনের বছর আমার ছেলের পরীক্ষা শেষ হবে। তোমার যদি মত হয় তাহলে আমাকে জানাতে ভুলো না।

"চিঠি দিও ভাই মণ্টু" বলতে বলতে পুষ্পর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল, যেমন এসেছিল আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে মণ্টুদের চলে যাবার দিনে।

গলিপথ দিয়ে চ্যাটার্জ্জী সাহেব আগে আগে চল্লেন, ঠিক পেছনেই পুষ্প—তার পেছনে পুষ্পর মেয়ে। গাড়ীতে উঠে চ্যাটার্জ্জী বল্লেন, "চলি," তাঁর হাতটা গাড়ীর দরজার ওপোর ছিল।

গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে পুষ্প হঠাৎ তার হাতের ওপোর হাত রেখে বল্লে, এসো ভাই মণ্টু, আর তোমার বউমাকে তোমার যেদিন ইচ্ছে হবে নিয়ে যেও।

চ্যাটার্জ্জী হাত সরালে না। পুষ্পর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, তোমার মত আছে?

রাস্তার দিকে চেয়ে পুষ্প বল্লে, তোমার মতেই আমার মত।

গাড়ী ষ্টার্ট দিলে। যতক্ষণ গাড়ীখানা দেখা গেল, মা মেয়ে দু'জনেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল। মোটরটা মোড় ঘুরে অদৃশ্য হবার পর বাড়ীর দিকে মুখ করেই প্রবীণা পুষ্প মেয়ের চিবুকে হাত দিয়ে নিজের ঠোঁটে ঠেকালে—মেয়ে দেখলে, মায়ের দু'চোখে জল টল্‌টল্ করছে।

একটি আদর্শ নির্মাণ-যজ্ঞ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মানুষ একটু মনযোগ, ধৈর্য্য ও বুদ্ধি বিবেচনার সহিত পৃথিবীর জিনিষ লক্ষ্য করিলে সব সময়ই অতি সাধারণের মধ্যে বহু অসাধারণকে দেখিতে পারে। এক শ্রেণীর লোকের ধারণা যে, উচ্চশিক্ষিত বিশেষরূপ ধীশক্তি-সম্পন্ন না হইলে কেহ কোন অসাধারণ কার্য্য করিতে পারে না। আমরা এখানে এমন একজন মানুষের কথা বলিব যাহাকে মানুষ না বলিয়া একটি প্রতিষ্ঠান বলিলেই প্রকৃত আখ্যা দেওয়া যায়। তিনি অতি সহজ এবং সাধারণভাবে জীবনে কার্য্য আরম্ভ করিলেও শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁহাকে এমন ভাবে নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল যেখানে তাঁহার—প্রতিভা ও শক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হইয়াছে।

আমরা এখানে ২৪ পরগণা জেলার মধ্যমগ্রামের নিকটস্থ নব-ব্যারাকপুর উদ্বাস্তু উপনিবেশের কথা বলিতেছি। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিল বটে, কিন্তু বাংলা দেশের একটি বিরাট অংশ পাকিস্থানের অন্তর্গত হইয়া পড়ায় বাঙ্গালীর দুঃখ-দুর্দ্দশা না কমিয়া বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাংলার যে অংশ হিন্দুপ্রধান বলিয়া বিবেচিত হইল, মাত্র তাহাই স্বাধীন ভারতে আসিল। আর যে অংশ মুসলমানপ্রধান বলিয়া দেশ বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাদের মনে হইল তাহা পূর্ব্বপাকিস্থানে পরিণত করিয়া এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইল। এই সময়ে ভাগ্য দোষে দুইটি জেলার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল। মুর্শিদাবাদ জেলা মুসলমানপ্রধান হইয়াও এক শক্তিমান মহানুভব ব্যক্তির চেষ্টায় হিন্দু ভারতের অন্তর্গত হইল। আর পক্ষান্তরে খুলনা জেলা হিন্দুপ্রধান হইয়াও পাকিস্থানের মধ্যে চলিয়া গেল। সেই খুলনা জেলার ব্যারাকপুর নামক একটি অখ্যাত অঞ্চলে শ্রীহরিপদ বিশ্বাসের পৈতৃক বাসভবন ছিল। তিনি শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করিয়া—কলিকাতায় ডাক বিভাগে সামান্য চাকুরী করিতেন। তাঁহার সহজাত দেশপ্রীতি প্রথম জীবন হইতেই
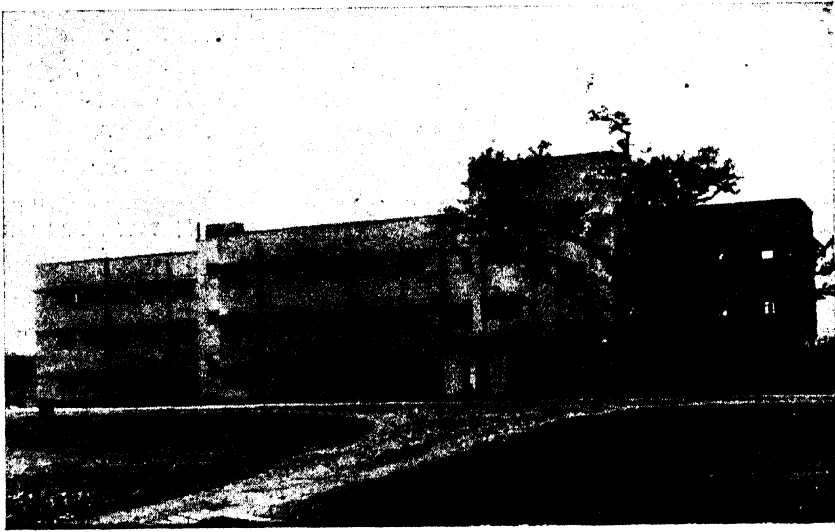
নববারাকপুর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ

তাঁহাকে পল্লীউন্নয়ন কার্য্যে আহ্বান করিয়াছিল। তিনি পিতৃভূমির একটি ইউনিয়ন বোর্ডের পরিচালকরূপে কর্ম্ম-জীবন আরম্ভ করিয়া অসাধারণ নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে সে অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা সকল অধিবাসীর আপনজন হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে সাহসিকতা ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস সকল মানুষকে বুদ্ধি ও প্রেরণা দান করে, তাহাই ছিল হরিপদবাবুর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তাহা সম্বল করিয়া তিনি জনকল্যাণ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং তাহাই সকল সময়ে তাঁহার সকল কার্য্যে সাফল্য আনিয়া দিত। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের পরিচালকরূপে শুধু শিক্ষাবিস্তার, পথনির্ম্মাণ, কৃষির উন্নয়ন প্রভৃতি মামুলী কার্য্যের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নাই। ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবারের সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হইয়া তাঁহাদের অভিভাবকে পরিণত হইয়াছিলেন। সপ্তাহে পাঁচ দিন কলিকাতা সহরে ও বাকী দুইদিন নিজের গ্রামে বাস করার ফলে তিনি তাঁহার ইউনিয়নের বহু অধিবাসীর উচ্চশিক্ষার, চাকুরীলাভের সুযোগ, ব্যবসায়ের পথপ্রদর্শক, শিল্পের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্যের দ্বারা দেশবাসীকে উন্নত করিবার ও তাহাদের সকল প্রকার দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার চেষ্টায় সকল সময়ে দৌড়া-দৌড়ি করিতেন। কলিকাতায় চাকুরী করিতে আসিয়া তিনি অবসর পাইলেই অথবা অনেক সময় অবসর করিয়া লইয়া নানা কর্ম্মক্ষেত্রের মানুষদের সহিত পরিচিত হইতেন ও তাঁহাদের মাধ্যমে নিজের বাস-অঞ্চলের মানুষকে উপকৃত করিতে চেষ্টা করিতেন।

দেশবিভাগের পর যখন তাঁহার খুলনা ব্যারাকপুর ইউনিয়নের হিন্দু অধিবাসীরা পাকিস্তানে বাস করা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করিল তখন তিনি তাহাদের বসবাসের জন্য কলিকাতা সহরের কাছে সুলভে জমি সংগ্রহে মনোযোগী হইলেন! মধ্যমগ্রাম ও বিরাটী রেল ষ্টেশনের মধ্যে রেল লাইনের উভয় পার্শ্বে, বিশেষ করিয়া লাইনের পশ্চিম পার্শ্বে হাজার হাজার বিঘা জমি ফলের বাগান, বাঁশবন, জলা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ঐ স্থানটিকে লোকালয়শূন্য বলিলেও অন্যায় বলা হইত না। কয়েক বর্গমাইল বিস্তৃত একটি বিরাট অঞ্চলে মাত্র কয়েক ঘর অতি দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমান পরিবার বাস করিত ও উপায়ান্তর না থাকায় কোন প্রকারে অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে জীবনযাপন করিত। দেশ বিভাগের পর তাহাদের মধ্যে কয়েক ঘর মুসলমান পরিবার দেশ ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে সৌভাগ্য লাভের আশায় চলিয়া গিয়াছিল। ঐ অঞ্চলটি ক্রমে হরিপদবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং তিনি তাঁহার স্বগ্রামের একদল বন্ধু-বান্ধব লইয়া সেখানে আসিয়া নূতন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিলেন। আহারামপুর, কোদালিয়া, মাসুণ্ডা প্রভৃতি

শ্রীহরিপদ বিশ্বাস

গ্রামগুলির খণ্ড খণ্ড জমি ক্রয় বা অধিকার করিয়া হরিপদবাবু তাঁহার একদল স্বগ্রামবাসীকে আনিয়া বাসস্থান দান করিলেন। নিজের বাসগ্রাম বারাকপুরের নামানুসারে নূতন উপনিবেশের নাম দিলেন নববারাকপুর। ঐ অঞ্চলটি বারাকপুর মহকুমার খড়দহ থানার বিলকান্দা ইউনিয়নের অন্তর্গত এবং বারাসাত মহকুমার মধ্যমগ্রাম ইউনিয়নের পার্শ্বে অবস্থিত।

যে অঞ্চলে ১৯৪৭ সালের পূর্ব্বে সাপ, বাঘ, শিয়াল প্রভৃতির বাসভূমি ছিল, হরিপদবাবু ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের

চেষ্টায় তাহা গত বার বৎসরে কিরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া আর কাহাকেও বুঝান সম্ভব নয়। সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া হরিপদবাবু নূতন অধিবাসীদের সকল প্রকার সুখসুবিধাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। একটি অল্পপরিসর স্থানে প্রায় তিন হাজার পরিবার একই নেতার নেতৃত্বে নিজ নিজ অর্থ ও সামর্থ্য অনুসারে গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছে। স্থানটি কলিকাতা সহর হইতে রেলে মাত্র দশ মাইল বলিয়া অধিবাসীদের জীবিকাসংগ্রহের অসুবিধা হয় নাই। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহের চাঁদ খান্না, পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, পশ্চিমবঙ্গের সহৃদয় ও কর্ম্মনিষ্ঠ পুনর্ব্বাসন

নববারাকপুর কালী মন্দির

কমিশনার শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই, সি, এস, প্রভৃতি সকল সরকারী কর্ম্মচারী হরিপদবাবুর অসাধারণ শ্রমশীলতা ও জনপ্রীতি লক্ষ্য করিয়া সকল সময়ে সাধ্যমত সাহায্য দানে অগ্রসর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার সহিত হরিপদবাবুর ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের অসাধারণ ত্যাগ, সেবা, ও জনকল্যাণের প্রচেষ্টা সংযুক্ত না হইলে বর্ত্তমান নববারাকপুরের প্রস্তুতি ও গঠন আদৌ সম্ভব হইত না।

তাঁহারা নিজেদের পরিশ্রমে কত যে নূতন বাসগৃহ নির্মাণ করিয়াছেন, কত মাইল পথ মাটি কাটিয়া চলার উপযোগী করিয়াছেন, কত নালা, নর্দ্দমা কাটিয়া বর্ষার জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণে স্বেচ্ছাশ্রম দান করিয়াছেন তাহার কোন হিসাব নাই। যেখানেই অল্প মাত্র সরকারী সাহায্য পাওয়া গিয়াছে সেই সাহায্যকে মূলধন করিয়া কর্ম্মীরা নিজেদের ভিক্ষালব্ধ অর্থ ও পরিশ্রম দান করিয়া কার্য্যকে সুন্দর ও সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। আজ তাই এই আয়তনে ক্ষুদ্র অঞ্চলে তিরিশটার অধিক অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় দশটি উচ্চ এবং সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। হাসপাতাল, প্রসূতিসদন, কয়েকটি পাঠাগার, কয়েকটি জনসভার হল, অভিনয়ের মঞ্চ, ডাকঘর প্রভৃতি নাগরিক জীবনের সকল প্রকার সুযোগদানের উপযোগী প্রতিষ্ঠান সেখানে দর্শকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কর্ম্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের এবং চেষ্টার ফলে মধ্যমগ্রাম ও বিরাটীর মধ্যস্থলে একটি রেলষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে। সোদপুর ও বারাসাত রোডের দক্ষিণধারে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র মহাবিদ্যালয় নামে একটি বিরাট কলেজ গৃহ নির্মিত হইয়া ঐ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার পথ প্রস্তুত করিয়াছে এবং একটি মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া ওখানকার নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের আয়োজনে অগ্রসর হইয়াছে। অতি অল্পকালের মধ্যেই এই অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজ নিজ গৃহে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের সুবিধা লাভ করিয়াছেন।

কিভাবে এত দ্রুত ও এরূপ অধিক সম্প্রসারণ কার্য্য সম্ভব হইয়াছে তাহা আজ চিন্তা করাও কঠিন। হরিপদবাবুকে তাঁহার একদল বন্ধু সকল সময়ে সকল কার্য্যে সাহায্যদান করিলেও আর একদল বন্ধু কার্য্যের প্রথম হইতেই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া—সকল কার্য্যের সাফল্যলাভে বাধা দান করিয়াছেন। এজন্য হরিপদবাবুকে প্রয়োজনের অধিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে ও সময়ে সময়ে মিথ্যা মামলা-মকর্দ্দমা তাঁহার উৎসাহকে বিলম্বিত করিয়াছে। সেখানে যে নূতন সমাজ গঠিত হইয়াছে তাহার সদস্যগণের মধ্যে সমবেদনা এবং পরস্পরের স্নেহপ্রীতি দেখিয়া তাঁহাদের বর্ত্তমান হিংসাদ্বেষপরায়ণ যুগের মানুষ বলিয়া মনে হয় না। একটি মানুষের নিঃস্বার্থ পরোপকার

প্রবৃত্তি যে কত অধিকসংখ্যক মানুষকে তাঁহার মতাবলম্বী ও কার্য্যের অনুসরণকারী করিতে পারে তাহা নব-বারাকপুরে নূতন সমাজের অধিবাসীদের সহিত মেলামেশা না করিলে বুঝিবার উপায় নাই। আমরা এই অঞ্চলের অধিবাসী। গত প্রায় ত্রিশ বৎসর বিলকান্দা ইউনিয়নের বহু জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্লিষ্ট থাকিয়া ঐ অঞ্চলের সকলপ্রকার অবস্থার সহিত সুপরিচিত। সেই জন্য নব-বারাকপুরের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা দেখিয়া আমরা শুধু আনন্দলাভ করিনা—বিস্মিত হইয়া যাই। কোন নূতন কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যে সকল মানুষ ভবিষ্যতের অসুবিধাসমূহের কথা চিন্তা করিয়া ভীত হয় আমরা তাহাদের নব-বারাকপুরের আদর্শের কথা লক্ষ্য করিতে ও হরিপদবাবুর কর্ম্মের সম্বন্ধে অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি।

দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের ছোটবড় হাজার হাজার উদ্বাস্তু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। বহু ধনী ব্যক্তির অর্থ সাহায্যলাভ করিয়া বহু স্থানের নূতন পল্লী সমৃদ্ধ ও উন্নত হইয়াছে। বহুস্থানে অযাচিত সরকারী সাহায্য এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের দান নূতনঅধিবাসীদের নানাপ্রকার সুখ-সুবিধা আনয়ন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু নিজেদের পরিশ্রম ও চেষ্টা মানুষকে যে কত বেশী সাফল্য আনিয়া দিতে পারে তাহার উদাহরণ বোধ হয় একমাত্র নব-বারাকপুরেই লক্ষ্য করা যায়।

এ কথা সত্য যে নব-বারাকপুরের অধিবাসীদের সকল অভাব-অভিযোগ ও অসুবিধা এখনও পর্য্যন্ত দূর করার ব্যবস্থা হয় নাই। কারণ একটি সুসমৃদ্ধ সহরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দান করা অল্প সময় বা অল্প পরিশ্রমের দ্বারা সম্ভব হয় না। ঐ এলাকায় সকল স্থান এখনও পর্য্যন্ত ভূমিগ্রহণ আইনের দ্বারা অধিকার করিয়া লওয়া হয় নাই। কাজেই একদল পুরাতন অধিবাসী ও আর একদল জবর-দখলকারী মানুষ সেখানে উপনিবেশ কমিটির নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া যথেচ্ছাভাবে নিজ নিজ গৃহাদি রক্ষা করিয়া বসবাস করিতেছেন। কাজেই নূতন পরিকল্পনা অনুসারে নব-বারাকপুর সহরে সকল পথ-নির্ম্মাণ ও বিজলী আলোর ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই। স্কুল পাঠাগার প্রভৃতি সর্ব্বত্র সুষ্ঠুভাবে বিন্যাস করাও হয় নাই। কারণ যে অঞ্চলের অধিবাসীরা—ভূমি, অর্থ ও শ্রমদান করিতে অগ্রসর হইয়াছে সেখানেই বিদ্যালয় পাঠাগার প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে। রেলের লাইন পার হইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম অংশের অধিবাসীদের যাতায়াত করিতে হয়। তাহা যে কিরূপ বিপদজনক সে কথা ভুক্তভোগীদের বলা নিষ্প্রয়োজন। রেল পারাপারের জন্য মানুষ ও গাড়ী উভয়েরই যাতায়াতের উপযোগী—পুলনির্ম্মাণ অত্যাবশ্যক। কলেজটি উপনিবেশের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে নির্ম্মিত হওয়ায় নূতন সহরের সকল প্রান্ত হইতে সেখানে যাতায়াতের জন্য আরও নূতন পথ নির্ম্মাণ প্রয়োজন। এই সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে হয়ত আরও কয়েক বৎসর সময় লাগিবে।
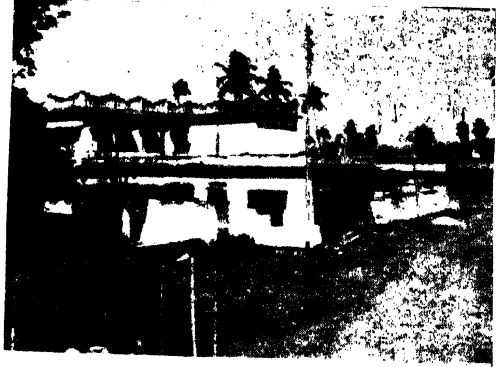
নববারাকপুরের হাসপাতাল

মোটের উপর নব-বারাকপুরের নূতন সহর পশ্চিম-বাঙলার একটি আদর্শস্থল হইয়াছে। তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বাদ দিয়া বর্ত্তমানে সেখানকার অধি-বাসীদের জন্য যত অধিক সুখসাচ্ছন্দ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছে, বহু বড় বড় সহরে তাহা করা নানা কারণে সম্ভব হয় নাই। আমরা এই নূতন প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করি এবং আশাকরি শ্রীহরিপদ বিশ্বাস ও তাঁহারসহকর্মীদের এই উন্নয়ন চেষ্টা অব্যাহত থাকিয়া ঐ অঞ্চলটিকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে বুদ্ধ

সন্তোষকুমার অধিকারী

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এমন কতকগুলি সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, যাদের আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী ব'লে মনে হয়। আমার মনে হয় আমরা অনেক সময়ই তাঁকে বুঝি না, অথবা ভুল ক'রে বুঝি। মূর্তিপূজক ও ভক্তি-পথের সাধক বলেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমরা জানি। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হ'য়েও কিন্তু বিবেকানন্দ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী—এবং অদ্বৈতবাদের সমর্থক। অথচ বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য তাঁর কোথায়? বিবেকানন্দ শুধু ঈশ্বরকে নয়, মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্রতী হ'য়েছিলেন। এই জগৎসংসারকে মায়াপ্রপঞ্চ বলে উড়িয়ে না দিয়ে সন্ন্যাসী অগ্রণী হ'লেন সমাজ-সংস্কারে, শিক্ষার উন্নয়নে ও দুর্গত মানবের সেবায়। আমিই বিশ্ব—"I am the universe"—যাঁর বাণী, তিনিই বললেন, "ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ।" শঙ্করাচার্যের ভক্ত ব্রহ্মবাদী বিবেকানন্দ বুদ্ধের নাম করতে বললেন—the greatest among the aryans—

বিবেকানন্দের জীবনের এই বিপরীতমুখী চিন্তাগুলিকে অনুধাবন করতে হ'লে তাঁর জীবন, তাঁর সাধনা, তাঁর বাণী ও সর্বোপরি তাঁর আবির্ভাবের ঐতিহাসিক প্রয়োজনটুকু আমাদের জানা দরকার। একদিন বৌদ্ধ প্রভাবের হাত থেকে হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হ'য়ে বেদান্তকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঠিক অনুরূপ-ভাবে যুগের প্রয়োজনে জন্ম নিলেন বিবেকানন্দ। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম বিচ্ছিন্ন ও অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হ'য়ে পড়েছিল। আচারসর্বস্ব ও বহু সংস্কারে আচ্ছন্ন হিন্দুধর্মের বিলুপ্তির সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল। এদেশের অবহেলিত মানুষের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের দ্রুত প্রসার শঙ্কার কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি ও ক্ষুদ্র দলাদলি থেকে মুক্ত করে হিন্দুধর্মকে তার মহত্বের ভিত্তিভূমিতে নতুন করে গড়ে তোলবার জন্যে বিবেকানন্দর মত মানুষের জন্মের প্রয়োজন ছিল।

ভারতের ইতিহাসে আড়াই হাজার বছর আগে একদিন গৌতম বুদ্ধ বৈদিক ধর্মের ক্রিয়াকর্ম ও অনুষ্ঠানের বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করতে এসেছিলেন। গৌতম-বুদ্ধই ভারতের ইতিহাসে প্রথম বিপ্লবী—যিনি সমগ্র দেশে একটি ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। দ্বিতীয় যুব-আন্দোলন সৃষ্টি করলেন বিবেকানন্দ এবং তাঁর চিন্তাধারাও বৈপ্লবিক। বুদ্ধের মতই বিবেকানন্দ শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের সর্বত্র গিয়ে পৌঁছলেন ভারতীয় সংস্কৃতির পসরা নিয়ে। ভারতীয় দর্শনকে পৃথিবীর লোক মূলতঃ এই দুই মহামানবকে কেন্দ্র করেই জেনেছে।

বিবেকানন্দ যাঁর পদধূলি লাভ করতে না পারলে বিবেকানন্দ হ'তেন না, সেই রামকৃষ্ণদেবের সাধনা ছিল সর্বধর্মের সমন্বয়ের সাধনা। সাধারণ লোকের মধ্যে প্রতিমা-পূজক বলে খ্যাত এই দুর্জ্ঞেয় মানুষটির মধ্যেই বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন অদ্বৈতবাদের প্রেরণা। ভবিষ্যদ্ জীবনে বিবেকানন্দ নিজেকে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক বলে ঘোষণা করলেন এবং বেদান্ত দর্শনের সূত্রে সমগ্র হিন্দুজাতিকে এক ঐক্য বন্ধনে বেঁধে দিলেন। শুধু হিন্দুজাতিকে নয়, বিবেকানন্দ বিশ্বমানবকে প্রত্যক্ষ করলেন এবং মানুষকে সেই ব্রহ্মরূপ পরমাত্মার ছায়াস্বরূপ—এই ধর্মচেতনায় শঙ্করাচার্যকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ এখানেই থামলেন না। তিনি আরও এগিয়ে গেলেন। সন্ন্যাসীর মত মোক্ষলাভের তপস্যা না করে তিনি মানবাত্মার মুক্তি সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। এ এক আশ্চর্য ঘটনা যে এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী পার্থিব

বিষয়ে নির্বিকার হ'য়ে মুক্তিলাভের চেষ্টা না ক'রে দুর্গত দুঃস্থ অসহায় ও অজ্ঞ মানুষের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করলেন। আশ্চর্য যে অদ্বৈতবাদের উপাসক যিনি, তিনি দেশকেই একমাত্র পূজ্য দেবতা বলে প্রচার করলেন। সন্ন্যাসী-মঠ গড়লেন, মানুষের শিক্ষা ও সেবার প্রয়োজনে সর্বত্যাগী মানুষ গড়ে তুলবেন ব'লে।

মানুষ তাঁর কাছে সবার বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছিল। নিরন্ন, ক্ষুধিত, যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষ। জগতের দুঃখ দূর করবার জন্য এমন কি একজন মানুষের বেদনা লাঘব করবার জন্য আমি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করতে পারি—এ তাঁরই উক্তি। অথচ বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর উক্তি ত' এ হতে পারে না। জগৎ সংসার সবই যার কাছে মায়া, কি প্রয়োজন তার মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার কথা ভাববার? এ অনুভূতি তবে কোথায় পেলেন বিবেকানন্দ?

শঙ্করাচার্যের পথ জ্ঞানমার্গের পথ; সাধারণ মানুষের কাছে সে পথ দুর্গম। আর অদ্বৈতবাদী শঙ্কর জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়ে সত্যকে অংশতঃ অস্বীকার করেছিলেন। কারণ ব্রহ্ম যদি সত্য হ'ন, তবে তাঁর প্রকাশও সত্য। রবীন্দ্রনাথের কথাও তাই—তিনি অসীম হ'য়েও সীমিত; মুহূর্তের মধ্যে যেমন মহাকাল বিধৃত। জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দিলে ঈশ্বরকেও শূন্য বলে মনে করতে হয়।

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবই প্রথম মানুষকে বড় ক'রেছিলেন। যন্ত্রণাবিক্ষুব্ধ মৃত্যুময় জগতে মানুষের দুঃখ দূর করবার ব্রত নিয়েছিলেন। বুদ্ধ জগৎকে ও জীবনকে তার পরিবর্তনশীল প্রকাশের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। একটি ভঙ্গুর মুহূর্তও যেমন মহাকালেরই অংশ, পৃথিবীর নগণ্যতম মানুষও তেমনই "মহানিয়মে"র অংশ: এই মানুষের প্রতি মনের মৈত্রীভাবকে প্রসারিত ক'রে দেওয়াই বুদ্ধজীবনের লক্ষ্য ছিল। স্বামী বিবেকানন্দর ভাষায়—

In Sankaracharyya we saw tremendous intellectual power throwing the searchlight of reason upon everything, We want today that bright sun of intellectualty juined with the heart of Buddha.

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা যেতে পারে যে বিবেকানন্দর প্রথমজীবনের ধ্যানেও বুদ্ধেরই অধিষ্ঠান। শ্রদ্ধেয়া নিবেদিতার 'The master as I saw him' গ্রন্থে এর সমর্থন রয়েছে। নিবেদিতা একটি ঘটনার উল্লেখ ক'রে বলছেন যে একদিন স্বামীজি যখন তাঁর ঘরে পাঠমগ্ন ছিলেন তখন সহসা তাঁর সম্মুখে এক সৌম্যমূর্তি দীর্ঘদেহ পুরুষের আবির্ভাব ঘটলো। তাঁর মুখমণ্ডলে এক গভীর প্রশান্তি বিরাজিত। বালক বিবেকানন্দ সে মুখের দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। কিন্তু তিনি ভীত হয়ে উঠতেই সে মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। স্বামীজি নিজেই ঘটনাটির উল্লেখ করে বলেছেন—I know it was the Lord himself.

স্বামীজির জীবনচরিতে পাওয়া যায় যে স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধগয়ায় যান এবং বুদ্ধকে স্মরণ করে বলেন—আমি তাঁর ভৃত্যদের ভৃত্য। ১৮৮৪ সালে বুদ্ধগয়ার প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়ে। তরুণ বিবেকানন্দও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি মূল সংস্কৃতে ললিতবিস্তার, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করেন। বুদ্ধের জীবন তাঁকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে তিনি তাঁর গুরু রামকৃষ্ণদেবের মধ্যেও বুদ্ধকে দর্শন করেন। In Buddha he saw Ramkrishna Paramhansa ; in Ramkrishna he saw Buddha,—"the master as I saw him."

শুধু বিবেকানন্দ নন, সমসাময়িক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথও বুদ্ধ সম্বন্ধে একই মনোভাব পোষণ করতেন। বুদ্ধ প্রসঙ্গে কবি বলেছিলেন—যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি, আজ এই বৈশাখী জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি, বিবেকানন্দ বললেন—"Verily was He the only man in the world who was ever quite sane, the only sane man ever born." বুদ্ধের মানবতাবোধ, ত্যাগ ও চরিত্রের বীর্য বিবেকানন্দর জীবনে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বুদ্ধের সেই বাণীটিকে তিনি মনের মধ্যে নিত্য আবৃত্তি করতেন:

পথ যদি না থাকে তবু ও এগিয়ে যাও।
ভীত হোয়োনা; কোন উদ্বেগ যেন তোমাকে
স্পর্শ না করে।

একলাই এগিয়ে চলো তুমি
যেমন করে চলে গণ্ডার।

সিংহ বিচলিত হয় না কোন শব্দে,
বাতাসকে বাঁধা যায় না জাল দিয়ে,
পদ্মপত্রে জল জমতে পারে না।
গণ্ডার একাই চলে যায়,
তুমিও চলো।

আমরা জানি তাঁর পথপরিক্রমায় বিবেকানন্দ একাই চলেছিলেন। কোন বাধা তাঁকে বিক্ষুব্ধ করতে পারেনি। প্রচলিত কোন সংস্কারে তিনি আবদ্ধ হননি। অস্পৃশ্য মেথরের আতিথ্যও তিনি স্বীকার করেছেন। সভানর্তকী গণিকাকেও তিনি সহানুভূতি দিয়ে উপদেশ দিয়ে প্রীত করেছেন। বুদ্ধই একমাত্র মানুষ—প্রাচীন ভারতে যিনি অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। বিখ্যাত গণিকা আম্রপালীর (অম্বপালী) গৃহে তাঁর আতিথ্য-গ্রহণের ঘটনাকে আমরা স্মরণ করতে পারি। বুদ্ধ পুরুষ থেকে নারীকে বিচ্যুত করে দেখেননি। মানুষের দুঃখে তাঁর করুণাঘন মূর্তি স্বামী বিবেকানন্দকে অনুপ্রাণিত করেছিল। মহামারীতে আক্রান্ত কলকাতায় গুরুভাইদের সঙ্গে নিয়ে আর্ত রোগগ্রস্তদের সেবায় যেদিন তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেম সেদিন তাঁর মধ্যে বুদ্ধের ছবিই ফুটে উঠেছিল। সমস্ত মানবসমাজের সেবায় সকলকে আহ্বান জানিয়ে যেদিন তিনি বললেন—"স্বার্থপরের মত নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করিলে তুমি নরকে যাইবে"—সেদিনও তাঁর হৃদয়ে বুদ্ধই বিরাজ করছিলেন। প্রথম জীবনে বুদ্ধের মূর্তি তিনি ধ্যানের মধ্যে জেনেছিলেন। শেষ জীবনে মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তিনি তাঁর ভ্রমণ সমাপ্ত করেছিলেন বুদ্ধগয়া দর্শন করে।

ছোট ছোট আলোচনাসভার অথবা—গুরুভাইদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তিনি প্রায়ই বুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে আনতেন—এ কথা আমরা নিবেদিতার ডায়েরি থেকে জানতে পারি। বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের মুহূর্তের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাপ্রয়াণের মুহূর্তকে তুলনা করে দেখিয়েছেন তিনি। বুদ্ধ হিন্দুধর্মবিরোধী ছিলেন—এই প্রচলিত ধারণাকে আঘাত করে বিবেকানন্দ বললেন—You must not imagine that there was ever a religion called Buddhism, with temples and preists of its own order. It was always within Hinduism."

তবে বুদ্ধের মতবাদ কেন ভারতে স্থান পায়নি? বিবেকানন্দ বললেন যে বুদ্ধ সমগ্র মানবসমাজকে ঔপনিষদিক আদর্শে টেনে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি আপোষ জানতেন না; শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিও তাঁর ছিলনা।

বিবেকানন্দ বললেন—বুদ্ধের মধ্যে কিছুটা অসম্পূর্ণতা ছিল। তিনি বলেছিলেন—অনুভব কর এ সবই মিথ্যা, অবিদ্যামাত্র। জীবন এক দুঃখময় অনন্তপরিবর্তনশীল প্রবাহ। বুদ্ধ এই নিত্যভঙ্গুর পরিবর্তনশীল জগতের মধ্যে সেই শাশ্বত সত্যকে (ব্রহ্মকে) স্বীকার করতে চান নি।

রাজকুমার শাক্যসিংহ একদিন রাজসিংহাসন ত্যাগ করে কৃচ্ছ্র-সাধনের পথে এগিয়েছিলেন মানুষের দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় খুঁজে বার করতে। বিবেকানন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন সমগ্র মানবের মুক্তিলাভের সাধনা করতে। একদিন ভারতের বাইরেও বুদ্ধের নামে লুটিয়ে পড়লো ধনী দরিদ্র পাপী পুণ্যবান সকলেই। বিবেকানন্দও ভারতের বাইরে প্রচার করলেন—বেদান্ত দর্শনের মহত্ত্ব। তাঁর কাছেও ছুটে এলো সারা পৃথিবী থেকে মানুষ।

সন্ন্যাস গ্রহণ করেই বিবেকানন্দ ছুটে গিয়েছিলেন বুদ্ধ-গয়াতে। বলেছিলেন—আমি কি সেই মৃত্তিকা স্পর্শ করছি, যে মৃত্তিকা দিয়ে তিনি হেঁটে গিয়েছিলেন।

বুদ্ধ বললেন—তোমার স্বরূপকে জানো। কি সেই স্বরূপ? বাসনা ও আকাংক্ষার মোহে আত্মা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। সদিচ্ছা ও সদসংকল্পের দ্বারা প্রবৃত্তিকে জয় করলে আত্মানুভূতি আসে। বুদ্ধ বললেন—হৃদয়কে প্রসারিত কর, যুক্ত কর অনন্তপ্রবাহের সঙ্গে। মাতা যথা নিয়ংপুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনু রকখে এবম্পি সর্বভূতেষু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং। মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি তোমার অপরিমিত মৈত্রীভাবকে রক্ষা করবে। প্রেমের মধ্যে দিয়ে মানবকে প্রসারিত করে পূর্ণতাকে লাভ করতে বলেছেন বুদ্ধ। এই পূর্ণতাকেই তিনি বলেছেন নির্বাণ'।

Nirvana is a positive blessedness, It is the goal of perfection Through the destruction of all that is individual in us, we enter into communication with the whole of universe (Dr. S. Radhakrishnan.)

বিবেকানন্দ বললেন—জীবে প্রেম দাও। দয়া নয়, সহানুভূতি নয়, সেবা ও প্রেম। মানুষের সঙ্গে একাত্ম হও।

"Love binds, love makes for oneness, you become one, the mother with the child, families with the city, the whole world becomes one with thc aniverse,

বৈদান্তিক বিবেকানন্দ তাই ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হননি যে পূর্ণমানবতার উপলব্ধির জন্য শঙ্করের মনীষার সঙ্গে বুদ্ধের হৃদয়ের সংযোজনা হওয়া চাই। অদ্বৈতবাদী হ'য়েও বিবেকানন্দ তাই মানবপ্রেমিক। তিনি মুক্তি-কামী ছিলেন: কিন্তু আত্মমুক্তি নয়, সমগ্র মানবজাতির মুক্তিই ছিল তাঁর কাম্য। সন্ন্যাসী হ'য়েও তিনি তাই সর্বাঙ্গীণ জ্ঞানের চর্চায়, সামাজিক উন্নতিতে ও দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত। ব্রহ্মকে এক ও অদ্বিতীয় জেনেও তিনি সর্বজীবে করুণাশীল প্রেমিক পুরুষ।

আমি মরে গেলে

বিভাস চক্রবর্তী

আমি মরে গেলে
এই জলে স্থলে
এতটুকু কোনো ক্ষতি হবে না কো তবু,
কোনো চিহ্ন রবে না কো কভু ?

আমি শুধু মুছে যাবো, মরে যাবো—
শেষের শূন্যতা নিয়ে নিঃশেষে ফুরাবো।
—অথচ সেদিনো আকাশ তেমনি নীল,
সেই এক রোদ ঘাস বন নদী চিল,
সব সেই এক !
অব্যাহত পৃথিবীর গতি সেই এক !!
কোনো চিহ্ন থাকে নি কোথাও
কোনো ক্ষতি হয় নি কোথাও
—এই জলে স্থলে,—
আমি মরে গেলে।

মুহূর্তের যতি যদি নেমেছে কোথাও
গতি যদি থেমেছে কোথাও
দৃষ্টি ও শ্রুতির পারে
খরতর চিন্তার সাগরে
নেমেছে সজল সন্ধ্যা লাবণ্য কোমল :
—সে প্রদোষে অশ্রু ছলোছল।

যদি দুটি আঁখি
ভীরু ত্রস্ত সাবধানে গোপনেতে ঢাকি
আড়ালে লুকায় একটি বিক্ষত মন,
হৃৎপিণ্ডে চেপে ধরে রক্তাক্ত স্মরণ,—
তবে আমি ধন্য হয়ে যাবো :
অনেক আনন্দ নিয়ে বড় দুঃখে
আমি মরে যাবো।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

আগেই বলেছি—কলিকাতা শহরের বুকে বিলাতী-কেতায় বাঙলা-রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়—সেকালের ভারত-প্রবাসী বিলাসী-সৌখিন ইংরাজ-সম্প্রদায়ের শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির আদর্শ-অনুপ্রেরণা অনুকরণে। একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল নিবারণের উদ্দেশ্যে সুপণ্ডিত ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রচিত 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থ থেকে বাঙলা-রঙ্গালয়ের সংক্ষিপ্ত-ইতিহাসের পরিচয় নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো। এটি থেকে সেকালের বাঙলা-রঙ্গালয়, ও বিবিধ নাটকাভিনয়ের নানান্ বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

* * *

(নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থ হইতে)

বঙ্গে রঙ্গালয়

বাঙ্গালীর রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার মূল ইংরাজ। তবে ইংরাজ হাতে কলমে ধরিয়া শিখাইয়াছেন এমন নহে।

ইংরাজ জাতি আপনাদের আমোদপ্রমোদের জন্য ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে এদেশে থিয়েটারের প্রথম সূত্রপাত করেন। তখনকার ইংরাজ-রাজপুরুষেরাই ইহার অনুষ্ঠাতা এবং অভিনেতা ছিলেন। কবে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য, তবে হিকির "বেঙ্গল গেজেটে" দেখা যায় ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে "কলিকাতা থিয়েটার" নামে ইহাদের থিয়েটারে সাত আটবার কএকখানি নাটক ও প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল। উক্ত বর্ষের কলিকাতার "জেনারল এড্‌ভার্‌টাইজার" * নামক পত্রে এই সকল অভিনয়ের বিজ্ঞাপন আছে।

Vol. II, No. I, 1782 Hickies Gazette হইতে জানা যায়, ১৭৮২।৫ জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই কলিকাতা থিয়েটার বর্ত্তমান ছিল।

তাহার পর কলিকাতায় ইংরাজের চেষ্টায় পেশাদার থিয়েটারের সৃষ্টি হয়।

অতঃপর বাঙ্গালী দ্বারা নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত ঠিক কখন হইয়াছে, নিঃসন্দেহ তাহা নিরূপণ করা বড় কঠিন। অনুসন্ধানে ১৮২১ সালে 'কলিরাজার যাত্রা' নামক এক

* ৩১এ জানুয়ারী সোমবার Comedy of the Beaux Strategem ও একখানি ফার্স (Farce); ৩১ মার্চ Comedy of Foundling ও Like Master like man নামক ফার্স এবং ৪ঠা ও ১১ই এপ্রিল School for Scandal অভিনীত হয়। বিস্তৃত বিবরণ Calcutta General Advertiser No. 1 29th January, and No. 10., 3rd April, 1780. পত্রিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন উক্ত বর্ষের ১২ই, ১৯এ ও ২১এ আগষ্ট Tragedy of Mahomet এবং Citizen নামে একখানি ফার্স অভিনয় হইয়াছিল।

নাটকের অভিনয়ের কথা "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ডের (Calcutta Review, Vol, xiii. 1850) ১৬০ পৃষ্ঠা পাঠে অবগত হওয়া যায়। ১৮২১ সালের বাঙ্গলা সংবাদপত্র "সংবাদ-কৌমুদীর" ৮ম সংখ্যায় এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তখনকার যাত্রা গাওনা হইতে এই অভিনয়ের নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব ছিল, নতুবা ইহার বিবরণ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠে উঠিত না। এই সময়ে কিন্তু কয়েকখানি নাটক লিখিত হইয়াছিল। উক্ত "কলিকাতা রিভিউ" খানিতে "সংবাদ কৌমুদীর" যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে আছে যে উহার পঞ্চম সংখ্যায় "নবপ্রকাশিত নাটকগুলির কুরুচি" (The evil tendency of the dramas lately invented)" নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলির কোনখানি অভিনীত হইয়াছিল কি না, তাহাও জানা যায় না। "কলি রাজার যাত্রা নাটক" নামটি, আর তাহা অভিনীত হইয়াছিল, এই বিবরণটুকু ভিন্ন বাঙ্গালীর প্রথম নাটক ও নাটিকাভিনয়ের আর কোন পরিচয় এখনও (১৩১২) পাওয়া যায় নাই। ইহা ১২২৭ সালের ঘটনা।

ইহার পর ১২৩৭ সালের সম্ভবতঃ কোজাগরী লক্ষ্মী-পূর্ণিমার দিন বাঙ্গালীর এক নাটকাভিনয়ের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। "হিন্দু পাইওনীয়ার" নামক এক প্রাচীন সংবাদপত্রের ১৮৩৫ সালের অকটোবরমাসের এক সংখ্যায় উহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বিবরণের মধ্যে প্রথমেই আছে—"This private theatre, got up about two years ago, is stlll supported by Babu Nabinchandra Bose"—

অর্থাৎ "এই সখের নাট্যসম্প্রদায় দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এখনও নবীনচন্দ্র বসু মহাশয় দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে।" ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে এই নাট্য-সম্প্রদায় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ বা ১২৩৯ সালে প্রথম অভিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও নহে। "কলিকাতা মান্থলী জর্ন্যাল" নামক প্রাচীন মাসিক পত্রে দেখা যায় যে, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের চেষ্টায় ইংরাজীতে উত্তর-রাম-চরিতের অভিনয় হয়। এই সময় হইতে বুঝা যায় যে, উহা ১২৩৮ সালের পৌষমাসের ঘটনা।

যাহা হউক ১২৩৭ সালের কোজাগরী পূর্ণিমায় (১৮৩১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) বঙ্গে অভিনয় প্রথম হয়। এই অভিনয়ে "বিদ্যাসুন্দর" অভিনীত হইয়াছিল। শুনা যায়, তৎকালে যাত্রায় বিদ্যাসুন্দর পালারই বড় আদর ছিল।

কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে এই সময়ে ডোমটুলীতে ইংরাজদিগের যে নূতন নাট্যশালা স্থাপিত হয়, তাহাতে এই বিদ্যাসুন্দর ইংরাজীতে গীত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায় ;—

"By permission the Honourable the Governor General, Mr. Lebedeff's New Theare in the Doomtulla (ডোমটুলী-চীনাবাজার), decorated in the Bengali style, will be opened very shortly with a play colled "The Disguise." * * * The words of the much admired poet Shree Bharat Chandra Ray are set to music."—

অর্থাৎ গবর্নর জেনারেলের আদেশ অনুসারে মিষ্টার লেবেডেফের ডোমটুলীস্থ নূতন নাট্যশালায় "ছদ্মবেশী" নামক নূতন ইংরাজী নাটক শীঘ্রই খোলা হইবে। * * * বহু আদৃত কবি ভারতচন্দ্রের কবিতা সুরে বাঁধা হইয়াছে। ইহা যে বিদ্যাসুন্দর—অন্নদামঙ্গল নহে, তাহা প্রমাণ ভিন্নও বুঝা যায়। তাহা সম্ভবতঃ Ballad হিসাবে গীত হইয়াছিল। ইহা ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের কথা।

নবীনবাবু সেই লোক-প্রিয় বিষয়টিই নাটকরূপে অভিনয় করাইয়াছিলেন। শুনা গিয়াছে, তনু মগ নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রথম গাওনা হয়। এই "তনু" জাতিতে মগ নহেন। তনুবাবু ভদ্রলোক ধনী বাঙ্গালী ছিলেন, কোন মগ সওদাগরের অধীনে কর্ম্ম করিতেন বলিয়া তাঁহাকে সকলে "মগ" উপনামে অভিহিত করিয়াছিল। তনু অবশ্য "রামতনুর" সংক্ষিপ্ত আকার। এই তনুমগের পুত্রই বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই বিদ্যাসুন্দরের যাত্রার দল সুপ্রসিদ্ধ গোপালউড়ের দলের পূর্ব্ববর্ত্তী কিম্বা অভিন্ন তাহা জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন, পাথুরিয়াঘাটার ৺বীরনৃসিংহ মল্লিক মহাশয়ই গোপালের দলের প্রতিষ্ঠাতা। যাহা হউক, উক্ত বিদ্যা-সুন্দরের যাত্রা হইতেই নবীনবাবুর নাট্যাভিনয়-প্রবৃত্তি

উন্মেষিত হইয়াছিল। শ্যামবাজারে এখন (১৩১১ সাল) যেখানে ট্রামওয়ে আস্তাবল (অর্থাৎ কৃষ্ণরাম বসুর গলির মোড়) সেইখানে ৺নবীনবাবুর সুবৃহৎ অট্টালিকা ছিল। এই অট্টালিকায় সেই অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে প্রথমে চিত্রিত নাট্যশালার ব্যবস্থা হয় নাই। নাটকোক্ত দৃশ্যাবলী বাটীর নানাস্থানে প্রকৃত সাজসজ্জাদি দ্বারা সাজানো হইয়াছিল। এক ঘর হইতে অন্য ঘরের মধ্যে মৃত্তিকা খনন করিয়া সুড়ঙ্গ করা হইয়াছিল। বকুলতলার পুষ্করিণীর দৃশ্য প্রকৃত প্রস্তাবে অট্টালিকাসংলগ্ন উদ্যানের পুষ্করিণীতীরে সজ্জিত হইয়াছিল। বীরসিংহের দরবার সুবৃহৎ বৈঠকখানায় সাজান হইয়াছিল। অট্টালিকা-সংলগ্ন উদ্যানের একপার্শ্বে মালিনীর কুটির ও মালঞ্চ গুছান হইয়াছিল। একস্থানে এক দৃশ্যের অভিনয় দেখিয়া, অন্য দৃশ্য দর্শনের জন্য যেখানে সেই দৃশ্য সাজান হইয়াছে, দর্শকগণকে সেইখানে উঠিয়া যাইতে হইত। প্রথম অভিনয়ে এইরূপে ছুটাছুটি করিয়া অভিনয় দেখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই অভিনয়ে স্ত্রীচরিত্রের অংশ স্ত্রীলোকেই অভিনয় করিয়াছিল। এখনকার ন্যায় তখনও বারনারী দ্বারাই স্ত্রীচরিত্র অভিনীত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ইহা প্রথমাভিনয়ে হয় নাই, পরবর্ত্তী অভিনয়ে হইয়াছিল। নবীনবাবুর দৌহিত্রেরা বলেন, প্রথম হইতেই স্ত্রী-অভিনেত্রী ছিল। হিন্দু পাইওনীয়ারে আছে, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, এই অভিনয় রাত্রি ১২টার সময় আরম্ভ হইয়া পরদিন প্রাতে ৬৷৷০টা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। দর্শকের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সাহেব ফিরিঙ্গী সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্য দর্শকের সংখ্যাই অধিক ছিল। শুনা যায়, প্রথমাভিনয় আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত ২ দিন সময় লাগিয়াছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের অভিনয়ের বিবরণে দেশীয় যন্ত্রের একতান-বাদনের পরিচয় পাওয়া যায়। সেতার, সারঙ্গ, পাখোয়াজ, বেহালা প্রভৃতি যন্ত্র বাজিয়াছিল। বাদকগণের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ। ব্রজনাথ গোস্বামী নামে বেহালাবাদক খুব ভাল বাজাইয়াছিলেন। একটী পরমেশস্তুতি গীত হইয়া অভিনয় আরম্ভ হইল। এই অভিনয়ে চিত্রিত রঙ্গমঞ্চ ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই অভিনয়ের অভিনেতৃবৃন্দের নাম যাহা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা এই,—

সুন্দর—শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বরাহনগরনিবাসী), বিদ্যা—রাধামণি (মণিনামে পরিচিতা), রাণী—জয়দুর্গা, মালিনী—ঐ, সহচরী—রাজকুমারী (রাজুনামে পরিচিতা)।

হিন্দু পাইওনীয়ার বলেন, * স্ত্রীচরিত্রগুলির ও রাজা বীরসিংহের অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর ও সুসম্মত হইয়াছিল। সুন্দরের অভিনয় এই সম্পাদকের নিকট সুসম্মত বলিয়া বোধ হয় নাই। মনোভাব পরিবর্ত্তন-কৌশল, বাক্‌ভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গী অকৃত্রিম হয় নাই।

শুনা যায় এই অভিনয়ের ব্যয় নির্ব্বহার্থ নবীনবাবুকে দুইলক্ষ্যাধিক টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। এজন্য তাঁহাকে তাঁহার খাতাবাড়ী নামক ইংরাজটোলার এক বাড়ী বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। এখন (১৩১২) যে বাড়ীতে Military Accounts আছে, উহাই সে কালের খাতাবাড়ী। যাহা হউক প্রথমে রঙ্গমঞ্চের অভাবে নানাস্থানে দৃশ্য সাজাইয়া অভিনয় করিবার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করায় নবীনবাবুর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পর অভিনয়ের সহিত রঙ্গমঞ্চের সংযোগ বোধ হয় ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উত্তর-রাম-চরিতের রঙ্গমঞ্চ দেখিয়াই করা হইয়াছিল।

একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই—নাট্যাভিনয়ের এই প্রথম চেষ্টাতেই বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতা, অশ্লীল বিষয় অভিনয়ার্থ নির্ব্বাচন,—বাঙ্গালায় লিখিত নাটকের অভিনয়ে বিরক্তি এবং বেশ্যাঅভিনেত্রীর সংস্রব প্রভৃতি নানা কথা লইয়া সংবাদপত্রে বিপুল আন্দোলন চলিয়াছিল।

যাহাহউক এই নাট্যসম্প্রদায় মধ্যে মধ্যে অভিনয় করিয়া চারিবৎসরকাল বর্ত্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ইহার পর যদিও বাঙ্গালায় অভিনয় হয় নাই, তথাপি বাঙ্গালী দ্বারা অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া এস্থলে ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুষ্ঠিত উত্তররামচরিতের অভিনয়ের কথা বিবৃত হইতেছে। Hindu Reformer নামক সংবাদপত্রের ১৮৩২ সালের জানুয়ারী মাসের এক সংখ্যায় এই নাট্য সম্প্রদায়ের প্রথমাভিনয়ের বিবরণ

* ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে এই পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।

পাওয়া যায়। শুঁড়োর বাগানে ইহার অভিনয় হইয়াছিল। সংস্কৃত-কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ ডাক্তার হোরেস হেমেন উইল্‌সন্ সাহেব উত্তররামচরিতের যে ইংরাজী অনুবাদ করেন, সেই অনুবাদ অভিনীত হইয়াছিল। একজন ইংরাজ এই দল গঠনে ও শিক্ষিতকরণে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করেন।

এক বুধবারে এই অভিনয় হয়। অভিনয়ের পূর্ব্বে নাট্য-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে একব্যক্তি উদ্দেশ্যাদি বিবৃত করিয়া বক্তৃতা করেন। এই অভিনয়ে কে কাহার অংশ অভিনয় করেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। উত্তর-রামচরিতের অভিনয় শেষ হইলে এই সম্প্রদায়ই জুলিয়াস-সীজারের ৫ম অঙ্ক অভিনয় করেন। এই দলে মার্চ্চ মাসে একখানি গীতি-নাট্যের দৃশ্যকাব্য অভিনীত হয়। ইণ্ডিয়া গেজেটে একজন সাহেব দর্শক তাহার প্রশংসা করিয়া পত্র লেখেন। জাফর-গুল নেহারের বিবরণ সেই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। নাটকখানির নাম কি ছিল জানা যায় নাই। ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এই নাট্যসম্প্রদায় কতদিন চলিয়াছিল তাহার স্থির করা যায় নাই।

ইহার পর ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে হিন্দুকলেজের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক গভর্ণমেণ্ট "হোয়াইট হাউসে" নানা পুস্তকের বক্তৃতা ও অভিনয় হইয়াছিল। গভর্ণর-জেনারল্ লর্ড অক্‌লণ্ড্, লর্ড বিশপ, মাননীয় ইডেন প্রভৃতি ইহার উৎসাহ-দাতা ছিলেন। এই সকল ঠিক নাটকাভিনয় নহে। এই সম্প্রদায়ের কয়েকটি অভিনয়ের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল—

পুস্তক	পাত্র	অভিনেতা
1. The King and the Miller	King	গোবিন্দচন্দ্র দত্ত
	Miller	নরোত্তম দাস
2. Soldier's dream	Roldier	শশিচন্দ্র দত্ত
		(ইনিই পরে রায় শশিচন্দ্র দত্ত বাহাদুর হন)
3. Topsy Tosspot		গোপালনাথ মুখোপাধ্যায়
4. Shakespear's Seven ages		অবতারচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
5. Lodgings for Single Agent		প্রতাপচন্দ্র ঘোষ
6. Merchant of Venice	Salarino	গোপালনাথ মুখোপাধ্যায়
	Duke	রাজেন্দ্রনাথ সেন
	Shylock	উমাচরণ মিত্র
	Portia	অভয়চরণ বসু
	Bassanio	রাজেন্দ্রনারায়ণ বসু
	Nerissa	রাজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র
	Gratiaus	রাজেন্দ্রনারায়ণ দত্ত
	Nellygray	গোবিন্দচন্দ্র দত্ত
7. The Dramatic Aspirant	Antonio	কালীকৃষ্ণ ঘোষ
	Patent	গোপালকৃষ্ণ দত্ত
	Dowles	গিরীশচন্দ্র ঘোষ

হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের এই ইংরাজী অভিনয় চেষ্টা কালক্রমে অন্যত্র সংক্রামিত হইয়াছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে লর্ড অকল্যণ্ড "ওরিএন্টাল সেমিনারী" পরিদর্শন করিতে আসেন, এই সময় হারমান জেফ্রয় নামে একজন ফরাসী প্রধান-শিক্ষক ছিলেন। ইঁহার একজন বন্ধু রিশি নামক জনৈক ফরাসীও এই সময়ে কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। জেফ্রয় ও রিশি উভয়ে মিলিয়া ওরিএন্টালের ছাত্রগণ দ্বারা "জুলিয়াস্ সীজার" অভিনয় করিবার সংকল্প করেন। ইহার ব্যয় দেড়হাজার টাকা পড়িবে রিশি এইরূপ স্থির করেন। অর্থাভাবে এ অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কয়েকদিন শিক্ষাদানাদি মাত্র হইয়াছিল। ইহা ১২৪৭ সালের কথা বলিতে হইবে।
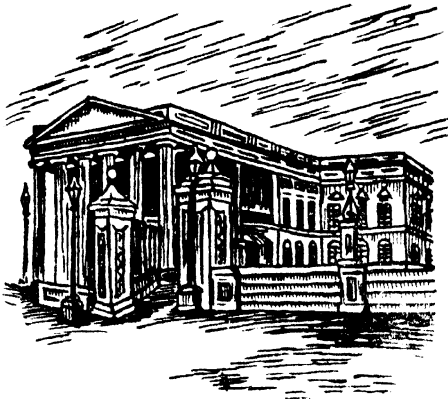
মেট্রপলিটান একাডেমী স্কুল বাড়ী

(প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি হইতে)

তাহার পর বারবৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর মধ্যে কি ইংরাজী, কি বাঙ্গালা কোনরূপ অভিনয়ের কথাই শুনা যায় না। ১২৫৯ সালে অর্থাৎ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বটতলায় "মেট্রপলিটান একাডেমী" নামক স্কুলের বাড়ীতে "জুলিয়াস্ সীজার" নাটকের অভিনয় হয়। এখনও (১৩১২) বাঁধাবটতলার পার্শ্বে যে বৃহৎ বাড়ী বর্ত্তমান আছে, সেই বাড়ীতে এই অভিনয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। পূর্ব্বে এই বাড়ীতে ওরিএন্টাল সেমিনারী ছিল। তাহার পর হাট-খোলার দত্তবংশীয় গুরুচরণ দত্ত মহাশয় এই বাটীতে মেট্র-পলিটান একাডেমী নামে আর একটী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই বৃহৎ স্কুলবাটীতে এই অভিনয়ের স্থান স্থির হওয়াতে বুঝা যাইতেছে যে, স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা গুরুচরণবাবুও এই নাট্যাভিনয়ের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শুনা যায়, ওরিএন্টাল সেমিনারীর ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ এই অভিনয়ের অভিনেতা ছিলেন। অনুমান হয়, রিশি ও ক্লেজারের উদ্যোগে দ্বাদশবৎসর পূর্ব্বে যে সকল ছাত্র জুলিয়াস্ সীজার অভিনয় করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাদেরই অনেকে সেই অতৃপ্ত বাসনার তৃপ্তিসাধনার্থ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। কে অনুষ্ঠাতা, কাহার ব্যয়ে অভিনয় সম্পূর্ণ হয় এবং কে কে অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই জানা যায় না। তবে সাঁ-সুচি (Sans Souci) নামক ইংরাজদিগের থিয়েটারের জনৈক অভিনেতা ক্লিঙ্গার নামে এক সাহেব বহু যত্ন চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া এই নাট্যসম্প্রদায়কে শিক্ষিত করেন। এই অভিনয়ে একটি বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল,—দর্শকের জন্য টিকিট বিক্রীত হইয়াছিল। টিকিটের মূল্য কত এবং কত টাকা বিক্রয় হইয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় না। অর্থ লইয়া বাঙ্গালী এই প্রথম অভিনয় করেন।

বটতলার "জুলিয়াস্ সীজার" অভিনয়ের পর বৎসর বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে ৺প্যারীমোহন বসুর বাড়ীতে জুলিয়াস্ সীজার অভিনয় হয়। এই প্যারীমোহন বসু প্রথম নাট্যাভিনয়কারী ৺নবীনচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ৺শান্তিরাম সিংহের বংশীয় কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্যারীমোহনের পুত্রগণের চেষ্টায় এই অভিনয়ের সূত্রপাত হয়, বটতলার অভিনেতৃবর্গের অনেকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই অভিনয়েও টিকিট বিক্রীত হইয়াছিল। একাধিক রাত্রি এই সম্প্রদায়ের অভিনয় হয়। এখানকার ব্যয় প্যারীবাবুর পুত্রেরাই বহন করেন। অভিনেতৃবর্গের মধ্যে একমাত্র ব্রজনাথ বসুর নাম আমরা জানিতে পারিয়াছি। ইঁহার পুত্রই আজকালকার (১৩১২) সুবিখ্যাত অভিনেতা ৺মহেন্দ্রলাল বসু।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত পাঠে জানা যায় যে যখন প্যারীবাবুর বাড়ীতে জুলিয়াস্ সীজারের অভিনয়ের উদ্যোগ চলিতেছিল, ঐ সময় ওরিএন্টাল সেমিনারীতেও তখনকার শিক্ষকদের যত্নে ওথেলো অভিনয়ের উদ্যোগ হইতেছিল। ওরিএন্টালের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রেরাই এই উদ্যোগ করেন। দীননাথ ঘোষ, প্রিয়নাথ দত্ত, রাধাপ্রসাদ বসাক, সীতারাম দে, ব্রজনাথ বসু ও কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিই ইহার অনুষ্ঠাতা ও অভিনেতা। বটতলার জুলিয়াস্ সীজারের শিক্ষক মিঃ ক্লিঙ্গার এবং মিঃ রবার্টস্ ও মিঃ পার্কার এই সম্প্রদায়ের শিক্ষকতা করেন। মিঃ ক্লিঙ্গারের ন্যায় মিঃ রবার্টস্ সাঁ-সুচি থিয়েটারে এবং মিঃ পার্কার "চৌরঙ্গী থিয়েটারে" ছিলেন। এই সম্প্রদায় প্রায় দুই বৎসরকাল চলিয়াছিল। ওথেলো, মার্চ্চেন্ট অফ ভিনিস্, হেনরি দি ফোর্থ ও এমেটিওস নামক চারিখানি পুস্তকের অভিনয় হইয়াছিল। এই সম্প্রদায় ওরিএন্টাল থিয়েটার নামে অভিহিত হইত। (ক্রমশঃ)

বড়মা

শেফালী চট্টোপাধ্যায়

খাজনার রসিদখানা একরকম অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়ল সুবালার হাতে।

একি—দীপকের নাম ত নেই রসিদে? মা-বাবা-হারা দীপকের কি দাঁড়াবার আশ্রয়টুকু থাকবে না সুবালার মৃত্যুর পরে? স্বামী নিখিলেশ রায় নামকরা উকিল। দুটি ছেলে একটি মেয়ে বড় হোয়ে গ্যাছে, দমদমের এতবড় বাড়ী বাগান সবই ত সুবালার অধিকারে, অথচ তার ভিতর ও এতটুকু অধিকার নেই দীপকের। সুবালা ত জানে—তার স্বামী আর ছেলেমেয়ের আদেশের পাত্র নিরীহ দীপক। এদের কাছে নাম তার ক্যাবলা। এই ক্যাবলা পাটা টিপে দে। জ্যাঠাবাবুর আদেশের সংগে হাসিমুখে এগিয়ে যায় সে, ওদিক থেকে বড়দার হুকুম।

এই ক্যাবলা কালিটা কলমে ভরে দে, 'যাচ্ছি' তেমনি হাসি মুখে বলে দীপক, সুবালার পরোক্ষ অভিযোগ ওরা হেসে উড়িয়ে দেয়।

পরের বোকা ছেলেটা কি আমাদের চেয়েও তোমার আপনার? কথা বলে না সুবালা। সে জানে বাপের রক্ত ওদের শরীরে বইছে, তাই ওরা বলতে পারে পরের ছেলে। ওর স্বামী বলেন—গলগ্রহ।

নিজের সহোদর ভাইয়ের ছেলে গলগ্রহ, একথাটা কেমন নূতন শুনায় সুবালার কানে—আজ বুঝি তাই কিছুটা বুঝবার সময় হোয়েছে সুবালার। কোর্ট থেকে ফিরলেন নিখিলেশ। রসিদখানা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে সুবালা জানতে চাইল—

দীপকের নামটা দিতে ভুল করেছে নাকি?

দীপকের নাম? আকাশ থেকে বুঝি পড়ে গেলেন নিখিলেশ। সারা জীবনের পরিশ্রমে যা করলাম, সেখানে ছেলেদের প্রতিদ্বন্দ্বী করব দীপককে?

প্রতিদ্বন্দ্বী? চমকে উঠল সুবালা। ঠাকুরপো যত টাকা যত গহনা মরবার আগে সব ত তোমারই হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল—দীপকের বাঁচবায় সব দায়িত্ব আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম দাদা?

হ্যাঁ, জামা প্যাণ্ট খুলতে খুলতে গম্ভীর হোয়ে নিখিলেশ বললেন—তার সেই টাকায় এই বারো বছর বাঁচিয়ে রেখেছি দীপককে। আরও বাকী জীবন—তার খাওয়া-পরার অভাব হবে না।

একান্ত বেপরোয়া হোয়ে আজ প্রতিবাদ মুখর হোয়ে উঠল সুবালা, চাকর বৃত্তির বিনিময়ে? ওঃ—রক্তচক্ষু মেলে কয়েকবার সুবালার দিকে চেয়ে নিখিলেশ বললেন, না, তোমার সংগে এর বেশী তর্ক করে আমি ভদ্রতা নষ্ট করতে চাই না। ঘরের শত্রু বিভীষণ চিনতে রাবণের দেরী হোলেও আমি বুঝেছি অনেক আগে, সুবালাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেলেন নিখিলেশ। বসে পড়ল সুবালা।

অতীতের কয়েকটা ছেঁড়া পাতা তার স্মৃতির দরজায় এসে থামল। মাত্র দুমাসের ছেলে দীপককে নিয়ে চাকরীস্থল থেকে একদিন বাড়ী এলো বিমল।

তুমি এলে শোভাকণ্ঠ? ব্যগ্র ব্যকুল প্রশ্ন সুবালার, ছমাসের দীপককে তার কোলে দিয়ে বিমল বললে, সে আর কোনদিন আসবে না বৌদি। আসবে না? আর্তনাদ করে উঠল সুবালা, না বৌদি—স্থির ধীর বিমল। সামান্য কদিনের অসুখে সে মারা গেছে। যাওয়ার আগে আমায় বার বার বলে গেছে—দীপককে ওর বড়মার কাছে পৌছে দিও. তাই আমি সব কাজ ক্ষতি করে তার অনুরোধ রেখে গেলাম। এবার আমি নিশ্চিন্ত। হাসির মধ্যে দিয়ে চোখ ভরা জল নিয়ে বিমল চেয়েছিল সুবালার দিকে—তার বুকে তখন স্থান পেয়েছে দীপক।

বিপরীত দিক থেকে দাদা নিখিলেশ এসে বিমলের হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন।

না, আর তোর কোন চিন্তা নেই বিমল। বড়মার বুকে স্থান পেয়েছে দীপক। সে আমি জানি দাদা? শান্তির হাসিতে মুখ ভরে ছিল বিমলের। তারপর সেই চলে গেল বিমল আর ফিরে এলো না, যাওয়ার ছমাসের শেষে নিখিলেশের নামে এক টেলিগ্রাম এলো,বিমল অসুস্থ।

একমাত্র ভাই অসুস্থ। উদভ্রান্ত উন্মত্ত নিখিলেশ চলে গেলেন বিমলের চাকুরী স্থল কানপুরে।

সুবালার উদগ্রীব উৎকণ্ঠার এক সপ্তাহ পরে ফিরে এলেন তাঁর স্বামী। বিমল নেই। সেকি বুক ভাঙা

কান্না তাঁর। সে গেছে, দীপক ত আছে। তার মধ্যে তুমি খুঁজে পাবে বিমলকে। দীপককে কোলে তুলে নিলেন তিনি, বিমলের দেওয়া ত্রিশ হাজার টাকা, আর তার স্ত্রীর প্রায় পঁচিশ ভরি সোনার গহনা তুলে দিলেন সুবালার হাতে। এই রইল দীপকের সারা জীবনের সম্বল।

তারপর এগার বছর কেটে গেছে, এর মধ্যে সবই বদলে গেছে, একতলা পুরানো ছোট বাড়ী খানা আজ নূতন প্রাসাদ চাকচিক্য নিয়ে গর্ব্ব ভরে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলে দুটী আর মেয়েটী হোষ্টেলে থেকে উচ্চশিক্ষিত হোয়েছে। এমন কি উপযুক্ত পাত্রে বিয়েও দিয়েছেন, মেয়েটার।- আর দুর্ভাগা দীপক এক ক্লাসে দুবার ও থাকে, পড়িয়ে দেবার লোকের অভাবে, অবশ্য প্রতিবেশীরা বলে এমন জ্যাঠামশাই কখনও দেখি নি যে ভাইয়ের ছেলেকেও দেখলে না। ছেলেটার লেখাপড়ায় একটুও মাথা নেই। তবুও কি চেষ্টা জ্যাঠার, অত ভাল বলেই ত লক্ষ্মী আজ দুহাত ভরে দিচ্ছেন। সুবালা জানে সেই লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান কোথায় আজ নূতন একরূপ নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল দীপকের জ্যাঠামশাই। এ সেই অতীত যুগের ধৃতরাষ্ট্র বুঝি উদয় হোয়েছেন তাঁর মধ্যে।

'বড়মা'? ছুটে এলো দীপক। তার বড় চোখ দুটো জলভরা, কি হোয়েছে রে? স্নেহের স্পর্শ তার মাথায় মাখিয়ে দিল সুবালা। অঝোরে কাঁদল সে, জ্যাঠা আমাকে খুব মারলো বড়মা, আমি কিছু করিনি। সে আমি জানি দীপক।

দীপক সুবালার চোখের জল এক হোয়ে মিশে গেল। সীমাহীন এক ব্যথা মিশে গেল অনন্তে। সুবালা একটা পথ খোঁজে দীপককে প্রতিষ্ঠিত করবার।

এর পর যা একান্ত অসম্ভব তাই হলো। একদিন দীপকের পক্ষ নিয়ে কোর্টে দাঁড়াল সুবালা। বিপক্ষে তার স্বামী আর সন্তানেরা।

শেষ নিষ্পত্তিও হলো একদিন। বাড়ীর আধাআধি পাপ্য স্থির হলো দীপকের।

নিকট-আত্মীয়ের আশ্রয় ছেড়ে দীপককে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো সুবালা।

সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিকের দরজা জানালাগুলো বন্ধ হোয়ে গেল একে একে। স্বামী সন্তান হয়ত বা বুক ছাড়া হোয়ে গেল চিরদিনের মত। তবুও অন্যায়কে মেনে নিতে পারবে না সে। শূন্য বুকখানায় টেনে নিয়ে দীপকের মাথাটা।

বড়মা, ফ্যালফেলে চোখে অশ্রুসজল বড় মায়ের দিকে চেয়ে থাকে দীপক। হয়ত সবই বুঝেছে, নাহয় কিছুই বোঝেনি ও।

প্রাচীর শুধু সুবালা আর তার স্বামী সন্তানের মাঝে উঠলনা, উঠল গোটা বাড়ীর মাঝখান থেকে।

আকাশ ছোঁয়া সে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ছুটে যায় সুবালার করুণ আবেদন, দীপককে ক্ষমা করে এগিয়ে এসো তুমি, ও বিমলের ছেলে তোমার ভাইয়ের ছেলে।

না, কোন সাড়াই পায়না সুবালা বিপরীত দিক থেকে, দেখতে চায় মাত্র একবার—দেখতে চায় ও বাড়ীর মাটীটুকু সেখানে রয়েছে তার নাড়ী ছেঁড়া সন্তান, তার প্রাণাধিক স্বামী একটা ছোট টুল ঘর থেকে এনে তার উপর দাঁড়িয়ে মাথাটা এগিয়ে দিলে বিপরীত দিকে—ঐ-যে ওরা সবাই বসে আছে, খোকা! আনন্দে অভিভূত সুবালার চীৎকার মাঝ পথে থেমে গেল, স্বামীর হাতের একটা বন্দুকের গুলি এসে তার গায়ে লাগল, উঃ তারা, বলে আর্ত্তনাদ করে পড়ে গেল সুবালা। 'বড়মা' ছুটতে ছুটতে এসে তাকে জড়িয়ে চীৎকার করে উঠল দীপক। সুবালার ফিনকী ধরা রক্তে রাঙা হোয়ে গ্যালো সে, একি কিসের স্কার্ফ দীপকের গায়ে, বন্দুক—জ্যেঠার বন্দুক? সেটা রাঙিয়ে গেল দীপকের হাতের রক্তে, নিমেষে ছুটে এলো প্রতিবেশী, এলো পুলিশ।

দীপক তার বড়মাকে খুন করেছে নিখিলেশের বন্দুকে।

আমি?—রক্তে আর চোখের জলে একাকার হোয়ে গেল দীপকের; আজ তার রক্ষা করবার কেউ নেই, জ্ঞানহারা বড়মাকে নিয়ে গ্যাছে হাসপাতালে।

দীপককে নিয়ে গেল হাজতে।

নিখিলেশের সব পরিকল্পনা সিদ্ধ হওয়ার মুহূর্ত্ত আগে জ্ঞান ফিরল সুবালার—দীপক চীৎকার করে এদিক ওদিক খুঁজছে তাকে—

আপনাকে গুলীকরার দায়ে জেল হাজতে বন্দী দীপক। নার্স বললে। সেকে? দীপক! জড়িয়ে জড়িয়ে বললে সুবালা—

সব-সব মিথ্যে, মিথ্যে তবে কে গুলি করেছে আপনাকে? নার্সের প্রশ্ন।

ইসারায় একটা কাগজ পেন্সিল চেয়ে কোন রকমে লিখলে সুবালা—

দুর্ভাগা দীপককে আপনারা বাঁচান। সে আমাকে গুলি করেনি, গুলি করেছে অদৃশ্য বিধাতা, সুবালার আর কিছু লিখবার আগে হাতের কলম খসে পড়লো, বালিশ থেকে লুটিয়ে পড়ল মাথাটা।

একি ডাক্তারবাবু? নার্সের চীৎকার, মা-মা? প্রাণহীনা সুবালাকে ঘিরে দাঁড়াল অনুতপ্ত ছেলেমেয়ে কটী। দূরে দাঁড়িয়ে নতমুখ, নিখিলেশ। রক্ত মাখা বন্দুকটা যেন তাঁর দিকে উঁচিয়ে আছে কে।

চোখ বন্ধ করলেন নিমেষে।

আঁধার হাজত ঘর থেকে বুঝি সব ছাপিয়ে ছুটে এলো দীপকের আর্ত্তনাদ—বড়মা? বড়মা? এত বড় শত্রু পৃথিবীতে আর কেউ নেই আমার।

দীপক? চমকে জ্ঞান হারালেন নিখিলেশ।

নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণের পথে

উপানন্দ

১৯১০ সাল পর্য্যন্ত বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে এক ভাবের ধারণাই ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ধারণা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয়নি। তখন ভাবা যেতো আমাদের এই নক্ষত্রমণ্ডল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মহাকাশের অনন্ত শূন্যতায় একটি মাত্র ক্ষুদ্র দৃঢ়বদ্ধ নক্ষত্রমণ্ডল। ছায়াপথের সীমানার বাইরে আমরা সেদিন যে সব ছোট ছোট ভাঁটার মত ক্ষীণ আলোক মালা লক্ষ্য করেছি, সেগুলোকে নীহারিকার জলন্ত গ্যাসজাত মেঘ বলে উড়িয়ে দিয়েছি। আজ সে কথা বলা চলে না।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে খ্যাতনামা ওলন্দাজ জ্যোতির্ব্বিদ ও শিক্ষক জ্যাকোবাস, সি, ক্যাপ্টেন ছায়াপথের একটি পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র তৈরী করেন। সে সময়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জ চক্রাকার, আর এর প্রান্তভাগ ঈষৎ চ্যাপ্টা—আর এই চক্রের ঠিক কেন্দ্রস্থলেই আছে সূর্য্য। স্যার উইলিয়াম হার্সেল এর এক শতাব্দীরও আগে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। ক্যাপ্টেনের হিসাব অনুসারে এই চক্রের ব্যাস ২০,০০০ আলোকবর্ষ।

১৯২০ সালের কথা। মাউণ্ট উইলসনের তরুণ জ্যোতির্ব্বিদ হারলো শ্যাপলে ছায়াপথের দূরত্ব পরিমাপের একটা উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। এ পদ্ধতিটা হচ্ছে কতকটা মোটর গাড়ীর হেড্‌লাইটের উজ্জ্বলতা দিয়ে দূরত্ব পরিমাপের পন্থার অনুরূপ। নিজের নতুন মাপকাঠির সাহায্যে মেপে শ্যাপলে ছায়াপথের আয়তনের মান আরো অনেক বেশী পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও প্রমাণ করলেন যে, সূর্য্যের অবস্থান নক্ষত্রপুঞ্জের কেন্দ্র স্থলে নয়—কেন্দ্রস্থল থেকে বহু দূরে, আর সূর্য্যের অবস্থিতি নক্ষত্রপুঞ্জের চক্রের পরিধির কাছে। এই তথ্য প্রমাণ করে শ্যাপলে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছেন এক বিরাট আলোড়ন।

এরপর থেকে বৈজ্ঞানিকদেয় উৎসাহ বৃদ্ধি পেলো, তাঁরা নতুন নতুন আবিষ্কারের পথে সুরু করলেন পদক্ষেপ, নতুন নতুন তত্ত্ব আমাদের সম্মুখে তুলে ধরলেন।

ছায়াপথের আয়তন সম্পর্কে শ্যাপ্‌লের হিসাবের যথার্থতায় সন্দেহ প্রকাশ করলেন লিক্ মানমন্দিরের হেবার কার্টিস। তিনি ক্যাপ্‌টেনের মতকে সমর্থন করলেন, আর তা অভ্রান্ত বলেই এক নতুন মত প্রচার করলেন। এই মতানুসারে সমগ্র বিশ্বের আয়তন বিপুল বলে প্রতিপন্ন হওয়া অনিবার্য্য হয়ে উঠ্‌লো।

কার্টিস প্রমাণ করে দেখালেন যে, দূরবর্ত্তী যে নীহারিকা-মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে তা গ্যাসে তৈরী মেঘপুঞ্জ নয়,—আমাদের এই বিশ্বের মত ঐগুলিও দ্বীপাকৃতি বিশ্ব আর ঐগুলি আমাদের ছায়াপথের সীমানার বহু দূরে রয়েছে।

১৯২৫ সালে এলেন লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যান,

এইচ, উরট। উনিই ক্যাপ্টেনের মতবাদের শেষ সমর্থক! উনি আবিষ্কার করলেন যে ফাঁকা মহাশূন্যে বহু অদৃশ্য পদার্থের অস্তিত্ব রয়েছে। এরপর ১৯৩০ সালে সুইস জ্যোতির্বিদ আর, জে, ট্রামপলার বললেন যে আন্তঃপ্রদেশে (Intersvellar space) যে মেঘপুঞ্জ দেখা যায়, তা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণার সমবায়ে গঠিত।

কয়েক বছর পরে ইয়ার্কশের দুজন জ্যোতির্বিদ অটো-স্ট্রাভ আর বেনজার্ট স্ট্রমগ্রেন আবিষ্কার করলেন যে নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী শূন্যস্থানে বহু টন হাইড্রোজেন গ্যাসও রয়েছে আর ঐ গ্যাস বিভিন্ন নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে খুব হাল্কাভাবে ছড়িয়ে আছে।

লাউয়েল মানমন্দিরের ভি এম স্লিফার যে সব মতামত প্রকাশ করলেন, সেগুলি নিয়ে গবেষণা সুরু করলেন মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের এডুইন পি হাবল। ১৯৩৬ সালে তিনি তথ্য সহকারে বললেন যে, সমগ্র বিশ্ব ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে আর সেই সঙ্গে নক্ষত্রপুঞ্জ পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে তাদের দূরত্বের আনুপাতিক গতিবেগে দূরে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ তারা যত দূরে যাচ্ছে, গতিবেগ তত বাড়ছে।

কিন্তু মহাবিশ্বের গঠন প্রকৃতি মানুষের কাছে ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়ে উঠ্লেও তার ভেতরকার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অস্পষ্টই থেকে যাচ্ছিল। নক্ষত্র কি আর কেনই বা এর থেকে আলোর বিকীরণ হয়, এ প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাচ্ছিল না—হাজার হাজার বছর ধরে এই প্রশ্ন আমরা করে এসেছি।

১৯২০ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার আর্থার এডিংটন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হোলেন যে, নক্ষত্রগুলি পরমাণু থেকে ক্ষুদ্রতর কণিকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী অগ্নিকুণ্ড বিশেষ। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই প্রতিক্রিয়াগুলির একটির স্বরূপও উল্লেখ করেছেন। সেটি হোলো এই যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর সংযুক্তির ফলে হিলিয়াম পরমাণুর সৃষ্টি। কিন্তু নক্ষত্রগুলোর ভিতরের গঠনে হাইড্রোজেনকে একটি গৌণ উপাদান ভেবে তিনি ভুল করে বসলেন। ১৯২০ সালের শেষ দিকে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দিরের অধিকর্ত্তা পরলোকগত হেনরি নরিস রাসেল বললেন যে, মোটামুটি-ভাবে শতকরা ৯০ ভাগ হাইড্রোজেন আর ১০ ভাগ হিলিয়াম—আর তার সঙ্গে নামমাত্র অন্যান্য মৌল নিয়ে সূর্য্য ও নক্ষত্রগুলো গড়ে উঠেছে। রাসেলের এই মতই আজকের দিনের বৈজ্ঞানিকরা সূর্য্য ও নক্ষত্রের সম্ভাব্য গঠন সম্পর্কে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন।

পরবর্ত্তীকালে নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞানের উন্নতি ঘটেছে, ফলে এ সম্পর্কে আরও তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ১৯৩৮ সালে করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হানস বেথে আর চার্লস ক্রিচফিল্ড হাইড্রোজেন যে প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হয়ে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয় তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব করে দেখিয়েছেন। ঐ বৎসরেই বেথে আর জার্মানীর কার্লভন ওয়েইজকার পৃথকভাবে কার্বন চক্রের প্রক্রিয়া সম্পর্কে নতুন আলোক সম্পাত করেন। তাঁরা আবিষ্কার করলেন সেই প্রক্রিয়াটির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম—যার ফলে অতি উত্তপ্ত নক্ষত্রগুলোর ভেতর দীপ্তির বিকাশ ঘটে, আর আমরা রাত্রিতে আকাশে নক্ষত্রের আলো থেকে বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে থাকি।

যে বলের দ্বারা নক্ষত্রগুলোর জলন্ত কেন্দ্রস্থল থেকে নির্গত শক্তি চতুর্দ্দিকস্থ অপেক্ষাকৃত শীতল মণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে সেই বল সম্বন্ধে ১৯৩৯ সালের শেষভাগে সুব্রাহ্মনিয়াম চন্দ্রশেখর বিশ্লেষণ করে দেখান। তিনিই প্রথম 'শ্বেতকায় বামন' নামে পরিচিত নিবে-যাওয়া নক্ষত্রগুলোর মধ্যকার এক অদ্ভুত ধরণের অপজাত পদার্থের বর্ণনা দেন। এ পদার্থ থেকে আর শক্তি উৎপন্ন হোতে পারে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মাউন্ট উইলসনে বিজ্ঞানী ওয়াল্টার বাডে এ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকামণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত বিশাল নীহারিকা সম্পর্কে হাবলের মতবাদের ওপর ভিত্তি করে আরও গবেষণা ও পর্য্যবেক্ষণের পর নিজস্ব একটি তত্ত্ব আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন নক্ষত্রগুলি দুই শ্রেণীভুক্ত। প্রথম শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্রগুলি নীল, উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত—আর ঐ নক্ষত্রগুলো কেবল মহাজাগতিক ধূলিকণা ও গ্যাসের মধ্যেই অবস্থিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্রেরা প্রথম শ্রেণীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ ও শীতল, লোহিত অথবা লোহিতাভ বর্ণের। এরা থাকে ধূলিকণা ও গ্যাসবিহীন জায়গায়। এই আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে বাডে ১৯৫২ সাল নাগাত সময়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্রগুলিই বিশ্বের

প্রাচীনতম নক্ষত্র আর এদের বয়স সম্ভবত: ছয়শত কোটি বৎসর। প্রথম শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্রগুলির বয়স অপেক্ষাকৃত কম আর ওরা ওদের চারিপাশে অবস্থিত ধূলিকণা ও গ্যাস দিয়ে তৈরী। এই সমস্ত সিদ্ধান্তকে নক্ষত্রপুঞ্জের উৎপত্তি সম্পর্কে পূর্ব্ববর্ণিত ও বহুল স্বীকৃত তত্ত্বের মধ্যে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়েছে। সেই তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, নক্ষত্রেরা প্রথমে উজ্জ্বল, প্রজ্জ্বলিত স্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। সে সময় লক্ষ লক্ষ হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের তুল্য শক্তিতেও সমান হারে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়। পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে নক্ষত্রগুলো অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নিষ্প্রভ হয়ে চরম বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়। এই তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হবার পর ১৯৫০ সাল থেকে সুরু হয়েছে আকাশের নব নব রহস্যের উন্মোচন।

নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণের পথে যে সব নব নব তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে বিজ্ঞানীরা দ্রুত এগিয়ে চলেছেন তা বিস্ময়কর, এ সম্বন্ধে তোমাদের কাছে অনেক কিছু বল্‌বার ইচ্ছে রইলো। আজ এই পর্য্যন্ত।

—

কাউন্ট লিও টলষ্টয়

রচিত
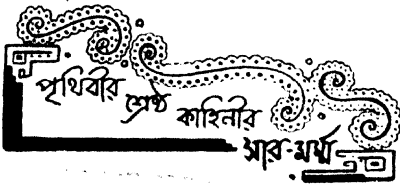
দি লঙ্‌ এক্সাইল্

(The Long Exile)

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৩

সরকারী-গারদে কয়েদীর পোষাকে লোহার শেকল-বেড়ী-আঁটা বন্দী-অবস্থায় স্বামীর জীর্ণ-শীর্ণ-অসহায় চেহারা দেখে আকৃস্তেনকের স্ত্রী শোকে-দুঃখে-হতাশায় বিহ্বল হয়ে শেষ পর্য্যন্ত সম্বিত হারিয়ে বসলো।···অনেকখানি আশা নিয়ে এতদিন পরে সঙ্গে দেখা করতে এসে আকৃস্তেনককে যে এমন অবস্থায় দেখবে—মনেও ভাবতে পারেনি সে ঘুণাক্ষরে! যাই হোক, কিছুক্ষণ বাদে জ্ঞান ফিরে আসতেই আকৃস্তেনকের স্ত্রী কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে ব্যাকুল ভাবে সরকারীগারদের কোণে বসে স্বামীর সঙ্গে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা সুরু করলো···বাড়ী ছেড়ে বিদেশ-যাত্রার পর, পথে যা কিছু ঘটেছে—তার প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি খবর সে শুনতে চাইলো আকৃস্তেনকের মুখ থেকে। কোনো কথা গোপন না করে আকৃস্তেনকও পথে যা কিছু ঘটনা ঘটেছে, আগাগোড়া সবই খুলে বললো তার স্ত্রীকে।

সব কথা শুনে আকৃস্তেনকের স্ত্রী স্পষ্টই বুঝতে পারলো যে নিতান্তই গ্রহের পাকচক্রে পড়ে, স্বামীকে তার আজ এমন মিথ্যা-খুনের দায়ে বন্দী-আসামী হয়ে সরকারী-গারদে মুখ বুজে দুর্দ্দশা-অপমান সয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে! কিন্তু উপায় কি?···

স্বামী এতদিন বিদেশে জেল-গারদে বন্দী থাকার ফলে, কাজ-কারবারের বিশৃঙ্খলা, পয়সা-কড়ির অভাবে সংসারের যা হালচাল দাঁড়িয়েছে···তাতে নিজেদেরই দিন চলা দায়! এ অবস্থায় মোটা টাকা খরচ করে আদালতে উকিল-মোক্তার দাঁড় করিয়ে ঠিকমতো স্বামীর মামলার তদ্বির-তদারক যে করবে—সে সঙ্গতিটুকুও নেই!···তাছাড়া নিতান্তই অসহায়···একা···সামান্য মেয়েমানুষ সে···সংসারে ছোট ছেলেমেয়ে ক'টি ছাড়া এমন আর কোনো আত্মীয়-বন্ধুও পাশে নেই যে হোমরা-চোমরা মুরুব্বী বা সরকারী-দপ্তরের মাতব্বর লোকজনকে ধরে মিথ্যা এই খুনের দায় থেকে তার স্বামী বেচারীকে বেকসুর খালাশ করে আনতে পারে!

ভাবনায়-চিন্তায় দিশেহারা হয়ে হতাশার নিশ্বাস ফেলে কাতর সজলদৃষ্টিতে স্বামীর চিন্তাকুল-মুখের পানে তাকিয়ে আকৃস্তেনকের স্ত্রী বললে,—তাহলে···এর পরিণাম?

শূন্যে হাতখানা উঁচিয়ে শুকনো-মুখে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আকৃস্তেনক জবাব দিলে,—ভগবানই জানেন!

স্বামীকে উৎসাহ দিয়ে আকৃস্তেনকের স্ত্রী প্রতিবাদ জানালো,—কিন্তু তাই বলে, শুধু ভগবানের উপর নির্ভর

করে চুপচাপ বসে থাকলেও তো চলবে না···আমাদেরও চেষ্টা করে দেখতে হবে···যদি কোনো উপায়ে···

নিশ্বাস ফেলে আকৃশ্চেনক বললে,—কি আর উপায় আছে, বলো !···খুনী-আসামীর বরাতে যে সাজা জোটে··· হয় ফাঁসী, নয়তো দীর্ঘ-কারাদণ্ডে নির্জ্জন সুদূর-সাইবেরিয়ার চির-দেশান্তরী !···এছাড়া, ব্যবস্থার আর তো কোনো দেখছি না !

ব্যাকুল-কণ্ঠে আকৃশ্চেনকের স্ত্রী বললে,—কেন··· তোমার বিষয়ে সত্য-ঘটনা সব যদি আগাগোড়া খুলে লিখে সরাসরি আমাদের জার্-সম্রাটের কাছে আবেদন জানাই ? · তাহলে ?···তাহলেও কি তোমার মুক্তি মিলবে না এই মিথ্যা-খুনের দায় থেকে ?

কথাটা শুনে আকৃশ্চেনক মুহূর্তের জন্য চুপ করে কি যেন ভাবলো···তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে,—এমন ব্যবস্থার কথা শুনেছি বটে !···লোকে বলে—জার্-সম্রাটের রাজ্যে অবিচারে এমন অন্যায়ভাবে নির্দ্দোষীকে কখনো কোনো সাজা দেওয়া হয় না তবে এ ক্ষেত্রে সে ব্যবস্থা যে কতখানি···

স্বামীর কথায় বাধা দিয়ে আকৃশ্চেনকের স্ত্রী সোৎসাহে বললে,—পাড়া-পড়শীদের মুখে আমিও এ কথা শুনেছি ! তাই তোমার গ্রেপ্তারের খবর পাবা-মাত্রই আমি খুনের ঘটনার সব কথা খোলাখুলিভাবে জানিয়ে নিজের হাতে সরাসরি চিঠি লিখে পাঠিয়েছি আমাদের জার্-সম্রাটের কাছে···যাতে তিনি অবিলম্বে তোমায় এই মিথ্যা-খুনের দায় থেকে রেহাই দেন !

জার্-সম্রাটের দরবারে মুক্তির আবেদন পাঠানোর খবর শুনে আকৃশ্চেনকের মুখে-চোখে আশার আভা ফুটে উঠলো ···পরম-আগ্রহে সে শুধোলো,—তুমি···তুমি লিখেছো চিঠি ···জার্-সম্রাটের কাছে !···কোনো···জবাব পেলে—তাঁর কাছ থেকে ?···কি লিখেছেন তিনি···তোমার সে চিঠির উত্তরে ?···

ক্ষণেক স্তব্ধ হয়ে থেকে ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে আকৃশ্চেনকের স্ত্রী ম্লানমুখে জবাব দিলে,—চিঠির উত্তর আজো মেলেনি !···পাবার আশায় রোজই পথ চেয়ে থাকি ···কিন্তু···

তার দু'চোখ অশ্রু-সজল হয়ে এলো···কথা আর শেষ করতে পারলো না !

ঝড়ের দম্‌কা বাতাসে বাতির আলো নিভে গিয়ে সহসা নিবিড়-অন্ধকার ঘনিয়ে আসার মতোই আকৃশ্চেনকের মুখে-চোখে নিমেষের মধ্যে ফুটে উঠলো হতাশার গাঢ়-ছায়া ! কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে নিশ্বাস ফেলে হতাশ-কণ্ঠে সে বললে,—চিঠির জবাব যে মিলবে না···এ কথা আমি জানতুম !···এত বড় বিশাল-রাজ্যের দীন-দুঃখী সামান্য প্রজা আমরা···মহামহিম জার্-সম্রাটের রাজ-দরবারে আমাদের মতো অভাগাদের কাতর আবেদন-নিবেদনের কি বা দাম·· আর কতটুকুই বা !·· খোঁজ-খবর নিলে, হয়তো জানতে পারবে—তোমার সেই তুচ্ছ-আবেদন আজো রাজ-দরবারের দেউড়ী পার হবারও অনুমতি পায়নি···সরকারী-দপ্তরের কোণে কোনো একটা বাজে-কাগজ ফেলার টুকরির একধারে পড়ে ধূলোয় লুটোচ্ছে···কর্ত্তাদের কারো সেদিকে নজর দেবার নিমেষেরও অবসর মেলেনি—এমনি পোড়া-কপাল আমাদের !···তাই বলছিলুম—একমাত্র ভগবানের করুণা ছাড়া, এ দায় থেকে মুক্তি পাবার আমাদের আর কোনো উপায়ই নেই !···

এ কথা শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে সজল চোখে স্বামীর মুখের পানে তাকিয়ে চিন্তাকুলভাবে আকৃ-শ্চেনকের স্ত্রী বললে,—সেদিন সেই দুঃস্বপ্নের কথা শুনেও যদি ঐ অশুভ-ক্ষণে বাড়ীঘর ছেড়ে বিদেশের পথে বেশাতী বেচতে না বেরুতে, তাহলে হয়তো এমন বিপদ ঘটতো না আমাদের বরাতে ! সত্যি, বিনা-দোষে তোমার এই দুর্ভোগ-অপমান ··তাছাড়া শরীরের যে হাল দেখছি··· সারাক্ষণ দুর্ভাবনা আর দুশ্চিন্তায় বয়স যেন হঠাৎ দশগুণ বেড়ে গিয়েছে···মাথার অমন সুন্দর কালো কোঁকড়া চুলের রাশি সব তোমার পেকে আগাগোড়া শাদা হয়ে গেছে এরই মধ্যে !···কি করে যে এ বিপদ থেকে তুমি···

বাকী কথাটুকু আকৃশ্চেনকের স্ত্রী আর শেষ করতে পারলো না···কান্নার আবেগে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল ! স্তব্ধভাবে নিরুপায় দৃষ্টিতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় আকুল তার অসহায় স্ত্রীর মুখের পানে তাকিয়ে আকৃশ্চেনক ভাবতে লাগলো—কি কুক্ষণেই গোয়ার্ত্তুমী করে সেদিন সে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছিল···যার ফলে—শান্তি-সুখে-ভরা

অমন সাজানো-সংসারটা তার আজ এমনভাবে ছারখার হতে বসেছে !

এ সব দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে আকৃশ্নেনকের দু'চোখ জলে ভরে উঠলো…কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে এ বিপদ থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায়ই তার নেই !

স্বামীর দুর্ভাবনা দেখে আকৃশ্নেনকের স্ত্রী ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করলে,—হ্যাগো…কেন…কেন তোমাকে ওরা এমনভাবে বন্দী করে রেখেছে ?…হঠাৎ কোনো ঝোঁকের মাথায়, সত্যিই কি তুমি সরাইখানার সেই সদাগরকে ছোরার ঘায়ে খুন করে বসেছো ?…লোকে বলছে…

বাধা দিয়ে ব্যথিত-কণ্ঠে আকৃশ্নেনক বললে,—লোকের কথায় বিশ্বাস করে তুমিও শেষে আমাকে খুনী ঠাউরে সন্দেহ করছো ! পথের সব ঘটনাই তো তোমায় খুলে বলেছি…তবু তুমি আমাকে…

আকৃশ্নেনকের বাকী কথা শেষ করবার সুযোগ আর মিললো না…কয়েদখানার পেয়াদা আচমকা এসে খবর দিলে,—সাক্ষাতের সময় শেষ হয়েছে…বন্দীকে এবার হাজতে ফিরে যেতে হবে !

[ক্রমশঃ
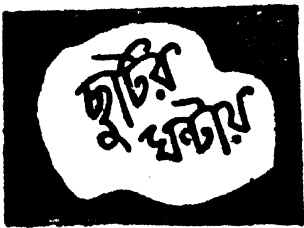
চিত্রগুপ্ত

আগুনের দাহ্য-শক্তির পরিচয় তোমরা সবাই জানো। কাঠ, খড়, কাপড়, কাগজ, কয়লা প্রভৃতি এমনি আরো নানান্ পদার্থ আগুনের ছোঁচ লাগলেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়—এ তোমরা নিত্যই ছাখো। কিন্তু বিজ্ঞানের এমন সব বিচিত্র কলা-কৌশল আছে, যে কারসাজিতে আজব উপায়ে আগুনের ছোঁয়াচ লাগলেও, কাগজ, কাপড় প্রভৃতি কোনো পদার্থকেই সহজে পোড়ানো যায় না…বরং সেগুলিকে অনায়াসেই দিব্যি 'অ-দাহ্য' বা 'Fire-proof' করে তোলা সম্ভব হয়। এবারে তেমনি ধরণেরই একটি বিচিত্র-মজার বিজ্ঞানের খেলার কথা তোমাদের বলছি।

এ খেলাটি দেখানোর জন্য সামান্য যে কয়েকটি সাজ-সরঞ্জাম দরকার, সেগুলি জোগাড় করা এমন কিছু ব্যয়বহুল বা হাঙ্গামার ব্যাপার নয়…বিনা-খরচে এবং অনায়াসেই এ সব জিনিষ তোমরা নিজেদের বাড়ীতে বসে সংগ্রহ করতে পারবে। বিজ্ঞানের এই মজার খেলাটি হাতে-কলমে পরখ করে দেখবার জন্য চাই—হাত দেড়েক লম্বা এক ফালি মজবুত সুতো, এক বাটি জল, একবাক্স দেশলাই, দু'তিন মুঠো গুঁড়ো-নুন এবং একটি লোহার চাবি।

এ সব জিনিষ জোগাড় হবার পর, গোড়াতেই বাটির জলে নুনের গুঁড়ো মিশিয়ে 'লবণাক্ত-দ্রবণ' (Saline-Solution) তৈরী করে নাও। তারপর সেই 'লবণাক্ত-দ্রবণে' সুতোটিকে খানিকক্ষণ চুবিয়ে রেখে, সেটিকে আগাগোড়া 'সু-শিক্ত' করে তোলো। এমনিভাবে 'লবণাক্ত-দ্রবণে' ডুবিয়ে 'সু-শিক্ত' করে নেবার পর, সুতোটিকে জল থেকে তুলে রোদে-বাতাসে মেলে দিয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে নাও। সুতোটিকে এভাবে শুকিয়ে নেবার পর, সেটিকে পুনরায় ঐ 'লবণাক্ত-দ্রবণে' ভিজিয়ে ও রোদে বাতাসে রেখে আগাগোড়া শুকনো করে তোলো। ঠিক এমনি পদ্ধতিতেই সুতোটিকে আরো
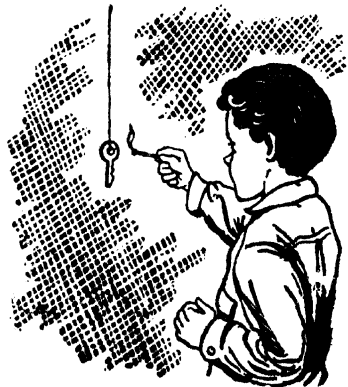
কয়েকবার 'লবণাক্ত-দ্রবণে' চুবিয়ে, ও রোদে-বাতাসে শুকিয়ে পাকাপোক্ত করে নাও। এ কাজ যত বেশীবার করতে পারো, ততই ভালো…কারণ অনবরত 'দ্রবণে'

চুবানো আর রোদে-বাতাসে শুকিয়ে নেবার ফলে স্থতোটি আরো বেশী পাকাপোক্ত-মজবুত এবং সুষ্ঠুভাবে খেলা দেখানোর পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়ে উঠবে।

উদ্যোগ-পর্ব্বের এ কাজগুলি সেরে ফেলবার পর, উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে সদ্য 'দ্রবণ-পরিশোধিত' (Treated with Saline-Solution) ঐ লম্বা স্থতোটির নীচের প্রান্তে বেশ শক্ত করে গিট বেঁধে লোহার চাবিটি ঝুলিয়ে দাও এবং স্থতোর উপরের প্রান্তটি টাঙিয়ে রাখো ঘরের দেয়ালের গায়ে-আঁটা পেরেকে। এবারে খুব সাবধানে দেশলাই-কাঠি জালিয়ে আগুন ধরাও দেয়ালের গায়ে আঁটা পেরেকে-টাঙানো চাবি-বাঁধা ঐ স্থতোটিতে। তবে হুঁশিয়ার···দমকা বাতাসের ধাক্কায় স্থতোটি যেন কোনোক্রমে ছিঁড়ে না যায়, সেদিকে নজর রেখো। এ কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখবে—বিজ্ঞানের বিচিত্র-নিয়মে আগুনের স্পর্শে স্থতোটি আগাগোড়া জলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও—নীচের প্রান্তে ঝোলানো ঐ লোহার চাবিটি কিন্তু মাটিতে খশে পড়ছে না···আগের মতোই দিব্যি শূন্যে ঝুলছে!

এমন আজব কাণ্ড ঘটবার কারণ—আগুন ধরানোর আগে, বার-বার 'লবণাক্ত-দ্রবণে' চোবানো ও রোদে-বাতাসে শুকিয়ে নেবার ফলে, স্থতোটির গায়ে এত বেশী পরিমাণে 'মুনের-আস্তরণ' (Saline-Coating) লেপে থাকে যে স্থতো আগুনের ছোঁয়াচে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও, স্থতোর গায়ে জমাট-বাঁধা 'ছাই রূপী' সেই 'মুনের-আস্তরণটি কিন্তু বেমালুম অক্ষত-অটুট রয়ে যায়। এই 'আস্তরণটি' অটুট থাকে বলেই—দগ্ধ স্থতোর নীচের প্রান্তে বাঁধা লোহার চাবিটি আগের মতোই শূন্যে ঝুলতে থাকে—স্থতো পুড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে ঝরে পড়ে যায় না।

এই হলো—এবারের বিচিত্র-মজার বিজ্ঞানের খেলাটির আসল-রহস্য। আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি মজার খেলার আজব কলাকৌশলের পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

——

মনোহর মৈত্র

১। রেখা-টানার হেঁয়ালি ঃ
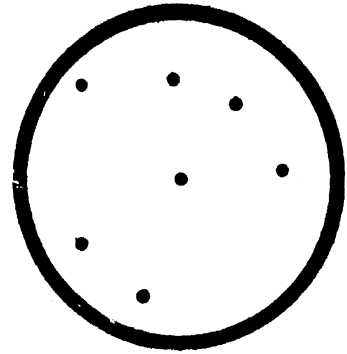
উপরের ছবিতে দেখতে পাচ্ছো—বড় ঐ গোলাকার 'চক্রের' (Circle) মধ্যে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আঁকা রয়েছে আলাদা-আলাদা সাতটি ছোট-ছোট 'বিন্দু' (Dots)। এবারে একটি পেন্সিল আর লাইন-টানবার 'রুলার' (Ruler) নিয়ে, মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে উপরের ছবিতে দেখানো ঐ 'চক্রের' একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি এমনভাবে কায়দা করে তিনটি সরল-রেখা (Straight Line) টানো যে চক্রের ভিতরকার প্রত্যেকটি ছোট-ছোট সাতটি 'বিন্দু' যেন পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র-পৃথক একেকটি 'ঘরে' (Segment) বসানো থাকে। অর্থাৎ, রেখাঙ্কিত একটি একটি ঘরেও যেন একের বেশী দুটি বিন্দু আদৌ না বসানো হয়। তবে মনে রেখো—মাত্র তিনটি সরল-রেখার সাহায্যে গোলাকার ঐ 'চক্রের' ভিতরকার বিভিন্ন 'ঘর-গুলি' রচনা করতে হবে···তার বেশী আর একটি 'রেখাও' ব্যবহার করা চলবে না। এখন চেষ্টা করে ভাখো···এ

হেঁয়ালির মীমাংসা যদি করতে পারো তো বুঝবো—বুদ্ধিতে রীতিমত পাকা হয়ে উঠেছো তোমরা !

'কিশোর-জগতের' সভা-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

২। প্রথমার্দ্ধ অমূল্য ধন,
নাহি হয় ক্ষয়।
প্রথমাংশ ত্যজিলে প'রে,
হয় জলাশয়।
দুই অংশ ধরিলে প'রে
সবাকার মনে,
অক্ষয় তাঁহার নাম
থাকিবে স্মরণে।
রচনা : দোলগোবিন্দ দাস (বাঁশবেড়িয়া)

৩। প্রথমার্দ্ধাংশ আকাশে থাকে,
দ্বিতীয়ার্দ্ধাংশ গলায়,
পুরোটা মিলায়ে সকল পূজাতে
দেবতার পাশে স্থান পায়।
একটু যদি ভেবেই ছাখো,
ধাঁধা অতি সোজা,
পাবেই পাবে জবাব খুঁজে—
মিলবে কত মজা !
রচনা : ওঙ্কারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বালী)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ

১। রাজা প্রতাপাদিত্য, তাত্তিয়া টোপে, সম্রাট অশোক, সুলতানা রিজিয়া, সম্রাট সাজাহান, রাণা প্রতাপসিংহ, নৃপতি বিম্বিসার।
২। কটক, দরদ, মলম
৩। নিজাম

গতমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), রিনি ও ও রনি মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই), কুলু মিত্র (কলিকাতা), পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), সতোন, সঞ্জয়, মুরারী ও সুনীল (ভিলাই), পিন্টু হালদার (বালী), রেখা, জ্যোতি-প্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ (যশপুরনগর), অশোক কুণ্ডু, রাণী, শুভ্র ও পার্থ হাজরা (আড়ুট), মীরা ও স্বপনকুমার দাস (উদয়পুর, ২৪ পরগণা), উষা ও আশীষ মুখোপাধ্যায় (বরাকর)।

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বুবু, মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), শর্ম্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), কবি ও লাড্ডু হালদার (কোরবা), আলো, তুফান, চায়না, মালা, পলা, সোমা, সীমা, শম্পা ও মিন্টু (রৌরকেল্লা), অঞ্জনকুমার বসু (বারাণসী), নারায়ণচন্দ্র ও শশাঙ্কশেখর মিশ্র (রুইলাল, সবং), কিশলয়, কাকলী ও কেতকী সর্ব্বাধিকারী (পূর্ণিমা), দীলিপকুমার ও রঘুনাথ দত্ত (বাঁশবেড়িয়া), অনিমা, কৃষ্ণা ও নিরুপমা (হুমজা), চৈতালী ও মিঠু বসু (বালীগঞ্জ), সুনীতিকুমার, মনোরমা, গৌরীবালা ও মদনমোহন মিশ্র (রাগপুর), আশীষকুমার কুণ্ডু (রাণাঘাট), সুধাংশু, গৌতম, অমিতাভ, স্বপ্না, পুরবী, সুজাতা কোঙার (বাতানল), প্রণব, প্রমোদ, রঞ্জন, শুক্লা ও প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), হাবু, বাবু, শামু, মামণি ও চন্দা (কলিকাতা)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য (তেঁতুলিয়া), অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (রঘুনাথগঞ্জ), রত্না ইলা (রাজবাড়ী), সুশান্ত, সুমন্ত, সুকান্ত ও বনানী সিংহ (মদনপুর), ধর্ম্মদাস রায়, গৌরী, ভানু, রাধাশ্যাম, গোপী ও প্রভাত (বিদ্যাধরপুর), প্রবীরগোপাল ও প্রদীপগোপাল মুখোপাধ্যায় (শিবপুর)।

জলযানের কাহিনী

দেবশর্ম্মা বিরচিত

অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবেম শারদশতং—এদেশের সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের কল্পনায় ছিল যে কুশল কর্ম করে মানুষ বাঁচবে একশো বছর। তার বাল্য ও কৈশোর কাটবে শিক্ষার প্রস্তুতিতে ব্রহ্মচর্যের আবহাওয়ায়। তার যৌবনে সে হবে কর্তব্যপরায়ণ গৃহী, ব্রহ্মনিষ্ঠ কর্মী, উদারত্যাগী, পুত্রকলত্র নিয়ে গড়ে তুলবে একটি নিষ্ঠাবান সংসার—বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে, সেবার ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে। প্রৌঢ়ত্বের পূর্ণছায়ায় সে ভোগের বিচিত্র উপাদানগুলি থেকে আস্তে আস্তে মনকে সরিয়ে মোড় ঘুরিয়ে দেবে। কর্মত্যাগ সে না করুক, কর্মফলের দিকে তার লোভকে সে সংযমিত করবে—আসক্তির বন্ধনগুলি যাতে শ্লথবৃন্ত হয়ে আসে—বাণপ্রস্থ মানেই প্রস্থানের প্রাক্-ইতিহাসের যুগ। আজকের যুগে তার জন্য বনে যাবার দরকার নেই, বৈষ্ণবী পরিভাষায় মনে বনে এক হলেই বৃন্দাবনে পৌছান যায়। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—ত্যাগ করেই ভোগ কর, এই হল বাণপ্রস্থের নব অপ্রমাদের পথ। তাই থেকেই আসে "যতি" অর্থাৎ নিষ্কণ্ড হয়ে সংযত হয়ে মহত্তর পটভূমিকায় বৃহত্তর অনুভূতির মধ্যে বৃহত্তমের আস্বাদনে লীন হওয়া—যিনি প্রেয়ো পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়ো অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ—তখনি দিন পূর্ণ হবে, রাত পূর্ণ হবে—তারপর একদিন যে ব্যক্ত হয়েছিল অব্যক্তের মধ্য থেকে, রূপ, আকার, দেশ কাল সীমার আধারে, সে মিলিয়ে যাবে বিরাম বিহীন মহাসাগরের অব্যক্তে। এই ত মানুষের চিরন্তনী নিত্যপরিক্রমার শুভ সংকল্প, শুদ্ধবুদ্ধ আদর্শ।

উপনিষদে একটি প্রশ্নোত্তর আছে। ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহনের সামনে দুই ব্রাহ্মণ তর্ক তুলেছিলেন—সামগানের মধ্যে যে রহস্য আছে তার প্রতিষ্ঠা কোথায়। দালভ্য বলেছিলেন—এই পৃথিবীতে স্থূল প্রত্যক্ষই সমস্ত রহস্যের চরম আশ্রয়। প্রবাহন জবাব দিলেন—তাহলে তোমার সত্যাংত অন্তবান্ হলো, সীমায় এসে ঠেকে গেলো যে। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের এই লাভই হয়।

মস্তক মেরা কর ধরা দক্ষ্যা হম্ অগাধ

এই অগাধে দীক্ষাই আমাদের শিক্ষা।
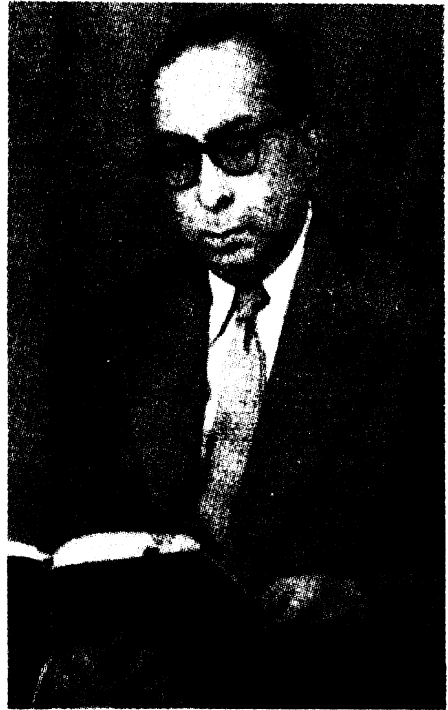
অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র

আমাদের বন্ধু পরলোকগত ডাঃ শিশিরকুমার মিত্রের জীবনীতে এরই কিছুটা প্রতিফলন দেখি। জীবনের প্রথমপাদে নানা বাধা বিপত্তি অর্থ অসাচ্ছল্যের মধ্যে মাতৃ-আশীর্বাদে চলেছেন এক অকুতোভয় নিষ্ঠাবান বিদ্যার্থী—যৌবনে দেখি তাঁকে একজন কর্মসুনিপুণ গৃহস্থ, সাধনা ও

সাফল্যে ভরা—তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণীর সহযোগে গড়ে তুলছেন একটি নীড়—

প্রেম দিয়ে প্রাণ দিয়ে কাজ দিয়ে গান দিয়ে
নবীন সংসার খানি রচিতে হবে যে জানি

তারপর দেখি এক অনাসক্ত প্রৌঢ়কে, বিজ্ঞানতপস্বী, জ্ঞানভিক্ষু, যাঁর চোখে লেগেছে সুদূরের স্বপ্ন—অগ্নি মেখলা রাত্রির, সূর্যস্বাক্ষর ভরা মীনাক্ষী দিনের। তাঁর দৃষ্টি চলে গেছে পৃথিবীর পারে স্তরের পর স্তরে, হয়তো বা গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যেখানে সৃষ্টি পুঞ্জীভূত ক্লান্ত নীহারিকায়, আর শ্রান্ত কালপুরুষ হোরাসের দল গ্যালাক্সীর পিছনে যারা আজও চঞ্চল সীমাহীন ঘূর্ণীতে, যুগল নৃত্যে। তারও পরে দেখেছি একজন প্রবক্তা বিজ্ঞান সাধককে,—বসেছেন আধুনিক কালের নিকুম্ভিলা যজ্ঞশালায়, ধূমজোতি-সলিল-মরুতের যৌগিক সীমানা ভেদ করে মৌলিক আধার ও আধেয়কে খুঁজচেন, ধরবেন নীলাঞ্জন ঘনপুঞ্জছায়ার ভিতর দিয়ে ধরণীতে যে বেতার বাণী আসছে, তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিমাপে, সে বাণী অ্যাস্টারীজ থেকেই আসুক বা সপ্তলোকের শেষ সীমানা থেকে। যতির ধাপে তিনি এগোননি বটে, নিদারুণ পুত্রশোকে তাঁকে বিহ্বলও দেখেছি কিন্তু মনের মধ্যে একজন উদাসী সংযমী ছিল, একটা মরমী অথচ অনাসক্ত সংযতসত্তা ছিল সে কথাও সত্য। মাঝে মাঝে এ ছবির কিছুটা অদল বদল হয়েছে, রংএর গাঢ়তা এসেছে, বর্ণবিন্যাসের কৌশলে হয়তো কর্ম-বিন্যাসের ধারা বদলেছে—তবু ঐ আসল খাঁটি মানুষের প্যাটার্ণটা সেকালের উপনিষদীয় ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বাণপ্রস্থ যতির একালীয় একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ—এক কথায় বলতে গেলে একজন নিষ্ঠাবান আত্মপ্রতিষ্ঠ মানুষ অগাধ যাঁর দীক্ষা।

জন্ম তাঁর শ্রীমতাং গেহে—২৪শে অক্টোবর ১৮৯০। কর্ম তাঁর বিজ্ঞানের সাধনায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞানের তপস্যায় লোকসেবার আদর্শে, মৃত্যু তাঁর প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত কর্মরত অবস্থায়—১৩ই আগষ্ট ১৯৬৩।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে আমাদের দেহাশ্রয়ী মন, ইন্দ্রিয়াশ্রিত বুদ্ধি দেহের দিক থেকেই মিলনে অভ্যস্ত—তাই মৃত্যু এসে যখন সে বিরহ ঘটায় তখন বিচ্ছেদ হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। মৃত্যুতে সত্তার বিনাশ নেই একথা মুখে বলেও আমরা শান্তি পাইনা। কিন্তু আমাদের ঋষিদের কল্পনায় এসেছিল—মৃত্যুই চলে, মৃত্যুই চালায় মৃত্যু র্ধাবতি পঞ্চমঃ—শ্রাদ্ধের দিনে মৃত্যুকে সামনে রেখেই আমরা ভাবতে চেষ্টা করি—মৃত্যু যাঁর ছায়া, অমৃতও তাঁর ছায়া। দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্য ছেড়ে দিয়ে বলা যায় স্থূল জৈবিক ভাবে পিতা যেমন বেঁচে থাকেন পৌত্রপুত্রের মধ্যে বীজরূপে বংশধারায়, তেমনি সদগুরু বেঁচে থাকেন মানস লোকে সূক্ষ্মভাবে শিষ্যের মধ্যে, তাঁর ঘরাণার মধ্যে, তাদের স্মরণে শুধু নয়, কৃতকর্মে। শুধু বুদ্ধ চৈতন্য খ্রীষ্ট রামকৃষ্ণরাই অমর নন, কতো অজানা অনামী মানুষ শুদ্ধসত্বার বীজ-রূপে আজও চিরজাগ্রত মানুষের মনে। শিক্ষাদাতা গুরুরাও সেই অমৃত সুরের মনীষী।

তাঁর কর্মজীবনের বিচিত্রতার কথা কিছু না বললে কাহিনী সম্পূর্ণ হয় না। ১৯১২ সালে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে তিনি এম্, এস্, সি পাশ করলেন, কাজ নিলেন টি এন্ জুবিলী কলেজে ভাগলপুরে—কিছুদিন অধ্যাপনা করলেন বাঁকুড়ায় মিশনরীদের কলেজে। তারপর ডাক এলো বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য কর্ণধার স্যার আশুতোষের কাছ থেকে—যিনি বিজ্ঞান-সাধনার নবপাদপীঠ গড়বার স্বপ্ন দেখছিলেন ভারতের তরুণ বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে, যে স্বপ্নসৌধ নির্মাণে সহায়তা করেছিলেন দুইজন স্বদেশহিতব্রত সুপ্রতিষ্ঠ বাঙালী—স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে যোগ দিয়ে শিশিরকুমার তাঁর মনের মত কাজ পেলেন। কিছুদিন তিনি বিখ্যাত স্যার সি ভি রমনেরও সহকারী ছিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি হলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস্, সি—তারপরে গেলেন ইউরোপ, প্যারিসের সরবোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে. ছাত্র হলেন অধ্যাপক কেব্রির, স্পেকট্রস্কোপিক বা আলোকের বিচ্ছুরণ সম্বন্ধে গবেষণা করলেন, করলেন আলট্রাভায়োলেট রশ্মির বর্ণালী রহস্যের সন্ধান—কাজ করলেন বিশ্ববিখ্যাত মাদাম কুরীর সঙ্গে রেডিয়ো ইন্সটিটিউটে গেলেন জার্মাণীর ফিজিক্স প্রতিষ্ঠানে, আত্মনিয়োগ করলেন রেডিও-ভাল্ভ-সার্কিটের গূঢ় তত্ত্বে। ফিরে এসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক হলেন তিনি, ও পরে ১৯৩৫ সাল থেকে পদার্থবিদ্যায় রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক। রেডিও রিসার্চই

ছিল তাঁর বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয় এবং আরও বিশিষ্টভাবে—আয়নিত আবহমণ্ডল। Institute of Radiophysics and Electronics এবং হরিণঘাটাতে Ionospheric Field Station তাঁরই কীর্তি।

বহু বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ও সাধনার ফল আমরা পেলাম তাঁর বিশ্ববিশ্রুত পুস্তকে—Upper Atmosphere বায়ুরাশি "আয়নিত" হয়ে তড়িৎ পরিবাহক হিসাবে কেমন ভাবে কাজ করে এবং বেতারতরঙ্গকে প্রতিফলিত করে পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়, তারই অপূর্ব ইতিহাস ও গবেষণা তাঁকে জগদ্‌বিজ্ঞানী সভায় অসংশয়িতভাবে স্থান করিয়ে দিলে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি স্বর্গীয় ডাঃ মেঘনাদ সাহার অনুপ্রেরণার কথা এবং সহযোগী কর্মী ও শিষ্যদের সাহায্যের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বইটির প্রকাশের ব্যবস্থা করেন কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি এবং এই বই পৃথিবীর ঊর্ধাকাশ—বিষয়ক গবেষণার একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে স্বীকৃত। আমি নিজে আমেরিকার বিদ্বজ্জনসমাজে এই বইটির বহুল প্রশস্তি শুনেছি এবং সবাই জানেন যে সোভিয়েট রাশিয়া এই বইটিকে অনূদিত করিয়ে তাঁদের দেশের বিজ্ঞানীদের জ্ঞান লাভের পথ সুগম করে দিয়েছেন।

অন্যতম সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী পরলোকগত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বিশ্বভারতী পত্রিকায় ডাঃ শিশিরকুমার মিত্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে চমৎকার বিবরণ দিয়েছিলেন তাহাই উদ্ধৃত করছি—Appleton, উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের যে অংশ আয়নিত হয় তাতে দুটি পৃথক পৃথক স্তর আছে। (বলেছেন) যেখানে আয়নরা বেশী রকমের ঘনীভূত হয়েছে। এই দুই স্তরের নাম দেওয়া হল E এবং F স্তর। E প্রায় একশো কিলোমিটার উঁচুতে অবস্থিত আর F স্তর আছে ২০০ থেকে ২৫০ কিলোমিটার উর্ধে। শিশিরকুমার মিত্র E স্তরের নীচে, ভূপৃষ্ঠ হতে ৬০ কিলোমিটার উঁচুতে আর একটি স্তরের সন্ধান পেলেন। অ্যাপলটন এই স্তরের নাম দিলেন 'ডি' স্তর। এই স্তর কেবলমাত্র দিবালোকে গঠিত হয়, রাত্রে বিলুপ্ত হয়। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বড় হলে, এই স্তরে তা প্রতিফলিত হয়, মাঝারি বা ছোট হলে প্রতিফলন হয় না।

কবি গেয়েছেন—

অসীম আকাশে মহাতপস্বী মহাকাল আছে জাগি
আজিও যাহারে কেহ নাহি জানে
দেয়নি যে দেখা আজো কোনো খানে
সেই অভাবিত কল্পনাতীত······
মহাকাল আছে জাগি

বিজ্ঞানীরাও কবিমনীষী—তাঁরাও দেখেন দেবতাদের কাব্য দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি। বিজ্ঞানী শিশিরকুমারও মহাপ্রকৃতির বিরাট বীক্ষণাগারে দিনে রাতে যে সব ঘটনা ঘটছে তারি একটু রহস্য ধরবার চেষ্টা করেছেন।

এতক্ষণ বৈজ্ঞানিক শিশিরকুমারের কথাই বললাম। কিন্তু মানুষ শিশিরকুমারকেও দেখেছি বহুদিন নানারূপে। দেখেছি তাঁকে কর্মব্যস্ততার মধ্যে, এশিয়াটিক সোসাইটিতে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেট সভার সহযোগী সদস্য হিসাবে, পশ্চিম বাংলার সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের কর্ণধাররূপে, কিন্তু তারও বেশী দেখেছি তাঁকে রবীন্দ্রসরোবরের মনোরম পরিবেশে চক্র বৈঠকের বৈঠকী সভায়—যে চক্র বৈঠক কবিগুরুর অমৃত নিস্যন্দিনী ভাষায় নন্দিত ও নিন্দিত দুইই হয়েছিল। সেখানে দেখেছি তাঁকে গম্ভীরতার "এপ্রণ" খুলে প্রকৃতির শ্যামশ্রী ল্যাবোরেটারীতে বসে গল্পগুজবে একটা প্রীতি স্নিগ্ধ সরস আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এক মেজাজী মৌতাত গড়ে তুলতে। কতদিন এই কঠোর বৈজ্ঞানিককে দেখেছি অরবিন্দতত্ত্বের গভীর তাৎপর্যে মনোনিবেশ করতে, দেখেছি রবীন্দ্রকাব্যের ও সংগীত সুধারসে আকণ্ঠ মগ্ন হতে, দেখেছি বাংলা সাহিত্যের কতোদিক নিয়ে আলোচনা করছেন, দেশ বিদেশের খবর দিচ্ছেন, গল্প বলছেন। মন পূর্ণ হতো, হৃদয় সরস হতো, কর্ণ তৃপ্ত হতো সে সব আলোচনায়, আর তারই মধ্যে তাঁর রসিক মনকে আমরা খুঁজে পেতুম—সেটি আকাশ বাতাস বায়ু চাপের নৈর্ব্যক্তিক রূপ নিয়েই ব্যস্ত থাকতোনা, মাটির মানুষের সামান্য সুখ-দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষাতেও ছন্দিত হতো।

বাংলাদেশের নামকরা মানুষরা, যাঁরা বিদেশে গিয়ে দেশের জন্য জয়পতাকা এনেছেন তাঁদের সংখ্যা কমে আসছে। উনবিংশ শতাব্দীর মহানদের পরে এঁদের

কয়েকজনকে আমরা পেয়েছিলাম যাঁদের নাম ভাঙিয়ে আমরা গর্ব করতে পারতাম—বাঙালী, ভারত তথা বিশ্বসভায় খর্ব নয়—কিন্তু ক্রমশঃ সেদলেও ভাঙন লেগেছে, তাই প্রশ্ন উঠছে হৃদয় মথিত হয়ে—ততঃ কিম্—সে অমৃতভাণ্ড বহন করবে কারা। পূর্বসূরীদের বিনম্র অভিবাদন জানিয়ে তবু আমরা আশা করে যাবো আমাদের উত্তর পুরুষদের জন্য, তারা যেন আরো মহৎ হয়, বৃহৎ হয়, জ্ঞানী হয়, বিজ্ঞানী হয়, কর্মী হয়, মরমী হয় আর বলে যাবো—

হে আমার অগ্রজের দল, লোক লোকান্তরে
তোমাদের যাত্রা বিচিত্র পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক্
যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকম্
তত্র আবর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে

তোমাদের মনকে, কর্মকুশলতাকে, যা দূরে চলে গেছে আমরা আবাহন করি, প্রণাম করি—

জীবনে মরণে পথের শরণে দুনিয়ার যত পদাতিকদের একটি প্রণাম লহ।

প্রথম বাঙালী মহিলা কবি

স্বপনকুমার বসু

আজিও ফুলেশ্বরী নদী কুলু কুলু বয়ে যায়। তার ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে চলে কত ব্যথা, কত গান, কত না পুরণো দিনের কথা। সেই সঙ্গে ভেসে চলে চন্দ্রাবতীর সেই দুঃখের কথা—প্রথম বাঙালী মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর কথা।

সে আজ কত দিনেরই বা কথা! ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। পাতুড়িয়া গ্রামের এক বাগান। কাল প্রভাত। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে তুলতে এসেছে ফুল। মেয়েটি গ্রামেরই, ছেলেটি কিন্তু ভিন্ন গ্রামের। মেয়েটি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি তো এ গাঁয়ের ছেলে নও তবে রোজ কেন এস ফুল তুলতে?'

ছেলেটি উত্তর দেয়, 'নাইবা হলাম গাঁয়ের ছেলে, এই নদীরই অপর পারে আমাদের বাড়ি।'

ক্রমে দুজনের মধ্যে বাড়লো ঘনিষ্ঠতা, হৃদয়ে হলো প্রেমের সঞ্চার। জয়চন্দ্র চন্দ্রাকে জানালেন চন্দ্রাকে না পেলে তাঁর জীবন যাবে ব্যর্থ হয়ে। চন্দ্রাবতীও জয়চন্দ্রকেই স্বামী বলে মনে মনে বরণ করলেন।

ঘটক এসে চন্দ্রার বাবার কাছে জয়চন্দ্রের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর বিয়ের প্রস্তাব করলো। তিনিও সানন্দে সম্মতি দিলেন। বিয়ের দিন সকাল থেকেই বরের বাড়িতে মহা ধুমধাম। চারিদিকে আনন্দোচ্ছ্বাস। হঠাৎ খবর এলো জয়চন্দ্র মুসলমান হয়ে এক মুসলমান কন্যাকে বিয়ে করেছেন। এক মুহূর্তে সব আনন্দ উৎসব গেল থেমে। চন্দ্রাবতীর সখীরা চন্দ্রাবতীকে ঘিরে বিলাপ করতে লাগলো, কিন্তু সে নির্বিকার।

ক্রমে দিন যায়। চন্দ্রার মনে ভেসে ওঠে সেই সুখের দিনগুলির স্মৃতি। কত না কথা, কত না আশা, কত না আনন্দে ঘেরা সেই দিনগুলি। আবার নানা জায়গা থেকে চন্দ্রার বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগলো। কিন্তু চন্দ্রাবতী পণ করলেন তিনি চিরজীবন কুমারী হয়ে থাকবেন। তখন তাঁর বাবা তাঁকে শিবপূজো করতে ও রামায়ণ অনুবাদ করতে বললেন। চন্দ্রাবতী বাবার কথামতো রামায়ণ অনুবাদ করে চললেন।

এমন সময় জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতীকে এক বিরাট চিঠি লিখলেন। তিনি জানালেন, যে মুসলমান মেয়েটিকে তিনি বিয়ে করেছিলেন সে তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। চন্দ্রাবতীর কাছে ক্ষমা চাইবার মুখ তাঁর নেই, তিনি শুধু চন্দ্রাবতীকে একবার চোখের দেখা দেখতে চান।

চন্দ্রাবতী পড়লেন উভয় সঙ্কটে। কি করবেন তিনি? একদিকে সমাজের অনুশাসন আর একদিকে হৃদয়ের টান। তিনি বাবাকে সব কথা জানিয়ে তাঁর পরামর্শ চাইলেন। তাঁর বাবা কঠোরভাবে জানিয়ে দিলেন যে বিধর্মীর সঙ্গে কোনমতেই সাক্ষাৎ করা চলবে না। চন্দ্রাবতী জয়চন্দ্রকে চিঠিতে সেই কথা জানিয়ে দিয়ে মন্দিরের দুয়ার বন্ধ করে মহাদেবের শরণ নিলেন।

উত্তর পেয়ে জয়চন্দ্র পাগলের মতো হয়ে চন্দ্রাবতীর কাছে এলেন। কিন্তু চন্দ্রাবতী তখন মন্দিরের দ্বার বন্ধ করে গভীরধ্যানে মগ্ন। বার বার তিনি দুয়ারে আঘাত করে বললেন, 'চন্দ্রা শোন শোন। আমি তোমার কাছেই এসেছি।' কিন্তু উত্তর পেলেন না। শেষ পর্যন্ত রাঙা ফুলের রসে মন্দিরের দুয়ারে নিজের শেষ ইচ্ছের কথা লিখে জয়চন্দ্র নদীতে আত্মবিসর্জন করলেন।

ধ্যান শেষ করে উঠে চন্দ্রাবতী বাইরে এসে সব দেখলেন, শুনলেন। এই আঘাত তিনি সহ্য করতে পারলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই জয়চন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে তিনি যাত্রা করলেন এক অজানা অচেনা রহস্যালোকের পানে।

এই চন্দ্রা বা চন্দ্রাবতীই হলেন বাংলার প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী ভট্টাচার্য। তাঁর জীবন কাহিনী গল্প উপন্যাসের মতো, চিত্তাকর্ষক হলেও এ কবি কল্পনা নয়, একান্তভাবেই ঐতিহাসিক সত্য। চন্দ্রাবতীর বাবার নাম বংশীবদন ভট্টাচার্য। ইনি প্রসিদ্ধ মনসামঙ্গল কাব্য রচয়িতা। চন্দ্রাবতীও বংশীবদনের মনসামঙ্গলের কতক কতক অংশ রচনা করেন। চন্দ্রাবতীর মায়ের নাম সুলোচনা বা অঞ্জনা। বাবার আদেশে জয়চন্দ্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পর চন্দ্রাবতী রামায়ণের বঙ্গানুবাদ শুরু করেন, কিন্তু তিনি তা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। রামায়ণের ভূমিকায় চন্দ্রাবতী অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় নিজের আত্মজীবনী রচনা করেছেন।

শ্রদ্ধেয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত মৈমনসিংহ গীতিকার চন্দ্রাবতীর 'মলুয়া' নামে একটি কাব্য পাওয়া যায়। ভাব, ভাষা ইত্যাদি সকল দিক দিয়ে বিচার করলে, 'মলুয়াকেই চন্দ্রাবতীর শ্রেষ্ঠ রচনার সম্মান দিতে হবে। মলুয়া ও চাঁদবিনোদের প্রণয়ই এই কাব্যটির মূল উপজীব্য। এই কাব্যটির স্থানে স্থানে কবি যে ভাষায় ভাব প্রকাশ করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। যেমন চাঁদ বিনোদের সঙ্গে প্রথম দেখা হবার পর মলুয়ার মনের ভাব,

'ভিনদেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন।
লাজ রক্ত হৈল কন্যার প্রথম যৌবন।'

কাব্যটির শেষাংশটিও অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ,

"এই সাগরের পার নাই, ঘাটে নাই খেওয়া।
পূবেতে সজিল দেওয়া ছুটল বিষম বা।
কইবা গেল সুন্দর কন্যা, মন পবনের না।'
সত্যিই অপূর্ব সুন্দর!

প্রাচীন বাংলা কাব্যে যে সব মহিলা কবির সাক্ষাৎ আমরা পাই তার মধ্যে চন্দ্রাবতী নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠা। আজ তিনি অবজ্ঞাত হলেও বাঙালীর জীবননাট্যে অগম্যপারের চন্দ্রাবতী যে অক্ষয় আসনের অধিকারিনী তা থেকে আমরা কোনদিনই তাঁকে বঞ্চিত করতে পারবো না!

মহাপ্রাণ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অনলস কর্ম্মী তুমি, সাধু ব্যবসায়ী—
সাধুতাই শক্তি তব তোমাকেই চাহি।
পবিত্র করিলে কুল ধন্য মাতা পিতা
তোমার গোপন দানে পল্লী দীপান্বিতা।
অতি 'মিতব্যয়ী'—নাহি অভিমান হায়
মুক্ত হস্ত শুধু দেশ দশের সেবায়।

অকপট ভক্তি তব—হে গৃহী বৈষ্ণব—
হৃদে রাধা-মাধবের অনন্ত উৎসব।
নামের আকাঙ্ক্ষী নও, হরি নামে রুচি,
মানের কাঙালী নও, মনে প্রাণে শুচি।
তিনি গৃহস্বামী তুমি সেবক তো খালি—
নৈবেদ্য করিয়া দেহ তব গৃহস্থালী।

আজ তুমি ধন্য ধনী, কিবা চাও আর?
নীলমণি ধন লয়ে তব কারবার।

দানবীর শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র দে'র প্রতি
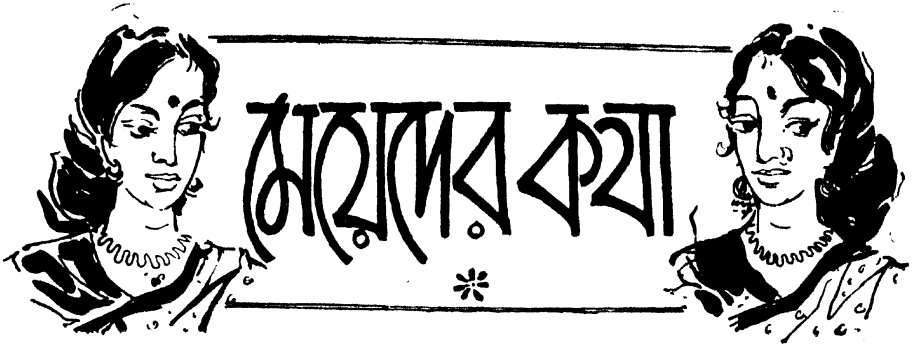
নারী শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ

নির্বাণপ্রিয়া

"আমরা কি মানুষ! তন্ত্র বলিতেছেন—কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ। ছেলেদের যেমন ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করিয়া বিদ্যাশিক্ষা হইবে, তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে। কিন্তু আমরা কি করিতেছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পার? তবে আশা আছে, নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।" স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে কী কঠিন সাবধান বাণী! কী ভীষণ সত্য!

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি যে কত অবহেলা তাহা দেখিয়া তিনি বড়ই মর্মাহত হইয়াছিলেন। শুধু তাই নহে, ছেলেদের শিক্ষাপদ্ধতির উপরেও তিনি মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। পরাধীন ভারতের শিক্ষা পদ্ধতির নির্ভীক সমালোচক ছিলেন স্বামীজী।

যে শিক্ষায় দেহ-মন-আত্মার বিকাশ হয় না. যে শিক্ষায় দেশের সকল মানুষের কোন উপকার হয় না, তিনি তাহাকে শিক্ষা বলিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি শুধু ভারতবাসীর নয়, সমগ্র জগতের মানুষের সুশিক্ষার কথা ভাবিয়াছেন, নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন কিভাবে মানব শিশুকে সত্যিকার মানুষে পরিণত করা যায়।

শিক্ষা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া স্বামীজী সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। আর প্রয়োজনের তুলনা অনুসারে মনুষ্যজগতের সকল কার্যকে শ্রেণী বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—

(১) যে-সকল কার্য দ্বারা আত্মরক্ষা হয়।

(২) যে সকল কার্য অপরোক্ষভাবে জীবনোপায় সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়া পরোক্ষভাবে আত্মরক্ষা করে।

(৩) যাহা দ্বারা সন্তান পালন সম্পন্ন হয়।

(৪) যাহা দ্বারা সামাজিক অবস্থা যথাযথ সংরক্ষিত হয়।

(৫) কতকগুলি মিশ্র কার্য যাহারা জীবনের অবসর ভাগ অধিকার করিয়া আমোদ ও সুখেচ্ছা চরিতার্থ করাইয়া পর্যাবসিত হয়।

তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে এ সকল কার্য সম্পন্ন করার জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক বিজ্ঞান। তিনি বলিয়াছেন, "যদি জীবন সুনিয়মে রক্ষা করিতে হয়, তবে শিক্ষা কর বিজ্ঞান। যদি জীবিকা নির্বাহ রূপ অপরোক্ষ প্রাণ রক্ষা শিক্ষা করিতে হয়, শিক্ষা কর বিজ্ঞান। যদি সমাজের একটি প্রকৃত অঙ্গ হইতে চাও তবে শিক্ষা কর—বিজ্ঞান। যদি প্রাণ মন বিমোহন সঙ্গীত শিল্পাদি শিখিতে চাও, তবে শিক্ষা কর—বিজ্ঞান।"

মানব-শিশুর প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে স্বামীজী তিন ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন—জ্ঞানশিক্ষা, নৈতিকশিক্ষা ও শারীরিকশিক্ষা। এই ত্রিবিধ শিক্ষা সম্পূর্ণ না হইলে একটি প্রকৃত মানুষ গঠিত হইতে পারে না। জ্ঞানশিক্ষা-দানের প্রণালী সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছেন—"প্রথমতঃ

শৈশবাবধি আজীবন অধিকাংশ শিক্ষা আপনার চেষ্টায় হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত সমস্ত শিক্ষা আনন্দদায়ক হইবে। শিক্ষা সহজ হইতে জটিল, অপরিস্ফুট হইতে উজ্জ্বল, মিশ্র হইতে শুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক—যদি মনোবিজ্ঞানের মত হয়, তাহা হইলে স্বাবলম্বন এবং আনন্দ সহকারে শিক্ষা হইয়াছে কিনা, এই দুইটি ইহার পরীক্ষা স্বরূপ।"

নৈতিকশিক্ষা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া স্বামীজী সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে "বর্বর ব্যবহার বর্বর মনুষ্য উৎপাদন করে, এবং শান্ত ব্যবস্থা শান্ত মনুষ্য উৎপাদন করে।" ......মনে করিও না যে, সকল বালক শুদ্ধ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যেক সভ্য শিশু-বাল্যকালে প্রাচীন অসভ্য পূর্বপুরুষদিগের স্বভাব প্রদর্শন করে।......প্রত্যেক দোষের স্বাভাবিক প্রতিফল বালককে প্রদান করিয়া তোমার স্বভাব অনেক পরিমাণে অবিক্ষুব্ধ থাকিবে। আজ্ঞা প্রদান যত অল্প পার করিবে।......স্মরণ রাখিও যে তোমার উদ্দেশ্য একটি আত্ম-শাসনক্ষম মনুষ্য চরিত্র গঠন করা, অপরের দ্বারা গঠিত হইবে, এরূপ গঠন করা উদ্দেশ্য নহে, যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে স্বাবলম্বন করিতে দিবে।...

শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া স্বামীজী দুঃখ করিয়াছেন যে, আমাদের সমাজের মানুষেরা পশুর স্বাস্থ্য নিয়া যতটা চর্চা করিয়া থাকে, মানব শিশুর স্বাস্থ্য নিয়া ততটা করে না। শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে নজর না দিলে শিশুর শিক্ষা সম্ভব নয়। শিশুকে পরিমিত আহার দিতে হইবে, যথাসম্ভব আমিষ খাদ্য দিতে হইবে। কারণ স্বামীজী নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিয়াছেন—

"আমরা ছয়মাসকাল নিরামিষ ভক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি যে ইহা দ্বারা মানসিক এবং শারীরিক শক্তি কমিয়া যায়।"

লক্ষ্য করিতে হইবে যে শিশু যেন অতিরিক্ত মানসিক শ্রম না করে, কারণ, "অতিরিক্ত পাঠের দ্বারা যে কেবল শরীরের হানি হয়, এমত নহে, মস্তিষ্কেরও অনেক ক্ষতি হয়।" মোটের উপর শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শ্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে, যাহাতে শরীর ও মন উভয়ই সুগঠিত হইতে পারে।

মেয়েদের শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামীজী বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন :—যে রকম শিক্ষা চলিতেছে, সে রকম নয়। সত্যিকার কিছু শিক্ষা চাই। খালি বই পড়া শিক্ষা হইলে চলিবে না। যাহাতে চরিত্র গঠন হয় মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে, এই রকম শিক্ষা চাই। ঐ রকম শিক্ষা পাইলে মেয়েদের সমস্যা মেয়েরা আপনারাই সমাধান করিবে। আমাদের মেয়েরা বরাবর প্যানপ্যানেভাবই শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে। একটা কিছু হইলে কেবল কাঁদিতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। এসময়ে তাহাদের মধ্যেও আত্মরক্ষা শিক্ষা করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে, দেখ দেখি, ঝাঁসির রাণী কেমন ছিলেন!"

সকলের উপর স্বামীজী ধর্মশিক্ষার স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন, "শিক্ষাই বল আর দীক্ষাই বল ধর্মহীন হইলে তাহাতে গলদ থাকিবেই থাকিবে। এখন ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করিতে হইবে। ধর্ম ভিন্ন, অন্য শিক্ষা গৌণ হইবে। ধর্মশিক্ষা, চরিত্র গঠন, ব্রহ্মচর্য ব্রতোদযাপন, এইজন্য শিক্ষার দরকার।"

বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে সংকট উপস্থিত হইয়াছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় নিত্য নূতন পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। সত্যিকারের কোন মঙ্গল ইহার দ্বারা সাধিত হইবে কিনা কেহ বলিতে পারে না। শিক্ষা ব্যবস্থার ভার আজ যাঁহাদের হাতে তাঁহারা স্বামীজীর নির্দেশগুলি মনে রাখিয়া সকল শিশুদের দেহ, মন ও আত্মার বিকাশের ব্যবস্থা করিলে দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন হইত।

—ঃ সুমাগধার সাধনা ঃ—

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

নীল আকাশের দিকে আর একবার দুই কালো চোখের দৃষ্টি তুলে অস্ফুট স্বরে বিস্মিত অন্তরে বলে উঠলো সুমাগধা—ইনিই বৃষভদত্ত!

শুভ্র পট্টবস্ত্রে সজ্জিত দেহ এক কান্তিমান্ যুবক শ্রাবস্তীর পথ দিয়ে চলেছেন। তাঁর রত্নখচিত উষ্ণীষ সূর্য্যের কিরণে দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। দিব্যদেহ ঐ তরুণের রূপের ছটায় যেন উজ্জ্বল হ'য়ে গিয়েছে শ্রবস্তির

রাজপথ। অসাধারণ রূপবান্। মনে হয়, কোন রাজ্যাধিপতি নরশ্রেষ্ঠ, উঠে দাঁড়ায় সুমাগধা, আশায় উৎফুল্ল হয়ে ভাবে—সুমাগধার জীবনের সাথী হতে পারে, এই তো সেই রমণীয় তনু যুবাপুরুষ! কে এই কুমার?

কৌতুকে ভ্রূভঙ্গী ক'রে সখী মাধবী জিজ্ঞাসা করে "কি দেখছ সখি?"

উঠে দাঁড়ায় সুমাগধা। মাধবীর কাছে এসে বলে "এই যুবকের পরিচয় জান কি সখি?"

—"জানি না, অনুমান ক'রতে পারি।"

—"কে?"

—"বোধহয় পুণ্ড্রনগরের বণিকশ্রেষ্ঠ সার্থনাথের পুত্র বৃষভদত্ত। শুনেছি শ্রেষ্ঠীদের পক্ষথেকে তিনি আজ রাজদর্শনে যাবেন।"

আড়াই হাজার বৎসর আগেকার কথা। পুণ্ড্রনগর তখন ছিল বাংলা দেশের রাজধানী, তার ধনের মানের বিত্তার গৌরব তখন কে না জানতো? করতোয়া নদীর যে স্থান পৌষ সংক্রান্তির দিন তীর্থ হয়ে উঠে, যে স্থানের তীরে তীরে দেব দেউলের সমারোহ, আর নীচে অবিরল ধারায় বয়ে চলেছে যোজন বিস্তৃত প্রবাহ, সেই পুণ্ড্রনগর বারানসীর মতই পবিত্র। তার আঁকা-বাঁকা পথের ধারে বড় বড় বাড়ি। কোনটায় মন্ত্রী থাকেন—কোনটায় সেনাপতি থাকেন—কোথাও থাকেন রাজপুরোহিত, আর কোথাও থাকেন কবি। কোন বাড়ির সিংহদ্বারে শঙ্খের ফুল, শঙ্খের লতা, শঙ্খের ফল, শঙ্খের পাতা বসানো—সূর্য্যের আলোয় ঝক্ ঝক্ করে।

পুণ্ড্রনগরের রাজপথের দুইধারে সারি সারি দোকানের পর দোকান। হাজার তাঁতী বাজার ভ'রে মসলিন বুনে রেখেছে—চিকন শাড়ীর পাড়ের গায়ে জরির লতা বুনিয়েছে। মহামূল্য ব'লে বিদেশীরা তা' মাথায় ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। তখন বাংলায় এত সূক্ষ্ম সাড়ি আর মসলিন তৈরী হতো যে, লোকে কথায় বলতো—'সাত পোষাকে লাজ যায় না।' চৈনিক পরিব্রাজক ওয়ান্ চোয়াং যখন এদেশে আসেন, তখন তিনি পুণ্ড্রনগরের গরিমা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

সার্থনাথ ছিলেন তখনকার দিনে পুণ্ড্রনগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বণিক্। তাঁর শতেরও বেশী বাণিজ্যতরী—গঙ্গা করতোয়া থেকে নীল সমুদ্র পর্যন্ত তাদের গতিবিধি, যখন এই সকল তরণী সাদা পাল তুলে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সমুদ্রযাত্রায় অগ্রসর হয় তখন মনে হয় একদল রাজহাঁস যেন পাখা মেলে নীল আকাশে ভেসে চলেছে।

তাঁরই কুলতিলক ঐ কুমার?

নীল আকাশের দিকে আর একবার দুই কালো চোখের দৃষ্টি তুলে বিগলিত স্বরে বলে উঠলো সুমাগধা—"ইনিই বৃষভদত্ত?"

থম্‌কে দাঁড়ায় আর তাকিয়ে থাকে সুমাগধা, এক সুমধুর লজ্জার আবেশে শিহরিত হয় সুমাগধার মন প্রাণ। একহাতে চেপে ধরে সে তার নিবিড় কেশদাম, আর অন্যহাতে ধরে তার বসনের অঞ্চল, ধীরে ধীরে যৌবনের প্রথম লজ্জায় নতমুখে বৃষভদত্তের দিকে দৃষ্টিরেখে সতৃষ্ণ নয়নে সে তাকিয়ে থাকে।

দেখ্‌তে ইচ্ছা করে আরও ভাল ক'রে। মন বলে সুমাগধার; যাও কুমারী সকল সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে একেবারে তার দুই চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়াও আর নৃত্যভঙ্গিমায় বন্দনা জানিয়ে একটি কটাক্ষে তাকে জয় ক'রে এসো।

কিন্তু আর এগিয়ে যেতে পারে না সুমাগধা। সলজ্জ কুণ্ঠায় তার পায়ে পায়ে বেধে যায়।

ফিরে যায় সুমাগধা। আর অন্দরের দ্বারপ্রান্তে এসেই হঠাৎ স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ে; শুন্‌তে পায়—নিভৃতে আলাপ করছেন পিতা ও মাতা—সুমাগধাকে পুত্রবধূরূপে পাবার প্রার্থনা জানিয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন সার্থনাথ।

কামনার অবরুদ্ধ আকুলতা বন্যার মত নেমে এল, দলিতাঞ্জন চোখ দুটি ছাপিয়ে দিয়ে ঝ'রে পড়্‌তে লাগল। সকল কামনার উপহার কি এই অশ্রু?

বিস্মিত বেদনায় শুন্‌তে পায় সুমাগধা পিতার উত্তর—"বাঞ্ছনীয় প্রস্তাব সন্দেহ নেই; কিন্তু আমার উপায়ও নেই। কন্যার জন্মকালে তথাগতের পায়ে তাকে নিবেদন করেছি।"

কেঁদে ওঠেন সুমাগধার জননী—"না, কখনই না। আমার সুখলালিতা স্নেহের পুতুলীকে চিরবাস সম্বল ভিক্ষুণী হ'তে দিতে পারব না।"

বেদনা বিচলিতস্বরে উত্তর দেন পিতা—"উপায় নেই, তথাগতের কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, বলেছিলাম তাঁকে। তাঁরই সেবাতে উৎসর্গ ক'রবো আমার কন্যা।"

কক্ষে প্রবেশ করে সুমাগধা। মাতা ও পিতাকে বিস্মিত ক'রে বলে—"প্রতিজ্ঞা পালন করুন, পিতা।"

—"তুমি জান কিসের সে প্রতিশ্রুতি?"

"হাঁ, সবই শুনেছি পিতা, ভগবান তথাগতের কাছে আপনার প্রতিশ্রুতি। তথাগতের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। বাংলাদেশে গিয়েও আমি ক'রব তাঁরই সেবা—আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা হবে।"

সুমাগধার আনন্দদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হ'ল তার পিতা। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন তার মাতা।—অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মাধবী। বাংলাদেশে গিয়ে, ধনাঢ্য বণিকের কুলবধূ হ'য়ে, কি ক'রে সে ক'রবে তথাগতের সেবা—পিতার প্রতিজ্ঞাপালন? বিবাহিত হ'লে সংসারের জটিলতায়, ক্লেশপঙ্কে বাধা পাবে তথাগতের সেবা। সংসারের সকলের মধ্যে বেছে নিয়ে বিশেষ একটি ব্যক্তিকে দয়িতরূপে আপন ক'রতে গিয়ে তথাগতকে ভুলে যেতে হবে। কিন্তু সুমাগধার মুখ দেখে, তার অধরের কোণে হাসি দেখে মনে হয় যেন অংশুকবসনে সজ্জিত, চন্দনকুঙ্কুমে রঞ্জিত এক প্রেমিকা তাপসী; প্রেমের পরিপূর্ণ সফলতার পথ দিয়ে তপস্যার ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে।

আর বাধা দিলেন না পিতা।

শুভক্ষণে বরকনে ফিরে এলেন পুণ্ড্রনগরে; হাঙ্গরমুখো পাল্কীতে। পাল্কীর আগে ঢোলের সাথে কাঁশি বাজে, সানাই বাজে সাথে সাথে। হাজার হাজার ফুলের ঝাড়ে, শোলায় গড়া কাগজের ফুলে আলো জলে কত! যেন শতেক তারার মণিহার।

সুমাগধার মুখ দেখে শাশুড়ী বল্লেন—বৌমা আমার ঘরের লক্ষ্মী; আঁধার ঘরের মাণিক! তোমার পুণ্যে আমার বংশ পবিত্র হোক্।"

সার্থনাথের বাড়িতে সেদিন পুণ্ড্রনগরের যত মেয়ে বৌ উপস্থিত হয়েছেন। কেউ ছেলে কোলে, কেউ ছেলে কাঁখে, কেউ বা আবার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের হাত ধরে—নানা রংএর শাড়ি পরে' ঘোমটা টেনে এসেছেন। বাড়ির উঠানে, বারান্দায়, জানালায়, দরজায়, শুধু ঘোমটা-ঢাকা মুখ। তাঁরা নূতন বৌ দেখ্ছেন, আর ভাবছেন,—আমার ছেলের বৌ-ও যদি এমনি হয়, তবে কতই সুখ, কত আনন্দ!

ফুলশয্যার রাত্রে সুমাগধার কক্ষে উপস্থিত হলো বৃষভদত্ত। লজ্জায় আনতদৃষ্টি দুটী অপরূপ চোখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলো সে।

এ রূপ বুঝি কবির কল্পনাতেই চিত্রিত হয়, আর ফুটে ওঠে প্রেমিকের বাসনা রঙিণ মনের পটে।

সারা কক্ষ পুষ্পে পুষ্পে বর্ণোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। ফুলের সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত। চারিদিকে অগুরু-চন্দনের সমাবেশ, সুগন্ধির ধারা বর্ষণ। আর তার মাঝে ইন্দ্রাণীর মত রূপ ঐশ্বর্য্যে ভূষিতা সুমাগধার লাজনম্র হাসি।

মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো বৃষভদত্ত।

রাত ঘন হলো। থামলো উৎসবের কোলাহল। দূর থেকে বেহাগ রাগিণীর একটি মধুর সুর শুধু ভেসে আস্‌ছে তখন নহবৎখানা থেকে।

সুমাগধার বাহুবন্ধনে ঘুমিয়ে পড়লো বৃষভদত্ত।

কিন্তু সুমাগধার চোখে ঘুম নামে নি। আকাঙ্ক্ষিত-দয়িতের বরমাল্য পেয়েছে সে। দয়িতেরই বাহুবন্ধনে শুয়ে আছে সে। কিছুক্ষণ আগেও চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল তার মুখ—মন ভরে উঠেছিল প্রেমের বিহ্বলতায়, আর কানে বাজছিল দয়িতের মধুর কূজন। কিন্তু স্বামী ঘুমিয়ে পড়লেও তার চোখে ঘুম আসে নি।

এক নূতন জীবন শুরু ক'রতে চলেছে সুমাগধা। আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মত গৃহধর্ম্মই তার একমাত্র কাম্য নয়। পিতার নিকট যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আকাঙ্ক্ষিত দয়িতকে লাভ করেছে সে, সেই প্রতিশ্রুতি যেন বিবাহের সঙ্গেই শেষ হয়ে না যায়। তথাগতের ধর্ম্মকেই সত্যবলে মনে করে সুমাগধা; তাই পিতার আদর্শকে পতির জীবনে জালিয়ে তুলতে চায়।

দিন চলে যায়। নূতন বৌ সুমাগধা দু'দিনেই সকলের মন কেড়ে নিল। দু'দিন আগেও যে সংসারে সে ছিল একান্ত অপরিচিত, সেই সংসারে তাকে বাদ দিয়ে আর কোন কাজই হয় না। নূতন বৌ ফুল না তুললে পূজায় শ্বশুরের মন বসে না। বৌমার হাতের পরশ বিনা শাশুড়ীর

নৈবেদ্যর থালি সাজে না। না বলতেই সে সংসারের এক-খানা কাজ সেরে দশখানা করে।

বাড়ির বুড়ি ঝি রেগে বলে—"বৌমা বিচার কর! দশগণ্ডা দাসী তোমার কড়ি নিতে দেখি। কিন্তু কাজের বেলা একা আমি! ওদের রেখে কাজ কি?"

সুমাগধা হেসে বলে—"করুক, করুক, একটু বিশ্রাম করুক। ওরা পেটের দায়ে এসেছে বলে কি দিনরাতই খাটবে? তুমিও আজ বিশ্রাম কর। হাতের কাজটুকু আমিই সেরে নিচ্ছি।

আর বৃষভদত্ত! সুমাগধাকে পেয়ে সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে। সুমাগধা তার সৌভাগ্যের পরম-দান। রাত্রির অন্ধকারে চারিদিক যখন নিশ্চুপ, নিথর, তখন সুমাগধার পাশে বসে তাকে হাতের মধ্যে টেনে নেয় সে। এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে তার দিকে যেন তার মাঝে নূতন কিছু দেখতে পেয়েছে সে! যা আর কেউ কখনো দেখেনি! আর তার দৃষ্টির মায়ায় ধীরে ধীরে সুমাগধার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসে। আরামের আবেশে তার চোখ দু'টী বুঁজে যায়।

মনে ভাবে সুমাগধা, এই তো জীবনের পাথেয়! এই তো জীবনের আনন্দ। এ অঘটন ঘটলো কেমন ক'রে? আমি ধন্য। সার্থক আমার প্রেম।

স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে তার বুকে মুখ লুকিয়ে সুমধুর বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে থাকে সে। অবশ, বিহ্বল।

এমনি করেই দিন যায়। মনেও থাকে না সুমাগধার, পিতার কাছে দেওয়া তার প্রতিশ্রুতির কথা।

ভোর হয়ে এসেছে। দিনের প্রথম আলোর বন্যায় বাগানের গাছগুলো মর্ম্মরিত আনন্দে গা মেলে দিয়েছে। উজ্জ্বল জরদা রঙের আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে—গাছের মাথায়, শাখায়, পাতায়।

প্রত্যুষে উঠে সাজি হাতে ফুল তুলছিল সুমাগধা। হঠাৎ দেখল, পুণ্ড্রনগরের রাজপথে কয়েকজন উলঙ্গ সন্ন্যাসী। ভয়ে লজ্জায় ঘরে ছুটে এলো সে।

শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করেন—"কি হলো বৌমা।"

সুমাগধা প্রশ্ন করে—"ওরা কে মা? উলঙ্গ হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?"

—"ওরা যাজ্ঞিক সন্ন্যাসী। উলঙ্গ হয়েই থাকে।"

বলে ওঠে সুমাগধা—"এ তো ঠিক নয়। সংসারীদের সাথে মিশবে যারা, তাদের সংসারের রীতিনীতি মেনেই চল্‌তে হয়। নইলে ওঁদের উচিত বনে জঙ্গলে থাকা।"

—"এই ত চলিত প্রথা মা।"

সুমাগধা বলে—"বা রে! প্রথা আবার কি? সাধু হবেন তিনিই যাঁকে দেখে লজ্জা হবে না, ভয় পাবে না, ভক্তিতে মাথা নুয়ে পড়ে পায়ে। এঁরা তো তা' নন।"

সহসা সুমাগধার মনে পড়ে' যায় তার পিতার কথা, পিতার নিকটে দেওয়া তার প্রতিশ্রুতির কথা। "স্বামী-গৃহে গিয়েও আমি তথাগতেরই সেবা ক'রবো—আপনার প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হবে না।"

অনুতাপে অবসন্নের মত ধূলার উপরেই বসে পড়ে সুমাগধা। ভুল হয়ে গেছে, মস্ত বড় ভুল হ'য়ে গেল জীবনে। কোথায় তথাগত, কোথায় বা তাঁর আদর্শ, আর কোথায়ই বা তাঁকে দেওয়া পিতার প্রতিশ্রুতি। সুমাগধার অনুতাপের অশ্রুতে সিক্ত হয়ে ওঠে গৃহের ধূলি-কণা। যেন জীবনের অন্ধকার ঘুচে গেল এতদিনে। সব ভুল বোঝার অবসান হয়ে পিতৃসত্য পালনের পথ যেন দেখ্‌তে পেল সুমাগধা।

বধূর চোখে জল দেখে ব্যস্ত হয়ে শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হলো বৌমা?"

সুমাগধা উত্তর দিল—"ঠিক জানি না মা। তবে হঠাৎ যেন মনে হলো স্বপ্ন দেখছি,—মস্ত একটা অশ্বত্থ গাছ, শাখায় পাতায় ভরা। তার তলে চরণের উপর চরণ রেখে এক সৌম্যমূর্ত্তি সাধু বসে আছেন। কী গম্ভীর; তবুও স্নিগ্ধ শান্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর মুখমণ্ডল। একবার যেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে আমার কল্যাণ কামনা করলেন এবং পরক্ষণেই যেন কোমল মধুর স্বরে বল্‌লেন—"আর দেরী করিসনে; আমি এসেছি।"

শাশুড়ী চম্‌কে উঠ্‌লেন—"সে কি?"

বধূ উত্তর করলো—"সত্যি মা। তিনি যেন আমাকে বলছেন—পুণ্যভূমি বঙ্গদেশ ধর্ম্মহীন আজ। ত্যাগের মহিমা গেয়ে একদিন যারা মানুষের দ্বারে দ্বারে কল্যাণ পরিবেশন করেছিল, আজ তারা বিশ্বাসহীন। আছে শুধু তাদের ভোগের আগুন ওঠে'—জাগো! তাঁকে ডাকার

...ত ডাকতে থাকো। সকলকে শিখিয়ে দাও প্রেম দিয়ে, ভক্তি দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে। নাম, মান, যশ সব ছেড়ে দিয়ে এসো—লোককে শিখাও—ওসব না ছাড়লে শুধু ধ্যানে আর যজ্ঞে, পূজায় আর হোমে নির্ব্বাণ লাভ হয় না।"

মনের আবেগে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সুমাগধা। যেন এক স্নিগ্ধ ও শান্তিময় জীবনের পথের সন্ধান দেখা দিল এই মাত্র। স্বপ্নে দেখা ঐ সৌম্যমূর্ত্তির পায়ের কাছে জীবনের সব প্রশ্ন নিবেদন করে দিয়ে তার শান্তিবাদ গ্রহণ করবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হয়ে উঠ্‌লো তার মন। স্নেহ, প্রেম, মান অপমান, লোভ মোহের হীনতার স্পর্শ থেকে মুক্তিলাভের পথ এতদিনে যেন দেখ্‌তে পেয়েছে সে।

ধীরে উঠে দাঁড়ালো সুমাগধা। খুলে ফেল্‌ল নূপুর, কঙ্কন আর যত সব রত্নালঙ্কার; মুছে ফেলল চন্দন তিলক। উদ্যানের পুষ্করিণীতে স্নান করে এসে সাধারণ একখানা শাড়ি তুলে নিল হাতে।

তাকিয়ে থাকেন শাশুড়ী। আজ এই মুহূর্ত্তে তাঁর সংসারের কুলবধূ এই নারীকে যেন নূতন ক'রে চিনতে পারলেন। প্রেম ও বিলাসে মগ্ন মনে হয়েছিল যাকে, এখন তাকে দেখে মনে হয় যেন সদ্যস্নাতা এক কিশোরী তাপসী, সংসারের অণুপরমাণুতে আবিষ্ট বধূ নয়; শবরীর প্রার্থনার মধ্যে তপস্যার দীপ্তি হয়ে ঝল্‌সে উঠেছিল যে প্রতিজ্ঞা, সেই প্রতিজ্ঞাই যেন দীপ্তিলাভ করেছে এই কুসুম-কোমল সুন্দর মুখের লালিমায়।

সেদিন পুণ্ড্রনগরের অধিবাসিগণ বিস্মিত হ'য়ে শুন্‌লো সুমাগধা বল্‌ছে—"প্রভুর আদেশ—"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" শুধু সেবা, সত্য আর ত্যাগই ধর্ম্ম—তপ, যোগ, কৃচ্ছ্রসাধন—এসবে এখন আর চলে না। নিজেকে পরের জন্য বিলিয়ে দাও; তবেই তোমার মুক্তি।"

দিন শেষ হ'য়ে সন্ধ্যা নামে, গভীর হতে গভীরতর হয় রাত্রি। চারিদিক হ'য়ে আসে নিস্তব্ধ। গাছের শাখায় শাখায় শাখায় পাখির শাবকও আর শব্দ করে না। শব্দহীন এক বিরাট শান্তিতে যেন মৌনী হয়ে রয়েছে বিশ্বচরাচর—মাটি ও আকাশ। তথাগতকে ডেকে চ'লেছে সুমাগধা। কী এক অদ্ভুত আনন্দ ফুটে রয়েছে তার মুখের উপর।

দিনের পর দিন চলে যায়। কিন্তু সুমাগধার তপস্যা যেন আর শেষ হয় না। কাতরস্বরে বলতে থাকে সে—দিনের পর দিন যাচ্ছে। রাতের পর রাত; আমি রৈলাম ব'সে বে-কার সেই। আজও ত প্রভু এলেন না! প্রভু—তুমি সুজাতাকে দেখা দিয়েছ, আমাকে দেখা দিবেনা?

বিচলিত হয়ে ওঠেন সার্থনাথ ও তাঁর স্ত্রী। হতাশা বোধ করে বৃষভদত্ত; মুখ তার ব্যথায় ম্লান—চোখে জল, শাশুড়ী কাতর হ'য়ে বলেন—"হায়, এমন সোনার বৌকে-ও রোগে ধরলো!

সার্থনাথ জানতেন আগেকার কথা। শুনেছিলেন তিনি সুমাগধার পিতার কাছে, বধূ জন্ম থেকেই দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিতা। তাই তিনি ধৈর্য্য ধরে রইলেন। সংসার, সমাজ, অর্থ, সুখ, ভোগ—কিছুই যেন বধূর সাধনায় বাধা না দেয়, শুধু সেই দিকেই রইল তাঁর দৃষ্টি।

চাঁদ ডুবেছে; আঁধার আছে। ভোরের আর বেশী দেরী নাই। গাছের গায়ে পাখা মেলে পাখীরা গান গেয়ে উঠ্‌ছে। ভোরের আবছা আলোয় পাখীর কাকলি মধুর শব্দ ছড়াচ্ছে। সুমাগধার ধ্যানের আবেশ হঠাৎ ভেঙ্গে যায়। শুনতে পায় সে, তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কে যেন বলছেন—"হে কন্যা! তোমার আগে, তোমার পিছনে, তোমার মধ্যে যা কিছু আছে, সে সকলই ত্যাগ ক'রে সংসারের ওপারে চলো। সকল রকমে মুক্ত হও, তোমাকে আর জন্ম জরা ভোগ করতে হবে না।"

চমক লাগে সুমাগধার দুই চোখে তার নিষ্পলক দৃষ্টি যেন বিপুল আবেগে শিহরিত হতে থাকে। অমন ধবলস্নিগ্ধ লাবণ্যে কল্লোলিত এক দেবতনু তার সম্মুখে চারিদিক আলোকিত ক'রে দাঁড়িয়ে। স্নিগ্ধায়ত ও মমতা-মাখা সেই দেবমানবের দুটী চক্ষু যেন কত কোমল, কত সুন্দর!

ধীরে ধীরে অশ্রুসজল হ'য়ে উঠলো সুমাগধার দুটি নয়ন, স্বপ্ন নয়, মায়া নয়;—জগতে অতুল দেবমানব দাঁড়িয়ে আছেন তার সম্মুখে। সঙ্গে র'য়েছে তাঁর অমৃত, যে অমৃতের সৌরভের কাছে পৃথিবীর সব চাওয়া পাওয়ার সাধ তুচ্ছ হয়ে যায়।

—"তথাগত !" দেবমানব গৌতমের ধূলিমাখা চরণ দু'খানি জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়লো সুমাগধা।

ধন্য হলো তার জীবন। পূর্ণ হলো তার পিতৃসত্য পালনের সাধনা।

তারপর আর দেরী হয়নি। পুণ্ড্রনগরের ঘরে ঘরে জলে উঠলো ধূপদীপ, সুরভিত হলো আকাশ বাতাস। পুণ্ড্রনগরের ঘরে ঘরে কল্যাণের বাণী পরিবেশন করলেন গৌতম বুদ্ধ—তিন মাস ধরে। তারপরে তিনি গেলেন সমতটে আর কর্ণ-সুবর্ণে, বাংলা জুড়ে জেগে উঠলো সহর্ষ কলরব সঙ্গীতের দ্যোতনায়—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"

আজও আছে বগুড়া সহর থেকে মাত্র তিনক্রোশ দূরে ধ্বংসস্তূপে আচ্ছন্ন মহাস্থানগড়। ঐ মহাস্থানই হলো সেদিনকার সেই পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর। চৈনিক পরিব্রাজক ওয়াংচোয়াং এখানে সপ্তম শতাব্দীতেও কুড়িটি বৌদ্ধ সংঘারাম এবং একশত দেবমন্দির দেখেছিলেন। ধ্বংসস্তূপের মাত্র দু'ক্রোশ দূরে আজও রয়েছে ভাসুবিহার নামে সেই মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ। যা সম্রাট অশোক একদিন তৈরী করে গিয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধের আগমনের স্মৃতিরক্ষার জন্য। আরও দূরে দেখা যায় রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর গ্রামে সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ—যার অনুকরণে একদিন গড়ে উঠেছিল বরবোদুরের মন্দির। ওদিকে রয়েছে মালদহ জেলায় জগদ্দল মহাবিহারের কীর্ত্তি চিহ্ন আর দিনাজপুরের বানগড়। আর মুর্শিদাবাদ রাঙ্গামাটি গ্রামে গড়ে উঠেছিল "রক্তমিত্তি" সংঘারাম—যেখান থেকে মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত বুদ্ধের বাণী নিয়ে সাগর থেকে সাগর পারে গিয়েছিলেন।

মৃতপ্রায় ধ্বংসস্তূপগুলি—মুখর হ'য়ে প্রচার করছে আজ এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের অতীত ইতিহাস। কৌতূহলী পথিক দেখে যায় সে সকল ধ্বংসাবশেষ আগ্রহের সাথে। কিন্তু কেউ জান্তেও পারে না যে এদেশে ভগবান্ তথাগতকে প্রথম আহ্বান করেছিল বাংলারই এক কুলবধূ।

তবু আজও দেখা যায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে বাংলার নারীর অবদানের স্মৃতি সাঞ্চীতোরণের গায়ে। ভারতের পুণ্যতীর্থ সাঞ্চীতে বুদ্ধস্তূপ নির্ম্মাণের ব্যয় যাঁরা দিয়েছিলেন। তোরণের গায়ে আজও তাঁদের নাম লেখা আছে। সেখানে দেখা যায়—"ধমতায় দানং পুঞ্চবদনিয়ায়" —পুণ্ড্রবর্দ্ধনের ধর্ম্মদত্তার দান।

আর দেখা যায় বাংলার কুলবধূর অবদানের স্বীকৃতি বৌদ্ধসাহিত্যের পাতায় পাতায়—"দিব্যাবদান" আর "অবদান-কল্প-লতিকা"য় এবং তিব্বতীয় "প্যাগ্ সাম্ জ্যোন্ জঙ্গ" নামক গ্রন্থে। এই সকল গ্রন্থে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে সুমাগধার অবদানের কথা; তারই পূজায় তুষ্ট হ'য়ে ভগবান্ বুদ্ধ "শশিকান্তমণির প্রভাময়রূপে" পুণ্ড্রনগরে এসেছিলেন।

বাংলার এক কুলবধূ তাঁর তপস্যার আলোকে যখন বন্দনা ক'রে এনেছিলেন তথাগতকে সর্ব্বপ্রথমে এদেশে, তখন তাঁর সুস্মিত ও সুন্দর মুখে যে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছিল, তা যেন চোখের সম্মুখে ভাসছে।

—

সুধীরা হালদার

এবারে বলছি—পশ্চিম-ভারতের মহারাষ্ট্র-অঞ্চলের বিচিত্র উপাদেয় দুটি নিরামিষ-খাবার রান্নার কথা। মহারাষ্ট্রীয় এই দুটি খাবারের মধ্যে, প্রথমটির নাম হলো—"সাগু-খিচড়ী" এবং দ্বিতীয়টির নাম—"কাটাচী আম্‌টি"।

সাগু-খিচড়ী ঃ

মহারাষ্ট্রীয় প্রথায় "সাগু-খিচড়ী" রান্নার জন্য উপকরণ দরকার—চায়ের পেয়ালার এক-পেয়ালা সাবু-দানা, চায়ের পেয়ালার আধ-পেয়ালা খোশা-ছাড়ানো এবং ভাজা চিনাবাদাম, প্রয়োজনমতো পরিমাণে খানিকটা গুঁড়ো-নুন, বড়-চামচের তিন-চামচ ঘি আর দু'তিনটি কাঁচা-লঙ্কা। ফর্দ্দমতো এই উপকরণ দিয়ে প্রায় চার-পাঁচ জনের আহারোপযোগী "সাগু-খিচড়ী" বানানো যাবে।

উপরের ফর্দমতো উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, গোড়াতেই পরিষ্কার জলে সাবু-দানাগুলিকে বেশ ভালোভাবে ধুয়ে সাফ্ করে নিয়ে আগাগোড়া জল-ঝরিয়ে সযত্নে পরিচ্ছন্ন একটি রেকাবীতে তুলে রাখুন। তারপর ভাজা-চিনাবাদামগুলিকে মোটা-ধরণে গুঁড়িয়ে রাখুন এবং কাঁচালঙ্কাগুলিকে ছুরি বা বঁটির সাহায্যে পরিপাটি-ছাঁদে কুচো করে নিন। এ কাজ সারা হলে রান্নার পালা।

মহারাষ্ট্রীয়-প্রথায় "সাগু-খিচড়ী" রান্নার সময়, প্রথমেই উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র বসিয়ে ঘি-টুকু গরম করে, সেই তপ্ত-তরল ঘিয়ে কাঁচা-লঙ্কার কুচোগুলিকে ছেড়ে অন্ততপক্ষে মিনিট পাঁচেক কাল হাতা, খুন্তি কিম্বা বড়-হাতলওয়ালা চামচের সাহায্যে সেগুলিকে বার-বার নেড়েচেড়ে পরিপাটিভাবে ভেজে নিন। এমনিভাবে কাঁচা-লঙ্কার কুচোগুলিকে আগাগোড়া ভেজে নেবার পর উনানের আঁচে-বসানো রন্ধন-পাত্রে সদ্য-ধোয়া সাবু-দানা ভাজা-চিনাবাদামের গুঁড়ো আর প্রয়োজনমতো পরিমাণে খানিকটা গুঁড়ো-নুন মিশিয়ে, রান্নার পাত্রের মুখ ঢাকা-চাপা দিয়ে বন্ধ করে উপকরণগুলিকে একত্রে সিদ্ধ করুন। কিছুক্ষণ এভাবে সিদ্ধ করার ফলে, সাবু-দানা ও চিনাবাদামের গুঁড়ো আগাগোড়া সু-সিদ্ধ এবং নরম হয়ে গেলে, উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটি নামিয়ে খাবারটি অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে তুলে রাখুন। তাহলেই অভিনব মহারাষ্ট্রীয়-প্রথায় "সাগু-খিচ্ড়ী" খাবার রান্নার কাজ শেষ হবে।

কাটাচী-আম্‌টি :

মহারাষ্ট্রীয়-প্রথায় বিচিত্র-মুখরোচক "কাটাচী-আম্‌টি" খাবারটি রান্নার জন্য উপকরণ চাই—চায়ের পেয়ালার আধ-পেয়ালা ছোলার ডাল, চায়ের পেয়ালার আধ-পেয়ালা ভাজা চিনাবাদাম, চায়ের চামচের ছু'চামচ বেসম, চায়ের চামচের শিকি-চামচ হলুদ-গুঁড়ো, চায়ের চামচের এক-চামচ 'গরম-মশলা' অর্থাৎ লবঙ্গ, দারুচিনি আর ছোট এলাচের গুঁড়ো, চায়ের চামচের আধ-চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, প্রয়োজনমতো পরিমাণে খানিকটা গুঁড়ো-নুন, বড় চামচের এক চামচ ঘি, বড় চামচের এক-চামচ গুড়, ছোট্ট এক-দলা তেঁতুল আর এক-টিপ হিং। এ সব উপকরণ দিয়ে প্রায় তিন-চারজনের আহারোপযোগী 'কাটাচী-আম্‌টি' রান্না করা চলবে।

উপকরণগুলি জোগাড় হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে, বড়সড় একটি ডেকচি বা গামলাতে পরিষ্কার জল ঢেলে সেই জলে ছোলার ডাল ভিজিয়ে রাখুন এবং ভাজা-চিনাবাদামগুলির খোলা ছাড়িয়ে, সেগুলি মোটা-ছাঁদে গুঁড়ো করে নিন। এবারে চায়ের পেয়ালার আধ-পেয়ালা জলে তেঁতুলের দলাটি ভিজিয়ে রাখুন।

উদ্যোগ-পর্বের এ সব কাজ সেরে নিয়ে, উনানের আঁচে রন্ধনপাত্র চাপিয়ে, সেই পাত্রে চায়ের পেয়ালার তিন-পেয়ালা জল দিয়ে, সু-সিদ্ধ ছোলার ডাল, ভাজা-চিনাবাদামের গুঁড়ো, হলুদ-গুঁড়ো, লঙ্কা-গুঁড়ো, আর প্রয়োজনমতো নুন মিশিয়ে, 'মিশ্রণটুটিকে খানিকক্ষণ ফুটিয়ে নরমভাবে সিদ্ধ করে নিন। 'মিশ্রণটি' সু-সিদ্ধ হলেই, রন্ধন-পাত্রে গুড় ও জলে-ভেজানো তেঁতুলের ক্বাথ, বেসম আর 'গরম-মশলা' মিশিয়ে আরো কিছুক্ষণ আগুনের আঁচে ফুটিয়ে নিন। তারপর তপ্ত-তরল ঘিয়েতে হিং মিশিয়ে রন্ধন-পাত্রের ঐ ডাল-চিনাবাদামের 'মিশ্রণটিতে' ফোড়ন দিন। এভাবে ফোড়ন দেবার পর, রন্ধন-পাত্রে বেসমের 'ফুটন্ত-মিশ্রণটি' মিশিয়ে কিছুক্ষণ হাতা, খুন্তি বা বড়-হাতলওয়ালা চামচের সাহায্যে রান্নার কাজ শেষ করে, খাবারটি উনানের আঁচ থেকে নামিয়ে পরিষ্কার একটি পাত্রে ঢেলে রাখুন। তাহলেই মহারাষ্ট্রীয় প্রথায় 'কাটাচী-আম্‌টি' খাবার রান্নার পালা চুকবে। এবারে সযত্নে প্রিয়জনদের পাতে খাবারটি পরিবেশন করুন···অভি-নব মুখরোচক এই মহারাষ্ট্রীয় রান্নাটির স্বাদ পেয়ে তাঁরা যে শুধু খুশী হবেন তাই নয়, আপনার কৃতিত্বের পরিচয় পেয়ে রীতিমত তারিফও করবেন।

বারান্তরে এমনি ধরণের বিচিত্র উপাদেয় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আরো কয়েকটি জনপ্রিয় খাবারের রন্ধন-প্রণালীর কথা আলোচনা করার বাসনা রইলো।

বিপদ ভঞ্জনের বিপদ

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায়।

ষোল হাজার একশ আটটি পরমাসুন্দরী মহিষী নিয়ে জীবনতরী বেয়ে চলেছেন।

বৃন্দাবনের বাল্যলীলার কথা বোধহয় আর তাঁর মনেও নেই। মথুরাস্মৃতিও মন থেকে বিলুপ্ত প্রায়। দ্বারকাই তখন তাঁর লীলাকেন্দ্র।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর মন্দিরে এসেছেন।

প্রভুর সঙ্গলাভে রুক্মিণীর সুখের আর সীমা নেই। প্রেমালাপ ও আনন্দের মধ্যে সময় যে কোথা থেকে কেটে যাচ্ছে তা দুজনার কেউ টেরও পাচ্ছেন না।

এমন সময় দেবর্ষি নারদ হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত। মুখে হরিনাম হাতে বীণা।

বীণায় একটি পারিজাত কুসুম গোঁজা।

কৃষ্ণগুণ গান করতে করতে পরম ভক্তিভরে দেবর্ষি নারদ পারিজাত কুসুমটি শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দিলেন সেটি রুক্মিণীকে।

মহাখুসী হয়ে রুক্মিণী সেটি মাথায় পরতে যাচ্ছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ফুলটি নিজের হাতে নিয়ে পরম সোহাগ ভরে রুক্মিণীর কবরীতে গুঁজে দিলেন - আর দুজনে দুজনার দিকে এমন সপ্রেম দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন যে সেখানে যেন আর কেউই নেই—এমন কি টিকটিকিটি পর্য্যন্ত নয়। এদিকে যে সুরলোকের টিকটিকি, দেবর্ষি নারদ, সেখানে বহাল তবিয়তে উপস্থিত সে কথা তাঁদের খেয়ালও হলনা।

দেবর্ষি বুড়ো মানুষ। পূজো-আচ্চা জপ-তপ নিয়ে থাকেন। তিনি ঠিক অতটা আশা করেন নি।

এই অতি মধুর পরমৈশ্বরীয় বেহায়াপনা স্বচক্ষে দর্শন করে মনে তাঁর এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হল—যুগপৎ আনন্দ ও লজ্জা।

গুটিকতক কাষ্ঠকাশি কেশেও দেবর্ষি যখন তাঁদের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে পারলেন না তখন নিরুপায় হয়ে বীণা কাঁধে নিয়ে তিনি সুরলোকের পথ ধরলেন।

খানিক দূর গিয়ে দেবর্ষির মন গেল বদলে।

তিনি ভাবলেন—"বহুদিন হল তেমন ভাল মত কলহ-কোঁদল দেখবার সুযোগ হয়নি। এই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ আপন হাতে রুক্মিণীর কবরীতে পারিজাত ফুলটি গুঁজে দিলেন এই খবরটি সত্যভামাকে দিলে কেমন হয়?"

যেমনি ভাবা তেমনি কাজ।

সুরলোকের পথ ছেড়ে দেবর্ষি সত্যভামার বাড়ীর পথ ধরলেন।

মুখে মধুর হরিনাম। মনে কোঁদল বাধাবার ফন্দী।

এদিকে—

সত্যভামার মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নেই।

অন্য সব মহিষীদের কাছে প্রভু হামেসাই যাতায়াত করেন কিন্তু তাঁর ঘরে বহুদিন হল আসেন নি। খবর দিলে বলে পাঠান "রাজকার্য্যের চাপ—সময় নেই।"

জানালার ধারে একাকিনী বসে বসে বিরস বদনে সত্যভামা কৃষ্ণ বিরহের কথা ভাবছেন এমন সময় দেবর্ষি নারদ এসে উপস্থিত।

ভক্তিভরে দেবর্ষিকে প্রণাম করে বসবার ঠাঁই দিয়ে সত্যভামা বললেন "ঋষিরাজ, আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য। বহুদিন পরে আপনার পদধূলি পেয়ে এ কুটীর আমার পবিত্র হ'ল।"

হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করে নারদ বললেন "কল্যাণ হোক বৎসে, কল্যাণ হোক।"

তারপর মুখ একটু গম্ভীর করে বললেন "একটি বিশেষ জরুরী কথা জিগ্যেস করতে তোমার কাছে এলাম সত্যভামা!"

সত্যভামা আশ্চর্য্য হয়ে জিগ্যেস করলেন "কি কথা ঠাকুর ?"

দেবর্ষি একটু ভণিতা সুরু করলেন। তিনি বললেন "নাঃ থাক। সে সব প্রসঙ্গ এখন না তোলাই ভাল। বহুদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল এখন কোনরূপ অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলে তোমার মন ভারাক্রান্ত করাটা ঠিক হবে না। তোমার চেহারা কেমন যেন মলিন দেখাচ্ছে! তুমি কেমন আছ বল।" এই বলে দেবর্ষি বীণাখানি পাশে নামিয়ে রাখলেন।

চেপে যাওয়া কথাটি শোনাবার জন্যে সত্যভামা যখন বিশেষ পিড়াপিড়ি সুরু করলেন তখন দেবর্ষি নারদ একটু যেন 'কিন্তু কিন্তু' ভাবে বললেন "প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তোমার কি আজকাল বনিবনাও হচ্ছে না ?"

মহাবিস্ময়ে সত্যভামা বললেন "মানে ?"

নারদ বললেন "মানে—তোমাদের দুটিতে কি বিচ্ছেদ-টিচ্ছেদ ঘটেছে ?"

সত্যভামা হাল্‌কা হেসে জবাব দিলেন "না না তা কেন হবে ? বিচ্ছেদ ঘটতে যাবে কেন ?

মুখের ভাব আরও গম্ভীর করে ঋষিরাজ বললেন "কেন হবে তা ত' বৎসে বলতে পারিনে, তবে ব্যাপার-স্যাপার দেখে যা মনে হয় তাই বলছিলাম। চেহারাও দেখছি আগের চেয়ে অনেক মলিন হয়ে গেছে! বেশভূষা প্রসাধনের দিকেও তেমন নজর নেই। যাক্! আমার আর বেশী কথায় কাজ কি ? তুমি যখন নিজের মুখেই বলছ যে কিছু হয়নি তখন আর কিছু না বলাই ভাল। আচ্ছা আমি এখন উঠি তাহলে! 'হরি হে সকলি তোমার ইচ্ছে।"

সত্যভামা ব্যস্ত হয়ে বললেন "সে কি ঠাকুর ? এতদিন পরে দয়া করে পায়ের ধুলো দিলেন এর মধ্যেই উঠবেন কি ? তাছাড়া 'ব্যাপার-স্যাপার' কি দেখলেন তা না বললে আপনাকে ত' ছাড়ছি না ঠাকুর।"

ঋষিরাজ পাকা খেলোয়াড়!

গভীর অনিচ্ছার ভাব মুখে এনে বললেন "আহা কেন আর মিছে সে সব কথা জিগ্যেস করছ বল ত' ?" এই ত তুমি নিজের মুখেই বললে যে কিছু হয়নি। তোমাদের ভালবাসা ভাবসাব আগের মত সব ঠিক আছে। 'নারায়ণ নারায়ণ! সকলি তোমার ইচ্ছে।' যাক্, সব ভাল থাকলেই ভাল। আমি এখন তবে উঠি। এই বলে বীণা হাতে নিয়ে তিনি ওঠবার উপক্রম করলেন।

সত্যভামা মহা ব্যস্ত হয়ে বললেন "ঋষিরাজ! যে কথা বলতে আপনি এখানে এসেছিলেন সে কথা না শুনে আপনাকে যেতে দেব না। আপনাকে সে কথা বলতে হবে।"

আরও একটু খেলিয়ে দেবর্ষি বললেন—"দরকার কি বাপু সে সব কথা শুনে ? মিছা-মিছি মন খারাপ করে লাভ আছে কিছু বলতে পার ?"

সত্যভামা তখন অধীর হয়ে বললেন "ঋষিরাজ আপনার পায়ে পড়ছি আপনি বলুন।"

অগত্যা দেবর্ষি তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন।

তিনি বললেন "শোন বৎসে, বেশ মন দিয়ে শোন। কাল আমি ইন্দ্রালয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবরাণী শচী নন্দনকাননের এক নিরালা উপবনে গভীর প্রেমালাপে মগ্ন। আমাকে দেখে দেবরাজ একটি পারিজাত-কুসুম আমাকে উপহার দিলেন। পারিজাত পেয়ে মনে মনে ভাবলাম—আমি বুড়ো মানুষ, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, পুজো-আচ্চা হরিনাম নিয়ে দিন কাটাই—এ পারিজাত নিয়ে আমি কি করব ? আমার এমন কেই বা আছে যাকে এই পারিজাতটি উপহার দিতে পারি ? এই সব কথা ভাবতে ভাবতে—বললে বিশ্বাস করবে না সত্যভামা—তোমার কথাই আমার মনে এলো। ভাবলাম—সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের সব চেয়ে প্রিয় মহিষী, এ পারিজাত একমাত্র তারই যোগ্য। এ ফুলটি তাকেই দিতে হবে। এই ভেবে পারিজাত-কুসুমটি বীণায় গুঁজে নিয়ে তোমার এখানে আসবার জন্যে রওনা হলাম"—

এই অবধি শুনে সত্যভামার মন আনন্দে নেচে উঠলো। স্বয়ং দেবর্ষি নারদ তাকে বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণের সব চেয়ে প্রিয় মহিষী। ঋষিরাজ আরও বলেছেন যে পারিজাত-কুসুম একমাত্র তাঁরই যোগ্য—আর কারও নয়!

এমন কথা শুনে মনে যে খুবই আনন্দ হবে তার আর বিচিত্র কি ? সত্যভামার মুখে হাসি আর ধরে না।

মহা আগ্রহভরে তিনি বলে উঠলেন—"ঋষিরাজ! কোথায় সেই পারিজাত? আপনার হাত থেকে সেটি উপহার নিতে আমার যে আর একটুও তর সইছেনা ঠাকুর"—এই বলে দেবর্ষির কাছে তিনি হাসি মুখে হাত পাতলেন।

ম্লান মুখে দেবর্ষি বললেন, "হায় হায় বৎসে! তবে আর বলছি কি? সে পারিজাত কি আর আমার কাছে আছে যে তোমায় দেব? নারায়ণ নারায়ণ"। এই বলে দাড়িতে হাত বুলিয়ে জটাচুলকে তিনি বিশ্রী রকম এক জোটমাল পাকিয়ে ফেললেন।

বেশ একটু দমে গিয়ে সত্যভামা বললেন—"সে পারিজাত কি হল ঠাকুর"?

দাড়ি ও জটার জোটমাল ছাড়াতে ছাড়াতে ঋষিরাজ বললেন—"শোন বৎসে, সেই কথাই বলছি, একটু ধৈর্য্য ধরে শোন। ইন্দ্রালয় থেকে সেই পারিজাত তোমাকে উপহার দিতে নিয়ে আসছিলাম। তোমার এখানে আসতে গেলে পথে রুক্মিণীর বাড়ী পেরিয়ে আসতে হয়। সেখানে দেখি প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী দেবী প্রেমালাপে এমনই মগ্ন যে আমাকে তাঁরা প্রথমে দেখতেই পেলেন না। আমি ভাবলাম ভালই হল। অতি সন্তর্পণে তাঁদের দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে এখানে আসবার চেষ্টা করছি এমন সময় প্রভুর নজর হঠাৎ আমার ওপর পড়লো। আমাকে দেখে তিনি আমায় কাছে ডাকলেন। প্রভু নিজের থেকে ডাকছেন, না গেলে ভাল দেখায় না—কি আর করি? রাস্তা ছেড়ে গেলাম তাঁদের ঘরে। কাছে যেতেই পারিজাতটির ওপর শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল। ছোট্ট একটু কুশল জিজ্ঞাসা করে প্রভু বললেন—"ঋষিরাজ! এ পারিজাত নিয়ে তুমি কি করবে?" আমি বললাম "এ ফুলটি সত্যভামার জন্যে এনেছি—তাঁকে দিতে হবে।"

তিনি বললেন "আরে রাখো তোমার সত্যভামা! এমন চমৎকার ফুল তাকে দিয়ে কি হবে? এটি তুমি আমাকে দাও।

শোনো কথা—

যে পারিজাত আমি অতদূর থেকে অত কষ্ট করে তোমার জন্যে নিয়ে আসছি সেটি তাঁকে দিতে আমার মন উঠিবে কেন? আমি অনেক করে তোমার কথা বললাম—অনেক কাকুতি মিনতি করলাম কিন্তু কে কার কথা শোনে?

প্রভু শেষ পর্যন্ত একরকম জোর করেই পারিজাতটি আমার বীণা থেকে খুলে নিলেন। আর সেটি খুলে নিয়ে"—এই অবধি বলেই ঋষিরাজের স্বরভঙ্গ হল। তিনি মাঝ-পথে থেমে গেলেন।

"পারিজাতটি নিয়ে প্রভু কি করলেন ঠাকুর?" সত্যভামা জিগ্যেস করলেন।

আঙ্গুল দিয়ে দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে দেবর্ষি বললেন—"আপন হাতে রুক্মিণী দেবীর কবরীতে বেঁধে দিলেন।"

সত্যভামার চোখে অন্ধকার নেমে এলো। তিনি গুম্ হয়ে বসে রইলেন।

ঋষিরাজ আবার বলতে সুরু করলেন—"এই ব্যাপার স্বচক্ষে দেখা অবধি আমার মনে যে কী অশান্তি ও দুঃখ হচ্ছে তা আর কি বলব বৎসে! তাইত তোমায় জিগ্যেস করছিলাম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তোমার কি বিচ্ছেদ ঘটেছে?"

সত্যভামা তখনো কোন কথা কইছেন না দেখে দেবর্ষি আবার সুরু করলেন "রুক্মিণীর প্রতি প্রভুর যে কী গভীর ভালবাসা তা চোখে না দেখলে বোঝা যায় না সত্যভামা! আমি যতই তোমার নাম করি, প্রভু ততই মুখ ব্যাজার করেন। শেষে ত একরকম জোর করেই পারিজাতটি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলেন। তাতেও না হয় কিছু বলবার থাকত না যদি প্রভু সেটি নিজের কাছেই রাখতেন। কিন্তু বৎসে, তোমার জন্যে আনা সেই পারিজাত ফুলটি আপন হাতে সোহাগ ভরে তোমার সতীনের খোপায় পরিয়ে দেওয়া—"হরি হে সকলই তোমার ইচ্ছে।"

রাগে দুঃখে অভিমানে সত্যভামা অধীর হয়ে উঠলেন।

অশ্রুগদগদ কণ্ঠে সত্যভামা জিগ্যেস করলেন "ঋষিরাজ পারিজাত কুসুমের কি কি গুণ?"

ঋষিরাজ বললেন "সে ফুলের গুণের কি আর সীমা আছে সত্যভামা? সে ফুল হল স্বর্গের ফুল। নন্দন-কানন ছাড়া আর কোথাও সে ফুল ফোটেনা। অমন সুমিষ্ট গন্ধ আর কোনো ফুলে নেই। আর সেই সুবাস এক যোজন জায়গা জুড়ে চারিদিক আমোদিত করে তোলে। সে ফুল কখনো বাসি বা মলিন হয়না। ঘরে তুলে রাখলে বহু দিন পর্যন্ত টাট্‌কা—তাজা থাকে। আর

তার সব চেয়ে বড় গুণ হল এই যে, যে রমণীর কাছে সেই ফুল থাকে তার স্বামী কখনো তার কাছ ছাড়া হতে পারেনা। তুমি বোধ হয় জাননা যে শচীদেবী সব সময় পারিজাত নিজের কাছে রাখেন, আর সেই কারণেই দেবরাজ ইন্দ্র এক নিমেষও শচী-ছাড়া থাকতে পারেন না। বৎসে! সেই জন্যেই ত তোমার জন্যে পারিজাতটি আনছিলাম। কিন্তু কি করব বল? আমারই কপাল দোষে নারায়ণ সেটি নিয়ে রুক্মিণীর খোঁপায় গুঁজে দিলেন!"

অনেক সহ্য করেছেন সত্যভামা। আর পারলেন না। সবেরই একটা সীমা আছে!

দুঃখে ক্রোধে অপমানে অভিমানে অধীর হয়ে উঠলেন তিনি।

প্রথমে গুটি কতক দীর্ঘ নিশ্বাস, তারপর ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগলো। চোখ দুটি অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো, কেশ আলুলায়িত।

দেবর্ষিকে আর কোন কথা না বলে মাথায় ও কপালে করাঘাত করতে করতে সোজা চলে গেলেন ক্রোধাগার বা গোসাঘরের দিকে। পরিচারিকারা কেউই তাঁর গতিরোধ করতে সাহস পেলনা।

দেবর্ষির গোঁফ-দাড়ি-সঙ্কুল মুখে হাসিরবিজুরী খেলে গেল। সে হাসিমুখের তুলনা নেই।

বীণা-খানি হাতে নিয়ে চললেন শ্রীকৃষ্ণকে এই সমাচার দিতে।

দেবর্ষি নারদ চলেছেন। হাতে বীণা—মুখে মধুর হাসি। হাসিমুখে হরিনাম।

শ্রীকৃষ্ণ তখনো রুক্মিণীর মন্দিরেই ছিলেন। দেবর্ষি নারদ ম্লানমুখে আবার সেখানে এসে উপস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দেখে বললেন—"ব্যাপার কি ঋষিরাজ? এই কিছুক্ষণ আগে এখান থেকে গেলে—আবার এখনি ফিরে এলে—সব ভাল ত"?

খুব দুঃখু-দুঃখু মুখ করে দেবর্ষি বললেন—"ব্যাপার সুবিধের নয় প্রভু! ব্যাপার খুবই গোলমেলে, তাই আমাকে আবার ফিরতে হল।"

বিস্মিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ জিগ্যেস করলেন "কি হয়েছে?"

নারদ বললেন "প্রভু! আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুরপুরের পথে ফিরছি এমন সময় অকস্মাৎ সত্যভামার সঙ্গে দেখা। তিনি জিগ্যেস করলেন—কোথায় গিয়েছিলে ঠাকুর? আমি বললাম—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণামৃত পান করতে গিয়েছিলাম। তিনি আবার জিগ্যেস করলেন—কোথায় তাঁর দেখা পেলেন—রাজসভায়? আমি বললাম—রাজসভায় হতে যাবে কেন? তিনি ত' এখন রুক্মিণী দেবীর ঘরেই রয়েছেন—বেশ কিছুদিন ধরে সেইখানেই ত' রয়েছেন তিনি।

তখন সত্যভামা আমায় আবার জিগ্যেস করলেন—"প্রভু সেখানে কি করছেন?"

আমি প্রথমে বিশেষ কিছুই বলিনি। কিন্তু বারবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করাতে পারিজাত-কুসুমের কথাটা আমার মুখ থেকে ফস্ করে বেরিয়ে পড়লো। অসাবধানতাবশতঃ যেমনি আমি বলে ফেলেছি যে প্রভু নিজের হাতে পারিজাতটি রুক্মিণীর খোঁপায় পরিয়ে দিলেন অমনি সত্যভামা দুড়ুম্ করে মেঝের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লেন। ওঃ তারপর সে এক এলাহি কাণ্ড! চোখ কপালে উঠলো, নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এলো—আলুথালু বেশ, আলুলায়িত কেশ—দাঁতে দাঁত লেগে—সে আর কি বলব প্রভু সে এক সাঙ্ঘাতিক অবস্থা"—

মৃদু ভর্ৎসনার সুরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"পারিজাতের কথাটা তুমি সত্যভামাকে বলতে গেলে কেন ঋষিরাজ? আর বললেই যদি—ত' অত খুলে সবিস্তারে বলবার কি দরকার ছিল? মহা মুস্কিলে ফেললে দেখছি।"

নারদ বললেন—"অন্যমনস্ক হয়ে বলে ফেলেছি প্রভু। বুড়ো মানুষ—কথাটা ফস্ করে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো। মন ত আর সব সময় নিজেতে থাকে না। এ' মন সদাসর্ব্বদা ঠিক থাকে না। বুড়ো হয়ে সব বে-ভুল হয়ে যায়। কথা চাপতে আমি কিছুতেই পারিনা—বিশেষত যদি প্রভুর কথা হয়। ভগবৎ প্রসঙ্গ"—

ঋষিরাজকে থামিয়ে দিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"তারপর কি হল? এখন তিনি আছেন কেমন?"

দেবর্ষি আবার ভণিতা সুরু করে বললেন—"তারপর আর কি? বীণা মাটিতে ফেলে পাখার বাতাস করতে সুরু করলাম—চোখে মুখে জলের ছিটে দিলাম—কিছুতেই কিছু হয় না। মনে ভয় হল—বুঝি জ্ঞান আর ফেরে না।

শেষে অবিরাম কৃষ্ণনাম শুনিয়ে বহুকষ্টে জ্ঞান একটু ফিরে এলো”—

ব্যগ্র হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—“জ্ঞান ফিরেছে—?”

ঋষিরাজ বললেন “তাতেই কি আর শোয়াস্তি আছে প্রভু? জ্ঞান ফিরে এসে সুরু হল কান্না। সে আবার এক নতুন বিপত্তি। আর সে কি কান্না! কান্নার আর বিরাম নেই। আজ অবধি অনেক রকমের কান্না আমিও দেখেছি—প্রভুও দেখেছেন—কিন্তু সত্যভামার সে কান্নার তুলনা নেই। চোখের জলে ঘরের ধুলো কাদা হয়ে উঠলো। হাঁটতে গেলে পা পিছলে যায়।”

শ্রীকৃষ্ণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার উপক্রম হল। তিনি বললেন—“আঃ! তারপর কি হল তাই বল।”

দেবর্ষি বললেন “তারপর—‘হায় হায় আমার কপাল পুড়েছে’—‘স্বামী আমার প্রতি বাম’—‘আমার কী সর্ব্বনাশ হোল’—‘এ প্রাণ আর রাখবো না—এইসব বলতে বলতে সত্যভামা জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলেন—সখীরা অনেক কষ্টে তাঁকে থামিয়ে রেখেছে। প্রভু যদি তাঁকে বাঁচাতে চান ত’ এক্ষুণি যান। আর একটুও দেরী করবেন না।”

এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ আর কালবিলম্ব না করে সত্য-ভামার মন্দিরের দিকে চললেন।

গণ্ডগোলটি বেশ ভাল করে পাকিয়ে গুণগুণিয়ে হরি-নাম করতে করতে ঋষিরাজ খুসী মনে নিজের কুটিরের পথে পা বাড়ালেন।

সত্যভামার ঘরে এসে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দেখা পেলেন না। প্রধান পরিচারিকার মুখে শুনলেন যে তিনি তখনো গোসা-ঘরেই রয়েছেন।

ফোঁপানির শব্দ দরজার বাইরে থেকেই বেশ শোনা যাচ্ছিল। মৃদু-মন্দ দীর্ঘ-নিশ্বাসের অল্প আমেজ স্থানীয় পরিবেশকে থমথমে করে তুলেছিল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দু একবার একটু কাশলেন। নিজেকে বড়ই অসহায় মনে হল। কোন্ কথার কি জবাব দেবেন সেটা একটু ভেবে নিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। কত-টুকু সত্যিকথা বলা চলবে—কতটা চলবে না—সে বিষয়েও স্থিরনিশ্চয় হতে পারলেন না। প্রভু আর একবার কাশলেন, তারপর যথাসম্ভব বিমর্ষভাব মুখে এনে গোসা-ঘরের ভেতর ঢুকলেন।

প্রভুকে দেখে সত্যভামার অভিমান আরও শতগুণ বেড়ে গেল। হাতের কঙ্কন দিয়ে নিজের কপালে ও মাথায় আঘাত করে তিনি অনর্থ বাধিয়ে তুললেন।

বিপদভঞ্জনের বিপদের আর সীমা নেই!

হাত দুটি ধরে ফেলতে সত্যভামা মাটিতে মুখ ঘসে আবার এক নতুন ফ্যাসাদ বাধিয়ে তুললেন।

কিছুতেই কিছু হয়না দেখে লজ্জানিবারণ হরি লজ্জা-সরম ত্যাগ করে সত্যভামাকে কোলে নিয়ে নানাভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না।

শ্রীকৃষ্ণের কোলে বসে সত্যভামা কাঁদছেন। অঝোর-ঝরে কেঁদে চলেছেন।

কান্নাও থামে না—কোল থেকে নামবারও নাম নেই।

পায়ে ঝিঁঝিঁ না ধরলেও শ্রীকৃষ্ণ একটু যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।

সত্যভামার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন তিনি—“তোমার কি হয়েছে তা না বললে আমি কি করি বল ত’ সত্যভামা? লক্ষ্মীটি, আর কেঁদোনা চুপ কর। অত কাঁদলে শরীর খারাপ হবে যে।”

তাতেও কান্না থামেনা। সত্যভামা এক নাগাড়ে কেঁদেই চলেছেন—প্রভুর কোলে বসে।

সোহাগ ও আদরের ভাব আরও একটু বাড়িয়ে দিয়ে সত্যভামার মুক্ত কবরী আলতো ভাবে বেঁধে দিতে দিতে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—“তোমার কিসের দুঃখ, কিসের অভিমান তা আমার কাছে খুলে বল সত্যভামা আমি তোমার কাছে কথা দিচ্ছি যে তার যথাযথ প্রতিকার করব।”

তখন কান্না থামিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে সত্যভামা বললেন “আমার ফুল—তুমি রুক্মিণীদিকে দিলে কেন? আমার জন্যে স্বর্গ থেকে আনা পারিজাত আমাকে না দিয়ে তুমি ঋষিরাজের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে সেটা রুক্মিণীদিকে দিয়েছ। আর ঋষিরাজের মুখে শুনলাম যে সেটা তুমি নিজের হাতে তাঁর খোঁপায় পরিয়ে দিয়েছ।”

শেষের কথাগুলি বলতে বলতে সত্যভামা ফোঁপানি থামিয়ে আবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

তখনো তিনি শ্রীকৃষ্ণের অভয় কোলে।

এতক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে সবই দেবর্ষি নারদের কারসাজি।

মধুর হেসে সত্যভামাকে বললেন তিনি—"আরে! এই পারিজাতের জন্যে এত দুঃখ—এত অভিমান তোমার? আচ্ছা বেশ তোমার রুক্মিণীদিদি মোটে একটি পারিজাত পেয়েছেন, আমি কথা দিচ্ছি তোমার এই মন্দিরে পারিজাতের গাছ পুঁতে দেব আমি। তখন যত খুসী পারিজাত নিও।" এই বলে সত্যভামার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে তাঁর মান ভাঙ্গাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

দুহাতে চোখ মুছতে মুছতে সত্যভামা বললেন—"আর সেই পারিজাত ফুল নিজের হাতে করে আমার খোঁপায় গুঁজে দেবে না?"

মধুর হেসে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"তা আর দেব না? নিশ্চয় দেব, একশ'বার দেব। যতবার বলবে ততবার দেব।"

মেঘ কেটে গেল।

সত্যভামার মুখে হাসি ফুটলো।

মানভঞ্জনের পালা হল সাঙ্গ!!

৭ রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ৯ উপমন্ত্রীর বিদায়—

পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ছিল—৩৪ জন। পূর্ণমন্ত্রী ১৪, রাষ্ট্রমন্ত্রী—১১ ও উপমন্ত্রী—৯। ১লা সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘোষণা করিয়াছেন যে কামরাজ প্রস্তাবমত ও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর নির্দেশ মত মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা কমাইয়া ৩৪ হইতে ১৮ করা হইল—১৪জন পূর্ণমন্ত্রী ও ৪ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী বহাল থাকিবেন এবং ৭জন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ৯জন উপমন্ত্রীর পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করা হইল। তাঁহারা ১৬জন কংগ্রেসের সাংগঠনিক কার্যে আত্মনিয়োগ করিবেন। পূর্ণমন্ত্রীরা সকলেই মন্ত্রীর কাজ করিবেন এবং ৪জন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র, শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর নস্কর ও শ্রীতেনজিং ওয়াংদি মন্ত্রিসভার কাজ করিবেন। পদত্যাগী ৭জন রাষ্ট্র-মন্ত্রী হইলেন—(১) শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি (২) শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় (৩) শ্রীআশুতোষ ঘোষ (৪) শ্রীবীজেশচন্দ্র সেন (৫) ডাঃ পি·কে·গুহ (৬) শ্রীপ্রমথরঞ্জন ঠাকুর (৭) ডাঃ সুনীলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। ৯ জন উপমন্ত্রী সকলেই বিদায় লইলেন—(১) শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় (২) সৈয়দ কাজেম আলি মির্জা (৩) শ্রীমতী সাকিলা খাতুন (৪) ডাঃ জিয়াউল হক (৫) ডাঃ জয়নাল আবেদিন (৬) ডাঃ তারাপদ রায় (৭) শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় (৮) শ্রীমহেন্দ্রনাথ ডাকুরা ও (৯) ডাঃ কানাইলাল দাস।

কেন্দ্রে কার্য্য পুনর্বণ্টন—

কেন্দ্রে ৬ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের সংগঠনিক কার্য্যে ব্রতী হওয়ায় তাঁহাদের কার্য্যভার রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ভাবে পুনর্ব্বণ্টন করিয়াছেন—(১) সর্দার স্বর্ণ সিং খাদ্য ও কৃষিবিভাগ ছাড়াও রেল বিভাগের কাজ দেখিবেন (২) শ্রীগুলজারিলাল নন্দ স্বরাষ্ট্র বিভাগ ছাড়াও শ্রম ও কর্মসংস্থান বিভাগ পরিচালন করিবেন—তিনি পরিকল্পনা মন্ত্রীর কাজও করিবেন। (৩) শ্রীঅশোক সেন আইন বিভাগ ছাড়া ও ডাক ও তার দপ্তরের ভার পাইয়াছেন। (৪) শ্রীহুমাউন কবীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিভাগ ছাড়াও শিক্ষামন্ত্রীর কাজ করিবেন। (৫) শ্রীসত্য-নারায়ণ সিংহ সংবাদ বিভাগ ছাড়াও তথ্য ও বেতার বিভাগের কাজ করিবেন (৬) শ্রীরাজবাহাদুর পরিবহন বিভাগের ভার পাইলেন (৭) শ্রীজয়সুখলাল হাতি সরবরাহ ও কারিগরী উন্নয়ন বিভাগের ভার পাইলেন। খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রীকে নিজ বিভাগ ছাড়া ও (ক) সমাজ উন্নয়ন ও সমবায়, গ্রামের কৃষি ও সমবায় (খ) সেচ ও বিদ্যুৎ শক্তি বিভগের কাজ দেখিতে হইবে। ১লা সেপ্টেম্বর রাষ্ট্র-পতির এই ঘোষণার পরই শ্রীগুলজারিলাল নন্দ শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রীর নিকট স্বরাষ্ট্র বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন।

৬ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৬ মুখ্যমন্ত্রী—

শ্রীকামরাজ নাদারের প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত হওয়ার পর বহু মন্ত্রী পদত্যাগ পত্র প্রধান-মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর নিকট পেশ করেন। গত ২৪শে আগষ্ট প্রধান মন্ত্রী নিম্নলিখিত ৬ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও ৬ জন মুখ্য মন্ত্রীর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (১) অর্থ মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই (২) পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম, (৩) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রী (৪) কৃষি মন্ত্রী শ্রী এস-কে-পাতিল (৫) তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডী (৬) শিল্পমন্ত্রী শ্রীকে-এল-শ্রীমালি। নিম্নলিখিত ৬ জন মুখ্য মন্ত্রী—(১) মাদ্রাজের শ্রীকামরাজ নাদার (২) উড়িষ্যার শ্রীবিজু পট্টনায়ক (৩) কাশ্মীরের শ্রীবক্সী গোলাম মহম্মদ (৪) বিহারের শ্রীবিনোদা-নন্দ ঝাঁ (৫) উত্তর প্রদেশের শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্ত ও (৬) মধ্যপ্রদেশের শ্রীবি-এ-মন্দালয়। ইঁহারা সকলেই কংগ্রেসের গঠনমূলককার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন। তাঁহাদের অবশ্যই কংগ্রেস সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদান কর

হইবে। মন্ত্রীরা সাধারণ কাজে আসিলে তাঁহাদের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধাও বাড়িবে।

নূতন তিনটি রাষ্ট্রের একত্রীকরণ—

পাকিস্তান, ইরাণ ও আফগানিস্তান তিনটি পাশাপাশি মুসলিম রাষ্ট্র। আরব রাষ্ট্রসংঘের মত তাঁহারা তিনটি রাষ্ট্রকে একত্রীকরণের কথা চিন্তা করিতেছেন। পাকতুনীস্তান লইয়া পাকিস্তানের সহিত আফগানদের বিবাদ আছে। সেজন্য ইরাণের শাহ'কে মধ্যস্থ করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে।

রাশিয়া ও চীন—

চীন এক দিকে ভারতের সীমান্তে বহু সৈন্য সমাবেশ করিয়া ভারত আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে, আর এক দিকে সোভিয়েট রাশিয়ার সীমান্তেও বহু সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। ফলে রাশিয়ার সামরিক কর্তৃপক্ষ কাজাখাস্থান, কিরগিজ প্রভৃতি স্থানে বহু চীনাকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক করিয়া রাখিয়াছে ও বহু স্থান হইতে চীনা সীমান্ত সৈন্যদের তাড়াইয়া চীনের অভ্যন্তরে যাইতে বাধ্য করিয়াছে। চীনের লোক সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় ৭০ কোটি—চীন তিব্বত অধিকার করিয়া তিব্বতীয়গণকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়া ভারতসীমান্তে মোতায়েন করিয়াছে। তাহারা শেষ পর্য্যন্ত কি করিবে, কেহ বলিতে পারে না। চীনারা পাকিস্তান হইতে বহু পরিমাণ মার্কিণ সমরাস্ত্রও সংগ্রহ করিয়াছে। অবশ্য রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে বা রাশিয়া আক্রমণ করিতে তাহারা কখনও সাহস করিবে না। দেশের লোকের সংখ্যা কমাইবার জন্য চীন নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছে এবং লোকক্ষয় করিতে চীনা কর্তৃপক্ষ আদৌ দ্বিধা বোধ করে না। ইহার জন্যই ভারত আজ আতঙ্কিত হইয়া চীন সীমান্ত রক্ষায় কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতে বাধ্য হইতেছে।

দুর্নীতি তদন্ত কমিটী—

মন্ত্রিবর্গ এবং কংগ্রেস সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অন্যান্য গুরু অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ড ৩রা সেপ্টেম্বর নিম্নলিখিত ৩ জন সদস্য লইয়া একটি কমিটী গঠন করিয়াছেন—(১) শ্রীমোরারজী দেশাই (২) শ্রীকামরাজ নাদার (৩) শ্রীজগজীবন রাম। যে ৬টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা পদত্যাগ করিয়াছেন, সে সকল রাজ্যে নূতন নেতা নির্বাচনে সাহায্য করার জন্য ৬ জন বিশিষ্ট নেতাকে পাঠানো হইয়াছে। তাঁহারা সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে নূতন নেতা নির্বাচন করিবেন।

পূজার ছুটী—

কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করিয়াছেন—২৫শে ও ২৬শে অক্টোবর পূজা অর্থাৎ দশেরার জন্য এবং ১৪ই ও ১৫ই নভেম্বর কালীপূজা বা দেওয়ালীর জন্য সরকারী অফিস বন্ধ থাকিবে। ২৭শে ও ২৮শে সেপ্টেম্বর ও ১৬ই, ১৭ই অক্টোবর সীমাবদ্ধ ছুটীর দিন বলিয়া গণ্য হইবে। কেহ ইচ্ছা করিলে ঐ দিনগুলিতে ছুটী লইতে পারেন—তাঁহাদের পরবর্তী দিনগুলিতে কাজ করিতে হইবে।

পঞ্জিকা সংস্কার ব্যবস্থা—

পঞ্জিকা-বিভ্রাটের ফলে এ বৎসর ২ বার দুর্গাপূজা হইবে—কেহ পূজা করিবেন আশ্বিনে, আর একদল করিবেন কার্তিকে। সরকার কার্তিকের পূজার সময় ছুটী ঘোষণা করিয়াছেন। এ সমস্যার সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক পঞ্জিকা-সংস্কার কমিটি গঠন করিয়াছেন ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন গত ৩রা সেপ্টেম্বর কমিটির বৈঠকের উদ্বোধন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণ সে দিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন—শ্রীহরিচরণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীষষ্ঠীচরণ জ্যোতির্ভূষণ, ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীশরৎচন্দ্র স্মৃতিজ্যোতিবিশারদ, ডাঃ এস-কে-চক্রবর্তী, শ্রীনিরঞ্জন স্মৃতিতীর্থ, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী ও শ্রীমুরারিমোহন বেদান্ততীর্থ। কমিটীর সদস্যদের একমত হইয়া এই সমস্যার সমাধান করা কর্তব্য—নচেৎ সাধারণ মানুষ বর্তমান বৎসরের মত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িবে। ১৩৭১ সালে যেন জনগণকে এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে না হয়।

কংসাবতী বাঁধের জল—

কংসাবতী নদীর বাঁধ বাঁধিয়া বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় সেচের জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বৎসর শীতকালে সেচের জল লইয়া চাষীরা যাহাতে চাষ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা চলিতেছে। বাঁকুড়া জেলার অম্বিকা নগরে ২½ মাইল মাটীর বাঁধ করিয়া যে জল ধরা হইতেছে, তাহাতে ৫০ বর্গমাইল স্থানের জন্য জল রাখা চলিবে। ফলে বাঁকুড়া জেলার খাতরা ও রায়পুর থানায় এবং মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানায় ১ লক্ষ একর জমি

জল পাইবে—পর বৎসর উহার দ্বিগুণ জমিতে জল দেওয়া চলিবে।

মেদিনীপুর কংগ্রেসের শুভ দৃষ্টান্ত—

পশ্চিমবঙ্গের পদত্যাগকারী রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি মেদিনীপুর জেলার প্রবীণ কংগ্রেস-সেবক। তিনি পদত্যাগ করার পরই মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ডাঃ রাসবিহারী পাল পদত্যাগ করিয়া মহান্তি মহাশয়কে জেলার ·গ্রেসের সভাপতি হইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। কংগ্রেস সংগঠনকে অধিকতর শক্তি· শালী করার জন্য প্রতি জেলাতে এইভাবে পদত্যাগী মন্ত্রীদের কাজের সুবিধা করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। তাহাতে কংগ্রেসের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে। সকল পদত্যাগী রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীকে একটি করিয়া জেলার সংগঠন কার্যের ভার দিলে জেলাগুলি অবশ্যই উপকৃত হইবে।

১০ লক্ষ টাকার রেশম—

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামের মাত্র ২০০ অধিবাসী প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের বিভিন্ন শ্রেণীর উৎকৃষ্ট রেশম উৎপাদন করিয়া থাকেন এবং তাহা বিদেশে বিক্রীত হইয়া ভারতের প্রায় ২ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। বিষ্ণুপুর সহর হইতে সোনামুখী মাত্র ১০ মাইল—সেখানে গ্রামের নারী ও শিশুরা এই কার্যে অর্থার্জন করিয়া থাকে। যাঁহারা নূতন শিল্পের কথা চিন্তা করেন, তাঁহাদের সোনামুখীর রেশম শিল্প ব্যবস্থা দেখিয়া আসা উচিত। বিষ্ণুপুরের খাদি উৎপাদন কেন্দ্রও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

দেশরক্ষার প্রস্তুতি—

গত ৯ই সেপ্টেম্বর লোকসভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবন জানাইয়াছেন যে একদিকে চীনাদের সামরিক প্রস্তুতি ও অন্যদিকে পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের উদ্যোগ ভারতকে চিন্তিত করিয়াছে। সেজন্য ভারত নূতন ৬ ডিভিসন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সর্বত্র তাহার দেশরক্ষা প্রস্তুতিতে অবহিত হইয়াছে। ভারতের মধ্যাঞ্চলে স্বতন্ত্র একটি কমাণ্ড গঠন করিয়া সৈন্যদল প্রস্তুত করা হইতেছে। যদিও অনেকের বিশ্বাস, চীনারা আর সহজে ভারত আক্রমণ করিবে না, বা আক্রমণ করিলেও সর্বত্র হটিয়া যাইতে বাধ্য হইবে, তথাপি চীনাদের সাহায্যে পাকিস্তান যেভাবে তাহার সাড়ে ১৩ শত মাইল দীর্ঘ সীমান্তে ভারতকে আক্রমণ করার জন্য আগাইয়া আসিয়াছে, তাহা ভারতের পক্ষে শুভ লক্ষণ নহে। সে জন্য ভারতীয় সৈন্যবাহিনী নূতনভাবে পুনর্গঠিত হইয়াছে এবং জল, স্থল ও বিমান বাহিনী—তিনটির ৩ জন সেনাপতি ছাড়াও সকলের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য আর একজন সেনাপতি নিযুক্ত করা হইয়াছে। দেশের সর্বত্র ছাত্রগণকে এন-সি-সি ব্যাপকভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং প্রয়োজন হইলেই তাহাদের দেশরক্ষার কাজে নিযুক্ত করা হইবে।

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়—

সর্বজনপ্রিয় শিক্ষাবিদ্ ও ঐতিহাসিক অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় গত ৯ই সেপ্টেম্বর সোমবার বেলা ১২টার সময় ৮৩ বৎসর বয়সে তাঁহার বালীগঞ্জ একডালিয়া প্লেসের বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর তাঁহার একমাত্র পুত্র কলিকাতা আকাশবাণীর অফিসার শ্রীপি কে-মুখোপাধ্যায় অফিসে যান এবং তাহার ৫ মিনিট পরে রাধাকুমুদবাবুর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল। তাঁহাদের পৈতৃক-বাস বর্দ্ধমান জেলার আমোদপুর গ্রামে—তিনি ১৮৮০ সালে মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০১ সালে দুই বিষয়ে অনার্স সহ বি-এ পাশ করিয়া ঐ বৎসর তিনি অর্থ-নীতিতে এম-এ পাশ করেন। ১৯০২ সালে তিনি ইংরাজিতে এম-এ পাশ করেন ও ১৯০৫ সালে পি-আর-এস ও ১৯১৫ সালে পিএচ্-ডি হন। রিপন কলেজে ইংরাজির অধ্যাপকরূপে তিনি কর্মজীবন আরম্ভ করেন এবং বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৩৭ সাল হইতে কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীরূপে তিনি নানা বিধানসভা প্রভৃতিতে কাজ করেন। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ও অসাধারণ জ্ঞান তাঁহাকে সর্বদা সর্বত্র সমাদৃত করিত। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার একজন দিক্পাল পণ্ডিতের অভাব হইল।

ব্যারিষ্টার প্রফুল্লরঞ্জন দাশ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার প্রফুল্লরঞ্জন দাশ গত ৩রা সেপ্টেম্বর বিকাল ৩টা ৪৫ মিনিটে ৮৩ বৎসর বয়সে পাটনার বাড়ীতে পরলোক-

গমন করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা গৌরী লাহিড়ী বর্তমান। ১২ বৎসর পূর্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং ১০ বৎসর পূর্বে তাঁহার একমাত্র পুত্র শঙ্কররঞ্জন মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁহার অপর কন্যা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান চিফ সেক্রেটারী শ্রীরঞ্জিত গুপ্তের পত্নীও পূর্বেই মারা গিয়াছেন। ১৮৮১ সালে তাঁহার জন্ম—১৯০৫ সালে তিনি ব্যারিষ্টার হন ও ১৯১৭ সালে পাটনায় আইনব্যবসা করিতে যান। তিনি কিছুকাল পাটনা হাইকোর্টের জজ ছিলেন এবং অবসর গ্রহণের পর আবার ব্যারিষ্টারী সুরু করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি প্রায় প্রত্যহ আদালতে যাইতেন। আইনজ্ঞ বলিয়া সারা ভারতে তাঁহার খ্যাতি ছিল এবং বিভিন্ন আদালতে তাঁহাকে যাইতে হইত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দানশীল এবং অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন।

জগদীশ ভট্টাচার্য—

শিলিগুড়ী হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য জগদীশ ভট্টাচার্য্য গত ২৯শে আগষ্ট ভোরে নীলরতন সরকার হাসপাতালে মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নী, পুত্র ও ২ কন্যা বর্তমান। তাঁহার মৃতদেহ মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টায় বিমানে শিলিগুড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তিনি মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ও আজীবন কংগ্রেস-সেবক ছিলেন—১৯৬২ সালে এম-এল-এ হইয়াছিলেন। মৈমনসিংহ জেলায় তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল।

উত্তরবঙ্গ ও আসাম—

উত্তরবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর হইতে আসাম যাইবার পথের এক ধারে বিহার ও অপর ধারে পূর্বপাকিস্তান। পথটি সংকীর্ণ—ঐ পথটি বিঘ্নিত করার জন্য পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ উহার পাশে বহু সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। ঐ পথ দিয়া প্রত্যহ বহু ট্রাক ও মালগাড়ী যাতায়াত করিয়া থাকে—পথটি সুরক্ষিত রাখিতে বহু অর্থব্যয় করা প্রয়োজন। ঐ পথরক্ষার ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রহণ করা উচিত। পথ নষ্ট হইলে আসাম পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলাও বিপন্ন হইবে। পাকিস্তান সরাসরী যুদ্ধ না করিয়া নানাভাবে ভারতীয় এলাকার ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে—বর্তমানে আবার তাহারা এ বিষয়ে চীনা সাহায্য লাভ করিতেছে। দেশবাসীর পক্ষে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

কলিকাতায় গ্যাস সরবরাহ—

কলিকাতা সহরে কয়লার পরিবর্তে গ্যাস দ্বারা রন্ধন কার্য চালাইয়া ধোঁয়া কমাইবার জন্য দুর্গাপুর হইতে কলিকাতায় অধিক গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থার উদ্বোধন গত ১লা সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। ঐ ব্যবস্থায় ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। উহাতে কলিকাতায় দৈনিক ৩ কোটি ৫০ লক্ষ কিউবিক ফুট গ্যাস সরবরাহ হইবে। সে জন্য ১৭৭ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপ বসানো হইয়াছে। উৎসবে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও কয়েকজন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। দুর্গাপুর প্রকল্পের চেয়ারম্যান শ্রীডি-এন-মিত্র এবং চিফ এঞ্জিনিয়ার শ্রীএস-কে কাঞ্জিলাল বিষয়টি সকলকে বুঝাইয়া দেন ও এই কার্যে যুগোশ্লাভিয়ার সাহায্যের কথা বলেন।

সরকারী কৃষি বিভাগের অবস্থা—

স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ণ ১৬ বৎসর অতীত হইলেও আজ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কৃষি বিভাগ আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হয় নাই। গত ১৬ বৎসরে এ জন্য অর্থব্যয় কম হয় নাই। চলতি বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬৩-৬৪ সালেও বাজেটে কৃষি বিভাগের জন্য যে টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল, তন্মধ্যে দেড় কোটি টাকা পড়িয়া থাকিবে—অথচ কৃষির উন্নতির কোথাও প্রয়োজনীয় কাজ করা হয় না। বীজ সরবরাহ, সার সরবরাহ, জল সরবরাহ প্রভৃতি ব্যবস্থা সর্বত্র ত্রুটিপূর্ণ—হাজার হাজার সরকারী কর্মচারী এ কাজের জন্য নিযুক্ত থাকিলেও কোন কাজ হইতেছে না—দেশে শুধু ধানের ফসল কম নহে, তরিতরকারী, ফলমূল ও অন্যান্য পরিপূরক-খাদ্য উৎপাদনের ও চেষ্টা করা হয় না। আজ প্রতি দেশবাসীর এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত এবং যাহাতে সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্যে অবহেলার কথা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

পুরীতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন—

আগামী বৎসর ৮ই হইতে ১২ই জানুয়ারী পুরীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী বার্ষিক অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে। পুরী ভারতের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান—চারি ধামের একটি। কাজেই ঐ উপলক্ষে তথায় বহু লোক সমাগম হওয়া স্বাভাবিক। নূতন ব্যবস্থায় নূতন জীবনলাভ করিয়া কংগ্রেস যাহাতে ভারতের জনগণের মনে শ্রদ্ধার স্থান লাভ করে, সে জন্য কংগ্রেস কর্মকর্তাদের এখন হইতেই অবহিত হওয়া দরকার।

রাষ্ট্রপতির জন্ম দিন—

ভারতের রাষ্ট্রপতি আজীবন শিক্ষাব্রতী ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন ৫ই সেপ্টেম্বর সারা ভারতবর্ষে শিক্ষা-দিবস বলিয়া পালন করিয়া সকল শ্রেণীর শিক্ষকগণ সভায় সমবেত হইয়া রাষ্ট্রপতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণ আদর্শ শিক্ষক এবং আজ দেশের সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানজনক পদে আসীন—কাজেই শিক্ষকগণ তাঁহার জীবনকথা আলোচনা করিয়া নিজেরাও লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সৌভাগ্য, ভারতের বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি ডাক্তার জাকীর হোসেনও একজন শিক্ষক। শিক্ষকদ্বয়ের পরিচালনে দেশের সাধারণ শিক্ষকশ্রেণী উপকৃত হইলেই দেশের মঙ্গল হইবে।

সাপ

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

সাপ, বাঘ, হাতীর ভয় যেখানে ভয়ংকর সেখানে কেটেছে আমার জন্ম থেকে বালক কালটা। সাপের কামড় খেয়েছি অতি শৈশবে। আমি ভেবেছিলুম সিঙ্গি মাছ বুঝি কামড়িয়েছে, কর্তারা ভেবেছিলেন, জলে যখন কামড়িয়েছে নিশ্চয়ই ডোরা সাপেই কেটেছে। কিন্তু যে ধন্বন্তরি চিকিৎসা করেছিলেন তিনি বলেছিলেন, কালসাপে কেটেছে। কারণ তার দুই দাতের চিহ্ন ছিল পায়ে।

তারপর অনেক দিন কেটেছে। অনেক সাপ দেখেছি—কেউ খুব কাল, কেউ সবুজ। কিন্তু যে-সাপটি আমার কোলের উপর লম্বা হয়ে শুয়েছিল, সেটি ছিল কালো। অন্ধকার ঘরে জানালার ধারে বসে তাকিয়েছিলাম তিতাসের কালো জলের দিকে, কিন্তু কখন এসে সে আমার কোলের উপর লম্বা হয়ে পড়েছিল তা বুঝতেই পারিনি। কিন্তু ঠিক ঠাহর করতে পেরেছিলুম যখন সে চলে যায়; সে অন্ধকার ঘরে বৌদি হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রেখে যাবার জন্যে এসেছিলেন। সাপটি ধীরে ধীরে বাইরে চলে গেল জানালা দিয়ে। জানালার বাইরে পুকুর। পুকুরের জল আর নদীর কালো জল তখন একাকার হয়ে গেছে। সেই কালোতে মিলিয়ে গেল কালো সাপটা।

বিদ্যুতের মত ঝক্‌ঝকে সোনালী সাপও আমি দেখেছি। তা' অবশ্য স্বপ্নে। স্বপ্নে আমায় তাড়া করত সাধারণতঃ সাপ বা কুকুর। জীবনে আমি দুয়েরই কামড় খেয়েছি। অবশ্য মানুষের কামড় খেয়েছি তার চেয়ে বেশী। কিন্তু যখনই কোন সমস্যা দেখা দিত, অর্থাৎ কোনও মনুষ্য কামড়াবে বলে ভয় হত, আমায় নৈশ বিভীষিকায় আক্রমণ করত, আমি দেখতে পেতাম স্বপ্নে কুকুর বা সাপ আমায় তাড়া করছে।

সাপের তাড়া খাওয়া কিন্তু এক সময়ে বেশ কমে গেল, অবশ্য এ কমার আগে অনেকগুলি ঘটনা ঘটেছে। প্রথমে আমাদের বাড়ীতে একটা বিড়াল এল—বড় শিকারী বিড়াল। ইঁদুর খেয়ে সে বিড়াল তৃপ্ত থাকত না। প্রায়ই সে জঙ্গল থেকে জীবন্ত সর্প মুখে করে কামড়ে ঘরের ভিতর নিয়ে এসে হাজির হত। কতবার বিড়ালটাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কদিন পরেই তাকে দেখা যেত, মুখে সাপ নিয়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকছে। তার গলায় সাপটা তিনবার পেঁচ লাগিয়েছে, মহাদেবের গলায় সে যেমন করে দেয়।

তারপর একদিন আমাদের শোবার ঘরের খাটের নীচে স্বয়ং কালনাগিনী এসে দেখা দিল, ফণা তুলে। কিন্তু স্বরেন শীলের লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। বল্লমের এক খোঁচায় তার ফণাটা ভেদ করে ছিল সে। তার পরের ঘটনা আরও সাংঘাতিক। আমাদের বাড়ীর বাইরেকার উঠানের পাশে ছিল পাটখড়ির স্তূপ। স্তূপের পাশে একদিন হঠাৎ দেখাদিল এক কেউটে সাপ আর বেজী। দুজনে তখন লড়াই হচ্ছে। সাপ মাথা তুলে ফণা দোলাচ্ছে। আর বেজী তার গায়ের লোম ফুলিয়ে চারি দিকে ঘুরে ঘুরে ওকে ঘায়েল করবার চেষ্টা করছে।

আমাদের বৈঠকখানা ঘর থেকে যুদ্ধটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। পাড়ার বহু লোক জমায়েত হয়েছিল সে ঘরে। তাদের মধ্যে ছেলে বুড়ো যুবক সকলেই ছিল। হাতের কাজ ফেলে ছুটে এসে সেখানে ভিড় করেছিল ঠাণ্ডার মা, বাতাসীর মাসী ও বিন্দার পিসী এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা-বাতাসী-বিন্দা সকলে। বৈঠকখানায় তাদের উপস্থিতি মোটেই ভাল লাগেনি। কিন্তু বিন্দার পিসীর পদ্মপুরাণ আগাগোড়া মুখস্থ। কত রকমের সাপ, তাদের আকৃতিপ্রকৃতি ও বিষের শক্তি সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব অনর্গল বলে যেতে লাগল সে। কয়টি জোয়ান ছেলে বল্লম হাতে বৈঠকখানায় বেড়া ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল। বিন্দার পিসী তাদের সাবধান করে দিল। রক্ষে নেই, বাছা এ কাজটি করো না। এ হচ্ছে স্বয়ং বাসুকির নিজের ছেলে। দেখছ না মাথায় শ্রীকৃষ্ণের পায়ের চিহ্ন দুটি-

কেমন পরিষ্কার? ওকে যদি ঘাটাও, তবে সারা গ্রামের লোক মা মনসার কোপে ভস্ম হয়ে যাবে। গ্রামে কেউ থাকবে না! ঠাণ্ডার মা নিজে পদ্মপুরাণ না পড়লেও প্রায় তিরিশ বছর ধরে পাঠ শুনে আসছে। তার জ্ঞানও কম নয়, একটা মৃদু প্রতিবাদ গুমরে উঠল তার মুখে। কিন্তু সাপটা হঠাৎ সুযোগ পেয়ে বেজীটাকে এমন এক ছোবল মারল, যে সে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মাটীতে গড়াগড়ি করতে লাগল, চীৎকার করতে লাগল। বিন্দার পিসী তখন যেন নিজের কথার মাহাত্ম্যের প্রমাণ পেল। বলল, "দেখলে তো স্বয়ং বাসুকির ছেলে হচ্ছে এ। বেজীর সাধ্য এর সঙ্গে লড়াই করা!

বেজীটা ছুটে চলে গেল জঙ্গলে। ঠাণ্ডার মা বলল, কিছু হবেনা বেজীটার। এক্ষুণি সে জঙ্গলে ওষুধের গাছ থেকে ওষুধ খেয়ে ভাল হয়ে যাবে।

বাসুকির নিজের ছেলে কামড়েছে, বেজীর আর রক্ষে নেই, এবার মা মনসা তোমাদের রক্ষা করুন, বলেই কপালে হাত ঠেকাল বিন্দার পিসী।

সাপটা তখন ফণা গুটিয়ে ধীরে ধীরে সোনার স্তূপের নীচে গিয়ে লুকাল। বিন্দার পিসী জয় মা মনসা, এবার গাঁওটাকে রক্ষে করেছ বলে নিজের কাজে গেল। গল্প করতে করতে যে যার কাজে চলে গেল। আমরা শুধু বিন্দার পিসী ও ঠাণ্ডার মার কাছে শোনা সাপ-কাহিনী নিয়ে আলোচনা করতে লাগলুম।

কতক্ষণের মধ্যেই ভীষণ ফোঁস ফোঁস শব্দ শোনা যেতে লাগল। আমরা বাইরে তাকিয়ে দেখলুম পাটখড়ির মাচান থেকে প্রায় কুড়িহাত দূরে বাঁশঝাড়ের জঙ্গলের কিনারায় সাপ ফণা তুলে গর্জন করছে। তার গর্জনের মধ্যে বোঝা যাচ্ছিল তার প্রবল প্রতাপ। তিনটা বেজী তাকে তিন দিক থেকে ঘিরে আছে। এবারকার যুদ্ধ বড় ভীষণ। তিন বেজীর তিন দিকে ঘুরে ঘুরে সাপকে আত্মরক্ষা করতে হচ্ছে, আক্রমণ চালাতে হচ্ছে। কতক্ষণ যুদ্ধ চলেছিল মনে নেই। হঠাৎ দেখলুম সাপটার পেছন দিক থেকে একটা বেজী ক্ষিপ্রবেগে তার ঘাড়টা কামড়ে ধরল। অমনি সাপটা তার কুণ্ডলী খুলে শরীরটাকে ঘাসের উপর সোজা করে রাখল, তারপর লেজটাকে ডাইনে বাঁয়ে ভীষণ বেগে আছড়াতে লাগল। ইতিমধ্যে আরও দুটি বেজী ঝাঁপিয়ে পড়ে সাপের দেহের আরও দুই ভাগে কামড়ে ধরল, মুহূর্তের মধ্যে সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা সাপটা চার টুকরো হয়ে গেল। বেজী তিনটা নাচতে নাচতে বনের ভিতর চলে গেল, মুখে তাদের সাপের কাঁচা রক্ত লেগে আছে। ঠাণ্ডা ও বিন্দা ঘরেই ছিল আমাদের সঙ্গে। ঠাণ্ডা উত্তেজনায় আমার ঘাড়ে এসে লাফ দিয়ে উঠে বসল। বিন্দা হাততালি দিয়ে বলল, কী লজ্জা এত বড় মেয়ে!

সেই থেকে দুঃস্বপ্নে আমি আর সাপের ভয় বড় একটা পাই না। কিন্তু প্রায়ই ভয় পাই ঠাণ্ডার স্বপ্ন দেখে। ঠাণ্ডাকে যেন গুণ্ডায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে যেন পারছি না। গুণ্ডার মুখ যেন ঠাণ্ডার বরেরই মুখ।

একটু সোনার স্বাদ

প্রতীপ দাশগুপ্ত

যদি ফুল না থাকত, যদি না থাকত পাখীর গান
আর মনের একটু স্বপন,
কি হ'ত তখন?
তখন দুঃখ, ব্যথা-কুশাঙ্কুরের
কাঁটায় ভরা এই জগৎ
লাগত কঠিন মরণ-শপথ।

তাই এ বিরাট রুক্ষতাতে একটু স্বপন,
একটু আলো, একটু পাখীর গান—
কেমন মধুর দান!
উষর-আবিলতা-ঘেরা বিরাট ধরার
বিরাট গহন খাদ—
এরই মাঝে একটু সোনার স্বাদ।

হার্সেল

উপাধ্যায়

হার্সেলের অপর একটি নাম ইউরেনাস। বাংলায় এর নামকরণ হয়েছে ইন্দ্র বা প্রজাপতি। এই গ্রহটির আবিষ্কর্তা উইলিয়ম হার্সেল। ইনি জনৈক বাদ্যকরের পুত্র। হার্সেল একটি বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন গ্রহনক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণের জন্যে। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আলোচ্য গ্রহটি আবিষ্কার করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাধর জ্যোতির্ব্বিদ। ফরাসী পণ্ডিতরা আবিষ্কর্তার নামানুসারে গ্রহটির নাম রাখেন হার্সেল। একে অনেকে ইউরেনাসও বলেন। লাটিন ও গ্রীক ভাষায় আউরেনাসের অর্থ স্বর্গ। এই মৌলিক অর্থ নিয়ে বর্ত্তমানকালে ইউরেনাস আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বৃশ্চিক রাশি এই গ্রহের তুঙ্গস্থান। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে গ্রহটি সূর্য্য থেকে দশলক্ষ মাইল দূরে ছিল। প্রায় সাত বছর এক একটি রাশিতে এই গ্রহ অবস্থান করে। সমগ্র রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে আসতে এর ৮৪ বৎসর লাগে। এই গ্রহ পাপগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

অপ্রত্যাশিত ঘটনার মূলে আছে এর প্রভাব। অল্প সময়ের মধ্যে যে সব ঘটনার অবসান ঘটে, তার মূলেও আছে এই গ্রহ। র‍্যাফেল তাঁর 'Ephemeris of 1934' গ্রন্থে বলেছেন যে—এই গ্রহের আবিষ্কারের পরই দ্রুতভাবে বিজ্ঞানের নব নব অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার সুরু হয়েছে আর মানব জীবনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে বাষ্প ও বিদ্যুতের আনুকূল্য ও প্রভাব দেখা দিয়েছে। সংসারের সর্ব্বক্ষেত্রে বিশেষতঃ সভ্যতা ও সংস্কৃতির আয়তনে, ধর্ম্ম ও রাজনীতির স্তরে যে সব মহানুভব কৃতীপুরুষ বৈপ্লবিক যুগ এনেছেন তাঁদের জন্মকালে দেখা যায় এই গ্রহের সুস্পষ্ট প্রভাব। পুরাতনের গতি ও প্রকৃতির বিলোপসাধন করে এই গ্রহটী নবীনের সংগঠনে অদম্যশক্তির প্রভাব বিস্তার করে। এ জন্যেই গ্রহকে 'The Socialist, the Awakener, the uplifter' বলা হয়।

ফ্রাঙ্ক থিওডোর এলেন সাহেব বলেছেন—'In the horoscope of all men of superior genius and originality, we never fail to find uranus prominently placed or strongly aspected !'

এ, জি, পিয়ার্স বলেছেন—'...Remarkable for a love of romance and a tendency to Bohemianism !'

হার্সেলের শুভ-কারকতায় মানুষ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি লাভের অধিকারী হয়। লগ্নে থাকলে জাতক নব নব ভাবের বা কাজের উদ্বোধন করতে সক্ষম হয়, কিন্তু গতানুগতিকের প্রতি আর প্রচলিত অনুষ্ঠানের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধাবান হয়না, আর কারও খাতির রাখে না বা কারও কাছে বাধ্যবাধকতা পছন্দ করে না।

হার্সেল পঞ্চম বা সপ্তমভাব পীড়িত করলে প্রায়ই অগম্যাগমন হয়। সপ্তম বা জায়া স্থানে হার্সেল থাকাটা বাঞ্ছনীয় নয়, তাতে জায়া-সুখ হয়না, বিশেষতঃ জায়াকারক গ্রহের অথবা চন্দ্রের সঙ্গে বিরুদ্ধ দৃষ্টি সম্বন্ধে আবদ্ধ হোলে জায়াসুখ কখনই ভাগ্যে ঘটেনা, হয়ত বিবাহ হয়না, হোলেও

বিলম্বে ঘটে—আর প্রায়ই জাতকের ভ্রষ্ট চরিত্র হয়। দশম স্থানে রবি চন্দ্র শুক্র বৃহস্পতির সঙ্গে শুভযোগ দৃষ্টি সম্বন্ধে আবদ্ধ হোলে জীবনে বিশেষরূপে সাফল্য লাভ হয়। পঞ্চমভাবে শুভ দৃষ্টি করলে আর বলবান হোলে লটারীতে বেশ মোটা টাকা পাওয়া যায়।

বুধ, শুক্র, প্লুটো বা রুদ্র ও রাহু এর মিত্র। ডাঃ এল, ডি. ব্রাউটন সাহেব তাঁর 'Elements of Astrology' গ্রন্থে বলেছেন সে গ্রহটী রবির স্কোয়ার অর্থাৎ ১৩৫ ডিগ্রীতে অথবা অপোজিশন ১৮০ ডিগ্রী প্রেক্ষায় থাকলে জাতকের জীবনে বহু বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হোতে হয়। দারুণ ক্ষতি ও নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি ঘটে। শক্তিসম্পন্ন দুর্দ্দান্ত শত্রুর দ্বারা পীড়িত হোতে হয়। স্ত্রীলোকের কোষ্ঠিতে এরূপ থাকলে সে অসতী হয়। তার চরিত্র নষ্ট করবার প্রবণতা বেশী দেখা যায়।

শুক্রের সঙ্গে গ্রহটী লগ্ন, তৃতীয় এবং নবম স্থানে অবস্থান সম্পর্কে ব্রাউটন সাহেব বলেছেন—'In 1st, 3rd, 9th, the native is generally a good musician or actor but fond of Women and pleasure.'

শনির সঙ্গে গ্রহটী লগ্নে অথবা মেষ রাশিতে থাকলে প্রতি সাত বৎসর অন্তর জাতকের কিছু দুর্ঘটনা, বিপত্তি ও দুর্ভাগ্য সৃষ্টি করবে।

দ্বিতীয় স্থানে হার্সেল চির দারিদ্র্য সৃষ্টি করে। গ্রহটীর স্বক্ষেত্র কুম্ভ। মূল ত্রিকোণ ও উচ্চ স্থান বৃশ্চিক। নীচ স্থান বৃষ। সিংহ এর নাশ স্থান। নাশস্থানে গ্রহ থাকলে ভালো মন্দ সকল গুণেরই প্রকাশে বাধা দেয়।

হার্সেল ভাগ্যনিয়ন্তা হোলে জাতকের জীবনে অসাধারণত্ব থাকে। শুভ হোলে গ্রহটি মৌলিকতা, অক্লান্ত-কর্ম্মশক্তি, শান্ত অথচ বেগবতী তেজস্বিতা, অদম্য ইচ্ছা-শক্তি ও প্রবল ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে।

যা কিছু গতিশীল ও গতিদ্যোতক, দ্রুতগতিবিশিষ্ট যানবাহন—রেল এঞ্জিন, মোটর গাড়ী, ইলেকট্রিক ট্রাম, এরোপ্লেন, প্রাচীন গ্রন্থ ও আসবাব, নির্জ্জন বাড়ী, রেডিয়াম প্রভৃতির ওপর এর প্রভাব।

বক্তা, জনগণের নেতা, সরকারী বা পৌর কর্ম্মচারী, আবিষ্কারক, ইলেকট্রিসিয়ান, জ্যোতিষী, সম্মোহনকারী, যাদুকর, অভিজাত, স্বেচ্ছাচারী, পুলিস বা সামরিক, বিভাগের ব্যক্তি, সংগঠক, তপস্বী, অবিবাহিত ও অবিবাহিতা ব্যক্তির ওপর হার্সেলের বিশেষ প্রভাব।

পরিবর্ত্তন, ট্রাজেডি, চমকপ্রদ ঘটনা, দুর্ঘটনা, ব্যোম-পথে বিচরণ, রোমান্স, দুঃখ দুর্দ্দশা, শোক, অশ্ব থেকে পতনের বিপত্তি প্রভৃতির মূলে আছে হার্সেলের প্রভাব। প্রণয়ভঙ্গ, অবৈধ প্রণয়, দাম্পত্য জীবনের বিশৃঙ্খলতা, লেখা বক্তৃতা, মান অভিমান, ভ্রমণ, অপ্রত্যাশিত ঘটনা, জীবন বিপন্নতা, বিদেশে নির্ব্বাসনভোগ প্রভৃতির সক্রিয়-তার মূলে আছে এর প্রভাব।

হার্সেল বায়ুরাশিতে বিশেষতঃ কুম্ভরাশি গত হোলে বলবান হয়। কুম্ভ রাশিগত হার্সেল আনে সংস্কারের উচ্চ আদর্শ, সব বিষয়ে সংস্কার করবার ইচ্ছা ও চেষ্টা। উচ্চপদ ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ হয়। নিজের কর্ম্মশক্তিতে উপার্জ্জন। শেষ বয়সে তন্ত্রমন্ত্রের দিকে অসম্ভব ঝোঁক। শোচনীয় মৃত্যু অথবা যোগে দেহত্যাগ। কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় বহু ব্যয় ও অবনতি। বিবাহে বা দাম্পত্য-জীবনে রোমান্স। প্রেমে অপ্রত্যাশিত বিচ্ছেদ।

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফল

মেষরাশি

ভরণীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। কৃত্তিকা ও অশ্বিনী নক্ষত্র জাত ব্যক্তির পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য হানির সম্ভাবনা নেই। তবে উদর ও চক্ষু সংক্রান্ত সামান্য পীড়াদি যোগ আছে। শরীরে দুর্ব্বলতা অনুভব। মনের শান্তির অভাব। গুরুজন বিয়োগ। পারিবারিক কলহ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ভয় ও দুর্ঘটনা, দুঃখপ্রাপ্তি, ক্ষতির সম্ভাবনা—ভরণীর পক্ষে সৌভাগ্যবৃদ্ধি ও সাফল্য। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে আশানুরূপ নয়। মামলা মোকর্দ্দমার পক্ষে প্রতিকূল মাস। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে বিশেষ শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি কিছু প্রতিকূল হোলেও বেশীর ভাগ সময় ভালো যাবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধ আশানুরূপ শুভ হবে না। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষ রাশি

রোহিণীজাতগণের পক্ষে উত্তম, কৃত্তিকা বা মৃগশিরার পক্ষে অধম। শরীরে বিশেষ কোন পীড়া হবে না। পারিবারিক অশান্তি। আর্থিক অবস্থা মোটের ওপর মন্দ যাবে না। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে ভালো বলা যায়। চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মোটের ওপর একই ভাব। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম সময়। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

মিথুন রাশি

আর্দ্রাজাতগণের পক্ষে অতীব উত্তম সময়। পুনর্বসুর পক্ষে মধ্যম। মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য হানি। শারীরিক দুর্ব্বলতার আধিক্য। সন্তানগণের পীড়া। পারিবারিক কলহ বিবাদ। স্বজনবর্গের শত্রুতা, আর্দ্রাজাতগণের পক্ষে সৌভাগ্যবৃদ্ধি, ভ্রমণ ও আমোদ-প্রমোদের সম্ভাবনা। প্রথমার্দ্ধটী শুভ হোলেও শেষের দিকে উল্লেখযোগ্য শুভ। টাকা লেন-দেনের ব্যাপারে ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। শেষার্দ্ধে শত্রুরা উপরওয়ালার সঙ্গে জাতকের মনোমালিন্য ঘটিয়ে দিতে পারে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে একই ভাব। তবে শেষার্দ্ধে কিছু আয়বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধ নৈরাশ্যজনক। শেষার্দ্ধটী উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে উত্তম, অশ্লেষার পক্ষে মধ্যম এবং পুষ্যাজাতগণের পক্ষে অধম। স্বাস্থ্যহানি, পীড়াদি। অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয়, গুহ্যপ্রদেশে পীড়া। পারিবারিক অশান্তি। আর্থিক ক্ষেত্র শুভ, দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিশেষ শুভ। শিল্পকলা ব্যবসাদির মাধ্যমে লাভ, ব্যয়-প্রবণতার সম্ভাবনা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ। অংশীদার সংক্রান্ত সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ ঘটতে পারে। চাকুরির ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত ভালো। প্রথমার্দ্ধে শত্রু পক্ষের জন্য কিছু অসুবিধা, দ্বিতীয়ার্দ্ধে অবস্থা উত্তম ও অনুকূল। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি-জীবীর পক্ষে লাভ ও সন্তোষজনক পরিস্থিতি।

প্রথমার্দ্ধে স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম, শেষার্দ্ধে পরিস্থিতি অনুকূল নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

সিংহ রাশি

পূর্ব্বফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, মঘজাতগণের পক্ষে মধ্যম, এবং উত্তরফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে অধম। শরীর বিশেষ খারাপ যাবে না। হৃদ্‌রোগ ও রক্তচাপবৃদ্ধি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ব্যাধির প্রকোপ। পারিবারিক শান্তি। পরিবারবহির্ভূত স্বজনগণের সহিত কলহ। আর্থিক ক্ষেত্র উত্তম। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটি শুভ। চাকুরির ক্ষেত্রে ভালো মন্দ দুইই ঘটবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মন্দ নয়।

স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি সর্ব্বতোভাবে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে ফল মধ্যম।

কন্যারাশি

হস্তাজাতগণের পক্ষে উত্তম, উত্তরফল্গুনী ও চিত্রাজাত গণের পক্ষে অধম। স্বাস্থ্যের অবনতি। বাতপ্রকোপ অজীর্ণ উদর পীড়া, পিত্তাধিক্য। রক্তের চাপবৃদ্ধি। পারি-বারিক শান্তি। পরিবার বহির্ভূত স্বজনবর্গের সহিত মনোমালিন্য। আর্থিক ক্ষেত্র আশাপ্রদ হোলেও ব্যয়াধিক্য-জনিত অস্বচ্ছন্দতা। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটা ভালোই যাবে। চাকুরির ক্ষেত্রে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিস্থিতি দেখা যায় না। সরকারী চাকুরিজীবীর সতর্কতা আবশ্যক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। প্রথম গর্ভবতীর সন্তান প্রসবের সময় কষ্টভোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

তুলা রাশি

স্বাতীজাতগণের পক্ষে উত্তম। বিশাখার পক্ষে মধ্যম। চিত্রার পক্ষে অধম। শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। জ্বর, পিত্তপ্রকোপ, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি। কোনপ্রকার আঘাতে দূষিত ক্ষত। শারীরিক দুর্ব্বলতা। ঘরে বাইরে বিপদ। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা। লাভ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, বন্ধুর সাহায্য প্রভৃতি। ব্যয় বৃদ্ধি দ্বিতীয়ার্দ্ধে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধি-কারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ নয়, নানাপ্রকার বিপত্তির

আশঙ্কা। চাকুরির ক্ষেত্র সন্তোষজনক, উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার যোগ। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে বিশেষ শুভ। স্ত্রীলোকেয় পক্ষে প্রথমার্দ্ধ শুভ, দ্বিতীয়ার্দ্ধ নৈরাশ্যজনক। চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ী মহিলার উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখাজাতগণের পক্ষে উত্তম, জ্যেষ্ঠার পক্ষে মধ্যম। অনুরাধাজাতগণের পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। পারিবারিক সুখ শান্তি। আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। নানাপ্রকারে লাভ। অর্থ লগ্নী করলে ভবিষ্যতে বিশেষ লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে সন্তোষজনক, চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর সৌভাগ্য বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ধনু রাশি

পূর্ব্বাষাঢ়ার পক্ষে উত্তম। মঘার পক্ষে মধ্যম। উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য মন্দ যাবে না। সর্দ্দি ও শারীরিক দুর্ব্বলতা। পারিবারিক শান্তি। কোন বন্ধু বা স্বজনের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির আশঙ্কা। আর্থিকক্ষেত্র শুভ ও আশাপ্রদ। প্রতারণায় কিছু ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না, চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে শেষার্দ্ধ বিশেষ শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মকর রাশি

শ্রবণাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। ধনিষ্ঠার পক্ষে অধম। উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে নিকৃষ্ট। শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। দৈহিক দুর্ব্বলতা। স্ত্রী ও সন্তানদের পীড়া প্রথমার্দ্ধে। পারিবারিক শান্তি। পরিবারবহির্ভূত স্বজন ও বন্ধুবর্গের শত্রুতা। আর্থিকক্ষেত্র সন্তোষজনক। নানাপ্রকারে লাভ। সহজেই অর্থাগম। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। চাকুরির ক্ষেত্র সন্তোষজনক, তবে প্রথমার্দ্ধে উপরওয়ালার সহিত মনোমালিন্যজনিত অশান্তিভোগ। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি ও অর্থাগম। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধ প্রতিকূল, শেষার্দ্ধ প্রীতিপ্রদ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ নয়।

কুম্ভ রাশি

শতভিষাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পূর্ব্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। ধনিষ্ঠার পক্ষে অধম ও নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। উদরের গোলমাল, গুহ্যপ্রদেশে ও মূত্রাশয়ে পীড়া, অজীর্ণতা প্রভৃতি। তীক্ষ্ণ অস্ত্র ব্যবহারে সতর্কতা আবশ্যক। স্ত্রী ও সন্তানদের সহিত কলহ। নানাপ্রকারে লাভ। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক। অপচয় ও ক্ষতি যোগ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। চাকুরির ক্ষেত্রে অধৈর্য্য হোলে গোলমালের সৃষ্টি হোতে পারে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে বিশেষ শুভ সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদজাতগণের পক্ষে উত্তম। রেবতীর পক্ষে অধম। শারীরিক অবস্থা বিশেষ খারাপ যাবে। দুর্ঘটনায় রক্তপাতের আশঙ্কা। হজমের গোলমাল, গুহ্যদেশে পীড়া, আমাশয়, জ্বর প্রভৃতি। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হবে না। কলহ বা মনোমালিন্যের সম্ভাবনা নেই। কিছু পারিবারিক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার আশঙ্কা আছে। আর্থিক অবস্থা উন্নত হোলেও ব্যয়ের জন্য অসুবিধা ভোগ। উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি লাভ, উপঢৌকনপ্রাপ্তি, অভিনন্দনাদি লাভের সম্ভাবনা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি নানা অসুবিধা ও গোলমালের মধ্যে অতিবাহিত হবে। মামলা মোকর্দ্দমার উদ্ভব হোতে পারে। চাকুরির ক্ষেত্রে পরিস্থিতি শুভব্যঞ্জক। বেকার ব্যক্তির কর্ম্মপ্রাপ্তি। অস্থায়ী চাকুরিয়ার স্থায়ীপদ লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধ শুভ নয়, দ্বিতীয়ার্দ্ধ ভালো যাবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নফল

মেষ লগ্ন—

শারীরিক অবস্থা ভালো যাবে না। ধনাগমও সুখ্যাতির আশা। সহোদরভাব শুভ নয়। কপট বন্ধুর সমাগম। সন্তানের লেখাপড়ার উন্নতি। গুপ্তশত্রুর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। পত্নীর স্বাস্থ্যহানি। মাতৃপীড়া। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। ব্যবসায় মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষ লগ্ন—

স্বাস্থ্যের অবনতি ও কৃশতা। ধন লাভ। চাকুরির উন্নতি যোগ। সহোদরের দ্বারা উপকারপ্রাপ্তি। সম্বন্ধ লাভ। ব্যয়বাহুল্য হেতু মানসিক চাঞ্চল্য। সন্তানের পীড়া। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

মিথুন লগ্ন—

পীড়া, দুর্ঘটনার ভয়, ব্যয়বাহুল্য, শত্রু বৃদ্ধির আশঙ্কা কম। সন্তানের বিদ্যা চর্চ্চায় উন্নতি। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি, বাত প্রকোপ ও স্ত্রী ব্যাধি। ভাগ্যোন্নতি যোগ। কর্ম্মোন্নতি। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ নয়। বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীর পক্ষে নিকৃষ্ট ফল।

কর্কট লগ্ন—

দেহ পীড়া, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, দুশ্চিন্তা ও মানসিক আঘাতপ্রাপ্তি, ধনাগম যোগ। সহোদরভাব শুভ। সম্বন্ধ লাভ। পত্নীর পাকাশয়ে গোলযোগ ও স্ত্রীব্যাধি। ভাগ্যোন্নতি। তীর্থ পর্যটন। পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ ফল। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

সিংহ লগ্ন—

দেহভাবের ফল মধ্যবিধ। ধনাগম যোগ। ব্যয়-সঙ্কোচের প্রচেষ্টা। সন্তানের পীড়া। বন্ধুভাব শুভ। পত্নীর হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা এমন কি হৃদ্রোগের সম্ভাবনা। তীর্থ পর্য্যটন। ভাগ্যভাব শুভ। গৃহ সংস্কার বা নির্ম্মাণ। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে পারিবারিক অশান্তি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

কন্যা লগ্ন—

শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা, শ্লেষ্মা প্রকোপ, হজমের গোলমাল, বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতি, শত্রুদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। পত্নীর স্বাস্থ্যোন্নতি, দাম্পত্য প্রণয়। ভাগ্যোন্নতি। কর্ম্ম-স্থানে কিছু বাধা বিঘ্ন। ব্যয়াধিক্য হেতু ঋণের আশঙ্কা। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

তুলা লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। ব্যয়বৃদ্ধি। স্নায়ুগত পীড়া। আশাভঙ্গ। ধনভাবের ফল শুভ নয়। সন্তান-গণের লেখা পড়ায় বিঘ্ন। শত্রু বৃদ্ধিযোগ। পত্নীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে। ভাগ্যোন্নতিতে বাধা। পুত্রকন্যার বিবাহ প্রসঙ্গ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে নিকৃষ্ট ফল।

বৃশ্চিক লগ্ন—

শারীরিক অবস্থার কিছু উন্নতি। ব্যয়াধিক্য। বৈষয়িক ব্যাপারে ভ্রাতার সহিত মতানৈক্য ও তজ্জনিত অশান্তি। পদোন্নতি। সন্তানসন্ততির পরীক্ষায় সুফল। ভাগ্যোন্নতি যোগ। ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি। স্ত্রীর স্বাস্থ্যোন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

ধনু লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক শান্তির অভাব। ধনভাব শুভ। সহোদরভাব শুভ। বন্ধু-বান্ধবের সহানুভূতিতে কিছু কিছু অর্থলাভ। সন্তানসন্ততির শারীরিক অবস্থা সন্তোষ-জনক। তাদের লেখাপড়ায় উন্নতি। স্ত্রীর স্বাস্থ্যভঙ্গ ও পীড়া। ভাগ্যোন্নতিতে সাময়িক বাধা। কর্ম্মক্ষেত্র শুভ। শত্রুবৃদ্ধি। নূতন জমিসংগ্রহ বা ক্রয়। ব্যবসায়ীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক। বিদ্যার্থী ও পরী-ক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

মকর লগ্ন—

দেহপীড়া। আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও শত্রুবৃদ্ধি। পাকাশয়ের পীড়া, রক্ত সম্বন্ধীয় পীড়া ও হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা। সহো-দরের সাহায্যে আর্থিকোন্নতি। সন্তানসন্ততির বিবাহ আলোচনা। ভাগ্যোন্নতিতে বাধা। কর্ম্মক্ষেত্রে অশান্তি। ব্যবসা বাণিজ্যে আশানুরূপ ফলের অভাব। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যবিধ ফল। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কুম্ভ লগ্ন—

শারীরিক অসুস্থতা, এমন কি মারাত্মক পীড়া। বাত, বেদনা, হঠাৎ আঘাতপ্রাপ্তি। বন্ধুভাব শুভ। সন্তানের লেখাপড়া ভালো বলা যায় না। গুপ্ত শত্রুবৃদ্ধিযোগ। ব্যয় বাহুল্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও শারীরিক কষ্ট। অর্থপ্রাপ্তিতে বাধা। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি।

মীন লগ্ন—

বেদনাসংযুক্ত ও রক্ত সম্বন্ধীয় পীড়া। ধনলাভ। সহোদরভাব শুভ। বন্ধুবান্ধবদের জন্য ব্যয়। সন্তানসন্ততির লেখাপড়ায় বিঘ্ন ও নৈরাশ্যজনক অবস্থা। পত্নীভাব শুভ। ভাগ্যোন্নতিতে বাধা। কর্মক্ষেত্রে অশান্তি। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাপ্রদ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

সমীক্ষা

মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের মন নিয়ে সার্জারি :
এই আমার পেশা।
তাই নিয়ে দিনরাত
লেখাপড়া, গবেষণা
বই, সেমিনার, জার্ণাল
সাইকো—এনালিসিস, ফ্রয়েড—
বাড়িতে, লাইব্রেরিতে, কলেজের লেকচারে ;
শত শত মানুষের মনের গহন তথ্য
সুসংবদ্ধ চার্টে সুনিপুণ
দিয়েছি ধ'রে।

ওরা বলে, আমি নাকি
মস্ত পারদর্শী
প্রতিভাবান্ মনোবিদ্।
কথাটা কতটা সত্যি
ওরাই বিচার করুক সেটা

আমি এটা জানি—
নিজের মনের গোয়েন্দাগিরিতে
হেরে ফিরেছি বারবার
শিকারী কুকুরের মত
চিন্তা শুঁকে শুঁকে
কিছুটা এগিয়েছি
তারপর—আর নয়।
অপরের বেলায় যে—'আমি'টা
শ্যেনচক্ষু, তীক্ষ্ণ, সজাগ
আমার বেলায় সেই—'আমি'
বেতো রুগীর মত অক্ষম ;
নিজের চেহারাটা কোনদিন
জান্‌তে পারল না সে,
মোটা মোটা কেতাবগুলো
সেখানে এক
ব্যর্থ জঞ্জাল।

স্বামীজীর ভারত দর্শন

শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

"আহা, দেশের গরীবদুঃখীর জন্যে কেউ ভাবে না রে! যা'রা জাতির মেরুদণ্ড—যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে—যে মেথর, মুদ্দফরাস, একদিন কাজ বন্ধ করলে সহরে হাহাকার উঠে যায়, তা'দের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নাই রে! এই দেখ্ না হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মাদ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার 'পারিয়া' কৃশ্চিয়ান হ'য়ে যাচ্ছে। মনে করিস্‌নি, কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চিয়ান হয়. আমাদের সহানুভূতি পায় না বলে। আমরা দিনরাত কেবল তাদের বলছি, 'ছুস্‌নে', 'ছুস্‌নে'। দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ্? কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝেঁটা—মার্ লাথি! ইচ্ছা হয়, তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডী ভেঙ্গে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগবেন না। আমরা তাদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা করতে পারলুম না, তবে আর কি রইল? হায়! এরা দুনিয়াদারীর কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না।"

আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে দেশ যখন ভেসে যাচ্ছিলো, আত্ম-বিস্মৃতির অথৈ অতলান্তে। ভাসছিল সুরাসমুদ্রের অবাধ্য ঢেউয়ে আর ইংরেজীয়ানার মোসাহেবিতে। আবেগ-পাগল পরানুকরণের জাত তলিয়ে যাচ্ছিল বেণের বিশুষ্ক আভরণের মনোহারী চাক্‌চিক্যে আর জড়বাদের দেহ সর্বস্বতায়। থাম্‌ছে না তার গতির স্রোত। চলেছে ছুটে মায়ামৃগের পিছু পিছু, চলেছে পাশ্চাত্যের শিক্ষা-দীক্ষা আর আচার-বিচারের রুক্ষরিক্ত কণ্টক-পথে।

শতাব্দীর তমসাচ্ছন্ন আঁধারসায়রে দাঁড়িয়ে তারা, অবসর পায় না পিছু ফিরে তাকাবার। কেবল এগিয়ে চলার নেশা। চলেছে তাই তামসিকতার তন্দ্রাচ্ছন্ন তুহিন তমিস্রায়! গোটা দেশ ঝুকে পড়ল খৃষ্টধর্মের দিকে। চলল দেশের বুকে অনাচার। ধর্মের নামে অধর্মের অভিযান। ডুবে গেল স্বাজাত্যাভিমান।

নেমে এলো অবিশ্বাস, অশান্তি, দুঃখ ও দহন—পাপের প্লাবন মুক্তির মহাতীর্থে। যায় বুঝি আত্ম-বিস্মৃত জাতির শেষ চিহ্নটুকুও—অবলুপ্তির অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে। ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে নিশ্চিত নির্ভাবনার অঙ্কে নিতে এলেন মুক্তি-যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত—রাজা রামমোহন রায়। শুনালেন প্রাচীন ভারতীয় ঋষির তপোলব্ধ শাশ্বত সত্যের উদার সার্বজনীন বাণী—বেদান্তের তত্ত্বদর্শনের সার্থক সমাচার। বন্ধ করে দিলেন সতীদাহ প্রথা। বন্ধ করলেন গঙ্গাবক্ষে সন্তাননিক্ষেপের পুণ্য অর্জন।

যুগের বুকে জেগেছে তখন মহামুক্তির ঢেউ। নৈস্ফলের গুহায় কে জ্বালাবে আশার দীপ-শিখা? কে শোনাবে ধ্বংসের মরু-শ্মশানে জীবনের জয়গান? তন্দ্রাচ্ছন্ন আঁধার সায়রে মুক্তির দীপ জ্বালিয়ে কে দেখাবে পথ, রাত্রির যাত্রীদের?

এলেন বিদ্যাসাগর। প্রবর্তন করলেন বিধবা-বিবাহ। কিন্তু তাতেও গেল না ধুয়েমুছে সমাজের মালিন্য।

এলেন কেশব, এলেন বিজয়। চমৎকার ইংরাজী বক্তৃতায় মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেললেন জনগণকে। মহর্ষি দেবেন ঠাকুর তাঁদের দীক্ষা দিলেন ব্রহ্মধর্মে। সংঘাতমুখর দুটি ধর্ম-বিরোধী জাতির মাঝে কেশব যেন নিশ্চিত ঐক্যের সেতুবন্ধন।

তবু দ্বন্দ্বের অবসান হোল না। সুরু হোলো দিকে দিকে ধর্ম-বিপ্লব। সনাতন ধর্মের ভিতে ধরিয়ে দিল কাঁপন—অন্তর-দ্বন্দ্বের প্রলয় বৈশাখ। দেখা দিল নতুন নতুন সমস্যা। দিকে দিকে গড়ে উঠল বিভিন্ন সমাজ। 'ব্রাহ্মসমাজ' আর 'সঙ্গত সমাজ' এর পরেই গড়ে উঠ্‌ল

কেশব-বিজয়-এর 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'। দেবেন্দ্রনাথ গড়লেন 'আদিসমাজ'। প্রাচীন-পন্থীরাও চুপ করে রইলেন না, তাঁরা গঠন করলেন 'হরি-সভা,' 'ধর্ম-সভা'। নবীনেরা চাইলেন পুরাতনের জীর্ণতায় আনতে নতুনের প্রাণচেতনা—রক্ষণ-শীলতার মাঝখানে উদারতা। আর প্রাচীনেরা চাইলেন হিন্দুত্বের গায়ে পশ্চাত্যের রং লাগাতে। কিন্তু রং লাগালে কি হবে—প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে কে ?

'চালাকীর দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না।' বলতেন বিবেকানন্দ, 'প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়।'

এমনি সংকটময় ক্ষণে, মোহাচ্ছন্ন জাতির ঘুম ভাঙাতে এগিয়ে এলেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর এক পূজারী ঠাকুর। ভারতের যুগস্রষ্টা অবতার। সর্বধর্মের সমন্বয় সাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। দলের ভেদ নেই। মতের দ্বন্দ্ব নেই। নেই জাত-বিচার। নির্বিকল্প সাধনায় সিদ্ধ। দেখেছেন মা-কে। কথা বলে মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হয়ে। শুধু কি তাই। 'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ।

এলো প্রবল প্লাবন। রাজনৈতিক আন্দোলন আর সংস্কারের ঝড়। ঘুমন্ত জাতির বুকে হানল বিদ্যুতের চাবুক। তন্দ্রামদির চোখগুলো মেলে তাকাল বিক্ষিপ্ত, বিক্ষুব্ধ জাতি।

দেখলে প্রলয়-বিধূণিত বাংলার বাঙালী আর একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসীম নিশিনির্ঝরে স্থর্যের রুদ্র দীপ্তি। এলেন আলোকবর্তিকা হাতে সিমুলিয়ার বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন্দ্রনাথ। ভাবী ভারতের যুগ-বিপ্লবী স্বামী বিবেকানন্দ।

এ-এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী। আর-আরদের মত খালি গায়ে থাকে না, বেনিয়ান পরে। মাথায় জটা নেই, পাগড়ি। হাতে দণ্ড নেই, লম্বা একটা লাঠি, বেড়াবার ছড়ি বলাও চলে। কমণ্ডলু একটা সাথে আছে বটে তবে পকেটে তিনখানি বই—তার মধ্যে আবার একখানা ফরাসী গানের স্বরলিপির বই। কথা বলে ইংরেজীতে। তাও আবার শুধু ধর্ম আর ভগবানের কথা নয়। সমস্ত লোক সংসারের কথা, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি আরো কত কি! শুধু শাস্ত্র নয়, সমস্ত খবরের কাগজ আর বিশ্বের ইতিহাস যেন কণ্ঠস্থ। দিন ক্ষণ-তারিখে এতটুকু ভুলচুক নেই। ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান যেন নখদর্পণে। আমিষ-নিরামিষ সবই খান—যখন যা জোটে। জাত-বিচার নেই, নেই কোন ছোঁয়াচের বালাই।

দেখলেন, ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দৈন্য, দুঃখ রোগ-শোকে জর্জরিত। একদিকে প্রবল বিলাস-মোহে উন্মত্ত, ক্ষমতামদ-গর্বিত ধনিকেরা দরিদ্রদের নিষ্পেষিত করে বিলাসতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করছে, অপরদিকে অনাহারে জীর্ণশীর্ণ 'ছিন্নবসন, যুগযুগান্তের নিরাশাব্যঞ্জিত-বদন নরনারীরা 'হা অন্ন' রবে গগন বিদীর্ণ করছে। দেখলেন 'ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নেই।'

ভাবলেন, "আমরা লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী ইহাদেরই অন্নে জীবনধারণ করিয়া ইহাদের জন্য করিতেছি কি ? তাহা-দিগকে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিতেছি! ধিক্ !!"

'খালি পেটে ধর্ম হয় না,' বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, 'মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের বন্দোবস্ত চাই।'

ভারতের উচ্চবর্ণীয়দের ধিক্কার দিয়ে স্বামীজীও বললেন : 'তোমরা শূন্যে বিলীন হও', 'আর নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপ্ড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদীর দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনানের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না।'

এ যেন দুরন্ত বিদ্রোহী। অবরুদ্ধ হৃদয় দুর্গে যুগধর্মের ঈশানী পাবক উড়িয়ে দিতে চায় প্রাচীন ধর্মপন্থাকে।

'এস, মানুষ হও।' বললেন স্বামীজী, 'প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও।...শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের মধ্যে তা'দের জন্ম, আগে তা'দের নির্মূল কর।'

এলো মরানদীতে স্রোতের কলতান। যেন তপ্ত

তৃষিত মরুমনে শান্তির বারি-বর্ষণ। দুর্দশাগ্রস্ত ভারতবর্ষ। দুর্গতির অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্ত জনতা। বিকৃত আচার। প্রাণহীন অনুষ্ঠান। সংস্কার-সমাচ্ছন্ন জাতি।

অন্তর নিরুদ্ধ অনল। চায় উন্মুক্তি। কিন্তু পথ কোথায়। কে জ্বালাবে আশার দীপ-শিখা।

'দেশের লোক খেতে পরতে পাচ্ছে না—আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি?' বললেন স্বামীজী: 'দেশের লোক দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না দেখে, এক এক সময় মনে হয়, ফেলে দেই তোর শাঁখ বাজান, ঘণ্টা নাড়া, ফেলে দেই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা, সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড় লোকদের বুঝিয়ে কড়ি পাতি যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্র নারায়ণদের সেবা করে জীবন কাটিয়ে দিই।'

জীবের জনতায় যারা আত্মমুক্তির বাসনায় লক্ষ বছরের গ্লানির উপল ঠেলে এগিয়ে যায় দুঃখের পাণ্ডুলিপিতে মুক্তি-যজ্ঞের অগ্নিস্বাক্ষর দিতে—তাদের চোখে আর্ত মানবের দুঃখে জল আসবে না তো কী? স্বামীজীর অন্তরে নিরুদ্ধ ঝড়। চলেছেন মানুষের বিবেক খুঁজে খুঁজে। তাদের সুখ-দুঃখের খবর জেনে। তাইতো তাঁর আবাস হোল ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণ কুটির অবধি।

দেখলেন সারাটা দেশ ঘুরে। দেখলেন কত ধনীর ধন, কত বিলাস কত না ঐশ্বর্য। আর তারই পাশে দরিদ্রের ভাঙা ঘর, জীর্ণ, শীর্ণ, কঙ্কাল দেহ। কণ্ঠে তাদের মৃত্যুর হাহাকার। ভাবলেন, উচ্চ নীচে এমন ভেদের প্রাচীর কেন? কেন তারা ভ্রান্ত আদর্শ নিয়ে ভুল পথে যাচ্ছে?

বিদ্রোহীর অন্তরে যায় আগুন ধরে। সিংহবিক্রমে গর্জন করে ওঠেন স্বামীজী। নিরন্ন স্বদেশ, বুভুক্ষা পীড়িত জনতার প্রাণ ফাটান চিৎকার যেন আছড়ে এসে পড়ে তাঁর বুকে। তাই অবহেলিত, উৎপীড়িত, দরিদ্র, দুঃখীদের শোনালেন অভয়ের আশ্বাস। বললেন: 'ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।'

স্তব্ধ হয়ে গেল প্রাচীনেরা আর নবীনেরা। বিমূঢ় বিস্ময়ে ভীতি বিহ্বল মনে রইল সবাই তাকিয়ে—তাকিয়ে রইল দৃঢ়বদ্ধ বাহুযুক্ত সন্ন্যাসীর দিকে। বিমুগ্ধজনতা স্বীকার করল নতি। জানাল অভিনন্দন।

'হে ভারত,' বললেন স্বামীজী: 'এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করবে?'

ধীরে ধীরে পরানুকরণের বাঁধনকে দিলেন শিথিল করে। একদিকে হিমালয় থেকে কন্যা-কুমারিকা অবধি ভক্তি-শ্রদ্ধায় বিগলিত সবাই। মুগ্ধ কি শুধু ভারত। আমেরিকা ও ইউরোপও 'ভ্রাতৃ-সম্বোধনে' মুগ্ধ হয়েছে··· মুগ্ধ হয়েছে তাঁর বক্তৃতায়।

'বক্তৃতাশক্তি তাঁর ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা' লিখলে আমেরিকার 'দি নিউইয়র্ক ক্রিটিক,'······'শুনলেই বুঝা যায় অন্তস্থল ভেদ করে উঠ্‌ছে।'

'মিঃ মারউইন্ মেরি স্নেল' লিখলে—'আর কোন ধর্মই ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের মতন প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পারে নাই, এবং এই ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ।'

শিকাগোর বিশ্বধর্ম-মহাসভার জেনারেল কমিটির সভাপতি রেভারেণ্ড্ ব্যারোজ বললেন: 'স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শ্রোতৃবর্গের ওপর আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।'

চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে স্বামীজীর মন্ত্র বন্দনায়। আর্য-সভ্যতার পতাকাবাহী আজন্ম বিবাগী তাপস আত্মার শাশ্বত বাণী শুনিয়ে মুগ্ধ করলেন মুখর মানুষের চিত্ত।

'ভারতের সর্ববিধ দুর্গতির মূল কারণ দরিদ্র জনসাধারণের দুরবস্থা।' শিকাগো থেকে স্বামীজী মহীশূরের মহারাজাকে এক পত্রে লিখেছেন, 'পাশ্চাত্যদেশের দরিদ্রেরা বর্বর, তুলনায় আমাদের দেশের দরিদ্রেরা দেব-প্রকৃতি; এই কারণে আমাদের দেশের দরিদ্রের উন্নতিবিধান সহজে সম্ভবপর। আমাদের নিম্নশ্রেণীগুলির প্রতি একমাত্র কর্তব্য তাহাদের শিক্ষা দেওয়া, তাহাদের প্রনষ্ট ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যে,

তোমরাও মানুষ; চেষ্টা করিলে সকলের মত তোমরাও উন্নতিলাভ করিতে পার।'

শুষ্ক মরুমনে সিঞ্চন করলেন মন্দাকিনী ধারা। বললেন ডেকে ডেকে: যত্র জীব, তত্র শিব।' মানুষই দেবতা, মানুষই ভগবান্। তার সেবা কর। পীড়িত নিরন্ন জনকে জাগরণের মন্ত্র দাও। তাদের দুঃখ মোচনে জীবনকে বিলিয়ে দাও। তবেই জানতে পারবে ঈশ্বরকে। মানুষের সেবা কর। নর-নারায়ণের সেবা।

'জীব আর ব্রহ্ম কি আলাদা?' স্বামীজী প্রশ্ন করেছিলেন ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে।

যতক্ষণ ভেদবোধ আছে,' ইশারায় উত্তর দিলেন ত্রৈলঙ্গ স্বামী, 'ততক্ষণ আলাদা। যেই ভেদবোধ দূরে যাবে অমনি এক।'

'ব্যক্তিত্বই আমার লক্ষ্য।' অভেদানন্দকে স্বামীজী লিখলেন, 'ব্যক্তিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর আকাঙ্খা আমার নাই।'

'আমি যদি আমার জীবনে একটি মাত্র ব্যক্তিকেও স্বাধীনতা লাভ করিতে সাহায্য করিতে পারি, তবেই আমার সকল শ্রম সার্থক হইবে।

এ যেন মহা প্লাবন। পূর্ব প্রান্ত থেকে যে মহাশক্তির জাগরণ হয়েছে, জগৎকে শান্তিবারি সিঞ্চন করে তবে তার ক্ষান্তি। সুরে তাঁর কত আমেজ। কত না বাহার।

মানুষ মানুষকে শেখে ভালবাসতে। হিংসা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব দুঃখের হয় অবসান। বিশ্বভ্রাতৃত্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে যায় বিশ্ব মানবের বিচ্ছিন্ন শক্তি। সৃজনের পারে এক অখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত।' বললেন স্বামীজী। জাগো, ওঠো। হে ভগ্ন জীর্ণ ঘুমন্ত দেশ, শোন জাগরণের বজ্রদৃঢ় আহ্বান।

কথা বল ঝড়ের বেগে। তুফান হয়ে এসো। এসো বাত্যাক্ষুব্ধ তরঙ্গস্পন্দনের মত তড়িৎ গতিতে। অবহেলা, লাঞ্ছনা আর দুঃখ জর্জর দিনের বুকে পদাঘাত করো।

আত্মগর্বী বস্তুতান্ত্রিক জাতির সামনে রেখে এলেন ভারত-আত্মার অমর বাণী আর সাম্য, শান্তি, প্রীতি ও মুক্তির জাগ্রত ইঙ্গিত। উদ্বুদ্ধ করলেন কর্মে। দীক্ষা দিলেন বৈদান্তিক ধর্মে। দিলেন সুপ্তি ভেঙ্গে সুষুপ্ত জাতির। মিথ্যার বেসাতি নিয়ে যাদের কারবার তাদের বন্ধঘরের দুয়ার গেল খুলে। অবহেলিত, লাঞ্ছিত পতিতের দল জানল, তারাও মানুষ। বাঁচার প্রচুর অধিকার আছে তাদেরও।

'যদি থাকত এখন আর একজন বিবেকানন্দ,' নিজেই স্বামীজী বলেছেন, 'তবে বুঝত বিবেকানন্দ কি করেছে! কালে অবশ্য অনেক বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করবে।'

পত্র দিয়েছিল স্বামীজীর কাছে মার্গারেট নোবেল। হ্যাঁ, সেই ভগিনী নিবেদিতা। ইচ্ছে তাঁর ভারতবর্ষে আসেন। ভারতের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। উত্তরে লিখলেন স্বামীজী, 'দরিদ্র, অধঃপতন, আবর্জনা, ছিন্নমলিন বসন পরিহিত নর-নারী যদি দেখতে সাধ থাকে, তবে চলে এসো, অন্য কিছু প্রত্যাশা করে এসো না। আমরা তোমাদের হৃদয়হীন আলোচনা সহ্য করতে পারি না।'

স্বদেশ-প্রেমিক পারবে কেন ভারতবাসীর নিন্দা আর ফাঁকা সহানুভূতির কথা শুনতে! স্বজাতির দৈন্য নিয়ে অন্যে দুটো কথা বলুক এ তাঁর কাম্য নয়। এমন দরদী-মন দিয়ে আর কে-করেছে ভারত-দর্শন?

'আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি স্বামীজী?' আলমোড়ায় স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করেছিল এক পাশ্চাত্য শিষ্যা।

'ভারতবর্ষকে ভালোবাসো' বললেন স্বামীজী। ভালোবাসো আমার জন্মভূমিকে। আমার দারিদ্র্য পীড়িত ভাই-বোনেদের।

এক ভক্ত প্রশ্ন করে: 'স্বামীজী! আপনি অসাধারণ বাগ্মিতাবলে ইউরোপ, আমেরিকা মাতিয়ে এসে নিজ জন্মভূমিতে চুপ করে আছেন, এর কারণ কি?'

'আগে জমি তৈরী করতে হবে এদেশে।' বললেন স্বামীজী: 'পাশ্চাত্যের জমি অনেক উর্বর। অন্নাভাবে ক্ষীণদেহ, ক্ষীণমন, রোগ-শোক পরিতাপের জন্মভূমি ভারতে লেকচার ফেক্‌চার দিয়ে কি হবে?'

'দেশের কাজই আমার কাজ।'

'দেশের কাজ?'

'হাঁ, দেশকে বড় করে তুলুন।' মহীশূরের রাজা উদিয়ারকে বললেন স্বামীজী, 'সম্পদে, সমৃদ্ধিতে, প্রাচুর্যে,

ঐশ্বর্যে। কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞান বাণিজ্যে। আপনি রাজা, আপনি না করবেন তো কে করবে? কিন্তু সকলের চেয়ে বড় রত্ন মানুষ। মানুষ গড়ে তুলুন।'

"বসে বসে রাজভোগ খাওয়ার আর 'হে প্রভু রামকৃষ্ণ' বলায় কোনো ফল নেই, 'গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখছেন স্বামীজী, 'যদি কিছু গরিবদের উপকার করতে না পারো। গ্রামে গ্রামে যাও, উপদেশ করো, বিদ্যাশিক্ষা দাও। কর্ম, উপাসনা আর জ্ঞান—এই তিন কর্ম করো, তবেই চিত্তশুদ্ধি হবে, নতুবা ভস্মে ঘৃত ঢালার মত সব নিষ্ফল। রাজপুতানার গ্রামে গরীব-দরিদ্রদের ঘরে ঘরে ফের। যদি মাংস খেলে লোকে বিরক্ত হয়, তদ্দণ্ডেই মাংস ত্যাগ করবে। পরোপকারার্থে ঘাস খেয়ে জীবনধারণ করা ভালো।"

'হিন্দুর ধর্ম বেদে নাই,' স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখছেন স্বামীজী: 'পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই—ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। হিন্দুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞান-মার্গেও নয়, ছুৎমার্গে, আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা'।

'আমার একমাত্র ধ্যান ভারতবর্ষ।' লণ্ডন ছাড়বার আগে মিষ্টার সেভিয়ারকে বলছেন স্বামীজী, 'আমার মন শুধু ভারতের দিকে ধাবমান।'

'প্রায় চার বছর তো কাটালেন পশ্চিমে, বললে সেভিয়ার, 'কাটালেন বীর্যবান ও সমৃদ্ধিমান সভ্যতার সাথে এখন কি আর নিজের দেশকে ভালো লাগবে? পদানত পরাধীন দেশ!'

'বলো কি!' গর্জে উঠ্লেন স্বামীজী: 'যখন ছেড়ে আসি তখন সমস্ত দেশটাকেই ভালোবাসতাম একটা অনবচ্ছিন্ন ভাবমূর্তিরূপে, এখন আমার দেশের প্রতিটি ধূলিকণাকে ভালোবাসছি।'

'পরোপকারই এই সার্বজনীন মহাব্রত। 'ব্রহ্মানন্দকে লিখছেন স্বামীজী: '····কোলকাতার ডোমপাড়া, হাঁড়ি-পাড়া বা গলি ঘুঁজিতে অনেক গরীব আছে, তাদের সাহায্য করো। বোঝাও তাদের তুমি ভালোবাসো। দয়া আর ভালোবাসায়ই জগৎ কেনা যায়। লেকচার, বই, ফিলসফি সব তার নিচে।··গরীবদের সাহায্যের জন্যে শশীকে ঐ রকম একটা কর্মবিভাগ খুলতে বলো। ঠাকুর পূজো ফুজোতে যেন টাকাকড়ি বেশি ব্যয় না করে। এ দিকের ঠাকুরের ছেলেপুলে যে না খেয়ে মরছে। শুধু জল তুলসীর পূজো করে ভোগের পয়সাটা দরিদ্রের শরীর-স্থিত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দাও। তাহলেই সব কল্যাণ।'

গৈরিক বসনে কি উজ্জ্বলরূপ দেখ একবার তাকিয়ে। মুণ্ডিত মস্তকে কি সৌম্য শোভা! কি উদাত্ত শান্ত শঙ্খ-কণ্ঠ! বলিষ্ঠ, মোহমুক্ত, উজস্বী। অথচ শিবের মত সদানন্দ, পরিহাসমুখর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্র্যাজুয়েট, অথচ শুধু ব্যাকরণে নয়,' সুন্দররমণকে বলেছে বঙ্কিশ্বর শাস্ত্রী, 'ভাষাজ্ঞানেও এই সাধু অসাধারণ।' ঋগ্বেদ থেকে রঘুবংশ আর বেদান্ত দর্শন থেকে আধুনিক পাশ্চাত্য-দর্শন ও বিজ্ঞান মুখস্থ। সমস্ত অন্ধতা ও অযুক্তির ওপর খড়্গহস্ত। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করলেও এক ভালোবাসায় বন্দী। সে হল তাঁর অপূর্ব দেশপ্রেম। এক দুঃখে আহত-অন্তর—সে তাঁর দেশবাসীর অধঃপতন।

ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে কন্যাকুমারীর মন্দিরের শেষ প্রস্তর চত্বরে এসে বসলেন স্বামীজী। ধ্যাননেত্রে দিব্যদর্শন হল। জগন্মাতাকে সাক্ষাৎ করলেন দেশ-মাতারূপে—রুক্ষকেশী, চীরবাসা, ধূলিধূসরিতা, ম্লানমূর্তি, শৃঙ্খলাবদ্ধ। এ শৃঙ্খল দাসত্বের নয়—দারিদ্র্যের। বললেন 'দারিদ্র্যমোচনের ব্রত নাও সকলে।'

শ্রী'শ'—

॥ দৃষ্টিপাত ॥

চলচ্চিত্র ও নাটক—এই দু'টিই হয়ে দাঁড়িয়েছে এ যুগের সাধারণ লোকের সাধারণ আনন্দ লাভের ক্ষেত্র। তাই এ দু'টির জনপ্রিয়তাও যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, ব্যবসা হিসাবে তেমনি অর্থকরীও হয়ে উঠেছে। কিন্তু ব্যবসা হিসাবে উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করলেও উৎকর্ষতার দিক থেকে বা অভিনয় শিল্পের দিক থেকে কতটা অগ্রসর হয়েছে এবং আদৌ এগিয়েছে কি না তার বিচার বিশ্লেষণের সময় এসেছে—সময় হয়েছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করবার।

বিংশ শতাব্দীর এই মধ্যভাগকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ বলা চলে। আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা থেকে আরম্ভ করে বহু স্তরে, বহু বিষয়ে ও বহু রকমের পরীক্ষা বা নতুন কিছু করবার প্রচেষ্টা চলেছে এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে। চলচ্চিত্র ও নাটকও এর প্রভাব থেকে বাদ পড়ে নি বলেই এই দুটি প্রমোদ শিল্পের ওপরও নানারূপ পরীক্ষা চলছে, আর এই চলমান যুগের ধর্ম্মও তাই। এই বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা রূপ কলা-কৌশলের সৃষ্টি ও প্রয়োগও প্রভাবান্বিত করছে আজ চলচ্চিত্র ও নাটককে। সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে বোধ হয় চলচ্চিত্রই। উন্নত কলা-কৌশলের সাহায্যে, ক্যামেরার কেরামতীতে সে আজ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। দর্শকদৃষ্টির সম্মুখে সে আজ সব কিছুই প্রদর্শন করতে সক্ষম—স্বর্গ থেকে নরক, স্বপ্নরাজ্য থেকে কঠিন বাস্তব, অসীম শূন্যলোকের রহস্য থেকে ভূগর্ভের ও অতল জলের অজানা কথা,—আজ সব কিছুর প্রদর্শনই সম্ভব চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এবং এ হিসাবে চলচ্চিত্র এগিয়ে এসেছে আজ অনেকখানিই তার উন্নত কলা-কৌশলের সাহায্যে।

নাটকের ক্ষেত্রেও এই কলা-কৌশলকে প্রয়োগ করা হচ্ছে। দৃশ্যসজ্জায় ও আলোক সম্পাতের নানারূপ কৌশলের মাধ্যমে এ যুগের রঙ্গমঞ্চও এক নবরূপ ধারণ করেছে—বৈচিত্রে ও বৈশিষ্ট্যে সেও অনুগমন করছে চলচ্চিত্রকে। যন্ত্রের যুগে যন্ত্রকৌশলের প্রাধান্য চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চকে প্রভাবান্বিত করে তুলেছে—এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই—চলমান যন্ত্র যুগের এটাই ধর্ম্ম, একে মেনে নিতেই হবে এবং এটাও স্বীকার করতে হবে যে এই যন্ত্রকৌশল চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চকে আরও দর্শনীয় ক'রে তুলেছে এ যুগের দর্শকচক্ষে। কিন্তু প্রত্যেক ক্রিয়ার যেমন প্রতিক্রিয়া আছে, তেমনি এরও একটা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় এবং তা হচ্ছে অভিনয় নৈপুণ্যের ক্রমাবনতি। হয়ত এ কালের নবীন দর্শক তা স্বীকার করবেন না। কিন্তু সে যুগের ও এ কালের অভিনয় দর্শনে অভ্যস্ত প্রবীণ দর্শকের চক্ষে এখনকার অভিনয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়বেই ; আর গিরিশ-শিশির-দুর্গাদাস-অহীন্দ্র-নির্ম্মলেন্দুর উত্তরাধিকারীদের তাঁরা বৃথাই খুজে মরবেন এ যুগের নটদের মধ্যে,—মনের মাঝে ভেসে উঠবে তাঁদের তারাসুন্দরী-কৃষ্ণভামিনী-রাজলক্ষ্মী-নীহারবালা-প্রভার অভিনয়দীপ্ত রজনীর সুমধুর স্মৃতি।

অভিনয়-শিল্পের বা আর্টের পরিবর্ত্তন হয়েছে একথা ঠিক। আধুনিক যুগের অভিনয়ে এসেছে অন্য ভাবধারা, এসেছে স্বাচ্ছন্দতা আর স্বাভাবিকতা। কিন্তু তা মেনে নিয়েও এবং বিতর্কমূলক হলেও স্বচ্ছন্দে বলা চলে অভিনয় নৈপুণ্যের অবনতিই ঘটেছে আজকের যুগে। আর এই অবনতির কারণ যন্ত্রযুগ না মনস্বীতার অভাব তা বলা শক্ত। এই মনস্বীতার অভাব আজ জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই সুপরিস্ফুট, সুতরাং আর্টের ক্ষেত্রে, অভিনয় শিল্পের ক্ষেত্রেও এর অভাব পরিলক্ষিত হবেই এবং তার জন্যে সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রযুগকে দায়ী করাও চলে না। বরং নৈপুণ্যের অভাবকে যন্ত্রকৌশল ও দৃশ্যসজ্জা যে কিছুটা পূরণ করছে এইটাই লাভ।

যাই হোক, কলা-কৌশলের সঙ্গে অভিনয় শিল্পেরও উন্নতি হোক এইটাই আমরা চাই এবং তাতেই ভারতীয় নাট্যকলার এবং অভিনয়ের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে ও বাহির বিশ্বে সমাদৃত হবে।

খবরাখবর ঃ

সত্যজিৎ রায়ের "মহানগর" চিত্রটি শীঘ্রই মহানগরীতে মুক্তি লাভ করবে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প 'অবতরণিকা' অবলম্বনে এই চিত্রটি নির্ম্মিত হয়েছে এবং প্রযোজনা করেছেন আর, ডি, বন্‌শল্। নগর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনীই এই চিত্রে স্থান পেয়েছে। প্রধান দু'টি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়। ভিকি রেড্‌উড্ নাম্নী এক নবাগতা অভিনেত্রীকেও একটি প্রধান ভূমিকায় দেখা যাবে। পরিচালনা ছাড়া শ্রীরায় এই চিত্রের চিত্র-নাট্য ও সঙ্গীতও রচনা করেছেন।

* * *

বনফুলের ছোট গল্প 'আরোহি'-র ওপর ভিত্তি করে পরিচালক তপন সিংহ তাঁর পরবর্ত্তী চিত্র নির্ম্মাণ করবেন। এখনও ভূমিকালিপি ঠিক না হলেও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গীতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামী নভেম্বর মাসেই চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হবে।

* * *

'চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থা' শম্ভু মিত্র ও অসিত মৈত্রের হাস্যরসাত্মক নাটক "কাঞ্চনরঙ্গ"-র চিত্র রূপ দিচ্ছেন। চিত্রটি পরিচালনা করছেন অভিনেতা অমর গঙ্গোপাধ্যায় এবং অভিনয়াংশে আছেন তৃপ্তি মিত্র, অরুণ মুখোপাধ্যায় গঙ্গপদ বসু, লতিকা বসু প্রভৃতি।

* * *

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক প্রাপ্ত প্রযোজক এস, এল, জালান্ তাঁর বাংলা চিত্র "দীপ নিভে নাই"-এর পরে কবি বিদ্যাপতির জীবনী অবলম্বনে হিন্দীতে একটি চিত্র নির্ম্মাণ করতে মনস্থ করেছেন। এই "বিদ্যাপতি" চিত্রের নাম

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "মহানগর" চিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায়, জয়া ভাদুড়ী ও মাধবী মুখোপাধ্যায়।

ভূমিকায় অভিনয় করবেন ভারতভূষণ এবং নায়িকার ভূমিকায় থাকবেন সিম্মি। মেহবুব-এর "সন্ অফ ইণ্ডিয়া" চিত্রে সিম্মি অনবদ্য অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেছেন এবং "টারজন্ কামস্ টু ইণ্ডিয়া" নামক ইংরাজী চিত্রের একটি প্রধান ভূমিকাতেও অভিনয় করছেন।

সঙ্গীত পরিচালক ভি, বাল্‌সারা এই 'বিদ্যাপতি'

উত্তমকুমার ও সুলতা চৌধুরীকে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে 'এইচ, জে, প্রডাকসন্স',-এর নূতন চিত্র "নতুন তীর্থ"-তে। গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্য এবং পরিচালনা করবেন সুধীর মুখোপাধ্যায় ও সঙ্গীত দেবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

* * *

চিত্রের সঙ্গীতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং ইতিমধ্যেই মহম্মদ রফি ও লতা মঙ্গেশকরের ছু'টি সঙ্গীত রেকর্ড করে ফেলেছেন।

* * *

স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ ভগত সিং-এর জীবনী অবলম্বনে পরিচালক রাম শর্ম্মা ও প্রযোজক কেওয়াল্ কাশ্যপ "ভগত সিং" নামে একটি চিত্র নির্ম্মাণ করছেন। এই সূত্রে প্রযোজক ও পরিচালক ভগত সিং-এর মাতা শ্রীমতী বিদ্যাবতী ও ভগ্নী শ্রীমতী অমর কাউর এবং ভ্রাতৃদ্বয় কুলতার সিং ও রণবীর সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁরা সকলেই এই চিত্র নির্ম্মাণে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ও সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দিতেও রাজী হয়েছেন। চিত্রটির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন মনোজ কুমার।

* * *

ভারতীয় চিত্রের খ্যাতনামা তারকা দেব আনন্দকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এখন থেকে আগামী বৎসরের এপ্রিল মাসের মধ্যে যে কোনও সময়ে যুক্তরাষ্ট্র সফর করবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময় ব্যবস্থায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রূপে দেব আনন্দকে এই আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। গত বৎসর দক্ষিণ ভারতীয় চিত্রতারকা শিবাজী গণেশনকে এই নিমন্ত্রণ জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

দেব আনন্দ যদিও এখনও তাঁর যাবার সময় নির্দ্ধারণ করেন নি, তবে মনে হয় ইঙ্গো-মার্কিন প্রচেষ্টায় "The Guide" নামের যে চিত্র তিনি লেখিকা পার্ল বাক্-এর সহায়তায় প্রযোজনা করেছেন, সেই "দি গাইড্" চিত্রের নিউইয়র্কে মুক্তি অনুষ্ঠানের সময়ই তিনি সেখানে যাবেন। এই চিত্রে দেব প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এবং ইংরাজী ভাষী এই চিত্র পরিচালনা করেছেন গত বৎসরের বার্লিন্ আন্তর্জাতিক চিত্রোৎসবে ছু'টি প্রধান পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্র "No Exit"-এর পরিচালক Tad Danielewski. "The Guide"-এর হিন্দী সংস্করণও নির্ম্মিত হচ্ছে বিজয় আনন্দের পরিচালনায়।

* * *

দেশে বিদেশে:

মস্কোয় ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি উৎসব অনুষ্ঠান হয়ে গেল এবং প্রদর্শিত কয়েকটি চিত্র রুশ জনসাধারণের বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করতেও সমর্থ হল। সত্যজিৎ রায়ের "অপুর সংসার" ও "অভিযান" চিত্র ছু'টি বিশেষ প্রশংসা লাভ করে এবং রাজকাপুরের "জিস্ দেশমে গঙ্গা বহিতি হায়"ও উচ্চ প্রশংসিত হয়। দক্ষিণ ভারতের চিত্র "রাখী"ও এই উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছিল।

* * *

বিমল রায়ের "সুজাতা" চিত্রটিও আগষ্ট মাসে মস্কোর আটটী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। দর্শকদের সুবিধার জন্য চিত্রটিতে রুশ সংলাপ সংযোজনা করা হয়েছে। মস্কোয় প্রদর্শনের পর রাশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও চিত্রটি প্রদর্শিত হবে।

* * *

আগামী ৩১শে অক্টোবর সান্-ফ্রান্সিস্কোতে যে চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে তাতে অরূপ গুহঠাকুরতা পরিচালিত "বেনারসী" চিত্রটি প্রদর্শিত হবে বলে জানা গেছে। শ্রীগুহঠাকুরতা এবং তাঁর অভিনেত্রী স্ত্রী ও এই ছবির নায়িকা রুমা গুহঠাকুরতাও উৎসবে উপস্থিত থাকবেন।

* * *

ভারতীয় চিত্রের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী মহম্মদ রফি তিন সপ্তাহ ইংলণ্ড সফর করে দেশে ফিরেছেন। আবার আমেরিকা থেকেও নিমন্ত্রণ এসেছে, সেখানে যেতে হবে গান শোনাতে।

মহম্মদ রফি তাঁর বিলাত সফরকালে লণ্ডন, লীডস্, এডিন্‌বরা, গ্লাস্গো, ব্র্যাড্‌ফোর্ড ও শেফিল্ডে সঙ্গীত

পরিবেশন করে বিলাতী শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গায়িকা গীতা দত্ত এবং জীবনকলা ও নাজি নামের দুই নৃত্য শিল্পী। অধিকাংশ অনুষ্ঠানেই মহম্মদ রফি ভারতীয় সিনেমার সঙ্গীতই গেয়েছিলেন।

* * *

"অপরাজিত" ও "অপুর সংসার" চিত্র তিনটির বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে। এই চিত্রত্রয়কে এশীয় চিত্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম্ম বলে প্রবন্ধকার লিখেছেন এবং "দেবী", "দুই কন্যা" এবং "জলসাঘর"-কেও অধিকতর লাবণ্যমণ্ডিত বলে অভিহিত করা হয়েছে। "টাইম্" পত্রিকার এই

*

নৃত্য-সংগীত পটীয়সী বিদুষী অভিনেত্রী

শ্রীমতী মিতা চট্টোপাধ্যায়

*

*

আমেরিকার বিখ্যাত সপ্তাহিক পত্রিকা "টাইম্"-এর একটি প্রবন্ধে সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাচালী", প্রবন্ধে প্রবন্ধ লেখক চলচ্চিত্রকে এ-যুগের সর্ব্বপ্রধান শিল্প মাধ্যম বলে উল্লেখ করেছেন।

যে সকল প্রতিভাধর পরিচালক ও প্রযোজকের প্রয়াসে চলচ্চিত্র আজ এই সম্মান লাভ করেছে লেখক সেইরূপ বারোজন চিত্র-পরিচালকের নাম করেছেন এবং তাঁদের প্রথম উল্লেখযোগ্য চিত্রের নামও দিয়েছেন। এই বারোজনের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ও আছেন। এই তালিকাটি হচ্ছে:—জাপানের আকিরা কুরোসাওয়া ("রশোমন"); সুইডেনের ইঙ্গমার বার্গম্যান্ ("ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ"); ফ্রান্সের আল্যা রেনে ("হিরোশিমা মনামুর"); ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো ("দি ফোর হান্‌ড্রেড্‌ রোজ্‌"), ইতালির ফেদারিকো ফেলিনি ("লা দলচে ভিতা"); মিকেলাঞ্জেলো আন্তোনিওনি ("লাভেন্তুরা"); লুশিনো ভিসকন্তি ("রকো অ্যাণ্ড হিজ ব্রাদার্স"); ইংলণ্ডের টনি রিচার্ডসন ("লুক ব্যাক ইন্ অ্যাঙ্গার"); পোল্যাণ্ডের আঁন্দ্রে ওয়াইদা ("কানাল"); রোমান পোলানস্কি ("টু মেন্ অ্যাণ্ড এ ওয়ার্ডরোব"); আর্জেন্টিনার নিলসন ("সামারস্কিন্"), এবং ভারতের সতজিৎ রায় ("পথের পাঁচালী")।

"মেরে মেহবুব" চিত্রে রাজেন্দ্রকুমার ও নিম্মি।

বিদেশী খবর ঃ

লণ্ডনের লিসেষ্টার স্কোয়ারের এম্পায়ার থিয়েটারে এম্-জি-এম্ প্রতিষ্ঠান বিশ্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী গ্রেটা গার্বোর কয়েকটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। পাঁচ সপ্তাহব্যাপি এই চিত্র-প্রদর্শনীতে "Ninotchka", "Queen Christina", "Camille", "Marie Walewska" ও "Anna Karenina"—এই পাঁচটি চিত্র প্রদর্শিত হয়। এর মধ্যে প্রথম প্রদর্শিত "Ninotchka" চিত্রটি তরুণ দর্শকদের বিশেষ করে মুগ্ধ করে।

* * *

"দি বাইবল্" নামে বাইবেলের একটি চিত্ররূপ দিচ্ছেন ইতালীয় খ্যাতনামা প্রযোজক দিনো দ লোরেন্‌তিস্। জগতের প্রথম পুরুষ এবং প্রথম নারী আদম-ইভ্‌এর কাহিনীও এই চিত্রের অন্তর্ভুক্ত। এখন এই ইভ্-এর ভূমিকার জন্য প্রযোজক লোরেনতিস্ এমন একটি অষ্টাদশী মেয়েকে খুঁজছেন যার চেহারায় থাকবে একটি অপার্থিব ভাব এবং চোখে থাকবে নিষ্পাপ চাহনি। বাইবেলে যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেই ভাবেই আদম-ইভের গল্পটি চিত্রায়িত করতে চান লোরেন্‌তিস্। তার অর্থ আদম ও ইভ্‌কে নন্দনকাননে নিরাবরণ অবস্থায় বিচরণ করতে হবে এবং একটি অকলঙ্ক ও অপাপবিদ্ধ ভাব ফুটিয়ে তুলতে হবে দু'জনকেই। নিজেদের নগ্নতা সম্বন্ধেও বিন্দুমাত্র সচেতনতা থাকা চলবে না

এই চিত্রটির তিনটি বিভিন্ন অংশ পরিচালনা করবেন তিনজন পরিচালক। আদম-ইভের অংশটি পরিচালনা করবেন রোবার ব্রেসঁ এবং অন্য দু'টি অংশ পরিচালনা করবেন ওর্সন্ ওয়েলস্ ও ভিসকান্তি। চিত্রনাট্য রচনা করছেন ক্রিষ্টফার ফ্রাই।

* * *

এই সেপ্টেম্বর মাসেই "ক্রিষ্টিন্ কীলার কাহিনী" চিত্রের স্যুটিং আরম্ভ হয়ে গেছে। এই ছবিটিতে ক্রিষ্টিন্ কীলারের ভূমিকায় অভিনয় করবেন ইভন্ বাকিংহাম্ এবং ডক্টর ষ্টিফেন্ ওয়ার্ডের ভূমিকায় রূপদান করবেন জন্ ব্যারীমুর (জুনিয়র)। চিত্রটি পরিচালনা করছেন রবার্ট ষ্টাফোর্ড। আগামী অক্টোবরের শেষের দিকেই চিত্রটি মুক্তি পাবে বলে আশা করা যায়।
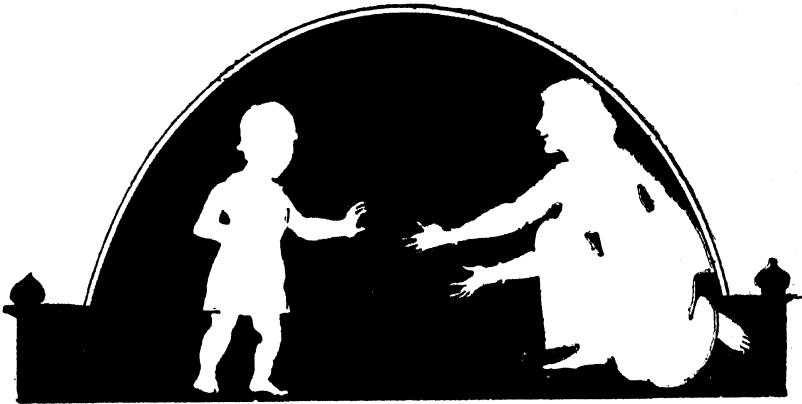
৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ইংল্যাণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৫ম টেস্ট ঃ

ইংল্যাণ্ড ঃ ২৭৫ রান (ফিল শার্প ৬৩, ব্রায়ান ক্লোজ ৪৬। গ্রিফিথ ৭১ রানে ৬ এবং সোবার্স ৪৪ রানে ২ উইকেট)।

ও ২২৩ রান (ফিল শার্প ৮৩ রান। হল ৩৯ রানে ৪, গ্রিফিথ ৬৬ রানে ৩ এবং সোবার্স ৭৭ রানে ৩ উইকেট)।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ২৪৬ রান (কনরাড হাণ্ট ৮০ এবং বুচার ৫৩ রান। ট্রুম্যান ৬৫ রানে ৩ এবং স্ট্যাথাম ৬৮ রানে ৩ উইকেট)।

ও ২৫৫ রান (২ উইকেটে। হাণ্ট ১০৮ নট আউট, কানহাই ৭৭ এবং বুচার ৩১ নটআউট। লক ৫২ রানে ১ এবং ডেক্সটার ৩৪ রানে ১ উইকেট)।

ওভালে ইংল্যাণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৮ উইকেটে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত ক'রে ১৯৬৩ সালের টেস্ট সিরিজে ৩-১ খেলায় জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে। ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত উভয় দেশের টেস্ট সিরিজ খেলায় ওয়েষ্ট দলের এই দ্বিতীয় 'রাবার' জয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল জন গডার্ডের নেতৃত্বে ১৯৫০ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে প্রথম 'রাবার' জয় করেছিল। এই নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে ১১টা টেস্ট সিরিজ খেলা হল। টেস্ট সিরিজের ফলাফল ঃ ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় ৫, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের 'রাবার' জয় ৪ এবং সিরিজ ড্র গেছে ২ এই ১১টি টেস্ট সিরিজে টেস্ট খেলার সংখ্যা ৪৫। টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ঃ ইংল্যাণ্ডের জয় ১৬, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয় ১৩ এবং খেলা ড্র গেছে ১৬।

১৯৬৩ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয় ক'রে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল 'উইসডেন ট্রফি' লাভ করেছে। এই 'উইসডেন ট্রফির' দাতা হলেন প্রখ্যাত 'উইসডেন' ক্রিকেট বর্ষপঞ্জির মেসার্স জন উইসডেন এ্যাণ্ড কোম্পানী লিঃ। 'উইসডেন' বর্ষপঞ্জি ১৯৬৩ সালে শতবর্ষে পদার্পণ করেছে। এই গ্রন্থের শতবর্ষ-জীবনের স্মারক হিসাবেই 'উইসডেন ট্রফি'। কেবল ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের টেস্ট সিরিজে 'রাবার' বিজয়ী দলের পুরস্কার হিসাবে এই 'উইসডেন ট্রফি' ১৯৬৩ সাল থেকে প্রবর্ত্তন করা হল। ওয়েস্টইণ্ডিজ প্রথম বছরেই সেই পুরস্কার লাভের গৌরবলাভ করেছে।

আলোচ্য ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্টইণ্ডিজ দলের পঞ্চম টেস্ট খেলার প্রথম দিনেই ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৭৫ রানের মাথায় শেষ হয়ে যায়। এই দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৮ উইকেট খুইয়ে ২৩১ রান করে। তৃতীয় দিনে ২৪৬ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের

প্রথম ইনিংস শেষ হ'লে ইংল্যাণ্ড ২৯ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস তৃতীয় দিনেই ২২৩ রানের মাথায় শেষ হয়। তখন খেলায় ওয়েস্টইণ্ডিজ দলের জয়লাভের জন্যে ২৫৩ রানের প্রয়োজন হয়। হাতে পুরো দু'দিনের সময় ছিল। তৃতীয় দিনে খেলার বাকি ৫ মিনিট সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কোন উইকেট না খুইয়ে ৫ রান তুলে দেয়। চতুর্থ দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময় থেকে ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট আগেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের জয় লাভের প্রয়োজনীয় রান উঠে যায়। দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের ২ উইকেট পড়ে ২৫৫ রান দাঁড়ায়।

১৯৬৩ সালের ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের টেস্ট সিরিজে উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কনরাড হাণ্ট—মোট রান ৪৭১ (গড় ৫৮'৮৭)। তাছাড়া তিনি উভয় দলের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রান (১৮২ রান) করারও গৌরব লাভ করেছেন। ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় ইংল্যণ্ডের পক্ষে প্রথম স্থান পেয়েছেন ফিল শার্প—মোট রান ২৬৭ (গড় ৫৩'৪০)। উভয় দলের পক্ষে সর্ব্বাধিক মোট রান করেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রোহন কানহাই—৪৯৭ রান (গড় ৫৫'২২) এবং ইংল্যাণ্ডের পক্ষে টেড ডেক্সটার—৩৪০ রান (গড় ৩৪'০০) বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় উভয় দলের পক্ষে প্রথম স্থান পেয়েছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের চার্লি গ্রিফিথ—৫১৯ রানে ৩২ উইকেট (গড় ১৬'২১)। উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট এবং ইংল্যাণ্ডের পক্ষে বোলিংয়ের গড়-পড়তা তালিকায় শীর্ষ স্থান পেয়েছেন ফ্রেডী ট্রুম্যান—৫৯০ রানে ৩৪ উইকেট (গড় ১৭'৪৭)। এক সিরিজে এই ৩৪টি উইকেট পাওয়ার ফলে ট্রুম্যান ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্টইণ্ডিজ দলের একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড করলেন। পূর্ব্বের রেকর্ড ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আলফ্ ভ্যালেনটাইনের—১৯৫০ সালের টেস্ট সিরিজে তিনি ৩৩টি উইকেট পেয়ে রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।

বর্ত্তমানে টেস্ট ক্রিকেটে ট্রুম্যানের উইকেট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫,৯৮৯ রানে ২৮৪ উইকেট (বিশ্ব রেকর্ড)।

১৯৬৩ সালের আলোচ্য টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় ডেরিক মারে উইকেট-কীপার হিসাবে ২৪ জন খেলোয়াড়কে আউট ক'রে একটা টেস্ট সিরিজের খেলায় সর্ব্বাধিক খেলোয়াড়কে আউট করার বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। পূর্ব্বের রেকর্ড (২৩ জন) ছিল তিন জনের—জে এইচ বি ওয়েস্ট (দক্ষিণ আফ্রিকা) নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৫৩—৫৪ সালে, গেরী আলেকজাণ্ডার (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৫৯-৬০ সালে এবং গ্রাউট (অষ্ট্রেলিয়া) ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১৯৬০-৬১ সালে। গারফিল্ড সোবার্স চৌকস খেলোয়াড় হিসাবে আলোচ্য সিরিজে ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন—মোট রান ৩২২ (গড় ৪০. ২৫), এক ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রান ১০২ (৪র্থ টেস্ট, লিডস্) এবং ৫৭১ রানে ২০টি উইকেট (গড় ২৮,৫৫)। সোবার্স বর্ত্তমান সময়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চৌকস খেলোয়াড়। এ পর্য্যন্ত সোবার্স ৪৭টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন এবং তাঁর সাফল্যের পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে—মোট রান ৪০৯৮, এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান নটআউট ৩৬৫ (বিশ্ব রেকর্ড), সেঞ্চুরী সংখ্যা ১৪ এবং ৩৪৩৩ রানে ৯৮ উইকেট। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় নানা ধরণের বিশ্ব রেকর্ড আছে। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এ পর্য্যন্ত ২০০০ রান এবং ১০০ উইকেট পেয়েছেন মাত্র এই ৪ জন খেলোয়াড়: উইলফ্রেড রোডস (ইংল্যাণ্ড)—৫৮টা টেস্টে মোট ২৩২৫ রান এবং ৩৪২৫ রানে ১২৭ উইকেট ; টি ই বেলী (ইংল্যাণ্ড) ৬১টা টেস্টে মোট ২২৯০ রান এবং ৩৮৫৬ রানে ১৩২ উইকেট ; কিথ মিলার (অষ্ট্রেলিয়া)—৫৫টা টেস্টে মোট ২৯৫৮ রান এবং ৩৯০৫ রানে ১৭০ উইকেট এবং ভিনু মানকাদ (ভারতবর্ষ)—৪৪টা টেস্টে মোট ২১০৯ রান এবং ৫২৩৫ রানে ১৬২ উইকেট। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন খেলোয়াড় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ৩০০০ রান এবং ১০০ উইকেটের রেকর্ড সৃষ্টি করতে পারেননি। সেই দুর্লভ সম্মান পেতে গারফিল্ড সোবার্সের আর মাত্র ২টি উইকেটের প্রয়োজন।

আলোচ্য ১৯৬৩ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে কোন খেলোয়াড় এক ইনিংসের খেলায় শত রান করতে সক্ষম হননি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে শত রান করেছেন এই তিন জন—কনরাড হাণ্ট (২): ১৮২

রান (১ম টেস্ট) ও ১০৮ নটআউট (৫ম টেস্ট) ; বেসিল বুচার (১) : ১৩৩ (২য় টেস্ট) এবং গারফিল্ড সোবার্স (১) : ১০২ (৪র্থ টেস্ট)।

১৯৬৩ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল মোট ৩০টি প্রথম শ্রেণীর খেলায় অংশ গ্রহণ ক'রে ১৫টি খেলায় জয় লাভ করে। বাকি ১৫টি খেলার মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২টি খেলায় পরাজয় ঘটে এবং ১৩টি খেলা ড্র যায়।

পোলভল্টে নতুন বিশ্ব রেকর্ড :

আমেরিকার জন পেনেল ১৭ ফিট ০¾ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম ক'রে নিজ প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব রেকর্ড (১৬ ফিট ৮¾ ইঞ্চি) ভঙ্গ করেছেন।

ভারত সফরে এম সি সি :

১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ইংল্যাণ্ডের এম সি সি ভারতবর্ষে ক্রিকেট সফরে আসছে। এই সফরে তারা মোট ১০টি খেলায় যোগদান করবে—৫টি পাঁচদিনের সরকারী টেস্ট খেলা এবং ৫টি তিন দিনের প্রথম শ্রেণীর খেলা। দলের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হয়েছেন কলিন কাউড্রে এবং সহ-অধিনায়ক মাইক স্মিথ। এই এম সি সি দলে নির্ব্বাচিত হয়েছেন মোট ১৫জন খেলোয়াড়। এই পনের জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ১১ জন খেলোয়াড় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ইতিপূর্ব্বে কোন-না-কোন দেশের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। এই ১১ জন টেস্ট খেলোয়াড়ের মধ্যে ৭ জন ১৯৬৩ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে খেলেছেন।

এম সি সি দলে নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়বৃন্দ : মাইকেল কলিন কাউড্রে (অধিনায়ক), মাইক স্মিথ (সহ-অধিনায়ক), কেন ব্যারিংটন, ব্রায়ান বোলাস, জন এডরিচ, বেরী নাইট, ডেভিড লার্টার, জন মর্টিমোর, জিম পার্কস, ফিল সার্প, ফ্রেডী টিটমাস, জিম বিন্কস, আইভর জেফ্রি জোন্স, জন প্রাইস এবং ডন উইলসন। শেষ চারজন খেলোয়াড় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে টেস্ট খেলায় এখনও অংশ গ্রহণ করেননি।

বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা :

বিশ্ব ব্যাডমিন্টন টমাস কাপ প্রতিযোগিতার ইণ্টার জোন খেলায় ভারতবর্ষ ৭-২ খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত ক'রে অষ্ট্রেলেশিয়ান জোন সেমি-ফাইনালে ১-৮ খেলায় মালয়ের কাছে পরাজিত হয়েছে। এই দুটি খেলাই নিউজিল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত হয়।

আমেরিকান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা :

১৯৬৩ সালের আমেরিকান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় আমেরিকার 'চাক' ম্যাকিনলে এবং মহিলা বিভাগের এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় অষ্ট্রেলিয়ার কুমারী মার্গারেট স্মিথ সিঙ্গলস খেতাব জয় করতে পারেন নি। ম্যাকিনলে সেমি-ফাইনালে মেক্সিকোর রাফেল ওসুনার কাছে পরাজিত হ'ন। অপরদিকে মার্গারেট স্মিথ পরাজিত হন ফাইনালে ব্রেজিলের মেরিয়া বুইনোর কাছে। বুইনো ১৯৫৯ সালে সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন। ১৯৬৩ সালের প্রতিযোগিতায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য অপ্রত্যাশিত ঘটনা পুরুষদের সিঙ্গলস খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার কোন খেলোয়াড় কোয়ার্টার ফাইনাল পর্য্যায়ে উঠতে পারেননি। অথচ পর্য্যায়ক্রমে গত ৭ বছর অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়ই পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয় করেছেন। ল্যাটিন আমেরিকার পক্ষে ওসুনা এবং প্যালফেক্স ১৯৬২ সালে পুরুষদের ডাবলস খেতাব প্রথম লাভ করেছিলেন। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ল্যাটিন আমেরিকার খেলোয়াড় একবার খেলেছিলেন কিন্তু খেতাব জয় করতে পারেননি। সুতরাং রাফেল ওসুনা (মেক্সিকো) ল্যাটিন আমেরিকার পক্ষে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব প্রথম জয় করলেন। মিক্সড ডাবলসে অষ্ট্রেলিয়ার কুমারী মার্গারেট স্মিথ এবং কেন ফ্লেচার শুধু আমেরিকান মিক্সড ডাবলস খেতাবই জয় করেন নি, ১৯৬৩ সালের প্রতিযোগিতায় অষ্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ এবং উইম্বলেডন খেতাবও পেয়েছেন। একই বছরে মিক্সড ডাবলস বিভাগে বিশ্বের এই সেরা চারটি খেতাব তাঁরাই প্রথম জয় ক'রে রেকর্ড সৃষ্টি করলেন।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস :

রাফেল ওসুনা (মেক্সিকো) ৭-৫ ৬-২ গেমে ফ্র্যাঙ্ক ফ্রোহিলিংকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস :

মিস মেরিয়া বুইনো (ব্রেজিল) ৭-৫ ও ৬-৪ গেমে মিস মার্গারেট স্মিথকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস :

মিস মার্গারেট স্মিথ এবং কেন ফ্লেচার (অষ্ট্রেলিয়া) ৩-৬, ৮-৬ ও ৬-২ গেমে জুডী টেগার্ট (অষ্ট্রেলিয়া) এবং এড রুবিনফকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস :

'চাক' ম্যাকিনলে এবং ডেনিস রলস্টোন (আমেরিকা) ৯-৭, ৪-৬, ৫-৭, ৬-৩ ও ১১-৯ গেমে রাফেল ওসুনা এবং এন্টোনিয়ো প্যালাফক্সকে (মেক্সিকো) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস :

কুমারী মার্গারেট স্মিথ এবং রবিন এব্বার্ণ (অষ্ট্রেলিয়া) ৪-৬, ১০-৮ ও ৬-৩ গেমে কুমারী ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) এবং কুমারী মেরিয়া বুইনোকে (ব্রেজিল) পরাজিত করেন।

ছন্দসূত্র প্রবেশিকা (১ম খণ্ড) : অম্বিকাচরণ দাস।

আজকাল যাঁরা কবিতা লিখতে চান তাঁরা ছন্দের প্রতি বিশেষ মনোযোগী নন—এইটাই এ যুগের কবিতা পাঠকদের সাধারণ ধারণা, আর ধারণাটা যে একেবারেই অমূলক তাও বলা চলে না। কারণ এটা সত্য যে ছন্দের ওপর দখল ও ছন্দ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতার অভাবেই অনেক কবির কবিতা সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত হতে পারছে না। একথাটি হৃদয়ঙ্গম করবার দিন এসেছে। তাই কবিতা লেখা শেখবার বই এই 'ছন্দ সূত্র প্রবেশিকা' নূতন কবিদের যে অনেক সাহায্য করবে তাতে সন্দেহ নেই।

[প্রকাশক—শ্রীমতী মালতীকা দাস। ৭৪, দশরথ ঘোষ লেন, হাওড়া। মূল্য ১.৫০ নঃ পঃ]

—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

যখন পলাশ ফোটে : সুমথনাথ ঘোষ

দশটি গল্প আলোচ্য গ্রন্থে গ্রথিত হয়েছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক গল্পগুলিকে গতানুগতিকতার পথ থেকে অপসারিত করে এনে অপূর্ব্ব কলা কৌশলের জাল বিস্তার করে সংযম সুন্দর রচনাশৈলী ও আঙ্গিকে অনন্য-সাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। 'যখন পলাশ ফোটে গল্পের বন্দনার জীবনের ইতিহাস ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শেষে কোন এক সুদূর পল্লীর অখ্যাত বালিকা বিদ্যালয়ে চাকরি নিতে হোলো। ওর ভাগ্যে আর বর জুটলো না। এম, এ পাশ করে যে রঙীণ স্বপ্ন বন্দনা দেখেছিল, যে আত্মবিশ্বাস ছিল নিজের ওপর, তা ভাগ্য-চক্রে তিরোহিত হোলো। ভালো ভালো পাত্র এলো, ওর পছন্দ হোলোনা এমনই অদৃষ্টের পরিহাস। 'শুভক্ষণ' গল্পের নায়িকা যে রীতিমত সবলা তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কি অদ্ভুত ভাবেই না তার মনের মত পাত্রটিকে জব্বলপুরে পাকড়াও করে বিয়ে করলো। 'অগ্নিশুদ্ধা' অরুণা চরিত্রটীর অভাবনীয় রূপান্তর উপভোগ্য। প্রত্যেক গল্পটি বিশিষ্টতায় দেদীপ্যমান। গ্রন্থখানি বাংলার কথা-সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

[প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩৲ টাকা।]

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বিপ্লবী বিবেকানন্দ (নাটক) : অমল সরকার

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন কাহিনী নিয়ে সম্প্রতিকালে যে কয়টি নাটিকা রচিত হয়েছে অমলবাবুর নাটিকাটি তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বামী বিবেকানন্দর জীবন নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ ছিল। তাই অতি সহজেই স্বামীজীর জীবনানুবর্তী এই নাটিকাটি রসোত্তীর্ণ সার্থকতায় শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। জাতির জীবনে যখন সঙ্কট, তখন এই জাতীয় নাটিকার প্রচার বিশেষ প্রয়োজন। তাই অমলবাবুর এই প্রয়াস বিশেষ প্রশংসনীয়।

প্রসঙ্গত দুটি বিষয়ে নাট্যকারের দৃষ্টি আকর্ষণ না করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। ছাপার ভুলের জন্যে অনেক বানান ভুল রয়ে গেছে, তারপর ক্যাবলরামের মুখে পূর্ববাঙ্গলার কথাও যথাযথ ফুটে উঠেনি। পরবর্তী সংস্করণে এই সকল ত্রুটি মুক্ত হয়ে নাটিকাটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয়ে প্রকাশ পাবে বলেই আশা করি।

[প্রকাশক—ভারতী পাবলিশার্স। ৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১'৫০ নঃ পঃ]

—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

মাতৃ-মন্ত্র ঃ শ্রীকালীচরণ ঘোষ।

বিদেশী ইংরেজ রাজশক্তির অধীনে ভারতবর্ষ যখন শাসিত ও শোষিত হইতেছিল, তখন মাতৃভূমির স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিবার জন্য ভারতবাসী দলে দলে মৃত্যুপণ সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সেই সময় এই দেশভক্ত সন্তানদের অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন একদল দেশপ্রেমিক কবি। আলোচ্য মাতৃ-মন্ত্র গ্রন্থখানি সজ্জিত হইয়াছে বাংলার এই জাতীয় কবির দেশাত্মবোধক সঙ্গীতসম্ভারে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল বা নজরুল ইসলামের মত সর্বজনপরিচিত কবিরাই নহেন, বর্তমানে বিস্মৃতপ্রায় অথচ সেই অগ্নিযুগে বহুবন্দিত অনেক কবিও এই সঙ্কলন গ্রন্থে স্থান পাইয়াছেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, স্বামী চণ্ডিকানন্দ, বরদা চরণ মিত্র, প্রমথনাথ দত্ত, রামচন্দ্র দাস, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, ক্ষীরোদ গঙ্গোপাধ্যায়, মুকুন্দদাস, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির কবিকণ্ঠ একদিন এদেশে আগুন ছড়াইয়াছিল। আজ ইহাদের অনেকেই কালপ্রভাবে বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া যাইতেছেন। সে যুগে এই জাতীয় কবিবৃন্দের অনেক গান বা কবিতা বিদেশী শাসন কর্তৃপক্ষ 'নিষিদ্ধ' করিয়াছিলেন। শ্রীকালীচরণ মহাশয় এই সব দেশপ্রেমিক কবির জাতীয় ভাবোদ্দী গানগুলিকে একত্রিত করিয়া গ্রন্থাকারে দেশবাসীর চো সম্মুখে রাখিবার যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি অ ধন্যবাদার্হ। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার স্বয়ং ভারতের স্বাধী সংগ্রামের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন, জীবনের অপর বেলায় বহু আয়াস স্বীকার করিয়া তিনি মাতৃ-মন্ত্রের গ গুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার এই দান দেশবাসী অ কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিবে। গানগুলির ঐতিহাসিক মূ কম নয়। এই গ্রন্থে অনেকগুলি গানের রচয়িতা নাম জানা যায় নাই। পাঠক সমাজ সচেতন হ হয়তো এই 'অজ্ঞাত' কবিদের সন্ধান মিলিবে।

গ্রন্থকার সূচনায় "মাতৃমন্ত্র" শীর্ষক একটি তথ্য সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন। এই ভূমিকাটিও বইয় এক মূল্যবান আকর্ষণ।

[ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, ৮সি, রমানাথ মজুমদার কলিকাতা—৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১.৫০ নঃ প

—শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপা

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ২৩।৯।৬৩ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী :
দীপেন বসু

দেবী দুর্গা

কার্ত্তিক—১৩৭০

প্রথম খণ্ড	একপঞ্চাশত্তম বর্ষ	পঞ্চম সংখ্যা

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা
সুধাত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥
অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবজননী পরা ॥
ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা ॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে ॥
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ॥

ঋগ্বেদে দেবী দুর্গা

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী এম-এ

ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র সর্ব্বজন-মান্যা এক মহাদেবীর যে কয়টি অতি-প্রসিদ্ধ রূপের পূজা-উপাসনা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, দুর্গা-রূপ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। এই দুর্গা-রূপে মহাদেবীর উপাসনা ভারতের উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চলসমূহে বিশেষভাবে বিস্তৃতিলাভ করিলেও, অন্য অনেক স্থানেই মহাদেবীর এই বিশেষ রূপটির উপাসনা প্রচলিত আছে, দেখা যায়। মহাদেবীর এই দুর্গা নাম ভক্ত সমাজে সর্বপ্রথম কখন গৃহীত ও প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা সাল-তারিখের নিরিখে বলা দুঃসাধ্য হইলেও, মহাদেবীর এই বিশেষ রূপটির সঙ্গে ঋষি-সমাজের পরিচয় যে ঋগ্বেদীয় যুগের প্রথম দিকেই সম্ভবতঃ ঘটিয়াছিল, তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদেই আছে। দেবী দুর্গা যে মূলতঃ ঋগ্বেদীয় দেবী, এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় ও ইহাই।

কোন কোন ভারতীয় ও অভারতীয় পণ্ডিতের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, দেবী দুর্গা বৈদিক দেবী নহেন। এই ধারণাটি সত্য এবং প্রমাণসিদ্ধ হইলে অবশ্য বলিবার কিছুই থাকিত না। কিন্তু ধারণাটি যে ভ্রান্ত এবং অমূলক, তাহা ঋগ্বেদ ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং অপর ২১টি বৈদিক গ্রন্থ একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেই বুঝা যায়। একথা ভাবিতে সত্যই আশ্চর্য বোধ হয় যে, এদেশীয় এত-এত মহাপণ্ডিতের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া দেবী দুর্গা সম্পর্কে এতগুলি মূল্যবান্ তথ্য কি করিয়া এতকাল লুক্কায়িত রহিল! আবার এমনও সম্ভব যে, ভারতীয় গবেষক-সমাজ সতর্কতার সহিত মূল-গ্রন্থ পাঠ না করিয়া, অনুবাদ এবং কোন-কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতামতের উপর অতিমাত্র নির্ভরশীল হইয়াই এই অবস্থাটি ঘটাইয়াছেন। যে-ক্ষেত্রে ধর্ম্মটি হইল ভারতীয়, আর উপাস্য দেবী ও হইলেন ভারতীয়, সে-ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি হইল অভারতীয়, এবং সেই হেতু অতি-প্রতিকূল, এই অবস্থাটি সত্যসত্যই বিসদৃশ এবং প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নয় কি? কোন অ-খৃষ্টান ভারতীয় পণ্ডিত এ কথা কখনও কল্পনা করিতে পারেন কি যে, খৃষ্ট-ধর্ম্ম সম্পর্কে তাঁহার কোন অভিমত,—তাহা যতই সুচিন্তিত এবং সুযুক্তিপূর্ণ হউক না কেন, খৃষ্ট-ধর্ম্ম জগতে সাদরে গৃহীত হইবে? অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, হিন্দুধর্ম্ম-মত সম্পর্কে ভারতে ঠিক তাহার উল্টা ব্যাপারটিই ঘটিয়াছে। তথা কথিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সত্যানুসন্ধানের নামে হিন্দুধর্ম্ম-মত সম্বন্ধে এযাবত যত-কিছু সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহা প্রায় সবক্ষেত্রেই হইয়াছে, অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিহাসিক, এবং অনুমান-ও-জবরদস্তিমূলক। এখানে বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হইল এই যে, এই সত্যানুসন্ধানের মহৎ প্রেরণাটি —"বে-ওয়ারিস মাল" বলিয়া কথিত হিন্দুধর্ম্মের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। খৃষ্টধর্ম্ম বা বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পর্কে ইহা প্রায় নীরব। আর ইস্‌লাম্ ধর্ম্ম? সত্যানুসন্ধিৎসা এখানে একেবারেই অনুপস্থিত! কারণ 'এ বড় কঠিন ঠাঁই'।

অমরকোষে দেবী দুর্গা (খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী)

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা প্রথমেই ঋগ্বেদ ধরিয়া আরম্ভ না করিয়া, নীচের দিক হইতেই আমাদের আলোচনার সূত্রপাত করিব। বিখ্যাত কোষগ্রন্থ অমরকোষের স্বর্গবর্গে শিবানী মহাদেবীর ১৭টি বিভিন্ন নামের মধ্যে দুর্গা-নামটি ধৃত আছে। এই ১৭টি নাম হইল:—উমা, কাত্যায়নী, গৌরী, কালী, হৈমবতী, ঈশ্বরা, শিবা, ভবানী, রুদ্রাণী, সর্ব্বাণী, সর্ব্বমঙ্গলা, অপর্ণা, পার্ব্বতী, দুর্গা, মৃড়াণী, চণ্ডিকা, ও অম্বিকা। আর মহাদেবের নামের সংখ্যা হইল ৪৮টি:—

শম্ভু, ঈশ, পশুপতি, শিব, শূলী, মহেশ্বর, ঈশ্বর, সর্ব্ব, ঈশান, শঙ্কর, চন্দ্রশেখর, ভূতেশ, খণ্ডপরশু, গিরীশ, গিরিশ, মৃড়, মৃত্যুঞ্জয়, কৃত্তিবাস, পিনাকী, প্রমথাধিপ, উগ্র, কপর্দ্দী, শ্রীকণ্ঠ, শিতিকণ্ঠ, কপালভৃৎ, বামদেব, মহাদেব, বিরূপাক্ষ, ত্রিলোচন, কৃশানুরেতা, সর্ব্বজ্ঞ, ধূর্জ্জটি, নীললোহিত, হর, স্মরহর, ভর্গ, ত্র্যম্বক, ত্রিপুরান্তক, গঙ্গাধর, অন্ধকরিপু,

ক্রতুধ্বংসী, বৃষধ্বজ, ব্যোমকেশ, ভব, ভীম, স্থানু, রুদ্র ও উমাপতি। দেবী দুর্গার সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেবের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য বলিয়াই আমরা এখানে অমরকোষে ধৃত সম্পূর্ণ তালিকাটিই উদ্ধৃত করিলাম। একথা অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, অমরকোষে একার্থ-বোধক নাম এবং পদ-সমূহের তালিকাই ধৃত আছে।

একই দেব-দেবীর বিভিন্ন নাম সম্পর্কে বেদাচার্য্যগণ

একই দেব-দেবীর বিভিন্ন নামের প্রকৃত উৎস কোথায়, এবার আমরা ইহা লইয়া সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা করিব। এ সম্পর্কে আমরা নিরুক্তকার যাস্ক (খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী) এবং বেদাচার্য্য শৌনকের (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) অভি-মতেরই মাত্র উল্লেখ করিব; কারণ এই দুইজনের মতের সঙ্গে প্রকৃতপ্রস্তাবে আরও কয়েকটি অতি প্রাচীন মত যুক্ত আছে, আমরা দেখিতে পাইব।

তাসাং মহাভাগ্যাৎ একৈকস্যাপি বহূনি নামধেয়ানি
ভবন্তি—নিরুক্ত ৭।৫

এতাসামেব মাহাত্ম্যান্ নামান্যত্বং বিধীয়তে।
তত্তৎ স্থানবিভাগেন তত্র তত্রেহ দৃশ্যতে॥
বৃহদ্দেবতা—১।৭০

অর্থাৎ একই দেবতার বিভিন্ন মহিমার ফলেই তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন নামের উদ্ভব হইয়াছে; এবং এই সমস্ত নামও স্থানবিভাগ অনুসারেই, বা পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও আকাশ, এই তিন-স্থান-ভেদেই, প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা দেখা যায়।

বৈদিক দেবতাগণের বিভিন্ন নামের উৎপত্তি ঠিক কি কি ভাবে হইয়াছে, সে সম্পর্কে বৃহদ্দেবতা-কার শৌনক বলেন :—

তৎখল্বাহুঃ কতিভ্যস্তু কর্ম্মভ্যো নাম জায়তে।
সত্ত্বানাং বৈদিকানাং বা যদ্বান্যদিহ কিঞ্চন॥
নবভ্য ইতি নৈরুক্তাঃ পুরাণাঃ কবয়শ্চ যে।
মধুকঃ শ্বেতকেতুশ্চ গালবশ্চৈব মন্যতে॥
নিবাসাৎ কর্ম্মণো রূপান্ মঙ্গলাদ্বাচ আশিষঃ।
যদৃচ্ছয়োপবসনাৎ তথামুষ্যায়ণাচ্চ যৎ॥
চতুর্ভ্য ইতি তত্রাহুঃ যাস্কগার্গ্যরথীতরাঃ।
আশিষোঽথার্থ বৈরূপ্যাদ্ বাচঃ কর্ম্মণ এব চ॥
সর্বাণ্যেতানি নামানি কর্মতস্ত্বাহ শৌনকঃ।
আশীরূপং চ বাচ্যং চ সর্বং ভবতি কর্মতঃ॥
যদৃচ্ছয়োপবসনাৎ তথামুষ্যায়ণাচ্চ যৎ।
তথা তদপি কর্মৈব তচ্ছুশ্রূষবং চ হেতবঃ॥
—বৃহদ্দেবতা—১।২৩-২৮

অর্থাৎ কয়প্রকার কর্ম বা প্রকৃতি হইতে বৈদিক দেবতা ও অন্যান্য সত্ত্ব বা প্রাণিগণের নামকরণ হইয়াছে? নিরুক্ত-কারগণের এবং মাধুক, শ্বেতকেতু ও গালব প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণের মতে ৯ প্রকার কর্ম হইতে; যথা:—নিবাস, কর্ম (বিভিন্ন কার্যাদি) রূপ, মঙ্গল বা মাঙ্গল্যদান, বাক্য, আশিষ বা প্রার্থনা, যদৃচ্ছ বা ঘটনা (accident-Macdonell), উপবসন বা প্রবৃত্তি (addiction-Macdonell), অমুষ্যায়ণ বা জন্মরহস্য। যাস্ক, গার্গ্য ও রথীতর (শাক-পূণি) ইত্যাদির মতে ৪ প্রকার কর্ম বা প্রকৃতি হইতে, যথা—আশিষ বা প্রার্থনা, অর্থবৈরূপ্য বা বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্য-সাধন, বাক্য ও কার্য্য বা বিভিন্ন প্রকার কর্ম্ম। আবার শৌনকের মতে বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মই নামোৎপত্তির একমাত্র কারণ, যেহেতু কর্ম্মের মধ্যেই প্রার্থনা, রূপ, বাক্য এবং ঘটনা, প্রবৃত্তি জন্মরহস্য প্রভৃতি সবকিছুই নিহিত আছে।

সুতরাং অমরকোষে ধৃত তালিকায় মহাদেব ও মহা-দেবীর বিভিন্ন নামের প্রকৃত উৎস কি বা কি কি, তাহা এবার আমরা বুঝিতে পারিলাম। মহাভারত ও পুরাণাদিতে ধৃত নামের অতিদীর্ঘ তালিকাসমূহ এখানে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন; কারণ আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল, দেবী দুর্গা ঋগ্বেদীয় দেবী কিনা, এবং তাঁহার এই নামের উৎপত্তি ঠিক কিভাবে হইল। বলা প্রয়োজন যে, উপাস্য দেবতার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া, কোন ঋষি বা তত্তুল্য ব্যক্তি যখন সেই দেবতার স্তবস্তুতি করিতেন, এবং তদনুযায়ী অভীষ্ট ফল-লাভেও সক্ষম হইতেন, তখনই সম্ভবতঃ সেই দেবতার সেই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একটি নামকরণ হইত। এই-ভাবেই এক-একটি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেই মহাদেবীর ও এক-একটি নামকরণ হইয়াছে, ইহা আমরা সহজেই ধরিয়া লইতে পারি। পর্বত-রাজের দুহিতা বলিয়া দেবীর এক নাম পার্বতী; হিমবানাধিপতির দুহিতা বলিয়া দেবী হইলেন হৈমবতী; গৌরবর্ণা ছিলেন

বলিয়া তিনি গৌরী; পিতা-মাতার দেওয়া ডাক-নাম ছিল অপর্ণা; আর ঈশ্বর মহাদেবের পত্নী হিসাবে তিনি হইলেন ঈশ্বরা বা ঈশ্বরী, শিবা, ভবানী, রুদ্রাণী, সর্বাণী প্রভৃতি; ত্রিলোকের অম্বা বা জননী বলিয়া তিনি হইলেন অম্বিকা; সর্বপ্রকার মঙ্গলদায়িনী বলিয়া তিনি হইলেন সর্বমঙ্গলা; আর সকল প্রকার দুঃখ-দুর্গতি ও দুরিত বা পাপ-নাশিনী বলিয়া তিনি হইলেন দুর্গা। এই দুর্গা-নামের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ঋগ্বেদীয় ঋষিগণের মতামত একটু পরেই আমরা দেখিতে পাইব।

খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দী

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের (খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী) ২।৪ অধ্যায়ে দুর্গ-নিবেশ প্রসঙ্গে আমরা তৎকালে পূজিত বহু দেবদেবীর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি নাম পাই :—

অপরাজিতাপ্রতিহত—জয়ন্তবৈজয়ন্ত-কোষ্ঠকান্ শিব-বৈশ্রবণাশ্বিশ্রীমাদেরা গৃহং চ পুরমধ্যে কারয়েৎ। ইত্যাদি

অর্থাৎ অপরিজিতা, অপ্রতিহত (বিষ্ণু?), জয়ন্ত ও বৈজয়ন্তের জন্য পৃথক পৃথক্ কোষ্ঠগৃহ, এবং শিব, বৈশ্রবণ (কুবের), অশ্বিদ্বয়, শ্রী (লক্ষ্মী) ও মাদেরা (মদিরাদেবী) দেবীর জন্য পৃথক্ পৃথক্ গৃহ বা মন্দির নির্মাণ করিবে। অপরাজিতা দেবী দুর্গারই অপর নাম। সুতরাং এখানে আমরা প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষ-ভাবে দেবী দুর্গার উদ্দেশ্যে কোষ্ঠগৃহ বা গর্ভগৃহ নির্মাণের নির্দ্দেশ পাইতেছি।

জৈন উত্তরাধ্যয়ন সূত্র (খৃঃ পূঃ ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দী)। এখানেও আমরা দেবী অপরাজিতার সঙ্গে বিজয়, বৈজয়ন্ত, জয়ন্ত (ইন্দ্রের পুত্রত্রয়) ও সর্বার্থ সিদ্ধিদাতা গণেশের উপাসনার উল্লেখ পাইয়া থাকি।

ললিতবিস্তর (খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী)। এই গ্রন্থের ১৭শ অধ্যায়ে আমরা নিম্নলিখিত দেব-দেবীগণের পূজা ও উপাসনা সমাজে প্রচলিত ছিল দেখিতে পাই :—

"ব্রহ্মেন্দ্র-রুদ্র-বিষ্ণু-দেবী-কুমার-মাতৃ-কাত্যায়নী-চন্দ্রাদিত্য বৈশ্রবণ-বরুণ বাসবাশ্বিন্……গণপতি…ইত্যাদি।

এখানেও অন্যান্য দেবতার মধ্যে আমরা রুদ্র, দেবী, কুমার (কার্ত্তিকের), মাতৃ (অম্বিকা), কাত্যায়নী, গণপতি—, এককথায় সমগ্র রুদ্র-পরিবারকেই পাইতেছি। কাত্যায়নী দেবী দুর্গারই অপর নাম; আর দেবী ও মাতৃ (অম্বিকা) শব্দে মহাদেবীকেই বুঝাইতেছে।

শৌনকীয় বৃহদ্দেবতার দেবী দুর্গা

শৌনকীয় বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে মুখ্যতঃ ঋগ্বেদীয় সূক্তসমূহের কোন্ কোন্ সূক্তে বা সূক্তাংশে কোন্ কোন্ দেবতা উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাহারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

বাক্-দেবীর বিভিন্ন নামের উল্লেখ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে শৌনক বলিতেছেন :—

পার্থিবী মধ্যমা দিব্যা বাগপি ত্রিবিধা তু ষা।
তস্যাঃ সূক্তানি নামানি যথাস্থানং নিবোধত ॥২।৭২
মধ্যে সত্যাদিতি বর্কি চ ভূত্বা চৈষা সরস্বতী।
সমগ্রং ভজতে সূক্তং ত্রিভিরেবতু নামভিঃ ॥—২।৭৬
এষৈব দুর্গা ভূত্বর্চং কৃত্বা স্যাৎসূক্তভাগিনী।
তন্নামানি যমীন্দ্রাণী সরমা রোমশোর্বশী।
ভবত্যগ্র্যা সিনীবালী রাকা চানুমতিঃ কুহূঃ ॥—২।৭৭

অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরিক্ষ (মধ্যম স্থান) ও দ্যু, এই তিন স্থানে দেবী বাক্ ত্রিবিধভাবে আখ্যাতা হইয়াছেন, এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে স্তুত সূক্ত এবং তাহাদের নামসমূহ ও যথাস্থানে শ্রবণ কর (২।৭২)। মধ্যস্থানে (অন্তরিক্ষে) তিনি অদিতি, বাক্ ও সরস্বতী, এই তিনটি বিভিন্ন নামে এক একটি পূর্ণসূক্তে স্তুত হইয়াছেন (২।৭৬)। তিনিই এখানে (অন্তরিক্ষে) দুর্গারূপে স্বয়ং ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন, এবং একটি সূক্তে স্বয়ং স্তুত ও হইয়াছেন। যমী, ইন্দ্রাণী, সরমা, রোমশা ও উর্বশী, এগুলি তাঁহারই (বাক্-দেবীর) ভিন্ন ভিন্ন নাম। তৎপূর্বে তিনি সিনীবালী, রাকা, অনুমতি ও কুহূ ইত্যাদি হইয়াছেন (২।৭৭)।

এখানে আমরা খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত ঋগ্বেদ সম্পর্কিত একটি অতিপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে দেবী দুর্গার স্পষ্ট উল্লেখই শুধু পাইতেছি না, বরং ইহাও পাইতেছি যে, দেবী দুর্গা এখানে বাক্ নামে স্বয়ং সূক্ত রচনা করিয়াছেন এবং পূর্ণসূক্তে নিজেই স্তুত ও হইয়াছেন। বৃহদ্দেবতার এই শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তিতে উল্লিখিত নাম কয়টির মধ্যে একমাত্র দেবী রোমশা ব্যতীত বাদবাকী ৪জনেরই (যমী-ইন্দ্রাণী-সরমা-উর্বশী) দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ ঋগ্বেদের ১০ম

মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এই ৪ জনের সকলেই দশম মণ্ডলের ঋষিকা, আর তাঁহাদের দৃষ্ট সূক্ত বা সূক্তাংশ হইল—যমী—১০।১০ ও ১০।১৫৪; ইন্দ্রাণী—১০।৮৬, ১০।১৪৫ ও ১০।১৫৯; সরমা—১০।১০৮; ও উর্বশী—১০।৯৫। ঋষিকা রোমশা-দৃষ্ট সূক্তাংশ ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলস্থ ১২৬ সংখ্যক সূক্তের ৬ষ্ঠ ও ৭ম মন্ত্রদ্বয়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই দেবী দুর্গা-কৃত সূক্ত বা মন্ত্রের সন্ধান আমাদিগকে এই দশম মণ্ডলেই করিতে হইবে। এই দশম মণ্ডলস্থ ১২৫ সংখ্যক সূক্তই হইল প্রখ্যাত বাক্-সূক্ত বা দেবীসূক্ত, (যাহা একটি আধ্যাত্মিক বা আত্ম-দৈবত শ্রেণীর সূক্ত), যাহা মহাদেবী দুর্গার অর্চ্চনায় এবং চণ্ডী-পাঠকালে সবিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হইয়া থাকে। শাক্ত আচার্য্যগণ ও ভক্তগণ ইহাকেই মহাদেবী সম্পর্কীয় মূলসূক্ত বা মূলসূত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। অবশ্য ইহার সঙ্গে এই দশম মণ্ডলেরই ১২৭ সংখ্যক সূক্ত বা রাত্রিসূক্তটিকেও যুক্ত করা হইয়া থাকে। আর "ভবত্যগ্র্যা সিনীবালী রাকা চানুমতিঃ কুহূঃ"—বাক্‌দেবীর এই পূর্ব্বোল্লিখিত নামগুলির সাক্ষাৎ ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের একই সূক্তে (৩২ সংখ্যক সূক্তে) পাওয়া যায়। দেবী অনুমতির নাম অবশ্য ১০।১৬৭ সূক্তেও আর একবার উল্লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন পুরাণে সিনীবালী, রাকা, কুহূও অনুমতিকে মহাদেবীর সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে। এই সংযুক্তির প্রকৃত উৎস কোথায়, এবার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। সকলেই একই বাক্-দেবীর ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং রূপ হিসাবেই মহাভারত ও পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছেন। অমরকোষের স্বর্গবর্গে দেখিতে পাই : কলা-হীনে সানুমতিঃ (১৬৪); পূর্ণে রাকা নিশাকরে (১৬৫); সা দৃষ্টেন্দুঃ সিনীবালী (১৬৭); সা নষ্টেন্দুকলা কুহূঃ (১৬৮)। অর্থাৎ কলাহীন চন্দ্রযুক্তা বা চতুর্দ্দশীযুক্তা পূর্ণিমাকে অনুমতি, পূর্ণ-চন্দ্র-যুক্তা বা শুদ্ধ পূর্ণিমাকে রাকা, চতুর্দ্দশী-যুক্তা অমাবস্যাকে সিনীবালী, আর যে অমাবস্যায় চন্দ্রকলা দৃষ্ট হয় না, তাহাকেই কুহূ বা পূর্ণ-অমাবস্যা বলে। সুতরাং মহাদেবীর নামের সঙ্গে এগুলির যুক্ত হওয়ার পিছনে বৈদিক নজীর আছে। এগুলি পুরাণকারগণের কল্পিত নাম নয়, বা পরবর্ত্তী-কালের কোন দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রসূত ও নয়।

বৃহদ্দেবতার অনুবাদক ও প্রকাশক (Harvard Edition—1904) Prof Macdonell বৃহদ্দেবতার এই দুর্গা-নামটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিতেন। তৎপূর্ব্বে ১৮৯২ সালে কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসা-ইটি হইতে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রকাশিত সংস্করণে এজাতীয় কোন মন্তব্য করা হয় নাই। সেখানে পাদ-টীকায় শুধু উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাঁহাদের পরীক্ষিত পুঁথিসমূহের দুইটিতে মাত্র দুর্গা-নাম-সম্বলিত শ্লোকাংশটি দেখা যায় নাই। অধ্যাপক Mocdonell নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি যতগুলি প্রাচীন পুঁথির (পাণ্ডুলিপির) পাঠ মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাহাদের সবকয়টিতেই একই পাঠ লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে এই প্রক্ষেপণ কার্য্যটি প্রাচীন কালেই সাধিত হইয়াছিল। এসম্পর্কে তিনি বলিতেছেন :—

"There can be no doubt that this life is an interpolation, for Durga not being a vedic goddess, is not to be found in the Nirghantuka, as are all the other deities here enumerated; the line, moreover, interrupts the sense of the passage, besides giving half a sloka too much to the Varga. It must, however, have been an early interpolation, as it occurs in Mss. of both groups"—part II, page 53.

সংক্ষেপে তাঁহার প্রদর্শিত কারণগুলি হইল :—(ক) দুর্গা বৈদিক দেবী নহেন, যেহেতু দুর্গা-নাম যাস্ক-সংকলিত নির্ঘণ্টুর দেব-দেবী সম্পর্কিত তালিকাগুলিতে পাওয়া যায়না; (খ) শ্লোকটি তিন-পংক্তি বিশিষ্ট এবং ইহার প্রথম পংক্তিটি, যেখানে দেবী দুর্গার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সমগ্র শ্লোকটির অর্থ-বোধের পক্ষে বাধা-স্বরূপ।

প্রখ্যাত পণ্ডিত Macdonell এর যেখানে আপত্তি, সেখানে আপত্তির কারণ অবশ্যই আছে, একথা বলাই বাহুল্য। তবে তৎপ্রদর্শিত কারণ দুইটির একটিও খুব জোরালো বলিয়া মনে হয় না। কেন হয় না, তাহাই

সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি :— (ক) অধ্যাপক Macdonell "দুর্গা বৈদিক দেবী নহেন" বাক্যটির "বৈদিক" শব্দটির অর্থে নিঃসন্দেহে মন্ত্র বা সংহিতা-সাহিত্য বুঝাইতেছেন। কিন্তু "বৈদিক" শব্দটির ব্যাপক অর্থে সংহিতা ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষৎ সবই বুঝাইতে পারে। এই ব্যাপক অর্থটি ধরা হইলে, আমরা দেখিতে পাই যে উক্তিটি ভুল; কারণ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গা নাম ধৃত আছে। দ্বিতীয়তঃ প্রচলিত নির্ঘণ্টুতে দেবী রোমশা, সীতা, সার্পরাজ্ঞী, শ্রী লাক্ষা ও মেধা প্রভৃতির নামও দেব দেবীগণের নামের তালিকাসমূহে পাওয়া যায় না। অথচ তাঁহারা সকলেই ঋগ্বেদীয় দেবী, এবং তাঁহাদের সকলেরই নাম এই বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে ঋগ্বেদীয় দেবী-হিসাবেই শৌনক কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, যথা :—

পৃথিব্যনুমতির্ধেনুঃ সীতালাক্ষা তথৈব গৌঃ।
গৌরী চ রোদসী চৈব ইন্দ্রাণ্যাশ্চৈষ বৈ পতিঃ॥ ১।১২৯
শ্রীর্লাক্ষা সার্পরাজ্ঞী বাক্ শ্রদ্ধা মেধা চ দক্ষিণা।
রাত্রী সূর্যা চ সাবিত্রী ব্রহ্মবাদিন্য ইরিতাঃ॥ ২।৮৪

নির্ঘণ্টুতে উল্লেখই যদি একমাত্র প্রামাণ্য বস্তু হইয়া থাকে, তবে ইঁহাদের সম্পর্কে অধ্যাপক Macdonell এর কোন আপত্তি নাই কেন? প্রখ্যাত পণ্ডিত Macdonell একথা নিশ্চয়ই জানিতেন যে, এদেশে পূর্ব্বে যাস্ক প্রণীত বৃহত্তর আকারের নিরুক্ত এবং নির্ঘণ্টু প্রচলিত ছিল, এবং যাস্ক-পূর্ব্ব যুগসমূহের অন্যান্য বহু নিরুক্তকার এবং বেদাচার্য-প্রণীত বৈদিক ভাষ্যসমূহও বর্ত্তমান ছিল। বৃহদ্দেবতা-রচয়িতা শৌনক যে ইহাদের কোন কোনটিকে অনুসরণ করেন নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? এতদ্ব্যতীত মূল ঋগ্বেদের কয়েকস্থলে উমা এবং উমা শব্দ-দুইটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; অথচ এই উমা বা উষার কোন উল্লেখই নির্ঘণ্টুতে নাই। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ধৃত ঋগ্বেদের ৯।৯৭।৪৭ তম মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে আচার্য্য সায়ণ "সোম" শব্দটির অর্থ করিয়াছেন, "উময়া সহ বর্ত্তমানত্বাৎ সোমঃ", অর্থাৎ উমা-পতি শিব বা মহাদেব। আচার্য সায়ণের অন্ততঃপক্ষে ২০০০ বৎসর পূর্ব্বেও এই মন্ত্রটিকে বিশেষ প্রকার চক্ষে দেখা হইত। যাস্কের নিরুক্ত-পরিশিষ্টে এই মন্ত্রটি সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। সেখানে ইহাকে অধ্যাত্ম-মন্ত্র বলা হইয়াছে (পরিশিষ্ট-১।১৬)। ঋগ্বেদে আছে, অথচ নির্ঘণ্টুতে নাই, এ জাতীয় শব্দ আরও আছে। প্রয়োজন বোধে দেখান যাইতে পারে।

(খ) তিন-পংক্তি-বিশিষ্ট শ্লোক এই বৃহদ্দেবতা গ্রন্থেই অন্ততঃপক্ষে আরও ৬টি আছে, যথা :—৬।১৬০, ৭।১৫, ৭।৩৭, ৭।৬৫, ৬।১৪৭, ও ৮।১১৩। ইহাদের কোনটির সম্পর্কে কিন্তু তিনি কোন আপত্তি দেখান নাই। আর শ্লোকের প্রথম পংক্তিটি-দ্বারা সমগ্র শ্লোকের অর্থ-বোধে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না, হয়ত কেহই পারিবেন না। বরং ইহাই মনে হইবে যে, এই পংক্তিটি না থাকিলে সমগ্র শ্লোকটির সহজ-অর্থ-বোধেই ব্যাঘাত জন্মাইত বেশী। যতদূর মনে হয়, আপত্তির কারণ হয়ত অন্য কিছু; যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা নয়।

বিশেষতঃ, পুঁথির পাঠ মিলাইবার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, অধিকসংখ্যক পুঁথিতে যে পাঠ দেখা যায়, তাহাই শুদ্ধ-পাঠ বলিয়া সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। এস্থলে ২টি সংস্করণে ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিসমূহের শতকরা ৮০।৮৫ ভাগের মধ্যে যে পাঠ ধৃত হইয়াছে, তাহাকেই শুদ্ধপাঠ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে বাধা কোথায়? মাত্র যে দুইটি পাণ্ডুলিপি.ত (তাহাও কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি-সংগৃহীত) এই ২।৭৭ সংখ্যক শ্লোকের প্রথম পংক্তিটি দেখা যায় নাই, সে-দুইটি যে লিপিকারের প্রমাদ-জনিত নয়, তাহারই বা প্রমাণ কি? নতুবা অধ্যাপক Macdonel-এর আপত্তি গ্রহণ করিলে আমাদিগকে ধরিয়া লইতে হইবে যে, সারা-ভারত ব্যাপী বৈদিক পণ্ডিতগণের মধ্যে দেবী দুর্গা সম্পর্কে এ একটি ষড়যন্ত্র সংঘটিত হইয়াছিল। ইহা অসম্ভব ও অবাস্তব ব্যাপার। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থেই আমরা আর একটী শ্লোক পাইতেছি :—

সূর্যামেব সতীমেতাং গৌরীং বাচং সরস্বতীম্।
পশ্যামো বৈশ্বদেবেষু নিপাতনৈব কেবলাঃ॥—২।৮১

অধ্যাপক Macdonell এখানে সতী শব্দটিকে "সৎ" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ সতী অর্থে ধরিয়া লইয়া শ্লোকটির অনুবাদ করিয়াছেন, " We see that when this Vac is Surya, Gauri, Sarsawati, they (are) in the

hymns to the All-Gods (praised) incidentally only—part II, page 54, sec 81. এখানে সতী পদটিকে অতি সহজেই 'সতী' দেবী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে অর্থ দাঁড়াইবে :—এই বাকদেবী যখন সূর্যা, সতী, গৌরী (অথবা সতী-বা-গৌরী—সতীমেতাং গৌরীং) এবং সরস্বতী হইয়াছেন, তখন তাঁহারা (এই সমস্ত দেবতা) কেবল নিপাত-মাত্রে বা সামান্যভাবেই (কয়েকটি মাত্র ঋক্ মন্ত্রে) বিশ্বদেব—সূক্তসমূহে স্তুত হইয়াছেন।

বাক্ নাম্নী দেবী গৌরীর উদ্দেশ্যে উদগীত মন্ত্রের (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪১ ঋক্) উল্লেখকালে অধ্যাপক সাহেব বিগত শতাব্দীর Griffith প্রমুখ কয়েকজন অনুবাদকের অনুবাদ অনুসরণ করিয়া গৌরী দেবীকে মহিষে (Buffalo) রূপান্তরিত করিয়াছেন (বৃহদ্দেবতা Part II. page 135, sec. 36)। ইউরোপীয় পণ্ডিতের বেদালোচনার ইহাই একটিমাত্র নমুনা নয়।

বিগত ১৮৯২ সালে অধ্যাপক Maxmuller সম্পাদিত ঋগ্বেদের যে দ্বিতীয় পরিশোধিত সংস্করণটি প্রকাশিত হয়, তাহার শেষাংশে ঋগ্বেদীয় কয়েকটি খিল-সূক্ত সংযোজিত হইয়াছিল। তাহার ২৫তম খিলসূক্তটি হইল একটি রাত্রিসূক্ত, যেখানে দেবী দুর্গার নাম কয়েকবার উল্লিখিত আছে। অধ্যাপক macdonell—সম্পাদিত বৃহদ্দেবতার প্রকাশকাল হইল ১৯০৪ সাল। সুতরাং তিনি যে ঋগ্বেদীয় খিল-সূক্তে দেবী দুর্গার উল্লেখের কথা অবগত ছিলেন না, এমন কথা বিশ্বাস করা যায়না। সুতরাং অন্য সব যুক্তির কথা বাদ দিলেও এই একটি মাত্র নজীরের বলে অধ্যাপক macdonell-এর উক্তি যে ভ্রান্ত, তাহা প্রতিপন্ন হইল। বেদাচার্য্য শৌনকের উক্তি অনুযায়ী দেবী দুর্গা যে প্রকৃতই ঋগ্বেদীয় দেবী, এবং তিনিই বাক্-নামে ঋগ্বেদের ০।১২৫ সূক্তটি রচনা করিয়াছেন. সেবিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারেনা। ঋগ্বেদে দেব-দেবীগণের স্বয়ং-কৃত বহু সূক্তের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ১০।১২৫ সংখ্যক সূক্তটি একটি আত্ম দৈবত শ্রেণীর সূক্ত, যেখানে যিনি ঋষি তিনিই দেবতা (শৌনকের ভাষায় "তস্মাদাত্মস্ত বেষু স্যাদ্ য ঋষিঃ সৈব দেবতা"—২।৮৭-বৃহদ্দেবতা)। এই সূক্তটির বিশেষত্ব সম্পর্কে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এস্থলে আর ইহার পুনরাবৃত্তি করিলামনা।

Max Muller-প্রকাশিত ঋগ্বেদের দ্বিতীয় সংস্করণেই আমরা আর একটি খিল সূক্তের উদ্ধৃতি পাই (২২নং সূক্ত), যেখানে ৪র্থ মন্ত্রটিতে "শঙ্করস্য যথা গৌরী তদুর্ত্তৃরপিভর্ত্তরি", এবং ৫ম মন্ত্রটিতে "কৌশিকস্য যথা সতী তথা ত্বমপিভর্ত্তরি", এই কথাগুলি পাইয়া থাকি। শঙ্কর ও কৌশিক উভয় নামই মহাদেবের, একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং গৌরী ও সতী, উভয়েই যে ঋগ্বেদীয় দেবী, তাহা আর একবার প্রমাণিত হইল।

ঋগ্বেদীয় এই খিল-সূক্তগুলি বস্তুতঃপক্ষে ১৮৯২ সালের বহু-পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। বিগত শতকের প্রথমার্দ্ধের কিছু পরেই জার্মান পণ্ডিত Aufrecht এগুলি প্রকাশিত করিয়াছিলেন, এবং ১৮৭৩ সালে পণ্ডিত-প্রবর Muir এই খিল-দুর্গাস্তবটির একটি অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছিলেন, (O. S. T.—Vol IV, page 498)। সুতরাং অধ্যাপক Macdonell জানিয়া-শুনিয়াই দেবী দুর্গা সম্পর্কে পূর্ব্বোক্ত অসঙ্গত উক্তিটি করিয়াছিলেন।

এই প্রক্ষেপ-বাদটি একটি অতি-পুরাতন ও সহজলভ্য অস্ত্র। কোন কিছু মংলবমত না হইলেই তাহাকে পরবর্ত্তী কালের যোজনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার একটা চেষ্টা করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃপক্ষে এই প্রচেষ্টা মোটেই প্রশংসনীয় নয়। আর উপযুক্ত প্রমাণ বা যুক্তি ব্যতীত কাহারও মুখের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক

(খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ—৭ম শতাব্দী ?)

একথা সুবিদিত যে বৈদিক সংহিতার (মন্ত্রাংশ) পরেই ব্রাহ্মণাংশ রচিত হইয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণাংশের অব্যবহিত পরেই আসিয়াছিল আরণ্যক সাহিত্য। এই আরণ্যক-গুলির পরিশিষ্টাংশই উপনিষদ্ নামে পরিচিত। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের অপর নাম তৈত্তিরীয় সংহিতা। এই তৈত্তিরীয় সংহিতার পরবর্ত্তী, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় আরণ্যকে, তৈত্তিরীয় ও যাজ্ঞিকী প্রভৃতি কয়েকটি উপনিষদ ধৃত আছে, দেখা যায়। আচার্য্য শঙ্কর যে ১২ খানি উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ অন্যতম। তিনি যাজ্ঞিকী বা নারায়ণীয়োপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন নাই। বেদের

প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার আচার্য্য সায়ন তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ভাষ্য রচনাকালে এই যাজ্ঞিকী বা নারায়ণীয়োপনিষদের ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ যাজ্ঞিকী ও নারায়ণীয় উপনিষদকে আলাদা গ্রন্থ বলিয়া লিখিয়াছেন। আসলে এগুলি একই উপনিষদের তুইটি বিভিন্ন নাম মাত্র। আচার্য্য সায়ন তদীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন :—"ইতি সায়নাচার্য্য-বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ প্রকাশে যজুরারণ্যকে অমুক-প্রপাঠকে নারায়ণীয়াপরনামধেয়যুক্তায়াং যাজ্ঞিক্যামুপনিষদি অমুকোঽনুবাকঃ" ইত্যাদি। এই যাজ্ঞিকী উপনিষদের ১০ম প্রপাঠকে আমরা প্রসিদ্ধ দুর্গা-গায়ত্রীর সন্ধান পাইয়া থাকি :—

কাত্যায়নায় বিদ্মহে. কন্যাকুমারী ধীমহি।
তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।১০।১।৭৪

কাত্যায়ন শব্দে সায়ন এখানে কাত্যায়নী দুর্গা, কন্যাকুমারী অর্থে কু+মারী বা বিঘ্ন-বিপদনাশিনী দেবী, এবং দুর্গি দুর্গারই সমার্থক বলিয়া ভাষ্য করিয়াছেন। কাত্যায়ন শব্দ দ্বারা কাত্যায়নীকে বুঝাইবে, ইহার কৈফিয়ৎ-স্বরূপ সায়ন বলিতেছেন, "লিঙ্গাদি-ব্যত্যয়ঃ সর্ব্বত্র ছান্দসো দ্রষ্টব্যঃ" অর্থাৎ বেদ-সাহিত্যে সর্ব্বত্রই লিঙ্গব্যত্যয় দেখা যায়।

এই যাজ্ঞিকী উপনিষদেই আমরা নিম্নোদ্ধৃত স্নান-মন্ত্রগুলি পাই :—

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরা
শিরসা ধারয়িষ্যামি রক্ষস্ব মাং পদে পদে। ১০।১।৮
রুদ্রো রুদ্রশ্চ দন্তিশ্চ নন্দিঃ ষড়্মুখ এব চ।
গরুড়ো ব্রহ্মবিষ্ণুশ্চ নারসিংহস্তথৈব চ ॥
আদিত্যোঽগ্নিশ্চ দুর্গিশ্চ ক্রমেণ দ্বাদশান্তসি।
১০।১।১৬ অনুচ্ছেদ

এখানেও আমরা দেবী দুর্গি বা দুর্গার উল্লেখ পাইতেছি। ইহারই অব্যবহিত পরে, এই উপনিষদে আমরা দুর্গা বা দুর্গি সম্পর্কীয় উপনিষদের উক্তির সমর্থনসূচক অতি-প্রসিদ্ধ কয়েকটি ঋক্-মন্ত্রের উদ্ধৃতি দেখিতে পাই। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভাষ্যকার সায়ন এগুলিকে স্পষ্টতঃ ঋক্-মন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিলেও, এদেশীয় অথবা বিদেশীয় কোনও গবেষক এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া হয়ত মনে করেন নাই। কিমাশ্চর্য্যম্, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ পর্য্যন্ত তৎপ্রকাশিত "চণ্ডী"র ভূমিকার ৮ম পৃষ্ঠায়—

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং
কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ ॥

এই মন্ত্রটিকে নারায়ণোপনিষদের মন্ত্র বলিয়াই লিখিয়াছেন। আর তাঁহারই অনুসরণ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তদীয় "ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য" নামক গ্রন্থে এই মন্ত্রটি এবং এতৎসঙ্গে উদ্ধৃত আর একটি ঋক্-মন্ত্রকেও (১।৯৭।৪০) নারায়ণোপনিষদের মন্ত্র বলিয়াই লিখিয়াছেন,—৩২, ৩৬, ও ৪৬ পৃষ্ঠা। আসলে ইহা এবং এতৎসঙ্গে উদ্ধৃত ৬টি মন্ত্রই উপনিষদ্-বাক্যের সমর্থন-সূচক ঋক্-মন্ত্র। উপনিষদ্ সাহিত্যের বহুক্ষেত্রে আমরা এপ্রকার সমর্থনসূচক ঋক্-মন্ত্রের উদ্ধৃতি দেখিতে পাই। আচার্য্য সায়নের ভাষ্য অনুসরণ করিলে, এবং মূল ঋগ্বেদ ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থ-সমূহ একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেই দেবী উমা, সতী, গৌরী ও দুর্গা যে ঋগ্বেদেই স্তুত হইয়াছেন, এই সত্য বহু পূর্ব্বেই প্রকাশ হইয়া পড়িত, এবং সেই সঙ্গে বহু অনাবশ্যক এবং ভ্রান্ত গবেষণারও শেষ হইয়া যাইত। মূল গ্রন্থ পাঠ না করিয়া এবং ইউরোপীয় মতের অন্ধ অনুসরণ করিয়া, কত কত গবেষক যে মহাদেবী সম্পর্কে কত ভ্রান্ত ও অমূলক উক্তি করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ঋগ্বেদে দুর্গা শব্দের নানা প্রয়োগ

আমরা ইতিপূর্ব্বেই প্রসিদ্ধ বেদাচার্য্য শৌনকের বৃহদ্দেবতা গ্রন্থের সাহায্যে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্তই (১০।১২৫ সূক্ত) দেবী দুর্গার স্বয়ং-কৃত আত্ম-স্তুতি। এবার আমরা ঋগ্বেদ হইতে নানা মন্ত্রাংশ উদ্ধার করিয়া দেখাইব যে, দুঃখ-দুর্গতির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমরা যে দুর্গাদেবীর উপাসনা করিয়া থাকি, সেই দুঃখ-দুর্গতি বুঝাইতে "দুর্গা" শব্দটি ঋগ্বেদে কত ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদে এই শব্দটি কখন ও পুংলিঙ্গে, আবার কখনও বা ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই নারায়ণী-

য়োপনিষদে ধৃত ঋক্‌মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত করিতেছি। বহু চেষ্টায় আমরা এই মন্ত্রগুলির সঠিক অবস্থান নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছি।

১। আক্রান্তসমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্ম্মন্ জনয়ন্ প্রজা
ভুবনস্য রাজা।
বৃষা পবিত্রে অধিসানো অব্যে বৃহৎসোমো বাবৃধে
সুবান ইন্দুঃ ॥ ঋগ্বেদ-৯।৯৭।৪০

এই মন্ত্রের ঋষি পরাশর বশিষ্ঠ, দেবতা সোম, এবং ইহার দ্বিতীয় পংক্তিতে উল্লিখিত বৃহৎসোমো অর্থে আচার্য্য সায়ন শ্রেষ্ঠ বা মহান্ ব্রহ্মস্বরূপ উমাপতি মহাদেবকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "উময়াসহ বর্ত্তমানঃ ইতি সোমঃ"।

২। জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো
নিদহাতি বেদঃ।
স নঃ পর্ষদতি দুর্গানি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং
দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥-ঋগ্বেদ-১।৯৯

এই মন্ত্রের ঋষি ভগবান মরিচি-পুত্র কশ্যপ, দেবতা অগ্নি জাতবেদা। সূক্তটিতে এই একটি মাত্র মন্ত্রই আছে। ইহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এই :—(সর্বজ্ঞ) জাতবেদা অগ্নির উদ্দেশ্যে আমরা সোম (সোমরস) নিবেদন করি। তিনি আমাদের শত্রুগণকে নিধন করিয়া আমাদিগকে নাবিকের ন্যায় অশেষ দুঃখদুর্গতি-রূপ সমুদ্র পার করাইয়া দিন, এবং আমাদের সমস্ত দুরিত বা পাপ নাশ করুন। দুর্গানি বিশ্বা এখানে অশেষ দুঃখ-দুর্গতি এবং দুরিত শব্দে পাপাদি বুঝাইতেছে। নিরুক্ত-পরিশিষ্টে ও মন্ত্রটির মোটামুটি এজাতীয় ব্যাখ্যাই দেওয়া হইয়াছে।

৩। অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যো অস্মান্ত স্বস্তিভিরতি
দুর্গানি বিশ্বা।
পূশ্চ পৃথ্বী বহুলা ন উর্বী ভবা তোকায় তনয়ায়
শং যোঃ ॥-ঋগ্বেদ-১ ১৮৯।২

এই মন্ত্রটির ঋষি হইলেন প্রখ্যাত মহর্ষি অগস্ত্য, দেবতা অগ্নি, এবং সংক্ষেপে ইহার অর্থ :—হে অগ্নি, তুমি আমাদের এই নূতন স্তুতিতে তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে স্বস্তির সহিত সকল প্রকার দুঃখ দুর্গতির পারে লইয়া যাও। তোমার প্রসাদে আমাদের নিবাসযোগ্য পুরীসমূহ প্রশস্ত হউক, পৃথিবী প্রশস্ত হউক। আমাদের পুত্র-পৌত্রাদিকে তুমি মঙ্গল দান কর। শং অর্থ মঙ্গল,—যাহা হইতে শং+কর=শংকর বা শঙ্কর হইয়াছে।

৪। বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুং ন নাবা
দুরিতাতি পর্ষি।
অগ্নে অত্রিবন্মনসা গৃণানোঽস্মাকং বোধ্যবিতা
তনূনাং ॥-ঋগ্বেদ-৫।৪।৯

এই মন্ত্রের ঋষি মহর্ষি অত্রি-পুত্র বসুশ্রুত আত্রেয়, দেবতা জাতবেদা অগ্নি, এবং ইহার অর্থ :—হে সর্ব-দুর্গতি-নাশী জাতবেদা অগ্নি, তুমি নাবিকের ন্যায় আমাদিগকে দুঃখ দুর্গতি এবং পাপাদির পরপারে লইয়া যাও। মহর্ষি অত্রি যেরূপ সকলের সুখ ও নিরাময় কামনা করিতেন, তুমিও সেরূপ আমাদের শরীরের রক্ষক হও।

৫। পৃতনাজিতং সহমান মুগ্রমগ্নিং হুবেম
পরাৎসধস্থাৎ।
স নঃ পর্ষদতি দুর্গানি বিশ্বা ক্ষামদেবো
অতিদুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ ঋগ্বেদ-

এই মন্ত্রটির কোন সন্ধান ঋগ্বেদে পাই নাই; সুতরাং এই মন্ত্রের ঋষি কে ছিলেন, তাহাও জানিতে পারি নাই। মন্ত্রের দেবতা অগ্নি, ইহা বুঝা যায়। সায়ন-কৃত ভাষ্য অনুযায়ী ইহার অর্থ এইরূপ :—ভৃত্যগণের সহিত যে উৎকৃষ্ট দেশে আমরা বাস করি, সেথান হইতে আমরা শত্রু-সেনা-জয়ী ও শত্রু-অভিভবকারী উগ্র অগ্নিদেবের আবাহন করি। তিনি আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া, আমাদের সকল বিঘ্ন-বিপদ ও মহাপাতকের বিনাশ-সাধন করুন।

আচার্য্য সায়ন সুস্পষ্টভাবে ইহাকে ঋক্‌মন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ মন্ত্রটি Maxmuller প্রকাশিত ঋগ্বেদ সংহিতায় পাওয়া গেল না। ইহার অর্থ এই হয় যে, সায়নের সময় কোনও শাখার ঋগ্বেদ সংহিতায় এই মন্ত্রটি নিশ্চয়ই ধৃত ছিল, হয়ত এখনও আছে। অথবা ইহা কোন খিল-সূক্তের মন্ত্রও হইতে পারে। এ রকম আরও একটি মন্ত্রের উল্লেখ যাস্কের নিরুক্তে দেখা যায়; অথচ মন্ত্রটি শৌনকের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলস্থ ১১২ সংখ্যক সূক্তে পাওয়া যায় না। নিরুক্তে যাস্ক লিখিতেছেন (৬।৫) : —ইন্দ্র ঋষীন্ পপ্রচ্ছ, দুর্ভিক্ষে কেন জীবতীতি; তেষামেকঃ প্রত্যুবাচঃ—

শকটং শাকিনো গাবো জালমস্যন্দনং বনম্।
উদধিঃ পর্বতো রাজা দুর্ভিক্ষে নব বৃত্তয়ঃ ॥

বৃহদ্দেবতায় শৌনক বলিতেছেন :—

অনাবৃষ্ট্যাং তু বর্ত্তন্ত্যাং পপ্রচ্ছর্ষীন্ শচীপতিঃ।
কালে দুর্গে মহত্যস্মিন্ কর্মণা কেন জীবথ ॥
শকটং শাকিনো গাবঃ কৃষিরস্যন্দনং বনম্।
সমুদ্রঃ পর্বতো রাজা এবং জীবামহে বয়ম্ ॥

৬।১৩৭—১৩৮

এখানে কালে দুর্গে অর্থে অনাবৃষ্টি-জনিত দুর্ভিক্ষাবস্থাকেই বুঝাইতেছে।

ঋগ্বেদে দুঃখদুর্গতি এবং পাপ ইত্যাদি বুঝাইতে দুর্গা এবং দুর্গ শব্দের প্রয়োগ যেমন দেখা যায়, তেমনই দুরধিগম্য স্থান বা দুর্ভেদ্য সৈন্যাবাস অর্থেও দুর্গ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যে কয়টি প্রয়োগ আমরা উপরে উদ্ধৃত মন্ত্রসমূহে দেখিয়াছি, তাহার সবকয়টিই দুঃখদুর্গতি এবং পাপাদি অর্থেরই দ্যোতক। এরূপ আরও কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

ঋগ্বেদ :—	১।১০৬।১-৬	রথং ন দুর্গাদ্বসবঃ সুদানবো ইত্যাদি,—দেবতা অগ্ন্যাদি বিশ্বদেবগণ,	
	৪।১৮।২	নাহমতো নিরয়া দুর্গহৈতত্তিরশ্চতা ইত্যাদি—ঋষি বামদেব	
	৫।৩৪।৭	দুর্গে চ ন ধ্রিয়তে ইত্যাদি—	—দেবতা ইন্দ্র
	৬।২২।৭	বিশ্বান্যতি দুর্গহানি···	দেবতা ইন্দ্র
	৭।৬০।১২	বিশ্বানি দুর্গা পিপৃতং তিরো নো যূয়ং পাত···	দেবতা মিত্র-বরুণ
	৭।৬১।৭	বিশ্বানি দুর্গা পিপৃতং···	দেবতা ঐ
	৮।২৭।১৮	দুর্গে চিদা সুসরণং ইত্যাদি···	দেবতা বিশ্বদেবগণ
	৮।৯৩।১০	দুর্গে চিন্ন সুগং কৃধি···	দেবতা ইন্দ্র
	৯।৯৭।৪৫	দুর্গোভিরসরৎ সরৎ সমদ্ভিঃ··	দেবতা সোমদেব
	১০।৫৬।৭	স্বস্তিভিরতি দুর্গানি বিশ্বা—	দেবতা বিশ্বদেবগণ
	১০।৯৮।১২	দুর্গহাপামী বামপ রক্ষাংসি সেধ	দেবতা অগ্নি
	১০।১৮২।১	বৃহস্পতির্নয়তু দুর্গহা তিরঃ······	দেবতা বৃহস্পতি

সৈন্যাবাস বা দুরধিগম্য স্থান অর্থে ঋগ্বেদে "দুর্গ" শব্দের প্রয়োগ :—

১।৫২।৬	বৃত্রস্য যৎপ্রবণে দুর্গৃভিশ্বনো নিজংঘস ইত্যাদি	
৪।২৮।৩	দুর্গে দুরোণে ক্রত্বা যাতান্······	"
৭।২৫।২	নি দুর্গ ইন্দ্র······	"
৯।১১০।২২	রক্ষাংসি অপ দুর্গহানি······	"

এ সমস্ত ছাড়াও ঋগ্বেদে "বিশ্বানি দুরিতানি" (৪।৩৯।১,৫। ৮২।৫), "বিশ্বানি দুরিতা (৫।৩।১১,৬।১৫।১৫,৬।৫০।১০, ও ৬।৬৩।১৩), এবং "দুরিতানি বিশ্বা" (৭।১২।২,১০।১৬৫।৫) ইত্যাদি বহুল প্রয়োগ দুঃখ দুর্গতি বা পাপাদি অর্থে; এবং তদ্বিপরীত "বিশ্বানি ভদ্রা" (১।১৬৬।৯), ভূরীনি ভদ্রা (১।১৬৬।১০), সুগানো বিশ্বা (৭।৬২।৭,৭।৬৩।৬) ইতাদি প্রয়োগ ও দেখা যায়।

ঋগ্বেদের দুর্গা স্তোত্র

এবার আমরা ঋগ্বেদের—"তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং ······" "এই প্রসিদ্ধ দুর্গা-স্তবটি লইয়া আলোচনা করিব। ইতিপূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, শৌনক বলিয়াছেন, "এষৈব দুর্গা ভূত্বর্চং কৃত্বা স্যাৎ সূক্তভাগিনী"—।৭৭ এই "ঋচং কৃত্বা" কথাটি ১০।১২৫ সূক্ত বা বাক্-সূক্ত বা দেবীসূক্ত সম্পর্কে প্রযোজ্য, ইহাও আমরা দেখিয়াছি। আর "স্যাৎ সূক্তভাগিনী" কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য্য এবার আমরা দেখিতে পাইব। এই সূক্তে দেবী স্বয়ং স্তুত হইয়াছেন। সূক্তটি অবশ্য ঋগ্বেদীয় শ্রী, লাক্ষা, মেধা প্রভৃতি সূক্তের ন্যায় খিলসূক্ত বা পরিশিষ্ট-সূক্ত। খিলসূক্ত হইলেও ইহা

সুপ্রাচীন সন্দেহ নাই এবং ইহার মর্য্যাদা ও অন্যান্য ঋক্-সূক্তের মতই। আচার্য্য সায়ন এই সূক্তের মন্ত্রকে অন্যান্য ঋক্ মন্ত্রের মতই দেখিয়াছেন। আচার্য্য শৌনক ও (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) ইহাদিগকে ঋক্-সূক্ত হিসাবেই দেখিয়াছেন। অনেক ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক গ্রন্থে খিলসূক্তের মন্ত্রসমূহ বেদ-মন্ত্র হিসাবেই উদ্ধৃত হইয়াছে। আচার্য্য যাস্ক (খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী) ও নিরুক্তের নৈগম কাণ্ডে কয়েকটি খিল মন্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়াছেন, বেদমন্ত্র হিসাবেই; সেখানে "খিল" শব্দের কোন উল্লেখ করেন নাই। সূক্তটির স্থান হইল ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলস্থ ১২৭ সংখ্যক সূক্ত বা রাত্রি সূক্তের পরে এবং ১২৮ সংখ্যক সূক্তের পূর্বে। সূক্তটি প্রত্যক্ষকৃত স্তুতি। যে যে মন্ত্রে দেবতাগণ স্তুত হইয়া থাকেন, সেগুলি মধ্যম-পুরুষে এবং প্রথম-পুরুষে উক্ত। যাস্কের নিরুক্তমতে (দৈবতকাণ্ড ১।১) মধ্যম-পুরুষে উক্ত মন্ত্রসমূহ প্রত্যক্ষ-কৃত স্তুতি, এবং প্রথম পুরুষে উক্ত মন্ত্রসমূহ পরোক্ষ-কৃত স্তুতি। আর উত্তম-পুরুষে উক্ত মন্ত্রসমূহ আধ্যাত্মিক বা আত্মদৈবত বা আত্মস্তুতিমূলক—যেমন দেবীসূক্ত বা বাক্-সূক্ত এবং আরও কয়েকটি। খিলানুক্রমণীর মতে এই সূক্তটির নামও রাত্রিসূক্ত, আর ইহার প্রথম শব্দটিও "আরাত্রি"। খিলানুক্রমণীতে সূক্তটির ঋষির নাম উল্লিখিত হয় নাই। শৌনকীয় আর্ষানুক্রমণীর ১০।১০২ বা সর্ব্বশেষ শ্লোকটি হইল এই:—

শ্রী র্লাক্ষা সার্পরাজ্ঞী বাক্ শ্রদ্ধা মেধা চ দক্ষিণা।
রাত্রী সূর্যা চ সাবিত্রী ব্রহ্মবাদিন্য ইরিতাঃ।
স গৌতমো বামদেবো যাঃ খিলান্তা ঋচো জগৌ ॥১০।১০২

সার্পরাজ্ঞী (১০।১৮৯), বাক্ (১০।১২৫), শ্রদ্ধা (১০।১৫১) দক্ষিণা (১০।১০৭), রাত্রী (১০।১২৭) ও সূর্যা সাবিত্রী (১০।৮৫) মূল ঋগ্বেদের ঋষিকা; আর শ্রী, লাক্ষা ও মেধা হইলেন ৩টি খিল-সূক্তের ঋষিকা। সুতরাং খিলানুক্রমণীতে যে-যে সূক্তের ঋষির নাম উল্লিখিত নাই, সেই সব সূক্তের ঋষি হইলেন গৌতম বামদেব, ইহা সহজেই ধরিয়া লওয়া যায়। সুতরাং শৌনকীয় আর্ষানুক্রমণীয় প্রমাণ অনুযায়ী এই সূক্তের বা দুর্গা স্তোত্রের ঋষি হইলেন গৌতম বামদেব বা গোতম বামদেব। সূক্তটির সঙ্গে অনেকেরই সাক্ষাৎ পরিচয় নাই বলিয়া, একটু দীর্ঘ হইলেও ইহার অনেকগুলি মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইল:—

আরাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতুরপ্রায়িধামভিঃ।
দিবঃ সদাংসি বৃহতী বিতিষ্ঠস আ ত্বেষং বর্ত্ততে তমঃ ॥১
যে তে রাত্রি নৃচক্ষসো যুক্তাসো নবতির্নব।
অশীতিঃ সন্ত্বষ্টা উতো তে সপ্ত সপ্ততিঃ ॥২
রাত্রীং প্রপদ্যে জননীং সর্বভূতনিবেশনীম্।
ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতো নিশাম্ ॥৩
সম্বেশনীং সংযমনীং গ্রহনক্ষত্রমালিনীং।
প্রপন্নোঽহং শিবাং রাত্রীং ভদ্রে পারমশীমহি ॥৪
স্তোষ্যামি প্রয়তো দেবীং শরণ্যাং বহ্বৃচপ্রিয়াং।
সহস্রসম্মিতাং দুর্গাং জাতবেদসে সুনবাম সোমং ॥৫
শান্ত্যর্থং তদদ্বিজাতীনামৃষিভিঃ সমুপাশ্রিতাঃ।
ঋগ্বেদে ত্বং সমুৎপন্নারাতীয়তো নি দহাতি বেদঃ ॥৬
যে ত্বাং দেবি প্রপদ্যন্তি ব্রাহ্মণা হব্যবাহনীং।
অবিদ্যা বহুবিদ্যা বা স নঃ পর্ষদতি দুর্গানি বিশ্বা ॥৭
যে অগ্নিবর্ণাং শুভাং সৌম্যাং কীর্ত্তয়িষ্যন্তি যে দ্বিজাঃ।
তাংস্তারয়তি দুর্গানি নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥৮
দুর্গেষু বিষমে ঘোরে সংগ্রামে রিপুসঙ্কটে।
অগ্নিচোরনিপাতেষু সর্ব্বগ্রহনিবারণে
দুষ্টগ্রহনিবারণ্যোন্নমঃ ॥৯
দুর্গেষু বিষমেষু ত্বং সংগ্রামেষু বনেষু চ।
মোহয়িত্বা প্রপদ্যন্তে তেষাং মে অভয়ং কুরু
তেষাংমে অভয়ং কুর্ব্বোন্নমঃ ॥১০
কেশিনীং সর্বভূতানাং পঞ্চমীতি চ নাম চ।
সা মাং সমা দিশা দবীং সর্বতঃ পরিরক্ষতু
সর্বতঃ পরিরক্ষত্বোন্নমঃ ॥১১
তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং
কর্ম্মফলেষু জুষ্টাং।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসে তরসে
নমঃ সুতরসি তরসে নমঃ ॥১২
দুর্গা দুর্গেষু স্থানেষু শং নো দেবীরভিষ্টয়ে।
য ইমং দুর্গাস্তবং পুণ্যং রাত্রৌ রাত্রৌ সদা পঠেৎ ॥১৩
রাত্রিঃ কুশিক সৌভরো রাত্রির্বা ভারদ্বাজী
রাত্রিস্তবং গায়ত্রং।
রাত্রিসূক্তং জপেন্নিত্যং তৎকাল উপপদ্যতে ॥১৪

পাঠান্তরে ৭ম মন্ত্র হইতে ১৫শ মন্ত্র পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। সেখানে ৯মী ঋকে দেবীকে বলা হইয়াছে গৌরী, আর সর্বশেষ

ঋকে 'কাত্যায়নি নমোহস্তুতে"। ঐ ৯মী ঋকেই আবার বলা হইয়াছে, "ঋগ্বেদে স্তুতয়া দেবী কশ্যপেন উদাহৃতা"।

খিল-গ্রন্থের সূক্তাদির মধ্যে একমাত্র শ্রী-সূক্তের ভাষ্যই পাওয়া যায়। স্কন্দস্বামী, বেঙ্কটমাধব বা সায়নাচার্য্য, কেহই খিল-সূক্ত সমূহের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়না। তাই হয়ত সাহস করিয়া আর কেহ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। খিল-মন্ত্র হইলেও ঋক্-মন্ত্রের ভাষ্য রচনা করা যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার, এই ঘটনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। এই সূক্তের ১২শ সংখ্যক মন্ত্রটির সায়ন-ভাষ্য তৈত্তিরীয় আরণ্যক-ভাষ্যে ধৃত আছে। প্রথম দুইটি মন্ত্রেরও সায়ন-ভাষ্য পাওয়া যায়। এই দুইটি মন্ত্র অথর্ব্ববেদীয় বিখ্যাত যুগল-রাত্রি-সূক্তের প্রথমটিতে দেখা যায় (অথর্ব্ববেদ—১৯ কাণ্ড—৬ষ্ঠ অধ্যায়—৪৭ সংখ্যক সূক্ত)। অথর্ব্ববেদীয় এই রাত্রি-সূক্তটির প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্রদ্বয় এই ঋগ্বেদীয় খিলসূক্তের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র—বাদবাকী মন্ত্রগুলির কোন ভাষ্য পাওয়া যায় না। তবে পণ্ডিত-প্রবর Muir বিগত ১৮৭৩ সালে তদীয় গ্রন্থ Original Sanskrit Textsএর ৪র্থ খণ্ডে এই সূক্তটির একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা দেখা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই অনুবাদ ঠিক মূলানুগ এবং বেদের ঐতিহ্য-অনুসারী হয় নাই; সায়ন-ভাষ্যের সঙ্গে প্রথম দুইটি মন্ত্রের অনুবাদের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। তাই বাধ্য হইয়াই অন্য মন্ত্রগুলির ভাবানুবাদ যথাসাধ্য পাঠকগণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছি। হয়ত স্থানেস্থানে ভুলভ্রান্তি দেখা যাইবে। কিন্তু ভাবগ্রাহী পাঠকগণ এই অনিচ্ছা ও অক্ষমতাজনিত ত্রুটি মার্জনা করিবেন, ইহাই আশা করি।

ভাবানুবাদ:—ভূলোক, পিতৃলোক (অন্তরিক্ষ) এবং দ্যুলোক ব্যাপিয়া দেবী রাত্রি বিরাজমানা; অন্ধকাররূপিণী এই দেবীর আকার অতি বৃহৎ (বৃহতী বি-তিষ্ঠস)।১। যাঁহারা রাত্রির এই অপার্থিব ও অলৌকিক রূপ দর্শন করেন, এবং যাঁহারা মানুষের কর্ম্মফলসমূহেরও দ্রষ্টা, তাঁহারা (সেই গণদেবতা-সমূহ) সংখ্যায় ৯৯, ৮৮, ও ৭৭; (তাঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করুন)। (আচার্য্য সায়ন এখানে সেই গণ-দেবতা সমূহের নামোল্লেখ করেন নাই)। ২। এই নিখিল বিশ্বের আশ্রয়স্থল ও নিদ্রাদায়িনী মঙ্গলময়ী ভগবতী, কৃষ্ণবর্ণা জননী রাত্রির শরণ গ্রহণ করি।৩। তিনি জগতের বিশ্রাম-দায়িনী (সম্বেশনীং), নিয়ন্ত্রী (সংযমনীং) ও গ্রহ-নক্ষত্র-মালিনী। আমি সেই মঙ্গলময়ী শিব-পত্নীর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম (শিবাং রাত্রিং); তিনি আমাকে তদীয় নিকেতন,—দুঃখ-দুর্গতি ও পাপাদির পরপারে,—লইয়া যাউন (ভদ্রে পারমশীমহি)। তাঁহাকে প্রণাম।৪। আমি অনন্তবীর্য্যা (সহস্রসম্মিতাং) ও বহু-বহু ঋক্-মন্ত্রে স্তুতা (বহবৃচপ্রিয়াং) অথবা বহু ঋক্মন্ত্রের দ্রষ্টা শতর্চিন ঋষিগণের প্রিয়া, সেই ভগবতী দুর্গার স্তব করি, এবং অগ্নি-জাতবেদার উদ্দেশে সোমরস নিবেদন করি।৫। হে সোম-পায়িনি (সোমপাঃ), আপদে-বিপদে শান্তির নিমিত্ত দ্বিজাতিগণের মধ্যে ঋষিগণ (জ্ঞানীগণ) তোমার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তুমি ঋগ্বেদে জাতা অর্থাৎ স্তুত হইয়াছে (ঋগ্বেদে ত্বং সমুৎপন্না), এবং সর্ব্বজ্ঞা (বেদঃ); তুমি স্বকীয় তাপে (তেজে) আমাদের শত্রুকুলকে দগ্ধ কর, বিনষ্ট কর (অরাতীয়তো নি দহাতি)।৬। হে হব্যবাহনি, অবিদ্বানই হউন, আর বিদ্বানই হউন, যে-সকল ব্রাহ্মণ তোমার শরণ গ্রহণ করেন, তুমি তাঁহাদের সকল দুঃখ-দুর্গতি বিনষ্ট কর (পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা)।৭। হে অগ্নি-বর্ণা দেবি, যে দ্বিজগণ (দ্বি-জাতীয় জ্ঞানীগণ) তোমার মঙ্গলময় সৌম্যরূপের কীর্ত্তন করিবেন, অগ্নিদেব তাঁহা-দিগকে নাবিকের মত দুর্গতি-সাগরের পরপারে লইয়া যান।৮। (পাঠকগণ এখানে লক্ষ্য করিবেন, ৫ম হইতে ৮ম, এই মন্ত্র চতুষ্টয়ের সঙ্গে পূর্ব্বে-উদ্ধৃত ঋষি কশ্যপ-দৃষ্ট ১৯৯ সংখ্যক এক মন্ত্রাত্মক ঋক-সূক্তটির ভাষাগত এবং ভাবগত সাদৃশ্য কত গভীর)। হে দেবি, তোমার কৃপায় ঘোর-সংকট, সংগ্রাম, রিপু-সংকট, অগ্নিভয়, চৌরভয়, গ্রহ-ভয়, ও দুষ্টগ্রহজনিত সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন-বিপত্তি দূর হয়; তোমাকে প্রণাম।৯। দুর্গম স্থানে, সংগ্রামে ও বনে-জঙ্গলে তুমি আমার শত্রুদলকে মোহিত বা পর্য্যুদস্ত করিয়া (মোহয়িত্বা) আমাকে অভয়-দান কর; হে অভয়-দায়িনি, তোমাকে প্রণাম।১০। হে দেবি জ্যোতির্ম্ময়ি (কেশিনীং), সর্ব্বভূতের মধ্যে তুমি পঞ্চমী নামে খ্যাতা; তুমি সর্ব্বক্ষেত্রে আমাকে রক্ষা কর; তোমায় প্রণাম।১১। হে অগ্নিবর্ণা দেবি, তুমি স্বীয় তপস্যায় জাজ্বল্যমানা (আচার্য্য সায়নের মতে স্বকীয় তাপে শত্রু-দহন-কারিণী), স্ব-মহিমায় প্রকাশ-মানা (বৈরোচনীং) এবং কর্ম্মফল-দায়িনী (কর্ম্মফলেষু

জুষ্টাং)। তোমার শরণ লইলাম। তুমি সহজে আমাকে দুর্গম ভব-সাগরের পারে লইয়া যাও (সুতরসি তরসে নমঃ); তোমাকে প্রণাম।১২। দুঃখ এবং বিপদে পড়িয়া যে-কেহ এই পুণ্যময় দুর্গাস্তব, এবং কুশিক সৌভর বা ভরদ্বাজ-দুহিতা (বা ভরদ্বাজ-গোত্রীয়া) দেবী-রাত্রি-কৃত (দৃষ্ট) রাত্রিস্তব (রাত্রি সূক্ত, ঋগ্বেদ—১০।১ ৭) প্রতি রাত্রিতে পাঠ করিবেন, তাহার সকল দুঃখ-দুর্গ তর আশু-অবসান হইবে ! ১৩ ও ১৪ ॥

[এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রটির আলোচনা নিরুক্ত পরিশিষ্টে দেখা যায়। সেখানে মন্ত্রটিকে স্পষ্টতঃ একটি অধ্যাত্ম-মন্ত্র বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। আচার্য্য সায়ন ও অথর্ব্ব-বেদীয় রাত্রি-সূক্ত দুইটিকে বলিয়াছেন অর্থ সূক্ত বা অধ্যাত্ম-সূক্ত। আচার্য্য সায়ন প্রথম মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় যেখানে বলিয়াছেন যে, দেবী রাত্রি ভূ-লোক, পিতৃলোক (অন্তরিক্ষ) ও দ্যুলোক ব্যাপিয়া পরিবাপ্ত, সেখানে Muir এবং Aufrecht অর্থ করিয়াছেন যে, ভূ-লোক রাত্রি দেবীর পিতার শক্তিতে পরিব্যাপ্ত ইত্যাদি। অধ্যাপক Whitney ও অথর্ব্ববেদের অনুবাদ-গ্রন্থে কতকটা এই ভাবেই মন্ত্রটির অর্থ করিয়াছেন, দেখা যায়। অন্যত্রও কয়েকস্থলে আমরা Muir এবং Aufrecht কৃত অনুবাদের সঙ্গে একমত হইতে পারি নাই। কেশিনী অর্থে তাঁহারা বুঝিয়াছেন "দীর্ঘ-কুন্তলা" (long haired)। কেশী শব্দের প্রয়োগ ঋগ্বেদে বহুক্ষেত্রে দেখা যায়। আচার্য্য সায়নের মতে কেশী "কুন্তল বিশিষ্ট" নয়, জ্যোতির্ম্ময়, তেজোময় বা রশ্মিযুক্ত।]

উদ্ধৃত দুর্গা-স্তবটিতে আমরা অগ্নিবর্ণা ভগবতী দুর্গাকে শুধু কৃষ্ণবর্ণা রাত্রি দেবীর সহিত অভিন্না-রূপেই পাইতেছি না, বরং এখানে ঋগ্বেদীয় রাত্রি-সূক্তটিরও স্পষ্ট উল্লেখ পাইতেছি। ঋগ্বেদীয় দেবী-সূক্তে আছে, "অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং",এখানে আছে "কর্ম্মফলেষু জুষ্টাং"; দেবীসূক্তে আছে, "অহং রাষ্ট্রী সংগমনী", এখানে আছে "সম্বেশনীং সংযমনীং"; দেবীসূক্তে আছে, "ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বতোমূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি", এখানে আছে "পার্থিবং রজঃ পিতুরপ্রায়ি ধামভিঃ, দিবঃ সদাংসি বৃহতী বি তিষ্ঠস" ইত্যাদি বাক্য। পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা যেমন একই চন্দ্রের দুইটি বিভিন্ন অবস্থা, অগ্নিবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ ও সেরূপ একই দেবীর দুইটি বিভিন্ন অবস্থা বা দুইটি বিভিন্ন রূপ মাত্র। সুতরাং এই দুর্গা-স্তবটি যেন দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তের পরিপূরক। মহাদেবী দুর্গার উপাসনার সময় এবং চণ্ডীপাঠকালে ঋগ্বেদীয় মূল দেবীসূক্ত এবং রাত্রি সূক্ত পঠিত হইবার ইহাই কারণ। আর "ঋগ্বেদে ত্বং সমুৎপন্নারাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ", এই মন্ত্রাংশ-দ্বারা দেবী যে প্রকৃতই ঋগ্বেদীয় দেবী, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে এবং এই সঙ্গে তিনি যে সর্ব্বজ্ঞা এবং অরাতিকুল-নিধন-কারিণী, ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে। আর দেবীর শিবা উপাধিটি-দ্বারা দেবীর প্রকৃত পরিচয়ও আমরা এই সঙ্গে পাইতেছি। বিশেষতঃ মন্ত্রমধ্যে উল্লিখিত অগ্নি জাত বেদার সঙ্গে দেবীর সম্পর্ক যে অতি নিকট, তাহাও এখানে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে দেবী হইলেন অগ্নি-জাতবেদারই শক্তি। শিব কথাটির আক্ষরিক অর্থ মঙ্গল বা মঙ্গলময় হইলেও শিব কথাটি দেবাদিদেব মহাদেবের ক্ষেত্রেই সুনির্দ্দিষ্ট; আর জাতবেদা অগ্নিরই অপর নাম। ভূলোকে যিনি অগ্নি, ভূব বা অন্তরিক্ষে তিনি জাতবেদা, আর দ্যুলোকে হইলেন তিনি বৈশ্বানর নামে পরিচিত। এখন শিব ও অগ্নি-জাতবেদার মধ্যে সম্পর্ক কি, তাহা জানা গেলে দেবীর পরিচয় স্পষ্টতর হয়। [এই দুর্গা-স্তবের ১০ম মন্ত্রে "সর্ব্বভূতানাং পঞ্চমীতি চ নাম চ" কথা কয়টি আছে। ইহাতে বুঝা গেল যে দেবীর এক নাম পঞ্চমী। কিন্তু এই পঞ্চমী শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি ? হিন্দুশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ পঞ্চভূত হইল—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও বোম্। পঞ্চমী নামটির কি ইহাই তাৎপর্য্য যে, দেবী দুর্গা পরম-ব্যোম-রূপিণী বা পরম-ব্যোম-বাসিনী ? ঋগ্বেদীয় ১।১৬৪।৪১ মন্ত্রে বাক্দেবী গৌরী সম্পর্কেও বলা হইয়াছে "সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্"। আবার শিবের একনাম পঞ্চমুখ বা পঞ্চবক্ত্র। দেবী শিবানী দুর্গা কি সেই হিসাবেই পঞ্চমী ?]

ঋগ্বেদের ১।৩১।১ মন্ত্রে অগ্নিকে শিব বলা হইয়াছে ; ১।৩১।৯ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—দেবো দেবেষু অনবদ্যঃ। ১।৩৬।১৮ মন্ত্রে অগ্নিকে বলা হইয়াছে উগ্র বা উগ্রা; ১।৫৮।৩ মন্ত্রে রুদ্র, ১।৫৮।৯ মন্ত্রে ভব বা ভবা; এবং ৯।৬৫।৩ মন্ত্রে শংভু বা শম্ভু। এরূপ আরও বহু উদাহরণ ঋগ্বেদীয় সূক্তসমূহ হইতে দেখান যাইতে পারে, যেখানে

অগ্নি দেবদেব, মহান দেব বা মহাদেব, কপর্দ্দী, ঈশ, ঈশান, সর্ব্ব, শর্ব, নীললোহিত ইত্যাদি নামে উপাসিত হইয়াছেন। সুতরাং ঋগ্বেদীয় অগ্নিদেবই আমাদের বহু-পরিচিত দেবাদিদেব শিব বা মহাদেব, ইহা নিঃসন্দেহ। দুর্গাস্তবের যে একটি পাঠান্তরের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে একস্থানে বলা হইয়াছে যে, কশ্যপাদি ঋষি ঋগ্বেদে দেবী দুর্গার স্তব করিয়াছেন। ঋষি কশ্যপের "দুর্গা" বা "দুর্গ" সম্পর্কীয় স্তোত্রটি অগ্নি-জাতবেদার উদ্দেশ্যে উদ্গীত হইয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সুতরাং ভগবতী দুর্গা যে আসলে অগ্নি বা শিব—মহাদেবের সঙ্গে যুক্তা, ইহারই সমর্থন আমরা এখানে পাইতেছি। ঋগ্বেদেরই ১৫৮।৭, ১৭১।৭ ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিদেবকে সপ্তজুহ্ব, সপ্তহস্বী (বা সপ্তজিহ্ব) বলা হইয়াছে। সুতরাং মুণ্ডকোপনিষদের।

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা
যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলীয়মানা
ইতি সপ্তজিহ্বাঃ ॥১।২।৪

এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ,—কালী, করালী, মনোজবা, ইত্যাদি অগ্নি তথা মহাদেবেরই শক্তি,—এই হিসাবেই হইবে; এবং তাঁহারা সেই মহাদেবের একই শক্তির ৭টি বিভিন্ন নাম বা রূপ মাত্র। আচার্য্য শঙ্কর মুণ্ডকোপনিষদের ভাষ্য রচনাকালে এই মন্ত্রটির কোন স্পষ্ট ভাষ্য দেন নাই। হয়ত সঙ্গত কারণেই তিনি ইহা করেন নাই; কারণ ইহা স্বপ্রকাশ, এবং ইহার কোন ভাষ্যের প্রয়োজন হয় না। বেদ-পাঠক মাত্রই এই উপনিষদ্-মন্ত্রের রহস্য স্বাভাবিক ভাবেই অবগত হইবেন, ইহাই হয়ত সেই আচার্য্য অবধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং যে সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তি এতকাল ধরিয়া এই মন্ত্রটির আক্ষরিক অর্থ ধরিয়া লইয়া, ইহাতে কালীর কোন কথা নাই, বলিয়া প্রচার করিতেন, তাঁহাদের অবগতির জন্যই বলিতেছি যে, এই মন্ত্রটিতে সত্য সত্যই মহাদেবের শক্তি হিসাবে কালী দেবীই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, অপর কেহ নহে। সুতরাং এবার আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারিতেছি যে, দেবী কালী ও দুর্গা মহাদেব-পত্নীর দুইটি বিভিন্ন রূপ মাত্র। রাত্রি দেবী কালী দেবীরই অপর নাম, এবং এজন্যই মহাদেবী দুর্গার উপাসনাকালে দেবীসূক্ত এবং রাত্রিসূক্ত, উভয়ই গঠিত হইয়া থাকে।

ঋগ্বেদের:—বি দুর্গা বি দ্বিষঃ পুরোঘ্নন্তি রাজান এষাং। নয়ন্তি দুরিতা তিরঃ। ১।৪১।৩—এই মন্ত্রটিতে দেবী দুর্গার স্পষ্ট উল্লেখ আছে, এরূপ অর্থ করাও সম্ভবপর। মন্ত্রটিকে গদ্যে রূপান্তরিত করিলে, দাঁড়ায়:—

বি দুর্গা বি রাজান এষাং দ্বিষঃ পুরো ঘ্নন্তি।
নয়ন্তি দুরিতা তিরঃ ॥

তাহা হইলে অর্থ হয়:—বিশেষ ভাবে দেবী দুর্গা এবং মিত্র-বরুণ-অর্য্যমাদি রাজাগণ আমাদের শত্রুসমূহের পুর বা নগরাদি ধ্বংস করেন, এবং আমাদিগকে (শত্রুর অত্যাচারজনিত) দুঃখদুর্দ্দশার পরপারে লইয়া যান। আচার্য্য সায়ন অবশ্য এখানে দুর্গা অর্থে দুরধিগম্য স্থান বা শত্রুপক্ষের দুর্গ বা সুরক্ষিত সৈন্যাবাসই ধরিয়া লইয়াছেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দুই ভাষ্যকার বেঙ্কটমাধব এবং স্কন্দস্বামীও একরূপ ভাষ্যই করিয়াছেন।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, কশ্যপ, অগস্ত্য, অত্রিপুত্র বসুশ্রুত ও শক্তি পুত্র পরাশর বাসিষ্ঠ প্রভৃতি ঋগ্বেদীয় অতি-প্রাচীন কয়েকজন ঋষি সংসারের দুঃখ-দুর্গতি ও পাপ ইত্যাদির হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে যে অগ্নিদেবের উপাসনা করিতেন, তাহাই সেই যুগে কিংবা তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগে অগ্নি বা মহাদেবের শক্তিতেও (পত্নীতে) আরোপিত হয়, এবং ইহা হইতেই দুঃখ-দুর্গতি-নাশিনীরূপে দেবী দুর্গার উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। অবশ্য দুঃখদুর্গতির হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য ইন্দ্রাদি অন্য দেবগণের উদ্দেশ্যে কৃত স্তবস্তুতি ও ঋগ্বেদে দেখা যায়। কিন্তু অগ্নিদেবের ক্ষেত্রে তাহা যেরূপ ব্যাপক, অন্য যে-কোনও একক দেবতার পক্ষে তাহা সেই অনুপাতে সীমাবদ্ধ মাত্র। সুতরাং অগ্নি বা শিবের উদ্দেশ্যে যে-যুগে দুঃখ-দুর্গতি ও পাপক্ষালনের জন্য স্তবস্তুতি উচ্চারিত হইত, সম্ভবতঃ সেই যুগেই যুক্তভাবে বা যুগ্মভাবে অগ্নি-অগ্নায়ীর উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে স্তবস্তুতি নিবেদিত হইত। ইহাই স্বাভাবিক এবং ইহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। আর ইহারই সমর্থন পাওয়া যাইবে খিল-সূক্তটির পাঠান্তরের বাক্যটিতে, "ঋগ্বেদে স্তবয়া দেবী কশ্যপেন উদাহৃতা"। সেখানে ঋষি কশ্যপ-দৃষ্ট সূক্তটির

(ঋগ্বেদ ১।৯৯) দেবতা হইলেন অগ্নি-জাতবেদা। ব্রহ্ম ও তদীয় শক্তি যেমন এক ও অভেদ, সমুদ্র এবং তাহার ঢেউ যেমন পৃথক্ পৃথক্ বস্তু নয়, শিব ও তদীয়শক্তি (পত্নী) সেরূপ এক ও অভিন্ন। অবশ্য কখন কখন শিবের শক্তির উদ্দেশ্যে আলাদা ভাবেও স্তবস্তুতি উচ্চারিত হইয়াছে, যাহার নিদর্শন হইল দেবীসূক্ত, রাত্রিসূক্ত, ও খিল দুর্গা-স্তোত্র ইত্যাদি। অনুরূপভাবেই আমরা ঋগ্বেদে দেবী অদিতি, সরস্বতী (বাক), শ্রী প্রভৃতি বহু দেবীর উদ্দেশ্যে আলাদা ভাবে স্তুতি নিবেদিত হইয়াছে দেখিতে পাই। ঋগ্বেদের এই দেবতা ও তদীয় শক্তিকে আলাদাভাবে লক্ষ্য করার প্রবণতা হইতেই পরবর্ত্তী কালে সাংখ্যমতের পুরুষ-প্রকৃতি-বাদের উদ্ভব হইয়াছিল, ইহা মনে করা অযৌক্তিক হইবে না। কারণ উত্তরকালে ভারতে যত দার্শনিক মতবাদ ও ধর্ম্মমত গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা সবই বেদ-মূলক। এমন যে নিরীশ্বরবাদী জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম তাহাদের অহিংসা-রূপ মূলসূত্র ও বেদান্তের অহিংসাবাদ হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। বেদের অভ্রান্ততা অস্বীকার করিলেও, এই দুইটি মতবাদ বেদের প্রভাব এড়াইতে পারে নাই।

ঋগ্বেদীয় খিল-কাণ্ডের এই রাত্রি-ও-দুর্গাস্তব দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তের পরেই রচিত হইয়াছিল, এবং ইহা এই দুর্গাস্তবের সূত্র হইতেই জানা যায়। রাত্রিসূক্তের ঋষি কুশিক সৌভর, মতান্তরে ভরদ্বাজ-কন্যা বা ভরদ্বাজ-গোত্রীয়া দেবী রাত্রি। ভাষার দিক হইতে বিচার করিলে, সূক্তটি যে ঋগ্বেদীয় প্রাচীনমন্ত্রসমূহ হইতে পরে রচিত হইয়াছিল, ইহাও অস্বীকার করা যায়না। সম্ভবতঃ সূক্তটি অথর্ববেদীয় রাত্রি-সূক্ত-দুইটির সমসাময়িক। কারণ ইহাদের মধ্যে ভাবগত এবং ভাষাগত সাদৃশ্য অতি গভীর। তথাপি ইহা ঋগ্বেদীয় সূক্তই, একথা অনস্বীকার্য্য। সুতরাং দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তের কথা বাদ দিলেও এই একটি মাত্র সূক্ত বা সূক্তাংশের দ্বারাই দেবী দুর্গা যে ঋগ্বেদীয় দেবী, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

বেদের ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক গ্রন্থসমূহকে এক-হিসাবে সংহিতা-মন্ত্রের প্রয়োগ-গ্রন্থ বলা হইয়া থাকে। সেই হিসাবে যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োগ-গ্রন্থ। এই আরণ্যকে যে-সমস্ত ঋক্-মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, নিঃসন্দেহে সেগুলি আরণ্যক অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। সুতরাং এই তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ধৃত অন্যান্য ঋক্-মন্ত্রের ন্যায় "তামগ্নিবর্ণাং" মন্ত্রটি-ও এই গ্রন্থ-রচনার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, ইহা অবধারিত। অতএব দেবী দুর্গা যে ঋগ্বেদীয় দেবী হিসাবে সেই আরণ্যকের যুগের পূর্ব হইতেই সুপরিচিতা ছিলেন, ইহা আমরা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লইতে পারি। এ সম্পর্কে বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হইল এই যে, আচার্য্য যাস্ক (নিরুক্তে) ও শৌনক (বৃহদ্দেবতায়) মূল ঋক্-মন্ত্র ও খিল-মন্ত্রে কোন প্রভেদ দেখেন নাই; তৈত্তিরীয় আরণ্যক-রচয়িতাও সেরূপ কোন প্রভেদ দেখেন নাই। এমন কি, ২০০০ বৎসর পরবর্ত্তীকালে প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার আচার্য্য সায়নও মূল-মন্ত্র এবং খিল-মন্ত্রের মধ্যে মর্য্যাদা-হিসাবে কোন পার্থক্য আছে বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। সুতরাং বৈদিক ঐতিহ্য অনুযায়ী খিলমন্ত্রসমূহও অতি প্রাচীন, এবং মূল-মন্ত্রসমূহের সম-মর্য্যাদা-সম্পন্ন। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে খিল-মন্ত্রসমূহ সম্ভবতঃ বেদ-বিভাগের কালেও কোন বিশেষ বিশেষ ঋষি-সম্প্রদায়ের পারিবারিক মন্ত্র-হিসাবে রক্ষিত ছিল ঋগ্বেদীয় বাস্কল ও মাণ্ডুকেয় শাখায় অনেক খিল মন্ত্র রক্ষিত ছিল বলিয়া শৌনকীয় অনুবাকা-ক্রমণী ও ঋক্-প্রাতি শাক্য পাঠে জানা যায়। অধ্যাপক কীথ (Keith) বিগত ১৯০৭ সালে J. R. A. S পত্রিকায় খিল-মন্ত্রগুলির প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য সম্পর্কে একটি অতি সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেবী দুর্গা সম্পর্কীয় মন্তব্য-সম্বলিত Macdonell-সম্পাদিত বৃহদ্দেবতার প্রকাশ-কাল হইল ১৯০৪ সাল। সুতরাং খিল মন্ত্রে স্তুত দেবী দুর্গা সম্পর্কে এই দুইজন পণ্ডিত যে ভিন্নমত পোষণ করিতেন, ইহা অনুমান করা যায়।

পুনার বৈদিক সংশোধন-মণ্ডল দেবী দুর্গা সম্পর্কে যে অভিমতই পোষণ করুন না কেন, একটি আরণ্যক-গ্রন্থ, অথবা একটি শৌনক, অথবা একটী সায়নের অভিমত তাঁহাদের ন্যায় বহু-বহু মণ্ডলীর অভিমত অপেক্ষা ওজনে অনেক ভারী, এবং অনেক অনেক বেশী প্রামাণ্য। এই সংশোধন-মণ্ডলের পণ্ডিত কাশীকর দেবী দুর্গা-সম্পর্কে যে-ভাবে অধ্যাপক Macdonell-এর অভিমতের অন্ধ-সমর্থন

করিয়াছেন, তাহাতে ইহা মনে হয় যে, তিনি বাহিরের দিকে দৃষ্টি যতটা প্রসারিত রাখিয়াছিলেন, ভিতরের দিকে ঠিক ততটাই হয়ত অন্ধ ছিলেন। নতুবা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উদ্ধৃত ঋক্-মন্ত্রটির প্রতি এবং ভাষ্যে ধৃত আচার্য্য সায়নের উক্তিটির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইত; এবং তিনি অধ্যাপক Macdonell-এর অভিমতকে আচার্য্য শৌনক অথবা আচার্য্য সায়নের মতের উর্দ্ধে স্থান দিতেন না। সুতরাং সংশোধক মহাশয়ের নিজেরই সংশোধিত হইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করা অন্যায় হইবে না। ঋগ্বেদীয় মূল-সূক্ত ত দূরের কথা, খিল-মন্ত্রগুলিরও ভাষ্য অথবা টীকা-টিপ্পনী রচনা করার হিম্মৎ যাঁহাদের হয়না, তাঁহারা বেদ-সংশোধক বলিয়া নিজেদের জাহির করেন কিরূপে, তাহা বুঝা গেল না।

এ প্রবন্ধে কোন দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই বা তাহার চেষ্টাও করা হয় নাই। ইতিহাসের দিক হইতেই দুর্গা-স্তুতির আদি-ধারা আলোচিত হইয়াছে মাত্র।

পূজার চিঠি

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

খবর আমার মন্দ কী আর!—
মোটামুটি ভালোই আছি;
এত ভালো সয় কপালে!—
মরণ হলে তাইতো বাঁচি!
সাতপুরুষের পুণ্যফলে
জীবন—গরুর গাড়ি চলে;
মায়ের দয়ায় যাইনি ক্ষেপে,—
আজো আমি যাইনি রাঁচি!
অভাব,—সেটা লেগেই আছে
টাইফয়েডের জ্বরের মত,
বাইরে বাহার খুল্‌ছে ততই—
ভেতরে খাঁক্ হচ্ছে যত।
নেই যদিও বস্ত্র-অন্ন—
ভাবনা কী আর তাহার জন্য!—
উপদেশের স্বর্গ-সুধায়
তৃষ্ণাক্ষুধা হচ্ছে গত!
ভাঁড়ে আমার মা ভবানী,—
এমন ভাগ্য কাহার আছে?
খাঁটি সোনা হচ্ছি ক্রমেই
দারিদ্র্যেরি আগুন-আঁচে।

শেষ না হতে মাসের আধা
ধান্দা হাজার গজায় দাদা,—
কোন্‌টা ধরি, কোন্‌টা ছাড়ি
শুধাই বলো কাহার কাছে।
বোঝার উপর শাকের আঁটি—
সর্বজনীন পূজার চাঁদা,
বিয়ে এবং অন্নপ্রাশন—
দু'দশ ডজন আছেই বাঁধা!
মামার জামাই, তস্য শ্যালক,—
এ দীন তাদের প্রতিপালক;—
মন্দ নহে—সুখেই আছি,—
যেমন থাকে ধোপার গাধা!
ভালোই আছি,—না খেয়ে মোর
দিনগুলো বেশ যাচ্ছে কেটে,
ফর্সা কাপড় পরছি আজো
ভদ্রলোকের লেবেল এঁটে!
কত খাসা আছি মশাই,
জানেন তাহা বাবা গোঁসাই;
গীতার মর্ম শিখ্‌ছি ঠেকে,
বিনা লাভেই মরছি খেটে!

সে কি আজ!

আঠের বছর আগে কৃষ্ণার সঙ্গে অরুণের পরিচয় হয়। অরুণ তখন কলকাতার কলেজে বি-এ পড়ে। কাব্য-চর্চা করে। মন রোমান্সে ভরা। ছুটিতে গ্রামে ফিরে অরুণ এক বিয়ের বরযাত্রী হয়ে গেল। সেখানে উৎসব প্রাঙ্গণের পথে মেয়েটির সঙ্গে দেখা। আরো অনেকের সঙ্গে দলের মধ্যে ছিল মেয়েটি। তবু ওকে আলাদা করে চোখে পড়ে। তন্বী, সুশ্রী, সালঙ্কারা, পরণে রক্তবর্ণের শাড়ি, হাতে শ্বেত শঙ্খ। বর আর বর-যাত্রীদের দেখে সেই শঙ্খ ধ্বনিময় হল। পথের দুধারে ফুলে ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়া। দলের মধ্যে ওই মেয়েটিই ছিল তরুণী। কিশোরী বলা যায়। চৌদ্দ কি পনের বছর হবে বয়স। অরুণের ভালো লেগে গেল। তারপর আলাপ হল বিয়ে বাড়ির পাশের বাড়িতে। অরুণের এক দূর সম্পর্কের বউদি দিলেন আলাপ করিয়ে। পুরো একটি দিনও ছিল না। কিন্তু মনে হল যেন পুরো এক জীবনের আত্মীয়তা।

তারপর ফিরে এল অরুণ। বউদি নিরক্ষরা। তাঁর জবানীতে মেয়েটি চিঠি লিখল। নিচে নিজের নাম লিখে কেটে দিল—যেন ভুলে লিখে ফেলেছে। অরুণ ইঙ্গিত বুঝতে পেরে উৎফুল্ল হল। বউদিকে মধ্যবর্তিনী রেখে ওদের মধ্যে চিঠি পত্র চলতে লাগল। তারপর শুধু আর একবার তাদের দেখা হয়েছিল। বিয়ে বাড়িতে নয়, রথের মেলায়। অরুণের সঙ্গে ছিল বন্ধুদের দল। কৃষ্ণার সঙ্গে ছিল স্বজনেরা। তাই শুধু চোখে চোখে দেখা। কথা হয়নি।

এই দ্বিতীয়বার দেখাই শেষ দেখা।

কৃষ্ণাদের গ্রামের আর একটি ছেলে অরুণকে প্রথমে বলেছিল—মেয়েটি তাকে খুব ভালোবাসে। তারপরে খবর

দিল—অমন ভালোবাসা মেয়েটি আরো অনেককে বেসেছে। আরো অনেককে লিখেছে অমন চিঠি। সে কথা শুনে অরুণের ভারি রাগ হল। প্রেমে একনিষ্ঠতার ওপর তার তখন অগাধ বিশ্বাস। যে দেবে সে সব দেবে। অংশে কোন সুখ নেই। অখণ্ডতায় তার দাবি। অরুণ চিঠি দেওয়া বন্ধ করল। সম্পর্ক ছিন্ন করল।

কিছুদিন বাদে অরুণ শুনল কৃষ্ণার কোথায় যেন বিয়ে হয়ে গেছে। একটু খোঁচা লাগল মনে। কিন্তু তা ভুলে যেতে বেশি দেরি ও লাগল না।

বছর খানেক বাদে অরুণেরও বিয়ে হল। আরও বছর দুই পরে ছেলে-পুলে হল। ভালো ছাত্র হতে পারলনা, ভালো চাকুরে হতে পারলনা। ছবি এঁকে খানিকটা নাম হল। কোন আর্ট কলেজে পড়েনি। একজন বড় আর্টিষ্টের কাছে শুধু যাতায়াত করেছে। শিক্ষা দীক্ষা তাঁর কাছে। অনেকটা একলব্যের মত। কিন্তু অরুণের তৃপ্তি নেই। জীবনে সে আরো সিদ্ধি, আরো সার্থকতা চায়। কিন্তু তার জন্য উপযুক্ত কাজ করতে পারেনা। খাটতে পারেনা। সে যেমন শিল্পসিদ্ধি চায়, তেমনি চায় নারীর প্রেম। তার এই ক্ষুধার যেন শেষ নেই। তার চরিত্রে আর কোন ক্ষুদ্রতা নেই, কিন্তু এই বাসনা তাকে ক্ষুদ্রের চেয়েও ক্ষুদ্র করে তোলে। সে অস্থির অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অরুণ বুঝতে পারে তার শিল্প প্রেরণার মূলে আছে নারী, আবার তার ধ্বংসের মূলেও সেই নারী। তার এই বাসনা অস্বাভাবিক। প্রায় বিকৃতির নামান্তর। সে কোন মেয়ের জন্যে অর্থব্যয় করেনি, কিন্তু বহু সময় নষ্ট করেছে। নিজের শিল্পসাধনাকে অঞ্জলি দিয়েছে। তারপর অনুতাপ আর আত্মগ্লানি। ফের বসেছে আসন পেতে। এই দোটানার টানা-পোড়েনে আঠের বছর কেটে গেছে।

অরুণ এক পাবলিসিটি অফিসে কাজ করে। কমার্শিয়াল আর্টিষ্টের কাজ। তাতে জাত যায় কিন্তু পেট ভরে না। মন ভরে না মোটেই। নিজের জন্য আঁকে গোপনে গোপনে—এঁকে রসিক বন্ধুর প্রতীক্ষা করে। তার সে তুলি আলাদা।

তারপর অফিসে একদিন মেয়েলি হাতে লেখা এক খানা চিঠি এল। এমন চিঠি তার আরো এসেছে; কিন্তু এ চিঠি অন্য, হাস্যকর সে চিঠি। বানান ভুলে ভাষার ভুলে ভরা, ভাবের দুর্বলতার সীমা নেই। এইসব দোষত্রুটিই অরুণের বেশি করে চোখে পড়ে। তবু কোথায় যেন একটু সৌরভ লুকিয়ে আছে। তা অতি ক্ষীণ। তবু তা আছে। মেয়েটি লিখেছে—সে নাকি এই আঠের বছর ধরে অরুণকেই কেবল খুঁজেছে। কত জায়গায় কত চিঠিপত্র যে দিয়েছে তার ঠিক নেই। কত চিঠি ফেরত গেছে, কত চিঠি হারিয়ে গেছে। সে সব কার হাতে পড়েছে কে জানে। এই চিঠি যদি পৌঁছোয় অরুণ যেন কৃষ্ণার সঙ্গে একবার দেখা করে। সে শুধু দেখবে। আর কিছু চাইবেনা। কৃষ্ণা এখন এই কলকাতাতেই আছে।

দুএকদিন বাদে অরুণ গিয়ে দেখা করল। দেখে একেবারে হতাশ হল। কৃষ্ণার রূপ বলতে কিছু নেই, যৌবন বলতে কিছু নেই। তার সেই কিশোরী প্রণয়িনী এখন কুরূপা এক প্রৌঢ়া। স্বামী স্বাস্থ্যবান প্রৌঢ় ভদ্রলোক। বাইরে কোথায় মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভের কাজ করেন। তিনটি ছেলে মেয়ে হয়েছে তাদের মধ্যে দুটি ছেলে, একটি মেয়ে।

একজনের হারানো রূপ যেন আর কজনের মধ্যে বাসা নিয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণার কোন রূপ নেই। সে তার কড়ির মত দুটি চোখ মেলে অরুণের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল। হেসে বলল, 'জানতাম তুমি আসবে। চিঠি পেলে না এসে পারবেনা।

স্বামী ভদ্রলোক বাড়িতে ছিলেন না। ছেলে মেয়েরা উৎসুক চোখে অরুণের দিকে তাকাল। যেন কত বড় এক নামকরা লোক ঘরে এসেছে। বড় ছেলে অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে এল। অরুণ ভাবল, এই খাতায় স্বাক্ষর দেবার যোগ্যতা কি তার আছে? তবু দিতেই হল স্বাক্ষর। শুধু সই নয়। দুটি কুঁড়ির সঙ্গে একটি ফুলও এঁকে দিল।

তারপর অনেক সুখ দুঃখের কথা হল। কৃষ্ণার স্বামীর বদলীর চাকরি। অনেক ঘুরে ঘুরে তারা এই শহরে এসেছে।

বিদায় নেওয়ার সময় কৃষ্ণা বলল, 'আবার কবে আসবে?'

অরুণ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কোনদিন আসবেনা। কিন্তু মুখে বলল, 'আসব আর একদিন।'

কৃষ্ণা বলল, 'আমার গা ছুঁয়ে বল।'

অরুণ সভয়ে দুপা পিছিয়ে গেল। এ কী গ্রাম্যতা।

মেয়েটি বলল, 'আমাকে ছুঁতে তোমার ঘেন্না হয়, তাই না?'

কথাটা ঠিক, আবার ঠিকও নয়। ঘৃণা নয়, প্রবৃত্তির অভাব। কিন্তু তাতো আর মুখে বলা যায় না।

অরুণ বলল; 'তা কেন?'

কৃষ্ণা ছলছল চোখে বলল, 'তখন তো তুমি আমাকে ছোঁও নি। আজ আমার কিছু নেই। আজ আর কেন ছোঁবে?'

'কিছু নেই' কথাটি খট করে কানে লাগল অরুণের। রূপ নেই, যৌবন নেই, কিন্তু ওর স্বামী ঘরসংসার ছেলে-মেয়ে সবই তো আছে। শিক্ষা নেই, রুচি নেই, কিন্তু সেই পুরোন ভালোবাসার স্মৃতিকে ধরে রাখবার শক্তিটুকু তো আছে। তার কি কোন দাম নেই? যৌন আকর্ষণের দিক থেকে কোন মূল্যই অবশ্য তার নেই। কিন্তু সেই আকর্ষণের অতীত যদি কিছু থেকে থাকে?

কৃষ্ণা হঠাৎ অরুণকে প্রণাম করে বলল, 'দোষ নিয়ো না। আমি তোমাকে ছুঁলাম।'

অরুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মত তার প্রাক্তন-প্রেমিকা তাকে প্রণাম করবে এটা সে চায় না। আজকাল এ সব হয় না। কিন্তু একালের জীবনেও সেকালের ঘটনা ঘটে।

কৃষ্ণা বলল, 'কথা দাও, আবার আসবে।'

অরুণ বলল, 'আসব।'

কিন্তু মাসখানেকের মধ্যে আর দেখা করল না। কৃষ্ণা দুতিনখানা চিঠি লিখল—'এর চেয়ে দেখা না হওয়াই ভালো ছিল। তোমাকে দুবার করে হারালাম। তুমি কী নিষ্ঠুর।'

অরুণ যায় না। কিন্তু তার মন মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়। তবু যেতে ভরসা হয় না। কৃষ্ণার সেই কড়ির মত চোখে সে বাসনার আগুন দেখতে পেয়েছে। অরুণ মোটেই নীতিবাগীশ নয়, বরং একেবারে উল্টো। তবু আর একটি নারীর বাসনার মধ্যে সে যেন নিজের প্রতি-মূর্তি দেখতে পায়। নিজেরই বিসদৃশ রূপের প্রতিবিম্ব তার চোখে গিয়ে লাগে। কিন্তু নিজের মনেই সে হাসে। তার এই বিবেক কোথায় থাকত মেয়েটি যদি তরুণী সুন্দরী আর উচ্চশিক্ষিতা হত? অরুণ কি তখন অযাচিতভাবে যেতনা। নিজেই যাচক হত না?

অরুণ গেলনা। কৃষ্ণা শেষ পর্যন্ত তার বড় ছেলেকে পাঠিয়ে দিল। তার হাতে চিঠি। পনের ষোল বছরের রূপবান ছেলে। গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। বড় বড় দুটি চোখ। চোখে মুখে কথা বলে। তার হাতে চিঠি। এ কী ধরণের রুচি। অরুণ ভিতরে ভিতরে ভারি চটল। ছেলেটি বলল, 'আপনি শিগগিরই একদিন যাবেন। মার শরীর ভারি খারাপ। একটা বড় রকমের অসুখ-বিসুখ বাঁধিয়ে না বসেন।'

নিজের ছেলেমেয়েদের কথা অরুণের মনে পড়ল। একই বাৎসল্যের ভাব এল মনে। ছেলেটির পিঠে হাত রেখে বলল, 'আচ্ছা যাব।'

অরুণ ভাবল, কৃষ্ণার রুচিহীনতার শেষ নেই। কিন্তু বাসনার আগুন রুচিকে শালীনতাবোধকে যুক্তিজালকে কীভাবে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে তা তো সে নিজেও জানে। যদি ধিক্কার দিতে হয় নিজেকে দাও। যদি বিচার করতে হয় নিজের বিচার আগে করো। অরুণ এই দিক থেকে ভালো যে—সে ভণ্ড নয়। আর কাউকে যাচাই করবার আগে সে নিজেকে ওজন করে নেয়।

তারপর যাতায়াত চলতে লাগল। একদিকে বিতৃষ্ণা, আর একদিকে সহানুভূতি। একদিকে বিতৃষ্ণা, আর এক-দিকে কৌতূহল। কীসের অভাব কৃষ্ণার? ওরও তো সব আছে। স্বামী, ছেলেমেয়ে, সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য। তবু কেন এই অতৃপ্তি? অরুণেরও সব আছে। স্ত্রী ছেলে-মেয়ে কিছু পরিমাণে যশ অর্থ এবং তার চেয়েও দুর্লভ কিছু আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা। সেই আনন্দের সঙ্গে কোন আনন্দের তুলনা হয় না। তবুওতো অরুণের কতবার মনে হয়েছে একটি তরুণী সুন্দরী নারীকে নিয়ে সে এখনো সব ছেড়ে উধাও হতে পারে। তার আর যেন দ্বিতীয় কোন কামনা নেই।

যাতায়াত চলে। কৃষ্ণা বলে, স্বামীর কাছে তার কোন সাধ মেটেনি। সে গায়িকা হতে চেয়েছিল, লেখিকা হতে চেয়েছিল, শিক্ষিতা হতে চেয়েছিল। কিছুই হয়নি। হয়েছে শুধু মা, হয়েছে শুধু গৃহিণী। তার স্বামী বদলীর

চাকরিতে বাইরে বাইরে ঘোরেন—কলকাতায় সবকিছু কৃষ্ণাকেই আগলাতে হয়। তার জীবনে কোন আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়নি। যে ভালোবাসায় সব বিকশিত হয়, সেই ভালোবাসা সে স্বামীর কাছ থেকে পায়নি। অরুণ বিশ্বাস করেনা। সে হাসে। সে তো স্ত্রীর ভালোবাসা পেয়েছে। সে ভালোবাসা অবিমিশ্র নয়। তার মধ্যে মূঢ়তা আছে, কলহ বিরোধ আছে, সহনাতীত ঈর্ষা আর সন্দিগ্ধতা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে নির্ভরতা। সে তো কম পায়নি। তবুতো অরুণের আরো চাই।

কৃষ্ণা বলে 'আমি যদি তোমার মত স্বামী পেতাম আর কিছু চাইতাম না।'

অরুণ হেসে বলে, 'আমার মত স্বামী পেলে উপপতির জন্যে একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটিভের দরকার হত।'

কৃষ্ণা রাগ করে। দুঃখ পায়। বলে, 'আমার ভাল-বাসাকে তুমি বিশ্বাস করনা?

অরুণ বলে, 'একদম না।'

কৃষ্ণা বলে, 'তুমি কী নিষ্ঠুর'। হৃদয় বলে তোমার কোন পদার্থ নেই।'

অরুণকে কৃষ্ণা বারবার বোঝাতে চায়, তার জন্যেই সে এতদিন অপেক্ষা করে আছে। অরুণ সে কথা বিশ্বাস করেনা। তার মনে হয়, কৃষ্ণা অন্তত আরো দু'একজনের ভোগ্যা হয়েছে। তার এই উদ্দাম বাসনা আঠের বছর ধরে শুধু স্বামীকে নিয়ে তৃপ্ত ছিল—কি প্রথম প্রেমিকের ধ্যানে মগ্ন ছিল—একথা বিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই।

কৃষ্ণা লিখতে চায়, ছবি আঁকতে চায়। সব বিষয়ে সাহায্য চায় অরুণের। কিন্তু অরুণ জানে এত বয়সে ওসব কৃষ্ণার হবার নয়। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'সংসার-শিল্পই বড় শিল্প।'

কৃষ্ণা অভিমান করে বলে, 'তুমি আমাকে ভালবাসনা। ভালোবাসলে আমাকে তোমার সঙ্গিনী করে নিতে।'

কৃষ্ণা চিঠি লেখে অফিসের ঠিকানায়। অরুণ জবাব দেয়না। তবে মাঝে মাঝে যায়। কৃষ্ণার আদর সহ্য করে। এ ব্যাপারে কৃষ্ণা ভারি অসতর্ক অসাবধান। অরুণ কখনো বিরক্ত হয়, কখনো সন্ত্রস্ত হয়। কৃষ্ণাকে সে তো আর ভালোবাসেনা। সেই পুরোনো ভালোবাসাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। একটু সহানুভূতি হয়তো অনুভব করে। আর বোধ হয় ভালোবাসে ওর ভিতরকার বাসনার আগুনকে। যে আগুনে কৃষ্ণা পুড়ে খাক হয়ে যায়, পাগলের মত মাতালের মত ব্যবহার করে। রূপহীনা যৌবনহীনা শিক্ষা-সংস্কৃতিবর্জিতা এই নারীটির মধ্যে যে বাসনার আগুন জ্বলে, সেই একই আগুনতো অরুণ নিজের মধ্যেও জ্বলতে দেখে। সেই জ্বালার তীব্রতা যে কী তা তো সে জানে। তার শিক্ষা আছে, রুচি আছে, খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে, আছে সৃষ্টির আনন্দ—তবুও তো সে অনাসৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

অরুণ কৃষ্ণার জন্যে সহানুভূতি বোধ করে এই পর্যন্ত। আরো কিছু বেশি দিতে পারলে সে খুশি হত। কিন্তু পারে কই। তবু যায়। আর একজনের বাসনার আগুন দেখতে যায়। যে আগুনে সে নিজেও কতবার দগ্ধ হয়, জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়। কৃষ্ণার কাছে গিয়ে স্থির নির্বিকার থেকে সে তার জ্বলুনি দেখে। ব্যঙ্গ নয়, বিদ্রূপ নয়, মমতা আর সহানুভূতির চোখেই সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এ যন্ত্রণা যে কী তাতো তার জানতে বাকি নেই।

দেবীর হিমালয়-যুদ্ধ

স্বামী নির্ম্মলানন্দ

হিমালয়ের হিমশীতল উত্তুঙ্গ শিখরে ভারতের সহিত প্রতিবেশী রাষ্ট্র লাল চীনের এক ভীষণ সঙ্ঘর্ষ হয়ে গেছে। সীমান্ত প্রশ্নের কোনও সুরাহা না হওয়ায় দ্বিতীয় সঙ্ঘর্ষের আশঙ্কায় উভয় পক্ষেই চলেছে ব্যাপক অস্ত্র-সজ্জা ও ব্যাপক সৈন্যসমাবেশ। ফলাফলের কথা ভেবে সকলেই উদ্বিগ্ন এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। অনেকেরই অভিমত, এত উচ্চ পর্ব্বতের উপর ঈদৃশ ব্যাপক সম্মুখ সংগ্রাম স্মরণীয় কালের মধ্যে পৃথিবীর কুত্রাপি আর হয়নি। সকলের কণ্ঠেই এক কথা—"ঘুমন্ত হিমালয় জেগে উঠেছে, দ্বিপক্ষের গোলা-গুলির আগ্নেয় দাহনে হিমবান্ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছেন, সহস্র সহস্র দেশভক্ত বীরের সুতপ্ত শোণিত-তর্পণে তুষার ধবল গিরিশৃঙ্গ তরুণ অরুণবৎ রক্তিম রূপ ধারণ করেছে।" এ সম্বন্ধে কারো দ্বিমত নেই যে, এ যুদ্ধ অভূতপূর্ব্ব। কিন্তু সত্যই কি তাই ?

হিমালয় যুদ্ধ প্রাচীন কালেও একাধিক বার হয়ে গেছে। ঋগ্বেদের যুগে শম্বরাসুর হিমালয়ে চল্লিশ বৎসর আত্মগোপন করেছিল। ইন্দ্র তাকে অনুসন্ধানপূর্ব্বক নিহত করেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তর-চরিতে ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ এবং দৈত্যাধিপতি শুম্ভ-নিশুম্ভের সহিত দেবী মহামায়ার যে একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তা এই হিমালয়-শিখরেই এবং আধুনিক চীন ও ভারতের সীমান্তেই। আমরা শেষোক্ত কাহিনীর কথাই বলবো। শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত দেবগণ বিষ্ণুমায়ার শরণাগত হলে জগজ্জননী ভক্তগণের ত্রাণ তথা দেবরাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্বয়ং সে যুদ্ধের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন।

বহু পুরাতন কথা। পুরাতন বিধায় একে কেহ ইতিহাস আর বলে না, পুরাণ-কথাই বলে। শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য ছিল। তাদের সাম্রাজ্যবাদী-সুলভ গর্ব্ব, ধৃষ্টতা, প্রভুত্বস্পৃহা তথা পররাজ্যগ্রাসের বিরামহীন স্পর্দ্ধা এতটাই দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল যে তারা অবশেষে ইন্দ্রের ত্রিলোকাধিপত্য এবং যজ্ঞভাগও হরণ করে। সূর্য্য, চন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণও নিষ্কৃতি পান নি। তৎকালে দেবতারা পরাজিত, নির্জ্জিত, রাজ্যহীন, বিতাড়িত, উদ্বাস্তু। চরম দুর্গতির সম্মুখীন হয়ে তাঁরা স্মরণ করলেন দুর্গতিহারিণী দুর্গাকেই। কেননা, দেবী প্রতিশ্রুতা—শরণাগত সন্তান স্মরণ করলেই আর্ত্তিহর্ত্রী আসবেন। দেবগণের আজ জাতীয়সঙ্কট। সুতরাং একক প্রচেষ্টা, একক আরাধনায় ফল হবে না। চাই—সংহতি ; চাই—ঐক্যবদ্ধ তপঃ ও আরাধনা। বিপর্য্যস্ত অমরবৃন্দ দুঃখ ও লাঞ্ছনার কশাঘাতে এ সত্যটী মর্ম্মে মর্ম্মে চূড়ান্তরূপে উপলব্ধি করেছেন। তাই আজ তাঁরা আর কোনও ভেদ-বৈষম্য রাখলেন না। সমবেদনার আবেগে দেবীর রাঙা চরণে সকলের প্রাণের আর্ত্তিকে সুসংহত করলেন। সুরগণ আজ "ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তি"। কেননা, এই মাতৃভক্তিবিমুখতাই তাঁদের পরাজয়ের কারণ। আজ বিশ্বজননীকে দেখলেন তাঁরা নূতন ভাবে, নূতন রূপে, নূতন স্তুতির আলোকে। বিশ্বজননীর মধ্যেই বিশ্ব-সংহতি। বুদ্ধি, জাতি, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, ক্ষুধা, নিদ্রা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, তুষ্টি, চিতি, মাতৃ, দয়াদি রূপে তিনি সর্ব্বভূতে, সর্ব্বঘটে। সর্ব্বাত্মিকা, সর্ব্বব্যাপিনী পরমেশ্বরীর এক অদ্বিতীয় স্বরূপের ধ্যানপূর্ব্বক তাঁর পদ-মকরন্দের উদ্দেশ্যে "নমস্তস্যৈ নমোনমঃ" মন্ত্রে পুনঃ পুনঃ প্রণতি জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে তাঁদের অদ্বৈতজ্ঞানপুষ্ট জাতীয় ঐক্যচেতনার ভিত্তিটি হলো সুদৃঢ় অভেদ্য। আজ তাঁদের কামনা এক, মন্ত্র এক, সাধনা এক, সিদ্ধি এক। সকল দ্বিধা জয়পূর্ব্বক সমবেত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দেবতারা প্রার্থনা

জানালেন—"হে কল্যাণি, হে পরমেশ্বরি, আমাদের মঙ্গল বিধান করুন এবং সমস্ত বিপদ বিনাশ করুন। উদ্ধত দৈত্যগণ কর্তৃক উৎপীড়িত হয়ে আপনাকে প্রণাম করছি।" হিমালয়ের প্রশ্নে আমরাও আজ উৎপীড়িত, বিপন্ন, বিপর্য্যস্ত। কিন্তু কই আমাদের মাতৃভক্তি? কই আমাদের অনন্য শরণাগতি? আমাদের কণ্ঠে কণ্ঠে সেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি কই? কই আমাদের ঐক্য ও সংহতি? পাশ্চাত্যের ধারকরা পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক মতবাদের কলকোলাহলে আমাদের প্রাণ-বীণার মোহন তারে এক মূর্চ্ছনা, এক তান, এক ভাষা, এক গান বাজে কই?

সুরগণের আকুল ক্রন্দনে শরণাগতপালিকার সিংহাসন টলেছে। সংহতির আবেদন যেখানে মূর্ত্ত, মহাশক্তিময়ী মহাদেবীর আবির্ভাব সেখানেই। অতীতে দেবশক্তির সমবায় থেকেই মহাপ্রকাশ ঘটেছিল মহিষমর্দ্দিনী মহালক্ষ্মীর। সেদিনও দেবগণ সংহতি শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। নিজ নিজ শক্তি, আয়ুধ, ঐশ্বর্য্য, আভরণ দিয়ে এক সিংহবাহিনী দেবীকেই তাঁরা বীর্য্যময়ী করেছেন। এই ত্যাগ, এই ঐক্য, এই মাতৃভক্তি ব্যর্থ হয় নি। মাতৃপ্রসাদে পুনরুদ্ধার করেছিলেন তাঁরা অমরাবতীর হৃত স্বাধীনতা। আজ সেই পুরাতন বিপদেরই পুনরাবৃত্তি। তাই দেবতারা জননীর শরণাগত। বিপন্ন সন্তানগণের আকৃতি মাতৃহৃদয়কে মথিত করেছে। আর ভয় নেই। অভয়া ডাক শুনেছেন। এবার দুঃখের অবসান। জয় সুনিশ্চিত। কেবল অস্ত্র ও বাহুবলেই যুদ্ধ জয় হয় না। চাই—আত্মিক বীর্য্য, চাই—নৈতিক বল, চাই—দেবীকৃপা। দেবতাদের তা লাভ হলো।

শুম্ভ-নিশুম্ভ ত্রিলোক-বিজয়ী। কিন্তু হিমালয়কে কদাপি তারা নিজ অধিকারে আনয়নে সমর্থ হয়নি। কেননা, হিমালয় যে উমা হৈমবতীর নিত্য অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। এখানে দৈত্যের দস্যুপনা চলেনা, চলবে না। এ স্থান সর্ব্বোপদ্রবশূন্য, সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। দেবতারা স্বর্গচ্যুত হয়ে তাই এ স্থানকেই আশ্রয় করেছেন। সত্যই তো মাতৃক্রোড়, মাতৃভুমি ভিন্ন শান্তিময়, সুখময়, নিরুপদ্রব আশ্রয় আর বিশ্বজগতে আছে কোথায়? হিমালয় সাম্রাজ্যপিপাসু দৈত্যদের নয়, হিমালয় দেবতাদের; যুগযুগান্তর ধরে দৈব সংস্কৃতিকে যারা বুকে করে আঁকড়ে রক্ষা করছে, হিমালয় তাদের। দেবতাত্মা হিমালয় ভারতীয় হিন্দুর মাতৃভূমি, তপোভূমি, তীর্থভূমি, চির শান্তির মধু নিকেতন; হিমালয়ই তাদের স্বর্গ, তাদের কৈলাস। এ অধিকার থেকে তাদিগকে বঞ্চিত করবে কে?

"আপনারা কার স্তব করছেন?"—জাহ্নবীর স্নিগ্ধোচ্ছল জলে স্নানাভিলাষিণী পার্ব্বতীর প্রাণ-তোষণ প্রশ্ন। হিমালয়ের এক ঊর্দ্ধচূড়ায় পুণ্যতোয়া জাহ্নবী। গোমুখীগুহা থেকে আট মাইল দূরে গঙ্গোত্রী। এখান থেকে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই গঙ্গার নাম জাহ্নবী। স্থানটী অধুনা চীনাধিকৃত তিব্বতের প্রায় সীমান্তে। যাক্, শুভ্র দেবী নিজে প্রশ্ন করে আবার নিজেই উত্তর দিলেন—"নিশুম্ভ কর্ত্তৃক পরাজিত এবং শুম্ভ কর্ত্তৃক স্বর্গ হতে বিতাড়িত দেবতারা সমবেত ভাবে আমারই স্তব করছেন।" সর্বান্তর্যামিনী দেবী দেবতাদের অভিপ্রায় নিজেই বুঝেছেন, তাই দেবগণকে আর কোনও উত্তর দিতে হলো না।

শুম্ভ নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ড ও মুণ্ড। দেবীর ইচ্ছাতেই যেন তারা সহসা সেই জনমানবহীন তুষার দেশে। ভুবনেশ্বরীর ভুবন-ভুলানো রূপ দেখ্‌লো, আর অমনি ছুটে গেল প্রভুদ্বয়ের সমীপে। বল্লে—"জগতের সকল রত্ন আপনারা বাহুবলে জয় করেছেন, আমরা আর এক অপূর্ব্ব রত্নের সন্ধান এনেছি, যাঁর কাছে সবই ম্লান। আসুন, দেখবেন আসুন, অপরূপ রূপের ভাস্বর দীপ্তিতে হিমাচল উদ্ভাসিত করে তিনি বিরাজমানা—এক তন্বী রামা, সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা। এঁকে আপনি এখনো কেন গ্রহণ করছেন না?" চণ্ডমুণ্ডের বার্ত্তায় হৈমবতীর সঙ্গে হিমালয়ের উপর নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার তাগিদ অনুভব করেছে দৈত্যবর শুম্ভ ও নিশুম্ভ। হৈমবতীকে পেলে হিমালয় আপনা থেকেই করায়ত্ত হবে। তাই হিমালয়ের নামটিও তারা করলো না বটে, কিন্তু হৈমবতীর উপর স্বামিত্ব লাভেই যত্নপর হলো।

আপোষে অভীষ্টলাভের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে দূত—নাম সুগ্রীব। মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে কপট শান্তিবাদের অন্তরালে দেবীকে কৌশলে বশীভূত করাই এ দৌত্যের উদ্দেশ্য। দূত বল্লে—"দেবি! ত্রিলোকের অধীশ্বর এক্ষণে শুম্ভ ও নিশুম্ভ। আপনি চলুন, উত্তরের

একজনকে পতিত্বে বরণ করুন, তাতে পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হবেন।" তাৎপর্য্য এই,—"অবলে, কেন পড়ে আছ একাকিনী এই তরুলতা তৃণ গুল্মহীন চিরতুহিনাবৃত গিরি-কন্দরে, যেখানে উপযুক্ত খাদ্য-পরিধেয়, ভূষণ-প্রসাধন কিছুই মিলে না? এ দারিদ্র্য-জ্বালা থেকে তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি মুক্তিদূত রূপে। তুমি এ প্রস্তাবে সম্মতি দাও, আত্মসমর্পণ কর, এ দুখের অবসান ঘটাও।" বাহিরে "হিন্দী-চীনী ভাই ভাই" এর উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে লাল চীনও চেয়েছিল তলে তলে সমগ্র হিমালয় অঞ্চল গ্রাস করতে। চৈনিক আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এমন হতভাগারও দেশে অভাব হয়নি, যাদের মুখে শুনা গেছে—"চীন ভারত দখল করতে চায় না, সে চায় দরিদ্র, নিরন্ন ভারতবাসীকে মুক্তি দান করতে; তারা আক্রমণকারী-রূপে আসে নি, আসছে মুক্তি ফৌজ হিসেবে।" সুখের বিষয়—মাতৃভক্ত ভারত-সন্তানেরা এ সব পাগলের প্রলাপে কর্ণপাত করে নি।

দূতের প্রস্তাবে জগদ্ধাত্রী মনে মনে হাসলেন। ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখায় মোহান্ধ দৈত্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল ঐশ্বর্য্য যাঁর চরণের ধূলি, তাঁকে কি বশীভূত করা যায় ঐ অঙ্গীকারে? দেবতারা ভক্তি দিয়ে, নতি দিয়ে যাঁকে আপন কল্যাণকারিণী জননীরূপে পেয়েছিল, শুম্ভ-নিশুম্ভ আসুরিক বুদ্ধিরবশে তাঁকেই পেতে চায় ঐশ্বর্য্য দিয়ে, শক্তি দিয়ে ভোগ-সঙ্গিনী রূপে! শক্তির গর্ব্ব হয়েছে? বেশ তো, তবে শক্তিরই পরিচয় দাও না কেন! এসো, যুদ্ধ কর, তুমি কতবড় শক্তিধর একবার দেখি। আমারো প্রতিজ্ঞা—যে আমাকে সংগ্রামে জয় করবে, যে আমার দর্প বিনাশ করবে, সে-ই হবে আমার পতি। যদি অতটা না পার, তবে শক্তিতে অন্ততঃ আমার সমান সমান হও, তাতেও চলবে। গম্ভীরকণ্ঠে দেবী শুনিয়ে দিলেন তাঁর বক্তব্য। দূত শু'নেই তো বিস্ময়াবিষ্ট। সে কি? কি বলছেন দেবি আপনি? ত্রিলোকে শুম্ভ-নিশুম্ভের সমকক্ষ পুরুষ কে আছে? সকল দেবতা একত্রিত হয়েও যাঁদের অগ্রে তিষ্ঠিতে পারেনি, তাঁদের সঙ্গে একাকিনী নারী হয়ে আপনি যুদ্ধ করবেন? বড় গর্ব্বিতা দেখ্‌ছি আপনি। শেষে কি কেশাকর্ষণে অপমানিতা হবেন?—ভয় দেখালে দূত। কিন্তু দেবী অবিচলিতা, বল্লেন—"যাও, তোমার প্রভুদের কাছে যাও। গিয়ে সব বল, তারা যা ভাল বুঝবে, করবে।

কামনা প্রতিহত হলে উপস্থিত হয় ক্রোধ। সহজে দেবীকে লাভ করার আশা নেই দেখে শুম্ভ-নিশুম্ভও অতিশয় ক্রোধান্বিত। সেনাপতি ধূম্রলোচনকে পাঠালে ষষ্টিসহস্র সৈন্যসহ। জবরদস্ত হুকুম—"সেই দুষ্টাকে কেশাকর্ষণ করে নিয়ে আসবে। দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব যে তাকে রক্ষা করতে আসবে, তাকে নির্ব্বিচারে বধ করবে।" একটা নিরস্ত্রা নারীকে ধরবার জন্য ষাট হাজার পাইক। প্রথম থেকে সংখ্যা গরিষ্ঠতার চাপ সৃষ্টি। তুহিনাচলসংস্থিতা চণ্ডীকে দেখে ধূম্রলোচনও দৈত্য-রাজের কঠোর আদেশ তাঁকে জানিয়ে দিলে। প্রীতিপূর্ব্বক না গেলে চুলেরমুঠি ধরে নিয়ে যাওয়া হবে, তাও বলে রাখলো। দেবী একাকিনী, নিরস্ত্রা, অপ্রস্তুত, তাতে নারী; আর ধূম্রলোচন নিজে বলবান, দৈত্যেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত, বহু সৈন্য পরিবৃত। সুতরাং দেবী অসহায়তার ভাণ করলেন, বল্লেন—"তা যদি জোর করেই আমাকে নিয়ে যাও, তবে অবলা নারী আমি কি করতে পারি?" ক্রুদ্ধ ধূম্রলোচন বলপূর্ব্বক দেবীকে আকর্ষণ করতে উদ্যত—নাদময়ীর বিশ্ব-প্রকম্পী হুঙ্কারেই সে ভস্মীভূত হলো। অবশিষ্ট সৈন্যেরা মরলো দেবীর সিংহের শাণিত নখ-দংষ্ট্রা ঘাতে।

প্রথম আঘাত খেয়েই দৈত্যেন্দ্রের টনক্ নড়েছে। সে বুঝেছে—দেবী সহজ পাত্রী নন। ধমক খেয়েই যার প্লীহা বিদীর্ণ হয়ে যায় এমন দুর্ব্বলচেতা, কাপুরুষ সেনা-পতির দ্বারা দেবীকে ধরা যাবে না। চাই—যোগ্যতর নেতা, সাহসী বীর। ডাক পড়লো চণ্ডমুণ্ডের। ক্রোধ-কম্পিতাধরে দৈত্যরাজ বল্লে—"যাও, দেবীকে জীবিতা বা মৃতা যে কোন অবস্থায় বেঁধে আনা চাই।" ধূম্র-লোচনের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল ষাট্ হাজার পুলিশ, চণ্ড-মুণ্ডের সঙ্গে দেওয়া হলো, উদ্যতায়ুধ চতুরঙ্গ সেনা। যুদ্ধটা সর্ব্বাত্মক হয়ে দাঁড়ালো। ঘুমন্ত হিমালয় জেগে উঠ্‌লো।

অলঙ্ঘ্যবীর্য্যা দেবী। তিনি বুঝেছেন—এবার আর শুধু হুঙ্কারে চল্‌বে না। কেবল ভীতি-প্রদর্শন, বাগাড়ম্বর আর গলার জোরে সকল যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না। যুদ্ধটা যখন ভাল করেই বেধে উঠ্‌লো, তখন যেমন কুকুর তেমনি

মুগুর হানতে হবে। উলঙ্গ আক্রমণের বিরুদ্ধে চাই উলঙ্গ প্রতিরোধ—নিষ্ঠুরতার বিনিময়ে চরম নিষ্ঠুরতা। দেবী তজ্জন্য প্রস্তুত। দৈত্যরণে তিনি চির-বিজয়িনী। অপূর্ব্ব তাঁর বৈরীবিনাশ-যজ্ঞ, অত্যদ্ভুত তাঁর সৈনাপত্য, লোকাতীত তাঁর ভুজবীর্য্য, বিপুল তাঁর আয়োজন। তাঁর রক্তপিপাসাও ভয়ানক।

ক্রুদ্ধা অম্বিকা। তাঁর ভ্রূকুটীকুটিল ললাটফলক হতে আবির্ভূতা হলেন পাশ খড়্গধারিণী, নৃমুণ্ডমালিনী, ঘোর-নয়না, অতি বিস্তারবদনা, জিহ্বাললন-ভীষণা, করালিনী কালী। কালী—কালের নিয়ন্ত্রী, জীবগণের পরিণাম-প্রদায়িনী, সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপা, প্রলয়াত্মিকা। দেবীর এ সংশপ্তক মূর্ত্তি। এঁর চিত্তে কৃপা নেই, আছে কেবল সমর নিষ্ঠুরতা। নারী হলেও নারী-সুলভ স্নেহ কোমলতা এঁতে নেই। ইনি অতি ভৈরবা; এঁর দেহমাংস শুষ্ক—লৌহ সদৃশ কঠিন। রণজয়ী সৈনিকের আদর্শ এই রণপ্রিয়া, মৃত্যুময়ী কালী। সত্যই যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দয়া, অহিংসা, উদারতা, বিশ্বপ্রেমের ন্যাকামি চলে না, নারীজনোচিত স্নেহ কোমলতাও শোভা পায় না, তোষামোদের দ্বারা আপোষের ক্লৈব্যোচিত প্রচেষ্টাও ফলবতী হয় না। সংশপ্তক হয়েই সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। অম্বিকা আত্মসত্তা থেকে কালীকে সৃজন করে সে শিক্ষাই আমা-দিগকে দান করলেন।

চণ্ডমুণ্ডের সঙ্গে কালীর মহাযুদ্ধ। ভীমনাদিনী কালী ক্রোধে ভয়ঙ্কর অট্টহাস্য করলেন। তাঁর করাল বদনের দুর্দ্ধর্ষ দন্ত সমূহের প্রভায় তিনি তেজোদীপ্তা হয়ে উঠেছেন। এক হস্তে তিনি শক্ত করে ধরেছেন তাঁর সুশাণিত খড়্গ, অন্য হস্তে রথ, অশ্ব, হস্তী, সারথি ও বিপক্ষ নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-শস্ত্রসহ সহস্র সহস্র অসুর সেনাকে বিস্তৃত মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করিয়ে কড়্মড়্ করে চিবিয়ে খাচ্ছেন—কেহবা খড়্গা-ঘাতে, কেহবা পদপীড়নে, কেহবা দেবীর দন্তাগ্রে পিষ্ট হয়ে গতায়ু। সর্ব্বশেষে চণ্ডমুণ্ডের শিরদ্বয় নিয়ে কালী মহাদেবী চণ্ডিকার চরণে উপহার প্রদান করলেন। তখন থেকে কালী প্রসিদ্ধা হলেন চামুণ্ডা নামে। "চণ্ড" গেছে, আবার "চৌ"এর আবির্ভাব ঘটেছে; "মুণ্ড"ও নেই, কিন্তু হিমালয়ের উপর "মাং সেতুং"এর লুব্ধ দৃষ্টি। নামগুলির মধ্যে পরস্পর শাব্দিক ঐক্য আছে। হিমালয় রক্ষা করতে হলে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আজ চামুণ্ডার বীর্য্যে গড়ে তুলতে হবে।

দ্বিতীয় আঘাত খেয়ে নিজশক্তি সম্বন্ধে ভ্রান্তবিশ্বাসী দৈত্যনৃপতির অধিকতর চৈতন্যের জাগরণ হয়েছে। এতক্ষণে সে বুঝেছে, তার নিজের সামর্থ্য পর্য্যাপ্ত নয়। সুতরাং দল গঠনের প্রয়োজন। শুম্ভনিশুম্ভ আমন্ত্রণ পাঠালো পৃথিবীর দিকে দিকে—যেখানে যত দৈত্য দলপতি ছিল তাদের কাছে। সাড়া পাওয়া গেল অভূতপূর্ব্ব। উদায়ুধ বংশের ছিয়াশি জন, কম্বুবংশের চুরাশিজন, কোটি-বীর্য্য বংশের পঞ্চাশ জন, ধূম্র বংশের একশত জন সেনাপতি স্ব স্ব বিরাট বাহিনী নিয়ে দৈত্যরাজের সহায়তায় এলো। কালক, দৌহৃর্দ, মৌর্য্য, কালকেয় নামক অসুরেরাও অবশিষ্ট রইলো না। শুম্ভ নিশুম্ভকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর সকল দৈত্য হিমালয় শিখরে এসে যুদ্ধার্থে ব্যূহ রচনা করলো।

এদিকে অমরবৃন্দও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নেই। প্রতি-রক্ষার জন্য তাঁরাও দেবীকে সাহায্যার্থে অগ্রসর। শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভাষায়—

ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণূনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ।

শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্মা, শিব, কার্ত্তিকেয়, বিষ্ণু, দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ নিজ নিজ শক্তি—অর্থাৎ, ধন-জন, বাহন, যান, অস্ত্রশস্ত্র—সর্ব্বস্ব নিয়ে দেবীর পার্শ্বে এসে দাঁড়ালেন। দেবীর আরাধনার ভিতর দিয়ে একদা যে অখণ্ড সংহতির মন্ত্র তাঁরা শিখেছিলেন, এক্ষণে তা কার্য্যে প্রকাশের সময় উপস্থিত। যে শুদ্ধা মাতৃভক্তি তাঁদের দেবচিত্তে জেগে-ছিল, সে মাতৃপূজায় অদ্য শোণিতাক্ত প্রাণবলিদানের আহ্বান। তেত্রিশ কোটী দেবতা সে আহ্বানে সাড়া দিলেন। জাতীয়সঙ্কটের দিনে এমনটিই করা চাই। সর্ব্বস্ব পণেও প্রতিরক্ষার শক্তিকে সুদৃঢ় করতে হয়। বহু সহস্র বৎসর পর হিমালয় থেকে আবার ডাক এসেছে। দেবজাতির বংশধর আমরা সে আহ্বানে কি সাড়া দিব না?

দেব ও দানব দু'টী পক্ষই সুসংহত, সুসংগঠিত, প্রস্তুত। হিমগিরির তুঙ্গ শিখরে তরলতরঙ্গা জাহ্নবীর উপকূলে যে রণ-তাণ্ডবের সূত্রপাত হয়েছিল, তা এক্ষণে বিশ্বযুদ্ধের

দারুণ লোকক্ষয়ী বিভীষিকা নিয়ে আবির্ভূত। এমন ভয়ানক যুদ্ধ হিমালয়ে আর কদাপি হয় নি। অগণিত সেনানীর শিবিরে শিবিরে বুঝি নগরাজের শুভ্র কিরীট ঢাকা পড়ে গেছে। দেবী আজি আর একাকিনী নন; তিনি এবে বহুবলশালিনী; ত্রয়স্ত্রিংশ কোটী কণ্ঠে তাঁর কল কল নিনাদ; ষট্‌ষষ্টি কোটি ভুজে তাঁর চক্র, পাশুপত. শক্তি, বজ্রাদি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণঘাতী মারণাস্ত্র। যুদ্ধ হবেই, দেবতাদের জয়ও হবে, কারণ স্বয়ং জয়দা দেবগণের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন। তথাপি মঙ্গলময়ী দৈত্যরাজের সমীপে শান্তির দূত পাঠালেন। দৈত্যের উদ্দেশ্য আপোষ আলোচনার দ্বারা তুমিও কিছু নাও, আমিও কিছু নিই, এরূপ নয়। দেবীর শান্তিপ্রস্তাবের সর্ত্ত বড় কঠিন। তিনি বলে পাঠালেন—"যা বলপূর্ব্বক অপহরণ করেছ সব ছেড়ে দাও। ইন্দ্র তাঁর ত্রিলোকাধিকার এবং দেবগণ তাঁদের যজ্ঞভাগ পুনঃ লাভ করুন। আর এক কথা, তোমরা যুদ্ধোন্মত্ত, তোমরা ক্ষমার যোগ্য নও। সুতরাং যদি জীবনের সাধ থাকে, তবে পাতালে পলায়ন কর। আর যদি বলগর্ব্বে যুদ্ধই করতে চাও, তবে এসো, আমার শিবাগণ তোমাদের মাংস ভক্ষণ করে তৃপ্ত হোক।" অহঙ্কারদৃপ্ত অসুরেন্দ্র যুদ্ধই বেছে নিল। জঙ্গীবাদীরা কোনদিন শান্তিপ্রস্তাব গ্রাহ্য করে না, কোন আপোষ বা মধ্যস্থতা মানেনা, পঞ্চশীলকে পঞ্চশূলে রূপান্তরিত করে চরম বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় তা তারা শান্তিকামীদের উপরই পুনঃ প্রয়োগ করে থাকে।

শোণিতকর্দ্দমাক্ত মৃত্যু মহাযজ্ঞ। ঘুমন্ত হিমালয় কেবল জেগেছে তা নয়, সে যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। রণ-রঙ্গিণী-চণ্ডিকা তথা মাতৃগণের প্রচণ্ড আয়ুধাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও ছিন্নভিন্ন হয়ে অসুরবাহিনীর মধ্যে কেহ বা হত, কেহ নিহত, কেহ ভূপাতিত, কেহ কেহ বা পলায়নপর। হত বা নিহত দৈত্য-রক্তের প্রবাহিত-স্রোতে বুঝি হিমালয় কন্দর থেকে আর একটা কলম্বিনী তরঙ্গিনীর সৃষ্টি হলো। পরাজিত দৈত্যগণের মধ্যে যে হতাশা ও বিশৃঙ্খলার ছায়াপাত হয়েছে, তা নিরাকরণের জন্য এগিয়ে এলো উগ্রকর্ম্মা রক্তবীজ। এর প্রতিবিন্দু রক্ত থেকে তারই সদৃশ বলবান্ এক একটী অসুরের উৎপত্তি। চণ্ডিকা এবং মাতৃগণের শস্ত্রাঘাতে যতই সে রক্তাক্ত হয়, ততই অসুরের সংখ্যা বেড়ে যায়। রক্তোদ্ভব সে সব অসুর দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। তাৎপর্য্য এই, বিপক্ষের সৈন্যসংখ্যা এতই অধিক যে. একজনকে ভূতলশায়ী করলে শত শত এসে তার শূন্য স্থান পূরণ করে। সংখ্যা-গরিষ্ঠতার বিপুল চাপ সৃষ্টি করে যুদ্ধজয়ের কৌশল সাম্প্রতিক হিমালয়-যুদ্ধেও আমরা দেখেছি।

চণ্ডমুণ্ডের যুদ্ধে যেমন, রক্তবীজের যুদ্ধেও তেমনি ঘোররূপা চামুণ্ডা শক্তিরই পুনরাহ্বান। "চামুণ্ডে, বিস্তরং বদনং কুরু"—দেবীর এই আদেশ বাক্য শিরোধার্য্য পূর্ব্বক কালী তাঁর করালমুখ ব্যাদান করলেন। চণ্ডমুণ্ডের যুদ্ধে চামুণ্ডার ভূরিভোজন হয়েছিল, কিন্তু তাঁর পানক্রিয়াটি হয়নি। ঝলকে ঝলকে রক্তবীজের রক্তপান করে তাঁর সে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হলো। চামুণ্ডার দেখাদেখি অন্যান্য মাতৃগণও রক্তপানে উন্মত্ত হয়ে তাথৈ তাথৈ নৃত্য করলেন। নীরক্ত রক্তবীজ অতঃপর চণ্ডিকার শূলাদির আঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে ভূপাতিত হলো। ভারতীয় সন্তান আমরা চামুণ্ডার উপাসক। সত্যই যদি হিমালয়ে রক্তবীজের পুনরাবির্ভাব ঘটে, তবে আমাদের দেশভক্ত জওয়ানদের পিপাসু বেয়নেট যেন এমনিভাবেই তাদের শোণিত পানে উল্লসিত হয়।

রক্তবীজ গেল, নিশুম্ভেরও পতন ঘটলো। রইলো শুম্ভ একক। হাঁ, আজ সে একা, নিঃসহায়, নির্ব্বল। তবু কিন্তু অহংটা নির্ম্মূল হয়নি। দেবীকে লাভ করবার সাত্ত্বিক বাসনা তার অন্তর জুড়ে বাসা বেঁধে আছে। তামসিক ও রাজসিক অহঙ্কার অপেক্ষা সাত্ত্বিক অহঙ্কার ভাল। কিন্তু অন্তিমে এই সাত্ত্বিক অহঙ্কার এবং সাত্ত্বিক বাসনাও ত্যাগ করতে হয়, নতুবা সেই পরমার অদ্বয় সত্তার সঙ্গে মিলন ঘটা সম্ভবপর নয়। তাই তো শুম্ভের এই সাধন-সমর। সাত্ত্বিক অহঙ্কারের সোনার শিকলটা ছিন্ন করার জন্য, জীবভাবের বিনাশের জন্য, দ্বৈতভাবের খণ্ডনের জন্য তার অক্লান্ত রণশ্রম। সাধনা-পূর্ণ হয়েছে। তাই দেবী এবার স্বরূপে ধরা দিলেন।

শুম্ভ বল্লে—"বলগর্ব্বিতে দেবি! তুমি গর্ব্ব করো না; কেননা, তুমি অন্যের বল আশ্রয় করে যুদ্ধ করছো।" যিনি সকলের আধার বা আশ্রয়-স্বরূপা, তিনি আবার কার বল আশ্রয় করবেন? শুম্ভের বুদ্ধি দ্বৈতভাবে আচ্ছন্ন,

তাই সে দেবীকে বহুরূপে দেখছে; সাত্ত্বিক অহঙ্কারের আবরণ কাটেনি, তাই সে জানে না যে দেবী একা এবং অদ্বিতীয়া। এই অবিদ্যাই তো তার আসুরিকতার কারণ, তার সকল দুর্ভোগের মূল। মোক্ষদা শুম্ভের এই চিত্তভ্রম ঘুচিয়ে দিয়ে বল্লেন—"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।"—জগতে আমি একাই আছি, আমি ভিন্ন দ্বিতীয় আর কে আছে? বলেই দেবী নিজবিভূতি ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী আদি মাতৃগণকে নিজ মধ্যে আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বয়ং অদ্বৈতভাবময়ী হয়ে একাই বিরাজ করতে লাগলেন। দৈত্যরাজ তা প্রত্যক্ষ করলো। এত দিনে তার বাসনার নিবৃত্তি। লালসাময় ভোক্তৃভোগ্যভাবটি অর্থাৎ দ্বৈতবুদ্ধিটি তার বিনষ্ট। দেবীর তীক্ষ্ণাগ্র শূলাঘাতে তার জীবভাবেরও অবসান। ইহাই শুম্ভবধ। অসুর নিহত হলে নিখিল জগৎ প্রসন্ন ও সুস্থির—যজ্ঞাদি নির্ব্বিঘ্ন, দেবগণ হর্ষোৎফুল্ল, গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীতরত, অপ্সরাবৃন্দ নৃত্যপরায়ণা, নদীর কুলুতানে মধুরিমা, মৃদুমন্দ সমীরণ-প্রবাহে অনুকূল সুখ-স্পর্শতা। সাধনার সিদ্ধিতে ভিতরের আসুরিক বৃত্তির নিরাকরণ হলে মহাদেবীর অদ্বৈতপ্রসাদে সাধকের সকল দুঃখের অবসান ঘটে। তখন সমগ্র বিশ্বই তাঁর কাছে আনন্দময়ীর আনন্দ নিকেতন।

দেবীর শুম্ভনিশুম্ভ-বধলীলায় আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দ্বিবিধ ভাবেরই প্রকাশ সুস্পষ্ট।

অপেক্ষা

হাসিরাশি দেবী

তুমিতো জানাতে পারো—আরও কত কাল
বোশেখের রোদে পুড়ে এ মনের মাটি হবে লাল
টক্‌টকে রং!
তুমি তো বোঝাতে পারো সহজে বরং
এই যে গুমোট ভরা থম্‌থমে দিন—
অকস্মাৎ এ হবে বিলীন
কোন ছায়াচ্ছন্নতায়! হয়তো বা আর তারও পর
হঠাৎ আসতে পারে ঘূর্ণিঝড়
প্রচণ্ড বেগে! দুপাশের কাঁটাগাছ গুলো—
উপড়ে আছড়ে ফেলে ছড়াবে সে মুঠো মুঠো ধুলো!

হয়তো এ আমারই কল্পনা।
একা ব'সে ব'সে শুধু ভাবনার ঘন জাল বোনা,
যার নেই সুরু,—শেষ,—কিছু নেই যার,—
সে জালের মাঝখানে বাসঘর গড়েছি আমার
নিজেরে কুড়িয়ে নিয়ে,—নিজেরে গুটিয়ে নিয়ে তাই
এতবড় দিন শুধু নীরবে কাটাতে—একেলাই।

আকাশে তো আজ মেঘ নেই!
এদিকে ওদিকে তাত,—শুধু তাত,—বাতাস তাতেই
চমকিয়ে চলে গেল—একবার শুধু থমকেই।

তুমি তো ব'লতে পারো,—পৃথিবীটা কেঁপে
জঠরের ক্ষুধানলে গ্রাস ক'রে নেবে
কি না বহুদিনকার—
জমানো ভাঁড়ার!
আজ ঐ ছড়ানো আকাশ—
মুঠোয় যাবেনা ধরা?—একথা বিশ্বাস
করে নেব! ভেবে নেব, বুঝি—
যেমন চ'লেছে দিন,—তাই যাবে; শুধু খোঁজাখুঁজি—
কেন! যে শেকড় মাটির ভেতরে
জীবনের রস পান করে,—
তার খুঁৎ নিয়ে,—
কী হবে ফেনিয়ে?

তবু তুমি পারো ব'লে দিতে,—
কখন আসবে রাত কোন সপ্তর্ষিতে
লিখে নিয়ে প্রাণমন্ত্র! কোন শুকতারা
শেষ-যাত্রা-পথে দেবে সতর্ক পাহারা—
তুমি তা ব'লতে পারো; কিন্তু কী দ্বিধায়
থেমে যায়
তোমার গলার স্বর: যেন মনে হয়,—
যা চেয়েছ ব'লে যেতে,—সে বলায় হয়নি সময়।

আকাশ জলছে—মাটি জলছে—

দাউ দাউ বোশেখের রোদ্দুরের আঁচে ঝলসাচ্ছে পথের ধারের গাছপালাগুলো। পায়ের তলার পথটা তেতে আগুন হয়ে হাঁপাচ্ছে—আছড়াচ্ছে আধপোড়া সাপের মত।

আর সেই সঙ্গে জলছে পুড়ছে ময়নার মন। শুধু মন নয়, যেন ওর সর্বাঙ্গের জলুনিটা কেন্দ্রীভূত হয়ে ওর দুটো উৎসুক চোখের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। যেন একটা নিষ্ঠুর প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বারোয়ারী পাম্প-কলটার আশেপাশে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ভাঙ্গাচোরা উদ্বাস্তু কলোনীর এবড়ো-খেবড়ো মাঠ পেরিয়ে ময়নাদের বাড়ির সব চেয়ে কাছের টিউব ওয়েলটা

পেরিয়ে এখানে জল নিতে আসবার সময় ভাবন জানলায় দাঁড়িয়ে ওকে ডাক দিয়ে ছিল, "হ্যাঁলা ময়না, এই ভর দুপুরে একমাথা রোদ্দুর নিয়ে চললি কোন চুলোয় ?"

একরাশ বিরক্তি গলায় ঢেলে ময়না ঝঙ্কার দিয়েছিল, "সিনেমায়। চোখের মাথা খেয়েছিস্ ? কলসী কাঁকে ভর দুপুরে লোকে কোন চুলোয় যায়, তাও জানিস না বুঝি ভাবন ?"

ভাবন তার উত্তরে মুখটিপে হেসে, চোখে গভীর ইঙ্গিত ভরে প্রশ্ন করেছিল, "তোর বাড়ির কাছের কলটায় বুঝি তোর তেষ্টা মেটানোর মত জল নেই—নারে ময়না ?

রোদ্দুরে না রাগে কে জানে, টকটকে লাল হয়ে ময়না জবাব দিয়েছিল, "ওর হ্যাণ্ডেলটা বড় কড়া। আর আমার হাতে বড় ব্যথা—"

"হাতে নয় ময়না। ব্যথা তোর বুকের মধ্যে।"

কথাটা বলেই একছুটে জানলা থেকে পালিয়ে ঘরের মধ্যে সরে গিয়েছিল ভাবন। দাঁড়িয়ে থাকার সাহস আর ছিলনা তার।

মুখরা ময়নার মুখ এ কলোনীর সবাই চেনে।

অথচ কথাটা মিথ্যে বলেনি ভাবন।

ঠিক এই নির্জন সময়টায়, বাড়ি থেকে বেশ একটু দূরে এই কলটায় জল নিতে আসতে অনেকটা হাঁটতে হয়। চড়চড়ে রোদ মাথায় লাগে। অনেকটা কাজের সময় নষ্ট হয়। আর অনেক গঞ্জনা শুনতে হয় বুড়ী ঠাকুমার কাছে।

তবু না এসে পারেনা ময়না।

এই পথটা ছাড়া গোবিন্দ মুদীর বাড়ি ফেরার আর কোন রাস্তাই নেই।

আর ময়নার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানো গোবিন্দকে ধরতে হলে এতটা রোদ্দুরে, এই ভর-দুপুরে এতটা রাস্তা হেঁটে, বাড়ির কাছের কলের জল ফেলে ময়নার এখানে আসা ছাড়া আর কি উপায়টা আছে ?

গোবিন্দর মন যে আর ময়নাতে নেই, গোবিন্দ যে বদলে যাচ্ছে, বেশ কিছুদিন ধরেই একথাটা মনে প্রাণে অনুভব করছে ময়না। গোবিন্দর দৃষ্টির সেই পুলক বিহ্বলতা, উত্তপ্ত মাদকতা নিস্তেজ হয়ে গেছে। ময়নার রক্তে রক্তে আগুন ধরিয়ে দেওয়া প্রমত্ততা ঝিমিয়ে পড়েছে। আগে আগে সুযোগ পেলেই যার আদরে সোহাগে বিমনা হয়ে পড়ত ময়না, সে আজ মুখ ফিরিয়ে চলে যায় - দেখা হলেই।

একটা মাংসলোভী ক্ষুধিত হিংস্র জানোয়ারকে কে যেন আফিং খাইয়ে ঝিম ধরিয়ে দিয়েছে।

অথচ ময়না, সেই আগেকার মতই আছে। ময়না তার বাইশ বছরের ভরন্ত-পুরন্ত দেহ নিয়ে, এক শরীর উন্মাদ যৌবন নিয়ে, রূপ নিয়ে, ঠিক একই ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে গোবিন্দর সামনে।

* * * *

দুম্ করে কলসীটা কলের সামনে পাতা ইঁটগুলোর উপর বসায় ময়না। ঠং করে একটা ধাতব শব্দ হয়। পেতলের কলসীর তলায় অনেকগুলো টোলের পাশে আর একটা নতুন টোল পড়ে। ময়নার রাগের চিহ্নের মত।

হ্যাচাং হ্যাচাং করে পাম্প করে ময়না। সঙ্গে সঙ্গে এদিক ওদিক তাকায়। আঁজলা আঁজলা জল নিয়ে ছিটোয় চোখে মুখে কপালে গলায়। জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে ওর বুকের কাপড় ভিজে ওঠে।

বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হয় না। গোবিন্দ মুদীর শাল-গাছের মত লম্বাচওড়া বিশাল শরীরটা দেখতে পাওয়া যায় গাছপালার আড়ালে পথের বাঁকে। আর ময়নাকে এ ভাবে এই নির্জন কলের কাছে দেখে আসন্ন একটা দুর্যোগের সম্ভাবনায় গোবিন্দর বুকের মধ্যে ধড়-ফড় করে ওঠে।

কোমরে হাত দিয়ে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে ময়না মুখো-মুখি দাঁড়ায় গোবিন্দর। চোখভরা উৎকট ঝাঁজ আর গলাভরা আক্রোশের আগুন ঝরিয়ে প্রশ্ন করে।

"চাঁপিকে সোহাগ করে চাঁপাফুল রংএর বেগমবাহার ডুরে তুমিই কিনে দিয়েছ বুঝি ?"

"আ আমি।" গলা শুকনো। মুখ শুকনো। সমস্ত চেহারায়, চোখে মুখে অপরাধের ভাব! তবু মুখে জোর ফলায় গোবিন্দ। "আমি! আমি কেন শাড়ি দিতে যাবো—কে বলেছে ? কোন শালা ? মি—মিথ্যে কথা।"

সত্য মিথ্যা বুঝতে দেরী হয়না ময়নার। ঈর্ষার আগুন ঝিলিক মারে ওর দুচোখে। "থামো। মিথ্যুক কোথাকার।

বদনতলার হাটে নেত্য তোমাকে নিজের হাতে ঐ শাড়ি কিনতে দেখেছে। ক্ষীরো স্বচক্ষে দেখেছে সন্ধ্যাবেলায় তুমি চাঁপিকে ঐ শাড়ি দিয়ে এসেছ। তুমি মনে কর আমি কিছু টের পাই না, না? আমি কচি খুকী? বানিয়ে বানিয়ে—বলছি তোমার নামে?"

বঙ্কিম ঠোঁট দুটো যেন ঘেন্নায় কুঁকড়ে গেল। উদ্ধত অপলক চোখের আগুনে অপরাধীকে যেন পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চাইল ময়না।

আর সেই আগুনের উত্তাপে ছিপছিপে তন্বী একটি মেয়ের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে বিশাল বিরাট শরীর গোবিন্দ যেন একেবারেই ছাই হয়ে গেল।

তবু শেষ চেষ্টা করার মত নির্জীব মিনমিনে গলায় বলল, "আ—আমার কী দোষ! বৌদি অনেক করে বলেছিল তাই। যদি দিয়েই থাকি, অত রাগ করার কি আছে? আত্মীয়-কুটুম, বৌদির বোন, সম্পর্কও তো আছে একটা। ছেলেমানুষ—"

"বৌদির বোন! আত্মীয়-কুটুম! ছেলেমানুষ—"

হঠাৎ আঘাত পাওয়া ফণিনীর মত ফণা তুলে ফোঁস করে উঠল ময়না। "ঐ তো ছুঁড়ির রূপ! ওতেই মাথাটা ঘুরে গেছে? নেমকহারাম বেইমান পুরুষ কোথাকার। স্বভাব যায়না মলে, ইল্লৎ যায়না ধুলে। তোমার হাড় হদ্দ আমি চিনি না, না? আজ তোমায় নতুন দেখছি, না? পরীর সঙ্গে কদ্দুর গড়িয়েছিলে, সব ভুলে গেছি, না?"

ওস্তাদ সাপুড়ের হাতে ধূলোপড়া সাপের মত একেবারে মিইয়ে যায় গোবিন্দ। কোনমতে হাত কচলে চিঁচিঁ করে বলে, "তুই বড্ড বদরাগী ময়না। না হয় একটা শাড়ি বৌদির ফরমাস মত কিনেই দিয়েছি চাঁপাকে, তার মধ্যে গড়াগড়ির তুই কী দেখলি? আমি—আমি—মানে তোকে ছাড়া আমি অন্য কোন মেয়ে মানুষকে—"

"থাক থাক।" আবার ঝলসে উঠল ময়না। "ফের মিথ্যে কথা। নির্লজ্জ বেহায়া মিনসে কোথাকার। অত সহজে ময়নাকে ভোলানো যায়না, বুঝলে? এই শেষ বারের মত তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ফের যদি কোন রকম বেচাল দেখি, তোমার একদিন কি আমার একদিন। আঁশবঁটি দিয়ে টুকরো টুকরো করে তোমায় কেটে নিশ্চিন্ত হব আমি। তারপর ফাঁসী যেতে হয়, যাবো। ভুলে যেওনা, আমি পঞ্চানন মণ্ডলের নাতনী! বুঝলে?"

মস্ত বড় জলভর্ত্তি ভারী কলসীটা অতি অবলীলায় কাঁকালে তুলে নিয়ে ময়না মুখ ঘুরিয়ে বাড়ি মুখো পা বাড়ালো। জলন্ত সূর্যের আলোয় মাজা চকচকে পেতলের কলসীটার উপর পড়ে যে ঝকমকানি তুলল, তারি ঝলক ছড়িয়ে পড়ল খয়েরী রংএর ডুরে শাড়ি জড়ানো ময়নার দেহ তরঙ্গের আঁকে বাঁকে।

স্তম্ভিত বিস্ফারিত গোবিন্দর চোখের সমুখ দিয়ে যেন একটা বাঘিনী দর্পিত পদক্ষেপে তার আয়ত্তাধীন শিকারটিকে আহত পঙ্গু করে ফেলে রেখে ফিরে গেল নিজের ডেরায়।

পা বাড়াল গোবিন্দও।

মাথার উপর চড়চড়ে রোদ—মাথা জ্বলছে। গা জ্বলছে। গোবিন্দর লুপ্ত সাহস ফিরে আসছে একটু একটু করে। ক্রমশই ও উত্তেজিত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে। পায়ের সামনে একটা ইটের টুকরোকে সজোরে পদাঘাত করে সরিয়ে দিয়ে গায়ের জ্বালা মেটাতে চাইল। কিন্তু কোন ফল হলনা।

এ কী অন্যায় ময়নার? গোবিন্দ—নিরীহ শান্তিপ্রিয় গোবিন্দর উপর তার এ কি অত্যাচার?

এমন ভাব দেখায়, ময়না যেন গোবিন্দর বিয়েকরা সাতকেলে পরিবার। গোবিন্দকে ও তার আচলে বেঁধে একেবারে দাসখত লিখিয়ে নিয়ে কেনা গোলাম করে রেখেছে।

বাড়ির দিকে যতই এগোতে লাগল, গোবিন্দর মাথার মধ্যে ততই অসন্তোষের বারুদগুলো ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চাইল। নিজের গালে নিজেই ঠাস্ করে একটা চড় কষিয়ে দিতে ইচ্ছে হল।

আর সেই বা কি রকম পুরুষমানুষ!

এত বড় একটা বিরাট শক্ত সমর্থ জোয়ান পুরুষ হয়ে একটা অল্পবয়সী রোগাপটকা মুখসর্বস্ব মেয়েমানুষের ভয়ে অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছে? ও কি—একটা নাচের পুতুল যে ময়নার হাতের অদৃশ্য সুতোর ইঙ্গিতে উঠবে বসবে চলবে ফিরবে। হাসবে কাঁদবে ভালবাসবে?

এতটুকু 'এদিক ওদিক' হবার জো নেই গোবিন্দর। দজ্জাল ঝগড়াটে খাণ্ডার মেয়েটা ঠিক খবর পাবে? তার পরই শুরু করবে।

গোবিন্দ ওর মেছোবন্ধু সুবলের কাছে অক্টোপাশ বলে একটা অদ্ভুত সামুদ্রিক প্রাণীর নাম শুনেছিল। একবার তার আলিঙ্গনের মধ্যে গেলে আর কোনমতেই নাকি ছাড়ানো যায়না তার মর্মান্তিক বন্ধন। ময়না যেন ওকে ঠিক তেমন ভাবেই বেঁধে রেখেছে। মুক্তি নেই—কোনমতেই মুক্তি নেই ঐ ভয়ঙ্করী রাহুর গ্রাস থেকে!

এক কলোনীর মধ্যে এ পাড়া ও পাড়ায় বাড়ি। ছেলেবেলা থেকে মেলামেশা খেলাধুলো। উঠতি বয়সে পীরিতের প্লাবন। মানুষজনের চোখ ফাঁকি দিয়ে কত কাণ্ড কারখানা।

রেল স্টেশনের উপরেই গোবিন্দর মুদীর দোকান। আগে ছোট ছিল। সম্প্রতি অবস্থা ভাল হওয়াতে স্টেশনারী জিনিসপত্রও রাখা সুরু করেছে। লোকও রেখেছে বাড়তি।

রেল লাইনের পাশ দিয়ে সিন্নির খাল। খালের দুদিকই লোকালয়হীন নির্জন গাছপালা ঝোপঝাপড়ায় ভর্তি। তারি কয়েক পা এগিয়েই ময়নাদের বাড়ি। এই জঙ্গলেই ওদের প্রেমের খেলাটা সুরু হয়েছিল সময়কাল হবার আগে থেকেই।

তবে ময়নাটা ভয়ঙ্কর ধূর্ত। আর তেমনিই কুটিল ওর মন। বছর বারো পেরিয়ে তেরোয় পড়তেই গোবিন্দর ধারে কাছে আসা বন্ধ করল—কি লোকের সামনে, কি লোকের চোখের আড়ালে।

তখন গোবিন্দর নতুন যৌবন। নতুন প্রেম। আর ময়নাকেও ভালবাসত একেবারে পাগলের মত। হঠাৎ ময়নার এই পরিবর্তনে ওর প্রায় মরবার দশা হল। মিথ্যে কথা বলা উচিত নয়, সে সময় ময়নাকে একবারটি চোখের দেখা দেখবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মশার কামড় খেয়ে, সাপের ছোবলের ভয় উপেক্ষা করে ওদের বাড়ির পিছনের কলাগাছের ঝাড়গুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকত। আর নিষ্ঠুর ময়না, সব জেনেশুনেও চুপ করে থাকত, ফিরেও তাকাত না ওর দিকে।

গোবিন্দর অবস্থা যখন চরমে উঠল, একদিন কোন মতে সুযোগ পেয়ে ওর পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল, তখন ময়নার মন নরম হল। সিন্নির খালের পাশের জঙ্গলে ভাঙ্গা শিব মন্দিরটায় ওকে টেনে এনে বোঝাল, ময়না এখন বড় হয়েছে। ঠাকুমার ভাষায় "মেয়ে মানুষ" হয়ে গেছে। কোন পুরুষের ধারে কাছে ওকে যেতে নেই এখন।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল গোবিন্দ—"কী সর্বনাশ! তাহলে উপায়! তোকে একদিন না দেখতে পেলে আমি ম'রে যাবো—একেবারে মরে যাবো ময়না। বিশ্বাস না হয়, দেখ এখনি আমি সিন্নির খালে ঝাঁপ দিচ্ছি। তুই নিজের চোখে দেখে যা—"

"থাক থাক। জলে ঝাঁপ দিলেই মরা যায় না। শোন, একটা উপায় আছে। যা বলি, তাই যদি কর—তবে না হয়—"

"তুই যা বলবি তাই করব।" হাতে স্বর্গ পেয়ে গদগদ বিগলিতভাবে গোবিন্দ জবাব দিল।

"তুমি ঐ শিবের মাথায় হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা কর, আমাকে ছাড়া অন্য মেয়ে নিয়ে ঘর করবে না। তবেই আমি আগের মত আসব।"

"এই কথা।" গোবিন্দ বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়াল। "এ তো জানা কথা। তুই তো আমার বউ হবি। তোকে ছাড়া আমি আবার কোন মেয়েকে ঘরে আনবো? বিয়ে করব?

* * * *

সেদিনের সেই ঘটনার পর দুজনের অন্তরঙ্গতা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল। বিয়েও হয়ে যেত। কিন্তু গোলমাল বাধাল গোবিন্দর মা। বছর দুই ধরে ভুগে ভুগে খিটখিটে হয়ে উঠেছিল। কয়েকটি পরামর্শদাতা হিতৈষিণী প্রতিবেশিনীর কানভাঙ্গা মন্ত্রণায় একেবারে বেঁকে বসল। "না বাপু। ও মেয়ে যতই সুন্দরী হোক, খুনে পঞ্চাননের নাতনীকে নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে আমি দেব না। যতদিন বেঁচে আছি ততদিন ও মেয়ে এ বাড়িতে ঢুকবে না। তারপর গোবিন্দ যা ইচ্ছে তাই করুক গে। আমি দেখতে আসব না।"

এই কথা এক থেকে সাতরকম সাত কথা হয়ে ময়নার মা-ঠাকুমা-কাকাদের কানে উঠল। ব্যস্, আর যায় কোথায়! দাউ দাউ করে জলে উঠল তারা।

পঞ্চানন মণ্ডল তাদের গৌরব। পাড়ার গৌরব। ঘরের ইজ্জত রাখতে যে নাকি খুন করেছে, তাকে খুনী বলে গোবিন্দের মা, এত বড় স্পর্ধা ?

ময়নাকে সঙ্গে নিয়ে পাশের গ্রাম নসিবপুরে ময়নার মামার বাড়ি চলে গেল ওর মা। আর পুরো একমাসও কাটল না সবাই মিলে জেদ করেই গঙ্গাধরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিল। খুব ভাল করে খোঁজ খবর নেওয়াও প্রয়োজন মনে করল না। গঙ্গাধর রেলের কি একটা কাজ করে। মোটা মাইনে। দুহাতে পয়সা ছড়ায় বলে নসিবপুরে ওর খ্যাতি আছে খুবই।

কিন্তু কপাল বটে ময়নার। এতকাল বেশ ছিল গঙ্গাধর। বিয়ের দুটো মাস কাটতে না কাটতে পুলিশ এসে হাজির। দাগী ওয়াগনব্রেকার হিসেবে ওর নাম নাকি পুলিশের খাতায় লেখা। বিয়ের আগেই ভয়ঙ্কর একটা লুটের ব্যাপার ও করে এসেছে। মারামারি, খুন জখম, দু' একটা তাও ঘটে গেছে। থানা থেকে নোটিশ দিয়েছে। অত্যন্ত কঠোর নির্দেশ গঙ্গাধরকে জেলা থেকে বহিষ্কার করার হুকুম হয়েছে। বিনা অনুমতিতে এ অঞ্চলে প্রবেশ করলেই গ্রেপ্তার। জেল। গ্রেপ্তারে বাধা দিলে গুলিচালানোর হুকুমও আছে।

ফেরারী আসামীর স্ত্রী, এই পরিচয়ে ময়না ফিরে এলো বাপের বাড়ি।

ময়নার এই অকস্মাৎ বিয়ের ব্যাপারে নিরুপায় গোবিন্দ যতখানি ব্যথা পেয়েছিল, মুষড়ে পড়েছিল, ময়না আবার আগেকার মত ফিরে এসে হেসে খেলে বেড়াতে—আগের মতই নিশ্চিন্ত হয়ে আবার মেলামেশা শুরু করল।

এই সময়ই পরীর উদয় হল। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে ফিরে এসেছিল। যত না রূপ, ঠাট-ঠমক তারও বেশী। সুপুরুষ সচ্ছল অবস্থার গোবিন্দকে ইঙ্গিতে ইসারা অনেকদিন থেকেই করছিল। শুধু ওর চঞ্চল স্বভাব আর বয়সকালের পুরুষ দেখলেই ঢলে পড়া ঢং দেখে, ময়নার ভয়েও, কতকটা চুপচাপ ছিল গোবিন্দ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাথাটা ঘুরেই গেল। ধরা দিতে হল পরীর ডাকে।

আর আশ্চর্য ব্যাপার, ময়না কি করে জানতে পারল এই ব্যাপারটা। শুধু জানা নয়; সিন্নির ধারের ঝোপ জঙ্গলে দুজনকে হাতে নাতে ধরে ফেলল একদিন। প্রাণের বন্ধু ভাবনের সঙ্গেই সেখানে বেড়াতে গিয়েছিল নাকি ও।

তারপরের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। পরীর পূর্ব প্রেমিককে ঘটনাস্থলে দেখা গেল। আর তাকেই বিয়ে করে পাড়া ছেড়ে সঙ্গে চলে গেল পরী।

আর গোবিন্দ ? তার যা হাল করল ময়না, সেকথা প্রকাশ্যে উল্লেখযোগ্য নয়। ময়নার মুখের বিষে জর্জরিত গোবিন্দ মনে মনে এই দজ্জাল খাণ্ডার মেয়েটাকে অনেক শাপ-শাপান্ত করে থাকলেও, মুখ ফুটে একটা কথাও বলতে পরেনি।

দুজনের মুখের উপর ঝাপটা মেরে ময়না বলেছিল, বাজারের মেয়েদের মত আজ ওকে, কাল তাকে নিয়ে এত ঢলানিপনা না করলে বুঝি তোর মন ভরে না পরী ? একটাকে নিয়ে যদি বেশীদিন থাকতে ভাল না লাগে, বাজার পাড়ায় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকগে যা। সেখানে সব কটাকেই পাবি, নিত্যি নতুন। ছিরিপদকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছিস অনেকদিন। পরেশ তেলী তোর ঘরে ধরা পড়েছিল, সবাই জানে। মহেশ ছোঁড়াকে নিয়ে কত কীর্তিকাণ্ডই না করলি। রামপদকে বিয়ে করবি ঠিক করে তার সঙ্গে এদিক ওদিক করে—এখন আবার গোবিন্দর দিকে তোর নজর পড়েছে! তোর গলায় দড়ি জোটে না পরী ?"

আশাভঙ্গের ব্যর্থতায় জলতে জলতে হিস্‌মিস্ করে উঠল পরী, "গোবিন্দর উপর তোর যদি অত দরদ, ওকে বিয়ে করে ওর ঘরে উঠলেই তো পারিস ? ছাড়া গরু ধর্মের ষাঁড় করে রেখেছিস কেন। ছাপ মেরে রেখে দিগে যা। কেউ নজর দেবে না।"

"কেন এতকাল এ পাড়ায় আছিস, আমার ছাপমারা জিনিস কোন্‌টা, তুই জানিস্ না ? ছেলেবেলা থেকে ঐ একটাতেই ছাপ মেরে রেখেছি বলেই তো আজ এত জ্বালা। তোর মত রোজ যদি একটা করে মানুষ বদলাতে পারতাম, তবে কি আর ঐ হতচ্ছাড়া বোকা মুখ্যটার জন্যে গলা বাড়িয়ে আজ ঝগড়া করতে আসতাম ?

অতি শান্ত কথাটার অন্তর্নিহিত হুলের খোঁচায় পরী জ্ঞান হারিয়ে চিৎকার করে উঠল, "তোর ছাপমারা

নাগংকে তুই আঁচলে বেঁধে রাখগে যা, যদি ক্ষমতা থাকে। আমার যা খুশী তাই করব। তোর খাই না পরি? তুই বলবার কে?"

"তবে তাই করে দেখ। বলবার দরকার নেই আমার সত্যিই। আমারো যা খুশী, আমি তাই করব। তবে একথাটাও ভুলে যাসনি পরী, খুনে পঞ্চানন মণ্ডলের রক্ত আমারও শরীরে বইছে।"

ময়নার গলায় এমন একটা কিছু ভয়ঙ্কর সঙ্কেত ছিল, গোবিন্দর সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আর অমন ডাকসাইটে ঝগড়াটে মেয়ে পরী সেও আর একটা কথা বলতে সাহস করেনি।

"পঞ্চানন মণ্ডলের নাতনী—"

এই ইঙ্গিতটা শাণিত তরবারির তীক্ষ্ণধারের চেয়েও তীক্ষ্ণতর। ময়না কখনো 'অমুক বাপের বেটি' এ কথা উচ্চারণ করে না। ওর পরিচয় ও পঞ্চানন মণ্ডলের নাতনী।

ময়নার ঠাকুমা ওর ঠাকুর্দার দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার। প্রথমটি পরীর মত একটু বেশী রকম 'রসবতী' এবং রূপসী ছিল। বিয়ের আগেও ছিল। বিয়ের পরও স্বভাব শোধরায়নি। স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে আরো দু একটা পুরুষের সঙ্গে ওর 'নিভৃত রসচর্চাটা' বেশ জমে উঠেছিল। একদিন রাত্রে হাতে-নাতে ধরা পড়ার পর মেছো পঞ্চানন তার মস্তবড় মাছকাটা আঁশবঁটি দিয়ে দুজনকে একসঙ্গে খুন করেছিল।

তার স্ত্রীর স্বভাবের কথা সবারই জানা ছিল। বিচারে তাই ওর মাত্র বছর কয়েকের জেল হয়েছিল। ফিরে এসে আবার বিয়েও করেছিল।

ময়না তারই নাতনী।

ময়না যে অক্ষরে অক্ষরে ওর কথা রাখবে, একথা অবিশ্বাস করার মত সাহস বা ক্ষমতা ওদের ছিলনা। ঐ কোপবতী নাগিনীকন্যার মত হিংস্র মেয়েটা গোবিন্দকে ক্ষমা করবেনা। রেহাই দেবেনা।

কেটে কুচি কুচি করে সিন্নির খালের জলে ওকে ভাসিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে ও ফাঁসী যেতেও পারে।

ঐ সর্বনাশিনী সংহারিণী মেয়েটা সব পারে!

* * * *

"গলায় দড়ি! গলায় দড়ি! এত বড় একটা রোজ-গেরে শক্তসমর্থ পুরুষমানুষ হয়ে একটা মেয়ের কেনা গোলাম হয়ে রইলে। না বিয়ে-থা। না ঘর-সংসার। আচ্ছা ভীরু পুরুষমানুষ বটে তুমি।"

বহুদিনের বহু পুরোণো ধিক্কারটা আর একবার গোবিন্দর কান থেকে হৃদয় পর্যন্ত ছড়িয়ে দিল ওর জ্যাঠতুতো দাদা অঘোর বায়েনের বৌ হরিমতি। চাঁপির দিদি। "আমি আছি তাই। নইলে খুড়িমা মারা যাবার পর থেকে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হতনা? কই, একমুঠো ভাত ফুটিয়ে দিতে তো কেউ আসেনা অসময়ে? কিন্তু তাও তোমাকে বলি ঠাকুরপো, এমন করে আর কদিন চলবে?"

ভাতের থালাটা গোবিন্দর সামনে ধরে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে হরিমতি গলা ছেড়ে হাঁক পাড়ে। "ওলো ও চাঁপি, তোর হাতের সেই শুঁটকো মাছের সরষে ঝালটা দিয়ে যা তো—"

লজ্জাজড়িত পায়ে চাঁপা মাছের বাটি হাতে এগিয়ে আসে। শ্যামলা পনেরো বছরের মেয়ে। আসন্ন যৌবনের পূর্বাভাস সমস্ত শরীরে। সুন্দরী নয়, শ্রীময়ী।

"মাছটা কেমন হয়েছে? মুখে দিয়ে দেখ তো ঠাকুর-পো?" মুখ টিপে হেসে হরিমতি প্রশ্ন করে।

চাঁপার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুচকে হেসে চোখ নামায় ও। আর গোবিন্দ মাছের টুকরো ভেঙ্গে মুখে তুলে স্বাদ নেবার আগেই বলে ওঠে, "খুব ভাল হয়েছে।"

"তোমার পছন্দ হয়েছে তো?"

কী পছন্দ হয়েছে সে কথা না বুঝেই বড় বড় ভাতের গ্রাসে অবরুদ্ধমুখ গোবিন্দ সজোরে ঘাড় নাড়ে। "হাঁা।"

"তবে বাবার সঙ্গে তোমার দাদা পাকা কথা বলবে তো?"

"পাকা কথা, কিসের পাকা কথা?" ভাতের গরাস-টাকে গলার নীচে নামিয়ে দিয়ে অবাক হয়ে গোবিন্দ জবাব দেয়।

"কিসের কথা জাননা? চাঁপার সঙ্গে তোমার বিয়ের।" মনের রাগ আর চাপা থাকে না। "সোজা কথা বুঝতে তোমার এত দেরী হয় কেন ঠাকুরপো বুঝিনা। স্পষ্ট করে বলে দাও চাঁপাকে তুমি বিয়ে করবে কিনা। আমার বোন ফেলনা নয় ঠাকুরপো। অন্য কোথাও বিয়ে হলে

বেশ মোটা টাকাই ঘরে তুলতো বাবা। নেহাত তুমি আমার দেওর বলেই এক কথায় রাজী হয়ে বসে আছে। আর মেয়েটাও মনে মনে তোমাকে একেবারে—ষাট ষাট কি হল ?"

গোবিন্দ বিষম খেয়ে কাশতে শুরু করাতে হরিমতির কথাগুলো আর শেষ করা হল না।

কিন্তু কথার চেয়েও কাজে কম পটু নয় হরিমতি। স্বচ্ছল অবস্থা, একখানা পাকা বাড়ি, অতবড় দোকানের মালিক, এমন স্বাস্থ্যবান্ সুদর্শন দেওরটিকে বেহাত করার পাত্রীই সে নয়! ময়নার সঙ্গে গোবিন্দর যতই ভাব-ভালবাসা থাকুক না কেন, ওটা যে বয়স কালের রং মাত্র! বিয়ে-থা হলে ওসব ঘুচে যাবে, একথা ওর জানা ছিল। এ পাড়ারই মেয়ে ও। ওদের জাতে এসব এমন একটা কিছু আশ্চর্য বা অঘটন ঘটনা নয়। পাড়ার মধ্যে বয়স কালের ছেলেমেয়ে থাকলে, এমন 'এদিক ওদিক' প্রায় সবাই করে থাকে।

চাঁপাকে তালিম দিল ভাল করে। যদিও অতটা না দিলেও হত। গোবিন্দর মন ফেরাবার জন্যে—উঠে পড়ে লাগল চাঁপা। হাতে হাতে পায়ে পায়ে ঘুরে ঘুরে, সেবা যত্ন করে। অনবরত ওর সান্নিধ্য দিয়ে গোবিন্দকে প্রায় বেকায়দায় ফেলল।

শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াল, চাঁপাকে বিয়ে করার ব্যাপারে না করার মত মনের জোরটুকুও হারিয়ে ফেলল গোবিন্দ। আর এই সুযোগে হরিমতির বাবা একদিন সদলবলে ওর বাড়ি এসে বিয়ের কথা পাকা করে গোঁফে তা দিয়ে বড় মেয়ের উপর আটঘাট বাঁধবার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিয়ের ব্যবস্থায় মন দিল।

সব কথাই কানে গেছে ময়নার। সুযোগ বুঝে এক-দিন গোবিন্দও দেখা করতে এসেছে। নিজের মুখে সব কথা বুঝিয়ে না বললে কি করে বসবে কে জানে ?

যেন আত্মপক্ষসমর্থনের জন্যেই গোবিন্দ বলল, "বিয়ে না করে উপায় কি আমার ? সমস্ত দিন খেটেপিটে হাত পুড়িয়ে রান্না করে তো আর খেতে পারিনা দুবেলা। বৌদি ভাল তাই। মজা করার বেলা সবাই আছে, কাজের বেলা কেউ নেই সংসারে।"

বাড়িতে তখন কেউ ছিলনা। সন্ধ্যার অন্ধকারে ময়নার মুখ দেখা যাচ্ছিল না! ময়না কোন কথাও বল-ছিল না।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করতে করতে গোবিন্দ আবার বলল, "গঙ্গাধর বেঁচে থাকতে তোকে বিয়ে করবার জো নেই। তবে এমন তো অনেকেই করে। ওর সঙ্গে তোর বিয়েটা ধরতে গেলে বিয়েই নয়। তোর দুখ্যু আমি মর্মে মর্মে জানি ময়না। খুনে গুণ্ডা ডাকাত ফেরারী আসামীর বৌ হয়ে কি আর সুখ আছে তোর মনে ? তবে হক কথা শুনে রাখ, বিয়ে করি আর যাই করি, আমার কাছে তোর আদর এতটুকুও কমবে না কোনদিন। তুই আর আমি, যেমন ভাবে আছি, এমন ভাবেই থাকব।" যখনি ডাকবি, তখুনি ছুটে আসব। তোকে আমি ফেলবনা ময়না, এ তুই দেখে নিস।

—"কী বললে ? কী বললে !—"

এতক্ষণ একটা কথাও ময়নার মুখ দিয়ে বার হয়নি। ময়না নড়েনি চড়েনি। সন্ধ্যার ঝোঁকে ঝোপজঙ্গল থেকে উড়ে আসা গোটাকতক মশা সমানে ওর অনাবৃত বাহুর উপর হুল ফুটিয়ে রক্ত শুষছিল, হাতটা নাড়ানোর মত হুঁশটুকুও বোধ করি ওর ছিলনা। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে স্থির নিস্পলক চোখে ও তাকিয়েছিল গোবিন্দর মুখের রেখাগুলোর দিকে। গোবিন্দর কথাগুলোর তীব্র বিষক্রিয়ায় ও যেন একেবারে আচ্ছন্নসত্ত্বার মতই অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। ওর পাতলা ঠোঁটের উপর ক্রমেই দাঁতের জোর পড়ছিল। রক্তের নোনা আস্বাদটাও অনুভব করার মত ক্ষমতা ও হারিয়ে ফেলেছিল।

গোবিন্দর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ওর সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। আরো কিছু বলবার ছিল বোধহয়, কিন্তু বলা সম্ভব হল না। শুধু সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হবার আগেই অন্ধকার ঘরখানার মধ্যে ঢুকে দরজার ঝাঁপটা বন্ধ করে দিল।

আর গোবিন্দ !

এতক্ষণ পর তার মনে পড়ল, ময়নাকে সে কী বলেছে। আতঙ্কবিহ্বল হয়ে, বারান্দা থেকে একলাফে উঠোনে নেমে, কলাগাছের লম্বাছায়া ফেলা অন্ধকারের দিকে ছুট মারল।

ভবিষ্যতে ময়নার হাতে ওর লাঞ্ছনার কথা ভাবতেই ওর মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল।

* * * *

পর পর কটা দিন কাটল। কটা সপ্তাহও।

পুরো একটা মাসও কেটে গেল আস্তে আস্তে।

গোবিন্দর বিয়ের দিনও এগিয়ে আসতে লাগল অনিবার্য গতিতে।

ময়না ডেকে পাঠালনা গোবিন্দকে এতদিনের মধ্যেও। কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঝগড়া করতে এগিয়ে এলোনা।

আর মাথার উপর বৈশাখের গনগনে রোদ্দুর ভরা আকাশ ঢেকে গেল নীলাঞ্জন ছায়ায়। ঝির ঝির বৃষ্টি নামল। শান্ত হল তৃষ্ণার্ত পৃথিবী।

দোকানের কাজ ফাঁকি দিয়ে, সেই নির্জন পথের ধারের টিউবওয়েলটার পাশে রাতদিন কতক্ষণ ধরে যে গোবিন্দ ঘুর ঘুর করল, দাঁড়িয়ে রইল তার আদিঅবধি নেই। কিন্তু এত শান্ত স্নিগ্ধ মেঘের মায়াভরা পরিবেশেও ময়না জল নিতে এগিয়ে এলোনা কলসী হাতে নিয়ে।

দিনের পর দিন গোবিন্দর আসাযাওয়ার পথের ধারে ময়না তার অনুযোগ অভিযোগ তিরস্কারভরা চোখ তুলে ভৎর্সনা করার ছলেও এসে দাঁড়ালনা।

সত্য সত্যই গোবিন্দকে ও রেহাই দিয়ে দিল নাকি চিরদিনের মত?

ওই রাক্ষসীর ভালবাসার গ্রাস থেকে তবে এতকাল পর মুক্তি পেল গোবিন্দ?

গোবিন্দর উৎসুক ব্যাকুল দৃষ্টির প্রতীক্ষাকে ব্যর্থ করে একবার চোখের দেখাও ওকে দিল না ময়না।

খুশী হল হরিমতি। পুলকিত উচ্ছ্বসিত হয় চাঁপা। বড় গলায় গোবিন্দ বলল, "দেখলেতো বৌদি, কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ঝগড়াটে ময়না? আর ভীতু কাপুরুষ বলবে আমাকে? আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে দিয়েছি। আমার সঙ্গে চালাকি? একটা ছেড়ে একশোটা বিয়ে করব, ওর তাতে কি?"

—খুশী হয়ে হরিমতি উত্তর দেয়, "যা ডাকসাইটে মেয়ে বাবা। আমাদেরই ভয় করে। ছিনেজোঁকের মত তোমায় জড়িয়ে বসে ছিল এতকাল। নাঃ, তোমার মুরোদ আছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। জোঁকের মুখে তুমি নুন দিয়েছ। তবু বাপু ও মেয়েকে বিশ্বাস নেই। ওর ধারে কাছেও একটা দিন যেওনা। ভালয় ভালয় বিয়েটা হয়ে গেলে বাঁচি। হরির লুট মানত করে রেখেছি।"

গোবিন্দর দুচোখ, সহস্র চোখ হয়ে ময়নাকে খুঁজে বেড়াল—কিন্তু ওর আঁচলের ছায়াটুকুও এদিক ওদিক নজরে পড়লনা। আর ওর এই আশাতীত অভাবনীয় পরিবর্তনে আনন্দে অধীর হয়ে ওঠার বদলে মনে মনে কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল গোবিন্দ। ময়না যেন আসন্ন ঝড়ের আকাশের মত থমথমে হয়ে আছে। যে কোন মুহূর্তে শুধু ঝড় বৃষ্টি হয়ে নয়, মৃত্যু-হানা বাজের মতই ওর মাথায় এসে পড়বে।

পঞ্চানন মণ্ডলের সেই মাছকাটা আঁশবঁটিটায় কত ধার দিচ্ছে ময়না?

এ অবস্থা অসহ্য। অসহনীয়। ফাঁসীর হুকুম হয়ে যাওয়া আসামীর মতই অবর্ণনীয়।

অগত্যা ময়নার বন্ধু ভাবনের খোঁজেই বেরোতে হল ও পাড়ার দিকে। যা হয় হোক। যা ঘটে ঘটুক। ময়না ওকে গালাগালি দিক। মারুক ধরুক। আঁশবঁটি দিয়ে কেটে কুচি-কুচি করে সিন্নির খালের জলে ভাসিয়ে দিক। গোবিন্দ আর পারছেনা। গোবিন্দর রাতের ঘুম, দিনের শান্তি, আহার বিহার সব ঘুচে গেছে। হু হু আগুন জলছে বুকের মধ্যে। অপরাধী গোবিন্দ আত্মসমর্পণ করছে। যে শাস্তি দিতে চায়, তাই দিক ময়না। গোবিন্দ নিঃশব্দে মাথা পেতে নেবে! এমনভাবে আর নয়!

"কেমন আছো ভাবনদি? আমায় একেবারে ভুলে গেলে? শীর্ণ মুখে একগাল হেসে ভাবনের কাছে এসে দাঁড়াল গোবিন্দ।

বাড়ির কাছের টিউবওয়েল থেকে জল ভরছিল ভাবন। গোবিন্দকে দেখে ও হাসল। "ভুলব কেন গোবিন্দদা, এখন তোমারই আমাদের ভুলে যাবার দিন আসছে। সত্যি সত্যিই তাহলে তোমার বিয়ের নেমন্তন্নটা খাচ্ছি।"

অত্যন্ত বিরক্তি, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে গোবিন্দ জবাব দিল, "কি করে বলব বল? ভালয় ভালয় বিয়েটা হয়ে

গেলে আমি বাঁচি ভাবনদি। ময়না কি করবে কে জানে? ওই খাণ্ডারণীকে বিশ্বাস নেই।"

মুখের হাসি বন্ধ হয়ে ভাবনের মুখ গম্ভীর হল। "তুমি নিশ্চিন্ত মনে একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে কর গোবিন্দদা। ময়না কিছুই বলবে না। হয়তো তোমার বিয়ের আগেই ও পাড়া ছেড়ে চলে যাবে।"

ভাবনের কথাটা ঠিক বুঝতে পারলনা যেন গোবিন্দ। "ও আবার যাবে কোন চুলোয়। কে আছে ওর শুনি? এর মধ্যে আবার কে জুটল?"

ময়নাকে যথার্থই মনেপ্রাণে ভালবাসত ভাবন। তাই গোবিন্দর কথায় রাগে ওর গা জ্বলে গেল। ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "তোমার যদি জুটতে পারে, ওর মত মেয়ের জুটতে পারেনা? একটা ছেড়ে হাজারটা পারে। ওর সঙ্গে পীরিত করার লোকের অভাব? নেহাত তোমার মুখ চেয়ে এতকাল কাউকে আমল দেয়নি তাই। তোমার কপাল একেবারেই পুড়েছে গোবিন্দদা, আর কোন আশাই নেই তোমার। বিশ্বাস হচ্ছেনা বুঝি। অ। ছোঁক ছোঁক করে তো বেড়াও। ময়নাদের বাড়ির কলাঝাড়ের আড়াল থেকে মাঝরাত্তিরে না হয় একবার উঁকি মেরে দেখে এসো সত্যি না মিথ্যে।"

কলসীটা কাঁখের উপর বসিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল ভাবন, হতবুদ্ধি গোবিন্দকে একটা অতল খাদের ধার ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে রেখে।

ময়নার পীরিতের লোক জুটে গেছে! ভাবন যা বলল, তা সত্যি? অসম্ভব কখনো সম্ভব হয়।

এও কি সম্ভব—গোবিন্দ আর ময়নার এতদিনকার ভালবাসার ইতিবৃত্ত জানা সত্ত্বেও—অন্য কেউ হাত বাড়াবে ওর দিকে? এঅঞ্চলে এত বড় স্পর্ধা কার হবে—বাঘের মুখে হাত ঢোকাবার?

রতন সাহা? মেছো সুবল? শিবপদ ঘরামী? না অন্য কেউ?

তাদের কি জানা নেই গোবিন্দর গায়ের অসুরের মত শক্তি? বুকের এই এতখানি চওড়া ছাতির জোর?

কুস্তি, লাঠি খেলায় গোবিন্দ যে সবার উপরে, একথাও তো ভাল করে জানে তারা।

তবে কোন সাহসে, ময়নার ধারে কাছে যাবার মত স্পর্ধা হয় তাদের? ময়না যে গোবিন্দর, এতো সবাই জানে।

ময়না। ঐ সর্বনাশিনী ময়নাই ওদের কাউকে প্রশ্রয় দিয়েছে। রাতের অন্ধকারে নিরালা নিভৃত ময়নার সেই ঘরে, যে ঘরে এতকাল একচ্ছত্র অধিপতির মত ইচ্ছামত ঢুকেছে, ময়নার উপর নিজের জোর খাটিয়েছে গোবিন্দ, সেই ঘরে অন্য কেউ এসে—

সমস্ত শরীরের রক্তধারা জ্বলন্ত আগুনের ঢেউ তুলল! চোখ দুটো রক্তজবার মত লাল হয়ে ধক্ ধক্ করে জ্বলতে লাগল। মাথার শিরাগুলো দড়ির মত পাকিয়ে ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চাইল?

কী ভেবেছে ময়না? একদিন গোবিন্দকে আঁশবঁটি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলার ভয় দেখিয়েছিল, এতটুকু বেচাল দেখে। এখন? এখন কি করছে ও?

এতকাল ময়নাকে গোবিন্দ ভয় করে এসেছে। তাতেই ওর এত দূর স্পর্ধা হয়ে গেছে। কিন্তু পঞ্চানন মণ্ডলের আঁশবঁটি গোবিন্দর কাছে না থাকলেও ওর ঘরে দা-ছুরির অভাব নেই। অন্তত পক্ষে ওর হাতের জোর ময়নার অজানা নয়।

তবে অন্যায় করবেনা গোবিন্দ। হাতে-নাতে ধরবে ওদের দুজনকে পঞ্চানন মণ্ডলের মত।

তারপর?—

যা হবার তাই হবে।

সুন্দরী ময়না। যুবতী ময়নার এই ভয়ঙ্কর নীরবতার, গোবিন্দর উপর এই চরম উপেক্ষার প্রতিশোধ হাতে হাতেই পেয়ে যাবে।

* * *

ঝিঁ ঝিঁ ডাকা কৃষ্ণ পক্ষের অন্ধকার রাত। আকাশে মেঘ।

দুহাত দূরের অতিচেনা মানুষকেও চেনা যায় না।

একটা আদিম, প্রাগৈতিহাসিক হিংস্র পশুর মত, প্রতিহিংসায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য গোবিন্দ প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিয়ে, কলাগাছের ছায়ায় অন্ধকার রাতের আবরণে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে ময়নার

বন্ধ জানলার একটু ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল। কান পাতল কথাবার্তার দিকে।

ভাবনের কথা মিথ্যে নয়। ঘরে লোক আছে। কিন্তু ও কে? কে ও?

অত্যন্ত সন্তর্পণে শিকারীর ক্ষিপ্রতায় আরো এগিয়ে গেল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নজর দিয়ে আরো ভাল করে তাকাল ঘরের মধ্যে। ওদের কথাবার্তায় কান পাতল আরো একাগ্রভাবে।

লোকলোচনের অন্তরালে, অন্ধকার রাত্রে। নির্জন ঘরের নিভৃতে ময়নার বিছানার উপর যে বসে আছে ময়নারই ঘন সান্নিধ্যে, সে শিবপদ নয়। রতনাও নয়। মেছো স্বলও নয়—সে গঙ্গাধর!

ময়নার দাবীদার গঙ্গাধর। ময়নার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। ময়নার স্বামী।

ময়নার স্বামী ময়নাকে নিয়ে যেতে এসেছে। ময়নাই নসিবপুরে খবর পাঠিয়ে ছিল। জিনিষপত্র সব গুছিয়ে রেখেছে ময়না। ফেরারী স্বামীর সঙ্গে দিনের আলোয় যাওয়া চলবেনা। তাই শেষ রাত্রের অন্ধকারে ওরা এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবে। এখানে গঙ্গাধরের একমুহূর্ত থাকবার উপায় নেই। পুলিশ খবর পেলে গুলি করতেও পারে। এমন হুকুমই আছে। দাগী ওয়াগনব্রেকার খুনের হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়া দুধর্ষ আসামী গঙ্গাধর সাঁইদারের নাম থানায় রেকর্ড করা।

স্বামীর কাছে স্ত্রী। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী চলে যাবে। নিভৃত ঘরের অন্ধকারে স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্যলীলায় উচ্ছল হয়ে উঠবে ময়না—

গোবিন্দর—মহাশক্তিশালী, পেশীবহুল, বিরাট বিশাল দৈত্যের মত চেহারার গোবিন্দর কোন ক্ষমতাই নেই, ওই প্রায় কুৎসিত, নোংরা সমাজবিরোধী লোকটার কাছে থেকে সরিয়ে আনে ময়নাকে।

ওর সব অধিকার একমাত্র গঙ্গাধরের।

শেষ বর্ষার মধ্যরাত্রের আকাশে গুম্ গুম্ গুর্ গুর্ করে সহসা মেঘ ডেকে উঠল।

তীক্ষ্ণতীরের মত বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল।

বিদ্যুৎ ঝলকের সঙ্গে সঙ্গে আকাশফাটা শব্দ করে কোথায় যেন বাজ পড়ল।

সেই প্রচণ্ড আওয়াজে আত্মস্থ সচেতন হল গোবিন্দ।

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলবে না।

রাত বাড়ছে। রাত শেষ হয়ে আসছে।

* * * *

সেই ভূতুড়ে, গা ছম ছম করা অন্ধকারে ঝড় বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুৎ—সব কিছু মাথায় নিয়ে একটা নিশিপাওয়া মানুষের মত উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল গোবিন্দ।

ঘরের পথে, বাড়ির দিকে নয়।

সাত মাইল দূরের থানাটার দিকে।

কীর্ত্তন

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

"নামলীলা গুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্" শ্রীহরির নাম, লীলা ও গুণাদির উচ্চভাষণই কীর্ত্তন। নবধা ভক্তির দ্বিতীয় অঙ্গ কীর্ত্তন। এই কীর্ত্তন "জপ" নামেও পরিচিত। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন "যজ্ঞানাং জপ-যজ্ঞোঽস্মি"। জপ ত্রিবিধ—মানসিক জপ, মনে মনে জপ। উপাংশুজপ—মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় ৮৫ সংখ্যক শ্লোকে উপাংশুজপের প্রশংসা আছে। মনু বলিতেছেন—

বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভি র্গুণৈঃ।
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ॥

দর্শ-পৌর্ণমাসাদি বিধি যজ্ঞ অপেক্ষা প্রণবাদির জপযজ্ঞ দশগুণ অধিক শুভপ্রদ। সেই জপ যজ্ঞের অপেক্ষা উপাংশু জপ (যে জপমন্ত্র উচ্চারিত হইয়া নিকটস্থ অপর লোক কর্ত্তৃক শ্রুত হয় না) শতগুণে ফলপ্রদ এবং মানসজপ সহস্রগুণে শুভপ্রদ। (শ্রীশ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণের অনুবাদ) অপরে শুনিতে পাইবেনা, অথচ আমার ওষ্ঠোচ্চারিত মন্ত্র আমি শুনিতে পাইব, ইহারই নাম উপাংশু জপ। তৃতীয় জপ বাচিক জপ—উচ্চকণ্ঠে হরি কীর্ত্তন।

এই কীর্ত্তন নামকীর্ত্তন ও লীলাকীর্ত্তন ভেদে দুই প্রকার। নামকীর্ত্তনে শ্রীহরির নাম ও করুণার কথাই প্রধান। আর লীলাকীর্ত্তনে তাঁহার রূপ গুণ ও বিবিধ মনোহারী লীলার বর্ণনাই প্রাধান্য লাভ করে। নাম-কীর্ত্তনই হউক আর লীলাকীর্ত্তনই হউক তাহা যথাযথ তাল প্রয়োগে এবং বিশুদ্ধ সুরে ও বিবিধ রাগ রাগিণী যোগে গীত না হইলে কীর্ত্তন পদবাচ্য হইবেনা।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৮ম বিলাস ২৭৪ শ্লোকে বলিতেছেন—

॥ বারাহে ॥ ব্রাহ্মণো বাসুদেবার্থং
গায়মানোঽনিশং পরং।
সম্যক্ তাল প্রয়োগেন
সন্নিপাতেন বা পুনঃ॥

টীকায় আছে—

"সন্নিপাতেন বিবিধ রাগাদি সমুচ্চয়েন"।

ব্রাহ্মণে নিরন্তর বাসুদেবের গুণ গান করিবেন। এই গান সম্যক্ তাল প্রয়োগে এবং বিবিধ রাগাদিতে গীত হইবে।

*   *   *

নারায়ণানাং বিধিনা গানং শ্রেষ্ঠতমং স্মৃতম্।
গানেনারাধিতো বিষ্ণুঃ স্বকীর্ত্তিঃ জ্ঞানবর্চ্চসা
দদাতি তুষ্ট স্থানং স্বং যথাস্মৈ কৌশীকায় বৈ॥

নরগণের সকল আরাধনার শ্রেষ্ঠতম হইল নারায়ণের গুণ গান। ভগবান নাম গুণ লীলায় আরাধিত হইলে প্রীতি লাভ করেন এবং গায়ককে কৌশীকের ন্যায় নিজ স্থানে লইয়া যান।

গায়ক ভাবাবিষ্ট হইলে স্বতন্ত্র কথা। স্বাভাবিক ভাবে উচ্চ কণ্ঠে হরি কীর্ত্তন গানে—নৈর্ম্মল্যের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভক্তি রত্নাকর বলিতেছেন—

"উচ্চারণেন বাক্যস্য সম্যগর্থাববোধনং
উচ্চারণে বাক্যের সকল বোধ হয়।
অদোষ রস যুক্তার্থ নৈর্ম্মল্য কহয়॥"

শ্রীভগবানের লোককল্যাণপ্রদ কীর্ত্তিকথনই কীর্ত্তন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে উল্লিখিত আছে—ব্রজরাখালগণ সখা শ্রীকৃষ্ণের গুণ গান করিতেন। রাসে গোপীগীত এবং মাথুর বিরহের ভ্রমরগীত ভক্তগণের আস্বাদ্য বস্তু। যে গানে হৃদয় নির্ম্মল হয়, যে গানে শ্রীভগবদ্ পাদপদ্মের স্মৃতি জাগ্রত হয়, তাহাই জগতের অভ্যুদয়প্রদ সঙ্গীত। সঙ্গীত মানবহৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। ভক্তহৃদয়ের অভিব্যক্তি বলিয়া কীর্ত্তন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

নারদের নামে প্রচলিত সঙ্গীত গ্রন্থ আছে। "নারদ পঞ্চরাত্র" গ্রন্থখানি মহর্ষি নারদ বিরচিত। আধুনিক কোন কোন ব্যক্তি বলেন এই গ্রন্থখানি দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বা তাহার দুই একশত বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল।

এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে এক জন্মে নারদ উপবর্হন নামে গন্ধর্ব্বগণের অধিপতি ছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার প্রভূত পারদর্শিতা ছিল।

নারদ পঞ্চরাত্রের "পঞ্চম রাত্রম" একাদশাধ্যায়ে শ্রীব্যাসদেব বলিতেছেন—ব্রহ্মার আদেশে—

অথ গন্ধর্ব্বরাজস্ত ভগবানাজ্ঞয়া বিধেঃ।
সঙ্গীতজ্ঞঃ জগৌ তত্র কৃষ্ণরাস মহোৎসবম্॥
সুষমং তালমানঞ্চ সতানং মধুর শ্রুতম্।
বীণা মৃদঙ্গ মুরজ যুক্তং ধ্বনিসমন্বিতম্॥
রাগিণী যুক্ত রাগেণ সময়োক্তেন সুন্দরম্।
মাধুর্য্যং মূর্চ্ছনাযুক্তং মনসো হর্ষ কারণম্॥
বিচিত্রং নৃত্য রুচিরং রূপ বেশ মনুত্তমম্।
লোকানুরাগ বীজঞ্চ নাট্যোপযুক্তহস্তকং॥

অনন্তর ঐশ্বর্য্যশালী গন্ধর্ব্বরাজ উপবর্হন ব্রহ্মার আদেশানুসারে সেই সভাস্থলে কৃষ্ণের রাসমহোৎসব গান করিলেন। সেই সঙ্গীত সুশোভন তালমান সুতান সুমধুর বীণা মৃদঙ্গ মুরজধ্বনি মিশ্রিত শ্রুতিমধুর। সময়োচিত রাগিণীযুক্ত সেই সুন্দর রাগমূর্চ্ছনাযুক্ত বলিয়া মাধুর্য্যময় ও মনের উল্লাসকারক। সেই সভায় উপস্থিত বিচিত্র রুচির নৃত্যকারী নটদিগের মনোহর রূপ ও উত্তম বেশ অনুরাগের বীজ স্বরূপ এবং হস্তাদির চালন নাট্যোপযুক্ত। উপবর্হনের গানে মৃদঙ্গের সঙ্গে বীণা ও মুরজের উল্লেখ রহিয়াছে।

সেকালের ভাষায় রচিত বৌদ্ধাচার্য্যগণের বহু সাধনসঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে। আচার্য্যগণ, তাঁহাদের শিষ্যগণ এবং সাধারণ গৃহস্থ সকলেও সেই সমস্ত সঙ্গীত গান করিতেন। এই সমস্ত সঙ্গীত যে সুরে ও তালে গাওয়া হইত, সেই সেই সুর ও তাল একেবারে লোপ পায় নাই। তাহার মধ্যে কোন কোন সুর ও তাল আজিও কীর্ত্তনে ব্যবহৃত হয়।

বৌদ্ধসাধনসঙ্গীতের পরই কবি জয়দেবের নাম উল্লেখ করিতে পারি। শ্রীগীতগোবিন্দের কবিত্ব, ছন্দ ও ভাষা যেমন অনবদ্য, ইহার অন্তর্নিহিত সাধন সঙ্কেতও তেমনই অভীষ্টপ্রদ। শ্রীরামকৃষ্ণের উপাসনা রহস্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠগ্রন্থ এই শ্রীগীতগোবিন্দ। গ্রন্থখানি সঙ্গীতরাজ্যেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কি সঙ্গীতজ্ঞগণ, কি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই স্বীকার করেন কবি জয়দেব সুগায়ক এবং সুরে তালে অভিজ্ঞ ছিলেন। নিজরচিত সঙ্গীতে তিনি নিজেই রাগ ও তালের সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগানের পর জয়দেবের গান, তাহার পর মঙ্গলগান ও চণ্ডিদাস বিদ্যাপতির মধ্য দিয়া কীর্ত্তনের ধারা প্রায় অব্যাহত আছে।

চণ্ডিদাসের ও বিদ্যাপতির পরেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে সংকীর্ত্তনের জনক বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তাহার কারণ তিনিই শ্রীহরিনামকীর্ত্তন যুগধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন। সঙ্ঘবদ্ধভাবে হরিনাম কীর্ত্তনের প্রথা তাঁহারই প্রবর্ত্তিত। তিনিই নীলাচলে শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর ও শ্রীল রামানন্দ রায়ের সঙ্গে চণ্ডিদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী, কবি জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য, রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক ও বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত আস্বাদনপূর্ব্বক উক্ত পদাবলী প্রভৃতিকে শাস্ত্রের মর্য্যাদা দান করিয়া গিয়াছেন। তদবধি উক্ত গ্রন্থাদি ভক্তগণের পরম আস্বাদ্য বস্তুতে পরিগণিত হইয়াছে। গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্যসাধন নির্ণয় বিচারে শ্রীগীতগোবিন্দকে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে একই কক্ষায় প্রতিষ্ঠিত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সুকণ্ঠ সুগায়ক শ্রীস্বরূপ দামোদর তাঁহাকে চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি ও জয়দেবের পদাবলী গান করিয়া শুনাইতেন। সেই হইতেই লীলাকীর্ত্তন সুরু হইয়াছিল।

রাজসাহী জেলায় গড়েরহাট পরগণায় গোপালপুর গ্রামে পুরুষোত্তম দত্ত নামে একজন গৌড়রাজ অমাত্য ভূম্যধিকারী ছিলেন। পুরুষোত্তমের কনিষ্ঠের নাম কৃষ্ণানন্দ। লোকে উভয়ভ্রাতাকেই রাজসম্মান দান করিত। কৃষ্ণানন্দের পুত্র নরোত্তম প্রথম যৌবনেই শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন। বৈষ্ণবগণের মণ্ডলেশ্বর সে সময় শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। নরোত্তম শ্রীজীবের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য ও বৈষ্ণব গ্রন্থাদি অধ্যয়নে কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। বৃন্দাবনেই শ্রীনিবাস ও শ্রীশ্যামানন্দের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় এবং বন্ধুত্ব হয়। শ্রীজীবের যত্নেই শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সঙ্গে নরোত্তমের পরিচয়ের সৌভাগ্যলাভ ঘটে। নরোত্তমের অকপট সেবায় প্রীত হইয়া লোকনাথ তাঁহাকে দীক্ষাদান করেন। নরোত্তমই লোকনাথের প্রথম ও শেষ শিষ্য। নরোত্তমের বিদ্যাবত্তা

ও প্রেমভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীজীব তাঁহাকে ঠাকুর উপাধি দান করিয়াছিলেন।

আমি শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া বহু প্রাচীন বৈষ্ণবের মুখে শুনিয়াছি শ্রীনরোত্তম ঠাকুর তথায় খ্যাতনামা গায়ক তানসেনের গুরুদেব শ্রীপাদ হরিদাসস্বামীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হরিদাসস্বামীর গায়কির এক ধারা তানসেনের কণ্ঠে ধ্রুপদের উৎকর্ষ সাধনে সার্থক হইয়াছিল। অপর ধারার অনুসরণে ঠাকুর নরোত্তম বাঙ্গালার কীর্ত্তনের সংস্কার সাধন করেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দত্তের সহায়তায় রাজধানী গোপাল রের অন্তর্গত খেতরীতে নরোত্তম ঠাকুর এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহার উপলক্ষ্য ছিল ছয়টী শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা। এই মহোৎসবে সারা বাঙ্গালার বৈষ্ণবমণ্ডলী আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ভক্ত, পণ্ডিত, গায়ক, বাদকের সংখ্যা ছিল সুপ্রচুর। নরোত্তম যখন বৃন্দাবনে, সেই সময় কাঞ্চনগড়িয়ার দ্বিজ হরিদাসের পুত্র শ্রীদাস বা শ্রীদাম ও গোকুলানন্দ পুরীধামে গিয়া স্বরূপ-দামোদরের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন গৌরাঙ্গদাস ও দেবীদাস। ইহারা পুরীধামে মৃদঙ্গ বাদ্য শিক্ষা করেন। ইহাদের শিক্ষাগুরুর নাম জানিতে পারি নাই। এই উৎসবে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীশ্যামানন্দ, বৈষ্ণব সমাজের এই নেতৃদ্বয় উপস্থিত ছিলেন। উৎসবের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর যোগ্যতমা সহ-ধর্ম্মিণী শ্রীমতী জাহ্নবী দেবী। এই উৎসবেই দোহার গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস বা শ্রীদাম, এবং বাদক গৌরাঙ্গ দাস ও দেবীদাসের সহযোগিতায় নরোত্তম ঠাকুর কীর্ত্তনের বিধিবদ্ধ ধারার প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে লীলা গান হইবে, তদুচিৎ গৌরচন্দ্র গানের প্রবর্ত্তন হয় এই খেতুরীর মহোৎসবে। নরোত্তম প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তন ধারা গড়েরহাটী ধারা নামে পরিচিত হয়। নরোত্তম-বিলাসে এই উৎসবের ও এই কীর্ত্তনের বিশেষ বর্ণনা আছে।

ভক্তিরত্নাকর দশম তরঙ্গে বর্ণিত আছে—

শ্রীনরোত্তমের প্রিয় পরিকরগণ।
সকলেই গীত নৃত্য বাদ্যে বিচক্ষণ॥

প্রথমেই দেবীদাস মর্দ্দল বামেতে।
করে হস্তাঘাত প্রেমময় শব্দ যাতে॥
অমৃত অক্ষর প্রায় বাদ্য সঞ্চারয়ে।
শ্রীবল্লভদাসাদি সহিত বিস্তারয়ে॥
শ্রীগৌরাঙ্গদাসাদিক মনের উল্লাসে।
কর কাংস্য তালাদি প্রভেদ পরকাশে॥
অনিবদ্ধ নিবদ্ধ গীতের ভেদ দ্বয়।
অনিবদ্ধ গীত গোকুলাদি আলাপয়॥
অনিবদ্ধ গীতে বর্ণন্যাস স্বরালাপ।
আলাপে গোকুল কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ॥

* * * *

শ্রীরাধিকাভাবে মগ্ন গোকুলের চান্দ।
সেই ভাবময় গীত রচনা সুছান্দ॥

* * * *

তদুপরি শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের বিলাস।
গাইবেন মনে এই কৈলা অভিলাষ॥

খেতরীর মহোৎসব হইতে ফিরিয়া কান্দরার মঙ্গলঠাকুর, পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন, মঙ্গলঠাকুরের শিষ্য নৃসিংহ মিত্র ঠাকুর প্রভৃতি মিলিয়া কীর্ত্তনের রাঢ়দেশে প্রচলিত ধারার সংস্কার সাধন করেন। কান্দরা মনোহর-সাহী পরগণার অন্তর্গত বলিয়া এই ধারার নাম হয় মনো-হরসাহী। গড়েরহাটী ধারার বিলম্বিত লয়ের গানকে মনো-হরসাহী ধারায় বহুলাংশে খর্ব্ব করা হয়। মনোহরসাহী সুরে কারুকার্য্যের আধিক্য লক্ষণীয়। হুগলী জেলার রাণীহাটী পরগণার বিপ্রদাস ঘোষ আরো একটী সংক্ষিপ্ত ধারার প্রবর্ত্তন করেন। এই সুর রাণীহাটী নামে পরিচিত। সেরগড় পরগণার গোকুল দাস ঝাড়খণ্ডী সুরের প্রবর্ত্তক। এই সুর মঙ্গলকাব্য গানের সুর। গড়মন্দারণ অঞ্চল হইতে একটী সুরের প্রচলন হয়, নাম মন্দারিণী, এই সুর প্রায় লোপ পাইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণির নির্দ্দেশানুসারে—লীলা কীর্ত্তনের দুইটি বিভাগ, একটি বিভাগের নাম বিপ্রলম্ভ, অন্যটির নাম সম্ভোগ। পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য ও প্রবাস, বিপ্রলম্ভ এই চারি ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্ব রাগাদির আটটি করিয়া

বিভাগ। সম্ভোগও চারিপ্রকার। এই চারি প্রকারেরও আটটি করিয়া বত্রিশ ভেদ আছে।

নায়িকাভেদে চৌষট্টি রসের গান—অভিসারিকা, বাসক সজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা। এই আটটী বিভাগের প্রতি বিভাগে আটটি করিয়া ভাগ ধরিয়া চৌষট্টি হয়। আমি পদাবলী পরিচয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

শুভম্

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

একটি শ্যামল চিন্তা চৈতন্য বিলাসে
নন্দনলোকের দ্বারে উদ্বোধিত প্রাণ,—
বিনম্র বিকেল পায় একটি উচ্ছ্বাসে
স্নিগ্ধ ও শান্তির চোখে সবুজ সন্ধান।

বেদনার হাত ছুঁয়ে মনের দিগন্ত
উদার ঐশ্বর্যপায় সৌন্দর্য শোভনে,
অন্তর যাদের শুধু শুভ বুদ্ধিমন্ত
আবার সেই তো স্থায়ী হবে চিরন্তনে।

সুখ আর দুঃখ নিয়ে মনের উত্তাল
সাগরের ফেনপুঞ্জ স্বভাব সকল
বিস্তৃত সোনালি চরে এ-কাল সে-কাল ;—
জীবনে আনন্দলোক সীমান্ত সম্বল।

মেঘলা আকাশ শুধু বিরহ বিকাশে
আনন্দ-উচ্ছল-রোদ শাশ্বত সুবাসে।

কেন ?

বেণু গঙ্গোপাধ্যায়

টিয়ে-পাখী মাঠে বাতাসের আনাগোনা।
ঝিঙে গাছে ফিঙে দেয় দোল দোল দোলা।
নরম রোদে যে ছড়ানো গলানো সোনা।
চাঁদের আলোয় যেন চাঁদিরূপা গোলা।

খুশী খুশী মন, হাসি হাসি মুখ কারা,
তুলে কাশফুল দ্বারকেশ্বর চরে।
শিউলি ঝরিছে যেনরে খইয়ের ধারা।
ঝরা শিউলিতে কাহারা আঁচল ভরে ?

ঝিনি গুড় গুড় কমল ফুটিয়া উঠে।
বন হ'তে উড়ে উড়ে মৌমাছি আসে।
কানন-সভাতে ছাতার শালিখ জুটে।
টুনটুনি নাচে, ফড়িং লাফায় ঘাসে।

কেন এ সকল ?—আসিবে সারদা মাতা।
বনে মনে আজ তাঁহার আসন পাতা।

বাঙ্গালীর চোখে স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

বিবেকানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনি কায়স্থ সন্তান। জন্মেছিলেন, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। জন্মশতবর্ষপূর্তি হতে আজ প্রায় ৯ মাস প্রতিদিন দেশে বিদেশে বহু স্থানে, গ্রামে-নগরে, তাঁর গুণ কীর্তন করা হচ্ছে। এই গুণকীর্তনের সভায় বহু আয়োজন, তজ্জন্য বহু শ্রম ও উৎসাহ।

এই সব সভায় বলা হচ্ছে—বিবেকানন্দজী (১) ভারতকে স্বাধীন করার জন্য নানা কর্মের সূচনা করেছিলেন, (২) ধর্মের আচারের পরিবর্তে মানুষের সেবাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। (৩) রামকৃষ্ণমিশনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলেই তার নানা প্রশংসনীয় কর্ম আমরা চোখে দেখতে পারছি। (৪) তিনি ভারতে কৃষ্টি ও ধর্মের বৈশিষ্ট্য প্রতীচ্যে প্রচার করেছিলেন এবং তজ্জন্য তথায় শিক্ষিতসমাজের শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন, (৫) বাংলা গদ্যে তিনিই প্রথম কথ্যভাষা চালিয়েছিলেন, (৬) সমাজে নারীজাতির সম্মান প্রতিষ্ঠিত করার তিনিই প্রারম্ভিক বিঘ্নের অপসারণ করেছিলেন।

এই সব কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়ে আমাদের কিছু উপকার নিশ্চিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একটি বিষয়ে আমাদের সতর্ক করেছিলেন। সেই সতর্কবাণী স্মরণীয়—

"আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করিনা; যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করিনা; ভূরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারিনা; আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করিনা।"

যে ভাষায় আমরা বিবেকানন্দজীর প্রশস্তি আজকাল উচ্চারণ করে থাকি—তা হতে মনে হবে যে, তিনি বুঝি চিরদিনই তাঁর কর্মে বাঙ্গালীর কাছে সহায়তা পেয়েছেন, কোন বিঘ্নই আমরা তাঁর সামনে উপস্থিত করিনি। কিন্তু এই ধারণা যে ভুল, তা দেখিয়ে দিলে হয়তো বাঙ্গালীর দৃষ্টির একটা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে এবং সঙ্গত মনে করলে অতঃপর তার পরিবর্তনে ইচ্ছুক হতে পারি।

এখানে কয়েকটি বিবরণ উদ্ধার করছি।

১৮৯৩ সনে স্বামিজী চিকাগো যান, সেখানে ধর্মসভায় যোগ দেওয়া ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। যাঁরা তাঁর যাওয়ার আয়োজন করে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বাঙ্গালীর নাম পাইনে। তিনি কোন পরিচয়পত্র দেশ হতে নিয়ে যান নি। ওদেশের বিশিষ্ট জ্ঞানী, অধ্যাপক রাইট স্বল্প পরিচয়েই মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পরিচয়পত্র দিয়ে সভায় পাঠান। ধর্মসভার কর্তৃপক্ষ তখন ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি এই যুবক সন্ন্যাসীকে চিনেন কিনা। ডাঃ মজুমদার ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি হয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি কেশব সেনের শিষ্য। কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণদেব সদলে বহুবার মিলিত হয়েছেন। এ অবস্থায় বিবেকানন্দজী ডাঃ মজুমদারের পরিচিত হবার কথা। তবু ডাঃ মজুমদার বললেন, "চিনিনে"। মিশনের সাধুরা এখন, এই ঘটনাকে একটা ঈর্ষ্যার উদাহরণ বলে গণ্য করেন।

বাঙ্গালীর ঈর্ষ্যার আরও উদাহরণ আছে। কায়স্থসন্তান নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ হয়েছেন। ইনি হিন্দু ধর্ম-আচার ও সমাজের ব্যাখ্যাতা ও সংস্কারক হয়েছেন, এ অবস্থা বাংলাদেশের অনেক ব্রাহ্মণ চাননি এবং তাদের সঙ্গে অনেক অব্রাহ্মণও মিলিত হয়ে নানা বিরোধী দল গঠন করেছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধাচরণও সামান্য ছিলনা। কিন্তু মিশনের দীক্ষাপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীরা এবং গৃহীভক্তগণ নানারূপ সহায়তা ও আন্দোলন দ্বারা এই বিরোধিতা হ্রাস করতে পেরেছিলেন। এদিকে আর

একটি বিপদ এসে দাঁড়ায়। বাংলা দেশে খবর পৌঁছে যে, স্বামিজী ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক টাকা পাচ্ছেন এবং ভ্রমণকালে বড় বড় হোটেলে থাকছেন! সে দেশে ঠাণ্ডায় বাইরে থাকা যায়না এবং অশ্বেতকায় বলে—যদিও তপস্যার দ্বারা তাঁর বর্ণ খুব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান হয়েছিল—ছোট হোটেলে তাঁকে স্থান দিচ্ছিল না। তাই তিনি ওদেশের বন্ধুদের পরামর্শে বড় হোটেলেই উঠতেন। কিন্তু এই খবর তাঁর বিলাসপ্রবণতার সাক্ষ্য-স্বরূপ হয়ে এদেশে নিন্দিত হতে থাকে। এ নিন্দাও পরে স্তিমিত হয়ে পড়ে তখন, যখন ওদেশের কাগজে কাগজে স্বামিজীর বিশেষ প্রশংসা ও ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হতে থাকে। ওদেশের প্রশংসা শুনলে আমাদের নিন্দা হ্রাস পায়, তখন আমরা সম্বর্ধনার জন্য উদ্যোগ করি—হয়তো সম্বর্ধনার কর্তারাও নিজেরা তখন নিজেদেরও প্রচার চান!

স্বামিজী চিকাগোর ধর্মসভায় যোগদেন ১৮৯৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। প্রায় ৪ বছর পর তিনি ১৮৯৭ সনে স্বদেশে এলে, তাঁকে মহাসমারোহে গ্রহণ করা হয়। যে রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে একদিন রামমোহনের (ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন) ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রতিরোধার্থ ধর্মসভা নামক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল, সেই রাধাকান্ত দেবের বাড়ীর আঙিনায় তাঁরই একজন বংশধরের সভাপতিত্বে ধর্ম ও সমাজসংস্কারক কায়স্থসন্তান স্বামী বিবেকানন্দের সম্বর্ধনা সভা হয়েছিল, ১৮৯৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে।—যখন দেখাগেল যে, এই মানুষটিকে আর ঠেকানো গেল না।

রামকৃষ্ণদেবকে একজন বলেছিলেন, "মহাশয়, গীতা খুব ভাল বই!" ঠাকুর বলেছিলেন "কেন? সাহেবরা বলেছে বুঝি?"

কয়েক জন সাহেব বিবেকানন্দজীর সঙ্গে এদেশে এসেছিলেন। তাঁরাও এই সম্বর্ধনা সভাতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন! তাঁদের জন্য বিলাতী ভোজের ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে বসার জন্য অনেক ভারতীয় ও বিদেশীয় নিমন্ত্রিত ছিলেন! এই ভোজ হতে একটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে—স্বামিজীর ৬ই এপ্রিল ১৮৯৭ তারিখের পত্রে—কুমারী সরলা ঘোষালকে লেখা—

"অনেক পাশ্চাত্য নরনারী ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতীয় ভাবে ভারতীয় ধর্মের মধ্য দিয়া অতি নীচ চণ্ডালাদিরও সেবা করিতে প্রস্তুত আছে। দেশে কয়জনা? আর অর্থবল? আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য—ব্যয় নির্বাহের জন্য কলিকাতাবাসীরা টিকিট বিক্রয় করিয়া লেকচার দেওয়াইলেন এবং তাহাতে সঙ্কুলান না হওয়াতে ৩০০৲ টাকার এক বিল আমার নিকট প্রেরণ করেন।" স্বামিজীর পত্রেই আছে যে—যাহা হউক দেশী ও বিদেশীদের ঐ ভোজের দরুণ ঐ খরচের টাকাটা খবর পেয়ে ঐ বিদেশী ভক্তরাই দিয়ে দিয়েছিলেন।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর রবীন্দ্রসম্বর্ধনার শেষ স্বাদও প্রীতিকর হয়নি। শান্তিনিকেতন আমবাগানে হয় (১৯১৩ খৃষ্টাব্দ) এই সভা। স্পেশাল ট্রেণে করে রবীন্দ্রভক্তরা সেখানে গিয়েছিলেন। গুরুদেবের পরম বন্ধু আচার্য জগদীশ মানপত্র পড়লেন। রবীন্দ্রনাথ যা বললেন, তার মর্ম এই—"এতদিন বাঙালীরা জ্বালিয়েছে। এখন বিদেশ হতে নোবেল প্রাইজ এসেছে, তাই চৈতন্য হয়েছে। তোমাদের মনের এ দৈন্য আমার সহেনা।" সভার দিনও প্রাতে তিনি কটূক্তিপূর্ণ পত্র পেয়েছিলেন।

অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, নোবেল পুরস্কার পাবার পরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথের খানিকটা গদ্য লেখা তুলে দিয়ে বলা হয়েছিল, বিশুদ্ধ বাংলায় লেখ—rewrite into chaste Bengali. স্বামীজীও সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন, বিদেশে সম্মান ও অর্থ পাবার পর। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগরচরিত হতেই আবার উদ্ধার কর্চ্ছি। "পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিকস্ এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কার্যহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল।"

এই ধিক্কার বিবেকানন্দজীরও ছিল কিনা সঠিক বলতে পারিনা। তবে জানি, চিকাগো ধর্মসভার পর যে মাত্র ৯ বৎসর তিনি বেঁচেছিলেন তার মধ্যে দুই বারে গড়ে প্রায় ২॥ বছর, ও ১॥ বছর, মোট ৪ বছর স্বদেশের

নানাস্থানে ছিলেন। তার আবার অনেক সময় পর্বতে বা অল্পবসতির স্থানে। বাকী ৫ বৎসর বিদেশে। মৃত্যুর কিছু আগে তিনি বেলুড়মঠে নাকি গুরুভ্রাতাদের বলেছিলেন, "চারদিকে অন্নকষ্টের বার্তা। মঠের অনেক টাকার সম্পত্তি। সব দিয়ে দরিদ্রের অন্নকষ্ট নিবারণ কর। দেবতার পূজা এখন থাক।"

লক্ষ্য করা যাচ্ছে, স্বামিজী স্বগোষ্ঠীকে রক্ষা করাকেই একমাত্র কাম্য বলে মনে করেন নি। তিনি মানুষের জাগতিক প্রয়োজনকে মর্যাদা দিয়েছিলেন। সেই মর্যাদা তাঁকে স্বপ্রতিষ্ঠিত মিশনের প্রতিও মমতাপন্ন করেনি।

কিন্তু আমাদের মমতা সর্ববিষয়ে আমাদের ঈর্ষান্বিত করে। বাঙ্গালী চিন্তাশীল, বহুকর্মে তার কীর্তি দীপ্যমান্। বাঙ্গালীর স্বার্থত্যাগও বিস্মৃত হবার নয়। বিদ্যাসাগরের ধিক্কার আর সর্বথা আমাদের প্রাপ্য নয়।

কিন্তু ঈর্ষা। ঈর্ষা তার একমন, এক প্রাণ হতে বাধা দেয়। তাই যে পথে গ্রামের দলাদলি আমাদের সমাজ-জীবনে ঘুণ ধরিয়েছিল, সেই পথেই রাজনীতি ক্ষেত্রে দলাদলিতে প্রতিটি দল এত দুর্বল হয়েছিল যে, যে-বাঙ্গালী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল তাঁরা পেছিয়ে পড়লেন। যারা এগিয়ে গিয়েছিলেন, এখন তাঁদের কাছে রাষ্ট্রস্নেহের প্রার্থনা নিয়ে যাওয়া ছাড়া বাঙ্গালীর অন্য গতি নেই। সে প্রার্থনাও যদি মিলিত কণ্ঠে হত! এখনও ঈর্ষা-জনিত সেই দলাদলিই চলছে।

বাংলা দেশের মানুষ আজ নানাকারণে দিন দিন ক্লিষ্ট হচ্ছে। যাঁরা এই ভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাঁদের সংখ্যাই বেশী। এর ছবি সাহিত্যে এসেছে। কিন্তু ফল দেখা যাচ্ছে না বিশেষ। মনে হচ্ছে কোথায় যেন ফাঁক আছে।

বিদেশীদের দেখাদেখি কি আমরা জন্মশতবর্ষ-পূর্তি উৎসব করছি, সুভেনির বই বার করছি, তাতে খ্যাতনামা মানুষের লেখা ছাপছি, সেই খ্যাতনামা মানুষটি আবার অনেক সময়ই নিজের লেখা ছাড়া আর কিছু পড়ছেন না? এসব লেখা কারও মনে কোন কর্মের সূচনা করেছে বলে বোধ হচ্ছেনা। মনে হচ্ছে, সমস্যাকে এড়িয়ে আমরা কেবল পালিয়ে (escape) গিয়ে সুখ পাবার আশা করছি।

প্রার্থনা করি, আমরা বাঙ্গালীরা যেন এখন স্বামিজীর জীবনকে সেই চোখে দেখি, যে চোখে তিনি ভারতবাসীর অন্নাভাবের দুঃখ মোচনের কাজকে পুরোভাগে স্থান দিয়েছিলেন। কেন স্থান দিয়েছিলেন, দৈনন্দিন জীবনের সংঘাতে আজ অধিকাংশ মানুষের কাছে তা স্পষ্ট হয়েছে। বিবেকানন্দের সাহিত্য বিরাট সমুদ্র। সে সমুদ্র হতে বাঙ্গালী জ্ঞানালোকের মুক্তা তুলে যদি তার আলোতে একটা সহজ সরল কর্মানুযায়ী আয়ব্যয়ের সমতারক্ষক অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি খুঁজে পায়, তবে তার বিবেকানন্দের জীবনচর্চা সার্থক হবে।

কোজাগরী লক্ষ্মী

কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকে চাঁদের রোশনায়েতে আঁধার রাতের চেতন হরে,
লক্ষ মতির ঝরণা নামে আকাশ বেয়ে ধরার পরে।
নদীর বুকে একটি দুটি
কুমুদ কলি উঠ্‌লো ফুটি,
রূপের ছটা উথলে পড়ে পল্লী মায়ের জীর্ণ দ্বারে।

অমর লোকের কোন দেবী গো আজকে
ধরায় চরণ দিলে,
ধানের ক্ষেতে লুটিয়ে আঁচল সাজি ভরে ধান্য নিলে!

বনের কুসুম রাতের তারা,
অবাক হ'য়ে চাইছে তারা,
চরণ তোমার পূজবে বলে জাগছে রাতে সবাই মিলে।

আকাশ ধরা আলোয় আলো ঐযে মায়ের আননখানি
ধরার বুকে পড়ছে ঝরে স্নিগ্ধ মুখের অভয় বাণী;
কাশের ক্ষেতে চামর ঢুলে
শিউলি বধূ ঘোমটা খুলে,
ওগো, দেখবে যদি বাইরে এস কোজাগরী লক্ষ্মীরাণী।
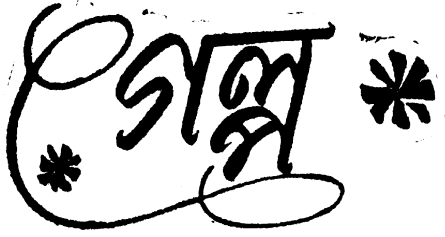
অনিলকুমার ভট্টাচার্য

অঙ্গনা তেমনিভাবেই কপালটা টিপে দিচ্ছিল কল্যাণাক্ষের। দু'পাশের রগের শিরায় হাত দিয়ে সত্যিই যেন অনুভব করলে—শিরাগুলি ফুলো ফুলো আর তা দপ্ দপ্ করছে। গাটাও যেন একটু গস গস করছে—একটু হয়তো জরও এসেছে।

'টেম্পারেচারটা নিয়ে দেখবো একবার?'

'না। হয়তো সামান্য জর।'

'তাহলে না হয় ডাক্তার ডাকি! যদি বেড়ে যায়! কী জানি বাপু দিনকাল ভালো নয়।'

অঙ্গনার এ-কথার কোনো গুরুত্বই দিলোনা কল্যাণাক্ষ। বিছানায় শুয়ে শুশ্রূষারত অঙ্গনার সে সান্নিধ্য অনুভব করছিলো। অঙ্গনা উঠতে যাচ্ছিল।

কল্যাণাক্ষ বাধা দিলে।

'এক্ষুণি আসছি!'

'কেন?'

'থার্মোমেটারটা নিয়ে আসি। জরটা এলো কিনা দেখা দরকার।'

কল্যাণাক্ষ বললে 'না,ঠাণ্ডা-লাগায় একটু জর হয়তো।' তারচেয়ে তুমি চুলটা একটু টেনে দাও। মাথার যন্ত্রণাটাই কষ্ট দিচ্ছে বেশি।

অঙ্গনা স্বামীর রুক্ষ চুলগুলির মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিতে লাগলো। কল্যাণাক্ষ আরও তার ঘন সন্নিবেশে সরে এলো—আরও আরও।

'কী দেখছো?'

'দেখছি তোমাকে।'

'রোজই তো দেখো।'

'আজকে আরো কিছু দেখতে চাইছি!'

'বৌমা!'—ডাক এলো রান্নাঘর থেকে! অঙ্গনা উঠে পড়লো—'যাই, মা ডাকছেন।'

'এক্ষুণি এসো কিন্তু!'

অঙ্গনা আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকালে, 'ভর দুপুরে কী করে শাশুড়িকে বলবো যে তাঁর কচি খোকা বৌকে ছাড়তে চাইছে না!'

'বলবে জর। বড় ছটফট করছেন।

'যদি এসে গায়ে হাত দিয়ে দেখেন—মায়ের মন তো! আমার থেকেও হয়তো ব্যস্ত হয়ে উঠবেন।'

'বলবে মাথার যন্ত্রণা খুব। তা হলে তো সত্যি কথাই বলা হবে!'

'আচ্ছা, তাই বলবো।' অঙ্গনা উঠে রান্নাঘরে গেলো।

কল্যাণাক্ষ সত্যিই অসুস্থ বোধ করছিলো।

সকাল থেকেই বৃষ্টি সুরু হয়েছে। ভাদ্র মাসের বৃষ্টি। ক'দিন ধরে ভ্যাপ্সা গরমের পর আকাশ জুড়ে কালো মেঘ। সকাল থেকেই ঝম ঝম করে বৃষ্টি। বেশ কিছুক্ষণ বৃষ্টি।

কল্যাণাক্ষের শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিলো, মাথাটাও ধরেছে,—কপালের দুটি রগ টিপ টিপ করছে।

বললে—আজ আর অপিস যাবো না।'

অঙ্গনা হাসলে, 'কেন বৃষ্টি তো থেমে গেলো এইবার।'

'তা যাক্! শরীরটা ভালো লাগছে না। মাথা ধরেছে, বোধ হয় জর আসবে!'

'বোধ হয়? স্পষ্ট করে এখনো বুঝতে পারছো না!' স্ত্রীর কথায় রেগে গেলো কল্যাণাক্ষ 'মানে?'

'মানে, সারা দুপুর জালাবে আর কী!'

'জালাতন বোধ করলে আমার ঘরে তোমার আসবার দরকার নেই। কাজ-কর্ম সেরে মার কাছেই থেকো তুমি।'

কল্যাণাক্ষ বিরস মুখে নিজের ঘরের বিছানায় আশ্রয় নিলে।

অঙ্গনা অবিশ্যি মুখেই বলেছে, অন্তরে কিন্তু সে খুসিই হয়েছে। রোজকার জীবনের একটি ব্যতিক্রমের দিন।

ছেলেমেয়ে দুটিকে বৃষ্টি ধরতে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে এসে সে বসলো। কপালটায় হাত দিয়ে দেখলে সত্যিই শিরা দপ্‌ দপ্‌ করছে—গাটাও গস্‌গসে। একটু হয়তো চিন্তিতও হয়ে উঠলো।

শাশুড়ি ডেকেছিলেন রান্নাঘরে ছেলের খবর নিতে, 'হ্যা বৌমা, কল্যাণের জ্বর কী বেশি ?'

'না।'

'তবে যে অপিস গেলো না।'

'বড্ড মাথা ধরেছে ; আর হয়তো জ্বরও আসছে।'

'তা কী খাবে কল্যাণ ?'

'পাউরুটি আনতে দিয়েছি, আর ডিম। ডিমের টোষ্ট খেতে তো খুব ভালোবাসেন।'

'জ্বরে ওইসব দেবে ?

'জ্বর তো তেমন ফুটে বেরোয় নি।'

'তা হলেও বাপু বুঝেসুঝে দেখো।'

বুঝে সুঝেই ব্যবস্থা করলে অঙ্গনা। পাউরুটিগুলি স্লাইস করে কেটে ডিমের গোলা মাখিয়ে মাখন দিয়ে বেশ কড়া কড়া করে ভাজলে, চায়ের সঙ্গে একটু ওভ্যালটিনও মিশিয়ে দিলে।

স্বামীকে খাইয়ে, রান্নাঘরের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে, নিজে দুটি খেয়ে শাশুড়িকে খাইয়ে সে আবার স্বামীর ঘরে ঢুকলো।

কল্যাণাক্ষ বললে, 'দরজাটা বন্ধই করে দাও না কেন !'

'তোমার কী ভিমরতি ধরেছে ? ঠিক দুপুর বেলা !'

'তাতে কী হয়েছে ? আলো আসছে বড়ো—ওতে মাথা আরও ধরে !'

তবুও দিনের বেলায় বেহায়ার মতন অমন দরজায় খিল দেওয়া যায় না।'

'তা বলে আরো মাথা ধরাবো ?'

'দিন দিন যে কী ছেলেমানুষ হচ্ছো !'—অঙ্গনা উঠে ঘরের দরজার পর্দাটা ভালো করে টেনে দিলে।

'তবু দরজাটা বন্ধ করলে না ?'

'না। ওটা পারবো না। মা হয়তো আসতে পারেন। এসে দেখবেন দরজায় খিল। না, লক্ষ্মীটি !'

অগত্যা কল্যাণাক্ষকে চুপ করতে হলো।

তবুও অঙ্গনা কল্যাণাক্ষের অত্যন্ত কাছেই বসেছিলো। অত্যন্ত অনুরাগের সঙ্গেই স্বামীর কপালে—মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো। চুলগুলির মধ্যে আস্তে আস্তে অঙ্গুলি সঞ্চালন করছিলো।

রান্নাঘরের ময়লা সাড়িখানি স্বামীর কথায় ছেড়েও ফেলেছিলো—গোলাপী পাউডার পাফের ছোঁওয়াও মুখে লাগিয়েছিলো। মাথার চুলগুলিকেও একটু বিন্যস্ত করে নিয়েছিলো। বুকের আঁচলটাও ঈষৎ শ্লথ—গায়ের ব্লাউজ-টার রঙটিও মানানসই। স্বভাবতঃ এমন সাজগোজ করা ইদানিং আর হয়ে ওঠে না।

তবুও কল্যাণাক্ষের মন ভরছে না। কোথাও যেন একটু ফাঁক থেকে গেছে—কোথাও যেন একটা শূন্যতা, একটা অভাববোধ মনের মধ্যে তার উঁকিঝুঁকি মারছে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। সকালের ঘন মেঘের চিহ্ন-মাত্র এখন আর আকাশে নেই। বাইরে ভাদ্রের দুপুরের প্রখর রোদ। মাথার ওপর বন বন করে ইলেকট্রিক পাখা ঘুরছে। স্বস্তি নেই। না, কিছুতেই স্বস্তি নেই।

ছটফট করছিলো কল্যাণাক্ষ।

'কী হচ্ছে কী ?'

'ভীষণ মাথার যন্ত্রণা !'

একটু ঘুমোও দিকিন্‌।'

'ঘুম হলে তবে তো !'

কল্যাণাক্ষের চোখে ঘুম নেই। ঘড়িতে বারোটা, একটা, বাজলো। প্রায় দুটো বাজে।

অঙ্গনার চোখ দুটি জড়িয়ে আসছে ঘুমে। কোন সকালে বিছানা ছেড়ে উঠেছে সে। ছেলে মেয়ে দুটির পড়াশুনার একটু তদ্বির করা। বৃষ্টির জন্যে ঝি আজ সকালে আসতে পারেনি। ভিজে বাসন-কোসন মাজা, বাটনা বাটা—রান্না-বান্না সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম

করা। তবুও বুড়ো শাশুড়ি রান্নার কাজে অনেক সাহায্য করেছেন। কিন্তু সংসারে কাজ কী কম ?

অঙ্গনার চোখ ঘুমে ভরে আসছে। কল্যাণাক্ষের শয্যার পাশেই গাটা একটু এলিয়ে দিলে সে। তারপরই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো সে।

কিছুটা ধাক্কাধাক্কি করলে কল্যাণাক্ষ।

অঙ্গনা তাতে বিরক্ত হয়েই ওঠে, 'এমন কী হয়েছে তোমার ? অত অসহ্য হলে কী চলে ?'

'অসহ্য হলাম কোথায় ? অসুখ তো আমার হাত-ধরা নয় !'

'অসুখই বা কোথায় ?'—ঘুমের ঘোরেই অঙ্গনা বললে।

'কী অসুখ করে নি, মিথ্যে মিথ্যে অসুখের অভিনয় করছি আমি ?'

সে-কথার জবাব আর অঙ্গনা দিলে না। এখুনি আবার তাকে উঠতে হবে। চারটা বাজলে ছেলে মেয়েরা স্কুল থেকে এসে পৌছোবে,—হাঁক-ডাক সুরু করবে। ঝি যদি আবার এ-বেলাতেও কামাই করে, আবার সেই জড়ো-করা এঁটো বাসনের গোছা নিয়ে কলঘরে ঢুকতে হবে। রাত্রের জন্যে আবার সেই রান্নাবান্না। দুপুরে একটু না গড়িয়ে নিলে অঙ্গনার দেহই বা সুস্থ থাকে কেমন করে ?

অঙ্গনা সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলো। দুপুরের পাতলা ঘুম নয়। কল্যাণাক্ষ উঠে নিজেই টেম্পারেচার নিলে—না জ্বর নয় ! মাথাটা কেবল টিপ টিপ করছে—কপালের রগ দুটির দপ্‌দপানির ভাব কিছুতেই যেন যেতে চায় না।

ঘড়িতে তিনটে বাজতে কুড়ি মিনিট বাকী।

অঙ্গনা ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে। না, অসহ্য লাগছে কল্যাণাক্ষের।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে জামা-কাপড় ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়লো হঠাৎ।

কোথায় যাবে সে ? ভাদ্রের বেলা—এখনো বেশ চড়চড়ে রোদ। বন্ধু-বান্ধবরা সবাই কাজ-কর্মে—যে যার অপিসে। রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সিই নিলো সে।

টালিগঞ্জ থেকে চৌরঙ্গীর পথ। সিনেমার ম্যাটিনী শো আরম্ভ হয়ে গেছে। তা যাক্‌। তবুও আসল বই দেখা যাবে এখনো। ইণ্টারভ্যালের পরে আসল ছবি আরম্ভ হয়। একটা বিলিতি ছবি—অসামাজিক প্রণয়ের তীব্র উত্তেজনা, শুধুমাত্র বয়স্কদের জন্যে। কল্যাণাক্ষ ঢুকে পড়লো মেট্রো সিনেমায়। দুপুর বেলাতেও ভিড়ের অন্ত নেই। কলেজ পালানো ছেলে-মেয়েদের মেলা বসেছে যেন !

অগত্যা চড়া দামের টিকিট কিনেই কল্যাণাক্ষ ঢুকে পড়লো সিনেমায়।

সামনের সীটে একজোড়া তরুণ-তরুণী। আবছা অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করা যায় না। হয়তো স্বামী-স্ত্রীই হবে। তবু অনুমান করা যাচ্ছিল—দুজনে দুজনের খুবই কাছাকাছি হয়েছে। সীটের হাতলের ব্যবধান সরে গেছে। কনুইয়ে কনুই ঠেকিয়ে ছবির নায়ক-নায়িকার সঙ্গে বুঝিবা একাত্ম তারা।

ফিসফিস করে মেয়েটি বললে, 'আজকের দিনটি অনেক দিন মনে থাকবে। কলেজ পালিয়ে তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখা।'

ছেলেটি বললে, আমারও। সকালের বৃষ্টি দেখেই তোমার কথা মনে পড়লো। তোমার সঙ্গ কামনায় অপিস কামাই করলাম।

'এই যে বলেছিলে অপিসে খুব জরুরি কাজের তাগিদ !'

'হ্যাঁ। কাজের চাপ খুবই বেশি। তার ওপর নতুন অফিসার হয়েছি তো !'

'তবে যে কামাই করলে ?

'তোমার চেয়ে কী অপিস বড়ো ?'

অন্ধকারে দেখা গেলো না ; কিন্তু কল্যাণাক্ষ নিশ্চয়ই বুঝলে—মেয়েটির চোখ দুটো ছেলেটির এ-কথায় নিশ্চয়ই চকচকে হয়ে উঠেছে।

মেয়েটি আবার ফিসফিস করে বলে উঠলো, 'কিন্তু তোমাকে যদি না পাই ?'

'হঠাৎ এ কথা বলছো কেন ?'—ছেলেটি মৃদুস্বরে বললে।

'ভবিতব্যের কথা কিছু কী বলা যায় ?'

'ভবিতব্য তো আমাদেরই হাতে !'

'তবু বলা যায় না। মন তো, মতিভ্রমও হয় !'

'আমার দিক থেকে সে সম্ভাবনা নেই।'

'ধরো, যদি আমার দিক থেকেই হয়? আমি তো আর তোমার মতন স্বাধীন নই!'

'ওকথা বলো না সু!' - ছেলেটি'র গলা ভারি ভারি ঠেকছে।

'এমন তো হতেও দেখি—দু'পক্ষের একপক্ষ শেষে পেছিয়ে গেলো' – মেয়েটির গলায় আর্দ্রস্বর।

'তা হলে আজকের দিনটিকে স্মরণ করেই সারাজীবন কাটিয়ে দেবো।'—ছেলেটি দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলো।

'পারবে তো?'

'নিশ্চয়ই!'

হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে উঠলো কল্যাণাক্ষ।

আষাঢ়ের মেঘে প্রথম বর্ষার আমেজ। জলে ভিজে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিলো। মাথাটাও টিপ টিপ করে ধরেছে যেন। ট্রাম থেকে নেমে অপিসের রাস্তাই ধরেছিলো সে। কেমন যেন মনে হলো—নাই বা গেলো আজ সে অফিসে।

অঙ্গনার মন যেন ছটফট করছিলো।

'এ কী অপিস যাও নি?'

'না।'

'হঠাৎ কী মনে করে?'

'তোমায় জন্যেই শুধু!'

ভালোই হয়েছে। বাবা অপিসে। মা গেলেন বাপের বাড়ী, ভাই-বোনেরা ইস্কুলে।

'তুমি কলেজ যাও নি?'

'না, বাড়ির চার্জে আজ আমি। দাদুর অসুখের খবরে মা মামার বাড়ি। অপিস থেকে ফিরবার পথে বাবা মাকে নিয়ে আসবেন।

বেলা এগারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত টিপে-টিপে মাথা-ধরার পরিচর্যা করেছিলো অঙ্গনা নিজেই।

'আঃ, মাথাটা ছাড়লো। তোমার হাতে যেন জাদু আছে।'

'আর একটা হাতের জাদু কিন্তু একদিন এ-হাতকে ভুলিয়ে দূরে সরিয়ে রাখবে।'

'কক্ষণো না।'

'তবু ভবিতব্যের কথা কী কিছু বলা যায়?'

'সে ভবিতব্য তো আমাদের হাতেই।'

'তবুও!'

'তবু ও কেন অঙ্গনা। এমন অলক্ষুণে কথা কেন মনে আনছো?' অঙ্গনার চোখ দুটি চিক চিক করছিলো। অন্ধকার নয়, প্রকাশ্য দিবালোকে সে-চোখ দুটিকে পরম আশ্বাসে ভরিয়ে তুলেছিলো কল্যাণাক্ষ।

সিনেমার আলো জলে উঠলো। ছবি শেষ হয়ে গেছে।

সন্ধ্যেবেলা চা-জল-খাবার আর পুরো কয়েক হাত ব্রিজ খেলে বন্ধু-বান্ধবদের সান্নিধ্যে কল্যাণাক্ষের মনের গ্লানি কেটে গেলো। আপিস একদিন কামাইয়ের আর মনোবেদনা নেই তার। দিনটা একেবারে অসার্থক নয়।

ছুটির দিন ছাড়া এমন অবকাশ আর বড়ো একটা পাওয়া যায় না। আজ নিজেই উদ্যোগী হয়ে পুরোনো বন্ধুদের আড্ডায় মিশেছে।

অফিস থেকে বাড়ি—ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার একটু তাগিদ করা, আর সংসারের তৈজসপত্তর কেনা, এই নিয়েই অধিকাংশ দিন কেটে যায়। আজ তবু ব্যতিক্রম।

বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে, স্ত্রৈণ!

রাত দশটা বেজে গিয়েছে। বাড়ি ফেরার পথে ঝির-ঝিরে বাতাস বইছে। তাসখেলা কল্যাণাক্ষের বড়ো প্রিয়। আর আজ প্রথম থেকেই হাত পেয়েছে ভালো। ফুরফুরে বাতাসে মনটা ফুরফুর করে উঠলো। মাথা ধরাটাও এখন আর নেই।

বাড়ির কাছে আসতেই মনটা কেমন যেন আবার অস্বস্তিতে ভরে উঠলো। তাসখেলার ওপর বড়ো বিরূপ অঙ্গনা। সে বলে, জুয়া খেলা। ফ্ল্যাশের বোর্ডকে অত্যন্ত ঘৃণা করে অঙ্গনা। আর একা একা সিনেমা দেখা!—দু'টিই গুরুতর অপরাধ।

আবার মাথাটা টিপটিপ করে ধরে উঠলো কল্যাণাক্ষের—গায়ে জ্বর জ্বর ভাব।

পাড়ার ডিসপেনসারিটা এখনো খোলা রয়েছে। ভাগ্যিস খোলা রয়েছে এখনো। একশিশি ওষুধ নিয়ে কল্যাণাক্ষ ঢুকলো বাড়িতে—সত্যিই তার জ্বর এসেছে।

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস

কৃষ্ণচন্দ্র দে

উনিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলা উপন্যাসের গোড়া পত্তন হল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা তখন সম্পূর্ণভাবে ইংরেজের হস্তগত। সমাজ ও শিক্ষার ব্যবস্থা কিভাবে কোন্ পথে চালালে জাতিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে দেশকে পরাধীনতা মুক্ত করা যাবে তাই ছিল তখনকার ঔপন্যাসিকদের একমাত্র চিন্তা।

ইংরেজের কঠোর শাসনে যখন অজস্র রকমের গৃহ-শিল্পের কেন্দ্রগুলি ভেঙে পড়ল, যখন সাম্রাজ্যবাদের যূপকাষ্ঠে বলি হল সহস্র নিরীহ প্রাণীর, যখন পুলিসের সঙ্গীণের সামনে অসহায় বিক্ষিপ্ত জনসাধারণ আত্মসমর্পণ করল, তারপর থেকে শুরু হল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের। বঙ্কিমী উপন্যাস থেকেই প্রথম স্বেচ্ছা-প্রণোদিত প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। রাধারাণী, রজনী প্রভৃতি উপন্যাস-গুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র জাতির সামনে তুলে ধরেছিলেন প্রেমের প্রতিচ্ছবি।

জনপ্রিয় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র শুধু বিদ্রোহী সাহিত্যিকই ছিলেন না, তিনি সমকালীন অবস্থাকে উপলব্ধি ক'রে মানবমনের বিশিষ্ট বৃত্তিগুলিকে আশ্রয় করে মধ্যবিত্তের সামাজিক চিত্রগুলিকে আবেগের সংহত রূপদানে রূপায়িত করে দাঁড় করাতেন আসামীর মঞ্চে। তাঁর বাচনভঙ্গী ও ভাষারীতিতে ছিল উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য। তাঁর প্রতিটি উপন্যাসের কাহিনী, ঘটনা, রচনাবিন্যাস ও আবেগের উদ্বেল তরঙ্গমালা তরঙ্গায়িত করে তুলেছে বাস্তবের মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিটি মানুষকে।

বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস। ওপরে উপন্যাসের গোড়াপত্তন সামান্য কিছু আলোচনার পর এখানে সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হল। সাম্প্রতিক বলতে এই প্রবন্ধে আলোচিত হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে।

পরিবর্তনশীল জগৎ। মানুষের জীবনধারার গতিও পরিবর্তনশীল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনধারার পরিবর্তন আসে। দেশে যখন এইরূপ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয় তখনই ঔপন্যাসিকরা সেই পথের সন্ধান করেন, যেপথে মানুষের জীবনযাত্রা পরিচালিত করলে দেশের মানুষ সঙ্কটাপন্ন বিভিন্ন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। তাঁরা সেই পথেরই সন্ধানে লেখনী ধারণ করেন; যে পথের সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করলে মানুষ দেশকে সেই বিপর্যয় অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারে।

ঔপন্যাসিকরা হচ্ছেন সর্বত্রচারী। কারণ, একটি উপন্যাস সাহিত্যশিল্পের সব শাখাগুলিকেই বহন করে। কবিত্ব, নাট্যরস, কাহিনীরস প্রভৃতি সকলকে নিয়েই উপন্যাসকার রচিত করেন তাঁদের উপন্যাস। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পাঠককেও হতে হয় সর্বরস ভোক্তা।

মানব জীবনের সকল অবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে আছে উপন্যাস। জীবনের সঙ্গে উপন্যাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই নিবিড় সম্পর্ক সম্বন্ধে হেন্‌রি জেম্‌স্ তাঁর সুবিখ্যাত Art of Fiction… ..প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

"As people feel life, so they will feel the art that is most closely related to it. This closeness of relation is what we should never forget in talking of effort of the novel."

তাই জনসাধারণের একমাত্র কাম্য হচ্ছে উপন্যাসের মধ্যে জীবনের সামগ্রিক রূপের সন্ধান করা। সমাজ এবং সমাজবিধৃত মানবজীবনই হচ্ছে উপন্যাসের উপাদান। আর এই জনসাধারণ হচ্ছে তাঁরাই—যাঁরা "ভোটযুদ্ধে ব্যস্ত রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ে উদ্যোগী বণিকশ্রেণী, শুভ-

✻
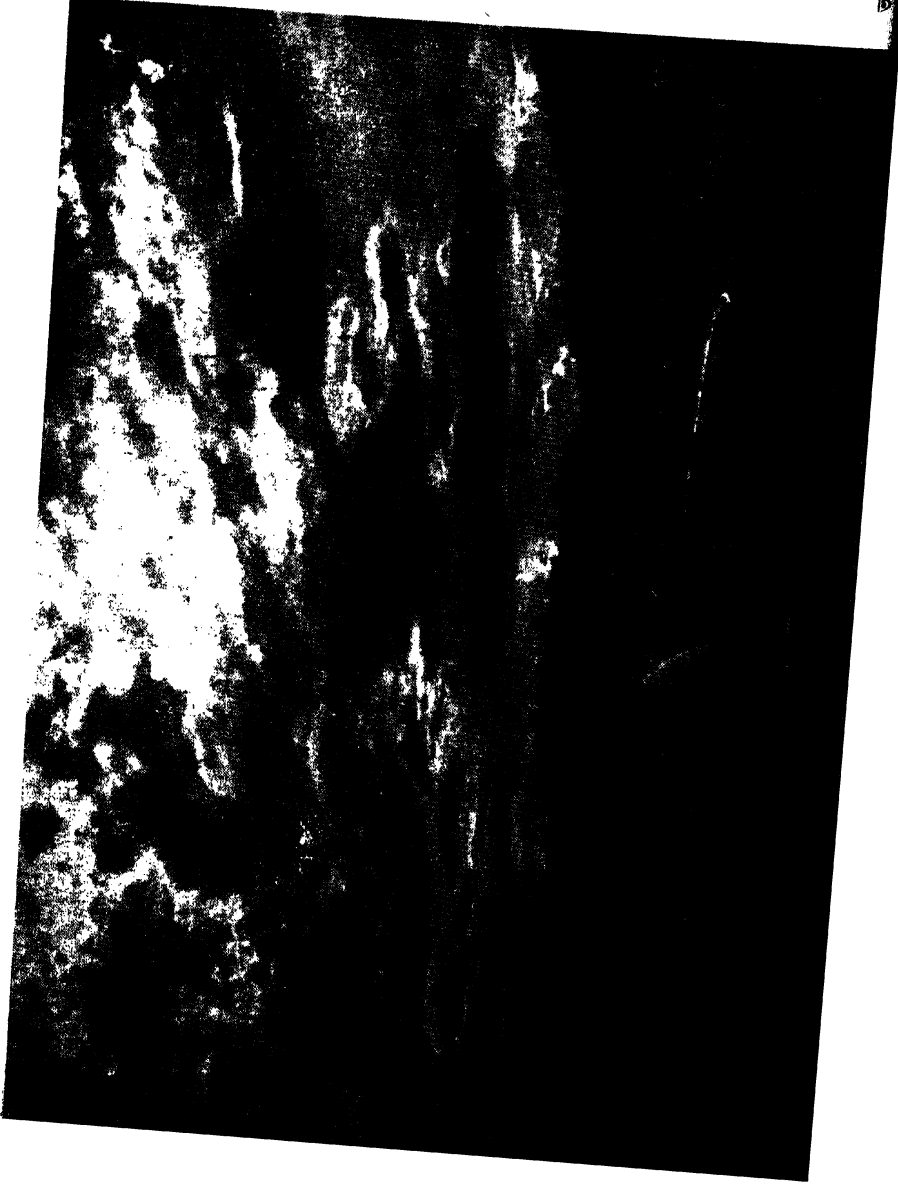
মেঘলা দিনে

✻

শিল্পী : বিমল সরকার

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

নীতিবোধে আস্থাবান ধর্মপ্রচারক, দুঃসাহসী ভ্রমণকারী, জমিদারী নিয়ে ব্যস্ত গ্রামীণ ভদ্রলোক, সেতু, পথ, খাল নির্মাণে অগ্রণী কারুবিদ, সামাজিক স্বভাবসম্পন্না মহিলা-চিকিৎসক, আইনজীবী, নাবিক, দোকানদার, সৈনিক।...এ যুগের লেখকেরও কাজ ছিল তাই কর্মিষ্ঠ বহুমুখী আশাশীল এই সাধারণ মানুষের জীবনকে রূপায়িত করা। ১

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, গণবিক্ষোভ ও দেশবিভাগ-জনিত স্বাধীনতায় যেমন জনমানব ছিল খণ্ডিত, তেমনি শিল্পী মানসের বৃহৎ অংশেও ছিল অনুরূপ বিহ্বলতা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিকগণের লেখনীতে সমৃদ্ধ হ'ল বাংলা উপন্যাস। জনসাধারণও পথের সন্ধান পেল।

এই যুদ্ধকালীন অবস্থার পর বাংলাদেশ আর এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। সুরু হল সাম্প্রদায়িকতা। জনচিত্তে নেমে এল মূল্যবোধ বিনষ্টির দুর্দ্দিন। একদিকে চলেছে হানাহানি, আর অপরদিকে চলেছে বাংলাদেশের গ্রামজীবনকে নিয়ে টানাটানি। ফলে দেখা দিল বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত সমাজে অর্থনৈতিক দুরবস্থা। এই অর্থনৈতিক সংকটে ভাঙতে শুরু করল সমাজের সতীত্ব—নারীত্ব আর মাতৃত্ব।

এই সময়ের ঔপন্যাসিকগণের উপন্যাসগুলির মধ্যে দুটি রূপের সৃষ্টি হল। একটি হল, জীবনের বিশাল ভাঙা-গড়াকে দ্বন্দ্বমূলক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসে প্রতিষ্ঠা করা, আর অপরটি হল জাতীয় কোন সংকটকালীন অবস্থার পর নাগরিক জীবনের অস্তিত্ব ও যন্ত্রণা-বিদ্ধ মানব-চেতনাকে সমগ্রভাবে উপন্যাসে ব্যবহার করা।

অতীত ইতিহাসকে আশ্রয় করে লেখনী ধারণ করলেন সমরেশ বসু, বিমল মিত্র, প্রমুখ ঔপন্যাসিকগণ। বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' উল্লেখযোগ্য। কর্মিষ্ঠ মানুষ—শ্রান্তিতে, ক্লান্তিতে, অবসাদে অপরূপ, আকাংক্ষায় দুর্মর—এইটুকু সম্বল করেই সমরেশ বসু 'গঙ্গা' উপন্যাসখানি লিখেছিলেন।

অজ্ঞাতপূর্ব আঞ্চলিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে লিখলেন ঔপন্যাসিক। সতীনাথ ভাদুড়ী, অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রভৃতি ঔপন্যাসিকগণ এসম্বন্ধে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' সাম্প্রতিক সাহিত্যে তুলনারহিত। এই উপন্যাসখানিই সতীনাথ ভাদুড়ীর লেখনী শক্তির পরিচয় বহন করে।

মধ্যবিত্ত জীবনের ভাঙন-ভিত্তিক নিয়ে রচনা করলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ঔপন্যাসিকগণ। 'বারো ঘর এক উঠোন', 'মোমের পুতুল' 'চেনা মহল' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি এঁদের পরিচয় বহন করে। এছাড়া নতুন রীতি-চেতনাপ্রবাহ বহন করে আনলেন বিমল কর, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকবৃন্দ—আর বিশাল দ্বন্দ্বময় জীবন-ভিত্তিক ও এপিক-লক্ষ্য রচনা করলেন অমিয় ভূষণ মজুমদার, অসীম রায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ ঔপন্যাসিকগণ।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের অগ্রনায়ক ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় বাস্তববাদী না রোমান্টিক সে প্রশ্নের সমাধা না করেও বলা যায় তিনি মানব-দরদী। কারণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তরঙ্গভঙ্গ তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে রাজনীতি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, সন্দীপনপাঠশালা, মন্বন্তর প্রভৃতি উপন্যাসগুলি বাংলা দেশের এক বিরাট ঐতিহ্য।

অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মধ্যে দিয়ে প্রমথ চৌধুরী তাঁর উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন জাতি কুল-মান ইত্যাদি সামাজিক ঘটনাগুলি। 'আহুতি' 'বড়বাবুর বড়দিন' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীন চিন্তার শক্তিশালী ঐতিহ্য বহন করে।

শুভনীতিবোধে আস্থাবান্ ধর্মপ্রচারক হিসাবে ঔপন্যাসিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত চিরস্মরণীয়। দ্বন্দ্ব-আঘাতে যখন মানুষের মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে চঞ্চলমতি হয়, তখন ধর্মের প্রতি একমাত্র আস্থা রেখে ধীর ও মন্থরগতিতে

পাদটীকা—১। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। পৃঃ ১২।

অগ্রসর হওয়া মানুষের কাজ সেদিক দিয়ে 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' বাংলাসাহিত্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

একদিকে ভোটযুদ্ধে ব্যস্ত রাজনীতিবিদ্‌দের জীবনের এক অধ্যায় নিয়ে 'মিছিল' উপন্যাস লিখলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, আর অপরদিকে লিখলেন কদর্য পারিবারিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে মানব জীবনের দ্বন্দ্ব নিয়ে 'উপনয়ন' উপন্যাসখানি।

প্রকৃতি-প্রিয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের মধ্যে ফুটিয়ে তুললেন একটি সামাজিক চিত্র—যা তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি-সমূহের আদর্শীকৃত রূপ।

বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সাহিত্যিক বিষ্ণু দে বলেছিলেন—'বর্তমান যদি কিছুমাত্র সুস্থ হত, তাহলে হয়ত আমাদের স্বপ্ন প্রয়াণে সামঞ্জস্য থাকত! কিন্তু নানা লোভে ক্রূরতায় আজ আমরা ক্ষতবিক্ষত।

সম্প্রতি চীনের নগ্ন ও বর্বরোচিত আক্রমণে দেশের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে জাতীয় সঙ্কট। বর্তমান সঙ্কটে প্রথমেই লেখনী ধারণ করে এগিয়ে আসতে হবে সাহিত্যিকদের। বাংলাদেশের জনসাধারণের বর্তমান মানসিক অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করে সাহিত্যিকদের লেখনী ধারণ করতে হবে। উপযুক্ত পথের সন্ধান দিয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে দেশরক্ষার কাজে। ইতিমধ্যে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের অগ্রনায়ক ঔপ-ন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করলেন 'ভারতবর্ষ ও চীন'।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৬২ সালে গোরক্ষপুরের নিখিল-ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে চিন্তাশীল সাহিত্যিক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন—'বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে যে দেশাত্মবোধের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ প্রবাহিত হয়েছে তার মূলে সাহিত্যের প্রভাব যে অনেকখানি তা নিঃসন্দেহ।

বাংলা উপন্যাস যেমন সর্বাপেক্ষা গণতন্ত্রী, তেমনি তার ভাষাও বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করলেন যে, জাতির শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও মনন, ওর উন্নততম আদর্শবাদ ও দুরূহতম আত্মিক সাধনা সাহিত্যের মণিমঞ্জুষায় সঞ্চিত আছে। উপন্যাস যখন সাহিত্যের সব শাখাগুলিকেই বহন করে তখন ঔপন্যাসিক-গণের গুরুদায়িত্ব হচ্ছে উপন্যাসের মাধ্যমে বলিষ্ঠ জীবন গড়ে তোলা ও প্রকৃত দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করা।

২৬শে ডিসেম্বর উক্ত সম্মেলনে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বললেন—'সাহিত্য শুনাইতে পারে মানবতাবোধের অমৃত-বাণী; কোনো বিপর্যয়ের মুখেই যদি আমাদের মানবতা-বোধে প্রতিষ্ঠিত কল্যাণ আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হই, তবে বুঝিব আমাদের সাহিত্যসাধনা আমাদের জীবনে সত্যমূল্য লাভ করিয়াছে। আমরা আমাদের উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে একটি আশাপ্রদ এবং শ্লাঘনীয় মান অধিকার করিয়াছি।'

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্থার আইসেনবার্গ ভারতীয় সাহিত্যের রসমাধুর্য ও সৌরভ অনুভব ক'রে ২৬শে ডিসেম্বর (১৯৬২) নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বললেন—'ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে নিত্য নূতন আঙ্গিক, ভাষা, ভঙ্গিমা ও চিন্তা ধারার নব নব বিন্যাসের পরীক্ষা ও নিরীক্ষা চলিতেছে। ভারতীয় সাহিত্যের অপরিমেয় ঐশ্বর্যের প্রকাশ নিত্য নূতনভাবে দেখা যাইতেছে।'

এছাড়া সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস বা সাহিত্য সম্বন্ধে গত বুধবার ২৬শে ডিসেম্বর দ্বারভাঙ্গা হলে অনুষ্ঠিত একসভায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে ভারতীয় সংস্কৃতি ভবন ভারতীয় ভাবধারার প্রতি মানুষকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিবে বলিয়া তিনি আশা করেন। সাহিত্যিক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন—"সাহিত্যিক আজ কলম লইয়া তৈরী, শিল্পী তাঁহার তুলিসহ প্রস্তুত। সমগ্র জাতির জীবনে এ এক নতুন অধ্যায়।

তাই ঔপন্যাসিকগণ লেখনী ধারণ করে এগিয়ে আসবেন তাঁদের গুরুদায়িত্ব সমাধা করার কাজে। জাগিয়ে তুলবেন জনচিত্তকে, রক্ষা করবেন জনগণের জাত—কুল—মান, আর সহায়তা করবেন শান্তিপূর্ণ জীবনযানে, প্রতিষ্ঠা করবেন ঐক্য ও সংহতি।

শরৎচন্দ্রের একটি অনন্যা সৃষ্টি

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন—"As for Bengali we have had Bankim, have still Tagore and Sarat chandra. That is achievement enough for a Century." সত্যসত্যই বাঙালীর এক শতাব্দীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে জীবন সাহিত্য, সমাজ, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই তিন মনীষীর মনীষা-দীপ্ত অবদান চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অবদান হিসাবে বাংলার জাতীয় জীবনে এই তিন চিন্তাশীল লোকোত্তর প্রতিভার আবির্ভাব এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য যে এই তিন জ্যোতিষ্ক আজ সাহিত্যাকাশে অস্তমিত। তবু নিমীলিত জ্যোতিষ্কের অস্তরাগে যেমন আকাশ সকরুণ দীপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি এই তিন জ্যোতিষ্কের রক্তিম অস্ত-সৌন্দর্য্যে বাংলার সাহিত্যাকাশ চিরভাস্বর হইয়া রহিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—তিন-জনই জীবন-শিল্পী। মানব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাসনা-কামনা, সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, লোভ, জিগীষা, জিঘাংসা—সবই তাঁহারা একান্ত সংবেদনময়তা ও সহানুভূতি দিয়া তাহাদের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে স্বীয় কল্পনার অনুগত নর-নারী সৃজন করিয়া তাহাদের মধ্যে আপনার মনোগত আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই জন্য তিনি Real অপেক্ষা Ideal সৃষ্টি করিয়াছেন। কল্পনার অনুরঞ্জনে চরিত্র সৃষ্টি করিতে যাইয়া তাঁহাদের উপন্যাস-সাহিত্য গন্ধ-রোমান্স হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রোমান্স হইলেও তাহার মূল বাস্তবে। বাস্তবের বৃন্তে রোমান্সের ফুল ফুটিয়া উঠে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সাহিত্যে Ideal বেশী লক্ষণীয় হইলেও Realকে তিনি এড়াইতে পারেন নাই। রোমান্স-ধর্ম্মিতা থাকার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র অতীতচারিতা হইতে বিমুক্ত নন। তাই প্রাত্যহিক দৈনন্দিন জীবনে আমাদের দেখা নর-নারী হইতে আমরা বেশী লক্ষ্য করি—তাঁহার সাহিত্যে জমিদার, ঐতিহাসিক, বীর, কাপালিক, সন্ন্যাসী প্রাণধর্মী আদর্শবান ব্যক্তিপুরুষ।

রবীন্দ্রনাথ এই Real কে তাঁহার Subjectivity দিয়া অপরূপ করিয়া তুলিয়াছেন। ভাবের পরিমণ্ডল রচনা করিয়া তিনি Real কে প্রত্যক্ষ বাস্তবকে অভিনব করিয়া তুলিয়াছেন। Real কে তিনি তাঁহার অন্ত-র্মুখিতা দিয়া সুন্দর করিয়াছেন। সত্যকথা বলিতে কি বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বাস্তবতার তিনিই নিখুঁত চিত্র পরিবেশন করেন, কিন্তু প্রত্যক্ষের সমস্ত নগ্নতা, মলিনতা, বীভৎসতা ঘুচাইয়া দিয়া তিনি প্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে বিশ্ববোধের-ঐক্যবোধের এক আনন্দঘন শংস্তরসাবেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সেই প্রত্যক্ষ বাস্তবকে। বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত অন্তর্গূঢ় অন্তরঙ্গতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই বাস্তব। রবীন্দ্রনাথের এই এক মহান Idealism, রবীন্দ্রনাথ Real ও Ideal এর সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

রবীন্দ্র-প্রভাবিত শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে তাঁহার পূর্ব্বসূরীদ্বয় অপেক্ষা একান্ত Realist—বাস্তববাদী বলিয়া প্রখ্যাত। সত্যসত্যই শরৎচন্দ্র Realist—আমাদের বাস্তবজীবনের একান্ত সমবেদনাশীল প্রত্যক্ষদর্শী। প্রত্যক্ষ মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-নিরাশা, বাসনা-কামনার এমন নিখুঁত, এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহই করিতে পারেন নাই। শরৎচন্দ্র জীবনকে অতি নিকট হইতে দেখিয়াছেন, দেখিয়াছেন তাহার নগ্নতা, তাহার বীভৎসতা, তাহার লোভ, তাহার পাপ, তাহার পঙ্কিলতা। তাঁহার উপন্যাসের পাতায় পাতায় ইহা বিধৃত হইয়া আছে। কিন্তু শক্তিশালী বলিষ্ঠ জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র কি একান্ত ভাবেই Realist

ছিলেন ? যে Idealism না থাকিলে কোন শিল্পই বড় শিল্প হইতে পারেনা, সেই Idealisn কি শরৎচন্দ্রের ছিল না ? তিনি কি Idealist নন ? বিংশ শতাব্দীর অন্যতমশ্রেষ্ঠ সমালোচক মোহিতলাল বলেন—"রবীন্দ্রনাথের সত্যাশ্রয়ী ভাব-কল্পনা বাঙালীকে রসের ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করিবার অধিকার দিয়াছে। এই সত্যকে তিনি পৃথিবীর ধূলামাটির উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সীমাকে অসীমের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছেন। শরৎচন্দ্র এই ধরণী ও ধরণীর ধূলামাটিকে তেমন করিয়া দেখেন নাই—তিনি বিশ্ব বা প্রকৃতি, কাহাকেও ভক্তি করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহার নিজের সমাজে তিনি যে জীবন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাকেই গভীর বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, আর কিছুর ভাবনা তিনি করেন নাই। তিনি রবীন্দ্রনাথের মানবতাটুকুই গ্রহণ করিয়াছেন, বিশ্ব-মানবতা বা বিশ্ব-প্রাণতার দিক দিয়াও যান নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া শরৎচন্দ্র বস্তুতান্ত্রিক বা Realist নহেন। তিনি একজন বড়দরের Idealist। অতি নিম্ন শ্রেণীর জীবন যাত্রা এমন কি, সমাজ বহির্ভূত জীবনকে তিনি তাঁহার কল্পনায় স্থান দিয়াছেন, অথবা অনেক বাস্তব দুঃখের চিত্র আঁকিয়াছেন বলিয়াই তিনি Realist নহেন। বরং তাঁহার হৃদয়ের আবেগ এতই বেশী যে, কোন কিছুতেই তিনি ঠিক তাহার মত করিয়া দেখিতে পারেন নাই—অনেক বড় করিয়া দেখিয়াছেন। মানুষের দুঃখ তিনি যতটুকু দেখিয়াছেন, তদপেক্ষা বেশী উপলব্ধি করিয়াছেন; এই উপলব্ধি করার মধ্যে যে শক্তি আছে, সেইটাই তাঁহার কবিশক্তি। যিনি প্রকৃত Realist, তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তবকে ঠিক ঠিক প্রকাশ করেন, এজন্য তাঁহার রচনায় সুন্দরের অপেক্ষা কুৎসিতের দিকটা, ভাব অপেক্ষা অভাবের দিকটা, আত্মা অপেক্ষা অনাত্মার দিকটাই বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠে—তাহার মধ্যে লোকের নিজের কোন অভিপ্রায় বা ভাবের উচ্ছ্বাস থাকেনা। এইটি মনে রাখিলেই শরৎচন্দ্রকে কেহ Realist বলিবেন না।"

এই উপলব্ধি, অনুভূতির গভীরতার জন্যই, সংবেদনশীল হৃদয়ের অসামান্য দরদের জন্যই শরৎচন্দ্রের বাস্তবচিত্র একান্ত নগ্ন বাস্তব হইয়া উঠে নাই। তাহার মধ্যে একটি আদর্শবাদ, একটি ভাব অদৃশ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই আদর্শবাদ ছাড়া কোন শিল্পই মহৎ শিল্প হইয়া উঠিতে পারে না। শরৎচন্দ্র মহাশিল্পী। তাই তাঁহার শিল্পে এই Idealism দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হই, আমরা সুখী হই। 'দেবদাস' এ পার্ব্বতীর চিত্র এ সম্পর্কে একটি বড় দৃষ্টান্ত। পার্ব্বতী যে সংযম, শান্তসমাহিত চিত্তে, সহজ স্বাভাবিকতায় বৃদ্ধ স্বামীর ঘর করিয়াছে তাহা সর্ব্বকালের অনুকরণীয়। শরৎচন্দ্র ছাড়া অন্য যে কোন বাস্তববাদী আধুনিক ঔপন্যাসিকের হস্তে পার্ব্বতী চরিত্রের পরিণতি অন্যরূপ হইত—পার্ব্বতী পলাতকা হইয়া তাহার প্রিয়তমের সহিত জীবন অতিবাহিত করিত। তাহা খাঁটি বাস্তবচিত্র হইলেও কালজয়ী সাহিত্যের উপযোগী হইত না, আর্টের ক্ষেত্রে সত্যকার আর্ট হইয়াও উঠিত না। Art for art's Sake-বাদীদিগের মনস্তুষ্টি হইলেও শাশ্বত সাহিত্যের মর্য্যাদায় উন্নীত হইত না।

শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রগুলি "She pays the debt of life not by what she does, but by what she suffers"—এই নিয়তির মানদণ্ডে বিবেচিত হইলেও পার্ব্বতীর চরিত্রকে ঘিরিয়া শরৎচন্দ্রের যে Idealism কাজ করিয়াছে তাহা পার্ব্বতী চরিত্রকে মহনীয় ও অবিস্মরণীয় করিয়াছে। শরৎ সাহিত্যে এমনি আর একটি অপূর্ব্ব, অবিস্মরণীয় চরিত্র বিশ্বেশ্বরীর—জ্যাঠাইমার চরিত্র। জ্যাঠাইমাও Suffer করিয়াছেন, কিন্তু সেই Suffering ঠিক শরৎ সাহিত্যের অধিকাংশ নারী চরিত্রের Suffering এর সঙ্গে সর্ব্বাংশে তুলনীয় নয়। সমাজ মনের সহিত হৃদয়-ধর্ম্মের দ্বন্দ্বই শরৎ চন্দ্রের নারী চরিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ। নারীর সামাজিক সংস্কার হৃদয়ধর্ম্মকে নির্জ্জিত করিয়াছে এবং সেই দ্বন্দ্বে নারী ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে—ইহাই শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নারীচরিত্রে রূপায়িত হইতে দেখি। কিন্তু বিশ্বেশ্বরীর চরিত্রে এই ধরণের অন্তর্দ্বন্দ্ব বা সংঘাত দেখি না। শরৎ সাহিত্যের নারীচরিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণে বঞ্চিত হইয়াও জ্যাঠাইমা-চরিত্র অনন্য ও অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। এককথায় শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নারীচরিত্র হইয়াছে। শরৎচন্দ্র বাস্তববাদী হইয়াও কী এক বলিষ্ঠ আদর্শে তিনি এই গরীয়সী নারীচরিত্রটি চিত্রিত করেছেন, তাহা মনে করিলে এই মানবদরদী লেখকের প্রতি শ্রদ্ধায়

মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানের যৌন-আবেদন-কলুষিত বাস্তববাদী সাহিত্যের নীতিহীন বিষাক্ত পরিবেশে শরৎচন্দ্রের বাস্তববাদী সাহিত্যের আদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যিনি মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার প্রধান শিল্পী, সেই শরৎচন্দ্রের আদর্শ আজ তথাকথিত Realist সাহিত্যিকবৃন্দ বর্জ্জন করিয়া বাস্তবতার যে নগ্ন, কদর্য্য আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে চলিয়াছেন, তাহাতে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ যে গভীর নৈরাশ্যময় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিশ্বেশ্বরী চরিত্র শরৎচন্দ্রের অনুপমেয় সৃষ্টি, অনবদ্য সৃষ্টি, মহৎ সৃষ্টি। শরৎ-সাহিত্যে জননীর অভাব নাই। শরৎ সাহিত্যে প্রত্যেকটি নারীচরিত্র জননী, রাজলক্ষ্মী, অন্নদাদিদি, নারায়ণী, মাধবী, ভারতী, রমা, সাবিত্রী, অভয়া, হেমাঙ্গিনী —সকলেই জননী, তা সে সন্তান গর্ভেধারণ করিয়াই হোক আর না হোক। এমন জননী সৃষ্টি করিতে বিশ্বসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের তুলনা নাই। সন্তান প্রসব করলেই যে জননী হওয়া যায় তাহা নহে, সন্তান প্রসব না করিয়াও অপত্য-বাৎসল্যের অধিকারী হইয়া যে জননীত্ব লাভ করা যায় —এই অপূর্ব্ব অপত্য-মমত্ববোধ নারীচরিত্রে সঞ্চারিত করিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রত্যেকটি সৃষ্ট নারী চরিত্রকে মহীয়সী করিয়া তুলিয়াছেন। জননীর স্নেহ তাঁহার সৃষ্ট নারীচরিত্রে বহাইয়া দিয়া তাহার সমস্ত দৈন্য, গ্লানি হরণ করিয়াছেন—তাহাকে নির্ম্মল, পবিত্র করিয়া তুলিয়াছেন। শরৎ-সাহিত্য তাই বাংলা সাহিত্যের এই দিক হইতে গরীয়সী স্বর্গভূমি। শরৎ-সাহিত্য জননীময়। আপন সন্তানকে সকলেই ভালবাসে, পরের সন্তানকে ভালবাসিতে হৃদয়ের যে উদারতা ও বিশালতা, অতলস্পর্শ মমত্ববোধ ও বাৎসল্য থাকা চাই—শরৎচন্দ্রের অমর লেখনীতে তাহার সৃষ্টির অভাব নাই। শরৎচন্দ্র তাঁহার নারীচরিত্রে এই এক মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। নারীত্বের অসামান্য মর্য্যাদা দিয়া গিয়াছেন।

বিশ্বেশ্বরীর চরিত্র যেন মনস্বিনী গান্ধারীর চরিত্রের সমধর্ম্মী। ধর্ম্মশীলা গান্ধারীর চরিত্রের মূল কথা ধর্ম্ম। ধর্ম্ম যেখানে লাঞ্ছিত, মানবতা যেখানে নিপীড়িত, সেখানে গান্ধারীর সীমাহীন ঘৃণা। পুত্র দুর্য্যোধন অধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া, রাজ্যলোভের বশবর্ত্তী হইয়া ধার্ম্মিক পাণ্ডবদিগকে কপট পাশাখেলায় পরাজিত করিয়া মানবধর্ম্মকে কলুষিত করিয়াছে, জীবনকে দুর্নীতিগ্রস্ত করিয়াছে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ পুত্রস্নেহে, হৃদয়দৌর্ব্বল্যে দুর্য্যোধনকে সমর্থন করিয়া যখন ধ্বংসের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন, তখন ধর্ম্মদর্শিনী গান্ধারী মাতা হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্য্যোধনকে ত্যাগ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন, সমস্ত নারীজাতির প্রতিনিধি হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাপী দুর্য্যোধনের দণ্ড প্রার্থনা করিয়াছেন। অধার্ম্মিক, লোভী, প্রবঞ্চক, পাপী পুত্রকে ত্যাগ করিতে জননীর স্বাভাবিক ধর্ম্মে বেদনা, ব্যথা, কাতরতা আসিলেও তিনি পুত্রকে ত্যাগ করিতে পারেন শুধু ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য। গান্ধারী যে ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা, ধর্ম্মই যে তাঁহার জীবন! তাই তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন—

> শমে স্থিতান্ কো নু পার্থান্ কোপয়েদ ভরতর্ষভ।
> স্মরন্তং ত্বামাজমীঢ় স্মারয়িষ্যাম্যহং পুনঃ॥
> শাস্ত্রং ন শাস্তি দুর্ব্বুদ্ধিং শ্রেয়সে চেতরায় চ।
> ন বৈ বৃদ্ধো বালমতি র্ভবেদ্ রাজন্ কথঞ্চন॥
> ত্বন্নেত্রাঃ সন্তু তে পুত্রা মা ত্বাং দীর্ণাঃ প্রহাসিষুঃ।
> তস্মাদয়ং মদ্বচনাৎ ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ॥
> তথা ন তে কৃতং রাজন্ পুত্রস্নেহান্নরাধিপতে।
> তস্য প্রাপ্তং ফলং বিদ্ধি কুলান্তকরণায় চ॥

রবীন্দ্রনাথ উক্ত উক্তিটিই মহাপ্রাজ্ঞা গান্ধারীর মাতৃহৃদয়াবেগের অভিব্যঞ্জনায় বর্ণনা করিয়াছেন—

> মাতা আমি নহি? গর্ভভার জর্জ্জরিতা
> জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে?
> স্নেহবিগলিত চিত্ত শুভ্র দুগ্ধ ধারে
> উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি
> তার সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি?
> শাখাবন্ধে ফল যথা সেই মত করি
> বহুবর্ষ ছিল না সে আমারে আঁকড়ি
> দুই ক্ষুদ্র বাহুবৃন্ত দিয়ে—লয়ে টানি
> মোর হাসি হ'তে হাসি, বাণী হ'তে বাণী,
> প্রাণ হ'তে প্রাণ? তবু কহি, মহারাজ,
> সেই পুত্র দুর্য্যোধনে ত্যাগ করো আজ।
>
> * * *
>
> অধর্ম্মের মধুমাখা বিষফল তুলি
> আনন্দে নাচিছে পুত্র; স্নেহ মোহে ভুলি
> সে ফল দিয়ো না তারে ভোগ করিবারে—
> কেড়ে লও ফেলে দাও কাঁদাও তাহারে।

ছললব্ধ পাপস্ফীত রাজ্যধনজনে
ফেলে রাখি সেও চলে যাক নির্ব্বাসনে,
বঞ্চিত পাণ্ডবদের সমদুঃখভার
করুক বহন।
*　　*　　*
—তবে আজ রাজপদতলে
সমস্ত নারীর হয়ে নয়নের জলে
বিচার প্রার্থনা করি। পুত্র দুর্য্যোধন
অপরাধী প্রভু! * * *
গৃহধর্ম্মচারিণীর পুণ্যদেহ 'পরে
কলুষ পরুষ স্পর্শে অসম্মানে মরে
হস্তক্ষেপ—পতি-সাথে বাধায়ে বিরোধ
সে নর পত্নীরে হানি লয় তার শোধ,
সে শুধু পাষণ্ড নহে, সে যে কাপুরুষ।
মহারাজ, কী তার বিধান? * *
…………ধর্ম্ম জানে
সেদিন চূর্ণিয়া গেল জন্মের মতন
জননীর শেষ গর্ব। * * *
—মহারাজ, শুন মহারাজ
এ মিনতি—দূর করো জননীর লাজ,
বীরধর্ম্ম করহ উদ্ধার, পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন, অবনত
ন্যায় ধর্ম্মে করহ সম্মান, ত্যাগ করো
দুর্য্যোধনে।

বিশ্বেশ্বরীও তাই করিয়াছেন। দুশ্চরিত্র, কাপুরুষ, দুষ্ট-বুদ্ধি কপটাচারী পুত্র বেণী ঘোষালকে ত্যাগ করিয়াছেন। এ ত্যাগ করিতে তাঁহার হৃদয় স্বাভাবিক ধর্ম্মে ব্যথিত হইয়াছে, কাতর হইয়াছে তবু তিনি ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে, সত্যকে জয়ী করিতে, মানবতাকে সম্মানিত করিতে বেণীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন। পাছে বেণী তাঁহার মৃত্যুর পর মুখাগ্নি করে সেই ভয়ে আন্তরিক ঘৃণায় অশুচি হইবার আশঙ্কায় তিনি রমাকে লইয়া কাশী চলিয়া গিয়াছেন।

তুষ্টু কলুর ছেলে বেণীর মাথা ফাটাইয়া দিলে রমার সমবেদনা ও সহানুভূতির উত্তরে বিশ্বেশ্বরী বলিয়াছিলেন—"দুঃখ করো না মা, এই তার প্রয়োজন ছিল। এতে তার ভালই হবে।……ভাবচ, মা হয়ে সন্তানের এত বড় দুর্ঘটনায় এমন কথা কি করে বলচি? কিন্তু তোমাকে সত্যি বলচি মা, এতে আমি ব্যথা বেশি পেয়েছি—কি আনন্দ বেশি পেয়েচি তা বলতে পারিনে। কেন না, আমি জানি, যারা অধর্ম্মকে ভয় করে না, লজ্জার ভয় যাদের নেই, প্রাণের ভয়টা যদি না তাদের তেমনি বেশি থাকে, তাহলে সংসার ছার-খার হয়ে যায়। তাই কেবলই মনে হয় রমা, এই কলুর ছেলে বেণীর যে মঙ্গল করে দিয়ে গেল, পৃথিবীতে কোন আত্মীয় বন্ধুই ওর সে ভাল করতে পারত না। কয়লাকে ধুয়ে তার রঙ্‌ বদলানো যায় না মা, তাকে আগুনে পোড়াতে হয়।………… রমা, এক সন্তান যে কি, সে শুধু মায়েই জানে। বেণীকে যখন তারা অচৈতন্য অবস্থায় ধরাধরি করে পাল্কিতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেল, তখন যে আমার কি হয়েছিল, সে তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না। কিন্তু তবুও আমি কারুকে একটা অভিসম্পাত বা কোন লোককে আমি দোষ দিতে পর্য্যন্ত পারিনি। একথা ত ভুলতে পারিনি মা যে, এক সন্তান বলে ধর্ম্মের শাসন ত মায়ের মুখ চেয়ে চুপ করে থাকবে না।"

পুত্রকে জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দেখিয়াও বিশ্বেশ্বরী বেণীর আঘাতকারীকে একটি অভিশাপ পর্য্যন্ত দেন নাই। বেণীর এই শাস্তি বিধাতার ন্যায়দণ্ড বলিয়াই তিনি ধর্ম্ম-কঠিন হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছেন। গান্ধারী দুর্য্যোধনাদির মৃত্যুতে শোকাহত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত অনর্থের মূল জানিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন—"আমার বধূগণ যেমন অতিশোকে আর্ত্তনাদ করিতেছে—তোমার বধূগণও তেমনি আর্ত্তনাদ করিবে।" পুত্র-বাৎসল্যের সাময়িক দৌর্ব্বল্যহেতু গান্ধারীর এই উক্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশ্বেশ্বরীর হৃদয়ে এই দৌর্ব্বল্যটুকুও দেখি না। সন্তানের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনি বজ্রকঠোর হৃদয়ে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

কাশী যাত্রার দিন পাল্কীর মধ্যে বসিয়া বিশ্বেশ্বরী রমেশকে বলিয়াছিলেন—এখানে যদি মরি রমেশ, বেণী আমার মুখে আগুন দেবে। সে হলে ত কোন-মতেই মুক্তি পাবো না। ইহকালটা ত জ্বলে-জ্বলেই গেল বাবা, পাছে পরকালটাও এমনি জ্বলে-পুড়ে মরি, আমি সেই ভয়ে পালাচ্চি রমেশ।"

এ যে কত বড় আদর্শ, তা ভাষায় বলিবার নহে, লেখনী তাহা প্রকাশ করতে অক্ষম। এ শুধু অনুভবের। একমাত্র পুত্রকে পাপিষ্ঠ জানিয়া কোন মাতা যে নির্ম্মম-চিত্তে তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করতে পারে, ভবিষ্যতে তাহার হস্তে মুখাগ্নি গ্রহণে বিতৃষ্ণা জ্ঞাপন করিতে পারে, তাহা আমাদের পূর্ব্বে জানা ছিল না।

প্রত্যেক জননীই তাহার পুত্রের হস্তে অন্তিম মুখাগ্নি কামনা করে। এই জন্যই নারী পুত্র কামনা করে। শত অপরাধেও জননী পুত্রকে ত্যাগ করে না। ইহাই সাধারণ ও স্বাভাবিক। বিশ্বেশ্বরী কিন্তু অসাধারণ। মাতার স্বাভাবিক স্নেহধর্ম্মে গরীয়সী হইয়াও তিনি বেণীকে ঘৃণাভরে ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার বিষাক্ত সঙ্গ পরিহার করিয়াছেন। বিশ্বেশ্বরী শরৎচন্দ্রের অনন্য সৃষ্টি।

নীচের তলার এক ঘরের ফ্লাটটা সত্যিই অপয়া। ভাড়াটে এসে তিন মাসের বেশী থাকতে পারে না, তার পরেই চলে যায়। এ জন্তে বাড়ীওয়ালার না হলেও আমার গৃহিণীর মনে যথেষ্ট ক্ষোভ। তার হেতুও একেবারে না আছে এমন নয়। তিনি বলেন, ওই ঘরে একটা দোষ আছে, একটা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা দরকার।

বাড়ীওয়ালা বৃদ্ধলোক, ভাড়া নিতে এসে গল্প করে, চা পান খেয়ে ভাড়া নিয়ে যায়। গৃহিণী তাকেও ওকথা বলেছেন—নীচের ঘরে আপনার ভাড়াটে টেঁকে না। একটু কিছু পূজা শান্তি করুন,—

বৃদ্ধ হাসেন। বলেন,—এই পৈতৃক বাড়ী ভাড়ায় দিয়েছি আজ পনর বছর। এমন ত হয়নি,—ইদানীং কেন যেন এমনি হচ্ছে। এই ত আপনারাই ত প্রায়, ছ'বছর আছেন।

গৃহিণী বলেন,—উপর তলার কথা নয়। নীচের কথা বলছি।

—হ্যাঁ, সেই কথাই বলছি। এমন ত আগে হ'ত না। তবে কোন ভাড়াটে—হয়ত তুকতাক্ করেছে—তাও ত হ'তে পারে। বৃদ্ধ হাসেন। তারপরে বলেন,—তাতে আমার আর লোকসান কি? লোকসান নেই, তবে এক আধ মাস হয়ত ভাড়া বাদ যায়। আপনারা ছ'খানা ঘরে সেই সাবেককালের ভাড়া পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছেন, আর এই-বার ঐ নীচের এক ঘরই পঞ্চাশ টাকা ভাড়া হয়েছে।

গৃহিণী অর্থাৎ রেবা বলে,—তা হলে ভাড়া হয়েছে?

—হ্যাঁ এক কথায় পঞ্চাশ টাকায় রাজি হয়ে আগাম ভাড়া দিয়ে গেছে। শিগ্ গিরই আসবে—আমার লোকসান নেই—বৃদ্ধ আবার হাসেন।

—আপনার 'ত লোকসান নেই—কিন্তু আমার যে ঘোর ক্ষতি, লোকসান ত বটেই।

বৃদ্ধ বলেন,—আপনার আবার কি ?

—এই ত দেখুন উনি আফিসে চলে যান, খোকা স্কুলে যায়। দু'ঘর ত ভাড়াটে এই ছোট বাড়ীতে, তার একটা ত নেই। সারা দুপুর সেলাই, রেডিও, নভেল নিয়ে কতক্ষণ চলে—মানুষ বিনে মানুষ থাকতে পারে ?

—সেই ভাল মা, সেই ভাল। মানুষ আজকাল নেই, অমানুষই বেশী তাই একা থাকাই ভাল, তাতে শান্তি আছে, তাই আর স্বস্ত্যয়ন করতে চাইনে।

—একা একা ত দিন কাটে না। আচ্ছা যাদের ভাড়া দিয়েছেন তারা কারা ? কজন ?

—সে ভালই আছে। একটি যুবক, সম্ভবতঃ নতুন বিয়ে করেছে—প্রথম ঘর পাতবে তোমার এখানেই—

রেবা উৎসাহিত হ'য়ে বললে,—ভালই হবে, যাহোক একটা কথা বলার লোক হবে। একটু জিরিয়ে নেওয়া যাবে—

—হ্যাঁ তাই যেন হয়। আবার দু'জনে ঝগড়া করে করে শেষে আমাকে বিপন্ন না করলেই বাঁচি।

—আমরা ঝগড়া করি বুঝি ?

বৃদ্ধ হেসে বলেন,—তা কেন ? এমন অনেক লোক আছে যারা ঝগড়া করবেই এবং তার সঙ্গে ঝগড়া না করে পারাই যায় না—

বাড়ীওয়ালা আমাদের সত্যিকার ভাল লোক। আগে রেলে চাকুরী করতেন, তখন সস্তাগণ্ডার দিনে পাশাপাশি দু'খানা বাড়ী করেছিলেন এখানে। একখানায় নিজেরা থাকেন, শান্ত সুখী ছোট পরিবার, আর একখানি ভাড়া দেন। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ,—চালচলন, জাত, নিষ্ঠা ভাল করে দেখে তবে সে বাড়ীতে চা বা জলস্পর্শ করেন। আমাদের বাড়ীতেই প্রায় দু'বছর জলস্পর্শ করেন নি, তার পরে যখন দেখলেন আমাদের সাত্ত্বিকতায় সন্দেহজনক কিছু নেই, তখনই কেবল চা পান খেয়েছেন। শুধু তাই নয়, ফোঁকলা দাঁতে সব সময়ই শিশুর মত হাসেন। মাঝে মাঝে রেবার নিঃসঙ্গ জীবনে সেকালের গল্প ইতিহাসের চমকপ্রদ কাহিনী বলে তাকে বেশ আনন্দ দেন। বিকেলে এসে মাঝে মাঝে সুখ দুঃখের কথাও বলেন—সর্বদাই 'মা লক্ষ্মী' বলে সম্বোধন করেন, তাই রেবাও তার অকৃত্রিম ভক্ত।

সেদিন আফিস থেকে ফিরে দেখি আমার ঘরেই বাড়ীওয়ালা রমণীবাবু বসে চা খাচ্ছেন এবং রেবাকে কি একটা গল্প হয়ত' বলছেন। ঘরে ঢুকতেই রেবা মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে বলল,—বলুন না, শেষটা শুনে যাই—

—না, না, বাবাজী এসেছেন সারাদিন খেটে-খুটে, খেতে দিন, তাউত করুন। আমি যাই—

বললাম,—বসুন বসুন, আমি হাতমুখ ধুয়ে আসি। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলি অপরাধ নেবেন না।

—বলুন, বলুন—

—ওদিকে ত মা লক্ষ্মী বলেন, আমাকে বাবাজী বলেন, অথচ 'দিন করুন' এসব বলেন কেন ? তুমি বললেই ত মানায় ভাল।

—সেটা ঠিকই বলেছেন বাবাজী, তবে সেটাও ঠিক নয়। সম্মানীকে সম্মান করাই ভাল—

আমি হেসে বললাম,—ধরুন কারও ছেলে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছে, খুব সম্মানী লোক ত ? তার বাবা তা হ'লে তখন আপনি বলবে ছেলেকে ?

বৃদ্ধ রমণীবাবু উঠে দাঁড়িয়ে শিশুর মত হেসে বললেন, —একটু তিরস্কারই করলেন বাবাজী, তা বেশ। একটা ছোট গল্প মনে পড়ল, এই মা লক্ষ্মীর মাথায় কাপড় টানা দেখে। মফঃস্বল শহরে এক খুঁদে হাকিম এসেছেন, সস্ত্রীক বেড়াতে যান কিন্তু মাথায় কাপড় দেন না গিন্নি। একদিন আর এক হাকিমের সঙ্গে দেখা, তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, ইনি আপনার বোন ? খুঁদে হাকিম রেগে কাঁই,—আমার ওয়াইফ্, ওইভাবে প্রশ্ন করে ? বললেই হয় উনি কে ? তা নয় ইনি আপনার বোন ?

রমণীবাবু ফোঁকলা দাঁতে হিহি করে হাসলেন, গল্পের সঙ্গতি কোথায় বা প্রবক্তই বা কি তা না বুঝেও আমরা হাসলাম। তিনি লাঠি নিয়ে তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

রেবা বলল,—যা হোক নীচেটা ভাড়া হয়েছে, এক তরুণ দম্পতি আসছে। সারা দুপুর একা একা কি ভাবে যে যায় ?

—ভাল, নবদম্পতির নতুন প্রেমের গল্প শুনে বেশ

কেটে যাবে, তবে ভাগ আমাকেও কিছু দিও—নতুন করে স্বাদ পাওয়া যাবে, কি বল ?

দু'একদিন পরে আপিস বাজার সেরে বাড়ী গিয়ে শুনলাম বা দেখলাম নতুন ভাড়াটে এসেছে। তবে নেহাতই ছেলেমানুষ দু'টি—একজনকে যা দেখলাম তাতে মনে হয় বৌটি হয়তবা এই সতর আঠার, আর স্বামীটি বড়-জোর ছাব্বিশ। যা হোক প্রতিবেশী হয়েছে এই ভাল—বাড়ীতে দ্বিতীয় জনপ্রাণী নেই বলে সন্ধ্যার পরে একটু বেরুতেও পারিনে।

রেবা খাবার দিয়ে গেল,—নব দম্পতীর আগমন হেতু যতটা খুশী দেখব ভেবেছিলাম তা নয়, রেবা বরং একটু গম্ভীরই। জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি ?

রেবার কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার হ'চ্ছে এই যে—বিকেলে ভাড়াটেদের দরজা খুলে দিয়ে তার 'মালক্ষ্মী'কে ডেকে রমণীবাবু বলে দিলেন, এরা ছেলেমানুষ, দেখাশুনো করবেন আর সংসার পাততে হিতোপদেশ দেবেন। ওদের বললেন,—হ্যাঁ এঁরা উপরে আছেন অতি সজ্জন সব সাহায্য পাবেন, অবশ্য আমার কাছেও পাবেন। এখন গুছিয়ে ভাল করে বসুন—তারপরে তিনি প্রশ্ন করলেন,—বিছানা-পত্র, বাসন-কোসন সব কোথায় ? রাত্রে খাবেন কি ? শোবেন কি করে ?

স্বামীটি বললেন,—আমার ভাইএর নিয়ে আসবার কথা, হয়ত পরের গাড়ীতে আসছে—রাত্রি নাগাদ এসে যাবে—

রেবা একটু চাপা গলায় বললে;—কিন্তু এই ত ছিরি, একটা টিনের সুটকেশ নিয়ে এসেছে। এই ত রাত্রি আটটা, কোথাও কিছু নেই। কর্তা ত একটা মাদুর কিনে আনল, দেখলাম। তারপর দু'জনেই বেরিয়ে গেল বোধ হয় হোটেলে খেতে—মাথায়ও কাপড় নেই—

—তাতে কি হ'ল ? মাথায় কাপড় দেওয়া বা সিন্দুর দেওয়ার রেওয়াজ আজকাল উঠে যাচ্ছে, ওরা হয়ত খুব মডার্ণ—

—ছাই,—বৌটা ত গেঁয়ো গেঁয়ো মনে হয়। চা খেতে ডাকলুম, ভাবলুম আলাপ করবো। তা বললে,—না থাক্ দরকার নেই। যেন একটু তফাৎ থাকতে চায়—

—প্রথম প্রথম কিনা তাই—পরে ঘনিষ্টতা হলে চলে যাবে—

আমার সান্ত্বনা বাক্যে রেবা বিশেষ কোন উৎসাহবোধ করলো না। মন্তব্য করলে,—না, সে রকমই মনে হচ্ছে না। যেন কেমন কেমন! শুধু মাদুরে রাত কাটাবে কি করে ?

—সে হয়, দুর্ভাবনা তোমার কেন ? হয়ত খাট্ বিছানাই কিনতে গেছে—

পরদিন সকালে নীচে স্নান করতে নেমে কর্ত্তার সঙ্গে দেখা। বললাম,—নমস্কার, আপনিই আমার একমাত্র প্রতিবেশী হলেন। কাল রাত্রে ত আলাপ পরিচয় হয়নি, তা আপনার নামটি কি ?

ভদ্রলোক একটু থেমে ইতস্ততঃ করে বললেন,—আমার নাম ?

হেসে বললাম—হ্যাঁ আপনার নাম। নাম না জানলে ডাকবো কি করে ? আলাপইবা করবো কি করে ?

—হ্যাঁ আজ্ঞে, আমার নাম হরেন্দ্রনাথ ঘটক—

—ও ঘটক ? ভাল ভাল, আপনারা রাঢ়ী ব্রাহ্মণ তা হ'লে ? আপনাদের গোত্র কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। রাঢ়ী ব্রাহ্মণ—

—গোত্র -

—আজ্ঞে, গোত্র ?

—হ্যাঁ এই ত সেদিন বিয়ে করেছেন—তখনই ত গোত্র অন্ততঃ পঁচিশবার বলতে হয়েছে। তাও ভুলে গেছেন ?

ভদ্রলোক একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কথার মাঝেই সরে পড়তে চাইলেন। কেমন যেন একটু সন্দেহ হল। বললাম,—কই কোথায় যাচ্ছেন ? যাকগে, আজকাল কুলুজি আর কে মুখস্থ রাখে ? তা কোথায় চাকুরী করেন ?

—আজ্ঞে, রেল আফিসে ?

—কোথায় ?

—খিদিরপুর আফিসে ?

—বেশ বেশ, তা আজ ছুটি নিয়েছেন ? সাড়ে আটটায় না বেরুলে ত আফিস যেয়ে উঠতে পারবেন না। যে ভীড় আর রাস্তা ত কম নয়।

—ক'দিন ছুটি নিয়েছি—

—হ্যাঁ, তা নইলে, ঘর সংসার গুছিয়ে নিতে পারবেন না।

ভদ্রলোক এক পায়ে দুই পায়ে সরছিলেন, আমিও এক পায়ে দুই পায়ে এগিয়ে এসে ওদের জানলার পাশে দাঁড়ালাম। একটা টিনের সুটকেশ ও একটা মাদুর ছাড়া কিছুই নেই। কোনও জোগাড়ও নেই। হিতোপদেশ দিলাম,—হরেনবাবু, এ নীচের ঘরে মেঝেয় থাকবেন না। একটা তক্তপোষ, আজই জোগাড় করুন। কই রান্নার জোগাড় কোথায়! দু'জন ত? একটা তোলা উনুন নিয়ে আসুন,—তাতেই হবে—

এই ফাঁকে ঘরের মাঝে একবার তাকিয়ে নিলাম, মাথা নীচু করে বৌটি মাদুরে বসে আছে। মুখখানি দেখতে পেলাম না তবে দেহ ও বর্ণ ভালই। বয়স নেহাতই কম—

হরেনবাবু জবাব দিলেন,—হ্যাঁ, আজই সব জোগাড় করতে হবে বৈ কি?

—হ্যাঁ, এ বেলা কি হ'বে? অসুবিধে হলে আমার ওখানেই দু'টো ডাল ভাত হ'তে পারে—

—না না, এই কাশীপুরে মামাবাড়ী, সেখানেই আজ—

—ও তা বেশ,—

ফিরে এলাম। বন্দোবস্ত সবই তা হলে হয়ে গেল। আমিও নিশ্চিন্তে আফিসে চলে গেলাম।

এক সপ্তাহ চলে গেল—

রেবার খুব দুঃখ ওদের সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনাই হল না। ওদের জীবনযাত্রাটা ঠিক আমাদের মত নয়। ঘরে অবশ্য চাঁপাতলার একটা তক্তপোষ, তোষোক বালিশ এসেছে, কিন্তু রান্না-বান্নার কোন ব্যবস্থাই নাই। আমার সময় নেই কিন্তু রেবা লক্ষ্য করে, ওরা সকালে দোকান থেকেই চা-বিস্কুট এনে খায়, তার পরে চান করে সেজেগুজে দুজনেই বেরিয়ে যায়। কোনদিন রাত্রি ৯'টা, কোনদিন ১০টা ১১টায়ও দু'জন ফিরে আসে। তারপরে কোন সাড়াশব্দ নেই, সব নিঝুম।

রেবা সেদিন তাই বললো,—এরা কেমন গো? কোথায় থাকে, কোথায় খায়? যদি এই করবে ত বাড়ী ভাড়া করতে গেল কেন?

ঘটনাটি শুনে বললাম,—ও ব্যাপারটা আমি বুঝে নিয়েছি। অর্থাৎ দু'জনেই চাকুরী করে,—অফিস ক্যান্টিনে খায়, তাতে ঝামেলাও নেই দামেও সস্তা। তারপর রাত্রে বাইরে থেকে খেয়েই ফেরে।

—যদি তাই হবে, তবে ত দশটার মধ্যেই বেরুবে?

—তা কেন? নানা অফিসে নানা সময় থাকতে পারে!

—দু'জনেই এক আফিসে?

—তাই হবে। হয়ত বাপ-মায়ের অমতে আফিস-বন্ধু বিয়ে করেছে তাই বাসার এই চাল। মাইনে পেলে হাঁড়িকুড়ি কিনে ঘর পাতবে—

রেবা তবুও বলে,—না গো, যতই বল। কি যেন গোলমাল একটা আছে। এত ভাড়াটে এলো গেল, এমনটা ত দেখিনি—

—দুনিয়ার হালচাল পালটাচ্ছে—বিলেতে ত বহু লোক আছে—যারা ফ্লাটে থাকে অথচ বাইরে খায়। ঘরে কিছুই থাকে না—

—তবে এটা কি বিলেত হল?

—হতে বাকী নেই, অন্ততঃ কোন কোন জায়গায় ত হ'য়েই গেছে। যাকগে অত দিয়ে দরকার কি? ওরা মিশতে চায় না যখন, আমরাও মিশবো না। গায়ে পড়ে যাবোই বা কেন? দরকার হয় ওই রমণীবাবুর বাড়ীতে একটু যেয়ো—

এর পরে কিছুদিনের মত নীচের ভাড়াটে সম্বন্ধে আমাদের আর বিশেষ কোন কৌতুহল রইল না। রাস্তার ওপারের ওরা যেমন এই ছয় বছরও অপরিচিত হয়ে রয়েছে এরাও তেমনি রয়ে গেল।

একদিন রমণীবাবু এসে মা-লক্ষ্মীকে শুধু বলে গেছেন, —লোকটা ভাড়া কেবল দিচ্ছি—দেব করছে, ব্যাপারটা সন্দেহজনক হয়ে উঠলো। তাকে ধরতেই পারিনে—দিনে-রাতে কোথায় যে থাকে—

এরই কিছুদিন পরে একদিন বাসায় ফিরতেই রেবা বললে,—কাণ্ড শুনেছ?—কি হল?

—ওই ত নীচের কর্তা আজ দুদিন হল কোথায় যেন গেছে। বৌটি ত ঘরেই বসে আছে। তাই আজ গিয়ে-

ছিলাম, জিজ্ঞাসা করলাম। প্রথমে বললে, জানি না—তারপরে বললে দেশে গেছে। ওদের দেশ মেদিনীপুর বললে—কিন্তু ব্যাপার তা নয়, মুখটুক্ রীতিমত ভার। চোখ টলমল করছে—

তুমি ত সাহায্য করতে পারতে। রেবা বললে,—তা ত বললামই। আমাদের দ্বারা যদি কিছু হয় আমরা করতে প্রস্তুত। টাকা পয়সাও যদি নাই রেখে গিয়ে থাকেন তবে ধার দিতে পারি। সংসার করতে হ'লে ধার দেনা ত সময় অসময়ে করতেই হয়?

—কোন উত্তর করলে না। কেবল বললে, না দরকার নেই। দরকার হলে নিশ্চয়ই সাহায্য চাইব।

আমি বললাম,—তবে আর কি? আমাদের কর্ত্তব্য আমরা সবই করেছি—কিন্তু যাই হোক ধার দেনা দেওয়াটা—

—না না, যদিই দিই, দু' পাঁচ টাকা। নইলে শ' দুশো দিতে যাচ্ছি,—না পারি?

কয়েকদিন পরে অফিসেরই একটা কাজে চৌরঙ্গী গিয়েছিলাম। চা'র সময় হ'য়েছে দেখে একটা বেশ ভাল রেঁস্তোরায় চা খেতে ঢুকলাম। সেখানে বসে চা-খেতে খেতে হঠাৎ দেখি একটা ক্যাবিন থেকে একজোড়া বেরিয়ে গেল। মনে হল নীচের তলার সেই মেয়েটি, কিন্তু এমনি সময় চৌরঙ্গীতে? তারপরে সঙ্গের লোকটিকেও ঠিক বাঙালী মনে হয় না। চা'র কাপ ফেলে রেখেই উঠে এলাম দরজা পর্য্যন্ত, না আমার ভুল হয়নি—নিশ্চিতই সেই মেয়েটি। তবে তার কাপড়, বেশবিন্যাস প্রসাধনে একটা নতুনত্ব আছে আজ। কি হতে পারে? স্বামীটিই বা কয়েকদিন কোথায় গেল! মনে সন্দেহের দোলা লাগল—

আফিসের পরে ছুটে বাড়ী পৌঁছে রেবাকে ঘটনাটা বলতে, সে বললে,—ভাল করে দেখেছ? তাই কি হয়? মেয়েটা ত গেঁয়ো গেঁয়ো—সে কি—

—হ্যাঁ আমি ভাল করে দেখেছি, চা' ফেলে রেখে এসে দেখলাম। আমার ভুল কিছুতেই হয় নি।

তা একরকম চেহারাও ত হতে পারে—ভুলও করতে পার ত?

—না। ভুল আমার হয়নি। যাই হোক মোটের উপর ব্যাপারটা রীতিমত সন্দেহজনক। তুমি আর ওধারে একেবারেই যাবে না। এলেও পাত্তা দেবে না। আমার কিন্তু ঘোর সন্দেহ হ'চ্ছে—

—কি সন্দেহ?

—কত রকম, ওরা হয়ত স্বামীস্ত্রীই নয়, চোরা-কারবারী। সোনার স্মাগলার হ'তে পারে। গুপ্তচর হতে পারে। তা ছাড়া বেশ্যাবৃত্তি নিরোধ আইন হবার পরে তারা সব নানাছলে নানাভাবে সমাজের মধ্যে ঢুকে পড়েছে—ইতর ভদ্র চিনবার যোটি নেই। ভদ্রপাড়ায় ভদ্রবেশে, বেপরোয়া ব্যবসা চালাচ্ছে। বুড়ো মিনসে, বলে ব্রাহ্মণ কিন্তু গোত্রটা বলতে পারলে না। সেইদিনই আমার সন্দেহ হয়েছে—

রেবা বললে,—তাই নাকি। সর্ব্বনাশ! এরা এসেছে একই বাড়ীতে। কালই বাড়ী দেখ, না হয় বাড়ীওয়ালাকে বলে দিয়ে ব্যবস্থা কর।

—রমণীবাবুও কাঁচা ছেলে নয়, তিনি নিশ্চয়ই নজর রেখেছেন। তাঁর বাস্তভিটের 'পরে একটি অনর্থ অনাচার হবে এ তিনি নিশ্চয়ই সহ্য করবেন না। আমরা থামকা জড়াতে যাই কেন?

রেবা উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বললে, কি হবে তা হলে?

বেশ দু'তিন সপ্তাহ চলে গেল—আমার সময় নেই, আর রেবা ভয়েই ওধারে যায় না। তবে সেই হরেন্দ্রনাথ ঘটক মশায়কে আর দেখতে পাইনে। রেবা বলে,—সেও নাকি আর দেখেনি। কিছু দিন, মাঝে বোধ হয় দু'তিন দিনের জন্যে একবার এসেছিল।

সেদিন শনিবারে সিনেমা থেকে বেরিয়ে দেখি বাইরে প্লাবন হয়ে গেছে—রাস্তায় একহাঁটু জল। রিক্সা ছাড়া যানবাহন বন্ধ। কোনমতে বাসায় ফিরে, খাওয়া সেরে শুয়েছি—একটু ঘুমের ঝুলও এসেছে, এমন সময় নীচে পুরুষ কণ্ঠের একটা কোলাহল। মনে হয় অনেক লোক একসঙ্গে অনেক কথা বলছে।

হঠাৎ রমণীবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল, আমার বাস্তভিটের উপর এই সব অনাচার, ছিঃ ছিঃ—শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলেই কি এ ভিটে শুদ্ধ হবে?

রেবা সভয়ে বললে,—নীচে কিসের গোলমাল শুনছ?

—হ্যাঁ, দাঁড়াও দেখে আসি, রমণীবাবুর গলা শুনছি—

—না না, যেওনা, পুলিশ এসেছে মনে হচ্ছে, শেষে নাজেহাল হতে হবে।

—কিছু না, রমণীবাবু ত রয়েছেন ওখানে, নিশ্চয়ই একটা অঘটন ঘটেছে—না গেলে সেটা কি ভাল হয়, তিনি আমাদের এত করেন—

নীচে নেমে যেতেই রমণীবাবু উত্তেজিতকণ্ঠে বললেন, দেখুন বাবাজী, দেখুন কাণ্ড—আমার বাস্তুভিটের উপর এই অনাচার। এই পাপ—শান্তি স্বস্ত্যয়নে কি এই পাপস্খালন হবে ?

তাকিয়ে দেখলাম, সেই মেয়েটি সলজ্জ ভাবে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের স্বল্প আলো তার মুখে পড়েনি, সেখানে অন্ধকার জমা হ'য়ে আছে। তারই একটু তফাতে অপরিচিত এক আধা-বয়সী ভদ্রলোক সম্ভবতঃ অবাঙালী দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে। একজন পুলিশ অফিসার ও কয়েকজন কনেষ্টবল নির্বাকভাবে দাঁড়িয়ে। রমণীবাবু কেবল, তারস্বরে তার বাস্তুভিটায় এই অমঙ্গলেয় কথা বলছেন—

মেয়েটির অঙ্গে আজ নতুন প্রসাধন। পাতলা কাপড়ের ফাঁকে ব্লাউজের রং দেখা যাচ্ছে, আর পাতলা ব্লাউজের ভিতর দিয়ে ভিতরের নীবিবন্ধের রং দেখা যাচ্ছে। হাতের উপরে আলো পড়েছে, নখে নেল পলিশ। কিন্তু আনত-মুখখানায় অন্ধকার ঘনীভূত হ'য়ে রয়েছে।

পুলিশ অফিসার পরুষকণ্ঠে বললেন,—শুনুন, হরেন ঘটক কোথায় ? তার ঠিকানা আপনাকে দিতেই হবে। বলুন—

মেয়েটি মুখ নীচু করেই বললে,—জানিনা।

—থানায় গেলে অবশ্য বলতেই হবে। তবে মানে মানে বলাই ভাল। হরেন ঘটক বি-এ, বি-টি, মহোদয় এখন কোথায় আছেন ? তাকে যে চাই-ই—

মেয়েটি এইবার মুখ তুলে চাইল—বুঝলাম আজ প্রসাধনে সে সত্যিই সুন্দরী হ'য়েছে। ওষ্ঠে রং মাখতেও ও কবে শিখে নিয়েছে। স্বল্পালোকেও সত্যিই ওকে অপরূপ সুন্দরী বলে মনে হ'চ্ছে। পুলিশ অফিসার প্রশ্ন করলেন,—তুমি কোথায় থেকে এলে হে বাপু ?

—কম্পমান লোকটি হাত জোড় করে বললে,—আমার কি কসুর আছে ? হাম রূপেয়া দিয়া, রাণ্ডি লোক হামাকে লিয়ে এসেছে—হাম ত পঞ্চাশ রূপেয়া আগাম দিয়া —

পুলিশ ভদ্রলোক হেসে বললেন,—রূপেয়া দিয়া যখন তখন আর কসুর কি ? তা কসুর কিছু নেই বটে—কিন্তু শুনছেন মেম সায়েব, হরেন ঘটক কোথায় ?

মেয়েটি চোখ মেলে কঠিনকণ্ঠে বললে,—জানিনা।

—জানতে ত আপনাকে হবেই,—না জানলেও আমাদের জেনে নিতেই হবে ?

—না জানলে আমি বলবো কি করে ? এখানে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেছে সে, আমি কি করবো ?

এইবার সুস্পষ্ট দেখলাম ওর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরছে। সে জলের বেগে পালিশ করা মুখের রং ধুয়ে নামছে চিবুক দিয়ে। রমণীবাবু বললেন—আমি ব্রাহ্মণ ছাড়া বাড়ী ভাড়া দেই নে, পাছে মুরগী-টুরগী এনে বাড়ী অপবিত্র করে আর শেষে আমারই ভাগ্যে এই—

পুলিশ হেসে বললেন,—তা খুব সুব্রাহ্মণকেই বাড়ী ভাড়া দিয়েছিলেন বটে। একেবারে কুলীন—

—ঘটক ত রাঢ়ী শ্রেণীর ভাল ব্রাহ্মণ—

—তা বটে, তবে আপনাদের হরেন্দ্রনাথ ঘটক বি-এ, বি-টি, মহোদয়ের প্রকৃত নাম মইনুল ইসলাম, বাড়ী পূর্ব্ব পাকিস্থান এবং তিনি বিশেষ একজন পাকা লোক —

রমণীবাবু আর্ত্তস্বরে বললেন, মুসলমান, শেষে গোমাংস এনে খেয়েছে হয়ত ? হায় হায় কি হবে ? আমার বাস্তুভিটে—

তাকিয়ে দেখলাম মেয়েটির চোখের জল শুকিয়ে গেছে, চোখদুটো জল জল করছে অন্ধকারে সরীসৃপ শ্বাপদের মত। সেও আর্ত্তকণ্ঠে বললে, মুসলমান ?

—হ্যা, মেম সায়েব তাতে আর আপনার লাভলোকসান কি ? এই ঠাকুর মশারই এখন ভাবনার কথা! এই মইনুল ইসলাম সায়েব একদিন রেল গাড়ীতে হরেন ঘটকের সুটকেস চুরি করে নেমে পড়েন। সুটকেসে বি-এ, বি-টির ডিপ্লোমা ছিল।—তাই নিয়ে তিনি আপনাদের গ্রামের স্কুলে স-পৈতা হরেন ঘটক হয়ে—

মেয়েটি আর্ত্তকণ্ঠে একবার উঃ করে উঠে, বিভ্রান্ত বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ল। সেও বোধ হয় জানতো না,—এতখানি, এত ইতিহাস—

পুলিশটি বলল, যাক্ ভদ্রলোকদের শান্তিভঙ্গ করে কি হবে? এখন দয়া করে উঠুন, থানায় যেতে হবে। সেখানে রাত্রি প্রবাসে অসুবিধে কিছু নেই—

দেখি অদূরেই পুলিশ ভ্যান অপেক্ষা করছে। ওরা দু'জনকে ধরে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে তুলেছিল, রাস্তার দেখলাম, মেয়েটি আর কাঁদছে না। পাথরের মত নিশ্চল হ'য়ে গেছে—কেবল মুখের রং এর মধ্যে অশ্রুর রেখা সুস্পষ্ট হ'য়ে রয়েছে।

গাড়ী ষ্টার্ট দিয়ে চলে গেল। রমণীবাবু বললেন—কি করবো বাবাজী বলুন ত? মা-লক্ষ্মী বলছিলেন—শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করতে, তাতেই কি এই পাপ বিমোচন হবে। মুসলমান—তার উপর বেশ্যাবৃত্তি—হায় হায়? পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়নেও এ পাপক্ষয় হবে না—

এর পর পুলিশ এসে একদিন দু'চারটে প্রশ্ন করে গেছে, আমরা কিছু জানিও না, কিছু বলতেও পারিনি। খবরের কাগজের ঘটনা যেমন মানুষ পড়েও আগ্রহে এবং ভুলেও যায় নিশ্চিন্তে তেমনি আমরাও ঘটনাটা ভুলতে বসেছি। এমন কত মামলা কত ধারা মতে কত আদালতে নিত্য হচ্ছে কে আর সে সব মনে রাখে। তবে মাঝে মাঝে মেয়েটির সেই কঠোর শুষ্ক পাংশুমুখখানা মনে পড়ে। হয়ত সেই নিষ্কলুষ ছিল, এমনি এক হৃদয়হীন জুয়াচোরির সঙ্গে পড়ে জীবনকে নষ্ট করেছে—

সেদিন দুপুরে খুব গরম পড়েছে। এগারটা বেজে গেছে, কিন্তু বন্ধের দিন বলে স্নান হয় নি। ছাতা হাতে এক ভদ্রলোক কড়া নাড়লেন। বললেন, এইটি কি···নং বাড়ী?

—আজ্ঞে হা—

—এ বাড়ীতে অন্য কোন ভাড়াটে ছিল বা এখন আছে—

—ছিল এখন নেই—

ভদ্রলোকের চেহারা বেশ অভিজ্ঞ, দেখলে মনে হয় গ্রাম্য হলেও অর্থবান্ ও শিক্ষিত। তিনি একটু থেমে বললেন, একটু জল দেবেন? বড় তৃষ্ণা—

—আসুন। উপরে নিয়ে এসে তাকে বসিয়ে পাখা খুলে দিয়ে বললুম, একটু বিশ্রাম করুন। জল আনছে—রেবা জল ও সম্ভবতঃ একটু মিষ্টির ব্যবস্থা করতে চলে গেল।

—এ বাড়ীতে কে ভাড়া ছিল জানেন?

—এক নবদম্পতি ভাড়া নিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের নাম হরেন ঘটক বোধ হয়—

—হরেন ঘটক? তাঁর সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল?

হ্যাঁ—

—কি রকম দেখতে?

—তাঁকে ঠিক আমরা দেখি নি—তাঁরাও আলাপ করেন নি—

বৃদ্ধ বুক পকেট থেকে একখানা ফটো বের করে বললেন, দেখুন ত এই মেয়েটি কি?

—হ্যাঁ, এই মেয়েটি—

—তারা কোথায়?

—জানি না, কিছুদিন আগে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে—

—কেন?

—বেশ্যাবৃত্তির দায়ে—

বৃদ্ধ লাফিয়ে উঠে বললেন, কি বললেন? বেশ্যাবৃত্তি—এঁ্যা—সঙ্গে সঙ্গে ছাতাটা নিয়ে নেমে গেলেন তর তর করে। বললাম, জল খেয়ে যান, গৃহস্থের অকল্যাণ হবে ফিরে আসুন—

কোন কথা না বলে তিনি দুপুরের কাঠফাটা রোদে ছুটতে সুরু করলেন। মনে হয় যেন কিসে তাকে তাড়া করেছে। আর তার তালে তাল বাজাচ্ছে কলকাতার ট্রাম বাস আর নিষ্ঠুর সমারোহ।

মাদুরা থেকে কন্যাকুমারিকার পথে

নন্দদুলাল চক্রবর্তী

মাদ্রাজ রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী মাদুরা। প্রাচীন মন্দিরশ্রেণী ও স্থাপত্যশিল্পের পটভূমে মাদুরা দক্ষিণ শিক্ষা-সংস্কৃতি সঙ্গীত বিজ্ঞান শিল্প ও বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। সুতা আর বস্ত্রশিল্পে এই জেলার খ্যাতি সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত। পথ চলতে নজরে পড়ে সিল্ক আর সুতীবস্ত্রের রঙীণ সুতোর টানা। সুতো আর কাপড়ের কলের ঘর্ঘর ঘটঘট একটানা আওয়াজ পথিককে মাঝে মধ্যে সচকিত করে তোলে।

প্রকৃতির দাক্ষিণ্য ও কিছু কম নেই এখানে। তটিনীর কলগান তটভূমির সারি সারি নারিকেলকুঞ্জ আর দিগন্ত-জোড়া ধানের ক্ষেতে সবুজের সমারোহ ভ্রাম্যমান মনশ্চক্ষুর নিঃসন্দেহে তৃপ্তিদায়ক।

মন্দিরশ্রেণীর মধ্যে দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকলার পরম রূপটি ধরা পড়েছে মন্দিরে। দক্ষিণ ভারতের তিনটি সুবৃহৎ স্থাপত্যধর্মী মন্দিরের এক তুলনামূলক আলোচনায় জানা যায়,মন্দিরের বিস্তৃতির দিক দিয়ে শ্রীরঙ্গম, বিশালতায় রামেশ্বরম, আর বিস্তৃতি ও বিশালতার যুগ্ম সংগঠন হচ্ছে মীনাক্ষীদেবীর মন্দির।

প্রাত্যকৃত্যাদি সেরে পোষাক পরিবর্তন করে বিছানা-পত্তর মাদুরা ষ্টেশনের ক্লোকরুমে জমা করে দিলাম। তারপরে মীনাক্ষী মন্দিরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম —মন্দির নাকি বেলা বারোটায় বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব দূরত্ব বেশী না হলেও তাড়াতাড়ি পৌঁছাবার জন্য একটা টাঙ্গা ধরতে হল।

মন্দিরের বাইরে রাস্তার ধারে ধারে সারিবদ্ধ বিপনি। রাস্তার অপর পাশে মন্দির। টাঙ্গা ছেড়ে সেইদিকে অগ্রসর হলাম।

একটা বিস্তীর্ণ এলাকার চারদিকে দুর্গপ্রাকারের মতো উচু পাথরের চৌঘরা। ভিতরে মন্দির। মন্দিরকে ঘিরে আছে ন'টি সুদৃশ্য গোপুরম—মন্দিরের প্রবেশপথ পুর্বদিকে। বহির্ভাগের বিস্তৃত বাঁধানো চত্বর অতিক্রম করে সেই পথে মন্দিরের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করলাম।

শান্ত সুন্দর স্বর্গীয় এক পরিবেশ মন্দিরের চারপাশে।

এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর গঠনরীতি। শুধু কতকগুলো বিশালাকার স্তম্ভের উপরে মন্দিরের ছাদ বসানো রয়েছে। এক একটি অখণ্ড পাথর কোঁদাই করে এমনিভাবে একটি করে স্তম্ভ তৈরি হয়েছিল। স্তম্ভ আর মন্দিরগাত্রের অলঙ্করণ খুবই চমকপ্রদ। পাথরের গায়ে লতাপাতার খোদাই এমনি সুক্ষ্ম আর বক্ররেখায় প্রতিফলিত হয়েছে যে দেখলে বিস্ময় জাগে। শুধু লতাপাতা নয়, ছত্রিশ কোটি দেবদেবীর মূর্তি, আর রামায়ণের সম্পূর্ণ কাহিনীটিও সজীবভাবে খোদিত করা রয়েছে সেখানে। বোধ হয় এই সমস্ত কারুকলার জন্য দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য প্রধান প্রধান মন্দিরের চেয়ে মীনাক্ষী-মন্দিরের নামডাক সবচেয়ে বেশী।

অন্যান্য মন্দিরের মতো এখানেও রয়েছে একটি নামেমাত্র স্বর্ণ তড়াগ। ছোট একটি জলাধারের মতো পুকুরে জলের মধ্যে রাখা হয়েছে সোনার তৈরী একটি ফুটন্ত কমল। পাণ্ডার বাচনে প্রকাশ, কোনো এক ভক্ত নাকি দশ হাজার টাকা দিয়ে স্বর্ণ পদ্মের সাধ মিটিয়েছেন।

মন্দিরের আর এক দিকে সহস্র স্তম্ভযুক্ত এক সভা মণ্ডপ। স্তম্ভগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত যে দক্ষিণ বাম বা কোণাকুনি যে দিক দিয়ে তাকানো যায়, মনে হয় সেগুলো ঠিক একটি রেখায় বসানো হয়েছে।

মন্দিরেব আর একটি দ্রষ্টব্য ব্যাপার হচ্ছে সুরস্তম্ভ। এক একটি বেদিকার উপরে পাঁচ-ছটি ক'রে স্তম্ভ একত্রে গায়ে-গায়ে বসানো আছে। স্তম্ভগুলোর গোড়ার দিকে

প্রায় তিন ফুট পর্য্যন্ত সমকোণ আকারের এবং নিরেট —তার উপরের তিন ফুট আবার নিরেট নয়, তারপরে চার পাঁচ ফুট পর্যন্ত নিরেট। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, স্তম্ভ-গুলোকে পাথর বা লোহা দিয়ে মৃদু আঘাত করলে স-রে-গা-মা'র সপ্ত সুর বেজে ওঠে।

মন্দিরের দুটি ভাগ। এক অংশে মন্দির-মধ্যে সুন্দরেশ্বর শিব এবং অপর অংশের মন্দিরে দেবী মীনাক্ষী।

তাড়াতাড়ি দেবী-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলাম।

মন্দির-দুয়ারের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াতে পূজারী কাছে এসে কপালে চন্দন আর হাতে ফুল দিয়ে দিলেন। তারপরে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রদীপের আলোকে দেবীমূর্তি সুন্দরভাবে দর্শন করা গেল। কালো পাথরের ছোট লক্ষ্মী প্রতিমার মত দেবী মূর্তি। পরণে রক্তাম্বর। দেবীর ললাটে বহুমূল্য হীরকখণ্ড প্রদীপের শিখায় জলজল করছে।

দেবীদর্শন সেরে গেলাম শঙ্কর মন্দিরে। লিঙ্গমূর্তি শঙ্কর। পূজারী বলেন, ইনি স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ। রূপার ফণিভূষণ স্বয়ম্ভু লিঙ্গের অঙ্গে।

ভিড় বিশেষ না থাকায় শঙ্কর আর মীনাক্ষী দর্শন বেশ ভালোভাবে সম্পন্ন হল। তারপর মন্দিরের অন্যান্য দিক ঘুরেফিরে দেখে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সকলে।

মন্দিরের কাছে রাজা তিরুমলের প্রাসাদ আর তাঁর বিশাল দীঘিটা। কিন্তু মন্দির দর্শনে তখন এমনি পরিতৃপ্ত যে আর রাজপ্রসাদ দেখার মতো মনোবৃত্তি জাগল না।

মাদুরা ষ্টেশনে ফিরে আসতে দৈহিক দিকটার কথা প্রবলভাবে মনে পড়ল। অতএব দ্বিপ্রাহরিক আহার কর্মটা সেখানেই সেরে নিলাম। তারপরে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম।

বিকেলের গাড়িতে কলুটোলার দলটি ত্রিবান্দ্রমের পথে রওনা হয়ে গেলেন। তাঁদের ছিল ওই পথের ভ্রমণ তালিকা। আমি সব দিক দিয়ে বান্ধবহীন—নেই তাই তাড়াহুড়ো। আমি যাব টিনেভেলি নাগরকয়েল হয়ে ত্রিবান্দ্রম আর কন্যাকুমারিকা ট্রেণ ছাড়বে সেই রাত্রে। সময় হাতে। অতএব আপাতত ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় আরাম করা যেতে পারে।

কিন্তু আরামের সঙ্গে যদি নিদ্রার সংযুক্তি ঘটাতে হয় এবং সেই ঘটনাস্থলটি যদি কোনো ষ্টেশনে নিরূপিত হয়ে থাকে তবে তাতে যথেষ্ট বাধা আছে। প্রধান বাধা হচ্ছে, ফেরিওয়ালা ঝুড়িতে করে কলা আপেল আর অঙ্কুর নিয়ে একের পর এক এসে কেবলি ঠোকর দিতে থাকে। অগত্যা তাদের একজনের সঙ্গে আপোষ করতে হয়। বৈকালিক বিশ্রামের সঙ্গে ফলসেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ নয় বলে বিজ্ঞজন মনে করেন। কিন্তু এখানকার আঙুর-গুলো আয়তনে আর গাত্রবর্ণে স্মরণীয় বটে! এমন গাঢ় নীল রঙের আঙুর সহজে দেখা যায় না। আস্বাদ করে অবশ্য পুলকিত হতে পারলাম না। ফেরিওয়ালাও কম রসিক নয়। চাটনি করে খেলে তবেই নাকি এর স্বাদ খোলে বলে কথায় কথায়, জানিয়ে দিলে।

সন্ধ্যা নামল। ট্রেণের সময় এসে গেল ক্রমে। বিছানা-পত্তর নিয়ে ট্রেণে চাপলাম সারা রাতের মতো। টিনে-ভেলির দূরত্ব আটানব্বই মাইলের মতো। সারা রাত লাগবারই কথা। তবে কোথা দিয়ে রাত কাটল টেরই পেলাম না। সারাদিনের ঘোরাঘুরির পরে বিছানায় একটু এলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখে ঘুম নেমে এল। টিনেভেলি যখন নামলাম, তখন চারিদিকে অন্ধকার। পুরোপুরি ভোরও হয়নি।

টিনেভেলি। ইংরেজের উচ্চারণের নামের অমন বিকৃতি ঘটলেও আসল নামটি এর তামপনী। তামপর্নী নদীর তীরে এক দ্বীপময় শহর।

রাস্তায় তখনো আলো জলছে। লোকজন বেরোয়নি।

ষ্টেশনের এক টিকেট-কলেকটরকে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন একজন এমন পোর্টারকে আমার সঙ্গে দিয়ে দেন যে কন্যাকুমারীর বাস চিনে সেখানে আমার মালপত্তর তুলে দিতে পারে। কারণ আমার পক্ষে মুশকিল হচ্ছে, এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ, পোর্টার, বাস-কণ্ডাক্টর—কেউ ইংরাজি বা হিন্দী আদৌ বোঝে না। আর বাস-ষ্ট্যাণ্ড কোথায় তা-ও আমার জানা নেই।

ভদ্রলোক খুবই সহানুভূতি জানালেন। একটা পোর্টারকে ডেকে স্থানীয় ভাষায় তাকে সমস্ত কিছু নির্দেশ দিয়ে আমাকে বললেন, 'এর মাথায় আপনার হোল্ড-অলটি চাপিয়ে দিন, ও আপনাকে নাগরকয়েলের বাসে তুলে দেবে, সেখানে থেকে অন্য বাসে কন্যাকুমারী

যাবেন। কোনো টাঙ্গা এখান থেকে কন্যাকুমারী যায় না।'

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে পোর্টারের পিছু পিছু গিয়ে বাসে চাপলাম। পোর্টারটি স্থানীয় ভাষায় কণ্ডাকটরকে যা বললে তার থেকে অনুমান করলাম, কণ্ডাকটর আমাকে গন্তব্যস্থলে নামিয়ে পরবর্তী বাসে তোলার ব্যবস্থা করে দেবে।

বাস ছাড়ল। নাগরকয়েল এখান থেকে তিপ্পান্ন মাইল দূরে। সেখানে থেকে আরো বারো মাইল পথ অতিক্রম করলে তবেই কন্যাকুমারী।

টিকেট করে নিয়ে বাসের এক কোণে চুপচাপ বসেছিলাম। সবই ভিনদেশী যাত্রী। কার সঙ্গে কী কথাই বা বলব। আমার সামনের আসনে দু'জন যাত্রী নিজেদের মধ্যে নিম্নস্বরে ইংরাজীতে কথাবার্তা বলছিলেন। গায়ের রং শ্যামল, পরণে প্যাণ্ট। একটা কিছু আন্দাজ করতে যাব এমন সময় দেখি, তাদের একজনের মুখ দিয়ে ফস করে বাংলা বুলি বেরিয়ে পড়ল।

আর যায় কোথা। নিজেই আলাপ করলাম। কলকাতার লোক, দু'জনেই এরোড্রামের ইঞ্জিনিয়ার। প্লেনের পাস পেয়ে মাদুরায় নেমে স্থানীয় যানবাহনে করে চলেছেন কন্যাকুমারী দেখতে। ভালোই হল। ভারতের একেবারে দক্ষিণতম প্রত্যন্তে উপনীত হয়ে একা-একা যে নিঃসঙ্গতা পলে পলে অনুভব করছিলাম, সেটি আপাতত মন থেকে নিঃশেষে মুছে গেল।

চওড়া পিচঢালা রাস্তা ধরে বাস ছুটেছে। ভোরের স্নিগ্ধ আলো-আঁধারি পরিমণ্ডলে ততক্ষণে দেখা দিয়েছে নতুন সূর্যের আভা। চারিদিকের দৃশ্যাবলী রূপের পসরা মেলে ধরেছে। আশেপাশে শ্যামল ধানের ক্ষেত, এদিক-ওদিক অগণিত নারিকেল কুঞ্জ, দূরে দিগন্তে সবুজ বনময় আর পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ঘন মেঘের নীলাম্বরী ওড়না—সব যেন টুকরো নিটোল কবিতার মতো চলার পথে পথে ভেসে উঠছে। এই পথের দৃশ্যই তো কালিদাসের কাব্যে 'তমালতালী বনরাজিনীলা' হয়ে ফুটে উঠেছিল।

বাসে বসে মনে মনে অনেকগুলো গান রচনা করে ফেললাম। পাল্টা বাসে ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুরা আমার পাশেই আসন নিলেন।

ধীরে-সুস্থে বাস ছাড়ল।

নতুন মানুষ এ অঞ্চলে এলে প্রথমেই তার চোখে যা বিস্ময়করূপে ধরা পড়ে তা হচ্ছে—কলা আর স্ত্রীলোক। কথাটা পরিহাস বিজল্পিতের মতো শোনালেও নির্ভেজাল সত্য বটে।

প্রথমেই ধরা যাক কলা। অবশ্য আদিতে কলা ধরলে অন্তে শেষোক্ত কী মিলবে তা ভগবান জানেন। কিন্তু প্রথমেই যখন ওই নিদারুণ কলার দর্শন মিলেছে তখন যা ঘটার ঘটেই গেছে--সুতরাং আলোচনায় বাধা কোথায়। আর কলাকে আমরা হেয়জ্ঞান করলেও দক্ষিণী 'কালচারে' কলার একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে—তা' সে যে-কলাই হ'ক না কেন। অতএব এই কালচারের একটি বড় অংশকে 'কাচার' বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই কলাচাষের একটি কলা আয়তনে যেমন, গাত্রবর্ণেও তেমনি। অমন গাঢ় লাল রঙের কেঁদো মোটা কলা ভারতের আর কোথাও আমার নজরে পড়েনি। তাই আচমকা অমন লাল কলা চোখে পড়লে চোখের প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

তারপর স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক না বলে তাদের কর্ণাভরণের কথাই বলতে চাচ্ছি। কেননা, দক্ষিণী নারীদের একটা পরিচিত রূপ আছে—সেই শ্যামলা রঙ, কাছা দেয়া কাপড়, সেই নাকে কানে মুক্তো—দেয়া 'টাব' উড়ন্ত বেণীতে ফুলের বাহার—চেহারায় পোষাকে এটাই সর্বজনীন চলতি রূপ এবং আমার দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ-পর্বে এই রূপটাই আমি এতাবৎকাল ধরে দেখে আসছিলাম। সহসা এ অঞ্চলের নারীদের মধ্যে ওই উৎকট কর্ণাভরণ দেখে চোখ দুটো একেবারে ভুরুতে ঠেকে যাওয়ার দাখিল! বাপ্‌স্—ওই কী একটা অলঙ্কার—যা স্ত্রীলোকের অতি সুকোমল কর্ণযুগলে সখ করে ধারণ করবার মতো! প্রায় এ পো' দেড় পো' ওজনের স্টীলের অবস্থাভেদে রূপোর তৈরী মোটা মোটা গয়না কানে পরে অবলীলাক্রমে স্থানীয় নারীরা রাস্তা ঘাটে চলা ফেরা করছে।

গহনার ভারে কানের ফুটো দুটো এমনি বড় হয়ে গেছে যে তার মধ্য দিয়ে একটা মোটা রুল-বাড়ি অনায়াসে গলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বোধ হয় এ জন্যেই সৃষ্টি হয়েছিল এই বাক্যটি—'ভিন্ন রুচিহি লোকাঃ।'

বাস ছুটে চলেছে উদ্দামগতিতে।

ভারতের দক্ষিণাভিমুখী এই ভূখণ্ডটি ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠছে। পিচঢালা রাস্তা এঁকেবেঁকে একবার পূর্বঘাট পর্বতমালা, আর একবার পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ছুঁয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। আমাদের বাস ছুটেছে ওই পথ ধরে।

একদৃষ্টে চেয়ে আছি সামনের দিকে।

'সুচীন্দ্রম' ফেলে ক্রমে বাসখানা কন্যাকুমারীর দিকে ছুটছিল। বেলা প্রায় সাড়ে ন'টার সময় কন্যাকুমারিকায় পৌছোলাম।

ভারতমাতা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(স্বামী বিবেকানন্দ ও দ্বিজেন্দ্রলালের শততম জন্মোৎসবে উভয়ের অনুভাবে)

আজ দেখা দিলে ঝলকি' নিখিলে মৃন্ময়ী মাগো
কালো নিশায়
বিকলি' তিমির চিরন্তনীয় বিলায়ে আশীষ আলোশিখায় !
আমরা যে সাড়া দিই ক্ষণে ক্ষণে
মিথ্যামলিন কামনাকূজনে,
সাধিয়া আঁধার শুনি না তোমার শঙ্খ, যে ডাকে :
"আয় রে আয় !"
তাই কি অশনি মন্দ্রি' জননী, জাগালে তন্দ্রালস হিয়ায় ?
মাটি নও তো মা তুমি নিরুপমা, চিন্ময় তব প্রতি অণু।
এসেছেন বুকে তব যুগে যুগে নারায়ণ ধরি' নরতনু।
তোমারি তো ডাকে গোলোক মুরলী
কত শত প্রাণ পুলকে উছলি'
শ্যামল-করুণা-কোমল-যমুনা বহালো বৃন্দাবন লীলায়।
তোমার আকাশে তোমার বাতাসে আজো সে-অমরা
স্মৃতি বিছায় ॥

কত কবি গুণী যোগী ঋষি মুনি নমি' মা তোমার ধূলিকণা
হয়েছে ধন্য চিরবরেণ্য—অলস-উছাসে উন্মনা।
তোমারি কোলে মা গগনগঙ্গী
ধায় গেয়ে গান নীলতরঙ্গী,
তপনবাহিনী মরণতারিণী ! কৈলাস শিরে তোমার তায়
কনককান্ত ধ্যান প্রশান্ত যুগযুগান্ত বন্দনায় ॥
আজ প্রার্থনা : তোমার সাধনা পলতরেও
না যেন ভুলি।
ত্যজিয়া স্বার্থ যেন পরার্থ-বুকে অন্তর ওঠে দুলি'।
যেন পারি মাগো তোমার প্রসাদে
আপনারে দিতে বিলায়ে দুহাতে,
প্রতি জীব মাঝে যে-শিব বিরাজে বরি' তারে
তাপিতের সেবায়।
আজ দেখা দিলে স্বরূপে নিখিলে প্রেমের-
প্রতিমা-মধুরিমায় ॥

Swami Vivekananda : "If there is any land on this earth that can claim to be the blessed *Punya Bhumi*···it is India."

দ্বিজেন্দ্রলাল : "এ-দেবভূমির প্রতি তৃণ 'পরে আছে বিধাতার করুণাদৃষ্টি।

ত্রিমাত্রিক

II সা ধ্‌া সা | গা রা সা I পা পা গা | না ধা পা I
আ জ দে খা দি লে ঝ ল কি নি খি লে
ক ত ক বি গু ণী যো গী ঋ ষি মু নি

র্সা -া ধা | র্গা র্রা র্সা I না ধা না | ধপা -া -া I
মৃ ন্‌ ম য়ী মা গো কা লো নি শা - য়
ন মি মা তো মা র ধূ লি ক ণা - -

পা পা গা | ধা ধা -া I না ধপা গা | না না -া I
বি দ লি তি মি র চি র ন্‌ ত নী র
হ য়ে ছে ধ - ন্য চি র ব রে - ণ্য

র্সনা ধা পা | র্সা র্সা -া I সা রা গা | গসা -া -া I
বি লা য়ে আ শী ষ আ লো শি খা - য়
অ সী ম উ ছা সে উ ন্‌ ম না - -

না না র্সনা | ধনা ধপা ধা I গা র্সা না | ধনা ধপা পা I
আ ম রা যে সা ড়া দি ই ক্ষ ণে ক্ষ ণে
তো মা রি কো লে মা গ গ ন গ ঙ্‌ গা

সা রা গা | পা ধা না I র্গা র্রা র্সা | ধনা ধপা পা I
মি - থ্যা ম লি ন কা ম না কু্‌ জ নে

র্সা র্সা র্সা | ধনা না -া I পধা ধা ধা | ক্ষপা পা -া I
সা ধি য়া আঁ ধা র শু নি না তো মা র
ত প ন বা হি নী ম র ণ তা রি ণী

সা রা গা | পা না ধা I গা পা র্রা | র্সা -া -া I
শ ঙ্‌ খ যে ডা কে আ য় রে আ - য়
কৈ - লা স শি রে তো মা র ভা - য়

না র্রা র্রা | র্সা র্সা র্রা I না র্রা র্রা | র্সা র্সা র্রা I
তা ই কি অ শ নি ম ন্‌ দ্রি জ ন নী
ক ন ক কা ন্‌ ত চি র প্র শা ন্‌ ত

নর্রা র্সা না | ধা পা ধা I গা র্গা র্রা | র্সা -া -া I
জা গা লে ত ন্‌ দ্রা ল স হি য়া - য়
যু্‌ গ যু্‌ গা ন্‌ ত ব ন্‌ দ না - য়

সা মা মা | রা রা পা I গা ধা ধা | জ্ঞা জ্ঞা না I
মা টি ন ও তো মা তু মি নি রু প মা
আ জ প্রা র্‌ থ না তো মা র সা ধ না

পা র্রা র্সা | না ধা পা I ক্ষপা ক্ষপা মা | গা -া -া I
চি ন্‌ ম য় ত ব প্র তি অ ণু - -
প ল ত রে ও না যে ন ভু লি - -

গা মা পা | ক্ষা পা ধা I দা ধা না | ধা না র্সা I
না রা য় ণ যু গে যু গে ত ব বু কে
ত্যা জি য়া স্বা - র্থ যে ন প রা - র্থ

নর্রা র্সা ধর্সা | না পনা ধা I গা ক্ষা ধা | পা -া -া I
এ সে ছে ন ধো রে ন র ত নু - -
বু কে অন্ - ত র ও ঠে দু লি - -

সা রা গা | মগা রা সা I পা ধা না | র্সনা ধা পা I
তো মা রি তো ডা কে গো লো ক মু র লী
যে ন পা রি মা গো তো মা র প্র সা দে

র্সা র্রা র্গা | র্মর্গা র্রা র্সা I না ধনা ধপা | র্সা র্সা র্সা I
ক ত শ ত প্রা ণ পু ল কে উ ছ লি
আ প না রে দি তে বি লা য়ে দু হা তে

সা গা রা | মা গা পা I ক্ষা ধা পা | না ধা র্সা I
শ্যা ম ল ক রু ণা কো ম ল য মু না
প্র তি জী ব মা ঝে যে শি ব বি রা জে

নর্রা সর্রা নর্সা | ধনা পা ধা I গা পা র্রা | র্সা -া -া I
ব হা লো বৃন্ - দা ব ন লী লা - য়
ব রি তা রে তা পি তে র সে বা - য়

না না র্রা | র্সা র্সা র্রা I না না র্রা | র্সা র্সা র্রা I
তো মা র আ কা শে তো মা র বা তা সে
আ ন ন্দে থা দি লে স্ব রূ পে নি খি লে

নর্রা র্সা না | ধা পা ধা I গা র্গা র্রা | র্সা -া -া II
আ জো সে অ ম রা স্মৃ তি বি ছা - য়
প্রে মে র প্র তি মা ম ধু রি মা - য়

ভারত ও নেপাল

আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ পিএচ-ডি

অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত নেপাল একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যরূপে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। মুসলমান ও ইংরেজ ইহা আক্রমণ করিয়াছে কিন্তু দখল করিতে পারে নাই। ভারতের আর কোনও দেশ বা রাজ্য এই গৌরবের দাবি করিতে পারে না। ভারতের উত্তরে এই স্বাধীন রাজ্য হিমালয়ের উপত্যকায় ও পাদ দেশে পূর্ব পশ্চিমে ৫০০ মাইল ও উত্তর দক্ষিণে ১৩০ মাইল বিস্তৃত। ইহার উত্তরে হিমালয়, পূর্বে সিকিম এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে হিন্দুস্থান। কিন্তু "নেপাল উপত্যকা বলিতে প্রকৃত পক্ষে খুব ক্ষুদ্র একটি দেশ বুঝায়। ইহার কেন্দ্র রাজধানী কাটমাণ্ডু এবং ইহার বিস্তার পূর্ব পশ্চিমে ২০ মাইল এবং উত্তর দক্ষিণে ১৫ মাইল। নেপাল রাজ্য প্রাচীনকালে মোটামুটি এই ক্ষুদ্র ভূভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল, নেপালের ইতিহাস প্রধানতঃ এই জনপদেরই ইতিহাস।

নেপালের রাজগণের যে সমুদয় বংশাবলী আছে তাহা হইতে ইহার প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথমে এই দেশে গোপাল; আভীর কিরাত প্রভৃতি পার্বত্য আদিম জাতিরা রাজত্ব করিত। তারপর লিচ্ছবি বংশীয় রাজারা পাচশত বৎসরের অধিককাল এখানে রাজত্ব করেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে লিচ্ছবি নামটি সুপরিচিত। গৌতম বুদ্ধের সময় বৈশালী (বর্তমান মুজফরপুর জেলায় অবস্থিত) নগরে গণতন্ত্রশাসিত লিচ্ছবিগণের রাজধানী ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থে এই গণতন্ত্রের সংবিধান সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। আটশত বৎসর পরে পরাক্রান্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এই লিচ্ছবি দেশের রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের পুত্র গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা সমুদ্রগুপ্তকে সমস্ত গুপ্ত শাসন লিপিতে লিচ্ছবি দৌহিত্র এই আখ্যায় অভিহিত করা হয়—আর কোন সগুপ্তম্রাটের সম্বন্ধে এইরূপ মাতামহ কুলের উল্লেখ নাই। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন যে লিচ্ছবি কুমারদেবীর সহিত বিবাহই চন্দ্রগুপ্তের সৌভাগ্যের ও শক্তিবৃদ্ধির কারণ এবং এই জন্যেই গুপ্ত বংশীয় রাজারা চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত লিচ্ছবিদের সহিত সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রায় তাঁহার ও মহিষী কুমারদেবীর মূর্তি খোদিত আছে—এবং গুপ্তরাজগণের মুদ্রায় আর কোন রাণীর মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং বুদ্ধের সময় অর্থাৎ খৃঃ পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত লিচ্ছবিগণ একটি পরাক্রান্ত রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন।

নেপালে যে লিচ্ছবিবংশ রাজত্ব করিতেন তাহা যে বৈশালীর লিচ্ছবি বংশ, অথবা তাঁহার এক শাখা এরূপ অনুমান খুবই সঙ্গত। ইহার সমর্থক দুই একটি যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে।

গৌতম বুদ্ধের সময় লিচ্ছবির ন্যায় মল্ল জাতিও একটি প্রবল গণতন্ত্র গঠন করেন। এই মল্ল জাতির একটি শাখা বুদ্ধের মৃত্যু স্থান কুশীনগরে (গোরক্ষপুর জেলায় অবস্থিত) রাজত্ব করিতেন, আর এক শাখা ইহার নিকটবর্তী পাপ নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। পরবর্তীকালে নেপালে মল্ল বংশীয় রাজারা বহুদিন রাজত্ব করিয়াছেন। সুতরাং মনে হয় যে লিচ্ছবি ও মল্ল এই দুইটি গণতন্ত্রশাসিত জাতি রাজধানীর গোলযোগের জন্য অথবা অন্য কোন কারণে বিপন্ন হইয়া দুর্ভেদ্য গিরিবেষ্টিত নেপালের উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করেন এবং কালক্রমে ঐ দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

বিহার ও উত্তর প্রদেশের সমতলভূমি হইতে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুরাজগণ যে নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহার আরও দৃষ্টান্ত আছে। মিথিলা উত্তর বিহারে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। যে সময় বাংলাদেশে কর্ণাট-ক্ষত্রিয়বংশীয় সেনগণ রাজত্ব করিতেন সেই সময় কর্ণাট

বংশীয় নান্যদেব মিথিলার রাজা ছিলেন। নান্যদেব নেপাল উপত্যকায় স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার বংশ মিথিলায় দুই শত বৎসরের অধিককাল রাজত্ব করিবার পর দিল্লীর মুসলমান সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন তুঘলক মিথিলা আক্রমণ করেন (১৩২৪ খ্রীঃ)। মিথিলার রাজা হরিসিংহ নেপালের তরাই অঞ্চলে এক দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুসলমান সৈন্য বহু দিন পর্যন্ত এই দুর্গ অবরোধ করিয়াও জয় করিতে পারে নাই—কিন্তু বিহারের সমতল ভূমি অধিকার করে। ইহার ফলে হরিসিংহ নেপালেই রাজত্ব করেন। তাঁহার পর মল্লবংশ নেপালে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন ইহাদের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মল্লবংশীয় রাজগণ তিন শত বৎসরের অধিককাল রাজত্ব করিবার পর গোর্খা নামক সামন্ত রাজ্যের রাজা পৃথ্বী-নারায়ণ ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল উপত্যকা জয় করেন। তাঁহার বংশধরেরাই গুর্খা রাজবংশ নামে পরিচিত এবং অদ্যাবধি নেপালে রাজত্ব করিতেছেন।

এই গুর্খা জাতি রাজপুতানার অধিবাসী ছিলেন। কিরূপে ইহারা নেপালে আসেন তাহার সম্বন্ধে যে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহার সারমর্ম এই :

মুঘল সম্রাট্ চিতোরের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলে তাঁহার পিতা ফতে সিং অসম্মত হওয়ায় মুঘল সৈন্য তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করে। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও ফতে সিং পরাস্ত ও নিহত হন—রাজপুত রমণীরা জহরব্রত করেন এবং যাঁহারা বাঁচিয়াছিলেন তাঁহাদের একদল নেপালের পশ্চিম ভাগে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ক্রমে তাঁহারা গোর্খা নামক এক ক্ষুদ্র নগরী অধিকার করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। ইহারা নেপালের মল্লরাজাদের সামন্ত ছিলেন। মল্লরাজগণের মধ্যে গৃহবিবাদের সুযোগে গোর্খা নায়ক পৃথ্বীনারায়ণ তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া কাটমাণ্ডু অধিকার করেন এবং নেপালের পশ্চিম অঞ্চল জয় করিয়া বিস্তৃত বর্তমান নেপাল রাজ্যের সূত্রপাত করেন। এইরূপে দেখা যায় যে নেপালের প্রসিদ্ধ রাজবংশগুলি ভারতের সমতল ভূমি হইতে নেপালে আশ্রয় লাভ করেন।

ইহার ফলে খুব প্রাচীনকাল হইতেই নেপালে ভারতে সমতলভূমির কৃষ্টি ও সভ্যতা প্রবেশ লাভ করে। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে মৌর্য সম্রাট অশোকের কন্যা চারুমতী নেপালে এক মঠে অবস্থান করেন। সম্রাট অশোক বর্তমান নেপালের অন্তর্গত বুদ্ধদেবের জন্মস্থান পরিদর্শন করেন এবং সেখানে একটি শিলাস্তম্ভ স্থাপন করেন—তাহার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেবল বৌদ্ধধর্ম নহে ভারতের যাবতীয় ধর্মই নেপালে প্রচারিত হইয়াছে এবং এখনও প্রচলিত আছে। ভারতের সমতলভূমি বহু বিদেশী আক্রমণে পুনঃ পুনঃ বিপর্যস্ত হওয়ায় ইহার প্রাচীন মন্দির মঠ প্রভৃতি এবং ধর্ম, রীতিনীতি সামাজিক অনুষ্ঠানের স্মৃতিচিহ্ন বহু পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু নেপালে এইরূপ আক্রমণ না হওয়ায় সেখানে সকলই বজায় আছে। ফলে মুসলমান যুগের পূর্বে ভারতের সংস্কৃতি ও ধর্ম কিরূপ ছিল তাহার ধারাবাহিক স্তর এখনও নেপালে প্রত্যক্ষ করা যায়। মুসলমান আক্রমণকারীরা বৌদ্ধ মঠ ও বিহার ধ্বংস করিলে অনেক বৌদ্ধভিক্ষু বাংলা ও বিহারের অন্তর্গত নালন্দা প্রভৃতি স্থান হইতে পলাইয়া নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা সঙ্গে অনেক পুঁথিও লইয়া যান। ইহার ফলে নেপালে সহস্র সহস্র এমন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে যাহা ভারতের আর কোথাও পাওয়া যায় না। বাংলা ভাষায় লিখিত সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' নেপালেই পাওয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিতে'র একমাত্র পুঁথি নেপালেই আবিষ্কৃত হয়—ইহাতে উত্তর বাংলার কৈবর্ত বিদ্রোহ ও পাল-সম্রাট রামপালের জীবন চরিত সম্বন্ধে মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায়। সুতরাং নেপাল ও ভারত ইতিহাস ও সংস্কৃতির মাধ্যমে বহুদিন যাবৎ নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। ভবিষ্যতেও এই নিকট সম্বন্ধ ও মৈত্রী বন্ধন যে কখনও ছিন্ন হইবে না এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে।

উত্তরাধিকারী

কামিনীকুমার ভট্টাচার্য

অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। প্রবল বেগে বাতাস বহিতেছে। অশ্বত্থ বৃক্ষের ডালগুলি ঝড়ের বেগে থাকিয়া থাকিয়া মড় মড় করিয়া উঠিতেছে, বাহিরে ভীষণা প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য, অন্ধকার কুটীরাভ্যন্তরে মৃতপ্রায় সাধুর শয্যা পার্শ্বে সিক্ত-বসন নিশীথনাথ উপবিষ্ট। বাহিরে উন্মাদ অস্থিরতা, ভিতরে নীরব গাম্ভীর্য্য।

নিশীথনাথের অন্ধকারে একাকী বসিয়া থাকা কষ্টকর হইল। তাহার সঙ্গী কনষ্টবলেরা তখনও আসিয়া পৌঁছে নাই, নিশীথ অত্যন্ত ভাল মানুষ। কনষ্টবলেরাও সেই জন্যই তাহাকে ফেলিয়া নির্ভয়ে নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে আশ্রয় লইয়াছে। নিশীথ বহু কষ্টে নিজের দিয়াশলাইয়ের ১০।১২টা কাঠি নষ্ট করিয়া শেষে একটা কুলুঙ্গীতে আলো জ্বালিতে সমর্থ হইল। সেই অস্পষ্ট আলোকে সেবকদাসের মুখখানি নিশীথ যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত দেখিয়া লইল। দেখিল—মৃত্যুর ছায়া তাঁহার শ্বেতশ্মশ্রুপরিশোভিত প্রশান্ত বদনমণ্ডলের কমনীয়তা বেশী নষ্ট করিতে পারে নাই। এই আসন্ন সময়ে মুমূর্ষু সাধুর মুখের উপর একটী স্বর্গীয় প্রসন্নতার দ্যুতি খেলা করিতেছিল। নিশীথনাথ পুলিশের লোক হইলেও হৃদয়হীন ছিল না। বৃদ্ধার মুখে সাধুর বদান্যতার কথা, তাঁহার আর্ত্তসেবার কথা শুনিয়া অবধি নিশীথের মনে সাধুর প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহার নির্ম্মল কলুষলেশহীন প্রশান্ত মুখকান্তি অবলোকন করিয়া নিশীথের শ্রদ্ধার ভাব দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তাঁহার এই দুর্দ্দশা ও সঙ্গীহীন অবস্থা দেখিয়া নিশীথের কোমল হৃদয় গলিয়া গেল। তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ সাধুর মুখের নিকট মুখ নিয়া নিশীথ সাধুর মুখটি স্পষ্টতর ভাবে দেখিয়া লইতে চাহিতেছিল, হঠাৎ নিশীথের চোখ বাহিয়া দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু সাধুর ললাটে পতিত হইল। অশ্রু স্পর্শেই যেন চেতনা লাভ করিয়া সাধু বলিয়া উঠিল, "কে প্রমথ এলি কি বাবা?" নিশীথ চমকিয়া উঠিল। সাধু বাঙ্গলায় কথা কহিল; বিশেষতঃ নিশীথের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম প্রমথ। সাধু ধীরে ধীরে চোখ মেলিল, অস্পষ্ট আলোকে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। নিশীথের মনের মধ্যে তখন ভয়ানক তুফান বহিতেছিল। সে যেন ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও কোন স্বর্গ রাজ্যের সঙ্কেত দীপ দেখিতে পাইয়াছে। তাহা আলেয়াও হইতে পারে। এই চিন্তায় আবার নিশীথ আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বে ভয়ানক ক্লিষ্ট হইতেছিল। নিশীথ কেবলই চিন্তা করিতেছে, পশ্চিমদেশের এই সুদূর প্রান্তে এই দুর্গম গ্রামে কে এই বাঙ্গালী, কে এই মহাজন অজ্ঞাতবাসে পরোপকার ব্রত উদ্‌যাপন করিতে আসিয়া ধীরে ধীরে পরলোকের দিকে অগ্রসর হইতেছে? এমন সময় সাধু আবার বলিয়া উঠিল "এদের যে অবস্থায় ফেলে এসেছি—এতদিন যে তারা জীবিত আছে তারই বা স্থিরতা কি? সাধুর কথা অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে—কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সাধু কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "জল"

জল কোথায় ছিল নিশীথের জানা ছিল না, কুলুঙ্গী হইতে আলো লইয়া তল্লাস করিয়া একটী কমণ্ডলু পাইল। তাহাতে সামান্য মাত্র জল ছিল। সাধুর মুখে ধীরে ধীরে নিশীথ তাহা ঢালিয়া দিতে লাগিল। জল পান করিয়া সাধু একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আরা জেলার প্রচলিত ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?" নিশীথ বলিল "আপনার কথায় বুঝিতে পারিলাম আপনি বাঙ্গালী, আমিও বাঙ্গালী. আমার সহিত বাঙ্গলাতেই কথা বলিতে পারেন। আমি প্রতাপগড় থানার দারোগা, আপনার ঘরে পোতা টাকা আছে সংবাদ পাইয়া আপনাকে পাহারা দিতে আসিয়াছি। সাধু ধীরে ধীরে

বলিতে লাগিলেন "আপনি বাঙ্গালী। ভালই হইয়াছে, আমার সৎকারের একটা উপায় আপনি করিতে পারিবেন, আমার টাকার কথা যাহা শুনিয়াছেন তাহা সবই মিথ্যা, আমি ভিক্ষা করিয়া অনেক টাকা আনিয়া এ দেশের অনেক গরীবদুঃখীর ভরণপোষণ করিয়াছি, তাহাতেই হয়ত লোকে মনে করে আমার হাতে অনেক টাকা জমা আছে। টাকা থাকিলে আমার উত্তরাধিকারীদের জন্য রাখিয়া যাইতে পারিতাম বা অন্য কোন সৎকার্য্যে ব্যয়ের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া যাইতাম। বড় দুঃখদারিদ্র্য ভোগ করিয়া স্ত্রী পুত্র ফেলিয়া দেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। আর তাহাদের সঙ্গে দেখা হইল না, এই যা কষ্ট, নতুবা দারিদ্র্য সত্বেও এখানে আনিয়া ভগবান আমাকে শান্তিতে রাখিয়াছিলেন। যাক, সে অনেক কথা! দারোগাবাবু, আপনি কোন জাতি?"

নি—আমি বৈদ্য।

যা—ভালই হ'লো, আমিও বৈদ্য। আপনি দয়া করিয়া শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া আমার সৎকার করিয়া যাইবেন। আপনি এই বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলে আমি শান্তিতে মরিতে পারিব।

নিশীথ স্বীকৃত হইল। বেশী কথা কহিয়া সাধুর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিতেছিল। সাধু আবার জল চাহিল, নিশীথ কমণ্ডলু হইতে আবার সাধুর মুখে জল ঢালিয়া দিল, সাধু জলপান করিয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া নিশীথকে জিজ্ঞাসা করিল "দারোগাবাবু! আপনি বাঙ্গালী—বাঙ্গলার কোন জেলায় আপনার বাড়ী?"

নিশীথ—যশোহর জেলায়।

সাধু একটু কাঁপিয়া উঠিল, নিশীথ জিজ্ঞাসা করিল "আপনি এমন করিলেন কেন?"

"না কিছু না" বলিয়া সাধু নীরব হইল।

নিশীথের কৌতুহল ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছিল। সাধু—যশোহর জেলায় তাহার বাড়ী শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন কেন? তিনিও স্ত্রীপুত্র ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া সাধুর পরিচয় জানিবার জন্য নিশীথের বড়ই আগ্রহ হইতেছিল, তথাপি ঐ সকল কথা উত্থাপন করিলে সাধু আসন্ন সময়ে বেদনা পায় আশঙ্কায় নিশীথ নিজের কৌতূহল বহু কষ্টে চাপিয়া রাখিয়াছিল।

সাধু কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল "দারোগাবাবু! আপনি যশোরের লোক, —যশোর জেলায় গুপ্তপাড়া গ্রাম চেনেন কি? সেখানে মহানন্দ গুপ্তের ছেলে প্রমথ, মন্মথ ওদের চেনেন কি? আর একটী ছেলে ছিল তার নামকরণের পূর্ব্বেই আমি বড় কষ্টে দেশ ত্যাগ করে এসেছি, কে জানে আমার হত-ভাগিনী সহধর্ম্মিণী ওদের বাঁচিয়ে তুলতে পাল্লে কিনা। ওরা কি এত দারিদ্র্য সহ্য করে এতদিন বেঁচে আছে? আপনি হয়ত গুপ্তপাড়া চিনেন না। চিনলেও বা অত নগণ্য লোকের সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকা সম্ভব কি? বড় ইচ্ছা হচ্ছে ছেলেদের ভেতর যদি কেউ আমার আসন্ন সময়ে এখানে উপস্থিত থাকতো!"

নিশীথ বহু কষ্টে এতক্ষণ আত্মসম্বরণ করিয়াছিল, আর সে তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ রক্ষা করিতে পারিল না—চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "বাবা, বাবা! আমিই তোমার কনিষ্ঠ সন্তান নিশীথ" নিশীথ মহা আবেগে মুমূর্ষু পিতার চরণে লুটাইয়া পড়িল। সাধু আত্মসংযম শিক্ষা করিয়াছিলেন, অপ্রত্যাশিতরূপে এই দূর দেশে মৃত্যু সময়ে নিজ পুত্রকে সম্মুখে পাইয়াও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল না। ধীরে ধীরে বলিলেন—"ভগবানকে ধন্যবাদ, আমার শেষ সময়ের কাতর প্রার্থনা বিফল হয় নাই, বাবা! এস আমার সম্মুখে আসিয়া বস, আমার আর অধিক সময় নাই।"

নিশীথ পিতার সম্মুখ আসিয়া বসিল, সাধু সেবকদাস আসন্ন মৃত্যু শিথিল দক্ষিণকর পুত্রের মস্তকে তুলিয়া দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "ভগবান আমার মৃত্যু সময়ে আমার উত্তরাধিকারীকে নিকটে আনিয়াছেন, তাঁহার চরণে কোটী কোটী প্রণাম। বাবা আমার কমণ্ডলু ভিন্ন অপর কোন সম্পত্তি নাই, ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইয়াছি তাহার সমস্তই দরিদ্রের সেবায় ব্যয় করিয়াছি। আজ মরণ সময়ে আমার কমণ্ডলুর সঙ্গে আমার দরিদ্রের সেবার, আর্ত্তের শুশ্রূষার অধিকার তোমাকেই দিয়া গেলাম। দারিদ্র্য যে কি যন্ত্রণাময় তাহা তুমি নিজেই বেশ অনুভব করিয়াছ। আমি যে কাজ শক্তির অভাবে শেষ করিয়া যাইতে পারি নাই—তুমি আমার আত্মজ—তুমি তাহা শেষ করিও। ভগবান তোমাকে শক্তি প্রদান করুন।" বৃদ্ধ সাধু

স্নেহাতিশয্যে নিশীথের মস্তক নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া তুষার শীতল ওষ্ঠে নিশীথের তপ্ত ললাটে প্রথম ও শেষ চুম্বন করিলেন। নিশীথ সুখ দুঃখের প্রবল দ্বন্দ্ব সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত পিতার বক্ষে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিল। বাহিরের অন্ধকার কাটিয়া গিয়া পূর্ব্বাকাশে উষার আলোক রেখা ফুটিয়া উঠিল, দূরে একজন পথিক মধুর ভৈরবী রাগিণীতে প্রভাতবায়ু কম্পিত করিয়া গাহিয়া যাইতেছিল।

সুখে থাক আর দুঃখেই থাক,
জীবন একদিন যাবেই যাবে।
স্বদেশে বা পরদেশে
এ দেহ ধূলায় লুটাইবে॥ ইত্যাদি

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দুখের কথা ঢের বলেছি,—
সুখের কথা বলবো কাকে ?
আমরা তো রাজপুত্র সবাই
যখন ডাকি মা তোমাকে।
আজকে মোরা এক যে মাগো,
বিভেদ প্রভেদ জানিনাকো,
আনন্দে মন গুঞ্জরিছে
জগৎ জোড়া এ মৌচাকে।

২

শুনছি তোমার আগমনী
উল্লাসে বুক উথলে ওঠে,
আলো করে বুকের দীঘি
লক্ষ কমল হঠাৎ ফোটে।
রাঙা জবায় গাছ যে ভরে,
শিউলি ধরে, শিউলি ঝরে,
শঙ্খ-চিল সব ডেকে বেড়ায়
মাথার উপর পাকে পাকে।

৩

অফুরন্ত তোমার পূজা
এ পূজা যে চিরন্তনী
আমরা শুধু আসি ও যাই
দুদিনে হই পুরাতনই।
সুধার তবু পেয়েছি ভাগ,
দুঃখ বুকে রাখেনা দাগ
মা যাহার আনন্দময়ী
সে কি নিরানন্দে থাকে ?

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যগ্রন্থ

নির্মল সান্ন্যাল

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের প্রথমদিকে সুপ্রসবিনী বাঙলা জন্ম দিয়েছিল অনেক কৃতি সন্তানের, যাঁরা পরবর্ত্তী জীবনে নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে এমন ছাপ রেখে গিয়েছেন যা বাঙালী বহু যুগ ধরে স্মরণ করবে নিতান্ত শ্রদ্ধাভরে। সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, রাজনীতি বিভিন্ন শাখায় বাঙলার ভাগ্যাকাশে এই সময় উদয় হয়েছিল দিক্‌পাল মনীষীদের, পরবর্ত্তী জীবনে যাঁদের ঔজ্জ্বল্যে বাংলা তথা সারা ভারত ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। সঙ্গীত বা কাব্যের ক্ষেত্রে এই সব মনীষীদের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান স্থান দ্বিজেন্দ্রলালের—অবশ্যই রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার আলোকবৃত্তের মধ্যে প'ড়ে অনেক প্রতিভাধরই আপন আপন প্রতিভাকে যথাযথ প্রকাশ করতে পারেন নি, ফলে জনমানসে তাঁদের আসনের ঔজ্জ্বল্যও কিছু কম। প্রখ্যাত সমালোচক স্বর্গত সজনীকান্ত দাস একবার বলেছিলেন, "বাংলা দেশে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রতিভা যে যথাযথ সমাদর লাভ করে নাই তাহার প্রথম এবং প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রপ্রতিভার ভাস্বর দীপ্তিতে সকলের চক্ষু এমনই ধাঁধিয়া গিয়াছিল যে, আশেপাশের অনেক স্নিগ্ধ-দীপ্তি জ্যোতিষ্কেরা সাধারণের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এই দলের প্রধান ছিলেন।"

এই উক্তির যথার্থতা সম্বন্ধে—অন্তত দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে—কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই। কবিতা, সঙ্গীত, নাটক—তিন ক্ষেত্রেই নিপুণতার সঙ্গে বিচরণ ক'রে এবং প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেও দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর যোগ্য এবং প্রাপ্য সমাদর পান নি।

কবিতা, সঙ্গীত এবং নাটক এই তিনের মাধ্যমেই আপন প্রতিভার স্ফুরণ ঘটালেও দ্বিজেন্দ্রলালের স্বীকৃতি প্রধানতঃ কবিরূপে। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা যদিও খুব বেশী নয়, তবু তারই মাঝে তিনি রেখে গেছেন তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর।

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। হাসির কবিতা, স্বাদেশিক ও অন্যান্য। এই অন্যান্যের মধ্যে আছে প্রেম, প্রকৃতি, সৌন্দর্য প্রভৃতি। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ হয় কবির নিতান্ত তরুণ বয়সে। মাত্র উনিশ বছর বয়সে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা'র প্রথমভাগ প্রকাশিত হয়। নিতান্ত তরুণ বয়সের রচনা ব'লে এই গ্রন্থের কবিতাগুলোর মধ্যে কবির স্বকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে কম। নির্দ্দিষ্ট পথ বা ক্ষেত্রে খুঁজে না পাওয়াতে কবি পূর্ব্ববর্ত্তীদের বলার ও চলার পথই অনুসরণ করেছেন। তাই এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য প্রকৃতি ও স্বদেশপ্রেম। এই সব কবিতার মধ্যে হেমচন্দ্রের অথবা নবীনচন্দ্রের ছাপও কিছু কিছু চোখে পড়ে।

এর চার বছর পরে প্রকাশিত হয় তাঁর একমাত্র ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ 'দি লিরিক্‌স্ অব্ ইণ্ড্' (১৮৮৬)। কবি তখন বিলেতে এবং বিলাতপ্রবাসকালেই এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়।

অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের রচনা বলে আর্যগাথার কবিতার তুলনায় এর কবিতার সুরও কিছুটা পরিণত হয়েছে। আর পরিণত হয়েছে কবিমানস। তাই এই ইংরাজীগ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে যৌবনধর্মী মনের কথা, উচ্চারিত হয়েছে যৌবন মনের স্বপ্নের সুর, প্রকাশ পেয়েছে নতুন আবেগ, প্রেমানুভূতি।

পরবর্ত্তী কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' (২য়) প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ সালে। এর মধ্যে ১৮৮৭ সালে কবি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। তাই আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগের কবিতায় কবির প্রেমিক জীবনের স্পষ্ট ছাপ চোখে পড়ে। এই কবিতাগুলো রচিত হয় কবির বিবাহোত্তর জীবনে। ফলে, দাম্পত্যপ্রেম এবং যৌবন স্বপ্নের রঙ্ এই সব কবিতার মূল সুর। পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরাজী কাব্যে প্রেমের প্রকাশ ঠিক দৃঢ় ছিল না, অবলম্বনহীন ভাসমান অবস্থায় ছিল সে প্রেম। কিন্তু এই কবিতাগুলোর মধ্যে ওই আশ্রয়হীন প্রেমের

পরিবর্ত্তন বেশ সুন্দরভাবে চোখে পড়ে। স্পষ্ট বোঝা যায় কবির প্রেমানুভূতি ক্রমশঃ ধীরে ধীরে একমুখী হয়ে একটি নারীমূর্ত্তির চতুর্দিকে আবর্ত্তিত হচ্ছে।

আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হবার পরই কবির রচনারীতিতে আমূল পরিবর্ত্তনের ঢেউ লাগে। এই সময়ই প্রধানত তিনি ব্যঙ্গ কবিতা ও হাসির গান রচনা সুরু করেন। এই সঙ্গেই সুরু হয় প্রহসন সৃষ্টি। অবশ্য এর আগে বিলাত থেকে ফেরার পর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে 'একঘরে' প্রহসনখানি প্রকাশিত হয়। এই প্রহসনখানি প্রধানতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রয়োজনে লিখিত হ'লেও এর হাস্যরস এবং বক্তব্য প্রশংসা কুড়িয়েছিল অনেকের।

হাসির গানই দ্বিজেন্দ্রলালকে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল। কেউ কেউ দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রধানতঃ হাসির কবি বলেই উল্লেখ করেন। তাঁর হাসির কবিতার একটা বিশেষ রূপ ছিল, তাঁর হাসি শুধু হাসি নয়, ভাবনাও বটে। তিনি হাসির আড়ালে প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে রেখেছেন ভাবনাকে। তাই তাঁর হাসির কবিতাগুলো আমাদের হাসাতে হাসাতে ভাবাতে সুরু করে। মনে প্রাণে প্রগতিবাদী ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, তাই অন্ধ কুসংস্কারবাদকে সমাজ থেকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন তিনি। প্রগতিবাদী হ'লেও তিনি ছিলেন অনুকরণ বা উচ্ছৃঙ্খলতার ঘোরতর বিরোধী। স্বদেশপ্রেমিক হ'লেও গোঁড়ামি বা কুসংস্কারকে ঘৃণা করতেন ততখানিই, যতখানি তিনি ভালবাসতেন দেশকে। এই সব ভাবের প্রত্যেকটির প্রকাশ ঘটেছে তাঁর হাসির কবিতাবলীতে। যেখানে যতটুকু বিকৃতি দেখেছেন সমাজের বুকে—তারই বিরুদ্ধে, তীক্ষ্মস্বরে কলম চালিয়েছেন তিনি। সুনিপুণ ব্যঙ্গে ছারখার করে দিয়েছেন সব বিকৃতি, সব অন্ধতা।

"আষাঢ়ে' (১৮৯৯) ও হাসির গান" (১৯০০) এই দুখানি গ্রন্থেই দ্বিজেন্দ্রলালের অধিকাংশ হাসির গান এবং কবিতা সংকলিত হয়েছে। আষাঢ়ের কবিতা সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই বলেছেন যে, 'বাঙলা ভাষায় হাস্যরসাত্মক কবিতার অভাব পূরণ করিবার জন্যই আষাঢ়ে প্রকাশিত হয়।' আষাঢ়ের কবিতাগুলিতে বিভিন্ন ধরণের ঘটনাপূর্ণ কবিতা নানা ছন্দের মাধ্যমে বিধৃত হয়েছে। তবে এ সব কবিতার মধ্যে প্রায় সবগুলিই সামাজিক পটভূমিকায় রচিত। ফলে সমাজের বিভিন্ন চিত্র, গোঁড়ামি, সমাজমানস সম্বন্ধে কবির সুস্পষ্ট মতামত সুনিপুণ ব্যঙ্গের আড়াল থেকে ধ্বনিত হয়েছে। কখনও তা নিছক কৌতুক, শুভ্র ব্যঙ্গ—কখনও বা সমাজের দোষসংশোধনের জন্য কঠোর এবং তীক্ষ্ণ।

হাসির গানে হাসিই প্রধান। 'আষাঢ়ে'র মত 'হাসির গানে' উদ্দেশ্য বা গল্প বড় একটা চোখে পড়েনা। বিভিন্ন উপাদান বা বিভিন্ন উপায়ে আনন্দদান করাই যেন হাসির গানের উদ্দেশ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতি প্রথম তাঁর এই হাস্যরসাত্মক কবিতা এবং গানের জন্যই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন বাঙালীবাবুদের আলস্য, পরানুকরণ-প্রিয়তা, হুজুগপ্রিয়তা, কাপুরুষতা আর আরামপ্রিয়তার প্রতি কঠোর এবং তীব্র ব্যঙ্গের মাধ্যমে ধিক্কার জানিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। হাসানো এই সব কবিতার মূল উদ্দেশ্য নয়, মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশবাসীকে ভাবানো, চেতনা জাগানো। হাসির গান সম্বন্ধে কবিশেখর কালিদাস রায় সুন্দর মন্তব্য করেছেন, 'তিনি সমাজসংস্কারকের ব্রত গ্রহণ করলে এসব নিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন, সভায় সভায় বক্তৃতা করে বেড়াতেন, নানা সংঘ সমিতি গড়তেন। তিনি জন্মসিদ্ধ কবি, তাই তিনি কবিতা লিখেছেন···রঙ্গাত্মক মনোভাব তাঁর সহজাত।'

হাস্যরসাত্মক কবিতাগুলোর মধ্যেও দ্বিজেন্দ্রলালের বিদ্রূপাত্মক কবিতাগুলোই লোককে বেশী আগ্রহান্বিত ও আনন্দিত করে তুলেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল কোনও বিশেষ দল বা মতবাদের অনুগত ছিলেন না। তাই তাঁর বিদ্রূপের ধারা সবার ওপরেই বর্ষিত হ'ত সমান বেগে। সবাই উপভোগ করত সেগুলো, যদিও তাদের ধার কিছুই কম ছিল না। এই সব বিখ্যাত কবিতার মধ্যে পাশ্চাত্যের প্রতি অন্ধমোহপোষণকারীদের উদ্দেশ্যে 'এই বিলেত দেশটা মাটির' বিলাতফেরৎ উগ্রবাদীদের প্রতি বিদ্রূপপূর্ণ "আমরা বিলাতফেরৎ ক'ভাই" বা হুজুগপ্রিয় বাঙালীদের ব্যঙ্গ করে লেখা 'একটা নতুন কিছু ক'রো', প্রভৃতি আজও লোকের মনে সমুজ্জ্বল। হাসির গানের বাক্যবিলাসী কর্মবিমুখ বাঙালীর উদ্দেশ্যে লেখা 'নন্দলাল' বা 'হতে পার্ত্তাম' কবিতায় কবির আক্ষেপ বড় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

পরবর্ত্তী কাব্যগ্রন্থ 'মন্দ্র' প্রকাশিত হয় ১৯০২ সালে।

কাব্যের বিচারে সম্ভবত মন্দ্রই কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। 'মন্দ্র' প্রকাশিত হবার পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলালের পথ ছিল লিরিকধর্মী ও স্যাটায়ারমূলক। আর্যগাথার কবিতাবলীতে যেমন কবির লিরিসিজম্ ফুটে উঠেছে উজ্জ্বলভাবে, তেমি হাস্যরসাত্মক গান এবং কবিতাপুঞ্জে স্যাটায়ারই প্রধান। কিন্তু মন্দ্রের রচনাগুলিতেই এই দুই ধারার সর্বপ্রথম মিলনে এক অপূর্ব রসের সৃষ্টি হয়। গদ্যধর্মী কবিতার এবং নতুন ধরণের গদ্যছন্দের মাধ্যমেও তিনি বিভিন্ন কবিতার মধ্যে লিরিসিজ্মের যে ধারা প্রবাহিত করেছিলেন তা তৎকালীন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মন্দ্রকাব্য প্রকাশিত হ'লে বঙ্গদর্শনে লেখেন, 'মন্দ্র কাব্যখানি বাংলার কাব্যসাহিত্যকে অপরূপ বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। ……সে সাহস কি শব্দনির্বাচনে, কি ছন্দোরচনায় কি ভাববিন্যাসে সর্বত্র অক্ষুন্ন।…. কাব্যে যে নয় রস আছে অনেক কবিই সেই নয় রসকে নয় মহলে পৃথক করিয়া রাখেন,—দ্বিজেন্দ্রবাবু অকুতোভয়ে একমহলে একত্রে তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্য, করুণা, মাধুর্য্য, বিস্ময়—কখন কে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে, তাহার ঠিকানা নাই।"

মন্দ্র কাব্য থেকেই দেখা যায় কবি জীবনের গভীরতম অংশের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন। জীবনের খুঁটি-নাটি নানা খণ্ড খণ্ড দৃশ্য তাঁর জীবনবোধের চেতনাকে আরও গভীরে প্রবিষ্ট হ'তে প্রেরণা যুগিয়েছে। তাই মন্দ্রকাব্যের সময় থেকেই দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় জীবনের লঘুদিকের সঙ্গে জীবনের গভীরদিকের দর্শনের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। 'সু মৃত্যু" কবিতায় লঘুসুরে যাত্রা সুরু করলেও তার সমাপ্তি রীতিমত গভীর এবং গম্ভীর।

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় প্রেম দুপ্রকারের, গৃহগত ও অন্তর্মুখীপ্রেম এবং দেশপ্রেম। দেশপ্রেমের পরিচয় তাঁর দেশাত্মমূলক কবিতায় এবং গানে পাওয়া যায় যথাযথরূপে। তার গাংসারিক বা দাম্পত্যপ্রেমের নিদর্শন মেলে মন্দ্র এবং তার পরবর্ত্তী কাব্যগুচ্ছে। বিশ্বপ্রেম কিম্বা Sublimityর ছোঁয়া দ্বিজেন্দ্রলালের খুব কম কবিতাতেই পাওয়া যায়। 'মন্দ্রে' এই পর্য্যায়ের দুটি কবিতা উল্লেখযোগ্য, 'তাজমহল' আর 'সমুদ্রের প্রতি'। মন্দ্রের অন্যান্য কবিতার মধ্যে নাম করা যায় বাৎসল্য প্রীতির নিদর্শন, 'জীবন পথের নবীন পান্থ, স্মৃতিস্নিগ্ধ 'নববধূ,' আর মিশ্ররসের কবিতা "নবদ্বীপ"। তবে মন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবিতা 'উদ্বোধন'। একেবারে নতুন ছন্দে লেখা হয় এ কবিতাটি। পরে রবীন্দ্রনাথও এ ছন্দে 'বলাকার' একাধিক কবিতা রচনা করেন। উদ্বোধনের ছন্দ রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা পেয়েছিল, তিনি বলেছিলেন 'ছন্দ সম্বন্ধেও কবি স্পর্দ্ধাভরে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার 'উদ্বোধন' কবিতায় ছন্দকে একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উড়াইয়া দিয়া ছন্দোরচনা করা হইয়াছে।……এই দুঃসাহস কোন ক্ষমতাহীন কবিকে আদৌ মানাইতনা।'

মন্দ্রের অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে 'রাধার প্রতি কৃষ্ণ' (এটি প্রথমে Lyrics of Ind-এ Krishna to Radha নামে প্রকাশিত হয়), আশীর্বাদ, কার দোষ প্রভৃতি।

মন্দ্রের পরবর্ত্তী কাব্য 'আলেখ্য।' ১৯০৭ সালে আলেখ্য প্রকাশিত হবার আগে কবির ব্যক্তিগত জীবনে এক প্রকাণ্ড ওলট পালট ঘটে যায়। ১৯০৩ সালে কবিপত্নী সুরবালা দেবীর মৃত্যু হয়। কবির জীবনে এ এক প্রচণ্ড আঘাত। এই আঘাতের ফলে এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে 'আলেখ্য' এবং তৎপরবর্ত্তী কাব্যে কবির দুঃখবাদী সুরটা অল্পআয়াসেই ধরা প'ড়ে পাঠকের চোখে। তবে কবিতা নিয়ে আলোচনা করার আগে আলেখ্য কবিতার নতুন ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করার অবকাশ আছে। আলেখ্যের ভূমিকায় কবি বলেন "প্রথমত ছন্দ। এ কবিতাগুলি ছন্দমাত্রিক (Syllabic); অক্ষর হিসাবে ছন্দ নয়। দাশরথি রায়ের পূর্ব হ'তে এ ছন্দ বাংলা দেশে প্রচলিত আছে, আমি সেই পুরোন-মাত্রিক ছন্দেই এ কবিতাগুলি রচনা করেছি। তফাৎ এই যে, আমি সেই ছন্দকে সম্পূর্ণভাবে মাত্রা ও তালের অধীন করতে চেষ্টা করেছি।

তারপর ভাষা, যতদূর স্বাভাবিক ও প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করতে পারি (সুশ্রাব্যতা, মর্য্যাদা ও সদর্থ বজায় রেখে) চেষ্টা করেছি। ক্রিয়াপদের সর্বদাই প্রচলিত আকার ব্যবহার করেছি—যেমন, যাচ্ছি, করছিলাম ইত্যাদি। অন্য পদ নির্ব্বাচনে আমার লক্ষ্য প্রধানতঃ

প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা। তবে অপ্রকাশিত শব্দ একেবারে বর্জন করিনি।"

প্রসিদ্ধ ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন এই ছন্দসম্পর্কে বলেছেন—"দ্বিজেন্দ্রলালের একটি মস্ত কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি স্বরবৃত্ত ছন্দের সঙ্গে অক্ষরবৃত্তের সমাহিত কদম মিশিয়ে এক নবছন্দের রসসৃষ্টি করেছেন—এমন কি মৌখিক হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদের প্রয়োগ বজায় রেখে। আমরা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আলোচনায় দেখেছি যে, সে ছন্দে আসলে এক হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ ছাড়া অন্য সব মৌখিক ক্রিয়াপদই পাংক্তেয় হয়েছে (যথা, পেয়েছিলাম দিয়েছিল ইত্যাদি)। দ্বিজেন্দ্রলাল সর্ব্বপ্রথম দেখালেন—যাচ্ছি, কর্‌ছি, কর্‌তে, বল্‌তে, বস্‌লাম, কর্‌লাম জাতীয় হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ এনেও অক্ষরবৃত্তের গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব।"

আলেখ্যর প্রথম দিকের কবিতায় কবির গৃহসন্ধানী মনের পরিচয় পাওয়া যায় সুন্দরভাবে। তাদের মধ্যে প্রধানত বাৎসল্যরসউপজীবী 'ঘুমন্ত শিশু' 'পুত্রকন্যার বিবাদ', 'নূতন মতো' প্রভৃতি প্রধান। 'মাতৃহারা' কবিতায় শিশু পুত্রের প্রতি স্নেহের আড়ালে পত্নীবিয়োগের ব্যথা লুকিয়ে আছে প্রচ্ছন্নভাবে। স্ত্রীর মৃত্যু নিঃসন্দেহে কবির জীবনের করুণতম ঘটনা। পত্নীর মৃত্যুতে দ্বিজেন্দ্রলালের উচ্ছলতা, ব্যঙ্গপ্রিয়তার উদ্দামতা ধীরে ধীরে কমে গিয়ে তাঁর মন ঝুঁকে পড়েছে আরও গভীরের দিকে। ব্যক্তিগত প্রেমের সীমা ছাড়িয়ে দেশপ্রেমের অঙ্গনে প্রবেশ করেছে তাঁর মন। তাই পরবর্ত্তীকালে রচিত নাটকাবলীতে দেশপ্রেমই দ্বিজেন্দ্রলালের মূল উপজীব্য। জীবন এবং পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে উদাসীন হতে শুরু করলেও কবি নিঃসন্দেহে কিছু মাত্রায় দুঃখবাদী হয়ে ওঠেন তারপর থেকে, তাই দেখি 'বিধবা' কবিতা এত করুণরস কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে, 'চিরবিচ্ছেদ' কবিতাটি যেন জমাট কান্না। আর কবির শূন্যমনের প্রতিচ্ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে 'বিপত্নীক'।

আলেখ্যর অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবিতা 'সত্যযুগ', এক অদ্ভুত রসের কবিতা—অদ্ভুত কবিতাও বটে। ইতিপূর্বে ঠিক এই রকম রসের কবিতা দ্বিজেন্দ্রলালের কলম থেকে আর বার হয় নি। কবিতাটা পড়লেই মনে হয় কবি যেন একটা নতুন জগৎ, একটা নতুন চেতনা আবিষ্কারের জন্মযন্ত্রণায় ছটফট করছেন—অস্থির আর চঞ্চল। ব্যঙ্গ হাসি সব এখানে অনুপস্থিত, খুঁজে পাবার আকুলতাটাই স্পষ্ট। প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলপাড় করে তুলেছে কবির মন, তারই উত্তর সন্ধানে অস্থিরচিত্ত কবি। এই চিন্তা, উত্তর খোঁজবার এই আকুলতাই মানুষের মনকে ক্রমশ দার্শনিক ক'রে তোলে, আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের জন্যে হাতছানি দেয়—লুব্ধ করে বিরাটের সন্ধান কার্য্যে। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনেও সেই সন্ধিক্ষণের সূচনা চোখে পড়ে 'আলেখ্য' থেকেই।

পরবর্ত্তী এবং শেষ কাব্যগ্রন্থ 'ত্রিবেণী'তে এই মনোভাব আরও গভীর, আরও স্পষ্ট। জীবনের একটা বড় অংশ শুধু হাসি আর ব্যঙ্গের পেছনে নষ্ট করার জন্য কবি আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন একাধিকবার। দীর্ঘ কবিতা 'প্রবাসে' তাঁর এই আক্ষেপ সরলভাবে প্রকাশিত, "হাস্য শুধু আমার সখা? অশ্রু আমার কেহই নয়?/ হাস্য করে অর্ধ-জীবন করেছি তো অপচয়।" আবার বঙ্কিমচন্দ্র মিত্রকে লেখা পত্রের উত্তরে চোখে প'ড়ে—"প্রভাতে এ জীবনের হাসায়েছি বঙ্গভূমি,—করিয়াছি তীব্র ব্যঙ্গ—বন্ধুবর জানো তুমি:—জীবনের এ' সন্ধ্যায় মিলায়ে গিয়াছে হাসি—/ সব হাস্য শুয়ে আছে রোদনের পাশাপাশি।" Sublimity'র ছোঁয়া লাগা কবির অন্যতম কবিতা 'সমুদ্রে'তেও এই ভাবের প্রতিফলন চোখে প'ড়ে। লৌকিক পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে কোথায় পৌছান যায় সেই প্রশ্ন, "সেই চিরন্তন প্রশ্ন—'কোথা? কোথা আদি? / কোথা অন্ত? কোথা হ'তে চলেছি কোথায়?" সমুদ্রের প্রতি কবির শেষ অনুরোধ, "তুলে লও যবনিকা যাদুকর! তবে/ কি আছে পশ্চাতে তার—দেখাও মানবে।", 'আহ্বান' কবিতায় কবি আহ্বান জানাচ্ছেন সেই পরমসত্যকে—যা অপ্রতিহত, নিয়ত। জীবনের খেলাঘরে খেলা সাঙ্গ হবার পর সেই সত্যকে যেন তিনি আশ্রয় করতে পারেন আঁধার পথের সঙ্গী হিসেবে—এই তাঁর প্রার্থনা।

ত্রিবেণীতে অবশ্য ভিন্নরসের কবিতাও স্থান পেয়েছে। যেমন, প্রথম যৌবনের প্রথম প্রেমের অমলিন 'প্রথম চুম্বন'। আবার তারই পাশাপাশি করুণ সুরের 'সোনার

স্বপ্ন'। 'বিবাহের উপহার'এর আনন্দের পাশে 'স্মৃতি'র বেদনা, তারই সঙ্গে আবার রঙ্গের ছোঁয়াচ লাগা, 'সুন্দরী কে?'

ত্রিবেণীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য অংশ তার সনেটগুলি। চতুর্দশপদীর স্থলে দশপদী। তাই সনেট রচনা সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই বলেছেন, "আমি মিত্রাক্ষরিক চতুর্দশপদী কবিতা না লিখিয়া মাত্রিক দশপদী কবিতা লিখি কেন, ইহার কৈফিয়ৎ এই যে, আমি ইংরাজী বা ইটালিয়ান সনেটের অন্ধ অনুকরণের পক্ষপাতী নহি।... অষ্টপদী, ষট্পদী বা চতুষ্পদী কবিতা কেহ প্রচলিত করিতে চাহেন—আমার আপত্তি নাই। কিন্তু কবিতার দশটি পদ আমার নিকট বেশ 'যুৎসৈ' ঠেকে।'

এই সনেটের মধ্যেও কবির পরিবর্তিত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে 'অবসান' এবং 'শান্তি'র শেষ দু' পংক্তিতে, "শ্রান্ত আমি, ভ্রান্ত আমি, চিনেছি গো নিজের জন্মভূমি—দেখাও কোথায় শান্তিশয্যা পেতে আমার রেখেছ গো তুমি।"

নিজের জন্মভূমিকে চিনতে পারার এই অনুভূতিই কবির দেশপ্রেমের মূল উৎস। তাই 'আলেখ্য'র পরবর্তী সকল নাটকেই মুখ্য উপজীব্য দেশপ্রেম। অবশ্য এই দেশপ্রেম দ্বিজেন্দ্রলালের 'অন্তরের' গভীরে চিরদিনই প্রবহমান ছিল। তবু তাঁর ধারণা ছিল, "যে জন কার্য করে, নিস্তব্ধে নিভৃতে, নির্জনে, জননীর জন্য—সেই/যোগ্য সুসন্তান, সেই মায়ের প্রিয়পুত্র, সেই সে জগন্মান্য, ধন্য সেই।" তাই সমালোচনাকারীদের উদ্দেশ্যে কবি আক্ষেপ ক'রে বলেছেন,

> ব্যঙ্গ করি আমি?—ব্যঙ্গ করি শুধু?
> নিন্দা করি শুধু সকলে?
> কভু না! আসলে ভক্তি করি আমি
> ঘৃণা করি শুধু নকলে।"

তুমি মোর শৈল-শিখরিণী

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কলমন্দ্র মুখরা ধরণী। আয়ুহারা দিনগুলি ঝরে,
আনত আমার কাছে প্রার্থনার মত স্বপ্ন কত:
বিধ্বস্ত গোপন আশা আজো যেন কোথা কেঁদে মরে।
কামনা-মথিত আঁখি ব্যাকুলিত হোলো ক্রমাগত,
অভিসার রজনীতে ভালো করে আদর করিনি,
দ্বীপময় সিন্ধুবুকে তুমি মোর শৈল শিখরিণী।

তীর্থযাত্রী আত্মামোর পথে যেতে পেয়েছে একদা
যৌবনের চিত্রশালা তব। অনুপম পরিচিতি তার,
ঐশ্বর্য্য-সমৃদ্ধ রূপ আনে মোর চিত্তে পুলকতা
সঁপেদিতে হৃদয় আমার মিলনের অঙ্গীকার
পূর্ণ করিবারে এই চন্দ্রালোকে স্ফটিক-নির্ম্মল কূলে,
কানে কানে গুঞ্জরণে শিহরণে মর্ম্ম ওঠে দুলে।

রহস্যের করেছি উদ্ধার গুণ্ঠনের স্তূপ হোতে
তুমি যেন কার স্পর্শ পেয়েছিলে ছায়া বীথি তলে
বিরলে বিহনে! দুলেছিলে কিগো আনন্দের স্রোতে
প্রাঞ্জল মুহূর্ত্তমাঝে? শষ্পভরা সবুজ অঞ্চলে!
চেপে রাখা উৎকণ্ঠার দীর্ঘশ্বাসে দারুণ আক্ষেপে
তোমায় খুঁজেছি আমি ফেলে আসা নানা কথা ভেবে।

তুচ্ছ করি অসঙ্গতি, বেঁধে কিগো দেবে অনুক্ষণ
কামনার গূঢ়গ্রন্থি জীবনের পান্থনিকেতনে?
স্মৃতির লিখন হোতে কবিতার করি আহরণ
তোমারে শুনায়ে দেবো, কাছে এসো—প্রেমের স্পন্দনে
এরাত্রি নেমেছে মোর জনান্তিকে আকাঙ্ক্ষারে লয়ে,
বর্ণাঢ্য ছলনা তব মন্থরিত কেন গো বিস্ময়ে?

প্রথমে ভুবনেশ্বর, তার পর পুরী, সেখান থেকে কোনারক। কোনারক থেকে আবার পুরী।

কিন্তু না, মন সুস্থির হবার কোন লক্ষণ নেই। সারা অন্তর জুড়ে একটা হাহাকার। অনন্তহীন দাহ। কমলেশ আবার পালিয়ে এল কলকাতায়। নিজের বাড়ীতে। এখানেই কি নিস্তার আছে! প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি জিনিসে সুরমার স্মৃতি। আলনায় সবুজরংয়ের একটা শাড়ী এখনও ঝুলছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে টুকিটাকি প্রসাধন। কবে, কি পার্বণ উপলক্ষে সিঁড়ির চাতালে সুরমা আলপনা এঁকেছিল। বর্ষার নির্মম ঝাপটায় এখনও সবটা নিশ্চিহ্ন হয় নি। দেয়ালের গায়ে কার্পেটের ওপর রঙীণ একটা ময়ূর। বাজারের সবকটা রং তাতে রয়েছে। তলায় লেখা, সু। সুরমারই আদ্যক্ষর। কিন্তু ওই ছোট্ট অক্ষরটুকু আদি নয়, অনাদিও হয়ে উঠেছে। সব আছে, শুধু সুরমা নেই।

দর্শনে কমলেশ শান্তি খোঁজার চেষ্টা করল। অনেক দিন আগে ফুটপাথের ওপর থেকে কেনা সরল গীতা একটা বের করল। খুজে খুঁজে সেই পাতা, যেখানে শোক বিশ্লেষণ করা হয়েছে - কিন্তু পাতাটা খুলেই কমলেশ আঁতকে উঠল। দুটো পাতার মাঝখানে কাঁটা। সুরমার চুলের কাঁটা। কখন কি খেয়ালে রেখেছে কে জানে! সেই কাঁটা বইয়ের পাতা থেকে বুকের মাঝখানে এসে বিঁধে রইল।

অফিসের বন্ধুবান্ধবরা মাঝে মাঝে আসত সান্ত্বনা দিতে। বোঝাত—কণ্ঠে সহানুভূতির প্রলেপ মাখিয়ে 'মনুষ্য-জীবনের নশ্বরতার কথা—বলত পদ্মপত্রে বারি বিন্দুর সনাতন উপমা।

কমলেশ কিছু বলত না। ভাবলেশহীন মুখে চুপচাপ চেয়ে থাকত।

বন্ধুদের মধ্যেই একজন বলল, ওসব পুরী, হরিদ্বার নয়, তীর্থস্থানে গেলে স্বভাবতই মনটা চঞ্চল হয়ে উঠবে—কারণ এদেশে সস্ত্রীক ধর্মাচার করার বিধি। তার চেয়ে গ্রামাঞ্চলে চলে যাও, প্রকৃতির অবারিত পরিবেশে মনটা ভাল থাকবে।

কমলেশ এ কথারও কোন উত্তর দিল না। পাঁজর কাঁপিয়ে মাঝারি গোছের শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অবশ্য অফিসে ছুটি এখনও অনেক দিন পাওনা আছে, কিন্তু অফিসে যেতেও মন সরছে না। অফিস যাবার মুখে

কপালে ঘামের বিন্দু,আয়ত প্রত্যাশা টলটল দুটি চোখ,আর স্থূল শরীর নিয়ে যে মানুষ পানের ডিবেটা এগিয়ে দিত, তার কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। আরো মনে পড়ে, মাথা খুঁড়ে রক্তপাত করে ফেললেও রক্তমাংসের শরীরে আর তার দেখা পাওয়া সম্ভব নয়।

শ্বশুর বাড়ীতে কেবল মাত্র শাশুড়ী সম্বল। সান্ত্বনা দিতে তিনি মাঝে মাঝে এসে নিজেই কেঁদে আকুল হন। তাঁকে নিয়েই কমলেশ মুস্কিলে পড়ে যায়।

অনেক ভেবে চিন্তে কমলেশ অফিসে যোগ দেওয়াই ঠিক করল। তবু অনেক লোকের মাঝখানে, অন্য কাজে, অন্য চিন্তায় বেশ কিছু সময় অন্যমনস্ক থাকতে পারবে।

দিন কুড়ি, তারপরই বদলির অর্ডার হ'ল কমলেশের। একেবারে পাটনা।

সবাই বলল—এ তোমার পক্ষে শাপে বর হল কমলেশ। বাইরে যেতে চাইছিলে, এ ভালই হ'ল। অফিসের পয়সায় যাবে, নিজের একটি পয়সা খরচ হবে না।

কিন্তু সেখানে থাকব কোথায় ?

থাকবার অভাব কি। ষ্টেশন রোডের ওপর বহু বাঙালীদের হোটেল আছে। দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর দ্বিধা করো না। চলে যাও।

বিছানাপত্র বেঁধে বাড়ীতে তালা দিয়ে কমলেশ রওনা হয়ে পড়ল।

পৈত্রিক বাড়ী। একতলায় ভাড়া আছে, দু তলায় কমলেশ থাকত। ছোট বাড়ী। ঠিক হল ভাড়াটে ভদ্রলোক মাস মাস কমলেশের পাটনার ঠিকানায় ভাড়ার টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন, আর সময় অসময় বাড়ীটারও তদারক করবেন।

পাটনা হোটেল। ছোট কিন্তু বেশ নিরিবিলি। হৈ হল্লা নেই। কোণের দিকে একটি কামরা নিয়ে একটি পরিবারও থাকেন।

সেই হোটেলের সাত নম্বর কামরায় কমলেশ আস্তানা পাতল।

গাড়ীতে সারাটা রাত ঘুম হয় নি। কেবল মনে হচ্ছিল। বাড়ী ছেড়ে যাওয়া মানেই যেন সুরমাকে ছেড়ে যাওয়া, তার হাজার স্মৃতি জড়ানো পরিবেশ পিছনে ফেলে।

হোটেলে ঢুকেই সুটকেশ খুলে সুরমার ফটোটা বের করে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখল। এটা বিয়ের আগে তোলা ফটো। কিশোরী সুরমা। একটা হাত চেয়ারের হাতলের ওপর রেখে অপরূপ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে।

বিয়ের পর আর ফটো তোলা হয় নি। অনেকবার কথা হয়েছে, দিনও ঠিক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন না কোন কারণে ভেস্তে গেছে। সব শেষ হয়ে যেতে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে দু একজন ফটো তোলানোর কথা বলেছে। একলা সুরমা নয়, আত্মীয়-পরিবৃত হয়ে, স্বামীর কোলে মাথা রেখে।

কমলেশ আপত্তি করেছে।

না, এ সময়ে ফটো তোলানোর কোন মানে হয় না। এ ছবি দেখলে কমলেশ পাগল হয়ে যাবে। আপত্তির ধরণ দেখে কেউ আর জোর দেয় নি।

অনেকক্ষণ কমলেশ ফটোর সামনে বসে রইল। মনে হ'ল যেন সুরমা হাসছে। কি বলতে চাইছে। কমলেশকে কি সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে সুরমা ? নাকি ডাকছে! আমি চলে এসেছি দিব্যধামে, তুমিও এস। আবার আমরা এখানে আসর সাজিয়ে বসব !

দু গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে কমলেশের খেয়াল হল। দরজা খোলা রয়েছে। এখনই কেউ ঘরে ঢুকলে কি মনে করবে!

বিকেলে সাইকেল রিক্সা করে অনেকদূর বেড়িয়ে এল। গান্ধী ময়দানের পাশ দিয়ে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত। বিস্তীর্ণ গঙ্গা। একূল ওকূল দেখা যায় না। স্রোতের পর স্রোত। স্রোতই তো জীবন। বসে বসে কমলেশ জীবনের অনিত্যতার কথা, অসারতার কথা ভাবল। ফেরার সময় অফিসটাও দেখে এল। হোটেল থেকে খুব দূরে নয়।

একমাস কেটে গেল। জায়গাটা কমলেশের ভালই লাগল। কলকাতার মতন অবিশ্রান্ত জনস্রোত নেই। অবারিত কলরব। হৈ হল্লা আছে, কিন্তু পরিমিত। ভয় হয়েছিল সুরমা বুঝি থাকবে না। কিন্তু না, সেও আছে। কাজকর্মের অবসরে স্বপ্নে তন্দ্রায়, নিদ্রাচ্ছন্নতায় এসে দেখা দেয়। হাসে, ডাকে, কথা বলে।

একদিন অফিসে গিয়েই কমলেশ একটা পোষ্টকার্ড

পেল। কলকাতার অফিসের গিরিজাশঙ্করের লেখা। গিরিজা কমলেশের সহকর্মীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। বসতোও একেবারে পাশে। অন্তরঙ্গ কথাবার্তা যা কিছু তার সঙ্গেই হ'ত। সুরমার অসুখের সময় গিরিজা রাতের পর রাত জেগেছে।

গিরিজা লিখেছে—তার এক মামা এলাহাবাদ থেকে সদ্য বদলি হয়েছে পাটনায়। অবশ্য পাটনায় তিনি আগেও ছিলেন। সেখানেই লেখাপড়া শিখেছেন। বাড়ীঘরও আছে। কমলেশ যেন সময় করে তাঁর সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করে। গিরিজা ঠিকানাও দিয়েছে।

পোষ্টকার্ডটা কমলেশ পকেটে রাখল। সেদিন শুক্রবার। পরের দিন বিকালে গিরিজার মামার সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

ঠিকানা পেতে বিশেষ অসুবিধা হল না। দুটি ছেলে খেলছিল, তারাই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

সামনে একফালি বাগান। নানা রংয়ের ফুলের বাহার। গেটের ওপর লতানো একটা গাছ উঠেছে। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে বকুল ফুলের মতন অজস্র ছোট ছোট ফুল। লাল রংয়ের দুতলা বাড়ী।

হাত দিয়ে কাঠের গেট সরিয়ে কমলেশ ভিতরে ঢুকল। দরজা বন্ধ। এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই। একটু এগিয়ে কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল।

ওপাশ থেকে মধুর নারীকণ্ঠ ধ্বনিত হ'ল, আজ এত দেরী যে?

কমলেশ চমকাল। মেয়েটিও।

মাটির দিকে মুখ রেখে কমলেশ বলল, আমি কমলেশ রায়। গিরিজাশঙ্করের বন্ধু। এটাই তো করালীবাবুর বাড়ী?

হ্যাঁ, করালীবাবু আমার বাবা। আমি মনে করেছিলাম তিনিই বুঝি এসেছেন।

ও, তিনি বাড়ী নেই, তাহলে আমি বরং অন্য সময়ে আসব। অন্য দিন।

কমলেশ ঘুরে দাঁড়াল।

না, না, আপনি যাবেন কেন? একটু অপেক্ষা করুন। বাবা এখনই এসে পড়বেন। অন্য শনিবার এত-ক্ষণ এসেও পড়েন।

মেয়েটি সরে দাঁড়াল। কমলেশের যাবার পথ করে দিয়ে।

কমলেশ ভিতরে গিয়ে বসল।

বাইরের ঘর। আসবাবপত্র খুব বেশী নেই, যে কটি আছে, সে কটি খুব পরিপাটি ভাবে সাজানো।

কমলেশ বসলে মেয়েটি ভিতরের দিকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি একটু বসুন, মাকে খবর দিচ্ছি।

মিনিট পাঁচেক, তারপরই করালীবাবুর স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। ফর্সা, স্বাস্থ্যবতী, চওড়া লালপাড় শাড়ী পরণে, পানের রসে ঠোঁট টুকটুকে।

কমলেশ একটু ইতস্তত করে উঠে গিয়ে প্রণাম করল।

থাক বাবা থাক। তোমার কথা সব শুনেছি গিরিজার কাছে। আহা, ভারি দুঃখের ব্যাপার। কতদিন সংসার করেছিল?

মেঝের ওপর চোখ রেখে কমলেশ নিস্তেজ গলায় বলল, এক বছর দু মাস।

আহা! ভদ্রমহিলা তালুতে জিভ ঠেকিয়ে সমবেদনা-সূচক শব্দ করলেন। কিছুক্ষণ কোন কথা হ'ল না। তারপর ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানে কোথায় আছ?

পাটনা হোটেলে। ষ্টেশন রোডের ওপর।

হোটেলে? খাওয়া দাওয়ার খুব কষ্ট তো?

না, কষ্ট আর কি। কমলেশের সুরে দার্শনিক নির্লিপ্তি।

ঠিক এই সময় বাইরে ভারি জুতোর শব্দ। খোলা দরজার সামনে কোট-প্যান্টপরিহিত একটি গৌরবর্ণ প্রৌঢ় এসে দাঁড়ালেন। লোকটি কে বুঝতে কমলেশের একটুও অসুবিধা হ'ল না। ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হ'ল ভদ্র-মহিলার হাত দিয়ে ঘোমটা টেনে দেওয়ার ব্যস্ত ভঙ্গীতে।

কে? প্রৌঢ়ের দু চোখে জিজ্ঞাসা।

গিরিজার বন্ধু কমলেশ। যার কথা গিরিজা লিখেছিল এলাহাবাদে, সেই যে—গৃহিণী একটু এগিয়ে কর্তার কানের কাছে ফিস ফিস করে বাকি কথাটা শেষ করলেন।

প্রৌঢ়ের দুটি চোখে সমবেদনার মেদুর ছায়া। কমলেশের দিকে ফিরে বললেন, একটু বস বাবা, আমি এই রাজবেশটা ছেড়ে আসি।

তোমার আর কে কে আছেন? ভদ্রমহিলা অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করলেন।

আমার মা বাবা কেউ নেই। কাকা কাকিমার কাছে মানুষ হয়েছিলাম। কাকাই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মাস ছয়েক হ'ল মারা গেছেন। কাকিমা আছেন দেশের বাড়ীতে।

আহা! মহিলা আবার গলার স্বর মোলায়েম করলেন। প্রৌঢ় এসে ঢুকলেন। গায়ে গেঞ্জি, পরণের ধুতিটা লুঙ্গির ধরণে জড়ানো। এসে চেয়ার চেপে বসে হাঁক পাড়লেন, কইরে মমতা, আমাদের চা-টা দে।

তোমার যে আজ এত দেরী হল?—গৃহিণীর প্রশ্ন।

আর বল কেন? এক মাদ্রাজী সাহেব এসে জুটেছে। কোন কিছু বুঝবে না, কেবল প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবে। এতক্ষণ ধরে তাকে ফাইল বোঝাচ্ছিলাম।

মহিলা কমলেশের দিকে ফিরে বললেন, আমি চলি বাবা। তোমরা গল্প করো। এই সময়ে রান্নাঘরে না ঢুকলে, নতুন ঠাকুর একেবারে সর্বনাশ করবে।

তারপর দুজনে কথা শুরু হ'ল, দুটি পুরুষে সচরাচর যে ধরণের কথা হয়। দেশ-কালের অবস্থা। কলকাতা আর পাটনার তুলনামূলক সমালোচনা। জিনিসের অগ্নিমূল্য। এলাহাবাদে এখনও খাঁটি দ্রব্য একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। অফিসের কথা হ'ল। বড় সায়েবদের নিন্দা। কমলেশের চাকরির ভবিষ্যৎ। আর্থিক, পারমার্থিক, দুই-ই। শেষ-কালে কমলেশের হাতে ভাল পাত্র আছে কিনা সে খবরও প্রৌঢ় নিলেন। গিরিজাকেও লিখেছেন, কিন্তু সে রকম মনের মত পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। একটি মাত্র মেয়ে, একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট সংসারে দিতে চান, যাতে মেয়েকে কোন কথা শুনতে না হয়।

মেয়ের কথা হ'তে, খোদ মেয়ে এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়াল।

বাবা, তোমরা ভিতরে এস।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, চল কমলেশ, চা দিয়েছে।

কমলেশ উঠে দাঁড়াল. তারপর ভদ্রলোকের পিছন পিছন অন্দরমহলে চলে এল।

এসেই স্তম্ভিত।

পাশাপাশি দুটি আসন পাতা হয়েছে। সামনে থালায় স্তূপীকৃত লুচি, বাটিতে তরকারী, প্লেটে মিষ্টি। সব আছে, শুধু চা-ই নেই।

এ কি, এখন এসব খেলে রাত্রে গিয়ে আর খেতে পারব না।

কমলেশ আপত্তি জানাল।

খুব পারবে, খুব পারবে। ছেলেমানুষ তোমরা, কি যে বল। এস, বসে যাও। ভয় নেই, এ বাড়ীতে ডালডার প্রবেশ নিষেধ। এলাহাবাদের ভাল ঘিয়ে ভাজা লুচি, কোন অসুখ বিসুখ হবে না। দেখছ না, এ বয়সে আমি কি রকম খাচ্ছি।

অগত্যা হাত গুটিয়েই কমলেশ বসল। ভদ্রলোকের পাশাপাশি। খাব না, খাব না—করেও মন্দ খেল না। অনেকদিন তরকারীতে এমন স্বাদ পায় নি। শুধু কি তরকারির স্বাদ, পরিবেষণ করার মাধুর্যটুকুও কম নয়।

সুরমা যাবার পর থেকে বাড়ীতেও ঠাকুরের রাজত্ব। পাটনায় হোটেলে এসে ওঠার পর থেকে তো কথাই নেই। বেয়ারা আর ঠাকুর মিলে পরিবেষণ করত। খেতে দিত ওই পর্যন্ত—কি নেবে না নেবে, কোন বিশেষ তরকারী নেবে কিনা, এ সম্বন্ধে একেবারে কাঠখোট্টা প্রশ্ন, নিস্পৃহ কণ্ঠে খাওয়া যেন একটা হাঙ্গামা! খাওয়া শেষ হলে চেঁচিয়ে বলে, সাত নম্বর বাবু খতম। থালা উঠাও।

মমতা কিন্তু সার্থকনামা। বার বার জিজ্ঞাসা করেছে, না বললেও ছাড়ে নি। মৃদু হাস্যে, কটাক্ষে, অনুযোগে পরিবেশটা মধুর করে তুলেছে।

সে রাতে হোটেলে ফিরে এসে কমলেশ অনেকক্ষণ সুরমার ফটোর সামনে বসে রইল নিমীলিতনেত্রে। আজ সুরমা থাকলে এভাবে কমলেশকে দিন কাটাতে হ'ত না।

গভীর রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে বার দুয়েক সুরমা এসে দাঁড়াল। কমলেশ বিস্মিত হ'ল। দুটি চোখ মমতার, ঠোঁটের গড়নটুকুও তার। ঠিক তেমনি পরিবেষণ করার ভঙ্গী, লুচি পাতে দেবার সময় চুড়ির রুণঝুন শব্দ।

সুরমা কি ব্যঙ্গ করছে কমলেশকে?

খুব ভোরে উঠেই কমলেশ গীতা খুলে বসল। বিড়বিড় করে অনেকক্ষণ ধরে পড়ল। সূর্য ওঠার আগে স্নান সেরে নিল। অনেকটা পরিচ্ছন্ন মনে হ'ল নিজেকে।

সকালে উঠে চায়ের সঙ্গে ডিম খেত একটা, বেয়ারাকে বারণ করে দিল, না, ডিম আমার দরকার নেই। শুধু চা।

টিফিনের সময় অফিসে এসে গিরিজাকে একটা চিঠি লিখল। তার মামার বাড়ীতে যাবার খবর দিয়ে। মামা আর মামীর অপূর্ব আতিথেয়তার কথা লিখল। মমতার কথাও। ভারি হাসিখুশী সরল মেয়েটি। ছুটির সময় চিঠিটা ডাকে দেবার আগে চিঠিটা আর একবার পড়তে গিয়ে মমতার কথাটা কলম দিয়ে জোরে জোরে ঘষে তুলে দিল। এমনভাবে যেন গিরিজা পড়তে না পারে। কিন্তু আশ্চর্য এত দাগ টানার পরেও একেবারে মমতাকে যেন মুছে ফেলা গেল না।

পরের রবিবার সকাল থেকে কমলেশ উন্মনা হয়ে রইল। একবার ভাবল—বেড়াতে বেড়াতে ঘুরে এলে হয়। এতে আর ক্ষতি কি। করালীবাবু তো বলেইছেন—যখন খুশী চলে আসবে। বিদেশে বন্ধুর মামা এমন কিছু অনাত্মীয় নন। নিজের যুক্তির দুর্বলতা উপলব্ধি করতে কমলেশের একটুও দেরী হ'ল না।

করালীবাবু যা বলেছেন—সেটা তো নিছক ভদ্রতা। এ কথা সবাই সবাইকে বলে। এমনি এক সাধারণ কথার ওপর নির্ভর করে প্রতি সপ্তাহে ছুটে ছুটে তাঁর বাড়ী চড়াও হলে, তিনি কি ভাববেন। গৃহিনীটিও চমৎকার লক্ষ্মীরূপিণী। এমন গৃহিণী সংসারে শ্রী আনেন, শান্তিও। মেয়েটিও ভাল। সর্বকর্ম নিপুণা। হাস্যময়ী।

পলকে কমলেশ গম্ভীর হয়ে গেল। চোরা বালির ওপর পা দিয়ে দিয়ে চরম সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়াবার উপক্রম করছে। একটু অসতর্ক হলেই তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরে একলা বসে বসে ভাল লাগল না। একেবারে রোদ নেই। মেঘলা আকাশ। কমলেশ একটা সাইকেল রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আজকাল সুরমার সামনা সামনি বসে থাকতে কেমন ভয় হয়। সুরমার দুচোখে যেন ব্যঙ্গের ঝিলিক। ঠোঁটের কোণেও পরিহাসের রেশ। কি বলতে চায় সুরমা?

পুরোনো শড়ক, পুরোনো বাড়ী ঘর ভেঙেচুরে নতুন পাটনা গড়ে উঠছে। বিরাট পার্ক, মর্মর মূর্তির সার, প্রশস্ত রাজপথ।

সাইকেল রিক্সা ছেড়ে দিয়ে কমলেশ ঘাসের ওপর বসে পড়ল। গিরিজা চিঠির উত্তর দিয়েছে। লিখেছে—তার মামাও একটা চিঠি দিয়েছেন, কমলেশ দেখা করেছিল, সে কথা উল্লেখ করে। কমলেশকে তাঁদের স্বামী স্ত্রীর খুব ভাল লেগেছে। এত অল্প বয়সে এত বড় একটা শোক পেয়েছে কমলেশ, সেজন্য তাঁদের দুঃখের অন্ত নেই। সংসার শুরু করার আগেই সংসার শেষ!

কিন্তু কি বলতে চায় সুরমা? সে কি চায়—কমলেশ এমনই ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াবে? যৌবনেই সব কিছু বিসর্জন দিয়ে গৈরিক নির্লিপ্তির নামাবলী অঙ্গে জড়াবে। মুঠো মুঠো ছাই নিয়ে দেহে মাখবে। বাসনা, কামনা সব কিছুর ইতি। তাহ'লে এভাবে, এত দূরে এসে চাকরি করার কষ্ট স্বীকার কেন? বাঘের ছাল আর কমণ্ডলু খুব দামী জিনিষ নয়, এদেশে দুষ্প্রাপ্যও হবে না। সংসারের নামে এ ভাঙা হাট সাজিয়ে বসা অর্থহীন।

আজ রাত্রে সুরমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। কি সে চায়? বন্ধন দিয়ে মুক্তির প্রলোভন দেখানো কেন? জীবনকে বরণ করতে দেবে না, মৃত্যুকে গ্রহণ করবার সাহস কমলেশের নেই, কিন্তু তাই বলে এমন জীবন্মৃত অবস্থায় কতদিন সে থাকবে।

বিকেল হতেই কমলেশ উঠে পড়ল। একটু হেঁটে গিয়ে একটা সাইকেল রিক্সা ধরল। হোটেলে ফিরে দুতলায় পা দিয়েই চমকে উঠল। তার বন্ধ কামরায় সামনে চেয়ারে করালীবাবু বসে আছেন। সামনের বারান্দায় মমতা।

কোথায় গিয়েছিলে হে ঠিক দুপুরবেলা? বসে বসে পা ব্যথা হ'য়ে গেল। কমলেশকে দেখে করালীবাবু কলরব করে উঠলেন।

মমতা বারান্দা থেকে সরে এসে বাপের চেয়ারের পাশে দাঁড়াল।

কমলেশ মৃদু গলায় বলল—বসে বসে ভাল লাগছিল না, বেশ মেঘলা দিন, তাই সাইকেল রিক্সা নিয়ে নিউ পাটনার দিকটা একটু ঘুরে এলাম।

আচ্ছা তো বাবাজী বেড়াতে বেড়াতে আমার ওদিকে চলে গেলেই পারতে, তা হলে বুড়ো মানুষকে উজান বেয়ে আর এতটা পথ আসতে হ'ত না।

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে কমলেশ তালাটা খুলল। জানলা দুটো খুলে দিয়ে বলল, আসুন আপনারা, ভিতরে আসুন।

করালীবাবু ভিতরে গিয়ে বেতের চেয়ারে বসলেন, মমতা বসল ড্রেসিং টেবিলের সামনের টুলে।

চা খেতে আপত্তি নেই তো? দাঁড়ান আপনাদের চায়ের কথাটা বলে আসি।

কমলেশ বেরিয়ে বয়কে ডাকার বোতামটা টিপল।

করালীবাবু হাত নেড়ে বারণ করলেন, আরে আমাদের জন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না। কাজের কথাটা আগে সেরে নিই।

বলুন। কমলেশ করালীবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল।

কাল মমতার জন্মদিন। মমতার মা বিশেষ করে বলে দিয়েছে তোমাকে যেতেই হবে। মমতা নিজে এসেছে নিমন্ত্রণ করতে। তুমি অফিস থেকে সোজা চলে যাবে। কোন আপত্তি শুনব না।

না, না, এতে আর আপত্তি করার কি আছে। নিশ্চয় যাব। মমতা দেবীর জন্মদিন, আপনি নিজে এসেছেন কষ্ট করে।

কমলেশের বলার ভঙ্গী দেখে করালীবাবু সশব্দে হেসে উঠলেন—বাবা,মমতা আবার দেবী হ'ল কবে থেকে তুমি ওকে আপনি আজ্ঞে সুরু করলে নাকি কমলেশ? আরে ও দেখতেই ওই লম্বা চওড়া, বয়স ওর খুব বেশী নয়।

কমলেশ এ কথার কোন উত্তর দিল না। পাশে বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে নীচু গলায় নির্দেশ দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

সামনের পূজোর ছুটিতে গিরিজাকে আসতে বলেছি কমলেশ, বুঝলে, পূজোর সময় থেকে পাটনার আবহাওয়াটাও ভাল। খুব বেড়ানো যাবে। তুমি পূজোর ছুটিতে ক'লকাতা যাবে নাকি?

আমি, না, আমি আর কলকাতায় কি করতে যাব?

কমলেশ মৃদু নিশ্বাস ফেলল। খুব মৃদু। করালীবাবুর কাণে গেল না। বোধহয় মমতারও নয়।

ইতিমধ্যে দরজার কাছে বেয়ারা আসতেই কমলেশ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ট্রে থেকে চায়ের কাপ আর খাবারের থালাটা তুলে করালীবাবুর সামনে রেখে দিল।

মমতার জন্য চায়ের কাপ আর থালাটা এগিয়ে দিতে গিয়েই কমলেশ থেমে গেল।

মমতা একদৃষ্টে সুরমার ফটোর দিকে চেয়ে রয়েছে। সাড় নেই। নিস্পন্দ।

আপনার চা। কমলেশ প্রয়োজনের চেয়েও একটু চড়াল গলার স্বর।

মমতা চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি চায়ের কাপটা ধরতে গিয়ে অল্প গরম চা হাতের ওপর পড়ে লাল হয়ে উঠল। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী লাল হ'য়ে উঠল দুটি গাল।

একি কাণ্ড করেছ হে কমলেশ, তুমিই যে আমাদের নেমন্তন্নর খাওয়া খাইয়ে দিলে?

কমলেশ কোন উত্তর দিতে পারল না। উত্তর দেবার মতন মনের আর দেহের অবস্থা তার নেই। বুকের স্পন্দন অসম্ভব দ্রুততর, দুটো পা ঠক ঠক করে কাঁপছে।

ঠিক করল, সুরমার ফটোটা সুটকেশের মধ্যেই রেখে দেবে। এভাবে বাইরে হাজার কৌতূহলী উৎসুক দৃষ্টির সামনে রাখবে না। সুরমার মর্ম আর কেউ বুঝবে না। আর কাউকে কমলেশ বোঝাতেও পারবে না। সে শুধু তার একান্তের জিনিস। যখন প্রয়োজন হবে মুখোমুখি বসাবে! দেখবে, কথা বলবে।

করালীবাবু আর মমতাকে কমলেশ চৌরাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল।

রিক্সায় ওঠবার সময় করালীবাবু আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন, অফিসের পরেই সোজা চলে যেও হে কমলেশ, দেরী করো না।

কমলেশ ঘাড় নেড়ে অস্ফুটকণ্ঠে যাবার প্রতিশ্রুতিও দিল।

সাইকেল রিক্সা পথের বাঁকে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কমলেশ দাঁড়িয়ে রইল অদ্ভুত এক আশা নিয়ে! শেষ পর্যন্ত একবার বোধ হয় মমতা ঘাড় ফিরিয়ে দেখবে। দুটি চোখের দৃষ্টি দিয়ে তাকে যাবার জন্য আমন্ত্রন জানাবে।

কিন্তু সেই যে মমতা গম্ভীর হয়েছে, সুরমার ফটোটা দেখার পর থেকে, আর সে ভাল করে কথাই বলে নি। অবশ্য কমলেশেরও তার সঙ্গে কথা বলার কোন সুযোগই হয় নি। করালীবাবু অনর্গল বাকচাতুর্যে একাই আসর জমিয়ে রেখেছিলেন।

হোটেলে ফিরে নিজের ওপর ঘৃণা হ'ল কমলেশের।

ছি, ছি, কোথায় সে নেমে যাচ্ছে, কোন্ নরকে! কোন্ একটা মেয়ে কথা বলল, কি ফিরে দেখল তার দিকে, তাই নিয়ে মনে মনে কল্পলোক রচনা করবার মতন মনোবৃত্তি তার হ'ল কি করে? এর মধ্যেই সুরমার কাছ থেকে সে এত দূরে নেমে এসেছে? জন্মজন্মান্তরের একটা সম্পর্ক এভাবে মুছে ফেলার একি অর্থহীন চেষ্টা!

রাত্রে বিছানা ছেড়ে কমলেশ মেঝের ওপর নেমে এল। শুধু মাথার একটা বালিশ, আর কিছু নয়। কৃচ্ছ্রসাধন প্রয়োজন নরম বিছানা, বিলাস-চিন্তার অনুকূল। মনের ক্ষতি হয়। অন্যায় চিন্তা চিত্ত অধিকার করে।

সুরমার ফটোটা কমলেশ নিজের কাছে রাখল। মনের গোপনতম রহস্যও সুরমার জানা। সুরমা ভুল বুঝবে না। বুঝতে পারে না।

কিন্তু সুরমাও ভুল বুঝল।

অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখে কমলেশ শিউরে জেগে উঠল। ফ্রেমের মধ্যে সুরমা নেই, মমতা বসে বসে মুখ টিপে হাসছে।

* * * *

পরের দিন অফিস থেকে সোজা কমলেশ গেল না। এভাবে সার্ট প্যান্ট পরে অফিসের পোশাকে যেতে ইচ্ছা করল না; তাছাড়া মমতার জন্মদিন, তার জন্য কিছু একটা কিনেও নিয়ে যেতে হবে।

দু একটা দোকান ঘুরে কমলেশ একটা প্রসাধনের কাস্কেট কিনল। জিনিসটা দেখতে যেমন নয়ন মনোহর, দামটাও একটু বেশী পড়ল। তা পড়ুক, সব সময় টাকা-আনা-পাইয়ে সব কিছুর হিসাব করা চলে না। সামাজিকতা রক্ষা করতেই হয়—অন্তত লোকসমাজে বাস করতে হলে।

সেই দোকান থেকেই কমলেশ একটা অগুরু কিনল। হোটেলে ফিরে এসে স্নান সেরে নিল, তারপর ধুতি পাঞ্জাবি পরে অগুরুর শিশিটা পাঞ্জাবি আর রুমালের ওপর উপুড় করে দিল। মৃদু অথচ প্রীতপ্রদ সুরভি। বারবার নিশ্বাস টেনে টেনে কমলেশ অনুভব করল।

আড়চোখে একবার ড্রেসিং টেবিলের দিকে দেখল। না, ভয় নেই। সুরমার ফটোটা আজ সকালেই সুটকেশের মধ্যে তুলে রেখেছে।

কিন্তু কমলেশের কাণ্ড দেখে কি রাগ করত সুরমা? ব্যঙ্গের হাসি হাসত?

কেন, কমলেশ অস্বাভাবিক আর কি এমন করেছে! কোথাও যেতে হ'লে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া বুঝি উচিত নয়। একটু স্নো, হালকা প্রসাধন, সামান্য অগুরুর গন্ধ। এতে হাসবার বা ব্যঙ্গ করবার কিছু থাকতে পারে না।

সাইকেল রিক্সায় উঠে কমলেশ প্রশ্ন করল, নিজেকে। শুধু কি নিছক সামাজিকতা রক্ষা করতেই চলেছে কমলেশ? আর কোন অভিসন্ধি নেই?

অভিসন্ধি? প্রশ্নের ধরণ দেখে কমলেশ চমকে উঠল। ছি, ছি, এ কি হীন চিন্তা। সংসার করার সাধ তো কমলেশের শেষ হয়ে গেছে। আবার এ খেলা শুরু করার ইচ্ছা তার এতটুকুও নেই। সুরমার জায়গায় আর কাউকে কোনদিন সে বসাতে পারবে না। জীবন নিয়ে ছেলেখেলা চলে না।

একেবারে গেটের কাছেই মমতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ঠোঁট ফুলিয়ে সে বলল, বাব্বা, এ ত দেরী হ'ল আপনার। আমি কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

দু হাতে বুকের মাঝখানটা সজোরে চেপে ধরেও কমলেশ স্পন্দন স্বাভাবিক করতে পারল না। যে ভাবে গলার কাছটা কাঁপছে, ভয় হ'ল, হয়তো কথা বলতে গেলেই ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু কিছু একটা না বলাও ভারি বিসদৃশ দেখায়। দুটি চোখে অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে মমতা চেয়ে রয়েছে।

বেশ একটু পরে, আবেগ কিছুটা প্রশমিত হ'লে কমলেশ বলল, আমার কি খুব দেরী হয়ে গেছে?

বা রে, কথা ছিল না আপনি অফিস থেকে সোজা চলে আসবেন। অভিমানে মমতার ঠোঁট দুটো ফুলে উঠল।

আশ্চর্য, মাত্র তিনদিনের দেখা—কিন্তু মনে হচ্ছে যেন যুগযুগান্তরের সম্পর্ক। অচ্ছেদ্য। দুদিন ভাল করে মমতা কথা বলে নি, আজ কিন্তু সুধার ভাণ্ডার উজাড় করে দিচ্ছে। এত প্রগলভা হবার কি হেতু?

কাস্কেটটা কমলেশ মমতার হাতে তুলে দিল, আপনার জিনিস আপনাকে দিলাম।

মমতা লজ্জায় আরক্ত হ'ল।

আরে, এসো এসো কমলেশ। ঘরের কোণ থেকে আওয়াজ ভেসে এল, তুমি মমতার সঙ্গে কথা বল, আমার ওঠবার উপায় নেই। পালমশাই আমাকে বড় প্যাচে ফেলেছেন।

কমলেশ এদিক ওদিক চোখ ঘুরিয়ে দেখল। টেবিলের ওপাশে মাদুর পেতে করালীবাবু আর একজন প্রৌঢ় বসে আছেন। সামনে দাবার ছক। চেয়ার দুটো আড়াল পড়ায় এদিক থেকে দেখা যায় নি।

চলুন, আমরা বরং বাগানে গিয়ে বসি। এখানে বসে কথা বললে বাবা ক্ষেপে উঠবে। দাবা খেলার সময় বাবার জ্ঞান থাকে না।

মমতা ফিসফিস করে বলল।

কমলেশ কোন উত্তর দিল না। মমতার পিছন পিছন বাগানে এসে দাঁড়াল। গোটা তিনেক সবুজ বেতের চেয়ার। দুজনে মুখোমুখি বসল।

দু ঘণ্টারও বেশী,কিন্তু কমলেশের মনে হ'ল দু'সেকেণ্ড। মনে মনে তুলনা করল, সুরমা যদি মাটির প্রদীপ, মমতা বিজলিবাতির চোখ-ধাঁধানো দ্যুতি। সুরমা যদি লাল-পাড় আটপৌরে শাড়ী—তো মমতা মহামূল্য শিফন। কথার চাতুর্যে, হাস্যে লাস্যে মমতা অতুলনীয়া।

আচ্ছা,আপনি আমায় আপনি বলেন কেন বলুন তো?

কমলেশ অনেকক্ষণ একদৃষ্টে দুটি আয়ত চোখের দিকে চেয়ে দিশা হারাল, তারপর বলল, বেশ এবার থেকে তুমিই বলব।

আর একটা কথা দিন।

বল।

সামনের শনিবার আসবেন। অবশ্য বাবা আপনাকে বলবেন। আমরা ষ্টিমারে গঙ্গার ওপারে যাব। আপনি থাকলে বেশ মজা হবে।

সে রাত্রে কমলেশ ফিরল যেন বাতাসে ভর দিয়ে। কাণের কাছে মধুরকণ্ঠের অশ্রান্ত কাকলী, চুড়ির কিঙ্কিণী, দামী শাড়ীর খসখস শব্দ। আশ্চর্য, যে গন্ধসার কমলেশের প্রিয়, তারই সুরভি মমতার অঙ্গ থেকে পাওয়া গেল।

পরেরদিন যখন কমলেশের ঘুম ভাঙল তখন বেলা অনেক। জানলা দিয়ে রোদ বিছানার ওপর এসে পড়েছে। কমলেশ তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিল।

কথাটা মনে পড়ল অফিস যাবার সময়। একেবারে মাঝপথে। সুরমার ফটোটা সুটকেশের মধ্যেই রয়ে গেছে। আজ বের করাই হয় নি। সুরমা যাবার পর এমন ভুল আর কোনদিন হয় নি। প্রত্যেকদিনই দুজনে মুখোমুখি বসেছে। সুরমা কথা বলেছে, কমলেশ শুনেছে।

এই প্রথম স্বপ্নে কিংবা জাগরণে সুরমা দেখা দিল না।

পরের শনিবার কি একটা উপলক্ষে অফিস ছুটি ছিল। একটু তাড়াতাড়ি হোটেল থেকে বেরিয়ে কমলেশ করালী-বাবুদের বাড়ী গিয়ে উঠল।

ষ্টীমারে যাবার সময় ততটা ভাল লাগল না। ওপারে করালীবাবুর পরিচিত এক বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া সেরে, বিশ্রাম করে অপরাহ্ণে সবাই ষ্টীমারে উঠল।

আকাশে অবারিত জ্যোৎস্না। বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের মাথায় মাথায় হাজার চাঁদের চমক। করালীবাবু আর তাঁর স্ত্রী ডেকের ওপর সতরঞ্চ পেতে বসেছিলেন। কমলেশও কাছে দাঁড়িয়েছিল।

হঠাৎ করালীবাবুরই খেয়াল হ'ল।

কমলেশ, মমতা কোথায় গেল?

একটু আগেই কমলেশ দেখেছে। ওদিকের ডেকে একটি বিহারী ভদ্রলোক গ্রামোফোন নিয়ে বসেছিলেন। একেবারে বাছাই করা হিন্দী গান। তাঁকে ঘিরে বেশ একটু ভীড়। মমতা সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছিল।

ইচ্ছা থাকলেও কমলেশ লজ্জায় সেখানে দাঁড়াতে পারে নি। মমতার কাছাকাছি। কি জানি, করালীবাবুরা কি মনে করবেন। তাই সে পায়ে পায়ে সরে এসে এদিকে দাঁড়িয়েছে।

দেখতো খুঁজে একবার। যা চঞ্চল মেয়ে।

করালীবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কমলেশ আর তিলমাত্র সময় নষ্ট করল না। এই রকম একটা অজুহাতের জন্যই বুঝি সে অপেক্ষা করছিল। করালীবাবু নিজে খুঁজতে চলছেন, কাজেই কোন অসুবিধা নেই।

প্রথমে কমলেশ গ্রামোফোনের ভীড়ের মধ্যে খুঁজল। না, মমতা নেই। কমলেশ ডেকের একদিক থেকে আর একদিক দেখল। ডেকে-বসা লোকেদের ফাঁকে ফাঁকে চোখ বুলিয়ে। কোথায় মমতা?

সিঁড়ি বেয়ে কমলেশ ওপরের ডেকে গিয়ে উঠল। ক্যাপ্টেনের ঘরের সামনে। সেখানে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে মমতা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। গঙ্গার বুকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে।

একেবারে পিছনে গিয়ে কমলেশ ডাকল, মমতা।

মমতা চমকাল না। ওর যেন জানাই ছিল কমলেশ পিছনে এসে দাঁড়াবে। ঘাড় না ফিরিয়েই বলল, দেখুন গঙ্গার বুকে কে যেন রুপো ঢেলে দিয়েছে।

কমলেশ পাশে এসে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, গঙ্গার বুকে নয়, মমতার মুখে, চোখে, সারা দেহে রুপোলী বন্যা। অপূর্ব মহিমাময়ী।

করালীবাবুর ডাকে দুজন যখন সচেতন হ'ল, তখন ষ্টীমার কূল ছুঁয়েছে। লোকজন নামার আয়োজন করছে।

এর পরের ব্যাপার গতানুগতিক।

পূজোর ছুটিতে গিরিজা এসেছিল। করালীবাবু কথাটা তার মারফৎই পেড়েছিলেন। কমলেশ খুব মৃদু আপত্তি করেছিল। কিন্তু খোদ করালীবাবু আর তাঁর স্ত্রী যখন বললেন, তখন কমলেশ ঘাড় হেঁট করে রইল।

বিয়েটা পাটনাতেই হ'ল।

বাসর ঘরেই কমলেশ কথাটা মমতাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, প্রথম দুদিন তো ভাল করে কথাও বল নি, তিন দিনের দিন বাগানে হঠাৎ অত মুখরা হয়ে উঠলে যে? ব্যাপারটা কি?

চোখ ঘুরিয়ে মমতা হাসল, ব্যাপার আবার কি। তার আগের দিন রাত্রে যে শুনতে পেলাম, মা বাবাকে বলছে, বেশ ছেলেটি, এর হাতে মমতাকে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হই! বাবা বলল, আমার মনে হয় কমলেশেরও মমতাকে ভালই লেগেছে। গিরিজাকে দিয়ে কথাটা পাড়তে হবে। কাজেই আমিও নিশ্চিন্ত হলাম।

এই অবধি বলেই মমতা লজ্জায় জিভ কাটল, ওই দেখ, বাসরঘরেই তোমার নামটা করে ফেললাম।

কমলেশ হাসল।

বিয়ের ঠিক দিন পনের পরেই কমলেশের বদলীর হুকুম এল! কলকাতায়।

মমতাকে নিয়ে যাবার আগে কমলেশ নিজে চলে এল। সুরমার ফটোটা ছাদের বাড়তি জিনিসপত্র রাখার ঘরে রেখে দিল। সুরমার হাতের যে কার্পেটের ছবি ছিল দেয়ালে, সেটা খুলে সরিয়ে রাখল। আর কিছু নয়, সবই তো মমতার জানা, কোথাও কোন লুকোচুরি করা হয় নি, তবু এগুলো চোখের সামনে না থাকলেই ভাল। ভাঙা সংসারের চিহ্ন নতুন মানুষের চোখে নাই বা পড়ল।

কিছুদিন পরেই মমতা এল। গিরিজার সঙ্গে। ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখল। ওপর থেকে নীচে। কমলেশ সঙ্গে সঙ্গে রইল। একটি বেফাঁস কথা বলল না মমতা, পুরোনো দিনের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে অহেতুক কোন প্রশ্ন। কমলেশ নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

ছুটির দিন আলমারি থেকে গহনার বাক্সটা বের করে কমলেশ মমতার হাতে তুলে দিল।

কদিন ধরেই ভাবছিল। গহনাগুলোর সঙ্গে সরে যাওয়া একটা মানুষের স্মৃতি জড়ানো। আর একজনের একদা-অস্তিত্ব প্রকট। তাই কমলেশ ভাবছিল—কি জানি কি মনে করবে। হয়তো ক্ষুণ্ণ হবে কিংবা আঘাত পাবে।

কিন্তু এ কদিনে কমলেশের দ্বিধা কেটেছে, আলমারি খুলে নিজেই সুরমার শাড়ী জামা বের করে রোদে দিয়েছে। দু একটা আটপৌরে শাড়ী অঙ্গেও জড়িয়েছে। কোন কথা উত্থাপন করে নি।

আবরণ যখন সহ্য করেছে তখন আভরণেও নিশ্চয় আপত্তি করবে না।

চাবিটাও কমলেশ মমতার হাতে সমর্পণ করল।

নাও, এসব তোমার।

বাক্স নিয়ে মমতা মেঝের ওপর বসল। কমলেশ খাটের একপাশে। চুড়ি, কানপাশা, মান্তাসা, চুড়, হার, টায়রা, আংটি গোটা তিনেক। সব খোপগুলো খুলে খুলে মমতা দেখল, তারপর এক সময়ে মুখ তুলে কমলেশের দিকে চেয়ে বলল, এসব আমার?

মমতার ছেলেমানুষীতে কমলেশের হাসি পেল। মমতার দিকে চেয়ে বলল, সব তোমার বই কি মমতা। আর কার?

এ বাক্সে যা আছে সব তো? মমতা দু চোখের অপরূপ ভঙ্গী করে কমলেশের দিকে ফিরল।

বিস্মিত কমলেশ ঘাড় নাড়ল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব তোমার। বাক্সের মধ্যে যা আছে সব, এমন কি বাক্সটা সুদ্ধ।

মমতা হাসতে হাসতে একেবারে তলার খোপ থেকে ছোট একটা কাগজ বের করে কমলেশের সামনে ধরে বলল, এটাও? এটাও আমার তো?

ঝুঁকে কাগজটার দিকে চেয়েই কমলেশ চমকে উঠল। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল কপালে। দারুণ একটা অস্বস্তিতে বুক ভরে উঠল। চোখ তুলে মমতার দিকে চাইবার সাহসটুকুও নিভে গেল।

ছোট্ট কাগজের টুক্‌রো। তার ওপর কমলেশের হাতের লেখা। আঁকাবাঁকা গোটা গোটা অক্ষর।

সুরমা, তুমি চিরদিন আমার। জীবনে, মরণে। তোমার জায়গায় কোনদিন আর কাউকে বসাতে পারব না।

কি জানি কবে কোন্ খেয়ালে, হয়তো খেলাচ্ছলে কমলেশ কথাগুলো লিখেছিল, কিন্তু আজ আর এক নারীর মুখোমুখি বসে এই দলিলের দিকে চোখ তুলে চাইতেও পারল না।

এতদিন পরে আবার সুরমা দেখা দিল। ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি, কিন্তু দু চোখে অশ্রুর মুক্তা।

রজকিনী

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

চণ্ডীদাসের হিয়ার-বাসে প্রেমের-ক্ষারে
শুভ্র শুচি যে-রজকী রাখ্‌তে পারে,
প্রাণ-সরসীর প্রীতির ধারায় ধৌত করি'
আর্দ্রতা সব মর্ম্মালোকে লয় হে হরি'
রজকিনী সে-রামমনি পূজনীয়া।
মালিন্যহীন করলো সে যে কবি-হিয়া।

(২)

উচ্ছলিত রাধা-ভাবের সাদা কথার
বাণী-বসন প'রে কবি কাল-যমুনার
তীরে ব'সে উর্ম্মি-লহর হেরে সুখে ;
রামী-সেবার অপূর্ব্বতায় অথই বুকে
অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের আমেজ আসে ;—
তা'রই সুবাস চণ্ডীদাসী
গীতোচ্ছ্বাসে।

(৩)

চণ্ডীদাসী রাধা-ভাবের সাদা কথা
মহাপ্রভুর মহাপ্রেমের অমেয়তা
পরিস্ফুট ক'রে তোলে অনায়াসে।
রামী-প্রেমের ক্ষারে-কাচা বাণীর-বাসে
চণ্ডীদাসে হেরি মহাকালের বেলায়,—
সে-বাস রামীর মর্ম্মালোকে শুভ্রতা পায়।

বুড়ো ভালুকের জোয়ান বউ

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আমি একদিন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে চোখ বুলিয়ে আপন মনেই খুব হেসে উঠলাম। বিষয়টি পাত্রী চাই—লেখা আছে—পাত্রের বয়স বেশী নয় মাত্র পঁয়তাল্লিশ—তিন পুত্র, চার কন্যা—তাঁদের দেখাশোনা করার জন্যে একটি অভিভাবিকার প্রয়োজন, গিন্নীবান্নী গোছের হলেও ক্ষতি নেই, তবে তরুণী হলেই অগ্রাধিকার। এক কপর্দ্দকও পণ দিতে হবে না—শিক্ষিতা না হলেও চল্‌বে। আবেদন করুন—বক্স নম্বর অমুক অমুক।

সামনে আমার সহপাঠী বন্ধু বঙ্কিম ওরফে বঙ্কেশ্বর—সে আমার হঠাৎ হেসে ওঠার কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি ঐ পাত্রীর অংশটা পড়ে শোনাই। তার মন্তব্য—

—খেপেছো? পাত্রের বয়ঃক্রম অন্ততঃ বিশ বছর বেশী—পঁয়ষট্টি, কন্যার বয়স—নিদেন পক্ষে পঞ্চান্ন—পঁয়তাল্লিশ হতেই পারে না।

আমাদের দুজনের মধ্যে যখন খুব হাসির হররা চলছিল, এমন সময় প্রখ্যাত শিকারী অর্জ্জুন সেনের প্রবেশ। আজ দুদিন হ'ল আমার অতিথি। হাসির কারণ না জেনেই সেও একচোট হেসে উঠল—তারপর

একটু সামলে নিয়ে আমাদের এত ফুর্ত্তির কারণ কী জিজ্ঞাসা করে। বিজ্ঞাপন-বৃত্তান্ত জানার পর তার অট্টহাস্য গোঁফের আড়ালে লুকিয়ে গেল। তার নাসিকাকুঞ্চিত এবং সুবিজ্ঞ উক্তি—

ওঃ বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা! সে আর বেশী কথা কী? এ রকম তো আকচার হচ্ছে। জন্তুজানোয়ারের মধ্যেও যা দেখি, মানুষের মধ্যেও তাই। কিচ্ছু তফাৎ নেই—

—কী রকম?

—তবে শোনো একটা ঘটনা—

—জানি তোমার ঝুলিতে রং-বেরং-এর শিকার—শুনতে রাজী আছি—একটা সর্ত্তে—গৌরচন্দ্রিকা করে যদি বল—

বাইরে জোর হাওয়া—ভেতরেও জোর শিকারের গল্প—

পূজার পূর্ব্বে আচমন, অঙ্গন্যাস, আসনশুদ্ধি ইত্যাদি ইত্যাদি যেমন করা হয়, এবার কিন্তু অঞ্জন সেন শিকারের পায়তাড়া না করেই বিনা ভূমিকায় বল্‌তে থাকে।—

বাঘের মত ভালুকরাও যদি আঘাত পায়, তবে এরা সামনাসামনি পেলে শিকারীকে চিবিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। উত্তর কাছাড়ের অনেক পাহাড়েই পাথরের খনি আছে। পাথুরে চূন তৈরী করার জন্যে পাহাড় কেটে বড় বড় গর্ত্ত করা হয়। তারপর দীর্ঘদিন সেগুলি অকেজো হয়ে পড়ে থাকে, ফলে জঙ্গল-ভর্ত্তি কতকগুলো ভালুকের আস্তানা সৃষ্টি হয়। এই রকম একটা পাথর খনির দিকেই একদিন রওনা হয়ে গেলাম। সঙ্গে আমার চিরপুরাতন ভন্টু।

আমার গাইড্ টঙ্কনাথ পূর্ব্বেই সাবধান করে দিলে—

—সাহেব, এবার খুব হুঁশিয়ার, খাদী ভালুকটা নর-মাংস ছাড়া কিছু খায় না। ভীষণ জাঁদরেল চেহারা আর বেপরোয়া। প্রায়ই ধানক্ষেতে হামলা করে আর মানুষ দেখলেই তাকে সাবাড় করে ভোজনপর্ব্বে মেতে ওঠে।

—সে কি রে? আমাদের দিশী ভালুক তো মাংস খায় না—তারা যে সেকেলে ফলারে বামুনের মত খাটি নিরামিষ।

টঙ্কনাথের মুখে প্রতিবাদের সুর—

আমরাও তো তাই জানতাম—কিন্তু চাক্ষুষ দেখার পর সেটা আর বলি কেমন করে?

ভন্টু বরাবর চুপ করেই ছিল—এবার কিছু না বললে যেন তার ওজনটাই কমে যায়—তাই বিজ্ঞের মত উক্তি করে—

খুব সম্ভব সাইবেরিয়ার ভালুক, পথহারা এক পথিকের মত তিব্বত হয়ে এদিকে নেমে এসেছে। ওরাই বেশী নরখাদক হয়।

—চোখ একরকম দেখে, কান অন্যরকম শোনে—তাই চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন না হলে বিশ্বাস নেই।

টঙ্কনাথ পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, আর এই নরখাদক ভালুকের বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী শোনায়।

—এটা একটা মাদী-ভালুক—যেমন বিরাট বপু, তেমনি তার ভীষণ আক্রমণ। মাঠে যখন চাষীরা কাজ করে, ভালুকটা ওৎ পেতে বসে থাকে। যেই কোনও চাষীকে একলা পায় ছুটে এসে এক থাবায় তাকে উল্টে দেয়। তারপরই সামনের থুপা দিয়ে লোকটাকে চেপে ধরে, আর তার গায়ের মাংস কামড়ে ছিঁড়ে খায়। মানুষের মুখের ওপরই তার লোভটা বেশী; প্রথমেই এক কামড়ে নাক আর মুখের মাংস ছিঁড়ে নেয়—তারপর সেই লোকটাকে উল্টেপাল্টে দেহের অন্যান্য অংশের মাংস খেয়ে উদর পূর্ত্তি করে।

নরখাদক ভালুকটাও চূণা পাথরের গুহার মধ্যে কোনও একটাতে থাকে, স্থানীয় লোকদের কাছে সংবাদ পেলাম। টঙ্কনাথ বললে—সে নিজের চোখে দেখেছে সেই মাদী ভালুকটাকে—আর কোন্ দিকে তার আনা-গোনা সেটাও তার বিশেষ জানা আছে।

টঙ্কনাথ সত্যই খুব কাজের লোক। এমন একটা ঘোরানো পথে সে আমাদের নিয়ে গেল যে আমারই মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম। কিছুক্ষণ পরে আমরা ঠিক সেই গুহার কাছাকাছি এসে পড়লাম—যার মধ্যে সেই নরখাদক ভালুকের আস্তানা। টঙ্কনাথের সদম্ভ উক্তি—সে অনেকদিন থেকেই ভালুকটার ওপর নজর রেখেছে।

আমরা পেছন থেকে পাহাড় বেয়ে উঠেছি। গুহাটা বাঁ দিকে—তার সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা—এলো-মেলো পাথরের টুকরো আর ছোট ছোট ঝোপ। আমরা

গুঁড়ি মেরে একটা ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এদিক ওদিক কড়া নজর করে দেখি, সর্ব্বনাশ! সামনেই একটা বিরাট গুহা—যেন হাঁ করে আছে। তারই পাশে ইজিচেয়ারে ঠেস দিয়ে বসার মত পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে অতিকায় এক ভল্লুকী বসে আছে। তার পেছনের পা দুটো সামনে ছড়ানো—সম্মুখের দুই হাতে কোনও জন্তুর মাংস একমনে চিবিয়ে চলেছে—গালের দুকষ বেয়ে লাল ঝরে। সেই বীভৎস মূর্ত্তি দেখে মনে হল—নরমাংসছাড়া যে এঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, সেটা তা হলে উড়ো খবর নয়।

সময় আর নষ্ট করা উচিত হবে না। আমার ৫০০ এক্সপ্রেস বুলেট সেই ভল্লুকীর মাথাটাকে চূর্ণ করে দিতেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গুহার ভেতর থেকে একটা ক্রুদ্ধ হুঙ্কার শুনলাম। ভল্লুক প্রবর যে ভেতরেই আছেন এবং তাঁরও চেহারাখানা যে দশাসই হবে, সেটা অনুমান করেই তৈরী হয়ে নিলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যে একটি জানোয়ার বেরিয়ে এসেই ধাঁ করে পাশের একটা খাদের মধ্যে নেমে গেল—তারপরই কী মনে হওয়ায় আবার আমাদের দিকেই আসতে থাকে। মাদী ভালুকটা যেখানে পড়ে আছে, সেখানে এসেই সে যেন বুঝতে পারে অঘটন একটা কিছু ঘটেছে। পেছনের দু পায়ে ভর দিয়ে, কপালে সামনের একটা পা ঠেকিয়ে সে যেন সীমান্ত প্রহরীর মত সজাগ দৃষ্টি নিয়ে চারিদিকে দেখে নিতে চায়। তার বুকের সাদা দাগটা স্পষ্ট চোখের সামনে ফুটে উঠতেই, আমার দ্বিতীয়গুলীতে তিনিও পাতিতং বৈ পৃথিব্যাম্। আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি। ভল্টুও তো সাহসী কম নয়; সে একদিন ভালুকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছিল। বুক ফুলিয়ে দু চারটে পাথরের টুকরো সেই গুহার দিকে ছুঁড়ে মারে—কিন্তু আর কোনও সাড়াশব্দ নেই।

গুটি গুটি পা ফেলি আর এগিয়ে দেখি দাঁত-পড়া একটি অতি কৃশকায় লোমওঠা বুড়ো ভালুক তরুণী ভার্য্যার বীর দাপটে এতদিন জীবন্মৃত হয়েই ছিল—আজ আমার গুলীতেই তার মহামুক্তি।

তাই বলছিলাম না, জন্তু জানোয়ারের মধ্যেও যা, মানুষের মধ্যেও ঠিক তাই।

স্বর্গ-মর্ত্ত্য

অরূপ ভট্টাচার্য্য

আমি যে দেখেছি জ্যোৎস্না-ক্লান্ত রাতে
পথে প্রান্তরে মৃত্যুর কালো ছায়া
অশরীরী প্রেত নৃত্যে সেথায় মাতে
তাই দেখে হাসে কৈলাসে মহামায়া।
নন্দন বনে আজ নাকি মন্দারে
কণ্টকগুলি তীক্ষ্ণ হয়েছে বড়
অনঙ্গ আজি পরিণত অঙ্গারে
কামধেনুগুলি ভয়ে সব মরমর।
কোটি কোটি মন বাঁচিয়া রয়েছে ম'রে
সঞ্জীবনীর এতটুকু নাই আশা
আজ পৃথিবীর সতরঞ্চের ঘরে
জয়-চাল চালে শকুনির শঠ পাশা।

স্বর্গেও আজ শুনি তাই হাহাকার
তেত্রিশ কোটি দেবতা কি উপবাসী?
ইন্দ্রের তবে ফুরালো কি ভাণ্ডার?
নারদের মুখে উবে গেছে বুঝি হাসি!
বজ্রী কি বীর? অসি নহে উদ্ধত?
ভাঙ্গা তলোয়ার বেঁচে আছে কোন মতে?
অকাল-মৃত প্রেতাত্মারা যত
মিছিল কেন করে নাক পথে পথে?
ঝোড়ো বাতাসের কঠিন হৃদয় চিরে
ডানা ঝাপ্‌টিয়া মরিছে প্রলাপী পাখী
আহারের লাগি' ক্ষুধাতুর বৃথা ফিরে
পৃথিবীর আয়ু শেষ হ'তে কত বাকি?

শ্বেতরাজের মোহমুক্তি

(রম্যরচনায় পুরাণ-কথা)

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ঋক্ষ পর্বতের সেই ভয়াবহ মহাবনের গভীরে জনপাদস্পর্শ-বঞ্চিত এক সরোবরের তটপঙ্কে হিমশীতল উপলখণ্ডের মত পড়েছিল সেই শবদেহ। কত দিন, কত বর্ষ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তবু একইভাবে পড়েছিল সেটি সেখানেই। একটু বিকৃতি আসেনি সেই শবদেহে; তার স্পর্শে পূতিগন্ধে একটুও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি সেই ছায়াময় বনানীর চিরলঘু বাতাস। বরং প্রফুল্লকমলের সুরভিত রেণুর সুগন্ধে একটু বেশীরকমই সুবাসিত হয়েছিল সরসীর নীর।

নিবিড়তম সেই অরণ্যপ্রদেশে এই শবদেহ কিন্তু সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে পড়েনি কখনও। পড়বার সম্ভাবনাও ছিল না সেখানে। নানা মৃগ ও পক্ষীরবে পরিব্যাপ্ত, ফল-ফুল ও পুষ্প-পল্লবে পরম রমণীয়শ্রী বন-বীথিকার সজ্জায় কোনদিন সজ্জিতা হয়ে ওঠেনি এ অরণ্য। লতাপত্রে আবৃতচূড় কালজয়ী বনস্পতিতে সমাকীর্ণ এবং ভাস্করালোক বঞ্চিত এ এক অতি ভীষণ মহাবন। অরণ্যের এই অংশে অতিসাহসী কোন প্রাণসন্ধানীও প্রবেশ করার দুঃসাহসে দুঃসাহসী হয়নি কোনদিন।

নির্জ্জন সাধনার অভিলাষে এখানে আসেন শুধু বিমল-প্রাজ্ঞ সাধকদল।

এ শব সেই সব সাধকদেরও দৃষ্টিতে যে পড়েনি, তাও নয়। অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে কয়েক পদ এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু অন্য সকলেরই মত উদাসীনভাবে চলে গেছেন অবশেষে।

কেউ কেউ বা দূর থেকেই তাঁদের সেই উদাসীন দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিয়েছেন। কেউ কেউ বা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভেবেছেন ছন্দহীন বাস্তবের দ্বন্দ্বের কথা। মৃত্যুর এ চরম দর্শন এনে দিয়েছে বা কারো কারো দার্শনিক চিত্তে অস্থিরতা।

না—কোন সুরবর মুনির শব এ নয়। মহাপ্রাজ্ঞ প্রতিটি সাধকই জানেন যে, এ শব এক অভিশপ্ত রাজশব। সেই রাজা—যিনি প্রকৃত যজ্ঞপথ জানতেন না, কিন্তু তবুও নিজের সর্বস্ব বিসর্জিত করে অলীক এক যজ্ঞে ব্রতী হয়েছিলেন আপন গর্বের পদানত হয়ে।...

হতভাগ্য সেই রাজন্! যজ্ঞহীন যজ্ঞকারী অভিশপ্ত সেই রাজন্।

সুতরাং? সুতরাং বৃথা কালক্ষয় করে নিজের সাধন মুহূর্ত্তকে ব্যর্থ করে কি আর পাবেন তাঁরা?

মৃত্যুঞ্জয়ের বাসনায় সংসারত্যাগী সকল তাপসই এগিয়ে গেছেন সেই শবদেহটি অতিক্রম করে। তারপর এক সময় আরও দুর্গম অরণ্যের গভীরতায় হারিয়ে গেছেন তাঁরা তাঁদের পদধ্বনির সাথে সাথে।

একদিন এক অভিজিৎমুহূর্ত্তে সেই সরোবর তীরে এসে দাঁড়াল এক যুবক তাপস। ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠের অন্যতম বেদশিষ্য তিনি, নাম রহস্যবজ্র।

স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টি আকর্ষিত হয় তাঁর সেই শব-দেহে। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবেন তিনি। মুগ্ধ হয়ে যায় তাঁর দৃষ্টি। আর, সেই সমুগ্ধ দৃষ্টির বিস্ময়তায় জাত হয়ে বিচিত্র এক মহাপ্রশ্নে বিচলিত হয়ে ওঠে একটি তরুণ সাধকের অন্তর্জিজ্ঞাসা। প্রশ্ন জাগে—মর্ত্যের সর্ব-ক্ষয়ী শক্তির গ্রাসে যেখানে ক্ষয়িত হয়ে অবশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কঠিন শিলাও, সেখানে কোন নিগূঢ় সত্যের কৃপা ভিন্ন পঞ্চভূতসার এই, জৈবিক দেহ কি অক্ষত থাকতে পারে কখনও? আর, মৃতদেহ?

এই প্রশ্নের মধ্যেই যেন অভূতপূর্ব এক রহস্যের আভাস পান রহস্যবজ্র। আর সেই রহস্যের আবরণ উন্মোচিত না

করে ফিরে যাবার সকল সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে সত্যসন্ধানী ঋষি যুবার প্রতিজ্ঞা।

ধীরে ধীরে সেই শবদেহটি থেকে কিছু দূরে পশ্চাদপসরণ করে একস্থানে স্থির হয়ে দাঁড়ান তিনি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার সাধনা দিয়ে এক নিগূঢ়তম রহস্যসিদ্ধির সাফল্য আনবার প্রতিজ্ঞায় পাষাণ হয়ে দাঁড়ান তিনি অচঞ্চল।

দেখতে দেখতে অস্তাচলে চলে যান দিনতীর্থ দিবাকর। আসেন লগ্নরাণী গোধূলি, নামেন ঘোরময়ী তিমিরা।

সরোবরের কৃষ্ণ জল আরো কৃষ্ণ হয়ে আসে, অন্ধকারে লুপ্ত হতে সুরু করে বনানীর অন্ধচ্ছায়া।

একই ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিসের যেন প্রতীক্ষা করতে থাকেন তরুণ তাপস। এতদূর হতে কিছু দেখা যায় না, তবু কিছু যেন শোনবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন রহস্যবজ্র।

সহসা সেই ঘনান্ধকারে অতি অদ্ভুত এক শব্দে চমকিত হয়ে ওঠেন রহস্যবজ্র।

এক পা এক পা করে সরোবরের দিকে এগিয়ে যান সাধক রহস্যবজ্র। তারপর এক সময় এক মর্মান্তিক দৃশ্য দর্শনে শিহরিত হয়ে ওঠে জ্ঞানাভিলাষী সাধকের প্রতিজ্ঞা। বিস্ময়স্তিমিত হয়ে আসে সত্যসন্ধানী দুটি চরণের চঞ্চলতা।

দেখলেন রহস্যবজ্র, পরমশ্রীযুক্ত অপূর্ব দেবসঙ্কাশ এক রাজপুরুষ সেই রহস্যময় শব মাংসে আপন আহার সমাপনে ব্যস্ত হয়েছেন সেইমাত্র।

শিহরিত হয়ে ওঠে তরুণ তাপসের প্রশান্তচিত্তের স্থৈর্য্য।

দেখেন রহস্যবজ্র, যেখান থেকেই মাংস গ্রহণ করছেন সেই ক্ষুধার্ত্ত রাজপুরুষ। সেখানেই নূতনভাবে পূর্ণ হচ্ছে নূতন মাংস।

দুঃসহ দীর্ঘরাত্রির একটি প্রহর অতীত হয়ে যায় ক্ষণিক বিস্ময়ের তন্ময়তায়।

এক সময় সমাপ্তি আসে সেই তমোময় দৃশ্যের।

সেই একইভাবে পড়ে থাকে সেই রাজশব।

এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পান তাপস রহস্যবজ্র। দুঃস্বপ্ন যেন সদ্য ভেঙে যায় তাঁর। শরীরের সর্ব্ব অঙ্গে যেন এক অজানা বেদনা এসে বাসা বাঁধে সহসা।

ত্রস্ত পদে এগিয়ে চলেন তিনি আশ্রম অভিমুখে। মহাগুরুর পাদপদ্মে এ রহস্য নিবেদিত করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেন রহস্যবজ্র।

অমিতাত্মা ব্রহ্মবাদী যোগীর কাছে মুহূর্তে সব অজ্ঞাত জ্ঞাত হয়, সব অচেনা চেনা হয়।

ব্রহ্মজ্ঞানৈকনিষ্ঠ মহাযোগী বশিষ্ঠও যোগবলে জানতে পারেন যে, তাঁর অনুমানই নির্ভুল। শবমাংস ভক্ষণকারী শ্রীযুক্ত দেবসঙ্কাশ ঐ রাজপুরুষ আর কেউ নন, স্বয়ং সংশিতব্রত মহাযশা শ্বেতেরই বিদেহ আত্মা।

কিন্তু এই পরিচয়ে আরো চঞ্চল হয়ে ওঠে অচঞ্চল মহাযোগীর সংযমিত চিত্তের সুসীমতা।

একদিন সূর্যকুলতিলক এই শ্বেতেরই কুলপুরোহিত ছিলেন যে তিনি নিজে! তাঁরই সংসারী শিষ্যের হবে এ চরম দুর্গতি!

না, এতে বিস্মিত হননি ব্রহ্মপুত্র। এ তিনি জানতেন। মহাবল শ্বেতরাজের এ পরিণতির কথা তিনিই তো জেনেছিলেন সর্ব্বাগ্রে।

কিন্তু তবু, তবু কর্ত্তব্য আছে। আছে কুলগুরুর অবশ্য পালনীয় ধর্ম্মীয় দায়িত্বের প্রতিশ্রুতি। সাংসারিক মায়াচ্ছন্ন শিষ্যকে মহাপতনের হাত হতে রক্ষা করাই তো বেদ-বিধান। তারই জন্য তো যজ্ঞ। তারই জন্য তো সাধনা!

রহস্যবজ্রকে পাশে নিয়ে বনপথ ধরে এগিয়ে চলেন বশিষ্ঠ। রহস্যবজ্রই দেখিয়ে নিয়ে যাবে তাঁকে পথ।

এইভাবে চলতে চলতেই বলতে থাকেন ব্রহ্মপুত্র। বলতে থাকেন সুদূরতম অতীতের কথা। যে কথা ও কাহিনীগুলি না শুনলে এ রহস্যের রহস্যাবরণ উন্মোচিত করতে সমর্থ হবেন না রহস্যবজ্র কোনদিন।

সপত্তনা সপ্তদ্বীপা মহী নিঃশেষে বিজিত করে ফিরে এলেন ইলাবৃতবর্ষরাজ মহাবল শ্বেত।

কুলপুরোহিত মহামুনি বশিষ্ঠ তাঁকে বরণ করে তুললেন তাঁর মহামণিসমাকীর্ণ হেমরাশিসমুজ্জ্বল রাজপ্রাসাদে। সম্মানের জয়টিকা অঙ্কিত করে দিলেন তিনি রাজাধিরাজ শ্বেতের কপালে।

এরপর সুরু হল সেই পরমধার্মিক মহীপালের দান-যজ্ঞ। সুমহাত্মা ধরণীপতি তাঁর রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করে সমাপন করলেন রত্নদানযজ্ঞ। সসম্মানে সকল দ্বিজেন্দ্রকে আহ্বান করে তাঁদের হাতে তুলে দিলেন তিনি বহুমূল্য অনেকানেক রত্নসামগ্রী। তুলে দিলেন সুবর্ণনির্ম্মিত বিরাটায়তন সব মনুষ্যাকৃতি।

একদিন—

তখন নিদাঘ মধ্যাহ্নে জ্বালা বিকিরিত করে প্রখর-তাপে জ্বলছেন দীপ্ততেজা দিবাকর। দিবা-বিলাসী নর-নারী তাঁদের প্রাত্যহিক ভোজন সমাপন করে দিবা নিদ্রার আয়োজনে ব্যস্ত হয়েছেন সবেমাত্র, ঠিক সেই প্রতপ্ত প্রহরে মহাযশা রাজাধিরাজের সভাস্থলের প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন এক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ। মধ্যাহ্ন আহারের প্রার্থনা জানালেন তিনি শ্বেতরাজের কাছে।

রাজাদেশে সভারক্ষক ছুটে গেল রত্নভাণ্ডারে। সেখান থেকে নিয়ে এল সে লক্ষমুদ্রামূল্য রত্নরাজি। নিজ হাতে সেই রত্নরাজি সসম্মানে ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দিয়ে সবিনয়ে বললেন সুমহাত্মা শ্বেতরাজ—ব্রাহ্মণ, আপনি শুধুমাত্র একটি সূর্য্যোদয়ের আহার প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু এই রত্নে আপনার সমগ্র জীবনের বিলাসস্পৃহা পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে।

এ অচিন্তানীয় রত্নলাভের প্রথমে কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন সেই ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ। পরক্ষণেই নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করলেন তিনি সেই রত্নসামগ্রী। তারপর সর্ব্বান্তঃকরণেই মহারাজকে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন সেই যাজ্ঞিকব্রাহ্মণ।

শুধু সেইদিনই নয়, এইভাবে বহুদিন বহুবিধ আহার্য্য প্রার্থীকে শুধু বহুমূল্য রত্ন ও সুবর্ণের প্রলোভনে পরিতৃপ্ত করে ত্রিদশেশ্বর শক্রের গৌরবকেও ম্লান করে দেবার আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল মহাবল শ্বেতের শক্তিমত্ত পঞ্চম রিপু। দানের ঐশ্বর্য্যে সকলকে স্তম্ভিত করে দেবার এক অত্যদ্ভুত পন্থার অনুসরণ করে চলেছিলেন তিনি এই ভাবে।

কেউ জানত না, কিন্তু কুলগুরু বশিষ্ঠ জানতেন এর পরিণতি। জানতেন, অতি অর্থদণ্ডে এক যজ্ঞহীন যজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন সংশিতব্রত শ্বেতরাজ। জানতেন, একটি না পাওয়ার ব্যর্থতা যে দীর্ঘশ্বাসের রূপ নিয়ে নির্গত হয়েছিল প্রতিগ্রাহী ক্ষুধার্ত্তের বক্ষ থেকে, তা অসীম নির্ব্বাতে আপন দাপট নিয়ে জ্বলছে।

প্রতিবাদ করেছিলেন বাঙ্‌নিষ্ঠ ঋষিগুরু—ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান কর, রাজন্। তাতে তুমি এর চেয়ে বহুমাত্রায় সুফলভাগী হবে। অনেক কামনা চরিতার্থ হবে তাতে।

কিন্তু সবিনয়ে সেই গুরুবাক্যে অনাস্থা দেখিয়ে গেছে পুণ্যার্জ্জনাভিলাষী তিমিরাবৃতমতি শ্বেতের পন্থাহীন দানসাধ। সামান্য এক মুষ্টি অন্নদানের চেয়ে বহুমুষ্টি রত্ন দানের কোন মূল্য নেই—এই অবিশ্রান্ত বিশ্বাসে কিছুতেই বিশ্বাসী হতে চায়নি তাঁর ভ্রান্তিবদ্ধ বিবেকের যুক্তি।

নিঃশব্দে সেখান হতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছিলেন মহাযোগী ব্রহ্মপুত্র। নিয়তিচালিত শ্বেতের অনিবার্য্য পরিণতির কথা ভেবে হাসি কান্নায় দুলে উঠেছিলেন তিনি সেদিন।

হ্যাঁ, আজ স্বীকার করতে লজ্জা নেই ঋষি বশিষ্ঠের—তিমিরাবৃত কুসংস্কারের অচলায়তন চূর্ণ করে সূর্য্যবংশের একটি অভিমানী বিবেককে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছিল সেদিন স্মার্ত্তশ্রেষ্ঠ এক ঋষির অভিমান। বহ্নিকুণ্ডে আত্মসমর্পণোদ্যত শলভকে প্রতিনিবৃত্ত করা যে সর্ব্বজয়ী ঋষিরও অসাধ্য, তা বুঝেছিলেন তিনি সেদিনই প্রথম।

অবশেষে তাই হ'ল। বিনিবর্ত্তিত কালযাত্রার সাথে সাথে সমবর্ত্তী মৃত্যু এসে একদিন পিতৃযানের পথে নিয়ে গেল সেই মহাবল মনুজেশ্বরকে।

বিচার হ'ল। অদৃশ্য বিচারকের সুক্ষ্মতম বিচারের সম্মুখীন হলেন এবার মহীপাল শ্বেতরাজ। বহু যজ্ঞ কারণে যাগপুণ্যলব্ধ স্বর্গলাভ করলেন শ্বেতরাজ। অর্ব্বুদত্রয় কাল তপস্যার অধিকারে অনাময় নির্ম্মল ব্রহ্মলোকবাসী হ'লেন শ্বেতরাজ। বহু বিলাসসামগ্রী দানপুণ্যে দেবদুর্লভ ভোগবিলাসেও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল শ্বেতরাজের।

মহাপ্রাজ্ঞ তুম্বরু হলেন তাঁর অনুগত কীর্ত্তি-গায়ক। মহর্ষি নারদ তাঁর সম্মানগীতির সুরঝঙ্কারে সার্থক করলেন তাঁর বীণা। সর্ব্বালঙ্কারবিভূষিত সুমহাত্মা ক্ষিতীশ্বরের সম্মুখে তালমানরসাশ্রয় বিলাসাঙ্গবিক্ষেপে এগিয়ে এসে লাস্যভঙ্গীমার উপচারে তাঁকে বন্দনমালিকা দান করে ধন্য হলেন যত লাস্যময়ী গন্ধর্ব্বকন্যা।

এত বৈভবের মধ্যেও কিন্তু কি যেন এক অজ্ঞাত

রিক্ততার খিন্ন স্পন্দন স্পন্দিত হতে থাকে। আত্মার আত্মাত্ব দিয়ে তাকে উপলব্ধি করতে থাকে স্বর্গবাসী শ্বেতরাজের আতঙ্কিত অস্তিত্ব।

ক্ষুধাহীন দেবভূমিতেও নিদারুণ ক্ষুধায় আক্রান্ত হ'ল রাজর্ষির আত্মিক জঠর। অবোধ্য তৃষ্ণার প্রভাবে আর্ত্ত হয়ে উঠল তাঁর আত্মিক পিপাসা।

অগণ্য দেবমান যেন আরো সীমাহীন হ'য়ে ওঠে। মর্ম্মে মর্ম্মে সে ক্ষুৎপিপাসার ক্রমিক তীব্রতা উপলব্ধি করে মৃত্যুময় হয়ে ওঠে মৃত্যুহীন রাজাত্মা। কিন্তু সে সবের কারণ অজ্ঞাত রয়ে গেল তবু।

ব্রহ্মলোকবাসী সুমহাত্মা শ্বেতরাজ খাদ্যবস্তুর প্রার্থনায় কৃতাঞ্জলিপুটে গিয়ে দাঁড়ালেন ব্রহ্মপতি চতুরাননের সম্মুখে। কিন্তু তাঁর কথা শুনে চমকিত হয়ে উঠলেন তিনি তখনই।

তাঁর খাদ্যবস্তু নির্দ্দেশ করলেন পদ্মযোনি তাঁরই শবদেহ—তাঁরই ইচ্ছায় যে শবকে স্পর্শ করবার স্পর্ধায় স্পর্ধিত হয়নি জরা। আর, সেই শবমাংস ভক্ষণের সহজাত ঘৃণাই হ'ল পিপাসার্ত্ত রাজাত্মার পানীয়।

কিন্তু এ ক্ষুধা এল কেন? এ তৃষ্ণা এল কোথা হতে?

ব্রহ্মলোকবাসী সুমহাত্মা মহীপালের এ অন্তরজিজ্ঞাসার কোন উত্তর দিলেন না লোকস্রষ্টা পদ্মযোনি। তিনি শুধু বললেন—অনিল সুমেরু বহন করে না মানব, ভূতলে নিপতিত হয়না নভোমণ্ডল। এ মহাসত্যের সকল সংশয় নিরসনের জন্য পুনরায় প্রতীক্ষা কর তোমার কুলগুরুর আগমনের। আর, সেই দিনই মুক্তি পাবে তুমি এই ক্ষুৎপিপাসার মর্ম্মান্তিক বন্ধন হতে।

আত্মার জিজ্ঞাসা আত্মাতেই সুপ্ত রেখে ঋক্ষপর্ব্বতের মহাবনে এবার নেমে আসে ব্রহ্মলোকবাসী শ্বেতরাজের আত্মিক আকাঙ্ক্ষা। এসে দাঁড়ায় সেই সরোবরতটে।

তারপর—

ধীরে ধীরে সকল বুদ্ধি তিরোহিত হয়ে আসে বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান সেই রাজাত্মার। অর্থহীন ক্ষমার মূল্য নিরূপণের অক্ষমতায় শঙ্কিত হয়ে ওঠেন পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাবান্ সেই পৃথ্বীশ্বর। ধীরে ধীরে সকল মানসিক ধীরতা হারিয়ে ফেলেন হিমাচল সদৃশ সুধীর সেই শ্বেত-অস্তিত্ব।

তারপর সেইদিন হ'তেই আরম্ভ হ'ল এই নারকীয় নাট্যদৃশ্যের।......

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কেটে যায়, দিনের পরে দিন।

সরোবরোতীরে আসেন কত অসূয়াবিহীন মুমুক্ষু মুনিপুঙ্গব, আসেন কত শত যতি। আসেন অত্রি ও গৌতম। আসেন জাবালি ও কশ্যপ, আসেন পুলস্ত্য ও পুলহ। আসেন শতানন্দ ও বিশ্বামিত্র, আসেন ক্রতু ও দক্ষ, কিন্তু আসেন না কেবল ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ।

ক্ষুধার্ত্ত নরব্যাঘ্র নিজশবমাংসে ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যর্থ প্রয়াসে প্রয়াসী হলেন।

আর, অপেক্ষা করেন সেই অনাগত দিনের—কবে, কবে আসবেন সেই মহাগুরু?

আজ তাই চলেছেন কুলগুরু। সংশিতব্রত শ্বেতরাজকে রক্ষা করবার জন্য, পুত্রপ্রতীম রহস্যবজ্রকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত বনপথ অতিক্রম করে চলেছেন ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মপুত্র।

ঋক্ষ পর্ব্বতের শিলাবক্ষে পুষ্টতনু নিবিড় বনানীর দুর্ভেদ্য অন্ধকারকে ভেদ করে সেই সরোবরতীরে এসে দাঁড়ান বশিষ্ঠ রহস্যবজ্রকে সঙ্গে করে। অদূরে যেন কি এক আসুরিক অবিশ্বাসকে সত্য করার প্রতিজ্ঞায় নিশ্চল শবের মতই পড়েছিল সেই রাজশব।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই ব্রহ্মলোকের এক বেগবান্ বিমান এসে থামে সেই সরোবর পার্শ্বে, আর তা থেকে নেমে আসে গন্ধাম্বুলিপ্ত দিব্যদেহধারী একটি আত্মিক আকাঙ্ক্ষা। তার ব্রহ্মাবতংসের উজ্জ্বলালোকে আপ্লুত হয়ে ওঠে নিবিড় বনশ্রেণী।

সেই মুহূর্ত্তে অভাবনীয় সাক্ষাৎকার হয়ে যায় গুরু-শিষ্যে। অমিতাত্মা বশিষ্ঠের চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়েন সুমহাত্মা শ্বেতরাজ।

প্রেমবিগলিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলতে থাকেন ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মজ্ঞানী:—সকল বাস্তবতার অলীক ভ্রান্তির অবসান হতে চলেছে মহীপাল, আজ মুক্ত হবে তুমি। ওঠো।

ধীরে ধীরে মাথা তোলেন শ্বেতরাজ।

—কিন্তু প্রভু, এতদিন এ দুঃসহ অভিশাপে জর্জ্জরিত হতে হ'ল কেন আমায়? মায়াহীন যে মৃত আত্মায় ভৌতিক পদার্থ নেই, জীবের সত্ত্বা নেই, বিষয়ের অধিকার

নেই, মানসিক রাগানুরাগেরও নেই কোন অস্তিত্ব, সেই দেহে তৃষ্ণা এ'ল কেন? ক্ষুধায় অবসন্ন হ'লাম আমি এ কোন্ রহস্যে?

—'কিন্তু যখন তা ছিল, তখন ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান কর'নি রাজন্, পিপাসার্ত্তকে জলদান কর'নি কখনও।'

—'কিন্তু তার চেয়েও মূল্যবান্ রত্নরাজি তো দান করেছিলাম প্রভু! দান করেছিলাম মহামূল্য স্বর্ণের রাশিও! সেগুলির কি তবে কোন মূল্যই নেই?

—'সেই বিলাসদ্রব্য দান পুণ্যেতো মুক্ত দেহেও ভোগ-বিলাসের অধিকার তুমি পেয়েছ রাজন্।'

—'কিন্তু যজ্ঞফল? রাজসূয়যজ্ঞ করেছি, বাজপেয়-যজ্ঞ করেছি, সেগুলি কি তবে ব্যর্থ হয়ে গেছে? যজ্ঞীয় পাবকে যে আহুতি দান করেছি, তাও কি হারিয়ে গেছে শেষে?'

—'না, সে যজ্ঞফল অবলুপ্ত হয়ে যায়নি রাজন্, তার জন্য অনেক পেয়েছ তুমি। পেয়েছ স্বর্গের অধিকার, পেয়েছ ব্রহ্মের দর্শন। তোমার যে যশোকীর্ত্তনে মুখর হয়েছে সপ্তলোক, তা শুনে পরিতৃপ্ত হয়েছে তোমারও শ্রুতি।'

—'তবে আমি ব্যর্থ হলাম কেন? ক্ষুধা-তৃষ্ণার তাড়নায় মুক্তদেহ পরমাত্মা আমি—ব্রহ্মলোকবাসী হয়েও মহারৌরবে নিপাতিত পাপাত্মার মত আপন অস্থিমাত্র লেহন করব, এই কি তবে শেষ বিচারের নির্দ্দেশ?

নির্ম্মল হাসিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে ব্রহ্মপুত্রের প্রশান্ত মুখ-মণ্ডল।

—'না রাজন্, এ তোমার মধ্যবিচারের অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল—যে কর্ম ভ্রান্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে শুধু আপন মতকেই শ্রেষ্ঠ বলে ভেবে প্রতারিত হয়েছ। মহাপ্রাজ্ঞ, তুমি অনেক জানতে, কিন্তু প্রকৃত জানতে না। জানতে না—যে যে বস্তু দান করে না, সে তা লাভেরও অধিকারী নয়। জানতে না যে, আকাঙ্ক্ষিতবস্তু লাভের একটিমাত্রই পথ আছে, আর সেটি হ'ল দান—মূল্যহীন যশের জন্য দান নয়, পরমপ্রাপ্তির জন্য দান। আর এই পরম প্রাপ্তির জন্যই প্রাপ্তিহীনতা বরণ করতে হয় রাজন্, ভোগের জন্য ত্যাগ। মৃত্যুর পরে ক্ষুধা নিবৃত্তি তো তুমি চাওনি, তাই ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করনি। তৃষ্ণা জয়ের অভিলাষ তো ছিল না তোমার, তাই তৃষ্ণার্ত্তকে শীতল জলকণার পরিবর্ত্তে লক্ষ মুদ্রামূল্য মণিকণা দান করেছিলে। শুধু বিলাসের মর্ম বুঝেছিলে, তাই বিলাস সামগ্রী নিয়ে দানের কৌতুকে মত্ত ছিলে সেদিন, কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণারই কি মোহময় কৌতুক সংঘটিত হয়ে চলেছে মর্ত্তের মুক্তিকায়, তা কি জানতে? এই একটি না জানার বোধেই ব্রহ্মলোকবাসী হয়েও মর্ত্ত্যের অতি তুচ্ছ দু'টি প্রয়োজনের ভয়াল গ্রাসে গ্রাসিত হতে হয়েছিল তোমায়। আজ যদি নিজের সেই অজ্ঞানতার অনুশোচনা এসে থাকে, তবেই মুক্ত হবে তুমি।'

হাসি ফুটে ওঠে এবার ব্রহ্মলোকবাসী শ্বেতরাজেরও ইন্দুবিনিন্দিত বদনমণ্ডলে। আচম্বিতে যেন মুক্তিময়ী জ্ঞানের স্পর্শে নিরাকাঙ্ক্ষার মহাজ্যোতিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় সেই আত্মিক আকাঙ্ক্ষা।

ধীরে ধীরে শীতল হয় আত্মার অগ্নিদাপট। পরিসমাপ্তি আসে সকল জিজ্ঞাসার। আর তাঁর ক্ষুধা নেই, আর তাঁর তৃষা নেই।

মহাপথপ্রদর্শক চিরপূজ্য গুরুকে প্রণাম করে বেগবান ব্রহ্মস্যন্দনে আরোহিত হয়ে পুনরায় ব্রহ্মলোকে ফিরে যান সর্ব্বকামতৃপ্ত মোহমুক্ত শ্বেতরাজ। আর, তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই বায়ুমণ্ডলের স্তরোষ্ণতায় বিগলিত হয়ে অবশেষে বিলীয়মান হয়ে যায় সেই উপলসদৃশ রাজশব।

অন্তহীন মহাপথের নব্য পথিক তরুণ তাপসের সকল অজ্ঞানতার অন্ধকার বিদূরিত হয়ে যায় সহসা। যেন ব্রহ্ম-পুত্রেরই দশনচন্দ্রমার কিরণচ্ছটার প্রকাশে মৃত্যু হ'ল সকল তমসার। মহাগুরুর পদপ্রান্তে তাই লুটিয়ে পড়ে ধন্য হতে চায়—তরুণ তাপসের সকল জিজ্ঞাসা।

সাম্প্রতিক সমালোচনার আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভা যথেষ্ট সমকালীন-স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার জীবনী, গ্রন্থ-রচনা ও উপন্যাস বিশ্লেষণের ব্যাপক প্রচেষ্টা উনবিংশ শতকের শেষ হইতেই বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মৎসম্পাদিত 'সমালোচনা-সাহিত্য' প্রবন্ধ-সংকলনে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রভৃতি লেখক বঙ্কিমের বিভিন্ন উপন্যাস লইয়া যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত হীরেন্দ্র-নাথ দত্ত, ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীও বঙ্কিম প্রতিভার বিভিন্ন দিকের আলোচনায় আকৃষ্ট হইয়াছেন। গিরিজা প্রসন্ন রায়চৌধুরী, শুধু বঙ্কিম উপন্যাসের নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ না থাকিয়া, সমগ্র বঙ্কিম-উপন্যাস সাহিত্যের শিল্পগুণের একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টিপূর্ণ পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং আধুনিক সমালোচনা রীতির প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বঙ্কিম-সাহিত্য সমকালীন শ্রেষ্ঠ সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছিল।

বিংশ শতকেও বঙ্কিমসাহিত্যের মূল্য সম্বন্ধে অনেক মতবিরোধ দেখা দিলেও এবং মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তব বোধ প্রণোদিত বিচারের মানদণ্ডে তাঁহার পূর্বপ্রতিষ্ঠার কিছু লাঘবের চেষ্টা হইলেও তাঁহার রচনার সমালোচনা-ধারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত, সদ্যপরলোকগত ডাঃ হেমেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত ও ডাঃ সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত যুগোচিত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বঙ্কিম সাহিত্যের পুনর্বিচার করিয়াছেন ও বঙ্কিম প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে যুক্তিনিষ্ঠ ও অনুভূতিমূলক আলোচনার সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বঙ্কিম সম্বন্ধে কালের দিক দিয়া সর্বাধুনিক আলোচনা শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাসগুপ্ত লিখিত 'উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম' (১৩৬৮)। এই গ্রন্থখানিতে বঙ্কিম সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য ও তাঁহার উপন্যাস সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের মূল্যায়ন সংগৃহীত হইয়া লেখকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাশীল ও রসগ্রাহী মন লইয়া বঙ্কিম উপন্যাসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার ও তাঁহার প্রতিভার স্বরূপ নির্ধারণ প্রয়াস হিসাবে এই গ্রন্থখানি লেখকের নিষ্ঠা, অনুসন্ধিৎসা, শ্রমশীলতা ও রসানুভব শক্তির একটি প্রশংসনীয় পরিচয় বহন করে।

লেখক বঙ্কিমের উপন্যাসাবলীর কালানুক্রমিক আলোচনার পূর্বে 'ভূমিকা', 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শ্রেণী বিভাগ' ও 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তাঁহার ভাবধারার ক্রমবিকাশ' শীর্ষক তিনটি অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। 'ভূমিকা' তে তিনি বঙ্কিম-উপন্যাসের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা উপন্যাসের অসম্পূর্ণ প্রয়াসগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে আলোচনার সম্পূর্ণতা বিধানই লেখকের উদ্দেশ্য, কোন মৌলিক তথ্য পরিবেশন নহে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রেণী বিভাগ বিষয়েও তিনি প্রচলিত বিন্যাস রীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন, কেবল 'কপালকুণ্ডলা' কে সমস্যা-মূলক উপন্যাসরূপে অভিহিত করিয়া উহার জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে বঙ্কিমের বিভিন্ন পর্যায়ের উপন্যাসের অন্তর্নিহিত ভাব-প্রেরণার বিবর্তন রেখাটি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়া তিনি খানিকটা নূতন বিচারবুদ্ধি ও সংযোগসূত্র যোজনার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসের মূল কথা সৌন্দর্য সৃষ্টি ও অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ। 'বিষবৃক্ষ' হইতে নিয়তি ও বিশ্বনীতির যুগপৎ সহাবস্থান। 'ইন্দিরা', 'রাধারাণী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'

লঘু ঘটনা চমকে পাঠকের মনোরঞ্জনই মুখ্য লক্ষ্য। 'চন্দ্রশেখরে' নীতি প্রতিপাদনের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের গূঢ় রহস্যের সংযোগ—রামানন্দ স্বামীর যোগবল ও লোকচরিত্রাভিজ্ঞতা এবং শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত নীতিবিধানকে অতিক্রম করিয়া অধ্যাত্ম রাজ্যের রহস্য লোকে আরোহণ করিয়াছে। 'কৃষ্ণকান্তে' নিয়তি গৌণ, নীতিবিধানই মুখ্য; শুধু পরিবর্তিত শেষ সংস্করণে সন্ন্যাসী গোবিন্দলালের চিত্ত শান্তি লাভের প্রসঙ্গে ধর্ম প্রভাবের প্রক্ষিপ্ত আরোপ। 'রাজসিংহে'-র শেষ সংস্করণে রাজসিংহ-আওরঙ্গজেবের শক্তিপরীক্ষায় ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়—এই নীতির কাহিনী-নিঃসম্পর্ক সংযোজনা। 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী', 'সীতারাম'—এই ত্রয়ীতে ঘটনার বহিরাবরণের তলায় ধর্মতত্ত্বের অন্তর রূপ প্রকটন। 'আনন্দমঠে' সত্যানন্দের ব্যর্থতা, 'দেবী চৌধুরানী'তে প্রফুল্লর সার্থক নিষ্কাম ধর্ম অনুষ্ঠান ও 'সীতারামে' কর্মত্যাগের অভিমানে শ্রীর দ্বারা সমস্ত রাজ্য মধ্যে এক বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি—এ সবই বিভিন্ন জীবন পরিবেশে ধর্মতত্ত্বের নিগূঢ় ফল-পরিণতি। এই ভাব বিবর্তনের ইতিহাস বঙ্কিমের সমগ্র উপন্যাস সাহিত্যে অনুস্যূত জীবনদর্শনের ক্রমাভিব্যক্তিটি সুপরিস্ফুট করিয়া উহাকে এক অখণ্ড তাৎপর্য সূত্রে গাঁথিয়া তোলে।

লেখক এইবার বঙ্কিম-উপন্যাসাবলীর ধারাবাহিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 'বঙ্কিমের প্রথম ও তৃতীয় উপন্যাসের কিয়দংশ (দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনী) রোমান্স পর্যায়ভুক্ত। ঐতিহাসিক রোমান্সের সঙ্গে অলৌকিক রোমান্সের পার্থক্য ইহার পটভূমিকার আপেক্ষিক বাস্তবতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা। কিন্তু মূলতঃ উভয়েই চমকপ্রদ ও সময় সময় অবিশ্বাস্য ঘটনা ও মনস্তত্ত্ব উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বাস্তবতার মানদণ্ড খানিকটা শিথিল না করিলে ঐতিহাসিক রোমান্সেরও রসোপলব্ধি সম্ভব হয় না ও লেখক পাঠকের নিকট যে বিশ্বাসের ঔদার্য প্রত্যাশা করেন তাহার দাবী রক্ষিত হয় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নিখুঁত চরিত্রসঙ্গতি ও ঘটনাবিন্যাসের ওজন করা সম্ভাব্যতার মানদণ্ড খানিকটা সমালোচনাশক্তির অপাত্র-বিন্যস্ত অপপ্রয়োগ বলিয়াই মনে হয়। রোমান্সের নায়ক ঠিক ব্যক্তিসত্তা নহে, একটা প্রথাসিদ্ধ আদর্শেরই প্রতিমূর্তি মাত্র; তাহার নিকট ব্যক্তিত্বের স্বাধীন প্রাণ স্পন্দন আশা করা যায় না। সে উচ্চবংশ, সাহসী, প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়িবার জন্য সদা উন্মুখ, ঈর্ষ্যাপরায়ণ, প্রণয়িনী সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ চিত্ত ও আচরণে হঠকারী। এই তাঁহার শ্রেণী-পরিচয়। জগৎসিংহ, হেমচন্দ্র ও কিয়ৎ পরিমাণে ওসমানকে এই মানদণ্ডে বিচার করিতে হইবে। তাঁহাদের ধমনীতে রক্তপ্রবাহের সঙ্গেও বস্তুনির্ভর স্বাধীন জীবনের সঙ্গে কল্প লোকের কিছুটা সূক্ষ্মতর ভাবনির্গাস মিশ্রিত। কাজেই ডঃ সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত ইহাদের সম্বন্ধে যে অবাস্তবতার অভিযোগ আনিয়াছেন ও গ্রন্থকার যেরূপ উৎসাহের সহিত এই অভিযোগ খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—এ দুইই আমার নিকট খানিকটা নিরর্থক বলিয়া মনে হয়। প্রফুল্লবাবু এই সম্পর্কে একটি নূতন কথা বলিয়াছেন—অভিরাম স্বামী, জ্যোতির্গণনায় যে মোগল সেনাপতির সন্ধান পাইয়াছেন, সে বস্তুতঃ জগৎসিংহ। এই কথাটি ভাবিয়া দেখার মত। রোমান্সের প্রেম বাস্তব রজ্জুর ফাঁস গলায় পরে না—ইহার স্বচ্ছন্দলীলা সর্বথা মনস্তত্ত্বানুগামী নয়। শেকসপিয়রের Two gentlemen of Verona ও Midsummer Night's Dream এ আমরা প্রেমের ভোজবাজী দেখি; ইহার সমস্ত ঘটনা-পরিবেশ ও চরিত্রাশ্রয় অবাস্তব কুহকের সঙ্গে গাঁথা বাস্তব প্রতিচ্ছায়ার এক মিশ্র জগৎ। অবশ্য কবি তাঁহার নৈসর্গিক প্রতিভাবলে সমগ্র প্রতিবেশ ও পরিকল্পনার মধ্যে একটি অন্তঃসঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন, যাহা আমাদের অন্তরে একটা ভাব-সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। এখানে বাস্তব বোধের অবিশ্বাসকে সচেতন ভাবে মুলতুবি রাখিতে হয় না, ইহা স্বতঃই ঘুমাইয়া পড়ে।

সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার বিন্যাস দক্ষতায় দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনীতে দুইটি আভ্যন্তরীণ সঙ্গতিবিশিষ্ট, বাস্তব সঙ্কেত নিয়ন্ত্রিত কল্পকাহিনী উপস্থাপিত করিয়াছেন। এখানে জগৎসিংহ ও হেমচন্দ্র প্রেমের সনাতন অধিকারে বাস্তবতার দুশ্ছেদ্য নাগপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, ও সম্ভাব্যতার নানা অসুবিধাজনক প্রশ্ন

এড়াইয়া গিয়াছেন। এখানে প্রথম দর্শনে প্রেমোন্মেষ প্রণয়াকৃতির সকল পরিণামের অসম্ভাব্যতা সত্ত্বেও প্রণয়িনীকে অকারণ পুনর্দর্শনের অভিলাষ, অভিসার পথে অতর্কিত বিপৎপাত ও অদ্ভুত উপায়ে এই বিপদ হইতে মুক্তি, ভুল বোঝাবুঝির জন্য সন্দেহসঞ্চার ও অপ্রত্যাশিত ভাবে এই সংশয় নিরসন, নানা বাধা বিঘ্ন কাটাইয়া পরিণামে প্রেমিক যুগলের মিলন, প্রণয়প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উহার জটিল প্রতিক্রিয়ার শুভ সমাধান—ইত্যাদি প্রেমলীলার সমস্ত পূর্ব নির্দিষ্ট স্তরগুলি যেন একটা অভ্রান্ত দৈব নিয়মে পুনরাবর্তিত হয়। রোমান্স মায়ারথের অগ্রগতি মধ্যাকর্ষণের নীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষাও করে না, অথচ সর্বতোভাবে উহার অধীনও নয়। উহার মধ্যে কল্প-জগতের অক্ষরেখানুবর্তনের যে নিজস্ব নীতি আছে ও উহার চক্রাবর্তন সঞ্চিত যে গতিবেগ তাহাই উহার পরিণতিকে পাঠকের নিকট বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণীয় করিয়া তোলে। বঙ্কিমের রোমান্সে যদি এই সাধারণ স্বভাবানুকারিতার সর্ত পূরণ করিয়া থাকে তবে বাস্তব কৌতূহলের আতিশয্য এখানে অপ্রাসঙ্গিক। যে দূরের জগৎ দূরবীক্ষণের সাহায্যে দর্শনীয়, সেখানে অণুবীক্ষণের প্রয়োগ অবাঞ্ছিত ও অ-ফলপ্রসূ।

'দুর্গেশনন্দিনী'র সামগ্রিক আবহ মোটামুটি এই জীবন প্রত্যয়ের অনুকূল। ঘটনার বর্ণাঢ্যতা ও আবেগের উচ্চ মাত্রা রোমান্সের স্বরূপলক্ষণ—সুতরাং সাধারণ জীবনযাত্রার মন্থর গতি, চাপা সুর ও বর্ণবিরল ধূসরতার খানিকটা ব্যতিক্রম এখানে অপরিহার্য। ইতিহাসের যুদ্ধবিগ্রহ, ভাগ্যচক্রের দ্রুত আবর্তন, বধ্যভূমির রক্তাক্ত ভীষণতা, গুপ্তহত্যার উৎকট উন্মাদনা প্রভৃতি উপাদানে যাহার পরিবেশ রচিত হইয়াছে, সেখানে আবেগের অতিরঞ্জন ও দৈব সংঘটনের অবিশ্বাস্যতা কিছুটা স্বীকার করিতেই হইবে। সঙ্কটময় যুগের মনস্তত্ত্বকে উত্তেজনাহীন গার্হস্থ্য জীবনের মানদণ্ডে মাপা চলে না। রোমান্সের রঙীণ কাঁচলাগান ইতিহাসের প্রতিধ্বনিময় প্রাসাদে মানুষের কণ্ঠস্বর ও আবেগ প্রকাশভঙ্গী উচ্চগ্রামারোহী না হইয়া পারে না, বাস্তব সত্যের শুভ্র সূর্যালোক ও বিচিত্র বর্ণানুরঞ্জনে বিচ্ছুরিত হয়। এই সাধারণ স্বীকৃতির পটভূমিকায় 'দুর্গেশনন্দিনী'কে যথার্থ জীবনানুলিপির মর্যাদা দিতে বিশেষ আপত্তি থাকা উচিত নয়। উহার চরিত্রগুলি—বীরজাতীয়, যথা জগৎসিংহ, ওসমান, বীরেন্দ্রসিংহ, কতলু খাঁ, দৈবরহস্যজ্ঞ, অভিরাম স্বামী, নারীসংঘ, বিমলা, তিলোত্তমা, আয়েষা, আসমানি, উপহাস্য, উৎকেন্দ্রিক-চরিত্র, গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ ও মোগল সেনাপতি করিমবক্‌স সকলে মিলিয়া ঘটনার স্রোতবাহিত, দ্রুতগামী ও প্রাণোচ্ছল বুদ্‌বুদ সমষ্টির চঞ্চল রূপটি ফুটাইয়া তোলে।

এই বর্ণবহুল ছায়াশোভাযাত্রার মধ্যেও যে বঙ্কিম বাস্তব-জীবনের ছন্দ, স্পন্দ ও আবেগ যাথার্থ্যের কিছুটা আভাস দিয়াছেন ইহাতেই তাঁহার কৃতিত্ব। বিমলা, তিলোত্তমা ও আয়েষার রূপবর্ণনা ও চরিত্রদ্যোতনার মধ্যে বঙ্কিমের যে স্থির, অন্তর্ভেদী জীবন পর্যবেক্ষণের পরোক্ষ-পরিচয় মিলে, তাহাতেই এই বিভিন্ন প্রকৃতির রোমান্স-নায়িকারা আমাদের সুপরিচিত বস্তুজগতে অন্ততঃ এক পা দিয়াও দাঁড়াইতে পারিয়াছেন। আয়েষার চরিত্রগৌরব তাঁহাকে বাস্তব জীবনের বিষাদ মহিমার দৃঢ় পাদপীঠে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বিমলা দাসীর প্রগল্‌ভতা ও গৃহিণীর মর্যাদা-বোধের সংমিশ্রণে একটু অসাধারণত্ব মণ্ডিত হইয়াছে। বোধহয় যেন ইহা সমাজ শ্রেণীবিন্যাসের সুনির্দিষ্টতার উপর অসামাজিক পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধনশিথিলতার উৎক্ষেপ। যে যুগের কাহিনী উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের সমসাময়িক ও তাঁহার কাব্যের সাক্ষ্য হইতে আমরা জানি যে তখন বাঙ্‌লার সমাজ নববিন্যস্ত হইতেছে। সেই সুদূর অতীতে অনেক অভিজাত পরিবারে উপগৃহিণী যে গৃহিণীত্বের মহিমায় অধিরূঢ় ছিল ও সমাজ যে এই ব্যবস্থায় প্রচ্ছন্ন অনুমোদন জানাইত তাহা অসম্ভব মনে হয় না। সীতা-সাবিত্রীর সতীত্ব-আদর্শ তখন সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কিন্তু সেই জাতি-সাঙ্কর্য ও রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে সকল গৃহলক্ষ্মীই যে বৈধ অধিকার লইয়া অন্তঃপুর-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সুতরাং বিমলার মধ্যে একদিকে রোমান্সের আতিশয্য ও গার্হস্থ্য জীবনের সম্ভ্রম, অন্যদিকে দাসীর স্বৈরাচার ও গৃহিণীর অধিকারবোধ এক অদ্ভুত মিলনে সংহত হইয়াছে। তিলোত্তমা ও আয়েষার মধ্যে নারীত্বের সমাজসমর্থিত,

আধুনিক আদর্শের দুইটি দিক্ পরিস্ফুট হইয়াছে, কিন্তু বিমলার অন্তরে যুগবিপ্লবের বহ্নিশিখা এখনও কোন গার্হস্থ্য শীলধর্মের সুনিয়ন্ত্রিত আধারে সংবৃত হয় নাই। মনে হয় ইহারা দুই বিভিন্ন যুগের প্রতিনিধি। আসমানির মধ্যে বিমলার পূর্ব ইতিহাস চিহ্ন রাখিয়াছে—বিমলা যে অবস্থা হইতে উঠিয়াছে, আসমানি সেই অবস্থারই স্মারক। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ হয়ত সংস্কৃত সাহিত্য হইতে আগন্তুক; কিন্তু তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া বিমলা ও আসমানির চরিত্রে তৎকালীন নারীর রহস্যরুচির যে একটা অশালীন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, ইহাই তাহার বাস্তবতার লক্ষণ।

মৃণালিনীতে এই অন্তঃসঙ্গতি ত্রিধা—বিদীর্ণ। প্রথমতঃ ইহার ঐতিহাসিক অংশের সহিত গার্হস্থ্য অংশের এক দূরতিক্রম্য ব্যবধান; দ্বিতীয়তঃ ইহার গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যেই এই স্তরের বাস্তবতা বিসদৃশভাবে গ্রথিত। 'দুর্গেশনন্দিনী'র ইতিহাস বাঙালীর জীবনে এক আকস্মিক উৎপাতের মত প্রক্ষিপ্ত। মোগল-পাঠানের যুদ্ধে বাঙালী হয় উদাসীন দ্রষ্টা, না হয় অনিচ্ছুক অংশগ্রাহী। বীরেন্দ্র সিংহ ব্যক্তিগত কারণেই অভিরাম স্বামীর প্ররোচনায় মোগল পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু বখ্‌তিয়ার কর্তৃক বঙ্গবিজয় বাঙ্‌লা ইতিহাসের একটা ক্রান্তি লগ্ন; বাঙালীর জীবনযাত্রায় ইহা একটি মর্মান্তিক সংঘটন। সুতরাং এখানে ইতিহাস ও গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে আমরা একটি অন্তরঙ্গ, অচ্ছেদ্য যোগসূত্র প্রত্যাশা করি। যেখানে মুসলমান অধিকারের ফল সমস্ত জাতীয় চেতনায় একটা সুগভীর আলোড়ন আনিয়াছে ও সমস্ত পূর্ব সংস্কৃতির একটা আমূল বিপর্যয় সাধন করিয়াছে, সেখানে হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর অতি সাধারণ প্রণয়-কাহিনী, দাম্পত্য সম্পর্কের ভুল বোঝাবুঝি ও অমূলক সন্দেহ-অভিমানসঞ্জাত ক্ষণিক বিকার উহার যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ারূপে গৃহীত হইতে পারে না। যে প্রলয়-ঝটিকায় রাজ্য উন্মূলিত হইয়াছে তাহাতে নায়ক-নায়িকার সাধের প্রেমতরী একটুখানি মাত্র টাল খাইয়া আবার মিলনের বন্দরে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করিয়াছে—এই অসঙ্গতি আমাদের সমস্ত সামঞ্জস্য বোধকে পীড়িত করে। আবার এই সর্বনাশের প্লাবনগ্রাস হইতে নায়ক যে নিজ প্রণয়িনী সম্বন্ধে সংশয় মোচনের প্রমাণ আহরণ করিয়াছেন, এই টলমল তরঙ্গোচ্ছ্বাস হইতে বিচলিত প্রেমের জন্য স্থির আশ্রয়ভূমি সংগ্রহ করিয়াছেন—ইহাতে মাত্রাজ্ঞান ও বিশ্বাস্যতার অভাবই পরিস্ফুট হয়। দেশ-বিধ্বংসী ভূমিকম্পের মধ্যে প্রণয়ের সুখনীড় রচনা যেন স্বপ্নবিভ্রমেরই সাক্ষ্য দেয়। সমস্ত প্রতিবেশের সঙ্গে হেমচন্দ্র আরও উৎকটভাবে বে-মানান। যবন-অভিযানের প্রতিরোধ সংকল্প গ্রহণ করিয়া তিনি বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি তুর্কী সৈন্য নিহত করিয়াছেন। বেশীর ভাগ সময়েই তিনি নিজ হাস্যকর হৃদয়-সমস্যা লইয়াই বিব্রত। মনেহয় গিরিজায়ার তীক্ষ্ণ ভৎর্সনাই তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য। জগৎসিংহ না হয় পূর্বরাগের অজানা নদীতে হাবুডুবু খাইয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র দাম্পত্য সম্পর্কের সুদৃঢ় তীরে দাঁড়াইয়া একইরূপ অপ্রকৃতিস্থতার কেন পরিচয় দিবেন তাহা দুর্বোধ্য। ঐতিহাসিক বীর ও রোমান্সের নায়ক—এই উভয় অংশ অভিনয়েই হেমচন্দ্র নিজ সম্পূর্ণ অনুপযুক্ততার পরিচয় দিয়াছেন।

গার্হস্থ্য জীবনের এই স্তরের সহিত গিরিজায়া-দিগ্বিজয়ের স্থূল জীবনশক্তি, গিরিজায়ার মৃণালিনীর প্রতি সূক্ষ্ম-অনুভূতিহীন, অথচ একনিষ্ঠ আনুগত্য, বিশেষতঃ পশুপতি-মনোরমার জটিল, অস্পষ্ট আকর্ষণে বিপরীত ধারায় প্রবাহিত মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক একটি সম্পূর্ণ নূতন স্তরের ইঙ্গিত দেয়। গিরিজায়ার প্রখর, লৌকিক সংস্কারমুক্ত জীবনবোধ তাহাকে একটি অত্যন্ত জীবন্ত চরিত্ররূপে উপস্থাপিত করিয়াছে। সে মৃণালিনীর একান্ত অনুগতা হইয়াও তাহার আদর্শবাদের হিমানী স্পর্শে নিজ দীপ্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নিষ্প্রভ হইতে দেয় নাই। মনে হয় নিত্যানন্দ বৈষ্ণবী-বৈরাগিণী গোষ্ঠীর এক নূতন শ্রেণী-পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করার পূর্বে গিরিজায়া প্রাক্-চৈতন্য যুগের ভিখারিণীর বলিষ্ঠ যাযাবরতার ও ক্ষুরধার বাক্-স্বাধীনতার লক্ষণ-চিহ্নিত ছিল। তাহার মুখে বৈষ্ণবীর গান, কিন্তু অন্তরে বৈষ্ণবীর দীনতার স্পর্শ নাই।

মনোরমা-পশুপতির সম্পর্ক বিষয়ে ডাঃ সুবোধ সেন-গুপ্ত ও শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাসগুপ্ত উভয়েই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন ও উভয়েই এই সম্পর্ক-পরিণতির

একটি সম্ভাব্য স্তর নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মনোরমা সম্বন্ধে এ আলোচনা সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক হইয়াছে। কেন না মনোরমার দ্বৈতজীবনের জটিলতা রোমান্সের রঙীণ কল্পনা নহে, পরন্তু বাস্তব জীবনের একটা দুর্বোধ্য গ্রন্থি। কিশোরীর সরলতা ও প্রৌঢ়ার পরিণতপ্রজ্ঞা মনোরমার অসাধারণ জীবন অভিজ্ঞতায় নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হইয়াছে। দুই বৃন্তে দুই রকমের ফুল ফুটিয়া একই সৌরভের সারনির্যাসে মিশিয়াছে। বঙ্কিমের এই দুঃসাহসিক মনস্তত্ত্ব-পরিকল্পনা আচরণের বৈসাদৃশ্যের মধ্যেও এক নিগূঢ়তর ঐক্যের মূল স্পর্শ করিয়াছে। মনোরমার বয়স সম্বন্ধে প্রফুল্লবাবু অনুমান করিয়াছেন যে উহা পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশের মধ্যে। এই অনুমান আমার নিকট ঠিক সঙ্গত মনে হয় না। কোন অষ্টাদশ-বর্ষীয়া যুবতী বাল-বৈধব্যের অন্তর্গূঢ় যন্ত্রণা-বহ্নির পুটপাক সিদ্ধ হইয়াও মনোরমার অন্তর্ভেদী চরিত্রাভিজ্ঞতা ও সম্ভ্রমরুদ্ধ ব্যক্তিত্ব মহিমা অর্জন করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

সদ্য উদ্ভিন্নযৌবনা কোন কিশোরী পঞ্চত্রিংশবর্ষ বয়স্ক গৌড়ের ধর্মাধিকারকে এরূপ নৈতিক প্রভাবে অভিভূত করিতে পারিত না। হেমচন্দ্র ও পশুপতির সঙ্গে জীবন-তত্ত্ব-আলোচনায় তাহার যে নিগূঢ়তলসঞ্চারী প্রজ্ঞার সহজ প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহা কোন অষ্টাদশীর অনধিগম্য। তাহার প্রৌঢ় গাম্ভীর্যের কথা মনে করিলে তাহাকে পঁচিশ বৎসরের পূর্ণ যুবতী বলিয়াই মনে হয়। যে নারী প্রেমরহস্যের অতলে প্রবেশ করিয়াছে ও উহার নৈতিক বিধি নিরপেক্ষ দুর্দম শক্তির পরিচয় পাইয়াছে তাহাকে বয়সের দিক দিয়া এই বিভ্রান্তিকর, জ্বালাময় অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইবে। যে রমণী প্রবৃত্তির ঐরাবত শক্তি অনুভব করিয়াছে তাহার জীবন কেবল পৌরাণিক কল্পনাপুষ্ট নহে, পরন্তু অন্তরের দেবাসুর দ্বন্দ্বের প্রচ্ছন্ন ভূকম্পনে আলোড়িত। মনোরমার যৌবন সহজ প্রকাশে প্রতিরুদ্ধ হইয়া ফল্গুপ্রবাহে প্রৌঢ়ত্বের তটসীমায় উপনীত হইয়াছে। অন্তর লোকের যে তরঙ্গপ্রবাহ নারী-মনের সমস্ত পুষ্পিত কামনা ও উচ্ছল লাবণ্যলীলার মধ্যবর্তিতায় উহাকে কৈশোরের সলজ্জ আভাস হইতে যৌবন শেষের পরিণত সার্থকতায় পৌঁছাইয়া দেয় তাহা মনোরমার ক্ষেত্রে রুদ্ধগতি হইয়া কেবল নিশ্চেষ্টভাবে কালের অগ্রগতির অনুগমন করিয়াছে মাত্র। বয়স বাড়িয়াছে, মনের পাপড়ি বিকশিত হয় নাই। প্রবৃত্তি দার্শনিকতায় প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে, রূপতত্ত্বে জমাট বাঁধিয়াছে, যৌবনের প্রাণশক্তি সামনে চলিবার পথ না পাইয়া কর্তব্যনির্ধারণের দ্বিধাদ্বন্দ্বে, প্রেম-গিরি সঙ্কটে উদ্‌ভ্রান্ত পদচারণায় আপনাকে নিঃশেষিত করিয়াছে। বৈষ্ণব-নায়িকার বয়ঃসন্ধি মনোরমার জীবনে এক চির-অলিখিত অধ্যায় রহিয়া গেল। কৈশোর ও প্রৌঢ়ত্বের অস্বাভাবিক সহাবস্থান ও অনৈসর্গিক বিস্তার মধ্যবর্তী-যৌবন পর্যায়কে চির নেপথ্যলোকে নির্বাসিত করিল। ইহাই মনোরমার অদ্ভুত জীবননীতির ব্যাখ্যা।

সুবোধচন্দ্র ও প্রফুল্লকুমারের মনোরমা-পশুপতির সম্পর্ক পুনর্গঠনের তুলনায় প্রফুল্লকুমারের ব্যাখ্যাই আমার অধিকতর সঙ্গত মনে হইল।

মনোরমা যখন নিজেকে বিধবা বলিয়া জানিত, তখন হইতেই এই সম্পর্কের সূত্রপাত। কেন না পশুপতির রাজ্যলাভের উচ্চাভিলাষ বিধবা-বিবাহের উপায়-রূপেই উভয়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরিয়া আলোচিত হইয়াছে মনে হয়। মনোরমা এই রাজ্যলাভ ইচ্ছায় এতদিন বাধা দেয় নাই, কেননা তুর্ক-আগমনের অব্যবহিত পূর্বেই তাহার নিকট এই ষড়যন্ত্রের ঘৃণ্যতা সুস্পষ্ট রূপ লইয়াছে। যখন সে নিজেকে হৈমবতী ও পশুপতিকে নিজ স্বামী বলিয়া জানিয়াছে, তখন সে কথনই বিশ্বাস-ঘাতককে স্বামীরূপে গ্রহণ করিবে না—এই ভীতি-প্রদর্শনের দ্বারা পশুপতিকে বিশ্বাস-ঘাতকতার পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তখন ষড়যন্ত্র বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, আর ফিরিবার পথ নাই। সুতরাং মনোরমার দ্বিতীয় চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে ও নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিণাম অনিবার্যভাবে ফলিয়াছে। তবে মনোরমা যে তাহার সর্বশক্তি দিয়া, তাহার সমস্ত প্রভাব প্রয়োগ করিয়া পশুপতিকে সংশোধন করিতে চাহে নাই ইহা সুস্পষ্ট। ইহার কারণ, মনোরমার দ্বৈত-প্রকৃতির স্বভাব-দুর্বলতা। যাহার জীবন দুই বিচ্ছিন্ন অংশে বিভক্ত, যাহার যৌবন-আবেগ অবদমিত, সে মহৎ সংকল্প কার্যকরী করিবার শক্তি কোথা হইতে পাইবে? তাহার

অপ্রকৃতিস্থতা, মুহুর্মুহু আত্ম-বিস্মৃতি, প্রৌঢ় জ্ঞানগাম্ভীর্য ও নীতিদৃঢ়তা হইতে কিশোরীর ক্রীড়াশীল, দায়িত্ব-শূন্য মনোভাবে বারে বারে স্খলন তাহাকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষয়িত্রীর মহৎ গৌরব হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। সে পশুপতিকে যুক্তিতে হারাইয়া, ইচ্ছাশক্তিতে পরাভূত করিয়া তাহার অসহায় রোদনের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। হেমচন্দ্র ও মনোরমা এই দুই জনের নিকট বাঙলার স্বাধীনতাদুর্গের চাবি ছিল, কিন্তু উভয়েই এই খবরদারিতে শৈথিল্য দেখাইল। হেমচন্দ্র মত্তহস্তীকে মারিয়া বক্তিয়ারকে বাঁচাইল। কিন্তু শত শত গৌড়বাসীর প্রাণনাশের হেতু হইল। মনোরমা তাহার যৌবনশ্রীর দৃঢ় ভূমিতে না দাঁড়াইতে পারিয়া, তাহার দ্বিধা-গ্রস্ত মনোবল লইয়া না পারিল আত্মজীবন সমস্যার সমাধান করিতে, না পারিল দেশকে বাঁচাইতে। গৌড়ের আকাশস্পর্শী অগ্নি-বেষ্টনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র চিতার প্রজ্বলন, রাজ্যব্যাপী ধ্বংসলীলার মধ্যে একটি ব্যক্তিজীবনের নিয়তি-কবলিত দুঃখ পরিণতির কতটুকু মূল্য আছে? প্রফুল্লকুমার মনোরমার চিত্তবৈক্লব্যের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় মিলে। এই চিত্ত বৈক্লব্যের সঙ্গে রাষ্ট্রবিপ্লবের সম্পর্কটুকু পরিস্ফুট করিলে তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা আরও পরিপূর্ণ হইত। হেমচন্দ্রের সহিত ওথেলোর সন্দেহ পরায়ণতার তুলনা উভয় কাহিনীর মর্মগত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে অপপ্রযুক্ত মনে হয়।

'কপালকুণ্ডলা' সম্বন্ধে প্রফুল্লকুমার কোন মৌলিক অভিমত প্রকাশ না করিলেও কতকগুলি নূতন তথ্য তাৎপর্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন ও কতকগুলি নূতন প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম হইতেছে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির অর্থপূর্ণ একাত্মতার সঙ্কেত। এই সঙ্কেতসমূহের প্রাচুর্যে ও তাৎপর্যদ্যোতনায় সমস্ত উপন্যাসটি-অদৃষ্টরহস্যের ইঙ্গিতময়তায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতের সঙ্কেতবাহী স্বপ্ন, অলৌকিক দৃষ্টি ও শ্রুতি বিভ্রম উপন্যাসটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক অতি-প্রাকৃত শক্তির সর্বব্যাপিতার ধারণা বদ্ধমূল করিয়াছে। কাপালিক নবকুমারের নিকট যে নিজ স্বপ্ন বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছে ও কপালকুণ্ডলার অবিশ্বাসিতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছে তাহা কি তাহার সত্য বিশ্বাস না নবকুমারকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রবঞ্চনাময় উদ্ভাবন—এই প্রশ্ন প্রফুল্লকুমার সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। কাপালিকের ধর্মসাধনা যতই বিকৃত হউক, উহার আন্তরিকতা বা নিষ্ঠা সম্বন্ধে বঙ্কিম কোন সন্দেহ পোষণ করিতেন না। যদি উপন্যাসে অদৃষ্টের প্রভাবকে যথার্থ বলিয়া মানিতে হয়, তবে এই ধারণা যে সমস্ত চরিত্রের কার্যকলাপে পুষ্ট হইয়াছে তাহাদের কাহারও মধ্যে বুজরুকি আবিষ্কারের চেষ্টা করিলে লেখকের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। নবকুমারকে বলি দিবার সময় যেমন, তেমনি কপালকুণ্ডলার উপর প্রতিহিংসা লইবার ক্ষেত্রেও কাপালিক এক ধর্মান্ধ আন্তরিকতার দ্বারা অনু-প্রেরিত, সজ্ঞান মিথ্যাচারী নয়। সে ভৈরবী প্রেরিত, অদৃষ্টের দূত, নিয়তির ক্রুর শক্তির বাহন—ইহাই তাহার চরিত্রের বিকৃত মহিমার সত্য ব্যাখ্যা। কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে তাহার যে গোপন দুর্বলতা ছিল তাহাও সে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়াছে। কপালকুণ্ডলার অবিশ্বাসি-তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে তাহার নিশ্চয়তার কারণ অবশ্য নিজ অনুমান শক্তির অভ্রান্ততার প্রত্যয়। ইহাতে যদি কিছু দুর্বল গ্রন্থি ছিল তাহা ভক্তিসংস্কারমত্ত ভৈরবী সাধকের চোখে পড়িবার মত নয়। এই নিয়তিপ্রযো-জিত নাটকে কোন চরিত্রকে অসাধু মনে করিলে উহার রথরজ্জুর নির্মম আকর্ষণ শিথিল হইয়া পড়ে, উহার শক্তির অপ্রতিবিধেয়তা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সংশয়া-চ্ছন্ন হয়।

কপালকুণ্ডলার সংসারাসক্তি সম্বন্ধে প্রফুল্লকুমার একটি মৌলিক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য যে নবকুমারের প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহার প্রযত্ন তাঁহার নারীহৃদয়ের প্রথম যৌবন-কামনার তির্যক অভিব্যক্তি, অনুকম্পাই তাঁহার প্রণয়োন্মেষের প্রথম ছদ্মবেশী রূপ! এ অনুমান স্বীকার করিলে নবকুমারের প্রতি তাঁহার ঔদাসিন্য আরও দুর্বোধ্য হইয়া উঠে। নবকুমারের প্রতি তাঁহার প্রেমসঞ্চার ঘটিয়া থাকিলে একবৎসর সাহচর্যের ফলেও তাহা বদ্ধমূল হইল না কেন, এ প্রশ্ন আরও জটিল আকার ধারণ করে। গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা হইল যে কপালকুণ্ডলার নৈসর্গিক স্বাধীনতা

প্রিয়তা তাহার মনকে সংসারে বসিতে দেয় নাই। এ ব্যাখ্যা একটু অতিমাত্রায় সূক্ষ্মতার্কিক ঠেকে। প্রেম সহজাত প্রবৃত্তি; স্বাধীনতাপ্রিয়তা একটা অভ্যাসজাত সংস্কার মাত্র। এ দুইএর সংঘর্ষে সহজাত প্রবৃত্তিরই জয় সুনিশ্চয়। কপালকুণ্ডলার অন্তর্নিহিত প্রেমাকুতি যদি সত্য সত্যই উন্মেষিত হইত, তবে ইহা নবকুমারের অজস্র প্রেমনিবেদনে আরও শক্তিশালী হইয়া গার্হস্থ্য জীবনের বাধা নিষেধকে ক্লেশকর বলিয়া অনুভব করিত না। দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্য সংসার জীবনকে অভিষিক্ত করিয়া পূর্বতন নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতি আকর্ষণকে সম্পূর্ণ উন্মূলিত করিয়া দিত। তাহার মনের কোণে রং ধরিয়া থাকিলে এই রং গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া সমস্ত অন্তরকে অনুরঞ্জিত করিত ও বৈরাগ্যের বর্ণহীন ধূসরতার লেশমাত্র রাখিত না। কপালকুণ্ডলার শ্যামার সহিত কথোপকথনে ও তাহার সমস্ত পরবর্তী-আচরণে তাহার চিত্তে প্রণয় সঞ্চারের কোন সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায় না। নদীতে বান ডাকিলে বাঁশের গভীর-প্রোথিত অবরোধও কতক্ষণ টিকিয়া থাকিতে পারে?

মতিবিবির সহিত কপালকুণ্ডলার সাক্ষাতের প্রথম ও দ্বিতীয় রজনীর ঘটনাবলী, নবকুমারের উন্মত্ত সন্দেহ ও কাপালিকের প্ররোচনায় উহার চরম বাহ্যজ্ঞানলোপী পরিণতি, অলৌকিক জগতের ইঙ্গিতে কপালকুণ্ডলার উদ্ভ্রান্ত, ভক্তিবিহ্বল ভাবাবিষ্টতা, নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার অন্তিম সংলাপে পরস্পরের মনোভাবের বিপরীত ভ্রান্তচারিতা—এই সমস্ত অধ্যায়ে বঙ্কিমের নিপুণ কাহিনী শিল্প ও দৈবরহস্যের চমকপ্রদ ব্যঞ্জনা প্রফুল্লকুমারের আলোচনায় অতি চমৎকার ভাবে উদঘাটিত নিগূঢ় তাৎপর্য সূত্র-গ্রথিত হইয়াছে। এই আলোচনায় শিল্পীমনের সার্থক অনুসরণে উহার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়টি-সুস্পষ্ট করার যে বিরল সমালোচনাশক্তি তাহার প্রশংসনীয় নিদর্শন মিলে।

'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমের প্রথম সামাজিক উপন্যাস। কিন্তু বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাসের ক্ষেত্র পরিবর্তন করিলেও মানবজীবনে দৈবসঙ্কেত প্রক্ষেপ সম্বন্ধে তাঁহার যে অভ্যস্ত সংস্কার তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। কাজেই গার্হস্থ্য-জীবনে এই ধরণের সাঙ্কেতিকতার সার্থক প্রয়োগ সম্বন্ধে আমাদের সংশয় উদ্রিক্ত হওয়া স্বাভাবিক। কুন্দের দুইবার স্বপ্নদর্শন—ভবিষ্যতের ইঙ্গিত, অতীতের প্রতিচ্ছায়া নয়, সুতরাং কুন্দের অহংজ্ঞান-চেতনায় ইহার বীজের অস্তিত্ব-কল্পনাও দুরূহ। তথাপি প্রফুল্লকুমার হয়ত খানিকটা কষ্টকল্পনার সাহায্যে এই প্রতিদিনকার জীবনকাহিনীর মধ্যে রোমান্সসুলভ সঙ্কেতময়তার আবিষ্কার—চেষ্টা করিয়াছেন। 'বিষবৃক্ষের' প্রারম্ভিক দুর্যোগ নায়ক-নায়িকা-প্রতিনায়িকার জীবনে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের পূর্বাভাস, অথবা ঝড়ের রাত্রির শেষে সূর্যমুখীর পুনঃপ্রাপ্তি ও কুন্দের চিরবিদায় সাঙ্কেতিক তাৎপর্যপূর্ণ—এই জাতীয় মন্তব্য অনেকটা কল্পনা বিলাসের আতিশয্য বলিয়াই মনে হয়। আসল কথা প্রকৃতি ও মানবরাজ্যে সমজাতীয় বিক্ষোভের সহাবস্থান মাত্রই উভয়ের মধ্যে আত্মিক সংযোগের নিদর্শনরূপে গৃহীত হইতে পারে না। লেখকের উদ্দেশ্য ও আখ্যায়িকার ভাবানুরঞ্জনই এ বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত-নির্ণায়ক। বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষে' যে নিয়তির নেপথ্যলোক হইতে বর্ণ ও সূত্র আহরণ করিয়াছেন এরূপ কোন নিশ্চিন্ত প্রত্যয় তাঁহার রচনায় প্রতিফলিত হয় নাই। ঘটনার দিক দিয়া কিছু শ্লেষ-বৈপরীত্যের (tragic irony) উদাহরণ প্রফুল্লকুমার সংগ্রহ করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ কুন্দের সন্ধানে বাহির হইবেন, সূর্যমুখীকে এই ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহাকে সূর্যমুখীরই অনুসন্ধানে বাহির হইতে হইল। সূর্যমুখী কুন্দের প্রথম আশ্রয় লাভের সংবাদে পরিহাসচ্ছলে তাহার প্রতি নগেন্দ্রের রূপমুগ্ধতার যে আশঙ্কার ভান করিয়াছিল, তাহাই মর্মান্তিক সত্যরূপে তাহার জীবনে দেখা দিল। নগেন্দ্র কুন্দকে ভুলিতে পারিলে সূর্যমুখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন, কুন্দের প্রতি অনুরাগব্যঞ্জক ও সূর্যমুখীর মর্মবিদারক এই উক্তি ভাগ্যের ক্রুর পরিহাসে তির্যক সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কুন্দের তিরোধান ঘটিয়াছে নগেন্দ্র কর্তৃক সম্পূর্ণ অকল্পনীয় উপায়ে; আর তিরোধানই যে বিস্মৃতির কারণ তাহাও সত্য নয়। এইরূপ কতকগুলি ঘটনা ও উক্তির অপ্রত্যাশিত পরিণতি উপন্যাসটিতে দৈব প্রভাবকে পরোক্ষভাবে সূচিত করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে প্রফুল্লকুমার দুইটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। প্রথম প্রশ্ন, কুন্দের মৃত্যু সত্ত্বেও তাহার আত্মিক বিজয় সম্বন্ধীয়। সূর্যমুখী-নগেন্দ্রের জীবনে সে মধ্যবর্তিনীর মত ছায়াপাত করিয়াছে। স্বামী পদে মাথা রাখিয়া মৃত্যুপথযাত্রিণী কুন্দের সৌভাগ্যে সূর্যমুখী ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়াছে। সুতরাং কুন্দের নৈতিক প্রভাব উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সপত্নীর জন্য পথ ছাড়িয়া দিয়া সে স্বামী ও সপত্নীর মনোলোকে চিরস্থায়ী আসন লইয়াছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালের চরিত্র ও অদৃষ্ট পরিণতির তুলনা বিষয়ক। আপাত দৃষ্টিতে উভয়েরই অবস্থা ও জীবনসমস্যা অভিন্ন; উভয়েই রূপমোহের পিচ্ছিলতায় পদস্খলিত। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে নগেন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় গোবিন্দলালের অপরাধ লঘুতর ও আরও মার্জনীয়। গোবিন্দলালের ক্ষেত্রে ঘটনার চক্রান্ত ও প্রতিবেশের প্রতিকূলতা তাহার সাধু সংকল্প ও আত্মদমনের প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়াছে। নগেন্দ্রনাথ প্রৌঢ়, গোবিন্দলাল সদ্য যৌবন সীমায় উত্তীর্ণ। নগেন্দ্রনাথ পূর্ণ প্রেমের আস্বাদন পাইয়াছে, গোবিন্দলালের ভালোবাসা কৈশোর অপরিপক্বতায় অর্ধ-তৃপ্তিকর। নগেন্দ্রনাথের প্রেমের রাজকীয় সমারোহ, গোবিন্দলালের প্রেমের গার্হস্থ্য পরিমিতি। নগেন্দ্রনাথের কুন্দমোহ একটা স্থূল, অকারণ খেয়াল; গোবিন্দলালের রোহিণীর প্রতি আকর্ষণ প্রথমতঃ কারুণ্য রসপুষ্ট দ্বিতীয়তঃ প্রণয়াকাঙ্ক্ষার একটা সত্যিকার অভাববোধ-সঞ্জাত ও তৃতীয়তঃ অভিমানিনী বালিকা পত্নীর অবিচার প্রসূত। নগেন্দ্রনাথের অবৈধ প্রেম সমাজ-সমর্থনে বৈধীকৃত ও নিজ চিরাভ্যস্ত পারিবারিক অক্ষপথে আবর্তিত—ইহার সর্বাঙ্গে স্থূল আত্মতৃপ্তির মেদ বহুলতা। গোবিন্দলালের প্রেম তাহাকে অজ্ঞাতবাসের নিরালম্ব নির্বাসনে পাঠাইয়াছে। গোবিন্দলালের সর্বাধিক দুর্ভাগ্য এই যে, যে আকর্ষণের জন্য সে নিজ অতীত জীবনকে মুছিয়া ফেলিয়াছে তাহা মোটেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পর্যায়ের ঊর্ধ্বে উঠে নাই। নগেন্দ্রনাথ কুন্দের প্রেমের কৈশোর মাধুর্যে অন্ততঃ সূক্ষ্মতর মানসতৃপ্তি উপভোগ করিয়াছে; গোবিন্দলাল প্রথম হইতেই ভালবাসাহীন দেহসম্পর্কের বিষজ্বালায় জ্বলিয়াছে। নগেন্দ্রনাথের অনুতাপ নিজ কৃতকর্মের জন্য নয়, সূর্যমুখীর গৃহত্যাগে; সে যদি সীতারামের মত বহু বিবাহের অধিকার নিশ্চিন্তভাবে প্রয়োগ করিতে পারিত, তবে তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের অঙ্কুর মাত্র দেখা দিত না। গোবিন্দলালের অনুশোচনা আরও নির্মম ও জ্বালাময়; সে সম্ভ্রান্ত জীবন ত্যাগ করিয়া পাতাল জীবনের সমস্ত ধিক্কারবোধ অঙ্গীকার করিয়াছে। যে পিস্তলের গুলিতে সে কামসঙ্গিনীর জীবনাবসান ঘটাইয়াছে, তাহাই তাহার অন্তঃসঞ্চিত ক্ষোভ ও তীব্র মানস প্রতিক্রিয়ার পরিমাপক। তাহার অন্তঃপ্রবৃত্তিগুলি নগেন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় আরও গভীরভাবে, আরও সাংঘাতিক ভাবে আলোড়িত হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ তাঁহার অপেক্ষাকৃত সৌখীন অন্তর্বেদনার উপশম স্বরূপ সূর্যমুখীর স্নিগ্ধ সান্ত্বনা ও কুন্দের মৃত্যুকালীন প্রেমনিবেদন লাভ করিয়াছে। গোবিন্দলালের অন্ধকার সুড়ঙ্গ-জীবন সমবেদনার ক্ষীণতম রশ্মিতেও আলোকিত হয় নাই। অপরাধ বোধের অনির্বাণ তুষানলের মধ্যে সে পাইয়াছে ভ্রমরের রূঢ় প্রত্যাখ্যান, কাতর ভিক্ষার নির্মম অস্বীকৃতি। তাহার বিবেকের উপর দুইটি নারীর মৃত্যুঘটানোর দায়িত্ব দুঃস্বপ্নের মত চাপিয়া বসিয়াছে। তাই ভ্রমরের মৃত্যুর পর বারুণীতটের নির্জন প্রকোষ্ঠে তাহার বিকারগ্রস্ত অনুভূতি সমস্ত বিশ্বসংসারকে ভ্রমর-রোহিণীময় দেখিয়াছে ও সে নিজেও তাহাদের অনুগমন করিতে প্ররোচিত হইয়াছে। আমরা নগেন্দ্রনাথকে এই আত্মঘাতী মনোবিকারের ক্রীড়নকরূপে কল্পনা করিতে পারি না। উভয়ের মধ্যে এই গভীর চরিত্র-ও-আবেষ্টন-গত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিম পরবর্তী-সংস্করণে গোবিন্দলালের জন্য মৃত্যুর পরিবর্তে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ ও সন্ন্যাসে শান্তি লাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথের এরূপ পরিণাম তাঁহার চরিত্রের সহিত সঙ্গতিহীন হইত। সে মাঝে মাঝে কুন্দের স্মৃতিতে বিমনা হইলেও সূর্যমুখী সাহচর্যের নিবিড় তৃপ্তিপ্রদ সংসার-জীবনে ফিরিয়া গিয়াছে। তাহার মনের ক্ষত দুশ্চিকিৎস্য নয়। গোবিন্দলালের দারুণ দুঃখময় অভিজ্ঞতা, তাহার জীবনরহস্যের অপরিমেয় গভীরতায় নিমজ্জন তাহাকে নবজীবনের প্রতিষ্ঠাভূমিতে উত্তীর্ণ করিয়াছে। ভ্রমর-

রোহিণী তাহার অনুতাপবিদ্ধ সত্তার দুইহাত ধরিয়া তাহাকে শ্রীভগবানের পাদপদ্মাশ্রয়ে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। প্রফুল্লকুমার এই পটভূমিকা স্মরণে রাখিয়াই এই উভয় নায়কের পরিণামী পার্থক্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

'রাধারাণী' 'যুগলাঙ্গুরীয়' 'ইন্দিরা'—এ তিনটিই ক্ষুদ্রায়তন, ঘটনাসর্বস্ব ও লঘুরসপ্রধান উপন্যাসের নিদর্শন। মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখরে' হিন্দুধর্মতত্ত্ব-প্রভাবিত, অদৃষ্টের দারুণ-পরিহাস-লাঞ্ছিত গভীর রসাত্মক নূতন ধরণের উপন্যাস লেখার পূর্বে যেন একটু বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন। তথাপি মাঝে মধ্যে চরিত্র পরিকল্পনায় ও ঘটনার উপর মন্তব্য প্রকাশ তাঁহার মুন্সিয়ানার পরিচয় মিলে। রুক্মিণীকুমারের সহিত প্রথম আলাপে প্রণয় নিবেদনে রাধারাণীর সঙ্কোচ ও প্রগল্‌ভতার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রটি স্বাভাবিকতার দিক্ দিয়া উপভোগ্য হইয়াছে। সে যুগের বাঙালী তরুণীর মুখেও কোর্টশিপ বেমানান হয় নাই। রাধারাণীকে মুখরা করিতে গিয়া তাহার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ারূপে রুক্মিণীকুমারকে মুখ-চোরা করিতে হইয়াছে। নায়ক—নায়িকা উভয়েই যদি সমান সপ্রতিভ হইত ও চতুর-মধুরসংলাপ—বিনিময়ে পাল্লা দিত তাহা হইলে গল্পের ক্ষুদ্র শরীরে সে রসোচ্ছ-লতা ধরিত না। কাজেই প্রফুল্লকুমার নায়কের মধ্যে যে বর্ণহীনতার অনুযোগ করিয়াছেন তাহা নায়িকার বর্ণাঢ্যতার কলাসম্মত পরিপূরক।

'যুগলাঙ্গুরীয়ে' পুরন্দর—হিরণ্ময়ীর আচরণ ও 'ইন্দিরা' সম্বন্ধে উঁহার দুর্বল গ্রন্থিগুলির আলোচনা বিশেষ মৌলি-কতাসমৃদ্ধ না হইলেও সুষ্ঠু বিচারের পরিচয় দেয়। তবে ইন্দিরার মূল গল্পের সহিত অসংশ্লিষ্ট কৌতুকচিত্রগুলিকে pickri paper এর খণ্ড কাহিনীর সঙ্গে তুলনা ঠিক মাত্রাজ্ঞানানুগ হয় নাই। বিশেষতঃ 'ইন্দিরা'—প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের অধ্যাপক বন্ধুর 'চিত্রাঙ্গদা'-র উল্লেখ জ্ঞানাতি-শয্যবিড়ম্বিত অধ্যাপকশ্রেণীর প্রাসঙ্গিকতা বোধ সম্বন্ধে সংশয়ের উদ্রেক করে। এরূপ তুলনা শুধু রসবোধের প্রণোদনায় আসিত না। 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'ইন্দিরা'র ভাবাবহ ও রচয়িতার মনোভঙ্গীর মধ্যে এমন এক দুরতিক্রম্য ব্যবধান আছে যাহাতে উভয়কে এক নিঃশ্বাসে উল্লেখ করাও কষ্টকল্পনা মনে হইতে পারে। উভয়ের নায়িকার মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র হইল দৈহিক রূপের উপর নির্ভরশীলতা। কিন্তু এইখানেই সাদৃশ্যের শেষ। চিত্রাঙ্গদা যে সমুন্নত কবিকল্পনার আদর্শলোকবিহারিণী। মৃত্তিকাসীমায় আবদ্ধা ইন্দিরার সে কল্পলোকে প্রবেশাধিকার নাই। তাহাকে জীবনসঙ্কট এড়াইতে হইলে যে কোন উপায়ে স্বামিগৃহে স্থান সংগ্রহ করিতে হইবে—পত্নী-পরিচয়ে না হইলে গণিকা-পরিচয়ে। বঙ্কিমযুগে কুলীন পত্নীদের স্বামিসন্দর্শন ঘটাইতে যে সব কৌশল অবলম্বন করিতে হইত তাহা উচ্চনীতির ধার ধারিত না। নারীর তূণীরে যত অস্ত্র আছে সমস্ত প্রয়োগ করিয়া, নারীমর্যাদা ধূলায় লুটাইয়া, এমন কি অলঙ্কারবিক্রয়লব্ধ অর্থ উপ-ঢৌকন দিয়াও ইহাদিগকে স্বামীর প্রসাদ ভিক্ষা করিতে হইত। কৌলীন্য প্রথা বিড়ম্বিতা এই নারীকুলের মর্মান্তিক অমর্যাদার পটভূমিকায় ইন্দিরার এই স্বামিলাভের প্রাণপণ প্রচেষ্টা, তাহার ছলনা কলাকৌশলের সমস্ত অশালীনতাই বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য ইন্দিরার অদম্য প্রাণোচ্ছলতা ও রমণবাবুর সুভাষিণীর ব্যবস্থাপনা-নৈপুণ্য এই পতিশিকারের গ্লানিটুকু যথাসম্ভব আবৃত করিয়াছে ও যাচিকার দৈন্যকে অনুগ্রহকারিণীর বদান্যতার ছদ্মবেশ পরাইয়াছে। এই অবস্থাসঙ্কটের আচরণকে নীতি-বাগীশের শুচিবায়ুগ্রস্ত দৃষ্টি দিয়া বিচার বঙ্কিমের অনভিপ্রেত ছিল। সেই দুইটি পল্লীবালিকার 'বাজিয়ে যাব মল' গানের অর্থ বাণীর ইঙ্গিতেই এই দুর্মদ প্রাণপিপাসা-নিবৃত্তির কাহিনীকে দেখিতে হইবে।

বাসর ঘরে নারীসমাজের যে রঙ্গরসের আতিশয্য, যে জীবন রস-আস্বাদনের অসংস্কৃত, অসংবৃত আয়োজন তাহাই সমস্ত উপন্যাসটির অন্তর্নিহিত সুরের ইঙ্গিতবাহী ও চরম পরিণতি। বাঙালী মেয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্য নীতি ভুলিয়াছে, লজ্জাকে লজ্জা দিয়াছে, গুরুজননিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলিত জীবনের বেড়ি কাটিয়াছে, উদ্দেশ্যের সাধুতায় উপায়ের হেয়তাকে সমর্থন জানাইয়াছে ও মধুপানমত্ত প্রজাপতির ন্যায় বিশুদ্ধ জীবনানন্দের দক্ষিণা বাতাসে রঙীণ পাখা মেলিয়া উড্ডীন হইয়াছে। আর কোন দৃষ্টি-ভঙ্গী এখানে অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক হইবে। 'ইন্দিরা' রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা-'র বঙ্কিমচন্দ্রীয় সংস্করণ।

'চন্দ্রশেখরে' বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক শিল্পকলা ও জীবন সমস্যার এক নূতন স্তরে প্রবেশ করিলেন। জ্যোতির্গণনার সাহায্যে অদৃষ্টের যে পূর্বাভাস পাত্র-পাত্রীর জীবনে ছায়াপাত ও অদৃশ্য দৈবশক্তির দ্যোতনা করিত, তাহা 'চন্দ্রশেখরে' আরও গভীরতর তাৎপর্যমণ্ডিত হইয়া বিধাতৃ-বিধানের অমোঘতায় উন্নীত হইল। দলনীর ক্ষেত্রে যে অদৃষ্ট জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে আভাসিত ও শৈবলিনীর যে মানস অপরাধ যোগবলের সহায়তায় প্রত্যক্ষীকৃত ও উৎকট মনোবিকারের প্রায়শ্চিত্তে সংশোধিত—উভয়েরই মধ্যেই এক মনুষ্য বোধাতীত রহস্যময় বিশ্ববিধানের নির্মম অপ্রতিবিধেয়তা প্রকটিত। কপালকুণ্ডলার জীবনে এই অতন্দ্র, প্রতিহিংসাক্রুর দৈবশক্তির প্রথম আত্মপ্রকাশ, কিন্তু এখানে নায়িকার স্বভাব-উদাসীনতার ও ধর্মভাব তন্ময়তার ফলে ও স্বপ্নকল্পনার মৃদুতর প্রলেপে উহার উগ্রতা অনেকটা প্রশমিত ও পাঠকচিত্তে অনেকটা সংস্কার-অনুকূল ব্যঞ্জনায় প্রতিফলিত। কপালকুণ্ডলা মাতৃশক্তির নিকট স্বেচ্ছাপ্রদত্ত বলি—কাজেই তাহার অনির্দেশ্য পরিণাম আমাদের অসহ্য পীড়াদায়ক বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ এখানে বাহিরের ঘটনা অন্তরের আগুনে অতি ক্ষীণ ইন্ধন যোগাইয়াছে। কপালকুণ্ডলার জীবন বাহিরের প্রশান্তি ও ঘটনারিক্ততার মধ্যে অন্তরে সূক্ষ্ম অতৃপ্তি-ক্ষুব্ধ। চন্দ্রশেখরে ইতিহাস আততায়ী দস্যুর মত জীবনকে বজ্রমুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়াছে ও বিধ্বস্ত করিয়াছে। জ্যোতির্গণনা এখানে ইতিহাসের রাশিচক্রের প্রভাবে অপ্রত্যাশিত পথে সার্থক হইয়াছে। ঐতিহাসিক অক্ষক্রীড়ার একটি চালে দলনীর জীবনে দুর্গদ্বার ও শান্ত, সৌভাগ্যমসৃণ পরিণতির দ্বার একসঙ্গে বন্ধ হইয়াছে। নূতন ইতিহাসস্রষ্টা ইংরেজ শৈবলিনীর ভাগ্যকে নূতন করিয়া গড়িবার উপলক্ষ্য যোগাইয়াছে। ইতিহাসের জটিল জালে দুই বিরুদ্ধপ্রকৃতি-সম্পন্ন ও বিভিন্ন জীবনস্তরঅধিষ্ঠিত নারী অসহায়ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। বাহিরের এই প্রচণ্ড শক্তির ঝটিকাবেগ তাড়িত হইয়া নবাবের বেগম ও দরিদ্র ব্রাহ্মণের স্ত্রী নিজ নিজ স্বাভাবিক বিচরণভূমি হইতে সবলে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। দলনী মরিতে চাহে নাই, তথাপি তাহাকে মরিতে হইয়াছে। শৈবলিনী ইতিহাসের রাহুগ্রাস এড়াইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসচক্র বিঘূর্ণিত শক্তি তাহার মধ্যে এক নূতন চেতনা জাগাইয়াছে। ঐতিহাসিক যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে শতগুণে ভয়াবহ আত্মিক বিপর্যয়ের অন্তরা-হবে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে। ভাগ্যের এই নিদারুণ পরিহাস, অদৃষ্টের চক্রান্তজালের এই বেষ্টন আমাদের মনে এক বিহ্বলবিমূঢ়তার সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ শৈবলিনী যে আগুনে পুড়িয়াছে তাহা এক অস্থিমজ্জাগত অতীন্দ্রিয় জীবন প্রত্যয় ও অত্যাজ্য সংস্কার-পুষ্ট প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধ ভাবকল্পনা ব্যতীত আর কোন উপায়ে প্রজ্বলিত হইত না। আমাদের পৌরাণিক নরক-চিত্রের সহিত দান্তের জ্বালাময়ী অনুভূতিযুক্ত হইয়া শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তদৃশ্য রচনা করিয়াছে। পড়িতে পড়িতে আমরা নরকাগ্নির অসহনীয় উত্তাপ ও অনু-শোচনার উৎকটতম বিকার-বিভ্রম যেন সমস্ত অনুভূতি দিয়া স্পর্শ করি।

প্রফুল্লকুমার প্রথমতঃ উপন্যাসটির ঐতিহাসিক যাথার্থ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এ আলোচনা প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু উপন্যাসের রসানুভবে উহার বিশেষ উপযোগিতা নাই। অবশ্য তকি খাঁর চরিত্রের কলঙ্কিত রূপান্তর ইতিহাসভক্ত পাঠকের মনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জাগায় তাহা সর্বথা স্বীকার্য। উপন্যাস চন্দ্রশেখরের নামানুসারে অভিহিত হওয়ারও তিনি কতকটা সঙ্গত কারণ দিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মনে হয় যে চন্দ্রশেখর রামানন্দস্বামীর হাতে ক্রীড়নক মাত্র। যে অতল রহস্যময় মানস নাট্যক্রিয়ার সহিত তিনি জড়িত হইয়াছেন তাহার গতিনিয়ন্ত্রণ ও তাৎপর্য-অনুধাবন উভয়ই তাঁহার সাধ্যাতীত। তথাপি শৈবলিনীর রোমাঞ্চ-কর প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত, তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই শৈবলিনীর সমস্ত মন্ত্রসাধনা নিয়োজিত, তাঁহার সৌন্দর্য ও মহিমার নব আবিষ্কারই তাহার সিদ্ধির শেষ ফল। যে মর্মান্তিক অস্ত্রোপচারে শৈবলিনীর হৃদয়ের গভীর স্তর হইতে অবৈধ অনুরাগের মূল উৎপাটিত হইয়া নব অনুরাগের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারই পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন। আমরা যখন ঔপন্যাসিকের এই অভিপ্রায়ের কথা স্মরণ করি তখন চন্দ্রশেখরের সমস্ত নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও তাঁহাকেই নায়ক-গৌরবে অধিষ্ঠিত করা

ছাড়া আমাদের উপায় থাকে না। যাহার অনুকূলে এত বড় একটা অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, তিনি দেবতা না হইলেও যে দেবানুগৃহীত পুরুষ তাহা অস্বীকার করা যায় না।

বঙ্কিমের দার্শনিক প্রত্যয় হার্ডির বিপরীত হইলেও যে আমাদের অভিজ্ঞতা-সমর্থিত ও অলৌকিক শক্তির ক্রিয়া-প্রদর্শন যে সময় সময় আর্টের অনুমোদিত সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, প্রফুল্লকুমার সে বিষয়ে সমীচীন মন্তব্যই করিয়াছেন। শৈবলিনী সম্বন্ধে নীতিবেত্তা বঙ্কিম ও শিল্পী বঙ্কিমের মধ্যে যে একটা দ্বন্দ্ব সময় সময় দেখা দিয়াছে সমালোচক তাহাও লক্ষ্য করিয়াছেন। তবে এখানে বলা যাইতে পারে যে পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর মধ্যে তিনি প্রায়শ্চিত্তশুদ্ধা, পতিব্রতা শৈবলিনীর পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধে বরাবরই সচেতন ছিলেন। কাজেই কখনও কখনও তাহার প্রতি পরুষ ভর্ৎসনাবাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহার প্রায়শ্চিত্তের কঠোরতা, অনুতাপের আন্তরিকতা ও শেষ পর্যন্ত সতীধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করিয়া তিনি তাহার প্রতি সম্পূর্ণ নির্দয় হইতে পারেন নাই। মুনিশাপে প্রস্তরীভূতাও রামচরণ স্পর্শে পূতা অহল্যার ন্যায় শৈবলিনী ও তাহার স্রষ্টা ও পাঠকের মনে এক মিশ্র ভাবের উদ্বোধন করে। সুন্দরীর চরিত্রমূল্যায়ন ও রূপসীকে কাব্যে উপেক্ষিতা শ্রেণীর মধ্যে স্থান দান সমালোচকের সূক্ষ্মদর্শিতা সূচিত করে। প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রণয়-সম্পর্ক পরিবর্তনের স্তরগুলিও সমালোচক নিপুণভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। প্রতাপ-প্রণয়িনী হইতে চন্দ্রশেখর পত্নীরূপে শৈবলিনীর নবজন্মের সূচনা তাহার প্রায়শ্চিত্তের পূর্বেই প্রতাপের অনমনীয় প্রত্যাখ্যানে সাধিত হইয়াছে। প্রতাপ যাহা লৌকিক উপায়ে আরম্ভ করিয়াছিলেন, রামানন্দ স্বামী তাহাই অলৌকিক উপায়ে সমাপ্ত করিয়াছেন।

সমালোচকের সর্বাধিক কৃতিত্ব শৈবলিনীর মানসিক বিকারের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও উহার বিভিন্ন স্তর—নির্দেশে। তিনটি স্তর সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে—(১) স্বপ্ন-বিভীষিকা, (২) জাগরণে অনুভূতি-বৈক্লব্য, ও (৩) উন্মত্ততা। শৈবলিনীর চিত্তশুদ্ধির সম্পূর্ণতা বিধানের জন্য প্রতাপের আত্মবলিদান ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তকে যোগবলের ব্যর্থতা সম্বন্ধে ঈষৎ শ্লেষাত্মক মন্তব্য করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। এ বিষয়ে প্রফুল্লকুমারের ব্যাখ্যাই অধিকতর সঙ্গত ও তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। বঙ্কিম যোগবলের অলৌকিক প্রভাবের প্রয়োগ করিয়াছেন ফষ্টরের মুখ হইতে সত্য-স্বীকৃতি আদায়ের জন্য ও শৈবলিনীর মনের গোপন পাপের প্রকাশের জন্য। যোগবল শৈবলিনীর চিত্তশুদ্ধি ও লৌকিক কলঙ্ক স্খালনের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়াছে মাত্র। ইহার অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মতত্ত্ব তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধানের পরিকল্পনাও উদ্ভাবন করিয়াছে। যে উপায়ে তাহার মানস পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহার প্রবৃত্তিপ্রবাহ প্রতাপ-তট হইতে অপসৃত হইয়া চন্দ্রশেখর তটে সংসক্ত হইয়াছে। তাহা মূলতঃ অলৌকিক হইলেও বস্তুতঃ একটি বহুপরীক্ষিত লোক ধারণার সুপ্রতিষ্ঠিত সাধনাক্রম, একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। ভগবৎসাধক যে উপায়ে ইষ্টদেবতার পাদপদ্মে চিত্ত স্থির করেন, শৈবলিনীর ক্ষেত্রে তাহারই এক বিশিষ্ট প্রয়োগ ঘটিয়াছে। তবে শৈবলিনীর অসাধারণ মানস বিপর্যয়ের জন্য, তাহার মানস ক্ষেত্রে নানা বিপরীত অনুভূতি প্রবাহের দ্রুত সঞ্চরণের জন্য, তাহার অতীত ও বর্তমান, মর্ত ও নরকের মধ্যে সীমালোপী কল্পনার চিত্তমন্থনকারী-আলোড়নের জন্য তাহার রূপান্তর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হইয়া এক সপ্তাহের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছে। তাহার এই সপ্তাহ-ব্যাপী রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার মধ্যেই একটা সমগ্র যুগের ব্যাপ্তি ও জীবন জঙ্গমতা ঘনীভূত রূপে আঁটিয়া গিয়াছে। যোগবল পরিবর্তনের চাকাতে প্রথম গতি সঞ্চার করিয়াছে, কিন্তু ইহার পরিণতিবিন্দুতে পৌছানর উপযোগী অবিচ্ছিন্ন বেগধারা আসিয়াছে মানবমনের স্বাভাবিক বৃত্তির উৎস হইতে। যোগবল মনোবলকে জাগাইয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। শৈবলিনীর জীবনে কেবল যোগসিদ্ধির দৈব প্রসাদ আসে নাই, আসিয়াছে দুরূহ সাধনার পুরুষকারের পুরস্কার।

'রজনী'—উপন্যাসের আলোচনায় প্রফুল্লকুমার লিটনের উপন্যাসের অন্ধ ফুলওয়ালী নিদিয়ার সহিত রজনীর অবস্থা ও চরিত্রগত পার্থক্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। বঙ্কিমের আসল উদ্দেশ্য নিদিয়া চরিত্রের একটি বাঙালী সংস্করণ প্রণয়ন করা নয়, অন্ধের রূপোন্মাদজাত প্রণয়াকুলতারূপ মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উন্মোচন। অন্ধ নারীর ইন্দ্রিয়বৃত্তি

ও কামনা যে চক্ষুষ্মতী নারীর সহিত অভিন্ন ইহা বুঝাইতে কোন মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না—উহা স্বতঃসিদ্ধ স্বীকৃতিরূপে গ্রহণীয়। তবে অন্ধের রূপানুভব দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রতিহত হইয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়, বিশেষতঃ স্পর্শ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহযোগিতায় তির্যক পথে অন্তরে প্রবিষ্ট হয়। শচীন্দ্রের প্রতি রজনীর অনুরাগ, তাহার অন্ধত্ব সত্ত্বেও, খুব স্বাভাবিক কারণে উদ্ভূত। বিশেষতঃ শচীন্দ্রের সদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ রজনীর প্রণয়োন্মুখতা উদ্রেকের সঙ্গত কারণরূপে গৃহীত হইতে পারে। সুতরাং প্রণয়ের উন্মেষে মনস্তত্ত্বের কিছু অসাধারণত্ব নাই। কিন্তু এই এই প্রণয়ের প্রকাশভঙ্গী অন্ধ রমণীর পক্ষে একটু স্বতন্ত্র ধরণের হওয়াই স্বাভাবিক এবং বঙ্কিমের মনস্তত্ত্বজ্ঞান এই প্রকাশের নূতনত্বকে পরিস্ফুট করিতেই প্রধানতঃ নিয়োজিত হইয়াছে। পরিস্থিতি জটিলতর হইয়াছে রজনী ও শচীন্দ্রের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান ও সম্ভ্রম বৈষম্য। তাহাদের আর্থিক অবস্থার হঠাৎ—বৈপরীত্য সাধন ও অমরনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শচীন্দ্রের প্রতি প্রেমের মধ্যে দ্বন্দ্বের জন্য। যে কিছুদিন পূর্ব পর্য্যন্ত তাচ্ছিল্যের পাত্রী ছিল, সে যেন অতর্কিত ইন্দ্রজাল প্রভাবে অভিজাত পরিবারে শ্লাঘনীয় আসনের অধিকারিণী হইল। এই অভাবনীয় পরিবর্তনে রজনী-চরিত্রের উদারতা ও মর্যাদাবোধ আরও উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত অলৌকিক শক্তির সহায়তায় শচীন্দ্রের বিমুখচিত্ত তাহার প্রতি অসংবরণীয়ভাবে আকৃষ্ট হইল। দৈবের শেষ আশীর্বাদরূপে তাহার অন্ধত্বও আরোগ্য হইয়া সে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। রজনীর জীবন-ইতিহাস বাস্তবতা ও দৈবানুগ্রহের এক অদ্ভুত মিতালির নিদর্শন।

কিন্তু রজনী উপন্যাসের নায়িকা হইলেও উহার প্রধান সক্রিয় চরিত্র নহে—তাহার জীবন কতকগুলি বহিরাগত প্রবল প্রভাবের, মানবিক ও দৈবসংঘটনের, নিষ্ক্রিয় লীলা-ভূমি। নদীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস যেমন ঊষর বালুচরকে প্লাবিত করিয়া তাহাতে সোনার ফসল ফলায় তেমনি রজনীর রিক্ত জীবন মরুভূমির উপর কতকগুলি উর্বরতাবিধায়ক ঘটনা ও ভাবের উচ্ছ্বাস বহিয়া গিয়াছে। উপন্যাসের সমস্যাগ্রন্থি জড়িত আছে শচীন্দ্র ও অমরনাথের মর্মমূলে। ইহারাই উপন্যাসের সক্রিয় ও সচল প্রেরণা। শচীন্দ্রনাথের আকস্মিক চিত্ত পরিবর্তন ও রজনীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব ও এই বিষয়ে অমরনাথের সহিত তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনা। শচীন্দ্রের মনে রজনী সম্বন্ধে প্রকাশ্য বিরাগের মধ্যে কোন অসংজ্ঞান অনুরাগের বীজ লুক্কায়িত ছিল কিনা এই বিষয়ে প্রফুল্লকুমার আমার ও ডঃ সুবোধচন্দ্রের মতামত বিচার করিয়াছেন। রজনীর বিবাহ সম্বন্ধে শচীন্দ্রের আগ্রহ ও তাহার রূপ বিশ্লেষণকে আসক্তির গোপন বীজ বলিয়া সঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা তাহা নিশ্চয়ই বিচার্য। অবশ্য যদি শচীন্দ্রের দয়াকেও প্রেমের পূর্বাভাস ধরা যায়, তাহা হইলে তাহার পরিবর্তন আরও স্বাভাবিক হয়। আজকাল ফ্রয়েডের কল্যাণে যে কোন কোমল, এমন কি কঠোর বৃত্তিকেও কামের ছদ্ম-বেশী আত্ম ঘোষণারূপে গ্রহণ করা যায়। তবে বঙ্কিমের ক্ষেত্রে হয়ত ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা প্রযোজ্য না হইতে পারে। রজনীর রূপ বিশ্লেষণ নগেন্দ্রনাথ কর্তৃক কুন্দনন্দিনীর অনুরূপ রূপ বিশ্লেষণের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে পারে ও রূপ-মোহের দার্শনিক নির্লিপ্তির অন্তরালে আত্মগোপনের আর একটি নিদর্শন যোগাইতে পারে। তবে সমবেদনা, অনাথাকে পাত্রস্থ করার আগ্রহ, ও রূপানুভবের প্রেরণা হয়ত সমসূত্রে গ্রথিত। যাহা হউক, এই স্বাভাবিক কারণের সংমিশ্রণে যদি অতি প্রাকৃত প্রভাবের তীব্রতা কিছুটা প্রশমিত হয়, তবে তাহা আধুনিক যুগের অলৌকিকত্বে আস্থাহীন পাঠকের পক্ষে অধিকতর রুচিকর হওয়া সম্ভব।

শচীন্দ্রের সন্ন্যাসীপ্রদত্ত মন্ত্রবলে স্বপ্নদর্শন প্রফুল্লকুমার গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। শচীন্দ্রের স্বপ্নে তাহার নিজের অভিজ্ঞতা নয়, রজনীর প্রণয়-বিহ্বল ও গঙ্গাপ্রবাহে নিমজ্জমান অবস্থাই প্রতিফলিত হইয়াছে। এই স্বপ্নে শচীন্দ্রের মন নয়, রজনীর মনই ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু আর একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে বোঝা যায় রজনীর মনের গভীরে শচীন্দ্র নিজের মনেরও প্রচ্ছন্ন প্রতিচ্ছায়া দেখিয়াছে। রজনী তাহাকে সর্বাধিক ভালবাসে—এই স্বপ্নলব্ধ জ্ঞান তাহার নিজের অনুরাগকেও আরও দৃঢ়মূল করিয়াছে। ব্যাধির ফলে যখন তাহার চিত্তদমনক্ষমতা দুর্বল হইয়াছে তখন এই অবচেতন মনের অনুরাগাঙ্কুর শত শত শাখা-বাহু প্রসারিত করিয়া তাহার চিত্তাকাশে

পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকারে অতি-প্রাকৃতের আকস্মিকতার মধ্যে কার্যকারণ শৃঙ্খলার একটু মৃত্তিকাস্পর্শ আবিষ্কার করিয়া তিনি বঙ্কিমের অবাস্তবতাদোষ কিছুটা স্খালন করিয়াছেন।

শচীন্দ্র রজনীপ্রেমের সার্থকতায় সুলভ জীবনতৃপ্তির আকিঞ্চনতায় বিলীন হইয়াছে। জীবনের অযাচিত দাক্ষিণ্যে তাহারা জীবনজিজ্ঞাসার দুরূহ আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া তাহাদের ব্যক্তিত্বমহিমা হারাইয়াছে। এই মহিমা সম্পূর্ণভাবে উদাহৃত হইয়াছে অমরনাথের বিধি-বিড়ম্বিত, সমস্ত নিশ্চিন্ত আশ্রয় হইতে উৎক্ষিপ্ত যাযাবর জীবনে। বঙ্কিমের জীবন রহস্যভেদী মনীষা, আদর্শের চির-অতৃপ্ত অনুসন্ধান, নিয়তি-বিধানের বিরুদ্ধে রক্তক্ষরা সংগ্রামের দারুণ মর্মজ্বালা অমরনাথের মুখে ও অভিজ্ঞতায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। সে-ই বঙ্কিমের জীবনানুভূতির সম্পূর্ণ প্রতিনিধি—বঙ্কিমের দার্শনিক প্রত্যয়ের সার নির্যাস তাহারই ক্ষুদ্র স্বার্থ হইতে প্রতিহত ও বৃহত্তর মানব-কল্যাণ নিয়োজিত সত্তার আধারে সঞ্চিত হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, চন্দ্রশেখর, সত্যানন্দ, সীতারাম—সকলেই বঙ্কিম সত্তার অংশবিশেষের মানস প্রতিমূর্তি। কেবল অমরনাথের সঙ্গেই আমরা বঙ্কিমের পূর্ণ একাত্মতা কল্পনা করিতে পারি। অন্যান্য চরিত্রের পরিণতিতে কিছু আকস্মিকতা থাকিতে পারে, বঙ্কিমমানসের শাশ্বত সাধনা ইহাদের জীবনচর্যার সহিত অনিবার্যভাবে সংযুক্ত হয় নাই। বঙ্কিমের দিব্যকল্পনা এই সব রক্তমাংসের জীবনাধারে স্বচ্ছন্দ আশ্রয় লাভ করে নাই। কিন্তু অমরনাথের ক্ষেত্রে তাহার ভগবৎমুখী ও মানব-কল্যাণে উৎসর্গিত পরিণাম অনবদ্য সঙ্গতির সহিত তাহার ভাগ্যহত জীবনের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। লবঙ্গলতার প্রতি তাহার প্রথম যৌবনের রূপমুগ্ধতার অসংযম তাহার দেহে যে কলঙ্ক চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছে তাহারই কালো দাগ তাহার জীবনে চিরস্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার চরিত্রদৃঢ়তা ও জীবনব্যাপী উচ্চ আদর্শের অনুসরণ এই কলঙ্ককে শুভ্র দীপ্তিতে রূপান্তরিত করিয়াছে। অমরনাথ বঙ্কিমের সর্বাপেক্ষা জীবনতাৎপর্যপূর্ণ সৃষ্টি। অমরনাথের রজনীর সহিত সংসার বাঁধিবার ইচ্ছা নিবিড় প্রণয়োচ্ছ্বাসজাত নয়, ইহা জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত ব্যক্তির অন্তিম শান্তির আশা। ইহাতে তাহার চরিত্রদুর্বলতার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। তাহার তিক্ত অভিজ্ঞতা তাহাকে সামাজিক মান সম্ভ্রমের অসারতা বুঝাইয়া নীচকুলোদ্ভবা রমণীর আন্তরিক স্নেহ-ভক্তির অভিলাষী করিয়াছে।

লবঙ্গলতার প্রেমপ্রতিদানের জন্মান্তরীণ আশ্বাস তাহার শূন্য-হৃদয় কতটা পূর্ণ করিতে পারিবে তাহা কে বলিতে পারে?

লবঙ্গলতা আর একটি অসাধারণ চরিত্র। হিন্দু রমণীর পাতিব্রত্য সংস্কারের যুগ যুগান্তরের অনুশীলনে এরূপ চরিত্র সম্ভব হইয়াছে। যখন কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক বাঙলা দেশের কৌলীন্য প্রথাসঞ্জাত অসম বিবাহের পরিহাসময় ও করুণ অসঙ্গতির প্রতি জাতীয় বিবেককে উদ্বুদ্ধ করিতেছিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র সেই বাতাবরণের মধ্যে বাস করিয়াও বহুবিবাহ ও বৃদ্ধের সহিত তরুণীর দাম্পত্য সম্পর্কের ওরূপ একটি সমপ্রাণতা মধুর, রসোচ্ছলতায় উপভোগ্য, সম্পূর্ণ আক্ষেপহীন চিত্র আঁকিয়া তাঁহার শিল্পীস্বাধীনতার পরিচয় দিয়াছেন। যে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা নীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ব-বিদের মনে একটি ব্যঙ্গপ্রবণতা ও পারিবারিক অশান্তির সম্ভাবনা উদ্রেক করিতেছিল, বঙ্কিম তাহাকে একটি অনাবিল আনন্দের উৎসরূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। লবঙ্গলতা যে ভাগ্যের এই কৃপণতাকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নিশ্চয়ই একটি একক দৃষ্টান্ত নয়। হিন্দু সমাজে তাহার সমজাতীয় আরও অনেক নারী বিদ্যমান ছিল। সপত্নীকোন্দলের বার্তাটাই আমাদের সাহিত্য ও সামাজিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। কিন্তু সপত্নীর প্রীতি ও বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি ভক্তি-ভালবাসা একেবারেই যে বিরল ব্যতিক্রম ছিল তাহাও ঠিক নয়। সে যুগের কোন কোন নারী ব্রজেশ্বরের মধ্যে বৈকুণ্ঠেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিত, সে ব্রজেশ্বর জরাগ্রস্ত হইলেও তাহার দিব্যদৃষ্টি আচ্ছন্ন হইত না। অবশ্য প্রথম যৌবনে সে তাহার প্রণয়মুগ্ধ অমরনাথের প্রতি যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিল সে কালের বাঙালী মেয়ের পক্ষে তাহা একটু অস্বাভাবিকই লাগে। যে লৌহশলাকা দগ্ধ করিয়া সে প্রণয়ীর পৃষ্ঠে অনপনেয় কলঙ্কচিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছিল, তাহা তাহার চিত্তেরও বহির্গত তেজস্বিতা, অপরাধের প্রতি ক্ষমতাহীন জলন্ত ক্রোধের নিদর্শন আগ্নেয়

অক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে সে ইহাকে বালিকা বয়সের খেয়াল বলিয়া তাহার জন্য অনুতপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার চরিত্রে এইরূপ বিস্ফোরক উপাদান না থাকিলে তাহার ছেলেমানুষী খেয়ালিপনা কখনও এই পথে আত্মনিক্রমণ করিত না। এই শক্তি-মত্তা, এই গঠিত আত্মপ্রত্যয়, হৃদয়বৃত্তির এই কঠোর অবদমন তাহার প্রতিটি আচরণে পরিস্ফুট। যেমন বৃদ্ধ স্বামী, তেমনি বয়োজ্যেষ্ঠ সপত্নীপুত্রের সহিত সম্বন্ধে এই এই সহজ কতৃত্বশক্তি, এই দৃঢ়, অথচ স্নেহসিক্ত নিয়ন্ত্রণ নৈপুণ্য মর্যাদাময় অভিব্যক্তিলাভ করিয়াছে। অথচ নারী সুলভ কমনীয়তার কোথাও কোন অভাব নাই। সন্ন্যাসীর মন্ত্রবলে শচীন্দ্রের অবাধ্য মনকে বশীভূত করিবার চেষ্টায় যখন তাহার দুঃসাধ্য রোগ জন্মিয়াছে, তখন লবঙ্গ নিজ স্ত্রীবুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়াছে, ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়াছে ও নিতান্ত দীনভাবে রজনীর নিকট পুত্রের প্রাণভিক্ষা চাহিয়াছে। অথচ এই সমস্ত গুরুতর পারিবারিক দুর্যোগে বাড়ীর বড় গিন্নী, শচীনের মা, নেপথ্য লোকেই রহিয়া গিয়াছে।

আর একবার অমরনাথের সহিত শক্তিপরীক্ষায় লবঙ্গ অকপটে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। সে অমরনাথের উদারতায় স্বেচ্ছাকৃত অধিকার প্রত্যাহারে, রজনীর নিকট নিজ কলঙ্ক কথা ব্যক্ত করিবার সংসাহসে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে অমরনাথের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইয়াছে। তাহার সহিত শেষ বিদায়ের দৃশ্যে সে হিন্দুনারীর পাতিব্রত্যের আদর্শ ও প্রণয়ের দুর্বার দাবির মধ্যে যে আপোষ-মীমাংসার ইঙ্গিত দিয়াছে তাহাই ধর্ম ও কর্তব্যশাসিত হিন্দু সমাজে অবৈধ হৃদয়বৃত্তির অধিকারের শেষ সীমা নির্দেশ করিয়াছে। বঙ্কিম দেবী চৌধুরাণীর প্রফুল্লর ন্যায় লবঙ্গকে কোন ধর্ম-তত্ত্বের মূর্ত বিগ্রহ করেন নাই। কিন্তু সে কোন বিশেষ সাধনা-পদ্ধতির অনুসরণ না করিয়াও নিষ্কাম ধর্মের একই লক্ষ্যে পৌছিয়াছে। হিন্দুনারীর জীবন সংস্কার যদি বিকৃত আদর্শানুগামী না হয়, তবে ইহাই তাহার স্বাভাবিক পরিণতি। লবঙ্গ হয়ত রামসদয় মিত্রকে বৈকুণ্ঠেশ্বর ভাবে নাই, তাহাকে কোন দার্শনিক মহিমামণ্ডিত করিয়া আদর্শায়িত করে নাই. কিন্তু তাহাকেই সহজভাবে, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া, অবদমিত কামনার ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাসে মলিন না করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই পরীক্ষা হয়ত প্রফুল্ল অপেক্ষা কঠোরতর। প্রফুল্লর সংসার গ্রন্থিচ্ছেদনের ক্ষুরধার বুদ্ধি বঙ্কিম আমাদিগকে অনুমান করিয়া লইতে বলিয়াছেন। লবঙ্গর ক্ষেত্রে আমরা উহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই। লবঙ্গলতা যে গৃহাঙ্গনে রোপিত হইয়াছে তাহাকেই সে ছায়াস্নিগ্ধ আচ্ছাদন দিয়াছে। অমরনাথ ও লবঙ্গলতা —ইহারাই, একজন বুদ্ধি-অনুভবের ক্ষেত্রে, অন্যজন কর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে, জীবনরসের সারনির্যাস নিষ্কাশনে সমর্থ হইয়াছে। অমরনাথ ইহজীবনের প্রশ্ন সঙ্কুলতার মধ্যে পরম সার্থকতার উত্তরটি আবিষ্কার করিয়াছে, লবঙ্গ উহার আনন্দময়, অবিচল কর্তব্যনিষ্ঠার সহিত পরজীবনের বাঞ্ছিত প্রসাদের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া ইহ ও পরকালের মধ্যে মিলনের আশ্বাসে চিত্তকে স্থির রাখিয়াছে।

আর একটি ক্ষুদ্র বিষয়ের অবতারণা প্রয়োজন মনে হইতেছে। শচীন্দ্র রজনীর বিবাহ স্থির করিয়াছে সপত্নী-যুক্ত পরিবারে। প্রফুল্লকুমার এই জন্য প্রত্যক্ষভাবে শচীন্দ্রকে ও পরোক্ষভাবে বঙ্কিমচন্দ্রকেও দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। এক যুগের আদর্শ লইয়া অন্য যুগের বিচার করিলে এরূপ প্রমাদ স্বাভাবিক। শুধু বঙ্কিমের যুগে নয়, ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত দুঃস্থ পিতামাতা কন্যাকে সতীনের উপর সমর্পণ করাকে বাঞ্ছনীয় না মনে করিলেও নীতি-বিরুদ্ধ মনে করিতেন না। একপত্নীত্বের আদর্শ অতি-আধুনিক যুগের নীতিবোধ সঞ্জাত। তা ছাড়া শচীন্দ্রের নিজ পরিবারে তাহার পিতার দুই বিবাহ এবং তাহার সাংসারিক অভিজ্ঞতাতে এই সপত্নী সমাবেশ নিতান্ত অপ্রীতিকর হয় নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাহার প্রতিবাদ সোচ্চার হইলেও ক্ষীণ। সমাজের নিম্নপর্যায়ভুক্ত দরিদ্র মালীর কানা মেয়ের পক্ষে ইহা অপেক্ষা ভাল বিবাহ ব্যবস্থার জোটার অসম্ভাব্য—তাই শচীন্দ্রকে কতকটা অনিচ্ছার উপর এইরূপ বিবাহ প্রস্তাবে রাজী করিয়াছে।

যোগ বিয়োগ

বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়

এটাই সত্য—একটি বস্তুর সাথে অপর একটি বস্তুর মিলন যজ্ঞই যোগ। সুতরাং দেহ-মন কিম্বা মন ও মানুষ এই দুই-এর মধুর মিলন নিশ্চয়ই যোগ পর্য্যায়ভূক্ত। তার একটা ফল আছে। নির্ভুল ফলপ্রাপ্তিই যোগাঙ্গের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ। গণনায় ভুল হলেই যত গণ্ডগোল।

দেহ-মন বা মন ও মানুষের যোগফল নিয়েই তো আজকের বক্তব্যের অবতরণিকা। যোগের ফল প্রাপ্তি ও ভোগ নিয়েই এক শ্রেণীর আচার্য্য বা যোগী যাই বলুন তারা কত কি কেচ্ছাকাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন। তারা যোগ বিদ্যাকে মাধ্যম করে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে যত রকম ছলা, কলা, রঙ্গ, তামসা, দেব ও অলৌকিকতার সম্মোহনী ম্যাজিক খেলা খেলেন। ম্যাজিসিয়ানদের ধর্ম্মই হলো লৌকিক বস্তুকে অলৌকিকের আবর্ত্তে ফেলে লোক ঠকানো। তবে ঠকাবার কৌশলপদ্ধতিতে সিদ্ধহস্ত না হলে কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। ম্যাজিসিয়ান খুব জানে আমি আমার যাদু কৌশলে লোক ঠকাচ্ছি—সেই সুযোগে ম্যাজিসিয়ান মানুষে উপরর আপন ইচ্ছা চরিতার্থ করে আনন্দ পান, আর অনুরাগীবৃন্দ বোকা বলে ঐ ভেল্কি ভোজবাজিতে মেতে গিয়ে আনন্দ করেন এবং অনুরক্ত হয়ে পড়েন অলৌকিক ব্যক্তি হিসাবে আকৃষ্ট হয়ে। তখন নিজ জীবন সত্বাকে মোহতলে বিলিয়ে দিয়ে সমাগত বিয়োগ জীবন দেউলের ছাউনি তোলার আয়োজন করেন। এমনি করেই মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারায়। এই কি যোগ? এই কি আমাদের দেশজাত যোগী? অষ্ট যোগ বা যোগীর জন্ম প্রথম আমাদের ভারতবর্ষে। শাস্ত্রে এই যোগ ও যোগীর মহিমা অনন্ত। এই দেহ-মন বা মন ও মানুষ ভগবৎ শক্তিলাভের তরণীমাত্র। এই তরণীর সান্নিধ্যেই বৈতরণী পার হ'তে হবে, তবে তো পরমারাধ্য বৈকুণ্ঠ দর্শন হবে। পারের চিন্তা নিজে না করে চিন্তামণিতে সমর্পণ করতে পারলে নিজ বিবেকবুদ্ধি বিচার নিরপেক্ষ থাকে। সেখানে যত ঘাটতি গেলেই যত গণ্ডগোল।

এই সত্যকে তামাম যোগীরা যতক্ষণ উপলব্ধি করতে না পারবেন ততক্ষণ তারা যোগী নন রোগী। রোগের উপসর্গ ভোগের নিশানা। Material অর্থাৎ বস্তুবাদ দিক থেকে বিচার করতে গেলে নিভূ'ল হিসেব পাওয়া যায়, দেহটি একটি নিগেটিভ পদার্থ, আর মনটি পজেটিভ পদার্থ। উভয়ের জাত ধর্ম্ম আছে। প্রকৃতিজাত কর্মতৎপরতাও আছে।

বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়

কিন্তু এই দুই-এর বিজ্ঞানজাত প্রবাহে প্রকাশ করে বিচিত্র ধারা। আলো, আওয়াজ, গতি, বাতাস ইত্যাদি তারই শাস্ত্রগত বিজ্ঞান প্রকাশ। ব্যবহার বিধি বিবুদ্ধিতায় পরিবর্তন হলে বা করলে অপ্রকাশ থেকে যাবে তার খাঁটি প্রকাশ অর্থাৎ ফিউজ। নিত্যনৈমিত্তিক জীবধর্ম কর্মেও ঠিক একই বিজ্ঞানের স্বীকৃতি রয়েছে।

যোগের মাধ্যমে যোগীর মধ্যে ঈশ্বর কৃপার যে বিভূতি বিস্তার লাভ করে—তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সুরু হলেই

যোগ বিভূতি লয় পায়। কারণ সে তখন ঈশ্বরকে ক্রমশই ভুলতে সুরু করে অবচেতন অহমিকার আমন্ত্রণে এবং তখন সোহং সেজে ম্যাজিসিয়ান হয়ে পড়েন।

মহাশক্তির অধিকারে মানুষ যোগী ঈশ্বরশক্তি তুলনায় অণুবিশেষ। ঈশ্বর "বিভু" শক্তি সম্পন্ন। সেই অণুরও মূল্য থাকে। সাধারণ মানুষ তা পেতে পারেনা। ঈশ্বরের এই অণুশক্তিকে লাভ করতে মানুষকে ত্যাগধর্ম্মকে প্রথম গ্রহণ করতে হয়েছিল—তারপর আরাধনা। সুতরাং তারও একটা তাৎপর্য্য আছে বৈকি। তা'বলে অনুশক্তি বিভুশক্তি সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষকে ধোকা দেবেন, ঈশ্বর তা সহ্য করবেন কেন? ভগবান্ সহ্য করেন তখন যখন ঐ অণুশক্তি বিভুশক্তির সাধনায় মগ্ন। তখন কিন্তু বিভুশক্তি অণুশক্তির কাছে হার মেনে বশ্যতা স্বীকার করে—যেমন ঈশ্বর ভক্তের কাছে সব সময়ই বশ্যতা স্বীকার করে আছেন। কেন? প্রহ্লাদ, ধ্রুব, শ্রীচৈতন্য, যিশু, শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানকে বশে আনেননি? এনেছিলেন ভক্তিযোগে সর্ব্বসমর্পণ যজ্ঞের মাধ্যমে। তাঁরাও তো বিভূতিলাভ করেছিলেন যোগেরই মাধ্যমে।

কিন্তু আধুনিক কালের এক শ্রেণীর যোগী যেই মুহূর্ত্তে অলৌকিক শক্তি লাভ করলো অমনিই নিজেকে বিভূশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরূপে সবার মাঝে পরিচয় করাতে চান। এই অহং ভাবই তখন ষড়রিপুর দাসত্ব গ্রহণ করে যোগীকে ভোগী করে তোলে। ঈশ্বরে ও মানবে Qualitative এবং Quantitative এর পার্থক্য ভুলে গিয়ে Qualitative-এর মাহাত্ম্য ঘোষণা করে। সুতরাং যোগকে আশ্রয় করে জীবনালেখ্য বিয়োগের পালা যারা এমনি ভাবেই শুরু করেন চরম দুর্দ্দশার পরিণতি তাদের শত গুণে দেখা দেয়। সেই ইতরবৃত্তির ভাগ পান তারা, যারা অনুরাগী ও অনুরক্ত হয়েছিলেন অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। এই চির-সত্যকে অস্বীকার করার স্পর্দ্ধা একমাত্র তাদেরই আছে, যারা এই মহান যোগবিদ্যাকে নিয়ে ভোগের এক আড়ম্বর পূর্ণ নৈবদ্য সাজিয়ে ভোগ বিলাস পূজা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এ জাতীয় যোগ ও যোগীর লণ্ডভণ্ড কারখানা বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে অনেক গড়ে উঠেছে। Production হচ্ছে তেমনি যতসব দুষ্টের দল। তারা সত্য সুন্দর বস্তু হতে বিশ্বাসের মান তুলে নিয়ে মিথ্যা ও অবাস্তরের প্রতি বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করে আত্মার আত্মীয়তা হারিয়ে ষড়রিপুর সাথে করে মিতালী—ফলে সদুপদেশ ও নির্দ্দেশ তাদের জন্য হয়ে পড়ে এক প্রহেলিকা বিশেষ।

দেখেছি এমন অনেকে আছেন, যারা যোগের নামে কৃত্রিম বিভূতি সরসবাণীতে রচনা করে বিবিধ ধরণের ব্যবসায় লিপ্ত আছেন মুখোস পড়ে। এই ধরনের পশুজাত মনোবৃত্তির মধ্যে না আছে সৃষ্টির প্রেরণা, না আছে সংবেদনশীলতা। কিন্তু কৃত্রিম মানুষ—মানুষের রূপের ভেতর দিয়ে কামনায় ফুটিয়ে তোলে লালসা এবং দেহকে আশ্রয় করে প্রচ্ছন্ন করে তোলে তার ইতর বৃত্তির কৃত্রিম ঐশ্বর্য্য। তার এই নিজ প্রকৃতিজাত পরিণাম বা Evolutionএ চেতনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়ে দেবমানব যে পশুমানবে রূপান্তরিত হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে?

আসল যোগীর প্রকাশ ঠিক তা নয়। সে অতি সাধনায় ঈশ্বরদত্ত ঐ অণুশক্তিতেই পরম বিভূতিশক্তির কৃপা প্রার্থনা জানায় অবিরত। সে উপলব্ধি করবে তার অণুশক্তির মাধ্যমে যে আমি একটি "SPARK" মাত্র। বিভুশক্তি সম্পন্ন ঈশ্বর হলেন FIRE. ঈশ্বর বিরাট অগ্নি। আমি অগ্নির অতি ক্ষুদ্রতম অংশ অর্থাৎ আমি বিরাটেরই অতি ক্ষুদ্রতম অংশ, সেই জন্য ঐ ক্ষুদ্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তুচ্ছ হলেও ঈশ্বরদত্ত। এইটুকু শক্তিকে মাধ্যম করেই আমায় কর্ত্তব্য করে যেতে হবে তাঁকে সমর্পণ করে—স্মরণ করে। তবেই মানুষের "অণুবিভূতি" সমাজ, সংস্কারে জাতীয় কল্যাণে কল্যাণকর হবে

"বিভূতিলাভ হয়েছে বা করেছি"—এই তন্ময়াচ্ছন্ন ভাবই অহং এবং ঈশ্বরের বন্ধুত্ব বাতিল করার—এবং তাঁর শরণাগতি হতে সরে যাবার ও বঞ্চিত হবার একমাত্র পথ। তখনই যোগী বা আচার্য্যরা এবং স্বামীজিরা যোগভ্রষ্ট হয়ে অলৌকিক বৃত্তি নিয়ে বাজার মাত করে রাখার ইতরবৃত্তি অবলম্বন করেন।

যোগীর আচরণ, আভরণ এবং আকর্ষণ হবে মায়ামুগ্ধ মানুষের অবচেতন মনের সুপ্ত বা লুপ্ত উৎকর্ষকে স্বীয় শক্তি দ্বারা সৎজ্ঞানের শিখরে শাস্ত্রগত নির্দ্দেশে পৌঁছে দেওয়া। ভাঙ্গাহৃদয়ের অপকর্ষকে ছাইচাপা দিয়ে তখন প্রাপ্ত উৎকর্ষই তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে প্রাণ ধর্ম্মের রস ও লীলাধামে।

শাস্ত্রে আছে—নরনারীর মধ্যে খুঁজে বেড়ায় শুদ্ধস্থচী আনন্দ, মধুময় মাধুর্য্য ও উজ্জীবিত রস। তেমনি নারীও নরের ভেতর পেতে চায়—দেখতে চায় চিৎশক্তিসম্পন্ন পৌরুষোচিত দীপ্তি, অপর মহিমা প্রভৃতির সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য। এই অধ্যাত্ম মিতালী ঈশ্বর প্রেমেরই ইসারা। দৈহিক কামনার স্থান সেখানে অতি নগণ্য। শুধু আত্মীয়তা বোধে কুলধর্ম্ম রক্ষার্থে মাত্র। কিন্তু এই ভক্তি যোগের সেই গভীর আকুতি মিনতি কেন মানব মনে দুর্ব্বলসুযোগের ছায়াপাত করে। যোগ ও প্রাণায়াম অধ্যবসায়ী প্রলোভনের প্রতাপে ভুলে যান যে আমাদের এই অনুশক্তি দ্বারা ঈশ্বর কৃপার একমাত্র শাস্ত্রগত পথ শুদ্ধ অষ্ট যোগ ও প্রণায়াম অনুশীলনে—এর ব্যতিক্রমেই যোগভ্রষ্ট হয় মানুষ। যোগী প্রাণায়ামের মাধ্যমে প্রাণধর্ম্মের দীক্ষা পান ও তাতেই প্রাণের আয়াম অর্থাৎ শান্তি স্থাপন হয়। কলুষচিত্ত শুদ্ধ হয়। ঈশ্বরের কৃপাবিন্দু তখনই লাভ হয়। তার আগে নয় এবং তাই হল ঈশ্বর প্রদত্ত অণুশক্তি বা মানবে ঈশ্বরের অনুভূতি। সেই অমূল্য সম্পদ যদি আত্মচারিতার্থে ব্যাপৃত থাকে ঈশ্বরচিন্তা আসবে কেমন করে? বলুন তখন রিপুর দাসত্ব ছাড়া আর কি গতি আছে? একটা কিছুতেই তো তখন আত্মবিস্তার করতেই হবে। ঐ ক্ষেত্রে দুষ্টশক্তির মতলবই তখন সহায় সম্বল হয়ে দাঁড়ায়। সেই শয়তানী ও ভণ্ডামী করলে যদি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সম্মোহিত হন, কেন তারা আত্মবিস্মৃত হবে না? সেখান থেকে তখন ছুটি পাওয়া কিংবা জন্মের মত ছুটি নিয়ে আসা যদিচ কঠিন, তথাচ বেরিয়ে আসবার সহজ একটি মাত্র পথ আছে—তখন দীক্ষা বা শিক্ষাগুরুর শাস্ত্রোক্ত হিতোপদেশ শ্রবণ ও গ্রহণ করা কায়মনোবাক্যে।

আধুনিক যুগের মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন যেখানে যোগীর বৃত্তি ভোগ—সেইখানেই মানসিক ত্রিবিধ রোগ। যোগ সেখানে একটি ফলস্ ম্যাজিক ষ্টিকের মত কাজ করে মাত্র। অষ্টযোগ মাহাত্ম্য তারা ভোগলালসার অবগুণ্ঠনে রেখে অলৌকিক দ্রব্যগুণের কৃত্রিম মাহাত্ম্য প্রচারে নিজেকে একটা সমস্যামূলক আবর্ত্তের ফলে চরিতার্থমূলক স্বভাব ধর্ম্মের মধ্যে ঘূর্ণিপাকের মত কেবলি ঘূরপাক খেতে থাকেন। কাজে কাজেই ঐ শ্রেণীর যোগীবাবা যোগী স্বামীজীদের তন্ত্রমন্ত্র দ্রব্য সম্ভারের ভণ্ডামীতে আপন সত্যকে বিসর্জ্জন না দিয়ে—আপন সত্য ও নিয়তির প্রতি বিশ্বাস রেখে একান্তই যদি ইচ্ছা হয়—শুদ্ধ যোগ প্রাণায়াম সিদ্ধ সাধু যোগীর ভক্ত হোন, অনুরাগী হন মহামুক্তির প্রয়াসে। সেই সাধু যোগীর পরিচয় নিষ্কাম, অক্রোধ, বাক্‌সংযম, মিতাচার ও লৌকিক আচার ও আড়ম্বরহীন। মানুষ নিজেকে দেহ ও মনে দুর্ব্বল বোধ করলেই কোন কিছুতে আশ্রয় নিয়ে দেহমনের সবলতা লাভের প্রত্যাশী হন। সেই সুযোগে যদি যোগী ডাক্তার আত্মচরিতার্থে উন্মত্ত হয়ে পড়েন তবে মহাপাতকী হন। আর যিনি আত্মচরিতার্থের সুযোগ দিলেন তিনিও পাপী।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে দেহ মনের সংকর্ম্ম ধারার মহামিলনই হ'ল অষ্টযোগবিদ্যা। এই বিদ্যাভ্যাসে যারা আপন ইচ্ছানুভূতির আয়ত্বে অনায়াসেই আনতে সক্ষম হন এবং সেটাই তার অষ্ট যোগসিদ্ধ বা যোগফল।

সৃষ্টির আদিমতম এককোষী জীব থেকে সুরু করে সর্ব্ব প্রাণিসাধারণ জৈব সংগ্রামের মধ্যে যে জীবনের পরিপূর্ণতা আসে—আসে জীবনের আত্মবিকাশমুখী অধ্যাত্ম সংগ্রাম-এরই মধ্যে। মনে রাখতে হবে কোন কারণেই যোগ মাহাত্ম্য যেন বিয়োগ না হয়—এই পথেই মানুষ অমরাবতীর দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘোষণা করবে—

"মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?"

বেদান্তে নূতন আলোকপাত

অধ্যাপক ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের বেদান্তদর্শন দেশে বিদেশে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দর্শনরূপে যুগে যুগে বন্দিত। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা মহাদেশে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণী এই বেদান্তের মাধ্যমেই বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ভারতে ও ভারতের বাহিরে বেদান্তের জনপ্রিয়তাও অল্প নয়। বস্তুতঃ, ভারতের দর্শন বলিতে লোকে, সাধারণতঃ, বেদান্ত-দর্শনই বুঝিয়া থাকে। বেদান্ত দর্শনের মূল কথা কি? তাহা হইল তাত্বিক দিক হইতে বিশ্বাত্মবাদ এবং ব্যবহারিক দিক হইতে বিশ্বমৈত্রবাদ। এই দুইটী অতি মহান্ তত্ত্ব নিঃসন্দেহ। এই কারণে দেশে বিদেশে বেদান্তের পঠন-পাঠন বিশেষ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে আজ পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ প্রকৃত পাণ্ডিত্য-ব্যঞ্জক বিজ্ঞানসম্মত বেদান্ত বিষয়ক গবেষণা হয় নাই।

এই কারণে বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা মহাবিদ্যালয়, কলিকাতাস্থ সরকারী লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের জনপ্রিয় স্বনামখ্যাত অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী কর্তৃক বিরচিত "The Doctrines of Srikantha" নামক ৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীটস্থ প্রাচ্যবাণী হইতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত (মূল্য ২০+৩২,=৫২, বায়ান্ন টাকা) গ্রন্থ সর্বদিক হইতে বিশেষভাবে অভিনন্দন যোগ্য।

বেদান্তদর্শনের বহু সম্প্রদায় আছে। কিন্তু অধিকাংশ সম্প্রদায়ই বৈষ্ণব। শৈবশাক্ত সম্প্রদায়ের ভাষাসূত্রভাষ্য সাধারণে প্রায় অজ্ঞাত। তন্মধ্যে শ্রীকণ্ঠ শৈবাচার্য বিরচিত শ্রীকণ্ঠ-ভাষ্য প্রখ্যাত। তাহা সত্ত্বেও শ্রীকণ্ঠ-বেদান্ত সম্বন্ধে পঠন-পাঠন এ যাবৎকাল হয় নাই। তাঁহার ভাষ্য-সূত্রভাষ্য বহুদিন পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছিল; বর্তমানে তাহা একবারেই দুষ্প্রাপ্য। বিশেষ করিয়া এই সকল কারণে ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরীর এই দুই খণ্ড শ্রীকণ্ঠ সম্পর্কিত পুস্তক বিদগ্ধসমাজে বিশেষ সমাদৃত হইবে, নিঃসন্দেহ।

Doctrine of Srikanthaর প্রথম খণ্ডে শ্রীকণ্ঠ—মতানুযায়ী ব্রহ্ম-তত্ত্ব সুললিত ইংরাজীতে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। তিনশতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাণ্ডিত্যমূলক ও সুখপাঠ্য। এই অমূল্য গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ডে ব্রহ্ম বিষয়ক বহুবিধ তত্ত্ব যুক্তিতর্ক সহকারে এবং সম্পূর্ণ মৌলিক ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ব্রহ্মই বেদান্ত দর্শনের মূলীভূত তত্ত্ব। কিন্তু একমাত্র ব্রহ্ম সম্বন্ধে স্বতন্ত্র এবং এরূপ একান্ত গ্রন্থ পরিদৃষ্ট হয়না। ইহাতে ব্রহ্মের স্বরূপ, গুণ, শক্তি, কার্য, দেহ সম্বন্ধে বিশদ পর্যালোচনা আছে। তাহার পরে প্রমাণাবলী সম্বন্ধে প্রপঞ্চনা আছে। পুনরায়—দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম কেন্দ্রীভূত ও দুর্বোধ্যতত্ত্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে বহু পৃষ্ঠাব্যাপী অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবরণী আছে। একদিক হইতে বলা চলে যে এই সৃষ্টিতত্ত্বই দর্শনের দুরূহতমতত্ত্ব। এই তত্ত্বটী যুক্তি সঙ্গতভাবে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে পারিলেই সেই মতবাদও দার্শনিক ভিত্তিতে স্থাপিত করা সম্ভবপর হয়। সেই কারণে—ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী এই সৃষ্টি-তত্ত্বের এরূপ সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বেদান্ত-সম্মত সৃষ্টিতত্ত্ব দুইটি—শঙ্করাদির বিবর্তবাদ ও রামানুজাদির পরিণামবাদ। দুইটি মতবাদের বিরুদ্ধেই বহু আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। বিবর্ত-বাদের বিরুদ্ধে রামানুজের প্রখ্যাত সপ্তানুপপত্তি বা সাতটি প্রধান আপত্তি আছে, অপরপক্ষে—পরিণামবাদের বিরুদ্ধেও সাতটি প্রধান আপত্তি ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্যেই পূর্বপক্ষ করিয়া উত্থাপিত হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠ পরিণামবাদী, এই কারণে ডক্টর রমা চৌধুরী এই সাতটি আপত্তির ব্যাখ্যাও খণ্ডন করিয়াছেন—অতি সুবিস্তৃত প্রাঞ্জল ও যুক্তিসঙ্গতভাবে। এরূপ অতি সুন্দর আলোচনা পূর্বে দেখি নাই। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁহার নিজের মতের মৌলিকত্ব সুপরিস্ফুট। তিনি যেরূপ অভিনব ভাবে অথচ যুক্তিবিচার সহকারে এই

আপত্তিগুলির যথার্থ অর্থ এবং তাহাদের মমার্থ খণ্ডন প্রণালী বিবৃত করিয়াছেন, তাহা সত্যই পরম বিস্ময়াবহ।

আর একটী তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার মৌলিক অভিনব মতবাদ সকলের প্রণিধানযোগ্য—সেটি হল ভারতীয় দর্শনের মূলভিত্তি কর্মবাদ। এই কর্মবাদ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্ত্য জগতে বহু ভ্রান্তধারণা রহিয়াছে। অথচ ইহার সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনাদি প্রায় নাই বলিলেই হয়। সেজন্য ডক্টর শ্রীমতী রমা অতি যত্নের সহিত কর্মবাদের প্রকৃত অর্থ প্রপঞ্চিত এবং তাহার বিরুদ্ধে সংভাব্য বহু আপত্তি খণ্ডন করিয়া ভারতবাসী মাত্রেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ভারত-দর্শন-প্রেমিক প্রত্যেককেই এই অংশটি পাঠ করিতে আমি অনুরোধ করি।

ভারতের নীতিতত্ত্ব জগতে একটি অপূর্ব বস্তু। ভারতবর্ষের নিষ্কাম কর্মবাদ নিঃসন্দেহে জগতের একটি শ্রেষ্ঠ নীতিতত্ত্ব। অথচ এই সম্বন্ধে বহু ভ্রান্তধারণা দেশ-বিদেশে আছে। ডক্টর শ্রীমতী রমা এই সম্বন্ধেও অতি বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনাসমূহ ভাবের মৌলিকতা ও যুক্তিতর্কের তীক্ষ্ণতায় সমুজ্জ্বল।

আদ্যোপান্ত গ্রন্থটি এক নিঃশ্বাসেই পড়িয়া ফেলার যোগ্য। বেদান্ত সম্বন্ধে অধিকাংশ গ্রন্থই কেবল একই পুরাতন তত্ত্বের পুনরাবৃত্তিমাত্র তাহাতে আলোচনাও নাই, মৌলিকতা ত দূরের কথা। এই উভয় দিক হইতেই ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরীর এই অতি উপাদেয় গ্রন্থখানি স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ইহা কেবলমাত্র তথ্যবিবরণী নয়। তাহার চেয়েও বড় কথা ইহা আদ্যোপান্ত যুক্তিসঙ্গত বিশদ আলোচনা এবং সব থেকে বড় কথা—ইহা আদ্যোপান্ত তাঁহার মৌলিক মতবাদের অতি সুন্দর প্রপঞ্চনা।

Doctrines of Srikanthaর দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীকণ্ঠ ভাষ্যের অতি সুললিত ও মূলানুগ ইংরাজী অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠ ভাষ্যের কোনও অনুবাদ কোনও ভাষায় পূর্বে হয় নাই। সেই দিক হইতেও ইহার মূল্য অনেক। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শ্রীকণ্ঠভাষ্য গ্রন্থটিই বর্তমানে একান্ত দুষ্প্রাপ্য। নানাবিধ ব্যাখ্যা ও টীকাটিপ্পনীসহ অনূদিত এই খণ্ডটিও সর্বদিক হইতে অশেষ মূল্যবান্।

গ্রন্থ দুইটির ভাষা সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। সাধারণতঃ দার্শনিক গ্রন্থগুলির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে ঐ গ্রন্থগুলি দুর্বোধ্য ও অপাঠ্য। সেই ভয়ে অনেকেই দর্শনগ্রন্থ স্পর্শ করেন না। তাহাদের সকলকে ডক্টর রমা চৌধুরীর এই দুইটি গ্রন্থ পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিব। অতি সুন্দর, সুললিত, সুখবোধ্য ইংরাজী ভাষায় বিরচিত এই গ্রন্থ দুইটি সাহিত্যের দিক হইতেও স্থায়ী সম্পদ, নিঃসন্দেহ। প্রকৃত দার্শনিকই যে প্রকৃত কবি, তাহা ডক্টর শ্রীমতী রমা প্রমাণিত করিলেন। তাঁহার সুমিষ্ট, কবিত্বপূর্ণ ভাষা সত্যই সাতিশয় হৃদয়গ্রাহী।

বহু বৎসর ধরিয়া ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী বেদ-বেদান্ত প্রচারে ব্রতিনী হইয়া আছেন। আধুনিক যুগের ব্রহ্ম-বাদিনীর এই প্রচেষ্টায় আমরা সকলেই অতি কৃতজ্ঞ। সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, তিনি কেবল ব্রহ্মপ্রচারিণীই নন, প্রকৃত অর্থেই—ব্রহ্মবাদিনী। অর্থাৎ তিনি কেবল বেদান্ত আলোচনা ও প্রচারই করেন না, বেদান্তসম্মত জীবনও পালন করেন।

সর্বজনশ্রদ্ধেয়া ব্রহ্মবাদিনী শ্রীমতী রমার এই সাধনা জয়যুক্ত হউক। তাঁহার এই গ্রন্থে বেদান্ত বিষয়ক অন্যান্য তত্ত্ব প্রপঞ্চনাসূচক তৃতীয় খণ্ডের জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি। *

---

* Doctrine of Srikantha, Vols 1+2, Prachya Vani Series, 3, Federation St, Calcutta By Principal Dr. Roma Chaudhuri. Prices Rs 20 and 32 respectively.

ফিরে আসা সেই রাতে

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

—'নালোবদলায়েঁ'এ' অনুষ্ঠান শেষ হ'য়েছে সবে মাত্র।

নাম বদলানোর রীতিনীতি পালনের ত্রুটি হয়নি কোনো। পুরোহিতের কথা মতো তখনো পদ্মাবন্তী বিয়ের পিঁড়িতে বসে আছে ওড়নাঢাকা মুখে। পাশে অচুমল বসে।

নাইলনের দোপাট্টার ভিতর দিয়ে কৌতুকঝরা তেরছা চোখে দেখলে অচুমলকে পদ্মাবন্তী। রুমালটা মুখে চেপে ধরেছে অচুমল। তবুও রুমালের ফাঁক দিয়ে চাপা হাসি উঁকি মারছে।

ও হাসির মর্ম বুঝলে পদ্মাবন্তী। ও হাসি যেন তার মনের কানে কথা কইলে; যেখানে দু'টো মনই এক হ'য়ে মিলে আছে, সেখানে আবার নামে-নামে মিল করতে নতুন নামকে টেনে আনা হ'ল! আসল নাম পাল্টানো হ'ল!

নাম পরিবর্তনে পুরোহিতের নির্দেশ সিন্ধীসমাজের ছেলেমেয়েদের শিরোধার্য। অবশ্য নামের আদি অক্ষর নিয়ে, রাশিতে রাশিতে অমিল যাদের—অন্যদের নয়।

এক্ষেত্রে নিজেদের অনিচ্ছা সত্বেও অচুমল পদ্মাবন্তী পুরোহিতের আদেশের মর্যাদাই দিলে অর্থাৎ নাম বদলানো মেনে নিলে তারা।

বাপ-মার রাখা আদুরে নাম, অচুমলের পছন্দসই মিষ্টি নাম নিমেষে হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্য। পদ্মাবন্তী হ'ল লীলা দেবী।

বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ী এসে, অচুমলের মুখের 'লীলা' ডাক শুনে, হেসে কুটি কুটি হয়েছে পদ্মা। বলেছে অচুমলকে, দেখ! লীলা নামটায় কেমন ভয় ধরে। তোমার মুখের লীলা—নীলার মতো শোনায়! নীলা নাকি সয় না সবার!

জোরে হেসে উঠেছে অচুমল। দুশ্চিন্তার ভান করে, ভুরু কুঁচকে বলেছে, সেটাই মস্ত চিন্তার বিষয়। দেখা যাক্ কি হয়!

কোঁয়ার! বৌমা! ঘুমোও নি? রাত যে অনেক! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছো কি?

শাশুড়ীর ডাকে চমক ভাঙল পদ্মার। কোনো জবাব না দিয়েই, বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকল।

—এখন রাতে দিনে শাশুড়ী পদ্মাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে! আগেই দাঁতে পিষতো সারাক্ষণ! সে শাসনের দাপট স্নেহের কায়াকল্প করেছে যেন!

পদ্মাকে ঘরে যেতে দেখে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন শাশুড়ী। বৌয়ের দোষ ত্রুটি ধরার পূর্বঅভ্যাস গেছে তাঁর। বৌয়ের অন্তর্বেদনা বুঝেছেন তিনি। ওর দুঃখে সমভাগী হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করছেন।

বছরখানেক বিয়ে হয়েছে পদ্মা অচুমলের। মাস ছয়েক বেশ মনের মিলে—সুখে কাটিয়েছে ওরা।

বৌয়ের হাসির ব্যামো ছিল। কারণে অকারণে সবার সামনে হাসির জন্যে বকুনি খেয়েছে অনেকবার। জেদী মেয়ে। কানে কথা নেয়নি। বারণ শোনেনি কারো। ভদ্রতা-সভ্যতা-বনেদীর দোহাই গ্রাহ্য করে নি। বরং প্রগল্‌ভতায় প্রতিবাদ জানিয়েছে।

নিষেধের গণ্ডী ডিঙিয়ে, বৌয়ের হাটেবাজারে—অচুমলের অফিসে যাওয়ার জন্যে—জাতবেরাদার-পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে কম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়নি শাশুড়ীকে।

এই সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে যখন, তখনি শাশুড়ীর আভিজাত্যহানির মর্মব্যথা প্রচণ্ড রাগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অচুমলের ওপর।

শান্তশিষ্ট স্বল্পভাষী গম্ভীর ছেলেকে ঝাঁঝাল গলায় বলেছেন তিনি, বৌমাকে একটু শাসন—রাস টেনে রাখতে পারিস নে! লোকের কাছে মুখ দেখানো যে ভার হ'য়ে উঠছে!

বিনম্র মুখে উত্তর দিয়েছে ছেলে মাকে—পুরনো আমলকে আঁকড়ে ধরে থাকা অচল। সেই মুহূর্তে অবাধ্যতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি বৌ উচ্ছল হাসির ঢেউ বইয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকেছে।

বৌয়ের বেহায়াপনা দেখে, সমস্ত শরীরের রক্তকণিকা মুখে-চোখে এসে জমাট বেঁধেছে শাশুড়ীর। ছেলে-বৌয়ের কাছ থেকে সদ্যপ্রাপ্ত উপেক্ষা অপমানের আগুনকে নেভানোর জন্যে, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেছেন ঘর থেকে।

অবসর সময়ে—মাথার তাপটা একটু কমলে, নিজের মনে মনেই রোমন্থন করেছেন কথাগুলো—

—ছেলে-বৌয়ে একাত্মা। পুরোহিতের নাম মিল করানো অব্যর্থ বটে। কিন্তু সংসারের মিলে ভাঙন ধরবে—অমিল হবে এই বেসরম-নির্লজ্জ বৌকে নিয়েই। কেউ রুখতে পারবে না। তিনি দিব্যজ্ঞানে বুঝতে পারছেন। দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছেন সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য। ছেলেটাও বৌয়ের পাল্লায় পড়ে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছে দিনকে দিন!

শাশুড়ীর এই ভবিষ্যৎ চিন্তা অশুভ আশঙ্কা সত্যি হয়নি। উল্টো ফল ফলল। অমিল ঘটেনি সংসারে বৌয়ের জন্যে, ভাঙন ধরেনি। শাশুড়ীর চোখে এখন দু পুটটুর—ছেলে-বৌয়ের একাত্মার ভিত নড়েছে নিশ্চয়। পুরোহিতের অব্যর্থ মিলে টানে ধরছে। দিবালোকের মতো সত্যি সেটা।

মাস দুয়েকের মধ্যে বৌয়ের শাসন-না-মানা হাসি, মুখ থেকে মিলতে মিলতে—রেশটুকুও মিলিয়ে গেল। হাসির বদলে বিষণ্ণতায় ভরে গেছে মুখখানা। মুখরা বৌ একেবারে বোবা হয়ে গেছে। ছেলে বাড়ীতে আসে না বললেই হয়। মাঝে মাঝে ঝাঁকি দর্শনের মতো দর্শন. দেয় শুধু—পাঁচ সাত মিনিটের জন্যে। বাড়ীতে এলেই, কারো সংগে কোনো কথাবার্তা না কয়েই চলে যায় আবার।

শাসন করতে চেয়েছিলেন শাশুড়ী! এরকম কাণ্ড ঘটুক—বৌয়ের সর্বনাশ হ'ক—এটা স্বপ্নেও চান নি তিনি। একটা অজ্ঞাত অসোয়াস্তি বিষাক্ত কাঁটার মতো অহর্নিশি বিঁধছে শাশুড়ীর বুকের তলায়।

জানলার ধারে এসে দাঁড়ালেন শাশুড়ী। রেলিংয়ের ফাঁকে চোখ রাখলেন খানিক। একটা সাময়িক পরিতৃপ্তির নিশ্বাস টেনে নিলেন বুক ভরে। বৌয়ের দু'চোখ বোজা। তন্দ্রা আসছে হয়তো। ঘুমিয়ে পড়বে এখুনি। তবু কিছুক্ষণের জন্যে শান্তি পাবে তো! ঘুমই ওর একমাত্র ওষুধ!

নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন শাশুড়ী।

পদ্মা চোখ বুঁজে পড়ে আছে বিছানায়। পাতাচাপার ভিতর দুচোখে চেয়ে আছে ঠিকই। ঘুম আসছে না। আকাশপাতাল চিন্তা ঘিরে ধরছে তাকে।—বদলানো নাম নিয়ে কতো ঠাট্টাতামাশা করেছে পদ্মা। লীলাকে নীলা বলেছে। এখন বুঝতে পারছে। সে সত্যিই নীলা হয়ে দাঁড়াল অচুমলের কাছে। অচুমল সইতে পারবে না তাকে। পারলে না।

বিয়ের আগে কলকাতায় গেছে অচুমল। থেকেছে তাদের বাড়ীতে দিনের পর দিন। পাকুড়ে পাথর-খনির ইজারা নেওয়ার কথা বাবাকে জানাতো ও। মাটির তলায় পাহাড় ফাটানো—ছোট বড় মাঝারি ধরণের টুকরো পাথরগুলোর দেশবিদেশে চালান দেবার ব্যাপারেও আলোচনা করতো।

ব্যবসাসংক্রান্ত কোনো বিষয়েরই আলোচনার গোপনীয়তা ছিল না অচুমলের। পদ্মার সামনেই চলতো সব।

সিন্ধুর রোড়ী গ্রামের—একই দেশের লোক বলে—পরামর্শ-অর্থের সাহায্যে, অচুমলের প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন বাবা। বার বার বলতেন, ও বড় শান্ত-বিনয়ী-ভদ্র ছেলে।

কিছুদিনের মধ্যে বাবার প্রশংসাধন্য শান্তবিনয়ী ভদ্র ছেলে অচুমলের স্বরূপ প্রকাশ পেল।

পদ্মার কলেজে যাবার সময়—গাড়ীতে উঠার সময়, অপলক চোখে চেয়ে থাকতো পদ্মার দিকে অচুমল। মনে হত পদ্মার—অচুমলের দুচোখ যেন তার সর্বাংগে আটকে পড়েছে।

চাউনির ভংগী দেখে, রাগে গা রি-রি করে উঠতো

পদ্মার।—কী ভণ্ডামি! যেন কতো নিরীহ ভালোমানুষ ভাববিলাসী উদাসী পুরুষ!

রোজ এই বিরক্তিকর দৃশ্যের পুনরাবির্ভাবে বিষিয়ে উঠেছিল পদ্মার মনপ্রাণ। একদিন বলেই ফেললে সে অচুমলকে—এরকম কাউকে জীবনে দেখনি নাকি? চোখ দুটো অন্ধ করে দেবো এবার।

অবাক হ'য়ে দেখলে পদ্মা। অপদস্থ হওয়ার বদলে, ঘা খাওয়ার বদলে, অচুমলের চোখেমুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠল। নিঃসংকোচে বললে,—না। তোমাকেই প্রথম। ভারী সুন্দর তুমি! শিল্পীর সুন্দর হাতে পাথরে খোদাই গড়ন যেন।

কথাগুলো সর্বশরীরে আগুন ছড়িয়ে দিলে পদ্মার। বাবার কাছে নালিশ করতে দৌড়ল সে।

আদ্যোপান্ত শুনলেন বাবা মেয়ের মুখে। মেয়ে দেখছে নিমেষনিহত দৃষ্টিতে বাবার মুখ চোখ। খুঁজছে সেখান রাগের দানা বেঁধে উঠছে কিনা। নিরাশ হয়ে যাচ্ছে। —না। দানা বাঁধছে না। প্রশান্তিই ভেসে উঠছে সেখানে শুধু।

বাবা বোঝালেন মেয়েকে—অচুমলের শিল্পী মন সৌন্দর্যপিপাসু ও। ওর সত্যি কথা বলার সৎসাহসের জন্য খুশী খুব। তিনিও তো ওই ভাবের কথা কতোবার পদ্মাকে বলছেন।

বাবার বোঝানোয় নিজেকে যেন নতুন করে চিনলে পদ্মা। বুক থেকে পা অবধি চোখ বুলিয়ে নিলে।—এরকম কথা বাবা অনেকবার বলেছেন সত্যি। কলেজের বান্ধবীরাও। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেনি অচুমল তাহলে—মনের ভাব পরিবর্তন হওয়ার সংগে সংগে সৌন্দর্যের গরিমায় মুখখানা লজ্জারাঙা হয়ে উঠল পদ্মার। মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

করিডরের পূর্বদিকে দাঁড়িয়ে অচুমল। সামনের দিকে চাইতেই, অচুমলের মুগ্ধনয়নে ধাক্কা খেলে পদ্মার দুচোখ। এবার আর ভানকরা ভণ্ডামির চাউনি মনে হল না পদ্মার। যেতে যেতে সৌন্দর্য পিপাসুকে—তার রূপের স্তাবককে দেখার কৌতূহল জেগে উঠতে লাগল। লোভ সংবরণ করতে পারলে না। ফিরে ফিরে দেখলে। অচুমলের চোখও তার চলারপথে ঘুরপাক খাচ্ছে।

দিন কতক পরে।

সন্ধ্যের দিকে বাবার ঘরে বেশ হাসিতামাশা চলছিল তিনজনের—বাবা, পদ্মা আর অচুমলের—কৌতুকের মাঝে কথা কাটাকাটি সুরু হল অচুমলের সংগে পদ্মার। হঠাৎ উত্তেজনার মুখে, অচুমলকে 'গেঁয়োভূত' বলে ফেললে পদ্মা। মুহূর্তে বাবার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। 'ধান ভানতে শিবের গীত' গাইলেন তিনি। এরকম দুমুখ-কুঁদুলে-দস্যি মেয়ের উপযুক্ত মুরদ্-স্বামী হতে পারে, একমাত্র অচুমলই। না হ'লে বুঝতে হ'বে—অশেষ দুর্গতি ভোগ লেখা আছে ন'সিবে।

অচুমলের সামনে অপমানিত হওয়ায়, আত্মাভিমান মাথা চাড়া দিয়ে উঠল পদ্মার। আড়ালে বলতে পারতেন নাকি এসব কথা বাবা! আশ্রয়পুষ্টকে আস্কারা দেওয়ারও তো একটা সীমা আছে! নিজের মেয়েকে এতখানি ছোট করা! 'ছোট করা' কথাটাই মাথার ভিতর কুরে খেতে লাগল বেশী করে।

আশ্চর্য হ'য়ে, কানকে অবিশ্বাস করেও শুনেছে পদ্মা। যার কাছে বাবা তাকে ছোট করেছেন, যার স্বপক্ষ নিয়ে বাবা তার বরাত দেখিয়েছেন—সেই অচুমলই বাবাকে বলছে, পদ্মাকে বকলেন কেন? ও তো অন্যায় কিছু বলেনি। বাড়ীতেও তো ওই কথা ব'লে খেপায় সকলে।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পদ্মা। অচুমলও উঠে পড়ল। পদ্মাকে অনুসরণ করল। বারান্দায় ওর কাছে এগিয়ে এসে, জলভরা চোখের দিকে চেয়ে, চাপা গলায় বললে অচুমল—একি বোকা তুমি! বাবা যে আগে থেকে পরামর্শ ক'রে রেখেছিলেন রাগাবেন বলে। ঠিক কথা। রাগলে আরো সুন্দর দেখায় তোমায়!

রাগ-অপমান-অভিমান—সব ধুয়ে মুছে গেছল এক নিমেষে পদ্মার।

এরপর থেকে, অনেক ঘটনাতেই অচুমল মানুষটির ওপর রাগ করেও রাগ রাখতে পারতো না বেশিক্ষণ পদ্মা। নিজের কৃতকর্মের অনুশোচনায় লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পারতো না তিন চার দিন।

এ সত্ত্বেও পদ্মা রাগ করতে ছাড়তো না বাবার ওকালতির ওপর—অচুমলের প্রশংসায় পঞ্চমুখের জন্যে।

বাবার রাগানো অভ্যাসও বেড়ে চলল দিন দিন। সেই সংগে অচুমলের বোঝানোও।

বোঝানোর সেতু বেয়ে কখন অনুরাগের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে পদ্মা, বুঝতে পারে নি।

বুঝল একদিন। যেদিন তাদের বাড়ী থেকে, তাকে না বলে-কয়েই চলে গেল অচুমল।

কেন চলে গেল অচুমল? প্রশ্নটা ঠোঁটের আগায় এসেও থমকে গেছল। বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারেনি পদ্মা। গলায় পাথরভারী সরম চেপে বসেছিল তার। মনটা হাহাকারে ভরে উঠেছিল।

বাবার চোখে চোখ রাখতে, তিনি বুঝেছিলেন হয়তো মেয়ের মনের কথা। গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, অচুমলকে চলে যেতে বলেছি। ওর আচার-ব্যবহার বড় দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছিল। তোর বিয়ে হবে। পাত্র দেখা হয়ে গেছে। এসময় সরানো দরকার।

বাবার কথায়, মাথায় বাজ পড়েছিল পদ্মার। কানে তালা ধরে ছিল। চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। আচ্ছন্নের মতো ঘরে ফিরে, আছড়ে পড়েছিল বিছানায়। বুক ভাঙা কান্নার স্রোতে বালিশ ভিজে যাচ্ছে তখন—মনের ভিতর শুধু একটাই উপলব্ধি তোলপাড় করছে—তার হৃৎপিণ্ডকে টুকরো টুকরো করে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা হচ্ছে যেন।

বাবাও যে তার পিছু পিছু এসেছেন, বুঝতে পারেনি পদ্মা। বাবার স্নেহ-স্নিগ্ধ স্পর্শে চেতনা ফিরে পেল সে। শান্ত-সংযত হ'য়ে উঠে বসল। মাথায় হাত বুলতে বুলতে বাবা বললেন, বড়ো ধীর! পাগলী মেয়ে কোথাকার। কাঁদিস নে! পিয়ার করিস অচুমলকে? বেশ তো ওরই সংগে বিয়ে দেবো।

হ্যাঁ কি না, কোনো মতামতই জানায়নি পদ্মা, কেবল বাবার মুখের দিকে দুচোখের কান্না তুলে ধরেছিল। বুঝি-বা সে সময় তার জলভরা চোখে খুশীর ঝিলিক মেরেছিল। তারই প্রতিফলন দেখল যেন সে বাবার ছলছল চোখে—আনন্দ উপচে পড় পড়।

দেয়াল ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে পদ্মা—রাত এগারোটা।

—ঠিক একবছর আগে, এই সময়ে তার বিয়ে হ'য়েছিল অচুমলের সংগে। এ রাতে অচুমল নেই তার কাছে। মাস দু'য়েকের অনেক রাতই তার বিনিদ্র রজনী হয়ে কেটেছে একই ভাবে।

ভাবতেও বিস্ময় লাগে পদ্মার। গেল কোথা অচুমলের হৃদয়-জোড়া অতো প্রেম!

বাড়ীতে আসা সম্ভব হয় না। পাথর-খনির কাজ—সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়—স্রেফ অজুহাত অচুমলের।

সমাজ পছন্দ করে নি পদ্মার চাল-চলন। জ্ঞাতি-স্বজন বলেছিল, শৃংখলা নষ্ট ক'রে, বিশৃংখলা আনাই বৌয়ের ধর্ম। একটি দুষ্টক্ষতের মতো সমাজের বুকে বেড়ে উঠছে ক্রমে বৌ। আর এই বেড়ে ওঠার স্পর্দ্ধার ইন্ধন যোগাচ্ছে মুখবুজে সহ্য করে অচুমল—বৌ-ভক্ত স্বামী।

এসব অপ্রিয় কথা শোনার পর অচুমলের কাছে বলেছিল পদমা—আমায় নিয়ে অশান্তি যখন,—তোমারও বদনাম—আমাদের ডিভোর্স—বিয়ে নাকচ করে দেওয়াই ভালো।

পদ্মার মুখে হাত চাপা দিয়েছে অচুমল! সহানুভূতি ওপচানো কথায় বলেছে—যে যা ব'লে বলুক, কারো নতুন ধরণ চোখে পড়লে সংস্কারবদ্ধদের অস্বস্তি হয় ওরকম। ভুলে যাচ্ছ কেন—আমাদের সমাজে মুরশ-জালের—স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের নিয়ম নেই কোনো। মৃত্যুই একমাত্র বিচ্ছেদ!

চিবুক ধরে, আদর করে বলেছিল আরো অচুমল—ছাড়াছাড়ির কথা মুখে এনোনা আর। আমি তো কিছু মনে করি না। মা তুমাথে পিয়ার কর্‌া থো। প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি তোমায়।

অশান্তির আগুনে জল পড়েছিল পদ্মার সেদিন। আর মনে হয়েছিল, অচুমল অচুমলই—অন্য কেউ নয়।

কিন্তু এ ভাবকে বেশীদিন ধরে রাখতে পারেনি শত চেষ্টা করেও পদমা।

কথায় কাজে ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে তুলতে দেখতে পেল সে অচুমলকে। পৃথক পৃথক ভাব। এড়িয়ে যেতে চায় পদ্মাকে।

পারিপার্শ্বিক উত্তপ্ত আবহাওয়া—স্বামীবিমুখতার অস্বস্তিকর আওতা থেকে নিস্তার পেতে চাইলে সে। জুড়তে বাবার কাছে চলে গেল পদ্মা।

সাময়িক শান্তি পেতে গিয়ে, ফিরে এসে দ্বিগুণ অশান্তি ভোগ করতে হয়েছে শ্বশুর বাড়ীতে। এবারের অশান্তির মূল কা.ণ অচুমল নিজে। নির্মম আঘাত এসেছে অচুমলের দিক থেকে। অচুমলকে মনে হয়েছে পদ্মার—সংস্কার-বদ্ধদেরই একজন হয়ে গেছে যেন ও-ও।

বাবার কাছ থেকে এসে বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেল পদ্মা। ঘরের চার দেওয়ালে চোখ বুলিয়ে দেখলে ফোটো শূন্য। ফোটোগুলো কলকাতায় তোলা—তাতে অচুমলেতে এক-সংগে বসা-দাঁড়ানো নানা অবস্থার।

প্রথম যখন ঘরে টাঙিয়েছিল ফোটোগুলো পদ্মা, শাশুড়ী-ননদরা আখ্যা দিয়েছিলেন তাকে—বেআদব-বেসরম বৌ। তার পক্ষ নিয়েই জোরাল প্রতিবাদ জানিয়েছিল অচুমল।

এবারে ?

অচুমলের কথা শুনে বিস্মিত হতবাক হ'য়ে গেছল সে। —অকারণ কেন মাথা গরম করছে পদ্মা ? কেন চোর বলছে সবাইকে ? ফোটো সরিয়েছে সে। 'কেন'র উত্তর দিতে নারাজ।

স্তব্ধ নির্বাক হয়ে গেছে পদ্মা। অচুমল বেরিয়ে যাবার পরও ভেবেছে—অচুমলকে নতুন করে আবিষ্কার করলে সে। সংকীর্ণ মনের মানুষের সংগেই বিয়ে হয়েছে তার। প্রাচীন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন অচুমল। উদারপন্থীর মুখোশ পরে প্রবঞ্চনা করেছে তাকে। তার আব্বাকে—বাবাকেও। বাবাকে দিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিয়ে নেবার জন্যেই তাকে বিয়ে করা।

গুম-গুম-গুম !

পাথরখনির বারুদ ঠাসা গর্তে আগুন ধরেছে। ব্লাস্টিং হল। পাথর ফাটল। নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে শব্দ ভেসে এলো। সজোরে আছড়ে পড়ল পদ্মার হৃৎ-পিণ্ডের ওপর। এই হৃৎপিণ্ডপেষা যন্ত্রণা ভোগ করে পদ্মা ব্লাস্টিংয়ের প্রতিরাতে। সব বারের চেয়ে যন্ত্রণাটা অসহ্য হয়ে উঠছে যেন আজ বেশী করে।

যখুনি গুমগুম্ আওয়াজ কানে আসে তার—আওয়াজের গতি ধরে মনটাও ছুটে চলে যায় পাথরখনিতে। জমা দুঃখ-ক্ষোভকে উজাড় করে দিয়ে আসতে ইচ্ছে করে—ওই পাহাড়ফাটার পাথরবৃষ্টির তলায় নিজেকে বিছিয়ে দিয়ে। অনেকবার যেতে গিয়ে থমকে গেছে পদ্মা। ভেবেছে, সে দুনিয়ায় না থাকলে কার কি ক্ষতি ? কেন সে আহম্মকের মতো অন্যের ইচ্ছের, অচুমলের ইচ্ছের খোরাক হতে যাবে স্বেচ্ছায়—সব বুঝতে পেরেও !

পদ্মার মাথার ভিতর তালগোল পাকিয়ে উঠছে এক-চিন্তা। দারুণ অস্বস্তি পাগল করে তুলছে তাকে। পাথরখনির টানটাই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল ক্রমে। পাথরখনি টানছে পদ্মাকে। এটান থেকে বাঁচতে হবে—ছিটকে বেরিয়ে পড়তে হবেই তাকে।

বারান্দা থেকে সরে এলো পদ্মা। তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল। গেট খুলে বেরিয়ে পড়ল।

—বারোটার ট্রেন আছে। কলকাতায় ফিরে যাবে সে—বাবার কাছে।

গেটের পাশে, আস্তাবল থেকে সহিস ইব্রাহিমকে ডেকে জাগালে পদ্মা। গন্তব্য স্থলের কথাও জানালে —স্টেশান।

বৃদ্ধ ইব্রাহিম এ বাড়ীর পুরাণো সহিস। বাড়ীর মেয়েছেলে—সকলের সংগেই তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দ্বিরুক্তি না করে, সকলেরই আজ্ঞাবহ হয়ে আসছে বরাবর ও। কিন্তু এই প্রথম দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠল। হকচকিয়ে পদ্মার মুখের দিকে চেয়ে রইল।—এত রাত্তিরে বৌঠাকরুণ একলা···। কি করবে, কি বলবে—ভেবে স্থির করতে পারলে না কিছু ইব্রাহিম।

ইব্রাহিমের ইতস্তত ভাব দেখে, নিয়ে যাবার অনিচ্ছা বুঝতে পেরে, বললে পদ্মা—ভয়-ডরের কিচ্ছু নেই তোমার ! লুকিয়ে যাচ্ছি নে। মালিকের সংগে দেখা করেই যাব।

—স্টেশানে যাবার পথে মালিকের খনি পড়ে সত্যি। সাহসে নির্ভর করে, টাঙা গাড়ী বার করলে আস্তাবল থেকে ইব্রাহিম।

···গাড়ী চলেছে। পথের দু'ধারে পাথরগুঁড়োর প্রলেপমাখা সাদা ধবধবে মহুয়া গাছের সারি। পাথর-খনির রেল লাইনের ওপর, টুকরো পাথরে ভরতি ট্রলির সারবন্দী।

ঢেউ খেলানো উঁচুনীচু রাস্তায় টাঙা উঠছে নামছে

ছুটছে। উত্তর-দক্ষিণের মাঝে মাঝে বাতিল পাথর টুকরো জমাট বেঁধে বেঁধে নকল পাহাড় গড়ে তুলেছে।

অচুমলের পাথরখনির দিকে গাড়ী এগিয়ে আসছে। জ্যোৎস্নার আলো নেমেছে ওখানে বিজলীবাতির আলোক ছটায় আরো বেশী করে।

পাথরভাঙা কাজ হচ্ছে। পাহাড়ের বুকে ব্লাস্টিং করা জায়গায়—ফাটলের মুখে মুখে সাওতালী জওয়ানরা শাবল চালাচ্ছে। দঁড়াম দঁড়াম শব্দে, আগুন ছিটকে পাথরের চাঁই খসে পড়ছে।

অস্থিরতা উত্তেজনা বেড়ে উঠছে পদ্মার।

পদ্মার চোখে পুরনো দিনের দৃশ্য ভেসে উঠছে। পুরনো কথাগুলো কানে ভেসে আসছে আবার।

—নিজের পাথরখনির লাগোয়া—পাশের খনিটা দেখাতে দেখাতে বলেছিল অচুমল—মাটির তলায় কতো কঠিন আস্তর! একেবারে পাগাড় পাথর। পাথর কাটার ছ'সাত তলা নীচে দেখ! জল! প্রকৃতির গঠন বিচিত্র! পাহাড় তলায় জলের ঢেউ!

ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো পদ্মা।

—প্রবঞ্চক। কথার কারিগরিতে নিপুণ কারিগর অচুমল!

মনে মনে ভেজে নিলে পদ্মা—কি বলবে; সে অচুমলকে বলবে—মা হেতে রহণ দুশে—আমি এখানে কিছুতেই থাকবনা। চির জীবনের জন্যে ছেড়ে চললুম। এই যাওয়াই বিচ্ছেদের পথ পরিষ্কার করে দিলে।

হয়তো অচুমলের কাছ থেকে একথাগুলোর কোনো সম্মানই পাবে না সে। সম্মানের প্রত্যাশাও করেনা পদ্মা। বলে যাওয়ার প্রয়োজনেই বলা খালি।

পাথরখনির পাথর মানুষ অচুমল। পাথরের তলায় মনুষ্যত্বের প্রেমের সত্যের জল পর্যন্ত ওর ভিতর নেই। শুধু নীরেট পাথর অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত।

গাড়ী থামল পাথরখনির বাইরে। অফিস ঘরের সামনে। ভিতরে জোর বাতি জ্বলছে। সবুজ পরদাটা দরজার আবরু বজায় রাখতে পারছে না। দুরন্ত হাওয়াতে উড়ছে ভিতর বাইরে অবাধ গতিতে। দাওয়ায় দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে আছে—সাঁওতালী সর্দার রেংখা।

রেংখা হাড়িয়া খেয়ে নেশায় ঝিমুচ্ছে। ঝিমুনিতে ঝাঁকুনি খেল সে পদ্মার পায়ের শব্দে। দুহাতে চোখ রগড়ে ভালো করে দেখলে আপাদমস্তক পদ্মার। জড়ানো কথায় ফিসফিসিয়ে বললে—মালিকের নিষেধ। ভিতরে যাওয়া নিষেধ সবার।

বিশেষ দরকার ব'লে রেংখার আপত্তি ঠেলেই ঘরে ঢুকে পড়ল পদ্মা।

ভিতরের দরজায় গোলাপী পরদা ঝুলছে। ওঘরেও জোর আলো। কিন্তু বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না কিছু। পরদা সরালে সন্তর্পণে পদ্মা। স্তম্ভিত হয়ে গেল অচুমলকে দেখে। একভাবে চুপ করে, রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ঘরের চারদিকের দেওয়াল ভরে আছে তার ঘরের ফোটোয়। ধ্যানমগ্ন হয়ে, পদ্মার পাথরে খোদাই প্রতিমূর্তির ঠোঁটে গোলাপী রঙ ধরাচ্ছে অচুমল।

পদ্মা কি দেখছে এ! সত্যি না স্বপ্ন! দুচোখ বড় করে তাকালে। সত্যিই ভালবাসা অচুমলের।

অচুমলের হাতের পাথরপ্রতিমা জীবন্ত হয়ে উঠছে যেন পদ্মার চোখে। ব্যংগ করছে তাকে। দাঁড়াতে পারলে না পদ্মা।

নিঃশব্দে পরদা টেনে দিলে। ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

পাথরমূর্তির মতো টাঙায় উঠে বসল পদ্মা। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ। ইংগীতে জানিয়ে দিলে ইব্রাহিমকে—স্টেশনের দিকে নয়, বাড়ীর দিকে গাড়ী চালাও।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বিচার পদ্ধতি

জুল্‌ফিকার

*

হিন্দুরা তাঁদের বিচার-বিষয়ক গ্রন্থাদিকে ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এখানে 'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ ঠিক religion নয়, শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ। court of law কে তাঁরা বলেছেন ধর্ম্মাধিকরণ! পাপপুণ্য অনুযায়ী মানুষের কৃতকর্ম্মের বিচার যিনি করেন সেই যমরাজা, তাঁকে ধর্ম্মরাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে!

*

প্রবলের হাত থেকে দুর্ব্বলকে রক্ষা করাই রাজার ধর্ম্ম। রাজশক্তির প্রতীক, রাজার হস্তধৃত দণ্ড (রাজদণ্ড, ইংরাজীতে যাকে 'সেপ্টার' বলা হয়) সর্ব্বপ্রাণীকে অন্যায় ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষার জন্য নিযুক্ত এবং ইহা ধর্ম্মস্বরূপ। ভগবান মনু বলেছেন—

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।

দণ্ড সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্বুধাঃ॥

স্বভাবতঃ নিষ্পাপ লোক জগতে বিরল, দণ্ড-ভীতিই মানুষকে সৎপথে চালিত করছে। দণ্ডধর রাজা যদি শাস্ত্রানুযায়ী সম্যক বিবেচনা করে দুষ্কৃতের সাজা না দেন, কিম্বা লোভের বশবর্ত্তী হয়ে অবিচার করেন, তবে তাঁর রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য্য। মনু বলেন,

রাজা যদি দণ্ডনীয় দুষ্ট লোকের উপর যথোপযুক্ত শাস্তি বিধান না করতেন তবে বলবান ব্যক্তিরা শূলে মৎস্য পাকের ন্যায় দুর্ব্বলদের যন্ত্রণায় দগ্ধ করত, কুকুর যজ্ঞের হবি লেহন করত, কাক পুরোডাশ (যজ্ঞীয় পিষ্টক) ভক্ষণ করত (অর্থাৎ কাক পুরোডাশং শ্বাবলিহ্যাদ্ধবিস্তথা)।

*

মনুরাজার আচরণীয় ধর্ম্ম ও পালনীয় কর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তৃত উপদেশ দিয়াছেন। অষ্টম অধ্যায়ে তিনি বিচারপদ্ধতি ও দণ্ডবিধি সম্বন্ধে বলেছেন। হিন্দুদের Jurisprudence civil & criminal procedure codes, transfer of properties act, lawof tort সব কিছুই এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। মনু যে কেবল বৈষয়িক বা নৈতিক অপরাধের কথাই বলেছেন, তা নয়, সামাজিক বিধান লঙ্ঘনের জন্যও শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন।

*

যাজ্ঞবল্ক্য মনুর পরবর্ত্তী। তিনি তাঁর গ্রন্থের ৩০৯ নং থেকে ৩৬৮ নং শ্লোকে রাজধর্ম্মপ্রকরণ ও রাজার পালনীয় কর্ত্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ করে গেছেন, যাজ্ঞবল্ক্যের বিধানগুলিতে তাঁর পূর্ব্বসূরী মনুর প্রভাব সুস্পষ্ট। মনুর সময়ে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয় নি, সমসাময়িক সেই সব সমস্যাগুলির উপর দৃষ্টি রেখেই যাজ্ঞবল্ক্য কিছু কিছু নতুন কথাও বলে গেছেন।

*

দণ্ড সাধারণতঃ দ্বিবিধ—শারীর দণ্ড ও অর্থদণ্ড। যাজ্ঞবল্ক্য অপরাধের তারতম্য ভেদে চার প্রকার দণ্ডের উল্লেখ করেছেন,—

দিগদণ্ড (ধিক্কার)

বাগদণ্ড (বাচনিক ভৎর্সনা)

ধনদণ্ড (জরিমানা বা ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা)

ও বধদণ্ড (প্রহার, কারাবাস, প্রাণদণ্ড) মনুর মত যাজ্ঞবল্ক্যও বলেন যে—রাজা, অপরাধের গুরুত্ব, দেশ কাল, অভিযুক্ত ব্যক্তির বয়স, কর্ম্ম, শারীরিক ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করবেন! বিচারকের Discretion প্রয়োগের ক্ষমতা সেকালেও ছিল।

*

বিচারকার্য্যের জন্য রাজা কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ, পক্ষপাত শূন্য ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মাধিকরণের সভ্য (Juror or assessor) নিযুক্ত করবেন, এঁদের সহায়তায় বিচারকার্য্য

নির্ব্বাহ করবেন। রাজার অনুপস্থিতিতে একজন বিচক্ষণ সভ্য (ব্রাহ্মণ) সভাপতি হিসাবে প্রাড়বিবেকের সাহায্যে দণ্ডাদির আদেশ দান করবেন। 'প্রাড়বিবেক' শব্দটির ব্যবহার সংহিতার অনেক স্থানেই করা হয়েছে।

প্রাক্ × বিবেক ॥ প্রাড়বিবেক

প্রাক্ শব্দের অর্থ যিনি বাদী ও প্রতিবাদী উ য়কে বিবাদের কথা জিজ্ঞাসা করে লিপিবদ্ধ করেন। বিবেক—যিনি বাদী ও বিবাদীর বাক্য বিরুদ্ধ কি অবিরুদ্ধ তাহা সভাগণের সহিত আলোচনান্তে নির্দ্ধারণ করেন।

প্রাড়বিবেকের কাজ Function ছিল আজকালকার সেশন জজের মত।

*

সংহিতায় বলা হয়েছে অর্থী বা মামলাকারীর বক্তব্য প্রতিবাদীর সন্মুখ লিখতে হবে। মামলার সন, তারিখ, বাদী বিবাদীর নাম ধাম, জাতি প্রভৃতির পরিচয় সুস্পষ্ট রূপে উল্লেখ করতে হবে। স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমার লেখ্য পত্রে নিম্নোক্ত দফাগুলির উল্লেখ অবশ্যই থাকা চাই :

দেশ (জেলা). স্থান, জাতি (বাদী ও বিবাদীর জাতি পরিচয়), সংজ্ঞা (উভয়ের নাম), সন্নিবেশ (জমির অবস্থান), অধিবাস (ক্ষেত্রের সন্নিকটে বাস করেন এমন লোকদের নাম ও ঠিকানা), প্রমাণ পত্র (জামিন্ পরিমাণ শ্রেণী, কি ফসল উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ উহা যবক্ষেত্র, ধান্যক্ষেত্র না ইক্ষুক্ষেত্র ইত্যাদি) এ ছাড়া বাদী প্রতিবাদীর পিতা পিতামহদের তিনপুরুষের নাম রাজাদের স্তুতি—এই সব গুলি লেখ্যপত্রে সন্নিবিষ্ট হলে তবেই উহা পক্ষ (Valid) হবে। অন্যথায় পক্ষাভাস হবে। কি কি কারণে হতে পারে যাজ্ঞবল্ক্য তাও বলেছেন। পক্ষাভাসের এই পাঁচটা কারণ হচ্ছে—

অপ্রসিদ্ধ—(যুক্তিবিরুদ্ধ কথা,—যেমন কেউ যদি নালিশ জানায় অমুক ব্যক্তি আমার পালিত খরগোসের শিঙ ভেঙে দিয়েছে।)

নিরবাধ—(যেমন কেউ যদি বলে, আমার গৃহের আলোক গবাক্ষপথে বাইরে এসে পড়ায়, সেই আলোয় অমুক লোক কাজ করেছে। অতএব সে আলো ব্যবহারের জন্য আমাকে খাজনা দিতে বাধ্য।)

নিরর্থ—(আবোল-তাবোল কথা)

নিষ্প্রয়োজন—(আমার বাড়ীর পাশের লোক উচ্চৈস্বরে সংগীত বা অধ্যয়ন করে।)

অসাধ্য—(ঐ লোকটা আমাকে দেখে হাস্য করে।)

বিরুদ্ধ—(ঐ মূক ব্যক্তি আমাকে গালিগালাজ করেছেন।)

পক্ষপত্রের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত হবার পর তাকে নথীভুক্ত করার বিধান।

ঋণ, অর্থের আদান-প্রদান প্রভৃতি আঠার রকম বিবাদে যাজ্ঞবল্ক্য চারটে পদ বা Stage এর কথা বলেছেন।

প্রথম হচ্ছে ভাষাপাদ—এটা হচ্ছে নালিশকারীর বক্তব্য, ইহা প্রতিবাদীর উপস্থিতিতে লিখতে হবে। বাদীর তার অভিযোগ শোনানোর পর প্রতিবাদী যে উত্তর লেখাবে, তা হচ্ছে দ্বিতীয় পাদ বা উত্তরপাদ। এর পর বাদী বা অভিযোগকারী তাঁর স্বপক্ষে যে সমস্ত যুক্তিপ্রমাণ উপস্থিত করবেন সেগুলো লেখা হবে। এটা হচ্ছে তৃতীয় পাদ বা ক্রিয়াপাদ। বাদীকে দলিল (documentory) বা বাচনিক সাক্ষ্যের (oral evidence) প্রমাণ দেখিয়ে প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের সত্যতা বোঝাতে হবে এই সেই প্রদর্শিত প্রমাণ। সভ্যদের যুক্তিতর্কে সিদ্ধ হলে, বাদীর যে জয়লাভ—তাকেই বলা হয় সিদ্ধিপাদ। এইটি চতুর্থ বা শেষপাদ বাদীর উত্থাপিত অভিযোগ মীমাংসিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিবাদী বাদীর নামে কোন প্রত্যভিযোগ বা Counter Complaint আনতে পারবেন না। আবার প্রত্যর্থীর নামে অর্থী যে অভিযোগ এনেছে, তার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত, তার বিরুদ্ধে নতুন কোন অভিযোগ উত্থাপন করা যাবে না। বাদী মামলা উপস্থাপনের সময় যা বলেছে, ভাষাকালে বা জবানবন্দীর সময় তা ছাড়া নতুন কোন কথা বলতে পারবে না। অভিযোগের বিচার শেষ হবার পূর্ব্বেই প্রত্যভিযোগ ক্ষেত্রবিশেষে আইনতঃ গ্রহণ হতে পারে।

কুর্য্যাৎ প্রত্যভিযোগঞ্চ কলহে সাহসেষু চ।
উভয়োঃ প্রতিভূগ্রাহ্যঃ সমর্থ কার্য্যনির্ণয়ে ॥

বচসা বা হত্যাঘটিত ব্যাপারে, প্রতিবাদী তার উপর আনীত অভিযোগের বিচার চলবার সময় কিম্বা তার পূর্ব্বেও পাল্টা অভিযোগ আনতে পারে। এইরূপ প্রত্যভিযোগ উত্থাপিত

হলে, সভাপতি ধর্ম্মাধিকরণের অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করতঃ বাদীবিবাদীর বিবাদ বিষয় নির্ণয়ের জন্য এমন একজন প্রতিভূ (surety) গ্রহণ করবেন, যিনি বিবাদ বিষয়ভুক্ত ধন বা সম্পত্তির মূল্য বাদীকে দিতে কিম্বা বিবাদীর দ্বারা দেওয়াইতে সক্ষম। উপযুক্ত প্রতিভূর অভাবে বাদী বিবাদীকে তত্ত্বাবধানে রাখবার জন্য রক্ষক পুরুষ নিযুক্ত করা যেতে পারে—যার পারিশ্রমিক বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই দেয়।

* * *

বিষ প্রয়োগ, বা অস্ত্রাঘাতে হত্যা, চুরি, মারামারি, প্রাণবিনাশ ও ধনহানির আশঙ্কা, কুলস্ত্রীর চরিত্রে দোষারোপ এবং দাসী বা পত্নীর সত্ব বিষয়ক বিবাদের অভিযোগ, বাদীর উত্থাপিত মামলায় প্রতিবাদীকে কালক্ষেপ না করে, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দাখিল করতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে, উত্তর দানের জন্য প্রতিবাদীর প্রার্থিত সময় মঞ্জুর করতে পারেন।

* * *

কোন ব্যক্তি যদি মিথ্যা অভিযোগ করে অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তবে সেইরূপ দুষ্প্রকৃতি, অসৎ লোককে কতকগুলি লক্ষণ দ্বারা জানা যেতে পারে।' যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন,—

দেশাদ্দেশান্তরং যাতি সৃক্কণী পরিলেঢ়ি চ।
ললাটং স্বিদ্যতে যস্য মুখং বৈবর্ণমেতি চ॥
পরিশুষ্যৎ স্খলদ্বাক্যো বিরুদ্ধং বহুভাষতে।
বাক চক্ষুঃ পূজয়তি নো তথোষ্ঠৌ নিভুর্জত্যপি॥

যে ভবঘুরে, অকারণ যে ওষ্ঠপ্রান্ত চাটে, কপাল যার ঘর্মসিক্ত হয়ে ওঠে, মুখ বিবর্ণ হয়, কথা বেধে বেধে যায় বা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে বা উল্টা-পাল্টা উচ্চারণ হয় (যেমন বিষ্ণুমূর্ত্তি বলতে বলে বিষ্ণু মূর্ত্তি), যে পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ অনেক কথা বলে—প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে অশক্ত, অন্যের চোখের দিকে তাকাতে পারে না, অথবা ঠোঁট বেঁকাতে থাকে—এইরূপ এইসব মানসিক বাচিক বা কায়িক বিকার লক্ষণ যে সব ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পায় তারা কখনই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হয় না এবং সত্যের অপলাপে কুণ্ঠা বোধও করে না।

*

বিচারকালে অনেক ক্ষেত্রে ন্যায়ের তর্ক ওঠে এবং স্থান বিশেষে অনুমানেরও (Presumption) প্রয়োগ করতে হয়। বাদী প্রতিবাদীর নিকট থেকে কয়েক দফা জিনিষ পাবার দাবী করে, কিন্তু সে সবগুলিই প্রতিবাদী অস্বীকার (অপলাপ) করে। এক্ষেত্রে যদি সাক্ষ্য বা দলিলাদির দ্বারা দাবীকৃত কোন একটা জিনিষের সত্যতা প্রমাণ হয়, তবে ঐ একাংশের সত্যতার উপর নির্ভর করে বাদীর আনীত সমস্ত দাবীগুলিই প্রতিবাদীর পরিশোধ্য।

*

যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর সংহিতায় সাক্ষ্যদান বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে আদর্শ সাক্ষী হবেন সদ্বংশজাত ধর্ম্মনিষ্ঠ, সরল, পুত্রের পিতা ও ধনবান্। সাক্ষীর সংখ্যা যেন তিনজনের কম না হয়।

ব্রাহ্মণের সাক্ষী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের সাক্ষী ক্ষত্রিয় এবং স্ত্রীলোকের সাক্ষী স্ত্রীলোক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য স্বজাতীয় বা সবর্ণ সাক্ষীর অভাবে, অন্যেরাও সাক্ষ্যদান করতে পারেন। সাক্ষ্যদানে অনুপযুক্ত ব্যক্তি যাদের 'অসাক্ষী' বলা হয়েছে, যাজ্ঞবল্ক্য তাদের পাচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—

বচনোক্ত—শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, বানপ্রস্থাবলম্বী তপস্বী, বৃদ্ধ, সন্ন্যাসী, গুরুবংশীয়, পরিব্রাজক প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত।

দোষগ্রস্ত—চোর, পরস্ত্রীধর্ষণকারী, উগ্র প্রকৃতি, জুয়াড়ি, প্রবঞ্চক—ইহারা দোষগ্রস্ত অসাক্ষী।

বাক্যভেদকারী—বাদী কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট বা লিখিত বিষয়ের সাক্ষীদের কেউ যদি অন্যায়বাদী (Hostile) হয় তবে সে ভেদাধীন অসাক্ষীপদবাচ্য।

স্বয়ংমুক্তি—বাদী বা বিবাদী কেউই যাকে সাক্ষী মানে নাই, নিজে থেকেই বিবাদ বিষয়ে কথা বলতে চায়—তাকে শাস্ত্রে সূচি বলা হয়েছে। সূচি, সাক্ষী হিসাবে অনুপযুক্ত।

মৃতান্তর—অর্থী বা প্রত্যার্থীর কারো মৃত্যু ঘটলে, তাদের চুক্তি যাদের সম্মুখে হয়েছিল তারা সকলেই মৃতান্তর বলে সাক্ষ্যদানে অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

এ ছাড়া মাতাল, পাগল, ভাঁড়, বিকলেন্দ্রিয় প্রভৃতি আরো অনেককে অসাক্ষী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

*

যেখানে অর্থশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধ দেখা যায়, সেখানে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসনই গ্রাহ্য।

যেমন অর্থশাস্ত্রের মতে,

'নাততায়ি বধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন'

অথচ ধর্ম্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে

'গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনামায়ন্তং হন্যাদেব বিচারয়ন্॥'

অর্থশাস্ত্র Right of Private Defence স্বীকার করে। ব্রাহ্মণ যদি আততায়ী হয়ে আক্রমণ করে, তবে তাকে বধ করলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হবে না। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে অনিচ্ছাকৃত (অকামতঃ) ব্রহ্মহত্যায়ও দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। স্বেচ্ছাকৃত ব্রাহ্মণবধে মৃত্যুই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। অর্থশাস্ত্রের মত ততক্ষণই কার্যকারী, যতক্ষণ ব্রাহ্মণ আততায়ীর হননকারীও ব্রাহ্মণ। হত্যাকারী যদি শূদ্র হয় তবে তার নিষ্কৃতি নেই। আত্মরক্ষার্থে শূদ্র কর্ত্তৃক যদি শূদ্রই নিহত হয় তবে অপরাধীর কোন সাজা হবে না। বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় কেউ যদি আত্মরক্ষার্থে কোন ব্রাহ্মণের প্রাণ নাশ করে, তবে তাদেরও দণ্ড ভোগ করতে হবে,—তবে শূদ্র অপেক্ষা লঘুতর দণ্ড, এই যা।...

মনু সংহিতায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র অপরাধীদের দণ্ডের তারতম্য বিশেষ লক্ষণীয়। অতিবড় পাপাত্মা ব্রাহ্মণ, যে অপরাধে ব্রাহ্মণেতর বিশেষ শূদ্র অপরাধীর গুরুতর দণ্ড প্রাপ্য— অনুরূপ অপরাধে সে বিনা সাজায় মুক্তি পায়। শূদ্রের যে অপরাধে প্রাণদণ্ড হচ্ছে ব্রাহ্মণকে হয়ত সেই একই অপরাধে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করা হচ্ছে। শাস্তির এই তারতম্য যুক্তিসহ না হলেও, ধর্ম্মশাস্ত্র অনুমোদিত। এখানে ধর্ম্মশাস্ত্র সামাজিক অনুশাসনকেই অনুসরণ করেছে।

*

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পুনর্বিচার হতে পারে, সে বিষয়েও বলা হয়েছে সংহিতায়, বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনে যেখানে বিচার নিষ্পত্তি হয়েছে, সে বিচারের পুনর্বিচার কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোক বা শত্রু কর্ত্তৃক আনীত মোকদ্দমায় এবং রাত্রিকালে অথবা গৃহাভ্যন্তরে ঘটিত কোন মামলায় আপীল করা চলতে পারে।

*

মাতাল, উন্মাদ, ব্যাধিগ্রস্ত, বালক, শত্রু প্রভৃতির ভয়ে বিহ্বল ব্যক্তি, এবং পুর বা রাষ্ট্রের বিরোধী যারা তাদের উত্থাপিত অভিযোগ বিচারযোগ্য নয়। বিবাদ বিষয়ে অনিযুক্ত বা সম্বন্ধরহিত তৃতীয় পক্ষের আনীত মামলাও অসিদ্ধ। গুরু-শিষ্যে, পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে এবং প্রভু-ভৃত্যের বিবাদও রাজদ্বারে অগ্রগমন, তবে স্থল বিশেষে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।......

হিন্দুদের বিচারপদ্ধতি অনেকস্থানে আধুনিক বিচার-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অযৌক্তিক ও পক্ষপাতদুষ্ট মনে হলেও, এই ব্যবস্থা দুরাত্মা দমনে যে অধিকতর সাফল্যলাভ করেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তখনকার লোক এখন থেকে অনেক সুখে ও নিরুপদ্রবে বাস করত। হয়ত সংহিতা যখন প্রণীত হয়, তখন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কোন বিপ্লব দেখা দেয় নি এবং মানুষের সমস্যাগুলিও বর্ত্তমান কালের মত এত জটিল হয়ে ওঠে নি।

বাসবদত্তা ও শকুন্তলা

শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাকবি ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' ও 'কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' সংস্কৃতসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই মহাকবিদ্বয়ের নাটক দুইটির একটি তৌলনমূলক আলোচনা হইতে ইহার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। ইঁহাদের নাটকদ্বয়ের আলোচনা করিবার পূর্বে ভাস সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করি, নচেৎ প্রবন্ধের অঙ্গহানি হইবে। কালিদাস সম্বন্ধে ঐরূপ বলার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই, কারণ তাঁহার সম্বন্ধে যে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহার সহিত প্রায় সকলেই সম্যক পরিচিত। কিন্তু ভাস সম্বন্ধে এইরূপ হইবার কোন কারণ নাই, কারণ ভাসের নাটকাবলীর আবিষ্কার ১৯১০ খৃষ্টাব্দে।

মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজের অধীনে পুস্তকপ্রকাশবিভাগের কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে হস্তলিখিত পুথির সন্ধানে বাহির হইয়া, দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরের কোনও এক মঠে তালপত্র লিখিত একতাড়া পুথি প্রাপ্ত হন। সেই সমস্ত পুথি পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, যে মহাকবির নাম এতকাল ধরিয়া কেবল লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে, এমনকি স্বয়ং মহাকবি কালিদাসও সে কবির যশের কীর্তন করিয়াছেন, তিনিই কালিদাসপূর্বজ মহাকবি ভাস। তিনি দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ খৃষ্টপূর্বের মধ্যে জীবিত ছিলেন। এখন যেমন কালিদাসের যশঃপ্রভায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত, তদ্রূপ তখনও ভাসের যশঃপ্রভায় আসমুদ্র হিমাচল আলোকিত হইয়াছিল—ইহা আমরা কালিদাসের উক্তি হইতেই পাই। তিনি বলিয়াছেন—

"প্রথিতযশসাং ভাস-সৌমিল্ল—কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্তমানকবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ?"

গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় ভাসের (১) স্বপ্নবাসবদত্তা, (২) প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, (৩) পঞ্চরাত্র, (৪) চারুদত্ত, (৫) দূতঘটোৎকচ, (৬) অবিমারক, (৭) বালচরিত, (৮) মধ্যমব্যায়োগ, (৯) কর্ণভার, (১০) উরুভঙ্গ, (১১) প্রতিমা নাটক, (১২) অভিষেক নাটক এবং (১৩) দূতবাক্য—এই তেরখানি নাটক আবিষ্কার করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই নাটকগুলির একধর্মিত্ব লক্ষ্য করিয়া, উহা যে একজন লেখকেরই লেখনী প্রসূত এবং সেই লেখকই যে ভাস—তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এই তেরখানি নাটকের মধ্যে স্বপ্নবাসবদত্তাই যে শ্রেষ্ঠ—এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। অপরপক্ষে কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী এবং অভিজ্ঞানশকুন্তল—এই তিনখানির মধ্যে অভিজ্ঞানশকুন্তলই শ্রেষ্ঠ। কারণ কথিত আছে—কালিদাসস্য সর্বস্বম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।" অতএব এই মহাকবিদ্বয়ের তুলনা করিতে হইলে তাঁহাদের এই দুইখানি শ্রেষ্ঠ নাটকের তুলনা করিলেই চলিবে।

কালিদাস তাহার উপাখ্যানভাগটি মহাভারতের বনপর্ব হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তথায় আখ্যানভাগটি এইরূপ:—

"বিশ্বামিত্র মুনি ও মেনকা অপ্সরার সন্তান শকুন্তলা প্রসবান্তে মাতা কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া কণ্বমুনি কর্তৃক পরিপালিতা হইয়া আশ্রমেই বসবাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি যখন পূর্ণযৌবনে সমৃদ্ধিশালিনী, তখন একদিন রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ার্থ বাহির হইয়া ঘটনাচক্রে সেই অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হন এবং শকুন্তলার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া গন্ধর্বমতে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া রাজধানীতে একাকীই প্রত্যাবর্তন করেন। মহর্ষি কণ্ব তখন আশ্রমে ছিলেন না। তিনি সোমতীর্থ হইতে ফিরিয়া ধ্যানবলে সমস্ত অবগত হইয়া ক্ষত্রিয়প্রশস্ত এই বিবাহকেই অনুমোদন করিলেন। বহুদিন পরে কণ্বমুনির আশ্রমেই শকুন্তলার একটি পুত্র সন্তান হয়। অতঃপর কণ্বমুনি পুত্রবতী শকুন্তলাকে রাজসদনে প্রেরণ করেন, কিন্তু তথায় তিনি রাজা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হন। অনন্তর দৈববাণী হইলে গৃহীতা হন।"

কালিদাস তাঁহার নাটকে এই গল্পটিকে সাতটি অঙ্কে পল্লবিত করিয়াছেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে অধিকাংশ গ্রন্থেরই গল্পাংশ কোন না কোন গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ভাস কিন্তু এই "স্বপ্নবাসবদত্তম্" নাটকের মূলাংশ কোন গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আজ পর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই মনে হয়, ইহা তাঁহার নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত। এই নাটকের গল্পাংশ এইরূপ :—

এই নাটকের নায়ক রাজা উদয়ন আরুণি নামক রাজার নিকট পরাজিত হন। অনন্তর তাঁহার মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সেই হৃতরাজ্য উদ্ধার মানসে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং তন্নিমিত্ত একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি বৎসরাজ উদয়নপত্নী বাসবদত্তা ও অন্যান্য মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে মগধরাজের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া তিনি আরুণিকে পরাস্ত করিবেন। কিরূপে মগধরাজের সহিত মিত্রতা স্থাপন করা যাইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি ঠিক করিলেন যে মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহ প্রদান করিয়া, তিনি তাঁহার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইবেন। এই উদ্দেশ্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত তিনি বাসবদত্তা ও অন্যান্য মন্ত্রিনিচয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং সকলেই এমনকি বাসবদত্তা পর্যন্ত তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। তখন যৌগন্ধরায়ণ রাজা উদয়ন ও রাণী বাসবদত্তাকে লইয়া লাবাণক নামক গ্রামে আগমন করিলেন। অনন্তর তথায় একদিন যখন রাজা উদয়ন মৃগয়ার্থ বাহির হইয়াছেন, তখন সুযোগ অবলম্বন করিয়া যৌগন্ধরায়ণ সেই গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন এবং তৎসহ এইরূপ প্রচার করিলেন যে রাণী বাসবদত্তা ও উদয়নমন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সেই গৃহে থাকিয়া দগ্ধ হইয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজা উদয়ন অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন এবং বাসবদত্তার নিমিত্ত অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে যৌগন্ধরায়ণ পরিব্রাজক বেশ ও বাসবদত্তা আবন্তিকার বেশ ধারণ করিয়া মগধরাজের উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় পদ্মাবতীও তাঁহার মাতাকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। যৌগন্ধরায়ণ কৌশল অবলম্বন করিয়া বাসবদত্তাকে কিছুদিনের জন্য পদ্মাবতীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। বাসবদত্তাও ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্নেহের ভাজন হইয়া উঠিলেন। পরে যৌগন্ধরায়ণ দর্শকের সাহায্যে পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহ প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি মগধরাজের সাহায্যে আরুণিকে পরাস্ত করিয়া হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন। যুদ্ধান্তে যখন তাঁহারা এই জাতীয় বিবাহের কারণ জানিতে পারিলেন, তখন সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহারাও সুখে শান্তিতে বাস করিতে লাগিলেন।

এই গল্পটিকে ভাস তাঁহার নাটকে ছয়টি অঙ্কে রূপায়িত করিয়াছেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই নাটক দুইটিতে বোধ হয় কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই, কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে এই নাটক দুইটিতে সাদৃশ্য যথেষ্টই রহিয়াছে।

(১) প্রথমতঃ দুইখানি নাটকই রাজার প্রণয়-কাহিনীতে পরিপূর্ণ।

(২) দ্বিতীয়তঃ দুইখানি নাটকেতেই নায়কদ্বয় বিয়োগব্যথা ভোগ করিয়াছেন।

(৩) তৃতীয়তঃ দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেমে উন্মত্ত, রাজা উদয়নও বাসবদত্তার প্রতি সম্পূর্ণভাবে আসক্ত।

(৪) চতুর্থতঃ রাজা উদয়ন পদ্মাবতীকে স্নেহের চক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া আছে বাসবদত্তায়। তিনি বলিয়াছেন—

"পদ্মাবতী বহুমতা মম যদ্যপি রূপশীলমাধুর্যৈঃ।
বাসবদত্তাবদ্ধং নতু তাবন্মে মনো হরতি॥" (৪।৪)

অর্থাৎ—যদিও পদ্মাবতী রূপে, চরিত্রে ও মাধুর্যে আমার আদরের সামগ্রী তথাপি কিন্তু তিনি আমার বাসবদত্তায় নিবদ্ধ মন আকৃষ্ট করিতে পারিতেছেন না। তদ্রূপ রাজা দুষ্মন্ত ও বলিয়াছেন—

"সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ। তদস্যা দেবীং বসুমতী-সন্তরেণ মহদুপালম্ভনং গতোঽস্মি।" (৫ম অঙ্ক)

অর্থাৎ ইনি একবারমাত্র প্রণয়বন্ধন করিয়াছেন। দেবী বসুমতী ভিন্ন এই হংসপদিকার নিকটেও আমি তিরস্কৃত হইলাম।

(৫) সর্বশেষে এটুকু বলা যাইতে পারে যে, রাজা দুষ্মন্ত যেমন শকুন্তলার সহিত মিলনে আনন্দিত হইয়াছিলেন

সেইরূপ উদয়নও বাসবদত্তার সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।

শকুন্তলায় ও বিচ্ছেদের পর মিলন, বাসবদত্তায়ও বিচ্ছেদের পর মিলন। শকুন্তলা মিলনান্তক বাসবদত্তাও মিলনান্তক।

এই নাটক দুইটিতে সাদৃশ্য যেমন আছে, বৈসাদৃশ্যও তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয়। শকুন্তলা নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য "Love at the first sight"—এর অবস্থা বর্ণন, অপরপক্ষে বাসবদত্তানাটকের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধি। একটিতে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত অপরটিতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় নিয়ন্ত্রিত। একটিতে রাজা রূপ দেখিয়াই উন্মত্তবৎ, অপরটিতে রাজা রূপ দেখিয়াও নিরুৎসাহবৎ। একটিতে রাজা কিয়দ্দিনেই নায়িকাকে ভুলিলেন, অপরটিতে নায়ক বিয়োগেও নায়িকাকে স্বপ্নে দর্শন করেন। একজন বহু পত্নীক; কিন্তু অপরজন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত দ্বিপত্নীক।

নায়িকা সম্বন্ধেও উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের যথেষ্ট বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ শকুন্তলা অনূঢ়া; বাসবদত্তা ঊঢ়া। শকুন্তলা তাপসী, বাসবদত্তা রাজ্ঞী। শকুন্তলা উদ্দাম—প্রবৃত্তিপরায়ণা, রাজা দেখিয়াই মুগ্ধ, বিবাহে কণ্বমুনির অনুমতির অপেক্ষা রাখিলেন না; অপরপক্ষে বাসবদত্তা ধীরা, বিশ্রব্ধা, পতির সম্মানার্থে স্বেচ্ছায় ক্লেশ স্বীকাররতা। শকুন্তলা গর্বিণী বাসবদত্তা বিবেকিনী।

নায়ক সম্বন্ধেও এইরূপ পরিলক্ষিত হয়।

মূল কথা এই যে, অভিজ্ঞানশকুন্তলের নায়ক-নায়িকা প্রকৃত প্রস্তাবে পার্থিব মানব ও মানবী; আর স্বপ্নবাসবদত্তার নায়ক নায়িকা প্রকৃত পক্ষে দেব ও দেবী।

এই জাতীয় বৈষম্য দেখিয়াই যে বলিতে হইবে একজন অপরজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এরূপ কোন কথা নাই। কে কাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ নিম্নলিখিত প্রসঙ্গ হইতেই বুঝিতে পারিবেন।

সর্বপ্রথমে আমরা দেখি কালিদাস একজন সৌন্দর্যের পূজারী কবি। তিনি শকুন্তলার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, রূপ বর্ণনার জন্য নহে, নাটকের প্রয়োজনের নিমিত্ত। তাই তিনি কুত্রাপি শকুন্তলার 'হাতমুখচোখ' ইত্যাদির বর্ণনা করেন নাই। তিনি তাহার বর্ণনার মধ্য দিয়া দেখাইয়াছেন দুষ্মন্তের মনোভাব। তাই আমরা দেখিতে পাই, যখনই তিনি বল্কল পরিহিতা শকুন্তলাকে সর্বপ্রথম বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দেখিতে পাইলেন, তখনই তিনি তাহার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া উঠিলেন—

"শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥"

অর্থাৎ—'যদি আশ্রমবাসিজনের রূপ রাজঅন্তঃপুরচারিণীদিগেরও অত্যন্ত দুর্লভ হয়, তাহা হইলে দেখিতেছি বনলতিকা অদ্য নিজগুণে উদ্যানলতাকে পরাভূত করিল।' অথবা, কামমননুরূপমস্যা বপুষো বল্কলম্।

ন পুনরলঙ্কারশ্রিয়ং ন পুষ্যতি। কুতঃ—
সরসিজ মনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥

অর্থাৎ—'অথবা বল্কল শকুন্তলার দেহে অনুপযুক্ত হইলেও উহার দ্বারা তাহার আভরণ শোভা পর্যাপ্ত ভাবে পুষ্টিসাধন করিতেছে না, তাহাও নহে। যেমন কমল শৈবালযুক্ত হইলেও সুদৃশ্য হয়, চন্দ্র কলঙ্কী হইলেও শোভাযুক্ত, সেইরূপ এই কৃশাঙ্গী বল্কলধারণ করিলেও অধিকতর মনোহারিণী; বস্তুতঃ যাঁহাদের আকৃতি স্বভাবসুন্দর, কোন্ বস্তুই বা তাহাদিগের অলঙ্কার স্বরূপ না হয়?'

তারপর আবার বলিতেছেন—

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্॥

অর্থাৎ—শকুন্তলার অধরদেশ নবীন পল্লবের ন্যায় লোহিত বর্ণ; বাহুযুগল কোমল শাখাদ্বয়ের ন্যায় এবং পুষ্পের ন্যায় বাঞ্ছনীয় যৌবন যেন দেহে নিবদ্ধ রহিয়াছে।'

শকুন্তলা সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন মনোভাব তিনি ব্যক্ত করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন একটি মধুকর শকুন্তলার অধরদেশ পান করিতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।

*

'ওরে সুজন নাইয়া'—

শিল্পী : রথীন চক্রবর্তী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

করং ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্বস্বমধরং
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী ॥

অর্থাৎ—হে মধুকর ! তুমি শকুন্তলার চপল অপাঙ্গমণ্ডিত সকম্পনেত্রদ্বয় পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিতেছ এবং কর্ণসমীপে ভ্রমণপূর্বক নির্জনে রহস্যালাপীর ন্যায় মৃদুস্বরে শব্দ করিতেছ ; যখন ইনি হস্তসঞ্চালন করেন, তখন তুমি ইহার সর্বস্বধন অধরসুধা পান করিতেছ ; সুতরাং এই ফলভোগ হেতু তুমি কৃতকৃত্য)।"

তিনি শকুন্তলাররূপে এরূপভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন যে, প্রিয়বয়স্য বিদূষকের নিকটে পর্যন্ত তিনি তাহার বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তিনি কোথাও শকুন্তলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বর্ণনা করেন নাই। তিনি বিদূষকের নিকট শকুন্তলার রূপ সম্বন্ধে বলিতেছেন—দেখ, বিদূষক! শকুন্তলাকে দেখিয়া মনে হয়—

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত সত্ত্বযোগা,
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনাকৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে,
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ ॥"

অর্থাৎ—'শকুন্তলার দেহ সৌন্দর্য চিন্তা করিয়া এইরূপ মনে হয় যে, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত নির্মলবস্তু একত্র সঞ্চয় করিয়া সমস্ত রূপরাশি একস্থানে দেখাইবার জন্যই যেন অপর একটি স্ত্রীরত্ন সৃষ্টি করিয়াছেন।"

এবং

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ
রণাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং,
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ ॥

অর্থাৎ—'এবং সেই শকুন্তলার সৌন্দর্য্য অনাঘ্রাতকুসুমের ন্যায়, নখচ্ছেদশূন্য নবপল্লবের ন্যায়, অপরিহিত রত্নের সদৃশ এবং যেন অনাস্বাদিত নূতন মধুস্বরূপ। তাঁহার সেই নিষ্কলুষ সৌন্দর্য যেন পুণ্যশীলগণের অখণ্ডফলস্বরূপ। জগৎপাতা ধরাতলে কোন্ ব্যক্তিকে যে ইহার উপভোক্তা করিবেন, তাহা বুঝিতে পারি না।'

অপরপক্ষে ভাসের নাটকে ইহার কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। তাঁহার নাটকে কোথাও সৌন্দর্যের বর্ণনা নাই। তিনি পদ্মাবতীকে উদয়নের প্রতি অনুরক্ত করাইয়াছেন, একজন ঘটকের মারফতে অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর দ্বারা। ব্রহ্মচারী পদ্মাবতীর সম্মুখে লাবাণকের অগ্নিকাণ্ড, তাহাতে বাসবদত্তার মৃত্যু এবং বাসবদত্তার মৃত্যুতে রাজা উদয়নের বিলাপ এবং সেই বিলাপের মধ্যে রাজা উদয়নের পত্নীপ্রেম প্রকটিত করিয়াছেন—সেই পত্নীপ্রেম শুনিয়া পদ্মাবতী উদয়নের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন।

কালিদাস তপোবনের বর্ণনা করিয়াছেন, ভাসও করিয়াছেন। কালিদাস লিখিয়াছেন—

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিস্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ ॥

অর্থাৎ—'এখানে (তপোবনে) কোটরস্থ শুকশাবকের মুখ হইতে নীবারকণা সকল পড়িয়া বৃক্ষমূলে রহিয়াছে এবং তাপসেরা যে সকল প্রস্তরখণ্ড দ্বারা ইঙ্গুদীসবল ভগ্ন করিয়াছিলেন, প্রস্তরখণ্ডে সেই সমস্ত ফলের নির্যাস সংলগ্ন থাকাতে তপোবনের সূচনা করিয়া দিতেছে। আরও দেখ, রথের শব্দ শুনিয়া মৃগগণ বিশ্বাসভরে উহা সহ্য করিতেছে ; জলাশয়ের পথে বল্কলাগ্রদেশ হইতে বারিধারা নিপতিত হইয়াছে ; ইহাতে তপোবনের সূচনা হইতেছে।'

আর, ভাস লিখেছেন—

বিস্রব্ধং হরিণাশ্চরন্ত্যচকিতা দেশাগতপ্রত্যয়া
বৃক্ষাঃ পুষ্পফলৈঃ সমৃদ্ধবিভবাঃ সর্বেদয়ারক্ষিতাঃ।
ভূয়িষ্ঠং কপিলানি গোকুলধনান্যক্ষেত্রবত্যোদিশো
নিঃসন্দিগ্ধমিদং তপোবনময়ং ধূমো হি বহ্বাশ্রয়ঃ ॥

অর্থাৎ—'এস্থান নিরাপদ বলিয়া বিশ্বস্ত ভয়শূন্য হরিণগণ নিঃসন্দিগ্ধভাবে বিচরণ করিতেছে ; সযত্নে রক্ষিত বৃক্ষসকল ফলপুষ্পে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে ; প্রচুর কপিলবর্ণের গোধন রহিয়াছে, চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রে হলকর্ষণাদি হয় নাই ; এ সমস্ত দেখিয়া মনে হইতেছে এটি তপোবন। কারণ, অনেক স্থান হইতে ধূমরাশি উদ্গত হইতেছে।'

কালিদাসের নাটকে হাস্যরস বাৎসল্য করুণরস প্রভৃতি বহুপ্রকার রস পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ভাসের নাটকে শৃঙ্গার ব্যতীত অন্য কোন কিছু বিশেষ পরিলক্ষিত

হয় না। করুণরসে কালিদাস সিদ্ধহস্ত এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইবার কালে কণ্বমুনি নিজেকে ও আমাদিগকে যেভাবে কাঁদাইয়াছেন, তাহার তুলনা জগতের সাহিত্যে দুর্লভ। তিনি স্বাভাবিক মানবহৃদয়ের ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদান নাই, তিনি কাঁদাইয়াছেন হৃদয়ের গভীরতম অন্তরপ্রদেশে। এ সম্বন্ধে ডি, এল, রায় বলিয়াছেন—

"ওগো মাগো, ওরে তুই কোথায় গেলি রে"—এইরূপ চীৎকার করিয়া কাঁদানোর শক্তি উচ্চাঙ্গের কবিত্বসূচক নহে। ইহা প্রায় সকলেই পারে। কর্ত্তব্য ও স্নেহই, শোক ও ধৈর্য, আনন্দ ও বেদনা, এই মিশ্রপ্রবৃত্তির সংঘর্ষণে যে কথায় অমৃত উৎপন্ন হয়, সেই অমৃত যিনি তৈয়ারী করিতে পারেন, যিনি মিশ্রপ্রবৃত্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মনুষ্য হৃদয়ের নিহিত কারুণ্যের দ্বার মুক্ত করিয়াছেন, ভিন্ন শ্রেণীর সৌন্দর্য্য একত্র রাশিকৃত করিয়া দেখাইয়া যিনি চক্ষে জল বাহির করিতে পারেন—তিনিই মহাকবি, তিনি মনুষ্য হৃদয়ের গূঢ় রহস্য বুঝিয়াছেন।" কালিদাসের কারুণ্য এই শেষোক্ত শ্রেণীর।

একখানি গ্রন্থের সমালোচনা করিতে হইলে তাহার অন্যান্য দোষগুণের সহিত ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। ভাষা ভাবের অনুগামী। অতএব ভাবকে সরল করিতে হইলে ভাষাকে সরল করিতে হইবে। কিন্তু ভাব উচ্চাঙ্গের হইলে ভাষা অবশ্য গম্ভীর হইবে।

এই দুই মহাকবির ভাষা সম্বন্ধে কাহার শক্তি অধিক, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। উভয়েরই ভাষা সুন্দর ও সুচারু। তবে ভাষার সারল্যে ও স্বাভাবিকতায় ভাস কালিদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কালিদাসের রচনায় আভিধানিক শব্দের প্রাচুর্য্য যথেষ্ট আছে; কিন্তু ভাসের রচনায় উহা বিরল। K. M. Jogleker কালিদাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"The language and style of the author has been so chaste, so plain, so natural, so idiomatic, so collogirial and so homely that a correct understanding of every little phrase and every little word, brings to light new beauties at every stop."

আমাদের বিবেচনায় এই উক্তি ভাসের সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।

ভাষা অধিকতর মধুর হয় ছন্দে এবং সেই ছন্দ অধিকতর মধুর হয় উপমাদি অলংকারে। কালিদাস সেই উপমার একমাত্র আধার। তাই উক্তিও আছে—"উপমা কালিদাসস্য"। এ সংসারে প্রায় সকল কবিই ত উপমাদি অলংকার প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কিন্তু বলিবার সময় কেন বলা হয় 'উপমা কালিদাসস্য'। তাহার কারণ আছে। উপমা দিবার সাধারণতঃ তিন প্রকার নিয়ম আছে :—

(১) বস্তুর সহিত বস্তুর উপমা, (২) গুণের সহিত বস্তুর উপমা এবং (৩) বস্তুর সহিত গুণের উপমা। কালিদাসের উপমার বিশেষত্ব প্রথমোক্ত ও দ্বিতীয়োক্ত উপমা ব্যবহারে।

একটি ছোট উদাহরণেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। শকুন্তলাকে দর্শন করিবার পর দুষ্মন্ত যখন প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন দুষ্মন্তের মন আর কিছুতেই শকুন্তলা হইতে ফিরিতেছিলনা। তাই তিনি—

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥

অর্থাৎ—"আমার দেহ অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছে, কিন্তু মন পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রতিকূল বায়ু দ্বারা (চীনদেশজাত) সূক্ষ্মবস্ত্র যেমন নীয়মান হয়, আমার মনও শকুন্তলাদর্শন দ্বারা সেইরূপ আশ্রমেই নীয়মান হইতেছে।

ভাসের নাটকে কিন্তু এই প্রকার উপমাদি পরিলক্ষিত হয় না।

কালিদাসের নাটকে যে কোন প্রকার অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ নাই, একথা জোরগলায় বলিতে পারি না। কালিদাস রক্তমাংসেগড়া মানুষ দোষগুণে বিভূসিত, তাঁহার রচনা শরতের পূর্ণ জ্যোৎস্না হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সে তাহাতে কৃষ্ণ মেঘ দৃষ্ট হইবে না, এমন কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে দুর্বাষার হঠাৎ অতিথি-রূপে আগমন, তৎপরে তাঁহার শাপপ্রদান এবং সেই শাপে দুষ্মন্তের স্মৃতিভ্রম, প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার অন্তর্ধান,

অঙ্গুরীদর্শনে স্মৃতিশক্তির পুনরাগমন প্রভৃতি যেন একটু অতিপ্রাকৃত এবং অসম্ভব ঘটনার ব্যাপার—মর্ত্তলোকে এইরূপ ঘটনা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, তাহা অবশ্য আমার জানা নাই ; কিন্তু তথাপি ইহা কতটা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে ইহা পার্থিব জগতের ঘটনা নহে। ইহার ফলে নাটকের চমৎকারিত্ব কতকটা পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—সে অতিথিতো হঠাৎ আসিয়াই উপস্থিত হয় ; দুর্বাসাও তাহাই আসিয়াছে, ইহাতে আর দোষ কি ? ইহা হয়ত আমরা মানিয়া লইলাম কিন্তু দুর্বাসার হঠাৎ আগমনের ফলে সে ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল—তাহার কি কোন প্রকার যুক্তি আছে ? শাপের ফল যে স্মৃতিভ্রংশ—ইহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকজগতে কেহ কি বিশ্বাস করিবেন ? কেহ কেহ বলিবেন যে এইরূপ ব্যাপারে তৎকালের লোকের বিশ্বাস ছিল—কালিদাস তৎকালের লোক হইয়া সেইরূপ বিশ্বাসের অবতারণা করিয়াছেন—তাহাতে তাঁহার দোষ কোথায় ? কিন্তু আমরা বলি যে,তৎকালে লোকের বিশ্বাস ছিল বলিয়াই সে সর্ব্বকালের তাহা থাকিবে এরূপ কোন কথা নাই। যিনি বিশ্বমানবের চিরন্তন সাহিত্য রচনা করিতে যাইতেছেন, তাঁহার পক্ষে এ ক্রটি কম কথা নয়। কিন্তু তাই বলিয়া যে আবার ইহাকে নিকৃষ্ট বলিতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই।

কারণ—

"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ
কিরণেষ্বিকঙ্কঃ॥"

অর্থাৎ—"চন্দ্রের কলঙ্ক যেরূপ তাহার কিরণসমূহের মধ্যে বিলীন হয়, সেইরূপ একমাত্র দোষ বহুগুণের মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়।"

ভাসের নাটক সম্বন্ধে আর কি বলিব, তাহার নাটকে এইরূপ কোন অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ নাই, যাহা আছে, তাহা কমবেশী সকল রচনাতেই দৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে ভাস কালিদাস অপেক্ষা উর্দ্ধে।

এই জাতীয় দোষগুণে বিমিশ্রিত হইলেও নাটকদ্বয় আমাদের লাগে ভাল। হৃদয়কে উন্মাদিত করে, প্রাণকে স্পন্দিত করে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ঘটনার বৈচিত্র্যে, কল্পনার কোমলত্বে, ভাষার সারল্যে ও লালিত্যে, মানবচরিত্র বিশ্লেষণে, বর্ণনার উজ্জ্বলতায়, হৃদয়ের গভীর অনুভূতিতে 'স্বপ্নবাসবদত্তা' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; আবার ধারণার মহিমায়, প্রেমের পবিত্রতম, ভাষার সারল্যে, হৃদয়ের মাহাত্ম্যে "স্বপ্নবাসদত্তা" "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই দুইখানি নাটক যেন একখানি আর একখানির পরিপূরক। অভিজ্ঞনশকুন্তলম্ শরতের পূর্ণ জ্যোৎস্না, বাসবদত্তা নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ। একটি উদ্যানের রাজীব, অপরটি উহার বনলতা। একটি ব্যঞ্জনমিশ্রিত অন্ন, অপরটি হবিষ্যান্ন। একটি প্রকৃতির বসন্ত, অপরটি উহার বর্ষা। একটি উপভোগ্যের, অপরটি প্রজাহের, ধন্য কালিদাস। যাহার অমর লেখনীপ্রসূত নাটকের ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম্ জেমস্ কৃত ইংরাজী অনুবাদের ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ ফষ্টরকৃত জার্মান অনুবাদ পাঠে গেটের প্রাণ আলোড়িত করিয়া বলাইয়াছিল—

"Wouldst thou the young year's blossoms
and the fruits of its decline,
And all by which the sonl is charmed
recaptured, feasted, fed
Wouldst thou the earth and heaven itself
in one sole name combine ?
I name thee, O Sakuntala !
at all at once it said."

শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় ইহার সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে—

"বসন্তং মুকুলং (অথবা কুসুমং) ফলঞ্চ যুগপৎ গ্রীষ্মস্য
সর্বং চ তৎ
যৎ কিঞ্চিন্মানসো রসায়নমথো সন্তর্পণং মোহনম্।
একীভূতম্ অভূতপূর্বম্ অথবা স্বর্লোক-ভূলোকয়োর্
ঐশ্বর্যং যদি কোপি কাংক্ষতি তদা শকুন্তলং সেব্যতাম্॥"

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—

নব বৎসরের কুড়ি, তারি এক পাশে, বরষ-শেষের পককল।"
প্রাণ করি চুরি, আর তারি এক সাথে, প্রাণে এনে দেয়
পূর্ণবল।
আছে স্বর্গলোক, আর সে এক ঠাঁই, বাঁধা যেথা আছে
মহীতল।

হেন যদি কভু থাকে, তুমি তবে তাই, ওহে
অভিজ্ঞানশকুন্তল।

বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন—

"যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞানশকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দেশ করি এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।"

আর ধন্য মহাকবি ভাস—যাহার গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়া মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—

"The style and dignity of conception appeared to me to be such as characterise the great works of the "Rishis" and superior to what we find in the famous works of the great poets."

সুন্দরের পূজারী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

সুন্দরের উপাসক আমি চিরদিন।
যা কিছু সুন্দর মোরে রেখেছে বিমুগ্ধ ক'রে
সুন্দরের দিব্যাসন এ হৃৎনলিন।
যেই পঙ্কে সে নলিন আজো আছে সমাসীন
ভুলিয়া ছিলাম তার সহজাত ঋণ।
হইনিক দর্পণের কভু সমাসীন।

সে ঋণ ভোলার আর নেইক উপায়!
জরায় জর্জর হয়ে অসহ্য কুশ্রীতা লয়ে
সতত তাহার ঋণ আমারে স্মরায়।
চাহিতে তাহার পানে ঘৃণা মোর জাগে প্রাণে
সুন্দরে আবরি সে যে নয়ন মুদায়
ত্যজিতে তাহার সঙ্গ এবে সাধ যায়।

সুন্দরের অর্চনার একি পরিণাম?
অসুন্দর দেহটার সঙ্গ যে সহেনা আর
সুন্দরে পূজিতে বাধা দেয় অবিরাম।
এ দেহ চিতারই যোগ্য অথবা কীটের ভোগ্য
ভাবি আমি, নাই যাতে কিছু অভিরাম
এতকাল কি করিয়া তারে সহিলাম।

উত্তর পাইনি আজো এই জিজ্ঞাসার,
গীতার সে মহাবাণী উত্তর কি? নাহি জানি,
এই জীর্ণ বস্ত্রখানি করি পরিহার
পাব কিনা নববাস কেবা দিবে সে আশ্বাস?
নব দেহে নব জন্ম লভিয়া আবার
পাব কি শ্রীসুন্দরের পূজা অধিকার!

ঘটে যদি চিতানল সহিত নির্বাণ,
রোগ-শোক জরা তাপ সকল মালিন্য পাপ
এসব হ'তে তো তাতে পাব পরিত্রাণ,
তাও লোভনীয় বটে ভাগ্যে যদি তাই ঘটে
সুন্দরের অর্চনার স্তবনান্দী গান
রচনারও চিরতরে হবে অবসান!

সুন্দরে সেবার তবে নেই পুরস্কার?
শ্রীমান সুন্দর দেহে জনমি শ্রীমতাং গেহে
ছন্দের শৃঙ্গার বেশ রচিব না আর?
সুন্দরের শ্রীচরণে সেই দেহ সমর্পণে
হবে নাকি সুন্দরের যোগ্য উপহার?
চাহি আমি চিরন্তন পূজা উপচার।

একটু অন্ধকারের স্বাদ

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়
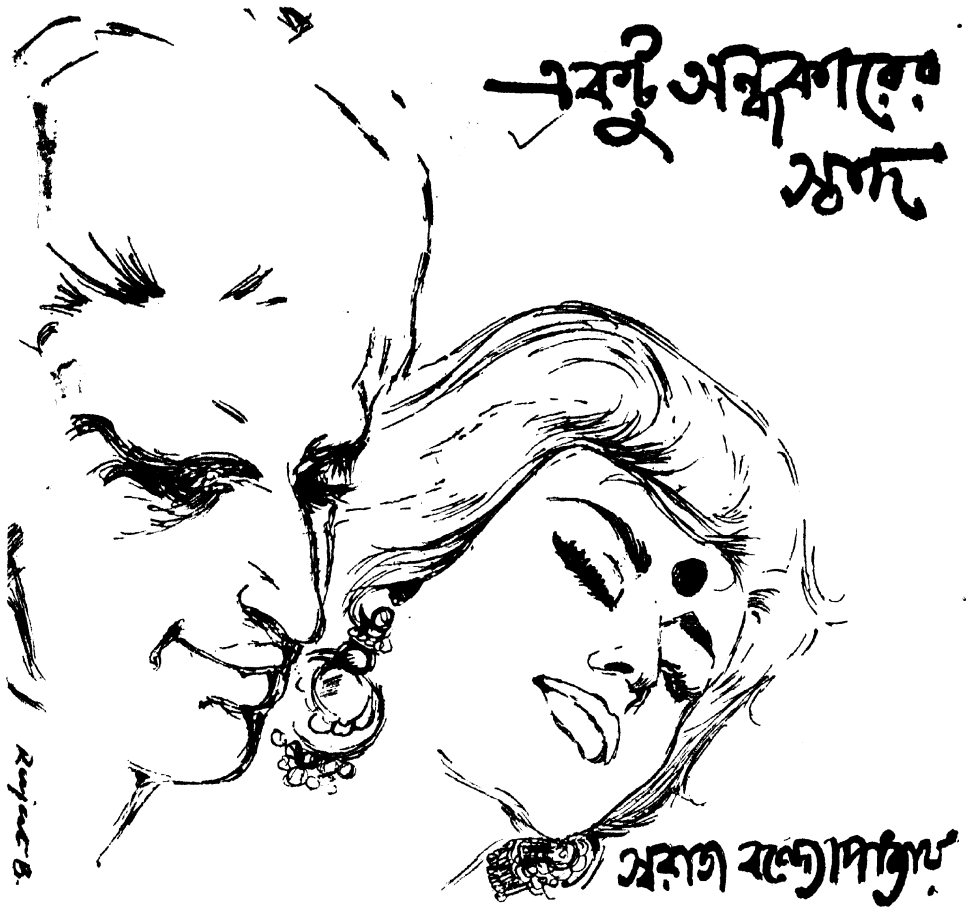
সখ হয়েছিলো এ কথাও বলা যায়, আবার বলা যায় যে দেখবার কৌতুহল ছিল। কিন্তু কৌতুহল বা সখ ছাড়া আর কিছু ভাবলে ভুল ভাবা হবে।

কৌতুহলটা মেটাবো কিন্তু তেমন সহজ মনে হোল না, তাই অনেক ভেবে-চিন্তে সাধুর শরণ নিলাম।

সাধু আমার ছোটবেলার বন্ধু। ওর নামটা যে কেন সাধু রাখা হোল, সেটা ভাবতে গেলে আর হাসি চাপা যায় না, সংসারের নামকরণের মূল্য সম্পর্কে বৈরাগ্য এসে পড়ে।

ইস্কুলে যখন নীচু ক্লাসে পড়ি, তখন সাধু সিদ্ধি খেতো, তারপর সাধু মদ খেতো, এবং তারপর শুনেছিলাম সাধু কোন একটা যাত্রাপার্টিতে ঢুকে সমানে বাপ মায়ের দেয়া নামকে সার্থক করে চলেছিলো।

সাধুকে চিৎপুরে যাত্রাদলের অপিস ঘরে আবিষ্কার করে উদ্দেশ্যের কথা খুলে বললাম। যারা এক সের চাল বা একপো মাছের দামে দেহ বিক্রি করে, তাদের একজনকে দেখতে চাই। এ একটা সখও বলতে পারো, আবার কৌতুহলও বলতে পারো।

সাধু বিঁড়িটা ঠোঁটে চেপে একটু ভেবে বললে,—মানে সোজা বাংলায় একটা বস্তির মেয়েমানুষের কাছে যেতে চাস?

ঘাড় নেড়ে জানালাম, ঠিক তাই।

ঠিক আছে ম্যান, কাল সন্ধ্যেবেলা আসিস। নিয়ে যাবো।

বিঁড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটু থুক্ ফেললো সাধু।

নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এলাম।

পরদিন সন্ধ্যে নাগাদ সাধুর ডেরায় গিয়ে হাজির হলাম। ও তখন ছোট্ট ঘরটায় মাদুরের ওপর আধশোয়া হয়ে বিঁড়ি টানছিল, আর ছোট একটা ছেলে ওর পা টিপছিল। ছেলেটা যাত্রাদলের সন্দেহ নেই।

আমাকে দেখেই ও উঠে বসল, ছেলেটাকে বলল,—দেখে আয় তো কলতলাটা খালি হয়েছে কিনা।

ছেলেটা চলে গেল উঠে।

লক্ষ্য করলাম সাধুর দিকে। পেটমোটা হাত পা লিকলিকে। বাঁ হাতে একটা মোটা তামার তারে বাঁধা এক গোছা মাদুলী।

হেসে বললাম,—ওগুলো কেন ?

মাদুলীর তারটা হাতের কনুয়ের আর একটু ওপরে তুলে ও বললে,—ওসব তুকতাক আমাদের রাখতে হয়। স্থানে অস্থানে যাতায়াত করি। হয়তো নেশার ঘোরে নিমগাছের ডগাতেই রাত্র কেটে গেল। একবার তো নিমের ডালের ওপরে আমায় টেনে প্রায় তুলেছিলো।

আমি অবাক হয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই ছেলেটা এসে বললে,—ভুঙ্গা বেরিয়েছে।

সাধু উঠল,—ভুতো বেরিয়েছে! তবে কলতলা থেকে একবার চট করে আসছি।

ছেলেটাকে বললে,—এ্যাই, এক কাপ চা এনে দে বাবুকে।

বলে সাধু বেরিয়ে গেল।

অতি অল্পসময়ের ভেতর এসে বললে,—তোকে চা দেয়নি ?

ঘাড় নেড়ে জানালাম, না।

—মরুগ্ গে যাক, চল এবার বেরোই।

বলে টিনের তোরঙ্গ খুলে কাঁচিপেড়ে গিলেকরা পাঞ্জাবী বার করে পরে নিলে—চটপট।

একটু হেসে বললে,—তুই যে জায়গা বলছিস, ও সবখানে এত ধোপদুরস্ত না হলেও চলে। লুঙ্গি গেঞ্জি পরেই যাওয়া যায়। তবে কিনা তোর সঙ্গে বেরোব—'

সামনের ক্ষয়েযাওয়া দুটো দাঁত বার করে হাসলো সাধু।

এবারে বেরোন গেল।

বাইরে বেরিয়ে ভেবেছিলাম ট্রামে-বাসে উঠতে হবে। দেখলাম, সাধু সেদিকেও গেল না। একটা রিক্শা নিয়ে নিলে।

দুজনে চেপে বসলুম। রিকশাওয়ালাকে ও বরানগর যেতে বললে।

বেশী দূর নয়। বরানগর পৌঁছে একটা ফাঁকা মাঠের মত জায়গায় নামলুম দুজন। জায়গাটা আধা অন্ধকার।

মাঠের পাশে একটা গলির ভেতর ঢুকে দু-চারটে পাক মেরে একটা বস্তির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সাধু। আমি পেছনে।

দরজাটার সামনে একটু আলো নেই। রীতিমত অন্ধকার। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম, প্রায় ছ' সাতটি মেয়ে দরজার আশে পাশে কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সাধু এগোল।

পেছনে আমি একটু তফাতে।

দেখে স্পষ্ট অনুভব করলাম, জায়গাটুকু যেন ইচ্ছে করেই একটু অন্ধকারে ঢেকে রাখা হয়েছে। যাতে করে একটা নিষিদ্ধভাব এবং রহস্যভাব যে কোন মানুষের মনে নিষিদ্ধ বস্তির লোভে উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া আরও কারণ ছিল, সেটা ওদের রূপ। ওদের আসল রূপ পাছে বা আকর্ষণীয় না হয়, তাই আধা-অন্ধকারে রূপ সম্পর্কে আগন্তুককে একটু ধাঁধায় ফেলবার চেষ্টা।

সাধু এ সব ব্যাপারে পোক্ত। ও ঝপ্ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে বিঁড়ি ধরাল। তাতেও বোধহয় পুরোপুরি দেখতে পায় নি, তাই বাছাই করবার জন্যে আরও কয়েকবার দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে মেয়েগুলোর মুখের কাছে ঘোরাতে লাগল।

একজনকে বলতে শুনলাম,—আ মরণ!

সাধু ততক্ষণে একটার হাত ধরে ফেলেছে। ঘাড় ফিরিয়ে আমায় ডাকছে,—চলে এসো ম্যান্। ওর পেছন পেছন বাড়িটার ভেতরে ঢুকলাম।

ঢুকে বাঁ হাতি এক সার কয়েকখানা ঘর। মাটির বেড়া, ওপরে খোলার চাল। চারপাঁচখানা ঘরের পর আরও তিনচারটি ঘরের সারি ডানদিকে বেঁকে গেছে।

ঠিক মনে নেই, দ্বিতীয় কি তৃতীয় ঘরের সামনে ছোট বারান্দার ওপর উঠে মেয়েটি ঘরের শেকল খুলল।

এক নজরে দেখলাম বারান্দার ডান দিকে ঘেরা একটু জায়গা, বোধহয় রাঁধবার খাবার জন্যে। কাঠের ফ্রেমে আঁটা টিনের দরজাটা খুলে ঢুকল ওরা। আমিও ঢুকলাম।

একটা হারিকেন জ্বলছে এক কোণে। তার পাশে একটা মাটির কলসী। দরজার উলটো দিকে একখানা চৌকি পাতা। তার ওপর পাতলা বিছানা। চৌকির পরেই দেয়াল। দেয়ালের অনেকটা ওপরের দিকে ছোট্ট খুপরীর মত জানালা একটুখানি চৌকো আকাশ দেখা যায়। চৌকীর ওপর উঠে পায়ের ওপর পা রেখে ততক্ষণে সাধু বসে পড়েছে। চোখ দুটো ওপরে তুলে বিঁড়িটায় শেষ টান দিচ্ছে।

আমিও গিয়ে ওর পাশে বসলাম পা ঝুলিয়ে, দেখলাম মেয়েটাকে। মিশমিশে কালো রঙ। মুখে একটু মিষ্টিভাব আছে বটে, কিন্তু হাঁ টা বড্ড বড় প্রায় আকর্ণবিস্তৃত। চোখ দুটোয় বেশ হাসি-খুশী ভাব। আশ্চর্য, এরাও হাসে!

সাধু এবার দুটো বিড়ি বার করে একটা ওর দিকে এগিয়ে দিলে,—নে, খা। নিজের বিড়িটা দাঁতে চেপে দেশলাই বের করে নিজেরটা ধরিয়ে ওর বিড়িটাও ধরিয়ে দিলে।

মেয়েটা দিব্যি বিড়ি টানতে লাগল। দৃশ্যটা আমার কাছে এত বেশী খারাপ লাগছিল যে আমি তাকাতে পারছিলুম না। শুনেছি এরা বিড়ি সিগারেট খায়, কিন্তু খেলে যে এত কদর্য দেখায় আমার ধারণা ছিল না।

চিন্তা করে বুঝি এ কথা সত্যি, আমরা যা দেখতে অভ্যস্ত নই, সেইটে দেখলেই আমাদের খারাপ লাগে। বহুকালের অভ্যাস মানেই সংস্কার। সংস্কারে বাধে, আবার যদি মেয়েদের সিগারেট খাওয়া হামেশাই দেখা অভ্যেস থাকত, তবে হয়তো এতটা খারাপ লাগত না, এ সব যুক্তির কথা।

চোখের সামনে এই কালো অজ্ঞবয়সী মেয়েটাকে বিড়ি টানতে দেখে বিচার-বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে ওই সংস্কারটাই চাড়া দিয়ে উঠল। ঘৃণাকে মন থেকে মুছে ফেলবার সাধ্য আমার ছিল না। (যদিও জানি, ঘৃণা করা পাপ, কেউই ঘৃণ্য নয়, ইত্যাদি) আমি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে অন্যদিকে না তাকিয়ে পারছিলাম না। কিছু বলিনি, কেননা আমি কিছু বলতে আসিনি, দেখতে এসেছি।

—কি হে ম্যান, একেবারে চুপ্‌সে গেলে যে!

বলে সাধু মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বাঁ চোখটা একটু ছোট করে বললে,—এ্যাই যা যা, বাবুর কাছে গিয়ে একটু মেস না!

মেয়েটা একগাল হেসে বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একেবারে আমার গা ঘেঁসে বসে পড়ল। একটু নিয়ম-মাফিক মুচকী হেসে বললে,—বাবুর কি আমাকে মনে ধরেনি?

হাসিটা এবং কথাটা এতই বেমানান যে পরিষ্কার বোঝা যায়, বহুকালের বানানবলা কথা ও আবার আবৃত্তি করছে। এই অপটু অভিনয়টুকু এতই জঘন্য যে আমি রাগব না হাসব কিছুই বুঝলাম না। জানি ওরা এর চেয়ে বেশী আর কিই বা জানতে পারে? নিখুঁত অভিনয় করে মন ভোলাতেই যদি পারত, তবে আর এখানে এক সের চালের দামে দেহ বিক্রি করবে কেন? সরল মূর্খ গাঁয়ের কোন মেয়েকে ধরে এনে বসিয়ে দেয়া। যারা ট্রেণিং দিয়েছে তারাও এত বেশী মূর্খ যে এমনিধারা কয়েকটি বাঁধাধরা ধারকরা কথা আর ভাবভঙ্গী প্রকাশ করবার শিক্ষাই দিয়েছে।

এ শিক্ষা তারা হয়তো বহুকাল থেকে বহু ধরেআনা মেয়েকে দিয়ে আসছে, একেও দিয়েছে। এ মেয়েটাও নিষ্ঠা নিয়ে ওই কথা কটি আর ভঙ্গীগুলো অভ্যাস করেছে। এতেই ওর চলে যায়। কারণ আমার মত লোক এখানে বড় একটা আসে না। যারা লুঙ্গি আর হাফসার্ট পরে—দিশী মদ গিলে আসে, তাদের কানে এই কথা কটিই অমৃতবর্ষণ করে।

আহা, মেয়েটার কি দোষ। ও তো এর চেয়ে বেশী কিছু জানে না।

ভেতরে স্নায়ুগুলো রি রি করে উঠল। কি কদর্য ভঙ্গী করে আমার দিকে ঢলে পড়েছে! এই মুহূর্তে ওর হাত

থেকে বাঁচবার জন্যে তাকিয়ে একটু হাসলাম। মেয়েটা আকর্ণ বিস্তৃত ঠোঁটে হাসতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল।

একটা বাচ্চার কান্না কানে আসছিল।

মেয়েটা এক মুহূর্ত আনমনা হয়েই আবার হেসে আমার দিকে তাকাল। একেবারে গা ঘেঁসে আমার পাঞ্জাবীর হাতাটা নিয়ে গুটোতে লাগল।

এবারে স্পষ্ট হয়ে কানে এলো একটা বাচ্চার তীব্র আর্তনাদের মত কান্না।

মেয়েটার হাতটা কাঁপল। ফ্যালফ্যাল করে তাকালো আমার দিকে। দৃষ্টিটা কিন্তু এ মুহূর্তে ভীষণ অসহায়।

আবার বাচ্চার কান্নার আওয়াজ।

সাধু একটি লম্বা বিঁড়ি ধরিয়ে ঠ্যাংয়ের ওপর ঠ্যাং তুলে চোখ দুটো একটু আধবোজা করে অন্য একটা নেশার আমেজ আনবার চেষ্টা করছিলো।

মেয়েটা হঠাৎ চৌকি থেকে নেমে পড়ে মুখখানা শুকনো করে অত্যন্ত কাতর হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললে—একটু বসুন, আমি এখুনি আসচি।

বেরিয়ে গেল মেয়েটা।

চোখ দুটো এক তৃতীয়াংশ খুলে টেরিয়ে দেখলে সাধু, —যা বাব্বা! এ যে আঁতুড়, পোয়াতির ঘরে এলুম রে বাবা!

বলে উঠল সাধু। মনে হোল ও ঠিকই ধরেছে, সাধুর জ্ঞানচক্ষুকে এড়ান অত সহজ নয়। এমনিতেই আমার পেটের ভেতর গুলোচ্ছিল, এবারে সাধুর 'আঁতুড়' কথাটা শুনে বুক পর্যন্ত কেমন পাক খেয়ে উঠলো।

সাধুর দিকে তাকিয়ে বললাম,—চল, এখান থেকে চলে যাই।

—চলো ম্যান, মন যখন বসচে না!

—কিন্তু মেয়েটাকে ক' টাকা দোব?

—টাকা! দু' মিনিট ঘরে বসলেই টাকা! ফুঃ! চলে এসো।

ও আমার হাত ধরে ঘর থেকে বার করে নিয়ে সোজা দরজা দিয়ে বেরিয়ে মাঠের পাশ দিয়ে একেবারে রাস্তায়।

এতক্ষণ পরে একটা নিঃশ্বাস ফেললুম। একটু থামতে যাব, সাধু হাত ধরে টান মারলে—চলো, ওই দোকানটায় বসে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া যাবে—

দোকানটার সামনে রঙচটা একটা টিনের প্লেটে লেখা —'দিশী মদের দোকান।'

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।—না, ভাই একটা চায়ের দোকানে গিয়ে আগে বসি চলো। পরে তুমি ওখানে যেও।

সাধু আর আপত্তি করলো না।

একটু তফাতে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসে এতক্ষণ পরে যেন নিজের অভ্যস্ত পৃথিবীতে এসে নিঃশ্বাস ফেললাম।

এক কাপ চা নিলাম। সাধু চা খাবে না। একটু পরে ও পাশের সেই দোকানে যাবে। চায়ে চুমুক দিয়ে সাধুর দিকে তাকাতে দেখি ও পকেট থেকে এক মণিব্যাগ বার করেছে।

আমি বলে উঠি, না, না, পয়সা আমি দেবো।

সাধু সামনের ক্ষয়েযাওয়া দাঁত দুটো বার করে বলে, —ব্যাগটা নিয়ে তো এলুম, এতে মালকড়ি কত আছে দেখি। থাকলে তোমার চায়ের দামটা দেয়া যাবে, আমারও আজকের নেশার খরচাটা হয়ে যাবে।

—কোত্থেকে পেলে?

সাধু অদ্ভুত হাসি-হাসি চোখে আমার দিকে তাকায়, তারপর বলে,—ওই মেয়েটার ঘরে। ওর চৌকির চাদরের তলায় ছেল। পেছনে শক্ত লাগতে তুলে নিয়ে পকেটে রেখেছিলাম। তা মন্দ নেই হে! সতেরো টাকা তেরো আনা—না—আ—মানে আশী নয়া। সন্ধ্যেটা কাটবে ভাল।

অবাক হয়ে সাধুর দিকে তাকিয়েছিলাম, ওর সামনের ক্ষয়ে-যাওয়া ধারালো দাঁত দুটো কি জঘন্য! ওই গরীব মেয়েটা যে রাতের পর রাত দেহ বিক্রি করে একসের চালের দরে, তার জমানো টাকা কটি চুরি করে নিয়ে এলো!

সাধুটা কি।

না। আর সাধু সঙ্গ নয়।

পকেট থেকে দুখানা দশটাকার নোট বার করে সাধুর দিকে এগিয়ে বললাম,—এই ব্যাগটা আমাকে দিতে হবে ভাই। এই টাকাকটা নিয়ে ব্যাগটা দাও।

সাধু রীতিমত অবাক হয়ে বলল,—কেন বলো তো

ম্যান? আচ্ছা নাও, আমার আজ সন্ধের খরচটা পেলেই হোল।

আমি ওর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে চলে এলাম। রাস্তায় এসে সেই বস্তির দিকেই হেঁটে চললাম। ব্যাগটা বার করে দেখলাম, চামড়ার ছোট ব্যাগ। অনেকদিনের পুরোন। ভাঁজে ভাঁজে ক্ষয়ে এসেছে। সেলাই খুলে গিয়েছিল বোধহয় কোন সময়ে, মুচির মোটা সুতোর সেলাই খানিকটা জায়গায় স্পষ্ট।

ব্যাগটা খুললাম। দেখি না, কোন কাগজে কোন নাম, বা এক টুকরো চিঠি, কিছু থাকতেও পারে, না, কিছু নেই, সতেরো টাকা আশী নয়া পয়সা ছাড়া আর কিছু নেই। মাঠটার কাছে এসে পড়েছি, ওই তো সামনে সেই অন্ধকার!

ব্যাগটা বার করেছি আমি কোন সাহসে? এতক্ষণে হয়তো মেয়েটা পুলিশে খবর দিয়েছে। টাকা কটা তো ওর কাছে ছেড়ে দেবার মত নয়?

পুলিশ তো আমাকেই ধরবে। ব্যাগটা তো আমার হাতে!

পিছিয়ে এলাম। আবার যে পথে এসেছিলাম, সেই পথে পেছিয়ে যেতে যেতে চায়ের দোকানের কাছে এসে ঢুকে পড়লুম দোকানে, আরও এক কাপ চা নিতে হোল।

ব্যাগটা মেয়েটাকে ফিরিয়ে দিতে যাওয়ার ভেতর অনেক ভাবনার কথা রয়েছে। আমি কি করে তাকে বিশ্বাস করাতে পারব যে ব্যাগটা আমি চুরি করিনি, নিয়েছিলো আমার সঙ্গী। যদি না বিশ্বাস করে?

(আহা, মেয়েটা দেহের কত যন্ত্রণার বিনিময়ে টাকা কটা জমিয়েছিলো, হয়তো বা ভেবেছিলো, সামনে পূজোয় বাচ্চা ছেলেটার জন্যে সিল্কের জামা আর পাজামা কিনে দেবে। নয়তো বা শীতের সময় একটা ছোট লেপ তৈরী করাবে!

এমনো তো হতে পারে, কালকের রেশন আনবার টাকাটাও এই ব্যাগেই ছিল বা ছেলের একটা কৌটোর দুধ আনবার টাকা!)

ব্যাগটা ফিরিয়ে দিয়ে আসতে গেলে বহু বিপদের সম্ভাবনা।

শোনা যায়, ওদের নাকি কিছু কিছু পোষা গুণ্ডা ধরণের লোক হাতে থাকে। তাদের কানে যদি কথাটা গিয়ে থাকে, বা তাদের মেয়েটা জানিয়ে থাকে যে তার ঘর থেকে ব্যাগ খোয়া গেছে, তারা এতক্ষণে হয়তো ধরবার জন্যে ঘোরাফেরা করছে।

ও পাশে বসে চা খাচ্ছে আর আমার দিকে বার বার তাকাচ্ছে, ও লোকটা যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে।

নাঃ! ব্যাগটা নিয়ে বিপদ হোল!

ফেরত দিতে গেলে মেয়েটা হয়তো আমাকে ডেকে ঘরে নিয়ে বসাবে, তারপর গোটা দুয়েক গুণ্ডা দুদিক থেকে এসে আমার দুহাত ধরে উঁচু করে তুলে নিয়ে অন্ধকার কোন একটা ভীষণ জায়গায় নিয়ে গিয়ে—।

(কিন্তু ব্যাগটা ফেরত না দিলে যে বিবেকের কাছে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না। ফেরত দিতে গিয়ে হয়তো দেখবো। মেয়েটা উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাচ্চা ছেলেটা মেজেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে রয়েছে।

আমি গিয়ে ডাকলাম, চোখের জলে ভিজে কালো মুখটা তুলল মেয়েটা। ব্যাগটা পাবার আশায় এগিয়ে এলো। হাতে তুলে দিলাম ব্যাগটা।

আবার বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদে উঠল।

কালকের নিশ্চিত অনাহার থেকে আমি ওকে বাঁচিয়েছি। আজকের এই নিদারুণ হতাশা থেকে আশার তীরে টেনে তুলেছি।)

মনে মনে হাসি পেলো। এমন আদর্শ নাটক জীবনের কোন রজনীতে অভিনীত হয় না। তাছাড়া ব্যাগটা ফেরত দেবার পেছনে একটা ছেঁদো নাটকের নায়ক হবার নিজের বাসনাটা নিজে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

আমি ব্যাগটা না দিয়ে এলেও কাল অনাহারে থাকবে এমন কথা ভাববার কোন কারণ নেই। ওদের বাড়ীউলী যিনি তিনি নিশ্চয়ই টাকা ধার দেবেন। বিনা সুদে। বরং ব্যাগ ফেরত দিতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা পদে পদে। ধরে নেয়া যাক, বিপদ যদি বা নাও থাকে, বোকা সাজবার সম্ভাবনা থাকবে ষোল আনা।

অতএব ও পথে আর পা না বাড়িয়ে ব্যাগ সমেত ঘরে ফিরে যাওয়া সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। অন্তত তাতে কোন ঝুঁকি নিতে হবে না।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম।

(তবু টাকা-কটা অনেক রাত্রের যন্ত্রণার দাম। এ বোঝাটা নামিয়ে আসাই কি ভাল ছিল না? যে কোন পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত হয়েই না হয় যাওয়া যেত! তবু এ কথা তো মিথ্যে নয় যে কোন গাঁ থেকে ধরে আনা ওই কালো কুচকুচে মেয়েটা—মেয়ে মানুষ এবং একটি সন্তানের মা। এই স্বীকৃতিটুকুর দাম না হয় আমিই দিলাম। বিপদের ঝুঁকি নিয়েই দিলাম!)

না। চায়ের দোকানের সামনে পাশের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে লোক দুটো আমার দিকে তাকাচ্ছে আর কি বলাবলি করছে। দেহটা অক্ষত থাকতে থাকতে বাড়ি পৌঁছোনোই ভাল। ওই তো একটা বাস আসছে।

টুক করে বাসে উঠে পড়ি। পেছন ফিরে দেখি, না, লোক দুটো ওঠেনি। আমার দিকে তাকিয়ে যেন হাসল। আমার চোখের ভুল নয় তো?

বাড়ি ফিরে টাকা-সমেত ব্যাগটি নিজের তোরঙ্গের ভেতরে কাপড় জামার তলায় রেখে দিলাম। পরে একদিন গিয়ে না হয় দিয়ে আসা যাবে।

ওই ভাবা পর্যন্তই! ব্যাগটি আজও আমার তোরঙ্গেই পড়ে আছে। আজও ফিরিয়ে দিয়ে আসা হয়নি! ফিরিয়ে দিতে আর ইচ্ছেও হয় না।

বরং কখনো-সখনো পুরোন মণিব্যাগটা বার করলে অনেক আলোর বাণীর ছড়াছড়ির ভেতরে একটু নিটোল অন্ধকারের স্বাদ পাই। অতি তিক্ত—বিরক্তিকর—তবু স্বাদ!

প্রযোজকের সঙ্গে পুরোহিত ঠাকুর গাড়ী থেকে নাম্‌তেই সারা ষ্টুডিওতে একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠ্‌ল।

প্রযোজকের দৃষ্টি পড়ে এইভাবে সবাই নিজের নিজের জুতো খুলে ভক্তি গদ-গদ-ভাবে ভীড় করে দাঁড়ালো ওঁদের দুজনকে কেন্দ্র করে।

কালীঘাটের পূজো শেষ করে একেবারে পুরোহিত ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে প্রযোজক ষ্টুডিওতে এসে হাজির হয়েছেন। তাঁর প্রথম ছবির মহরতের ব্যাপারে যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে—সেদিকে সর্বদা তাঁর সজাগ দৃষ্টি।

তরুণ পরিচালক ঘনশ্যাম ঘড়ঘড়ি চোখের কোণে একটা আল্‌গা গর্বের ভাব নিয়ে এগিয়ে এসে বল্লেন, আগে আমার কপালে সিঁদুরের তিলক পরিয়ে দিন—তবে ত' আপনার ছবি হিট করবে।

পরিচালকের কোঁচানো ধুতি আর শাল ঝোলানোর কায়দা দেখে পুরোহিত ঠাকুর দু পা এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রযোজক ছগনদাস মগনলাল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বল্লেন, সবুর করুন। আগে ত' নাটক্‌কা পর ফুল চড়ানে হোগা।

তরুণ পরিচালক ঘনশ্যাম ঘড়ঘড়ি তখন নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে মাথা দুলিয়ে বল্লেন, ঠিক! ঠিক! আগে চিত্রনাট্যের অর্চনা। তারপর আর সব কিছু! নতুন সম্পত্তি আর ব্যবসা হাতে পেয়েছেন—প্রযোজক

পরিচালক—ঘনশ্যাম ঘড়ঘড়ি

ছগনদাস মগনলাল। কিন্তু তাঁর হাজার খোপে ভর্তি ব্যবসায়ীমগজ একেবারে সাফ্!

কোন্ দেবতার পায়ে আগে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করতে হবে—তা তরুণ ছগনদাস মগনলালের অজানা ছিল না।

প্রযোজক—ছগনদাস মগনলাল

সেই জন্যে প্রযোজক একবার তার দিকে কৃপা দৃষ্টি বর্ষণ করে—তাঁর খাস খানসামাকে হাঁক দিয়ে বল্লেন, সুখনরাম, হামার দোতলা কাম্‌রামে গণেশজী বৈঠা হায়, উন্‌কো ত জরুর লে আনে হোগা। নাটক্‌-কা পর বৈঠানে হোগা, ফিন্ ফুল চড়ানে হোগা—

নতুন মনিবের হুকুম পেয়ে সুখনরাম দু-তিনটে করে সিঁড়ি টপ্‌কে গণেশজীকে আনতে ছুটে চলে গেল।

ষ্টুডিও অঞ্চলের চিরকালের প্রথা—মহরতের দিন কালীঘাটে আগে পূজো দিতে হবে। সে ব্যাপারে ছগন দাস মগনলালের প্রখর দৃষ্টি। নিজে তিনি পুরোহিত নিয়ে গিয়ে কালীঘাটের পূজো সমাপন করে এসেছেন। কিন্তু জাত-ব্যবসার দেবতা গণেশজীকে চটাতে তিনি মোটেই রাজি নন। মা-কালী কাঁচা-খেকো দেবতা,—তাই তাঁর পূজো নির্বিঘ্নে সমাধা করে প্রযোজক ছগনদাস মগনলাল গণেশজীর অর্চনায় আত্মনিয়োগ করলেন।

রাশি রাশি ফুল কিনে এনেছেন প্রযোজক। চিত্র-নাট্যের ওপর সিদ্ধিদাতা গণেশজীর মূর্ত্তি স্থাপন করে পুরোহিত পূজোয় বসেছেন। ছগনদাস মগনলাল হাত জোড় করে গরুড়পক্ষীর মতো বসে আছেন পাশে। সিদ্ধি-দাতার পূজোয় যেন কোনো বাধা না আসে!

ওদিকে পরিচালক ঘনশ্যাম ঘড়ঘড়ি ষ্টুডিওর আর এক কোণে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ক্ষুণ্ণ মনে বসে প্রহর গণনা করছেন।

এক ঘর লোকের সাম্‌নে—তিনি স্বয়ং পরিচালক,—এমন ভাবে প্রত্যাখ্যাত হলেন! সিঁদুরের তিলকটা আগে পরিচালকের কপালে পরিয়ে দিলে কি ক্ষতি ছিল। সিদ্ধি-দাতা গণেশ ঠাকুরকে নিয়েই ছগনদাস মগনলাল মগ্ন হয়ে রইলেন। ছবির সাফল্য কিন্তু নির্ভর করে একমাত্র পরিচালকের হাতে।

কত কষ্ট করে, কত সত্য-মিথ্যা কথার অভিনব 'পাঞ্চ্' করে এই নবীন প্রযোজককে যে তিনি সিনেমা লাইনে নামাতে রাজি করিয়েছেন—তা একমাত্র তিনি জানেন, আর জানেন তাঁর ভাগ্যদেবতা। সেই কথাই চুপচাপ বসে ভাবছিলেন—ঘনশ্যাম ঘড়ঘড়ি। The wearer only knows where the shoe pinches!

সদ্য পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ছগনদাস মগনলাল এক বিরাট সম্পত্তি আর ততোধিক বিপুল এক ব্যবসায়ের কর্ণ-ধার হয়ে পড়েছেন। তাঁর আশে-পাশে চারদিকে সব সময় যেন মাছি ভন্‌ভন্ করছে! সেই ব্যূহ ভেদ করে, মোসাহেব মহলের চোখে ধূলি দিয়ে, ওর মায়ের সতর্ক দৃষ্টির পাশ কাটিয়ে, আসল প্রাণ-ভোম্‌রার কাছে পৌছুনো বড় সহজ সাধ্য ব্যাপার ছিল না!

যে করেই হোক—পরিচালক ঘনশ্যাম ঘড়ঘড়ি তার অকৃত্রিম কৃচ্ছ্রসাধনায় অসাধ্য সাধন করেছেন!

সাফল্য যখন তাঁর প্রায় করায়ত্ত,—ঠিক সেই সময় স্বয়ং সিদ্ধিদাতা তাঁর পথ আগ্‌লে দাঁড়াবেন—এ যে অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার!

তবু ছোট-খাটো কণ্টকের দংশন তাঁকে সহ্য করতেই হবে। তীরের কাছে তরী এনে—অকারণ মান-অভিমানের দমকা হাওয়া পালে লাগিয়ে ত আর নৌকোটাকে ডুবিয়ে দেয়া চলে না! তাই মনকে অনেক রকম সান্ত্বনা দিয়ে চুপ করে আছেন—পরিচালক ঘনশ্যাম ঘড়িঘড়ি!

আর সত্যি কথাই ত!

যে গরু দুধ দেয়—কারণে-অকারণে তার চাঁট্ সহ্য

করতে হবে বৈ কি !

কোনো রকমে মহরৎ-পর্ব সম্পন্ন হয়ে যাক্, তখন নিজের হাতে রাশ টেনে ধরবেন—পরিচালক ঘনশ্যাম ঘড়ঘড়ি। ছবি তৈরীর সমস্ত ক্ষমতা ত পরিচালকের

তেঁতুল তলাপাত্র—(কাহিনীকার)

হাতে। তখন জুড়ি-গাড়ী হাঁকিয়ে দিবেন—প্রডাক্সনের সোজা সড়ক দিয়ে। কেউ যদি বাধা দিতে আসে তখন চাবুক হাঁক্‌ড়াবেন ডাইনে আর বাঁয়ে !

ভবিষ্যতের সেই অসামান্য ক্ষমতায় উজ্জ্বল দিনগুলির কথা স্মরণ করে পরিচালক আপন মনেই পুলকিত হয়ে উঠ্‌লেন।

ততক্ষণে সিদ্ধিদাতা গণেশজীর পূজো সম্পন্ন হয়ে গেছে। উল্লাসে আর উদ্দীপনায় যেন ফেটে পড়ছে সারা স্টুডিওর মানুষ।

প্রযোজক ছগনদাস মগনলাল এগিয়ে এসে সবাইকার ললাটে আশীর্ব্বাদী সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছেন।

পরিচালক ঘনশ্যাম ঘড়ঘড়ির মনে আবার সেই অভিমানের ঢেউ জেগে উঠ্‌ল। তিনি এই ছবির পরিচালক,—তাঁকে সিঁদুর পরানো উচিত ছিল সকলের আগে। 'পরিচালক' কথাটার মানে কি এরা কেউ জানে না ? নতুন করে অভিধান কিনে দিতে হবে ?

ঠোঁট কাম্‌ড়ে চেয়ারের ওপর বসে রইলেন নবীন পরিচালক—ঘনশ্যাম ঘড়ঘড়ি।

এই অবকাশে কাহিনীকার তেঁতুল তলাপাত্র প্রযোজক ছগনদাস মগনলালের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছেন।

তেঁতুল তলাপাত্র বল্‌ছেন, স্যার, একখানা কাহিনী যা লিখে দিয়েছি—দেখ্‌বেন, একেবারে হিট্ পিকচার হয়ে যাবে। গল্পই ত' আসল। তারপর নায়িকার যা পার্ট—একেবারে আগুন জ্বালিয়ে দেবে—

এতক্ষণে ছগনদাস মগনলালের মনে হল তাইত'—ছবির নায়িকা মদালসা মজুমদার ত' এখনো এসে পৌঁছেন নি! তারই ত' ছবি নেয়া হবে—আজকের এই মহরৎ উৎসবে।

মদালসা মজুমদার—(নায়িকা)

ষ্টুডিওর এ-ধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত তিনি ছুটোছুটি সুরু করে দিলেন।

—আরে, প্রোডাকসন ম্যানেজার কিধার গিয়ো ইয়ে ত' বাত্‌লাও—

কিন্তু সারা ষ্টুডিওময় কেউ বল্‌তে পারেনা—প্রডাক্সন ম্যানেজার কোন্ দিকে কোন্ কার্যে ব্যস্ত আছেন।

প্রযোজক ছগনদাস মগনলাল হন্যে কুকুরের মতো ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগ্‌লেন, আরে,—সব কাম ত' গড়্‌বড় হো যায়েগা! জলদি হিরোইনকা পাশ্ গাড়ী

ভেজ্‌নে হোগা! নেহি ত' তস্‌বীর খিঁচেগা কেইসে? দেখো—প্রডাকসন্‌ ম্যানেজার কাঁহা ছিপায়া?

প্রযোজকের কথা শুনে চাকর বেয়ারার দল এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগ্‌লো।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত হৈ-চৈ—সেই প্রডাকসন ম্যানেজার নিভৃতে ক্যান্টিনের পেছন দিকে বসে আজকের অভ্যাগতদের খাবারের প্যাকেট নিয়ে গভীর তত্ত্ব-আলোচনায় মগ্ন।

কল্‌কাতার একটি নামকরা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ওপর অভ্যাগতদের খাবার সরবরাহের ভার দেয়া হয়েছে। ব্যাপারটা প্রডাকসন ম্যানেজার ত্রিযুগ তালুকদারের মনোমত হয়নি।

মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিকের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি এসেছে খাবারগুলি পৌছে দিতে! কিন্তু প্রডাকসন ম্যানেজার ত্রিযুগ তালুকদার তাকে নিয়ে এক গোপন শলা-পরামর্শে বসেছেন।

ত্রিযুগ তালুকদার—(প্রডাকসন্‌ ম্যানেজার)

ত্রিযুগ তালুকদার বল্লেন, আরে ভায়া, আমি কি আজকের যুগের লোক নাকি হে? সারা জীবন ষ্টুডিওতে প্রডাক্‌সন ম্যানেজারী করে এলাম। আমার অজানা ত' কিছু নেই চাঁদ? সেই 'সাইলেণ্ট্' যুগ থেকে আছি। কত রুই কাত্‌লা চিতল পুঁটি-ডিরেক্টর আমার হাত দিয়ে মানুষ হয়ে গেল। তা' এই ব্যাপারে আমার বখ্‌রাটা কি থাক্‌বে ভালো করে বলে দাও ত' চাঁদ—

মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মানুষটি যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ে!

—আজ্ঞে, আপনার সঙ্গে কিসের বখ্‌রা? খোদ কর্ত্তায়-কর্ত্তায় ফোনে কথা-বার্ত্তা হয়েছে। আমরা আজ মাল ডেলিভারী দিতে এসেছি। এর ভেতর বখ্‌রার কথা ত' কিছু ছিলনা।

ত্রিযুগ তলুকদার বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন, আরে ছোক্‌রা, কথা-বার্ত্তা সবই ছিল। তুমি নতুন মানুষ ত' ঠিক বুঝে উঠতে পারো নি। এটার নাম হচ্ছে ষ্টুডিও রাজ্যি।—কিছু না জেনে, না শুনে তুমি এই হাটে ছুঁচ বেচ্‌তে এসেছ! বলিহারী যাই তোমাকে।

তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে প্রডাকসন্‌ ম্যানেজার ত্রিযুগ তালুকদার বল্লেন, আগের যুগ ছিল ভালো। মিষ্টি আস্‌তো মণ হিসেবে। সবাইকে দিয়ে থুয়েও আমাদের হিসেবে যথেষ্ট থাক্‌ত। এখন হয়েছে খাবারের প্যাকেট! সব গোনা গুন্‌তি জিনিস। একটু এধার-ওধার হলেই চক্ষু চড়ক গাছ। কিন্তু আমার নাম ত্রিযুগ তালুকদার। কথায় বলে, হিসেবের কড়ি বাঘে খায়না! আমার কড়িই বা বরবাদ হবে কেন? নাও—নাও ছোক্‌রা, চটপট পাওনা-গণ্ডার হিসেব ঠিক করে ফেল।

একটি গাছের তলায় কাহিনীকার আসর জমিয়ে বসেছেন! তাঁকে ঘিরেই নায়ক আর উপনায়কের দল। ছিঁটে ফোঁটা পার্ট যারা করবে—তারা আর কাছে ঘেঁষতে সাহস করছে না!

কাহিনীকার তেঁতুল তলাপাত্র বল্লেন, আলু-কাব্‌লী খেয়েছেন আপনারা? বেশ করে লঙ্কার গুড়ো আর নুন মিশিয়ে—খানিকটা তেঁতুল গোলা ছিটিয়ে না দিলে মুখে সোয়াদ লাগেনা! এ ও ঠিক তেমনি! আপনারা যতই চুটিয়ে পার্ট করুন, ভেতরে পদার্থ থাকলে—হবে ত নাটক জমবে? গল্প ভালো না হলে—একেবারে ভস্মে ঘী ঢালা। হুঁ-হুঁ-বাবা। গল্পের 'গ্রিপ্' চাই!

সেই গ্রিপ হচ্ছে—তেঁতুল জলের ছিঁটে!

উপনায়ক নিধিরাজ নকলনবীশ ফোঁস্ করে উঠে

বল্লেন, আপনি গল্পের 'গ্রিপের' কথা বল্‌ছেন, মান্‌লাম সে কথা। কিন্তু ভালো ভালো সবগুলো কথাই যে নায়কের মুখে চালান করে দিয়েছেন! গল্পের উপনায়ক কি বানের জলে ভেসে এসেছে মশাই?

একটা সুন্দর সুযোগ পেয়ে ছবির ভিলেন বটুকেশ্বর বটব্যাল এগিয়ে এলেন। ফিস্ ফিস্ করে বল্লেন, আপনি

বটুকেশ্বর বটব্যাল—(ভিলেন)

ত' তবু খানিকটা সুযোগ পেয়েছেন নিধিরাজদা। কিন্তু আমার কথাটা একটু ভেবে দেখেছেন কি? আমি ছবির ভিলেন। আমার শয়তানীতে দর্শকদল সর্বক্ষণ শঙ্কিত থাক্‌বে—তা নয়, শুধু আঁধার পথে ঘুরে বেড়ানো। না আছে মুখের একটা এক্সপ্রেশন দেখাবার সুযোগ, না আছে চটক্‌দার ডায়ালগ। গোটা ছবিতে একটা 'ক্লোজআপ' নেই। দুঃখের কথা কি বলব আপনাকে! শুধু গাছের ছায়ায়-ছায়ায়—আঁধারে আঁধারে ঘুরে বেড়ানো! রামচন্দ্র!

দূরের একটা হৈ-হল্লায় এদের এই মুখরোচক আলোচনা অর্ধ-পথেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

প্রচার-সম্পাদকের সঙ্গে ষ্টুডিও ফটোগ্রাফারের বাত্‌-চিত থেকে ঘুঁষো-ঘুঁষি সুরু হয়ে গেছে!

সবাই এসে টানাটানি করে দুজনকেই ছাড়িয়ে নিলে। কিন্তু উভয়ের মুখরোচক বাক্য বিনিময় তখনো স্তিমিত হয়নি। অনেক গবেষণার পর উভয়ের কথা আধাআধি ছেঁকে যে বিষয়টি বোঝা গেল—তা সত্যি লাফিং গ্যাসের কাজ করে।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, প্রচার সচিব গুণময় গায়েনের ছোটখাটো একটি নিজস্ব ব্যবসা আছে। ব্যবসাটা আর কিছু নয়—"স্যু-সাইন",—অর্থাৎ জুতোর কালির। গুণময় গায়েন ফটোগ্রাফারকে বলে রেখেছেন, নায়ক ও নায়িকার চরণ যুগলের দুটি চমৎকার ফটো তুলে রাখ্‌তে। সেই ফটোর ঝক্‌ঝকে ব্লক হবে ষ্টুডিওর খরচেই। যে সব কাগজের লোক ছবিখানির বিজ্ঞাপন নিতে আসবে তাদের গছিয়ে দেয়া হবে—"স্যু-সাইনের" ব্লক। বিনে পয়সায় প্রচারের অভিনব পরিকল্পনা।

কিন্তু গোলমাল বাধালে ষ্টুডিওর ষ্টিল ক্যামেরাম্যান। সে কিছুতেই "স্যু-সাইনের" ফটো তুল্‌বে না।

প্রথমে নিছক ওজর আপত্তি। তারপর মতান্তর থেকেই কথান্তর। শেষ পর্য্যন্ত কথা বাদ দিয়ে একেবারে ঘুঁষোঘুঁষি!

ছবির ভিলেন বল্লে, আরে বাবা, বৃহৎকর্মে এ রকম ব্যাপার হামেশাই ঘটে। তাই বলে কেউ মুখ গোম্‌রা করে থাক্‌বেন না। মহরৎ বলে কথা!

কৌতুক অভিনেতা এগিয়ে এসে টিপ্পনী কাট্‌লে, কুমড়ো-পটাশ্ হয়ে থাক্‌বার কোনো কারণ নেই। আমার একটা 'ক্লোজআপ' নিয়ে নিন—হাসির হুল্লোড় আপনিই বয়ে যাবে—সারা ষ্টুডিওময়।

সবাই মাথা নেড়ে বল্লেন, ঠিক! ঠিক!

পরিচালক তখনো চুপচাপ বসে নিজের 'কেরিয়ারের' কথাই ভাবছিলেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বহু 'চার' ফেলে এই রাঘববোয়ালটিকে বঁড়শীতে আট্‌কানো গেছে। কোনো রকমে মহরতটি করিয়ে ফেল্‌তে পারলেই—নিজের ইজ্জৎ রক্ষার জন্যে টাকা ঢাল্‌তে বাধ্য হবে।

ছগনদাস মগনলালের মাকে—অনেক করে ভজিয়ে-ভাজিয়ে কাশীধামে তীর্থকর্ম করতে পাঠানো হয়েছে। সেই অনুসারেই মহরৎ-এর দিন ঠিক করা হয়েছে। এখন টুঁ শব্দটি করবেন না পরিচালক। আগে প্রযোজক মহরতের টোপ্ গিলুক,—তখন খেলিয়ে খেলিয়ে রাঘব বোয়ালকে ডাঙায় তুল্‌তে হবে।

কূটবুদ্ধিতে ঘনশ্যাম ঘড়ঘড়ি কারো চাইতে খাটো নয়।

সময় আগে আসুক। অনুকূল বায়ু পেলে—উল্টো খেল্ দেখাবে ঘনশ্যাম ঘড়ঘড়ি।

আচম্‌কা দিবা স্বপ্ন ভেঙে গেল -পরিচালক ঘনশ্যাম ঘড়ঘড়ির।

কর্ত্তার ঘর থেকে ডাক এসেছে। যখনই কোন জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়—তখনই প্রযোজক ছগনলাল মগন দাস ষ্টুডিওর ফ্লোর ছেড়ে দোতলায় নিজের বস্‌বার ঘরে গিয়ে হাজির হন।

মহরতের সময় সমাসন্ন, এমন সময় কর্ত্তা সোজা ওপরে চলে গেছেন—এ ত' ভালো কথা নয়!

ঈশান কোণে ঝড়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

এক্ষুণি নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গ এসে উপস্থিত হবেন। তাঁদের সবাইকার কাছে পরিচালক ঘনশ্যাম ঘড়ঘড়ি মুখ দেখাবেন কি করে?

পরিচালক নিজের ভাব্‌না-চিন্তাকে শিকেয় তুলে প্রযোজকের খাস কামরার দিকে পা চালিয়ে দিলেন। বিঘ্ন উপস্থিত হলে তাকে বিতাড়ন করতেই হবে।

ওপরে গিয়ে দেখা গেল,—ছগনদাস মগনলাল হাত দুটো পিঠের দিকে নিয়ে মুষ্টিবদ্ধ করে কেবলি পাইচারী করে বেড়াচ্ছেন।

পরিচালক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, একি শেঠজী, এ সময়ে আপনি ওপরে চলে এলেন কেন? তবিয়ৎ ঠিক আছে ত?

সঙ্গে সঙ্গে তেলে-বেগুনে জলে উঠ্‌লেন—ছগনদাস মগনলাল।

—বাবু, বিলকুল গড়বড় হো গিয়া!

পরিচালক যেন পাঁচতলার ছাদ থেকে পা হড়কে একেবারে নীচুতে পড়ে গেলেন!

শুধোলেন, ব্যাপার কি শেঠজী? আমায় সব খুলে বলুন—

ছগনদাস মগনলাল মুখখানা কাচুমাচু করে উত্তর দিলেন, আপ্‌কা হিরোইন মুক্তাকা-মালা মাংতি হ্যায়! উ মালা নেই মিল্‌নেসে মদালসা 'মহরৎ-মে তস্‌বির খিঁচ্‌নে নেহি দে গা!

সর্বনাশ!

শেষকালে মদালসাও এমন করে বুকে ছোবল মারতে চায়!

পরিচালক তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে প্রযোজকের হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরে বল্লেন, দোহাই শেঠজী, এখন আর এই নিয়ে কোনো গোলমাল করবেন না। দিয়ে দিন মুক্তোর মালা। মহরৎটা আগে শেষ হয়ে যাক্। আমি মদালসার কাছ থেকে 'ড্যামেজ' আদায় করবো। নাকের জলে চোখের জলে এক করে দেবো ওর। দেখ্‌বেন আপনি!

প্রযোজক পরামর্শটার মূল্য বুঝ্‌লেন। ভোঁস্ করে তিনি গাড়ীতে চড়ে মদালসাকে নিয়ে জুয়েলারের দোকানের উদ্দেশ্যে ছুট্‌লেন।

গোটা ষ্টুডিও আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগ্‌লো।

অবশেষে হাস্যবদনা মদালসাকে নিয়ে ফিরে এলেন ছগনদাস মগনলাল।

গোটা ষ্টুডিও আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। পোঁ ধরল তোরণদ্বারের সানাই।

ঠিক এই সময় সবাইকে হক্‌চকিয়ে দিয়ে একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো—ষ্টুডিওর ভেতরে। গাড়ীর ভেতর থেকে নাম্‌লেন—ছগনদাস মগনলালের মামা, সঙ্গে কাশী প্রত্যাগতা মা জননী স্বয়ং!

মগনলাল-মাতা বল্লেন, আরে ছগনা—তু জাত্ ব্যবসা ছোড়কে ইধার মাইফেল সুরু কর্ দিয়া? উঠ্ মেরা সাথ গাড়ীমে—নেহি ত'—

আর কিছু শোন্‌বার আগেই ছগনদাস মগনলাল মায়ের বাধ্য ছেলের মতো গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লেন। শাঁ—করে গাড়ী ফটক দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

ষ্টুডিওভর্ত্তি মানুষ হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

পরিচালক ঘনশ্যাম ঘড়ঘড়ি আপন মনে শুধু অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌লেন,—

নাঃ, নতুন করে হাতটা আবার দৈবাচার্যকে দেখাতে হবে!!

হাইড পার্কের খৃষ্ট ধর্ম

রবীন সরকার

হাইড পার্কে প্রতিদিন রিলিজিয়াস্ কর্ণার বা ধর্ম উপদেশ স্থানে যে ভাবে যীশুখৃষ্টকে বারংবার ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, তা দেখে মনে হয় যে আজকালকার যুগে ধীরে ধীরে যীশুর মহিমা লুপ্ত হতে চলেছে। খৃষ্টানরা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যে ভাবে বিষ-উদ্গীরণ করে থাকে তা দেখে মনেহয় যে আমাদের ভারতবর্ষে যীশু অনেক শান্তিতে বসবাস করছেন।

এখানে সেলভেশন আর্মি, চার্চ আর্মি, কাথলিক মিশন, প্রোটেস্‌টেন্ট মিশন, ক্রিশ্চিয়ান এভিডেন্স, লণ্ডন ফোরাম, মরালিটি গ্রুপ, ইত্যাদি ইত্যাদি যে কতরকম ধর্ম সম্প্রদায় আছে তা আমাদের দেশের লোকদের জানাবার জন্য একটু লেখনী ধরলাম।

প্রত্যেকটি ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের এক একটি ছোট মঞ্চ আছে। কাঁধে করে নিয়ে এসে মাঠে রেখে দেয়। একজন বক্তা মঞ্চে উঠে নিজের মনে যীশুর মহিমা সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করে। কে শুনলো—কি না শুনলো—তার কোন তোয়াক্কা সে রাখে না। বকেই চলেছে। তবে মজা দেখবার জন্য হয়ত কেউ দাঁড়িয়ে গেল। কৌতূহলবশতঃ হয়ত কয়েকটি প্রশ্ন করলো। উত্তর এল বাঁধাধরা হিসাবে। অর্থাৎ বইতে যা আছে তারই পুনরাবৃত্তি করে চললো। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে তারা কিছুই বলতে পারে না।

কেন না—তারা যা শিখেছে তাই বলে, প্রায় বক্তারা এর জন্য মাইনে পেয়ে থাকে। যদি কেউ প্রশ্ন করল—সেই দিকে দৃষ্টি না দিয়ে নিজের বিদ্যে তোতাপাখীর মতন বলে যায়। এরা বাইবেলের ভিতর কি লেখা আছে—তা জানে কি না সন্দেহ। এখন যারা প্রশ্ন করে তারা বরং জয়লাভ করে—যখন আলোচনা চলতে থাকে।

এই নিয়ে মাঝে মাঝে পুলিশ এসে যীশু সম্প্রদায়ের লোকদের থানায় নিয়ে যায়—কিন্তু আদালত থেকে তারা সস্তা ছাড়ান পায় না। তখন তারা বুঝতে পারে যে অশান্তি সৃষ্টি করলেই জরিমানা দিতে হয়। কোন ধর্ম এসে বাঁচাতে পারে না।

কয়েকটি প্রশ্ন এখানে তুলে দিচ্ছি। তা দেখে মনে হবে যে এদেশে খৃষ্টানরা কি ভাবে ভুল পথে চলে থাকে। এসবের উত্তর কি হবে আপনারাই ঠিক করে নিতে পারেন।

ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয়দিন ছয়রাত্রি ধরে। এখন কে দেখেছে ভগবানকে সৃষ্টি করতে? যদি কেউ দেখে থাকে সে তখন কোথায় ছিল? ভগবান কোথায় থেকে পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।

আদম যখন ঘুমাচ্ছিল তখন তার অজান্তে ভগবান পাঁজরের হাড় খুলে নিলেন কেন তাকে না জানিয়ে? মাটির পুতুলে ফুঁ দিলে প্রাণ পায় কিভাবে? ভগবান যদি সর্বশক্তিমান তবে কেন ইভকে ফল খেতে মানা করলেন না? ভগবান শয়তানকে সৃজন করলেন কেন?

ক্রাইষ্ট কথাটি কোথা থেকে এসেছে? য়িহুদিরা কি ক্রাইষ্ট বলে জানতো? জন কর্তৃক ব্যাপ্টাইজ হবার আগে যীশু কোথায় ছিলেন? যীশুর মরণের ২৫ বা ৩০ বছর পরে বাইবেল লেখা হয় যদি—তবে কি করে ঘটনাগুলি মনে থাকতে পারে?

ভগবান সর্বশক্তিমান যদি তবে শত্রুদের আক্রমণে গীর্জা বাঁচাতে পারলেন না কেন? শত্রুদের উপর ইংরাজ এমেরিকান-রাশিয়া বোমা ফেলে নগরকে নগর ধূলিসাৎ করে দিচ্ছিল যখন—তখন সর্বশক্তিমান যীশুরা—ভগবান তাদের রক্ষা করতে পারেননি কেন?

যীশু কেন পিটারকে মিথ্যা কথা বলতে বলেছিলেন? (And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day. before that thou shalt thrice deny that thou knowest me (stluke 22—34.)

যীশু কেন প্রমাণ দিতে পারেন নি যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র? (stluke 23—35)

এই ধরণের নানারকম প্রশ্ন তুলে যে ভাবে দিনের পর

দিন, মাসের পর মাস আর বছরের পর বছর চলে আসছে, তাতে মনে হয় না কি খৃষ্ট ধর্মের ভিতর একটু গোঁজামিল আছে ?

সেদিন এক রেভারেণ্ডকে প্রশ্ন করেছিলাম যে আপনাদের যীশুর জন্ম কাহিনীর সঙ্গে আমাদের শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী প্রায় এক রকম কেন ? যেমন যীশুর জন্মের সময় হেরোদ রাজা শিশুদের হত্যা করবার আদেশ দিয়েছিল—ঠিক সেই রকম শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় কংস রাজা শিশুদের হত্যা করবার আদেশ দিয়েছিল.। একই রকম ঘটনা কি ভাবে হতে পারে তা ত বুঝলাম না। হয়ত না হতে পারে। কিন্তু সেই সময় জ্যোতিষ বিদ্যা জেরুজালেমে ছিল কি না সন্দেহ। কেন না, বাইবেল বলেছে যে যীশু জন্মায় যখন তখন তার ঘরের উপর উজ্জ্বল তারা উঠেছিল। তা দেখে জ্ঞানীব্যক্তিরা জানতে পেরেছিলেন যে যীশু জন্মেছেন। এ সব বাজে কথা বলে আপনারা যীশুর নামে অসম্মান করছেন। তার চাইতে আমাদের ভারতীয়রা অনেক ভাল। আমরা জানি মহৎ ব্যক্তিকে সম্মান দেখাতে; যা আপনারা জানেন না।

এই পার্কের এক কোণে একদল এমেরিকান যুবক-যুবতী খৃষ্টের মহিমা প্রচার করে থাকে। তারা বলে যে ইংরাজদের বাইবেল ঠিক নয়। তাদের নূতন আবিষ্কারের কথা ইংরাজদের জানাতে চায়। এই নিয়ে যে ভাবে হাসি ঠাট্টার খেলা চলে তাতে এমেরিকার প্রচারকরা কি করবে ঠিক করতে না পেরে সরে যায় আস্তে আস্তে । তারা এখানে এমেরিকার খৃষ্ট ধর্মের প্রচার করে বেড়াচ্ছে।

যারা এই হাইড পার্কে বিকেলে বেড়াতে আসে তারা অনেকখানি বুঝে নিতে পারে যে ধর্ম নিয়ে কেমন একটা হৈহুল্লোট চলছে। এই ইংরাজ রাজত্বে সেদিন জনৈক মহিলা নাকি খৃষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে অনেক কথা রেডিও মারফৎ জানিয়েছিলেন। সেই নিয়ে আবার কাগজে অনেক লেখা লেখি হয়ে গেছে।

কয়েকজন পাঞ্জাবীকে দেখা যায়। তারা গীতা এনে বোঝায় যে হিন্দুধর্ম কোন ধর্মের বিরুদ্ধে যায় না। যদিও তারা খৃষ্ট ধর্মের বিরোধী নয়, তবুও তারা বলে যে ধর্ম সব আজকাল যে যার নিজের জিনিষ। ধরুন—আপনি খৃষ্টীয় ধর্ম অনুসরন করেন—স্বীকার করে নিলাম। কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্মের কোনখানটাকে আপনারা মেনে চলেন। তার সঙ্গে হিন্দু ধর্মের পার্থক্য কোথায় ? তার সঠিক কোন উত্তর পাওয়া যায় না।

এই ভাবে নানা লোকের নানা রকমের কল্পনা শোনা যায়। কিন্তু কে যে সত্যিই ধার্মিক তা আপনারা এখানে বেড়াতে এলেই বুঝতে পারবেন। এটা শোনা যায় যে যারা খৃষ্টীয় ধর্ম নিয়ে জোর দিয়ে চেঁচায় তারা বেশ রোজকার করে থাকে।

গরমের ছুটী উপলক্ষে নানা দেশের লোক এই হাইড-পার্কে জমা হয়। বিশেষ করে প্রতি রবিবার অভূতপূর্ব জনতা দেখা যায়। তারা ধর্ম সম্বন্ধে যে একটা অপূর্ব ধারণা নিয়ে যায় তা ত বুঝতেই পারছেন। আপনারা যদি লণ্ডনে কখনও আসেন,বিশেষ করে গরমের সময়—তবে অনেক কিছুই দেখতে বা শুনতে পাবেন যা দ্বারা আপনাদের স্বর্গের পথ খুলে যাবে। অবশ্য হাইড পার্কে না এলে কিছুই হবে না। আসবেন তো ?
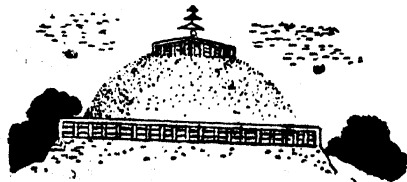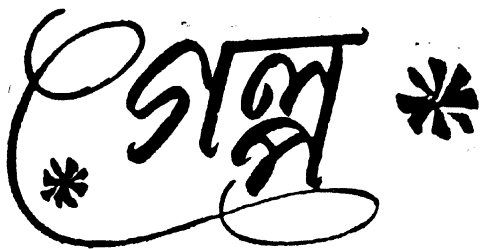
রূপ যখন হয় অপরূপ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘর থেকে বেরিয়ে মুক্ত অঙ্গনে এসে দাঁড়ালো জয়ন্ত। কালো নিঝুম রাত, শরতের লঘু মেঘের ফাঁকে ফাঁকে মৃত্যুমুখী নিভন্ত তারার দল, আকাশে আলো নেই, বাতাসেও গুমোটের আভাস। এইমাত্র ফিরেছে সে থিয়েটার দেখে—সারা রাত্রিই তার নিশি যাপন আজ, হাঁসপাতালের নাইট-ডিউটি। আনমনা পাইচারী করতে করতে সদ্যশোনা গানের এককলি গুণ গুণ করে কণ্ঠে এসে গেলো —সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ, হে ভৈরব শক্তি দাও, ভক্তপানে চাহ, দূর করো মহারুদ্র, যাহা মুগ্ধ যাহা ক্ষুদ্র, মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ।

জুতোর খট্ খট শব্দে তাল ভঙ্গ হলো—

ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, শীগগির একবার আসুন—

বলে ব্যস্ত হয়ে সামনে এলো রেবা, নতুন নার্স, সবে দুমাস এই ওয়ার্ডে এসেছে—

কি হয়েছে—

সেই বত্রিশ নম্বরের পেশেণ্ট বড্ড অস্থির হয়ে উঠেছে, ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলছে, কেবল চেঁচাচ্চে, আমার ভারী ভয় করছে—

আচ্ছা, চলুন, আমি আসছি এখনি—

জয়ন্ত হাই তুলে হাত ঘড়িটা দেখলে, রাত দুটো চল্লিশ। ভাবলে, এই ছোট্ট পৃথিবীরই আরেক দিকে আকাশ ভরা আলো নিয়ে সূর্যদেব উঠছেন, নতুন দিনে কতো বুকভরা আশ্বাস, কতো কাজ, কতো আনন্দ, কতো নিবিড় বেদনা।

বড়ো হাঁসপাতালের সার্জিকাল ওয়ার্ড। জয়ন্ত সেখানকার রেসিডেণ্ট সার্জেন। দীর্ঘ শ্যামল চেহারা, সেবাতৎপর অনলস দুটি হাত, রোগ ও রোগীর মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছে। কোন দিন ক্লান্তিবোধ করেনি, বিরক্তি ত নয়ই। তার মমতাভরা দুটি আয়ত চোখ আর মুখের মৃদু হাসি যন্ত্রণাতুর মুমূর্ষু রোগিদেরও ক্ষণিকের জন্য যে সান্ত্বনা দিত, তাতেই তাদের চিরযাত্রার পাথেয় হোত। বই পড়া তার আর একটা বাতিক ছিল, আর গান সে ভালবাসতো সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে। ঐ ছিল তার ব্যসন। তাকে নিয়ে কোন দিন কমনরুম সরগরম হোত না চপল চটুলতায়, না হোত রেশারেশি মেয়ে-ডাক্তার, ছাত্রী বা নার্স মহলে—অফ্ ডে-তে সে একাই যেতো সিনেমা দেখতে বা থিয়েটারে বা চুপচাপ নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকতো—কেউ বলতো—ফিল-জফার, কেউ বলতো পাগলা। কাজ-পাগলা যে ছিল সে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চিফ্ সার্জেন তারই শিক্ষক ডাঃ মুখার্জির অপারেশন থিয়েটারে সে না থাকলে চলতোই না—এমন কি বিলেত-ফেরত এফ. আর. সি. এস. হয়েও ব্যাণ্ডেজ তুলো এগিয়ে দেবে সে, ড্রাম ঠিক আছে কিনা দেখবে, অ্যানাসথেসিয়া কি রকম হলো, খোঁজ নেবে, রোগীর জ্ঞান সঞ্চারের জন্য বসে থাকবে। যে ওয়ার্ডের যখনই কোন শক্ত কেস আসবে তখনই তার ডিউটি। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ডেকে বলবেন—ডাঃ নাগ, আজ একটা বড়ো 'এ্যাবডোমেনাল' আছে। সিনিয়ররা ত তাকে পেলে খুব খুশী।

হেসে সে উত্তর দেবে—বেশ—

বাইরে হাওয়ার শন্ শন্ শব্দ—বড় বড় ফোঁটা পড়ছে—। তাড়াতাড়ি ওয়ার্ডে ঢুকেই—সে বত্রিশ নম্বরের দিকে এগিয়ে গেলো। রোগী তেড়ে উঠে বসতে

যাচ্চে, দুজন নার্স চেপে ধরে আছে, কিছুতেই তাকে শান্ত করতে পারছে না।

আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাব···

জয়ন্ত তার জ্বরতপ্ত কপালে হাত দিলে, চোখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলে, রোগী ডিলিরিয়স্ নয় বটে, তবে অত্যন্ত উত্তেজিত। সারা মুখ ব্যাণ্ডেজে বাঁধা, হাতে পায়ে প্লাষ্টারের জ্যাকেট্।

জয়ন্ত তার মাথার কাছে বসে হাত বুলুতে বুলুতে জিজ্ঞাসা করলে—কী কষ্ট হচ্চে বলুন্ দিকি, ঘুম হচ্চেনা, এখনি ওষুধ দিচ্চি—

না, না, ডাক্তারবাবু, না—আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন, আমি বাঁচতে চাইনা, আমি হাজারবার বলছি—ছেড়ে দিন—

চুপি চুপি কানের কাছে মুখ নিয়ে জয়ন্ত আস্তে আস্তে বল্লে—

—অতো অস্থির হচ্চেন কেন,—

বোমার মত কেটে পড়লো রোগী—অস্থির হবনা, কি হবে আমার বেঁচে থেকে, খঞ্জ পঙ্গু বিকলাঙ্গ হয়ে, এই পোড়ামুখ দেখে কে আমায় ভালবাসবে—সংসারে সং সাজবার জন্যই কি আসা, আপনিই বলুন—

জয়ন্ত বললে—দেখুন্—পৃথিবীতে দুঃখ কষ্ট অত্যন্ত সত্য, তাকে এড়ানোও যায়না—কিন্তু তেমনি স্নেহ মায়া ভালবাসা এও সত্য—শুধু কী বাইরের খোলসটাই সব—আপনি ছেলেমানুষ, ডাক্তারবাবু, দেখেননি এই জীবনের ঘোর প্যাঁচগুলোকে—নিজের মনের অলিগলির দিকেই চেয়ে দেখুন্—আচ্ছা আমার স্ত্রী আমায় ঘেন্না করবে না—ঠিক সেই রকম ভালোবাসবে—

মাথার বালিশটা ঠিক করে দিয়ে জয়ন্ত আস্তে আস্তে বললে—শুনুন আমার স্ত্রী যদি আজ আপনার মত অক্ষম হয়ে পড়তেন কর্মের বিপাকে তাহলে আমার চোখ দিয়ে তাঁকে দেখাতাম এই পৃথিবীর রূপ, আমার হাত দিয়েই তাঁকে দিতুম সবার পরশ। সত্যিকারের ভালবাসা কি এতই ভঙ্গুর—

সত্যি বলছেন—আমার স্ত্রী আমায় ঘৃণা করবেন না, আমায় বোঝা মনে করবেন না

না তা হতে পারেনা—তা ছাড়া আজকাল প্ল্যাস্টিক্ সার্জারীর যুগ—আপনাকে একেবারে ময়ূর ছাড়া কার্তিকটি করে ছেড়ে দিতে পারি। জয়ন্তের মনে ভেসে উঠলো একটি সেবাস্নিগ্ধ মহিলা, কঙ্কণ-পরা দুটি নিরলস হাত, কর্মনিরতা কল্যাণময়ীর একটি প্রোফাইল।

রোগীকে ট্রানকুইলাইজার খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে উঠে এলো জয়ন্ত। জানালা দিয়ে আসছে আলোর অস্ফুট রেখা, সাদাস্বপ্নের ধূপ উঠছে ভোরের আকাশের দিকে, সামনে বৃষ্টি পাণ্ডুর দিগন্তে সজল দিনের স্বচ্ছ সরসতা।

নার্সকে উপদেশ দিয়ে গেলো সে। করিডরে দেখা স্টাফনার্স মিলি সোমের সঙ্গে। বহুদিনের 'ওল্ড ফ্রেণ্ড' অবশ্য একতরফা—জয়ন্ত তাঁর পুরোনো ভক্ত কি না কেউ জানেনা-গত কবছরের আলাপ—তবে মিলি সোম যে এই খাপছাড়া তেজীয়ান পুরুষমানুষটিকে পছন্দ করতেন মনে মনে, সে কথা তাঁর অনেক ভক্ত অনুরাগীর দল জানতো। তাকে অহেতুকী অনেকবার আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণও করেছেন, কিন্তু সুবিধে বিশেষ হয়নি। হ্যাঁলো, জয়ন্তবাবু ঐ বত্রিশ নম্বর বুঝি—জলন্ত ঘরের দুতলা থেকে লাফ দিয়েছে, মুখ ত পুড়েছেই, পা দুটোও বোধহয় জন্মের মত যাবে—এ্যাম্পুটেট্ না করতে হয়—এরকম করে বেঁচে থাকাটাও ঝকমারী—

জয়ন্ত বলে—আহা, বেচারী—

মিলি হেসে জিজ্ঞাসা করে একটু হিংসা ও রিরংসা মিশিয়ে—আমরা নিমন্ত্রণটা পাচ্চি কবে, আপনি ত শুনলাম শীঘ্রই আবার ফরেনে যাচ্ছেন, এবার নাকি আমেরিকায়, সুজাতা বেচারী কী শবরীর প্রতীক্ষাই করবে। সুজাতা আর মিলি মানে নির্মলা স্কুলে কলেজে হষ্টেলে সহপাঠিনী। তার পর একজন নার্সিং এ ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী নিলে, আর একজন বি, এ—এম্ এ পড়লে। সুজাতার নামে জয়ন্তের অবচেতনে যেন একটা বৈদ্যুতিক শক্ খেলে যায়। হ্যাঁ, সুজাতা, সুজাতা—মনে মনে নামটি সে আউড়ে যায়-অনেক চেষ্টা, কষ্ট আর সাধনায় লব্ধ কৃপণের ধনের মতন—মনের গোপন মণিকোঠায় সে রত্ন লুকোনো আছে। মিলির মত মেয়েরাই সেটাকে টেনে হিঁচড়ে পাঁকের দরজায় এনে তারস্বরে লাউড স্পীকারে ছাড়িয়ে দিয়েছে। হাঁসপাতালের সবাই জানে যে জলপাইগুড়ির

কাছে এক মেয়ে স্কুলের অনৈকা শিক্ষিকা শ্রীমতী সুজাতা এম এ বিটি, তার বাগ্‌দত্তা ভাবী বধূ। জয়ন্ত গরীবের ঘরের ছেলে, মামার বাড়ীতে মানুষ—অতিকষ্টে বিধবা মা তাকে মানুষ করেছেন ডাক্তারী পাশ করেই সে বিলেতে গিয়েছিল স্কলারশিপ পেয়ে। ফিরে চাকরী নিয়েছে চা মালিকদের এই বড় হাসপাতালে—বছর খানেকের টাকা জমলেই দুজনে করবে সংসার—নিরলস ক্লান্তিহীন সেবায় মাধুর্যে ভরা জীবনের একটি নিটোল স্বপ্ন—তাদের আশা যে দুজনেই যাবে আমেরিকায়—আরো পড়বে, আরো শিখবে।

তিন মাস পরে। সকাল থেকেই হাঁসপাতালে একটা উদ্বেগময় কর্মব্যস্ততা। হিমালয়ের পাদদেশে একটা বড় ভূকম্পন হয়েছে—স্বয়ং বাসুকি নড়ে চড়ে নগাধিরাজের খণ্ডশৈল প্রস্তাদের অতিরিক্ত চঞ্চল করে তুলেছিলেন এবং তারই ফলে বিপর্যয় বিপদ ঘটে গেলো তেরাইয়ের গ্রামে সহরে। জয়ন্ত তখনো জানতো না যে টেলিফোনে খবর এসেছে এমার্জেন্সী বেড তৈয়ারী রাখবার জন্য, রিলিফ্ ট্রেণ আসছে। সে যখন ওয়ার্ডের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল তখন নজরে পড়লো ৩২ নং এর উপর। বেশ হাসিখুসি মুখ, বললে—জানেন, আমি বাড়ী থেকে চিঠি পেয়েছি, আমার স্ত্রী আসছে, কালীঘাটে মানত করেছিল যে আমি ভাল হলে বুকের রক্ত দিয়ে পূজো দেবে।

মিলি সোম্ কাছেই ছিল, এসে বললে—এই যে ডাঃ নাগ, সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আপনাকে খোঁজ করছেন, এক ঝাক পেশেণ্ট আসছে—মন খারাপ করবেন না কিন্তু—

জয়ন্ত আশ্চর্য হয়ে যায়—ডাক্তার নার্স, এদের কাজই ত আর্ত্তের সেবা করা, মন খারাপের কী আছে—

সে চেয়ে থাকে আনাড়ীর মত।

না, এই সুজাতার কথা বলছি—সেও ত আসছে এ রিলিফ্ ট্রেনে, ভূমিকম্পে সেও যে ক্যাসুয়ালটি—কেন শোনেননি—লিষ্টে তারও নাম দেখলুম যে—সুজাতা, সুজাতা—জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে যায়—সে কী—হ্যাঁ, কাল রাত্রেই খবর এসেছিল—ডাঃ মুখার্জ্জী শুনে বললেন—জয়ন্ত এখানে রয়েছে—এই হাসপাতালেই তাকে আনবার ব্যবস্থা করবো আমরা—ভাবনা কি, আমরা ত রয়েইছি—সকলের ধ্যান দিয়ে, ধৈর্য দিয়ে, সেবা দিয়ে প্রেম দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে,—পারবেন না, ভালোবাসা যে মৃত্যুঞ্জয়।

জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে তন্দ্রাহতের মত উঠে গেলো। তার পর যথারীতি আহতাকে স্ট্রেচারে করে একেবারে অপারেশন হলে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাঃ মুখার্জ্জী বললেন—জয়ন্ত, তুমি শুধু দাঁড়িয়ে দেখে যাও। এই অপারেশন থিয়েটারে কত ভীষণ নির্মম কাটাছেঁড়ায় সে সাহায্য করেছে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে, চিকিৎসক হিসাবে। আজ যেন তার হাত পা সব কাঁপচে, মন চঞ্চল। অজ্ঞান সুজাতাকে টেবিলে নিয়ে আসা হলো—ব্যাণ্ডেজের স্তূপ থেকে বেরিয়ে পড়লো একটা বীভৎস, ফোলা, থেতলে-যাওয়া মাংসপিণ্ড। কোথায় গেল সেই স্নিগ্ধ শ্যামল চোখের চাহনি—যা দেখে জয়ন্ত বলতো—তোমার এ ডাগর কালো হরিণ চোখই আমায় ডুবিয়েছে। সে হাঁ করে দেখতে লাগলো, অত্যন্ত নিপুণভাবে অস্ত্রোপচার করে চলেছেন ডাঃ মুখার্জ্জী—জয়ন্ত কিন্তু ততক্ষণে হারিয়ে গেছে নিজের গভীরে—এই কি সেই সুজাতা—যাকে সে সবমন দিয়ে ভালো বেসেছিল, এ কোন সুজাতা, তার কতটুকু সত্তা। আচ্ছা এই পঙ্গু মাংসপিণ্ডকে নিয়েই সারাজীবন ধরে সে ভালোবাসার অভিনয় করে যাবে—না, সেই পুরোনোদিনের সুজাতা আবার বেরিয়ে আসবে—তার মনকে প্রবুদ্ধ করবে, জীবনকে ধন্য করবে, অন্নকে বহু করবে—যে হবে গৃহিণী সচিব সখী প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ। কুমারসম্ভবের এক কলি মনে পড়লো ফিরে ফিরে —রূপকে অব্যক্ত করতে হবে—রূপে আর ভোলানো নয়, অরূপ দিয়ে। ছিঃ ছিঃ এ কী ভাবছে সে, জোর করে নিজের মনকে সে চাবুক মারে—সে না ডাক্তার, সেবাব্রতই না তার ধর্ম। দিনের পর দিন যায়, ক্লান্ত করুণ এক ঘেয়ে দিনগুলি, বৈচিত্র্যহীন, স্বাদহীন। জয়ন্ত হাতে পায়না জোর, কাজে পায়না আনন্দ—কোথায় যেন সুরের তাল কেটে গেছে। সুজাতার মুখের দিকে চেয়ে মনের ভিতর জমে ওঠে একটা হিমশীতল প্রলেপ—কোন অতলে যেন চলে গেছে তার অতো গভীর ভালোবাসা—সে ও কী আর সকলের মত আত্মসর্বস্ব মত্ততার পূজারী হলো। সুজাতার দুইচোখ

হাত পা বাঁধা—মাঝে মাঝে ক্ষীণ চৈতন্যের আভাস আসে, কে যেন অতি আস্তে বলছে সত্তার অতি গভীরের মূর্চ্ছনা দিয়ে—জয়ন্ত কোথায়, জয়ন্ত—একমাত্র সেই আমাকে বাঁচাতে পারে, তার জন্যই আমি বাঁচতে চাই। জয়ন্ত শোনে, অভ্যস্ত নিপুণ হাতে কাজ করে যায়। সুজাতা জিজ্ঞাসা করে—সে কী জয়ন্তের হাঁসপাতালে এসেছে, না অন্য কোথাও। মাঝে মাঝে বলে-জয়ন্ত, জয়ন্তকে খবর দাও না?

নার্সকে বলে—ডাঃ নাগের পায়ের শব্দ না, অবচেতনে সে যেন টের পায় যে জয়ন্ত কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। নার্সদের বিশেষ করে বলা হয়েছে যে রোগিণী যেন জানতে না পারে যে জয়ন্তের হাঁসপাতালে তাকে আনা হয়েছে। তা হলে উত্তেজনায় হিতে বিপরীত হওয়া অসম্ভব নয়—অন্ততঃ কিছু না হোক্ সে চাইবে জয়ন্তকে কাছে ডাকতে। জয়ন্ত মাঝে মাঝে হঠাৎ উদয় হতো, চুপ করে বসে থাকতো দূরে। কেবিন নার্সকে বলতো যেন কিছু না বলে।

সেদিন বিকালে মিলি সোম পাকড়াও করলে জয়ন্তকে —বললে আপনি যেন কী—মিছামিছি রোগের ভাবনা বা রোগিণীর কাছে বসে কিছু লাভ হবেনা। নিজের কোয়াটারে তাকে জোর করে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ালো। সেদিন তার অফ্ ডে, বললে—চলুন, সিনেমা দেখে আসি। কোনদিন এসব চটুলতার প্রশ্রয় দেয়নি জয়ন্ত। বিশেষ করে মিলি সোমের মত চপলা চঞ্চলা মেয়েদের। আজ কিন্তু সহজেই সে রাজী হয়ে গেলো। মিলির আকর্ষণটা সিনেমার চেয়ে সিনেমা যাওয়া সঙ্গীটির পরেই বেশী। হাসিতে গানে গল্পে ভাবে ভঙ্গীতে ইঙ্গিতে সে জয়ন্তকে কুক্ষিগত করবার চেষ্টায় লেগে যায়। সেদিন শুধু অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু—দিনের পর দিন তাদের মেলা-মেশা ঘনিষ্ঠ আলাপ আলোচনা, তাদের একত্র থিয়েটার সিনেমা দেখা ক্রমশঃই হাঁসপাতালের আরো পাঁচ জনের নজর এড়ায় না। সুজাতাও ক্রমশঃ ভালোর দিকে। মাথায় আঘাতের দরুণ ব্রেণের আচ্ছন্নভাবটা ক্রমশই কমে আসছে। ডাঃ মুখার্জী সেদিন বললেন—জয়ন্ত, you are lucky. She is coming round very fine. you are a marvel. অবশ্য মিলি সোমের সঙ্গে যতই বেড়াক বা ঘুরুক্—সুজাতার সেবা ও চিকিৎসার ভার জয়ন্ত নিজেই নিয়েছিল। প্রথম প্রথম সারারাত্রি বসে থাকতো, নিজে ইন্‌জেকসন্ দিতো, ওষুধ খাওয়াতো, পথ্যাদির তদারক করতো। সেদিন সে বেড়াতে বেরিয়ে -ছিলো বিকেলে, সন্ধে বেলার রাউণ্ডে এসে ডাঃ চাটার্জী বললেন—আজ সুজাতার বেশ টনটনে জ্ঞান, কাল ওর চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলবেন—Let the poor girl see this old world again দুচোখ ভরে দেখুক—আর জয়ন্ত কিনা সেইদিন সন্ধে বেলাতেই মিলির সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে শুনে এসেছে—জয়ন্তবাবু, জীবনটাকে এরকম করে নষ্ট করবেন না, we live but once সুজাতা লেখাপড়া জানা মেয়ে, দায়িত্ব জ্ঞানহীনা নয়—বেরসিক্ নয়, নিজের অবস্থা বুঝলেই সে সব দাবী ছেড়ে দেবে, অন্ততঃ দেওয়া উচিত, কী বলেন—

জয়ন্ত বলেছিল—ছিঃ ছিঃ কি বলছেন আপনি—গলার স্বরটা কিন্তু কেঁপেছিল।

সুজাতার চোখের বাধন খোলবার দিন এসে গেলো। আশ্বিনের বর্ষণধৌত সোনালী সকাল—দূরে পাহাড়ের চূড়ায় শ্বেতবরণার আবির্ভাব-মাঠে ও সাদার ছড়াছড়ি শিউলিফুলে আর কাশে। ভোর রাত থেকেই জেগে আছে সুজাতা—আজ সে দুচোখ ভরে দেখবে সকলকে, পৃথিবীকে, আলোকে, মনের মানুষকে—তিনমাস সে পড়ে আছে এই ভাবে—অবশ্য এখনও বহুদিন তাকে থাকতে হবে হাঁসপাতালে—তবু ত সে দেখতে পাবে, কথা বলতে পাবে, শুনতে পাবে। বেলা এগারোটায় তার ব্যাণ্ডেজ খোলা হোল। জয়ন্ত মুখ নীচু করে একপাশে দাঁড়িয়েছিল, তার চোখে কোন উল্লাস নেই, বুকে কোন উত্তেজনা নেই, পাংশু নীরব নত মুখ।

চারি চোখে মিলন হোল, কিন্তু সুজাতার মুখচোখ লাল হলেও জয়ন্ত তার প্রতিধ্বনি খুঁজে পেলে না তার রক্তের তরঙ্গে। সে চেয়ে রইল উদাস হয়ে, যেন সুজাতার ক্ষতলাঞ্ছিত মুখ তার অচেনা। সুজাতা উৎসুক হয়ে তাকিয়ে দেখে, সবাই চলে গেলে তাকে কাছে ডাকে তার যে হাতটা ভাঙেনি, সে হাতটা দিয়ে জয়ন্তের আঙুলের স্পর্শ নিতে চায়, আগেকার আবেগ দিয়ে—কিন্তু পায়না কোন প্রতিদানের ইঙ্গিত জয়ন্তের ভঙ্গীতে। ঠিক

বোঝেনা সে—ভাবে এটা হয়তো তার রোগক্লান্তির অক্ষমতা। একদিন দুদিন যায়, মিলি সোম ও আসে, কিন্তু তার সান্ত্বনার ভঙ্গীটা বিশেষ ভালো লাগে না সুজাতার, বিশেষ করে যখন সে বলে—তোর উচিত কিন্তু সু, জয়ন্তবাবুকে "রিলিজ" করে দেওয়া, বেচারী কি রকম মনমরা হয়ে আছে দেখেছিস্—তবে বলতে হবে নিশ্চয়ই—কী সেবাটাই করেছে তোর দিনে রাতে—যমের মুখ থেকে টেনে নিয়ে এসেছে—কিন্তু ওর ভবিষ্যৎ-টাও তো ভাবতে হবে, ওকে এখন প্রায়ই ইউরোপ আমেরিকা যেতে হবে, ওর কী এখন পঙ্গু বউ ঘাড়ে করে সংসারে জুবড়ে থাকা উচিত—কি বলিস্—

সুজাতার মুখ বেদনায় নীল হয়ে যায়, সে কিছুই জবাব দিতে পারলে না। আরো খানিকটা তাজা বে-ভেজাল হলাহলে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে মিলি সোম বিদায় নিলে।

সেই দিনই বিকেলে নার্সকে ডেকে সুজাতা বললে—আর্সিটা নিয়ে এসে চুলটা একটু গুছিয়ে দিন না। নার্স কিছু সন্দেহ করে নি। আর্সিটা আনতেই তার হাত থেকে নিয়ে নিজের বিক্ষত বীভৎস চেহারার একটু নমুনা দেখেই চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলো সে।

ছুটে আসে ডাক্তার নার্সের দল—জয়ন্ত, মিলি সোম, ডাঃ মুখার্জী সবাই। জয়ন্তের চোখে ছোটে আগুন।

গভীর রাতে সুজাতা তার হাত দুটো ধরে বলে—কিছু মনে করো না, জয়ন্ত, ভগবানের বোধহয় ইচ্ছে নয় যে তোমাতে আমাতে মিলন হয়—তোমার জীবন আমি নষ্ট হতে দেবো না—আমার ভালবাসা অতটা স্বার্থগান্ধী নয়—আমি বলি কি মিলিকেই তুমি বিয়ে করো—ও তোমাকে বড্ড ভালবাসে। তুমি ফুলের মত বিকশিত হয়ে ওঠো। তোমাকে এখন বড়ো হতে হবে—মস্ত বড় ডাক্তার। তুমি কি আর একটা পঙ্গু অঙ্গহীনা কুৎসিতাকে নিয়ে চলতে পারবে ?

জয়ন্ত মুখে অবশ্য বললে—কী সব বাজে কথা বলছো,

কিন্তু সুজাতার মনে হলো যেন কোথায় খুঁত রয়ে গেলো, আরো জোরে বললে না কেন জয়ন্ত।

সুজাতা কিন্তু, তারপর থেকে জয়ন্ত আর মিলিকে ওই একই কথা বার বার বলে। জয়ন্ত চটে যায়, মিলি হাসে, বলে—একেবারে কবুলতী করে লিখিয়ে নেবো কিন্তু—শেষকালে সত্ত্ব সামিত্বের মকর্দ্দমা করতে পারবো না বাবু তোর সঙ্গে—হাজার হোক্ এক সঙ্গে পুতুল খেলেছি, কুল খেয়েছি, আচার খেয়েছি—

সুজাতা হেসে বলে—শুধু আচার নয়, আছাড়ও পালাতে গিয়ে—

শেষ পর্য্যন্ত সুজাতারই যেন দায়, সে বলে—আর কেন, দিয়ে এসো সিভিল ম্যারেজের নোটিশ,—

মিলিকে বলে—তোর হাতেই ওই ভোলানাথকে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারি—ওর ঐ বাউণ্ডুলে উদাস ভাব আর সহ্য হচ্ছে না আমার।

ক্রমশঃ মনে হয় জয়ন্ত যেন নিমরাজী হয়ে আসছে।

সেদিন হাসপাতালে হৈ হৈ ব্যাপার। একটি মহিলা এসে চেঁচামেচি সুরু করে দিয়েছেন—তার স্বামী নাকি এই হাসপাতালেই মারা গেছেন, তিনি জানতে চান, শেষ সময়ে তিনি কি বলে গেছেন, সেই হবে তাঁর বৈধব্যের শেষ সম্বল।

বলুন, বলুন,—তিনি কি বলে গেছেন—বলে ফুঁপিয়ে কাঁদেন মহিলা।

জয়ন্তকে ডেকে বলে—ডাক্তারবাবু, আপনি ছিলেন তাঁর কাছে শেষ সময়ে, সত্যিই তিনি কিছু বলে যান নি—বলে আবার কাঁদেন।

ওদিকে ৩২ নম্বরেও সোরগোল—সে আজ সুস্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছে নিজের ছোট গ্রামে—বসে থাকবে চণ্ডী-মণ্ডপে, না হয় নদীর ধারে বটের ছায়ে। মুখের ব্যাণ্ডেজ খোলা, অপারেশনের বীভৎস দাগ, একটা চোখ সাদা ঘোলাটে দৃষ্টিহীন। তবু সে সুখী, সে ক্রাচে ভর দিয়ে দিয়ে চলতে শিখেছে। পাশে বসে আছে ঘোমটা দেওয়া সপ্তগ্রাম থেকে আসা একটি কালো মেয়ে। কালীঘাটের মানত পূজো দিয়ে স্বামীকে নিয়ে দেশে যাবে। দুচোখ ভরে হাঁ করে সে চেয়ে আছে স্বামীর দিকে, চোখের দৃষ্টিতে উপছে পড়ছে নিংড়ে নেওয়া ভালবাসা আর চিরকৃতজ্ঞতার ভাষা—ভগবান্ রক্ষা করেছেন তার স্বামীকে, মা কালী ফিরিয়ে দিয়েছেন

হাতের নোয়া, নিজের সব দিয়ে সে ঢেকে রাখবে তার স্বামীকে। বলে—কিছু বোঝা যাচ্ছে না যে তোমার একটা পা কেটে দিয়েছে—পাটা আসল নয়—কী মজা। আর ডাক্তারবাবু কি বলেছেন জানো যে আর একটা অপারেশন্ করলে মুখের কাটাছেঁড়াগুলোও শুধরে নেওয়া যায়—তাই করে নিয়ো পরে—তা বাপু আমি কি আর মুখ নিয়ে ধুয়ে খাবো—

স্তব্ধ হয়ে দেখতে থাকে জয়ন্ত, মন্ত্রমুগ্ধের মত তাদের যাত্রার আয়োজন, মনে পড়ে আর এক অনাথার চীৎকার —কোন কথা বলে যান নি তিনি।

মিলি এসে বলে—সুজাতা বলছিল যে নোটিশটা আজই দিয়ে দিতে—আপনি ত কাল ফর্মটা এনেছেন—

অত্যন্ত কঠোর স্বরে জয়ন্ত বলে—থামুন্—কী যা তা বলছেন, পাগলামী করবেন না—

মিলি ভাবে—পুরুষ মানুষের 'মুড্' বোঝা ভার—

জয়ন্ত হন্ হন্ করে এগিয়ে এসে একেবারে সুজাতার কেবিনে ঢোকে, চুপ করে বসে আছে সে ইনভ্যালিড চেয়ারে হেলান্ দিয়ে। কী যেন ভাবছে—চোখে দুফোটা জল। মায়ামন্থর নিবিড়ক্ষণ। জয়ন্ত পিছনে এসে দাঁড়ায়—জড়িয়ে ধরে তার দুটো হাত—সকল দেহের আকুলতা দিয়ে—টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ে সুজাতার চোখ দিয়ে—দেবতার স্নিগ্ধ আশীর্বাদের মত।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে জয়ন্ত চুপিচুপি ডাকে—সুজাতা, সু—

হরিণ সন্ধ্যা মন

শ্রীরাধারমণ সিংহ

আমার হরিণ সন্ধ্যা এ মন হাসে বাসরের লাজুক হাসি
ডুব দিয়ে নীল ঊর্ম্মি মুখর ফেন উচ্ছল সাগর জলে;
শোনে কান পেতে বিংশ শতের ব্রজ গোপালের মধুর বাঁশি,
ছড়ায় যখন নব ফাগ-রাগ অধুনা রাধার কপোল তলে।
আমার হরিণ সন্ধ্যা এ মন ঘুরে ঘুরে মরে হেথা ও হোথা,
খুঁজে খুঁজে ফেরে ঝাঁঝরা পাজরে ঝরে পড়ে কত দীর্ঘশ্বাস,
মাথা কুটে মরে কত যৌবন, এ মন শুধু নীরব শ্রোতা।
দূর পাল্লায় তাই দিয়ে আড়ি স্বেচ্ছায় তার পড়েছি ফাঁস।
আমার হরিণ সন্ধ্যা এ মন বোবা কান্নার প্রহর গোণে।
তারা ঝিল্‌মিল্ রাতের ডানায় ঈশানী মেঘের আল্‌তো ছোঁয়া
গোপন প্রিয়ার ছলোছলো চোখে হারানো দিনের স্বপ্ন বোনে।
হরিণ সন্ধ্যা মন ত এ নয়—অভিশাপে ভরা বিষের ধোঁয়া।

আক্ষেপ

রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার মনের পতিত জমি তো নাই,
যেথায় তোমার হ'তে পারে আস্তানা,
তোমার জমিতে থাকে যদি কোন ঠাঁই—
চাই না কখনো দিতেও
করি না মানা।
ছিলো ক' বিঘৎ বিলিয়ে দিয়েছি তা'ও
ফিরেও নেবো না আছে
আজো নিষ্কর,
এর পরেতেও তুমি যদি এসে চাও
অনুরোধ কর ঘুষ দাও বিস্তর—
আমার থাকার আস্তানা তবে দিয়ে,
যেতে হ'বে শেষে উদ্বাস্তুর দলে;
তখন কিন্তু আমার এ দশা নিয়ে
বিরহী হয়ো না ভেকো না অশ্রুজলে।

দুষ্টু
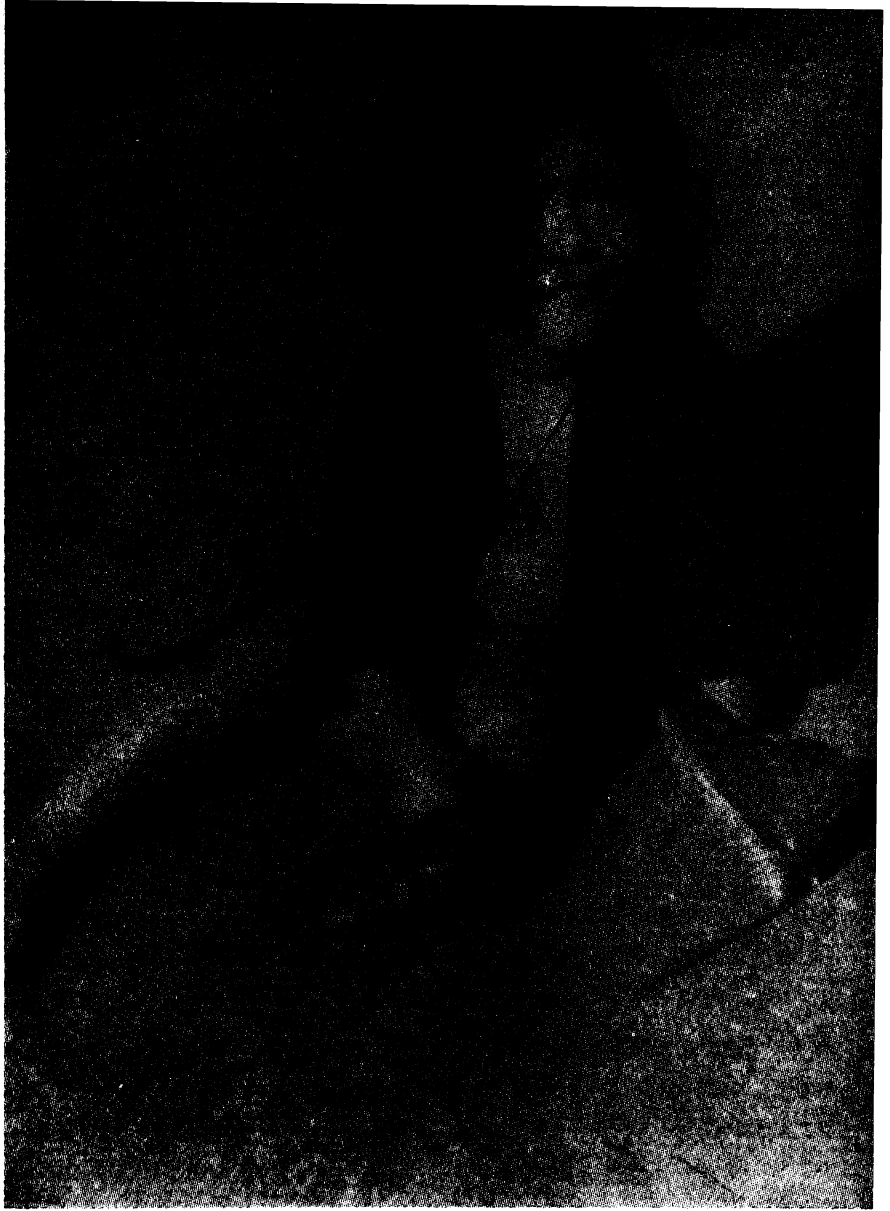
শিল্পী : সনৎকুমার দাস

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উপদেশ

উপানন্দ

মন্দভাগ্য উচ্চাশাকে দ্রুত পরিচালিত করে, এজন্যে দুর্দ্দশায় কাতর হওয়া উচিত নয়। দুর্দ্দশায় না পড়লে মানুষ উদ্যোগী হয় না। উচ্চাশা ঘুমিয়ে পড়ে আলস্যে। অশ্বারোহীর পাদুকার লৌহকণ্টক যেমন অশ্বপার্শ্বস্পর্শ মাত্রেই অশ্বকে দ্রুতগামী করে, মানুষের দুর্দ্দিনও সেইরূপ পার্শ্বদেশে আঘাত না করলে মানুষ সচেষ্ট হয় না, সেজন্যেই সাধুরা বলেন, দুর্দ্দিন সুদিনের দূত। হতাশ হোতে নেই, উদ্যোগী হোতে হয়—তা হোলে দুর্দ্দিন দূর হয়ে যাবে আর তা-ই হয়ে থাকে। দুর্দ্দিনে যে হাত পা ছড়িয়ে কাত্‌রে পড়ে, সেই চিরদিনের মত ধ্বংশের মুখে পতিত হয়, জীবনে আর উঠ্‌তে পারে না। নিশ্চেষ্ট হয়ে যারা অলসভাবে জীবন যাপন করে আর ক্রমাগত আক্ষেপ করে বলে—কিছু হোলো না, তারা জাতির কলঙ্ক, পরিবারের বিস্ফোটক, আর সমাজ বিধ্বংসী। যে মানুষ সব হারিয়েও চরিত্র ঠিক রেখেছে, সে যে আবার উন্নতি করতে পারবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যার চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে, তার সবই গেছে। কারণ চরিত্রই দুঃখীর মূল ধন। এই মূলধন যে নষ্ট করে নি, সে আবার জগৎ সংসারে মাথা তুলে দাঁড়াবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সৌন্দর্য মানুষের চোখকে ধরতে পারে। এই সৌন্দর্য্য চলার পথে আমরা দেখি, আর আমাদের কাছে পথ হয়ে ওঠে চিত্র প্রদর্শনী; কিন্তু বাহিরের সৌন্দর্য্যই সব টুকু নয়, মানুষকে সম্মোহিত করে মাত্র—কিন্তু গুণ হৃদয় জয় করে। তাই গুণী ব্যক্তির সমাদর সব চেয়ে বেশী। কেবল শিমুল ফুলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য ব্যগ্র হওয়া উচিত নয়; গুণ না থাকলে মানুষের হৃদয় জয় করা অসম্ভব। যেখানে সৌন্দর্য্য আর গুণের একমাত্র সমাবেশ, সেখানে নয়ন ও মন দুই-ই জয় করা সম্ভব হয়েছে। এ কথাটা তোমরা স্মরণ রাখবে। যে সুযোগ হারায়, সে কোন দিন সৌভাগ্য লাভ করতে পারে না। যে যত বড় কর্ম্মক্ষম আর উদ্যোগী, সে ই তত ভাগ্যবান পুরুষ। যে উদ্যোগী সেই লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ। প্রত্যেক মানুষই যেন এক একটা বিশ্বকোষের মত বিরাট গ্রন্থ। তাকে যদি ঠিকমত পড়বার শক্তি অর্জ্জন করা যায়, তা হোলে তা থেকেই ভাল মন্দ অনেক শিখতে পারা যাবে। প্রত্যেক মানুষ্যচরিত্ররূপ বিরাট গ্রন্থ পড়বার অভ্যাস করো। মানুষকে পড়্‌তে শেখেই বা কজন!

জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই দেখা যায় উচ্চ আর তুচ্ছ দুই-ই আছে। সৌরজগতের কাছে পৃথিবী তুচ্ছ, রাজ্যের কাছে একটি নগর তুচ্ছ, একটি নগরের কাছে পল্লী তুচ্ছ, পল্লীর কাছে একটি গৃহস্থালী তুচ্ছ—একটি গৃহস্থালী আবার কত উচ্চ ও তুচ্ছে পরিপূর্ণ। তুচ্ছের সংহতি উচ্চের গৌরব নষ্ট করতে পারে, এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আবার তুচ্ছও একদিন উচ্চপদে আরূঢ় হোতে পারে। 'সংহতিঃ কার্য্য সাধিকা'—বটে, কিন্তু ঘটনা-

চক্রে পড়ে সময়ের স্রোতে একটি তুচ্ছ ও উচ্চ হয়। জড় বা চেতন উভয়ই এই চিরন্তন প্রথার অধীন। এজন্যই বল্‌তে শোনা যায়, উচ্চ ও তুচ্ছ কিছু বেশী প্রভেদ নয়। অবস্থান আর প্রতিষ্ঠানের মাহাত্ম্য ভেদে তুচ্ছ ও উচ্চ হয়ে সমাজ সংসার দেশ ও জাতির ওপর কর্ত্তৃত্ব করে। প্রত্যেক নগণ্য ক্ষুদ্রের সমষ্টিতেই গণ্য সম্পূর্ণতার উৎপত্তি, কিন্তু যখন সম্পূর্ণ দ্রব্য দেখা যায় তখন কি ক্ষুদ্রের সমষ্টি বলে কেউ উপেক্ষা করে! ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করে বহু সর্ব্বনাশও হয়ে থাকে। স্বভাবের ক্ষুদ্র দোষ, ক্ষুদ্র ব্যয় প্রভৃতি আমরা উপেক্ষার চক্ষুতে দেখি, কিন্তু যখন এই সব দোষ একত্র হয়ে প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে, তখন অনুতাপে দগ্ধ হোতে হয়, এজন্যে ক্ষুদ্র বলে উপেক্ষার কিছু নেই। মানুষ, জীব শরীর, জড় অজড় সবই পরমাণুর সমষ্টিমাত্র 'Trifles made perfection.'

স্পেনের রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড বলেছিলেন – 'মানুষের তিনটি চিহ্ন দেখে জ্ঞানী আর অজ্ঞানীতে পার্থক্য ঠিক করতে পারি—(১) ক্রোধ সংবরণ (২) সাংসারিক সুশৃঙ্খলতায় নিপুণতা আর (৩) একই কথার পুনরুক্তি-দোষ বর্জ্জন। প্রত্যেক জ্ঞানীর এই তিনটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক—একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে তাঁর কথাগুলি যথেষ্ট অভিজ্ঞতাপ্রসূত। মানুষের মনুষ্যত্ব না থাকলে ঐশ্বর্য আর পাণ্ডিত্য থাকলেও সে পশু, এই পশুতেই আজ সমাজ সংসার পরিপূর্ণ। অলস আর অপব্যয়ী ব্যক্তি কখন বড় হোতে পারেনা। সময়ই অর্থ। প্রত্যেক সময়টি এজন্যে সদ্ব্যবহার করা দরকার। পরিশ্রমই মানুষ প্রস্তুত করে, অদৃষ্ট নয়। আমরা ক্ষুদ্র ব্যয় উপেক্ষা করে সঙ্কটময় দারিদ্র্যের করালগ্রাসে আত্ম সমর্পণ করি। সঞ্চয়ের আদর আমাদের কাছে নেই, এজন্যে সর্ব্বজাতি অপেক্ষা আমরা দরিদ্র। এই দরিদ্রতার জন্যে আমরা মনুষ্যত্ব, বীরত্ব, কর্ম্মতৎপরতা, বৈষয়িক জ্ঞান সব কিছু হারিয়ে বাক্যবাগীশে পরিণত হয়ে পড়েছি। নীচ প্রকৃতির লোকেরা নিজের দোষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তারা জীবনে কোন অন্যায় আচরণ করেছে বলে মনে করেনা। শুভ আর অশুভ নিয়েই জগৎ। মানুষ শুভের আশা যতটা করুক আর নাই করুক, অশুভের আশঙ্কাই তার মনের মধ্যে সর্ব্বদা প্রবল। শোকদুঃখাদির নৈরাশ্য আর অনুশোচনার মত মানুষের আর কোন বড় শিক্ষক নেই। শোকদুঃখাদির চাপে না পড়লে মানুষের চৈতন্য হয় না, এই চাপে পড়লেই লোকের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী জাগে, জ্ঞান ফিরে আসে। চির-সুখী ব্যক্তি দুঃখীর দুঃখকে অগ্রাহ্য করে। আত্মবলে বলীয়ান ব্যক্তিরাই মান অভিমানের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখেন না। এরা সত্যসঙ্কল্প ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। পতন আসন্ন হোলেও পরুশস্য এজন্য বিচলিত হয় না, নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দুঃখকে পুরুষকারের দ্বারা বাধা দিলে ওকে দুঃখ বলে মনে হবে না। জগতে দুর্ব্বলের কোন স্থান নেই, বেঁচে থাকলেও মৃতের মত তার অবস্থা। জাতি বড় হবার পর যখন ধীরে ধীরে তার পতন ঘটে তখন বুঝতে হবে সে জাতির মধ্যে মানুষ নেই, আছে নর পশু, আছে কাপুরুষ ব্যক্তিত্ব হীন গণসমাজ। তোমরা এই সব কথা অনুধাবন করবার চেষ্টা করো—যাতে গরিমাময় ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলা যায়, প্রত্যেকে এক একটি আদর্শের স্তম্ভ হয়ে স্বদেশের জীবন সৌধ ধারণ করো, তবেই সার্থক হবে জাতীয়তা। জাতীয় জীবন-মন্দির সার্থক হবে।

—

পালকের পোষাক

(জাপানী রূপকথা)

সতীন্দ্রনাথ লাহা

তখন বসন্ত কাল, ফুলের মিষ্টি গন্ধ নিয়ে মৃদু সমীরণ বইছে। 'মিও' সাগরের নীল জলে ছোট ছোট ঢেউ নেচে বেড়াচ্ছে। সূর্য্য আলোর ঢেউগুলোর মাথায় সোনালী মুকুট চিক্‌চিক্ ক'রে জ্বলছে। আহা, কি শোভা তার!

সমুদ্র উপকূলে পাইন গাছের ছায়ায় জেলের ছেলে 'হেইরুকু' চুপচাপ ব'সে আছে তন্ময় হ'য়ে। নীল জলে ঢেউয়ের নাচন দেখছে সে আপন মনে। বেশ লাগছে তার সমুদ্র কূলের মনোরম পরিবেশ।...আলো, বাতাস, ঢেউ, বালুচর—সব কিছু।

পাইন গাছের ডালে একটা পাখী ডেকে উঠ্‌লো।

কি মিষ্টি পাখীটার গলার স্বর!—কোন্ পাখীটা ডাক্লো এত মিষ্টি স্বরে?—পাখীটাকে দেখতে কেমন?

জেলের ছেলে পাইন গাছের প্রতিটি ডালে খুঁজছে পাখীটাকে। ধবধবে সাদা ওটা কি ঝুলছে গাছের ডালে? ···পাখী তো নয়। ও যে সাদা পালকের চমৎকার একটা পোষাক।···এখানে কি ক'রে এলো?

হেইরুকু গাছের ডাল থেকে পালকের পোষাকটা পাড়তে গিয়ে ওপর থেকে নীচের দিকে দেখলে সমুদ্রের নীল জলে পরমাসুন্দরী একটা পরী সাঁতার কেটে তার দিকে এগিয়ে আসছে। দেখলে মনে হয়, চাঁদ আকাশ ছেড়ে জলে নেমেছে হাবুডুবু খেলা ক'রতে।

পরী জলে দাঁড়িয়ে জেলের ছেলেকে বলে,—ও ছেলে, শুনছো!—এই যে আমি এখানে, সাগর জলে। পালকের পোষাকটা আমায় দাও না গো!

পালকের পোষাক

হেইরুকু অবাক হ'য়ে গেছে পরীকে দেখে। মানুষের দেহে এত রূপও থাকতে পারে!

জেলের ছেলে হেইরুকু দামী জিনিষের মর্ম বোঝে। পরীর রূপে ভুলে দামী জিনিষটা বিলিয়ে দেবার পাত্র সে নয়। তার অনুনয়ে সে ভুলবে কেন?

সে বলে,—আমি পালকের পোষাকটা আগে দেখেছি। কষ্ট করে গাছ থেকে আমিই পেড়েছি। তোমায় কেন দেবো? ওটা আমার কাছেই থাকবে।—এটার যা তা দাম নাকি?···যে চাইলেই দিয়ে দেবো! জাপানের সব সেরা জিনিষগুলোর মধ্যে এটাও একটা। এত দামী জিনিষটা এক কথায় কি করে তোমায় দিই বলো।

পরী কাতর ভাবে বলে, 'লক্ষীটি জেলের ছেলে, ওকথা ব'লো না। পালকের পোষাক না পেলে আমি স্বর্গে ফিরবো কি করে? যদি তুমি ওটা তোমার কাছে আটকে রাখো, আমি যে এইখানেই পড়ে থাকবো, বাড়ী ফিরতে পারবো না। দয়া ক'রে আমার পালকের পোষাকটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।—না বলো না।

জেলের ছেলের কঠিন মন। অনুনয় আবেদনে তার কি মন ভেজে। দামী জিনিষটি সহজে সে হাতছাড়া করতে চায় না। সে বেশ বুঝেছে, এটি একটি অমূল্য সম্পদ এবং জাপানে মাত্র তার কাছেই এটি আছে।

জেলের ছেলে পরীর প্যানপ্যানানি শুনে বলে,—যতই দাও দাও বলে কাকুতি-মিনতি করবে, ততই কিন্তু আমার না দেওয়ার জেদ বেড়ে যাবে। আমি এক কথার মানুষ। এ জিনিষ আমি কিছুতে হাতছাড়া করবো না। ইনিয়ে' বিনিয়ে যতই বলো না কেন, এ কান দিয়ে ঢুকবে, ও কান দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

ধরা গলায় পরী বলে,—

ওগো ও জেলের ছেলে, ও ক·া এনো না মুখে,
জানো না কোন বিপাকে এ মেয়ে কাঁদে কি দুখে।
অসহায় পাখীর মতো ভাঙা মোর ডানা দুটি,
নিলীমায় যাই কি ক'রে অভাগীর নাই কি ছুটি?

পরীর কান্না মাখা অনুনয় শুনে জেলের ছেলে হেইরুকুর কঠোর মন ভিজে নরম হ'ল। মচ্কায়, তবু ভাঙে না। পরীর সংগে হেইরুকুর আরো খানিকক্ষণ তর্ক হ'লো। কিছু না নিয়ে ছাড়বার পাত্র সে নয়।

হেইরুকু বলে,—বেশ, তোমাকে পালকের পোষাক দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে তোমার নাচ দেখাও। শুনেছি, পরীরা খুব ভালো নাচতে জানে।

—আচ্ছা, আমি নাচবো। আমার নাচের সংগে সংগে চন্দ্রপুরী ফিরে দাঁড়াবে আমার দিকে। নশ্বর মাটির মানুষ-

গুলো রহস্যময় অনেক কিছু দেখতে পাবে, শিখতে পাবে। কিন্তু পালকের পোষাক না পরলে আমি নাচবো কি ক'রে? ওটা আগে আমাকে দাও। আমি পরি। তবে তো নাচবো।

সন্দেহের ক্রূর দৃষ্টি খেলে গেল হেইকুকুর চোখে। সে বলে,—হ্যাঁ পালকের পোষাকটা তোমাকে দিয়ে দিই, আর পাখীর মতো ফুড়ুং ক'রে তুমি উড়ে পালাও আর কি।… বেশ তো, মতলব ফেঁদেছো। ভেবেছো, আমাকে ভোগা দেবে?…সেটি হচ্ছে না!

জেলের ছেলের হীন কথা শুনে রাগে পরীর সর্বশরীর জ্বলে উঠ্‌লো। সে শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে,—আমি তোমার মতো মাটির মানুষ নই। মাটির বুকে যারা মরে, তারাই মিথ্যে কথা বলে। আমি স্বর্গের বাসিন্দা। সেখানে মিথ্যে বলতে কেউ জানে না। কথা দিয়ে কথা না রাখার হীনতা সেখানে কারো মনে নেই।…বুঝলে?

পরীর মুখে এই সব কথা শুনে হেইকুকুর লজ্জায় মাথা হেঁট হ'য়ে গেলো। আর একটি কথাও না বাড়িয়ে সে তক্ষুণি পালকের পোষাকটা পরীর হাতে দিয়ে দিলে।

পরী ধবধবে সাদা পালকের পোষাকটা নিজের গায়ে চাপিয়ে দিলে। বীণার তারে টংকার দিয়ে সে নাচের তালে তালে পা ফেলে গান ধরলো।—

জমজমাটি চাঁদের প্রাসাদ, তিরিশ রাজার জন্মভূমি
তাদের দেশেই জন্মেছি যে, এবার আমায়
চিন্‌লে তুমি?
এদের ভেতর শ্বেত পোষাকে জন পনেরো যখন সাজে,
পূর্ণিমার চাঁদ তোমরা দেখো, দূর গগনে ঠিক বিরাজে।
কাল্‌চে পোষাক আর পনেরো চাপায় যখন অমানিশা
আঁধার ঘেরে চতুর্দিকে…সবাই তখন হারায় দিশা।
ধনধান্যে উঠুক ভরে এই পৃথিবীর জাপান দেশ,
আমার আশিস স্মরণ রেখো যা বলেছি সর্বশেষ।

জেলের ছেলে তন্ময় হ'য়ে শুন্‌লো পরীর গান, দেখলো পরীর নাচ, কিন্তু এ সৌভাগ্য বেশীক্ষণ তার বরাতে টিকলো না। এতক্ষণ সমুদ্র তীরে বেলাভূমিতে চাঁদের পরী নাচ দেখাচ্ছিল বালিতে পা ফেলে ফেলে। এখন তার পা দুটি আর তালে তালে সোনালী বালির উপর প'ড়ছে না, খানিকটা শূন্যে উঠে গেছে। সেখানে দাঁড়িয়েই সে এখন নাচ দেখাচ্ছে, গান শোনাচ্ছে। অবাক চোখে হেইকুকু তাকিয়ে থাকে।

দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে সে আরো ওপরে উঠে গেল। পাইন গাছের চূড়ো আর নীল আকাশকে পেছনে রেখে এখন সে শূন্যে দাঁড়িয়েছে। পোষাকের সাদা পালকে আলো লেগে চোখ ঝল্‌সে দিচ্ছে হেইকুকুর। ক্রমে পরী আরো, আরো ওপরে উঠে গেল। পাহাড় চূড়ার সীমানা ছাড়িয়ে গেল। এখনো দেখা যাচ্ছে তার নাচের অপরূপ লীলায়িত ভংগীমা। এখনো হাওয়ায় ভেসে আসছে তার মিষ্টি গানের সুর। এখনো তালে তালে পা পড়ছে শূন্যে। এবার সে আরো ওপরে চাঁদের দিকে উঠে গেল। মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেল। আর দেখা যায় না চাঁদের পরীকে।

কে জানে, এখন হয়তো সে পৌঁছে গেছে তার নিজের দেশে—চাঁদের প্রাসাদে। ভুলে গেছে হয়তো বা মাটির দেশের সব কিছু।
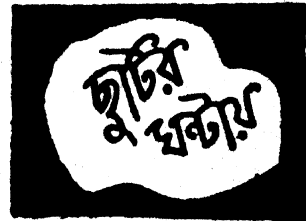
চিত্রগুপ্ত

তোমাদের অনেকেই হয়তো জানো যে প্রতি দিনের তাপমাত্রা (Temperature), আর্দ্রতা (Humidity) প্রভৃতির হদিশ পাবার উদ্দেশ্যে, দুনিয়ার সব উন্নত-আধুনিক দেশেই আজকাল ছোট-বড় নানান ধরণের 'আবহাওয়া-গবেষণাগারের,(Meteorological Research Centre) সুব্যবস্থা হয়েছে। এই সব 'গবেষণাগারে' নানা রকম বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রপাতির সাহায্যে একালের আবহাওয়া

বিশেষজ্ঞেরা দৈনিক তাপমাত্রা, আর্দ্রতা,ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে, জনসাধারণের সুবিধার জন্য, খবরের কাগজ ও বেতারের মারফৎ নিয়মিত-ভাবে তার খবরাখবর প্রচার করেন। এইভাবে দৈনিক তাপমাত্রা আর আবহাওয়ার অবস্থা পরীক্ষার জন্যে যে সব বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, সেগুলি সহজে জোগাড় করা যায় না…তাছাড়া গবেষণার কাজটিও রীতি-মত জটিল ও ব্যয়বহুল ব্যাপার। কাজেই তোমাদের অনেকেরই হয় তো মনে মনে আবহাওয়ার পরিচয় জানবার প্রবল সখ থাকলেও, বিপুল খরচ আর হাঙ্গামার কথা বিবেচনা করে, সে বাসনা আর শেষ পর্য্যন্ত কাজে পরিণত করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে 'আবহাওয়া-গবেষণাগারের' দুর্লভ আর দামী-দামী বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রপাতি না জোগাড় করতে পারলেও, বিজ্ঞানের নিতান্ত সহজ-সরল বিচিত্র-অভিনব একটি উপায়ে সামান্য কয়েকটি ঘরোয়া-সামগ্রীর সাহায্যে তোমরা অনায়াসেই নিখরচায় ঘরে বসে হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দৈনিক তাপমাত্রা, আর্দ্রতা প্রভৃতির আবহাওয়ার বিভিন্ন তথ্যের মোটামুটি পরিচয় পেতে পারো।

কি উপায়ে?… শোনো তাহলে, সেই কথাই বলি।
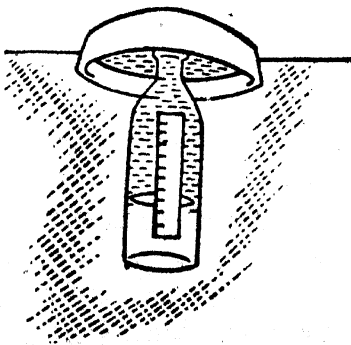
দিনের তাপমাত্রার পরিচয় জানতে হলে, গোড়াতেই উপরের ছবিতে যেমন দেখছো, ঠিক তেমনি-ধরণের বড় একটি কাঁচের বোতল আর জল-রাখবার গামলা জোগাড় করো। এগুটি উপকরণ সংগ্রহ হবার পর ইঞ্চি-খানেক চওড়া আধ-ফুট লম্বা একটি কাগজের ফিতা (Paper-tape) কেটে নিয়ে, 'ফুট-রুল' (Scale-Ruler) ও রঙীন পেন্সিলের সাহায্যে সেই কাগজটির একপিঠে আধ-ইঞ্চি অন্তর-অন্তর রেখা এঁকে 'মাপ-কাঠি' (Measure-tape) বানাও। এবারে মাপের রেখা-চিহ্নিত ঐ কাগজের ফিতার শাদা-দিকটিতে অর্থাৎ যেদিকে রেখা-আঁকা নেই, সেই দিকে অল্প একটু গঁদের আঠার প্রলেপ লাগিয়ে, ফিতাটিকে সেঁটে দাও কাঁচের বোতলের গায়ে—উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে। তাহলেই কাঁচের বোতলটির একদিকে দিব্যি-সুষ্ঠুভাবে মাপের (Measure) 'লেবেল' (Label) আঁটা হয়ে যাবে—আবহাওয়ার তাপমাত্রা পরীক্ষার সময় তাহলে হিসাবের গণ্ডগোলের আর সম্ভাবনা থাকবে না এতটুকু।

এ কাজটুকু সেরে নেবার পর, কাঁচের বোতলটির তিনের-চার অংশ জল ভরে নাও এবং গামলাটিরও আধাআধি ভর্ত্তি করে দাও জল ঢেলে। এবারে খুব সন্তর্পণে জল ভর্ত্তি কাঁচের বোতলের মুখটি তোমার হাতের বুড়ো-আঙুলের চাপ দিয়ে এমনভাবে এঁটে বন্ধ করো যে বোতলটিকে উপরের ছবির ভঙ্গীতে জলভরা গামলার ভিতর উবুড় করে বসিয়ে রেখে দিলে একফোঁটা জলও যেন বাইরে না পড়ে যায়। এমনিভাবে কায়দা করে জল-ভর্ত্তি কাঁচের বোতলটিকে গামলার জলের ভিতরে সুষ্ঠু-ধরণে উবুড় করে বসিয়ে রাখতে পারলেই তোমার কাজ চুকবে।

এবার লক্ষ্য করো—বিজ্ঞানের আজব-কারসাজি। বাতাসের চাপ (Air Pressure) যদি 'বেশী' (High) থাকে, তাহলে দেখবে—গামলার ভিতরে উবুড়-করে-রাখা কাঁচের বোতলের জল ক্রমশঃ উপরদিকে উঁচু হয়ে উঠবে (The water in the bottle stands high)। বোতলের জল 'উর্দ্ধগামী' হলেই বুঝবে—আবহাওয়ার অবস্থা ভালো (Good Weather)…দিনের তাপমাত্রাও যে বেশী …তার পরিচয় মিলবে ঐ বোতলের গায়ে-আঁটা কাগজের ফিতার উপরে রঙীন পেন্সিলের রেখা-চিহ্নিত-করা 'মাপ-কাঠিটি' দেখলেই…এবং তাই দেখে সঙ্গে সঙ্গেই তুমি নিজেই হিসাব করে নিতে পারবে, দিনের তাপমাত্রা কত ইঞ্চি হয়েছে। তবে দৈনিক আবহাওয়ার অবস্থা যদি 'খারাপ' থাকে, তাহলে বোতলের জল আর 'উর্দ্ধগামী' (High) হবে না। কারণ বাতাসের চাপ (Air

pressure) তখন 'কম' (Low)·· কাজেই বোতলের জল আগের মতো আর ফেঁপে 'উঁচু' হয়ে উঠবে না।

কোনো রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়ে সহজ-সরল উপায়ে দৈনিক-তাপমাত্রার মোটামুটি হদিশ জানবার এই হলো বিচিত্র রহস্য। যাই হোক, রহস্যের সন্ধান তো পেলে, এবারে তোমরা নিজেরাই হাতে-কলমে পরীক্ষা করে ছাখো—বিজ্ঞানের এই আজব-কারসাজি।

—

মনোহর মৈত্র

১। লুকোনো প্রবাদ-বাক্যের হেঁয়ালি ঃ
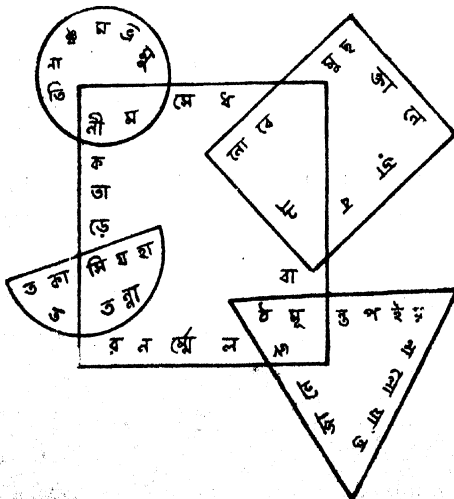
উপরের ছবিতে এলোমেলোভাবে অক্ষর-সাজানো আজব-ছাঁদের যে বৃত্তাকার, অর্দ্ধ-বৃত্তাকার, চতুষ্কোণ ও ত্রিকোণাকার 'ঘরগুলি, দেখতে পাচ্ছো, সেগুলির প্রত্যেকটিতে লুকোনো রয়েছে—বাঙলা দেশের চির-প্রচলিত পাঁচটি বিভিন্ন প্রবাদ-বাক্য। পূজোর ছুটিতে হৈ চৈ আর আনন্দোৎসবের অবসরে, বুদ্ধি খাটিয়ে পাঁচটি বিভিন্ন 'ঘরে' এলোমেলোভাবে ছাপা অক্ষরগুলিকে সুষ্ঠু ও যথাযথ-ধরণে সাজিয়ে প্রত্যেকটি লুকোনো প্রবাদ-বাক্যের সঠিক-সন্ধান বার করে চটপট আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে পারো তো বুঝবো, সত্যিই তোমরা বাহাদুর হয়ে উঠেছো। তবে, এ হেঁয়ালির সমাধান করবার সময় কিন্তু একটি নিয়ম মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ উপরের ছবিতে দেখানো পাঁচটি বিভিন্ন 'ঘরের' কোনটি থেকেই কোনো অক্ষর আশপাশের অন্য 'ঘরে' সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সাজিয়ে বসানো চলবে না। প্রত্যেক 'ঘরের' অক্ষর, প্রত্যেক 'ঘরেই' থাকবে, শুধু যথাযথভাবে সেগুলিকে পর-পর সাজিয়ে বসাতে হবে। এ হেঁয়ালি সমাধানের এই হলো বিশেষ নিয়ম। এ নিয়মটি মেনে চলে, এখন তোমরা চেষ্টা করে ছাখো—লুকোনো প্রবাদ-বাক্য পাঁচটির সঠিক সন্ধান পাও কিনা!

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

২। দেশ-বিভাগের আগেকার আমলে বাঙলা দেশের এমন একটি জেলা-শহরের নাম করো, যার প্রথমাংশে বোঝায়—ভারতের প্রাচীন পুরাণে উল্লিখিত এক দানব, শেষাংশে বোঝায়—বিশেষ এক ধরণের চতুষ্পদ বন্য-প্রাণী এবং মধ্যমাংশে বোঝায়—মানুষের অনুভূতি-কেন্দ্র, যেখান থেকে তার দোষ-গুণ সব কিছুরই উৎপত্তি।

রচনা: দীপালি দত্ত (আসানসোল)

৩। চার অক্ষরে নামটি···কি বলো তো আজ?
নামেতে প্রকাশ পায়, রামায়ণ-রাজ।
প্রথম দুই অক্ষরে অঙ্ক-সংখ্যা হয়,
দ্বিতীয়-তৃতীয় মিলি অস্ত্র সবে কয়,

তৃতীয় চতুর্থ মিলি হয় যানবাহন,
ভেবে দেখে করো তার উত্তর কথন।
রচনা : শৈলেন সাধু (আসানসোল)

গতমাসের ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর :

১। নীচের ছবিটি দেখলেই স্পষ্ট বুঝতে পারবে—মাত্র তিনটি সরল রেখার সাহায্যে কেমন সহজ উপায়ে গোলাকার-চক্রের ভিতরকার বিন্দু-চিহ্নিত সাতটি 'ঘর' রচনা করা সম্ভব।

২। বিদ্যাসাগর
৩। চাঁদমালা

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :
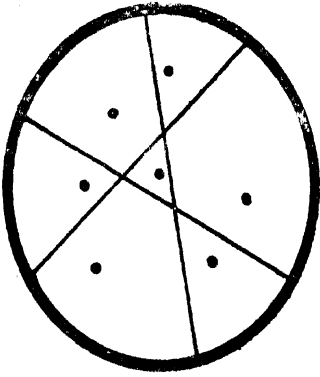
পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), কুলু মিত্র (কলিকাতা), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), সত্যেন, সঞ্জয়, মুরারী ও সুনীল (ভিলাই), কবি ও লাড্ডু হালদার (কোরবা), রিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই) বাণী, শুভ্র ও পার্থ হাজরা (আড়ুই শাকনাড়া), বাপ্পা ও পম্পা সেন (কলিকাতা), ধর্ম্মদাস ও গৌরাঙ্গ রায়, ভদ্রেশ্বর ও রাধাশ্যাম মণ্ডল (বিদ্যাধরপুর), হাবু, বাবু, শামু, মামণি ও চম্পা (কলিকাতা), সুরাগময়, সিপ্রাধারা, ধীরাগময় ও মণিমালা হাজরা (বড়বড়িয়া), আশীষকুমার কুণ্ডু (রাণাঘাট), দিলীপকুমার দত্ত (বাঁশবেড়িয়া), উমা ও আশীষ মুখোপাধ্যায় (আড়াহাটি), তারকনাথ নন্দন (বাঁশবেড়িয়া), সুধাংশু, গৌতম, অমিতাভ, স্বপ্না, পুরবী ও সুজাতা কোঙার (বাতানল), দোলগোবিন্দ দাস (বাঁশবেড়িয়া), অনিমা, কণিকা, কৃষ্ণা ও নিরুপমা (হুগ্গা), প্রণব, প্রমোদ, রঞ্জন, শুক্লা ও প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা)।

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

মিঠু ও বুবু গুপ্ত (কলিকাতা), পিণ্টু হালদার (বালী) পুতুল, সুমা, হাবলু, ও টাবলু মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), শর্ম্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), ধর্ম্মদাস রায়, থাঁদা ও বুলু (বাঁকুড়া), প্রবীরগোপাল ও প্রদীপগোপাল মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), অনীতা, অনুরাধা, অরূপ ও অঞ্জন সেন (আগরপাড়া), গৌতম, অশোক, কল্পনা, নীতা ঘোষ ও মানস বসু (কলিকাতা), মমতা চক্রবর্ত্তী ও বাপন (?), দীপিকা দাস বড়ুয়া (জামশেদপুর)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বিশ্বনাথ ও দেবকী সিংহ (কলিকাতা), গৌতম বসু (বর্দ্ধমান), বাপি, বুতাম ও পিণ্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), সুনীতিকুমার, মনোরমা, গৌরীবালা ও মদনমোহন মিশ্র (রাগপুর), শশাঙ্কশেখর মিশ্র (রুইনান), উমা বসু (আরারিয়া)।

জলযানের কাহিনী

দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত
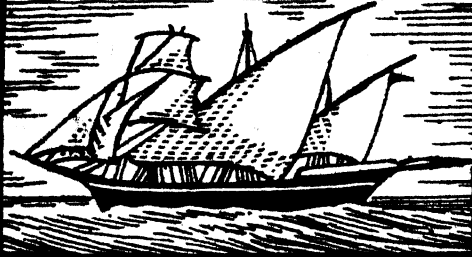
তিন-সারি পাল-তোলা এই বিরাটকায় জলযানের নাম— 'XEBEC' বা 'জ্যেবেক'। এ ধরনের জাহাজের প্রচলন ছিল একশো-দেড়শো বছর আগে— ভূমধ্যসাগর উপকূলের দেশে।

অতিকায় পাল-তোলা ভেলার মতো গড়নের বিচিত্র এই জলযানটিতে চড়ে উত্তাল-তরঙ্গশঙ্কুল নদী ও সাগরের বুকে অবলীলাক্রমে পাড়ি জমায় চীনদেশের নাবিকবৃন্দ। এ নৌকার নাম— 'SURF-BOAT' বা 'তরঙ্গ-তরী'।
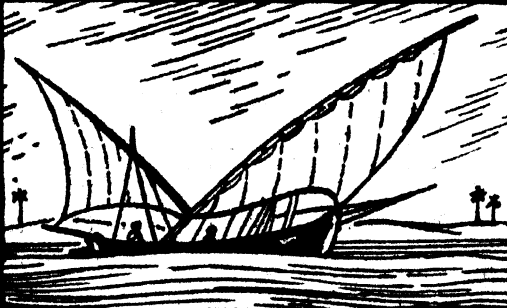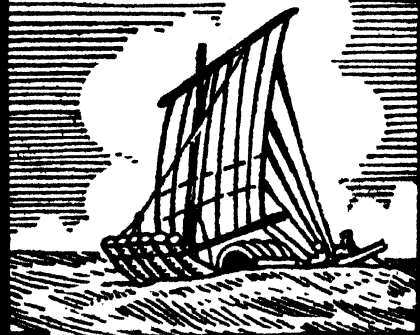
বহু প্রাচীন আমল থেকে মিশর দেশের নীল-নদের জলে সতেজে পাল তুলে আজো পর্য্যন্ত পাড়ি দিয়ে চলে এমনি ধরণের বিচিত্র তরী। এগুলি কাঠের তৈরী... বেশ সুদৃঢ়-মজবুত ছাঁদের ও দ্রুতগামী।

বিচিত্র-ছাঁদের পাল-তোলা এই জলযানের নাম— 'ইয়্যট্' (YACHT)। ইউরোপ ও আমেরিকার সৌখিন নৌ-চালকদের কাছে এই ধরণের জলযানের খুবই কদর। এই নৌকায় চড়ে সাগর-জলে তাঁরা সানন্দে ক্রীড়া-প্রতিযোগীতায় মেতে তীব্র প্রতিদ্বন্দীতা করেন।

নজরুল কাব্যে বিপ্লব চেতনা

সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলা কাব্য সাহিত্য নজরুলের আবির্ভাবে যে বিচিত্র ভাব-ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়েছে তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। নজরুল ছিলেন বিদ্রোহী কবি। তাই তার সমগ্র কাব্য আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই বিপ্লবের প্রতি আহ্বান। পরাধীনতার দুঃখ আর ক্লেশের ছবি ফুটে উঠেছে তার অগণিত কবিতার মধ্যে। তিনি চেয়েছেন বিপ্লব। তাই ডাক দিয়েছেন জনমানসকে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে এগিয়ে আসতে। এই চিরবিদ্রোহী কবির কাব্য তাই বিপ্লব চেতনাতে ভরপুর।

যে সময় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়িয়ে চলা যে কোন কবির পক্ষেই ছিল প্রায় অসম্ভব, সেই সময়েই নজরুলের কাব্যে ফুটে ওঠে সম্পূর্ণ নতুন এক সুর। সেই সুর বিদ্রোহের। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুল ইসলামের এই-খানেই তফাৎ। নজরুল কাব্যের প্রধান সুর এই ভাব-সাধনার সুর। পরাধীন দেশের দেশ-প্রেমিক এই কবির কাব্যে তাই ফুটে উঠেছিল আগুন। সে আগুনের জ্বালা সহ্য করতে পারে নি তৎকালীন ইংরেজ সরকার। ফলে নজরুল ইসলামকে কারাবরণও করতে হয়। তার বহু রচনার প্রকাশও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

নজরুল ছিলেন স্বভাবকবি। কাব্য পরিণতির দিকে তার কোন নজর ছিলনা। তার কাব্য-প্রতিভা ছিল অসাধারণ ও স্বতঃস্ফূর্ত। অসংখ্য কবিতা আর গান রচনা করে আজ তাঁর লেখনী যেন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করেছে।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে নজরুল অনুভব করেন পরাধীনতার গ্লানি। বিপ্লবের প্রতি তার ছিল স্বাভাবিক আকর্ষণ। তাই বিপ্লবী বারীন ঘোষের কাছে তিনি বিপ্লবের দীক্ষা নেন। তখন থেকেই তিনি তাঁর অপূর্ব ভাবসমৃদ্ধ কাব্য সম্ভার উপহার দেন বাংলার জনগণকে। নজরুলের সঙ্গে ইংরাজকবি বায়রণের বহু মিল দেখতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত মার্কিণ কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের সঙ্গেও তার অনেক মিল। তবুও এদের থেকে নজরুল সম্পূর্ণ পৃথক আরও বিশিষ্ট। তার কবিতা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। জাতীয় জীবনে নজরুলের আবির্ভাব ভগবানের আশীর্বাদ। তার আবির্ভাব অনেকটা ধুমকেতুর মত। তবুও চিরকালের জন্য জনমানসে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে। সে স্থান শ্রদ্ধার আর ভালবাসার।

নজরুল ইসলামের কাব্যে যে বিপ্লব চেতনার উদয় হয় বাংলার জনমানস তার ফলে যথেষ্ট সচেতন হয়ে ওঠে। যার ফলে ইংরেজ সরকারের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিও পড়ে কবির ওপর। প্রথম জীবনে নজরুল জাতীয়তার প্রেরণা লাভ করেন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে। যদিও তিনি ইংরাজকবি রিউপার্ট ব্রুক বা উইলফ্রেড আওয়েনের মত যুদ্ধ ক্ষেত্রের চিত্র আঁকেন নি তার কবিতায়, তবুও এই যুদ্ধ ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্য রচনায় নতুন প্রেরণা জোগায়।

'মোসলেম ভারত' নামক সাময়িকপত্রে তার প্রথম বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' ১৯২১ সালে প্রকাশিত হয়। এর ফলে বাংলার সাহিত্য জগতে প্রথম আলোড়ন আসে। এই একটি মাত্র কবিতাই তাঁর সুনাম ও প্রতিপত্তি এনে দেয়। এর পর থেকেই অনর্গল কবিতা আর গান রচনা করে চলেন নজরুল।

মানবতার মুক্তি ও প্রতিষ্ঠার উদাত্ত মন্ত্র কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বারবার। দেশের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও ভালবাসা ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর অসংখ্য কবিতার মধ্যে। জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে গেল কবির আহ্বান। সে আহ্বান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের সংগ্রামের আহ্বান। সেই আপোষহীন সংগ্রামের একচ্ছত্র নায়ক বাংলার নিজস্ব কবি নজরুল। তাই তাঁর বিদ্রোহী কবিতায় শোনা যায়—

বল বীর

বল উন্নত মম শির

শির নেহারি আমার, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির

বল বীর—

বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাঁড়ি

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি

ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া

খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া

উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি

বিশ্ব-বিধাত্রীর!

কাজী নজরুলের আবির্ভাব ঘটে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের পটভূমিকায়, যখন হিন্দুমুসলিম মিলন-প্রচেষ্টা ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই সময়েই বিপ্লবীদের প্রচেষ্টাও তীব্রতা ধারণ করে। নজরুলের দেশপ্রেম তীব্র। গান্ধীজীর আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বিপ্লবী। তিনি চির-বিদ্রোহী। আপোষ-মীমাংসায় তিনি বিশ্বাসী নন। তাই বিপ্লবের গন্ধ আছে বলেই তাঁর 'বিষের বাঁশী' আর 'অগ্নিবীণা' রাজরোষ থেকে অব্যাহতি পায়নি।

বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত নজরুল। তাই তার কাব্যের প্রতিটি অংশই সেই বিপ্লবের বহ্নিতে স্নাত। উদাত্ত কণ্ঠস্বরে নির্ভীকভাবে জনমানসকে তিনি আহ্বান করেছেন বিপ্লবের আগুন জ্বালতে। বিদেশী শাসকগোষ্ঠীকে তীব্র ভাষায় তিনি আক্রমণ করেছেন। তাঁর কাব্যে সঙ্কীর্ণতার কোন স্থান নেই। তিনি সাম্যবাদী। তাঁর প্রতিটি কবিতায় ছড়ানো রয়েছে আগুন। দীপ্ত কণ্ঠে তিনি বলেন—

নাচে ঐ কাল-বোশেখী

কাটাবি কাল বসে কী?

দেরে দেখি

ভীমকারার ঐ ভিত্তি নাড়ি'।

লাথি মার ভাঙরে তালা

যত সব বন্দীশালায়

আগুন জ্বালা

আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি'!

নজরুল ছিলেন চারণ-কবি। জনপ্রিয়তার উচ্চশিখরে উঠেও তিনি তার সহজ সত্তাকে হারিয়ে ফেলেন নি। বরং আরও গভীরভাবে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছেন সাধারণের মাঝে। যে নবীন চেতনায় এই সময় মানুষের মন উদ্বুদ্ধ হয় তাতে কবি নজরুলের দান কম নয়। তিনি সহ্য করেন নি অত্যাচারী বিদেশী শাসকগোষ্ঠীকে। তাই তাদের কাছে তিনি হয়েছিলেন রাজদ্রোহী। কঠিন কারাকক্ষের চারিটি দেওয়াল তার কাব্য প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। নানা অত্যাচার সহ্য করেও তার কাব্য-স্ফূরণ বন্ধ হয়নি। কারাভ্যন্তরে থেকেও তিনি রচনা করেন অনেক কবিতা। ধূমকেতুতে তিনি লেখেন এক সময়—

আর কতকাল রইবি বেটি মাটির ঢেলার

মূর্ত্তি আড়াল?

স্বর্গকে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।

দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীরযুবাদের দিচ্ছে ফাঁসী

ভূভারত আজ কসাইখানা আসবি কখন সর্বনাশী!

যে তীব্র শ্লেষ ও সত্যভাষণের উদাত্ত আহ্বানে কবি এগিয়েছিলেন, তার তীব্র বেগে টলমল করে উঠেছিল বিদেশী শাসকদের সিংহাসন।

চিরকাল এক অনবদ্য শিল্প সৃষ্টি করে গেছেন নজরুল। বিদ্রোহের আগুনে শুদ্ধ হয়েছে তার মন। নীচতা পঙ্কিলতার অসবলতা স্পর্শ করতে পারেনি তার মনকে। কালের শ্রেণীসংগ্রামেও তিনি ছিলেন একজন অংশীদার। তাই কেবল মাত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রতিটি সংগ্রামী মেহনতী মানুষের। নিত্য প্রেরণা দিয়েছেন কবি তার কবিতার মধ্য দিয়ে জনমানবকে।

এক নতুন বৈপ্লবিক ভাবধারার স্রষ্টা কবি নজরুল। গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে তিনি গ্রহণ করেছিলেন বিদ্রোহের পথ। তার মন ছিল সুদূরপ্রসারী। তিনি বুঝেছিলেন আপোষের আবেদনে শক্তিশালী শাসকগোষ্ঠীর মন টলানো সম্ভব নয়, তাই এগিয়ে এসেছিলেন কবি তার লেখনী নিয়ে। কবি নজরুলের সাধনা কতটা সফলতা লাভ করেছে ভবিষ্যতই তার উত্তর দিয়েছে।

চাল ও চিনি সঙ্কট—

গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম হইতে পশ্চিম বঙ্গে চালের দাম বাড়িতে থাকে—রেশন দোকানে যে ৬০ নয়া পয়সা কিলো দরের সিদ্ধ চাল দেওয়া হইত, তাহা ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়—৫২ নয়া পয়সা কিলো দরে অখাদ্য সিদ্ধ চাউল দেওয়া হইত ও কয়েক সপ্তাহ ৮০ নয়া পয়সা কিলো দরের একটা চাল পাওয়া যাইত। অক্টোবর মাস প'ড়িতেই রেশনের দোকানে চাল বিক্রয় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে—যে অতি সামান্য পরিমাণ চাল রেশন-দোকানে আসে, তাহা শতকরা ১০ জনকে দিতে ফুরাইয়া যায়। বাকী ৯০ জন লোককে বাজারে চা'লের জন্য ছুটাছুটি করিতে হয়। বাজারে চাল পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাহার প্রতি কিলোর দাম ১ টাকা ৫০ নয়া পয়সা। ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ও চালের মণ ৪০ টাকার বেশী হয় নাই—এখন তাহা ৬০ টাকা হইয়াছে। ইহা কি দুর্ভিক্ষ নহে? সাধারণ দরিদ্র মানুষ—যাহার সপ্তাহে ১০ সের চাল প্রয়োজন, সে ৫ সের চাল কিনে ও বাকী আটা প্রভৃতি খাইয়া জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইতেছে। বাঙ্গালী, বিশেষ করিয়া উদ্বাস্তু বাঙ্গালীরা আটা খাইতে চাহেনা, কিন্তু উপায় নাই। আমেরিকান গমের আটা খাইলেই পেটের অসুখে ভুগিতে হয়—এবার আশ্বিন মাসেও বর্ষা কমে নাই; বর্ষার এই প্রভাব—তাহার উপর আটা খাওয়া—প্রায় প্রতিটি মানুষের কর্মশক্তি কমিয়া গিয়াছে। কে দরিদ্রের দুঃখের কথা শুনিবে! মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় সংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রকাশ করেন—তাহার সহিত প্রকৃত অবস্থার মিল নাই। সত্যই আজ সরকার শক্তিহীন হইয়াছে। একথা সত্য যে, পশ্চিমবঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে প্রচুর চাল মজুত আছে—আজ রেশনের চালের অভাব হওয়ায় বহু মুনাফা খোর ১·৫০ নয়া পয়সা কিলো দরে সে চাল বাজারে বিক্রয় করিতেছে। বাংলা সরকারের কর্মচারীরা—বিশেষ করিয়া পুলিশের দল যদি সক্রিয় হইত, তাহা হইলে সে চাল আটক করিয়া তাহা ন্যায্য মূল্যে দরিদ্র জনগণকে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইত। কিন্তু সে চেষ্টা কোথাও দেখা যায় না। এ অবস্থায় সাধারণ মানুষ—যাহার বে-আইনি কাজ করার শক্তি ও সাহস নাই, তাহার পক্ষে পড়িয়া মার খাওয়া ছাড়া গতি কি?

এই ত গেল চালের কথা। কি কারণে জানি না, গত বৎসর সরকারী নির্দ্দেশে আখের চাষ কম হইয়াছে—সে জন্য এ বৎসর বাজারে চিনি নাই। প্রথমে সপ্তাহে মাথা পিছু ৫০০ গ্রাম করিয়া চিনি (রেশনে) দেওয়া হইত, তাহা কমাইয়া ৩০০ গ্রাম করা হইয়াছে। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ হইতে রেশন দোকানে আর চিনি আসে না, লোকের দুর্গতির আর সীমা নাই। চায়ের নেশায় লোক ভেলীগুড় দিয়া চা খাইতেছে—চায়ের দোকানেও ভেলী গুড়ের চা—খাবারের দোকানে যে চিনি দেওয়া হয়, তাহা ১৫০ কিলো দরে সাধারণ মানুষ কালো বাজারে ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। সরকারী অব্যবস্থাই সাধারণ মানুষের এই দুঃখের এক মাত্র কারণ। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে দুর্ভিক্ষের সময়ের যে অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন, ১৩৫০ সালে দুর্ভিক্ষের সময় আমরা যে অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, ১৩৭০ সালে আবার সেই অবস্থা আসিল। শক্তিহীন মন্ত্রীর দল শক্তি ব্যবহারে অসমর্থ—অথচ জনগণের ভোটে তাঁহারা নির্বাচিত ও নিযুক্ত—কাহাকে কি বলিব? দেশে শক্তিমান মানুষের অভাব—কোথা হইতে শক্তি আসিবে? ক্রন্দন করা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নাই—ধীরে ধীরে আমাদের মৃত্যুর দিকে আগাইয়া যাইতে হইতেছে।

প্রতীকার কোথায়—

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সাধারণকে চালের পরিবর্তে

আটা ও আলু খাইতে উপদেশ দেন—লোক সে কথায় কর্ণপাত করে না—হাসিয়া উড়াইয়া দেয়—কাজেই তাহার ধ্বংস নিশ্চিত। মহাত্মা গান্ধী ৪০ বৎসর পূর্বে এই অবস্থার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন—তিনি লোককে খাদ্য উৎপাদনে ব্রতী হইতে বলিয়াছিলেন—আমরা কেহ সেকথায় কর্ণপাত করি নাই। ১৩৫০ সালে পশ্চিম বঙ্গে ৫০ লক্ষ লোক কয় মাসের মধ্যে না খাইয়া মরিয়াছিল—১৩৭০ সালে কত লক্ষ মরিবে কে জানে। তথাপি আমরা খাদ্য উৎপাদনে অবহিত হইব না। সরকার সহর গড়িতে ব্যস্ত—আমরাও সহরে বাস করিবার জন্য উদ্‌গ্রাব। কেহ খাদ্য উৎপানের কথা চিন্তা করি না। যে ব্যবসায়ে শতকরা ২০০ টাকা লাভ করা যায়, সকলেই সেই ব্যবসা করিবে—কম লাভের কৃষির প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয় না। সকলেই দুর্নীতি-পরায়ণ—কে কি ভাবে অপরকে ঠকাইব, সে জন্য ব্যস্ত—ফলে যে শেষ পর্যন্ত নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, সে কথা কেহ চিন্তা করি না। ২০ বৎসর পূর্বে দেশে একটি বড় দুর্ভিক্ষ হইয়া গেল, তাহার পর স্বাধীনতা আসিল—তাহাও ১৬ বৎসর হইয়া গিয়াছে। দেশের খাদ্যাভাব দেখিয়া সরকার বিদেশ হইতে চাল ও গম আমদানী করিতেছে, দেশে যাহাতে অধিক খাদ্য উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ে সরকারের চেষ্টা নাই বলিলেই হয়। খাদ্য উৎপাদনের জন্য একজন পৃথক মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। আমরা সরকারী প্রচার বিভাগের বক্তব্য পাঠ করি, বিভাগের কর্মীদের বক্তৃতা শুনি—কিন্তু কাজে কিছু করি না—ফলে ৬০ টাকা মণের চাল কিনিতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত সপরিবারে না খাইয়া মরি। কে আমাদের রক্ষার ব্যবস্থা করিবে! সাধারণ মানুষ বুদ্ধি বিবেচনা হারাইয়া কুপথে চলিয়াছে,কে সুপথ দেখাইবে?

আজ দুর্ভিক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমরা চিন্তাকুল হইয়াছি। ১৩৭০ সাল আমাদের জন্য কি ভাগ্য আনিয়াছে তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না।

কলিকাতা সাহিত্য সমাজ—

গত ২২শে সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা—৭, ৪৬ মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীটস্থ মর্মর প্রাসাদে কলিকাতা সাহিত্য সমাজের এক সাধারণ সভায় ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। খ্যাতিমান সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। গৃহস্বামী শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক সমাজের সভাপতিরূপে মানপত্র ও একটি মূল্যবান্ মঞ্জাধার উপহার প্রদান করেন। সভায় কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, কবি শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ ঘোষ, শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সময়োচিত ভাষণ দেন। ১৮৭৫ সালে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার পুনর্জন্মদান করিয়া শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক মহাশয় সকলের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। মর্ম্মর প্রাসাদের সুসজ্জিত হলঘরে শতাধিক সাহিত্যিক সমাগমে সে দিনের উৎসব সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল।

চীন ও পাকিস্তান সমস্যা—

ভারত মহারাষ্ট্রকে আজ দুই শত্রুর সহিত যুদ্ধের জন্য সর্বদা নিজেকে প্রস্তুত হইতে হইতেছে—গত এক বৎসর-কাল চীনা সৈন্যরা ভারত আক্রমণ করার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে এবং কোন্ সময় কোন্ দিক দিয়া ভারতে প্রবেশ করিবে বলা যায় না। লাদাকের দিকে পাকিস্তানী সাহায্য পাইয়া সে বহু সৈন্য মোতায়েন রাখিয়াছে। নেফা অঞ্চলে অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব সীমান্তে তাহার যুদ্ধোদ্যমের বিরতি হয় নাই। আশার কথা—নেপাল, ভুটান, সিকিম ভারতের সহিত আনুগত্য রক্ষা করিতেছে এবং তিব্বত রাজ্য আজ চীনের অধীন হইলেও তিব্বতের বহু স্থানে তিব্বতীরা চীনাদের অত্যাচারে বিব্রত হইয়া চীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। ওদিকে রাসিয়ার সহিত চীনের বিরোধ বাধিয়াছে, ফলে রাসিয়া-বাসীরা চীন ত্যাগ করিয়া দলে দলে নিজ দেশে ফিরিয়া যাইতেছে। চীন বিরাট দেশ, তাহার লোকসংখ্যা ৭০ কোটি—আয়তনও বৃহৎ। তথায় খাদ্যাভাব লাগিয়া আছে—কাজেই চীনের অভ্যন্তরে নানা প্রকার বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা লাগিয়া থাকে। এই ত চীনের অবস্থা। অন্য দিকে পাকিস্তান—ভারতের ১৩ হাজার মাইল সীমান্তে সর্বদা সৈন্য সমাবেশ করিয়া বসিয়া আছে এবং সুবিধা পাইলেই ভারত রাজ্য আক্রমণ করিতেছে। জলপাইগুড়ী, কুচবিহার,

পশ্চিম দিনাজপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় সর্বদা মানুষকে পাকিস্তানের আক্রমণে ভীত থাকিতে হয়। আসামরাজ্যে ত সঙ্কটজনক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। আসামে বহু মুসলমান পাকিস্তান হইতে বে-আইনিভাবে প্রবেশ করিয়া তথায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়াছে। তাহারা আসামের মধ্যে থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। কাজেই আজ আসামে শান্তিরক্ষা করা কঠিন হইয়াছে।

ভারতরাষ্ট্র তথা ভারতের রাজ্যগুলিকে এই সকল শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রতি বৎসর যে কত কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে, তাহার হিসাব নাই। তাহার ফলে ভারতের পক্ষে জনকল্যাণকর কাজ করা সম্ভব হয় না এবং বিদেশ হইতে কোটি কোটি টাকা ঋণ করিতে হয়। যতদিন চীন ও পাকিস্তানের সহিত ভারতের একটা মীমাংসা বা সামরিক বুঝাপড়া না হয়, ততদিন এই ভাবে সামরিক ব্যয় বাড়াইয়া দেশবাসীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়া সরকারের গত্যন্তর নাই।

আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি দেশ এ অবস্থা লক্ষ্য করিয়াও নিজেদের স্বার্থে মীমাংসার পথে অগ্রসর হয় না। ঋণ দিয়া ভারতকে সাহায্য করিয়া ভারতকে সকলেই তাঁবেদার করিয়া রাখিতে চায়—এ অবস্থা হইতে ভারতকে রক্ষা করার যোগ্য শক্তিমান্ লোক কোথায়? দেশবাসীকে অধিকতর শক্তিমান্ লোকের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে ও সব অনাচার সহ্য করিতে হইবে।

এবারের পূজা—

এ বৎসর বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত মতে আশ্বিনে ও প্রাচীন মতে কার্তিকে পূজা। আশ্বিনের পূজা হইয়া গেল—তাহাতে কোন আড়ম্বর দেখা যায় নাই। মাত্র কয়েকজন গৃহস্থের বাড়ী পূজা হইল এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সকল কেন্দ্রে আড়ম্বরের সহিত দুর্গাপূজা করা হইল। তারকেশ্বর মঠ, কাঁকো মঠ প্রভৃতিতেও আশ্বিনে পূজা হইয়াছে। বাকী সকলের পূজা কার্তিকে হইবে। এই উভয় মতকে এক-মত করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে নাকি একবার এইরূপ মতভেদ হইয়াছিল—তখন পূজার সংখ্যা খুব কম থাকায় সাধারণ লোক তাহা বুঝিতে পারে নাই। দারুণ বর্ষার মধ্যে আশ্বিনের পূজা হইল—কার্তিকের পূজা—প্রায় সবই সার্বজনীন পূজা—কাজেই চাল চিনির অভাবের মধ্যে সে পূজা কিরূপ হইবে বলা কঠিন।

নূতন মন্ত্রিসভা—

গত ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে মাদ্রাজ বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশে নূতন মুখ্যমন্ত্রী সমেত মন্ত্রিসভার সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করেন। নূতন মুখ্যমন্ত্রী হইলেন—মাদ্রাজে শ্রীভক্তবৎসলম, উড়িষ্যায় শ্রীবীরেন্দ্র মিত্র, বিহারে শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় এবং উত্তর প্রদেশে শ্রীমতী সুচেতা কৃপালানী। বীরেন্দ্রবাবু ও সুচেতা উভয়েই বাঙ্গালী, কাজেই বর্তমানে ভারতের তিনটি রাজ্যে বাঙ্গালী মুখ্যমন্ত্রী হইল। মাদ্রাজ, উড়িষ্যা ও বিহারে দলাদলি মিটাইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইলেও উত্তর প্রদেশের দলাদলি এখনও মিটে নাই। পরে দিল্লীতে যাইয়া শ্রীযুক্তা কৃপালানী মন্ত্রীদের সকলের নাম স্থির করিবেন।

মার্কিণ কর্তৃক ২৪ কোটি টাকা ঋণ—

ভারতে তিনটি বিদ্যুৎ পরিকল্পনা কার্যের জন্য মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ২৪ কোটি টাকা ঋণ দিবেন—গত ৩রা অক্টোবর দিল্লীতে ঋণের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে—(১) ব্যাণ্ডেল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (২) গুজরাটের কাছে বিদ্যুৎ কারখানা (৩) মধ্যপ্রদেশের বীরসিংহপুর কারখানা—এই টাকা পাইবে। কলিকাতার নিকট ব্যাণ্ডেলে নূতন কারখানা হইলে কলিকাতায় বিদ্যুৎসরবরাহ বাড়িবে এবং নূতন বহু কারখানা স্থাপন সম্ভব হইবে। বর্তমানে কলিকাতা ও সহরতলীর বহু স্থানের অধিবাসীরা বিদ্যুৎ চাহিয়াও পায় না—বহু সময় সেজন্য অপেক্ষা করিতে হয়। বহু কারখানা বিদ্যুতের অভাবে কাজ আরম্ভ করিতে পারে নাই—ঘরবাড়ী, যন্ত্রপাতি সব পড়িয়া আছে। সেজন্য আমেরিকার নিকট ঋণ লইয়া এই সকল উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইতেছে।

কাশ্মীর ও ভারত—

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বহু বৎসর ভারতের সহিত যুক্ত থাকিলেও সে সংযোগ সম্পূর্ণ হইল গত ৩রা অক্টোবর। ঐ দিন রাজ্যের শেষ প্রধান মন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ ঘোষণা করেন যে অতঃপর কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসৎ

হইবেন রাজ্যপাল এবং প্রধানমন্ত্রী হইবেন মুখ্যমন্ত্রী। ভারত সাম্রাজ্যের অন্যান্য রাজ্যের মত জম্মু ও কাশ্মীর একটি রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। বিধান সভা মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবে।

মালদহে ভীষণ ঝড়—

গত ২৮ সেপ্টেম্বর মালদহ সহর ও তাহার চারিদিকে কয়েক মাইল স্থানে যে ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে—এরূপ ঝড় সাধারণতঃ দেখা যায় না। ফলে বহু গৃহ ও মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহার পূর্বে ২ দিন ধরিয়া অতিবৃষ্টির ফলে চারিদিক প্লাবিত হইয়াছিল। এ বৎসর দৈবদুর্বিপাক সর্বত্রই অধিক।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—

গত ২৪শে আগষ্ট শনিবার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে রমেশ ভবনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ১৯৬৩-৬৪ সালের জন্য পরিষদের কর্মকর্তা নির্বাচিত হইয়াছেন। সভাপতি ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সহসভাপতি ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে, ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার; শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য, ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী, ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীপ্রভাত মুখোপোধ্যায় ও ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, সম্পাদক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ। সহ সম্পাদক শ্রীঅতুল্য চরণ দে, পুরাণরত্ন ও শ্রীশুভেন্দু মুখোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত।

ডি-ফিল উপাধি লাভ—

প্রেসিডেন্সী কলেজের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক ভারতবর্ষের লেখক শ্রীযুক্ত শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি গবেষণা করিয়া ডক্টরেট উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক আচার্য সুকুমার সেন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে কাজ করিতেছিলেন। অপর দুইজন পরীক্ষক ছিলেন আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্রজীবনে প্রথমাবধিই কৃতিত্বে ভাস্বর। তিনি রেকর্ড মার্কস্ সহ অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন; এম-এ পরীক্ষায়ও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বিখ্যাত চিকিৎসক কবিরাজ ডক্টর প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র।

শ্রীঅশোককুমার সরকার—

আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ এর সম্পাদক শ্রীঅশোক কুমার সরকার ২ মাস কাল ইউরোপ ভ্রমণের পর কলিকাতায় ফিরিয়া গত ৫ই অক্টোবর ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটী কর্তৃক আয়োজিত কলিকাতা কুমার সিং হলে এক সভায় তাঁহার ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেন। তিনি বলিয়াছেন—ভারি শিল্প, যুদ্ধ সরঞ্জাম, বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রভৃতি বিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়া পশ্চিমী দেশগুলিকে পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে—বিশেষতঃ ভোগ্যপণ্যগুলির দিক হইতে রাশিয়ার অবস্থা ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনুন্নত। কথাটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ—বর্তমান খাদ্য সঙ্কটের দিনে সরকারী ব্যবস্থার নিন্দা করার সময় আমাদের এ কথাটি বিচার করা প্রয়োজন। ভারতে ভোগ্যপণ্য দুষ্প্রাপ্য না হইলেও দুর্লভ হয় নাই। সাধারণ ব্যবস্থা ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা উভয়ের এক সঙ্গে উন্নতি বিধানে রাশিয়াও সমর্থ হয় নাই।

কক্ষপথের বাইরে
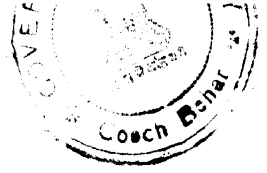
প্রফুল্ল রায়

আড়াই শ মাইল উত্তরে হিমালয়ের যে অংশে উৎসটা অদৃশ্য হয়ে আছে কী একটা বিপর্যয় সেখানে ঘটে গেল। তারই প্রতিক্রিয়ায় বিহারের এই শান্তপ্রায় নিস্তরঙ্গ নদীটা হঠাৎ ক্ষেপে উঠল। তারই ফলে দশ বছরের অভ্যস্ত জীবন থেকে একটি ধাক্কায় বৈজুলাল ছিটকে বেরিয়ে গেল।

নদীটার একপারে রাজপুত ব্রিজ সিং-এর প্রকাণ্ড ইটের ভাঁটি। বিপরীত দিকে বিশাল-দেহ অগণিত কারখানা মাথা তুলতে শুরু করেছে।

প্রায় সমস্ত দিনই ব্রিজ সিং এর ভাঁটি থেকে বিরাট বিরাট নৌকো বোঝাই হয়ে ইটের চালান ও-পারের কারখানা গুলোতে যায়। এমনই এক নৌকোয় দাঁড় বায় বৈজুলাল।

দশ বছর আগে আধা-পাহাড় আধা-সমতল একটা গ্রাম, যার নাম মিচান্দা—থেকে এক রকম পালিয়েই এখানে এসেছিল বৈজু। এই দশ বছরের মধ্যে একবারও মিচান্দায় ফেরে নি সে। ফেরার সুযোগই হয় নি। তা ছাড়া সেই গ্রামটিতে ফেরার মত কোন আকর্ষণই নেই। পাঁচ বছর বয়সের সময় তার মা মরেছে, বাবা মরেছে আরো বছর তিনেক পর। ভাইবোন কেউ ছিল না।

বাপ-মা মরার পর গ্রাম-সুবাদে এক চাচার বাড়ি আশ্রয় পেয়েছিল বৈজু। জীবনটা ছিল সেখানে ক্রীত-দাসের মত। সমস্ত দিন গোটা পচিশেক মোষ চরাতে হত। সন্ধ্যেবেলা মাঠ থেকে ফিরে এসে কুয়ো থেকে জল তুলে পঞ্চাশ-ষাটটা গাগরা ভরতে হত। তার ওপর ছিল পর্যাপ্ত মার। জল তুলতে তুলতে কোনদিন যদি চোখ ঢুলে আসত আর নিস্তার ছিল না। কাঁচা চামড়ার এক জোড়া নাগরা ছিল চাচার। সে দুটো দিয়ে নৃসংসের মত মারত সে।

মারের চোটে একদিন মিচান্দা ছাড়তে হয়েছিল বৈজুলালকে। তারপর এখানে ওখানে ভাসতে ভাসতে ব্রিজ সিংএর ইটের ভাঁটিতে এসে ঠেকেছে।

কৈশোরের শেষ সীমায় অর্থাৎ পনের ষোল বছরের সময় এখানে এসেছিল বৈজুলাল। এখন পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ জোয়ান সে। নাক থ্যাবড়া, পুরু পুরু তামাটে ঠোঁট। চোখ দুটো এত সরল, মনে হয়, সেখানে কোন ভাবের মেলাই মেলে না। মাংসল কাঁধ, চওড়া বুকে থরে থরে পেশী। হাত পায়ের হাড় মোটা এবং শক্ত। এক নজরেই বোঝা যায়, অনেক শক্তি ধরে সে। মাথার চুল নিরপেক্ষভাবে ছোট ছোট করে ছাঁটা।

ব্রিজ সিংএর ইটের ভাঁটিতে কাজ নিয়ে জীবনটা এই রকম হয়ে গেছে বৈজুলালের। ভোরবেলা ভোঁ বাজলেই নদীর ঘাটে ছোটে সে। বেলা বারোটা পর্যন্ত ইট বোঝাই নৌকো নিয়ে ওপারে যেতে হয়। বারোটার পর ঘণ্টা-খানেকের বিরতি। এই সময়টা ছোলার ছাতু জলে গুলে নুন মরিচ দিয়ে খেয়ে নেয়। কাঁটায় কাঁটায় একটা বাজলেই আবার ভোঁ। আবার সেই একই তালে দাঁড় বাওয়া। যতক্ষণ দিনের আলো থাকে ইট নিয়ে যেতে হয়। সমস্ত দিনে বৈজুলালকে কতবার যে নদী পারাপার করতে হয়, সে হিসেব কে রাখে!

ইটের ভাঁটির একপাশে বেতপাতার ছাউনি মাথায় নিয়ে আর ভাঙাচোরা ইটের দেওয়াল তুলে অনেকগুলো ঝুপড়ি উঠেছে। ওগুলো মাঝিমাল্লাদের আস্তানা। সারাদিন পর অবসন্ন ক্লান্ত দেহে টলতে টলতে নিজের ঝুপড়িতে ফেরে বৈজু। প্রায় ঢুলতে ঢুলতে খানকয়েক

রুটি সেঁকে নেয়। তারপর খেয়েই শুয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই অচেতন হয়ে যায়। পরের দিন ভোরে কারখানার বাঁশি বাজা পর্যন্ত ঘুম তার ভাঙে না।

আপাতত এই হল বৈজুলালের জীবন। এই কক্ষপথের মধ্যেই ক্রমাগত দশ বছর ধরে ঘুরছে সে। এই অভ্যস্ত নিয়মের কোনদিন কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। তার ধারণা ছিল বাকি জীবনটা এইভাবেই কেটে যাবে।

কিন্তু আচমকা হিমালয়ের অদৃশ্য উৎসে কি যেন হয়ে গেল। তার ফলাফল স্বরূপ চিরদিনের শান্ত নদীটায় মাতন লাগল। গেরুয়া রঙের ঘোলাটে জল ফুলে ফুলে বিপুল হয়ে অন্ধ আক্রোশে দু-পাড়ে অবিরাম আছাড় খেয়ে চলল। পাড় ভাঙতে লাগল।

নদীর নাম সুমরা। দশ বছর তার ওপর দিয়া নৌকো পারাপার করছে বৈজুলাল। কিন্তু তার এমন রুদ্রাণী রূপ আর কখনও দেখে নি। বৈজুলালের চেয়েও বেশি দিন যারা এখানে আছে সুমরার এই ভয়ঙ্করী চেহারা তাদেরও অপরিচিত।

নদীকে যেন নিশিতে পেয়েছে। যত দিন যেতে লাগল সুমরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কত দিন এমন অবস্থা চলত বলা অসম্ভব। প্রমত্ত নদীতে ইটের নৌকো নিয়ে পাড়ি জমানো অসাধ্য ব্যাপার।

কাজেই মালিক ব্রিজ সিং মাঝিমাল্লাদের ছুটি দিলেন। যতদিন না নদী শান্ত হয় কাজ বন্ধ। মাঝিমাল্লারা তাদের দেহাতে ফিরে যেতে পারে। অবশ্য মাঝে মাঝে যেন খোঁজ নেয়, নদী শান্ত হল কি-না। সুমরার মত্ততা থামলেই আবার কাজ শুরু হবে।

কাজ বন্ধ!

দশ বছরের মধ্যে বৈজুলালের এই প্রথম ছুটি। সারা-দিনের অফুরন্ত অবকাশ নিয়ে সে যে কি করবে, কিছুই স্থির করে উঠতে পারল না। তার মনে হল, সাঁতার-না-জানা মানুষের মত অগাধ সমুদ্রে এসে পড়েছে।

প্রথম দিনটা ইটের ভাঁটির চারপাশে আর সুমরা নদীর পারে লক্ষ্যহীনের মত ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিল বৈজুলাল।

ইতিমধ্যে চারদিকে ফাঁকা হয়ে যেতে শুরু করেছে। নৌকোর মাল্লারা একে একে যে যার গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। বৈজুলালের ফেরার মত জায়গা নেই। ভাঁটির পাশের সেই শ্বাসরুদ্ধ নীচু ঝুপড়িতেই তাকে পড়ে থাকতে হবে।

ঝুপড়ির মধ্যে সঙ্গীহীন নিরুৎসব ছুটি কাটাবার জন্য মনে মনে তৈরী হয়েই ছিল বৈজুলাল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন সকালে বিষণ অদ্ভুত কথা বলল, 'একা একা এখানে পড়ে থাকবি কেন. আমার সাথ চল।'

বিষণ তারই মত মাল্লা। একই নৌকোয় তারা দাঁড় বায়। তা ছাড়া পাশাপাশি ঝুপড়িতে থাকে। বহু বছর একই কাজে কাটিয়ে একসঙ্গে থেকে মনের দিক থেকে দু-জনের খানিকটা অন্তরঙ্গতা জন্মেছে। বৈজু বলল, 'কোথায় যাব তুহার সাথ?'

'চল্, গেলেই বুঝতে পারবি। খারাপ জায়গা নয়।'

'লেকেন—'

'লেকেন-ফেকেন না। চল্ দিকি—'

বৈজুর সব দ্বিধা ভাসিয়ে দিয়েছিল বিষণ। একরকম জোর করেই তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

যেতে যেতে বিষণ বলেছিল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি বল্ দিকি?'

'কি করে বলব!' বৈজু ঈষৎ অবাক হয়েছিল।

'আমরা ভরতপুর যাচ্ছি।'

'সেখানে কী?'

'হায় সীয়ারাম. সেখানে কী, পুছ্ছিস (জিজ্ঞেস করছিস)? সেখানে আমার সসুরাল (শ্বশুর বাড়ি)। আমার বহু, মতলব—আমার দিলের রোশনি সেখানে আছে যে। আউর—'

'আউর কী?'

রহস্যটা আর ভাঙল না বিষণ। মুখের বিচিত্র একটা ভঙ্গি করে হাসল। বলল. 'চল্ না, গেলেই দেখতে পাবি।'

সুমরা নদীর পার থেকে মাইল পনের দূরে ভরতপুর। সকালবেলা বৈজুরা রওনা হয়েছিল। পৌছুতে পৌছুতে বিকেল পার হয়ে গেল।

বিকেলের আয়ু নিঃশেষিত। সূর্যটা অনেক আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। তবু পশ্চিমের আকাশে খানিকটা রক্তাভা এখনও লেগে রয়েছে। বাকি তিন দিগন্তে গাঢ় বিষণ্ণ ছায়া।

উত্তর বিহারের শেষ প্রান্তে অর্থাৎ নেপালের সীমান্ত ঘেঁষে এই গ্রাম। নেপালগামী একটা পাথুরে পথ ভরতপুরের বুক ভেদ করে চলে গেছে। পশ্চিম দিগন্তে যতদূর তাকানো যায় মোষের পিঠের মত ধূসর পাহাড়ের অগণিত তরঙ্গ।

ভরতপুর একটা গ্রাম। গ্রাম আর কি! ইতস্তত কিছু কাঠের বাড়ি, ভুট্টাক্ষেতের বিক্ষিপ্ত ক'টি টুকরো, নিঃশব্দ একটি ঝরণা—এ ছাড়া কোনদিকে কোন বিস্ময় নেই।

যাই হোক, বিষণের পিছু পিছু একটা কাঠের বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল বৈজু।

সামনের দিকে সংক্ষিপ্ত একটু উঠোন। সেখানে চৌপায়ার ওপর একটা বুড়ো বসে ছিল। ঠিক বসে ছিল বললে যথার্থ হয় না। বসে বসে 'চুট্টা' ফুঁকছিল, আর সমানে কাশছিল। বিষণদের দেখে সে প্রায় লাফিয়ে উঠল, 'আও, আও, তারপর হঠাৎ চলে এলে—'

বিষণ বৈজুর কানে মুখ গুঁজে বলল, 'আমার সসুরা।' বুড়োর উদ্দেশে বলল, 'নদী ক্ষেপে গেছে। কাম বিলকুল বন্দ্। কারখানা থেকে ছোটি হয়ে গেল। কি আর করি, শোচতে শোচতে শেষ পর্যন্ত চলেই এলাম।'

'হাঁ-হাঁ, শুনছিলাম বটে। পাশের গাঁওএর লটরু তুমহাদের ওখানে কাজ করে। কাল দুপুরে সে এসেছে। সে-ই বলছিল। তা এসেছ, বেশ করেছ, আচ্ছা করেছ।' বলতে বলতেই বুড়ো বৈজু সম্পর্কে সচেতন হল, 'এ কৌন?'

'আমার দোস্ত। এক সঙ্গে কাজ করি। ওকেও নিয়ে এলাম।' বিষণ বলল।

'বেশ করেছ।' বলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল বুড়ো। ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ বিলাসিয়া, এ পঞ্চী, জলদি বাহার আ। বিষণ এসেছে।'

বিলাসিয়া এবং পঞ্চী—দুটো নাম উচ্চারণ করল বুড়ো। কিন্তু দেখা গেল ঘরের ভেতর থেকে একজনই বেরিয়ে এসেছে। কত বয়স হবে তার? সতের কি আঠার। এই বয়সেই তো ঢল নামার কথা। নেমেছেও। আর তাতেই শরীরের সব কূল ভেসে গেছে।

অবাক করার মত রূপ নেই মেয়েটার। গায়ের রঙখানি মাজা মাজাই। নাক-মুখ-ভ্রূ—কি আর? কোন কিছুই তার নিখুঁত নয়। নাকটি ভুটানী মেয়েদের মত চ্যাপ্টা, মুখ গোলাটে, ভ্রূ-দুটো পিঙ্গল।

লালে-সবুজে ডোরা-কাটা একখানা শাড়ি, দেহাতী ঢঙে পরা। আর আছে বেগুনী একটা জামা। এরই তলায় আভাষ পাওয়া যায়, ঊর্ধ্বলোকে অর্থাৎ কোমরের ওপরে অসমতল গোলাকার বুক। সরু কটির নিম্নদেশে সুবিশাল অববাহিকা। চলার তালে তালে সেটি তরঙ্গিত।

মেয়েটির সব আকর্ষণ তার চোখে। সেখানে কৌতুকের নিরন্তর একটা খেলা রয়েছে। বুড়ো বলে উঠল, 'এরা এসেছে। হাতমুখ ধোবার পানিয়া দে। আমি কিছু সবজী আর দুধ জোগাড় করে আনি।' বলতে বলতে সে চলে গেল।

বিষণ আর বৈজু দাঁড়িয়েই ছিল। ফিস ফিসিয়ে বিষণ বলল, 'এ আমার শালিয়া। নাম পঞ্চী।'

এদিকে সেই মেয়েটি অর্থাৎ পঞ্চী সামনে এগিয়ে এসেছে। বৈজুর ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। নিয়ত কৌতুকের সঙ্গে তার চোখে কৌতূহলের ছায়াও মিশেছে।

কৌতূহল রয়েছে ঠিকই, কিন্তু বৈজু সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করল না পঞ্চী। আড়চোখের দৃষ্টিটা তার ওপর রেখে বিষণের দিকে ফিরল। বলল, 'আও ভেইয়া—'

যদিও বিষণ তার বোনাই, তবু তাকে 'ভেইয়া'ই বলে পঞ্চী।

বিষণ তাকে অনুসরণ করল। বৈজু এতক্ষণ স্থির নিষ্পলকে পঞ্চীর দিকে তাকিয়ে ছিল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন ঘোর লাগল। যাই হোক, মন্ত্রচালিতের মত সে-ও চলতে লাগল।

যাচ্ছে, আর আড়ে আড়ে ফিরে ফিরে বৈজুকে দেখছে পঞ্চী। বিষণ বলল, 'কি দেখছিস অত?'

আশ্চর্য, মেয়েটা লজ্জা পেল না। বিচিত্র হেসে বলল, 'কি দেখছি, তুমি তো জান।'

আচ্ছন্নের মত চলতে চলতে বৈজুর মনে হল, মেয়েটা ভারি প্রগল্‌ভা।

ইতিমধ্যে গলা খাদে ঢুকিয়ে বিষণ বলে উঠল, 'ও কে, পুছলি না তো?'

'আমার কোন দায়! তুমহার সাথ এসেছে। তুমহারই

তো বলা উচিত।' বলেই পরিপূর্ণ চোখে বৈজুর দিকে তাকাল পল্লী। ঠোঁট দু'টি ঈষৎ বাঁকিয়ে শব্দ করে হাসল। বলল, 'তাই না ?'

থতমত খেয়ে গেল বৈজু। কি উত্তর দেবে, বুঝে উঠতে পারল না সে। প্রায়—অব্যক্ত একটা আওয়াজ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল শুধু।

মেয়েটি সাবলীলা। কোথাও তার বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই। যাই হোক, আর কোন প্রশ্ন করল না পল্লী। মুখ ফিরিয়ে চলতে লাগল।

বিকেল আর সন্ধ্যের মাঝামাঝি সময় ভরতপুর পৌঁচেছে বৈজু। রাতের খাওয়া-দাওয়া সারবার আগেই এই বাড়িটার সব খবর জেনে ফেলল।

এ বাড়িতে চারজন মাত্র মানুষ। বিষণের শ্বশুর সেই কেশো বুড়োটা। তার দুই মেয়ে পল্লী আর বিলাসিয়া। একমাত্র ছেলে সুরয। সুরয এখানে থাকে না। মজঃফরপুরে কাজ করে। মাঝে মাঝে ছুটি-ছাটায় আসে। বুড়োর বউ নেই। বছর দশেক আগে ডেঙ্গু জ্বরে মরেছে।

বিলাসিয়া অর্থাৎ বুড়োর বড় মেয়ের যদিও বিয়ে হয়ে গেছে তবু বাপের বাড়িই থাকে। কেননা শ্বশুর-শাশুড়ী নেই তার। স্বামী ইটের ভাঁটির মাল্লা। সেখানে ঝুপড়ির ভেতর বউকে নিয়ে রাখার নিদারুণ অসুবিধে।

এই হল এ-বাড়ির মানুষগুলির মোটামুটি বিবরণ। এ ছাড়া আরো দু'টি তথ্য জেনেছে বৈজু। বিষণের শালী পল্লী যেমন সুচতুরা সাবলীলা, তার বউ বিলাসিয়া তেমনি আড়ষ্ট, সঙ্কুচিত। সব সময় নাক পর্যন্ত ঘোমটা টেনেই আছে সে। এ বাড়িতে আসার পর থেকে বৈজুর কাছে তাকে আনবার জন্য অনেক সাধাসাধনা করেছে বিষণ। কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হয়েছে।

পল্লী আর বিলাসিয়া—দুই বোন যেন দুই বিপরীত প্রান্তের মানুষ।

রাতের খাওয়ার জন্য এক সময় ডাক পড়ল। বিষণ আর বৈজু—দু-জনের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বৈজু জেনে ফেলেছে বিষণের শ্বশুর, সেই বুড়ো বেশির ভাগ দিনই রাত্রে খায় না। বাইরে খাটিয়ায় বসে বসে এখন সে 'চুট্টা' ফুঁকছে আর সমানে কাশছে।

যাই হোক, পল্লীই তাদের খেতে দিতে বসেছে। আর বিষণের বউ দরজার বাইরে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঘাড় গুঁজে খেতে খেতে বৈজুর মনে হল, এ এক পরম আস্বাদ। তার চব্বিশ পঁচিশ বছরের অগৌরবের জীবনে এমনভাবে কাছে বসিয়ে কেউ খাওয়ায় নি। কথাটা ভাবতেই চোখে জল এল।

নিবিষ্টের মত খেয়ে যাচ্ছিল বৈজু। হঠাৎ বিষণের গলা তার কানে এল, তুই তো আর নিজে থেকে পুছবি না। তা আমিই বলছি। ও আমার দোস্ত। নাম বৈজু।'

বোঝা গেল, বিকেলের কথার জের টানছে বিষণ।

পল্লী সরল মুখে বলল, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। তা মুলুক কোথায় তুমহার দোস্তের ?'

শেষের কথাগুলো যদিও বিষণকেই বলা, লক্ষ্যটা কিন্তু বৈজুই। তড়িতগতিতে সে মুখ তুলল। তুললই শুধু। কিন্তু পল্লীর দিকে তাকিয়ে সব কথা হারিয়ে ফেলল।

পল্লী বলল, 'কি গো ভেইয়া, তুমহার দোস্ত বোবা নাকি ? না আমাকে দেখে বোবা হল ?'

বৈজু বিব্রত ভঙ্গিতে এবার বলল, 'না, মতলা'—

'হোয়—হোয়—হোয়'—পল্লী উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠল'। কে বলে বোবা, এই তো বেশ কথা ফুটেছে। 'তা বল দিকিন, তুমহার মুলুক কোথায় ?'

'মিচান্দা।'

'কে আছে সেখানে ?'

'কেউ না।'

'বাপ ?'

'নহী।'

'মাঈ ?'

'নহী।'

'সাদি করেছ ?'

বৈজু মাথা নাড়ল।

এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল পল্লী। তারপর দুরন্ত হাসিতে মেতে উঠল, হোয়—হোয়—হোয়. বহুত দুক্‌কা (দুঃখের) বাত।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা নীচের দিকে নুয়ে পড়ল বৈজুর। মেয়েটা শুধু সাবলীলা সুচতুরাই নয়, বিচিত্র কৌতুকময়ীও।

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর শোবার পালা। এ-বাড়িতে দু-খানা ঘর। আর সামনের দিকে ঢাকা বারান্দা। ব্যবস্থা হল একটা ঘরে বিষণ এবং তার বউ থাকবে। দ্বিতীয় ঘরটিতে থাকবে পঞ্চী। বাইরের বারান্দাটায় দু-খানা চৌপায়া পেতে বুড়ো আর বৈজুর জন্য নির্দিষ্ট হল।

আরো একটা ব্যাপার ঠিক করা হল। পাশের গ্রামের একটি লোক ব্রিজ সিং-এর ইটের ভাঁটিতে নৌকো বায়। সে প্রায় রোজই নদী শান্ত হয়েছে কিনা খোঁজ নিতে যায়। ঠিক হল, বিষণের শ্বশুর একদিন অন্তর তার কাছে গিয়ে নদীর খবর নিয়ে আসবে। সুমরা স্থির হলে বৈজুরা ফিরে যাবে। যতদিন না তা হচ্ছে নিরুদ্বেগে এখানে থাকতে পারবে।

দেখতে দেখতে কয়েকটা দিন কেটে গেল। এর মধ্যে বিষণের বউর সঙ্কোচ অনেকটা কেটে গেছে। আজকাল বৈজুর সঙ্গে দু-একটা কথাও বলে। ঘোমটা তার একেবারে খসে নি। নাকের প্রান্ত থেকে কপাল পর্যন্ত উঠেছে মাত্র।

আর যত দিন যাচ্ছে পঞ্চী ততই রঙ্গিণী হয়ে উঠছে! বৈজুকে নিয়ে বিচিত্র কৌতুকের খেলায় মেতেছে সে। যখন আসে পাশে কেউ থাকে না, হুড়মুড় করে এসে পড়ে। বলে, 'এ জায়গাটা কেমন লাগছে?'

মেয়েটাকে দেখলেই তটস্থ হয়ে ওঠে বৈজু। কোন রকমে রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'ভাল।'

'আর আমাদের?'

'খুব ভাল।'

'তা তো লাগবেই। গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলে পঞ্চী—আমার মত ডাঁটো যুবতী মেয়ে রয়েছে। না ভাল লেগে উপায়?

বিমূঢ়ের মত কিছু একটা বলতে চেষ্টা করে বৈজু। তার আগেই খিল খিল করে হেসে ওঠে পঞ্চী, 'হোয়—হোয়—হোয়—হেসেই সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মাঝে মাঝে তারা চারজন অর্থাৎ বিলাসিয়া বিষণ পঞ্চী আর বৈজু—দল বেঁধে বেড়াতে বেরোয়। চারপাশে শালের বন, পাহাড় আর ঝর্ণা—প্রকৃতির স্বদেশ যেন।

শালবনে গিয়ে কৌশলে দল থেকে বৈজুকে বার করে আনে পঞ্চী। তারপর জঙ্গলের জটিলতর অংশে তাকে ফেলে দিয়ে উধাও হয়ে যায়।

পথ খুঁজে খুঁজে যখন বৈজু শ্রান্ত, ভীত এবং দিশেহারা, সেই সময় আবার দেখা মেলে পঞ্চীর। হাসতে হাসতে তাকে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে মেয়েটা।

এইভাবেই চলছিল। কখন কোনদিক থেকে কৌতুকের মেলা শুরু করবে পঞ্চী আগে থেকে বোঝা যায় না। আর যায় না বলেই এই দুর্বোধ রহস্যময়ীর জন্য সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে বৈজু।

যাই হোক, দিন পনের ভরতপুরে কাটাবার পরই রামনবমী এসে গেল। এই উপলক্ষে এ অঞ্চলে একটা মেলা বসে।

নেপাল-গামী যে রাস্তাটা বিহারের শেষ প্রান্তে গিয়ে ঠেকেছে মেলাটা বসে সেখানে।

সকালবেলা গামছায় কিছু রুটি আর ভাজি বেঁধে পঞ্চীরা চারজন বেরিয়ে পড়ল। মেলায় যখন পৌঁছুল তখন দুপুর।

বিরাট মেলা। চারদিকের পঞ্চাশ ষাটটা গ্রামের তাবত মানুষ এসে ভিড় করেছে যেন। খাবারের দোকান, পুতুলের দোকান, কাপড়-খেলনা এবং মনোহরণ জিনিসের দোকান—দোকানে দোকানে চারপাশ ছয়লাপ। তার ওপর অতিরিক্ত আকর্ষণ রয়েছে নাগরদোলা।

সমস্ত দিন মানুষের স্রোতে ভেসে ভেসে মেলা দেখল বৈজুরা। নাগরদোলায় চড়ল। খাবার কিনে খেল।

কোথা থেকে একটা নৌটঙ্কীর দল এসেছে। 'রাম-সীতা'র পালা গাইল তারা। মাঝরাত পর্যন্ত সেই পালা শুনল পঞ্চীরা। তারপর সারাদিনের ক্লান্তি আর মেলার আনন্দে ভরপুর বাড়ীর পথ ধরল।

ইতিমধ্যে উত্তর বিহারের শেষ প্রান্তের এই অংশটির মাথায় চাঁদ উঠেছে। চারিদিকের শালবন চাঁদের আলোয় কেমন যেন আচ্ছন্ন, স্তব্ধ আর নেশাগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বিলাসিয়া আর বিষণ আগে আগে চলেছে। অনেক-

খানি পেছনে পঙ্খী আর বৈজু। ইচ্ছা করেই কি বিষণরা তাদের নিভৃত হবার সুযোগ করে দিয়েছে!

চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ পঙ্খী ডাকল, 'এ জী—'

—'হাঁ—' ভয়ে ভয়ে বৈজু তাকাল।

'দিনটা বেশ কাটল, না?'

পঙ্খীর কথাগুলো কোন নিষ্ঠুর কৌতুকের ভূমিকা কি-না, বুঝবার চেষ্টা করল বৈজু। তারপর কিছুটা সংশয়ের সুরে বলল, 'হাঁ।'

'নৌটঙ্কীর গানাটা বহুত আচ্ছা, না?' অদ্ভুত সুরে বলল পঙ্খী। কিসের যেন একটা ঘোর লেগেছে তার গলায়।

সেই ঘোরটা এবার বৈজুর মধ্যেও সঞ্চারিত হল যেন। সে শুধু বলল, 'হাঁ।'

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ।

একসময় পঙ্খীই আবার ডাকল, 'এ জী—'

'হাঁ।' বৈজু উন্মুখ হল।

'তুমারা ক'দিন আমাদের বাড়ী আছ! কি আনন্দ যে পাচ্ছি—'

'হাঁ—'

'ভাবি তুমরা যখন চলে যাবে, ভারি কষ্ট হবে—'

'হাঁ—'

'তুমাদের নদীটা যেন আরো বহুত বহুত দিন যেন ক্ষেপেই থাকে—'

পঙ্খী নামে এই মেয়েটা যেন অনায়াসগতি দুরন্ত এক ঢল। সেই ঢলে একটু একটু করে ভেসে যাচ্ছে বৈজু। তার চেতনা ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে যেন। সে শুধু বলতে পারল, 'হাঁ—'

তারপর আবার অনেকক্ষণ স্তব্ধতা।

চলতে চলতে পঙ্খীই আবার ডাকল, 'এ জী—'

'হাঁ—'

'আমার বড় ডর লাগে—'

'কিসের?'

'যদি তুমহাদের সেই নদী ঠিক হয়ে যায়—'

কি উত্তর দেবে, ভেবে পেল না বৈজু। অসহায়ের মত পঙ্খীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

রঙ্গিণী স্বভাবের পঙ্খী এবার এক কাণ্ডই করল। বৈজুর দুটো হাত ধরে নিশি-পাওয়া গলায় বলে উঠল, 'তুমহাকে একটা কথা বলব।'

'কী?' কোনরকমে উচ্চারণ করতে পারল বৈজু।

কি যেন বলতে গিয়ে থমকে গেল পঙ্খী। বৈজুর হাত ছেড়ে দিয়ে সলজ্জ মৃদু হেসে বলল, 'আজ থাক, কাল বলব।'

ভোরবেলা চারজন বাড়ি ফিরল। ফিরেই দেখল উঠোনের খাটিয়ায় বসে যথারীতি 'চুট্টা' ফুঁকছে আর কাশছে বুড়োটা।

বৈজুদের দেখেই ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াল বুড়ো। বলল, 'আরে, কাল সুবে মেলায় গেছ, আজ ফিরলে! কাল দুপুরে পাশের গাঁয়ে খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। তুমহাদের নদী ঠিক হয়ে গেছে। আজ এখনই তুমহাদের যেতে হবে।'

অতএব তখনই চাটি মুখে দিয়ে বৈজুদের ইটের ভাঁটির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তে হল। খানিকটা দূর এসে একবার পেছন ফিরে তাকাল সে। দেখল উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ সকরুণ চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে পঙ্খী। কাল রাতে সে কী বলতে চেয়েছিল, জানা হল না। কী বলতে চেয়েছিল পঙ্খী?

পঁচিশ বছরের অভ্যস্ত জীবন থেকে কয়েকদিনের জন্য ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল বৈজু। কে জানত, এরই মধ্যে পঙ্খীর সঙ্গে দেখা হবে? কে জানত, পঙ্খীকে ঘিরে অনাস্বাদিত কি যেন একটা পুরোপুরি বুঝবার আগেই নদী শান্ত হয়ে যাবে?

একটি গ্রহ আকস্মিক দুর্ঘটনায় তার নিয়ম থেকে বেরিয়ে এসেছিল। জীবনের একটা রহস্য কিছু বুঝে আর অনেকখানি না বুঝে আবার সে তার কক্ষপথে ফিরে যাচ্ছে।

নেপচুন

উপাধ্যায়

নেপচুনের ভারতীয় নামকরণ হয়েছে বরুণ। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। কেমব্রিজের মিষ্টার এডামস আর প্যারিসের লিভেরিয়ে এই দুইজন জ্যোতির্ব্বিদ লক্ষ্য করেন হার্শেল গ্রহের গতি বৈষম্য। এদের ধারণা হয় ঐ গ্রহ কক্ষের বহির্ভাগে আছে কোন অনাবিস্কৃত গ্রহ, আর সেই গ্রহই সবলে আকর্ষণ করে হার্শেলের গতি বিপর্যায় ঘটাচ্ছে। পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান কার্য্য দ্রুত চলতে থাকে। তারপর ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মঁসিয়ে লিভেরিয়ে অভূতপূর্ব্ব গণিত প্রণালীর মাধ্যমে এই অনাবিষ্কৃত গ্রহটিকে খুঁজে পেলেন—এই নূতন গ্রহের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব তার কক্ষ পরিভ্রমণের বর্ত্তমান নির্দ্দেশ করেন। সূর্য্য থেকে প্রায় ২৭৪৬ মিলিয়ান মাইল দূরে গ্রহটি অবস্থিত, এজন্যে এর প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত হওয়া যায়নি। অবশ্য এর প্রধান প্রধান প্রভাব ও কারকতা সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য বাহির হয়েছে। তরুণ জ্যোতির্ব্বিদ এ্যাডমস্ও জটিল প্রণালী উদ্ভাবিত গণিত সাহায্যে নেপচুনের স্থিতাদি ফল সাধন করে দেন। বার্লিনের মান মন্দিরে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে ঠিক নির্দ্দিষ্ট স্থানে যে গ্রহটি ধরা পড়ে, তাকেই নেপচুন নামে অভিহিত করা হয়। গ্রীক ভাষায় এর অর্থ জল দেবতা। ১৬৪ বৎসর ৬ মাসে গ্রহটি একবারে সমগ্র রাশিচক্র ঘুরে আসে। এক এক রাশিতে এর স্থিতি কাল প্রায় ১৪ বৎসর। যত কিছু রহস্যজনক বস্তু বা ঘটনা যত কিছু অবস্থা বিপর্য্যয় বা নিষ্ক্রিয় ব্যাপার আমরা দেখতে পাই—অথচ যাদের রূপ বা অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের কোন বোধ নেই, তাদের ওপরই প্রভাব বিস্তার করে আছে গ্রহটি। আবেগ, ভাবপ্রবণতা, অতীন্দ্রিয় কাম বা কামনা, চিন্তার স্পন্দন প্রভৃতির ওপর এর আধিপত্য। যোগ-দর্শন, দিব্যশ্রবণ, অধ্যাত্মচিন্তা, ভূমাবোধ, থটরিডিং প্রভৃতির মূলে আছে নেপচুনের প্রভাব। ব্যোমপথে বিচরণের ক্ষেত্রেও আছে নেপচুন। থিওসফিষ্ট পত্রিকায় ১৯১২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর সংখ্যায় মিসেস মেরী রুথাক্ বলছেন—Neptune is a splendid friend to the Spiritouslly minded, but a dangerous foe to the base !

মিষ্টার জর্জ্জ ওয়াইল্ডস বলেন, নেপচুন রবির সঙ্গে শুভ-দৃষ্টি সম্বন্ধে আবদ্ধ হোলে ঐ দুটি গ্রহের আশ্রিত ভাব-নির্দ্দিষ্ট বস্তুগুলি লাভপ্রদ হোতে পারে। দশমভাবে থাকলে ভালো চাকুরি থেকে অর্থলাভ হয়। ঐ প্রকার যোগ বৃহস্পতির সঙ্গে হোলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি অথবা বিবাহের পর সম্পত্তি বা যৌতুক ইত্যাদি লাভ হয় আর তার আনুকূল্যে স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। দশমস্থ নেপচুন হার্সেলের দ্বারা পীড়িত হোলে বিষয় কর্ম্মে অথবা চাকুরির ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন—এমন কি বিশেষ বিপত্তি এনে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে জাতকের কর্ম্মচ্যুতি ঘটিয়ে দীর্ঘকাল বেকার অবস্থায় রাখে। নেপচুন পীড়া-দাতা হোলে আর চররাশিতে থাকলে শরীরের রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায়। যদি স্থিররাশিতে থাকে তাহোলে

গ্রাও ও রসক্রিয়ার ওপর ব্যাধি জন্মায়। দ্ব্যাত্মক রাশিতে থাকলে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী ঘটিত পীড়া হোতে পারে। র‍্যাফেলের মতে মৃত্যুকালে প্রায়শঃ নেপচুনের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়।

দ্বিতীয়ে নেপচুন বিশেষরূপে শুভগ্রহের যোগদৃষ্টি সম্বন্ধ বর্জ্জিত হোলে, জাতকের মধ্যে মধ্যে আর্থিক ক্ষতি বা কষ্ট এনে দেয় আর অপরিমিত ব্যয় ঘটিয়ে জাতককে বিপন্ন করে তোলে। নবম ভাবগত হোলে জাতক ভূপর্য্যটক হয়। জায়া ভাবগত নেপচুন দাম্পত্য জীবনের পক্ষে আদৌ শুভ নয়। বিচ্ছেদ অথবা নানা প্রকার অসামঞ্জস্য ঘটনার সৃষ্টি করে। হার্সেল যেমন বায়ুরাশিতে বিশেষতঃ কুম্ভ রাশিতে থাকলে বলবান হয়, নেপচুন ও তেমনই বলশালী হয় যদি সে থাকে কর্কট বা মীন রাশিতে।

অগ্নি বা বায়ুরাশি গত হোলে শুভ নেপচুন জাতককে আধ্যাত্মিক স্তরে বহু উর্দ্ধে নিয়ে যায়। তার চিন্তাধারা সুন্দর ও মার্জ্জিত হয়। নানা প্রকার অলৌকিক স্বপ্ন, ভাব মহাভাব আর প্রেতের প্রভাব জাতকের মধ্যে আনে। বুধ বা চন্দ্রের সঙ্গে বিরুদ্ধ দৃষ্টি সম্বন্ধে আবদ্ধ হোলে এই গ্রহ জাতকের মধ্যে স্নায়ুর উত্তেজনা আনে আর বিষময় পরিণতি ঘটায়, স্নায়ুশক্তির হ্রাস করে, সাধারণভাবে শারীরিক দুর্বলতা, মেরুদণ্ডের যন্ত্রণা আর মূর্চ্ছা আনে। তৃতীয়ে বা নবমে গ্রহটি বিরুদ্ধভাবে পীড়িত অবস্থায় থাকলে ঐ রকম ফলগুলি দেখা দেয়। রবি বা চন্দ্রের সঙ্গে বিরুদ্ধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হোলেও অনুরূপ পরিস্থিতি আনে গ্রহটি।

এ্যালান লিও বলেছেন—

It somewhat favours travelling prenatal reminiscences ; it improves thc artistic, foetic aesthetic side of the nature and may aid in giving a touch of genius in matters pertaining to religion, poetry, music art or the stage.

আকস্মিক মৃত্যু, হত্যাকাণ্ড, পর্য্যটন, নির্ব্বাসন, দুর্ঘটনা ও বহুবিধ সমস্যার স্রষ্টা নেপচুন। উন্মাদনা, কুষ্ঠব্যাধি, চক্ষুপীড়া, মস্তিষ্কপ্রদাহ, নানা প্রকার নেশাও মাদকতার সাহায্যে চিত্ত ভগবদমুখী করতে গিয়ে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিপন্ন প্রভৃতির মূলে নেপচুনের অপ্রতিহত প্রভাব প্রত্যক্ষ হয়। তদনুভাবে ভালোমন্দ দুইই আনে। ভালোর দিকে আধ্যাত্ম সাধনায় অনুরাগ ধর্ম্ম প্রবণতা, প্রতিভার স্ফুরণ কর্ম্মদক্ষতা প্রভৃতি কারক। খারাপের দিকে মতিগতি পরিবর্ত্তনশীল, রোমান্টিকতায় ভাবালুতা ও স্বপ্নাচ্ছন্ন কল্পনার আবেষ্টনে অবস্থান। ধনভাবে থাকলে প্রতারণায় ক্ষতি ও আর্থিক বিপর্যায়। শুভভাবে থাকলে ভাগ্য বিপর্য্যয়ের মধ্য থেকে উঠে সম্পত্তিলাভ। সহজ ভাবে থাকলে নভেল লেখা বা পড়ায় আসক্তি তা ছাড়া অতীন্দ্রিয় বিষয়বস্তু ও আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক। ক্ষেত্রটী-জলরাশিগত হোলে জল যাত্রা নির্দ্দেশ করে। সুখভাবে থাকলে শুভ গ্রহ দৃষ্টি বা সংযোগ যদি হয়, তা হোলে সম্পত্তি, ভূমি, বাড়ী, উদ্যান প্রভৃতি বৃদ্ধি করে। সাধারণতঃ শেষজীবনটি দুঃখের হয়। প্রতারণা ও পারিবারিক অশান্তি ও আবাসের অনিশ্চয়তা আনে। অশুভগ্রহের দৃষ্টিতে থাকলে মৃত্যু হয় কষ্টে বিচ্ছিন্ন ও একক অবস্থায়। পঞ্চমস্থানে নেপচুনের অবস্থিতি হোলে প্লেটোনিক প্রেম সৃষ্টি করে, শুভ গ্রহের দৃষ্টি বা সংযোগ হোলে এই প্রেমের মাধ্যমে নানা প্রকার লাভ হয়,—সন্তান সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। অশুভ দৃষ্টি বা সংযোগে-প্রণয়ের ব্যাপারে প্রতারণা, অনৈসর্গিক ইন্দ্রিয় বিলাস ও প্রণয়ঘটিত আবেগের সঞ্চার করে। ষষ্ঠস্থানে নেপচুন দীর্ঘস্থায়ী দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি করে। যথেষ্ট পরিমাণে স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় আর আলস্য আনে। সপ্তমস্থানে গ্রহটি থাকলে স্ত্রীর পৌনঃপুনিক পীড়া বা প্রতারণা বা মৃত্যুর জন্য দ্বিভার্য্য যোগ আনে। অদ্ভুত ঘটনায় মাধ্যমে বিবাহ। প্রণয় ঘটিত ব্যাপার বৃদ্ধি করে আর তা থেকে অপবাদ রটে যায়। অশুভ গ্রহের দৃষ্টি বা সংযোগে বিবাহ বিচ্ছেদ অথবা দাম্পত্যজীবনে দুঃখ ও নৈরাশ্যকর পরিস্থিতি নৈতিক চরিত্রের অধ্যপতন এবং পরস্ত্রী সম্ভোগ প্রবৃত্তি আনে। অষ্টমস্থানে গ্রহটি থাকলে বিবাহের দ্বারা উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তিলাভ অথবা অদ্ভুত উপায়ে অপরের সাহায্যে সম্পত্তি—অদ্ভুতভাবে মৃত্যু—মূর্চ্ছা আর ট্রান্স-স্ত্রীর আর্থিক অবস্থার বিপর্য্যয়, উইল বা মৃতের সম্পত্তি সম্পর্কে বিভ্রাট। নবমস্থানে নেপচুন থাকলে অদ্ভুত শারীরিক অভিজ্ঞতা, স্বপ্নে দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছিন্নতা দর্শন বা নানা প্রকার অদ্ভুত স্বপ্ন—স্বপ্নেদীক্ষালাভ—ধর্ম্ম প্রবণতা আর

মৃত্যুর পর মানুষের গতি সম্পর্কে জানবার আগ্রহ। গ্রহটি এখানে বিরুদ্ধ অবস্থায় থাকলে সমুদ্রযাত্রায় অথবা দূর দেশে দীর্ঘ ভ্রমণে বা মামলার মকর্দ্দমায় প্রতারণা হেতু বিপন্নতা। দশমস্থানে নেপচুন পিতার আয়ুহ্রাস করে আর অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটায়। সাধারণতঃ মানুষকে কলাকুশলী ও ও প্রণয় ঘটিত ব্যপারে সাফল্য দেয়। অসাধারণ সাফল্য ও সম্মান দেয়। বিভিন্ন প্রোফেসনে অশুভ দৃষ্টি বা সংযোগে জন প্রিয়তার অভাব, কর্ম্মবিপর্য্যয়, ভাগ্যহানি ও কর্ম্ম জীবনের সঙ্কীর্ণ দুঃখপ্রদ অবস্থা সৃষ্টি করে। একাদশে থাকলে বন্ধুদের দ্বারা প্রতারণা ও ব্যর্থ আশা। দ্বাদশে থাকলে অধ্যাত্ম বিদ্যালাভের দিকে ঝোঁক ও গোয়েন্দাগিরি করার প্রবণতা। অশুভ গ্রহদৃষ্টি বা সংযোগে গুপ্ত শত্রুদের দ্বারা নির্য্যাতন ভোগ ও প্রতারণা, নির্ব্বাসন অথবা কারাবাস!

——

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফলাফল

মেষ রাশি

ভরণী জাত ব্যক্তিগণের পক্ষে শুভ! অশ্বিনীর পক্ষে মধ্যম। কৃত্তিকার পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। স্বাস্থ্যের অবনতি। উদর ও গুহ্য প্রদেশে পীড়া। অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতির সম্ভাবনা। পুরাতন জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির সতর্কতা প্রয়োজন। পারিবারিক কলহ ও অশান্তি। আর্থিক অবস্থা অনুকূলে নয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে অর্থকষ্ট বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হবে। ব্যয়বৃদ্ধি। বাড়ীওয়ালা ভূম্যাধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে সন্তোষজনক নয়। চাকুরির ক্ষেত্রে কিছুটা ভালো কিন্তু উল্লেখযোগ্য পরিস্থিতি নেই। প্রথমার্দ্ধ বহুল পরিমাণে অনুকূল। কর্ম্মপরিবর্ত্তন আর বেকার ব্যক্তিরা কাজ পাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি একভাবেই যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি অনুকূল ভ্রমণ এবং আমোদ-প্রমোদ উপভোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ নয়।

বৃষ রাশি

রোহিনী জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। কৃত্তিকা ও মৃগশিরার পক্ষে ভালো বলা যায় না। স্বাস্থ্য মোটের ওপর ভালোই থাকবে। হজমের গোলমাল। সন্তানদের শারীরিক অসুস্থতা। দুর্ঘটনার আশঙ্কা। পারিবারিক কলহ বিবাদ। সর্ব্বপ্রকার সাফল্য। আর্থিক অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি এক ভাবেই যাবে। ফসলের অবস্থা আশাপ্রদ নয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অনুকূল। স্ত্রীলোকের মোটেই ভালো নয়। শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। অর্থ সম্বন্ধে সতর্কতার প্রয়োজন। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

মিথুন রাশি

আর্দ্রাজাতগণের পক্ষে উত্তম। পুনর্ব্বসুর পক্ষে মধ্যম। মৃগশিরাজাত ব্যক্তির পক্ষে অধম। স্বাস্থ্যের অবনতি। শারীরিক দুর্ব্বলতা। সন্তানদের শারীরিক অবস্থা আদৌ ভালো নয়। সামান্য দুর্ঘটনায় তারা আক্রান্ত হোতে পারে। পারিবারিক কলহ। পরিবার বহির্ভূত আত্মীয় স্বজনের সহিত মনোমালিন্য। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা। সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টায় ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশী। দ্বিতীয়ার্দ্ধে নানাভাবে অর্থাগম। আর্থিক স্ফীতির সম্ভাবনা। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবি ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে শুভ। ফসলের অবস্থা সন্তোষজনক। চাকুরীর ক্ষেত্র অতীব উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কর্কট রাশি

অশ্লেষাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পুনর্ব্বসুর পক্ষে মধ্যম। পুষ্যার পক্ষে নিকৃষ্ট। শারীরিক অবস্থার অবনতি। অজীর্ণতা, উদরাময়, আমাশয় অথবা অর্শ। প্রথমার্দ্ধে জ্বর। সন্তানের পীড়াদি কষ্ট। পারিবারিক মনোমালিন্য। স্বজনের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি। অর্থাগম। লেখক ও প্রকাশকের উত্তম সময়। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবি ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে চলনসই। চাকুরিজীবির পক্ষে অনুকূল। কর্ম্মনিয়োগ কর্ত্তার সতর্কতা প্রয়োজন। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। অধ্যয়নস্পৃহা বৃদ্ধি। মাতামহ গৃহ হোতে শুভসংবাদ। সামাজিক ক্ষেত্রে উত্তম পরিস্থিতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

সিংহ রাশি

পূর্ব্বফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। মঘার পক্ষে মধ্যম। উত্তরফল্গুনীর পক্ষে নিকৃষ্ট। সামান্য হজমের গোলমাল ও গুহ্যদেশে পীড়া। স্বাস্থ্য মোটামুটি সন্তোষজনক। ভ্রমণকালে সামান্য দুর্ঘটনাদির আশঙ্কা। আর্থিক অবস্থা মন্দ নয়। উপঢৌকন প্রাপ্তি যোগ। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে সন্তোষজনক। চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রশংসা লাভ। পদপ্রার্থীদের পরীক্ষায় বা নিয়োগ কর্ত্তার সহিত সাক্ষাতে সাফল্য লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

কন্যারাশি

হস্তাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। উত্তরফল্গুনী ও চিত্রার পক্ষে নিকৃষ্ট। শারীরিক অবস্থা মোটের ওপর ভালোই যাবে। রক্তের চাপ বৃদ্ধি হৃদ্রোগ ও শ্বাসপ্রশ্বাসের পীড়ায় যারা বহুদিন থেকে ভুগেছে, তাদের সতর্কতা প্রয়োজন। পিত্ত ও বায়ু প্রকোপ। পারিবারিক অশান্তি ও কলহ। পরিবার বর্হিভূত স্বজনবন্ধুদের সঙ্গে মনোমালিন্য। আর্থিক ক্ষেত্র সন্তোষজনক নয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি শুভ বলা যায় না। চাকুরির ক্ষেত্র আশানুরূপ নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। চাকুরিজীবি, শিল্পী, মঞ্চ ও ছায়াছবিতে নিযুক্তা নারীর পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

তুলা রাশি

স্বাতীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। বিশাখার পক্ষে মধ্যম। চিত্রার পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য সন্তোষজনক নয়। সারা মাস রক্তের চাপ বৃদ্ধি। পিত্ত ও রক্তঘটিত পীড়া। হাঁপানি বা শ্বাসকাস রোগীর সতর্কতা আবশ্যক। পারিবারিক কলহ ও অশান্তি। স্বজন বন্ধুবর্গের সহিত মনোমালিন্য। আর্থিক ক্ষতিযোগ। ব্যয়বৃদ্ধি। চৌর্য্য ও প্রতারণা ভয়। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবি ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে বাধা বিপত্তি এনেও শেষ পর্য্যন্ত শুভ এবং আয়বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

বৃশ্চিক রাশি

জ্যেষ্ঠাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। বিশাখাও অনুরাধার পক্ষে নিকৃষ্ট। উত্তম স্বাস্থ্য, মধ্যে পিত্ত প্রকোপ ও ব্রঙ্কাইটিস। পারিবারিক শান্তি ও ঐক্য। বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি ক্রয়। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা ও লাভ। বাড়ীওয়ালা কৃষিজীবি ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে উত্তম। চাকুরির ক্ষেত্রে শুভাশুভ পরিস্থিতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ধনু রাশি

পূর্ব্বাষাঢ়া জাতব্যক্তির পক্ষে উত্তম। মূলার পক্ষে মধ্যম। উত্তরাষাঢ়া জাত গণের পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্যভাব শুভ। শরীরে কিছু পিত্ত প্রকোপ। কোন স্বজনের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি। আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। ব্যয়বৃদ্ধি। বাড়ীওয়ালা কৃষিজীবি ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে আশাপ্রদ। চাকুরি ক্ষেত্র শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে সন্তোষজনক। স্ত্রীলোকের পক্ষে (বিশেষতঃ মঞ্চও চিত্রাভিনেত্রী, শিল্পী প্রভৃতি) উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মকর রাশি

শ্রবণার পক্ষে উত্তম। উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে নিকৃষ্ট। বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পীড়া হবে না। শারীরিক দুর্ব্বলতা। প্রথমার্দ্ধে আর্থিক ক্ষেত্রে সুবিধাজনক নয়, শেষার্দ্ধে শুভ। অর্থবৃদ্ধি, লাভ। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবি ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে উত্তম। চাকুরিজীবির পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবি অর্থস্ফীতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কুম্ভ রাশি

শতভিষাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পূর্ব্বভাদ্রপদ জাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। ধনিষ্ঠাজাত ব্যক্তির পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। প্রথমার্দ্ধে রক্তের চাপবৃদ্ধি। স্ত্রী ও সন্তানাদির স্বাস্থ্যের অবনতি। কোন স্বজনের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। ব্যয় বাহুল্য। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবি ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মধ্যম। চাকুরির ক্ষেত্রে শুভাশুভ ফল। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির সন্তোষজনক পরিস্থিতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধ অশুভ, শেষার্দ্ধশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি।

মীন রাশি

রেবতীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তর ভাদ্রপদ জাতব্যক্তির পক্ষে অধম। স্বাস্থ্যহানি ও শারীরিক দুর্ব্বলতা। রক্তের চাপবৃদ্ধি গ্রস্ত রোগীর সতর্কতা আবশ্যক। দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। পারিবারিক অশান্তি। স্ত্রীপুত্রাদির সহিত কলহ। আর্থিক অস্বচ্ছলতা।

ব্যয়বৃদ্ধির জন্য নগদ টাকার অনটন হোতে পারে। বাড়ী-ওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি সন্তোষজনক নয়। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। বেকার ব্যক্তির চাকুরি লাভ। অস্থায়ীপদে নিযুক্ত ব্যক্তির স্থায়ীপদ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

——

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নফল

মেষ লগ্ন—

সহোদরের সহিত মনোমালিন্য। সন্তানের শারীরিক অবস্থা শুভ। খ্যাতি, প্রতিপত্তি। স্বাস্থ্যহানি। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি। ধনভাব আশানুরূপ নয়। সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব। ব্যবসাক্ষেত্রে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

বৃষ লগ্ন—

বাসস্থান সংক্রান্ত গোলযোগ। ব্যয়বাহুল্য। চিত্তের উদ্বেগ ও মানসিক চাঞ্চল্য। কর্ম্মোন্নতি, আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা। মধ্যে অপ্রত্যাশিত লাভ। নূতন সম্পত্তি লাভ। চাকরি ক্ষেত্রে আকস্মিক পরিবর্ত্তন। ক্রয় বাণিজ্যে অধিকতর শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মিথুন লগ্ন—

দেহভাব অশুভ। নানাপ্রকার পীড়াদি কষ্ট। আকস্মিক দুর্ঘটনা। স্ত্রী ও সন্তানের পীড়াযোগ। কর্ম্মোন্নতি। ব্যবসাবাণিজ্যে লাভ। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে জটিল সমস্যা। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কর্কট লগ্ন—

ধনভাব উত্তম। আকস্মিক পীড়া। অনিয়মহেতু পীড়াবৃদ্ধি। চাকুরিক্ষেত্র আশাপ্রদ নয়। পত্নীভাবের ফল শুভ নয়। তীর্থ পর্য্যটন। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

সিংহ লগ্ন—

দেহভাবের ফল মধ্যবিধ। ধনভাব উত্তম। মামলা বা মোকর্দ্দমার সম্ভাবনা। কর্ম্মস্থলে উন্নতি। সন্তানের দেহপীড়ার জন্য উদ্বেগ ও অর্থব্যয়। যশোভাগ্যাদি যোগ। চিত্র ও রঙ্গজগতের ব্যবসায়ীর ক্ষতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ ফল। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে কিঞ্চিৎ বাধা।

কন্যা লগ্ন—

শারীরিক ভাব দুর্ব্বল। পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি, সন্তানের স্বাস্থ্যহানি ও পরীক্ষাদিতে সুফলের অভাব। শত্রুবৃদ্ধি। বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতির অভাব। কর্ম্মস্থানে বাধা বিঘ্ন। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। চাকুরিজীবী নারীর কর্ম্মোন্নতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

তুলা লগ্ন—

শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। স্নায়ুগত পীড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধনভাব শুভ হোলেও ব্যয়াধিক্য। নানা রকমে অর্থব্যয় হেতু উদ্বিগ্নতা। মাতৃপীড়া। শত্রুবৃদ্ধিযোগ। কর্ম্মস্থলে উন্নতির অভাব। ভাগ্যোন্নতিতে বিঘ্ন। সন্তানের বিবাহ আলোচনা। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

বৃশ্চিক লগ্ন—

শারীরিক স্বচ্ছন্দতা। ধন ব্যয় যোগ। ভ্রাতার সহিত বৈষয়িক ব্যাপারে গোলযোগ। স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি। সন্তান-সন্ততির পরীক্ষায় সুফল। ভাগ্যোন্নতিতে কিঞ্চিৎ বাধা। কর্ম্মস্থলে গুপ্তশত্রু বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ধনু লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতা। ধনাগমে বাধা বিঘ্ন। সহোদরের সহিত প্রীতির অভাব। স্ত্রীর সহিত অসদ্ভাব। বন্ধুভাব উত্তম। পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা। অযথা অর্থহানি। শোক, কর্ম্মোন্নতি, ব্যবসায়ে সাফল্য-লাভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

মকর লগ্ন—

দেহ পীড়া। সহোদরভাব শুভ, স্ত্রীর সহিত প্রীতির অভাব ভাগ্যোন্নতি, সন্তান সন্ততির লেখাপড়ায় উন্নতি, স্ত্রীর জীবন সংশয় পীড়া, কর্ম্মভাব শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ নং, স্বামীর জীবন সংশয় পীড়া। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

কুম্ভ লগ্ন—

দৈহিক ও মানসিক কষ্ট। অনিয়মহেতু আকস্মিক পীড়াবৃদ্ধি ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা, ঋণযোগ, চাকুরিতে খ্যাতি, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ নয়, সঞ্চিত অর্থনাশ ও যশোহানি যোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

মীন লগ্ন—

স্বাস্থ্যোন্নতি। অর্থাগমযোগ প্রবল সত্বেও ব্যয়াধিক্য-হেতু উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা। অতিলোভের পরিণতিতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা। পরাক্রম বৃদ্ধি, গুরুজনবিয়োগ। আর্থিক উন্নতি। কর্ম্মভাব শুভ। পিতার জীবন সংশয় পীড়া। স্ত্রীলোকের পক্ষে তীব্র অশান্তি—মাসটি ভালো নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।
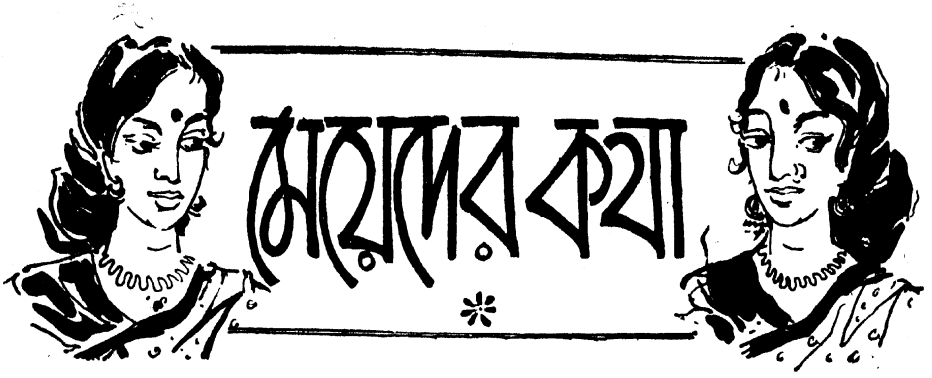
নারীমুক্তি—কোন্ পথে ?

চারুশীলা দেবী

গত ১৯২০ সালের আন্দোলনে যোগদানের অপরাধে আমার জেল হয়েছিল। জেলের বাইরে যখন ছিলুম তখনও আমাদের গতিবিধির উপর কড়া নজর ছিল পুলিসের। কুমিল্লা থেকে লাবণ্যদি ও যমুনাদি (শ্রীযুক্তা লাবণ্য চন্দ ও শ্রীযুক্তা যমুনা ঘোষ) আমাদের অঞ্চলে কাজ করতেন। ১৯৩০ সালে আমরা প্রায় সকলেই জেলে ছিলাম। আমি আলিপুর জেল ও হুগলী জেল পার হয়ে শেষ পর্য্যন্ত কুমিল্লা জেলে স্থানান্তরিত হলাম। আলিপুর জেলেই দেখা হয়েছে দুইজন নারীনেত্রীর সঙ্গে—শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেও স্বর্গতা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী। জ্যোতির্ময়ীদি জেলে আমাদের সকলের তত্ত্বাবধান করতেন। আমরা কেহই খুব শান্তশিষ্ট ছিলুম না। শান্তি ও সুনীতি (কুমিল্লা-মেজিষ্ট্রেট হত্যার আসামী) বড় চঞ্চল ছিলেন। কিন্তু জ্যোতির্ময়ীদি সস্নেহে সকলকে পরিচালনা করতেন।

দেশের মুক্তিই যে শুধু আমাদের সংগ্রামের বিষয় ছিল তা নয়। আমরা দেশের জীবনে যেমন রাজনৈতিক স্বাধীনতা চেয়েছিলুম, তেমনি সমাজ-জীবনেও নারীর নিগ্রহ দূর করার ব্রত নিয়েছিলুম। শরৎ চাটুজ্যের সাহিত্য বাঙলার নারী সমাজে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন এনে ছিল। আমরা ছিলাম সেই আলোড়নে উদ্বুদ্ধ। জ্যোতির্ময়ীদি প্রত্যেকটি মেয়েকে শক্ত সমর্থ হয়ে উঠার জন্যে উৎসাহ জোগাতেন। পিতৃদেব (৺কামিনীকুমার ভট্টাচার্য) নারীজাগরণের গানগুলি বড় পছন্দ করতেন, আর আমাদের গাইতে বলতেন।

"আপনার মান রাখিতে জননী
আপনি কৃপাণ ধর গো।
পরিহরি চারু ধনিক ভূষণ
গৈরিক বসন পর গো।
আমরা তোদের কোটি কুসন্তান
গিয়েছি ভুলিয়ে আত্ম-অভিমান
কবে মা পিশাচে তোদের অপমান
তাও নিহারি নীরবে সহি গো।

* * *

তোদের তপ্ত শোণিত পরশে
দানব-দলিত ভারত বরষে
জাগুক আবার যত কুলাঙ্গার
আজিও সুখে ঘুমায়ে রয়
শুনিয়ে তোদের ভৈরব হুঙ্কার
নিখিল চমকি উঠুক আবার
বিমল পুণ্যে যোদের দৈন্যে
কর মা ধৌত কলুষ গো।"

আমরা পড়েছি পশ্চিমের স্বাধীন দেশগুলিতেও নারী-আন্দোলন খুব জোর চলছে। কিন্তু এ আন্দোলন সমাজে সত্যিকার নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নয়।

পুরুষের যে-সব নির্লজ্জ নীতি-বোধ হীনতা রয়েছে সে সকলকে অন্ধভাবে অনুকরণ করাই আর সে অনুকরণে সকল বাধা দূর করাই সে আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু আমাদের আন্দোলন সে রকম ছিল না। আমরা চেয়েছিলুম দেশের স্বাধীনতা ও নির্যাতন থেকে নারীর মুক্তি। পাশ্চাত্য দেশে নারী মুক্তি আন্দোলনের নামে যে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকট হয়েছিল তা আমরা ঘোরতর ঘৃণা করতাম। কিন্তু সে উচ্ছৃঙ্খলতার ঢেউ আমাদের দেশে এসে পৌঁছায় নি এমন নয়। পাশ্চাত্য ভাবধারার অন্ধ অনুকরণ অনেক তথাকথিত শিক্ষিতা নারীর জীবনে প্রকাশ পেয়েছে, তা আমরা লক্ষ্য করেছি। জ্যোতির্ময়ীদি এ ধরণের উচ্ছৃঙ্খলতার কিছুমাত্র প্রশ্রয় দিতেন না। যখনি কোন মেয়েদের মধ্যে কিছুমাত্র দুর্বলতা দেখতেন, তখনি নির্মম ভাষায় তিরস্কার করতেন। বলতেন—এলিনর মার্ক্স এর জীবনে ভীষণ পরিণতির মর্মান্তিক কাহিনী।

কার্ল মার্ক্সের মেয়ে এলিনর মার্ক্স। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের নারীমুক্তি আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন এলিনর। তিনি শুধু পিতার প্রচারিত সাম্যবাদের পূজারিণী ছিলেন না, তিনি নারীর মুক্তি (সামাজিক নীতি বিষয়ক) আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন। তিনি কমরেড্ এভেলিঙ্ এর সঙ্গে মুক্ত-বিবাহে আবদ্ধ হন। এডোয়ার্ড-এর আইনসিদ্ধ বিবাহিত পত্নী বর্তমান ছিলেন। সামাজিক রীতি ও আইনকে অমান্য করে প্রকাশ্যে এলিনর এডোয়ার্ডের সঙ্গে পরিণয়াবদ্ধ হন। কিন্তু জীবনে তিনি সুখ পান নি। যে স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করেন সেখানে তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি মুক্ত পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছেন। অধ্যক্ষ তাঁকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হন। নিজের দুর্গতির সম্বন্ধে তিনি ক্রমে অবহিত হতে থাকেন, জীবন সম্বন্ধে তাঁর ধীরে ধীরে জ্ঞান আসতে থাকে। তিনি এক বন্ধুকে চিঠি লিখেন :—

"There are people who lack in certain moral sense just as others are deaf or short-sighted or are in otherway afflicted. And I begin to realise the fact that one is as little justified in blaming them for the one sort of disorder as the other. We must strive to cure them, and if no cure is possible, we must do our best. I have learnt to perceive this through suffering—suffering whose details I could not tell even to you—but I have learnt it, and I am endeavouring to bear all these trials as well as I can."

এডোয়ার্ডের স্ত্রী মারা গেলে তাঁর আইন সিদ্ধ পত্নী হতে পারবেন এ আশা মনে জেগেছিল এলিনরের। কিন্তু সে আশা তাঁর মিটল না। এডোয়ার্ড তাঁর প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর হঠাৎ অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। ফিরে এলেন নূতন বৌ নিয়ে, নাম তার ইভা ফ্রাই—এক অভিনেত্রী।

এলিনরের হৃদয় ভেঙ্গে পড়ল। এডোয়ার্ড প্রস্তাব করলে—দুজনে বিষ খেয়ে মরবেন। নিজে বিষ আনালেন এডোয়ার্ড। এলিনর খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তেই পালিয়ে গেলেন কমরেড্ এডোয়ার্ড এভিলিঙ্। এলিনর একটি লেখা রেখে গেলেন, তার মর্ম :—

"How sad has life been all these years."

কী কঠিন নিয়তির লেখা! এলিনর নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন—উচ্ছৃঙ্খল জীবন নারী জীবনের মুক্তি নয়—শান্তির পথও নয়।

নারী মুক্তির প্রকৃত অর্থ বুঝবার দিন এসেছে। দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাতেই শুধু সে মুক্তি আসে না। নারীকে স্বাবলম্বী হতে হবে, আত্মরক্ষায় সমর্থ হতে হবে, নৈতিক চরিত্রে বলবতী হতে হবে, যাতে পুরুষরাও তার দৃষ্টান্তে নীতিবান হয়ে ওঠে,—পুরুষের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিযোগী হয়ে প্রকৃত মুক্তি লাভ কখনও সম্ভব হতে পারে না।

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

ইতিপূর্ব্বে স্থতী ও রেশমের কাপড়ের উপর সৌখীন-সুন্দর আলঙ্কারিক-নক্সা খোদাই-করা কাঠের 'ব্লকের' (Wooden Block) সাহায্যে নানা রকম রঙীণ-সুন্দর চিত্র-মুদ্রণের (Textile Printing) কারুকলা-পদ্ধতির মোটামুটি হদিশ দিয়েছি। এবারেও কতকটা সেই ধরণেরই স্থতী ও রেশমী কাপড়ের উপর রঙীণ ও আলঙ্কারিক নক্সা-চিত্রণের বিচিত্র-অভিনব আরেকটি কারুকলা-পদ্ধতির পরিচয় দিচ্ছি। তবে ইতিপূর্ব্বে কাপড়ের উপর আলঙ্কারিক-চিত্র রচনার যে পদ্ধতির কথা আলোচনা করেছি, সেটির সঙ্গে এবারের আলোচিত পদ্ধতিটির অনেকখানি পার্থক্য আছে। আগের পদ্ধতিতে যেমন নক্সা-খোদাই করা কাঠের ব্লকের সহায়তায় কাপড়ের উপর রঙবেরঙের আলঙ্কারিক-চিত্রের ছাপ তোলার কথা বলেছি, এবারের পদ্ধতিতে কিন্তু তেমনি-ধরণের কাঠের ব্লকের কোনো প্রয়োজন নেই···শুধু রঙ-তুলি, মোম আর বিশেষ কয়েকটি সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় হলেই নতুন এই পদ্ধতিতে যে কোন রকম স্থতী আর রেশমের কাপড়ের উপর নানান ছাঁদের সুন্দর-সুন্দর কারুচিত্র রচনা করা যাবে। বিচক্ষণ-কারু-শিল্পীদের মতে, আগেকার পদ্ধতির চেয়ে নতুন এই পদ্ধতি স্থতী ও রেশমের কাপড়ের উপর আলঙ্কারিক-চিত্র রচনার কাজ করা অনেক বেশী শ্রমসাধ্য ও কঠিন। তাছাড়া এ পদ্ধতিতে যারা কাজ করবেন, রঙ-তুলি ব্যবহার ও অঙ্কন-বিদ্যায় তাঁদের বেশ কিছু অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস থাকা দরকার। অর্থাৎ, কাঠের উপর খোদাই-করা নক্সার ব্লকের ছাপ তোলার মতো নিজের হাতে রঙ-তুলি-মোমের প্রলেপ বুলিয়ে কাপড়ের উপর চিত্র-রচনা, আপাত-দৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও, আসলে কিন্তু নিতান্ত অনায়াস-সাধ্য ব্যাপার নয়। যে কোনো শিক্ষার্থী হাতে-কলমে কাজ করলেই, এ ব্যাপারটি নিজেই বুঝতে পারবেন। কাজেই এই নতুন পদ্ধতিতে স্থতী বা রেশমের কাপড়ের উপর রঙীণ নক্সাচিত্র রচনা করতে হলে শিক্ষার্থী ও কারুশিল্পীদের অঙ্কনবিদ্যায় অন্ততঃ কিছু জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। কথাটা শুনে শিক্ষার্থীরা অনেকে হয়তো রীতিমত দমে যাবেন···এমন কি কেউ-কেউ হয়তো শেষ পর্য্যন্ত সাহস করে আর এ কাজে হাত দিতেও এগুবেন না! তাই তাঁদের বোঝবার সুবিধার জন্য জানিয়ে রাখি যে ব্যাপারটা আসলে কিন্তু তেমন খুব দুঃসাধ্য নয়···নিষ্ঠাভরে নিয়মিত-ভাবে কিছুদিন অনুশীলন করলেই যে কোনো শিক্ষার্থীই অনায়াসেই এ শিল্প-কাজে সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবেন।

যাই হোক, আপাততঃ এ সব আলোচনা ছেড়ে, আসল কথায় আসা যাক্।

স্থতী ও রেশমী কাপড়ের উপর রঙ-তুলি-মোমের সাহায্যে আলঙ্কারিক-চিত্র রচনার নতুন পদ্ধতির নাম—'বাটিক্' (Batik)। 'বাটিক্' কথাটি কিন্তু বাঙলা দেশের ভাষার নয়···এ কথাটি আমদানি হয়েছে—এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের 'জাভা' (Java) বা 'যবদ্বীপ'···দেশ থেকে। কাপড়ের উপর 'বাটিক্' পদ্ধতিতে চিত্র-রচনা—জাভা বা যবদ্বীপ রাজ্যের মেয়েদের 'জাতীয় কারু-শিল্প' এবং বাঙলাদেশের মহিলাদের 'কাঁথা-সেলাইয়ের' কারুচর্চ্চার মতোই ও দেশে ছোট-বড় সকল সংসারের অধিকাংশ মহিলারাই একান্ত-আগ্রহে তাঁদের দেশে বিশিষ্ট অভিনব এই অপরূপ কারুশিল্প-কলার চর্চ্চা করে আসছেন বহুদিন থেকে। জাভায় 'বাটিক্' কারুশিল্প-কলার প্রথম প্রচলন হয় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে—ওদেশের 'সুলতান' শাসক-পরিবারের মহিলাদের 'হাতের কাজ' হিসাবে। সেই থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিচিত্র এই কারুশিল্পটি ওদেশের মহিলা-সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে এসেছে। তারপর ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ফলে, যবদ্বীপে ইউরোপীয়-শাসকদের ঔপনিবেশিকরাজ্য প্রতিষ্ঠার আমলে বিদেশীদের আগ্রহে-আনুকূল্যে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে

'বাটিক্' কারুশিল্পের চর্চ্চানুশীলন। আমাদের দেশে 'বাটিক্' শিল্পকলার প্রথম প্রচলন হয়—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'শান্তিনিকেতনের' কলা-ভবনের শিল্পানুরাগীদের প্রচেষ্টায়। 'বাটিক' শিল্প-কলা নিয়ে তাঁরা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং সুদীর্ঘ-অনুশীলনের ফলে, অধুনা শান্তিনিকেতনে যে পদ্ধতিতে 'বাটিক্' শিল্পের কাজ করা হয়, সেটি জাভা বা যবদ্বীপের চিরাচরিত-পদ্ধতি থেকে কতকটা স্বতন্ত্র-ধরণের। শুধু জাভা বা যবদ্বীপেই নয়, শান্তিনিকেতনের কলা-ভবন ছাড়াও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে বহুকাল থেকেই অনেকটা 'বাটিকের' মতো পদ্ধতিতেই কাপড়ের উপর আলঙ্কারিক-চিত্র রচনার যে রীতিমত প্রচলন আছে—তারও প্রচুর প্রমাণ মেলে।

'বাটিক্'-শিল্পের কাজ করতে হলে, আপাততঃ আমরা যে পদ্ধতির আলোচনা করছি, সেটি কিন্তু জাভা বা যবদ্বীপের সনাতন-রীতি নয়…এটি হলো সেখানকার পদ্ধতিকে সহজ-সরল-অনায়াসসাধ্য করে নিয়ে অধুনা আমাদের দেশে সচরাচর যে নিয়মে কাজ করা হয়—

তারই মোটামুটি বিবরণ। এ পদ্ধতিতে 'বাটিকের' কাজ করতে হলে যে ধরণের 'নক্সা' বা Design' প্রয়োজন। উপরের ও নীচের দুটি চিত্রে তার 'নমুনা' (Specimen-Pattern) দেওয়া হলো।

চৌকোণা-ধরণের যে 'নক্সা-নমুনাটি' দেখানো হয়েছে, সেটি শাড়ী, রুমাল, স্কার্ফ, ব্লাউজ, ফ্রক, টেবিল-ক্লথ, পর্দ্দা প্রভৃতির 'জমীর' (Ground) পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অপর ছবিতে যে 'নক্সা-নমুনাটি' দেখছেন, সেটি উপরোক্ত সাজ-পোষাকের 'পাড়' (Border) হিসাবে ব্যবহার করা চলবে।
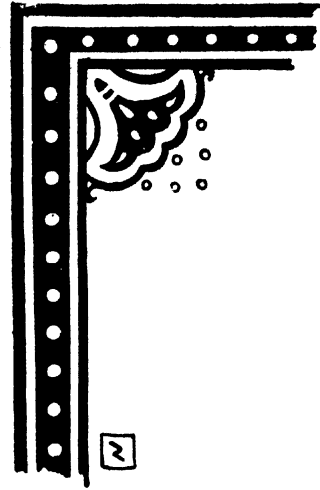
স্থানাভাবের কারণে, এবারের মতো এখানেই আলোচনা শেষ করছি। আগামী সংখ্যায় 'বাটিক্' কারুশিল্পের সাজ-সরঞ্জাম ও কর্ম্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ-পরিচয় জানাবো। ক্রমশঃ

সূচী-শিল্পের নক্সা-নমুনা

হিরণ্ময়ী মুখোপাধ্যায়

সৌখিন সুন্দর নানা রকম ছাঁদে রঙীণ-সুতোর ফোঁড় তুলে চিত্র-বিচিত্র নক্সা সেলাই করে পোষাক-পরিচ্ছদ আর ঘরের পর্দ্দা, আশবাবপত্রের ঢাকা, 'টি কোজি' (Tea-Cosy), বালিশের ওয়াড়, টুকিটাকি জিনিষপত্র রাখবার থলি প্রভৃতি সুদৃশ্য-শোভায় সাজিয়ে তোলার বাসনা ছোট-বড় সকল সংসারের মেয়েদের মধ্যেই আছে। এবারে তাই বাঙলা দেশের লোক-শিল্পের খুবই সহজসাধ্য নিতান্তই সরল অথচ সুন্দর একটি মাটির তৈরী ঘোড়া-পুতুলের বিচিত্র নক্সা-নমুনা (Design Motif) সূচীশিল্পানুরাগী পাঠিকাদের সাদরে উপহার দিলুম।

সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে যে সব মহিলারা নিজের হাতে সূচী-শিল্পের কাজ করেন, উপরের ছবিতে দেখানো নক্সা-নমুনাটি ছুঁচ-সুতোর সেলাই দিয়ে অনায়াসেই তাঁরা পরিপাটি-নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন।

উপরের নক্সার সমস্ত অংশই 'বাটন-হোল্ ষ্টিচ্' (Button-hole Stitch) পদ্ধতিতে সেলাই করতে হবে। সেলাইয়ের কাপড়টি যদি শাদা, হলদে অথবা হাল্কা-সবুজ হয়, ঘোড়া-পুতুলের দেহের সীমা-রেখা সূচী-কার্য্যের জন্য তাহলে ব্যবহার করবেন গাঢ়-লাল (Crimson বা Scarlet) কিম্বা বাদামী রঙের সুতো। ঘোড়া-পুতুলের ঘাড়ের কেশগুচ্ছ ও ল্যাজ সেলাইয়ের জন্য বেছে নেবেন কালো অথবা গাঢ়-বাদামী রঙের সুতো। চোখের মণির কিনারা ঘিরে যে ছোট আর বড় 'চক্রটি' (Circles) রয়েছে, সে দুটি রচনা করবেন লাল বা হলদে ও কালো বা গাঢ়-নীল রঙের সুতো দিয়ে। ছোট-চক্রটি সেলাইয়ের জন্য ব্যবহার করবেন কালো বা গাঢ় নীল রঙের সুতো। বড় চক্রটি সেলাই হবে আগাগোড়া লাল বা হলদে রঙের সুতোয়। ঘোড়া-পুতুলের পিঠের 'জীন' রচিত হবে হলদে ও সবুজ রঙের সুতো দিয়ে মানানসইভাবে ছোট ও বড় অংশ দুটিতে পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে। তাছাড়া ঘোড়া-পুতুলের মুখে, গলায়, ল্যাজের ও দেহের সংযোগ-স্থলে এবং সামনের আর পিছনের পায়ে যে সব ডোরা-কাটা রেখাগুলি দেখানো হয়েছে, সে সব রচনা করবেন গাঢ়-নীল অথবা অন্য কোনো মানানসই রঙের সুতোর ফোঁড় তুলে। ঘোড়া-পুতুলের কেশগুচ্ছ আর ল্যাজের অংশে যে রেখাগুলি দেখানো রয়েছে, সেগুলি ফুটিয়ে তুলতে হবে কালো, বেগুনী অথবা গাঢ়-বাদামী রঙের সুতো ব্যবহার করে। তাহলেই দিব্যি সুন্দর ছাঁদে ঘোড়া-পুতুলের বিচিত্র নক্সাটি আগাগোড়া রঙীণ হয়ে ফুটে উঠবে।

তবে বলা বাহুল্য, উপরোক্ত রঙগুলি ছাড়া সূচী-শিল্পীর নিজস্ব রুচি-অনুসারে অন্যান্য রঙের মানানসই সুতো ব্যবহার করা চলবে।

বারান্তরে সূচী-শিল্পের আরো কয়েকটি 'নক্সার' নমুনা প্রকাশের চেষ্টা করবো।

সুধীরা হালদার

এবারে উত্তর-ভারতের অভিনব-মুখরোচক বিচিত্র ধরণের একটি আমিষ-খাবার রান্নার পদ্ধতির কথা বলছি। ছুটির দিনে কিম্বা বাড়ীতে কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়-স্বজনকে আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত করবার পক্ষে, উত্তর-ভারতীয় প্রথায় নতুন-কায়দায় রান্না-করা অপরূপ-সুস্বাদু এই ভাজা মাংসের খাবারটি যে পরম উপযোগী হবে—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। উত্তর-ভারতীয়দের বিশেষ প্রিয় নতুন-ধরণের এই উপভোগ্য আমিষ-খাবারটির নাম—'ভাজা মাংস'।

ভাজা মাংস:

উত্তর-ভারতীয় প্রথায় 'ভাজা মাংস' রান্নার জন্য উপকরণ চাই—প্রয়োজনমতো পরিমাণে বেশ বড়-বড় টুকরো করে কাটা ভালো মাংস, টক-দই বা টোম্যাটো,

ঘি, নুন, অল্প একটু চিনি, আস্ত গরম-মশলা, পেঁয়াজবাটা, রসুনবাটা, হলুদবাটা, লঙ্কাবাটা আর আদাবাটা।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, গোড়াতেই মাংসের টুকরোগুলিকে পরিষ্কার জলে ধুয়ে আগাগোড়া ভালোভাবে সাফ্ করে নেবেন। তারপর ঐ মাংসের টুকরোগুলিকে সুষ্ঠুভাবে হলুদবাটা মাখিয়ে নিতে হবে। এ কাজ সারা হলে, উনানের আঁচে হাঁড়ি বা ডেক্‌চি বসিয়ে হলুদবাটা-মাথানো মাংসের টুকরোগুলি সু-সিদ্ধ করে নিন। হাঁড়ি বা ডেক্‌চির মুখ আগাগোড়া ঢাকা চাপা দিয়ে বেশ ভালো-ভাবে বন্ধ করে দিতে হবে। তবে হুঁশিয়ার…এভাবে সিদ্ধ করার সময়, অসাবধানতার ফলে, মাংসের টুকরোগুলি যেন এতটুকু পুড়ে বা গলে না যায় – সেদিকে নজর রাখা বিশেষ প্রয়োজন। উনানের আঁচে রন্ধনপাত্র বসিয়ে এ কাজ করবার সময় সর্ব্বদা লক্ষ্য রাথবেন—প্রত্যেকটি মাংসের টুকরো যেন আগাগোড়া আস্ত অটুট থাকে এবং পুরোপুরি সু-সিদ্ধ হয়।

এমনিভাবে মাংসের টুকরোগুলিকে আগাগোড়া সু-সিদ্ধ করে নেবার পর, উনানের আঁচের উপর থেকে হাঁড়ি বা ডেক্‌চিটি নামিয়ে মাংসের টুকরোগুলিকে অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে রেখে বেশ ভালো করে জল ঝরিয়ে নিন।

মাংসের টুকরোগুলি থেকে এইভাবে জল-ঝরাণোর ব্যবস্থার পর উনানের আঁচ কমিয়ে 'নরম' করে ফেলুন। এবারে উনানের ঐ 'নরম' আঁচে পুনরায় রন্ধনপাত্র চাপিয়ে সে পাত্রে ঘি গলিয়ে গরম করে নিন। আগুনের তাপে ঘিটুকু গরম হয়ে আগাগোড়া গলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই উনানে-বসানো রন্ধনপাত্রে পেঁয়াজবাটা ছেড়ে, সেটিকে যেমনভাবে মাংসের ঝোলের পেঁয়াজ ভাজা হয়, অবিকল তেমনিভাবে ভেজে ফেলুন। তারপর ঘিয়ে-ভাজা ঐ পেঁয়াজের সঙ্গে রন্ধনপাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে আস্ত গরম-মশলা, টক দই বা টোম্যাটো, নুন, চিনি, রসুনবাটা, লঙ্কাবাটা, আদাবাটা প্রভৃতি রান্নার উপকরণগুলি ছেড়ে, হাতা বা খুন্তীর সাহায্যে সবগুলিকে একত্রে মিশিয়ে কিছু-ক্ষণ অনবরত নেড়েচেড়ে পাক করুন। এইভাবে পাক করার সময় বিশেষ নজর রাখবেন যে অসাবধানতার ফলে, রান্নার মশলা যেন রন্ধনপাত্রের গায়ে এতটুকু ধরে না যায়।

কিছুক্ষণ এমনিভাবে পাক করার ফলে, রান্নার মশলা আগাগোড়া তৈরী হয়ে যাবার পর, উনানের নরম আঁচে বসানো রন্ধনপাত্রে ইতিপূর্ব্বে জল-ঝরিয়ে-রাখা মাংসের টুকরোগুলি ছেড়ে দিয়ে হাতা বা খুন্তীর সাহায্যে নেড়ে-চেড়ে রান্না করুন। কিছুক্ষণ এমনিভাবে রান্নার ফলে, মাংসের টুকরোগুলি যখন বেশ ভাজা-ভাজা এবং বাদামী-রঙের হয়ে উঠবে, তখন উনানের উপর থেকে রন্ধনপাত্র নামিয়ে নিন এবং অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে সদ্য-তৈরী খাবারটি সযত্নে পাতে পরিবেষণের উদ্দেশ্যে তুলে রাখুন। তাহলেই—উত্তর-ভারতীয় প্রথায় 'ভাজা মাংস' খাবার রান্নার কাজ শেষ হবে।

প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি যে—এ খাবারটি গরম-গরম থাকতেই প্রিয়জনদের পাতে পরিবেষণ করবেন এবং তার আগে যদি এই 'ভাজা-মাংসের' টুকরোগুলির উপর অল্প কিছু ধনেপাতা, কাঁচা-লঙ্কার, পাতিলেবুর ও কাঁচা-পেঁয়াজের কুচো ছড়িয়ে দিতে পারেন তো রান্নাটি আরো বেশী উপ-ভোগ্য ও মুখরোচক হয়ে উঠবে।

গান

শ্রীশিশির মুখোপাধ্যায়

শেফালী চরণ লাগি অঝোরে পড়িছে ঝরে
মেনকা দুহিতা উমা কোথা রে।
বরষের দিন গোনে আকাশের তারা দল
চাঁদিমা কাঁদিছে হায় কোথা রে॥
পাগলের সাথে উমা হলি কি পাগল
এখানে জননী তোর আঁখি ছল ছল
কেমনে ভুলিলি বল বন শিখিদল
যে ছিল নিত্য তোর প্রিয় রে॥
আকাশের বুকে দেখি ময়ূরপঙ্খী ভাসে
হৃদয়ের মমতায় দরশন আশে
কোথা হে গিরিরাজ কৈলাশ ভবন
তিনটি দিনের তরে পাঠাও উমারে॥

রবীন্দ্রনাথ ঃ বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর উত্তরসাধক

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ. পি-এইচডি, অধ্যাপক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনা সম্পূর্ণ হয় রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ২৫ বৎসর পদাবলীর প্রথম সাতটি পদ প্রকাশিত হয় ১২৮৪ সালে 'ভারতী' পত্রিকায়। এরপর কবিগুরু আরও কয়েকটি পদ লেখেন এবং তাঁর ২৩ বৎসর বয়সে পদাবলী আত্মপ্রকাশ করে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে ; কিন্তু তাতে তিনটি পদ দেখা যায় না। সেই তিনটি পদ হচ্ছে—'আজু সখি মুহুমুহু,' 'মরণ রে তুঁহু মোর শ্যাম সমান' এবং 'কো তুহু বোলবি মোয়'। কবির উক্তিতে জানা যায়, উক্ত তিনটি পদের মধ্যে প্রথম দুটি ১২৮৯ সালের পূর্বেই রচিত। শেষের পদটি প্রকাশিত হয় ১২৯৩ সালে কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণে।

এই পদাবলী রচনার মূলে ছিল বৈষ্ণব কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সুগভীর অনুরাগ। ১৩১৭ সালের ২০শে আষাঢ়ের এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন—"আমার বয়স যখন তেরো চৌদ্দ, তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করছি; তার ছন্দ রস ভাষা ভাব সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্পষ্ট অস্ফুট রকমেও বৈষ্ণব-ধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশলাভ করেছিলুম (দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রজীবনী, পৃষ্ঠা ৬১ ; পরিবর্ধিত সংস্করণ) এখানে 'বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব'-সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রজীবনী-কার বলেছেন, "কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবসাহিত্য পাঠ করিয়াছিলেন, সাহিত্যরসের জন্য, তত্ত্বের জন্য নহে" (দ্রষ্টব্য ঐ পৃষ্ঠা ৬১-৬২)। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবকবি; কাব্যরত্নের অনুসন্ধান ও সৃষ্টি তাঁর প্রধানতম ধর্ম ; তা হলেও তিনি যে বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের সত্যদর্শন করে নানা কবিতার মধ্যে তা প্রকাশ করে গেছেন ; এর প্রমাণ দুর্লভ নয়। দুটিমাত্র দৃষ্টান্তেই তা সপ্রমাণ হবে। খেয়ায় 'শুভক্ষণ' কবিতায় পাওয়া যায়,—

ওগো মা,
রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখ পথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে
রহিব বলো কী মতে!
বলে দে আমায় কী করিব সাজ,
কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে
কোন্ বরণের বাস।
মাগো, কী হল তোমার, অবাক নয়নে
মুখপানে কেন চাস?
আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়ন কোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে,
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ,
যাবে সে সুদূর পুরে—
শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন্ মাঠ হতে
বাজিবে ব্যাকুল সুরে।
তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখ পথে,
শুধু সে নিমেষ-লাগি না করিয়া বেশ
রহিব বলো কী মতে!

উদ্ধৃত কবিতাটিতে বৈষ্ণবধর্মের সুগভীর তত্ত্বই নিহিত আছে। প্রেমিকভক্ত প্রেমময় চিরসুন্দর রাজার দুলাল-রূপী কৃষ্ণের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। ভক্তিসাধিকা মনোবৃন্দাবনে ধ্যান করে জানতে পেরেছেন, যে তাঁর চির-আকাঙ্ক্ষিত পুরুষোত্তম তারই ঘরের সামনে দিয়ে যাবেন। তাই আজ তার মহা উৎসবের দিন। আজ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন ; বহুকাল ধরে এই দিনটির জন্যই সে প্রতীক্ষা করে এসেছে ; এই হেতু একান্ত বহু-

নিষ্ঠ দৈনন্দিন গৃহকাজ আর তার আজ প্রয়োজন নেই। সেই পুরুষোত্তমকে দেখতে হলে সামান্য সজ্জা পরিধান করলে হবে কেন? দেবতাকে দেখতে হলে নিজেকেও তো দেবময় হতে হবে! কাজেই তার আজ বিশিষ্টসজ্জার প্রয়োজন। প্রত্যহ যে-রঙের বস্ত্র সে পরিধান করে আজ তাতে চলবে না; প্রতিদিন যে-ছাঁদে সে কবরীবন্ধন করে, আজ সেই সাধারণ কবরীবন্ধন সে করবে না। আজ তার যে উৎসবের দিন! তার দয়িত ঘরের সামনে দিয়ে যাবেন, সে কি সাধারণ পোষাক পরে তাঁকে দেখতে পারে? সেই ভক্তি-সাধিকা এও জানে সে তার বাতায়নে দাঁড়াবার সময় তিনি তো চাইবেন না; শুধু নিমেষের জন্য একপলক মাত্র তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে, এই আশায় সে দাঁড়িয়ে থাকবে বাতায়নকোণে। সেই একটিমাত্র নিমেষের জন্য তাকে উৎসব সজ্জাই তো পরতে হবে।

এই অপূর্ব প্রেমভক্তিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ সেই তত্ত্বই এখানে সুন্দরতর করে পরিস্ফুট করেছেন।

খেয়া কাব্যগ্রন্থের 'ত্যাগ' কবিতায় পুনরায় এই সুরই বেজে উঠেছে,—

ওগো মা,
রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখ পথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়নে থেকে,
নিমেষের লাগি নিয়েছি, মা, দেখে—
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধুলার 'পরে।
মা গো, কী হল তোমার, অবাক নয়নে
চাহিস কিসের তরে?
মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে,
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কী দিলেম কারে জানে না সে কেউ,
ধুলায় রহিল ঢাকা।
তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখ পথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বলো কী মতে!

ভক্তিসাধিকা তার মনোমন্দিরে যে-দেবতাকে এতদিন ধরে পূজো করে এসেছে, আজ কত সৌভাগ্যের ফলে তাঁকে নিমেষের জন্য একটু দেখতে পেয়েছে। প্রকাশ্য পথে এসে তো তাঁকে দেখবার অধিকার নেই, সে কুলবধূ; তাই ঘোমটা খসিয়ে বাতায়নকোণ থেকে চিরবাঞ্ছিত সেই পুরুষরতনকে দেখে সে বক্ষ থেকে মণিহার তাঁর উদ্দেশে ফেলে দিয়েছে পথে; কিন্তু সেই হার-ছেঁড়া মণি তো তিনি দেখতেই পান নি; তাঁর রথের চাকায় কখন গুঁড়ো হয়ে গেছে; শুধু রথের চাকার দাগ আঁকা আছে তার ঘরের সামনে। তিনি ভক্তের ভগবান্, তিনি যে এসেছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সে তার শ্রেষ্ঠ রত্নহার যে দিতে পেরেছে এতেই সে কৃতার্থ, এতেই তার জন্ম সার্থক। কাকে কী দেওয়া হল, কেউ জানতেও পারেনি; কাউকে জানানর জন্যও সে রত্নহার পথে ফেলেনি। যাঁর উদ্দেশে দেওয়া হয়েছে, তিনি স্বয়ং অন্তরতম দেবতা; তিনি পথ দিয়ে গেলে বক্ষের মণিরূপ ভক্তির অর্ঘ্য তাঁর উদ্দেশে সে তো নিবেদন না করে পারে না।

এই কবিতাটির মধ্যে প্রেমভক্তির যে-নিদর্শন আছে তাতে কবিকে ভক্তিরসের আস্বাদক রূপেই দেখতে পাওয়া যায়। রসিক না হলে এমন অকৃত্রিম কাব্যসৃষ্টি কখনই সম্ভব নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূলকথাই এর মধ্যে বিধৃত। প্রেমভক্তির এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সত্যই অদ্ভুত। যে মণিহারটি রাজার ছেলের উদ্দেশে নিবেদিত হয়েছে, সে রত্নটি কি একটি তুচ্ছ পার্থিব বস্তু মাত্র? তার মধ্যে কি প্রেমভক্তিদীপের শিখাই প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি?

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন, 'বৈষ্ণবধর্ম তত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশ লাভ করেছিলুম'—এই সহজ কথাটির অর্থান্তর আবিষ্কারের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। 'রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠ করিয়াছিলেন, সাহিত্যরসের জন্য, তত্ত্বের জন্য নয়'—রবীন্দ্র-জীবনীকারের এই মন্তব্য বিশেষ বিবেচনার বিষয়। উপরন্তু বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের রসাস্বাদক-রূপে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাওয়া যায় তাঁরই সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী' নামক পদসংকলন গ্রন্থেও। কবিগুরুর বৈষ্ণবতা এই গ্রন্থে কিভাবে ফুটে উঠেছে সে-বিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা রইল পরবর্তী প্রবন্ধে।

বেদান্ত দর্শনে শঙ্কর ও রামানুজের প্রভাব

ব্রহ্মচারী অতুলকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্য, ভক্তিমংগল

মানুষের সবচেয়ে বড়ো ধারণা, তার জীবন ও জিজ্ঞাসা। জগৎ সম্পর্কে তার নিজস্ব একটা ভাবগণ্ডির নিরাসক্ত জীবন বেদনাকে উপলব্ধি করবারও অধিকার নিশ্চয়ই আছে, মানস লোকে বিবর্ত্তনী ধারার অনুবর্ত্তনেও মানুষের নৈর্ব্যক্তিক সত্বার যে বিকাশ ঘটে থাকে, তারও সামাজিক ইতিহাস—বাংলার সমাজ চিত্রে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। সংস্কারমুক্ত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই দর্শন শাস্ত্রের অভ্যুদয় এবং চরম-উৎকর্ষ লাভ সাংস্কৃতিক পট ভূমিকায় একটি অবিচ্ছেদ্য স্থান জুড়ে রয়েছে স্বীকার করতে হবে। সংস্কৃতসাহিত্যে যে সমস্ত দর্শনশাস্ত্র আজ পর্য্যন্ত মানবসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, সে গুলির সংখ্যা প্রায় ষোলটি। তার মধ্যে ছয়টি দর্শনই সমধিক প্রচলিত। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র গ্রন্থে এই ছয়টি দর্শনের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এদের আবার প্রস্থানত্রয় ভাগ করা হ'য়েছে নানান কৌশলে। যেমন ন্যায় ও বৈশেষিক বিচার পদ্ধতি ও পদার্থতত্ত্ব বিষয়ের যে গবেষণামূলক আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় তারই কংকাংশের মিল থাকার জন্য এই দুইটিকে ন্যায়প্রস্থান এবং সাংখ্য ও পাতঞ্জলের পরস্পর যোগসূত্র অক্ষুন্ন রাখার জন্য এই দুইটিকে সাংখ্য প্রস্থান এবং সমানতন্ত্রও বলা হ'য়েছে। এর পরে মীমাংসা ও বেদান্তের সমাশ্রয়ী চিন্তার প্রভাবে মীমাংসাপ্রস্থান নামে আখ্যায়িত হয়েছে। কোথাও আবার এই প্রস্থানত্রয়কে শ্রুতিপ্রস্থান, ন্যায়-প্রস্থান ও স্মৃতিপ্রস্থান নামে অভিহিত হ'য়েছে দেখতে পাই। তা যাই হোক না কেন মানব মুক্তির সোপানস্বরূপ দর্শনকে অপরিহার্য রূপে গ্রহণ করেছিলেন আমাদের প্রাচীন দার্শনিকগণ। যদিও ভারতে বাংলা ভাষায় দর্শন-মূলক কোনও গ্রন্থ ছিল না, তথাপি সে যুগে অর্থাৎ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ৺উমেশ চন্দ্র বটব্যাল এবং রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ মনীষীগণ দর্শন মূলক গ্রন্থ কিছু কিছু লিখেছিলেন বটে, কিন্তু তদানীন্তন যুগের সমস্যাসঙ্কুল আবর্ত্তনে তা মোটেই সহজবোধ্য বা সহজপাঠ্য ছিলনা বললেই হয়। এর কিছুদিন পরে শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃত নামক একখানি ভক্তিমূলক দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর আলোক পাত করেন. অবশ্য এই গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্যের জীবনবেদকে লক্ষ্য করেই রচিত যে হয়েছিল একথা অনস্বীকার্য। এতো গেল দর্শনের সামান্য ভূমিকা মাত্র। এবার আসল কথায় আসা যাক। বেদান্ত দর্শনে যে দুইটি প্রাণ পুরুষের প্রভাব সম্বন্ধে অবতারণা করেছি, তাঁদের মধ্যে বেদান্ত-কেশরী শঙ্করাচার্য ও বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীরামানুজের নাম বিশেষ উপজীব্য বিষয়।

শঙ্করাচার্য্য ছিলেন দক্ষিণ ভারতীয় কেরলের অন্তর্গত কালাডি গ্রামের অধিবাসী ব্রাহ্মণ। তিনি শৈশব অবস্থা থেকেই ত্যাগনিষ্ঠ ও জ্ঞানতপস্বী ছিলেন বলেই বেদান্তের ভাষ্য লেখা তাঁর পক্ষে সহজ হ'য়েছিল। যদিও শঙ্করের পূর্বসূরীয় পণ্ডিতগণ বেদান্তের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। তাদের মধ্যে বোধায়ন ও উপবর্ষই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম, তাঁরা বেদান্তের ভাষ্য লিখে সে যুগে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন সত্য, কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে শঙ্করাচার্যের প্রভাবে তা একেবারে ম্লান হয়ে যায়।

আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ব্রহ্মসূত্র চতুর্থ অধ্যায়ে যে শঙ্কর জীবন্মুক্তির আস্পৃহা নিয়ে আলোচনা করেছেন সেই সূত্রটি হলো "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" এই সূত্র শঙ্কর বৃহদারণ্যক-উপনিষদের আত্মা বা আরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্য সূত্রটিকে অবলম্বন করে বলেছেন

যে, আত্মাকে দর্শন করা, আত্মতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করা এবং সেই সংবিদ অর্থাৎ, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি এইরূপ চিন্তা করা পরিশেষে ধ্যান করাই হলো আবৃত্তি শব্দের প্রতিপাদ্য বিষয়। উপদেশাৎ কি না বেদে এইরূপ উপদেশ আছে যে, একবার করলে চলবেনা বারংবার ক্রিয়ার অনুশীলন না করিলে কখনও ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হয়না। এবারে রামানুজ শঙ্করের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ভাষ্য শুরু করলেন, সেটি হলো শ্রীভাষ্য। তিনি বেদের ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' সূত্রটিকে অবলম্বন করে বললেন যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে বেদন অর্থাৎ পরিজ্ঞাত রয়েছে, সে ব্যক্তি ব্রহ্ম চিন্তার ফলে ব্রহ্মে নিষ্ণাত হ'য়ে যায়। তিনি আবার বলেছেন যে, "মনো ব্রহ্ম ইতি উপাসিত' অর্থাৎ মনকে ব্রহ্মরূপেই চিন্তা করা উচিৎ। যেহেতু ব্রহ্মকে কেউ জানতে পারেনা বলেই ব্রহ্মের উপাসনাই হলো ব্রহ্মদর্শন —শঙ্কর আর একটি সূত্রের অবতারণা করতে ছাড়লেন না। তিনি বলেছেন "লিঙ্গাৎ চ" উপনিষদে লিঙ্গাৎচ এর অর্থ-লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন আছে যে, বারংবার-চিন্তা করতেই হ'বে। সেই জন্যই শ্রীরামানুজ বলেছেন —মানব মুক্তির উপায় স্বরূপ যে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা শাস্ত্রে লেখা রয়েছে, তা হলো একমাত্র ব্রহ্মকে স্মরণ করা। ভক্তিশাস্ত্রে নবধা-ভক্তির মধ্যে যে স্মরণ ভক্তির উল্লেখ আছে, সেই স্মরণ ভক্তিকেই ভক্তির মধ্যে সব চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে। শঙ্করের প্রধান বিষয়-বস্তু হলো মায়াবাদ অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা—এই বাক্যই ব্রহ্ম চিন্তার একমাত্র প্রেয় ও শ্রেয় পন্থা, সুতরাং জীব ও ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা। কাজেই অধ্যাস বিষয় সন্দেহ নাই। তাই মানুষ ভ্রমবশতঃই বিশ্বাস করে এবং সত্য ভাবেই গ্রহণ করে। রজ্জুতে সর্পভ্রমের উদাহরণ দিয়ে তিনি বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে অনুমান ও উপমানের মাধ্যমে প্রমাণ করাবার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী চিন্তাধারায় আর একটি বিষয়ের উপস্থাপন করে বলেছেন যে, উপদেশ যে শ্রোতা এবং উপদিষ্ট যে ব্রহ্ম—উভয়েই পরস্পর অবিরোধী, অতএব 'তত্ত্বমসি' সূত্রের ব্যাখ্যায় তার প্রকৃত প্রমাণ যুক্তিতর্কের দ্বারা নিরসনের চেষ্টা করেছেন।

বেদান্ত দর্শনে আত্মখ্যাতিবাদকে খণ্ডন করে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ, সৌত্রান্তিক ও বৈজ্ঞানিক মতের বিরুদ্ধে জগতের ব্যক্তি মানসিক সত্তার প্রতিষ্ঠা করাই হলো অধ্যাত্ম চিন্তার মূল সূত্র এবং ভক্তিনিষ্ঠার সর্ব্বোত্তম উদ্দেশ্য। কাজেই শঙ্করের অলোকসামান্য প্রতিভার আর একটি দিক আলোচনা না করে উপায় নেই। তিনি বলেছেন—

প্রাক্ চ ব্রহ্মাত্মদর্শনাৎ বিষয়াদি প্রপঞ্চো ব্যবস্থিতো রূপো ভবতি, সন্ধ্যাশ্রয়স্তু প্রপঞ্চ প্রতিদিনং বাধ্যতে ইতি বৈশেষিক মিদং সন্ধ্যাস্য মায়ামাত্রত্বমুদিতম্।

স্বপ্নময় জগৎ জাগ্রৎ বাসনা হ'তেই উদ্ভব হয়, সেইজন্য স্বপ্নকে জাগ্রত্তুল্য বলা কোন মতেই ভুল হয় না।

তিনি আরও বলেছেন যে, অতীন্দ্রিয় ব্যক্তিসত্ত্বার উপর আমাদের পারস্পরিক পরিণাম ও বিচিত্র বস্তুর যে নিছক অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, তার মূলে একমাত্র অধ্যাস বা অবিদ্যারই বিশেষ প্রভাব রয়েছে, যার ফলে—পারমার্থিক তত্ত্বেরও বিশ্লেষণ নাস্ত্যর্থ বাচক হয়ে পড়ে। অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ খণ্ডন করে তিনি যুক্তি ও তর্কের সম্মুখীন হ'য়ে বলেছেন যে, জগৎ সৎও নয়, অসৎও নয়, এমন কি সদসৎ-ও নয়।

সুতরাং অদ্বৈতবাদী দর্শনের যে সমন্বয়ী সাধনার গভীর আত্মোপলব্ধি, সেইখানে শঙ্করের নিজস্ব যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হ'য়েছে যে, জগতে দ্বান্দ্বিক সংঘাত নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও পরস্পর বিরোধেরই সহায়ক।

এখানে রামানুজ সিদ্ধান্তটিকে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন —ব্রহ্ম সত্য এ কথা অস্বীকার করছি না, তবে তিনি নির্গুণ হ'তে পারেন না, বরং অশেষ কল্যাণগুণের আধার স্বরূপ। ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতি তাঁর গুণ নয়। জগতে যত প্রকার উৎকৃষ্ট গুণ থাকা প্রয়োজন এ সবই তাঁর মধ্যে রয়েছে। গুণ দ্বারাই তাঁর বিশিষ্ট আখ্যা দেওয়া যেতে পারে এবং অদ্বৈত অর্থাৎ তাঁর মধ্যে দ্বিতীয় কিছুই থাকা সম্ভব নয়। কাজেই জীব ও জগৎ তাঁর সত্তা থেকে মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়। তাঁর গুণেরই বিকার মাত্র।

এ কথার উত্তরে শঙ্কর বলছেন—

"গতি শব্দাভ্যাং তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গং চ"

এর অর্থ—গতি ও শব্দের দ্বারা অন্যত্র ইহা দেখা যায়, কথাটা খুলেই বলেছেন যে, গতি ও শব্দ পরস্পর

অবিরোধক। কারণ—যে দহরাকাশ সম্বন্ধে আলোচ্য বিষয়কে অবলম্বন করা হচ্ছে সেই সম্বন্ধে শ্রুতি বাক্যকেই একমাত্র অবলম্বন না করে উপায় নেই বলে 'সত্তা সোম্য তদা সম্পন্নোভবতি' অর্থাৎ সুষুপ্তাবস্থায় সেই সৎ অর্থাৎ ব্রহ্মে নিষ্ক্রান্ত হয়, কাজেই এইরূপ শব্দ অন্যত্রও রয়েছে,। আরও বলা হ'য়েছে যে,ব্রহ্মে নিষ্ক্রাত হয় মানে ব্রহ্মলোকে গমন করে, এরূপ হ'তে পারেনা, যে হেতু ব্রহ্ম স্বরূপ বোধক, এখানে কিন্তু ব্রহ্মলোক শব্দটি "ব্রহ্ম এব লোকঃ" অর্থেই ব্যবহার সিদ্ধ হ'য়ে পড়ার জন্য এ স্থলে চতুর্মুখ ব্রহ্মার বাসস্থান কল্পনা করা নিতান্ত অসঙ্গত। সুতরাং সুষুপ্তাব. ায় জীব কখনও সত্য লোকে যেতে পারেনা, ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত বাক্য।

প্রত্যুত্তরে রামানুজ বলছেন—

গতি শব্দে জীব প্রত্যহ দহরাকাশে গমন করে বলে দহরাকাশই ব্রহ্ম এরূপ চিন্তা করতে হবে, শব্দ কথাটি উক্ত দহর াকাশকেই লক্ষ্য করে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং তথাহি দৃষ্টং মানে অন্যত্র পরমাত্মাকে দেখা যায় এবং সেই জন্যই এই শব্দের প্রয়োগ সিদ্ধ হ'য়েছে।

লিঙ্গং মানে সুষুপ্তির সময় জীব দহরাকাশে বিলীন হয় কারণ ইহা দহরাকাশের ব্রহ্মত্বের লিঙ্গরূপ অভিধেয় অর্থ, তাহলেই বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁর মতে জগৎ মিথ্যাও নয় এবং একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বাও নয়। রামানুজ বাঁশীর উদাহরণ দিয়ে বলছেন যে বাঁশীর ভিন্ন ভিন্ন রন্ধ্রে অর্থাৎ ছিদ্র গুলিতে ভিন্ন ভিন্ন ফুঁ দিলে বিভিন্ন রকমের সুর বের হয়, কিন্তু বাঁশীতো সেই একটি? কাজেই পরমাত্মা একমাত্র ঠিকই রয়েছেন কেবল বাঁশীর ছিদ্রের মত জীবাত্মাই বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

তা যাই হোক আমরা এতক্ষণে এই মাত্র বুঝতে পেরেছি যে যেখানে অতীন্দ্রিয় রহস্যের অনুভূতি আমাদের প্রধান উপজীব্য হ'য়ে ওঠে সেইখানেই পাশ্চাত্য দর্শনের মিষ্টিসিজম্ আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

এই ভাবে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ যাকে হেগেল তাঁর দার্শনিক মতবাদে অ্যাব্‌সলিউটিজম্ বলেছেন—রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হ'য়েও শঙ্করের মতবাদকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চাননি, তিনি এই মাত্র দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, শঙ্কর, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ জ্ঞানীর পক্ষে প্রায় বিলুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয় বলেছেন কিন্তু রামানুজ উক্ত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অস্তিত্বের উপর জোর দিয়ে জীব ও জগতের সত্যতা প্রমাণ করিয়েছেন এবং শেষ সিদ্ধান্তে এই টুকু মাত্র বললেন যে, শুধু জ্ঞানের পরিমার্জ্জিত বুদ্ধির দ্বারা জীবের অর্থাৎ মানবের মুক্তি হয় না তিনি—ভক্তি যোগান্মুক্তি' এই সূত্রটিকেই বিশেষ ভাবে গ্রহণ করে বললেন যে, জ্ঞানের পরিসমাপ্তি ভক্তিতেই পর্য্যবশিত হয়।

অভিসারিণী

গান

(কেদারা—ত্রিতালী)

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

আধেক আঁধারে দেখেছিনু তারে
আমারি দুয়ারে সে অভিসারিণী
সে-বিহগিনীরে সোনার জিঁজিরে
আমারি এ-নীড়ে বাঁধিতে পারিনি।

প্রান্তর পারে, গেল সে আঁধারে,
গোপন বিহারে স্বপনচারিণী
তবু তারি পানে কেন প্রাণ টানে
মিনতি না মানে সে অভিমানিনী।

পরাণ উদাসে, যদি সে না আসে.—
যদি সে না ভাষে মধুরভাষিণী
সান্ত্বনা দানে মনতো না মানে
মন শুধু জানে সে মনোহারিণী।

বল সখি তারে নিঠুর প্রিয়ারে
কাটে হাহাকারে এ-রাকা-যামিনী
চাহেনা আমার চাহি তবু তারে
ভুলিতে সে পারে আমিতো পারিনি।

পুজোর মজা
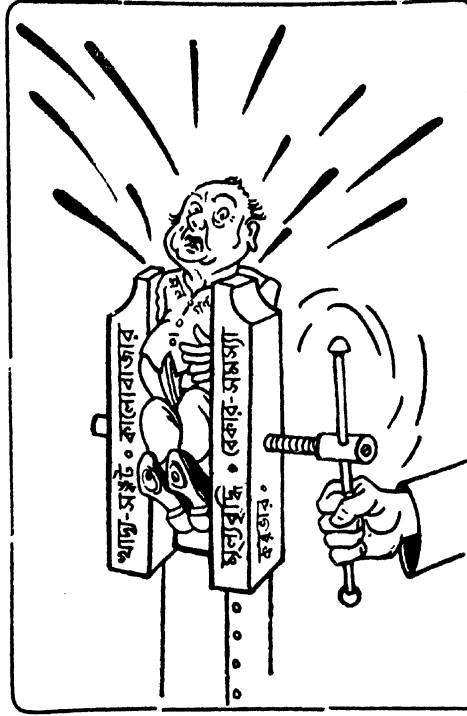
এবার পুজোয় জমলো মজা বেশ······
চাপের চোটে বাঁচার দফা শেষ!

—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

শ্রী'শ'—

॥ উত্তর ফাল্গুনী ॥

উত্তমকুমারের "উত্তর ফাল্গুনী" নামের এই প্রথম চিত্রটি একটি বিশিষ্ট চিত্ররূপে মুক্তিলাভ করে দর্শক মনে রেখা-পাত করেছে। পরিচালক শ্রীঅসিত সেনও এই চিত্রটির পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এবং শ্রীরবিন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনাও কৃত্তিত্বের দাবি করতে পারে। অভিনয়াংশে প্রত্যেকেরই অভিনয় যথোপযুক্ত হয়েছে বলা চলে, বিশেষ করে আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না অভিনেত্রী শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের অভিনয় যে তাঁর সুনাম অনুযায়ী হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রথম দিকে বধূ, বাইজী ও মাতা রূপে পরে তরুণী কন্যা রূপে তিনি অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে পৌঢ়ত্বে উপনীত, অদেখা কন্যার প্রতি স্নেহান্ধ বাইজী পান্না বাঈকে তিনি রূপ দিয়েছেন অপূর্ব্ব দক্ষতায়। ব্যারিষ্টার মনীষ রায়ের ভূমিকায় বিকাশ রায়ের অভিনয়ও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সু-অভিনীত হয়েছে। গল্পাংশটিও ঘটনাবহুল ও উৎকণ্ঠামূলক বলে সহজেই দর্শক মনকে আকৃষ্ট করে রাখে। আর সর্ব্বোপরি রাগ সঙ্গীতের সুরও সঙ্গীত প্রিয় দর্শকদের চিত্ত বিনোদনে সাহায্য করে।

ডঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তর কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই চিত্রটির প্রথমেই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সঙ্গীত পরিবেশন-রত লক্ষ্মৌ-এর বাঈজী পান্না বাঈকে। পান্না বাঈ-এর ফেলে আসা দুশ্চরিত্র স্বামীর উদয় হয় সেখানে এবং তার কলুষ হস্ত থেকে শিশু কন্যাকে রক্ষা করবার জন্যে উদ্‌ভ্রান্ত পান্না ছুটে আসে কল্‌কাতায়। তারপর অনেক কাকুতি মিনতি করে এবং নিজের পূর্ব্বজীবনের করুণ কাহিনী শোনায় মিশনারী স্কুলের মাদারকে। পান্নাবাই বলে, তার পূর্ব্বনাম ছিল দেবযানী। তার পিতাকে ঋণদায় থেকে মুক্ত করতেই সে মদ্যপ দুশ্চরিত্র রাখাল ভট্টাচার্য্যকে বিয়ে করতে বাধ্য হয় এবং রাখালের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতেই সে সন্তানবতী অবস্থাতেই গৃহত্যাগ করে এবং লক্ষ্মৌএর এক বাঈজীর কৃপায় তারই আশ্রয় থেকে এবং তারই শিক্ষায় সে পারদর্শিনী হয়ে এই বাঈজী বৃত্তি গ্রহণ করেছে। আর তা করেছে শুধু এই কন্যাটিকে মানুষ করবার জন্যেই। এর পর সে প্রতিশ্রুতিও দেয় যে সে তার মেয়ের সঙ্গে কখনও দে া করবে না বা তার পরিচয়ও জানাবে না। তখন মিশনারী বোর্ডিং স্কুলের মাদার তার কন্যা অপর্ণাকে ভর্ত্তি করে নেয়। তারপর একদিন প ন্না বাঈ ওরফে দেবযানীর হঠাৎ দেখা হয়ে যায় তার পূর্ব্ব প্রণয়ী বিলাত প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার মনীষ রায়ের সঙ্গে। প্রথমে মনীষকে এড়িয়ে গেলেও পরে সে তাকে জানায় তার সব দুঃখ দুর্দ্দশার কথা। মনীষ ঠিক করে ফেলে তার কর্ত্তব্য। ভার নেয় অপর্ণার তার কাকু পরিচয়ে এবং বড় হলে তাকে পাঠিয়ে দেয় বিলাতে ব্যারিষ্টার পড়তে। আর এদিকে নিজে দেবযানীর অকৃত্রিম বন্ধুরূপে ও অবিবাহিত থেকে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে যায়। ব্যারিষ্টারী পাশ করে ফিরে আসে তরুণী অপর্ণা। দেখতে হয়েছে অবিকল তার মার মতন সুন্দরী। প্রৌঢ়া দেবযানী কিন্তু দেখা দেয় না তাকে। অপর্ণা থাকে তার কাকুর কাছে। সেখানে মনীষের জুনিয়ার রূপে আসে তার বিলাতের বন্ধু ও প্রণয়ী তরুণ ব্যারিষ্টার ইন্দ্রনীল চৌধুরী।

একদিন কিন্তু ঘটে গেল এক অঘটন। রাখাল দেখে ফেলল ব্যারিষ্টার-রূপী অপর্ণাকে হাইকোর্টের অলিন্দে। মা দেবযানীর সঙ্গে তার অদ্ভুত সাদৃশ্যই তাকে চিনিয়ে দিল রাখালের ক্রূঢ় চক্ষে। রাখাল এত বছর ধরে দেবযানীর কাছ থেকে সব কথা প্রকাশের ভয় দেখিয়ে টাকা নিয়ে আসছিল। এবার সে অধিক অর্থের দাবী করল দেবযানীর কাছে, আর না পেলে কন্যা অপর্ণার কাছে গিয়ে সব কথা বলে দেবে বলে ভয়ও দেখাল। নিপীড়িতা, নিগৃহীতা

উত্তম কুমার প্রযোজিত "উত্তর ফাল্গুনী" চিত্রের পান্না বাঈ-এর রূপসজ্জায়

শ্রীমতী সুচিত্রা সেন

দেবযানী আর সহ্য করতে পারল না—রিভলভারের গুলিতে রাখালের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দিল। বিচারে দেবযানীর পক্ষ সমর্থন করল ব্যারিষ্টার মনীষ রায়। কিন্তু দেবযানীর ইচ্ছা অনুসারে অপর্ণাকে এই মামলার থেকে দূরে সরিয়ে রাখল মনীষ। কিন্তু এই কেস নিয়ে মনীষকে অপরিসীম পরিশ্রম করতে দেখে অপর্ণার সন্দেহ হয় এবং তার কাকুকে প্রশ্নবানে জর্জ্জরিত করে তোলে, আর ভাগ্যের পরিহাসে অপর্ণার জেরার মুখে মনীষ বলে ফেলল পান্না বাইজীর পরিচয়। তারপর দেবযানীর পক্ষে সওয়াল করল অপর্ণা নিজের পরিচয় দিয়ে, আর মাতা-কন্যার মিলন হল কোর্টের মধ্যে; কিন্তু হার্টের [illegible] দেবযানীর পক্ষে এই নাটকীয় মিলনের বেগ সহ্য [illegible] সম্ভব হল না—কাটগড়ার মধ্যেই সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল কন্যার কোলে মাথা রেখে।—

এইহ'ল সংক্ষেপে 'উত্তর ফাল্গুনী'র কাহিণী।

আগেই বলেছি "উত্তর ফাল্গুনী"র গল্পাংশটি সবল ও ঘটনাবহুল একটু দীর্ঘ হলেও একেঘেয়ে বা বিরক্তিকর হয়ে ওঠে নি। তবে চিত্রের গতি আরও একটু দ্রুত হলে ভালই হত। রাগ সঙ্গীতগুলিও সুগীত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কালের গতি বা বৎসর কেটে যাচ্ছে এই ভাব সঙ্গীতের পর সঙ্গীতে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে একটু একঘেয়ে হয়ে গেছে। অতগুলি সঙ্গীত না হলেই বোধ হয় ভাল হত। তার ওপর চার্চ্চের ঘন্টাধ্বনি সহ গীর্জ্জার পশ্চাৎপটে [illegible] রাগ সঙ্গীতের সুর কি বেমানান হয় নি? এরকম [illegible] মিলের চেষ্টা না করলেই ঠিক হত। তাছাড়া,

আর, ডি বনশল প্রযোজিত ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "মহানগর" চিত্রে

ভিকি রেডউড্ ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে পান্না বাঈ-এর মেয়েকে কখনও দেখতে আসব না বলে শপথ গ্রহণ এবং মিশনারী স্কুলের পারিপার্শ্বিকতা প্রভৃতি না দেখিয়ে, হিন্দু মন্দির সংলগ্ন শিশু-শিক্ষায়তনের সৃষ্টিও তো করা চলত, যেখানে পান্না তার মেয়েকে রেখে আসতে পারত দেবতার সম্মুখে মেয়ের কাছে আর কখনও আসব না বলে প্রতিজ্ঞা করে। আর দেবমন্দিরের আরতির ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে মন্দিরের পশ্চাৎপটে ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের সুর কি আরও সুন্দর ও শোভন হয়ে ফুটে উঠত না? এই সূত্রে একটা কথা উল্লেখ না করে পারছি না, আজকাল বাংলা চিত্রে চার্চ, মিশনারী, 'ফাদার'-'মাদার' ইত্যাদি দেখাবার একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এর কারণ যে কি তা ঠিক বোধগম্য হয় না। স্যুট্, বুট্, টাই-এর সঙ্গে আর একটু পাশ্চাত্য ভাবের সৃষ্টি করাই কি লক্ষ্য?

তাই যদি হয়, তাহলে বলব এই পাশ্চাত্য ভাব আনয়নের প্রয়োজনই বা কি? এ না হলে কি ছবি আধুনিক বা প্রগতিশীল হবে না? প্রগতিশীল ও অতি আধুনিক পাশ্চাত্য দেশে ও সিনেমার স্বর্গ মার্কিন মুলুকে বাংলা চিত্র "পথের পাঁচালী" সমাদৃত হয়েছিল এই সব পাশ্চাত্য লক্ষণ ছাড়াই,—এ কথাটা আশা করি চিত্র-নির্মাতারা যেন ভুলে না যান এবং তাঁদের আর একটি কথাও না ভুলতে অনুরোধ করব যে ভারতীয় ভাব, ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ও ভারতীয় ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তোলা, প্রকাশ করা ও প্রচার করাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। সর্ব্বস্তরের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকাশ, প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব তাঁদের ওপরও অনেকখানি নির্ভর করছে এটা যেন তাঁরা সব সময়েই মনে রাখেন।

যাই হোক, "উত্তর ফাল্গুনী" চিত্রটি যে একটি সফল প্রচেষ্টা তাতে কোনও সন্দেহ নেই এবং সেজন্য আমরা উত্তমকুমার ও এই চিত্রের শিল্পীগোষ্ঠীকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করছি আরও অনেক সফল চিত্র তাঁরা ভবিষ্যতে নির্ম্মাণ করে দর্শক মনরঞ্জন করতে সক্ষম হবেন।

মাননীয় মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে হাওড়ার সঙ্গীত নৃত্য-শিক্ষা সংস্থার নৃত্যম্-এর অষ্টম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠান ই-আর রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দুই দিনের এই প্রথম দিবসে মাননীয় শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ প্রধান অতিথিরূপে এবং বিশিষ্ট অতিথিরূপে শ্রীমুকুল দাস উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিবসের নৃত্য-নাট্য "কাল মৃগয়া" দর্শকদিগের প্রচুর আনন্দ দান করে।

মাননীয় মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় নৃত্যম্-এর অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন। তাঁর বামদিকে হাওড়ার পৌরপ্রধান শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহকেও দেখা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় দিবসের নৃত্যনাট্য "সেলফিস জায়্যাণ্ট"ও প্রথম দিবসের মতই দর্শকদিগের প্রশংসা অর্জ্জন করে। সব শেষে ইলেট্রিক গীটারে আনন্দ দান করেন ইরা সান্যাল ও সন্ধ্যা দাস।

অনুষ্ঠান শেষে সংস্থার সম্পাদক শ্রীদশরথি ঘোষ সমাগত অতিথি বৃন্দকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

"নৃত্যম্"-এর অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় দিবসে সমবেত কণ্ঠে অংশ গ্রহণ করেন:—

মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য, অর্চনা খাঁ, সন্ধ্যা আঢ্য, প্রতিভা মুন্সী, দীপ্তি কর, কল্যাণী মিত্র, পূর্ণিমা ঘোষাল ও মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়।

"নৃত্যম্"-এর "কালমৃগয়া" নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্যে, অন্ধমুনির ভূমিকায় সবিতা ঘোষকে, পুত্র সিন্ধুর ভূমিকায় কল্পনা হাজরাকে এবং রাজা দশরথের ভূমিকায় সুব্রতা হাজরাকে দেখা যাচ্ছে।

ফটো: রণেন ঘোষ

কাশ্মীরের কাকলী

শান্তিময় সান্যাল

কলকাতার তাপদগ্ধ সহার মূর্ত্তিকে ভোলবার জন্যে গিয়েছিলাম ভূস্বর্গ কাশ্মীরে। তখন কল্পনাও করি নি যে প্রকৃতির স্বর্গে নরলোকের তারকার এত ভীড়—! এবং যখন সত্যি জানলাম তখন এই সব উজ্জ্বল নক্ষত্রের সঙ্গে নিবীড় ভাবে মেশবার এক অদম্য আগ্রহে এগিয়ে গিয়েছি তাদের দিকে—সুখের কথা সর্বত্রই সমাদৃত হয়েছি নিরাশ করেন নি কেউ। এই স্বল্পস্থায়িত্বের মধ্যে যে সব প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসেছি তার টুকিটাকি সর্বজন সম্মুখে না এনে তৃপ্ত পাচ্ছি না!

কাশ্মীরে পদার্পণ ক'রেই খবর পেলাম শাম্মিকাপুর ও শর্মিল ঠাকুর এসেছেন শক্তিসামন্তের 'কাশ্মীর কি কলির' স্যুটিং করতে—। শর্মিলার সঙ্গে 'অপুর সংসার' দেখার পর থেকেই চাক্ষুস পরিচয় হওয়ার ইচ্ছে ছিল—তাই এ সুযোগ ছাড়লাম না। খোঁজ নিয়ে জানলাম উনি ডাল হ্রদের এক হাউস বোটে আছেন। প্রথম দিনের অভিযান ব্যর্থ হ'লো—কারণ সেদিন তিনি ছিলেন না। তবে আলাপ হ'লো শর্মিলার বাবার সঙ্গে আর ওদের হাউস বোটে শক্তি সামন্তের সঙ্গে। শ্রীসামন্ত আমন্ত্রণ জানালেন স্যুটিংএ—স্থান ঘুস মার্গ, শ্রীনগর থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূর। সম্মতি জানিয়ে সেদিনের মত বিদায় নিলাম।

পরের দিন ভোর বেলায় শর্মিলদের হাউসবোট এ হানা দিলাম। প্রথমেই আলাপ হ'লো শর্মিলার বোন কাবুলীওয়ালা খ্যাত 'টিংকু'র সঙ্গে—তার মুখেই জানলাম শর্মিলার ডাক নাম রিংকু' ও নবজাত বোনটির নাম রাখা হ'য়েছে মিংকু। ইতি মধ্যে শর্মিলা এসে বসেছেন। কথায় কথায় জানতে চাইলেন কলকাতায় 'নির্জন সৈকতে' কেমন চলেছে? বল্লাম ক্রিটিকদের মতে 'তপনবাবুর শ্রেষ্ঠ' আর প্রেক্ষাগৃহ রোজই পূর্ণ—অতএব বুঝতে পারছেন—।

আমার মুখে এত প্রশংসা শুনে রিংকু প্রশ্ন করে—'কাবুলীওয়ালা'র চেয়ে ভালো হ'য়েছে? অমনি টিংকু ফোঁস করে ওঠে—'কেন দিদি কাবুলীওয়ালা কি ভালো হয় নি?' রিংকু অপদস্থ হ'য়ে বলে—'দেখলেন ত? আমি তাই বলেছি'। এদের আলোচনার মধ্যে চিরন্তন শিশুসুলভ যে চপলতা ফুটে উঠছিল তা বেশ ভালো লাগলো।

আলোচনা বেশী দূর এগুলো না—সামন্তবাবু তাড়া দিচ্ছিলেন—হাউসবোটের সামনেই একটা Scene নিতে

ডাল লেকে ফুলওয়ালী—শর্মিলা ঠাকুর

✻

'সানাই' ছবির নায়িকা রাজশ্রী। কাশ্মীরের নেহেরু পার্কের সামনে ছবিটি তোলা। নায়ক বাংলার **বিশ্বজিত**

✻

হবে। শর্মিলা তাড়াতাড়ি মেক আপ দিয়ে রেডি হ'য়ে নিল। এই দৃশ্য ছিল ফুলওয়ালীর ফুল বিক্রি আর তার সঙ্গে গান—গান গুলি সব শুনেছি—সত্যি সুন্দর হ'য়েছে গান গুলি।

স্যুটিংএর সময়েই নজর পড়ল শক্তিবাবুর হাউস বোটের দিকে—দেখি বসে আছেন বঙ্গের অনুপকুমার। কাঁধে ক্যামেরার বোঝা দেখেই বোধহয় বুঝে ফেলেছেন আগমনের উদ্দেশ্য—ভদ্রলোক খুব আলাপী। বললেন আগে কিছু খান মশাই তবে অন্য কিছু! বললাম শর্মিলাদের বোটে প্রাতঃরাশ সেরেছি—কিন্তু আবার আমাকে খেতে হ'লো—! খাবার সময় আলাপ হ'লো শক্তিবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে। আলাপ আলোচনা যখন বেশ জমে উঠেছে তখন শাম্মিকাপুর হাজির। ছবিতে অনেকবার দেখেছি—কিন্তু চোখের দেখা প্রথম—সত্যিই একটা যেন Dynamic personality—। অনুপকুমার আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। শাম্মি যখন শুনলো আমি ওর ছবি বাংলাদেশের দুএকটি বিখ্যাত পত্রিকায় দিতে চাই তখনই ও ব'ল্লে তার কপি ওর চাই কিন্তু। বললাম তথাস্তু। সঙ্গে সঙ্গে ছবি তোলার জন্যে রেডি—নানা ভাঙ্গ—নানা পটভূমিতে ওর ছবি তুললাম—হাসি মুখে সে আমার নির্দেশ মেনে চললো—খ্যাতিমান নায়ক বা নায়িকা সম্বন্ধে—যে দাম্ভিকতা দোষ প্রায়ই দেখা যায়

পহেল গাঁও এর রাস্তাতে গাড়ি থামিয়ে লোকেসান দেখেছেন
শাম্মি কাপুর

তা শাম্মির মধ্যে একদম নেই—বোধহয় এই জন্যেই সে এত জনপ্রিয়।

আগেকার কথামত বেলা ১ টার সময় আমরা সবাই মিলে যুসমার্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা ক'রলাম। ৪০ মাইল পথ নানা গল্প হাসি ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হল—মাঝে মাঝে প্রকৃতির অকৃপণ সৌন্দর্য্য সবাই আকণ্ঠ পান ক'রে নিচ্ছিল—এমন ভাবেই আমরা গন্তব্য স্থলে এলাম। পৌঁছিয়েই সবাই অনুভব করে প্রকৃতির সৌন্দর্য সুধায় মন ভরলেও পেট ভরে না—তাই ওই কাজটা সারতে হবে। শুরু হ'লো ভুরি ভোজন। গাড়ীর ছায়ায় খাবার নিয়ে বসে পড়ে শর্মিলা, মীনা, শাম্মি ও শক্তিবাবু—আমি সুযোগ হাতছাড়া ক'রলাম না—কয়েকটা shot নিয়ে ফেল্লাম। কিন্তু হিতে বিপরীত—সাম্মি বলল সান্যাল তোমার নিশ্চয় পেট ভরে নি—খেয়ে যাও!' যত বলি আমি এক্ষুনি পুরো পেট খেয়েছি—কিন্তু উপায় কি 'পড়েছি শাম্মির হাতে খানা খেতে হবে সাথে—!' তাই বাধ্য হয়ে দ্বিতীয়বার Lunch ক'রলাম।

তারপর শুরু হ'লো স্যুটিং। এ সময়ে দু'একটা মজার মজার ঘটনা ঘটে। 'কিসিমা কিসিমে' রফির গানের সঙ্গে শাম্মির Dance ছিল। গাড়ী নিয়ে যেতে যেতে আর গান গাইতে গাইতে হুডের ওপর বসতে হবে শাম্মিকে। রাস্তাটা ছিল ঢালু—দুতিন বার স্যুটিং মনঃ

পুত না হওয়ায় শক্তিবাবুর হুকুম হ'লো গাড়ী আরও ঢালুর ওপর দিয়ে আসার—শাম্মি আবার নতুন উদ্যমে নাচতে নাচতে লাফিয়ে যেই হুডের ওপর উঠেছে অমনি গাড়ী গড়িয়ে চলল আপন মনে পাহাড়ী রাস্তা ধরে—দুদিকে গভীর খাদ অনুমান করুন কি অবস্থা! ভাগ্যক্রমে একজন ড্রাইভার নিচু হ'য়ে সিটের তলায় ব'সে ছিল—সে ব্রেক কষে প্রাণ বাঁচায়। আর এক জায়গায় শাম্মীর নাচ ছিল একপাল ছাগলের মধ্যে—ছাগলওয়ালাকে অনেক বুঝিয়ে যেই টেব শুরু হ'লো অমনি ছাগল গুলো উল্টোদিকে দৌড় দেয়—দুতিনবার এমন হবার পর শক্তিবাবু ঠিক করলেন ছাগল ছাড়াই ছবি নেবেন। কিন্তু এবার ছাগলের মালিক এক বুদ্ধি করলে—একটা বাঁশী বাজিয়ে ওদের অন্যমনস্ক ক'রে দিলে তার মধ্যে শক্তিবাবুও কাজ সারলেন।

এই সব স্যুটিং এর সময় শাম্মি আমার হাতে একটি অতি মূল্যবান জিনিষ গচ্ছিত রেখেছিল—সেটি হচ্ছে একটি সোনার ব্যাণ্ডযুক্ত ঘড়ি। অন্ততপক্ষে ৩।৪ হাজার টাকা দাম। ফেরত দেওয়ার সময় ব'ললাম এমন দামী জিনিষ ব্যবহার করার মধ্যে বিপদ আছে। ও ব'ল্লে সেই জন্যই ত' পরা—বিপদ ত' এসে ছিলই এবং ৩ বার'। এই বলে ও বাঁহাতের জামা গুটিয়ে দেখালো. দেখি কাটা কাটা দাগ। শিউরে উঠলাম। ও ব'ল্লে পাহাড়ে ভাংড়া Dance এর সময় কাড়তে এসেছিল কিন্তু তখন ত' জানে না এটাকে—ব'লে ডান হাত দেখায়—দেখ কেমন হারিয়ে ছিনিয়ে নিয়েছি। ওর বিপদকে এই Challenge করার ভঙ্গীই বোধ হয় ওকে 'rebel actor' করে তুলেছে।

শাম্মি উঠেছিল Palance হোটেলে। জানতাম ওই খানেই আছেন 'সায়রাবানু'—শাম্মিকে ধরলাম আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। সে ব'ল্লে পরের দিন ত' ও থাকবে না—তবে সায়রুকে বলে রাখবে—দেখা করতে। রুম নম্বর 'দশ'। কথামত পরের দিন প্যালেস হোটেলে হাজির—রুমে ঢুকেই মনে হ'লো এক ঝলক আলো বুঝি চোখটাকে ধাঁধিয়ে দিল—বুঝলাম এই সেই সুন্দরী শ্রেষ্ঠ সায়রা বানু। প্রথম পরিচয়ের পর আলাপ শুরু হ'লো। উনি ব'ল্লেন কালই চ'লে যাচ্ছেন কাশ্মীর ছেড়ে। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলাম—কারণ ১ দিন পরে এলেই আর দেখা হ'তো না। যাক আমার ফটো তোলার প্রস্তাব করতেই একটু মেক আপ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—শিথিল ড্রেসিং গাউনে ও এলায়িত চুলে তাঁকে মনে হচ্ছিল সেই রূপকথায় পড়া ঘুমন্ত রাজকন্যার মত—কিংবা কোনও উর্বশী বুঝি বা মর্ত্তলোকে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। কিছুক্ষন ছবি তোলা ভুলে তাকিয়ে

হাউসবোটেতে বম্বের অনুপকুমার

থাকি কিন্তু খেয়াল হ'লো ক্যামেরার শাটারের শব্দে—একি ফিল্ম যে নেই—এমন এক পোস্ ক্যামেরায় অক্ষয় হ'য়ে থাকতে পারবে না—এযে রীতিমত Tragedy। সায়রা আমার অবস্থা অনুমান করে ব'ললো, রাত্রে আসুন ছবি নিতে। কিন্তু বিধি বিরূপ—তখনই এক লোক এসে কিকথা হ'লো, সায়রা ব'ল্লেন 'মাপ করবেন—রাত্রে ডিরেক্টর অন্য জায়গায় Dance করার নিমন্ত্রণ করেছেন।

ঐ হোটেলেই রাজশ্রী জয় ও আশা ছিলেন—কিন্তু সবাই গিয়েছেন স্যুটিংএ—তাই হতাশ মন নিয়ে বাড়ী ফিরলাম। ডাল গেটে এসে শাম্মির সঙ্গে দেখা—ওঁকে বল্লাম আমার ট্র্যাজিডির কথা। তারপর সবাই বিদায় নিলাম।

রাত্রি নটার সময় একজন Teclmician বললে আপনাকে শাম্মিবাবু এই প্যাকেটটা দিয়েছেন—খুলে দেখি একটাতে কালো ফিল্ম ও অন্যতে রঙীন ফিল্ম রয়েছে ওজন অনুমান করে বুঝি প্রায় ১০।৮০ ফিট ফিল্ম আছে। পরের দিন শাম্মিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম।

জয়কে কোনো কথা বলে জানলাম ওঁর পক্ষে appointment দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ রোজই স্যুটিং বা অন্য কিছুতে উনি ব্যস্ত। তবে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন 'বম্বে আসুন—এলে ভালো ভ'লো ছবি তুলিয়ে দেব।

এর পরদিনই আমরা কাশ্মীর ছ'ড়লাম। নিদাঘের দাব দাহ কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য প্রলেপে শীতল হ'লো—আর তার সঙ্গে ফাউ হিসেবে যা পেলাম তা আমার আগামী দিনের স্মৃতি রোমন্থনের পাথেয় হয়ে থাকবে তাতে সন্দেহ নেই!

সম্প্রতি শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মেলনী স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষীক জন্মোৎসব পালন করেন রঙমহল মঞ্চে। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রী এস, সি, ডুগার উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে শ্রীঅমল সরকার বিরচিত "বিপ্লবী বিবেকানন্দ" নাটকটি অতি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। প্রথিতযশ অভিনেতা শ্রীবিপিন গুপ্ত গিরিশচন্দ্রের ভূমিকায় এবং শ্রীমতী গীতা দে নিবেদিতার ভূমিকায় অতি উচ্চাঙ্গের অভিনয়ের নিদর্শন রাখেন। রবীন গুপ্তর বিবেকানন্দ, অনিল চ্যাটার্জ্জীর শ্রীরামকৃষ্ণ, গোপালদাস মুখার্জীর কেবলরাম, মমতা ব্যানার্জীর ক্ষ্যান্তমণি, জীবন গোস্বামীর রঘুডাকাত, এবং প্রিয়া চ্যাটার্জীর শ্রীমার অভিনয়ে নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

"বিপ্লবী বিবেকানন্দ"-র একটি দৃশ্যে প্রিয়া চট্টোপাধ্যায় (শ্রীমা), গীতা দে (নিবেদিতা), রবীন গুপ্ত (বিবেকানন্দ) ও বিপিন গুপ্ত (গিরিশচন্দ্র) কে দেখা যাচ্ছে।

"মেরে মেহেবুব" চিত্রে—
রাজেন্দ্রকুমার ও সাধনা

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ :

কলকাতার আজাদ হিন্দ বাগ সরণীতে অনুষ্ঠিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ক'লকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ছাত্রীরা দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়ে বিশেষ কৃতিত্বর পরিচয় দিয়েছেন। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্য্যায়ে ছাত্রীদের সন্তরণ প্রতিযোগিতা এই প্রথম। ছাত্রীদের এই প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্রতিটি অনুষ্ঠানে (সংখ্যা ৬) প্রথম স্থান লাভ করেন। ছাত্রদের ১১টি অনুষ্ঠানের মধ্যে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় সাতটি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাকি ৪টিতে প্রথম হয়। ছাত্র বিভাগে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুই জন সাঁতারু—এ ভি সারাঙ্গ এবং আর উদেসী। সারাঙ্গ ৪০০ ও ১,৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে এবং উদেসী ১০০ ও ২০০ মিটার চিৎ সাঁতারে প্রথম স্থান লাভ করেন। উভয় বিভাগে সর্ব্বাধিক ব্যক্তিগত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র। তিনি ১০০, ২০০, ও ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এবং ১০০ মিটার চিৎ সাঁতারে প্রথম স্থান লাভ করেন এবং ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলে রেসে প্রথম স্থান অধিকারী ক'লকাতা দলে অংশ গ্রহণ করেন।

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ

ছাত্র বিভাগ : ১ম ক'লকাতা (৫৮ পয়েন্ট) ; ২য় বোম্বাই (৫৩ পয়েন্ট) ; ৩য় বেনারস (৪ পয়েন্ট)।

ছাত্রী বিভাগ : ১ম ক'লকাতা (৪৬ পয়েন্ট) ; ২য় পুণা (১৪ পয়েন্ট) ; ৩য় পাঞ্জাব (১ পয়েন্ট)।

ডাইভিং ১ম কলকাতা (১৬ পয়েন্ট) ২য় আগ্রা (২ পয়েন্ট)।

ওয়াটার পোলো : ১ম কলকাতা (৬ পয়েন্ট) ; ২য় বোম্বাই (৪ পয়েন্ট) ; ৩য় দিল্লী (২ পয়েন্ট)।

নতুন রেকর্ড

ছাত্র বিভাগ :

১০০ মিটার বাটারফ্লাই : ১মি: ১৬.৯ সে:—মধুসূদন সাহা (কলকাতা)

চারটি বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারিণী কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

চারশত মিটার ফ্রিস্টাইল রিলেতে নূতন রেকর্ড সৃষ্টিকারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল

২০০ মিটার বাটারফ্লাই : ৩ মিঃ ৪২ সেঃ—রবীন ঘোষ (কলকাতা)

৪×১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রীলে : ৪ মিঃ ২৮.৮ সেঃ—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২০০ মিটার চিৎসাঁতার : ২ মিঃ ৪৪.২ সেঃ—আর, উদেসী (বোম্বাই)

৪×১০০ মিটার মিড্‌লে রীলে : ৫ মিঃ ৫ সেঃ—বোম্বাই বিশ্বিদ্যালয়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতা :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ২৬তম বার্ষিক সন্তরণ অনুষ্ঠানে ন্যাশানাল সুইমিং এসোসিয়েশন প্রতিটি বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ ক'রে এই রাজ্যের সন্তরণ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে অসাধারণ রেকর্ড স্থাপন করেছে। ন্যাশানাল সুইমিং এসোসিয়েশন মোট সাতটি অনুষ্ঠানে দলগত খেতাব পায়। ব্যক্তিগত কৃতিত্বের পরিচয় দেন নিমাই দাস। তিনি চারটি অনুষ্ঠানে (১০০, ২০০, ৪০০ ও ১,৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল) প্রথম স্থান পান এবং এই নিয়ে তিনি চারবার ১,৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে প্রথম স্থান পেলেন।

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ

সিনিয়র বিভাগ : ১ম ন্যাশানাল সুইমিং এসোসিয়েশন (৫১ পয়েণ্ট); ২য় হাটখোলা (২৬ পয়েণ্ট)

ইণ্টারমিডিয়েট বিভাগ : ১ম ন্যাশানাল সুইমিং এসোসিয়েশন (১৯ পয়েণ্ট); ২য় বৌবাজার বি এস (৭ পয়েণ্ট)

জুনিয়র বিভাগ : ১ম ন্যাশানাল সুইমিং এসোসিয়েসন (৪০ পয়েণ্ট); বৌবাজার বি এস (১৫ পয়েণ্ট)

বালক বিভাগ : ১ম ন্যাশানাল সুইমিং এসোসিয়েশন (২২ পয়েণ্ট); ২য় ক্যালকাটা এস এ (৮ পয়েণ্ট)

ডাইভিং : ১ম ন্যাশানাল সুইমিং এসোসিয়েশন (১৬ পয়েণ্ট); দ্বিতীয় পশ্চিমবঙ্গ পুলিস (২ পয়েণ্ট)

মহিলা বিভাগ : ১ম ন্যাশানাল সুইমিং এসোসিয়েশন (২০ পয়েণ্ট); ২য় ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিংস (৯ পয়েণ্ট)

মহিলা বিভাগ (জুনিয়র) : ১ম ন্যাশানাল সুইমিং এসোসিয়েশন (১১ পয়েণ্ট); ২য় মেদিনীপুর (৬ পয়েণ্ট)

ওয়াটার পোলো : চ্যাম্পিয়ান—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবহণ বিভাগ

জেলা বিভাগ : ১ম মেদিনীপুর (১৬ পয়েণ্ট); ২য় ২৪পরগণা (৬ পয়েণ্ট)।

নতুন রেকর্ড

ইণ্টারমিডিয়েট বিভাগ : ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল : ১ মিঃ ৬.৯ সেঃ সুব্রত সাহা (হাটখোলা)

বালক বিভাগ (১৬ বছরের নীচে)

১০০ মিটার বুক সাঁতার : ১ মিঃ ২৬.০২ সেঃ—পরিমল চন্দ্র (সেণ্ট্রাল সুইমিং)

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল : ৫ মিঃ ২৫.৯ সেঃ—প্রেমময় বিশ্বাস (ন্যাশানাল এস এ)

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ভারতবর্ষের সূচী

একপঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—ষষ্ঠ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ—১৩৭০

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্রসূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

ধান কাটা হল সারা—

শিল্পী : শ্রীপঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

প্রথম খণ্ড | একপঞ্চাশত্তম বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়

অধ্যাপক জীবনবল্লভ চৌধুরী এম-এ

বেদ, পুরাণ, মহাকাব্যাদির প্রণেতা, ধর্মপরিবৃংহিত অত্যদ্ভুত মহাভারতের স্রষ্টা, উদ্গাতা মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস আজ শোকান্বিত, অবসন্ন! সরস্বতী নদীর তীরস্থ স্বীয় আশ্রমে বসিয়া তিনি এক অবর্ণনীয় অপূর্ণতার বেদনায় চঞ্চল, বিষণ্ণচিত্তে কালাতিপাত করিতেছেন। সহসা সেস্থানে আবির্ভূত হইলেন মহর্ষি নারদ।(১) ব্যাসকে বিষণ্ণচিত্ত দেখিয়া নারদ প্রশ্ন করিলেন, "হে পরাশরতনয়! তুমি যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সবই জানিয়াছ; তুমি পরব্রহ্মের স্বরূপ বিচার করিয়াছ এবং তাহা প্রাপ্ত হইয়াছ, তথাপি কোন্ অকৃতার্থতার জন্য তোমাকে আজ শোকান্বিত দেখিতেছি?" ব্যাস নিজেই জানেন না তাঁর অন্তর কোন্ অজ্ঞাত অপূর্ণতার বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে, সকল চরিতার্থতার উপরেও কোন্ অভাববোধ তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতেছে। অতঃপর মহামতি নারদ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া বলিলেন—

যথা ধর্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি তোমার প্রণীত গ্রন্থসকলে ধর্মার্থাদির

(১) নারং পরমাত্মতত্ত্বং দদাতি যঃ স নারদঃ।

কীর্তন করিয়াছ সত্য, কিন্তু বাসুদেবের মহিমা তেমন করিয়া প্রধানভাবে বর্ণন কর নাই ; অতএব—

অথমহাভাগ ভবানমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধনমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতং ॥

হে মহাভাগ বেদব্যাস ! তুমি সত্যদর্শী, যশস্বী, সত্যপরায়ন, এবং শম-দমাদি ব্রত ধারণ করিয়া আছ, তোমার অবসন্নতা ও ক্লেশ অপসারণের জন্য একাগ্রচিত্তে উরুক্রম ভগবান্ কৃষ্ণের লীলা স্মরণপূর্বক বর্ণনা কর। মহাযশস্বী বিভু পরমেশ্বরের যশঃ প্রকৃষ্টরূপে কীর্তন করা ব্যতীত ক্লেশ নিবারণের অন্য কোনও উপায় নাই—

ত্বমপ্যদভ্রশ্রুতবিশ্রুতং বিভোঃ সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতং।
প্রখ্যাহি দুঃখৈর্মুহুরর্দ্দিতাত্মনাং সংক্লেশনির্বাণমুশন্তি নান্যথা ॥

নারদের এবম্বিধ উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মহর্ষি ব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত রচনার ইহাই সংক্ষিপ্ত পূর্বাভাষ।

রাসপঞ্চাধ্যায়

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবত মহাগ্রন্থের দশম স্কন্ধের ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩—এই পাঁচটি অধ্যায় শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় নামে খ্যাত, বিশ্বমানব মনের রহস্যঘন সংখ্যাতীত ইতিকথায় পরিকীর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ বিশ্বপ্রাণকোষ স্বরূপ। তন্মধ্যে রাসপঞ্চাধ্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য-লীলারস বৈচিত্র্যে ও চমৎকারিত্বে অতুলনীয়, বিস্ময়কর। সমগ্র ভাগবত হইতে এই পাঁচটি অধ্যায়কে পৃথক করিয়া দেখিলেও মনে হইবে যে ইহারা খণ্ড অংশ হইয়াও যেন সমগ্রতার অখণ্ড গৌরব বুকে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ভগবৎলীলা-কাহিনী, ভক্তচরিত কথা, শ্রীকৃষ্ণলীলা, ও ভগবৎতত্ত্ব—এই চারিটি বিষয় অপূর্ব নিপুণতার সহিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম নয়টি স্কন্ধ প্রধানত ভগবৎলীলা-কাহিনী ও ভক্তচরিত কথায় পরিপূর্ণ, দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা বিধৃত হইয়া আছে, একাদশে অন্তিমবাণী ও সর্বরসের তাত্ত্বিক সমাবেশ, দ্বাদশ স্কন্ধে শ্রীশুকদেবের কথাসমাপ্তি ও গ্রন্থসমাপ্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ ভক্তিধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। ভাষা, ভাব ও তত্ত্বের গভীরতায় দশমস্কন্ধ অতুলনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ "অবতীর্য্য যদোবংশে কৃতবান্ যানি বিশ্বাত্মা," তিনি "আত্মামলখিলাত্মনাম", তিনি "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ঃ বিত্তাৎ প্রেয়ঃ স্যাৎ অন্যাস্যাৎ সর্বস্যাৎ", "প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি"। তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, যাবতীয় প্রিয় বস্তুর মধ্যে প্রিয়তম। তাঁর ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীরবমাধুরী ভক্তকে ঘরছাড়া করে ; তিনি পরমপ্রেমাস্পদ—'পরমানন্দঃ পরমপ্রেমাস্পদং যতঃ,' (২) তিনি 'সর্বৈশ্বর্য সর্বশক্তি সর্বরসপূর্ণ' (৩) তিনি দশবিধ রসে প্রকাশিত—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥৪

রৌদ্ররসে তাঁহাকে অশনির ন্যায় দেখিয়া কংসের মল্লাদি সশংকিত, শৃঙ্গার রসে কন্দর্পতুল্য দেখিয়া ব্রজাঙ্গনারা মুগ্ধা। পিতামাতার দৃষ্টিতে তিনি বাৎসল্যরসের মূর্ত বিগ্রহ, নৃপতিদিগের চক্ষে তিনি বীররসের আধার, তাঁর ভয়ানক রসের আভাস পাইয়াই কংস মৃত্যুভয়ে জর্জরিত, ভক্তযোগীরা তাঁহাকে শান্তরসে পরাদেবতাজ্ঞানে অকুণ্ঠচিত্তে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অর্চনায় রত। তিনি ভক্ত বৈষ্ণবের আদর্শ, ভক্তের হৃদয় বৃন্দাবনে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥৫

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, অন্য সকল দেববেবী তাঁর অংশ বা কলা – ইহাই ভাগবতের অকুণ্ঠ ঘোষণা। 'ব্রহ্মসংহিতা'ও বলিয়াছেন—

---

(২) পঞ্চদশী
(৩) চৈতন্যচরিতামৃত
(৪) শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৪৩।১৭
(৫) শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৩

ঈশ্বরঃ পরমকৃষ্ণসচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণং॥

এই শ্লোকে বিশেষ্য-বিশেষণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরতা সম্পাদনার্থে নয়টি বিশেষণে শ্রীকৃষ্ণকে এক বিশেষ্য করিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সৎ, চিৎ, আনন্দ, পরমেশ্বর, অনাদি, আদি, গোবিন্দ, সকল কারণের কারণ—তিনিই পরমকারুণিক ভগবান। সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া সমগ্র জগৎ সত্যের ন্যায় প্রতিভাত চেতনবৎ পরিদৃশ্যমান; তিনিই দ্রষ্টারূপে সর্বঘটে বিরাজমান, সর্বানন্দময়রূপে তিনিই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত। এই সৎ, চিৎ ও আনন্দের ঘনীভূত স্বেচ্ছাময় পরমভাবত্বই হইলেন গোবিন্দ। 'কৃষ্ণ এব পরোদেবস্তং ধ্যায়েৎ তং যজেদিত্যাদিশ্রুতে'—এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণই পরমদেব পরমাত্মা এবং স্বপ্রকাশ। এহেন শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাকথা 'শ্রীশুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুক্ত' শ্রীমদ্ভাগবত মহাগ্রন্থে বিধৃত হইয়া আছে। যিনি সকল রসের আধার তাঁরই মাধুর্য-লীলাকে অবলম্বন করিয়া রাসপঞ্চাধ্যায় ভক্তপ্রাণের পঞ্চপ্রদীপ শিখায় আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ

'কৃষ্ণঃ বৈ পরমদৈবতম্'৬—কৃষ্ণই পরমদেবতা। শ্রীকৃষ্ণই নিখিল-আত্মার আত্মা, সর্বঅবতংস—'কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানম্ অখিলাত্মানং'৭; তিনি—

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥৮

শ্রীমদ্ভাগবতের—

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানেতি শব্দ্যতে॥

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ জীব গোস্বামী বলিয়াছেন—"সর্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেন হি ব্রহ্মশব্দঃ প্রবৃত্তঃ। বৃহত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানধিকাতিশয়ঃ সোঽস্য মুখ্যার্থঃ। অনেন চ ভগবানেবাভিহিতঃ। স চ স্বয়ং ভগবত্বেন শ্রীকৃষ্ণ এবেতি।" সর্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেই 'ব্রহ্ম'-শব্দের প্রবৃত্তি; ব্রহ্ম হইলেন স্বরূপে ও গুণে বৃহৎ, ব্রহ্মের সমানও কিছু নাই, অধিকও কিছু নাই। ভগবত্তায় বৃহত্তম বলিয়া 'ব্রহ্ম'-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে 'একোঽপি সন্ যো বহুধা বিধাতি'৯, তিনি এক হইয়াও বহুমূর্তিতে প্রতিভাত হইয়া থাকেন—'বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্'১০।

শক্তি এবং শক্তির ক্রিয়ার, মাধুর্যের, সৌন্দর্যের এবং ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশ হইয়াছে বলিয়াই ভক্তের হৃদয়বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, সর্বগুণান্বিত সর্বগৌরবমণ্ডিত, সকল ঐশ্বর্যের মহিমায় মহিমান্বিত সকল মাধুর্যের লালিত-গীতি-কল্লোলে পরিপ্লুত। এতগুলি মহৎগুণের একত্র সমাবেশ অন্য কোথাও দেখা যায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আংশিকভাবে ঐশ্বর্যাদি গুণের সমাবেশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেই ষড়ৈশ্বর্যের পরিণত পরিপূর্ণ বিকাশ। ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়টি মহিমায় যিনি মহিমান্বিত তিনিই ভগবান—

বিরাট হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপদং
বিদুরিত্যেব লক্ষণে॥
ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ১১ ইতীঙ্গনা॥

এস্থলে 'তুরীয়' শব্দের অর্থ বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ (এই তিনটি উপাধি) এই উপাধিত্রয়ের অতীত অবস্থা। তুরীয় অবস্থায় ষড়ভগবিশিষ্ট অর্থাৎ নিত্য ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সর্বশক্তিমানই 'ভগবান' এই নামে প্রকীর্তিত। শক্তির পূর্ণতম প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেই ঈশ্বরত্ব ও ভগবত্তার পূর্ণতম প্রকাশ; তাই শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান।

'কৃষ' হইতেছে ভূ-বাচক শব্দ, 'ণ' নির্বৃতিবাচক১২ অর্থাৎ সুখবাচক, এই উভয়ের ঐক্যরূপই (ভূ=সত্তা+ণ=আনন্দ) পরমব্রহ্ম (সৎ ও আনন্দঘনরূপ)—তিনিই 'কৃষ্ণ' নামে অভিহিত—

(৬) গোপালতাপনী শ্রুতি
(৭) শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।১৪।২৫
(৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২০।৭২
(৯) গোপালতাপনী শ্রুতি
(১০) শ্রীমদ্ভাগবত

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দোণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম ইত্যভিধীয়তে॥—
(গোপালপূর্বতাপন)

শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়, পরমাত্মা। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পাইবার ও তাঁহার অশ্রিত হইবার সরলতম নিশ্চিত উপায় আমাদের চির-রচিত চিত্র অবলম্বনে বিশ্লেষিত হইয়াছে শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে। শরণাগত হইয়া প্রাণঢালা অকৃত্রিম ভালোবাসার দ্বারা তাঁহাকে কিভাবে আপন করিয়া লওয়া যায়, কি করিয়াই বা অভিমানের গুরুভার ধীরে ধীরে অপসারিত করিয়া তিনি জীবকে প্রেমমধু পান করাইয়া প্রাণবঁধু করিয়া লন তাহারই ধারাবাহিক বর্ণনায় বাঙ্‌ময় শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ, এবং রসের স্পন্দনে প্রাণময় শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়।

শ্রীরাধা

গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে ও তত্ত্বে শ্রীরাধা কৃষ্ণবল্লভা, রাসেশ্বরী, 'শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তি' তিনি 'মহাভাব-স্বরূপা'। শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমের ঘনীভূত মূর্ত্ত বিগ্রহ, তিনি 'সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি', তিনি 'গোবিন্দানন্দিনী' 'গোবিন্দমোহিনী' গোবিন্দসর্বস্ব সর্ব-কান্তাশিরোমণি'। রাধা কৃষ্ণময়ী, 'কৃষ্ণ যাঁর অন্তরে বাহিরে'। বৈষ্ণব মতে রাধা ও কৃষ্ণ তত্ত্বত অভেদ, কিন্তু লীলারস আস্বাদনের জন্য 'ধরে দুই রূপ'—

রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশাক্তমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥ (১৩)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে দেখি—

যথাত্বঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদোহি নাবয়োর্ধ্রুবম্।
যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্নৌ দাহিকা সতি॥

অর্থাৎ যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই রাধা, উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই—যেমন ভেদ নাই দুগ্ধ আর তার ধবলতার মধ্যে অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তির মধ্যে। এই পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে কৃষ্ণ বলিতেছেন—

মমাধারঃ সদা ত্বঞ্চ তবাত্মাহং পরস্পরম্।
যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ সমৌ প্রকৃতিপুরুষৌ।
নহি সৃষ্টির্ভবেদ্দেবি দ্বয়োরেকতরং বিনা॥

তুমি (রাধা) আমার আধার আমি তোমার আত্মা, তুমি যেখানে আমি সেইখানে—তুল্য প্রকৃতিপুরুষ; আমাদের একজনের অভাবে সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না।

পূর্বেই জানা গিয়াছে যে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'; শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা, বিভু, পূর্ণব্রহ্ম। তবে তাঁর লীলার প্রয়োজন কি?—"সোঽকাময়ত, বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" ১৪ পরমাত্মা কামনা করিলেন 'আমি বহু হইব, আমি সৃষ্ট বা উৎপন্ন হইব।' তিনি সৃষ্টি বিষয়ে অর্থাৎ সৃজ্যমান জগতের বিষয়ে আলোচনা করিলেন এবং সবকিছুই সৃষ্টিপূর্বক তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। এই কারণেই ব্রহ্মাকে সুকৃত অর্থাৎ স্বয়ং কর্তা বলা হয়—"তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যতে ১৩। তিনি স্বয়ং-কর্তা, তাই তিনি রসস্বরূপ; জীব সেই রসকে লাভ করিয়াই আনন্দ লাভ করে—"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" ১৫। তা' ছাড়া—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি" ১৷—আনন্দ হইতেই ভূতবর্গের উৎপত্তি' আনন্দের দ্বারাই তাহারা বর্ধিত, অবশেষে

---

১১ 'ভগঃ'—শব্দের-ইংরেজী প্রতিশব্দ হইল—Dignity, Distinction, Fame, Glory, Excellence Final Beautitude, omnipotence, (The students Sanskrit Englsh Dictionary—V. S. APTE)

১২ নির্—বৃ+ক্তিন্=নির্বৃতি। 'বৃতি' শব্দের অর্থ সীমাবদ্ধতা; সীমাবদ্ধতা যাহাতে নাই (নির্) তাহাই নির্বৃতি। এস্থলে অধিকরণে ক্তিন্-প্রত্যয় হওয়ায় আনন্ত্য প্রকাশে অবস্থিতি বুঝাইতেছে। সুতরাং 'নির্বৃতি'-শব্দের অর্থ—পরমানন্দ, মহাসুখ।

১৩ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ৪

১৪ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৬

১৫ ঐ ' ২।৭

আনন্দাভিমুখে প্রতিগমন করিয়া আনন্দেই বিলীন হইয়া যায়। বস্তুত অব্যক্ত, অনির্দেশ্য, অচিন্ত, অক্ষর-এর লীলা নাই, সৃষ্টিও নাই, জীবনবৃত্তের সীমানার মধ্যে তাঁকে ধরা যায় না। কিন্তু অব্যক্ত যখন ব্যক্ত হয়, অনির্দেশ্য যখন নির্দিষ্ট হয়, অচিন্ত্য যখন চিন্তার সীমানার মধ্যে আসিয়া ধরা দেয়, অক্ষর যখন ক্ষরিত হইয়া আমাদের পরিচিত পথে, সম্বন্ধের মধ্য দিয়া সীমার মধ্যে ধরা দেন, তখন কত মধুর সেই প্রকাশ! সাধককবির কণ্ঠে তাই শুনি—

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর,

তোমার মধ্যে আমার প্রকাশ তাই এত মধুর।

অসীম যেমন সীমাকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করে, সীমাও তেমনি হইতে চায় 'অসীমের মাঝে হারা'। সীমা ও অসীমের যুগল সম্মেলনেই ব্যাপ্তির পূর্ণতা। একে ছাড়িয়া অন্যটি অসম্পূর্ণ, উভয়ের নিত্যসম্বন্ধের মধ্যে যে এক চিরকালের সত্য নিহিত আছে তাহা হইতেই একের জন্য অপরের ভাবনা,—সীমার আরাধনা, অসীমের আকর্ষণ; সীমার ক্রন্দন, অসীমের অভিনন্দন, সীমার অভিসার, অসীমের আস্বাদন। সীমা ও অসীমের অদ্বৈতরূপকে দ্বিধাবিভক্ত না করিলে তো আর একাকী লীলা করা সম্ভবপর হয়না; তাই "স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ" ১৬—। এই ইচ্ছাই লীলার আদি, মধ্য, ও শেষ কথা। এই কথা স্মরণে রাখিয়াই মহর্ষি বাদরায়ণ বলিয়াছেন—'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'। এই লীলারস আস্বাদনের জন্য—

রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।

লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥ ১৭

প্রকৃতি হইলা কৃষ্ণ পুরুষ আপনে।

বিভিন্ন আকার হৈল রমণ কারণে॥ ১৮

'রাধা'র সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় ঋক্‌বেদে—

মা তে রাধাংসি মা ত উতয়ো

বসোঽস্মান কদাচনা দভন্। ১৯

১৬ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

১৭ ঐ ’ ৩।৬

১৮ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৪।৩

১৯ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আচার্য সায়ণ ভাষ্য করিয়াছেন—"হে বসো নিবাসয়িতরিন্দ্র তে তব সম্বন্ধীনি রাধোত্যেভিরিতি রাধাংসি ভূতান্যস্মান্ কদাচন কদাচিদপি মা দভন্।" ঋক্‌বেদে আরও তিনটি সূক্তে 'রাধা'র উল্লেখ আছে—

(১) তদ্বাং নরা শংস্যং রাধ্যং

(২) মাদয়স্ব সুতে সচা শবসে শূর রাধসে

(৩) ইন্দ্রো অস্মভ্যং শিক্ষতু বি ভজা ভূরিতে বসু ভক্ষীয় তব রাধসঃ

'রাধ'-ধাতুর অর্থ বরণীয়, আরাধনীয়। আচার্য সায়ণও 'রাধ্যং' এর অর্থ করিয়াছেন 'বরণীয়ং আরাধনীয়ং চ'। রাসপঞ্চাধ্যায়ের 'অনয়ারাধিত নূনং'-ইত্যাদির ব্যাখ্যায় পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামী 'বৈষ্ণবতোষণী' টিপ্পনীতে বলিয়াছেন—"রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকরণঞ্চ দর্শিতং"; শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত 'সারার্থ দর্শিনী টীকায় দেখি—"রাধয়ত্যারাধয়তীতি রাধা ইতি নামব্যক্তির্বভূব··· ···হরিরয়ং রাধিতঃ।"

ঋক্‌বেদের বহুযুগ পরে আমরা পুনরায় 'রাধা'র দর্শন পাই প্রতিষ্ঠাপুরাধিপতি হাল সাতবাহন-রচিত গীতসংকলন গ্রন্থ 'গাহা সত্তসঈ'তে (২০)—

মুহমারুএণ তং কহ্ন গোরঅং রাহিআএঁ অবনেন্তো।

এতাণঁ বলবীণং অন্নাণঁ বি গোরঅং হরসি॥ ১।৮৯

'হে কৃষ্ণ! তোমার মুখমারুতের দ্বারা রাধিকার মুখের গোরজ অপনোদন করিয়া এই সকল বল্লভী এবং অন্যদেরও গর্ব হরণ করিতেছ।'

"তত্ত্বরূপে শ্রীরাধার পরিপূর্ণতা বৃন্দাবনবাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ধ্যানে ও মননে।···এই তত্ত্বের বিকাশে রাধা সত্যই 'কমলিনী'; অর্থাৎ দ্বাদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বিষ্ণু শক্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু বিশ্বাস, চিন্তা ও মতামত, সেই উর্বর ভূমির উপরে যেন উপ্ত হইয়াছিল এই অনন্ত বিচিত্রমধুর রাধার বীজ, সেই বীজ পুরাতন ভূমি হইতে উপজীব্য সংগ্রহ করিয়া আপনার নবধর্মে নিত্যনব সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে প্রকাশ লাভ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে পূর্ণপ্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।" ২১

২০ ভুর্লভসার

২১ ১ম মণ্ডল, ১৩ অনুবাক, ৮৪ সূক্ত

শ্রীমদ্ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায়ের একটি শ্লোকে ২২ ইঙ্গিতে ছাড়া আর কোথায়ও রাধার নাম নাই। বিষ্ণুপুরাণেও স্পষ্টভাবে রাধার উল্লেখ নাই, বিষ্ণুপুরাণেও 'বিষ্ণুরভ্যর্চিতো ময়া' বলিয়াই রাধা সম্বন্ধে যেন সব বলার শেষ হইয়া গেল। যদিও 'অভ্যর্চিত' এবং 'আরাধিত সমার্থবাচক তথাপি রাধা এখানেও গোপনেই রহিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সুধীজন নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই, কিন্তু এই পুরাণেই রাধাকে অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণলীলা মুখর হইয়া উঠিয়াছে। বরাহপুরাণে দেখি—

তত্র রাধা সমাশ্লিস্য কৃষ্ণমক্লিষ্টকারণম্।

স্বনাম্না বিদিতং কুণ্ডং কৃতং তীর্থমদূরতঃ।

মৎস্যপুরাণে আছে—"রুক্মিণী দ্বারবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে (২৩)

শ্রীলরূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে বলিয়াছেন যে অষ্টযুথেশ্বরীর মধ্যে রাধা ও চন্দ্রাবলী সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা; রাধা ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে সর্বপ্রকারে রাধিকাই অধিকা, রাধাই মহাভাব স্বরূপা ও গুণের দ্বারা অতিশয় বরীয়সী—

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বথাধিকা।

মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥ (২৪)

'উজ্জ্বলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণে দেখি যে কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীগণের মধ্যে নয়জন প্রধানা, ইহাদের মধ্যে মুখ্যা হইলেন শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী, এ দুইজনের সৌন্দর্য ও বৈদগ্ধ্যাদি গুণ কৃষ্ণের তুল্য। 'রাধাতন্ত্রে' রাধা সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী, পদ্মিনীরূপা। রাধা এখানে অসামান্য গুণগ্রামের আধার, গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অধিনায়ক—"অসমান গুণোদর্য্যা ধুর্য্যো গোপেন্দ্রনন্দন"; রাধা ভূভাহরণের নিমিত্ত মথুরা ব্রজমণ্ডলে আবির্ভূতা হইয়াছেন—

ভারাবতারণং দেবি ছলং কৃত্বা শুচিস্মিতে।

আবিরাসীন্মহেশানি মথুরা ব্রজমণ্ডলে॥

রাধাতন্ত্রে রাধা এক বিশেষ অর্থপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; ব্রজমণ্ডলে তিনি প্রতিযুথে বিদ্যমান, মথুরাতে তিনি প্রতি গৃহে বিরাজমানা—

যুথে যুথে বরারোহে মথুরা ব্রজমণ্ডলে।

অন্যত্র বিরলা দেবী মথুরায়াং গৃহে গৃহে॥ ২৫

রাধাতন্ত্রের এই শ্লোকটি বিশেষ অর্থবহ, রাধাতত্ত্বের মূল সূত্রটি এখানে পরিলক্ষিত হয়।

গোপীভাব ও গোপীপ্রেম

গোপীপ্রেমে স্বসুখ বাসনা নাই, 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি'র বলবতী ইচ্ছাতেই গোপীপ্রেমের উদ্বোধন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গোপীভাব ও প্রেমের পরিচিতি দিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

বেদধর্ম লোকধর্ম দেহধর্মকর্ম।

লজ্জা ধৈর্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম॥

দুস্ত্যজ্য আর্যপথ নিজ পরিজন।

স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥

সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।

কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেমসেবন॥

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দৃঢ় অনুরাগ।

স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোনো দাগ॥

অতএব কামপ্রেম বহুত অন্তর।

কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর॥

অতএব গোপীগণে নাহি কাম গন্ধ।

কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণের সম্বন্ধ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপদেশ গোপীভাব। শ্রীকৃষ্ণের সুখতাৎপর্যের সুধাসলিলে অবগাহমানা ব্রজগোপীদের নিকট কৃষ্ণসুখ ভিন্ন অন্যকোনো সুখ কল্পনাতীত। প্রিয়তম কৃষ্ণের সুখের জন্য ধর্মাধর্মকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া গোপীরা সর্বত্যাগিনী। ভগবদ্বিমুখ, বিষয়াসক্ত বিমূঢ় চিত্তে পরম নিষ্কিঞ্চনের চরম আদর্শ গোপীভাব কলুষিত কামভাব

---

২২ হাল সাতবাহন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের লোক।

২৩ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—(সপ্তম অধ্যায়, পৃঃ ৯৫)—ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত

২৪ ১০।৩০।২৪

২৫ এই শ্লোকটি পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডেও পাওয়া যায়।

বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু ব্রজগোপিকাগণের অন্তরেই যে ভগবন্মাধুর্যের পূর্ণতম স্ফুরণ ইহা বৈষ্ণব-সাধকদিগের অনুভূত সত্য ও আস্বাদিত ব্যাপার। 'গোপা'-শব্দের অর্থ গোপনীয়া, রক্ষণীয়া। 'গোপা'র সংগেও আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ঋক্‌বেদে—

"মরুৎস্তোত্রস্য বৃজনস্য গোপা
বয়মিন্দ্রে সনুয়াম বাজং"

গোপীপ্রেম যদি প্রাকৃতকাম হইত তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলার সখা, যদু রাজ মন্ত্রী, পরমভাগবত শ্রীউদ্ধব কি কখনও প্রার্থনা করিতে পারিতেন—"আসামহো চরণরেণু-জুষ'মহংস্যাম্"—আমি যেন বৃন্দাবনের লতাগুল্ম হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারি, কারণ তাহা হইলে আমার ব্রজগোপীদের চরণরেণু লাভ করিবার সৌভাগ্য হইবে। তিনি ব্রজগোপীদের চরণরেণু বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পদরেণুমভীক্ষ্নশঃ।
যেষাং হরিকথোদ্‌গীতং পুণাতি ভুবনত্রয়ম্॥

শ্রীশ্রীরাসলীলার বর্ণনা শেষ শ্রীশুকদেব গোস্বামীর উপদেশ—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চবিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

ব্রজবধূগণের সহিত ভগবানের এই ক্রীড়া যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ অথবা বর্ণনা করেন তিনি ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া অচিরে সংযত হইয়া হৃদয়ের ব্যাধিরূপ কাম হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।

রাস-এর ঐতিহাসিকতা

মহাভারতের সভাপর্বে কুরুসভামধ্যে লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী কাতরকণ্ঠে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে "গোবিন্দ! দ্বারকাবাসিন্। কৃষ্ণ! গোপীজনপ্রিয়!" বলিয়া ডাকিয়াছেন। এছাড়া মহাভারতে আর কোথাও 'গোপীজনপ্রিয়' শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাইনা। কয়েকস্থানে গোবর্দ্ধন ধারণ, পূতনাবধ, কংসবধ, ইত্যাদির উল্লেখ থাকিলেও মহাভারতে রাসলীলার উল্লেখ নাই। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতের পরিশিষ্ট খিল হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে রাসের বর্ণনা থাকিলেও সেখানে রাস 'হল্লীশ' নামে অভিহিত হইয়াছে; রাধা সেখানে অনুপস্থিত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কৃষ্ণ-রাধার রতিক্রীড়ার বর্ণনা মোটেই রুচিসম্মত নয়। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বর্ণিত রাসেও ভাবের গভীরতা নাই, কিন্তু পাতালখণ্ডে দেখি রাধা ভাবময়ী কৃষ্ণবল্লভা। ব্রহ্মবৈবর্ত ও পদ্মপুরাণ—এই দুই পুরাণেই অবশ্য রাধা রাসেশ্বরী। বৃন্দাবনের গোপকন্যাদের সহিত কৃষ্ণের 'হল্লীষ' ক্রীড়ার বর্ণনা খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের কবি ভাস রচিত 'বালচরিতম্'—নাটকে দেখা যায় (২৮)

শ্রীমদ্ভাগবতের রচনাকাল

শ্রীমদ্ভাগবতের রচনাকাল সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্ববর্তী কোনো গ্রন্থে আজপর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ চোখে পড়ে নাই। দ্রাবিড়ের আলবার সম্প্রদায়ের দ্বাদশ আচার্যের অন্যতম ত্রিবাঙ্কুরাধিপতি কুলশেখররচিত 'মুকুন্দমালায়' শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২।৩৬ সংখ্যক শ্লোকটি উদ্ধৃত আছে। আচার্য কুলশেখর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। দ্বাদশ শতকের আনন্দতীর্থ স্বীয় গ্রন্থে প্রমাণস্বরূপ ভাগবতের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাকে রূপক মনে করিয়া যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা তত্ত্বসম্মত না হইলেও একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বিষ্ণুপুরাণের পূর্ববর্তী কোনো পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার উল্লেখ দেখিনা; বিষ্ণুপুরাণের প্রাচীনতা সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়াও সহজ নয়। বিদ্যানিধিমহাশয় জ্যোতির্বিজ্ঞানসম্মত বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা (২৯) শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জ্জুনভঙ্গ-লীলার সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০০ অব্দ! তাঁহার মতে মহারাজা পরীক্ষিতে জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪১ অব্দ। সুতরাং যাঁহারা বিদ্যানিধি মহাশয়ের যুক্তি ও নির্দ্ধারিত সময়কে স্বীকার করিয়া লইতে পারিবেন তাঁহারা অনুমান করিতে পারেন যে শ্রীশুকদেব আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দেড়হাজার বৎসর পূর্বে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত হরিলীলাগাথা মহারাজা পরীক্ষিৎকে শুনাইয়াছিলেন।

ইতিহাসের মূল্য অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু একথাও সত্য যে ইতিহাস ভ্রান্তিমুক্ত নয়। কার্যকারণ সম্বন্ধ, অনুমানাদির উপরনির্ভর করিয়া অনেক সময় ইতিহাসের সিদ্ধান্তে পৌছাইতে হয়। সুতরাং গবেষণার ত্রুটিবিচ্যুতি সবসময় কালাদি নিরূপণ কার্যে-সংগতি রক্ষা করিবেই এমন কথা স্পর্দ্ধার সহিত কেহই বলিতে পারেন না—তা' ছাড়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ আস্বাদনের ব্যাপারে ইতিহাসকে ছাপাইয়া আদর্শ ই স্পষ্টতর হইয়া উঠে, ভৌগোলিক বৃন্দাবন চিৎবৃন্দাবনের ভাবসমারোহের মধ্যে হারাইয়া যায়, বনগোপী মনগোপীরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়া কালের নির্দেশিত পদাঙ্ককে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে প্রেমনির্যাস আস্বাদনের মধ্য দিয়া নব নব রূপে বর্ণে, গন্ধে ভক্তহৃদয়ে মূর্ত হইয়া উঠে। ভক্তের আদর্শ কৃষ্ণ—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং", আর রাধা—"কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তি"।

---

২৬ উজ্জলনীলমণি, রাধাপ্রকরণং
২৭ রাধাতন্ত্র, ১০ম পটল, ৭
২৮ রাসলীলা—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
২৯ পৌরাণিক উপাখ্যান—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

দীপান্বিতা

সঙ্কর্ষণ রায়

কৃষ্ণা ঘরের এক কোণে নিজেকে প্রায় আড়াল ক'রে ব'সেছিল পশম বোনার সরঞ্জাম নিয়ে। ঘরের মধ্যে তার ছোট দুই বোন রমা ও রুমাও ছিল। কি নিয়ে যেন তারা গল্প করছিল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে।

তাদের দাদা প্রকাশ তার বন্ধু পুলক, মিহির ও রমেনকে নিয়ে হাজির হ'ল। ঘরে ঢুকেই প্রকাশ বললে, চট ক'রে চা ক'রে আন তো। ভীষণ চায়ের তেষ্টা পেয়েছে।—ব'লে সে রুমা ও রমার দিকে তাকাল একে একে। রমা ও রুমা দুজনেই উঠবার উপক্রম করতেই কৃষ্ণা ইঙ্গিতে তাদের নিবৃত্ত ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তার বোনার সরঞ্জাম নিয়ে।

একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে প্রকাশ বললে রমা, রুমা, তোরা যে ব'সেই রইলি। আমাদের চায়ের বন্দোবস্ত করবি নে?

রুমা বললে, দিদি তো গেছে।

প্রকাশ বললে, কে—কৃষ্ণা! সে কী এতক্ষণ ঘরে ছিল! আমি তো দেখি নি ওকে।

রুমা বললে, দিদিকে কেইই বা দেখতে পায়!

পুলকের ঠোঁটের কোণে মৃদু একটা হাসি ফুটে ওঠে। সে বললে, উনিও যে কাউকে দেখতে পান তা' মনে হয় না। কারুর দিকেই ওঁর নজর পড়ে না।

প্রকাশ ভুরু কুঁচকে বললে, বড় ঘরকুণো হ'য়ে পড়েছে মেয়েটা।

খানিক বাদে চাকর চা নিয়ে এল। কৃষ্ণা পাঠিয়ে দিয়েছে—নিজে আর আসে নি।

কৃষ্ণা তখন তার নিজের ঘরে ব'সে সোয়েটার বুনছে। প্রকাশের জন্য বুনছে। প্রকাশ বলেছিল, প্রত্যেক বছরই তো আমার জন্য বুনিস—এবারে না হয় রমেনকে একটা বুনে দে।

কৃষ্ণার ভারি রাগ হয়েছিল। কোথাকার কে রমেন, তারজন্য সে সোয়েটার বুনতে যাবে কেন!

রমেন সম্পর্কে দাদার অত দুর্বলতা কেন সে ভেবে পায় না। দাদার বন্ধুদের মধ্যে কারুর সম্বন্ধেই তার উৎসাহ নেই—আর সব বন্ধুদের থেকে তফাৎ ক'রে রমেনকে সে কখনো দেখে নি। রমেনকে তার সামনে এনে দাঁড় করালে সে হয়তো চিনতেই পারবে না।

কৃষ্ণা বেশ টের পায় যে সে ক্রমশঃ নিজেকে তার চার পাশ থেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। বাবার মৃত্যুর পর থেকে সে যেন তার পারিপার্শ্বিক জগৎটা থেকে নিজের যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছে। সে যেন তার পূর্বতন সহজ জীবনটাকে খুঁজে পাচ্ছে না। জীবন-মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়েছে যেন। সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়েছে তার সামাজিক সত্তা।

আর সবাই কী ক'রে যে এত অল্প সময়ের মধ্যে তাদের সামাজিক অস্তিত্ববোধকে ফিরে পেল সে ভেবে পায় না। এক বছরও তো হয় নি। অতি প্রাণবন্ত একটা অস্তিত্বের আকস্মিক পরিসমাপ্তি শুধু নয়—তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে লতিয়ে ওঠা অনেকগুলো অস্তিত্বের বিপর্যয়ও বটে। আর সবাই কী ক'রে ভুলল! সে তো পারছে না।

অতল নৈঃসঙ্গবোধের ভার তাকে একা বহন করতে হচ্ছে। মাকে হারিয়েছে ছেলেবেলায়—আবছা আবছা মনে পড়ে তাঁর মুখ। তাঁর স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টির স্পর্শ সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করে সে। তার নিরালম্ব শূন্যতা-বোধের মধ্যে তাঁর অভাবও এসে মেশে।

পশম বুনতে বুনতে কৃষ্ণা তার মনের ভাবনাগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করে। বাইরের ঘরে রুমা অথবা রমা হঠাৎ খুব উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হেসে উঠল। কে যেন গলার স্বর খুব চড়িয়ে কথা বলছে—বোধ হয় পুলক। ওদের হাসিখুশি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না সে। এক এক সময় অসহ্য লাগে। কী ক'রে হাসে ওরা! কান্নার সমুদ্রের ওপর হাসির হাল্কা ফানুস কী ক'রে ওড়ায়। সে তো পারে না। হাসতে সে ভুলে গেছে। হাসবার চেষ্টাও করে না কখনো।

প্রকাশ ঘরে ঢুকে বললে, একা একা ঘরে ব'সে কী করছিস্ বল্ তো? সবাই বাইরে ব'সে হাসিগল্প করছে—আর তুই—ওরা কী ভাবছে বল্ তো?

কৃষ্ণা বিরক্ত মুখে বললে, যা খুশি ভাবুক গে ওরা—আমার ভাল লাগে না।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রকাশ বললে, কী তোর ভাল লাগে বল্ তো?

কৃষ্ণা বুনতে বুনতে মুখ না তুলেই বললে, একা থাকতে—শুধু একা থাকতে। দোহাই দাদা, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

প্রকাশ বললে, সারা জীবন কী একাই থাকতে চাস্?

গলার স্বর নামিয়ে কৃষ্ণা বললে, হ্যাঁ দাদা।

প্রকাশ উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, কিন্তু আমি তো তা' হ'তে দিতে পারি নে। তোর ভবিষ্যৎ তো আমাকে দেখতে হ'বে।

কৃষ্ণা চুপ করে থাকে।

খানিকক্ষণ বাদে প্রকাশ বললে, রমেন যে তোর জন্যই রোজ এ বাড়িতে আসে তা' জানিস?

কৃষ্ণা অবাক হয়ে মুখ তুলে বলে, আমার জন্য! সে কী দাদা!

—মুখ চোরা ছেলে—মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারে না। তুই তো ওর সঙ্গে ভাল করে আলাপও করিস্ নি।

গম্ভীর মুখে কৃষ্ণা বললে, আমি যে তেমন আলাপী নই, তা' তো জানই দাদা। রমেন কেন, কারুর সঙ্গেই আমি ভাল ক'রে আলাপ করি নি। ও আমি পারি নে। রমা রুমা ওরা পারে—ভালভাবেই পারে। আমি না পারলে কী এসে যায় বল।

প্রকাশ ঢোঁক গিলে একটু ইতস্তত: ক'রে বললে, কিন্তু রমেন যে তোকে ভালবাসে।

কৃষ্ণা চমকে ওঠে। হাত দুটি তার কেঁপে উঠল একটু। পরমুহূর্তে আত্মসংবরণ ক'রে নিয়ে সে বললে, রমেনকে ব'লে দাও দাদা, সে যেন আর এ বাড়িতে না আসে।

বিস্ফারিত চোখে প্রকাশ বললে, ও কী বল্‌ছিস্ তুই!

কৃষ্ণা কঠিন স্বরে বললে, ঠিকই বলেছি। অনর্থক ও কষ্ট পাবে এ তো আমি চাই নে। এ বাড়িতে না আসাই ভাল ওর পক্ষে।

—কী যে বলিস্ তুই! খামোকা ওকে হঠাৎ কী ক'রে বলি বল্ তো এ কথা!

—খামোকা ওকে যাতে কষ্ট পেতে না হয়, তার জন্য বলবে। আমার সম্বন্ধে কোনও রকম দুরাশা পোষণ করবে ও, এ আমার সইবে না।

প্রকাশ আর কিছু বলতে পারল না।

আর বাইরের ঘরে গিয়ে বসে না কৃষ্ণা। নিজের ঘরটির মধ্যে নিজেকে পুরোপুরি গুটিয়ে ফেলে সে। সে যে কত একা ঘরে ব'সে ব'সে তা' অনুভব করতে যেন তার ভালই লাগে। প্রকাশের জন্য সোয়েটার বোনা শেষ হয়। বোনার সরঞ্জাম তুলে রেখে শোপেনহাওয়ারের দর্শন নিয়ে বসে সে।

ঘরের মধ্যে বদ্ধ বাতাস ভারি হ'য়ে ওঠে। এক এক সময় যেন তার দম আটকে আসতে চায়। তখন দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে সে রাস্তার জনস্রোত। এক এক সময় তার মনটা তৃষিত হ'য়ে ওঠে ঐ জনস্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে। কিন্তু কে তাকে তার মধ্য থেকে টেনে বের ক'রে আর সকলের মাঝখানে এনে দাঁড় করাবে!

নীচের ড্রইংরুম থেকে রুমা ও রমার তরলিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। ওদের প্রাণপ্রাচুর্য তার নিষ্প্রাণ সত্তাকে এক এক সময় যেন স্পর্শ করে। ইচ্ছে হয় ড্রইংরুমে

ওদের মাঝখানে গিয়ে বসতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে সামলে নেয়—মনে প'ড়ে যায় যে রমেন আছে সেখানে।

রমা এসে সেদিন বললে, জানিস দিদি, রমেনদা' ছোড়দি'কে বিয়ে করতে চায়।

কৃষ্ণার মনে প'ড়ে গেল, প্রকাশ তাকে মাত্র দিন কয়েক আগে বলেছিল যে রমেন তাকে ভালবাসে। তার ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির আভাস রমার দৃষ্টি এড়াল না। সে সবিস্ময়ে বললে, হাসছিস যে তুই!

কৃষ্ণা আত্মসংবরণ ক'রে বললে, কই না তো। হাঁরে রমা, দাদা জানে তো?

—জানে বইকি। রমেনদা' তো দাদাকেই ব'লেছে। ছোড়দিকে বলে নি।

—সে কী রে! রুমার মত আছে তো?

আছে বই কি।—ব'লে রমা মুখ টিপে হাসল।

খুশির খবর। কিন্তু কৃষ্ণা খুশি হ'তে পারছে না কেন! খুশি হ'বার ক্ষমতাটুকুও সে কী হারিয়ে ফেলেছে! মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোও কী নিষ্ক্রিয়।

ঘরের ছেলের মত এ বাড়িতে অবাধ হ'য়ে ওঠে রমেনের আনাগোনা। তার সঙ্গে এক আধবার আলাপও হ'য়েছে কৃষ্ণার। এড়াতে পারে নি।

রমা তাকে বললে, জানিস দিদি—মিহিরদা আর আসে না।

কৃষ্ণা ভুরু কুঁচকে বলে, মিহির কে?

চোখ কপালে তুলে রমা বললে, ওমা—মিহিরদাকে চিনিস না! দেখেছিস তো ওঁকে।

নিস্পৃহ ভাবে কৃষ্ণা বললে, হয়তো দেখেছি। কিন্তু তাই ব'লে চিনে রাখতে হ'বে তার কী কথা আছে! আসে না কেন তা' তো বললি নে?

মুচকি হেসে রমা বললে, আমি তো তা' জানি নে—ছোড়দি হয়তো জানে।

কৃষ্ণা চুপ ক'রে থাকে। মিহিরের আসা-না-আসায় তার কিছু এসে যায় না। হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার খেলায় কে হারল কে জিতল সে খবর নিতে বিন্দুমাত্রও উৎসাহ নেই তার। হৃদয়ের বৃত্তিগুলি বুঝি তার সব শুকিয়ে গেছে।

মিহির আসে না আর। রমেন ও পুলক আসে। আসে আরও অনেকে—প্রকাশের নতুন নতুন সব বন্ধু-বান্ধব। কৃষ্ণা রমা ও রুমার কাছে শুনল ওরা সবাই মিলে নাকি একটি খেয়ালী সংঘ গ'ড়ে তুলেছে। পুলক সংঘের মধ্যমণি। অনেকেই সভ্য হ'য়েছে।

রুমা কৃষ্ণাকে বললে, দিদি, তুই সভ্য হবি নে?

কৃষ্ণা একটু হেসে বললে, জানিস নে বুঝি যে আমি সভ্যতার বাইরে চ'লে গেছি? সভ্য হওয়া কী আমার পোষায়!

বাইরের ঘরে সন্ধ্যার পরই বসে খেয়ালী সংঘের অধিবেশন। হৈ-হল্লা ও গান-বাজনা। কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড় হয় কৃষ্ণার। নিজের ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে সে ব'সে থাকে।

প্রকাশ এসে বন্ধ দরজায় ঘা দেয়। বলে, কৃষ্ণা আয় না আজ বাইরের ঘরে। গান বাজনা হ'বে আজ।

কৃষ্ণা ভেতর থেকে জবাব দেয়, হোক গে। গোলমাল সইতে পারি নে।

—গান-বাজনাও তোর কাছে গোলমাল! দিন দিন তোর যে কী হ'চ্ছে ভেবে পাই নে।

ঝাঁজালো স্বরে কৃষ্ণা বলে, কাজ নেই ভেবে। যাও না দাদা—অনর্থক কেন সময় নষ্ট করছ?

প্রকাশ বিরক্ত হ'য়ে চ'লে গেল।

কৃষ্ণা ভাবে, এম্নি সকলের স্পর্শ বাঁচিয়ে আর কতকাল সে চলবে। তার সামাজিক সত্তা যে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হ'তে চলল।

বাইরের লোকেদের সঙ্গে মেলামেশাতেই শুধু নয়—ভাইবোনদের সাহচর্যেও যেন তার মনে বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে।

খাবার টেবিলে সেদিন রাত্রে রুমা বললে, কী চমৎকার সেতার বাজালেন পুলকদা'—তুই তো শুনলি নে দিদি!

কৃষ্ণা বললে, তার জন্ম এতটুকু দুঃখ নেই আমার।

রমা বললে, তুই তো জানিস্ নে দিদি—কত কী miss করছিস্ তুই।

প্রকাশ কৃষ্ণার দিকে বক্র কটাক্ষ হেনে বললে, নিজেকে তো আর miss করে নি, তা' হ'লেই হ'ল।

রমা বললে, দিদির চেহারা দিন দিন কী রকম খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে দেখেছিস ছোড়দি?

রুমা বললে, সত্যি। নিজের দিকে এতটুকু নজর দেবে না! সাজগোজের তো ধারই ধারবে না!

কৃষ্ণা মৃদু হেসে বললে, দাদা তো এইমাত্র বললে যে নিজেকে নিয়েই আছি। নিজের দিকে ছাড়া আর কোন দিকে তো নজর দিই নে।

রুমা বললে, আর সকলের দিকে নজর যার নেই, সে কী সত্যি সত্যি নিজের দিকে নজর দিতে পারে!

রমা বললে, দিদিভাই, চুল বাঁধাও তো ছেড়ে দিয়েছিস্।

প্রকাশ বললে, আর ক'দিন বাদে তোদের দিদিভাই বোধ হয় সন্ন্যাসই নিয়ে বসবে।

রুমা চোখ দুটো বড় বড় ক'রে বললে, ইস্ তাই বই কি! দিদিভাইয়ের বিয়ে হ'বে না!

কৃষ্ণা রুমার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, তোদের বিয়ে হ'লেই তোদের দিদিভাই খুশি হয়।

সেদিন গভীর রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে পর কৃষ্ণা তার ঘরের ড্রেসিং টেবিলের সাম্নে এসে দাঁড়ায়। অনেক দিন বাদে নিজেকে ভাল ক'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল— দেখল নিজের প্রতিটি অবয়ব। এ যেন আর সে কৃষ্ণা নয়। কোথায় সেই পুষ্পিত যৌবন-সম্ভার! এ যে শুক্‌নো ফুলের রাশ। তার অজ্ঞাতে তার বুক চিরে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

একদিন বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুর পিঠে নিয়ে নীচের তলায় বারান্দায় ব'সে হেগেলের ডায়েলেক্‌টিক্স্ পড়ছিল কৃষ্ণা। সেদিন খেয়ালী সংঘের অধিবেশন বসবে না। সভ্য-সভ্যারা সবাই বটানিক্‌সে গেছে চড়ুইভাতি করতে। খালি বাড়ি। তাকে বিরক্ত করতে কেউ আসবে না। নিশ্চিন্ত মনে তাই সে বাইরের বারান্দায় এসে ব'সেছে।

এক মনে পড়ে যাচ্ছে কৃষ্ণা। কোন দিকে খেয়াল নেই তার।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে সে চমকে চোখ তুলে তাকাল।

দেখল একটি অপরিচিত যুবক তার সাম্নে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্কোচভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। আশ্চর্য সুন্দর তার চোখ দুটি। সুদূর আকাশের নীলিমার গভীরতা আছে তাতে। কিন্তু চেয়ে আছে কেন অমন ক'রে? কিছু বলবে তো বলুক।

যুবকটির চোখের চাওয়ায় বোধ হচ্ছিল যেন সদ্যোদ্‌ঘাটিত এক পরম বিস্ময়ের সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে সে। কৃষ্ণার সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে।

যুবকটি অবশেষে বলে, প্রকাশ আছে?

কৃষ্ণা কোন মতে মুখ নীচু ক'রে বললে, নেই। সবাই মিলে বটানিক্‌সে গেছে পিক্‌নিক্ করতে।

যুবকটি বলে, ও।

হেগেলের বইখানা দু'হাত দিয়ে চেপে ধ'রে কৃষ্ণা মুখ নীচু ক'রে ব'সে থাকে। চোখ তুলে আর পারে না তাকাতে। তার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস। অননুভূত লজ্জার শিহরণ তার সর্বাঙ্গে।

যুবকটি একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললে, আমি তা' হ'লে চলি।

কৃষ্ণা কিছু বলতে পারল না। উৎসুক দৃষ্টিতে সে শুধু যুবকটির গমন পথের দিকে চেয়ে রইল।

জানা হ'ল না যুবকটি কে। নামটিও তো জেনে নিতে পারল না সে। প্রকাশের সঙ্গে কী তার দরকার তা'ও তো জিজ্ঞাসা করতে পারে নি।

হয়তো সে খেয়ালী-সংঘেরই সভ্য। হয়তো রোজই এ বাড়িতে আসে। ইচ্ছে করলে আবার হয়তো তাকে দেখতে পারবে সে। কিন্তু অব্যক্ত বেদনায় তার বুকের ভেতরটা টনটন্ ক'রে ওঠে কেন! ঐ যে সে বাড়ির সাম্নের রাস্তা দিয়ে চ'লে যাচ্ছে—যেন ঊষার সোনালী আভার মত তাকে নিমেষের জন্য ছুঁয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে — আর যেন ওকে ধরা যাবে না।

সন্ধ্যার পর বটানিক্স্ থেকে ফিরে এল প্রকাশ, রমা ও রুমা। বারান্দার অন্ধকারে কৃষ্ণাকে ব'সে থাকতে দেখে প্রকাশ বললে, অন্ধকারে ব'সে আছিস কেন? আলোটা জ্বেলে নিতে পারিস নে? না আজকাল তোর আলো সহ্য হচ্ছে না?

কথাটা কৃষ্ণার বুকে বেঁধে। আর্ত চোখে তাকায় সে প্রকাশের মুখের পানে।

রমা সোচ্ছ্বাসে বললে, বটানিক্‌সে কী যে মজা করলাম আমরা, জানিস দিদিভাই।

প্রকাশ হেসে বললে, তোদের দিদিভাই কোনও রকম মজা বরদাস্ত করতে পারে না। ও কথা মুখেও আনিসনে ওর কাছে।

কৃষ্ণা বললে, তোমার এক বন্ধু এসে ছিলেন দাদা।

প্রকাশ সাগ্রহে প্রশ্ন করলে, কে? কী নাম?

—তা' তো জানি নে।

—জেনে নিতে পারলি নে? কী রকম দেখতে বল্‌তো।

কৃষ্ণা আরক্ত মুখে বললে, তা' তো দেখি নি।

প্রকাশ মুখ টিপে হেসে বললে, তোকে জিজ্ঞেস করাই ভুল হয়েছে আমার। কারুর দিকে চোখ তুলে তাকাবি তুই—এ কী কথনো হয়!

কৃষ্ণা কিছু বলে না। একটা তরঙ্গোচ্ছ্বাস তার বুকের মধ্যে উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে।

রুমা বললে, ব্রতীনবাবু এসেছিলেন বোধ হয়।

প্রকাশ বললে, ব্রতীন তো হুগলি গেছে। সে আসবে কী ক'রে। কে যে এসেছিল—নামটাও যদি জেনে রাখতিস—

প্রকাশ ভুরু কুঁচকে ভাবতে থাকে।

পরদিন বিকেলে আয়নার সাম্নে চুল বাঁধতে বসে কৃষ্ণা। বহু দিনের না-বাঁধা রুক্ষ চুলের ভার যেন চিরুণীর শাসন মানতে চায় না। চুলে চিরুণী চালাতে চালাতে কৃষ্ণা আয়নায় ফুটে-ওঠা তার মুখের দিকে ভাল করে তাকায়। নিজের দৃষ্টিতে নয়—আর কারুর চোখের দৃষ্টির আলোয় যেন নিজেকে দেখে। কী দেখছিল সে অমন ক'রে? রুক্ষ চুলে ঘেরা তার শুকনো মুখে কী আবিষ্কার করেছিল সে? জানতে কী পারবে কথনো!

চুল বেঁধে হাল্কা নীল রঙের একটি শাড়ি পরল কৃষ্ণা। মৃদু প্রসাধনের প্রলেপ বোলাল মুখে। কাজল আঁকল চোখে। তারপর বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

রমা ও রুমা তখন তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। কৃষ্ণাকে দেখে তারা অবাক। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তার মুখের পানে চেয়ে রমা বললে, ওমা, দিদিভাইকে কী মিষ্টি দেখাচ্ছে! এম্নি রোজ সাজলে তো পারিস দিদিভাই।

প্রকাশ এসে ঠাট্টা ক'রে বললে, কী রে কৃষ্ণা, তোর কৃষ্ণপক্ষ কী শেষ হ'ল নাকি! ব্যাপার কী বল তো? নাম লেখাবি আজ আমাদের খেয়ালী সংঘে?

রুমা সোৎসুক কণ্ঠে বললে, তাই নাকি রে দিদি?

রমা হাততালি দিয়ে বললে, ভারি মজা হ'বে তা'হলে।

কৃষ্ণা বললে, না রে না—ও সব সভ্য-টভ্য হওয়া আমার পোষাবে না।

রমা হতাশাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী ক'রে বললে, তবে!

কৃষ্ণা হেসে বললে, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'লাম ব'লে যে তোদের সংঘের সভ্য হ'তে হ'বে তার কী কথা আছে!

ব'লে সে রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল খেয়ালী সংঘের সভ্যদের জন্য চা-জলখাবারের তদারক করতে।

রান্নাঘরে তাকে দেখে ঠাকুর-চাকর সবাই অবাক। রামশরণ অনেকদিনের পুরোণো চাকর। সে বললে, বড় দিদিমণি, তুমি এখানে কেন? বাইরের ঘরে গিয়ে বোসো।

কৃষ্ণা বললে, কেন আমার কী এখানে আসতে নেই? বাইরের ঘরেই বা গিয়ে বসব কেন?

রামশরণ বললে, ওখানে দাদাবাবু দিদিমণিরা সব নেকচার দিচ্ছেন।

কৃষ্ণা হেসে বললে, নেকচারে কাজ নেই আমার।

খেয়ালী সংঘের সভ্যদের জন্য চা-জলখাবার চ'লে যায়। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে কৃষ্ণা। ভাবে নিজের ঘরে চ'লে যাবে কিনা।

বাইরের ঘরে সোরগোল চলেছে। অনেকে মিলে কী নিয়ে যেন আলোচনা করছে। কৃষ্ণা আস্তে আস্তে খাবার ঘর ও বাইরের ঘরের মাঝখানকার প্যাসেজে এসে দাঁড়ায়।

উৎকর্ণ হ'য়ে শোনে কৃষ্ণা। কী নিয়ে আলোচনা চলছে সে সম্পর্কে অণুমাত্রও ঔৎসুক্যও নেই তার। সকলের সম্মিলিত গলার স্বরের মধ্যে সেই কণ্ঠস্বরটিকে খোঁজে সে।

খুঁজে পায় না। অনেকের মধ্যে সে হারিয়ে গেছে। উদ্ধার করতে পারবে না তাকে?

পারে না। দিনের পর দিন শুধু বাইরের ঘরের দরজার সাম্নে উৎসুক কান পেতে থাকে—তার উৎকর্ণ শ্রবণ বৃথাই

প্রতীক্ষা করে সেই মধুরতম স্বরের উন্মেষের। হয়তো ভিড়ের মধ্যে চাপা প'ড়ে গেছে—আর সকলের মুখরতায় স্বর মেলাতে পারছে না।

রমা একদিন তাকে আবিষ্কার করল বাইরের ঘরের দরজার সাম্নে দাঁড়িয়ে থাকতে। সে অবাক হ'য়ে বললে, এ কী দিদিভাই—তুই এখানে দাঁড়িয়ে যে!

ঈষৎ অপ্রস্তুতভাবে কৃষ্ণা বললে, তোদের গান শুনছিলাম।

—ভেতরে গিয়ে শুনলেই তো পারিস্।

কৃষ্ণা শিউরে উঠে বললে, না ভাই, ভেতরে আমি যাব না।

রমা একরকম জোর ক'রে তাকে ভেতরে নিয়ে গেল।

তার মনের সঙ্কোচের বাধা ডিঙ্গোতে পারে নি এতদিন—কাজেই রমার প্রতি মনে মনে কৃষ্ণা কৃতজ্ঞতাই বোধ করল।

খেয়ালী সংঘের জমাট আসরে হঠাৎ যেন চিড় ধরল কৃষ্ণা ঘরের মধ্যে ঢুকতেই। সংঘের সভ্য-সভ্যাদের সকলের দৃষ্টি তার ওপর এসে পড়ে। কৃষ্ণা সঙ্কুচিত বোধ করে রীতিমত। কোনমতে একটি চেয়ারে ব'সে পড়ে সে।

যারা কৃষ্ণাকে চিনত না তাদের চেয়েও উৎসুকভাবে তার দিকে তাকায় পুলক। কৃষ্ণাকে যেন সে চিনতে পারছে না। এ কী আশ্চর্য রূপান্তর!

সে খাতা খুলে বললে, এখন থেকে তা' হ'লে আপনাকে আমাদের একজন হিসেবে ধ'রে নিতে পারি।

কৃষ্ণা একটু হাসল—কিছু বলল না।

প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে উঠে কৃষ্ণা একে একে প্রত্যেকের দিকে তাকাল। কিন্তু তাকে দেখতে পেল না। আসে নি সে। অন্তরালে যার সান্নিধ্য সে প্রাণমন দিয়ে অনুভব করেছে, তার অনুপস্থিতিতে মনে মনে আচমকা একটা ধাক্কা খেল। হয়তো সে এ সংঘের আসরে আদৌ আসে না।

কিন্তু এ-ও তো হ'তে পারে যে সে আজ অনুপস্থিত। কৃষ্ণার মনে একঝলক আলোর মত এই সম্ভাবনাটির উদয় হয়।

সভার শেষে পুলক বললে, আজ তিনজন অনুপস্থিত। এঁরা অনেকদিন ধ'রে আসছেন না।

কৃষ্ণার মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। অনুপস্থিতদের মধ্যে সে-ও হয়তো আছে। আজ আসে নি—কাল নিশ্চয়ই আসবে।

অনুপস্থিত তিনজনের নাম জেনে নিতে ইচ্ছে করে কৃষ্ণার। রমা বা রুমাকে জিজ্ঞেস করবে কী? থাক গে। কিছু হয়তো ভেবে বসবে ওরা।

পরদিন আরও যত্ন ক'রে সাজ করে কৃষ্ণা। ফিকে নীল রঙের সিল্কের শাড়ি পরে—কপালে আঁকে কুঙ্কুম টিপ—খোঁপায় জড়ায় বেলফুলের মালা। কিন্তু সে এল না।

সে কী আসবে না! কৃষ্ণার চোখের কাজল জলে ধুয়ে যায়।

পুলক একদিন বললে, একজনের নাম কাটা গেল আজ।

কার! কৃষ্ণা উৎসুক দৃষ্টিতে পুলকের মুখের পানে তাকায়। যার নাম কাটা গেল তার সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না কেউ। কী তার নাম—জানতে পারল না কৃষ্ণা।

নতুন ক'রে কৃষ্ণাকে দেখছে পুলক। বার বার দেখেও তার আশ মেটে না। এতদিন ধ'রে দেখে এসেছে—কিন্তু কুহেলিকা উদ্‌ঘাটন করা সূর্যের মত তার এই আত্মপ্রকাশ পুলকের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। অতি-সাধারণ মেয়েটি কোন্ শুভ্র সুদূর স্বর্গের আলোয় অবগাহন করেছে? কোন্ আলোয় প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে তার মুখখানা? পরম একটা বিস্ময়ের মত পুলকের সমস্ত মন জুড়ে থাকে সে।

কৃষ্ণার চোখের জলে তার মাথার বালিশ ভিজে যায়। তার জীবন-যৌবন মন্থন করা অমৃতভাণ্ড নিয়ে আর কতকাল প্রতীক্ষা করবে সে!

সেদিনও হতাশ মনে কৃষ্ণা তার ঘরে ফিরে এসেছে। মনের উদ্গত কান্নাটাকে চেপে সে শুয়ে পড়েছে তার বিছানায়। এমন সময় চাকর তার হাতে একটি চিঠি গুঁজে দিয়ে গেল। বললে, পুলকবাবু দিয়েছেন।

আকস্মিক বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে কৃষ্ণার চোখ দুটি। পুলক তাকে চিঠি লিখেছে কেন!

চিঠিটা খুলে পড়ল সে। পড়তে পড়তে পাথরের মত কঠিন হ'য়ে ওঠে তার কমনীয় মুখখানা।

অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন চিঠিটার পংক্তিতে পংক্তিতে। এ কী দুঃসাহস পুলকের!

দুঃসহ জালায় ঝলসে ওঠে কৃষ্ণার চোখ দুটি।

পরক্ষণে অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা হ'য়ে আসে তার দৃষ্টি। তার ওপরে অভিমানে মনটা ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। সে তো এল না—তবু তাকে টেনে আনল বাইরে দুঃসহ অপমানের মাঝখানে।

চিঠিটা টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে কৃষ্ণা।

খেয়ালী সংঘের আসরে আর কখনো তাকে দেখা যায় নি।

দ্বিজেন্দ্র কাব্যে প্রেম

শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-টি

প্রেমই জীবন। হৃদয় শতদলের পাপড়িগুলি একটির পর একটি ফুটিয়া দেবতার পায় উৎসর্গ করিয়া ধন্য হয়। প্রেমের স্পর্শে সামান্য হইয়া উঠে অসামান্য, প্রেমের পরশ রতন সম্বল করিয়া দৈনন্দিন অশান্তির মধ্যে শান্তি, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য, সীমার মাঝে অসীমের বোধনের রাগিণী বাজিয়া উঠে। প্রেমের মহৎ স্পর্শেই দিব্যের অনুভূতি,—অসীম নিঃসীম আনন্দলোকের আভাস জাগে। তাই কবি যুগে যুগে বারে বারে নূতন সুরে প্রেমের তান তোলেন। বাংলার কবি দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁহার মনোবীণায় প্রেমের সূক্ষ্ম নিপুণ ঝঙ্কার দিয়াছেন।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু নৈর্ব্যক্তিক রক্তমাংসসংস্রবহীন প্রেমের ঠিকা বাসিন্দা নহেন। কবির সৌন্দর্য্যানুভূতি জাগিয়াছে জগতের মাঝে দেহের মাঝে, "মাংসের শরীরে" "জীবন্ত হৃদয়ের" অনুভূতিতে, কবি-পত্নীর প্রেমের মধ্যেই স্বপ্নের মোহন স্পর্শ লিরিকের গীতি-মূর্চ্ছনা জাগিয়াছে। কবি প্রেমের মোহন স্পর্শে অভিভূত ও আবিষ্ট। কবি বিস্ময়ের আবেশে যেদিকেই চাহিতেছেন, দেখিতেছেন শুধু অকারণ পুলকশিহরণ, তাঁহার মনোবীণায় ভাবশিহরণ জাগিতেছে।

কবি এই প্রেমের বাতাসে পাল তুলিয়া দিলেন। দিলেন তাঁহার মনের কপাট খুলিয়া; সাক্ষাৎ মিলিল রূপ-কথার রাজকন্যার সাথে, যে রাজকন্যাকে আমরা গৃহের প্রাচীরের মধ্যে সাধারণতঃ দেখিতে পাইনা তাহার দেখাই-ত পাই বাধাবন্ধহীন পরিবেশে অপরূপ সাজে। মনে হয় পাইলাম। কি পাইলাম তাহা যুক্তি দিয়া বুঝান যায়না, শুধু বর্ণনা করা চলে—শুধু আবেশমুগ্ধচিত্তে বলা চলে:

"ছিল বসি সে কুসুম-কাননে!
আর অমল অরুণ উজল আভা ভাসিতেছিল সে আননে।
ছিল, এলায়ে সে কেশরাশি (ছায়াসম হে)
ছিল ললাটে দিব্য আলোক, শান্তি—অতুল গরিমা ভাসি ;
তার কপোলে সরম, নয়নে প্রণয়,
অধরে মধুর হাসি।

সেথা ছিলনা বিষাদ ভাষা (অশ্রুভরা গো)
সেথা বাঁধা ছিল শুধু সুখের স্মৃতি—হাসি, হরষ, আশা ;

সেথা ঘুমায়ে ছিলরে পুণ্য, প্রীতি,
প্রাণভরা ভালবাসা।"

এই প্রেমই ত প্রেমিকের মনকে চুরি করিয়া লয়। আর চুরি করিবেনা কেন? যে অসীম সৌন্দর্য্যের জগৎ হইতে অপরূপ রূপ লাবণ্য লইয়া তাহারা আবির্ভূত হয়, তাহা-দিগকে না বলিলেও তাহারা শিবের তপস্যা ভাঙ্গিবেই—অকাল বসন্ত জাগিবেই। অপরূপ সৌন্দর্য্যের বিজয় কেতন উড়াইয়া, আনন্দের মোহন বেণু বাজাইয়া তাহারা বিশ্ব-জনকে বলিতে থাকে:

"আজি এসেছি—আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে,
নিয়ে এই হাসি, রূপ, গান।
আজি, আমার যা কিছু আছে, 'নেছি তোমার কাছে,
তোমায় করিতে সব দান।"
আজি তোমার চরণতলে রাখি এ কুসুমহার,
এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি, তোমার অধরে ধরি,
কর বঁধু কর তায় পান;
আজি হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ ভালবাসা,
তোমাতে হউক অবসান।"

তখন সৌন্দর্যাতিয়াসী মানবের চিত্তে রূপের মাঝে অপরূপ, সীমার মাঝেও অসীম সৌন্দর্যের জ্যোতি কল্যাণী গৃহ লক্ষ্মীর মাঝেও যেন চিরন্তনী সৌন্দর্যালোকের সুষমাময়ীর আবির্ভাব ঘটে। প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা এক অপরূপের স্পর্শে রূপান্তর লাভ করে। বিহ্বলচিত্তে পত্নী-প্রেমিকও তাঁহার প্রিয়তমার মাঝে দেখেন সুন্দরকে। তখন কবি বলেন:

"এসেছ তুমি
বসন্তের মত মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘনসম প্রিয়।
এসেছ তুমি
শুধু উজলিতে; স্বর্গীয়
সুন্দর।
কভু ভাবি মনে,
তুমি নও শীত
ধরণীর;
কোন্ সূর্যালোক হতে এসেছিলে নেমে
এক বিন্দু কিরণ শিশির
শুধু গাথা—গীত
আলোক ও প্রেমে
লালিত ও ললিত এক অমর স্বপনে।"

কিন্তু কবি যত নিবিড় যতই একান্ত করিয়া প্রেমসুধা পান করেন, ততই যেন তাঁহার তৃষ্ণা বাড়িতে থাকে। চির-প্রাপ্তির মধ্যে অপ্রাপ্তির, প্রাচুর্যের মধ্যেই অপরিপূর্ণতা. নিবিড় বাহুডোরের মধ্যে বিরহের ছায়া পড়ে। এখানেই ত রোমান্টিক প্রেমের রহস্য। সমস্ত পাওয়ার মধ্যেও না-পাওয়া, সমস্ত হওয়ার মধ্যেও না-হওয়া, সমস্ত মিলনের মধ্যেও বিরহের ছায়া মিলনকে যেন আরও মোহনীয় করে —সাময়িক দুঃখ জাগাইয়া আনন্দের গভীরতা ও মাধুর্য্যকে ঘনীভূত করিয়া তুলে। কবির কাব্যে বাজিয়া উঠে সহসা বহিঃ সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রধনু অতিক্রম করিয়া চিরযুগের চির-শাশ্বত বিরহের মহিমার সুর:

"তোমার হৃদয়খানি আমার এ হৃদয়ে আনি
রাখি না কেনই যত কাছে,
যুগল হৃদয় মাঝে কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে।
এ ক্ষুদ্র পরাণ ভরি যেন পরিমাপ করি
দিয়া প্রেম পুরে না ক সাধ এ;
যত ভালবাসি তাই, আরও বাসিতে চাই—
অপূর্ণ বাসনা পড়ি কাঁদে।"

কবির এই বিরহই শেষ কথা নয়। এই বিরহের পিছনে রহিয়াছে এক অখণ্ড সীমাহীন নিবিড় নিঃসীম সৌন্দর্য্যানু-ভূতির পরিকল্পনা। যে পরিকল্পনায় রূপায়িত হইয়া উঠে এক অখণ্ড প্রেমের আস্বাদন, যেখানে প্রেমিক প্রেমিকা-যুগলে অখণ্ড প্রেমসুধা পান করিতেছে, যেখানে দ্বন্দ্বময় জগৎ তাহার কলকোলাহল লইয়া পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে, রহিয়াছে যুগলে প্রেমিক-প্রেমিকা শাশ্বতের মহিমায় মহিমান্বিত, সর্বদেশকালের ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়া মহাভাবসম্মিলনে। কবির ভাষায়:

"সে দিন এপ্রাণ দুটি, অসীম রাজত্বে উঠি
যাবে নিশি যুগ যুগ বাহি;
জগতের কথা সব এ স্বপ্নবৎ বোধ হবে
জগৎ বিস্ময়ে রবে চাহি।'

যে কবি একদা প্রেমের বাহ্যরূপে আবিষ্ট হইয়া অনুপম বর্ণাঢ্য রামধনু আঁকা সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন—ধীরে ধীরে তিনি বৈতরণী অতিক্রম করিয়া যুগল সম্মিলনের রসাস্বাদন করেন। সুরের আবেশে আবিষ্ট হইয়া কবি মধুর স্বপ্নজগতে আবিষ্ট হইয়াছেন। মনের মাধুরী ঘনীভূত করিয়া কবি সৌন্দর্য্যের আলপনা আঁকিয়াছেন:

"ঘুমায় সুরভিকূলে, নিকুঞ্জে ঘুমায় গান,
ঘুমায় জগত পাশে চাঁদের অলস প্রাণ,—
আয়লো স্বপন খানি

যামিনী বহিয়া যায়,—
অধরে মধুর হাসি
আয়, আয় আয়।"

আর প্রেমাবিষ্ট কবি তাঁহার প্রিয়তমার জন্য কল্পনার ইন্দ্রধনুমণ্ডিত পাথায় ভর করিয়া মালঞ্চের মালাকরের মত জীবন সর্বস্ব ধন অর্পণ করিতে প্রস্তুত। প্রেমিক কবির ভাষায়:

"মেথলা দিব ভানু লেখা আমি নবঘন স্নেহে সিনায়ে,
দিবরে বসন সান্ধ্য মেঘে রঞ্জিত রবির ঘুমটি বিনায়ে,
চরণের তলে দিব অলক্তক
কবির গীত ভকতি রাশি;
দিব ও অধরে অধররাগ—
কিশোর প্রেম স্বপনে হাসি।"

কবির বাহ্য সৌন্দর্য্যানুভূতি নিবিড় হইলেও এখানে পূর্ণতা-লাভ করে নাই। কবির এখনও "প্রেম স্বপন" "অধরে অধররাগের" কথা জাগিতেছে। এখনও যেন অন্তরপথে প্রেমিক প্রেমিকার ব্যবধান রহিয়াছে—এখনও প্রেমের অনুভূতি অপেক্ষা প্রেমের ব্যাখ্যানে কবি যেন ব্যস্ত। এখনও যেন কবির অবচেতন মনে নেপথ্যচারী শ্রোতার প্রেমের জন্য অনুভূতি ও প্রেমের বহিঃসৌন্দর্য্যসুধা বর্ণনায় ব্যস্ত। কিন্তু কবির চিত্ত ইহাতে তৃপ্তিলাভ করিল না। তাই কবি যাত্রা করিলেন আরও গভীরে—অন্তরপথে। এই চলার পথে বাহির পথের কপাট পড়িল—অনুভব হইল অনন্ত জীবনের এক অদ্বৈত-অনুভূতিতে। যে দ্বৈত-সত্তা একদা প্রেমিকপ্রেমিকারূপে জীবন সাগরবেলায় রূপের ভেলায় অপরূপের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিল, তাহারা এই জগৎ হইতে বহুদূরে ভাব সম্মিলনে মিলিত হইল—দ্বৈত প্রেম এক অদ্বৈতের অনুভূতিতে রূপান্তরিত হইল।

কিন্তু জীবনের প্রতি ক্ষণেই কি এই নিবিড় আনন্দ-ঘন পুলক শিহরণ অনুভব করিবার ভাগ্য হয়? জীবন কি শুধু পুষ্পশয্যা? এখানে কি বিরহ নাই? বিচ্ছেদ নাই? উপেক্ষিতা প্রিয়া তাঁহার হৃদয়ের তীব্র বেদনাকে নীরবে নিভৃতে সহ্য করিয়া, পরাণে তুষানলের মত তীব্র জ্বালাকে সহ্য করিয়াও প্রিয়তমের জন্য ফুলমালা গাঁথেন। প্রেমিকের মধুর হাস্য তাঁহাকে ফুলহার রচনায় অনুপ্রেরণা দেয়। প্রিয়তমকে তিনি ফুলহার অর্পণ করিয়া বলেন:

"আমি, সারা সকালটি ব'সে ব'সে, এই
সাধের মালাটি গেঁথেছি
আমি পরাব বলিয়ে তোমারই গলায়, মালাটি
আমার গেঁথেছি

*　　*　　*

"বঁধু মালাটি আমার গাঁথা নহে শুধু বকুল কুসুম কুড়ায়ে;
আছে প্রভাতের প্রীতি, সমীরণ গীতি কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে
আছে সবার উপরে মাখা তার বঁধু তব মধুময় হাসি গো;
ধর গলে ফুলহার, মালাটি তোমার, তোমারই
কারণে গেঁথেছি।"

নিঠুর প্রিয় যদি তাঁহার ফুলহার গ্রহণে পরাঙ্মুখ হন, মিলনসুখে প্রিয়তমার প্রেমের ঋণ শোধ করিতে না চাহেন, তথাপি প্রিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় প্রহর গণিতে থাকেন—তাকাইয়া থাকেন পথের দিকে শবরীর প্রতীক্ষায়। প্রিয়তমার হৃদয়ের কথাটি চিরযুগের প্রেমিকারই কথা—চিরনিরাশার মধ্যে আশ্বাসের কথা, একমাত্র প্রিয়তমাই গভীর বিশ্বাস লইয়া প্রিয়তমের জন্য অপেক্ষা করিয়া বলিতে পারেন:

"আমি রব চিরদিন তব পথ চাহি,
ফিরে দেখা পাই আর না পাই,
দূরে থাক কাছে থাক, মনে রাখ নাহি রাখ,
আর কিছু চাহি নাক, আর কোনও সাধ নাহি।
অবহেলা অপমান, বুকে পেতে লব, প্রাণ।
ভালবেসেছিলে, জানি, মনে শুধু রবে তাই;
আমি তবু তব লাগি নিশি নিশি রব জাগি,
এমনই যুগ যুগ জনম জনম বাহি।"

ভাগ্যগুণে দৈবাৎ যদি আনমনে পথ চলিতে চলিতে প্রেমিকার পর্ণকুটীরে প্রিয়তমের পদধূলি পড়ে, হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত প্রিয়তমের ক্ষণিকের জন্য আবির্ভাব হয়, তখন প্রিয়ার হৃদয় বীণায় সপ্তস্বরা বাঁশীর রাগিণী বাজিয়া উঠে—আনন্দের আতিশয্যে প্রেমিকা তাঁহার "হৃদয়াসন" পাতিয়া "নব প্রেমহার" পরাইবার জন্য লীলাচঞ্চল হইয়া উঠেন—কাতর মিনতি লইয়া প্রিয়া তাহার সর্বস্বই প্রিয়তমকে সমর্পণ করেন—প্রিয়তমার আত্মনিবেদনের ভিতর চিরযুগের তথন চিরমিনতিভরা প্রেমিকার আত্মসমর্পণের সুরটি বাজিয়া উঠে:

"যদি এসেছ এসেছ বঁধু হে—
দয়া করি কুটীরে আমারি ;

*　　*　　*

যদি পেয়েছি তোমায় কুটীরে আমার, আশার অতীতগণি ;
আমি আঁধার পথের ধূলার মাঝারে, কুড়ায়ে পেয়েছি মণি ;
যদি এসেছ দিব হৃদয়াসন পাতি,
দিব গলে নিতি নব প্রেমহার গাঁথি ;
রহিব পড়িয়া দিবস রাতি হে—
—চরণে তোমারি।"

এ আত্মসমর্পণ, আত্ম অবলুপ্তি, আত্মনিবেদন প্রেমের জীবনে একটি বৃহত্তর, শাশ্বত সত্য প্রকাশ করিয়াছে। এই অহৈতুকী প্রেমের নীচ তলাতেই রহিয়াছে মিশ্রিত প্রেম—এ প্রেমে আছে পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্ব, কঠোরতা কোমলতার যুগপৎ প্রকাশ, বিষ ও অমৃতের মন্থন। দ্বিজেন্দ্রলাল অহৈতুকী প্রেমের সঙ্গে এই সত্ত্ব, রজঃ মিশ্রিতলোকের প্রেমেরও সন্ধান রাখেন। তাই তাঁহার নায়িকারা অমিয় মথিয়া শুধু অপ্রাকৃত লোকের প্রেমেরই জয়গানে মুখর নন। তাঁহার প্রেমিকারা মানবীয়গুণে মহিমান্বিত হইয়া সগর্বে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন :

"ওগো, আমরা ভুবন ভোলাতে আসি।
ওগো কখন আমরা গৃহের লক্ষ্মী কখন
আমরা সর্বনাশী
আমরা আধেক কঠিন আধেক তরল,
আধেক অমিয়া, আধেক গরল,
আধেক কুটিল, আধেক সরল,
আধেক অশ্রু আধেক হাসি।
আমরা ঝঞ্ঝার মত অধীর বিরাট,
মলয়ের মত স্নিগ্ধ শান্ত ;
আমরা বজ্রের মত ভীষণ অন্ধ,
কুসুমের মত কোমল কান্ত।
আমরা আনি ঘরে যত আপদ বালাই ;
ব্যাধির মত আসিয়া জ্বালাই ;
দাসীর মত সেবা করি (এসে)
দেবীর মত ভালবাসি

এই চিরদ্বন্দ্বময়ী, চিররহস্যময়ী, কৌতুকময়ী নারীই চির যুগ ধরিয়া মানবের মনকে নাড়া দিয়াছে। প্রেমিক নিজে ব্যর্থতা লাভ করিয়াছে। কণ্টকের আঘাতে হস্ত রক্তাক্ত হইয়াছে। লোক চক্ষুর অগোচরে একান্ত নিভৃতে ছাড়িয়াছে চাপা দীর্ঘশ্বাস। তথাপি তাহার মন মানেনা মানা। শুধু নিজেকে সে সমর্পণ করিতেই চায়—নিজের সুখ দুঃখ প্রেমিকের জন্য নিবেদন করিয়া দেউলিয়া হইতে গর্ব অনুভব করে। সে সগর্বে বলে :

"দিয়াছি হৃদয় তবু পূরে নাক আশা ?
সাগর সমান প্রেমে মিটেনা তিয়াসা,
বিঁধে বা এ ফুলহার, চরণে তোমার
নন্দন কুসুম যার কাছে কি ছার,
ঢেলেছি চরণে প্রাণ, হৃদয়ের ভাষা,
(মোর) হৃদি সুখ, দুখবুক ভরা ভালবাসা।"

কিন্তু প্রেম যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, প্রেমিক যদি প্রেমিকার হৃদয়ের ভাষা বুঝিয়াও না বুঝেন, প্রেমলতা যদি অঙ্কুরেই অবহেলিত হয়, তথাপি প্রেমিক বলেন :

"মনে কত ভালবাসা
আঁধারে লুকায়ে আছে ;
ফুটিতে পারেনা ভয়ে
হিমে ঝরে যায় পাছে ;
হৃদয় গোপন ক'রে
রহে নিজ মানভরে,
ভালবেসে সুখী রহে
প্রতিদান নাহি যাচে।"

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমে আছে লিরিকের সুষমা, নভোলোকে বিচরণ করিবার স্পৃহা। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে বাস্তববাদী দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমের মাঝে চির-শাশ্বত যুগের প্রেমের রাগিণী বাজিয়া উঠে—দিব্যের মোহন স্পর্শে নতুন সুর, নতুন জগৎ, নতুন আলোয় লীলায়িত হইয়া উঠে। কিন্তু ক্ষণিক পরে আবার দেখিতে পাই বাস্তববাদী দ্বিজেন্দ্রলালকে বাস্তবের পটভূমিতে। তখন তাঁহার বীণায় ধ্বনিত হয় মর্ত্ত্যলোকের বাস্তব সুর আশা-নিরাশা, কঠোর-কোমল, দ্বন্দ্ব ও প্রশান্তির সুর। বাস্তবের কঠোরভূমিতে দাঁড়াইয়া কবি আর 'যুগ যুগ চাহি' জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন প্রেমিকপ্রেমিকার যুগলমিলনের চিত্রে বিভোর নহেন। তিনি তখন বলেন কুসুমে ও কীট আছে, মিলনে বিরহ আছে, প্রেম নিবেদনে

প্রত্যাখ্যান আছে। হৃদয় মানেনা মানা। সে ভালবাসা না পাইলেও, প্রতিদান না চাহিয়াও প্রিয়তমাকে ভালবাসিয়াই সুখী। এ সুখ শ্রীকৃষ্ণরাধিকার মিলনের মধ্যে যে বিরহ তৎসঞ্জাত সুখ নয়, এ সুখ সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের মধ্যে, সম্পূর্ণ অবহেলার মধ্যে, নরনারীর প্রেমের মধ্যে, প্রেমিকার অবলুপ্তির মধ্যে। এ প্রেমের আদি ও অন্তে মানবীয় প্রেমের মোহিনী আকর্ষণ, দুর্নিবার ও দুর্বার প্রেমের জয়গানের কথা। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমের মূলে মানব মহিমা। বস্তুতঃ প্রেমের কাব্যচিত্রণে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল মধ্যযুগের রাধাকৃষ্ণপ্রেমের ধারা হইতে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। প্রেমের কবিতায় দ্বিজেন্দ্রকাব্যে নবযুগের চেতনা ও রোমান্টিক মনোভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে।

একদা দ্বিজেন্দ্রলাল নারীর সৌন্দর্যপাথায় ভর করিয়া সে নিঃসীম সৌন্দর্যসুধা পান করিয়াছিলেন, প্রিয়তমার বাহুডোরের মধ্যে যে বিরহের ছায়ায় কাতর হইয়াছিলেন, তিনিই আবার পত্নী সুরবালা সুরলোকে লোকান্তরিত হইলে, সন্তান স্নেহের মাঝেই পত্নীর প্রেমের মূর্তিটি গভীরভাবে অনুভব করিলেন। পুত্রকন্যার অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া তাঁহার হৃদয় যমুনায় যেন পত্নীর গৌররূপটি আরও উজ্জ্বল ও মধুময় হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ বাৎসল্যরসের মাধ্যমেই প্রাত্যহিক ও শাশ্বত প্রেমের দ্বন্দ্ব দ্বিজেন্দ্রকাব্যে এক কেন্দ্রে স্থায়িত্ব লাভ করে। পুত্রকন্যার প্রতি নিবিড় স্নেহপ্রীতিই দ্বিজেন্দ্রলালকে সম্রাট সাজাহান ও প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন চাণক্যের সন্তান প্রীতির নিকট আত্মসমর্পণের চিত্র অঙ্কনে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিগত অনুভূতিই ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির অন্তরলোকের মাধুর্যসুধা আবিষ্কারে অনুপ্রেরণা দিয়াছে। বস্তুতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের রোমান্টিক প্রেমের বিবর্তনে সাজাহান ও চাণক্যচরিত্রের রূপায়ণে বাৎসল্যরস বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাৎসল্যরস দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমের কবিতার বিবর্তনে পরিপূরকরূপে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রকাব্যে কবির পত্নীপ্রেম ও সন্তানপ্রীতি ও কবির ব্যক্তিগত জীবনে গভীর ছায়াপাত করিয়াছে।

মানুষ দ্বিজেন্দ্রলাল গভীর কর্তব্যবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিবেকনিষ্ঠ ব্যক্তি হইলেও, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল কর্তব্যবুদ্ধির উপরে প্রেমের মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন। ন্যায় অন্যায়ের ভূমি অতিক্রম করিয়া প্রেমের রসক্ষেত্রবিস্তৃত সীতা নাট্যকাব্যে বাল্মীকি বশিষ্ঠকে কর্তব্য ও প্রেমের মধ্যে কার স্থান উচ্চে নিরূপণ করিয়া আধুনিক যুগোচিত মনোভাব প্রকাশ করিলেন :

"—কর্তব্য কি উচ্চ প্রেম চেয়ে?
চেয়ে দেখ মহারাজ, চেয়ে দেখ ঋষি—এ-সুন্দর
বিশ্ব মুঞ্জরিত প্রেমে। দিগন্তবিতত নীলাম্বর
প্রেমে উদ্ভাসিত। প্রেমে সূর্য্য উঠে, প্রেমে নীলাকাশে
পুঞ্জে পুঞ্জে জাগে লক্ষ নক্ষত্র, চন্দ্রমা প্রেমে হাসে।
প্রেমে বহে বারিধারা, প্রেমে বিশ্বে নির্ঝরিণী ছুটে।
প্রেমে বিকশিত কুঞ্জে প্রেমে রাশি রাশি পুষ্প ফুটে।
অন্ধকারে প্রেম দেয় আলো, বিশ্ব হাহাকার মাঝে
স্বর্গীয় সঙ্গীতে নিত্য নিয়ত প্রেমের বীণা বাজে!"

এই প্রেমের মধ্যেই প্রসারিত হয় মানব আত্মা ব্যক্তি—সত্তা হইতে ভূমা সত্তায়, বিস্তারিত হয় মানব মাধুরী সীমা হইতে অসীমের দিকে, অসীম ধরা দেয় সীমায়। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় :

'প্রেমে নর আপন হারায় প্রেমে পর আপন হয়।
আদানে প্রেম হয় না কো হীন, দানে প্রেমের
হয় না ক্ষয়।'

* * *

'প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে, প্রেমে নদী উজান বয়,
স্বর্গ মর্ত্যে আসে নেমে,
মর্ত স্বর্গে ওঠে প্রেমে,
প্রেমে গান হয় গগনভরা, প্রেমে কিরণ ভুবন-ময়'।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রেমকে দেখিয়াছেন জীবনের মূলে, অন্তরের অন্তরে। কবি তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি দিয়া নিখিল বিশ্বে সর্বপ্রাণের মধ্যে প্রেমের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। কবি প্রেমের বিচিত্র ও বহুমুখী প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াছেন। না চাহিলেও প্রেমের হাত হইতে নিস্তার নাই—দিগন্তপ্রসারী প্রেমের হস্ত। মানুষ কি ছার, দেবতাও প্রেমের তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন। সকলের জন্যই যে প্রেম কল্যাণের বাণী লইয়া আসে তাহাও নহে। অনেকের নিকট প্রেম আসে মৃত্যুরূপে!

রোমান্টিকধর্মী কবি বাস্তববাদী দার্শনিকের ন্যায়

নিস্পৃহ দৃষ্টি দিয়া প্রেমের আবির্ভাবকে লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রেম বাঁশী বাজাইলে, নিখিল বিশ্ব লুটাইয়া পড়ে তাহার পদতলে, ভুলিয়া যায় ভবিষ্যতের শুভাশুভের কথা। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়:

"যাচ্ছে বোয়ে প্রেমের সিন্ধু উঠ্‌ছে পড়্‌ছে
প্রেমের ঢেউ ;—
কেউ বা খাচ্ছে হাবুডুবু, ভেসে চোলে যাচ্ছে কেউ।
* * *
প্রেমের টানে টেনে আনে জনার্দ্দনে ধরায় জীব,
পাগল, উদাস শ্মশানবাসী প্রেমে ভোলা সদাশিব।
কেউ বা প্রেমে সর্বত্যাগী, কেউ বা চাহে উপভোগ ;
কারো পক্ষে প্রেম আসক্তি, কারো পক্ষে মহাযোগ ;
প্রেমে জন্ম, প্রেমে মৃত্যু, প্রেমে সৃষ্টি, প্রেমে নাশ ;
প্রেমের শব্দ উঠে মর্ত্ত্যে, প্রেমে স্তব্ধ নীলাকাশ।"

প্রেমের ছোঁয়ায় যখন মনের মণিকোঠায় জাগে অপরূপের পরশ, তখন সকল ইন্দ্রিয়ের ঘটে রূপান্তর। এই প্রেমের ছোঁয়াতেই বারবিলাসিনী মাধুরীর অন্তরদেবতা জাগিয়া উঠেন, মাধুরীর হয় নব জন্ম নব জাগরণ! এই প্রেমেই মাধুরীর জীবনে যে রূপান্তর হয়, তাহাতেই সে প্রতিষ্ঠালাভ করে নারীর মহিমায়। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রেমের মধ্যে যে অপরূপ, যে অলৌকিক জ্যোতির আবির্ভাব দেখিয়াছেন, লৌকিক প্রেমের মধ্যে যে অলৌকিক প্রেমের সুষমা দেখিয়াছেন তাহাই পতিতাকেও মহীয়সী করিয়াছে। প্রেমের প্রতি গভীর নিষ্ঠাই দ্বিজেন্দ্রলালকে পতিতার মধ্যে নারীর মহিমা আবিষ্কারে ও নারীকে দেবীর মহিমায় প্রতিষ্ঠা করিতে অনুপ্রেরণা দিয়াছে। হৃদয়ধনী দ্বিজেন্দ্রলাল মাধুরীর মত পতিতার মধ্যেও নারীত্বের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন। কারণ প্রেমই নারীর জীবন। এই সহানুভূতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী পরবর্ত্তীযুগে অবহেলিত নারীর অনুরাগী দরদী শিল্পী শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব সূচনা করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমের অলৌকিকতা ও পবিত্রতা বাংলা সাহিত্যে নব-দিগন্ত নির্দেশ করিতেছে।

প্রদোষে

সুনন্দা দাস

এখনও কি আছে মধু স্ফুরিত অধরে
স্বপ্নশেষ, লগ্নশেষ, শেষের প্রহরে
শান্ত মন, ক্লান্ত মন, তরঙ্গ নিথর,
শুধু শুভ্র ফেনপুঞ্জ, গুঞ্জন মর্মর
মধুর স্মৃতির শয্যা, স্নিগ্ধ আলিঙ্গন,
ভিনাসের উত্তরীয়ে পুরুষ চুম্বন
সময়ের গতিহারা অবাধ্য তারকামণ্ডলী,
সাক্ষী ছিল, গুণেছিল, অনিমেষ সেই ক্ষণগুলি।
এখন নিবিড় শান্তি, রৌদ্রকণা যত
অঘ্রাণের অনাঘ্রাত ফসলের মত
আবরণ খসে গেছে, হাওয়ার পরশ,
রাত্রি গেছে লজ্জা রেখে রক্তিম প্রদোষ
আঁখির পল্লব কাঁপে ফুরাল কি সব ?
আশাবরী বড় প্রিয় আহির ভৈরব ?

একটি গল্পের খসড়া

দুর্গাদাস সরকার

কখনো জননী, কন্যা কখনো বা। নাম-ভূমিকাতে
প্রধান নায়িকা। নটী রঙ্গমঞ্চে। শ্যামা চণ্ডালিকা
অথবা ডেসডেমনা। লোভী অঙ্গে তবু অগ্নিশিখা।
লাবণ্যের নীল পদ্মে বাসা বাঁধে কীটদষ্ট দাঁতে
যে, সে লোভী সূত্রধার; ঊর্দ্ধমুখে রয়েছে পশ্চাতে
অন্ধকারে চূর্ণ করে দিতে দর্প, ছদ্ম অহমিকা,
মেয়াদী বেতনভোগী উজ্জ্বল মুখের। সাবালিকা
রাত বারোটায় ফেরে রিক্তদেহে পরিপূর্ণ হাতে।
তারপর এ-অঙ্কের অকস্মাৎ যবনিকাপাত।
পঞ্চদশী কন্যা জাগে। কেঁদে ওঠে ঘুমন্ত বালক।
দরজার খোলে খিল দুর্বল যে-ত্যক্ত অধ্যাপক
চাকরি হারিয়ে তিনি যদিওবা একান্ত সচিব—
দু'বেলা কাটিং এঁটে তার দুই পায়ে গেঁটে বাত।
তাখে বোবা চোখে—স্ত্রীর অটোগ্রাফ দিতে ভাঙা নিব।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ইন্দ্রায়ণীতে হঠাৎ ডুব দিয়ে মহাদেব ডাকলেন তুকারামকে: "প্রভু, তুমি সাধু, আমি জানি। তোমার কৃপার্থী আমি। বুঝিয়ে দাও—আমি বুঝতে পারছি না। দেখিয়ে দাও—আমি যে দেখতে শিখি নি আজো।" মনে হঠাৎ গুনগুনিয়ে ওঠে তুকারামের, একটি অভঙ্গ—কটি তটে হাত রেখে সুন্দর পীতাম্বরের ধ্যান মূর্তির বন্দনা :

সুন্দর তেঁ ধ্যান উভেঁ বিঠেবরী
কর কটাবরী ঠেবুনিয়াঁ।

প্রার্থনা আরো নিবিড় হ'য়ে ওঠে : "যে-আলোর বরে তাঁর ত্রিভঙ্গ মূর্তি দেখে বেঁধেছিলে এ-গানটি তার এক কণিকা আমাকে দাও—যাতে আমিও দেখতে পাই।... তোমারি প্রার্থনার সুরে সুর সেধে প্রার্থনা করছি প্রভু :

তুকা ম্হণে পণ্ঢরিনাথ! ক্ষমা করী অপরাধ!

কত অপরাধে অপরাধী আমি, প্রভু, তবু তুমি ক্ষমাময়, ক্ষমা না করলে আমার ভরসা কোথায়?"

বাইশ

ইন্দ্রায়ণীর পুণ্যসলিলে মহাদেবের দেহমন জুড়িয়ে গেল। ফিরে এসে বিছানায় শুতেই ঘুমে এলিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন এক আশ্চর্য স্বপ্ন!

সেই দিব্যকান্তি পুরুষ...অবিকল সেই মূর্তি... সাদা দাড়ি, সাদা চুল। বললেন মহাদেবের মাথায় হাত রেখে : "কেন মিথ্যে নিয়তির সঙ্গে যুঝছ বাবা? যা থাকবে না তাকে কি আগলে রাখতে পারে কেউ? মুঠো শক্ত করলেই কি জল ধরে রাখা যায়?"

তাঁর করস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে মহাদেবের মেরুদণ্ড বেয়ে ঝিলিক খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে-বিদ্যুৎপ্রবাহে শিরায় শিরায় নিবিড় শান্তি বহিয়ে যায়। দেহ মনে—কই অবসাদের চিহ্নলেশও তো নেই! বললেন আবিষ্ট স্বরে, "সাধুজি এরি নাম কি দীক্ষা? দিব্যকান্তি পুরুষ ঘাড় নেড়ে মৃদু হাসলেন। মহাদেবের ঘুম ভেঙে যায়। পাশের গাছে কোকিল ডাকছে কু—উ, কু—উ—কুকু—কুকু—কুকু কুকু—কু—উ।

ইন্দ্রায়ণী নদীতে স্নান ক'রেই তিনি প্রথম এমন গভীর শান্তি পেয়েছিলেন কাল নিশুত রাতে। মহাদেব প্রফুল্ল মনে ফের ইন্দ্রায়ণীতে নেমে তর্পণ করতে করতে প্রার্থনা জানালেন তুকারামকে :

"ঠাকুর, তুমি আমাদের গৃহদেবতার চেয়েও আপন—কারণ জীবন্ত। আশীর্বাদ করো—যেন ফের আঁকড়ে ধরতে চেয়ে মিথ্যে না জ'লে পুড়ে মরি। যা যাবার তা যখন থাকবে না, যাদের আপন ভাবি তারা যখন আপন নয়—তখন এবার অতীতকে বিদায় দিয়ে নব আগমনীর বরণমালা গাঁথার দীক্ষা দাও। মনে পড়ল একটি হিন্দী গান প্রহ্লাদ চমৎকার গাইত গজল ঢঙে :

জো নজর আতে হৈঁ নহি আপনে,
জো হয় আপনা নজর নহি আতা।
দেখা দেয় যারা নয় তো তারা আপন,
আপন যে—তারি মিলিল না দরশন।

তেইশ

বিষ্ণুঠাকুরকে অভ্যর্থনা করতে মহাদেব মন্নুভাইয়ের বড় মোটরে বম্বে গেলেন তার সঙ্গে। ব্রিগেডিয়ার দেশাইয়ের মস্ত ক্যাডিলাক মোটরে ক'রে তিনি গেলেন শ্রীমতী দেশাইকে নিয়ে। মন্নুভাইয়ের মোটরে বিষ্ণুঠাকুর ও দেশাইয়ের মোটরে গুরুমা, বিপিন ও ধ্রুব বসতে বিষ্ণুঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন মন্নুভাইকে – চারজনের থাকার কী ব্যবস্থা হয়েছে। মহাদেব বললেন : আমি চেয়েছিলাম আমার ওখানে রাখতে কিন্তু আমার ওখানে মাত্র একটি ঘর আছে অতিথিদের জন্যে। তাই ঠিক হয়েছে আপনারা সবাই মন্নুভাইয়ের ওখানে থাকবেন।" মন্নুভাই একগাল হেসে বলল : "না গুরুদেব—আমার বাড়ি ব'লে কিছুই নেই, সবই আপনার।" মহাদেব মৃদু হেসে বললেন : "বাবাজি আমার কেতাদুরস্ত বটে!" বিষ্ণুঠাকুর হেসে বললেন : "ডি এল রায়ের একটি হাসির গান বাবাজির কৃপায় মনে প'ড়ে গেল :

"আমরা সব রাজভক্ত রাজভক্ত ব'লে চেঁচাই উচ্চরবে,
কারণ সেটার যতই অভাব ততই সেটা বলতে হবে।"

মন্নুভাইয়ের মুখ লাল হ'য়ে উঠল। পথে আর একটিও কথা বলল না। বাড়ি ফিরে বিষ্ণুঠাকুর ও গুরুমাকে গৌরীর জিম্মায় দিয়ে বলল মিষ্টি হেসে : "গুরুদেব যদি অনুমতি করেন তো আমি একটু ঘুরে আসি।" ব'লে সরে গিয়ে একটা স্যুটকেস গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ল। যাবার সময় গৌরীকে ডেকে শুধু ব'লে গেল : "আমাকে পুণায় দুদিন থাকতেই হবে, আমার বন্ধু পিণ্টোর ভাইঝির বিয়ে।"

গৌরী (সবিস্ময়ে) : সে কি বলো? গুরুদেব এলেন, আর তুমি চলে যাচ্ছ?

মন্নুভাই (বিরস কণ্ঠে) : আমি থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি—যখন তোমাদেরই জয় হ'ল। (সিগারেট ধরাতে ধরাতে) আমি দিন তিনেক বাদে আসব। যদি দরকার হয় ডেক্কান জিমখানায় পিণ্টোর ওখানে টেলিফোন কোরো—জোসেফ পিণ্টোর নাম ডিরেকটরিতে খুঁজে পাবে সহজেই

গৌরী (চেঁচিয়ে) : সেই দাম্ভিক বিধর্মী, তার উপর নাস্তিক! তাকে স'য়ে থাকো কেমন করে? উঃ—তাকে দেখলেও আমার গা জ্বালা করে।

মন্নুভাই : যার যেমন গা। আমার গা জ্বালা করে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি দেখলে। পোপ মিথ্যে বলেন নি : "Praise andereserved is scandal in disguise.

ব'লে হর্ণ দিতেই গৌরী নেমে মোটরের হাতল ধ'রে বলল : "দাঁড়াও। কেবল একটা কথা বলতে চাই : (চাপাস্বরে) যে, এও ঠাকুরেরি ব্যবস্থা—গুরুদেবের কৃপার তুমি যোগ্য নও।"

মন্নুভাই (সব্যঙ্গে) : একটা ছড়া মনে পড়ল :

Fallen from grace
Into reason's wilderness

হাতল ছেড়ে দাও (হর্ণ দেয় ফের)

গৌরী : দিচ্ছি, কেবল আমার পাল্টা ছড়াটা শোনো—গুরুমা প্রায়ই বলতেন হেসে : "শঠের মায়া তালের ছায়া।" যার ছায়ায় ঠাণ্ডা হ'তে যাচ্ছ সে শুধু যে তাপ ঠেকাতে পারবে না তাই নয়—আরো জ্বালাবে মনে রেখো।

মন্নুভাই রেগে বাড়ী, ফিরেই দুপেগ টেনেছিল তাই পিঠ পিঠ উত্তর দিল : নটের চেয়ে শঠ ভালো। কেবল এক কথা : নটরাজ প্রস্থান করলেই ফোন কোরো—আমি ফিরে আসব।

গৌরী (হাতল ছেড়ে দিয়ে) : আর আমরা পথ চেয়ে থাকব কখন কংসরাজের অবতংসের পায়ের ধুলোয় দেহের প্রতি ঝোপে গোলমোহর ফুল ফুটবে।

চব্বিশ

তিনদিন হরিকথা, ভজন, নামকীর্তন, আরতি ও প্রসাদের মহোৎসবে দেহু হ'য়ে উঠল আনন্দধাম। পুনা থেকেও অন্তত হাজার দর্শনার্থী বিষ্ণুঠাকুরের ভাগবত পাঠ কীর্তন ও হরিকথা শুনে সবশেষে পিতাপুত্রের ভজন ও অভঙ্গে যোগ দিয়ে ইন্দ্রায়ণীতে স্নান ক'রে প্রসাদ পেল দুটি বাড়িরই অঙ্গনে। এই সব শুভ যোগাযোগের প্রভাবে মহাদেবের মনে এমন গভীর শান্তি নামল যে তিনি ভুলে গেলেন সব ক্ষোভ, চাইলেন পূর্ণ দীক্ষা।

ক্ষোভ ভুলে দীক্ষা চাইতে হয়ত তাঁর একটু দেরি হ'ত, যদি না তিনি মন্নুভাইয়ের কাছ থেকে পেতেন একটি অপ্রত্যাশিত চিঠি। চিঠিটি সে লিখেছিল পুনা এসেই—

মহাদেবকে সাবধান করতে, কিন্তু ফলে উলটো উৎপত্তি হ'ল। কী ভাবে বলতে হ'লে একটু পিছিয়ে যেতে হবে।

মনুভাই আত্মম্ভরী ও অব্যবস্থিতচিত্ত হ'লেও নিজের সম্বন্ধে অন্ধ ছিল না কোনোদিনই। তাই বাইরে নিজের চরিত্রের দুর্বলতার গ্লানিকে যুক্তির চুণকামে সাদা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করলেও জানত খুব ভালো ক'রেই যে তার ছিল না সে নিষ্ঠার জোর যা গৌরীর চরিত্রে ও আচরণে প্রতিপদেই ফুটে উঠত। স্বভাব অপলকা মানুষ যতই কেন না নিজের বলিষ্ঠতার গুণগান করুক, একটা কথা সে হাড়ে হাড়ে জানে: যে, যথার্থ বলিষ্ঠদের সঙ্গে টাগ-অফ-ওয়ারে জিৎবার আশা দুরাশা। তাই এ-হেন হুহুঙ্কারীরা প্রথম দিকে হাজার সিংহনাদ করুক না কেন, তাদের সে-গর্জনের অবসান হয়ই হয় মিউ-মিউ-এর রেশে। মনুভাইয়ের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয় নি: গৌরীর জবরদস্তির কাছে হার মেনে তার দীক্ষা নেওয়ার মূলে ছিল এই দারুণ আত্মপ্রত্যয়ের অভাব।

ফলে সে ক্রমাগতই খুঁজত এমন পথের দিশা—যেপথে চললে সে গৌরীর চোখে বড় হ'য়ে উঠবে। কাশীতে দীক্ষা নেওয়ার জন্যে তার চিত্তগ্লানি হ'লেও সে গৌরীর কাছে ঘড়ি ঘড়ি বড় গলা ক'রেই বলত যে, সে শুধু প্রিয়তমার মন পেতেই দীক্ষা নিতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু হায় রে, এই, গৌরবের শিখর থেকে তাকে লজ্জার গহ্বরে টুপ ক'রে ফেলে দিলেন মহাদেব, বললেন তাকে প্রকারান্তরে যে সে স্বভাবে ক্লীব, স্ত্রৈণ। সে প্রমাণ করতে চাইল—মহাদেব তার 'পরে অবিচার করেছেন। কিন্তু স্বাভাবিক বল যার নেই, সে বাইরের প্রতি ঢেউয়েই গা ভাসিয়ে দিয়ে চলে জেনে শুনেই যে, ঢেউ তাকে নিয়ে যাচ্ছে এমন দয়ে যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন সুকঠিন। তাই বিষ্ণুঠাকুরকে দেখে আশপাশের সার্বজনীন উচ্ছ্বাসের ছোঁয়াচে সে প্রথমটায় (খানিকটা না ভেবেই) মুখ ফসকে ব'লে ফেলেছিল যেকথা শুধু ভক্তের মুখেই সাজে, গুরুদ্রোহীর মুখে নয়। কিন্তু বিষ্ণু ঠাকুর ওর অতিভক্তিকে নিয়ে হাসির গানের নজিরে ওকে নিষ্করুণ ব্যঙ্গ করবামাত্র ও দেখতে পেল যে, পরিবেশের প্রভাবই—যাকে বলে হার্ড-ইনষ্টিংক্ট্‌—ওকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছে যা ও আদৌ বলতে চায় নি। নিজের এ-দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর মন রুখে উঠল—আরো মহাদেব হো হো ক'রে হেসে ওঠার দরুণ। ওর কান উঠল গরম হ'য়ে—এত সাজ-সজ্জা অভিনয় সত্ত্বেও ছদ্মবেশ ধরা প'ড়ে গেছে ভেবে। ছি ছি, কেন ও অনর্থক বিষ্ণুঠাকুরের পায়ের কাদা হ'তে গেল—নৈলে তো এমন অপমানিত হ'তে হ'ত না।

সারা মোটরে ও গুম্ হ'য়ে রইল। গাড়ী হাঁকাতে হাঁকাতে আথাল পাথাল ভাবতে লাগল—কী ক'রে মহাদেবকে গৌরীকে তথা বিষ্ণুঠাকুরকে শিক্ষা দেওয়া যায়—বুঝিয়ে দিয়ে যে, সে কারুর হুকুমবরদার নয়—কারুর তোয়াক্কা রাখে না। মহাদেব তাকে মেরুদণ্ডহীন ক্লীব বলেছিলেন সেদিন রেগে, আজ ভাবলেন—ভণ্ড! ফুঃ! সে দেখিয়ে দেবে সে কী ধাতুতে গড়া! নৈলে মান থাকে না আর।

সে কেবল একটি কথা জানত না—মহাদেবের স্বপ্নে দীক্ষা পাওয়া। মহাদেব তাকে বলেন নি আরো এই জন্যে যে, এ-দীক্ষার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনেই দ্বিধাভাব ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি টের পেয়েছিলেন যে, ভিতরে ভিতরে তাঁর মধ্যে একটা ওলটপালট হয়ে গেছে স্বপ্নের ছোঁয়াচে। তাই তিনি সাগ্রহেই বসে গিয়েছিলেন মনুভাইয়ের মোটরে—শুধু যাওয়া নয়, সান্টাক্রুজে হঠাৎ-জেগে-ওঠা ভক্তির আন্তরিক আবেগেই দিব্যকান্তি যোগীকে বরণ করেছিলেন দণ্ডবৎ প্রণামে। এ যে অভাবনীয়! তাই মনুভাই প্রথমটায় কেমন যেন থ হ'য়ে গেল। কিন্তু তার পরেই ফের সেই দুর্বলতার ফেরে প'ড়ে চাইল মহাদেবের ভক্তিভাবে সায় দিয়ে শুধু তাঁর মন রাখতে নয়, গুরুদেবের চোখেও বড় হ'তে। তাছাড়া যাদের মন দুর্বল ব'লেই স্তবস্তুতি ও তোষামোদে দেখতে দেখতে দুলে ওঠে—তারা সেই নিরবলম্ব আত্মদানের মোহেই ধ'রে নেয় যে, সাধুসন্তরাও চাটুবাণীতে উৎফুল্ল হ'তে বাধ্য। তার মোহ ভাঙল শুধু বিষ্ণুঠাকুরের ব্যঙ্গেই নয়, মহাদেবের কাছেও ধরা প'ড়ে গিয়ে। আন্তর্দাহের জ্বালায় মন পেণ্ডুলাম ফের উধাও হ'ল উল্টোদিকে, সে রুখে উঠে পণ নিল—আর গান নয়, অভিনয় নয়, 'শিলি শ্যালি' নয়—পুরুষসিংহ দাঁড়াবে একাই ধর্মের বিরুদ্ধে। জোসেফ পিণ্টো ছিল গোয়াবাসী খৃষ্টান, তার অন্তরঙ্গ বন্ধু—এক গেলাসের ইয়ার—নাস্তিক তথা বুদ্ধিবাদী বৈজ্ঞানিক।

মোটরেই সে স্থির করল যে, দেহুতে বিষ্ণুঠাকুর ও গুরুমাকে নামিয়ে দিয়েই সে সোজা গিয়ে ধর্ণা দেবে এই দিশারি বন্ধুর দরবারে।

জোসেফ পিন্টো অহঙ্কারী হ'লেও মনুভাইকে সত্যি স্নেহ করত। তাই ক্ষুব্ধ বন্ধুকে সে নিরাশ করে নি—বলিষ্ঠ বুদ্ধিবাদী বিশ্লেষণে গুরুবাদ মন্ত্রতন্ত্র-কে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে প্রবল বৈজ্ঞানিক যুক্তিজালে প্রমাণ ক'রে দিল যে, মানুষের মন সৃষ্টির অরুণোদয় থেকে শুধু ভয়ের তাগিদেই ভগবান্‌কে কল্পনা করেছে, দেবদেবীর সাধুসন্তের পাণ্ডা-পুরুতের গুরুগিরি প্রসাদার্থী হয়েছে। এককথায়, ধর্মের ধুমধাম সবই ফক্কিকারি, শ্রদ্ধাভক্তি প্রণাম উপাসনা—এ-সবই ধাপ্পাবাজির বোলচাল—মিডীভাল। সত্যের সত্য হ'ল রক্তমাংসে গড়া মানুষ—ম্যাটার—আর দর্শনের দর্শন হ'ল hedonism—বস্তুতান্ত্রিক সুখবাদ। সুতরাং তেজস্বী পুরুষকে দাঁড়াতে হবেই হবে ভাগবত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। ও-পথে মানুষের মুক্তি নেই—বিশ্বমানবের একমাত্র ত্রাতা হচ্ছে বস্তুবিচারী বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবাদী বাহ্বাস্ফোট। উপেয় হ'ল—স্বাবলম্বী নাস্তিক্য, আর উপায় হ'ল—জড়বাদী যুক্তির হুকুমবরদার হ'য়ে সমাজকে ঢেলে সাজানো মন ও ইন্দ্রিয়ের সমর্থনে···এই ধরণের আরো কত বোধোদয়ী বুকনি, গুরুগম্ভীর গবেষণা, চমকপ্রদ চারুপাঠ! মনুভাই মহাদেবকে এসব লিখে পিন্টোর এক চারাশি মার্ফৎ পাঠিয়ে দিল—মোটর সাইকেলে।

মহাদেব চিঠিটি পেলেন বিষ্ণুঠাকুরের দেহুতে পদার্পণের ঠিক দুদিন পরে—সন্ধ্যাবেলায়। চিঠি খুলে পড়তে না পড়তে তাঁর রক্ত গরম হ'য়ে উঠল। এত বড় আস্পর্ধা এই মেরুদণ্ডহীন হঠকারীর, সেদিনকার ছেলের! ঈশ্‌! বিলেত গেছে ব'লে অপোগণ্ডটা ধরাকে সরা দেখে! নইলে লেখে:

"আপনি পুত্রস্নেহে মিথ্যাচারী হবেন না মামাবাবু! মনে রাখবেন—সত্যের সোজা পথে চলতে না পেয়ে যারা ভণ্ড গুরুর ভাঁওতায় পাপ পৌত্তলিকতার কুটিল পথ ধরে তারা বড়ই দুর্ভাগা। কারণ তাদের একূল ও-কূল দুকূলই যায়। পিন্টো ঠিকই বলে: 'যারা ভারতবর্ষে পাণ্ডাপুরুত সাধুসন্ত বিশেষ ক'রে so-called গুরুদের বুলিবাজিতে ভোলে তাদের কেবল একটি উপাধি দেওয়া চলে—nincompoop, গণ্ডমূর্খ।' আমি সেদিন বিষ্ণুঠাকুরের সামনে অভিনয় করেছিলাম শুধু তাঁকে expose করতেই, যেমন ডিটেকটিভরা কুচক্রীদলের দলে নাম লেখায় তাদের অন্ধি-সন্ধির খবরাখবর নিতে তাদের হাতেনাতে ধরিয়ে দিতে। আপনি আমাকে ভুল বুঝলেন, ভাবলেন ভণ্ড। আপনার এ-ভুলও একদিন ভাঙবেই ভাঙবে। কেবল আমি চাই না যে, আপনাকে বেশি ঘা খেতে হয়। আর একটা কথা শুধু: বিষ্ণুঠাকুরকে আপনি সেদিন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন কী ব'লে? জানি আপনি ঝোঁকের মাথায়ই এ-ভুল করেছিলেন, কিন্তু আপনি আমাদের মাথা, আপনার এ ধরণের মতিভ্রম হ'লে সর্বনাশ! তাই আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি—অন্ধ ইম্‌পাল্‌স্‌ আবেগের পথে চ'লে এই সব ভণ্ড গুরুদের পায়ে দাসখৎ লিখে দেবেন না। দুদিন আগে আপনি নিজেই তো আমাকে উঠতে বসতে বললেন—মাথা ঠাণ্ডা রেখে পা গুণে গুণে পথ চলতে। কিন্তু বিষ্ণুঠাকুরের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হ'তে না হ'তে আপনি যে-রকম গদ্‌গদ হয়ে উঠলেন তাতে আমার ভয় হয়—পাছে আপনি এই ফাঁপা উচ্ছ্বাসের মোহে পৌরুষ ও বুদ্ধির এলাকা ছেড়ে রাতারাতি স্তাবকতা ও অন্ধবিশ্বাসের রাজ্যে ভক্ত ব'লে নাম কিনতে ছোটেন। পিন্টোও আপনাকে এই সব বৈজ্ঞানিক যুক্তির কথা বিশেষ ক'রে জানাতে বলল। তাই আরো আপনাকে সাবধান ক'রে দিতে আজ বাধ্য হচ্ছি মামাবাবু। মনে রাখবেন—মরদকে মরদ হ'তেই হবে—দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে—আর, শেষকথা: চলতে হবে সুবুদ্ধির নির্দেশে। মনে রাখবেন—বিশ্বাসের দুর্বুদ্ধি যাকে পেয়ে বসে তার শুধু এক উপাধি—ভেড়ের ভেড়ে।"

মহাদেব ছিলেন স্বভাবে বলিষ্ঠ মানুষ—চিরদিন স্বাবলম্বী, নিজের মতেই চ'লে এসেছেন। তাছাড়া স্বভাবে তিনি ছিলেন সেই শ্রেণীর আত্মকেন্দ্রিক মানুষ—যারা না চায় উপদেশ দিতে বা নিতে। তাই ক্লীব জামাতার বিজ্ঞম্মন্য ভর্ৎসনায় তিনি আগুন হ'য়ে উঠলেন, ঠিক করলেন আর দেরি নয়—অন্তত এর শোধ তুলতেও দীক্ষা নিতে হবে—এককথায়, তিনি রুখে উঠলেন সেই পথে চলতে যে-পথে চলতে মনুভাই নিষেধ করেছিল মুরুব্বিয়ানা ক'রে।

কিন্তু আত্মাভিমানী স্বভাব-স্বাবলম্বী মানুষ দীক্ষা নেব বললেই এককথায় সে পণ রাখতে পারে না। তাই দীক্ষা

নেবেন স্থির করতেই তাঁর মনে ফের নানা প্রশ্ন ভিড় ক'রে পথ আগ্‌লে দাঁড়ালো: বিষ্ণুঠাকুরের সান্নিধ্যে তাঁর মনে যে-ভক্তিভাব জেগে উঠেছে, তাঁর প্রস্থানের পরে সে-ভাব উবে যাবে না তো? গেলে কোথায় দাঁড়াবেন তিনি? দেখতে তিনদিন ধ'রে এ-সদ্‌গুরুর জ্ঞান ধ্যান চরিত্র-মাহাত্ম্য, প্রতিভা ও ঔদার্যের পরিচয় পেয়ে তিনি সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু বিচক্ষণ বিষয়ী মানুষের মন তো—কথায় কথায় ধর্মের নামে ডরিয়ে ওঠে, বলে: "সাবধান!" অথচ সেখানে সাবধান হ'তে চায় কে—যেখানে মন পায় প্রত্যক্ষ শান্তি অহেতু আলো, অপূর্ব আনন্দ? কারুর মনে কৃপা যে এ-ভাবে অশ্রান্ত জলপ্রপাতের মতন নামতে পারে—তিনি ভাবতেও পারতেন না যদি তার প্রত্যক্ষ ঝংকারে তাঁর মন না জোয়ার দিয়ে গান গেয়ে উঠত।

কিন্তু এ কী ব্যাপার? যে-ই ঠিক করলেন দীক্ষা না নিলেই নয়, সেই ফের মনে ছেয়ে আসে হাজারো আশঙ্কার মেঘ, উদ্বেগের কুয়াশা! বিষ্ণুঠাকুর এক'দিন পাঠ দিচ্ছিলেন শ্রীরূপ গোস্বামীর পদাবলী থেকে যে সাধকের মন সাধন পথে অগ্রসর হয় এই ভাবে যথাপর্যায়ে:

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি···"

অর্থাৎ সাধনার প্রথম ধাপ শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, সাধনার পথে অনর্থ বা বিঘ্নের অভ্যুদয় ও তার নিবৃত্তি, তার পরে সাধনা চলে তরতর ক'রে নামগানে রুচি হ'লে, কারণ রুচি থেকেই আসে নামাসক্তি তার পরে ভাব ভক্তি—সবশেষে প্রেমের অভ্যুদয়। এবার কি তাই অনর্থ হানা দিল বাদ সাধতে—মন্তুভাইয়ের মাধ্যমে? কিন্তু তার নিবৃত্তি হবে কোন্ পথে!

ভেবেচিন্তে তিনি তারপর দিন সন্ধ্যায় বিষ্ণুঠাকুরকে বললেন—তাঁর একটি প্রশ্ন আছে। ঠিক তার আগেই মন্তুভাইয়ের চিঠিটি পেয়েছেন—এবং তার ফলে দীক্ষা নেবার রোখ ফুলে ওঠা সত্ত্বেও একটা কুণ্ঠার ভাবও উঁকি দেওয়া সুরু করেছে যে! বিষ্ণু ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে: "জানি বাবা! মন্তুভাইয়ের চিঠি তো? আর পিন্টোর প্রবল যুক্তি! ঠাকুর আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন তোমার কথা ভেবেই, বোসো বলছি।"

তাঁর ইঙ্গিতে সবাই বাইরে চ'লে যেতে বিষ্ণুঠাকুর মহাদেবকে আশ্চর্য ক'রে দিলেন চিঠির সব কথা একের পর এক ব'লে। তারপরে বললেন: "আমি জানতাম তোমার সামনে এ-পরীক্ষা আসবেই আসবে—বিশ্বাসের সংকট পরীক্ষা। অর্থাৎ কাকে তুমি বড় মনে করো: যারা দেখে নি তাদের সংশয়কে, না যারা দেখেছে তাদের প্রত্যয়কে, জ্ঞানকে? তোমার দীক্ষা নেওয়ার সময় আসবে তখনই যখন জ্ঞানীর কথায় তোমার পূর্ণ আস্থা আসবে, কারণ তখনই অজ্ঞানের ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে।"

মহাদেব (একটু চুপ করে থেকে): বুঝেছি গুরুদেব। আমি অহঙ্কারী হ'লেও কপট নই, হয়ত পুরোপুরি অন্ধও নই। অন্ততঃ, আপনাকে দেখে আমার চোখের ঠুলি খ'সে পড়েছে। তাই জানি যে সংশয়কে আমি বর্জন করতে পারবই পারব, যদি আপনি আমাকে গ্রহণ করেন। কেবল·· আর একটি প্রশ্ন আছে—যদি কিছু মনে না করেন—

বিষ্ণুঠাকুর (হেসে): একটি কেন বাবা? একান্নটি প্রশ্ন করলেও কিছু মনে করব না আমি।

মহাদেব: প্রশ্নটি এই: আমার স্বপ্নে দীক্ষা দিয়েছিলেন কি আপনি—না আমার মনের ভুল?

বিষ্ণুঠাকুর (তার মাথায় হাত রেখে): মনের ভুল নয় বাবা। সত্যিই দেখেছ। আমি এসেছিলাম দুবার—একবার কলম্বোয়, একবার এখানে। কলম্বোয় ছুঁয়েছিলাম, এখানে তোমাকে ধরেছিলাম আর পালাতে পারবে না তো।

মহাদেবের রোমাঞ্চ হ'ল আনন্দে, চোখে জল উঠল উথ্‌লে। আবেশে খানিকক্ষণ চোখ বুঁজে থেকে পরে বিষ্ণুঠাকুরের পায়ে মাথা রেখে চুপ ক'রে রইলেন। শুধু "জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু" জপ বেজে ওঠে তাঁর হৃদয়-তন্ত্রীতে। গুরু তাঁর মাথায় হাত রেখে শুধু "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" জপ ক'রে চললেন। শিষ্যের দেহমনপ্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল!

পঁচিশ

দীক্ষাপর্ব সমাপ্ত হ'লে মহাদেব বললেন: "কিছু যদি মনে না করেন তবে আর একটি প্রশ্ন করতে চাই: মন্তুভাই

প্রকৃতিতে অবিশ্বাসী ও স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খল জেনেও আপনি তাকে দীক্ষা দিতে রাজী হলেন কেন?

বিষ্ণুঠাকুর (হেসে): শোনো বলি তবে—যদিও তোমার প্রশ্নটি সরল হ'লেও উত্তর একটু জটিল। কাল আমরা আনন্দিতে যাব, তাই গৌরীও চায় কয়েকটি ব্যবস্থা। তার সমস্যা তোমার চেয়ে গুরুতর। তাই সংক্ষেপেই বলব আজ। যদি আনন্দিতে সময় পাই তবে সেখানে বলব এ সম্বন্ধে আরো কিছু। আজ রাতে শুধু তোমাকে বলতে চাই দুটি কথা: প্রথম কথা এই যে, গৌরীর আধার খুব বড়—প্রহ্লাদেরই মতন। তাই তার সুগম করতে—মানে বাধা খানিকটা কাটাতে—মনুভাইকে দীক্ষা দিয়েছিলাম। চতুর মানুষ ভাবে, বঙ্কুবিহারীকে লাগাবে তার নিজের কাজে—তুতিয়ে পাতিয়ে। কিন্তু আমাদের বাঁকা ঠাকুরটি আরো চতুর—ডিপ্লোম্যাট। তাঁর ভাবটা এই যে চতুরালির দাবাখেলায় তিনি অনেক সময়েই একটা বল বলি দিয়ে কিস্তি মাৎ করেন আরো সহজে। অর্থাৎ তুতিয়ে পাতিয়ে দেবদ্রোহীকে দিয়েও তিনি কাজ হাসিল করতে চান—খানিকটা ওস্তাদের মার শেষ রাতে—এই নীতি মেনে। মনুভাইকে সে সময়ে দীক্ষা না দিলে রমা আসত না, আর রমা না এলে গৌরীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ পিছিয়ে যেত।

মহাদেব: কিন্তু তা ব'লে যে স্বভাবে টলমলে ও গুরুবাদীময়, সে গুরুদ্রোহীও হয় তো এককথায়ই?

বিষ্ণুঠাকুর (হেসে): বাবা গুরুরা জানেন কে গুরুদ্রোহী হ'তে পারে। তবু কি জানো? করুণা গুরুর স্বধর্ম। তাই কৃপার তাগিদে তাঁরা দুর্জনকেও না বলেন না—যদি সে প্রসাদের জন্যে হাত পাতে—অর্থাৎ তাকেও একটা সুযোগ দেন আত্মশোধনের। ঠাকুর গীতায় বলেছেন 'দুরাচারও যদি একমনে তাঁকে ভজনা করে তবে সে রাতারাতি ধর্মাত্মা ব'নে যেতে পারে।' এ কথার কথা নয় বাবা—বহু দুরাচারই তাঁর কৃপার জাদুস্পর্শে ধন্য হ'য়ে গেছে এক মুহূর্তে: যথা বেরি মডলীন, সেণ্ট পল, সেণ্ট ফ্রান্সিস, সয়েলা, বিভীষণ, অজামিল, কালীয়, বিল্বমঙ্গল, জগাই-মাধাই—আরো কত নাম-না-জানা পাষণ্ডী ত'রে গেছে ঠাকুরের বাঁশির একটি ডাকে। ইংরাজীতে একে বলা হয়—চান্স দেওয়া। জীবন বিচিত্র—ঠাকুরের লীলা তথা অভিসন্ধিও দুরবগাহ—কাকে যে তিনি কোন্ আঘাটায় কিভাবে বিষের মধ্যে চুবিয়ে নীলকণ্ঠ করবেন কেউ জানে বাবা? সবার মধ্যেই যখন তিনি আছেন—তখন কে আছে এমন হঠকারী যে বলতে পারে জোর ক'রে—অমুক দুর্বৃত্ত নরকে যাবেই যাবে? বিপিনের কাহিনী তো শুনেছ? ওকে যদি সে সময়ে দেখতে—তাহ'লে নিশ্চয়ই ভাবতে এমন দুরাচারকেও ঠাকুর দিনের পর দিন স'য়ে থাকেন কী ক'রে? কিন্তু ঠাকুরের যে সওয়াই স্বভাব। কত যে সহ্য করেন তিনি আমাদের মন প্রাণ গ'ড়ে নেবার সুযোগ পেতে—তার সব খবর মহাযোগীরাও জানেন না। তাই বলি বাবা—নিজের ভাবনা ভাবাই ভালো, বেশি তদন্ত করতে নেই—মাথা বকাতে নেই—ঠাকুর কেন অমুকের জন্যে তমুক ব্যবস্থা করলেন? কারণ বুদ্ধি দিয়ে যে সব কিছু বুঝতে চায় সে পড়েই পড়ে অথই জলে—অর্জুন যে-অর্জুন—তিনিও হন নি কি দিশাহারা. বলেন নি কি কেঁদে:

> ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে
> তদেব বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্।"

অর্থাৎ কিনা: "তোমার উল্টোপাল্টা কথায় বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায় ঠাকুর, হেঁয়ালি ছেড়ে ধরো সোজাভাষা, বলো—কী করলে ত'রে যাব?"

মহাদেব (একটু চুপ ক'রে থেকে): বুঝেছি গুরুদেব, তাছাড়া এর ওর তার কথাই বা কেন? আমার কাহিনীই নিন না। দুরাচারদের মধ্যে আমিও তো বড় একটা কেও কেটা নই।

বিষ্ণু ঠাকুর (হেসে): না বাবা, তোমার স্বভাবের মধ্যে দেবদ্রোহিতা ছিল মানি—কোন্ মানুষের মধ্যে নেই বলো? কিন্তু খাঁটি দুরাচার বলা চলে কেবল তাদেরই, যারা পেয়েও স্বীকার করতে চায় না যে পেয়েছে—যাক বলে: 'Better to reign in hell than to serve। তাই দেবদ্রোহীদের চেয়েও তারা বেশি দুর্ভাগা যারা ডাক শুনেও সাড়া দিতে চায় না—কেন না তারা হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে চায় এই ভেবে যে, বড়র অপমান করার নামই পৌরুষ, বাহাদুরি। এই জন্যেই বলিরাজ দেবদ্রোহী হ'য়েও পেলেন তাঁর চরণ, কিন্তু ঠাকুর

শিশুপালের একশো অপরাধ ক্ষমা করা সত্ত্বেও সে বদলালো না এতটুকু, বলল—"কৃষ্ণকে পূজ্য উপাধি দেওয়া হ'ল ক্লীবকে রমণীমোহন উপাধি দেওয়ারই সামিল।" তাই দুঃখ এ নয় যে, মনুভাই দেবদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে, দুঃখ এই যে, যে-গুরুর মধ্যে দিয়ে ঠাকুর তাকে প্রথম একটু ছুঁতে পেয়েছিলেন তার ছায়া মাড়াতেও সে আজ নারাজ। ঠাকুর জোর ক'রে কাউকে ভক্তিবর দেন না—ভক্তি পায় কেবল সেই, যে শক্তির মিথ্যা অভিমানকে আমল না দিয়ে চায় তাঁর পায়ে নত হ'তে। এইজন্যেই দেখবে—যুগে যুগে দীনতাকে বরণ করার পথেই ভাগ্যবান মানুষ আপ্তকাম হয়েছে—কেন না নিচু যে হয় সেই পায় সর্বোচ্চ সম্পদ—ঠাকুরের কৃপা—যার বরে সে শুধু যে পরলোকেই কৃতকৃত্য হয় তাই নয়, ইহলোকেও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। খৃষ্টদেব এই গভীর সত্যটিরই আভাষ দিয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন: Blessed are the meek; for they shall inherit the earth." আমাদের মুনিঋষিরাও তাই এই দীনতাকেই সবচেয়ে মান দিয়েছেন, বলেছেন: "তৃণাদপি সুনীচেন"—কেন না যে তৃণের চেয়েও নিচু হবার শক্তি ধরে সেই পারে—সাধুর পায়ে গুরুর পায়ে ইষ্টের পায়ে শরণ চেয়ে আত্মদানের শিক্ষাদীক্ষা পেতে।"

ছাব্বিশ

বিষ্ণুঠাকুর গুরুমা ধ্রুব ও বিপিনকে নিয়ে আলন্দিতে জ্ঞানেশ্বরের সমাধিকে প্রণাম ক'রে প্রয়াণ করলেন পন্ধরপুরে। মহাদেব প্রহ্লাদ ও গৌরীকে নিয়ে ফিরে এলেন দেহুতে। ফেরার পর তাঁকে দেখে সবাই অবাক্। এ কী? যে-বলিষ্ঠ মানুষ কথায় কথায় এত জাঁক করত পৌরুষের, কীর্তির, প্রতিভার—তার চোখে জল আসে গুরুর নাম করতে না করতে—কণ্ঠে ভাবাবেশ জেগে ওঠে ভজনের ধুয়া ধরতে না ধরতে!

মহাদেবের মনে গভীর উচ্ছ্বাস জেগে উঠে গুরুকৃপার কথা ভাবতে না ভাবতে—মনে ঘুরে ফিরে কেবলই বেজে ওঠে তাঁর দীনতা-প্রশস্তি—"দীনতাই শক্তি দেয়, আমাদের নত হ'তে শিক্ষাদীক্ষা দেয় আত্মদানের।…আত্মদান আত্মদান আত্মদান—শুধু এই বরই চাইতে হয়—এইই হ'ল দানের দান, জ্ঞানের পরম দিশারি, ভক্তির শ্রেষ্ঠ পূজারী।"

স্বভাব-বলিষ্ঠ মানুষ সব কিছুই ধরে তার প্রবল আঁকশি দিয়েই। বিশ্বাস সহজে করতে চায় না, কিন্তু একবার বিশ্বাস এলে আর সহজে নড়চড় হয় না। তাই মহাদেবও দেখতে দেখতে ফুটে উঠলেন আশ্চর্য প্রণামের বিশ্বাসের শ্রদ্ধার পথে—স্বাবলম্বী মানুষ হ'য়েও প্রতি পদে চাইতে শিখলেন গুরুর নির্দেশ! প্রহ্লাদ গৌরী সাবিত্রী তাঁর এ-পরিণতি দেখে আনন্দ কোথায় রাখবে ভেবে পায় না যেন।

কিন্তু জগতে কোথাওই এমন কেউ নেই যার চলার পথ নিষ্কণ্টক। এ-পরিবারের কাঁটা হ'য়ে এল মনুভাই। মহাদেবের গুরুমুখী প্রগতি দেখে সে ঠিক সেই অনুপাতে অবিশ্বাসী ও অসংযমী হ'য়ে উঠল, যে-অনুপাতে মহাদেব তার উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে হ'য়ে উঠলেন ধর্মভীরু ও নিষ্ঠাবান্। ফলে মনুভাই প্রায়ই বেরিয়ে যেত ও থাকত তার নাস্তিক বৈজ্ঞানিক বন্ধুর ওখানে। ক্রমশঃ কানাঘুষোয় খবর এল—সে ফের উন্মার্গগামী হ'য়ে উঠছে! গৌরীর মন খারাপ হ'ত প্রথম প্রথম, কিন্তু ক্রমশঃ সে মেনে নিল। বিষ্ণু ঠাকুর তাকে লিখলেন: গীতায় লিখেছে "যার প্রতিকার নেই তার কথা ভেবে মন খারাপ করতে নেই।" গৌরী রমাকে পেয়ে ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল স্বামীর অভাবের, এখন সে আরো মন দিল সাধনায়। কেবল প্রার্থনা করত—যেন মমতার মাথায় রমাকেও আঁকড়ে ধরতে না চায় "আমার" ব'লে। এ-প্রয়াসের ক্ষেত্রে মহাদেবকে দেখে সে বল পেত প্রতি পদেই। প্রহ্লাদ বলত—যে পিতা ছিলেন অজ্ঞানের আজ্ঞাবহ, সংসারে থাকতে এতটুকু অধিকারকেও ছাড়তে চাইতেন না—সে-পিতা এখন তাকেও সঁপে দিতে চাইছেন গুরুচরণে—পিতাপুত্র হ'য়ে দাঁড়ালো গুরুভাই—এ কী অপরূপ দৃশ্য! গৌরীর বুক দশহাত হয়ে উঠত মামার এ আশ্চর্য পরিবর্তন দেখে। বলত প্রায়ই প্রহ্লাদকে: "দেখ্ প্রহ্লাদ একবার নয়ন ভরে দেখ!—ঠাকুর যে বলেছিলেন—তাঁর ছোঁওয়ায় দেবদ্রোহীও "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি"—তার প্রমাণ দেখ হাতে হাতে। যে-মামাবাবু ছিলেন আত্মম্ভরী, সাধুবিমুখ, আত্মকেন্দ্রিক, তিনি গুরুকৃপার ছোঁওয়ায় রাতারাতি হয়ে উঠলেন কিনা গুরুপরায়ণ, শ্রদ্ধাবান্ আত্মভোলা

ভক্তিসাধক! গুরুশক্তির এর চেয়ে বড় প্রমাণ কী হ'তে পারে—বলবি আমাকে ?"

সাতাশ

দত্তাত্রেয় বামন পলুস্করকে সবাই ডাকত বামন ব'লে। কী অনিন্দ্য কান্তি! পাঁচ বৎসরের শিশু—কিন্তু এমন বাড়ন্ত গড়ন যে, মনে হ'ত সাত আট বছরের। ওদিকে রমা সাড়ে সাত বছরের মেয়ে, হেলতে তুলতে সুষমা ঠিকরে পড়ত তার প্রতি ভঙ্গি থেকে। ওরা দুজন যখন খেলা করত মহাদেব সবাইকে ডেকে দেখাতেন: "দেখ দেখ—আমাদের মাটির বাগানে ফুটেছে দুটি স্বর্গের পারিজাত!"

মনুভাই আসত যেত; নানা বিষয়ে অস্থির হ'লেও এক জায়গায় সে বেতাল ছিল না: নানা ফুলের মধু খেয়ে বেড়ালেও কাজ ফাঁকি দিত না। কণ্ট্রাক্টরি কাজে উপার্জন করতও প্রচুর—কিন্তু গৌরীকে সংসারে খরচের বেশি এক পয়সাও দিত না। বলত নির্লজ্জ ব্যঙ্গেই: "স্ত্রীকে যা দেওয়া চলে, হাউসকীপারকে তা' দেওয়া যায় না।"

মহাদেব সাবিত্রীর কাছে এ কথা শুনে রুষ্ট হ'য়ে গৌরীকে বলতেন: "মা, তুমি আমার কাছে প্রহ্লাদের চেয়ে কম আদরের নও। যখন যা দরকার আমার কাছ থেকে চেয়ে নিতে এতটুকুও সংকোচ কোরো না।" কিন্তু গৌরী কিছুই চাইত না দেখে তিনি নানা অজুহাতে এ-ও তা সরবরাহ করতেন, রমার খেলার জন্যে নানা খেলনা, ফ্রক্, চকলেট প্রভৃতি কিনে এনে দিতেন। মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন ওদের নিজের মোটরে কখনো লোনাবালায়, নাসিকে, বেলগাঁওয়ে, কখনো বা জুহুতে, ভীমাশঙ্করে, পন্ধরপুরে। কিন্তু প্রহ্লাদ আর সাবিত্রী বড় একটা যেত না কোথাও, থাকত গৃহবিগ্রহের পূজা, সাধনভজন, নামকীর্তন, আরতি, অতিথিসেবা—এই সব নিয়েই।

আটাশ

এমনি ক'রে আরো পাঁচ ছয় বৎসর কাটার পর একদিন মহাদেব বললেন প্রহ্লাদকে: "তোরা থাক, আমি এবার যাই। আমাদের শাস্ত্রে আছে বাণপ্রস্থের কথা। আমার সময় এসেছে। আমি চললাম গুরুচরণে।"

প্রহ্লাদ (জলভরা চোখে): "অজান্তে কি ফের কোনো অপরাধ করেছি বাবা, যে ছেড়ে যেতে চাইছেন?

মহাদেব (ওকে আলিঙ্গন ক'রে): ছি বাবা! অমন কথা বলে? আর ছেড়ে যাওয়া বলছিস কেন? যখনই ডাকবি তখনই আসব ফিরে। তবে মেঘে মেঘে বেলা তো কম হ'ল না বাবা! তাছাড়া মনে এখন সবে একটু রঙ ধরেছে গুরুর রাঙা পায়ের ধুলোর ছোঁওয়ায়। এ সুলগ্ন ব'য়ে যেতে দেওয়া কিছু নয়। মনে নেই গুরুদেবের গাওয়া সেই ভজনটি:

কিস গুণকা তু মান করে মন? কিস বল
পর ইৎরায়া?
মাটী হো জায়েগী ইকদিন মাটীকী য়ে কায়া।

(একটু থেমে) তাছাড়া গুরুদেবও আমাকে লিখেছেন আসতে। তাই দুঃখ করিস নি—বরং আনন্দ কর যে ডাক এসেছে।

পরদিনই তিনি কাশী রওনা হবেন তার করে দিলেন। তখন দত্তাত্রেয়ের বয়স দশ বৎসর, রমার—বারো।

ঊনত্রিশ

মহাদেব বিষ্ণুঠাকুরের আশ্রমে গিয়ে কাশীবাসী হ'তে চলেছেন শুনে মনুভাইয়ের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। ও থেকে থেকে তাঁকে প্রবল বৈজ্ঞানিক বন্ধুর মেটীরিয়ালিস্ট দর্শনের নজির দিয়ে সুবুদ্ধি দেবার চেষ্টা করত, কিন্তু মহাদেব আমল দিতেন না ওকে, বলতেন: "ষাট বৎসর ধরে বস্তুতান্ত্রিক সুবুদ্ধির জাঁকালো শূন্যবাদের পথে চ'লে দেখেছি বাবা। বিজ্ঞান ও যুক্তির খাসতালুকে তোমরাই থাকো কায়েমী হ'য়ে, অনন্তকাল ভোগ করো এ অন্তঃসারশূন্য বস্তুবিলাস—নিত্যনতুন গ্যাজেট, রঙিণ খেলনা চিনির পানা। আমি এখন পেয়েছি নিজের পথ খুঁজে—স্বাদ পেয়েছি অমৃতের। তবে স্বধর্মে যে নিধনও শ্রেয়ঃ একথা তো তোমরাও মানো, নৈলে কি আর বিজ্ঞানের পথকে স্বধর্ম ব'লে চিনে তোমরা আজ আণবিক দৈত্যের হাতে নিধনও বরণ করতে পারতে এমন হাসিমুখে?'

মনুভাই কথায় এঁটে উঠতে না পেরে হানত শব্দভেদী-বাণ গুরুবাদের বিপক্ষে। বলত: "আমরা যাই করি না কেন, চোখ খুলেই পথ চলি। কিন্তু আপনারা গুরুবাদের

পথে যে চোখে বিশ্বাসের ঠুলি বেঁধে অন্ধ হয়ে চলেছেন অন্ধকারের অ্যাটলান্টিকে ডুবসাঁতার কাটতে।"

এইভাবে মৃদু কথাকাটাকাটি চলত, কিন্তু মহাদেব তর্কাতর্কিকে বেশি আমল দিতেন না, একটু প্রতিবাদ ক'রেই মনুভাইকে থামিয়ে দিতেন এই ব'লে যে প্রাণবন্ত মানুষ যেমন চলতে চলতে পথ বদলায়—তেমনি চিন্তাশীল মানুষও ভাবতে ভাবতে মত বদলায়। কেন না জীবন-বিধাতার বিধানই এই যে "চলাচলম্ ইদং সর্বম্"—জগতে কোনো কিছুই দাঁড়িয়ে নেই।

তবু মহাদেব বাণপ্রস্থী হ'য়ে গুরুগৃহবাসী হ'তে চ'লেছেন শুনে মনুভাই আর থাকতে পারল না, এসে বলল ক্লিষ্ট কণ্ঠে: "এমন কাজ করবেন না মামাবাবু! আমি বড় আশায় বুক বেঁধে ছিলাম এতদিন—যে আপনি শেষে ভুল বুঝবেনই বুঝবেন—এই কুসংস্কারী মিডীভাল ধর্মান্ধতার পথ ছেড়ে ফের চলবেন মডার্ণ মানুষের নর্মাল সুবুদ্ধির পথে। আমি ভেবেছিলাম—এ যুগের আবহাওয়ায় শেষে আপনার চোখ খুলবেই খুলবে যে, এ-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবাদের যুগে গুরুবাদ ও ধর্মের আইডিয়লজি অচল।"

মহাদেব ওকে থামিয়ে দিলেন: "কেন মিথ্যে বকছ বাবা? সচল হিংসার পথে চ'লে অটল বিজ্ঞানের মারণাস্ত্র উচিয়ে চলো তোমরা অব্যর্থ ধ্বংসের পথে আত্মঘাতী যুক্তির পাল তুলে। আমাকে ছেড়ে দাও—আমি তোমাদের না আত্মীয় না বন্ধু। আমাদের সম্বন্ধ খতিয়ে অহি-নকুলের। বনবে না, বনতে পারে না ব'লেই।

ত্রিশ

মহাদেবের অগস্ত্যযাত্রার কয়েকমাস পরে মনুভাই পিন্টোর উপদেশে গৌরীকে দেহুর গুরুবাদী পরিবেশ থেকে ছিনিয়ে নিতে চেয়ে তাকে না ব'লে পুণায় সঙ্গম ব্রিজের কাছেই একটি সুন্দর একতালা বাড়ি কিনল। কিন্তু গৌরীকে বলতেই সে সাফ জবাব দিল: "যেতে চাও তুমি থাকো সেখানে গিয়ে, আমি এ-পবিত্র তীর্থস্থান ছেড়ে "পাদমেকং ন গচ্ছামি'-ব'লে দিলাম।"

মনুভাই নিরুপায় হ'য়ে পিন্টোর কাছে এসে খেদ জানালো। পিন্টো সত্যিই ভাবে নি যে গৌরী এ চাল চেলে বাজি মাৎ করবে। ভেবেচিন্তে বলল যে, তাঁহ'লে আর একটা পাল্টা কিস্তি দিতে হবে হারন্ত বাজি জিততে: দেহুর বাড়িটি বেচে ফেলা। মনুভাইয়ের ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু গৌরীর গোঁ-র জন্যে পিন্টোর কথা ম'ত দেহুর বাড়িটি বেচে ফেলে গৌরীকে বলল হেসে: "কেমন? এবার! কী করবেন তোমার ভণ্ড গুরু শুনি?"

গৌরী শুনে খানিকক্ষণ গুম্ হ'য়ে রইল, তারপর বলল: "তুমি স্বার্থপর জানতাম, কিন্তু এত হিংসুক হ'তে পারো—ভাবতে পারি নি।"

মনুভাই (হেসে): কেমন হয়েছে? যেমন কুকুর তেমনি মুগুর!

গৌরী (জ্ব'লে উঠে): মুগুরেরও উত্তর আছে—আর সে-উত্তর পাবে তুমি যথাকালেই।

মনুভাই (একটু ভয় পেয়ে): উত্তর? মানে?

গৌরী জবাব দিল না। মনুভাইয়ের মিথ্যা বলতে কোনোদিনই বাধত না, বলল অম্লানবদনে: "ক্রেতা পরশু আসবেন, কাজেই বাড়ি কালই ছেড়ে দিতে হবে, মনে রেখো।" গৌরী পূজার ঘরে গিয়ে জপে বসল।

দুপুরবেলা মনুভাই কাজে বেরিয়ে যাবার পরে সে দুটি বাক্স ও একটি হোল্ড্-অল নিয়ে চ'লে গেল প্রহ্লাদের ওখানে। সব কথা ব'লে শেষে বলল: "প্রহ্লাদ, আমি কালই সন্ধ্যার ট্রেণে কাশী রওনা হব রমাকে নিয়ে।"

প্রহ্লাদ গৌরীর হ'য়ে তার করল অনুমতি চেয়ে।

মনুভাই রাত দশটায় গোলাপী নেশা ক'রে বাড়ি ফিরতেই চাকর বলল: "মাজী চলী গঈ।" মনুভাইয়ের নেশা ছুটে গেল—তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পাশে প্রহ্লাদের বাড়ির গেটে ঢুকতেই মহাদেবের মোতায়েন-করা বলিষ্ঠ ভোজপুরী দরোয়ান সেলাম ক'রে বিনীত কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলল: "মাফ কীজিয়ে সাব! মগর হুকুম নহী"।

মনুভাই রাগে লাল হ'য়ে চেঁচিয়ে ডাকল: "প্রহ্লাদ! এর মানে কী শুনি?"

প্রহ্লাদ সামনের জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল: "গৌরী এখন দুচারদিন আমার এখানেই থাকবে।"

মনুভাই হাতের ছড়ি ঘুরিয়ে শাসিয়ে বলল: "আচ্ছা দেখে নেব। এ আইনের রাজ্য। মগের মুলুক নয়।"

ব'লেই মোটরে হর্ণ দিয়ে হু হু ক'রে বেরিয়ে গেল পিন্টোর কাছে। রাতে সেখানেই থাকল, পরদিন দিশারি বন্ধু তলব করলেন এক উকিলকে। বলল: "মুকদ্দমা

ক'রে রমাকে ছিনিয়ে নিতে হবে গৌরীর কাছ থেকে।" প্রবীণ উকিল সব শুনে মনুভাইকে বললেন হেসে: "কী পাগলামি করছেন? মিটমাট ক'রে ফেলুন।"

রাত এগারটায় সাত আট 'পেগ' টেনে মত্ত অবস্থায় মনুভাই বাড়ি ফিরেই শুনল গৌরী রমাকে নিয়ে চ'লে গেছে বম্বে—কেবল একটি চিঠি লিখে রেখে গেছে।

চিঠিটি প'ড়ে সে হতভম্ব হ'য়ে রইল খানিকক্ষণ, পরে আবার পড়ল ধীরে ধীরে: "আমি আজই বিকেলে উড়ে কাশী রওনা হচ্ছি। গুরুদেবকে কাল টেলিগ্রাম ক'রে আজ আর অপেক্ষা করতে না পেরে টেলিফোনে সব জানিয়ে ঠাঁই পেয়েছি তাঁর পায়ে। আমি আর ফিরব না। রমাকেও ফেরৎ দেব না। ইচ্ছে হয় আদালত করতে পারো। আমার মনে হয় তারা মেয়েকে মা-র কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এমন বাপের তদারকে রাখবে না যে মাতাল ও চরিত্রহীন, তবে যদি রমাকেও ছাড়তে হয় ছাড়ব, কিন্তু যে উঠতে বসতে আমার গুরুর অপমান করে তার মুখদর্শনও করব না আর। আমার কাছে গুরুর স্থান সবার উপরে। ঢের সয়েছি—আর নয়।

"শেষে কেবল একটি কথা বলব। এই আমার শেষ কথা।

"এখনো সময় আছে। যদি তুমি ভবিষ্যতে আর কখনো কোনো সূত্রেই গুরুদেবের অপমান করবে না কথা দাও, আর দেহু ছেড়ে পুনা না যাও—কেবল তাহলেই আমি ফিরতে পারি: তোমার ঘরণী হিসেবে নয়—শুভার্থিনী হিসেবে। কিন্তু তোমাকে ছাড়তে হবে ঐ ভবু ক্বিবন্ধুর সঙ্গ। এ প্রস্তাবও আমি করতাম না কেবল গুরুদেব তোমাকে আর একটা চান্স দিতে চান তাই আমি অনুরোধ করছি—তোমারই মঙ্গলের জন্যে—যে বিপথে পা বাড়িও না। গুরুদেবের ও ঠাকুরের পায়ে প্রার্থনা করব যেন তোমার সুমতি হয়। কিন্তু সুমতি যে আদৌ চায় না তার কুমতির কাটান্ নেই। গুরুদেব টেলিফোনে আজ উদ্ধৃত করলেন কঠোপনিষদের একটি শ্লোক:

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।"
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥'

অর্থাৎ, যারা শুধু ইহলোকসর্বস্ব, আত্মা ভগবান্ পরলোক কিছুই মানে না তাদের ফিরে ফিরে দুর্ভোগের কবলেই পড়তে হয়।

ইতি তোমার নিত্যশুভার্থিনী গৌরী।

"পুনশ্চ। তোমার বিরুদ্ধে গুরুদেব ক্ষোভ পুষে রাখতে মানা করেছেন। তাই তোমাকে বলছি—তাঁরই আদেশে—যে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, আমি তোমার বিরুদ্ধে কাউকে কিছু বলব না। শুধু তাই নয়, তুমি যদি আমাকে ত্যাগ ক'রে ফের বিবাহ করো তাতেও আমি আপত্তি করব না। বলতে কি—এবার বলছি আমার নিজের জবানীতেই—যে, আমাকে যদি তুমি ডাইভোর্স ক'রে একটি মনের মতন স্ত্রীকে বিয়ে ক'রে মদ টদ ছেড়ে সৎপথে থাকো তাহলে আমার চেয়ে বেশি সুখী কেউ হবে না।"

রমার বয়স তখন তেরো—কিন্তু যে-সব শিশু আশৈশব মার দুঃখ দেখে মানুষ হয় তাদের মনের বয়স দেহের বয়সকে ছাড়িয়ে যায়। ফলে রমাও চাইল দীক্ষা—বিষ্ণুঠাকুরের উপদেশে প্রহ্লাদ ওকে দীক্ষা দিয়েছিল কাশী রওনা হবার কিছু আগে।

(দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত) (ক্রমশঃ)
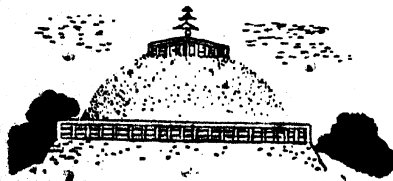
জাতীয় জাগরণে বিবেকানন্দের উদাত্ত বাণী

শ্রীকালীপদ লাহিড়ী

ঊনবিংশ শতাব্দী। বাত্যা বিক্ষুব্ধ ভারত। বিদিশার অন্ধকারে নিমজ্জমান জাতি অবলুপ্তির স্রোতে ভেসে চলেছে। এমন সময় এলেন মুক্তি-যজ্ঞ-সংগঠনের প্রধান ঋত্বিক প্রজ্ঞাদীপ্ত মনীষী রামমোহন। অভিষিক্ত করলেন হিন্দুধর্মের নির্য্যাসে ব্রাহ্মধর্মের পতাকা। চাইলেন বেদান্তের মর্ম্মবাণী মন্দ্রিত করে তুলতে স্বদেশের আত্মায়। কিন্তু নীলকণ্ঠ যে বিষপান করলেন, তা ষোলআনা বুঝতে পারলেন না মন্থনকারীর দল। তারপর এলেন জ্ঞান ও করুণার অবতার বিদ্যাসাগর। একে একে এলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ। জাতির তন্দ্রাবিজড়িত আঁখি ঈষৎ উন্মীলিত হল বটে, কিন্তু গোঁড়া হিন্দুরা দাঁড়ালো পথরোধ করে। সুরু হল খৃষ্টান ধর্মের প্রচার। সংগঠন, সংরক্ষণ ও ইয়ং বেঙ্গল দলে চললো দ্বন্দ্ব। নাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল কলকাতা হয়ে উঠলো রণক্ষেত্র বিশেষ। জাতি ধর্ম্ম তখন পথ ও মতের গোলক-ধাঁধায় দিকভ্রান্ত। ঠিক এমনি সময়ে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির পূজারী গদাধর ঠাকুরের নিকট থেকে আহ্বান এলো সবার জন্য। এই সময় সুরু হোল রাজনৈতিক আন্দোলনও। সে এক মহাবিপ্লবের ভীম প্রভঞ্জন। এমন সময় বাঙালী জাতি শুনলো, আশার বাণী—ধ্বংস নয়—সংগঠন। হলাহল নয়—অমৃত। দাসত্ব নয়—মুক্তি এবং মৃত্যু নয়—নবজীবন। ভারতের জাতীয় জীবনের কর্ণধার যুগবিপ্লবী বিবেকানন্দ এগিয়ে এলেন তাঁর অমৃতময় উদাত্ত-বাণী কণ্ঠে নিয়ে। দুর্দ্দিনের সেই ঘনতমসায় হল নবীন সূর্য্যের কিরণসম্পাত। তিনি গঙ্গার জলে করলেন গঙ্গা পূজা।

জাতি ও দেশের এই চরম দুর্দ্দিনে হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা করলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বীয় সাধনালব্ধ শক্তি-বলে যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করে আপন মহিমা বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহারই কৃপায় আধ্যাত্মিক শক্তিবলে জগৎকে এক মহাসত্যের সন্ধান দিয়েছিলেন। এঁরা একই উদ্দেশ্য নিয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ছিলেন গুরু,—স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শিষ্য। পরমহংসদেব ছিলেন যন্ত্রী, আর স্বামিজী ছিলেন যন্ত্র। বৈদিক ধর্ম্মের গ্লানিতে বিক্ষুব্ধ বিবেকানন্দ পরমহংস কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে শুধু ভারতের নয়—সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ কামনায় যুগাদর্শকে বিশেষ রূপে অনুসরণ করে বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে বিশ্বময় এক বিরাট আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন।

বিবেকানন্দ ধর্ম্মকে শুধু জীবনগত ক'রে না রেখে, দেবোপাসনাকে ছড়িয়ে দিলেন মানুষের সেবার মধ্যে, শিবকে আবিষ্কার করলেন জীবের মধ্যে। তাঁর ধর্ম্ম প্রথমতঃ সমগ্র জীবনকে ধারণ ক'রে রাখবার ধর্ম্ম, দ্বিতীয়তঃ বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত সেবার ধর্ম্ম। তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মের দৃঢ় পটভূমি ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগধর্ম্ম—অর্থাৎ বিবেকানন্দের প্রচারিত ধর্ম্মই হল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাঙালী জাতির প্রকৃত ধর্ম্ম।

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন স্বামিজী জীবনের প্রথমাবধি। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। বীর্য্যে ও তেজে তিনি ছিলেন বলীয়ান। একটা মোহাচ্ছন্ন জাতির মধ্যে তিনি বজ্রকণ্ঠে শুনিয়েছিলেন জাগৃতির গান,—বেদান্তের বাণী। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ একদিন সেই বজ্রনির্ঘোষে সচকিত হ'য়ে উঠেছিল, সেই ধ্বনি প্রকম্পিত হ'য়েছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশে দেশে। তাঁর সেই অগ্নিময় মন্ত্র প্রচারিত হ'ল দিকে দিকে,—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত"— তিনি নবমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন মুমূর্ষু জাতিকে, বললেন,—"ওঠ, জাগো, আর ঘুমিয়ে কাল কাটিও না। শুভ মুহূর্ত্ত আগত। ওঠ

জাগো, জগৎ তোমাদের আহ্বান করছে, অনন্ত কাজ পড়ে আছে তোমাদের জন্য। দেশের ওপর আমি বিশ্বাস রাখি। বিশেষতঃ দেশের যুবকদের ওপর আমার বিশ্বাস অগাধ।"

নিবীর্য্য মৃতপ্রায় জাতিকে বাঁচবার পথে চালিত করার জন্য শোনালেন উপনিষদের সেই শাশ্বত বাণী ;—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

সুপ্ত ভারতের কানে দিয়েছেন জাতীয় অভ্যুত্থানের ইষ্টমন্ত্র। সুদূর পাশ্চাত্যদেশে বসেও তিনি উপদেশ বাণী প্রেরণ করেছেন, বারিসিঞ্চনে সুজলা সুফলা করেছেন স্বদেশের মরুভূমিকে। স্বামিজী বলেছেন ;—"যে অপরকে ঘৃণা করিবে, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী, ইহা অলঙ্ঘনীয় বিধি।···আদান প্রদান জগতের নিয়ম। ভারতবর্ষ যদি আবার উঠিতে চায়, তাহা হইলে তাহার শুভ ভাণ্ডারে যাহা সঞ্চিত আছে, তাহা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে এবং বিনিময়ে অন্যে যাহা দিবে, তাহা গ্রহণ করিবার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সম্প্রসারণই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু ; প্রেমই জীবন, ঘৃণাই মৃত্যু। আমরা সেইদিন হইতে মরিয়াছি, যেদিন আমরা অন্যান্য জাতিকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিলাম এবং সম্প্রসারণ ব্যতীত আমাদের এই মৃত্যু কেহ রোধ করিতে পারিবে না। অতএব আমাদিগকে জগতের সকল জাতির সহিত মিলামিশা করিতে হইবে।···অনাবশ্যক হা-হুতাশ এবং বিলাপ না করিয়া আসুন আমরা দৃঢ়চিত্তে মানুষের মত কাজে লাগিয়া যাই।···আমাদের অতীত মহৎ ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমাদের ভবিষ্যৎও মহত্তর হইবে সন্দেহ নাই।" চরিত্রে, সংযমে, তপে, তিতীক্ষায় যাঁরা দৃঢ়প্রাণ, সত্যের অভিসারে যারা একমন এক ধ্যান নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে তিনি খুঁজেছেন সেই রকম লোক জাতীয় কল্যাণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তিনি দেখলেন —সকলেই স্বার্থান্ধ মন নিয়ে খুঁজছে নিজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বদেশহিতৈষণার বড় বড় বুলি কপচাইয়া নিজে মহাধার্ম্মিক এই -তাই অভিমানে গর্ব্ব অনুভব করছে। তাই তাঁর বিদ্রোহী বিবেক হতে নিঃসারিত হয়েছে সাবধান বাণী ;— "আমরা যে সবাই আহাম্মকের দল—স্বার্থপর, কাপুরুষ! মুখে স্বদেশ হিতৈষণার কতকগুলি বাজে বুলি আওড়াইতেছি, আর আমরা মহাধার্ম্মিক এই অভিমানে ফুলিয়া রহিয়াছি। ··আমি চাই এমন লোক—যাহাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্ম্মিত হইবে ; আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটি মন বাস করিবে, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য্য মনুষ্যত্ব, ক্ষাত্রবীর্য্য, ব্রহ্মতেজ।"···

ভারতের উত্থানের প্রতি ইঙ্গিত ক'রে জগতের বুকে ভারতের শ্রেষ্ঠ আসন লাভের স্বপ্ন দেখেছেন তিনি ; উদাত্ত কণ্ঠে শুনিয়েছেন তাঁর মর্ম্মবাণী, –

"তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙ্গল ধ'রে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে, বেরুক মুদীর দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনানের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ, জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে ; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবেনা। এরা রক্তবীজের প্রাণ সম্পন্ন। আর পেয়েছে সদাচার বল—যা জগতে নেই, এত শান্তি, এত প্রীতি, ভালবাসা, মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম!!··· হে আমার ভারত! জাগ্রত হও! কোথায় তোমার জীবনী শক্তি? সে শক্তি তোমার অমর আত্মার।"···

নব দীক্ষিত শিষ্যদের ডেকে তাঁর অমৃতময় বাণী শোনালেন। প্রকৃত সন্ন্যাসীর সাধনা কি ভাবে জনকল্যাণে সার্থক করে তোলা যায়। তিনি বললেন ;—"মনে রাখবি 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' সন্ন্যাসীর জন্ম। প্রাণটা রাখবি হাতের মুঠায়। জীবের ক্রন্দনে যদি দরকার হয় ঐ মুঠা খুলে অকাতরে দান করবি প্রাণ। ওরে, দুঃখীর দুঃখ দূর করে, আর্ত্তের ক্রন্দন নিবারণ করে, বঞ্চিতের বুকে আশার বাণী জাগিয়ে দিতে পারলেই বুঝবি তোর সাধনা হয়েছে সার্থক। সবাইকে ডেকে বলতে হবে। সকলের মাঝে যে সুপ্ত শক্তি রয়েছে তাকে ধাক্কা দিয়ে সজাগ করে দিতে হবে। তবেই তো সন্ন্যাসধর্ম্মের দুশ্চর ব্রত মহিমান্বিত হয়ে উঠবে।"

গুরু ভাইদের উদ্দেশ্যে আবেগদীপ্ত ভাষায় আবার বলে

উঠলেন ;—"ওঠ, জাগ নিজে। নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর—নরজন্ম সার্থক করে দিয়ে চলে যা—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'।"

স্বামিজী স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে জানালেন আকুল আবেদন। কলকাতায় প্লেগ মহামারীর আকার ধারণ করেছে। চাইলেন মৃত্যুপথযাত্রীদের টেনে আনতে মৃত্যুর করাল কবল হতে। প্রচুর সাহায্য এলো, অর্থের অভাব হলনা। সহস্র সহস্র মানুষ প্রাণ ফিরে পেল। বেদান্তবাদীর বৈদান্তিক সাম্যবাদের ভিত্তি হল সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি আহ্বান করলেন স্বদেশবাসীকে। বললেন ;—

"হে ভারত! ভুলিওনা নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে ডাকিয়া বল, আমি ভারতবাসী ভারতবাসী আমার ভাই।"

জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করলেন স্বামিজীকে "আপনি অসাধারণ বাগ্মিতাবলে ইউরোপ আমেরিকা মাতাইয়া আসিয়া নিজ জন্মভূমিতে চুপ করিয়া আছেন, ইহার কারণ কি?"

উত্তরে স্বামিজী বললেন, "আগে জমি তৈরী করতে হবে এদেশে। পাশ্চাত্যের জমি অনেক উর্বর। অন্নাভাবে ক্ষীণদেহ ক্ষীণ মন, রোগ শোক পরিতাপের জন্মভূমি ভারতে লেকচার ফেকচার দিয়ে কি হবে?…কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলি বালসন্ন্যাসীকে ঐরূপে তৈরী করছি। শিক্ষা শেষ হ'লে এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে।…দেখছিস্‌না পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য্য উঠবার আর বিলম্ব নাই। তোরা এই সময় কোমর বেঁধে লেগে যা—সংসার ফংসার করে কি হবে? তোদের এখন কাজ হচ্ছে দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আলস্য করে বসে থাকলে চলছেনা, শিক্ষাহীন, ধর্ম্মহীন বর্তমান অবনতির কথা তাঁদের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে—ভাই সব, উঠ, জাগ, কতদিন আর ঘুমুবে?… ধর্ম্মটা দেশের সকল লোক যাতে পায়, তার ব্যবস্থা করগে। সকলকে বুঝাবে, ব্রাহ্মণের ন্যায় তোমাদেরও ধর্ম্মে সমান অধিকার। আচণ্ডালকে এই অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত কর।"

কোথাও উপদেশচ্ছলে বলেছেন, "কয়দিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসেছিস্, তখন একটা দাগ রেখে যা।"

স্বাধীনতার প্রাক্কালে শক্তি জাগরণের মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে তাঁর কণ্ঠে, তিনি বলেছেন ;—"রয়েছে তোমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি। সে শক্তিকে জাগিয়ে তোল।"…

আত্মবিস্মৃত জাতির সম্মুখে তুলে ধরলেন স্বামিজী তাদের জীবন বেদের আদর্শগুলোকে। বুঝিয়ে দিলেন কর্ম্মময় জীবনের উদ্দেশ্য। শোনালেন আত্মিক ও ঐহিক মুক্তির মহামন্ত্র, বললেন,…"নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে হয়েও তোমাদের সেবা করতে শিখেছে, আর তোরা—নিজের দেশের লোকের জন্য তা' করতে পারবিনি। যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হয়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে চলে যা সেদিকে! নয় মরেই যাবি। তোর আমার মত কীট হচ্ছে মরছে, তাতে জগতের কি আসছে যাচ্ছে? একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই, তা' ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভাল। এই ভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর, নিজের ও দেশের মঙ্গল হবে। তোরাই দেশের আশা ভরসা। তোদের কর্ম্মহীন দেখলে আমার কষ্ট হয়। লেগে যা, লেগে যা! দেরী করিস্‌নি—মৃত্যু দিন দিন নিকটে আসছে! আর পরে করবি বলে বসে থাকিসনি—তাহলে কিছু হবেনা।" কাজ ফেলে রাখা মানে অসমাপ্তির ছেদ টানা। জীবনের গতিকে অবরুদ্ধ করে মহৎ কার্য্যের সমাধি গড়ে তোলা। সম্মুখে অবারিত উন্মুক্ত আকাশ, আর অন্তহীন সমুদ্র। তিনি ফেনশুভ্র বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বজ্রের আহ্বানে জগতের কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হবার বাণী প্রচার করে গেছেন, শুনিয়েছেন, বজ্রনির্ঘোষে "ফেটে পড় পৃথিবীর কেন্দ্র বিন্দুতে। আলোড়িত করে দাও তামাম দেশটা। মিথ্যাকে, হীনতাকে ও অত্যাচার-অশান্তিকে নিক্ষেপ কর নির্ব্বাসনের কারাগারে। আগে রাষ্ট্রিক মুক্তি। সবার অধিকার প্রতিষ্ঠা। তারপরে ব্যক্তিগত মুক্তির চিন্তায় তন্ময়তা।"

বিবেকানন্দের বহুশ্রুত উদাত্ত আহ্বান বাণীগুলি শুধু একটা হৃদয়াবেগের ক্ষণস্থায়ী উচ্ছাস মাত্রই ছিলনা, এই আবেগের পেছনে ছিল ক্লান্তিহীন গবেষকের সাধনালব্ধ সত্য—মননধর্ম্মী বাস্তবচেতনা ও যুক্তিস্নাত ভাস্বর ভাবনা-প্রযুক্ত সাফল্যে দৃঢ় বিশ্বাস। বিশ্বমানবের মুক্তিকামী মহাপুরুষ নবমন্ত্রের উদ্গাতা স্বদেশহিতৈষী জাতীয় জাগরণের প্রধান ঋত্বিক ঋষিকল্প স্বামী বিবেকানন্দ নিষ্কাম কর্ম্ম ও ধর্ম্ম সমন্বয়ের যে অভিনব আদর্শ প্রচার করেছেন, যুগে যুগে তা জগতের যে অশেষ কল্যাণসাধন করবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ঝঞ্ঝাট
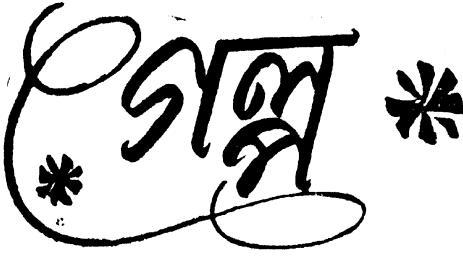
শ্রীঅনিল মজুমদার

ঝঞ্ঝাট কাকে বলে তা বোধ হয় সবাই জানেন, হাড়ে হাড়ে বুঝেছেনও বোধ হয়। এমন হাড় জালানে জিনিষ দুনিয়াতে আর কিছু আছে কিনা জানিনা, থাকলেও তার কোন সন্ধান পাইনি এখনও। কখন যে কি ভাবে আসেন বলা যায়না, হঠাৎ আসেন, জালিয়ে মারেন, এক এক সময় আবার এমন ভাবে আসেন যাতে তাল রাখাই দায়।

রাতে হাত পা ছড়িয়ে দিব্যি ঘুমিয়েছি—সকালে চোখ মেলতেই দেখি তিনি এসে গেছেন। বাড়ীময় হৈ হৈ চলছে, ব্যাপার কি? ঝি আসেননি, এখন বাসনই বা মাজে কে, উনুনে আগুনই বা দেয় কে? মেয়েটি কলেজ যেতে পারেনি, ছেলেটা চা চা করছে, আর গৃহিণী আলুথালু হয়ে সারা বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এদিকে গৃহিণীর আবার হার্টের ব্যায়রাম—একটু খাটা-খাটুনী হলেই সেটা আবার বাড়ে। অতএব উঠতে হল, এক জনকে হাতে পায়ে ধরে নিয়েও আসতে হল, মেয়েটা কলেজে গেল, ছেলেটা চা পেল, কিন্তু ঝঞ্ঝাট গেল না, তিনি আবার নতুন করে দেখা দিলেন। যে লোকটিকে নিয়ে এসেছিলাম তাকে মোটেই পছন্দ নয় গৃহিণীর, সে নাকি এড়া কাজ বেড়া করছে, বাধ্য হয়েই তাকে বিদেয় করতে হল। গৃহিণী ঘটা করে কড়া মাজতে বসলেন, খানিকক্ষণ বাদেই তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কণ্ঠের ডাক শুনলেম 'ওগো, শুনছো, আমায় একটু ধরবে বুকটা যেন কেমন কেমন করছে' ছুটলাম আবার, ধরাধরি করে তাকে নিয়ে এসে বিছানায় শোয়ালাম, তারপরই ডাক্তারের বাড়ী। ডাক্তার নেই, তিনি বেরিয়েছেন কখন ফিরবেন তার কোন ঠিক নেই, বাধ্য হয়েই রাস্তা থেকে একজন উপোসী ডাক্তারকে ধরে নিয়ে এলাম।

তাঁর নির্দেশমত দুএকটা অষুধও কিনে এনে গৃহিণীকে খাওয়ালাম, কিন্তু ফল তেমন কিছু পাওয়া গেলনা। গৃহিণী উল্টে অনুযোগ শুরু করলেন, বললেন 'ছেলে মেয়েদের শীগগির খবর দাও, আর বোধ হয় দেখতে পাবোনা তাদের' সেই কথাই ভাবছি, এমন সময় বাড়ীর ডাক্তার এসে হাজির, একটা কড়া ইন্জেকসন ঠুকে দিতেই গৃহিণীও অনেকটা সামলে উঠলেন। ইতিমধ্যে ছেলে মেয়েরা সব এসে পড়ল, আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। খাওয়া দাওয়া আর হলনা, কোন রকমে মাথায় খানিকটা জল ঢেলে অফিসের পথে বেরুলাম। ঝঞ্ঝাটও সঙ্গে সঙ্গে চললো। হাঁ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি বাসের জন্যে, বাসের দেখা নেই, যে নম্বরটি আমার চাই, সেটি বাদে অন্যসব নম্বরের বাসই শুধু আসছে। ইতিমধ্যে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, কোন রকমে এক দোকানে ঢুকে কাপড় জামা সামলালাম, তারপরই একখানা বাস এল। ভীষণ ভীড়, মানুষগুলো সব বাদুড়-ঝোলা হয়ে ঝুলছে। উপায় নেই, ঠেলেঠুলে তার মধ্যেই উঠলাম। এক জনের গলা ধরে কোন ক্রমে ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাতেও কি শেষ আছে। দেখি বাস আর নড়েনা, একটু করে যাচ্ছে আর দাঁড়াচ্ছে—হয় লাল বাতি না হয় পুলিশের হাত। একে দেরী হয়েছে, আরও হচ্ছে। যাক্ গে, ভাবলাম অফিসে ত আর পাঁচজন আছে কোন রকমে সামলে নেবে। এখন কিন্তু অফিসে পৌছে দেখি আমিই এসেছি আর পাঁচজন তখনও আসেনি, তারা বোধ হয় আরও কোন বড় রকম ঝঞ্ঝাটে পড়েছে। নিরুপায়' সারাদিনটা কাটলো অফিসের নানান ঝামেলা মেটাতে—সন্ধ্যে-বেলা বাড়ী ফিরে দেখি আর এক ঝঞ্ঝাট। দেশ থেকে একপাল

কুটুম এসেছেন, রাত্রি বাস করে তারা কাল সকালে গয়া তীর্থে যাবেন। গৃহিণী হন্তদন্ত হয়ে বললেন, এক্ষুণি বাজারে যাও, মাছ মাংস কিছু নিয়ে এস, কুটুমের মান রক্ষা করতে হবে। করতেই হল, বাজারে গেলাম তাদের সঙ্গে বসে খেলাম, একটু আধটু দেঁতো আমিও হাসলাম তাদের সঙ্গে, পরের দিন সকালে তাদের বিদেয় করে তবে ঝঞ্ঝাট মিটলো।

এই হচ্ছে ঝঞ্ঝাট!

কোথায় নেই ইনি? যেখানে যাবেন সেখানে পথেঘাটে পাহাড়ে জঙ্গলে, ঘরে বাইরে, সর্বত্র; সর্বঘটে, সর্বকর্মে। তাড়াতেও পারবেননা, এড়াতেও পারবেন না, মাথায় করে নিতে হবে আপনাকে। যেখানে মানুষ, সেইখানেই ঝঞ্ঝাট। মরেও নিস্তার নেই।

একবার একদল খোট্টা গভীররাত্রে 'রাম নাম সত্য হ্যায়' বলতে বলতে মড়া নিয়ে যাচ্ছিল। একটা থানার সামনে দিয়ে যেতেই একজন এসে তাদের ধরলে, বললে, মড়া নিয়ে যাচ্ছিস পাশ নিয়েছিস্?

তারাতো অবাক। থতমত খেয়ে বললে, এতেও পাশ লাগে নাকি।

—লাগেনা। ভেবেছিস কি তোরা?

—তা হ'লে।

তা হ'লে আর কি? দুটি করকরে টাকা তার হাতে গুঁজে দিতে তবে মড়া খালাস পেল, রাম নামও সত্য হল।

উপাই নেই।

সংসারে বাস করতে গেলে এমন সব উটকো ঝঞ্ঝাট আপনার আসবেই আসবে। কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না।

ভাবছেন সংসার করবেন না, তারও ঝঞ্ঝাট কম নয়। যারা করেনি তাদেরই একটু জিজ্ঞেস করে দেখবেন। শেষ পর্যন্ত সংসার পাততেই হবে আপনাকে, ঘরে বউ আসবে, তার সঙ্গে ঘোমটা মাথায় দিয়ে ঝঞ্ঝাটও এসে ঘরে ঢুকবে। তারপরই দুচারটি ছেলে-মেয়ে এক একটি ঝঞ্ঝাট, যত বড় হচ্ছে, ঝঞ্ঝাটও বাড়ছে। সব পুইয়ে তাদের আপনি মানুষ করবেন, শেষকাণ্ডে দেখবেন তারা কেউ আপনার ঝঞ্ঝাট নয়, উল্টে আপনিই তাদের কাছে একটি ঝঞ্ঝাটে পরিণত হয়েছেন।

ঘাবড়ে যাবেন না।

এ হচ্ছে সংসারের নিয়ম।

যাক, এ সব তো গেল আপনার ব্যক্তিগত, এর ওপরে আছে আবার অপরের ঝঞ্ঝাট,—আত্মীয় স্বজনের, বন্ধু-বান্ধবের, পাড়া-পড়শির। পোয়াতে হবে আপনাকে, সমাজে বাস করতে গেলে এগুলো আপনি কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। এরই নাম সহ-অবস্থান।

একবার এক বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর অনুরোধে দার্জিলিং যেতে হয়েছিল। তাদের বাড়ীতেই অতিথি হয়েছিলাম। শিলিগুড়ি অবধি এক সঙ্গেই গেলাম, তারপরই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। বন্ধু ও বন্ধুপত্নী গেলেন তাদের নিজস্ব মোটরে—আর আমি ট্রেণে, প্রথম যাচ্ছি বলে।

বন্ধুর অনেক মাল-পত্র, মোটরে ধরলোনা, বাধ্য হয়েই আমাকে সঙ্গে নিতে হল।

বেশ চলেছি, অবাক হয়ে দুপাশের পাহাড়, জঙ্গল আর ঝরণা দেখতে দেখতে। কোত্থেকে এসে জুটলো এক টিকিট চেকার, টিকিট দেখতে চাইলে দেখালাম, তারপরই সে পড়ল মাল নিয়ে, একখানা টিকিটে এত মাল, কিছুতেই ছাড়বেনা, কিছু দিলেই হয়ত হয়ে যেত—কিন্তু সেটি আর সম্ভব হলনা কারণ গুরুর নিষেধ। বাধ্য হয়েই দার্জিলিং ষ্টেশনে নেমে পুরো মাশুলটাই দিতে হল!

বন্ধুত্বেও ঝঞ্ঝাট।

দার্জিলিং ষ্টেশনে বসে আছি। কথা ছিল বন্ধু এসে আমায় সেখান থেকে নিয়ে যাবে, কিন্তু তার দেখা নেই। এদিকে ঠাণ্ডা গরমে আমার দারুণ সর্দি হয়েছে, বসে বসে মাল পাহারা দিচ্ছি আর ঘন ঘন হাঁচছি।

বন্ধুর দেখা নেই।

ঘণ্টা দুই কাটলো।

কি করি, কি করি ভাবছি। এমন সময় আর একখানা ট্রেন এল, তার থেকে নামলেন বন্ধু ও বন্ধুপত্নী। ব্যাপার কি, শুনলাম কিছুদূর যেতেই তাদের মোটর খারাপ হয়ে যায়, সারানো যায়না, অন্য কোন গাড়ীও পাওয়া যায়না। শেষ পর্য্যন্ত পায়ে হেঁটে কাছাকাছি এক ষ্টেশনে এসে ট্রেণ ধরে তবে তারা আসতে পেরেছে।

কে যে কার ঝঞ্ঝাট বলা শক্ত।

এইটেই বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু আর বলা হলনা—তার আগেই বিকট এক হাঁচি।

সবার শেষে হচ্ছে মূর্তিমান ঝঞ্ঝাট, যারা ঝঞ্ঝাট একেবারে মাথায় করে নিয়ে আসে—যেমন আমার বন্ধু জগা।

পাড়ায় আলো নিভে গেছে, ঘুটঘুটে অন্ধকার, বাড়ীতে রৈ-মাতন চলেছে। অন্ধকারের মধ্যে পাছে কেউ ঢুকে পড়ে সেই জন্যে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছি, জগা এসে হাজির। বললে, কেমন আছিস্? বললাম, দেখতেই পাচ্ছিস।

একে আলো নেই মন এমনিতেই খিচড়ে ছিল, জগা আবার তাতে ইন্ধন জোগালে, সেই অন্ধকারের মধ্যে দু-পাটি দাঁত বার করে বললে, একটু চা করতে বল, ভাই, বেজায় হাঁফিয়ে গেছি।

কি বিপদ বলুন তো? এর মধ্যে আবার চা! জগার যে কবে বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে সেই-ই জানে। কিন্তু তবু তাকে না করতে পারলাম না, যতই হোক ছেলেবেলাকার বন্ধু, তার ওপর তার ঘাড় ভেঙ্গেছি অনেক, অনেক সিনেমা থিয়েটারও দেখেছি তার পয়সায়। গৃহিণীকে আর বলতে ভরসা পেলাম না, মেয়েটাকে ডেকেই এক কাপ চা আনতে বললাম। চা এল, চা খেয়ে জগাও একটু সুস্থ হল।

পরে জানলাম জগার এখানে আসার কারণটা কি। 'রঙ্‌মশাল' থিয়েটারে 'নিমাই সন্ন্যাস' হচ্ছে, জগা আমার জন্যেও টিকিট কেটেছে, সেই খবরটাই সে দিতে এসেছে।

সুখবরই। রাজীও হয়ে গেলাম সেই মুহূর্তে। কথা হল কাল বিকেল পাঁচটায় জগার বাড়ীতে যাব, সেখান থেকে থিয়েটারে। জগা থাকে শ্যামবাজারে, থিয়েটারেরই কাছাকাছি।

পরের দিন যথাসময়ে গিয়ে তার বাড়ীতে হাজির হলাম। জগা দেখি তখন দাড়ী কামাতে বসেছে। বললাম, তাড়াতাড়ি কর, ছটায় তো আরম্ভ। জগা বললে, নে, নে, অনেক সময় আছে, চা-টা খা। যেতে আর কতক্ষণ লাগবে।

চা এল, খাবার এল, জগা সাজগোজ করতে করতে পৌনে ছটা বাজিয়ে দিলে। বললাম, কিসে যাবি। বাসে গেলেত দেরী হয়ে যাবে। বললে, ভাবছিস্ কেন, ট্যাক্সি ত আছে।

তাই হল। একখানা ট্যাক্সিই করলাম। খানিক দূর যেতেই জগা অমনি বললে, এইরে, ব্যাগটা তো নিতে ভুলে গেছি।

সর্বনাশ! আমার পকেটে ত একটি মাত্র টাকা। ট্যাক্সির মিটারের দিকে তাকিয়ে বসে আছি। চোদ্দ আনা উঠতেই বললাম 'রোখো'। অনেকখানি এসে গেছি। আর একটু গেলেই থিয়েটারে পৌছে যাব। ট্যাক্সি ছেড়ে দুজনে হাঁটতে শুরু করলাম। ছটা প্রায় বাজে বাজে, তাড়াতাড়ি হাঁটতে গিয়ে জগা আবার পায়ে পায়ে হোঁচোট খেলে—আর সেই সঙ্গে তার চটির ষ্ট্র্যাপটাও ছিঁড়ে গেল। ভাগিস পাশেই একজন মুচি বসেছিল, তাকে দিয়ে তখনই সেটা সারিয়ে নেওয়া হল, পকেটে যে দু আনা পয়সা ছিল জগার কল্যাণে তাও গেল। থিয়েটারে গিয়ে যখন পৌছলাম তখন ছটা বেজে পনের মিনিট। যাক্ খুব তেমন দেরী হয়নি। হন্তদন্ত হয়ে হলে ঢুকতে যাব, জগা অমনি বললে, সর্বনাশ হয়েছে রে, টিকিটগুলো ত খুঁজে পাচ্ছিনা।

—কোথায় রেখেছিলি?

—পকেটেই ত ছিল। তাহ'লে বোধহয় পরে ভুলে ব্যাগেই রেখেছি।

মাথা আগুন হয়ে গেল। বললাম, খুব হয়েছে, এখন ফিরে চল। থিয়েটার দেখে আর কাজ নেই।

জগা কাঁচু-মাঁচু হয়ে বললে, চলনা, ট্যাক্সি করে যাই। কতক্ষণ আর লাগবে, যাব আর আসবো।

তাই হল, আবার ট্যাক্সি ধরা, আবার জগার বাড়ী যাওয়া। জগা ছুটে গিয়ে ব্যাগ নিয়ে এল, কিন্তু খুলে দেখা গেল টিকিট সেখানেও নেই। আবার বাড়ী ঢুকলো জগা, ঘর-বাড়ী তন্ন তন্ন করে খুঁজলে কিন্তু টিকিটের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। শেষ পর্য্যন্ত টিকিট বেরুলো তার জামার ঘড়ির পকেট থেকে।

এই সব করে যখন থিয়েটারের হলে এসে ঢুকলাম তখন দেখি নিমাই ইতিমধ্যে সন্ন্যাস নিয়ে নিয়েছেন, শচী-মাতা ষ্টেজে বসে কাঁদছেন, আর সারা অডিটোরিয়াম জুড়ে চলেছে ফোঁস ফোঁসানি। জগাটাও এমন, বসা মাত্র সেও দেখি ফোঁস ফোঁস করতে শুরু করে দিয়েছে আর রোগটাও এত ছোঁয়াচে কিছুক্ষণ বাদে দেখি আমিও দিব্যি সেই দলে ভিড়ে গেছি।
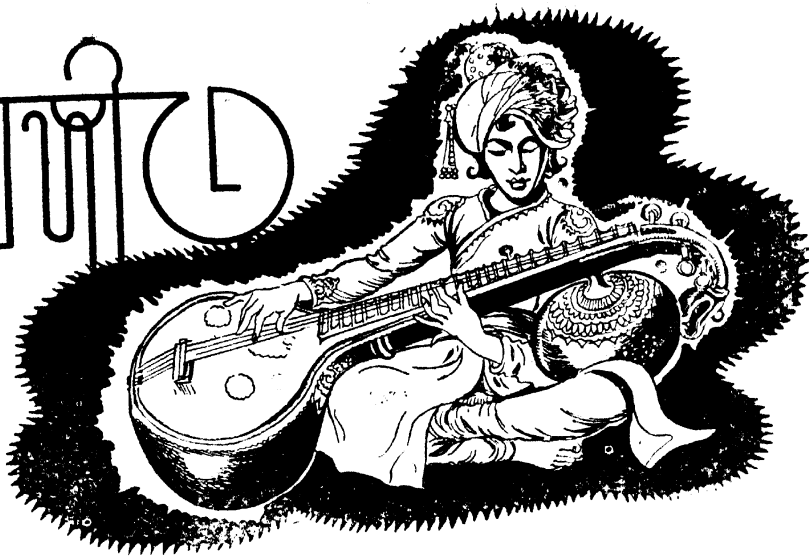
ইমন্-কল্যাণ—দাদ্‌রা

রূপে রূপে যিনি অপরূপ হয়ে র'ন
তাঁর রূপ বল কোন সে শিল্পী গড়বে ?
এই নীলাকাশ শুভ্র আলো,
সুন্দর বনশোভা—
সেইজন বিনে কেইবা সৃজন কর্‌বে ?
দিন অবসানে চেয়ে থাকি নীলাকাশে
রঙের বন্যা কোন্ কথা পরকাশে—
তারা-দীপগুলি একে একে একে ভাসে
হেন রূপ বল কার্ না হৃদয় হর্‌বে ?

সুন্দরে শুধু প্রণাম করিয়া যাই
হৃদয়-রতনে হৃদয়ে খুঁজিয়া পাই,
শরণ লইয়া তাঁরি শুধু গান গাই—
আর যাহা চাই সেই প্রিয় কাছে ধরবে।
মন্দির তাঁর তাঁরি নিজ হাতে গড়া
প্রদীপ জ্বালায় চন্দ্র-সূর্য্য-তারা,—
গম্বুজ তার নীলাকাশ চিত-হরা—
হেন মন্দিরে কে না শির
নত করবে ?

কথা ও সুর—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্, বাণীকণ্ঠ।

স্বরলিপি—শ্রীসুনীলচন্দ্র বড়াল বি-কম্।

	+								+							
II	ধ্‌া	সা	সা	|	সা	সা	রা	I	গা	গা	পা	|	-া	পা	পা	I
	রূ	পে	রূ		পে	যি	নি		অ	প	রূ		প	হ	য়ে	
	গা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I	সগা	-গা	গা	|	-গা	গা	গরা	I
	র	॰	॰		॰	ন্	॰		তাঁ	র্	রূ		প্	ব	ল॰	
	রা	-া	-া	|	রা	-া	সা	I	ন্‌া	-রা	সা	|	-া	-া	-া	I
	কো	ন্	সে		শি	ল্	পী		গ	ড়্	বে		॰	॰		

গা -পা পা | পা পা -া I পা -া পা | পা পা -া I

এ ই নী লা কা শ্ শু ০ ভ্র আ লো ০

না -া ধা | ধা পা হ্মা I গা -মা গা | -া -া -া I

সু ন্ দ র ব ন শো ০ ভা ০ ০ ০

গা পা পা | -া পা গরা I গা -া গা | রা রা -সা I

সে ই জ ন্ বি নে০ কে ই বা স্ব জ ন্

ন্‌া -রা সা | -া -া -া II

ক র্ বে ০ ০ ০

II গা গা গা | পা পা ধা | ধা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I

দি ন অ ব সা নে চে য়ে থা কি নী লা

না -র্রা র্সা | -া -া -া | না না -া | না -া ধা I

কা ০ শে ০ ০ র ঙে র ব ন্ ন্যা০

\+ ০ + ০

না -া ধা | ধা পা হ্মা I গা -মা গা | -া -া -া }I

কো ন্ ক থা প র কা ০ শে ০ ০ ০

গা পা পা | -া পা পা I পা পা পা | পা পা হ্মা I

তা রা দী প্ গু লি এ কে এ কে এ কে

গা -মা গা | -া -া -া I পা পা পা | -রা রা রা I

ভা ০ সে ০ ০ ০ হে ন ক্ষ প্ ব ল

গা -পা পা | ধা ধা -না I না -া র্সা | -া -া -া II

কা র্ না হৃ দ য়্ হ র্ বে ০ ০ ০

II {ধা -সা -সা | সা সা রা I রা রা -গা | গা গা রা I

সু ন্ দ রে শু ধু প্র ণা ম্ ক রি য়া

গা -া -া | -া -া -া I রা রা -া | রা রা রসা I

যা ০ ০ ০ ই ০ হৃ দ য়্ র ত নে০

সা গা রা | রা গা রা I গা -া -া | -া -া -া I

হৃ দ য়ে খুঁ জি য়া পা ০ ০ ০ ই ০

গা গা -পা | পা পা পা I পা না ধা | পহ্মা গা -মা I

শ র ণ্ ল ই য়া তাঁ রি শু ধু০ গা ন্

\+ ০ + ০

গা -া -া | -া -া -া I পা -া পা | পা পা -রা I

গা ০ ০ ০ ই ০ আ র্ যা হা চা ই

রা গা গা | গা রা রা I ন্‌া -রা সা | -া -া -া} II

সে ই প্রি য় কা ছে ধ র্ বে ০ ০ ০

II {গা -া গা | পা পা -ধা I ধা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I

ম ন্ দি র তাঁ র্ তাঁ রি নি জ হা তে

না -র্ঋা র্সা | -া -া -া I না না -া | না না -ধা I
গ ০ ড়া ০ ০ ০ প্র দী প্ জ্বা লা য়্
না -া না | ধা -া পক্ষা I গা -মা গা | -া -া -া }I
চ ন্ দ্র সূ ০ র্য্য০ তা ০ রা ০ ০ ০
গা -পা পা | পা পা -া I পা পা পা | -া পা ক্ষা I
গ ম্ বু জ তা র্ নী লা কা শ্ চি ত
গা -মা গা | -া -া -া I পা -পা পা | -ঋা ঋা ঋা I
হ ০ রা ০ ০ ০ হে ন ম ন্ দি রে
গা পা পা | -ধা ধা না I না -া র্সা | -া -া -া ॥ II
কে না শি র্ ন ত ক র্ বে ০ ০ ০

প্রহেলিকা মন

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

আলোকের হাতছানি এঁকে রেখে যায়
তমসার মাঝে ক্ষীণ স্বপ্নিল মায়া,
জীবনের বাঁকে স্রোতে আশা তরী ধায়
হৃদি-তটে পড়ে তার ক্লান্তির ছায়া!

মাস্তল' পরে বসে কাঁদে গাঙ চিল,
প্রহেলিকা মোহে ধরা এখনও বিভোল ;
একফালি কালো-মেঘ ঢাকে নভঃ নীল,
মূক মুখ, জাগে না সে খুশী সোরগোল!

যৌবন তটরেখা : অতি অস্ফুট ;
ব্যথা-সীমা প্রান্তর হা-হা স্বনে হাসে।
কাল বৈশাখী যেন, মতলব কূট—
বজ্রের ধ্বনি শুনি দুরন্ত বাতাসে।

ঝাপটায় ডানা ওরা—মাঝরাত্তিরে,
কাঁচাঘুম ভেঙ্গে গিয়ে মনে জাগে ত্রাস।
মায়াবিনী বিজলী সে, হাসে ঘুরে ফিরে ;
অন্তরতম প্রেমে : ওঠে নাভি-শ্বাস।

সময়ের হরিণ

প্রশান্ত মৈত্র

সময়ের হরিণ ঘাটে নেমে জলে ছায়া দেখে
সিঁড়ি বেয়ে পালাল সে বনের কোটরে।
জলের মুক্ত বৃত্ত কীর্ণ হয়ে এঁকে এঁকে।
লীন হওয়া সব শেষে উপবৃত্ত সাগরে।

রংয়ে আঁকা সন্ধ্যা নামে জলের শরীরে
জোনাকীকে কথা দেয় রাত-কানা মনো-মেয়ে,
মৃত নাম ঘুমে মৃত শান্তির অভিন্ন কবরে।
আদি অন্ত হারা কোন জীবনের
জালফেলা নেয়ে
ফিসফাস কথা কয় পৃথিবীর প্রাচীরের ধারে।

স্তব্ধতার অন্ধকারে বিধ্বস্ত হৃদয় বিন্যাস :
সময়ের ব-দ্বীপে জমা অজস্র শংখের স্তূপ
পলি ঢালা কাক-বন্ধ্যা কান্নার
অনেক উচ্ছ্বাস।
মৃগনাভি-ধূলি-গন্ধ, রং ছাড়া রূপ!
অসহ্য কাচের ব্যথা তবু এই হরিণের মুখে
পৃথিবীকে যে ভোলায় রংয়ে আর রূপে।

সাংখ্যের মুক্তি

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

সংখ্যা শব্দের অর্থ সম্যক্‌জ্ঞান ; সম্যক্‌ জ্ঞানের উপদেশ আছে বলেই মহর্ষি কপিলের দর্শনকে সাংখ্যবলে। সাংখ্যাচার্য্য গৌড়পাদ (শুকদেবের শিষ্য) এর মতে আসুরি-গুরু ব্রহ্মাপুত্র কপিলই "আদিবিদ্বান্‌" ও তত্ত্ব সমাস বা দ্বাবিংশ সূত্রই মুখ্য বা আদি সাংখ্য-দর্শন, বাদ বাকী সাংখ্যদর্শন গৌণ। জন্মসিদ্ধ মহর্ষি কপিল আর্য্যাবর্তীয় (আর্য্যগন চিরকালই ভারতীয়ই ছিলেন, বহিরাগত নন) ব্রাহ্মণ ঋষি ছিলেন। যোগ ছাড়া মুক্তি হয় না, কাজেই যোগ কপিলের জন্মের বহু আগেই ছিল। কপিলের আগে সনক, সনন্দ ও সনাতন ছিলেন, কপিল চতুর্থ সাংখ্য-কার (সম্ভবতঃ)—যেমন বুদ্ধদেবের আগেও ঐ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল বা শঙ্করাচার্য্যের বহু আগেও মায়াবাদ প্রচলিত ছিল ; মাত্র তাঁদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের জন্য তাঁরা যা প্রচার করে গেছেন তা তাঁদের নামেই চলে আসছে, যেমন বুদ্ধের নির্ব্বাণ, শঙ্করের মায়াবাদ, পতঞ্জলির যোগ,তেমনিই এই সাংখ্যদর্শন। যদি জন্মসিদ্ধ কথাটা সত্যি হয় তা হলে অবশ্য মানতে হয় মুক্তিই সাংখ্যকারের লক্ষ্য যাকে কৈবল্য বলে। কৈবল্যের দুটি অবস্থার কথা বলা হয়েছে একটি কৈবল্য বা মুক্তি, অপরটি বিদেহকৈবল্য বা লয়। এখন বিদেহকৈবল্য নিয়ে কথা। যদি মনে করা যায় যে বিদেহ কৈবল্য কথার অর্থ ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা লয় বা স্বরূপপ্রতিষ্ঠা এইই পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ চিরতরে আত্ম-বিলুপ্তি—তা হলে জন্মসিদ্ধ কথাটা মিথ্যে হয়ে যায়। সিদ্ধিলাভ করতে বহু জন্ম লাগে এবং পূর্ব্ব জন্মে সিদ্ধিলাভ না করলে জন্ম সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে পূর্ব্বজন্মেই কপিল সিদ্ধি বা মুক্তিলাভ করেছিলেন এবং তার পরও জন্ম নিয়েছিলেন অর্থাৎ লয় হয়ে যাননি, তার পৃথক্‌ অস্তিত্ব তিনি রেখেছিলেন, এটাই স্বাভাবিক। সমস্ত সাংখ্য দর্শনের মতেই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকেই মোক্ষ, স্বরূপপ্রতিষ্ঠা পরম পুরুষার্থ বলেছেন। "ত্রিবিধো মোক্ষঃ" (২০ সূত্র, তত্ত্ব সমাস), কপিল তিন প্রকার মুক্তির কথা বলেগেছেন। মুক্তি, মোক্ষ একই কথা, কিন্তু লয় বা ব্রহ্ম নির্ব্বাণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

মুক্তি বা প্রকৃতিসংযোগরাহিত্য একই কথা। প্রকৃতির সংযোগে পুরুষ বদ্ধ, আর প্রকৃতির বন্ধনের হাত থেকে মুক্ত হলেই মুক্তি, এ শুধু সাংখ্য নয় সমস্ত যোগেরই মূল কথা। "পুরুষঃ" (৪ সূত্র, তত্ত্ব সমাস) পুরুষ (প্রকৃতি-হতে) পৃথক তত্ত্ব, পুরুষকে প্রকৃতি থেকে পৃথক্‌ করাই পুরুষার্থ। এই মুক্তি কেউ কাউকে দিতে পারেনা, এমনকি ঈশ্বরও (বেদান্তের "জন্য ঈশ্বর") নয়, এ নিজে তপস্যা করেই অর্জ্জন করতে হয়। ঈশ্বর বা গুরু সাহায্য বা কৃপা করতে পারেন (সাধ্য বস্তু সাধনা বিনা কেহ নাহি পায়) অন্যান্য দর্শনের মত সাংখ্যাচার্য্যেরাও এটা স্বীকার করেন। বলা বাহুল্য এই মুক্তি এই জড় দেহেই এই জড় জগতেই অর্জ্জন করতে হয়, অন্যত্রও নয়—মৃত্যুর পরও নয়।

যে কোন প্রকারেই হোক প্রকৃতির (অজ্ঞানের) হাত থেকে মুক্ত হওয়াই মুক্তি—ইহাই কৈবল্য, পুরুষার্থ। মুক্তির অর্থ এই জড় দেহ, প্রাণ, মন এদের হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভ করা। এই জড় দেহের রূপান্তর হয় না, কাজেই এই জড়দেহ ধারণ করা অর্থ হল নিম্নপ্রকৃতির বন্ধন বা দুঃখ বরণ করা। কপিল মতে মুক্তি তিন প্রকার হলে লয় ছাড়াও মুক্তি সম্ভব। মৃত্যুর পর মুক্ত জীবাত্মার যখন অন্যত্র তার সত্তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আনন্দে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে তখন লয় হয়ে যাবার মধ্যে যে কি পরমপুরুষার্থ রয়েছে তা বুঝতে পারিনা, এটা যাদের সত্যিকার পুরুষার্থের অভিজ্ঞতা নাই তাদের মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনা মাত্র, আমারও আগে ঐরূপ কল্পনা ছিল। এখানে মনে রাখা অবশ্য দরকার যে এ তত্ত্ব শুদ্ধ চেতনা (Pure consciousness) ছাড়া অন্য কিছু নয়, এখানে আনন্দ বা ঐরূপ কিছু নেই। এখানে গেলে অনুমান করা যায় যে এরপরও কিছু বড় সত্য আছে এবং তা বুদ্ধদেবও উপলব্ধি করেছিলেন, সেটা হ'ল বেদান্তের পরব্রহ্ম-বা গীতার

পুরুষোত্তমতত্ব। যার উপরে বা বাহিরে আর কিছুই নেই, ইহাই পরম ও চরম তত্ব।

সাংখ্যদর্শন দুটি। মূল সাংখ্য কপিলের তত্ত্ব-সমাস, অন্যটি গৌণ বা এরই বিস্তার, পতঞ্জলির যোগ। জৈমিনির মত কপিলও ঈশ্বর মানতেন না বলে তাঁর দর্শনের নাম হয় নিরীশ্বর সাংখ্য, আর পতঞ্জলি ঈশ্বর ("জন্য-ঈশ্বর-" বেদান্তের) মানতেন বলে তাঁর দর্শনের নাম হয় সেশ্বরসাংখ্য। পতঞ্জলি প্রচারক মাত্র মূল বক্তা হিরণ্যগর্ভ।

তত্বসমাস বা দ্বাবিংশ সূত্র—এটি মাত্র বাইশটি সূত্রের সমষ্টি, তার মধ্যে প্রথম ও শেষ সূত্রটি বাদ দিলে থাকে মাত্র কুড়িটি সূত্র; এই ক্ষুদ্র কুড়িটি সূত্রে অপূর্ব্বভাবে তিনি প্রকৃতি রহস্যের পরিচয় ও মুক্তির পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। বলা বাহুল্য সমস্ত সাংখ্য-দর্শনই এই কুড়িটি সূত্রের বিস্তার বা ভাষ্য। ইনি ঈশ্বর মানতেন না, তাঁর দর্শন তাই বলে, যদিও বেদ, পুরাণ বা মহাভারতে তাঁকে ভক্তরূপে বলা হয়েছে—ঈশ্বর বা মন্ত্রের কোনপ্রকার ইঙ্গিত নেই তাঁর দর্শনে। মনে রাখা দরকার এই ঈশ্বর দেহধারী অর্থাৎ সৃষ্ট। এর মুক্তি বা কৈবল্য দেবার ক্ষমতা নেই এবং তত্ববিদ্‌গণ একে প্রকৃত তত্বও বলেন না। তাকেই তত্ব বলা হয় যার কখনও ধ্বংস হয় না। যার উৎপত্তি, পরিণতি ও ধ্বংস হয় তাকে দার্শনিকরা তত্ব বলেন না (যোগ পরিচয় ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার) অর্থাৎ এই ঈশ্বর সৃষ্ট, সৃষ্টির অতীত নয়, তত্ব সৃষ্টির অতীত। বুদ্ধদেবের মত কপিলও ঈশ্বরের প্রাধান্য স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে এ তত্ব মাত্র সাধনা দিয়ে। আর্য্য অষ্টাঙ্গযোগের পথে লভ্য। বুদ্ধদেব ঈশ্বর (ও পুরুষোত্তমকে) জানতেন, তা বলেও গিয়েছেন, কিন্তু তত্ব ঈশ্বরের বহু উর্দ্ধে, অবশ্য পুরুষোত্তম তত্ব নয়। ঈশ্বর ছাড়াও এ তত্ব বা মুক্তি, মোক্ষ লাভ করা যায়। তত্বসমাসের শেষ বা দ্বাদশ সূত্রটি "এতৎ সম্যক্ জ্ঞাতা কৃতকৃত্যঃ স্যাৎ ন পুনস্ত্রিবিধেনাঽভিভূয়তেঃ এই সকল তত্ব (তত্ব দুইপ্রকার অপরিণামী বা পুরুষ ও পরিণামী বা প্রকৃতি) সম্যক রূপে উপলব্ধি করতে পারলে কৃতকৃতার্থ হয়, আর কখনও দুঃখত্রয়ে অভিভূত হয় না। এখানে মুক্তির কথা বলা হয়েছে, লয়ের ইঙ্গিত নেই।

মোক্ষ বা মুক্তি তিন প্রকার (ত্রিবিধে মোক্ষঃ, ২০সূত্র, তত্ত্ব-সমাস] অর্থাৎ লয় হওয়াই একমাত্র মোক্ষ বা মুক্তি নয়, অন্য প্রকারের মোক্ষও আছে। বিদেহ কৈবল্য বা ব্রহ্ম নির্ব্বাণ বা বৌদ্ধের লয় একই তত্ব-লিপ্ত কৈবল্য বা মুক্তি তা নয় তাহলে জন্মসিদ্ধ কপিলকে আর জন্ম নিতে হ'ত না বা তার সম্ভাবনাও থাকতো না কখনও। আমি বহুবার সেখানে গিয়েছি তাই বলতে পারি লয় বা বিদেহ-কৈবল্য বা ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ মুক্ত পুরুষরা চান না। এ সম্ভব এবং হয়ও। মৃত্যুর পর মুক্ত জীবাত্মা অন্যত্র শান্তিতে যখন থাকতে পারে তখন ব্যষ্টিসত্বায় লীন হয়ে যাবার কোন অর্থ হয় না। যাঁদের এই মুক্তি বা কৈবল্যের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা মানবেন আমার কথা। এই কৈবল্য হতে নেমে এলে মনে হয়, এ পূর্ণ জ্ঞান নয়, এর পরও আরো কিছু আছে এবং তার আভাস বা ইঙ্গিতও কিছু পাওয়া যায়। এই কৈবল্য বা মুক্তি যাকে বুদ্ধদেব সর্ব্বশূন্য বলেছেন, বেদান্ত বলেছেন নির্গুণ ব্রহ্ম, এ মাত্র শুদ্ধ চেতনা (pure consciousness)। এখানে এ ছাড়া জ্যোতিঃ বা অন্য শক্তি বা আর কিছুই নেই, দ্বৈত বলে এখানে কিছু নেই। অন্য লোকের যেমন অধিমানস (over mind) জগতের, অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে, তাঁদের মনে হবে এ পূর্ণ সত্য নয়—"এই বাহ্য" আসে কত আর। এখানে মাত্র শুদ্ধ অদ্বৈত চেতনা সঙ্গে গভীর অন্ধকার ও ভয়াবহ নীরবতা (Silence) এরা সব একত্র মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে কালহীন সীমাহীন এক অনন্ত শুদ্ধ চেতনায়। এখানে বেশীক্ষণ থাকা যায় না। এখানে বহুবার গিয়েছি কাজেই ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। এখান থেকে সগুণ ব্রহ্ম, ও পরব্রহ্ম বা পরব্রহ্মে যাওয়া সহজ।

পতঞ্জলির যোগ—ভারতীয় অন্য সব দর্শনের মত দুঃখবাদেই এই দর্শনের উৎপত্তি। কি করে দুঃখের হাত হতে মুক্ত হওয়া যায় তাই-ই ইহার প্রধান প্রতিপাদ্য। পতঞ্জলি ঈশ্বর স্বীকার করতেন বলে তৎপ্রচারিত দর্শনের নাম হয় (শঙ্কর সাংখ্য) ঈশ্বর মানলেও তিনি স্পষ্টই বলেছেন মুক্তি বা কৈবল্য দেবার বা সৃষ্টিতে ঈশ্বরের হাত নেই। গুরু বা ঈশ্বর কৃপায় কৃপাই লাভ হয়, মুক্তি বা কৈবল্য নয় আর যাই হোক না কেন, মুক্তি বা কৈবল্য কৃপা লভ্য নয়, তা নিজের পুরুষকার বা তপস্যা দ্বারাই অর্জন করতে হয়। মুক্তি বা মোক্ষ সৃষ্টির অতীত

তত্ব। ঈশ্বর সৃষ্টির মধ্যে। বলা বাহুল্য সমস্ত সাংখ্যদর্শনই পুরুষকারবাদী, অদৃষ্ট গৌণ। পতঞ্জলি মতে চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ, এই নিরোধ হ'লে পুরুষ তার স্বরূপ উপলব্ধি করে। এই ই মূল কথা। এঁর মতে ইচ্ছা যদি খুব বলবতী হয়, তাহলে এই জন্মেই মুক্তি সম্ভব। অর্থাৎ যার সুতীব্র একাগ্রতা সহ ইচ্ছা যত্ন ও চেষ্টা নিরন্তর একমুখী হয় তার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। তিনি ঈশ্বর কৃপা ও ওঁ মন্ত্র ইত্যাদিষ কথাও বলেছেন। সকলের মত তাঁর পথও আর্য্য অষ্টাঙ্গের পথ অর্থাৎ যমনিয়ম করে শেষে সমাধিলাভ করে মুক্ত হওয়া। সমাধি বহু প্রকারের, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুটি, সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্প সমাধি। অন্যটি অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বিকল্প সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্প সমাধির অর্থ ঐ অবস্থায় প্রকৃতির বা সৃষ্টির রহস্য, ঈশ্বর দেবদেবী ইত্যাদির দর্শন হয়, এটা দ্বৈত কিন্তু এতে কৈবল্য বা মুক্তিলাভ হয় না। তা পেতে হ'লে এ ছাড়িয়ে উঠতে হবে অদ্বৈত তত্বে, সৃষ্টির অতীতে এবং তার একমাত্র পথ অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বিকল্প সমাধি, আর অন্য পথের কথা জানি না। নির্ব্বিকল্প বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ব্যষ্টি বা অহংবোধ থাকে না, কাজেই সেখানে দুয়ের স্থান নেই, কে দেখে বা কাকে দেখে সে কথা সেখানে অবান্তর, অর্থাৎ অদ্বৈত ব্রহ্মে দ্বৈতের কোন স্থান নেই। সম্প্রজ্ঞাত অভিজ্ঞতা না থাকলেও কিছুটা অনুমান করতে পারি, কারণ আরও অন্য সমাধির অভিজ্ঞতা কিছু আছে।

জাগ্রত (অবস্থায়) সমাধি হয় না। সমাধি, সে যে রকমেরই হোক না কেন, জড় দেহ, মন ও প্রাণ ত্যাগ করে শরীর ছেড়ে যেতে হবেই। জাগ্রত ও সমাধি পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থা, জেগে স্বপ্ন দেখা যায় কিন্তু ঘুমোনো যায় না, আমি সুদীর্ঘকাল চেষ্টা করেই পারিনি! যাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে তারা খালি চোখেই অনেক কিছু দেখতে পান—কিন্তু তা নিকটের, সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে সগুণ বা নির্গুণ ব্রহ্ম বা অধিমানস (over mind) জগৎ দেখা যায় না, তাহলে সমাধির আর প্রয়োজন হ'ত না। সূক্ষ্মদর্শীরা ব্রহ্মজ্ঞানবান, তার জন্য সমাধির দরকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি, যে কোন সমাধিতে যেতে হলে স্থূল শরীর ছেড়ে এর বাইরে যেতে হবেই।

অনেকের মতে সাংখ্যের কৈবল্য, অদ্বৈতব্রহ্ম ও বুদ্ধের নির্ব্বাণ একই তত্ব এবং এটাই ঠিক বলে মনে হয়। যে অদ্বৈত বেদান্ত স্বীকার করেন নিগুর্ণ ব্রহ্মে আনন্দের স্বাদ আছে, তাঁরা ঠিক অদ্বৈত বেদান্তী নন। যারা স্বীকার করেন ব্রহ্মে আনন্দের স্বাদ আছে আর যাঁরা তা স্বীকার করেন না, তাঁদের মধ্যে বেশ একটু পার্থক্য আছে, শুনতে একটু শ্রুতিকটু হলেও তা সত্য। নিগুর্ণ ব্রহ্মের দুটি বিভাব আছে, একটি অসৎ বা অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বা সচ্চিদানন্দ। এই অসৎ বা শূন্য শূন্যবাদী বৌদ্ধদের চরম লক্ষ্য (বুদ্ধের শূন্য ও বৌদ্ধের নির্ব্বাণ আর নিগুর্ণ ব্রহ্ম একই তত্ব)। অপরটি ব্যক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, যার তিন বিভাগ সৎ, চিৎ ও আনন্দ বা সত্যলোক, তপলোক ও আনন্দলোক। এখানে আনন্দের স্পন্দন আছে, যা অব্যক্ত বা নিগুর্ণ ব্রহ্মে নেই। কাজেই যাঁরা বলেন ব্রহ্মে আনন্দ আছে তাঁরা এই ব্যক্তি নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দের উপলব্ধিই করেছেন তার বেশী নয়। এই সাংখ্যে কৈবল্য বা বুদ্ধের নির্ব্বাণ বা অদ্বৈত বেদান্তের নিগুর্ণ ব্রহ্মে আমি বহুবার গিয়েছি। যেখানে আনন্দের অনুভূতি আছে, সেখানে দ্বৈতের আভাস আছে, সেখানে আনন্দের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করা হ'ল, অহংতত্বও স্বীকৃত হ'ল, সে আর যাহোক—অদ্বৈত শুদ্ধ চেতনা তা নয়। কৈবল্য বা নির্ব্বাণে এরূপ কিছু নেই। তবে এটা ঠিক সমাধির পর জাগ্রত হ'লে স্থূল শরীরে নেমে এসে আমি আনন্দের স্বাদ পেয়েছি, সমাধিস্থ অবস্থায় নয়। আনন্দ সেখানে আছে, তা না হ'লে তার অনুভূতি পেতাম না, কিন্তু সেখানে আনন্দ আছে গুপ্ত বা বীজাকারে—তার পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই, এক অদ্বৈত শুদ্ধ চেতনা ছাড়া। বলা বাহুল্য এটি মাত্র অদ্বৈত শুদ্ধ চেতনার স্তর, এখানে দ্বৈতের কোন স্থান বা অনুভূতি নেই। এবার সৃষ্টিতত্ব সম্বন্ধে যা জেনেছি বলবার চেষ্টা করি। মনে করুন একটা সাততলা বাড়ী, তার মাটির নীচে এক খানা ঘর। মাটির নীচের ঘর গুলো অচিতি (Inconscient), এক তলার ছাদ আমাদের এই জড় জগৎ (Natural work), দুই তালার ছাদ প্রাণময় জগৎ (Vital works), তিন তালার ছাদ মনোময় জগৎ overmental works, চার তলার ছাদ স্বর্গ বা অধিমানস জগৎ (overmental worlds), পাঁচ তলার ছাদ সগুণ

ব্রহ্ম বা অতি মানসিক জগৎ (Supermental orws), ছয় তলার ছাদ নিগুর্ণ ব্রহ্ম (Silent brahman), সর্ব্বশেষ গীতার পুরুষোত্তম বা বেদান্তের পরব্রহ্ম, যাঁর অতীত বা উপরে বা বাইরে কিছুই নেই। এটি মনে রাখলে বুঝতে সুবিধে হবে। এখানে যেমন এক ছাদ থেকে উপরের ছাদে যেতে হলে মধ্যে কয়েকটা সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয়, তেমনি এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যেতে হলে মধ্যবর্তী কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। এই সমস্ত স্তরই স্বয়ংসম্পূর্ণ অথচ প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে বদ্ধ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা কারো নেই। এখানে বিশেষ করে মনে রাখা দরকার যেমন প্রত্যেক স্তরের বা ছাদের বিভিন্ন চেতনা আছে, তেমনি তাদের সিঁড়ি বা বিভাগেরও পৃথক পৃথক চেতনা আছে, এক কথায় একই চেতনা দুই জায়গায় নেই কখন। যেমন ব্যক্তি নির্ব্বিশেষের তিন বিভাগ সত্যলোক, তপলোক ও আনন্দ লোক তেমন সগুণ ব্রহ্ম বা অতিমানব লোকের তিন বিভাগে অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত এই তিন বিভাগে সম্পূর্ণ তিন প্রকার বিভিন্ন চেতনা একই লোকের হয়েও বিভাগ জন্য চেতনার তারতম্য।

চেতনাবিহীন স্থান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও নেই, এমনকি অচিতি (Inconscient) যাকে পাতাল বলে, যা, আমাদের পায়ের নীচে, যা অন্ধকার তার জ্যোতিঃ ও নিজস্ব চেতনা আছে। আমি অচিতির চেতনার সঙ্গে একীভূত হয়েছি, তার চেতনা না থাকলে এ সম্ভব হ'তনা। বাস্তবিক অন্ধকারের অর্থ হ'ল কম আলো বা অতিক্ষীণ আলোক, একেবারে আলোহীন নয় এবং তা সম্ভবও নয়, তা যদি হতো তাহ'লে অন্ধকারে কেউই দেখতে পেতনা। বিড়াল অন্ধকারে দেখে, তার অর্থ অন্ধকারের ক্ষীণ আলো সে তার চোখে কেন্দ্রীভূত (Concentrated) করে—ফলে সে দেখতে পায়—আমরা তা করতে পারলে গভীর অন্ধকারে দেখতে পারি, অন্ধকার একেবারে আলোহীন হ'লে তা সম্ভব হতনা। নিগুর্ণ ব্রহ্মের গভীর অন্ধকার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। সেখানে শুদ্ধ চেতনার মধ্যে সমস্ত বীজাকারে রয়েছে বলে বা তাদের ঘনীভূত অবস্থা বলে ঐ অদ্বৈত তত্ত্বে আর কারো পৃথক অস্তিত্বই নেই।

সাধনার দুটি পথ আছে—একটি অতি বাঁকা ও সুকঠিন, অন্যটি সরল ও সহজ। যারা আর্য্য অষ্টাঙ্গ যোগের পথে যেতে চেষ্টা করেন অর্থাৎ যমনিয়ম-আসনাদি করে সমাধি লাভ করতে চেষ্টা করেন তাদের পক্ষে এই সব অভ্যাস করে এক জীবনে সিদ্ধিলাভ করা অর্থাৎ মুক্তি বা কৈবল্য লাভ করা অতীব সুকঠিন। তাকে অতি ধীরে ধীরে অন্তবর্তী সমস্ত ধাপ বা চেতনা কষ্ট ও গভীর পরিশ্রম করে উঠতে হবে। মনে রাখা দরকার—সাধনার পথ ক্ষুরস্য ধারা, তোতাপুরী মহারাজেরই সুদীর্ঘ ৭০ বৎসর কঠোর তপস্যা করতে হয়েছিল নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করার জন্য। আজন্ম ব্রহ্মচারী গৃহত্যাগী কঠোর তপস্বী সাধকেরই এই অবস্থা। অন্য পথটির সঙ্গে লিফটের (lift) তুলনা করা চলে, একেবারে সোজা চলে যাওয়া—কোথাও না থেমে বা কোন ছাদ বা লোক স্পর্শ না করে। এ দুটিই সম্ভব। আমি মাত্র ১০ মাসের চেষ্টায় কৈবল্য নির্ব্বাণ বা নিগুর্ণ-ব্রহ্মে গিয়েছিলাম যদিও আমার লক্ষ্য ছিল পরব্রহ্ম। এর জন্য আমি কারো কৃপা বা সাহায্য—দীক্ষা, কিছুই আমি পাইনি। দৈবকৃপা বা মহাকালীর কৃপা অবশ্য আমি পেয়েছিলাম, কিন্তু তা বহু আগে—এর পরে বুদ্ধদেবের। তবে এটা সত্য কৃপা সাহায্য করেছে, মুক্তি দেয়নি তা আমাকে—সাধনা করে অর্জ্জন করতে হয়েছে। পরে জানতে পারি ওঁ মন্ত্রটি স্বয়ংসিদ্ধ অর্থাৎ মন্ত্রটি ঠিকমত একাগ্রতা সহকারে নিষ্ঠার সঙ্গে জপ করতে পারলে মন্ত্রটিই চেতনাকে বা অন্তশ্চেতনা মন্ত্রটিকে রূপ দেয়—অর্থাৎ মোক্ষ বা নির্ব্বাণে নিয়ে যায় এর সঙ্গে আমি বিনা কষ্টে লাভ করি অযাচিত ভাবে নির্ব্বিকল্প সমাধি ও অন্য আর একটি সমাধি, যার মধ্য দিয়ে আমি অচিতির চেতনার সঙ্গে একীভূত হই।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে যাঁরা বিদেহ কৈবল্য লাভ করেন তাঁরা কোথায় থাকেন মৃত্যুর পর। আমি বহুবার সেখানে গিয়েছি, তাই বলতে পারি সেখানে কৈবল্য প্রাপ্ত বা মুক্ত জীবাত্মারা মৃত্যুর পর সংকল্প করে লয় হবার জন্য যান না, কারণ তাঁদের মৃত্যুর পর মুক্ত অবস্থায় আনন্দে থাকবার জন্য অন্য লোক আছে, সেখানে যতদিন ইচ্ছা স্বরূপে অবস্থান করা যায়। এও সত্য যাঁরা সংকল্প করেন মৃত্যুতে একেবারে লয় হয়ে যাবেন বা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

হঠাৎ খুকির কান্নার শব্দে চমকে উঠল। কাঁদছে ক্ষীণকণ্ঠে বাচ্চাটা। মনফিরে আসে সেই কল্পনার রঙ্গীণ রাজ্য থেকে এবার অন্ধকার ওই ঘরের মধ্যে।

কেমন বন্দী করে রেখেছে ওই বাচ্চাটাই এই প্রাণহীন বাড়ীর সঙ্গে তাকে অদৃশ্য কঠিন কোন কোন বাঁধনে। নিস্তব্ধ পুরীতে ওই একটুকুই মাত্র প্রাণের সঙ্কেত—আর সব শব্দ থেমে গেছে—স্তব্ধ হয়ে গেছে।

খুকিকে বুকে তুলে নেয়, গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে।

হঠাৎ জীবনকে ঢুকতে দেখে স্বামীর দিকে চাইল মণিমালা। জীবন সাইকেল নীচে রেখে উঠে আসছে। সারাদিন নাওয়া খাওয়া হয়নি, তবু মুখে কেমন একটা নীরব তৃপ্তির ছায়া।

—তুমি! কখন এলে? মণিমালা ওকে প্রশ্ন করে!

—কেমন আছে খুকি?

—তেমনিই!

আবার জ্বরের ঘোরে যেন অচৈতন্য হয়ে পড়ছে সে। ঘুমিয়ে পড়ে বেহুঁসের মত। বিছানায় শুইয়ে এগিয়ে আসে মণিমালা।

জীবন বলে ওঠে- চাকরি একটা পেলাম।

চাকরী! কোথায়? অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মণিমালা স্বামীর দিকে। জীবন জানলার বাইরে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়—ওইখানে!

চুপ করে ওই দিগন্তে আলোর দিকে চেয়ে থাকে মণিমালা। নোতুন ব্লাষ্ট ফার্ণেসের বুক থেকে গরম লোহার স্লাগ বের হয়ে আসছে - তারই চোখজ্বালানো লালদীপ্তি দূর আকাশ জ্বালিয়ে দিয়েছে। বলে চলে জীবন।

অনেক ভেবে চিন্তে নোবই ঠিক করেছি। তবু মাসে নগদ কিছু আসবে। কোয়াটারও পাবো। এতবড় বাড়ী টিকিয়ে রাখা যাবেনা, দেখছনা চারিদিকে ফাটল ধরেছে, ধ্বসে পড়বে চুরমার হয়ে একদিন। তাছাড়া—

মণিমালা কি ভাবছে।

একেবারে দিন বদলের কথা, এদেরও ভিত্তিমূলে নাড়া পড়েছে। ধ্বসছে ওদের অন্তর বাইরের সব রূপ, সব সংস্কার, সবকিছু। দুঃখ হয় কিছু তবু ভাললাগে। এবাড়ীর কারাগার থেকে মুক্তি পাবে—এখনও নোতুন করে বাঁচবার সময় পাবে।

বলে ওঠে—ভালোই হয়েছে।

—সত্যি! জীবন স্ত্রীর দিকে চাইল।

মণিমালা অন্তরের আনন্দ চেপে রাখে, স্বামীর কাছেও তা প্রকাশ করতে চায় না। প্রকাশ করতে চায় না এ বাড়ীর ধ্বংসে সে আনন্দিত। কোন রকমে বলে—এ ছাড়া আর পথ কি বলো?

চুপকরে থাকে জীবন। কত দুঃখ আর বেদনায় তাকে আজ এটা স্বীকার করে নিতে হয়েছে তা কি করে মণিমালাকে বোঝাবে! লোহা কারখানায় হপ্তা রোজের চাকরী!

তারই সংবাদে খুশী হয়েছে মণিমালা—আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে সে নিজেও!

—জানলাটা বন্ধ করে দেবে?

জীবন যেন ওই আলোর দিকে চাইতে পারে না।

মণিমালা বলে ওঠে—ওইখানেই গিয়ে থাকতে হবে এবার! বাবাঃ যা অন্ধকার এখানে ভয় লাগে।

জবাব দিলনা জীবন।

ক্লান্তিতে সারা শরীর ছেয়ে আসছে—পরাজিত ক্লান্ত মানুষটার দিকে চেয়ে থাকে মণিমালা।

নিদারুণ দুঃখ আসে বুক ঠেলে।

এমনি দিনে নোতুন পঞ্চায়েত বোর্ড ইলেকসনএর পর্ব আসে। পঁচিশ বছর ধরে প্রেসিডেণ্টের গদি আঁকড়ে ছিল তারকরত্নবাবু। আশপাশে সাতজন মেম্বার বলতে ওই অবনী মুখুয্যে—হাটতলার চাটুয্যে—গোপগাঁয়ের নটবর দাস—নমশূদ্র মেম্বর নিতাই বাগ্দী এরাই।

সাধারণ গ্রামবাসীরা শুধু হঠাৎ পাঁচবছর পর দেখত—বাবুরা দুএকদিন এদিক ওদিকে বের হয়েছে, তারা কৃতার্থ হয়ে যেত।

তারপর আবার আগেকার সেই নামগুলোই বোর্ড অপিসের দেওয়ালে লটকানো হয়ে যেত। তাদের অবশ্য এতে কোন উৎসাহই ছিলনা বিশেষ। যেই হোকনা কেন, তাদের যে একই অবস্থা থাকবে এটা ধরেই নিয়েছিল।

এতকাল তেমনই চলে এসেছিল, এবার হঠাৎ যেন কেমন একটা সাড়া জাগে: পান্নুদাস দাঁড়াচ্ছে তারই কয়েকজন চর অনুচর। ওদিকে কামারপাড়া থেকে মাথা তুলেছে তারাও দাঁড়াবে। আশপাশের গ্রমে তন্তুবায় সমিতি কৃষকসমিতি আর আরও অনেক সাধারণমানুষ এবার মাথা তুলেছে। তারা পথে নেমেছে—সরগোলে বিভিন্ন গ্রাম মুখর করে তুলেছে। পান্নুদাসও একখানা জিপে পতাকা তুলে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, সঙ্গে রয়েছে সেই গোকুল—ডাকনাম এখন তার চোরা গোকুল।

সেই অভয় দেয়—গ্যাটমেরে বসে থাকুন দাস মশায়, আমি সব ম্যানেজ করে দিচ্ছি।

গোকুলও আবার ভাঙ্গাদল যোড়া লাগিয়েছে। আশা রাখে এবার আর রাতের অন্ধকারে গেরস্থর পাঁচীল টপকে দরজা ভেঙ্গে ঢুকতে হবেনা, দিনে দুপুরেই ওটা করবার আশা রাখে। পান্নু ভাবছে—তাইতো কামারপাড়ার ওদিকেই ভয়রে, বড় বাবু তো টেসে গেছে। কিন্তু ওরা যে রক্তবীজের ঝাড়। পিছনেও লোক আছে, কথাটা গোকুলও ভাবে। ওদিকে সে আজও ভয় করে, ওদের দেহে আছে অসুরের মত শক্তি আর পিছনে বুদ্ধি দেবার অন্য আছে অশোকবাবু। সারা অঞ্চলের লোকও যেন আস্তে আস্তে ওই জনতার পিছনে দাঁড়িয়েছে। তাদের তুলনায় পান্নুদাস অনেক যেন দুর্বল। তবু গোকুলের পান্নুকেই চাই।

চুপি চুপি জবাব দেয়—ছাড়েন না ওদের কথা, শেষ ইলেকশনের দিন দোব দুচার বম্ ঝিরিয়ে সব ভণ্ডুল করে। বলেন কেনে দুর্গাপুর থেকে দুবার ইয়ার বন্ধুকে নিয়ে আসবো।

পান্নু জানে—ওটা তার শেষ অস্ত্র। তাই আপাততঃ বলে ওঠে ওসব এখন থাক গোকুল। চল গোপগাঁ দিকে ঘুরে আসি। গোকুল নিপুণহাতে ষ্টিয়ারিংএ মোচড় দেয়।

পান্নু ভাবছে কামারপাড়ার পুঞ্জীভূত শক্তিকে কোথায় আঘাত হানবে। মনে মনে খুশীই হয়—একটা পথ সে পেয়েছে।

রোদপোড়া ধুসর মৃত্তিকা—বৃষ্টির জলে ধুয়ে ধুয়ে লাল কাকুরে মাটি খোয়াইএর সৃষ্টি করেছে, ওপাশে আধমরা শালবনের বিবর্ণতা—তারই পাশ দিয়ে চলছে জিপটা।

দূর থেকে কামারপাড়ার জনতার কোলাহল শোনা যায়। নোতুন তৈরী ইস্কুলের পাশ দিয়ে চলেছে ওরা ভিন্ন গ্রামের দিকে।

এতবড় ঝড় থেকে দীর্ঘদিন পর তারকবাবু সরে দাঁড়িয়েছে—সে যেন বাতিল একটি প্রাণী। অবনী মুখুয্যে, শক্তি চাটুয্যে এসেছে। আজ আর বৈঠকখানায় চালা ফরাসও নেই, বোর্ডএর জমকালো অফিসও বন্ধ, জনহীন। বিশালদেহ হরিনারাণও ক'দিন জিরুচ্ছে, নোতুন মনিবের

দল এলে আবার বোর্ডের দরজা খুলবে, ততদিন ছুটি করে নিয়েছে বেওয়ারিশ রাজত্বে।

...তারকবাবু চুপ করে বসে আছে।

জীবন চাকরীর তদারকে গেছে সাইকেল হাঁকিয়ে দুর্গাপুরে। শুনেছে তারকবাবু সবই। দেখেছে নিজের চোখে—বিনা চিকিৎসায় বাচ্চাটা কেমন তিলে তিলে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে। কোন পথ নেই।

...সতীশ ভটচাযকে গোপনে কিছু দরজা জানলা বিক্রী করেছিল তাই দিয়েই চলছে ক'দিন। পিছনের বাঁশবাগানের কিছু বাঁশও দুর্গাপুরের ঠিকাদারকে বিক্রী করেছে, দিঘীর পাড়ের কিছু পুরোনো তালগাছও বিচবে।

এমনি করে ক'দিন চলবে।

তাই জীবনের চাকরী খোঁজাটাকে মনে মনে সমর্থন না করে পারেনা। বৌমার দিকে চাইতে পারেনা—মনে হয় মস্তবড় একটা অপরাধ করেছে সে নিজেই ওকে এবাড়ীতে এনে।

বড় ঘরের মেয়ে সেদিন ওরা জীবনকে দেখে ভুলেছিল—মাকাল ফল ছেলে, সাজান এতবড় সাম্রাজ্য, কিন্তু ভিতরে কিছুই নেই। ওরা বাইরে থেকে জীবনকে দেখে বিয়ে দিয়েছিল।

তারকবাবুও ছিল প্রধান উপলক্ষ্য।

আজ! আজ মনে হয় মণিমালা তাকেই সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করে।

...চুপকরে বসে আছে তারকবাবু একাই। ওদের ঢুকতে দেখে মুখতুলে চাইল।

শুকনোকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানায়—এসো অবনী। চাটুয্যে যে—অনেকদিন পর?

বসো রমণ।

অবনী ভাঙ্গা চেয়ারে বসে চারিদিক দেখতে থাকে। সারা ঘরে কেমন একটা মলিন বিবর্ণতা। তার ছায়া নেমেছে তারকবাবুর মুখে চোখেও।

—তুমি এসব দাঁড়িয়ে দেখবে শুধু? গাঁয়ের মধ্যে মানুষ হল পানুদাস—আর ওই গুণ্ডো কামারপাড়ার ওরা?

রমণ ডাক্তার বলে ওঠে—ওদেরই মেনে নিতে হবে?

—না মেনে উপায় কি বলো? তারকবাবু জবাব দেন, একটু থেমে বলে চলেন।

—দিন বদলাচ্ছে ডাক্তার, আমরাও ঝরাপাতার মত ঝরে গেছি—দুঃখ করে লাভ কি?

—তাই বলে ওই সব বাজে লোকগুলোকে মাথায় তুলতে হবে? রমণ ডাক্তারের মন বিষিয়ে উঠেছে নানা কারণে। নোতুন সরকারী ডাক্তারখানা খুলেছে ওদিকেই, অশোকের চেষ্টাতেই তা সম্ভব হয়েছে, গড়ে উঠেছে নোতুন ইস্কুল—লাল ডাঙ্গার উপর সাদা ছবির মত বাড়ীগুলো গ্রামকে ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এতকাল এরা যা করতে পারেনি—নোতুন কালের ওরা তার চেয়ে অনেক বেশী করেছে। এইটাই যেন সদাপে ঘোষণা করে—তারই দাবীতে আজ কর্তব্য অধিকার করতে চায়।

...অবশ্য রমণ ডাক্তারের অসুবিধা বেশ হয়েছে ওই ডাক্তারখানার জন্য। ঝাঁজটা তাই তারই বেশী।

শক্তি চাটুয্যে এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, সেও বলে ওঠে—এমোকালী শুনলাম নাকি গ্রাম প্রধান হবে। গাঁ ছেড়েই চলে যাবো ভাবছি।

অবনী বলে—এদিকে ভাসুর, ওদিকে আঁস্তাকুড় এদিকে পানু আর ওদিকে এমোকালী। বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?

তারকবাবু চুপ করে থাকে। ধীরে ধীরে বলে।

—এ মেনে নেওয়া ছাড়া পথ নেই, ডাক্তার। আমি মেনেই নিয়েছি। তাইতো একোণে এসে লুকিয়েছি, লজ্জায় আর দুঃখে। এছাড়া আর করবারই বা কি আছে।

...হঠাৎ পানুকে উঠে আসতে দেখে ওরা একটু অবাক হয়। এগিয়ে এসে পানু গুরুজনদের পায়ের ধুলো নেয় পরম ভক্তি ভরে। রমণ ডাক্তার একটু আশ্চর্য্য হয়। পানু এত বড় অবস্থা করেও বদলায় নি।

যোড় হাত করে আবেদন জানায় তারকবাবুকে—যদি দয়া করে অনুমতি দেন—আমিই দাঁড়াই, নাহলে আপনিই দাঁড়ান বড়কাকা—আমি সরে যাচ্ছি। তবু ওই কামার-পাড়া—বাগ্দীপাড়া, তাঁতীপাড়া—দশ গাঁয়ের বেহেড গুলোকে প্রশ্রয় দেবেননা।

অবনী মুখুয্যে লাফ দিয়ে ওঠে পানুর কথায়। মনের কোণে আশার খবর জাগে। পানুও তাকে খুঁজে

ফেলবেনা। শক্তি চাটুয্যেও ভরসা পায়। তারা কথাটা সমর্থন করে।

—ঠিক বলেছ পান্নু। হক্ কথা।

পান্নু ব্যবসা জানে। ভাগ দিয়ে যেতে হয় এটা ও শিখেছে।

তাই বলে ওঠে—ওদের বলুন। দশগাঁয়ের মানী লোক আপনারা—আজও দাঁড়ালে লোকে আপনাদের কথা শুনবে।

তারকবাবুর ওদের এই ভাবান্তর দৃষ্টি এড়ায়না। দুঃখ আর বিপদের মাঝে মানুষ চিনতে আর দেরী হয় না। অবনী শক্তিকেও চেনে তারকবাবু। কেমন সবকিছুর উপরই বিতৃষ্ণা আসে আজ।

পান্নু দাঁড়ালনা, অবনী শক্তি চাটুয্যেও ওর পিছু পিছু চলে গেল—ওদের উদ্দেশ্যও বুঝতে দেরী হয় না। হাসে তারকবাবু।

—কই তুমি গেলেনা ডাক্তার?

রমণও আশা করেছিল, কিন্তু হাতুড়ে ডাক্তারের আর দরকার নাই পান্নুর। পয়সা আছে, তুড়ি মারলে পাশকরা ডাক্তার ছোটে। তাই বোধহয় হেনস্থাই করে গেল।

রমণ কথা বললে না—মুখ কালো করে বের হয়ে গেল।

বৈকালের আলো ম্লান হয়ে আসে।

পাখী ডাকছে নীরব বাঁশবনে—হু হু কাঁপে হাওয়া। কেমন অসীম শূন্যতা উঠেছে চারিদিকে—এ বাড়ীর অন্তর বাইরে।

তারকবাবু কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। পথও চেনা যায় না—হঠাৎ কার কান্নার শব্দ কানে আসে। ধ্বসেপড়া প্রায়ান্ধকার বাড়ীটায় গুমরে কাঁদছে মণিমালা।

হ্যাঁ! চমকে ওঠে তারকরত্ন।

.. পায়ের তলের মাটি কাঁপছে!...একমাত্র বংশের প্রদীপ—ওই ছোট্টসুন্দর মেয়েটা!...

—বৌমা! এগিয়ে যায় তারকরত্ন। কাঁপছে সারা দেহ।

মণিমালার ঘরের দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল তারকরত্ন। পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলে চাইল মণিমালা।

...জীর্ণ শয্যায় পড়ে আছে বিবর্ণ ফুলের মত শিশু-কন্যার প্রাণহীন দেহটা। শুকিয়ে যেন ঝরে গেছে জীবনের বৃন্ত হতে। আপনা হতেই ঝরেনি—কে নিষ্ঠুর হাতে ছিড়ে পিষে দলেছে তাকে।

তাদেরই একজন ওই তারকরত্ন—এই প্রাণহীন পুরীর পাহারাদার। মণিমালা ওর দিকে চাইল। বন্দী মণি-মালা—পরাজিত, প্রতারিত একটি নারী।

ওর দিকে চেয়ে থাকে, চোখের জল শুকিয়ে গেছে। ফুটে উঠেছে জ্বালা। দুঃসহ সেই জ্বালা।

...খুকী চলে গেল! আর্তনাদ করে ওঠে তারকবাবু।

—হ্যাঁ।

দুঃসহ জ্বালার উত্তাপে মণিমালার চোখের জল শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে—জমাট পাথর। তারকরত্ন সরে গেল—ভয় পেয়েছে সেও!

পান্নু চরম আঘাত হেনেছে একেবারে ওদের ভিত্তি-মূলে।

...ভুবন কর্মকার আজ প্রকাশ্যে কথাটা পাড়ে—চাকরী পেয়েছি, ভাল চাকরী। কাল থেকেই জয়েন দোব।

অতুল কামার ছেলের কথায় মুখ তুলে চাইল। অবাক হয়ে গেছে সে। কদমও চেয়ে থাকে লোকটার দিকে। ক'দিন থেকেই দেখছিল কেমন যেন অমানুষ হয়ে উঠেছে—আজ বুঝতে দেরী হয় না তার প্রকৃত কারণটা।

এমোকালী ইলেকসনের ব্যাপারে ব্যস্ত—একবার খেতে বাড়ী এসেছিল, সবে উঠোনে পা দিয়েছে, ভুবনের কথায় থমকে দাঁড়াল।

—চাকরী! কোথায়? দুর্গাপুরে?

ভুবন জবাব দেয়—না, এখানেই। নোতুন কারখানা হচ্ছে তারই ম্যানেজার।

ওই পান্নুদাসের কারখানায়?

গর্জন করে ওঠে বুড়ো অতুল—কি বললি? পেনোর কারখানায়?

হ্যাঁ, গদা, ফটিক—নটবর আরও কজন যাবেক, বাকী কারিগর আসছে বিষ্টুপুর—হাওড়া থেকে।

ভুবন বেশ সদাপে বর্ণনা করে চলেছে। কালী বলে ওঠে—লাজ লাগেনা তুমার?

—লাজ।

চমকে ওঠে ভুবন! কথাটা সেই রাত্রেও বলেছিল কদম। কামনামদির উন্মাদ ভুবন আজ ভোলেনি কথাটা। আজ আবার ঠিক সেই কথাই শোনায় কালীও।

…কদমের দিকে চাইল ভুবন!…স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ভুবন-ওর চাহনিতে কেমন বিশ্রী একটা কদর্য ভাব—চোখ দুটো একটু লালচে ঠেকে। সেই রাত্রের একটা বুভুক্ষু দানবের কুৎসিত লালসা আর কদর্য সন্দেহভরা চাহনি।

ভুবন গর্জে ওঠে—ইখানে থাকতে লারবো, ভাল কায পাই কেনে করবোনা?

কালী বলে ওঠে—তাই বলে উথানে, ওই পেনোর কাছে? নিজেদের ঘরের শত্রুর কাছে যাবা—

—বেশ করবো। যেথানে মাইনে পাবো—ম্যানেজারি পাবো—কেনে যাবো না। পাকা বাড়ী—জিপ!…দিবি তুরা?

অতুল অবাক হয়ে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। মনে হয় এতকাল দুধকলা দিয়ে সাপই একটা পুষেছে। আজ বড় হয়ে ফণা মেলেছে—ছোবল দেবার জন্য হয়ে উঠেছে উদ্যত ফণা। গর্জে ওঠে বুড়ো।

—দুশো টাকা দুব—মাতৃহরণ করতে পারবি?

ভুবন বাবার দিকে চেয়ে থাকে। কালী চমকে ওঠে —মামা!

কদমও এগিয়ে আসে। অসহায় রাগে কাঁপছে বুড়ো। হাসছে ভুবন। অবজ্ঞার হাসি।

…জ্যামুক্ত ধনুকের মত সোজা হয়ে অতুল ছেলের গালে সজোরে একটা চড় কসেছে।

—হাসছিস! বেজন্মা কুথাকার।

—বাবা! কদম ওকে ধরতে যায়। বুড়ো হাতের লাঠিটাই তুলেছে—ভুবন ওটাকে নামিয়ে দিয়ে কদমের হাত ধরে টানে।

—চলে আয়!

গর্জে ওঠে অতুল, না যাবে না ও। যেতে হয় তু একাই যা।

—ছোবল মেরেছে সেই উদ্যত ফণা বিষধর সাপটা। নীলাভ তীব্র গরল জ্বালা বুড়োর সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরায়। ভুবন বলে ওঠে—তা যাবে কেনে? নাহলে রাসলীলা জমবেক কেনে? ওই এমোকালী—তোমার অশোকবাবু! এত মহাজনের পায়ের ধুলো পড়ে—কত লীলাখেলা! গোকুলো সেদিন কোটে দাঁড়িয়ে মিছে কথা বলেনি!

…কদম শিউরে আর্তনাদ করে ওঠে—থামবে তুমি!

হাসছে ভুবন—কথাটা আঁতে লেগেছে লয়?…তবে যাবিনা কেনে?

অতুল অসহ্য উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে অসহায় প্রাণীর মত। বলে ওঠে—তুমি যাও বৌমা। এ বাড়ীর লক্ষ্মীও যাবে তোমার সাথে সাথে, কিন্তু কি করবে। এ যে লক্ষ্মীছাড়ার দিন মা। সব যাবে।

—বাবা! কদম ওর দিকে চাইল। বুড়োর চোখে জল। কাঁদছে সে।…অপমানিত লাঞ্ছিত একটি মানুষ।

—তুমি যাও মা এ তোমার শাস্তি—কিন্তু পথ কই?

…হাসছে ভুবন—তবে রংবাজী হচ্ছিল কেনে! তুই গুছিয়ে নে—বাসা দেখেই আমি আসছি। আজই—আভি চলা যায়েগা হিঁয়াসে।

বের হয়ে গেল ভুবন বীর দর্পে। কালী তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, চাপা রাগে ফুলছে সে।

—বৌঠান!

দাঁড়াল না কদম। কান্না আসছে—লজ্জায় অপমানে আর ঘৃণায়। আজ মন চায় প্রতিবাদ করতে, বিদ্রোহী হতে।

…কিন্তু তবু পারে না—জন্মগত সংস্কারই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে সেই স্ত্রীর পতিভক্তির অন্ধ সংস্কার, অন্যদিকে পুঞ্জীভূত প্রতিবাদ আর বিক্ষোভের জ্বালা—অমানুষ পৈশাচিকতার তাণ্ডব, কিন্তু প্রতিবাদের পথ সে জানে না। তাই সহ্য করে আর কাঁদে।

ভিতরে চলে গেল কদম। কালী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।…অতুল কামার ওরদিকে চাইল।…বের হয়ে যাচ্ছে কালী। অনেক কায পড়ে আছে।

কতক্ষণ বসেছিল কদম জানে না।

সন্ধ্যা নামছে গাছ গাছালির মাথায়, পাখীদেরার বেলা। ওদের কলরব কাকলিতে চারিদিক ভরে উঠেছে। এ বাড়ী ওবাড়ীথেকে সন্ধ্যা দীপের আলো দেখা দেয়। শাঁক এর শব্দ কানে আসে।

উঠে বাইরে এল কদম—এ যেন ভূতোপুরী তখনও সন্ধ্যা পড়েনি। মেজবৌ সেজবৌ ঘাট এর দিকে গেছে, এখনও ফেরেনি।

নিজেই কাপড় ছেড়ে সন্ধ্যা দিতে যায়।

…বাড়ীটা নিস্তব্ধ। অতুল কামার ও বার হয়ে গেছে বাইরের দিকে—খামার বাড়ীতে এসে থামল কদম। আবছামুখ-আঁধারী সন্ধ্যা নির্জনপথে কেউ কোথাও নেই। বাঁশ গাছটা দোলখায় অশরীরী কালো ছায়ার মত।

হঠাৎ অশোককে সামনে দেখে চমকে দাঁড়াল। অশোকও। সব খবরই পেয়েছে—ভুবন চলে যাচ্ছে বাড়ী ছেড়ে নোতুন চাকরীতে—তারই সঠিক ব্যাপার জানতে আসছিল সে।

পথের ধারে কদমকে দেখে দাঁড়িয়েছে এক ঝলক আলোয় কদমের সুন্দর মুখখানা ঝলসে উঠেছে। শাড়ীর লালপাড়টা ঘিরে রয়েছে সুডৌল মুখের পুরুষ্ট জলে ভেজা আদলটুকুকে। থমথমে মুখ আলোয় সুন্দর হয়ে উঠেছে।

—কদম!

অশোক এগিয়ে আসে। অতর্কিতে কদমের হাতের পিদীমটা ঝড়ো হাওয়ায় নিভে যায়। এতক্ষণ এতটা পথ আঁচল আড়াল দিয়ে ওই ম্লান শিখাটুকুকে আগলে রেখেছিল—তাও নিঃশেষে হারিয়ে গেল।

…কি এক নিস্ফল অভিমানে থমকে দাঁড়িয়েছে কদম আবছা অন্ধকারে, ওর দুটো চোখ কি এক জ্বালার ব্যর্থতায় জলছে।

…তুইও চলে যাবি শুনলাম?

অশোকের দিকে চেয়ে অন্ধকার এলোচুলে কোন ব্যর্থনারী আজ যেন প্রশ্ন করে।

—তাতে কার কি আসে যায়?

অশোক একটু অবাক হয় ওর কথায়। মাঝে মাঝে কি এক সুর জেগে ওঠে কদমের মাঝে ওই অতলান্ত আঁধারজলা চাহনিতে।

—কেন?

—না গিয়ে আমার পথ কই? সব পথেই যে কাঁটা দেওয়া। চুপকরে চেয়ে থাকে অশোক। মাঝে মাঝে কেমন বিদ্রোহের সুর জাগে কদমের মনে।—সব বাঁধন দুর্বলতা ফুঁড়ে বের হতে চায় সেই আদিম নারী; এ কদমকে কোন্ অতীতে হারিয়ে ফেলেছে সে।

তবু সেই দূর সবুজ থেকে তাকে যেন কোন মায়াচ্ছন্ন লোকে চেতনার প্রত্যূষ বেলায় ডাক দেয়।

—কোথায় যাচ্ছিস তাহলে?

—নরকে। জবাব দেয় কদম তীক্ষ্ণকণ্ঠে।

—কি বলছিস যা তা? অশোক চমকে ওঠে।

কাঁদছে কদম।…আঁধার—তারাজ্বলা আঁধারে হু হু বাতাসে ওর বুক জলে।…কান্না—ভেজা কণ্ঠে বলে ওঠে কদম।

—সত্যি যা তাইই বলছি ছোটবাবু। মেয়েমানুষের নিজের মন নিয়ে বাঁচবার পথ কোথায়? তাই সোয়ামীর পথেই তাকে চলতে হবে, সে সোয়ামী জানোয়ারই হোক আর মানুষ হোক।

—ভুবন কিছু বলেছে? হ্যারে? অশোক প্রশ্ন করে।

—আগেকার সে মানুষটা বলেনি কুনদিন—এ যেন নোতুন মানুষ, কলের মানুষ বলেছে ছোটবাবু। ওরা সব আজ বদলে গেছে ওই কলের ধমকে।

—আর তুই।

—বদলাতে পারিনি; সব কিছু ভালো-মন্দ মিশিয়ে একাকার করতে পারিনি আজ তাই কাঁদছি। কাঁদছি হারাবার ভয়ে, যেদিন সব হারিয়ে যাবে সেদিন আর কাঁদবো না, সয়ে যাবে। আমিও বদলে যাবো—হয়তো হারিয়েও যাবো ওরই ভিড়ে।

চুপ করে থাকে অশোক। কি হারাবে ওর—কিসেরই বা ভয় ঠিক যেন বুঝতে পারে না।

হঠাৎ চমকে ওঠে অশোক—কদম কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এগিয়ে এসেছে কাছে—আরও কাছে। দুচোখের চাহনিতে কেমন টলমল চাহনি।

—আমাকে সেদিন তোমার খুব ঘেন্না করবে ছোটবাবু—নয়? সত্যিই যদি কুনদিন হারিয়ে যাই।

—কি বলছিস্ যা তা!

হাসবার চেষ্টা করে কদম। জবাব দিল না। বাড়ীর দিকে চলতে থাকে খড় গাদার পাশ দিয়ে, হঠাৎ পিছন ফিরে অশোককে আসতে দেখে বলে ওঠে তরল কণ্ঠে—বাড়ীতে কেউ নাই, এখন এসোনা ছোটবাবু।

—কেন? অশোক কি ভাবছিল তারই মাঝে অন্যমনস্কভাবে প্রশ্নটা করে। হাসছে কদম এত দুঃখেও। অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে।

—তোমার কোন বোধ নাই ছোটবাবু। বুঝেছি এদ্দিনে—প্রীতিদিও কেন এতদূর এগিয়েও পিছিয়ে গেল।

—মানে? অশোকের মনের পুরোণো ক্ষত জায়গায় যেন হাত পড়েছে অতর্কিতে।

—এমনিই বললাম। কোন মেয়েই তোমাকে ভরসা করতে পারে না। চিনেছ শুধু কায আর কায—মানুষ নিয়েই রইলে, জানলে না চিনলে না মেয়েমানুষকে—তার মনের খবরও রাখলে না।

সরে গেল—আবছা আঁধারে মিশিয়ে গেল রহস্যময়ী নারী। তারাভরা আকাশের নীচে একাই দাঁড়িয়ে থাকে অশোক। কি ভাবছে। কেমন যেন বুঝতে পারে না কদমকে—পায়ে পায়ে পথে নেমে এল।

আঁধারে পুরোনো বাড়ীটা থেকে একক কান্নার শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল। মণিমালা কাঁদছে।

...জীবনকে আসতে দেখে দাঁড়াল। দুর্গাপুর থেকে ফিরছে জীবন—সাইকেল থেকে নেমে বাড়ীর দিকে চলে গেল। সাইকেলে ঝোলান শূন্য টিফিন কেরিয়ারটা ঢং ঢং শব্দ তোলে।

শূন্য ফাঁপা একটা শব্দ।

দাঁড়ালনা অশোক। অন্ধকার পথে আর ও দুচার জন চাকরী সন্ধানী ভাগ্যবান চাকরীওয়ালাদের আসার শব্দ শোনা যায়।

নিতে বাউরীর সেই গবাও চাকরী পেয়ে গেছে ইতিমধ্যে। একটা সাইকেল ও কিনেছে পানুদাসের মাহিন্দারীতে জবাব দিয়ে গবা এখন প্যাণ্ট পরে ছাপা ছিটের হাওয়াই সার্ট লাগিয়ে আসা যাওয়া করে, মাথায় একটা রুমাল বাঁধা।

...শনিবার। একটু খোসমেজাজেই হপ্তা নিয়ে ফিরছে—আঁধার গ্রাম্যপথ তার গানের সুরে মুখর হয়ে ওঠে।

—আওয়ারা হুঁ!

বেসুর বেমানান ঠেকে সব কিছু গ্রামের এই শান্ত পরিবেশে। কেমন বদলে গেছে—গবা নয়, এ-কালের হাওয়া—গ্রামীণ এই জীবন। তাই বোধ হয় ভয় পেয়েছে কদমবৌ।

...এই ঘরের শান্ত মধুর পরিবেশ—তার ছোট্ট গৃহকোণের স্বপ্ন পবিত্র মধুর জীবনধারা—তাই হারাবার ভয়ে।

...কিন্তু পথ কই!

গ্রাম ছেড়ে তাই ওদের বেরুতে হয়েছে যারা এখনও বেরোয়নি তাদেরও বেরুতে হবে মাটি ছেড়ে—সবুজ ছেড়ে ওই রুক্ষ জীবনের কঠিন বন্ধুর পথের টানে। যেমন করে নদীর প্লাবন আসে গ্রাম-শস্যঢাকা মাঠ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে, তেমনি করেই দুর্বার স্রোত এসেছে সব ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে।

...বাড়ীর দিকে চলেছে অশোক।

কদমের কথাগুলো কানে ভাসছে।...প্রীতির কথাও বলেছে কদম। কোথায় অশোক যেন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করে, প্রীতি সরে গেছে—সরে যাবে কদমও।

...জীবনের একটু সবুজ ইশারা—বার বার তাকে দূর থেকে ডাক দিয়ে সরে গেল দিক থেকে দিগন্তরে। আবছা আঁধারে আজ তারাই তবু ভিড় করে আসে নীরব প্রশ্নের মত সারা মনে।

বাড়ীর কাছাকাছি এসেই হেলুমাষ্টারকে দেখে দাঁড়াল অশোক। হেলুবাবু হ্যারিকেন জ্বেলে তারই খোঁজে বেরিয়েছে। এগিয়ে আসে—এই যে, আপনাকেই খুঁজছিলাম।

—কেন?

—ওরা এসে গেছেন সন্ধ্যার বাসেই। তা সহুরে লোক পাড়া গাঁ তো দেখেননি, শিয়ালের ডাক আর বন দেখে তো রীতিমত ঘাবড়ে গেছেন।

অশোক বলে ওঠে—ও সয়ে যাবে।

—আজ্ঞে তা যাবার আগেই ওনারাই না চলে যান। একে সহুরে মানুষ, তায় মেয়ে ছেলে। আপনিও একবার চলুন।

—একটু বিরক্ত হয় অশোক।

—কেন বাসায় সব ব্যবস্থাতো করাই আছে। ঝি চাকর—তাতো আছেই। বাসাও পছন্দ হয়েছে। নোতুন মাষ্টাররা এলেন, আপনি সেক্রেটারী একবার দেখা করবেন না। নোতুন লোক ওরা—একটু থমকে দাঁড়াল অশোক।

সত্যিই কোন সহরের আলো থেকে অন্ধকার অতলে আসছেন তাঁরা, কি একটা কর্তব্য তারও আছে।

চলুন, একবার দেখা করেই আসি। হেলুমাষ্টার ও নিশ্চিন্ত হয় যেন।

—হ্যাঁ, আমিও তাই বলছিলাম। দাঁড়ান আলোটা উসকে নিই—

হ্যারিকেনের কাঁচে যেন গ্রহণ লেগেই আছে। কেবলই ঝাপসা।

...চুপ করে এগিয়ে চলে ওরা দুজনে—রাতের অন্ধকারে।

অশোকের মনে ক'দিন ধরেই চলেছে এমনি এক ছন্নছাড়ার সুর। মাঝে মাঝে দেখেছে কি যেন একটা নিবিড় হতাশা আর বেদনার অন্ধকার-ছায়া নামে মনে। সব আলো ঢেকে দেয়, মুছে দেয় সব সুর।

কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখেছে সমাজের এই শুধু ভাঙ্গনের রূপ ভাঙ্গছে সব কিছু।

শান্তিপূর্ণ সংসার ভালবাসা আত্মীয়তার সম্পর্ক—মনুষ্যত্ব! বোবা নারাণঠাকুর তাই রাত আঁধারে আজও কাঁদে। মানুষের নিষ্ঠুর ব্যবহারে কাঁদে কেনা জড় একটি সত্ত্বা।

প্রীতিও গেছে। কোন কিছুরই দাম ওরা দেয়নি। কদমও আজ যাচ্ছে। ভেঙ্গে যাবে অতুলের এতদিনের সাজানো সংসার। সব গড়ে তোলার সাধনা। তার মাঝে নিজেকে আজ একান্ত অসহায় একাকী বোধ করে অশোক। মনে হয় এই দুর্বার স্রোতকে সংহত করবার চেষ্টা করা—এই আলোড়নের মাঝে ঘর বাঁধা বাতুলতা মাত্র।

কেন বা পড়ে থাকবে এইখানে—এতদিন এ প্রশ্নটা মনে জাগেনি। আজ জাগে।

—এসে পড়েছি অশোকবাবু!

হেলুমাষ্টারের কথায় চমক ভাঙ্গে আশোকের। গ্রামের বাইরেই লাল ডাঙ্গাটায় গড়ে তুলেছে নোতুন ইস্কুল—হাসপাতাল—কো-অপারেটিভ ষ্টোর এর বাড়ীটার তখনও কায চলেছে। ওদিকে ছোট্ট ছোট্ট কয়েককটা কোয়ার্টার।

সামনে ওই কঠিন কাঁকুরে মাটিতে দুর্বার সাধনার মতই ফুটে রয়েছে গোলাপ রজনীগন্ধার গাছগুলো। গোলাপ ফুল ফুটেছে—লাল আর সাদা কতকগুলো বড় বড় ফুল। রাতের বুনো বাতাস ওই গোলাপের গন্ধে পোষ মেনেছে।

কয়েকটা আলো জলছে—অন্ধকার আদিম বন্য পরিবেশে মানুষের বাস গড়ে তুলেছে। সেবা আর শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে সহরের আলোময় পরিবেশ থেকে কারা এসেছে অন্ধকার জগতে যেখানথেকে দুমুঠো অন্নের জন্য একটা নেশার মত ওরা ছুটে চলেছে দুর্গাপুরের দিকে। কলকারখানার কি এক নিবিড় আকর্ষণ।

এরা পালাচ্ছে, ওরা আসছে জয় করতে; ভীত পলায়মান জনতার মনে প্রতিরোধের ও মাটিতেই বেঁচে থাকার শক্তির সন্ধান দিতে।

অশোক কেমন ভরসা পায় মনে মনে।

ওদের পায়ের শব্দ পেয়ে বের হয়ে আসে নবাগত শিক্ষিকাদের একজন—ওর পিছু পিছু আর দুজনও।

হেলুমাষ্টার হ্যারিকেনটা দাওয়ায় নামিয়ে একটু উৎসাহের সঙ্গেই বলে ওঠে।

—এই যে মা লক্ষ্মীরা, ধরে আনলাম আমাদের সেক্রেটারীকে। নানা কাযের লোক, সকালে উঠে গা দেখবে—দেখবে এই বুনো ডাঙ্গা—একা এঁরই চেষ্টায় নোতুন করে গড়ে উঠছে সব।

—নমস্কার। নমস্কার জানায় ওরা...অশোকও।

হঠাৎ কেমন যেন একটু আশ্চর্য্য হয়, এগিয়ে আসে একটি মেয়ে; সুন্দর স্বাস্থ্য—চোখেমুখে বুদ্ধির দীপ্তি।

—আপনাকে তো চিনি! পাটনায় থাকতেন না অশোকবাবু—

চমকে ওঠে অশোক। তার অনুমান মিথ্যা নয়। দীর্ঘ কতদিন পর আজও সে আবার দেখা পেয়েছে সেই হারাণো শিখার—হারিয়ে যাওয়া অতীতের।

...জবাব দেয়—হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন।

শিখা সহজভাবেই বলে ওঠে—ওঃ কতদিন পর দেখা। আমি তো প্রথমে এ জায়গা দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেছলাম. শীলাদি তো বলে—এ যে বন আর বন।

হেলু মাষ্টার জবাব দেয়—তা যা বলেছ মা—বনবাসই বটে। দেখ—এবার বন কেটে বসত—নোতুন বসতে কেমন লাগে। একটা সুবিধা এর আছে—

—কি? শিখা প্রশ্ন করে।

—নোতুন বসত—নোতুন মানুষ, নিজের মনের মত করে একে গড়া যেতে পারে। গড়া হয়ে থাকলে তাকে বদলানো যেতো না।

হাসছে বর্ষিয়সী মহিলা—ঠিকই বলেছেন।

হেলুমাষ্টার বলে ওঠে—কোন অসুবিধা হলে তখুনিই জানাবেন। আর এ্যাই খুদি—তুই কিন্তু রাতের বেলায় এখানেই থাকবি।

খুদি লোহার মাথা নাড়ে—হি গো মাষ্টারবাবু; দুধ-ডিমও এনে দিছি। কাল হাট করে দোব।

অশোকও সায় দেয়—যা দরকার দেখে শুনে করিস। আর মাহিন্দকে কাল সকালে দেখা করতে বলবি। বাইরে থেকে এসেছেন—কোন অসুবিধা হলে তোর আমার সবারই নিন্দে হবে। আর শোন—

খুদি ছোটবাবুর দিকে মুখ তুলে চাইল। অশোক বলে ওঠে।—তোর ডাবা হুকো কলকে এখানে আনিস না, তামাক খাওয়ার নেশাটা ছাড়।

হেসে ফেলে শিখা—অন্যান্য ওরা সকলেই! আবছা অন্ধকার ফুঁড়ে দীর্ঘকায় বয়স্ক একটি লোক এগিয়ে আসে। পরণে একটা খাকি লংপ্যাণ্ট, হাফসার্ট।

—আমি অবশ্য খুদির নিকোটিন এডিক্টেড স্বভাবটা ছাড়াতে পারি অশোক!

অবশ্য যদি বলেন।

খুদি জলে ওঠে—থামেন কেন ডাক্তারবাবু। ছুটবাবুর উসব ছেঁদো কথা। খেতম বটেক—উ থাকতে। লুকটা মরে গেল আমাকেও মেরে গেল, সেই খেছি তো খেছিই। নোতুন করে আর তো ধরিনি তামুক খাওয়া—

...হাসতে থাকে সকলেই।

অশোকই পরিচয় করিয়ে দেয়—নোতুন মিস্ট্রেস্—উনি হেড্ মিসট্রেস।

হাসতে থাকে সারদাবাবু।

—পরিচয় আমার আগেই হয়েছে অশোক, আমারই প্রতিবেশী হবেন ওরা—ওদের জানবোনা। চা পর্বও হয়ে গেছে। ইউ আর রাদার লেট।

হাসতে থাকেন সারদাবাবু। অশোক বলে ওঠে। —রাত হয়ে গেল, ওদিকে আবার কাযকর্ম পড়ে আছে। চলি।

—হ্যাঁ। সারদাবাবু সায় দেন।

হেলুমাষ্টার একটু চায়ের আশাতেই বসেছিল, অশোককে উঠতে দেখে বাধ্য হয়েই উঠল।

চুপ করে ফিরছে অশোক। ..

রাতের নির্জন অন্ধকারে পথটা কেমন বিচিত্র হয়ে ওঠে আলো আঁধারির আভায়। মনে একটা হালকা সুর জাগে। পথ—সব পথই কেমন বৈচিত্র্যময়; নইলে কোন্ পথের বাঁকে যাকে হারিয়েছিল—সেই শিখাকে আজ এখানে দেখবে কল্পনাও করতে পারেনি।

শিখা ফিরে এসেছে।

...বাতাসে সুরটা উঠছে। ধ্বসেপড়া গ্রামের মাঝে অবিনাশ সেন ভালোই আছে। ওর বাঁশীতে সুর ওঠে।

...সেই স্বপ্ন দেখার সুর—দুঃখ আর আনন্দ মেশানো সুর।

চুপ করে অশোক পথ চলছে।

হেলুমাষ্টারও কেমন চুপ হয়ে গেছে। বাঁশীর ওই সুরটা বোধহয় তার অন্তরও স্পর্শ করেছে।

—আওয়ে না বালম
ক্যা করু সজনী।

...প্রিয়তমকে হারাবার ব্যর্থতায় মন কেঁদে ওঠে। সে কান্নার সুর জাগে আকাশ বাতাসে—অন্তরের তারে তারে।

..তাই বোধহয় কদমবৌ কাঁদে—সেই প্রিয়তমকে খুঁজে খুঁজে; কাঁদে স্বৈরিণী মিষ্টি লোহার—জীবনের পথে পথে যে মনের মানুষ খুঁজতে গিয়েছিল—আঘাতই পেয়েছে তার বিনিময়ে; শূন্য জীবনপাত্র পূর্ণ করতে চেয়েছিল জীবনের প্রসাদে—পেয়েছে গরলনীল তীব্র জ্বালা—শিখা নোতুন এসেছে, সেও নিরন্ধ্র রাতের অন্ধকারে ওই সুর শুনে চেয়ে থাকে তারাজলা আঁধারের দিকে।

—কি ভাবছিস হ্যাঁরে?

বান্ধবী শিলার কথায় ফিরে চাইল।

—বেশ বাজাচ্ছে কিন্তু। ভাল বাজিয়ে মনে হয়, বড়ে গোলাম আলিখাঁ সাহেবের ঠুংরী না রে?

জবাব দিল শিখা। মনের অতলে কোথায় স্পর্শ করেছে সুরটা। এতদিন যাকে ভুলে গিয়েছিল ভেবেছে —সেই হারানো অতীত, সেই ব্যর্থ স্বপ্নের ঘোরে ওই কান্না

আজ যেন সত্য হয়ে উঠেছে। অশোককে দেখে সেও অবাক হয়েছে।

…রাত হয়েছে অনেক।

—হ্যাঁ। শিখা নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে শিলা ওর দিকে।

সানাইএর স্বর তখনও শোনা যায়।

কদমের ঘুম আসেনা। এ কোথায় যেন তাকে জোর করে ধরে এনে খাঁচায় পুরে রেখেছে ওরা। চারিদিকে এর পাষাণ প্রাচীর। সেই গ্রামের সবুজ পরিবেশ এখানে রুক্ষ বিলীন। চোখের সামনে দেখা যায় কল বাড়ীর দীর্ঘ টিনের চালা—আর ধান মেলবার সান বাঁধানো টাকপড়া উঠোন।

ভস্ ভস্ করে বয়লারের শব্দ ওঠে—যেন দিনরাত কে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছে। তার এতদিনের ঘর—সাজানো সংসার সব কিছু থেকে জোর করে তাকে টেনে উপড়ে নিয়ে এসেছে।

আঁধার আকাশে চিমনী থেকে ধোঁয়া উঠছে—চাপ চাপ কালো ধোঁয়া।

…ভুবন তখনও ফেরেনি বাসায়। কোথাও গেছে।

জাগর রাত্রির প্রহর গোণে বন্দিনী নারী স্তব্ধ জমাট অন্ধকারে। তারাগুলোও আর দেখা যায় না। সবাই যেন হারিয়ে গেছে কোথায়। মনে মনে সেই চাপা বিদ্রোহটা জেগে ওঠে।

[ক্রমশঃ

নির্বাণ ?

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

মুক্তি চাও ? চাও বুঝি আত্মার নির্বাণ ?
ত্রিতাপ জ্বালায় ক্লিষ্ট তুমি ?
আর সে আশায় ত্যাগ কর—
জগতের যত কাজ যত আশা, যত ভালোবাসা ?
মায়া মোহে জয় কর ?
দগ্ধ কর কামনা বাসনা ?
পায়ে পায়ে দলে চলে যাও
জীবনের যত সুখ ভোগ ?
তুমি চাও শেষ পুনরাবৃত্তি জীবনের !
এক জন্মে, দুই, তিন কিংবা চারে
চাও পুর্নজনমের অবসান !
নির্বাণ চাহ বুঝি !

আর তুমি ?
তুমি জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন !
প্রতি পদে পেয়েছ আঘাত।
ব্যর্থতা ও পরাজয় জীবনে এনেছে তব
বিতৃষ্ণার বৈরাগ্য কঠিন।
অপেক্ষা করার আর অবসর নেই !
কিবা হবে জন্মে জন্মান্তরে ?
এক্ষুণি জীবন আর জীবন-সমস্যা থেকে
মুক্তি চাও তুমি !
আত্মহত্যা লোকে বলে একে।

ঐ যারা ঘোর তপস্যায় লভিছে নির্বাণ,
পৌনপুনিক জন্ম থেকে,
অন্তহীন মহাকাল
হারাল যাহারে অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ বিকাশের আগে—
তার নাম আত্মহত্যা নয় ?
কেন তাকে মুক্তি বলে ?
নির্বাণ কেন তার নাম ?

বোম্বাই-মান্দ্রাজ-পণ্ডিচেরীতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

পণ্ডিত শ্রীঅনাথশরণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

১৯৬৩ সালটি আমাদের প্রাচ্যবাণী সংস্কৃত পালি নাট্যসঙ্ঘের একটি বিশেষ গৌরব ও আনন্দের বৎসর, নিঃসন্দেহ। কারণ, এই একই বৎসরে আমরা তিনটি বড় সফরে বাহির হই। প্রথমটি হইল ঈষ্টারের বন্ধে দিল্লী সফর, দ্বিতীয়টি হইল গ্রীষ্মের বন্ধে নৈনিতাল সফর, তৃতীয়টি ও বৃহত্তম হইল পূজার বন্ধে বোম্বাই-মান্দ্রাজ-পণ্ডিচেরী সফর। প্রথম সফর কালে দিল্লীতে সুবিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌, সংস্কৃতকবি ও নাট্যকার পরমশ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত পাঁচটি সংস্কৃত নাটক প্রাচ্যবাণী-সংস্কৃত-পালি-নাট্যসঙ্ঘ কর্তৃক বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়, তন্মধ্যে একটি রাষ্ট্রপতি ভবনে। দ্বিতীয় সফর কালে নৈনিতালে তাঁহারই বিরচিত তিনটি সংস্কৃত নাটক এবং তৃতীয় সফর কালে, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও পণ্ডিচেরীতে তাঁহারই বিরচিত চারটি সংস্কৃত নাটক প্রাচ্যবাণী কর্তৃক

বাঁ দিক থেকে: শ্রীমতী লীলাবতী মুন্সী; ডাঃ কে, এম্ মুন্সী; স্বামী অজয়ানন্দ; সর্ব্বপীঠ মহামণ্ডলেশ্বর; ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও ডক্টর রমা চৌধুরীকে দেখা যাইতেছে। স্থান—বোম্বাইস্থ সুপ্রসিদ্ধ সুন্দরভাই হল। স্বামিজীর শতবার্ষিক উৎসব সমিতির সদস্যগণ ডাঃ চৌধুরী-দম্পতীকে অভিনন্দন জানাইতেছেন।

তুল্য সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। এই শেষোক্ত সফর সম্বন্ধেই সামান্য দু'একটি কথা আজ আপনাদের শ্রীচরণে নিবেদন করিব, সংস্কৃত জননীর বিজয়-গৌরব-গাথা রূপে।

বোম্বাইতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয় ঃ

বোম্বাই! ব্যবসায়ী ও নাট্যামোদিগণের সমান আদরের স্থান! এরূপ সুপ্রসিদ্ধ সহর হইতে সংস্কৃত অভিনয়ের আমন্ত্রণ পাইয়া আমরাও পরমাহ্লাদিত হইলাম। আমাদের এই সাদর আমন্ত্রণ জানান সর্ব-মহারাষ্ট্র স্বামী-

ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত "ভারত-বিবেকম্" সংস্কৃত নাটকের একটি দৃশ্য। এখানে শ্রীমা ও শ্রীঠাকুরের ভূমিকায় শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী এবং শ্রীঅনিন্দ্যসুন্দরকে দেখা যাইতেছে। মহাতিরোধানের পূর্বে শ্রীপরমহংসদেব জননীর উপর সকল ভক্ত সন্তানের ও তাঁর অসমাপ্ত সমস্ত কাজের ভার দিয়ে যাচ্ছেন।

বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব সমিতি। তদনুসারে ২২শে অক্টোবর, ১৯৬৩ আমরা গীতকার, রূপসজ্জাকার সমেত ষোলো জনের একটি দল সন্ধ্যাকালে বোম্বাই-মেলে রওয়ানা হইলাম বোম্বাইর উদ্দেশ্যে আনন্দোদ্বেলিত হৃদয়ে। সুদীর্ঘ পথ; কিন্তু অন্যান্য বারের মতই তাহা নিমেষেই কাটিয়া গেল হাসি-গল্পে, গান-অভিনয়ে অতি মধুর ভাবে মাতৃসমা ডক্টর রমা চৌধুরীর সস্নেহ পরিচর্যায়। ২৪শে অক্টোবর ১৯৬৩ বোম্বাইর দাদর ষ্টেশনে অবতীর্ণ হওয়া মাত্রেই স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের পরম শ্রদ্ধেয় স্বামীজীগণ আমাদের সাদরে অভ্যর্থনাপূর্বক তাঁহাদের অতি সুন্দর অতিথি-ভবনে লইয়া গেলেন। অতিথি-ভবনের ব্যবস্থাদি অত্যুৎকৃষ্ট, এবং অশেষ পূজ্যপাদ স্বামীজীগণের সেবাযত্নও সত্যই অতুলনীয়। বোম্বাইস্থ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ পরম পূজনীয় শ্রীমৎস্বামী অজয়ানন্দ স্বয়ং বারংবার আসিয়া সমস্ত ব্যবস্থাদি করিয়া গেলেন। তাঁহাদের ঋণ অপরিশোধ্য। এই প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সর্বাধিক ধন্যবাদার্হ।

আমাদের অভিনয়ের ব্যবস্থা হয় বোম্বাইর সুবিখ্যাত ও সুবৃহৎ প্রেক্ষাগৃহ "সুন্দরভাই হলে।" সেখানকার ব্যবস্থাদি অতি সুন্দর। ২৬শে অক্টোবর শনিবার ১৯৬৩, বেলা ৬টা হইতে আমাদের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। অভিনয় করা হয়, ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত সুবিখ্যাত সংস্কৃত নাটক "ভারত-বিবেকম্। শ্রীরামকৃষ্ণর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার হইতে আরম্ভ করিয়া পার্লামেণ্ট অফ্ রিলেজনের জন্য ভারত ত্যাগ পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জীবনের কয়েকটী অমৃত গাথা এই পুস্তকে অতি সুললিত ভাবে, সহজবোধ্য সংস্কৃতে গ্রথিত করা হইয়াছে। এই নাটকটি পূর্বে বহুবার কলিকাতা এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে, এবং গোরক্ষপুরে নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে প্রাচ্যবাণী কর্তৃক অভিনীত হইয়া যশ অর্জন করিয়াছে।

সভায় পৌরোহিত্য করেন সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও ব্যবহারাজীব, যুক্তপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রী কে, এম্, মুন্সী; এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বেতার ও তথ্যমন্ত্রী ডক্টর শ্রীগোপালন্ রেড্ডী। ইঁহারা দুইজন এবং স্বামী অজয়ানন্দ, মহামণ্ডলেশ্বর ও শতবার্ষিকী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ চম্পকলাল মেহতা প্রাচ্যবাণীর সংস্কৃত ও সংস্কৃতি প্রচার প্রচারের ভূয়সী প্রশংসাপূর্বক সকলকে আশীর্বাদ

জ্ঞাপন করেন। ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের সুললিত সংস্কৃত ও ডক্টর রমার সুমধুর ইংরেজী বক্তৃতাও সকলের বিশেষ উপভোগ্য হয়।

সুবৃহৎ প্রেক্ষাগৃহ শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ছিল এবং সকলেই দুই ঘণ্টাধিক কাল বসিয়া সাগ্রহে স্বামীজীর অতিপ্রিয় সংস্কৃত ভাষায় অভিনীত তাঁহারই অতি মহিমময় জীবনালেখ্য দর্শন করেন। শ্রীসারদামণির ভূমিকায় শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী, স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকায় শ্রীঅনিলকৃষ্ণ দত্ত এবং শ্রীঠাকুরের ভূমিকায় শ্রীঅনিন্দ্যসুন্দর চট্টোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করেন এবং সকলের মনোরঞ্জনে সমর্থ হন। বোম্বাইতে উপরের সমিতি আমাদের জন্য আরেকদিন এই হলটী লইয়া ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের সুবিখ্যাত সংস্কৃত নাটক "শক্তি সারদম্" অভিনয়ের ব্যবস্থাও সানুগ্রহে করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে—সময় না হওয়াতে, আমরা সেই সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি নাই। সেজন্য আজও মনে দুঃখ রহিয়া গিয়াছে, যেহেতু বোম্বাইর ন্যায় আভিজাত্যসম্পন্ন স্থানে পুনরায় কবে যে আমন্ত্রণ পাইব তাহার নিশ্চয়তা কিছুই নাই।

বোম্বাই রেডিও "ভারত বিবেকমের" কয়েকটী দৃশ্য রেকর্ড করিয়া হইল পরে প্রচারের জন্য।

মাদ্রাজে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

যাহা হউক, পূর্বব্যবস্থানুসারে, আমরা পরের দিনই (২৭শে অক্টোবর ১৯৬৩) মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম, এবং ২৮শে অক্টোবর সন্ধ্যাকালে সেখানে পৌঁছিলাম। মাদ্রাজ আমাদের পূর্বপরিচিত, অতিপ্রিয় স্থান। স্থানীয় গৌড়ীয় মঠের সস্নেহ তত্ত্বাবধানে, মাদ্রাজে পূর্বে তিনবার আসিয়া প্রাচ্যবাণী ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের বহু সংস্কৃত নাটক অভিনয় করিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়া গিয়াছে। এইবারও গৌড়ীয় মঠই আমাদের সকল ভার লইলেন সানন্দে। মাদ্রাজস্থ গৌড়ীয় মঠের পরম-শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ নন্দদুলাল ব্রহ্মচারী স্নেহ-মমতার একটি মূর্ত প্রতিচ্ছবি বিশেষ। তিনি এবং তাঁহার সহকর্মিগণ যেভাবে নিজেরা স্বয়ং রন্ধন ও পরিবেশন করিয়া আমাদের সেবা শুশ্রূষাদি করিলেন, তাহার তুলনা সত্যই নাই। যত রাত্রিই বা বিলম্বই হউক না কেন, অতিথিগণকে না খাওয়াইয়া তাঁহারা কোনদিন জলস্পর্শও করিতেন না; নিজেদের নানাবিধ সুকঠোর ব্রত উপবাসাদির মধ্যেও তাঁহারা সহাস্যমুখে আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। ইহাতে আমরা সকলেই বিশেষ লজ্জিত বোধ করিলেও, ধন্যাতিধন্য হইয়াছি। কারণ, এরূপ সাধুসঙ্গ-লাভ সত্যই বহু-জন্মের পুণ্যের ফল। শ্রীমান ভোলার ঋণও অপরিশোধ্য।

"ভারত বিবেকম্" নাটকের আর একটি দৃশ্য। এখানে ঘুষুড়ি গ্রামে নরেন্দ্রনাথকে মায়ের নিকট বিদায়ের প্রাক্কালে দেখা যাইতেছে। মায়ের ভূমিকায় শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী এবং স্বামিজীর ভূমিকায় শ্রীঅনিলকৃষ্ণ দত্ত।

মাদ্রাজে আমাদের প্রথম অভিনয় হয় অখিল-ভারত বৈষ্ণব সমাজের তত্ত্বাবধানে মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ এগমোরস্থ মিউজিয়াম্ থিয়েটারে। এই থিয়েটার হলটি মাদ্রাজ সরকারের মিউজিয়ামের এক তলায়, এবং অতি সুন্দর ও আভিজাত্য সম্পন্ন। পূর্বে এই হলটিতে ভারতীয়গণের প্রবেশাধিকারই ছিল না, এবং কেবলমাত্র সাহেব মেমগণই

মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী "শ্রীভক্তবৎসলম্"কে এখানে দক্ষিণে দেখা যাইতেছে। বাঁ দিক থেকে মাদ্রাজের প্রধান সেক্রেটারী ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল; ব্রহ্মচারী শ্রীসনৎ কুমার; ব্রহ্মচারী শ্রীনিত্যানন্দ এবং সম্মুখে শ্রীভক্তবৎসলম্।

ইহাতে অভিনয় করিতেন। সেজন্য, ইহাতে ব্যবস্থাদি অতি চমৎকার।

অভিনয় করা হয় ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের সুমধুর সংস্কৃত নাটক "দীনদাস-রঘুনাথম্।" শ্রীল রঘুনাথ ষড়্‌বৃন্দাবন গোস্বামিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন। বিশেষ আনন্দের বিষয় যে, এই অভিনয়টি হয় ২৯শে অক্টোবর ১৯৬৩; এবং সেই দিনই ছিল শ্রীল রঘুনাথের তিরোভাব-তিথি। এই শুভ যোগাযোগেই যেন আমাদের সেই দিনকার অভিনয় বিশেষভাবে জমিয়া উঠিল, এবং সকলেরই প্রাণ স্পর্শ করিল গভীরভাবে। বিশেষতঃ এই দিন পরম গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী শ্রীভক্তবৎসলম্ মহাশয়ের উপস্থিতিতে ও মধুর ভাষণে সকলে বিশেষ আনন্দলাভ করেন। তিনি প্রাচ্যবাণীর সর্ববিধ সংস্কৃত সংপ্রসারণকার্যের বিশেষ প্রশংসা করেন।

সভায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ পদ্মবিভূষণ ডক্টর শ্রীরাঘবন্, বিচারপতি শ্রীরামচন্দ্রম্', বিচারপতি শ্রীরামকৃষ্ণন্ এবং অন্যান্য বহু পণ্ডিত, স্বামীজী, অধ্যাপকগণ সানুগ্রহে উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে ইঁহারা সকলেই অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা পূর্বক সকলকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। বিচারপতি শ্রীরামকৃষ্ণন্ ঐখানেই বসিয়া বসিয়া ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের প্রশংসা করিয়া একটি ক্ষুদ্র সংস্কৃত কবিতা রচনাপূর্বক পাঠ করিলেন।

মাদ্রাজে আমাদের দ্বিতীয় অভিনয় হয় ডক্টর রাঘবনের সংস্কৃত নাট্য-সংস্থা "মাদ্রাজ সংস্কৃত-রঙ্গমের" তত্ত্বাবধানে ৩১শে অক্টোবর ময়লাপুরস্থ রামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেন্টস্ হোমের স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষ্যে সদ্যনির্মিত সুবিশাল স্বামী বিবেকানন্দ সেন্টিনারী হলে। এটিও অতি পবিত্র যোগাযোগ। আমরা এই পবিত্রস্থানে "ভারত-বিবেকম্" সংস্কৃত নাটক অভিনয় করিলাম। স্থান

মাহাত্ম্যেই হউক, অথবা যে কোনো অজ্ঞকারণেই হউক, সেইদিনকার অভিনয় অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল সকলের মতেই। সভায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু পণ্ডিত, অধ্যাপক ও ছাত্র এবং রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজী উপস্থিত ছিলেন। আলোক সম্পাত, মাইক প্রভৃতির অতি সুন্দর ব্যবস্থাদি হইয়াছিল।

সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রদ্ধেয় বিচারপতি শ্রীরামকৃষ্ণন্। সভান্তে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ, ডক্টর রাঘবন্ প্রমুখ সুধীবর্গ ডাঃ চৌধুরী-দম্পতীর এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য বহুল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং অভিনয়ের উচ্চমানের জন্য সকলকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। পূর্ববৎ, ডক্টর যতীন্দ্রবিমল ও ডক্টর রমার সুমধুর সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষণ সকলের মনোহরণ করে।

পণ্ডিচেরীতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয় ঃ

পণ্ডিচেরীও আমাদের পূর্ব পরিচিত, পরমপ্রিয় স্থান। পূর্বে এই পুণ্যস্থানে শ্রীঅরবিন্দাশ্রমে ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের বহু সংস্কৃত নাটক প্রাচ্যবাণী তিনবার আসিয়া অভিনয় করিয়া গিয়াছে বহুল প্রশংসার সঙ্গে। এই চতুর্থবারও আমাদের সংস্কৃত নাটক "ভারত-বিবেকম্" শ্রীঅরবিন্দাশ্রমে শ্রীশ্রীমাতৃ দেবীর অনুমত্যনুসারে অভিনীত হইল বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে। শ্রীঅরবিন্দাশ্রমের সুবৃহৎ প্রেক্ষাগৃহ শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ছিল ; এবং হঠাৎ মাঝখানে আলোক নিভিয়া যাওয়াতে আধঘন্টা বিলম্ব হইয়া গেলেও, কেহই আসন ত্যাগ করেন নাই।

সভান্তে, সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর আশীর্বাদী ফুল এবং পুস্তক সকলকে উপহার দিলেন। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ সংস্কৃতভাষায় সকলকে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। ডক্টর রমার ইংরাজীতে অতি মধুর মোহন মাতৃবন্দনা সকলকেই বিশেষ মুগ্ধ করিল।

রূপসজ্জার ভার গ্রহণ করেন অশেষ শ্রদ্ধেয়া ব্রততীদি। তাঁহার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতার অবধি নাই।

শ্রদ্ধেয় যতীনদা, মৃত্যুঞ্জয়দা, স্নেহাস্পদ নিরঞ্জন, দীনেশ প্রভৃতির স্নেহ ভালবাসায় ঋণ জীবনে শোধ হইবার নহে। তাঁহারা সমস্তক্ষণ ছায়ার ন্যায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়াছেন অক্লান্তভাবে। পরম দার্শনিক কবি মৃত্যুঞ্জয়দার স্নিগ্ধ আলাপে সকলেই পরিতৃপ্ত হইলাম।

অতপর বার্নপুর, জয়পুর, পুরুলিয়া, পাটনা, গোরখপুর, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানে আমাদের সংস্কৃত-নাট্যাভিনয়ের দিন স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে। জননী জগদম্বিকার কাছে প্রার্থনা করি যেন সংস্কৃত শিক্ষার পথ

এখানে ডাঃ রাঘবনকে প্রাচ্যবাণীর নাট্যসংস্থার সমস্ত ভারতে ও ভারতের বাইরেও সংস্কৃতশিক্ষার সংপ্রসারণের বহুল প্রচারের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনে রত—দেখা যাচ্ছে। ডাঃ রাঘবনের পার্শ্বে ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী।

সুগম করিয়া দিয়া দেশের ভেদ-বিসংবাদের মূল কারণটি দূর করিয়া দেন। আমরা এই প্রসঙ্গে পুনরায় স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উৎসবের মুখ্য সেক্রেটারী, বেলুড়-মঠের পরম পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীসম্বুদ্ধানন্দ মহারাজকে পুনরায় অশেষ হার্দিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। স্বামী

শ্রদ্ধেয় বিচারপতি শ্রীরামকৃষ্ণন্ নাট্যাভিনয়ের পরে প্রাচ্যবাণীর সংস্কৃত-পালি-নাট্যসঙ্ঘকে হার্দিক আশীর্ব্বাদ ও আনন্দ জ্ঞাপন করছেন।

বাঁদিক থেকে—বিচারপতি শ্রীরামকৃষ্ণন্; ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী; শ্রী অনিলকৃষ্ণ দত্ত; শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মিশ্র; শ্রীঅসীমকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী; গায়ক শ্রীপূর্ণেন্দু রায়; গীতিবিশারদ শ্রী গৌরীকেদার ভট্টাচার্য্য।

বিবেকানন্দ সংস্কৃতই মুখতঃ প্রচার করিয়াছিলেন। স্বামী সংবুদ্ধানন্দ অশেষ প্রচেষ্টায় তাঁর আদর্শকে বহু উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, ইহাই পরম আশ্বাসের কথা।

শ্রীঅরবিন্দাশ্রমের আদর যত্নের কথা কোনোদিন ভুলিবার নহে। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে প্রলয়ঙ্কর সাইক্লোন ইহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার বহু ধ্বংসচিহ্ন এখনও রহিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও, আমাদের জন্য সর্ব-প্রকার অতি সুন্দর ব্যবস্থাদি তাঁহারা করিয়াছিলেন। এ কেবল তাঁহাদের অশেষ স্নেহেরই ফল। আরেকদিন অভিনয়ের ব্যবস্থাও তাঁহারা সানুগ্রহে করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সময়াভাবে তা হয় নাই।

উপসংহার:

সত্যই কি অপরূপ বিজয়যাত্রা—আমাদের নহে, সংস্কৃত জননীর! মাত্র ১২ দিনের মধ্যে আমরা বোম্বাই হইতে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ হইতে পণ্ডিচেরী, পণ্ডিচেরী হইতে কলিকাতায় যাইয়া ফিরিয়া আসিলাম। কি অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া, কি অপার আনন্দ লইয়া! সর্বত্রই দেখিলাম সেই একই দৃশ্য—সহস্র সহস্র জন, একইভাবে বসিয়া সংস্কৃতের রসপান করিতেছেন পরমানন্দে! ইহাতে আমাদের কৃতিত্ব বিন্দুমাত্রও নাই; আছে কেবলই সংস্কৃত-জননীর অনন্ত-অসীম মহিমা!

নাটকাদির মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচার আমাদের দেশের চিরাচরিত প্রথা। পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর চৌধুরী-দম্পতী যে সংস্কৃতের ক্ষেত্রেও সেই পরম কল্যাণকর প্রথাই অবলম্বন করিতেছেন, তাহা অতি শুভবুদ্ধিপ্রসূত, নিঃসন্দেহ। বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহারা গবেষণা কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া বহু পুস্তক-প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেছেন। ইহাতে দেশের বিদগ্ধ-সমাজ উপকৃত হইলেও

জনসাধারণ সংস্কৃতের রসাস্বাদনে বঞ্চিতই ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই নব সংস্কৃত নাট্যান্দোলন সরল মধুর নাটকাভিনয়, সঙ্গীতাদির মাধ্যমে নীতিতত্ত্বের অন্তর্নিহিত মহিমা ও মাধুর্য আসমুদ্র হিমাচল জনগণের মধ্যেও আজ প্রকটিত করিতেছে পূর্ণতম গৌরবে! সংস্কৃত ও সংস্কৃতির সঠিকতম সেবা আর কি হইতে পারে! এই প্রসঙ্গে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র "Indian Express, Madras বিগত রবিবারের (৩রা নভেম্বর, ১৯৬৩) sunday Standard সংখ্যায় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম :—

The Sunday Standard, Sunday,

November 3, 1963.

CASE FOR SANSKRIT

The question is, little Alice asked, whether words could be made to mean so many different things, Why not? When Dr. Lohia talks of National Integration he wants Hindi hegemony in the bargain. To those emotionally involve in Sanskrit, integration is better achieved by restoring the ancient language to its lost glory,

Dr. Jatindra Bimal Chaudhuri and his wife, Dr. Roma Chaudhuri, are eminent Sanskrit Scholars who have done more than most universities to rediscover our Sanskrit heritage. Pracyavani (Institute of oriental Learning) has done signal service in the field, Staging Sanskrit dramas wrltten in lucid style is part of its activities. The couple was here last week with the Pracyavani Sanskrit-Pali Darma troupe which has played in India and abroad for several years now.

Dr. Jatindra Bimal Chaudhuri is confident of a bright future for the Sanskrit stage, for this is one language which is understood oll over India. It takes a great deal of doing to stage Sanskrit plays on themes as modern as national integration and the life of Subhas Chandra Bose. Sincere and enthusiastic amateurs make the troupe.

What is your Kannada or Telugu without Sanskrit Dr. Chaudhuri asked the man around town, who does not lay claim to any knowledge of etymology or philology. A philostine newspaperman with no match for an erudite scholar. So he let Dr. Chaudhuri have the last question. After all in a democracy, your views are as important as Dr. Chaudhuri's.

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যা

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয় এই তিনটিই হইল মানুষের অপরিহার্য প্রয়োজন এবং ইহাদের অভাব ঘটিলে সাধারণ মানুষ সহজেই বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে। অভাবগ্রস্ত মানুষের এই ক্ষোভ প্রথমটা চাপা অবস্থায় ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে বটে, কিন্তু পরিস্থিতির শোচনীয়তা দীর্ঘস্থায়ী হইলে বিক্ষোভ সমষ্টিগত হইয়া গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এইজন্যই বিশেষ করিয়া গণতান্ত্রিক দেশে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের তীব্র অভাব সরকারী কর্তৃপক্ষকেও বিচলিত করিয়া তোলে। অবস্থার উন্নতির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা তখন বাস্তব অসুবিধাসমূহ এবং তাহাদের কারণগুলি জনসাধারণের কাছে খোলাখুলি উপস্থাপিত করেন। এই সময় আশাবাদী মনোভাব লইয়া সাময়িক সঙ্কট কাটাইয়া উঠিবার জন্য তাঁহারা দেশবাসীকে দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও তাঁহাদের সহিত আন্তরিক ও পূর্ণ সহযোগিতার আহ্বান জানান। বিশেষ করিয়া খাদ্যসমস্যায় বিপদ সর্বাধিক—কারণ খাদ্যাভাবে মানুষের দ্রুত স্বাস্থ্যহানি, এমন কি, মৃত্যু ঘটে। খাদ্যসঙ্কটে দেশব্যাপী বিক্ষোভ-সম্ভাবনা প্রবলতর হয়। তখন নীতিগতভাবে বিপন্ন সরকারের সবচেয়ে বড় আশ্রয় হয় সঙ্কটাপন্ন জনসাধারণ, জনসাধারণের কাছে সমস্ত অবস্থা খোলাখুলি উপস্থাপিত করিয়া জাতীয়তাবোধের অনুপ্রেরণা জাগাইয়া তাহাদের দুঃখবরণে আরও সহিষ্ণু করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়। সরকারের দিক হইতে দুর্নীতি বা অকর্মণ্যতা বেশি না হইলে এবং অভাবিত বা আয়ত্তাতীত কারণে সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে উপলব্ধি করিতে পারিলে জনগণ এক্ষেত্রে প্রায়ই আশ্চর্য ধৈর্য ও ক্লেশস্বীকার করিয়া থাকে, ইহাই ইতিহাসের অভিজ্ঞতা।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ঠিক এতটা শোচনীয় না হইলেও ভারতের এই সীমান্তরাজ্যের বর্তমান খাদ্যসঙ্কট উপেক্ষার বস্তু নয়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ভয়াবহ মন্বন্তরের পর বাংলাদেশ কখনই খাদ্যের হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। ইহার উপর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতার মাশুল হিসাবে দেশবিভাগের ফলে বাংলার কৃষিক্ষেত্রের অধিকাংশ পূর্বপাকিস্তানে চলিয়া যায়। অখণ্ড বাংলার ৭৭৪৪২ বর্গমাইলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পড়ে মাত্র ৩১০৪৪ বর্গমাইল। এই সঙ্গে বিহার হইতে পুরুলিয়া জেলা সহ কিছু এলাকা পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের আয়তন দাঁড়ায় ৩৪২০৫ বর্গমাইল। বাংলাদেশের মোট আবাদী জমির পরিমাণ ছিল ৪৫,২১৯ বর্গমাইল, ইহার মধ্যে পূর্ববঙ্গে ২৯,১০৭ বর্গমাইল ও পশ্চিমবঙ্গে ১৬,১১২ বর্গমাইল পড়ে। দেশ বিভাগের ফলে পূর্বপাকিস্তান হইতে বন্যাস্রোতের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী সমাগম হইতে থাকে এবং কলিকাতা ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্পাঞ্চল হওয়ায় ও দুর্গাপুরে নূতন বৃহৎ শিল্পাঞ্চল গঠিত হওয়ায় ভারতের অন্যান্য রাজ্য হইতেও বহুসংখ্যক লোক পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া ভিড় করিতে থাকে। ইহার ফলে বঙ্গ বিভাগের সময় বাংলার মোট ৬,০৩,০৬,৫২৫ লোকসংখ্যার মধ্যে ২,৬৩,০২,৩৪৬ জন পশ্চিমবঙ্গে পড়িলেও ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারীতে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩,৪৯,৬৭,৬৩৪ দাঁড়াইয়াছে। এই ভয়াবহ লোকবৃদ্ধির ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির উপর সাংঘাতিক চাপ পড়িয়াছে এবং সবচেয়ে বেশি আঘাত পাইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যব্যবস্থা। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা কম হইতেছে না, চাষীরা, বিশেষ করিয়া শরণার্থী নিরুপায় কৃষিজীবীরা অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর জমিকেও যথাসম্ভব বেশি ফসল ফলাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য কৃষক সম্প্রদায়ের উৎসাহ বৃদ্ধি স্বাভাবিক। সরকারের দিক হইতেও এ হিসাবে অধিকতর সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইতেছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কৃষিখাতে ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫৮ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা

ব্যয়ের স্থলে ১৯৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে ব্যয়িত হইয়াছে ৫ কোটি ৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। কিন্তু অবিরাম লোকবৃদ্ধির ফলে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন যদি জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন যদি বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে, তাহা হইলে অবস্থার প্রকৃত উন্নতি কেমন করিয়া হইবে? তাছাড়া সুবিধা সুযোগ এখন আগের চেয়ে বেশি দেওয়া হইতেছে সত্য, কিন্তু দরকার তাহার চেয়ে অনেক বেশি সুযোগ সুবিধার। জমিতে উপযুক্ত জল সেচ কৃষির উন্নতির অনুপূরক। ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে জলসেচের সুবিধাপ্রাপ্ত আবাদী জমির পরিমাণ যেখানে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার একর ছিল, ১৯৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাহা বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ১৭ লক্ষ একর, কিন্তু পশ্চিম বাংলার মোট ১ কোটি ১৩ লক্ষ একর কৃষিক্ষেত্রের হিসাবে ইহাতো মোটেই যথেষ্ট নয়। এ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকার্য এখনও মোটামুটি প্রকৃতিদত্ত বৃষ্টির জলের উপরই নির্ভরশীল রহিয়াছে এবং কোনবৎসর কোন কারণে বৃষ্টিপাত কম হইলে শস্যহানির ফলে এই রাজ্যের স্বাভাবিক খাদ্যাভাব আরও তীব্র হইয়া উঠে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কৃষিকার্য এখন পশ্চিমবঙ্গে কিছুটা বাড়িতেছে সন্দেহ নাই, তবু রাসায়নিক সার বা কৃষির বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি চাহিদার তুলনায় গ্রামাঞ্চলে অনেক কম সরবরাহ করা হইতেছে। এছাড়া অর্থকরী ফসল পাটের চাহিদা সবসময় তীব্র বলিয়া এবং পাটের দর হারাহারি-ভাবে বেশি বলিয়া অধিকতর পরিমাণ জমিতে পাট চাষের একটা আগ্রহ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। খাদ্য-শস্যের অভাবের নিরিখে এই আগ্রহ অস্বস্তিকর।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে খাদ্যশস্যের যে ঘাটতি চলিয়াছে, এই রাজ্যের খাদ্যশস্য উৎপাদনের সাম্প্রতিক উন্নতির নিরিখে তাহা লক্ষ্য করিলে তবু কিছুটা সান্ত্বনা মিলিবে। আগেই বলা হইয়াছে লোকবৃদ্ধির হার বেশি হওয়ার জন্যই এই উৎপাদন-উন্নতি স্বচ্ছলতা আনিতে পারে নাই। পশ্চিমবঙ্গে গম বিশেষ উৎপন্ন হয় না, ১৯৪৭খ্রীষ্টাব্দে যেখানে এই রাজ্যে চাউল উৎপন্ন হয়েছিল ২৫ লক্ষ ৫ হাজার টন, সেস্থলে ১৯৬২ সালে নিতান্ত অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতেও ৪৩ লক্ষ ৬২ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে আরও ৩ লক্ষ ৭১ হাজার টন চাউল এই রাজ্যে বেশি উৎপন্ন হইয়াছিল। এবার ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে যে ৪৩ লক্ষ ৬২ হাজার টন চাউল জন্মাইয়াছে, তাহার শতকরা ১০ ভাগ বীজধান ও ক্ষয়ক্ষতির হিসাবে বাদ দিলে ৩৯ লক্ষ ২৬ হাজার টন চাউল থাকে। কিন্তু বর্তমান জনবাহুল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গের চাউলের প্রয়োজন ৫৪ লক্ষ ৫০ হাজার টনের কম নয়। মাথাপিছু ১৬·৫ আউন্স খাদ্যশস্য ধরিলে পশ্চিমবঙ্গের মোট প্রয়োজন হয় ৬২ লক্ষ টনের। সরকারী কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী বিগত তিন বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬০, ১৯৬১ ও ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে যথাক্রমে ১১ লক্ষ টন, ৯ লক্ষ টন ও ১০ লক্ষ টনের মত চাউলের ঘাটতি হইয়াছে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘাটতির পরিমাণ ১৫ লক্ষ টনের মত। অর্থনীতির সাধারণ সূত্র হইতেছে—পণ্যের মূল্য নির্ভর করে যোগান ও চাহিদার ভারসাম্যের উপর। খাদ্যশস্যের ঘাটতি থাকায় পশ্চিমবঙ্গে চাউলের মূল্য ক্রমেই উপরের দিকে উঠিয়া যাইতেছে। বিধানসভায় উপস্থাপিত সরকারী হিসাবে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে প্রতি কিলোগ্রাম চাউলের মূল্য ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে যখন ছিল ৬৮ নয়া পয়সা, উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধির ফলে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাহা ৫৬ নয়া পয়সায় নামিলেও ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া ইহা ৬৯ নয়া পয়সায় উঠে এবং বর্তমান বৎসরের জুন মাসে ইহা ৮২ নয়া পয়সা হয়। তারপর দেশে খাদ্যশস্যের অভাবের সুযোগ লইয়া মুনাফা-খোর ব্যবসাদারেরা অক্টোবর মাসের প্রথমে চাউলের দর আকাশস্পর্শী করিয়া প্রতি কিলোগ্রাম এক টাকার উপরে তুলিয়া দেয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের চাপে এবং সরকারী হস্তক্ষেপে চাউলের দর কিছুটা কমিয়া ৮০ নয়া পয়সায় নামে। নূতন চাউল উঠিতেছে বলিয়া বর্তমানে চাউলের দর আরও নিম্নমুখী হইয়াছে।

ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গের অভাব সত্বেও অন্যান্য রাজ্যে স্বচ্ছলতার ফলে সমগ্রভাবে যদি ভারতের খাদ্যস্বচ্ছলতা থাকিত, তাহা হইলেও পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসঙ্কট মোচনে অসুবিধা দেখা দিত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখন প্রায় সমগ্র ভারতেই খাদ্য পরিস্থিতি অস্বস্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। গম উৎপাদনের হিসাবে সমৃদ্ধ সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাব এবং চাউল উৎপাদনের হিসাবে সমৃদ্ধ পূর্ববঙ্গ লইয়া পাকিস্তান গঠিত হইবার পর হইতে ভারতের খাদ্যাভাব

একরূপ স্থায়ী সমস্যায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। শরণার্থীদের চাপ সমেত অবিরাম জনবাহুল্যে ভারত বিব্রত, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কিছুটা সাফল্য সত্বেও ভারতের খাদ্যসঙ্কট ঘুচিতেছে না। ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের লোক সংখ্যা ছিল ৩৫ কোটি এবং এই বৎসর এদেশে খাদ্যশস্য জন্মায় ৫ কোটি ২০ লক্ষ টন; দশ বৎসর পরে ১৯৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ২ কোটি ৬৬ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়া ৭ কোটি ৮৬ লক্ষ টনে উঠিলেও লোকসংখ্যা ৮ কোটি ৫৮ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়া ৪৩ কোটি ৮০ লক্ষ হওয়ায় বাড়তি উৎপাদন খাদ্য-সমস্যার সুরাহা করিতে পারে নাই। অবস্থা আরও অনেক শোচনীয় হইত, যদি প্রধানত: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিদেশ হইতে ভারত প্রভূত পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে না পারিত। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে (১৯৫১-৫৬) ভারতে মোট ১ কোটি ১৬ লক্ষ ১৯ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানী হয় এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে ভারত বিদেশ হইতে মোট ১ কোটি ৭৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানী করে। বলা বাহুল্য, এই বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী খাদ্যের হিসাবে ভারতের দুঃস্থতারই স্মারক। অবশ্য খাদ্য আমদানী করিলেই যে কোন দেশ অনুন্নত থাকিয়া যায় তাহা নহে,পৃথিবীর বহু সমৃদ্ধ দেশে স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপযোগী খাদ্যশস্য জন্মায় না, কিন্তু এইসব দেশের শিল্প-বাণিজ্যের স্বাচ্ছল্য বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর সঙ্গতি রক্ষা করে। ভারত শিল্প-বাণিজ্যের হিসাবেও পশ্চাৎপদ, ভারতের সামগ্রিক আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী হইতেছে, তজ্জন্য বিদেশ হইতে নানা পণ্য সংগ্রহ করিতে হয়, এই সময় বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী খুবই অসুবিধাজনক। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১৯৫১ হইতে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ, এই দশ বৎসরে ভারতে ১২৯৬ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানী হইয়াছে। নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অর্থনৈতিক মুখপত্র 'ইকনমিক রিভিউ' দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, খাদ্যশস্য আমদানীর জন্য না হইয়া টাকাটা অন্যভাবে ব্যয়িত হইলে প্রতিটি ১০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনে সক্ষম এমন ৬টি ইস্পাত কারখানা, অথবা প্রতিটিতে ৩৫ লক্ষ একর জলসেচের ও ৪ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের উপযোগী ১০টি বাঁধ এই টাকায় নির্মিত হইতে পারিত।

বাস্তবিক খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতির জন্য ভারতের সরকারী কর্তৃপক্ষ এখন অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। দেশে খাদ্য যোগানে শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিদেশ হইতে যত বেশি সম্ভব খাদ্যশস্য আমদানী করিতেছেন। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কৃষিকেন্দ্রিক হয়েছিল, তাহার ফলে কৃষির উন্নতিও দেখা যায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শিল্পকেন্দ্রিক হয়, আপেক্ষিকভাবে ইহাতে কৃষির উপর জোর পড়ে কম, কিন্তু খাদ্যসঙ্কটের তীব্রতা লক্ষ্য করিয়াই পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আবার শিল্পের সঙ্গে কৃষির উপর জোর দিয়াছেন। এই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে যন্ত্রশিল্প বাবদ যেখানে ১৫২০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে, কৃষিসংক্রান্ত বরাদ্দ হইয়াছে সেখানে ১২৮১ কোটি টাকা। পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টনের স্থলে ১০ কোটি টনে উঠিবে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন এইভাবে বৃদ্ধি পাইলে ভারতের খাদ্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হইবে এবং বিদেশী খাদ্যের উপর নির্ভরশীলতা অনেকটা কমিয়া যাইবে বলিয়া তাঁহারা আশা করেন। এই সঙ্গে ভারতে লোক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচারকার্য ও এ সংক্রান্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার (Preventive measures) উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

সারা ভারতে এখন খাদ্যাভাব চলিতেছে, এই সময় পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টন কম চাউল উৎপন্ন হওয়ায় এই রাজ্যের সম্পর্কে দায়িত্বশীল সকলেই বিস্ময়বোধ করিয়াছেন। আগেই উল্লিখিত হইয়াছে যে পশ্চিমবঙ্গে গম উৎপাদন হয় না বলিলেই চলে এবং এ রাজ্যের অধিবাসীরা অধিকাংশই পুরোপুরি চাউলভোজী। কাজেই জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমানতার সঙ্গে এক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টন চাউল কম উৎপন্ন হওয়ায় এই ঘাটতি রাজ্যের সমস্যা তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। বর্তমানে অবশ্য জনসাধারণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করায় এবং সরকার দুর্নীতি দমনে

অপেক্ষাকৃত সক্রিয় হওয়ায়, সর্বোপরি ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বা আগামী বৎসরের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্য উৎপাদন ভাল হইবার আশা থাকায় অবস্থা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সরকারী অনুমান মত এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গে যদি ৫৮ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হয়, তবে যোগানের প্রাচুর্যে দর অবশ্যই আরও অনেক নামিয়া যাইবে। তবে পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদন সম্বন্ধে নভেম্বর মাসের বৃষ্টির এবং অজয় নদের সাম্প্রতিক বন্যার পর খুব বেশি উচ্চাশা সঙ্গত নয় বলিয়াও অনেকে মনে করিতেছেন।

যাহা হউক, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি কিছুটা উদ্বেগজনক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন কথা হইতেছে এই অবস্থার স্থায়ী নিরসন কিভাবে করা যাইবে? এই খাদ্য সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া গত জুলাইমাসের মধ্যভাগে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা, বিধান পরিষদ ও কলিকাতা কর্পোরেশনে উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্ক চলিয়াছে, বিরোধীপক্ষ পশ্চিম বঙ্গের, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জেলা পুরুলিয়ার খাদ্যাভাবের উল্লেখ করিয়া সরকারের বর্তমান খাদ্যনীতির পরিবর্তন দাবী করিয়াছেন এবং কেহ কেহ প্রতিবাদসূচক প্রতীক অনশনও করিয়াছেন। সরকারের পক্ষ অবশ্য বর্তমান খাদ্যনীতির সাহায্যেই সঙ্কট মোচনের আশাপ্রকাশ করিয়াছেন এবং চলতি নীতি পরিবর্তনে অস্বীকার করিয়াছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা যদি শুধু মাত্র ভাতের পরিবর্তে ভাত ও রুটি উভয়বিধ খাদ্য গ্রহণ করিতে রাজী হন, তাহা হইলে চাউলের অভাব এড়াইয়া তাঁহার সরকার পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য যোগান নিশ্চিত করিতে পারিবেন।

প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে চাউলের উৎপাদন যখন কমিয়াছে এবং বিদেশ হইতে ভারতে আমদানীকৃত খাদ্যশস্যের অধিকাংশই যখন গম, তখন গমের দ্বারা চাহিদার একাংশ পূরিত না হইলে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইতে পারে না। এই গম চালাইতে হইলে বা জনসাধারণকে গম ব্যবহারে অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে হইলে খাদ্যশস্য বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণই প্রকৃষ্ট পথ। গম খাদ্য হিসাবে ভাল, দামও চাউলের চেয়ে কম, রাজ্যে চাউলের প্রচণ্ড অভাব, এ অবস্থায় চাউলের সঙ্গে গম চালাইবার চেষ্টায় সরকারী কর্তৃপক্ষের দোষ কিছুই নাই। সরকারী ন্যায্য মূল্যের দোকান হইতে সস্তাদরের চাউলের সঙ্গে লোককে বাধ্যতামূলকভাবে গম লইতে হইলে গম ব্যবহারে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে। যুদ্ধের সময় বাংলাদেশে গমের ব্যবহার এইভাবে যথেষ্ট বাড়িয়াছিল।

মোটের উপর খাদ্যশস্য বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে পশ্চিমবঙ্গে রেশনিং প্রথা যতটা সম্ভব পুনঃপ্রবর্তনই বাঞ্ছনীয়। এজন্য সারা রাজ্যে ন্যায্য মূল্যের দোকানের সংখ্যা দ্রুত বাড়াইয়া লইতে হইবে এবং যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব দেশবাসীকে সেই সব দোকানে খাদ্যশস্য ক্রয়েরও সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে যে ৮৮ লক্ষ লোক মূলতঃ পশ্চিমবঙ্গের বাহিরের খাদ্যশস্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়, এই ব্যবস্থা সম্ভব হইলে তাহাদের সমস্যার অনেকটা সমাধান হইবে। তবে রেশনিং ব্যবস্থা সহরাঞ্চলে প্রসারিত করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে অকৃষি সম্প্রদায়, ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বা ছোটখাট চাষীদের,—যাহারা আপন ক্ষেতে উৎপন্ন চাউল ধরিয়া রাখিয়া সম্বৎসর চালাইতে পারে না, তাহাদের কথাও মনে রাখা দরকার। গতবারের রেশনিং ব্যবস্থায় অসহায় গ্রামের মানুষরা উল্লেখযোগ্য উপকৃত হয় নাই বলিয়া স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন।

অবশ্য সরকারী ন্যায্য মূল্যের দোকানে রেশনিং প্রথায় খাদ্যশস্য সরবরাহের সহিত খোলাবাজারে চাউল ও গম সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির প্রতি যত্ন লইতে হইবে এবং এক্ষেত্রে অন্যায় মুনাফাকারী ও বণ্টনে অব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে কঠোর শাস্তিদান করিতে হইবে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ভারতের খাদ্যপরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হইয়া দেশের স্বাভাবিক ব্যবসায় যন্ত্র (Normal Trade Channels) যাহাতে যথাযথভাবে আপন কর্তব্য পালন করিতে পারে, তজ্জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। বর্তমান অবস্থায় যখন সরকারী ন্যায্যমূল্যের দোকান বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন সেগুলিতে লোকের ব্যবহার্য জিনিষ ন্যায্য দামে ব্যাপকভাবে সরবরাহ হইলে তাহার প্রভাব খোলা বাজারের চাউলের উপর পড়িতে বাধ্য

এবং সেক্ষেত্রে জিনিষের সরবরাহ ব্যবস্থায় এবং মূল্যহারে লক্ষণীয় উন্নতি দেখা দিবেই।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান খাদ্যসমস্যার সমাধানে সমবায় প্রতিষ্ঠান বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। এই বিষয়ে সচেতন হইয়া পরিকল্পনা কমিশন ভারতে ২০০টি পাইকারী সমবায় ভাণ্ডার (wholesale Co-Operative Store) এবং ৪০০০ প্রাথমিক সমবায় ভাণ্ডার খুলিবার জন্য ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। পাইকারী সমবায় ভাণ্ডারগুলি তাহাদের আপন আপন সদস্য প্রাথমিক সমবায় ভাণ্ডারগুলিকে পাইকারী দরে খাদ্যপণ্য যোগাইবে এবং প্রাথমিক ভাণ্ডারগুলি তাহাদের নিজ নিজ সদস্যদিগকে ন্যায্য দামে সেই পণ্য বিক্রয় করিবে। প্রতিটি প্রাথমিক সমবায় ভাণ্ডার সর্বোচ্চ পাঁচশত সদস্য বিশিষ্ট হইবে, তবে একশত সদস্য লইয়াই একটি প্রাথমিক সমবায় ভাণ্ডার খোলা যাইবে। এইভাবে সমবায় ভাণ্ডার খোলার কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। দশ টাকা প্রবেশ দক্ষিণা দিয়া একটি পরিবার প্রাথমিক সমবায় ভাণ্ডারের সদস্য হইতে পারে এবং ইহার ফলে সেই পরিবারটি ন্যায্য মূল্যে ভেজালহীন ও পুরো ওজনের প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য অনায়াসেই সংগ্রহ করিতে পারিবে। এই ভাণ্ডার খোলার কাজ প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ন্যায্যমূল্যের খাদ্যপণ্যের দোকান যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে খোলা বাজারের খাদ্যপণ্যের দর এবং মান অবশ্যই ক্রেতা জনসাধারণের স্বার্থের অধিকতর অনুকূল হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যা সমাধানে এইভাবে অধিকসংখ্যক ন্যায্যমূল্যের দোকান ও সমবায় ভাণ্ডার খোলার ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া বাঞ্ছনীয়, এইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কৃষির সাধারণ উন্নতির তথা কৃষিপণ্য-উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য বিধি ব্যবস্থা অবলম্বনের দিকে এখনই বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। একথা সত্য যে, পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র গ্রামাঞ্চলে চাষের সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় বীজধান, রাসায়নিক সার ও যন্ত্রপাতি যোগানের ব্যবস্থা প্রয়োজনানুযায়ী হয় নাই। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গে আবাদী জমির পরিমাণ ১ কোটি ১৩ লক্ষ একর, অথচ সেচ সুবিধা পায় মাত্র ১৭ লক্ষ একর। এই সুবিধা সম্প্রসারণের যে কোন ব্যবস্থারই মূল্য আছে। গ্রামাঞ্চলে প্রকৃত চাষী পরিবারের সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য আবশ্যকীয় চাউল ছাড়া চাউলের মজুতদারী বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। খাদ্যশস্য লইয়া ভারতে একদল ব্যবসায়ী ফাটকাবাজী চালায়, ব্যাঙ্ক এজন্য অগ্রিম টাকা সরবরাহ করে, মানুষের প্রাণধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক খাদ্য লইয়া মুনাফাশিকারীদের কারবার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। শুধু চাউলের পরিবর্তে চাউলের সহিত গম ব্যবহার পশ্চিমবঙ্গবাসীদের আত্মরক্ষার একমাত্র পথ, কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রচারকার্য যথাযথভাবে হইতেছে না। সাধারণ মানুষকে রুটি বা গমজাত পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করিতে প্রচার ও প্রদর্শনীর ব্যাপক ব্যবস্থা করিতে হইবে। খাদ্য সমস্যা কিছুটা কমিতে পারে—যদি আলু, শাকসব্জী, মাছ, ডিম প্রভৃতি খাদ্যপণ্যের যোগান বাড়ে এবং দাম অপেক্ষাকৃত সস্তা হয়। এই সব পণ্যের উৎপাদনবৃদ্ধি এবং বাজার নিয়ন্ত্রণেও সরকারকে সচেষ্ট হইতে হইবে। ভাত রান্নার প্রক্রিয়া পরিবর্তন করিয়া ফেন ভাতে শুকাইয়া লইতে পারিলে চাউলের প্রয়োজন কিছুটা কমিতে পারে। এজন্যও শিক্ষা ও প্রচার দরকার। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত অশোক মেটার নেতৃত্বে ভারত সরকার যে খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, সেই কমিটি ভারতে খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থা যথাসম্ভব সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমতার ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য সুপারিশ করেন। এই সুপারিশের ভাষা একটু অস্পষ্ট হইলেও ইহার আবেদন সম্পর্কে এদেশের খাদ্যনীতি নির্ধারণে সদাই অবহিত থাকা উচিত। এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অশোক মেটা কমিটি ভারতের খাদ্যপরিস্থিতির স্থায়ী উন্নতির জন্য কেন্দ্রে একটি ৫০ লক্ষ টন ভাণ্ডার রক্ষার সুপারিশ করিয়াছেন। ভারতের পরিকল্পনা কমিশন নীতিগতভাবে এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় বর্তমানে এই ভাণ্ডার গঠনের ব্যবস্থা হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যার সমাধান সকলের সক্রিয় সহযোগিতার উপরই নির্ভর করে। খাদ্য সমস্যার অগ্রাধিকার অবিসংবাদিত এবং দেশকে যাঁহারা ভালবাসেন সকলেরই এজন্য উদ্বিগ্নতা স্বাভাবিক। কিন্তু এই খাদ্যচিন্তা সুস্থ মানবিক মূল্যবোধের উপর দাঁড়ানো উচিত,

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। খাদ্যকে সব সময় রাজনীতির ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া দরকার। সরকারী অর্থসাহায্যে খাদ্যের কিছুটা মূল্য হ্রাস হয়তো হইতে পারিত, কিন্তু বিদেশী আক্রমণের মুখে দাঁড়াইয়া শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সে অর্থব্যয় আশা করা যায় না। সীমান্ত সঙ্কটের চাপে বাধ্য হইয়া যে সামরিক প্রস্তুতি বা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে, তাহাতে ভারতের প্রতিরক্ষা বাজেট বৎসরে সাড়ে তিনশত কোটি টাকা হইতে আটশত কোটি টাকায় উঠিয়া গিয়াছে। এই অর্থসংগ্রহের জন্যই দেশবাসীর উপর বৎসরে সাড়ে চারিশত কোটি টাকা করভার বসিয়াছে। নবভারত গঠনের জন্য ব্যাপক ও ব্যয়বহুল উন্নয়ন পরিকল্পনার চাপও ভারত গত বারো বৎসর যাবৎ বহন করিয়া চলিয়াছে, এতখানি অগ্রসর হইয়া সেই ব্যয়বহনে এখন আর পিছাইয়া যাওয়া যায় না। এ অবস্থায় দেশবাসী যখন করভারে বিব্রত, তখন খাদ্যাভাবের প্রশ্নে তাহাদের ক্ষুব্ধ করিয়া তোলা কঠিন নয়, কিন্তু ইহাতে রাজনৈতিক যে স্বার্থই থাক জাতীয়তাবোধ বা দেশপ্রেমের নিরিখে এরূপ চেষ্টা এখন নিঃসন্দেহে অন্যায়। অবশ্য গঠনমূলক বা সমস্যার সমাধানাত্মক পরামর্শের মূল্য সব সময়েই আছে। বিরোধী দল পশ্চিমবঙ্গে প্রতিমণ চাউল ২২ টাকায় নামাইবার জন্য দাবী করিতেছেন, ইহা সত্যই বর্তমান অবস্থায় সম্ভব কি না তাহা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত। একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, চাউলের দাম বর্তমানের তুলনায় কমাইতেই হইবে এবং সেজন্য লোভী ব্যবসাদারদের কঠোরভাবে প্রতিরোধ করিয়া খাদ্যশস্য বণ্টন যথাসম্ভব সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বিরোধী পক্ষকেও সহযোগিতামূলক মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। পরিকল্পনা কমিশন এই নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দিয়াছেন, এ বিষয়ে জনসাধাধারণকে অবহিত ও শান্ত রাখিয়া এবং কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া বিরোধীদলের খাদ্যসঙ্কট সমাধানে সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। চাউলভোজী বাঙ্গালীর খাদ্যের অভ্যাস পালটানোর অত্যাবশ্যকতা ও রাজনৈতিক সুযোগ সন্ধানের চাপে চাপা পড়িয়া যাইতে পারে, এ অভ্যাস পরিবর্তন যে অপরিহার্য, খোলা মন লইয়া বিরোধী দলকে তাহা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। পশ্চিমবাংলায় খাদ্যশস্য লইয়া অন্যায় কারবার বন্ধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ভারতরক্ষা আইনের ব্যাপক প্রয়োগ ব্যবসায় ক্ষেত্রে অত্যন্ত জটিলতা সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংযতভাবে আইনটি ব্যবহার করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। এ সম্পর্কে সরকারকে সাহায্য করার অর্থ—পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান,—এদিক হইতেই গঠনমূলক ও সহযোগিতামূলক মনোভাব লইয়া চিন্তা করিতে হইবে।

আমরা আবার বলি, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান খাদ্য সঙ্কট দূর করিবার প্রধান উপায় দেশবাসীর গম ও চাউলের মিশ্র খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস সৃষ্টি করা এবং এই মিশ্র খাদ্যশস্য যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে অধিকসংখ্যক দেশবাসীকে সরকারী বা সরকারনিয়ন্ত্রিত ন্যায্যমূল্যের দোকান হইতে সরবরাহ করা। এই সঙ্গে যথেষ্ট সংখ্যায় প্রাথমিক সমবায় ভাণ্ডার খোলার উৎসাহ দিতে হইবে এবং খোলাবাজারের খাদ্যবিক্রয়ের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া প্রয়োজন হইলে ভারতরক্ষা আইনেরও সাহায্য লইয়া অন্যায় মুনাফাবৃত্তি কঠোরভাবে দমন করিতে হইবে। খোলাবাজারের ব্যবসাকে দেশের স্থায়ী আর্থিক স্বার্থের হিসাবে বাঁচাইয়া রাখার প্রয়োজন আছে বলিয়াই খোলাবাজার একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া ঠিক হইবে না। খাদ্যশস্যের সরবরাহ ভাল করা এবং দাম কমান দুইটিই একত্রে মূল লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী স্বর্গতঃ নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের একটি সুচিন্তিত মন্তব্য মনে পড়ে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর দেশের পণ্যমূল্য হ্রাসের আলোচনায় তিনি বলিয়াছিলেন: "It is clear that so long as the controlling authority does not Control the supply of commodities and their distribution and it is not in a position to sell in the market large quantities through recognised trade agencies at the contolled rates, the legal maximum Cannot be made effective over a larger range of tbe market. Control over supplies and distribution are,

therefore, essential and vital corroarlies to effective price Control" পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সমস্যাতেও আইন প্রয়োগের সর্বাধিক সুফল পাওয়া যাইবে যদি পণ্যমূল্য হ্রাসের প্রয়াসের সঙ্গে পণ্যের যোগান ব্যবস্থায় লক্ষণীয় উন্নতি ঘটে।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে চাউলের উৎপাদন যদিই বা বৃদ্ধি পায় এবং ফলে বর্তমান তীব্র খাদ্যসঙ্কট স্তিমিত হয়, এই রাজ্যের অবিরাম খাদ্যঘাটতির প্রশ্ন স্মরণ রাখিয়া সেই অবস্থায় আত্মসন্তুষ্টির তথা নিষ্ক্রিয়তার কোন অর্থ হয় না। বরং এইরূপ শ্লথভাব ভবিষ্যতের পথে অধিকতর বিপজ্জনক হইতে পারে। এই সীমান্ত রাজ্যের খাদ্যসঙ্কট মোচনের যে সব বিধি-ব্যবস্থা বর্তমানে চালু হইয়াছে, সেগুলি ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের চাউল উৎপাদনের হিসাব নিরপেক্ষভাবেই আরও জোরদার করিতে হইবে। এইজন্য এখন সর্বদাই এরাজ্যে চাউল উৎপাদন বৃদ্ধির ও চাউলের পরিবর্তে গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য ব্যবহারের উৎসাহদান, রাজ্যের লোকবৃদ্ধি সমস্যা ও বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা, কেন্দ্র ও অন্যান্য রাজ্য হইতে যথাসম্ভব অধিকতর পরিমাণে চাউল ও গম আমদানী এবং সর্বোপরি আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমনে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন,—এসব বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সাফল্যের উপরই পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

পুণ্যস্মৃতি

রাধানাথ চট্টোপাধ্যায়

আজ থেকে একশো ত্রিশ বছর আগে রাজা রামমোহন রায় ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিস্টল সহরে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমাজসংস্কারক এই মহাপ্রাণ পুরুষের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। প্রতি বছর তাঁর মহাপ্রয়াণ তিথি দিনটিতে ব্রিস্টল সহরে অনেক ভারতীয়ের সমাগম হয়, তাঁর পুণ্য জীবন নিয়ে আলোচনা হয়, সমাধিটি পুষ্পস্তবকে ভরে ওঠে।

এবারও আমরা লণ্ডন থেকে এভন্ নদীতীরের সুন্দর সহর ব্রিস্টলে জমা হয়েছিলাম। লণ্ডন থেকে ব্রিস্টলে যাবার এবং সবকিছুর বেশ ভাল বন্দোবস্ত করেছিলেন এখানকার 'রাজা রামমোহন রায় মেমোরিয়াল কমিটি'।

এখন ইংল্যাণ্ডে শরৎকাল চলেছে, পাতাঝরার মরশুম শুরু হয়ে গেছে। আর আকাশ প্রায়ই মেঘের ঘেরাটোপের আড়ালে থাকে যখন তখন বৃষ্টি হয়। কিন্তু ঐদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত আকাশ তেমনিই নীল, মাঝে মাঝে পেঁজা তুলোর মত মেঘের আনাগোনা ছিল। এমন অত্যুজ্জল রোদের শেষেও ফেরার পথে দেখছিলাম তারার ঝিকিমিকি, আকাশে চাঁদ আঁকা।

ইণ্ডিয়া হাউস থেকে যখন আমরা এই বছরের তীর্থযাত্রা শুরু করলাম তখন সকাল আটটা বেজে গেছে। অনেকে 'মার্বেল আর্চ' নামে জায়গায় জমায়েৎ হয়েছিলেন তাঁরাও উঠলেন। ডেপুটি হাইকমিশনার মিঃ কেওয়াল সিং আগেই তাঁর গাড়ীতে চলে গিয়েছিলেন। তারপর আরম্ভ হোল আমাদের দীর্ঘ পথ অতিক্রম। মোটর কোচটি খুবই আরামদায়ক ছিল। পথে আমরা মার্লবরোতে কিছু খেয়ে নিলাম, তারপর রেডিং সহর পার হয়ে ইংল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলে এসে গেলাম। একটা একটা গ্রাম, ট্র্যাক্টর দিয়ে জমি চাষ হচ্ছে, মাঠে খড় গাদা করা আছে। কোথাও কোথাও পথের ধারে দীর্ঘ পপলার

গাছের সারি। সিডার গাছ, ওক গাছের আড়াল দিয়ে চমৎকার নীল আকাশ আমাদের বরাবর যেন অভিনন্দিত করছিল।

যাত্রা পথে ভাবছিলাম উনবিংশ শতাব্দীর এই মহান পুরুষের সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই বা জানি। ভারতের এক যুগসন্ধিক্ষণে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন, তাই নতুন আগত যুগকে তিনি বরণ করেছিলেন পুরোনো সংস্কার ও ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যার জন্য স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে অনেকের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার' তিনি বেশ ভালভাবেই বুঝেছিলেন তাই অন্তরের তাগিদে তিনি সমাজ সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন। যে বীভৎস 'সতীদাহ' প্রথা আজ অকল্পিত, মানুষের সেই যন্ত্রণা তাঁকে নিঃসংশয়ে ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ করেছিল তাই তিনি আত্মবিশ্বাসে অটল ছিলেন। যুগে যুগে এই পৃথিবীতে তাঁর মত পুরুষেরা অন্ধকারে ধ্রুবজ্যোতির মত আসেন সত্য ও মঙ্গলের বার্তা নিয়ে এবং যতক্ষণ কর্তব্য কর্ম না করছেন ততক্ষণই তাঁরা অশান্ত এবং মনে হয় এই সংসার গহনে একক থাকেন। রাজা রামমোহন সেই কোন শৈশবে চলে গেলেন সুদূর তিব্বত —সংসারের কোন বাঁধনই তাঁকে রাখতে পারল না। কারণ তিনি বুঝেছিলেন—হিন্দুধর্মের যদি সংস্কার করতেই হয় তবে আগে হিন্দুধর্মের আগা গোড়া জানতে হবে—তারপর অন্য সব ধর্মও। তাই ক্রমে তিনি সংস্কৃত পাঠ শেষ করলেন, উপনিষদের মূলসূত্রগুলি যা উত্তরকালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের চিন্তাধারাকে বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল সে সব, এবং হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করে ক্রমে তিনি অন্য অন্য ধর্মশাস্ত্র পাঠ করলেন এবং গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন। এজন্য তাঁকে হিব্রু, গ্রীক, পার্শিয়ান, আরবী ও পালি ভাষায় পণ্ডিত হতে হোল—কারণ অন্য ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু জানতে গেলে তখনকার দিনে একমাত্র সেই সব ধর্মপুস্তকের ভাষা শেখা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না এবং বোঝা যায় এজন্য তাঁকে কি পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি মনেপ্রাণে হিন্দু ছিলেন এবং হিন্দুধর্মকে এত ভাল বাসতেন বলেই ধর্মের আড়ালে যে সমস্ত সামাজিক অনাচার অবিচার পরগাছার মত বৃদ্ধি পাচ্ছিল তা উৎপাটিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তারপর তিনি আরও অন্য অন্য আন্দোলন করেছিলেন যেমন তৎকালীন সরকারী ভাষা পার্শিয়ান থেকে ইংরাজী প্রবর্তন, জুরীর মাধ্যমে বিচার, এমন কি শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের পৃথক করা পর্যন্ত। তারপর তিনি ইংলণ্ডে এলেন, সে অনেক, অনেক যুগ আগেকার কথা যেন। ১৮৩১ সালের ৮ই এপ্রিল। তারপর ১৮৩৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার আবার নতুন করে প্রবর্তিত হবে কিনা ওসম্বন্ধে এক কমিটি হয়েছিল, রাজা রামমোহন হাউস অফ কমন্সে সেই কমিটির কাছে তাঁর মতামত পেশ করলেন। তারপর তিনি ব্রিস্টলে এলেন—সে যুগের ব্রিস্টল, তাঁর ধর্মসংক্রান্ত কাজেই, কিন্তু এখানেই তিনি মহাপ্রয়াণ লাভ করলেন, স্টেপলটন গ্রোভএ, এম গাছের ছায়ায় তাঁর সমাধি রচিত হল।

এই সব ভাবনা চিন্তার মাঝে আমরা কখন বাথ্ এবং বাথেস্টন নামক দুটো ছোট ছোট শহর পার হয়েছি এবং ব্রিস্টল সহরে এসে গেছি। মোটামুটি বেশ বড় সহর পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন। অনতিবিলম্বে আমরা ওয়ার মেমোরিয়াল স্ট্যাচুর কাছে এলাম।

প্রথমেই আমরা 'রেড লজ' বাড়ীটি দেখলাম। এটি মিস্ মেরী কার্পেণ্টারের বসত বাটি ছিল। মিস্ মেরী কার্পেণ্টার রাজার শিষ্যা ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন এবং তৎকালীন মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং জেলখানা সম্বন্ধে বই লিখেছিলেন। তাঁর এই বাড়ীটি বহু পুরাতন এবং এটি লেডী বায়রণ, যিনি মিস্ মেরীর বন্ধু ছিলেন, তাঁর সহযোগতায় তৈরী হয়। এখন এটি একটি মিউজিয়াম এবং তৎকালীন ইংলণ্ডে ব্যবহৃত আসবাবপত্র, যোদ্ধাদের বর্ম, তলোয়ার প্রাচীন কালের স্মৃতি বহন করছে। একটি সপ্তদশ শতাব্দীর দেওয়াল ঘড়ী বিংশ শতাব্দীতেও তার কাজ করে যাচ্ছে। তা ছাড়া মিস মেরীর আঁকা অনেক ছবি আছে। তৎকালীন ভারতবর্ষের পটভূমিকায় আঁকা একটি চিত্র নীরবে যুগ পরিবর্তনের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এই মিউজিয়মে রাজার ব্যবহৃত জিনিষপত্র, মিস মেরীর লেখা বই "Six Months in India" Last days of Ram Mohn Roy এবং prison discipline and

Female education in India" ইত্যাদি বই রয়েছে। তা ছাড়া মিস মেরী কলকাতায় বেথুন সোসাইটীতে যে বক্তৃতা দেন তার এক বিবরণী, 'Report of Mari Carpenter's address at Bethune Society রক্ষিত আছে। এই রিপোর্টটির ভূমিকা লিখে দেন বেথুন সোসাইটীর সেক্রেটারী হিসাবে কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয়। এই সব দেখলেই বোঝা যায় রাজার শিষ্যা এই বিদেশিনী মহিলা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, বিশেষ করে সেখানকার মেয়েদের শিক্ষা ব্যাপারে কত উৎসাহী ছিলেন। রাজা রামমোহন লিখিত অনেক চিঠিপত্র এবং তখনকার দিনের খরচপত্র সংক্রান্ত হিসাবের খাতা সযত্নে রক্ষিত আছে।

এর পর আমরা সবাই সহর দেখলাম, কারণ আগেই ঠিক করা ছিল আমরা আগে স্থানীয় ইউনিটারিয়েন চার্চে এই বিশেষ দিনটিতে যে ধর্মালোচনা হয় এবং সেই মহাপ্রাণ পুরুষের স্মরণে প্রতি বৎসর 'সার্ভিস' পালন করা হয় তাতে যোগ দেব—তারপর রাজার সমাধি ক্ষেত্রে যাবো।

আজকের ব্রিস্টল সহর কর্মচঞ্চল। এভন নদীতীরে হোয়ার্ফ এবং জেটী, সেই 'ন্যাশানাল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক' রাস্তায় বিপুল ট্রাফিক, নতুন বাড়ি। তবে মাঝে মাঝে সেকেলে চার্চ এবং বিরাট থামওয়ালা প্রাসাদ—যা হয়তো কোন সরকারী দপ্তর এবং তার একান্ত বাসিন্দা পায়রারা চকিতে প্রাচীনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা 'লুইস' নামে এক বিরাট ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে খেলাম এবং ঠিক আড়াইটের সময় 'লেউইস্ মিড্ চ্যাপেলে' এসে উপস্থিত হলাম।

কতদিন কেটে যাবে কিন্তু সেদিনের এক পুরাতন গির্জার এক মহাপুরুষের জীবন ও বাণীর আলোচনা মনে থাকবে। সুউচ্চ বাতায়ন মধ্যাহ্নের প্রসন্ন রবির কিরণে প্রশস্ত হলঘরে আলো আঁধারের রশ্মিরেখা মিনিস্টার সাহেব উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ করলেন উপনিষদ থেকে 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'। গীতা ও বাইবেল থেকেও উদ্ধৃত করলেন এবং তারপর রাজার জীবন ও বিশেষ করে তিনি কিভাবে গতানুগতিকের নাগপাশ ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন তাই বললেন। এক উচ্চ বর্ণের হিন্দুর পক্ষে তখনকার দিনে বিপদসঙ্কুল সাগর পথে পাড়ি জমানো এবং মাত্র ষোল বছর বয়সে নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতে জ্ঞানার্জনে যাওয়া ইত্যাদি।

অনেকেই জমা হয়ে ছিলেন। নিস্তব্ধ গির্জা—আমরা যখন সমবেতভাবে মৌন হয়ে তাঁকে স্মরণ করছিলাম তখন আরও নিস্তব্ধ হয়ে উঠছিল।

গীর্জার এই ঘটনার পর আমাদের যাওয়ার কথা ছিল রাজার সমাধিক্ষেত্র দেখতে। আমরা আবার গাড়িতে গিয়ে উঠলাম এবং দেখতে দেখতে কিং উইলিয়মের প্রস্তরমূর্তি পার হয়ে এক সরু খাঁড়ি পার হয়ে প্রায় সহরের বাইরে 'আর্নস ভেল' সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হলাম। এই খানেই রাজার মরদেহ পরে 'স্টেপলটন গ্রোভ' যেখানে রাজা দেহরক্ষা করেন সেখান থেকে আনা হয় এবং সমাধিস্থ করা হয়। এটি তীর্থস্থান বলে গণ্য করা হয় এবং প্রতি বছরই বহুজন সমাগম হয়।

শরতের প্রথম। গাছের পাতা ঝরে পড়ছে সমাধিগুলির ওপর। এরই মাঝে রাজার সমাধি। এটি রাজার বন্ধু প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। অবিকল হিন্দু মন্দির একটি যেন। এখানে ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার মিঃ সিং সমাধিতে মাল্যদান করলেন এবং ভারতের ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে রাজার চিন্তাধারা, তাঁর কর্মবহুল জীবন এবং সমাজ সংস্কার কিভাবে অগণিত নরনারীকে অনুপ্রাণিত করেছিল তার উল্লেখ করলেন। ব্রিস্টল প্রবাসী ভারতীয়রাও অনেকে বললেন, গীতা থেকে পাঠ হোল এবং মেয়েরা ব্রহ্মসঙ্গীত গাইলেন আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ' সত্যসুন্দর। উজ্জল রৌদ্রালোকে শ্বেত পাথরের সুন্দর সমাধি মন্দিরটি খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। এতদিন পরেও নূতনের মত আছে।

তারপর আমরা গেলাম সহরে আর্ট গ্যালারী দেখতে। এই গ্যালারীতে রাজা রামমোহন রায়ের একটি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র আছে। এটি লিভারপুল সহরের জনৈকা মিস্ কিডেল ১৮৪১ সালে ব্রিস্টল ইনস্‌টিটিউসনকে দান করেন এবং পরে গ্যালারীতে রক্ষিত হয়। এই চিত্রটি এই বিশেষ দিনে গ্যালারীর এমন এক জায়গায় রাখা হয় যাতে দর্শকরা সহজেই দেখতে পারেন। তা ছাড়াও এই গ্যালারীতে অনেক সুন্দর সুন্দর তৈলচিত্র, প্রস্তর মূর্তি, তৎকালীন যুগের ব্যবহৃত দৈনন্দিন তৈজসপত্র এবং

সেতুবন্ধন

ফটো : চঞ্চল মিত্র
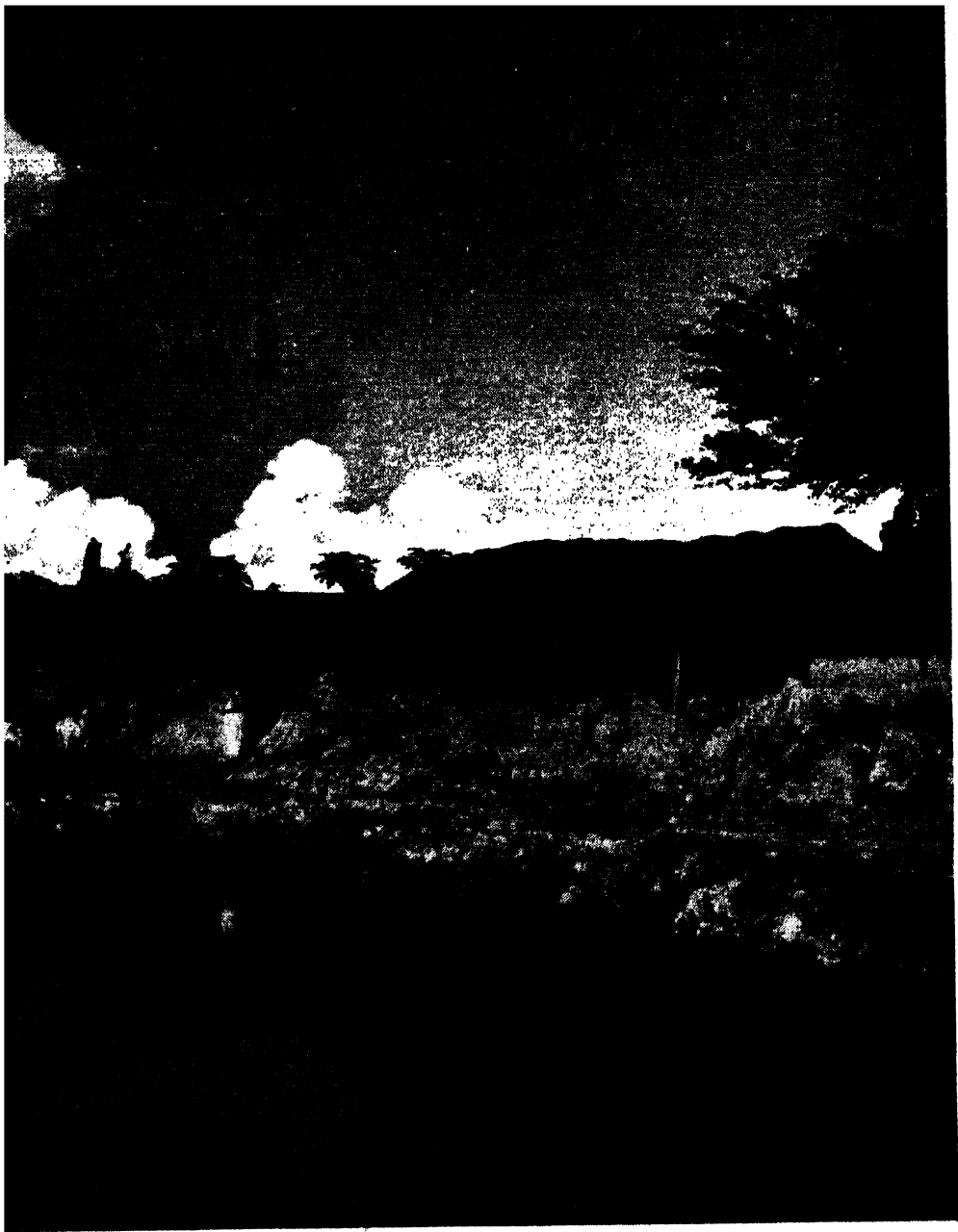
শান্ত

ফটো : সুধাংশু মণ্ডল

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইতিহাসের ধরা বিবর্তন সংক্রান্ত চিত্রগুলি খুবই অনুপ্রাণিত করে। ঝড়তুফানের মাঝে তৎকালীন সমুদ্রগামী একটি জাহাজের বিরাট তৈলচিত্র মনকে স্তম্ভিত করে দেয়। সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো রাজার তৈলচিত্রটি খুবই জীবন্ত এবং চমৎকার আছে। সচরাচর আমরা রাজার যে ছবি দেখতে অভ্যস্ত এটিও তাই এবং নীচে উল্লিখিত আছে। The First Hindu Refomer.

ক্রমে অপরাহ্ন হয়ে এল। সহরের অন্য প্রান্তে' আস্টি-কোট´কাউন্টি ক্লাবে' ঐদিন ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার একটি পার্টি দিয়েছিলেন—সকলেই তাতে জমায়েৎ হলাম। সহরের অনেক গণ্যমান্য লোক এসেছিলেন। ক্লাবটিও বেশ পুরাতন। এই সহরের অনেক কিছু এখনও পুরাতনই আছে, নূতনের স্পর্শ লেগেছে, আবার পুরাতনকেও আঁকড়ে আছে। এই ক্লাবে অনেকের সঙ্গেই মেলামেশা করা গেল। ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক নামজাদা অধ্যাপকরা এসেছিলেন। অনেকেই ভারতবর্ষ এবং দূর প্রাচ্য ঘুরে এসেছেন আজকের ভারতবর্ষ এবং ছুনিয়ার অনেক খবর রাখেন। একজন অধ্যাপিকা জিজ্ঞাসা করলেন—আমি Nirode C. Choudryর লেখা Autobiography of an unknwn Indian—যা কিনা 'বেস্ট সেলার', পড়েছি কিনা। বল্লাম, বেস্ট সেলার কি জানিনা তবে বইটা পড়েছি।

এখানেও অনেকে বক্তৃতা দিলেন। শহরের শেরিফ এবং আরো অনেকে। 'ব্রিস্টল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' থেকেও দু-একজন বললেন। শেরিফ মহাশয়ের বক্তব্য খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি এতগুলি ভারতীয়কে একসাথে দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন তারপর সংক্ষেপে এই কথাই বললেন যে 'কমনওয়েলথ' বলতে সাধারণভাবে গোটাকতক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্মেলনই শুধু নয়, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রভাবও পরস্পরকে অনুপ্রাণিত করে। এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন ব্রিস্টল নিশ্চয়ই গর্ব করতে পারে যে রাজা রামমোহনের মত পুরুষ এখানে তাঁর শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন। ব্রিস্টল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অনেক ভারতীয় ছাত্র পড়েন তাঁরা প্রায় সকলেই এসেছিলেন। স্থানীয় লোক দু-একজন বললেন, এবং মিঃ সিংও এখানে তাঁর বক্তব্যে [illegible] সকলকে এই পার্টিতে আসার জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং স্থানীয় ভারতীয় ও অন্য সকলকে এই অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

অপরাহ্ন ক্রমেই শেষ হয়ে এল, অস্তরবির শেষ আলোক বৃক্ষলতা ও হর্ম্যরাজির ওপর তখনও যায়নি, সহরের এ প্রান্তে সে প্রান্তে ঘুরে প্রায় সহরতলী অঞ্চলে 'ষ্টেপ্‌লটন গ্রোভ' নামক বিখ্যাত বাড়িটিতে উপস্থিত হলাম। এই বাটিতেই রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এবং দেহত্যাগ করেন। দেখলেই বোঝা যায় সেকেলে ধরণের বাড়ি—উঁচু উঁচু থাম খিলান ও কার্নিস ক্রমেই আজকালকার স্থাপত্য থেকে বিদায় নিচ্ছে। শুধু ইংলণ্ডেই নয়, ছনিয়ার সব জায়গা থেকেই। অনেক অনেক দেশে পুরানো আমলের বাড়ি ভেঙে ফেলে রাস্তা বানাচ্ছে—নয়তো আধুনিক বাক্স ধরণের ফ্লাট উঠছে, যেখানে প্রয়োজনটাই সব। হয়তো সবদিক দিয়েই ভাল হচ্ছে, কিন্তু স্থাপত্য যে একটা কলা সেটাই অস্বীকার করে। তাই এই সুপ্রাচীন গৃহটি বড়ই ভাবগম্ভীর। আজকে এটা একটি 'মেণ্টাল হোম', অধিবাসীরা খুবই অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে পরস্পরের মধ্যে কি বলাবলি করতে লাগলো এবং বোধ হল অনেকেই খুব আশ্চর্য হোল। রাজা দুতলায় যে ঘরটিতে দেহত্যাগ করেছিলেন সেটি বাগানের দিকে এবং রোগীদের বেড্‌ রয়েছে।

তিনি মারা যাবার পর তাঁর দেহ সংলগ্ন একটি বাগানে সমাধিস্থ করা হয়, জায়গাটি রেলিং দিয়ে ঘেরা রয়েছে এবং ইতিবৃত্ত একটি পাথরে উৎকীর্ণ আছে—যদিও বহু পুরাতন হয়ে গেছে কিন্তু বেশ পড়া যায়। এই সমাধি থেকে তাঁর দেহ পরে আর্ণস ভেল সমাধিতে স্থানান্তরিত করা হয়।

দিন শেষ হয়ে এল, সন্ধ্যার অন্ধকার গাছের তলায় ঘন হচ্ছে, এল্‌ম্‌ গাছের ওপর গৃহ প্রত্যাগত পাখীরা কলরব করছে কলস্বরে, আমরা ফিরে চললাম লণ্ডনের দিকে। সারা দিনের এই তীর্থ পর্যটনের শেষে, ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর যে মহাত্মা এই শান্ত বৃক্ষতলে তাঁর শেষ শয্যা রচনা করেছিলেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করে।

লণ্ডনে ফেরার পথে ভাবছিলাম আমাদের দেশে রাজা রামমোহনের জীবন ও বাণী নিয়ে খুব বেশী আলোচনা হয়নি। অথচ ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ইতিহাসে

তাঁর অবদান অসামান্য। বৃটেনে সাম্প্রতিক প্রকাশিত বারবারা ওয়ার্ডের 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড দি ওয়েষ্ট বইএ রাজাকে ভারতবর্ষে পশ্চিমী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্রদূত হিসাবে বলা হয়েছে এবং লেখিকা বলছেন —"That India has so for followed its own route, avoiding both extremes, springs from the wisdom of its own traditions. The form modernisation in India might take was prefigured during the first days of British rule by the life of one of Indin's greatest reformers, Raja Ram Mohan Roy,...Thus at the very beginning of India's close contact with the west, a way was shown of accepting western ideals without abandoning the deepest ethical insights of Indian Society."

এই যে 'রেকনসিলিয়েশনে'র মনোভাব, যা এই দ্রুত সঙ্কুচিত পৃথিবীর আর্ট, ধর্ম, রাজনীতি অর্থনীতি এবং কালচারে ক্রমাগত প্রাধান্যলাভ করছে, যুগ প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় বহুদিন আগেই তার সূচনা করেছিলেন।

স্বামীজী ও দেশাত্মবোধ

সুদর্শন চক্রবর্ত্তী

"Do you love your country ? Then come, let us struggle for higher and better things, look not back, no not even if you see the dearest and nearest. Look not back, but forward" —স্বামী বিবেকানন্দের এই আহ্বান যে কতখানি অন্তরস্পর্শী তা যথার্থ দেশপ্রেমিক না হলে যথাযথ উপলব্ধি হয়না, যিনি বলেছেন—'The very dust of India has become holy to me, the very air is now to me holy, it is now the holy land, the place of pilgrimage, the tirtha."

আজ বিশেষ করে এই যুগসন্ধিক্ষণে তাঁর কথাই আমাদের উদ্বুদ্ধ করে—"I see clear as life before me. That the ancient mother has awakened once more, sitting on her throne, rejuvenated, more glorious than ever, Proclaim her to all the world with the voice of peace and benediction,"

ধর্ম্মের নামে দেশটা যে ঘোর তামসিকতায় ছেয়ে গেছে, একথা তিনি আগেই ব'লে সাবধান ক'রে দিয়েছেন,— "খোল-করতাল বাজাইয়া কীর্ত্তনে লম্ফঝম্ফ করিয়া দেশটা উৎসন্ন গেল।" বাঁশী বাজিয়ে এখন আর দেশের কল্যাণ হবে না জেনে তিনি বলেছেন,—"ছেলেবেলা হ'তে মেয়েমানুষি বাজনা শুনে শুনে, কীর্ত্তন শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হ'য়ে গেল। এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা ; ধনুর্ধারী রাম, মহাবীর, মা কালি—এঁদের পূজা। ডমরু শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুলিতে হইবে, 'মহাবীর, মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম ব্যোম' শব্দে দিগেদশ কম্পিত করিতে হইবে।

তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিদেশপ্রীতি, স্বামীজী তা তখনই লক্ষ্য করেছেন, তাই বলেছেন,— "দেশশুদ্ধ লোক নিজের সোনা রাঙ্, আর পরের রাঙ্‌টা সোনা দেখিতেছে। এইটাই হইতেছে আজকালকার শিক্ষার ভেল্‌কি।" মানুষ যেখানে পশু, সেখানেই তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রয়াস। তাই সেখানে সে আপনাকে বিস্মৃত হয় প্রলোভনে নিজস্ব সত্ত্বাকে ভুলে। তাই প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,—"শিক্ষার সার কথাই হ'ল মনের একাগ্রতা, কতকগুলি ঘটনার সংগ্রহ নহে। গাধা চন্দনকাষ্ঠের ভারই বোঝে, ভিতরের বস্তুর সন্ধান পায় না।"

তাই দেখা যায়, ভারতের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয়তার রক্ষার বীজমন্ত্র র'য়ে গেছে আসলে কৌপিন পরিহিত সর্ব্বত্যাগী প্রেমপ্রতিক অরণ্যচারী সন্ন্যাসীর মধ্যেই—যা লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলককে তিনি নিজেই লিখেছেন, —"সন্ন্যাসীর ভিক্ষাপাত্র ভারতের সমাজকে যুগে যুগে

বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করেছে।" এইখানেই ভারতের বৈশিষ্ট্য; আর তা যথার্থ উপলব্ধি করেছেন বলেই স্বামীজীর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যদি ভারতীয় সাংস্কৃতিকে উপলব্ধি করতে চাও, তবে বিবেকানন্দকে অনুধ্যান কর।" শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন, 'বিরাট প্রাণপুরুষ ব'লে যদি কাউকে স্বীকার করা যায়, তবে তিনি একমাত্র বিবেকানন্দ।" জহুরী যেমন জহর চেনে, তেমনই দ্রষ্টা-পুরুষ বিখ্যাত মনীষী রোঁমারোলা বলেছেন,—Gandhiji took torch from the hand of Swami Vivekananda."

নেতাজী সুভাষচন্দ্রও সমস্ত অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন স্বামীজীর লেখার মাধ্যমেই, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ছাড়া উৎকৃষ্ট সাহিত্য তিনি কল্পনাও করতে পারেন নাই।

যা ঘটে তাই যে সত্য (Real) নয়; Absolute ideaই যে সত্য, হেগেল (Hegel)-এর এই মতকে বাস্তব গতির সঙ্গে মিলিয়ে বাস্তববাদী মার্ক্স বললেন, আদর্শের বিকৃতি (Ideological perversion)। কিন্তু স্বামীজী অধ্যাত্মবাদ দিয়ে এ সব মতকে খণ্ডন ক'রে বোঝালেন যে পূর্ণের বিবর্তন অসম্ভব। তিনি বললেন তাই,—Civilisation is the manifestation of spirituality. বনের বেদান্তকে ঘরে আপনার ক'রে নিতে সমস্ত শোষণের অবসানের জন্যে তিনি বললেন ধর্ম যে শোষণ করে—মার্ক্সের এই মতকে অস্বীকার করে,—ধর্মই শোষণের অবসান করে (The work of advaita philosophy is to break down all privileges.)

ধর্ম যে Dogma নয়, Theoryও নয়, এ হ'ল Being and becoming; এই Divineকে স্বামীজী প্রত্যক্ষ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। শিবজ্ঞানে জীবসেবার নির্দেশ দিয়ে আধ্যাত্মিক সত্য আস্বাদনে সমস্তক্ষণ সমাধিমগ্ন থেকেও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তার মানসপুত্র স্বামী বিবেকানন্দকে যথার্থ উত্তরাধিকারী পেয়ে বলেছেন, "কালে যে তোকে বটগাছের মত অনেককে আশ্রয় দিতে হবে।"

হ'লও তাই। যে জড়বাদী জীবনাদর্শ মানুষকে অমানুষ করেছে সারাটা ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে, সেই ক্ষয় বীজকে আমাদের সমাজদেহ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রান্ত না করতে পারলে অদূরেই মহাব্যাধির এই বিষে দেশের সমগ্র জলবায়ু ছেয়ে যাবে। তাই আজই এর প্রতিরোধ-বাহিনী গ'ড়ে তুলতে হবে। স্বামীজীর আহ্বান তাই ধ্বনিত হয়েছে, "বঙ্গযুবক, তোমরা বিশ্বাস কর তোমরা মানুষ, বিশ্বাস কর তোমরা অপরিসীম কার্য্যক্ষম···বিশ্বাস কর তোমরা জনে জনে ভারত উদ্ধারে সক্ষম।"

ভবিতব্য বা অদৃষ্টের উপরে নির্ভর না করে আদর্শের জন্যে সংগ্রামে যারা জীবন দান করেন, তারাইত ইতিহাসে যথার্থ মানুষ। মানুষ হতে গেলেই তার কর্ত্তব্য ও প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। ত্যাগ ও সেবার আদর্শ নিয়ে তখনই মানুষ আজ্ঞাবাহী হয়ে এগিয়ে আসবে, একদল পড়বে, অপরদল তাদের রক্তাক্ত হাত থেকে পতাকার ভার নেবে—

"ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী
অন্য বীর তারি ধ্বজা নিয়ে আগে চলে।"

জীবন ও ধর্ম্ম পৃথক নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠ না হলে জীবন ও সত্য হয়ে ওঠে না। তাই তার ঝাণ্ডা রক্ষার জন্যই অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ—"হতো বা প্রাপ্ সসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥"

তাই দুর্জয় আশা আর সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলার জন্যে তাঁর অভয় বাণী—আমার দেশমাতৃকা বাণীর মত পদবিক্ষেপে পশুমানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত করিবার জন্য মহিমময় ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন, স্বর্গ, বা মর্ত্তের কোন শক্তির সাধ্য নেই, এ জয়যাত্রার গতিরোধ করিতে পারে।"

মুখে নিছক ধর্ম্ম ধর্ম্ম করা full of morbidity-cracked brains অথবা fanatic (মজ্জাগত দুর্বলতা, মস্তিষ্কবিকার অথবা বিচারশূন্য উৎসাহসম্পন্ন)—এদের ডেকে New humanism-এর প্রতিষ্ঠা-কল্পে তিনি সন্ন্যাসী হয়েও বললেন, গীতা পাঠ করার চেয়ে ফুটবল খেলা ভাল। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা, ধর্ম্ম ও বীরের জন্যেই।

জীবনে সত্য না প্রয়োজন—এই দু'টানায় পড়ে তথা-কথিত সুবিধাবাদী নেতাদের প্রয়োজনকে আসল দেখে তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে ভীষণ কটাক্ষপাত করেছেন, যা লক্ষ্য করে শ্রীজহরলাল নেহেরুও বলেছেন, রাজনৈতিক যদি সত্যের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করেন, তবে ঋষিদের উপলব্ধির ও কোন মূল্য থাকে না।"

মোটের উপর তাঁকে বুঝতে গেলে যে আর একটা বিবেকানন্দের দরকার, এ কথা তিনি নিজেই বলে গেছেন, তাই গঙ্গাজলেই গঙ্গা পূজা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, তাঁর শতবার্ষিকী যদি শহরে পুরোহিত ভাড়া করে মাইকে গান গেয়ে, ধুপ, ধুনা, ফুলমালা, চন্দন আর বক্তৃতায় শেষ পর্য্যন্ত ধুনোচী নৃত্যে শেষ না করে যথার্থ ভাবে সত্যের অনুধ্যানে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথের নির্দেশমত (যে আমরা আজও মানিনা) 'মৈত্রের নিভৃত শান্তিবনে', তবেই সার্থক হবে তাঁর আশীর্ব্বাদ আমাদের আজ্ঞাবহ জীবনে। তাই কোথাও প্রকার ব্যভিচার দেখলে আজ তা এত অসহনীয় মনে হয়। জয়তু।
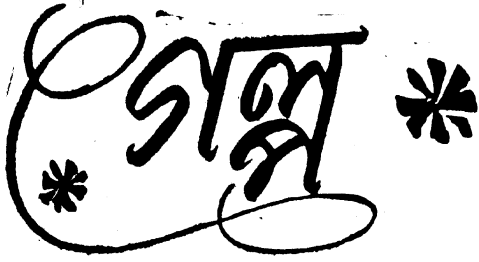
দাগ

রথীন সরকার

কথা ছিলো পাঁচটায় অফিস থেকে ফিরে সাড়ে পাঁচটায় স্ত্রীকে নিয়ে ছ'টার শো ধরবো। কিন্তু অফিস থেকে বেরুতে বেরুতে পাঁচটা পনেরো। তারপর বাড়ি ফিরতে ফিরতে আরও দশ মিনিট। তবু একটা ধৈর্যের বাঁধ থাকতো, যদি না এভাবে তখনও গা এলিয়ে বসে থাকতে দেখতাম জয়ন্তীকে।

কিন্তু অসিত এবার সত্য সত্যই আর পারলো না। তার সমস্ত ঔদার্য আর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। স্ত্রীকে ধমকে উঠলো, উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। তুমি এখনও বসে রয়েছো, এদিকে ঘড়িতে ক'টা বাজে দেখেছো?

জয়ন্তী মৃদু হেসে বললো, সেটা কি আমার দোষ? ফিরবার কথাছিলো পাঁচটায়—ফিরলে সাড়ে পাঁচটায়। ভাবলুম আজ বুঝি আর সিনেমায় যাবে না তাই আর তাড়াহুড়ো করিনি।

অসিত এতেও কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হলো না। বললো, বটে! সব দোষ কেবল আমার, কেমন! কেন দিব্যি সেজেগুজে থাকলে তো আর এভাবে অপেক্ষা করতে হতো না এসেই নিয়ে যেতে পারতুম। তা নয় তোমাদের সেই আঠার মাসে বছর।

জয়ন্তী এবার হেসে ফেললো। বললো, বাবা বাবা পান থেকে চুণ খসলেই আর রক্ষে নেই বাবুর। হয়েছে বাপু হয়েছে আমারই ঘাট হয়েছে—এবার হলো তো। লক্ষ্মী ছেলেটির মতো এবার বসো দেখি। দেখো আমি ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তৈরী হয়ে নিচ্ছি।

দেখতে এমন কিছু আহামরী নয়। তবু তারই মধ্যে একটু লালিত্য একটু কমনীয়তা আছে। আর তাতেই এত মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছে জয়ন্তীকে। মোটামুটি ভালোই লাগে অসিতের। গত বছর বি, এ, পাশ করেছে জয়ন্তী, আর এ বছর মাঘেই বিয়ে হয়েছে তার। কিন্তু নিজে শিক্ষিত বলে এতটুকু গর্ববোধ নেই। আজকালকার মেয়েদের মতন অমন উগ্রও নয়। কথায় কথায় বিদ্যার বুলিও আওড়ায় না। বরং শ্রদ্ধা আর ভক্তি করেছে অসিতকে, স্বামীর উপর স্থির বিশ্বাস রেখেছে। ভারি নম্র আর শান্ত স্বভাবের মেয়ে জয়ন্তী। কেমন একটা নমনীয়তা এনে দিয়েছে তার চরিত্রে ফলে নিজের ভারসাম্য রাখতে সদাই ব্যস্ত।

আর অসিত ভেবেছে সত্যই তাই—এমন না হলে আর স্ত্রী, এমন না হলে আর সহধর্মিণী। তারা পরস্পর পরস্পরের উপর যদি নির্ভরই করতে না পারলো, একে অপরের পরিপূরকই যদি না হতে পারলো তবে সে স্ত্রী কিসের? সে সহধর্মিণীর মূল্য কি? প্রেম ভালবাসা দাঁড়ায় কোথায়? আসলে আমরা সবাই চাই একটু জমি একটু মাটি। যার উপর নির্ভর করা যায়। যার উপর বিশ্বাস করে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া যায়। আর তাতেই এত ভালো লাগে অসিতের। স্নেহ আর ভালোবাসা দিয়ে পাকে পাকে জড়াতে চেয়েছে।

রাস্তায় এসে জয়ন্তী বললো, কি নেবে—রিক্সা না ট্যাক্সী?

অসিত জয়ন্তীর মনের কথা বুঝে হাসলো। এই একটা চিরকালের সাধ জয়ন্তীর। যখনই রাস্তায় বেরিয়েছে তখনই অনুযোগ করেছে রিক্সার জন্য। কিন্তু কার্যকালে তা আর কিছুতেই সম্ভব হয়ে উঠেনি কাজের ব্যস্ততা আর সময়ের স্বল্পতাই তার প্রচণ্ড বাধা হয়ে উঠেছে। তাই একটা দুঃখ থেকে গিয়েছে অসিতের মনে।

বললো, লক্ষীটি এখন আর রিক্সায় নয়, এখন ট্যাক্‌সীতেই চলো—নইলে ছ'টার শো ধরতে পারবো না। ফিরবার পথে না হয় রিক্সায় করে আসা যাবে।

জয়ন্তী আর কোন কথা বললো না।

অসিত একটি ধাবমান ট্যাক্‌সীর দিকে ছুটে গেল। ডাকলো, এই ট্যাক্‌সী, ট্যাক্‌সী—

ট্যাক্‌সী এগিয়ে আসতেই বললো, আর এই হয়েছে আর এক জ্বালা। যদি একটা ট্যাক্‌সীও ফাঁকা পাওয়া যায়। সব দেখো বোঝাই হয়ে চলেছে। আর ব্যাটারাও হয়েছে তেমনি, ডাকলে কেয়ারই করেনা যেন সব নবাব বাদশা।

জয়ন্তী এবার হাসলো। বললো, তুমিই বা কম কিসের? দেখে তো মনে হচ্ছে যেন ছোটখাটো নবাব বাদশা—রাজ্য জয় করতে বেরিয়েছো।

অসিত বললো, সেখানেই তো দুঃখ জয়ন্তী, নবাব-বাদশা আর হতে পারলাম কৈ? তাহলে তো আর এমন করে একটা ট্যাক্‌সীর জন্যে হা-পিত্যেশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো না। আসলে কি জানো, আমাদের ফুটো কপালে ওসব হবার নয়।

ট্যাক্‌সী থামতেই অসিত জয়ন্তীকে তুলে দিলো। তারপর নিজেও উঠে বসে ড্রাইভারকে নির্দেশ করলো।

মাত্র তিনমাস হলো বিয়ে হয়েছে ওদের। অথচ তার মধ্যে একদিনও সে স্ত্রীকে নিয়ে বেরুতে পারেনি। অবশ্য তার যে নতুন বৌকে নিয়ে বেরুতে ইচ্ছা করেনা তা নয়। আর আর স্বাভাবিক মানুষের মতোই তারও সাধ আহ্লাদ আছে। তারও ইচ্ছা করে ছুটীর দিন আর অবসর মুহূর্ত-গুলো জয়ন্তীর সাহচর্যে ভরিয়ে তুলতে। কিন্তু মোটে সময় করে উঠতে পারেনি অসিত। এর জন্য বন্ধু-বান্ধবের কাছে কম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করতে হয়নি তাকে। বন্ধুরা ঠাট্টা করেছে, তামাশা করেছে, কিন্তু অসিত সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করেছে—শুনেও না শোনার ভান করেছে। আর কেউ জানুক বা না জানুক অসিত তো জানে তার দুর্বলতা কোথায়।

কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত সমস্ত পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে গেল ওদের। ওরা যখন এসে পৌঁছলো তখন শো আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কোন কাউন্টারেই আর টিকিট পাওয়া গেল না। মুহূর্তে সমস্ত কিছু বিস্বাদ ঠেকলো অসিতের। এত তাড়াহুড়ো, এতদিনের প্রতীক্ষা, সমস্তই যেন একটা মস্তবড়ো প্রহসনে পর্যবসিত হলো। তার দুই চোখ ফেটে কান্না আসবার উপক্রম হলো। কিন্তু কিছু করতে পারলো না অসিত। একটা বোবা দৃষ্টি মেলে সান্ত্বনার ভাষা খুঁজতে গিয়ে তার গলা ধরে এলো। বললো, চলো জয়া, ফেরা যাক। সবই ভাগ্য। নইলে এত সুখ আর সইবে কেন।

জয়ন্তী বললো, তা কেন, তার চেয়ে চলো বড়দির ওখান থেকে ঘুরে আসি। বড়দি কতদিন বলেছেন, আমাদেরই বেরুনো হয় না। আজ যখন বেরুনোই হলো তখন চলো বড়দির ওখান থেকে ঢু মেরে আসি।

অসিতের এবার ইচ্ছা না থাকলেও রিক্সা ডাকতে হলো। তারপর পাশাপাশি উঠে বসে বললো, তা ছাড়া আর উপায় কি। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনে এর চেয়ে আর বড়ো সান্ত্বনা কি?

জয়ন্তী বললো, না গো না, তা নয়। চুপচাপ বসে ছবি দেখাটাই বরং বিরক্তিকর হতো। আর এতে দু-কাজ হবে। শহর প্রদক্ষিণও হবে, বড়দির ওখান থেকে ঘুরেও আসা যাবে।

অসিত আর কোন কথা বললো না। চুপচাপ বসে রইলো।

রাতের কোলকাতার বিশেষ একটা রূপ আছে। যে রূপটা দিনের বেলায় কখনও প্রকাশ হয় না—যেন আত্ম-গোপন করে থাকে আততায়ীর মতো। আর রাত্রির অন্ধকারেই তার মুখোশ খুলে পড়ে। তখন আর চেনা যায় না এই কলকাতাকে। চিরাচরিত পথটুকুও কেমন অচেনা অজানা মনে হয়। কেমন রহস্যময় লাগে। মনে হয় কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরীতে সন্ধ্যা নেমেছে, পথ হারিয়ে তারা গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরছে।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অসিত বললো, কিন্তু যাই বলো ফিরতে আমাদের রাত হবে।

—হোক না। এত আর একদিন বৈ নয়।

অসিত জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে এবার হাসলো। বললো, খুব যে দেখছি আজ বেপরোয়া।

জয়ন্তী বললো, আহা আমি চিরকালই বেপরোয়া। তুমিই বরং—

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, তাই।

অসিত এবার কাছে সরে এলো। তারপর জয়ন্তীর একখানা হাত ধরে একটু আকর্ষণ করে বললো, বেশ তো তবে এবার বেপরোয়ার নমুনাটুকু দেখিয়ে দাও।

জয়ন্তী প্রতিবাদ করে উঠলো, এই ছাড়ো ছাড়ো—কি দুষ্টুমি করছো, রিক্সাওয়ালা দেখতে পাবে যে।

—দেখুক না। অসিত হাসলো—বললো, ভয় কি, তুমি না এইমাত্র বললে খুব বেপরোয়া।

—না না ছাড়ো ছাড়ো। কি দুষ্টুমি করছো রাস্তা-ঘাটে। জয়ন্তী এবার প্রায় কেঁদে ফেলবার উপক্রম করলো, ছিঃ ছিঃ ছাড়ো ছাড়ো, তোমার যদি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকে।

অসিত ছেড়ে দিয়ে এবার সরে বসলো। বললো, আসলে তোমরা সবাই ঐ মুখেই। মনে মনে ভয় পাও, সংস্পর্শ এড়িয়ে চলো। মুখে যতই বড়াই করো না কেন আসলে তোমরা মজ্জাগত ভয় আর সংস্কারকে মন থেকে তাড়াতে পারোনি।

জয়ন্তী কোন প্রতিবাদ করলো না। রিক্সা এগিয়ে চললো ঠুন্‌ঠুন্ করে। সতীশ গাঙ্গুলী লেনে রিক্সাটা ঢুকতেই অসিত হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, আরে এই রিক্সাওয়ালা—রোখো রোখো—

জয়ন্তী অবাক হয়ে বললো, কি হলো ?

—আরে ঐ তো বড়দির বাড়ি। ঐ যে তে-তলা ফ্ল্যাট বাড়িটা দেখছো না: ঐটাই তো বাড়ি। নামো নামো।

অসিত লাফিয়ে নেমে দাঁড়ালো। তারপর জয়ন্তীকে নামিয়ে নিয়ে এগুলো।

বরানগরে আগেও অনেকবার এসেছে অসিত, কিন্তু এমন রহস্যময় লাগেনি কোনবার। বড়দির স্বামী অর্থাৎ বিশ্বপতি চৌধুরী কর্মঠ বলিষ্ঠ পুরুষ। নিজের চেষ্টায় সংসারের অভাব অনটন দূর করেছেন, দারিদ্র্যও মোচন করেছেন। তারপর বাড়ি করেছেন, গাড়ি করেছেন, বড়-বাজারের ওদিকে ফলাও করে কারবার করেছেন। সে কারবার ফুলে ফেঁপে এখন বিশাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছোটবেলায় একরকম বড়দির কাছেই মানুষ হয়েছে অসিত। বড়দিরা তখন শেয়ালদার ওদিকে ভাড়া বাড়িতে বাস করতেন। জামাইবাবু চাকরি করতেন ইন্সীয়োরেন্স কোম্পানীতে। সেসব দিনগুলোর কথা মনে করলে সত্যিই আজ কষ্ট হয়। কি দুর্ভোগ, কি কষ্ট গেছে। একখানি ঘর, মাথা গুঁজতে ঠাঁই হয় না। অথচ তারই ভাড়া গুণতে গুণতে প্রাণান্ত হতে হয়েছে। আর বড়দি কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছেন। ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়েছেন। কিন্তু চিরকাল এমন থাকেনি। আস্তে আস্তে জীবনের মোড় ঘুরেছে। জামাইবাবু চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় নেমেছেন। আর অসিত একটা প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরি নিয়ে দূরে সরে এসেছে। তারপর চাকরি পাকা হলে বড়দি নিজেই বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। অসিতের কোন কথা শোনেননি। জোর করে বিয়ে দিয়ে রমাকান্ত লেনে ঘর-সংসার পেতে দিয়েছেন।

অসিত হেসে বলেছে, এতদিন পরে আমাকে বিদেয় করে বাঁচলে বড়দি ?

বড়দি বলেছেন, সে কিরে, বাঁচলাম কি! আমার তো আরও জ্বালা বাড়লো। তোরা এখন থেকে দু'টিতে খুনসুটি করবি, আর আমার কাছে নালিশ করবি।

অসিত বলেছে, তাই যদি হবে তবে বিয়ে দিলে কেন ?

বড়দি বলেছেন, বারে, তাই বলে তুই বিয়ে করবি নে। চিরকাল বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াবি! আমার একটা কর্তব্য নেই।

অসিত হেসেছে। ভেবেছে সত্যি তাই, বড়দির কর্তব্য-জ্ঞান আছে। আর সেই কর্তব্যের দোহাই দিয়ে জয়ন্তীকে ঘাড়ে গছিয়ে দিতে কসুর করেননি। আসলে বড়দি স্নেহ করেন অসিতকে—আর তাই ছোটভাইটি চিরকাল বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াবে তা তিনি বরদাস্ত করতে পারেননি। তিনি চেয়েছিলেন কোন নারী এসে তাকে ভালবাসুক, শ্রদ্ধা করুক। প্রেম আর বিশ্বাস দিয়ে তাকে বাঁধুক। আর তাতেই তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে-ছিলেন অসিতের। অন্ততঃ নারী হস্তের কল্যাণ স্পর্শে তার জীবনটা মধুময় হয়ে উঠবে এটুকু তিনি আশা করেছিলেন বৈকি।

দরজা খুলে দিতেই বড়দি অবাক হয়ে গেলেন, ওমা একি তুই! কি আশ্চর্য। তা এতদিন পরে বড়দির কথা মনে পড়লো। হ্যাঁরে তুই তো আচ্ছা ছেলে অসিত।

অসিত বললো, তা শুধু শুধু আমাকেই বা দোষ দিচ্ছো কেন? যে শালটি গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছো তার জ্বালায় তোমার কথা মনে থাকে না যে।

বড়দি হাসলেন। বললেন, খুব তো পাক পাকা কথা শিখেছিস্ দেখছি। তা আয় ভেতরে আয়, বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তর্ক করবি নাকি। ভেতরে আমার এক ননদের দেওর রয়েছে, আয় তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এসো ভাই বৌ।

বড়দি এগুলেন। অসিত বললো, জামাইবাবু কোথায় বড়দি?

—তিনি তো নেই রে, তাঁর এক বন্ধুর বিয়েতে গিয়েছেন—ফিরতে রাত হবে।

—ও।

অসিত আর কোন কথা বললো না।

ভিতরে প্রবেশ করতে এবার বিস্ময়ের অবতারণা ঘটলো। যে ভদ্রলোক খাটের উপর বসে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছিলেন তিনি এবার লাফিয়ে উঠলেন, হাউ ষ্ট্রেন্জ! একি জয়া তুমি!

জয়ন্তীও বিস্মিত কম হয়নি—বললো, পরিমলদা তুমি এখানে?

পরিমল বললো, আমিও তো সেই কথাই বলছি। কি আশ্চর্য যোগাযোগ। একেবারে ভোল পাল্টিয়ে এভাবে দর্শন দেবে ভাবতেই পারিনি। কবে বিয়ে হলো তোমার?

জয়ন্তী লজ্জায় মুখ নিচু করলো। বললো, এই মাঘে।

—ও। পরিমল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। বললো, তা ভদ্রতা করে একটা নেমন্তন্ন পর্যন্ত করলে না। না হয় আনন্দ করে বেশ পেট ভরে খেয়েই আসতুম।

জয়ন্তী এবার প্রতিবাদ করতে চাইলো, না ঠিক তা নয়। মানে—

পরিমল হাসলো। বলবো, কেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইছো জয়া? তোমার সাথে না পতিদেবতাটি রয়েছেন, তাঁর সামনে কখনও মিছে কথা বলতে আছে।

বড়দি এতক্ষণ অবাক হয়ে ওদের কথা শুনছিলেন। কোন কথাই বলতে পারেননি। অসিতেরও তথৈবচ। সুযোগ পেয়ে বড়দি এবার এগিয়ে এলেন। বললেন, তোমাদের দেখছি বেশ আলাপ পরিচয় আছে।

পরিমল বললো, আছে কিনা একবার ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন না।

বড়দি হাসলেন। বললেন, জিজ্ঞাসা করবার তো প্রয়োজন দেখছি নে—যা একখানা মুখ ছুটিয়েছো। চলো বৌ, তুমি আমার সঙ্গে ওঘরে চলো। এঘরে থাকলে তোমাকে বিব্রত করে মারবে!

জয়ন্তীকে নিয়ে বড়দি জোর করে পাশের ঘরে চলে গেলেন। আর অসিত এবার ভালো করে তাকিয়ে দেখবার সুযোগ পেল। পরণে ফিনফিনে ধুতি,গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। বেশ ভব্যিযুক্ত মানুষটি।

অসিত বললো, আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুব খুশী হলাম পরিমলবাবু।

পরিমল বললো, আমি কিন্তু মোটেও খুশী হইনি। বরং আপনাকে দেখে আমার হিংসেই হচ্ছে।

অসিত অবাক হলো। বললো, কেন হিংসে হবে কেন?

পরিমল বললো, মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে জানোয়ারের পর্যন্ত হিংসে হয়, আর আমি তো সামান্য রক্তমাংসের মানুষ।

অসিত এবার হো হো করে হাসলো। বললো, তা আপনার মুখের গ্রাস আপনি ছেড়ে দিলেন কেন?

পরিমল বললো, না ছেড়ে দিয়ে উপায় কি। খাদ্য যদি হঠাৎ বিট্রে করে বসে, তখন খাদককে বাধ্য হয়েই ছেড়ে দিতে হয়।

অসিত কিছু বলবার আগেই বড়দি এসে ঘরে ঢুকলেন। পরিমল চিৎকার করে উঠলো, এই যে বৌদি আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে তো? নাকি আপনার নতুন বৌকে পেয়ে ভুলে গেলেন? দেখবেন শেষ পর্যন্ত এই অধমেরা যেন বাদ না পড়ে।

বড়দি মৃদু হাসলেন। বললেন, তুমি বড়ো দুষ্টু হয়েছো পরিমল। অত উতলা হচ্ছো কেন—সব হবে।

পরিমল বললো, বেশ বেশ হলেই বাঁচি। শুধু শুধু কথা খেয়ে তো আর বেঁচে থাকা যায় না। নইলে না হয় তাও একবার চেষ্টা করে দেখতাম।

খাওয়ার টেবিলে আবার ঝড় উঠলো। পরিমল একাই একশ' হয়ে মাতিয়ে রাখলো সারা টেবিল। যেন কথার ফুলঝুরি। ক্ষীণায়ু জীবনের টুকরো টুকরো কথা—ব্যঞ্জনাময় ধ্বনির তরঙ্গ। সে কথার মূল্য কিছু নেই, উচ্ছ্বাসই প্রবল। তবু জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা একটা অনাস্বাদিত জীবনের স্পন্দন বহন করে। যেমন দূরবীণ দিয়ে দেখা ওপারের অপরিচিত গ্রাম।

পরিমল এবার ইঙ্গিত করে তাকালো বড়দির দিকে, দেখেছেন তো বৌদি—প্রেমে পড়লে পুরুষেরা নাকি বোকা হয়ে যায়, কিন্তু বিয়ে করলে মেয়েরা যে একেবারে বোবা হয়ে যায় একথা কিন্তু জানা ছিলো না।

অসিত বললো, ঠিক তা নয় পরিমলবাবু। আমার তো মনে হয় বিয়ের পর মেয়েরা একটু বেশীই বাচাল হয়। নইলে পরবর্তী জীবনে অমন খাণ্ডারণী হয়ে উঠে কেমন করে।

পরিমল এবার হো হো করে হেসে উঠলো। জয়ন্তী মুখ তুলতে পারলো না লজ্জায়। প্লেটের উপর হুমড়ী খেয়ে পড়লো আরও। বড়দি বললেন, তোমরা আর ওর পেছনে লেগোনা বাপু—ওকে এবার রেহাই দাও। সেই সন্ধ্যে থেকে লেগেছো তো লেগেছোই। একে ও লজ্জায় মরে যাচ্ছে, তার উপর আর খাঁড়ার ঘা মেরো না।

পরিমল বললো, বেশ বেশ আর লাগবো না। আমারই ঘাট হয়েছে—এবার আর একটু টমাটোর চাটনী দিন দেখি। মুখটা ভোঁতা হয়ে গেছে তাতিয়ে নিই।

উঠতে উঠতে তবু রাতই হয়ে গেল। এগারটা দশ। এরপর দেরী করলে আর ট্রাম-বাস পাওয়া যাবে না, গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং উঠতেই হলো অসিতকে। বড়দি এগিয়ে এলেন দরজা পর্যন্ত। পরিমলও। বললো, তোমার পতিদেবতাটিকে নিয়ে আমাদের ওখানে একদিন এসো। এরপর তো আর কখনও যাওয়া ঘটে উঠবে না। একবার দেখে এসো কেমন সুখে আছি।

জয়ন্তী কোন উত্তর করলো না। হয়তো উত্তর করবার সুযোগ ঘটলো না। কিংবা প্রয়োজন বোধ করলো না। অনর্থক সময় নষ্ট করে লাভ কি। এরপর ট্রাম-বাস বন্ধ হবে, কোলকাতা নগরীর স্পন্দন থেমে যাবে। রমাকান্ত লেনে পৌঁছুতে তখনও আর একঘণ্টা।

রাস্তায় এসে ভাগ্যক্রমে একটা ট্যাক্সী পেয়ে গেল ওরা। জয়ন্তীকে তুলে দিয়ে অসিত নিজে উঠে বসলো। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলো। রাস্তা জনহীন হয়ে এসেছে। দোকানপাট বন্ধ হতে শুরু করেছে। কলকাতার সে চঞ্চলতা এখন আর নেই। কেমন নৈরাশ্য নেমে এসেছে নগরীতে। যেন বিগত-যৌবনা রমণীর মতো স্তিমিত প্রায়। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অসিতের অনেক কথা মনে হতে লাগলো। হয়তো কলেজের কোন রি-ইউনিয়ানে কিংবা কোন ফাংশানে আকস্মিক পরিচয় হয়েছিলো তাঁদের। বেশ বলিষ্ঠ আদর্শবাদী যুবক। যার সান্নিধ্যে এসে একদিন পথ হারিয়েছিলো জয়ন্তী। স্বপ্ন দেখেছিলো একটি মধুর জীবনের। কত টুকুই বা আশা। অথচ সে স্বপ্ন কখনই সম্ভব হয়নি—সম্ভব হতে পারেনি। সে স্বপ্ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে, চুরমার হয়ে গিয়েছে। কত তুচ্ছ কত ক্ষুদ্র ঘটনা। জীবনের চড়াই-উৎরাইয়ে এমন ঘটনা তো কতই ঘটে। কি মূল্য তার? কিন্তু এই মুহূর্তে অসিতের মনে হলো এই সামান্য ঘটনাও যেন দুটি মধুর জীবনকে বিষিয়ে তুলবার পক্ষে যথেষ্ট।

ইচ্ছা হলো জয়ন্তীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদরে আদরে ভরিয়ে তোলে—জীবনের এই সামান্য বিচ্যুতিকে আদরের বন্যায় ভাসিয়ে দেয়। মনের সমস্ত গ্লানিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলে। কিন্তু অসিত কিছুতেই ঘুরে বসে জয়ন্তীর একখানা হাত টেনে নিয়ে একটু হেসে উঠতে পারলো না।

ইনিও নমস্য

উপানন্দ

বড় হোলে জানতে পারবে, শুধু চাষবাসের ওপর কোন জাতি স্বয়ংসম্পূর্ণ হোতে পারে না। তাই দরকার হয় যন্ত্রপাতি, কলকারখানা প্রভৃতি। জাতিকে উন্নত করতে হোলে শিল্পায়ন, যাতায়াতের ভালো বন্দোবস্ত আর জমির উন্নতির প্রয়োজন। তাছাড়াও দরকার ঘরে বাইরে বানিজ্যিক লেনদেন। তোমরা এ বিষয়ে বুঝবার চেষ্টা করবে। কেন না তোমরা স্বাধীন ভারতের ভাবী অভিভাবক—জনক ও জননী। তোমরা আমাদের আশাও ভরসার স্থল।

এলি হুইটনী ছেলেবেলা থেকে এটা বুঝতে পেরেছিলেন। এই মানুষটি ভগবৎপ্রেরিত যান্ত্রিক পরিবর্ত্তনের অগ্রদূত। আজ যদি কেউ তোমরা নিউ হ্যাভেনের বর্হিদেশে মিল নদীর ধারে বেড়াতে যাও, দেখতে পাবে হুইটনির কারখানা তাঁর অমর কীর্ত্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে। যত রকম যন্ত্র আজ পর্য্যন্ত তৈরী হয়েছে, যেমন ধর না কেন মোটর গাড়ী, উড়ো জাহাজ, কাপড় কাচার যন্ত্র, ভ্যাকুয়াম-ক্লিনার, তাদের প্রত্যেকটীর উৎপাদন ব্যবস্থার উৎপত্তি স্থল এই কারখানাতে খুঁজে পাবে। সমস্ত জাতির রুচিও অভ্যাসের পরিবর্ত্তন করে গেছেন এলি হুইটনী। তিনি জাতির নমস্য।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাসাচুসেটসের ওয়েষ্ট বরোতে এলি হুইটনীর জন্ম। তাঁর পিতার খামারে বড় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। খামারের দৈনন্দিন নিয়মবদ্ধ কাজের চেয়ে তাঁর বেশী আগ্রহ ছিল বাবার ছোট কারখানায় যন্ত্রপাতি আর লেদযন্ত্র নিয়ে একটা কিছু করার দিকে। যখন তাঁর বয়স দশের কোঠায়, তখনই পেরেকের দাম চড়া বলে পেরেক তৈরী করবার প্রথম ছোটখাটো ব্যবসায়টী স্থাপন করলেন। সে সময়ে চলেছে আমেরিকায় বৈপ্লবিক যুদ্ধ।

যুদ্ধ শেষ হবার পর পেরেকেরও দাম কমে গেল। অল্প বয়সেই তিনি বিচক্ষণ ব্যবসায়-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। পেরেকের দাম নামতেই মেয়েদের হ্যাটের পিন তৈরী করতে সুরু করলেন। জিনিষ তৈরী করার আগ্রহ আর ব্যবসায়ে দক্ষতা এই দুই বৈশিষ্ট্য অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল। আমাদের দেশে এরকম ছেলে কই? এরজন্যে তিনি লেখাপড়ায় অবহেলা করেন নি। কয়েক বছর দেশের স্কুলে পড়ার পর ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে ইয়েল্স কলেজে ভর্ত্তি হোলেন। স্নাতক হবার পর দক্ষিণ অঞ্চলে এক ক্ষেত্র-স্বামীর পরিবারে শিক্ষকতার জন্যে সুপারিশ করে পাঠালেন ইয়েল কলেজের সভাপতি এজরা ষ্টাইলস্।

সাভানা পর্য্যন্ত দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার পর হুইটনী বুঝলেন ভুল করা হয়েছে। নিলেন আশ্রয় বৈপ্লবিক যুগের অন্যতম সেনানায়ক ন্যাথানিয়েল গ্রীণের বিধবা পত্নী মিসেস ক্যাথারিন গ্রীণের জমিদারীতে। এখানে এসে বোধহয়

বুঝতে পারলেন দক্ষিণের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কথা—চাউল কিংবা নীল থেকে আর কোন মুনাফা হয় না, অন্যদিকে বাজারে তামাকের অত্যধিক প্রাচুর্য্য। সে সময়ে আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারেও বস্ত্রশিল্পের উন্নতি হচ্ছিল। রোড আইলাণ্ডের প্রভিডেন্স সহরে স্যামুয়েল শ্লেটার নামে এক ব্রিটীশ যান্ত্রিক ব্রিটেনের স্যুতো কলে যে জটিল যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয়, কেবল স্মৃতিশক্তির সাহায্যে তা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

একদিন মিসেস গ্রীণের বাড়ীতে কথা হচ্ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন অতি সম্মানিত ব্যক্তি। সে সময়ে হুইটনি এখানে শিক্ষকতা করেন। সকলেই একমত হয়ে বললেন—'খুব তাড়াতাড়ি যদি তুলো থেকে বীজকে আলাদা করার যন্ত্র কেউ আবিষ্কার করতে পারে তাহোলে তার পক্ষে শুধু নয় দেশের পক্ষেও সেটা লাভজনক হবে। হুইটনী এই সমস্যার সমাধান খুব চটপট করে ফেললেন। প্রথমে মডেল, আর তারপর বড় আকারের যন্ত্র তৈরী হোলো। শিক্ষকতার কথা ভুলে গিয়ে তিনি ফিলিয়াস মিলারের সঙ্গে অংশীদার হয়ে নিউ হাভেনে এসে 'কটন জিন' যন্ত্র তৈরীর কাজে মন দিলেন, আর তারই উন্নতি সাধনের জন্যে সমস্ত সময় নিয়োগ করলেন।

হুইটনীর তৈরী জিন যন্ত্রটায় জটিলতা বিশেষ ছিল না। এজন্যে এর কর্ম্মক্ষমতা বেশী। হুইটনী তাঁর বাবাকে খুব সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত পেটেন্ট না নেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপন রাখা হয়। কিন্তু হুইটনীর মতে যে যন্ত্র একদিনে একশজন মানুষের কাজ করতে পারবে—আর যে যন্ত্র বহু ক্ষেত্রস্বামীর মন্দা ব্যবসায়কে লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করবে, কোন পেটেন্টই সেই যন্ত্রের উদ্ভাবকের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে না। ব্যবসায়ীদের স্বার্থ তখন সঙ্কটাপন্ন, তারা আরও যুক্তি দিয়েছিল যে মিলার আর হুইটনীর একচেটিয়া ব্যবসায় কি মার্কিন বিপ্লবের ঐতিহ্যের পরিপন্থী নয়?

তাই পেটেন্ট নেবার এক বছরের ভেতর সারা দক্ষিণ অঞ্চলে বেআইনী 'জিন' তৈরী হোতে লাগলো। হুইটনী আর মিলার তখন আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আদালতে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু বে-আইনী 'জিনের ব্যবহার প্রমাণ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। এগুলি খুব গোপনে তৈরী হোতো, আর ঘর্ঘর আওয়াজ [illegible] না। সেজন্যেই আইন সংশোধিত হোলো উদ্ভাবকের স্বার্থরক্ষার জন্যে। দক্ষিণ ক্যারোলাইনা, উত্তর ক্যারোলাইনা আর টেনেসি হুইটনীর 'জিনে'র স্বত্ব কিনে নিল। এর পরই হোলো অবস্থার পরিবর্তন। যেখানে এক চেটিয়া ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বেশী বিরোধিতা হয়েছিল সেই জর্জ্জিয়াতে ন্যায্য বিচার করা হোলো হুইটনীর প্রতি।

বিদ্যালয়ের কলিং বা নির্দ্দেশে এই নতুন আবিষ্কারের কৃতিত্ব আর দক্ষিণের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কৃতিত্ব এই আবিষ্কার—হুইটনীকে জানানো হোলো। একটি পরিসংখ্যান থেকে এই আবিষ্কারের গুরুত্ব বোঝা যাবে—১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হুইটনী যখন জিনের পেটেন্ট নেন তখন যুক্তরাষ্ট্রের তুলোর উৎপাদন ছিল আশী লক্ষ পাউণ্ড, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই উৎপাদন দশ গুণ বৃদ্ধি পায়।

ক্ষেত্রস্বামীদের মত 'জিন' যন্ত্র আবিষ্কারের দ্বারা হুইটনী বিরাট ধনী হোতে পারেননি, তবে শিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে তখন ছিল শ্রমিকের অভাব। কাজেই জিনের উৎপাদনে তাঁকে যন্ত্র ব্যবহারের চেষ্টা করতে হয়েছিল। এর পর সরকারের জন্যে বন্দুক তৈরী করতে গিয়েই উৎপাদনের ক্ষেত্রে যন্ত্রের বহুল প্রয়োগের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। সেই সময়ে দক্ষ বন্দুক প্রস্তুতকারক পর্য্যন্ত বাইরে থেকে দেখতে এই রকম বন্দুক তৈরী করলেও তাদের অংশগুলি নির্ম্মাণে এবং জোড়া দেওয়ার পদ্ধতিতে সামান্য হোলেও পার্থক্য থাকতোই। প্রত্যেকটি বন্দুক একক ভাবে তৈরী হোতো। একটি বন্দুকের একটি অংশ অন্য আর একটি বন্দুকে ব্যবহার করা যেতো না, যন্ত্রের দ্বারা বহু এক রকম অংশ তৈরী করতে পারলেই অংশের বিনিময় যোগ্যতা সম্ভব।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কা—আর উদ্ভাবক হিসাবে হুইটনীর যশ এই দুয়ের জন্যে দশহাজার বন্দুক তৈরীর চুক্তি পেলেন হুইটনী। সরকারের কাছ থেকে সে সময় পর্য্যন্ত আর কেউ এত জিনিষ তৈরী করার চুক্তি পায়নি। এই রকম বিরাট প্রয়োজনেই একটি অস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব, আর সরকারের বিরাট প্রয়োজন মেটাতেই বিরাট আকারের উৎপাদন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হোতে পারে।

সরকারের সঙ্গে চুক্তির বলে উৎপাদনের নতুন উপায় নিয়ে পরীক্ষা করবার অর্থ তিনি পেলেন—আর এরই বলে অর্থ সঙ্কটের হাত থেকেও তিনি মুক্তি পেলেন। হুইটনী

লিখেছেন—'দেউলিয়া অবস্থা আর ধ্বংস আমার সামনে। কোনো রকম মূলধন বা ব্যবসায় সম্ভাবনা নেই—আমার অবস্থা শোচনীয়। এমন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বন্দুক তৈরীর চুক্তি পেলাম। এই সুযোগকে তৎপরতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি—এই চুক্তি দ্বারা কয়েক হাজার ডলার অগ্রিম পাওয়ায় আমি বিপদমুক্ত হয়েছি—' মিল নদীর ধারে নিউ হাভেন শহরের বাইরে হুইটনী অস্ত্রের কারখানার জন্যে জমি নির্ব্বাচিত করলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শীতকালে খুব বরফ পড়লো, কারখানা তৈরীর কাজে এলো কিছুটা বাধা। নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে যে সব বাধার সম্মুখীন তাঁকে হোতে হয়েছিল, তার তুলনায় এই ছোট খাটো আকস্মিক বাধাগুলি কিছুই নয়। কত টাকা আর কত সময় লাগবে হুইটনী ঠিক বুঝতে পারেন'ন।

বার বার তাঁকে ওয়াশিংটনে আসতে হয়েছে, সরকারী কর্ম্মচারীদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে' মাল তৈরীর বিলম্বের কারণ সম্বন্ধে—আর চাইতে হয়েছে অগ্রিম টাকা। এঁরা হুইটনীকে সমর্থন করেছেন, চাহিদা মিটিয়েছেন, কিন্তু বিল পাশ করার সময় টাকা থেকে ভাগ বসাননি, হুইটনীকে এর জন্যে দপ্তরে পূজো দিতেও হয় নি। যে জাতি বড় হবার পথে এগোতে থাকে, সে জাতির সে সময়কার সন্তানরাও হয় সৎ ভদ্র সমাজসেবা তৎপর ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। তারা ঘুষের কারবারী হয় না, বখরাদারীকেও ঘৃণা বলে বোধ করে। তারা হয় না অর্থলোভী। এই সব সরকারী কর্ম্মচারী হুইটনীকে যে ভাবে স্বার্থশূন্য ভাবে সহযোগিতা ও সমর্থন করেছেন তাতে মনে হয়, স্বাধীন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বিবেকের নির্দ্দেশে যাঁরা চলেন, একমাত্র তাঁরাই এরকম সমর্থন করতে পারেন। সেই বছরের প্রথম ভাগে হুইটনী ওয়াশিংটনে গিয়ে প্রেসিডেন্ট জন এডামস্, আর জাতীয় সরকারের বিভাগীয় কর্ম্মকর্ত্তাদের পর্য্যবেক্ষণের জন্যে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি বন্দুক উপহার দিয়েছিলেন। তাঁরা বন্দুক দেখে সকলে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

জনৈক পর্য্যবেক্ষক এই আবিষ্কার সম্বন্ধে লিখেছেন—'এঁর প্রতিভার গুরুত্ব সম্বন্ধে আর এই আবিষ্কারককে দেশরক্ষার কাজে লাগানোর সম্বন্ধে সব দলের লোকেরাই একমত হোলেন—এ সম্পর্কে জেফারসনের মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি ভার্জ্জানিয়ার গবর্নর মনরোকে লিখেছিলেন—'এমন ছাঁচ আর এমন যন্ত্র তৈরী হয়েছে যেগুলি থেকে বন্দুকের বিভিন্ন অংশ যদি একত্র মিশিয়ে দেওয়া হয় তা হোলেও আবার যে অংশগুলি প্রথম হাতে আসবে সেগুলি ঠিক মত জুড়ে দিয়ে একটা সম্পূর্ণ বন্দুক তৈরী করতে একটুও অসুবিধা হবে না।'

১৮১২ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ সুরু হবার ফলে হুইটনী আবার সরকারের জন্যে অস্ত্র তৈরী করতে লাগলেন। তিনি এই সময়ে ঠিকই বলেছিলেন যে তাঁর নতুন ব্যবস্থা বাস্তবিক খুব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিই তা প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর উৎপাদন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করলেন, আর তাঁদের অস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানা ব্যবহার করলেন। হুইটনীর আবিষ্কারগুলির ফল সুদূরপ্রসারী হোলো। তাঁর তৈরী 'জিন' দক্ষিণের আর্থিক অবস্থাকে রক্ষা করলো, যদিও তার জন্যে পরে বিরাট মূল্য দিতে হয়েছে। ক্রমবর্দ্ধমানভাবে দক্ষিণ আমেরিকার ভাগ্য তুলোর বার্ষিক উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল হোলো। সৌভাগ্য লক্ষ্মীর অজস্র করুণা বর্ষিত হোতে লাগলো।

তুলো থেকে বীজ আলাদা করবার যে যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, দক্ষিণাঞ্চলের তুলোর সাম্রাজ্য সৃষ্টিতে সেই যন্ত্র বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অপরপক্ষে উত্তর অঞ্চলের শিল্প যন্ত্রগুলিতে বিভিন্ন অংশ বা পার্ট অদলবদল করার জন্য হুইটনীর আবিষ্কৃত নীতি কেবলমাত্র গাদা বন্দুকের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে বড় ঘড়ি, হাতঘড়ি, সেলাইয়ের কল আর কৃষিযন্ত্রপাতির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হোতে লাগলো। ম্যাসনাডিক্সন সীমানার উত্তর আর দক্ষিণ—দুই অঞ্চলেই এই উদ্ভাবকের পরিশ্রমের ফল অনুভূত হচ্ছিল। মার্কিন শস্ত্রশক্তি ও যন্ত্র সভ্যতার অন্যতম স্রষ্টা হিসাবে আমরা পেয়েছি এলি হুইটনীকে, স্বদেশ-প্রেমের চরম অভিব্যক্তি আমরা পেয়েছি তাঁর জীবনীতে, স্বজাতির সঙ্কট দুর্য্যোগে অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করে তিনি দেশকে রক্ষা করেছেন—তাঁর আদর্শ তোমরা গ্রহণ করো, তাঁরই মত ছেলবেলা থেকে নতুন নতুন জিনিষ আবিষ্কারের দিকে ঝুঁকে পড়ো, জাতির হৃদয় মন ও দেহের পরিপূর্ণ শক্তিগঠনে তোমরা সচেষ্ট হও।—সাহায্য করো।

আমাদের দেশ—ভালো হোক আর মন্দ হোক এর প্রত্যেকটি ধূলিকণা আমার কাছে সব চেয়ে পবিত্র জিনিষ, যে এই ধূলিকণার অমর্য্যাদা করবে সে আমার সবচেয়ে বড় শত্রু'—তাকে সংহার করবার জন্যে যতরকম বুদ্ধি কৌশল ও উদ্ভাবন দরকার তার জন্যে আত্মনিয়োগ করো—এই জাতীয়তা-বোধ, এই পবিত্র স্বদেশপ্রেম ছিল মহামতি এলি হুইটনীর মধ্যে—তাই তিনি মার্কিনজাতি গঠনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে পৃথিবীতে অমর হয়েছেন।

তোমরাও এঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিজেদের শাশ্বত স্বাক্ষর রেখে জননী জন্মভূমির মুখে হাসি ফোটাবে, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে। তোমরা আমার ৺বিজয়ার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করো।
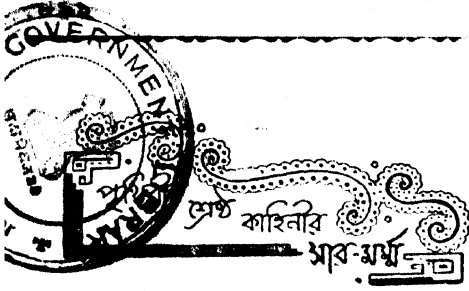
কাউণ্ট লিও টলষ্টয়
রচিত

দি লঙ্ এক্সাইল্

(The Long Exile)

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে আকৃশ্নেনকের বউ ছেলেমেয়েদের হাত ধরে ফিরে চললো ভ্লাডিমির বাড়ীতে···কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাদের পানে তাকিয়ে থেকে হতাশার নিশ্বাস ফেলে পেয়াদার সঙ্গে আক্শ্নেনকও আবার এসে সেঁধুলো তার বন্দীশালার কুঠুরীতে। মন তার পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠেছে। ··এমনই দুর্ভাগ্য তার যে নিজের বউ পর্য্যন্ত শেষে খুনী-আসামী বলে সন্দেহ করছে !

ক্ষোভে-দুঃখে আকৃশ্নেনক শেষে ভগবানকে স্মরণ করলো···একমাত্র তিনি ছাড়া দুনিয়ার আর কেউই বিশ্বাস করছে না যে আকৃশ্নেনক সত্যিই খুনের ব্যাপারে এতটুকু জড়িত নয়···বাস্তবিকই সে কোনো অপরাধ করেনি··· নিতান্তই ভাগ্যের চক্রান্তে তাকে আজ মিথ্যা-কলঙ্কের-কালি মেখে সরকারী-জেলখানায় কয়েদী হয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। বন্দীশালার নিরালা-কুঠুরীতে একা বসে এমনি সব কথা ভাবতে ভাবতে আকৃশ্নেনকের মনে ক্রমশঃ দৃঢ় বিশ্বাস জাগলো যে নিদারুণ এই বিপদের দিনে ভগবানই তার একমাত্র সহায়···শুধু তাঁর করুণা ভিক্ষা ছাড়া আক্শ্নেনকের অভাগা-জীবনের বাঁচবার আর কোনো উপায় নেই। ভগবানের করুণা লাভের বাসনা জাগার সঙ্গে সঙ্গেই আকৃশ্নেনকের ব্যাকুল মন ভরে উঠলো অপরূপ শান্তিতে···সে সিদ্ধান্ত করলো কয়েদখানা থেকে মুক্তি লাভের জন্য দেশের 'জার'-সম্রাটের দরবারে বৃথা আর আবেদন না জানিয়ে এবার থেকে শুধু ভগবানের কাছেই তার সব কিছু প্রার্থনা নিবেদন করবে।

এই সিদ্ধান্ত করার পর থেকেই বন্দী আকৃশ্নেনক যেন মন্ত্রবলে তার জীবনে এক নতুন পথের সন্ধান পেলো। জেলখানার গারদ-ঘেরা ছোট্ট নিরালা কুঠুরীতে বসে দিনরাত সে শুধু ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়—ঠাকুর, মনে আমার বল দাও···এ বিপদ সহ্য করবার মতো শক্তি দাও। এমনিভাবে যতই সে ভগবানের করুণা ভিক্ষা করে, ততই যেন কোন এক অলৌকিক-শক্তিতে তার অশান্ত-মন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে···দুঃখ-দুর্দ্দশা-অবিচারের গ্লানি তার মনকে আর আগের মতো কাতর বা বিচলিত করে তোলে না।

দিন যায়···সরকারী-আদালতের বিচক্ষণ বিচারকের বিচারে শেষে আসামী আকৃশ্নেনকের শাস্তির ব্যবস্থা হলো—নির্ম্মম কশাঘাত আর সুদূর সাইবেরিয়ার জনহীন-প্রান্তরে আজীবন সশ্রম কারাবাস !

আদালতের হুকুম মতো জেল পেয়াদার নির্ম্মম-কশাঘাতের দাপটে, আসামী আকৃশ্নেনকের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত-রক্তাক্ত হয়ে গেল। সে ক্ষত উপশম হতে না হতেই নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত অন্য কয়েদীদের সঙ্গে আকৃশ্নেনককেও পাঠিয়ে দেওয়া হলো সুদূর সাইবেরিয়া-প্রান্তরের মৃত্যু-কারায়।

সেখানে কয়েদী-অবস্থায় আকৃশ্নেনকের কেটে গেল সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছর। এ ক'বছরে জেলখানার হাড়ভাঙা-পরিশ্রম আর কঠোর-নির্ম্মম জীবনযাপনের ফলে, আক্শ্নেনকের শরীর ক্রমশঃ ভেঙে পড়লো···মাথার অমন সুন্দর একরাশ কোঁকড়া-কালো চুল সব আগাগোড়া শণের নুটীর মতো শাদা হয়ে গেল···সুশ্রী মুখ তার ভরে উঠলো পাকা-ধবধবে দাড়ী-গোঁফে আর বার্দ্ধক্যের রেখা-চিহ্নে···সুঠাম-বলিষ্ঠ দেহ ক্লান্তি-অবসাদে নিতান্ত অকালে ক্ষীণ-জরাজীর্ণ হয়ে নুয়ে পড়লো···দীর্ঘ কারাবাসের দৌলতে তার মুখের হাসি, মনের আনন্দ সবই গেল মিলিয়ে! গল্প-আড্ডা, হাসি-ঠাট্টা তো দূরের কথা···জেলখানার অন্য কয়েদীদের সঙ্গে আকৃশ্নেনককে বিশেষ কোনো

কথা কইতেও দেখা যেতো না কখনও···কাজকর্ম্মের ফাঁকে-ফাঁকে সারাক্ষণই সে শুধু ভগবানের নাম-কীর্ত্তন আর ঈশ্বর-চিন্তাতেই মশগুল হয়ে থাকতো।

শান্ত-স্বভাবের কয়েদী দেখে জেলখানার কর্ত্তারা আক্‌শ্যেনককে দিয়েছিলেন সুতো-বানানোর কাজ। জেল-দপ্তরের মারফৎ সে সব সুতো বাজারে বেচে দু'চার টাকা যা কিছু হাতে আসতো, বন্দীশালার অন্য কয়েদীদের মতো সে টাকা বাজে-খরচ না করে, তাই দিয়ে আক্‌শ্যেনক দেশের জ্ঞানী-গুণী চিন্তাশীল-ধর্ম্মাত্মা মনীষিদের লেখা ভালো-ভালো বইপত্র কিনে পড়তো। এসব বই পড়ার দিকে তার ছিল খুব ঝোঁক···জেলখানার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ-কর্ম্মের অবসরে আর ছুটি-ছাটার দিনে সুযোগ পেলেই সে একান্তে বসে সারাক্ষণই শুধু পড়াশুনো করতো! সাধু-সন্তদের জীবনী আর ধর্ম্মের বই —এই সবই ছিল তার পরম-প্রিয়···তাছাড়া প্রতি রবিবার আর পাল-পার্ব্বণের তিথিতে জেলখানার গির্জ্জায় গিয়ে সে নিষ্ঠাভরে ঈশ্বর-উপাসনাতেও যোগ দিতো, আর ধর্ম্ম-সঙ্গীত গাইতো নিয়মিতভাবে। আক্‌শ্যেনকের গানের গলাটি ছিল যেমন সুরেলা-মধুর, আচার-ব্যবহারও ছিল তেমনি শান্ত-বিনয়ী! এজন্য জেলখানার কর্ত্তা আর পেয়াদারা থেকে সুরু করে কয়েদীরা পর্য্যন্ত সবাই আক্‌শ্যেনককে রীতিমত খাতির করতো···ভালবাসতো··· আদর করে সবাই তাকে 'দাদু, বলে ডাকতো···আর বলতো—মানুষের মঙ্গলের জন্যই ভগবান তোমাকে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন!

জেলখানার কর্ত্তারা, পেয়াদারা, মায় কয়েদীদের সকলের সঙ্গেই আক্‌শ্যেনকের ছিল নিবিড় ভালবাসা-সদ্ভাব···দরকার পড়লেই যে কোনো কয়েদীর চিঠিপত্র লিখে দেওয়া, কারো কোনো অসুবিধা ঘটলে জেলের কর্ত্তাদের কাছে আবেদন জানানো, ঝগড়া-বিবাদ বাধলে তার মীমাংসা করে দেওয়া, কেউ কোনো বিপদে পড়লে তাকে সৎ-পরামর্শ দেওয়া—এমনি সব ব্যাপারেই আক্‌-শ্যেনক ছিল জেলখানার সকলের সহায়···সকলের বন্ধু।

সুদূর সাইবেরিয়া-প্রান্তরের জেলখানায় আক্‌শ্যেনকের দিন এইভাবেই কাটে···মনে তার দারুণ দুশ্চিন্তা··· নির্ব্বাসনে আসার পর থেকেই বাড়ীর বৌ-ছেলেমেয়ের কারো কোন খোঁজখবর বা চিঠিপত্র পায়নি সে এ ক'বৎ-সর। তারা সবাই কেমন আছে···কিভাবে দুঃখ-দুর্দ্দশায় দিন কাটাচ্ছে · প্রত্যেকে এখনও প্রাণে বেঁচে রয়েছে কিনা ···তার কোনো হদিশই জানবার উপায় নেই! কাজেই ভাবনায় উদ্বেগে আক্‌শ্যেনকের মন ভারী হয়ে থাকে সারা-ক্ষণ···অথচ এ উদ্বেগ যে কাটিয়ে উঠতে পারে এমন কোনো উপায়ও খুঁজে পায় না সে কোনোমতেই। শুধু উদ্বেগ-দুশ্চিন্তার ভারী বোঝা বুকে বহেই এমনিভাবে তার দিনের পর দিন কেটে যায়।

একঘেয়ে এই জীবনযাত্রার মাঝে হঠাৎ একদিন জেলখানায় এসে হাজির হলো—রাজ্যের নানান্ জায়গা থেকে জড়ো-করা সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত নতুন একদল কয়েদী। নতুন এই দলের মধ্যে ছিল বছর ষাটেক বয়সের এক বলিষ্ঠ-বিশাল ষণ্ডামার্ক-চেহারার কয়েদী···মুখ তার একরাশ কাঁচা পাকা দাড়ী-গোঁফের জঙ্গলে ভরা···লোকটির চাল-চলনও অদ্ভুত—দেখলেই কেমন যেন একটা সন্দেহ জাগে!

সারাদিন হাড়-ভাঙা খাটুনীর পর, সেদিন সন্ধ্যার সময় খাওয়াদাওয়ার পালা চুকিয়ে জেলখানার কুঠরীতে ফিরে সদ্য-আগন্তুক নতুন কয়েদীদের সঙ্গে পুরোনো কয়েদীদের আলাপ-পরিচয়ের মজলিশ সুরু হলো। আক্‌শ্যেনকের নজর পড়লো নতুন কয়েদীদের দলের সেই অদ্ভুত-চরিত্র ষাট-বছরের লোকটির পানে···বোধহয় তার বিচিত্র ধরণ-ধারণ আর কথাবার্ত্তা লক্ষ্য করেই! নতুন আর পুরোনো দলের কয়েদীরা পরস্পরের নাম-ধাম-পরিচয় জানবার পর, কে কোন অপরাধে সাজা পেয়ে কতদিনের মেয়াদে এই জেলখানায় দুর্ভোগ ভুগতে এসেছে—এ খবর জিজ্ঞাসা করতেই অদ্ভুত-ধরণের নবাগত সেই ষাট-বছরের কয়েদীটি বললে,—খাঁটি কথা বলছি ভাই—আমাকে এরা মিথ্যা সাজা দিয়ে এখানে এনে গারদে পুরে রেখেছে··· আসলে কোনো অপরাধ করিনি! ঝুটমুট হায়রাণ করছে এরা আমাকে—পথের একটা ফোক্‌রে-ঘোড়া চুরির ব্যাপারে ফাঁশিয়ে! ব্যাপারটা আগাগোড়া খুলে বললেই তোমরা স্পষ্ট বুঝতে পারবে যে আমাকে সাজা দেওয়াটা সরকারের উচিত কাজ হয়েছে কিনা!···

আগন্তুক-কয়েদীর অদ্ভুত-কথাবার্ত্তা শুনে জেলখানার

পুরোনো কয়েদীরা তো অবাক! তাদের মুখের পানে তাকিয়ে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করেই ষাট-বছর বয়সের সেই নতুন কয়েদী সোৎসাহে বলে চললো—শোনো তাহলে, আসল কথাটা! আমার নাম হলো—মিকার…আর আমার বাবার নাম ছিল—সিমিয়ন…ভ্লাডিমির শহরে আমাদের বাড়ী!

ভ্লাডিমির শহরের নাম শুনেই কৌতূহলী-দৃষ্টিতে আগন্তুক-কয়েদী মিকারের পানে তাকিয়ে আক্শ্যেনক প্রশ্ন করলেন,—ভ্লাডিমির শহরের লোক আপনি!… সেখানকার সদাগরদের কারো সঙ্গে পরিচয় আছে?… আক্শ্যেনক সদাগরের নাম শুনেছেন?…তাকে চেনেন আপনি?

মিকার বললে,—বিলক্ষণ! আক্শ্যেনক তো আমাদের শহরের মস্ত নামজাদা সদাগর! তবে বেচারার বরাতটা নিতান্তই খারাপ! ক'বছর আগে বাড়ী ছেড়ে নীজ্-নিহির শহরের মেলাতে সওদা বেচতে বেরিয়ে পথের ধারে কোন এক গাঁয়ের সরাইখানায় তার এক বন্ধুকে খুন করে টাকা-কড়ি ছিনিয়ে পম্পট দিচ্ছিল· তবে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে!…পুলিশ ওদিকে সন্ধান পেয়েই তাকে হাতে-নাতে গ্রেপ্তার করে আদালতে চালান দিয়েছে!…শুনেছি—আদালতের বিচারে খুনী-আসামী হিসাবে সে নাকি এখন এই সাইবেরিয়া-অঞ্চলেরই কোন জেলখানায় কয়েদী হয়ে আমাদেরই মতো লম্বা-মেয়াদের নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করছে!…তা, বাছাধনকে দুর্ভোগ ভুগতে হবেই তো… যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল! (ক্রমশঃ)
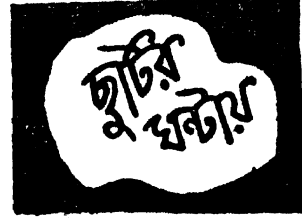
চিত্রগুপ্ত

এ বছর দেওয়ালী আর কালী-পূজোর রাত্তিরে মনের আনন্দে মজার মজার আতস বাজি পুড়িয়েছো নিশ্চয় তোমরা প্রায় সকলেই…তুবড়ি, হাউই, চরকী, পট্কা, রংমশাল, ফুলঝুরি…এমনি আরো কত কি! সে আনন্দের রেশ এখনও হয়তো জেগে রয়েছে তোমাদের অনেকেরই মনে…কেউ কেউ হয়তো এখন থেকেই মতলব আঁটছো যে আসচে-বছর দেওয়ালী আর কালী-পূজোর রাত্তিরে আরো কত কি নতুন-নতুন ধরণের আতস বাজি তৈরী করবে, আর সে সব বাজি পুড়িয়ে মজা লুটবে। আজ তাই তোমাদের বিচিত্র-মজার আর নতুন-ধরণের একটা বাজি-তৈরীর কথা বলছি। এটি হলো—খুব সহজেই জোগাড় করা যায় এমন কয়েকটি রাসায়নিক-পদার্থের সাহায্যে তৈরী বিশেষ এক-ধরণের 'সাপ-বাজি'…একালের রসায়ন-শাস্ত্রবিশারদেরা এ বাজির নাম দিয়েছেন—'The Pharaoh's serpent' অর্থাৎ, 'ফারাওয়ের (প্রাচীন মিশর-রাজ্যের পুরোহিত-রাজের) সাপ'। এই ধরণের 'সাপ-বাজি' তৈরী করার উপায় খুবই সহজ-সরল…শহরের যে কোনো বড় ওষুধের দোকান থেকে গোটা কয়েক রাসায়নিক-উপকরণ জোগাড় করে আনতে পারলেই, বাড়ীতে বসে নিজের হাতেই তোমরা অনায়াসে এই মজার 'সাপ বাজি' বা The pharaoh.s serpent' বানাতে পারবে।

এ বাজি তৈরী করতে হলে, যে সব উপকরণ দরকার, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ জানিয়ে রাখি তোমাদের। বিচিত্র-মজার এই 'সাপ-বাজি' বানানোর জন্য চাই—$\frac{1}{2}$ আউন্স চিনি, $\frac{1}{2}$ আউন্স পোটাসিয়াম্

নাইট্রেট্ (Potassium Nitrate), ½ আউন্স পোটাসিয়াম্ বাইক্রোম্যাট্, (Potassium Bichromate), গোটাকয়েক সিগারেটের প্যাকেট মোড়বার পাত্‌লা রাংতা কাগজ, এক ফালি 'টোয়াইন' সুতো (Twine Chord), একখানি কাঁচি বা ছুরি, একবাক্স দেশলাই আর একখানা পাত্‌লা কার্ডবোর্ড।

উপরের ফর্দ্দমতো প্রত্যেকটি উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, প্রথমেই পরিষ্কার একটি হামানদিস্তা অথবা শিল-নোড়ার সাহায্যে চিনির দানা, পোটাসিয়াম্ নাইট্রেট্ আর পোটাসিয়াম্ বাইক্রোমেট্··· প্রত্যেকটি উপাদানকেই আলাদা-আলাদা পিষে আগাগোড়া বেশ মিহি-ছাঁদে গুঁড়িয়ে নাও···তবে নজর রেখো—এগুলির কোনোটির কোথাও যেন এতটুকু মোটা-দানা বা ডেলা না থাকে। এ কাজ সারা হলে, পরিষ্কার একটি পাত্রে মিহি-ছাঁদে-গুঁড়োনো এই উপকরণ তিনটিকে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে একত্রে মিশিয়ে নাও। এবারে এই 'মিশ্রণটিকে' (Mixture) পরিপাটিভাবে আগাগোড়া রাংতা-কাগজ জড়িয়ে সযত্নে মুড়ে রাখো। তারপর
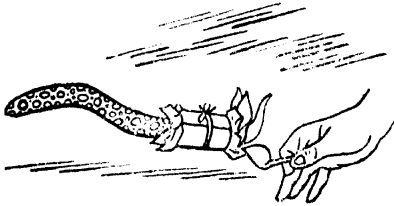
উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, অবিকল তেমনি-ছাঁদে পাত্‌লা কার্ডবোর্ডের টুকরোটিকে 'ফাঁপা নল' (Hollow Tube) বা 'চোঙের' মতো গোল করে পাকিয়ে নিয়ে, তার মধ্যে রাংতা-কাগজে মোড়া ঐ 'মিশ্রণের 'ঠোঙা' বা 'প্যাকেটটি, (Packet) ভরে দাও। এবারে উপরের ছবির ভঙ্গীতে রাংতা-কাগজের ঠোঙা-ভর্ত্তি গোল-ছাঁদে-পাকানো পাত্‌লা-কার্ডবোর্ডের ঐ 'চোঙা' বা 'ফাঁপা-নলটিকে' সুতো জড়িয়ে বেশ মজবুতভাবে বেঁধে রাখো। তাহলেই বাজি-তৈরীর কাজ চুকবে।

এবারে এই বাজিটি পোড়ানোর পালা এবং সে পালা জমিয়ে তুলতে হলে—সাবধানে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে, উপরের ছবির ভঙ্গীতে, বাজির একপ্রান্তে আগুন ধরিয়ে দাও! এভাবে বাজির প্রান্তে আগুন ধরানোর সঙ্গে সঙ্গেই দেখবে—বাজির অপর-প্রান্তের কার্ডবোর্ডের 'চোঙা' বা 'নলের' মুখের ভিতর থেকে শোঁ-শোঁ করে দিব্যি হেলে-দুলে ক্রমশঃ বাইরে বেরিয়ে আসছে আজব-ছাঁদের ইয়া-লম্বা বিচিত্র-মজার এক 'রাসায়নিক-সাপ'। এ দৃশ্য দেখে তোমাদের বন্ধুবান্ধব আর বাড়ীর লোকজন সবাই শুধু যে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবেন তাই নয়···তোমাদের হাতের কারসাজিরও রীতিমত তারিফ করবেন।

এই হলো—নতুন-ধরণের 'সাপ-বাজি' বা 'The pharaoh's serpent' বানানোর আসল রহস্য।

পরের সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি মজার খেলার হদিশ দেবার ইচ্ছা রইলো।

—

মনোহর মৈত্র

১। জমির হেঁয়ালি ঃ
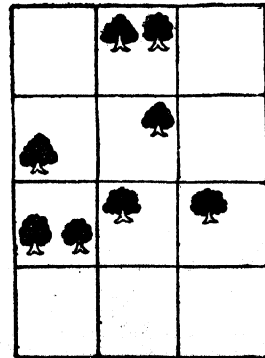
রতনপুর গ্রামের জমিদার-মশাইয়ের ছিল বিরাট একটি বাগান। সে বাগানে ছিল এলোমেলোভাবে সাজানো আটটি আমগাছ। বুড়ো বয়সে জমিদার-মশাইয়ের ভাবনা

হলো—তিনি মারা গেলে, এই বাগান আর আমগাছগুলির মালিকানা-স্বত্ব নিয়ে যদি তাঁর চার ছেলের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বাধে। তাই তিনি বেঁচে থাকতে থাকতেই বিরাট বাগানটিকে সমান-মাপের বারোটি অংশে ভাগ করে ফেললেন—তাঁর চার ছেলেদের মধ্যে সমানভাবে বাঁটোয়ারার উদ্দেশ্যে।—উপরের নক্সাটি দেখলেই তোমরা জমিদার-মশাইয়ের সমান-ছাঁদে বাগান-জমি বাঁটোয়ারা করার হিসাব পাবে। তবে মুস্কিল বাধলো তাঁর চার ছেলের মধ্যে বাগানের বিভিন্ন অংশে এলোমেলোভাবে দাঁড়ানো ঐ আটটি আমগাছ ভাগ করে দেবার সময়! জমিদার-মশাই কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তি···মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে এমন নিপুণভাবে তিনি বাগানের ঐ বারো টুকরো জমি আর আটটি আমগাছ তাঁর চার ছেলেকে সমান-হিসাবে ভাগ করে দিলেন যে গ্রামের সবাই তাঁকে ধন্য-ধন্য করতে লাগলো।···বলো তো দেখি, রতনপুরের সেই বিচক্ষণ জমিদার-মশাই কি উপায়ে এই বারো টুকরো জমি আর আমগাছ আটটিকে নিখুঁত হিসাবে তাঁর চার ছেলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন ?

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

২। তিন অক্ষরে নাম তার—মিলন ঘটায়।
শেষাক্ষর ছেড়ে দিলে লাগে তা পূজায়।
ছাড়িলে প্রথমাক্ষর—মিষ্টি কভু নয়··
বলো দেখি, চিন্তা করে—কেবা সেই হয়!

রচনা ঃ কান্তিপদ ঘোষ (রাজনগর)
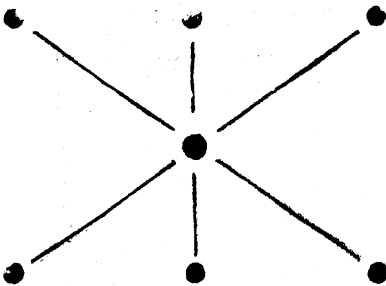
৩। উপরের নক্সায় দেখানো ঐ সাতটি ফুটকিতে ১ হইতে -এর মধ্যে সংখ্যাগুলির এক-একটিকে এমনভাবে সাজাইয়া বসাও যে কোণাকুনি বা আড়াআড়ি কিম্বা সোজাসুজি যেভাবেই হউক পর-পর তিনটি ফুটকিতে বসানো তিনটি সংখ্যা একত্রে যোগ করিলে, যোগফল যেন দাঁড়ায়—১২।

রচনা ঃ চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর)।

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ

১। বৃত্তাকার 'ঘরের' প্রবাদ-বাক্য :—
"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম !"
অর্দ্ধ-বৃত্তাকার 'ঘরের' প্রবাদ-বাক্য :—
"যত হাসি, তত কান্না !"
ত্রিকোণাকার 'ঘরের' প্রবাদ-বাক্য :—
"উঠন্ত মুলো পত্তনেই জানা যায় !"
ছোট চতুষ্কোণ 'ঘরের' প্রবাদ-বাক্য :—
"বেণাবনে মুক্তা ছড়ানো !"
বড়-চতুষ্কোণ 'ঘরের' প্রবাদ-বাক্য :—
"ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে !"

২। ময়মনসিংহ

৩। দশরথ

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

কুলু মিত্র (কলিকাতা), রিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই), সত্যেন, মুরারী, সঞ্জয় ও সুনীল (ভিলাই), দেবীশঙ্কর ও বাণীশঙ্কর পাণ্ডা (মেদিনীপুর), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), পিন্টু হালদার (বালী), পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), কবিও লাড্ডু হালদার (কোরবা), পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), প্রতীপ, গৌরী, প্রণয় ও বামা মজুদার (কুচবিহার), ভুতো সিংহ, গোকুল ও রেবা ঘোষ (নাগপুর), ধর্ম্মদাস রায়, গৌরাঙ্গ, ভদ্রেশ্বর, শ্যামদা, রাধাশ্যাম, প্রভাত ও মাগারাম (বিদ্যাধরপুর), সুমিতা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)।

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

গৌতম বসু (কলিকাতা), বাপি, বুতাম ও পিন্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), শর্ম্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), বুবু ও মিঠু গুপ্তা (কলিকাতা), দেবকী ও বিশ্বনাথ সিংহ (গয়া), রাণা ও বুনা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), ইন্দুমতী মিত্র (হুগলী), প্রতাপচন্দ্র জানা (মেদিনীপুর)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে

কল্যাণী, শ্যামলী, দিলীপ ও জয়দীপ ঘোষ (কলিকাতা), পুলিন সিংহ ও গোলাম রববানী (ওকড়াবাড়ী বন্দর), রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য, অপূর্ব্ব দে সরকার ও অমলেন্দু নাগ (তৈতুলিয়া)।

ঘুড়ির কথা

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্মা

শ্রমিক-বিজ্ঞান

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রমিক নিয়োগ

অধুনাকালে শ্রমিক নিয়োগ পদ্ধতি একটী বৈজ্ঞানিক রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। কোনও এক কর্ম্মী একটি কর্ম্মে দক্ষতা না দেখাতে পারলেও সে অপর কর্ম্মে ধারণাতীত-রূপে দক্ষতা দেখিতে থাকে। করণিকরূপে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ব্যর্থতায় পর্য্যবেশিত, সেই ব্যক্তির পক্ষে একজন দক্ষ যন্ত্রশিল্পী [মেকানিক] রূপে খ্যাতি অর্জ্জন করা অসম্ভব নয়। একজন বিক্রয়-বিদ্ (Salesman) বা প্রচার-বিদ তাদের স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যর্থতা প্রকাশ করলেও তাদের পক্ষে একজন দক্ষ কৃষি-বিদ্ হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে এই সকল অসফল ব্যক্তি নিজ নিজ পছন্দমত নিজেদের জন্য কর্ম্মক্ষেত্র বেছে নেবার সুযোগ পায় নি। বহু ক্ষেত্রে এরা কোন কর্ম্মে উপযুক্ত হতে পারে তা অভিজ্ঞতার অভাবে নিজেরাও বুঝে উঠতে পারেনি। অথচ এই কর্ম্ম নির্ব্বাচনে তাদের অভিভাবকদের মত তারা নিজেরাও মাথা ঘামাবার প্রয়োজন মনে করে নি। এইরূপ অঘটনের মনস্তাত্বিক ফলাফলও সমাজের পক্ষেও অতীব বিপজ্জনক হয়ে উঠে। কোনও এক কর্ম্মে অসাফল্যজনিত বরখাস্ত হলে কর্ম্মী বিশেষের অবচেতন মনে একটি অসহায়বোধাত্মক মনোজট (কমপ্লেক্স) সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় এরা সূক্ষ্মবৃত্তি চালিত হওয়ায় এদের স্থূল বৃত্তি পরিচালিত কাযকর্ম্মে নিজেদের নিয়োগ করতে চেয়েছে। এইভাবে অকারণে একদল অলস ও অপরাধী সৃষ্ট হওয়ায় সমাজের অশেষ অমঙ্গল সাধন হয়ে থাকে। এমন কি একজন ক্ষুরধারবুদ্ধি বালকও এইরূপ বিপাকে পড়ে সমাজের উপকার না করে অপকারে প্রবৃত্ত হবে। সমগ্র সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় বাদ দিলেও এইরূপ অসম শ্রমিকনির্বাচনে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহেরও ক্ষতির পরিমাণ অসামান্য হয়ে থাকে। 'আচ্ছা! তুমি কল্য হতে কর্ম্মে যোগ দিও'—একজন আপতঃদৃষ্টিতে স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিমান কর্ম্মপ্রার্থীকে মনোনীত করে সরাসরি আদেশ প্রদান বাতুলতা মাত্র। এই বিষয়ে আমার গবেষণা-লব্ধ ফলাফল নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম। কিরূপ পদ্ধতিতে এই মতবাদের সত্যাসত্য বুঝা যায় তা নিম্নে উদ্ধৃত আমার স্বকীয় প্রতিবেদন হতে বুঝা যাবে।

"শ্রমিক বা কর্ম্মীদের পারস্পরিক দক্ষতা নির্দ্ধারণ করতে হলে নিয়োগের পর মুহূর্ত্তে তাদের শ্রম দক্ষতা সম্পর্কে বিবেচনা করলে চলবে না। কিছুকাল তাদের নিজ নিজ কর্ম্মে কর্ম্মরত রেখে অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে দিতে হবে। এর পর অভ্যাসগতভাবে সমঅভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের কর্ম্ম দক্ষতাজনিত কর্ম্মের পরিমাপ করলে দেখা যাবে যে এদের কর্ম্মফলের মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ। একইরূপ সুযোগ সুবিধা এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তি সম্পন্ন দুই ব্যক্তি পাশাপাশি একই প্রকার কায করলেও দেখা যায় যে এদের একজনের কর্ম্মফল অপরজনের কর্ম্মফল অপেক্ষা পঞ্চাশভাগ অধিক হয়ে থাকে। এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে একই পরিবেশে এই উভয় ব্যক্তির কর্ম্মফলের মধ্যে শতকরা নব্বই বা পঁচানব্বই ভাগ প্রভেদ হতেও দেখা গিয়েছে। কিন্তু আমি এদের সম্পর্কে সবিশেষ অনুসন্ধান করে জেনেছি যে এরা আপন কর্ম্মে সমভাবে কর্ম্মদক্ষ ও অত্যুৎসাহী হলেও দৈহিকশক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি যেন এদের মধ্যে সমভাবে বর্ত্তায় নি। অবশ্য এদের কয়েকজনের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা সমরূপে দেখা গেলেও এদের বুদ্ধি প্রকাশনী শক্তি বিভিন্ন প্রকারের

দেখা গিয়েছিল। এক এক ব্যক্তি এক এক দিকে যে তাদের মাথা খেলাতে পারে তা একটি পরীক্ষিত সত্য। সকল কাষ সকলে একভাবে কোনও দিনই সমাধা করতে সক্ষম হয়নি। এমন বহু শ্রমিক আছে যারা তাদের দৈহিক শক্তি প্রবণগতভাবে প্রতিটি কাযে সমভাবে প্রয়োগ করতে অক্ষম হয়েছে। এর কারণ মানুষের আশৈশব অভ্যাস এবং পছন্দাপছন্দ তাদের মনের ন্যায় দেহকেও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।"

উপরোক্ত প্রকীয় প্রতিবেদন হতে বুঝা যাবে যে উপযুক্ত কাযে উপযুক্ত শ্রমিক নির্ব্বাচনের উপর শ্রমিকদের নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং মালিকদের শ্রমশিল্পের উৎকর্ষতা বহুগুণে নির্ভর করে থাকে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে এদেশে কলকারখানা সমূহে বৈজ্ঞানিক পন্থায় শ্রমিক নিয়োগ কম ক্ষেত্রেই করা হয়ে থাকে, এমন কি আত্মীয় ও বন্ধু বাৎসল্য এবং ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের সুপারিশও এদেশে অক্ষম শ্রমিক নিয়োগের কারণ হয়। তবে অধিক ক্ষেত্রে নির্বিচার ভাবে অবৈজ্ঞানিক পন্থায় সমবেত কর্ম্মপ্রার্থীদের মধ্য হতে এই সকল শ্রমিক নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

এইবার আমি এই অসম-নিয়োগপদ্ধতির কুফল সম্বন্ধে আলোচনা করবো। যেরূপ নিয়োগে কর্ম্মী ও কর্ম্মের মধ্যে অসমাঞ্জস্য [দৈহিক ও মানসিক] থাকে তাহাকে অসম-নিয়োগ বলা হয়ে থাকে। এই অসম কর্ম্মী নিয়োগের কারণে একদিকে উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকর্ষতার মান ও সংখ্যা কমে যায় এবং অপরদিকে উহা অযথা শ্রমিক-নিষ্ক্রামণের হার বৃদ্ধি ক'রে একাধারে শ্রমিক ও মালিকের ক্ষতিসাধন করে। এক্ষণে শ্রমিক প্রবেশ এবং শ্রমিক নিষ্ক্রামণ সম্পর্কে একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। মালিকগণ অসম নিয়োগে নিজেরা দায়ী হলেও শ্রমিকদের নিকট হতে তারা প্রচুর উৎকৃষ্ট কর্ম্মের দাবী করে থাকেন। অধিক উৎকৃষ্ট দ্রব্যের উৎপাদনের আশায় এরা একদিক থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যার অপেক্ষা অধিক [উর্দ্ধসংখ্যক] শ্রমিক নিয়োগে বাধ্য হন এবং অপর দিক থেকে এঁরা অকর্ম্মণ্য শ্রমিকদের খুঁজে বার করতে পারলে তাদের বরখাস্ত করে থাকেন। অনুসন্ধান দ্বারা দেখা গিয়েছে যে এই অকারণ শ্রমিক প্রবেশ এবং নিষ্ক্রামণ যে কোনও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সবিশেষ ক্ষতিকর।

এই শ্রমিক নিষ্ক্রামণ এবং শ্রমিক প্রবেশ কিরূপে শ্রমশিল্পসমূহের ক্ষতির কারণ হয় সেই সম্বন্ধে এইবার আমি আলোচনা করবো। বারে বারে শ্রমিক প্রবেশ ও নিষ্ক্রামণের কারণে নূতন শ্রমিকদের শিক্ষিত ও অভ্যস্ত করে তুলতে যথেষ্ট সময়ের অপচয় হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে স্বভাবতঃ উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকর্ষতার মান এবং সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে, উপরন্তু নূতন নূতন কর্ম্মী নিয়োগের ফলে দৈব দুর্ঘটনার সংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটে থাকে। এই দৈব দুর্ঘটনার কারণে মেসিন পত্রের ক্ষতির জন্য যেমন দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যাহত হয়, তেমনি শ্রমিকদের দৈহিক ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ করার জন্যেও মালিকদের লাভের অঙ্কে ঘাটতি পড়ে। উপরন্তু নিয়োগ বিভাগের কর্ম-কর্ত্তা এবং করণিকদের শ্রমিক নিয়োগ এবং উহাদের বরখাস্ত করার জন্যে কম সময়, মেধা ও কাগজপত্র অপচয় করতে হয়নি। এতদ্ব্যতীত বড় মিস্ত্রী বা ফোরম্যানদের নূতন শ্রমিকদের শিক্ষাদীক্ষা ও কর্ম্মে অভ্যস্ত করার জন্যে বহু অযথা শ্রমক্ষণ ও অর্থ অপচয় করতে হয়েছে। এইভাবে বারে বারে শ্রমিক বরখাস্ত করতে বাধ্য হওয়ায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। এইভাবে দেখা যায় যে শ্রমিক নিষ্ক্রামণের অত্যধিক হার একাধারে সামাজিক এবং অর্থ-নৈতিক ক্ষতির কারণ ঘটিয়ে দেশের প্রভূত ক্ষতি করেছে। প্রথমে কিরূপ উপায়ে এই শ্রমিক নিষ্ক্রামণের হার নির্দ্ধারণ করে উহার সহিত তুলনামূলক ভাবে উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রীর সংখ্যার তুলনা করে গবেষণা করা সম্ভব সেই সম্বন্ধে জানা দরকার। এই শ্রমিক নিষ্ক্রামণের হার নির্দ্ধারণের রীতি-নীতি সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা যাক।

কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটী শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কতো জন শ্রমিক প্রবেশ করলো এবং ঐ একই সময়ের মধ্যে কতোজন শ্রমিককে বরখাস্ত করা হলো বা কতো জন নিজেরাই এখানকার কর্ম্মে ইস্তফা দিল—তাদের সংখ্যার অনুপাত নির্দ্ধারণ করে এই শ্রমিক নিষ্ক্রামণের হার জ্ঞাত হওয়া সম্ভব। অবশ্য প্রতি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যার উর্দ্ধে বাড়তি শ্রমিকের নিয়োগ এই তালিকা হতে বাদ দিতে হবে। সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে

যে বৎসরে এক হাজার শ্রমিক নিয়োগ করলে ঐ সময়ের মধ্যে ত্রিশ জন শ্রমিক স্ব স্ব কর্ম্ম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে থাকে। এই অবস্থায় এই বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-নিষ্ক্রামণের হার শতকরা ত্রিশ ভাগ রূপে উল্লিখিত হবে। এখন যদি দেখা যায় যে এই শিল্প প্রতিষ্ঠান বৎসরে ১,১০০ জন্য শ্রমিক নিয়োগ করে ১১০ জন্য শ্রমিক বরখাস্ত করে থাকে, তাহলে উহা শ্রমিক নিষ্ক্রামণের হার শতকরা ১১০ভাগ রূপে নিৰ্দ্ধারিত হবে। এইরূপে শ্রমিক নিষ্ক্রামণের শতকরা হার বার করে যদি উহার সহিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যের উৎপাদন হারের তুলনা করা যায় তা হলে দেখা যাবে যে শ্রমিক নিষ্ক্রামণের হারের বৃদ্ধি সহিত সমান তালে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎকৃষ্ট দ্রব্যের উৎপাদনের হারও আনুক্রমিক ভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে চলেছে।

বলাবাহুল্য যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক গঠনের অধিকারী শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত কর্ম্ম বা শ্রম নিৰ্দ্ধারণে অসফলতা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহে বহু শ্রম ও মেধা বৃথা অপচয় হয়ে থাকে। ঠিক ব্যক্তিকে ঠিক কাযে নিয়োগ না করায় উৎকৃষ্ট দ্রব্যের উৎপাদনের হ্রাস ঘটে থাকে। এই জন্য প্রতিষ্ঠান সমূহে নিয়োগ-বিভাগের কর্ত্তাদের শ্রম মনো-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের এই বিষয়ে সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। আবিষ্কৃত বহু প্রকার মনস্তাত্বিক পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা কোন্ কাযে কোন্ শ্রমিক উপযুক্ত হবে তা বলে দেওয়া যায়। এইরূপে শ্রমিক নিয়োগ করলে শ্রমিকের মাথা পিছু প্রয়োজনীয় খরচ খরচা কমে যাবে এবং আনুপাতিক হারে উহাদের বেতন ও মালিকের লাভের অঙ্ক বেড়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে একদিকে বারে বারে বরখাস্ত শ্রমিকের বদলে নিযুক্ত নূতন শ্রমিকদের শিক্ষার ব্যয় এবং তাদের সৃষ্ট অনুৎকৃষ্ট দ্রব্য সৃষ্টি জনিত লোকসান থাকে না এবং অপর দিকে উপযুক্ত কর্ম্মীদের দ্বারা উৎপাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রীর সংখ্যা দ্রুত গতিতে প্রকৃত সংখ্যায় নির্ম্মিত হওয়ায় মালিকদের লাভের অঙ্ক বেড়ে যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে মালিকগণ এই সকল দক্ষ শ্রমিকদের আরও অধিক বেতন প্রদানে তাদের কর্ম্মে অধিকতর উৎসাহী করে তুলতে পারেন। অনুপযুক্ত লোককে কোনও এক কাযে নিযুক্ত করলে সে ঐ কাজ ভালোরূপে করে না এবং তাড়াতাড়ি ঐ কায হতে নিজেকে বিরত করে। এই উভয় ক্ষেত্রে দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনে অধিক অর্থের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

শ্রমিক নিয়োগ কালে শ্রমিক প্রতি ব্যয়িত এই প্রারম্ভিক মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহে কদাচিত করা হয়েছে। এই প্রারম্ভিক মূল্যায়ন পরিভাষাটি সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। ইহাকে সম অর্থে শ্রমিকদের মূল্যায়নও বলা যেতে পারে। নূতন শ্রমিক নিয়োগে তাদের কর্ম্মে অভ্যস্ত ও শিক্ষিত করে তুলতে বহু অর্থ ও সময় ব্যয় হয়ে থাকে। এই জন্য শ্রমিক-শিক্ষকদেরও সময় অপচয়ের সহিত তাদের এই কাযে নিয়োগের জন্য ব্যয়িত অর্থও ধরা হবে। উপরন্তু এই নূতন শ্রমিক উৎপাদিত অনুৎকৃষ্ট দ্রব্য,মন্থর গতিতে দ্রব্যোৎপাদন এবং কাচামালের অপব্যয়জনিত লোকসানও আছে। এই ত্রিবিধ লোকসানের জন্য অপব্যয়িত অর্থের মাথা পিছু পরিমাণকে বলা হয়ে থাকে শ্রমিক নিয়োগ কলের মূল্যায়ন বা প্রারম্ভিক মূল্যায়ন। ইতি পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে নূতন শ্রমিকদের মাথাপিছু মূল্যায়ন সম্বন্ধে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোনও ধারণা নেই। অথচ এই বাবদে বাৎসরিক বহু অর্থ তাদের লোকসান হয়ে থাকে।

এইবার বুঝা যাবে যে শ্রমিক আগমন (ভর্তি) এবং শ্রমিক-নিষ্ক্রামণের বাৎসরিক হার প্রতিটি কল ফ্যাক্টরীতে অনুধাবন করার কতো বেশী প্রয়োজন। পূর্ব্বাহ্নে এই বিষয়ে সাবধান হলে বহু অর্থ ও সময় অযথা অপব্যয় হতে পারে না।

আমার নিজস্ব ফিতা কলের প্রথম দিকে শতকরা ১০০ ভাগ নিষ্ক্রামণের হার ছিল। এর ফলে আমি দেখতে পাই যে প্রতিটি নিষ্ক্রামণের কারণে প্রারম্ভিক মুল্যায়মান বাবদ বিশটি করে টাকা নূতন শ্রমিকদের মাথা পিছু লোকসান হয়েছে। এই হিসাবে বাৎসরিক হারের হিসাবে দেখা যায় লোকসানের উপরই এই প্রতিষ্ঠানটি এতোদিন চালানো হয়েছে। আমি এই সম্বন্ধে অবহিত হওয়া মাত্র এই কুটির শিল্পে শ্রমিক নির্ব্বাচনে সতর্ক হই। প্রথমত আমি দেখি যে নির্বাচিত শ্রমিক কোনও এক ঠেকা বা ঠিকা শ্রমিকের পর্য্যায়ে পড়ে কি না। যে সকল

শ্রমিক অন্যত্র ভালো কর্ম্ম সংগ্রহের অপেক্ষায় কোনও এক স্থানে কিছুকাল ঠেকা দিয়ে কাল কাটাইতে চায় তাদের বলা হয় ঠেকা বা ঠেকানদারী শ্রমিক। এই ঠেকায় পড়া শ্রমিক ও ঠিকায় আনা শ্রমিক—এই উভয় প্রকার শ্রমিকই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব ও মঙ্গলের জন্য পরিহার করা উচিৎ। এর পর আমি তাদের পারিবারিক প্রয়োজন, উচ্চাভিলাষ শিক্ষা দীক্ষা বাসস্থান পছন্দাপছন্দ এবং মনের ও দেহের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হতে চেষ্টা করি। অবশ্য ক্ষুদ্র শিল্পসমূহে সামান্য চেষ্টাতে উপযুক্ত শ্রমিক নির্ব্বাচন সম্ভব। এইভাবে শ্রমিক নিয়োগ করে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে আমি লোকসানের হার কমিয়ে এনে প্রায় তা বন্ধ করে দিতে পেরেছিলাম।

এই হিসাবে অবশ্য ট্রেণীং ও গবেষণার জন্য আনীত অলস ও অসৎ ব্যক্তিদের ধরা হয় নি। এদের সঙ্গ ও শিক্ষা দেবার জন্য আনীত কর্ম্মীদের বিষয়ই এতে বলা হয়েছে।

ক্ষুদ্র বা বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে তিনটি পৃথক পৃথক নির্ব্বাচন ক্ষেত্র আছে, যথা কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এবং শ্রমিক। এই কাঁচামাল নির্ব্বাচনে কোনও অসুবিধা নেই। পাট সুতা লৌহ পিত্তল ইত্যাদি প্রতিটি কাঁচা মাল শিল্প 'প্রতিষ্ঠান সমূহে রক্ষিত বীক্ষণাগারে কঠোর রূপে পরীক্ষা করা হতে থাকে। এমন কি উহাদের যথোচিত মূল্যও বিভিন্ন বাজারে অনুসন্ধান করে নির্দ্ধারিত হয়েছে। অপরদিকে যন্ত্রপাতিসমূহ পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতাশীল যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণে দক্ষ প্রতিষ্ঠান সমূহে খোঁজখবর ক'রে অভিজ্ঞ যন্ত্রবিদ্‌গণ দ্বারা নির্ব্বাচিত করার রীতি আছে। কিন্তু উপরোক্ত দুইটি ক্ষেত্রে এবংবিধ সুব্যবস্থা থাকলেও শিল্পপ্রতিষ্টান সমূহের প্রাণ স্বরূপ সজীব শ্রমিকদের নির্ব্বাচনের ভার সাধারণতঃ প্রায় অনভিজ্ঞ নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের উপর অর্পিত থাকে।

এই শ্রমিক সুনির্ব্বাচন ক্ষেত্রে এই অবহেলার প্রথম কারণ এই যে, প্রতিটি শ্রমিক দৈহিক ও মানসিক কারণে যে প্রতিটি কর্ম্মে উপযুক্ত হতে পারে না, তা বহু মালিক ম্যানেজার ও ডিরেকটারের কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত ধারণার বাইরে ছিল। রৌদ্র বৃষ্টি হতে সুরক্ষিত সুললিত দেহী বচনবাগীশ কোনও এক সুবেশ যুবকের সহিত সামান্যক্ষণ কথাবার্ত্তা কয়ে এঁদের বলতে শুনা গেছে বাঃ! বেশ স্মার্ট ইনটেলিজেণ্ট বয় তো! কিন্তু এরা ভুলে যান যে ছেলেটি স্মার্ট এবং ইনটেলিজেণ্ট হলেও একজন দক্ষ শ্রমিক বা কারণিক বা যন্ত্রবিদ হতে গেলে তাঁদের কয়েকটি বিভিন্ন প্রকার আনুসঙ্গিক গুণ থাকা দরকার। উহার দ্বিতীয় কারণ স্বরূপ ইহা বলা যেতে পারে যে, অধুনাতম সমুন্নত মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির উপকারিতা সম্বন্ধে তাদের কোনও ধ্যান ধারণা নেই উপরন্তু এঁদের অনেকে নিজেদের এক একজন অভিজ্ঞতা প্রসূত মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিত মনে করে থাকেন। অভিজ্ঞ মানুষরা যে স্বস্ব কর্ম্ম ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জ্জন করে থাকেন সে কথা বেঠিক তা বলা যায় না। কিন্তু সুসংবদ্ধ মনোবিজ্ঞান এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক শাস্ত্রের জ্ঞান এদের না থাকায় এরা প্রায়শঃ ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন।

এদেশে সাধারণতঃ সাক্ষাৎ দ্বারা কর্ম্মী নির্ব্বাচন করা হয়ে থাকে কিন্তু সুনির্ব্বাচিত প্রশ্নসমূহ তৈরী না করলে কোনও মানুষের চিন্তাধারা বা পছন্দ-অপছন্দের বিষয় জানা যেতে পারে না। বহুক্ষেত্রে কর্ম্মপ্রার্থীগণ নিজেরা যা নয়, তাই তারা প্রকাশ করেছে। যা তারা নিজেরা বিশ্বাস করেনা তাই তারা বলেছে। অর্থাৎ বহু ক্ষেত্রে তারা মনোভাব গোপন করে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। এই অবস্থায় সমবোধার্থক কয়েকটি প্রশ্ন অন্যান্য আজে-বাজে প্রশ্নের মধ্যে করলে তারা মনের ভাব একই রূপে প্রকাশ করতে পারে নি। অন্যদিকে কয়েকজন অসফল উত্তরদানকারীর পর কোনও এক কর্ম্মপ্রার্থী মামুলি সফলতা দেখালে তাকেই নির্ব্বাচকগণ মনস্তাত্ত্বিক কারণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্মপ্রার্থী মনে করেছেন। এই জন্য প্রতিটি ব্যক্তির উত্তর সকল লিপিবদ্ধ করে রাখলে পরে একটির সহিত অপরটির তুলনা করে এইরূপ নির্ব্বাচনে এর উচিত সিদ্ধান্তে এসে পৌছতে পারবেন। সাক্ষাৎকার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে এদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব হলেও এদের মানসিক মতিগতি সম্বন্ধে নির্ব্বাচকরা নির্ভুলরূপে কোনও এক ধারণা করে নিতে পারেন নি। এই জন্য প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে প্রাথমিক নির্ব্বাচনের পর এদের শিক্ষার্থী রূপে রেখে এদের দোষ গুণ বুঝে তবে তাদের কর্ম্মে বাহাল করা উচিত। কিন্তু শ্রমিক বিজ্ঞানীরা

এই পন্থার উপযোগিতা সম্যক রূপে স্বীকার করেন না। এঁদের মতে মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে এদের পছন্দাপছন্দ ও দৈহিক ও মানসিক উপযোগিতা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তবে এদের শিক্ষার্থী রূপে নিযুক্ত করা উচিত হবে। এর কারণ শেষোক্ত পদ্ধতিতে ভুলনির্ব্বাচনের জন্য উপযুক্ত কর্মপ্রার্থীরাই শিক্ষার্থীর তালিকা হতে বাদ পড়ে যেতে পারে। অন্যদিকে ফোরম্যানরা বা বড় মিস্ত্রিরা খুব বাধ্য না হলে কোনও শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট নালিশ জানান নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এঁরা মন্থরগতি কর্ম্মীরা কর্ম্মেচ্ছুক হলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ না করে বরং তাদের কর্ম্মে বহাল রেখেছেন। এর ফলে বহু প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-নিষ্ক্রামণের হার অত্যধিক রূপে দেখা দিয়ে থাকে। এই শ্রমিক নিষ্ক্রামণের হারের বৃদ্ধির কুফল সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এর ফলে বহু অনুপযুক্ত ব্যক্তি আবহমানকাল প্রতিষ্ঠানে থাকায় সমধিক দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনে বাধা সৃষ্ট হয়েছে। এঁরা মামুলি ধরণের কায চালিয়ে যেতে পারলেও নিজেদের দক্ষ শ্রমিক রূপে গড়ে তুলতে পারেন নি। এই সকল কারণে শ্রমিক বিজ্ঞানীরা কর্ম্মপ্রার্থীদের প্রাথমিক নির্ব্বাচনকালে অধিক প্রযত্ন লওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করে এসেছেন।

এইভাবে আমরা দেখতে পাবো যে উৎকৃষ্ট দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত শ্রমিকদের শিক্ষানবীশরূপে নিযুক্ত করা উচিৎ হবে। এই দুরূহ কর্ম্ম কিরূপ উপায়ে সম্ভব হতে পারে তাহাই এখন বিবেচ্য বিষয়। এইখানে শ্রমিক বৈজ্ঞানিকগণ কোনও এক নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে প্রয়োজনীয় দৈহিক ও মানসিক গুণ আছে বা নেই। প্রায়শঃক্ষেত্রে কর্ম্মীনিয়োগ কালে 'প্রত্যক্ষ পরীক্ষা' রীতির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। এই প্রত্যক্ষ পরীক্ষাতে নির্দ্ধারিত কর্ম্মের সমজাতীয় কর্ম্মে তাদের পরীক্ষা করা হয়। একজন টাইপিষ্টকে টাইপিঙ মেসিনে এবং মোটর চালককে মোটরে পরীক্ষা করা খুবই সহজ। কিন্তু এখানেও দেখা গিয়েছে যে একটি মোটর বা টাইপ মেসিনে অভ্যস্তকর্ম্মী অপর মেকারের মোটর বা টাইপ মেসিনে প্রয়োজনীয় দক্ষতা দেখাতে পারে নি। বহু ক্ষেত্রে পরীক্ষার সময়ে এরা সমধিক উৎকর্ষতা দেখতে না পারলেও পরবর্ত্তীকালে তারা উৎকর্ষতা দেখাতে পেয়েছে। এই জন্য ধৈর্য্য ধরে একই পরীক্ষা কয়েক বার গ্রহণ করা উচিত হবে। এর কারণ মনের উদ্বেগ অপসারিত হতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে। কিন্তু পরে অভ্যস্ত হওয়ার পর ঐ সকল নূতন মেকারের যন্ত্রপাতি উত্তম রূপেই এরা ব্যবহার করতে পেয়েছে। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ পরীক্ষাতে কায জানা শ্রমিকদের পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্ভব হলেও নবাগতদের ভবিষ্যৎ দক্ষতা সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা একমাত্র অপ্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা সম্ভব হয়ে থাকে। এই অপ্রত্যক্ষ পরীক্ষা বিশ্লেষণ-মূলক ভাবে করা হয়ে থাকে। কোনও এক কর্ম্মের কর্ম্মীর কয়েকটি গুণ থাকা উচিৎ এবং কয়েকটি দোষ থাকা উচিত নয়। এক্ষণে এই প্রতিটি গুণ কর্ম্মপ্রার্থীর আছে কিনা তা পৃথক পৃথক রূপে পরীক্ষা করে বুঝে নিতে হবে। কোনও একটি গুণ বা দোষ নবাগত যুবকের আছে বুঝলে পরবর্ত্তী পরীক্ষা দ্বারা উহার পরিমাণও শ্রমিক বৈজ্ঞানিক বুঝে জেনে নিতে হবে। এইরূপ পরীক্ষা নিরীক্ষার বহুবিধ পদ্ধতি আমেরিকা য়ুরোপীয় দেশসমূহে প্রচলিত আছে। কিন্তু এইরূপ পাশ্চাত্য দেশীয় পরীক্ষা নিরীক্ষায় সুযোগ সুবিধা বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে নেই বলে আমি মনে করি। এইজন্য এইদেশের জন্য আমি এইরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার্থে কয়েকটি সহজপন্থা আবিষ্কার করেছি। প্রথমে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বাৎসরিক শ্রমিক নিষ্ক্রামণের হার সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। এই শ্রমিক নিষ্ক্রামণের হার অস্বাভাবিক হলে বুঝতে হবে যে এই-খানে উপযুক্ত শ্রমিকদের নির্ব্বাচন করা হয় নি। এইবার ম্যানেজার ও ফোরম্যানদের সহিত আলাপ আলোচনা দ্বারা জেনে নিতে হবে যে কি কি দোষের জন্য বা কি কি গুণ না থাকায় এই সকল শ্রমিকদের বরখাস্ত করতে হয়েছে বা তারা কর্ম্মে অপারক হয়ে আপনা হতেই কর্ম্মে ইস্তফা দিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে। এইভাবে এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভাগে বিভাগে কর্ম্মীদের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন তা শ্রমিক-বিজ্ঞানীকে বুঝে নিতে হবে। এরপর এই নবলব্ধ জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে নবাগতদের গুণাগুণ তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পারবেন।

এইবার আমার স্বনির্বাচিত সহজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে আমি আলোচনা করবো। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রথমে একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক মানুষের মনে নানা কারণে এক একটী চিত্ত প্রস্তুতি [predisposition] দেখা যায় একজন ডাক্তারকে ষ্টেথিস্কোপ যন্ত্র দেখালে বা কোনও ঔষধের উল্লেখ করলে তাকে যেরূপ আগ্রহশীল হতে দেখা যায় তাহা কোনও উকিল, কেরাণী বা যন্ত্রবিদ-এর মধ্যে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়েছে। এইজন্য আমি কোনও একটী শিল্পের বা উহার বিভাগে ব্যবহৃত কাঁচা মাল বা যন্ত্রের অংশ তাকে দেখিয়ে তার সঙ্গে সেই সম্বন্ধে মামুলি আলোচনা করে বুঝি যে সেই কাঁচা মাল ও যন্ত্র সম্পর্কে সে আগ্রহশীল কিনা? এই সব কাজে স্বভাব বলে, বা বসে, লৌহ শিল্পের ক্ষুদ্র যন্ত্রাদি, মোটর পার্টস্ ইলেকটিক পার্টস্ ইত্যাদির সাহায্যে এইরূপ পরীক্ষা করা যেতে পারে। প্রথমে দুরূহ টেকনিক্যাল প্রশ্ন তুলে তাকে উদ্বেগপূর্ণ বা নারভাস করে তুললে কিন্তু উপযুক্ত ইনট্রসপেকসন তার কাছ হতে পাওয়া যাবে না। মানুষের মনের ভাব সূক্ষ্মাসূক্ষ্মভাবে মুখের পেশীর কুঞ্চনে প্রকাশ পেতে বাধ্য। এইরূপ আলোচনাকালে তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালে বুঝা যাবে যে কোন কর্ম্ম সে মনে প্রাণে পছন্দ করে বা করে না। এইভাবে পরীক্ষা করে দেখা যাবে যে কেহ লৌহ শিল্প, কেহ বস্ত্র শিল্প, কেহ মোটর শিল্প, কেহ বিদ্যুৎ শিল্প অধিক পছন্দ করে। এরপর তাদের পছন্দকর শিল্পের বিভাগে বিভাগে সাক্ষাৎভাবে নিয়ে গিয়ে সেখানকার যন্ত্রাদি কর্ম্মরত শ্রমিকদের কায দেখিয়ে অনুরূপভাবে বুঝে নিতে হবে যে ঐ বিশেষ শিল্পের কোন্ বিভাগে কায সে অধিক পছন্দ করে। এই সময় আমি দেখেছি যে একটু সৌখীন লোকেরা লৌহ শিল্পের পঙ্কিলতার তুলনায় বস্ত্রশিল্পের পরিচ্ছন্নতা অধিক পছন্দ করেছে। কিন্তু এইরূপ মানসিক সংস্কৃতি অভ্যাস দ্বারা বিদূরিত করা যায় বলে আমি উহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনি নি। এর পর এইভাবে নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে ঐ শিল্পের যন্ত্রাদি পরিচালনা করতে বলে দেখা যেতে পারে উহার পরিচালনার উপযোগী দৈহিক ও মানসিক শক্তি তার আছে কিনা? কতোটুকু সময়ের মধ্যে এই যন্ত্র পরিচালনা কতটুকু সে বড় মিস্ত্রীর নিকট হতে শিখে নিতে পারছে বা তাতে নিজেকে অভ্যস্ত করে নিতে পারছে তা'ও পরিলক্ষ্য করা দরকার। এরপর আমি ঐ নির্ব্বাচিত শ্রমিকের পারিবারিক প্রয়োজন উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে কৌশলে বুঝে নিতে চেষ্টা করবো যে এই কর্ম্মের জন্য নির্দ্ধারিত বেতনে সুখী ও খুশী মনে তার কার্য্য করা সম্ভব কিনা? এইরূপ প্রতিটি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ কর্ম্মপ্রার্থীকে কিছুকাল শিক্ষা দিলে সে নিজেকে একজন সুদক্ষ কর্ম্মীরূপে গড়ে তুলতে পারবে। ইতি পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মালিকের সহিত শ্রমিকের এবং একজন শ্রমিকের সহিত অপর শ্রমিকের সহযোগিতা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই সহযোগিতাসুলভ মনোভাব নবাগতদের মধ্যে আছে কিনা এই প্রয়োজনীয় সহযোগিতাতে তাদের অভ্যস্ত করা সম্ভব কিনা তা'ও পূর্ব্বাহ্ণে অবগত হওয়ার প্রয়োজন আছে। যারা স্বল্প কারণে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং যাদের মধ্যে সহনশীলতার ও পরোপকার স্পৃহার অভাব থাকে তাদের এই অতি আবশ্যকীয় সহযোগিতাও গুণ থাকে না। এই বিবিধ পরীক্ষা সহ তাদের ব্যক্তিগত স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করার প্রয়োজন আছে।

কঠিন কার্য্য সহজ করার উপর কোনও এক কার্য্যের দ্রুত গতি নির্ভর করে। শ্রমিক বিজ্ঞান দুরূহ সমস্যার সমাধান করার জন্য সৃষ্ট। একদিকে ইহা কর্মক্ষেত্রের সুখ সুবিধার সৃষ্টি এবং উপযুক্ত কর্ম্মী নির্ব্বাচন [সঠিক কর্ম্মে সঠিক কর্ম্মী] করে শ্রমিকদের অযথা দৈহিক ও মানসিক শ্রম-ক্লান্তি নিবারণ ও তৎসহ শ্রমিকদের মন যন্ত্র-যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়ানের উপায় নির্দ্ধারণ করে থাকে, অপর দিকে এই নূতন শাস্ত্র দ্রুত গতিতে দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি, মালমশলা এবং সময়ের অপচয় নিবারণ, নিকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের হ্রাস প্রভৃতি দ্বারা মালিকদের তথা জনসাধারণের ও রাষ্ট্রের ধন সম্পত্তি বর্দ্ধনের সহায়ক হয়ে থাকে।

কোনও দেশের ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি দ্রুত গতিতে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের উপর নির্ভর করে থাকে। যন্ত্র শিল্পিগণ এই উদ্দেশ্যে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি এই দুরূহ কার্য্যে উত্তম রূপেই নিযুক্ত করতে পেরেছে।

অন্যদিকে দেহ ও মনোবিজ্ঞানীরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষের উপকারের জন্য এই শ্রমিক জগতে প্রবেশ করেছে। এদের একমাত্র চিন্তা উৎপাদনের দ্রুত গতি রক্ষণার্থে কিরূপে যে মানুষ এই সকল যন্ত্র পরিচালনা করবে তাদের কর্ম্মক্লান্তি বা শ্রম ক্লান্তি বিদূরিত করে তাদের কর্ম্মঠ রাখা যাবে। যন্ত্রের চালক রক্তমাংসে গঠিত মানুষকে বাদ দিয়ে কেবল যন্ত্রের উৎকর্ষতার দ্বারা দ্রুত গতিতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যের উৎপাদন করা সম্ভব হবে না। যন্ত্র বারে বারে ভেঙ্গে গড়ে নূতন নূতন ডিজাইনের সৃষ্টি করে উহার উৎকর্ষ বাড়ানো যে প্রয়োজন সে কথা ঠিক। কিন্তু সেই সঙ্গে যে শ্রমিক উহা চালনা করবে তাদেরও উহাদের চালানোর সুবিধার বিষয় ভেবে ঐ সকল ডিজাইনের অদল বদল করতে হবে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শ্রম শিল্প সমূহের সামগ্রিক উন্নতি মাত্র এই উপায়েই সমাহিত হওয়া সম্ভব।

শ্রমিক নির্ব্বাচনের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে প্রথমে নিম্নোক্ত ডাটা বা তথ্যসমূহ সংগ্রহ করার প্রয়োজন আছে।

(১) ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের অনুরোধে বা সুপারিশে নির্ব্বিচারে কতো কর্ম্মী এই প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত করা হয়েছে। এদের বেতনের হার অন্য কর্ম্মীদের অপেক্ষা অধিক হলে এই অবিচার অন্য শ্রমিকদের মনে কোনও প্রতিক্রিয়া এনেছে কিনা।

(২) সুদক্ষ শ্রমিকদের কর্ম্মের তদারকীর ভার অযোগ্য কর্ম্মীদের উপর ন্যস্ত করে তাদের প্রতি ত্রুটিশীল করে তোলা হয়েছে কি না। [ক্রমশঃ

সূর্য

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

মনের অতলস্পর্শ আদিগন্ত শুধু অন্ধকার—
মৃত্যুর মতন স্থির। ঊর্দ্ধ-অধঃ ব্যাপ্ত অন্তস্তলে
কোথাও পাইনি সূর্য শুধুই আহত প্রাণ জ্বলে
হতাশায়, বৈপরীত্যে, অনিয়ম, বৈগুণ্যে জড়িয়ে।
দেখেছি আকীর্ণ মাটি রক্তস্রোত, হাড় আর হাড়
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল—বহুবিধ বিচিত্র ব্যঞ্জনা;—
অসার বিমূঢ় ভ্রান্তি,—এইসব বিহ্বলতা নিয়ে
দিন যায় তবু এক উপলব্ধি অসহ্য যন্ত্রণা।

চতুর্দিকব্যাপ্ত রাত্রি—ইন্দ্রিয়ের অবরোধ ঠেলে
সঞ্জাত দৃঢ়তা থেকে মুছে ফেলে সব আকর্ষণ
একদিন সূর্য পাবো—এই বোধি
ব্যস্ত করে মন।
তাই কী প্রস্তরীভূত এ-মৃত্তিকা—খুঁড়ে খুঁড়ে স্তর
প্রবৃত্ত সন্ধানে মণি, ঐকান্তিক আলোড়নে জেলে
প্রজ্ঞান মশাল? ক্রমে সূর্য মনে সুদৃঢ় ভাস্বর।

তুমি নেই

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়

আকাশ, বাতাস, বনের বিহগ খোঁজে শুধু তোমাকেই,
তারাতো জানেনা, আমি জানি শুধু, তুমি নেই, তুমি নেই।
যেথা আছ তুমি যেথা সেথায় এ ডাক যাবেনা শোনা!
বৃথা হবে মোর গানে গানে আর সুরে সুরে জালবোনা।
আবছা আলোকে, আধভেজা চোখে, নিশীথের তারাদল,
তোমার তরেই ধরার ধূলিতে ফেলেছে অশ্রুজল।
বোঝেনিত তারা, আমি কিযে হারা, হারিয়েছি কি যে কবে
সারাটি জীবন সে কথা আমার শুধু ব্যথা হয়ে রবে।
পূর্ণিমা রাতে, আলোতে ছায়াতে আবার নতুন করে'—
তুমি নেই বলে' শুধু তাই মন হাহাকারে ওঠে ভরে'—।
না ফুরাতে বেলা শেষ হ'ল খেলা, ভেঙ্গে গেল খেলাঘর।
ফাগুনের বনে শুরু হ'ল যেন কালবৈশাখী ঝড়।
স্বপ্ন আমার রামধনু হ'য়ে লুকালো আকাশ কোণে,
শিয়রের দীপ অবাক নিশীথে শুধুই প্রহর গোণে।
চৈতালী বনে ফোটেনা কুসুম, চলেছে পত্রঝরা—
মনের মানুষ মনে রয়ে গেল, বাহুতে দিলনা ধরা।
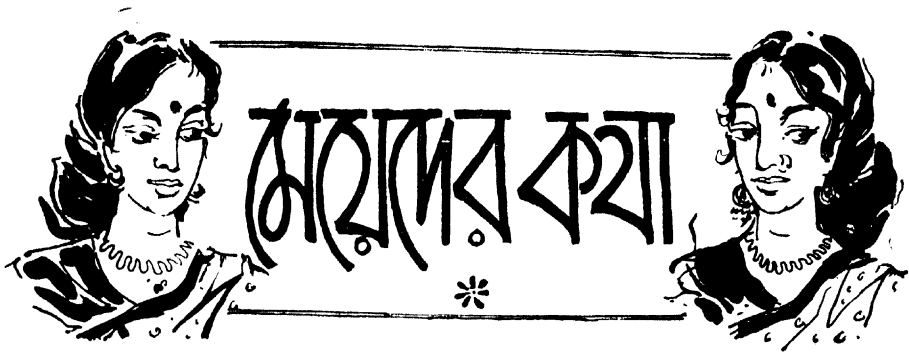
ভদ্রতা কাকে বলে ?

স্থভদ্রা

জগৎ ছুটে চলেছে। একদল মানুষ আসছে আবার তারা চলে যাচ্ছে। পৃথিবী নিত্য নূতন মানুষ নিয়ে এগিয়ে চলছে। কোথায় ? তা জানি না। তবে জানি এসব মানুষ যত দিন পৃথিবীতে থাকছে—ইচ্ছা করলে তারা আরো ভালোভাবে থাকতে পারে, পৃথিবীকে আরো সুন্দর আরো সুশ্রী করে তুলতে পারে। যে পৃথিবীতে বার বার করে জন্ম গ্রহণ করে বলবেন—

'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।'—

কিন্তু আজকালকার যে কোন ঘরের শ্বশুর শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁদের সকলের মুখে শুনতে পাবেন এক কথা—'ব্যবহার জানে না।'—কেউ বা বলবেন, 'মা-বাপ ভদ্রতা শেখায় নি, এ রকম সব কটূক্তি ।

স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জিজ্ঞাসা করুন। তাঁদের কাছে শুনতে পাবেন, সেই একই কথা—ছেলে মেয়েরা সভ্য বা শিষ্ট নয়। শিষ্টাচারের শিক্ষা এদের নেই।

কিন্তু কোথায় পাবে এ শিক্ষা ? আমরা প্রত্যেকেই ভাবি, যে আমরা নিজেরা খুব ভদ্র, শিষ্ট, সভ্য ইত্যাদি। আমাদের ছেলে-মেয়েরা যা শেখে আমাদের দেখে দেখেই শেখে। যদি তাই হয়, তবে তারা অসভ্য বা অভদ্র হচ্ছে কি করে ? আমাদের অভদ্রতা বা অসভ্যতা দেখে নিশ্চয়ই। তবে নিশ্চয়ই আমাদের জীবনে সব ব্যবহার শিষ্টতার রীতি অনুযায়ী ঘটছে না। তাই ভদ্রতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে সাবধান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ-সম্বন্ধে ভাবারও অনেক কথা আছে।

একটা কথা ঠিক, সামাজিক রীতি কালের সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আগে সমাজে গুরুজনকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করা অবশ্য কর্তব্য ছিল। আজ কাল সে রীতি প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। তার বদলে আজ কাল চালু হয়েছে হাত জোড় করে নমস্কারের রীতি—নমস্তে, নমস্কার, নমস্কারম্ বলে। কিন্তু তবু এ পরিবর্তনের মধ্যেও ভদ্রতার একটা সাধারণ ধারণা বা রীতির ধারণা চিরকাল সমাজ জীবনের অন্তঃস্থলে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বয়ে চলেছে। সে ভদ্রতা জ্ঞান যদি মানুষের লোপ পায়, তবে মানুষের সমাজ আর বন্য সমাজে কোন পার্থক্য থাকবে না।

সামাজিক ভদ্রতা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকলে আমাদের জীবনে একটা নিরপত্তা বোধ আপনি জেগে উঠে, ভদ্রতা জ্ঞান আমাদের জীবনের কঠিন সমস্যাগুলি অতিক্রম করে যেতে সাহায্য করে, এক কথায় বলতে গেলে ভদ্রতার অর্থ হচ্ছে অপরের মনোভাব, এঁদের নিরাপত্তা, গোপনীয়তা, সামাজিক অধিকার, সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি —আর অপরকে প্রীত করার আন্তরিক বাসনা।

আমাদের সমাজে অতি প্রাচীনকাল থেকে সামাজিক শিক্ষা, ভদ্রতা শিক্ষা দেওয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হত। তার প্রমাণ অভিজ্ঞানশকুন্তলে শকুন্তলার পতি-

গৃহে যাওয়ার প্রাক্‌কালে মহর্ষি কণ্বের উপদেশাবলী—'তুমি পতি-গৃহে গিয়ে, গুরুজনদের শুশ্রূষা করবে, সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীর মত ব্যবহার করবে। সৌভাগ্য গর্বে গর্বিত হবে না'······ইত্যাদি।

কিন্তু আজকাল ভদ্রতা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই ঠোঁট বাঁকানো অনেক সুন্দর মুখ দেখতে পাওয়া যাবে। ভাব, 'জানি শিষ্টাচার সভ্যতা কাকে বলে—আমরাও এমন দু'চার কথা লিখতে পারি, যদি জান তবে পালন কর না কেন? কেন ঘরে ঘরে বোনে-বোনে ঝগড়া, মায়ে-ঝিয়ে মন কষাকষি, শাশুড়ী-বৌয়ে কুরুক্ষেত্র? কেন?

এর কত মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, এমন কি রাজনৈতিক কারণ উপস্থিত করা হতে পারে, সব জানা আছে। তাদের মধ্যেও যাথার্থ্য থাকতে পারে, কিন্তু আসল সত্য হলো, আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে শিষ্টাচারের অনুশীলন যৎসামান্য। তাই জীবন ক্ষেত্রে যেখানেই বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত আসে আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়—চুরমার হয়ে যায় শান্তির স্বপ্ন।

তাই প্রত্যেকের জীবনে আজ প্রয়োজন শিষ্টাচারের সাধনার। সাধনার প্রথম সোপান সকলকে ভালবাসা—'সবারে বাসরে ভালো নইলে তোর মনের কালো ঘুচবে নারে।' একথাটি মনে রেখে অপরকে প্রীত করবার অকৃত্রিম ও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা যদি না থাকে, শিষ্টাচারের সকল আচরণ মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসতি হবে। সাবধান!

—

রমণী রত্ন

শ্মশান থেকে মসনদে

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

বাংলার নুরজাহান!

এই বলেই তার পরিচয় দেয় লোকে। কিন্তু হারিয়ে গেছে আজ তার কথা ইতিহাসের পাতা থেকে, হারিয়ে গেছে তার নাম।

কত যুগের কত ঘটনার কথাই ত নীরব হয়ে এ দেশের মাটি আর বাতাসের সাথে মিশে গিয়েছে, হারিয়ে গিয়েছে কত কথা। সাধারণ এক নারীর কাহিনী ইতিহাসের পাতা থেকে ঝরে যাবে, এ আর নূতন কথা কি? তবু সবটাই যায়নি হারিয়ে। বহু প্রাচীন গড়ের আর অট্টালিকার ধ্বংশাবশেষ আজো রয়েছে গৌড়-পাণ্ডুয়ার নানা স্থানে। দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজশাহ ও গৌড়ের সুলতান সামসুদ্দিন ইলিয়াসের ইতিহাসবিখ্যাত যুদ্ধের স্মৃতি ধারণ করে আজো রয়েছে একডালা দুর্গের ধ্বংশাবশেষ—'রিয়াজ-উস-সালাতিনে' যে যুদ্ধের কথায় লেখা আছে, 'সেদিন বীরের দেহের ক্ষতে আরক্ত গোলাপের দেখা গিয়েছিল।' 'তারিখ-ই-ফিরোজসাহী'তে একডালার যুদ্ধক্ষেত্রে অবগুণ্ঠনবতী রমণীর কথা লিখে রেখেছেন ঐতিহাসিক আফিফ।

সবই আছে ইতিহাসে। শুধু নাই তার নাম—সামাজিক কিংবদন্তীতে যে আজও বাংলার নুরজাহান নামেই পরিচিতা হয়ে রয়েছে।

নুরজাহানের মতই ছিল তার রূপ। ভাগ্যের পরিহাসে নুরজাহানের মতই সে করেছিল পত্যন্তর গ্রহণ—নুরজাহানের মতই সে ধরেছিল দেশের শাসনরজ্জু নিজের হাতে। তফাৎ শুধু এইটুকু, একজন নিয়েছিল দিল্লীর তক্তাউসের পরিচালনা ভার,—আর অন্যজন চালনা করেছিল গৌড়ের মসনদ।

উপকথা নয়, কিংবদন্তীও নয় এবং খুব বেশী দিন আগেকার কথাও নয় যে সকলেই ভুলে যাবে। আজ থেকে প্রায় ছয়শ বৎসর আগেকার কাহিনী এবং এই কাহিনী হলো বাংলা দেশের ইতিহাসেরই এক অধ্যায়। বাংলায় তখন পাঠান শাসনকাল। পাঠান সুলতান সামসুদ্দিন তখন গৌড়ের সিংহাসনে।

গৌড়ের সুলতান সিকান্দার শাহ তখন দেহত্যাগ করেছেন। পিতার শোণিতে পা ভিজিয়ে গৌড়ের রাজসিংহাসনে বসলেন গিয়াসউদ্দিন, ন্যায়বিচারকরূপে প্রশংসা লাভ করে তিনিও গেলেন পৃথিবী ছেড়ে কোন্ অজানা দেশে। চলে গেলেন সৈফুদ্দিন গৌড়ের সুলতানীর মায়া ত্যাগ করে। গৌড়ের সিংহাসনে এসে বসলেন সামসুদ্দিন ইলিয়াস—'রিয়াজ-উস-সালাতিন' যাঁকে বলেছেন সাহাবুদ্দিন। কিন্তু সেই সিংহাসন লাভে কোন গৌরব ছিলনা

সেদিন। মলিন হয়ে গিয়েছে তখন ইলিয়াসশাহী বংশের সম্মান। গৌড়ের সিংহাসন ঘিরে তখন চলেছে অন্তর্দ্বন্দ্ব; শুধু হত্যালিপ্সা, তরবারির রক্তমাখা ঝলসানি আর বিভীষিকা।

বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে আজ ফুলমতী বেগমের নাম, কিন্তু তার স্মৃতি আজও রয়েছে বরেন্দ্রভূমির সামাজিক গল্প-কথিকায়, 'গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হইল রাজা' যিনি, সেই গণেশ দনুজমর্দ্দনের উত্থানের ইতিহাসে—টুকরা টুকরা প্রবাদের মত।

সামসুদ্দিন ইলিয়াস গৌড়ের সিংহাসনে বসেছেন; বসে দেখলেন সিংহাসনের চারিদিক ঘিরে রয়েছে চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রের ছুটাছুটি। জানতেন তিনি মসনদের রক্তাক্ত ইতিহাস—একের রক্তে পা ধুয়ে অন্যের মসনদে বসার কাহিনী। কাজেই তিনি মন দিলেন, রাজ্য সুগঠিত করার জন্য নয়, ইলিয়াসশাহী বংশের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যও নয়,—সুন্দরী নারীর রূপ দিয়ে গড়া প্রমোদ ভবনের দিকে। তাঁর দুই চক্ষু তখন খুঁজে বেড়াতে লাগলো যৌবনবতী নারীর রক্তিম অধরোষ্ঠ, ঘনকৃষ্ণকেশদাম আর আয়ত নয়ন। তরবারি স্পর্শ করতেও যেন ভুলে গেলেন তিনি। কোন খেদ নেই তার জন্য যে কোন সময়ে জীবনের দীপ নিভে যেতে পারে ঘাতকের ছুরিকায়, কাজেই জীবনের কামনা বাসনা পরিতৃপ্ত করে নেওয়াই ভাল, এই ছিল তাঁর মনের কথা

এমনি সময়ে তাঁর জীবনে এলো ফুলমতী বেগম।

ঢাকা থেকে গৌড়ের পথে ফিরছেন সামসুদ্দিন। তাঁর প্রকাণ্ড বজরা ভেসে চলেছে বিক্রমপুরের ভিতর দিয়া পদ্মার স্রোত বেয়ে। কত গ্রামের ধার দিয়ে, কত মোহনায় মোড় ঘুরে লতায় ঘেরা—পাতায় ঢাকা অশ্বত্থ গাছের তলা দিয়ে বয়ে চলেছে তাঁর বজরা। কত গ্রামের ঘাটে তাঁর বজরা এসে থেমেছে। গ্রামের রূপ দেখেছেন তিনি আর দীন দুঃখীকে দান করার ছলে খুঁজে বেড়িয়েছেন নারীর রূপ। সুন্দরী নারী, ভদ্রঘরের হোক, বা পথের ভিখারিণী হোক, সামসুদ্দিনের চোখে পড়লে তার আর নিস্তার নাই। এমনি ভাবেই শরৎকালের এক প্রত্যুষে বজ্রযোগিনী গ্রামের ঘাটে এসে লাগলো তাঁর বজরা।

অতি প্রত্যুষে নদীর জল থেকে উঠছে কুয়াশা; তার আড়ালে অস্পষ্ট দেখা যায় নদীর তীর। দেখা যায়, কিন্তু বোঝা যায়না সব কিছু।

নদীর তীরে অনেক লোকের সমাবেশ। যেন এক উৎসবের আনন্দ মেলা। জিজ্ঞাসা করেন সুলতান—মাঝি, নদীর ধারে যেন উৎসব দেখতে পাচ্ছি। কিসের উৎসব করে ওরা?

উত্তর দিল মাঝি—সতী হবে গ্রামের এক বালিকাবধূ।

সামসুদ্দিন বজরার ছাদে উঠে গেলেন, নদীতীরে এক স্থানে তৈরী হয়েছে এক চিতা। বহুলোকের সমাগম হয়েছে চিতা ঘিরে, এসেছে কত ঢাক-ঢোল কাড়া নাকাড়া। সতীদাহ দর্শনেও সতী হবার সমানপুণ্য, সেই জন্য এসে দাঁড়িয়েছে কত স্ত্রীলোক; বৃদ্ধা, বালিকা, যুবতী।

সাধারণ কৌতূহলেই নদী তীরের সেই চিতার দিকে তাকিয়ে ছিলেন সুলতান সামসুদ্দিন। দেখলেন, স্তব্ধ উৎকণ্ঠায় চিতা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে একদল লোক—হয়তো মৃতের আত্মীয়-স্বজন; দাঁড়িয়ে আছে চিতার পাশে শব-দাহকারীর দল ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের নেতৃত্বে। সেই শারদ প্রত্যুষে, আলো আঁধারের রঙীণ প্রচ্ছায়ে হঠাৎ এক দিকে তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল—নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরী এক নারী। বিচিত্র তার বেশ, অপরূপ তার সজ্জা, অতুলনীয় তার রূপ। রক্তবর্ণ পট্ট-বসনে আবৃতা দেহ সেই নারীকে দেখে মনে হলো যেন বিয়ের আসরে এসেছে সে।

মুগ্ধ হলেন সুলতান সামসুদ্দিন রমণীর রূপে। প্রশ্ন জাগে তাঁর মনে, এমন এক পরমাসুন্দরী যুবতী মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাচ্ছে কিসের কারণে? ওর কি জীবনের কামনা বাসনার পরিতৃপ্তি হয়েছে? অগ্নিশিখায় আচ্ছন্ন হয়ে আর কিছুক্ষণ পরে তার দেহ যে শুধু কতকগুলি পোড়া কয়লার রূপ ধারণ করবে, তা কি বুঝতে পারছে না ঐ যুবতী?

সন্তর্পণে বজরা থেকে নেমে পড়লেন সুলতান সামসুদ্দিন। তাঁকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললো মুক্ত তরবারি হাতে পাঠান সৈন্যের দল। ত্রস্তপদে যুবতীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন সুলতান; জিজ্ঞাসা করলেন তাকে তুমি কি স্বেচ্ছায় সতী হতে এসেছ?

কিন্তু কোন উত্তর নাই যুবতীর। নির্ব্বাক নিস্পন্দ সে,

যেন পাথরে ক্ষোদাই করা মূর্ত্তি। নির্নিমেষ স্থির অচঞ্চল দুটি চোখের তারা যেন বিষণ্ণ বিবশ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে শুধু। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আফিংএর ধোঁয়ার মাদকতা আর স্বল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন রকম মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতা তখন অসাড় করে তুলছে তার মন।

বাজনা বাজে উন্মত্ত হয়ে। শত শত কৌতূহলী মানুষের দৃষ্টি এসে পড়ে সুলতানের দিকে। সহমরণে কি বাধা দিতে চান সুলতান? জনতা এগিয়ে আসে সুলতানকে লক্ষ্য করে। পরমুহূর্ত্তেই পিছিয়ে পড়লো তারা সুলতানের দেহরক্ষী সৈন্যদলের হাতে তরবারি আর বন্দুক দেখে। বাজনা গেল সঙ্গে সঙ্গে থেমে।

ক্ষণকাল অপেক্ষা ক'রে যুবতীর বাহু স্পর্শ করলেন সুলতান।

অস্ফুট শব্দ করে উঠলো জনতা—এই রে! যবন-স্পর্শ দোষ ঘটল। আর কি নেবেন ওকে অগ্নি দেবতা?

কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও কোন কথা ফুটে ওঠেনি যার ভীতি-বিহ্বল মুখে, সুলতানের স্পর্শে তার বিহ্বলতা কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে চোখে ফুটে উঠলো বিস্ময়ের রেখা। ধীরে মুখ তুলে সুলতানের দিকে তাকালো যুবতী।

সুলতান আবার তাকালেন যুবতীর মুখের দিকে—আমার প্রশ্নের উত্তর দাও সুন্দরি!

—কি প্রশ্ন?

—তুমি কি স্বেচ্ছায় এসেছ সতী হতে?

কি উত্তর দেবে যুবতী? মরতে তার সত্যিই ভয় করে। গ্রামের কাত্যায়নী বামনীকে চিতায় উঠে 'সতী' হতে স্বচক্ষে দেখেছে সে। উঃ, কী কষ্টই না পেয়েছিলেন তিনি! প্রাণভয়ে যতবার চিতা ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন, ততবারই বাঁশ দিয়ে ঠেলে চিতায় চেপে ধরেছে তাঁকে, সুতীব্র যন্ত্রণায় কাতর চীৎকার করেছিলেন তিনি। তাছাড়া, দেহের রূপ আর মনের বাসনা যার আজো ম্লান হয়নি, তার কি মরতে ইচ্ছা করে? কিন্তু বাঁচবেই বা সে কেমন করে। আগুনে না পুড়লে জনতার অভিশাপ আর আত্মীয় স্বজনের ক্রোধ থেকে কে বাঁচাবে তাকে? পৃথিবীর পারে গিয়েও যে নিস্তার নেই তার! মনে ভাবে সত্যিই যেন মৃত্যু হয়েছে তার। তবুও তার অস্ফুট দুটি ওষ্ঠ থেকে প্রকাশ হয়ে পড়লো তার মনের কথা—না, মরতে আমার বড় ভয় করে।

ধিক্কার দিয়ে ওঠে সমবেত জনতা; কী অসতী এই নারী! নিজের মুখে স্বীকার করেছে স্বেচ্ছায় সে আসেনি সহমরণে, হৃদয় মন দেয়নি তার স্বামীকে। এ কি সর্ব্বনাশা মেয়ে!

উৎফুল্ল হয়ে ওঠে সামসুদ্দিনের দুই চোখ। আবেগে যুবতীর হাত চেপে ধরেন সুলতান। বলেন—চলে এসো।

—কোথায়?

—আমার সঙ্গে?

যুবতী প্রশ্ন করে—কেন?

বলে ওঠেন সুলতান—তোমার মত রূপসীকে আগুনের শিখায় মরতে দিতে পারি না আমি। এসো আমার জীবনে। যে কুসুম-কোমল দেহ কিছুক্ষণ আগেই চিতার আগুনে শেষ হতে পারতো, সেই পেলব দেহ ফুটে উঠুক গৌড়ের রাজপ্রাসাদে। তুমি হবে সুলতানের বেগম।

স্তব্ধ হয়ে যায়; বিস্ময়ে নীরব হয়ে থাকে যুবতী। সত্যি কি রক্ষা পাবে সে জলন্ত আগুনের শিখা থেকে, আবার ফিরে যাবে পৃথিবীর কোমল বুকে? এতক্ষণ নিশ্চেষ্ট হয়েছিল সে মৃত্যু নিশ্চিত জেনে, ভেবেছিল, যেন মরলেই বাঁচে। এখন বাঁচবার সম্ভাবনা দেখে আশা জেগে উঠলো তার মনে। ভাবলো, আবার বাঁচি না কেন? চকিতে একবার চারদিক দেখে নিলো সে; ব্যাকুল আগ্রহে সুলতানের হাত চেপে ধরলো—সুলতান, বাঁচান আমাকে। ওরা একবার কায়দায় পেলে আর ছাড়বে না, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে আমাকে।

হাত বাড়িয়ে যুবতীকে পাশে টেনে নেন সুলতান বুকের পাশে; বলেন—ভয় কি? এই তো আছি আমি।

নব জন্ম লাভ করলো যুবতী। শ্মশান থেকে উঠে এলো মসনদে। সেদিন থেকে সে আর ব্রাহ্মণী নয়, সুলতানের হৃদয় আলোকিত করা বেগম—ফুলমতী।

ফুলমতীর জীবনে এলো নবজন্মের নিত্য নূতন অভিযান। বৈচিত্র্যভরা আনন্দ যাত্রা। সামনে কোন বাধা নেই। পেছনেও কোন দায় নেই।

বিক্রমপুরের সামান্যা এক নারী ঐশ্বর্য্যের মোহে অতীতকে ভুলে গেল। চিতা শয্যায় দুঃস্বপ্ন কেটে গিয়েছে

তার মন থেকে। চিতার আগুনে পুড়ে গিয়েছিল তার মনের হিন্দুনারীর সংস্কার, পোড়েনি তার রমণী হৃদয়। চিতার আগুনে পুড়েছিল তার সংস্কারের বাঁধন, পোড়েনি তার দেহের বাসনা। সুলতানের হারেমে এমন এক পরিবেশের মধ্যে এসে পড়লো সে' যেখানে সমস্তই তার বাসনার অনুকূল। হারেমের উচ্ছৃঙ্খল জীবন তাকে মাতিয়ে তুলল, তাতিয়ে দিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষার জ্বালায় উন্মাদ হয়ে উঠলো ফুলমতী বেগমের মন। মৃত্যুর মুখ থেকে যখন অভাবিতভাবে ফিরে এসেছে, তখন একবার জীবন নিয়ে জুয়া খেলে দেখবে সে; উঠবে অনেক দূরে। হারেমের আর দশটি বেগমের একজন হয়ে থাকবে না সে। তাকে হতে হবে সবার প্রধানা। শিখতে থাকে সে হারেমের ছলাকলা পরম আগ্রহে। সুলতান সামসুদ্দিনকে পুরাপুরি আপন আয়ত্তে আনার জন্য নারীর সব ছলাকলা প্রয়োগ করে সে। জয়ের আনন্দে হেসে উঠলো তার সুর্মা আঁকা দুটি চোখ।

নীল আকাশ যখন তারায় তারায় ভরে ওঠে, গাছের মাথা শাখা পাতা দুলিয়ে শীতল বাতাস হয়ে চলে, তখন প্রাসাদের ছাদে মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বেগমের গান শোনেন সুলতান। শুনে, কাউকে দেন জড়োয়ার কঙ্কণ, কাউকে আবার দেন মুক্তার মালা। ফুলমতীকে যখন উপহার দিতে চান সুলতান, তখন অস্বীকার করে সে।

বিস্মিত সুলতান জিজ্ঞাসা করেন—কি চাও তুমি ফুল বিবি? হীরার আংটি, না চুনি পান্নায় চন্দ্রহার!

মাথা নীচু করে মুখে লজ্জার আভাস এনে ফুলমতী উচ্চারণ করে অস্ফুটে—শুধু আপনার প্রেম জাঁহাপনা।

খুশী হয়ে ওঠেন সুলতান। এক ঝাঁক ভ্রমর বেষ্টিত পদ্মফুলের মত রাশিকৃত চুলেঘেরা ফুলমতীর মুখখানি টেনে এনে নিজের প্রশস্ত বুকের উপর চেপে ধরেন তিনি। মুগ্ধ হয়ে বলেন ফুলমতীর আবেগভরা কণ্ঠ শুনে—সে কি তুমি আজো পাও নি? আমি তো নিজেকেই বিলিয়ে দিয়েছি তোমার কাছে। তুমিই আমার সব।

নিজের মনেই কৌতুকের হাসি হাসলো ফুলমতী। তার চোখে মুখে ফুটলো সার্থকতার আলো। সে যা চাচ্ছিল, তাই ঘটলো। পরীক্ষা করতে চেয়েছিল সে সুলতানের মনোভাব। মেয়েরা অনেক সহজেই পুরুষের মনের ভাব বুঝতে পারে, তাদের অনুমান হয় নির্ভুল। বুঝলো ফুলমতী, সুলতান তার রূপের ফাঁদে বন্দী, নড়বার ক্ষমতাও নেই তাঁর। তবুও ভাবে ফুলমতী, দুর্ব্বল চিত্ত, অসাড়, কামুক সুলতানকে আরো মুগ্ধ করতে হবে, আনতে হবে একেবারে হাতের মুঠায়। হতে হবে তাকে সুলতানের ভাগ্যবিধাতা, জ্ঞান হবে—তার ইচ্ছাই সুলতানের কাছে খোদার ইচ্ছা। তার পরে রাজ্য পরিচালন করবে সে নিজে।

সুলতানের গলা জড়িয়ে ধরে, পেলব নয়নের কটাক্ষে মাতাল করে তোলে! মধুর স্বরে প্রণয় নিবেদন করে ফুলমতী, তাঁকে একেবারে বশীভূত করবার জন্য। তাঁকে আয়ত্তে এনে নিজের প্রতিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করতে থাকে সে। পুরুষকে নারী চিরদিন করায়ত্ত করে এসেছে তার হাস্যে, লাস্যে, নয়নের কটাক্ষে—যৌবনের লীলা ভঙ্গিমায়। আদিম যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত নারীর জয়যাত্রা প্রতিহত করতে পারে নি কোন পুরুষ। সামসুদ্দিন ইলিয়াসও ভেসে গেলেন সেই পথে। ফুলমতীর অনুরোধই তাঁর কাছে আদেশের মত হয়ে উঠলো।

মাঝে মাঝে অভিনয় করে সে।

সুলতান যখন আদর করে ডাকেন—ফুলবিবি, ফুলমতি, পিয়ারি! তখন সাড়া দেয় না ফুলমতী। নড়ে না, চুপ করে মুখ গুঁজে থাকে একধারে। সুলতান থাকে তুলে ধরতে চান, কিন্তু বাধা দিয়ে সরে যায় ফুলমতী।

বুঝতে পারেন না সুলতান, কি হয়েছে আজ ফুলমতীর কেন অমন করছে সে। ভাল করে তাকিয়ে দেখেন, তার চোখে জল। ব্যাকুল হয়ে বলে ওঠেন—একি কাঁদছ কেন? কি হয়েছে তোমার? আমার কি কোন অপরাধ হয়েছে?

তবু নীরব থাকে ফুলমতী।

অনেক সাধাসাধির পরে, অনেক মনগড়া দোষ স্বীকারের পরে সুলতানের দিকে মুখ তুলে তাকায় ফুলমতী, তার কাল দুটি চোখ যেন আষাঢ়ের ঘন মেঘভারে ম্লান।

কপট আতঙ্কে মুখ কালো করে সুলতানকে বলে—বড় ভয় হয় জাহাপনা! শ্মশানের ছাই আমি, আমার সংস্পর্শে

তোমার সাধের প্রাসাদ ভস্ম হয়ে যেতে পারে। চলেই যাই আমি।

মিটি মিটি হাসে ফুলমতী। ঐ হাসিটুকু দিয়ে সে নিজের কথার জবাব নিজেই দিয়ে দেয়। হাসি দিয়ে সে বুঝাতে চায়, এমন কথাও কি সত্য হতে পারে—না সে মন থেকে বলছে? এ যে শুধু মুখের কথা!

কিন্তু ফুলমতীর এই অভিনয়কে সত্য বলে শিউরে ওঠেন সুলতান। ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, সত্যিই কি চলে যাবে ফুলমতী? হারিয়ে যাবে তার রূপের দীপ্তি প্রাসাদ থেকে!

ব্যাকুল হয়ে বলেন—একি কথা ফুলবিবি। তুমি আমার জীবনের আলো। একমাত্র স্বপ্ন; তোমাকে ছাড়া আমার জীবনই যে আঁধার। তবুও কেন এমন বিচলিত হয়ে ওঠো অতীতের কথা ভেবে? আমায় কি বিশ্বাস করো না তুমি?

মুখে অপ্রতিভের ছায়া টেনে আনে ফুলমতী। বলে—তোমায় অবিশ্বাস? শ্মশানের চিতা থেকে কুড়িয়ে এনে আমায় মসনদে বসিয়েছ। সেই তো আমার পরম আনন্দ, চরম শান্তি। তোমায় অবিশ্বাস করবার পূর্বে যেন আমার মৃত্যু হয় মেহেরবান। আমার প্রাণমন, জীবন যৌবন, এমন কি পৈত্রিক ধর্ম—সবই তো তোমার পায়ে ডালি দিয়েছি। তোমাকে অবিশ্বাস করবো আমি?

—তবে?

মুখে সলাজ হাসি ফুটিয়ে তোলে ফুলমতী। কথা ঘুরিয়ে নেয়।

আবার এক সুমধুর মূহূর্তে সুলতানের বুকে মুখ লুকিয়ে বলে সে—আমি নিজের কথা ভাবি না জাঁহাপনা। আমার দুঃখের কাঁটায় ফুল ফুটিয়েছ তুমি। আমি ভাবি শুধু………।

—কি ভাবো, বলো। কৌতূহলী হয়ে ওঠেন সুলতান।

—অন্ধ নাকি তুমি? কিছু দেখতে পাওনা, বুঝতে পার না? উত্তর দেয় ফুলমতী। লজ্জায় সঙ্কোচে নীচু হয়ে আসে তার মুখ। মৃদু কাঁপে তার দুটি কোমল ওষ্ঠ। কিন্তু কথা ফোটে না তাতে। কি বল্‌তে চেয়েও যেন স্পষ্ট করে বলতে পারছে না সে।

ফুলমতীর কুসুম কোমল দেহকে কোলের আরও কাছে টেনে নেন সুলতান পরম আদরে। কোমল স্বরে বলেন—কি কথা ফুল? লজ্জা কি, বলো, বলো তুমি……।

সুমধুর এক আবেশে নত হয়ে থাকে ফুলমতী ক্ষণকাল। তার পর ছলো ছলো চোখ দুটি সুলতানের মুখের দিকে তুলে বললে—তোমার সন্তান কি মসনদের অধিকার পাবে না জাঁহাপনা। সে কি রইবে সকলের পিছে?

সুলতানের দেহের মধ্যে যেন আনন্দের বিদ্যুৎ বয়ে গেল। সন্তান! ফুলমতীর দেহে তাঁর সন্তান আসছে!

উৎফুল্ল আনন্দে ফুলমতীর মুখ তুলে ধরেন সুলতান—তাই নাকি? সত্যি আসছে আমাদের সন্তান?

সামসুদ্দিনের বুকের মধ্যে মুখখানা আরও লুকিয়ে অস্ফুট স্বরে বলে ফুলমতী—সত্যি।

দুই সবল বাহুর বেষ্টনে ফুলমতীর দেহকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন সুলতান। তার কালো চুলে ভরা মাথার উপর কপোল স্পর্শ করে আবেগ জড়ানো কণ্ঠে বললেন—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে ফুলবিবি। তোমার সন্তান যাতে মসনদের দখল পায় তার আদেশ-নামা লিখে দেব আমি।

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ফুলমতীর মুখ সফলতার আনন্দে। বাংলার ভাবী সুলতানের মাতা হবে সে! দুই চোখে সুখ-গর্ব্ব-বিশ্বাস-অনুরাগ ভরে নিয়ে সে সুলতানের দিকে তাকালো। অপূর্ব্ব সুষমায় তখন ভরে উঠেছে তার মুখখানি।

রেশমের ঝালর দেওয়া দোলনায় হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করে শিশুপুত্র। অপূর্ব্ব সুন্দর তার গায়ের রং, কোঁকড়া কালো চুল। ফোলা ফোলা গালে অকারণ পুলকে খিল খিল করে হাসে সে। তার দিকে তাকিয়ে মনে হয় ফুলমতীর, ভাগ্যই কৃপা করেছে যেন তাকে। কন্যা নয়, পুত্রই এসেছে তার কোলে মসনদে আসন নেবে বলে।

বিধির বিধান পূর্ণ হলো। ফুলমতীর স্বপ্ন হলো সার্থক। বিধাতা তাকে রাজ্যেশ্বরী রাজমাতা করে গড়েছেন, খণ্ডাবে কে?

কয়েক বৎসর পরে। ধীরে ধীরে অভিশপ্ত গৌড় মসনদের চারিদিক ঘিরে আবার ষড়যন্ত্রের কুটিলবাহু বিস্তার হয়ে উঠলো।

নিয়তির অমোঘ বিধানে নিহত হলেন সুলতান

সামসুদ্দিন ইলিয়াস। মসনদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো —সুলতানের পাঠান সেনাপতি জুনা খাঁ।

কিন্তু পারলো না সে হাত মসনদ পর্য্যন্ত পৌছতে।

ফুলমতীর মোহিনীশক্তি জুনা খাঁর হাত চেপে ধরলো। লাবণ্যময়ী ফুলমতীর অসাধারণ বচন ভঙ্গী, তার মধুরকণ্ঠ, তার আয়ত-কৃষ্ণ নয়নের মুহূর্মুহূ কটাক্ষ জুনা খাঁর মনকে একটা আবর্ত্তের প্রচণ্ড টানে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো, তার হিতাহিত চেতনা গেল বিলুপ্ত হয়ে। ফুলমতীর অঙ্গের স্পর্শে তার দেহের শিরায় শিরায় যেন উঁচু সুরে বাধা বীণা যন্ত্রের মতো রীণ রীণ করে উঠলো। তার বাহ্যজ্ঞান গেল বিলুপ্ত হয়ে।

ক্ষমতা প্রয়াসী নারীচরিত্র সত্যিই বিচিত্র!

মসনদে বসলো ফুলমতীর শিশুপুত্র সাহাবুদ্দিন বায়জিদ। পূর্ণ হলো ফুলমতীর রাজমাতা হবার আকাঙ্ক্ষা। পুত্রের নামে আদেশ দেয় সে নিজে। দরবারের আমীর ওমরাহরা সে আদেশ পালন করেন নত মস্তকে, সসম্ভ্রমে।

কিন্তু নিরস্ত হলো না ফুলমতী।

ভাবলো, সাময়িক ভাবে বিরত হলেও শেষ পর্য্যন্ত কি আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করবে জুনা খাঁ? রূপের মোহের কাছে কি হেরে যাবে মসনদের মায়া? শান্তি নাই, স্বস্তি নাই তার মনে। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত গৃহে যেমন ভয় পায় লোকে, দুদণ্ড আগের চিরপরিচিত পরিবেশ যেমন নূতন মনে হয় তার, তেমনি অবস্থা হলো ফুলমতীর।

কিন্তু হতাশ হবার মেয়ে ফুলমতী নয়। শ্মশানের চিতা থেকে যেদিন বেঁচে ফিরেছে, সেইদিন থেকেই তৈরী হয়ে উঠেছে তার চরিত্র। তার ধমনীতে হিন্দুর রক্ত, আর পরিবেশে হারামের শিক্ষা, সোনায় লোহায় সমপরিমাণে মিশে দুইয়ে এক হয়ে তাকে করে তুলেছে যেমন মোহময়ী, তেমনি কঠিন।

মনে ভাবলো সে, আরো এক শক্তিকে হাতকরা দরকার। ছেলে বায়জিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। কে সে? কোথায় পাবে এমন নির্ভরশীল বান্ধব যে লোভ মোহ দূর করে। সিংহাসনে বীতস্পৃহ হয়ে রক্ষা করবে তার ছেলের মসনদ? দরবারের আমীর ওমরাহদের উপর ভরসা নেই তার। বুঝতে পেরেছে সে। গৌড়-মসনদের চারদিকে চক্রান্তের জাল বিছিয়ে চলেছে তারাই।

দৃষ্টি পড়লো তার ভাতুরিয়ার জমিদার গণেশের দিকে। ভাবলো, আজ ভাগ্যের পরিহাসে মুসলমানের বেগম হলেও আমার শরীরেও তো হিন্দুর রক্ত বয়ে চলেছে। রাজা গণেশও তো হিন্দু, তবে কেন তিনি রক্ষা করবেন না হিন্দু-রমণীর সন্তানকে?

বিশ্বাসী এক খোজাকে পাঠিয়ে আহ্বান করলো সে গণেশকে হারামের নিভৃতে।

অর্থ আর সম্পদের জন্য সুলতানের গোলামী করলেও গণেশের মনের কাঠামোটা ছিল পুরাপুরি হিন্দু। দেশ-ভক্তি আর দেবভক্তি দুই-ই ছিল তাঁর অতুলনীয়। সুলতানের আদেশে কোন হিন্দু মন্দির ধ্বংস হয়ে গেলে গোপনে অর্থব্যয় করে, শিল্পী পাঠিয়ে নূতন করে তৈরী করিয়েছেন তিনি সেগুলি। প্রতিষ্ঠা করেছেন কত নূতন মন্দির নিজ এলাকার মধ্যে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর বিদ্বান-সজ্জন প্রতিপালনে কার্পণ্যও করেন নি তিনি। অসামান্য বীর রাজা গণেশের স্মৃতি গৌড়ের মুসলমান শাসনকালে হিন্দুর ক্ষীণ পুণ্য তারকার মতই জ্বলছে।

এক সুন্দর প্রভাতে হারেমের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন ভাতুরিয়ার রাজা গণেশ। হাবসী খোজা তাঁকে পৌছে দিল বেগম সাহেবার কাছে।

কুর্ণিশ করে হজরৎ বেগম সাহেবার আদেশ প্রার্থনা করলেন গণেশ।

ফুলমতী সসম্ভ্রমে ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে অভ্যর্থনা করলো। তাঁর পায়ের কাছে বসিয়ে দিল পুত্র সাহা-বুদ্দিনকে।

রাজা গণেশ বুঝলেন, এ মেয়ে অসাধারণ। মনে মনে প্রশংসা না করে পারলেন না তিনি ফুলমতী বেগমের। হয়তো সাফল্য কামনাও করলেন তার রাজ্যপরিচালনার কূটনীতিকে। কিন্তু বিস্মিত হলেন বেগমের প্রস্তাবে। সাহাবুদ্দিন বায়জিদকে মসনদে রেখে বেগমের আড়াল থেকে রাজ্য চালনা করবেন তিনি।

শুধু বিস্ময়কর নয়, অবিশ্বাস্য মনে হলো। মনে হলো, ছলনা করছেন হজরৎ বেগম সাহেবা। কে জানে কোন মুহূর্তে গুপ্ত ঘাতকের খড়্গ নেমে আসবে তাঁর কাঁধে বেগম সাহেবার ইঙ্গিতে!

কিন্তু, কী আশ্চর্য্য সুন্দর দুটি চোখ। অসামান্য

সুন্দরের স্বীকৃতি না দিয়ে পারলো না গণেশের ভাবমুগ্ধ পুরুষের মন। অদ্ভুত একটা যাদু যেন তাঁকে সম্মোহিত করে তুললো। একটা অপরূপ শিহরণ তাঁর শরীরকে কাঁপিয়ে তুললো।

এমনি করেই সব নারী পুরুষকে বশীভূত করে, কথনো রূপ দিয়ে, কথনো ধন মান বংশ মর্য্যাদা দিয়ে; আবার কেউ বা বশীভূত করে পুরুষের মন স্নেহ প্রীতি আর শ্রদ্ধার বন্ধনে, আলাপ-আপ্যায়ন দিয়ে। যে পারে না, ব্যর্থ হয় তার জীবন।

প্রতিশ্রুতি দিলেন গণেশ, এক সর্ত্তে। হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হলে মসনদ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে বায়জিদকে।

নিশ্চিন্ত হলো ফুলমতী; পাঠান অধ্যুষিত দেশে হিন্দুর রাজ্য স্থাপন তো অসম্ভব ব্যাপার; অলীক কল্পনামাত্র।

বেগম সাহেবার কাছে গণেশের প্রতিপত্তি দেখে জুনা খাঁর মনে হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। কিসে বায়জিদের রাজ্য যাবে, দশের মাঝে অযশ হবে জুনা খাঁর চেষ্টা কেবল তাই। কিন্তু গণেশের জন্য কিছু করতে পারে না। বাদলা দিনে পাখী যেমন পাখা দিয়ে শাবকদের ঢেকে রাখে, রাজা গণেশও তেমনি বায়জিদকে ঢেকে রাখেন।

হতাশায় ক্রোধে ফুলতে থাকে জুনা খাঁ। রাত্রির অন্ধকারে ফুলমতীর সতর্ক চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে অন্দর মহলে সুরু করে দিল কুটিল চক্রান্ত। এক দিকে ক্ষমতা-মদমত্ত জুনা খাঁ, অন্যদিকে ক্ষমতা বঞ্চিত সামসুদ্দিনের প্রতিহিংসা পরায়ণা অন্যান্য বেগম। তাদের সকলেরই আকাঙ্ক্ষা সাহাবুদ্দিন বায়জিদের মৃত্যু।

গতিক দেখে গোপনে শক্তি সঞ্চয় ক'রে চলেন রাজা গণেশ। মনের গোপনে জেগে ওঠে তাঁর হিন্দু রাজত্বের বাসনা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে গৌড়ের সিংহাসন। পাঠান আমীর ওমরাহরা নিজেরাই যদি শেষ করে দিতে চায় মুসলমান রাজত্ব নিজেরাই হানাহানি করে—কি দরকার তাঁর সে সুলতানী রক্ষা করবার?

তৈরী হতে থাকেন তিনি। গৌড়ের মসনদ দখল করবার জন্য উত্তেজিত হয়ে ওঠেন গণেশ। মৃত্যুকে তুচ্ছ করে মসনদ দখল করতে হবে; আবার ছড়িয়ে দিতে হবে হিন্দু ধর্মের জয়ধ্বনি দেশ দেশান্তরে।

জুনা খাঁ আকস্মিক ভাবে আঘাত করে বসলো রাজা গণেশকে গুপ্ত ঘাতকের ছুরিকায়। কিন্তু ভাগ্য ক্রমে আঘাত হলো না গভীর। ক্রোধে জ্বলে উঠলেন গণেশ। তাঁর ইঙ্গিতে "হর হর বম্ বম্" শব্দে গর্জ্জন করে উঠলো বাংলার জনসাধারণ। হাতের সড়কি, বর্শা, বিষাক্ত তীর আর বন্দুক নিয়ে ছুটে এলো তারা পাণ্ডুয়ার দিকে। প্রাসাদ ঘিরে ফেলল তারা।

আতঙ্কে থর থর করে কেঁপে উঠলো ফুলমতী। শিশু সাহাবুদ্দিনকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলো সে। যেমন করেই হোক বাঁচাতেই হবে তার আপন সন্তানকে। কিন্তু বাঁচাবে কেমন করে?

মানুষের আর সব সম্বল যখন শেষ হয়ে যায়, তখন থাকে শুধু চোখের জল। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো ফুলমতী। রূপ নয়, অর্থ নয়, কৌশল নয়; শুধু চোখের জলেই যেন জীবন ভিক্ষা চাইল সন্তানের।

কিন্তু সব চেষ্টাই তখন বৃথা। উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তখন বিদ্রোহী সেনা। নির্ম্মম আক্রোশে তারা ধেয়ে এলো দরবারের সব প্রধানদের দিকে। প্রবল আক্রমণে ভেঙ্গে পড়লো দুর্গদ্বার, মাটিতে লুটিয়ে পড়লো জুনা খাঁর শির; মারা গেল ইস্কান্দার খাঁ, আয়ুব খাঁ আর যত আমীর ওমরাহ। বাংলার বুক থেকে পাঠান শাসনের চিহ্নও যেন মুছে ফেলবে আজ বিদ্রোহীর দল।

অতি সহজেই প্রাসাদ দখল করলো বিদ্রোহীসেনা। বন্দী করলো যত পাঠান সৈন্য আর সেনাপতিদের। প্রাসাদের কোলে আটকে রাখল যত বেগম আর বাঁদীদের।

তারপর খুঁজতে লাগল কোথায় আছে লুকিয়ে সুলতান সাহাবুদ্দিন বায়জিদ নিরাপদ আশ্রয়ে। গোপন কক্ষের সন্ধান পেয়ে তারা ধেয়ে চললো তরবারি হাতে নিয়ে উন্মত্ত গর্জ্জনে।

সহসা থেমে গেল তাদের চীৎকার। স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখলো তারা অসামান্যা রূপসী ফুলমতী বেগম তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে তাঁর উন্মুক্ত অসি। বিনা-যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার নয়, শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য চেষ্টা করবে সে।

কিন্তু সে প্রচেষ্টা আর কতক্ষণ? ক্ষণকাল পরেই

দেখা গেল তেজোদৃপ্তা বেগমের হাত থেকে তরবারি খসে পড়েছে ; রক্তে লাল হয়ে উঠেছে তার আহত দেহ।

বিহ্বলের মত ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থেকে পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলো ফুলমতী। নিজের দেহ দিয়ে যেন ঢেকে রাখতে চায় সন্তানকে। সেও বা কতক্ষণের জন্য ?

বিদ্রোহী জনতার আক্রমণে এক সময়ে ফুলমতীর বুক থেকে শিশুপুত্র ছিটকে পড়লো মাটিতে। রক্তাক্ত হয়ে উঠলো প্রাসাদের ধূলিকণা। আকুল কান্নায় চিৎকার করে ওঠে ফুলমতী। তার বায়জিদ—তার বুক ছেঁড়া মাণিক !

মাটিতে লুটিয়ে পড়া শিশুপুত্রের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ফুলমতী ; পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। সে জ্ঞান আর ফিরলো না, শেষ হয়ে গেল তার জীবনের স্পন্দন। শেষ হলো এক সামান্যা নারীর অসামান্য জীবন কথা।

কে জানে, সেদিন গৌড়ের সিংহাসনে বসতে গিয়ে রাজা গণেশ তাঁর নিজের মনে অনুতাপের আভাস অনুভব করেছিলেন কিনা ? হয়ত শিশুপুত্র কোলে নিয়ে পদতলে প্রণতা এক নারীর কথা ক্ষণেকের জন্য তাঁর মনে জেগে উঠেছিল। হয়ত জাগেনি। কিন্তু জ্যোৎস্না রাতে পাণ্ডুয়ার ভগ্নপুরীতে আজো যেন এক করুণ সুর বেজে ওঠে, চারিদিক শিহরিত হতে থাকে এক কান্নাভরা সুরের মায়ায়। মনে হয় সন্তানের বিয়োগ ব্যথায় যেন আকাশ বাতাস জুড়ে কেঁদে উঠ্‌ছে এক মায়ের মন।

—

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

২

গত সংখ্যাতে সুতী ও রেশমী কাপড়ের উপর 'বাটিক্' কারু-শিল্প পদ্ধতিতে নক্সা-চিত্রণের মোটামুটি পরিচয় দিয়েছি। এবারে এই ধরণের শিল্প-কাজ করতে হলে, যে সব সাজ-সরঞ্জাম দরকার, তারই কথা বলছি।

উপরের 'নক্সা-নমুনার' ছাঁদে 'বাটিক্'-শিল্পের কাজ করবার জন্য নীচের ফর্দ-অনুসারে উপকরণগুলি জোগাড় করে নেওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ, এ কাজের জন্য চাই—

১। প্রয়োজনমতো মাপের সুতী বা রেশমী কাপড়। সুতীর কাপড়ে 'বাটিকের' কাজ করার জন্য, বেশ মিহি-মোলায়েম এবং ঘন-ঠাস্‌বোনা আদ্দি, লংক্লথ কিম্বা মল্‌মল্ জাতীয় কাপড়ই বিশেষ উপযোগী হবে। তবে আমাদের মতে, সুতীর কাপড়ের চেয়ে 'সিল্ক' (Silk) বা রেশমী-কাপড়েই 'বাটিক্'-পদ্ধতিতে নক্সা-চিত্রণের কাজ আরো বেশী মনোরম-সুন্দর ও মজবুত-টেঁকসই হয়ে উঠবে। তাছাড়া 'বাটিক্'-শিল্পের নক্সা-রচনা বিশেষ শ্রম-সাধ্য কাজ···সুতরাং এ কাজের জন্য মেহনৎ যখন করতেই হবে, তখন সুতীর কাপড়ের চেয়ে রেশমী-কাপড়েই 'বাটিকের' কাজ করাই সমীচীন। 'বাটিক্'-শিল্পে শিক্ষার্থী-দের হাত পাকানোর উদ্দেশ্যে অবশ্য দামী রেশমী-কাপড়ের বদলে সস্তা-দামের মিহি-ঠাস্‌বোনা সুতীর কাপড ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, গোড়ার দিকে যথোচিত অভিজ্ঞতার অভাবে এবং অপটু-হাতে নক্সা-চিত্রণের ফলে, থানকয়েক দামী রেশমী-কাপড়ের টুকরো অল্প-বিস্তর নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে·· উপরন্তু এই ব্যাপারে আর্থিক লোকসান হয়তো শিক্ষার্থীদের মনে কিঞ্চিৎ দুর্ভাবনাও সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু তাই বলে, এমন দুর্ভাবনাকে মনে ঠাঁই দিয়ে শিল্প-চর্চা বন্ধ রাখাও ঠিক নয়। কথায় বলে, শিশু পড়তে পড়তেই, দাঁড়াতে এবং

চলতে শেখে…এক্ষেত্রেও সেই কথাটি পুরোপুরি খাটে! অর্থাৎ, গোড়ার দিকে কাজে দু'চারবার যে সব ভুল-ত্রুটি ঘটবে, যত্ন-সহকারে নিয়মিত-অনুশীলনের ফলে, ক্রমশঃ সে সব গলদ অনায়াসেই শুধরে নিয়ে শিক্ষার্থীরা দিনে-দিনে এই শিল্প-কাজে রীতিমত সুদক্ষ-নিপুণ হয়ে উঠবেন।

২। আধপোয়া মৌমাছির চাকের খাঁটি 'মোম' (Bee-wax)। মৌচাকের খাঁটি মোমের রঙ ধবধবে-শাদা নয়…দেখতে কতকটা ঘি কিম্বা হাতীর দাঁতের মতো (Cream or Ivory Colour) ঈষৎ-হলদে শাদা রঙের। মৌচাকের খাঁটি-মোম ছাড়া 'বাটি'কের কাজের জন্য ভেজাল-মেশানো অন্য কোনো ধরণের মোম ব্যবহার না করাই ভালো। কারণ তাতে শিল্প-কাজ ভালো হয় না।

৩। আধ ছটাক ভালো 'রজন' (Resin)। 'বাটিকের' কাজের জন্য যে 'রজন' ব্যবহার করবেন, সেটি যেন খয়েরী-রঙের এবং শুকনো-গঁদের (Gum Arabie) ডেলার মতো হয়—সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

৪। এক কাঁচ্চা 'তুঁতে' (Copper-Sulphate)। নীল রঙের ও মিছরীর দানার মতো চেহারার তুঁতেই 'বাটিকের' কাজ করবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে।

৫। এক ছটাক 'মথি-খয়ের'। এ উপকরণটিও 'বাটিক'-শিল্পের কাজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। 'মথি-খয়ে'রের চেহারা—নস্যের মতো বাদামী ও চকচকে-তেলা ধরণের।

৬। এক কাঁচ্চা 'পটাসিয়াম্-বাইক্রোমেট' (potassium Bichromate)। এ উপকরণটি যে কোনো ভালো ওষুধের দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে। এটির চেহারা হলো কমলা বা গাঢ়-জর্দা রঙের…কতকটা সৈন্ধব-লবণের (Rock-Salt) ডেলার মতো। 'বাটিকের' কাজ করতে হলে, এ উপকরণটি বিশেষ আবশ্যক।

৭। মোম রাখবার পাত্র হিসাবে ব্যবহারোপযোগী প্রয়োজন মত ছোট, বড় বা মাঝারি সাইজের মজবুত-গড়নের একটি টিনের কৌটো।

৮। সরু, মোটা এবং মাঝারি সাইজের গোটা তিন-চার ভালো ছবি-আঁকার তুলি।

৯। প্রত্যেকটিতে প্রায় তিনপোয়া পরিমাণ জল ধরে, এমনি মাপের গোটা চার-পাঁচ মাটির (Earthen), এনামেলের (Enamel) অথবা চীনা-মাটির (Chino-Clay) পাত্র বা বাটি।

১০। উনানে বসিয়ে জল গরম করার উপযোগী একটি গামলা।

১১। একটি ছোট-উনান এবং সে উনানটিকে জ্বালানোর মতো কিছু কাঠ-কয়লা।

১২। একটি মজবুত সাঁড়াশী।

১৩। উনানের আগুনে গামলা চাপিয়ে মোম, পটাসিয়াম্-বাইক্রোমেট্, তুঁতে প্রভৃতি উপকরণগুলি জ্বাল দেবার উপযোগী একটি কাঠি।

১৪। প্রায় আড়াইসের পরিমাণ জল সমেত একটি বালতি।

১৫। কাপড়ের উপরে বিভিন্ন-বর্ণের নক্সা-চিত্রণের উপযোগী প্রয়োজনমতো পরিমাণে কিছু কালো, লাল, নীল, সবুজ, হলদে প্রভৃতি নানা রকমের কয়েকটি রঙের গুঁড়ো (Assorted powder Colours)। গরম-জলে (Hot water) যে সব গুঁড়ো-রঙ মিশিয়ে দিয়ে কাপড়-ছোপানোর কাজ করতে হয়, সে সব রঙ 'বাটিক'-পদ্ধতিতে নক্সা-চিত্রণের পক্ষে নিতান্তই অনুপযোগী। কারণ, গরম-জলে গোলা রঙ লেগে, 'বাটিকের' কাজের অন্যতম প্রধান-উপাদান 'মোম' সহজেই গলে যাবার ফলে, কাপড়ের উপরকার নক্সাগুলি অল্পেতেই নষ্ট হয়ে যায়। তাই 'বাটিক' শিল্পের-কাজে যে সব গুঁড়ো-রঙ ঠাণ্ডা-জলে (Cold Water) গোলা যায়, তেমনি রঙ ব্যবহার করাই রীতি। সুতরাং এ কাজের জন্য সর্ব্বদা ঠাণ্ডা-জলে গোলা চলে, এমনি-ধরণেরই গুঁড়ো-রঙ ব্যবহার করবেন এবং রঙ কেনবার সময়ও এদিকে রীতিমত নজর রাখবেন।

কাপড়ের উপর 'বাটিক্'-পদ্ধতিতে রঙীন নক্সা-চিত্রণের জন্য যে সব সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন—এই হলো তার মোটামুটি তালিকা। স্থানাভাবের কারণে, আপাততঃ এই তালিকাটি প্রকাশ করেই এবারের মতো আলোচনা শেষ করছি। আগামী সংখ্যায় 'বাটিক্'-শিল্পের 'নক্সা-চিত্রণের'-অভিনব পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ-পরিচয় জানাবো।

সৌখিন ব্লাউশের নক্সা

হিরণ্ময়ী দেবী

সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে যে সব মহিলা সীবন-শিল্পের চর্চ্চা করেন, নিত্য-নতুন নানা রকমের সৌখিন-সুন্দর বিচিত্র-অভিনব পোষাক-পরিচ্ছদের 'প্যাটার্ণ' (Pattern-Design) বা 'নক্সা-নমুনা সংগ্রহের দিকে তাঁদের বিশেষ ঝোঁক দেখতে পাওয়া যায়। তাই সীবন-শিল্পানুরাগী মহিলাদের সে চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে, এবারে একটি বিচিত্র-সৌখিন ছাঁদের ব্লাউশের 'প্যাটার্ণ' বা 'নক্সার' নমুনা সাদরে উপহার দিচ্ছি।

বাড়ীতে নিজের হাতে ছাট-কাট-সেলাই করে উপরের নক্সার ছাঁদে ব্লাউশ বানানো খুব একটা কঠিন কাজ নয়। সযত্নে একটু চেষ্টা করলেই সীবন-শিল্পানুরাগী মহিলারা অনায়াসেই সহজ-সরল অথচ সৌখিন-সুন্দর অভিনব ছাঁদের এই ব্লাউশটি তৈরী করতে পারবেন। 'আটপৌরে' হিসাবে বাড়ীতে নিত্য-ব্যবহারের চেয়ে, এই ধরণের সৌখিন ব্লাউশ, বাইরে কোথাও বেরুনোর সময় 'পোষাকী-হিসাবে যে আরো বেশী ব্যবহারোপযোগী হবে—সে কথা বলাই বাহুল্য। কারণ, সাধারণ সুতী-কাপড়ের চেয়ে রঙীনে-নক্সাদার দামী ও সৌখিন রেশমী কিম্বা জরীদার-ব্রোকেডের (Brocade-Cloth) কাপড়েই এমনি ধরণের ব্লাউশ অনেক বেশী সুন্দর ও মানানসই দেখাবে।

উপরের নক্সার ছাঁদে জরীদার-ব্রোকেড অথবা রঙীন রেশমী কাপড় দিয়ে এমনি সৌখিন ব্লাউশ বানানোর সময় পোষাকের গলায় ও দু'পাশের হাতার প্রান্তে মানানসই-ধরণের সরু কিম্বা চওড়া মাপের অন্য কোনো নক্সাদার জরীর 'পাড়' (Border) বা 'ফিতা' (Decorative Tape) বসিয়ে সেলাই করলে, পরিচ্ছদটি আরো বেশী মনোহর ও শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠবে। তবে যাঁরা ব্লাউশের গলার ও হাতার প্রান্তে এ-ধরণের জরীর-নক্সাদার সৌখিন 'পাড়' ব্যবহার করার পক্ষপাতী নন, তাঁরা অবশ্য এক্ষেত্রে নিজেদের পছন্দ-অনুযায়ী সাদাসিধা-ছাঁদের মানানসই কোনো রঙীন-রেশমী কাপড়ের 'ফিতা' বসিয়ে সেলাই করতে পারেন। সাদাসিধাভাবে শুধু রঙীন কাপড়ের 'পাড়' সেলাই করা ছাড়া আরেকটি উপায়েও পোষাকের সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলতে পারেন। সে উপায়টি হলো—এমনি ধরণের রঙীন-ফিতার উপরে মানানসই-রঙের রেশমী সুতো দিয়ে নক্সাদার এমব্রয়ডারীর কাজ করে ব্লাউশের গলার ও হাতার কিনারায় বিচিত্র-সৌখিন ছাঁদের 'পাড়' ফুটিয়ে তোলা। এ কাজটুকু সযত্নে এবং সুষ্ঠুভাবে করতে পারলে জামার জৌলুশ যে আরো বৃদ্ধি পাবে—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে ব্লাউশের গলার ও হাতার কিনারায় 'পাড়' বা 'ফিতা' বসানোর কাজটি অবশ্য নির্ভর করে সীবন-শিল্পীর ব্যক্তিগত-রুচি ও কলাজ্ঞানের উপর। কাজেই এ বিষয়ে কোনো বিশেষ-নির্দ্দেশ না দিয়ে মোটামুটিভাবে বলা চলে যে—ব্লাউশের কাপড়ের রঙ যদি হাল্কা-ধরণের হয়, তাহলে গাঢ়-রঙের 'পাড়' বা 'ফিতা' এবং গাঢ়-রঙের কাপড়ের উপর মানানসই-ধরণের কোনো হাল্কা-রঙের 'পাড়' বা 'ফিতা' ব্যবহার করাই সমীচীন।

বারান্তরে এমনি ধরণের আরো কয়েকটি অভিনব ছাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদের নক্সা-নমুনা প্রকাশ করার বাসনা রইলো।

—
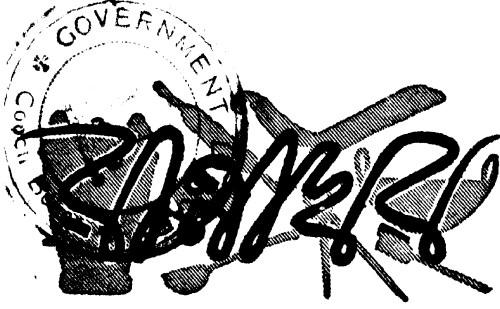
সুধীরা হালদার

শীতের মরশুমী-সব্জী ইদানীং বাজারে মিলছে। তাই এবারে অভিনব-প্রথায় শুধু সব্জী দিয়ে বানানো উত্তর-ভারতের অধিবাসীদের বিশেষ-প্রিয় ও পরম-মুখরোচক একটি নিরামিষ-খাবার রান্নার কথা বলছি। এ খাবারটির নাম—'সব্জী-কোর্ম্মা'। বাড়ীতে অতিথি-অভ্যাগত আর প্রিয়জনদের সাদর-আপ্যায়নের পক্ষে বিচিত্র-সুস্বাদু এই উত্তর-ভারতীয় রান্নাটি খুব উপযোগী হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। 'সব্জী-কোর্ম্মা' রান্নার উপকরণগুলি জোগাড় করা এমন কিছু দুঃসাধ্য বা ব্যয়বহুল ব্যাপার নয় এবং এর রন্ধন-পদ্ধতিও নিতান্ত সহজ-সরল···সামান্য চেষ্টা করলেই অনায়াসেই বাড়ীতে নিজের হাতে এ খাবার রান্না করা যাবে। উত্তর-ভারতীয় প্রথায় 'সব্জী-কোর্ম্মা' রান্নার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, আপাততঃ তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিচ্ছি। অর্থাৎ, এ খাবারটি রান্নার জন্য চাই—বেশ বড় এবং পুরুষ্টু একটি ফুলকপি, একপোয়া আলু, দুটি বীট্, একপোয়া কড়াই বা মটর শুঁটি, আধপোয়া পেঁয়াজকুচি এবং আন্দাজমতো পরিমাণে ঘি, দই, আদা, গরম-মশলা, কাঁচা বা শুকনো লঙ্কা, হলুদবাটা, নুন আর গোটাকয়েক তেজপাতা।

উপকরণগুলি জোগাড় হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে প্রথমেই বঁটি কিম্বা ছুরির সাহায্যে ফুলকপি, আলু আর বীট্ ছোট-ছোট টুকরো করে কুটে নিয়ে, সেগুলিকে জলে ধুয়ে সাফ করে সযত্নে পরিষ্কার একটি পাত্রে তুলে রাখুন। তারপর কড়াই বা মটর শুঁটির দানাগুলি ছাড়িয়ে ও জলে ধুয়ে নিয়ে সযত্নে আনাজের ঐ পাত্রে তুলে রাখুন। তাহলেই কুটনো-কোটার পালা শেষ হবে।

এবারে উনানের আঁচে ডেক্‌চি চাপিয়ে, সেই ডেক্‌চিতে আন্দাজমতো পরিমাণে ঘি দিয়ে পেঁয়াজকুচি ভেজে নিন। ফুটন্ত-ঘিয়ে ভাজার ফলে, পেঁয়াজকুচির রঙ আগাগোড়া বেশ বাদামী লাল হয়ে উঠলে, উনানের আঁচে বসানো রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে দই, নুন আর রান্নার মশলাগুলি মিশিয়ে 'মিশ্রণটিকে' কিছুক্ষণ ভালভাবে সাঁতলে নিন। এভাবে সাঁত্‌লানোর পর, উনানের আঁচে বসানো ডেক্‌চিতে সব্জীগুলি, অর্থাৎ ফুলকপি আলু আর বীটের টুকরোগুলিকে ছেড়ে, হাতা বা খুন্তীর সাহায্যে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে সব্জীর টুকরো-গুলিকে রান্নার মশলার সঙ্গে আগাগোড়া মিশিয়ে ফেলুন। রান্নার মশলার সঙ্গে সব্জীর টুকরোগুলি আগাগোড়া বেশ পরিপাটিভাবে মিশে একাকার হয়ে গেলে, রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে জল মেশান এবং সেই সঙ্গে গোটাকয়েক কাঁচা অথবা শুকনো লঙ্কা ছেড়ে দিয়ে তরকারীটিকে কিছুক্ষণ উনানের আঁচে রেখে ভাল করে সিদ্ধ করে নিন।

তরকারীটি আগাগোড়া বেশ সুসিদ্ধ হয়ে যাবার পর, অল্প-অল্প ঝোল থাকতেই উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্র নামিয়ে ফেলুন এবং ডেক্‌চির ভিতরে আন্দাজমতো পরিমাণে অল্প একটু গরম-মশলার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে পাত্রের মুখটি ঢাকা চাপা দিয়ে বন্ধ করে রাখুন। তাহলেই উত্তর-ভারতীয় প্রথায় 'সব্জী-কোর্ম্মা' রান্নার কাজ শেষ হবে।

এবারে প্রিয়জনদের পাতে বিচিত্র-মুখরোচক এই 'সব্জী কোর্ম্মা' খাবারটি সযত্নে পরিবেষন করুন···আপনার হাতের রান্না অভিনব সুস্বাদু এই খাবার খেয়ে তাঁরা যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন—সে কথা বলাই বাহুল্য।

আগামী সংখ্যায় এই ধরণের আরেকটি নতুন খাবার রান্নার হদিশ দেবার ইচ্ছা রইলো।

নেকড়ের ডাক

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

[এ গল্পের রচয়িতা হেক্টর হিউ মুনরো। সাহিত্যক্ষেত্রে ইনি সাকি (Saki) ছদ্মনামে পরিচিত। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বর্মা দেশের আকিয়াব শহরে এঁর জন্ম হয়। বর্মার পুলিস বিভাগে কিছুকাল কাজ করার পর ইনি সাংবাদিকের বৃত্তি অবলম্বন করেন। Morning Post, Bystander, Westminster Gazette প্রভৃতি পত্রিকার ইনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। ছোট গল্প রচনায় ইনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। আখ্যানবস্তুর অভিনবত্বে ও সরল বর্ণনার গুণে এঁর প্রত্যেকটি গল্প উপভোগ্য। এঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে Tbe Westminster Alice, Not So Stories, When William Came ও The Rise of the Russian Empire বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইনি সৈন্যদলে যোগদান করেন এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে শত্রুপক্ষের আক্রমণে নিহত হন।]

"তোমাদের এই দুর্গ সম্বন্ধে কোন প্রাচীন কাহিনী প্রচলিত আছে কি?" ভগ্নীকে লক্ষ্য ক'রে উৎসাহব্যঞ্জক স্বরে প্রশ্ন করে কনরাড, কিন্তু ব্যবসায়ী হলেও তার মধ্যে আছে এক কবিসুলভ ভাবপ্রবণতা যা তাদের বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন পরিবারে একান্ত বিরল।

কনরাডের প্রশ্নে ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে মুখটা বিকৃত করেন স্থূলদেহা ব্যারনেস গ্রুয়েবল্। তারপর একটু গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলেন, "এই সব প্রাচীন অট্টালিকা সম্বন্ধে নানা কাহিনী শুনতে পাবে লোকের মুখে। এগুলো রচনা করতে বিশেষ উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজন হয় না আর এতে অর্থব্যয়ও হয় না কা'রো। এই দুর্গ সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী আছে যে, যখনই এখানে কারও মৃত্যু হয় তখনই গাঁয়ের সমস্ত কুকুর এবং জঙ্গলের যত সব বন্য পশু সারা রাত চীৎকার করে। সে চীৎকার যে কানে মধু বর্ষণ করে না একথা অবশ্য বলাই বাহুল্য।"

"কিন্তু ঐ চীৎকারে যে অলৌকিক রহস্যময়তা রয়েছে তার একটা আকর্ষণ আছে বৈকি", প্রতিবাদের সুরে বলে কনরাড।

"সে যাই হোক, ঐ কিম্বদন্তীর মধ্যে সত্যতা নেই এতটুকু," শান্তস্বরে বলেন ব্যারনেস, "এই দুর্গ কেনার পর আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে ঐ সমস্ত কিছুই ঘটে না। গত বছর বসন্তকালে যখন আমার বৃদ্ধা শাশুড়ী মারা যান তখন আমরা ঐ আওয়াজ শোনবার জন্য কান খাড়া ক'রে ছিলাম, কিন্তু কিছুই শুনতে পাই নি। ওটা নিছক কাহিনী, প্রাচীন দুর্গটির শুধু গৌরব বৃদ্ধি করেছে।"

"কাহিনীটি আপনি যেভাবে বর্ণনা করলেন ঠিক তেমনটি নয়", মন্তব্য করেন বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রী আমালি।

সকলে তাঁর দিকে তাকায় বিস্ময়ের সঙ্গে। আমালি বরাবরই চুপ করে বসে থাকেন টেবিলের এক ধারে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা না করলে কথা বলেন না তিনি—তাঁর সঙ্গে কথা বলার আগ্রহও দেখা যায় না কা'রও। আজ হঠাৎ যেন এক প্রগল্ভতা পেয়ে বসেছে তাঁকে। ঈষৎ উত্তেজিতভাবে তিনি কথা বলতে থাকেন—দ্রুত আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বর, দৃষ্টি শূন্যের দিকে নিবদ্ধ।

"এই দুর্গে যে কেউ মারা গেলে ঐ চীৎকার শোনা যাবে এ ধারণা করা ভুল। সারনোগ্রাৎস্ পরিবারের কেউ যদি এখানে মারা যায় তবেই দূর দূরান্তর থেকে নেকড়ের দল এসে মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বে চীৎকার শুরু করে জঙ্গলের ধারে। এখানকার জঙ্গলে মাত্র কয়েকটি নেকড়ের বাসা

আছে, কিন্তু জঙ্গলের রক্ষকেরা বলে যে ঐ সময় চতুর্দ্দিক থেকে দলে দলে নেকড়ে এসে হাজির হয় জঙ্গলে এবং এক সঙ্গে চেঁচাতে থাকে। আর দুর্গে ও গ্রামে যত কুকুর আছে, নেকড়ের ডাক শুনে তারাও চীৎকার শুরু করে দেয় ভয়ে ও রাগে। মুমূর্ষু ব্যক্তির আত্মা যেই তার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যায় অমনি পার্কে একটা গাছ ভেঙে পড়ে মড় মড় করে। সারনোগ্রাৎস্ বংশের কেউ তাদের এই পারিবারিক বাসভবনে মারা গেলে এ সমস্ত অলৌকিক ব্যাপার ঘটে, কিন্তু অপর কেউ যদি এখানে মারা যায় তাহলে নেকড়ের ডাকও কেউ শুনতে পাবে না, গাছও ভেঙে পড়বে না পার্কে। না, ঐ সমস্ত কিছুই ঘটবে না।"

শেষের কথা কয়টি বলার সময় তাঁর কণ্ঠস্বরে যুগপৎ গর্ব্ব ও ঘৃণার ভাব ফুটে ওঠে। বার্দ্ধক্যপীড়িতা শীর্ণদেহা শিক্ষয়িত্রীর পানে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল বিলাসিনী ধনগর্ব্বিতা ব্যারনপত্নী। বৃদ্ধার স্পর্দ্ধা দেখে বিস্মিত হন তিনি।

"সারনোগ্রাৎস পরিবার সম্পর্কে অনেক কিছুই তুমি জানো দেখছি, ফ্রাউলিন শ মিড," বিদ্রূপের সুরে বলেন ব্যারনেস, "আমি জানতাম না যে ঐ সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশের ইতিহাস সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্য আছে তোমার।"

ব্যারনপত্নীর এই ব্যঙ্গোক্তির জবাবে বৃদ্ধা যা বললেন তা একান্ত অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর।

"আমি সারনোগ্রাৎস বংশের মেয়ে—সেই জন্যই ও বংশের ইতিহাস সবই আমার জানা," শান্তকণ্ঠে বলেন বৃদ্ধা।

"অ্যাঁ! সারনোগ্রাৎস বংশের মেয়ে তুমি। তুমি!" সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে অবিশ্বাসের সুরে।

"আমরা যখন অত্যন্ত দরিদ্র হয়ে পড়লাম," ধীরকণ্ঠে বৃদ্ধা বলতে থাকেন, "এবং জীবিকা অর্জ্জনের জন্য শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিতে হল আমায়, তখন অন্য নাম গ্রহণ করলাম আমি। ভাবলাম, আসল নাম গোপন ক'রে অন্য নাম নেওয়াই উচিত হবে আমার পক্ষে। আমার পিতামহ দীর্ঘকাল এই দুর্গে অতিবাহিত করেছিলেন এবং পিতার মুখে এই দুর্গ সম্বন্ধে অনেক গল্পই আমি শুনেছি। মানুষের জীবনে স্মৃতি ছাড়া যখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না তখন সেই স্মৃতিটুকুই সে সযত্নে লালন করে অন্তরের মধ্যে। আপনাদের পরিবারে কাজ নেবার সময় আমি ভাবতেই পারি নি যে একদিন আপনাদের সঙ্গে আমায় আসতে হবে আমাদেরই পরিবারের প্রাচীন আবাসে। এখানে যদি না আসতে হত তাহলে বোধ করি মনে মনে খুশিই হতাম আমি।"

বৃদ্ধার কথা শেষ হবার পর সকলে চুপ করে থাকে। পারিবারিক ইতিহাসের আলোচনা ত্যাগ ক'রে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন ব্যারনপত্নী। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে শিক্ষয়িত্রী নিঃশব্দে অন্যত্র চলে যাবার পর আবার একটা ঘৃণা ও অবিশ্বাসের প্রবল কলরব ওঠে।

"এ নিতান্ত ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কিছু নয়," বেশ একটু উষ্মার সঙ্গে মন্তব্য করেন ব্যারন, "আমাদের সামনে ঐ ধরণের কথা বলবে সামান্য একজন স্ত্রীলোক এ আমি ভাবতেই পারি না। ও যেন বলতে চায় আমরা অতি তুচ্ছ, সামাজিক পদমর্যাদা আমাদের কিছুই নেই। ওর একটা কথাও বিশ্বাস করি না আমি। ও কখনোই সারনোগ্রাৎস বংশের মেয়ে নয়—ও সত্যই শ্‌মিড—তার অতিরিক্ত কিছু নয়। নিশ্চয়ই ও স্থানীয় কৃষকদের মুখে প্রাচীন সারনোগ্রাৎস পরিবারের কাহিনী শুনেছে আর এখানে সেই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ক'রে নিজেকে ঐ পরিবারের মেয়ে বলে দম্ভ করে গেল।"

"ও যে অভিজাত পরিবারের মেয়ে এই কথাটা জানানো ওর উদ্দেশ্য," গম্ভীর মুখে বলেন ব্যারনেস, "ও যে আর বেশীদিন কাজ করতে পারবে না তা ও জানে, তাই আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে

ওর পিতামহ নাকি এই দুর্গে বাস করতেন। সত্য হলেও এ কথা আবার কেউ বলে নাকি? আমারও তো পিতামহ ছিলেন, কিন্তু কৈ, তাঁর ঐশ্বর্য্যের কথা তুলে কোনদিন গর্ব্ব করিনি আমি।"

"আমার মনে হয় ওর পিতামহ এই দুর্গে পাকশালার ভৃত্য ছিল," বিদ্রূপের সুরে বলেন ব্যারন, "ওর গল্পের এই অংশটুকু হয়তো সত্য।"

কনরাড চুপ করে থাকে, কোনো মন্তব্য করে না বৃদ্ধা যখন অতীতের স্মৃতিকে অন্তরে লালন করার কথা বলছিলেন তখন তাঁর চোখে অশ্রু দেখেছিল সে। হয়তো

বা কল্পনাপ্রবণ বলে সে শুধু অনুমান করেছিল বৃদ্ধার চোখে অশ্রু টলটল করছে।

"নববর্ষের উৎসব শেষ হলেই আমি ওকে জানিয়ে দেব ওকে আর আমাদের প্রয়োজন নেই," ব্যারনেস বলেন বিরক্তির সুরে, "এখনই ওকে বিদায় দেওয়া সম্ভব হবে না, কারণ উৎসবের সময় একা সব কাজ তদারক করা কষ্টকর হবে আমার পক্ষে।"

কিন্তু কষ্টকর হলেও একাই তাঁকে উৎসবের সময় সব কিছু তদারক করতে হল, কারণ ক্রিষ্টমাসের পর এমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ল যে বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং ঘরের বাইরে আসার সামর্থ্য রইল না তাঁর।

নববর্ষ উৎসবের পূর্ব্বে, একদিন সন্ধ্যায় অতিথিরা যখন অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে বসে আরাম উপভোগ করছেন সেই সময় ব্যারনেস হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

"কী বিরক্তিকর ব্যাপার বলুন দেখি।" ব্যারনেস বলেন অতিথিদের লক্ষ্য ক'রে, "ফ্রাউলিন এখানে আসা অবধি একদিনও ওকে অসুস্থ হতে দেখিনি আর আজ ও এমনি অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে কোন কাজ করবার সামর্থ্যই ওর নেই। বাড়ি এখন অতিথিতে ভরে গেছে, নানাভাবে ও আমায় সাহায্য করতে পারত, কিন্তু এই সময়ে ও কিনা অসুখ বাধিয়ে বসল। অবশ্য বেচারীর জন্য দুঃখ হয় আমার, ভারী দুর্ব্বল ও শীর্ণ হয়ে পড়েছে, কিন্তু আমিই বা একা সামলাবো কি করে? এ যে কী বিরক্তিকর তা বলতে পারি না।"

"সত্যিই এ অত্যন্ত বিরক্তিকর," সহানুভূতির সুরে বলেন ব্যাঙ্কারের স্ত্রী, "আমার মনে হয় ঠাণ্ডার দরুণ বৃদ্ধা কাবু হয়ে পড়েছে। এ বছর শীতটা পড়েছে প্রচণ্ড রকমের।"

"ওর বয়সটাও তো কম নয়—এই বয়সে এরকম ঠাণ্ডা ও সহ্য করবে কেমন করে? কয়েক সপ্তাহ আগেই ওকে বিদায় দিলে ভাল করতাম—অসুখ হবার আগেই তাহলে ও চলে যেত এখান থেকে।.. ওয়াপ্পি, কী হল রে তোর? হঠাৎ এমন করছিস কেন?"

লোমে ঢাকা ছোট্ট কুকুরটা হঠাৎ চেয়ারের ওপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে সোফার নীচে আশ্রয় নেয় অত্যন্ত ভয়ার্ত্তের মত। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দুর্গ প্রাঙ্গণ থেকে একসঙ্গে অনেকগুলি কুকুর ডেকে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে দূর পল্লী থেকেও অন্যান্য কুকুরের ডাক ভেসে আসে।

"কুকুরগুলো হঠাৎ চেঁচাতে শুরু করল কেন?" জিজ্ঞাসা করেন ব্যারন।

উপস্থিত সকলে কান খাড়া করতেই শুনতে পায়, বিলাপের সুরে একটানা একটা তীক্ষ্ণ গর্জ্জন বাতাসে ভেসে আসছে। ঐ গর্জ্জন শুনেই ভীত ও ক্ষিপ্ত হয়ে কুকুরগুলো চীৎকার শুরু করেছিল। আওয়াজটা কখনও স্পষ্ট, কখনও মৃদু—কখনও মনে হচ্ছে বহুদূর থেকে আসছে পাহাড় প্রান্তর পেরিয়ে, কখনও বা মনে হচ্ছে অতি নি ট থেকে—যেন দুর্গপ্রাচীরের তলদেশে গর্জ্জন করছে কারা। শীতার্ত্ত বনভূমির যাবতীয় দুঃখক্লেশ, ক্ষুধিত বন্য পশুর অসহায় কাতরতা, রিক্ত প্রকৃতির যা কিছু মর্ম্মবেদনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে ঐ বেদনার্ত বিলাপের মধ্যে।

"নেকড়ে বাঘ! নেকড়ে বাঘের ডাক।" চেঁচিয়ে ওঠেন ব্যারন। সঙ্গে সঙ্গে নেকড়ে বাঘের ঐকতান প্রচণ্ড আবেগে ফেটে পড়ে যেন। চতুর্দ্দিক থেকে একটানা ঐ ভয়ার্ত্ত বিলাপ দুর্গপ্রাচীরের গায়ে আছড়ে পড়তে থাকে।

"হাঁ, নেকড়ের ডাকই বটে। শত শত নেকড়ে একসঙ্গে ডাকতে শুরু করেছে।"—উচ্ছ্বসিত আবেগে চেঁচিয়ে ওঠে কনরাড। কল্পনার আবেশে চোখদুটো তার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

হঠাৎ ব্যারনেস উঠে দাঁড়ান চঞ্চলভাবে। ভুলে যান অতিথিদের আপ্যায়নের কথা। ব্যস্তভাবে এগিয়ে যান বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রীর নিরানন্দ সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠের দিকে। শীতের রাতেও জানলাটা খোলা রয়েছে। সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বৃদ্ধা শুয়ে আছেন তাঁর রোগশয্যায়। খোলা জানলার দিকে দৃষ্টি পড়তেই ব্যারনেস শশব্যস্তে এগিয়ে আসেন জানলাটা বন্ধ করতে।

"বন্ধ ক'রো না—জানলা খোলাই থাক," বৃদ্ধা বলেন গম্ভীরভাবে। কণ্ঠস্বরের দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও এমন একটা আদেশের সুর ধ্বনিত হয় তাঁর কণ্ঠে যা ব্যারনেসের কাছে সম্পূর্ণ অভিনব।

"কিন্তু ঠাণ্ডায় তুমি যে মারা পড়বে!" প্রতিবাদ করে ব্যারনেস।

"মৃত্যু কেউ আমার ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না," ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে বলেন বৃদ্ধা, "আমি ওদের সঙ্গীত শুনতে চাই। দূর দূরান্তর থেকে ওরা এসেছে আমাদের পরিবারের মৃত্যু-সঙ্গীত গাইবার জন্য। ওরা যে এসেছে এতে আমার মন আনন্দে ভরে গেছে। আমিই সারনোগ্রাৎস্ পরিবারের শেষ প্রতিনিধি যে আমাদের এই প্রাচীন দুর্গে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। ওরা এসেছে আমাকে ওদের সঙ্গীত শোনাতে। শোনো, ঐ ওরা ডাকছে। কী মধুর, আবেগময় ওদের ডাক!"

শীতের রাত্রির নিস্তব্ধতার মাঝে নেকড়েদের চীৎকার ক্রমশঃ তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং দুর্গপ্রাচীরের চারিদিকে ভাসতে থাকে মর্ম্মভেদী করুণ বিলাপের সুর। বৃদ্ধা সে চীৎকার শুনতে থাকেন তন্ময় হয়ে—তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে তাঁর মুখে।

"চলে যাও এখান থেকে।" ব্যারনেসকে লক্ষ্য করে দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বলেন, "আমি এখন আর নিঃসঙ্গ নই। এক প্রাচীন অভিজাত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত আমি··· আমাদের পরিবারের অনেকেই এখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে···তারা সবাই রয়েছে আমার চারপাশে···"

"আমার মনে হয় বৃদ্ধার শেষ সময় উপস্থিত," অতিথি-দের সঙ্গে মিলিত হবার পর বিষণ্ন মুখে বলেন ব্যারনেস, "এখনই একজন চিকিৎসককে আনা দরকার।···ওঃ, ঐ ভয়ঙ্কর চীৎকারে দেহের রক্ত হিম হয়ে আসে। প্রচুর অর্থের বিনিময়েও ওরকম মৃত্যু-সঙ্গীত কামনা করি না আমি।"

"অর্থের বিনিময়ে ঐ সঙ্গীত পাওয়া যায় না," আবেগ-পূর্ণ কণ্ঠে মন্তব্য করে কনরাড।

"ওটা আবার কিসের শব্দ?" চমকে উঠে প্রশ্ন করেন ব্যারন।

দুর্গ সংলগ্ন পার্কে মড় মড় শব্দে একটা প্রকাণ্ড গাছ ভেঙে পড়ে।

এক মুহূর্ত্ত সকলে নির্ব্বাক হয় থাকে—যেন কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে তারা। তারপর ব্যাঙ্কারের স্ত্রী যেন কতকটা আত্মস্থ হয়ে বলেন, "প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দরুণই গাছ ভেঙে পড়ছে। ঠাণ্ডার দাপটেই নেকড়ে বাঘের দল গর্ত্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। এমন ভয়ঙ্কর শীত অনেক-কাল আমরা দেখিনি।"

শীতের প্রকোপই যে ঐ সমস্ত অদ্ভুত ঘটনার জন্য দায়ী ব্যারনেস তা মেনে নেন আগ্রহের সঙ্গে। বৃদ্ধার মৃত্যুর কারণও নিশ্চয়ই শীতের আধিক্য। খোলা জানলা দিয়ে হিম এসেই বেচারীর হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন স্তব্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু সংবাদপত্রে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল তাতে দেখা গেল গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি:

২৯শে ডিসেম্বর শ্লস্ সারনোগ্রাৎস দুর্গে আমালি ফন সারনোগ্রাৎস দেহত্যাগ করেছেন। দীর্ঘকাল তিনি ব্যারন ও ব্যারনেস গ্রুয়েবলএর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

এ দেশ আমার

শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়

না আমি দেব না তোকে, এ দেশ এ মাটি
না আমি দেব না তোকে এ মাটি আমার
আমার অজস্র রক্তে এই কথা খাঁটি
এ দেশ আমার গর্ব, এ দেশ সোনার।

কে তুই নির্মম লোভী দু'হাত বাড়াস
এখানে কঠিন পণ অযুত সেনার
মিলিত অযুতকণ্ঠে এখানে আকাশ
মুখর নেশায় কাঁপে, শপথে সোচ্চার।

না আমি দেব না মা তোর এই অটল সম্মান
রাখবো দু'হাতে দৃঢ়, অবিচল অনঢ় বিশ্বাসে
বরং আমরা এই যৌবনের রক্ত দেব দান
তবুও 'আমার দেশ' বলে যাবো অন্তিম নিশ্বাসে।

চতুরাশ্রম

সমীর চট্টোপাধ্যায়

উচ্ছিষ্টের ওপর আঁকড়ে ধরা একঝাঁক মাছির মত ছেলেকটা ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল জিনিষটার ওপর। গুণতিতে অনেকগুলো। নানা বয়সের। নানা মাপের। চেহারাও নানা ভাবের। কোনটা রোগা হ্যাংলা, হাড় জিরজিরে বেমানান। ওরই ভেতর কোনটা একটু চলনসই গোছের।

ঝণাৎ করে কি একটা পড়ল গড়িয়ে মেঝের ওপর। ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গেল।

আপাদ মস্তক ঢাকা দেয়া জীর্ণ আর ময়লা কাঁথাটা মুখ থেকে একটু ফাঁক করে এক চমক দেখে নিলেন উমাপতি। একখানা কাঁচের পুরোনো প্লেট ভাঙ্গল। ভাঙ্গা প্লেটের টুকরোগুলো মেঝেয় ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। কুঁচো কুঁচো সাদা রঙের কাঁচের গুঁড়ো।

চোখ পিটপিট করে সেই দিকে চেয়ে রইলেন উমাপতি কিছুক্ষণ। কাল সন্ধ্যে বেলাতেও তিনি ওটাতে করে মুড়ি খেয়েছিলেন। আর এই একদিনের মধ্যে ভেঙ্গে শেষ করে দিলে হতভাগারা জিনিষটাকে।

ছেলেগুলোর ভ্রুক্ষেপ নেই। এখনও ওরা ওদের নিজেদের কাজে ব্যস্ত। একসংগে জড়াজড়ি করে কি একটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। ওই অমূল্য জিনিষটা কি! দেখবার চেষ্টা করলেন উমাপতি। বিছানার-ওপরে উঠে বসলেন। কাঁথাটা রেখে একখানা পুরণো-রঙচটা-সুজনী ছিল, সেটা গায়ে জড়িয়ে নিলেন। শীতটা বেশ জাকিয়ে পড়েছে এ'বছর। শীতের সময় আর হাত পা আসেনা। মেলতে পারেন না।

ঘরে ঘড়ি নেই। কটা বাজলো কে জানে। বাইরের দিকে দেখলেন উমাপতি। বেশ রোদের তেজ ফুটে গেছে। পূবের জানলাটা দিয়ে এক চিলতে ধারাল রোদ এসে পড়েছে ঘরের মেঝেয়। এই রোদের পরিমাপ দেখে সময়টা নিরূপণ করেন উমাপতি। তাঁর ঘরের এই ছোট জানলাটা দিয়ে বছরের সব সময়েই সকালের প্রথম রোদটা এসে পড়ে। কেবল ঋতুভেদে এধার ওধার হয়। এই এক টুকরো আলো ছাড়া আর চারদিক চাপা। সামান্য বাতাসও আসেনা।

বস্তির মধ্যে এই বাড়ীটাতে বহু দিন ধরে বাস করছেন উমাপতি। ভাড়া বাড়ী। ভাড়াটা সাবেকী রেটেই চলে আসছে। বাড়ীওলা অনেক চেষ্টা করেছে ভাড়া বাড়াবার, ভাড়াটে উচ্ছেদের। কিন্তু পুরণো লোক বলে পেরে ওঠেনা।

এখন আর বাড়ী বদলের কোন প্রশ্ন ওঠেনা। আগে হলেও সম্ভব ছিল। তখন চাকরী ছিল। সরকারী আপিসের ডেস্প্যাচিং ক্লার্ক তখন কম বেশী যা হোক মাস মাইনেটা বাঁধা ছিল। এখন পেনসন ভরসা। মাইনের অর্দ্ধেক টাকাও নয়। বাকি কটাদিন এই বাড়ীতেই কাটাতে হবে উমাপতিকে।

ছেলেগুলো একটা আর একটার ঘাড়ে উঠেছে। আঁচড়া কামড়ী করছে। মারপিট শুরু হয়ে গেছে এবার।

অন্দরের উদ্দেশে ডাক দিলেন উমাপতি। প্রথমে বড় ছেলের নাম ধরে। কোন সাড়া এলনা। বড় ছেলে যদুপতি অল্প মাইনেতে কাছেই একটা কারখানায় কাজ করে। আজ ওদের ছুটির দিন। সকালেই কোথায় বেরিয়ে গেছে। আজ আর তার পাত্তা মিলবে না। এমনিতেই মেলেনা। মাসের শেষে কেবল মাইনের টাকাটা এনে দেয় বাপের হাতে। প্রথম পক্ষের ছেলে যদুপতি। আর একটা মেয়ে করুণা। বিয়ের যোগ্য হয়ে গেছে

অনেকদিন। এখন বিগত-যৌবনা সৌন্দর্য-ঝরা চেহারা। অনেক চেষ্টা করেছেন উমাপতি। কিন্তু টাকায় আট্‌কেছে বরাবর। এখন আর সে প্রশ্নও ওঠেনা। মেয়ের দিকে এখন আর তাকান না উমাপতি। চোখ ঘুরিয়ে থাকেন।

কাছের একটা স্কুলে সেলাই শেখে করুণা। নিজের ভবিষ্যতের সংস্থান।

এবার স্ত্রী সুলতার উদ্দেশে ডাক দিলেন উমাপতি। এবারও কোন সাড়া নেই। কেবল ওপাশের রাস্তার কল থেকে অবিরাম জল পড়ার শব্দ ভেসে আসছে।

আবার ঘরের মেঝের দিকে মন দিলেন উমাপতি। ভাঙ্গা কাঁচগুলো দেখছেন। সাদা সাদা গুঁড়ো ছড়িয়ে আছে। অনেকটা হাড়ের গুঁড়োর মত। মানুষের হাড়। উমাপতির মত মানুষের। সারা জীবনের অমানুষিক পরিশ্রমে ক্ষয়ে যাওয়া হাড়ের গুঁড়ো। ফসিল।

এবার সাড়া দিল করুণা। উমাপতির বড় মেয়ে।

এই মেয়েটাই একটু কথা শোনে। তবু এরই একটা ব্যবস্থা করতে পারলেন না তিনি।

উমাপতি জিগ্যেস করলেন,—চা হয়েছে ?

—হাঁ বাবা, অনেকক্ষণ, তুমি ওঠোনি বলে দেয়া হয়নি।

—অঃ! গম্ভীর হয়ে গেলেন উমাপতি। মেজাজটা হঠাৎ বিগ্‌ড়ে গেল। তক্তাপোষ ছেড়ে নেমে পড়লেন। সুজনীটা গায়ে জড়ানো আছে। এবার ঝুঁকে পড়লেন ছেলেগুলোর দিকে। একটার গায়ে আর একটা লেপ্‌টে আছে। গুঁতোগুঁতি চলছে।

—আই—আই—হতভাগা জানোয়ার কোথাকার সব!—ওঠ, যা এখান থেকে!

কোন ভ্রূক্ষেপ করল না ওরা। সমানে মারপিট চলেছে। একটা এবার উঠে কাঁদতে কাঁদতে একপাশে সরে দাঁড়াল। এবার একটু পৃথক হয়েছে জটলাটা। ঝাঁকটা ভেঙ্গে গেছে। ওদের শরীরের ফাঁক দিয়ে নিজের ঘুম-জড়ানো চোখ দুটো চালিয়ে দিলেন উমাপতি কিন্তু বস্তুটা একজনের মুঠোর মধ্যে।

এক ঝটকায় সবকটাকে সরিয়ে ছেলেটার মুঠো ধরে সজোরে নাড়া দিলেন। কাঁকড়ার ঠ্যাঙের মত সরু আর শক্ত হাত আঁকড়ে আছে।

দু'পক্ষেই জেদ চেপেছে। শেষে অনেক কসরতের পর, মুঠো আল্‌গা হয়ে ঘরের মেঝের ওপর পড়ল বস্তুটা। ঠক্‌ করে অস্পষ্ট শব্দ হল। বস্তুটা হাতে করে তুলে নিলেন উমাপতি। একটা শ্লেট পেন্‌সিলের টুক্‌রো!

হতভাগারা! বেল্লিক কোথাকার! সামান্য জিনিষটা নিয়ে এতক্ষণ কি রেসারেসি! মল্লযুদ্ধ! এরপর বড় হয়ে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে যে খুনোখুনি করবে তাতে আর সন্দেহ কি!

কথাটা ভাবলেন উমাপতি। কিন্তু শঙ্কিত হলেন না। সম্পত্তি কিছু নেই উমাপতির। সুতরাং—

ওদের স্বোপার্জিত অর্থে যা খুসী হয় করবে, তাতে বাধা দিতে যাবেন না তিনি। আর তখন তিনি থাকবেনও না।

দ্বিতীয় পক্ষের আটটি আবার গোলমাল শুরু করেছে। উমাপতিকে ঘিরে ধরেছে চারদিক থেকে। মাঝখানে উমাপতি চক্রব্যূহের মধ্যে বন্দী অভিমন্যু। বস্তুটা নেবার জন্য সকলেরই আপ্রাণ চেষ্টা। যে ছেলেটার মুঠোয় ছিল, সেও কাঁদতে কাঁদতে ঘিরেছে এসে উমাপতিকে। ষোলটা হাত এগিয়ে এসেছে উমাপতির দিকে।

ভাবলেন উমাপতি। জিনিষটা দেখলেন। পরিমাপ কষলেন মনে মনে। আট ভাগ করলে দস্তুর মত মিলি-মিটার ডেসিমিটারের ব্যাপার। তারচেয়ে কাউকেই দেবেন না। তাহলেই মিটে যাবে। টুকরোটা হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে পা বাড়ালেন। পেছনে ঝাঁক বেঁধে ছুটে এল ছেলেগুলো, চিৎকার করতে লাগল।

এ চিৎকারে অভ্যস্ত উমাপতি। নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

কলতলায় নেমে মুখে-চোখে একটু জল দিলেন উমাপতি। পাশে একটুকরো জায়গা টিন দিয়ে ঘেরা। রান্নাঘর। উঁকি মেরে দেখলেন, উনুনে কি একটা ফুটছে। ঘরে কেউ নেই। পেছনের দরজা ঠেলে করুণা এসে দাঁড়াল।

—বৌমণি কোথায়? জিগ্যেস করলেন উমাপতি।

—হারাণ কাকার বোয়ের সঙ্গে কথা কইছেন। গাটা যেন জ্বালা করে উঠল উমাপতির। সক্কাল বেলাতেই মজলিশ বসে গেছে!

—চা-টা দিবি-টিবি নাকি ?

—একটু যে দেরি হবে বাবা। তুমি ঘরে গিয়ে বসো, —আমি তৈরি করে নিয়ে আসছি।

—যদু কোথায় ?

—দাদা সক্কাল বেলাতেই কোথায় গেছে।

—হুঁ !

—তোমাকে বাজারে যেতে হবে বাবা।

—সে তো রোজই হয়, আজ আবার নতুন কি ! আর কথা বাড়ালেন না উমাপতি। থলিটা আর পয়সাগুলো নিয়ে, পায়ে ছেঁড়া চটিটা গলালেন। গায়ে কিছু দেবার দরকার হবে না মোটা সুজনীটা রয়েছে।

গলির মোড়ে গোটা দু'তিন চায়ের দোকান। ছোট-বড় মাঝারি। বড় আর মাঝারিতে ঢোকেন না উমাপতি। ছোট মানুষ। ছোট দোকানই ভাল। দামও ছোট। কথাবার্তাও ছোট। বাইরে একটা বেঞ্চ পাতা থাকে। চা না খেলেও অনেক সময় ওটাতে বসেন উমাপতি। আসতে যেতে পড়ে দোকানটা। দু' একটা কথা বলেন এখানে এসে পাঁচজনের সঙ্গে। আজ অবশ্য তিনি চা খাবেন।

এক ভাঁড় ধোঁয়া-ওঠা গরম চা নিয়ে বেশ করে গুছিয়ে বসলেন উমাপতি। ঠাণ্ডায় ভাঁড়ের গরম চায়ের বাষ্পটার ঘ্রাণ বেশ আরামদায়ক।

সামনের রাস্তা দিয়ে লোকজনের আনাগোনা। সত্য-কিঙ্করবাবু চলে গেলেন। একবার আড়চোখে দেখলেন উমাপতি। বড় রাস্তার ওপর বাড়ী সত্যকিঙ্করের। সদাগরী আপিসে কাজ করতেন। এখন মোটা টাকা নিয়ে রিটায়ার করেছেন। দেখা হলেই বলেন, একটু আগেই বেরিয়ে এলুম হে উমা ! না হলে এ'ত আমার বিফোর-টাইম। সাহেবরা বললে সব পুরণো স্টাফ্‌দের। —তা আমরা রাজি হলুম। ভলান্টারিলি বুঝলে না ? মোটা টাকা পেয়ে গেলুম, আর দরকারই বা কি জোয়ালে লেগে থেকে। ওরাও অনেকে চলে গেল বিলেতে।

উমাপতি শুনে যান।

সত্যকিঙ্কর বলেন। সংসারের ভার ছেলেদের দিয়েছি। মেয়েদের সব বিয়ে হয়ে গেছে। এখন তো আমার বান-প্রস্থ আর সন্ন্যাসের সময় কি বল হে উমা ?

উমাপতি আর কি বলবেন।

সত্যকিঙ্করবাবু সন্ন্যাস নিয়েছেন। তবু ধব্‌ধবে সাদা কাঁচি ধুতি আর কাশ্মীরী শাল গায়ে দিয়ে বড় বাজারে থলিটা হাতে নিয়ে বাজার যান। পরিপাটি করে বাজার করেন। দরে বাধে না। চড়া দাম দিয়ে মাছ কেনেন।

চা-টা শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, তবু একটু দেরি করলেন উমাপতি। ইচ্ছে করেই করলেন, নাহলে সত্য-কিঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজার করার সাধ্য তাঁর নেই।

পরিমাণে একটু বেশী জিনিষ কিনতে হয় উমাপতিকে। তাই ভাল আর দামি জিনিষ কিনতে পারেন না। খাবার লোক অনেক। সস্তার জিনিষ একটু বেশী করে কিনতে হয়। দু'পক্ষ মিলিয়ে গুটি দশেক ছেলে মেয়ে উমাপতির।

রোদের তেজ এবার গায়ে ফুটছে। সকালের আরাম-দায়ক সুজনীটা আর গায়ে রাখা যায় না। বাজারটা উঠানে নামিয়ে ঘরে চলে গেলেন। সুজনীটা রেখে দিলেন বিছানায়।

ইতিমধ্যে বোধ হয় দ্বিতীয় পর্ব চা হয়ে গেছে উমা-পতির অনুপস্থিতিতেই। ছেলের পাল চায়ের বাটি নিয়ে কলরব শুরু করে দিয়েছে। ঘরের মেঝেয় মুড়ি ছড়ানো। কোথাও শুকনো চায়ের প্যাচ্‌প্যাচানি।

—হারামজাদা ! বেল্লিকগুলো, ঘরখানাকে গোয়াল করে রেখেছে। দাঁতে দাঁত চেপে গজরালেন উমাপতি। সককাল থেকেই গেলার ধুম।

—আই ! আই ! হয়েছে, এবার একটু বই নিয়ে বসো ! আমার মাথা কেনো !

উমাপতির কোন কথাই গ্রাহ্য করেনা ছেলেগুলো। দু'হাতে কলা'য়ের বাটি নিয়ে চুমুক দিচ্ছে ঠাণ্ডা চায়ে। যেন একবাটি সরবৎ গিলছে !

একজন মেঝের মুড়িগুলো খুঁটে তুলে রাখছে জামার কোঁচড়ে।

আই—কথা কানে যাচ্ছে না নাকি অ্যাঁ—

গলার স্বর চড়ালেন উমাপতি। শীতের শ্লেষ্মা জড়ানো শব্দটা চিড় খেয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বেরিয়ে এল।

মজা পেয়েছে ছেলেগুলো। বাপের বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনে হেসে উঠেছে।

একটার কান সজোরে চেপে ধরলেন উমাপতি। বেল্লিক বাঁদর! আস্পর্দ্ধা দেখ! মায়ের আদরেই তো সব জাম্বুবান্ হয়ে বসেছে! নাহলে—

নাহলে কি? ভাবলেন উমাপতি একটু থতিয়ে গেলেন হঠাৎ। কিন্তু আর কোন গুরুত্ব দিলেন না কথাটার। ওটা মুখের কথা। ওটা তিনি না বললেও ছেলেদের লায়েক করতে পারতেন না।

করুণা এল ঘরে।

--বাবা! করুণার হাতে চা-এর কাপ আর একটা ডিসে কিছু মুড়ি।

মনটা প্রসন্ন হল উমাপতির।

—বাজারটা তুলে রেখেছিস মা?

—হ্যাঁ বাবা!

চা—আর মুড়ির ডিসটা নিলেন উমাপতি।

করুণা চলে গেল ভেতরে।

এই বাঁদরগুলোর জন্যই মেয়েটার কোন ব্যবস্থা হল না।

দ্বিতীয়বার সংসার করার সময় এসব কথা ভাবেন নি উমাপতি। কিন্তু ভাবলে কি হত। মেয়েটার ভাল বিয়ে দিতেন, আর ছেলের ওপর সংসার দিয়ে, তার বিয়ে-থা দিয়ে বানপ্রস্থে যেতেন। সন্ন্যাস নিতেন।

কিন্তু তা হত না। একথা বেশ ভালই জানেন উমাপতি। সরকারী আফিসের ডেসপ্যাচিং ক্লার্কের জন্য ওসব নিয়ম বোধ হয় নয়। সত্যকিঙ্করাই পারেন হয়তো।

তখন অনেকেই বলেছিল। যদুর বিয়ে দাও। অবশ্য বিয়ের বয়েস হয়েছিল যদুর।

চায়ের কাপে একটা চুমুক দিলেন উমাপতি। এবার একটা জটিল বিষয় নিয়ে ভাবতে বসেছেন।

ছেলের বিয়ে তখন দিতে পারেন নি উমাপতি। তার আগে যেটা আরও প্রয়োজন ছিল মেয়েটার বিয়ে দেওয়া। কিন্তু আসল কথাটা কি। নিজের মনে নিঃসঙ্গ হলেন উমাপতি। নিঃসঙ্গ হয়ে ভাবলেন। ছোট শালীর কাছে বাঁধা পড়ে গেছলেন।

আবার একটা সংসারের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভেবেছিলেন, মেয়ের বিয়ে পালাচ্ছে না। যেমন করে হোক ওটার ব্যবস্থা করবেনই। আর ছেলে নিজের পায়ে দাঁড়াক তখন দেখা যাবে। অবশ্য তখন এটা ভাবতে পেরেছিলেন তিনি। খুব সহজ ভাবেই। আরও ভাবতেন। বস্তির বাড়ী ছাড়বেন। একটা ভাল বাড়ী ভাড়া করবেন। সময়ে মেয়ে আর ছেলের বিয়ে দেবেন। তারপর ছেলের হাতে সংসারের ভার দিয়ে—

এখন এই পর্যন্ত ভাবলেন উমাপতি। এরপর থেকে যে ভাবনাটা সেটা একটু জটিল। এবার চড়াইয়ে উঠছেন উমাপতি। এতক্ষণ উৎরাইয়ে নামছিলেন। অত্যন্ত সহজ আর সাবলীল গতিতে।

একটু একটু করে তখন পথটা চড়াইয়ে শুরু হচ্ছিল। একটি একটি করে ফল ফলতে শুরু করেছিল উমাপতির রোপিত বৃক্ষে। একটা দুটো করে আটটা। বস্তির বাড়ী জমজমাট। তারপর একদিন চাকরি থেকে অবসর নিলেন উমাপতি।

ডুবতে-ডুবতে অনেক গভীরে নেমে গেছলেন উমাপতি। কিন্তু আর পারলেন না। মনে হল দম ফুরিয়ে গিয়েছে। ওপরে ভেসে উঠলেন। ঠাণ্ডা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ঐ শুকনো গলাটা ভিজিয়ে নিলেন।

উমাপতি সকালে বাজারে গিয়ে কানাঘুষো শুনতে পেলেন, যদুপতির নাকি গত রাত্রে বিয়ে হয়ে গেছে। যে কথা অন্যে তাঁর কাছে শুনতে বা জানতে চাইতো, সেটা তিনি অপরের কাছ থেকে শুনলেন। অবশ্য কিছুদিন আগে যদুপতি একবার এসেছিল বটে। মেয়েদের তরফ থেকেও দরকার হয়েছিল তাঁর কাছে। উমাপতি হাঁ বা না কিছুই বলেন নি ছেলেকে। কেবল বলেছিলেন, সংসারের সব কথা বুঝে যা তুমি বোঝ করো। তোমার বোনের বিয়েটাও আগে ব্যবস্থা হলে তারপর না হয়—কিন্তু আজ পঁয়ত্রিশ বছরের যদুপতি যা বুঝল। নিজের অধিকারটুকু বুঝতে চাইল। জীবনের সাধ মেটাতে চাইল। উপভোগ করার বাসনা করতে ইচ্ছা করল। যে সংসার সমস্যা উমাপতি তৈরি করে রেখেছেন, তার সমাধান করতে যদুপতির বার্ধক্য এসে দাঁড়াবে। তার মাঝে একটা নতুন লোক এলে এমন কিছু এসে যাবেনা।

বিয়ে করল যদুপতি। পাড়ারই একটি গরীবের

মেয়েকে। বিয়েটা ওরাই দাঁড়িয়ে থেকে দিয়ে দিয়েছে। উমাপতিকে দাঁড়াতে হয়নি। ওখানেই আচার অনুষ্ঠান হয়েছে।

দিন কয়েক পরে যদুপতি এসে দাঁড়াল বাড়ীতে, সঙ্গে নতুন বৌ। বিয়ের পর এখন যদুপতির থাকার ঘর চাই একখানা আলাদা। নিজের শোবার ঘরখানাই ছেড়ে দিলেন উমাপতি। টিন আর দরমা দিয়ে সামনের বারান্দাটা ঘিরে নিলেন নিজের জন্য।

উমাপতির বয়স হয়েছে। কিন্তু যে বয়েসে মানুষ সব সখ আহ্লাদ ছেড়ে ধর্মে মন দেয়, সে বয়েস এখনও আসেনি সুলতার। সে এখনও সাজ গোজ করতে ভালবাসে। নিয়মিত সিনেমা দেখতে যায়। ছেলেপুলের সংখ্যা সুলতার অবশ্য বেশীই। স্বাস্থ্যটা একটু ভেঙ্গেছে। কিন্তু মনের দিক থেকে সে বেশ কাঁচা এখনও। এতদিন স্বাধীন ছিল সুলতা নিজের সংসারে। তার সব কর্তৃত্ব করুণার ওপর অবাধে চলে যেত। কিন্তু যদুপতির বৌ করুণা নয়। সুলতার সঙ্গে তাই ছেলের বৌ এর নিত্য খিটিমিটি। সংসারে সব কাজ এখন থেকে সুলতা আর একা করতে চায় না। সকাল বেলাতেই খেয়ে বেরিয়ে যায় যদুপতি। তার খাবার করা নিয়ে গোলমাল বাধে। এতদিন করে দিত করুণা কিংবা সুলতা নিজে। এখন সে ভারটা সম্পূর্ণ এসে পড়ল যদুপতির বৌ এর ওপর। যদুপতির বৌ ওইটুকু সেরেই চলে আসে রান্নাঘর ছেড়ে। যে যার দিক যখন দেখবে তখন তাই হোক।

সন্ধ্যেবেলা ছুটির দিন বৌ নিয়ে যদু সিনেমায় যায়। কিংবা কোন বন্ধুর বাড়ী। কোনদিন খেয়ে দেয়ে রাত করে বাড়ী ফেরে।

সুলতা করুণাকে সঙ্গে করে যায় এখানে সেখানে। ছেলের বৌকে পারত পক্ষে আমল দেয় না।

নিজের বোনের সঙ্গে সম্পর্ক বেশ দূরে চলে যাচ্ছে যদুপতির। করুণাও বুঝতে পারে, ক্রমে সে ঐ বাড়ীর বোঝা আর অপাংক্তেয় হয়ে পড়ছে।

কোথাও গেলে দাদা আর সঙ্গে নিতে চায় না তাকে। আগে সিনেমায় গেলে তাকে আর বৌ-মণিকে নিয়ে তবে যেত। আগে থেকে টিকিট করে নিয়ে এসে তাদের জানাত। এখন বৌ ছাড়া আর সবাইকে এড়িয়ে যায়। করুণাও লজ্জায় কিছু বলেনা। বোঝে, বৌয়ের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করবে যদুপতি হয়তো। তার মাঝে করুণা অশোভন। করুণা থাকলে ওরা প্রাণখুলে কথা বলতে পারবে না।

অনেকদিন থেকেই কাজে কর্মে বাইরে যাতায়াত করে করুণা। এতদিন একা একাই বাইরে যায়। আজকালকার মেয়েরা স্বাবলম্বী। তাছাড়া সে সেলাই শিখতে যায় স্কুলে। মেয়েটা ভালই ছিল। অন্ততঃ তাই জানতেন উমাপতি। এতদিন এতটুকু বেচাল কিছু দেখেননি। কোন অভব্যতাও না। হয়তো মনে মনে সেও তার অধিকার বুঝতো। কিন্তু মুখ ফুটে সকলে প্রকাশ করে না। সেই-দিন এই অপ্রত্যাশিত কথাটা জানলেন উমাপতি। পাড়ারই কোন একটা ছেলের সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎ তৈরী করতে চলে গেছে সে। একটুকরো চিঠির মারফৎ জানিয়ে গেছে বাবাকে সবিনয়ে।

কথাটা ঘরে বাইরে সকলেই জানল। বাইরে থেকেও নানাভাবে শুনলেন উমাপতি। ঘরের বয়স্কা মেয়েকে আই-বুড়ো করে বসিয়ে রাখার ফল! দোষটা বেশী উমাপতির।

বেশ কিছুদিন পরে একদিন মেয়ে জামাই এল শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করে তাদের বিবাহকে সুসিদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠিত করতে। তাদের অভ্যর্থনা বা অপমান কোন কিছুই করলেন না উমাপতি। এ তার লাভও নয় ক্ষতিও নয়, এইভাবেই বিচার করে নিলেন।

যদুপতির একটি ছেলে হয়েছে। উমাপতির প্রথম নাতি। বাড়ীতে ছোট ছেলের সংখ্যা ন'টিতে দাঁড়াল।

এরই মধ্যে হঠাৎ শরীর খারাপ হল সুলতার। অত্যন্ত দুর্বল লাগে। কাজকর্ম করতে পারে না। খাওয়ায় অরুচি। প্রায় বিছানা নিল সুলতা।

যদুপতির বৌ সংসার দেখাশোনা করে। এই নিয়ে যদুপতির সঙ্গে সুলতার খিটিমিটি। সংসারের কাজ থাকলে, বৌকে সব সময় কাছে পাওয়া যায় না। বৌ নিয়ে আমোদ আহ্লাদ বন্ধ হল। শেষে অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করে বাড়ী ছাড়ল যদুপতি।

উমাপতি সঙ্কল্প করেছিলেন। এবার হয়তো সেই বহু প্রত্যাশিত সুযোগ এল। ছেলে বৌয়ের হাতে সংসার দিয়ে অবসর নেবেন। সেটা হঠাৎ গোলমাল হয়ে গেল।

যদুপতির যাবার পর ঘরখানা আবার খালি হ'য়ে গেল। উমাপতি আবার এলেন নিজের ঘরে।

সুলতার কিন্তু ওই টিনের ঘরে থাকাই আপাততঃ পাকা হয়ে গেল। একে অসুস্থ শরীর তার ওপর আবার—

—সেদিন সকালে উঠে নিজের ঘরে বসে সদ্যোজাত শিশুর কান্না শুনলেন উমাপতি।

—গত রাতে টিনের-ঘরে সুলতা একটি শিশু-সন্তান প্রসব করেছে।
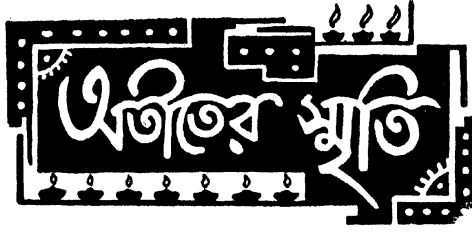
সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই সম্প্রদায় ওরিএন্টাল থিয়েটার নামে অভিহিত হইত। নিম্নে ইহার বিবরণ দেওয়া হইতেছে :—

পুস্তক		তারিখ	অভিনেতা।
ওথেলো	(১ম)	১২৬০।১১ আশ্বিন	ওথেলো—দীননাথ ঘোষ।
		১৮৫৩।২২ সেপ্টেম্বর	আয়াগো—প্রিয়নাথ দত্ত।
	(২য়)	১২৬০।২০ আশ্বিন	ব্রাবানশিও—খগেন্দ্রনাথ মল্লিক।
		১৮৫৩।৫ অক্টোবর	ডেসডিমোনা—রাজরাজেন্দ্র মিশ্র।
			এমিলিয়া—রাধাপ্রসাদ বসাক।
মার্চ্চেণ্ট অফ ভিনিস্	(১ম)	১২৬৯।২০ ফাল্গুন	শাইলক—প্রিয়নাথ দত্ত।
		১৮৫৪।২রা মার্চ্চ	পোর্শিয়া—রাধাপ্রসাদ বসাক।
	(২য়)	১২৬০।৫ চৈত্র	
		১৮৫৪।১৭ মার্চ্চ	
হেনরি দি ফোর্থ		১২৬১।৪ঠা ফাল্গুন	হেনরি—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
		১৮৫৫।১৫ ফেব্রুয়ারী	ফলষ্টাফ—প্রিয়নাথ দত্ত।
			হটস্পার—নিত্যলাল দে।
এমেটিওস´		১২১১।৪ঠা ফাল্গুন	মেজর ক্রস্—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
		১৮৫৫।১৫ ফেব্রুয়ারী	

ওথেলোর দ্বিতীয় অভিনয়ে লর্ড ডালহৌসির নাম এই থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকরূপে গৃহীত হইয়াছিল।

এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ অভিনেতাই উত্তরকালে বাঙ্গালা নাট্যাভিনয়ের প্রধান উদ্যোগী ও অভিনেতা

হইয়াছিলেন। জেফ্রয় ও রিশি নাট্যামোদের বীজ যাহাদের হৃদয়ে বপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা উপযুক্ত ক্ষেত্রে পতিত হওয়ায় কালে ফলেফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহার পরই বাঙ্গলায় অভিনয়ের সূত্রপাত হইল। কলিরাজার যাত্রা নাটক ও বিদ্যাসুন্দরের কথা ছাড়িয়া দিলে ১২৬৩ (ইং ১৮৫৭) সালেই বাঙ্গালা অভিনয়ের প্রকৃত আরম্ভ বলিতে হয়, কারণ ইহার পর হইতেই নানা স্থানে বাঙ্গালা নাটকের অভিনয়-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। পাথুরিয়াঘাটার নিকট চড়কডাঙ্গায় জয়রাম বসাকের বাড়ীতে ১২৬৩ সালে (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) বাঙ্গালা অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। এই সময় পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের লিখিত "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" (১৮৫৪ খৃঃ) প্রথম প্রচারিত হয়। এই অভিনয়ে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের অভিনেতা রাধাপ্রসাদ বসাক যোগ দিয়াছিলেন। এখানে কে কি অংশ লইয়া অভিনয় করেন, তাহা জানা যায় নাই; তবে কয়েকজন অভিনেতার নাম প্রদত্ত হইল,—রাধাপ্রসাদ বসাক, জয়রাম বসাক, জগদ্দুর্লভ বসাক, নারায়ণচন্দ্র বসাক, রাজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (ইনি স্ত্রীচরিত্র অভিনয় করেন)। শেষোক্ত ব্যক্তিই উত্তরকালের বেঙ্গল থিয়েটারের সুপ্রতিষ্ঠ অধ্যক্ষ বিহারী বাবু। ইহাদের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে অতি উৎকৃষ্ট অভিনেতা হইয়াছিলেন। উক্ত কুলীন কুল-সর্ব্বস্বের দুইবার অভিনয় হয়।

ইহার সমকালেই কলিকাতায় ও মফঃস্বলের কয়েক-স্থানে বাঙ্গলা নাটকাভিনয়ের চেষ্টা ও উদ্যোগ চলিতে থাকে। ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের একজন অভিনেতা রাধাপ্রসাদ বাবু জয়রাম বসাক প্রধান উদ্যোগী হন। অপর অভিনেতা প্রিয়নাথ দত্ত তাঁহার নিজ মাতুলালয়েও (গদাধর শেঠের বাড়ীতে) ঐ কুলীনকুলসর্ব্বস্বের অভিনয়ের অনুষ্ঠান করেন। ১২৬৪ সালে প্রথমে (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) এই সম্প্রদায়ের অভিনয় হয়। গদাধর শেঠের পুত্র গোপালচন্দ্র শেঠ (প্রিয়-নাথের মাতুল) ইহার পৃষ্ঠপোষক। এই সম্প্রদায়ে প্রিয়নাথ দত্ত, গোপালচন্দ্র শেঠ, নকুড়চন্দ্র শেঠ, নারায়ণচন্দ্র বসাক প্রভৃতি অভিনেতা ছিলেন। নারায়ণ বাবু এই দলে জাহ্নবী ও রসিকা নাপিতানীর ভূমিকা অভিনয় করেন।

এই সময়েই অর্থাৎ জয়রাম বসাকের বাড়ীর অভিনয়ের সময়েই সিমলায় ছাতুবাবুর বাড়ীতে বাঙ্গালায় শকুন্তলা অভিনয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই অভিনয়ে প্রিয়মাধব বসু মল্লিক, শরচ্চন্দ্র ঘোষ, মণিমোহন সরকার প্রভৃতি অভিনেতা ছিলেন। শকুন্তলার এই প্রথম বঙ্গানুবাদ হয়। যে দিন জয়রাম বসাকের বাটীর অভিনয় হয়, তাহার পর দিনই ছাতুবাবুর বাটীতে শকুন্তলার অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে সকল অভিনেতাই যথোপযুক্ত মূল্যবান্ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এই সময়েই চুঁচুড়ায় কুলীন কুলসর্ব্বস্বের অভিনয় হইয়াছিল।

বাঙ্গালা নাটকাভিনয়ের এই একযুগ। এ সময়ে যেথানে যত চেষ্টা হইয়াছে, সর্ব্বত্র কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ও শকুন্তলা ভিন্ন অন্য নাটকের অভিনয় হয় নাই।

এই সময়েই ৺কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ীতে গোরীভা গ্রামে ইংরাজীতে হ্যামলেট অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে কেশবচন্দ্র—হ্যামলেট, শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—লিয়ার্টেস শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মজুমদার—হোরেশিও, মহেন্দ্রনাথ সেন —রাজা, ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী—পলোনিয়স্, যোগেন্দ্রনাথ সেন—বার্ণাডো, নন্দলাল দাস—রাণী, শ্রীযুক্তনরেন্দ্রনাথ সেন (মিরর-সম্পাদক)—অফিলিয়ার অংশ লইয়াছিলেন। ইহার পর বাঙ্গালী দ্বারা ইংরাজী অভিনয়ের উৎসাহ আর প্রবল ছিল না।

এই সময়েই ১২৬৩ সালের চৈত্রমাসে (১৮৫৭ মার্চ্চ) ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের যত্নে তাঁহারই বাটীতে বেণীসংহারের বাঙ্গালা অনুবাদ অভিনীত হয়। ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মিঃ ডব্লিউ, সি, বানার্জি), ৺বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের অভিনেতা ছিলেন। বিহারীবাবু স্ত্রীচরিত্র অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহার আটমাস পরে ১২৬৪ অগ্রহায়ণে (১৮৫৭ নবেম্বরে) এই স্থানেই বিক্রমোর্ব্বশীর অনুবাদ অভিনীত হয়। এই অনুবাদ কালীপ্রসন্ন সিংহ পণ্ডিত সাহায্যে নিজে করেন। কালীপ্রসন্নবাবুই পুরুরবা সাজিয়াছিলেন। এই অভিনয়ের কথা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা রিভিউ পত্রে উল্লিখিত আছে। এই সময় নড়াইল হাটবাড়িয়ার ৺গুরুদাস রায় মহাশয়ের বাড়ীতে ও

তাঁহার বড় বৈঠকখানায় রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছিল। গুরুদাসবাবুর পুত্র ৺গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

ছাতুবাবুর বাড়ীতে যখন শকুন্তলার অভিনয় হয় তাহার পরেই কাপ্তেন পামার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক মিঃ ডি, এল্, রিচার্ডসন, রসিকলাল সরকার প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্যব্যক্তি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে পুনরায় সেক্‌স্পীয়ারের নাটকবলী অভিনয় আরম্ভ করেন।

করিতে বলেন। কোনও ভদ্রলোকের বাড়ী চাহিয়া লইয়া বা ভাড়া করিয়া কার্য্যারম্ভের কথাও হইয়াছিল। ইহার পর দুই কি আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত উহার আর কোনও উচ্চবাচ্য ছিল না। শেষে যখন কতকগুলি যুবককে একখানি বাঙ্গালা নাটকের আখড়াই দিতে শুনা গেল (সম্ভবতঃ জয়রাম বসাকের বাড়ীর "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব") তখন ইহারা পরামর্শ করিয়া সংস্কৃত "রত্নাবলী" নির্ব্বাচন করিয়া, রামনারায়ণ তর্করত্ন দ্বারা উহার অনুবাদের ব্যবস্থা
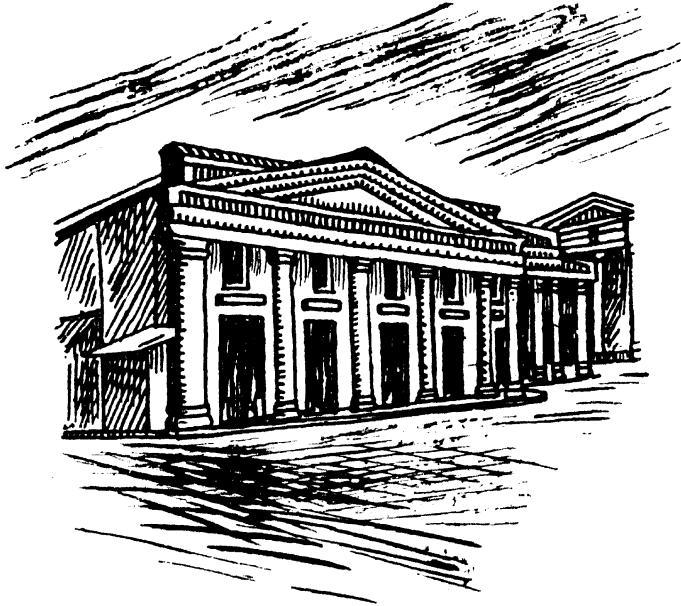
কোম্পানীর আমলে কলিকাতার আদি-রঙ্গালয়

ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের ১ম বারের অভিনয়াদি দেখিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ ও রাজা প্রতাপচন্দ্রাদির মনে থিয়েটার করিবার ইচ্ছা হয়। কাদম্বরীর অভিনয়ের সময়ে ছাতুবাবুর মৃত্যু হইয়াছিল। "মহাশ্বেতা" নামে কাদম্বরী অভিনীত হয়।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের একখানি পত্র হইতে জানা যায়,—ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের অধ্যক্ষগণের সহিত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ দত্ত প্রভৃতির মনোমালিন্য ঘটিলে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালা নাটক অভিনয়ের প্রস্তাব করেন। তাঁহারাই আগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে স্থান নির্ব্বাচন করিলেন। চারিমাসের পর পণ্ডিতের অনুবাদ শেষ হয়, পরে সংশোধন করিতেও আর একমাস যায়। সংশোধনের সময়ে অনেক পরিবর্ত্তন করা হয়। অতঃপর ইহা ছাপাইতেও তিনমাস বিলম্ব ঘটে। তাহার পরেও স্ত্রীচরিত্রের অভিনেতা নির্ব্বাচনেও যথেষ্ট বিলম্ব হইয়াছিল। ইহার পর আখড়াই দিতেও অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা অনেক বেশী সময় গিয়াছিল। যাহা হউক ১২৬৫ সালের ১৬ই শ্রাবণ শনিবারে (১৮৫৮।৩১ জুলাই) বেলগেছিয়ায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাগানে রত্নাবলীর প্রথম অভিনয় হয়। রত্নাবলীতে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের কতিপয় অভিনেতা যোগদান করিয়াছিলেন। শিক্ষা দিবার ভার শ্রীযুক্ত

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর ন্যস্ত ছিল। এই অভিনয়ে যাঁহারা যে যে অংশ লইয়া অভিনয় করেন নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল,—

রাজা উদয়ন	প্রিয়নাথ দত্ত।
বসন্তক	কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
রুমন্বান	রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ।
যৌগন্ধরায়ণ	গৌরদাস বসাক, দীননাথ ঘোষ, তারাচাঁদ গুহ।
বাভ্রব্য	নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
বাসুভূতি	গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
বাসবদত্তা	মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী, চুনিলাল বসু।
রত্নাবলী	হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কাঞ্চনমালা	(শ্রীরামপুরনিবাসী এক ব্রাহ্মণ)।
সুসঙ্গতা	অঘোরচন্দ্র দীঘড়িয়া।
বাজীকর	শ্রীনাথ সেন।
দ্বারবান	যদুনাথ ঘোষ।
সূত্রধার	ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী।
চোপদার	(১ম) দ্বারকানাথ মল্লিক। (২য়) কৃষ্ণগোপাল ঘোষ।
নটী	রমানাথ লাহা।
নর্ত্তকী	১ কালিদাস সান্যাল, ২ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রত্নাবলীর ছয়টী অভিনয় হয়। শেষ অভিনয় ২৪শে কার্ত্তিক (১৯শে অক্টোবর) শনিবারে হয়। এই অভিনয়েই ঐক্যতান বাদনের প্রথম প্রবর্ত্তনা হয়। শ্রীযুক্ত (এখন মহারাজ) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের যত্নে সঙ্গীতাধ্যাপক ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী দ্বারা দেশীয় যন্ত্রাদি লইয়া এই বাদ্য-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। রাজাদিগের ব্যয়ে সাজসজ্জা ও রঙ্গমঞ্চ অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ধনীর সাহায্য পাইয়া এবং উত্তরোত্তর অনুশীলনে রুচিমার্জ্জিত হওয়ায় এই নাট্য সম্প্রদায় সাধারণের বিশেষ তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। বেলগেছিয়ার এই নাট্যশালা ও নাট্যসম্প্রদায় অনেক দিন বর্ত্তমান ছিল। রত্নাবলীর অভিনয় দর্শনে সস্ত্রীক ছোটলাট হালিডে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি উপস্থিত থাকিতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তও এই অভিনয় দর্শন করেন। কেশববাবুর বন্ধু বলিয়া তিনি রাজাদিগের নিকট পরিচিত হন। সাহেবদিগের জন্য রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ আবশ্যক হয়। সেই সূত্রে মাইকেল এখানে আসেন ও ইংরাজীতে রত্নাবলী অনুবাদ করিয়া দেন। এই অবধি তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়। শেষে মাইকেল নাটকের সংস্কৃত প্রথা ত্যাগ করিয়া ইংরাজী প্রথায় শর্ম্মিষ্ঠা নাটক রচনা করিয়া কেশববাবুকে দেখান ও বাঙ্গালা রত্নাবলীর নাটকীয় গুণ-হীনতা বুঝাইয়া দেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র পরে উহা শুনিয়া শর্ম্মিষ্ঠা অভিনয় করিতে উদ্যত হন।

অন্ধকারের প্রয়োজন

যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

জগতভরা আলোর ধারা
চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ তারা
তবু তার অন্ধকারের আছে প্রয়োজন।
সুখ আছে নাইক শান্তি
সত্য আছে নাইক মুক্তি
তাইত তার দুঃখ তাপের এত আয়োজন।

জ্ঞান আছে ধর্ম্ম নাই
কৃত্য আছে কর্ম্ম নাই
সরস্বতীর ভক্তে তাই এতই ধিক্কার।
রাজ্য আছে রাজা নাই,
ক্ষেত্র আছে প্রজা নাই
তাইত লক্ষ্মীর এত তিরস্কার।

বিজয়াভিবাদন—

বর্তমান বৎসরে একবারের স্থলে দুইবার মহাপূজা অর্থাৎ বাৎসরিক শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইল। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে আশ্বিনে ও চলিত পঞ্জিকা মতে কার্তিকে পূজা হইয়াছে। আশ্বিনের পূজার সংখ্যা খুব কম—অধিকাংশ পূজাই কার্তিকে হইল। সপ্তমী অষ্টমীতে দারুণ বর্ষায় পূজার আনন্দ জমে নাই—নবমী দশমীতে বৃষ্টি কমিয়া যাওয়ায় কাদা ও জলে কোনরূপে লোক উৎসব করিয়াছে। আমরা পূজার পর সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করি। বিজয়ার দিন আমরা উচ্চ নীচ, শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সকলকে প্রীতি, আশীর্বাদ, প্রণাম, নমস্কার, শুভেচ্ছা প্রভৃতি জানাই। ঐ দিন প্রার্থনা করি, যেন পরবর্তী এক বৎসর সকলে আবার সুখে ও শান্তিতে অতিবাহিত করিতে সমর্থ হই। ভারতবর্ষের গ্রাহক, লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, অনুগ্রাহক সকলকে আজ সেই অভিবাদন জানাইয়া নববর্ষে তাঁহাদের সকলের শুভেচ্ছা লইয়া আমরা আবার নূতন কর্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। মায়ের কৃপায় আমাদের পথ যেন কুসুমাস্তীর্ণ হয়—জয়যাত্রার পথে যেন বাধা না আসে—ইহাই অদ্যকার প্রার্থনা।

অসীম সাহসী ও পরম আদর্শ নিষ্ঠ প্রেসিডেণ্ট কেনেডি নিহত—

গত ২১ নভেম্বর রাত্রিতে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট, সারা জগতের শক্তিকামী নেতা কেনেডি মোটরে চড়িয়া আমেরিকার ডালাসে যাওয়ার পথে আততায়ীর গুলিতে আহত হন। গাড়ীতে তাঁহার পাশে তাঁহার স্ত্রী ছিলেন—তখনই তাঁহাকে নিকটস্থ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় এবং কয়েক মিনিট পরে তিনি মারা যান। ৪৬ বৎসর বয়সে ১৯৬০ সালের শেষে তিনি প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন—তাঁহার পূর্ববর্তী ৩৪জন প্রেসিডেণ্ট অপেক্ষা তিনি বয়সে সকলের ছোট এবং ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের মধ্যে তিনিই প্রথম প্রেসিডেণ্ট। যে নিবেত্রা (কালো মানুষ) জাতির স্বার্থরক্ষা করিতে যাইয়া আব্রাহাম লিঙ্কন নিহত হইয়াছিলেন, সেই নিগ্রো জাতির মানুষকে সমানাধিকার দিতে যাইয়া কেনেডি নিহত হইলেন। গত জুন মাসে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন আমেরিকায় যাইয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। কেনেডির মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আমাদের রাষ্ট্রপতি বলেন—"কেনেডি ছিলেন এ যুগের অসীম সাহসী ও পরম আদর্শনিষ্ঠ মানুষ।" একমাত্র কম্যুনিষ্ট চীন ছাড়া পৃথিবীর সকল সভ্যদেশের রাষ্ট্রনায়কগণ প্রেসিডেণ্ট কেনেডির হত্যাকাণ্ডে সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন ও কেনেডি-পত্নীকে তারযোগে বেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ২৫শে নভেম্বর আমেরিকায় জাতীয় শোক প্রকাশের সময় পৃথিবীর ৬০টি দেশের প্রতিনিধি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন—ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর প্রতিনিধিরূপে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ঐদিন তথায় উপস্থিত ছিলেন।

শতাধিক বৎসর পূর্বে আলুর দুর্ভিক্ষের সময় কেনেডি পরিবার আয়র্লণ্ড হইতে আমেরিকায় গিয়া বাস করেন। প্রেসিডেণ্ট কেনেডির পিতামহ ও মাতামহ উভয়েই রাজনীতি চর্চা করিতেন—কেনেডির পিতা ব্যবসা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন। কেনেডির পিতার নাম ছিল যোশেফ—তাঁর ৯টি সন্তানের মধ্যে কেনেডি দ্বিতীয়। বড় ভাই রাজনীতি চর্চা আরম্ভ করে যুদ্ধে যাইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ১৯১৭ সালে কেনেডির জন্ম। বোষ্টনে পড়া শেষ করিয়া তিনি লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে পড়িতে গিয়াছিলেন। বিখ্যাত চিন্তানায়ক লাস্কির প্রভাবে তিনি জীবন গঠন

করেন এবং ১৮ বৎসর বয়সে ১৯৩৫ সালে তিনি হার্ভার্ড বিদ্যালয় হইতে গ্র্যাজুয়েট হন। তিনি খেলার মাঠে ও সাঁতারে বিশেষ প্রতিভা দেখান ও ১৯৪১ সালে নৌ-বাহিনীতে যোগদান করেন। সে সময় যুদ্ধে আহত হইয়াও নিজ অসাধারণ সাহসের জন্য রক্ষা পান। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে তিনি সাংবাদিকের বৃত্তি গ্রহণ করেন—তিনি তিনখানা বই লিখিয়া গিয়াছেন—(১) হোয়াই ইংল্যাণ্ড স্লেপ্ট (২) প্রোফাইল্স ইন কারেজ (৩) ষ্ট্র্যাটেজি অফ্ পিস্। তন্মধ্যে প্রথম বইখানি তাঁহার ছাত্রাবস্থায় লেখা। তিনি একটি সংবাদপত্রের রিপোর্টার ও একটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসাবে কয়েক বৎসর কাজ করিয়াছিলেন, ১৯৪৬ সাল থেকে তিনি রাজনৈতিক—প্রথম ৬ বৎসর এক প্রতিনিধি সভার সদস্য ছিলেন—১৯৫২ সালে সেনেটের পদপ্রার্থী হচলেন—কিন্তু পরাজিত হইতে হইল। ১৯৫৩ সালে কেনেডি বিবাহ করেন—তাঁর ৬ বৎসরের একটি মেয়ে ও ৩ বৎসরের একটি ছেলে আছে। ১৯১৮ সালে তিনি সিনেটে আসেন ও ১৯৬০ সালে তিনি জনসনকে পরাজিত করিয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। প্রথম দিনের ভাষণে তিনি বলেন—আমার সংগ্রাম মানব জাতির সাধারণ শত্রু দারিদ্র্য, উৎপীড়ন ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তিনি গত ৩ বৎসর সাহসের সহিত নিজ কর্তব্য পালন করিতেছিলেন।

আইসেন হাওয়ার ৮ বৎসরকাল প্রেসিডেন্ট থাকার পর তরুণ কেনেডি গদি পাইয়া সকল দিক দিয়া আমেরিকার উন্নতির কাজে হাত দিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে তাঁহার দান জগতের লোক চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। কমিউনিষ্ট রাশিয়ার সহিত আমেরিকার সখ্য প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। তাঁহার নিমন্ত্রণে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আমেরিকায় যাইলে তিনি নেহরু তথা ভারতের আদর্শবাদকে উচ্চ প্রশংসা করেন ও নেহরুকে গুরুর মত শ্রদ্ধা সম্মান জ্ঞাপন করেন। তিনি নিজে ভারতে আসার সময় না পাইয়া মিসেস কেনেডিকে ভারত ভ্রমণে তথা ভারতের সহিত মৈত্রী-বন্ধন সুদৃঢ় করিতে ভারতে পাঠাইয়াছিলেন।

কেনেডি তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন—"যা না করে আমি পারব না, তা করবই। বাধা আসবে, বিপদ আসবে, চাপ আসবে, হয় ত নিজের জীবনেও তার ফল-ফল সুখকর হবে না, কিন্তু তা হলেও মানুষের সমগ্র নীতিবোধের ভিত্তি সেখানেই।" তিনি জীবনে এই সকল কথা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। সেজন্য আজ তাঁহার হত্যায় সমগ্র সভ্য জগত কাঁদিতেছে ও তাঁহার আদর্শবাদকে শ্রদ্ধা জানাইতেছে।

খাদ্য পরিস্থিতিতে চাঞ্চল্য—

গত কয় মাস হইতে সর্বত্র, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে মানুষ কিছুতেই স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। ২ মাস পূর্বে চাউলের মণ ৫০।৬০ টাকা পর্যন্ত বাড়িয়া যায়—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের একটি উক্তির ফলে চাউল ব্যবসায়ীরা ঐ ভাবে চাউলের দাম বাড়াইয়া দিয়াছিল। তাহার পর সেন মহাশয়ের চেষ্টায় চাউলের মণ দর বাঁধা হয়—২২ ও ৩৫ টাকায়। সেন মহাশয় সে সময়ে ধনী ব্যবসায়ীদের কথা না শুনিয়া বিচার করিলে অনায়াসে ২২৲ ও ২৫৲ মন—চাউলের দর বাঁধিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু সাধারণের দুর্ভাগ্য—মুখে যতই আমরা সমাজতন্ত্রবাদের কথা বলি না কেন, কাজের সময় ধনিকদের তোষণে প্রবৃত্ত না হইয়া থাকিতে পারি না। চাউলের দর বাঁধার সময় তাহাই হইয়াছে। কিন্তু দর বাঁধিলে কি হয়। রেশনের দোকানে অধিকাংশ সপ্তাহে আদৌ চাল আসে না—আসিলেও তাহা অখাদ্য চাল। মানুষ সাধারণ বাজারে যাইয়া ৩৫ টাকায় যে চাল পায়, তাহাও অধিকাংশ সময় অখাদ্য। কাজেই খোলা বাজারে ৪০।৪৫ টাকায় এখন চাল বিক্রীত হইতেছে। কে দরিদ্রের দুঃখ দেখিবে? আমরা জানি মুখ্যমন্ত্রী দরিদ্রের ব্যথা অনুভব করেন। কিন্তু শক্তি ও সাহসের অভাবে হয়ত সর্বদা মনের মত কাজ করিতে পারেন না বা শাসনযন্ত্র এমন ভাবে গঠিত—চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে সাফল্য দেয় না। ইহা শুধু চালের কথা নহে। মাছ সম্বন্ধেও সরকারী ব্যবস্থায় দর বাঁধা হইয়াছে—কিন্তু বাঁধা দরে বাজারে মাছ পাওয়া যায় না। অতি অখাদ্য ছোট মাছই শুধু বাজারে বাঁধা দরে বিক্রীত হয়, বড় মাছ বাঁধা দর অপেক্ষা বেশী দরেই অর্থাৎ ৫।৬ টাকা কিলো দরে বিক্রীত হইতেছে। এ বিষয়ে দেখিবার কেহ নাই। বাজারে যাই। এ বিষয়

লইয়া গোলমাল করিলেই পরের দিন আর মাছ পাওয়া যায় না। বিরাট পুলিস বাহিনী শুধু বসিয়া বসিয়া সময় কাটায়. এ সব কাজের ভার লইবার তাহাদের অবসর নাই। চাল ও মাছের বাজারের এই অবস্থা দেখিয়া এক-দল সাহসী মানুষ—সরকারের আইন উপেক্ষা করিয়া নিজেদের হাতে আইন গ্রহণ করিয়াছিল—তাহা অনাচার হইলেও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন তাহাদের কাজ সমর্থন করিয়াছেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় সন্দেশের দাম ১৫ টাকা সের হইলে ছেলের দল বহু মিষ্টির দোকানে অভিযান করিয়া নিজেরা সমস্ত মিষ্টান্ন—সন্দেশ ৫ টাকা সের দরে ও রসগোল্লা ২ টাকা সের দরে বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। ফলে কলিকাতায় ২ সপ্তাহকাল বহু মিষ্টির দোকান বন্ধ ছিল এবং শেষ পর্যন্ত মিষ্টান্ন বিক্রেতারা কম দরে সন্দেশ ও রসগোল্লা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। তবে দেখা যাইতেছে ৫ টাকা সেরের সন্দেশে চিনির পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। ছেলের দল সরিষার তেলের দোকানে হানা দিয়া ২॥০ টাকা সেরের সরিষার তেল ১॥০ টাকা সেরে বিক্রয় করিয়াছিল—ফলে কলিকাতায় ৫।৭ দিন সরিষার তেল সংগ্রহ করাও সম্ভব হয় নাই। ঐ সময় কয়েকটি কাপড়ের দোকান, মণিহারী দোকান প্রভৃতিতে ছেলের দল হামলা করিয়া কম দামে জিনিষ বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছিল। উল্টাডাঙ্গার কাপড় কাচা সাবান তৈয়ারীর কারখানাগুলির বহু সাবান তাহারা দাঁড়াইয়া থাকিয়া কম মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছে। তাহার ফলে বাজার হইতে কাপড় কাচা সাবানও উধাও হইয়াছে। এই ত গেল অবস্থা—কিন্তু ইহার প্রতিকারের উপায় কি ও কোথায়? সরকারী দপ্তরখানায় বসিয়া ব্যবসাদারদিগের সহিত আলোচনা করিয়া এ সমস্যার সমাধন হইবে না। মানুষ এখন অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকে না, থাকিতে পারে না। কাজেই যে যতটা পারে বেশী লাভ করে। প্রত্যেক ব্যবসায়ী সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে। বাজারে ন্যায্য মূল্যে সিমেণ্ট পাওয়া যায় না—কিন্তু ১৪ টাকা বস্তা দরে কালো বাজারে সিমেণ্ট পাওয়া যায়—সে সিমেণ্ট কোথা হইতে আসে? হয় একদল পুলিসকে অধিক ক্ষমতা দিয়া দৃঢ়তার সহিত কাজ করিতে বলিতে হইবে—নচেৎ জনগণের মধ্য হইতে পুলিসী কাজের জন্য লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদের হাতে এই প্রকারের শাসনভার প্রদান করিতে হইবে। হোমগার্ড, বেসরকারী প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রভৃতির দ্বারা এ কাজ করানো প্রয়োজন। দোষীকে কঠোর শাস্তি না দিলে সমাজ হইতে এ দোষ দূর করা যাইবে না। প্রতি চালের দোকানে হোমগার্ড দিয়া পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা হইলে কম দামে ভাল চাল পাওয়া যাইবে–সকল জিনিষের বেলায় এ ব্যবস্থার প্রয়োজন। মানুষ এমন দুষ্টমনোভাবাপন্ন হইয়াছে যে, কঠোর শাস্তিদান ও ভয়প্রদর্শন ছাড়া তাহাদের সায়েস্তা করা যাইবে না। আমরা সমাজের কোন ক্ষেত্রে অনাচার সমর্থন করিব না—কাজেই ছেলের দলের হামলা সকল ক্ষেত্রে সকল সময়ে সমর্থন করা যাইবে না। কিন্তু নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া সে কাজ করিলে কেহই তাহাতে আপত্তি করিবে না। মাছের বাজারে কয়েকদিন হোমগার্ড দ্বারা দর নিয়ন্ত্রণ করিলে অবশ্যই সুফল দেখা যাইবে। আমরা বিবিধ সমস্যায় জর্জরিত কাজেই আজ দৃঢ়তার সহিত সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা প্রয়োজন। জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসভা যদি একাজের ভার গ্রহণ না করে, তবে কে করিবে? আমরা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের সততায় বিশ্বাস করি, কিন্তু তাঁহার কর্মশক্তি যেন আরও কঠোর ও দৃঢ় হয়, সর্বান্তঃকরণে তাহাই কামনা করি!

পশ্চিম বঙ্গের উন্নয়ন—

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে দিল্লী যাইয়া পশ্চিম বঙ্গের উন্নয়ন সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী, জালানী ও খনিমন্ত্রী শ্রীআলপেসন ইস্পাত ও ভারী শিল্প মন্ত্রী শ্রীসি, সুব্রহ্মণ্যম্ প্রভৃতির সহিত আলোচনার ফলে স্থির হইয়াছে—পশ্চিম বঙ্গের হলদিয়াতে একটি তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইবে ও পরে ঐ স্থানে পেট্রলজাত রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া তোলা হইবে। তাহা ছাড়া শ্রী সেন দিল্লীতে একটি প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। কলিকাতায় জন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যথাসম্ভব সমস্যাগুলির সমাধান সত্বর প্রয়োজন। সাধারণ পরিকল্পনা তহবিলের অর্থে তাহা করা সম্ভব নহে। সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অতিরিক্ত অর্থ দানের জন্য শ্রী সেন অনুরোধ করায় কেন্দ্রীয় সরকার ঐ কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করিতে সম্মত হইয়াছেন। সত্বর

কলিকাতায় উন্নয়ন কার্য আরম্ভ না হইলে পানীয় জল সমস্যা ও ভূগর্ভের পয়ঃ প্রণালী সমস্যা কলিকাতা সহরকে অচল করিয়া দিবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার সময়—

নভেম্বর মাসের প্রথমে নয়া দিল্লীতে ভারতের সকল রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা তিনদিন ব্যাপী এক বৈঠকে সমবেত হইয়া স্থির করিয়াছেন যে ১১ বৎসর শিক্ষা দিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা শেষ করা হইবে। বর্তমানে যেমন দশম শ্রেণীর বিদ্যালয় ও প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা আছে তাহার পরিবর্তন করা হইবে না। বার বার ব্যবস্থা পরিবর্তনের ফলে ছাত্রদের শিক্ষায় বাধা পড়ে। গত কয়বৎসর প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ও ডিগ্রী কোর্সের পরীক্ষা চালু হইয়াছে। অন্তত ১০।১৫ বৎসর এ ব্যবস্থার ফলাফল লক্ষ্য করিয়া ও প্রয়োজন মত ইহার ছোট খাট পরিবর্তন করিয়া পরে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। সারা ভারতের চিন্তাশীল শিক্ষাবিদেরা যে এ বিষয়ে সুচিন্তিত মন্তব্য করিয়াছেন, ইহাই আশার কথা।

শ্রীনেহরুর জন্ম দিবস—

গত ১৪ই নভেম্বর ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর ৭৪ তম জন্মদিবসে ভারতের সর্বত্র শিশু দিবস পালন করা হইয়াছে। শ্রীনেহরু ভারতব্যাপী শিশুদিগকে ভালবাসেন—যাহাতে তাহারা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক হইতে পারেন, তিনি সর্বদা সে জন্য সচেষ্ট। তাই তিনি তাঁহার জন্মদিবসে সকলকে শিশু দিগের সমস্যার কথা চিন্তা করিতে বলেন ও কি করিয়া শিশুদের সমস্যার সমাধান করা যায় নিজেও সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া কর্ম পদ্ধতি স্থির করেন। আমরা শ্রীনেহরুর জন্ম দিনে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই এবং প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বাধীন ভারতকে পরিচালিত করুন।

পাকিস্তানের গুপ্তচর—

ভারতবর্ষে পাকিস্তানের বহু গুপ্তচর কাজ করিতেছে। ভারতের পক্ষে লজ্জার কথা যে বহু ভারতীয় অর্থলোভে পাকিস্তানের গুপ্তচর রূপে ভারত সরকারের ক্ষতিসাধন করিতেছে। সম্প্রতি দিল্লীতে এরূপ একজন ভারতীয় ধরা পড়িয়াছে—সে ভারত সরকারের কেরাণী ছিল। ভারত সরকারের এ বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করা উচিত। বহু পাকিস্তানী ভারতে থাকিয়া ভারতের ক্ষতি করিয়া থাকে —তাহাদের সম্বন্ধেও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। আমরা এ বিষয়ে সকল শ্রেণীর শাসককে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। ভারতবর্ষেই কেবল এইরূপ দেশদ্রোহিতা সম্ভব।

ভারতে প্রথম রকেট—

গত ২১শে নভেম্বর সন্ধ্যায় ভারতবর্ষ মহাকাশ যুগে পদক্ষেপ করিল—তাহার তথ্যানুসন্ধানী প্রথম রকেট মহাকাশের বার্তা সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে সুদূর মহাকাশে ধাবিত হয়। ভারতের প্রথম মহাকাশযান নীল আকাশে ঈষৎ রক্তাভ সোডিয়াম বাষ্প-মেঘ ছড়াইতে ছড়াইতে গভীর নীলিমায় মিলাইয়া যায়। ২শত বৎসর পূর্বে একদা পরাজিত ভারতীয় সৈন্যদের নিকট হইতেই ইউরোপীয়েরা রকেট বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিল। ত্রিবান্দ্রাম হইতে রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়। আণবিকশক্তি কমিশনে সভাপতি শ্রীএচ-কে-ভাবা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রকেটের ওজন ১৬০০ পাউণ্ড। উহা ঘণ্টায় ২৪০০ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল। এই রকেট যেন ধ্বংস কার্যের সহায়ক না হইয়া জন কল্যাণের সহায়ক হয়, আমরা ইহাই কামনা করি। ভারতে নূতন যুগের মানুষ মহাকাশে অবশ্যই বিচরণ করিবে।

ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি—

২২শে নভেম্বর শুক্রবার বেলা ১২টা ১৫ মিনিটে কাশ্মীরে এক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ভারতীয় বাহিনীর ৫ জন বিশিষ্ট সেনানী মারা গিয়াছেন। বিমানের পাইলট-ও মারা গিয়াছেন। কাশ্মীর রাজ্যের পুঞ্চ্ অঞ্চলের গুল-পুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সেনানীরা যুদ্ধবিরতি রেখার নিকট অবস্থা পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। নিহত সেনানী হইলেন (১) লেঃ জেঃ দৌলত সিং পশ্চিম-কমাণ্ডের জি-ও-সি (২) এয়ার ভাইস মার্শাল পিন্টো—পশ্চিম কমাণ্ডের এ-ও-সি (৩) লেঃ জেঃ বিক্রম সিং—পশ্চিম-কমাণ্ডের ফোর-কমাণ্ডার (৪) মেঃ জেঃ এন কে ডি নানাবতী জম্মু-কাশ্মীর পদাতিক ডিভিসনের কমাণ্ডার (৫) ব্রিগেডিয়ার এস-আর-

ওবেরয়—জম্মু কাশ্মীর পদাতিক ব্রিগেডের কমাণ্ডার। পাইলটের নাম ফ্লাইট লেফ্টেন্যান্ট এস-এস সোধী। এই ঘটনা যেমন শোচনীয় তেমনই মর্মন্তুদ। ফলে ভারতের সামরিক বিভাগের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। আমরা নিহত সেনানীদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি ও তাঁহাদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাই।

কৃষির উপর গুরুত্ব দান—

গত ১৫ই নভেম্বর দুপুরে রাঁচী হইতে ৭ মাইল দূরে জগন্নাথপুরে হেভী ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের উদ্বোধন করিতে যাইয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বলিয়াছেন যে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই এখন দেশের প্রধান কর্তব্য। শিল্প-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কৃষির উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হইবে। কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন না হইলে শিল্প-গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না। গত ১৬ বৎসর ধরিয়া যদি শ্রীনেহরু কৃষির উন্নতিতে অধিক অবহিত হইতেন, তবে আজও বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীর প্রয়োজন থাকিত না। ১৬ই নভেম্বর শ্রীনেহরু দুর্গাপুরে যাইয়া একটি কয়লা খনির যন্ত্র নির্মাণ কারখানারও উদ্বোধন করেন। হিন্দিতে শ্রীনেহরু তথায় ৩০ মিনিট বক্তৃতায় বলেন—এই কারখানা ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আর একটি সোপান! রাঁচী হইতে তিনি পানাগড় হইয়া দুর্গাপুর আসেন—তথায় রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইডু, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহুমাউন কবির প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

নূতন কংগ্রেস সভাপতি—

মাদ্রাজের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীকামরাজ নাদার গত ২০শে নভেম্বর কংগ্রেসের নূতন সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীকামরাজ ছাড়া অন্য কেহ কংগ্রেস-সভাপতি পদের প্রার্থী হন নাই। আগামী জানুয়ারী মাসে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

ভারতীয় জীবনের অভিশাপ—

১১ই নভেম্বর দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয় যুব উৎসবের উদ্বোধন করিয়া বলেন—ভারতীয় জীবনের অভিশাপ এই যে, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় প্রদেশ প্রভৃতির ভিত্তিতে জনগণ বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। ফলে জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে। এই সত্যটি আজ সকলের উপলব্ধি করা দরকার।

সংশয়

বিভাস চক্রবর্ত্তী

এখনো সংশয়!
প্রত্যহের ধূলাবালি আনে দ্বিধা ভয়,—
অভ্যাসের পরিচয়
নীচ নগ্ন দুই হাতে ঢেকেছে সে পরম প্রত্যয়,
শেষ হয়ে গেছে আজ তোমার বিস্ময়,
—তাই এ সংশয়।
দৃঢ় প্রত্যয়িত মন তবু আজ অসংশয় নয়—
সেখানেতে আলোছায়া; দ্বিধা দ্বন্দ্ব; বিশ্বাসের ভয়;
কতটুকু জেনেছি তোমার;
কি-ই বা পেয়েছি;
কতটুকু সত্যমিথ্যা, কতটুকু ঠিক
ভুল এই এ তোমার.
অথবা সত্যিই কিগো এতদিনে নিজে ফুরিয়েছি!
না, না। যাক্ এ সংশয়,
আরো যাক্ মোহ-মুগ্ধ পরম প্রত্যয়।
প্রত্যহের পরিচয়
নিঃশেষ করুক্ আরো তোমার বিস্ময়,—
শান্ত স্থির শেষ সত্যে নির্বাণের আগে
সুশয়িত প্রতিক্ষণে অজস্র মৃত্যুর স্বাদ যেন
এই জীবনেতে থাকে।

গ্রহের পাপচক্রে

জ্যোতিষ-সম্রাট—ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ···তাইতো···গণনায় একটু ইয়ে···মানে···আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—আপনি একজন বিশিষ্ট পরিব্রাজক !···অর্থাৎ···ঘরের মায়ায় জড়িয়ে থাকার চেয়ে বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়ানোর নেশাই আপনার জীবনে প্রবল ···ঠিকুজীতে যা দেখছি—এই বয়সেই আপনি তো নানান্ দেশ-বিদেশে ঘুরে এসেছেন !···

ভাগ্যান্বেষী—বলেন কি মশাই !···আজ পর্য্যন্ত আড়ৎ ছেড়ে কোলকাতার বাইরে কোথাও এক পা নড়বার ফুরশৎ মেলেনি···কারবার ছেড়ে কোথাও বেরুইনি কোনোদিন !···না দমদম্, না হাওড়া, না কশবা, না টালীগঞ্জ···কোনোদিকেই নয় ! অথচ আপনি বলছেন···

জ্যোতিষ-সম্রাট—বটে ! বটে !···তাই নাকি ! ··আচ্ছা, এবারে আমার মুখের পানে তাকান দেখি একবার ! ···হুঁ !···বেশ বুঝতে পারছি···সম্প্রতি আপনার কিছু টাকা লোকসান হয়েছে ?···নয় কি ?···

ভাগ্যান্বেষী—আজ্ঞে হ্যাঁ !···যথার্থ বলেছেন···নগদ পাঁচটি টাকা !···খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন···আর পথের মোড়ে ঐ জ্যোতিষ-গবেষণাগারের সাইনবোর্ড পড়ে এই-মাত্র আপনার কাছে ভাগ্য-গণনা করাতে এসে !···

শিল্পী :—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

বৃহস্পতি

উপাধ্যায়

বৃহস্পতি নৈসর্গিক শুভ। এর আছে বিস্তৃতি, আছে প্রসারণ। আকারে এবং বৃত্তে সূর্য্যের এবং ঔজ্জ্বল্যে শুক্রের পরই এর স্থান। সূর্য্য থেকে প্রায় ৪৭৬ মিলিয়ান দূরে। পুং ও জলগ্রহ। মানব জীবনে এর প্রভাব খুব বেশী। কফকারক। এর সত্বগুণ। ব্রাহ্মণ প্রকৃতিও প্রজ্ঞার কারক। কোব্‌লেজ আর ল্যাম্পল্যাণ্ড বলেন, গ্রহের ভেতরটা ঠাণ্ডা। যাদের জন্ম কুণ্ডলীতে এর প্রধান আধিপত্য ও পরম প্রভাব, তাদের মেজাজ ঠাণ্ডা। চন্দ্র বৃহস্পতিযুক্ত বা বৃহস্পতির দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হোলে মন গম্ভীর প্রকৃতির হয়, আর হয় সত্বগুণী। বহু কষ্টে পড়লেও স্থির চিত্ত, সুখ দুঃখে মানসিক সমভাব বিশিষ্ট ও বিবেচনা শীল। গ্রহটী দুর্ব্বল হোলে, প্রায়ই মানুষের বিবেচনা শক্তির অভাব হয়।

ম্যাক্স হাইনডেল সাহেব বলেছেন—'The Jupiterin ray makes people human, honou ralvle, Courteous, refined generous law-abdring religious, cheerful and optimistic.

বুধ শুক্র ও বৃহস্পতি এই তিনটি গ্রহ থেকে চিন্তা করতে হয় শাস্ত্র চর্চ্চা, জ্ঞান বিজ্ঞান, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি সম্পর্কে। বুধ মানসিক শক্তি কারক। ব্যাখ্যা করবার শক্তি, তর্ক যুক্তি দ্বারা মত বিশেষ খণ্ডন বা স্থাপন পার্থিব বিষয় বস্তুর প্রতি মায়া মোহ, সাহিত্য ও বিজ্ঞান—এই সবই বুধের দান!

বুধের ক্ষেত্র বৃহস্পতির ক্ষেত্রের সপ্তমে। বুধের প্রাধান্য খর্ব্ব না করলে প্রকৃত তত্বের বা জ্ঞানের উদয় হয় না। গ্রহটির মিত্র রবি চন্দ্র ও মঙ্গল, শনি সম, শত্রু বুধ ও শুক্র।

The Message of the Stars গ্রন্থের ২১১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—

'Jupiter represents the spiritual part and therefore he presides at the ingress of the Ego itself in to the body,

বৃহস্পতি বলবান হ'য়ে কেন্দ্রে বা কোণে থাকলে জাতকের সুবিদ্যা হয়। চন্দ্র ও বৃহস্পতি পীড়িত হোলে তবে যক্ষ্মা হয়। যদি গ্রহটি পুষ্যা নক্ষত্রে অথবা রবি, চন্দ্র ধনু বা মীন রাশিতে একত্রে থাকে অথবা পূর্ণচন্দ্র পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত হয় তা হোলে গ্রহ বলবান হয়। বৃহস্পতির জন্ম নক্ষত্র পূর্ব্ব ফল্গুনী। পূর্ব ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র সৌভাগ্যের প্রতীক। কর্কট এর উচ্চস্থান। মকর রাশিতে নীচস্থ। ১ থেকে ১৩° ডিগ্রী পর্য্যন্ত ধনু রাশিতে এর মূল ত্রিকোণ।

বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি পঞ্চম, সপ্তম এবং নবম স্থানে। এজন্যে বৃহস্পতি লগ্ন গত হোলে মানুষের স্বাস্থ্য সুখ সম্পদ, বিদ্যা, উত্তমা স্ত্রী ও উত্তম ভাগ্য লাভ হয়। লগ্নে থাকার দরুণ জাতকের ব্যক্তিত্ব সুগঠিত চেহারা ও প্রতিষ্ঠার উদ্ভব হয়। পঞ্চম স্থানে দৃষ্টি দেওয়ার দরুণ— যশ, বিদ্যা ও সন্তান সম্পর্কে শুভ কারক হয়, সপ্তম স্থানে দৃষ্টি দেওয়ার দরুণ উত্তমা স্ত্রী বা উত্তম স্বামী লাভ হয়,

দাম্পত্য জীবন সুখের হয়, ব্যবসায়, বৃত্তি ও দূরভ্রমণে লাভবান হওয়া যায়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহাঃ সর্ব্বে কেন্দ্রী যস্য বৃহস্পতিঃ।

দ্বিতীয়, পঞ্চম, নবম, দশম ও একাদশ—এই সকল ভাবকারক এই গ্রহ। 'প্রজ্ঞাবিত্ত শরীর পুষ্ট তনয়জ্ঞানানি বাগীশ্বরাৎ।' যদি লগ্নে বৃহস্পতি থাকেন অথবা যদি লগ্ন বৃহস্পতি দ্বারা দৃষ্ট হয়, যদি জন্মরাশি লগ্ন হয় আর তাতে জন্মগ্রহের যোগ ও দৃষ্টি থাকে তা হোলে মানুষ অতিরিক্ত স্থূল হয়ে থাকে। ৫৭ থেকে ৬৮ বর্ষ পর্যান্ত মানুষের জীবনে বৃহস্পতির প্রভাব।

আত্মার বিবর্ত্তন রবি ও বৃহস্পতির উপর নির্ভরশীল। লগ্নে বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকলে মানুষ অধ্যাত্মপথের যাত্রী হয়, কিন্তু শুক্রের দৃষ্টিতে স্বার্থপর, পাপাসক্ত ও ভোগ বিলাসী হয়। দ্বাদশে বৃহস্পতি জাতকের অর্থনাশ কর্ত্তা। দ্বিতীয়, চতুর্থ অথবা নবমে চন্দ্র ও বৃহস্পতির একত্র অবস্থান হোলে প্রচুর ধনৈশ্বর্য্য হয়।

বৃহস্পতি উচ্চস্থ স্বক্ষেত্রস্থ মূল ত্রিকোণস্থ বা কেন্দ্রস্থ হোলে কলহযোগ হয়। জাতক লম্বা শিক্ষিত, ধর্ম্মপ্রাণ, সৎ, চরিত্রবান ও আকর্ষণীয় হয়। সুন্দরী স্ত্রী লাভ। আয়ু প্রায় বিরাশী বৎসর পর্যান্ত।

"Jupiter rules the adrenals and arterial circulation." বৃহস্পতির ব্যাধি—শ্বাসযন্ত্রের রোগ, তালুর রোগ, বমন, উদরাময়, শ্বাসরোগ হাঁপানি, গুল্মরোগ, যকৃতের দোষ, মেদবৃদ্ধি, গ্যাবা, বহুমূত্র, প্লুরিসি, সারকোমা প্রভৃতি।

বৃহস্পতি দুর্ব্বল ও ব্যাধিকারক হোলে বায়ু প্রকোপ, সাধারণ জ্ঞানের অভাব, ধৈর্য্যহানি ও অসহিষ্ণুতা হয়। চন্দ্র, বুধ ও শুক্রের সঙ্গে বৃহস্পতি কোন ভাবে থাক্‌লে জাতক বধির হয়।

শনির সঙ্গে বৃহস্পতি একত্র থাকলে আর রবি সপ্তম বা অষ্টমে থাক্‌লে টিউবারকিউলিস হয়। লগ্নে বৃহস্পতি আর সপ্তমে শনি থাক্‌লে বায়ু প্রকোপ হয়। লগ্নে রাহু ও বৃহস্পতির সহাবস্থান হোলে হাইড্রোসিল হয়।

বৃহস্পতি লগ্নে থাক্‌লে জাতক পণ্ডিত, চতুর, দয়ালু, ধর্ম্মপ্রাণ, সম্ভ্রান্ত ও রূপবান হয়। পাপগ্রহ পীড়িত গ্রহটি কিছু না কিছু শারীরিক কষ্ট দেয় কিন্তু সে কষ্ট দীর্ঘ স্থায়ী হয়না। দ্বিতীয় স্থানে থাক্‌লে জাতক সুদর্শন, শত্রুশূন্য আর আত্মকেন্দ্রিক নেতা হয়। স্বক্ষেত্রে থাক্‌লে জাতক ধনৈশ্বর্য্যশালী হয়। তৃতীয়ে বৃহস্পতি সন্তানের প্রতি মায়া-মমতার অভাব ঘটায়, তা ছাড়া করে লোভী ও কৃপণ। স্বল্প সংখ্যক ভ্রাতা ভগ্নী হয়। অজীর্ণরোগে কষ্ট পায়। এসব লোক সাধারণতঃ কৃষক শ্রেণীর। চতুর্থে বৃহস্পতি থাক্‌লে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে জাতক আত্মপ্রসাদ লাভ করে। গৃহকর্ত্তা হয়ে পরিবারবর্গকে আয়ত্তাধীনে রাখে। উত্তম বেশভূষা হয়। বন্ধুভাবাপন্ন হয়।

পঞ্চম স্থানে বৃহস্পতি থাকলে জাতক বাস্তববাদী, বুদ্ধিমান, সদ্‌গুরুর শিষ্য, মন্ত্রসিদ্ধ হয়। পঞ্চম স্থানে বৃহস্পতি নিষ্ক্রিয়। সন্তানভাব নষ্ট করে। স্বল্প সংখ্যক সন্তান। ষষ্ঠে বৃহস্পতি জাতককে অলস, দুর্ব্বল ও রসিক করে, মাথায় ক্ষত চিহ্ন। শুভ গ্রহের সঙ্গে থাকলে এ চিহ্ন থাকে না।

সপ্তমে বৃহস্পতি থাকলে জাতক বুদ্ধিমান, বিদ্বান, উচ্চপদ মর্য্যাদাসম্পন্ন, উচ্চ পরিবারজাত, ও প্রগতিপন্থী হয়। স্ত্রী ধর্ম্মপ্রাণা। সপ্তমাধিপতি দুর্ব্বল অথবা রাহু কেতু বা শনির সঙ্গে বৃহস্পতির এখানে অবস্থান বা বৃহস্পতি এখানে পীড়িত হোলে, স্ত্রীলোকের সঙ্গে অবৈধ সংস্রব হয়। অষ্টমে বৃহস্পতি জাতককে নোংরা স্বভাবগ্রস্ত করে। জাতক প্রকৃতিতে ভোঁতা আর বিধবার সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হয়।

নবমে বৃহস্পতি থাকলে জাতক বিভিন্ন বিষয়ে অত্যন্ত অধ্যয়নাসক্ত, নীতিপরায়ণ, ধনী, ধর্ম্মপ্রাণ ঈশ্বর প্রেমিক ও দর্শনানুরাগী হয়।

দশমে বৃহস্পতি থাকলে জাতক ধনৈশ্বর্য্যবান, সুখী, বন্ধুপুত্র বেষ্টিত, সৌভাগ্যবান সাফল্যমণ্ডিত, গেজেটেড গভর্ণমেণ্ট অফিসার, সম্মানিত দৃঢ়চেতা, উপাধি, উপঢৌকন ও সম্বর্দ্ধনা লাভ।

একাদশে বৃহস্পতি থাকলে অত্যন্ত শুভ হয়। জাতক ধনী, বিখ্যাত ও শিক্ষিত হয়। মূল্যবান সম্পত্তি লাভ। এখানে চন্দ্র ও বৃহস্পতি থাকলে জাতক সৌভাগ্যশালী হয়, প্রোথিত ধন, হৃত সম্পত্তি ও লটারিতে অর্থলাভ।

ব্যয়স্থ বৃহস্পতি শুভজনক নয়, অলস, দরিদ্র, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও বদ মেজাজী করে।

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির-ফলাফল

মেষ রাশি

ভরণীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। আশ্বিনীজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির পক্ষে অধম। শারীরিক অবস্থা ভালো যাবেনা। উদরের গোলমাল, আমাশয় প্রভৃতি। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিছু রক্তের চাপ বৃদ্ধি, পুরাতন জ্বর রোগীর সতর্কতা আবশ্যক। পারিবারিক কলহ। স্বজন বিরোধ, আর্থিক ফল মিশ্র, ভালোমন্দ দুইই আছে। ব্যয়বৃদ্ধি। বাড়ীওয়ালা কৃষিজীবি ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মধ্যম। মাসের শেষার্দ্ধে চাকুরিজীবি উপরওয়ালার অপ্রিয়ভাজন হোলেও, মোটের উপর চাকুরি জীবির পথে শুভ বলা যায়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীর পক্ষে একভাবেই যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

বৃষ রাশি

রোহিনীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। কৃত্তিকা ও মৃগশিরার পক্ষে অধম। দ্বিতীয়ার্দ্ধে শারীরিক অসুস্থতা। উদরের গোলমাল, জ্বর প্রভৃতি। পারিবারিক অশান্তির সম্ভাবনা। আর্থিকক্ষেত্র এক ভাবেই যাবে। বাড়ীওয়ালা কৃষিজীবি ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মন্দ নয়। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাপ্রদ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

মিথুন রাশি

আর্দ্রাজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। মৃগশিরা জাত ব্যক্তির পক্ষে অধম। প্রথমার্দ্ধে শারীরিক কষ্ট। সন্তানদের অসুস্থতা। সামান্য দুর্ঘটনার ভয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে অজীর্ণ, উদরশূল এবং চক্ষু পীড়া। স্ত্রীপুত্রপরিজনবর্গের সহিত কলহ বিবাদ। নানারকম পরিবর্ত্তনের আশঙ্কা। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা। অর্থাগম নানাবিধ উপায়ে। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে শুভ। চাকুরি জীবিদের পক্ষে অতীব উত্তম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে বিশেষ আশা প্রদ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কর্কট রাশি

পুষ্যাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পুনর্ব্বসু ও অশ্লেষা জাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। মাসটি মিশ্রফলগত। স্বাস্থ্য মোটের উপর মন্দ নয়। সন্তানদের শরীর ভালো যাবেনা। পারিবারিক অশান্তি ও কলহ। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য। আর্থিক অবস্থা মন্দ নয়। ব্যয় প্রবণতা। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে আশাপ্রদ নয়। চাকুরির ক্ষেত্র ভালো বলা যায়না। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

সিংহ রাশি

পূর্ব্বফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। মঘা জাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। উত্তর ফল্গুনীজাত ব্যক্তির নিকৃষ্টফল। শারীরিক কষ্ট অজীর্ণ, উদরাময়। পারিবারিক শান্তি। আর্থিক ক্ষেত্র আশানুরূপ। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কন্যারাশি

উত্তরফাল্গুনী ও চিত্রাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। হস্তার পক্ষে নিকৃষ্টফল। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। পারিবারিক শান্তি। বন্ধুমহলে কেউ কেউ শত্রুভাবাপন্ন হবে। আর্থিক দুশ্চিন্তা ব্যয়াধিক্য হেতু। ভ্রমণের সম্ভাবনা। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে আশাপ্রদ। চাকুরিজীবির পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি নৈরাশ্যজনক। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

তুলা রাশি

স্বাতীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। বিশাখা ও চিত্রাজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা। রক্তের চাপ পিত্তপ্রকোপ, প্রস্রাবের দোষ। আয়বৃদ্ধির আশাকরা যায়না। আর্থিক স্বচ্ছন্দতার অভাব। বাড়ীওয়ালা কৃষিজীবি ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মন্দ নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে খুব আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

বৃশ্চিক রাশি

অনুরাধার পক্ষে উত্তম। বিশাখাও জ্যেষ্ঠার পক্ষে মধ্যম। স্বাস্থ্য ভালো যাবে। পারিবারিক শান্তিও শৃঙ্খলা। পরিবারবহির্ভূত স্বজনবর্গের সহিত মনোমালিন্য। প্রথমার্দ্ধে আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি। এমাসে কিছু লাভ বা প্রাপ্তিযোগ। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে আশাপ্রদ নয়। চাকুরিজীবির পক্ষে উত্তম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির আয় ও কর্ম্মবৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ শুভ।

ধনু রাশি

পূর্ব্বাষাঢ়া জাতকের পক্ষে শুভ। মূলার পক্ষে মধ্যম। উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে নিকৃষ্ট। শারীরিক কষ্ট। পিত্তপ্রকোপ পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি ও অবসাদ। আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে কষ্টভোগ। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা। আর্থিক স্বচ্ছন্দতার অভাব। প্রতারণা বা নানা প্রকার অপকৌশল হেতু ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে আশাপ্রদ নয়। চাকুরি জীবির পক্ষে শুভ নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে আশাপ্রদ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মোটামুটি মন্দ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

মকর রাশি

শ্রবণার পক্ষে উত্তম। উত্তরাষাঢ়া ও ধনিষ্টার পক্ষে মধ্যম। শরীর ভালো যাবে। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবি ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে সন্তোষজনক। চাকুরি জীবির অতীব উত্তম সময়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির আয় বৃদ্ধি লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব শুভময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কুম্ভ রাশি

শতভিষাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পূর্ব্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। ধনিষ্টার পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্য স্বাভাবিকভাবে যাবে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বা অন্য স্থানে সপরিবারে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যোগদান। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবি ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মিশ্রফল—ভালো মন্দ দুই-ই ঘটবে। প্রথমার্দ্ধ চাকুরিজীবির পক্ষে আশাপ্রদ নয়, শেষার্দ্ধ উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মীন রাশি

উত্তরভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পূর্ব্বভাদ্রপদ ও রেবতীর পক্ষে মধ্যম। শরীর সম্পূর্ণ ভালো যাবে না যদিও কোনও উল্লেখযোগ্য পীড়ার সম্ভাবনা নেই। পারিবারিক সংক্রান্ত ব্যাপারে উদ্বেগও দুশ্চিন্তা। পারিবারিক শান্তি। আর্থিকক্ষেত্র একইপ্রকার। বহির্বাণিজ্য বা গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁরা আছেন তাঁদেব পক্ষে বিশেষ শুভ। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মধ্যম। চাকুরির ক্ষেত্রে কোন পরিবর্ত্তন নেই—একই ভাব। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর শুভ।

—

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নফল

মেষ লগ্ন—

শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। সুখ্যাতির আশা। সন্তানের শারীরিক অবস্থা ব্যয় বাহুল্য। চাকুরিজীবির পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ীর পক্ষে মধ্যম। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সন্তোষজনক।

বৃষ লগ্ন—

ভ্রাতার রোগ ভোগ। ব্যয় বাহুল্য। মানসিক চাঞ্চল্য। ধনলাভ যোগ। কর্ম্মোন্নতি। অধীনস্থ ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতারণা লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্য লাভ।

মিথুন লগ্ন—

বেদনাজনিত পীড়া। শত্রুবৃদ্ধির আশঙ্কা। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি। ভাগ্যোন্নতি। পিতার স্বাস্থ্যোন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাপ্রদ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

কর্কট লগ্ন—

অম্লপিত্তজনিত পীড়া, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা। ধনাগম। পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি। নানাবিধ শুভ কাজের যোগাযোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষ আশাপ্রদ।

সিংহ লগ্ন—

দেহভাব মধ্যবিধ। বন্ধুভাবের ফল শুভ। সন্তানের দেহ পীড়া। যশোভাগ্যাদি সূচিত হয়। ব্যবসা বাণিজ্যে কিছু লাভ। মানসিক উদ্বেগ। শোক প্রাপ্তি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কন্যা লগ্ন—

বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতির অভাব। সন্তানের স্বাস্থ্যহানি ও পরীক্ষাদিতে সুফলের অভাব। ভাগ্যোন্নতি যোগ। কলহ দ্বারা মানসিক উদ্বেগ সৃষ্টি। সম্মান বৃদ্ধি। আশানুরূপ কর্ম সাফল্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। অবিবাহিতাগণের বিবাহ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

তুলা লগ্ন—

গৃহ নির্মাণে বাধা। শত্রু বৃদ্ধি। ভাগ্য লাভে বাধা। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার পীড়া। অর্থ হানি। সন্তানের লেখাপড়ায় বিঘ্ন। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বিঘ্ন।

বৃশ্চিক লগ্ন—

শারীরিক সুস্থতা। ধনব্যয়। বিবাহজনিত সৌভাগ্য। দাম্পত্য প্রণয়। সন্তানাদির লেখাপড়া ও পরীক্ষায় সুফলের আশা। বেকার ব্যক্তির চাকুরি প্রাপ্তি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম।

ধনু লগ্ন—

কর্মস্থল স্বাভাবিক। বিবাহ প্রসঙ্গ কিন্তু বাধার উৎপত্তি। আর্থিক অশান্তি। কর্মোন্নতি। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মিশ্রফল—ভালোমন্দ দুই-ই ঘটবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি।

মকর লগ্ন—

কর্ম পরিবেশের মধ্যে শত্রু বৃদ্ধি। স্ত্রীর জীবন সংশয় পীড়া। দাম্পত্য কলহ। প্রীতিভঙ্গ। ভাগ্যোদয়। দেশ ভ্রমণ। আকস্মিক অশান্তি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মন্দ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

কুম্ভ লগ্ন—

বাত বেদনা। স্নায়বিক দুর্বলতা। সন্তানের পড়াশুনার ফল ভালো নয়। গুপ্ত শত্রুবৃদ্ধির যোগ। কর্মস্থলে উন্নতির আশা। সৌভাগ্য বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর কৃতকার্যতা লাভ।

মীন লগ্ন—

স্বাস্থ্য মন্দ নয়। ধন লাভ। সন্তান সন্ততির লেখাপড়ায় উন্নতি। ভাগ্যোন্নতি। মাতার রোগভোগ। পুত্রকন্যার বিবাহে বাধা। পারিবারিক কলহ। বুদ্ধির ভুলে অর্থক্ষয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর সাফল্য ও উন্নতি লাভ।

দৃষ্টি ভেদে

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

কারুর দু'চোখে স্বপ্ন : রাশি রাশি রজনীগন্ধা
ছড়ানো রাত।
সাত সমুদ্রের ওপার থেকে রাজকন্যার পাঠানো পারিজাত
আকাশকে ভেট দিতে শুকতারা হয়ে ছোটে।
কেউ বা পাহাড় আঁকে
প্রশান্ত মহাসাগরের মুক্তোভরা ঝিনুকের রঙে। প্রিয়াকে
চাঁদের মতই এক রূপসীর বসন পরায়। কারু মন চায়
ঘুম সমুদ্র ছেঁচে এনে দিতে একটি নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
অনেক আনন্দ।
যারা একটি কাঙাল পৃথিবীকে ঠিকানা করে
বিরাট কালের সমুদ্রে ছেঁড়া জালে ঐশ্বর্য্যের মাছ ধরে
নিঃস্ব হয়ে গেছে, তা'দের মনের চিন্তা পামীর গ্রন্থির মত
মৌন হয়ে থেমে শুধু। অসমান জীবন সংগ্রামে পরাজিত
এক শান্ত মৃত্যু সাধনায় নিমগ্ন উলঙ্গ সন্ন্যাসী
বিদায় বেলায় উপহার দিয়ে যায় তৃপ্তির
এক ফোঁটা হাসি।

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

বিলাতের চিত্রজগতে চিত্র প্রযোজক

শ্রীউমেশ মল্লিক (লণ্ডন)

দেখতে দেখতে জাহাজটা এসে ভীড়লো সাউথ এম্‌টলের জেটীতে যখন, তখন বেলা সাড়ে আটটা। অক্টোবর মাস। পড়েছে এ দেশে শীতের মরশুম। হাল্কা কুয়াশার ওড়না ভেদ্ করে এক টুকরো সূর্য্যের আলো ঠিকরে পড়ছে জাহাজটার আনাচে কানাচে। নিশ্চল সমুদ্রের বুকে সুরু হয়েচে আবার গোলা রঙের মাতামাতি। সুরু হয়েছে সমুদ্রের বুকে "সিগালের" লুকো-চুরি খেলা। তুষারের মত সাদা পালকের এ পাখীগুলো ভাষতে ভাষতে উড়ে এসে হঠাৎ ছোঁ মেরে সমুদ্রের বুক থেকে খুদ কুটো নিয়ে উড়ে গেল শূন্যে আকাশের নীলিমায় কোথায় কে জানে? আসছে তারা একে একে, দলে দলে।

জেটীতে বাজছে তখন ওদিকে ইংরেজী বাজনা যেন কাদের উদ্দেশ্যে।

দেখতে দেখতে এসে দাঁড়াল জাহাজ ঘাটে প্রকাণ্ড একটা কাল রঙের রোল্‌স্। ব্যনেটে তার তিন রঙের ভারতীয় জাতীয় পতাকা।

সোর গোল পড়ে গেল সারা জাহাজ খানায়। একটা নাম "কৃষ্ণ মেনন্" "কৃষ্ণ মেনন্" ভেসে বেড়াতে লাগলো সারা জাহাজটায়। দেশ তখন স্বাধীন হয়েছে সবে মাত্র।

"কৃষ্ণ মেনেনের" নামটা শুনে মনটায় লালা লেগে গেল। কারণ কিছুক্ষণ আগেই জাহাজের ক্যাপ্টেনের অনুরোধে আমি তাঁর ভারতীয়দের অভ্যর্থনা বাণী পড়ে শুনাই ক্যাপ্টেনের ঘর থেকে ব্রডকাষ্টিংকারে। এ হেন "কৃষ্ণ মেনন্‌কে" দেখবার আগ্রহ পেয়ে বসে ছিল আমার।

ভীড় ঠেলে আর পাচ জনের সঙ্গে যখন জাহাজের প্রকাণ্ড সিনেমা হ'লে ঢুকলাম তখন কৃষ্ণ মেননের বক্তৃতা হয়েছে সুরু। এ বিদেশে বিভূঁয়ে আমাদের কারুর কোন প্রকার দরকার হ'লে আমরা যেন কোন প্রকার দ্বিধা না করি তাঁর স্মরণাপন্ন হ'তে। দ্বার তার খোলা থাকে আমাদের জন্যে অবারিত ইত্যাদি ইত্যাদি।

উৎসাহ কৃষ্ণ মেন্‌নের কথা শুনে আরও বেড়ে গেল। কেননা লাল মুখো ছুটো ইংরেজ আমাদের খাবার টেবিলে সারাটা পথ আমায় জালিয়ে এসেছে এই বলে যে বিলাতে সিনেমা সম্বন্ধে শিখতে যাওয়াটা আমার ভস্মে ঘি ঢালা ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। কারণ এ দেশের union এত কড়া যে মাথা গলান সেখানে বহু ভাগ্যের কথা। যদিও বা শেখবার সুযোগ শত ভাগের মধ্যে এক ভাগ পাওয়া যেতে পারে তাহলেও বিলাতে ছবি পরিচালনা করা বা প্রযোজনা করা এক রকম অসম্ভব।

কারণ বিলাতের মতে চিত্র প্রযোজকের কাজ সম্পূর্ণ আলাদা কলকাতার থেকে। বাড়ীর পয়সা আছে রাতারাতি কলকাতায় প্রযোজক হওয়া যায় এখানে এ ভাবনা করতে ও পারা যায় না।

প্রযোজক এখানে কোম্পানী, নিযুক্ত করে। এর কাজ হ'লো ছবির সকল বিষয়ে খুঁটি নাটি করে দেখে কোম্পানীর পয়সায় ছবি করা। ছবি একবার খারাপ হয়ে গেলে তার ভবিষ্যতও অন্ধকার। পরের ছবিতে কাজ পাওয়া হবে ভার।

এ প্রযোজকরা হ'লো আসলে এক একজন "খান্দ" ঝানু লোক। অভিজ্ঞতা থাকা চাই সব বিষয়ে, কি গল্প ঠিক করায়, কি চিত্রনাট্য লেখায়, কি পরিচালক নিযুক্ত করায়, কি ছবি তোলায় পরিচালকের কাজের তদ্‌বির করায়, কি সেটের কাজে, কি চিত্রতারকা নিযুক্ত করায়, কি মেক্ আপে, কি মিউজিকে, সব বিষয়ে। কলাকৌশলের দিকের কথা তো ছেড়েই দিলাম। দায়িত্ব

কছু কমিয়ে দেওয়ার জন্য আজকাল আছে Executive Producer। কোম্পানীর ছবি করবার পয়সা জোগাড়ে তাদেরই মাথা ব্যথা সব থেকে বেশী।

চিত্র প্রযোজক এ দেশে হ'লো শুধু যে শিল্পী তা নয় ব্যবসাদার লোকও বটে। তাদের বাজারে নাম না থাকলে বিলেতে ছবি প্রযোজনা করা এক রকম অসম্ভব। কারণ গভর্ণমেণ্টের ছবি করবার টাকা সরকার বাহাদুর দিতে রাজী হবেন না। জিজ্ঞেসা করবে যে প্রযোজকের এই সরকারের টাকায় ছবি করবার দায়িত্ব বা যোগ্যতা কি আছে ? যদিও বা এ ফাঁড়া কাটান গেল দ্বিতীয় প্রশ্ন আসবে Distributor—পরিবেশকের কাছ থেকে।

পরিবেশক ছবি করার ৫০।৬০ ভাগের এমন কি ৭০ ভাগের টাকা দেয় আগাম। এই সব ইংরেজরা যার তার হাতে টাকা ছেড়ে দিতে রাজী হবেনা। বাঙালীর হাতে তো দূরের কথা। তাছাড়া পথে পথে বিলেতের ইংরেজ প্রযোজকরা কেঁদে বেড়াচ্ছে কাজের জন্যে। ইংরেজরা কাজ দেবে নিজেদের লোককে স্বভাবতই। আমি বাঙালী আমাকে প্রযোজকের কাজ দেওয়ার কথা ভাবা তো দূরের কথা। তাছাড়া শেলী, সেক্সপিয়ারের দেশে গল্প লেখকের ছড়াছড়ি। আমার গল্প পড়বে কে ইত্যাদি ইত্যাদি।

মনের মণিকোঠায় সারা পথটায় এ সব কথায় যে মেঘ জমে উঠেছিল, যাই হোক "কৃষ্ণ মেননের" আশার বাণীতে যেন তা দখিন হাওয়ার ছোঁয়াচের মত উড়ে গেল।

পাঁচ জনের মত আমিও তর তর করে গ্যাঙ্‌ওয়েতে নেমে পড়লাম ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে যখন জেটীতে এসে নেমেছি তখন সামনে দেখি দাঁড়িয়ে ঘোষাল (কলকাতা মিউ-জীয়ামের) বললে সে, "আপনারাও তো পালোয়ানী করতেন বিষ্ণুদার আখড়ায়, পারবেন এদের সঙ্গে গায়ের জোরে।"

দেখে তো তাজ্জব বনে গেলাম। শক্ত এদের মুটেদের দেখে। বিরাট বিরাট আমাদের Cabin trunk গুলো এরা এক একজনে তুলছে ঝাঁপটামেরে আর ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে ক্রিকেট বলের মত সহজে অনায়াসে এক এক কোণে। কব্জীগুলো যেন এদের এক একজনের বট অশথ গাছের ঝুড়ীর মত। দাঁড়িয়ে আছে সাত ফুট দৈত্যের মত এক এক জন যেন।

রেলওয়ের মাইনে করা মুটে এরা। উর্দিপরা। যাত্রীদের কাছে বকশীস পায়। নম্রতার চূড়ান্ত ধরা পড়ে চোখে। শারীরিক শক্তির যেখানে প্রয়োজন হয় সেখানে এ দেশের লোকে মাইনে পায় মাথা ঘামান লোকেদের কাজের থেকে অনেক বেশী। ডকের মুটে এক একজন রোজগার করে এ ও তাতে প্রায় মাসে আড়াই হাজার থেকে তিন হাজারের ওপর। সুতরাং এ সব দেশে লোকে অধিকাংশই স্কুল কলেজ ছেড়ে দিয়েই কাজে লেগে পড়ে। পড়া শুনা করে রাতের স্কুল কলেজে।

উঠলাম গিয়ে বোট্ ট্রেনে।

ছুটতে লাগলো ট্রেন। দেখতে লাগলাম দু' ধারে রেল লাইনের হথনের ঝোপ, নদীর ফাঁকে ফাঁকে দোলায়মান উইলো গাছের হাত ছানি দিয়ে সাদর সম্ভাষণ, পাহারা-দারের মত এলম্ আর ওক্ গাছের গাম্ভীর্যময় রুদ্র আসন পাতা কাঁচা সবুজ ঘাসের খেত খামারের সমারোহ, ভাজ্জী-নিয়া আর আইভী লতায় ঢাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ঘর বাড়ী। সন্ধ্যেও নেমে এসেছে তখন পৃথিবীর বুকে। বাড়ীর মাথায় মাথায় চিমনীতে চিমনীতে লেগেছে ধোঁয়ার গোধূলি।" দেখতে দেখতে পৌছালাম Waterloo Station এ।

উঠলাম গিয়ে Y, M, C, A এর ছাত্রাবাসে। আর পাঁচজনের সঙ্গে পরিচয় করে নিতে হ'লো খাবার টেবলে দাঁড়িয়ে প্রথা মত। সেদিন ছিল ২৩শে অক্টোবর। গণ্য মান্য বহু লোকের ভীড়। কোন এক অনুষ্ঠান হচ্ছিল সে দিন।

ডিনারের শেষে ২।৪ জন ভারতীয় এবং অভারতীয় আমায় এসে ভীড় করে দাঁড়াল। এদের মধ্যে অনেকে পরিণত বয়স্ক ইংরেজ। সবাই এক মুখে জানিয়ে দিল যে সিনেমা জগতে ঢুকতে পারা কি রকম কষ্ট সাধ্য। জানিয়ে দিল আর, সে মুখে এরা যাই বলুক এদেশে বর্ণ বৈষম্য খুব, তাছাড়া Union এ দেশে এ বিষয়ে ভয়ানক কড়া। দুঃখ করলেন কেউ কেউ যে বাড়ীর অত পয়সা খরচ করে

বিলেতে সিনেমা সম্বন্ধে শিখতে আসাটা হয়েছে অনুচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। দুচার জন ছেলে যাঁরা এদেশে বহুদিনের বাসিন্দা যাঁরা কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে পরিচিত ছিল দত্ত ঘোষ (Faraday House) এঁরা আমায় এসে সেই একই কথা বলে গেল।

সুতরাং রাত ১২টার সময় যখন শুতে গেলাম তখন এক মাথা ভাবনা চিন্তা। লণ্ডনের প্রথম রাত ভুলবার কথা নয়। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই হোটেলে গিয়ে উঠলাম। গেলাম India Houseএ। বাঁ ধারে ঢুকতে রবীন্দ্রনাথের মূর্ত্তি। কোথাও তাঁর নাম নেই, বসিয়েছিল এ মূর্ত্তি ইংরেজরা। আমার চেষ্টায় এবং কুশয়ান্ত সিংহ এর আগ্রহে আজ রবীন্দ্রনাথের নাম এবং জন্ম তারিখ লেখা হয়েছে। কোথাও নেতাজী সুভাষ বোসের চিহ্নটুকু নেই India Houseএ। চোখ অস্থির ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এ মহা মানবের স্মৃতিটুকুর জন্য। হতাশ হলাম এবিষয়ে। India Houseএর শিক্ষা বিভাগ তো আমার কথা শুনে চটেই লাল। ইংরেজী শেখ, ভূগোল শেখ, ইতিহাস পড়তে চাও তারা সাহায্য করতে চেষ্টার ত্রুটি করবে না। এত বাড়ীর পয়সা খরচ করে কে সিনেমা সম্বন্ধে শিখতে আসে তা তারা ধারণাই করতে পারলো না। মিঃ সার্থে বলে এক মারাঠী সরাসরি আমায় জানিয়ে দিল যে সাহায্য করা এ বিষয়ে তাদের হাতের বাইরে। কিন্তু আজ আমার সেই দিনের হাঁক ডাকে ওপরওয়ালা সিনেমার লোকেদের সঙ্গে এখন ২।৪ মাস এ বিষয়ে শেখবার ব্যবস্থা আছে। আছে এখন Brixtonএ বিষয়ে শেখবার স্কুল। তবে কোন পেশাদার লোক এ সব থেকে পাশ করা ছাত্রদের তোয়াক্কা করে না।

India House এর ওপরের রেঁস্তরা থেকে cunh খেয়ে নেমে আসতেই দেখা হ'লো সুধীরঞ্জনের সঙ্গে। আলাপ হ'লো তার শালার সঙ্গে মিঃ ডেস্তর্জ্জনা। নিউথিয়েটার্সে এক সময়ে ক্যামেরাম্যানের কাজ করতেন তিনি। তিনিও এসেছিলেন এদেশে সিনেমা সম্বন্ধে কাজ শেখবার অভিপ্রায়ে। সুযোগ দু বছরেও না পেয়ে বর্ত্তমানে অন্য কি কাজ শিখছেন বাড়ী ফিরে যাবার আগে। শুনে আমার কথা জানিয়ে দিলেন কি রকম অসম্ভব এদেশে সুযোগ করে নেওয়ার। বিনা বেতনে কলকাতার মত কাজ করবো বলতেই বললেন এ সব এদেশে চলে না। পয়সা কাজ করিয়ে না দেওয়ায় কথা বোর্ড ভাবতেই পারে না এখানে।

বি, বি, সির বেতার বিচিত্রার' লোকেদের কাছে ধন্না দিতে লাগলাম। সেই এক কথা। কমল বোস বললে' এখনো সময় আছে। পরের জাহাজে বাড়ী ফিরে যান। শেখরেন্দু বোস আমায় প্রোগ্রাম দিলেন প্রথম।

৺প্রমথেশ বড়ুয়া একটা চিঠি দিয়েছিলেন একজন বাঙালীর নামে বিলেতে।

খোঁজ করতে লাগলাম তাঁর। দুচার দিন ঘোরা ঘুরি করার পর দেখা হ'লো তাঁর সঙ্গে। সেই একই কথা তাঁরও মুখে। কি যেন মহা অন্যায় করে বসেছি সিনেমা জগতে কাজ শিখতে আসায়। বরং তিনি দিলেন আর এক মাত্রা এগিয়ে। বললেন ডিনার টিনার দিতে হবে এদেশের প্রডিউসারদের। খরচ পড়বে এক একটা ডিনারে ৫০।৬০ টাকা করে। সন্তুষ্ট হ'লে খাওয়া দাওয়ার পর হয়তো প্রডিউসার কেউ ও বিষয়ে শিখতে সুযোগ দেবেন। রাজী হয়ে গেলাম এতেও। ধন্না দিতে লাগলাম তাঁর গৃহে রোজই। বলেন যখন তিনি আমি তার কথা মত হাড় কাঁপান শীতে, বরফ পড়ছে ঝিপ্ ঝিপ্ করে দাঁড়িয়ে আছি পথে ঘাটে হা-পিত্তেশ করে অধীর প্রতীক্ষায় তাঁর জন্যে। কোথায় কে, তাঁর পাত্তা নেই। নাছোড় বান্দা আমার এ ভাব দেখে এক পার্শী ছেলে আমার চোখ খুলে দিল। বললো সে "এম্ এ ও ল পড়েছেন আপনি, আপনি শিক্ষিত লোক। একটা কথা বলছি বলে ক্ষমা করবেন। এতদিনে আপনার বোঝা উচিত যে এসব লোকের কথার কোন মূল্য নেই। বরং নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করুন।"

কথাগুলা মনে ধরে গেল। কোন বাঙ্গালী ছেলে ভবিষ্যতে এ সমস্যার সন্মুখীন না হয় সেই জন্যেও প্রবন্ধে এ বিষয়ে অবতারণা করা। বহু বিলাতে ভারতীয় লোক আছেন যাঁরা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা লোক দেখিয়ে চালকরবার জন্য বহু বিলাতে নতুন আসা ছেলেদের এ বিষয়ে প্রতারণা করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে অপরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে বেশ জুতসই করে খাওয়া-দাওয়া

বিমল বর্ধন পরিচালিত আর-ডি-বি-র পরিবেশনায় মুক্তি প্রতীক্ষিত 'বিভাস' চিত্রে
অনুভা ও ললিতা

করা আর কি? পার্শী ছেলেটির কথাটা সারা পথ আমাকে যেন পেয়ে বসেছিল। হোটেলে গিয়ে telephone directory দেখে সিনেমাজাতীয় লোকদের তালিকা একটা করলাম।

তারপর স্বরু হ'লো তাদের কেন্দ্র করে আমার ব্যক্তিগত অভিযান।

প্রথমেই গিয়ে খেলাম এক প্রচণ্ড আঘাত।

এক প্রতিষ্ঠানে হানা দিতেই কোন এক সিনেমা জগতের মাতব্বরের বুড়ী সেক্রেটারী যা উপদেশ দিয়েছিল আজ তা আমি ১৬ বছর পরে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে থাকি।

বলেছিল সে বিলাতে গিয়ে কারুর বাড়ীতে বা অফিসে স্বশরীরে হানা দেওয়া এখানে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। ভাল হ'লো সব থেকে ব্যক্তি বিশেষকে চিঠি লেখা সব খুলে আসল উদ্দেশ্য কি? তিনি আমায় কি উপদেশ দেন? আমি বিদেশী লোক ইত্যাদি ইত্যাদি জানিয়ে।

কোন প্রকার কারুর সাহায্য করবার ইচ্ছা থাকলে তিনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে মুক্ত হস্তে সাহায্য করবেন।

টেলিফোন করা চলে যেখানে ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে জানা হয়েছিল কোন দিন বা যিনি বলেছেন বা দুজনার মধ্যে এমন কেউ আছেন যিনি পরস্পরকে জানেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আরো জানিয়ে দিল সেক্রেটারী যে

বিধায়ক ও জয়শ্রী সেন
"সেতু" নাটকে।

এ দেশে রাণীকে চিঠি দিলেও লোকে উত্তর পায় এবং সাধ্য মত অভাব-অভিযোগের বিধি-ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

যা হোক প্রায় সপ্তাহে যতগুলো পারা মানুষের পক্ষে সম্ভব, লিখতে লাগলাম চিঠি। উত্তর এল কিন্তু সকলেই দুঃখিত, সাহায্য করা তাদের হাতের বাইরে। আশা করি আপনার প্রচেষ্টা সফল হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

গেলাম হাউসেস্ অফ্ প্যার্লামেন্টে। রেজিল্যাণ্ড সরেনসন প্রভৃতি ভারতীয়দের শুভানুধ্যায়ীদের খোঁজ করতে লাগলেম M. P. দের মধ্যে। সাড়া পেলাম সরেনসনের কাছে। বহু লোককে তিনি চিঠি লিখে দিলেন। উত্তর এলো তাদের কাছ থেকে। অধিকাংশই পোষাকী চিঠি সব, তাতে আন্তরিকতার কোন প্রকার বালাই নেই। দমে গেলাম না এতেও। দেখা করতে লাগলাম বড় বড় Lord Family'র ছেলেদের সঙ্গে। এর মধ্যে Lord Opswald রাণীর যে Lord-in-waiting তাঁর ভাই মাননীয় ডেরিক উইন্ আজ আমার ছবির ব্যাপারে অংশীদার, Rt Honble Lord Milner—প্রিভি-কাউন্সলার এবং ভূতপূর্ব্ব হাউস অফ ক্যামন্সের স্পীকার, আজ তিনি আমার সলিসিটার, তার ছেলে মাননীয় মাইকেল মিলনার আমার বন্ধু। আর হোলেন লেডী প্যামেলা মাউণ্ট ব্যাটান (হীক্স), লড্ ব্রেবন প্রভৃতি আমার বিশেষ পরিচিত। বিশেষ করে লেডী প্যামেলা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। তাছাড়া স্বর্গত লর্ড প্যাথিক লরেন্স তখন সবে মাত্র ভারতের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী অফ্ স্টেটের পদ ত্যাগ করেছেন, তিনি নিজে হাতে আমায় পরিচয় পত্র লিখে দিয়েছেন। এসব মাথাওয়ালা লোকদের চিঠিতে কাজ যে হয়েছে তাও সামান্য। যেমন সরকারের Crowd unit এর সঙ্গে কাজ শেখার ২।৪ সপ্তাহ তাও আবার প্রামাণ্য ছবি—documentary ছবি যা আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। আশা আকাঙ্ক্ষা বিলাতের বড় বড় ষ্টুডিওতে কাজ শেখা। আশে পাশে থাকবে Sir Lawrence oliver তখনকার দিনে Marorrn lock wood বা Annanige ইত্যাদি।

কোথাও কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না এ সব উচ্চ আশা সফল হবার।

[ক্রমশঃ

হীন হত্যা ঃ অমর আত্মা

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

"তুমিও ব্রুটাস্!"—এই শেষ কথা, তারপরই নীরব হয়ে গেছিল সিজারের কণ্ঠ ঘাতকের মর্ম্মান্তিক আঘাতে,—রোমান্ সিনেটের মর্ম্মর চত্বরে লুটিয়ে পড়েছিল রোমক্ সাম্রাজ্যের ভাগ্য বিধাতা মহামান্য সিজারের রুধিরাক্ত দেহ রাজনৈতিক হত্যার এক উগ্র উদাহরণ হয়ে। ক্রুশবিদ্ধ মুমূর্ষু যীশুর ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল, "ঈশ্বর, এরা জানে না কি করছে, এদের ক্ষমা কর।" ধর্ম্মান্ধতার বিষাক্ত পরিণামে ঘটেছিল এক হীন হত্যা আর মহান মৃত্যু পাপীদের ত্রানের জন্য। জোয়ান্-অব-আর্ক-এর স্বর্গীয় দীপ্তিভরা মুখেও ফুটে উঠেছিল যন্ত্রণার ছাপ আগুনের

প্রেসিডেণ্ট
জন্ ফিট্জারাল্ড কেনেডি

লেলিহান শিখা যখন ঘিরে ধরেছিল তরুণীর বীরতনু নিষ্ঠুর উল্লাসে। বীরবালার মর্ম্মন্তুদ মৃত্যু—ইতিহাসের এক জঘন্য হত্যা। ফাঁসীর মঞ্চে নন্দকুমারের দোদুল্যমান দেহও সাক্ষ্য দেয় স্বার্থান্বেষীদের হীন চক্রান্তের আর বিচারের প্রহসনের। আরও আছে, আগে ও পরে এই হীন হত্যার লীলা। এসেছে আগ্নেয় অস্ত্র ঘাতকের হাতে—হত্যাও হয়েছে সহজ। বর্ণান্ধতার বলি হল এক মহান রাজনীতিক, ঘটল এক শোচনীয় শোনিতপাত—লিঙ্কন হত্যা।

এই আধুনিক সুসভ্য যুগেও ঘটছে এই হীন হত্যার লীলা আর মহীয়ান মৃত্যু—শহীদের সম্মান। "হা রাম"—বলে লুটিয়ে পড়েছে এ যুগের মহাত্মার বুলেটবিদ্ধ দেহ প্রার্থনার প্রাঙ্গনে—ঘটেছে ইতিহাসের আর একটি হীন হত্যা ও মহৎ মৃত্যু। দেশের কাজে উৎসর্গীত প্রাণ বীর বন্দরনায়ককেও প্রাণ দিতে হয়েছে ঘাতকের গুলিতে।

তারপর, এই তো সেদিন সেই শুক্রবারে, ২২শে নভেম্বরে ঘটে গেল বিশ্বের আর একটি হীনতম হত্যা, আর এক মহাজীবনের মধ্যপথে মহাঅবসান। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জন ফিট্‌জারাল্ড কেনেডি নির্দ্দয় ভাবে নিহত হলেন অদৃশ্য আততায়ীর নিক্ষিপ্ত গুলিতে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, যাঁর একটি ইঙ্গিতে সুরু হয়ে যেতে পারে বিশ্বযুদ্ধ, অসীম ক্ষমতার অধিকারী সেই রাষ্ট্রনায়ক গুপ্ত ঘাতকের অব্যর্থ সন্ধানে, প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে শকটের মধ্যে চূর্ণ মস্তিষ্কে লুটিয়ে পড়লেন পত্নীর বাহুপরে। কেউ রক্ষা করতে পারল না, কেউ বাঁচাতে পারল না এই তরুণ রাষ্ট্রপতিকে, এই উজ্জ্বলতম রত্নটিকে এই মর্ম্মান্তিক মৃত্যুর হাত থেকে। গুপ্ত ঘাতকের গুলি স্তব্ধ করে দিল শান্তি প্রেমিক, প্রগতি প্রয়াসী এই মহান মানুষের কণ্ঠকে চিরতরে।

জীবন অনিত্য, জগতে কেউ অমর নয়; কিন্তু একটি মহৎ জীবনের যখন অবসান ঘটে জীবনের মধ্যপথে, কর্ম্মসাধনার সিদ্ধির মুখে, এইরূপ নির্ম্মম, নৃশংস, নিষ্ঠুর আঘাতের মাঝে, তখন সে মৃত্যু সভ্য মানুষের মনে হানে ভীম কশাঘাত, শোকে উদ্বেল হয়ে ওঠে মানুষের মন, জাগে শুধু এক অনন্ত জিজ্ঞাসা—কেন, কেন এই হীন হত্যা, এই বর্ব্বর আচরণ। এর উত্তর নেই—শুধু জানি অতীতেও ঘটেছে এই নৃশংস কাণ্ড, বর্ত্তমানেও ঘটছে এবং হয়ত ভবিষ্যতেও ঘটবে। যুগ পাল্‌টেছে, সমাজ-সভ্যতার উন্নতি হচ্ছে কিন্তু মানুষের এই জিঘাংসার পরিবর্ত্তন হয় নি। মানুষ যে একদা পশুই ছিল, আর নিষ্ঠুর হত্যার নির্লজ্জ নীচতার প্রতি তার যে আকর্ষণ ছিল, আজকার সুসভ্য মানুষের এই পাশবিক আচরণই তা প্রমাণ করে দিচ্ছে,—প্রমাণ করে দিচ্ছে যে মানুষ এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও সম্পূর্ণ সুসভ্য হয়ে উঠতে পারে নি বলেই তার বিবেক তার বর্ব্বরতাকে বাধা দিতে পারছে না, তার নির্ম্মলতা তার নির্ম্মমতাকে নষ্ট করতে পারছে না, তার ধর্ম্মপ্রাণতা ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম তার পাপের প্রতি আসক্তিকেও পরাস্ত করতে পারছে না। তাই যুগে যুগে মানুষ—বিকারগ্রস্ত, বিবেকহীন, বিপথগামী মানুষ, মানবতাকে হত্যা করেছে মাৎসর্য্য মত্ততায় ও বিকৃত বুদ্ধিতে। প্রেসিডেন্ট কেনেডির মৃত্যু বার বার তাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে মানুষের এই নীচতাকে। তবে ঘন কৃষ্ণ মেঘের মাঝেও যেমন রূপালী রেখা দেখা যায়, ঘোর অন্ধকারেও যেমন জেগে থাকে ধ্রুবতারা, মানুষের এই নির্ম্মম নীচতার মাঝেও দেখা যাচ্ছে আলোর লেখা, সারা জগৎ ব্যাপি স্বতঃস্ফূর্ত্ত শোকোচ্ছ্বাসে কেনেডি হত্যার প্রায়শ্চিত্ত রূপে। জন কেনেডি আজ শুধু আমেরিকার নন—তাঁর বিয়োগ ব্যাথায় শোকসন্তপ্ত সমগ্র বিশ্বমানবের আজ তিনি পরম আপনার জন হয়ে উঠেছেন এই মহান মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তাই তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে শুধু শোকই সবাই করছে না, চাইছে অপরাধীর শাস্তি, পাপের প্রায়শ্চিত্ত। প্রেসিডেন্ট কেনেডির হত্যার পিছনে যে ষড়যন্ত্র, যে রহস্য রয়েছে তার উদ্ঘাটনও সবাই চাইছে—জানতে চাইছে কেন এই শান্তি প্রেমিক মানুষটিকে এই ভাবে হত্যা করা হল, কি এর রহস্য। অবশ্য আমেরিকার ইতিহাস প্রেসিডেন্ট হত্যার কালিমায় কলংকিত। জন কেনেডির আগেও তিনজন প্রেসিডেন্ট নিহত হয়েছেন আততায়ীর গুলিতে। এর মধ্যে ডেমোক্রেসির উদ্গাতা অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কিন প্রেসিডেন্ট এব্রাহাম্ লিঙ্কন দাস প্রথা বিলোপ করে নিগ্রোদের স্বাধীনতা দেওয়ার মহান কার্য্যের জন্যই আত্মদান করেছিলেন। বর্ণান্ধতার বিষ তাঁর মহৎ প্রাণকে হনন

প্রেসিডেণ্ট কেনেডির মৃত্যুতে নয়া দিল্লীর মার্কিন দূতাবাসে ২৫শে নভেম্বরের শোক সভায় দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত সদস্য বক্তৃতারত শ্রীজোশেফ গ্রাণ্‌কে এবং প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু, রাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণন, উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রীজাকির হোসেন প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে।
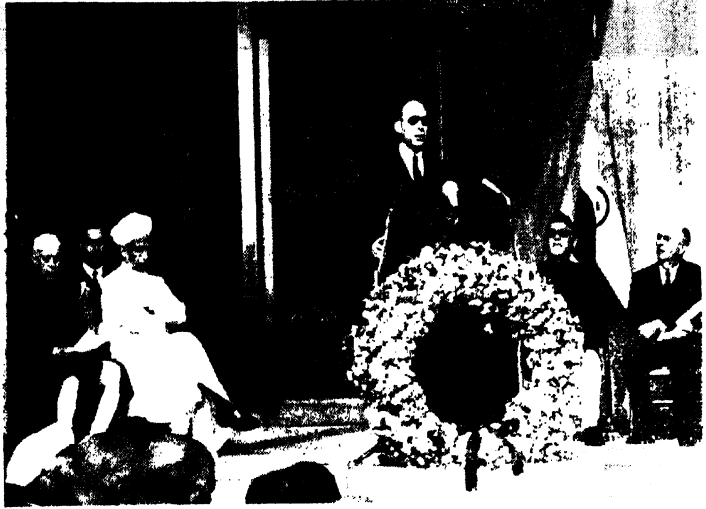
করে দিয়েছিল তাঁকে মহান মৃত্যু। বুথ নামক এক অভিনেতা পত্নীসহ অভিনয় দর্শনে মগ্ন প্রেসিডেণ্টকে অতর্কিতে গুলি করে। সেই নির্ম্মম আঘাতেই প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের মৃত্যু ঘটে। তারই প্রায় এক শতাব্দী পরে আমেরিকার আর এক প্রসিদ্ধ প্রেসিডেণ্ট পত্নীসহ শকটে যেতে যেতে আততায়ীর গুলিতে নৃশংস ভাবে নিহত হলেন। এর মধ্যে আরও দু'জন মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট নিহত হয়েছেন ঘাতকের গুলিতে। প্রেসিডেণ্ট জেনারেল গারফিল্ড নিহত হন মাত্র কয়েকমাস প্রেসিডেণ্ট থাকার পর। তারপর ১৯০২ সালে প্রেসিডেণ্ট ম্যাকিন্‌লেও নিহত হন। এবার নিহত হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পঁয়ত্রিশতম, তরুণতম ও উজ্জ্বলতম প্রেসিডেণ্ট জন ফিট্‌জারাল্ড কেনেডি ২২শে নভেম্বর, ১৯৬৩ সালে মাত্র ৪৬ বছর বয়সে তিন বৎসর প্রেসিডেণ্টের কার্য্যভার বহন করে। আরও এক বছর তিনি প্রেসিডেণ্ট থাকতে পারতেন, তারপর হত নির্ব্বাচন এবং এই নির্ব্বাচনে জন কেনেডির জয়লাভ প্রায় সুনিশ্চিত ছিল। কিন্তু ভাগ্য তাঁকে সে সুযোগ দিল না—দিল না তাঁকে দেশের ও বিশ্বের উন্নতিকল্পে কাজ করবার আরও সুবিধা। তবুও স্বল্প তিন বৎসরের কার্য্যকালের মধ্যেই প্রেসিডেণ্ট কেনেডি তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সৎসাহস ও বিশ্ব-শান্তিরক্ষার সচেষ্টতার জন্য আমেরিকা-বাসীদের দ্বারাই শুধু নন বিশ্ববাসীকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হয়েছেন। এমন কি প্রতিদ্বন্দ্বী কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিও যে তাঁকে কত শ্রদ্ধা করত তা তাঁর মৃত্যুর সংবাদে ব্যথিত কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র-প্রধান ও জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত শোক প্রকাশেই প্রস্ফুটিত হয়েছে। বিশেষ করে রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভের শোকবাণীতে ও শোকসন্তপ্ত আচরণে এবং রুশ জনসাধারণের শোকোচ্ছ্বাসে এইটাই প্রমাণ করে দেয় যে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ক্যাপিটালিষ্ট তথা ডেমোক্রেটিক দুনিয়ার নায়ক হয়েও অনন্যসাধারণ সদগুণে বিশ্বের অপামর জনসাধারণের হৃদয়ই শুধু জয় করেন নি, কম্যুনিষ্ট শিবিরেও তিনি আস্থাভাজন বন্ধুরূপে পরম শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বল্পকালের মধ্যে এই আস্থা অর্জ্জন যে অসামান্য ও অভূতপূর্ব্ব সাফল্যের পরিচয় তা অনস্বীকার্য্য। এই স্বল্প তিন বৎসরের মেয়াদে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি বার্লিন সমস্যা, কিউবা থেকে রুশ রকেটের অপসারণ, চীন কর্ত্তৃক আক্রান্ত ভারতকে তড়িৎগতিতে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যদান, রাশিয়ার সহিত পরমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধের চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি দুরূহ কার্য্য সম্পাদনের মধ্য দিয়ে তাঁর অসাধারণ কার্য্য-দক্ষতা, নির্ভীক দৃষ্টিভঙ্গী ও শান্তি রক্ষার সৎপ্রচেষ্টার পরিচয় প্রদান করেছেন। তাঁর এই অকাল মৃত্যু না ঘটলে

এবং আরও কিছুকাল প্রেসিডেণ্টরূপে কাজ করবার সুযোগ পেলে বিশ্বমানবের জন্যে আরও অনেক কিছুই করতে পারতেন, এমন কি হয়ত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক থেকে বিশ্ববাসীকে চিরতরে মুক্তি দিতেও পারতেন, কম্যুনিষ্ট শিবিরের সঙ্গে সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চিরস্থায়ী অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করে। প্রেসিডেণ্ট কেনেডি বেঁচে থাকলে যে বিশ্ব আজ সর্ব্বতোভাবে লাভবান হত, তা আজ সকলেই উপলব্ধি করতে পারছে—তাই আজ দিকে দিকে উঠছে শোকোচ্ছ্বাস তাঁর মহাপ্রয়াণে। অবশ্য সৃষ্টি-ছাড়া কম্যুনিষ্ট চীন এর ব্যতিক্রম। শোক প্রকাশ তো দূরের কথা সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় প্রেসিডেণ্ট কেনেডির এই শোকাবহ মর্ম্মন্তুদ মৃত্যুর এক জঘন্য ব্যঙ্গ-চিত্র প্রকাশ করতেও চীনা সংবাদপত্রের দ্বিধা হয়নি। অথচ অন্যান্য কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র বিশ্বের অকম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির ন্যায় অকুণ্ঠ সমবেদনা জানিয়েছে প্রেসিডেণ্ট পরিবারকে ও মার্কিন জনসাধারণকে। শুধু তাই নয়, এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে চক্রান্ত রয়েছে বলে রাশিয়া অন্যান্য অনেকের মত মনে করে এবং এই রহস্য ভেদের জন্য আগ্রহও দেখিয়েছে। হত্যাকারীরূপে ধৃত ও পরে নিহত লী হার্ভে অস্‌ওয়াল্ড-এর কিছু পূর্ব্বের রেকর্ডও এফ্, বি, আই (Federal Bureau of Investigation)-এর হাতে তুলে দিয়েছে তদন্তের সুবিধার জন্য।

সারা পৃথিবী আজ উন্মুখ হয়ে আছে এই হত্যা রহস্য ভেদের আশায়। শুধু একজন বিকারগ্রস্ত, বিবেকহীন মানুষের খেয়ালেই কি এই ঐতিহাসিক নারকীয় হত্যা সঙ্ঘটিত হল? নাকি এর পশ্চাতে রয়েছে দক্ষিণের বর্ণবিদ্বেষীদের দারুণ ক্ষোভ ও ঘৃণা নিগ্রোদের স্বাধিকার রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প কেনেডির প্রতি? কিংবা বিশ্বশান্তি রক্ষায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ প্রেসিডেণ্টের সাধনা সফল হয়ে বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক দূরীভূত হলে যুদ্ধবাজ পুঁজিবাদীদের স্বার্থহানি ঘটবে বলেই কি জন কেনেডিকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া হল?—এ রহস্যের সন্ধান হওয়া দরকার, চক্রান্ত যদি হয়ে থাকে তাও ভেদ করা কর্ত্তব্য - শুধু মাত্র প্রতিশোধের জন্যেই নয়, এর পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্যও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্ত্তমান বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী, সম্পদশালী ও প্রগতিশীল দেশ। তার রাষ্ট্রপতির বার বার এরকম শোচনীয়ভাবে নিহত হওয়া সে দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে, বিশেষ করে পুলিশ ও সিকিউরিটি বিভাগের পক্ষে বিশেষ লজ্জার কথা। ডালাস শহর দক্ষিণের বর্ণবিদ্বেষী অধ্যুষিত স্থান। কিছু-দিন আগেই শ্রীঅ্যাদলাই ষ্টিভেনসন্ সেখানে জনতা কর্ত্তৃক প্রহৃতও হয়েছিলেন। প্রেসিডেণ্টকে শ্রীষ্টিভেনসন্ সে কথা বলে সাবধানও করে দিয়েছিলেন। ডালাসে প্রেসিডেণ্ট গেলে একটা কিছু ঘটবে বলে অনেকেই সন্দেহ করছিলেন এবং উদ্বিগ্নও হয়েছিলেন। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও প্রেসি-ডেণ্টকে ডালাসে যেতে দেওয়া হল এবং খোলা গাড়ীতে করে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। সিকিউরিটি ব্যবস্থাও যে যথোপযুক্ত হয়েছিল বলে মনে হয় না, কারণ তাহলে হত্যাকারী নির্ব্বিবাদে কাজ সেরে সরে পড়তে পারত না। হত্যাকারী সন্দেহে অসওয়াল্ড ধরা পড়েছে অনেক পরে অন্য স্থলে। তারপর অসওয়াল্ডের মতন মূল্যবান আসামীকেও নিরাপদে রাখতে পারল না পুলিশ, নিহত হল সেও পিস্তলের গুলিতে প্রকাশ্য রাজপথে পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে। সব কিছু আলোচনা করলে মনে হয় এর পিছনে আছে ঘনঘোর চক্রান্তজাল। অসওয়াল্ডের হত্যাকারী জ্যাক্ রুবী এখন পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। অসওয়াল্ডের মুখ বন্ধ করবার জন্যই যদি তাকে হত্যা করা হয়ে থাকে তাহলে রুবীর মুখ থেকেও বিশেষ কিছু বেরুবে না। টেক্সাস্ স্কুলবুক ডিপোজিটরী ব্যুরোর যে জানালার থেকে গুলি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, একজন ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় অতর্কিতে সে জানালার ছবি উঠে গেছে এবং সেখানে নাকি দু'জন লোকের ছায়া দেখা গেছে ফটো-গ্রাফে। অসওয়াল্ড যদি একজন হয় তাহলে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে? এই হত্যা রহস্যের সমাধান হবে এবং কি ভাবে হবে তা আজ অজ্ঞাত। কিন্তু মানুষের মনে এ সন্দেহ জাগা আশ্চর্য্যের নয় যে এর পিছনে রয়েছে এক সুদূর প্রসারী ঘনঘোর রহস্যজাল। সে রহস্যের যদি কোনওদিন সমাধান হয় তাহলে হয়ত দেখা যাবে তা রহস্যোপন্যাসের কাল্পনিক কাহিনীকেও হার মানিয়েছে। আশা করি মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ অচিরেই এই ঐতিহাসিক হত্যা রহস্যের সমাধান করে তাঁদের কর্ম্মদক্ষতার প্রমাণ দেবেন।

প্রেসিডেণ্ট জন্ কেনেডির স্থলাভিষিক্ত বর্ত্তমান

বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট
লিণ্ডন জনসন

*

প্রেসিডেণ্ট লিণ্ডন জনসনও এই হত্যারহস্যের সমাধানে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। প্রেসিডেণ্ট কেনেডির আরব্ধ কার্য্য সম্পাদনেও তিনি বিশেষ আগ্রহী। কেনেডি আনীত "সিভিল্ রাইটস বিল"-এর তিনি একজন প্রধান সমর্থকও এবং এই বিল্‌টি যাতে সিনেটে পাশ হয় তার জন্য তিনি বদ্ধপরিকরও। ভারতদরদী প্রেসিডেণ্ট কেনেডির মতন প্রেসিডেণ্ট লিণ্ডন জন্‌সনও ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। তাঁর কার্য্যকাল এখনও এক বৎসর রয়েছে। এর মধ্যে আমেরিকার বৈদেশিক বা ঘরোয়া রাজনীতিতে বিশেষ পরিবর্ত্তন হবে বলে মনে হয় না—অনেকটা কেনেডি নীতিতেই চলবে এবং আশা হয় কেনেডি আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রেসিডেণ্ট জন্‌সনও অকুতোভয়ে নিগ্রোদের স্বাধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকবেন।

প্রেসিডেণ্ট জন ফিট্‌জারাণ্ড কেনেডির স্মৃতি রক্ষার অনেক ব্যবস্থা হবে, কিন্তু যে বর্ণবিদ্বেষ দূরীকরণের দুরূহ কাজ করতে গিয়ে তাঁর মহামূল্য জীবন দান করলেন, প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনও যে কাজের জন্যে প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁদের সেই আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন হলেই লিঙ্কন-কেনেডির স্মৃতিও চিরস্থায়ী হবে। ঘাতকের হস্ত লিঙ্কনকে নিহত করেছে, কেনেডির কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু এই হত্যা তাঁদের আত্মাকে বিনষ্ট করতে পারে নি। ধর্ম্মের অন্ধতায়, স্বার্থের তাগিদে, ক্ষমতার লোভে যুগে যুগে এই হত্যাকাণ্ড চালিয়ে এসেছে মানুষ নির্লজ্জ নির্ম্মমতায়। কখনও প্রকাশ্যে বিচারের প্রহসনে, কখনও বা গুপ্তঘাতকের নিষ্ঠুর আক্রমণে কত মহাজীবনের হয়েছে অবসান সেকালে ও একালে, হয়ত আরও হবে দূর-অদূর ভবিষ্যতে মানব সভ্যতার ইতিহাসকে কলঙ্কে লিপ্ত করে। কিন্তু নীচমনা মানুষের কৃত এই হীন হত্যা মহামানবের অমর আত্মাকে পারে না নিহত করতে। তাঁদের

রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন ও প্রেসিডেণ্ট লিণ্ডন জনসন।

১৯৬১ সালে তৎকালীন মার্কিন উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রীজনসন যখন দিল্লীতে আগমন করেছিলেন, সেই সময় এই চিত্র গৃহীত হয়।

*

কেনেডির সমাধিতে যে অনির্ব্বাণ দীপশিখা জ্বালা রয়েছে সেই দীপশিখার মতন কেনেডির কার্য্য চিরকাল অনুপ্রাণীত করবে ভবিষ্যত প্রেসিডেণ্টদেরই শুধু নয় অপামর জনসাধারণকেও। ঘাতকের হস্ত তাঁর দেহকে নিহত করেছে সত্য, কেড়ে নিয়েগেছে তাঁকে প্রিয় পরি-জনের কাছ থেকে, কিন্তু তাঁর অজেয় আত্মাকে জয় করতে পারে নি—মৃত্যুতে আরও মহীয়ান হয়ে উঠেছেন তিনি, মৃত্যু তাঁকে দিয়েছে শহীদের সম্মান, বসিয়েছে তাঁকে একাসনে লিঙ্কন-গান্ধীর পাশে। জন কেনেডি আজ হয়ে গেছেন অমর। প্রেসিডেণ্ট কেনেডির মৃত্যু নেই।

অপূর্ণ কাজে সমাধা করতে এগিয়ে আসে অজেয় নতুন মানুষ সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে। লিঙ্কনের আরদ্ধ কার্য্য শেষ করতে শত বর্ষ পরে এগিয়ে এসেছিল জন কেনেডি। আবার কেনেডির অসমাপ্ত কাজ শেষ কর:তে এগিয়ে আসবে নূতন মানুষ নবীন বলে বলিয়ান হয়ে। প্রেসিডেণ্ট

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

জাতীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতা ঃ

জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে (১৯৬৩) গত তিন বছরের বিজয়ী মহীশূর দল ৫—০ গোলে গত দু' বছরেরই রানার্স-আপ মাদ্রাজ দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ক'রে লেডি রতন টাটা ট্রফি পেয়েছে। মহীশূর ১৯৬০ সালের ফাইনালে ২—০ গোলে পাঞ্জাবকে এবং ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালের ফাইনালে ২—০ ও ৪—০ গোলে মাদ্রাজকে পরাজিত করেছিল।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতার একদিকের সেমি-ফাইনালে মহীশূর ৩—০ গোলে দিল্লীকে এবং অপর দিকের সেমি-ফাইনালে মাদ্রাজ ২—০ গোলে মহাকোশলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছিল। বাংলা কোয়ার্টার ফাইনালের খেলায় ০—২ গোলে গত দু'বছরের রানার্স-আপ মাদ্রাজের কাছে পরাজিত হয়।

ডেভিস কাপ আঞ্চলিক ফাইনাল ঃ

১৯৬৩ সালের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক ফাইনালে আমেরিকা ৫—০ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে গত চারবছরের (১৯৫৯-৬২) ডেভিস কাপ বিজয়ী দেশ অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার যোগ্যতা লাভ করেছে। এই নিয়ে আমেরিকার ৪২ বার ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলা হবে। ডেভিস কাপ বাৎসরিক লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে ১৯০০ সালে। সেই সময় থেকে ১৯৬২ সাল পর্য্যন্ত সময় ধরলে ৬৩ বার খেলা হওয়ার কথা। কিন্তু দুটি বিশ্ব যুদ্ধের দরুণ ১০ বছর (১৯১৫-১৮ ও ১৯৪০-৪৫) প্রতিযোগিতা বন্ধ রাখতে হয়েছিল; তাছাড়া ১৯০১ সালে ১৯০০ সালের ডেভিস কাপ জয়ী আমেরিকাকে এবং ১৯১০ সালে ১৯০৯ সালের ডেভিস কাপ জয়ী অষ্ট্রেলেশিয়াকে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি; অর্থাৎ ১৯০১ ও ১৯১০ সালেও প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। সুতরাং সর্ব্বসাকুল্যে ১২ বছর ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়নি—১৯০০ থেকে ১৯৬২ সাল পর্য্যন্ত মোট ৫১ বার ডেভিস কাপের খেলা হয়েছে। বিগত এই ৫১ বারের ডেভিস কাপের খেলায় এক আমেরিকাই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেছে ৪১ বার অর্থাৎ মাত্র ১০ বার আমেরিকা চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেনি। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে আমেরিকাই সর্ব্বাধিক বার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলবার রেকর্ড করেছে। আমেরিকার এই ৪১ বারের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় আমেরিকা ডেভিস কাপ জয় করেছে ১৮ বার। ১৯৬৩ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ অষ্ট্রেলিয়াও কম যায় না। অষ্ট্রেলিয়ার এই নিয়ে ৩২ বার

ভারত আমেরিকা ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় আমেরিকার ডেনিস রাল্‌সটনকে রমানাথন কৃষ্ণানের বিপক্ষে খেলতে দেখা যাচ্ছে।

*

চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা হবে। বিগত ৩১টি খেলায় অষ্ট্রেলিয়াও আমেরিকার সমান ১৮ বার ডেভিস কাপ পেয়েছে। ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড মিলিত হয়ে অষ্ট্রেলেশিয়া নামে ডেভিস কাপের খেলায় যোগদান করতো। ১৯২৩ সাল থেকে অষ্ট্রেলিয়া পৃথক ভাবে খেলছে। ১৯২২ সালের মধ্যে নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে মিলিত অবস্থায় (অষ্ট্রেলেসিয়া নামে) অষ্ট্রেলিয়া ৯ বার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে ৬ বার ডেভিস কাপ পেয়েছে। ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৬২ সালের খেলা নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া পেয়েছে ১২ বার ডেভিস কাপ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯৪৬ সাল থেকে পুনরায় ডেভিস কাপের খেলা আরম্ভ হয়েছে। যুদ্ধোত্তর কালের এই প্রতিযোগিতায় (১৯৪৬-৬২) আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া—মাত্র এই দুটি দেশই একটানা ১৪ বার (১৯৪৬-৫৯) ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেছিল। এই ১৪ বছরের খেলায় আমেরিকার জয় ৬ বার এবং অষ্ট্রেলিয়ার ডেভিস কাপ জয়ের সংখ্যা ৮ বার। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া এইখানেই থামেনি, তারা পরবর্ত্তী তিন বছরও (১৯৬০-৬২) ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে ৩ বারই ডেভিস কাপ পেয়েছে। সুতরাং যুদ্ধোত্তর কালের (১৯৪৬-৬২) মোট ১৭ বছরের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ডেভিস কাপ জয় হয়েছে ১১ বার এবং আমেরিকার ৬ বার। ইতালী উপর্য্যুপরি দু'বছর (১৯৬০-৬১) এবং মেক্সিকো একবার (১৯৬২) অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে পরাজিত হয়েছে। তিন বছর পর ১৯৬৩ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে দুই পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী, অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা পুনরায় মিলিত হবে আগামী ২৬শে ডিসেম্বর, অষ্ট্রেলিয়ার এডিলেড সহরে।

১৯৬৩ সালের আঞ্চলিক ফাইনাল খেলাটি বোম্বাইয়ের ক্রিকেট ক্লাব অব্ ইণ্ডিয়ার বালি-মিশ্রিত টেনিস কোর্টে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় টেনিস মহলের এক রকম দৃঢ় ধারণাই ছিল, এই শ্রেণীর টেনিস কোর্টে ভারতীয় খেলোয়াড়রা যথেষ্ট সুবিধা লাভ করবেন এবং অপরদিকে আমেরিকার খেলোয়াড়রা অনভ্যস্ত মাটিতে খেলতে নেমে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়বেন। কিন্তু আমেরিকার খেলোয়াড়-দের কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। তাঁরা অল্প কয়েক দিনের অবস্থানে ভারতবর্ষের জলবায়ু ধাতস্থ ক'রে নেন

এবং ভারতবর্ষের মাটির সঙ্গে নিজেদের খেলার পদ্ধতি সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। প্রথম দিনের দুটি সিঙ্গলস খেলাতেই আমেরিকা জয়ী হয়ে ২—০ খেলায় অগ্রগামী হয়। আমেরিকার এক নম্বর খেলোয়াড় এবং ১৯৬৩ সালের উইম্বলেডন সিঙ্গলস বিজয়ী 'চাক' ম্যাকিনলে ৬—৪, ৬—৩ ও ৬—০ গেমে প্রেমজিৎলালকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় সিঙ্গলস খেলায় ডেনিস র‍্যালস্টন (আমেরিকা) ৬-৪, ৬—১ ও ১৩—১১ গেমে ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণানকে পরাজিত করেন। র‍্যালস্টনের বিপক্ষে কৃষ্ণাণের এই পরাজয় কেউ আশা করেননি। এই বছরই বিগত উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় কৃষ্ণান ৬—৩, ৬—৩, ৩—৬ ও ১২—১০ গেমে র‍্যালস্টনকে পরাজিত করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের ডাবলস খেলায় আমেরিকার ম্যাকিনলে এবং র‍্যালস্টন ৬—৮, ৬—৩, ১২—১০ ও ৬—৪ গেমে ভারতীয় জুটি জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লালকে পরাজিত করলে আমেরিকা চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। ডাবলসের খেলায় ভারতীয় জুটি যে এ রকম তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন তা টেনিস খেলার অভিজ্ঞ মহলেরও ধারণার অতীত ছিল। ডাবলসের খেলায় আমেরিকার এই জয়লাভের ফলে তৃতীয় দিনের বাকি দুটি সিঙ্গলস খেলায় তাদের হার-জিতের প্রশ্ন নিয়ে কোন দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না, তারা তখন ৩-০ খেলায় জয়লাভ করে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে পাশ-পোর্ট পেয়ে গেছে। সুতরাং তৃতীয় দিনে প্রতিযোগিতার বাকি দুটি সিঙ্গলস খেলায় আমেরিকার হার হ'লে তাদের কোনই ক্ষতি নেই, জয় হ'লে জয়লাভের সংখ্যা যা বেড়ে যায়। এই ভারতবর্ষের মাটিতেই ১৯৬১ সালের আঞ্চলিক সেমিফাইনাল খেলায় আমেরিকা খুব অল্পের ব্যবধানে ৩-২ খেলায় ভরেতবর্ষকে পরাজিত করেছিল। মাত্র একটা খেলার ব্যবধানে জয়লাভের ফলে টেনিস খেলায় আমেরিকার বিশ্বজোড়া সুনাম যথেষ্ট নষ্ট হয়েছিল। সুতরাং অতীতের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জয়লাভের ব্যবধান এই সুযোগে বৃদ্ধি ক'রে সুনাম অক্ষুন্ন রক্ষার ইচ্ছা আমেরিকার পুরো মাত্রায় ছিল। কিন্তু তৃতীয় দিনে বাকি দুটি সিঙ্গলস খেলার খুবই পরিশ্রম ক'রে জয়লাভ করতে হয়েছিল। প্রথমদিনের সিঙ্গলস খেলার মত সহজভাবে জয় হয়নি। এইদিনে আমেরিকার র‍্যালস্টন শারীরিক অক্ষমতার দরুণ খেলায় যোগদান করেননি। প্রেমজিৎলালের বিপক্ষে তাঁর বদলে মার্টি রিশেন খেলতে নেমে ৬-৩, ২-৬, ৬-০ ও ৬-১ গেমে জয়ী হন। প্রতিযোগিতার শেষ সিঙ্গলস খেলায় 'চাক' ম্যাকিনলে ১০-৮, ৬ ৮, ৬-২, ২ ৬ ও ৬ ০ গেমে কৃষ্ণানকে পরাজিত ক'রে আমেরিকাকে ৫-০ খেলায় জয়যুক্ত করেন। এই ম্যাকিনলের বিপক্ষেই ১৯৬১ সালের ডেভিস কাপের আঞ্চলিক সেমি-ফাইনালে কৃষ্ণান ১১০ মিনিট খেলে ৬-৩, ৬ ৪ ও ৬-৪ গেমে জয়লাভ করেছিলেন। ডেভিস কাপের খেলায় কৃষ্ণান ও ম্যাকিনলের এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ।

হাওড়ায় ফুটবল প্রতিযোগিতা—

সম্প্রতি 'জাতীয় সেবাদল' পরিচালিত হাওড়ার অন্যতম জনপ্রিয় প্রতিযোগিতা 'বি, কে, হাজরা ও অখিল খাঁ স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতা' বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়েছে। অক্ষয় শিক্ষায়তন ২-০ গোলে সালখিয়া এ, এস্, স্কুলকে পরাজিত করে বি, কে, চ্যালেঞ্জ কাপ লাভ করে। সালখিয়া স্কুল দল অখিল খাঁ চ্যালেঞ্জ কাপ লাভ করে। হাওড়ার I. P, S, শ্রীএ, ঘটক মহাশয়ের সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ

হাওড়ায় 'জাতীয় সেবাদল' পরিচালিত ফুটবল প্রতি-যোগিতার পুরস্কার বিতরণী সভায় ভাষণ দিচ্ছেন পদ্মশ্রী গোষ্ঠ পাল। ফটো: রণেন ঘোষ

ও পুরস্কার বিতরণ করেন পদ্মশ্রী গোষ্ঠ পাল। পদ্মশ্রী গোষ্ঠ পাল, বাংলার ভূতপূর্ব্ব স্পীকার শ্রীবঙ্কিম কর এবং ডাঃ গোপীকৃষ্ণ খাঁ খেলাধূলার মান উন্নয়ন সম্বন্ধে বলেন। সভার শেষে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানান সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীঅসিতকুমার খাঁ।

ডি সি এম ফুটবল ঃ

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে (১৯৬৩) ই এম ই সেণ্টার ৩-১ গোলে পাঞ্জাব পুলিসকে পরাজিত করে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা ১-১ গোলে ড্র গেলে দ্বিতীয় দিনের খেলার আয়োজন করতে হয়। ডি সি এম ফুটবল প্রতিযোগিতা ১৯৪৫ সালে আরম্ভ হয়েছে। প্রথম বছরের ফাইনালে দিল্লী হিরোজ জয়ী হয়। এই প্রতিযোগিতাটী একাদিক্রমে তিনবছর (১৯৪৬-৪৮) অনুষ্ঠিত হয়নি। ক'লকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্ব্বাধিকবার (মোট ৪ বার) এই ডি সি এম ট্রফি জয় লাভের গৌরব লাভ করেছে। ক'লকাতা থেকে এ পর্য্যন্ত চারটি ক্লাব এই ট্রফি জয় করেছে: ইস্টবেঙ্গল ক্লাব (১৯৫০, ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬০), মহামডান স্পোর্টিং ক্লাব (১৯৫৮ ও ১৯৬১), রাজস্থান ১৯৫১ এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে (১৯৫৪)।

জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান ঃ

কটকে অনুষ্ঠিত শরৎকালীন নবম জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ফাইনাল ফলাফল :

ফুটবল : ১ম উড়িষ্যা, ২য় পাঞ্জাব ও ৩য় বিহার। গত বছরের বিজয়ী পশ্চিম বাংলা দল নিজের গ্রুপ থেকে মূল প্রতিযোগিতাতেই উঠতে পারেনি।

সাঁতার (বালক বিভাগ): ১ম পশ্চিম বাংলা (৩৯ পয়েণ্ট), ২য় গুজরাট (১০) এবং উড়িষ্যা (৩)।

সাঁতার (বালিকা বিভাগ): ১ম পশ্চিম বাংলা (২৪ পয়েণ্ট), ২য় গুজরাট (৯) ও ৩য় ত্রিপুরা (২)।

খো-খো: ১ম মধ্যপ্রদেশ, ২য় পাঞ্জাব ও ৩য় গুজরাট।

কাবাডী: ১ম উড়িষ্যা, ২য় উত্তর প্রদেশ ও ৩য় পাঞ্জাব।

টেবল টেনিস (বালক বিভাগ): বিজয়ী পশ্চিম-বাংলা, রানার্স-আপ মণিপুর।

টেবল টেনিস (বালিকা বিভাগ): বিজয়ী গুজরাট ; রানার্স আপ মধ্যপ্রদেশ।

সুব্রত মুখার্জী কাপ ঃ

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সুব্রত মুখার্জি ফুটবল কাপ প্রতি-যোগিতার ফাইনালে ১৯৬৩) বাটানগর হাইস্কুল ৪-২ গোলে গত ১৯৬২ সালের বিজয়ী কলকাতার রাণী রাসমণি স্কুলকে পরাজিত করে। আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বাটানগর দল মোট চারটি খেলায় ২৫টি গোল দেয় এবং মাত্র ২টি গোল খায়। তাছাড়া বাটানগর স্কুল দল এ্যাংলো-অ্যারাবিক স্কুলকে ৯-০ গোলে পরাজিত ক'রে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একটি খেলায় সর্ব্বাধিক গোল দেওয়ার রেকর্ডও করেছে।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে ৬।১২।৬৩ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

একপঞ্চাশত্তম বর্ষ, প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৭০

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

মাসানুক্রমিক—চিত্রসূচী

ভারতবর্ষের সূচী

একপঞ্চাশত্তম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—প্রথম সংখ্যা

পৌষ—১৩৭০

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্রসূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

প্রসাধন

শিল্পী : শ্রীসতীন্দ্রনাথ ল

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়া

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীপ্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মহাজগৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন অংশে বিশেষ বিশেষ ভাবপ্রধান হয়ে অবস্থান করিতেছে। আদ্যাশক্তি অ, উ, ম আকারে স্পন্দিত হয়ে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়শক্তিরূপে পরিণত হয়ে বিশ্বকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্ত্তা কেন্দ্রস্বরূপ। ইঁহাকে বিষ্ণুনাভি বলা হয়। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষিগণকে ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া ধরা হয়। ইঁহারা পুরাণমতে বশিষ্ঠ, অত্রি, মরীচি অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু। ঋগ্বেদের সপ্তর্ষির নাম বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জামদগ্নি, কশ্যপ, গৌতম, অত্রি ও ভরদ্বাজ। ব্রহ্মলোকে ওঁকারবিশিষ্ট সামগান হয়। ব্রহ্মভাব তেজোদীপ্ত, রক্তিমবর্ণ, পরমতঃ নিষ্কাম ও শুদ্ধভাববিশিষ্ট। ব্রহ্মভাব ও শৈবভাবে তত্ত্বে কেবল অদ্বৈত কথাটিই প্রযোজ্য। অদ্বৈতে তত্ত্ব আছে, লীলার কোন স্থান নেই। যদিও স্বয়ং ব্যাসদেব বলেছেন, 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'। বিষ্ণুলোক লীলার অন্তর্গত। 'লীলা' কথাটি সম্পূর্ণভাবে এখানে প্রযোজ্য। যদিও পুরুষ ও প্রকৃতি অংশ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মময়ী বা ব্রহ্মাণীগণ বাস করেন। শিবলোকে শিবানী বা হরের গৌরী এবং অন্যান্য পুরুষ প্রকৃতি অংশ ত আছেই। কেন্দ্রে মহাশক্তি মা মহামায়া আছেন। যাঁর কৃপাই একমাত্র আশ্রয়। জয় মা আনন্দময়ী। ব্রহ্মা তাঁর গোষ্ঠীসহ এই সৃষ্টিকে পালন ও ধারণ করে আছেন।

ইহাকেই কেন্দ্রশক্তি বা বিষ্ণুনাভি বলা হয়। ব্রহ্ম 'নিরাকার নির্ব্বিকল্প রূপ। 'অহং' বোধ না থাকিলেও সেখানে চেতনার সাড়া রয়েছে। ব্রহ্মমুক্তিকে নির্ব্বাণমুক্তি বলা হয়। ব্রহ্ম প্রজ্ঞার অতীত। 'নান্তপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং ন প্রপঞ্চ উপশম। শান্তম্‌. শিবম্‌, তুরীয়ম্‌, অদ্বৈতম্‌, বিষ্ণুলোক পরিপূর্ণতা লাভ কোরেছে পুরুষ প্রকৃতির যুগল মিলনে। নারায়ণ শুদ্ধসত্ত্বের এবং নারায়ণী শুদ্ধসত্ত্বময়ী। রাধাকৃষ্ণ পরিপূর্ণতা লাভ কোরেছে ওঁকারের মধ্যে। ইহাকে সাযুজ্যমুক্তি বলা হয়। ভগবানের শিবভাবকে দুই অংশে ভাগ করা যায়। মঙ্গলময় ও সংহারকর্ত্তারূপে। শিব হলেন জ্ঞানীবর, পূর্ণযোগে শয়ান। শিবমুক্তিকে সালোক্যমুক্তি বলা হয়। পাপ, তাপ, দুঃখ, গ্লানি, ভালমন্দ, জ্ঞান-অজ্ঞান, পূর্ণযোগে বিশেষিত। অতএব কিছুই কিছু নয়। এগুলি সৃষ্টির এক একটি বিকারমাত্র। পুরুষ যখন জ্ঞানময়, তিনি দ্রষ্টা ও সাক্ষীস্বরূপ। শুদ্ধাপ্রকৃতি তখন লীলায় আনন্দময়ী। ব্যক্তিগতজীবনে দেখা যায় পুরুষ যদি জ্ঞানহীন হয় এবং নারী যদি ব্যভিচারিণী হয়, ওঁকারের পূর্ণমিলন ত দূরের কথা, সাধারণ সাংসারিক জীবনও দুর্ব্বিসহ হয়। শিবের মঙ্গলরূপ পূর্ণজ্ঞান বিষ্ণুলোকের অন্তর্গত ভূলোকে অমিতভাবে ফলদান কোরেছে। শিব অংশে আচার্য্য শঙ্করাচার্য প্রমুখ মহাপুরুষগণের বেদান্তদর্শন কিংবা পতঞ্জলির যোগদর্শন, বুদ্ধের শূন্যবাদ কোনটাকেই অস্বীকার করিবার উপায় নেই। প্রেমভক্তিপথের মহাপুরুষগণের বেশীরভাগই শিব অংশ, বিষ্ণু আচ্ছাদিত। মূলতঃ ব্রহ্মারপুত্র সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষিগণের অংশ বা পূর্ণঅংশ অনেক জায়গাতেই আছে। যীশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ এঁদের অন্তর্গত। আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ নৃপতিগণ, বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রই তাই। নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষগণ বিভিন্ন ভাববিশিষ্ট হয়ে এক একবার এক একভাবে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুলীলা সৃষ্টির ধারা, আর শিবকে সংহারকর্ত্তা বলা হয়। ধারাগতভাবে দুইটি বিভিন্ন। জন্মমৃত্যুর প্রবাহ বিপরীতমুখী দুইটি স্রোত বিভিন্ন হলেও মঙ্গলময় শিব পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ, ইনিই মায়ের সিদ্ধিদাতা গণেশ, জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীশক্তি। উংসশক্তি বা অভয়দায়িনী মায়ের সঙ্গে এঁরাও আমাদের অগ্নিগোলকে বিষ্ণুশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে শক্তি ও আনন্দলীলা বর্দ্ধন কোরেছেন। বিভিন্ন শক্তিপ্রবাহকে সংমিশ্রণে, ও ভিন্নভাবে সাধনে, প্রাণপ্রতিষ্ঠায় ও প্রয়োগে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করা সম্ভব হয়েছে।

"চেতনাচেতনানাং", বহু চেতনার মধ্যে একমাত্র চেতনা। মূল সুর বা প্রণবনাদ মহাচেতনার সুর। মহাচেতনার বেদনায় জীবের দুঃখে স্পর্শকাতর হৃদয় মহামানবদের। মানুষ মানুষ কিসে? তার মনুষ্যত্ব চৈতন্যে। Human being a rational animal মানুষ যখন ঘোর কলিতে এসে পৌচেছে, দেখা যায় চেতনা আজ অবচেতনায় অবনমিত হয়েছে। চাই তাই পুনঃ পুনঃ নতুন কোরে চেতনার সঞ্চার—ভাগবতীশক্তি যে কেন্দ্র থেকেই আসুক না কেন। জীব আত্মকেন্দ্রিক অহংজ্ঞানসম্পন্ন অত্যধিকমাত্রায় হয়ে পড়েছে। অবচেতনা যেন নিশ্চেতনায় না পৌছায়। তাই উপনিষদের ঋষি বলেছেন,

'তমসো মা জ্যোতির্গময়।'

জীবের তাই মহাশক্তির সাধন করা প্রয়োজন। ভগবান কৃপা করিবেন, মহামায়া কৃপা করিবেন। 'সম্ভবামি যুগে যুগে।' প্রয়োজন তাগিদে মাত্রাযুক্ত হয়ে সৃষ্টিতে পরিপূরকভাবে এক অন্যে বা পরপর সকল কর্ম্মই সম্পন্ন হয়ে চলেছে। একটা প্রাকৃতিক নিয়মে সব বাঁধা। অস্বীকার করিবার উপায় নেই। Nature abhors the vacuum শূন্য স্থানই পূর্ণ হয়। পূর্ণ ত পূর্ণই, নতুন কোরে পূর্ণের প্রয়োজন হয় না। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" নিবৃত্তিই সাধনার চরম লক্ষ্য। কলিকে আজ সত্যযুগে ক্রমশঃই নিয়ে যেতে হবে। মায়ের কৃপা, ভগবানের কৃপার প্রয়োজন। যাঁর সৃষ্টি তিনিই দেখেন, নিশ্চয় আরো বেশী করে কৃপা বর্ষিত হবে। মোট ২৪০০ হাজার বছরে চারিযুগবিশিষ্ট এক কল্প হয়। এখন আমরা মধ্য সময়ে বা ঠিক কলির মাঝপথে এসে উপস্থিত হয়েছি। (জ্ঞানাবতার শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজের লিখিত 'কৈবল দর্শনম্‌' পুস্তকটি দ্রষ্টব্য)

অত্যধিক জড়বাদী আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, যদিও আমরা অনেক অনেক সংস্কারমুক্ত হয়েছি। ভগবান সবার,

সবাই একসূত্রে আবদ্ধ। 'সূত্রে মণিগণা ইব।' আগেকার দিনের শ্রেষ্ঠ নৃপতিরা নিজেদের প্রজাকে সন্তানতুল্যজ্ঞানে সেবা ও কর্ত্তব্যপালন কোরেছেন। ধর্ম্ম ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা তাঁদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে দেখি। তাঁরা বীর্য্যের প্রতীক, দুর্ব্বলের সহায়ক। যতদিন এইভাব ছিল, ততদিন রাজা প্রজার কোন অহংগত চেতনামূলকভাবে ভেদ ছিল না। যতই দিন গেল কালের অবক্ষেপে ক্রমশঃই দেখা দিতে লাগল অহংজ্ঞানসম্পন্ন প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব। আঘাত প্রতিঘাত করে। 'তুমি যারে পশ্চাতে টানিছ সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' হে অহংজ্ঞানসম্পন্ন মূঢ় জীব, তুমি তোমাকেই অবহেলা করিতেছ। তুমি যে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—'প্রাণো বিরাট। বিভিন্ন ভাববিকারে হে ব্রহ্মা তুমি ব্যষ্টিভাবে নিজেকে প্রকাশ করিতেছ। সে কথা তমসাচ্ছন্ন জীব ভুলে গেছে। তাই আজ মহামিলনের মন্ত্র, ভাগবতী চেতনার মূলে যে ঘুণ ধরেছে তার চাই পরিণতি। এটাকে Scienceএর ভাষায় বলা হয় Potential Drop. যতটা তুমি অহংকারে ভাগবতী চেতনা বিচ্যুত হয়ে নিজেকে বড় ভাববে, ততটাই নিজেকে ছোট কোরে ফেলবে নীচের সঙ্গে মিশে গিয়ে। ইহাকেই বলে অহংকারের পতন।' অর্থসম্পদ বা ধন ঐশ্বর্য্য মানুষকে প্রতিক্রিয়াশীল করে না—করে নিম্নমনোভাব। এদেশে রাজার ছেলের সন্ন্যাসী হওয়ার উদাহরণ অজস্র। আজকের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অভ্যুত্থান ধর্মবিচ্যুত মানসিক অবচেতনার ফল এবং অন্যদিক দিয়ে সবার স্বার্থে দানস্বরূপ বলা যায়, তারতম্য যতই হোক না কেন। শুধু অর্থ-বৈষম্যই কারণ নয়, জীবন ও সমাজের সর্ব্বক্ষেত্রে একই জিনিষ চলিতেছে। নিষ্কামভাবে সাধনার প্রয়োজন, ধর্ম্মকে সংস্কারমুক্ত কোরে যথার্থভাবে প্রয়োগ কোরতে হবে। সবই আছে অথচ সাধন নেই। সেজন্য সব পাপের মূল 'অহং'এর নাশ হচ্ছে না।

অন্নময়কোষযুক্ত ভূলোকে খাদ্য সমস্যা নিদারুণ, না খেলে নয়। কিন্তু এটাই শেষ নয়। পঞ্চভূতের সমষ্টি এ দেহ গ্রহণ করে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমকে। মূলতঃ মন্ত্র দ্বারা দেহ তেজ গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। "বিষ্ণু তেজসে জগৎ সবিত্রে সূচয়ে।" অগ্নিগোলকে সৌরতেজেই প্রাণশক্তি। Cosmic Salvation কথাটি এখানে বেশ প্রযোজ্য। যে যত পরিমাণে এই তেজ গ্রহণ কোরতে পারবে, ততই তার ভাল। মনন, চিন্তন, নিদিধ্যাসন ইত্যাদির সঙ্গে তাই প্রাণায়ামের এত সুন্দর ব্যবস্থা। 'জামদগ্নিঃ ঋষিঃ অনুষ্টুপছন্দ অগ্নির্দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।' 'দিব্' ধাতু দেবতা। 'দিব্' কথার অর্থ তেজ বা জ্যোতি। দেবলোক মানে জ্যোতির্ময়লোক। এই আনন্দময় লোক জ্যোতিরই প্রকাশ। সুতরাং প্রাণায়াম পদ্ধতিকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধনই বলা যায়।

এখন ধর্মকে ভাষাগতভাবে ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ কোরে দেখা যাক্। 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয়যোগে 'ধর্ম' পদ নিষ্পন্ন। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ ধারণ করা। যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম। "ধর্মে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাৎ ধর্মং পরমং বদন্তি।" জ্ঞান বা মহাচেতনার সাহায্যে পরব্রহ্মকে ধারণ করাই হল ধর্ম্মের শেষ কথা। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, "যোগ্যতাবচ্ছিন্নাধর্মিণঃ শক্তিরেব ধর্মঃ. যোগ্যতাবিশিষ্ট ধর্মীর বা পদার্থের কার্য্যসাধিকা শক্তিই ধর্ম। অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তুমাত্রই বিভিন্নভাবে যে গুণ ও শক্তির পরিচয় দিচ্ছে তাহা নিজ নিজ ধর্মেরই পরিচয় বহন করে। সব শক্তিই মহাশক্তিতে এবং সব চেতনাই মহাচেতনাতে সংযুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং ধর্ম সম্পূর্ণতালাভ কোরেছে শক্তি ও চেতনার পূর্ণমিলনে ও সার্থক রূপায়নে। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার কোরলে দেখা যায় ধর্ম্ম সর্ব্বক্ষেত্রে বিদ্যমান। আমাদের Electronci theory মতে কেন্দ্রবিন্দু বা neucleus মূলকেন্দ্রশক্তি। যেটাকে কেন্দ্র কোরে অন্যান্য অণুপরমাণু আশ্রয় কোরে আছে। সেইরকম তার নিকটবর্ত্তী অপর একটি কেন্দ্রশক্তিকে কেন্দ্র কোরে আরও অণু পরমাণু আশ্রয় কোরে আছে। এ যেন একটা জাল। প্রত্যেক বিন্দুই শক্তিসম্পন্ন, যতই কেন্দ্রের দিকে ততই শক্তি অধিক। একইপ্রকারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর মূলশক্তি-স্বরূপ এবং এক একজন লোকেশ্বর নিজ লোকের কেন্দ্র-শক্তিস্বরূপ। আমরা জীবমাত্রই নিজ সীমা, শক্তি ও ক্ষমতানুযায়ী সীমাবদ্ধ। যতই অগ্রসর হওয়া যায়, অবিদ্যা দূরীভূত হয়, ততই ক্ষুদ্রতা অপসারিত হয়ে বিরাটাকারে স্ফুরিত হয়। সেইরূপ কেন্দ্রশক্তি বা তাহার নিকটবর্ত্তী ঋষিগণ বিরাট বোধে ও পরমচেতনায় অবস্থান

করিতেছেন। গৃহস্বামীর মতামতের উপর যেমন পারিবারিক কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেইরূপ এই মহানদের ইচ্ছায় সৃষ্টির মঙ্গল অনেকাংশে নির্ভর করে। এই কেন্দ্রশক্তিকে central magnetic force বললে বুঝতে সুবিধা হয়। এটা যেন very powerful magnet, ভাগবতী মহাচেতনা ও মহাশক্তিতে শক্তিমান। অপর সকল শক্তিই অধীনস্থ। বিষ্ণুনাভিই হল universal magnetic centre কেন্দ্র থেকে যে যতই দূরে যাচ্ছে দেখা যায় চুম্বকীশক্তি ততই কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ ক্রমশঃই অবচেতনার ভাব বেড়ে যাচ্ছে দূর হতে দূরান্তরে। সুরু বা মধ্যের কোন শক্তি নাই ; জীব যদি অন্যায়, অসত্য কাজ করে, তবে তাহা সুচেতনাহীনতারই পরিচায়ক। ভগবান বা সত্য হতে হঠে যাচ্ছে। তাই প্রয়োজন অধ্যাত্মসাধনার - যাহা শক্তি ও জ্ঞানদান করে। শুধু তাই নয়, সুরু বা মধ্যের কোন শক্তি যদি অবনতির দিকে যায় তো অধীনস্থ সবার উপরই তার প্রত্যক্ষ প্রভাব দৃষ্ট হয়।

এই কেন্দ্রশক্তি সকল যেন Radio centre, এঁদের কাজই হল চেতনার বার্ত্তা, আনন্দের বার্ত্তা, আলোকের বার্ত্তা ও সকল মহতীভাবসমূহ জীবলোকের অন্তর্দেশে সঞ্চারিত করা। এঁরাই জগৎবরেণ্য—মহান। সর্বাগ্রে জামদগ্নি ঋষি ও শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী মহারাজের নাম সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করা যাক। ইনিই আমাদের লোকেশ্বর। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। মহানদের কাজই হল সৃষ্টির যা কিছু ভাল সংগ্রহ করা, সঞ্চয় করা—আর শুধু বিলিয়ে দেওয়া, অবচেতনায় চেতনা সঞ্চার করা, মৃতে প্রাণ দেওয়া। এঁরাই আদর্শ। প্রেম, ত্যাগ ও জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে এঁদের মধ্যে বিরাজিত। জয়তু ভগবান। হে ভগবান, তোমাকে আজ আহ্বান করি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্যরচিত হৃদয়াসনে, নব-নবরূপে তুমি জন্মপরিগ্রহ কর দৈহিক সম্পর্ক বিরহিত আমাদের চিত্তলোকে :—

"উদ্যতে নমঃ, উদায়তে নমঃ, উদিতায় নমঃ।
বিরাজে নমঃ, স্বরাজে নমঃ, সম্রাজে নমঃ॥"

('যোগীকথামৃত'—শ্রীশ্রীযোগানন্দগিরি)
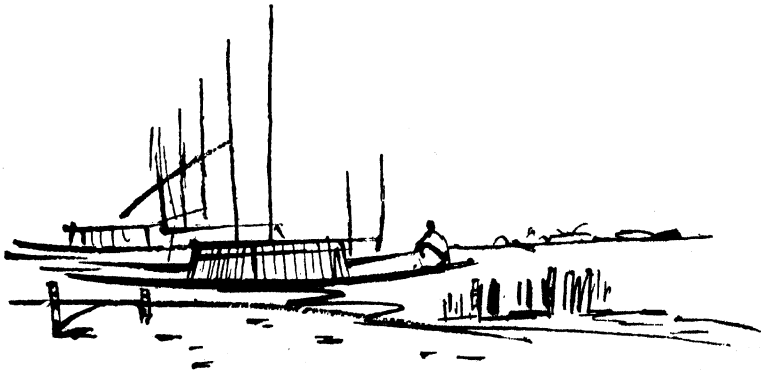
এ বি সি ডি
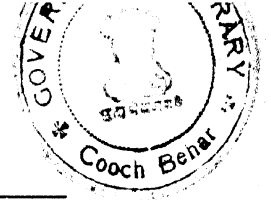
শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

বহুদিন আগেকার কথা। আমরা থাকি ভবানীপুরে—পালিত ষ্ট্রীটে। ফাল্গুন মাস। কলকাতার লোকারণ্যে কোকিলের ডাক শোনা যায় না। তবে বসন্তের বাতাস নিঃশব্দ সংগীতে যৌবনের বাণী পৌঁছে দেয় কানে কানে। সকাল আটটা হবে। বাইরের ঘরে খবরের কাগজ খুলে বসেছি। কাছেই কলতলায় দৃশ্যকাব্য জমে উঠেছে নারী-পুরুষের বিচিত্র কলরবে। এমন সময় প্রসাদবাবু এসে হাজির। সংগে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক।

প্রসাদবাবু বললেন - পরিচয় করিয়ে দিই। মিস্টার এ্যালবিয়ন বিনোদচন্দ্র দাস। এডিনবরার গ্র্যাজুয়েট। কিছুকাল আগে এঁর লেখা বই 'Future of Christianity in India ইউরোপের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অনেক দেশ ঘুরেছেন, অনেক পড়াশুনাও করেছেন। যেমন পাণ্ডিত্য তেমনি জ্ঞান, যেমন জ্ঞানী তেমনি উদার—যাকে বলে 'a man of wide culture'। গুণী লোক, কিন্তু একটি দোষই সব মাটি করেছে। কর্তৃপক্ষের সংগে বনিয়ে চলতে পারেন না। বাংলার বাইরে কয়েকটি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন—কোথাও বেশীদিন টিকে থাকেননি। সামান্য মতান্তর হয়েছে কি কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। নাগপুর বিসপ্‌স্‌ কলেজে আমরা চারজন বাঙালী ছিলাম। ইনি ছিলেন আমাদের 'লিডার'। এঁর প্রতিষ্ঠাও ছিল খুব। ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করেছিলেন অনেকখানি। তাদের কাছে ইনি এ বি সি ডি নামে পরিচিত ছিলেন। আমরাও এঁকে এ বি সি ডি ব'লেই ডাকি। আত্মভোলা প্রাণখোলা 'মাই ডিয়ার' মানুষ। আমাদের চেয়ে বয়েসে অনেক বড় হলেও কোন ভেদাভেদ নেই। আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় এ বি সি ডি-র অনুপ্রেরণায় আমরা সকলেই কাজ ছেড়ে চলে এসেছি। এমন একটি মানুষের সংস্পর্শে আসা সত্যিই ভাগ্যের কথা। আপনিও নিশ্চয় খুশী হবেন।

অধ্যাপক এ বি সি ডিকে যথারীতি সংবর্ধনা জানালাম। এ বি সি ডি মানুষটি ছোটখাটো, গৌরবর্ণ, গোঁফ-দাড়ি কামানো। মাথার চুল পাতলা, চোখ দুটিতে বুদ্ধির দীপ্তি। গায়ে ঢিলে হাতা পাঞ্জাবি, পায়ে গ্লেজ্‌ড-কিডের নিউকাট। বেশ ফিটফাট—তবু মনে হয় প্রসাধনের ওপর পড়েছে প্রচ্ছন্ন অবসাদের ছায়া। বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলেও চেহারায় মেলে স্বাস্থ্য ও শক্তির নিদর্শন। প্রৌঢ়দের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একদল সহজে যৌবনকে ভুলতে চান না, আর একদল বার্ধক্যের বাঁশি শুনবার জন্য সারাক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থাকেন। এ বি সি ডি প্রথম দলেই পড়েন। জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় থাকেন? খুব কাছেই—ল্যান্সডাউন হাজরা রোডের মোড়ে বললেই চলে। দোতলা বাড়ি। সামনেই ফুটপাতে নিমগাছ। বাইরের বারান্দা থেকে বাঁ দিকে একটা কাঠের সিঁড়ি বরাবর দোতলায় উঠে গিয়েছে। বুঝতে পেরেছেন?

—কী আশ্চর্য! এত কাছে আপনার বাড়ি অথচ আপনাকে জানতাম না।

—কি ক'রে জানবেন, কলকাতার সংগে কোন সম্পর্কই যে রাখতে পারিনি। 'লং ভেকেশন' এও বড় একটা আসতাম না। দেশভ্রমণের নেশা আমার ছেলেবেলা থেকেই। তাছাড়া কলকাতার পরিবেশটাও আমার কাছে তেমন প্রীতিকর ছিল না। থাক সে কথা, এখন প্রয়োজনের বিষয় বলি। আমি ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার একটা ইতিহাস লিখেছি। ভাবছি 'থিসিস্‌' হিসাবে ওটা 'সাবমিট' করব ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে।

তার আগে আপনার সংগে কিছু আলোচনা করতে চাই। ওয়েস্টার্ণ স্কলারদের 'রেফারেন্স'গুলোও আপনাকে একবার দেখিয়ে নিলে ভালো হয়। প্রসাদভায়া সেইজন্যেই আমাকে নিয়ে এসেছে আপনার কাছে।

অত্যন্ত সংকোচের সংগে বললাম—আপনার মতো অভিজ্ঞ পণ্ডিতের সংগে আলোচনা করবার যোগ্যতা আমার নেই। আমি আপনার ছাত্রস্থানীয়।

ছাইদানে চুরুটটা ঠুকতে ঠুকতে এ বি সি ডি বললেন—সে কি কথা! আমি ইতিহাসের ছাত্র, আর আপনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র। আপনার সাহায্য আমার দরকার বই কি। দেখুন, সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে অভিমান করা চলে না। বেলা হয়ে গেল। আজ উঠি। একদিন আসবেন আমার ওখানে।

অদ্ভুত মানুষের স্বভাব। দূরের জন্য মন কেমন করে; দুর্লভের মোহ আনে ব্যাকুলতা। যে জিনিস অতি কাছে তার ওপর আকর্ষণ হয়না; যা সহজে পাওয়া যায় তার প্রতি অনুরাগ জন্মায় না। তাই যাই যাই ক'রেও এ-বি-সি-ডি-র বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সেদিন রবিবার। বেলা আন্দাজ সাড়ে পাঁচটা। পূর্ণ থিয়েটারে দুপুরের শো-তে 'দেবদাস' দেখে ফিরছি। রাস্তায় মোটরের ভিড় তেমন শুরু হয়নি। রমেশ মিত্তির রোডের একটা বাড়ির গাড়ি-বারান্দার নিচে পাড়ার ওড়িয়া ঠাকুরদের তাসের আসর তখনও জমজমাট। কাছেই এক জমিদার ভবনের রেডিওতে পঙ্কজ মল্লিকের গান শোনা যাচ্ছে—'দিনের শেষে ঘুমের দেশে'।—ল্যান্সডাউনের মোড় ঘুরতেই এ-বি-সি-ডি-র সংগে দেখা। বললেন—কই ভায়া আমার ওখানে এলেন না তো? কবে আসছেন?

অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললাম—বিশেষ কাজ ছিল, সময় ক'রতে পারিনি, ক্ষমা করবেন। কাল নিশ্চয়ই যাব। আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

—বহরমপুর কলেজে লোক চেয়েছে। একখানা দরখাস্ত ফেলে এলাম পোস্ট অফিসে। আর চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগেনা।

আর কথার খেলাপ করা চলে না। পরদিন বিকেলের দিকে কলেজ থেকে ফিরেই এ-বি-সি-ডি-র বাড়ি গেলাম। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখি দরজার দু-পাশে দু-খানি ছোট প্রস্তর ফলক—একটিতে লেখা 'Sanctum', অন্যটিতে 'A B C D'। পায়ের শব্দ শুনে এগিয়ে এসে এ বি সি ডি হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন—বসালেন এক-খানা কৌচের ওপর। ঘরটি বেশ বড়। একদিকে জানলার ধারে স্প্রিংয়ের খাট, অপর তিন দিকে র‍্যাকে র‍্যাকে বই বোঝাই। এক কোণে তেপায়ার ওপর মহীশূরের সুগন্ধি চন্দন ধূপ জ্বলছে। আবহাওয়া শুচি-স্নিগ্ধ। আসবাব-গুলো সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দেয়, কিন্তু কল্যাণীর করস্পর্শে পরিচ্ছন্নতায় প্রদীপ্ত নয়। কেমন যেন একটা ছন্নছাড়া ভাব অচিরেই প্রকট হয়ে ওঠে আমার দৃষ্টিতে। এ বি সি ডি তাঁর 'থিসিস'টা নিয়ে সামনের কৌচটায় বসলেন, আর একটা 'Light of Asia' জায়গায় জায়গায় পড়তে লাগলেন। ঘণ্টাখানেক এইভাবে আলো-চনা চলল। তারপর এ বি সি ডি বললেন—আজ এই পর্যন্ত, আর একদিন হবে। এখন মাঝে মাঝে আপনাকে একটু কষ্ট না দিয়ে উপায় নেই। আমার সমস্যাটা বলি শুনুন। বিদেশী 'ডক্টরেট'-এ দেশ ছেয়ে গিয়েছে। এম, এ ডিগ্রির আর ইজ্জত নেই। 'ডক্টরেট' না থাকায় কোন কলেজেই আমাকে পাকাপাকিভাবে Head of the department করেনি। হাজারিবাগে তো মহামুশ্‌কিলেই পড়েছিলাম। এক বিহারী তরুণ লণ্ডন পি-এইচ-ডি উদয় হওয়া মাত্রই গুঞ্জন শুরু হ'ল—তাকে Head of the dapartment করতে হবে। অবস্থা বুঝে আমি মানে মানে বিদায় নিলাম। অধ্যাপক জীবনে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে বাধ্য হয়েই বুড়ো বয়েসে উঠে প'ড়ে লেগেছি 'ডক্টরেট'-এর জন্যে। এডিনবরা থেকে 'ডক্টরেট' নেবার কথা। বিষয় নির্বাচন হয়েছিল, কাজও শুরু করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ বিশেষ পারিবারিক কারণে আমাকে দেশে ফিরতে হয়। যাই হোক, অবসর মতো সেই বিষয়টা নিয়ে কাজ করেই এই 'থিসিস্'টা খাড়া করেছি।

আমি বললাম—আপনার কাছে প্রেরণা পেলাম। আমাদেরও অবহিত হওয়া দরকার। শুনছি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি শীঘ্রই একটা Lower Research degreeর ব্যবস্থা করবে। ভবিষ্যতে ডি-ফিল হবে কলেজে পড়ানোর minimum qualification। এম-এ ডিগ্রিতে ইস্কুল-মাস্টারি চলবে, অধ্যাপনা চলবে না।

—আমি প্রসাদভায়া ও নিশীথ ভায়াকে প্রায়ই একথা বলি। দেখুন, বাড়ি বসে তো বেশী দিন চলেনা। সংসারের চাপ আছে। একটি চির-রুগ্ন ভাই রয়েছে। তার পরিবারের ভার আমাকেই বহন করতে হয়।

চাকর চা নিয়ে এল। তাকে লক্ষ্য ক'রে এ বি সি ডি বললেন—এ হচ্ছে হারাধন—'মোর পুরাতন ভৃত্য।' আমার কাছে বহুকাল আছে। ওকে ছাড়া আমার একদণ্ডও চলেনা—He is all the world to me.

কথায় কথায় রাত হয়ে যায়। আর একদিন আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিই। বাইরের মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। ঘরের আবহাওয়ার মধ্যে যেন দীর্ঘ দিনের হাহাকার স্তম্ভিত হয়ে আছে।

মাস দেড়েকের মধ্যে কয়েকবার এ বি সি ডি-র বাড়ি যাতায়াত করেছি। তাঁর 'থিসিস'-এর আলোচনাও হয়েছে। ভদ্রলোককে আমার বেশ লাগে। বিলাত-ফেরত—ক্রীশ্চান—বেশভূষা আচার ব্যবহার বা কথাবার্তায় কিছু বোঝবার জো নেই। তাঁর ঘরটি বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন—বাড়ির ওপর তলার সংগে কোন যোগাযোগ দেখিনে। বোধ হয় ওটা later extension। ঘরে জিনিসপত্র প্রচুর—তবে গৃহিণীপনার কোন ছাপ তো নজরে পড়েনা। সদর অন্দর একাকার। ভদ্রলোক কি বিবাহ করেন নি? হয়তো তাই হবে। খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হলেও আলাপ অল্প দিনের। জিজ্ঞাসা করতে শিষ্টতায় বাধে।

বৈশাখের শেষাশেষি। মোহনবাগান মহামেডান স্পোর্টিংয়ের লীগখেলা দেখতে গিয়েছিলাম। বালিগঞ্জ-বাসী বন্ধু হাজরা-ল্যান্সডাউনের মোড়ে নামিয়ে দিলেন মোটর থেকে। আকাশে কালো মেঘ। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা মাথায় দিয়ে হনহন করে হাঁটছি। দাস ষ্টোর্স'এর সামনে এ বি সি ডি-র কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কি ভায়া, ছাতার আড়াল দিয়ে কেন? মোহন-বাগান হেরেছে বুঝি?

উত্তর দিলাম—হ্যাঁ।

—ভালো খেলে হেরে গেল তো?

না হেসে থাকতে পারলাম না। বললাম—আপনি দেখছি সব খবরই রাখেন।

—রাখি বই কি। আপনাদের বয়েসে আমারও ও নেশা একটু আধটু ছিল। এখন আর ভালো লাগেনা। আসুন আসুন, ভিতরে এসে বসুন, ঝড় উঠেছে।

এ বি সি ডি-র আহ্বানে ভিতরে গিয়ে বসলাম। এক রোগা লিকলিকে ভদ্রলোককে দেখিয়ে এ বি সি ডি বললেন—আমার ভাই চারু। রোগে রোগে বেচারার শরীরটা মাটি হয়ে গেল। জীবনটাও গেল নষ্ট হয়ে। মেয়ে ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে অথচ রোজগারের ক্ষমতা নেই। পরিশ্রম একেবারেই সহ্য হয়না। এই স্টেশনারি দোকানটা কোন রকমে বসে বসে চালায়। আপনাদের একটু Patronage আশা করি। আমারই উপকার করা হবে।

—নিশ্চয়ই। এর জন্যে আপনি এত সংকোচ বোধ করছেন কেন? বাড়ির কাছে—পাড়ার মধ্যে—এতে আমাদেরই তো সুবিধে।

—অনেক ধন্যবাদ। চারু নড়াচড়া করতে পারেনা, পাঁচ জনের সংগে আলাপ পরিচয় করবারও উপায় নেই। ওকে ভগবান মেরেছেন, কি করবে!

—সে তো বটেই। আচ্ছা, বহরমপুর থেকে কোন খবর আসেনি?

—না। 'থিসিস্'-এ finishing touch দেওয়ার কাজটা এগিয়ে যাচ্ছে। সেও কম লাভ নয়।

ধুলোর ঝড় পনর মিনিটেই থামে। আমি বাড়ির দিকে অগ্রসর হই। সন্ধ্যায় খালি গাড়ি টেনে নিয়ে চলে 'Happy boy'-এর 'হকার'। তপসে মাছ হেঁকে যায়। বড় লোভনীয় জিনিস। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা মনে পড়ে। গুপ্ত কবি মহানিদ্রায় সুপ্ত হয়েছেন কত কাল, কিন্তু বাঙালীর চিত্তে তাঁর হাস্যরস আজও লুপ্ত হয়নি।

কলকাতাবাসী হলেও আমাদের পরিবার তেমন আধুনিক নয়। ছোটরা খেলে গোলকধাম, বড়রা খেলে পাশা। বৃহৎ সংসার—হইচই লেগেই আছে। প্রতিবেশীরা মাঝে মাঝে মৃদু প্রতিবাদ জানান। বর্ষীয়সীরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মেয়ে মহলকে শোনান—আপনাদের ছেলেরা বাজে কাজে বড় সময় নষ্ট করে। পৃথিবীতে কাজ অকাজ ও বাজে কাজের ব্যবধানটা সব সময় সুস্পষ্ট নয়। আমরা ওসব কথায় কান দিইনে। পড়াশুনা ও আমোদ প্রমোদ

সমান উত্তমেই চলে। সে দিন শনিবার। সন্ধ্যার পর বৈঠকখানার পাশের ঘরে পাশা জমে উঠেছে। অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হলেন এ বি সি ডি। বললেন—বাঃ এ যে দেখছি সাবেক আমলের আবহাওয়া। How refreshing! আমারও যোগ দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

আমি সসম্ভ্রমে স্থান ছেড়ে দিলাম এ বি সি ডি-কে। তিনি পরম উৎসাহে দান ফেলতে লাগলেন—'ছ তিন নয়,' 'বারো পঞ্জা সতর,' 'দশ ছয় ষোল'। যাঁর Bridge বা Biliards খেলার কথা তাঁকে মহাভারতী যুগের পাশাখেলায় প্রাণ ঢেলে দিতে দেখে আমরা তো অবাক। এ বি সি ডি চলে যাওয়ার পর বড়দা মাথা নেড়ে বললেন,—ওহে, রকম সকম দেখে মনে হয় এ বি সি ডি একজন 'Mystery man'। বড়দার বয়েস হয়েছে। বহু দিন জজিয়তির পর অবসর গ্রহণ করেছেন। চোর ডাকাত, পকেটমার, প্রেমে পড়া যুবক, ধর্মে গোঁড়া প্রৌঢ়, ভীমরতি ধরা বৃদ্ধ—নানা মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন। লোক চরিত্রের বিভিন্ন দিক ধরা পড়েছে তাঁর চোখে। তাই যেমন ভালো না লাগলেও তাঁর কথাটা উপেক্ষা করতে পারলাম না। মনের মধ্যে একটা সন্দেহ ক্রমেই যেন ঘনিয়ে উঠতে লাগল।

মেঘলা সকাল। কলেজ বন্ধ। বারান্দায় বেড়াতে বেড়াতে শহরের কাব্যহীন বর্ষা জীবনের কথা ভাবছি। হারাধন এসে একটুকরো কাগজ হাতে দিলে। তাতে লেখা আছে:

* * *

আজ সন্ধ্যায় জলসার আয়োজন করেছি। একেবারে ঘরোয়া ব্যাপার। আপনারই মতো কয়েকজন আসবেন। ৬টা নাগাত expect করব। রাত্রে আপনার এখানেই খাওয়া।

এ বি সি ডি

* * *

সারা দুপুর বিরামবিহীন বৃষ্টি। বিকেলেও ছাড়বার কোন লক্ষণ নেই। যাই হোক, যথাসময়ে Sanctum-এ উপস্থিত হলাম। নিশীথবাবু ও প্রসাদবাবুর পাশে বসে আছেন দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক। বুঝলাম ওরাই গায়ক ও বাদক। মেঝেয় কার্পেট পাতা। মাঝখানে জরদা রঙের টেবিল ঢাকা দিয়ে মোড়া জলচৌকিতে ফুলদানি ও ধূপদানি। কাছেই হারমোনিয়াম ও তবলা। আমি এ বি সি ডি-কে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার 'থিসিস'-এর আলোচনা পর্ব শেষ হতে আর কত দেরি?

নিশীথবাবু রবীন্দ্রভক্ত। তিনি ব'লে উঠলেন—"আজ যুক্তিতর্ক ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ খাটবেনা। আজ গান ছাড়া আর কোনো কথা নেই।"

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম—বর্তমান পরিবেশে 'থিসিস'-এর প্রসংগ তোলা আমার খুবই অন্যায় হয়েছে। এই বর্ষণমুখর শ্রাবণ সন্ধ্যায় যিনি সংগীতের আসর বসিয়েছেন তিনি যথার্থই কবি।

জলেশ দাশগুপ্ত পর পর কয়েকখানি মল্লার গাইলেন। শেষে গাইলেন দ্বিজেন্দ্রলালের "আজি তোমার কাছে ভাসিয়া যায় অন্তর আমার।" ঝিঁ ঝিঁ ডাকা বর্ষা রাত। ঝিঁঝিঁটের মর্ম্মস্পর্শী মূর্ছনা। আমরা সকলেই অভিভূত হলাম। এ বি সি ডি অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন নিমীলিত নয়নে। মনে হ'ল তাঁর অন্তর ভেসে গিয়েছে বহু দূরে—বন্দী হয়েছে অতীতের কোন গোপন গহ্বরে। মিনিট পাঁচেক পরে ধীরে ধীরে চোখ মেলে জলেশবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—কী চমৎকার গলা আপনার। গলার গুণে গানের সুর ও ভাব আমাকে একেবারে বিহ্বল ক'রে তুলেছে।

মৃদুহেসে শান্ত স্বরে বললেন জলেশবাবু—দাস সাহেব। বন্ধুবর বলেছেন আপনি কবি। আমি মনে করি আপনি একাধারে কবি ও প্রেমিক।

গানের পালা শেষ হলে আমরা এ বি সি ডি-র সংগে নিচে নেমে এলাম। অন্দর মহলে আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। মাটিতে আসন পাতা। চারুবাবুর মেয়ে হাসি দাঁড়িয়ে। সে পরিবেশন ক'রে খাওয়ালে খিচুড়ি, ইলিশ মাছ ভাজা, আলুবখরার চাটনি, দই ও মিষ্টি। সে দিনের অভিজ্ঞতা রমণীয় ও রহস্যময়।

কিছু দিন ব্যস্ত ছিলাম। এ বি সি ডি-ও আসেননি। 'Sanctum'-এ গিয়ে দেখি তালাবন্ধ। দাস স্টোর্স-এ চারু বাবুর সংগে দেখা হ'ল। তিনি বললেন—বহরমপুর কলেজ থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে পরদিনই দাদা চলে গেলেন। আপনাদের খবর দেবার সময় পেলেন না।

চিঠিতে জানিয়েছেন ভালো বাড়ি পেয়েছেন। পূজার ছুটিতে আসবেননা, নিরিবিলিতে থিসিসটা তৈরি করবেন।

পূজার ছুটি। বাড়িতে আমি একা। আর সকলেই পুরীতে। রাত দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ি। ভোরে উঠে ছাদে বেড়াই। চমৎকার লাগে। প্রাসাদপুরীর অভ্রভেদী আত্মবোধনার মধ্যে প্রকৃতির সংগে পরিচয়ের স্থান আর কোথায়! অনুভব করি শরৎ এসেছে। আকাশে তার ইংগিত, বাতাসে তার বার্তা। ম্যাডক স্কোয়ার সার্বজনীন পূজা মণ্ডপে সানাই আগমনী আলাপ করে—যেন সুরলোকের নবত বাজে। রাস্তায় প্রসাদবাবুকে দেখে নেমে এলাম দোতলায়। তাঁকে ডেকে বসালাম বারান্দায়। বললাম—এ বি সি ডি বহরমপুর কলেজে যোগদান করেছেন।

প্রসাদবাবু খুশী হয়ে বললেন—সুসংবাদ। ভদ্রলোক বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন। সংসার না পেতেও সংসারী তো!

—ও, উনি bachelor! আমি ঐ রকমই অনুমান করেছিলাম। আচ্ছা, বলতে পারেন—ওদের পরিবার ক্রীশ্চান হয়েছেন কত দিন আগে?

—ওঁদের পরিবার তো ক্রীশ্চান নয়, ক্রীশ্চান উনি নিজেই। অবশ্য এটা আমার ধারণা, এ সম্বন্ধে ওঁর সংগে কোন দিন কোন কথা হয়নি। তবে নাগপুরে থাকতে অন্নপ্রাশন, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ওঁর নিকটতম আত্মীয়দের কয়েকখানা চিঠি আমার চোখে পড়েছিল। তাতে মনে হয়েছিল ওঁদের পরিবার গোঁড়া হিন্দু।

—আমারও তাই মনে হয়। হালচাল তো ষোল আনাই হিন্দুর। জলসার রাত্রে খেতে বসে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা নেই, ডিম মাংস চপ কাটলেটের বালাই নেই। খাঁটি হিন্দু বাড়ির খাওয়া। ভাইঝিটির সলজ্জ ভাবভংগি ক্রীশ্চান সমাজের ধার দিয়েও যায়না। এ বি সি ডি নিজেও এই ধরণের জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত। কি বলেন?

—ঠিক বলেছেন। ওঁর ঘরখানি বাড়ির বাইরে, কিন্তু উনি গৃহস্থেরই একজন। উনি কেন যে ক্রীশ্চান হয়েছিলেন জানিনে। মাঝে মাঝে বলেন—আমি কোন ধর্মই মানিনে, মানি শুধু ভগবানকে। তিনিই একমাত্র সত্য। জীবনের অজানা পথে আমাদের নিয়ে যান হাত ধ'রে। এই যে আত্মসমর্পণ, এই যে 'Lead kindly Light' ভাব—এর মধ্যে একটা ট্রাজেডির আভাস পাওয়া যায়না কি?

—আমিও তাই ভাবি। ভদ্রলোক যখন চুরুটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়েন তখন তার সংগে বেরিয়ে আসে তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস অন্তরের অন্তস্তল থেকে। প্রেমের গান শুনে উন্মনা হয়ে যান। নিশ্চয়ই ওঁর মধ্যে কোন করুণ কাহিনী লুকিয়ে আছে। যতই দিন যায়, ততই মনে হয় এ বি সি ডি-কে যত জানি তত জানিনে।

—অসম্ভব নয়। পৃথিবীর একভাগ স্থল আর তিন ভাগ জল। তেমনি মানুষের এক ভাগ ব্যক্ত, আর তিন ভাগ অব্যক্ত।

হাত ঘড়িটির দিকে তাকিয়ে প্রসাদবাবু উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—আজ আসি। কথায় কথায় বেলা অনেকখানি গড়িয়েছে।

প্রসাদবাবু চলে যান। নিস্তব্ধ বারান্দায় একা বসে থাকি। অনুশোচনায় মন ভরে ওঠে। এ বি সি ডি বহরমপুরে 'থিসিস' তৈরি করছেন, আর আমরা কলকাতায় তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে নিয়েই 'থিসিস' রচনা করছি। অত্যন্ত লজ্জার কথা। একজন অমায়িক শিক্ষাব্রতীর ব্যক্তিগত জীবন আড়ালে আলোচনা করা ঘোর অন্যায়। পরচর্চা কি মানুষের স্বভাব? ঔৎসুক্য কি আত্মার তৃষ্ণা?

মেজদা শিক্ষা বিভাগ থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় এসেছেন। তিনি অনেক দিন আগে পরলোক সম্বন্ধে পড়াশুনা ও লেখালেখি আরম্ভ করেছিলেন। ইদানীং পরলোকগত আত্মার সংগে যোগাযোগ করছেন। ভালো 'medium হয়ে উঠেছেন automatic writing এর। কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসেন; তাঁকে কেন্দ্র ক'রে বসেন কয়েক জন যাঁদের এ বিষয়ে বিশ্বাস আছে; সকলেই একাগ্রচিত্তে চিন্তা করেন কোন বিশিষ্ট আত্মাকে। দেখতে দেখতে 'medium' আবিষ্ট হয়ে পড়েন, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে, পেনসিল ন'ড়ে ওঠে, আত্মার আবির্ভাব হয়। জিজ্ঞাসা করলে পরিচয় দেন, প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায়। কেউ অল্প ক্ষণেই বিদায় নেন, কেউ বা অনেকক্ষণ

ধ'রে নানা কথা বলেন। জীবের মতো আত্মারও প্রকার ভেদ আছে। আমাদের সম্মুখে একটা নতুন জগৎ যেন খুলে গিয়েছে। পরমহংসদেব আসেন, স্বামীজী আসেন, বঙ্কিমচন্দ্র আসেন। উচ্চস্তরের আত্মার সান্নিধ্যে এসে অমূল্য উপদেশ শুনে বিবিধ বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিলাভ ক'রে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করি আমাদের উৎসাহের অন্ত নেই। বাড়িতে একটা ছোট-খাটো 'সেক্রেটারিয়েট' বসে' গিয়েছে। বড় বড় বাঁধানো খাতায় প্রেত-চক্রের বিবরণী লিখে রা া হয় নিয়মিতভাবে। আমরা লোকান্তর রহস্যে ডুবে আছি। সন্ধ্যার পর বৈঠক বসে, চলে রাত্রি দশটা পর্যন্ত। আজকাল বেলাবেলি কাজ সেরে বাড়ি ফেরা আমাদের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জানুয়ারি মাস। বালিগঞ্জের মাঠে বেড়িয়ে ফিরছি। সংগে মেজদা আছেন। সূর্য অস্তোন্মুখ পশ্চিম দিগংগনার চোখে সোনার স্বপন। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের কাছে আচমকা যেন এ বি সি ডি-র ডাক-শুনতে পেলাম। চেয়ে দেখি পদ্মপুকুর রোড ধ'রে এগিয়ে আসছেন এ বি সি ডি। জিজ্ঞাসা করলাম—'থিসিস' দিতে এসেছেন বুঝি ?

—না, বহরমপুর ছেড়ে একেবারেই চলে এসেছি। শরীর ভালো যাচ্ছেনা, constipation এ ভুগছি, মাথাটা মাঝে মাঝে ঝিম ঝিম করে, কেমন একটা দুর্বলতা অনুভব করি। 'থিসিস' পাঠিয়েছি ডিসেম্বরের গোড়ায়। চারুর চিঠিতে আপনার খবর পেতাম। আমি না হয় ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু আপনি কলম ধরেন নি কেন ? Research এ মন দিয়ে ছন নাকি ?

মেজদার পরিচয় ও প্রেতচক্রের বিবরণ দিয়ে বললাম যে নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছি তাতে মগ্ন হয়ে আছি। একটুও অবসর নেই। অন্য কাজে মনও যায়না। আপনার কি এতে বিশ্বাস আছে ?

—বিলক্ষণ আছে। পৃথিবীর পর্দার আড়ালে কত অজ্ঞাত জগৎ রয়েছে যার কোন খবরই আমরা রাখিনে। পাশ্চাত্য মনীষীরা এ ক্ষেত্রে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন এবং অপার্থিব লোকের সংগে রীতিমতো যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ের সুস্পষ্ট ইংগিত দিয়াছেন :

"পরিচিত সীমানার
বেড়া-ঘেরা থাকি ছোটো বিশ্বে ;
বিপুল অপরিচিত
নিকটেই রয়েছে অদৃশ্যে।"

মেজদাদার দিকে চেয়ে এ বি সি ডি বললেন—দাদা, আপনার permission পেলে আমি আপনাদের বৈঠকে গিয়ে একটু বসি।

মেজদা বললেন—বেশ তো, আজই আসুননা, সাড়ে সাতটায় বৈঠক বসবে।

সাতটা বেজে পঁচিশ মিনিটের সময় এ বি সি ডি উপস্থিত হলেন। পায়ে মোজা, গায়ে ওভার কোট, মাথায় কান ঢাকা টুপি। মেজদা বললেন—আমরা এখন আমেরিকার মহিলা' স্পিরিচুয়ালিস্ট' লিলিয়ান এডগারের আত্মাকে আহ্বান করছি। কি ভাবে কি হয় দেখুন ; তারপর আপনি যে আত্মার সংগে যোগাযোগ করতে চান তাঁকে আহ্বান করব।

এডগারের আত্মা কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বিদায় নিলেন। এ বি সি ডি-কে বলা হ'ল তাঁর অভিলষিত আত্মাকে স্মরণ করতে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার খসখস ক'রে পেনসিল চলতে লাগল। আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী এ বি সি ডি প্রশ্ন শুরু করলেন—নাম কি ?

—মীরা

—আমাকে চিনতে পার ?

—খুব পারি।

—কোথায় আছ ?

—পঞ্চম স্বর্গে।

—কেমন আছ ?

—ভালোই। * * * আপনার জন্যে সময়ে সময়ে কষ্ট হয়।

এ বি সি ডি-র কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল। আত্মসংবরণ ক'রে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—মা-বাবাকে মনে আছে ?

—আছে বই কি। * * * পার্থিব জীবন অনেক-দিন আগে দেখা ছবির মতো ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছে। আপনি খুব চিন্তার মধ্যে রয়েছেন। ভাববেন না, যে কাজে ব্রতী হয়েছেন তাতে কৃতকার্য হবেন।

অকারণে পেনসিল ঘুরতে লাগল। এ বি সি ডি-কে আমরা বুঝিয়ে বললাম—উনি আর থাকতে চাননা। ওঁকে ছেড়ে দিতে হবে।

হতাশভাবে এ বি সি ডি বললেন—তোমাকে আর কষ্ট দিতে চাইনে। কতকাল পরে তোমার সংগে কথা-বার্তা ব'লে বড় আনন্দ পেলাম। মাঝে মাঝে বিরক্ত করব।

— আচ্ছা আসি।

এ বি সি ডি-কে বিস্ময়াবিষ্ট অবস্থায় রেখে মীরার আত্মা চলে গেলেন। বৈঠক শেষ হ'ল। মেজদাকে কর-জোড়ে নমস্কার জানিয়ে বললেন এ বি সি ডি—জীবিত ও মৃতের মধ্যে আপনি যে সেতু রচনা করেছেন তা সত্যিই অদ্ভুত। কথার ভংগিতে মানুষ চিনতে একটুও দেরি হয়না। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আবার হয়তো আপনাকে জ্বালাতন করতে হবে, কিছু মনে করবেন না।

এ বি সি ডি কে এগিয়ে দিতে গেলাম পালিত ষ্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত। রাস্তায় যেতে যেতে বললাম—মীরাকে আপনি খুবই স্নেহ করতেন মনে হয়। সে কি হাসির বড় বোন ?

—না।

—তবে মীরা কে ?

এ বি সি ডি শুক্লা চতুর্থীর অস্তগামী চাঁদের দিকে চেয়ে রইলেন নীরবে। তারপর বললেন—আর এক দিন শুনবেন !

কনকনে ঠাণ্ডা। মিটমিটে আলো। শ্রান্তদেহে ঘরে ফেরে ঘুগনি আলুরদমওয়ালা। আমার অন্তর্জগতে প্রসারিত হয় নূতন প্রহেলিকা।

গরমের ছুটির পর কলেজের নতুন 'সেসন' শুরু হয়েছে। পুরোদমে কাজ চলছে। খবর পেলাম এ বি সি ডি 'ডক্টরেট' পেয়েছেন। ভারি আনন্দ হ'ল। ছুটে গেলাম অভিনন্দন জানাতে। এ বি সি ডি বললেন—প্রসাদ ভায়া কাল এসেছিলেন। নিশীথ ভায়া একটু আগেই চলে গেলেন। এর জন্যে এ বয়েসে অভিনন্দন নিতে লজ্জা করে। আমার তরফ থেকেই বরং আপনাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত। আপনাদের উৎসাহ ও সাহায্য না পেলে 'থিসিস'টা কোনকাজেই লাগত না, শুধু পোকার পেটে যেত।

—জীবনের প্রতিকূলতার মধ্যেও আপনি যে প্রাণশক্তি হারান নি 'ডক্টরেট' তার পরিচয়। আপনার অধ্যবসায় সত্যিই অনুকরণীয়।

—একটা কথা আছে। St. Paul's এর Principal আমার পুরণো বন্ধু। Congratulationএর সংগে তিনি Senir Professorshipএর offer পাঠিয়েছেন। ৫০০ টাকা দিতে চান। আমার টাকার দরকার। হাসির বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলেছি। প্রসাদভায়া ও নিশীথভায়া তো accept করতে বলেন। আপনার কি মত ?

—নিশ্চয়ই করবেন। কলকাতায়—respectable college—দেখতে দেখতে Post graduateএ চলে যাবেন।

—ওসব আশা রাখিনে। এখন আর সেদিন নেই যে গুণ আছে ব'লে আমার মতো বুনো লোকেরও ডাক পড়বে। Propagandaর যুগ। প্রচার চাই। শুধু রাত জাগা পাণ্ডিত্যে পার পাওয়া যায়না ভায়া। যোগ্যতার পুরস্কার পায় তারাই যারা ভাগ্যবান, যাদের বোঝা ভগবান বহন করেন।

— ডক্টর লক্ষ্মীনারায়ণের 'ডিনার' এ যাচ্ছেন তো ?

—ও সব জায়গায় আমরা কলকে পাবনা। আমাদের না যাওয়াই ভালো। নিজের মান নিজের কাছে। বুঝলেন ভায়া ও একটা diplomatic dinner। শুনছি উনি কি একটা commissionএ যাবার চেষ্টায় আছেন। তাই এই আয়োজন।

—আপনার মর্যাদাবোধ দেখে শ্রদ্ধা হয়। আপনার কাছে অনেক জিনিসই শিখবার আছে।

অঘ্রাণ মাস। হাসির বিয়ে হয়ে গেল। এ বি সি ডি-র যেমন সংকল্প তেমন কাজ। একটু নড়চড় হবার জো নেই। বুড়ো হাড়েও যে সময়ে সময়ে ভেলকি খেলে এ বি সি ডি তার জলন্ত প্রমাণ। তার ব্যক্তিত্বে ব্যবহারে মিষ্টি কথায় ও শিষ্ট ভংগিমায় শুভকর্ম নিষ্পন্ন হয় নির্বিঘ্নে। পরদিন অপরাহ্ণ বেলা। রোশনচৌকির সানাই সাহানার সমস্ত করুণা ঢেলে দেয়। বাড়িশুদ্ধ লোকের চোখ ছলছল ক'রে ওঠে। হাসি কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। কোন রকমে আত্মসংবরণ ক'রে এ বি সি ডি বসে পড়লেন

বারান্দার বেঞ্চির ওপর। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর আর্দ্রকণ্ঠে বললেন—আজ বড় ফাঁকা বোধ হচ্ছে। হাসি আমার অন্তরের অনেকখানি জুড়ে ছিল। কি নিয়ে থাকব? মরণকালে যদি বেশীদিন বিছানায় পড়ে থাকি তো দেখবে শুনবে কে? বউমা তো চাকুর চাকায় বাঁধা।

—দেখুন, সংসারে কারও ওপর নির্ভর করা যায়না। অবস্থার সৃষ্টি করেন যিনি ব্যবস্থাও তিনিই ক'রে দেন। এখন মনটা মুষড়ে পড়েছে। তাই ভাবনা হচ্ছে। পরে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

এ বি সি ডি মাথা নেড়ে সমর্থন জানালেন। আমি আস্তে আস্তে অন্য প্রসংগ তুলে তাঁকে কতকটা সহজ অবস্থায় এনে সে দিনের মত বিদায় নিলাম।

তিন মাস পরে। এ বি সি ডি ইউনিভার্সিটিতে Part-time Lecturer হয়েছেন। দু জায়গায় কাজ চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েন—কোথাও বড় একটা যাননা। এ বি সি ডি-র অনুপ্রেরণায় আমি গবেষণায় মন দিয়েছি। সময়ের একান্ত অভাব। 'Sanctum'এ যাতায়াত প্রায় বন্ধ। একদিন নিশীথবাবুর মুখে শুনলাম এ বি সি ডি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কিছুদিন আগে। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় 'Sanctum'এ গেলাম। সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে এ বি সি ডি আমাকে বসতে বললেন গদি-আঁটা আরাম কেদারাটা খাটের কাছে টেনে নিয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন আছেন? আপনার অসুখের খবর দেন নি কেন? আজ নিশীথবাবু বললেন।

—বিশেষ কিছু নয়—a mild type of Influenza। শরীর বেশ সুস্থ হয়েছে কিন্তু মনটা তেমন সজীব হয়নি। কোন কিছু ভালো লাগেনা। বাড়ির বাইরে যেতেও ইচ্ছা করেনা। মনে হয় সময়ের স্রোত যেন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে ঘরখানার মধ্যে। তখন মনের মানুষ কাছে পাওয়ার জন্য কী ব্যাকুলতা! আপনাকে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।...আচ্ছা, আপনার সেই 'স্পিরিচুয়ালিস্ট' দাদার খবর কি?

—তিনি আগামী সপ্তাহে আসছেন।

—What a coincidence! আমি ক-দিন থেকে ভাবছি তাঁর কথা। একদিন বসতে হবে তাঁর চক্রে।

হঠাৎ আমার মনে পড়ল এ বি সি ডি-র বিস্মৃত প্রতি-শ্রুতি। বললাম—প্রেতচক্রের অধিবেশনে আপনি যাঁর আত্মাকে আহ্বান করেছিলেন তাঁর পরিচয় তো দেননি। একেবারে ভুলে গিয়েছেন।

—মীরার কাহিনী আমারই জীবনের বেদনাময় ইতিহাস। যে ইতিহাস আপনাকে শোনাতে আজ ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু সময় হবে কি? কয়েক ঘণ্টা নষ্ট করতে রাজী আছেন?

—আমার বিশেষ কাজ নেই, কেবল বাড়িতে একটা খবর পাঠিয়ে দিলেই হবে।

হারাধনের হাতে বউদির কাছে একখানা 'স্লিপ' পাঠালাম:—'Sanctum'-এ আটকে পড়েছি জরুরী কাজে, ফিরতে অনেক রাত হবে। ঠাকুরকে বলবেন, খাবার ঢাকা দিয়ে রাখতে শোবার ঘরে। কড়া নাড়লে নিধিয়া যেন দরজা খুলে দেয়।

ঠিক সাতটার সময় বিছানার ওপর বালিশে হেলান দিয়ে বসলেন এ বি সি ডি। উপাখ্যান শুরু হবে। শোনবার জন্য আমার মনে ছাত্রের আগ্রহ।

এ বি সি ডি আরম্ভ করলেন—আমি যখন General Assemblyতে পড়ি তখন এ্যালবার্ট অমিত বিশ্বাস ছিল আমার সহপাঠী। বাদুড়বাগানে তাদের বাড়ি আমি মাঝে মাঝে যেতাম। অমিতের বাবা মা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। অমিতের ছোট বোন আইভি বেথুন স্কুলে পড়ত। তাকে আমার খুব ভালো লাগত।

মিস্ বিশ্বাস কি রূপসী ছিলেন?

—ঠিক রূপসী বলা যায়না তবে সুশ্রী। তার গুণের অবধি ছিল না। যেমন লেখা পড়ায় তেমনি কাজকর্মে। কী মধুর কণ্ঠ। কী অপূর্ব হাত পিয়ানোয়! আদর আপ্যায়নে অতুলনীয়া। চা খাবার নিয়ে যখন ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করত, তখন কোঁকড়ানো চুল ছড়িয়ে পড়ত মুখের ওপর আর পেলব প্রাণের প্রীতি দিকে দিকে উৎসারিত হয়ে তার সান্নিধ্যকে ভরে তুলত স্বর্গীয় কমনীয়তায়। ভায়া, রূপ বাইরের, গুণ ভিতরের। রূপ দূর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, গুণ কাছে এসে হৃদয় জয় করে। রূপ এগিয়ে চলে, গুণ পিছনে থাকে। রূপকে

অতিথিরূপে পেলেই আমরা খুশী হই, গুণের সংগে আত্মীয়তা করতে চাই।

—চমৎকার। তার পর।

—আমি যে বছর বি এ পাশ করলাম আইভি সে বছর এণ্ট্রান্স পাশ করলে। আমাদের প্রীতি ক্রমেই ঘনীভূত হতে লাগল। জীবনে যখন বসন্ত আসে, অন্তর যখন মুকুলিত হয়ে উঠে, তখন এমনিই হয়। আমরা গোঁড়া হিন্দু, আইভিরা ক্রীশ্চান, মিলনের অন্তরায় অনেক —একথা বুঝেও দূরে সরতে পারিনে। কথা পাড়লে আইভি চুপ করে থাকে। নীরবতার মধ্যেই হয় মানুষের গভীরতম প্রকাশ। মুখের ভাষা যখন স্তব্ধ হয়ে যায় তখন অন্তর ধরা দেয় চোখের ভাষায়। ব্যবধানের বিষয় আইভি যেন চিন্তাই করেনা। মনে হয় ভবিষ্যতের পথ তার কাছে উন্মুক্ত—সহজ সরল উজ্জ্বল। আমার ভাবান্তর ঘটে, মুখের ওপর ফোটে চিন্তার রেখা, হাসিতে বাজে বিষাদের সুর। সেটা মিসেস বিশ্বাসের অভিজ্ঞ দৃষ্টি এড়ায় না। তিনি একদিন আমাকে নিভৃতে ডেকে বললেন—দেখ বাবা, আইভি তো বিনুদা বলতে অজ্ঞান! তুমিও আমাদের একান্ত আপনার ক'রে নিয়েছে। কিন্তু মুশকিল এই তুমি আমাদের সমাজের নও। মিষ্টার বিশ্বাসের সংগেও কথা হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের সমাজে তোমার মতো ছেলে পাওয়া যায়না। তুমি baptised হলে ভবিষৎ গড়ে তোলার কোন বাধাই থাকেনা। বড় বড় মিশনারীদের সংগে ওঁর ঘনিষ্ঠতা আছে। উচ্চ শিক্ষার জন্য তোমাকে বিলাত পাঠাবার ব্যবস্থা আনায়াসেই হতে পারে। অনেক দিন থেকে কথাটা বলি বলি ক'রেও বলা হয়নি। কেমন যেন বাধে মুখ ফুটে বলতে। ধর্ম ও সমাজ জীবনের বড় বন্ধন, বাবা। তোমার অভিভাবক রয়েছেন—মা না থাকলেও মাথার ওপর বাবা আছেন। তিনি কি ভাববেন? এই প্রস্তাবের মধ্যে অনুদারতার—হয়তো বা সংকীর্ণ স্বার্থের আভাষ পাবেন। আমরা তাঁর কাছে বড় ছোট হয়ে যাব, বাবা তাই অত্যন্ত সংকোচ বোধ করি। আইভি আমাদের একটি মাত্র মেয়ে। তার সুখ শান্তির কথা ভাবতে গিয়ে তোমার দুঃখ অশান্তির কারণ না হই। এ ভাবনাও হয়। কি করলে ভালো হয় ঠিক বুঝতে পারিনে। তোমরা জীবনে সুখী হও শুধু এই কামনাই করি। কিছু মনে করোনা, বাবা। তোমাকে ছেলের মতো দেখি বলেই কথাটা বলতে সাহস করেছি। সব দিক বিবেচনা ক'রে তুমিই আমাদের পথ দেখাও।

তিন মাস চিন্তার পর মন স্থির ক'রে ফেললাম। বাড়ির অবস্থা খারাপ। বাবার রোজগার নেই। একমাত্র পৈতৃক বাড়িখানি সম্বল। ছোট ভাইটি নিতান্ত ক্ষীণ-জীবী, নিজের পায়ে দাঁড়'তে পারবে কিনা সন্দেহ। বিশ্বাস পরিবারকে জানিয়ে দিলাম যে পথে লক্ষ্মী ও আইভির মতো অঙ্কলক্ষ্মী দুইই লাভ করব সেই পথই আমার জীবনের একমাত্র পথ। বাড়িতে কাউকে কিছু বললাম না। চির-বন্ধুর পথেই চলে প্রেমের জয়রথ। সে রথের চিংসারথি ভগবান। যথাকালে আমার conversion ও এডিনবরায় মিশনের টাকায় পড়াশুনার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'ল। যাত্রার কয়েক দিন পূর্বে বাবার মুখ সহসা গম্ভীর হয়ে উঠেছে দেখে বুঝলাম খবরটা তাঁর কানে পৌচেছে। ভয়ে বুক কাঁপে, কি জানি কোন্ অসহনীয় অগ্ন্যুৎপাতের সম্মুখীন হতে হবে। আইভি বলে—ভয় কি বিনুদা, বাবা তোমাকে ফেলতে পারবেননা। এখন যদিই বা অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, যখন বিলাত থেকে তাঁর মুখ উজ্জ্বল ক'রে ফিরে আসবে তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। ক্ষমা তিনি করবেনই। সে ভার আমার ওপর রইল।

সংকটে সমবেদনা প্রেমকে ক'রে তোলে প্রগাঢ়, ভীতি-বিক্ষুব্ধ চিত্তে সঞ্চার করে সাহস। আইভির কথায় ভরসা পেলাম। বাবাও রাগ বা দুঃখ তেমন কিছু প্রকাশ করলেন না, যদিও প্রাণে লেগেছিল প্রচণ্ড আঘাত। বিদায় বেলায় বললেন—ভবিষ্যতের আশায় তুমি অতীত ও বর্তমানকে ভাসিয়ে দিয়েছ। দেখো যেন ক্ষতিপূরণ করতে পারো। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা প্রশংসনীয়, তবে পরি-বারের প্রতিও একটা কর্তব্য আছে। তোমার মা ভাগ্যবতী, আগেই চোখ বুঁজেছেন। বেঁচে থাকলে অশেষ দুঃখ পেতেন। ভগবান আমাকে নিয়ে বার বার পরীক্ষা করছেন। আমার বড়ই দুর্ভাগ্য। কিন্তু ভাগ্যবান তারা, যারা আমার আশে পাশে থেকে শিক্ষা লাভ করবে।

বাবার রাগ-চাপা দুঃখ ও আইভির দুঃখ-চাপা হাসির

মধ্যে সমুদ্র যাত্রা করলাম আগামী কালের আলোর দিকে চেয়ে।

হারাধন ওভালটিন ও বিস্কুট নিয়ে এল। এ বি সি ডি বললেন—রাত্তিরের খাওয়া সেরে নিই। ভায়া, আপনিও কিছু খান। ফিরতে অনেক দেরি হবে।

দশ মিনিট বিরতি। তার পর শুরু করলেন এ বি সি ডি—এডিনবরায় মাস ছয়েক বেশ কাটে। স্বাধীন দেশ, উন্নত মানুষ, সুসভ্য পরিবেশ, শিক্ষার সুবর্ণ সুযোগ, আমার অভিনব অভিজ্ঞতা। চারু চিঠি লেখে মাঝে মাঝে, আইভি লেখে প্রতি মেলে। কল্পনায় আনি সেই দিন, যে দিন দেশে ফিরে আইভির হাস্যোজ্জ্বল অভ্যর্থনা পাবো। পুনর্মিলনের পটভূমিতে মধুর হয়ে ওঠে বিরহ। হঠাৎ আইভির চিঠি আসা বন্ধ হয়। বিশ্বাস পরিবারের সংগে আমার আসল সম্পর্কটা আমাদের পরিবারে সুস্পষ্ট নয়। কাজেই চারুকে খবরের জন্যে লেখা যায়না। অকরুণ নীরবতায় দুর্ভাবনা হয়। আইভিকে কেবল্ করি। কোন সাড়া নেই—যাকে বলে' All quiet 'হীন সন্দেহ জাগে—আইভির ভাবান্তর ঘটেছে, তার যৌবনের অংগনে আবির্ভাব হয়েছে নূতন পূজারীর। বিচিত্র কি! আঁখির অন্তরাল অচিরেই যবনিকা টেনে দেয় মনের মঞ্চে। প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়ে পড়ে সুদূরের স্মৃতি। আমার তখনকার মনের অবস্থাটা সুন্দর ফুটে উঠেছে কবি গুরুর 'বিরহীর পত্র'-তে—

ভালবাসা কাঁদে, হাসে, মোছে অশ্রুজল।

চায়, পায়, হারায় আবার।

উপায় নেই। মিশনের সর্ত অনুযায়ী দু বছরের ডিগ্রী নিতে হবে, আর ভারতে Christianity-র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখতে হবে—যা গ্রন্থাকারে ছাপা হবে। মনকে সান্ত্বনা দিই আর নীরবে কাজ করে যাই। বছর ঘোরে। ফাইনাল পরীক্ষার ৬ মাস বাকী। এই সময় একদিন অকস্মাৎ মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ে। একটি নবাগত বাঙালী ছাত্র আমার সংগে আলাপ করতে এসে একখানি বই ফেলে গিয়েছিলেন টেবিলের ওপর। ক্যালকাটা এডিসন স্টেট্‌সম্যান কাগজের মলাট দেওয়া বইখানি নাড়া চাড়া ক'রতে করতে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় Editorial column এর পাশে। লেখা আছে :—

In Memoriam

Biswas—In sad and loving memory of our dear daughter, Ivy, Whom God called to His Eternal Rest suddenly on March 4, 1909, "In memory a constant thought, in heart a silent sorrow." (Inserted by her parents—BenJamin Haladhar and Verna Sudamini)

কে যেন সুইচ টিপে মুহূর্তে জগতের সমস্ত আলো এক সংগে নিভিয়ে দেয়। চোখে ঘোর অন্ধকার দেখি। দেহমন অবসন্ন হয়ে আসে। বইখানা হাত থেকে মেঝেয় পড়ে। আইভির নীরবতার কারণ চির-নীরবতা। ওতো স্বপ্নেও ভাবিনি। কী ভুলই না হয়েছে, কত অবিচারই না করেছি! অপরাধের গ্লানি চির-বিচ্ছেদ বেদনাকে শোণিত রাঙা ক'রে তোলে। আমার মানসিক আবহাওয়াটা কল্পনা করতে পারেন ভায়া? সুদূর এডিনবরার সুবিশাল ছাত্রাবাসের জনহীন কক্ষ। কুহেলী মলিন তপনহীন দিন। অন্ধকার তরল হয়ে আসে ধীরে ধীরে। অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে চলচ্চিত্রের মতো ভেসে উঠে রৌদ্র রঞ্জিত ভারত—কলকাতা বাদুড় বাগান—তরুলতা ঘেরা ছোট বাড়ি—নানা রঙের পর্দা—সুসজ্জিত বৈঠকখানা—টেবিলের ওপর জলভরা ফুলদানিতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। আর কিছু নেই—আর কেউ নেই।

বাষ্পাকুল হয়ে উঠল এ বি সি ডি-র কণ্ঠ। আমি ভাবতে লাগলাম—কী অদ্বিতীয় শক্তি ভালোবাসার! একমাত্র ভালোবাসাই মানুষ-বিশেষকে মিশিয়ে দিতে পারে নিখিল বিশ্বের সংগে। মানুষ বিশেষের আবির্ভাবে জগৎ জুড়ে বাজে আনন্দগান, মানুষ বিশেষের তিরোভাবে সারা পৃথিবী পরিণত হয় নিরানন্দের অন্ধকূপে।

এ বি সি ডি একটু জিরিয়ে আবার আরম্ভ করলেন—একটি চরম আঘাত মানুষের জীবন দর্শনকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে নিয়ে যায়। অপরিমেয় আশাবাদের মৃত্যু হলে তার ভস্মরাশি থেকে বেরিয়ে আসে অনতিক্রমণীয় নৈরাশ্যবাদ। মনে হ'ল অর্থহীন এই প্রবাস-জীবন। ভাবলাম যেমন ক'রে হোক পালাই এখান থেকে। কিন্তু আমি যে অসহায়, আমার হাত পা যে একেবারে বাঁধা। বিশ্বদেব বল দেন বলহীনকে। আজ

আস্তে চাঙ্গা হয়ে উঠি। বিপরীত ভাব প্রবল হয়ে জাগে মনের মধ্যে।: দেশের মাটিতে আর পা দেব না। বিদেশেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হবে। যথা-সময়ে পরীক্ষা দিই এবং তারপর মিশনের প্রবন্ধের শেষ অধ্যায় সমাপ্ত করি। পরীক্ষায় ফল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উচ্চস্থান অধিকার ও বৃত্তিলাভ। অজস্র ধন্যবাদ দিই ভগবানকে। মিশনের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচি। স্বাধীনভাবে research-এ আত্মনিয়োগ করি, নিশ্চিন্তভাবে কাজে অগ্রসর হই। আবার অন্তরায় দেখা দেয়। চারুর কেবল্ আসে:—বাবা রোগ শয্যায়। ডাক্তার বলেন আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনা কম, তবে বেশী দিন বাঁচবেন না। যদি শেষ দেখা দেখতে চাও তো যত শীঘ্র পারো দেশে ফিরে এসো।

ঘা-খাওয়া মন মুয়ে পড়ে, উদ্দীপনা নিস্তেজ হয়ে আসে, প্রতিজ্ঞা যায় ভেঙে। সংসারে বড় হওয়াই যে সব চেয়ে বড় জিনিস তা নয়। মনে পড়ে বিদায় বেলায় বাবার কথা—'পরিবারের প্রতিও একটা কর্তব্য আছে।' ডক্টরেটে অভিলাষ অপূর্ণ থাকে থাক। দেশে ফিরতেই হবে। বিধিলিপি কি খণ্ডানো যায়? The moving finger writes and having writ, moves on." ।

দেশে ফেরার সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই বাবা লোকান্তর যাত্রা করলেন। মৃত্যুর পূর্বে আমাকে কাছে ডেকে বললেন—বিশু, তোমার ব্যবস্থা আমি করেছি। তুমি বাড়িতেই থাকবে।

বংশ রক্ষার জন্যে চারুর বিয়ে দিয়েছি। তার সংসার তুমি দেখবে। সে তো কর্মক্ষম নয়। তার ভার তুমি নিলে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করেছি। লোকলোচনের অন্তরালে পরমপুরুষ আপনার মনে কি খেলা খেলেন তা তিনিই জানেন। আশীর্বাদ করি সুখী হও।

বাবার মৃত্যুর পর জীবনের রিক্ততা আরও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। নিজেকে বড় অপরাধী ব'লে বোধ করি—বাবার অকাল মৃত্যুর কারণ হয়তো আমিই। যৌবনের কুসুম কাননে আমরা যখন ক্ষণিকের তৃপ্তি খুঁজে ফিরি তখন কল্পনাও করতেও পারিনে কত দীর্ঘদিনের শাস্তি আমাদের হারাতে হবে। অনেক ইতস্ততঃ ক'রে শেষে একদিন বাদুড়বাগানে যাই। শুনি অমিত দেরাদুনে চাকরি করে, তার বাবা মা কলকাতার বাস তুলে দিয়ে সেখানেই আছেন, বাড়ি ভাড়া দেওয়া। দেরাদুনে চিঠি লিখি আমার সংবাদ দিয়ে। মিস্টার ও মিসেস্ বিশ্বাস সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লেখেন, সংসারী হতে উপদেশ দেন এবং তাঁদের কাছে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এইখানেই আমার আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তি। এরপর থেকে হারাধনকে সম্বল ক'রে বিদেশে বিদেশে চাকরি ক'রে বেড়িয়েছি, আর চারুর সংসার দেখেছি। বিশ্বাস দম্পতির সান্ত্বনা গ্রহণ করেছি কিন্তু উপদেশ বা আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারিনি।

আমি বললাম—আপনার জীবনকাহিনী বড়ই 'ট্র্যাজিক', শুনলেও চোখে জল আসে। সংসারে কার দুঃখ যে কোথায় এবং কতখানি তা কিছুই বোঝা যায় না বাইরে থেকে। ভালো কথা, আপনি মীরার পরিচয় তো দিলেন না?

—ও, বলতে ভুলে গিয়েছি। আইভিও যে মীরাও সে। ওর আত্মাকেই আকর্ষণ করেছিলাম আপনাদের চক্ষে। ওর 'ক্রীশ্চান নেম'টাই চলিত ছিল। আমিই শুধু ওকে মীরা ব'লে ডাকতাম। ও পছন্দও করত। একদিন বলেছিল—বিশুদা, আমার স্বদেশী নামটা তো লুপ্ত হতে বসেছিল, আপনিই ওটা উদ্ধার করেছেন। আমার বড় ভালো লাগে—জানার মধ্যে যেন অজানার বাঁশি শুনতে পাই। মীরা চলে গিয়েছে স্বর্গে, রেখে গিয়েছে 'তৃষিত স্মৃতির মরু'। কিন্তু উপায় কি? দুঃখ দেবতার দান, তাকে হাসিমুখে সহ্য করাই তো জ্ঞানীর ধর্ম। মনো-মন্দিরের নির্মমতা থেকে দুঃখকে বাহিরবিশ্বে টেনে আনলে সান্ত্বনা মেলে না, বরং মুখর মানুষের চপলতার মাঝে অনেক সময়ে তার মর্যাদাহানি হয়।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্তিমিত নয়নে নীরব হলেন এ বি সি ডি। আমার মনে পড়ল Washington Irving সম্পর্কে William Makepeace Thackeray-র উক্তি—"Deep and quiet he lays the love of his heart, and buries it; and grass and flowers grow over the scarred ground in due time." শ্রদ্ধায় নত হয়ে এল আমার মাথা। বললাম—এতদিন ছিলাম শুধু প্রতিবেশী, এখন হলাম প্রাণের প্রতিবেশী। আজ থেকে আমি আপনার ছোট ভাই।

ভাবাবেগে হাত চেপে ধরলেন বিনোদদা। তাঁর কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়া চোখের জলে হাত ভিজে গেল। আমার প্রাণের পিয়ানোয় পিলু বেজে উঠল।

রাত তুটোয় বাড়ি ফিরে না খেয়েই শুয়ে পড়ি। পাড়ায় রোঁদে বেরিয়েছে পাহারাওয়ালা। তার ভারি বুটের শব্দ দূরে মিলিয়ে যায়। ফাল্গুনী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ছেয়ে ফেলেছে চারিদিক। কী স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতা! চোখে স্বপন নামে। ধূলি-ধূসর জগৎ যেন মায়া-কানন। তারই এক আলোছায়া আঁকা লতা-বিতানে মুখোমুখি বসে আছি আমরা তুজনে—আমি আর বিনোদদা। কোথায় কলকাতা কে জানে। সময় চলে যায়। সে দিকে বক্তা বা শ্রোতা কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। *** সম্মুখে এসে দাঁড়ায় এক তন্বী তরুণী। অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখি তার কনকের হার। হীরকের তুল, কুন্তল-আকুল মুখ। কে-এ? এ-কি স্বপন দেশের রাজকুমারী? ফাল্গুন রাতের দখিন হাওয়ায় আনমনা হয়ে চলে এসেছে আমার নির্জন-কুঞ্জে পথ ভুলে? এ কি মীরা? এ বি সি ডি-র যৌবন-রাঙা আকাশে ক্ষণিকের দেখা দিয়ে যে অদৃশ্য হয়েছিল কোন্ নীরবের দেশে? কিছুই বুঝতে পারিনে। ঘুমের ঘোরে সব একাকার হয়ে যায়।

রূপ-বহ্নি

শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

জাগায়েছ এ-কী রূপ, ওগো বহ্নিশিখা,
স্নেহসিক্ত দীপমূলে—দেহ-কূলে—অনির্ব্বাণ লিখা
অনায়াস অনিন্দ্য সুন্দর!
কঠিন মুঠিতে যেন ধরা-দেওয়া ইশারার চকিত চমক
খ'সে পড়ে নিচোলের ত্রস্ত প্রান্ত হ'তে
বিলাস মর্ম্মর—
শূন্য-সে পতঙ্গ-প্রাণ!—তবু কেন তার
তরে তিয়াস-ব্যঞ্জক
অযাচিত লক্ষহীরা-হাসি
প্রচণ্ড দাহতে
বিচ্ছুরিছ ক্ষমাহীন, ওগো সর্ব্বনাশী?
পেলব ও-কুচবিম্বে ফুটেছে প্রসূন,
অতনুর-ফুলশরে নিরুদ্ধ যে মনের আগুন
কামনায় মুক্তি রসাতল!
—ভরেছ' কী তারি রস ভঙ্গুর ভৃঙ্গারে তব দৃপ্ত অনুভবে
দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে শিরায় শিরায়,
মৃত্যু হলাহল
তাই মোর নৃত্য করে অহর্নিশ নিষ্করুণ জীবন আহবে
বিস্মৃতির ভাণ্ড' অপস্মার,—
চিত্ত কিনারার
কেঁদে' ওঠে সৃষ্টিছাড়া রিষ্টি-হাহাকার!—

ঐন্দ্রিক এ-ফাঁদ!—তবু আছে উত্তরণ
মদিরাক্ত মুহূর্ত্তের, নেশা-লাগা এষার পীড়ন
মোচনের নির্ব্বাক্ত প্রেরণা—
তারো উর্দ্ধে নির্য্যন্ত্রণ রতি হ'তে যবে তুমি হৈমবতী ধ্যানে
রূপায়িত,—মহেশের মর্ম্ম-উচাটন,
অরূপ মন্ত্রণা,—
রুদ্র মোর অস্তিত্বের যত ক্ষোভবিক্ষোভের প্রদ্যুম্ন আহ্বানে
হবে লব্ধ শর্ব্বরীর স্বাদ
স্রগ্ধ সমাপন,
অন্তর্দাহ আন্তমের অপূর্ব্ব আহ্লাদ!—
আশ্লেষ আগ্রহ শ্লেষ—নিগ্রহের ঋণ!
তাইতো ধরিতে চাই এক দেহে নিত্য রাত্রি দিন
ওগো বহ্নি, রূপ স্বতন্তর,
বুকের উষর হ'তে তাপদগ্ধ ললাটের ভ্রূ-যুগ মাঝারে
অপরূপ আঘাতের আশ্চর্য্য আরাম!
যুগ-যুগান্তর
তাইতো কাঙ্ক্ষিত তুমি,—সত্তা তব আমার এ
চেতনা-পাথারে
প্রণয়ের পূজা দিদৃক্ষায়
উন্মেষ নিষ্কাম,
মোর দিব্যভূতীর নয়ন দীপিকায়!

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ তাঁহার জীবন ও বাণী

কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়

বৈচিত্র্যই সৃষ্টির বিশেষত্ব। মানস চক্ষের অন্তরালবর্তী দেবতা সৃষ্টির আনন্দে বিভোর হয়ে অবিরাম রচনা করে চলেছেন নবীনতর অধ্যায়,—যার মধ্যে পুরাতনের কণা মাত্র নেই, নেই একের সহিত অন্যের ক্ষীণতম সাদৃশ্য। সৃজনকালে মানুষ জ্ঞাত কিম্বা অজ্ঞাতসারে পুনরাবৃত্তির দোষে সৃষ্টিকে বৈচিত্র্যহীন করে তুলতে পারে। কিন্তু যিনি অনন্ত শক্তির আধার, তাঁর রচনাধারায় কোন পূর্ব্ব ইতিহাস নেই, কোন হিসাব নেই। কবি বলেছেন।

প্রথম দিনের সূর্য্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
'কে তুমি'?
মেলেনি উত্তর।

বাস্তবিক কোন উত্তর নেই। সম্ভবত তাই একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য। কিন্তু সেই পার্থক্য—যাকে "বৈচিত্র্যের মাধূর্য্য" নামে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হবেনা, তাকেই নিম্নপর্য্যায়ে নামিয়ে এনে মানুষ করেছে বিভেদের সূত্রপাত। যার ফলে কত অসংখ্য সম্ভাব্যময় জীবনের ও কত সাধের প্রাণবিন্দুর ঘটেছে নৃশংস অপচয়!

কিন্তু বিবেকানন্দ ঈশ্বর প্রেরিত মুক্ত-পুরুষ। তিনি দেখেছেন বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য, দেখেছেন বিভিন্নতার ভিতর একই শক্তির মূল। যে কালে তিনি জীবনের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন সেই কালে বঙ্গদেশের ভাগ্য বিদেশীর হাতে রঙ্গে পরিণত হয়েছিল। পাশ্চাত্যজ্ঞান-বিজ্ঞান, ন্যায়-অন্যায় সমগ্র দেশের, বিশেষত বঙ্গদেশের শিরা উপশিরায় উগ্র মদিরার ও মত্ততার করেছিল সঞ্চারণ; সেই বিষক্রিয়ায় উত্থিত বিধর্ম্মের হলাহল বিবেকানন্দ পান করেছিলেন নীলকণ্ঠের ন্যায়।

প্রথম জীবনে প্রাণবন্যায় উচ্ছল, অনুশাসনের সহস্র দুয়ার ভাঙ্গা মুক্ত জীবনের প্রতীক বিবেকানন্দের স্বপ্নময় মন সমগ্র মানব জাতির দুর্দ্দশায় হাহাকার করে উঠলো। জীবনের যে মুহূর্ত্তটি ক্ষণকালের মধ্যে দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল মর্মভেদী আর্ত্তনাদে, তা কি আর ফিরে আসবে? সহস্র তপস্যারও অলভ্য যে প্রাণ, মানুষ কি তা ফিরে পাবে! প্রতিক্ষণের বর্ণ সম্ভার, প্রতি পদক্ষেপের অনুরণন, প্রতিটি নিশ্বাসের মধ্যে যার অনন্ত পরিচয়,—অসংখ্য বন্ধন দুর্ভেদ্য কারায় কেন তার এই নিষ্পেষণ! বিবেকানন্দের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। তিনি কামনা করলেন সীমাহীন সম্ভাবনায় ওরা এই জীবন সহস্রদলে বিকশিত হোক, জীবনের প্রতিটি রন্ধ্র ঐক্যতানে পূর্ণ হোক। সমস্ত শাসন, সকল দুয়ার ভেঙ্গে বাধাহীন, পরিপূর্ণ মুক্ত জীবনের সুধাপানে জীবনের জয়গান ধ্বনিত হোক। দৃপ্তকণ্ঠে তিনি জানালেন, "একটি মানুষের উদ্ধারের জন্য যদি আমাকে সহস্রবার জন্মাতে হয় তবে আমি তাতেও রাজী।......নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙ্গল ধরে চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুজা-ওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝাড়, জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত থেকে।"

আহ্বানটি শুধু মাত্র বাক্যসমষ্টি নয়; যেন উত্তপ্ত লৌহশলাকার উপর কঠিন আঘাতের সঙ্গে নির্গত হচ্ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। স্বামীজী নিজে স্বীকার করেছেন যে তিনি সমাজতন্ত্রী। তাঁর মতে, সকল নরনারী একই নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, এবং সকল জ্ঞান পবিত্রতার আধার স্বরূপ একই

আত্মার বহু রূপ। মানুষে মানুষে ভেদ ও বৈষম্য কেবল তাহাদের আত্মশক্তির বিকাশের তারতম্যে। সেই জন্য তিনি বেদান্তের মহান তত্ত্ব কেবল ব্রাহ্মণের গৃহে, অরণ্যে কিম্বা গিরিগুহায় আবদ্ধ রাখতে স্বীকৃত হননি। তিনি কামনা করেছেন—"বিচারালয়ে ভোজনালয়ে দরিদ্রের কুটিরে মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে,—সর্বত্র এই তত্ত্ব আলোচিত হোক।……যে জেলেকে বেদান্ত শিখাও সে বলিবে, তুমিও যেমন, আমিও তেমন, তুমি না হয় দার্শনিক আমি না হয় মৎস্যজীবী। কিন্তু তোমার ভিতর যে ঈশ্বর আছেন আমার ভিতরেও সে ঈশ্বর আছেন।' আর ইহাই আমরা চাই—কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই—অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুবিধা।—এই উক্তি আধুনিকতম সমাজতন্ত্র থেকে ভিন্ন নয়। স্বামীজী অনুভব করেছেন, "সমষ্টির উন্নতিতেই ব্যষ্টির উন্নতি, সমষ্টির সুখেই ব্যষ্টির সুখ। এ অনন্ত সত্য,—জগতের মূল ভিত্তি। ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু, পালনে অমরত্ব।"

যে তেজ যে বীর্য্যবত্তা দেশপ্রেম তথা মানবপ্রেমের জন্য অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রয়োজন, স্বামীজীর তা ছিল পূর্ণমাত্রায়। প্রকৃত শিক্ষাতেই যে জাতির অগ্রগতি ও অভ্যুত্থান ঘটে, স্বামীজী তা উপলব্ধি করেছিলেন মরমের সঙ্গে। তিনি বলতেন, "মানুষ গড়াই আমার ব্রত।" একদা তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতাকে লিখেছিলেন, "নেতা হওয়া বড় কঠিন। সঙ্ঘের পায়ে যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি নিজের সত্তা পর্য্যন্ত নেতাকে বিসর্জন দিতে হয়।

কাপুরুষতা, ভীরুতা, তমোগুণের বিরুদ্ধে তিনি সদাই ব্যবহার করেছেন তিক্ত ভাষা। "If there is any sin in the world, it is weakness, weakness is sin, weakness is death."…"আমি চিরকাল বীরের মত চলে এসেছি, আমার কাজ বিদ্যুতের মত শীঘ্র, আর বজ্রের মত অটল চাই।"

কিন্তু আধ্যাত্মিক পথে উন্নতির প্রধান বাধা,—অর্থাৎ সমাজের দারিদ্র্য ও ক্ষুন্নিবৃত্তিতে অসমর্থ জনগণের অবস্থায় স্বামীজীর দূরদৃষ্টি পড়েছিল। সেই জন্য প্রারম্ভে ধর্মোপদেশ দান করা অপেক্ষা দৈহিক শক্তি সঞ্চয়ের দিকে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হন "যদি জীবনীশক্তি প্রবল হয়, তবে কোন রোগের বীজাণু সেই দেহে থাকতে পারে না। আমাদের জীবনধর্ম্ম, এর ধারা যদি স্বচ্ছন্দগতিতে প্রবাহিত হয়, মহাতেজে প্রবাহিত হয়, শুদ্ধ ও শক্তিশালী হয়, তবে সব দিক ঠিক থাকবে, রাজনৈতিক সামাজিক এবং অন্যান্য জাগতিক ত্রুটি, এমন কি দেশের দারিদ্র্য,—সকলই নিরাময় হবে।—স্বামীজীর বলিষ্ঠ জীবনবাদ এই।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান উপদেশ "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" একেই জীবনের মূলমন্ত্র করেছিলেন স্বামীজী। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করে তিনি গুরুভাইকে লিখে জানালেন, "আমার আশ্রম অতি অবশ্যই করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? মুসলমান বালককেও লইতে হইবে বৈকি এবং তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিবেনা। তাহাদের খাওয়া দাওয়া আলগ্ করিয়া দিলেই হইল, এবং যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতব্রত হয় এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম্ম—জটিল দার্শনিকতত্ত্ব এখন শিকেয় তুলে রাখ।…তিনি প্রেমরূপে সর্বভূতে প্রকাশমান। আবার কি কাল্পনিক ঈশ্বরে পূজো হে বাপু! হিন্দু, মুশলমান, খৃশ্চান ইত্যাদি সকলজাতের ছেলে লও—…আর ধর্ম্মের যে সার্ব্বজনীনভাব তাহাই শিখাইবে।"

ভারতবর্ষ কখন কাহাকেও আঘাত করেনি। সহিষ্ণুতাই তাহার স্বধর্ম্ম, বিরোধের মধ্যে ঐক্য, বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয়ই ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। এই গ্রহণের ক্ষমতার এই উন্মেষশালিনী প্রতিভা ভারতবর্ষকে যুগে যুগে নবীনতর দৃষ্টিদান করে নূতনকে বরণ করার সামর্থ্য দান করেছে। যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে স্বামীজী তাই সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, "আমরা পাশ্চাত্যের শিল্প বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিব, কিন্তু ভারতীয়তাকে বর্জন করে নয়। Make a Europian society with Indian background.

যুগ যুগান্তর হইতে মানব জাতির মধ্যে অহোরাত্র যে সংগ্রাম পরিলক্ষিত হচ্ছে, এবং কোন বিশেষ রাজত্ব কেন যে স্থায়িত্ব-লাভ করতে পারেনি, পারছেনা এবং পারবে না, তার কারণ স্বামিজী বিশ্লেষণ করেছেন, "ঘৃণা ও বিদ্বেষপরায়ণ জাতি কখনও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেনা; ভালবাসার বলেই জাতীয় জীবন, স্থায়ী হইতে

পারে, কেবল পশুত্ব ও শারীরিক শক্তি কখনও জয়লাভ করিতে পারেনা। ক্ষমা ও কোমলতাই সংসার সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে। "কারণ" প্রেমই প্রেমের একমাত্র পুরস্কার—ইহাই একমাত্র বস্তু যাহা সকল দুঃখ দূর করে—একমাত্র পানপাত্র—যাহা পান করিলে ভবব্যাধি দূর হয়।"

সামাজিক উন্নতিসাধনে সদাব্যস্ত, স্বামীজীকে স্বামী অভেদানন্দ বলেছিলেন, "সন্ন্যাসীর কি এই সকল কাজে মেতে থাকা উচিৎ?" উত্তরে স্বামিজী বলেন, "জানিনা, তোমরা ধর্ম্ম বল্‌তে কি বোঝ। রসই যদি না থাকলো, শুধু শুষ্কখোলা চুষে কি লাভ? ধর্ম তো শুধু নিজে সাধন করলেই চলবেনা, দেশবাসীকেও উদ্বুদ্ধ করতে হবে ধর্ম্মসাধনায়। কিন্তু ঠাকুর কি বলতেন না, খালি পেটে ধর্ম্ম হয়না? আমার কাছে তো ভাই ধর্ম মানে দরিদ্র অসহায় নিঃসম্বল, দুঃস্থ মানুষের সেবা করা, তাদের নির্জীব বুকে প্রাণ জাগিয়ে তোলা,—তাদের জীর্ণ দেহে শক্তি দেওয়া।·· যার আশীষবাণীকে আমি বাস্তব রূপ দেবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি—সেই জীবত্রাতা ঠাকুরের মন্ত্রের মূলেও বুঝিবা আছে এই কথাই। দিকে দিকে মানুষ যদি মরে পচে হেজে যায়,—মঠ—মন্দির নিয়ে কি হবে ভাই?"

কথাগুলির মধ্যে যেন সেই পরম কারুণিক প্রেমময়ের ভেসে আসছে দুঃখহরা বাঁশরীর সুর। স্বামিজী বিশ্ব ভ্রমণ পরিক্রমার জন্য প্রস্তুত হলেন। এলেন কন্যাকুমারী। উক্ত স্থানের পরম রমণীয়, মৌন শান্ত গম্ভীর পারিপার্শ্বিকতায় মুগ্ধ হলেন তিনি একান্তভাবে। সম্মুখে অসীম সিন্ধু,—পশ্চাতে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত—সুনিবিড় বিশাল অরণ্য; দূরদূরান্তরে অসংখ্য জনপদ। এখানে উপবেশন করে স্বামিজী যেন আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করলেন আপন অন্তরে।

কিন্তু সহসা তাঁর সদা মুক্তি-প্রয়াসী মন যেন বলে উঠলো, 'আর কেন, এবার যোগস্থ হয়ে দেহত্যাগ করি!' পরক্ষণে অন্তর প্রশ্ন করলো, 'তাহলে কেন এসেছিলে জগতে, কোটি কোটি লোকের অন্তরের ব্যথা অনুভব করেছ তুমি আপন অন্তরে; স্মরণ কর তাদের শীর্ণ শুষ্ক পাণ্ডুর মুখচ্ছবি।'

আত্মস্থ হলেন স্বামিজী। তাইত তাঁর তখনও অনেক কাজ বাকী! নবীন প্রেরণায় মন তখন মেতে উঠেছে নবতম কর্মের উৎসাহে। 'ভারতের কল্যাণ, ভারতবাসীর কল্যাণ'—এই মূল মন্ত্র ঘন ঘন মন্দ্রিত হচ্ছে তাঁর—স্পর্শকাতর হৃদয় তন্ত্রীতে।

জাপানে গিয়ে তাদের দেশপ্রেম, 'সাহসিকতা, কর্মকুশলতা ও শিল্পানুরাগ দেখে স্বামিজী হলেন চমৎকৃত। অদম্য উচ্ছ্বাসে মাদ্রাজের শিষ্যবর্গকে লিখলেন,—

'তোমরা কি করছো? সারা জীবন কেবল বাজে বকছো। এসো, এদের দেখে যাও; তারপর যাও গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোয় গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাতি যায়। হাজার হাজার বছর ধরে কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ তোমরা।···খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার করে শক্তিক্ষয় করছো। শত শত যুগের সামাজিক অত্যাচার তোমাদের মনুষ্যত্ব একেবারে দলে পিষে দিয়ে গেছে।···এসো মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত্ত থেকে বাইরে নিয়ে এসে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তোমরা কি দেশকে ভালবাস? তাহলে এসো আমরা ভাল হবার প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে চেয়োনা,—অতি প্রিয় আত্মীয় স্বজন কাঁদে কাঁদুক,—পেছনে চেয়োনা, এগিয়ে যাও।"

স্বামিজী বিশ্বাস করতেন ভারতের নিদ্রিত সিংহকে যদি জাগ্রত করতে পারা যায় তবে কার্য্যসিদ্ধি অনিবার্য্য। তাঁর ধারণা যে ভ্রান্ত নয়, তার প্রমাণ দিয়েছেন, কানাই দত্ত, ক্ষুদিরাম; আশাকে সত্যে পর্যবসিত করেছেন শ্রীঅরবিন্দ, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র ও ভারতের অগণিত জ্ঞাত-অজ্ঞাত বীর সন্তান—যাদের 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।' তাই উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ কোন বিদেশীকে জানিয়েছিলেন, 'যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও, তবে আগে বিবেকানন্দকে জান। এত বড় ধ্রুব সত্য আর বুঝি বেশী নেই!

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে মানবকল্যাণের জন্য মঠ স্থাপন করে স্বামিজী যে সর্ব্বময় কর্তৃত্ব সহস্তে গ্রহণ করেছিলেন, তাতে বুঝি বা গুরু ভাইদের সহজ যাতায়াত

সম্ভব ছিলনা। কিন্তু অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে, প্রকৃত তথ্য তা নয়, তিনি সকল বন্ধনের মাঝে চির-বৈরাগী। 'কেবল কাজটাকে গুছিয়ে নেবার জন্য সর্ব্বক্ষণ কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি,—শুধু এই জন্য যে, আমি যখন রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে যাব, তখনও যেন যন্ত্রটি সামনের দিকে এগিয়ে চলে। বহুদিন আগে যেদিন জীবনকে বিসর্জ্জন দিয়াছি, সেইদিনই আমি মৃত্যুকে জয় করেছি। আমার একমাত্র দুশ্চিন্তা হলো 'কাজ'—এমন কি তাও প্রভুকে সমর্পণ করে দিচ্ছি,তিনিই সব চেয়ে ভাল জানেন।'

অর্থাৎ কবির ভাষায়.—"সীমার মাঝে অসীম তুমি—বাজাও আপন সুর।'

এই সূত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন,……এই জন্য বারংবার আমি বলি যাতে সকলে কাজের জন্য তৈয়ার থাকে। একজন মরে গেলে অমনি একজন (প্রয়োজন হলে দশজন) কাজে লাগবার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। দ্বিতীয় কথা মানুষের interest না থাকলে কেউ খাটে না; সকলকে দেখানো উচিত যে, প্রত্যেকের কাজে ও সম্পত্তিতে অংশ আছে এবং কার্য্যধারা সম্বন্ধে মতপ্রকাশের ক্ষমতা আছে।…এমন একটি যন্ত্র খাড়া কর যে আপনি আপনি চলে যায়, যে মরে বা যে বাঁচে। আমাদের ইণ্ডিয়ায় ঐটি প্রধান দোষ যে, আমরা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়তে পারি না। আর তার কারণ এই যে, আমরা অপরের সঙ্গে কখনও ক্ষমতা ভাগ করে নিতে চাইনা এবং, আমাদের পরে কি হবে, তা কখনও ভাবি না।" একে গণতন্ত্রের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বললে বোধ করি অত্যুক্তি হবে না।

তথাকথিত দেশপ্রেমিকের উপর স্বামিজী বিন্দুমাত্র আস্থাবান ছিলেন না। বলেছেন, "আমি শাক্ত মায়ের ছেলে। মিনমিনে, ভিনভিনে, ছেঁড়াল্যাতা তমোগুণ আর নরককুণ্ড আমার চক্ষে দুই এক।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গুরুত্বে বরণ করায় স্বামিজী অনেকের নিকট অপ্রীতিভাজন হয়েছিলেন। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের দেশের তথাকথিত কল্যাণকামীর দল জানিয়েছিলেন, স্বামিজী যদি গুরু পূজা ত্যাগ করেন, তবে তাঁরা দলভুক্ত হতে পারেন। উত্তরে স্বামিজী শ্লেষ করে বলেন, "যে সকল দেশহিতৈষী মহাত্মা গুরুপূজাটি ছাড়লেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাঁদের সম্বন্ধেও আমার একটুকু খুঁত আছে। বলি এত দেশের জন্য বুক ধড়ফড়, কলিজা ছেঁড়-ছেঁড়, প্রাণ যায়-যায়, কণ্ঠে মড় মড় ইত্যাদি—আর একটি ঠাকুরেই সব বন্ধ করে দিলে?…কে জানে কার কি মতিগতি। আমার যেন মনে হয় ওসব লোককে গ্লাসকেসের ভিতরই তাল;

প্রীত না মানে জাত কুজাত
ভুখ্ না মানে বাসী ভাত॥

আমি তো এই জানি।"

দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্ব্ব হতেই স্বামিজীর মন পার্থিব জগতের কর্ম্মময় জীবনের উর্দ্ধে যেতে থাকে। কুমারী ম্যাকলাউডকে লেখেন, 'আমি এখন সেই আগেকার বালক বই কিছু নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটির তলায় রামকৃষ্ণের বাণী অবাক হয়ে শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যেত। বালকভাবটাই হবে আমার আসল প্রকৃতি,—আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা-কিছু করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতির উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি মাত্র।…আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশি; এত যে কষ্ট পেয়েছি তাতেও খুশি; জীবনে যে বড় বড় ভুল করেছি তাতেও খুশি; আবার এখন যে নির্ব্বাণের শান্তি সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি, তাতেও খুশী।…দেহটা গিয়েই আমার মুক্তি হোক, অথবা থাকতেই মুক্ত হই,—সেই পুরাণ 'বিবেকানন্দ' কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে—আর ফিরছে না!…শিক্ষাদাতা গুরু, নেতা, আচার্য্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস!"

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি থেকে আমরা জেনেছি যে, স্বামিজী সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি; নর-নারায়ণের নর-দেবতা। কিন্তু অপর একটি পরিচয়ের কথা সহজ-শ্রাব্য নয়। কুমারী মেরী হেলকে পত্রে স্বামিজী স্বয়ং জানান, "এখন আমি সত্যিকারের বিবেকানন্দ হতে চলেছি। তুমি কখনও মন্দকে উপভোগ করেছ? হাঃ! হাঃ! বোকা মেয়ে, সবই ভাল। যত সব বাজে। কিছুভাল, কিছু মন্দ। ভাল মন্দ দুই-ই আমার উপভোগ্য। আমিই ছিলাম যীশু এবং আমিই ছিলাম জুডাস ইস্কারিয়ট; দুই-ই আমার কাছে খেলা, আমারই কৌতুক।"

জগতে কোন ধর্ম্মাবলম্বীকে স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্ম্ম

গ্রহণে উৎসাহিত করেননি। বলেছেন স্বধর্মে অধিষ্ঠিত থেকে বিভিন্ন ধর্ম্মকে উদারচিত্তে স্বীকৃতি দাও। তাই আজ তিনি জগৎপূজ্য। স্বামিজীর নিকট ভারতের ঋণের শেষ নেই, যুগ যুগান্তর তাঁর আশীর্ব্বাদ ভারতের উপর বর্ষিত হবে। কিন্তু প্রায় তিনবৎসর কালের পাশ্চাত্য-ভ্রমণ বিদেশীদের মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছে, তা তারা সহজে, বিস্মৃত হবে না, তাঁর স্মৃতি শাশ্বত হয়ে বিরাজ করবে।

উপেক্ষিত প্রতিভা

বীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়

কবি ও নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্মশতবার্ষিকী দ্বারে এসে অনাদরে ফিরে গেল। বাঙালী তাঁর "প্রতাপাদিত্যে"র স্রষ্টাকে বাঙালী এর মধ্যেই ভুলে গেছে। কেউ উদ্যোগী হয়নি তাঁর স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে। এখন যাঁরা রঙ্গালয়ের কর্ণধার তাঁরাও কেউ এ বিষয়ে মনোযোগী হলেন না। একমাত্র শ্রীমহেন্দ্র গুপ্তের "সপ্তপর্ণা" সম্প্রদায় ক্ষীরোদপ্রসাদের শতবার্ষিকী স্মৃতি পূজায় তাঁর বিখ্যাত জনপ্রিয় গীতিনাট্য "আলিবাবা" ও কাব্যনাট্য "নরনারায়ণ" অভিনয় করে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন। বাঙালী তার জাতীয়তাবোধ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন বলেই বোধকরি এতবড় একজন প্রতিভাবান দেশাত্মবোধের উদ্বোধক নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্বন্ধে সে আজ এত শোচনীয়-ভাবে উদাসীন।

বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের দান অসামান্য। কোনদিনই তা ম্লান হবার নয়। তাঁর গীতিনাট্য "আলিবাবা" তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে। ক্ষীরোদ-প্রসাদের অন্যতম গীতিনাট্য "কিন্নরী"ও এক সময়ে বাংলা রঙ্গালয়ে খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। "বরুণা" তাঁর আর একখানি উল্লেখযোগ্য গীতিনাট্য। তাঁর "রঘুবীর," "নর-নারায়ণ" এবং "আলমগীর" প্রতিভাবান প্রয়োগশিল্পী ও অভিনেতা স্বর্গত শিশিরকুমারের যাদুস্পর্শে অমর হয়ে আছে। এখানে একটি কথা সততই মনে হয় যে, স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টি বুঝি বড় হয়ে উঠেছে। শিশিরকুমারের অভিনয় যাঁদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, "আলমগীর" শিশির-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান। "আলমগীর" পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। কারো কারো মতে "নর-নারায়ণ" তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক। "নর-নারায়ণ" শুধু নাটকই নয় একখানি শ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্য। এমন সুললিত মধুর ভাষায় বাংলা নাট্যকাব্য আর দ্বিতীয় একখানি নেই। তাঁর অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি ও নাট্যপ্রতিভা এ গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সে বিচার পণ্ডিতের। সাধারণ দর্শক ও পাঠক যুক্তি দিয়ে কোনো নাটকের বিচার করে না। তারা বিচার করে অনুভব দিয়ে। তাই তাদের কাছে যুক্তির চেয়ে হৃদয় স্পর্শনের মূল্য বেশী।

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক যাঁদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, তাঁর চরিত্রচিত্রণ, সংলাপ ও দৃশ্য সন্নিবেশ খুবই উপভোগ্য। ধরুন "রঘুবীর" নাটকের কথা—কৃষক সেখানে নিজের ভাষায় কথা বলে। সখার মা গ্রাম্য লোভী স্ত্রীলোকের প্রতিচ্ছবি। ভীলের ছেলে-মেয়ে রঘুবীর এবং শ্যামলী—ব্রাহ্মণের গৃহে লালিত-পালিত তাদের আচরণ, চলন, বলন সবই ব্রাহ্মণোচিত। রাজকন্যা পরীবানু ঠিক রাজার মেয়ের মতই স্বল্পভাষী ও ধীরস্বভাবা। ফলব্যবসায়ী লোভী জাফর রাজ্যের লোভে নবাবকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করলেও তার চরিত্র ও আচার-ব্যবহার সবই নীচ বংশোচিত।

ক্ষীরোদপ্রসাদ সব সময়েই দর্শকদের মনে রেখে তাঁর নাটক সৃষ্টি করতেন। সেই জন্যই তাঁর নাটক সকল সময়েই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছে। এখানে তাঁর রচিত বাংলা রঙ্গালয়ের চিরনূতন, অতিজনপ্রিয় অভিনব গীতি-নাট্য "আলিবাবা"র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আরবের মরুপথ বেয়ে বাংলার মাটিতে বাংলার আউল-বাউল, ফকির-দরবেশের মত "আলিবাবা" আমাদের নিজস্ব, আমাদের আপনার জন হয়ে গেছে। মুসলিম্ হারেমের

বান্দা আবদাল্লা ও মর্জ্জিনাকে আপনার করে নিয়েছে বাঙালী পাঠক আর দর্শক। এইখানেই ক্ষীরোদপ্রসাদের কৃতিত্ব, এইখানেই তাঁর নাটকীয় প্রতিভা।

ক্ষীরোদপ্রসাদের যুগান্তকারী নাটক "প্রতাপাদিত্য" বাংলার দেশাত্মবোধকে একদা সঞ্জীবিত করে তুলেছিল। "আলিবাবা"র নাট্যকার যে আবার এ ধরণেও নাটক লিখতে পারেন এ ছিল সেদিন এক বিস্ময়। ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রসঙ্গে আমার নিজের শৈশবের একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। যদিও তা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবুও তা প্রকাশ না করে থাকতে পারছি না। শিশু মনে গীতি-নাট্যের কি প্রভাব এবং নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রভাব কি ভাবে সেদিন আমার মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাই এখানে জানাব। তখন আমি নিতান্ত ছোট ছেলে। মা দিদমার সঙ্গে অভিনয় দেখতে গেছি। রঙ্গালয়ের দোতলায় কি তিনতলায় (ঠিক আমার মনে নেই) জাল দিয়ে ঘেরা মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে মা দিদিমার কাছে বসে অভিনয় দেখছি। প্রথমে কি একটা সামাজিক নাটকের অভিনয় হল। তার কথা সুস্পষ্ট আমার মনে নেই। হয়তো তখন আমার সামাজিক নাটক বুঝবার মত জ্ঞান এবং বুদ্ধি হয়নি। তাই সে নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়, চরিত্র-চিত্রণ এবং সংলাপ আমার মনে কোনই রেখাপাত করতে পারে নি। কিন্তু দ্বিতীয় নাটক গীতি-নাট্য "আলিবাবা"র অভিনয় যখন আরম্ভ হল তখন কেন জানি না—প্রস্তাবনা থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমি নির্ব্বাক বিস্ময়ে দেখলুম। নাটকের ঘটনাবলী আমার শিশুমনে যে মায়াজাল বিস্তার করেছিল, সত্যি কথা বলতে কি আজ জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও তার স্মৃতি ভুলতে পারিনি।

বাংলা ভাষায় সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত গীতিনাট্যের মধ্যে "আলিবাবা" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বজনপ্রিয় একথা বললে হয়তো বেশী বলা হয় না।

"আলিবাবা"র অভিনয় আমি বহুবার দেখেছি। তখনকার দিনে বিখ্যাত নৃত্যবিদ্ নৃপেন বসুর (যিনি ন্যাপা বোস নামে পরিচিত ছিলেন) আবদাল্লার ভূমিকায় নৃত্য-গীত ও অভিনয় এবং কুসুমকুমারী, নীরদাসুন্দরী পরে চারুশীলা প্রভৃতির মর্জ্জিনা সত্যই খুব উপভোগ্য এবং দেখবার মত ছিল। তা ছাড়া এক সময়ে ভবানীপুর নাট্য-মন্দিরে ভবানী থিয়েটারের অতুল মাষ্টারের আবদাল্লা এবং ভবানীপুরের চারুশীলার মর্জ্জিনাও খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠে-ছিল। তার অনেক পরে শ্রীমধু বোসের প্রযোজনায় অভিজাত সৌখিন সমাজের অভিনীত "আলিবাবা" দর্শক-দের অভিবাদন জানায় এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চ থেকে। আব-দাল্লার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন শ্রীমধু বোস এবং মর্জ্জিনার রূপ দেন কুমারী সাধনা সেন (তখনও তিনি বিবাহিতা হন নি)। সে অভিনয় যাঁদের দেখবার সুযোগ হয়েছিল তাঁরা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন গীতিনাট্য হিসাবে "আলি-বাবা" অভিজাত শ্রেণীরও প্রিয়। সেই অভিনয়ে শুচিতা বা আধুনিকতার অঙ্গ হিসাবে—"বাজে কাজে···মিন্সে"··· এই গানটির "মিন্সে" শব্দটির কর্ত্তায় রূপান্তরিত হয়েছিল। তা হ'লেও "আলিবাবা" "আলিবাবা"ই ছিল। Ali-dady"তে পরিণত হয়নি।

হাস্যরস সৃষ্টিতেও ক্ষীরোদপ্রসাদের ক্ষমতা ছিল অসামান্য। গুরুগম্ভীর নাটকের মাঝেও হাস্যরস সৃষ্টিতে তিনি কৃপণতা করেননি। তাঁর রচিত প্রহসনও আছে একাধিক।

সে সব দৃষ্টান্ত আর রস-সংলাপ উদ্ধৃত করে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। "দাদা ও দিদি" "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত" "বাংলার মসনদ" প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক তদানীন্তন ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছিলেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক পড়বার এবং অভিনয় দেখবার সুযোগ অনেকেই পেয়েছেন। যাঁরা সে সুযোগ পাননি তাঁদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ ক্ষীরোদপ্রসাদের সার্থক জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হবে তাঁর নাটকের পঠন, পাঠন এবং অভিনয়ে।

জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে "প্রতাপাদিত্য" নাটকের অবদানও বড় কম নয়। প্রতিভাবান নাট্যকারের প্রসাদ গুণে বাঙালী বীর প্রতাপাদিত্য বাঙালীর হৃদয়ে অমর হয়ে আছেন।

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ একজন খাঁটি বাঙালী ছিলেন এবং বাংলা ভাষাকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতেন। এখানে একটি ঘটনার ক্ষীণ স্মৃতি আমার মনে পড়ে। কোন মামলায় সাক্ষী দেবার সময় ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর বক্তব্য বাংলায় বলেন, কিন্তু অপরপক্ষের আইনজীবী ইংরাজিতে তাঁর বক্তব্য বলবার জন্য জেদ ধরেন এবং আদালতকে জানান যে, তিনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ উপাধীধারী অধ্যাপক এবং ইংরাজি অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি। অতএব তিনি ইংরাজিতে তাঁর উত্তর দিতে বাধ্য। পরাধীন ভারতে ইংরাজদের আদালতে দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন—"ইংরাজি আমি ভুলে গেছি। ইংরাজি আমার মাতৃভাষা নয়। বাংলা আমার মাতৃভাষা। বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় আমার বক্তব্য বলা সম্ভব নয়।"

আজ আমরা তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকীতে তাঁর কথা স্মরণ করে তাঁর অমর স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা এবং অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।
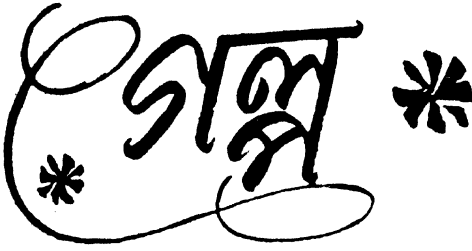
নেকার নদীর ধারে

মণিভূষণ মজুমদার

সারাবছর রামলাল ড্রেসডেন সহরের এক কারখানায় হাড়-ভাঙ্গা খেটে, জার্মানীর দক্ষিণে নেকার নদীর ধারে Black forestএর একটা অতি ছোট্ট গ্রামে ঘুরে আসবে ঠিক করল,—কয়েকদিনের ছুটিতে। রামলাল যেখানে কাজ শেখে—পৃথিবীর প্রায় সব দেশের ছাত্রই আসে কাজ শিখতে সেখানে। তিনটি জাপানীও আছে। এই সব বিদেশী ছাত্ররা নিজের নিজের দেশের আচার ব্যবহার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে। ওদের আলাপ বেশ জমাট হয়। কিন্তু জাপানী তিনজনেই কারো সঙ্গে আলাপ করত না, যদিও ওরা জার্মান ভাষা আগেই শিখেছিল। একদিন ফোরমান অটো বলল—

এই যে দেখছ জাপানী, ওরা সবই শিখতে চায়, তাই কথাই বলে না, হয়ত ভাবে কাজের সময় ওতে ক্ষতি হবে।

ওরা বাহিরে যখন যায় এখন কেউ কেউ Guten Tag বলে ওদের সঙ্গে আলাপ জমাতে চায়, তখন ওরা শুধু একটু হেসে ওদের হলদে বড় বড় দাঁত বেরই করে কিছুই বলে না বিশেষ।

নেকার নদীর ধারের গ্রামের কথা বলেছিল অটো, আরও খবরের জন্য Kassberg strasseএর একটা দোকানের হের ভাল্এর সঙ্গে দেখা করতে বলে। জোয়াফিম্ তাঁকে জানে তাই ৫টা বাজবার আগেই রামলাল Boiler suit খুলে হাত ধুয়ে জোয়াফিমকে বলে—

চলনা হাত ধুয়ে একটু আগেই, হের্ ভাল্এর সঙ্গে তাহলে দেখা হয়ত হবে।

ওদেশে কেউ একটু আগে গেলে কিছুই বলে না, যদি ফোরমান্এর চোখে পড়ে তবে সে একটু হেসে ও চোখ-টিপে বলবে—'কি হে খবর ভাল ত ?'

রামলালের কথায় জোয়াফিম্ যেমন কাজ করছিল file চালাতে চালাতেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল – ওরা আমাকে পাঁচ মিনিটেরও মাইনা দেয়। মনে হল রামলালের, ছেলেবেলায় একবার ইস্কুল পালাচ্ছিল খেলা দেখবে বলে, আর ধরা পড়ে অনন্ত মাষ্টারের সেই কসে কান মলাটা।

ওরাই নেকারকে বলে নদী—কারণ অনেক দূর থেকে জল বয়ে আসছে। স্রোতও আছে—কারণ ঝর পাতা ও ফুল ধীরে ধীরে এগিয়ে যচ্ছে ও মাঝে মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে। ট্রেনে সে সময়ে ১ম থেকে ৪র্থ ক্লাস পর্য্যন্ত ছিল এই সব ছোট গ্রামের লোকাল গাড়ীতে। বড় লাইনের Express গাড়ী ছেড়ে রাম এই রকম ছোট গ্রামের গাড়ীতে বসেছে। জানালা দিয়ে দেখা যায় বাগান ও ছোট ছোট বাড়ী—মেয়েরা লেপ তোষক রোদে দিচ্ছে, ছোট মেয়েরা পুতুল খেলছে সিঁড়ির ধারে বসে—ট্রেন ধীরে ধীরে চলে যায় ছোট লাইন—হাতে তার অনেক সময়। তেমন ছিল না সময় ওই সব Express গাড়ীর। এক ষ্টেসন ছাড়ল ত থামবার নাম নাই, বিরক্তি ধরে যায় ওর ঝিক্ ঝিক্ একটানা আওয়াজে। আর করিডোর দিয়ে Speise waagen (খাবার গাড়ী) বয় ঝুড়ি হাতে ডাকবে —বিয়ার চাই, কফি চাই sandwich চাই Biffe.

Sandwich এ থাকে salami না হয় Ham, প্রথমটায় থাকে গরু শুয়োর ও গাধার মাংসের কিমা। Beer খেলেও মুখ তিতো হয়, আর কফি—সেত বলাই যায় না, মনে হয় ছেলেবেলায় পিলে হলে যে চিরতার রস খাওয়াত তাই যেন। জল নাই, চাইলে দেবে Soda-water, না হয় sprudel এক রকম Mineral জল, দাম বেজায়। আর শুধু জলকে বলবে Frisches wasser (fresh water), আর চোখ গোল গোল করবে, তারপর গাড়ীর কামরার সব কটা লোক বুড়ো বুড়ি চ্যাংড়া চেংড়ী বাচ্চা খুকুও—মুখ দিয়ে কেমন একটা আওয়াজ করবে।

আর বয় হেসে বলে Bloss wasser! তারপর টলটলে বিয়ারের বোতল দেখিয়ে ঝুড়ি হাতে চলে যাবে—"Beer biffe," অন্য কামরায় গিয়ে হাঁকবে। রামলাল মনে মনে বলে—ব্যাটা মাতালের জাত, ওরা হয়ত বলে—মর ব্যাটা রোগে পড়ে। ওরা সাধারণত খায় না যেটা বোতলে ভর্ত্তি না থাকে ও কোন লেবেল না থাকে। ভারতবর্ষের লোকের কাছে ভেজালটাই অনেক সময় আসল হয়। যেমন মাইনার চেয়েও উপরিই বড়। হরিহরের চাকুরী হল মাইনা এত টাকা, সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন হবে—উপরি কত? উপরিই আসল, ওতেই হরিহরের সংসার, জমিজমা, ও পুকুরে মাছ ছাড়া হবে ও ওর দিকেই কনের বাপ তাকায়।

ছোট্ট গ্রাম প্লাটফরম নাই, ঝাঁপিয়ে নামতে হয়। হাতের বাক্সটী এক বুড়ি নামিয়ে দিল। Danke অর্থাৎ Thanks, তার জবাবে জার্ম্মানরা সর্ব্বদাই বলে Bitte (ওর মানে কি জানি না)—Wo wollen Sie gehen? (কোথায় যাবে?)

—একটা হোটেল না হয় থাকবার ঘর, কারো বাড়ীতে যাব। দুগালই বুড়ির আরো গেল তুবড়ে হাসতে, ও কপালের চামড়া আরো গেল কুঁচ্‌কে, চোখ দুটী গোল গোল করে রামলালের একটা হাত জাপটে ধরে গেল ষ্টেসনের কাছেই একটা ছোট্ট পাথরের দোতালা বাড়ীতে। বুড়ির অন্য হাতে একটা কাপড়ের বোঁচ্‌কা—মনে পড়ে দেশের দিদিমা যেন ফুলকাটা কাঁথা ও পাটালি গুড়, চিড়ে ভর্ত্তি গাঁটরি নিয়ে চলেছে নাতির বাড়ী। দরজায় ঘণ্টা মারতেই যে এল তাকে দেখে মনে পড়ে যায় পরশুরামের ভুশুণ্ডিমাঠের মূর্ত্তিমান—বেঁটে, মোটকা, ঘাড় নাই, মাথা-ভর্ত্তি টাক্‌, কিন্তু বিরাট গোঁফজোড়া ঠোঁটের দুদিকে এসে নেমেছে চিবুকের কাছে। যেন হুড্ডু প্রপাত,—ফোঁটা ফোঁটা বিয়ারের রস গড়িয়ে পড়ছে। টল্‌ টল্‌ করছে উপরের দিকে। নাকটা মনে হয় পাহাড় কেটে দুটী রেলের টানেল। পরণে রং চটা প্যাণ্ট, গায়ে টাই ছাড়া সার্ট, তার উপর কালো সোয়েটার। (মাথায় টাক পড়ে, গোঁফের ত টাক দেখি না) ভদ্রলোক সার্টের হাতায় গোঁফজোড়া মুছে কথাবার্ত্তার পর বোঝা গেল ওটা ওরই বাড়ী—হোটেলও বলতে পার, এখানে অনেক tourist আসে ও থাকে, খেতেও দেবে, তবে যারা আসে সবাই গাড়ী নিয়ে। আর ৮টা garage আছে। স্থানটী অতি স্বাস্থ্য-কর, তবে রামলালই প্রথম কালা আদমী—but you are welcome.

দোতালায় ছোট্ট ঘর, পুব খোলা, বড় জানলার ধারে খাট পাতা, ঘর ভর্ত্তি এখানে ওখানে Aster Pansy, Ficus ইত্যাদি গাছে ভর্ত্তি, জানলার Ivy—প্রায় গাছেই ফুল ফুটেছে। পুবদিকে দেখা যায় শুধু মাঠ ও পাহাড়—আর সর্ব্বত্রই Tanne গাছের মাথা উঁচু করে রয়েছে সোজা আকাশের দিকে। Land lady (সহজ কথায় আমরা বলি বুড়ি, তা তার যতই বয়স হোক্‌ না কেন) গরম জল ও গামলা নিয়ে ঘরে এল—যেন একটা বিয়ারের পিপে গড়াতে গড়াতে যাচ্ছে, হাঁটছে কিনা বোঝা যায় না। রামলাল মুখ, হাত ধুয়ে এক ঘুম দিল, জানলা দিয়ে ঝিরঝিরে মিঠে হাওয়া আসছে। হঠাৎ দরজায় ঠক্‌ ঠক্‌ আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গেই দেখে সুপের প্লেট হাতে বুঝি শূর্পণখা, মিঠে হাওয়ায় ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল—রামলাল ভাবছিল বুঝি উর্ব্বশী, কারণ আগেই শুনেছিল Schone schwarzwald madchen—অর্থাৎ Black forest এর মেয়েরা সুন্দরী হয়। কিন্তু বাতি জ্বালতেই দেখা গেল দুটি কুতকুতে চোখ, মুখটি এত গোল যে সত্যিই চন্দ্রবদন, নাক ও ঠোঁট দেখেই বুঝতে পারে—বাপ-মুখো মেয়ে। সুপের প্লেটটি চোখ বুজেই খেল, তারপর মাংসের টুকরো যেমন শক্ত তেমনি ভোটকা গন্ধ। এর পর এল কর্ত্তা হাতে কয়েক বোতল বিয়ার। গল্প চলছে বিয়ারও চলছে ঘন ঘন, ও কর্ত্তার হাঁক Mutti (মুটী) বিয়ার আন। রামলাল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় আর ভাবে এই বুঝি পিপেমার্কা বুড়ীকে বলছে 'মুটকী' আর তাও বলছে ভুশুণ্ডিমাঠের মোটকা বুড়ো—লাগবে নাকি হাতাহাতি এই সন্ধ্যা বেলায়! ভাগ্যিস মনে পড়ল ওদেশে বয়স হলে স্বামী স্ত্রীকে ডাকে Mutti অর্থাৎ মা, আর স্বামীকে ডাকে বাবা বলে। যাক্‌ জার্ম্মাণ দেশে ত বাংলা মুটকীর মানে বোঝে না।

ভোরে উঠে নেকার নদীর ধারে ধারে বনের ভিতর রামলাল চলে যায় ও দুপুরে পড়ে Heine র Lieder, ঘরে থাকতে ওর প্রায়ই মনে হয় কে যেন ওর দরজায়

তো নিবিড়তর। বিরহের অবস্থান তাই মহাশ্মশানে, মহাকালের তীর্থে! কালের প্রবাহে তাই বিরহের তারল্য লীন—তাই অচ্ছেদ্য।

এই বিরহের সুবাস ছড়িয়ে আছে- পৃথিবীর প্রতিটি ফুলে। শ্মশানযাত্রীর একমাত্র পাথেয়।

বিরহ সত্যিই সুন্দর। এই সুন্দরের উপাসক হলেন সাহিত্যিক তথা শিল্পী। তাই শিল্পী চিরবিরহী। শিল্প তার অভিব্যক্তির প্রয়াস মাত্র। সাধারণে এই বিরহের খোঁজ জানে না বলেই তাদের জীবনে সুখ আছে, আনন্দ নেই—অল্পদিনেই সুখের বোঝা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে—ও দুঃখ দেয়। বেদনাই আনন্দ। বিরহানন্দ হলো প্রাণরস এবং রসাস্বাদনই জীবনের ধারানুভূতি।

কবি

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

কবি আমি কবিতালিখি—এই শুধু জানি মোর কাজ :
প্রত্যেকের হৃদিতন্ত্রে অজানার সুর বেঁধে দিয়ে
পুলক ঝঙ্কারে তুলি : বিষাদের বিষবাষ্প নিয়ে
সকলেরে এনে দিই আনন্দের অপূর্ব্ব আস্বাদ।
প্রত্যেকের অন্তরেতে ফল্গুধারা সম,
যখন যে ধারা বহে, তারে ধরি মোর কবিতায়,
সবাকার সামনে আনি, নিত্য আমি এই দুনিয়ায়
হোক বা না হোক তাহা বিশ্বে কারও প্রাণ প্রিয়তম।
সুন্দর সৃজন করা এ জীবনে কোনদিন মোর কাম্য নয় ?
সৃষ্টিকে সুন্দর করা বিশ্ব বুকে কর্ম্ম শুধু মোর :
এতে যদি ঝরে পড়ে ঝরো ঝরো মম অশ্রুলোর
তবু ঘুচিবে না জানি কাব্যলক্ষ্মী সাথে মোর আছে
যে প্রণয় ?

কল্পনার কল্পলোকে, প্রকৃতির উন্মুক্ত ভাণ্ডারে—
যে রত্ন লুকিয়ে আছে তারই শুধু করি যে সন্ধান ;
মধুতে হুলের ব্যথা, অমৃতে সে গরলের দান।
বরে নিই বিশ্বে আমি হাস্য মুখে সদা
নির্ব্বিচারে।

নূতন যাত্রার পথে অভিনব প্রস্তুতি আমার :
কাঁটাকুঞ্জে পরিপূর্ণ জীবনের ক্ষুদ্র পরিবেশ।
সত্য ও সুন্দর যাহা তারই শুধু করি যে উদ্দেশ
এতে অভিমন্যু আত্মা কাঁদে তো কাঁদুক বারবার
সংসার সমরাঙ্গণে দারিদ্র্যের চক্রব্যূহে নিতি।
কিবা ক্ষতি এতে বলো ? অশান্তির অগ্নিকুণ্ডে যদি,
প্রাণ মোর তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে যায় নিরবধি
থাকিবে অম্লান তবু ক্ষুদ্র মোর জীবনের স্মৃতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

...জেগে আছে মিষ্টি লোহারণী।
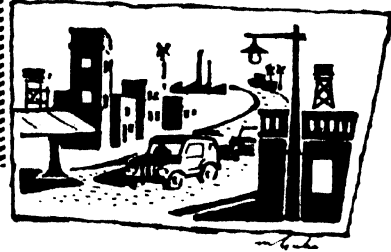
বুক জলছে তার। অনেক কষ্টে বাঁধা সংসার—অনেক আশা ; সব তার ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছে।

রাত কত জানেনা, একলাই বসে আছে দাওয়ায়। দেখেছে ধীরে ধীরে কারিগর লোকটা কেমন বদলে গেছে। আগেকার সেই মানুষটা মাথা ঠেলে উঠেছে—বন্য উদ্দাম দুর্বার সেই মানুষটা।

সেদিন যৌবনের বেগে তাকে পরাস্ত করেছিল—আজ বয়স হয়েছে। বাইরের মন চায় ঘরের নিভৃত শান্তি। কিন্তু সে আশা তার ব্যর্থ হতে চলেছে।

অপমানিত ব্যর্থ মিষ্টি আজ কারিগরের উপর সব আশা হারিয়েছে—মন ভরে উঠেছে পুঞ্জীভূত ঘৃণা আর ব্যর্থতায়।

ধীরে ধীরে বের হয়ে এল পথে। অন্ধকার নির্জন পথ। কোথাও কোন শব্দ নেই। শিশির ভেজা পথ ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে মিষ্টি।

ভালো লাগে এমনি নির্জন পথ চলতে। একাই সে জেগে রয়েছে—আর সবাই নিবিড় শান্তিতে মগ্ন।

...বাঁশীর সুর জেগে ওঠে—সেই দয়িতবিরহের সুর।

...হঠাৎ অবিনাশ ওকে দেখে বাঁশী নামায়।

...কাঁদছে মিষ্টি। ডাগর দুচোখ ওর জলে ভরে উঠেছে।

—মিতেন!

...কথা কইলনা মিষ্টি।...কেমন বিরস চাহনিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে। মনের অনেক খবরই সে অজানতে জেনেছে—তাই বোধ হয় ওর বুকের জ্বালা বাঁশীর সুরে ফুটে ওঠে। মন ছোঁয়।

—এতরাতে!

—রাত দিন আর ফারাক কই। অন্ধের আবার রাতদিন।

মিষ্টি কথাগুলো বলে কি এক দুঃসহ জ্বালায়।

--কি মনে করে? অবিনাশ একটু অবাক হয়েছে।

—মন কি বুঝি মিতেন, জ্বলে তাই বেরিয়ে পড়লাম।

—মনের বড় জ্বালা।

হাসে মিষ্টি—মন থাকাটাই জ্বালা মিতেন। বড় জ্বালা—অবুঝ হয় আর হু হু কাঁদে।

কথা কইলনা অবিনাশ। বসে আছে মিষ্টি। আবছা আঁধারে কেমন বিবশ তার চাহনি—বলিষ্ঠ দেহের একটি নীরব মাদকতা ওর দুচোখের চাহনিতে। রাত্রি গভীর।

...হঠাৎ চমকে ওঠে মিষ্টি।...অবিনাশের হাতখানা ওর হাতে—কেমন সারাদেহে একটা চাঞ্চল্য। কাছে টানছে তাকে—আর ও কাছে।

—মিতেন ! কাঁপছে অবিনাশের কণ্ঠস্বর।

শিউরে ওঠে মিষ্টি। উঠে দাঁড়ায়।

—উঠলে যে !

—না, না। মিতেন। এ আমি চাইনি এতো আমি চাইনি।

—কিহল ? ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে অবিনাশ।

—কিছু না।

—চলে যাচ্ছো !…

কোন জবাবই দিলনা মিষ্টি ওর কথার। সরে গেল—মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে কোন রহস্যময়ী অধরা নারীর মতই।

…বাঁশী আর বাজান হলনা। অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে অবিনাশ। সত্যি! মুহূর্তের ভুলে একটা অন্যায় কোথায় করে ফেলেছে সে।

…লজ্জা আসে নিজের মনে। হু হু বইছে বন-ফেরা রাত-জাগা বাতাস—কোথায় ডাকছে দুএকটা ভুলো পাখী, আবার সব চুপ চাপ।

সব আঁধারে ডুবে গেছে।

…মিষ্টি বাড়ী ফিরছে।

কেমন যেন হয়ে গেছে সারা মন। নিজের জীবনে যাদের দেখেছে—তারাতো এমন নয়। এসেছে তারা রাতের অন্ধকারে উন্মাদ হয়ে—মত্তপ লম্পটের দল। জৈবিক ক্ষুধার বীভৎস রূপই দেখেছে। পঙ্কিল সে নরক থেকে বাঁচবার চেষ্টায় সরে এসেছে ঘৃণায়।

…মানুষকে চোখে দেখেনি যে—তাকে স্বীকৃতি দিয়ে বাঁচতে চায় নিজে—বাঁচাতে চাইবে তাকে। তাদের মাঝ থেকে কারিগরকে তুলে এনেছিল।

অবিনাশ সে জাতের নয়। আজ রাত্রি অন্ধকারে কোন নীরব স্বীকৃতির চকিত সন্ধানে খুসীতে মন ভরে উঠেছে। সে সম্পদ হেলায় হারাতে চায়না সে।

…বাড়ীতে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। দাওয়ায় সাটপাট হয়ে শুয়ে আছে লোকটা—পরণে তেলকালি মাথা প্যাণ্ট, একটা নীল কাপড়ের হাফ সার্ট, তেলের দাগে সেটাও রঞ্জিত, আর সারা গা থেকে উঠছে মদের গন্ধ।

পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলল কারিগর।

—কোথা গিয়েছিলি রাতদুপুরে—কোন নাগরের কাছে।

কথা কইলনা মিষ্টি।

—জবাব দিছিসনা যে ? এ্যাই ! জানতা নেহি—ছেনালিপণা ঘুচিয়ে দোব।

সেই শ্যামনগরের কলের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে পলাতক মানুষটা। আবার জানোয়ারে পরিণত হয়েছে। এগিয়ে আসে মিষ্টি।

—দয়া করে দেয় নুন, ভাত—মারে তিন গুণ। বড় তেল বেড়েছে তুর না ?

—ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোব। খুনে মিনষে কোথাকার।

চমকে ওঠে কারিগর। জোঁকের মুখে চুণ পড়েছে। বিড় বিড় করছে।…মিষ্টি আজ মরীয়া হয়ে উঠেছে। অনেক সহ্য করেছে সে, আর নয়। আপোষ করে ওই শয়তানের সঙ্গে আর বাস করবেনা সে।

—যেখানে খাটবি সেইখানে থাকগে। ইথানে কেন ?

—কি বললি ?

—ঠিকই বলেছি। সবাইকে শোনাব তোর কথা।

…চুপ করে গেল কারিগর। মিষ্টি ভিতরে গিয়ে খিল বন্ধ করে দেয়।

…দাওয়াতেই পড়ে থাকে কারিগর।

সারাটা দিন কাযের পর আজ সন্ধ্যাবেলায় একটু আসর জমেছিল কলবাড়ীতে। ভুবনও এসে পাকাপাকি আস্তানা বেঁধেছে ওখানে। বৌটাকেও দেখেছে—কেমন নধর পুরুষ্টু মেয়েটা।

…গোকুল এনেছিল ভাল দিশী চোলাই মদ।

…হুল্লোড় জমেছে রাতদুপুর অবধি।

…বাড়ী এসে এই ঝামেলা। কেমন সব কথাগুলো শুনে নেশা ছুটে যায় তার। আজ মিষ্টি রাগে ফেটে পড়েছে।…সব খবরই জানে সে।

…জানে তার আগেকার পরিচয়, তাই ওকে নিয়েই

এসেছিল এই অন্ধকার পল্লীর মাঝে—তাকে ভুলিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল।

…কিন্তু সব কোনদিকে ছারখার হয়ে গেল।

কলের নেশা আছে—নেশা আছে সেই মত্ত লৌহ-দানবের। একবার যে তার পাকে পড়েছে তার আর রেহাই নেই।

সব রস নিংড়ে বের করে নেবে—দেহমনের সব রস।

…তাই সেই জীবনকে ভুলতে পারেনি শ্যামনগর মোল্ডিং মিলের পুরোনো কারিগর। পারার বিষের মত সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে।

‥ রাত হয়ে আসে।

…দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছে মধ্য-আকাশের নীলাভ তারাটা।

উঠে বসেছে কারিগর। মাথার মধ্যে এমনি একটা যন্ত্রণা!

…সেই বীভৎস ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে! মেজে ভরে উঠেছে রক্তে! ছটফট করছে বৌটা দুঃসহ যন্ত্রণায়।

…হাতের সেই কাঠখানা ফেলে দিয়ে নিমেষের মধ্যে বের হয়ে পড়ে কারিগর—অতীতের সেই ছবিটা আজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে!…আতঙ্ক আর ভয়ে কেমন শিউরে ওঠে।

…জানে!…ওরা জানে—মিষ্টি জানে তার অতীতের সেই কলঙ্কময় ইতিহাস—ফেরারী খুনের আসামী সে।

…সব তার হারিয়ে গেল—মাঝখানের এই ক'বছরের দিনগুলো, শান্তি আর নিশ্চিন্ততার দিন।…

পালাবে!…

পালাবে এখান থেকে। আবার হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে - যেথান কেউ আর খুঁজে পাবে না তাকে।

…পূব আকাশে দুর্গাপুরে ব্লাষ্টফার্নেসের আলোটা দীপ্তশিখায় জ্বলছে।…

পা পা করে উঠে এল কারিগর দরজার কাছে!… পিছনে ফিরেও চাইল না। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে জনহীন পথে নামল রাতের অন্ধকারে। চলেছে সে—জোরে পা চালিয়ে আঁধারে হারিয়ে গেল নিঃশেষে।

বাজপড়া তালগাছের মত মুষড়ে পড়েছে অতুলকামার। ভুবন চলে গেছে—ভুবনের জন্য নয়, বুকের একখানা পাঁজরা গেছে ওই কদমবৌয়ের সঙ্গে সঙ্গে। এ বাড়ীর লক্ষ্মীশ্রী যেন মুছে গেছে।

…চুপ করে বসে থাকে অশোক। ওরা সকলেই।

ষষ্ঠীচরণ বলে ওঠে—পাম্নুদাস তো কারখানা জোর চালিয়েছে—ট্রাকে করে মাল চালান দিচ্ছে। ভুবনই উঠে পড়ে লেগেছে।

—চুপ দে! ওর কথা বলিস না ষষ্ঠে। চমকে ওঠে অতুল। বুড়ো বলে ওঠে—তোরা পারিস চালা। তবেই ইয়ার জবাব হবে।

বুড়ো কি ভাবছে। কথাটা কালীই পাড়ে।

—ছোটবাবু তুমি গ্রামপ্রধান হও।

অশোক জবাব দেয় - না। ওসব রাজনীতিতে আমাকে টেনো না কালী। যা করছি তাই নিয়েই থাকি। তোমরাই ব্যবস্থা করো।

অতুলও সায় দেয়—ঠিক বলেছেন ছোটবাবু। ওসব দলবলে যাবেন নাই। বড় ভাল জিনিষ লয়। পাম্নু হেরেছে এই ঢের—তুরা যা পারিস কর।

শালের আগুনে গনগন করছে ঘরখানা। কেমন ভাবসা গরম। ভাবনায় পড়েছে ওরা। কাজের লোক নাই—যা মাল তৈরী হচ্ছে তা ও সামান্য।

—দরও কম করেছে পাম্নু!

—করুক। ত্যানাপরে থাকিস—একবেলা খেয়ে। দিনকতক টিঁকে থাকতে পারবি নাই?

অতুলকামার ছেলেছোকরাদের দিকে চেয়ে থাকে। ছানি পড়ে আসছে। ঘোলাটে চোখের সামনে কেমন অন্ধকার নামে। ওদের চোখেমুখে দেখেছে অতৃপ্তির ছায়া—দুঃখকষ্টভোগ করে নিজের মঙ্গলের জন্যও টিকবার ক্ষমতা—জোর ওদের যেন নেই।

গদাকামার কি ভাবছে। পাড়ার পদাই, বসন্ত, খেতন সবাই কারখানায় চাকরী নিয়েছে। আর বাকী তারা যেন জীবনে কিছুরই স্বাদ পেল না।

অশোকও মনে মনে কেমন হতাশ হয়।

পাম্নুদাস সত্যিই এদের মূলে আঘাত হেনেছে, পাম্নু দাস নয়—এই যুগ, পাম্নু একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

…হঠাৎ জীবনকে আসতে দেখে দাঁড়ায় অশোক।

—কি ব্যাপার।

…জীবন পকেট থেকে ফর্মটা বের করে—দুর্গাপুরে চাকরীর ব্যাপারে গ্রামপ্রধানের একটা সই লাগবে।

—কালী!

অশোকের ডাকে এমোকালী শাল থেকে কয়লামাখা অবস্থাতেই উঠে আসে। বলে ওঠে অশোক।

—একটা সই করে দাও।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কালী, তার সই ওই ছাপান কাগজে চাই, দুর্গাপুর কারখানার কর্তারা তবেই চাকরী দেবে! রীতিমত অবাক হয়ে গেছে সে। একটু সামনে নিয়ে হাতের কালিঝুলি পরণের ট্যানায় মুছে সই করে কম্পিত হাতে।

জীবন কাগজখানা নিয়ে বের হয়ে গেল।

কি ভাবছে অশোক।

তারকবাবুর ছেলে! পচিশবছরের প্রেসিডেন্ট দুর্দান্ত সেই জমিদার। তারই ছেলে আজ কারখানায় যাচ্ছে সেমিস্কিলড লেবার হয়ে; তার সার্টিফিকেট সই করছে অখ্যাত অজ্ঞাত একটি মানুষ—পরগাছা কালীকান্ত কর্মকার।

…কি এক নীরব স্বীকৃতির মর্য্যাদা দিয়েছে এ যুগ—সাধারণ মানুষকে। ওরা হয়তো আজও তার মূল্য বুঝতে পারেনি, বুঝতে পারেনি সে দায়িত্বের কথা।

—ছোটবাবু!

অশোক কালীর দিকে চাইল।

কালী বলে ওঠে—ব্যাপারটা ঠিক বোঝলাম না ছুটবাবু!

—চাকা ঘুরছে কালী। তোমাদেরও বদলাতে হবে, ওই স্বীকৃতির যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

অতুল কর্মকার উঠে আসে। বুড়ো লাঠিখানায় ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে।

…বলে ওঠে—তাই তোমান উদিকে ছুটবাবু। শালারা এখনও পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখলনা, মাথা নীচু করে পা চাটবার জন্যে দৌড়চ্ছে। একশালা আগেই গেছে সেই জাহান্নামে—সঙ্গে ঘরের লক্ষীকেও—

কেঁদে ফেলে বুড়ো। কান্নায় ওর গলার স্বর বুজে আসে।

প্রথম চেতনার যুগ। জড় অসাড় পদার্থে প্রথম সাড়া আসছে। তার কঠিনদেহের অনুপরমাণু কাঁপছে কি এক প্রচণ্ড আলোড়নে। সইতে পারলে তাতে সাড়া বের হবে, সচেতন হয়ে উঠবে সেই সুপ্ত হারানো প্রাণ।

…তাই সব যার তা সইবার ক্ষমতা নেই সেই প্রচণ্ড আলোড়নের ধাক্কায় সে চুরমার হয়ে যাবে। খান খান হয়ে খসে পড়বে, কিছু খসে পড়ার পরও বাকী যারা থাকবে তারা প্রাণময় হয়ে উঠবে—দেখবে বহু বাধার পর নোতুন দিনের আলো ভরা পৃথিবীকে দুচোখ মেলে।

তাই খসছে ভাঙ্গছে চারিদিক। নোতুনকে গড়ে তোলার সাধনায়।

ফাঁকা পথদিয়ে আসছে অশোক।

ছাহুদাসের দোকানের পাশে ওদের আড্ডা তখনও ভাঙ্গেনি।

দুপুরের রোদ চড় চড়ে হয়ে উঠেছে, আমগাছের বোল গেছে শুকিয়ে, গুটি ধরেছে। তালফুলের কাঁদিতে সবে গোল দানা পাকাচ্ছে।

…অবনী, ফনী মুখুয্যে, মণি দত্ত আরও অনেকেই বসেছিল। ক'দিন ধরেই জল্পনা কল্পনা করছে, কোন পথ পায় নি।

ডেকে ডেকেও মজুর মুনিষ মাহিন্দার মেলেনি। জমি বেবাক পড়ে আছে তাদের আরও অনেকেরই।

—কি হবে এবার ছোটবাবু!

—জমি যে ফাটলে যাবে। এইবার বয়সও নেই যে কারখানায় কায দেবে। আর গাঁয়ের মুনিষ জনও তো কারখানায়, বলে, দেড় টাকা রোজ—বাঁধা ভিটা, কে যাবে কিনা রোদে জলে গরুর পিছনে লাঙ্গল ঠেলতে।

মণি দত্ত বলে ওঠে—শালোদের মেজাজ যেন তাতা তাওয়া, হাত দেবেন তো ছ্যাঁক। উদেরই দিন এসেছে।

চুপ করে থাকে অশোক। দেখেছে সকাল বেলায় ঠিকাদারের ট্রাক আসে রাস্তার ধারে, বাউরীপাড়া—লোহার পাড়া থেকে অনেকেই যায়, প্যান্ট জামাও পরে, কেউ কেউ বা জুতোও কিনেছে। মুখে সিগ্রেট।

…দলে দলে বিভিন্ন গ্রাম থেকে গিয়ে ট্রাকে ওঠে—ফেরে সেই রাত্রে। ওদের অনেকেরই পা টলে। মুখে মদের গন্ধ—খিস্তী আর হিন্দী গান।

মদ আগেও খেত।

তবে ধেনো খাত্ত এবং পানীয় দুটোই হ'ত। এখন খায় বোরা ব্লাডার ভর্তি কারবাইডের তৈরী বিষাক্ত পানীয়।

...কি ভাবছে সে। দেখেছে—এক নিদারুণ বিপদের ছায়া সামগ্রিকভাবে ঘনিয়ে আসছে কৃষিনির্ভর এই জীবনে। একখানা গ্রামে নয়, আশপাশের সমস্ত গ্রামেই।

—কিছু একটাতো করতে হবে ছোটবাবু!

রুক্ষ ধূ ধূ মাঠে নীল ছায়া মেলা রোদ কাঁপছে। লিলি রোদ। লাল মাটির শেষে গেরুয়াডাঙ্গায় সেই অসীম শূণ্যতা। মাঝে মাঝে ওঠে রোদতাতা প্রান্তরে ছোট্ট ঘূর্ণি ঝড়।

দুরন্ত কাল বৈশাখীর ইসারা আনে।

ষোল চাষে পান।
আট চাষে ধান।
তার অর্দ্ধেক মুলো
বিনি চাষে তুলো॥

ধরণী ভট্টচায কথাটা বলে ওঠে—এবার তুলোর চাষই করবো ভাবছি। অবনী গম্ভীরভাবে জবাব দেয়—সেই সঙ্গে কিছু চিটে গুড়ও কিনে রেখ, গাময় মাখলে মানাবে ভালো।

—ওইটাই বাকী আছে কাকা। মণি দত্ত জবাব দেয়।

...নীলাম্বরবাবু চুপ করে থাকেন। এ ভাবনা তিনিও ভাবছেন। তার জমিজায়গারও হাল একরকম। নিতে বাউরী আছে—ঠিকে আরও কয়েকজন বাউরী পাড়ায় লোহার পাড়ায়।

কিন্তু তারাও কবে থাকে কবে যায় গোছের অবস্থায় রয়েছে। বাকী দুচার জন আছে পাকা ফলের মত—ঝুলছে শূন্য বোটার ডগায়। করে খসে পড়ে জীবন বৃক্ষ হতে। তাদের দিয়ে কায হবেনা। সোমত্থ যোয়ানগুলো পালিয়েছে—তাদের ছেঁড়া কাঁথার মত পথের একপাশে ফেলে রেখে। বাতাসে রোদে জলে ক্ষয়ে একদিন আপনা হতেই মাটিতে মিশিয়ে যাবে।

নীলাম্বরবাবু বলে ওঠেন—একটা পথ তো ভাবা দরকার।

অশোক বলে ওঠে—ভেবেছি, কিন্তু রাজী হবার মত অবস্থায় না এলে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়; নোতুন কিছুকে মেনে নেবার আগে মনের প্রস্তুতিও দরকার।

—সেকি এখনও বাকী আছে অশোক?

অবনী মুখুয্যের কথায় হাসে অশোক।

—আছে মামাবাবু।

—কে জানে বাবা। এর পরও বদ্মাতে আর কি আছে।

কথা বলেনা অশোক। ওদের দিকে চেয়ে থাকে। বলে ওঠে—জমিগুলোতে চাষ করতে গেলে যৌথ কিছু করা দরকার। কমিটি করুন, তাদের হাতে তুলে দেন ওই জমি। আপনিও তার অংশীদার হবেন। সব জমি এককরে চাষ করলে—কম লোকে হবে, দরকার হয় ট্রাক্টর পাওয়া যাবে।

ধরণী মুখুয্যে আঁৎকে ওঠে। জমির দখল ছেড়ে দিতে হবে। তারপর ধর আমার তো সব সোল—একেবারে যাকে বলে আকালপোষা জমি। জল ঝর্ণা ধরে, তার সঙ্গে ডাঙ্গা ডাংগি চটান কিনা এক হ'ল? হ্যাঁরে।

ছানুদাসও দাঁড়িয়েছিল। কথাটা শুনে বলে ওঠে—তাইতো দেখছি খুড়ো। মুড়ি মুড়কী একদর।

—কথাটা একটু ভাবতে হবে বাবা। অবনী এক কথায় যেন এ প্রসঙ্গ থেকে সরে যেতে পারলে বাঁচে।

চুপকরে থাকে অশোক। ওরা ক্রমশঃ উঠে চলে গেল ভিতরের দিকে।

হাসছে অশোক—দেখলেন তো। মরবে তবু সোজা হবেনা।

নীলাম্বরবাবু সায় দেন—তাই দেখছি। কথাটা খারাপ বলনি অশোক—ওরা রাজী না হোক আজ—একদিন হতেই হবে বোধ হয়।

...চলে আসছে হঠাৎ অশোক মণি দত্তের কথাতে ফিরে চাইল।

—একটু কথা ছিল ছোটবাবু। ওই যে বল্লেন যৌথ ব্যাপারটা—

—বৈকালে এসো। কথা হবে।

—তাই যাবো। মণিদত্ত গম্ভীরভাবে ভাবছে কথাটা। জায়গাটা শূন্য হয়ে গেছে, কেউ নেই। পিছন

ফিরে দেখে অশোক চুপিসারে বের হয়ে আসছে অবনী-ধরণী আরও কয়েকজন। পিছনে আসছে ছান্নু। ওরা দোকানের বাইরের চত্বরে এসে দাঁড়িয়েছে।

…দাঁড়াল।

ছান্নু বলে ওঠে—এ আবার এক চাল অবনী খুড়ো।

ধরণী বিজ্ঞের মত টাকে হাত বোলাতে বোলাতে বলে —তাই দেখছি। এদ্দিন ছিল মুরুক্ষু ঠগ—এরা লেখাপড়া জানা ডাকাত। সব তো গেছে, বাকী আছে বিঘে কতক জমি, বুকের মাড়ি। তাও আবার ছেড়ে দিতে হবে! বেশ কথা বাবা।

অবনী বলে ওঠে—অল রাবিশ। ব্লাডি ফুলস।

ধরণী বলে—কথাটা তারককে জানাতে হয় একবার।

অবনী জবাব দেয়—নো গুড। হি ইজ অলরেডি ডেড। বোবা মেরে গেছে গোপাল মন দুঃখে বুঝলে।

ছান্নু তখনও হাসছে। কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিতে চায় সে। কারবারের যৌথ বোঝে; যে বাগে পাবে অপরকে ঠগাবে। কিন্তু চাষে যৌথ—এ সোনার পাথর বাটি। বিশ্বাসই করতে পারে না।

অবনী ধরণী আরও দুচারজন কি ভাবছে হঠাৎ একটা গাড়ী ধুলো উড়িয়ে আসতে দেখে ওরা চেয়ে থাকে।

…পাকা রাস্তা থেকে পথটা কোনরকমে এসেছে গ্রাম অবধি। রিলিফের রাস্তা। কোনরকমে কিছু লোককে কাষ দেবার জন্যই মাটি কেটে রাস্তার মত একটু জায়গায় ফেলে গেছে। কাঁকুরে মাটি। আপনা হতেই বসে গিয়ে একটু রাস্তার মত হয়েছিল এতদিন।

…গাড়ীখানা এগিয়ে আসছে—একটা প্রাইভেট গাড়ী।

…সতীশ ভট্‌চায আরও দুজন মাড়োয়ারী বসে রয়েছে। বিশাল দেহ বেশ হৃষ্টপুষ্ট। গাড়ীখানা থেকে সতীশ ভটচায একবার হাত নেড়ে কি বলে যায় ওদের। সরু পথ ধরে গাড়ীখানা চলেছে এগিয়ে।

সতীশ ভটচাযের কথা মিথ্যা নয়। শিষ্যবর্গ—এবং জোতিষের খদ্দেরও জুটেছে, বেশ শাঁসালো খদ্দের।

তারাই বাড়ী করে দিচ্ছে সেই সঙ্গে কিনেছে কিছু ধান জমিও।…তারকবাবুই বিক্রী করেছে। আরও কিছু কিনবে।

…ধুলো উড়ছে—পেট্রলের পোড়া গন্ধমেশা ধুলো—ফণীবাবু গজগজ করে।

—ব্লাডি।

তাদের নাকের উপর দিয়ে চালকলা বাঁধা বামুন আজ গাড়ী হাকিয়ে যায়। দিন এমনি বদলে গেছে।

নিতে বাউরী বাউরীপাড়ার বটতলায় বসে দড়ি পাকাচ্ছে।…সেই সঙ্গে ছেলেটা বাখারী চাঁচছে। আরও ক'জন বসে আছে।

শূন্যপ্রায় পাড়াটা। ঘরগুলো অধিকাংশই ফাঁকা। চালাগুলো বেওয়ারিশ অবস্থায় পড়ে আছে, ধ্বসে পড়ছে মাটি—জীর্ণ খড়।

কালো বাউরী—বিষ্টু, পটু আরও ক'জন কি ভাবছে।

—ভাবছি আমরাও যাবো রে নিতে। রিলিফও নাই—চাষবাসও নাই কি না। নিতাই বাউরী মুখ তুলে চাইল ওর দিকে।

…কিই বা বলবে সে। তার অবস্থাও তেমনি। একা চাষ করা যাবে না; বাপবেটায় দুপাঁচ বিঘে জমি গ্রামের মধ্যে চাষ করেও ধান বাঁচাতে পারবে না; ধান ফাঁকার ফসল নয়, মঠের ফসল—আশপাশের টানে ওর বাড়ন বাঁচন, ফলন ফসল।

পটু বলে ওঠে, কি রে, চুপ মেরে রইলি কি। তবু ভরসা হারাতে পারে না নিতে—সব্বাই শলা করছিল, ছোটবাবুও কি বলছিল। দেখনা দুএকটা দিন। তারপর যিথানে যাস যাবি, কে মানা করছে।

…হাসে বিষ্টু—বড্ড মায়া তুর ই মাটিতে লয় নিতে!

নিতে কথা বলে না, চেয়ে থাকে ওর দিকে।

সত্যিই বলে মনে হয় কথাটা। এ মাটির কি এক টান আছে। নামালে খাটতে গেছে দু একবার, দামোদর পেরিয়ে দল বেঁধে গেছে। পিছনে হারিয়ে গেল তাদের গাঁ—মোলবাগান। মনটা ফাঁকা হয়ে যেত। শর-বন আর তালবনার পাতা কাঁপা বাতাসের সুর মনে কান্না আনে। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে বিরাট পৃথিবীতে।

আবার ফিরে আসবার সময় দূর আকাশ কোল থেকে গ্রামসীমা দেখে দৌড়ে আসত, বাতাসে কান পেতে শুনতো তালবনের সুর—বনের সবুজ আর পাখীর ডাক। ওই বৃদ্ধ বটতলায় এসে বাঁক নামিয়ে পেন্নাম করত নিতে। বলত

—পেন্নাম কর বউ। ঘরকে ফিরে এলম। বাপুতি সাত-পুরুষের ভিটে। বৃদ্ধ বটগাছ বাপের তুল্যি।

…এ মাটিতে এতকাল কাটিয়েছে, অন্ন জুগিয়েছে এ মাটি। আজ কি এমন পাপ করেছে সে যে হন্যে হয়ে বেরুতে হবে ভিখারীর মত এক মুঠো ভাতের আশায়।

…অবনী, ধরণী মুখুয্যে আরও কয়েকজনকে আসতে দেখে একটু অবাক হয় ওরা। এদিকে বড় একটা ওরা আসতো না উনি। এরাই যেত ধন্না দিতে। আজ তাই ওদের দেখে একটু অবাক হয়।

—আসুন, ঠাকুর মশায়। তা—নিতে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানায়।

অবনী বলে ওঠে—একবার তোরা আসবি সন্ধ্যাবেলায় বড়বাবুর ওখানে।

—আজ্ঞে! পটু কথাটা বলতে গিয়েও পারে না।

—আসবি, কাযের কথা আছে। গাঁয়ে আছিস—তোদেরও পুষতে হবে ত। কায কাম দিতে হবে। সেই কথাই কইবো। আসিস।

ওঁরা চলে গেল। বিষ্টু বলে ওঠে—কথাটা কেমন লাগছে। যেচে এসে নেমতন্ন।

পটু ধমক দেয়—তুর সবতাতেই ওই। চল তো দেখি কি বলে। কেমন আশার সুর জাগে ওদের মনের অতলে।

হাসছে অবনী, ছান্নু দাস একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিল, ওরা ফিরে যেতেই বের হয়ে আসে।

—আসবে বল্লে?

জবাব দেয় ফণীবাবু—না এসে যাবে কোথায়?

ছান্নু মন্ত্র দেয়—সব কটাকেই কিছু কিছু ধান টাকা দিয়ে বেঁধে ফেলান খুড়ো, যেন একজন মুনিষ ও না পায়। ওসব ভক্কিবাজী এখানে চলতে দেবেন না। যৌথ চাষ!

—তারকবাবুকে কথাটা জানানো দরকার। তুইও চল ছান্নু—

ছান্নু জবাব দেয়—আমাকে এর মধ্যে টানবেন না, আমি তো রইলামই আপনাদের দলে। কথাটা তারক-বাবুর সামনে ওদের বলুন—ফেলতে পারবে না ওরা। ওদেরও তো কায চাই।

বৈকালের পড়ন্ত রোদের আভায় শূন্য মাঠ—আলভাঙ্গা রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। পাখী ডাকছে। দীঘির কোণে কালো জল সীমার ধারে সবুজের নিশানা। বাইরের বকুল-গাছের কালো পুঞ্জীভূত ডালে রক্ত লাল ছোপ, বকুল গন্ধে উদাস অপরাহ্ণ বেলা আমন্থর হয়ে উঠেছে।

অশোক খানিকটা ভেবে-চিন্তে তৈরী হয়েছে।

নীলম্বরবাবু—মণিদত্ত—বুড়ো অতুল কামার—কালী—ষষ্ঠীচরণ আরও অনেকেই এসেছে। ওরাও কথাগুলো শোনে মন দিয়ে। কি যেন আশার কথা!

…পরিষ্কার হিসাব কষে দেখায় অশোক। সারা গ্রামে ধর পাঁচশো বিঘে ধান জমি আছে; তাতে চাষ করতে লাগে পঁচিশ যোড়া বলদ, পঞ্চাশজন মুনিষ আর দুজন সরকারই যথেষ্ট। আর যদি একটা ছোট্ট ট্রাক্টর হয়—নিজেদের জমি চাষ তো হবেই, ভাড়া খাটানো যাবে; তাতেই খরচ উঠে যাবে। এই বলদ মুনিষ—সরকার রেখে চাষ করে যা উৎপন্ন হবে তাতে দাম মিটিয়ে মালিকদের যা থাকবে ভাগ চাষের থেকে তা কোন অংশে কম নয়।

আর এখন কি হচ্ছে—এতকাল।

কালী হিসাব করে বলে ওঠে—তা আজ্ঞে ঘর ঘর মরুক্কে বাছুর ছাড়া প্রায় যোড়া পঞ্চাশ ষাট মিলবে, মুনিষ কামিন লিয়েও ধরুন লাগে শ দেড়েক দুয়েক আর সরকার তো ঘর ঘর—তা দশ বিঘের চাষই হোক আর বিশ বিঘের চাষ হাল ফালই হোক। আর তার খরচও তেমনি বেশী পড়ে গড়পড়তা।

অশোক বলে ওঠে—এদ্দিন সকলেই বেকার ছিল—ওভাবে তাই চলেছে। এখন লোকে কায পাচ্ছে—একশোই হোক আর আশি টাকাই হোক এর চেয়ে বেশী মাইনে; তাই চলে যাচ্ছে গ্রাম ছেড়ে, এখন কি আর সেভাবে চলবে?

অতুল কামারও ভেবেছে কথাটা; সেও দেখেছে তার পাড়ার লোকদের এতে পোষাবে না; সামান্য জমি, হাল-ফাল করে সবাই লোকসানই দিয়েছে।

মাথা নাড়ে সে—না ছোটবাবু। জমি আর রাখতে পারবো না।—তাই বলছি এমনিতেই জমি ছেড়ে দেবে যদি, দু এক বছর এই ভাবে যৌথ করে দেখ।

—হিসাবে তো সাবই মনে হচ্ছে ছোটবাবু।

—দেখতেও সাফ হবে বষ্ঠীচরণ।

—তার ওই যে কলের ন'ঙল বললেন—

কালীর কথায় হাসে অশোক—একটু এগোলেই হবে, একটা পাম্পও আনতে হবে।

—পাম্প!

—জল সেচ হবে।

—ও! দেখেছি বটে দামোদরে বাঁধ হবার সময়। ভক্ ভক্ জল উঠছে, তেমনি!

—হ্যাঁ।

—অতুল ওর দিকে চেয়ে থাকে ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি মেলে।

অশোক বলে ওঠে—কিন্তু পরস্পরকে বিশ্বাস করতে হবে আগে। নাহলে এটা দাঁড়াতে পারবেনা।

বুড়া অতুল বলে ওঠে—বিশ্বাস! এ যুগে বিশ্বাস কাকে কি করবে ছোটবাবু! তবু দেখেছি দামোদরের বানে ডোবা একই গাছ সাপ আর মানুষ একসঙ্গে বাস করেছে। কেউ কাউকে ছোবল মারেনি।

নীলাম্বরবাবু বলেন—সেইটাই জীবনের ধর্ম অতুল। তেমনি বিপদের দিনে আজ আমরাও হয়তো শুধু বেঁচে থাকার দরকারেই আপাততঃ ওটি ভুলবো।

কালী তাগাদা দেয়—তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েত ডেকে জানিয়ে দিই কারা জমি দেবে—কারা দেবেনা। তেমনি কায সুরু করবো।

—আর আমরা! আমরা কি হিসেবের বাইরেই থাকবো ছুটবাবু।

নিতে বাউরী বসেছিল এককোণে, সঙ্গে বাউরী লোহার পাড়ার আরও দুচার জন।...মন দিয়ে শুনছিল কথাগুলো।

মাটির সঙ্গে আজন্ম সম্বন্ধ তাদের, এ কথায় তারা সার বুঝেছে। তাই উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।

অশোক বলে—তোদের তো আগেই চাই নিতাই। বাউরী পাড়ার লোহার পাড়ার যে কজন কায করতে চায় কালই খবর দে। হপ্তাহে মাইনে পাবি—আর ধান পোতার সময়—কাটার সময় দেড়া মাইনে।

...অশোকও যেন ডুবে যায় কাযের নেশায়। আবার সেই নেশায় পেয়ে বসে তাকে।... যে নেশায় মত্ত হয়ে গড়েছে স্কুল, গার্লস স্কুল, ডাক্তারখানা। সেই নেশায় আর দুর্বার শক্তি নিয়ে যেতে উঠেছে গ্রামের এই সমস্যার সমাধান করতে।

...বেশ পড়াশোনাও সুরু করেছে, দেশ বিদেশের কো-অপারেটিভ ফার্মিংএর কথা, তাদের সমস্যা—তার সমাধান। কতখানি সাহায্য সহযোগিতা কোথা থেকে কি ভাবে আসবে তাও ছক নিয়ে কর্মসূচী করে তুলেছে।

এ নিয়ে অনেকদিন হতে পড়াশোনা—কায-কর্ম সুরু করেছে। সদরেও যোগাযোগ করেছে; কিন্তু কথাটা পাড়েনি নিজে থেকে। ওদের দিক থেকে সমস্যাটা বড় হয়ে উঠলে তখনই কথা বলার সুযোগ হবে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে কাগজগুলো দেখছে অশোক—হঠাৎ কাকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইল। অবাক হয়ে যায়—আপনি!

...শিখা এসেছে। শিখা সহজ ভাবেই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে।—কি এত কায করেন জানিনা, বৈকালে শুনলাম রীতিমত মিটিং করছেন।

—হ্যাঁ। একটু ব্যস্ত ছিলাম। কালই একবার সদরে যেতে হবে। একটা বড় কাযে হাত দিয়েছি।

হাসে শিখা—তা বিরুদ্ধ দলের তোড়জোড় দেখেই বুঝলাম।

—মানে!

—ওই অবনীবাবু টাঁকপড়া এক ভদ্রলোক আরও কারা বেশ উৎসাহের সঙ্গে মুণ্ডপাত করছিলেন শুনলাম।

হাসে অশোক—তাই নাকি!

—হ্যাঁ তারকবাবুর বাড়ীতে ওরা ছিলেন। মণিমালা আমার পরিচিত তাই দেখা করতে গিইছিলাম। বেচারা!

অশোক চুপ করে থাকে, কি ভাবছে। শিখাই বলে ওঠে।—আপনি কিন্তু একটুও বদলাননি, আগেকার মতই তেমনি গোঁয়ার—একগুঁয়ে রয়ে গেছেন।

অশোক প্রশ্ন করে—মণিমালাকে দেখে খানিকটা বুঝেছেন আজকের পরিবর্তনটা।

—চুপ করে থাকে শিখা। কি ভাবছে সে। জবাব দেয়।—হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি।

—সেই বদলের প্রবল স্রোতের মাঝে দাঁড়িয়ে—

সামগ্রিকভাবে বাঁচবার চেষ্টা করছি শিখা; একা নয়—সবাইকে নিয়ে। আজও ওরা এ মতে বিশ্বাস করে না তাই নিন্দা করে, করবেও। হয়তো চরম আঘাত হানবে—

—তবুও থামবেন না? শিখা প্রশ্ন করে।

—হেরে যাবো কিনা জানিনা; মনে হয় জিতবোই। ওরা এই দারুণ বিপদের কথা স্মরণ করেনি। এখনও বিশ্বাস করে ফাঁকি দিয়ে বাঁচতে পারবে, কিন্তু এ ভুল যেদিন ভাঙ্গবে সেদিন বানে ডোবা গাছে সাপের হিংসা ভুলে সেও বাঁচবার চেষ্টাই করবে। আমাদের হাতে হাত মেলাতে বাধ্য হবে।

চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থাকে শিখা। কালো ডাগর চোখে কি যেন মায়া। একটা কঠিন শপথে যেন অশোকের দুচোখ জ্বলছে।

শিখার মনে তারই উত্তাপ। বলে ওঠে—মনে হয় এখানে এসে ভালোই করেছি।

—কেন?

—একটা যুগের নিদারুণ ব্যর্থতার যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করেছি এই ধ্বসেপড়া গ্রামের বুকে। প্রথমে দেখেছিলাম সবুজ হলুদ বন আর লাল গেরুয়া ডাঙ্গার বুকে হুমড়ি খাওয়া একটা গ্রাম। তার মানুষগুলোকে। কিন্তু তাদের এত সমস্যা—এত জ্বালা তলিয়ে দেখিনি!

শিখা বলে চলেছে।

হাসে অশোক, মলিন ক্লিষ্ট হাসি। বলে ওঠে—সব গ্রামের—সব ঘরের—প্রতিটি মানুষের বুকে আজ এমনি জ্বালা শিখা; কেউ বুঝেছে—কেউ বুঝতে চায়নি। কিছু লোকও এ জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়, বাঁচতে চায় নোতুন করে। দেখছ!

[ক্রমশঃ

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল স্মরণে

শ্রীগোপালদাস কাব্যভারতী

সুরের পূজারী কবি হে দ্বিজেন্দ্রলাল,
বঙ্গ সাহিত্যের তুমি উজ্জ্বল মশাল।
সারস্বত জগতে তুমি দুর্লভ শিখা,
ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বর্ণোজ্জ্বল লিখা।
স্বদেশী সংগীতে তব বাঙালীর প্রাণ,
স্বাদেশিকতার সুরে ডেকেছিল বান।
তোমার পূজার মন্ত্র হয়নি নিষ্ফল,
ভারতীর আশীর্ব্বাদে হয়েছে সফল।

তোমার অনুপম কাব্য "আর্য্যগাথায়"
হৃদয় ধর্ম্মের সুর আজো শোনা যায়।
বঙ্গের গৌরব শিখা হে ভাস্বর কবি,
অনন্ত মহিমাময় তব স্মৃতি ছবি।
অন্তরে জাগ্রত চির জ্যোতির্ম্ময় প্রাণ,
তোমার আশীষে হোক দেশের কল্যাণ।
অমৃত অমর কবি হে স্বদেশ প্রাণ,
শতাব্দীর শঙ্খে বাজে তব জয় গান।

তব শতবার্ষিকীতে একান্ত প্রার্থনা।
সিদ্ধ হোক বাঙালীর হৃদয় বাসনা।

কুমায়ুঁর কৌশানী

আভা পাকড়াশী

আজ আকাশটা বেশ পরিষ্কার। তাই রাণীক্ষেতে আমাদের হিমালয় হোটেলের পেছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইনাকুলারে দেখছি ত্রিশূল, নন্দাদেবী, নন্দাকোঠ। বেশ পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছিল সেই বরফাচ্ছাদিত চূড়গুলি। রাণীক্ষেতের এইটেই প্রধান আকর্ষণ এই আড়াইশো মাইলব্যাপি স্নো রেঞ্জ। দত্তসাহেব সেদিন এই বাইনাকুলারটি দিয়াছিলেন। আমরা বলেছিলাম আমরা একদিন একটি ভাল করে দেখেই ফিরিয়ে দেব আপনার দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি। কদিন আকাশ মেঘে ঢাকা থাকায় আর দেখার সৌভাগ্য হয়নি, আজ দেখলাম। কি যে অপূর্ব্ব দৃশ্য। সকালের সোনালী রোদ পড়েছে বরফে ঢাকা ত্রিশূলে। রামধনু রং ধরেছে চূড়াগুলি। আমরা চারজনে কাড়াকাড়ি করে বাইনাকুলার দিয়ে দেখছি। কেননা একবার রোদ সরে গেলেই আর এই অপরূপ রূপ থাকবেনা। ঢাকা পড়ে যাবে মেঘের আড়ালে।

বাইনাকুলারটি খুবই দামী। তাই আমার স্বামী চাইলেন সেদিনই ওটি ফিরিয়ে দিতে। আপারম্যালে থাকেন দত্তসাহেব। বাইনাকুলারটি ওঁরই "অ্যাডায়ার দত্ত কোম্পানী"র তৈরী। এই শ্রীপ্রবোধ দত্তই তার মালিক ছিলেন। বহুকাল প্রতীচ্যে ছিলেন কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে প্রাচ্যের ডাক, দেশের হাতছানি এড়াতে পারেন নি। তাই নীরব নির্জন চীড়ের জঙ্গল ঘেরা, পাইনের পাতায় ঢাকা রাণীক্ষেতকে নিজের আবাসস্থল করে নিয়েছেন। আবার এই স্নো রেঞ্জের হাতছানি হয়তো তাঁকে ফেলে আসা প্রতীচ্যকে মনে পড়িয়ে দেয়।

ওঁর ওখানে পৌঁছে দেখি এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির এক্স-ভাইসচ্যান্সেলর অমিয় ব্যানার্জি অতিথি হয়ে এসেছেন। ওঁরা বাল্যবন্ধু। এর আগে এঁর এখানে দিল্লী ইউনিভারসিটির ইকনমিকসের চেয়ার-হোল্ডার ডাক্তার বি, এস গাঙ্গুলীর স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল। ইনি বার্ড ওয়াচার।

যাই হোক এখন শুনলাম এই ব্যানার্জি দম্পতি ওখান থেকে সোজা মোটরে কৌশানী যাচ্ছেন। আমরা বাইনাকুলারের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বরফঢাকা চূড়াগুলির যখন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলাম তখন ওঁরা তাই শুনে বললেন আপনারা যখন এত আগ্রহ নিয়ে স্নো দেখেছেন, আর দেখে এত আনন্দ পেয়েছেন তখন আপনারাও আমাদের সঙ্গে কৌশানী আসুন না। কৌশানী গেলে আপনার দুটো লাভ। একতো রাণীক্ষেত থেকে কৌশানী যাবার

কৌশানীর ক্ষেতের দৃশ্য ফটো: শঙ্কর

এই পঞ্চাশ মাইল রাস্তার অতি সুন্দর শোভা। এই পথেই আপনারা real কুমায়ুঁর beauty দেখতে পাবেন। আর তাছাড়া এই ত্রিশূল, নন্দা দেবী, নন্দা কোট এত কাছে চোখের ওপর দেখতে পাবেন যে মনে হবে বোধ হয় একটা লাফ দিলেই পৌঁছে যাবেন। বড় লোভ হল শুনে। ওরা গিয়ে ডাকবাংলায় উঠবেন। সেখানে নিশ্চয়ই আর

একখানা ঘর পাওয়া যাবে। অবশ্য নিজেদের রসদ সঙ্গে নিতে হবে। কৌশানী পাহাড়ের গণ্ডগ্রাম কিছুই পাওয়া যায়না সেখানে। পরশু ভোরে বেরুবেন ওরা। ওদের সঙ্গে আমরাও যাব,এক রকম কথা দিয়েই আমরা ফিরে এলাম।

কিন্তু হোটেলে ফিরেই জ্বরে পড়ল আমার ছোট ছেলে গোরা। যাওয়া হোলনা ওদের সঙ্গে। পরে আমরা রওনা দিলাম বাসে। ডিম, চাল, ডাল আলু, পেঁয়াজ মশলা সবই প্রায় সঙ্গে নিলাম। উপস্থিত আমাদের গন্তব্য স্থল হল কৌশানী ছাড়িয়ে বাগেশ্বর। প্রথমে উঁচুতে উঠে কৌশানী পৌছে আবার তাকে পথে ফেলে রেখে বাগেশ্বর গিয়ে সেখানে সরযূ আর গোমতীর সঙ্গম দেখে, আর মহাভারতের যুগের বাগেশ্বর শিবের মন্দির দর্শন করে আবার ওপরে উঠে কৌশানী।

সত্যিই চমৎকার শোভা এই পথের। সিঁড়ি সিঁড়ি করা ক্ষেত। মনে হয় প্রত্যেকটি সিঁড়িকে কেউ বিভিন্ন রঙ দিয়ে এঁকেছে। আসলে পাহাড়ীরা থাকে থাকে ফসল বুনেছে। বীট, গাজর, পিয়াজ, ধান, গম, আলু। তারই রঙ ফলেছে এক একটি থাকে! পাহাড়েরও শোভা অপূর্ব। কোনটি বা নীল কোনটি ধূসর দেখাচ্ছে। আসলে যে পাহাড়ে কোন গাছ পালা নেই সেই পাহাড় রং ধরেছে ধূসর। আর যেটিতে জঙ্গল ভরা সেটি রং ধরেছে নীল।

এসেছি লুএর দেশ থেকে। রাণীক্ষেতেও দুপুরে বেশ গরম লাগে মে মাসে। মনে হয় পাখা থাকলে খুলে দিলে ভালই লাগত। তাই যতই বাস ওপরে উঠছে ততই সুন্দর একটা ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে।

কোশী নদীর তীরে কৌশানী। কোশী উপত্যকা খুবই উর্বরা। সেচের অভাব নেই বলে ক্ষেত ভরে ফসল ফলেছে আর নয়নাভিরাম দৃশ্য ধরেছে। দেখতে দেখতে চলেছি। পৌছে গেলাম কৌশানী। বেশ ঠাণ্ডা এখানে। আবার বাস নীচে নামছে, চলেছি বাগেশ্বরের দিকে। পথে পড়ল গরুড়। এখানে মস্তবড় মন্দির আছে গরুড়ের। বাগেশ্বরে সরযূ আর গোমতী বয়ে চলেছে। বেশ বুঝতে পারছি দুটি স্রোতস্বতীর ধারা এক খাতে বইলেও নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। যেন দুটি ভগ্নী। তার একটি গৌরী অন্যটি শ্যামা। বড় সুন্দর শোভা। মন্দিরটির জীর্ণতাই তার বয়েসের প্রমাণ। গরমে বড় কষ্ট হচ্ছিল। সঙ্গের খাবার সেই গঙ্গাতীরে বসে খেতে গিয়ে মাছির তাড়নায় কোনরকমে গলাধঃকরণ করে তাড়াতাড়ো করে বাসে ফিরে এলাম। আমরা ড্রাইভারের সিটের সঙ্গে যে সিট ফাষ্ট ক্লাশ নামধারী লম্বা সিট দুটি আছে তারই যাত্রী। তারপর রেলিং দেওয়া। ওদিকে থার্ডক্লাশের। এতক্ষণ আমরা এই ফাষ্টক্লাশের একমাত্র অধিকারী ছিলাম। এখন ফিরে এসে দেখলাম একজন খদ্দরের সালোয়ার কামিজ পরা প্রৌঢ়া ইংরেজ মহিলা তাঁর বেশ সুদীর্ঘতন ঝোলাটি কোলে নিয়ে বসে আছেন। আসে পাশে আমাদের জিনিষপত্র ছড়ান থাকায় অমনি সঙ্কুচিত হয়ে বসেছেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর বসার জায়গার পরিসর একটু বাড়িয়ে দিই।

স্বদেশী পোষাক পরা বিদেশী মহিলা স্বভাবতঃই আমাদের মনে কৌতূহল জাগাল। প্রশ্নোত্তরে জানলাম ইনিই গান্ধীজীর অন্যতমা শিষ্যা সরলা বেন। বাপুজীর আদর্শ অনুসারে সর্বোদয় সঙ্ঘের পরিচালনায় কৌশানীতে তিনি একটি স্কুল করেছেন। আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর স্কুলটি পরিদর্শন করার জন্য। আমার স্বামী ওঁর সঙ্গে অনেক বিষয় আলোচনা করলেন। উনি কিন্তু অন্যসব বিষয়ে নিজের মতামত বিশেষ জাহির না করে শুধুই শুনে গেলেন। অবশ্য নিজের স্কুলের আদর্শবাদ সম্বন্ধে অনেক কথাই বললেন। এঁরই সহ-সঙ্গী ছিলেন মীরা বেন। গান্ধীজীর দেহরক্ষার পর তিনি স্বদেশে ফিরে যান। তাঁর লেখা নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী স্পিরিটস পিলগ্রিমেজ নামে ধারাবাহিক ভাবে ইলাষ্ট্রেটেড উইকলিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

এসে গেলাম কৌশানীতে। বাসষ্টাণ্ড থেকে ডাকবাংলো অনেকটা ওপরে। সরলাবেনও নামলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁরই একটি ছাত্রী। ভারী সুন্দরী এই পাহাড়ী মেয়েটি। নাম কান্তি। যাবার সময় আমাদের গন্তব্য পথের উল্টোদিকের একটা টিলা দেখিয়ে বললেন— এ দিকে আমার স্কুল। রাস্তাটা ভালনা। মানে বিপদের নয়, বিপথ আর কি। যাবেন নিশ্চয়ই। "মাতাজীকা আশ্রম" বললে যে কোন পাহাড়ী লোক দেখিয়ে দেবে।

সুন্দর ডাকবাংলোটি আমাদের। সামনে একটা গোল বারান্দা তারপর ঘর, পাশেই বাথরুম। একজন দারওয়ান আছে সে দুধের ব্যবস্থা করে দিল। চমৎকার দুধ। বাকি জিনিষ তো নিয়েই ফিরেছিলাম। সবই খরচ করছি সন্তর্পণে, ফুরিয়ে গেলে তো আর পাব না। বাসন পত্র, প্লেট চামচে বেশীর ভাগ এখানেই পেয়েছি।

ষ্টোভে রান্না করছি। নিজেই সব পরিষ্কার করছি। কিন্তু একটা বড় দুঃখ আকাশ সেই মেঘে ঢাকা। যে জন্যে এলাম সেই বরফে ঢাকা চূড়াগুলি দেখব বলে—তা আর হচ্ছে না। এদিকে মাত্র চারদিনের রসদ সঙ্গে এনেছি। জানি তার মধ্যে ফিরে যাব। দত্তসাহেব আমাদের এই সামনের ঘরটাই নিতে বলেছিলেন ভাগ্যক্রমে পেয়েও গেছি। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার না হলে সবই যে বৃথা যাবে। দারওয়ানের কাছে দুঃখপ্রকাশ করলেই সে বলত, "জলদি কিয়া আপলোক আভি আয় কে, সিতম্বর অক্তোবর মে 'সোনো' দিখাই দেতা। আভি সোনো ওনো কঁহা আব? মানে ভুল সময় এসেছ তোমরা, সেপ্টেম্বর অক্টোবর এলে স্নো দেখতে পেতে, এখন স্নো কোথায়? এই লোকটি এখান কারবহু পুরাণ কেয়ার-টেকার। নিজেই বলল, লেখক প্রবোধ সান্যাল এই-খানে বসেই "দেবতাত্মা হিমালয়" লিখেছিলেন। তার মধ্যে ওরও নাম আছে। চারদিকে চীড় আর দেব-দারুতে ঘেরা সুন্দর পরি-বেশে এই ডাকবাংলোটা। লাইট নেই। রাত্রে কেরো-সিনের সেজ দিয়ে যায়। ইনস্পেকসন বাংলোটা একটু নীচে। সেটিও চমৎকার।

চীড়ের শোভা ফটো: শঙ্কর

পরদিনই গেলাম সরলা বেনএর স্কুল দেখতে। নাম "লক্ষ্মী আশ্রম"। লক্ষ্মী আশ্রমের চতুর্দিকেই যেন লক্ষ্মীর কৃপা উছলে উঠছে। ওঁর নির্দেশে কান্তি, সেই বাসে দেখা কান্তিমতী মেয়েটি আমাদের সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল।

বেশীর ভাগ কাঠের আর মাটির দোতলা বাড়ী। তবে স্কুল বাড়ীটি পাকা। স্কুলে পৌছবার রাস্তাটি সত্যই বিপথ। নালা ডিঙিয়ে, টিলা পেরিয়ে উঠতে হয়। তবে একবার ওপরে উঠলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মেয়েদের হাতে তৈরী ক্ষেতের শ্যামলিমা টেনে নেয় মনকে। এখানে মেয়েরাই সব কাজ করে। এইসবই তাদের শিক্ষার মধ্যে পড়ে। বহুকাল আগে ছাত্রেরা যেমন গুরুগৃহে গিয়ে অধ্যয়ন করত। সেখানে সেই ঋষির আশ্রমে তারা গো-দোহন, কাষ্ঠসংগ্রহ, ফসল উৎপাদন, পুষ্পচয়নসবই করত, সঙ্গে সঙ্গে চলত তাদের অধ্যয়ন। সেদিক থেকে এই আশ্রমের নামটিও যথাযথ হয়েছে। সত্যিই যেন এই সরলাবেন কোন ঋষিমাতাই—আর এই মেয়েরা তাঁর অনুগতা শিষ্যা।

এখানে মাত্র কুড়ি টাকা করে দেয় মেয়েরা, তবে হরিজন মেয়েদের জন্য গভর্ণমেণ্ট থেকে সামান্য কিছু সাহায্য আসে। তিন বছর ধরে এদের সব শেখানো হয়। এর মধ্যে দুবছর ছাত্রীরা প্রবেশনার থাকে। তারপর তাদের পরীক্ষা করে দেখা হয়। এদের মধ্যে যারা স্থায়ী সদস্যা হবার যোগ্যা তাদের আরও শিক্ষা দেওয়া হয়। এই পরবর্তী ছাত্রীদের কাছ থেকে আর কোন ফিস্ নেওয়া হয় না। শুধুমাত্র এদের তেল সাবান আর হাত-খরচের জন্য পাঁচটি করে টাকা নেওয়া হয়। এই সবই কান্তির সঙ্গে চলতে চলতে শুনছিলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি বুঝি ঐ শেষোক্ত দলের? সহাস্তে উত্তর দেয়, হাঁ। আমি আর আমার দিদি দুজনেই এখন এখানে

আছি। পরে কোথায় যেতে হবে তা এখনো জানিনা। বহেনজী যা বলবেন তাই হবে। বহেনজী মানে সরলাবেন।

এরপর ওর সঙ্গে গেলাম রান্নাঘরে। দেখলাম মেয়েরা নিজেরাই রান্না করছে। রান্নার কাঠ এরাই কেটে আনে জঙ্গল থেকে। পুরনো কাপড়ের সুতো দিয়ে আসন বুনেছে মেয়েরা, সেই আসনে বসেছে ছোটরা। তাদের খাওয়াচ্ছে বড়রা। নয় দশ বছর বয়েস থেকে এই স্কুলে নেওয়া হয়। তারপর বয়েস আর যোগ্যতা অনুযায়ী এরা কাজের ভার পায়।

গোশালায় সুপুষ্ট গরুগুলি আলস্যসুখে জাবর কাটছে। মেয়েরা এদের পরিচর্য্যা করে। দুধ যা হয় তাও সমান ভাগে সবাই পায়।

কম্বলঘরে মেয়েরা কম্বল বুনছে। বড়রা ছোটদের শেখাচ্ছে। এরা নিজেরাই ভেড়ার লোম থেকে উল তৈরী করে। তারপর তাকে রংএ ছোপায়। আবার সেই উল দিয়ে সোয়েটার বোনে, কম্বল বোনে, গালিন তৈরী করে। কি তাড়াতাড়ি আর কি সুন্দর বুনছে দেখলে অবাক হতে হয়। আমরা কয়েকটি সোয়েটার কিনে এদের কিঞ্চিৎ সাহায্য করলাম। জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা এই যে বড় মেয়েরা ছোটদের শেখাচ্ছে এরা কার কাছে শিখেছে? বলল—প্রথমে সর্ব্বোদয় সঙ্ঘ থেকে শিক্ষয়িত্রী এসে এদের শিখিয়েছেন। এখানকার এই নিয়ম। এই সংস্থায় ভর্তি হতে হলে আগে ছাত্রীর মা বাবাকে লিখে দিতে হবে যে, তাঁদের মেয়েকে এঁরা যে সঙ্ঘে চাইবেন সেখানে পাঠাতে হবে। সেখানে গিয়ে এমনি একটি সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। এখানে মেয়েরা প্রধানতঃ শেখে কৃষিবিদ্যা, গো-পালন, সমাজবিজ্ঞান, বস্ত্রশিল্প, সিল্ক ও উল বয়ন, সাধারণ বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, গৃহ-বিদ্যা, রন্ধন ইত্যাদি।

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম মেয়েরা কাপড় কাচছে। ঝরণার জল একটি চৌবাচ্চায় জমা হয়েছে। আজ ওদের পালা পড়েছে কাপড় কাচার। এখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য কাজ করবে এই শিক্ষাই দেওয়া হয়। ওদের মূলমন্ত্রই হল সাম্যবাদী আর স্বাবলম্বী হতে হবে। হাসপাতালে গিয়ে দেখলেম কয়েকটি বড় মেয়ে শুশ্রূষা করছে। এই রোগীর সেবাও ওদের পাঠের মধ্যে গণ্য; বলল কান্তি। আমি বললাম—এদের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়না কেন? বলল—এরা নিজেরাই যেতে চায় না। পরস্পরকে সাহায্য করায় ওদের মধ্যে এমন একটা নিবিড় বন্ধন গড়ে ওঠে যে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না।

সত্যি দেখলাম প্রত্যেকটি মেয়েই কি হাসিখুশী স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। এরা প্রাণের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। কাজ এদের কাছে বোঝা নয়। ভয় পায় না কাজকে তাই। ওরা যেন এক একটি কর্ত্তব্যের প্রতিমূর্তি।

এই সবুজ রংএর শাড়ীপরা পর্ব্বত দুহিতাটিকে প্রকৃতই প্রকৃতি কন্যা বলে মনে হচ্ছিল। আমাদের পেয়ে খুব খুশী—সমানে শত মুখে সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, আবার আমার ছোট ছেলের সঙ্গে খুব গল্প করছে এতই উৎসাহ। নিজেদের এই সংস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

লাইব্রেরী দেখতে যেয়ে দেখলাম, অনেকগুলি বই ছিল আমাদের সর্ব্বোদয় সংস্থার। আমরাও আগ্রহ করে কিনলাম। হাতে তৈরী আটা আর গুড়ের নাড়ু এনে আমাদের জল খাওয়াল। পাহাড়ী গান গেয়ে শোনাল। ওদের দেশের সুমিষ্ট আর সব চেয়ে প্রিয় বেড়ুফল আর কা-ফলের গান।

"বেড়ুপাকো বারমাস্তা
নবন কা-ফল পাকো মেরি ছয়লা।"

ভারী মিষ্টি গলা এই কিশোরীর। আজও এই টানা সুরের পাহাড়ী গানটি কানে বাজে। এবার আমরা আবার অফিস ঘরে ফিরে চললাম।

শ্রীমতী সরলার কাছে এসে তাঁর স্কুলের প্রশংসা করায় খুবই প্রীত হলেন। তারপর ব্যক্ত করলেন এই স্কুলের আসল উদ্দেশ্য। গ্রাম উন্নয়ন ও স্বাবলম্বন এই হল দেশের ও জাতির উন্নতির মূল। এই কথাই বলতেন বাপুজী, সুতরাং আমি সেই ব্রতই নিয়েছি। আমার মতের সঙ্গে বিনোবাজী সম্পূর্ণ একমত। তাই আমাদের পথও এক। সর্বোদয় মানে আমরা মনে করি (সর্ব্বের উদয়) সকলের উন্নতি। আমার এই স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্তা দুটি ছাত্রীও যদি দুটি গ্রামকে জাগাতে পারে, তবে তাদের ছাত্রীরা আবার অন্য গ্রামকে সংস্কৃত করবে। এই ভাবে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে শিক্ষার আলো

সাম্যবাদ আর স্বাবলম্বী হবার প্রেরণা। তাই আমি এখন মাসে অন্ততঃ পনের দিন কান্তি বা তার দিদিকে নিয়ে অন্য গ্রামে গিয়ে তাদের মধ্যে এমনি উদ্দীপনা দেবার চেষ্টা করি। তবে দেখেছেন ত, আমাদের অর্থের বড় অভাব—তাই বলছি আপনারা যদি হাতে কাটা সুতো পাঠিয়ে দেন বা বছরে কিছু অর্থ সাহায্য করেন কিম্বা বন্ধুদের দিয়ে কিছু সাহায্য করান বড়ই উপকৃত হব। যদিও আশে পাশের আর অনেক দূর গ্রাম থেকেও আমার স্কুলে ছাত্রী আসে, কিন্তু বেশীর ভাগ মেয়েই টাকা দিতে পারেনা। এই পাহাড়ীরা বড় গরীব আর দুঃস্থ। এদের মেয়েরা পেট ভরে খেতে পাবে শুধু এইজন্যেই তাদের স্কুলে পাঠায়, শিক্ষা এদের কাছে গৌণ। "আমি বললাম" কেন, গবর্ণমেণ্ট মানে নেহেরুজীর কাছে আবেদন করলেই তো পারেন। এটি যখন গান্ধীজীর আদর্শের প্রতীক তবে কেন তিনি সাহায্য করেন না। প্রথমে কিছু বললেন না। মাথা নীচু করে কি যেন চিন্তা করলেন। পরে বললেন, "নেহেরুজী এখন আর এই আদর্শের পক্ষপাতী নন। এই কারণেই তাঁর দান নিতে আমার বাধে।" আত্মবিশ্বাসে আস্থাশীলা এই মহিলার প্রতি শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে ওঠে মন।

এই যন্ত্রযুগেও একজন ইংরেজ মহিলার ভারতের মাটিতে বর্ত্তমান বিনোবাজী ও স্বর্গত মহাত্মাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করে যাবার মত অধ্যবসায় ও মনের বল দেখে সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যেমন পাণ্ডবদের শুধু ধর্ম্ম ভরসা ছিল, শ্রীমতী সরলা বেনেরও সেই একমাত্র ভরসা -বিশেষ করে স্বাধীনতা লাভের পর, সরকারের সহযোগিতার অভাবে শ্রীমতী মীরা বেনের ভারত ত্যাগের পর। যাই হোক, পাঠকপাঠিকারাও দয়া করে শ্রীমতী সরলা বেনের সামান্য আবেদন মঞ্জুর করবার চেষ্টা করবেন আশা করি।

এরপর আমার ছেলের অনুরোধে তিনি আমাদের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। ফটো তোলা হ'ল। কান্তিও দাঁড়াল হেসে। পরে এঁরা গুরু-শিষ্যা আমাদের অনেক দূর অবধি পৌছে দিয়ে গেলেন। আমরা নেমে এলেও দেখলাম ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছেন। এই মায়ার বাঁধনেই বেঁধেছেন এ পাহাড়ীয়া কঠিন কঠোর মানুষগুলিকে।" মাতাজী কি আশ্রম—বলতে তারা একবাক্যে এই কারণে সহজেই তাঁকে চেনে। তিনি যে তাদের দুর্দিনের বন্ধু, দুর্ব্বলের সহায়। "আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাবে অন্যেরে" গীতার এই বাণীর তিনি জলন্ত নিদর্শন। তিনি ছাত্রীদের সঙ্গে সমানে পরিশ্রম করেন। সব কাজে তাদের সাহায্য করেন। তাঁর স্কুলে উঁচু নীচু ভেদ নেই, সবাই সমান। সকলের সমান অধিকার আছে প্রত্যেক কাজে। যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের ভাগ পায় তারা, জাত অনুযায়ী নয়। এই যন্ত্রের বিরাটত্বের মধ্যেও তিনি ক্ষুদ্র মনুষ্য শক্তিকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টাই করে চলেছেন।

শঙ্কর, লেখিকা, সরলাবেন, কান্তি, গোরা

যেন প্রখর সূর্য্যালোকের মধ্যে একটি দীপবর্তিকার মৃদু শিখা বিকীরণ করছে তাঁর স্কুলটি। বলছে—কল্যাণ আছে এর মধ্যেই। এই লক্ষ্মী আশ্রমের চতুর্দিকে যেন মা লক্ষ্মীর প্রসন্ন কৃপার দৃষ্টি উপলব্ধি করা যায়। এই আশ্রম-কন্যারা যেন সমস্ত কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁরই আরাধনা করে চলেছে। আমাদের সঙ্গে অনেকটা এসে পৌছে দিয়ে গেলেন। শেষ কথাও বললেন—আমাকে একটু সাহায্য করবেন কিন্তু আপনারা; ভুলে যাবেন না। আমার ঠিকানা—"কস্তুরবা উত্থান মণ্ডল"...লক্ষ্মী আশ্রম কৌশানী (আলমোড়া)

কাল রাত্রের প্রচণ্ড বৃষ্টির পর আজ খুলে গেল আকাশ। সোনালী সকালের প্রথম অরুণোদয়ের লাল আভা পড়েছে

বরফাচ্ছাদিত চূড়াগুলির ওপর। তুষারশুভ্র পর্ব্বতমালার একটি বিরাট মিছিল আমাদের চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে ফুটে উঠল। গিরিরাজের কি অপূর্ব্ব প্রকাশ। একেবারে চোখের সামনেই তুষারধবল ত্রিশূল। তারপর নন্দা দেবী, নন্দা কোঠ, যুধিষ্ঠির, শতপন্থ—প্রত্যেকটি চূড়া পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

বিদায় নিলাম কৌশানী থেকে। দরওয়ানের কথা বিফল করে দিয়ে অভিষ্ট সিদ্ধ হয়েছে—"যেনো" দেখে নিয়েছি। রসদও ফুরিয়েছে। নেমে তো এলাম কিন্তু বাস ষ্ট্যাণ্ডে বাস পেলাম না। ঘর ছেড়ে দিয়ে, বকসিস দিয়ে বেরিয়ে এসে আবার সেঘরে ঢুকতে কিছুতেই ইচ্ছে হলনা। তাই বাস ষ্ট্যাণ্ডের ওপরেই একটা ভাঙ্গাবাড়ীতে রাত্ত কাটালাম। সারা রাত ছাতা মাথায় দিয়ে বসে। ফুটো ছাত দিয়ে অজস্র বৃষ্টির জল আসছে। দুর্ভোগ ছিল বরাতে কে খণ্ডাবে—তায় মাত্র তুষ্ক ভরসা। কোথায় সুন্দর ডাক বাংলোর আরামের নরম বিছানা, আর কোথায় খোয়া ওঠা ভাঙ্গা বাড়ীর মেঝে। পরদিন ভোরে রাণীক্ষেত রওনা হলাম।

উপলব্ধি

শ্রীঅমরনাথ গুপ্ত

এই যে জীবন কান্না হাসি
মিথ্যা মায়ায় ভরা,
অসার প্রেমের আবর্জনায়
চিত্ত পাগল করা,
অন্ধ স্নেহে আকুল হয়ে
মূর্খ সেবক সম—
পাগল হয়ে বাসিস্ ভালো
ভাবিস্ প্রিয়তম—
শত্রু সে জন নয়কো আপন
তার ছলনায় ভুলি'
রাখিস্ নে আর মোহে ভরা
এ সংসারের ঠুলি।
আসা শুধু যাওয়ার লাগি—
মাঝে কয়েক দিন
কান্না হাসির ঢেউ বয়ে যায়
শুনিয়ে মরণ বীণ।
তবুও মানুষ স্বপ্ন দেখে
যায় ভুলে যায় নিতি—
আজকে যাহা টাট্‌কা সবুজ
কাল যে তাহা শুষ্ক।

প্রশ্ন জাগে সেই

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়

সবুজ ঘন ধরার বুকে আঁধার এলো নেমে,
পূবের রবি পশ্চিমেতে কখন গেছে থেমে।
সবাই জানে, আমিই শুধু তোমার কথা ভেবে
সব ভুলেছি, 'রাত্রি হ'ল' কেই বা
বলে দেবে ?

আবার কখন আঁধার মুছে রাত্রি হবে পার—
আঁধার ডুবে, আবার পূবে জ্বলবে আলো, আর
তোমার খোঁজে হয়তো আমার
সময় হারাবেই,
বিশ্বভুবন হয়তো খুঁজে ফিরবো তোমাকেই।

কেমন ক'রে বোঝাই বলো, এ মন বোঝে না যে,
সেদিন যারা ছিল, আজও সবাই হেথা আছে—
সেই তারা আজ জ্বল্‌ছে, নভে, সেই
চাঁদও আজ ওঠে,
সেই কাননে তেমনি করে, কতনা ফুল ফোটে।

সবাই ছিল, সবাই আছে, তুমিই শুধু নেই—
কোথায় তুমি হারিয়ে গেলে প্রশ্ন জাগে সেই।

প্রজাপতি মন

অজিত চট্টোপাধ্যায়

ফিকে রংটা দুচোখের বিষ শর্মিলার। কিন্তু সুশান্তর ঠিক উল্টো। হাল্কা যে কোন রংই ওর প্রিয়। ওরই মধ্যে সবুজ বা কচি কলাপাতার রংটাই আবার একটু বেশী ভালো লাগে। কোন জিনিষ কিনতে গিয়ে সুশান্তর দুটি চোখ কচি কিশলয়ের মনোরম বর্ণটির খোঁজ করে ফিরে।

শর্মিলার চোখে ঐ রংটাই আবার জ্বালা ধরিয়ে দেয়। ফিকে বা হাল্কা কোন রংই ওর পছন্দসই নয়। 'কি যে সব পানসে রং মানুষের পছন্দ হয় বাবু'—শর্মিলা প্রায়ই অনুযোগ করে। ওর আয়ত কালো চোখের দুটি তারায় ঘন লাল বা গভীর কালো রং পরমপ্রিয় হয়ে ওঠে। সুশান্ত বলে, 'পানসে বলো আর যাই বলো তোমার ঐ ক্যাটকেটে লাল বা কালো রং কেউ পছন্দ করবে না। চোখে যেন বড্ড লাগে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাও, শাড়ীর দিকে হাঁ করে চাইবে মানুষ-জন। যেন সং চলেছে পথে।'

প্রতিবাদ জানিয়ে শর্মিলা উত্তর দেয়,—'তোমার ঐ প্যানপেনে হাল্কা রঙের চেয়ে গভীর রং অনেক সুন্দর। আর রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে যারা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তাদের স্বভাবই ওই। রঙের কোন দোষ নেই মশাই, বুঝলে?—

রং নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে খিটিমিটি। ফিকে রং ছাড়া কোন বস্তুই কিনবে না সুশান্ত। শর্মিলারও ধনুকভাঙ্গা-পণ। শাড়ী থেকে ব্লাউজ পর্য্যন্ত সবকিছু ঘন রঙের। লালের সঙ্গে লাল কিংবা কালোর সঙ্গে কালো, ম্যাচ করে ঠিক পরবে। সুশান্ত হেসে বলবে,—বেশ মানিয়েছে কিন্তু। লাল রং হোলে বলে,—নিশাচরী-রূপ। কালো হলে মন্তব্য করে, এ যে সাক্ষাৎ রক্ষাকালী সাজলে। শর্মিলা জবাব দেয় না। মুখ টিপে হাসে। কথাটা আংশিক ভাবেও সত্যি নয়। হ্যাঁ, রূপ আছে শর্মিলার। ঘন লাল আর গভীর কালো দুটোতেই সমান মানায় ওকে। ফর্সা রং, ছিপছিপে গড়ন। কোঁকড়া চুল হাঁটু পর্য্যন্ত নেমে গেছে। মুখের উপর বাঁ গালের ছোট্ট তিলটি একটি সৌন্দর্য্য বিন্দুর মতই শোভা পায়।

বেহালার কাছে বাড়ী সুশান্তর। ফ্ল্যাট বা ভাড়া বাড়ী নয়। নিজেদের বাড়ী। ওর বাবা করিয়েছিলেন তাঁর কর্মজীবনে। এখন দোতালায় থাকে ওরা। নীচের তলায় ভাড়াটেরা থাকে। কি একটা সদাগরী অফিসে কাজ সুশান্তর। ডালহৌসী অঞ্চলে অফিস।

শর্মিলার কাজ শুধু গিন্নিপণা, তাই বলে শুধু রান্না-বান্না করেই ক্ষান্ত নয় সে। দোতলার খোলা ছাদে সুন্দর বাগান রচনা করেছে। ছোটবড় মাঝারী টবে বসানো ফুলগাছ—ব্ল্যাকপ্রিন্স থেকে শীতের মরসুমী ফুল, কিছুই বাদ নেই। দোপাটি, গাঁদা আর বেলফুল। কত কি যে ফোটে। ওদের সুবাসে স্বল্প আয়তন ছাদটা যেন 'ম' 'ম' করে। ওরই মধ্যে চেয়ার পাতা আছে দুখানা। ছোট্ট একটি তেপায়া টেবিল। অফিস থেকে সুশান্ত এলে চা খায় ওরা।

শর্মিলা বলে,—'দেখেছ ডালিয়াগুলো, কি বড় বড় হয়েছে।'

ঘাড় ঝুঁকিয়ে সুশান্ত দেখে। সারাদিনের ক্লান্তিকর অফিস কাটিয়ে পরিবেশটা বড় সুন্দর লাগে। শীতের বেলা সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ছড়িয়ে পড়তে আর দেরী নেই। আকাশে তারা ফুটে উঠবে এবার। হয়ত চাঁদ উঠবে একফালি।

—'তোমার ঐ আসমানী রঙের ফুলগুলো ভারী সুন্দর লাগে আমার'—সুশান্ত বলে।

—'তাতো লাগবেই। ফিকে রঙের ফুল কিনা। তোমার চোখে তো সুন্দর মনে হবেই—

সুশান্ত চোখ তুলে তাকাল এবার। শর্মিলার দিকে। উজ্জ্বল লাল রঙের একখানা শাড়ী পরেছে শর্মিলা। কপালে লাল টিপ। গায়ের ব্লাউজটাও লাল। সন্ত প্রসাধনের পর খানিকটা সিঁদুর দিয়েছে সীমন্তে।

'কি যে বলো', সুশান্ত হাসবার চেষ্টা করল। 'কিছু একটা বললেই তুমি সেই পুরানো ব্যাপারটা টেনে আনবে। লাল রং বলে কি, আমি গোলাপ ফুল ভালবাসি না? নাকি তোমাকে?' চোখের কোণে একটা দুর্বোধ্য হাসি সুশান্তর। চিকমিকিয়ে উঠেছে চোখের তারা দুটো। দুষ্টুমির হাসি ঠোঁটের এককোণ থেকে অপরকোণে ছড়িয়ে পড়ছে। একটা হাত বাড়াল সুশান্ত। বুঝতে পেরে সরে গেল শর্মিলা। মুখ ভার করে বলল,—'যাও, আর সোহাগ দেখাতে হবে না। তুমি যে কী রং ভালবাস, তা আমার আর জানতে বাকী নেই।'

বিয়ের পরই বুঝতে পেরেছিল শর্মিলা। ঘন রং এতটুকু পছন্দ করেনা সুশান্ত। ওর সাদা রঙের ট্রাউজার্স, ফিকে হলুদ রঙের সার্ট, আর হাল্কা সবুজ রঙের টাই দেখে খটকা লেগেছিল। নতুন বউ হয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেনি প্রথমে। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে এল ব্যাপারটা। বিয়ের পরের মাসেই এক শাড়ী এনে হাজির করল সুশান্ত। হয়ত নতুন বউকে খুশী করার ইচ্ছে ছিল মনে। কিন্তু শাড়ী দেখে ঠোঁট উল্টোল শর্মিলা। নতুন বউয়ের মুখে এক ঝলক আলোর বদলে কালো মেঘের ছায়া ভেসে এল।

সুশান্ত বলল,—'কি ব্যাপার? কাপড়টা পছন্দ হয়নি তোমার?'—

—'কাপড়টা তো বেশ ভালই। জমিটা পাতলা আর ঠাস বুনুনি। শুধু রংটাই—

—রংটা? বেশ সুন্দর তো। কচি কলাপাতার রং ভাল লাগে না তোমার?'—

—'একটুও না।' ঠোঁট উল্টে জবাব দিল শর্মিলা। একটু থেমে বলল,—'এত রং থাকতে এই সব ফিকে রং কেন পছন্দ তোমার? গাঢ় রং ভালবাস না?'

—'কেন ফিকে রঙে আপত্তি কিসের? কি সুন্দর তোমাকে মানাবে এতে'—

—'ছাই'—মুখখানা পাংশু করে বলল শর্মিলা, 'আসলে ঘন রং একটুও ভালবাস না তুমি। কাল যে বেড়াতে যাবার সময় নীল শাড়ীটা পরেছিলাম, তোমার বুঝি পছন্দ হয়নি'—

—'কেন হবেনা? নীলাম্বরী অপছন্দ করতে পারি কখনো?'—

—'থাক থাক। নীলশাড়ীর আর প্রশস্তি গাইতে হবে না'—

সে শাড়ী শর্মিলা নিজে গিয়ে ফেরৎ দিতে এসেছিল দোকানে। সুশান্ত পিছু পিছু গিয়েছিল তার। দোকানে গিয়ে একরাশ কাপড় থেকে ঘন লাল রঙের একটা শাড়ী বেছে নিয়েছিল সে। সুশান্ত আপত্তি করেনি। নিজের মতে খাও, আর অন্যের রুচিমত সাজো। এটি প্রবাদবাক্য শুধু। মেয়েদের বেলায় খাটে না।

ইতিমধ্যে শর্মিলার এক বন্ধুর বাবা এসে বাসা নিলেন ওদের পাড়ায়। স্কুলে পড়তে মালতীর সঙ্গে খুব মাথামাখি হয়েছিল। তখন মফঃস্বলে থাকত শর্মিলা। ওর বাবার সঙ্গে গাধাবোটের মত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে হত ওদের। বর্ধমান থেকে বসিরহাট, কুচবিহার থেকে মালদহ, কত জায়গাতেই না ঘুরেছে। মালদহ হতেই আলাপ মালতীর সঙ্গে। বারলো গার্লস স্কুলের ভাল ছাত্রী ছিল মালতী। শুধু পড়াশুনোতেই নয়, কথাবার্তা চলনে বলনেও চৌকস—। প্রতি বছর প্রাইজ পেত দুহাত ভর্তি। শর্মিলার সঙ্গে বড় ভাব ছিল ওর। কানায় কানায় ভরে ওঠা ভরানদীর মত দুকূলপ্লাবী ভালবাসা।

প্রথমটা বুঝতে পারেনি শর্মিলা। রাস্তার ওপারের তেতলাবাড়ীর ছাদে কে একটি মেয়ে বেড়াচ্ছে। যেন অল্প অল্প চেনা। পুরনো গানের কলির মত। সুর মনে আসে, কিন্তু কথাগুলির ঠিক হদিশ পায় না।

অন্য একদিন। রাস্তার বাসষ্টপে দাঁড়িয়েছিল মালতী। হাতে বই আর ঝোলানো হাতব্যাগ। বোধহয় পড়াশুনো করে। কলেজ কিংবা লাইব্রেরী যাবার জন্য প্রস্তুত। চাকর পাঠিয়ে ওকে ডেকেছিল শর্মিলা, অবাক মালতীও। মুখে কথা সরেনি অনেকক্ষণ—

—'কিরে তুই? একেবারে বউ সেজে বসে আছিস যে'—

—শর্মিলা ঠোঁট টিপে হাসল। বলল, 'কিরে কয়সে

মেয়েরা তো বৌ হয়। তুই নতুন কি বললি'—

—'ইস্ কতদিন পরে দেখা তোর সঙ্গে' মালতী ওকে জড়িয়ে ধরল।

—'তোকে দেখেছি ভাই ছাদে। কিন্তু ডাকতে সাহস পাইনি। কি জানি, হয়ত ভুল আমার—

—'কতদিন বিয়ে হল তোর? ভদ্রলোক কইরে?'—

—'এখনও এক বছর হয়নি। আর ভদ্রলোককে পাবি কোথায় এখন? বউয়ের আঁচলধরা হলে না হয় সারাদিন ঘরেই থাকত। তেমন তো নয়। তার আফিস নেই?'—

শর্মিলা একটা কটাক্ষ করল।

মালতী হেসে বলল, 'বারে, বেশ কথা বলতে শিখেছিস তো? তখন তো মুখ ফুটত না।'—

—'চিরকাল বুঝি একরকম যায়?'

হঠাৎ ছোট্ট একটু হেসে মালতী প্রশ্ন করল, 'তারপর, তোর সেই অশোকদার কি খবর রে? অশোক দত্ত, যিনি তোকে পড়াতেন।'

একটা চকিত কালো ছায়া ভেসে গেল শর্মিলার মুখের উপর। সে ভাব কাটিয়ে নিয়ে বলল শর্মিলা—কি জানি। এতদিন কি আর মনে করে রেখেছি?'—

—'তা ঠিক, কতদিন তো হল। আর চোখের আড়াল হলেই মনের আড়াল। কিন্তু সেই গাঢ় রংটা তো ছাড়তে পারিসনি। তোর অশোকদা বলত না? তোকে 'ডিপ্' রং ভিন্ন মানায় না। সেটা তো ভুলিস নি'—

মালতীর চোখটা একবার বুলিয়ে গেল সমস্ত ঘরটার মধ্যে। জানালায় গাঢ় লাল রঙের পাতলা পর্দা। বিছানায় নীল রঙের চাদর। আলনায় নানা রঙের শাড়ী, কিন্তু সব কটিরই রং গাঢ়। লাল, নীল বা মেরুণ বর্ণ। টেবিলের উপর ফুলদানীতে শোভা পাচ্ছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। তারও রঙ ঘন।

—'ছেড়ে দে ওসব কথা। শর্মিলা চাপা দিল প্রসঙ্গটা. হেসে বলল,—'আসিস না একদিন বিকেলে। ওর সঙ্গে আলাপ করবি—'

—'নিশ্চয়,' মালতী সোৎসাহে জবাব দিল।

দু একদিন পর। সন্ধ্যের সময় ছাদে বসে গল্প করছিল শর্মিলা। সুশান্ত একটা চেয়ারে বসে রিং করছিল সিগারেটের ধোঁয়ায়! মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো জবাব দিচ্ছিল শর্মিলার কথার। আকাশে তারা ফুটেছে অল্প কয়েকটি। শীত আর নেই বললেই চলে। গাঢ় লাল, আর খয়েরী রঙের মরসুমী ফুল ফুটেছে টবের গাছে।

—'আসতে পারি?" দরজার কাছে মেয়েলী গলায় কে যেন ডাকল।

কাছে গিয়ে শর্মিলা অবাক।—'ওমা তুই! আমি ভাবলাম কে এল আবার।—

—'বিরক্ত হলি ত?'

—'দূর। আয় আয়।' শর্মিলা ওকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এল।

—'তোমাকে বলেছি না এর কথা। নতুন এসেছে এ পাড়ায়। মালদহে একক্লাসে পড়তাম আমরা। ভীষণ ভালো পড়াশুনোয়। এম, এ, পড়ছে এ বছর'—শর্মিলা এক নিঃশ্বাসে বলল কথা কটি।

সুশান্ত মুখ তুলে চাইল। নমস্কার করে বলল,—'ভারী আনন্দ হল আপনার সঙ্গে আলাপ করে। কি সাবজেক্টে পড়ছেন?'

—'বাংলায়। ও কিছু নয়। শর্মিলা বড্ড বাড়িয়ে বলছে। একমাস হল এসেছি এ পাড়ায়, কিন্তু শর্মিলার সঙ্গে দেখা হল মাত্র তিনদিন আগে।' মেয়েটি হাসল। সুশান্ত চেয়ে দেখল আবার। শর্মিলার মত সুন্দরী নয়। শ্যামবর্ণ পাতলা পাতলা গড়ন। মাথার চুল বিনুনী করে ঝোলানো পিঠের দুপাশে। পরণে হাল্কা হলুদ রঙের শাড়ী।

ছাদে বসে গল্প গুজব শুরু করল ওরা। পুরাতন নূতন আর ভবিষ্যতের মিশ্র কাহিনী।

কোথাকার কোন পেটা ঘড়িতে নটা বাজল। মালতী বলল,—'ইস্ বড্ড দেরী হয়ে গেল। আজ উঠি, কেমন?'

শর্মিলা বলল, 'আবার আসবি কিন্তু।'

—'আসবো নিশ্চয়। কিন্তু তুই যাবি না?'—

শর্মিলা ঘাড় নেড়ে সায় দিল। মালতী চলে গেল। একটা নিঃস্তব্ধতা, কয়েকটি মৌনমুহূর্ত গড়িয়ে পড়ল।

সুশান্ত বলল,—'তোমার বন্ধুটি বেশ কথা বলতে পারে। খুব চটপটে কিন্তু'—

—'খুব। মালদহে ডিবেট করত। কত প্রাইজ পেয়েছে।'

সুশান্ত হাসল।

বেশ কিছুদিন কেটেছে। ইতিমধ্যে অনেকবার এসেছে মালতী। কয়েকবার গিয়েছে শর্মিলা, কখনো একা একা, কখনো সুশান্ত ক নিয়ে। নিজেদের বাড়ীর ছাদে গোল হয়ে বসেছে। গল্প করেছে, হেসেছে আবার তাল মিলিয়ে তর্ক করেছে। কখনো বিপক্ষে ওরা দুজনে, সুশান্ত একা। কখনো শর্মিলা নিস্পৃহ। তর্ক করেছে ওরা দুজনেই—

মাস দুই পর।

অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরছিল সুশান্ত। নিউমার্কেটে একবার যাওয়া প্রয়োজন। আজকের দিনটির একটি বিশেষ অর্থ আছে ওর আর শর্মিলার জীবনে। দিনটি ওদের বিয়ের তারিখ। প্রথম বিবাহ বার্ষিকী। ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে সুশান্ত ভাবছিল। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ওর কাঁধে হাত রাখল।

মুখ ফেরাতেই চিনতে পারল সুশান্ত। ফোর্থ ইয়ার ক্লাসের অশেষ সরকার। কিন্তু কি মোটা হয়েছে অশেষ। গোলগাল মুখ আর দশাসই চেহারা। এই ক'বছরেই যেন আগাগোড়া পাল্টে গেছে মানুষটা।

অশেষ ওকে টেনে নিয়ে গেল একটা রেস্তরায়। বলল 'কিরে সুশান্ত, কেমন আছিস ?'

—'ভালো, তুই ?—

—'কেটে যাচ্ছে একরকম। বে-থা করেছিস ?'

হাসল সুশান্ত। বলল,—'তুই করেছিস ?'

কথা শুনে হো হো করে হাসল অশেষ। 'করেছি মানে ? দুটি ছেলেমেয়ের বাবা হয়ে বসে আছি। নে তোর কথা বল'—

—'বিয়ে তো করেছি। কিন্তু শুধু পতি, পিতা হওয়া পর্যান্ত হতে আর পারিনি'—সুশান্ত রসিকতা করল।

—'হবে হবে। ক্রমে ক্রমে সবই হবে। তারপর তোর অফিসটা কোথায় ?'—

ডালহৌসীর একটা অফিসের নাম করল সুশান্ত। বয় এসে চা দিল। ধুমায়িত চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সুশান্ত বলল,—'আর কারো সংগে দেখা হয় ?'

—'হয় মাঝে মাঝে। তারপর, তোর সেই নিভা সান্যালের খবর কি ? যাকে সবুজপরী নাম দিয়েছিলি।'

—'নিভা সান্যালের খবর আমি কি করে জানব ?' একটু লজ্জার হাসি হেসে বলল সুশান্ত।

—'তা নয়। তবে কলেজে পড়তে তোর সঙ্গে তো বেশ আলাপ জমেছিল।'—

—'কলেজের আলাপ কলেজেই শেষ, কলেজের বৃত্ত ছাড়িয়ে খুব কম জীবনেই তা বাইরে আসে। কে জানে কোথায় এখন নিভা সান্যাল। হয়ত সিঁদুর পরে সংসার করছে।'—সুশান্ত আস্তে আস্তে বলল কথা কটি।

—'কিরে, কেন উদাসীন এত ? একদিন তো ওর হাল্কা রঙের শাড়ীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলি'—

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সুশান্ত উঠল বলল,—আজ কাজ আছে অশেষ। তুই একদিন আয়-না আমার অফিসে।'

—'সময় কই তেমন ? আচ্ছা পারি তো আসব।'—

অশেষ বিদায় নিল।

সুশান্ত হেঁটে চলল নিউমার্কেটের দিকে একটা শাড়ী কিনবে শর্মিলার জন্য। কিন্তু মনের মধ্যে শর্মিলার মুখটা আড়াল পড়ে গেছে কোথাও। উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে অন্য একটি মুখ। নিভা সান্যাল। বি, এ, ক্লাসে সুশান্তর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তার। হাল্কা রঙের শাড়ী আর জামা পরে আসত মেয়েটি। সুশান্তর চোখে ভালো লেগেছিল। আজ এখন নিভা সান্যালকে মনে পড়ছে। শর্মিলাকে নয়।

দোকানে ঢুকে একটা শাড়ী নিল সুশান্ত। বেশ কিছু টাকা লাগল। কিন্তু কাপড়খানা সুন্দর। হাল্কা সবুজ রং, পাড়ের কাছে জরির কাজ। গা ভর্তি ছোট ছোট বুটী। শর্মিলার নিশ্চয় পছন্দ হবে সুশান্ত ভাবল। অবিশ্যি রংটা ফিকে। কিন্তু কিছুতেই গাঢ় রঙের কোন শাড়ী পছন্দ হল না সুশান্তর। সবুজ শাড়ীখানায় নিভা সান্যালকে কেমন মানাত ? প্রশ্নটা একবার উঁকি দিয়ে গেল সুশান্তর মনে।

রাতে মালতী এসে অবাক। আজকের দিনটিতে সেই একমাত্র অতিথি। শর্মিলা ওকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছিল। কিন্তু চারদিক অদ্ভুত স্তব্ধ। কোথায় গেল

সবাই ? এত চুপচাপ কেন ওরা ? আলো জলছে না কেন বাড়ীতে ?—

খুঁজে খুঁজে শর্মিলাকে বের করল মালতী। খাটের উপর শুয়ে আছে। একটা আধময়লা শাড়ী পরণে। বিকেলে চুল বাঁধেনি। প্রসাধন করেনি। নিশ্চয় গা ধোয় নি।

—'কিরে, এমন করে শুয়ে আছিস যে? সুশান্তবাবু কই ?'

ওকে দেখে উঠে বসল শর্মিলা। ঠোটের কোণে হাসি আনল। বলল,—'আয় বোস তোর সুশান্তবাবু নেই। রাগ করে বেড়াতে বেরিয়েছেন ভদ্রলোক। বোস না, এক্ষুণি আসবে—

অন্য কিছু নয়। দাম্পত্য কলহ। সেই হাল্কা সবুজ রঙের শাড়ীখানাই যত নষ্টের মূল। প্রথমে উল্লসিত হয়েছিল শর্মিলা। বিয়ের তারিখে শাড়ী উপহার এনেছে দেখে। কিন্তু রং দেখেই মাথা খারাপ। শাড়ীখানা ছুঁড়ে ফেলেছে রাগে—

মালতী বলল,—'এ তোর বাড়াবাড়ি। আজকের দিনটায় রাগ না করলেই পারতিস। আর আচ্ছা মেয়ে তুই—। মন বদল করতে পেরেছিস আর রং বদল করতে পারিস না ?—

অনেকরাতে বাড়ী ফিরল সুশান্ত। মালতী আগেই চলে গেছে। সেই রকম চুপচাপ আর নিস্তব্ধ পরিবেশ। কোনো কথা বলল না সুশান্ত। ছাদের আলসেয় হাত রেখে দাঁড়াল চুপ করে।

ঘরের মধ্যে দুটি পায়ের লঘুধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সুশান্ত জানে শর্মিলা আসছে ছাদে।

চৈত্রের শেষ। বসন্ত অতিক্রান্ত, গ্রীষ্ম প্রায় এসে গেছে। ওরা জানে এখুনি আবার আলো জ্বলবে ছাদে। আলো জ্বলবে ওদের মনে। ওরা কথা বলবে, জ্যোৎস্নারাতে মশগুল হয়ে গল্প করবে। আগের সবকিছু ভুলে যাবে, বিস্মৃত হবে।

শুধু ওই রঙটুকু। প্রথম পরিচয়ের সবকিছু চুকে গেছে। রংটুকু সম্বল। ও রং বদলায় না, মোছে না। কোনদিন বিবর্ণ হয় না।

আমি মন করলেই

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

এই আলো এই গান—আরো কিছু কান্নার মাঝে
নিরুদ্বেগ শৈবাল স্বপ্নেরা
খেলা করে মাটির আরামে
আমি চোখ মেললেই,
চোখ মেললেই।
অবাক আলোর বেদনার সেতু ভেঙ্গে
শত শত প্রস্তুতির খবর আসে।

নিবিড় আগ্রহের সমারোহে
প্রাণের স্বপ্নেরা উচ্ছল আরামে—লুটোপুটি খায়
আমি মন করলেই,
মন করলেই।
তেপান্তরে ব্যঙ্গমা দুটো সুখ দুঃখের কথা জানায়
রাজকুমারকে
রোদ দেখি আমি চোখ মেললেই, শুধু মন করলেই।

গান

(মিশ্র বেহাগ)

তাল : ত্রিতাল

কী দিয়ে তোমায় পূজিব হে প্রভু
আমার বলিতে কিছু নাই।
তোমারে সাজাতে বল বল প্রভু
ভুবন খুঁজিয়া কোথা পাই ॥
ফুল, ফল যত পূজা-উপচার,
কিছু নয় মোর, সকলি তোমার,
তোমারি সে-দান আমার বলিয়া
দেবো, কেমনে তোমারে বল তাই ॥

নিজেরে সঁপিব চরণে তোমার
সেও তো আমার ওগো নয় ;
সব-ই যদি তুমি হে বিশ্বরূপ
হোক তবে হৃদি তুমিময়।
তবে, তোমারি পূজা তুমি আপনি কর,
আরতির দীপ হাতে তুলিয়া ধর,
হৃদি মন্দিরে সে মহা পূজার
প্রসাদ পেতে যে আমি চাই ॥

কথা ও সুর : রামকৃষ্ণ চন্দ

স্বরলিপি : সেবা বন্দ্যোপাধ্যায়

II সা গা গা মা | পা না -া -া | না র্সা র্সা র্সা | র্সনা -া ধনর্সনা ধপজ্ঞগা |
কী দি য়ে তো মা ॰ ॰ য়্ পূ জি ব হে প্র ॰ ॰॰॰॰ ভু॰॰॰
॰ ১ ২´ ৩

*I গজ্ঞা গা ধা পা | জ্ঞা গা গা মা | গা -া -া -া | -া -া -া -া *II
আ॰ মা র্ ব লি তে কি ছু না ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰
॰ ১ ২´ ৩

II -া সগা রা গরা | ন্া রসা ন্া ধ্া | ধ্া ন্া সা স্া | সগা -া গা -া |
॰ তোমা রে সা॰ জা ॰॰ তে ॰ ব ল ব ল প্র ॰ ভু ॰
॰ ১ ২´ ৩

I সা গা -া গা | গা মা পা না | ধনা র্সা -া ধনা | -া -া ধপা মগা | *……*
তৃ ষ ণ খুঁ　জি য়া কো থা　পা০ ০০ ০ ০০　০ ০ ০০ ০ই
০　১　২´　৩

II {গা মা পা -া | না -া না ধা | না না র্সা না | র্সা -া -া -া |
ফু ল ফ ল্　য ০ ত ০　পূ জা উ প　চা ০ ০ ০
০　১　২´　৩

I র্সা র্গা র্গা -া | র্রর্গর্মা -া -া র্গর্রা | র্রর্গা র্রর্গা র্গর্রা র্সনা | র্সা -া -া -া} |
কি ছু ন য়　মো০০ ০ ০ র্০　স০ ক০ লি০ তো০　মা ০ ০ র্
০　১　২´　৩

I{ -া ননা না র্সা | ধনা র্রর্সা -া পা | পধা পধা -া পা | (মা -া গা -া)} | মা মা গা গা
০ তোমা রি সে　দা ০ ০ ন　আ০ মা০ র্ ব　লি ০ য়া ০　লি য়া দে ব
০　১　২　৩

I -া সগা গা গা | গা গা মা ধা | পা -া -া মা | গা মা গা রসা | *……*
০ কেম নে তো　মা রে ব ল　তা ০ ০ ০　০ ০ ০ ই০
০　১　২´　৩

II -া সরা না সা | সরা -া রা -া | -া সরা গা মা | গমা রগা -া -া |
০ নিজে রে সঁ　পি০ ০ ব ০　০ চর ণে তো　মা০ ০০ ০ র্
০　১　২´　৩

I রা পা পা পা | পা পমা মাপা | পা -া -া -া | -া -া -া -া |
সে ও তো আ　মা ০র্ ওগো　ন ০ ০ ০　০ ০ ০ য়্
০　১　২´　৩

I{ মা ধপা গা মা | ধা -া ধা -া | পা পধা নর্সা ধনা | না -া -া ধপা |
স বি০ য দি　তু ০ মি ০　হে বি০ ০০ শ্ব০　ভূ ০ ০ প্০
　১　২´　৩

I মা ধা পা পা | মা গা সনা রা | সা -া -া -া | ।। (।।)} | পা পা
হো ক্ ত বে　হৃ দি তু০ মি　ম ০ ০ ০　০ ০ ০ য়　ত বে
　১　২´　৩

I গা মা পা পা | না -া না না | -া ননা র্সা না | র্সা -া র্সা র্সা |
তো মা রি পূ　জা ০ তু মি　০ আপ নি ক　র ০ প্র ভু
০　১　২´　৩

I -া র্সর্গা র্গা র্গর্রা | র্রর্গর্মা -া র্মা র্মর্গর্রা | -া র্রর্গা র্রর্গা র্গর্রর্সা | র্রর্সা -া -া -া |
০ আর তি র০　দী০প ০ হা তে০০　০ তুলি য়া০ ধ০০　রো০ ০ ০ ০
০　১　২´　৩

I না না না র্সা | নর্সা র্রর্সা র্সা পা | পধা পধা পা মা | গা -া -া -া |
হৃ দি ম ন্　দি০ ০ ০ রে ০　সে০ ম০ হা পূ　জা ০ ০ র্
০　১　২´　৩

I সগা গা গা গা | গা গা মা ধা | পা -া -া মা | গা গমা গা রসা II II
প্র০সা দ পে　তে যে আ মি　চা ০ ০ ০　০ ০০ ০ ই০
০　১　২´　৩

মল্লরাজত্বে সঙ্গীতের সৃষ্টি ও প্রচার

শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (সঙ্গীতাচার্য্য)

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের রাজসভায় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহে যে সময় উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিপুল চর্চা হয়েছিল তার প্রভাব শক্তিতে প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামেও এনে দিয়েছিল মানুষের প্রাণে সঙ্গীতের মাদকতা।

তাই বাল্যকালে দেখেছি গ্রামে গ্রামে তানপুরা পাখোওয়াজ নিয়ে শ্রেষ্ঠসঙ্গীত ধ্রুপদ গানের চর্চা। সে সময় বিবাহাদি ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্মে অনুষ্ঠিত হত ধ্রুপদাদি গানের আসর। উপস্থিত হতেন গ্রাম গ্রামান্তর হতে যাঁরা বড় গায়ক তাঁরাও। সাধারণ আসরেও অন্তত: দু-চারজন গায়ক বাদক ধ্রুপদ সঙ্গীতে আসর মাতিয়ে রাখতেন। বুঝতে না পারা শ্রোতারাও আগ্রহ নিয়ে শুনতেন বিষয়বস্তুর শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দিয়ে।

এখন তাই মনে হয়, তখনকার মানুষ দর বড় বস্তুর প্রতি কি সুন্দর শ্রদ্ধা ছিল। শুধু তাই নয়, তাকে অনুসরণ করে চলার জন্যও একটা বিরাট আকাঙ্ক্ষা তাঁরা রাখতেন।

যে সকল গ্রামে তখন যাত্রার দল ছিল তাতে সঙ্গীতের বিরাট অংশ থাকত এবং গানগুলো গাওয়া হতো প্রকৃত সাধনার সম্পদ নিয়ে। জুড়িরা গাইতেন ধ্রুপদ পদ্ধতিরই গান। আর কম বয়স্কদের গানগুলোয় থাকত কীর্ত্তনেরই সুর নানান প্রকাশভঙ্গী নিয়ে এবং এক একটা গান তারা গাইত অনেকক্ষণ ধরে প্রত্যেকে ছাড়্ ধর্‌তাইএর দ্বারা তান বিস্তার দেখিয়ে। এদের গানে কীর্ত্তনের সুরের সংগে রাগ সঙ্গীতের খাঁটি সুরেরও মিশ্রণ ছিল। ঝিঁঝিট,খাম্বাজ, সিন্ধু, আলাইয়া, বিভাস এই রাগগুলোই বিশেষভাবে ওই গানে আকর্ষিত হয়েছিল।

যাত্রার গানেও দস্তুর মত কণ্ঠ সাধনা, শিক্ষা ও তালিম নিতে হত। আমি দেখেছি খানিকটা রাত থাকতে শিক্ষককে ছেলেদের গলা সাধাতে। ছেলেরা সে সময় আনন্দে ও উৎসাহ নিয়ে ঘুম থেকে উঠে আসত। শিক্ষকেরও তালিম দেবার অদ্ভুত নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দেখেছি।

সে যুগে ধর্ম্মীয় আবহাওয়ার গুণে সকল মানুষই যেন প্রধান সাধনার বস্তুকে সংস্কার ও স্বভাব শক্তিতেই গ্রহণ করে নিয়েছিল। তাই গান বাজনা শিক্ষার্থীদেরও সঙ্গীতের মর্য্যাদা ও মূল্যমান বোধহয় একমাত্র কামনা ছিল। আর ছিল কীর্ত্তন গান গাওয়ার মধ্যে প্রেমভাব ও রস-লালিত্যের প্রচার বাসনা।

এই সমস্ত গান শুনে শুনে অতি সাধারণ শ্রেণীর লোকেরাও অল্প বিস্তর গাইতে শিখেছিল। এইরূপভাবে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সঙ্গীতের আনন্দময় একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে অন্তরকে সর্বদা আনন্দিত ও হৃদয়ানুগ নানান গুণসমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

ছন্দতালের দুরূহ সাধনার প্রকাশ প্রতীক পাখোওয়াজ-বাদ্য সাধারণ জনমনেও এত আনন্দদোলা জাগিয়েছিল যে তার আকর্ষণের প্রমাণ খোল, ঢোল, ঢোলক, মাদোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রে বিশেষরূপে পাওয়া যায়। বিস্ময় আনিয়ে দেয় যখন শুনি, না শেখা মানুষের হাতে ওই সব যন্ত্রে নানান তালের সুন্দর সুন্দর বোল, পরম ও অদ্ভুত অদ্ভুত তেহাইসমূহ। সঙ্গতের মাধ্যমে যে বস্তুগুলো উৎপন্ন করতে এখনকার দিনে শিক্ষার্থীদের বহুদিন ধরে শিক্ষা ও সাধনা করতে হয় সেগুলো এদের ধারাবাহিক সংস্কারে স্বভাবতই প্রকাশ পেয়ে আসছে।

মল্লভূমে যন্ত্র-সঙ্গীতের মধ্যে তাউসের প্রচলন এত বেশী হয়েছিল যে ওস্তাদ মহল ছাড়াও ঐ যন্ত্র যাত্রায়, রামায়ণ-গানে ও কীর্ত্তনাদিতে এবং ঢুলি-ডোমদের ব্যবসায় বিশেষ-ভাবে প্রবেশ করেছিল। এই যন্ত্রটি রাগরূপ প্রকাশের উৎকর্ষতার জন্য যে অবয়ব নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল এখন তার সে রূপাবয়ব এক রকম উঠেই গেছে। যন্ত্রটি দেখতে ঠিক ময়ূরের আকৃতির মত ছিল, তাই তার উর্দু নাম 'তাউস্'।

ওর থেকেই সহজ গঠন নিয়ে তৈরি হয় 'এসরাজ' যন্ত্র। এ-ও এখন প্রায় সঙ্গীত-গোষ্ঠী ছাড়া হতে বসেছে। অথচ এই বাদ্যের সঙ্গীত-প্রকাশক শক্তি যে কত উচ্চে—তা যাঁরা উঁচু দরের শিল্পীর কাছে শুনেছেন তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারবেন।

মল্লভূমের ডোমেদের তাউস বাদনের সঙ্গে তাল সঙ্গতের এক আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ক্ষমতা দেখেছি। গৎ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতকার প্রথমতঃ একটা খঞ্জনী নিয়ে সুরু করলেন সঙ্গত করতে, ক্রমশঃ দুটো, তিনটে এই রকমভাবে সাত, আটটা পর্য্যন্ত খঞ্জনী নিয়ে বাজতে লাগল তালে তালে ছন্দে ছন্দে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর আঘাত দিয়ে এবং লুফোলুফির দ্বারা। যেন এক ম্যাজিকের মত বস্তু সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়ে অবাক করে দিতে থাকে। এখনও এরূপ কৃতি সঙ্গতকার দু'একজন আছেন। যে সব ক্রিয়া অনুষ্ঠানে এই সব কৃতিরা উপস্থিত হয়ে তাঁদের কৃতিত্ব দেখিয়ে যেতেন এবং পেতেন উৎসাহ ও অর্থ, এখন আর সে সব নাই। সব জায়গাতেই মাইক এসে গেছে। গ্রামীণ শিল্পীদের বংশ ক্রমশই লোপ পেয়ে গেল।

মল্লভূমের যে অঞ্চলে ডোম্‌দের প্রধান সঙ্গীত গোষ্ঠী ছিল, বিষ্ণুপুর হতে তার দূরত্ব ছিল আট মাইল, গ্রামের নাম জরপুর। এখানের মনোমোহন ডোম্‌ বেহালা বাজাত রাগ রূপ রচনায় অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়ে। সকাল বেলা ও রাত্রে বেহালায় তার হাতে বিভাস ও সিন্ধু রাগ শুনে অতিশয় আনন্দ পেয়েছিলাম। ছড়ের এমন ঘোরাল ও মধুর টান প্রায় শুনা যায় না। ঐ রাগ দুটিতে যেন সে সিদ্ধ ছিল। ঐখানের হরি ডোমের সানাই সুমিষ্ট স্বর তুলে রাগ বিস্তার, তাল ও ছন্দের খেলা দেখিয়ে লোককে মুগ্ধ করত। অথচ আশ্চর্য্য, শুনে শুনেই এরা সব কিছু আয়ত্ত করে নিয়েছিল। এর দ্বারা প্রমাণ হয়, মল্লভূমের সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন সে সময় রাগসঙ্গীতময় হয়ে উঠেছিল এবং মানুষের মনে সঞ্চারিত হয়ে ধরা দিয়েছিল তার মহিমা ও কৃষ্টি।

মল্লরাজাদের সময় নর্ত্তকী ও বাঈজী সৃষ্টিও বড় কম হয়নি। শুধু বাঈজীরাই নয়, নর্ত্তকীরাও উচ্চাঙ্গ সংগীতের সব শ্রেণীর গানই ভাল গাইতে পারত। বৃদ্ধা ভৈরবী বাঈজীর গান শুনে মন খুব তারিফ্‌ করেছিল। রাজত্ব পতনের শেষ অবস্থার সময় থেকে এদেরও শোচনীয় অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় এবং ক্রমশঃ বাঈজীগোষ্ঠী লোপ পেয়ে যায়। বৃদ্ধাবস্থায় লক্ষ্মীবাঈজীকে ভিক্ষা করে দিন যাপন করতে হয়েছে। বাড়ীতে যখন আসত তখন একমুঠো চালের আশায় টপ্পা গান শুনাত। শোরী মিঁয়ার টপ্পাগুলো এমন গাইত যে এখনও মনে হলে ভাবি—তারা কত নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে শিক্ষা ও সাধনা করেছিল। এদের কণ্ঠ যেমন ছিল বলিষ্ঠ তেমনি ছিল রসাল। টপ্পার তানগুলো যেন ঢেউএর মত ফুলে ফুলে দুলে দুলে সমের তটে আছড়ে পড়ত। বহুকাল সাধনা না করলে গাওয়ার এরূপ কৃতিত্ব অর্জন হয় না। এমন সাধিকাদের পেটের জ্বালায় ভিক্ষা করতে হয়েছিল এ কথা যখনই মনে পড়ে—তখন গভীর দুঃখে ও লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়ি এবং চক্ষু অশ্রুসজল হয়।

যাই হোক্‌ বহুকাল ধরে মল্লভূমে বহুমুখী ধারায় সঙ্গীতের যে বিরাট ও বিপুল স্রোত বয়ে এসেছে এবং এখনও তার মূলধারা বিস্তৃত বেগেই চলেছে, তার সমতুল্য অন্য কোথাও আর পাওয়া যাবে কিনা বলা খুবই শক্ত।

ধ্রুপদ চর্চার কথায় বলতে পারি আমার সেই বাল্য জীবনে যদি গণনা করা হত, তাহলে নিয়মিত চর্চার ধ্রুপদ-গায়ক শতাধিক এবং সেইসংখ্যক পাখোওয়াজ-বাদক অক্লেশে পাওয়া যেত। তখনকার আসরের শেষের দিকে গায়করা বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ গানের চার অঙ্গের ভাবধারার মাধ্যমে বলিষ্ঠ রূপের খেয়াল গানও দু'চারটে করে গাইতেন। সে গানগুলোর বিস্তৃত রচনাও বিশেষ পাণ্ডিত্য গভীর ভাবপূর্ণ ছিল। ভাবভাষাসমৃদ্ধ এই রকম খেয়াল গান আমার বৃদ্ধ-প্রপিতামহও গাইতেন। বহুকাল ধরে প্রচারিত এইসব গান ক্রমশঃ হিন্দী খেয়ালের মোহচর্চার প্রবল ধাক্কায় একেবারে চাপা পড়ে গেছে। উদ্ধার করবার আর বিশেষ উপায় নেই।

এ দেশে সঙ্গীতের আর একটা দিক যে আছে, সেও বড় সুন্দর ও ভাববিহ্বলতায় পরিপূর্ণ। এই দিকের বিষয়বস্তু গ্রাম্যসঙ্গীতকে নিয়ে। যুগের এবং তারিখের খবর জানি না, তবে এককালিন এবং ক্রমিক ধারায়

গ্রাম্য কবিদের সংখ্যা যে কত সৃষ্টি হয়ে এসেছে এবং কত রকমের শ্রেণীগত গ্রাম্যগীত যে এখনও শুনতে পাওয়া যায় তা দেখে আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ হইয়াছি। ওই সব কবিদের গানগুলো যখন শুনি, তখন অনেক গানে রচনার ভাবে পাণ্ডিত্যের পরিচয় এনে দেয়। বহু গানের মধ্যে দেহতত্ব ও তন্ত্রশাস্ত্রের গভীর তথ্য সহজ ভাষায়, সহজ উপাদান ও উদাহরণ দিয়ে রচিত হলেও তার ভাবার্থ গ্রহণ করতে গভীর মনোনিবেশ ও জ্ঞানবোধের দরকার হয়। অথচ এইসব কবিরা যে লেখাপড়ায় তেমন অধিকারী ছিলেন তা শুনা যায়নি। তাই বিস্ময় সহকারে মনে হয়, শাস্ত্রাদি চর্চা ও তার আলোচনা কত বেশী এবং ব্যাপকভাবে হয়েছিল।

তারপর সহজ সরল ভাব দ্বারা যে সমস্ত গান কবিদের রচনা আছে সেগুলো শুনা মাত্র মনকে আলোড়িত ও মুগ্ধবিহ্বল করে দেয়। এখানের গ্রাম্য সঙ্গীতের মধ্যে দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের অনেক গানে ঝুমুরের সুরই বেশী পাওয়া যায়। বাকী গানগুলোর মধ্যে কীর্ত্তনের মত সুর ও গ্রাম্যসুরের নানা ধারা নিয়ে এখনও চলে আসছে। ঝুমুর গানে যে সুর শুনতে পাওয়া যায় তাতে বেশ মনে হয় যেন স্থানাঞ্চলের প্রকৃতির স্বভাব থেকে উৎপত্তি হয়েছে। ভাষার ভাব এবং ওই সুর যেন প্রেমবিরহের প্রকৃত রূপটি দুইএর মধ্যে মিলে এক হয়ে গেছে। শুনা মাত্র মনের ভাববীণার তারগুলোতেও করুণ মধুর সুরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠে এবং চোখ দুটোকে অশ্রু ছল্ ছল্ করে দেয়।

এই অঞ্চলে যে সব গ্রাম আছে তার প্রান্ত সীমায় দৃশ্যরূপ বড়ই বৈরাগ্যবিধুর ও উদাস-করুণ। যখন আমি এই সকল স্থানে কোন কোন সময় আগ্রহ নিয়ে দাঁড়াই, তখন সঙ্গীতেরও একটি অপরূপ মূর্ত্তি যেন ভাবের মনে ফুটে উঠে। অনুভবে তার স্বরূপকে মনে হয় যেন শ্রেয়ঃবস্তুকে পাবার আকুলতায় অদৃশ্য কোন চির-উদাসী ব্যাকুলপ্রেমিকের করুণ কণ্ঠ বায়ুহিল্লোলে ভেসে বেড়াচ্ছে পশ্চাতের বনানী এবং প্রান্তরের স্থানে স্থানে। দীর্ঘদেহ তরুরা বংশপরম্পরা সেই সঙ্গীত নিঝুম বিস্ময়ে উর্দ্ধে তাকিয়ে যুগের পর যুগ শুনে যাচ্ছে। মন আমার আকুল হয়ে ব্যাকুলভাবে খুঁজতে থাকে সেই সঙ্গীতকে ধরবার জন্য। কিন্তু তা কি সম্ভব?

যাই হোক—আমরা যদি সঙ্গীত সাধনার প্রথম স্তর থেকেই তাকে প্রকৃতরূপে লাভ করবার জন্য নিষ্ঠা, ভক্তি, ভালবাসা ও প্রেম দিয়ে একাগ্রতায় অগ্রসর হতে চেষ্টা করি এবং তাঁর মূর্ত্তিকে হৃদয়ে সর্বদা বসিয়ে রাখতে পারি তাহলে সব রূপকেই একদিন প্রত্যক্ষ করতে পারব। এই প্রকৃত পথে গেলে নাম, ডাক, উপাধি ও প্রতিষ্ঠার লালসা ইত্যাদি কিছুই থাকে না এবং কেউ সাহসও করে না দিতে। এইভাব দেখেছি আগে অনেক সঙ্গীত-সাধকের মধ্যে।

পরিশেষে আমার বিশেষ বক্তব্য, আমাদের দেশে বহুপ্রকারের পল্লীগীতসকল এখনও যাঁরা রক্ষা করে আছেন তাঁদের কাছ থেকে সেই সব গানের সমস্ত বিষয় যত্ন করে রাখার আবশ্যকতা খুবই আছে, মনে করি। নচেৎ এইসব সংগীতের একটী অপূর্ব ভাবরাজ্য একেবারেই লোপ পেয়ে যাবে।
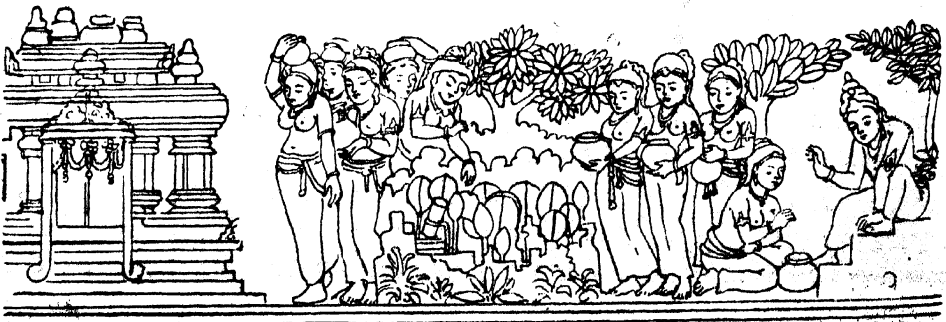
নতুন বাড়ী

জয়শ্রী চক্রবর্তী

বাড়ীটা সুতপার মনের মতন।

বাড়ীর চারদিকের—চার দু'গুণে আটখানা ঘর, একটী চতুষ্কোণ উঠোনকে ঘিরে, প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। ঘরগুলো বড় নয়। মাঝারি সাইজের। সুন্দর, সুদৃশ্য! জানালাগুলো বড়। দরজাগুলো আরও বড়। আলো-বাতাসের অভাব নেই। প্রশস্ত খোলামেলা চারপাশ। বেশ স্নিগ্ধকর পরিবেশ।

রাস্তার সামনেই সুতপার ঘর। বড় রাস্তা না হলেও যানবাহনের চলাচল নিতান্ত কম নয়। হরেকরকম লোকজনের যাতায়াত। বিভিন্ন লোকের কোলাহল! সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত, ফেরিওলাদের চিৎকার। সব মিলিয়ে, এখানকার পরিবেশ, খুব অস্থির মুখর। প্রখর ভাব সর্বক্ষণ, গলা উঁচিয়ে থাকে। সুতপার বেশ লাগে।

বাড়ীর মধ্যে বাড়ীওয়ালা ছাড়া আরও দু'ঘর ভাড়াটে। কারো সংগে তার তেমন আলাপ হয়নি। কিন্তু আলাপী, বেজায় পাকা মেয়েটি সেদিন, বিনা অভ্যার্থনায় সুতপার ঘরে এসেছিল। বছর আষ্টেক বয়সের, সুন্দর মেয়েটির চোখে মুখে কৌতুহল। নাম ওর মিনু। এ' কথা সে কথার পর বলছিল—কাল রাত্তিরে বউটার কান্না শুনে বুঝি ভয় পেয়েছিলে। সুতপা অবাক হয়ে জবাব দিল—তুমি কি করে জানলে! মিনি চট্ করে উত্তর দিল—"মা মণি, বাবুকে বলছিল, নতুন ভাড়াটের বউটা কি ভীতু?" আশ্চর্য! সুতপা বিস্মিত হোল। ভয় পেয়েছিল সত্যি। গত রাত্রে হিমাদ্রির নাইট্ ডিউটি ছিল। সমস্ত রাত একা সে ঘরে। একা বলে নয়, আগেও একা থাকতে হয়েছে। কিন্তু নতুন বাড়ী অচেনা পরিবেশ! অজানা অনুভূতি! তারপর মাঝ রাতে, এক নিপীড়িত বধুর কান্না! মাতাল স্বামীটার রণহুঙ্কার, রাতের নিস্তব্ধতাকে ভয়ার্ত করে তুলেছিল। সুতপা প্রায় ভয় পেয়ে মিনুদের ঘরের দরজা ঠেলেছিল। মিনুর মা বেরিয়ে আসতে সুতপা বলেছিল—"দেখুন, আমার ভয় করছে, একটু আসবেন আমার ঘরে।" বিনা দ্বিধায় মিনুর মা ঘরে এসেছিল। অভয় দিয়েছিল ঐ মেয়েলী কান্না আর পুরুষের চিৎকার—এ বাড়ীর ব্যাপার নয়। পাশের বাড়ীর কীর্তি! মাঝে মাঝে এমন হয়। লোকটা মাতাল। নাম যুগলকিশোর। নেশার দাপটে বউ ঠ্যাঙায়। সারা পাড়ার ঘুম ভাঙ্গায়। এখন সকলের গা সওয়া হয়ে গেছে। ভয়ের কিছু নেই।' নানা কথা বুঝিয়ে মিনুর মা বিদায় নিয়েছিল। সুতপার ভয় কাটলেও বিশ্রী আবহাওয়ার দরুণ সমস্ত রাত ঘুম হয়নি। সকালেই মিনু এসে হাজির। তার মুখে পাকা পাকা কথা শুনে সুতপা হাসলো। পরে ছুটে সে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো। ওখানে দাঁড়িয়ে মিনু হঠাৎ সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলো—'শিগ্গীর দেখবেন আসুন—"সুতপা না জানি কি ভেবে ছুটে গেল। মিনু আঙুল তুলে দেখালো—ঐ দেখুন, যে লোকটা বউকে মারে।" সুতপার দৃষ্টি নামলো, পাশের বাড়ীর রকের সামনে। লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিল। ভাগ্যি, তার দৃষ্টিটা ছিল অন্য দিকে। আর কানটাও বোধহয় সজাগ নয়। নইলে মিনুর ঐ চিৎকার, আর সুতপার কৌতুহলী তাকানো দেখলে, লোকটা নিশ্চয় কিছু ভাবতো। সুতপা আর না দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে এলো।

পরক্ষণে হিমাদ্রি বাড়ী ফিরে এলে, সুতপা গত রাতের ঘটনা গুছিয়ে বললো স্বামীকে। বললো মিনুর কথাও। ততক্ষণে ও' অদৃশ্য! সুতপা বললো—'ভারি পাকা মেয়ে। তোমার পায়ের শব্দ পেয়ে পালিয়েছে।" হিমাদ্রি হাসলো।—"তুমি তাহলে

লোকটাকেও দেখলে?" সুতপা বললো—"শুধু আমি কেন, তুমিও দেখতে পারো। এখনো বোধহয় দাঁড়িয়ে আছে।" এ' কথায় হিমাদ্রির কৌতূহল বাড়লো। 'কই দেখি তো—বলে সেও জানলায় দাঁড়ালো। পেছনে দাঁড়িয়ে সুতপা ইসারা করলো। লোকটা তখন সবে দাঁতন শেষ করে, বাড়ী ঢুকছে। সুতপা একটু বিস্ময় সুরে বললো—'লোকটাকে দেখলে মনে হয় না বউ ঠ্যাঙায়।" হিমাদ্রি জবাব দিল—'হুঁ! আমাকে দেখলে কি কেউ বলবে, তোমাকে এত ভালবাসি?" হিমাদ্রির সারা মুখে দুষ্টু হাসি! সুতপার মুখ আবেগে অনুরক্ত! মুখে সে "তাই না বটে" বলে জানলার পর্দা টেনে, স্বামীর বক্ষলগ্না হোল। হিমাদ্রি তার গতরাতের বিরহটা, এই একটা মুহূর্তে পুরিয়ে নিতে, নির্লজ্জ অধর স্পর্শের সিক্ততায়, নিজের সংগে সুতপাকেও হাঁফিয়ে তুললো। পরে, সুতপা ছুটে পালিয়ে গেল।

রাতের নিঃসঙ্গতার চেয়ে, দিনের সঙ্গীহীন পরিবেশটা, সুতপার আরও খারাপ লাগে। রাতটা এ'পাশ ও'পাশ করে, শেষে ঘুমিয়ে কেটে যায়। কিন্তু হিমাদ্রির দিনের ডিউটি, যে সপ্তাহগুলোতে থাকে, সুতপার তখন অস্বোয়াস্তির এক শেষ! দশটায় বেরিয়ে যাবে হিমাদ্রি—ফিরবে সন্ধ্যের মুখে। সারা দিনে দুজন লোকের সংসারের কাজ শেষ করেও, অফুরন্ত সময়। সময়গুলো খাঁ খাঁ করে। সুতপার একা একা ভাল লাগে না। অন্য ভাড়াটেদের ঘরে যেতেও, তার ইচ্ছে করে না। সুতপা জেনেছে, পরিবারগুলোর মধ্যে কালচরের অভাব। হাঁড়ি হেঁসেল, রান্না খাওয়া নিয়ে সমস্ত দিন মত্ত! প্রাত্যহিক জীবনে ওদের কোন নতুন সংস্কার হয় না। একই ছাঁচে, একই ধাঁচে, সময়ের তালে তালে পা ফেলে চলেছে। বৈচিত্র্যহীন, ছন্দহারা এই জীবনগুলো, সুতপাকে ভারি অবাক করে দেয়। ওদের মধ্যে যে প্রাণটা বাস করে সেটারও বোধহয় ওঠানামার নতুনত্ব নেই। আত্মসর্বস্ব মানুষগুলো, শুধু নিজেদের ভাগ্য গড়ছে, কেবল কাজের স্তূপের মধ্যে দিয়ে। কাজের কারখানা বানিয়ে।

দুপুরে বই পড়ে কাটিয়ে বিকেলটায় সুতপা এসে দাঁড়ায় জানলার সামনে। এখানে দাঁড়ালে খোলা আকাশটাকে কাছে পাওয়া যায়। অনেক দূরের···অনেক অস্পষ্ট দৃশ্যও তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনা। মনটা যেন ফাঁক পেয়ে, বদ্ধ জীবনের খাঁচা থেকে উড়ে পালায়, দূর দূরান্তরে। নিজেকে যেন সে অনেক সময় হারিয়ে ফেলে। পেছন থেকে কেউ ডাকলেও, সুতপার খেয়াল হয়না। পিঠে ধাক্কা পড়লে, সুতপা চমকে উঠবে। সামনে হিমাদ্রির বিরক্তিমাখা মুখ।—ডাকলে শুনতে পাওনা? এই এক সপ্তাহে, নতুন বাড়ীর, নতুন রাস্তায় যে মন হারিয়ে ফেলেছো।" সুতপা সলজ্জ হাসি ছড়িয়ে, জানলার পর্দা টেনে সরে আসবে।—"কি আশ্চর্য সামনের রাস্তা দিয়ে এলে, অথচ দেখতে পেলাম না?" সুতপার গলায় বিস্মিত সুর। হিমাদ্রি তিক্ত স্বর—"তা দেখবে কি করে! চোখ থাকে আকাশে, মন থাকে বাতাসে!" সুতপা হাসে! কথাটা হিমাদ্রি ঠিকই বলে। চোখ তার মেঘের দেশেই ঘুরে বেড়ায়, মনটা বোধ হয় আর কোথাও।

সুতপার এই ভাবপ্রবণতা চিরদিনের। বিয়ের আগের জীবনে দুর্নামের অন্ত ছিলনা। মা বলতেন, এত ভাবপ্রবণতা, বড় অলুক্ষণে মতি। দুঃখ পেতে হয় নাকি, সারা জীবন। বাবা বলতেন, মেয়ের মনের গতি নেই। ঘরে মন রাখেনা, আকাশে রেখে দ্যায়। এ' মেয়ে কেমন করে সুখী হবে? একটা আশঙ্কার দুঃস্বপ্ন যেন দেখতেন, সুতপার মা বাবা। কিন্তু সুতপার ভাবুকতার তাতে ছেদ পড়তোনা। সন্ধ্যে হলে ছাদে উঠে যাওয়া, রাতের আকাশের তারা গোণা—ভোরের জানলা খুলে, প্রথম সূর্যোদয়ের দৃশ্য দর্শন, নয়তো শান্ত বিষণ্ণ দুপুরে চিলেকোঠার খুপড়ী জানলায় চোখ রেখে, দূরের পাতাশূন্য শিরীষ গাছটার বিরস ছবিটা শুধু চেয়ে দেখা, এ সবই সুতপার নিত্য অভ্যেস ছিল। পড়ার সময়তেও, বই খুলে, বিমনা হয়ে ভাবতো তার মনের অতল রহস্যের সূত্রগুলো! কখনো আকাশচুম্বী সৌধে চড়ে, আস্ত পৃথিবীটাকে, পায়রার খোপ, নয় তো চড়ুই পাখীর পুঁচকে বাসা বলে মনে হোত তার। নিজেকে মনে করতো, মুক্ত বিহঙ্গ! উন্মুক্ত আকাশচারিণী। নীল সাদা, কালো মেঘের স্তরে, স্তরে কখনো সে ডুব দিয়ে দিয়ে মুক্ত নিঃশ্বাস ফেলতো। মনে হোত কি স্বাধীন জীবন।

সেই সুতপা, লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে, শ্বশুর ঘর

করতে এলো। হিমাদ্রির ঘরণী হয়ে। শ্বশুর শাশুড়ী নেই। নেই হিমাদ্রির কোন আত্মজন। তার প্রিয়জন হোল সুতপা।

প্রেতপুরীর মত একটা ঝুপ্‌সী অন্ধকার বাড়ী। পচা নর্দমার পাশে, হাঁপানী রোগীর মত দিনরাত হাঁফাতো বাড়ীটা। হাঁফিয়ে গেল সুতপা। "উঃ এই বাড়ীতে তুমি থাকো?" হিমাদ্রি কুণ্ঠিত হয়ে বলেছিল—একা মানুষ, তাও আবার ভাড়া কম। রাতটুকু শুয়ে কাটানো সুতপার আশ্চর্য লেগেছিল, এটা কি মানুষের উক্তি? একটু স্বাস্থ্য-জ্ঞান পর্য্যন্ত নেই লোকটার। সুতপা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল—'না না, এ বাড়ীতে কিছুতেই থাকা হতে পারেনা।' হিমাদ্রি নববধূকে কাছে টেনে জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার কি ভয় করে তপু? সুতপা সে কথার উত্তর দেয়নি। কিন্তু ভেবেছিল, কথাটা ঠিকই। ভয় করে বৈকি! ভয় পাবার মত একটা ভূতের বাড়ী যেন। আলো বাতাসহীন চূণ বালি খসে পড়া বাড়ীটাকে মানুষের আবাসস্থল মনে হোতনা! মনে হোত এক রাজ্যি ভূতের আস্তানা। রাত বিরেতে গা ছম্ ছম্ করতো। ভাঙা উঠোনের ইট খসে-পড়া, পাঁচিলের গা বেয়ে মুখ বাড়িয়ে থাকতো ঝাঁক্‌ড়া-মাথা সেই নিমগাছটা। ঐ বাড়ীর তিন পুরুষের গাছ নাকি। তিন যুগ ইতিহাসের সাক্ষী!

অস্থি-চর্মসার দেহসমেত কোটরাগত দু' চোখের দৃষ্টি জেলে, আশীর বুড়ি, বাড়ীউলী হিমিপিসী বলতো, ঐ গাছ, ঐ বাড়ীর তে-পুরুষের মানুষগুলোকে বড় হতে দেখেছে। মরতে দেখেছে। ওটার মধ্যেই নাকি তিন পুরুষের জ্যান্ত পরাণগুলো ধ্বক্ ধ্বক্ করছে।' শুনতে গিয়ে সুতপা শিউরে উঠতো! উঃ কি সব্বনেশে বাড়ী! ছেলে দেখে সুতপার বাবা-মা পছন্দ করলো, কিন্তু এমন বাড়ীর কথা মনে ঠাঁই দেয়নি। নইলে সুতপা কি আসতো এই বাড়ীতে মরতে? তার চেয়ে কুমারী থাকা ভাল। নইলে এ বাড়ী থেকে এখুনি পালানো দরকার। স্বামীকে সে ক্রমাগত ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো—আর এখানে নয়। শিগ্‌গীর বাড়ী দেখো। উঃ আকাশ নেই বাতাস নেই শেষে দম বন্ধ হয়ে মরবো?"

হিমাদ্রি বুঝেছিল, সুতপার মনের অবস্থা। তাই তলে তলে সে নিজেই চেষ্টা চালাচ্ছিল, বাড়ী বদলানোর। তাও চট করে হোল কোথায়? কোলকাতায় বাড়ী খুঁজতে গিয়ে দশ মাস প্রায় কেটে গেল। শেষে বাড়ী মিললো, কিন্তু ভাড়ার অঙ্ক শুনে হৃদস্পন্দন স্থির। মাত্র একখানা ঘরের ভাড়া পঞ্চাশ টাকা? মাইনের এক তৃতীয়াংশ! হবেনা, বলে থামলো হিমাদ্রি। সুতপা নাছোড়বান্দা! নিতেই হবে ঐ বাড়ী। আলো বাতাস, রাস্তার ওপর, অমন ঝকঝকে ঘরের ভাড়া, পঞ্চাশ টাকা বোধহয় কিছুই নয়। তাও খাস কোলকাতায়। স্বামীকে বোঝালো সুতপা। হিমাদ্রি বুঝলো বটে। তবে তিনটে রাত সে ভেবে নিল। দশ টাকার জায়গায়, আরও চল্লিশ টাকা বাড়তি? ভাবতে গিয়ে তার তিন রাতই ঘুম হোলনা। কিন্তু চতুর্থ দিনে মন স্থির করে, সুতপার ইচ্ছেকেই বলবৎ করলো। একে বউ, তায় নববধূ! কোন ইচ্ছেই বোধহয়, অপূর্ণ রাখা যায় না। নিজের ইচ্ছেটাকেও হয়তো হারাতে ইচ্ছে করে।

মাইনে পেয়েই ওরা চলে এসেছিল। এসেই ঘর-দোর সাজাতে সুরু করলো সুতপা। কতদিন মনের মতন ঘর সাজানোর অবকাশ হয়নি। নতুন ডিস্‌টেম্পার করা ঘরের দেওয়ালে, সুদৃশ্য ক'টা ছবি সে টাঙালো। তার বিয়েতে পাওয়া সেই বড় আয়নাটাও। ঠিক তার নীচেই, দেওয়াল ঘেঁসে ভাঙা রংচটা টেবিলটা ঠেস্ দিয়ে রাখলো। বাক্সে তোলা তার নিজের তৈরী করা আইহোল্ ষ্টীচ্ এর—সৌখিন ফুল তোলা টেবল্ ক্লথটা বার করে ঢেকে দিল, টেবিলের সমস্ত সামনেটার চেহারা ফিরলো। যেন কালো কুৎসিৎ মেয়েকে বিয়ের রাতে, নতুন বেনারসী, গয়না পরিয়ে সাজানো হোল। তাতে সৌন্দর্য ধরা পড়লো। হিমাদ্রি দেখে বললো—"বাঃ বেশ সাজিয়েছো তো! সুতপা টেবিলের ওপর তাদের যুগল মূর্তির ফটো ষ্ট্যাণ্ডটা রাখতে রাখতে, বেশ গর্বিতভাবে উত্তর দিল—"দেখতে হবে তো কে সাজাচ্ছে!" হিমাদ্রি সহাস্যে উত্তর দিল—হুঁ—দেখছি বৈ কি, আমার বউ। সুতপা সশব্দে হেসে উঠলো। পরে ওরা দুজনে ধরাধরি করে, পায়া ভাঙা চৌকিটা, ঘরের ঠিক জায়গায় রাখলো। কিন্তু সুতপার ঠিক মনঃপূত হোল না। খুতখুঁতে গলায় বললো—উঁহু, হোল না। ঘরের আয়তনের সংগে মেলেনি। একটু সামঞ্জস্যহীন দেখাচ্ছে। সুতপা যেন তার ঘর সাজানোটাকে

একটা কবিতার মত তৈরী করতে চাইলো। মিল, ছন্দ, সমতা, সব নিয়ম মেনে নিয়ে। হিমাদ্রি আবার ঘর্মাক্ত হয়ে চৌকি টানলো। সুতপার নির্দেশমত সামঞ্জস্য রক্ষা করলো। সুতপা সানন্দে বললো—'ব্যস্ এই ঠিক।' ঘরের মুখ বদলে গেল। থাঁদা নাকে মুক্তোর নোলক দুললো!

সাদা ধবধবে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো হিমাদ্রি।—উঃ আর নয়। এবার সাজানো রেখে, ষ্টোভে খিচুড়ী চাপাও। ক্ষিদে পেয়েছে ভীষণ। সুতপা হাসিমুখে অনুনয় জানালো—"লক্ষীটি, আর একটু সেরে নিই', সে ব্যস্ত হয়ে মিট-সেফের ওপর জাপানী কাঁচের টি-সেটটা সাজিয়ে নিয়ে, রান্না ঘরের দিকে চলে গেল। সে দিনটা ছিল, সুতপার কাছে একটা উৎসবের দিন। মনের আনন্দে পরিশ্রম করেছিল রাত পর্যন্ত। আর সমস্ত রাতটাই সুতপা গল্প করে কাটিয়েছিল—স্বামীর সংগে! আনন্দের স্রোতে সুতপা খাওয়া ঘুম বাদ দিয়ে মন ভাসিয়েছিল।

তারপর থেকে সুতপার দিনগুলো কাটছে। কাজ করে। বই পড়ে। ঘর সাজায়। মনোমত না হলে, এটা ওটা টেনে সরায়। যে ভাবে হোক সময়টাকে সে পার করে দ্যায়। সবচেয়ে আনন্দ হয়—বিকেলবেলায় জানলার সামনে দাঁড়াতে। এক বুক নিঃশ্বাস নিয়ে, নীল পর্দা ঠেলে সমস্ত মুখখানা বাড়িয়ে দ্যায়। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু অসীম নীলাকাশে ছড়িয়ে পড়া মেঘের রাশিগুলো চোখে পড়ে। ধোঁয়ার মত ধূসর। কখনো বরফের স্তূপের মত জমাট! নীল, সাদা, কালো, রঙে রঙে ছড়াছড়ি। হরেক রঙের বাহার। উজ্জল দৃষ্টি মেলে যেন সুতপা, মেঘের মেলা দেখে বেড়ায়। আর সেই আকাশ-ছোঁয়া কল্পনা তাকে ঘিরে তৈরী করে এক অদৃশ্য জগৎ। কিন্তু বিরক্ত হয়ে একদিন হিমাদ্রি বললো—"রাস্তার সামনে জানলায় ও'ভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, হাজার লোকের দৃষ্টি পড়ে। কথাটা শুনে সুতপার বিস্ময় জাগলো। হঠাৎ এ' উক্তি? কিন্তু চিন্তা করার আগেই ও' জবাব দিল—এতদিন কোথায় ছিলাম বলতো; শুধু দমবন্ধ ঘরে পচে মরা। হাঁফিয়ে উঠেছি একটু আলো বাতাসের অভাবে। আজ এমন সুযোগে আমায় বাধা দিওনা, লক্ষীটি! কাতর সুর সুতপার কণ্ঠ ছাপিয়ে ওঠে। হিমাদ্রি এ' কথায় বিশেষ খুসী হোলনা। বরং একটু উত্তপ্ত ছায়া, সারা মুখে তার ছড়িয়ে পড়লো। মেয়ে বউদের ও' ভাবে জানলায় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দৃষ্টিকটু বৈকি! আর রাস্তার লোকগুলোই বা কি ভাবে? সুতপা একেই সুন্দরী, তাও মাথায় গায়ে কাপড় থাকেনা। ভারি খেয়ালী মন। —না, না, এ' মোটেই ভাল নয়। মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো হিমাদ্রি। চাপা রোষে সে বললো—কি আশ্চর্য তোমার অনুরোধ, নিজে কিছু বোঝনা জানোনা, ওভাবে দাঁড়ানো চলে না? স্তব্ধ হয়ে গেল সুতপা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে। এ' যেন নতুন মুখ। নতুন গলার স্বর। এ সবের সংগে তার কোনদিনও পরিচয় নেই। হিমাদ্রিকে যেন ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক মনে হোল। পর মুহূর্তে চোখে জল এলো, কিন্তু সামলে নিলে নিজেকে। কেন, কিসের জন্য সে হার মানবে? পরাজিত হতে চায়না সুতপা, প্রতিবাদ জানালো—তার মানে? তুমি বলতে চাও, আমার দাঁড়ানো অপরাধ, আর তাই নির্বিবাদে, মানতে হবে?" এ কথায় হিমাদ্রি যেন জলে উঠলো—"মানে নয়। মানতে হবে।" সুতপা ঝাঁকালো হয়ে উত্তর দিল—"হ্যাঁ, তাই মানবো, কিন্তু বলতে পারো অপরাধ কোথায়? বিচিত্র পৃথিবীর পথে-ঘাটে তোমরা ঘুরে বেড়াও, বুক ভরে চোখ ভরে তার সব স্বাদটুকু নিয়ে নাও, কেবল আমাদের বেলায় অপরাধ? শাসনের ব্যবস্থা?" এবার আরও কঠোর ভাবে জবাব দিল হিমাদ্রি—হয়তো তাই। সমস্ত নিয়মের মধ্যে তোমরা থাকতে বাধ্য। পৃথিবীর বৈচিত্র্য তোমাদের নয়, আমাদের। ঘরের মধ্যেই, তোমাদের সীমানা তৈরী করেছে বিধাতা"—আশ্চর্য! কি অমানুষিক যুক্তি! রুদ্ধস্বরে সুতপা জিজ্ঞেস করলো—তাহলে মেয়েদের মনটা মূল্যহীন? অর্থাৎ মনের বালাই নেই? হিমাদ্রি আবার স্পষ্টভাবে উত্তর দিল—হ্যাঁ, বিধাতার নিয়মানুসারে মেয়েদের মনের মূল্য বহির্জগতে নিতান্ত নগণ্য। সংসারের মধ্যে তোমাদের মনটুকুর স্থান হতে পারে। বাইরে গেলে তা ধৃষ্টতা! উপরন্তু বেয়াদপি স্পর্দ্ধা! সুতপা আর প্রতিবাদ করলো না। যুক্তিহীন তর্কে যোগ দিতে তার বিরক্তি লাগলো। উপরন্তু অভিমানে সে সরে গেল। আড়ালে গিয়ে চোখভরা জলটুকু, দু'হাতে চেপে ঝরিয়ে ফেললো সে।

সেই নীল পর্দা ঠেলে মনের মেয়ের দাঁড়ানো বন্ধ

হোল। সুতপাই হার মেনেছে। হয়তো এমনি করে হার মানতে হয় অনেক মেয়েকেই। তাই তার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হোলনা। আর উপায় বা কি? মেয়েদের মন নেই। বিমনা মেয়ে সুতপা তাই ঘরের নিভৃত কন্দরে অবস্থান সুরু করলো। নীল পর্দাটা এবার থেকে একই নিয়মে দাঁড়িয়ে রইলো। মুক্ত বাতাসের অবাধ গতিপথও রুদ্ধ হোল। পর্দার সামান্য গলিপথ দিয়ে,—সামান্য যাতায়াত। একটু উঁকি ঝুঁকি দেওয়ার প্রয়াস! নিদাঘের উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে—বাতাসহীন ঘরে—সুতপার অস্থিরতা বাড়লো। হাঁফিয়ে উঠলো সে। উঃ এই পবিত্র বাতাসের গতিপথ কে রুদ্ধ করলো? সুতপা মনে মনে বিষাক্ত হয়ে উঠলো। কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেনা, স্বামীকে। নিষ্ঠুর নির্দয় ঐ মানুষটা! অশ্রদ্ধায় অতৃপ্তি জাগে ধীরে ধীরে। কিন্তু বাইরে সুতপা তার কিছুই প্রকাশ হতে দিলনা। সংসারে শান্তির প্রচেষ্টা তার একান্ত কাম্য!

বোধহয় কোন শুভ কামনাই অনাবিল পথে এগোতে পারেনা। দৈবের মত, অদৃশ্য শয়তান তার রাহুগ্রাস প্রসারিত করে এগিয়ে আসে। নইলে এত করেও হিমাদ্রি কেন খুশী হোলনা? তার অভিযোগের কাঁটা তো সে তুলে দিয়েছে? কিছুই ভেবে কুল পেলনা সুতপা। জানালায় দাঁড়ানো তার বন্ধ, তবু হিমাদ্রি কেন আজও সন্দিগ্ধ? অফিস থেকে ফিরেই, সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে। জানালার পর্দার দিকে চেয়ে। একটু যেন পর্দাটা সরে আছে। মনে হচ্ছে, তার ফেরার আগে, সুতপার গোপন উপস্থিতি ছিল। হয়তো, তার অজান্তে সুতপা তার দাঁড়ানোর অভ্যেস একই নিয়মে চালাচ্ছে। মনে মনে অসম্ভব কল্পনার জাল বোনে, হিমাদ্রি। যুক্তিবাদীর অদ্ভুত যুক্তির কল্পিত ছবিগুলো, বিক্ষুব্ধ করে তোলে তাকে। মনোবাদী হিমাদ্রির মনে মনে সন্দেহের ঘোর আন্দোলন সুরু হয়। ক্রমে ক্রমে তা চরম সীমায় উঠলো। অসহিষ্ণু অতৃপ্ত হয়ে উঠলো সে স্ত্রীর ওপর। সুতপা বিস্মিত! বিমূঢ়। কিছুই সে বুঝতে পারেনা।

কিন্তু সব চেয়ে হতচকিত করলো সুতপাকে, যেদিন হিমাদ্রি বাড়ী ঢুকেই, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত প্রথম সুরু করলো সেই জঘন্য উক্তি—"আমি বাড়ী ঢুকতে দেখি সেই মাতালটা এই ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে।

সুতপা শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো—"কোন মাতালটার কথা বলছো?" হিমাদ্রি চেঁচিয়ে উঠলো, ন্যাকা সেজে আছো? জানোনা কোন মাতালটা, ঐ যুগলকিশোর! পরে একটু থেমে সে বললো—তুমি যাকে দেখে বলেছিলে, দেখলে মনে হয়না তো বউ ঠ্যাঙায়! সেই বদমাইসটা।" রাগে ফুলতে লাগলো যেন সে। সুতপা দেখলো স্বামীর রোষদীপ্ত দৃষ্টিটা তাকে লক্ষ্য করেই অগ্নিশিখার মত জ্বলছে।

তারপর থেকে প্রতিদিনই, হিমাদ্রির সেই ঘৃণিত উক্তি, জঘন্য জিজ্ঞাসা, "রাস্তা ঝাঁট দেওয়া মেথরটাও শেষে তোমাকে দেখে ভুলেছে? নর্দমা সাফ করতে করতে কেন সে উঁকি মারে জানালার পাশে? পাড়ার রাম শ্যাম থেকে মাতাল মেথর, কিসের আগ্রহে এদিকে চেয়ে থাকে জানিনা। সুতপাও জানেনা, কারও প্রলুব্ধ দৃষ্টি তাদের জানলায় থমকে থাকে কিনা। এমন ঘটনা তার চোখে পড়েনি। যদিও সে এখন জানলায় দাঁড়ায়না, কিন্তু যখন সে দাঁড়াতো এবং অন্যান্য বাড়ীর সোমত্ত কুমারী মেয়েরা পর্যন্ত নিয়মিত হারে জানলায় দাঁড়ায়। সুতপা এমন কাউকে তখন দেখেছে বলে মনে পড়েনা, যে লুব্ধদৃষ্টি ফেলেছে, এই জানলায় কিংবা অন্য বাড়ীর দিকে। তবে, নতুন ভাড়াটে দেখে কারও দৃষ্টি হয়তো পড়তে পারে, ঐ জানলায়, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কি আছে? সন্দেহ করার যুক্তিও ভিত্তিহীন। দগ্ধ-ঘৃণায় মন ভরে উঠলো সুতপার। কি হীনমনা এই পুরুষ জাতটা! মনে মুখে কিছুই আটকায় না? যা খুসী তাই ভাবা, যা খুসী তাই উচ্চারণ করা? রুচি শিক্ষা, সব কি বিসর্জন দিয়েছে হিমাদ্রি? নিজের স্ত্রীকে ইঙ্গিত করে—" উঃ আর ভাবতে পারে না সুতপা। চোখের জলে সে নিজেকে, ডুবিয়ে, ভাসিয়ে ত্যায়, মুক্তি চায় এই যন্ত্রণা থেকে।

কিন্তু সুতপার অশ্রুতে হিমাদ্রির মনের পরিবর্তন হোল না। উপরন্তু সন্দেহের আবর্তে সে ক্রমাগত ঘুরতে লাগলো। মনের মধ্যে তার বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝার প্রচণ্ড আলোড়ন চললো। দিনে স্বোয়াস্তি নেই। রাতে ঘুম নেই। কাজে মন নেই। হিমাদ্রি যেন পাগল হতে চললো। এবং এটার উৎপত্তিস্থল হোল, মাতাল যুগলকিশোরকে কেন্দ্র

করে।···অথচ সুতপাই একদিন ঐ লোকটার যেন প্রশংসা করেছিল। (দেখলে মনে হয়না বউকে মারে) হিমাদ্রিও দেখে বুঝেছে বাইরে থেকে লোকটার চেহারার বাহার আছে। দেখলে শুধু ভাল মনে হয় না, "ভালও লাগে।" সেটা কিন্তু সুতপা বলেনি। হয়তো মনে চেপে রেখে, কিছুটা মনে মনে ভালবাসতেও পারে। আর চোখে চোখেও যে সাক্ষাৎ হচ্ছে না, এমন কথাই বা কে বলতে পারে? অন্ততঃ হিমাদ্রি তা বলবেনা। তারই চোখের সামনে কতদিন ধরা পড়ে গিয়ে যুগলকিশোর চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে চোরের মত। পালিয়ে যেতে পথ পায়নি বেচারা। কিন্তু বিছের কামড়ে জ্বলে ওঠে হিমাদ্রি। ঐ সুতপাই এর মূল। নইলে লোকটা সাহস পায়? সমর্থন না পেলে? কে জানে এতদিনে ওদের প্রেমের আদান প্রদান চলছে কিনা! মেয়েদের মনকে বিশ্বাস নেই। অমন ঠুকনো মন ভোলাতে, মাতালও পারে! পাগলের প্রেমে পড়েছে, এমন মেয়েকেও, সে জানে। কি সাংঘাতিক এই মেয়ে জাতটা? পাগল, ছাগল, মাতাল, লম্পট কিছুই বাকি রাখলো না? সাধে কি শাস্ত্রে বলেছে—'স্ত্রী মন, না জানে মধুসূদন'। গোটা বিশ্বটাকে ওরাই বোধ হয় রসাতলে ভাসিয়ে দিতে পারে। হিমাদ্রির সর্বাঙ্গ শিহরিত! ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলো সে।

ভয়ার্ত সুতপা আতঙ্কিত হয়ে ভাবলো লোকটা কি শেষে পাগল হয়ে যাবে? সমস্ত রাতে চোখের পাতা এক করে না। অন্ধকার ঘরে পায়চারী করে, মুখে বিড়বিড় করে কি যেন বলে! সুতপা তার বর্ণোদ্ধার করতে পারেনা। বিবর্ণ হয়ে যায়। স্বামীর বিক্ষিপ্ততা দেখে। সুতপা বোঝাতে চায়, স্বামীকে সান্ত্বনা দেয়—কেন এই মিথ্যে ভাবনা নিয়ে মরছো? এই পাগলামীর কোন অর্থ হয়? কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে যায়। হিমাদ্রি তার ধারণায় স্থির। সুতপাকে তার বিশ্বাস নেই। ঐ মেয়েরা রহস্যময়ী, ছলনাময়ী, মায়ায় ভোলাতে চায়। কথায় বোঝাতে চায়। সব মিথ্যে, সব ফাঁকি! না না, সে কোন কথা শুনতে চায় না, সুতপা কিছু বলতে গেলে হিমাদ্রি চেঁচিয়ে ওঠে। অনেক সময় নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকে। ডাকলে ওঠেনা। কথা বললে সাড়া দ্যায় না। প্রায় দিন অফিস কামাই, প্রায় দিন লেট্। সুতপা ভাবনায় পাথর হয়ে যায়। স্বামীর ভালবাসা, মন সবই সে হারিয়েছে, এখন কি লোকটা শেষে পাগল হয়ে যাবে? এমন বিকৃত মানুষকে চোখে দেখা তো দূরের কথা, গল্প উপন্যাসেও নজির পায়নি। সুতপার মনে হোল, একটা দুঃস্বপ্ন সে দেখছে। রুদ্ধ নিশ্বাসে হাঁপিয়ে মরছে···।

হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে পড়ন্ত বেলায় সে পথে নামলো। দু' চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা, মরা ম্রিয়মান কণ্ঠস্বর! একা সে কখনো পথ হাঁটেনি। হিমাদ্রি থাকে সংগে। কিন্তু আজ একাই চলেছে সুতপা। একা। বড় একা। একা একা পথ হাঁটে।···

ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ীটার সামনে এসে সে দাঁড়ালো। চিনতে ভুল হয়নি। সেই রুদ্ধশ্বাস কানা গলি। পচা নর্দমা। ধ্বসে পড়া, একফালি বাড়ীর অংশ। এখানে দাঁড়িয়ে সুতপার মনে হোল, সত্যি কি এ বাড়ীতে মানুষ থাকে? অথচ এখানে পাক্কা দশ বছর কাটিয়েছে হিমাদ্রি। আর হিমিপিসীর জীবন ভোর কাটলো।

দরজা ধাক্কা দিতে হিমিপিসী বেরিয়ে এলো—'কে রে কাজ্‌লী নাকি?' কাজ্‌লী এ পাড়ায় পুরোন যুগের মেয়ে। হিমিপিসীর সই। মাঝে মাঝে সে আসে। সুতপা বললো—"পিসী আমি। তোমার সেই নতুন বৌ!"—ওমা! হ্যাঁ গা তুই, সোল্লাসে আহ্বান জানালো হিমিপিসী, তা বাইরে কেন রে, ভেতরে আসবি নি? চোখেও তেমন দেখি নে বাছা। তোরাও গেলি-পর না খেয়ে মরি"—সুতপা এগিয়ে গেল।—"কেন পিসী, ঘর কি তোমার ভাড়া হয়নি?" মনে মনে কিন্তু সুতপা সেটা আন্দাজ করে এসেছিল। ও'ঘর ভাড়া হবে না সে তা জানতো। কথাটা আরও ভাল করে মিলে গেল। হিমিপিসী হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে বললো—"ভাঙা ঘর কেউ ভাড়া নিতে চায় না। আলো নেই। বাতাস নেই। দিনে পিদীম জ্বলে, রেতেও কুপী—সবাই বলে যায়, মানুষ থাকে এখানে। এখন বল্ দিকিন বাছা তোরাও তো মানুষ ছিলি। তোদের ঠাঁই হোল তো, ওদের কেন হয়না?' হিমিপিসীর গলার স্বর কেঁপে কেঁপে ওঠে। সুতপা যেন প্রস্তুত ছিল। সংগে সংগে জবাব দিল—'ও ঘর কেউ ভাড়া নেবেনা পিসী! আমরাই আসবো।' "সত্যি বলছিস্?" অবিশ্বাস্য আশায় হিমিপিসীর ক্ষীণদৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ঠিক আসবো। দশ টাকার ভাড়ারও পাঁচটাকা বাড়িয়ে আসবো। কিন্তু মনে মনে সুতপা বললো—পাঁচ টাকা কেন, যত খুশী বাড়ানো যাবে। ওই ঘর তার চাই। তবে আর নয়। আনন্দে সে পথে নামলো। হিমিপিসীর শেষ কথাটাও তার শোনা হোল না।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যঃ দেশাত্মবোধ

শ্রীপ্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ,

উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের সার্থক সূচনা। কথাটা পাকাপাকি ভাবে স্বীকৃতির দৃষ্টান্ত যেমন বিরল, অস্বীকৃতির যুক্তিও তেমন দৃঢ় নয়। একথা ঠিক, উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাঙ্গালী-ভাবনায় দেশপ্রীতির স্ফূর্তি যতটা ব্যাপক বাঙ্ময় রূপ গ্রহণ করেছে, পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যে উহা ততোটা প্রত্যাশিত ছিল না। মুসলমান-বিজয় বাঙ্গালী চেতনাকে আকাঙ্ক্ষিতভাবে আত্ম-সচেতন করতে সক্ষম হয়নি, অথচ ইংরেজ আগমন সে সাফল্যকে সার্থক করেছিল। এর দুটো কারণ; এক বাণিজ্যিক, দুই সাংস্কৃতিক। ফলতঃ উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে দেশ ও জাতি চেতনা গভীরতর হয়েছিল। এ কারণেই ঐ যুগের বাংলা কাব্যে জাতি-ভিত্তিক বীর কাহিনীর উদ্ভব। সুতরাং অস্বীকারের উপায় নাই, ইংরেজ বিজয়ের ফলেই বাঙ্গালী-ভাবনায় পরাধীনতার জ্বালা বৃশ্চিক দংশনের সৃষ্টি করেছিল।

ওপরের কথা অনুসারে বলা চলে, উনিশ-শতকী বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধ সক্রিয় ও সার্থক হয়েছে। দেশাত্মবোধের প্রতিফলন দেশচেতনা ও দেশপ্রীতিতে। যে জাতির বা ব্যক্তির দেশ সম্বন্ধে বোধ নেই, তার দেশ-প্রীতি স্বভাবতই জাগে না।

উনিশশতকী বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধ সক্রিয় ও গভীর হয়েছে। কিন্তু এর বীজ রয়ে গেছে আরও সুদূরে।

মুসলমান ও ইংরেজ বাংলা দেশে যখন অনুপস্থিত, তখন বাঙ্গালীর রচিত সাহিত্যে দেশাত্মবোধ কোন্ স্বরূপে ছিল, তার সংবাদ সন্ধান করা শক্ত। তবে একথা ঠিক, আধুনিক কালের দেশপ্রীতির প্রকাশ ও বাঙ্ময় রূপ মধ্যযুগীয় সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র হলেও উনিশ শতকী বাংলা সাহিত্যের দেশাত্মবোধের মূল যে প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে রয়েছে, তা অস্বীকার করা চলে না।

উনিশ-শতকী দেশাত্মবোধ সক্রিয়, গোষ্ঠীপ্রধান এবং গভীর। ব্যাপক ও স্পষ্ট। এই শতাব্দীর পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের যে কেন্দ্রিকতা তা সীমিত পরিমিত, ধর্ম্ম জাতি ও রাজভিত্তিক। কারণ তখন বাহিরের সংঘাত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। যেটুকু করেছিল তা ধর্ম্মের ও পূজার মধ্যে সীমিত ছিল। সুতরাং তা বৃহৎ মানব গোষ্ঠীর মুক্তির কথা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে পারেনি। আর এইজন্যেই উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে প্রতিফলিত যে দেশপ্রীতি—তা রূপে-রেখায়, ভাষায় ও চিন্তায় পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ থেকে আলাদা। উনিশ শতকের দেশাত্মবোধ ব্যাপক ও গভীর হওয়ার মূলটা কোথায়? ত্রয়োদশ শতকের তুর্কী আক্রমণ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ বিজয় এই উভয়ের সমন্বয়ের ফলে ষষ্ঠ শতাব্দীর দেশপ্রীতির স্বরূপ স্বতন্ত্র, উজ্জ্বল ও ব্যাপক হয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে দেশ চেতনার যে প্রকাশ, তার কিছুটা তুর্কী অত্যাচার হতে জাত। অর্থাৎ বিধর্ম্মীর পীড়ন জাতিকে দগ্ধ করছিল। একথা যেমন ঠিক, তেমনি এও স্বীকার্য্য যে, ঐ দেশপ্রীতির আর এক উৎস ছিল ভারতীয় মহাকাব্য।

এখন দেখা যাক, ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের স্বরূপ কেমন ছিল। ষোড়শ শতকের জাতি ও দেশপ্রীতি ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। কিন্তু এরও পূর্ব্বে দেশপ্রীতি কি বাংলা সাহিত্যে অনুপস্থিত ছিল? একথা বললে নিশ্চয়ই কষ্টকল্পনা করা হবে না যে, দশম শতাব্দীর প্রহেলিকাচ্ছন্ন ধর্ম্মীয় সাহিত্যে 'চর্য্যাপদে' বাঙ্গালী চেতনার ইঙ্গিত রয়েছে। ৪৯নং পদটি ভুসুকের।

কবি বলেছেন : অজয় জঙ্গালে দেশ লুড়িউ। অর্থাৎ নির্দ্দয় দস্যু দেশ লুট করিল। এর ধর্ম্মীয় ব্যাখ্যা যাই থাকুক, নির্দ্দয় দস্যু কর্ত্তৃক দেশ লুণ্ঠিত হওয়ার জন্য কবি-চিত্ত যে ব্যথিত, তারই এক ইঙ্গিত এতে প্রতিফলিত হয়েছে।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় "বঙ্গ সাহিত্যে স্বদেশ চেতনা ও ভাষারীতি" পুস্তকে যে আলোচনা করেছেন, তাতে উনিশ শতাব্দীর-পূর্ব্ব সাহিত্যে দেশ চেতনার সামান্য আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতীয় মহাকাব্য ও সংস্কৃত সাহিত্যে স্বদেশ বন্দনার দৃষ্টান্ত ব্যাপক। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিতে দেশাত্মবোধ স্পষ্ট, উজ্জ্বল এবং সার্থক। মহাভারত কথাটিই তো দেশ-প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এ বাক্য মহাকবি বাল্মীকির। বিষ্ণুপুরাণের ভারতমাতার মাহাত্ম্য কীর্তনের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের স্বদেশ বন্দনার মধ্যে ঐক্যসূত্র যেমন স্পষ্ট, সাদৃশ্য হীনতাও তেমনি আছে। এতএব, এ সিদ্ধান্ত অমূলক নয় যে, দেশ বন্দনার ধারা কেবলমাত্র উনিশ শতকেই জেগেছিল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য থেকে দেশপ্রীতির ধারা যদি বাংলা সাহিত্যে এসে থাকে, তবে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে এই বোধ অ-প্রকাশ থাকে কিরূপে? বলা চলে বাংলা সাহিত্যে দেশবন্দনা আকস্মিকও নয়, বিদেশ আগতও নয়।

নয় বলেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেশচেতনা জাতি ধর্ম ও সংগ্রাম মহিমা বর্ণনায় উজ্জ্বল। এই যুগের সাহিত্যে দেশপ্রীতির লক্ষণ জাতিকেন্দ্রিক, ধর্ম-ভিত্তিক ও রাজানুগত্যমূলক। রাজাকে বা জমিদারকে ব্যাসের সমান, রামচন্দ্রের সমমূল্যে মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে। গৌড় দরবারের সাহিত্যে এ-জাতীয় রাজবন্দনা তো প্রচুর। হিন্দু কবিরা মুসলমান নবাবকে সাক্ষাৎ রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর রাজ্যকে অমরাবতী বলেছেন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ষোড়শ শতাব্দীর। 'চণ্ডীমঙ্গলে কবি নিজের গ্রাম মহিমা বর্ণণা করেছেন। এতে দেশ-প্রাণতার প্রতিফলন স্পষ্ট :

দামুন্যার লোক যত শিবের চরণে রত,
সেইপুরী হরের ধরণী।

* * *

গঙ্গা সম সুনির্ম্মল তোমার দুচরণ জল
পান কৈনু শিশুকাল হইতে।

নবদ্বীপ বর্ণনাও দেশ বন্দনা :

ভুবনে বিখ্যাত গ্রাম সুধন্য সুপুণ্য গ্রাম
জম্বুদ্বীপ আর নবদ্বীপ।

রাজবন্দনাতেও দেশপ্রীতির স্বাক্ষর :

আড়-রা ব্রাহ্মণ ভূমি ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান।

* * *

ধন্য রাজা রঘুনাথ রূপে গুণে অবদাত
বীর-বাঁকুড়া ভাগ্যবান।

বিধর্ম্মী রাজার অত্যাচার বর্ণনা :

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণু পদাম্বুজ ভৃঙ্গ
গৌরাঙ্গ উৎকল অধিপ
যে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ যরিপ ॥
উজীর হলো রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল অরি।

উনিশ শতাব্দীর দেশ বন্দনার প্রকাশ লক্ষ্য করলে এর তফাৎ বোঝা যাবে :

জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি
ধর্ম্মহীন ভূমাহীন হয়ে?
(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

চৈতন্যভাগবত ষোড়শ শতকের। চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম ও ভক্তি প্রচারধর্ম্মের কারণে, এবং সংস্কারবদ্ধ ও সুলতানী অত্যাচারে পীড়িত মানুষকে সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। মহাপ্রভুর দিব্য আবির্ভাব জাতীয় মুক্তির পথকে প্রশস্ত করে দিল। সাহিত্যেও তার ব্যাপক প্রভাব ঘটলো। চৈতন্য-কেন্দ্রিক রচনাসমূহে যে বীরবন্দনা তার লক্ষ্য চৈতন্যদেব। চৈতন্যপ্রভুকে এই অর্থেই বাঙ্গালীর মুক্তিদাতা বলা চলে কিনা তা বিচার করে দেখতে হবে। রামমোহন রায়কে ভারতপথিক বলা হয়। রামমোহনের প.ক্ষ এ-কথা যদি প্রযুক্ত হয়, তবে মহাপ্রভুকে কি বলবো? চৈতন্য-আবির্ভাবকেই বাংলার নবযুগের মাইলষ্টোন বলা সঙ্গত। এক শ্রেণীর মানুষ—সংখ্যায় এরা অধিক, মুসলমানী শাসনে ভোগ বিলাস মত্ত,

স্তাবক ও জিজ্ঞাসাশূন্য জীবন যাপনে জড়ত্ব পেয়েছিল। মহাপ্রভু এই অবস্থা থেকে মানুষকে আত্মচিন্তায় মগ্ন হবার আহ্বান দিলেন। নিজেকে জানার সঙ্গে দেশকে জানার প্রেরণা আসে। বেদের 'আত্মানং বিদ্ধি'—নিজেকে ও দেশকে জানার মন্ত্র। নিজের জানার প্রেরণা থেকে জাগে আত্মশুদ্ধি। মহাপ্রভু এই আত্মশুদ্ধির মন্ত্র দেন।

অধর্ম্মের বৃদ্ধিই আত্ম-পরাধীনতার পরিচয়।

ধর্ম্ম পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্ম্মের প্রবলতা বাঢ়ে দিনে দিনে ॥

ধর্ম্মহীন জাতির মন্ত্র কি ?

কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরি সংকীর্ত্তন।

বিংশ শতাব্দীতে 'বন্দেমাতরম্,' 'ভারতমাতা কি জয়' জাতীয় শ্লোগানাবলির সঙ্গে এর সাদৃশ্য কি কষ্টকল্পনা? হরিসংকীর্ত্তনকে জাতীয় মুক্তির মন্ত্ররূপে দেখেছিলেন বৃন্দাবনদাস :

এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন।

জাতির আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের জন্য যে ঐকান্তিক কামনা, তাই বীর বন্দনা। চৈতন্যভাগবতে নবদ্বীপ বর্ণনা :

নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।

চণ্ডীমঙ্গলেও এই জাতীয় বর্ণনা রয়েছে।

১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর লেখা 'ধর্ম্মমঙ্গলে' দেশাত্মবোধের পরিচয় আরও সার্থক : রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণে। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবতে'ও জীবের কল্যাণ কামনা করা হয়েছে।

গৌড় দরবারের কবিদের রচনা অনেক উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এযুগের সাহিত্যে রাজবন্দনা ও দেশ-বর্ণনাও প্রচুর। এগুলি নিছক স্তুতিগান নয়! মনে হয় এরই মধ্যে দেশ-প্রাণতার অস্ফুট আভাস রয়েছে। 'চৈতন্য ভাগবতেও' যবনভীতি আছে :

'অন্যথা যবনে গ্রাস করিবে কেবল।' এর সার্থক প্রকাশ 'বীরবাহুতে' :

এবে সেই দেশমান্যা ভারত বক্ষেতে।
ম্লেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে ॥

অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র 'অন্নদা মঙ্গলে' ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা ক্লাসিক সাহিত্যের অনুবর্ত্তন :

সপ্ত দ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ ॥
তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান।
সাধ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান ॥

এর সঙ্গে তুলনীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'ভারতবর্ষ' শীর্ষক কবিতায় :

সিন্ধু হতে ব্রহ্মপুত্র হিন্দুস্থান ভূমি,
অবিস্মৃত অগণিত 'বীর-প্রসূ-তুমি!
স্বাধীনতা বেদী দিলে সুখ-পীঠ-স্থান।
গৌরব কবর এবে অসুখ আধান ;
আর্য্যালোক-বাস বলি আর্য্যাবর্ত্ত নাম
তবগরিমার বুঝি এই পরিণাম!

কাজেই ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকী সাহিত্যে যে দেশ-বন্দনা আছে, উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে তা আরও সার্থক ও ব্যাপক হয়েছে। এর কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকূলতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়।

উপরি আলোচিত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের আলোচনা করা কি অপ্রাসঙ্গিক ?
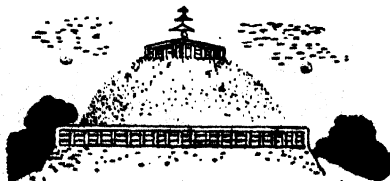
বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির কুফল

শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য

ইংরেজ আমলে লক্ষ্য করেছি যে প্রত্যেকটি জাতীয় আন্দোলনে ছাত্র-সমাজই প্রথমে সাড়া দিয়েছে, মুক্তি আন্দোলনে তারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে এবং ইহাকে সাফল্য মণ্ডিত করে তোলবার জন্য যে কোনরূপ ত্যাগ স্বীকার করতে, এমন কি জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। যে দেশের ছাত্রছাত্রীরা কিছুকাল পূর্বেও এইরূপ বীর ও সাহসী ছিল, যারা বৃটিশের গুলির সামনে এগিয়ে যেতেও দ্বিধা করেনি, যাদের অতীত কার্যকলাপ গৌরব মণ্ডিত, গত বছর চীনা আক্রমণের প্রথম ভাগে তাদের নিকট উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যায়নি বলে কোন কোন মহল অভিযোগ করেছে। এর জন্য দায়ী ছাত্রসমাজ নয়, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাই ইহার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। মানুষের জীবনে শিক্ষার প্রভাব খুবই বেশী, ছাত্রজীবনে যে যেরূপ শিক্ষা পায়, তার চরিত্রও সেইরূপ ভাবে গঠিত হয়ে থাকে। ছাত্রজীবনে সামরিক শিক্ষা পেলে ছাত্রের মনোবৃত্তি হবে সামরিক, ধর্মীয় শিক্ষা পেলে হবে ধার্মিক, ধর্মের সম্পর্কহীন শিক্ষা পেলে হবে দেশের কুলাঙ্গার ইত্যাদি। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সুফলের চেয়ে কুফলই বেশী। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি ধর্মাবতার, এবং ভীম, অর্জুন, পুরু, রাণাপ্রতাপ, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বীর-পুরুষদের জীবনকাহিনী প্রতিটি স্কুলে পড়াবার ব্যবস্থা হলে ছাত্রজীবন হতেই প্রত্যেকের মনে স্বধর্ম ও স্বদেশ-প্রেমের প্লাবন আসবে, সমগ্র জাতি উন্নত ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী হবে। কিন্তু সংগ্রামী মনোভাব সৃজনের ও উত্তম চরিত্র গঠনের সহায়ক এই সমস্ত পুস্তক পড়ানোর দিকে শিক্ষক মহাশয়দের ততটা ঝোঁক নেই, যতটা আছে ছাত্রছাত্রীদের $a^2+b^2=(a^2+2ab+b^2)-2ab=(a+b)^2-2ab$ ইত্যাদি শেখানোর দিকে। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, বর্তমান যুগের শিক্ষাপদ্ধতি দেশে সংগ্রামী মনোভাব সৃজনের মোটেই সহায়ক নয়। ইহা ছাড়া বর্তমান যুগের শিক্ষার প্রভাবে জীবনের প্রথম ভাগ থেকেই ছাত্রদের কেহ কেহ ঈশ্বরের ভক্তি, পরলোক বিশ্বাস, গুরুজনে শ্রদ্ধা, ভদ্রতা, নম্রতা, শিষ্টাচার ইত্যাদি হারিয়ে ফেলছে। এইরূপ দৃষ্টান্তও আমাদের চোখে পড়ে, যেখানে সন্তান জনকজননীর সঙ্গে অভদ্র আচরণ করছে। শিক্ষক মহাশয়ের সামনে সিগারেট টানতে টানতে যাচ্ছে, প্রমোশন না দিলে শিক্ষককে অপমান করছে ইত্যাদি। এইতো বর্তমান শিক্ষার প্রভাব। মারাঠাবীর শিবাজীর নাম সকলেই জানেন। তিনি লেখাপড়া কম জানতেন, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি লেখাপড়া জানতেনই না। মায়ের নিকট সব সময়ে রামায়ণ ও মহাভারতের যুগের বীরপুরুষদের কাহিনী শুনে শুনে তাঁর ভেতর এমন স্বদেশ প্রেমের প্লাবন আসে যে তিনি হিন্দুদের তথা ভারতের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের জন্য বহিরাগত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করেন এবং ভারতের বুকে এক স্বাধীন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে যান। আজ যদি ৪৪ কোটি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর স্থলে শিবাজীর মত মাত্র ৪৪ লক্ষ অল্পশিক্ষিত স্বধর্ম, স্বজাতি ও স্বদেশ প্রেমিক বীর পুরুষ এদেশে থাকতো, তবে হিংস্র চৈনিক ড্রাগনের বিষদাঁত ভেঙ্গে ভারত আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হতো।

যারা ভারতীয় স্বাধীনতার অবিনশ্বর ভাস্কর সুভাষচন্দ্রকে জাপানের দালাল বলে কুৎসা রটনা করেছে, যারা আজাদ-হিন্দ ফৌজের ভারত আক্রমণকালে এই ভারতীয় বাহিনীর বিরোধিতা ও ইংরেজের পক্ষে প্রচার কার্য চালিয়েছে, যারা বর্তমান জনপ্রিয় কংগ্রেস সরকারের বিরোধিতা করছে এবং যারা চীনাহানাদারদের মুক্তিফৌজ আখ্যা দিয়ে বরণের

সাগর বেলায়

: রণেন্দ্রশেখর ঘোষ

*

অস্তাচল

*

ফটো : বিমল সরকার

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
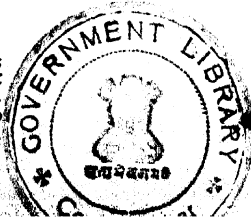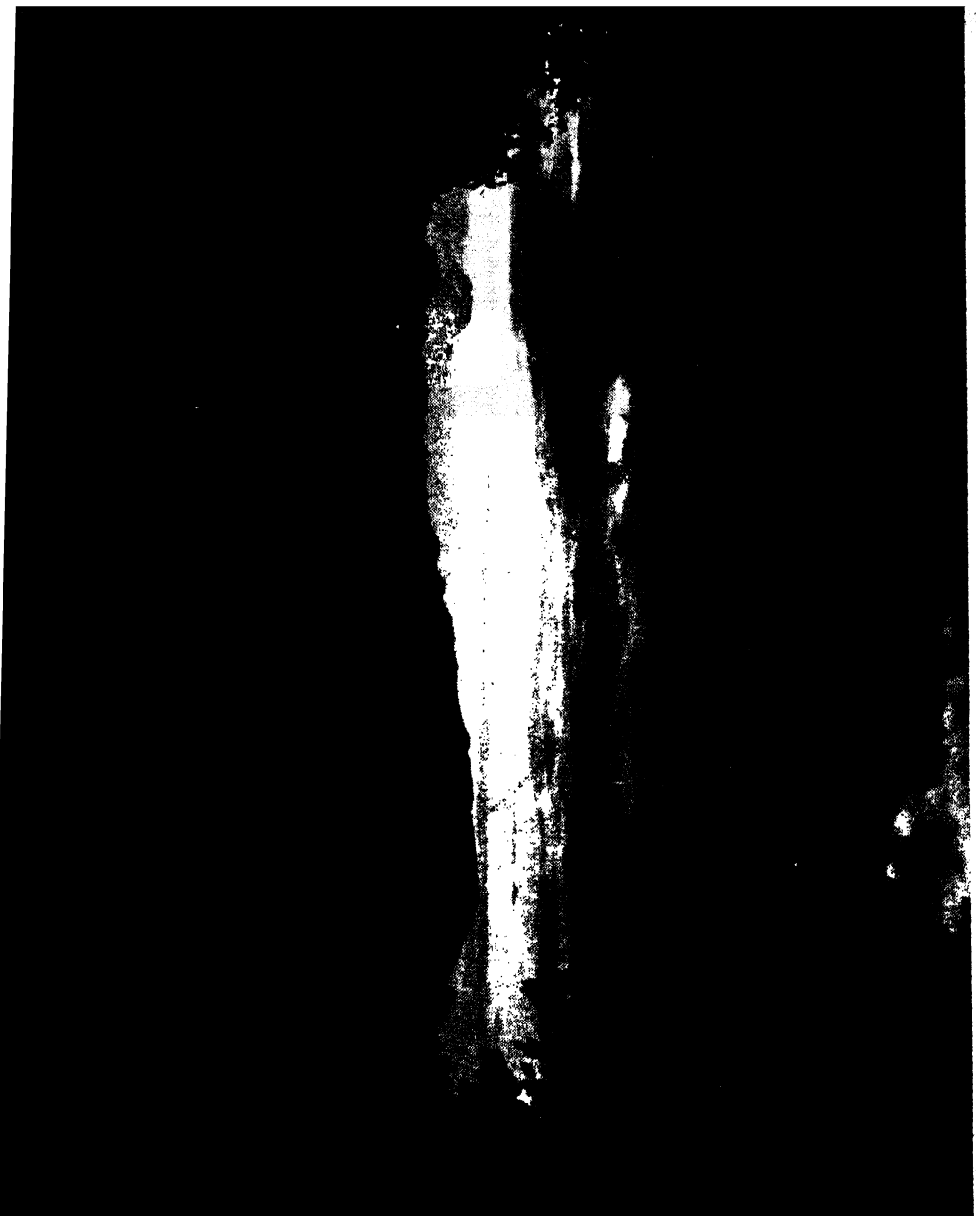
আশায় ফুলের মালা নিয়ে অপেক্ষা করছে, তারাতো ভারতের বাইরের লোক নয়। তারা কিছুদিন পূর্বে এই দেশের স্কুল-কলেজেরই ছাত্র ছিল। আবার এদের মধ্যেই শিক্ষিতের হার বেশী। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলের নেতাকে কি আমরা অশিক্ষিত বলতে পারি? কিন্তু তিনি চীনকে আক্রমণকারী পর্যন্ত বলতে পারেন নি। কেরালা ও পশ্চিমবাংলায় শিক্ষিতের হার অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে অনেক বেশী, কিন্তু এই কেরালায় ও পশ্চিমবাংলায় চীন ও পাকপ্রেমিকের সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী। এই সমস্ত কি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির কুফল বুঝায় না? যে খাদ্যদ্রব্য মানুষের ভেতর জীবনশক্তি সঞ্চার করতে পারেনা, বরং শরীরের ভেতর নানা রোগের সৃষ্টি করে, তাকে কি কোনদিন সুখাদ্য বলা যেতে পারে? আমার মনে হয়, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি জাতির চরিত্র-গঠনে মোটেই সহায়ক নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—"আমাদের এই পুণ্য-ভূমিতে একমাত্র ধর্মই জাতীয় জীবনের বনিয়াদ। ভারত-বাসীর জীবন-সঙ্গীতে ধর্মই মূল সুর। * * * * ধর্মের পথ বর্জন করিলে তোমাদের মৃত্যু অপরিহার্য। যে মুহূর্তে তোমরা জাতীয় জীবনের এই মূল প্রবাহের বাহিরে যাইবে, তখনই ঘটিবে এই জাতির বিলুপ্তি। ধর্ম, কেবল ধর্মই ভারতের প্রাণ। উহা যদি চলিয়া যায় তাহা হইলে রাজনৈতিক প্রগতি বা সমাজ সংস্কার সত্বেও—এমনকি প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে কুবেরের ঐশ্বর্য ঢালিয়া দিলেও ভারতের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতির প্রয়োজন নাই, একথা আমি বলি না; শুধু তোমাদিগকে মনে রাখিতে বলি যে, এই দেশে এসব লক্ষ্য গৌণ, ধর্মই মুখ্য।"

আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি একপ্রকার ধর্মের সম্পর্কহীন বলা চলে। ছাত্রজীবনে ছেলেমেয়েদের অসংখ্য পুস্তক পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি ধর্মপুস্তকগুলো পড়াবার ব্যবস্থা কোন বিদ্যালয়ে আছে বলে মনে হয় না। এইভাবে বর্তমান শিক্ষার প্রভাবে জীবনের প্রথম ভাগ হতে আমরা ধর্মের পথ বর্জন করে চলেছি, যেটি আমাদের বর্তমান অধঃপতনের কারণ।

ধর্মের সম্পর্কহীন শিক্ষার আর একটি কুফল এই যে, আমাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনের স্বধর্মের প্রতি আকর্ষণ নেই। ফলে খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম প্রচারকদের সামান্য প্রলোভনে আমাদের ভাই-বোনরা ধর্মান্তর গ্রহণ করে। শোনা যায় এই স্বাধীন ভারতেও দৈনিক গড়ে প্রায় হাজার হিন্দু ধর্মান্তরিত হচ্ছে। এইভাবে আমরা ধীরে ধীরে সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে পড়িতেছি। ১৫ বছর পূর্বে অখণ্ডভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে আমরা (হিন্দুরা) সংখ্যালঘিষ্ট ছিলাম, এই সমস্ত অঞ্চল ভারতের হাতছাড়া হয়েছে, অবশিষ্ট ভারতও সে পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। আমাদের অবস্থা বর্তমানেই কাহিল। স্বধর্মপ্রিয়তা জাতিকে স্বদেশপ্রেমিক করে তোলে এবং পাঠ্যজীবন হতে শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেকের অন্তরে এইরূপ ভাব জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা জাতির ভেতর ধর্মপ্রিয়তার ভাব জাগাতে পারে না। সেই জন্যই এদেশে পঞ্চমবাহিনীর সংখ্যাবেশী। স্বামীজী, নেতাজী, গান্ধীজী ছিলেন স্বধর্মপ্রিয় এবং এই স্বধর্মপ্রিয়তাই তাঁদের ভেতর স্বদেশপ্রেমের প্লাবন এনেছিল। অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে চীনপন্থী ভারতীয় নাগরিকরা ছাত্রজীবনে ধর্মবিষয়ে কোন শিক্ষা পায়নি, যা তাদের স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক ও বিদেশের প্রতি অনুরাগী করে তুলেছে। সুতরাং বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন করে পাঠ্যজীবন হতে ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষা না দিলে তারা ভাবীজীবনে দেশমাতার সুসন্তানে পরিণত হতে পারবে না। ছাত্রছাত্রীরা জাতির ভবিষ্যৎ, বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণকালে ছাত্র সমাজের উপযুক্ত সাড়া পেতে হলে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের ভেতর স্বধর্মের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে, কারণ স্বধর্মপ্রিয়তা মানুষকে স্বজাতি ও স্বদেশ প্রেমিক করে তোলে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার সাহস ও শক্তি জোগায়।

আমার মনে হয় যে সমস্ত পুস্তক ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনের ভাবীজীবনে কোন কল্যাণ আনয়ন করবে না, সে সমস্ত বই পাঠ্য তালিকা হতে বাদ দিয়ে মাত্র কয়েকটি প্রয়োজনীয় পুস্তক পড়ানোর ব্যবস্থা করলেই ভাল হয়। ছাত্রজীবনে বালকবালিকাদের অন্তরের প্রশান্ততা, বুদ্ধির বিকাশ ও উত্তম স্বাস্থ্য গঠনের সুযোগ দেওয়ার

অন্তও অনাবশ্যক পুস্তক পাঠ্যতালিকা হতে বাদ দিয়ে উল্লিখিত অল্পসংখ্যক বই পড়ালে ভাল হয়।

(এক) গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অংশগুলো নিয়ে একটি ধর্মবিষয়ক পুস্তক। (সংস্কৃত ভাষায়)।

(দুই) শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি ধর্মাবতার এবং পুরু, রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বীরপুরুষের পূর্ণ জীবনকাহিনীসহ একটি ভারতীয় ইতিহাস।

(তিন) একটি গণিত।

(চার) একটি বিজ্ঞান।

(পাঁচ) এই চারটির সঙ্গে আর ২।৩টি প্রয়োজনীয় পুস্তক ছেলেমেয়েদের পড়তে দিলেই যথেষ্ট।

এই সম্পর্কে এইটিও উল্লেখ করতে চাই যে, ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যাধিক্য বশতঃ শুধু যে ছেলেদের ক্ষতি হচ্ছে তা নয়, অভিভাবকরাও অসংখ্য পুস্তক ছেলেমেয়েদের জন্য খরিদ করতে গিয়ে ব্যয়ভারে জর্জরিত হচ্ছেন। আমার ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ে, তাদের বই খরিদ করা এবং লেখাপড়ার অন্যান্য খরচের দরুণ এমন চাপ আমার ওপর পড়ছে যে কোনরূপ পুষ্টিকর আহার সম্ভব হচ্ছে না এবং এই কারণে বর্তমানে "লো ব্লাড প্রেসারে" ভুগছি। প্রতিবছর জানুয়ারী মাসে যেন নরক যন্ত্রণা ভুগি এবং এই মাসে ছেলেদের বই খরিদ করার ব্যাপারে যা ঋণ হয়, তা সারাবছর টানতে হয়। এইরূপ বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের কত অভিভাবক যে ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচের চাপে ঋণভারে জর্জরিত হচ্ছেন এবং এই কারণে পুষ্টিকর আহারের অভাবে ভুগছেন —একমাত্র ভগবান জানেন। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে অভিভাবক হত্যার কলও বলা চলে।

ধর্মের সম্পর্কহীন ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যবসায়ীরা বর্তমানে খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের মাত্রা এতই বাড়িয়েছে যে, এইরূপ খাদ্যদ্রব্য আহারের ফলে ছাত্রছাত্রীরা মানসিক পরিশ্রমে অক্ষম ও স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ছে। একদিকে শরীরের হানিকর ভেজাল খাদ্যদ্রব্য এবং অন্য দিকে অসংখ্য পাঠ্যপুস্তকের চাপ, এই দুয়ের ফলে জীবনের প্রথমভাগেই ছাত্রছাত্রীদের মেরুদণ্ড ভেঙে যাচ্ছে, তাদের স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য দিনের পর দিন হ্রাস পাচ্ছে এবং তাদের কর্মশক্তি ও উৎসাহ এখন বিলুপ্তির পথে। ছাত্রসমাজের যদি আমরা এভাবে মেরুদণ্ড ভেঙে দি, তবে শত্রুর আক্রমণ কালে তাদের নিকট কিভাবে সাড়া পাওয়া যাবে!

এই দেশের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ যা বলেছেন, তার কিছু অংশ নিয়ে উল্লেখ কচ্ছি :—

"বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি শুধু কেরাণী সৃষ্টির নিখুঁত একটি যন্ত্র বিশেষ। ইহার প্রভাবে মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লোপ পাইতেছে। তাহারা জোর করিয়া বলিতে সুরু করিয়াছে যে, গীতা ষোল আনাই প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের সঙ্কলন, আর বেদ কতকগুলি পল্লীগীতির সমাবেশ মাত্র। ভারতের বাহিরের জাতি ও বিষয়সমূহের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জ্ঞান অর্জনে ইহঁাদের উৎসাহ প্রচুর; কিন্তু নিজেদের চৌদ্দপুরুষ তো দূরের কথা, সাত পুরুষের নাম পর্যন্ত ইহারা জানে না।

আমাদের গুরুমহাশয়রা ছেলেদের তোতাপাখী করিয়া তুলিতেছেন। রাশি রাশি বিষয় ঢুকাইয়া তাহাদের কোমল মস্তিষ্কগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন। হা ভগবান! গ্র্যাজুয়েট হইবার আজ কী হুড়াহুড়ি! কিন্তু কিছুদিন পরে সব ঠাণ্ডা! আর এত কাণ্ড করিবার পর তাহারা এইটুকু মাত্র শিখে যে, এদেশের ধর্ম, রীতিনীতি সব অসার, এবং পাশ্চাত্যের যাহা কিছু সবই বরণীয়। তারপর স্নাতকোত্তরকালে দেখা যায় যে, অন্ন সংস্থানের যোগ্যতাটুকুও অর্জন করা হয় নাই। এরূপ উচ্চশিক্ষার কী সার্থকতা? ইহা লোপ পাইলেও তেমন কিছু যায় আসে না। এই ধরণের শিক্ষা অপেক্ষা খানিকটা কারিগরীশিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে অনেক ভাল হইত; কারণ তাহা হইলে চাকুরীর প্রত্যাশায় বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া যে-কেহ সহজেই কাজের যোগাড় করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে পারিত।

* * * *

স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা তোমরা আজকাল পাইতেছ, তাহা শুধু অজীর্ণ রোগগ্রস্তের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতেছে। তোমরা শুধু যন্ত্রের মত কাজ করিয়া চলিয়াছ, আর জীবনযাপন করিতেছ মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মত।

মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা স্বতঃই বর্তমান, তাহারই বিকাশের নাম শিক্ষা। এই সকল শিক্ষাপ্রণালীর লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষ-তৈয়ার। শিক্ষা বলিতে এমন তথ্য-রাশি বুঝায় না, যাহার মর্ম কখনও হৃদয়ঙ্গম হয় না, অথচ যাহা শুধু মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া সারা জীবন উহাকে অনর্থক বিপর্যস্ত করিতে থাকে। * * * শিক্ষা বলিতে আমি বুঝি যথার্থ কার্যকরী জ্ঞান অর্জন, বর্তমান পদ্ধতি যাহা পরিবেশন করে, তাহা নহে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় চলিবে না। আমাদের প্রয়োজন সেই শিক্ষার, যাহা দ্বারা চরিত্র গঠন হয়, মনের বল বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধি-বৃত্তি বিকশিত হয় এবং মানুষ স্বাবলম্বী হইতে পারে।

আমি মনে করি ধর্মই শিক্ষার অন্তরতম অঙ্গ। ইহা যেন অন্ন এবং শিক্ষাসংক্রান্ত অপর সবই ব্যঞ্জনস্থানীয়।"

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে স্বামীজীর উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বর্তমান যুগের শিক্ষার প্রভাবে মানুষের মন থেকে ঈশ্বরে ভক্তি, পরলোকে বিশ্বাস, ধর্মে আস্থা এবং সেইরূপ অন্যান্য সুভাবগুলো ধীরে ধীরে বিলোপ পাচ্ছে, দেশে রাবণ ও বিভীষণের সংখ্যাক্রমে বেড়ে চলেছে। বাইরের জাতি ও বিষয়-সমূহের জ্ঞান অর্জন এবং পৃথিবীর আদিম থেকে বর্তমান যুগের তথ্যসমূহ অবগত হওয়ার জন্য এই দেশের অধিবাসীদের আগ্রহ খুবই বেশী, কিন্তু এই দেশের শতকরা ৯০জনই হয়ত প্রপিতামহের নাম পর্যন্ত জানে না। গীতা আমাদের পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। কিন্তু "গীতা" কি জিজ্ঞেস করলে এইদেশের শতকরা ৭৫জন হয়ত জবাব দিবেন "গীতা" একটি মেয়ে। মাষ্টারমশায়রা গীতার বিষয়বস্তু নিয়ে সাধারণতঃ শ্রেণীতে আলোচনা করেন না, ফলে ছাত্রেরা পাঠ্যজীবনে বা ভাবীজীবনে এর চেয়ে বেশী বলতে অসমর্থ।

মোট কথা, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সুফলের চেয়ে কুফলই বেশী দেখা যাচ্ছে। এইরূপ শিক্ষায় মানুষ তৈরী হয় না, মানুষের ভেতর স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি অনুরাগ জাগে না এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকল্পে সংগ্রাম করবার মনোবল যোগায় না। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ছেলেমেয়েদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ার এবং তাদের পিতামাতাদের মেরে ফেলার একটি যন্ত্রবিশেষ বলা চলে। স্বামী বিবেকানন্দের মত মহাপুরুষও তাই বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির নিন্দা করতে বাধ্য হয়েছেন। দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য তাই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।"

তুমি যে

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তুমি যে ডাকো আমায় দূরে
খেয়াঘাটে একলা তখন
নিঝুম দুপুরে।
মেঘের সঙ্গে কী করে যায় মেশা
বল কোন দাঁড় বাইবার নেশা
নিয়ে যায় আমায় তেপান্তরে ?

একলা আমি চলতে পারি না যে
মনে পড়ার চপল পলক বাজে

সন্ধ্যা যখন আলিঙ্গনে বাঁধে
সিন্ধু তখন উধাও হবার সাধে
গুণগুণিয়ে ওঠে অবাক সুরে।

সেখানে নেই কোনো আশার মায়া
সেখানে তো ঘুমেরই আবছায়া
সেইখানেতে যদি দাঁড়াই পাশে
সময় শুধু আপন অট্টহাসে
বন্ধ দুয়ার তোমার অন্তঃপুরে।

'বিস্মরণী'র কবি মোহিতলাল

মিহিরকুমার রায়

ভারতীপর্বের কবিগণ সূর্যমুখীফুলের মত রবীন্দ্র-প্রতিভা-লোকে যখন প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠছিলেন, তখন রবীন্দ্রানুসারী ভাবধারাকে পাশ কাটিয়ে তিনজন কবি বাংলা সাহিত্যে নোতুন সুর ও স্বাদ সঞ্চার করলেন। এই কবিত্রয়ের মধ্যে সর্বাগ্রজ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং সর্বকনিষ্ঠ নজরুল ইসলাম। মোহিতলাল এলেন এঁদেরই মাঝখানে। যতীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে আমদানি করেছিলেন বুদ্ধিবাদপ্রসূত প্রশ্ন-মনস্কতা, বলিষ্ঠ অবিশ্বাস এবং স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া। বাংলার ছেলে হয়েও তিনি গীতিমুখরিত বনবীথিকার পরিবর্তে স্বপ্ন দেখেছেন গোবী সাহারাকে। আর সেই স্বপ্নে ভেসে উঠেছে জড়বাদ, প্রেম ও যৌবনের প্রতি কবিমনের সক্রিয়-বুদ্ধির বিরূপতা এবং দুঃখবাদ। এই দুঃখবাদ কিন্তু সোপেনহাওয়ারী দুঃখবাদ নয়। মানবপ্রেমে অভিসিঞ্চিত দুঃখবাদ মানবপ্রেমেরই মহাসংহিতা।

কাব্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাবমুহূর্তটি ছিল রবীন্দ্রনাথের অরূপ সাধনার পর্ব এবং রবীন্দ্র-ভাবনায় ভাবিত রোমান্টিক ভাববিলাসী কবিদের কলগুঞ্জনের যুগ। কাব্যসাহিত্য 'জীবনের ক্ষেত্রে প্রাণপ্রদ ও প্রাণবিদারক রস' সঞ্চারিত করে। রবীন্দ্র সমকালীন অন্যান্য কবিদের ক্ষেত্রে তা 'বিলাস ভোগ্যবস্তু'তে পর্যবসিত হয়েছিল। তাই এই কবিত্রয় রবীন্দ্রযুগের কবি হ'য়েও রবীন্দ্র ভাবিত পন্থা পরিত্যাগ করে অন্য পথে চলতে সুরু করেছিলেন।

নজরুল এলেন বিদ্রোহীসত্তাকে নিয়ে। 'উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল যেদিন আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না' সেইদিনই কবির বিদ্রোহী সত্তা শান্ত হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। জনগণের বুক ও মুখের ভাষার বাণীগ্রন্থনই তাঁর কাব্য। সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ-ই তার প্রমাণ। অবশ্য তার সঙ্গে এসে মিশেছে প্রেম-ভালবাসার প্রতি কবির তন্নিষ্ঠ সাধনা —যেন বিষের বাঁশীর ফুৎকার মিলিয়ে গেছে দোলন চাঁপার কুঞ্জবনে।

জগত ও জীবনকে পরিত্যাগ করে যখনই কবিদের সাধনা শুরু হয়েছে মঙ্গলময় অনধিগম্য ভাবকে নিয়ে, রোমান্টিক বিলাসিতাকে নিয়ে, তখনই বাংলা সাহিত্যে এই কবিগণের আবির্ভাব।

মোহিতলাল এলেন বলিষ্ঠ ভোগবাদকে নিয়ে! ভাও-আলের কবি গোবিন্দদাসের যে ভোগবাদ, তারই উত্তর-সাধক আমাদের কবি। কিন্তু গোবিন্দদাস যেখানে 'কামনার কালীদহে' নারীদেহের পঙ্ককুণ্ডে আত্মনিমজ্জনেই পরিতৃপ্ত, মোহিতলাল সেখানে 'দেহেরি মাঝারে দেহাতীতের ক্রন্দন সঙ্গীত শুনেছেন। মোহিতলালের ভোগবাদকে বলাধান করেছে তাঁর অকুণ্ঠ মানব প্রেম ও মর্ত্যপ্রীতি। সমসাময়িক কালের রবীন্দ্রানুসারী কবিদের যে ভোগবাদ তা ভিক্টোরীয় যুগের আদর্শবাদের ও শুচি-শুভ্র সৌন্দর্য নিষ্ঠার আলোক সম্পাতে প্রোজ্জ্বল। দেহকে বাদ দিয়েই অদেহী প্রেম-স্বপ্নে মশগুল ছিলেন এঁরা। আর রবীন্দ্রনাথের কাছে দেহজ প্রেম তো কোনদিনই সত্য সাধনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারেনি। ঔপনিষদিক ভাবধারায় ভাবিত কবি মঙ্গলময় চৈতন্যে বিশ্বাসী বলেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মানুষের স্থূল দেহটা পরিত্যক্ত হয়ে মানব জীবনের গভীর ভাব স্বরূপটিই স্থান পেয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্র সমকালীন কবিদের মধ্যে ঐ ত্রয়ী কবির সুর-স্বাতন্ত্র্য যুগ-রুচির প্রতি তাঁদের মানসিক বৈরূপ্যেরই চিহ্ন। এই রকম যুগ-বিরূপতা নিয়েই মোহিতলাল বাংলা কাব্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর স্বল্পসংখ্যক কাব্যগুচ্ছ নিয়ে। কিন্তু সংখ্যার স্বল্পতা ভাবের ন্যূনতা প্রকাশ তো করেই না, বরং কবিব্যক্তিত্বের গভীর প্রত্যয়লব্ধ অভিজ্ঞতার আলিম্পনে এবং রচনা-শৈলীর ঘন-গম্ভীর পরিবেশ সৃজনে একক মহিমার দীপ্তি দান করেছে কবির কাব্য সত্তারকে।

মোহিতলাল কাব্যের ক্ষেত্রে শাক্ত-সাধক বামাচারী কবি বলেই খ্যাত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপনপসারী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। করোটীর পানপাত্রে আসব পান করার উদগ্র বাসনা কাব্য-ক্ষেত্রে তাঁর 'রুচির ধর্ম' পালনেরই প্রতীক। জগত ও জীবনকে অধ্যাত্মসুন্দর ভাববাদীর দৃষ্টিতে না দেখে তিনি জীবনকে কঠিন আশ্লেষ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভোগবাদ ভোক্তার বলিষ্ঠ আত্মতৃপ্তির কলধ্বনি। ভুঞ্জনের মহিমা ও ত্যাগের গরিমা উভয়ই তাঁর সেই ভোগ-বাদকে উজ্জ্বল করেছে। প্রেমের যে বাণী-সংহিতা কবি নির্মাণ করেছেন, সে প্রেম চলিষ্ণু জীবনেরই অংগাবরণ মেখে নিয়েছে। কামই প্রেমের ভিত্তি। আবার দহ-ই সকাম প্রেমের জন্ম দেয়। মোহিতলাল ঐ দেহকেই অবলম্বন করেছেন এবং দেহ-ভুঞ্জনের মাধ্যমেই প্রেমের শুভ্র শতদলের সৌরভ লাভে ধন্য হয়েছিলেন।—

হায় দেহ !—নাই তুমি ছাড়া কেহ—
জানি তাহা প্রাণে প্রাণে,
মুরতি পাগল মনের মমতা
তাই ধায় তোমাপানে।
তোমারি সীমায় চেতনার শেষ,
তুমি আছ তাই আছে কাল-দেশ,
দুঃখ-সুখের মহা পরিশেষ !—
দেহ-লীলা অবসানে
যা থাকে তাহার বৃথা ভাগাভাগি
দর্শনে-বিজ্ঞানে !

জনৈক সমালোচক বলেছেন—"যতীন্দ্রনাথকে প্রথম জীবনে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি জড়বাদীরূপে ; তাহারই একটু রকম ফেরে মোহিতলালকে পাইতেছি দেহবাদীরূপে। রকম ফের বলিলাম এই জন্য, জড়বাদই ত দেহবাদের বনিয়াদ।" সমালোচকের এই মন্তব্য সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয় বলেই মনে হয়। কারণ যতীন্দ্রনাথের জড়বাদ সক্রিয়-বুদ্ধিবাদপ্রসূত। জীবন-সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে উষর প্রান্তরের ক্যাকট্যাস জাতীয় এক রুক্ষ প্রাণের ধর্মই সেখানে প্রকাশিত। বাইরেটা জড়-জাতীয় কিন্তু অন্তর তা নয়। প্রতিক্রিয়ার চাপেই প্রথম যৌবনের ঘোষণা—'চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই'। উত্তর জীবনে চেতনার কূলে অতিক্রান্ত যৌবনের প্রাণধর্মের প্রতি স্মৃতিতর্পণ আছে। কিন্তু মোহিতলালের দেহবাদে জড়-বাদ নেই। প্রাণহীন দেহবাদ দেহভুঞ্জনের আবিলতার নামান্তর মাত্র—এ কথা কবি ভালভাবেই জানতেন। তাঁর দেহবাদে 'মনের মমতা'—প্রেম—এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

শাস্ত্রোক্ত বাণী নারী জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্তির সাক্ষ্য বহন করে—নারীকে শ্মশানঘাটের মতই পরিত্যাগ করা উচিত, নারী নরকের দ্বার ইত্যাদি। মোহিতলাল এই ভাবধারায় অবিশ্বাসী। 'পান্থ' কবিতায় সোপেনহাওয়ারের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত কবি-উক্তিই তাঁর মানস-প্রকৃতির স্বাক্ষর বহন করে। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী শ্যামল অথচ ভ্রুকুটি ভয়াল অবস্থাকেই কবি জীবন বলে কল্পনা করেছেন এবং সেই জীবনকেই পরিত্যাগ করে যারা "দেহহীন, স্নেহহীন, অশ্রুহীন বৈকুণ্ঠ স্বপনে" মশগুল, তাঁদের দলে তিনি নিজেকে 'ব্রাত্য' বলে আখ্যাত করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। কবি-হৃদয় যেন শাশ্বত প্রেমিকপুরুষের মতই বলে উঠতে সক্ষম হয়—

প্রকৃতি জোগায় ফুল, নারী গাঁথে করিয়া চয়ন,
পুরুষ পরিয়া গলে, চেয়ে থাকে মুখে তার
অতৃপ্ত নয়ন।

এই অতৃপ্তির তৃপ্তিই কবিকে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ স্মরগরলে 'নারীস্তোত্র' রচনায় প্ররোচিত করেছে। কবির এই দেহচেতনায় তথা প্রেমভাবনায় পারসিক প্রভাব রয়েছে। কিন্তু এও সত্য যে "পারস্যের পহ্লবী অধ্যায় থেকে কবি যে নূরজাহানকে নিয়ে" এসেছিলেন কবি তার দাহন ও দীপ্তি দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি ; সেই দাহন ও দীপ্তির পেছনে কবির জীবনসত্য ও কাব্যসত্য লুকিয়েছিল এবং ঐ সত্যেরই বহিঃপ্রকাশ 'পান্থ' কবিতায়—

তাই আমি রমণীর জায়ারূপ করি উপাসনা—
এই চোখে আরবার না নিবিতে গোধুলির আলো,
আমারি নূতন দেহে, ওগো সখি, জীবনের
দীপখানি আলো।

এই উপাসনার মধ্যে কবি-চিত্তের বিরাটত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেহ-কেন্দ্রিকতা প্রেম সম্ভাব্যতাকে এনে দিলেও

কবি তাঁর প্রেম কবিতায় যে প্রেমের জয়গান গেয়েছেন তা শক্তিহীন রতি-উৎসুকের ব্যাভিচার নয়—তাত আছে "প্রীতি-নিবিড় বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে প্রবৃত্তির অন্তর্নিহিত শক্তিকে পূর্ণভাবে জাগ্রত করিয়া তাঁহার জীবন চেতনাকে বৃহত্তর চেতনার অধীন করিয়া লইবার" সাধনা।

মোহিতলাল 'দেহ'কে প্রেম-সাধনার সোপান হিসেবে গ্রহণ করলেও বিস্মরণীর 'অকাল-সন্ধ্যা' কবিতাটি আপাত-দৃষ্টিতে কবি-ধর্ম-বিচ্যুতির পরিচায়ক বলে মনে হয়। কবি তাঁর কাব্যগুচ্ছের মধ্যে যে দেহবাদ-স্বরূপের জয়গান করেছেন, এটি তার একটি বিরল-ব্যতিক্রম। দেহকে কেন্দ্র করে কবির প্রেম-জীবনের যে উদ্বোধন হয়েছিল, তা যেন আজ বেদনা-ঘন পরিবেশে অস্তমিত হতে চলেছে আকালিক সন্ধ্যার সজল মেদুরতার মধ্যে। এই রকম বিরল ব্যতিক্রম কবিতা পাঠে পাঠকের ধারণা স্বভাবতঃই আহত হয়—পাঠক ভাবতে থাকেন, যে দেহবাদের বনিয়াদ কবি এতক্ষণ রচনা করেছেন, তা হয়তো কবির নিজ প্রাণ-ধর্মেরই বিরুদ্ধাচরণ মাত্র। কিন্তু এই কবিতাটিতে যে সত্য প্রকাশিত তা কবির প্রাণধর্মের বৈরূপ্য প্রমাণক নয় বরং অন্যতর সত্যই স্বয়ং প্রকাশিত। কবির ব্যক্তিসত্তা ও কবিসত্তা যে বিভিন্ন দুটি সমান্তরাল পথে চলেছিল তা এ কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। কবি আত্মা ও ব্যক্তি আত্মার পারস্পরিক মিলন ঘটানো অসম্ভব হয় তখনই যখন ব্যক্তি-আত্মা নিঃসঙ্গ বিহঙ্গের মত নির্জনতা-ভিক্ষু হয়ে ওঠে। মোহিতলালের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। প্রেম ও জীবনের প্রতি ব্যক্তি-আত্মার আলিম্পনাঙ্কিত আসক্তি প্রকাশকে নিষ্ঠাবিরোধী বলে ভেবে নেওয়ার প্রতিক্রিয়া মোহিত-লালের মধ্যে ছিল। তাই এই কবিতাটি পাঠকের দৃষ্টিতে সুর-স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন বাহক হয়ে উঠেছে। কবি সত্তার পেছনে ব্যক্তি-সত্তার এই নিষ্ঠাচার ছিল বলেই কবির কাব্যে কোথাও মদনোল্লাসের গ্রন্থি-ছেঁড়া অনিষ্ঠা প্রকাশিত হয়নি বরং প্রেম এক অপূর্ব মহিমায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

মোহিতলালের দেহবাদের পাশে পাশে কবির অকুণ্ঠ মানবপ্রেমের প্রকাশ কতকগুলি কবিতার বিষয় বস্তু। 'বিস্মরণীর 'কালাপাহাড়' ও 'স্বপন পসারী'র 'নাদিরশাহের জাগরণ' ইত্যাদি কবিতায় ঐ ভাবের অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন পুরোপুরি বহ্নিপূজারী কবি। তিনি অগ্নি-বৈশ্বানরকে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর কাব্যে। মোহিতলালও রুদ্রসাধক কবি। সেই রুদ্র সাধনার সঙ্গে সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিল কবির আসবপানমত্ত অঘোর পন্থীর দুর্বার প্রবৃত্তি। তাঁদের পার্থক্যও কম ছিল না। জীবন ও যৌবধর্মের সাধনায় মোহিতলাল যখন বেহুঁশ, মাতাল; 'যতীন্দ্রনাথ তখন জীবনকে নির্যাসশূন্য করে তোলার মত্ততাতেই বেতাল'। কিন্তু মানুষের জীবনকে দেবতা ও অদৃষ্টের ফাঁসি থেকে বাঁচাবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা উভয়েরই লক্ষ্যে ছিল। যতীন্দ্রনাথ যখন লেখেন :

> চির বিদ্রোহী মানব আত্মা—আজিও তোমার
> মানে কি বশ,
> জনে জনে তারা বিশ্বামিত্র হরিতে বিশ্বকর্মা-যশ।
> … … …
> এ জগতে তব স্বেচ্ছাতন্ত্র,—তাই নয় তার জবাব দিতে
> গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা তরে প্রাণপাত করে এ পৃথিবীতে।
> (অপমান, মরুশিখা)

মোহিতলালও তখন বলেন—

> ভেঙ্গে ফেল মঠ-মন্দির চূড়া, দারু-শিলা
> কর নিমজ্জন!
> বলি উপচার ধূপ-দীপারতি রসাতলে দাও বিসর্জন!
> নাই ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ যবন, নাই ভগবান্—ভক্ত নাই,
> যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে রে। মানুষের বুকের
> রক্ত চাই!
> ছাড়ি লোকালয় দেবতা পালায় সাত সাগরের
> সীমানা পার।
> … … …

মোহিতলাল মানব-প্রেমের উদাত্ত সঙ্গীতে এমনই আত্ম-হারা যে সভ্যতা বিধ্বংসী মানবশোণিত লোলুপ কালা-পাহাড়কেও আহ্বান জানাতে দ্বিধা করেন নি। নজরুলের বিদ্রোহী সত্তায় এমন-ই একটি স্বরাট পুরুষের পদসঞ্চার অনুভূত হয়েছে। 'দেহের দেউলে দেবতা নিবসে—তার অপমান দুর্বিসহ।' বলে যে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে তাই তাঁদের কাব্যের ধ্রুবপদ। ধর্মধ্বজীদের চোরাবালিতে যখন মানব হৃদয় ক্লেদঘন, অবজ্ঞার বিপাকে যখন মানবি-কতার কণ্ঠরুদ্ধ তখনই এই কবিদের আবির্ভাব। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জনঅভ্যুত্থানের প্রাণে [illegible] [illegible] এ-

জাতীয় জনঅভ্যুত্থান যুগ-মানস পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী স্বাক্ষরই বহন করছে। সত্যেন্দ্রনাথ এতখানি বিদ্রোহী হয়ে না উঠলেও তাঁর কাব্য শুধু সারস্বত বন্দনায় কিংবা মঞ্জুল ছন্দ হিল্লোলে দোলায়িত নয়, তাঁর কাব্যের মধ্যেও বিশ্বজনকে আহ্বান জানিয়ে নতুন পৃথিবীর 'বারতা' শোনানর বাসনা স্বয়ং প্রকাশিত—

জাগ, জাগ, ওগো বিশ্বমানব! বারতা এসেছে আজ!
তোমার বিশাল বপু হ'তে ছিঁড়ে ফেল ভৃত্যের সাজ,
মানি না গির্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি-পেগম্বর,
দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে যার ঘর।"

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্য কবিত্রয়ের পার্থক্য শুধু সুরের ও প্রকাশভঙ্গীর। একজনের সুর অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব-প্রসূত সর্বজনের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার সুর, অন্যদের সুর ওজোগুণদীপ্ত বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহী সুর।

'বিস্মরণী'র অন্তর্গত দুটি কাব্য নাটিকায় মোহিতলালের কবি প্রতিভার বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। অতীতের পৃষ্ঠা থেকে কবি এমন কতকগুলি রুদ্ধ শ্বাস উৎকণ্ঠাবোধক চরিত্র অবলম্বন করেছেন যাদের মাধ্যমে কবি স্বীয় সৃষ্টি শক্তির চমৎকারিত্বকে সাধারণ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। জাহাঙ্গীর নূরজাহানের দেহ-কান্তির সৌষ্ঠব ও দাহন-দীপ্তি দেখে তাঁকে সাম্রাজ্ঞীর আসন দান করেছিলেন। কিন্তু সেই সাম্রাজ্ঞীর প্রাণদণ্ডাদেশ জারী করা হ'লে যখন নূরজাহান জাহাঙ্গীরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন, তখন জাহাঙ্গীরের অন্তর্দ্বন্দ্ব যে সঙ্কটময় মুহূর্তের সৃষ্টি করেছিল তাই কাব্য নাটিকায় প্রাণবস্তু হিসেবে স্মরণ্য। জাহাঙ্গীরের সেই সঙ্কটময় মুহূর্তকে আরও জটিল ঘটনাবর্তে পরিণত করেছে নূরজাহানের প্রেম ও প্রেম-সমাধি সম্ভাবনার মধ্যবর্তী এক নিঃশঙ্ক জীবনের তিক্ত মধুর স্মৃতিচারণা। 'রোমান্স রঙ্গিণ জীবনাদর্শের ঐশ্বর্যমণ্ডিত আদি ও অকৃত্রিম জীবনের যে বলিষ্ঠতা,' তাই এই কবিতায় আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে।

'মৃত্যু ও নচিকেতা'র মধ্যে মৃত্যুর স্বরূপ জানার আগ্রহ ব্যাকুলতায় উদ্বেলিত হৃদয় নচিকেতা বৈবস্বতের কাছে যে ভাবে মৃত্যুর মহান্ গম্ভীর, প্রশান্ত উদার মূর্তির আবির্ভাব মুহূর্তটির জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছে তার ভাব স্বরূপই এই কবিতাটিকে অপূর্ব চমৎকারিত্ব দান করেছে। পরিবেশ সৃজনে পুরাণজীবনের অঙ্গাবরণ নাটিকাটিকে বিলীয়মান অতীতের স্মৃতি সুরভিতে ভরে দিয়েছে। কবির ক্ল্যাসিক্যাল মেজাজ সেই পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে কবির মনে যে 'form' সচেতনতা দেখা গিয়েছিল, তারই অনুবর্তন এই সব কবিতায়। Dramatic lyric সৃষ্টিতে ইংরেজ কবি ব্রাউনিং-এর স্থান অদ্বিতীয়। মোহিতলালও বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরেই স্মরণীয়। রূপনেমীর প্রতি কবির তন্নিষ্ঠ আগ্রহের ফলেই এই কবিতাগুলির জন্ম। কিন্তু তবুও এই সব কবিতায় রূপ-সচেতনতার সঙ্গে কবির ভাবাভিব্যক্তি প্রকাশ দুর্লক্ষ্য নয়। উপসংহারে মোহিতলালের এই কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাটি (title poem) আলোচনা করেই আমাদের আলোচনায় ছেদ টানবো। এই কবিতাটি আত্ম-দিদৃক্ষামূলক কবিতা। কবি তাঁর ফেলে-আসা জীবনের দিকেই শুধু দৃষ্টিপাত করেন নি, তাঁর নতুন সুরের অপূর্ণতা ও ব্যর্থতার কথাও বলেছেন। সকল প্রতিভাশালী আত্ম-সচেতন কবির মনেই এই দিদৃক্ষু মনটি বাসা বেঁধে থাকে। রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুল পর্যন্ত, এমন কি অত্যাধুনিক সমাজ সচেতন কবিও নিজেদের কবি জীবনের পর্যালোচনা করে থাকেন।

যতীন্দ্রনাথ বাংলার ছেলে হয়েও কেন গোবী-শাহারার স্বপ্ন দেখেছেন, প্রেম ও যৌবনকে কেন অস্বীকৃতি জানিয়েছেন—তার একটা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁর কব্যে। নজরুল তো ব'লষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছেন—

পরোয়া করি না বাঁচি আর না বাঁচি
যুগের হুজুগ কেটে গেলে
মাথার ওপরে জলছেন রবি, রয়েছে সোনার
শত ছেলে।

তাঁর একান্ত বাসনা—তাঁরই শোণিতাক্ষরে যেন সর্বনাশীদের পরোয়ানা লেখা হয়।

মোহিতলালেও ঐ রকম আত্মদিদৃক্ষা বড় হয়ে উঠেছে, বাংলার নিত্য প্রবহমানা কাব্যস্রোতে কবি যে নতুন

শোণিত স্বাদ সঞ্চারিত করেছিলেন, তা বাংলার হৃদয় ধর্ম বিরুদ্ধ বলেই তাঁর মনে হয়েছে। বলিষ্ঠ কবি ব্যক্তিত্বের সঞ্জীবন মন্ত্রে কবে যে সুর আমদানী করেছিলেন তা হয়তো বর্তমান পাঠকের কাছে উপভোগ্য হবেনা—এই ধারণাই তাঁর মনে দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি আলোকাভিসারের পরিবর্তে তিমিরাভিসারকেই বরণীয় করে তুলেছিলেন। এতে কবির আক্ষেপ নেই, বরং আপনার ব্রত সাধনায় আত্ম প্রত্যয়ের সুরই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং শেষতঃ এই আশাবাদও তিনি পোষণ করেছেন—

'যে গান হেথায় হল নাকো সারা
সুর খানি তার হবে না যে হারা,
আরেক ভুবনে সন্ধ্যার তারা
লইবে তাহারে তুলে—
নব জাগরণী গাইবে সেথায়
বিস্মরণীর কূলে।'

বিশ্বামিত্র

মুকুন্দবিহারী মিত্র

কল্পনায় হেরি তব তপঃশীর্ণ মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়
ধ্যান-মৌন মহা ঋষি। তিলে তিলে করিতেছ ক্ষয়
তপস্যার হোমানলে বাসনা বন্ধন। অকস্মাৎ
কুঞ্জে কুঞ্জে বেজে ওঠে বসন্তের মদির সঙ্গীত
গুঞ্জরিয়া ওঠে অলি; শুরু হ'লো কুসুমের মেলা
মলয় হারালো দিশা, স্রোতস্বিনী
পুলক বিহ্বলা।

সহসা ঝঙ্কারি ওঠে নৃত্যপরা কোন্ অপ্সরার
নূপুর আকাশ পথে? অতনু হানিল পুষ্পশর
অলক্ষ্যে হৃদয় মাঝে। নির্ব্বাপিত লালসা অনল
আসক্তির চিতাভস্মে জ্বলিল আবার। মহাকাল
হাসিল নীরবে। লাস্যময়ী নারী
হ'লো কল্পনার
মায়াময়ী—গ্রাসিল সে হুতাশন ছায়াতনু তার।

অপ্সরা বিদায় হ'লো—রেখে গেল তীব্র তুষানল
জীবনের মর্ম্মমূলে। যুগান্তের সাধনার ফল
চকিতে মিলায়ে গেল, ধূলিসাৎ স্পর্দ্ধিত বাসনা
ব্রাহ্মণত্ব লভিবার—নব বিশ্ব করিতে রচনা
উপেক্ষিয়া বিধাতায়। সেই হ'তে রুদ্রমূর্ত্তি তুমি
ভয়ঙ্কর, দেবতা মানব ত্রাস—তোমারে প্রণমি।

তোমারে প্রণমি ঋষি—ভ্রূকুটি-কুটিল তব ভাল
ত্রিলোকের বিভীষিকা। তোমার গোপন অশ্রুজল
রিক্ততার নীরব বেদনা পশিছে অন্তরে মোর
কল্পান্তের পার হ'তে। ব্যর্থতার আঘাতে কাতর
তবু শির সমুন্নত। বীর্য্যবন্ হে মহাসাধক
বিশ্বের অমিত্র তুমি—বিশ্বামিত্র জলন্ত পাবক।
মিত্রকুলপিতা তুমি—আমি মিত্র, করিব সৃজন
কাব্য-অর্ঘ্য তব নামে—তা'রে তুমি করিও গ্রহণ।

পূর্ব প্রকাশিতের পর

তৃতীয় পর্ব

(কাঁটা ও ফুল)

এক

গৌরী কাশীতে গুরুচরণে আশ্রয় নেওয়ার পরে আরো তিন বৎসর কেটে গেছে। রমার বয়স এখন ষোলো, দত্তাত্রেয় চোদ্দয় পড়েছে। সে প্রায়ই কাশীতে আসে, থাকে বন্দনার কাছে। মনুভাই এখন প্রৌঢ়, পঞ্চাশে পা দিয়েছে। কিন্তু এখানে একটু থেমে সংক্ষেপে বলতে হবে এ কয় বৎসরে এ দুটি পরিবারের মধ্যে নানা ওলট পালটের কথা।

গৌরী রমাকে নিয়ে কাশী চ'লে যাবার পরে মনুভাই প্রথমদিকে ক্ষেপে উঠে কাশী রওনা হয় আর কি—যাবে কয়েকজন গুণ্ডা নিয়ে, আনবে রমাকে ছিনিয়ে, গৌরীকে দেবে শিক্ষা যে জোর যার মুল্লুক তার। কিন্তু পিন্টো ত্রস্ত হ'য়ে ওকে উপশান্ত ক'রে বলে আদালত করবে। পারিবারিক কেলেঙ্কারি নিয়ে আদালত করবার ইচ্ছা মনুভাইয়ের সত্যিই ছিল না একটুও,কিন্তু ও ভেবেচিন্তে রাজি হয় শুধু এই আশায় যে রমাকে আদালতের রায়েহেফাজতে পেলে হয়ত গৌরীকেও ফেরৎ পাওয়া যেতে পারে। গৌরী কী ধাতু দিয়ে গড়া ও শুধু যে জানত না তাই নয়, অকুণ্ঠে পিন্টোর বৈজ্ঞানিক বেদবাক্য শিরোধার্য করল: যে, সব নির্ভরযোগ্য জ্ঞানেরই ভিৎ হচ্ছে পরিসংখ্যান—statistics, স্ত্রীর হালচালের ঠিক দিয়ে আঁক ক'ষে পিন্টো ওকে বুঝিয়ে দিল মেয়েদের জীবনের কেন্দ্র সন্তান, গৌরীও মেয়ে, অর্থ রমাকে আদায় করলে গৌরীও আদায় হবেই হবে—কান টানলে মাথা না এসেই পারে না—E. D.

কিন্তু মনস্থির করতে মনুভাইয়ের তিন চার বছর লাগল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সে কত লেখালেখি, লোক পাঠানো, তর্জন গর্জন, টেলিফোন কী নয়? শেষে যখন দেখল গৌরীর ফেরার আশা দুরাশা তখন সে অগত্যা আদালতে কেস আনল।

মনুভাই ভেবেছিল গৌরী প্রাণপণে লড়বে রমার হেফাজত দাবি ক'রে। কিন্তু ও আশ্চর্য হ'ল যখন কোর্টে গৌরী কোনো উকিলই মোতায়েন করল না। মহাদেব চেয়েছিলেন উকিলের সব খরচ দিতে। কিন্তু বিষ্ণুঠাকুর বললেন শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে: "অসম্ভব, আদালতে কোনো কিছুর জন্যেই করতে পারি না আমরা। সে পারে বিষয়ী সংসারী। গৃহী যোগীকে হ'তে হবে 'সর্বারম্ভপরিত্যাগী। তিনি যা করেন: thy will not mine be done"

ফল যা হবার—মনুভাই চার্জ আনল desertion এর—স্ত্রী ছেড়ে গেছে। আদালত স্ত্রীর প্রতিবাদ না পেয়ে তাকে দোষী ধরে নিয়ে "নিরপরাধ" (?) স্বামীর স্বপক্ষেই ডিক্রি দিল অপরাধিণী স্ত্রীর বিপক্ষে: সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত রমাকে থাকতেই হবে পিতার হেফাজতে। গৌরী রমাকে বুকে ধ'রে আশীর্বাদ ক'রে বলল: "ভয় কোরো না মা, এখানকার আদালতের রায় উপরকার রায়ে উল্টে যাবেই যাবে যদি তুমি শুধু সেই আদালতেরি মুখ চেয়ে থাকতে পারো। মনে থাকবে?"

রমা চোখের জল মুছে বলল: "থাকবে মা। কেবল তুমি ভুলো না।" গৌরী বলল: "মা, তুমি আমায়

কাছে দেবতার বর, গুরুর আশীর্বাদ, তোমাকে কি ভুলতে পারি ?"

রমা পুণায় ফিরে এল শূন্য গৃহে, কিন্তু অচল অটল। বাপের সামনে এতটুকু হা হুতাশ করল না।

এ যে অভাবনীয়। পিণ্টো বিজ্ঞানের জ্ঞানকোষের নানা নজির ঘেঁটে বোঝালো ওকে—কিন্তু সে-নজিরে মন্নুভাইয়ের বিশেষ লাভ হ'ল না, কারণ রমাকে ফেরৎ পেয়েও গৌরীকে টলাতে পারল না। তখন হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকে ওর মনে প'ড়ে গেল বিষ্ণু ঠাকুরের একটি প্রায়োক্তি: গৌরী আর প্রহ্লাদ মস্ত আধার। কিন্তু এ কী কাণ্ড ? ও যে স্বপ্নেও ভাবে নি যে, যে-গৌরীর মেয়ে-অন্ত-প্রাণ ছিল সে এক কথায় শুধু গৃহসুখ ও বিলাস নয়—প্রাণাধিকা মেয়েও ছাড়তে পারবে গুরুর জন্যে। ও ভেবেছিল মোক্ষম চাল চেলেছে। কিন্তু ঠাকুরের চাল ছিল আরো মোক্ষম। তাই যখন মেয়েকে ফেরৎ পেয়েও মন্নুভাই মেয়ের মাকে ফিরে পেল না তখন ওর প্রথম মনে হল যে, পিণ্টোর বৈজ্ঞানিক পরামর্শ শুনে রমার হেপাজতের দাবি ক'রে মস্ত ভুল করেছে: লাভ তো কিছুই হ'ল না। উপরন্তু সবাই ওকে ছিছি করতে লাগল এমন লক্ষ্মীপ্রতিমা মেয়েকে মার কাছ ছাড়া ক'রে আনার জন্যে। আর শুধু সবার চোখে ছোট হওয়ার লজ্জাই তো নয়—রমাকে এনে ও ঠেকে শিখল—যুবতী মেয়েকে সাবধানে রাখবার না আছে ওর সময় না সাধ্য। রমা উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়—বড়ই দৃষ্টিকটু। ও ঠিক করল রমার জন্যে একটি পাত্র ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ওকে কাশীতে মার হেফাজতে রাখাই বিধি। তাছাড়া গৌরীকে আর এ'কবার তুতিয়ে পাতিয়ে ফেরাবার চেষ্টা করলে মন্দ কি ?

এই সব সাত পাঁচ ভেবে প্রহ্লাদের সঙ্গে রমাকে গৌরীর কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দিল কাশীতে বিষ্ণুঠাকুরের আশ্রমেই। এর পরে কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে খুব নরম সুরেই গৌরীকে লিখল ফিরে আসতে। গৌরী উত্তরে ওকে শুধু লিখল - তার পক্ষে পুনর্মুখিক হওয়া একেবারেই অসম্ভব। পিণ্টো শুনে রেগে বলল: "তোর কি এতটুকু সেল্‌ফ্ রেসপেক্ট নেই ? এর পরেও স্ত্রীর প্রসাদ চাওয়া ? ওকে এক্ষণি ডাইভোর্স ক'রে তুই আবার বিয়ে কর্ না। তুই টাকার কুমীর, স্ত্রী পাবি সহজেই। ভাত ছড়ালে কি কাকের অভাব হয় ?" ইত্যাদি।

কিন্তু মন্নুভাই বহুচেষ্টা করেও পারল না গৌরীর আশা ছাড়তে। পিণ্টো ওকে ব্যঙ্গ করত স্ত্রৈণ ব'লে। কিন্তু ও কী করবে ? গৌরীর পরে আর কোনো মেয়েকেই যে ওর মনে ধরে না—অকৃতদার পিণ্টো বিজ্ঞানেরই খবর রাখে, গৃহিণী কী বস্তু জানবে কোত্থেকে ? বিশেষ ক'রে এমন গৃহিণী! মন্নুভাই মুখে গৌরীকে যতই শাপমন্যি দিক না কেন মনে মনে তার রূপ গুণ বুদ্ধি—সর্বোপরি চরিত্রবল ও নিষ্ঠার জন্যে শ্রদ্ধা না ক'রে পারত না। যখন গৌরী রমাকেও ছেড়ে দিল বিনা বাক্যে তখন এ-শ্রদ্ধা পৌঁছল সভয় সমীহে—যার ইংরাজি নাম awe, বলত ও প্রায়ই পিণ্টোর কাছে। পিণ্টো হাসত, বলত: এরি তো নাম স্ত্রৈণ—definition of uxoriousness—শ্রদ্ধা প্লাস কুসংস্কার=নাজেহাল pitiful inconsistency—Q. E. D. বৈজ্ঞানিকের পরিভাষা কি গাণিতিক না হ'য়ে পারে ?

মন্নুভাইয়ের মন কিন্তু একটু যেন খুসি মতনই হ'ত—পিণ্টো যে পিণ্টো তার বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞতায় ফাঁক আছে দেখে—যে বিশ্বজ্ঞ হ'য়েও জানল না স্ত্রী কী বস্তু! আর এ-জগতে স্ত্রীর মতন কাম্য আর কী আছে ? ও স্বভাবে অসংযমী হওয়ার দরুণ মাঝে মাঝেই স্বৈরিণীদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে বেচাল হলেও ইন্দ্রিয়দাসত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম থেকে নিষ্কৃতি পেত না তো: অবসাদ ও পরিতাপ, উদ্‌ভ্রান্তি ও মোহভঙ্গ, উত্তেজনা ও আত্মগ্লানি ধরত ওকে ছেঁকে।

বার বার ভুগে শেষে পিণ্টোকে না ব'লে ফের গৌরীকে লিখল কাতর হ'য়ে। অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে শেষে লিখল যে গৌরী যদি ফিরে আসে তবে ও গুরুদেবের কাছে ক্ষমা চাইতেও রাজী আছে। এবার উত্তরে গৌরী লিখল একটি দীর্ঘ পত্র: "এখন আর হয় না। যখন আমি চেয়েছিলাম নত হ'তে তখন আমাকে মাড়িয়ে চ'লে গেছ আমার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত ক'রে। কিন্তু সেই কর্ষণেই আমার অন্তর উর্বর হ'য়ে উঠেছে—ফলেছে কৃপার ফসল। তাই তোমার বিরুদ্ধে আমার মনে আজ এতটুকু ক্ষোভ নেই, সত্যি বলছি। কেবল এ-

সংসারে যা যায় তা আর ফেরে না, যে-ফুলটি একবার ঝ'রে যায় সে আর ফোটে না। অতীত থাকে শুধু স্মৃতি-লোকেই—বর্তমানে তার আর পুনরুজ্জীবন হয় না। গুরুদেব বলেন কে এক গ্রীক দার্শনিক বলেছেন এক নদীতে মানুষ দুবার স্নান করে না। দিনে দিনে পদে পদে এক হয় আর। তাই আজ আমিও আর সে-গৌরী নেই যাকে তুমি একদিন বধূবরণ করেছিলে, আর তুমিও সে—তুমি নেই যাকে একসময়ে ভালোবেসেছিলাম সর্বান্তঃকরণে—যেমন ভালো বোধহয় জীবনে কাউকে বাসিনি কোনোদিন। কিন্তু পলে পলে তিলে তিলে সে-ভালোবাসাকে তুমি চূর্ণবিচূর্ণ করেছ তোমার লালসায়, কর্কশতায়—বিশেষ ক'রে নাস্তিক ব্যঙ্গবিদ্রূপে। গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েও হয়ে উঠেছ গুরুদ্রোহী, তাঁর অপার কৃপা পেয়েও তাঁকে অপমান করেছ আত্মঘাতী অহঙ্কারে। নৈলে আজ আমাদের জীবন কী মধুময় হ'তে পারত বলো দেখি? এক ইংরাজ কবি বলেছেন of all the saddest things the saddest is—what might have been! তাই আরো বাজে আমাকে যে তোমার স্ত্রী হ'য়েও তোমার সহধর্মিণী হ'তে পারলাম না। পারব কেমন ক'রে বলো? তুমি তো চাও নি সহধর্মিণী, চেয়েছিলে শুধু শয্যাসঙ্গিনী। আমি পারি নি তোমার মনের মতন হ'তে—মানি। কিন্তু সে-দোষ খতিয়ে আমার নয়, দোষ নিয়তির যিনি আমাকে সন্তানের লোভ দেখিয়ে টেনে এনেছিলেন আসলে গুরুচরণেই—যেখানে সব চাওয়াই সমাপ্ত হয় পরম পাওয়ার—কূলে ছেড়ে অকূলের কোলে।

"এক সময়ে কতই না কেঁদেছি—কেন এতবড় আঘাত আমাকে সইতে হ'ল। কিন্তু আজ বুঝেছি যে এ-বেদনা আমার কাছে শাপে-বর হ'য়ে এসেছিল, কেন না তারি অঞ্জনে আমি দেখতে পেয়েছি সংসারিয়ানার আসল রূপ, চিনতে পেরেছি কৃপার মহিমা, খ'সে পড়েছে মায়ার বন্ধন, পদে পদে শৃঙ্খলে বেজে উঠেছে নূপুর। তাই তো আজ আমার মনের সব ক্ষোভই জল হ'য়ে গেছে—আমি সত্যের অপলাপ না ক'রে বলতে পারি যে, আমি আজও তোমার সেই হিতৈষিণীই আছি।

"শেষে শুধু তোমাকে একটি অনুরোধ জানাই। আমার কাশী আসবার ঠিক আগেই গুরুদেবের কথায় রমা প্রহ্লাদের কাছে দীক্ষা নিয়েছিল। বছর দুই আগে ধ্রুব ওর কাকার এক উইলে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়ে বিলেত গেছে প্রকাশনার কাজ শিখতে। ফিরে ধর্মগ্রন্থ প্রকাশক হবে। সেও দীক্ষা নিয়েছে প্রহ্লাদের কাছে। গুরুদেব বলেন প্রত্যেকেরই গুরু নির্দিষ্ট থাকে তাই গুরুকরণ শব্দটি ভুল চয়ন, বলা উচিত গুরুবরণ। কিন্তু সে যাক্। ধ্রুব আর ছ সাত মাসের মধ্যেই বিলেত থেকে ফিরবে আমেরিকা হ'য়ে। আমার অনেকদিন থেকে ইচ্ছা—ওর সঙ্গে রমার বিবাহ দিই। কিন্তু তুমি মত না দিলে তো হবার জো নেই, কেন না রমা এখনো নাবালিকা। ধ্রুব বড় চমৎকার ছেলে। বয়স তার এখন সাতাশ। রমা তাকে ভালোবেসেছে, যদিও ধ্রুব তাকে বধূবরণ করতে চাইবে কিনা জানি না। আমার মনে হয় সে রাজী হবে, কিন্তু এ-বিবাহ তো এখন হ'তে পারে না তোমার সম্মতি ও আশীর্বাদ বিনা। হয়ত তুমি ক্ষুব্ধ হ'য়ে বলবে 'না'। কিন্তু আমি অপেক্ষা করব: কে জানে একদিন হয়ত তোমার সুমতি হবে, গুরুর কৃপায় পদেপদেই অঘটন ঘটতে দেখি নি কি?

"আর একটি কথা মাত্র। যদি আমাকে হঠাৎ পরপারে পাড়ি দিতে হয়—(কেন জানি না, আমার কানে কে যেন কেবলই গায়: ডাক এসেছে!) —তাহ'লে তুমি অন্তত একটু সংযত জীবন যাপন ক'রে রমাকে সুযোগ দিও তোমাকে শুধু ভালোবাসবার নয়, শ্রদ্ধা করবার। জন্মদাতাকে শ্রদ্ধা করতে না-পারা সন্তানের পক্ষে যে কত দুঃখের, তা তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি, আর জানে রমা। তাই ফের বলি তোমাকে: এখনো সময় আছে—উধাও হোয়ো না ঢালুপথে, রঙ্গিনী স্বৈরিণীদের সঙ্গ ছাড়ো—আর তোমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর কথায় ভুলো না—যে তোমাকে পেয়ে বসেছে ভূতের মত—মূর্তিমান্ evil genius যাকে বলে। গুরুদেব প্রায়ই বলেন—আমাদের কাছে যেমন সবচেয়ে বড় বর হ'য়ে আসে সাধুর কৃপা, গুরুর প্রসাদ—কেন না ঠাকুরের কৃপা সব প্রথম আসে এই প্রণালী বেয়েই—তেমনি সবচেয়ে বড় অভিশাপ হ'য়ে আসে নাস্তিক অশ্রদ্ধার দুর্বুদ্ধি। মহাভারতের একটি শ্লোক গুরুদেব প্রায়ই আবৃত্তি করেন:

অশ্রদ্ধা পরমং পাপং শ্রদ্ধা পাপপ্রমোচনী।
জহাতি পাপং শ্রদ্ধাবান্ সর্পো জীর্ণামিব ত্বচম্॥

অর্থাৎ এ-জীবনে অশ্রদ্ধার ম'ত পাপ নেই, আর শ্রদ্ধার ম'ত শুদ্ধিদাতা নেই, কারণ শ্রদ্ধাবান পাপের কালো গ্লানি থেকে তেম্‌নি সহজে মুক্তি পায় যেমন সাপ পায় তার জীর্ণ নির্মোক থেকে। তাই তো তোমাকে চিরদিনই পই পই ক'রে মানা করেছি পিণ্টোর মতন নাস্তিকদের ছায়া না মাড়াতে। আজ শেষবার বলছি—যদি জীবনের সবচেয়ে বড় দানকে বরণ করতে চাও তবে গুরুদেবের কাছে ফের নত হ'য়ে ধর্মবুদ্ধির দীক্ষা নিয়ে বৈজ্ঞানিক শূন্যবাদীদের মিথ্যা মন্ত্রণায় কান দেওয়া ছাড়ো। জন্মান্ধ হ'লেও কথা ছিল, কিন্তু যে চোখ নিয়ে জন্মেছে সে কেন চোখ মেলে দেখতে পায় না—বৈজ্ঞানিকেরা শক্তিবাদ ও ভোগবাদের জুড়িগাড়িতে ক'রে আমাদের নিয়ে চলেছে কোন্ ধ্বংসের পথে ?"

মন্নুভাই এ-চিঠি পেয়ে ফের আগুন হ'য়ে উঠল, গৌরীকে লিখল: "চোখ মেলে দেখতে পায় না কে ? আমি না তুমি? তোমার দুরবস্থা চাক্ষুষ ক'রেই তো আমি বিশ্বাস হারিয়েছি গুরুবাদে, আস্তিকতার মোহ ছেড়ে নাস্তিক বিজ্ঞানের দীক্ষাকে চিনেছি আলোর দীক্ষা ব'লে। প্রহ্লাদ আমাকে না জানিয়ে লুকিয়ে রমাকে দীক্ষা দিয়েছে এ-ও গুরুর পক্ষেই সম্ভব। এর পরেও তুমি আমাকে বলো কিনা রমার বিবাহ দিতে ধ্রুবর সঙ্গে ? তোমার লজ্জা করে না? তাছাড়া রমার মতন মেয়ের —heiressএর—কি সুপাত্রের অভাব যে, নিষ্কর্মা পাণ্ডা-পুরুষের কুপুত্রের হাতে ওকে স'পে দেব ?"

দুই

এদিকে মন্নুভাই গোঁ ধ'রে আরো গা ভাসিয়ে দিয়ে চলল উচ্ছৃঙ্খলতার পথে, ওদিকে মহাদেব কাশীবাসী হবার পর থেকে প্রহ্লাদ গুরুর নির্দেশে সাধনায় ফুটে উঠল ফুলটি হ'য়ে আর সাবিত্রী হ'য়ে দাঁড়াল তার পূর্ণ সহধর্মিণী—ব্রহ্মচারী স্বামীর "বিদ্যা স্ত্রী"। বিষ্ণু ঠাকুর মাঝে মাঝে ওদের দেহুর আশ্রমে এসে দু-চারদিন ক'রে কাটিয়ে যেতেন। সে দিনগুলি ওদের জীবনে যেন নিত্যনব আনন্দের দেয়ালি জ্বালিয়ে দিয়ে যেত। ওরাও থেকে থেকে কাশী গিয়ে গুরুগৃহে দুতিন সপ্তাহ কাটিয়ে আসত দত্তাত্রেয়কে নিয়ে। মহাদেবের সঙ্গে তখন ওদের দিনগুলি যে কী আনন্দে কাটত—বিশেষ ক'রে যখন পিতাপুত্রে বসত আসর জমাতে!—কেবল এখন আর ওস্তাদি গানের কসরৎ দেখাতে নয়—ভজনকীর্তনে ভক্তির বান ডাকিয়ে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রী ও গৌরী পরস্পরের সাধন জীবনের স্পর্শে দিনের পর দিন ভক্তির প্রেরণা পেতে নিত্যনব আনন্দ ছন্দে, দেখত কত কী অঘটন গুরুকৃপার প্রসাদে ঠাকুরের নরলীলায়! সে কি একটা? এ-একঘেয়ে তৃপ্তিহীন দীপ্তিহীন জগতে যে শুধু সাধনভজনে পূজাকীর্তনে জপতপে এত আনন্দ শান্তি ঝরতে পারে—পথ চলতে পথের ধুলোবালি কাঁটা আগাছা যে ভগবানের ছোঁওয়ায় পদে পদে গোলাপ হ'য়ে ফুটতে পারে এ-সত্য তারা কেমন ক'রে জানবে যারা কোনোদিন সাধনাকে বরণ করেনি গুরুর নির্দেশে ?

তিন

এই সময়ে বিপিনের মা-র ডাক এল ওপার থেকে। দীক্ষা নেওয়ার পরে তাঁর মন আশ্চর্য বদলে গিয়েছিল। পাড়াপড়শীরা বলত: "বিশ্বাস হয় না সত্যি যে মানুষের স্বভাব এত বদলে যেতে পারে গুরুর ছোঁওয়ায়।"

রটনাটা মিথ্যা নয়। বিপিনও বলত গৌরব ক'রে একথা। তার মা গঙ্গাজলে অন্তর্জলী হবার সময়েও একথা স্বীকার করেছিলেন গাঢ়কণ্ঠে: "গুরুর কৃপায় যে অসম্ভব সম্ভব হয় তার প্রমাণ আমি। নৈলে কি আমার মতন পাপিষ্ঠাকে আশীর্বাদ করতে আসতেন এমন দেবগুরু ?" ব'লে মালতীকে দেখিয়ে: "আর এই লক্ষ্মীপ্রতিমা—একেও পেয়েছিলাম তো তাঁরি বরে! সত্যি গুরুদেব, অবাক হবে আজ ভাবি আমি—কী ভাবে ওর মধ্যে দিয়ে আলো এল ঠাকুরের! ওকে যন্ত্রণা দিতাম ব'লেই না আপনি এলেন ওর সহায় হয়ে—আমার পাপ মন আপনাকে শাপমন্যি দিল—যার ফলে বিপিন হ'ল পঙ্গু। আমি পাগল হয়ে যাওয়ার দরুণ ঠাঁই পেলাম দয়াময়ীর চরণে—বিপিনেরও নবজন্ম হ'ল দয়াময়ের ছোঁওয়ায়! এসবই হ'ল আমার এই লক্ষ্মী মা-র জন্যেই তো। তাই শুধু একটি অনুরোধ—আপনি যদি পারেন

ওর একটি বিয়ে দেবেন। ওর মতন পুণ্যবতী যাকে স্বামী ব'লে বরণ করবে সে ঠাকুরের কৃপাও পাবেই পাবে।"

বিষ্ণুঠাকুরও চাইতেন তাঁর আর সব শিষ্যার মতন মালতীও বিবাহ ক'রে গৃহস্থাশ্রমে যোগ করবে স্বামীর সঙ্গে—দু একটি সন্তানের পরে নেবে ব্রহ্মচর্য ব্রত। মালতীকে বলতে সে বলল: "বিবাহ করবার আমার ইচ্ছা নেই গুরুদেব। তবে আপনি আমার দেবতা—আপনি যে-বিধানই দেন না কেন আমি মাথা পেতে নেব।"

বিষ্ণুঠাকুর গুরুমাকে একদিন বললেন: "মালতীর সঙ্গে ধ্রুবর বিবাহ দিলে কেমন হয়?"

গুরুমা (একটু চুপ ক'রে থেকে): কি জানো? আমার অনেকদিনের সাধ—রমার সঙ্গে ধ্রুবর বিয়ে হয়—রমা ওকে ভালোবাসে—"

বিষ্ণুঠাকুর (হেসে): ব্রাহ্মণী! শেষে তপোবনেও রোমান্স?

গুরুমা (পিঠ পিঠ): দুষ্মন্ত শকুন্তলার শুভদৃষ্টি হয়েছিল কোন্ "শান্তরসাস্পদ আশ্রমে" তোমার কাছে অজানা থাকার কথা নয়।

বিষ্ণুঠাকুর (অভিবাদন ক'রে): কবির ভাষায়—"মেনেছি—হার মেনেছি।" (গম্ভীর হ'য়ে) তবে কি জানো? রমার সঙ্গে ধ্রুবর বিবাহ অসম্ভব। মনুভাই মত দেবেনা।

গুরুমা (একটু ভেবে): পরে?

বিষ্ণুঠাকুর: কোনোদিনই নয়। ও এখন পুরোপুরি দেবদ্রোহী তথা গুরুদ্রোহী। না—ও আশা ছেড়ে দাও।

গুরুমা: কিন্তু গৌরী মনে বড় দুঃখ পাবে।

বিষ্ণুঠাকুর (একটু ভেবে): আচ্ছা, এখন এ-প্রশ্ন মুলতুবি থাক, পরে দেখা যাবে—ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে। তুমি কাউকে কিছু বোলো না। কেবল একটা কথা: মালতীর বিবাহ দেবার আগে ওর দীক্ষা হওয়া দরকার।

গুরুমা: আমি তো অনেক দিন থেকেই বলছি, কিন্তু তুমি যে কেন ওকে দীক্ষা দিতে দেরি করছ—

বিষ্ণুঠাকুর: কারণ খুব সোজা—আমি ওর গুরু নই যে—বলি নি তোমাকে?

গুরুমা: না তো। ওর গুরু কে তবে?

বিষ্ণুঠাকুর: প্রহ্লাদ।

গুরুমা (আশ্চর্য): প্রহ্লাদ বাবা? কই—

বিষ্ণুঠাকুর: তোমাকে বলি নি কারণ এতদিন আমিও জানতাম না। মাত্র কাল রাতে আমি জানতে পেরেছি—মালতীও কয়েকদিন আগে স্বপ্নে দেখেছে প্রহ্লাদ ওর গুরু।

গুরুমা: সত্যি? তাহ'লে তো বড় আনন্দের কথা—প্রহ্লাদ বাবার মতন গুরু—বড় ভাগ্যের কথা।

বিষ্ণুঠাকুর (হেসে): বটেই তো—নইলে আমার কাছেই হয়ত দীক্ষা নিতে হ'ত অভাগিনীর।

গুরুমা (জানুতে চাপড় মেরে): তুমি ভা—রি দুষ্টু। এমন কথা কি ঠাট্টা ক'রেও মুখে উচ্চারণ করতে আছে।

বিষ্ণুঠাকুর: কী করি বলো, যখন সতী লক্ষ্মীর জিভে দুষ্ট সরস্বতী ভর ক'রে দয়াময় বাবুকে কাবু করেন। কিন্তু সে যাক্ তুমি প্রহ্লাদকে ডাক দাও—এই মাসেই ওর দীক্ষা হওয়া চাই।

গুরুমা: কেন?

গুরুদেব: একটা ফাঁড়া দেখতে পাচ্ছি। মনে হয় দীক্ষার শুভস্পর্শে কেটে যেতে পারে।

গুরুমা (শিহরিত): ও মা! ফাঁড়া! আমি আজই লিখে দিচ্ছি।

চার

প্রহ্লাদ গুরুমার চিঠি পেয়ে লিখল—স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে সামনের মাঘ মাসে বহু ধর্মার্থীকে নিমন্ত্রণ করেছে চিঠি ছাপিয়ে। সভায় ভজন কীর্তন করতে হবে, কিছু বলতেও হবে, স্বামীজীর সম্বন্ধে। তার পরেই কাশী যাবে মালতীকে দীক্ষা দিতে।

ইতিমধ্যে কুম্ভমেলায় প্রয়াগে মহা ধুমধাম সুরু হ'ল। রমা, মালতী ও গৌরীকে নিয়ে মহাদেব গেলেন প্রয়াগে। তাঁবু পড়ল গঙ্গার চরে।

ওদের আনন্দ ধরে না! চারদিকে সাধুসন্ত, সামনে গঙ্গা। ভাণ্ডারা, হরিকথা, কীর্তন, গীতা ভাগবত পাঠ—প্রয়াগ হ'য়ে উঠেছে উৎসবের তপোবন!

শেষদিনে ওরা ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাস্নান করতে একটি নৌকা ভাড়া নিল। কী ভিড়! সঙ্গমের কাছে পৌছুতে মাঝির বেগ পেতে হ'ল। অনেক কষ্টে শেষে সঙ্গমে

পৌঁছল। শেষ ছুদিন হঠাৎ বৃষ্টির ফলে জল ফুলে উঠেছে, নৌকার গায়ে উচ্ছল গঙ্গার খরস্রোত ঢেউ এসে লেগে ছিটকে ছিটকে উঠছে। মালতী রমা আনন্দে "ও মা! কী কাণ্ড!" ব'লে পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে: "ঐ দেখ্ ঐ শুশুক—হুশ্!……ঐ দেখ সন্ন্যাসীর জটা! উঃ সাড়ে চার হাত···দূর্ কম ক'রেও তিন গজ···" ইত্যাদি।

এম্‌নি সময়ে পাশ থেকে একটি নৌকা হুহু ক'রে এসে ওদের নৌকায় ধাক্কা মারল। সঙ্গে সঙ্গে মালতী জলে প'ড়ে গেল। সাঁতার সে খুব ভালোই জানত। বিধবা হবার আগে স্বামীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাঝে মাঝেই সাঁৎরে গঙ্গা পার হ'ত। কিন্তু সাঁতার দেবে কে? ধাক্কায় জলে প'ড়ে যাবার সময়ে বেটক্করে আগন্তুক নৌকার একটা উঠতি দাঁড় ওর রগে এসে লাগতে মালতী চিৎকার ক'রেই অজ্ঞান হ'য়ে ভেসে চলল গর্জমান স্রোতে। মহাদেব তৎক্ষণাৎ "জয় গুরু!" ব'লে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু ততক্ষণে মালতী খর-স্রোতে বিশহাত দূরে চ'লে গেছে। মহাদেব ভালো সাঁতার জানলেও প্রয়াগের গঙ্গার দুর্জয় স্রোতে টাল সামলাতে না পেরে ভেসে কাছের একটা নৌকার হালে লেগে তলিয়ে গেলেন। দেখে সঙ্গে সঙ্গে গৌরী ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে চলল মালতীর ভাসমান চুলের দিকে। অতিকষ্টে পৌঁছল নিঃসম্বিৎ দেহের কাছে, ধরল ওর চুল চেপে। সাঁতারে ও নিপুণ ছিল আশৈশবই, কিন্তু সম্প্রতি ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠেছিল ব'লে বিষম হাঁপিয়ে উঠে চিৎকার ক'রে উঠল। চুল ছেড়ে দিয়ে শুধু ভেসে থাকবার চেষ্টা করলে হয়ত বাঁচতে পারত, কাছাকাছি কোনো নৌকার মাঝি তুলে নিত, কিন্তু তাহ'লে মালতী ভেসে যায়। এম্‌নি সময়ে ওদিক থেকে একটা পুলিশ মোটরবোট নিয়ে ছুটে এল। গৌরী চুলশুদ্ধ হাত তুলতেই আরোহী পুলিশ চুল ধ'রে মালতীকে টেনে তুলল নৌকায়, কিন্তু গৌরী এত হাঁপিয়ে পড়েছিল যে উঠতে পারল না, প্রবল স্রোতে ভেসে চ'লে গেল।

মোটর বোটের কর্ণধার মালতীকে তুলে গৌরীর দিকে চলল দ্রুতবেগে। পৌঁছলও বটে কিন্তু গৌরীর দেহে তখন আর প্রাণ নেই। (ডাক্তারে পরে পরীক্ষা ক'রে রায় দিল যে ওর থ্রম্বোসিস ছিল।)

মহাদেবের দেহ পাওয়া গেল তিনচার ঘণ্টা পরে—আড়াই মাইল দূরে একটি চরে বেধে গিয়েছিল। পুলিশ মোটরে দেহ তুলে আনা হ'ল বিকেলবেলা। রগের কাছে ক্ষত গভীর,—কিন্তু মুখে সে কী শান্ত হাসির আভা! দেখবার ম'ত!

পাঁচ

প্রহ্লাদ টেলিফোনে খবর পেয়েই সান্তাক্রুজ থেকে উড়ে কাশীতে পৌঁছল শেষ রাতে। বিষ্ণুঠাকুর নিজে বিমানঘাঁটিতে গিয়েছিলেন। প্রহ্লাদ নামতেই ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

প্রহ্লাদ চোখের জল মুছে জিজ্ঞাসা করল: "আপনি কি এই ফাঁড়ার কথাই লিখেছিলেন?"

বিষ্ণুঠাকুর বললেন: "ঠিক এই ফাঁড়া মানে কি? কারুর প্রাণসংকটযোগ থাকলে যোগীরা তার মাথার উপর একটা অশুভ ছায়ামতন দেখতে পান। ভাগবতে বলেছে বিশ্বরূপ মহাকায়ের 'ছায়াস্থ মৃত্যু'—ছায়ার উপনাম মৃত্যু।—কিন্তু সে যাক, আমি শুধু বলতে চাই যে তুমি এ-শোককে যেন সেই ভাবে গ্রহণ করতে পারো যে-ভাবে গ্রহণ করলে হৃদয়ের পদ্ম আরো দল মেলতে পারে ঠাকুরের কৃপার পানে।"

মোটরে আসতে আসতে বিষ্ণুঠাকুর প্রহ্লাদের হাত চেপে ধ'রে বললেন: "আমার মন আনন্দে টইটুম্বুর হ'য়ে উঠেছে বাবা!"

প্রহ্লাদ (চমকে): আনন্দ?

বিষ্ণুঠাকুর: নয়? বাবা, মরতে হবে সবাইকেই। তোমার প্রিয় কবি গেয়েছেন না—

একই ঠাঁই চলেছি ভাই ভিন্ন পথে যদি
দুঃখ মিছে, কান্না মিছে,
দুদিন আগে দুদিন পিছে,
একই সেই সাগরে গিয়ে মিশিবে সব নদী।

বটে, কিন্তু কাল সন্ধ্যায় এ গানটি গাইতে গাইতে কী আঁথর এল শুনবে?

সিন্ধু মুখে যে নদী ধায়
মরণে নবজীবন পায়
অকূল কোলে পূরণ হয় আর সকল ক্ষতি।

এ কথার কথা নয় বাবা। জীবনে অনেক মীড়ই বেজেও বাজে না, অনেক সুরই অনিশ্চিত, ধ্রুব কেবল একটি সুর—মৃত্যু। সব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় নানা জটিল যুক্তি দিয়ে, শুধু এইখানেই যুক্তি বুদ্ধি প্রতিভা বল সব হার মানে। কিন্তু এ-হারও জিৎ হ'য়ে দাঁড়ায় কার কাছে বলো তো? না, যে দেখতে পেয়েছে মরণের মধ্যে জীবনেরই প্রতিবিম্ব। আর সেই পারে এক কথায় পরপারে পাড়ি দিতে গান গেয়ে: "ভয় কি? এ-পারেও যাঁর চোখের আলো আমাকে পথ দেখিয়েছে ওপারেও সেই আলোর আলোই আমাকে পরম স্নেহে তুলে নেবে যদি আমি তাঁর শরণ চাই।"

প্রহ্লাদ (চোখ মুছে): আশীর্বাদ করুন গুরুদেব, যেন এ-আঘাতে আমার এই প্রত্যয়ই আরো দৃঢ় হ'য়ে ওঠে। এখনো মনটা অস্থির আছে।

বিষ্ণুঠাকুর (তার একটি হাত কোলে টেনে নিয়ে): জানি বাবা। আমাকেও কি দুঃখ শোক পেতে হয়নি? জগতে কি এমন কোনো মানুষ আছে যার পায়ের নিচের মাটি কখনো টলমল ক'রে ওঠেনি আকস্মিক দুর্যোগে? কিন্তু যতই মাথা ঘুরবে ততই খুঁটি আঁকড়ে ধরতে হয়। আর আমাদের জীবনে সব চেয়ে বড় খুঁটি কে জানো না কি?

প্রহ্লাদ: জানি গুরুদেব, গুরুকৃপার মধ্যে দিয়ে ভগবৎকৃপার পরম উপলব্ধি। আপনি আমাকে আরো কাছে টেনে নিন—শক্তি দিন। নৈলে রমার সামনে দাঁড়াব কোন মুখে বলুন? (দুহাতে মুখ ঢেকে) কেন আমাকে বললেন তাকে দীক্ষা দিতে? আমাকে বড় আধার বলেনই বা কী জন্যে? যে নিজেকে সামলাতে পারে না সে অপরকে বল দেবে কিসের জোরে? শুধু বাবা নয়, দিদিও ছেড়ে গেলেন আর এক মুহূর্তে? (ব'লে বিষ্ণু ঠাকুরের কোলে ভেঙে পড়ে কান্নায়)।

বিষ্ণুঠাকুর (প্রহ্লাদের শিরশ্চুম্বন ক'রে): জোর আছে বাবা, তবে খবর নেই। আর সেই খবর দিতেই আঘাত আসে বার্তাবহ হ'য়ে। আমি ভুল করি নি। তুমি কী ধাতুতে গড়া আমাকে ঠাকুর নিজে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই আমি জানি যে তাঁর বলে বলী হ'য়ে তুমি হাঁটবে—ভাগবতের ভাষায়—বিনায়কানীকপমূর্ধ্ন— অর্থাৎ সব বাধাবিঘ্নের মাথার উপর পা রেখে—আর সেদিন সুদূরও নয়। রমা ও ধ্রুবকে তুমি দীক্ষা দিয়েছ, এবার মালতীকেও মন্ত্র দিতে হবে। তবে এ তো সূচনা মাত্র। পরে আরো অনেক ধর্মার্থী শিষ্যশিষ্যা আসবে তোমার কাছে। কারণ গুরু তোমাকে হ'তেই হবে। আমি যার অপেক্ষা করেছিলাম সে এই আঘাত। তাই বলতে পারি যে এতদিনে সময় এসেছে।

প্রহ্লাদ (মুখ তুলে আশ্চর্য হ'য়ে): এই আঘাতের অপেক্ষা ক'রেই কি ছিলেন এতদিন।

বিষ্ণুঠাকুর: হ্যাঁ বাবা! পরের দুঃখের ভাগ নিতে পারে কেবল সে-ই যে গভীর বেদনার অন্ধকারকে আলো ব'লে চিনতে পেরেছে। এরই নাম দিব্যচক্ষু। এবার তুমি পাবে সেই শিবনেত্র—আর পাবে অচিরেই. তোমার ডায়ারিতে লিখে রাখতে পারো আমার এ-ভবিষ্যদ্বাণী।

ছয়

মহাদেব ও গৌরীর দেহ পাশাপাশি ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। সে কত যে ফুল মালা তুলসী…ধূপ দীপ নির্মাল্য। দলে দলে মেয়েরা আসে গৌরীর পায়ের ধুলো নিতে—বৃদ্ধ বৃদ্ধারা মহাদেবের পায়ে পড়ে লুটিয়ে। পরের জন্যে প্রাণ দেওয়া! এমন কি কাশীর কয়েকটি অবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক এসেও হাতজোড় ক'রে দাঁড়ায়।

* * *

মণিকর্ণিকার ঘাট থেকে সন্ধ্যায় ফিরে এসেই প্রহ্লাদ গুরুমার ঘরে গেল। গুরুমা মালতীর শিয়রে ব'সে জপ করেছিলেন। প্রহ্লাদ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেই মাথায় হাত দিয়ে বললেন নিচু স্বরে: "ঘুমুচ্ছে। জ্বর একশো চার। তুমি একবার রমার কাছে যাও বাবা, সে তোমার পথ চেয়ে আছে। মালতীকে আমি দেখছি। শুধু মাথার আঘাতই তো নয়—মন ওর বিহ্বল হ'য়ে পড়েছে আরো এই ভেবে যে ওরই জন্যে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল। সারাদিন ছটফট ক'রে সন্ধেবেলায় জ্বরের তাড়স একটু কমেছে, তাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু এখন এসব কথা থাক। রমা তোমার পথ চেয়ে আছে বাবা! শোক সবচেয়ে বেশি বেজেছে তাকেই। আহা!"

সাত

প্রহ্লাদ রমার ঘরে এসে দেখে সে গুরুদেব ও গুরুমার ছবির সামনে তন্ময় হ'য়ে জপ করছে। চোখের পাতা ভিজে, দেহ নিস্পন্দ, শুধু ঠোঁট নড়ছে। ও চমকে উঠল: কী অপরূপ মুখ! রমার রূপ নিয়ে লোকে বলাবলি করত। কিন্তু এ তো সে-রূপ নয়! রূপ গ'লে যেন আলো হ'য়ে গেছে!

প্রহ্লাদ ওর কাছে এসে দাঁড়িয়ে ওর মাথায় হাত রাখে। রমা চোখ খুলে তাকিয়েই ওর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। প্রহ্লাদ মাটিতে ব'সে ওর মাথাটি কোলে টেনে নিয়ে জপ করে নীরবে মৃদু কণ্ঠে:

প্রাণৈঃ স্বৈঃ প্রাণিনঃ পান্তি সাধবঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।
পুংসঃ কৃপয়তো ভদ্রে! সর্বাত্মা প্রীয়তে হরিঃ।*

* * * *

ক্ষণভঙ্গুর প্রাণ দিয়েও যে-সাধুরা প্রাণীরে রক্ষা করে
নিখিল জীবের অন্তরবাসী প্রসন্ন হয় তাদের 'পরে।"

রমা চোখের জল মুছে প্রহ্লাদের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে হাতজোড় ক'রে।

প্রহ্লাদ ওর মাথায় হাত রেখে গাঢ়কণ্ঠে বলে: "তোমাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিলাম মা, কিন্তু তোমার জপতন্ময় মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি যে, তুমি পেয়েছ সেই আলো যার স্পর্শে মায়ার আঁধার কাটে।"

রমা একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: "মামাবাবু! আমি কত দীন কত সামান্য জানি ব'লেই বুঝি দীনতারণ আমাকে দিয়েছেন শোক জয় করার শক্তি। প্রথমে মাথা ঘুরে উঠেছিল। কিন্তু মূর্ছা ভাঙতেই কী বলব মামাবাবু··· আমার নিজেরই যেন পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না···মনে হয়··· কে যেন আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর··· আর আমার সব তাপ গ'লে যাচ্ছে। এ-কি আমার মনের ভুল মামাবাবু?

প্রহ্লাদ: না মা···এরই নাম কৃপার অনুভূতি। আর একথা বলছি আমি পুঁথি প'ড়ে নয়—কৃপার মর্ম কিছু জেনেছি ব'লেই।

রমা: আপনি মহাসাধক—একান্তী—আপনি জানবেন না তো জানবে কে মামাবাবু!···সত্যি, আমার কেবলই মনে পড়ছে—কী শুনবেন? (গাঢ়কণ্ঠে) যখন দাদুর আর মার দেহ নিয়ে তাঁর ও গুরুদেবের পায়ে রাখা হ'ল তখন গুরুমা বললেন শুধু কয়েকটি কথা—কিন্তু সে তো কথা নয় মামাবাবু—আলো! বললেন আমাকে বুকে টেনে নিয়ে: "দুঃখ কোরো না মা, আনন্দ করো। শ্মশানে যেতে হয় শেষে সবাইকেই কিন্তু এমন মহাপ্রয়াণের ভাগ্য ঘটে কজনের? তাই দুঃখ বাজলেও তাকেই বড় ক'রে দেখো না। ভাগবতে ঠাকুর গোপবালকদের কী বলেছিলেন মনে রেখো সর্বদা:

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা॥

অর্থাৎ অপরের মঙ্গলের জন্যে শুধু ধন বুদ্ধি বাক্যকে নিয়োগ ক'রেই ক্ষান্ত হবে না, দরকার হ'লে প্রাণও দেওয়া চাই—আর যে এ পারে তারই জন্ম সফল। কারণ এই-ই হ'ল সাধনার সাধনা—সকলের মধ্যে ঠাকুরকে দেখে জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা। কিন্তু আমরা স্বভাবে এম্নিই স্বার্থপর মা, যে, দীক্ষা পেয়েও ভুলে যাই যে সুখী হয় শুধু সেই যে পরার্থনিষ্ঠার ডাক শুনে স্বার্থের মায়ামোহ কাটিয়ে ওঠে।" এই যে বন্দনাদি!

বন্দনা এসে প্রহ্লাদকে প্রণাম ক'রে বলে: "দাদা, শিষ্যা করেছেন বটে। ওকে দেখে আমরা কত কী যে শিখেছি!"

রমা: অমন কথা বলে না বন্দনাদি। আমার আর কতটুকু শক্তি বলো? আমি তোমার একটা কথায় কত জোর পেয়েছি—তুমি জানো না আগে।

বন্দনা (আশ্চর্য): আমার কথায়?

রমা: হ্যাঁ। তুমিই আমার চোখ খুলে দিয়েছ প্রথম—নৈলে কি আমি বল পেতাম এত সহজে? তুমি বলেছিলে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে: "রমা, কাঁদিস নে তোর দাদুর জন্যে মায়ের জন্যে। গৌরব কর যে তাঁদের মধ্যে

---

* দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনে ঘোর হলাহল বিষের তাপে সকলে মহাদেবের কাছে এসে আবেদন করল: "ত্রাহি নঃ শরণাপন্নাং ত্রৈলোক্যদহনাদ্বিষাৎ"—স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল বিষের তাপে জ্ব'লে যায়, রক্ষা করুন। তখন মহাদেব পার্বতীকে বলেন: "প্রাণৈঃ স্বৈঃ প্রাণিনঃ···

দেখতে পেলি গুরুকৃপা কী ভাবে মানুষকে ঢেলে সাজায়—স্বার্থ ছেড়ে পরমার্থকে বরণ করতে শিখিয়ে। দেখ না তোর মাকে—গুরুর জন্যে তোকেও তো ছেড়েছিলেন এক কথায়। তাই তো গুরুর কৃপাই আবার তোকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। আবার সেই মা-ই নৌকায় তোর কথা না ভেবে পরের শিশুকে বাঁচাতে ঝাঁপ দিলেন তো। তেমনি আবার দেখ্ তোর দাদুকে। তিনি কী ছিলেন কী হ'লেন বল্ তো? একসময়ে তোর মামাবাবু আর মামীমার গুরু-বরণের জন্যে কী দুঃখই না দিয়েছেন তাঁদের! সেই মানুষ সংসারের আসক্তি ছেড়ে বাণপ্রস্থী হ'ল—আর কখন বল্ তো? না, যখন ছেলে বৌ নাতি নিয়ে দিব্যি সুখে বিলাসের খাস-তালুকে বাকি জীবনটা কাটাতে পারতেন। ভাই রমা! বাঁচে সবাই, কিন্তু বাঁচার মতন বাঁচে কজন? ম'রে নিশ্চিন্ত হয়ও সবাই, কিন্তু তোর দাদুর মতন ম'রে অমর হ'তে পারে কজন এ সংসারে? গুরুবরণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই যে অপরূপ বিকাশ হ'ল একজন সংসারী মানুষের—এ দেখেও লোকে মানতে চায় না রে যে, জীবনে যত রকম সত্যের পরিচয় পেয়ে আমরা দিনে দিনে কালো-বেদনার বোঁটায় অলোচেতনার ফুল ফোটাই তার মধ্যে সেরা ফুল—শতদল পদ্ম—হ'ল গুরুর-মধ্যে-দিয়ে-পাওয়া ইষ্টের কৃপা। তাই তোর জন্যে আমি কেবল এই প্রার্থনাই করি রমা, যেন তুই দেখতে পাস যে, গুরু আর ইষ্ট অভিন্ন—কারণ এ-সত্যকে যে চিনেছে তার আর দুঃখ থাকে না রে—তার কাছে প্রতি শাপও হ'য়ে দাঁড়ায় বর।"

তোমার এই কটি কথাই আমার চোখ খুলে দিয়েছিল বন্দনাদি! (প্রহ্লাদকে) না, মিথ্যা বলব না মামাবাবু! আমি এখনো গভীর দুঃখ পাই ভাবতে যে, মা নেই, দাদুকে আর দেখতে পাব না কোনোদিন। কিন্তু খেদ নেই আমার সত্যিই। আমি যে চিনতে পেরেছি কৃপাকে আরো বেশি ক'রে এই দুঃখের মধ্যে দিয়েই। আপনার স্নেহ পেয়েছি, গুরুমার সে যে কত আদর কী বলব? তিনি কাল আমার কাছে বন্দনাদির বাঁধা একটি গান গাইলেন—গানটি বন্দনাদি বেঁধেছিলেন প্রয়াগে দাদু ও মার মহাপ্রয়াণের পরে। (বন্দনাকে) গাও না ভাই গানটি, আমি চাই—মামাবাবুও দেহুতে ফিরে গেয়ে মামী-মাকে শোনাবেন এই গানটি।

বন্দনা: আমি কী গাইব দাদার সাম্‌নে?

প্রহ্লাদ: অমন করে না। গাও, আমি শুনে শুনে শিখে নিয়ে ফিরে গিয়ে তোমার বৌদিকেও শেখাবো।

বন্দনা একটু চুপ ক'রে থেকে গান ধরে:

এসো কান্ত বিজনে,
আমার ক্লান্ত লগনে,
　　এসো আমার প্রাণের গহনে
　　　　গভীর মিলনে।
　　চাই তোমাকে কায়ায় ছায়ায়
　　　　শান্তি তাপনে
　　　　মৌনে কাঁপনে।
এসো অশ্রু-কাননে,
আশার কুসুম বিছনে,
　　আঁধার মরণ ক'রে সাধন
　　　　নয়ন-কিরণে
এসো মলিন সুখের বিসর্জনে
　　নবীন যুগের আবাহনে
　　নিশীথ কালোয় আলোর বোধনে
　　　　অরুণ চরণে
　　　　শরণ স্বপনে
　　　　　বিধুর বেদনে
　　　　　চমক চেতনে।

[ক্রমশঃ

হাসি ও অশ্রুর তত্ত্ব

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

হাসি-অশ্রু আমাদের জীবনের অবশ্যম্ভাবী অভিজ্ঞতা। এমন কোন্‌জন আছেন যিনি কদাপি হাসেন নি অথবা কাঁদেন নি? মনে হয়, জন্ম-তোরণ দিয়ে ধরণীর রঙ্গ-ভূমিতে প্রবেশ করার যে ছাড়পত্র বিধাতার কাছ থেকে আমরা পাই তার শীলমোহরটি হাসি-অশ্রুর।

কারণ বিনা কার্য নেই। অতএব প্রশ্ন আসেই—কেন হাসি, কেন কাঁদি। দুঃখ পেলেই কাঁদি। কিন্তু হাসির ব্যাপারটি জটিল। কেন হাসি, তার উত্তর অত সহজে দেওয়া যায় না। এইজন্যে হাসি সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু চিন্তা সেই সুদূর যুগের এরিষ্টটোল থেকে এ যুগের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই করেছেন দেখতে পাই।

কিন্তু এঁদের মধ্যে যাঁর চিন্তা বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য তিনি হলেন ফরাসী দার্শনিক—'অঁরি বের্গস'। তাঁর পূর্ণাঙ্গ Laughter বইটির সবখানি জুড়ে রয়েছে একটা মৌলিক চিন্তার ঠাসবুনানি।

বের্গসের গোটা বক্তব্যবস্তু যে মূল তত্ত্বটির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা হল এই :—

"The laughable element consists of a certain mechanical inelasticity, just where one would expect to find the wide awake adaptability and the living pliableness of a human being, The rigidity is comic and laughter is corrective." অর্থাৎ, হাসির উপাদান হল অনমনীয়তা—যা কিনা মানুষের নমনীয় এবং সামঞ্জস্য-সমর্থ স্বভাবকে আক্রান্ত করে থাকে। এই অনমনীয়তা কৌতুকপ্রদ এবং হাসি এর সংশোধক। প্রাণের লক্ষণ সজীবতা, এবং সজীবতার কাজ হল সকল কিছুর সঙ্গে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা। অতএব প্রাণবন্ত সজীব মানুষ সব কিছুর সমন্বয় সাধন করবে, খাপ খাইয়ে চলবে, এটা স্বতঃসিদ্ধ। ভদ্রসভায় শান্ত নীরব পরিবেশের মধ্যে বিরাট মুখব্যাদান করে নির্ঘোষে হাঁচলে হাসির উদ্রেক ঘটে, কারণ সে হাঁচি ভদ্রসভার রীতিনীতি ও পরি-মণ্ডলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে নি। রাস্তায় চলতে গিয়ে যে লোকটি কলার খোসায় পা দিয়ে পড়ে গেল, তারও ঐ দোষ। রাস্তায় চলতে গেলে যে সতর্কতার প্রয়োজন সেই সতর্কতার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে না পেরেই লোকটি পড়ল। এই সামঞ্জস্যের অভাবই 'রিজিডিটি' বা অনমনীয়তা। যে লোক কথা বলতে বারে বারে 'বুঝেছ কিনা' বলে, তার এই মুদ্রাদোষেই আমরা হাসি। কেন? সেই একই কারণ,—অনমনীয়তা সামঞ্জস্য রক্ষা করার শক্তির অভাব। 'বুঝেছ কিনা' এই অপ্রাসঙ্গিক কথাটি যন্ত্রের মতো পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করাই হাসি আনে। একটি সজীব লোক যন্ত্রের লক্ষণ দেখাবে কেন? তাই আমরা অন্যের মুদ্রাদোষে হাসি, প্রাণের ক্রিয়ায় যখন যন্ত্রের লক্ষণ দেখা দেয় তখন কৌতুকের অবকাশ ঘটে।

একলা মানুষ হাসে না, হাসলেও নিজেকে অন্যের সমক্ষে কল্পনা করে তবে হাসে। এই কল্পনা অবশ্য অবচেতন মনেই ঘটে থাকে। সুতরাং সামাজিক মানুষই হাসে। হাসি তাই সমাজ বা ব্যষ্টিধর্মী। সামঞ্জস্য রক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়েই যখন হাসি তখন হাসি ব্যষ্টি-নির্ভর না হয়ে হয়তো পারে না।

Laughter is corrective, অর্থাৎ হাসি সংশোধক। অনমনীয়তা বা সামঞ্জস্য রক্ষার অভাবকে হাসি সংশোধন করতে চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি নিজের অজ্ঞাতসারেই 'বুঝেছ কিনা' কথাটি যন্ত্রের মতো পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করে থাকে, তার সে মুদ্রাদোষের ভঙ্গীটি আমরা নকল করে, হেসে জানিয়ে দিই ঐ যান্ত্রিক পৌনঃপুনিকত্ব অনায়াসে পরিহার করা যায়। এই নকল করতে পারি বলেই, 'বুঝেছ কিনা' কথাটির অমন ব্যবহার কৌতুকপ্রদ। সেই সব বিবৃতিই কৌতুককর, যা আমরা সাফল্যের সঙ্গে অনুকরণ করতে পারি।

"A deformity that may be comic is a

deformity that a normally built person could successfully imitate."

যে নমনীয়তা প্রাণবন্ত সজীব মানুষ হিসাবে আমাদের কাছে অনায়াসলব্ধ, তাকে আয়াসলভ্য করাটা দুর্বলতা। অন্যের মধ্যে এই দুর্বলতা দেখলে আমরা হাসি। আমাদের হাসির সঙ্গে তাই আমাদের একটা আত্মপ্রসাদ বোধ থাকে। ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স্‌ তাই বলেছেন,

"We laugh because······we have a sudden glory in discovering some eminency in ourselves by Comparison with the infirmities of others.' অন্যের দুর্বলতার সুযোগেই আমাদের এই চিত্ত-গরিমা। তবে এই গরিমাবোধের তারতম্য আছে। কখনো তা প্রকাশ পায় উৎকটরূপে, কখনো আভাস ইঙ্গিতের আবরণ নিয়ে, অন্তঃসলিলারূপে। এই তারতম্য নির্ভর করে আমার যে 'এটিচুড্‌' বা মনোভাব নিয়ে হাসি, তার ওপর। ইংরেজি ভাষায় হাসির যে বিভিন্নরূপের নাম পাই যথা উইট, হিউমার, স্যাটায়ার, আইরনি, ইত্যাদি, সেগুলি সবই আমাদের এই মনোভাবের ওপর নির্ভরশীল।

বুদ্ধিদীপ্তির নানা প্রতিফলনে উইটের বৈচিত্র্যময় চমক, গমক এবং শাণিত তীক্ষ্ণ বাকবিভঙ্গী দেখা দেয়। অবশ্য প্রকৃত উইটে আছে, সহিষ্ণুতা; হাসতে গিয়ে বুদ্ধিতে শাণ দেওয়াই হল তার কাজ, কোনরকম আঘাত দেওয়াতে তার মন তত নেই। সহিষ্ণুতার যখন অভাব ঘটে তখন হাসির যে রূপ ফোটে তা হল স্যাটায়ার, অর্থাৎ বিদ্রূপ এবং এই অসহিষ্ণুতার জন্যেই স্যাটায়ার যথেষ্ট আঘাত দিয়ে থাকে। পিত্তদোষদুষ্ট মেজাজের রুক্ষতা ও নীতিবাগীশের কলহপরায়ণতা নিয়ে স্যাটায়ারের হাসি বেশ নিষ্করুণ। এক কথায় স্যাটায়ারের হাসিতে বেশ হুল আছে। কিন্তু হাসি যখন বাইরে মধুরপ্রলেপ দিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে হুল ফোটায়, তখন তা হল আইরনি বা ব্যঙ্গ। স্যাটায়ার গায়ে জ্বালা ধরায়, আইরনি কিছু সুড়সুড়ি দিয়ে চিমটি কাটে।

আর হৃদয়ের রসে যে হাসির ভিয়েন সে হাসির আধার হল হিউমার। হিউমারের মূল কথা হল মমতা, সহানুভূতি। অন্যের দুর্বলতা নিজের মনে করে নিয়ে যখন হাসা যায় তখনই হিউমারের সৃষ্টি হয়।

বের্গস যে হাসির তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার সঙ্গে ডারউইনের জীবতত্ত্বের একটি মূলসূত্রের আশ্চর্য মিল আছে। ডারউইনের একটা কথা হল এই যে, প্রাণিগণ অবিরত সামঞ্জস্য-সাধনের কাজে ব্যাপৃত। এই তত্ত্বের সত্য রবীন্দ্রনাথের কাছেও প্রতিভাত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "এই বিশ্বচরাচরে আমরা বিশ্বকবির যে লীলা চারিদিকেই দেখতে পাচ্ছি সে হচ্ছে সামঞ্জস্যের লীলা।" এই সামঞ্জস্য সূত্রের সঙ্গে হাসির কারণ-সূত্র মিলিয়ে দিয়েছেন বলেই বোধ হয় বের্গসর কথা এতো মূল্যবান্‌ ঠেকে। হাসির এই ইতিবৃত্তের সঙ্গে অশ্রুর ইতিবৃত্তের কোন মিল আছে কিনা এ কৌতুহল একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনেই জাগ্রত হয়েছিল দেখতে পাই। হাসির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, অসঙ্গতিও দুই শ্রেণীর আছে, একটা হাস্য-জনক, আর একটা দুঃখজনক।··· অসঙ্গতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে, তখনই আমাদের কৌতুক বোধ হয়; গভীরতর স্তরে আঘাত করলে আমাদের দুঃখ বোধ হয়।" একথাকে রবীন্দ্রনাথ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেননি; কিন্তু সূত্রাকারে জানিয়েছেন যে, একই কারণকে ভিত্তি করে হাসি-অশ্রুর উদ্ভব।

এরিষ্টটোল বলেছেন, জীবনে অনর্থ থেকে রেহাই পাবার উপায় হল Golden mean অবলম্বন করা। এই Golden mean আর কিছুই নয়, শুধু সামঞ্জস্য রক্ষা করার ক্ষমতা এবং সামঞ্জস্যের অভাবেই যখন আমাদের হাসি-অশ্রুর সৃষ্টি হচ্ছে, তখন এমন ভাবতে পারি যে, যেদিন এই Golden mean দ্বারা এমন স্বর্ণ-সরণী তৈরী করা যাবে, যার ওপর দিয়ে পৃথিবীর সব মানুষ চলতে পারবে, সেদিন মনুষ্যজীবনে আর হাসি বা অশ্রু কোনটিই থাকবে না। অবশ্য সে অবস্থা সম্ভব কিনা এবং কান্নাও ঠেকবে কিনা—সে কথা আলাদা।

প্রফুল্ল কি ট্রাজেডি ?

শ্রীবরুণকুমার চক্রবর্ত্তী

'প্রফুল্ল' নাটকখানি গিরিশচন্দ্রের একটি বিখ্যাত জনপ্রিয় সামাজিক নাটক। এই নাটকের নায়ক যোগেশ। তাঁহার বহু পরিশ্রমে গঠিত শান্তির ও সুখের সংসার অকস্মাৎ কিরূপে ভাঙ্গিয়া গেল, তাহারই করুণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে এই নাটকখানিতে। সমালোচক মহলে এই নাটকখানি আলোড়ন তুলিয়াছে—বিশেষ করিয়া ইহার আঙ্গিকতার বৈশিষ্ট্য লইয়া। এক শ্রেণীর সমালোচক নাটকখানিকে ট্রাজেডি বলিয়া স্বীকার করিয়া, নানাবিধ যুক্তি প্রয়োগে তাঁহাদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আবার আর এক শ্রেণীর সমালোচক নাটকখানির নানাবিধ ত্রুটি প্রদর্শন করাইয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, ইহা ট্রাজেডির পর্যায়ভুক্ত হইতে পারেনা। আবার ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ কয়েকজন সমালোচক নাটকখানির ট্রাজেডিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ট্রাজেডির পর্যায়ভুক্ত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে বিচার্য বিষয় হইল যে, 'প্রফুল্ল'কে আমরা সত্যই ট্রাজেডির পর্যায়ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি কিনা এবং স্বীকার করিলেও ইহা প্রথম শ্রেণীর ট্রাজেডির পর্যায়ভুক্ত হইবার যোগ্য কিনা। কিন্তু ইহা বিচার করিবার পূর্বে প্রয়োজন ট্রাজেডি বলিতে সাধারণতঃ আমরা কি বুঝিয়া থাকি এবং নাটককে কখন আমরা ট্রাজেডির পর্যায়ভুক্ত করি সেই সম্বন্ধে এক সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া লওয়া।

ট্রাজেডি বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি অলঙ্ঘ্য দুর্ভাগ্যের প্রতিরোধের নিমিত্ত প্রাণান্তকর প্রয়াস, এবং অবশেষে তাহাতে অকৃতকার্যতা। ট্রাজেডি নাটকের নায়ক এই অনিবার্য দুর্ভাগ্য প্রতিরোধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া অবশেষে তাহা রোধ করিতে অসমর্থ হন। কিন্তু এই প্রতিরোধের চেষ্টার মধ্যে ফুটিয়া উঠে নায়কের অসামান্য ব্যক্তিত্ব এবং মহিমা। বিশাল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ও মহিমামণ্ডিত নায়কের পতনের জন্য আমরা অন্তরে দুঃখ অনুভব করিয়া থাকি। Dixon সাহেব তাঁহার 'Tragedy' গ্রন্থে বলিয়াছেন: "It is however undifferentiated the characters, if the situation stirs in us the extremes of pity and alarm"—অতএব লক্ষ্যণীয় যে 'extremes of pity and alarm' উদ্রিক্ত করাই ট্রাজেডির উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ট্রাজেডির নায়কই যে ট্রাজেডির মূল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম। এই কারণেই ট্রাজেডি বিচারে নায়ক চরিত্রকেই মুখ্য আলোচ্য বিষয় করা হইয়া থাকে। এক্ষণে 'প্রফুল্ল' নাটকের নায়ক যোগেশের চরিত্র আলোচনার পূর্বে দেখা প্রয়োজন যে 'ট্রাজিক হিরো' সাধারণত কিরূপ হইয়া থাকেন। এ্যরিষ্টটল ট্রাজিক হিরোর সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন: "He falls from a Position of lofty emminence and the disaster that wrecks his life may be traced not to deliberate wickedness, but to so great error of frailty,—অর্থাৎ ট্রাজেডির নায়কেরই কোন মারাত্মক ভ্রান্তি বা ত্রুটি তাঁহাকে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির অবস্থা হইতে দুঃখময় অবস্থায় পতিত করায়। কিন্তু বর্তমানে ট্রাজিক হিরোর এই সংজ্ঞা পরিবর্তিত হইয়াছে। অন্তর্নিহিত ত্রুটি ছাড়াও কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনার প্রভাবেও যে নায়কের চরিত্রে ট্রাজেডি নামিয়া আসিতে পারে, তাহা বর্তমান কালের একাধিক প্রখ্যাত পাশ্চাত্য নাটকে দেখান হইয়াছে। এবং এই প্রকারের ট্রাজেডিকেই নাট্যসমালোচকেরা Tragedy of incident আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। আর নায়কের চরিত্রের মধ্যেই যে ট্রাজেডির বীজ নিহিত থাকে, তাহাকে আখ্যায়িত করা হইয়াছে 'Tragedy of charatcer' নামে। ইহার দৃষ্টান্ত Shakespeare এর 'ম্যাকবেথ' 'ওথেলো' ইত্যাদি নাটকে। এক্ষণে উল্লেখযোগ্য যে বহু সমালোচক 'প্রফুল্ল' নাটকের ট্রাজেডিত্ব বিচার করিবার কালে তাঁহাদের দৃষ্টি প্রধানতঃ

পূর্ব প্রচলিত ট্রাজেডির লক্ষণের প্রতি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। অর্থাৎ 'Tragedy of incident' এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ না করিয়া তাঁহারা 'Tragedy of character এর প্রতিই বিশেষভাবে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া নাটকখানি সমালোচনা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা 'প্রফুল্ল' নাটকের ট্রাজেডি বিচারে যোগেশের চরিত্রগত ত্রুটিকেই মুখ্য আলোচ্য বিষয় করিয়াছেন। কিন্তু 'প্রফুল্ল' হইল 'Tragedy of incident' এর প্রকৃত উদাহরণ। যদিও 'Tragedy of character'কেও একেবারে বাদ দেওয়া চলিবেনা। অর্থাৎ 'Tragedy of incident এবং 'Tragedy of character' এই দুইয়ের দৃষ্টিতেই 'প্রফুল্ল' নাটকের বিচার করিতে হইবে। প্রথমেই আমরা Tragedy of character এর ধারা অনুসরণে 'প্রফুল্ল'র আলোচনা করিব। সুতরাং যোগেশের চরিত্র আমাদিগকে প্রথমে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতি নাট্যসমালোচকগণ যোগেশকে নিষ্ক্রিয়তা দোষে দুষ্ট বলিয়া অভিমত পোষণ করিয়াছেন। অজিতবাবুর ভাষায়, "যোগেশের সক্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চূর্ণ হইয়াছে এবং সেই চূর্ণব্যক্তিত্ব ক্লীবের ন্যায় রমেশের ষড়যন্ত্রজালে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। যোগেশের চরিত্রের আর যাহা কিছু বাকি থাকিল তাহাতে রহিয়াছে কুৎসিত মাতলামি, কদর্য নিষ্ঠুরতা ও নিষ্ক্রিয় দুঃখ-বিলাস। এতবড় একজন সচেষ্ট, সক্ষম পুরুষ হঠাৎ এরূপ একটি নিশ্চেষ্ট জড়পিণ্ডে পরিণত হইলেন এবং তাহাও শুধু ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার জন্য। ইহা আকস্মিক পক্ষাঘাত, ট্রাজেডি নহে।"—অর্থাৎ যেহেতু যোগেশ তাঁহার প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করেন নাই, সেইহেতু অজিতবাবু এই নাটকটিকে ট্রাজেডির পর্যায়ভুক্ত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও অজিতবাবুর ন্যায়ই যোগেশ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "যোগেশের সাংসারিক দুর্ভাগ্যের সূচনা হইতেই কাহিনীর উন্মেষ এবং এই দুর্ভাগ্যের পূর্ণতার মধ্যেই ইহার পরিসমাপ্তি—ইহাতে কোন দ্বন্দ্ব নাই, অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিবার কোনও প্রয়াস নাই—নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দেওয়াই ইহার বৈশিষ্ট্য।" অতএব আশুবাবু যোগেশ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "তাঁহার শোচনীয় পরিণতির জন্য যোগেশ কতদূর সহানুভূতি পাইতে পারেন, তাহাও বিবেচ্য।" 'প্রফুল্ল' নাটকের বিয়োগান্তক ফল কার্যকরী হইবার পক্ষে আর একটি প্রধান বাধা—যোগেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আশুবাবু বলিয়াছেন, "তাঁহার জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির অংশ নাট্যকাহিনীর পূর্ববর্তী এবং কেবলমাত্র যোগেশের মুখের কথার দ্বারাই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে—প্রকৃত নাটকীয় দৃশ্যের ভেতর দিয়া তাহা প্রকাশ পায় নাই। 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' ইহা যোগেশের মুখের কথা, সাজান বাগানটি আমরা চোখে দেখিতে পাইলাম না বলিয়া ইহা যে কেমন করিয়া শুকাইয়া গেল তাহাও প্রত্যক্ষভাবে বুঝিতে পারিলাম না—ইহার কেবলমাত্র শুষ্ক দিকটাই আমরা গোড়া হইতে দেখিলাম—এই কারণেই কাহিনীর বিয়োগান্তক ফল দর্শকের উপর কার্য্যকর হইতে পারেনা।" অর্থাৎ যোগেশকে নাট্যকার passive রূপে অবতারণা করাইয়াছেন ইহাই হইল আশুবাবুর অভিযোগ।

এক্ষণে এই সকল অভিযোগগুলি বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। ট্রাজেডির নায়ক সম্বন্ধে প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গির কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ট্রাজেডির নায়ককে অবশ্যই উচ্চব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহান পুরুষ হইতে হইবে। কিন্তু আধুনিক কালে এই প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সমালোচক Dixon সাহেব তাঁহার বহুখ্যাত Tragedy গ্রন্থে Tragedy নাটকের নায়কের যোগ্যতা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিয়াছেনঃ "Good in some sense the hero of tragedy must be"—বিচারের এই মাপকাঠিতে যোগেশ চরিত্র নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হইয়া যায়। এক্ষণে যোগেশ সম্বন্ধে যে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

নাটকের প্রথমেই নাট্যকার যোগেশকে যেরূপভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই তিনি ত্রিশ বৎসর যাবৎ কঠিন পরিশ্রম করিয়া তাঁহার সুখের ও সোনার সংসারকে দাঁড় করাইয়াছেন। যোগেশের ভাষায় "দুটি অপোগণ্ড ভাই নিয়ে কি করে চালিয়ে এসেছি ; বাবা

মারা গেলেন, মাকে নিয়ে দুটি অপোগণ্ড ভাইয়ের হাত ধরে খোলার ঘর ভাড়া করে রইলুম। সে একদিন গেছে, এখন ঈশ্বর ইচ্ছায় একটু কুঁড়েও করেছি, খাবারও সংস্থান করেছি।" দুটি ভাইয়ের মধ্যে রমেশ এটর্নি হইয়াছে, এবং বলা বাহুল্য তাহাও যোগেশেরই প্রচেষ্টায়। কিন্তু ছোট ভাই সুরেশকে তিনি মানুষ করিয়া তুলিতে সক্ষম হন নাই। ইহার জন্য তাঁহার অসীম দুঃখ। যাহা হউক ত্রিশ বৎসর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর যোগেশ এক্ষণে বড়ই ক্লান্ত। তিনি এখন পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে ইচ্ছুক। সমস্ত সম্পত্তি তিনি ভাগ করিয়া দিতে চলিয়াছেন ভাইদের মধ্যে। এইরূপ অবস্থায় যোগেশকে আমরা পাইয়াছি। মাতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, সত্যনিষ্ঠ এবং সহৃদয় ব্যক্তিরূপেই আমরা নাটকের প্রথমে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। কিন্তু তাঁহার এই অবসর গ্রহণের মুখে বাধ সাধিল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার সংবাদ। এই ব্যাঙ্কেই তাঁহার উপার্জনের একটি বৃহৎ অংশ জমা ছিল। সুতরাং অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনার সংবাদে যোগেশ অত্যন্ত মুহ্যমান ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। যে সময়ে এই দুর্ঘটনা ঘটিল, তাহাতে যে যোগেশ অত্যন্ত shocked হইবেন, তাহা খুবই স্বাভাবিক এবং এই দুর্ঘটনার মধ্য দিয়াই যোগেশের ট্রাজেডির শুরু। হা-হুতাশ করিয়া যোগেশ বলিয়াছেন, "ত্রিশ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় রোজগার করেছি, গেল, একদিনে গেল, ভোজবাজী ফুরিয়ে গেল।" ইহার পর যোগেশ এই অ ঘাতকে ভুলিবার জন্য অত্যধিক পরিমাণে মদ্যপান করিতে শুরু করিয়াছেন এবং ইহার পরিমাণ বাড়াইয়া যোগেশের ট্রাজেডিকে ত্বরায় আগাইয়া আনিতে সাহায্য করিয়াছে রমেশ। দুঃখের মধ্যেও যোগেশের সান্ত্বনা ছিল যে তিনি সততা পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারই ভাষায়, "আমার সর্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু বড় গলা করে বলতে পারি, কখনো প্রবঞ্চনার দিক দিয়েও চলিনি।" কিন্তু এই সান্ত্বনার মূলেও কঠিন কশাঘাত হানিয়াছে রমেশের বিশ্বাসঘাতকতা। রমেশের বিশ্বাসঘাতকতায় অবশেষে যোগেশকে প্রবঞ্চকই হইতে হইল। যোগেশ সকল কিছু বুঝিতে পারিয়াও নির্বিকার হইয়া রহিলেন এবং ইহাতেই ট্রাজেডির মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে।

যোগেশ ইচ্ছা করিলেই এই সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিতেন কিন্তু একের পর এক আঘাতে এবং পুঞ্জীভূত অভিমানে তিনি বিরুদ্ধাচরণ করিবার মত মানসিক অবস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। Shakespeareএর king Lear যদি কন্যাদ্বয়ের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবিধানের জন্য বহিঃশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার উন্মত্ত এবং অসহায় অবস্থার জন্য যে সহানুভূতি ও চোখের জল পাঠকবর্গের নিকট হইতে লাভ করিয়া আসিতেছেন, তাহা লাভে অসমর্থ হইতেন। ঐ অবস্থায় Learএর উন্মত্ত এবং অসহায় অবস্থার উপস্থাপনাই শ্রেয়ঃ হইয়াছে। যোগেশের পক্ষেও ঠিক এইরূপে বিচার করিয়া বলা চলে যে, তাঁহার এই নিষ্ক্রিয়রূপে আত্মপ্রকাশের ফলে তাঁহার মানসিক আঘাতের গভীরতা, সুনাম সুযশের আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাসপরায়ণতা উজ্জ্বলরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একটির পর একটি আঘাত পাইয়া যোগেশ মদের নিকট নিজেকে বিকাইয়া দিয়াছেন। মদ্যপানের মধ্যেই সান্ত্বনার সন্ধান করিয়াছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের 'দান প্রতিদান' গল্পেও দেখিতে পাই শশিভূষণ, রাধামুকুন্দের বিশ্বাসঘাতকতা জানিতে পারিয়াও শেষ অবধি নির্বিকার হইয়াই ছিলেন। এই নির্বিকল্পতার মধ্যেই শশিভূষণের ভ্রাতৃপ্রেম গভীরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার পরিবর্তে শশিভূষণ যদি রাধামুকুন্দের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্রের ঔদার্য ও মহত্ত্ব বিনষ্ট হইত। ন্যায়ের নিকট যাহা দণ্ডনীয়, ভালবাসার নিকট অধিকাংশ সময়েই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে অভিমানের মধ্য দিয়া। যোগেশও রমেশের বিশ্বাসঘাতকতা টের পাইয়াও নিষ্ক্রিয় থাকিয়াছেন রমেশের প্রতি অভিমান করিয়া।

অজিতবাবু যোগেশের ট্রাজেডির কারণ সুরাপান বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে বলিতে হয় যে মদ্যপান যোগেশের ট্রাজেডির কারণ নহে, পরিণাম। যদিও যোগেশকে প্রথম হইতেই আমরা মদ্যপরূপেই দেখিয়াছি, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হয় যে মদ্যপান তাঁহার ট্রাজেডির কারণ নহে। স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় যোগেশের "অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, তাঁহার সুনাম

সুযশ আকাঙ্ক্ষাকেই তাঁহার ট্রাজেডির কারণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যোগেশের ট্রাজেডির কারণ হিসাবে কয়েকটি কারণকেই অভিহিত করিতে হয়। ব্যাঙ্ক ফেলই যোগেশের ট্রাজেডির মুখ্য কারণ এবং যে সময়ে ইহা ফেল করিয়াছে—যোগেশের সেই অবসর গ্রহণের অবস্থা রমেশের বিশ্বাসঘাতকতা, যোগেশের প্রবঞ্চকরূপে দুর্নাম, এবং সুরেশের চোর হওয়া—এই সকল ঘটনাই (incidents) যোগেশের ট্রাজেডির সম্মিলিত কারণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বেই আমরা 'প্রফুল্ল'কে বিশেষভাবে 'Tragedy of incident'এর পর্যায়ভুক্ত বলিয়াছি।

কিন্তু ইহাও সত্য যে 'প্রফুল্ল' নাটকের কয়েকটি গুরুতর ত্রুটি ইহাতে প্রথম শ্রেণীর ট্রাজেডির আসনলাভে অসমর্থ করিয়াছে। এই ত্রুটিগুলি হইল—যোগেশের চরিত্রের দ্রুত পরিবর্তন, ভাব-ঐশ্বর্যের অভাব, কয়েকটি অতিরঞ্জিত ঘটনার সমাবেশ, রমেশের চরিত্রের শঠতার অতিপ্রকাশ, 'উৎকৃষ্ট ট্রাজিক রিলিফের (Tragic relief) অভাব এবং সর্বশেষে নাটকের গান পারিপাট্যের দৈন্য।

মাছের বাজার
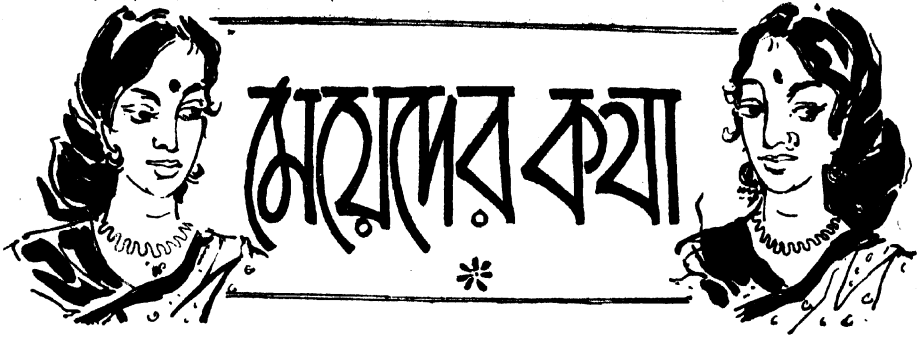
সভ্যতার সংকটে নারী

পঙ্কজিনী রায়

১৯৬৩ সালের একটি সভ্য দেশে প্রেসিডেণ্ট নিহত হল আততায়ীর গুলিতে—মহাকালের বক্ষে চিহ্নিত হল বর্বরতার কোন স্তরে বাস করছে এই সভ্যদেশের মানুষেরা। মানব-সভ্যতার ইতিহাস নামে পরিচিত তা আসলে মানব-বর্বতার ইতিহাস। ইতিহাস শুধু সাক্ষ্য দিচ্ছে কোন-যুগে মানুষ কতখানি বর্বর, তার বর্বরতার গতি প্রকৃতি কি, তার বর্বরতার স্বরূপ কি? এক একটা যুদ্ধ আসে তার সংহারী মূর্তি নিয়ে—নিরীহ মানুষ ভাবে, এই যুদ্ধের শেষে যে শান্তি আসবে তাতে মানুষ বর্বরতাকে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারবে। কিন্তু মানুষ কখনও তা পারল না, পারে নি বলেই সে এককালে বাল্মিকীর যুগে মনুষ্য-আকৃতি বিশিষ্ট জীবদের নর, বানর, ও রাক্ষস এই তিন ভাগে ভাগ করে ছিল। নরের শান্তি চিরকাল রাক্ষসেরা বিঘ্নিত করে এসেছে। রাক্ষসদের উৎপাতের ইতিহাসই মানবজাতির ইতিহাস—আসলে তা শুধু বর্বরতা-পরিমাপের ইতিহাস। সভ্যমানুষের পৃথিবী এখনও জন্ম পরিগ্রহ করে নি।

পৃথিবী সভ্য না হোক অন্তত সভ্যতার পথে কিছুটা এগিয়ে যাচ্ছে—এটা হয়ত আমরা আশা করতে পারি। সেই এগিয়ে যাওয়ার পথে নারী কোন অবস্থায় অবস্থান করছে তা লক্ষ্য করা যাক। ডলার সমৃদ্ধ দেশ অ্যামেরিকার নারীর তুলনায় অন্য সমস্ত দেশের নারীরা পশ্চাতে পড়ে আছে। অ্যামেরিকান নারীরা কতদূর এগিয়েছে তা দেখা যাক।

The modern American woman leads simultaneously a multiplicity of lives, playing at-once the role of sexual partner, mother, home-manager, hostess, nurse, shopper, figure of glamour, supervisor of children's schoosling and play and trips, culture avdieine and cultuse carrier, club woman, and often and careerist. for his part, psesents the position of the edwcated woman stripped of all romanticism since the dyingout of the servant class. In former times, he says, such woman would talk art and philosophy late into the hight; now they are so tired that the eyes close as soon as dishes are put away They used write te poetry, now they write launodry list,"

(The unfinished society : By Herbert von Borch)

এই তো হল শিক্ষিতা আমেরিকান নারীর প্রকৃত চিত্র। কিন্তু তাঁর শিক্ষা কালের চিত্র আরও সাংঘাতিক। বালক বালিকা ও তরুণ তরুণীরা সেখানে শিক্ষাকালে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়। তাতে করে একটা সুস্থ যৌবন চেতনা গড়ে উঠার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা

হচ্ছেনা। হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-তাত্বিক শ্রীপিটিরিম সরোকিন তাঁর The american ser revolution গ্রন্থে বলেছেন :—

Whatever aspect of our culture is considered, each is packed with sex obsession, If we escape from being stind by obscene literature, we may be aroused by crooners, or by new psychology and sociology or by the teachings of the frendianized pseudoreligious or by radio-television entertainment, we are completely surrounded by the rising tide of sex which is flooding every compartment of our culture, every section of our social life, unless we develop an inner immunity against these libidinal forces, we are bound to be conquered by the continious army of sex stimuli."

ঈদৃশ অবস্থায় সেখানকার তরুণ তরুণীদের মনের ও দেহের বিকাশ কীরকম ভাবে সাধিত হচ্চে সে সম্পর্কে সকলেরই উৎসুক্য জাগার কথা। অবাধ মেলা-মেশার সুযোগে, Datingএর বিচিত্র উপভোগে তরুণ তরুণীরা সেখানে নিজের আত্মাই রাখতে পারছে না। তার কুফল সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানীরা বেশ চিন্তিত হয়েছেন। বয়স পনর বা তার চেয়েও কম, যে-সব মেয়ের বয়স তাদের মধ্যে অবৈধ্য শিশু জন্ম অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেছে। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে এরূপ জন্মের হার চারগুণ বেড়ে গেছে। ওয়াশিংটনের ১৩টি স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে অবৈধ শিশু জন্ম দশগুণ বেড়ে গেছে। নিউ ইয়র্কে একবৎরের মধ্যে ১২৫০ পনর বৎসরের কম বয়সের ছাত্রীকে স্কুল থেকে বহিস্কৃত করা হয়েছে। বাল্টিমোর সহরে যত অবৈধ জন্ম হচ্ছে তার অর্দ্ধেকের জন্ম দায়ী উনিশ বছর বয়েসের ছেলে মেয়ে। সমস্ত আমেরিকার শতকরা ৪০ ভাগের অবৈধ সন্তানের জননীরা নাবালিকা।

অবাধ মেলামেশার যে ইচ্ছা প্রত্যক্ষ কুফল, তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে কি হচ্ছে? আমাদের দেশের বিরাট জনতার মধ্যে ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ নেই। তার জন্তে সমাজ দেহ যে অক্ষত সুস্থ রয়েছে তা নয়। অপরাধ বিচারালয়ের খবর থেকে জানা যায় ধর্ষণোচিত মামলার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রায় আশীভাগ মামলা বলাৎকার ঘটিত। এর কারণ অবশ্যই সুস্থ আবহাওয়ায় ছেলে-মেয়েদের মেলামেশার সুযোগের অভাব। কিন্তু আমেরিকার রিপোর্টে যাঁরা বিবেচনা করবেন তাঁরা সেখানকার অবস্থা দেখে নিশ্চয়ই হতাশ হবেন। সর্বতো ভদ্র সর্বতঃ সুস্থ নর-নারীর সংগঠন সম্ভব হবে কোন পথে? সমাজতাত্বিক আর সমাজ-নায়কদের সম্মুখে এ এক কঠিন সমস্যা।

রমণী রত্ন

যখন জাগলো প্রেম

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

ভাগীরথীর প্রবাহে যেখানে এসে মিশেছে অজয় নদ, দেবরাজ ইন্দ্র যেখানে এসে গঙ্গাস্নান করেছিলেন বলে লোকে, সেখানে আজো দাঁড়িয়ে আছে কাটোয়া সহর। মুসলমান শাসনকালে যে স্থান ছিল একটা বিখ্যাত বন্দর, শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য যেখানে একদিন তৈরী হয়েছিল দুর্গ, যে স্থানের অনতিদূরে নবাব আলিবর্দীর কাছে পরাজিত হয়েছিল ভাস্করপণ্ডিতের মারাঠা সৈন্যদল, এককালে সেই কাটোয়া ছিল বৈষ্ণবদের লীলাভূমি। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এখানেই কেশব-ভারতীর কাছে নেন সন্ন্যাসের দীক্ষা। এরই অদূরে আছে "চৈতন্যচরিতামৃত" রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীপাট, নিকটেই হাজিগ্রামে আচার্য্য শ্রীনিবাসের মাতুলালয়। আজো পর্ব্বদিনে মুখরিত হয় কাটোয়া নগর বৈষ্ণবদের কীর্ত্তন ধ্বনিতে। বৈষ্ণব আচার্য্যদের স্মৃতি বুকে ধারণ করে আজো কাটোয়ানগর তীর্থের মর্য্যাদা পেয়ে থাকে ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে।

এই কাটোয়া নগরে বাস করতো দেবকীনন্দন রায়। লোকে বলতো, নবাবের ফৌজদার। মস্ত বড় ধনী। সোনাদানা অর্থ সম্পদের তার 'লেখাজোখা' নাই।

গর্ব্বও সেইজন্য ছিল তার অপরিসীম। ধনগর্ব্বান্ধতা তার চরমে উঠেছিল এবং অর্থ যার নাই, তার কোন মূল্যও ছিল না দেবকীনন্দনের কাছে।

শুধু অর্থ নয়, ধর্ম্মের অহমিকাও ছিল তার প্রচণ্ড। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, বাঁকা সিঁথি, পরণে ফিনফিনে কালো পেড়ে ধুতি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা; কপালে প্রকাণ্ড একটা সিন্দুরের ফোঁটা। লোকে জানে, প্রচণ্ড শাক্ত ছিল দেবকীনন্দন, ত্রিসন্ধ্যা পূজা পাঠ না করে জল গ্রহণ করে না সে। সর্ব্বদা কারণ পানে আরক্ত তার দুই চোখ। ক্ষমতার দম্ভে, ধর্ম্মের ভণ্ডামীতে সে হয়ে উঠেছিল দুর্দ্দমনীয়। এমন দুষ্কার্য্য নাই যা সে করে নাই, এমন মহাপাতক নাই—যা সে করতে পারে না। কিন্তু সবটাই ছিল তার ধর্ম্মের ভানে ঢাকা। তান্ত্রিক সাধনায় উত্তর-সাধিকার নাম দিয়েই চলতো তার ব্যভিচারের পালা অমাবস্যার রাতে, তার জন্য পাড়ার বৌঝিদের আত্মসম্মান নিয়ে বাস করা হয়ে উঠেছিল কঠিন।

নবাবের ফৌজদারের অপ্রতিহত ক্ষমতার ভয়ে নীরব হয়ে থাকে জনসাধারণ। বাধাই বা দেবে কে? সে ক্ষমতা আছে কার? নবাবের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় দেবকীনন্দনের প্রতাপ প্রায় রাজকীয় সর্ব্বশক্তিমত্তাতেই পৌচেছিল।

সেদিন সায়াহ্নে খুবই হৃষ্ট মনে কাটোয়া থেকে বর্দ্ধমানের পথে চলেছে দেবকীনন্দন। আশাতীত রাজস্ব পাঠিয়েছে সে জন্য তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন নবাব। সংবাদ পেয়েছে, নবাব দরবারে উচ্চপদের স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করবে সে। প্রফুল্ল অন্তরে তাই চলেছে সে বর্দ্ধমানে। যেখানে নবাব এসে ছাউনি ফেলেছেন উড়িষ্যা বিজয়ের পথে।

সহসা তার কানে প্রবেশ করলো সুমধুর সঙ্গীত। অন্তরালবর্ত্তিনী কোন গৃহবধূর কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে গীতগোবিন্দের একখানি গান। সুমধুর কণ্ঠস্বর। আকাশ বাতাস অন্তরীক্ষের সমস্ত অশ্রুত সুর যেন ধ্বনিত হয়ে উঠেছে সেই কণ্ঠে। সুললিত সেই কণ্ঠের ঝঙ্কারে চারিদিক যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। সুরের মূর্চ্ছনায় যেন চারিদিক মর্ম্মরিত হয়ে উঠেছে। অন্তরালবর্ত্তিনী গেয়ে চলেছে ভক্ত কবি জয়দেবের সেই অবিস্মরণীয় সঙ্গীত—

"রতি সুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশম্।"

কানন পথে চলেছেন মুরলী মনোহর কানু। অভিসারে এসেছেন প্রেমময়ী অভিমানিনী রাধা। যমুনা পুলিনে উৎকর্ণ হয়ে আছেন শ্রীমতী, আর কতক্ষণে এসে পৌছবেন তাঁর কৃষ্ণ। ভক্তকবির লেখা এই অপরূপ সঙ্গীত যেন প্রাণ পেয়েছে গৃহবাসিনী তরুণীর কণ্ঠে। রাধাকৃষ্ণের লীলাগান। মানুষের দেহ মন এখানে অস্বীকৃত নয়। তবু যেন লুপ্ত হয়ে যায় দেহ কামনা এক সীমাহীন অন্তরাবেগের মধ্যে। ব্যক্তিকামনাকে অতিক্রম ক'রে বিশ্বকামনার যে চেতনা, মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনের যে অভিসার, বৈষ্ণব সাধনার সেই মূলমন্ত্র ফুটে উঠেছে গানে। মর্ম্মরিত হচ্ছে আকাশ বাতাস।

কে এই গায়িকা?

অধৈর্য্য হয়ে উঠলেন দেবকীনন্দন গায়িকার পরিচয় জানার জন্য। এমন অপরূপ সুরের মূর্চ্ছনা প্রকাশ করে যে কণ্ঠ, তার অধিকারিণীকে না দেখলে তার জীবনই যে বৃথা হয়ে যাবে।

সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলে দেবকীনন্দন।

চোখে পড়ে তার, তরুলতা ও গুল্মের সবুজ মায়া যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে কয়েকটি পর্ণকুটির। কুটিরের প্রাঙ্গণে ক্ষুদ্র তুলসীমঞ্চের সম্মুখে একটি প্রদীপ জ্বলছে। আর তার সম্মুখে বসে আছে গলবস্ত্র হয়ে এক সুন্দরী কিশোরী। তার দেহে বিদায়োন্মুখ কৈশোরের প্রান্তলীলায় অস্ফুট যৌবনের আভাস। ফর্সা রং, ডাগর ডাগর কা লটানা দুটি চোখ। সুন্দর মুখখানিতে স্নিগ্ধ লাবণ্য। তার শুভ্র গ্রীবার উপরে মৃদু বাতাসে কাঁপছে আলগা চুলের গুচ্ছ, সুঠাম নিটোল তনু। কণ্ঠে তার গান, চঞ্চল ঝরণা ধারার মতই ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

বিস্ময়ের অন্ত পায় না দেবকীনন্দন। নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। ভাবে দেবকীনন্দন, হাতের এত কাছে এমন অপূর্ব্ব রূপসী আছে। কেন জানতেম না এতদিন। ভাবে, একে তার চাই-ই।

একটু সম্বিত ফিরে পেয়ে লক্ষ্য করে সে, কিশোরীর সীমন্তে নেই সিন্দুর.—অনূঢ়া সে।

আশ্বস্ত হয় দেবকীনন্দন। ভাবে, বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয় নি যে নারী, তাকে বিবাহের অছিলায় [illegible]

করা কঠিন হবে না বিত্তশালী ফৌজদারের পক্ষে। ভাল করে লক্ষ্য করে দেবকীনন্দন কুটিরের চারদিকে—খোঁজে এমন কোন চিহ্ন যা দেখলে ভুল হবে না এই কুটিরকে চিনতে, ফেরার পথে। তারপর এগিয়ে চলে সে আনন্দিত মনে তার পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত পথে।

দিন কয়েক পর আবার সেই কুটিরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো দেবকীনন্দন। সঙ্গে অস্ত্রধারী অনুচরের দল রঙীণ রেশমী ঝালর দিয়ে ঢাকা এক পাল্কী নিয়ে।

ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসেন কিশোরীর পিতা গৃহদ্বারে, কে এলো তাঁর গৃহের সম্মুখে পালকি নিয়ে? দেখেন তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ফৌজদার দেবকীনন্দন. অবাক বিস্ময়ে অথচ ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে আপ্যায়ন করেন গৃহস্বামী বিনম্রভাষায়। প্রীত হয় দেবকীনন্দন সেই সম্ভ্রম-ভরা আচরণে। বলে সে—"যে আশা নিয়ে আমি এসেছি আপনার কাছে, তা নিশ্চয়ই পুর্ণ হবে এই ভরসাই আমি রাখি।"

উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন গৃহস্বামী। মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে কিসের আশায় এসেছে তাঁর কাছে প্রতাপান্বিত ফৌজদার? কি আছে তার? দরিদ্রের ঘর, সংসারে আছেন শুধু তিনি আর তাঁর কন্যা মাধবী। তবে কি মাধবীকেই কামনা করে ফৌজদার তার বিলাসের সঙ্গিনীরূপে?

ভীতির শিহরণ জাগে উৎকণ্ঠিত পিতার ব্যাকুলহৃদয়ে। রক্ষা করো প্রভু! কন্যার মান রাখো। লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছিলে তুমি কুরুরাজ সভায়, তেমনি আজ আমার কন্যাকে রক্ষা করো জনার্দ্দন!

ভীত কম্পিত হৃদয়, তবুও সাহসে ভর করে বললেন, গৃহস্বামী—"অবশ্যই পাবেন, যদি আমার সাধ্যায়ত্ত হয়।"

উল্লসিত হয় দেবকীনন্দন। বলে ওঠে—"সাধ্যের অতীত নয় সে বস্তু। আমি আপনার কন্যার পাণি-প্রার্থনা করি। আমাকে কন্যা দান করে আপনি সুখী হবেন নিশ্চয়ই।"

স্তব্ধ হন গৃহস্বামী, তাঁর আশঙ্কাই সত্য হয়েছে। ফৌজদার দেবকীনন্দন কামনা করেছে তাঁর অনূঢ়া কন্যাকে, কি ভয়ঙ্কর প্রস্তাব। নিজের বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য তাঁরই হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিতে এসেছে নরদেহী এক পশু। কি উত্তর দেবেন তিনি এ প্রস্তাবের?

অনুমান করে দেবকীনন্দন পিতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা। মৃদু হেসে বলে—"আমি বিপত্নীক। শাস্ত্রোক্ত মতে আমার হাতে কন্যা সম্প্রদান করুন। মাধবী হবে আমার পরিণীতা স্ত্রী।"

মন্দের ভাল,—ভাবেন গৃহস্বামী। আবার সেই সঙ্গেই মনে পড়ে তাঁর দেবকীনন্দনের বিলাসভবনের কথা। তাঁর নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক কন্যা হবে এক দুশ্চরিত্রের ঘরণী! কি শান্তি পাবে সে জীবনে? কেমন হবে তার সম্মান, বহুবল্লভ এক ব্যভিচারীর কাছে।

বেদনায় ছটফট করতে থাকে পিতৃহৃদয়; ভেবে পায় না কি করবে সে?

মাধবী এসে দাঁড়ালো দ্বারপথে। সিঁথিমূল অর্দ্ধেক ঢেকে ঘোমটা টানা, নতদৃষ্টি, নম্র ভঙ্গি। কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা টানার জড়তা নেই; মুখে তার সপ্রতিভ ও নম্রতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ।

দেবকীনন্দনের চোখের সামনে যেন একটা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠ্‌লো! এযে অপরূপা!

পিতার দিকে তাকিয়ে বলে মাধবী—'মনস্থির করুন পিতা। রাধামাধবের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

মনে ভাবেন গৃহস্বামী—এই ভালো। বাহুবলে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার বদলে পত্নীর সম্মান দিয়ে নিতে চায় যখন ক্ষমতাশালী ফৌজদার, বাধা দেবারও যখন নেই কোন উপায়, তখন এই ভালো। শান্তি না পাক জীবনে, সম্মানটা ত রইল বেঁচে।

শানাইয়ের আনন্দ করুণ সুরে ভরে উঠলো কাটোয়ার আকাশবাতাস—নিজগৃহদ্বারে এসে পালকি থেকে নামলো দেবকীনন্দন, সঙ্গে পট্টবাসপরিহিতা নববধূ মাধবী। উলুধ্বনি আর শঙ্খরবে মুখরিত হয়ে উঠলো চতুর্দিক।

বৌ দেখে সবাই একবাক্যে বললে—বেশ বৌ।

আরম্ভ হলো মাধবীর নূতন জীবন। কাটোয়ার ফৌজদার প্রাসাদে বলতে গেলে সেই হয়ে উঠলো সর্বময়ী কর্ত্রী। হাতে এসে পড়লো পরিবারের সব ভার। ঝি চাকরেরা তাকে জিজ্ঞাসা না করে কোন কাজ করে না। আত্মীয় পরিজন আশ্রিতরা মাধবীর নির্দ্দেশ মতই চলে। তার শান্ত সংযত ও প্রসন্ন গাম্ভীর্য্যকে সকলে শ্রদ্ধা করে, সমীহ করে।

এ তো গেল একদিকের কথা।

আর একদিক ?

ব্যভিচারী স্বামীর রূপলিপ্সা দুদিনেই মিটে যাবে, একথা বুঝেছিল মাধবী অনেক আগে। তবুও নূতন করে স্বপ্ন দেখতে থাকে সে, কি করে ফেরাবে সে স্বামীর মন। মনে ভাবে, দেখি না একবার চেষ্টা করে আমার স্বামীকে ফেরাতে পারি কিনা। মহাভারতে পড়েছি, সেকালের মেয়েরা কত কি করেছে স্বামীর জন্যে—কলাবতী, মাদ্রী, লোপামুদ্রা, স্বাহা—তাঁদের মত হতে পারব না জানি। কিন্তু একবার দেখিনা চেষ্টা করে! বামাচারী স্বামীর হৃদয়ে প্রেমের ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা যাতে হয় সেই হলো তার চেষ্টা—পিতার আদর্শকে স্বামীর জীবনে জাগানোর সাধনায় ব্রতী হলো সে। গৃহকোণে প্রতিষ্ঠা করলো সে রাধা-মাধবের বিগ্রহ—ফুলচন্দন, তুলসীপাতা আর ধূপধুনা দিয়ে পূজা করে সে প্রত্যহ।

কিন্তু কি দুষ্কর তার ব্রত! দিনের পর দিন দেবকী-নন্দনের হৃদয়ের পরিবর্ত্তনে জন্য চেষ্টা করে সে। কোন দিন তার মুখের দিকে চেয়ে শরীরের শিরা উপশিরায় উন্মাদনা জেগে ওঠে দেবকীনন্দনের,- দুটি বাহুর সবল আকর্ষণে মাধবীকে বুকের উপর টেনে নেয় সে। আবার কোনদিন সুরার নেশায় টলতে টলতে গৃহে ফিরে আসে সে প্রমোদ ভবন থেকে, বাহুতে আবদ্ধ থাকে কথনো অস্পৃশ্যা নারী। টুকটুকে চেহারা, ঘোমটা খোলা হাতে পানের ডিবে।

এমন দৃশ্যে অপমান বোধ করবে যে কোন বিবাহিতা নারী। মেয়ে মানুষের এত বড় লজ্জা, এত বড় অপমান আর নেই। দুহাতে বুক চেপে ধরে মাধবী, চোখে দেখে আঁধার।

আবার পরক্ষণেই মন থেকে সকল দুর্ব্বলতা ঝেড়ে ফেলে দেয় সে। দ্রুত পায়ে ছুটে এসে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে শয্যায় শুইয়ে দেয় সে, খুলে দেয় তার বেশ বাস—ধুইয়ে দেয় তার মুখ। সযত্নে দেবকীনন্দনের চুল বিলিয়ে-দিতে দিতে বলে—কেন যে ওসব খাও তুমি, কেন যাও এখানে সেখানে ?

দেবকীনন্দন তখন উত্থানশক্তি রহিত, বাহ্যজ্ঞান যেন নেই তার; বালিসে মাথা দিয়ে চুপ করে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে। সুরায় অচেতন দেবকীনন্দন কোন উত্তর দেয় না। হয়তো শুনতেও পায় না সে কথা।

আবার কোনদিন মাধবীর প্রশ্নের উত্তরে দেবকীনন্দন পদাঘাত করে তার দেহে। সেই দেহ,—যে দেহ দেখে একদিন পাগল হয়ে গিয়েছিল দেবকীনন্দন, যে দেহকে একটিবার দেখেই সকল কাজ ফেলে আনতে গিয়েছিল সে পত্নীর সম্মান দিয়ে। সুরার নেশায় চিৎকার করে ওঠে দেবকীনন্দন—দূর হয়ে যাও সামনে থেকে। গুরুমা এলেন যেন!

অসহ্য দুঃখে মন টনটন করে মাধবীর। ভাবে, একি দুঃখের কপাল তার? তার সম্মতিতেই যে বিয়ে হয়েছে, একথা সত্যি। কিন্তু তখন কে জানতো যে, এমন এক নিদারুণ ভবিতব্য তৈরী হয়েছে তার জন্য। এই তার জীবন মরণের সাথী—তার স্বামী।

টলতে টলতে বিছানা থেকে নেবে পড়ে দেবকীনন্দন। দেরাজ খুলে নিয়ে আসে সুরার পাত্র। ঢক্ ঢক্ করে এক পাত্র শেষ ক'রে আর এক পাত্র তুলে ধরে মাধবীর মুখের সামনে।

ঘৃণায় পিছিয়ে আসে মাধবী। দুচোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে তার। অনেকক্ষণ ধরে নিশ্চুপ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। বুক নিঙড়ে বের হয়ে আসে বুক ভরা দীর্ঘশ্বাস। কান্নার আবেগে থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে তার দুটি ওষ্ঠ।

"—উপায় বলে দাও রাধামাধব। বলে দাও কি করবো আমি।"

আর্ত্ত অসহায়কণ্ঠ সর্ব্বশক্তিমানের পায়ে পৌঁছে দেয় তার অন্তরের বেদনা। তাঁর আসন কখন যে কিসের জন্য টলে কেউ জানে না; তিনি যে সকল জ্ঞানের অতীত!

মন বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে মাধবীর। স্বামীর অনাদরে নয়, স্বামীর অনাচারে যন্ত্রণা বোধ করে সে। বলতে পারে না কাউকে; আর বলবেই বা কি? যখন একান্ত অসহনীয় মনে হয় তখন ঠাকুর ঘরে আশ্রয় নেয় মাধবী। রাধামাধবের বেদীর নীচে বুকভরা বেদনা আর আকুতি নিয়ে লুটিয়ে পড়ে। চোখের জলে ভিজিয়ে দেয় রাধামাধবের বেদীতল। আশা করে থাকে, ঠাকুরের

দয়ায় হৃদয়ের বেদনা গলে গলে যদি ধুয়ে মুছে যায়, যদি কিছু শান্ত হয় এ তীব্র অন্তর্দ্দাহ !

এমনি করেই দিন যায়।

ধীরে বৈষ্ণব সাহিত্যের অমর পদাবলীতে মনোনিবেশ করে মাধবী। প্রেম ও ভক্তির মাহাত্ম্য দিয়ে রচিত পদাবলীর মধুর সুরে মেতে গেল তার মন। খুলে গেল তার কাছে কৃষ্ণলীলার তথ্য ও দর্শনের চাবিকাঠি। ফুটে উঠল তার কণ্ঠের মধুর সুর—'হরি গেল মধুপুর হম কুলবালা, বিপথে পরল জৈছে মালতি মালা।'

খুলে ফেলল মাধবী পট্টবসন, তুলে রাখল যত রত্ন আভরণ—যা মানায় শুধু অর্থবান্ ফৌজদার গৃহিণীর দেহে। তুলে নিল অঙ্গে বৃন্দাবনী সাড়ি, কণ্ঠে নিল তুলসীর মালা। মাথার কবরীতে দিল শ্বেতপুষ্পের স্তবক। ললাটে আর বাহুতে আঁকল গঙ্গা মৃত্তিকার রসকলি। ঘরের কাজ করতে করতে কীর্ত্তনের পদ গুনগুন ক'রে গান করে মাধবী :—'অঙ্গনে আওয়ব জব রসিয়া। পালটি চলব হাম ঈষত হঁসিয়া॥'

তার মধুর কণ্ঠের মূর্চ্ছনা একটা অলৌকিক মোহাবেশ এবং অতন্দ্র নীরবতায় চারদিক ভরে উঠলো।

সুরায় অচৈতন্য দেবকীনন্দনের কানে গেল সে সুর। শরীরে রোমাঞ্চ জাগলো তার। সুললিত কণ্ঠের মধুর মূর্চ্ছনা যেন তার তন্দ্রাতুর অনুভূতির দ্বারে মৃদু আঘাত করলো। সে কণ্ঠ যেন কবে, কোন বিস্মৃত অতীতে শুনেছিল সে ; হয়ত এ জন্মে, অথবা পূর্ব্বজন্মে, আজো বিলুপ্ত হয়নি তার স্মৃতি।

চঞ্চল হয়ে ওঠে তার মন ; দেখতে চায় সে গায়িকার মুখখানি, কিন্তু পারে না। নেশায় হতচেতন হ'য়ে গড়িয়ে পড়ে সে। ওদিকে সুরের মূর্চ্ছনা ছড়িয়ে চলে সমস্ত পরিবেশে : 'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥ পাপ সুধাকর যত দুখ দেল। পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥"

গান শেষ করে দেখল মাধবী স্বেদবিন্দু ফুটে উঠেছে দেবকীনন্দনের কপালে ; নেশার প্রভাবকে অতিক্রম করেও যেন তার চোখে জেগে উঠেছে জিজ্ঞাসা। উৎসুক হয়ে ওঠে মাধবীর মন, চাঞ্চল্য জাগে চোখে।

কিন্তু বৃথা। চেতনা ফিরে এলেই দেবকীনন্দনের মনে জেগে ওঠে কামনার আগুন। নিত্যকার অনুষ্ঠানসূচি অনুসরণ করে সে। নৃত্যগীতের ঝড় আর সুরার বন্যায় টলমল করে ওঠে প্রমোদভবন। উচ্ছ্বসিত হাসি, ঘুঙুরের রব, গেলাশের টুংটাং, সুরা পানোন্মত্তের প্রণয় ভাষণ ভেসে আসে সেখান থেকে। মাঝে মাঝে চলে লোক-দেখান শ্যামাপূজার আয়োজন। লোকের হাঁকে ডাকে, 'মা-মা' শব্দের সঙ্গে ছাগশিশুর ত্রস্ত চিৎকারে মণ্ডপ প্রাঙ্গণকে সরগরম করে তোলে। কোমরে জড়ানো রক্তবস্ত্রের মধ্য হ'তে একটা বোতল বের করে মধ্যের তরল পদার্থ—কারণ বারি—গলায় ঢেলে চিৎকার করে ওঠে দেবকীনন্দন – জয় মা।

দিনের পর দিন কেটে যায়। দেবকীনন্দনের কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। মাঝে মাঝে নেশার প্রভাবকে অতিক্রম ক'রে যে নূতন জিজ্ঞাসা জেগে ওঠে তার মনে, তাও যেন বিভ্রম বলে মনে হয় মাধবীর। তবে কি স্বামীর হৃদয়ের গভীরে জাগেনি কোন অনুশোচনার আগুন, নূতন কোন আলো ?

দুঃখে, অভিমানে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। স্বামীর সঙ্গে একবার বোঝাপড়া করবার জন্য মনস্থির করে মাধবী।

আহ্বান করলো মাধবী আচার্য্য শ্রীনিবাসকে তার স্বামীভবনে। আরম্ভ করলো অষ্টপ্রহর সঙ্কীর্ত্তন দেবকীনন্দনের নিষেধ অমান্য করে। সঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত হয়ে উঠলো আকাশবাতাস। মৃদঙ্গ আর করতালের মধুর ধ্বনি এক কল্পরাজ্যের আবেশ নিয়ে এলো ফৌজদার ভবনে। ক্রোধে উন্মত্ত দেবকীনন্দনের প্রশ্নের জবাব দেয় মাধবী ফুলের পাপড়ীর মত কোমল ঠোঁট মুচড়ে—এ বাড়ীতে তোমার অধিকার যতটুকু, আমার অধিকারও কম নয় তার চেয়ে ; এ বাড়ির কুলবধূ আমি।

দেবকীনন্দনের ধৈর্য্য অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। এত স্পর্দ্ধা এই নারীর ? কাটোয়ার ফৌজদারের মুখের উপর যে কেউ এমন করে কথা বলতে পারে, এ তার ধারণার অতীত। কী সাজ্ঘাতিক সাহস এই নারীর ! এত সাহস ওর হলো কেমন করে ?

মাধবীর অনমনীয় কঠোর ভঙ্গিতে হতবাক্ হয়ে উঠলো দেবকীনন্দন। স্ত্রীর চোখে চোখ রাখতে দ্বিধা

জাগে তার মনে। সঙ্কুচিত হলো তার মন মাধবীর স্পষ্ট ভাষণে।

কয়েকদিন পরের কথা।

সেদিন প্রাতে সদ্যঃস্নাত দেহে অপরূপ রূপের লাবণ্য মেখে পদাবলীর কলি গুন্ গুন্ করে গেয়ে চলেছে মাধবী। লালপাড় শাড়ী আর সিন্দুরের টিপে কল্যাণী মূর্ত্তি, তার দুই চোখে এক আশ্চর্য্য দীপ্তি, সারা মুখ যেন ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত। কণ্ঠে তার সুরের ঝঙ্কার:—'সখি, কেমনে ধরিব হিয়া। আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া।'

প্রমোদভবন থেকে ঠিক এমনি সময়ে ফিরে এলো দেবকীনন্দন, চোখের পলক পড়ে না তার মাধবীর রূপ দেখে, মুখে হাসি টেনে এনে তার দিকে মোহ-মুগ্ধ দৃষ্টিতে মাধবীর শান্ত মধুর রূপের দিকে চেয়ে চেয়ে অধীর আবেগে ছুটে গেল, তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করবার জন্য।

'না।'—দু'পা পিছু হটে গিয়ে বলে উঠলো মাধবী। বলে চলে মাধবী—"পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম আর সাত্বিক আচার পালন করে না যে, সে স্বামী হলেও তার বাহু বন্ধনে ধরা দেবে না মাধবী। দেবে না আর সে প্রশ্রয় এক বামাচারী পুরুষকে।"

দেবকীনন্দনের মুখের হাসি মিলিয়ে যায় এবং তার দুই ওষ্ঠ যেন এক দুঃসহ অপমানে কাঁপতে থাকে।

মাধবীর চোখের তারায়, ঠোঁটের কোণে, আচার আচরণের প্রতিটি অভিব্যক্তিতে তখন ব্যক্তিত্বের অপরূপ বিকাশ। স্বামীর দিকে চেয়ে বলতে থাকে সে—"কোন বিভেদ দেখেন নি শাস্ত্রকারেরা শ্যাম ও শ্যামার মাঝে। যাঁর পূজাতেই হোক, ভক্তির আবেগ ফুটে ওঠে না যে স্বামীর চোখে, তার ধর্ম্মের ভণ্ডামীতে সাড়া দেবেনা কোন সতী রমণীর মন; ধরাও দেবে না তার বাহুতে।"

স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে দেবকীনন্দন। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোয় থর থর করে কাঁপতে থাকে তার দেহ। কে জানে অপমানে, না বেদনায়! দেখে মনে হলো, যেন জীবনের স্বপ্ন হারিয়ে শূন্য হয়ে গিয়েছে তার মন। রৌদ্র প্রখর হয়; বাস্তরবে মুখর হয়ে ওঠে দেবকীনন্দনের পূজা মণ্ডপ। কিন্তু সে দিকে যেন খেয়াল নেই তার।

ধীরে ধীরে যেন অবসন্নের মত সেই গৃহদ্বারেই বসে পড়ে দেবকীনন্দন। ভুল হয়েছে, সত্যিই ভুল হয়ে গেছে এ জীবনে। সব উচ্ছৃঙ্খলতা আর অনাচার দূর করে দিয়ে শান্তির মন্ত্র গ্রহণ করে এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার জীবন হতে চিরকালের মত দূরে যাওয়াই ত ভালো। সব লোভ, মোহ, ভুল আর নীচতার স্পর্শ থেকে যেন মুক্তি পেল দেবকীনন্দন।

উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো মাধবীর দুটি কাজলটানা চোখ; উৎফুল্ল হয়ে ওঠে তার মন। ধীরে ধীরে এবং নিঃশব্দে গৃহান্তরে গিয়ে একখানি বৃন্দাবনি পট্টবস্ত্র নিয়ে ফিরে আসে মাধবী, আর নিয়ে আসে পতিতপাবন শ্রীচৈতন্যের চরিতামৃত। জিনিষ দুটিকে অঞ্জলি দেবার ভঙ্গিতে ধরে মিনতি জানায় মাধবী—"এই নাও স্বামি, তোমার স্ত্রীর আজীবনের সঞ্চয়, শ্রদ্ধার উপহার।"

কেঁপে উঠলো দেবকীনন্দনের চোখের দৃষ্টি। বিহ্বলের মত নীরবে পুঁথির দিকে তাকিয়ে থাকে সে। তারপর হঠাৎ বৃন্দাবনী বস্ত্রখানা হাতে তুলে নিলো—ছিনিয়ে নিলো পুঁথিখানা পরম আগ্রহে। ধীরে অশ্রুসজল হয়ে উঠলো তার চক্ষু। এত দিনে পেয়েছে সে পরম সম্পদ। যেন জীবনের অন্ধতা ঘুচে গেল এতদিনে।

"—মাধবি!"

স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বলে দেবকীনন্দন।

"—মাধবি, একবার শোনাবে কি সেই গানখানা, যে গান আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তোমার কাছে।"

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে চোখের আনন্দাশ্রু মুছছিল মাধবী। দেবকীনন্দনের এ পরিবর্ত্তন যে তার কাছে অভাবিত, অকল্পনীয়। এতো দিনে সার্থক হলো কি তার মনের কামনা! স্বামীর করুণ সুরে কেঁদে উঠলো তার মন। গেয়ে উঠ্‌লো সে, ভাবে বিভোর হয়ে: "রতি সুখ সারে, গত মভিসারে, মদন মনোহরবেশম্।"

মুগ্ধ হয়ে গান শুনলো দেবকীনন্দন। চোখের দৃষ্টি হলো তার মোহাবিষ্ট। গান শুনতে শুনতে কখন দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে, বুঝতে পারেনি সে। এ কেমন গান? এ কি অদ্ভুত গান? হৃদয় নিঙড়ানো এই সঙ্গীতের আস্বাদ সে ভুলে ছিল কেমন করে, কোন প্রয়োজনে?

হঠাৎ বলে ওঠে দেবকীনন্দন—"আমায় মুক্তিদাও মাধবি।

কেমন যেন চমকে উঠলো মাধবী।—আমি কোথায় আবদ্ধ করে রেখেছি তোমাকে! তোমার সঙ্গে আমার যে সহজ সম্পর্ক সেখানে তো বন্ধনের প্রয়োজন বাহুল্য। প্রেম মানেই তো মুক্তি। যদি সত্যিই মুক্তি চাও, মাতোয়ারা হও হরিপ্রেমে।"

আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে গৃহ ছেড়ে চলে গেল দেবকীনন্দন প্রান্তরের পথে। কণ্ঠে বেজে উঠলো তার স্বর:—আজ রজনী হাম ভাগে পোহায়নু পেখনু পিয়া মুখচন্দা।

গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে দেখে মাধবী। দেখতে পায় সে, দূরে চলে যাচ্ছে তার স্বামী দেবকীনন্দন। প্রেমের যাদু মন্ত্রে সে আজ রূপান্তরিত। তার মনে ভক্তির আলো জ্বলে উঠেছে। আলোর আভায় উজ্জ্বল হয়েছে তার মুখ। যেন জন্মান্তর ঘটেছে স্বামীর! বেজে উঠলো মাধবীর জীবনের রাগিণী। তার তিলে তিলে গড়া স্বপ্নের কামনা যেন জ্বলে উঠেছে হোমাগ্নির মত এক অনির্ব্বাণ শিখায়। অশ্রু ভারাক্রান্ত নয়নে সে চেয়ে থাকে পথের দিকে।

নিজের পরিবর্ত্তনে নিজেই অবাক হয়ে গেল দেবকীনন্দন। তার বুকের মাঝে ভক্ত বৈষ্ণবের এত কোমল ও মধুর অনুভূতি গোপন ছিল, সে তার ধারণারও অতীত। ভক্তির সৌরভে পুলকিত হলো তার মন। নিজের প্রাণবন্যার চাঞ্চল্যে আকুল হয়ে উঠলো সে। ভাবের আবেগে গেয়ে উঠলো:—নব 'বৃন্দাবন নব নব তরুগণ, নব নব বিকশিত ফুল। নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল, মাতল নব অলিকুল।'

চলে গেল দেবকীনন্দন। গৃহদ্বার ত্যাগ করে কাটোয়ার ধূলি ধূসরিত প্রান্তরের উপর দিয়ে ফৌজদার দেবকীনন্দনের ছায়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর দেখা যায় নি কোন দিন কাটোয়ার ফৌজদারভবনে সে দেহের ছায়া।

নবদ্বীপে আচার্য্য শ্রীনিবাসের কাছে দীক্ষা নিয়ে চলে গেল সে বৃন্দাবনের পথে। মাধুকরী নিল দেবকীনন্দন। নিজের যা কিছু ছিল সব বিলিয়ে দিয়ে এক দুশ্চর সাধনায় ব্রতী হলো সে। নিজের চারপাশে কৃচ্ছ্র সাধনার আর নামজপের হোমানল জ্বেলে তারি আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সে। কীর্ত্তনের মধুর সুরে আত্মহারা হয়ে গেল তার প্রাণ মন।

এ সবই ইতিহাসের কথা।

বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে দেবকীনন্দন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে আজো।

আর মাধবী? দেবকীনন্দনের যাত্রা পথের দিকে চেয়ে হঠাৎ তার সমস্ত দেহ মন এক প্রচণ্ড আবেগে কেঁপে উঠলো। তার অন্তরাত্মা কেঁদে উঠ্‌লো স্বামীর বিরহে। নিজের হৃদয়কে বিশ্লেষণ করে দেখে সে। স্বামীর পরিবর্ত্তন চেয়েছিল সে সত্যই, সেই সঙ্গে চেয়েছিল স্বামী সঙ্গও। করতে চেয়েছিল তাঁর সেবা।

আবার তন্ময় হয়ে নিজের মনের গভীরে ভেবে দেখে মাধবী। এই ভালো; মানবীর হাতে আঘাত পেয়ে সত্যকার প্রেমের স্বাদ পেলো তার স্বামী। প্রেমের আগুনে পুড়ে খাঁটি হয়ে গেল; পেল হরিপ্রেমের আস্বাদ। সার্থক আমার জীবন। নর্ম্মসহচরী নয়, প্রকৃত ধর্ম্ম-সঙ্গিনীর কাজই করেছি আমি।—নিজের প্রেম দিয়ে স্বামীকে করেছি সেই প্রেমের পথের পথিক, যে প্রেম নিবেদিত হয় ভগবানের চরণে। ধন্য আমি, সার্থক আমার প্রেম।

মাধবী স্নিগ্ধ আবেগে চোখ বুঁজে রইলো। তার মনের সব দুঃখ সব অভিমান নিমেষে জুড়িয়ে গেল। পরম পরিতৃপ্তিতে তার মন কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে উঠলো।

তবুও কখন যে বাঁধ ভেঙ্গে অশ্রুর বন্যা নামল তার চোখে তা বুঝতেও পারলো না মাধবী। মাটিতে লুটিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদলো সে কতকক্ষণ। তার পর ভক্তিনম্র চিত্তে শান্ত সমাহিত হয়ে করজোড়ে চেয়ে রইল রাধা—মাধবের বিগ্রহের পানে। মনে হলো তার, যেন এক অপরূপ খুশীর আলোকে পুলকিত হয়ে উঠেছেন স্বয়ং রাধামাধব। পরিতৃপ্ত অন্তরে তিনি যেন চেয়ে আছেন তার দিকে সুমধুর ভঙ্গিমায়।

আজো আছে কাটোয়ায় ভাগীরথী তীরে রাধারমণের পাট, মাধবীর স্থাপিত সেই পাট কালের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে আছে আজো সমুন্নত মহিমায়। বাসন্তী পূর্ণিমাতে যখন জ্যোৎস্নার আলোয় চারিদিক ভেসে যায়, বকুলের সুরভি যখন চারিদিক আমোদিত করে তোলে, তখন মন্দিরের দিকে তাকিয়ে তপঃক্লিষ্ট সুন্দরী কিশোরীর এক প্রেমময় কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে যায় বিমুগ্ধ পথিকের, যে প্রতিজ্ঞার ফলে উদ্ধার পেয়েছিল তার বামাচারী স্বামী। মনে পড়ে তার, এক দুঃখিনী নারী তার জীবনে প্রথম প্রেমের আবির্ভাবকে চোখের জলে বন্দনা করে যখন ভিজিয়ে দিয়েছিল রাধারমণের পা দু'খানি, তখন মধুর বেদনায় আনন্দাশ্রু ঝরে পড়েছিল শিলাময় বিগ্রহের নয়ন থেকে।

রাশিচক্র দর্শনে স্ত্রীপুরুষ নির্ণয় ও অন্যান্য যোগ

উপাধ্যায়

জাতক স্ত্রী কি পুরুষ তা জানতে হোলে দ্রেক্কাণ বিচার আবশ্যক। কিন্তু বিচারের সময় সতর্কতার প্রয়োজন। কেন না যদি লগ্নে কোন স্ত্রীগ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি থাকে, তা হোলে পুরুষ স্থানে স্ত্রী ও হয়ে থাকে। যে কোন ব্যক্তির রাশিচক্র বা জন্মকুণ্ডলী দেখে বলা যেতে পারে তার সম্বন্ধে। জাতক পুরুষ না নারী—তা নির্ণয় করার প্রণালী আছে। সেই প্রণালী অবগত না হোলে সঠিক বলা অসম্ভব।

লগ্ন, রবি ও রাহু এই তিনটীকে লক্ষ্য করা দরকার। এরা যে যে রাশিতে আছে, সেই সেই রাশি সংখ্যা যোগ করে তাকে সাত দিয়ে ভাগ করলে যদি ভাগশেষ এক, তিন, পাচ বা সাত অথবা শূন্য হয় তাহোলে সে কোষ্ঠী বা রাশিচক্র হবে পুরুষের আর দুই, চার, ছয় থাকলে হবে স্ত্রীলোকের।

এই নিয়ম প্রয়োগ করে শতকরা আশীটি মেলানো সম্ভব হয়েছে। তবে লগ্নের ভুল থাকলে বা স্ত্রী ও পুরুষ গ্রহের দৃষ্টির আধিক্য হোলে ফল অন্যথা হয়। যেখানে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়, সেখানে সেই স্ত্রী পুরুষস্বভাব-বিশিষ্টা, আর পুরুষ স্ত্রীস্বভাবসম্পন্ন। ধরা যাক লগ্ন ধনু। রাশিচক্র গণনায় মেষ থেকে বামাবর্তে গুণলে ধনু নবম ঘর। রাহু মেষে সুতরাং প্রথম ঘর, রবি বৃষে দ্বিতীয় ঘর। এখন একত্র করলে আমরা দেখতে পাই—৯+১+২= ১২÷৭=১২ / ৭=৫

ভাগের শেষ ৫ হওয়ায় কোষ্ঠীখানি পুরুষের।

ভৃগুসংহিতায় উক্ত কয়েকটি যোগের কথা নিম্নে বলা গেল।

ধনস্থানে রবি বৃহস্পতি ও কেতু আর সহোদরভাব সৌম্য রাশিতে হয় এবং সেখানে মঙ্গল অবস্থান করে, সুখস্থানে থাকে শনি, নিধনস্থানে বুধ এবং চতুর্থ স্থানে থাকে চন্দ্র তাহোলে ভৃগুর মতে এর নাম হবে বিবাদ যোগ। এ যোগে জন্ম হোলে সুখ দুঃখ ভোগ করতে হবে। স্ত্রী ও পুত্র সুখ ঘটবে না। শরীর ব্যাধিশূন্য থাকলেও মানসিক সুখের অভাব ঘটবে। পঞ্চম স্থানে রবি ও চতুর্থ স্থানে পাপ গ্রহ থাক্‌লে ভৃগুর মতে বৈকল্য যোগ। এ যোগে জাত ব্যক্তির সন্তান হানি ঘটবে। ধনস্থানে রাহু, পুত্র স্থানে মঙ্গল, রাশিচক্রে রবি পাপসংযুক্ত হোলে ব্যঞ্জক যোগ বলে। ভৃগু বলেন এ যোগে পুত্রাদি নাশ নিশ্চয়ই হবে। ধর্মে রাহু, পুত্রস্থানে শুক্র বিকল বা বৃদ্ধ অবস্থায় থাকলে পঞ্চম যোগ হয়। এ যোগে পুত্র ও জ্ঞানের হানি ঘটে। ক্রূররাশিতে সপ্তম স্থানে রাহু, লগ্নে বা দ্বিতীয়ে পাপগ্রহ থাকলে নিশাচর যোগ হয়। এ যোগে পুত্র হয়ে শেষে মারা যাবে আর স্ত্রীনাশ ঘটবে। পুত্রস্থানে রাহু, লগ্নে বা সুখস্থানে রবি পাপসংযুক্ত হোলে দণ্ডযোগ হয়। এ যোগে পুত্র ও কন্যার মৃত্যু ঘটে।

পুত্রস্থানে কেতু ষষ্ঠস্থানে চন্দ্র, ধনস্থানে বা নিধন স্থানে রবি থাকলে ভুজঙ্গ যোগ। এ যোগে পুত্রহানি ঘটে। তিনটি পাপগ্রহ, ধর্ম্ম বা ভাগ্য স্থানে, সুখ স্থানে কিম্বা সন্তান স্থানে থাকলে এবং লগ্নাধিপতি পুত্রস্থানে থাক্‌লে

ভৃগু বলেছেন এর নাম হবে কুঞ্জক্ষক যোগ। এ যোগে জন্ম হোলে বড় ভাই সর্ব্বত্র—এমন কি সভাস্থানে পর্য্যন্ত জাতকের নিন্দা করে বেড়াবে। জন্মলগ্ন থেকে গণনায় পঞ্চম স্থানে অর্থাৎ পুত্র স্থানে রবির সহিত রাহু অবস্থান করলে আর দেহস্থানে চন্দ্র থাক্‌লে নিরয় যোগ হয়। এ যোগে জন্মালে গুরুজন, অর্থ সম্পদ ও গোধন নষ্ট হয়। সুতাধিপতি শত্রুগ্রহের সহিত থাক্‌লে, আর লগ্নে পাপগ্রহ থাকলে এবং উক্ত স্থানে তিনটী পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকলে বিপুল যোগ হয়। এ যোগে জাত ব্যক্তি রোগে কষ্ট পায় আর তার পুত্রপৌত্রাদির হানি ঘটে।

লগ্নে বৃহস্পতি অথবা শুক্র নষ্ট বা বাল্যভাবে অবস্থিত, সৌম্যরাশিতে কেন্দ্র ও ত্রিকোণ, ষষ্ঠ স্থানে অথবা ব্যয় স্থানে পাপগ্রহ থাকলে গজযোগ হয়। এ যোগে জন্ম হোলে ভৃগুর মতে পুত্র রাজমান্য ও মহাশক্তিসম্পন্ন, নিজে ও বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি, ক্রোধী, দীর্ঘায়ু ও বহু পুত্রবান হয়।

লগ্নে বুধ ও শুক্র, ধন স্থানে রবি ও চন্দ্র, সপ্তমে বৃহস্পতি এবং আয় স্থানে মঙ্গল থাক্‌লে জাতক সৌভাগ্য যোগ লাভ করে, শেষে রাজমন্ত্রী হয়। বন্ধুস্থানে শনি ও কেতু এবং কর্ম্মস্থানে বুধ থাক্‌লে সৌভাগ্য যোগ ঘটে এবং সর্ব্ব সম্পদ লাভ হয়। জাতক ধনী মানী জ্ঞাতি-পোষক, সুবিদ্বান, শ্রীমান, রাজমন্ত্রী ও কুলাগ্রগণ্য হয়। ভ্রাতৃ-হীন, নাস্তিক, ব্যয়শীল ও পরদাররত হয়।

জন্মকালে মঙ্গল যে ভাবে অবস্থিতি করে তা থেকে তৃতীয় ভাবে যদি পাপগ্রহ থাকে তাহোলে জাতকের সহোদরের মৃত্যু হয়। জন্মকালে শুক্রাধিষ্ঠিত রাশির সপ্তমে যদি পাপযুক্ত মঙ্গল থাকে, তা হোলে স্ত্রীর বিনাশ ঘটে, আর শনি থেকে অষ্টমে পাপগ্রহরা বলবান হোলে জাতকের মৃত্যু হয়।

গৃহাধিপতির দ্বারা গৃহাদির চিন্তা, বৃহস্পতির দ্বারা সুখের চিন্তা, শুক্রের দ্বারা সুন্দরী ভার্য্যা, বাহন ও বিলাসোপযোগী বস্তুর চিন্তা, রাহু ও শনি দ্বারা আয়ু চিন্তা, রবি দ্বারা পিতৃ চিন্তা, চন্দ্র দ্বারা মাতৃ চিন্তা, বুধ দ্বারা বুদ্ধির চিন্তা করতে হয়।

যার পঞ্চমে রাহু কিম্বা পঞ্চমাধিপতি পাপযুক্ত এবং বৃহস্পতি নীচ রাশিগত তার বত্রিশ বছর বয়সে পুত্রবিয়োগ হবে। যার বৃহস্পতি থেকে পঞ্চম ভাবগত পাপগ্রহ অথবা লগ্ন থেকে পঞ্চমে পাপগ্রহ, সে ছাব্বিশ বৎসরে, তেত্রিশ বৎসরে অথবা চল্লিশ বৎসরে পুত্রবিয়োগজনিত দুঃখে কাতর হবে। শনি যদি পঞ্চম রাশি থেকে পঞ্চমে থাকে, আর পঞ্চমাধিপতি পঞ্চমে থাকে তাহোলে সাতপুত্র হবে। কিন্তু দ্বিতীয় বারের গর্ভে যমজ সন্তান।

—

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফলাফল

মেষ রাশি

অশ্বিনীজাত ব্যক্তির পক্ষে অধম, ভরণীজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম এবং কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। উদরের গোলমাল। কর্ম্মোন্নতি হোলেও কর্ম্মস্থলে শত্রুবৃদ্ধির জন্য অশান্তি। পিতার রোগভোগ ও আকস্মিক বিপদ। কোন নারীর নিমিত্ত সুখ যোগ প্রাপ্তি। সন্তান, পত্নী বা ভ্রাতৃস্থানীয়ের মারাত্মক পীড়া যোগ। নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু। আয় স্থান শুভ। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটি মন্দ যাবে না। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীর পক্ষে আশানুরূপ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে অপবাদ ও আশাভঙ্গ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষ রাশি

মৃগশিরার পক্ষে উত্তম, রোহিণীর পক্ষে মধ্যম এবং কৃত্তিকার পক্ষে নিঃষ্ট ফল। ভ্রাতার রোগ ভোগ। আর্থিক উন্নতি। কর্ম্মোন্নতি। ব্যবসায়ে লাভ। ধনভাব শুভ। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অশুভ। সম্পত্তি সংক্রান্ত গোল যোগ। বাড়ীওয়ালা কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মধ্যম। মামলা মোকর্দ্দমার আশঙ্কা আছে। ব্যবসায়ী বৃত্তিজীবীর আর্থিক উন্নতি যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশা-প্রদ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্যলাভ।

মিথুন রাশি

মৃগশিরার পক্ষে উত্তম, আর্দ্রার পক্ষে মধ্যম, পুনর্ব্বসুর পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। মাসটি নানাপ্রকার বাধার মধ্য দিয়ে চলবে। বুদ্ধির ভুলে কাজকর্ম্মে অশান্তি সৃষ্টি। বন্ধুবিয়োগ,

আত্মীয় বিরোধ, অর্থ লাভ, পত্নী ও সন্তানের বিশেষ পীড়া, চাকুরি ক্ষেত্রে সন্তোষজনক সম্ভাবনা সত্ত্বেও উদ্বেগ ও অশান্তি। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসুর পক্ষে উত্তম, পুষ্যার পক্ষে মধ্যম, অশ্লেষার পক্ষে নিকৃষ্ট। স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক কষ্টভোগ, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। ভোগবৃদ্ধির সুযোগ। আর্থিক বিষয়ে ন্যায্য প্রাপ্তিতে বাধা এমন কি বঞ্চিত হবার যোগ। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে শুভ, নূতন সম্পত্তি প্রাপ্তি বা ক্রয় সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। স্ত্রীলোকের সৌভাগ্য বৃদ্ধি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্য লাভ।

সিংহ রাশি

উত্তরফল্গুনীর পক্ষে উত্তম, মঘা ও পূর্ব্বফল্গুনীর পক্ষে নিকৃষ্ট। দেহভাব মধ্যম। কোন নারীর কুহকে বিপন্ন…। স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি, সন্তানের পীড়া, মানসিক উদ্বেগ, কর্ম্মোন্নতি-যোগ। চাকুরিক্ষেত্রে উত্তম বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। আকস্মিক ধনলাভ যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর শুভ।

কন্যারাশি

চিত্রার পক্ষে উত্তম। হস্তার পক্ষে মধ্যম। উত্তর ফল্গুনীর পক্ষে অধম। আর্থিক উন্নতি, আশানুরূপ কর্ম্ম-সাফল্য, সম্মানবৃদ্ধি. স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি, সম্পত্তি বিষয়ে শুভ, পিতার স্বাস্থ্যহানি। নিজের বুদ্ধির বিভ্রম সৃষ্টি হ'তে পারে। গুরুস্থানীয়ের বিয়োগাশঙ্কা। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে উত্তম। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্য লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম।

তুলা রাশি

চিত্রা ও স্বাতীর পক্ষে উত্তম। বিশাখার পক্ষে মধ্যম, ভ্রাতৃস্থানীয়, মাতুল সম্পর্কীয়, সন্তান ও স্ত্রীর পীড়াযোগ। শত্রুবৃদ্ধি, মানসিক অশান্তি, গৃহ নির্ম্মাণে বাধা সৃষ্টি। মাতার স্বাস্থ্যভঙ্গ, গৃহ নির্ম্মাণে বাধা, বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মধ্যম। চাকুরির ক্ষেত্র সাধারণভাবে চলবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে আশানুরূপ বলা যায় না। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখার পক্ষে উত্তম, জ্যেষ্ঠার পক্ষে মধ্যম, অনুরাধায় পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্যহানি, সন্তানের উন্নতি, গৃহনির্ম্মাণ-যোগ, কর্ম্মোন্নতি, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ। পুরাতন ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা। অর্থব্যয়, চিত্র ও রঙ্গ জগতের ব্যবসায়ীর পক্ষে অশুভ। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে শুভ। চাকুরির ক্ষেত্রে উন্নতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম।

ধনু রাশি

মূলা ও পূর্ব্বাষাঢ়ার পক্ষে মধ্যম। উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে অধম, সাংসারিক অশান্তি, নিকটাত্মীয়ের কঠিন পীড়া। যানবাহন ও ভৃত্য সংক্রান্ত গোলযোগ। কণ্ঠ ও পরিপাক-যন্ত্র সম্পর্কীয় পীড়া। ধনভাব শুভ, নূতনভাবে কর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সম্ভা না। ব্যবসাক্ষেত্রে আশাতীতভাবে যোগা-যোগ। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে পুরাতন গোলযোগ বৃদ্ধি। চাকুরির ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মন্দ নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে উত্তম, ধনিষ্ঠার পক্ষে মধ্যম, শ্রবণার পক্ষে অধম। সন্তান ও গুরুস্থানীয়ের মারাত্মক পীড়া-যোগ। দেহভাব শুভ, আয় বৃদ্ধি, উত্তম ধনাগম, নূতন সম্পত্তি লাভ। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে আশাতীত সাফল্য লাভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের আশাপ্রদ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। শতভিষা ও পূর্ব্ব-ভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। স্বাস্থ্যভাব শুভ। নূতন ঋণের কারবকতা আছে। ব্যয়বৃদ্ধি, পারিবারিক

অশান্তি ও দুশ্চিন্তা, পত্নী ও সন্তানের পীড়া। ভাগ্যোন্নতির সম্ভাবনা, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উন্নতির সম্ভাবনা। বিক্রয় বাণিজ্যে অধিকতর লাভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম। কর্ম্মোন্নতিযোগ আছে। স্ত্রীলোকের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মীন রাশি

রেবতীর পক্ষে উত্তম। পূর্ব্বভাদ্রপদের পক্ষে মধ্যম। উত্তরভাদ্রপদের পক্ষে নিকৃষ্ট। গুরুজন বিয়োগ। আকস্মিক পীড়া, যানবাহন সংক্রান্ত দুর্ঘটনার ভয়। চিৎকিসাবিভ্রাট হেতু রোগবৃদ্ধি। অপ্রত্যাশিতপ্রাপ্তি। শত্রুনাশ, পরাক্রমবৃদ্ধি, উন্নতিযোগ, ধনভাব শুভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মধ্যম। সম্পত্তিলাভের সম্ভাবনা। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নফল

মেষ লগ্ন—

অধীন ব্যক্তির দ্বারা প্রতারণা। শত্রুবৃদ্ধি, পিতার রোগভোগ, ধনাগম, সন্তানের শারীরিক অবস্থার আংশিক অবনতি, ধনাগম ও যশ। চাকুরিজীবীর পক্ষে মধ্যম, কর্ম্মস্থলের বিভাগের পরিবর্ত্তন। স্ত্রীলোকের পক্ষে মন্দ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষ লগ্ন—

আর্থিক উন্নতি, ভ্রাতার পীড়া, কর্ম্মে সাফল্য লাভ। ব্যয় বাহুল্য। পত্নীর অসুস্থতা, ধনলাভ যোগ, সম্মান প্রাপ্তি, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

মিথুন লগ্ন—

বেদনাজনিত পীড়া, অর্থব্যয়, ব্যয়বাহুল্য, আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ, কর্ম্মোন্নতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ।

কর্কট লগ্ন—

বেকার ব্যক্তির কর্ম্মলাভ, পদোন্নতি, ভাগ্যবৃদ্ধিযোগ, স্ত্রীর পীড়া। সম্বন্ধলাভ, তীর্থ পর্য্যটন, স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্য লাভ।

সিংহ লগ্ন—

সন্তানের পীড়া, মানসিক উদ্বেগ, গুরুজন বিয়োগ। অযথা অর্থব্যয়, কলহ ও মামলা-মোকর্দ্দমা, ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

কন্যা লগ্ন—

স্ত্রীর সহিত মতবিরোধজনিত অশান্তি, সম্মানবৃদ্ধি। পদোন্নতি, মানসিক উদ্বেগ। নানারকমে ব্যয়াধিক্য। মাতার পীড়াযোগ, সন্তানের স্বাস্থ্যহানি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

তুলা লগ্ন—

স্নায়ুগত পীড়া, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। গৃহাদি নির্ম্মাণ বা ধর্ম্মকার্য্যে অর্থব্যয়, শত্রুবৃদ্ধিযোগ, পুত্রকন্যার বিবাহের আলোচনা। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি সুবিধাজনক নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

বৃশ্চিক লগ্ন—

ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি, পদোন্নতি, সুখ ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি। চিত্তের প্রসন্নতা। বেকার ব্যক্তির চাকুরি লাভ. দাম্পত্য প্রণয়, অর্থ সঞ্চয়, কর্ম্মস্থলে গুপ্তশত্রুর অপকৌশলের প্রচেষ্টা, স্ত্রীলোকের পক্ষে মন্দ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

ধনু লগ্ন—

পত্নীর হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাজনিত পীড়া। ভাগ্যোন্নতি। সন্তান সন্ততির লেখাপড়ায় উন্নতি। বাসগৃহের জন্য নূতন জমি সংগ্রহের চেষ্টা, সম্বন্ধলাভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

মকর লগ্ন—

সহকর্ম্মীদের সঙ্গে মতানৈক্য হেতু কিছু অশান্তিভোগ। সম্বন্ধ লাভ, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, আর্থিকোন্নতি, ব্যবসা-বাণিজ্যে আশানুরূপ ফল লাভ। সন্তান সন্ততির বিবাহের আলোচনা। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

কুম্ভ লগ্ন—

শারীরিক অসুস্থতা, বাতবেদনা, হঠাৎ আঘাতপ্রাপ্তি। সন্তানাদির লেখাপড়ায় বাধা। কর্ম্মস্থলে উন্নতির আশা। ব্যয় বাহুল্যহেতু মানসিক চাঞ্চল্য। বন্ধু লাভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

মীন লগ্ন—

ভাগ্যোন্নতি, কর্ম্মস্থলে অশান্তি, ধনলাভ, রক্ত সম্বন্ধীয় পীড়াভোগ। পারিবারিক অশান্তি, বৃথা ভ্রমণের যোগ। মাতার পীড়া, বন্ধুর দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ—

গত ২০শে ডিসেম্বর দিল্লীতে এসিয়া জনসংখ্যা সম্মিলনের শেষ দিনের সভায় এইরূপ সতর্কবাণী বলা হয় যে, এসিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার জনসংখ্যাবৃদ্ধি একটি নিদারুণ সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের দেশগুলির কর্তব্য—জরুরী ভিত্তিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম—বিশেষ করিয়া কৃষি ও শিল্পায়নের কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। দ্রুত এবং ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এ অঞ্চলের অর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে ও জীবনযাত্রার সন্তোষজনক মানে পৌছিবার চেষ্টা বানচাল হইয়া যাইতেছে। এ ধরণের জনসংখ্যা-সম্মিলন এসিয়ায় প্রথম হইল। ভারতসরকারের সহ-যোগিতায় রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃপক্ষ এ সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন—১০ দিন ব্যাপী সম্মিলন হইয়াছে। ২০টি দেশ হইতে ২৩০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। সকল দেশে যাহাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হয় সে জন্য সকল দেশকে স্বতন্ত্র ভাবে পরিকল্পনা করিতে বলা হইয়াছে। সারা পৃথিবীতে আজ জনসংখ্যাবৃদ্ধি সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিকে বিব্রত করিয়াছে। সে সমস্যা সমাধানের জন্য সত্বর উপযুক্ত কার্যপদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন হইয়াছে।

কলিকাতার সম্প্রসারণ—

২০শে ডিসেম্বর জানা গিয়াছে যে কলিকাতা ইমপ্রুভ-মেণ্ট ট্রাষ্ট দক্ষিণ-কলিকাতার সম্প্রসারণের জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। গত ৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে বেহালা মিউনিসিপালিটীর ৯টি ওয়ার্ড—৮নং হইতে ১৬নং পর্যন্ত অঞ্চল উন্নত করা হইবে। ঐ অঞ্চলের পূর্বে টালির নালা, পশ্চিমে ডায়মণ্ড-হারবার রোড, দক্ষিণে পুটিয়ারী, উত্তরে নিউ আলিপুর—ঐ এলাকার মধ্যে পড়িবে। সে জন্য জমি দখল, বাড়ী নির্মাণের জন্য জমি উন্নয়ন, পথঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতির জন্য ট্রাষ্টকে অধিকার ও ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ৬ সপ্তাহ পরে ট্রাষ্ট তাহার কাজ আরম্ভ করিবে। কলিকাতার সম্প্রসারণ বিশেষ প্রয়োজন—ঐ অঞ্চলটির উন্নয়ন হইলে সহরবাসী এক দল লোকের নানা সমস্যার সমাধান হইবে।

পরলোকে সুরাবর্দী—

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী হোসেন সহিদ সুরাবর্দী গত ৫ই ডিসেম্বর লেবানন দেশে বেইরুট সহরে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অবিভক্ত বাংলারও প্রধান মন্ত্রী ছিলেন—তাঁহার পিতার নাম বিচারপতি স্যার জহিদ সুরাবর্দী—সুরাবর্দী পরিবার বহু পূর্বে দিল্লী হইতে আসিয়া মেদিনীপুরে বাস করেন—তাঁহার এক পিতৃব্য সার আবদুল্লা সুরাবর্দী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান অধ্যাপক ও অপর পিতৃব্য সার হাসান সুরাবর্দী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ছিলেন। তাঁহার অগ্রজও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের বাগীশ্বরী অধ্যাপক ছিলেন। মৃত সুরাবর্দী ১৮৯২ সালে জন্মগ্রহণ করেন—গত ৮ই সেপ্টেম্বর তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। কলিকাতা কর্পোরেশন কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হইলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মেয়র ও তাঁহার সঙ্গে সুরাবর্দী ডেপুটীমেয়র হন। গত ৪৫ বৎসর কাল তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে বহু পদে ও বহুরূপে কাজ করিয়াছিলেন। ১৯৪৩ সালে তিনি বাংলার খাদ্যমন্ত্রী হন ও ১৯৪৬ সালে প্রধান-মন্ত্রী হইয়া দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানে চলিয়া যান।

ব্যারাকপুর মহকুমা সমিতি—

গত ৩১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা-৩৫, ৩৫ ব্যারিষ্টার পি, মিত্র রোডে ব্যারাকপুর মহকুমা সমিতির

এক বিশেষ সভায় কবিকঙ্কণ শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৫৯তম জন্মদিনে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। সমিতির সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং কবি বীরেন্দ্র মল্লিক, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, পান্নালাল মাইতি প্রভৃতি বহু কবি ও সাহিত্যিক সভায় উপস্থিত হইয়া কবিকঙ্কণের দীর্ঘজীবন ও সুখ-শান্তি কামনা করিয়াছিলেন।

২৪ পরগণা জেলা সাংবাদিক সংঘ—

২৪ পরগণা জেলা সাংবাদিক সংঘের সহ-সভাপতি বসিরহাটের উকীল শ্রীবিজয়চন্দ্র দাশের আহ্বানে গত ১০ই নভেম্বর রবিবার বিকালে বসিরহাট দালাল-ভবনে বিশেষভাবে নির্মিত মঞ্চে সংঘের বিজয়া-সম্মিলন হইয়াছিল। সংঘের সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন, স্থানীয় মহকুমা শাসক প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন এবং সংঘ-সম্পাদক শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ সংঘের পক্ষ হইতে সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। প্রবীণ কবি শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ বহু স্থানীয় সুধী-ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

তারকেশ্বরে কবি সম্মিলন—

গত ২৪শে নভেম্বর বঙ্গীয় কবিপরিষদের উদ্যোগে পুণ্যতীর্থ তারকেশ্বরে স্থানীয় হরিসভা গৃহে সন্ধ্যায় এক কবি-সম্মিলন হইয়াছিল। কলিকাতা ও অন্যান্য বহু স্থানের ৫০ জনেরও অধিক কবি তাহাতে যোগদান করেন; সুকবি বীরেন্দ্র মল্লিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, মেদিনীপুর লালগড়ের রাজা রণজিৎকিশোর সাহস রায় প্রধান অতিথি হন এবং শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। তারকেশ্বরের খ্যাতিমান দেশকর্মী শ্রীদিঘাপতি ভট্টাচার্য সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরিষদের সম্পাদক কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সহকর্মী কবিগণের চেষ্টায় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। এক দল কবি রাত্রিতে দিঘাপতিবাবুর নবনির্মিত গৃহে রাত্রে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন—

গত ৩০শে নভেম্বর ও ২রা ডিসেম্বর পুরুলিয়া জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রমে বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। স্থানটি আসানসোল হইতে আদ্রা যাইবার পথে মুরাডি ষ্টেশন হইতে মাত্র আধমাইল দূরে—তিন দিকে পাহাড় বেষ্টিত একটি রম্য পরিবেশে অবস্থিত। ঐ অঞ্চলের অধিবাসী শ্রীঅন্নদা চক্রবর্তী যৌবনে দেশের মুক্তিসংগ্রামের সৈনিক ছিলেন—তাঁহার চেষ্টায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে লইয়া তৎকালীন মানভূম জেলায় প্রথম রাজনীতিক সম্মিলন সম্ভব হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য শ্রদ্ধেয় কবি স্বর্গত কিরণচাঁদ দরবেশের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন এবং রামচন্দ্রপুর গ্রামে এক বিরাট আশ্রম নির্মাণ করিয়াছেন। সে নির্মাণযজ্ঞ এখনও শেষ হয় নাই—আমরা গত ৪ বৎসরে কয়েকবার আশ্রমে যাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছি ও দিন দিন আশ্রমের কর্মক্ষেত্র এবং কর্মধারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। ঐ স্থানে একটি বহু পুরাতন শ্মশান ছিল এবং শ্মশানের নিকট কয়েকটি বট ও অশ্বত্থ গাছে পূর্ণ জঙ্গল ছিল। স্থানটি চক্রবর্তীমহাশয়কে চিরদিন আকৃষ্ট করিত। তিনি সন্ন্যাসী হইয়া স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী নাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং একটি উচ্চ স্থান খনন করিয়া তন্মধ্যে যজ্ঞকুণ্ড, পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রভৃতি পাইয়াছেন। যে ঘরের মধ্যে যজ্ঞকুণ্ড অবস্থিত, তাহা পাকা—কতদিন পূর্বে নির্মিত তাহা বলা কঠিন। যাহা হউক, স্বামীজি ঐ স্থানে বহু গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন—তথায় আবাসিক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, সমাজসেবা শিক্ষা কেন্দ্র প্রভৃতি চলিতেছে। প্রতি বৎসর শীতকালে এক মাস তথায় চক্ষু চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং সে সময় এক একদিন শতাধিক বৃদ্ধ রোগীকে আশ্রমে আহার ও বাসস্থান দিতে হয়—কোন কোন রোগী প্রয়োজনমত আশ্রমে ২।৪ দিন বাস করিতেও বাধ্য হন। তাহাদের জন্য এবং বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, কর্মীদের বাসগৃহ প্রভৃতির জন্য তথায় শতাধিক পাকা ঘর ও বহু বারান্দা নির্মিত হইয়াছে। ৪টি বড় ইঁদারা খনন করিয়া জল সরবরাহ করা হয় এবং ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার প্রভৃতি ও অতিথিদের জন্য বহুসংখ্যক স্যানিটারি পায়খানা, স্নানের ঘর প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে। মধ্যস্থলে মন্দির ও

নাটমন্দির—নাটমন্দিরটি প্রয়োজনের সময় নাটামঞ্চে পরিণত করা হয় ও তাহার সম্মুখস্থ বিশাল প্রাঙ্গণে দর্শকগণের বসিবার স্থান হয়।

গত ৩০শে নভেম্বর শনিবার সকালে তুফান এক্সপ্রেসে কলিকাতা, শ্রীরামপুর, তারকেশ্বর, ব্যাণ্ডেল, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় শতাধিক সাহিত্যিক আসানসোল হইয়া সন্ধ্যায় রামচন্দ্রপুরে যাইয়া উপস্থিত হন। সেদিন সন্ধ্যায় ও পরদিন সকাল, বিকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাসভা হইয়াছিল। বার্ণপুর, ধানবাদ, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থান হইতেও সেদিন কয়েকশত সাহিত্যিক সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রবীণ শিক্ষাব্রতী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রামতনু অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মূল সভাপতিরূপে সকল সভাতেই উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীমন্মথ রায়, অধ্যাপক ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কবি শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, যুগান্তরের শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, স্বপনবুড়ো শ্রীঅখিল নিয়োগী, প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় সভাপতিত্ব করেন। স্বামীজি সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশব মুখোপাধ্যায়, হাওড়ার সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, ডাঃ শম্ভু পাল, সম্মিলনের সাধারণ সম্পাদক সুরেন নিয়োগী, কবি শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পান্নালাল মাইতি, তারকেশ্বরের নিত্যগোপাল পাল, বানপুরের শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ত্রিবেণীর নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়, সুগায়ক সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, আসানসোলের কবি শান্তিময় মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রপুরের প্রসিত রায়চৌধুরী, ধামুয়ার সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বেলঘরিয়ার অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ও রেবা চট্টোপাধ্যায়, বার্ণপুরের প্রবীণ লেখক বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সম্মিলনে যোগদান ও অংশ গ্রহণ করিয়া সম্মিলনকে সাফল্য মণ্ডিত করেন। আশ্রমের কর্মীরা, বিশেষ করিয়া স্বামীজির পুত্র নন্দদুলাল, ব্রজদুলাল, শচীদুলাল প্রভৃতি প্রত্যেক অতিথিকে ব্যক্তিগতভাবে আদর যত্ন করিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন। স্বামীজির চেষ্টায় কয় বেলা ভুরিভোজের ও সর্বদা চা-খাবারের ব্যবস্থা থাকায় কাহারও কোন অসুবিধা হয় নাই। পল্লীপ্রান্তে এত অধিক সাহিত্যিকের সমাবেশ প্রায়ই দেখা যায় না। রামচন্দ্রপুর বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম এ বিষয়ে এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের দপ্তর—

গত ৯ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন দপ্তরগুলি পুনর্বণ্টন করিয়াছেন। শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ করায় ইহার প্রয়োজন হইয়াছিল। নূতন ব্যবস্থা এইরূপ—(১) শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় অর্থ ও পরিবহন (স্বরাষ্ট্র) (২) শ্রীফজলর রহমন—স্বায়ত্ব শাসন (৩) শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়—স্বাস্থ্য (৪) শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য—ভূমিরাজস্ব ও সেচ (৫) শ্রীবিজয়সিং নাহার—শ্রম ও প্রচার (৬) শ্রীজগন্নাথ কোলে—কারাগার (৭) শ্রীঈশ্বরদাস জালান—বিচার ও আবগারী (৮) শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ—শিল্প ও বন (৯) শ্রীমতী আভা মাইতি—ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ। (১০) রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—শিক্ষা ও (১১) শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পূর্ত ও গৃহ নির্মাণ বিভাগে পূর্বের মত বহাল আছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন স্বরাষ্ট্র পুলিস, সাধারণ শাসন, কৃষি ও খাদ্য উন্নয়ন বিভাগের কাজ করিবেন। কামরাজ পরিকল্পনায় ২ মন্ত্রী, ৭ রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ৯ উপমন্ত্রী বাদ গেলে বর্তমানে ১২ মন্ত্রী ও ৪ রাষ্ট্রমন্ত্রী কাজ করিতেছেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র পঞ্চায়েৎ ও শিক্ষা, শ্রীতেনজিং ওয়াংদি উপজাতি কল্যাণ ও সমবায়, শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ উন্নয়ন ও কৃষি এবং শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর নস্কর স্বরাষ্ট্র পুলিস, আবগারী ও প্রতিরক্ষার কাজ করিবেন।

পরলোকে পানিক্কর—

গত ১৫ই ডিসেম্বর প্রখ্যাত পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, শিক্ষাব্রতী ও কূটনীতিবিদ সর্দ্দার কে-এম পানিকর ৬৮ বৎসর বয়সে মহীশূরে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন, তথায় সভা করার সময় হঠাৎ অসুস্থ হন এবং হাসপাতালে নীত হইয়া মারা যান। অধ্যাপক ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী সভায় তাঁহার পাশে ছিলেন। ১৮৯৫ সালে কেরল মাধব পানিকর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাদ্রাজে ও অক্সফোর্ডে শিক্ষা লাভ করিয়া ব্যারিষ্টার হন এবং আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে

অধ্যাপকের কাজ করিয়া দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইম্‌স পত্রের সম্পাদক হন। তিনি নরেন্দ্র মণ্ডলের সেক্রেটারী, পাতিয়ালার মন্ত্রী, বিকানীরের প্রধান মন্ত্রী, রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি, চীনে রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি পদে কাজ করেন। তিনি সুলেখক ছিলেন ও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতার জন্য ১০ কোটি টাকা—

গত ৫ই ডিসেম্বর লোকসভায় কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবি আর ভকত ঘোষণা করেন যে বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এ বৎসরে ১০ কোটি টাকা প্রদান করিবেন। কলিকাতার বর্তমানে যা অবস্থা তাহাতে জল সরবরাহ, ময়লা জল পরিষ্কার, পথ সংস্কার প্রভৃতি কাজের জন্য আরও বহু অর্থের প্রয়োজন। কলিকাতা মেট্রোপলিটন পরিকল্পনা সংস্থা দ্বারা এই টাকা সুষ্ঠুভাবে ব্যয়িত হইলে সহরবাসীর অসুবিধা আংশিকভাবে দূরীভূত হইবে।

নির্ব্বাণ

চিন্ময়

ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি আলো আর ছায়া
বহু দূরে গিরিচূড়ে ছেড়ে দিল কায়া।
তুমি নাই আমি নাই, নাই সুখ দুখ,
কেহ নাই কারো রূপ দেখিতে উৎসুক,
সীমাহীন নীরবতা প্রাণ স্পন্দহীন
অরূপের রূপছটা স্বরূপ সন্ধানী
দৃষ্টি পথে নাহি পড়ে, না হ শুনে বাণী,
প্রলয়ের পরে কিম্বা সৃষ্টির আদিতে
নাম রূপ রসহীন শিল্পীর আঁখিতে
অব্যক্ত আনন্দময় প্রশান্ত স্পন্দন
সুষুপ্তির স্বপ্নজাল করে না রচন।
সে অদৃশ্য ধ্রুবলোকে সত্যের সন্ধানে
চলেছে বিহগ বহ্নি কাহার আহ্বানে?

পরিকল্পনা

সুলতা সেনগুপ্ত

পঁচিশ বছর আগে
মনে রামধনু জাগে
ভবিষ্যতের হাত ধরে চলি
উজ্জ্বল পুরোভাগে।

পঁচিশ বছর পরে
নব উন্মেষ পরমাণু হোয়ে লুটায় ধূলার ঝড়ে,
দলিয়া - দলিয়া মান সম্মান
যে পথের শেষে, শেষ অভিযান
সে পথের রূপ দেখিবার মতো
হোল আজ অবসর
পথ কোথা হায়,
এ খেলার এক মৃতদেহ অজগর।

প্রাচীন কবির লেখনীতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ-ডি

শ্রীচৈতন্যের সময়ে বা তাঁর কিছু আগে বাংলা দেশে দেবকীনন্দন সিংহ বলে এক বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব হয়েছিল। কবিখ্যাতিস্বরূপ ইনি উপাধি পান 'কবিশেখর'। এই কবিশেখর নামেই কবি সমধিক পরিচিত। পদকর্তা-হিসেবেও এঁর বিশেষ খ্যাতি আছে। কবির বাড়ী বর্ধমান বীরভূম অঞ্চলেই ছিল বলে মনে হয়। ইনি অনেক গ্রন্থ লেখেন; কিন্তু 'গোপালবিজয়' নামে গ্রন্থখানি ছাড়া আর কোনো গ্রন্থ এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। গোপালবিজয় বাংলা সাহিত্যের একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। সাতখানি হাতে লেখা পুঁথি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া গিয়েছে; শ্রীমদ্ভাগবতের ছায়া অবলম্বনে গ্রন্থখানি লিখিত। গ্রন্থখানি অপ্রকাশিত থাকায় এর সাহিত্যরস-মাধুর্য এখনও অজ্ঞাত। গ্রন্থের শেষের দিকে রাসলীলার যে বর্ণনা আছে তা বাংলা সাহিত্যের একটি নব অবদান। এই লীলার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়াই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ বাঁশীমাত্র সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনের পথে চললেন; শেষে যমুনার তীরে এসে বসলেন এক কদম-গাছের তলায়। সেখানে বসে 'রাসরসে' বাঁশী মুখে ধরলেই সব রাগ-রাগিণী যেন মূর্ত হয়ে উঠল; আর—

বেণুরবে কীটপতঙ্গাদি উলসিত।
মুকুলের ছলে তরুলতা পুলকিত॥
পক্ষ-আদি করি বিনোদিল সভেঁ বাঁশী।
সর্পজাতি বিধাতায় কইল নৈরাশী॥
কর্ণ নাহি সর্পজাতি আখিএ দেখি শুনে।
আখি আছাদিল লোহে শুনিব কেমনে॥
বেণুরবে বৎস সব দুগ্ধ নাহি পিএ।
বাটে মুখে আরোপি দোপাশে ফেনা বহে॥
বনে বেণুধ্বনি শুনি মৃগ পালে পালে।
ঘূর্ণিত লোচনে আইসে কৃষ্ণ-অনুসারে॥
সহজে উদ্দাম যত দামড়া-দামড়ী।
খোআর ভাঙ্গিঞা সব জাএ বড়াবড়ি॥
উভ পুছ উভ খুর উভ মাথা করি।
চঞ্চল নআনে ধাএ দুই কান সারি॥

কৃষ্ণের বেণু রবে যখন স্থাবর-জঙ্গমের এই অবস্থা, তখন গোপীদের যে কী ভাব হতে পারে তা চিন্তারও বাইরে। গোপযুবতীরা হয়ে গেল কাঠের পুতুলের মতো; ত্রিভুবন মনে হতে লাগল শুধুই আনন্দময়; কৃষ্ণপ্রেমরসে গোপীগণ ভাসতে লাগল। এরপর হল তাদের নানা বিভ্রান্তি। কেউ জল আনতে দুধ নিয়ে আসে, কেউবা দুধ আনতে জল আনে; কাউকে আসতে বললে চলে যায়, আবার কাউকে চলে যেতে বললে আসে; একজনকে ডাকলে অন্য জন উত্তর দেয়। রান্নার ব্যাপারে আরও বিভ্রান্তি; কেউ কাঠখড়ে মিথ্যাই ফুঁ দেয়, কেউবা খালি উনুনে হাঁড়ি নাড়ে, জলন্ত উনুন কেউ চোখের জলে নিভিয়ে দেয়, কেউবা হাতে খড় নিয়ে উনুনে ফুঁ দেয়; হলদি সম্ভার দিয়ে কেউ ভাত রাঁধে, কড়াইতে ঘি দিয়ে কেউ তাতে জল দিয়ে দেয়; মাটিতে 'তেলানি' রেখে কেউ মিথ্যাই ভাজছে, পায়সের মধ্যে কেউ দিচ্ছে এক মুঠো নুন, কেউ বা তেল-নুন ছাড়াই রান্না করছে, কেউ পরিবেশন করতে গিয়ে নিজের ছায়াকে সত্য ভেবে তাকেই পরিবেশন করছে। কৃষ্ণাভিসারের বিলম্ব হবে ভেবে কেউ রান্না ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন না করেই গৃহকাজ শেষ করল।

দ্বিতীয়বার কৃষ্ণ বংশীধ্বনি করলে গোপীগণ কৃষ্ণাভিসারে বেশ পরিবর্তনে ব্যস্ত হল; কিন্তু তাতেও তাদের নানা বিভ্রম উপস্থিত—

কেহো কেশবেশ করে মুকুতার মালে।
নয়ানে চন্দন কেহো কাজল কপালে॥

দর্পণের বিম্বে কেহো করে মুখ বেশে।
চরণের নূপুর কেহো পড়ে লঞা কেশে॥
কটির কিঙ্কিনী কেহো পড়ে নিঞা গলে।
কেহো পাএ হার পড়ে কেহো ফুলমালে॥
হাতের মুদড়ি কেহো করিল পাসলি।
পাসলি করিল কেহো হাতের মুদড়ি॥

দেহেও তাদের দেখা দিল নানা পরিবর্তন। কেউ কেউ চমকে উঠতে লাগল; কারও দেহ কদম্বকলিকার মতো পুলকে রোমাঞ্চিত হল। কারও চোখের আনন্দ জল আর রোধ মানে না, কারও হাত কেঁপে কেঁপে ওঠে। গোপীদের এই অবস্থা দেখে তাদের স্বামীরা ব্যাকুল হয়ে পড়ল; তারা প্রবোধ দিলেও গোপীরা সান্ত্বনা পায়না; কোনো গোপী স্বামীকে ছলনা করার জন্য নানা কথা বলে, কেউ ক্রোধে স্বামীর কাছে যায় না; কেউ স্বামীর ডাকে সাড়া দেয় না; কোনো স্বামী তার গোপীকে জোর করে আটকিয়ে রাখতে চায়।

তৃতীয়বার বংশীধ্বনিতে চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের চাঞ্চল্যের মতো গোপীগণ 'হার্কালি বিকলি' করতে লাগল। সংকেত পেয়ে তারা কৃষ্ণাভিসারে গমন করল; বর্ষার দুর্বার স্রোতের মতো তাদের কেউ বাধা দিতে পারল না, কারো স্বামী চরণ ধরে আটকাতে গেলে সেই গোপী 'পায়ে উঝটিঞা যায় পাছ নাহি চাহে'। কেউ কেউ গোপীদের ঘরে আটকিয়ে রাখায় তারা 'নরুপায় হয়ে কৃষ্ণকথা ভাবতে ভাবতে দেহত্যাগ করল,—

কৃষ্ণরস ভাবিতে ভুঞ্জিল কর্মফলে।
বিরহের তাপে পাপ পুড়িল সকলে॥
পাপ পুণ্যক্ষয় গোপী হইল অদভুতে।
তখনি পাইল চিদানন্দ নন্দসুতে॥

কোনো কোনো গোপীর এই অবস্থা দেখে আর কেউ সাহস করে কোনো গোপীকে বাধা দিল না। গোপীগণ রাধার সঙ্গে মিলিত হয়ে কৃষ্ণের নিকট গমন করল।

ঘোর অন্ধকারে গোপীগণ এই ভাবে আসায় কৃষ্ণ কোনো কথা না বলে নীরব থাকলে সকলে মরণাধিক দুঃখ পেয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। কৃষ্ণ তখন তাদের বললেন, স্বামিগৃহ ত্যাগ করে এ-ভাবে আসা তোমাদের উচিত হয়নি; কারণ কুলধর্ম ও 'বেদপথ' লঙ্ঘন করলে কোনো জায়গায় ঠাঁই মেলেনা। কৃষ্ণের এই কথায় রাধা-আদি গোপীগণ চোখের জলে কৃষ্ণকে বলল, পরপ্রাণ নিয়ে তুমি আর কত চাতুরী খেলবে। শিশুকাল থেকেই তুমি স্ত্রী বধ করে আসছ, পুতনাই তার সাক্ষী; এখন যৌবনে যে কত গোপীকে তুমি বধ করবে তার কিছুই ইয়ত্তা নেই। তোমার বাঁশীর আহ্বান আর 'বিষম কুসুমশর' আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে ফেলেছে। এখন আমাদের কুল-শীল-লাজ-ভয় আর নাই। তোমাকে না দেখলে আমরা জীবন ধারণ করতে পারব না; পৃথিবীতে জন্মে যদি তোমার রূপই না দেখলাম তবে এ ছার জীবন রেখে লাভ কি? তুমি যে ভক্তবৎসল, দীন-দয়াল ও তুমি যে প্রেমের অধীন একথা বিশ্বাস করি কি ভাবে? যা হোক্, দোষ তোমাকে দিচ্ছি না, এ অদৃষ্টের বিড়ম্বনা আমাদেরই; তুমি আমাদের দয়া না করলে আর কে করবে? কেনইবা তুমি বাঁশী বাজাও, আর গোপীদের দগ্ধ করে কিইবা সুখ পাও। আমাদের কাম-সর্পে দংশন করেছে, তুমি যদি এ বিষ নষ্ট না কর তবে বৃথাই তোমার নাম কালীয়দমন; তোমা-ছাড়া গোপীদের আর বন্ধু নাই। তুমি শাস্তিই দাও বা দয়া কর, আমরা তোমার চরণে আশ্রয় নিলাম; এই বলে কোনো কোনো গোপী নয়নজলে কৃষ্ণের পদযুগল ভিজিয়ে দিল, কেউ কেউ কাতর নয়নে জোড়হাতে কৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। তখন দয়ারসাগর কৃষ্ণ প্রসন্নবদনে তাদের দিকে চাইলেন। এই অবসরে গোপীগণ গন্ধ, মাল্য ও আভরণ দিয়ে কৃষ্ণকে সাজাল। সাজের পর কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে নিয়ে ও রাধার কাঁধে হাত দিয়ে বৃন্দাবনের তরু-লতাদির সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। পূর্ণিমার চাঁদ তখন আকাশে; চন্দ্রালোকে সর্বত্র দিনের মতো উজ্জ্বল। শশক, হরিণ, ময়ূর, তিতির, হাঁস সবই পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল। এই সব জন্তুর মধ্যে হিংসার একান্ত অভাব। তারাও কৃষ্ণনামে পুলকিত হয়ে ওঠে, কৃষ্ণনাম শুনলে মাথা হেঁট করে তারা বন্দনা করে; তাদের মধ্যে জরা-মৃত্যুর ভয় নেই; কৃষ্ণের আগমনে তারা সবাই ছুটে এল কৃষ্ণকে দেখতে। এই সব দেখে গোপীরা অবাক হয়ে গেল। পরে গোপীরা কুঞ্জে কুঞ্জে আশ্রয় নিলে কৃষ্ণ রাধাকে নিয়ে মাঝ-কুঞ্জে প্রবেশ করলেন। নানা পরিশ্রমে রাধা কৃষ্ণকোলে নিদ্রা গেলে রাধাকে সেখানে রেখে কৃষ্ণ প্রতি

কুঞ্জে গোপীদের সঙ্গে মিলিত হলেন; তিনি একজনের গলার হার আর একজনের গলায়, একজনের হাতের কাঁকন অন্যের হাতে পরিয়ে দিলেন; কিন্তু 'নিন্দভোলে' কেউ এ-সব বিষয় জানতে পারল না। এরপর কৃষ্ণ পারিজাত বনে গিয়ে বংশীধ্বনি করলে হঠাৎ গোপীদের ঘুম গেল ভেঙ্গে। তারা কৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে ধ্বনি অনুসারে পারিজাত বনে গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হল। এই বনের মাঝে মাঝে কল্পলতানিকুঞ্জ; এই নিকুঞ্জগুলি অতুলনীয়, ছয় ঋতু সর্বদাই সেখানে বিরাজমান। বনের মধ্যে বিচিত্র সুবর্ণের পুরী,—

মেঘ যেহ করে যার রজত প্রাচীরে।
নানা মণি বিচিত্র ভিতরে বাহিরে॥
রত্নকাঞ্চনময় সিংহদ্বারখান।
না জানি এ কোন বিশ্বকর্মার নির্মাণ॥
গরুড়ের চূড়া শোভে দ্বারের উপরে।
অরুণ উইল জেন সুমেরু শিখরে॥

কৃষ্ণ এই রাসমন্দিরে গিয়ে রাধিকাকে নিয়ে মঞ্চে বসলেন, আর গোপীগণ তাঁদের চারপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল। এদের মধ্যে চন্দ্রাবলী-আদি মুখ্য অষ্ট গোপিকা তাম্বুল, চামর, দর্পণ ইত্যাদি নিয়ে কৃষ্ণের সান্নিধ্যে রইল, আর চন্দ্রমুখ-আদি ষোল শত গোপী কৃষ্ণের প্রতি স্থিরনেত্র হয়ে কৃষ্ণ-অধরামৃত পান করতে লাগল। বেণু-বীণার রবে চার দিক গেল ভরে; রাধাকৃষ্ণ তখন রাসমঞ্চ থেকে নেমে গোপীদের মাঝে আসলেন। কেউ মৃদঙ্গ, কেউ পিনাক, কেউবা সারঙ্গী বাজাতে লাগল, কেউ হাতে তুড়ি দিয়ে সুললিত গানে সবাইকে করল মুগ্ধ। কৃষ্ণ এই আনন্দে যোগ দিলেন; নানা অঙ্গভঙ্গিতে তিনি করলেন সকলকে মুগ্ধ। কখনও বাম কর কটিতে রেখে ডান হাত চূড়ার উপরে রাখলেন; কখনও দুই হাত মণ্ডলী করে শিখায় ধরলেন, কখনও বা গোপীদের কাঁধে হাত দিয়ে হেসে হেসে নিজেকে দেখতে লাগলেন, আবার কখনও দু-হাত সামনে প্রসারিত করে পায়ে তাল দিতে লাগলেন; মাঝে মাঝে কৃষ্ণ বেণু বাজিয়ে এই আনন্দময় পরিবেশকে মধুরতর করে তুললেন; কিন্তু ষোল শত গোপীর মধ্যে এক কৃষ্ণ থাকায় সকলের মন ভরছে না দেখে কৃষ্ণ বহু হলেন এবং দুই দুই সখীর মাঝে দাঁড়ালেন তাদের হাত ধরে,—

কৃষ্ণের শ্যামল বাহু শোভে গোপীগলে।
মদনে সাজিল জেন কুবলয় মালে॥
গোপীমুখ মাঝে মাঝে কৃষ্ণমুখ সাজে।
নীল গৌর চান্দে জেন পাতিল সমাঝে॥

সকলেই কৃষ্ণকে পেল বলে কারও আর অভিমান রইল না; কোনো সংকোচ না থাকায় সবাই কৃষ্ণের সঙ্গে হাস্য-পরিহাসে যোগ দিল। কৃষ্ণরসে মেতে যাবার ফলে আর কোনো কিছুই তারা শুনতে পায়না; কোনো গোপী কারোর কৃষ্ণের দিকে চায় না; অন্য কারোর কৃষ্ণদেহে কেউ হাত দেয় না; কখনও কখনও তারা আনন্দে জয়-ধ্বনি করে ওঠে; মনে হয় ত্রিভুবন আনন্দ হিল্লোলে ভাসমান। জল, স্থল, আকাশ যেন সব এক হয়ে গেছে। গোপীরা যে কোথায় আছে তার জ্ঞান বা লেশমাত্র শ্রম-বোধ তাদের নাই,—

অবিরত স্বেদজল সব গায়ে ঝরে।
দেহ উবরিঞা রস উছলিঞা পড়ে॥
নিমিষ বিরতি নাহি গোপীনাথ-সঙ্গে।
কদম্বকলিকা হেন পুলকিত অঙ্গে॥
নয়ানে আনন্দজল বহে অবিরতে।
আতিরসে চকোর কি উগারে অমৃতে॥
খেনে দাহা খেনে শীতে খেনে আগেয়ানে।
হেন রসে মজিল সুন্দর গোপীকালে॥

এই ভাবে ষোলশত গোপীর মনোরঞ্জন করে কৃষ্ণ আবার সমস্ত রূপ সংহরণ করে এক হলেন এবং রাধাকে নিয়ে বসলেন রাসমঞ্চে। এমন সময় রাত্রি অবসান দেখে সবাই হয়ে উঠল চঞ্চল; মনে হল যেন এক নিমিষে রাত্রি প্রভাত হল; তখন কৃষ্ণের কাছে গোপীরা কাকুতি মিনতি করে বলল,—

এই পরিহার করি তোম্মার চরণে।
আর হেন সতত নহিব দরশনে॥
দূরে থাকি অনুরাগ বাঢ়াইবে চিতে।
চান্দ-কুমুদিনী-সম রাখিবে পিরীতে॥

আসন্ন বিচ্ছেদে গোপীগণ আকুল হয়ে উঠল; অধোমুখে তারা অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল। কৃষ্ণ সকলকে সান্ত্বনা দিতে দিতে নগরের দিকে চললেন। নগরের উপান্তে এসে কৃষ্ণ সকলের কাছে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলে ক্রন্দনরত ও বিরহাকুল গোপীদের আর পা চলতে চায় না; লোকলাজ ভয়ে তারা কোনো প্রকারে গৃহে গেলেও তাদের মন রয়ে গেল কৃষ্ণের কাছেই।

অযুতমনের কবি

সন্ত নিহাল সিং

বর্তমান শতাব্দী শাশ্বতের পানে প্রবেশোন্মুখ হলেও এখন সবে সে শিশুর মত ক্ষীণপদী পথিক। অর্ধচন্দ্রাকৃতি বারাণসী-গঙ্গাতট অগণিত পদযাত্রা খচিত ছিল এবং তার ওপরের মাটিতে বড় ছোট মন্দিরচূড়া শোভা পেত—সেই গঙ্গার জল যে-বাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগের দেওয়ালে আছড়ে পড়ত সেখানে একজন ইংরেজকে হালকাতুরীয় হ্যাণ্ডলুম দেখানো হয়েছিল। তাঁর শ্মশ্রুও ছিল অল্প অল্প অর্থাৎ কামানো ছিলনা, সঙ্গে গোঁফ জোড়াও—যে রকম তাঁর স্বদেশীয়গণের থাকত। সে সময়টা ছিল এই শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিক। আমি সেই ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তাঁর মুখের সেই অসহায় দাড়িটা ছিল অনেকটা লালচে-খয়েরী রঙের। তবু সেটা তাঁর মুখমণ্ডলে শোভাপেতো, সম্মানও মিলেছিল তার জন্যে, সমকালীন য়ুরোপীয় রূপদক্ষদের কাছ থেকে এই রীতিটি তিনি নিয়েছিলেন। (যদিও এটা অত্যন্ত গোপনীয়রূপে আমাকে একজন কানে কানে বলেছিল) এই ভদ্রলোক হলেন তৎকালীন কলিকাতা আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ চিত্রকর ই, বি, হ্যাভেল। এই সনাতন কৃষ্টিকেন্দ্র বারাণসীতে তিনি এক স্বল্পায়ু সফরে এসেছিলেন।

অনাগরিকা ধর্মপাল নামে এক সিংহলী বৌদ্ধ তাঁকে সেই হাওয়াই তুরীয় হ্যাণ্ডলুমটা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে এনে দিয়েছিলেন, ইনিও সে সময় "মধ্যমার্গ" পুনরুদ্ধারের জন্য সারনাথে বসবাস করছিলেন। সেই জিনিষটা চিত্রকর-অধ্যক্ষের মনকে গঙ্গা থেকে ভাগীরথী তীরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি আমাদের ধ্রুপদী সংস্কৃতিবান এবং বিরল সাফল্যবান এক মনীষির কথা বলেছিলেন, তিনি নাকি বহুকাল ধরে ভারতীয় হস্তশিল্পে প্রাণসঞ্চার করবার প্রয়াসে রত আছেন। তিনি হ্যাভেল সাহেবের সর্বাপেক্ষা প্রতিশ্রুতিবান্ ছাত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বহুবর্ষব্যাপী ব্রতধরণের হ্যাণ্ডলুম তার সুবিশাল পরিবারায়ত্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীদের ঘরে ঘরে প্রবর্তনায় ব্যাপৃত ছিলেন তিনি। এমন কি তার পূর্বেও যুবাবয়সে তিনি নাকি জনকয়েক আত্মীয়সমভিব্যাহারে কলকাতায় বিপণি খুলেছিলেন, সেখান থেকে অভারতীয় পণ্যাদি একটিও বিক্রীত হয়নি; সেগুলোকে ঠিক আবার স্বদেশী দ্রব্যও বলা চলেনা।

সেই ইংরেজ চিত্রকর বলেই চলে ছিলে; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটবেলা থেকেই গীতিমাধুর্যসমন্বিত কবিতা রচনা করে আসছেন। আমাদের সেগুলো গতিশীল স্বরসঙ্গতির মত প্রেরণা দিত। বিশ্বপ্রসারী রূপদক্ষশ্রেষ্ঠ হিসেবে তিনি অবনীন্দ্র আহৃত হ্যাভেলের প্রাচ্য ভাবধারার পুনরুজ্জীবন প্রয়াসে এবং দেশের যুবাদলকে প্রতীচ্যের দাসানুগ এবং আত্মবিধ্বংসী অনুকরণেচ্ছা হতে ফেরাবার প্রচেষ্টায় প্রধান অবলম্বন ছিলেন। এই হল আমার দর্পণে প্রথম রাবীন্দ্রিক প্রতিবিম্ব।

॥ ২ ॥

অক্টোবরের (১৯০৫) মাঝামাঝি সময়ে আমি কলিকাতায় এসেছিলাম, এটাই আমার সে-শহরে প্রথম পদক্ষেপ নয় এর আগে যদিও রাজধানীতে এসেছিলাম (তখনও রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়নি) সে সময় যেন কিছু সূক্ষ্ম পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। সেই রাস্তা, সেই প্রাসাদের সারি-ই ছিল। জীবনধারার কথাও একই ছিল। সে সময় সেই গতানুগতিক আলস্যবোধটা যেন আর দেখতে পেলামনা। একটা দুর্বোধ্য খাতে যেন কি এক রহস্যঘন গোপনীয়তা তলে তলে শক্তিবদ্ধ হয়ে এক গতিপথ খননে ব্যস্ত ছিল।

এর আগে এই উদ্দেশ্যশীল মনোভাব আমি অন্ততঃ মানুষের বহিরাকৃতিতে দেখিনি। ক্রোধ এবং অসন্তোষের অন্তরাগ্নি তাদের মুখমণ্ডলে জলজ্বল করছিল। তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল আর্ল মারকুইস্ কার্জন তখন তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালিত করতে চেয়েছিলেন। ব্যর্থমনোরথ তিনি তাদের প্রতি কটূক্তি করলেন যে, তারা সত্যের কাছে

চিরদিন অনাবৃত আগন্তুকই রয়ে যাবে। বঙ্গ বিভাগের ঘোষণা করলেন তিনি। সেই প্রদেশাঙ্গচ্ছেদ এবং শাসন বিভাগ জনতার রাজনৈতিক ঐক্যের রূপ দিল।

সে-সময় কলকাতার অসন্তোষ অচিরেই সারাভারতে ছড়িয়ে পড়ল, এ যেন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সূচিত করল। মানুষ সেদিন অভূতপূর্ব পাশে পাশে কাঁধে কাঁধ স্পর্শ করে দাঁড়ানোর উপযোগিতা উপলব্ধি করল। তারই প্রতিফলনে একে অপরের হাতে চিরন্তন ভ্রাতৃত্বের প্রতীক রাখি পরিয়ে দিল। সেই সৌভাগ্যলগ্নে সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল, "বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পুণ্য হউক হে ভগবান"। এই স্বদেশাত্মার প্রেরণাসৃজনী সঙ্গীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই আন্দোলনের উদ্গারণে, রূপায়ণে এবং দিক্‌নিরূপণে অন্যতম প্রধান হোতা ছিলেন। সেই আবেগনির্ঝর অচিরেই বাংলার আগল ভেঙ্গে দিল, ছাপিয়ে পড়ল সমগ্র মাতৃভূমে অমিতপ্রভাবে প্রাণ পেল সমগ্র ভারতবর্ষ। একটি মাত্র বাক্যে আমি সেদিন দেখলাম আবেগের বন্যাদ্বার উন্মোচিত হল রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দানে।

১৯০৭ সালের বসন্ত কিম্বা গ্রীষ্মকাল। আমি তখন টোকিও জেলার হংগো-কু শহরে, আমি দেখলাম সহস্রাধিক জাপানী, অ-জাপানী ছাত্র পরিবেষ্টিত কোন বাঙালী যুবককে আসতে। তিনি তখন বোধ হয় সবে কৈশোরের বেড়ি পার হয়েছেন। শুনলাম তাঁর নাকি স্বদেশভুঁইয়ে সুবিশাল জমিজমা আছে এবং তিনি নাকি হস্তচালিত কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার্থে বিদেশ চলেছেন। তিনি কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হ্যাভেল তাঁর সম্বন্ধে আমার কাছে বেশ প্রশংসা করেছিলেন এবং কলকাতায় তাঁর প্রদর্শনী আমার কাছে জনমুগ্ধকর ও অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জাপানে তিনি বেশীদিন থাকলেন না, চললেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। এরপর ইলিনয় রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের দেখা হয়েছিল, আমি তখন শিকাগোতে সাংবাদিকতার ছাত্র—টোকিওতে এবং প্রাচ্যের অন্যান্যস্থানেও শিক্ষাগ্রহণ করে এসেছিলাম ইতিমধ্যেই। তাঁর সৌজন্যে ভারতে ফিরে (সে, ১৯১০) তাঁর এক ভগ্নীর শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণীর সাহায্যে আমি আমার মনে প্রতিফলিত রবীন্দ্রনাথের মূর্তির তাৎপর্য পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম। এ ছাড়াও সে-বছর গরমকালে সিমলাতে থাকাকালীন ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং রাসবিহারী ঘোষও আমাকে সাহায্য করেছিলেন।

আমি জানলাম যে রবিবাবুর ব্যক্তিত্ব সর্ব্বতোমুখী। সম্পত্তিসংরক্ষণের দায়িত্ব সত্ত্বেও তিনি কবিতা লিখেছেন, নাটক লিখে প্রয়োজনা করেছেন, গান গেয়েছেন, অভিনয় করেছেন, প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা করেছেন, সমকালীন সাহিত্য-চারুকলা-বিষয়ক পত্রিকায় নিবন্ধ লিখেছেন, নিজেও পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাতার পর পাতা টীকাসংগ্রহনিবন্ধকবিতা-কৌতুককর নক্সা, গল্প, উপন্যাসও তাঁর লেখনীনিঃসৃত হয়েছে। নিজে তো এছাড়াও পশ্চিমবাংলার বোলপুরের এক গ্রাম শান্তি-নিকেতনে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলেছিলেন, তার শিক্ষক ছিলেন।

স্বদেশপ্রেমের ঝংকার তাঁর হৃদয়তন্ত্রে চির আন্দোলিত, রাজনৈতিক পরাধীনতার গ্লানিময় অবমাননা তিনি মর্মস্থলে উপলব্ধি করেছিলেন, সেই লজ্জায় তাঁর আত্মা সঙ্কুচিত ছিল, তাঁর বেদনার্ত ছায়াও প্রায়ই তাঁর কাব্যবীণায় প্রতিফলিত হয়েছিল। এই ভাব তাঁকে অবনমিত করেছিল, তাঁর প্রতিভাকে বিনষ্ট এবং প্রাণহীন করে দিয়েছিল। মানুষের শক্তি এবং ক্ষমতার দৌড় তাঁর জানা ছিল, তাঁর সৃজনীশক্তি সেই ক্ষীণমান আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করল। যে-সময়ের কথা লিখছি তখন ভূপেন বসু রবীন্দ্রনাথের পরে রোষান্বিত ছিলেন, তিনি তাঁকে কলিকাতা ত্যাগ করায়এবং বোলপুরে ব্যাপৃত করার জন্য দোষ দিলেন। সে সময় তাঁর মতে কবির উপস্থিতি, সক্রিয় ও সদাসাহচর্য একান্তই আবশ্যক ছিল। রাজনৈতিক গণআন্দোলনের বিষাদকে জ্বালিয়ে, তাঁর কাব্যের অমোঘ শক্তিতে তাদের টেনে তুলে তাঁর উচিত ছিল শক্তিভূৎগদ্যের বিক্রমে তাদের হতাশার পাকথেকে টেনে তোলা। ভূপেন্দ্রর মন তখন সিমলায় শাসনপরিষদের আনীত বঙ্গননীতির বিরুদ্ধে রোষান্বিত ছিল। তাঁর শক্তি থাকলে তিনি হয়ত রবি-বাবুকে কাব্যসাধনা বন্ধ করে তাঁকে সবলে সেই দুঃসাহসিক সংগ্রামে নিক্ষেপ করতেন। রাসবিহারী ঘোষেরও একই মনোভাব ছিল, তবে তিনি অনেক সংযমী ছিলেন, অন্ততঃ প্রকাশ ভঙ্গিমায়।

৩

অথচ সমালোচকদের খুশী আর ধরেনা, যখন বোলপুরের নিভৃতে নির্জনে কবির ফসল সঞ্চয় বিশ্বে ছড়িয়ে গেল। ভূপেন বসুও পরে সংশোধনী অনুক্রমে উল্লসিত হয়েছিলেন। আমার মনে হয় রামানন্দবাবুই আমাকে শান্তিনিকেতনের কথা বলেছিলেন। বাল্যাবধি রামানন্দবাবু আমার কাছে মিত্র অপেক্ষা বরং অগ্রজতুল্য ছিলেন। তাঁর দুষ্কর সম্পাদনাকার্য হতে বিরতি নেব'র জন্যে কবি বলেছিলেন: "আপনি স্কুলশিক্ষক ছিলেন, আপনি এদিকেও তো দেখতে পারেন।"

বলাবাহুল্য, এখানে রবীন্দ্রনাথকৃত স্বীয় কবিতার ইংরেজী অনুবাদ-এর কথাই বলা হচ্ছে। এক'ধিকবার এই কাজ গ্রহণে অনুরুদ্ধ হয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সেগুলো পড়ে নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। ভাষান্তরের সৌন্দর্যে পুলকিত হয়ে, এবং বাগার্থগুলোর উপযুক্ত প্রয়োগে চমককৃত হয়ে তিনি কবিকে অধ্যবসায়ী হতে অনুরোধ করলেন।

এর কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে এলেন। তাঁর কিছু অনূদিত কবিতা উইলিয়াম্ রদেনষ্টাইনের গৃহে সমবেত সাহিত্যিক এবং রূপদক্ষের সম্মুখে পাঠ করলেন উইলিয়াম্ বাট্লার ইয়েটস্। সেগুলো পরিমিতসংখ্যায় 'গীতাঞ্জলি' নামে প্রকাশিত করল ইণ্ডিয়া সোসাইটি। প্রত্যেক সমালোচক মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করলেন। এর পরেই এল নোবেল পুরস্কার। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি কেবলমাত্র বাংলার কবি রইলেন না, হলেন পৃথিবীর কবি। এই গল্প আমি এবং তাঁর অন্তরঙ্গ কয়েকজন জানেন, সুতরাং এর বিশ্লেষণ মাত্রেই বাহুল্য। এইসময় কেদার নাথ দাশগুপ্ত আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। ইনি তখন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলনসভা স্থাপিত করেন। তিনি বললেন তাদের সংস্থা রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থিত করবেন এবং শুধালেন যে, তার একটি স্বদেশী কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন এবং সেটি যদি তিনি ঐ সভায় আবৃত্তি করেন, কবি কি কিছু মনে করবেন। তাঁর সম্মানার্থে একাধিক সভা ও সমিতি হয়েছিল। কবির শ্মশ্রু আমাকে তখন আকর্ষিত করে। কোন কথাবার্তায় বা অঙ্গভঙ্গিমায় উল্লাস প্রকাশ করতে দেখিনি, এমন শান্ত এবং গাম্ভীর্যবান ছিলেন তিনি চিরদিন। পুরুষ-মহিলা সবার সাথেই তার ব্যবহার অমায়িক ব্যবহার। যেই তাঁকে দেখেছে তাঁর কথা শুনেছে, সেই তাঁকে প্রাচ্যের ভবিষ্যবেত্তা ঋষি বলে স্বীকৃতি দেবে।

৪

ডাবলিনে যখন যাই তখন আমার বাসস্থান মেরিয়ন স্কোয়ারে ইয়েটসের গৃহ সন্নিহিত ছিল, তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিষয়ে আমাকে বলেছিলেন: "অধিকাংশ ব্যক্তির লেখাই এমন যে তার থেকে একটি বাক্য প্রতিস্থত করলেই সেটা নিরর্থ হয়ে দাঁড়ায়, রবীন্দ্রনাথ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রত্যেক বাক্যেই প্রায় এমন কি প্রত্যেক বাক্যাংশেই, অর্থবোধ বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। যতই তার রচনা পড়বেন, ততই তার অর্থবোধ আপনার মধ্যে জন্মলাভ করবে।" সে সময় এ, ই, নামে এক প্রখ্যাত চিত্রকর-কবি-গদ্যরচয়িতাও আমার কাছে ডাবলিনে বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তিসমন্বিত। তিনি একজন সুমহান চিত্রকর হতে পারতেন ইচ্ছে করলেই কেননা চিত্র প্রাথমিকভাবে মানসিক প্রতীতি এবং দ্বিতীয়তঃ তাকে নিষ্ঠাসহকারে কাগজ কিম্বা ক্যান্‌ভাসের ওপর আঁকতে হবে।

৫

লণ্ডনের হ্যাম্পষ্টিড অন্তর্গত বেলসাইনপার্ক এভেন্যুতে থাকাকালীন আমার নিকটেই থাকতেন জেমস্ র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্। পাব্লিক সার্ভিস কমিশন সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারত ভ্রমণের পর তাঁর নিভৃত সাহিত্য অলোচনা কক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায়তনের কথা এবং তিনি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন সেই শিক্ষায়তন। বদ্ধঘরের পরিবর্তে পল্লবিত-তরুতলে প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে ছাত্র ও শিক্ষকের পারিবারিক সম্পর্ক যে বুদ্ধি এবং বোধির শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে, যুগের পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রগঠন সম্ভব, একথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বললেন যে, সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষায়তনকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। যে সব যুবক সেখান থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে আসছে, তারা নাকি তাদের ধারায় অনুপযুক্ত। একদিন দুপুরে লর্ড

কারমাইকেলের বাংলা সফরের অব্যাহতি পরেই, তাঁকে ম্যাকডোনাল্ডের কথা বললাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম যে তাঁরা কি সত্যিই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিদ্রোহী বা তাঁর শান্তিনিকেতনকে রাজবিদ্রোহের ষড়যন্ত্রপীঠ বলে সন্দেহ করছেন। তিনি দুঃখের সঙ্গে ক্রোধমিশ্রিত স্বরে বললেন, "কতিপয় কর্মচারীর দুষ্ট আচরণই এর কারণ", বললেন যে তিনি এই সামাজিক-আধ্যাত্মিক শিক্ষায়তনের নাম পুলিশের গোপন খাতা থেকে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছেন।

৬

১৯১৯ সালের শরৎকাল। সে-সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মণ্টেগু—গঠন-সংস্কার বিষয়ক ব্যাপারে লণ্ডনে এসেছিলেন পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে উপস্থাপনের জন্যে। একদিন স্মৃতিমন্থিত সন্ধ্যায় আমরা তাঁর হাইড-পার্ক সন্নিহিত গৃহের বৈঠকখানায় আরামদায়ক অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে আছি। জন-জীবনের মত ব্যক্তিজীবনেও তিনি বাগ্মী ছিলেন, তাঁর কথার জোয়ার রোধ করে আমি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়-কালীন কলিকাতার অভিজ্ঞতা বিবৃত করলাম। হঠাৎ বোধহয় তিনি আমার বর্ণনার পরে বলেছিলেন, রবি অনেকের সঙ্গে বিবাদ করে সেই সঙ্কটমুহূর্তে নিজেকে সমর্থন করেছিলেন। কতিপয় অধৈর্য আদর্শবাদী তাঁকে আন্দোলনের নেতৃত্বভার ত্যাগ করাতে চেষ্টা করে-ছিলেন। কবি কদাপি তা শোনেননি। তিনি এই মাঝদরিয়ায় অশ্বদলী দলের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন এবং বলেওছিলেন। আহ্বানে তিনি প্রত্যেক মত খণ্ডিত করে এগিয়ে চললেন। সেই চরম পরীক্ষার দিনে তিনি সুরেন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত সহচর ও বন্ধু ছিলেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বোসের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের আজীবন সখ্য ছিল, অথচ কেউই কবির কৃতিত্বে গর্বান্বিত ছিলেন না। এই মহান বিজ্ঞানীও কবির স্বীকৃতির বিলম্বের কথা স্বীকার করেছেন। রবি কাব্যের উৎকর্ষ মানোন্নীত হতে পৃথিবীর লোকের দশকের পর দশক অতিবাহিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "আমরা বুদ্ধি-জীবিদাসত্বে এমন অবনমিত যে প্রতীচ্য যতদিন পর্যন্ত তাঁকে স্বীকৃত দিল না, অনেক ভারতীয়ই সঙ্কটে পড়েছেন এ বিষয়ে। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে, যেই নোবেল পুরস্কার পেলেন লোকে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর সম্মাননায়। তাদের ব্যথার প্রতিদানে রবিও উত্তম সাজা দিয়েছিলেন।" সে সময়ে শান্তিনিকেতনে প্রেরিত প্রতি-নিধিদল কর্তৃক প্রদত্ত সম্মাননাসভার দৃশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি স্বাভাবিক শ্লেষোক্তিসহকারে আমাকে একথা বলে ছিলেন। তারা এত পশ্চাৎপদ ছিল স্বভাবে যে সম্মান্য ব্যক্তি তাদের সামনে এসে স্পষ্ট বললেন যে, তারা বুদ্ধি-জীবী ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছু নয়।

৭

১৯২১ সালের জুলাই মাসে, বিলাতের নিম্নসভা ১৯১৯ সালের বসন্তে ইংরেজকৃত পাঞ্জাবের লাহোর ও অমৃতসরের অবমাননাকর কলঙ্কময় নিগ্রহণ-এর বিষয়ে আলোচনা করলেন (মূল ঘটনার প্রায় পনের মাস পরে)। ভারতরাষ্ট্রে নিযুক্ত সম্রাটের প্রধান রাষ্ট্রসচিব এডুয়িন স্যামুয়েল মণ্টেগু প্রাণপাত পরিশ্রম করে কিছু করতে চাইলেন যাতে করে জনগণের প্রশংসা অর্জন করতে পারেন। কিন্তু নিরাশ হলেন এই উদ্দেশ্যসাফল্য প্রয়াসে। আমি নিজের চোখে, নিজের কানে শুনেছি তাঁকে অপমানকর ধ্বনি শুনতে—কেন না যে-স্তরে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, সেটা রাজকীয় স্বার্থে হানিকর বলে বোধ হয়েছিল।

উচ্চসভাও আলোচনা করলেন। কিন্তু ব্যাপারটা সেইখানেই স্থাণুবৎ স্থির হয়ে রইল।

সেই বিতর্ক দিবসের অপরাহ্ণে আমি নীচের তলার ঘরের কোণের দিকের জানলায় বসেছিলাম চুপ করে। পাশে ছিলেন সদ্য আগত কবি। কবি সেই অত্যাচারে মর্মাহত অবনত হয়ে বসেছিলেন, বিশেষ করে এই দুষ্কৃতি এড়িয়ে যাওয়া যেন আরো দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে। তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের বৃত্তান্ত একত্রিত করে তাঁকে দেখিয়ে কিছু অদলবদল করে আমি সেটা ভারতের কোন এক সংবাদপত্রে তারযোগে পাঠিয়ে দিলাম। তাঁর মাতৃভূমির প্রতি যে কি অগ্নিময় ভালবাসা ও কি মহানাত্মা যে তিনি ছিলেন, তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি :

আমাদের শাসন কর্তৃপক্ষের এই বর্বর মর্যাদাতিক্রমের

পক্ষে এই নিঃসঙ্কোচ ক্ষমা চাইতে বলায় তিনি বেদনার্ত ও অপমানিতবোধ করেছিলেন। তিনি বললেন,—এর ফলেই আমরা আমোদপ্রিয় জাতির হাতে বিশ্বাসের ভার তুলে দেওয়ার অসারত্ব ও অবমাননা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, এরা যে আমাদের ঘৃণার চোখেই দেখে যাবে এমনিই। কেবল মাত্র অন্তর্দুর্বলতা দূর করে এবং আমাদের সামাজিক, শিক্ষামূলক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা সংগঠিত করেই আমরা এই অবনতির গহ্বর হতে উঠে আসতে পারব। "আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হও সাধারণ মানুষের দুর্দশা-মোচনের জন্য। সর্বপ্রকার বিভেদ বিসর্জন দাও। সহ-যোগিতা ও একাত্মচিত্তের আত্মাকে জাগরূক কর। বর্তমানের এই ভ্রান্তিভঙ্গের আঘাত যদি নিতে পারি, ছদ্ম-বেশে আশীর্ব্বাণী নেমে আসবে আমাদের শিরে এবং জাতীয় আত্মশ্রদ্ধা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, বাস্তবগত উৎকর্ষময় নতুন জীবনের যে যুগ, তাঁর বনিয়াদ গঠিত হবে। শুধুমাত্র অধীনতা ও পরনির্ভরশীলতা হতে মুক্ত হয়ে, আমাদের সমস্ত ভয় দূরে ফেলে দিয়ে এবং অনর্থক শক্তিহীন ক্রোধ ও প্রতিশোধমূলক অসন্তোষের ধ্বংসপথ রুদ্ধ করেই আমরা মহত্ত্বের পানে উঠতে পারব।"

—হিন্দু (মাদ্রাজ) [অনূদিত]

যে নাইট উপাধি তিনি মাননীয় সম্রাটের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, সেটা যখন তিনি অত্যাচারের প্রতিবাদ-প্রতীক হিসেবে ত্যাগ করলেন নিজেকে বঞ্চিত করে, তাতে তদানীন্তন ভারত সংসদের সদস্য ও মণ্টেগুর বিশ্বস্ত বন্ধু ভূপেন বসুর মত আর কেউই ততটা বিচলিত হননি। অতি উচ্চাদর্শের দেশপ্রেমের দুঃসাহসী দৃঢ়তার প্রতি শ্রদ্ধায় তিনি প্রায় বিস্মৃত হলেন যে রবীন্দ্রনাথ প্রায় দশ বছর আগে রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

৮

কবি জানতেন যে মণ্টেগুকে প্রথম মুহূর্তেই অকর্মণ্য-বোধে তাঁর সহকর্মীদের উপর নিক্ষেপ করে দেবে। বারাকনহেডের অধীনে মুমূর্ষুরা তাঁকে উৎক্ষেপনার্থে শপথ গ্রহণ করেছিল। সে সময়ে তাঁকে রাজনীতির মরুভূমিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।

ভারতবর্ষ নিজেকে শিক্ষিত দেশ বললেও প্রকৃত পক্ষে তা বাস্তব সর্ব্বস্ব। অন্ততঃ এইটাই কল্পনা করা যেতো। বলা হয় যে মণ্টেগু নাকি ব্যর্থ হয়েছিলেন—ব্যর্থ হয়ে-ছিলেন ইন্দো-ইঙ্গ ইতিহাসের সবচেয়ে সঙ্কটজনক পরি-স্থিতিতে।

কবির মত পৃথিবীকে তিনি জানতেন, ফলে তিনি বিচারে কাউকেই দোষারোপ করেননি এই ঘটনায়, কোন সংসাহসী প্রচেষ্টার কোন ফাঁক রাখেননি, এমন কি যদিও তা' অনেকাংশে নিষ্ফল হয়েছিল। এই পরিস্থিতির পরি-প্রেক্ষিতে এর বেশী আশা করা যায় না।

এক দ্বৈত উদ্দেশ্য তাঁকে উত্তেজিত করেছিল। প্রথমতঃ ভারতের সেবা করা, দ্বিতীয়তঃ ভারতের এক বিশ্বস্ত বন্ধুকে উদ্ধার করা।

অবজার্ভারের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি লর্ড চেমসফোর্ডের উত্তরাধিকারী হিসেবে মণ্টেগুর নাম প্রস্তাব করলেন। (এ সময় আমি ঐ পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলাম)। ব্যবহারগত অনেক দোষ থাকলেও ব্রিটেনের শাসক-শ্রেণীতে, তাঁর মতে, আর কেউই প্রতিনিধি ও গভর্ণর জেনারেল হবার মত সহানুভূতিশীল ও কল্পনাময় ছিলেন না। সেই মুমূর্ষু ষড়যন্ত্রের কাছে কোন কথাই চলল না। লর্ড রিডিং সহজেই পেলেন পুরস্কার, কিছুদিন বাদেই মণ্টেগু লর্ড কার্জনের অবিজ্ঞজনোচিত এবং অনেকাংশে অন্যায়মূলক তুর্কী-চুক্তির প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন। তুর্কীরা মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) পরাভূত হয়েছিল। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পীড়িত হলেন ও তাঁর মৃত্যু হল।

৯

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে শুধু সর্বময় ভক্তি দিয়ে ভাল-বাসেননি; তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তার ভূমির উর্বরতা, প্রাচুর্য তাঁর গর্বের বস্তু ছিল। আরো গর্বিত ছিলেন তার মন্থর তালে তালে গড়ে ওঠা সংস্কৃতির জন্য। প্রায় প্রত্যেক সভাতেই তিনি বলতেন যে, আমরা প্রতীচ্যের কাছে যত-টুকু পাই, ততটুকুই যেন প্রতিদান দিই, এমন কি তার চেয়ে বেশীই দেব প্রয়োজনবোধে। তিনি স্বাধীনতা ও গুণাগুণের উপর নির্ভরশীল দান প্রতিদান চেয়েছিলেন। তিনি চিরদিন আত্মীয়তার আনুকূল্য পাপমুক্ত করার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে গেছেন।

পৃথিবীতে আমি বহু কৃতি ও চিন্তাবিদ্‌দের সাহচর্যে এসেছি। কিন্তু পৃথিবীর কোন এক-চতুর্থাংশেই এরকম মুক্তিপাগল ব্যক্তি দেখিনি ;—কিম্বা নিয়ত এ রকম আগ্রহ-শীল-আকুল দেখিনি যিনি তার জন্য মহত্তম আত্মোৎসর্গ করতে পারতেন। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দিহান যে, প্রয়োজন উদ্ভূত হলে তিনি হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে আত্ম-বলিদান করতেন।

এবং মুক্তি তার কাছে রাজনৈতিকমুক্তির চেয়ে অনেক বড় মুক্তি ছিল। সে মুক্তি নিষ্পেষণশীল দারিদ্র্য হতে মুক্তি, দলিত সমাজাস্ত্র হতে মুক্তি এবং সামাজিক রীতি-নীতি হতে মুক্তি। সমস্ত জীবনব্যাপী তিনি এই বাণী বিলিয়ে গেছেন কথায়, লেখায় এবং সর্ব্বোপরি জীবনে।

—অনুবাদ : শঙ্কর রায়

বিচিত্র বিশ্ব

শ্রীধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়

কি এক বিচিত্র বিশ্ব স্থলে জলে নভে
অন্তরীক্ষে, চিত্তে চিত্তে মহা অনুভবে
শিরায় শিরায় মোর রক্তে রক্তে হায়,
অহরহ টানটুকু প্রেমে প্রাণে পাই।
তবুও শিহরি উঠি মাঝে মাঝে হেথা
প্রেম নেই, স্নেহ নেই, নেই ধর্ম যেথা।

শাণিত কৃপাণ হস্তে কপট বন্ধুত্বে
ফিরিতেছে নর নারী নরের পশ্চাতে।
মনে করি, কিছু দিন থাকি এক ঠাঁই
হেরিয়া অপূর্ব বিশ্ব নয়ন জুড়াই।
চোখের সম্মুখে ভাসে শাণিত কৃপাণ,
মিটি মিটি হাসি আর রক্তাক্ত নয়ান।

বিচিত্র হলেও বিশ্ব তাড়না প্রদান,
মোহমুক্ত হও, আর চাহহ নির্বাণ।

মহাকাশ অভিযানের কথা

উপানন্দ

বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে লক্ষ্য করলাম পাশ্চাত্য জাতির মহাকাশে দুর্দম অভিযান। মহাকাশে যারা উড়ে মানুষের চিরন্তন বাসনাকে পূর্ণরূপ দিয়েছেন, তাঁরা বিশ্বের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শাশ্বত স্বাক্ষর করেছেন, তাঁরা হয়েছেন মৃত্যুহীন। প্রথমেই মনে পড়ে য়ূরি গাগারিনকে। ১২ই এপ্রিল ১৯৬১ সালে তিনি মহাশূন্যে উড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন। এরপর তাঁকে অনুসরণ করলেন এ্যালেন শেফার্ড। ইনি মহাশূন্যে উঠলেন ৫ইমে ১৯৬১ সালে। ৬ই আগষ্ট ১৯৬১ সালে ঘেরম্যান টিটভ উড়লেন মহাকাশে। ২১শে জুলাই ১৯৬১ সালে মহাকাশে উড়লেন ভার্জিল গ্রিসম্। ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ সালে জন গ্লিন, ৩রা অক্টোবর ১৯৬২ সালে উয়াল্টার শিরা, ২৪শে মে ১৯৬২ সালে কারপেনটার, ১২ই আগষ্ট ১৯৬২ সালে পাভেল পাপোভিচ, ১১ ইআগষ্ট ১৯৬২ সালে নিকোলায়েভ, ১৫ই মে ১৯৬৩ গর্ডনকুপার, ১৪ই জুন, ১৯৬৩ সালে ভ্যালেরি বিকোভস্কি আর ১৬ই জুন ১৯৬৩ সালে ভ্যালেন্টিনা তেরেজকোভা বিশ্বের মহাকাশে উড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন আর গ্রহনক্ষত্রদের সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন।

একদিন মাটির মানুষ উঠবে মহাশূন্যে, এরূপ ধারণা ছিল অসম্ভব। এরূপ কল্পনাও ছিল আকাশকুসুম। মানুষের স্বপ্নাতীত ছিল এরূপ ঘটনা। কিন্তু বিজ্ঞান অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। মানুষের মহাকাশ অভিযানের পথে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে পৃথিবীর দুইটি শীর্ষস্থানীয় জাতি—সোভিয়েট রাশিয়া আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। এঁদের সাফল্য গৌরবে সমগ্র মানব জাতি গৌরবান্বিত। সর্ব্বোত্তম বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া এমন সব তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করেছেন, এমন সব বস্তুর উদ্ভাবন করেছেন—যার ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বহু দূরবর্ত্তী গ্রহ উপগ্রহকে পৃথিবীর খুব কাছে এসে অভিবাদন জানাতে হয়েছে।

তোমরা শুনেছ মহাকাশের অভিযানের পথে স্পুটনিক যুগ সক্রিয়। কিন্তু এখন স্পুটনিক যুগ পিছনে পড়ে গেছে। আমরা এযুগ পেরিয়ে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি, গ্রহ উপগ্রহে গিয়ে আমরা উপনিবেশ স্থাপন করবো, এরূপ সঙ্কল্প করেছি। আমাদের সঙ্কল্প কার্য্যকরী করবার জন্যে এসেছে পলিয়ট যুগ। আমরা চলেছি পলিয়ট যুগের মধ্য দিয়ে।

চলতি বছরের সোভিয়েট রাশিয়ার মহাকাশ যানের তালিকায় তোমরা বোধহয় পেয়েছ পলিয়ট—এই নতুন যান পলিয়ট আমাদের অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার জন্যে অগ্রণী হয়েছে। এর আনুকূল্যে এখন আর মহাকাশচারীকে মহাকাশযানের খেয়ালের ওপর চলতে হবে না। চালক তার খুশীমত মহাকাশের যেখানে সেখানে ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারবে—ডাইনে, বামে, ওপরে নীচে সর্ব্বত্র হবে অবাধগতি। এর আগে তা সম্ভব হোতো না। মহাকাশযানের দয়ার ওপর চলতে হোতো চালককে। পলিয়ট সে সব বাধাবিপত্তি দূর করে আমাদের পক্ষে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পাড়ি দেবার পথ পরিষ্কার করেছে। এজন্য এই পলিয়ট আমাদের ধন্যবাদার্হ।

মহাকাশযান পলিয়টের সঙ্গে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী কয়েকটি জেট ইঞ্জিন দিয়ে দিলে সময়মত এর গতিপথ উলটানো যেতে পারে। অতিরিক্ত ইঞ্জিন বিশেষ বিশেষ কোণে রেখে তা চালু করলে, মহাকাশযানও ওদের তালে তাল দিয়ে চলতে থাকবে। নৌকার পালের মত

আয়ন ফলকও এই পলিয়টের দিক পরিবর্তন করতে পারে। আজ মহাকাশ জয় করতে রাশিয়ার মত আমেরিকাও শক্তি দেখাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দান কম নয়। ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল, যার নব নামকরণ হচ্ছে কেপ কেনেডি, এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ। গত চার বছর ধরে এখান থেকে আকাশে উড়েছে হাজার হাজার রকেট আর মিসিল। কেপ ক্যানাভেরালের পানে পৃথিবী এখনও চেয়ে আছে।

১লা মার্চ ১৯.০ সাল। কেপ ক্যানাভেরাল উড়িয়ে দিল মহাকাশে তার পাওনিয়র—৪। প্রচণ্ড তার গতি। চাঁদ থেকে মাত্র সাঁইত্রিশ হাজার মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সে পৌঁছে ঘুরতে সুরু করলো। ঐ বছরের আগষ্ট মাসেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশে পাঠালো তার কৃত্রিম গ্রহ। একই বছরের মে মাসে কেপ ক্যানাভেরলের রকেট ঘাঁটি থেকে রকেটে করে আকাশ পথে তিনশ মাইল ওপরে বেড়িয়ে এলো মার্কিণ যুগল—এবল আর বেকার। কিছুক্ষণ ধরে আকাশ ভ্রমণের পর ওরা দুজন নামলো স্বদেশের মাটিতে।

এরপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের 'পাওনিয়র-৫'এর সঙ্গে হোলো আমাদের পরিচয়। এই কৃত্রিম গ্রহটি আকাশপথে পাঠিয়ে দিলেন আমেরিকা, তা এখনও দূরে চলেছে পৃথিবী থেকে বেশ কিছু দূরে থেকে সূর্যকে কেন্দ্র করে।

এবল আর বেকারের পর মহাশূন্যে পাঠানো হোলো একজন শিম্পাঞ্জীকে। নাম মিষ্টার হাম। ঘণ্টায় পাঁচ হাজার মাইল বেগে ঘুরে ফিরে এলেন মিষ্টার হাম। মিষ্টার হামের মহাকাশযাত্রার আগে আর পরে কেপক্যানাভেরল থেকে পাঠানো হ'য়েছিল কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ। এরা মহাশূন্যের রহস্যালোকে এসে পৃথিবীর কাছে মহাকাশের কিছু ঘোমটা খুলে দিয়েছে। ১৯৬১ সালে এপ্রিল মাসে আমেরিকা থেকে প্রেরিত মহাকাশ যানটি প্রথমে দূরবীণ বলে মনে হয়েছিল।

মহাকাশে উঠেছে প্রথম বানর, তারপর শিম্পাঞ্জী, সব শেষে মানুষ। মার্কিণ নৌবাহিনীর এ্যালাপ বি শেফার্ড আমেরিকার প্রথম আর বিশ্বের দ্বিতীয় মহাকাশচারীর স্থান অধিকার করেছেন। ১৯৬১ সালের ৫ই মে শেফার্ডের ক্যাপসুল মহাশূন্যে উড়ে চলেছিল ঘণ্টায় পাঁচ হাজার একশো মাইল বেগে। পনরো মিনিটে সোজাসুজি একশো পনের মাইল তারপর মহাশূন্যে ঘুরে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে কয়েক শ মাইল দূরে এসে নামলেন শেফার্ড। কয়েক মাস পরে এদিকে অগ্রণী হোলেন ক্যাপ্টেন ভার্জিল করিসন। ইনিও মহাকাশ বিচরণ করলেন। এরপর ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের কুড়ি তারিখে পরিক্রমা করলেন কর্ণেল গ্লেন তাঁর রকেট নিয়ে ৮৮·২৯ মিনিটে।

এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন মার্কিণ নৌবহরের লেফটেন্যাণ্ট কমাণ্ডার ম্যালকলম স্কট কার্পেণ্টার। ইনি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন তিনবার। মহাশূন্য থেকে মহাকাশচারীদের ফেরাবার ব্যাপারে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল, তার অনেকখানি সমাধান করে রাশিয়া এগিয়ে গেছেন অনেকখানি। আমেরিকার শেফার্ড থেকে সুরু করে প্রত্যেক মহাকাশচারী ফেরবার সময় বেশ কষ্ট পেয়েছেন কিন্তু পাননি রাশিয়ান মহাকাশচারীরা। নতুন জগৎ আবিষ্কারের জন্যে আমেরিকা ও রাশিয়ার উদগ্র সাধনার এখনও শেষ হয়নি।

আজ পৃথিবীতে যিনি মনুষ্য সমাজের মধ্যে দৈনন্দিন আলোচনার বস্তু তাঁর নাম ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভা। এই রাশিয়ান তরুণী বিশ্ববন্দিতা। মহাকাশ বিজয় করে যখন তিনি নামলেন মাটিতে তখন অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করে নানা প্রকার টীকা টিপ্পনি করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সন্দেহ দূরীভূত করে দিলেন কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক।

এতটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোতোনা যদি তিনি না নারী হোতেন। নারীর দ্বারা মহাকাশ বিজয় নর-সমাজের মুখে যেন চুণকালী মাখানোর মত হয়ে পড়েছে, তাই নানাদিক দিয়ে উঠেছিল নানা কথা। এই নারীর জন্ম রাশিয়ার মাসনে নিকেভো গ্রামে। ১৯৬১ সালে ১২ই এপ্রিল তারিখে ভস্তক-১এর মহাশূন্য যাত্রী হোলেন গাগারিন। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে যুরি গাগারিন বিশ্ব-বিশ্রুত হোলেন। এই বছরেই আগষ্ট মাসে জার্মান তিতভ ভস্তক—২এ চড়ে মহাকাশে উঠলেন।

ভস্তক মানে মহাযান। ১৯৬২ সালে আগষ্ট মাসের এগারো ও বারো তারিখে রাশিয়া পাঠালো মেজর আন্দ্রিয়ান নিকোলয়েভ আর কর্ণেল পাভেল পোপোভিচকে মহাশূন্যের ওপর। নিকোলয়েভ আর পোপোভিচ একই সঙ্গে মহাকাশ থেকে কয়েকবার পৃথিবী ঘুরেছেন। এর পর ১৯৬৩ সালের জুন মাসে আর একজোড়া ভস্তক উড়িয়ে দেওয়া হোলো। কক্ষপথে প্রবেশ করলো ভস্তক—৫ আর ভস্তক—৬

প্রথমটির চালক ভেলেরি বাইকোভেস্কি। দ্বিতীয়টির চালক বিশ্বের প্রথম মহাশূন্যচারিণী ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভা। ডাকনাম ভলিয়া, আকাশে উড়লেন শঙ্খচিল নামে। ইনি ট্রাক্টার চালকের মেয়ে। যখন ছোট, বাবার কাছে চাইলো এই মেয়ে তাঁর ট্রাক্টারকে, উদ্দেশ্য চাঁদামামার দেশে যাবে।

অবাক হয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন—'ট্রাক্টার নিয়ে কি সম্ভব? চাঁদমামার দেশে যাওয়া যায় না—অসম্ভব'—মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে বাবা আদর করে তাকে ভুলিয়ে দিলেন।

তখন ভলিয়া পড়ে ইস্কুলে। ভলিয়ার বাবা দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধে চলে গেলেন। যুদ্ধে মারা গেলেন তিনি। মেয়েটি মায়ের সঙ্গে শুধু ঘরের কাজ নয়, কারখানায়ও কাজ করতো। সতের বছর বয়স থেকেই সুরু হোলো কারখানায় কাজ করা। ভলগা নদীর ধারে কারখানা। কারখানাটিতে চাকা তৈরী হোতো। মা তখন একটা সুতোর কলের কর্ম্মী। বছর কয়েক পরে চাকা তৈরীর কারখানার কাজ ছেড়ে দিয়ে ভলিয়া এলো সুতোর কলে। মা ও মেয়ে একই জায়গায় কাজ করলো। কিছুদিন পরে মা অবসর নিলেন। ভলিয়া এই কলে ক্রমে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করলো। কলের কর্ম্মীসঙ্ঘের নির্ব্বাচনে সে হোলো সঙ্ঘ সম্পাদিকা। কর্ম্মক্ষমতার প্রাচুর্য্য, তা' ছাড়া অপরিমিত পরিশ্রম করবার শক্তি থাকায় এই ভলিয়া কারখানার কাজের সঙ্গে সঙ্গে বহু কাজ করতো। ঘরের কাজ, পড়াশুনা, খেলার মাঠে গিয়ে খেলাধুলা, প্যারাসুট লাফান—সব কিছু নিয়ে ওর দৈনন্দিন জীবন যাত্রা আনন্দে অতিবাহিত হোতে লাগলো। ওকে দেখে সবাই বলতো 'কি দস্যি মেয়েরে বাবা!' প্যারাসুটে লাফানোর জন্যে এরো-প্লেন ক্লাবে যোগদান করলো। প্যারাসুট লাফানোর দক্ষতার পরিচয় পেয়ে ভস্তকবাহিনী এই মেয়েটিকে গ্রহণ করলো। তার মত আরও কয়েকজন মেয়েকেও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রথম মহাকাশচারিণী হয়ে ভলিয়াই সাফল্য-গৌরবলাভ করলো। আজ পৃথিবীর কাছে সে পেয়েছে সর্ব্বোত্তম সম্মান। তোমরা স্বাধীন ভারতের ছেলেমেয়ের দল। এদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মহাকাশ জয় করবে, এই আশাই অন্তরে পোষণ করি।

— —

কাউন্ট লিও টলষ্টয়
রচিত

দি লঙ্‌ এক্সাইল্‌

(The Long Exile)

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মিকারের কথা শুনে আক্‌শ্যেনক কোনো জবাব দিলো না ...শুধু একটা চাপা-দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে কয়েদখানার পাথরের দেয়ালের পানে তাকিয়ে চুপ করে কি যেন চিন্তায় মগ্ন হলো। আকশ্যেনককে এমন চিন্তাকুল দেখে মিকার বললে,—আমার কাহিনী তো সব শুনলে দাদা...এবার বলো দেখি, তোমার কথা!...এই কয়েদখানায় তুমি সেঁধুলে কি কীর্ত্তি বাধিয়ে?...কতদিনের মেয়াদে?... দেখে-শুনে তো ঠাওর হয়—বেশ লম্বা-মেয়াদেই রয়েছো এখানে!

মিকারের রসিকতায় আক্‌শ্যেনক শান্তভাবেই জবাব দিলে,—ছাব্বিশ বছর আগে এ কয়েদখানায় এসেছি... জানি না আরো কতকাল এমনি বন্দী হয়েই থাকতে হবে!

আক্‌শ্যেনকের কথা শুনে মিকার চমকে উঠলো... বললে,—ছাব্বিশ বছর!...বলো কি!...তা কোন্ অপরাধে তোমার এমন শাস্তির ব্যবস্থা হলো?...

নিজের দুঃখ সর্ব্বদা নিজের মনেই চেপে রাখতো আকশ্যেনক...কাকেও সে সহজে তার মনের কথা খুলে বলতো না কোনোদিন। মিকারের কৌতুহল দেখে আকশ্যেনক বিশেষ কিছু বললো না। ছোট একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে সে জবাব দিলে,—সে কথা শুনে আর লাভ কি!...এই বলে সে সেখান থেকে দূরে সরে গেল।

মিকার কিন্তু সহজে ছাড়বার পাত্র নয়...বিশেষ করে তার কৌতুহল জেগেছে যখন এই বুড়ো-কয়েদীর পূর্ব্ব-ইতিহাস জানবার জন্য! আক্‌শ্যেনক দূরে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আশপাশের অন্য কয়েদীদের কাছে বুড়ো-কয়েদীর অপরাধের কাহিনী জানতে চাইলো। মিকারের পীড়াপীড়িতে অন্য কয়েদীরা তাকে আক্‌শ্যেনকের কয়েদ-খানায় আসার ইতিবৃত্ত সব খুলে বললো। স্তব্ধ-বিস্ময়ে সে কাহিনী শুনতে শুনতে মিকারের মুখের কৌতুক-হাসির ভাব মিলিয়ে গেল...ক্ষণেকের জন্য চুপচাপ দাঁড়িয়ে মনে-মনে সে যেন কি ভাবলো...তারপর সহসা ছুটে গেল কয়েদখানাকার নিরালা-কোণে—সটান আক্‌শ্যেনকের কাছে। মিকারের অদ্ভুত ব্যবহার দেখে অন্য সব কয়েদীরাও কৌতুহল-ভরে এগিয়ে এলো তার পিছু পিছু...হঠাৎ এমন পরিবর্ত্তন ঘটলো কেন, তারই পরিচয় জানতে!

বেচারী আক্‌শ্যেনক তখন একান্তে বসে কি যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন...মিকার ছুটে গিয়ে আবেগ-ভরে দু'হাত দিয়ে বৃদ্ধ-কয়েদীর হাঁটু দুটি জড়িয়ে ধরে বললে,—তাই তো

দাদা, তোমাকে দেখেই মনে হয়েছে—মুখখানা নিতান্তই চেনা-চেনা…আগেই কোথাও দেখেছি যেন কবে!… কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার দাদা!…এ ক'বছরে এত বুড়ো হয়ে গেছো তুমি, যে সহজে চেনা যায় না তোমায়!

মিকারের মন্তব্য শুনে আক্শেনক কোনো জবাব দিলো না…বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে চকিতের জন্য সে শুধু একবার নতুন-কয়েদীর পানে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আগের মতোই চুপচাপ আবার কি যেন চিন্তা করতে লাগলো! মিকারও পরম-বিস্ময়ে একদৃষ্টে আক্শেনকের মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।

তাদের এই অদ্ভুত-আচরণ দেখে অন্য কয়েদীরাও কৌতূহল-ভরে মিকারের কাছে এগিয়ে এসে নানান্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলো।…এই বুড়ো-কয়েদীকে সে আগে কোথায় দেখেছে এবং এমন অবাক হবারই বা কারণ কি?

এমনি নানান্ সব প্রশ্ন!…মিকার কিন্তু তাদের সে প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না। এতক্ষণ যেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল, তেমনিভাবে একদৃষ্টে আক্শেনকের পানে চেয়ে থেকেই সে হঠাৎ আপন-মনে অস্ফুট-কণ্ঠে বললে—সত্যিই আশ্চর্য্য ঘটনা!…এতকাল পরে এভাবে আবার আমাদের দুজনের দেখা হবে—এ কথা স্বপ্নেও ভাবিনি!

এ কথা শুনে আক্শেনক কৌতূহলী-দৃষ্টিতে মিকারের পানে ফিরে তাকালো…সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে,—বটে!… কোথায় দেখেছো তুমি—আমাকে?…তুমি কি শুনেছো যে আমি খুনী-আসামী…মানুষ-খুন করার অপরাধে দীর্ঘ-মেয়াদে সাইবেরিয়ার এই কয়েদখানায় সাজা ভোগ করছি!

মিকার জবাব দিলে,—শুনেছি বৈকি!…দেশের সবাই এ খবর জানে…ছেলে-বুড়ো সকলেই শুনেছে তোমার সেই মানুষ-খুনের কাহিনী! তবে, সে আজ অনেকদিনের কথা…তাই খুঁটিনাটি খবর সব ঠিক মনে নেই এখন।

গম্ভীর-কণ্ঠে আক্শেনক বললে,—তাহলে শুনেছো হয়তো যে কিভাবে বুকে ছোরা বসিয়ে মানুষ-খুন…

কথা শেষ হবার আগেই হো-হো করে হেসে মিকার জবাব দিলে,—নিশ্চয়!…নীজ্-নিহির শহরের মেলায় যাবার পথের ধারে সরাইখানার ঘরে তল্লাসীর সময়, সরকারী-পেয়াদারা যে লোকটির তোরঙ্গের ভিতরে রক্ত-মাখা-ছোরার সন্ধান পেয়েছিল, তাকেই তো খুনী আসামী সাব্যস্ত করেছে সবাই!—তবে, অন্য কেউ যদি বেমালুম ধরা না পড়ে বেশ কায়দায় হাত-সাফাই করে অজান্তে সঙ্গোপনে সেই তোরঙ্গের ভিতরে রক্তমাখা-ছোরাটাকে গুঁজে রেখে দিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্য অন্য ব্যাপার!…কিন্তু তেমন কাজ কি সম্ভব!…খুনী-আসামীই বা কেমন করে বেমালুম অজানা অন্য আরেকজনের কুলুপ-আঁটা তোরঙ্গ খুলে তার ভিতরে সেই রক্তমাখা-ছোরাখানা লুকিয়ে রাখতে পারে? কারণ, কুলুপ-আঁটা তোরঙ্গের পাশেই তো তখন শুয়ে ঘুমুচ্ছিল তোরঙ্গের মালিক স্বয়ং…তোরঙ্গ খুলে খুনের রক্তমাখা-ছোরাখানা লুকিয়ে রাখার সময়, শব্দ শুনেও কি সেই মালিক জেগে উঠে আসামীকে হাতে-নাতে পাকড়াও করে ফেলতে পারতো না?…কি বলো দাদা…তোমার কি মনে হয়?…

মিকারের এ সব কথা শুনে আক্শেনকের মনে সন্দেহ জাগলো…তার ধারণা হলো—অজানা-অচেনা এই নতুন-কয়েদীটিই হয়তো সে রাত্রে পথের ধারের সরাইখানায় সেই নিরীহ-সদাগরের বুকে ছোরা বসিয়ে খুন করেছে! এ সন্দেহ জাগার সঙ্গে-সঙ্গেই আক্শেনকের শান্ত-মন কি যেন এক অজানা দোলায় অস্থির-চঞ্চল হয়ে উঠলো… কয়েদখানার নিরালা কোণে চুপচাপ বসে থাকা আর সম্ভব হলো না তার পক্ষে…দল ছেড়ে সেখান থেকে দূরে সরে এসে সে একা চিন্তাকুলভাবে কয়েদখানার বেড়া-ঘেরা প্রাঙ্গণে পায়চারী করতে লাগলো! বিষাদ-ব্যথার ভারে মন তার এমনই বিচলিত হয়ে উঠলো যে সারারাত চোখে ঘুম এলো না একফোঁটা!…অস্থির-মনে সারারাত যতই সে একা পায়চারী করে বেড়ায়, ততই চোখের সুমুখে কেবলই ভেসে ওঠে অতীতের কত সব হারানো-স্মৃতির ছবি! মনে পড়ে—তার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে…ঘর-সংসার আর বন্ধু-বান্ধবদের কথা…অফুরন্ত শান্তি-সুখে আর হাসি-গান-আনন্দে ভরা ভ্লাদিমির-শহরের মধুর-জীবনের স্মৃতি! মনে পড়ে—সেই নীজ্-নিহির শহরের মেলায় বেশাতী বেচতে যাবার দিনটির কথা…পথের ধারে সরাই-খানায় সেই সঙ্গীন-রাত্রির স্মৃতি…অকস্মাৎ পুলিশের আবির্ভাব…জিনিষপত্র খানা-তল্লাস…রক্তমাখা-ছোরার সন্ধান…গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা-জারী…মিথ্যা খুনের [illegible] দায়ে

সরকারী-আদালতে বিচারের প্রহসন·· সুদূর সাইবেরিয়া-প্রান্তরের কয়েদখানায় দীর্ঘ নির্বাসনদণ্ড···কোথা থেকে যে দুর্ভাগ্যের দমকা-ঝড় এসে দুরন্ত-দাপটে তার সহজ-সুন্দর নিষ্পাপ-নিশ্চিন্ত-জীবনটাকে আগাগোড়া এমন ছারখার করে দিলো! নিজের এই লাঞ্ছনা-অপমান, মিথ্যা-কলঙ্ক আর শোচনীয় পরিণামের কথা ভাবতে ভাবতে মিকারের উপর ঘৃণায়-আক্রোশে আক্শ্যেনকের মন রীতি-মত তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে উঠলো! তার দৃঢ় ধারণা হলো—এত সব দুর্ভোগের জন্য কপটাচারী মিকারই একমাত্র দায়ী! খোলাখুলি স্বীকার না করলেও, মিকারের কথাবার্তায় আর আচার-ব্যবহারে স্পষ্টই সন্দেহ হয় যে রক্তমাখা-ছোরা আর সরাইখানায় সেই নিরীহ-সদাগরকে বেঘোরে খুন করার ব্যাপারে সে বিশেষভাবে জড়িত!

এ সব কথা চিন্তা করতে করতে আক্শ্যেনকের মন মিকারের অন্যায়-আচরণের প্রতিশোধ নেবার আক্রোশে ফুঁশে উঠলো! কিন্তু সে ক্ষণিকের আক্রোশ···পরের মুহূর্তেই আক্শ্যেনক মনের গ্লানি দূর করবার মানসে একাগ্রভাবে ঈশ্বরের শরণাগত হলো···সারারাত সে শুধু প্রার্থনা আর ভগবানের নাম-গান করেই কাটালো···তবু তার অশান্ত-মন শান্ত হলো না···মিকারের উপর ঘৃণা-আক্রোশ ঘুচলো না এতটুকু! ক্রমশঃ

স্যমন মাছের সন্তান পালন ও গৃহ নির্মাণ

গৌর আদক

পৃথিবীতে প্রত্যেক প্রাণীই তার শিশুসন্তানকে সুষ্ঠুভাবে লালন-পালন করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এটা প্রাণীদের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। খেচর, জলচর এবং উভচর—এ সব প্রাণীর মধ্যেই এটা সমান ভাবে প্রচলন আছে। এমন কোন প্রাণী নেই এ পৃথিবীতে যে এই প্রবৃত্তির হাত থেকে বিরত আছে। তবে সব প্রাণীর সন্তানপালনের ধরণ কিন্তু এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন ধরণ।

এখানে অন্যান্য প্রাণীর কথা বাদ দিয়ে শুধু এক জলচরদের কথাই ধরা যাক। মাছ জলের প্রাণী; জলের সঙ্গে এদের নিকট সম্পর্ক। জলের গভীরতা ভেদ করে এরা দিবানিশি ঘুরে বেড়ায় এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। কখন দ্রুতগতিতে, কখন বা মন্থর গতিতে, এটা মাছেদের স্বাভাবিক অবস্থার ঘটনা। কিন্তু মাছেদের সন্তান প্রসবের সময় হলেই তখন আর এরা স্বাভাবিকভাবে ঘোরাফেরা করতে পারে না। তখন তাদের স্বাভাবিকভাবে ঘোরা-ফেরার গতি দিনে দিনে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে এবং যতদিন না এদের সন্তান প্রসব হয়ে বেশ সাবলীল হয়ে ওঠে, ততদিন পর্যন্ত এরা আর স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ফিরে আসতে পারে না। অবশ্য এটা শুধু মাছেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ।

মাছেরা সন্তান প্রসবের কয়েক দিন পূর্ব থেকে অন্যান্য খেচর প্রাণীর মতন গৃহ নির্মাণ করে, তার মধ্যে সন্তান প্রসব করে। এ গৃহ নির্মাণ এদের অস্থায়ী, স্থায়ী নয়। সন্তান প্রসবের পর যখন সন্তানগুলি একাকী ঘোরা-ফেরা করতে পারে তখন মাছেরা আর সেই কষ্টাশ্রিত গৃহের দিকে দৃষ্টি ফেরায় না, তখন সেই গৃহটি আস্তে আস্তে জরাজীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়তে থাকে গভীর জলের মধ্যে।

মাছেদের গৃহ নির্মাণ এবং সন্তান পালন দুই-ই বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিশেষ করে পুকুরের মাছ অপেক্ষা সমুদ্রের মাছের এই দুই কাজের মধ্যে বিচিত্রতা একটু বেশি পরিমাণে অনুভূত হয়।

সমুদ্রের স্যমন মাছের সন্তান-পালনটি খুবই বিচিত্র। ইহারা ক্ষীণতোয়া পার্বত্য নদীতে আসিয়া ডিম প্রসব করে। এই সকল নদীতে আসিবার সময় ইহাদিগকে অনেক বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। নদীগর্ভের খানিকটা স্থান ক্রমাগত লেজের ঝাপটায় পরিচ্ছন্ন করিয়া সেইস্থানে ইহারা ডিম প্রসব করে। স্রোতের মুখ হইতে ডিমগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য চারিদিকে ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা আইল বাঁধিয়া দেয়।

বসন্তাগমের সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল মৎস্য সমুদ্র হইতে নদীতে চলিয়া আসে এবং তথায় প্রসবের উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিয়া লয়। ইহাদিগের প্রথম কার্য সেই নির্দিষ্ট স্থানের প্রস্তর বালুকা প্রভৃতি আবর্জনারাশি এক

পার্শ্বে ঠেলিয়া রাখিয়া সেই স্থানটিকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করে। কখন বা দুইটি মৎস্য পরস্পরের ক্রমাগত কুণ্ডলী পাকায়। আবার কখন বা পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া এই কার্য সম্পন্ন করে। তাহাদিগের এই কার্যপ্রণালী দেখিয়া মনে হয় যেন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়াছে।

এইরূপে স্থানটি পরিষ্কৃত হইলে আবাস নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। প্রস্তরখণ্ডগুলি উপর উপর সাজাইয়া দুই তিন ফুট উচ্চ করে। ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডগুলি সাধারণতঃ ইহারা মুখে করিয়া বহন করিয়া আনিতে পারে না। এ-ক্ষেত্রে তাহারা বেশ একটি সুন্দর উপায় অবলম্বন করে। তাহা হইতে ইহাদিগের বুদ্ধিরও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ বেগবান স্রোতের মুখেই ইহারা বাসের উপযোগী স্থান সংগ্রহ করিয়া লয়। নদীর উপরিভাগে কিছুক্ষণ সন্তরণ করিয়া একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ইহারা বাছিয়া লয়। তৎপরে ক্রমাগত ধাক্কা এবং নীচে হইতে মোচড় দিয়া সেটিকে কিছুদূর সরাইয়া আনে। পরে মসৃণ দিকটি জমির উপরে আসিলে মুখ দিয়া সমগ্র প্রস্তরখণ্ডটি উত্তমরূপে কামড়াইয়া ধরিয়া লেজটি উপর দিকে তুলিয়া ধরে। প্রস্তর ও মৎস্য উভয়ই তখন স্রোতের টানে খানিক দূরে ভাসিয়া আসে। দুই চারিবার এইরূপ করিলে প্রস্তরখণ্ড ঈপ্সিত স্থানে আসিয়া পড়ে এবং নিপুণ ইঞ্জিনিয়ারের মতই মৎস্য আপন বাসা নির্মাণ করিয়া লয়।

মনোহর মৈত্র

১। শাদা-কালো টালি সাজানোর হেঁয়ালী :

সুদর্শনবাবু সৌখিন জমিদার···সম্প্রতি দেশে নতুন ইমারৎ গড়ে তুলছেন। রাজমিস্ত্রীকে দিয়ে ঘরের মেঝেতে সুন্দর-ছাঁদে টালি বসানোর সময় তিনি লক্ষ্য করলেন সবশুদ্ধ ২৫খানি টালি তাঁর প্রয়োজন। এই ২৫খানা টালির মধ্যে ১৩খানা টালি কালো-রঙের আর ১২ খানা টালি শাদা-রঙের। সুদর্শনবাবুর দুর্ভাবনা হলো-কি উপায়ে নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে চৌকোণা-ঘরের মেঝেতে বেজোর-সংখ্যার এই ২৫ খানা শাদা-কালো টালিকে মানানসইভাবে সাজিয়ে বসানো যায়। রাজমিস্ত্রী পাকা লোক···জমিদারবাবুর দুশ্চিন্তা দেখে সে বললে,—হুজুর··· কোনো চিন্তা করবেন না! ধৈর্য ধরে দেখুন—কেমন সহজে কায়দা করে অন্ততঃপক্ষে ১৪ ধরণের সুন্দর-সুন্দর ছাঁদে ঐ ১২ খানা শাদা-রঙের আর ১৩ খানা কালো-রঙের টালি সাজিয়ে আপনার ঘরের মেঝে নিখুঁতভাবে বানিয়ে দিতে পারি!

রাজমিস্ত্রীর কথা শুনে সুদর্শনবাবু গোড়াতে বিশ্বাসই করতে পারেননি যে এমন কাজ সম্ভব হতে পারে! শেষে তাঁর চোখের সামনে রাজমিস্ত্রী যখন নিপুণ-কায়দায় শাদা-কালো রঙের ২৫ খানা টালি সাজিয়ে বিভিন্ন-ছাঁদে ঘরের মেঝে আগাগোড়া সুসজ্জিত করে দেখালো—তখন তিনি বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তোমরা এঁকে দেখাতে পারো চৌকোণা ঘরের মেঝেতে আগাগোড়া কি উপায়ে চৌদ্দ রকম ছাঁদে টালি সাজিয়ে সুদর্শনবাবুর সেই রাজমিস্ত্রী সহজেই এ সমস্যার সমাধান করেছিলো?

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

২। শীতে আসে···অতি মধুর

সুমিষ্ট-ব্যঞ্জনে···

উলটিয়ে দিলে তারে

সুধা ঢালে কানে।

রচনা ঃ—দিলীপকুমার দত্ত (বাঁশবেড়িয়া)
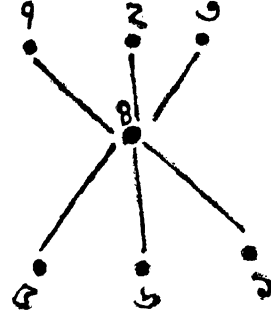
৩। ইউরোপীয়-সাহিত্যের এমন একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখকের নাম করো—যার নামের প্রথম দুই অক্ষরে ভারতের এক-ধরণের প্রাক্তন-মুদ্রার নাম বোঝায়···শেষের দুই অক্ষরে বোঝায় পাশ্চাত্যের সুবিখ্যাত একটি দেশের নাম এবং মাঝের দুই অক্ষরে—ভারতীয়-প্রথায় ওজনের বিশেষ এক-ধরণের হিসাবের মাপ বোঝায়। বলো দেখি—মুদ্রা, ওজন আর দেশ নিয়ে রচিত যার নাম—সেই সুবিখ্যাত ইউরোপীয় লেখকটি কে ?

রচনা ঃ—কার্তিক ও ভবানী

(কাশীপুর, পঞ্চকোটরাজ, পুরুলিয়া)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি'র উত্তর ঃ
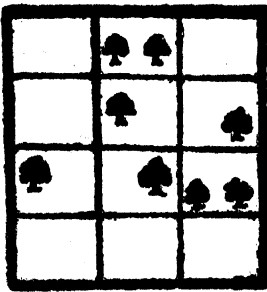
১। উপরের নক্সাটি দেখলেই বুঝতে পারবে—রতনপুর গ্রামের বিচক্ষণ জমিদার-মশাই কি উপায়ে বাগানের বারো টুকরো জমি আর আমগাছ আটটিকে নিখুঁত-হিসাবে তাঁর চার ছেলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন।

২। ঘটক

৩।

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), রুনু মিত্র (কলিকাতা), রিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই), কবি ও লাড্ডু হালদার (কোরবা), সত্যেন, সঞ্জয়, মুরারী ও সুনীল (ভিলাই), ধর্মদাস রায় (বিদ্যাধরপুর), নীতা, টুটুন, বোনটি, ভাইটি, রুবু, ববু, ছবু, বুড়ি, লিপু, ডলি ও বেগুনা (কলিকাতা),

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), বাপি, বুড়াম ও পিণ্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), শর্ম্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), পিণ্টু হালদার (বালী), শুভা, সোমা, কল্পনা ও অরিন্দম বড়ুয়া (কলিকাতা), সুনীরা ও সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ),

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে

বিশ্বনাথ ও দেবকী সিংহ (নওয়াদা), সন্দেশ ও সুশীল (আলিপুর), ইন্দ্র দাস (কটক),

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

স্থানাভাববশতঃ এবং বিলম্বে উত্তর পাবার ফলে গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'কিশোর-জগতের' যে সব সভ্য-

সভ্যাদের নাম প্রকাশিত করা সম্ভব হয়নি, নিম্নে তাঁদের তালিকা দেওয়া হলো :—

গতমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

চৈতালী ও মিঠু বসু (কলিকাতা), খুকু, জলি, ডলি, মাণিক, পিটু, ঝুমা, তোতন, খোকন ও মৌ (সম্বলপুর), প্রভাত মোদক (বাঁশবেড়িয়া), আলো, তুফান, চাইনা, মালা, পলা, সোমা, সীমা, শম্পা ও মিঠু (রৌরকেল্লা), ধীরেন্দ্রনাথ মোদক (বাঁশবেড়িয়া), উমা ও আশীষ মুখোপাধ্যায় (আদ্রাহাটী), সন্তু মন্তু, কান্তু ও বনানী সিংহ (গয়া), উমা বসু (আরারিয়া), নবকুমার শাসমল (চেতুয়া রাজনগর), শিবরাম ও শশাঙ্কশেখর মিশ্র (রুইনান), অলককুমার কুণ্ডু, বাণী, শুভ্র ও পার্থ হাজরা (আড়ুই শাকনাড়া), কার্তিক ও ভবানী (কাশীপুর), বাবলু ও বাদল ভট্টাচার্য্য (কুমারডুবি), অণিমা, কণিকা, কৃষ্ণা ও নিরুপমা (ভুঞ্জা), জগৎ, নিমাই, নিতাই, শঙ্করী ও প্রতিমা নন্দী (চকছাপি), পরেশনাথ ও তুষারকান্তি দে (শালকিয়া), দীলিপকুমার, দীপিকা, পঙ্কজ, ভানু, বুলু ও অনু দত্ত (দেবালয়), সুশীলকুমার অধিকারী, বিমল, বিপুল, শরৎ, হরেন, পরিমল, শিশির ও কমল (পত্তিরাম), বিধু, অমিয়, তপন মান্না, কালিপদ দাস, দিলীপ, বিনয়কুমার, বিনয়কৃষ্ণ, নিশীথ, কমল, বীরেন, বিনন্দ ও বাবলু মান্না (পারুলদা), মমতা চক্রবর্ত্তী ও শালটু ভট্টাচার্য্য (ধুবড়ী), একলব্য, সুভাষ মণ্ডল, দেবরঞ্জন বসুমল্লিক, হরেকৃষ্ণ, সাধন ও ডলু (বেলুড়), সুনীতিকুমার, মনোরমা, গৌরীবালা, নারাণচন্দ্র ও মদনমোহন মিশ্র (রাগপুর), দীলিপকুমার দত্ত (বাঁশবেড়িয়া), হাবু, বাবু, শামু, মামণি ও চম্পা (কলিকাতা), অরুণচন্দ্র ও মীনা সরকার (কালাইন), প্রদ্যোত, ঝুমকোলতা, বকুলদা, রত্না, গৌতম (দমদমোর), রেখা, জ্যোতিপ্রসাদ ও দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ (যশপুরনগর), দেবাশিস ও সুবল সেন (অভিরামপুর), টুকাই, কচো ও বাচ্চু চট্টোপাধ্যায় (আগড়পাড়া)।

কার্ত্তিক মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

তারকনাথ নন্দন (বাঁশবেড়িয়া), তারাশঙ্কর ও প্রভাতরঞ্জন ঘোষ (কামারপুকুর), শৈলেন সাধু (আসানসোল), রাণু, বুলু ও তুষার দত্ত (কলিকাতা), বু ও বালু মিত্র (গুড়াপ), স্বরাগময়, সিপ্রাধারা, ধীরাগময় ও মণিমালা হাজরা (বড়বড়িয়া), সুভাষ ও চিত্তরঞ্জন দত্ত, প্রিয়কুমার ও ভীষ্মদেব মুখোপাধ্যায়, দীলিপকুমার ঘটক, হারাধন ঘোষ বিশ্বাস, মণিমোহন সিংহরায়, মলয় মল্লিক, রূপেন চট্টোপাধ্যায়, অসীম হালদার ও সৌরীশ দে (বর্দ্ধমান), সঞ্জয় রায় (নিউ বারাকপুর), প্রবীরগোপাল ও প্রদীপগোপাল মুখোপাধ্যায় (শিবপুর), মা, মামু, দিদিভাই, দাদাভাই, মুন্নু, সন্তু ও আমি (নওয়াপাড়া), বারীন্দ্র ও দিলীপকুমার সিংহরায় (গোবিন্দপুর)।

কার্ত্তিকমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

শাশ্বত ও শর্ম্মিলা গোস্বামী (যাদবপুর), বিশ্বনাথ ও দেবকী সিংহ (নওয়াদা)।
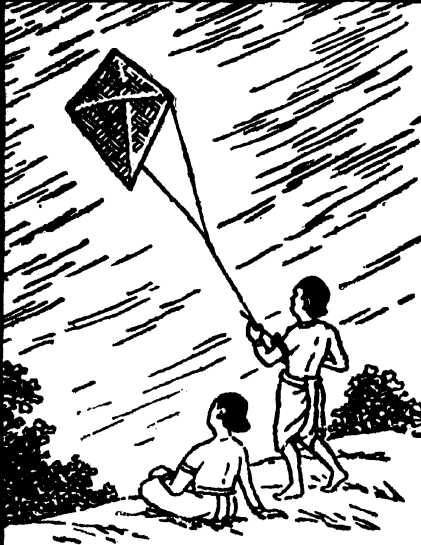
আমাদের দেশের পুরাণ-কাহিনী থেকেও প্রমাণ মেলে যে অতি-প্রাচীন কালেও ভারতের কুশলী-সৌখিন অধিবাসীদের মধ্যে বিচিত্র-ধরণের পাতার-তৈরী অভিনব ঘুড়ি ওড়ানোর খুবই রেওয়াজ ছিল। এমন কি, এই ঘুড়ি-ওড়ানোর ব্যাপারে সেকালে তীব্র-প্রতিদ্বন্দ্বীতা, রেশারেশি, ক্রীড়া-প্রতিযোগীতা, বাজী-রাখা প্রভৃতিরও প্রচুর নজীর-সন্ধান পাওয়া যায় অতীতের ঐতিহাসিক পুঁথি-পত্রে। সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে অধুনাবধি ঘুড়ি-ওড়ানোর সখ রীতিমতই সুপ্রচলিত রয়েছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে।

প্রতীচ্যের আধুনিক গবেষক-পন্তিতেরা অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেন যে খৃষ্ট-জন্মের প্রায় চারশো বছর আগে গ্রীসদেশের 'টারেন্টাম্' (TARENTUM) অঞ্চলের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক 'আর্কাইটাস্' (ARCHYTAS) অভিনব উপায়ে কাঠের তৈরী এক বিচিত্র-ছাঁদের 'পায়রা-ঘুড়ি' (WOODEN PIGEON) নির্মাণ করেছিলেন। সেকালের সেই বিচিত্র 'পায়রা-ঘুড়িটিকে' নাকি আশ্চর্য্য কৌশলে অনায়াসেই আকাশে ওড়ানো যেতো দিব্যি সহজ-সুছন্দ্য-গতিতে। এ সব ছাড়াও প্রাচীন যুগে ঘুড়ি-ওড়ানোর কৌশলের আরো বহু তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়।
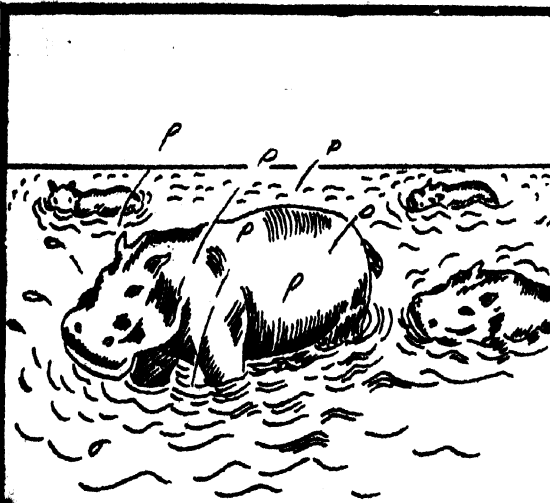
জলে-ডাঙ্গায়

—আব্রাহাম রচিত

লেঠেল
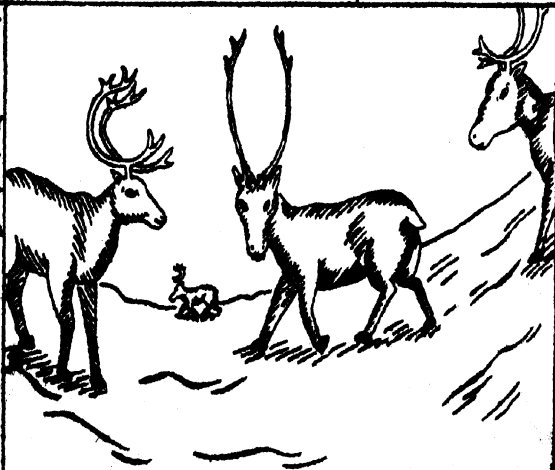
শ্রীসুষমা মৈত্র

সাজ সাজ রব পড়ে গেল অকস্মাৎ!

দু'পক্ষই প্রস্তুত।

বাছা বাছা লেঠেল মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথা থেকে ঢাল সড়কি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলি ওদের যেন সিংহের কেশরের মত ফুলে ফুলে উঠেছে ক্ষুব্ধ আক্রোশে। খুন চেপেছে রক্তের নেশায়। যে যার জায়গায় বসে গেছে হাঁটু গেড়ে। মাঝে মাঝে মা, মাঁ রবে আকাশ বাতাস মুখরিত করে মা কালির নামে রণ-হুঙ্কার ছাড়ছে। এপক্ষ ওপক্ষকে উদ্দেশ্য করে নানারকম উত্তেজক, অগ্নিবর্ষী ইঙ্গিতও করছে। তাদের আর তর সইছে না। কিন্তু দুপক্ষের সরদারের হুকুম এখনও এসে পৌছয়নি। কি এক অজানিত প্রলয়াশঙ্কায় উভয় পক্ষেই দেখাচ্ছে একটা প্রাক্‌ঝটিকা স্তব্ধতা। কি জানি কি হবে! অথচ আশ্চর্য্য, বিরোধের কারণটা এখনও অনেকের কাছে অজ্ঞাত। এমন কি যে সব লেঠেলরা মড়ার গন্ধে শকুনের মত যে কোন কাজিয়ার ইঙ্গিতে তাদের ঢাল তরোয়াল নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, এবং জুটেছে আজও—তাদেরও অনেকে জানে না আসল ব্যাপারটা কি!

সরদারের হুকুম হয়েছে ব্যস্। আর কি। কারণ বুঝবে সরদার। ওরা শুধু হুকুম তামিল করবে জান কবুল করে। তাই না হলে লেঠেল! হামেশাই এমন হুকুমের জন্য বিশেষ করে কিনু ও ভেনী সরদারের দলের লেঠেলরা এক পায়ে খাড়া থাকে। এখানেও সেই দুই সরদারের দল হাজির।

ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি। অনেকদিন ধরে পৈত্রিক ভিটে বাড়ীর জমির সীমানা নিয়ে যোগীবর ও নিত্যানন্দদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ—অবশেষে সেটা গিয়ে পৌঁচেছে ফৌজদারী মামলায়। এ ব্যাপারে মারামারি, রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে এবং এখনও সেই মামলা চলছে। সে আজ তিন চার বছর আগের কথা। প্রথমে মহকুমা হাকিমের কোর্টে মামলা চলে। সাক্ষী প্রমাণের অভাবে বাদী যোগীবরদের হার হয়। হেরে গিয়ে তারা দেওয়ানী কোর্টে সত্বের মামলা জুড়ে দেয়।

দুপক্ষেই এ নিয়ে বেশ মন কষাকষি—এমন কি মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ। কেউ কাউকে জব্দ করতে পারলে ছেড়ে কথা কয়না। তবুও অনেকদিন হয়ে যাওয়ায় একটু কেমন যেন নিস্তেজভাব এসে গেছে দুপক্ষের মধ্যে। পাশা-পাশি বাস করেও এতদিন যে একদল আর একদলকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেত—সেটাতে কেমন যেন একটু ভাটা পড়ে আসছে। দুপক্ষেরই পুকুরঘাট পাশাপাশি। শাকসব্জির ক্ষেত তা-ও এক লাইনে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখ দেখাদেখি না হয়ে উপায় নেই।

যোগীবরদেরই বাস্তুভিটার জমির খানিকটা অংশ জুড়ে নিয়ে নাকি নিত্যানন্দরা তাদের গোয়ালঘর ও বাইচের বাচাড়ী নৌকো গড়ার ঘর তুলেছে জোর করে। বারণ শোনেনি। যোগীবরের দিদি মালিনী বাধা দিতে গিয়েছিল দেখে নাকি তাকে নিত্যানন্দের কাকা রবি অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল—মেয়েছেলের আবার এর মধ্যে আসা কেন। তাই প্রতিশোধ নিতে যোগীবর তার দিদিকে নিয়ে গ্রামের প্রাচীন মাতব্বর ব্যক্তি অভিমন্যু মালাকরের কাছে পরামর্শ চাইতে গেল। তিনি পরামর্শ যা দিলেন, তাতে দেখা গেল যোগীবর গোপালগঞ্জে গিয়ে মামলা দায়ের করে এসেছে।

ফৌজদারী মামলা!

তার মধ্যে বিবাদী পক্ষ নিত্যানন্দ:—প্রধান আসামী। তার অপর দু'ভাই হারান, ধীরেন ও আসামী, আর তার কাকা রবি হলেন হুকুমদারী আসামী।

অপরাধ কিনা গোয়ালঘর তোলার সময় বাধা দিতে গেলে যোগীবরের দিদি মালিনীর মাথায় কোদালের এক কোপ বসিয়ে দিয়েছে।

মামলার পরামর্শ দিতে মাতব্বর অভিমন্যু অদ্বিতীয়। মালিনী একে মেয়েছেলে—তার উপর মাথায় মারাত্মক জখম। এ-মামলার জিত নির্ঘাৎ।

সজ্ঞানে স্বহস্তে যোগীবর দিদির মাথায় বেশ বড় রকমের ক্ষত করে ফেলল। মোটা সেলামীর বিনিময়ে ডাক্তারী সার্টিফিকেটও সংগ্রহ হল।…অতঃপর মামলার আর বাকী রইল কী? যোগীদেরই হার হল শেষ পর্য্যন্ত।

প্রত্যক্ষদর্শী'র প্রমাণ কোথায়?…কে দেখেছে?… বিপক্ষের জেরায় পড়ে যোগীবরের দিদির মাথার ঘায়ে ব্যথা বেড়ে গেল বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী'রূপে কোন সাক্ষীকেই টেকান গেল না।

… … …

এক একটা মামলার দিন আসত…আর মনে মনে হরির লুটের মানত করত উভয় পক্ষ। সেই হরিরলুটের পালা পড়ে গেল নিত্যানন্দদের ভাগে। ফৌজদারী মামলায় তাদের জিত হয়েছে। নিত্যানন্দের কাকিমা পাশের বাড়ীর পচার-মার সঙ্গে সেই হরিরলুটের দিন তারিখ ঠিক করে সবেমাত্র উঠি-উঠি করছে, এমন সময় ও উঠানের বুঁচি এসে হাঁপাতে হাঁপাতে খবর দিলে,… জ্যেঠিমা, লেঠেলে যে যোগীবরদের ঘর-বাড়ী ভরে গেছে। জ্যাঠামশাইকে নাকি মাইর‍্যা ফেলবে ওরা…কি সব কইছে গো।'

'অ্যাঁ, কি বললি? তোর জ্যাঠামশাই আবার কি করল! এই ত মানুষটা খেয়ে বের হয়ে গেল।'

তিনি পচার মাকে ডেকে বললেন, 'হ্যারে পচার-মা, তোর সঙ্গে দেখা হয়নি ছোট কর্তার! তুই কি কোন ঝগড়া-ঝাটি করতে দেখলি কারুর সঙ্গে!'

একটা হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ কানে আসতে লাগল যেন ওদেরও। পচার-মা একটু চিন্তিত হয়ে বলে উঠল, কই না ত? তবে হ, আমি যোগীবরের ছোটভাই হরিবরকে ত্যাখলাম ছুটে চলছে পচ্চিম পাড়ার দিকে। আমি অত গ্রাহ্যি করি নাই। তাতেও লাগে না দিনরাত অত ঝকমারি।'

এদিকে নিত্যানন্দের তিন ভা'য়ের একজনও বাড়ীতে নেই। কাকে দিয়ে তিনি কি খবর নেন। তিনিও মহা-ভাবনায় পড়লেন। বললেন, কি হবে ভাই পচার-মা! একটা মামলায় জিত হয়েছে বটে, তা তুই ত জানিস এখনও সত্ত্বের মামলা চলছে… এর মধ্যে আবার কোন বিপদ গো?

বুঁচি আবার চেঁচাতে আরম্ভ করল। 'ঐই ত্যাখ জ্যেঠিমা—ঐই ত্যাখ। তোমাদের দলের লেঠেলরাও যে এদিকে আসছে গো…কি হবে গো জ্যেঠিমা, কি হবে!'

প্রমাদ গুণল পচার-মা, বলল, 'না, তোমাগো জ্বালাতনে যে এ গেরামে বাস করাও দায় হইয়া ওঠছে। দুদিনও নিচ্চিন্দি থাকবার জো নাই। আমি ত ভাবছি ওনাকে কয়ে ছেলেমাইয়া নিয়া এ গেরাম ছাড়ে'…বলতে না বলতেই ফণী সর্দ্দার ছুটে এসে নিত্যানন্দের কাকার নাম ধরে 'রবিদা …রবিদা কোথায়—বলে হাঁকডাক সুরু করল। নিত্যা-নন্দের কাকিমা—বাড়ী নেই—বলামাত্র দ্বিতীয় কথা শোনার অপেক্ষা না রেখে—'এলেই পাঠিয়ে দিও যোগীবরদের—ওখানে' বলে ছুটে গেল। এদিকে যোগীবরের বিধবা বোন মালিনী ত মহা সোরগোল, ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে…আটকুঁড়ের ব্যাটা আমার ভাইরে এভাবে মাইর‍্যা ফেলতি চাইছে রে…ওরে তোরা সব দেইখ্যা যারে। ওর তেরাত্তি পোহাবে না…ওর বৌ'র হাতের নোয়া, সিঁতার সিঁদুর মুছে যাবে।…তোরা থাকতি আমার ভাইগে এই গতিরে। ওরে আমার কপাল রে…বলে এমন চিৎকার সুরু করেছে যে কারণটি জানার পুর্ব্বেই সহানুভূতিতে লোকের মন ভরে গেছে।

সকলের মুখে এক কথা—'খুনি, খুনির বিচার চাই… শাস্তি চাই। তাইত লেঠেল এসে গেছে! ওপক্ষেরও লেঠেলের অভাব হয়নি। কিন্তু মধ্যপাড়ার পঞ্চুঠাকুর ব্যাপারটা যেন খানিকটা আঁচ করতে পেরে রোজা আদিলদ্দি মোল্লাকে ডেকে পাঠাল ঝাড়-ফুঁকের জন্য।

ভীষণ ভীড়!

মহা হৈ হৈ রৈ রৈ।

ভীড় ঠেলে কিছু সরদার পঞ্চুঠাকুরের অনুমতি চাইল। 'অনুমতি করে ত সে এখনই রব্যার মাথাডা আইন্যে তার পায়ের কাছে রাখতি পারে।'

তদুত্তরে পঞ্চুঠাকুর তার কানে কানে কি কথা বলার

হন্তদন্ত হয়ে সে তার লেঠেলদের পাছে ছুটে গেল। তার-পর পঞ্চুঠাকুর জনতার দিকে মারমুখো হয়ে ধমকে উঠলেন, —'তোরা একটু চুপ কর দেখি। জীবন নিয়ে ত খেলা করা যায় না, আগে তার ব্যবস্থা, তারপর অন্য সব।

কাজির ব্যাটা আদিলদ্দি মোল্লা ঐ পথ দিয়েই চলেছিল কি কাজে। পথ থেকেই ধরে আনা হল তাকে।

'এই যে চাচা এসে পড়েছ দেখছি'—বলেই সকলকে সরিয়ে দিয়ে চুপি চুপি সব কথা পঞ্চুঠাকুর কাজির ব্যাটাকে বলল।

কেমন থমথমে ভাব। কাজির ব্যাটাও সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে কাজি যোগী-বরের দু'পা বেয়ে তাজা রক্ত গড়াতে দেখে তাজ্জব! একটা আশঙ্কামিশ্রিত ঔৎসুক্যের সহিত রোজার দৃষ্টিতে সে যোগীবরকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। এমন একটা ভাব দেখাল যেন এক্ষুণি যোগীবরের মৃত্যু অবধারিত। তাই না দেখে মালিনী তার সাঙ্গপাঙ্গ বুঁচি খেঁদির সঙ্গে একত্রে মরাকান্না জুড়ে দিল…'ওরে আমার ভাইরে… তোর কি হলরে…তোর বুঁচি খেঁদির কি হলরে? আমাগো কার কাছে থুইয়া গেলিরে…রে। ওরে আমার কপালরে…।'

উপস্থিত সকলে হতবাক্। উচ্চরোলে বার বার তারা কাজিকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করে তুলল। কেমন দেখলে! বাঁচার আশা আছে ত?

পাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'এমন শক্রতা করলি কি আর এক গাঁয়ে বাস করা চলে? বেটাচ্ছেলে ভাবছে কি? এডা কি মগের মুল্লুক!' হরিবর কথাটা লুফে নিয়ে বলল, 'এডা যে মগের মুল্লুক নয় তাইত সে কিনু সরদারের দলকে ডেকেছে এর একটা উচিত জবাব দেওয়ার জন্য।'

'এতক্ষণে দেয়া হয়েও যেত' বলল কিনু সরদার স্বয়ং। কিন্তু কাজির ব্যাটা যখন এসে গেছে তখন তার শেষ রায়টা জেনে নিতে কতক্ষণ।'

কাজির ব্যাটা মোল্লাসাব গম্ভীর চালে তার শাস্ত্রে অর্থাৎ রোজা শাস্ত্রে এবং রোগের সিমটমে মিল খুঁজতে লাগল মাথাটা ঈষৎ দুলিয়ে দুলিয়ে। সেই মত বিহিত করতে হবে যে। যা তা একটা করলে ত হবেনা। বেড়ে রোগের বেড়ে ওষুধ!

আকাশচুম্বি হট্টগোল, হৈ-চৈ তার কানের পর্দা ফেটে যাবার উপক্রম। কাজির ব্যাটা কিন্তু মূর্ত্তিমান ধৈর্য্যের প্রতীক! কোনদিকের কোন কথা তার কানে পৌছয় না। সে শুধু একবার রোগীর দিকে, আর একবার জনতার দিকে তাকাচ্ছে। বাক্‌শক্তিও রহিত।

সমস্বরে সকলে বলে উঠল, "এইবার—এইবার নিশ্চয়ই কাজির কারসাজি—অর্থাৎ ঝাঁড়ফিকির আরম্ভ হল বলে। জনতা একটু সরে সরে দাঁড়াল—পাছে ঐ রোগ তাদের কারো উপর কাজির ব্যাটা চালান করে দেয় তার মন্ত্রতন্ত্র বলে। তারা ভয়ে ভয়ে রামনাম জপতে লাগল মনে মনে।

"ঐ ত রোজা বিড়বিড় করে কি বলছে যেন। কিন্তু কই, সরিষা, আগুন…পাটখড়ি কিছুই ত কাজির ব্যাটা চাইছে না। এটা আবিষ্কার করল স্বয়ং যোগীবরের বৌ। আগুন জ্বালিয়ে সরিষা পোড়া না দিলে শুধু মন্ত্রের বলে ঐ দোষ কাটে নাকি? তাই ত সে আগেভাগেই রেকাবি করে কিছু শ্বেত সরিষা, ম্যাচ বাতি ও কিছু পাটখড়ি এনে রেখেছে।

শুধু মাত্র রোজার হুকুমের অপেক্ষা। স্বামী তার কত কষ্ট সইবে। সত্বর একটা বিহিত প্রয়োজন। কাজির হুকুমের অপেক্ষা না করেই সে তার ছেলে জ্যাকে ডেকে বলল, 'এইসব জিনিষগুলো দিয়ে আয় ত বাবা মোল্লার-পোর কাছে। একটু জলদি জলদি যা হয় একটা কিছু করতি। মানুষটা কি বেঘাটায় মারা পড়বে নাকি? দেখছিস না চোখ-মুখের অবস্থা কেমন ফ্যাকাশে হইয়া গেছে।'

ফেলু খুড়ো একটু অধৈর্য্য হয়ে বলে ফেললেন,—ব্যাপারডা কিন্তু আমার ভাল মনে হচ্ছে না বৌ। তোমরা বরং গোপাল ফকিরকে ডাকলি পারত্যা। রোজা সাব যে রকম বোজা হয়ে গেছে আর ত দেরী করা আমি ভাল মনে করিনা। কিসের ত্যা কি হয়ে যায়। তখনও 'আক্কেল সেলামী তোমাগেই দিতি হবে।'

রাম কেষ্ট—কাছেই দাঁড়িয়েছিল—কথাটা টেনে নিয়ে বলল, 'তা যা বলেছ খুড়ো, তহন কিন্তু বলতি পারবা না, তোমরা এতো নোক থাকতি—এট্টা সৎ পরামর্শ কেউ দিলে না।'

"এদিকে কাজিসাবকে হঠাৎ এক ক্ষ্যাপামীতে পেয়ে বসেছে,—প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে যোগীবরকে।"

"আচ্ছা যোগী, তুমি একটা খাঁটি সত্যি কথা কও ত বাবা, তুমি যে জমিতে কচুড়ী মারতে নামছিলা কত পর্য্যন্ত জল ছিল সে ভুঁইতে?"

যোগীবর আনুপূর্বিক সব ঘটনা বলে যেতে লাগল। সে সকালে পান্তা খেয়ে বিলের জমিতে কচুড়ি মারতে গিয়েছিল। কোমর পর্য্যন্ত জল ছিল সেজমিতে—বলেই কেমন অস্থির হয়ে মোল্লার পো···গো···উঃ···করে উঠল।

কাজির ব্যাটা বাধা দিয়ে বলল, "কি পরে জমিতে নামছিলা তুমি?"

যোগীবর বলল, "গামছা পরে গো' বলতে বলতে ওর গলার স্বর কেমন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হ'য়ে এলো।

আবার প্রশ্ন,—'কতক্ষণ ছিলা?"

যোগীবর বলল, 'ঘণ্টা দুই আড়াই।' যোগীবর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল।

অর্ধপথে বাধা দিয়ে কাজির ব্যাটা বলল, উঠেই বা কি দেখলে?

"আমি তেমন কিছু দেখি নাই" কেমন বেহুসের মত বলে যোগী এবং আসতি-আসতি কেমন লাগছিল আমার, অত খেয়াল ও করেনি। বাড়ী আইস্যা পরণের গামছা ধুইয়ে কাপড় পরার পর দেখতি পাই আমার দু ঠ্যাং বাইয়া রক্ত পড়তিছে।"—বলেই যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করে।

এবার একেবারে মোক্ষম প্রশ্ন করে বসল রোজাসাব—মাথাটা ঈষৎ দুলিয়ে দুলিয়ে।

'তোমার আশে পাশের ভুঁইতি কারা ছেল বাবা যোগী?'

নিতাইয়ের কাকা রবি গো'—বলে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল যোগীবর ও তৎসহ তার দিদি মালিনী।

সকলে কানখাড়া করে শুনছে সব। আর মনে মনে প্রমাদ গুণছে।

কাজির ব্যাটা বলল,—'রবি মাষ্টার হুঁ! তোমাদের সাথে না ওদের মামলা মোকদ্দমা চলছে।······হুঁ!'

'কিছু সরদার কাজির রায়ের অপেক্ষায় ছিল। এতক্ষণে তার রক্ত টগবগিয়ে উঠল: লেঠেল হলেও তার একটা ধর্ম আছে। কাজিসাব যখন রবি মাষ্টারের নাম করেছে তখন ওরই কাজ। ঐ রবিই বাণ মেরেছে যোগীকে। সহসা জনতাকে ঠেলে কাজিসাবের কানের কাছে মুখ নিয়ে কিছু সরদার বলল,—'তাহলি মোল্লার পো রব্যার মাথাডা আনতি পারি। যাই আমার লেঠেলদের হুকুম দেই!!'

জনতার মধ্যেও একটা চাপা গুঞ্জরণ শোনা গেল। না জানি কি লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যাবে—খুন-জখম, রক্তারক্তি! নিত্যানন্দদের দলের ভেনী সরদারও কথাটা শুনে এক ঝাঁকানি দিয়ে ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে দুহাত চালিয়ে প্রস্তুত। লেঠেলদেরও ইঙ্গিতে আদেশ করল। কিন্তু কাজিসাব রোষবহ্নি তুলতেই সকলে একটু থামল।

এবার সত্যি সত্যি কাজিসাব দেশলাই থেকে একটি কাঠি বের করে পাটখড়ি হাতে করল। রেকাবী হাতে এক মুঠো শ্বেত সরিষাও মুঠো করে ধরল। মুহূর্ত্তে কাজিসাবের চেহারা ভয়ঙ্কর রূপ নিল। বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে লাগল।

বিক্ষুব্ধ জনতা চুপ হয়ে এতক্ষণে একটু সরে সরে দাঁড়াল। যোগীবরও কেমন নিস্প্রাণতা কাটিয়ে প্রাণ পাচ্ছে। সে উঠে বসতে চেষ্টা করল।

পুনরায় রোজা আদিলদ্দি মোল্লা বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে চতুর্দিক তাকাতে লাগল। হঠাৎ একস্থানে তার দৃষ্টি পড়তেই যোগীবরের দিদি মালিনীকে ডেকে রোজাসাব আদেশ করল—'যোগীবর যে গামছাখানা পরে বিলে গেছিল দাও ত মা।'

—তক্তপোষের তলা থেকে দলা পাকানো গামছাখানা এনে যেইমাত্র মালিনী রোজার সামনে রাখল—জনতা দ্রুত পিছু হটে উচ্চস্বরে রামনাম জপতে লাগল।

রোজাসাব এবার মালিনীকে কিছুটা নুন আনার জন্য আদেশ করল। গামছাখানিতে তখনও তাজা রক্তের দাগ। সেই রক্তে মালিনীর দুহাত রক্তমাখা হয়ে গেছে। সে দৃশ্যে আবার লেঠেলদের মস্তিষ্কে খুন চাপল রক্তের নেশায়।

"খুনের বদলে খুন! ন্যায্য দাবী! ন্যায় বিচার। লেঠেলি পেশা!" বলে চেঁচাতে লাগল কিছু সরদার।

কিছুক্ষণ বাদেই মালিনী একমুঠো নুন নিয়ে হাজির! রোজাসাব তখন গামছাখানা জোরে এক ঝাড়া দিতেই ইয়ে প্রকাণ্ড এক রক্তখেকো জোঁক মাটিতে পড়ল। কাজিসাব অগত্যা নুন মুঠো মন্ত্র পড়ে জোঁকের মুখে দিতেই সে একটু নড়েচড়ে ধনু:কর মত বেঁকে গেল।

এদিকে নিত্যানন্দদের টিনের ও খড়ের চালা ভেদ করে কতিপয় সড় কি উর্দ্ধদিকে খাড়া হয়ে পুতে গেছে।

শ্রী'শ'—

বিলাতের চিত্রজগতে চিত্র প্রযোজক

শ্রীউমেশ মল্লিক (লণ্ডন)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দেখতে দেখতে দিন কাটতে লাগলো প্রায় ৬।৭ মাস। তবকে তবকে মাসে আসতে লাগলো ৫০০। ৬০০ টাকা বাড়ী থেকে। আসলে কিছু হচ্ছে না। দমে গেল মনটা। কৃষ্ণমেননের কাছে শেষ বারের মত হানা দিলাম। লোকে যাই বলুক'—কৃষ্ণ মেননের কাছে আমার অবারিত যাতায়াত ছিল। বললে একদিন "দাঁড়াও আমার মনে পড়ে গেছে একজন পুরাণ বন্ধুর কথা London school of Economics এর Sidney cole বলে একজন ক্লাস ফ্রেণ্ডের কথা। সে bilur এ কি করে যেন।"

বলতে বলতে টেলিফোন তুলতেই ইলিং ষ্টুডিওতে Cole মশাই এর পাত্তা পাওয়া গেল। দেখা করবার বন্দোবস্ত হ'লো কৃষ্ণমেননের আলাপ আলোচনায়। Cole একজন অতি নামকরা পরিচালক—প্রযোজক এবং চিত্র সম্পাদক। তার ছবি হ'লো "স্ক্যাসলাই" "স্কট্ অব্ দি এণ্টারটিক" ইত্যাদি বহু ছবি তার করা। দেখা তার সঙ্গে হতেই বললেন—২।৩ সপ্তাহ ইলিং ষ্টুডিওতে এসো তার পর কলকাতায় ফিরে যাও। মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। মুঠো মুঠো বাবার টাকা খরচ করে বাড়ী চলে যেতে হবে এতে দুঃখ রাখবার ঠাঁই থাকবে না। শিখিয়ে দিলে যে ঐ দেশে এ বিষয়ে টিকে থাকতে গেলে কাউকে যেন ঘৃণাক্ষরে আমি না বলি আমার আসল উদ্দেশ্য। কারণ এ দেশের লোক কোন বিদেশীকে এ দেশে থাকতে বা কোন প্রকার সুযোগ করে নিতে দেখতে চায়না—পয়সা রোজগার করা তো দূরের কথা। বললেন তিনি আমায়, পরে—সুযোগ কোথায় পেতে পারি তা তিনি জানাবেন। বিশেষ করে Sidnny Cole তখন এই সিনেমা জগতের union এর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। ইচ্ছে একটু করলেই তার পক্ষে আমাকে Union এ ঢোকাতে কোন প্রকার অসুবিধা ছিল না। আইন তাঁরা করেছেন। তা তাঁরাই ভাঙ্গতে রাজী নন। ভদ্র লোক নানান বিষয়ে প্রায় ১০।১৫ বার আতিথেয়তা গ্রহণ করেছেন আমার, কিন্তু কোন দিনই তার আইন ভঙ্গ করেন নি union ব্যাপারে। যা হোক মাস কেটে গেল, কোন সাড়া শব্দ নেই। দেখা হয়ে গেল ঘটনা চক্রে একজন জগৎবিখ্যাত চিত্র-পরিচালক এর সঙ্গে, নাম Thorold Dickinson সম্প্রতি কলকাতা থেকে ফিরেছেন। এঁর নাম করা ছবি "স্যাস্ লাইট্ মেন্ অব টু ওয়ালর্ডস্"। Cole এর ইনি বন্ধু। এঁকে গিয়ে ধরতেই এঁর সাহায্যে আর্থার ব্যাঙ্কের তখনকার সব থেকে মাথাওলা লোক Earl st john এর দয়ায় প্রথম ডেনহ্যম ষ্টুডিওতে ঢোকবার সুযোগ হ'লো। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার, সম্পূর্ণ আলাদা রাজ্য।

এখানে সত্যি দেখা হ'লো যা আশা করেছিলাম Sri Lawrenc oliver Tean sinnprs, stewart granger dian a dors, anna nigle প্রভৃতি সকলেরই সঙ্গে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের ছবিতে কাজ করছেন। এক একটা Devwan studoর সেটএ—(এখানে বলা হয় stage) এক একটা ছবি হচ্ছে এক সঙ্গে প্রায় ৭টা। অদ্ভুত কাজ করবার ক্ষমতা। অভাবনীয় গোছান ব্যবস্থা। বছরের কোন দিন কোন্ সেটএ কোন্ ছবি হবে, কে কে চিত্র তারকা কোন কোন দিন আসবে, সে দিনে এমন কি Hair dresser কে কে আসবে এ সমস্ত Krodrelion Office এ লেখা পড়া খুঁটিয়ে কাজের

মুক্তি প্রতীক্ষিত "তাহলে" চিত্রে

পাহাড়ী সান্যাল

বন্দোবস্ত যা আছে নিজে চোখে না দেখলে বুঝানো যাবে না।

আসে চিত্রতারক প্রত্যেকে সেই সকাল ৮টায়। স্টুডিওতে হাজিরা দিতে হয় এত সকালে।

স্টুডিওগুলো প্রায়ই সব লণ্ডনের বাইরে। বেশ দূরে। সুতরাং হাজিরা ৮টায় দিতে হ'লে উঠতে হয় সেই সকাল পাঁচটায়। তারপরে বাসে ট্রেনে সেই হাড়-কাঁপান শীতের মধ্যে ছুটতে হয় সময় মত স্টুডিওতে পৌঁছাতে গেলে। পৌঁছে যার যার কাজ সব ঘড়ি ধরে নিজের বিভাগে চলে যায়। Make up প্রভৃতি করে যখন সেটে এসে পৌঁছায় সব তখন বেলা দশটা। ধীরে [illegible] তালে পরিচালক মত সেই হিসাবে কাজ চলে। ছবির ফুটেজের সাধারণতঃ এখানে ৭০ মিনিট থেকে ১০০ মিনিটের ছবি হয়ে থাকে। এর মধ্যে রোজ সাধারণতঃ এই দীর্ঘতার ৭ মিনিট থেকে ৯ মিনিটের কাজ হ'লো স্ট্যানডার্ড। রোজকার কাজ হয়েছে বলে প্রযোজক সন্তুষ্ট হন। ছবির রাজ্যে দেখলাম সব সাম্যবাদ। সবাই সবাইএর নাম ধরে ডাকে।

আমার নাম নিয়ে Denham studioতে যেন একটা যেন রসিকতা শুরু হ'লো। প্রত্যেকে ইংরাজী উচ্চারণে ও—মেন্ বলে শুরু করলো। বেলা [illegible] এগিয়ে যখন স্টুডিওতে পৌঁছাতাম [illegible]

'যেতনা দূর ওতনা পাশ' চিত্রে

কে, এল সিং ও অশোককুমার

একবার চোখ পাকিয়ে দেখতো সব। কেউবা বলতো ঠাট্টা করে Good afternoon. নিয়ম এদেশে একবার ওপর-ওয়ালা যখন অনুমতি দিয়েছে তখন সেই অনুমতিকে শ্রদ্ধা করবার জন্য সে যেই হউক সকলে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। ফটকের দরওয়ান bow করে নমস্কার করা থেকে স্টুডিওর রেঁস্তরায় প্রযোজকদের খাবার টেবলে পর্যন্ত। রাজার হালে পাঁচজনের আদর সম্মান নিয়ে কাজ শিখতে লাগলাম। দেখলাম ২।৪ জন ইংরেজ ছেলে আমাকে দেখলেই চোখ ঠাওরে দেখছে। বুঝতে পারলাম না। মনে মনে ভয় হ'লেও নিজের গাম্ভীর্য্য রেখে আসা-যাওয়া করতে লাগলাম। বিলাতী রীতি হ'লো সব সময়ে নিজের পদ-মর্য্যাদা রেখে চলাফেরা করা। সম্মান এতে এখানকার লোকে তা করবে এমন কি আজকালকার দিনেও "মাননীয় মহাশয়" বলে সম্বোধনও করবে। সুতরাং কোন প্রকার উচ্চবাচ্য না করে রোজই আসি। বিরাট বিরাট সেট্। সারা সহরটা যেন সেটের মধ্যে তৈরী হয়ে গেল। ধন্য Art department। এটা না করলে উপায় নেই কেননা এ দেশের জল বায়ু এত অনিশ্চিত যে বলবার কথা নয়। কবে যে বরফ পড়তে শুরু হবে কে জানে। সুতরাং ঘর-বাড়ী পাহাড় পুকুর সব এই সেটের মধ্যে হয়ে থাকে। আমি একটা ছবির কাজ শিখছিলাম যেখানে সারা রিওডিজেনার এক অংশ সহরটা সেটের মধ্যে হয়ে গেল যেন।

যা হোক হঠাৎ পিছন ফিরে তাকাতেই দেখলাম Unionএর পাণ্ডা এসে দাঁড়িয়ে আছে। অতি মোলায়েম-ভাবে আমার এই স্টুডিওতে আসবার যে অনুমতি কে

দিয়েছে ইত্যাদি নানান প্রশ্ন করতে লাগলো। উত্তর পেয়ে তারা চলে গেল বেশ ভদ্রভাবে। ডাক পড়লো তারপর স্টুডিওর Managerএর Officeএ আমার। জানিয়ে দিল মালিক অনুমতি দিলেও স্টুডিওর Unionএর অনুমতি নেওয়া দরকার। সুতরাং Unionএর লোকদের কাছে গিয়ে বললাম যে পরের সপ্তাহে আমি কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। কিছু বললো না তারা। পরের সপ্তাহে আবার বললাম পরের সপ্তাহ। এ ভাবে লুকোচুরি চললো Unionর পাণ্ডাদের সঙ্গে। একদিন এমন সময় এলো যখন তারা যেন আমার অস্তিত্ব সরকারী ভাবে আছে বলে স্বীকার করলো না। ততদিনে Unionএর পাণ্ডাদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা জমে গেছে। আর কোন প্রকার উপদ্রব তারা করতে লাগলো না। দেখলেই বলতো তোমার কলকাতা যাবার জাহাজের টিকিট না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করবো না বাড়ী যাওয়া সম্পর্কে তোমার। আগেই বলেছি যে এ দেশের Studioগুলো সহর থেকে দূরে।

গাড়ী ভাড়া দিয়ে সেখানে পরিচালক এবং প্রযোজকদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে গেলে নিজের সম্মান বজায় রেখে অর্থাৎ তাদের সঙ্গে এক সঙ্গে বসে luncheon খেয়ে বা চা ইত্যাদিতে যোগদান করতে খরচ পড়ে সাধারণতঃ রোজ কম করে ১৫।২০ টাকা। ১০।১২৲ টাকা lunchএর দাম বড় বড় studioর রেস্তঁরাতে।

কলকাতায় আগে ছিল যেখানে প্রডাকসন্ কোম্পানী খাওয়ার খরচ দিত Unitএর। মনে পড়ে মুষ্টীযোদ্ধা রবীন সরকার এক একদিনে প্রায় ৩০।৪০ টাকা রুটী লুচি কলকাতায় ভারতলক্ষ্মী studioতে শ্রীঅর্দ্ধেন্দু মুখার্জ্জীর "পূর্বেরাগে"র Unit খেয়ে সোরগোল বাধিয়ে দেওয়ার কথা। আমরা একসঙ্গে সহকারী ছিলাম বিনা বেতনে। বিলাতে এ রকম Unitএর খাওয়ার খরচ দেয় না Locationএর কাজের জন্য বাইরে বা বিদেশে গেলে ছাড়া। তার জন্য Unionএর একটা rate বাঁধা আছে প্রত্যেকের মাথা পিছু। যাহোক বিলাতে এই রোজ ১০।১৫ টাকা খরচ ছাড়া ঘর ভাড়া প্রায় কমপক্ষে ৩০।৩৫ টাকা সপ্তাহে সপ্তাহে দিয়ে কাজ শিখতে পয়সা লাগে যা,তা অভাবনীয়। তবে অবশ্য Studioতে feature filmএর কাজ শেখবার সুযোগ করে নেওয়া এক রকম অসম্ভব। আমি বছর বছর কোন রকমে লুকিয়ে চুরি করে প্রায় ১২টি ছবির সঙ্গে কাজ শিখেছি। একদিন হুকুম হ'লো আমাকে আর ডেনহ্যাম Studi এ কাজ শেখবার অনুমতি দেওয়া হবে না। আবার মাথাওয়ালা Rankএর প্রতিষ্ঠানের Earl Sr Sohকে দিয়ে ধরলাম। সে হাসিমুখে বললো "তোমার মনে হয় না কি যে তুমি অনেকদিন এ স্টুডিওতে আছ ?"

বুঝতে বাকী রইলো না যে তার কথাবার্তায় কোথায় যেন একটু মৃদু আপত্তির সুর বেজে উঠেছে। সুতরাং সসম্মানে ডেনহ্যাম Studio থেকে বিদায় নিলাম। প্রত্যেকের কাছে বিদায় নিয়ে যখন অতবড় Studio ফটক পার হলাম তখন যেন চোখে জল এসে পড়েছে।

উর্দ্দীপরা দারওয়ানও ঘন ঘন shake hand করে আপ্যায়িত করলো, জানিয়ে দিল এই ক বছর আমাকে তাদের studioতে পেয়ে তারা কত আনন্দিত হয়েছিল। studioএর বাইরে বাসের জন্য অপেক্ষা করছি পিছনে একজন এসে কিউ করে দাঁড়ালো। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে জিজ্ঞাসা করলো ভারতবর্ষের কোথা থেকে আমি আসছি।

আলাপ হয়ে গেল তার সঙ্গে নাম হ'লো তার Brian Easdale সবে মাত্র Hollywood থেকে "Red Shoes" চিত্রে সঙ্গীতাংশের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার "Oscar" পেয়েছে। শুনেই আমার আবেদন একেবারে সরাসরি নিয়ে গেল সে National Studioতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক Michael powell এর কাছে। এইটি অদ্ভুতপ্রতিভাবান পরিচালক। তিনি আমাকে যাচাই করে বাজিয়ে দেখলেন সব রকমের প্রশ্ন করে। তারপর বললেন "আমার অন্ন যদি ধ্বংস না কর তাহ'লে আমার কাছে এস কাজ শিখতে।"

হাসিচ্ছলে এ কথাটা বললেন তিনি তার মত জগতে খুব কম পরিচালক আছেন যার প্রতিটি ছবি চিত্র জগতের অমূল্য সম্পদ যেমন :

১। Matter of life and deatt.

২। Black nareissus.

৩। Battle ofthe river

4। Plate the redshoes,

5। Gone to earth ইত্যাদি ইত্যাদি তাঁর ছবি হচ্ছিল The Elusive pimpernal. সেখানে ছবির নায়ক ডেভিড্ নিভেন্, মার্কিট লিট্ল প্রভৃতি। দুনিয়ার অনেক নাম করা ছবির চিত্র তারকার ভার সেখানে সুতরাং এঁর কাছে কাজ শিখতে লাগলাম। মধ্যে মধ্যে কাজের ফাঁকে ফাঁকে ইকন আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন আমাকে যদি এই দৃশ্যটার পরিচালনার ভার দেওয়া হয় তাহলে আমি কিভাবে পরিচালনা করবো। ইত্যাদি ইত্যাদি। এত বড় একজন পরিচালক ' The red studios ওর" আলয়ে যে সময় করে এই সব জিজ্ঞাসা করতেন বা আলাপ আলোচনা করতেন এতে বহু টেকনিশিয়ান আমাকে বলতো যে আমি অতি ভাগ্যবান লোক এ বিষয়ে। কেননা অনেকের চোখে মাইকেল পাওয়েল একজন দ্বিতীয় হিটলার। বিশেষ করে তখন তিনি Shoes film করে নাম করেছেন। Americaয় Gone with thewind ছবির মত সমান সমান The red shoesওর বক্স অফিসের কাটতি। এদের কাজ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা। এরা কেউ কলকাতার Studioর পরিচালকদের মত বিধি নিষেধ দিয়ে একেবারে একটা দৃশ্যের একজনের close np নিয়েই ছেড়ে দেয় না। কথোপকথনের সময় যদিও seript এ প্রধান চিত্র তারকার close upএর নির্দ্দেশ দেওয়া আছে তাহলেও এঁরা প্রধান চিত্র তারকা ছাড়াও অন্যান্যদের close up বহু mid shot ইত্যাদির ছবি নিয়ে থাকে এবং সম্পাদককে সুযোগ দেয় তার নিজের ক্ষমতা মত দৃশ্যটিকে নাটকীয় করে তুলবার। সব থেকে চোখে পড়ে এদের ঘন ঘন পরিচালক প্রযোজকদের সমাবেশ যাতে এরা বেশ বিশদভাবে আলোচনা করে ছবির কাজে এগিয়ে যেতে পারে। এখানে আর একটা কথা বলবার আছে যে এ দেশে Assistant Director অর্থাৎ প্রধান সহকারী পরিচালক একজন অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। কলকাতায় আমাদের সময় ছিল যেখানে প্রধান সহকারীর কোন প্রকার বিশেষ মূল্য ছিল না। এখানে পরিচালকের সুযোগ সুবিধার জন্যে সব রকম দায়িত্ব পূর্ণ কাজ প্রধান সহকারীর ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। সে চিত্র তারকাদের অভিনয়ের অংশ পড়ে রিহার্সাল দেওয়া কি "স্যুটিং" আরম্ভের পূর্ব্বে floor পরিচালনায় চিত্রতারকাদের দেখা শুনা করায় প্রডাক্সন ম্যানেজারের সঙ্গে সম্বন্ধ ভাবে "দিন্" Callcard দেওয়ায়, stand in দের ব্যবস্থাপনা করার প্রভৃতি যাবতীয় কাজে। এমন কি crowd Artist এর কে কে নির্ব্বাচিত হবে কোন কোন অংশে কোথায় তার নির্দ্দেশ দেওয়া পর্য্যন্ত। পরিচালক তাঁকে শুধু বলে দেন তিনি কি কি ধরণের লোক চান, কোথায় কখন। এবং তাঁর সঙ্গে camera man এর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে কোথায় কি Camera বসবে ইত্যাদি পরিচালক প্রথম সহকারীকে বলে সমস্ত বিষয় তার হাতে ছেড়ে দেন। প্রথম সহকারী বা প্রধান সহকারী তার কথা মত প্রত্যেকটি কাজ খাতায় লিখে নেন। পরিচালক যখন নিজের ঘরে বিশ্রাম নেন্ তখন প্রধান সহকারী lignting Camera man এর সঙ্গে যাতে পরিচালক এর আদেশ মত Camera বসাবার নির্দ্দেশ দেওয়ার কাজে কর্ম্মে হচ্ছে তা দেখেন।

আজকাল হয়তো কলকাতায়ও stand in এর ব্যবস্থা আছে। আমাদের সময় এ সব ছিল না। stand in মানে যখন lighting camera man আলোর নির্দ্দেশ দিচ্ছেন তখন চরিত্রের আসল অভিনেতাকে setএ দাঁড়িয়ে থাকতে না দিয়ে তাকে বিশ্রামাগারে পাঠিয়ে দিয়ে তারই মত দৈহিক গঠনের একজনকে চরিত্রের এমন কি makeup এবং পোষাক পরিয়ে দাঁড় করান হয় তারপর ছবি নেবার আগে যখন সব ঠিকঠাক তখন প্রধান সহকারী পরিচালক এবং আসল অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের ডাক দেয়। ছবি তোলার আগে পরিচালক lighting camera manকে আদেশ দেন তৈরী হবার জন্য lighting camera man আদেশ দেন camera operatorকে অর্থাৎ যিনি হাতে করে ক্যামেরা হাতোল ঘোরান তাকে। প্রধান সহকারী microphoneএর সাহায্যে সকলকে নিশ্চুপ হ'তে বলেন। লাল আলো—Red light জ্বলতে থাকে প্রধান সহকারী বলেন "roll on" রোল অন্ তারপর পরিচালক বলেন "Action" ছবি নেওয়া হ'তে থাকে।

[ক্রমশঃ

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

পূর্বভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা :

ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের ইন-ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ১৯৬৩ সালের পূর্ব্ব ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের একাধিক খ্যাতনামা খেলোয়াড় ছাড়াও মালয়েশিয়ার তিনজন খ্যাতনামা খেলোয়াড়—ইউ চেং হো, তান ই খান এবং এন জি বুন বী যোগদান করেছিলেন। মালয়েশিয়ার কোন খেলোয়াড়ই পুরুষদের ফাইনালে উঠতে পারেননি। সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষের ২নং খেলোয়াড় দীপু ঘোষ (ভারতীয় রেলওয়ে) ১৫-৬, ও ১৫-৮ পয়েণ্টে মালয়েশিয়ার এক নম্বর খেলোয়াড় ইউ চেং হোকে পরাজিত করেন। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় নান্দু নাটেকার (মহারাষ্ট্র) ৯-১৫, ১৫-৮ ও ১৫-১০ পয়েণ্টে তান ই খানকে পরাজিত করেন। মালয়েশিয়ার অপর খেলোয়াড় এন জি বুন বী তৃতীয় রাউণ্ডে ১৫-৫ ও ১৬-১৮ পয়েণ্টে ভারতীয় রেলদলের রমেন ঘোষের কাছে পরাজিত হ'ন। প্রতিযোগিতার মোট পাঁচটি অনুষ্ঠানের মধ্যে মালয়েশিয়ার খেলোয়াড়রা দুটি অনুষ্ঠানে জয়লাভ করেন—পুরুষদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসে ভারতীয় খেলোয়াড় সুনীলা আপ্তের সঙ্গে। প্রতিযোগিতার দুটি ক'রে অনুষ্ঠানের ফাইনালে জয়লাভ করেছেন ভারতবর্ষের সুনীলা আপ্তে (মহিলাদের সিঙ্গলস ও মিক্সড ডাবলসে) এবং মালয়েশিয়ার এন জি বুন বি (পুরুষদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসে)। পুরুষদের ডাবলস খেতাব পান বিশ্বের এক নম্বর ডাবলস খেলোয়াড় হিসাবে স্বীকৃত মালয়েশিয়ার তান ই খান এবং এন জি বুন বি।

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, মালয়েশিয়ার এই তিনজন খেলোয়াড়ই নিউজিল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত এ বছরের টমাস কাপ বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষকে শোচনীয়ভাবে ৮-১ খেলায় পরাজিত করেছিলেন।

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : নান্দু নাটেকার (মহারাষ্ট্র) ১৮-১৬, ১৫-১২ ও ১৫-৯ পয়েণ্ট দীপু ঘোষের (ভারতীয় রেলওয়ে) বিপক্ষে জয় লাভ করেন।

পুরুষদের ডাবলস : তান ই খান এবং এন জি বুন বি (মালয়েশিয়া) ১৫-৪ ও ১৫-৬ পয়েণ্টে নান্দু নাটেকার এবং সি ডি দেওরাসের (মহারাষ্ট্র) বিপক্ষে জয় লাভ করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : সুনীলা আপ্তে ১১-৪ ও ১২-১০ পয়েণ্টে সরোজিনী আপ্তেকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : সুনীলা আপ্তে এবং এন জি বুন বি ১৭-১৬ ও ১৫-৬ পয়েণ্টে সরোজিনী আপ্তে (রেলওয়ে) এবং এ আই শেখকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

পূর্বাঞ্চল এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা :

অল্ ইণ্ডিয়া এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশনের উদ্যোগে ভারতবর্ষে এক নতুন এ্যাথলেটিক স্পোর্টস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে—রায় দেওয়া

মীনাকুমারীর সৌন্দর্য্যের গোপন কথা...

'লাক্স আমার ত্বককে আরও লাবণ্যময় ক'রে তোলে'

— উনি বলেন।

'আমার রূপচর্চায় অপরিহার্য্য — লাক্স। লাক্সের নরম সরের মত ফেনায় আমার ত্বক আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। সুগন্ধি লাক্স ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করতে আমার মন ওঠে না। আপনারও তাই মনে হয় না?'

LUX TOILET SOAP

মীনা কুমারী, কমাল আমরোহীর 'পাকীজা' চিত্রের নায়িকা

লাক্স টয়লেট সাবান চিত্রতারকাদের প্রিয় বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্যসাবান

সাদা ও রামধনুর চারটি রঙে

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

হয়েছে আন্তঃ আঞ্চলিক এ্যাথলেটিক স্পোর্টস। এই আন্তঃআঞ্চলিক এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে যোগদানকারী অঞ্চলের সংখ্যা তিনটি—পূর্ব্বাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চল। পূর্ব্বাঞ্চলের ক্রীড়ানুষ্ঠান সম্প্রতি লক্ষ্ণৌতে হয়ে গেল। পূর্ব্বাঞ্চলের ক্রীড়ানুষ্ঠানে এই পাঁচটি দলের যোগদান করার কথা ছিল—পশ্চিমবাংলা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং সার্ভিসেস। কিন্তু উড়িষ্যা এবং সার্ভিসেস যোগদান করেনি।

লক্ষ্ণৌর পূর্ব্বাঞ্চলের এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে উত্তরপ্রদেশ পুরুষ বিভাগে এবং পশ্চিমবাংলা মহিলা বিভাগে বে-সরকারীভাবে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে। বে-সরকারীভাবে পুরুষ বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন বিহার রাজ্যের রমেশ তাওদে এবং মহিলা বিভাগে পশ্চিমবাংলার অনিতা মুখার্জি।

বিহারের রমেশ তাওদে প্রতিযোগিতায় বিশেষ ব্যক্তিগত সাফল্যের পরিচয় দেন। তিনি ১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান লাভ করেন। বিহার পুরুষ বিভাগে মাত্র চারজন এ্যাথলিট নিয়ে ৭টি অনুষ্ঠানে নেমে ৬টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান পায়। পশ্চিম বাংলা মহিলা বিভাগের ১০টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ৭টিতে যোগদান ক'রে ৬টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করে। পুরুষবিভাগে পশ্চিমবাংলা মাত্র একটিতে প্রথম হয়। সুতরাং পশ্চিম-বাংলার প্রথম স্থান লাভের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭টি। পশ্চিম-বাংলার অনিতা মুখার্জি লং জাম্প ও জ্যাভেলিনে প্রথম এবং ১০০-ও ২০০ মিটার দৌড় ও সটপুটে দ্বিতীয় স্থান পান।

মহিলা বিভাগের অনুষ্ঠানে মাত্র দুটি দল—পশ্চিমবাংলা এবং উত্তর প্রদেশ যোগদান করেছিল।

পশ্চিমবাংলা পূর্ব্বাঞ্চলের এই এ্যাথলেটিক প্রতিযোগি-তায় যে যে অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করছে তার ফলাফল নীচে দেওয়া হল:

মহিলা বিভাগ: ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে এম হোল্ডার (রেঞ্জার্স ক্লাব) প্রথম; লং জাম্প এবং জ্যাভেলিনে অনিতা মুখার্জি (সিটি এ্যাথলিটিক ক্লাব) প্রথম; ৮০ মিটার হার্ডলসে নমিতা ঘোষ (২৪-পরগণা) প্রথম; ৪ × ১৮০ মিটার রীলে রেসে পশ্চিমবাংলা প্রথম।

পুরুষ বিভাগ: লংজাম্পে শিশুতোষ মুখার্জি (ইষ্টবেঙ্গলক্লাব) প্রথম।

বে-সরকারী দলগত চ্যাম্পিয়ানসিপ

পুরুষ বিভাগ: ১ম উত্তর প্রদেশ (১০০ পয়েণ্ট)। ২য় বিহার ৪৮ পয়েণ্ট; ৩য় পশ্চিমবাংলা ২০ পয়েণ্ট

মহিলা বিভাগ: ১ম পশ্চিমবাংলা ৫৬ পয়েণ্ট।

দলীপ সিংজী ট্রফি:

আঞ্চলিক নক্-আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় (দলীপ সিংজী ট্রফি) পূর্ব্বাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসে মধ্যাঞ্চল দল অপেক্ষা বেশী রান করার কৃতিত্বে সেমিফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। মধ্যাঞ্চল দলের অধিনায়ক কিষেণ রুংটা টসে জয়লাভ করেও প্রথম ব্যাট করার সুযোগ গ্রহণ করেননি। মধ্যাঞ্চল দলে ছিলেন দু'জন ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড় বিজয় মঞ্জরেকার এবং সেলিম দুরাণী। অপরদিকে পূর্ব্বাঞ্চল দলে ছিলেন প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় পঙ্কজ রায় (পূর্ব্বাঞ্চলের অধিনায়ক)।

প্রথম দিনের খেলায় পূর্ব্বাঞ্চল দল ৫ উইকেট খুইয়ে ৩৫০ রান করে। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে প্রকাশ পোদ্দার এবং শ্যামসুন্দর মিত্র দলের ১৩৪ রান তুলেন। দলের ১২৮ রানের মাথায় তৃতীয় উইকেট পড়েছিল।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় ৪৩০ রানের মাথায় পূর্ব্বাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয় এবং খেলার বাকি ১৭৫ মিনিটে মধ্যাঞ্চল দলের ১ উইকেট পড়ে ১৫৪ রান ওঠে।

তৃতীয় দিনের খেলার এক সময় পর্য্যন্ত মধ্যাঞ্চল দলের রান ছিল ২৩৫, ২টো উইকেট পড়ে। কিন্তু এই ২৩৫ রানের মাথায় চতুর্থ ও পঞ্চম উইকেট পড়ে যায়। এবং মাত্র ৪ রান যোগ হওয়ার পর ২৩৯ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে। মধ্যাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ৩২১ রানে শেষ হয়। তাদের এই কাহিল দশায় ফেলেন অনিল ভট্টাচার্য (১০৫ রানে ৫ উইকেট) এবং কল্যাণ মিত্র (৪৯ রানে ২টো উইকেট)।

পূর্ব্বাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসের খেলায় ১০৯ রানের ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় তারা সেমি-ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল দলের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাটা নিছক নিয়মতান্ত্রিক ব্যাপার। দ্বিতীয় ইনিংসে তারা ৫টা উইকেট খুইয়ে ১৬৭ রান করে।

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পূর্ব্বাঞ্চল: ৪৩০ রান (প্রকাশ পোদ্দার ১০৪, শ্যাম-সুন্দর মিত্র ৭৭ এবং অম্বর রায় ৬৬। সেলিম দুরাণী ১০৪ রানে ৩ এবং রাজসিং ১০৮ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৬৭ রান (৫ উইকেটে। শ্যামসুন্দর মিত্র ৬৪ এবং কল্যাণ মিত্র ৪২)

মধ্যাঞ্চল: ৩২১ রান (হনুমন্ত সিং ৮৩, দেশপাণ্ডে ৬৮। অনিল ভট্টাচার্য্য ১০৫ রানে ৫ এবং কল্যাণ মিত্র ৪৯ রানে ২ উইকেট)।

অষ্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা:

অষ্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন মাঠের অষ্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম বে-সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি ড্র গেছে। পুরো পাঁচদিন খেলা হয়নি। মুষলধারে বৃষ্টি নামায় তৃতীয় দিনে খেলাই হয়নি এবং একই কারণে খেলার পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনের [illegible] পর [illegible] খেলা হয়ে একেবারে খেলা বন্ধ ক'রে দিতে [illegible]।

প্রথম দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ৫ উইকেট প.ড় ৩৩৭ রান ওঠে। ও' নীল এবং ব্রায়ান বুথ ৪র্থ উইকেটের জুটিতে দলের ১০ রান তুলেন। এবং ৫ম উইকেটের জুটিতে রিচি বেনো এবং বুথ ৭৬ মিনিটের খেলায় ১০২ রান করেন। প্রথম দিনে বুথ ১২৮ রান ক'রে নটআউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৪৩৫ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিনে তাদের বাকি ৫টা উইকেট পড়ে মাত্র ৯৮ রান যোগ হয় প্রথম দিনের ৩৩৭ রানের (৫ উইকেটে) সঙ্গে। বুথ দলের সর্ব্বাধিক ১৬৯ রান করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ১৫৭ রান তুলে, ৪টে উইকেট খুইয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসের সূচনায় অষ্ট্রেলিয়ার ন্যাটা ফাস্ট বোলার আয়ান মেকিফের প্রথম ওভারের চারটে বল আম্পায়ার কলিন এগার ছুড়ে বল করার অভিযোগে 'নো বল' ডাকেন। ফলে দলের অধিনায়ক রিচি বেনো খেলায় আর মেকিফকে বল করতে ডাকেননি। মেকিফের টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবন এইখানেই খতম হয়ে যায়। মেকিফ সম্বন্ধে ছুড়ে বল করার অভিযোগ পুরনো দিনের কথা। ১৯৫৮-৫৯ সালে এম সি সি দল অষ্ট্রেলিয়া সফরে এসে তাঁর বল দেওয়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে আপত্তি করেছিল। তার আগে মেকিফ বিভিন্ন দলের বিপক্ষে ১৭টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন কিন্তু এ সব টেস্ট খেলায় তাঁর ছুড়ে বল করা সম্বন্ধে কোন অভিযোগই ছিল না। এম সি সির এই আপত্তির কারণে মেকিফ গত তিন বছর অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট দলে স্থান পাননি। বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মেকিফ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে চিরতরে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

বৃষ্টির দরুণ তৃতীয় দিন খেলা বন্ধের পর চতুর্থ দিনের খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস ৩৪৬ রানে শেষ হয়। ফলে অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের রানের ভিত্তিতে ৮৯ রানে অগ্রগামী হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার এডি বার্লো এবং উইকেট-কিপার জন ওয়েট ৫ম উইকেটের জুটিতে দলের ৮২ রান তুলে দলকে শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছিলেন। বার্লো ৫ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট খেলে দলের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ রান (১১৪ রান) করেন।

চতুর্থদিনের বাকি সামান্য খেলার সময়ে অষ্ট্রেলিয়া কোন উইকেট না হারিয়ে ২৫ রান করে। ফলে তারা ১১৪ রানে অগ্রগামী হয়।

পঞ্চম দিনে লাঞ্চের সময় অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। তখন তাদের রান ১৪৪ (১ উইকেট পড়ে)। অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বোনার এই ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা খুবই খেলোয়াড়সুলভ হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা হাতে খেলার সময় পেয়েছিল ২৪০ মিনিট এবং এই সময়ে তাদের জয় লাভের জন্যে প্রয়োজন ছিল ২৩৪ রানের। অর্থাৎ মিনিটে একটা ক'রে রান করার চ্যালেঞ্জ। লাঞ্চের পর সামান্য সময় খেলা হয়েছিল। এই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার একটা উইকেট পড়ে গিয়ে ১৩ রান উঠেছিল।

অষ্ট্রেলিয়া: ৪৩৫ রান (ব্রায়ান বুথ ১৬৯, ও'নীল ৮২, বেনো ৪৩ এবং লরী ৪৩। পোলোক ৯৫ রানে ৬ উইকেট) ও ১৪৪ রান (১ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড; লরী ৮৭ রান)

দক্ষিণ আফ্রিকা: ৩৪৬ রান (নডি বার্লো ১১৪, ওয়েট ৬৬ এবং গডার্ড ৫২ রান। বেনো ৬৮ রানে ৫ উইকেট) ও ১২ রান (২ উইকেটে)।

ডুরাণ্ড কাপ ঃ

১৯৬৩ সালের ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে মোহনবাগান ২—০ গোলে অন্ধ্র পুলিস দলকে পরাজিত ক'রে পূর্ব্ব পরাজয়ের শোধ নিয়েছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা গোলশূন্য অবস্থায় ড্র যায়। ১৯৫০ ও ১৯৬১ সালের ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে অন্ধ্রপুলিস দল (পূর্ব্বনাম হায়দরাবাদ পুলিস) যথাক্রমে ১—০ ও ১—০ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করেছিল। ১৯৬২ সালে প্রতিযোগিতা দেশের জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধ রাখা হয়েছিল। সুতরাং মোহনবাগান এবং অন্ধ্রপুলিস দল উপর্যুপরি দু'বার ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেললো। এ পর্য্যন্ত মোহনবাগান ডুরাণ্ড কাপের ফাইনালে খেলেছে ৬ বার এবং ডুরাণ্ড কাপ পেয়েছে ৪বার (১৯৫৩, ১৯৫৯, ১৯৬০ ও ১৯৬৩)। অন্ধ্রপুলিস দল ৭বার ফাইনালে খেলে ৪বার (১৯৫০, ১৯৫৪, ১৯৫৭ ও ১৯৬১) ডুরাণ্ড কাপ জয় করেছে।

১৯৬৩ সালের দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে মোহনবাগান দলের অধিনায়ক চুনী গোস্বামী প্রথমার্দ্ধের ২২ মিনিটে এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১৬ মিনিটে গোল করেন। সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ১—০ গোলে সি আই এল দলকে পরাজিত করে। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে অন্ধ্র পুলিস দল ২—১ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করেছিল।

Sri Aurobindo on Social sciences and Humanities—

(an Anthology Compiled by Sri Kewal L. Motwani)

শ্রীঅরবিন্দের রচনা দিব্য অনুভূতির প্রকট দ্যুতি। বহু বিস্তৃত তাঁর চিন্তার পরিধি, অতলস্পর্শ তার গভীরতা। তাঁর চিন্তার সূক্ষ্মতা ও ভাষার নৈপুণ্য শুধু গভীর মনোযোগ আর প্রদীপ্ত বুদ্ধিরই অধিগম্য।

কিন্তু তাঁর রচনা থেকে সংগৃহীত রত্নরাজি যোগীরাজ অরবিন্দের অন্তর্দৃষ্টি, কবিত্ব, যোগশক্তি যেন একত্র সমাবিষ্ট করে পাঠকের সামনে স্থাপিত করেছেন সংকলক অধ্যাপক মটোয়ানী,—যার মধ্যে কঠিনতার দুর্বোধ্যতা আর দুর্ভেদ্যতা নেই ; আছে মূল্যবান্ সম্পদ-সঞ্চয়নের অপরূপ চাকচিক্য—যা পাঠকের চোখ ধাঁধায় না, জুড়িয়ে দেয় স্নিগ্ধ জ্ঞানের আলোক-লালিত্যে। অধ্যাপক মটোয়ানী বলেছেন :

Sri Aurobindo gave to the world an exquisite synthesis, deep spiritual and religious truths concerning man and the universe, a penetrating insight into the working of the occult and mystic in the life of both a vast cosmic vision translating the puissance of its being into human terms, a sublime scintillating beauty of expreience, suffused with magic of healing and transformation, all emerging from the depths of heights of his own experience of the Eternal."

অধ্যাপক মটোয়ানীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। তথ্যের প্রাচুর্যে, চিন্তার গাম্ভীর্যে, প্রকাশভঙ্গির মহত্ত্বে, আত্মদর্শনের গৌরবেও ঐশ্বর্যে শ্রীঅরবিন্দের অবদান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাসে অতুলনীয়, অনবদ্য, অভূতপূর্ব। শ্রীমটোয়ানীর সংকলন পাঠে পাঠক-মাত্রেই এই সত্যের সঙ্গে পরিচিত হবেন ইহাই আমাদের স্থির বিশ্বাস।

গ্রন্থের ছাপ, বাঁধাই প্রশংসার দাবী রাখে।

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

[প্রকাশক—ওরিয়েন্ট লঙ্ম্যানস্, মাদ্রাজ। মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।]

দেবতার ডাক (গল্প গ্রন্থ)—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

এই গল্প গ্রন্থের লেখক শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—সর্ব্বজনপরিচিত প্রবীণ কবি ও সাহিত্যিক—গদ্য ও পদ্যে সব্যসাচী। গদ্যে ইনি বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে তাঁহার ধর্ম্ম চিন্তা ও আধ্যাত্মিক অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থে ১৩টি ছোট গল্প আছে। গল্প গুলি ইতিপূর্ব্বে 'উজ্জীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময়ে পাঠকপাঠিকা মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। গল্পগুলির মধ্যে অলৌকিক ও অনন্যসাধারণ কাহিনী আছে। প্রত্যেক গল্পের মধ্যে বৈষ্ণবতত্ত্ব ও সাধনার কথা আছে। নামের প্রভাবে যে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায় এবং নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ রূপে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দেন ও লীলা করেন, তাহাই গ্রন্থের বিভিন্ন আখ্যায়িকার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

গ্রন্থখানির ভাষা সরস ও মর্ম্মস্পর্শী। কবির কলমে গদ্য যে মধুর রূপ ধারণ করে, সেই রূপই গল্প গুলিকে সুখপাঠ্য করিয়াছে। এই গল্পগুলির উপজীব্য বাস্তব সত্য নয়—ধর্ম্ম জগতেরই উপভোগ্য, অনধিকারীদের জন্য নয়। অধিকারীরা গল্পগুলি পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিবেন। মূল্য—তিন টাকা শ্রীকালিদাস রায়

[প্রকাশক—শ্রীবলরাম ধর্ম্মসোপান পোঃ খড়দহ, জেলা ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ]

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শক্তিপদ রাজগুরু প্রণীত উপন্যাস "জীবনকাহিনী"—৪·৫০

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু"—২·৫০

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত দার্শনিক-সন্দর্ভ "উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম" (৩৩শ সং)—২·০০

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত কিশোরদের জন্য "মজার মজার খেলা"—৩·০০

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস "দ্বিচারিণী"—২·৭৫

শ্রীমধুসূদন মজুমদার প্রণীত ছেলেদের "বিল্বমঙ্গল"—০·৭০, "রূপ-সনাতন"—০·৭০ ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত "ছেলেবেলার গল্প"—৩·০০

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ৩০।১২।৬৩ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষের সূচী

একপঞ্চাশত্তম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় সংখ্যা

মাঘ—১৩৭০

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্রসূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

বাঁশরি

শিল্পী—ভবানীচরণ লাহা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

মাঘ—১৩৭০

দ্বিতীয় খণ্ড | একপঞ্চাশত্তম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

'শান্তিনিকেতন' পাঠের ভূমিকা

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর ত্রয়োদশ খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয়ে পড়ি যে শান্তিনিকেতন সতেরো খণ্ডে ১৯০৯-১৬ সালে প্রকাশিত হয়। ১৩১৫ অগ্রহায়ণ হ'তে ১৩২১ পৌষ পর্য্যন্ত শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও অন্যত্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ যে সকল উপদেশ দিয়েছিলেন তারই অধিকাংশ সংগৃহীত ও সম্পাদিত হয়ে বেরিয়েছিল পুস্তকাকারে। অনেকগুলিই ছিল মৌখিক ভাষণ এবং কবি কর্তৃক পুনর্লিখিত হয়েছিল, আর কতকগুলি গোড়া থেকেই লিখিত ভাষণ ছিল।

'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধগুলি নতুন করে পড়তে গিয়ে যুগ-যুগের ওপার হতে এলোমেলোভাবে একটি কথা স্মরণে আসছে। তখনি সুপ্রতিষ্ঠিত একজন নবীন শক্তিমান্ কথাসাহিত্যিক তাঁর সৃষ্ট এক চরিত্রের মুখ দিয়ে বলছেন (অবশ্য আইনের ভাষায় obiter dictum বা প্রক্ষিপ্ত—ভাষণ)—ওরে মূঢ়, বক্তৃতার দ্বারা প্রেমের প্রচার হয়না—পুঁথিগত তত্ত্ব আওড়ালে মানুষের মন ভোলে না, উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। পরমহংস বলো, টলষ্টয় বলো, গান্ধী বলো—ওই এক নজীর। ওই নজীরটা চিরস্থায়ী দাঁড়িয়ে আছে বলেই রবিঠাকুরের "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থের পাঠক সংখ্যা কম। এতে কাব্য আছে, পরমাত্মিক কল্পনার

অপরূপ সৌন্দর্য আছে, শুচিশুদ্ধ অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রকাশ-মহিমা আছে।" সঙ্গে সঙ্গে একথাও পড়ছি···রবিঠাকুর যদি সোনারতরী আর চোখের বালির আদর্শ নিয়ে থাকতেন তবে তাঁর হতো সাহিত্যিক অপমৃত্যু। তিনি ত্রিকালজ্ঞ, নব নব নবান্ন যুগিয়েছেন আমাদের পাতে। মানুষের বিচিত্র রুচির প্রতি এত বড় সম্মান বোধহয় আর কোনো আর্টিষ্ট এর আগে প্রকাশ করেন নি। তাই ভদ্রলোক বৃদ্ধ হয়েও আজো নবযৌবনের দূত, প্রতিদিন নিজের সৃষ্টিকে তিনি অতিক্রম করে চলেছেন, তাঁর প্রতি রচনায় গতিশীল কাল নিজের ছায়া ফেলেছে।

প্রত্যেক লেখকেরই নিজের মত ব্যক্ত করার অধিকার আছে। 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালায় কবির পার্ট কী সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, সেখানে 'নজীর' আছে কী 'নজর' আছে সে নিয়েও তর্ক হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু গতিশীল কালের পিছনে মহাকালের যে এক স্থিতিশীল রূপ আছে— তার সন্ধানও কী কবি দেননি। তাঁর কবি-চেতনায় উদ্ভাবিত হয়নি কি অস্পষ্টভাবেও এক কল্যাণতম রূপ—শুধু রুদতী ধরিত্রীর ছায়া নয়, এক আনন্দ যজ্ঞের নিমন্ত্রণও। রবীন্দ্রনাথ গতির কবি, বলাকার সঙ্গে তিনি উধাও হয়ে যান নিরুদ্দেশের পানে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থিতিরও কবি, দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের কবি। গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন রস যেমন তাঁকে উৎফুল্ল করে, তেমনি আকাশের এক নিস্তব্ধ শান্ত অনুভবও। রবীন্দ্রনাথের কাছে দুই-ই গভীর ভাবে সত্য—

শুক বলে সমাধিতে স্তব্ধ গিরির দৃষ্টি
সারী বলে মেঘমালার নিত্য নূতন সৃষ্টি

কবি হচ্ছেন রূপকার, তিনি তাপস, তিনি একা, তাই তাঁহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে দেখা—তিনি জানেন—

চুকিয়ে দিয়ো তোমার দেয়
রিক্ত হাতে চলিয়ে যেয়ো
করোনা দাবী ফলের অধিকার

সিদ্ধ বাউলের ভাষায় বলা যায়—

কাজলে আর করবে কত যদি নয়নে নজর না থাকে
প্রেম যদি না মিললো খ্যাপা
তবে সাধনভজন কদিন রাখে

এই 'নজর'ই 'নজীর' খাড়া করে, শুধু কৌপীনবন্তরাই ভাগ্য-বন্ত নয়। রসসাধকদের বোঝাও ভগবান বহন করেন, তবে 'রসেবশে' থাকতে হয়। রবীন্দ্রজীবনীকার পরম-শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'শান্তি-নিকেতন' ভাষণগুলিকে ধর্ম বিষয়ক 'উপদেশমালা' বলে অভিহিত করে প্রশ্ন তুলেছেন—ধর্মদেশনায় কবির কী অধিকার? তিনি নিজেই জবাব দিচ্ছেন—এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের সন্দেহ ছিল এবং আজও সকলের সে বিষয়ে দৃষ্টি সংস্কারমুক্ত হয়নি—আপত্তি-কারীদের অভিযোগ এই যে, রবীন্দ্রনাথ ধনীর পুত্র, কবি, ভাববিলাসী আর্টিষ্ট, ধর্ম সম্বন্ধে তিনি কোনো গুরু-উপদেশ গ্রহণ করেন নি, ধর্ম বিষয়ে তাঁর ভাষণ ভারতীয় কোনো দার্শনিক মতবাদ সমন্বিত নয়। তাই তাঁর ধর্মবিষয়ক রচনাদি বস্তুতন্ত্রহীন···কবিরা যে কখনো নিজেদের আদর্শকে কর্মে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছেন ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাইনা। বোধহয় তার একমাত্র ব্যতি-ক্রম রবীন্দ্রনাথ (টলষ্টয়, শ্রীঅরবিন্দ, রোমারোঁলা—যারা সাধকও বটে, সাহিত্যিকও বটে?)। সমগ্র জীবনের যে একটি পরিপূর্ণতার আদর্শ তাঁর অন্তরে ছিল তাই তার ধর্ম। সে ধর্ম ভাবাত্মক মতবাদ, সৌখিন ভাববিলাস নহে। কবির ধর্মমত কঠিন আত্মশাসনের ও সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত। তথাচ উহা সর্বসাধনোপযোগী। কবির ধর্ম নিখিল জ্ঞানের সমন্বয়, জীবনের আপাতবিরুদ্ধ অর্থহীনতা ও বৈপরীত্যের সামঞ্জস্যসাধন, মানুষের সকল বৃত্তি সুসংগত-ভাবে সুপুষ্ট হবার সুযোগদান। মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশই এই ধর্মজীবনের আদর্শ। কোনো ইন্দ্রিয়কে কৃশ করা নহে, মনকে উপবাসী করা নহে, আত্মাকে শূন্যতার মধ্যে নিক্ষেপ করা নহে—এই হচ্ছে নব-যুগের ধর্মবোধ।'

কিন্তু 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধ বা ভাষণগুলিকে শুধু উপদেশমালা বললেই সম্পূর্ণ করে দেখা হলো কিনা সে বিষয়ে গুরুতর সংশয় থেকে যায়। কবির নিজের ভাষতেই বলতে ইচ্ছে করে—

দেখো ত চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কিনা

উত্তরে বলা যায়

দেখেছিলাম সুপ্ত আগুন লুকিয়ে জ্বলে

তোমার প্রাণের নিশীথ রাতের
অন্ধকারের গভীর তলে।

স্মরণ রাখতে হবে যে এই 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালাগুলি মোটে কয়েকটি বছরের সংকলন—মোটামুটি কবির পরিণত বয়সের একটি প্রজ্জলন্ত দীপশিখা—সাত বছর যার আয়ু। কিন্তু কবি নিজে যে অমিতায়ু—তাই তাঁর বোধনমন্ত্রে তন্দ্রালস বায়ু প্রাণবান হয়।

এই প্রবন্ধমালার পিছনে রয়েছে কবিজীবনের আবাল্য ইতিহাস, তাঁর কুলগত সংস্কার, শিক্ষাদীক্ষা মনীষা উপনিষদ বৈষ্ণব-বৌদ্ধ শাক্ত চেতনার ইঙ্গিত, প্যাগান ও ইউরোপীয় বিজ্ঞান বস্তুতন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রভাব, ব্রাহ্মসমাজের আবেদন, ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ের সমন্বয় চেষ্টা, বিশেষকরে মধ্যযুগীয় সন্তদের—তা ছাড়া কবির নিজের একটা সর্বজনীন আদর্শের প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ রঙীণ মন, যা পাতা নড়ে, জল পড়ে থেকেও বিচিত্রতার আস্বাদন পায়, বিস্ময়ে যাঁর প্রাণ জেগে ওঠে, এক সর্বগ্রাসী চেতনায় —যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে—সে ছুটেছে মহাসাগরের পানে দু বাহু বাড়ায়ে। ওদেশের এক কবি গেয়েছেন—

To me, the meanest flower that
blows can give
Thoughts do often lie too deep for tears.

কবিজীবনের এই যুগ যখন উগ্র স্বদেশী আন্দোলন একদিকে স্তিমিত হয়ে আসছে, আর একদিকে রূপান্তরিত হচ্চে এক উগ্রতর পন্থায়, দেখি কবি সক্রিয় রাজনীতির পথ থেকে থিদায় নিচ্চেন ধীরে ধীরে, তাঁর চিত্তে ঋতু পরিবর্তন হচ্চে—

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই
কাজের পথে আমি ত আর নাই
তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে
সে সব মিছে হয়েছে মোর কাছে
রত্ন খোঁজা রাজ্য ভাঙা গড়া
মতের লাগি দেশবিদেশে লড়া
আলবালে জল সেচন করা
উচ্চশিখা স্বর্ণ চাঁপার গাছে
পারিনে আর চলতে সবার পাছে

'শান্তিনিকেতন' পর্বের পিছনে যেমন নৈবেদ্য, খেয়া, স্বদেশী যুগের অপূর্ব গানগুলি, সামনে ও সমান্তরাল ভাবে তেমনি গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালির আলেখ্যগুলি। সঙ্গে সঙ্গে কবি লিখছেন "গোরা"—যাকে বলা হয়েছে—an epic of India in transition—লিপিবদ্ধ করছেন জীবনস্মৃতি, লিখছেন শারদোৎসব, অচলায়তন, রাজা, ডাকঘর। শোক আসছে, মৃত্যু দিচ্চে আঘাত তবু—

কবির হিয়ায় চলছে রসের খেলা

প্রভাতবাবু বলেছেন—'শান্তিনিকেতন' ভাষণগুলির মধ্যে গীতাঞ্জলির ভাবধারা সুপ্ত—সেগুলি আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে বোধিকেও উদ্বুদ্ধ করে। 'ডাকঘরের' কথায় কবি বলেছেন —শান্তিনিকেতনের ছাদের উপর মাদুর পেতে পড়ে থাকতুম। প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে।··· কিন্তু হঠাৎ কি হল, রাত দুটো তিনটেয় অন্ধকার যেন পাখা বিস্তার করল···যাই যাই মনে একটী বেদনা জেগে উঠল···আমার মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে, হয়তো মৃত্যু। ঘটেছিল একটা কিছু, একটি অপরূপ নাটক সৃষ্টি হ'ল—নাম তার ডাকঘর। এরই অভিনয় দেখে মহাত্মাজী চোখের জল রাখতে পারেননি। এই সৃষ্টিকেই আমি বলবো আধ্যাত্মিক জগতের অনুভূতিময় একটি সংকেতের (symbol) ভাবময় (emotional) প্রকাশ।

প্রভাতবাবুর লেখাতেই পড়েছি যে শান্তিনিকেতনের উৎসব আয়োজনের মধ্যে মহর্ষির এক প্রিয় শিষ্য ও ভক্ত-অনুরাগী বলেছিলেন যে সবই দেখছি, দেখছি না কেবল বরকে (দুলহাকে)। রবীন্দ্রনাথের হাতে নৈবেদ্যের সেই নৈর্ব্যক্তিক জীবন দেবতা (that ever evolving personality) ক্রমশঃ খেয়ার দুলহা হয়েছেন এবং সেই প্রিয়ই দেবতার রূপ নিলেন গীতাঞ্জলিতে—তখন তিনিই গীত-গোবিন্দ, আমোদিত দামোদর, সুপ্রিয় পীতাম্বর, যিনি তপের তাপের দগ্ধ দিনে শ্যামল বধূর স্পর্শ নেন, যার জন্য চোখের জলে ভিজে যায় পায়ের ধূলো যত। যে দেবতা ছিলেন অব্যক্ত তিনিই হয়েছেন ব্যক্ত, যুগে যুগে তার জন্য শুধু রাজপুত্ররাই ছিন্নকন্থা পরেনা, প্রতিটি মানবযাত্রী ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাত তুচ্ছ করে অন্তরের দীপটি জ্বালিয়ে এগিয়ে চলে। ১৩২১ সালে লেখা গীতালির শেষ কবিতা—শান্তি-নিকেতন প্রবন্ধগুলিরও শেষ কথা—

এই তীর্থ দেবতার মন্দির-প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন ; যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারাজীবনের অন্তরের অনির্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যাদীপ মুখে
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি যত। তোমরা এসেছ এ জীবনে
কেহ প্রাতে কেহ রাতে, বসন্তে শ্রাবণ-বরিষণে
কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ-বা কম্পিত
দীপশিখা
এনেছিল মোর ঘরে ; দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বারে বারে এনেছ প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েছ চলে
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবার প্রণাম।

রবীন্দ্রনাথ হচ্চেন জীবনশিল্পী—তিনি মায়ার নূতন সংজ্ঞা দিলেন—মায়া হচ্চে চারিদিকের আপাত-প্রতীয়মান দ্বন্দ্ব- এর উত্তর হচ্চে হার্মনী বা সমন্বয় বা সমীকরণ, সামঞ্জস্য বিধান—মিলিয়ে দাও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সমাজ প্রকৃতিকে—অন্তর চেতনার সঙ্গে বহিপ্রকৃতিকে—দেখবে দ্বন্দ্ব নেই, সেই দ্বন্দ্বও নেই মায়াও নেই। আবার অন্য-দিক দিয়ে দেখতে গেলে মায়ার অর্থই হচ্চে "মিত" হওয়া—নামরূপসীমার মধ্যে অসীমকে পাওয়া বা আবদ্ধ করা—আসলে সীমা হচ্চে অসীমেরই প্রকাশ, অনন্তেরই সান্ত স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্মসাধনা আবেগ নয়, উন্মাদন নয়, তবে ভাবঘন, প্রেমঘন, প্রজ্ঞাঘন, রসঘন, শান্ত ভাবনাময় ব্রহ্মবিহার, উল্লাস ভিতরের অন্তরঙ্গের, বহিরঙ্গের নয়।

সম্বরিয়া ভাব অশ্রু-নীর
চিত্তরবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর

নৈবেদ্যপর্বের এই উক্তি গীতাঞ্জলি-শান্তিনিকেতন যুগে একটু যেন বেশ ভাবঘন প্রেমঘন প্রজ্ঞাঘন রূপ যে নিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—"উচ্ছলফেন" অবশ্য নয়, তবে ভাবের ললিত ক্রোড়ে নিলীন, কারণ, ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা করেছেন কবি। অবশ্য তন্ময় হয়ে সমাধিস্থ বা বুঁদ হওয়াই তাঁর কাছে চরমপ্রাপ্তির সিদ্ধান্ত নয়। তাঁর ব্রহ্মবিহার হচ্চে বৃহতের মধ্যে নিমজ্জন, আকণ্ঠ আস্বাদন। তাই তিনি ব্রাহ্ম উৎসবকে বলেন ব্রহ্ম-উৎসব। কেবল 'জানার' দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না, 'হওয়া'র দ্বারা পেতে হয়।

দাদুর কথায়

জ্ঞানলহরী জঁহ তৈঁ উঠে বাণী বা পরকাশ
অনভব জঁহ তৈঁ উপজে সবদ কিয়া নিবাস
জহ্ তনমন কা মূল হৈ উপজৈঁ ওঁকার
তহঁ দাদূ নিধি পাইয়ে নিরংতর নিরাধার

জ্ঞানলহরী যেখানে ওঠে সেখানেই ত বাণীর প্রকাশ—যেখানে অনুভূতি থেকে অনুভূতিতে আসি, সেইখানেই তো শব্দের নিবাস—সেই তনু আর মনের মিলে যেতে পারলেই জাগ্রত হন ওঙ্কার, দাদূ সেইখানেই সবচেয়ে বড় নিধি পেয়েছে যা নিরন্তর নিরাধার। কবিরও সেই মত, গীতাঞ্জলিরও সেই সুর, শান্তিনিকেতনের ও সেই ভাষা

রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি
কেন না

সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হয়ে র'ব মরি।

শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলীরও এই ডাক্। কবি উপমা দিচ্চেন আপেল ফলের—মাটিতে পড়ার মধ্যেই বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রাকর্ষণ শক্তির আওতায় পড়লো সে—তুচ্ছ গতির মধ্যেই পেলে পরমা গতিকে, তিনিই এষঃ, তিনিই পরম সম্পদ, তিনিই পরম আশ্রয়। বুদ্ধিজীবীবৈজ্ঞানিকবাদী কবির মরমী মন world of facts আর world of valuesএর সঙ্গে একটা আদর্শগত সামঞ্জস্য করে নতুন রূপায়ন বা মূল্যায়ন করতে চাইছে। একদিকে প্রকৃতির ও নিয়মের জগৎ—আর একদিকে আনন্দের জগৎ, উপলব্ধির জগৎ, কবির জগৎ—এরি মাঝখানে আছে সংসার ও সমাজ, মঙ্গল কর্মের ক্ষেত্র, কুশলকর্মের ভিত্তিভূমি। কবি বুঝেছিলেন যে মানুষ তিন ডাইমেনশনে জন্মগ্রহণ করলেও তার থাকে একটা চতুর্থ ডাইমেনশনের সত্তার প্রক্ষেপ। একে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন Intuitive mentality, জগৎকে বোঝা তাই আত্মসচেতনতা। মানবতাবাদের কথা যখন বলি, তখন আসে এই অধ্যাত্ম স্বীকৃতি। রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দ এঁরা শ্রদ্ধায় সজ্ঞানে এই স্বীকৃতিকে মূল্য দেন, আবার ইউরোপের অনেক মানবতা-

বাদী বলেন যে তা কেন—ব্যবহারিক মনটাকে ঈশ্বর-নিরপেক্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে মিলিয়ে দাও। পারসোনালিজম্ বা একজিস্টেনশিয়ালিজমের মত মতবাদ অন্য কথা বলে। র‍্যাডিকাল হিউমানিজম্ মানুষকে ঐশী ভাবনার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে তার হাসিকান্না দোষগুণের মধ্যেই দেখতে চায়। রবীন্দ্রনাথ এর সামঞ্জস্যের সূত্র পেয়েছিলেন ভারতবর্ষের চতুরাশ্রমের ব্যবস্থার মধ্যে। ব্রহ্মচর্যে সংযত নিষ্ঠাবান জীবনের ভিত্তি স্থাপন হলো বাল্যেও কৈশোরে, গার্হস্থ্যজীবনে যোগভোগে একত্র কুশলকর্ম করলাম—বানপ্রস্থের সময় এলে আসক্তির গ্রন্থিগুলিকে একে একে শিথিল করবার উপদেশ দেওয়া হলো, যার ফলে 'যতিতে' শ্লথবৃন্ত ফলের মত টুপ করে ঝরে পড়া যায় মহাসাগরের সীমা বিহীনে। তাই কবি বললেন—সত্যেই শেষ নয়, মঙ্গলেই শেষ নয়, অদ্বৈতেই শেষ—এই হচ্চে ভারতবর্ষের বাণী—একটা অপ্রমত্ত অখণ্ড বোধ।

শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বলতেন যে রবীন্দ্রনাথের অভ্যাস ছিল প্রতিদিন ভোরে স্তব্ধ হয়ে বসে আলোর প্রথম প্রসাদখানিকে গ্রহণ করা। এটা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। বৈদিক কবির উপযুক্ত উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ কালোর মাঝ থেকে আলোকে উপর মাধ্যমে বরণ করতেন—

আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই
জানি আমি তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই
এক আদি জ্যোতি উৎস হতে
চৈতন্যের পুণ্যস্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক
ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী
পরম-আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
বিচিত্র জগতে
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে

এটি অবশ্য পরের যুগের কবিতা—কিন্তু এই আনন্দের পরশনের কিছুটা ভাগ পাবার জন্যই কয়েকজন ভক্ত ও অনুরাগী সেই আলো-আঁধারির সন্ধিক্ষণে ব্রাহ্ম মূহূর্তে প্রত্যুষার উদয়কালে জুটতেন কবির কাছে। কবি কিছু বলতেন, উপদেশ দিতেন—এই হলো শান্তি-নিকেতন ভাষণগুলির প্রাথমিক রূপ। এইগুলি পড়লেই কল্পনা করে নিতে পারা যায়—যেন এক তাপস বসে আছেন, প্রভাত আলোর হিরণ্ময়তার মধ্যে আপনি-মগ্ন—

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগাৎ
চিত্রঃ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা
যথা প্রসূতা সবিতুঃ

এইতো উষা এসেছে, জ্যোতির শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ বহুধা প্রজ্ঞান জন্মেছে সর্বব্যাপী হয়ে—সূর্যেরও জন্মদান করেছেন এই উষা—

রুশৎ বৎসা রুশতী শ্বেতাগ্যাৎ
আরৈক্ উ কৃষ্ণা সদনানি অস্যাঃ

আরক্তিম সন্তানকে নিয়ে আরক্তিম হয়ে এসেছে মাতা শুভ্রাবরণী, আর কৃষ্ণাবরণী তিনি তাঁর সব কালো কক্ষের দুয়ার খুলে দিয়েছেন, তাঁরা যে "সমানবন্ধু"।

তাই পরের যুগে কবি বললেন—

বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার
মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে
ভাষা নাই, ভাষা নাই
যখনি ভোর হোল রাত্রি
মন দাঁড়িয়ে উঠল
বললে আমি পূর্ণ
ভার অভিষেক হল আপনারি
উদ্বেল তরঙ্গে
উপচে উঠে মিলতে চলল চারিদিকের
সব কিছুর সঙ্গে

এরই পূর্বানুভূতি পাই শান্তি-নিকেতনের কবি ভাষণাবলীতে। সেই জন্য এই প্রবন্ধ গুলিকে ঠিক উপদেশমালা বলা চলে না। এখানে নিজস্ব একটা সৃষ্টিরূপ আছে, প্রচ্ছন্ন তত্ত্বের আভাস আছে, রসের ব্যঞ্জনা আছে, ভাষার লালিত্য আছে, ভাবের সৌকর্য আছে। তা ছাড়া এই নিবন্ধগুলিকে বুঝতে গেলে কবির মানসিক পরিমণ্ডলটিকে বুঝতে হবে (mental climate), শুধু (১) রবীন্দ্র সাহিত্যের পটভূমিকা বা পারিপার্শ্বিক হিসাবে নয়, (২) ঊনবিংশ শতাব্দীর সমন্বয়ী চেতনার প্রকাশ হিসাবেও। আরো দ্রষ্টব্য বিষয় যে রবীন্দ্রনাথের কুশলী শিল্প চাতুর্যে ভাষার সৌন্দর্য এমন একটা মোহময় আবেশের সৃষ্টি করে

যেন একত্র শ্রী, হ্রী ও ধীর সমাবেশ হয়েছে—রবীন্দ্রগ্রন্থের অভিব্যক্তিতেও এই প্রবন্ধগুলির মূল্য অসীম—এখানে আমরা দেখছি এক পরমাশ্চর্য স্থষ্টিচাতুর্য। তাই এই ভাষণগুলিকে শুধু ধর্ম উপদেশ বলবনা, উপনিষদের ভাবকে আত্মস্থ করে রম্যরচনা বা ব্যাখ্যা বলবোনা, বলবো যে এইগুলি কবিচেতনার একটি বিশিষ্ট রসানুভূতি ও সম্ভোগ —যার মধ্যে কাব্যের সৌন্দর্য আছে, জ্ঞানের তথ্য আছে, তত্ত্বের সমাবেশ আছে, একটা দার্শনিক অভিব্যক্তি আছে, আর আছে ভক্তজনের আকুতির সঙ্গে একটা আত্ম-বিশ্লেষণের, আত্ম উপলব্ধির আত্মসম্প্রসারণের ধারা, যার সুর দর্শনের চেয়েও কাব্যের কাছাকাছি—"কবয়ঃ" এর এক জন যে রবীন্দ্রনাথ—এতে কবিতার লাবণ্য ধ্বনি ও ঝঙ্কারের সঙ্গে পাই এক বিশ্বজনীন আরতির ছবি "গগন মৈ থাল্ রবিচন্দ দীপক বনে…ভবখণ্ডনা তেরী আরতি"

আরতি করতীহ, গাও ত গীত
ঝলকত ও মুখচন্দ
রম্যবীণায় বাজবে প্রথম আলোর প্রসাদখানি।

কবির ধর্ম কী ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি Richard Church রবীন্দ্রনাথের Hibbert Lectures এর Religion of Man অনুসরণ করে বলেছিলেন—In the poet's religion, we find no doctrine or injunction but the attitude of our entire being towards a truth which is ever to be revealed in its own endless creation. In dogmatic religion all questions are definitely answered, all doubts are finally laid to rest. But the poet's religion is fluid like the atmosphere round the earth where light and shadows play hide and seek. It never undertakes to lead anybody anywhere to any solid conclusion, yet it reveals endless spheres of light because it has no wall round itself রোঁলা যাকে প্যাসকাল উদ্ধৃত করে বলেছেন 'chemin qui maadche (to which marches) তাঁর ভাষায় 'Religion is never accomplished. It is ceaseless action and the wili to strive —the onspouring of a spring never a stagnant pool," রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় চঞ্চলা নদীর মত। প্রাণের স্রোতস্বিনী যার জোয়ার ভাটায়, আলো ছায়ায়, মন্দ-ভালোর মাঝখানে নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে বিশ্বপ্রবাহে যে নিঃশ্বাস তরঙ্গিত, তাকেই কবি বাঁশীতে ধরেছেন।

তাই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

আমি লিখি কবিতা, আমি আঁকি ছবি
দূরকে নিয়ে আমার সেই খেলা

কিম্বা

মনে হলো আকাশ যেন
কইলো কথা কানে কানে
মনে হলো সকল দেহ
পূর্ণ হলো গানে গানে

অতিসাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে নৈবেদ্য খেয়া—গীতাঞ্জলি গীতালির যুগ এবং শান্তিনিকেতন প্রবন্ধ মালার যুগ তাঁর কাব্য চেতনার তৃতীয় যুগ। প্রথম পর্বে নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে, বিস্ময়ে প্রাণ জাগবে, চেতনা জাগবে, তার ভিতর আসছে বেগ ও আবেগ উদ্বেলতা, উচ্ছল কলকল তান, দ্বিতীয় পর্বে সেই চেতনা বিশ্ব চেতনার সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে, আসছে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি, গাঢ় ভাবাবেশ, অনুভূতির তীব্রতা কমে ব্যাপ্তির দিকে চলেছে, তৃতীয় পর্বে সেই চেতনা প্রকৃতি থেকে খুঁজবে প্রকৃতির অধীশ্বরকে—কোথায় আমার জীবন দেবতা—তিনি কি আসছেন দুঃখের বেশে, যোদ্ধার বেশে, না ঝড়ের রাতে – পরাণসখা বন্ধু হে আমার—তিনি কি রাজার দুলাল না নির্মম নির্ভীক তপস্বী কঠোর শুচিব্রত—তিনি কালবৈশাখীতে আসছেন না বরষায় লোভন শোভন হয়ে, শরতে নয়ন ভুলানো রূপে, শীতের ঝরা পাতায়, হেমন্তের দিনান্ত বেলায়। চতুর্থ পর্বের সুরু হলো বলাকার সঙ্গে জীবনের চলমান নদীর flux এর মধ্যে কোথায় সেই অখণ্ড সত্য যেখানে স্বষ্টি পুঞ্জে পুঞ্জে রূপ থেকে রূপান্তরে চলেছে। পঞ্চম পর্বে—The wheel came full circle, তিনি দেখলেন দেবতাই নেমেছেন মানুষের বেশে। চিতাভস্মতলে মানব তপস্বী নতুন জগৎ স্বষ্ট করছে নিরাসক্ত ধ্যানের আসনে বসে –এই তো Divinity of pain, Humanity of Divinity শুধু জীবই শিব

নন, শিব ও জীব। মহামানবের কল্পনাই রবীন্দ্র চেতনার শেষ দান। তখন আর ভক্তের মুগ্ধ নিবেদন নয়, সমানে সমানে সমন্বসা রচিত নয়, মানুষে মানুষে মিলিয়ে যে মহা-দেবতা তারই পাদপীঠে পূজা। শেষসপ্তক-পুনশ্চ-পত্রপুট আরোগ্য-আকাশ প্রদীপে পাচ্ছি আমরা মানুষের মহৎ স্বরূপের ইতিহাস। প্রাচীন মন্ত্রগুলিকে নিয়ে আর আত্মবিলয়ের ভাব নেই। কবি বলেছেন—মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন—জন্মমৃত্যুর অন্তরালে একটা নিরাসক্তি এসেছে—এক সর্বজ্যোতির্ময় প্রাণসত্তার ঘন সমুদ্রে কবি নিমগ্ন নৈর্ব্যক্তিক সাধনায়—তিনি বলছেন

আমি আজ পৃথক হব

যে আমি মুক্ত, যে আমি স্বচ্ছ, যে আমি অতন্দ্র সৃষ্টিকে চরিয়ে নিয়ে যায় যুগ হতে যুগান্তরে নব নব চারণ ক্ষেত্রে। এই চেতনা কবিমনে পদ্মের কোরকের মত প্রচ্ছন্ন আছে বহু দিন হতেই। এই যুগে ব্যক্তিগত বিশ্বভুবনেশ্বর প্রায় বিলুপ্ত রয়েছে একটা agnostic touch বা সত্যসন্ধানীর দৃষ্টি। কাব্যে ভাবের মাধুর্যের বদলে এসেছে সত্যের ঋজুতা, ভাষাতেও তাই, ছন্দগঠনেও তাই। এ হচ্ছে কবির অহংকার—সমস্ত মানুষের হয়ে অহংকার—চেতনার রং এ পান্না হবে সবুজ। পূর্ব্বের যুগে সব চেতনাই শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক ভগবদ্‌ব্যাপ্তিতে আশ্রয় নিয়েছিল—এখানে দেখি প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে পুরুষ, পেরিয়ে এসে পুরুষেরই প্রতীক হিসাবে মানুষ বসেছে সিংহাসনে—সে মানুষ শুধু রাজাধিরাজ নয়, রাজার ঘরের দুলাল নয়—যারা কাজ করে, পাথর ভাঙে তারাও। একে শুধু প্রোলেটিরিয়াট্ চেতনা বললে ভুল হবে, এ হচ্ছে উত্তরণ ও অবতরণ—এক নব সংহিতার সোহং বাদ।

অসীম দূরের প্রেক্ষনীতি
পড়ুক ধরা শেষ গণিতে
জিত হয়েছে, কিম্বা হল হার

সাধক যিনি, ভক্ত যিনি, দৃষ্টিমান যিনি, তিনি প্রাণের প্রদীপটি জ্বেলে ধরায় আসেন, তাঁর বাণী শোনান—সে কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ নয়, প্রেমেরও যোগ—এই কথাগুলিই শান্তিনিকেতন রচনাগুলির সার—তপস্বিনী মৈত্রেয়ী উপকরণপীড়িত সংসারের মধ্যে সেই অমৃতের প্রার্থনাটিই মেনে নিয়েছিলেন। পরিপূর্ণ প্রেমকে পাবার জন্য—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্ কলকাতার ওভারটুন হলে কবির "তপোবন" পাঠএর ভিত্তিস্বরূপ—শাশ্বত ভারতবর্ষের সাধনা হচ্ছে বিত্তের সঙ্গে চিত্তের যোগ—ত্যাগের দ্বারাই ভোগ—পরের ধনে লোভ করোনা—এই চিত্তের যোগ সম্ভব নয় যদি চিত্তের জাগ্রত জিজ্ঞাসা বৃত্তি না থাকে—তাই শান্তিনিকেতনের প্রথম কথাই হলো—ওঠো, জাগো, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—সংশয় আসে আসুক, ক্ষতি হয় হোক্—তবু তব স্বর্ধ পরশে নমস্কার সত্য হোক্, নিজের অন্তরের দেবতাকে বঞ্চনা করোনা—১১ই মাঘ ১৩২১ সালে কবি আবার এই কথারই আবৃত্তি করলেন—এই হল তাঁর মন্ত্রের আবিষ্কার—সত্য আর জ্ঞান যে অনন্ত। তবু প্রশ্ন আসে, আসা উচিত—প্রবুদ্ধ উন্মুখী মর্ত্যমন প্রশ্ন করবেই—কস্মৈ দেবায়—কে সে, কী সে, কোন পথ গ্রাহ্য, কোন পথ বাহ্য। জ্ঞানে বা কর্মে মহৎলাভ হলেও কিছুটা ফাঁক থেকে যায়, সেটাকে ভরাতে হয় প্রেমের দ্বারা। প্রেমের মধ্যে আছে আত্ম-বিলোপ, আত্মদান। আত্মদান মানেই নিজেকে ফিরে পাওয়া, আত্ম আবিষ্কার। কবি বলছেন—এখানেই আছে স্থিতি আর গতির সামঞ্জস্য, হাঁ আর না-র মিলন। প্রেমের এক কোটি সগুণ, আর এক কোটি নির্গুণ। তার এক-দিকে বলে আমি আছি, আর একদিকে আমি নেই। 'আমি' না হলেও প্রেম নেই, 'আমি' না ছাড়লেও প্রেম নেই। এই তত্ত্বটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রেমের তিন রূপ—প্রথম রূপ যদি ধরি তার জৈবিক রূপ—শুধু আমি চাইনা, আমার চাই, দেহেতে অণুতে, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে কামনায় ভঙ্গীতে আমি আস্বাদন করতে চাই—সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাস—এটা একদিক দিয়ে physical needএর রূপক্। প্রেমের দ্বিতীয় ধারা হচ্ছে তার aesthetic need. আমি সুন্দরকে চাই—আমি প্রিয়কে চাই, শ্রেয়কে চাই—সুন্দর কাকে বলি, যাতে চোখ ধাঁধায়, রক্ত তাতায়, মনকে শুধু যা রসসিক্ত করে, উন্মিলিত করে, উন্মোচিত করে, উদ্বোধিত করে, তখন সুন্দরই হয় সত্য Truth Beauty, Beauty truth. প্রেমের তৃতীয় অভিব্যক্তির ধারা হচ্ছে তার spiritual need—শুধু আশ্রয় বা অবলম্বন নয়, তার অধ্যাত্ম সত্তার স্বীকৃতি।

অর্থাৎ আমায় ভালোবাসতেই হবে—এ আমার ধর্ম—এ আমার ত্যাগ—এই ত্যাগই আমার ভোগ—তা না হলে আমি ফুটবোনা, বিকশিত হবোনা—আমি 'হয়ে' (become) উঠবোনা। প্রথমটিতে শুধু চাওয়া, শুধু আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা, দ্বিতীয়টিতে সমানে সমানে ভোগ, আমিও দেবো, তুমিও দেবে,রসঘন প্রেমঘন দান প্রতিদানে মিলন সুসম্পন্ন। তৃতীয় পর্যায়ে শুধু দিয়েই আমি আনন্দিত, নন্দতি, নন্দতি, নন্দতি, শুধু ত্যাগ, শুধু উৎসর্জন, এখানে নেওয়ার বা চাওয়ার কোন প্রশ্ন নেই, আবার মত্ততাহীন তত্ত্বপারাবার নেই। এখানে ভালবাসার ভোগ আত্মব্যাপ্তিতে, আত্মসম্প্রসারণে ও আত্ম-বিলুপ্তিতে—আমিই তুমি—কিন্তু সোহহম্ নয়—বরং অয়মহং।

কবি শান্তিনিকেতন রচনাবলীতে প্রথমেই তাই আমাদের সাবধান করে দিলেন যে প্রেমের সাধনার বিকার-শঙ্কার বিশেষ প্রতিবন্ধক আছে। রসসম্ভোগকেই প্রেমের চরম সিদ্ধি বলে জানলে নেশায় পেয়ে বসে। প্রেম যদি সংযম হারায়, সত্য থেকে স্খলিত হয়, সেখানে যদি মত্ততার প্রাবল্য আসে তাহলে সে প্রেম ঋষি অভিশাপের দ্বারা প্রতিহত, ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, দেবরোষে ভস্মীভূত হয়। কালিদাসের কাব্যে নাটকে কবি এই প্রতীকই খুঁজে পেয়েছিলেন—সেই জন্যই প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়রূপ শুধু—

প্রহর শেষে আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস
তোমার চোখে দেখে ছিলাম আমার সর্বনাশ

নয়, সেখানে সর্ব খর্ব তারে দাহন করতে পারে—যে মহা রুদ্রের শক্তি তারই আবাহন। তোমার দিকে আমিই ত চলেছি—

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে

সে তো আজকে নয়—

ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে

এখানে কবির ভয়, কবির গর্ব, কবির আত্মোপলব্ধি সব মিলে তাঁকে বলাচ্চে

আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে—তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি, গান গেয়ে উঠি
আছি, আমি আছি
এবং ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মত যেন
অঙ্গ ওঠে ভরে

শ্রদ্ধেয় নলিনী গুপ্ত বলেন—এই রূপকল্পের অনুভূতি, ভাষা ভাবই যেন শাঁখের করাত—দুদিকই কাটে।

হয়তো তাই।

বীথিকায় এসে দেখি কবি রাত্রি রূপিণীকে ডেকে বলছেন—

আলো জ্বালো, এবারে ভালো করে চিনি

যখন অপ্রমত্ত "মিলন" হলো তখন অনুভূতির ছবিটা কি রকম—

নাই সময়ের পদধ্বনি (Time has a stop)
নিরস্ত মুহূর্ত স্থির দণ্ডপল কিছুই নাই গণি
নাই আলো নাই অন্ধকার
আমি নাই, গ্রন্থি নাই তোমার আমার
নাই সুখ দুঃখ, ভয় আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হল সব
আকাশে নিস্তব্ধ এক শান্ত অনুভব
তোমাতে সমস্ত লীন
তুমি আছ একা
আমি হীন চিত্ত মাঝে একান্তে তোমারে শুধু দেখা

প্রায় বৈদিক সূক্তের প্রতীকগুলিই ব্যবহার করেছেন কবি। কিন্তু 'সমস্ত লীন' হলেও, "আমি হীন" হলেও তার মধ্যে একটু 'অহং' রয়ে গেছে' যে দেখছে একান্তে।

রবীন্দ্রনাথ চোখ বুজে ধ্যানযোগে দেখবার কথাই বলেননি "আমি এই চর্মচক্ষে দেখার কথাই বলছি। চর্মচক্ষুকে চর্মচক্ষু বলে গাল দিলে চলবে কেন? একে শারীরিক বলে ঘৃণা করবে এত বড়ো লোকটি তুমি কে? আমি বলছি এই চোখ দিয়েই এই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা—তাই যদি না থাকতো তবে আলোক বৃথা আমাদের জাগ্রত করছে। শুধু 'দেখা' নয় 'শোনা'ও।

রবীন্দ্র-চেতনার এই বিরাট পটভূমিকার কথা বিস্মরণ হলে তাঁর শান্তিনিকেতন রচনামালার যথার্থ তাৎপর্য বোঝা যাবে না। ১৩১১ সালে কবি লিখেছিলেন—তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোন অধিকার নেই। দ্বৈত অদ্বৈতবাদের কোন তর্ক উঠলে আমি নিরুত্তর থাকব। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়ে বলছি—আমার মধ্য দিয়ে অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রয়েছে।

সকল পাওয়ার মধ্যে পেয়েছি অমূল্য উপাদেয়
এমন সম্পদ যাহা হবে মোর অক্ষয় পাথেয়

মহা সম্পদ তোমারে লভিব সব সম্পদ খোয়ায়ে—মৃত্যু হবে অমৃত। এই তো গীতভারতীর প্রসাদ।
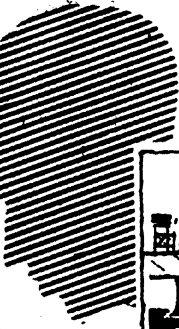
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পূবদিকের আকাশে দুর্গাপুর স্লাগব্যাঙ্ক এর আলো—লালাভ প্রচণ্ড জালার দীপ্তি সব মুছে ফেলেছে। তারই দিকে চেয়ে বলে ওঠে অশোক।

—ওই দিকে চেয়ে কি মনে হয় জানো?

—কি! অবাক হয়ে প্রশ্ন করে শিখা।

বলে ওঠে অশোক—ওই যন্ত্রদানবের নীরব চোখরাঙ্গানো দেখে বলি, তুমি জয় করতে পারবেনা আমাদের, তোমার আগুনের তাপে শুকিয়ে আমাদের অন্তর—ঘর—সবকিছু সবুজ, ছাই করে দিতে পারবেনা। তোমাকে অগ্রাহ্য করে নয়—তোমাকে স্বীকার করে, তোমার পাশেই আমরাও নোতুন ঘর গড়ে তুলবো।

—বলে ওঠে শিখা—শিল্প বিপ্লবও মানবেন না?

—মানবো। তবে তার ধ্বংসটাকে ঘটতে দেবো না। মানুষ যদি সব দিক দিয়ে এগিয়ে যায়, অন্তরের তার পুঁজি কিছু থাকে শিক্ষার পুঁজি, মানবিকতার পুঁজি, যন্ত্র তাকে অমানুষ করে দিতে পারেনা। অশোক কথাগুলো বলে চুপ করে। কি ভাবছে। বেশ জোরের সঙ্গেই বলে।

—কিছু ধুয়ে মুছে যাবে। কতক বদলে যাবে, কিন্তু বাকী যারা থাকবে তারা জীবনকে সুন্দর সহনীয় করে তুলবে প্রাণের স্পর্শ দিয়ে, ভারতের সেই পুঁজি আছে শিখা।

…শিখা ওর কথাগুলো শুনে চলেছে। বাতাসে বকুলগন্ধ; তারার আলো কাঁপে দীঘির জলে। রাতজাগা ডাহুক পাখী একবার ডেকেই থেমে গেল।

—রাত হয়ে গেল!

শিখা বলে ওঠে—আজ মুডে আছেন দেখছি।

—চল এগিয়ে দিয়ে আসি।

হাসে শিখা—না, একাই যেতে পারবো। রাত বেড়ানো অভ্যাসটি এখনও আছে।

হালকাকণ্ঠে বলে অশোক—তাতো দেখতে পাচ্ছি।

বের হয়ে গেল শিখা। কথাগুলো সেও ভাবছে। কোথায় যেন তার মনেও অশোকের চিন্তার সংক্রমণ দেখা দেয়।

দেখেছে কেমন যেন কালোছায়ার মত একটা হতাশা আর ক্লান্তি এদের আকাশ ঘিরে এসেছে।

…নির্জন পথটা দিয়ে আসছে বাসার দিকে, হঠাৎ কাদের আসতে দেখে দাঁড়াল পথের ধারে। প্যান্টপরা কয়েকটা মূর্তি—মুখে বিড়ি না হয় সিগ্রেট। ওকে দেখেই একজন দাঁড়াল।

—মীনাকুমারী নাকি বাবা! 'মহল' দেখছি না কি? আয়েগা আয়েগা! সরে যাবার চেষ্টা করছে শিখা, কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছে!

...ওদের বেসুরো কণ্ঠের চীৎকারে ভয় লাগে তার। এগিয়ে আসছে একজন এই দিকেই।

হঠাৎ কাকে আসতে দেখে সরে যাবার চেষ্টা করে, লোকটা আঁধায় ফুঁড়ে সামনে এসেছে দুজনকে দুহাতে ধরে আসমানে তুলে প্রচণ্ড ভাবে ঠোকাঠুকি লাগিয়ে দেয়; গর্জাচ্ছে।

—হারামজাদারা, দুর্গাপুরের পাইপের জল পেটে পড়ে সাহেব হয়েছিস!

প্রচণ্ড দুই চড়ে ছিটকে পড়ে দুজনে দুদিকে, উঠতে যাবে লাথির চোটে গড়িয়ে চলে ঢালু পাড় দিয়ে; সশব্দে ছিটকে পড়ল জলে। অন্যজন উঠে পড়ে দৌড়মারে সামনের দিকে বনবাদাড় ভেদ করেই।

—আপনি।...লোকটা ভয়ে জড়সড় শিখার দিকে চেয়ে থাকে অবাক হয়ে। শিখা বলবার চেষ্টা করে।

আপনি না এসে পড়লে—

—কোন ভয় নাই আপনার। এমোকালীকে এ চাকলার লোক চেনে। একটু অবাক হয় শিখা—আপনি কালীবাবু! গ্রামপ্রধান!

হাসছে কালী—আজ্ঞে আমি এমো কালী। ওসব বলে লজ্জা দেবেন না। চলুন এগিয়ে দিই পথটা!

—না, এসে গেছি। আর দরকার হবে না।

হঠাৎ দাঁড়াল কালী—শুনুন!

—কি!

—এ সব কথা ওই সেক্রেটারীবাবু মানে অশোকবাবুর কানে যেন না ওঠে, তালে লজ্জার আর শেষ থাকবেনা। ছিঃ ছিঃ এ আর হবেনা কুনদিন। জলে পড়া লোকটা উঠে আসছিল, চকিতের মধ্যে আর একটা লাথি খেয়ে গড়িয়ে পড়ে জলে অস্ফুট আর্তনাদ করে। গজরাচ্ছে কালী।

—শালো উঠবি কি! অ্যা! কোঁৎ কোৎ করে জল গিলে হাবুডুবু খা চোপ্পরাত। উঠেছিস কি ফের লাথিতে প্যাট-ফাটাবো শালোর—আম্মো ও রইলাম দীঘিরধারে ঠায় বসে। আয়েগা- আয়েগা! দেখ শালো তুর যম এয়েছেন ইবার। শিখা হাসিচেপে বাড়ীর পথধরে। প্রহরীর মত কালীর দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে আবছা তারাজলা অন্ধকারে।

...অশোকের কথা মনে পড়ে। কিছু লোকও বেঁচে থাকবে—এই দুর্দিনে তারা অত্যন্ত নোতুন করে বাঁচতে শিখবে—মানুষের মত।

তারকরত্ন রায় কথাটা শোনে ওদের। ফণী অবনী আরও কারা এসেছে। নীচের বৈঠকখানায় আর সলা-বৈঠক বসেনা। তারকবাবু নীচে নামে না—শরীর খারাপ। আর সেই তালবেতালও নেই যে রাজাবিক্রমাদিত্য পূর্ণ-বিক্রমে নিজের সিংহাসনে বসে বিচার করবে। তাদের কথাগুলো শোনেমাত্র। অবনী গজরাচ্ছে।

—যা ছিল সরকার নিয়েছে জমিদারী উচ্ছেদের মানে, বাকী যা আছে সেটুকু নেবে ওই লীডাররা যৌথকৃষি ফার্ম-এর হুমকিতে। ঘরের ঢেঁকি কুমীর তোমার ওই ভাগ্নে অশোকের এসব বদবুদ্ধি।

ধরণী টাকে হাত বুলিয়ে মন্তব্য করে—যম জামাই ভাগ্‌না, তিন নয় আপ্‌না॥ খালকেটে কুমীর ঢুকিয়েছ এখন ঠ্যালা বোঝ এইবার। আমার বাবা জমি পড়ে জলখাবে সেবি আচ্ছা—ওসব ফাঁদে পা দিতে যাবো নাই।

তারকবাবু কথা বলেনা। সারা মনে তার একটা দুঃসহ ব্যথা। এতদিনের প্রেসিডেণ্টগিরি ছেড়ে দিতে হল। কামারদের কালী হল কিনা গ্রামপ্রধান। নিজের এত-দিনের চেষ্টার ফল ওই ইস্কুল, সরকারী ডাক্তারখানা সব গড়ে তুলেছে অশোক।

লোকে তাকে ভুলে গেছে সেই লজ্জায় বের হয়না। জমিদারী যথাসর্বস্ব যাবার চেয়ে এ দুঃখ কম নয়। চোখের উপর দেখেছে তার একমাত্র প্রাণের নাতনী মরেছে বিনা চিকিৎসায় একরকম তিলে তিলেই।

ছেলেকে বের হতে হয়েছে লোহাকারখানার কাযে, কি কায সে করছে সেখানে তা দেখেই অনুমান করতে পারে। বৌমার কাছে মুখদেখাতে লজ্জা হয়।

ঘরে বাইরে তার দুঃসহ লজ্জা।

একটু আগেই দেখেছে স্কুলের নোতুন মিসট্রেসকে ভিতরে যেতে মণিমালার বন্ধু। অশোকও কথাটা পেড়ে-ছিল বৌদিরও মত আছে আপনি মতদেন এখানের ইস্কুলের একটা চাকরী ওঁকে দিই।

কথাটা শুনে খানিকক্ষণ ওর দিকে অসহায়ের মত

চেয়েছিলেন তারকবাবু! জবাব দেয় পরে—এখানে মাষ্টারী করা ওর চলবে না অশোক।

—কেন?

—তোমাকে বোঝাতে পারবো না। আমার মত চেয়েছিলে সেইটাই জানিয়ে দিলাম। উনি যদি রাজী থাকেন—ওর মতেই চলুক। আমি কে?

মণিমালা দরজার বাইরে থেকে শ্বশুরের কথাটা শুনেছিল, মনে মনে অসহায় রাগে গুমরে উঠেছিল।

…তারকবাবু তাও দেখেছিল চুপ করে।

আজ ওরা এসেছে। অবনী বলে ওঠে—

—একটা প্রটেষ্ট করা দরকার। ওরা নাকি বলেছে কেউ জমি না দিলে আইন বলে তা দখল করতে পারে। ব্লাডি—ফুলস্।

তারকবাবু জবাব দেয়—এ সম্বন্ধে আমার মতামত কিছুই নেই অবনী। যে ক'বিঘে জমি আমার আছে ক্রমশঃ সবই তা বেচে দোব।

—তারপর!

হাসে তারকবাবু—তারপর! দারু ভুতো মুরারি। ওরা অসহায়ের মত বের হয়ে এল। অবনী বলে ওঠে।

—তখনই বলেছিলাম হি ইজ এ ডেড ম্যান নাও।

নীচে অপেক্ষা করছিল ছান্দুদাস, ভাঙ্গা থামের আড়াল থেকে সে বের হয়ে আসে।

—হল কিছু?

—কচু! তুই যা করবি কর ছান্দু।

—দেখা যাক। ছান্দুই কর্তৃত্ব নেবার জন্য এগিয়ে আসে।

তারকবাবু একাই স্তব্ধ হয়ে জীর্ণ তক্তপোষটার উপর বসে আছে। রাত্রি নেমে এসেছে—ম্লান তেলেরবাতিটা জ্বলছে। স্ত্রীকে দেখে মুখ তুলে চাইল। ক' বছরেই তার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। হাতের সব চুড়িগুলো গেছে—গেছে মোটা হার,গহনা সবকিছু। মাত্র শাঁখা আর লালপাড় শাড়ী তাই পরণে।

—ওরা কি বলছিল?

—কিছুনা!

ভাবিনী স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে। কোনদিনই কোন প্রতিবাদ করেনি স্বামীর কথায়। ভয় করে এসেছে আজও সেই ভয় করে।

—জীবন কি বলছিল। বৌমাও জেদ ধরেছে। আমি বলি যা ভালো বোঝে ওরা করুক।

তারকবাবু কথা কইলনা, স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকে। হঠাৎ হাসতে থাকে তারকরত্ন।

—বুঝলে, বুড়ো মা বাপকে আজ ওদের বোঝা বলে মনে হয়। তাই সরে যেতে চাইছে?

ভাবিনী কথা কইল না। জীবনকে ঢুকতে দেখে তারকবাবু চাইলো।

—সাইকেল করে এতটা পথ যাতায়াত করে শরীর টিকছে না। কাযেরও অসুবিধা হচ্ছে।

—মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে তারকবাবু বলে।

—তাই ওখানেই বাসা করতে চাও?

—কোম্পানীই কোয়ার্টার দিচ্ছে।

তারকবাবু ছেলের দিকে চেয়ে থাকে; ওপাশে মণিমালার মুখখানাও দেখা যায়।

…ওর মনের ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে চাউনিতে। দুর্নিবার কোন বাঁচার প্রয়োজনের তাগিদ আজ ওদের সব কর্তব্যও ভুলিয়েছে। শুধু বেঁচে থাকা—এবং সেটা মুখ্যত নিজেকে কেন্দ্র করেই। ওদের নিষেধকরা মানেই নিজের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাওয়া।

তারকবাবু এত অসহায় বোধ করতে পারেনা নিজেকে। বলে ওঠে—বেশ, সেইখানেই যাও।

বলে ওঠে জীবন—মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করবো।

তারকবাবু বলেন বৌমাও যাবে তো? হ্যাঁ সেইই ভাল। যাচ্ছো কবে?

—ভাবছি কাল সকালেই।

ভাবিনী চমকে ওঠে। তারকবাবু জবাব দেয়।

…বেশ!

জীবন এত সহজে কায হাসিল হবে ভাবতে পারেনি। খুশী হয়েই বের হয়ে আসে। মণিমালাও খুশী হয়েছে। দুচোখে তার আনন্দের আভা। এই কারাগার থেকে মুক্তিপত্র পেয়েছে সে। বাইরের জগতে নোতুন করে বাঁচতে পারবে।

…ভাবিনী আর্তনাদ করে ওঠে—এ তুমি কি করলে?

তারকবাবু শান্ত ভাবেই জবাব দেয়—ঠিকই করেছি বড়বৌ। যে পাতা ঝরে যাবে তা যেতে দিতেই হবে। জীর্ণ বাস ত্যাগ করে নোতুনকে নিতেই হবে।

—তাই বলে মা-বাবাকে ফেলে এই সময়ে চলে যাবে তারা ?

—ওদের বাঁচতে দাও বড়বৌ, ওরা এখনও এ যুগের মাঝে বাঁচবার পথ পেতে পারে। তুমি আমি আজ বাতিলের দলে ; অন্ধকার ধ্বসে-পড়া এই বাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যে রায় বংশের ইতিহাস শেষ হয়ে যাবে। আমরা সেই রায় বংশের শেষ পুরুষ।

কাঁদছে ভাবিনী। দুঃখে আতঙ্কে ভীত একটি নারী। তার সব যেন হারিয়ে গেল। তারকবাবু কথা বলেনা—জানলার বাইরে চেয়ে থাকে। আকাশে আকাশে সেখানে শুধু আগুন আর তার লাল তীব্র শিখা।

…কদমবৌ কদিন নোতুন বাসায় এসে হাঁপিয়ে উঠেছে। বিশ্রী কদর্য পরিবেশ। জানলা দিয়ে দেখেছে ধানকলের মজুর আর কামিনদের মধ্যে কি কুশ্রী সম্পর্ক। আকাশ বাতাস ভরে ওঠে ওদের কদর্য ভাষায়।

জানলা বন্ধ করে দিয়েছে নিদারুণ ঘৃণায়।

রোদপোড়া ডাঙ্গার একদিকে ছোট্ট বাড়ীখানা, ওদিকে একটা পুকুর। অনেক খাদ করে তবে এই ডাঙ্গায় জল বের করেছে। চারিদিকে উঠেছে কাঁকুরে খাদ, ধারে নরম মাটির পাড়ের উপর কলাগাছ—দু একটা কাঁঠাল গাছ।

জায়গাটা একটু ছায়াঘন সবুজ।

ভুবন সারাদিন কাষ নিয়ে ব্যস্ত, মাঝে মাঝে মাল আনতে—বা চালান দিতে ট্রাকে করে দুর্গাপুর—বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর যায়।

লোকটা কেমন বদলে গেছে। সেই আগেকার সহজ সরল মানুষটি আর নেই কেমন কঠিন রুক্ষতা এসেছে চেহারায়। কথাবার্তায় ফুটে ওঠে কর্কশভাব।

—ভাত হয়েছে ?

…কোনমতে একটু তেলচান করে ভাতের থালায় বসে ভুবন। বলে ওঠে—বুঝলি, ভাবছি মাল যা তৈরী হচ্ছে তা গড়তায় কামারপাড়ার কো-অপারেটিভকে দোব লাটে তুলে। ওরাতো শুনলাম মিইয়ে গেছে। তাছাড়া গদাই ষষ্ঠীও কাল এসেছিল।

—কেনে ? কেমন যেন ভাল লাগেনা কথাটা কদমের।

—কেনে আবার, কাষের ধান্দায়। রস যে শুকিয়ে আসছে। গ্রামপ্রধান এমোকালী আর অশোকবাবু। সব ব্যাটাকে দেখবো। তালাই গুটোন করে দোব। দাসমশাই তো আমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছে কারখানা—

মাথা নীচু করে কদম ডাল ঢালতে থাকে। ভুবন বলে ওঠে—চুপ করে রইলি যে। কথাটা পানি পানি লাগছে না।

—জাত জ্ঞিয়াতের সর্বনাশের কথা কারই বা ভাল লাগে।

ভুবন কি একটা কড়া কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। মাঝে মাঝে দেখেছে কেমন বদলে যায় কদম।

—এখানে তুর ভাল লাগেনা লয় ?

একটু বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলে ওঠে কদম—কেনে ভালো লাগবেক নাই ? এত সুখে আছি। খেছি দেছি পাকাবাড়ী !

—হাঃ হাঃ বাব্বাঃ তবে ! থাকতিস উখানে এমনি ?

—না, এত তুখে থাকতাম নাই, তবে—

—তবে কি ?

—শান্তি ছিল, স্বস্তি ছিল।

কথাটা বলে দাঁড়াল না কদম, ভিতরে চলে গেল।

—ধ্যাত্তোর !…ভুবন বিরক্ত হয়ে ভাতগুলো কোন-রকমে গোগ্রাসে গিলতে থাকে। সদরে যেতে হবে তাকে। এ যেন তার বেশ লাগে।

বেশ রঙ্গীণ জীবন। কেনাবেচার ফাঁক থেকে একরাত জাঁকালো ফুর্তি করার খরচটা উঠে আসে। ধেনো আর ভাল লাগে না, সহরের দামী মদই খায় ; এখান ওখানে একটু ঢু মারে—সেই উন্মাদনা আর চাঞ্চল্যের সামনে বিচিত্র কোন নারীমাংস ভালোই লাগে, তাঁদের তুলনায় কদম অনেক ঠাণ্ডা—হিম। ক্লান্তি এসেছে তাই।

কদমও এটা অনুভব করেছে, জেনেছে ওর অন্তরের স্বরূপ। ক্রমশঃ তাই ভিতর বাইরে বেপরোয়ার মত বদলে চলেছে ভুবন।

—কখন ফিরবে ?

ভুবন বের হয়ে যাচ্ছিল, ওর ডাকে দাঁড়াল, বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে—

—ধ্যাত্তোর। দিলে তো পিছু ডেকে। যাচ্ছি শুভ কাযে—সদরে।

—খুব শুভ কায যাহোক।

—ফিরতে না পারলে কাল সকালে আসবো।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কদম, কথা বলেনা। ডাঙ্গার ধারে এই বাড়ীতে একলা থাকতে ভয় করে, লোকজন নেই একটা কথা বলবার। মুখ বন্ধ করে থাকতে হাঁপিয়ে ওঠে। বলে ওঠে কদম।

—একা থাকতে ভয় করে।

—মাইরী। হাসছে ভুবন বিশ্রী কদর্য হাসি। আরও কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। ঘৃণাভরে সরে গেল কদম। ওর দুচোখে দেখে কি একটা সেই আগেকার অবিশ্বাস—ঘৃণা আর অপমান করা চাহনি। ওকে আজও অবিশ্বাস করে—ঠিক তাও নয়, যেন মনে মনে সেটাকে খানিকটা প্রশ্রয় দিয়ে ও চলেছে।

কদম কথা বলল না। লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। বের হয়ে ভুবন কেঁদগাছের নীচে ট্রাকখানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গাড়ীর নীচে একটা গদি পেতে গোকুল কি ঠোকাঠুকি করছিল—রোগা লিকলিকে লোকটা বের হয়ে আসছে ওর দিকে।

সদরে যাবার মালপত্রও চাপান হচ্ছে তাতে।

…জানলাটা বন্ধ করে দিল কদমবৌ।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। জোনাকজ্বলা তারাজ্বলা সন্ধ্যা। সারা আকাশ জুড়ে আঁধার রাজ্যি নামছে—দূরে দুর্গাপুর-বাঁকুড়ার হাইওয়ের উপর দিয়ে দুটো জোরালো হেডলাইট জ্বেলে লরীখানা ছুটে যায়। ওদের ইঞ্জিনের শব্দ আর মাটি কামড়ানো টায়ারের একটানা গর্জন কানে আসে। একপাল দৈত্য যেন দাপাদাপি করে বনের অতলে হারিয়ে গেল—আবার বের হয়ে আসে দুএকটা।

মিলের কাযও বন্ধ হয়ে গেছে, আজকের মত ছুটি।

স্তব্ধ বিশাল কলবাড়ী—বাসনের কারখানা। এদিক ওদিকে দু একটা আলো জ্বলছে, মিটমিটে কম-পাওয়ারের বাল্‌ব মাত্র, ঠাঁই ঠাঁই আলোর আভাষ—আবার চারিদিকে অন্ধকার ভিড় করে আছে।

রাত কত জানে না ; হঠাৎ কাকে ঢুকতে দেখে একটু অবাক হয় কদম বৌ—ওকে এখানে দেখবে বিশ্বাসই করতে পারে না। পান্নুদাস ঢুকছে।

…অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে কদম। দূর থেকে মাঝবয়সী লোকটাকে দেখছে কদম, আগেও দেখেছে।

আজ সে যেন অন্য মানুষ। আদ্দির পাঞ্জাবী—পায়ে পামসু—গলার দামী বোতামগুলো আলোয় ঝিকমিক করছে। বাতাসে একটা মিষ্টি সুবাস পান্নুদাস সেন্ট ছড়িয়েছে গা ময়। তীব্র তার সৌরভ।

হাসছে পান্নু—একলা আছ তাই খবর নিতে এলাম।

জবাব দিল না কদম, লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। বন থেকে বের হয়ে আসা ধূর্ত শিয়ালকে দেখছে কেমন সন্তর্পণে লোকালয়ের দিকে এগিয়ে যায় পলাতক হাঁস মুরগীর সন্ধানে—তেমনি লোভ আর লালসায় দুচোখ জ্বলছে লোকটার। পান্নু বলে চলে।

—ভুবনও বলছিল, এখানে নাকি মন টিকছে না তোমার। তা সত্যিই তো, ছেলেপুলেও নেই। আর বয়সই বা কি ? মন উতলা হবারই কথা। তা একটা রেডিও আনতে বলেছি ভুবনকে—ওটা রেখো—গান-বাজনা শুনবে।

—কদম তখনও চুপ।

পান্নুই নির্লজ্জের মত বলে ওঠে—কই এলাম, বসতে বল্লে না ? চুপ করে আসনটা পেতে দেয় কদম, ঘোমটা একটু টেনেছে—কালো ডাগর দুচোখে কেমন সরম মাখানো একটু চাহনি—পান্নু দাস অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

পান্নুদাস চেপে বসলো—নিজের দাপে দখল করা মাটিতে তার অধিকার যেন কায়েম করতে চায় সে।

—আজ রাতে বোধহয় ভুবন ফিরবে না। এত কি কায—আমার ঠিক ভাল বোধহয় না।

—ভালই ছিল আগে। বলে ওঠে কদম।

হাসছে পান্নু—এ মাটির দোষ বলছ ? তা বলতে পাল্লে। কিন্তু কই তুমি তো বদলাও নি।

কথা কইল না কদম। ওর দিকে চেয়ে থাকে। পান্নু বলে ওঠে।

—দিন বদলের সঙ্গে মানুষও বদলায়, মানুষের স্বভাব ও। ফস্ করে কদম জবাব দেয়।

—তাই দেখছি। পায়ের কাদাও ধুলো হয়ে মাথায় ঠেকে।

পান্নুদাস চুপ করে কথাটা শোনে। মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। কেমন একটা কালো ছায়া ফুটে ওঠে।

দাঁড়াল পান্নুদাস—চলি কদম বৌ।

—আসুন।

পান্নু পিছন ফিরে বলে ওঠে—আসতে বলছ? কেউ যদি আবার দেখে ফেলে। অবশ্য তোমার তাতে মনে হয় সুনামের বেশ কম কিছুই হবে না।

কদমের সারা শরীরে রক্ত বয়ে যায়। সামনেই পড়ে ছিল ঝাঁটাটা, মনে হয় তাই তুলে নিয়ে আগাপাশ্‌তালা ধোলাই করে দেয়! বলে চলে পান্নু।

—গোকুলও এজলাসে দাঁড়িয়ে বলেছিল কথাটা। তা ছাড়া ভুবনই বলছিল মানে এমোকালী—ওই যে লীডার তোমাদের অশোকবাবু!

··কঠিনকণ্ঠে বলে ওঠে কদম—যাবেন? দরজাটা বন্ধ করবো।

—যাই। দরজাটা ভালো করেই বন্ধ কর কদমবৌ—বাইরের লোক অবশ্য রাতে এখানে ঢুকতে পারবে না। পাহারাদারও রয়েছে তো! আচ্ছা—।

···পান্নু বের হয়ে গেল। জিবের ডগা দিয়ে যতটুকু গরল ছড়ানো সম্ভব সবটুকুই ছড়িয়ে গেল, নীল হয়ে আসে সারা দেহ বিষের জ্বালায়।

ভুবন আর পান্নুদাস! ওরা দুজনেই এক সুরেই বাঁধা; আজ মনে হয় ভুবন ইচ্ছা করেই মালিককেও লেলিয়ে দিয়েছে। খুশী করতে চায় তাকে ··নিজের হীন জঘন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ হিসাবেই ব্যবহার করতে চায় তাকে—স্ত্রীর মর্যাদাটুকুও পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।···হু হু বয় রাতের বাতাস নির্জন প্রান্তরে—বাধাবন্ধহীন বাতাস।

ভুবনের উপরই রাগ হয় কদমের। এতদিনে ও এতখানি নীচে নেমেছে কল্পনাও করতে পারে না। মনে মনে আজ কদমও তৈরী হয়। অনেক সহ্য করেছে—এবার সব কিছু তার সহ্যের সীমা অতিক্রম করবার পর্যায়ে এসে পৌচেছে।

···লোকটা হাওয়ার মত কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল—উপে গেল কর্পূরের মত। কারিগর লোকটা।

মিষ্টির মন কাঁদেনা—যদিও একটু মন কেমন করে আর মনে হয় ভালোই করেছে সে। ওকে আর সহ্য করতে পারতো না। পাকা বাঁশে ঘুণ ধরার মত লোকটার অন্তরে ঘুণ ধরেছিল; এতদিন চাপা ছিল—সুযোগ পেতেই প্রকাশ পায় তার স্বরূপ। অনেকের মাঝেই খুঁজেছিল মনের মানুষ—একজন সঙ্গী; চেয়েছিল শূন্য মনকে পূর্ণ করতে কারো প্রীতিস্পর্শে—কিন্তু এমনিভাবে ঠকবে তা জানতো না।

—আমি নিজের কাছে নিজে ঠকেছি মিতে।

বড় দুঃখেই কথাটা প্রকাশ করে মিষ্টি।

শূন্য ঘর। সাজানো ঘর। অবিনাশ দেখেছে কেমন করে তিলে তিলে লোকটা বদলে গেল, সব হারালো তার।

—তা একবার খোঁজ-খপরও করবেনা তার?

হাসে মিষ্টি—বাসি ফুলের মালা আর গলায় নাইবা পরলাম।

—তবে?

বড় আক্ষেপের সঙ্গে যেন কথাগুলো বলে মিষ্টি—কলসী আর ভরা হোলনা মিতেন, যে ঘাটেই গেলাম জল ভরতে, দেখলাম কাদাগোলা জল আর তাতে থিকথিকে পোকা, কলসী তাই শূন্যিই রয়ে গেল।

অবিনাশ ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ডোমপাড়ার বাইরে ঝুপড়িগুলো আঁধারে হারিয়ে গেছে, বন থেকে হাওয়া ভেসে আসছে—কুর্চি ফুলের গন্ধ-মাখা হাওয়া।

সানাইএর অন্তরে কি সেই ব্যাকুল সুর তোলে।

—না আওয়ে বালম্।

ক্যা করু—সজনী।

···অর্থ বোঝেনা মিষ্টি, তবু ওই সুরের আকুল কান্না—সারা ব্যথাবিধুর মন ব্যাকুলতায় ভরিয়ে তোলে। অবিনাশের অন্তরেও তেমনি আকুতির ছায়া।

বলে ওঠে মিষ্টি—বিয়ে সাদী করে সংসারী হও মিতে। এমনি বিবাগী হয়ে ঘুরে মরোনা।

—কেনে ?…

—ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়ানোর বড় জ্বালা ভাই, বড়ো জ্বালা।

মিষ্টির মনে সেই চাপা বেদনাটা ফুটে উঠেছে—দু চোখের চাহনিতে তারই প্রকাশ।

কাল বৈশাখী নেমেছে। যত দূর চোখ যায় এদিকে লাল রুক্ষ প্রান্তর—আর সবুজহলুদে মেশা শালবন সীমা—কাছিমের পিঠে জিরি জিরি বিড়ালের লোম-ক্রমশঃ উঠে গিয়ে দিগন্ত সীমা স্পর্শ করেছে। বাটির মত উপুড় হয়ে নামা ধূসর আকাশ ছেয়ে আসে কালো জমাট পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ—এক কোণ থেকে অন্য কোণ অবধি ছেয়ে ফেলে—দূরে কোথায় গোঁ গোঁ করছে বন্দী বাতাস।

…জনহীন প্রান্তর আর বনের মাথায়—শান্ত জনপদকে আক্রমণ করার চক্রান্ত চলেছে। গরুগুলো ছুটে ফিরছে গ্রামের পানে। ত্রস্ত পথচারী আশ্রয়ের জন্য দৌড়চ্ছে।… সারা গ্রাম নিস্তব্ধ।

… তৃষিত ধরিত্রী উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে,…ওর কঠিন বুক খরতাপে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, বিবর্ণ হয়ে উঠেছে কাঁকুরে ডাঙ্গার প্রান্তে কোন রকমে টিকে আছে গাছ-গুলো।

…অতুলকামার—অতুলকামার কেন গ্রামের অনেকেই বৎসরের প্রথম মেঘসম্ভারের দিকে চেয়ে আছে। বাউরী-পাড়ার অনেকেই। বৃষ্টি নামুক—ঠাণ্ডা হোক বসুমতী। …মাটির বুকে বতর আসুক।

…কালো মেঘ জমা আকাশ হঠাৎ লাল গেরুয়া বর্ণ হয়ে ওঠে। শিখা দাঁড়িয়েছিল বাসার বাইরে, থমথমে বাতাস। স্তব্ধ হয়ে গেছে তার প্রবাহ; গরম আর গুমোট চারিদিক।

শিখা লাল আগুনলাগা আকাশের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে, বিচিত্র এর পরিবেশ। রুদ্র আর ধ্বংস এর চারিদিকে। প্রকট হয়ে উঠেছে আকাশ বাতাসে সেই ভয়াল রূপ।

…গর্জন শোনা যায়—অদৃশ্য কোন সৈন্যবাহিনীর কলোচ্ছ্বাসের শব্দ ভেসে ওঠে আকাশ বাতাসে।…দূরে বনের বুকে দেখা যায়—আকাশকোলে কি এক ঘূর্ণায়মান কুণ্ডলী, পাখীগুলো ছোট্ট কালো বিন্দুর মত উড়ছে। গাছের মাথাগুলো ধরে যেন সজোরে ঝাঁকানি দিয়ে উপড়ে ফেলবে তাদের মাটি থেকে—এগিয়ে আসছে ঝড়।

লাল ধূলোর আভায়—কালো আকাশ রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। কাঁপছে ডাঙ্গার বুকে ঘর ক'খানা।

সারদা ডাক্তার হেঁকে ওঠে—শিখামা, ঘরের ভিতর যাও।

ঝড়ের বেগে ওর গলাটাও যেন শোনা যায় না, কাঁকরগুলো তীব্র বাতাসের বেগে ছুটে এসে জানলায় লাগছে পট পট শব্দে, গায়ে মুখে বেঁধে।

…লাল ধুলোয় সব ঢেকে গেছে—আচ্ছন্ন হয়ে যায় দৃষ্টি। সব ওই ধ্বংসলীলার মাঝে হারিয়ে যায়। সারা গ্রামকে যেন নিশ্চিহ্ন করে দেবে ওই ঝড়।

বৃষ্টি নামল—তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

ঝড় থেমে গেছে—কালো বৃষ্টিধোয়া আকাশ শালবন সীমায় থেকে থেকে বিদ্যুতের ঝিলিমিলি শিখা ঝলসে ওঠে, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি।

…শাল কেঁদগাছ এর বন ভিজছে—ভিজছে ফুলে ভরা মহুয়া গাছগুলো, আকাশেরও বিরাম নেই। বাতাসে একটা মিষ্টি গন্ধ।

…সোঁদা মাটি ভেজা অদ্ভুত নেশা লাগানো একটি বিচিত্র সুবাস, বাতাসে মৃত্তিকার বুক থেকে ওঠে তৃপ্তির আবেশ; নীরব সেই রহস্যময়ী ধরিত্রীর বুকে খুশীর আভা।

মাটির এত কাছে কখনও থাকেনি শিখা।

ঝড়ের পর—ধ্বংসের পর বৃষ্টি বিধৌত মৃত্তিকা আকাশ বনানীর এই সুন্দর অনুভূতি আর নবরূপের সঙ্গে পরিচিত হয় নি।

…হঠাৎ বৃষ্টির মধ্যে বর্ষাতিঢাকা কাকে এগিয়ে আসতে দেখে চাইল শিখা। সামনের বাগানের গাছগুলো শুকিয়ে গেছল, উর্বরা মৃত্তিকা বৃষ্টির জলে আবার সতেজ হয়ে উঠেছে ফুটন্ত গোলাপ—রজনীগন্ধা স্থলপদ্মের গাছগুলো।

—তুমি!

অবাক হয়ে যায় শিখা অশোককে আসতে দেখে ভিজে গেছে—

—সদর থেকে ফিরেই এলাম এদিকে।

—কেন ভেবেছিলে আমরা বুঝি উড়েই গেলাম।

—না! এই বৃষ্টি খুব ভালো লাগলো। বেরিয়ে পড়লাম।

জানো শিখা—কাল থেকেই ফুল-সুইংএ কায সুরু করতে পারবো। কাল থেকে আমাদের কো-অপারেটিভের কায সুরু।

শিখা ওর দিকে চেয়ে থাকে। চোখে মুখে ওর খুশির দীপ্তি।

…সেই খবরটাই তাকে জানাতে এসেছে। তার পরিশ্রম আর তার সাফল্যের সংবাদ।

—একটু চাও খাবেন না?

—না। সময় নেই। ওদের সবাইকে খবর দিতে হবে।

—বের হয়ে গেল অশোক অন্ধকারেই বৃষ্টির মধ্যে।

গজরাচ্ছে আকাশ—বিদ্যুতের ঝলকে আর মেঘের গর্জনে। অন্ধকার আকাশকোল, ওদিকে দুর্গাপুর কোক ওভেনের বাড়তি গ্যাস জলার আগুন আর ব্লাষ্ট ফার্ণেসের লালাভ আলোয় ভরপুর; এরই মাঝে বেঁচে থাকার স্বীকৃতি নিয়ে একটি মানুষ যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

…দাঁড়িয়ে আছে শিখা, হঠাৎ সারদা ডাক্তারকে দেখে ওর দিকে চাইল।

—অশোকবাবু না?

—হ্যাঁ। ছোট জবাব দেয় শিখা।

—পাগল মা; ওরা খুশীতে পাগল। নোতুন মাটির বুকে ফসল জাগে যে খুশীতে—সেই খুশী ওর মনে। সব ছেড়ে সেই খেয়ালেই রয়ে গেল।

শিখা কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—ও কি ভুল করেছে ডাক্তারবাবু?

সারদাবাবু জবাব দেন।

—ভুল! না মা—ওই লোহাকারখানা—গাঁয়ের এই অবস্থা। ধ্বসেপড়া জীবনযাত্রা দেখে মনে হয়—এরও দরকার। খুব দরকার। একটাকে ছেড়ে অন্যটা নয়; একটাকে অস্বীকার করে অন্যটা নয়, দুটোর সমন্বয়ে যে নোতুন জীবন গড়ে উঠবে ওই অশোকবাবু সেই মতেই বিশ্বাসী। তাই যে সত্য সেই পরীক্ষা করছে মা।

ও ভুল করেনি। কিন্তু বড্ড একা—চারিদিকে এত বাধা ঠেলে এগোনো বড় কঠিন।

চুপ করে ওর কথাগুলো শোনে শিখা। একটি লোকের উদ্যমেই আজ নোতুন গ্রাম—তাকে কেন্দ্র করে কৃষি-জীবনও আধুনিক পর্যায়ে উঠতে চলেছে। এ একা পাতাজোড়ার সমস্যা নয়—আমাদের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি মানুষেরই সমস্যা।

সারদা ডাক্তার বলে ওঠে—দেখছ না চারিদিকে শুধু ভাঙ্গছে আর ভাঙ্গছে। এই ঝড়ের পর যেমন নোতুন ফসলের সম্ভাবনা আনে বৃষ্টি, তেমনি এই ভাঙ্গাটাই সব নয়—গড়ার পর্বও আছে এই মতে ও বিশ্বাসী শিখা মা।

·· শিখা কথা বললো না। নিজের জীবনেও দেখেছে—সেও কোথায় এই মতে বিশ্বাস করে। নইলে নিজের বাড়ী-ঘর—বাবা-মা সবাই গেল; ভাই কোথায় কোন অসামাজিক অপরাধে জেলে। খবর নিতে পরিচয় দিতেও ঘৃণা করে। শুধু বাঁচবার জন্যই আজও সংগ্রাম করে চলেছে শিখা; আজ মনে হয় তারও সার্থকতা আছে।

হারাণো পথের বাঁকে তাই অশোককে দেখে সেই কঠিন শপথে আজ আবার বিশ্বাস ফিরে পায় সে।

…ভুবনকে পানু দাস অনেক উপরে তুলছে। কতকটা নিজের ব্যবসার খাতিরে, কতকটা বা অন্য প্রয়োজনে। ভুবন সে খবর রাখে না, দুর্গাপুরেই বেশ খানিকটা জমি নিয়ে ফলাও কারখানা করছে পানু দাস। ভুবনকে সেই-খানেই প্রমোশন দিয়ে পাঠাবে।

ভুবন খুশীতে ভরে ওঠে। মনে মনে স্বপ্ন দেখে দুর্গা-পুরের জীবনের। সেই বিলাসব্যসন আর কর্মব্যস্ত জীবন। সেখানে অন্য কিছু ভাববার নেই—শুধু কায আর কায, অবসর সময়টুকু ভোগের স্রোতে ভেসে যাওয়া। মাইনেও পাবে মোটা।…নিজের কথাই ভাবে। পানুকে তাই আমন্ত্রণই জানায়—যদি বাড়ীতে একবার পায়ের ধুলো দেন দাসবাবু।

হাসে পানু। তার মনে সেই রাত্রের একটু বুভুক্ষু ছবি ফুটে ওঠে লালসার শিখা মনে মনে জলছে তুষের আগুনের মত মনের অতলে।

কদম!…যৌবনপুষ্ট কামনামদির দেহ।

—কিন্তু!…বাড়ীতে একবার শুধিয়ে দেখো—

—হ্যাঁ। আপনার পায়ের ধুলো পড়বে, অন্নদাতা, সে আবার কি বলবে। উদ্ধার হয়ে যাবে সে মাগী।

হাসছে পান্নু—কি জানি।

তবু রাজী হয় পান্নু।

দিনের শেষে কাজটাও তাই মনে পড়ে। একবার সদরে গিয়ে কয়েকটা মেসিনের লাইসেন্স আনতে হবে। ছুটতে হবে বর্দ্ধমানে। গাড়ী অবশ্য তৈরী।

ভুবনই অতি উৎসাহে বলে ওঠে—ঠিক আছে। যাবো, আজ সন্ধ্যা নাগাদ ফিরবো না হয়।

পান্নু যেন অগত্যা ওর কথাতেই রাজী হয়।—দেখ। না হয় পরেই হবে।

ভুবন কাষের নেশায়—ভবিষ্যতের উন্মাদনায় মেতে উঠেছে।

—না, না। কাষ আগে। আপনি কিন্তু দয়া করে যাবেন। আপনারই তো বাড়ী।

পান্নু আমতা আমতা করে—দেখা যাক।

কথাটা কদম শোনে মাত্র, জবাব দেয় না। দুর্গাপুরের প্রমোশনের কথাও শুনেছে কদম। প্রাণবল্লভবাবু যে কত ভালো লোক—ভুবনকে কেমন ভালবাসে, সে কথাও শুনে শুনে হদ্দ হয়ে গেছে। ভুবন বলে ওঠে।

—আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি যেন না হয় বুঝলি, মুনিব—অন্নদাতা। কোত্থেকে কোথায় এসেছি—আরও কোথায় উঠবো দেখবি।

কদম জবাব দেয়—হ্যাঁ, তা তো দেখছিই।

—গাঁয়ের ওই অন্ধকার পাঁদাড়ে পড়ে থাকলে হতো এসব? ফিঁচের উপর ট্যানা একখানা জড়িয়ে শালে হাতুড়ী পেটা। রামচন্দর।

ভুবন মনে মনে তাই পান্নুদাসের কাছে অত্যন্ত ঋণী, কৃতজ্ঞ। কদমের দিক থেকে ঋণ কারো প্রতিই নেই, কর্তব্য ওটুকু—যেটুকু ছিল স্ত্রীর কর্তব্য, স্বামীর দুর্ব্যবহারে তাও সহ্যের সীমাপ্রান্তে এসে পৌঁচেছে।

ভুবন বলে ওঠে—বাবুকে আজ নেমতন্ন করে এসেছি।

কদম ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল। প্রশ্ন করে। —তা আমাকে কি করতে হবে?

—সহজভাবে ওকে নিজের দলে, মতে আনবার চেষ্টা করে ভুবন। এটাও ক্রমশঃ শিখেছে সে—এই মাটিতে, এই জীবনে এসে চাল্লাকিটাও রপ্ত করেছে গোয়াতুর্মি ছেড়ে। বলে ওঠে ভুবন।

—বাঃ রে, তোর বাড়ীতে আসবে কত ভাগ্যির কথা—একটু কথাবার্তা কইবি, আমিও ফিরে আসবো রাতেই। আর হ্যাঁ—একটু খাওয়া-দাওয়ার যোগাড়ও করবি। মাছ মাংস গোকুল কিনে দিয়ে যাবে—বলে গেলাম।

কদম কথা বলে না, ক্রমশঃ ওই লোকটার মনের নীচেকার কুটিল অভিসন্ধিটাও বেশ বুঝতে পেরেছে। পান্নুদাসও আজ ব্যবসায় ফুলে ফেঁপে জীবনের কিছুটা সময় শান্তি আর ভোগের ইন্ধন খোঁজে। আগে এসব কথা শোনেনি ওর সম্বন্ধে।

ভুবনও বদলেছে—বদলেছে পান্নুদাসও।

কিন্তু কদম! মনের দিক থেকে বিন্দুমাত্র সায় পায় নি। এগিয়ে যাবার—নিজেকে পণ্য করে অনেককিছু অর্জন করার অপরিসীম কাঙ্গালপনা থেকে তার সেই আগেকার খড়ো ঘরে অভাব দুঃখ আর তার মাঝে শান্তিটুকুই ছিল অনেক ভালো।

সে বদলাতে পারেনি, শুধু পারেনি নয়। এ জীবনকে সহ্য করতে পারেনি—পারেনি নিজেকে সেই লোভ মোহ আর অন্ধকামনাময় জীবনের সামিল করে নিতে।

···হঠাৎ গলার শব্দ শুনে ফিরে চাইল কদম।

দুপুরের রোদ ম্লান হয়ে আসছে। ছায়া পড়েছে লম্বা হয়ে—কদর্য বিকৃত একটা ছায়া। গোকুল ঢুকছে কাঁধে একটা ব্যাগ ঝোলান। একটু চমকে ওর দিকে চাইল কদম। প্রায় বছর কয়েক পর ওকে দেখছে কাছ থেকে—আগেকার এমনি একটি বৈকালের ছবি কদমের চোখের উপর ভেসে ওঠে। একটি বুভুক্ষু রাস্তার ভিখারী সেদিন গোকুল, চোখে মুখে একটি অসহায় পাণ্ডুর ভাব। তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল অতুল।

খাইয়ে ছিল কদম—ক্ষুধার অন্ন জুগিয়েছিল, তৃষ্ণায় দিয়েছিল পানীয়; সেই স্বাভাবিক মানবিক ব্যবহারের মূল্য দিয়েছিল গোকুল—কোর্টে দাঁড়িয়ে তার নামে দুরপনের কলঙ্ক দিয়ে।

···আজও যা ভুবনের মনের অতলে রয়ে গেছে, তাই

হয়তো ভুবন সাহস করেছে—পান্নুদাসের সামনে তাকে বিকিয়ে দিয়ে নিজের চাকরীর উন্নতি করতে।

—এগুলো রাখো বৌদি; গোকুল দাওয়ায় চেপে বসে ঝুলি থেকে শালপাতা মোড়া রক্ত লাগা মাংস বেশ কিছুটা বের করে দেয়, কিছু আনাজপত্র—আর কাগজ জড়ানো একটা বোতলের মত।

দেখে কদম চমকে ওঠে—ওটা কি!

হাসে গোকুল—পান্নুবাবুর ওসব আজকাল এক আধটুর দরকার হয়। ওটা উঠিয়ে রাখো সামনে থেকে।

কদমের পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগুন জলছে। গোকুলের মুখ চোখ কেমন চোয়াড়ে হয়ে উঠেছে। একটু কুৎসিৎ ভঙ্গীতে হাসবার চেষ্টা করে—ভুবনদা এসব বলেনি কিছু তোমাকে? মানে যে পূজোর যে মন্তর আর কি!

কদমের দুচোখ ফেটে লজ্জায় আর অপমানে কান্না আসে। বুকের ভিতরটা হু হু জলছে। গোকুল বলে ওঠে—এক গেলাস জল দেবা? ওই সুন্দর হাতের একটু মিষ্টি জল।

—জল! চমকে উঠে কদম। আবার আজও এসেছে ওই দৈত্যটা তৃষ্ণায় জল চাইতে। সবাই তাকে কি মনে করে!

আখের শালের কথা মনে পড়ে, ভেসে ওঠে সেই গুড়-জ্বালানী কড়াই আর রসের হাঁড়িগুলোর কথা; মুনিব আর চাষী গুড়গুলো তুলে নিয়ে চলে যায়—পড়ে থাকে গুড়মাখানো কড়াইটা। কুকুর আর কাক চিলে ঠুকরে খায়।

গোকুলও যেন এমনি এসেছে—পান্নুদাস মুনিবের পাত চাটার পর যদি কিছু অবশেষ থাকে—চেটে-পুটে খাবে। কুকুরের দল—ঘেয়ো নোংরা কুকুর ওরা সব। কঠিন কণ্ঠে জবাব দেয় কদম।

—বাইরের কলে গিয়ে খাওগে। যাও।

গোকুল উঠে পড়লো, বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে, কেমন যেন ভয় পেয়েছে। পা পা করে এগিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে বলে ওঠে।

—ওসব কথা বলেছিলাম—দাসমশাইএর কানে যেন না ওঠে মাইরী। যা রেগেছ তুমি, বাবুকে যদি বলে দাও বিলকুল নোকরী খতম করে দেবে। হাজার হোক বাবুর মেয়েমানুষকে—

চাবুক খেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে কদম-বৌ। থরথরিয়ে কাঁপছে সারা দেহ। প্রতিবাদ করবার, চীৎকার করে প্রতিবাদ জানাবার সামর্থ্যটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে।

বের হয়ে গেল গোকুল।

উঠোনে আমগাছের ছায়াটা আঁধার হয়ে আসে। বেলা পড়ে এল। রোদ গেল—এল অন্ধকার। দুঃখ হতাশা আর অপমানের অন্ধকার। বলির পাঠার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে কদম।

ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে, অভিযোগ জানাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কেঁদে লাভ কি? অভিযোগই জানাবে কার কাছে? পালাবে?…তাই বা পালাবে কোথায়?

কি করে জানাবে বৃদ্ধ অসহায় অতুলকামারকে তার স্বামীর অমানুষিক পাশবিকতার কথা, লোভের জঘন্য কাহিনী। নিজেরই দুঃসহ এ লজ্জা—দুস্তর এ দুঃখ আর অপমান।

হঠাৎ কি যেন ভেবে…কঠিন হয়ে ওঠে। ভাবনার হারাণো খেইগুলো একটা সিদ্ধান্তের শেষ সূত্রে এসে গ্রথিত হয়ে ওঠে। স্তব্ধ হয় এলোমেলো চিন্তার জটগুলো।

[ক্রমশঃ

হিন্দুত্ব

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ভারতে আজ যত ধর্ম্মের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল—পরমব্রহ্ম নিরাকার মহাপুরুষসহ তাঁহার আশ্রিতা নিরাকারা মহাশক্তি (রাধা) হিন্দুর একমাত্র উপাস্য দেবতা। কারণ ঐ নিরাকার মহাপুরুষ মহাপ্রকৃতির সহায়তায় সমগ্র জগৎ এবং তাঁহার আশ্রিত সজীব নির্জ্জীব, স্থাবর-অস্থাবর সকল বস্তুই সৃষ্টি করিয়াছেন। কিছুদিন পরে ঐ মহাপুরুষ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া নাম গ্রহণ করিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ঐ সঙ্গে মহাশক্তিরূপিণী মহাপ্রকৃতিও তিনভাগে বিভক্ত হইয়া নাম গ্রহণ করিলেন সাবিত্রী, লক্ষ্মী ও পার্ব্বতী। প্রকৃতি সাবিত্রী আবার দুইভাগে বিভক্ত হইয়া নাম গ্রহণ করিলেন সাবিত্রী ও গায়ত্রী, ইহাদের দ্বারাই জীবজগতের বৃদ্ধি পাইল। ইতিপূর্ব্বে মহাশক্তিরূপিণী মহাপ্রকৃতি রাধা অপর একটি নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন লক্ষ্মী। এক্ষণে পুনরায় অপর একটি নাম গ্রহণ করিলেন সীতা। ইহারা জগৎকে প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ বিষ্ণু, নাম গ্রহণ করিলেন নারায়ণ, কৃষ্ণ ও রাম। এই কৃষ্ণ যদুপতি হইতে স্বতন্ত্র এবং এই রামও রঘুপতি হইতে স্বতন্ত্র। আর সীতা স্বয়ং রাধা বা লক্ষ্মীরই নামান্তর, ইনি জনকনন্দিনী হইতে স্বতন্ত্র।

রসময় পাগল মহাদেবও বিভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে বিভিন্ন নাম ধারণ করিলেন। অপরদিকে তাঁহার মহাশক্তি পার্ব্বতী আদিতেই পৃথিবীর সৃষ্টি করেন। পরে তিনি বহুভাগে বিভক্ত হইয়া হিন্দুর দ্বারে দ্বারে পূজিত হন। মহাদেবের সংস্পর্শ কামনায় চিরযৌবনা পার্ব্বতী তাঁহার নিত্য কলরবকে বৃদ্ধি করিতে থাকেন। ওদিকে রসময় ভোলানাথও তাঁহার শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কেবলই তাহার নিকট হইতে সরিতে থাকেন। আর ঐ সঙ্গে পার্ব্বতীর অপর ভগিনী বা সতিনী পার্ব্বতীর শক্তি বৃদ্ধির জন্যই হউক বা মহাদেবের সঙ্গলাভের ইচ্ছাতেই হউক পিতৃ-সঞ্চিত ধনরাজি বহন করিয়া আনিয়া মহাদেবের বক্ষোপরি স্থাপন করেন। ফলে মহাদেবের বক্ষে একের পর একটি করিয়া বিস্ফোটকের সৃষ্টি হয়। ঐ বিস্ফোটকের যন্ত্রণায় মহাদেব পার্ব্বতীকে আহ্বান করেন। আর পার্ব্বতী নিজ অঙ্গকে মহাদেবের বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া ঐ বিস্ফোটক নিজ অঙ্গে ধারণ করেন, এইরূপভাবে মহাদেব পশ্চাদপসরণ করিতে করিতে মহাকালীকেও দূরে রাখিয়া মহাকাল ভৈরব সাজিয়া যোগাসনে বসিয়া রহিয়াছেন। কাজেই পার্ব্বতী তাঁহার যোগভঙ্গের অপেক্ষায় কালযাপন করিতেছেন। আর গঙ্গাদেবী বহু-অপেক্ষা করিয়া শেষে পিতৃগৃহে ফিরিবার প্রয়াস পাইতেছেন। সুতরাং আদি নিরাকার পরম ব্রহ্মকে লইয়াই প্রথমে হিন্দুর হিন্দুত্ব আরম্ভ হয়। তৎপরে যেমন যুগের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে তেমনি হিন্দুত্বের মধ্যে নানা বিভাগের সৃষ্টি হয়। মহাভারতীয় যুগ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব, শৈব ও ব্রাহ্মণ্য—এই তিনটি মতই প্রচলিত ছিল, তবে সেই সঙ্গে তাঁহাদের শক্তিরও আবির্ভাব ঘটিত।

বৈষ্ণবগণ ভাবিতেন তাঁহাদের ইষ্টদেবের অবস্থিতি বৈকুণ্ঠে, শৈবগণ ভাবিতেন তাঁহাদের ইষ্টদেবের আসন কৈলাসে আর ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বীগণ ভাবিতেন তাঁহাদের ইষ্টদেবের আসন সৌরজগতের সর্ব্বত্র। বৈষ্ণবগণ নারায়ণসহ তাঁহার শক্তি ও উপশক্তির পূজা করিতেন, শৈবগণ শিবসহ তাঁহার শক্তি ও উপশক্তির পূজা করিতেন, আর ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বীগণ ব্রহ্মা ও গায়ত্রী সহ ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহের উপাসনা করিতেন।

অনুমান, আদিতে মহাব্যাস, হিমালয় ও মহাসমুদ্র ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ঐ হিমালয় পর্ব্বতই হইতেছেন ব্রহ্মা, তাঁহার এবং তাঁহার শাখা প্রশাখাবৃন্দের দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। হিমালয়ের বক্ষেই সর্ব্বপ্রথমে জীব জগতের সৃষ্টি হয়। তাঁহারা চক্ষুরুন্মেলন করিয়াই

দেখিলেন ব্রহ্মার বক্ষোপরি নিজেও অবস্থান করিতেছেন, আর ঊর্দ্ধে দেখিলেন, মহাব্যাসকে আশ্রয় করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্ররাজি বিরাজ করিতেছে এবং ঐ চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্ররাজি হিমালয়ের পূর্ব্বপার্শ্ব হইতেই ঊর্দ্ধলোকে গমন করিতেছে। কাজেই হিমালয়ের পূর্ব্ব অংশকে তাঁহারা বৈকুণ্ঠ (বিষ্ণুর আসন) নামে গ্রহণ করিলেন। হিমালয়ের ঐ অংশ বৈভ্র নামেও পরিচিত। আসামের উত্তরে ছিল গন্ধর্ব্ব দেশ (চিত্ররথের দেশ) এবং ঐ গন্ধর্ব্বদেশের পার্শ্বেই ছিল বৈভ্রাজ নামক দেবোত্থান, আর ঐ দেবোত্থানের সংলগ্নই ছিল বৈকুণ্ঠ বা বৈভ্র। ইহার যথেষ্ট সমর্থন মিলে যেমন—

"পূর্ব্বং চৈত্ররথং নাম দক্ষিণে নন্দনং বনন্।
বৈভ্রাজং পশ্চিমে শৈলে সাবিত্রীঞ্চোত্তরাঞ্চলে॥"

(বিশ্বকোষ, বৈভ্রাজশব্দ)

অনুমান, বর্ত্তমান দার্জ্জিলিংএর পার্শ্ববর্ত্তী স্থান বৈকুণ্ঠ নামে আখ্যাত হইয়াছিল। আর দার্জ্জিলিং ও কাশ্মীরের মধ্যবর্ত্তী স্থান, যাহা আদিতে সমুদ্রোপকূলে ছিল, তাহাই কৈলাস নামে পরিচিত হইয়াছিল। কেন না উহাই ছিল মহাসমুদ্রের (মহাদেবের) আসন। পরবর্ত্তী কালে ঐ প্রদেশ নাগবংশীয়গণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ায় মহাদেব নাগভূষণে ভূষিত হইয়াছেন। ঐ কৈলাস প্রসঙ্গে বিশ্বকোষ বলেন—

"বর্ত্তমান তিব্বতদেশে মানস সরোবরের নিকটও কাশ্মীররাজ্যের উত্তর-পূর্ব্বে কৈলাস পর্ব্বত অবস্থিত। এই পর্ব্বত হইতেই সিন্ধু, শতদ্রু ও ব্রহ্মপুত্র নদ উৎপন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান কৈলাসের অপর নাম গাঙ্গরী, সিন্ধু সাগর নদের উৎপত্তি স্থান হইতে সঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দক্ষিণে লাধক, বলতি, রঙ্গদো এবং উত্তরে রথেদ্, কুভ্রা, শিথর ও হূণজানগর। এই শৈলে ১০ হাজার হইতে ১২ হাজার হাত উচ্চে ৬টী গিরিপথ আছে। ভোট জাতি ইহাকে 'তিসি' বলে। তাহাদের মতে ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ।" (বিশ্বকোষ, কৈলাস শব্দ)

অনুমান, আর্য্যঋষিগণ সর্ব্বপ্রথমে সমগ্র হিমালয়কে—পরম-ব্রহ্ম নিরাকার মহাপুরুষের আসন রূপে কল্পনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকেই সৃষ্টিকর্ত্তা কল্পনা করেন। পরে ঐ হিমালয়কে তিন ভাগে ভাগ করিয়া পূর্ব্বভাগকে বিষ্ণুর আসন, পশ্চিম ভাগকে ব্রহ্মার আসন, আর মধ্যভাগকে মহাদেবের আসনরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান আর্য্যঋষি এবং প্রধান প্রধান নায়কগণও সম্মানিত হইতেন। তাহারই ফলে প্রজাপতি, অগ্নি, যজ্ঞেশ্বর প্রভৃতি ঋষি এবং গণপতি (গণেশ), দেবসেনাপতি কার্তিক, ভূস্বামী জমিদার বাস্তুপুরুষ (বাসভূমির প্রতিষ্ঠাতা) প্রভৃতিও অর্চ্চিত হইতেন। এখনও ঐ অর্চ্চনাধারা প্রচলিত আছে। অর্চ্চনা ধারাটি যতদূর সম্ভব রামায়ণের যুগ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কেননা সীতার বনবাস-দণ্ডাদেশ হইতে অনুমিত হয় যে, ঐ সময়ে ঋষি-শক্তি, রাজ-শক্তি ও প্রজাশক্তি সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও ক্ষাত্রধর্ম্ম সম-আচারী পরশুরামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে হিন্দুর পুরুষ ও প্রকৃতি সমভাবে সকল বিষয়েই স্বাধীন ছিলেন। পরদারগ্রহণে বা পরপুরুষসঙ্গলাভে কোন দোষত্রুটি ছিলনা। কুমারীপ্রকৃতির সন্তানগণ বা জারজ সন্তানগণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জনক-জননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রাজসরকারে রাজশক্তি কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া হয়ত দেবসেনাপতির আসন লাভ করিতেন, নতুবা মুনিঋষিগণ কর্ত্তৃক পালিত হইয়া ঋষিত্বপ্রাপ্ত হইতেন। ঐ রূপ জননপ্রসঙ্গে স্থলবিশেষে কুশপুত্তলিকা বা গাত্রময়লার ও অবতারণা ঘটিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কার্ত্তিক দেবসেনাপতি এবং ঋষি ধন্বন্তরি ও ভরদ্বাজ ঋষি। ধন্বন্তরি ছিলেন বৈশ্যদুহিতা কুমারীবীরভদ্রার পুত্র, আর ঋষি ভরদ্বাজ ছিলেন বৃহস্পতিঋষির ঔরসজাত এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর উতথ্য ঋষির পত্নী মমতার গর্ভজাত। কার্তিক গণেশ নাকি পার্ব্বতীর গর্ভজাত সন্তান নহেন। অনুমান, কার্ত্তিক ছিলেন জারজ সন্তান। রাজশক্তি তাঁহাকে শরবনে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর গণপতি রাজবংশে জন্মলাভ করিয়া পার্ব্বতীর বক্ষোপরি ভূমিষ্ট হন এবং জন্মগত বুদ্ধিবৃত্তির প্রাথর্য্য প্রকাশ করেন। পরে রাজদণ্ড লাভ করিয়া শীর্ষস্থানীয় হইলে, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে শনির আবির্ভাবে সাধারণের সুখসুবিধাদানে অক্ষম হইয়া মহামূর্খ আখ্যালাভ করেন। গজমুণ্ড তাহারই প্রতীক।

যদুবংশের প্রতিষ্ঠাতা যদুর পুত্র ও পৌত্রগণ কর্ত্তৃক পরশুরামের পিতা জমদগ্নি ঋষি নিহত হইলে পরশুরাম

ক্ষত্রিয় নিধন-যজ্ঞ আরম্ভ করেন। আর বিধবা ক্ষত্রিয়াণী-গণ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও অনার্য্য গোষ্ঠীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকেন। দেশময় সামাজিক ব্যভিচার দেখা দেয়। তখন কশ্যপ মুনি পরশুরামের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বহু স্তবস্তুতির দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া ক্ষত্রিয়নিধন যজ্ঞ হইতে নিরস্ত করেন। এই সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে হিন্দু জাতির মধ্যে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। এই কশ্যপ মুনি সূর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা সূর্য্যের পিতা হইতে স্বতন্ত্র। ইনি কাশ্যপ গোত্রের প্রবর্ত্তক।

আদিতে আর্য্যজাতি কর্ম্মগুণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ঋষি ধন্বন্তরির আবির্ভাবে অর্থাৎ বৈবশ্বত মনু বা সপ্তম মনুর সময়ে (যে সময়ে গালব ঋষি সপ্তর্ষি মধ্যে গণ্য ছিলেন) বৈশ্য জাতির সৃষ্টি হয়। তৎপরে পরশুরামের প্রভাবে ব্রাহ্মণ ঔরসজাত ক্ষত্রিয়াণী গর্ভস্থ সন্তান কায়স্থ আখ্যা লাভ করে, আর বৈশ্যের ঔরসজাত ক্ষত্রিয়াণী গর্ভস্থ সন্তান মাহিষ্য নামে পরিচিত হয়। আর অনার্য্য গোষ্ঠীর ঔরসজাত ক্ষত্রিয়াণী গর্ভস্থ সন্তানগণ হিন্দু জাতির নিম্নতর স্তরে (অনুমান, নবশাক সম্প্রদায় ব্যতীত) গমন করে। এই সময় হইতে নপুংসক বা বন্ধ্যাত্বগ্রস্ত ক্ষত্রিয়ের স্ত্রীগণের নিকটে স্বামীর অনুমতিক্রমে অতি সঙ্গোপনে স্বর্গের দেবতাগণের (মুনি ঋষিগণের) আবির্ভাব ঘটিতে থাকে। তাহারই ফলে পঞ্চপাণ্ডবের জন্মলাভ ঘটে। আর কুমারীর সন্তান অতি সঙ্গোপনে যাহাতে শিশুর কোন অনিষ্ট না হয় সেইরূপ কোন ভাসমান পাত্রে স্থাপন করিয়া জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইত। তাহারই ফলে মৎস্যগন্ধারপুত্র ব্যাসদেব এবং কুন্তিপুত্র দাতাকর্ণের আবির্ভাব ঘটে। অনেক সময় নিজপুত্রসহ পালিতপুত্রও নিজপুত্র মধ্যে গৃহীত হইত। সেই হেতু ধৃতরাষ্ট্র শতপুত্রের পিতা হইয়া ছিলেন। আবার অনেক সময় সুশাসকগণের প্রজাও পুত্ররূপে পরিচিত হইত। অনুমান, সগর রাজা নিজ পুত্রসহ ঐরূপ ষাট হাজার পুত্রের পিতা ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্য্যন্ত ঐ ধর্ম্মধারা ও সামাজিক ধারা প্রচলিত ছিল। ইহার পরে দলে দলে বৈদেশিকগণের আবির্ভাব ঘটিতে থাকে, আর ঐ সঙ্গে সমাজ বন্ধন আরও দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে আরম্ভ করে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তে মগধের বার্হদ্রথ বংশীয় জরাসন্ধপুত্র সহদেব শীর্ষত্ব লাভ করেন। পূর্ব আর্য্যাবর্ত্তে দাতাকর্ণের পুত্র বৃষকেতুর প্রভাব অর্থাৎ কায়স্থ প্রভাব বিস্তৃত হয়। আর আসাম প্রদেশে শৈব-মতাবলম্বী নাগবংশীয় বভ্রুবাহন অপরাজেয় শক্তি লাভ করেন। অপর দিকে কুরুবংশীয় রাজা পরীক্ষিৎ ছিলেন নাবালক। বৃষকেতু তাঁহার আত্মীয় সাজিয়া তাঁহাকে পরম বৈষ্ণবে পরিণত করেন। কাজেই হস্তিনাপুরীর রাজবংশ কালক্রমে একেবারেই হীনবীর্য্য হইয়া কৌশাম্বীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর যদু-বংশীয়গণ ক্রমে ক্রমে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে পলাইতে আরম্ভ করেন। এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। তাঁহার রোগবিমুক্তি জন্য সূর্য্য-পৌত্র বৃষকেতুর প্ররোচনায় শাকদ্বীপ (পারস্য) হইতে সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণ আনীত হয়। তাঁহারা আসিয়া মূল শাম্বপুরে (বর্ত্তমান মূলতান সহরে) সূর্য্যপূজা করিয়া শাম্বকে রোগ-মুক্ত করেন। কাজেই সকলেই সূর্য্য আরাধনার দিকে আকৃষ্ট হয়। এখন হইতে ভারতে সৌরধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে। আর ঐ সঙ্গে ভারতবাসী ও পারস্যবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সেই সূত্রে শাকবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ দলে দলে ভারতে আসিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা পারস্যবাসী বলিয়া এদেশীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে অবহেলার চক্ষে গ্রহণ করিয়া "রাজপুত" আখ্যা দান করেন। অপরদিকে আবার কলির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল পূর্ব্ব-আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরে বর্ত্তমান জলপাইগুড়িতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই। পারস্যদেশীয় ক্ষত্রিয় (রাজপুত) শিবভক্ত পৌণ্ড্র বাসুদেব ঐ সময়ে জলপাইগুড়ির রাজ্যশাসন করিতেন। ইহার সময়েই প্রথম জৈনমতের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু উহার বিকাশ পায় বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বে। কাজেই বুদ্ধদেবের আগমনের পূর্ব্বে হিন্দুর হিন্দুত্ব বহুভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ঐ প্রসঙ্গে ইহাও বলা যায় যে, মালদহের উত্তর সীমান্তে কলিগ্রামে আদি জিনের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

বুদ্ধদেব সকল মতের সারমর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিজ ধর্ম্মমত প্রকাশ করেন। কিন্তু

সাধারণে তাঁহার মতের উদ্দেশ্য গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া নানা ব্যভিচারে মত্ত হয়। কাজেই শঙ্করাচার্য্যকে নিজ শৈব মত লইয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হইতে হয়। এই সময় হইতে শৈব, সৌর এবং বৌদ্ধ, এই তিনটি মত পাশাপাশি চলিতে থাকে, আর অপরাপর মতগুলি কোণঠাসা হয়। ইহার পরে আবার মহম্মদের আবির্ভাব ঘটিলে ভারতীয় এবং এদেশে আগত পারশ্যবাসী ব্রাহ্মণগণ নিজেদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা দ্বারা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে যত্নবান হইতে আরম্ভ করেন। তাহার ফলে আদিশূরের সময়ে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য মত প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মগধ এবং উত্তরবঙ্গ তখনও বৌদ্ধ ব্যভিচারে মত্ত ছিল। সেই কারণেই পালবংশের (পারস্যবাসী কায়স্থ) উত্থান লাভ ঘটে। পালবংশ পতনের পর বল্লালসেন কর্ম্মগুণানুসারে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির সংমিশ্রিত জাতিবর্গকে নবশাক সম্প্রদায়ে পরিণত করেন। আর ঐ সঙ্গে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য মত প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু নিজ চরিত্র দোষে (ভৈরবী চক্রের প্রভাবে) ব্রাহ্মণ্য মত প্রতিষ্ঠায় অকৃতকার্য্য হন। শেষে মৃত্যুকালে রাজ্য হইতে বৌদ্ধমতকে বিতাড়নজন্য নিজ পুত্র লক্ষ্মণসেনের উপর ভারঅর্পণ করিয়া যান। লক্ষণ সেন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী পশুপতিও হলায়ুধের সাহায্যে ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব প্রণয়ন পূর্ব্বক শাক্ততন্ত্রবাদের প্রচার দ্বারা বৌদ্ধতন্ত্রবাদকে এদেশ হইতে বিতাড়িত করেন। লক্ষ্মণসেনের পর হইতেই হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

একদিকে মুসলমান নৃপতিগণ রাজসম্মান ও ধনদৌলতের মোহ দেখাইয়া উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছিলেন। অপরদিকে হিন্দুসমাজ কোনরূপ দয়া দাক্ষিণ্য না দেখাইয়া নিজ পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজনকে সমাজচ্যুত করিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছিলেন। এইরূপে কালাপাহাড়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বহু কালাপাহাড়ের সৃষ্টি হয়। পরে কালাপাহাড়ের আবির্ভাবে সুদূর উড়িষ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া কাশীধাম পর্য্যন্ত তাঁহার পদাবনত হয়। তাহার ফলে ঐ দুই প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডের প্রায় অর্দ্ধেক হিন্দু মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কালাপাহাড় বাদশাহজাদীকে বিবাহ করার পূর্ব্বেই মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হন নাই বা বাদশাহও তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ জন্য পীড়াপীড়ি করেন নাই। কালাপাহাড় বাদশাহজাদীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে বাদশাহজাদীসহ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিজধর্ম্মে স্থির থাকিবার উদ্দেশ্যে তৎকালীন পণ্ডিতদের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন। যখন তাঁহার কাতর ক্রন্দনে কেহই সাড়া দেন না, তখন তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম উচ্ছেদের জন্য বদ্ধপরিকর হন। হোসেনশাহ বাদশাহের সময়ে দুই বিভিন্ন সহজ মত ও সহজ পথ লইয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে দুই মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। একজন শ্রীরঘুনন্দন, অপরজন শ্রীশ্রীচৈতন্য। তৎপরে বাঙ্গলার বুকে আবির্ভূত হইলেন দাক্ষিণাত্যনিবাসী ব্রাহ্মণতনয় মুর্শিদকুলী খাঁ। তাঁহার প্রযত্নে বাঙ্গলা মুসলমান গরিষ্ঠতা লাভ পূর্ব্বক আজ দ্বিধা বিভক্তরূপে পরিণত হইয়াছে। মুর্শিদকুলী খাঁর প্রতিও তৎকালীন হিন্দুসমাজ উদারতা দেখাইতে বিমুখ হইয়াছিলেন। তজ্জন্যই তিনি প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুবিদ্বেষী হইয়াছিলেন। এই ত গেল মুসলমান ধর্ম্মের কথা। অপরদিকে ঢাকার নবাবী আমলে বাঙ্গালায় আবির্ভূত হইলেন কুমারী মেরীর পুত্র যীশুর চেলা চামুণ্ডাগণ। আড্ডা গাড়িলেন শ্রীরামপুরে। আরম্ভ করিলেন যীশুর শ্রীমধুবাণী প্রচার করিতে। তাঁহাদের বাণীতে বিগলিত লইয়া যুবকেরদল মাতিয়া উঠিলেন নব উত্তেজনায়। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণের ভয় হইল। কাজেই হিন্দুর হিন্দুত্ব সঠিক রাখার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব ঘটিল। অপরদিকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ হিন্দু সমাজে মৃতসঞ্জীবনীসুধা বর্ষণ করিয়া হিন্দুর মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন।

বর্ত্তমানের হিন্দু কোন্ পথে ধাবিত হইতেছেন, তাহার কোনই ঠিকানা নাই। মনে হইতেছে, হিন্দু যেন নিজ পথ ভুলিয়া গিয়া আলেকজাণ্ডারের মত বিভ্রান্ত হইয়াছেন।

রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি দুইটি বিভিন্ন নীতি হইলেও একটি অপরটির সহায়ক। ধর্ম্মনীতি বা সামাজিক নীতি যদি পথভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে রাজনীতিও কি পথভ্রষ্ট হইতে পারেনা? বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ যেন সর্ব্বদার জন্যই উচ্ছৃঙ্খলতার মাধ্যমে রাজনীতিকে পথভ্রষ্ট করিয়া নিজ

অনুচর করিবার প্রয়াস পাইতেছে। বর্ত্তমান রাজনীতি অবশ্য হিন্দুসমাজনীতির উপর কোন কোন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সত্য, তাই বলিয়া এমন কথা বলেন নাই যে, সমাজ-বন্ধন নীতি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতে হইবে। যে যুগে কোন বৈদেশিকের আবির্ভাব ঘটে নাই, সেই যুগে যাহা প্রচলিত থাকা সম্ভব ছিল, বর্ত্তমানে যদি তাহাই প্রচলিত হয়, তাহা হইলে হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা পাইবে কি ?

সকল ধর্ম্মেরই গন্তব্যস্থল নিরাকার পরম ব্রহ্ম। কাজেই ধর্ম্মমত লইয়া পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করা মোটেই উচিত নহে। নিজ ধর্ম্মে স্থির থাকিয়া অপরাপর মতবাদকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে হইবে, ইহাই ধার্ম্মিকের নীতি। এই নীতি পালন জন্যই আমাদের রাষ্ট্র 'ধর্ম্মনিরপেক্ষ' নামে পরিচিত হইয়াছে, অপর কোন উদ্দেশ্যে নহে। হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সামাজিক বন্ধন একেবারেই শিথিল করা কর্ত্তব্য কি ? আজ হিন্দুজাতির মধ্যে কোন জাতিরই সমাজ বন্ধন নাই। তজ্জন্য হিন্দুসমাজ নানা ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হইতেছে। এরূপ চলিতে দিলে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুর নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রক্ষিত হইবে কি ? বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজ যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে অতি সত্বর যদি কোন উদারভাবাপন্ন হিন্দুসমাজসংস্কারকের আবির্ভাব না ঘটে তবে হিন্দুর হিন্দুত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হইবে।

মধ্যযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে কুমারী এবং বিধবাগণের গর্ভে সন্তান জনন জন্য তৎকালীন সমাজপতিরা তাঁহাদের লজ্জানিবারণোপযোগী নানারূপ বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তৎকালে উহা সাধারণের নিকট দোষনীয় ছিলনা এবং তজ্জন্য কোন শিশুরও অনিষ্ট ঘটিত না। কিন্তু বর্ত্তমানে সেরূপ কোন উদারতা-প্রণোদিত বিধির ব্যবস্থা হইয়াছে কি ? যতদিন পর্য্যন্ত ঐরূপ বিধি ব্যবস্থা না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত শত শত হিন্দু নারীর গর্ভস্থ ভ্রূণ ও হিন্দু শিশুকুমার চিকিৎসা শাস্ত্রের উদার আশ্রয়ে অকালে বৃন্তচ্যুত হইতে থাকিবে। প্রকৃতির উপরে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তারও হস্তক্ষেপ করিবার শক্তি নাই। কাজেই বিধবা বা কুমারীগণকে গৃহপ্রাঙ্গণে আবদ্ধ রাখিলেই উহা রদ হইবে না। তাহাদের লজ্জা নিবারক উপায় উদ্ভাবন করিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

যখন শত শত হিন্দু নারী গর্ভস্থ ভ্রূণ সহ নিজ সমাজ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া অপর সমাজে গৃহীত হইতেছিল, সেই সময়েই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটে। তিনি হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে "বৈরাগী" জাতির সৃষ্টি করেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেক যুগেই সমাজপতিগণ হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে কালোপযোগী হিন্দুবিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। পুনরায় সমাজ সংস্কারের সময় আসিয়াছে। অনতিবিলম্বে হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজপতিগণের কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

নবীনচন্দ্রের কবি স্বভাব

শ্রীপ্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ

নবীনচন্দ্র সংগঠনাত্মক কবি। সে সংগঠন আধুনিক দেশাত্মবোধ নয়। তা এক শ্রেণীর জাতীয়তাবাদ। ওরই ওপর আধুনিক দেশাত্ম-প্রীতির নব জাগরণ। জাতীয়তা-বাদের এই সূত্র স্পষ্টভাবে নবীনচন্দ্রের এই কাব্যে প্রতি-ফলিত হয়েছে। এদিক হতে তিনি চারণকবি। আধুনিক যুগে একজাতি-ভিত্তিক যে মানব-সমাজ গঠনের ধুয়া উঠেছে নবীনচন্দ্র তার নবীন উদ্গাতা। পৌরাণিক পটভূমিকার ওপর জাতিত্ব বোধক কাব্যমূলে একটা আদর্শ থাকবেই। এই আদর্শের মূলে আছে পৌরাণিক মহিমা। এই মহিমাকে প্রকাশ করতে গিয়ে ত্রয়ীকাব্যে এসেছে নাটকীয়তা। এ নাটকীয়তা আকস্মিক অপ্রত্যাশিত নয়। নয় এই কারণে, পৌরাণিক আখ্যানকে আধুনিক ধাঁচে পরিবেশন করতে গেলে অভিনবত্বের আশ্রয় অপরিহার্য। এই অভিনবত্বই ত্রয়ীকাব্যের প্রস্তাবিত নাটকীয়তা।

নবীনচন্দ্রের ত্রয়ীকাব্যে পরিমিতিহীন লিরিক উচ্ছ্বাস একটা অ-কবি জনোচিত ত্রুটি বলে স্বীকৃত। এ স্বীকৃতি যথার্থ হলেও অ-যথার্থ। যে আদর্শবাদের ওপর 'ত্রয়ীর' সাম্রাজ্যবিস্তার তাতে ব্যাপক ও মহান দৈবী শক্তি কাজ করেছে। ওরই ওপর নবীনচন্দ্রের 'ত্রয়ী' প্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক আখ্যানের আধুনিক ভাষ্য রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস। যে কোন ভাষ্যে আত্ম-ভাব অ-কল্পনীয় নয়। নয় বলেই কবিকে এইটুকু ছাড় দিতে হবে।

কবিরা আত্ম-ভাবুক। ঐ ভাবনা লিরিকের সংহত—গ্রথিত রূপে নয়; অন্তর ব্যাকুলতার অ-পরিত্যজ্য তীব্রতায় গানের সুরে তার অভিব্যক্তি। ওই ছাড়টুকুকে স্বীকার করে নিলে নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে সংযমহীনতার অভিযোগ টেকে না। যে ধাতুতে তিনি তৈরী, তার স্বরূপটাও বিচার করতে হবে। হিন্দু চিন্তার অলৌকিকত্ব এবং ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বজীবনের আদর্শে নবীনচন্দ্র অনুপ্রাণিত। মানুষী ভাবনায় কৃষ্ণের যে কোন কাজ ভাবের আধারে, অক্ষরের বেড়ীতে গ্রথিত করতে গেলেই তা ওই বিরাট পুরুষের মহৎ কীর্তির মত অলৌকিক এবং ব্যাপক হয়ে উঠবে। হিমালয়কে নগাধিরাজ বললে সব বলা হয়না। তাকে কৈলাসও বলতে হয়। বলতে হয়—উমা-মহেশ্বরের বাসভূমি হিমালয়। তাই ত্রয়ীকাব্যে অলৌকিকতার সঙ্গে এসেছে উচ্ছ্বাস। পদা-বলীতেও সেই অনুস্থতি। মঙ্গলকাব্যেও অলৌকিক মাহাত্ম্যের সঙ্গে মানুষীভাবনার একাত্মতা। ফলে দেব-চরিত্রে মানুষের ছায়াপাত। তাই পাশ্চাত্য কবির সৃষ্ট 'সেটানের মুখে পার্লামেন্ট বিরোধিতা!

শিল্পী বড়কে পরিমিত ক্ষেত্রে রং তুলির কারবার দিয়ে প্রতিফলিত করেন। নবীনচন্দ্রও শিল্পী। শিল্পীর মধ্যে তারতম্য থাকে। নবীনচন্দ্র এক বিশেষ ধাঁচের শিল্পী। তিনি ক্যামেরাম্যান। ফটোর ওপর 'রি-টাচ্ করেন। সেই 'রি-টাচ্' এর ফলশ্রুতি ত্রয়ীকাব্য। ঐ 'রি-টাচ্-টাই তাঁর আত্মভাবনা।

মহাকাব্যের বিশালতাকে কবি ধরেছেন ক্যামেরার বন্ধনে। তাই কোথাও আলোর আধিক্য। কোথাও আলো আঁধার; কোথাও দূর নিকট হয়েছে, নিকট হয়েছে বিলম্বিত। মানুষের হাতের তৈরী কাজে ব্যতিক্রম স্বাভাবিক। শিল্পীও মানুষ। মানুষ বলেই তাতে নানা ত্রুটি ঘটে।

শিল্পী দু'জাতের। পরিণত ও অপরিণত। নবীনচন্দ্র পরিণততম আর্টিষ্ট। কিন্তু তাঁর ধাতুতে ও মজ্জায় একটা বিশেষত্ব আছে। ধর্ম্ম তাঁতে মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রথিত। ধারণ করে তাই সে ধর্ম্ম। নবীনের ধর্ম্ম আবেগ প্রাবল্য। ওর সঙ্গে দৈব মহিমার 'ছিটান' আছে। অতিমানবিক ঐশ্বর্য ও শক্তি বলতে গিয়ে কবিকেও অতি মানবীয়-ধর্ম পেয়ে বসেছিল। এ থেকে নিষ্কৃতি পেলে ত্রয়ীকাব্যের ভাবনা পুঞ্জ অস্বাভাবিক হয়ে উঠত। হতো না 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত'।

গীতিবাহুল্যকে কবির আত্ম চিন্তার গান বলে ধরতে হবে। ওকে অন্যভাবেও উপস্থিত করা চলে। একে 'ড্রামাটিক রিলিফ' বললে ক্ষতি কি? বরং বলা চলে, নবীনচন্দ্র ড্রামাটিক রিলিফ সংযোজনে প্রথানুসরণ না করে গীতের ঝঙ্কার সৃষ্টি করেছেন। যে গান তিনি গেয়েছেন সে সংগীত কবি চিত্তের গান। এ সংগীত না থাকলে ত্রয়ীকাব্য একঘেয়ে হয়ে যেত। আর ওই গানের মজলিসে কবি মহাভারতীয় পাত্র-পাত্রীর মুখে স্থূল পরিহাস তুলে দিয়েছেন, যা সমালোচকদের মতে লৌকিক। হ্যাঁ, এদিক থেকে কবি লৌকিক। দূরের মানুষকে কাছে এনেছেন ঘরের কথা তাঁদের মুখ দিয়ে বলিয়ে। নবীনচন্দ্র লোক-কবি। লৌকিক কবির যে স্বভাব, এ কবিরও তাই। এই জন্যেই ত্রয়ীকাব্যে লোক পরিহাস, 'হায় দিদি তুই বড় হবি'—ইত্যাদি যখন সত্যভামার মুখে শুনি, তখন সত্যভামা যে আমাদেরই তাতে কোন ভেদ চিন্তা করিনা। এ পরিহাস থেকে কালিদাসও মুক্ত নন। তাই আপন জগৎ-সভার চার পাশে কবি যা দেখেন, ক্যামেরায় তাকেই ধরেন। ছোট জগতের এই ছোট ছোট কথা ত্রয়ীকাব্যে (রৈবতক) যদি না থাকত, তবে তার অস্বাভাবিকতা মাত্রাধিক্য হয়ে উঠত। মহাকাব্যের নায়িকার মুখে লৌকিক কথা শিল্পের আভিজাত্য নষ্ট করেছে—এ অভিযোগ সত্য। সত্য ওইটুকু অর্থাৎ মহাকাব্যের নায়িকার মুখে লৌকিক কথা। কিন্তু আভিজাত্যের ব্যত্যয় হয়েছে কি? ত্রয়ীকাব্য লৌকিক। ত্রিলোকের মধ্যে মর্ত্য একটা লোক। এ লোক উনবিংশ শতকের। যুগ ভাবনা এখানে অভিক্ষেপিত হয়েছে। হওয়াই ঠিক। না হওয়াই অ-স্বাভাবিক। ব্যাসের মহাভারত সেই যুগের কাহিনী। অথবা যুগ পরম্পরার বিধৃত রূপ। ওরই ওপর 'ত্রয়ীর' ভিত্তি। তার মাল-মশলা সবই পৌরাণিক। তবে চুন সুরকি সিমেণ্ট মিশ্রণ আধুনিক রাসায়নিক রীতির। তাই এতে লৌকিক জীবনাবেগ, ছোট জগতের পরিহাস, আধুনিক কালের বাগ্মিতার স্থান হয়েছে। হয়েছে বলেই 'ত্রয়ীকাব্য' সার্থক।

নবীনচন্দ্রের মেজাজ ধ্রুপদী নয়। 'নাদ-পরম ব্রহ্ম' বলে ত্রয়ীকাব্যের সুর তোলেন নি। তিনি ঋতুর কবি, সে ঋতু উনবিংশ শতাব্দী। যেকালে মিশ্র-ভাবনার প্রয়োজন ছিল। তাই ধ্রুপদীতে তান না ধরে মিশ্রসুরে ধরেছেন। সে সুর মিশ্র হলেও জাগরণের ঝঙ্কার গতির সৃষ্টি করেছে! চারণের মত আত্ম-জাগৃতির গান গেয়েছেন। গাইতে গাইতে হয়ে পড়েছেন আত্ম-বিহ্বল! এই আত্ম-বিহ্বলতাই তাঁর ওপর আরোপিত গীতোচ্ছ্বাসের প্রাবল্য।

এ কবি শিল্পী। কিন্তু তত্ত্বের ব্যাখ্যাকার শিল্পী। ব্যাখ্যার রীতিও স্বতন্ত্র। চারণের ভঙ্গিতে কবি তত্ত্ব-ব্যাখ্যায় মেতেছেন। চারণ কবি জাগান। নবীনও জাগ্রত করেছেন। জাগরণের সংগীতে উদাত্তভাবই অধিক। আমাদের কবির মধ্যেও তাই গীতের উদাত্ত আহ্বান। একাধারে তিনি চারণ কবি, তত্ত্বব্যাখ্যাকার এবং বড়ো পর্বের শিল্পী। সে শিল্পী 'ফোক আর্টিষ্ট'। জাত্যাভিমানের আবেগে যে কাব্যের জন্ম, আদর্শের ভিত্তিতে যার প্রতিষ্ঠা, ধর্মের ভাবনায় যার বয়ন-বিস্তার, সে কাব্যের বিচার-প্রণালী স্বতন্ত্র। ক্যামেরায় ধরে তিনি ছবি আঁকেন। সে ক্যামেরা তাঁর কবি-চিত্ত। যা আছে, তারই ওপর আত্মভাবনাপূর্ণ, তত্ত্বময় অলৌকিকতার পট-চিত্র আঁকতে তুলি ধরেন। এই জন্যেই তিনি পটুয়া! পটুয়ার শিল্পে তাই স্থানিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে লৌকিক ভাবের গলাগলি। এ ব্যতিক্রম স্বাভাবিক।

অভাবনীয়

শ্রীদিলীপ কুমার রায়
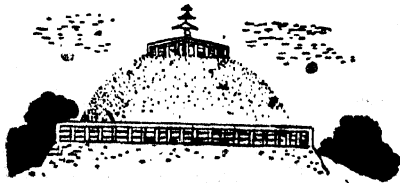
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আট

কিন্তু রাত্রে প্রহ্লাদের চোখে আর কিছুতেই ঘুম আসে না। বুকের মধ্যে টনটন করতে থাকে। স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী দিদির মূর্তি ফুটে ওঠে, আর চোখে জল উথলে ওঠে। কিছুতেই সামলাতে পারে না। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ ক'রে শেষে বেরিয়ে পড়ে। গঙ্গার একটি ঘাটে ব'সে চুপ ক'রে চেয়ে থাকে। অদূরে গঙ্গার উদার প্রসার চাঁদের আলোয় কী সুন্দর দেখায়! সামনে গঙ্গার জলে সোনার থাম ঝিকমিক করছে। বাতাস উঠেছে, পায়ের কাছে ছল ছল ছলাৎ ক'রে ঢেউ ভাঙছে। একটা নৌকায় পাল তুলে এক মাঝি ভাটিয়ালি গেয়ে চলেছে—গানটি ওর পরিচিত :

দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা,
(তারে) ধরি ধরি মনে ধরি, ধরতে গিয়ে
মিলিল না।
সে-মানুষ চেয়ে চেয়ে
ঘুরছি ফিরে পাগল হ'য়ে
মরমে জ্বলছে আগুন নিভিল না।
(ওগো) তারে আমার আমার মনে করি
(সে যে) আমার হ'য়েও আর হ'ল না।
বাউল কয় : ভেবো না রে!
ডুবে যাও রূপসাগরে।
ডুবিলে পাবে তারে, আর ভেবো না।
(ওগো) এবার ধরতে পেলে মনের মানুষ ছেড়ে
দিতে আর দিও না।

প্রহ্লাদের বুকের মধ্যে হঠাৎ বিষাদ ছেয়ে যায়। এতদিন যোগ করছে—কী পেল? মনের মানুষের আভাষ পেয়েছে তো কতবারই, কিন্তু তাকে ছুঁতে না ছুঁতেই যে সে মিলিয়ে যায়! "ধরতে গিয়ে মিলিল না"—ঠিক এই-ই তো ওর অবস্থা—বিরহের আগুন নিভেও নেভে না—এক আধবার শান্ত হয়, ফের জ্ব'লে ওঠে আরো দাউ দাউ ক'রে।

কিন্তু এ-ও তবু সওয়া যায়। অসহ্য শুধু এই বেদনা যে সে "আমার হয়েও আর হ'ল না।" তাই তো আজও এত ব্যথা বাজে প্রিয়বিয়োগে। মনে খেদ মিশকালো হ'য়ে ওঠে : পিতা শান্তি পেলেন, দিদিও ধন্য হ'ল, এমন কি ছোট্ট রমাও দীক্ষার আলো হাওয়ায় এমন ফুলটি হ'য়ে ফুটে উঠল, কেবল প্রহ্লাদই র'য়ে গেল যে-তিমিরে সেই তিমিরে!

ওর বুকে অশ্রুসাগর দুলে ওঠে। শুধু বেদনা নয়, ধিক্কার। কাকে ঠকাচ্ছে ও? পায় নি, তবু পাওয়ার ভঙ্গি করছে না কি? একটু কৃপার পরশ, জ্যোতির্দর্শন, মূর্তি দর্শন—এ তো কত সংসারীরও হয়। কিন্তু গৃহী যোগী হ'য়ে এমন মহাগুরুর আশ্রয় পেয়ে—সবচেয়ে আশ্চর্য—গুরুর কাছে বার বার আশ্বাস পেয়েও—ওর মনের কালি তো ঘুচল না আজো! কথায় কথায় আজো মনে হয় নিজেকে বড় আধার! ধিক্! বড় আধারই বটে! ওর মুখে নিষ্করুণ আত্ম-তিরস্কারের হাসি ফুটে ওঠে : রমা যা পারল ও পারল না—শোকে এখনো যে চোখে অন্ধকার দেখে তার নাম যোগী, বড় আধার! না, গুরুদেবের ভুল হয়েছে। স্নেহবশে ভুল করেছেন। যে নিজে ভালো সে সবাইকে ভালো দেখে।

দেখতে দেখতে ওর মনে ক্ষোভও বেদনা ফুলে ওঠে। ওর মনে দৃঢ় ধারণা হয় ও পারে না। বুকের মধ্যে যেন নিশ্বাস জমাট হ'য়ে যায়। কেবল মনে হয় মাতৃসমা দিদির কথা—শিবতুল্য পিতার কথা। মহাদেব নাম তাকেই মানায়—যে পরের জন্যে দুঃখ সয়। কিন্তু এতে গৌরব হ'লেও সঙ্গে সঙ্গে অবসাদে মন নুয়ে প'ড়ে—দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শিশুর ম'ত।

হঠাৎ আবেশ মতন আসে, শুনতে পায় নূপুরের শব্দ। কী অপরূপ! শুধু নূপুর না—সঙ্গে সঙ্গে বাঁশির সুর! এত স্পষ্ট!···তার পরেই চোখের সামনে দুটি মূর্তি—আলোগড়া তনু···দিদি! কী অপরূপ কান্তি! পাশে পিতৃদেব! জ্যোতিতে ঝলমল করছে!···ও কি স্বপ্ন দেখছে? না তো! চোখ খুলে দেখে গঙ্গা তেমনিই চলেছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে সোনার পতাকা জ্বেলে। অদূরে সেতু। আর একটা নৌকা পাল তুলে দিয়ে ভেসে চলেছে। পায়ের কাছে ঢেউ সামনেই আছড়ে আছড়ে ভেঙে পড়ছে···ছল ছল ছলাৎ। ও চোখ বোঁজে। অমনি ফের দিদির মুখ···কী অপরূপ কান্তি! এলোচুলে চাঁদের আলো ঝরছে যেন! পাশে মহাদেব···মুখে সে কী অপূর্ব হাসি! হঠাৎ মিলিয়ে যায় দুটি মূর্তি। এ কী! গুরুদেব!

ও নত হ'য়ে প্রণাম করে। মূর্তি ওর মাথায় হাত রাখে। এ কী! এত আলো···আকাশে আলো, বাতাসে আলো, জলে আলো, স্থলে আলো···শুধুই আলো আর আলো। ওর শিরায় রক্ত বয় না তো—শুধু আলোর প্রবাহ! সামনে নৌকার পাল তো পাল নয়—আলো দুলে উঠেছে আনন্দে। আনন্দ আনন্দ আনন্দ! দিগন্তে একটি কালো মেঘ···ঘন কালো···হঠাৎ আলো হ'য়ে উঠল। চাঁদের দিকে তাকায়। চন্দ্রসভার মাঝে চাঁদ হাসছে! হঠাৎ এ কী! চাঁদের পাশে ও কে? গোপী না দেবী?

হঠাৎ কে যেন বলে—শ্রীরাধা।

দেবীমূর্তি নেমে আসে···ওর মাথায় হাত রাখে। ওর সমাধি হয়।

যখন সমাধি ভাঙল, তখন পূর্বদিকে অগণ্য সোনার ঝালর ভাসছে। আর সামনে—স্বয়ং গুরুদেব! মুখে তাঁর বরাভয় হাসি। সঙ্গে সঙ্গে ও নত হয়। কিন্তু পায়ে মাথা ঠেকতেই দেখে গুরুদেবের পা নয়। দুটি নীল পদ্ম যেন। মুখ তুলে দেখে: ঠাকুর, মুখে হাসি হাতে বাঁশি!

ও জড়িয়ে ধরে ঠাকুরের পা। ঠাকুর ওর মাথায় বাঁশি ছোঁওয়ান।

শুধু সুরের ঢেউ: অশ্রান্ত সুরের ঢেউ: লক্ষ কণ্ঠে বেজে উঠল আলোর গান:

গুরুপদরজ মৃদু মঞ্জুল অঞ্জন
নয়ন-অমিয় মৃগ দোষবিভঞ্জন···
জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়···
জয় হরি জয়, দিলে দৃষ্টি-অভয়!

প্রহ্লাদ সমাধিতে ডুবে যায় ফের।

নয়

সহজ সম্বিতে ফিরে এল কতক্ষণ পরে কে জানে? গঙ্গা থেকে উঠে বিষ্ণুঠাকুর মৃদু হেসে বললেন: "বিশ্বাস হয়েছে কি এবার—যে আমি ভুল করি নি?"

ও পায়ে মাথা রেখে কাঁদে—কিন্তু বিষাদের কান্না নয়—অঝোর আনন্দাশ্রু।

* * *

প্রহ্লাদ মাথা তুলতেই বিষ্ণুঠাকুর বললেন: "এবার ঘরে চলো বাবা, কথা আছে।"

প্রহ্লাদ ঘরে ঢুকেই চম্‌কে বলল: গুরুমা বিগ্রহের সামনে হাত জোড় ক'রে ব'সে···অনড়, অচল···মুখে হাসি···ধ্যানস্থ···একটি সরু অশ্রু জলধারা গাল বেয়ে ঝরছে···

বিষ্ণু ঠাকুর ফিশ ফিশ ক'রে বললেন: "এই দেখ—ভাবসমাধির অবস্থা। দেখতে চেয়েছিলে না?"

প্রহ্লাদ (নিচু সুরে): এই অবস্থায়ই কি মা-র দর্শন-টর্শন হয়?

বিষ্ণু ঠাকুর (নিচু সুরে): না, অন্য অবস্থায়ও হয়—জাগ্রত অবস্থায়ও। (মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে) আহা! কী সুন্দর! বলছিলাম না—অসামান্য আধার! অথচ এম্‌নি সহজ চালে চলেন—সকলের সঙ্গেই আছেন তাদের সহচারিণী হ'য়ে—যে, তারা ভাবে ইনি তো আমাদেরই একজন, নয় কি?

প্রহ্লাদ (আরো চাপা স্বরে) : চুপ্‌…মা গাইছেন…

গুরুমা (মৃদু স্বরে—চোখ মেলে বিগ্রহের পানে চেয়ে) : অন্তরযামী ! আর কিছু আমি বলিতে যেন গো নাহি চাই, বলি যেন শুধু :

"এ-জীবনে বঁধু, তোমারি চরণে দিও ঠাঁই।
তুমি পিতা জানি, করো নিতি শুভকামনা,
তুমি মাতা—আছ দিতে কোল দিন-অন্তে,
তুমিই বন্ধু, শিখাও আলোকসাধনা
জ্বালি' প্রেমারুণ শান্ত ছায়াদিগন্তে।
তুমিই করুণাসিন্ধু,
সন্ধ্যায় পূর্ণেন্দু,
দেবদেব প্রিয়, চিরবরণীয়, তব তারা বিনা দিশা নাই,
পরাজয়ে জয়, প্রলয়ে নিলয়—তুমি বিনা কে বা
সুখদায়ী ?

* * * *

প্রহ্লাদ গড় হয়ে প্রণাম করল গুরুমাকে। গুরুমা ওর মাথায় হাত রেখে খানিকক্ষণ কৃষ্ণমন্ত্র জপ ক'রে স্নিগ্ধ হেসে বললেন : "কেমন ? বলি নি ?"

প্রহ্লাদ (আশ্চর্য হ'য়ে) : আপনি জানেন ?

গুরুমা (হেসে) : সবটুকু জানি বললে বেশি বলা হবে. তবে তোমার কী দর্শন হয়েছে ঠাকুর আমাকেও দেখিয়ে দিয়েছেন।

প্রহ্লাদ : কখন মা ?

গুরুমা (প্রফুল্ল স্বরে) : সে জেনে তোমার কী হবে বাবা ?—কিন্তু যখনকার যা—আমি তোমার চা ও ফল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিষ্ণু ঠাকুর : তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

গুরুমা : যেতে হবে যে অনেক কোথাও। আশ্রমের ঝক্কি তো বইতে হ'ল না তোমাকে। তবে (নিজের কপালে করাঘাত ক'রে) যে যেমন কপাল নিয়ে এসেছে। বিপিনের অসুখ, সুরেশেরও অসুখ। ওদের ডাক্তারের ব্যবস্থা ক'রে আসছি—তোমরা কথা কও।

* * * *

একটু বাদে প্রসন্না চা ও ফল নিয়ে এল। বিষ্ণুঠাকুর ও প্রহ্লাদ চাপানের শেষে সামনের গঙ্গামুখী বারান্দায় বসলেন। বিষ্ণুঠাকুর বললেন : "এবার বলো তোমার মনে যে-প্রশ্ন জমেছে।—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমি জানতে পারি অনেক কিছু—পাও নি কি পরিচয় ? আজ আমারো বিশেষ কিছু বলবার আছে। তবে তার আগে তোমার কথা হ'য়ে যাওয়া দরকার।"

দশ

প্রহ্লাদ (খানিকক্ষণ মুখ নিচু ক'রে চুপ ক'রে থেকে মুখ তুলে) : গুরুদেব ! আমি এটুকু জেনেছি যে গুরু-কৃপা ইষ্টের করুণা থেকে ভিন্ন নয়, ঠাকুর যে তাঁর কৃপার আলো গুরুপ্রসাদের আতশী কাঁচের মধ্যে দিয়ে আরো উজ্জ্বল ও জীবন্ত ক'রে ধরেন এও চাক্ষুষ করেছি—শুধু আমার জীবনেই নয়, দিদির পিতৃদেবের সাবিত্রীর রূপান্তর দেখেও যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছি বারবারই। তবু আঘাত যখন আসে—বিশেষ ক'রে এমন পরিবেশে যার 'পরে মানুষের কোনোই হাত নেই—তখন মন কেমন যেন খুঁটি পায় না, কেমন এমন হ'ল ভেবে। নিজের কর্মফলে যখন ভুগি, তখন বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে, কর্মভোগের দরকার ছিল মনকে আরো সজাগ ও একান্তী করতে। কিন্তু এমন সব বাইরের যোগাযোগ অনর্থ ঘটে পদে পদে যে, বিশ্বাসের উষার পরেও মনে ফের সংশয়ের সন্ধ্যা আসে ঘনিয়ে—ঠাকুরের কৃপা কেন বাঁচালো না ভেবে।

বিষ্ণুঠাকুর (স্নিগ্ধ হেসে) : বাবা, কৃপা বলতে অর্থার্থীরা যা বোঝে, জ্ঞানীরা তা বোঝেন না। আর কেন শুনবে ? অর্থার্থী'রা কামনা বাসনার চোখে সত্যের যে-রূপ দেখে জ্ঞানী বা ভক্তের দৃষ্টি সত্যকে ঠিক সে-রূপে দেখে না। কিন্তু এই জ্ঞানদৃষ্টি বা প্রেমেরদৃষ্টি যখন খুলেও খুলতে চায় না, তখন অনেক সময় আঘাত এসে দেখিয়ে দেয় চোখে আঙুল দিয়ে—কেন দুঃখ কষ্ট বেদনা না পেলে চেতনা জাগত না, নানা রিপুর পিছু ডাকে কান দেওয়ার পরে অনুতাপের আগুন না জ্বললে মনের কালিও ঘুচত না, চোখের ঠুলিও খ'সে পড়ত না। এককথায়, ঠাকুর বাঁচান বৈ কি, কেবল সেভাবে নয় যে-ভাবে আমরা চাই।"

প্রহ্লাদ : ক্ষমা করবেন গুরুদেব, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—আপনি কী বলতে চাইছেন। নানা রিপুর পিছু ডাকে যখন কান দেই, তখন তো জেনেশুনেই দিই যে,

স্খলনের পরে অনুতাপে তনু দগ্ধ হবে। তবু কেন দিই ?— এই চেতনা জাগাতে, না মনের কালি ঘোচাতে ?

বিষ্ণুঠাকুর : বাবা পাটনায় আমাদের কাছে গঙ্গাতীরে এক মাঝি থাকত। সে চমৎকার ডিঙি বানাত। কিন্তু প্রতি ডিঙিকে বার বার জলে ভাসিয়ে দেখত কোথায় কোন্ জোড় ঠিক লাগে নি। এজন্যে তাকে কখনো কখনো মাঝ দরিয়ায়ও যেতে হ'ত, জেনে শুনে যে সেখানে হঠাৎ ধানচাল হ'লে ডিঙিকে তীরে ভিড়োতে বেগ পেতে হবে। ঠিক তেম্‌নি, জীবনের নানা পরীক্ষা রকমারি পরিবেশে রকমারি বিপদে ফেলে আমাদের দেখিয়ে দেয়— চরিত্রের কোথায় খুঁৎ আছে, কোন সূক্ষ্ম ফাটল চোখে দেখা যায় না ব'লেই আরো সর্বনেশে, কেন না মিত্রচোখ না টের পেলেও শত্রু দল খবর পেয়ে চড়াও হ'য়ে করে ভরাডুবি—ঠিক যখন নদীতে নৌকা তর তর ক'রে চলেছে ভরা পালে। এই আকস্মিক বিপদ-আপদ থেকে ঠাকুর আমাদের বাঁচান আঘাত দিয়ে চোখের ঠুলি খসিয়ে দিয়ে —আর তখন সেই খোলা চোখের দৃষ্টিতে আমরা শুধু যে আমাদের চরিত্রের নানা অদৃশ্য ফাটল দেখতে পাই তাই নয়, আর একটি অভাবনীয় আবির্ভাবও ফুটে ওঠে—যাকে চলতি ভাষায় বলা হয় করুণার অঘটন, ওরফে দিব্যশক্তির রক্ষাকবচ। আর তখনই সত্যি জীবনকে দেখতে শিখি জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে—from the focus of knowledge—কামনা বাসনার ঝাপসা দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। এই জন্যই জ্ঞানীরা বলেন—স্খলন চ্যুতি পরাজয় চিত্তগ্লানি এ সবের ফলে দুঃখ আসে শুরু হয়েই —সত্যদর্শনের দীক্ষা দিয়ে বলের পাথেয় দিতে। দার্শনিকেরা এই প্রাপ্তির নাম দেন জ্ঞান, ভক্তেরা—কৃপা। কালীয় নাগের নাগিনীরা বলেছিল কৃষ্ণকে যে তাদের দুর্দান্ত স্বামীর মাথায় নৃত্য ক'রে পদাঘাতে তার ফণাগুলিকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে শাস্তি দেওয়াও কৃষ্ণের করুণা—"ক্রোধো হি তে অনুগ্রহ এব সম্মতঃ—ঠাকুর! তোমার ক্রোধও আসে প্রসাদ হ'য়ে।" ঠিক তেম্‌নি, যখন আমরা আলো ছেড়ে পড়ি অন্ধকারের কবলে তখন সে-আঁধারও আসে তাঁর করুণার দিব্য-দীপ্তিকে আরো উজ্জ্বল স্নিগ্ধ ক'রে তুলে ধরতে। ফলে দৃষ্টিগোচর হয় আলোকালোর এক চিত্রবিচিত্র দ্বন্দ্ব বা গলাগলি, যাই বলো।

প্রহ্লাদ : কালো মানে ? পাপ ?

বিষ্ণুঠাকুর : শুধু পাপ নয়—পাপের পেট্রনদেরও ধরছি ঐ সঙ্গে—যাকে বুদ্ধ নাম দিয়েছেন মার, ভাগবত বলেছেন কলি, খৃষ্ট—শয়তান, ঋষিরা—আসুরিক শক্তি।"

প্রহ্লাদ : এই শক্তিরা কি সত্যিই আছে গুরুদেব ? আমার তো মনে হয় যে আমরা ভুগি বিপথে পা দেওয়ার কর্মফলেই—খানিকটা অতিভোজনের পরে শূল্যব্যথার মতন।

বিষ্ণুঠাকুর (হেসে) : আছে ব'লে আছে বাবা! পদে পদেই তারা আসে লোভ দেখিয়ে নিপুণ কুতর্কে কালোকে সাদা দাঁড় করিয়ে আমাদের বিপথে টেনে নিয়ে যেতে। আচ্ছা, তবে বলি আমার নিজের দুএকটি অভিজ্ঞতা। কারণ দৃষ্টান্তের আলোয়ই সত্যের চেহারা সত্যি সত্যি জীবন্ত দেখায়—থিওরির ছায়ায় দেখায় কেমন যেন আবছা—unconvincing, বলে না বুদ্ধিমন্তেরা ?

প্রহ্লাদ (উৎসুক কণ্ঠে) : বলুন গুরুদেব—আর বেশ ফলিয়ে।

বিষ্ণুঠাকুর (খানিকক্ষণ চোখ বুঁজে থেকে) : আমার চোখে ভেসে উঠছে একটি পরিষ্কার ছবি। কিন্তু তার আগে একটু ভূমিকা করতে হবে। (একটু থেমে) তোমাকে বোধহয় বলেছি—পিতৃদেব আমাকে ত্যজ্যপুত্র করেছিলেন বিধবাবিবাহ করার অপরাধে। আমার সত্যিই এতটুকু ইচ্ছা ছিল না—তাঁকে চটিয়ে আমার চলার পথকে আরো দুর্গম ক'রে তুলবার। কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে ? না, ঠিক্ নিয়তিও নয়। আমার গুরুদেব প্রায়ই বলতেন তাঁর স্বপ্নে-পাওয়া তিব্বতীগুরু মিলারে-পার একটি জীবনবাণী : "যা তোমার সত্য মনে হয় তাকে মানতে হ'লে সমাজ এমন কি শাস্ত্রের কথাও যদি অমান্য করতে হয় করবে, কারণ নিজের কাছে যদি খাঁটি থাকো তবে সারাজগৎ বাধা দিলেও তুমি লক্ষ্যে পৌঁছবেই পৌঁছবে।" আরো, কে না জানে—রামের কাছে যা বিষ শ্যামের কাছে তা তো অমৃত হয় অনেক সময়েই, আর হয় ব'লেই বিশ্বলীলা আজো পুরোনো কি একঘেয়ে হয় নি। তাছাড়া মোক্ষদাকে বিবাহ করার পরে আমি দেখতে পেয়েছিলাম একটি আশ্চর্য সত্য : যে, ভালোবাসা যদি সত্য হয়,—অর্থাৎ যাকে ভালোবাসা যায় তার সুখদুঃখ

আমার কাছে সত্যি আমার নিজের সুখদুঃখের চেয়ে বেশি জরুরি ও দামী মনে হয়—তাহ'লে সে-ভালোবাসার ফলে অনিবার্য কারণে নানাদিকে দুঃখ বেদনার ঝড়ঝাপটা এলেও প্রতি ঝাপটাই আমাদের থেই ধরিয়ে দেয় লক্ষ্যচূড়ার, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় না রসাতলে।

কিন্তু মোক্ষদাকে সহধর্মিণী ব'লে বরণ করার পরে সাধনা একদিক দিয়ে হ'য়ে উঠল যেমন সমৃদ্ধ, অন্যদিকে তেম্‌নি জটিল! একজন মানুষের সাধনার যে-সমস্যা দুজনের—অর্থাৎ দম্পতীর—মিলিত জীবনের সমস্যা তার দুগুণ হয় না. অন্ততঃ দশগুণ কঠিন হ'য়ে ওঠে পাটীগণিতকে দুয়ো দিয়ে। আর সে দুটি মানুষ যদি প্রতিপদে নিজের বিবেকবাণীর সঙ্গে গুরুবাক্য ও ইষ্টমন্ত্রের সামঞ্জস্য ক'রে এগুতে চায় বিবাদী বেসুরকে কাটিয়ে সুরেলা ঝংকারের নির্দেশ পেতে—তাহ'লে সে-তীর্থযাত্রী জীবন হ'য়ে ওঠে আরো দায়িত্ব-সঙ্কুল ও আনন্দময়, গুরুভার ও বিচিত্র। প্রতিপদে একজনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আর একজনের দৃষ্টি ভঙ্গির গরমিলের মধ্যেও মিলের দিশা খুঁজে পাওয়ায়, এর ইচ্ছার সঙ্গে ওর বিপরীত ইচ্ছার সমন্বয়—এককথায়, গরমিলের মধ্যে দিয়ে সুষমাসুন্দর আত্মজয়ের সাধনা—সে অপরূপ নাট্যলীলার নানা বিচিত্র অভাবনীয় গর্ভাঙ্ককেই তোমার সামনে ফলিয়ে তুলতে সাধ যায়। কিন্তু এখন সময় নেই তো, তাই কেবল তোমার প্রশ্নের উত্তর দিই—বিরুদ্ধ শক্তিরা সত্যিই আছে না, শুধু কবিকল্পনা—কথার কথা?

এগারো

বিষ্ণুঠাকুর: বলেছি—মোক্ষদা ছিল নানা দিকেই অসামান্যা। রূপসী ছিল না, কিন্তু ওর অন্তরের আলো ওকে এমনই শ্রীমস্তিনী ক'রে তুলেছিল যে, নানা থাকের লোকই ওর কাছে আসতে না আসতে আকৃষ্ট হ'ত—আরো এই জন্যে যে, হাজার দুঃখে, দুর্দৈবে, দুর্দশায়ও কারুর কাছেই হাত পাতত না দরদ বা সহানুভূতির মুষ্টিভিক্ষা পেতে। কিন্তু না, গোড়া থেকেই বলি আমাদের বিবাহের আগেকার কথা—নৈলে ঠিক বুঝতে পারবে না কী গভীর দুঃখে ওকে বছরের পর বছর একলা কাটাতে হয়েছিল।

মোক্ষদার বাবা ছিলেন নবদ্বীপের একজন নামকরা কীর্তনী। তাঁর ইচ্ছা ছিল—শৈশবেই মাতৃহারা মেয়েকে ভালো করে কীর্তন শেখাবেন, কারণ মোক্ষদার শুধু কণ্ঠলাবণ্য নয়—সেই সঙ্গে ছিল সঙ্গীত প্রতিভা। কিন্তু ওর দশবৎসর বয়সে তিনি হঠাৎ মারা যেতে, তাঁর কয়েকটি শিষ্য টাকা তুলে অনাথা গুরুকন্যার বিবাহ দেয়—কাশীতে এক ডাক্তারের সঙ্গে। শ্বশুরের সচ্ছল অবস্থা—মোটা পেন্সেন পেতেন। সবাই সানন্দে বলল মেয়েটার একটা গতি হ'ল। কিন্তু হা অদৃষ্ট! বিবাহের ঠিক পরদিনই মোক্ষদার স্বামী সর্পাঘাতে মারা গেলেন।

এহেন ক্ষেত্রে প্রায়ই যা ঘটে তাই হ'ল। সংসারের সকলের রাগ পড়ল মোক্ষদার 'পরেই—বিশেষ ওর দজ্জাল শাশুড়ীর। উঠতে বসতে তিনি ওকে খোটা দিতেন "অপয়া অলুক্ষুণে স্বামীখেকো ডাইনী" ব'লে। এ-দুঃখ ওকে আরো বেশি বেজেছিল এই জন্যে যে, ওর এক ননদ ছিল সেও বিয়ের পরে বিধবা হয়, কিন্তু সে পেত শুধু সকলেরই স্তবস্তুতি। তার নাম নন্দিনী তার ছিল রূপসী ব'লে নামডাক—বিশেষ ক'রে তার দুধে-আলতা রঙের জন্যে। মোক্ষদা ও তার একদিনেই বিয়ে হয়। বিয়ের এক বৎসর পরেই তার স্বামী যায় বিলেতে। কুসঙ্গে পড়ে নানা কুকীর্তির পরে একদিন এক নৌকাবিহারে মদ খেয়ে বেটক্করে জলে প'ড়ে মারা যায়।

নন্দিনী স্বামীকে ভালোবাসে নি একটুও, স্বামীর জন্যে এক ফোটা চোখের জলও ফেলেনি। কিন্তু সে শুধু যে—মোক্ষদার ভাষায়—"দুধে ভাতে থাকত তাই নয়—হাসি গল্প পান মাছ থিয়েটার সিনেমা কিছুই তার বাদ যেত না এমন কি গহনাও পরত।" মোক্ষদার শাশুড়ীও মেয়ে বিধবা হওয়ার জন্যে শুধু যে কান্নাকাটি করেন নি তাই নয়, রূপের ডালি আদরিণী পিতৃগৃহে ফিরে এলে বলতেন জাঁক ক'রেই; "নন্দিনীর আমার ভাবনা কি? ওকে লুপে নেবে রাজপুত্তুর মন্ত্রীপুত্তুররা।" না বলবেন কেন? শুধু তো রূপ নয়, ওর এক নিঃসন্তান মামা উইলে ওকে একটি বাড়ি ও লক্ষাধিক টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু গল্পটাকে ঠিক বলা হচ্ছে না। গুছিয়ে বলতে হ'লে একটু পিছিয়ে যেতে হবে। বলতে হবে আগে নন্দিনীর কথা একটু ফলিয়েই।

ছেলেবেলা থেকে বাপমার প্রশ্রয় পেয়ে নন্দিনী হ'য়ে

উঠেছিল স্বভাবে রঙ্গিণী ও চঞ্চলা। সকলের কাছেই রূপের সুখ্যাতি শুনতে শুনতে ধরাকে দুদিনেই সরা জ্ঞান করল। সাহেব পুরাণে যাকে বলে, spoilt child, তার উপর বিধবা হবার সঙ্গে সঙ্গে হাতে এল টাকা। ম্যাট্রিক্ পাশ ক'রে কলেজে ভরতি হ'য়ে ওর মাথা আরো গরম হয়ে উঠল। যার তার কাছে বলত অকুণ্ঠেই: "আমার ভাবনা কি? রোসো না, একবার বি-এ পাশ ক'রে বিলেত ঘুরে আসি তো—তারপর ভিড় জ'মে যাবে···" ইত্যাদি। সে চাইত শুধু বিলাস আর রূপের যুগলপাখায় খুশখেয়ালে উড়ে চলতে। সম্বন্ধ এসেছিল তিন চারটি, কিন্তু হ'লে হবে কি—নন্দিনীর পণ—ময়ূর বাহন না হ'লেও চলতে পারে, কিন্তু কার্তিক না হ'লে সে স্বয়ম্বরা হবে না। দুঃখের বিষয় এই যে, জগতে কার্তিক ময়ূরের চেয়েও বিরল—কাজেই তার ভাগ্যে ঈপ্সিত নাগরের দেখা পাওয়া হ'য়ে উঠল ভার।

"কিন্তু বলে না অতি দর্পে হতা লঙ্কা? নন্দিনীর অহংকারে ঘা পড়ল এক বিলেতফেরৎ ফ্যাশনেবল স্মার্ট ছেলের পাল্লায় প'ড়ে। তার নাম মাণিক।

মাণিকের বয়স তখন পঁচিশ ছাব্বিস। সে লণ্ডনে পাশ ক'রে ফিরেছিল এঞ্জিনিয়র হয়ে। পসার হয়েছিল, গান গাইতে পারতও চমৎকার—তাছাড়া মেয়েদের পটাবার আর্টটা আয়ত্ত করেছিল বিলেতে নানা স্বৈরিণীর সঙ্গে মিশে। তারাও ছিল কাশ্মীর বাসিন্দা—বর্ধিষ্ণু পরিবার।

কাজেই মাণিককে নন্দিনীর মার পছন্দ হ'য়ে গেল। তাকে তিনি মাঝে মাঝেই নিমন্ত্রণ করতেন ও মেয়েকে তার সঙ্গে অকুণ্ঠেই থিয়েটারে বা পিকনিকে পাঠাতেন। কিন্তু মাণিক নন্দিনীর রূপে আকৃষ্ট হ'লেও স্বভাবে ছিল বিষম গর্বী। তাই নন্দিনীর কাছে এসেও ধরা দিল না। আর ঠিক সেই জন্যেই নন্দিনীর রোখ চাপল ওর গুমর ভাঙতে হবে একটু শিক্ষা দিয়ে—একটু খেলিয়ে তবে গেঁথে তুলবে। ওদিকে মাণিকও ছিল সেয়ানা ছেলে, মনে মনে হেসে বললে—বেশ দেখাই যাক না কে কাকে খেলায়।

বলেছি, মাণিক গান গাইতে পারত চমৎকার। নন্দিনী ধরল: মাণিকদা, গান শেখাতেই হবে আমাকে।" গানে তার প্রতিভা না থাকলেও মোটামুটি গাইতে পারত —অর্থাৎ আধুনিক ড্রয়িংরুম-সঙ্গীত। মাণিকের ভালোই লাগত রূপসী তরুণীকে গান শেখাতে—বিশেষ যখন দু-জনেই জানত গানটা উপলক্ষ্য মাত্র।

কিন্তু মানুষের নানা চালই ভেস্তে যায় বিধাতার কিস্তিতে। মাণিক যখন নন্দিনীকে গান শেখাতে যেত প্রায়ই মোক্ষদা শুনত পাশের ঘর থেকে। কাজেই মাঝে মাঝে মোক্ষদার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হ'ত বৈ কি। নন্দিনী যে চঞ্চল প্রকৃতির অসার মেয়ে, মাণিক এক আঁচড়েই চিনে নিয়েছিল। রূপ আছে তাই মিশতে ভালো লাগত বয়সের ধর্মে, কিন্তু ওর মন টানল মোক্ষদার ভাবেভরা চাহনি ও কমনীয় মুখ। চটক ও রূপকে হার মানতে হ'ল চরিত্র ও শ্রীর কাছে।

মোক্ষদাকে ওরা দূর ছাই করত—সবাই জানত। তাই মাণিকের প্রথমদিকে দয়া হয়। তারপরে মোক্ষদার সঙ্গে মাঝে মাঝে চকিতে দৃষ্টি বিনিময় হ'তে হ'তে এবং ওর গান শুনে তার ভালো লাগছে টের পেতে না পেতে ও ছুতো খুঁজতে লাগল মোক্ষদার সঙ্গে একটু আলাপ জমাবার। কিন্তু মোক্ষদা ওকে এড়িয়ে এড়িয়েই চলত, হঠাৎ দেখা হলে একবার স্থিরনেত্রে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে দূরে স'রে যেত। ফলে মাণিকের মনে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা জাগল। ওর একটা ধারণা জন্মেছিল যে, বিবাহ-যোগ্যা যে-কোনো মেয়েকে ইচ্ছে করলেই পটিয়ে নিতে পারে। কিন্তু মোক্ষদার মতন মেয়ের সংস্পর্শে ও কখনো আসে নি তো, তাই জানত না এ-জাতের স্বভাব-সংযমী মেয়েরা কী ধাতুতে গড়া। তাই ঘা খেল তাকে নানা-ভাবে ইসারা করা সত্ত্বেও সাড়া না পেয়ে। বিশেষ ক'রে মোক্ষদার কালো চোখের চাহনিতে ও ক্রমশঃ বিষম চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

এরূপ ক্ষেত্রে গর্বী মানুষের মনে প্রায়ই রোখ চেপে ওঠে। মাণিক মৎলব আঁটল। একটু সুবিধা হ'ল এই জন্যে যে, নন্দিনী মোক্ষদাকে মাঝে মাঝে ওর পাশে এসে বসতে বলত গান শিখবার সময়ে। ভাবটা: দেখ্, এমন কেতাদুরস্ত সুদর্শন ছেলে কিরকম আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। মাণিক নন্দিনীর রূপে আকৃষ্ট হ'য়েছিল দেখে সে মনে মনে ঠিক করেছিল তাকে নাজেহাল ক'রে তবে হবে বরদাত্রী। আর কী ভাবে মাণিক ওর পায়ে লুটোয় মোক্ষদা দেখুক—ভাবত রূপগর্বিণী।

কিন্তু এই ভুল চালেই নন্দিনী বাজি হারল—নিজের রূপের অভিমানে। মাণিক পাশাপাশি দুজনকে দেখে আরও বুঝতে পারল মোক্ষদা কী ধাতুতে গড়া। ফলে নন্দিনী ওর চোখকে মুগ্ধ করলেও ওর মন টানল মোক্ষদা। হাতের পাঁচকে ছেড়ে প্রেমে পড়ল অনধিগম্যার।

নন্দিনীকে ও একটি গান শিখিয়েছিল জ্ঞানদাসের—ঠুংরির তান বসিয়ে ভক্তিকে পাশ কাটিয়ে আদিরসেরই হাবভাব এনে—যাকে সাহেবরা বলে erotic :

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

মোক্ষদা শুনে শুনেই এ-গানটি শিখে নিয়েছিল, যদিও ওরা কেউই জানত না।

এর পরে খুঁটি নাটির নানা গর্ভাঙ্ক বাদ দিয়ে নাটকীয় ক্লাইম্যাক্সে আসি।

মোক্ষদা খুব ভোরে বাগানে গিয়ে ঠাকুর ঘরের জন্যে ফুল তুলত। মাণিক খবর নিয়ে একদিন ভোরবেলা খিড়কিদোর দিয়ে বাগানে ঢুকল—কারণ সে জানত নন্দিনী ও আর সবাই অনেক বেলায় ওঠে।

মোক্ষদা ফুল তুলতে তুলতে গুন গুন ক'রে গাইছিল এ-গানটি ও সঙ্গে সঙ্গে আঁখর দিচ্ছিল—ছেলেবেলায় কীর্তনী পিতার কাছে আঁখরের দোয়ার দিত তো, তাই আঁখর ওর সহজেই আসত। ও গাইছিল আঁখর দিয়ে :

পরশমণি……
নীলমণি ওগো পরশমণি…
ছুঁতে না ছুঁতেই করেছ ধনী…
কী জাদু জানে মধু চাহনি…ইত্যাদি।

অলক্ষিতে পিছনে দাঁড়িয়ে শুনতে শুনতে মাণিক সত্যিই মুগ্ধ হ'য়ে গেল। কী অপরূপ কণ্ঠলাবণ্য ও ভাব! আর সবার উপরে ওর নিজের শেখানো ঠুংরির খোঁচের লাবণ্যের সঙ্গে এ কী অভাবনীয় আঁখরের ফুলঝুরি! মোক্ষদা একটু থামতেই ও এগিয়ে এসে চাপা স্বরে বলল : "এমন গাইতে পারো তুমি? আর এসব আঁখর কোত্থেকে পেলে? এসব তো আমি নন্দিনীকে শেখাই নি!"

মোক্ষদা চমকে গিয়ে বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে দাঁড়াল, বলল : "আপনি! এমন অসময়ে?"

মাণিক চটুল হেসে বলল : "রসময় কি অসময় মানে সখী?"

মোক্ষদা ওর প্রগল্‌ভতা গায়ে না মেখে বলল : "এত ভোরে নন্দিনী ওঠে না—জানেন না কি?"

মাণিক বলল : "এ-ভান কেন মোক্ষদা? তুমিও জানো তুমি আমাকে চাও, আমিও জানি আমি তোমারে চাই।"

মোক্ষদা বলল : "কী বলছেন আপনি মাণিকবাবু? আপনার সঙ্গে আমার একটা কথাও হয়নি আজ পর্যন্ত—"

মাণিক বলল হেসে : "মোক্ষদা, ছেলেবেলায় একটা টপ্পা শিখেছিলাম—খুব নামজাদা টপ্পা—তুমিও নিশ্চয় শুনেছ"—ব'লেই সুর ক'রে : 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।'

মোক্ষদাকে কে যেন মাথায় বাড়ি মারল, জুগুপ্সায় শিউরে উঠে শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলল : "আপনি জানেন না কী বলছেন—"

মাণিক বলল পিঠ পিঠ : শুধু যে আমি জানি তাই নয় সখী, তুমিও জানো যে সব কিছু মুখে বলার দরকার হয় না। এও জানো তুমি যে মুখে মেয়েরা যা বলতে চায় না, তা চোখের মধ্যে দিয়ে ঠিকরে বেরোয়।"

মোক্ষদা কেঁপে উঠে বলল : "ছি ছি, এ সব কী বলছেন আপনি?"

মাণিক এবার সুর বদলে বলল জোর দিয়েই : "কী বলছি একটু ভেবেই দেখ না। একদিন দুদিন নয়, পর পর পাঁচ দিন তোমার চোখ কথা কয় নি? ডাকে নি আমাকে? দিন কয়েক আগে আমার গান শুনে উঠবার সময় ফিরে চাও নি তুমি? সখী, আমি আর যাই বুঝি বা না বুঝি, ইসারা বুঝি।"

মোক্ষদা বলল : "আমাকে বার বার সখী বলবেন না। আপনি জানেন বেশ ভালো ক'রেই যে আমাদের দেশ বিলেত নয়—যেখানে যে কোনো মেয়েকে সখী ব'লে কাছে ডাকা যায়। "তাছাড়া আমি—মানে আমার চোখে—"

মাণিক বাধা দিয়ে এবার পুরোপুরি গম্ভীর হ'য়ে বলল : "শোনো মোক্ষদা, আমি ভেবেছিলাম হাসি মস্করার মধ্যে দিয়ে অপরিচয়ের আড়ালটা কেটে যাবে সহজে। সখী ব'লেও হয়ত ভুল করেছি। তবে এ-অসময়ে এসেছি আমি

খোঁজ নিয়েছি যে, এত ভোরে কেউ ওঠে না—তোমাকে একলা পাব বাগানে। আর এসেছি তোমাকে সখী সম্বোধন করতে নয়—তার চেয়েও কিছু মরমী কথা বলতে, যা সখীকেও বলা যায় না—বলা যায় কেবল তাকে—যে সখী হ'য়ে এসে রাখী পরিয়েই খুসি হয় না।"

মোক্ষদা বলল বিরস কণ্ঠে: "আমাকে আপনার কীই বা বলার থাকতে পারে? আমি শুনব না।"

ব'লে পিছন ফিরতেই মাণিক্ ওর আঁচল চেপে ধরল: "লক্ষীটি মোক্ষদা, শোনো। তোমাকে শুনতেই হবে, নইলে আমি পারব না। গোলমাল করলে সবাই জানবে—তখন আমি পার পেয়ে যাব, পুরুষের সাত খুন মাপ, কিন্তু তোমার কী অবস্থা হবে বুঝতেই তো পারো। তাই শোনো। আমি তোমাকে নিয়ে ফুরতি করতে চাই না, চাই তোমাকে বিবাহ করতে—শপথ ক'রে বলছি।"

মোক্ষদা এবার সত্যিই চমকে গেল, বলল: "বিবাহ? আপনি—আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন মাণিকবাবু?"

মাণিক ফের হাসল, বলল: "কী হয়েছি—তার ইতিহাস তো তোমার ঐ গানেই রয়েছে: রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর—"

মোক্ষদার মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে ঝিলিক খেলে গেল, সে বলল রুক্ষ স্বরে: "আমি নন্দিনী নই মাণিকবাবু। যান আপনি।"

ব'লে ফুলের সাজি নিয়ে ফিরতেই মাণিক দুপা এগিয়ে এসে খপ ক'রে ওর হাত চেপে ধরল, বলল: "শোনো মোক্ষদা, আমি সত্যিই তোমার প্রেমে প'ড়ে গেছি বিশ্বাস কোরো, লক্ষীটি!"

মোক্ষদা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল: "প্রেম? নন্দিনীকে গিয়ে বলুন একথা। সে বিশ্বাস করবে।"

মাণিক এবার ওর দুহাতই চেপে ধ'রে বলল উদ্দীপ্ত-কণ্ঠে: "ভগবানের নাম নিয়ে বলছি মোক্ষদা—এ চোখের মোহ নয়। তোমাকে আমি সত্যিই ভালোবেসেছি। নন্দিনীকে আমি এক আঁচড়ে চিনে নিয়েছি। আমি চাই খাটি সোনা, গিল্টি নয়। তুমি শুধু একবার বলো যে তুমি আমার হবে। তারপর সব ভার আমার। আমি তোমাকে বিবাহ করব—না, শুধু বিবাহ করা নয়—মাথায় করে রাখব।

মোক্ষদা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল: "হাত ছাড়ুন।"

মাণিকের চোখে মুখে কেমন যেন একটা মত্ততার আভা উঠল ফুটে, সে বলল: "না, ছাড়ব না।—টানাটানি কোরো না, আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে। এ আমার চোখের নেশা নয়। এদেশে ওদেশে আমি অনেক মেয়ের সঙ্গেই মিশেছি—সত্যি বলছি তোমায়: রূপসী রঙ্গিনীদের রঙ্গ দেখে দেখে আমার মনে গভীর বিতৃষ্ণা এসে গেছে। আমি চাই এখন চরিত্র, গুণ, সংযম। আমি বড় মানুষের ছেলে, তার ওপর রোজগেরে। তোমাকে এরা কষ্ট দেয় আমি জানি—তাই আরো আমার মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে তোমাকে কাছে পেতে, সুখী করতে। কিন্তু না—শোনো। এসবও অবান্তরই বটে। আসল কারণ হচ্ছে যে, তুমি হচ্ছ তুমি—মানে এমন মেয়ে যে আমার প্রাণে হঠাৎ বান ডাকিয়ে দিয়েছ—কেমন ক'রে দিলে—জানি না। এরকম ভালোবাসার অনুভবও আমার কখনো হয়নি। আমি কেবল জানি একটি কথা, যার ওপরে আর কথা নেই: তোমাকে আমি ভালো-বেসেছি—আর এ মোহ নয়, সত্যিই প্রেম।" ব'লেই তাকে জোর করে কাছে টেনে নিতে যাবে, এমন সময়ে উপরের জানলা দিয়ে নন্দিনী মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় ক'রে বলল: "মা—মা! দেখবে এসো তোমার ভিজে বেড়াল বৌয়ের ছেনালি। বলিনি তোমায় যে, ও ডুবে ডুবে জল খায়?"

এর পরে হ'ল—যা ভবিতব্য। মোক্ষদার লাঞ্ছনার আর অবধি রইল না। নন্দিনী আগুন হ'য়ে উঠল: যাকে করত এত অবজ্ঞা, সেই কিনা হ'ল ওর কাল! এক-চক্ষু হরিণের মৃত্যুবাণ এসেছিল কানা চোখের দিক থেকে—উপমা আছে না? লজ্জায় অপমানে তার যেন মাথা কাটা গেল। মোক্ষদার বাগানে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হ'য়ে গেল।

বারো

বিষ্ণুঠাকুর (একটু থেমে): কিন্তু এখানে তোমাকে বোঝাবার জন্যে একটু ব'লে নিই পরের কথা—মানে মোক্ষদার কাহিনী যা তার কাছে আমি শুনেছিলাম তাকে বিবাহ করার পরে। ওর ভাষায়ই বলবার চেষ্টা করব যতটা পারি। ও বলেছিল:

"মাণিককে আমার সত্যিই ভালো লাগত বিশেষ ক'রে ওর গানের জন্যে। এমন সুকণ্ঠ ভালো না লেগে পারে? তাই এজন্যে আমার মনে কোনো গ্লানি নেই। তাছাড়া আমি যে পরে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম—কোন্ কর্মফলে আমার হ'ল এ-কর্মভোগ। আমার মনের কোণে কোথায় একটা ঈর্ষা ছিল—নন্দিনী ও আমি দুজনেই বিধবা, কিন্তু একই দুর্দৈবের ফল ফলল উল্টো। ও হ'ল আদরিণী—শুধু আদরিণী নয়, পেল মামার যৌতুক—সঙ্গে রূপও যোগ দিল এ-যৌতুকের মান বাড়াতে—কেবল বিনা অপরাধে একা আমারি হ'ল লাঞ্ছনার একশেষ—রটল দুর্নাম! তাই সময়ে সময়ে মনে মনে সত্যিই চাইতাম শোধ তুলতে, নন্দিনীকে হার মানাতে যদি ধরো ওর কোনো নাগর ওকে ছেড়ে আমাকেই চায়। এ-কুচিন্তার ফলে মনে গ্লানি হ'ত খুবই—ছি ছি, এমন অশুচি কামনাকে কেমন ক'রে মনে ঠাঁই দিচ্ছি! কিন্তু মন বোঝে তো প্রাণ বোঝে না, বলে না? কেন আমাকে সকলেই মাড়িয়ে যাবে—পাপোষের মতন—যখন ইচ্ছে? ঠিক এম্‌নি সময়েই মাণিকের উদয় হ'ল। আমারও মনে জেগে উঠল রেষা-রেষির ভাব। লজ্জার কথা বটেই তো—কিন্তু যখন সত্য, তখন না মেনে উপায় কি? আমি প্রায়ই কল্পনা করতাম মাণিক যদি আমাকে বিবাহ ক'রে এ অপমান থেকে বাঁচায়···তাহ'লে ওদের শিক্ষা হয়···এই ধরণের আরো যে কত হাবিজাবি চিন্তা!

"ঠিক এই ফাঁক দিয়েই এল কলি। ছেলেবেলায় শুনে-ছিলাম বাবার কাছে যে, যা-তা প্রার্থনা করতে নেই—অনেক সময় ঠাকুর বলেন—তথাস্তু, দিয়ে বসেন যা আমরা চাই। কথাটা সত্যি কি না জানি না, কিন্তু যা ঘটল তাকে 'প্রার্থনা পূরণ' নামই দিতে হয় বৈকি: মাণিক আমাকেই বরণ করল—হয়ত কোনো হঠাৎ-জেগে-ওঠা নেশার ঝোঁকে যে ধোপে টিকত না। তবু করল তো। কেন করল? সে যাই হোক, আমি এ সূত্রে বুঝলাম একটি কথা হাড়ে হাড়ে: যে মনেও কুচিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে নেই—কুচিন্তার চেয়ে বড় শত্রু কেউ নেই। কুকর্মও নয়। কারণ কুকর্মের তবু কাটান আছে—অনুতাপ, কিন্তু কুচিন্তার মধ্যে আছে শুধু বিলাস—অন্ততঃ কোনো শান্তি নেই বাইরের দিক থেকে। কেবল সে-সময়ে একটা কথা আমি ঠাহর করি নি: যে, কুচিন্তাকে প্রশ্রয় দিলে সে ক্রমশঃ চিন্তার কোঠা থেকে নামতে চায় হানাহানির কুরুক্ষেত্রে—তাই আমি মাণিকের দিকে কয়েকবার না তাকিয়েই পারি নি, যে-চাহনির মধ্যে একটা ডাক মতন ছিল—মানতেই হবে। মেয়েরা আস্কারা না দিলে যে পুরুষেরা এগুতে পারে না, এটুকুও আমি জানতাম বৈ কি। তাই কেমন করে শুধু মাণিককে দায়িক করব চড়াও হ'য়ে বেলেল্লামি করার জন্যে? কেবল এইটুকু মাত্র আমার বলবার আছে যে, সে সময়ে এত কথা সজাগভাবে ভেবে দেখি নি। তবে জানাজানির ওপারে যে মন আছে সে বুঝি জানত।"

(একটু থেমে প্রহ্লাদের দিকে তাকিয়ে): আমার কাছে দীক্ষা নেওয়ার পরে যে এ-ধরণের গভীর বোধ ওর মধ্যে প্রতি পদেই ফুটে উঠত; তার প্রধান কারণ—সত্যনিষ্ঠা ছিল ওর মজ্জাগত। দুঃখের চাপে হীন মানুষ আরো হীন হ'য়ে যায়, কিন্তু সত্যাশ্রয়ীরা আরো মহৎ হ'য়ে, উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে ওঠে—বিশেষ ক'রে সেই সব সাধক-সাধিকারা যারা নিজের রূপান্তর চায় ব'লেই মিথ্যার সঙ্গে রফা করতে রাজি হয় না। তাই তো মাণিকের একটুখানি অশুচি স্পর্শেই ওর মধ্যেকার ব্রহ্মচারিণী জেগে উঠল ওর ঈর্ষাকে নামঞ্জুর করে। কুন্তীকে কৃষ্ণ এই কথাই বলেছিলেন, বাবা: "সর্বং বলবতাং পথ্যং, সর্বং বলবতাং শুচিঃ'—যার মনের জোর আছে সে সব কিছু থেকেই আরো বল পায়, আরো শুচি হ'য়ে ওঠে। অন্যভাষায়: সত্যে যার নিষ্ঠা আন্তরিক ঠাকুর তাকে স্খলনের মধ্যে দিয়েও আকাশে টেনে তোলেন। ওর একটি কথা আমি কখনো ভুলব না। ও বড়গলা ক'রেই বলত আমাকে: "মিথ্যা বলা বোকামি, সত্যকে মিথ্যা ব'লে বরখাস্ত করা আরো বোকামি, কিন্তু সবচেয়ে বড় বোকামি হ'ল—গুরুর কাছে অসত্য ব'লে তাঁর প্রিয় হ'তে চাওয়া। কারণ শিষ্যশিষ্যারা সদ্‌গুরুর মনের মতন হ'তে পারে কেবল তখনই যখন গুরু যে-সত্যের সাধক, তারাও সেই সত্যের টানেই তাঁর আশ্রয় চায়। তাই তোমাকে তুষ্ট করতে যদি আমি মিথ্যার আশ্রয় নিই, তাহ'লে শুধু যে কে হারাব তাই নয়, তোমাকেও হারাব—আরো এই জন্যে যে, ইষ্ট ও গুরু যে ভিন্ন নয়

এ-সত্যের দেখা পেতে হ'লেও সব আগে চাই সত্যনিষ্ঠার সাধনাকে মনে প্রাণে বরণ করা।"

প্রহ্লাদ (আর্দ্র কণ্ঠে): কী চমৎকার কথা!

বিষ্ণুঠাকুর (স্নিগ্ধ হেসে সায় দিয়ে): আর চমৎকার এই জন্যেই যে, ওর মনের প্রাণের মূল গড়নটাই চমৎকার —যাকে অন্যভাবে নাম দিই আমরা—"বড় আধার।" কিন্তু ফিরে আসি ওর কাহিনীতে।

(একটু থেমে) বলছিলাম কি যে, ও স্বভাবে সত্যনিষ্ঠ ছিল ব'লেই আমার কাছে নিজের চ্যুতি বা' দুর্বলতার কথাও কখনো গোপন করত না। করবেই বা কেন বলো? আমাকে ও গুরুবরণ করেছিল তো ভেবেচিন্তে কি জোর ক'রে নয়—করেছিল যেমন সহজে পাখী বরণ করে আকাশকে, মাছ জলকে। আমি প'রে একদিন একথা ওকে বলেছিলাম সাবাস দিয়েই। বলেছিলাম: "যোগীরা এই জন্যেই বলেন যে, কোনো মিথ্যা শক্তিই আমাদের পেয়ে বসতে পারে না, যদি না তারা কোনো—না কোনো আস্কারার ছিদ্র পায়—ঠিক যেমন নৌকায় কোনো ফাটল না থাকলে জল ঢুকতে পারে না হাজার চেষ্টা করলেও। এ-উপমাটি সব দিক দিয়েই সুপ্রযুক্ত, কারণ কোনো ফাটলের মধ্যে দিয়ে জল একবার প্রবেশের পথ পেতে-না পেতে যেমন হু হু করে ফাটল বেড়ে যায়, ঠিক তেমনি একবার কোনো অশুচি কামনার স্ফুলিঙ্গকে জ্বলতে না জ্বলতে যদি নিভিয়ে না দেওয়া যায় তাহ'লে সে স্ফুলিঙ্গ নানা অনুকূল যুক্তির হাওয়ায় দেখতে দেখতে গনগনে আগুন হ'য়ে ওঠে। এই জন্যেই মুনি-ঋষিরা পই পই ক'রে মানা করেছেন, পাপ চিন্তাকে কোনো অছিলায়ই মনে ঠাঁই না দিতে। কারণ কুচিন্তা স্বভাবে খানিকটা মাইক্রোবেরই মতন, একবার আশ্রয় পেলে দেখতে দেখতে বংশবৃদ্ধি করে। কিন্তু যা বলছিলাম: মোক্ষদা যদি তার গোপন ক্ষোভকে পুষে নন্দিনীর প্রতি ঈর্ষাকে কুচিন্তা দিয়ে লালন না করত তাহলে তার মতন মেয়ে মাণিকের দিকে ধরি-মাছ-না-ছুঁই পানি গোছের ইসারা করতেই পারত না—গহন মনে কামনার ফুলকিও ঝিকমিকিয়ে উঠতে পারত না। তবে এ ফুল্‌কি যে কামনার আগুনেরই সগোত্র এ-সত্যকেও ও প্রথম দিকে ঠিক সজাগভাবে উপলব্ধি করে নি, করেছিল তখনই যখন মাণিক হঠাৎ এসে ওর হাত চেপে ধরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনের দুর্বলতার কুয়াশা কেটে গেল সত্যমুখী আত্ম-ধিক্কারের আলোয়—ওর দেহও ছি ছি ক'রে ওকে দেখিয়ে দিল যে মাণিককে ও একটু আস্কারা দিয়েছিল বৈ কি। খুব সামান্য সে ইসারা—বটে। কিন্তু বিধাতা যাদের ছোট উপাদান দিয়ে গড়েন নি—তাদের ক্ষেত্রে সামান্য স্খলনও আনে গভীর চ্যুতির অবসাদ, কেন না তাদের সাধনা ভগবদ্‌মুখী ব'লে দেবদ্রোহী শক্তিরা তাদের পথ আগলে দাঁড়াতে চায় প্রাণপণে। মোক্ষদা ছিল স্বভাবে ধর্মিষ্ঠা—বড় আধার। দেবদ্রোহী শক্তির অন্য নাম কলি—যিনি সমস্তক্ষণই ছিদ্র খোঁজেন পেয়ে বসতে। এই দুষমণ কলি খুব শেয়ানাও বটে, তাই জানে যে, মোক্ষদার মতন আধারের মধ্যে সে ধরণের কোনো গভীর চ্যুতি বা দারুণ স্খলনের ছিদ্র পাওয়া অসম্ভব, যে-ধরণের চ্যুতি স্বভাব-স্বৈরিণীদের রোজই ঘটে—প্রায় স্বাভাবিক বললেই হয়। তাই বড় আধারের ক্ষেত্রে শয়তানকে আরো ওঁৎ পেতে ব'সে থাকতে হয়—যাতে একটু ছিদ্র পেতে-না-পেতে টুক ক'রে ঢুকে বসতে পারে। আর কলি ঢুকতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তিল পরিমাণ চ্যুতির ফলে ঘটে তাল পরিমাণ দুঃখ-তাপ। এই জন্যেই মহৎ সাধকের বা যোগীদের সামান্য স্খলনের ফলেও আসে প্রায় অন্তহীন আত্মগ্লানি—যে-ধরণের গ্লানির সিকির সিকিও আসে না অসাধক বা অযোগীদের মারাত্মক কুকর্মের ফলে। (একটু থেমে) কিন্তু এ তো সবে কলির সন্ধে। তার পর কী হ'ল শুনলে তোমার মনে আর সংশয়লেশও থাকবে না যে, ঠাকুরের লীলালোকে তাঁর কৃপাশক্তিও যেমন অকাট্য সত্য তেম্‌নি অকাট্য সত্য—নেপথ্য কলিশক্তির মায়াতন্ত্ব, ওরফে বিপথে টানবার অভাবনীয় প্রতিভা। শুধু তাই নয়, এ-নেপথ্য-শক্তিদের খবর কিছুই না জানলে দৃশ্যমান অনেক অঘটনেরই তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

(একটু থেমে) বলেছি, নন্দিনী মোক্ষদাকে নেক-নজরে না দেখলেও মাণিকের সঙ্গে গান শেখবার সময়ে তাকে ডাক দিত নিজের গৌরব বাড়াতে। কিন্তু দর্প-হারীর চতুর চালে হ'ল উল্টো উৎপত্তি—মোক্ষদার চোখে বড় হবার গর্বলোভে নন্দিনী ছোট হ'য়ে গেল মাণিকের চোখে। ফল যা হবার: ওর আক্রোশের আর সীমা

রইল না—বিশেষ ক'রে মোক্ষদার'পরে। রূপে গুণে অসামান্যা হ'য়েও একদিকে এক লাঞ্ছিতা নগণ্যার কাছেও হার মানতে হ'ল, অন্যদিকে যে-মাণিককে খেলাচ্ছিল এই ভেবে যে - কাছে ডেকে দূরে ঠেলে তাকে আরো উস্কে দেবে, ক্ষেপিয়ে তুলবে—সেই মাণিক কিনা ওর স্বপ্নের তাসের ঘর ভেঙে দিয়ে "আমার নাগর যায় পরঘর, আমার আঙিনা দিয়া।' ছি ছি! কী লজ্জা! আর লজ্জার উল্টো পিঠে বিষম জ্বলুনি : নন্দিনী হ'য়ে দাঁড়াল মোক্ষদার সবচেয়ে বড় শত্রু। মায়ে ঝিয়ে ঠিক করল ওকে শিক্ষা দিতেই হবে। ওর বাগানে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হ'ল।

ঠিক এই সময়েই আমি এলাম কাশী। এও ঠাকুরের চাল বৈ কি। কেন—বলছি। কিন্তু ছবিটা ফুটিয়ে তুলতে হ'লে আগে একটু বলতেই হবে আমার কাহিনী—যাকে সাহেবরা বলায় back ground, সংক্ষেপেই বলব। [ক্রমশঃ

বৈশিষ্ট্যের সন্ধানে

(ভাগবতী কথা)

শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রায় সমানার্থক ভাগবতের দুইটি শ্লোক লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমটি (১০-৯-২০) এইরূপ (শুকোক্তি)—

নেমং বিরিঞ্চো, ন ভব ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।

প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥

মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যেরূপ প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, বিমুক্তিদাতা ভগবানের কাছে বিরিঞ্চ, ভব বা বক্ষবাসিনী লক্ষ্মীরও সেরূপ লাভ হয় নাই।

আবার অপর শ্লোকটিকে (১০-৪৭-৬০) লক্ষ্য কর (উদ্ধবোক্তি)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ

স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।

রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-

লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজবল্লবীনাম্।

রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণভুজদণ্ডগৃহীত অনুগ্রহপ্রাপ্তা গোপীগণের যেরূপ প্রসাদ লাভ হইয়াছিল, নলিনগন্ধদেহা কোন স্বর্গীয়-দেবী, এমন কি বিষ্ণুবক্ষোলগ্না লক্ষ্মীদেবীও সেরূপ প্রসাদ লাভে ধন্যা হন নাই।

দেখা যাইতেছে যে প্রসাদলাভ মা যশোদারও হইয়াছিল, গোপীদিগেরও হইয়াছিল। যেরূপ উপমা রহিয়াছে তাহাতে প্রসাদের উৎকর্ষের তারতম্য স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছেনা। অথচ শ্রীউদ্ধব, যাহাকে ভগবান চরমতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন,—(৯-২৪-৬৭) গোপীদের প্রসাদের প্রচুর প্রশংসা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়াছেন এভাবে যে, মা যশোদা যে অঙ্গের সেবা কৃষ্ণকে দিতে পারেন নাই, গোপিকাগণ সেই "নিজাঙ্গ" দিয়া কৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন বলিয়াই ত প্রসাদের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

আচ্ছা, কুব্জাও সেই নিজাঙ্গ দিয়াই কৃষ্ণসেবা করিয়াছিল। তবুও ভাগবতকার তাহাকে "দুর্ভাগা" বলিয়া তিরস্কৃত করিলেন কেন? (১০-৪৮-৮) উত্তরে দাবী করা হয় যে কুব্জার যে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গমসেবা তাহা শুধু আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির জন্যই। পক্ষান্তরে গোপিকাগণের নিজাঙ্গ দিয়া কৃষ্ণসেবার মধ্যে কৃষ্ণপ্রীতি ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য ছিলনা। চৈতন্যচরিতামৃতে ঘোষণা করা হইতেছে যে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির আকাঙ্ক্ষাকে কাম ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির কামনাকে প্রেম নাম দেওয়া হয়। গোপীগণ যখন রাসস্থলীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন, ভাগবতের বর্ণনা পড়িলে মনে হয়না যে, তাঁহারা নিছক কৃষ্ণপ্রীতির জন্যই অঙ্গসঙ্গের লোভে নানা "বিরুবিত" বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ", একথা ভাগবতে আছে। পরীক্ষিতেরও সংশয় হইয়াছিল যে যিনি ধর্ম্মস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তিনি পর-দারাভিমননিরূপ জুগুপ্সিত কর্ম কেন করিলেন? শ্রীশুকের উক্তিও ঐ ব্যাপারের সমর্থন করে; সেখানে তিনি বলিয়াছেন যে তেজস্বী অনলসদৃশ ব্যক্তির পক্ষে ঐ সব কার্য্য দূষণীয় হয়না, যেরূপ অগ্নি, পবিত্র বা অপবিত্র, সমস্ত বস্তুকেই আত্মসাৎ করিয়াও নিজে অপবিত্র হয়না।

এখানে আ'র একটা দিকও দেখিবার আছে। শ্রীউদ্ধবের যে উক্তিটি পূর্ব্বে উল্লিখিত করা হইয়াছে, সেখানে বলা হয় নাই যে কৃষ্ণ-সঙ্গমে ব্যভিচারদুষ্টা গোপীদের যে দুর্লভ প্রসাদ লাভ হইয়াছিল, অন্যের সেরূপ হয় নাই। সেখানে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে ঐ প্রসাদ উদ্ভূত হইয়াছিল, যখন ভগবান বহু হইয়া দুই বাহুদ্বারা দুই দুইজন গোপিনীর কণ্ঠ-ধারণ করিয়া রাসনৃত্যোৎসবসম্পন্ন করিয়াছিলেন। যদি উদ্ধববাক্যে বিশ্বাস করি তবে, রমণাদি ইন্দ্রিয়-প্রীতির প্রশ্নই এখানে উঠে না। এখানে উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের সমন্বয় এভাবে হইতে পারে যে, ভগবান কণ্ঠাশ্লিষ্ট হইলে মা যশোদার যে প্রসাদ লাভ হয়, গোপীগণেরও তাহাই হয়, ততোধিক নহে। কাজেই গোপীপ্রেমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হইলেও চলে। অধিকন্তু দেখা যায় যে, ভগবান উদ্ধবকে ভক্তি-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে একাদশ স্কন্ধে যে সব অনবদ্য তত্ত্ব বলিয়াছেন, সেখানে ঐরূপ গোপীভাবে নিজাঙ্গ দিয়া কৃষ্ণসেবার উল্লেখমাত্রও করেন নাই। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অর্জ্জুন, উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তশ্রেষ্ঠগণের কেহই গোপীভাবে ভজন না করিয়াই চরম পুরুষার্থলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং "এহ বাহ্য" প্রভৃতি না ভাবিলেও চলে।

আর ও একটি বিষয় বলিবার আছে। তন্ত্রোক্ত পঞ্চ-মকার সাধনের মদ্য, মাংস ও সম্ভোগের পরে ক্লেশকর মুদ্রাদ্বারা দেহক্ষয়ের পূরণ ও মনঃস্থৈর্য্য সাধন করার পরে মৎস্যভাবে একাত্মভাবে লীন হইবার বিধান রহিয়াছে। রাসপঞ্চাধ্যায়েও দেখা যাইতেছে যে তৃতীয় অধ্যায় পর্য্যন্ত গোপীগণ একান্ত কামাতুরা হইয়া কৃষ্ণসঙ্গম লাভ করেন। তার পরের অধ্যায়ে বিলাস পঞ্চমকারের কৃচ্ছ্র সাধন মুদ্রা) এবং পঞ্চম অধ্যায়ে দেখি যে রিরংসাপ্রবৃত্তির অবসান হইয়াছে এবং সকলে কৃষ্ণকণ্ঠলগ্না হইয়া অলৌকিক রাসনৃত্যে বিভোরা। ভাগবতে নারদ বলেন, "কামাৎ গোপ্যঃ" গোপীগণ কাম হইতে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন। এখানে "কামাৎ" শব্দটিকে অপাদান কারক বলিয়া ধরিলে ব্যাকরণগতভাবেও শুদ্ধ ব্যাখ্যা করা যায় এই ভাবে যে, বিশ্লেষের বেলায় যাহা স্থির থাকে, তাহাই অপাদান। "কামাৎ" কাম হইতে বিশ্লেষবশতঃ কাম নিজস্থানে স্থির রহিল,আর কাম হইতে বিশ্লিষ্ট বা মুক্ত হইয়া গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের চরম সত্তায় লীন হইলেন।

সুতরাং গোপীপ্রেমকে বাৎসল্য প্রেমের উপরে স্থান দিতে গেলে অন্যায় ও অবিচার হইবে না কি?
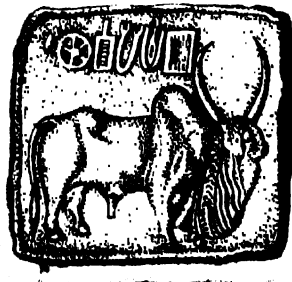
আজকের বৃটেন

ডক্টর শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য পি এইচডি (লণ্ডন)

বৃটেনের মাটিতে প্রথম পা দিয়েছিলাম ১৯৫২ সালে। সাধ ছিল তাকে ভাল করে দেখবো জানবো, কিন্তু পরিচয় নিবিড় হ'তে না হ'তেই বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এলো। মনে পড়ে সেদিনের কথা ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস। চারিদিকে পাতা ঝরা স্থরু হয়ে গেছে। তারপর ভারতের বুকে আরও সাতবছর কাটলো দুঃখসুখের দোলায় দুলতে দুলতে। কতদিন স্বপ্ন দেখেছি পুনর্মিলনের। একদিন সে স্বপ্ন বুঝি বাস্তব হ'য়ে দেখা দিল। সাত বছর বাদে আবার বৃটেনকে দেখলাম মনে পড়ল প্রথম শুভদৃষ্টির কথা। গোধূলি লগ্নে সে পরিচয় হোয়েছিল। আজ তার মাদকতা হারিয়ে গেছে। কিন্তু হারিয়ে যায়নি তার প্রতি ভালবাসা।

সরমজড়িত দৃষ্টিতে দেখলাম তার দিকে। কতদিনের বিরহ বিচ্ছেদের অন্তরালে হৃদয় দুরু দুরু করে উঠলো। বুঝলাম দীর্ঘদিনের ব্যবধানে কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন শুধু বাইরের। এই সাতবছরে অন্তরের ভাবমূর্ত্তি কিছু পাল্টায়নি—এই আশা নিয়ে আরও নিবিড় করে জানতে চাইলাম বৃটেনকে।

একটা দেশকে জানতে হ'লে,জানতে হয় তার সংস্কৃতিকে, জানতে হয় তার মানুষকে। প্রথম যখন এদেশে এসেছিলাম তখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে পারেনি এদেশ। তার সমাজ অর্থনীতি শিক্ষা ছিল সঙ্কুচিত। একে একে এদেশের ওপর দিয়ে অনেক পরিবর্ত্তনের ঢেউ চলে গেছে। অনেক মতবাদের তুফান এরা পেরিয়েছে। এতদিন ধরে সারা পৃথিবীতে যে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল, একে একে তাকে গুটিয়ে নিতে হয়েছে। কিন্তু তবুও এজাত মরেনি। তার চারিত্রিক বলে সে আবার নতুন করে সংসার পেতেছে। অনেক সমস্যার মুখোমুখী তাকে হতে হয়েছে, কিন্তু ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার গুণে স্থির বুদ্ধি দিয়ে সে তার সমাধান করে নিয়েছে। এর ফলে আজ বৃটেনের দৃষ্টিভঙ্গী হ'য়েছে অন্তর্মুখী। একদিন যেমন সে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিল সারা বিশ্বে—আজ তেমন তার সমগ্র দৃষ্টি পড়েছে তার নিজের ঘর সংসারে। কি করে তার ছোট্ট ঘর-সংসার গুছিয়ে নিয়ে তার মধ্যেই লক্ষ্মীর আড়ি পাতৃতে পারে সে দিকে তার দৃষ্টি আজ সজাগ।

এ কথা কয়েকদিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, অনুভব করেছিলাম তার হৃদস্পন্দনকে। সে যেন আজ দ্রুতগতিতে চলেছে প্রাণের তাগিদে। বুঝেছিলাম যে এবার বৃটেনের বাইরের রূপে আর ভুলে থাকা ঠিক হবে না। তার অন্তরাত্মার সঙ্গে পরিচিত হ'তে হবে। সেই আশা নিয়ে ছুটেছি এদিক ওদিক সেদেশের মানুষকে বুঝবার জন্যে, তাদের মনের কথা জানবার জন্যে। অনেককে প্রশ্নই করে বসেছি, "তোমাদের কেমন কাটছে এখন, আগের চেয়ে ভাল?" একগাল হাসি হেসে শ্রমিক-দম্পতি উত্তর দিয়েছে "তা আর বলতে"। আজ আমাদের আয় অনেক বেড়ে গেছে, খাদ্যের অভাব নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঋণের বোঝাও বেড়েছে। প্রথমটা শুনে অবাক লাগলো পরে বুঝলাম—এদের জীবনের প্রয়োজন আজ বেড়ে গেছে।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন কিছু অর্থ সংস্থানের আশা নিয়ে এখানকার বেতার বিচিত্রার আসরে এসে হাজির হ'লাম। মনে ক্ষীণ আশা ছিল যে আগেকার অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে এবারও কিছু মিলবে। এদেশের রীতি অনুযায়ী বিচিত্রার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম দূরভাষণের মাধ্যমে। কথা শুনে মনে হ'ল ভদ্রলোক রাশভারী, ভাবলাম গিয়ে তো দেখি। তাঁর নির্দ্দেশ মত শনিবারের বারবেলায় গিয়ে হাজির হ'লাম, দেখলাম খুব ব্যস্ত, আলাপ আলোচনার অবসর নেই। বেশী বাক্যব্যয় না ক'রে আমার বৃটেনের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা সম্বলিত একখানি বই তাঁর হাতে তুলে দিলাম, আর বললাম "যদি লেখা পছন্দ হয় তা হ'লে ডাকবেন বা ফোন করবেন।" রোজই

ফোনের আশায় থাকি তু' একদিন ফোন যে বেজে ওঠেনি তা' নয়। কিন্তু সে বাজে ফোন। ধৈর্য্য রাখতে না পেরে আবার ফোন করে বস্‌লাম। সোজাসুজি প্রশ্ন—কেমন লাগলো আমার বইখানি? এর মধ্যে নিশ্চয়ই আপনার পড়া হ'য়ে গেছে। ভদ্রলোক কোনও ভূমিকা না ক'রে বল্‌লেন "আরে আপনাকেই তো খুঁজ্‌ছিলাম। যাক্ ভালই হ'ল। একদিন আসুন, অনেক কথা আছে।" এই আশ্বাসবাণীর জন্যে মনে মনে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। তারপর থেকে আমাকে আর কোনও কথা বলতে হয়নি। যতখানি সম্ভব তিনি আমাকে কাকে লাগিয়েছেন। সত্যি কথা বল্‌তে কি—ভদ্রলোক সম্পর্কে আমার একটা কৌতূহলই ছিল। কোথায় এমন একটি মানুষ আগে দেখেছি মনে মনে খুঁজছিলাম। সে খোঁজার আজও শেষ হয়নি। ভদ্রলোকের নাম বিনয় রায়। নামের সঙ্গে আচরণের সামঞ্জস্য আছে বই কি। যতই তার সঙ্গে মিশেছি ততই আকৃষ্ট হ'য়েছি। কথাবার্তার মধ্যে একটা বুদ্ধির দীপ্তি। আচরণে সপ্রতিভ ভাব। এই মানুষটিকে আজও ভুলতে পারিনি। যাক্, যে কথা বল্‌ছিলাম—এমনি আরও অনেক মানুষের সঙ্গে এদেশে আমার পরিচয় হ'য়েছে তারা বেশীর ভাগই ইংরেজ।

ইংরেজ বন্ধুদের মধ্যে প্রথমেই মনে আসে মিঃ ডানষ্টলের কথা। এক সবজীর দোকানে গিয়ে এঁর সঙ্গে আলাপ হোয়েছিল। ভদ্রলোকের বোন ছিলেন এই সবজীর দোকানের মালিক। ভদ্রমহিলাটি খুব অমায়িক। স্বামী অফিসে কাজ করেন। আর স্ত্রী সব্‌জীর দোকান চালিয়ে স্বামীকে সাহায্য কর্‌তে চেষ্টা করেন। লণ্ডন থেকে একটু বাইরে এবার আমার আস্তানা মিলেছিল। বেশ পল্লীপরিবেশ, তাই সকলের সঙ্গেই একটা সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠ্‌তে এই সব পরিবেশে দেরী হয়না। এক দিন ঘরোয়া কথা বল্‌তে বল্‌তে নিজের থাকার অসুবিধার কথা প্রকাশ করে ফেললাম। ভদ্রমহিলা প্রশ্ন কর্‌লেন "তা হ'লে আমাদের তুমি ছেড়ে যেতে চাও, কেন এখানে কি অসুবিধে হচ্ছে?" আমি বল্‌লাম—অসুবিধা আর কিছুই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জায়গাটা বড় দূরে তাই। ভদ্রমহিলা একটু চিন্তা করেই বল্‌লেন "ভাল কথা, আমার এক ভাই-এর এক বাড়ী আছে, জায়গাটা ভাল আর কাছাকাছিও হবে। সেই প্রসঙ্গেই মিঃ ডানষ্টলের সঙ্গে ঐ সব্‌জীর দোকানে প্রথম আলাপ। একে একে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমে উঠল। পড়ে দেখ্‌লাম যে বাড়ীওয়ালা-ভাড়াটের সম্পর্ক ছাপিয়ে যেন একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠ্‌ছিল। বেশ কিছুদিন তাঁর বাড়ীতে অতিথি ছিলাম, অবসর পেলেই তাঁর বসবার ঘরটিতে একবার উঁকি দিয়ে যেতাম। একদিন ঘরে ঢুকতে ইতস্ততঃ করছি, কারণ, ঘরের মধ্যে এক মহিলার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, কিন্তু about turn নেবার আগেই ভদ্রলোক আমার নাম ধরে ডেকে একটি বস্‌বার জায়গা দিয়ে বল্‌লেন "Will you take your seat and be comfortable?" আমি একটু ইতস্ততঃ করে জড়-সড় হোয়ে এক কোণে গিয়ে বস্‌লাম। সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রমহিলা তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দ্দন করে বল্‌লেন "তোমাকে এক কাপ চা দিতে পারি কি?" বুঝলাম, আমার সম্বন্ধে আগেই আমার land lord এর কাছ থেকে কিছু খবর ইনি নিয়েছেন। বসে বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছি, ভদ্রলোক মহিলাটির পরিচয় দিয়ে বল্‌লেন—এটি আমার মেয়ে। শুনে একটু অবাক হ'লাম। আগে তো কই একে কোনদিন দেখিনি। পরে মেয়েটি চ'লে গেলে ডানষ্টল তাঁর জীবনের এক করুণ অধ্যায়ের কথা আমাকে বল্‌লেন। আমিও অলক্ষ্যে একটু সহানুভূতি প্রকাশ করেই ফেলেছিলাম। এই হোল আমাদের প্রথম বন্ধুত্বের সূত্রপাত, তারপর কত সন্ধ্যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা মিঃ ডানষ্টলের সঙ্গে গল্প করেছি। কত ঘরোয়া সুখদুঃখের কথা। বিদেশী হলেও যেন কোথায় একটা মিল খুঁজে পেয়েছিলাম। এমন অনেক দিন গেছে যখন ভদ্রলোকের সঙ্গে ডিনারও খেয়ে নিয়েছি। একে দেখে মনে হয়েছে যেন ইনি নিঃসঙ্গ—কোথায় একটা ব্যথা রয়ে গেছে কিন্তু জাতীয় বৈশিষ্ট্যের গুণে সেই ব্যথা কোথায় তা তিনি অনেকদিন প্রকাশ করেননি। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় ৬৫র কাছাকাছি, কিন্তু এখনও অক্লান্তকর্মী—ছুটির দিনেও তাঁকে বাড়ী বস্‌তে দেখিনি। খুব দরিদ্র অবস্থা থেকে শুধু কর্ম্মের বলে আজ লণ্ডন সহরের একখানি বাড়ীর মালিক হয়েছেন। মুখের মধ্যে অমায়িকতার ছাপ, মনে হয় জীবনে বহু অভিজ্ঞতা আহরণ করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন

সম্পর্কে আমার কৌতুহল প্রকাশ করা ঠিক হবে কিনা এই প্রশ্ন আমাকে বহুদিন সঙ্কুচিত করে রেখেছে। কিন্তু একদিন সব সঙ্কোচের বাঁধন আলগা করে দিয়ে জিজ্ঞেস করেই বসলাম। হয়ত এই প্রশ্ন আমার কাছ থেকে তিনি আশা করেছিলেন একদিনকার আলাপের পর। তাই আমার প্রশ্নটিকে সহজে স্বীকার করে নিলেন। লক্ষ্য করলাম – উত্তর দেবার সময় তাঁর চোখদুটি ছল ছল করছে, তিনি বললেন "আমার সবই ছিল, আমার একমাত্র ছেলে আজ বিয়ে করে পর হোয়ে গেছে, আর মেয়েটি মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে আসে, তবু বুড়ো বাবাকে তার মনে পড়ে। আমি বললাম, "তোমার মেয়ের বিয়ে হয়নি বুঝি ?" বলল, "না। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগলো তা হলে ও কোথায় থাকে—প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মিঃ ডানষ্টল বেশ খানিকটা ইতস্তত: করছিলেন পরে সামলে নিয়ে বললেন আমার স্ত্রী বহুদিন আমাকে ছেড়ে গেছে, মেয়েটি এখন তার কাছেই থাকে।" শুনে মনে প্রমাদ গুনলাম। সমবেদনা জাগলো এই অমায়িক ভদ্রলোকটির ওপর। এবার লণ্ডন থেকে বিদায় নেবার আগে ডানষ্টলকে আমার লেখা ছোট্ট একখানি বই দিয়ে বললাম, "তুমি আমায় যা দিয়েছ তার পরিশোধ করবার শক্তি আমার নেই। আমার এই ছোট্ট উপহারটি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে তোমাকে দিচ্ছি।" ভদ্রলোক বইখানি পেয়ে যে খুবই খুশী হলেন, তা তাঁর দু একটি কথায় বোঝা গেল। বললেন "চিরদিন হাতের কাজ করে এসেছি, বস্তুসর্ব্বস্ব দৃষ্টি নিয়ে। কিন্তু জীবনে শান্তি পাইনি। তোমার লেখা এই বইখানি যদি আমাকে কিছুটা ভুলিয়ে রাখে তা' হলে সেটাই হবে আমার সব চেয়ে বড় পুরস্কার।

এতে লণ্ডনের সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হ'তে থাকে। একদিন লণ্ডনের টিউবে চলেছি। সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে গাড়ী ছুটেছে বিদ্যুৎ গতিতে। হঠাৎ একটু থমকে উঠে দেখি, গাড়ী এসে পড়েছে মুক্তপ্রকৃতির কোলে। সেই কামরায় প্রায় সব আরোহী নেমে গেছে। এক কোণে শুধু এক ভদ্রলোক বসে আছেন—দেখে মনে হল বেশ অভিজাত। আমার দিকে একটু কটাক্ষে তাকিয়ে বললেন —"Are you from India" ? আমি একটু হেসে ঘাড় নাড়লাম। তিনি একটু এগিয়ে এসে আমার সামনের সিটটিতে ব'সলেন। কথায় কথায় জানা গেল ভদ্রলোক ভারতবর্ষে বহুদিন ছিলেন Armyতে। তিনি আমাকে বললেন যে তাঁর ছেলের জন্ম নাকি ভারতের মাটিতে— আর তাঁর স্ত্রী নাকি ভারতীয় সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাবান।

কথায় কথায় কথা বেড়ে উঠল। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন যে ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে আসার পর ভারতের কি কোন উন্নতি হ'য়েছে ? আমি বললাম নিশ্চয়ই। হঠাৎ দেখি তাঁর গন্তব্যস্থান এসে গেছে। বিদায় নেবার আগে—ভদ্রলোক একখানা কার্ড দিয়ে ব'ললেন "একদিন আসবেন—খুব খুশী হব।" আমি একটা ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিলাম। এই হ'ল Mr Chapman এর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। একদিন টেলিফোনে appointment করলাম। Dinner এর নিমন্ত্রণ। যথারীতি গিয়ে পৌছলাম। লণ্ডনের বাইরে স্থলিং এ নেমে আমার বাসে চাপতে হয়। প্রায় ১ ঘণ্টা লাগে যেতে। আমার জন্যে তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন। যাওয়া মাত্রই Home fire এর কাছাকাছি কুশনটি আমাকে দিলেন। আগুনকে ঘিরে সমস্ত পরিবার তখন গালগল্প করছিলেন। Mrs Chayman এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন—অনেক দিন থেকে আমার গিন্নী একজন ভারতীয় বন্ধুকে খুঁজছিলেন !…হঠাৎ কারণটা জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। মনে কৌতুহল র'য়ে গেল। তখন ছিল খ্রীষ্টমাসের সময়। সব ঘর-দোর জানলা দরজা পরিষ্কার করা সুরু হয়ে গেছে। চারিদিকে খ্রীষ্টমাস বৃক্ষের আয়োজন। Mr Chapmanএকে একে তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বড় ছেলেটির বয়স প্রায় ২১ বছর—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। বাবা মার কাছে খ্রীষ্টমাস উপলক্ষ্যে এসেছে। ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান। তার কথা ব'লতে ব'লতে বললেন, এর জন্ম হ'ল ভারতবর্ষে Bombay শহরে। কথায় কথায় বঙ্গের খুব সুখ্যাতি ক'রলেন। ছোট মেয়েটার বয়স মাত্র ৫ বছর। বেশ সুখের সংসার। Mr Chapman ভারতীয় দূতাবাসেরই একজন পদস্থ কর্মচারী। খুব ভদ্র ও দরদী। ডিনার সেরে আবার গল্প। আমি প্রশ্ন করলাম,—"আচ্ছা, ইংরেজ ত ভারত ছেড়ে চ'লে এসেছে—এখনও তাদের ভারতীয়দের প্রতি মনোভাব কি একই রকমের আছে ?" Mr Chapman একটু অমায়িক হেসে বললেন—তাই যদি হবে, তবে আমি কি করে ভারতীয় দূতাবাসে কর্ম্মচারী হ'তে পারি ? হাঁ তবে ভারতীয়দের প্রতি এ জাতির ধারণা খুব ধীরে ধীরে পাল্টাচ্ছে। বহুদিনের সংস্কার ও আভিজাত্যবোধ তারা একদিনে ছাড়তে পারবে কি ক'রে ?"

উক্তিটির মধ্যে সারল্যের পরিচয় পেয়ে ভালো লাগল। কথায় কথায় বেশ রাত্রি হ'য়ে গেছে। লণ্ডনের ব্যস্ত কোলাহল থেকে বেশ খানিকটা দূরে। Mr Chapman Carএ ক'রে আমাকে Tube-Stationএ পৌছে দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরাধাবল্লভ দে

শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক জীবনকথা অতি পুরাতন এবং বহুবার বহুভাবে আলোচিত হইয়াছে। তথাপি এই অমিয় জীবন বৃত্তান্তের অতি সংক্ষিপ্ত বিবৃতির একটি ভক্তি-পূর্ণ অর্ঘ্য তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিবার এক অদম্য প্রেরণা অন্তরে অনুভব করিতেছি। তাই এই নৈবেদ্য।

আবির্ভাব—তাঁহার ধরাধামে আবির্ভাব সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা বেশ রহস্যময়। পৈত্রিক ক্রিয়া উপলক্ষে তাঁহার পিতা ধর্মশীল ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ৺গয়াধামে যাইয়া স্বপ্নে জানিতে পারেন শ্রীশ্রীগদাধর তাঁহার পুত্ররূপে উদিত হইবেন। ইত্যবসরে তাঁহার পতিব্রতা পত্নী চন্দ্রাদেবীও নিকটস্থ যুগীদিগের শিবালয়ে গিয়া দেখিলেন যে শিবালয় হইতে একটি ঘূর্ণীবায়ু ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল। তদবধি তাঁর মনে হইতে লাগল, তিনি গর্ভধারণ করিয়াছেন। উপরোক্ত দুইটি ঘটনা তাঁহার ধরাধামে আবির্ভাবের পূর্ব্ব-সূচনা।

বাল্য জীবন—তাঁহার বাল্যজীবনের লীলাভিনয় হইতে মাত্র তিনটি ঘটনার উল্লেখ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। মাত্র সাত বৎসর বয়সে নিবিড় মেঘের কোলে বলাকা শ্রেণী দেখিয়া ভাবতন্ময়তায় তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। অষ্টম বর্ষ বয়সে আলুড়ের মাঠে বিশালাক্ষীর ভাবাবেশে আবার একবার ঐরূপ অবস্থা হয়। তার পর কামারপুকুর গ্রামে একদিন যাত্রাভিনয়ের সময় যিনি শিবের অভিনয় করিবেন তিনি হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়িলেন। গদাধরকে (গদাধর স্বপ্ন দেখাইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া বালকের নামকরণ হইয়াছিল গদাধর) শিবের অভিনয় করিতে হইয়াছিল। ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত ডমরু সাপ হস্তে যেন সাক্ষাৎ শিব আসরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু একেবারে স্থির, চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ যেন সাক্ষাৎ শিব ধ্যানে মগ্ন। যাত্রার আসর ভাঙ্গিয়া গেল, বহুক্ষণ পরে বালকের সংজ্ঞালাভ হইয়াছিল।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ—পিতৃবিয়োগের পর সাংসারিক অভাব অনাটনের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার কর্তৃক কলিকাতায় আনীত হন। বাংলা কিছুদূর পড়িয়া ও সময়ে সময়ে ভ্রাতার সহায়তায় পুজাদি কর্মে নিযুক্ত হইয়া বুঝিলেন, বিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষাদানের লক্ষ্য অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা কায়ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ। তাই তিনি ভ্রাতাকে একদিন বলিয়াছিলেন 'এ চালকলা বাঁধা বিদ্যায় আমার প্রয়োজন নাই।' রামকুমার তখন রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালীমাতার পূজারির পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভ্রাতা গদাধরকেও এই পুজাকার্যে ব্রতী করিলেন। এই সময় স্বাভাবিক প্রেরণায় উদ্দীপিত হইয়া তাঁহার মনে কেবলই জাগিতে লাগিল—এ কাহার পুজা করি? কেন করি? এই পুজার দ্বারা আমার কি লাভ হইবে? ইনি কি বাস্তবিকই জগন্মাতা অথবা কেবলমাত্র পুত্তলিকা? চিন্তার প্রাবল্যে, প্রাণের ব্যাকুল আবেগে আহার গেল, নিদ্রা গেল, সময় কোন দিক দিয়া যাইতে লাগল ঠিকও পাইতেন না। এই সুতীব্র ভাবের উত্তেজনায় হৃদয়ের আবেগ যখন চরমে উঠিল, মা আর অমন স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া দর্শন দিলেন। ভগবদ্দর্শনের পর শাস্ত্রোক্ত মতে সাধনা এবার আয়ত্ত হইল। শ্রীশ্রীজগন্মাতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভৈরবী ব্রাহ্মণী শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় তন্ত্র মতেই সিদ্ধ-সাধিকা—প্রধান প্রধান তন্ত্রের বিধানানুযায়ী সকল অনুষ্ঠান শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা সম্পাদন করাইয়া লইলেন। অতঃপর তিনি তোতা নামক এক অদ্বৈতবাদী সাধুর সান্নিধ্যলাভ করেন। তিনিই তাঁহাকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিয়া তাঁহার নামকরণ করিলেন রামকৃষ্ণ। ইনি ব্রহ্ম মানেন, কিন্তু শক্তি মানেন না। জগজ্জননী তোতাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলে তিনি যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি এই স্বীকারোক্তি প্রদান করিয়া সজল নয়নে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট

হইতে বিদায় লইলেন। অতঃপর তিনি গোবিন্দরায় নামক জনৈক মুসলমান দরবেশের নিকট মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া সেইমতে সাধনা দ্বারা হজরত মহম্মদের দর্শনলাভ করেন। সময়ান্তরে আবার তিনি যীশুর পবিত্র দিব্য ভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় শরীরে প্রবিষ্ট হইতে দেখেন। এই রূপে দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকাল তীব্র ও কঠোর সাধনার দ্বারা তিনি জানিতে পারিলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যিনি রাম ও কৃষ্ণ রূপে জগতের হিতকামনায় শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন তিনিই এবার রামকৃষ্ণ রূপে নব শরীরে উদিত হইয়াছেন। বিবেকানন্দ প্রমুখ নব্যবঙ্গ যখন শিক্ষা লইয়া উপযুক্ত হইলেন তখন তিনি অন্তর্হিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সূক্ষ্ম আবির্ভাব আজও তদধীন ভক্তগণকে অনুগৃহীত করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের বৈচিত্র্যবহুল সাধনলব্ধ জীবনের আচরণও ছিল অদ্ভুত। দুইটি মাত্র উদাহরণই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি। কাঞ্চনাসক্তি নিঃশেষে ত্যাগ করিবার জন্য এক হাতে টাকা ও অন্য হাতে মাটীর ঢেলা লইয়া—টাকা মাটী, মাটি টাকা—বলিতে বলিতে উভয়কে জলে নিক্ষেপ করিবার পর ধাতু স্পর্শ করিলে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। এই অদ্ভুত সাধক জ্ঞান অজ্ঞান ধর্ম অধর্ম পাপ পুণ্য শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীচরণে অর্পণ করিলেন, কিন্তু সত্য দিতে পারেন নাই। সত্য দিলে মাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণের সত্য রক্ষিত হইবে কি উপায়ে? কামিনীতে আসক্তিত্যাগ যাচাই করিবার জন্য পূর্ণ-যৌবনা স্ত্রীর সহিত মাতৃজ্ঞানে এক শয্যায় একাদিক্রমে ৮ মাস শয়নের পরও অবশেষে আজীবনের জপ ধ্যান সাধনার যা কিছু সাফল্য যা কিছু শক্তি জগদম্বার অংশ জ্ঞানে তাঁহার পায়ে নিবেদন করিয়াছিলেন। মন মুখ আচরণ—এই তিনকে এক করার কি সত্য সুন্দর উদাহরণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনলব্ধ জীবনের অগণিত অবদান-গুলির কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিয়া বক্তব্য শেষ করিব। দুরূহ জটিল সমস্যার সমাধানগুলি অতুলনীয়, সহজ সরল দৃষ্টান্ত সহজভাবে বুঝাইবার কি অদ্ভুত কৌশল তিনি জানিতেন!

যত মত, তত পথ—সকল প্রকার সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—সব মতই পথ, কিছু ভিন্ন নয়। হিন্দুরা এক পথে এক ঘাটে জল নিচ্ছে বলছে জল, খৃষ্টানরা অন্য ঘাটে অন্য পথে জল নিচ্ছে বলছে ওয়াটার, আবার মুসলমানরা অন্য পথে অন্য ঘাটে জল নিচ্ছে বলছে পানি—কিন্তু সেই এক বস্তুই সকলে নিচ্ছে।

অদ্বৈতজ্ঞান—অদ্বৈতজ্ঞান আমাদের এক জটিল সমস্যা। তিনি সংসারীদের বললেন—অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে সংসার কর। অর্থাৎ যতদিন সংসারে দেহাভিমান ততদিন অদ্বৈতজ্ঞানের সম্ভোগ হৃদয়ে নিরুদ্ধ রেখে ভূতে ভূতে তিনিই বিরাজিত আছেন—এই ভাব লইয়া জীবন যাপন করিতে বলেছেন। কারণ ইন্দ্রিয়াতীত, দেহাতীত অদ্বৈতভাব দেহাভিমান থাকিতে আসেনা। সেইজন্য শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিবার নির্দ্দেশ তিনি দিয়াছেন।

সগুণ-নির্গুণ—ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ—এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিমত যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। যখন তিনি সৃষ্টি স্থিতি লয় করছেন তখন তিনি সগুণ, আর যখন এ সকল কার্য্য কিছু নাই তখন তিনি নির্গুণ। সাপটা এঁকে বেঁকে চলছে আবার কখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে চুপ করে বসে আছে। অন্য উদাহরণ দিয়ে আবার বলছেন—সমুদ্র কখনও প্রশান্ত স্থির আবার কখনও উত্তাল তরঙ্গময়।

সাকার কি নিরাকার – ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার এ তর্কের মীমাংসা তিনি করেছেন এক অতি সহজ উপমার দ্বারা। ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু ইচ্ছা করিলে প্রেম ভক্তি শেখাবার জন্য মানুষ দেহ ধারণ করে আসেন অবতার হয়ে। গাভীর সার বস্তু দুধ আসে গাভীর বাঁট দিয়ে। সেই রকম ঈশ্বর তাঁহার সারবস্তু পাঠান মানুষের মধ্য দিয়ে। অবতার হচ্ছেন গাভীর বাঁট। আর এক উপমা দিচ্ছেন, সাগর অসীম অনন্ত হলেও হিমে বরফ হয়ে কোথাও কোথাও সাকার মূর্ত্তি ধারণ করে। নিরাকার ঈশ্বরও সেইরূপ ভক্তি হিমে বরফ হয়ে সাকার আকার ধারণ করেন।

স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টি—এ দু'টিই সত্য, এ জটিল সমস্যা বুঝালেন একটি বেলের উপমা দিয়ে। বেলটা ওজনে কত জানতে হলে খালি শাঁস ওজন করলে ঠিক ওজন পাওয়া যায় না। তার বীচি খোসা সব নিতে হয়। খোলাটা জগৎ আর বীচিগুলি সব জীব। বিচারের সময় শাঁসকে সার বলা হয়, কিন্তু যে সত্তাতে শাঁস সেই সত্তাতে খোলা আর বীচি। যিনি স্রষ্টা তাঁর ঐশ্বর্য্যই তাঁর সৃষ্টি।

যখন ভগবান সম্বন্ধে নানা মতবাদ এবং ধর্মাবলম্বীদের ভিতর দারুণ সংঘর্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভূত হলেন উদার উন্মুক্তির এক বিশ্বজোড়া আসন নিয়ে। ভবতারিণীকে প্রণাম নিবেদন করিবার পর তিনি প্রণাম নিবেদন করলেন—সাকারবাদীদের, নিরাকারবাদীদের সর্ব্বভূতে, সর্ব্ব জীবে! তিনি দ্বৈতবাদীদের দুই, প্রভেদ-বাদীদের বহু, নাস্তিকের নাস্তি, আস্তিকের আস্তি সবের সমন্বয় করে দিলেন, এক অপূর্ব্ব কৌশলের তাহার এই সর্বধর্ম-সমন্বয় জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এক অমূল্য সম্পদ।
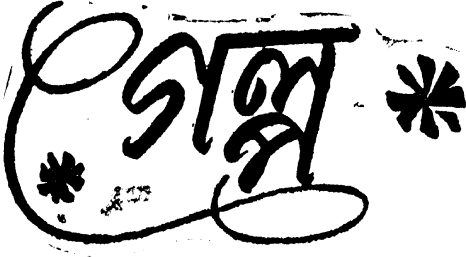
তিমির রাত্রি পোহাল

শ্রীঅমিয়কুমার সেন

গল্প লিখ্‌ছে অরুণা। লেখে ভালই। বাজারে ওর লেখার বেশ চাহিদাও আছে। সংসারের চাপে ওকে অনেক কিছুই ছাড়তে হয়েছে, কিন্তু ছাড়তে পারে নাই শুধু এই লেখার অভ্যাসটুকু। জীবনে আছে মাত্র এইটুকুই বিলাস। আর সবই ত গেছে।

কিন্তু কেন গেল? এর মধ্যে জীবনের সব মাধুর্য কেন গেল নিঃশেষ হয়ে? বিয়ের আগের সেই মধুর স্বপ্ন রচনা, কল্পনায় বুনেছিল যে মোহজাল—সত্যিই সবই গেল নিঃশেষ হয়ে!

লেখা ছেড়ে অরুণা ভাবে।

ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে তারই জীবনের প্রতিচ্ছবি।

স্বামী দিব্যেন্দুর সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয় তারই এক বান্ধবীর বাড়ীতে। তারপর তাদের সেই পরিচয় গাঢ় হতে হল গাঢ়তর। ওরা নিজেরাই নিজেদের করল নির্বাচন। অরুণা বোস হল অরুণা রায়।

ফলে, বড়লোক আর গোঁড়া বাপের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে, সবে পাশ করা ডাক্তার দিব্যেন্দুকে অরুণার হাত ধরে বাঁধতে হল নতুন ঘর।

ঘরই হল। অরুণা ভাবে, সত্যিকারের ঘরণী হতে পারল কই সে! এই চার বছরের মধ্যে স্বামী প্রতিষ্ঠিত হতে পারল কই!

অরুণা ভাবে, একি তাদের বাপমায়ের দীর্ঘশ্বাসে--না তার নিজেরই অদৃষ্ট দোষে!

একটা নিশ্বাস ফেলে অরুণা আবার কলম তুলে নেয়।

ছোট সংসার।

স্বামী, স্ত্রী আর তাদের একমাত্র তিন বছরের ছেলে।

এই ছেলে—লিক্‌লিকে রোগা পট্‌কা দেহ, হাত পা যেন নীরস কাঠির প্রতিমূর্তি, দীনতার খরচাপে শুকাতে বসেছে রোগাতুর একটি কোমল কচি প্রাণ!

অথচ এই ছেলেই পিতামাতার ভবিষ্য আশাস্থল—সুখ স্বপ্নের বনিয়াদ গড়ে এই ছেলের দিকেই চেয়ে চেয়ে তারা।

হায়রে!

অরুণা ভাবে—

ভাবে, তাদের দুঃখের জীবনে সন্তান কেন এল, এল যদি তাকে সুস্থ সবল করে বাঁচিয়ে রাখবার এতটুকু অধিকার ভগবান তাদের জীবনে দিলেন না কেন?

অভাব—অভাব চারদিক দিয়ে রাক্ষসীর মত হা করে তাদের সর্বস্ব গ্রাস করে নিয়ে যেতে চায়—কি এর প্রতিকার?

ভেবেই চলে—এ ভাবনার শেষ যেন আর হয় না।

দুঃখ হয় স্বামীর জন্য—ডাক্তারী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ, কিন্তু সে সম্মান দুঃখ, দারিদ্র্য আর ভাগ্য বিপর্যয়ে ঘুরপাক খেয়ে কোন অতলে তলিয়ে গেল।

লজ্জা হয় নিজের কথা ভেবে, দুর্ভাগিনী বলে নিজেকে দেয় ধিক্কার—দুর্ভাগিনীই ত, নইলে স্বামীর সৌভাগ্য সে কেন পারল না ফিরিয়ে আনতে?

ছেলেটা কেঁদে ওঠে—কান্নায় অস্পষ্ট জড়িয়ে যায়, মা—মা—

অরুণা সযত্নে ছেলেকে কোলে তুলে নেয়—মাতৃস্তন ছেলের মুখে দিয়ে তাকে শান্ত করবার ব্যর্থ চেষ্টাই প্রকাশ হয়ে পড়ে—মাতৃস্তন যোগাতে পারে না ছেলেকে শান্ত করবার উপকরণ—ছেলে শান্ত হবে কেন?

হয় না—অশান্ত ছেলে কেঁদে কেঁদে মায়ের কোলেই ঘুমিয়ে পড়ে।

অরুণা জানে, অভাব আর দারিদ্র্য মনের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়, জীবনের হাসি গান আনন্দের আলো চিরতরে

করে নির্বাপিত, মানুষকে করে ক্রোধী, চিত্তচাঞ্চল্যে অস্থির—বেঁচে থাকবার আশা বুকে নিয়ে মানুষের জীবনের গতি হয় এমনি ধারাই।

কিন্তু তার স্বামী। অভাব আর দারিদ্র্য তাকে ত জয় করতে পারে নাই। তার নিকট থেকে সে প্রায়ই এই কথা শুনতে পায়—অরুণা বাইরের অভাবে মনের আনন্দকে রিক্ত ক'রো না, আমরা বাঁচার মত বাঁচতে চাই, তুমি, আমি আর খোকা।

অরুণা কতদিন চোখের জল ফেলে বলেছে, কেমন করে মনে আনন্দ আনব, তোমার কষ্ট, খোকার কষ্ট, আমি যে সহ্য করতে পারিনা।

স্বামী অরুণার চোখের জল মুছিয়ে হেসে বলেছে, কিন্তু মনে আনন্দই আনতে হবে অরু, এই আনন্দের মাঝেই বেঁচে থাকে জীবনের চলার মোহন ছন্দ; অভাবে ভেঙে পড়লে, মুষড়ে পড়লে ভগবানের সৃষ্টির হয় অবমাননা, তিনি চান তাঁর সৃষ্টি-স্থিতির স্তরে স্তরে জীবনের আনন্দ বেঁচে থাকে—

অরুণা বলেছে, সবই বুঝি, কিন্তু এমন করে বেঁচে থেকে লাভ!

স্বামী বলেছে, লাভ লোকসানের মাপযন্ত্র ত আমাদের হাতে না অরু, এ যাঁর হাতে তিনি তাঁর বিচার করবেন।

শুনে অসংলগ্ন প্রশ্ন করেছে অরুণা, আমার মনে হয় কি জান? তোমার এ সংসারের অভাবের ছায়া হয়ত আমি—এ ছায়া অপসারিত হলে—

তার অসমাপ্ত কথাটাকে শেষ করতে না দিয়ে বলেছে, স্বামী, কিন্তু একথা কেন অরুণা?

ম্লান হাসি হেসে বলেছে অরুণা, তোমার বিয়ের আগে কি এত অভাব ছিল?

হয়ত ছিল না, তখন বাবার সঞ্চিত সামান্য কিছু টাকা হাতে ছিল, কিন্তু চিরদিন কারো সমান যায় না, জগতের এ চিরন্তনসত্যকে কি তুমি অস্বীকার করতে পার অরুণা?

না।

তবে?

স্বামীর কথা শুনে নিরুত্তর রয়েছে অরুণা।

ভেবে চলে অরুণা।

তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অরুণা এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাইরের আকাশ-পানে। আকাশে চাঁদ উঠলেও মাঝে মাঝে এক এক খণ্ড কালো মেঘ এসে চাঁদকে ঢেকে দিচ্ছে, কিন্তু সে মেঘ সরে গিয়ে চাঁদের স্নিগ্ধ মাধুরী নীলাকাশে হেসে উঠ্‌ছে বারবার।

দুর্দিনের কালো মেঘে ছেয়ে ফেলেছে অরুণার মনও কিন্তু সে মেঘ অপসারিত হয়ে নির্মেঘ মনের আকাশে সুদিনের আলো প্রতিফলিত হয় কই?

কেন এত বড় অভিশাপ তাদের জীবনে?

উপযুক্ত ডাক্তার স্বামী, মেডিকেল কলেজের ছাত্ররূপে একদা সুপ্রকাশ রায়ের ছিল কত সুনাম। কলেজের প্রিন্সিপাল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ডাক্তারী জীবনে সুপ্রকাশের পশার ও প্রতিপত্তি তাকে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

অরুণা একথা জানে শুনেছে সবই সে স্বামীর কাছে।

রাত্রি অনেকটা হয়েছে।

ডাক্তার দিব্যেন্দু রায় ঘরে ফিরতেই তার স্ত্রী তার কাছে এসে বল্‌ল, আজ তোমাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে, অনেক দূর গিয়েছিলে বুঝি?

মুখে একটু শুষ্ক হাসি এনে বল্‌ল দিব্যেন্দু, হ্যাঁ, অনেক দূরেই গিয়েছিলাম, একটা কল্ পেয়েছিলাম এবং ভেবেও ছিলাম, দূরের রাস্তা চ'লে কিছু বেশী টাকা পাব কিন্তু—

অরুণা ব্যগ্র ভাবে বলে, কিন্তু কি?

তেমনি শুষ্ক হাসি হেসে বলল দিব্যেন্দু, আমার সে জায়গায় পৌঁছান মাত্রই বাড়ীতে উঠল কান্নার রোল, সংবাদ পাওয়া গেল—রোগীর মৃত্যু হয়েছে, তাই ডাক্তারের প্রয়োজন তখন আর ছিলনা।

কিন্তু সে জন্য ত তুমি দায়ী নও, তোমার ভিজিট তারা দেয়নি? উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করে অরুণা।

তারা তাদের কর্তব্য করেছিল, টাকা দিতে গিয়েছিল কিন্তু আমার দ্বারা যাদের প্রয়োজন মিটলনা, তাদের কাছ থেকে সে টাকা আমি হাত পেতে গ্রহণ করতে পারিনি, রিক্ত হাতেই ফিরে এসেছি, এই বলে অরুণাকে কাছে টেনে বলে দিব্যেন্দু, টাকাটা পেলে সংসারের অনেকটা সাশ্রয় হত-না অরু?

হয়ত হ'ত, কিন্তু সেই সুবিধাটুকু সংসারে বড় পাওনা নয়, পাওনা যা আমার কাছে তা তোমার মনের নির্লোভ

পরিচয়, স্ত্রীর কাছে ঐ বড় গৌরব—বড় পাওনা, এই বলে অরুণা স্বামীর বুকে মাথা রাখে।

একটু পরে দিব্যেন্দু প্রশ্ন করে, এতক্ষণ কি করছিলে অরু?

অরুণা সলজ্জ হাসে। বলে, গল্প লিখ্‌ছিলাম।

হাসে দিব্যেন্দুও। বলে, অভাবের তাড়নায় তা হলে তোমার রসসাহিত্য বিদায় নেয়নি?

মৃদু হেসে বলে অরুণা, সে যাই হোক, কিন্তু তুমি এ গল্প পড়তে পারবে না, এ আমার একান্ত নিজস্ব কিন্তু।

বেশ ত তোমার গল্প তোমারই থাকবে, আমাকে শুধু একটু পড়তে দাও—এই বলে হেসে টেবিলের কাছে গিয়ে লেখা কাগজগুলি উঠিয়ে নিল এবং সবটুকু পড়ে বল্‌ল, আরে বাপ্‌রে বাপ্‌, এ করেছ কি, এ যে নিজেদের জীবনের একেবারে হুবহু প্রতিচ্ছবি।

অরুণা হাসে। বলে, কেন প্লট যত রিয়েলিষ্টিক হয়, গল্প ততই হয় ইন্‌টারেষ্টিং, নয় কি?

দিব্যেন্দু হেসে বলে, সব জায়গায়ই ত রিয়েলিস্‌মের ছড়াছড়ি, কিন্তু ডাক্তার দিব্যেন্দুকে হটিয়ে সেখানে ডাক্তার সুপ্রকাশকে প্রেস্‌ দিলে কেন?

লজ্জায় লাল হয়ে বলে অরুণা, তুমি আমার জীবনের পরম সত্য, তোমার নামকে নিছক গল্পে স্থান দিতে আমার নারীত্ব হয় সঙ্কুচিত।

স্ত্রীর কথায় দিব্যেন্দু নিজেকে মনে করে ভাগ্যবান। ভাবে, জীবনের কঠোর সত্যকে প্রকাশ করতে অরুণা সাহস সঞ্চয় করেছে, কিন্তু পারেনি তার স্বামীর নামটুকুকে গল্পের কাহিনীর মাঝে প্রকাশ করতে—হয়ত লজ্জায়, হয়ত ভালবাসার গভীরতায়।

অরুণা ভাবে, কেন এমন হল? এই একই ভাবে গড়িয়ে যাবে তাদের জীবন? দুঃখকে জয় করবার কোন অস্ত্র, কোন শক্তিই তাদের নেই?

নিশ্চয়ই আছে। স্বামীর শক্তিকে কঠিন জগৎ অস্বীকার করেছে, করুক, কিন্তু সে কেন করবে? সে জানে, তাঁর শক্তি, সেই শক্তির কোন পরিচয়ই কি তাদের জীবনে এসে দেখা দেবে না? কেন দেবে না? কি অপরাধ করেছে তারা?

হয়ত অপরাধই করেছে, নইলে দুর্দিনের কালো মেঘের যবনিকা তাদের জীবন নাট্যমঞ্চ থেকে কেন অপসারিত হয়না?

ভাবনার ঘন জালে জড়িয়ে যায় অরুণা।

ভগবানের পরীক্ষায় তারা কিভাবে উত্তীর্ণ হবে জানে না, এ অনিশ্চয়তার দোলায় দুলে জীবন হয়রান হয়ে পড়েছে, ক্লান্তির এ বিষণ্ণতা আর ত সহ্য করা যায় না! কিন্তু কিছুই কি করতে পারে না সে? কোন এক দুঃসাহসিক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে জীবনের ভাগ্যবিপর্যয়ের বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ফেনিল আবর্তকে স্থির প্রশান্তির স্তব্ধতায় পরিণত করতে পারে না?

স্বামী সুপ্রকাশ গৃহে ফিরেই প্রশ্ন করে অরুণাকে, কি ভাবছ বসে অরু? সন্ধ্যা যে কখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, ঘরে আলো জালোনি যে?

সত্যিই ত, স্বামীর কথায় ত্রস্তে অরুণা উঠে দাঁড়ায়, বাইরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই চোখে পড়ে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ক্ষণপূর্বের আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীর চেহারা বদলিয়ে দিয়েছে।

আলো জালা হতেই সুপ্রকাশ প্রশ্ন করে, খোকা কি ঘুমুচ্ছে?

হ্যাঁ।

ওর জর কি আর বেড়েছে?

না, দেখ না একবার।

সুপ্রকাশ ছেলের গায়ে হাত দেয়। বলে, এখন অনেক কম। কিন্তু বড্ড দুর্বল, একটু—বলতে গিয়ে সুপ্রকাশ হঠাৎ থেমে যায়।

কি বল না?

না, থাক্।

বল না গো, ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে অরুণা।

বলব? শোন—বলছিলাম কি একটু দুধ ও আঙ্গুর-বেদানার ব্যবস্থা করতে পারলে দুর্বলতা কমত, জরটাও যেত। বলে, একটু শুষ্ক হেসে বলল সুপ্রকাশ, বুঝেছ, অরু, এই!

বুঝেছে অরুণা, এ যে অক্ষম পিতার মুখে রুগ্ন ছেলের উদ্দেশ্যে কত কষ্টের উক্তি তা অরুণার বুঝতে এতটুকুও

বাকী রইল না। একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুকখানাকে সজোরে আলোড়িত করে অকস্মাৎ বেরিয়ে এল।

দুপুরের বেলা শেষ হতে চলেছে। অস্তায়মান সূর্য পশ্চিম আকাশ প্রান্তে বিদায়ের মুখে তার শেষ রক্তিম আভা ধীরে ধীরে একটু একটু করে ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

ডাক্তার দিব্যেন্দু রায়ের ঘরের ভেতর টেবিলের ওপর একখণ্ড কাগজ পড়ে রয়েছে।

সেই কাগজের ওপরের লেখাটুকু পড়ে যাচ্ছিল দিব্যেন্দু —অরুণার হাতের লেখা—একথা বলতে গেলেই অপরিসীম ব্যথার আঘাতে বুক ভেঙ্গে যায় যে এ সংসারের চিরন্তন দাবীদাওয়া ভগবান তোমার কাছে আমার যতখানি তার সবটুকু আশা বুকে নিয়েই দিনের পর দিন আমার চলে গেল। না পাওয়ার এ নিরাশা আমার জীবনের চরম নির্বেদ, তাই সংসারের আমার দেনাপাওনা, হিসাব নিকাশের সমস্ত ভার তোমার ওপর দিয়েই আমি এ জীবনের অবসান করতে চাই প্রভু! তুমি আমায় ক্ষমা ক'রে আমার এ ইচ্ছা পূর্ণ করে দাও। খোকাকে সঙ্গে নিয়েই আমি চলে যাচ্ছি প্রভু। ও বেঁচে থাকলে স্নেহশীল পিতা পুত্রের প্রতি কর্তব্যের অক্ষমতায় যে অস্থিরতা, অশান্তিও অবসাদ নিয়ে জীবনের শক্তি ক্ষয় করে ফেলবে তা ভাবতে গেলে মন আমার পাগল হয়ে যায়। ভগবান স্বামীকে দুশ্চিন্তার হাত হতে দূরে রাখুন—অভাবের জাল হতে মুক্ত হয়ে তার একক জীবন স্বাধীন, সুন্দর হোক। তবুও তাকে ছেড়ে যেতে সমস্ত মন বারবার বিদ্রোহী হয়ে পড়ছে যে—

লেখাটুকু পড়তে পড়তে দিব্যেন্দু সমস্ত অবস্থা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিল। পড়া শেষ হতেই তার সমস্ত শরীর অবসন্ন, অনড় হয়ে পড়ে, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে। কান্নার আবেগে সমস্ত চিন্তা উদ্বেলিত হয়ে তাকে অস্থির করে ফেলে।

আজ একথা সে বার বার বুঝতে পেরে সতীসাধ্বী স্ত্রী স্বামীকে সুখ আর শান্তি দেবার আশায় তাকে দুঃখকষ্টের অভাব থেকে মুক্ত করে দিয়ে গেল।

কিন্তু এ যে অরুণার কত বড় ভুল, সে কথা ভাবতে গিয়ে দিব্যেন্দু অতিমাত্রায় অধীর হয়ে পড়ে।

প্রিয়তমা পত্নী, প্রিয়তম সন্তান হারিয়ে কেউ যে জগতে সুখী হতে পারে, তা দিব্যেন্দু বিশ্বাস করতে পারে না।

সে ভাবে, শেষ পর্যন্ত অরুণা এমনি করে নিজেকে উৎসর্গ করে বসল—শুধু নিজে নয়, খোকাকে পর্যন্ত তার সঙ্গে নিয়ে গেল।

ভেবে পায় না দিব্যেন্দু, অরুণার এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত সে কি দিয়ে করবে? কেমন করে তাকে সে বোঝাবে, তার ভুল কত বড় মিথ্যা, কত মর্মন্তুদ।

কিন্তু তাকে যে বোঝাতেই হবে—

কিন্তু কোথায় সে?

দিব্যেন্দু তন্ন তন্ন করে সমস্ত বাড়ী অনুসন্ধান করল, পাশের দু একটা বাড়ীতে খোঁজ নিল, কিন্তু কোন সন্ধানই ত মিলল না।

কোথায়ই বা খুঁজবে তাকে? কোথায় পাবে? আত্মীয়-স্বজন বলতে তাদের কাকেও ত মনে পড়ে না।

কলকাতার এই বিরাট জনসমুদ্রে ক্ষুদ্র দুটি প্রাণী জলবুদ্বুদের ন্যায় হয়ত মিলে গেছে।

হঠাৎ মনে পড়ল অরুণার দূর সম্পর্কের এক বোনের কথা। কলকাতায়ই থাকে তারা। তাদের ঠিকানা জানে অরুণা। সেখানে খোঁজ করবে কি?

চিন্তার দোলায় দোলে দিব্যেন্দুর মন।

বড়লোকের বাড়ী।

অরুণার দূরসম্পর্কের বোনের বিশেষ পরিচিত দিব্যেন্দু।

সন্ধ্যার একটু পরেই সে উপস্থিত হয় সেই বাড়ীতে।

বাড়ী ঢুকতেই পায় এক বিপদের সংবাদ। অরুণার বোনের একমাত্র ষোল বছরের ছেলে সুবিমল কাল রাত থেকে পেটের এক অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় সে চীৎকার করছে—আবার মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। আবার জ্ঞান হতেই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে চীৎকার করেই চলেছে—কাল রাত থেকেই এই একই অবস্থা চলছে।

অরুণার ভগ্নিপতি সতীপতিবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি অস্থির হয়ে বললেন, আসুন দিব্যেন্দুবাবু, সুবিমলের অসুখের খবর কার কাছে পেলেন? অরুণা এসেছে কি?

সতীপতিবাবুর কথায় দিব্যেন্দু সত্যি বিস্মিত হল—যখন জানতে পারল অরুণা এখানে আসেনি। তবে?

দিব্যেন্দু ভেবে পায়না, কি করবে সে এখন।

তবুও নিজেকে স্থির করে নিয়ে সে সতীপতিবাবুর কাছ থেকে সুবিমলের অসুখের ইতিহাস একটু একটু করে জেনে নেয় এবং এও জেনে নেয় সুবিমলের মার একান্ত ইচ্ছায় তাকে হাসপাতালে পাঠান সম্ভব হয়নি—বাড়ীতেই ডাক্তার দেখান হচ্ছে। কাল রাতে ডাক্তার এসেছিলেন, আজও এসেছিলেন, এখনও তার কাছে বসে ডাক্তার মুখার্জি ওষুধের ব্যবস্থা কচ্ছেন। কিন্তু রোগের কোন পরিবর্তনই পাওয়া যাচ্ছেনা। অবশ্য ডাক্তার সেনগুপ্তকে খবর পাঠান হয়েছে, তিনি একটু দূরে গেছেন হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন।

সতীপতিবাবুর অনুরোধে দিব্যেন্দু রোগীর ঘরে গিয়ে তাকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে পরামর্শ করে গোটা দুই ওষুধ আনিয়ে নিল এবং তা মিশিয়ে ওষুধ তৈরী করে সুবিমলকে একটা ইন্‌জেক্‌সন দিতেই কয়েক মিনিট পরে সকলের আকুল আগ্রহ ও অধীর অপেক্ষার মাঝে সুবিমল ক্ষীণতম কণ্ঠে—'আঃ' বলে যেন একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলতেই দিব্যেন্দু বলে উঠল, সুবিমল, আর ব্যথা টের পাচ্ছ?

সুবিমল বল্‌ল, কৈ না ত।

সঙ্গে সঙ্গে দিব্যেন্দুও বলে উঠ্‌ল, আর ভয় নেই, আর কোন ওষুধের দরকার নেই। আজ রাতে কয়েকবার একটু একটু বার্লি ওয়াটার দেবেন, আমি কাল খুব ভোরে এসে আবার দেখে যাব।

এই বলে দিব্যেন্দু ওঠে দাঁড়িয়ে বাইরে আসতেই সতীপতিবাবু তার হাত দুখানি দুহাতে জড়িয়ে ধরে বার বার এই কথায় বলতে লাগ্‌লেন, আপনার ঋণ জীবনে শোধ করবার নয়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষাও নেই আপনার প্রতি। তবুও জানুন দিব্যেন্দুবাবু, এবার থেকে আপনিই হলেন আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান। দর্শনী মাসে আপনার দুশ টাকা। শুধু তাই নয়, এখন থেকে সমস্ত বন্ধু বান্ধবদের অনুরোধ করব, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত যে চিকিৎসক ছিলেন লুকিয়ে তাঁকে চিকিৎসকরূপে গ্রহণ করতে। তারপর সতীপতিবাবুর স্ত্রী দিব্যেন্দুর হাতে কয়েকখানি নোট গুঁজে দিয়ে বল্‌লেন, আজকের ফী দিব্যেন্দুবাবু।

দিব্যেন্দু বলল, একি! না—না—পাগল নাকি, আপনারা। আমি আত্মীয়, এ আমি নিতে পারি না—এই বলে নোট ক'খানি ফেরৎ দেবার চেষ্টা করতেই সতীপতিবাবু নোটশুদ্ধ তার হাতখানি সজোরে চেপে ধরে বল্‌লেন, পাগল আমরা নই, না নিলে বড্ড দুঃখ পাব দিব্যেন্দুবাবু—এ আপনাকে নিতেই হবে—না নিলে আমার কর্তব্যের ত্রুটি হবে—আমি অপরাধী হব।

দিব্যেন্দু আর আপত্তি করবার সুযোগ না পেয়ে নোটগুলি নিয়ে ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। সতীপতিবাবুর স্ত্রী কাছে এসে জানালেন, কাল যখন খোকাকে দেখ্‌তে আস্‌বেন অরুণাকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন—ওদের অনেকদিন দেখিনা।

উত্তরে দিব্যেন্দু অস্ফুটস্বরে কি যে বলে গেল—তা না পারলেন সতীপতিবাবু বুঝতে, না পারলেন তার স্ত্রী।

সুদীর্ঘ পথ নয়।

তবুও সে পথের যেন শেষ হয় না। আর কয়েক পা গেলেই ত নিজের বাড়ী-ঘর চোখের সামনে দেখা দেবে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে কি লাভ? শূন্যগৃহ ভরে সেখানে আছে হতভাগ্য এক জীবনের মর্মঘাতী ইতিহাসের ছিন্নভিন্ন কাহিনীর স্মৃতি—ভাবতেই বুক ভেঙ্গে দিব্যেন্দুর বেরিয়ে আসে করুণ দীর্ঘশ্বাস।

হায়, যে দারিদ্র্যের, অভাবের কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল তাদের জীবন, সে কশাঘাত হয়ত আর আস্‌বে না। কারণ টাকা পেয়েছে সে, টাকার উপায়ও হয়েছে—ভবিষ্যতের হাজার রঙীণ কল্পনা তার মনশ্চক্ষে বার বার ফুটে ওঠে—

কিন্তু? কি হবে আজ রঙীণ কল্পনার এই চিন্তায় বিভোর হয়ে? সেখানে আসে ব্যর্থতা, আসে ট্রাজেডি, চারদিকে জড়িয়ে থাকে শূন্য মনের হাহাকার ধ্বনির সূক্ষ্ম রেশ—

এতবড় পৃথিবী থেকে অরুণা যদি বিদায় নিতে পারে খোকাকে নিয়ে, সে কি বিদায়ী পথের কোন সন্ধানই জানে না?

জানে একটু তার পূর্বে—সে আর একবার অরুণাদের পৃথিবীর বুকে সন্ধান করে দেখ্‌বে—এবং দেখবার পূর্বে

যাদের নিয়ে সে এতকাল যেখানে কাটিয়েছে সেই বাড়ী থেকে জন্মের মত বিদায় নিয়ে যাবে—

বাড়ীতে প্রবেশ করতেই বিস্ময়ের প্রাচুর্য নিয়ে যখন তাভ দৃষ্টির সুমুখে অরুণা সত্য হয়ে দেখা দিল, তখন দিব্যেন্দু শুধু বিস্মিত নয়, অনেকদিনের হারানো প্রিয়তম বস্তু হাতের কাছে পেয়ে সত্যিই মানুষ যেমন আনন্দে অতিমাত্র উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, সেই অবস্থাই হল আজ দিব্যেন্দুর।

অরুণা তখন ঘরময় কি যেন খুঁজে বেড়ায়, সেই অবস্থায় হঠাৎ দিব্যেন্দুকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, ওগো, টিবিলের ওপর একটা কাগজ ছিল, সেটা দেখেছ কি? খুঁজে পাচ্ছি না।

—তোমার লেখা সেই কাগজখানাই বুঝি আমার দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটিয়েছে নাটকীয়ভাবে। কিন্তু তুমি খোকাকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে এভাবে···?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অরুণা বলল—চরম দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল আমার জীবন। রুগ্ন খোকার মুখে আমি দিতে পারিনি এতটুকু পথ্য,······ এতটুকু ওষুধ। অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস, একজন ডাক্তারের ছেলে তারই সামনে একফোটা ওষুধের জন্য তিলে তিলে মৃত্যুকে করছে বরণ—এ দৃশ্য মা হয়ে আমি সহ্য করতে পারলুম না। তাই চরম উত্তেজনায়, পরম দুঃখে আমি সত্যিই সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলুম। আমাদের দুটি জীবনকে শেষ করে দিয়ে তোমাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলুম এই অসীম জীবন-যন্ত্রণা থেকে।

দিব্যেন্দু হতভম্ব হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অরুণার মুখের দিকে। অরুণা বলে যায়—কিন্তু পেরে উঠিনি আমার সংকল্প রাখতে। প্রতি মুহূর্তে মনের পর্দায় ভেসে উঠছিল তোমার অসহায় মুখখানা। তাই আমার সংকল্প ত্যাগ করলাম, ভুল আমার ভাঙল, তাই ফিরে এলাম। এবার মনটাকে আমি আরও কঠোর করেছি, ভগবান যত আঘাতই দিন আমি তা তাঁর আশীর্বাদ মনে করেই হাসি-মুখে সহ্য করব। কথাগুলো বলে যেন হাঁফাতে থাকে অরুণা।

মৃদু হেসে এবার দিব্যেন্দু বলে—দেখ অরু, কোন মানুষের ভাগ্যেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ কিংবা দুঃখ থাকে না। আকাশ থেকে ঘনকৃষ্ণ কাল মেঘ একদিন সরে যায়··· দেখা দেয় নতুন সূর্য্যের রক্তিমা। ঠিক তেমনি এবার মনে হচ্ছে, আমাদের তিমির রাত্রির বুঝি অবসান হোল; এবার দেখা দেবে সোনালী সূর্য্য। এই তো চিরন্তন রীতি।

এই নাও দুইশত টাকা। এ ভিক্ষা করা অর্থ নয়, আমার চিকিৎসা-প্রতিভার স্বাক্ষরে অর্জিত, আমাদের এই বাস্তব ঘটনা নিয়ে তোমার লেখা অসমাপ্ত গল্পের পরিণতি ঘটিয়ে দাও।

দুশো টাকার নোটগুলি হাতের মুঠিতে চেপে ধরে অরুণা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে। ভাবে, এ স্বপ্ন না সত্যি!

আমৃত্যু

শ্রীপ্রশান্ত মৈত্র

শিউলি-ফোটা সকালবেলা আসল ঘন-যৌবনে,
স্বপ্ন-ঝরা মৃত্যু-হরা অচল বুকে বাসনা।
নৃত্য-মধুর চিত্তহারী কামনা-হীন নয়নে,
নিশ্বাসে তাই অশ্রু-ঝরা আপন-হারা কামনা।

পৃথিবী ভরা ব্যাকুল-বায়ু-বসনে
ললনা-বধূর আঁচল-আঁখি-সীমানা।
এই জীবনের স্বপ্ন নেই : মিথ্যা দীন-নয়নে,—
দেবতা বিহীন দেউলে কাঁদে ব্যর্থ-পূজা-কামনা।

সত্যেন্দ্রনাথের "মহাসরস্বতী"

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দত্ত

ঋগ্‌বেদের ধ্যানতন্ময় ঋষি কবি মধুচ্ছন্দা ঋকে ভাবাকৃতির পঞ্চপ্রদীপে একদিন যে "নদীরূপা দেবীরূপা" সরস্বতীর আরতি ক'রেছিলেন—"যজ্ঞং দধে সরস্বতী" (১ম মণ্ডল, ৩য় সূক্ত) নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাঁকেই মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী উত্তরচরিতে "ত্রিজগতামাধারভূতাং মহাপূর্বাম্‌" চিদ্রূপা মহাসরস্বতীরূপে ধ্যানমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। ছন্দ-রূপা সরস্বতীর বরপুত্র সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় জ্ঞানের শুভ্র আলোকে সেই পরম জ্যোতিই—ভাবে ও রূপে বর্ণময় হ'য়ে উঠেছে। "নির্ধূত নিখিলধ্বান্তে" ও "ব্রহ্মাণীরূপ-ধারিণী" এই দেবী শুধু "সর্বস্যবুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি-সংস্থিতা"ই নন, তিনি "শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ-পরায়ণা সর্বস্যার্তিহরা"ও। সত্যেন্দ্রনাথের "জ্যোতির্ময়ী, মহীয়সী মহাসরস্বতী"ও শুধু নিষ্ক্রিয় "শক্তির বিভূতি" কিংবা "মহাকাব্যধাত্রী" মাত্রই নন, তিনি "জগতের জড়ত্বের নাশ" করেন, মানবের "সর্বচেষ্টা সর্ব ইচ্ছা"কে "ঐক্য সুরে সুপ্তচিত্তপুরে" গেঁথে দেন। এক কথায়, "সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতা সনাতনী"-র মতই সত্যেন্দ্রনাথের কবিকল্পনায় তিনি "জন্মমৃত্যুরহস্যগুর্বিণী"ও "সর্ব-বিধা-বার্তাংবিধি"। তিনি একদিকে যেমন "দীপকের উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রিত করি' রুদ্রতালে" জেগে ওঠেন, অপর-দিকে তেমনি "সিদ্ধির প্রসূতি…ঋদ্ধি আরাধিতা" রূপে "লক্ষকোটী চিত্তে প্রাণে" বুলিয়ে দেন তাঁর কোমল-মধুর পরশ—ঋষিকবির ধ্যানমুগ্ধ ভাষায় "ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি" (ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ৩য় সূক্ত)।

শুধু ভাব-প্রেরণা নয়, রূপ-কল্পনার দিক থেকেও বিশ্ব-বিকাশ ধারার গতিচ্ছন্দে "নব নব সৃষ্টির উন্মেষ" বিধায়িত্রী মহাসরস্বতী, মার্কণ্ডেয়-সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্রের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। এই সরস্বতীকে "চিত্তময়ী" বলার মূলে যেমন "মনো বৈ সরস্বান্‌" এই অর্থটি আছে, তেমনি মনোময়ী কুলকুণ্ডলিনীর ধারণাটিও এসে যায়। শুধু শংখ-চক্র-শূল-ধনু-হল-ঘণ্টা-মুশল প্রভৃতি প্রহরণগুলিই নয়, "ছিন্ন-মেঘ-অম্বরের নিষ্কল চন্দ্রমা" কথাটা পর্যন্ত ঘনান্ত-বিলসচ্ছীতাংশুতুল্য-প্রভাম্‌"-এর প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। কবি যখন বলেন, "ভূলোকে ভ্রমর-গর্ভ শুভ্রনীল-পদ্ম বিভূষণা" তখন 'মূর্তিরহস্যের'র "তেজোমণ্ডল দুর্ধর্ষা" "চিত্রভ্রমরপাণিঃ" কথাটাই আমাদের মনে পড়ে যায়।

"সবিতুসম্ভবা দেবী সাবিত্রী" এবং "ব্রহ্মচ্ছায়া…গায়ত্রী" শাশ্বতী পরিকল্পনার মধ্যে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের সুসমঞ্জস বাগর্থেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই—"গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাদ্‌ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ। সবিতৃদ্যোতনাৎ সৈব সাবিত্রী পরিকীর্তিতা। জগতঃ প্রসবিত্রীত্বাৎ বাগ্‌রূপত্বাৎ সরস্বতী"। এ ছাড়া সরস্বতীর প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রও তাঁর কবি-কল্পনাকে আকৃষ্ট করেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট নয়, কারণ কবি এর বাইরেও তাঁর উদার-দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দিয়েছেন। ভারতের ঋষিকবির ধ্যান নেত্রে একদিন যেমন বিশ্বের মূর্ত্তীভূত বাণী ভারতের অধিষ্ঠাত্রী ভারতীর সংগে মিলে এক হ'য়ে গেছেন, কবি সত্যেন্দ্রনাথও তেমনি ছন্দরূপা সরস্বতীর সংগে চিদানন্দ-ময়ীর লীলাবিলাসকে অভিন্নরূপে কল্পনা করেছেন—তাঁর রুদ্র-ও-শান্তরূপ, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যরূপ, জ্ঞান-ইচ্ছা-কর্মশক্তি, সমস্ত কিছুই সেই পরম জ্যোতির কল্পনায় একাকার হয়ে গেছে। অথচ এরই মধ্যে বিবর্তনবাদের পরিপ্রেক্ষিতে পৌরাণিক ভাব-মহিমাকে নতুন ক'রে রূপ দেবার প্রয়াস—জীবন-নিষ্ঠ আধুনিক কবি-মানসের এই সংজ্ঞান চেতনাটিও "রক্তরশ্মি রুষ্ট তারা ভালে" ইত্যাদি খুঁজে নিতে আমাদের বিলম্ব হয় না। কবি সমালোচক মোহিতলালের সংগে সুর মিলিয়ে বলতে পারি—"বিহারী-লালের 'সারদা' ও রবীন্দ্রনাথের 'লীলা সহচরী—জীবন-দেবতা' সত্যেন্দ্রনাথের মানসে আর এক মূর্তিতে আর একরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"

কিন্তু সুন্দরের ধ্যানতন্ময় হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ শুধু কবি-চিত্তে তাঁর শুভ-অধিষ্ঠানই কামনা করেন নি, সর্বমানবের কল্যাণকল্পে ঋষিকবির মতই তাঁকে আবাহন করেছেন—

"বীণাধ্বনি ঘণ্টা রোলে যুক্ত হোক মূর্ত রুদ্ররোষ
শঙ্খের নির্ঘোষ,
পুণ্যে কর মৃত্যুঞ্জয়ী—পাপে ছন্নমতি,
মহাসরস্বতী।"

ঠিক একই সুরে বৈদিক কবিও যজুর্বেদীতে ব'সে প্রার্থনা করেছেন—"চেতন্তী সুমতীনাং"। 'অঞ্জলি' কবিতায়ও দেখি, বস্তুপুঞ্জের অভ্রকে, অন্তর-আবীরে রাঙিয়ে কবি তাঁর আরাধ্যা দেবীর চরণে উৎসর্গ করেছেন—

"আবির্ আবির্ মন্ত্র রাবে
করগো সফল আবির্ভাবে
অশ্রুহাসির অভ্র-আবীর আঁখির আলোয় উজ্জ্বলি।"

তবে জ্ঞানের সেই শুভ্র আলোক যে-অনুভূতির আবেগে রঙীণ হ'য়ে উঠেছে, তাও জাগ্রত অনুভূতির আবেগ—স্বপ্ন-কল্পনার রঙ নয়। এই যে সমন্বয়ী দৃষ্টি—এটাই ভারতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য এবং সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে এখানে সেই বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট।

ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ এখানে ভাবানুসারী ভাষার প্রয়োগে অপূর্ব শক্তি ও সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিটী শব্দের গম্ভীর মন্ত্রধ্বনি যেন কবিচিত্ত থেকে উত্থিত হ'য়ে সেই জ্যোতির্ময়ী দেবতার উদ্দেশে যাত্রা করেছে, রঙ ও রেখার কারিগরিতে সেই মহিমময়ী দেবী যেন এই ধূলি-মাখা ধরণীর বুকে নেমে এসেছেন, অথচ বিরাট সৃষ্টি প্রবাহের গতিচ্ছন্দে মিলিয়ে আমাদের কল্পনা তাঁর স্বরূপকে ধারণা করতে পারে না। রূপের মহিমা ও বিরাটের ব্যঞ্জনার এই যে সুমেল সমন্বয়, ভাব ও রসের নিবিড় মেশা-মিশি—এটা নিঃসন্দেহ যে শিল্পী-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে, তিনি "কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ"।

এইতো সেদিন

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

এইতো সেদিন ছিলে নববধূ,—
কখন সেজেছ গৃহিণী!
আলোকে পুলকে তুলিছ ছলকি'
ভবন আমার শ্রীহীন-ই!
অন্নপূর্ণা, তোমারি জন্য
ছন্নছাড়ার জুটেছে অন্ন!—
চির ভবঘুরে হ'ত কিগো গৃহী—
তোমার পরশ বিহীন-ই!
ছিলে লীলাসাথী,—পোহাতেই রাতি
হ'লে পরিণত জায়াতে!
মদবিহ্বল কোথা যৌবন,—
ইন্দ্রজালের মায়া এ!
ভুলিয়া কুণ্ঠা, পরিহরি'লাজ
ধরেছ দয়িতা, সেবিকার সাজ;—
সংসার-খররৌদ্রদহনে
রেখেছ আমারে ছায়াতে।
কোথা সেই ভীরু হরিণীর চাওয়া
কজ্জল-কালো নয়নে?
বাঁকাইয়া গ্রীবা হংসীর মতো
চুপিসাড়ে আসা শয়নে!
খোঁপায় আজিকে নাহিপরো ফুল,
কাঁচপোকা টীপ লাগাতেই ভুল!—
আজ দিন যায় সবার সেবায়,
পূজার পুষ্প চয়নে!

সকাল সন্ধ্যা কাজ আর কাজ,—
নেই হাসিগান অকারণ:—
চাবির গোছাটি ভুলে বুঝি গেছে
ছল ক'রে বাজা ঝনঝন্!
কলসী-কাঁকনে কহেনাকো আর
কানে কানে কথা—চলায় তোমার!
ঝুরু ঝুরু বায় বসি' নিরালায়
উড়ু উড়ু নাহি করে মন!
এটা সেটা নিয়ে কাটে গোটা বেলা,—
নেই একতিল অবকাশ;
রাহুর মতন করে সংসার
লাবণী তোমার সব গ্রাস!
কতো মায়াময় রাতি যায় চ'লে,
কতো যে সন্ধ্যা যায় গো বিফলে;—
কবিতা এখন নীরস গদ্য,—
একী নির্মম পরিহাস!
হৃদয় হরিতে এসেছিলে কবে,—
আজ তুমি হ'লে ঘরণী
দুখের পাথারে আনিলে সাঁতারি'
কূলে মোর ভাঙা তরণী!
রোগে আর শোকে জানিয়াছি সই,
কেউ নেই মোর আর তোমা বই!—
আর নহো দেবী—হইয়া মানবী
দেখাও জীবন সরণী!

অসমাপ্ত

শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়

জয়ন্তী আজ নিজেই গাড়ীটা চালাচ্ছে। ড্রাইভার মতিলাল সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু জয়ন্তী সঙ্গে নিতে চায়নি। হেসে বলেছিল, অনেকদিন নিজে ড্রাইভ করিনি—দেখি ভুলে গেছি কিনা বলে, এ্যাক্সিলেটারের উপর চাপ দিয়ে ষ্টার্ট নিয়ে এ্যাসফলটের রাস্তা মাড়িয়ে এসে নামলো বড় রাস্তার বুকে। তারপর দিল স্পিড বাড়িয়ে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে শুরু করেছে চারিদিকে, বিজলী আলোয় ঝলমলিয়ে উঠছে রাতের কোলকাতা।

হাতের রেডিয়াম ডায়েলের ঘড়িটার দিকে একবার তাকাল জয়ন্তী—সাতটা বাজে প্রায়। বিরক্তি ফুটে উঠলো তার মুখে। বড্ড দেরী হয়ে গেছে—ছয়টার মধ্যে দেখা করতে হবে সুধন্যর সঙ্গে। ভীষণ ব্যস্ত মানুষ—বিশেষ অবসর তার থাকেই না। গাড়ীর স্পিড আরো একটু বাড়িয়ে দিল।

সুধন্য রায়। দশ বৎসর আগেকার সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাসের ছাত্র সুধন্য রায়কে দীর্ঘদিন পরে খুঁজে পেয়েছে জয়ন্তী বসু। তবে, আজকের সুধন্য রায় আর দশ বৎসর আগেকার সুধন্য রায়ের মধ্যে ঘটে গেছে অনেকখানি পার্থক্য। আজকের সুধন্য রায়ের রয়েছে এক বিশেষ পরিচিতি—সাহিত্যিক সুধন্য রায়। যার সাহিত্য-সৃষ্টি আলোড়ন জাগিয়ে দিয়েছে দেশে। অনেক কষ্টে পাবলিসার্সের কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে সুধন্যর সঙ্গে দেখা করতে চলেছে জয়ন্তী। কতকটা হাতে চাঁদ পাওয়ার মত আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল সে। দশ বৎসর আগেকার পরিচয় নিয়ে সুধন্যর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কেমন যেন একটু সঙ্কোচ কুণ্ঠা লাগছিল জয়ন্তীর।

দশ বৎসরে জয়ন্তীর যে পরিবর্তন হয়নি তা নয়, হয়েছে বৈকি। কল্পনাতীত পরিবর্তন হয়েছে। বিরাট ধনী রায়বাহাদুর অতীন বসুর কন্যা জয়ন্তী বসু—স্কুল-মিসট্রেস্ হয়েছে। হেড মিসট্রেস্। বয়সও কিছু বেড়েছে। যৌবন প্রায় বিদায় নেব নেব। সেই বিদায়ী যৌবনকে ধরে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টায় সচেতন জয়ন্তী বসু। একটা লোভনীয় লাবণ্য তখনো ছড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যদেহে—যা পুরুষকে আকর্ষণ করে।

ভাগ্য ভাল, সুধন্যর বাড়ীতে পৌছে তার দেখা পেয়েছিল জয়ন্তী। সুধন্য সাদর আহ্বান করে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল নিজের ষ্টাডিরুমে। দীর্ঘদিন পরে উভয়ের সাক্ষাৎ হওয়ায় প্রথমে কিছুটা সঙ্কোচ বোধ হয়েছিল উভয়েরই, তারপর, কিছুক্ষণ আলাপের পর সে সঙ্কোচ সরে গিয়েছিল। তারা যেন নিজেদের মধ্যে ফিরে পেয়েছিল দশ বৎসর পূর্ব্বে ফেলে-আসা উজ্জ্বল আনন্দভরা ছাত্র-জীবনের দিনটিকে।

সত্যি আমি ভাবতে পারিনি—আজকের স্বনামধন্য সাহিত্যিক সুধন্য রায়ের কাছ থেকে এমন অভ্যর্থনা পাবো। হতাশা নিয়ে ফিরে যাবার জন্যই তৈরী হয়ে এসেছিলাম। অল্প একটু হাসলো জয়ন্তী।

এমন কথা ভাবতে পারলে কি করে জয়ন্তী? আমার আজকের পরিচয় ছাড়া এর আগে কি তোমার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় ছিল না? একটা ক্ষীণ বিস্ময়ের সুর কেঁপে উঠলো সুধন্যর কণ্ঠে।

ডোণ্ট টেক ইউ সিরিয়াসলি। কিছু মনে কোর না সুধন্য—তোমার সে পরিচয় আর যে কেউ ভুল করুক, জয়ন্তী অন্ততঃ ভুল করবে না। উঃ, বাপরে! কি জ্বালাতনই না করে মারতে। এখন সে সব দুষ্টামীগুলো সেরেছে তো?

একসঙ্গে হেসে উঠলো সুধন্য আর জয়ন্তী।

এতদিন তো সেরেই গিয়েছিল, এখন তোমাকে দেখে যদি সেগুলো নতুন করে মাথা চাড়া দেয়—পারবে না আগের মত সহ্য করতে? কৌতুকের হাসি ফুটে উঠলো সুধন্যর মুখে চোখে।

বহুদিন পরে একটা খুসীর শিহরণ সঞ্চারিত হতে লাগলো জয়ন্তীর রক্তে রক্তে! তবে কি আজো সুধন্য তাকে তেমনি করেই ভালবাসে? এই দীর্ঘদিনের মধ্যেও কি সুধন্যর মনের পরদায় ঘটেনি অন্য কোন নারীর মুখের ছায়াপাত? আজো কি সুধন্য অবিবাহিত? নানান ধরণের প্রশ্ন একসঙ্গে এসে ভীড় করতে লাগলো জয়ন্তীর মনের মধ্যে।......

জয়ন্তীর কোন উত্তর না পেয়ে সুধন্য জিজ্ঞাসা করলো, কি, কোন উত্তর দিচ্ছ না কেন?

চমক ভেঙ্গে উত্তর দিল জয়ন্তী, ওসব বাজে কথা থাক সুধন্য, নতুন কি বই লিখছো?

এখনো শুরু করিনি।

কেন?

ভাল প্লট পাচ্ছি না বলে।

আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে একটা প্লট দেই, নেবে? একেবারে সত্যিকারের ঘটনা। অবশ্য, সে কাহিনীকে সাহিত্যে রূপ দেবার ভার তোমার।

বেশ তো, নতুন প্লট আমার দরকার জয়ন্তী। বলনা শুনি?

আজ নয়, আর একদিন বলবো। ভীষণ দেরী হয়ে গেছে—বাড়ী ফিরতে হবে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জয়ন্তী। তারপর সুধন্যর সঙ্গে এসেছিল সদর গেট পর্যন্ত।

আচ্ছা, সুধন্য তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিলে না? গাড়ীতে উঠে বসে বললো জয়ন্তী।

মঞ্জু বাপের বাড়ী গেছে, পরের বারে এলে আলাপ হবে।

ও, আচ্ছা চলি সুধন্য। বলে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল জয়ন্তী।

সুধন্য বিবাহিত! বুকের মধ্যে এক ঝলক রক্ত চলকে উঠলো জয়ন্তীর। মুখখানা আশ্চর্য রকম মৃত মানুষের মুখের মত রক্ত সরে যাওয়া ফ্যাকাশে সাদা হয়ে গেল। ষ্টেয়ারিং-এর উপর রাখা হাতটা অল্প অল্প কাঁপতে লাগলো। বুদ্ধি করে গাড়ীর স্পিডকে অনেক কমিয়ে ফেললো সে। নয়তো এ অবস্থায় কোন এ্যাকসিডেণ্ট করে বসা বিচিত্র নয়। একি হোল! তার কয়েক মুহূর্তের আগের স্বপ্ন, শুধু কয়েক মুহূর্ত আগের কেন, তার এই দীর্ঘ দশ বৎসরের প্রতিটি মুহূর্ত দিয়ে আস্তে আস্তে অল্পে অল্পে গড়ে তোলা স্বপ্ন, সব ব্যর্থ হয়ে গেল! সুধন্য তার জীবনকে মিলিয়ে দিয়েছে আর একটি মেয়ের জীবনের সঙ্গে। সেখানে জয়ন্তীর ঠাঁই কোথা? না থাক, সে আর চিন্তা করবে না। জীবনে শুধু তার দেখবারই পালা—পাবার নয়।

বাড়ী এসে পৌছল জয়ন্তী। একটা বিশ্রী অবসাদ যেন নেমে এসেছে তার সারা দেহ-মনে। সুধন্যর সঙ্গে তার দেখা না হলেই বোধ হয় তার পক্ষে ভাল ছিল। কিন্তু না, এটা যে ঘটে গেল, এরও প্রয়োজন বোধহয় আছে জীবনে। নিষ্ঠুর একটা ঘা দিয়ে সুধন্য তার মোহ-ভঙ্গ করে দিল। আজ জয়ন্তী নিজেকে বড্ড বেশী রকম অসহায় বোধ করতে লাগলো। কেউ নেই এমন একজন—যে তার মনকে সঙ্গ দিতে পারে এখন, একটা গুরুভার নামিয়ে দিতে পারে চেতনার উপর থেকে।

বারান্দার ডেক চেয়ারে এসে গা এলিয়ে দিল জয়ন্তী। তাকিয়ে রইলো সামনের বাগানের অর্কিড্ কুঞ্জটার পানে। মিষ্টি ফুলের সুরভিতে বাতাস ভরে উঠেছে। একটা অলস দৃষ্টিতে সব কিছু দেখছে জয়ন্তী। এই বাড়ীর সেই আজ মালিক। বাবা, মা বছর পাঁচেক হোল গত হয়েছেন। এত বড় বাড়ীতে একাকী তপস্বিনীর মত বাস করছে জয়ন্তী। সময় কাটে না বলে স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়েছে। জীবনে সব কিছু ভোগ করবার উপাদান পেয়েও নিজেকে এমন করে সব কিছু থেকে সরিয়ে রাখলো কেন জয়ন্তী? থাক সে কথা।

ঝি এসে দাঁড়াল সামনে, মা, আপনার কফিটা এনে দেবো?

আনো।

ঘরে উঠে গিয়ে রেডিওটা খুলে দিল জয়ন্তী।

সুধন্যকে কথা দিয়েছিল বলেই জয়ন্তীকে পুনরায় আসতে হ'ল সুধন্যর বাড়ীতে। প্রথমে ভেবেছিল আসবে না, কিন্তু পরে চিন্তা করে ঠিক করলো—তার আসাটা

প্রয়োজন। অন্ততঃ গল্পের প্লটটুকুর জন্য। এ প্লটে সুধন্যর কোন উপকার হবে কিনা জানে না—কিন্তু সে তো মন খুলে বলতে পারবে তার মনের কথা। সুধন্যকে এ কথা বলবার যে একান্তই প্রয়োজন জয়ন্তীর।

জয়ন্তীর আসার সংবাদ পেয়ে সুধন্য নিজেই এসে নিয়ে গিয়ে বসাল তার ঘরে। পরিচয় করিয়ে দিল স্ত্রী মঞ্জুর সঙ্গে। নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরেই কিছুটা আলাপ করতে হোল জয়ন্তীকে মঞ্জুর সাথে—কিন্তু মনের অবস্থা ছিল ঠিক সম্পূর্ণ বিপরীত। কথায় কথায় জানতে পারলো জয়ন্তী, পল্লীগ্রামের এক স্কুল মাষ্টারের মেয়েকে বিবাহ করেছে সুধন্য। শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল জয়ন্তী—উন্নাসিক সহুরে শিক্ষিত ছেলে সুধন্যর পক্ষে এটা কি করে সম্ভব হোল!

সুধন্য উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে, জয়ন্তীকে বললো, চলো, ষ্টাডিরুমে গিয়ে বসা যাক। তারপর, স্ত্রীর পানে তাকিয়ে বললো, মঞ্জু, আমাদের চা'টা ওঘরে পাঠিয়ে দিও।

দু'জনে এসে বসলো ষ্টাডিরুমে। জয়ন্তী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো সুধন্যর মুখখানিকে। সেখানে যেন শান্তির অপরূপ ছোঁয়া লেগে রয়েছে। সুখশান্তিতে ভরে আছে সুধন্যার ছোট্ট সংসার। এ রাজ্যের গণ্ডিতে সে ভাগ্যবান্ রাজা।

চা এলো। দু'জনে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে শুরু হোল গল্প। টুকরো টুকরো এলোমেলো কথা। যেমন করে দু'জনে একদিন ক্লাসের শেষে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে 'কফি হাউসে' গিয়ে কফি খেতে খেতে গল্প করতো। স্বপ্ন রচনা করতো জীবনের ভবিষ্যৎ দিনগুলি নিয়ে। সে দিনগুলো যেন জীবন থেকে কুয়াশার মত মিলিয়ে গেছে। আজকের জয়ন্তী ও সুধন্য যেন সম্পূর্ণ নতুন দু'জন দু'জনের কাছে।

শুরু কর তোমার প্লটের কাহিনী। নিঃশেষিত চায়ের কাপটাকে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে দেহটাকে অলস ভঙ্গীতে চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে বললো, সুধন্য।

একটু চিন্তা করে নিল জয়ন্তী কি ভাবে শুরু করবে। তারপর, দেওয়ালের একটা ল্যাণ্ডস্কেপ ছবির পানে তাকিয়ে শুরু করলো। গলার স্বরটা একটু কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো জয়ন্তীর। সংযত করে নিল নিজেকে।

…একটি মেয়ে বিরাট ধনী এবং অভিজাত পরিবারে যেদিন সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করলো, সেদিন বাড়ীতে একটা মহা আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তারপর, পরম আদর যত্নের আওতায় থেকে মেয়েটি ধীরে ধীরে বাল্য কৈশোর জীবন অতিক্রম করে এসে দাঁড়ালো যৌবনের পদপ্রান্তে। সেদিন তার চোখে ছিল স্বপ্নের অঞ্জন—পৃথিবীটা তার কাছে রামধনুর দেশ বলেই মনে হয়েছিল। ক্রমে স্কুলের পাঠ শেষ করে এলো কলেজে। এলো একটা ভিন্ন জগতে। ফোটা ফুলের পাশে যেমন ভ্রমরের গুঞ্জন হয়—তেমনি মেয়েটির কাছে এসেও ভীড় করতে লাগলো স্তাবকের দল। উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলতে লাগলো তার মনকে। কলেজের এক সহপাঠিনীর ভায়ের সঙ্গে মেয়েটির আলাপ পরিচয়টা একটু অন্তরঙ্গ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ালো। শেষ পর্যন্ত টিকলো না—মেয়েটিরই ভাল লাগেনি। নিজেকে সে সম্পূর্ণ করে সরিয়ে নিয়েছিল। ছেলেটির ভালবাসার নামে হীনতা শঠতা আর নোংরামো দেখে মেয়েটির মন বিশ্রী ঘৃণায় ভরে উঠেছিল। তারপর সে আর কাউকে আমল দিতে চায়নি।

তারপর কেটে গেল চারটি বছর।

জয়ন্তী একটু থামলো। তাকিয়ে দেখলো সুধন্য নির্বিকার মুখে বসে সিগারেট টানছে। কাহিনীটা হয়তো তার মনের মত হচ্ছে না। একটা বহু পুরাতন বস্তাপচা জিনিষের মত মূল্যহীন। সামনের জানলা দিয়ে জয়ন্তী বাহিরের দিকে তাকাল, তখন বেলা গড়িয়ে এসেছে। সহরতলীর পথে ছায়া ঢাকা বিষণ্নতা। আকাশের কোণে কোণে ধোঁয়ায় তৈরী নানা আকারের মেঘ উড়ে যাচ্ছে অতিকায় ফানুষের মত। ঘরের ভিতরের হাওয়াটা কেমন যেন ভারী ভারী মনে হচ্ছে!

চেয়ার ছেড়ে উঠে সুধন্য ঘরের আলোটা জেলে দিয়ে বললো, একটু তাড়াতাড়ি শেষ কর জয়ন্তী, আজ আবার একটা সাহিত্যসভায় বেরুতে হবে।

চমক খেয়ে ঘাড়টাকে ঘুরালো জয়ন্তী, ইচ্ছা হোল শেষটা আর বলবার দরকার নেই। সেও উঠে বেরিয়ে যাক এখান থেকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হোল—এসেছে যখন কাহিনীটা বলতে, তখন শেষ করেই যাবে।

হ্যাঁ, প্রায় শেষ হয়ে এলো। একটু ধৈর্য ধর লক্ষ্মীটি।

তারপর শোন, মেয়েটি এম-এ পড়তে এলো য়ুনিভারসিটিতে, তখন সে ভালবাসলো একটি ছেলেকে। নিজেকে প্রায় উজাড় করে। ছেলেটি যে তাকে কতটুকু ভালবাসে সে বিচার সে সেদিন করেনি—নিজেকে সে ভাসিয়ে দিয়েছিল কূলপ্লাবিনী ভালবাসার স্রোতে। ছেলেটি শপথ করেছিল সেই মেয়েটিকে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। মেয়েটি সে কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করেছিল।

এম-এ পাশ করবার পর ছেলেটি এক মফঃস্বল কলেজে প্রফেসারী নিয়ে চলে গেল। সেখান থেকে মাঝে মাঝে আশা জাগিয়ে রাখবার জন্য চিঠি লিখতো। ধীরে ধীরে সেটাও বন্ধ করলো সে! মেয়েটির মনে জাগলো প্রচণ্ড অভিমান—সেও চিঠি বন্ধ করলো। যদি ছেলেটি কোনদিন তার কাছে ফিরে আসে, তবেই সে তাকে ক্ষমা করবে।

ধীরে ধীরে কেটে গেল দশটি বছর, ছেলেটি ফিরে এলো না। এদিকে আকুল আগ্রহ নিয়ে শবরীর মত প্রতীক্ষায় থাকে মেয়েটি। তার ভালবাসা কি ব্যর্থ হয়ে গেল? যাক, তবু সে একটি ছেলেকে সারাটি অন্তর দিয়ে ভালবেসেছে এই তার পরম পাওয়া। পরে, সে ছেলেটি হয়েছে খ্যাতনামা সাহিত্যিক। বিবাহ করে শান্তিতে ঘর সংসার করছে। কিন্তু, যে মেয়েটি তাকে ভালবেসেছিল সে? সে সমস্ত সুখ ভোগ ছেড়ে সেজেছে সন্ন্যাসিনী। বলতে পারো সুধন্য, মেয়েটির এই দণ্ড ভোগের অপরাধটা কোথায়?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো জয়ন্তী, শত চেষ্টাতেও নিজেকে সামলে নিতে পারলো না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তুমি প্লট চেয়েছিলে না সুধন্য—তাই সত্য-ঘটনাই একটি বলে গেলাম। হয়তো কাহিনীটা অসমাপ্ত থেকে গেল—সত্যিকারের কাহিনী অসমাপ্ত থেকে যায়। যদি তোমার ভাল লেগে থাকে, নিজের ইচ্ছা মত তুমি এ কাহিনী শেষ কোর। তুমি সাহিত্যিক, এই কাহিনীতে যতটা পারো ভেজাল দিয়ে রং চড়িয়ে সাহিত্য-সৃষ্টি কোর। দেশ জুড়ে সম্মান—বাহবা পাবে। কিন্তু এটুকু অন্তত: জেনে রেখো—মেয়েটির ভালবাসায় কোন ভেজাল ছিল না। সেটা সত্যিকারের খাঁটী। আচ্ছা, এবার চলি, সুধন্য।

মুহূর্তে চমকে উঠলো সুধন্য—একি বলছে জয়ন্তী। সেদিনের একটা মিথ্যা প্রেমের খেলাকে সত্য বলে জীবনে মেনে নিয়েছে? তারই জন্য পথ চেয়ে বসে আছে নিজের সমস্ত কামনা বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে ধনীর দুলালী—সন্ন্যাসিনীর ব্রত নিয়েছে! আর সুধন্য? কতটুকু মূল্য দিল জয়ন্তীর এই নীরব সর্বত্যাগী প্রেমের—যে প্রেম ধূপের মত তিলে তিলে নিজেকে দহন করে শেষ হতে যাচ্ছে।

জয়ন্তী আমাকে ক্ষমা কর—ভুল করে তোমার উপর অবিচার করেছি। জয়ন্তীর হাত দুটিকে নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিতে চাইল।

জয়ন্তীর কণ্ঠ ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসে রুদ্ধ হয়ে গেছে। কোন কথা সে বলতে পারলো না। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। তারপর তড়িৎ বেগে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গিয়ে মোটরে উঠে ষ্টার্ট দিল। অনেকদিনের জমে থাকা বুকের বোঝাটা তার হাল্কা হোল। হয়তো তার এ জীবনে সুধন্যকে পাওয়া হোল না, কিন্তু এই না-পাওয়ার মধ্যেই সে অনেক বেশী করে সুধন্যকে পেয়েছে যেভাবে মঞ্জু কোনদিন তাকে পাবে না, পেতে পারে না। অন্ততঃ নিজের প্রেমের কাছে সে নিজে শঠতা করেনি। সত্যিকারের নিষ্ঠায় তাকে জীবনে মেনে নিয়েছে। এ পাওয়া অনেক বেশী পাওয়া।

সামনের রাস্তার উপর দিয়ে জয়ন্তীর মোটরটা এগিয়ে চলেছে, আর উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্তব্ধ বিমূঢ়ের মত দেখছে সুধন্য। বিবেক তাকে আজ বারবার ধিৎকার দিচ্ছে—সুধন্য তুমি প্রতারক, তোমার উপন্যাসে গল্পে তুমি প্রেমের যতই গুণগান গাও না কেন—সত্যিকারের প্রেমকে তুমি জীবনে অস্বীকার করেছো। জয়ন্তীকে তুমি ঠকাবার চেষ্টা করলেও সে ঠকে যায়নি—নিজের জায়গায় সে আজ বিজয়িনী। তুমিই নিজেকে নিজে ঠকিয়েছ।

ক্ষিপ্র হাতে নিজের মাথার চুলগুলিকে সে মুঠো করে চেপে ধরলো। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলো, জয়ন্তীর মোটর ততক্ষণে পথের বাঁকে মোড় নিচ্ছে।

কবি শ্রীমধুসূদনের কাব্যমহত্ত্ব

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

বাঙলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে আধুনিক ধারার ভগীরথের ভূমিকায় আবির্ভাব ঘটেছিল কবি শ্রীমধুসূদন দত্তের। পাশ্চাত্য কবি-কল্পনার বৈশিষ্ট্যকে তিনি তাঁর রসবুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ ক'রে নিয়ে এমন একটি অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছিলেন যে, তাতেই বাঙলা কাব্য সাহিত্যের এক নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছিল। এই দিগন্তের দ্বারমুক্তির যা-কিছু উল্লেখনীয় পুরস্কার, তা কবি মধুসূদনেরই প্রাপ্য, এবং তিনি তা' পেয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন,—'কাল প্রসন্ন'—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন।' যে সুপবনের কথা সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছিলেন, তা হচ্ছে আমাদের বিশাল এক জাতীয় ঐতিহ্যের সুপবন, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টির বীজ দিয়ে বইয়ে দিয়েছিলেন কবি শ্রীমধুসূদন, আর দেশীয় ঐতিহ্যের জয়যাত্রার পতাকায় বাঙলা দেশের বুকে নবযুগের অভ্যাগমের উদ্গাতা হিসাবে অপরিসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে কবি শ্রীমধুসূদনের নামই লেখা হয়েছে। মধুসূদন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে মহাকবি হতে চেয়েছিলেন, আমরা তাঁর মধ্যে মহাকবিকেই পেয়েছি।

মহাকবি হওয়ার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজ কবিপ্রতিভার উপর তাঁর আত্মপ্রত্যয়ও ছিল অপরিসীম। সেই আত্মপ্রত্যয়কে মূলধন করে নিয়ে তিনি মহাকাব্য-রচনার একটি দুঃসাধ্য ব্রতকে জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য দেশের কয়েকটি ভাষাতেই তার অসাধারণ দখল ছিল, এবং বিভিন্ন ভাষার কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ছিল সুগভীর। সেই পরিচয়ের পথ ধরেই তিনি তাঁর কবিকল্পনাকে ভার্জিল, হোমার, দান্তে, ট্যাসো, মিলটন প্রভৃতি ইউরোপীয় কবির ভাব-কল্পনার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ভারতীয় পুরাণ থেকে চরিত্র গ্রহণ ক'রে নূতন ভঙ্গীতে সেগুলিকে রূপায়ণ দিলেন। তা' ছাড়া বাঙলা কাব্যের প্রথম আধুনিক যুগে মহাকাব্য রচনাই লোভনীয় ছিল। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যও অনেকটা মহাকাব্যধর্মী, সেই ঐতিহ্যও যে সেই যুগে মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে কিছুটা কাজ ক'রে গিয়েছে, তা' বললে হয় তো অসংগত হবে না। কিন্তু কবি মধুসূদন রেণসাঁ যুগের মানবতা-বোধের নূতন জীবনবাদে দীক্ষিত ছিলেন। নাটক রচনার মধ্য দিয়ে তিনি তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালীর মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিলেন; সেই বিস্ময় আনন্দিত হ'য়ে উঠেছিল তাঁর প্রতিভার মহৎ ফলশ্রুতিকে লাভ ক'রে।

বাঙলা ভাষায় যে মহৎ সৃষ্টি সম্ভব এই বিশ্বাসও অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মনের গভীরে জেগেছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর আবেগদীপ্ত আলোচনাই এই বিস্ময়ের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। তাঁর মধ্যে উনিশ শতকের যুগ-চেতনার সঙ্গে জাতীয়-চেতনার একটি সার্থক সম্মেলন ঘটেছিল এবং সেই জন্যেই কাব্যে যুগচেতনার স্বাক্ষর দিয়েও জাতিত্ব গৌরবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাশীল মানসিকতা ধরা পড়েছে। এখানেও তাঁর কাব্যের এক অবিস্মরণীয় মহনীয়তা।

মহৎ কাব্য রচনায় একটি গভীরতর জীবন বোধ যেমন থাকতে হ'বে, তেমনি কাব্যমহত্ত্ব নির্ভর করে চিরকালীন একটি অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধির উপর, যুগচেতনার সংশয়হীন প্রকাশভূমিতে। মধুসূদনের কাব্যে তার প্রকাশ ঘটেছে পটভূমি সৃষ্টির নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশালতায় এবং বিভিন্ন চরিত্রায়নের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে। আমাদের এই উক্তিকে সমর্থন দিতে গেলে প্রথমেই তাঁর শ্রেষ্ঠতম কাব্য 'মেঘনাদ বধ'কে গ্রহণ করতে হয়। কারণ যুগোত্তীর্ণ কবিধর্মটির অমর প্রতিষ্ঠা তাঁর এই কাব্যের সৃষ্টি কল্পনায়।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উপাদান বিদেশের অনেকগুলি

কাব্য থেকে গ্রহণ করলেও এর মধ্যে কবি মধুসূদন যে-মৌলিক সৃষ্টির পরিচয়-চিহ্ন রেখে গিয়েছেন, তা' নিঃসন্দেহে কালজয়ী। তিনি যে বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে একজন বিদ্রোহী রূপে (literary rebel) দেখা দিয়েছেন তা' তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজনারায়ণের কাছে লিখিত পত্রে অত্যন্ত সজাগ ভাবেই ঘোষণা করে গিয়েছেন ; তাঁর যে আবির্ভাব ঘটেছে বাঙলা কাব্যধারার নূতন এক পথসৃষ্টির জন্য, এই অনুভূতি এবং নিজ প্রতিভার নিঃসংশয় প্রত্যয়কে মূলধন ক'রে নিয়েই জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি রচনার পক্ষে এই নিঃশঙ্ক ঘোষণার সঙ্গে তিনি অভিযাত্রা করেছিলেন। আর এই জন্তেই মধুসূদনের কাব্য যুগ-বিদ্রোহেরই সার্থক বাণীরূপ। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি গ্রন্থ রচনার সঙ্গে সঙ্গে যদি তিনি জনসাধারণের কাছ থেকে ক্রমানুসারে তাঁর যথাযোগ্য সম্মান না লাভ করতে পারেন তবে তিনি তাঁর গ্রন্থ ভস্মসাৎ করতেও কুণ্ঠিত হবেন না বলে' সদৃপ্ত ঘোষণা করেছিলেন। এইখানেই দেখি তাঁর কবিব্যক্তিত্বের মহৎ প্রতিভার প্রতি নিঃসংশয় ধারণা এবং এই সঙ্গে কাব্যের মহত্ব সৃষ্টির জন্য অনলস সাধনা ও উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি। তাই তিনি বলেছিলেন, বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি প্রচণ্ড উল্কার মতো নিঃসংশয় গতিতে নেমে আসবেন। ১ অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ই তাঁকে এই বলিষ্ঠ উক্তির উচ্চারণে প্রবুদ্ধ করেছিল।

উনিশ শতকের বাঙালী মনে যে-একটি বিপ্লবাত্মক ভাবপ্রেরণা জেগেছিল, তার প্রাক্‌ভূমি সৃষ্টি ক'রে গিয়েছিলেন একজন বিদেশী শিক্ষাবিদ,—নাম তাঁর হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও। মধুসূদন যখন হিন্দুকলেজে পড়েন, তখন ডিরোজিও জীবিত ছিলেন না বটে, কিন্তু তরুণদলের মধ্যে তাঁর বিঘোষিত ভাবধারার প্রভাব ত'নও বেশ নিঃশব্দ-সঞ্চারী হয়ে ছিল। মধুসূদনের কাব্য সেই বিপ্লবাত্মক ভাব প্রেরণারই বহিঃ প্রকাশ।

মধুসূদনের কবিবৃত্তিতে যে-বিদ্রোহের ভাব, সে পাশ্চাত্য সাহিত্য দার্শনিকদের মনন চিন্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফল। উনিশ শতকের যে-জীবন-তৃষ্ণা উচ্চাভিলাষী সকলের হৃদয়কে আকুল ক'রে তুলেছিল, সেই জীবন তৃষ্ণাই অবিচল সৃষ্টিকল্পনার সঙ্গে সঞ্চারিত হ'য়ে মধুসূদনের রাবণ চরিত্রটিকে গড়ে তুলেছিল। অনুভূতির গভীরতার পিছনে যে একটি যুগচেতনা আছে, সেই যুগচেতনার স্বাক্ষরই তাঁর রাবণ চরিত্র চিত্রণে। উনিশ শতকের নবজাগরণের উষালগ্নে নারীহৃদয়ে যে আত্মসচেতনার স্বাক্ষর পড়েছিল, মধুসূদনের প্রমীলা, চিত্রাঙ্গদা, তারা, জনা প্রভৃতির চরিত্রায়নে এই আত্মচেতনারই প্রকাশ মুখরতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কাব্যমহত্বের পিছনে যে অতি-সজাগ ব্যক্তিত্বস্বীকৃতি ছিল তারই পরিচয় এই নারীব্যক্তিত্বকে একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দান করার মধ্যে। স্বকীয় ব্যক্তিত্বের উজ্জলতায় প্রত্যেকটি চরিত্রই বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। বিশেষ ক'রে সুগভীর মানবতা বোধের মধ্য থেকে নারী ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর কবিমানসে যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জেগেছিল, তারই প্রকাশ তাঁর প্রমীলাচরিত্রে। এই প্রমীলাচরিত্রটির রচনা-মুহূর্তে কবির ভাবকল্পনার রাজ্যে যে কয়টি নারী চরিত্র এসে কবিমনকে রাঙিয়ে দিয়েছিল তাদের মধ্যে যেমন আছে ট্যাসোর ক্লোরিডা, সিলভিপে, তেমনি আছে ভার্জিলের ক্যামিলা, হোমারের অ্যামিনী, বায়রণের মেড অফ সারাগোসা। কাশীরাম দাসের 'প্রমীলা' নামটিকেও তিনি গ্রহণ করলেন বীরত্ব ও কোমলতার সংমিশ্রণে এই তুলনাহীন নারীচরিত্রটিকে কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার বেলায়। প্রেমই প্রমীলাচরিত্রের কেন্দ্রীয় বীজ, এবং এই প্রেমের মর্মকোষ থেকেই তাঁর বীরত্ব ও সুকোমল নারীত্বের বিকাশ এবং এই বিকাশের মধ্যেই তাঁর কাব্যমহত্বের অক্ষয় স্বাক্ষর চিহ্নিত হ'য়ে আছে। মেঘনাদ চরিত্রকে আরও সুন্দর, উজ্জ্বল করার জন্যই প্রমীলাকে নিজস্ব রঙ্গলোকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে এই রূপে অঙ্কিত করার প্রয়োজন ছিল, যেমন ছিল রাবণ চরিত্রকে পরিস্ফুট করার জন্য প্রথমেই চিত্রাঙ্গদাকে সৃষ্টি করার। যেখানে রাবণের কথায় প্রকাশ পেয়েছে তিনি দৈবাহত, আর চিত্রাঙ্গদা তাঁকে তীব্র ভাষায় দিয়েছেন সীতাহরণের অন্যায়ের যে পাপ, তার ফল তাঁকে ভোগ করতেই হবে, ন্যায়ধর্মের বিজয়বার্তা সর্বপ্রথম চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়। কাব্যের কলশ্রুতির দিক দিয়েই একদিকে

---

(১) you may take my word for it, Raj, that I shall come on like a tremendous comet and no mistake. (রাজনারায়ণ বসুর কাছে চিঠি)

শোকাহত ও অভিমানাহত নারী হৃদয়ের এই অশ্রুসিক্ত অথচ সুতীব্র ঘোষণার প্রয়োজন ছিল। আর রাবণে যেন তাঁর নিজের ব্যক্তি হৃদয়েরই সমুজ্জ্বল প্রকাশ। জীবনের বহু দুঃখ বেদনার মর্মজ্বালাকে রাবণের বিলাপের মধ্যে শিল্প সংযম রূপায়ণে তিনি বাণীবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। মেঘনাদ বধে মধুসূদন শুদ্ধ মহাকাব্য রচনার জন্যই আত্মনিয়োগ করেন নি, তিনি এখানে জীবন-শিল্পী। রাবণের প্রতিটি উক্তিই হয় বীরব্যক্তিত্বের মর্মমূল থেকে উচ্চারিত, নয় বেদনা-মথিত জীবন-অভিজ্ঞতার অশ্রু ভারাতুর আর্তনাদ। মমতাকুল গার্হস্থ্য জীবনের স্নেহরসে কাব্যের প্রায় প্রতিটি সর্গই অভিষিক্ত হয়েছে; এমন কি অষ্টম সর্গেও দেখতে পাই, পরলোকগত দশরথ তাঁর পুত্রস্নেহাতুর হৃদয়ের অপরূপ প্রকাশ ঘটিয়েছেন প্রতিটি কথায়। এই ভাবেই একটি জীবন-অভিজ্ঞতার রসনিষেকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন মহাকাব্যধর্মী সৃষ্টিকর্মাকে; নিজের প্রত্যয়সিদ্ধ মানসক্ষেত্রের অনেকখানি সংবাদ পরিবেশন করেছেন তাঁর কবিহৃদয়ের প্রেরণা, সাধনা ও জীবনদর্শনজাত মহৎসৃষ্টির রূপকল্পে। তাঁর কাব্যমহত্বে একদিকে তাই যেমন প্রবল হৃদয়াবেগ, অন্যদিকে তেমনি বিষাদময়তার শান্ত গম্ভীর শিল্পস্বাক্ষর। মধ্যযুগের দেববন্দনা মূলক কাব্যভঙ্গীকে ত্যাগ করে মানব রস সিঞ্চিত ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা রচনার যে-প্রকাশ লীলাকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অল্প কিছু দিন পূর্বে মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন, সেই পথেই আরও একটি নূতন সৃষ্টির যুগান্তকারী প্রতিভা নিয়ে পদচারণা ঘটল মহাকবি মধুসূদনের। মানবপ্রীতির এক সুস্নিগ্ধ নির্ঝর-ধারা ঝ'রে পড়লো তাঁর উদার কাব্যভূমিতে। তখনকার যুগধর্ম ও ইউরোপীয় দার্শনিকদের মানবতাবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে, ও গ্রীক কবির সৌন্দর্যপ্রীতিকে অন্তরে গ্রহণ ক'রে তিনি তাঁর হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি ও ভালোবাসা বর্ষণ করলেন আর্যপ্রীতিবঞ্চিত অনার্য বা রাক্ষসদের উপর। তাদের মধ্যেই উজ্জীবিত ক'রে তুললেন তাঁর নিজের অন্তর-রাজ্যের স্বদেশপ্রেমকে। কিন্তু তা' হ'লেও তিনি এটুকু উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর এই সুস্পষ্ট অনার্য বা রাক্ষস প্রীতির জন্য জনসাধারণ হয়তো অসন্তোষ প্রকাশ করবেন এবং বলবেন যে, মেঘনাদ বধের কবিচিত্ত রাক্ষসদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন; এবং তিনিও নিঃসংকোচে জানিয়ে গিয়েছেন এ একান্ত সত্য।২ তাঁর চিন্তার জগতে রাবণ যে একজন মহৎব্যক্তি (grand fellow) এবং রাবণ যে তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে তাও জানাতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করেননি। এই সঙ্গে এও তিনি জানিয়েছেন রামচন্দ্র এবং তাঁর সঙ্গী নিম্নশ্রেণীর লোকগুলিকে তিনি ঘৃণা করেন। কাব্য সংগঠন এবং তাঁর নিজের এই উক্তিগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে অতি সহজেই এটা উপলব্ধি করা যাবে যে, যে কালভূমিতে তাঁর কবিমানস ও জীবন প্রতীতির বিকাশ সাধন ঘটেছে এবং বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যে ব্যাপকতর পাঠকৃতি আছে, তাতেই পাশ্চাত্যের humanism positivism প্রভৃতি নূতন ভাববাদ তার মনকে পুরোপুরিভাবে মানবমুখী করে তুলেছে। তা' ছাড়া, অপরিমিত ঐশ্বর্যের প্রতি যার আবাল্য পক্ষপাতিত্ব, তিনি ভিখারী রাঘবের কাছে তার প্রত্যাশা করবেন কি ক'রে? অন্তরে রসধর্মই তাকে রামায়ণের বিজয়ী পক্ষকে ত্যাগ করে বিজিত পক্ষের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ক'রে তুলেছিল।

মধুসূদনে আর যাই থাক, কোনরূপ রক্ষণ-শীলতা ছিল না। তিনি কাব্যরচনার ক্ষেত্রে বহিরঙ্গ রূপ গঠনের দিক ছাড়াও যে একটি অন্তরতর রহস্যময় দিক আছে, সেই দিকটির প্রতিই তিনি বহুবার অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, এবং এইখানেও তাঁর কাব্য সৃষ্টির মহত্ত্ব। গীতিপ্রাণতা (Lyricism) তাঁর কবি মানসের একটি লক্ষণীয় দিক এ-কথা তিনি কয়েক-বারই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এ-দিকটি তাঁর কাব্যকে যে বিশেষ সমুন্নতি দান করেছে সে কথা অস্বীকার করার অবকাশ নেই। 'মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গকে বাদ দিলে যেন অনেকখানিই বাদ পড়ে যায়। এই সর্গে মধুকবি যেন একেবারে আমাদের অন্তরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। অলংকার প্রিয়তাকে মাঝে মাঝে প্রশ্রয়

---

(২) এই প্রসঙ্গে কবি মধুসূদন তাঁর বন্ধু রাজ নারায়ণ বসুর কাছে একটি চিঠিতে লিখেছেন—'People here grumble and say that the hearl of the poet in meghnad is with the rakshasas and that is the real truth.

দিলেও, বহুক্ষেত্রে নিরলংকার ধ্বনিব্যঞ্জনার ভিত্তিভূমিতেই তার উপলব্ধ জীবনসত্যকে বা অন্তরতর অনুভবকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। নূতন যুগের কাব্যধর্মকে আবাহন জানিয়ে যে প্রাচীন কবিকর্মের দিকসীমাকে লঙ্ঘন করতে হবে, এ-বোধটি মধুসূদনের কবিমানসে খুব বেশি রকমই ছিল; এবং এইজন্যই তিনি যুগস্রষ্টা কবি বলে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ধারা যেখানে ভারতচন্দ্রে এসে পরিণতিলাভ করেছে, তার পরবর্তী স্তরে মধুসূদনের মহাকাব্যই যেন স্বাভাবিক। কারণ বাঙলা সাহিত্যে ঐ জিনিসটিরই অভাব ছিল।

'মেঘনাদবধের শিল্পকৃতিতে একটি ক্লাসিক মহিমাই সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হ'য়ে আছে; যদিও তার মর্মলোকে প্রবাহিত হচ্ছে একটি স্নিগ্ধ সুন্দর গীতিরসের ফল্গুস্রোত। মহাকাব্যের ভাবকল্পনায় এই গীতিফল্গুধারার রসসৃষ্টিতেই যুগ ধর্মানুসারী তাঁর কাব্যমহত্বের সৃষ্টি হয়েছে। মানবরস-পিপাসু যে-যুগচিত্ত তাতে মহাকাব্যের গাম্ভীর্যের সঙ্গে গীতি মাধুর্যের রসলীলাও মিশাতে হবে ব'লে তিনি হয়তো মনে করেছিলেন। তাই তাঁর এই অপরূপ সৃষ্টি। বিশ্বনাথের আলংকরিক নির্দেশানুযায়ী বর্তমান কালের যুগ হয়তো একমাত্র বীররসাশ্রয়ী মহাকাব্যকেই অশান্ত মনে গ্রহণ করতো না। তা ছাড়া তিনি জানতেন, যা' সুন্দর, কোমল এবং করুণ তাই কেবল কালপ্রবাহের অক্রুরন্ত ধারায় মহৎ গাম্ভীর্য বা উদাত্ততার সঙ্গে নিজের বিজয়ী অস্তিত্বকে ঘোষণা করতে পারে; করুণ রসের সৃষ্টিসুন্দর কবিকে সর্বযুগের পাঠকরাও অর্পণ করেন অকৃত্রিম শ্রদ্ধার অম্লান মালিকা।৩ তার মধ্যে যে একটি গীতিপ্রাণতার উচ্ছল সুর আছে, সেদিকেও কবি বেশ সজাগ ছিলেন; এবং এর পরে যে তিনি গীতিকাব্যের বিস্তৃত রসলোকেই প্রবেশ করবেন সে আভাসও তিনি চিঠিতে দিয়েছিলেন। গ্রীক পুরাণের সৌন্দর্যের সঙ্গে আমাদের প্রাচীন পুরাণের সৌন্দর্যকে অকুণ্ঠভাবে মিশিয়ে দিয়ে তিনি 'তিলোত্তমা সম্ভব' ও 'মেঘনদেবধ কাব্যে' এই ক্লাসিক মহিমার একটি অপরূপ রসলোক সৃষ্টি ক'রে গিয়েছেন। 'তিলোত্তমা সম্ভব' তো লিরিক মাধুর্যের একটি অপরূপ প্রতিমার মতো পরিস্ফুটরূপ নিয়ে সর্বকালের বাঙালী পাঠকের নয়ন সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এই কাব্যে তিনি কেবল তাঁর নিজের ভাষা ছন্দসৃষ্টির মৌলিক প্রতিভার উৎসমূলকেই আবিষ্কার করলেন না, তিনি একজন সৌন্দর্যধ্যানী নিপুণ শিল্পীর মতো সৌন্দর্যের আদিতত্ত্বকে উপলব্ধি ক'রে একটি কালবিজয়িনী সৌন্দর্যপ্রতিমাকে বাঙলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে অক্ষয় প্রতিষ্ঠা দিয়ে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই কাব্যটি যে আমাদের জাতীয়কাব্যকে একটি বহুবাঞ্ছিত সমুন্নতির স্তরে নিয়ে পৌছিয়ে দেবে, এই নিঃসংশয় বিশ্বাসও তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন। একটি কৌতুকালাপ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মনোবৃত্তিকে কেন্দ্র করে যে কাব্যের জন্ম, তার মধ্যে এত রসধারা বিলসিত হ'য়ে উঠবে, এ স্রষ্টা কবিও বুঝতে পারেন নি। 'অপূর্ব নির্মাণক্ষমা' যে শক্তি, সে বুঝি এমনি করেই সৃষ্ট করেই যায়। এই কাব্যে একদিকে অন্তরের সৌন্দর্যসাধনার আরতিপ্রদীপটিকে জ্বালিয়ে নিয়ে বিশ্বের হৃদয়স্থিতা সৌন্দর্যলক্ষ্মীর ধ্যান করেছেন কবি, অন্যদিকে সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সৃষ্টি বর্ণনায় বিভিন্ন উপাদানকে অবলম্বন ক'রে যে-রূপকল্পনার প্রয়োগ করেছেন, এবং বস্তুধর্মিতার বেশ কিছুটা বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন, তাই এই কাব্যকে অনেকটা মহকাব্যধর্মী ক'রে তুলেছে। এই কাব্যের চরিত্র-সৃষ্টিতে যথেষ্ট দুর্বলতা আছে, কিন্তু সৌন্দর্যধ্যানের উদাত্ততায় একটি সমুজ্জ্বল মহত্বও সঞ্চারিত হয়েছে। এবং এইখানেই কাব্যটির সার্থকতা। তা' ছাড়া, সেই যুগচিত্ত-আকাঙ্ক্ষিত যে-মানবতাবোধ মধুকবির অন্তরলোকে সঞ্চিত হচ্ছিল, তার প্রকাশ এই প্রথম কাব্যটিতেই বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয় সেইখানে, যেখানে তিনি দেবতাদের শত্রু ক'রে সুন্দ-উপসুন্দ নামক দুটি দানবভ্রাতাকে অঙ্কিত করেছেন। মহাভারতকারের রূপচিত্রণে এই দানব ভ্রাতা দুটি যেমন অধর্মাচারী তেমনি কামুক; কিন্তু মধুসূদনের তুলিতে যে রূপ ফুটে উঠেছে— তাতে তারা ধ্যানী ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। তারা ধর্মাচারী দেবতার শত্রু হ'লেও কবি হৃদয়ের সহানুভূতির অমৃত-

---

(৩) He who is 'beautiful' 'tender' and the 'pathetic' with a dash of sublimity, is sure to float down the stream of time in triumph All readers are sure to unite in loving and adoring him [রাজনারায়ণ বসুর কাছে চিঠি]

নিষেকে উনিশ শতকের বাঙলা কাব্যলোকে একটি বিশিষ্ট আসনে অভিষিক্ত হয়েছে। যেটুকু তাদের কামনা-পঙ্কিল-রূপ, সেইটুকুকেই অবলম্বন ক'রে যুগন্ধর কবিপ্রতিভার ধ্যানসম্ভূতা একটি অপরূপা সৌন্দর্যলক্ষ্মীর পদসঞ্চার ঘটেছে। এই দিক দিয়েই মধুসূদন গ্রীককবির স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্য-প্রীতিতে প্যাগান-দৃষ্টির অধিকারী। সব সময়ই দেখা যায়, দেবচরিত্রের মধ্যে তিনি একটি মানবীয় ভাবরস (human interest) সঞ্চার করতে চেয়েছেন, এবং এই সঞ্চারের ফলেই দেবচরিত্রগুলি হিন্দুর পুরাণাশ্রয়ী দেবচরিত্র না হ'য়ে পাঠক-মনকে বেশ কিছুটা মানবরসের মাধুর্য লীলায় অভিষিক্ত ক'রে তোলে। তাঁরা একদিকে সীমাহীন সৌন্দর্যের প্রতীক, অন্যদিকে অপরিসীম শক্তিশালী। এই জন্যই কোন ধর্মীয় তাৎপর্য তাঁর কবি-আত্মাকে জাগ্রত ক'রে তোলে নি, যা করেছে, সে হচ্ছে তাঁর সৌন্দর্যবোধ। কিন্তু তাঁর অন্তরে ছিল একটি সুগভীর নীতিবোধ ; সেই জন্য প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হ'য়েও মহাদেব রাবণের কর্ম-ফলকে রোধ করতে পারেন না। 'যতোধর্মস্ততোজয়ঃ' কথাটির মধ্যে যে-একটি চিরদিনকার নৈতিক-বিধান আছে, ইউরোপীয় বিদ্রোহাত্মক ভাবধারার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কারকে অন্তরে লালন ক'রে সেই বিধানেরই জয়ধ্বনি তিনি দিয়ে গিয়েছেন। এই জন্যই হয়তো তিনি তাঁর বন্ধুকে জানিয়েছিলেন, হিন্দু-বাতাবরণ তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে যতটা সম্ভব রক্ষা ক'রে যাবেন।৪ তাঁর কবিমানসে এই সদাজাগ্রত নীতিবোধ ছিল বলেই সুতীব্র সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে তাঁর কাব্যলোকে একটি সংযমের মহত্ত্ব এসে যুক্ত হয়েছে ; ঐশ্বর্যের বিপুলতার সঙ্গে জীবন অভিজ্ঞতার সংযত পদক্ষেপ কাব্যের গভীরে একটি মহত্তর ধ্বনির সৃষ্টি করেছে। তাঁর কাব্যজগতের এই সমন্বয়ের সুরই একটি সার্থক ফল-শ্রুতির দ্বারদেশে আমাদের মনগুলিকে এনে উপস্থিত করে। তিলোত্তমায় কোন সুগভীর জীবনবোধের প্রকাশ নেই বটে, কিন্তু সৌন্দর্যবোধের আনন্দময় অভিব্যক্তি আছে ; মেঘনাদবধে সৌন্দর্যবোধ ও জীবনবোধের একটি সুগভীর সমন্বয়ের রসলোক সৃষ্টি হয়েছে। তিলোত্তমায় যে-ছন্দ-সৃষ্টি করতে যেয়ে ছন্দটির ভবিষ্যৎ সার্থকতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে একটি পরম আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়ে-ছিলেন, সেই ছন্দ 'মেঘনাদবধে'এসে কাব্যের ললাটে একটি অক্ষয় মহত্ত্বের উজ্জ্বল তিলক এঁকে দিয়েছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ যে তার পদযাত্রায় একটি সার্থকতম ঐতিহ্য সৃষ্টি ক'রে চলেছে, এ তিনি প্রথমেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই তিনি বন্ধুকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন,—'অমিত্রাক্ষর এখন একটি প্রচলিত রীতি হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। বৃদ্ধ রণজিৎসিংহ যেমন ভারতের মানচিত্রের দিকে চেয়ে বলতেন,—সব লাল হো যায়েগা,'—তেমনি আমিও বলি 'সব অমিত্রাক্ষর হো যায়েগা।'৫ আর যাঁরা এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের যথার্থ মহত্ত্বকে ধরতে পারেন নি, অথচ পাণ্ডিত্যের অভিমান করেন, তাঁরা তাঁর কাছে barren rascals। তিনি জানতেন, যে ছন্দ মহাকাব্য রচনার উপযোগী হ'য়ে একটি অপূর্ব ধ্বনিনির্ঘোষ ও ভাষাদর্শ সৃষ্টি করার সহায়তা করে, সেই ছন্দের মধ্যেই একটি মহত্ত্ব আছে ; এই মহত্ত্বেরই অনুধ্যান করেছেন কাব্যরচনার মাহেন্দ্রলগ্নে এই যুগান্তকারী ছান্দস কবি।

এই অমিত্রাক্ষর ছন্দেরই গম্ভীর মধুর সার্থকতম শিল্পরূপ দেখি আমরা তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যে। এই কাব্যেরও মহৎ প্রকৃতির মধ্যে আছে তাঁর নূতন আলো জাগানো কবিব্যক্তিত্ব। প্রাচীন রোমক কবি ওভিদের Heroides এর অনুসরণে ভারতীয় পুরাণের কয়েকটি নারী চরিত্রকে গ্রহণ ক'রে তিনি এই কাব্যের কাঠামোটি রচনা করেছেন বটে, কিন্তু এর মর্মলোক সঞ্চারী যে-কাব্যভাবনা আছে তা' আধুনিক যুগের। এ-কাব্যেরও চরিত্র-চিত্রণে তিনি আধুনিক কালের দাবীকেই সব চেয়ে বড় ক'রে মেনে নিয়েছেন, এবং নারীপ্রেমের যে-শিল্পরূপটি এ-কাব্যে

(৪) I only hope I have given the Episode (মেঘনাদবধ কাব্য) as thorough Hindu air as possible. রাজনারায়ণ বসুর কাছে আবার অন্য একটি চিঠিতে লিখেছেন—You shan't have to complain again of the un Hindu character of the poem.

(৫) Blank vese is the 'go' now. As old Ranjit singh used to say, when looking at the map of India—'sub lol ho jaga, I say 'sab Blank verse ho jaga'

প্রকাশ পেয়েছে, তা' লিরিকের প্রাণব্যাকুলতাকে সঙ্গী ক'রে জীবনের এক চিরন্তন পিপাসাকে চিত্রিত করেছে। গম্ভীর ও মধুরের এক অপরূপ সম্মেলন এই কাব্যে। 'মেঘনাদ বধের' প্রমীলা চরিত্রে নারীহৃদয়ের প্রেমবৃত্তির যে সোচ্চার বলিষ্ঠতাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন তারই পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটালেন এই কাব্যে। প্রত্যেকটি পত্রিকাতেই একটি নাটকীয় রসসঞ্চারও ঘটেছে। নারী চরিত্রে এক আত্মসচেতন প্রেম প্রকাশ ঘটেছে বলেই এই কাব্যসৃষ্টিরও সঙ্গে একটি অপরূপ প্রজ্ঞার স্বাক্ষরও সমুজ্জ্বলরূপ লাভ করেছে। কারণ, ভাবীকালের যুগোপযোগী নারী চরিত্র কল্পনার তিনিই প্রথম উপাদান জুগিয়ে গিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হয়না। Ovid যেমন দুই একটি পত্রে সমাজ বিরুদ্ধ প্রেমের অকুণ্ঠ অবতারণা ক'রে গিয়েছেন, কবি মধুসূদনও মনোজগতের সত্য দিয়ে দুই একটি পত্রিকাকে ভূষিত করতে চেয়েছেন। অন্তরের সত্যকে সব সময়েই কাব্যজগতের সত্য বলে গ্রহণ করা হয়। রোমান্টিক প্রণয়াবেগের চিরকালীন রূপচিত্রই 'বীরাঙ্গনা কাব্যের বিশিষ্ট কয়েকটি পত্রিকায়, এবং এই রূপচিত্রের সঙ্গে যুগচেতনা মিশ্রিত হ'য়ে এই সৃষ্টিকে একটি দীপোজ্জ্বল কাব্যমহত্ত্ব দান করেছে।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র শূর্পণখার প্রেমে নীড় বাঁধার বিশেষ কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না বলেই মনে হয়; ছিল শুধু রূপমুগ্ধ-নারীমনের ভোগলালসার তীব্রতা। এইজন্যই সে কেবল লক্ষ্মণকে তার ঐশ্বর্যের সমারোহের কথাই বলেছে, কোন স্নিগ্ধ ও বিশ্বস্ত প্রেমের আশ্বাস ছিল না তার মধ্যে। আর শকুন্তলা কিংবা তারার মধ্যে ঐশ্বর্যের কোন প্রকাশ নেই, আছে শুধু আন্তরিক প্রেমের বিনীত প্রকাশ, নিঃসন্দিগ্ধ প্রেম-প্রত্যয়ের ব্যাকুল উচ্চারণ। কিন্তু তারার প্রেমে প্রতিকূল সমাজসম্পর্কের জন্য তার নারী হৃদয়ে একটি পৃথক ধরণের জটিল এবং প্রচণ্ড আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। তার বহুদিনকার প্রচ্ছন্ন প্রেম-তরঙ্গ অতর্কিতেই হৃদয়ের তটভূমিতে আঘাত হানছিল, আর সেই প্রাণচাঞ্চল্যের রন্ধ্রপথ ধরেই তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের তারার মতো ক'রে মধুসূদন যদিও তারার চরিত্র অঙ্কিত করেননি, কিন্তু তার চরিত্রে নারীপ্রেমের যে-ভীতিহীন বলিষ্ঠ প্রকাশের উজ্জ্বলতা দেখিয়েছেন, তারই অনুসারী হয়েছেন পরবর্তী যুগের কবিসাহিত্যিকেরা নারী চরিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে। যিনি মহৎ প্রতিভার অধিকারী, তিনি এমনি করেই প্রতি যুগে পথিকৃৎ হ'য়ে দেখা দেন। প্রেমের ক্ষেত্রে নারীর স্বাতন্ত্র্য প্রকাশে বাঙলা দেশে প্রথম পুরোধা তিনিই। যুগচেতনাকে অন্তরে গ্রহণ ক'রে এও তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। রঙ্গলাল পদ্মিনী-উপাখ্যানে পয়ার ত্রিপদীকেই অবলম্বন ক'রে মৃত্যুবরণের মধ্যে নারীর বিজয়িনী-রূপকে পরিস্ফুট করেছিলেন, মধুসূদন তার স্বাতন্ত্র্যকে স্বাক্ষরিত করলেন ছন্দোমুক্তির উজ্জ্বল প্রয়াসে ও নূতন যুগের নব জাগৃতির মুক্তিমন্ত্রকে নারীচরিত্রের প্রাণ চেতনার মধ্যে ঠাঁই দিয়ে। এইজন্যই তাঁর 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র তারা অন্তরের প্রেম প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশ একটু প্রগল্ভা। নারীহৃদয়ের সুগভীর রহস্যানুভূতিকেও কাব্যের নূতন গঠন সৌকর্যের মাধ্যমে তিনি এক নূতন রসরূপায়ণ দিয়েছেন। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র অধিকাংশ নায়িকাদেরই একটি সুগভীর প্রেম-বিহ্বলতা আছে, এবং তাদের নারী-হৃদয়ের প্রেম-বিহ্বলতাকে অবলম্বন করেই এক অপরূপ গীতি মাধুর্যের রসধারা উৎসারিত হয়েছে এই কাব্যে।

'মেঘনাদবধ কাব্যে' বিদেশী ভাবকল্পনার প্রেরণা যেমন বেশি কাজ ক'রে গিয়েছে কবি মনে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' বেশ কিছুটা কাজ করেছে দেশীয় ভাব। কিন্তু তা' হ'লেও স্তবক নির্মাণের প্রেরণা তিনি পেয়েছেন ইটালী দেশের Ovid-এই স্তবকরূপ Oltava Rima থেকে। কিন্তু 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' কবি মধুসূদনের কল্পনা-মাহাত্ম্য মৌলিকতা অর্জন করেছে সেইখানে, যেখানে তিনি রাধাকে Mis রূপে দেখেও ভারতীয় মানস সংস্কারকে বর্জন করতে পারেন নি। কিন্তু এই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে, বাঙলা গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে স্তবক-রচনার যে-কুশলী স্বাক্ষর তিনি রেখে গিয়েছেন, তাতে প্রাচীন প্রথার ত্রিপদীর ঐতিহ্য স্বীকৃতি পেয়েও তাঁর মৌলিক কবিপ্রতিভা অবিস্মরণীয় সৃষ্টি মহত্ত্বের এক সোচ্চার ছন্দরূপ লাভ করেছে। নিত্য নব নব ছন্দ সৃষ্টির জন্যও যে মধুকবির একটি মানসিক প্রবণতা ছিল, তারও এক সংবেদন-ভরা প্রকাশ দেখি 'ব্রজাঙ্গনা'র কবিকর্মে। তিনি এখানে নবতম ছন্দবিন্যাসরীতিকে অত্যন্ত সজাগ

ভাবেই আবাহন ক'রে এনেছেন, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ লাভ করা যায় বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর কাছে ode সম্বন্ধীয় কয়েকটি লিখিত পত্রে।

এই কাব্যর নার ক্ষেত্রে আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কাব্যটি লিখিত হচ্ছিল 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার সমকালেই। একটিতে ছিল সমুদ্রের বজ্রগম্ভীর উদাত্ত ছন্দমুখরতা, অন্যটিতে যেন শান্ত বাঁশরীর স্নিগ্ধ মধুর তান। মধুসূদনের মধ্যে সে একটি উচ্ছ্বসিত গীতি কবির মন লুকিয়ে ছিল, তাই নূতন ক'রে মুক্তির পথ রচনা করতে চেয়েছে এই কাব্যে। কল্পনা ও ভাব-প্রবাহের স্বচ্ছন্দতায় এবং মানবীয় অনুভূতির সুকল ছন্দের সাবলীলতায় বহিরঙ্গ দৃশ্যসজ্জার সঙ্গে একটি প্রেমাকুল নারীহৃদয়ের যে অপরূপ আকুলতার প্রকাশ ঘটেছে, এবং এই প্রকাশের মধ্যেই যে ব্রজাঙ্গনার যথার্থ কাব্যমহত্ত্ব তা' অস্বীকার করার উপায় নেই। রাধার প্রেমানুভূতি উদ্দীপন বিভাগ রূপে মধুকবি যে 'প্রতিধ্বনি' 'জলধর' প্রভৃতিকে এনেছেন, তার সঙ্গে রয়েছেন তাঁর সৃষ্টিকারীনী কবিকল্পনারই অম্লান স্বাক্ষর।

এই কাব্যটির রচনাকালে পত্রে যখন বন্ধুর কাছে লেখেন, Mrs Radha was not a bad woman, তখনই বুঝা যায়, এই কথা কয়টির উচ্চারণে ধ্বনিত হয়েছে কবির একটি চরিত্রসৃষ্টির বাসনা, যে-নারী চরিত্রটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক পটভূমিতে নিজের চিত্তকে দাঁড় করিয়ে প্রিয় বিরহের বেদনার বিধুরতার মধ্যে নিখিল বিরহিনী-নারীর প্রতিনিধি স্বরূপা হ'য়ে দেখা দেবে। মধুসূদন কোনদিনই আধ্যাত্মিকতাবাদী ছিলেন না, পরিপূর্ণ জীবনধর্মী মানবতাবাদের উপর ভিত্তি ক'রে তাঁর মানসিক গঠনটি গ'ড়ে উঠেছিল। এই জন্যই তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা একেবারে মানবী হ'য়ে দেখা দিয়েছেন। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নারীমন যেন একই সহমর্মিতার সূত্রে বাঁধা এবং এইজন্যই একজন বিদগ্ধ সমালোচক বলেছেন—'বিশ্বসংসারকে আপন বিরহের দিব্যোন্মাদময়ী দৃষ্টিতে গ্রহণ করাই ব্রজাঙ্গনার বিশেষত্ব।' চিরদিনকার বিরহের কথা রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গকে অবলম্বন ক'রে এই কাব্যে আরও একটু সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে এবং বাঙলা সাহিত্যের একটি বিশেষ গীতিকবিতা হ'য়ে উঠেছে। এই কাব্যের আনন্দ অনুভবের মধ্যে সব চেয়ে বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে প্রকৃতিরস। মানবরস ও প্রকৃতিরসের সম্মিলিত মহিমায় এই কাব্যের মহত্ত্ব।

'ব্রজাঙ্গনা'র রাধা বৈষ্ণব সাধনার আশ্রয়স্বরূপা মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা নয়, কারণ বৈষ্ণব কবির তপস্যাধৃত যে-অধ্যাত্মলোকের মানসতৃষ্ণা, তা' এর মধ্যে এতটুকুও নেই ; বৈষ্ণব কবিতার গঠনভঙ্গী ও বৈষ্ণব কবির শ্রীরাধার প্রেমকল্পনায় ক্রমবিকাশের স্তরবাদী অধ্যাত্ম-পরিণতির শান্তমাধুর্য নেই। এখানে দেখি শুধু কেবল ইন্দ্রিয় নির্ভর প্রেম-প্রকাশের সুগভীর আর্তি। এইজন্যই বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাব মাধুর্যের যে-গভীরতা তা' এই কাব্যে একেবারেই অনুপস্থিত। পদাবলী সাহিত্যের বিশিষ্ট আসন গানের জগতে, আর মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা'র একান্ত স্থান পঠন-পাঠনের মধ্যে। চণ্ডীদাসের রাধা নিসর্গ-প্রকৃতির মেঘ ও ময়ূরীর মধ্যে তাঁর প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের রূপ মহিমাকে দেখে ভাবোন্মাদিনী হয়েছেন ; কিন্তু মধুসূদনের রাধা প্রকৃতি-জগতের 'জলধর', 'ময়ূরী', 'ঊষা', 'গোধূলি', 'কুসুম', প্রভৃতিকে তাঁর বিরহ-বিধুর প্রাণের অংশভাগিনী রূপে গ্রহণ করেছেন ; তাদের অপার্থিব রূপের মধ্যে চিরারাধ্যের একাগ্রতাকে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই বৈষ্ণব কবির ভাবগভীরতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিশিষ্টতা 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য'কে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারেনি ; যদিও তিনি বৈষ্ণব রীতিতে ভণিতা প্রয়োগের দিকটি সজ্ঞান প্রয়াসের সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন। ভাষা বিন্যাসের সঙ্গেও ভাব মাধুর্যের যেন তন্ময়তা সাধিত হয়নি। এইজন্যই মনে হয়, কবি তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণকে ধর্মীয় মনোভাব (religious bias) ত্যাগ ক'রে এই কাব্য পাঠ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। 'ব্রজাঙ্গনা'র 'মিসেস রাধা' কথাটিই এই ইংগিত করে যে, বৈষ্ণব কবিতার পূর্বতন ধর্মীয় ভাবমণ্ডল থেকে কবি মধুসূদন শ্রীরাধাকে কেবল রসসৌন্দর্যের রূপপদ্মে প্রতিষ্ঠা দিয়ে নূতন যুগের নায়িকা ক'রে তুলতে চেয়েছেন।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' বৈষ্ণব কবিতার মতো অতলস্পর্শী গভীরতা থাক আর নাই থাক, এর বক্তব্য বা চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে বিদেশী কাব্যের ছায়ামাত্র স্পর্শ করতে পারে নি, কবির ভাবকল্পনা দেশীয় ভাবসংস্কৃতির মধ্যে

অবগাহন ক'রে নিজ দেশের সাহিত্য ঐতিহ্যের প্রতি অত্যন্ত স্পষ্ট শ্রদ্ধাশীলতার স্বাক্ষর রেখেছে, এখানেও 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্যে'র উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য। এইজন্যই তৎকালীন বৈষ্ণব-ধর্মানুরাগী ও কাব্যানুরাগী ব্যক্তিগণ এই কাব্য পাঠে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এও সত্য যে, কবি মধুসূদনের নিজ অন্তর বেদনার রোমান্টিক ব্যাকুলতা রাধার বিরহ-বিলাপের মধ্য দিয়ে একটি মুক্তির পথ খুঁজে নিতে চেয়েছে।

এর পরের কাব্যসাধনায় তাঁর চতুর্দশপদী কবিতা। অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিচেতনাময় জীবন জিজ্ঞাসার অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর চিহ্নিত হ'য়ে আছে তাঁর এই কবিতাগুলিতে। যখন তিনি সনেটগুচ্ছ রচনা করেন, তখন মহাকাব্যের কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি বাঙলা দেশে সুদূর প্রসারী হ'য়ে দেখা দিয়েছে। সুদূর ফরাসীদেশে বসে জীবনের এক নিরাশ্বাস দুর্যোগময় দিনে এই 'সনেট' রচনার মানসিকতাকে তিনি লাভ করেছিলেন। অবশ্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার সমসাময়িক কালে তিনি একটি সনেট রচনা ক'রে বাঙলা সাহিত্যে সনেটের রূপৈশ্বর্যের যে একটি প্রতিশ্রুতি আছে, সে-কথা তাঁর রসজ্ঞ বন্ধুকে জানিয়েছিলেন। তাঁর কবিআত্মা কাব্যবীণার তারে বিচিত্র ভাবরসে ভরা মর্ম-সংগীত গাইবার সাধনা করেছিল সেদিন এবং ব্যক্তি-মধুসূদনকে পুরোপুরিভাবে আমরা পাই এই কাব্যটিতে। সনেটের দৃঢ়বদ্ধ আঙ্গিক এবং বাদবন্ধের গাঢ় প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা ক'রে যে-রসঘন পরিপূর্ণতা কবির মানস-বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে তা' মধুসূদনের কয়েকটি সনেটে রূপময় হ'য়ে উঠেছে বটে, কিন্তু সবগুলো সনেট যথার্থ রসরূপ এবং বাকসংযমের নিবিড়তায় সার্থক হ'য়ে উঠতে পারেনি। সনেটের প্রাণস্পন্দন গাঢ়বদ্ধতার রসসৃষ্টিতে। অনেকগুলি সনেটে মহাকাব্যিক লক্ষণ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে ব'লে সনেটের এই গুণটিকে বহু পরিমাণে নষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু কল্পনার বিশালতার স্পর্শ একটি পৃথক রসাস্বাদও সঞ্চারিত করেছে। এই সনেট রচনার সময়েই দেখতে হবে, তিনি প্রকৃতি-বর্ণনার মধ্যে লিরিক-মাধুর্যের এক অপরূপ সুর সংযোজন ক'রে রোমান্টিক ভাবাবহ দৃষ্টিতে বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে একটি সত্যকার আধুনিক গীতিকাব্যের যুগকে আবাহন জানিয়ে যাচ্ছেন। রোমান্টিক কল্পনা-কুশলতার দিক দিয়ে 'বঙ্গভাষা' 'তারা', 'ব্রজবৃত্তান্ত' 'নূতন বৎসর' প্রভৃতি সনেটগুলি একটি আশ্চর্য সুন্দর রসশ্রী লাভ করেছে। রোমান্টিক ভাবাকুলতাই গীতিকবিতার প্রধানতম সুর, এ-সত্যটি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন; এই জন্যই চতুর্দশপদী কবিতার গীতে তিনি বহুক্ষেত্রে প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে একাত্ম হয়ে দেখা দিয়েছেন। অন্তরের গভীরতম উপলব্ধি এবং জীবন-পিপাসার সার্থকতম সম্মেলনেই মধুসূদনের চতুর্দশপদীতে একটি মহৎ কাব্যরূপ দেখা দিয়েছে। দুই একটি সনেটে (যেমন 'নূতন বৎসর', 'বঙ্গভাষা' প্রভৃতি) রসপরিণতির আত্মস্থতাও অতি সুন্দরভাবে এসেছে। তাঁর কবিকল্পনার সবচেয়ে বড় মহত্ত্ব যদিও ক্লাসিক ভাবনার সমুন্নতিতে, তবুও এই দিক দিয়ে তিনি বাঙলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে রোমান্টিক গীতি কবিতারও পথিকৃৎ।

সনেটগুচ্ছ রচনার বেলাতেও অবশ্য তিনি বিদেশী কবিতার গঠন রীতিকেই গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বাঙলা কাব্যদেহে একটি নূতন উজ্জ্বল ভূষণ পরিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁর মাতৃভাষা কতটা সুমিষ্টতার অধিকারিণী তাও তিনি গৌরবের সঙ্গে উল্লেখ ক'রে গিয়েছেন এই সনেটগুচ্ছ রচনার সময়েই। তিনি একটি চিঠিতে বলেছিলেন,—'এর (বঙ্গ-ভাষা) মধ্যে একটি মহতী-ভাষার উপাদান লুকিয়ে আছে',৬ এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তিস্পর্শে এর সমুন্নত রূপকেও দেখা যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন। মাতৃভাষার ঐশ্বর্যের দিকে চেয়ে তিনি নিজের প্রতিভাকে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই ইতালির কবি পেত্রার্কের অনুসরণে সনেট রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন, আমার বিনীত অভি-মত অনুযায়ী এই বলতে চাই যে, যদি যথার্থ প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা চর্চা করেন, তবে আমাদের বাঙলা ভাষার সনেট একদিন ইটালী দেশের সনেটের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়াবে।৭

(৬) Our Bengali is a very beautiful language, it only wants man of genious to polish it up. * * It is, or rather it has the elements of great language in it.

(৭) In my humble opinion, if cultivated by men of genious,our sonnet in time would rival the Italian.

কাব্যক্ষেত্রে তাঁর একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ছিল বলেই তিনি সনেট সম্বন্ধে বলতে পেরেছিলেন এই কথাগুলি, আর কাব্যমহত্ত্বের একটি উৎসবমালা রচনা ক'রে গিয়েছেন বঙ্গ-ভারতীর মন্দির প্রাঙ্গণে। মধুসূদনের কাব্যমহত্ত্ব তাই বহু পরিমাণে নিজের কাব্যোপলব্ধির স্বচ্ছতা ও দৃঢ়তার মধ্যে নিহিত। বক্তব্যের গাম্ভীর্য অনুযায়ী শব্দসৃষ্টি ক'রে ভাষাকে ঐশ্বর্যশালিনী ক'রে তোলা মহৎ কবিরই একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। মধুসূদন ঠিক সেই শ্রেণীর কবি। বাঙলা সনেট সত্যিই আজ যে-কোন দেশের যে-কোন শ্রেষ্ঠভাষার সনেটের পংক্তিতে একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়াতে পারে। সনেটের মধ্যে তাঁর যে কাব্যমহত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়েছে, তাতে আলোকরশ্মি সংযোজন করেছে তাঁর কবি-মানসের দেশপ্রীতি, মানবপ্রীতি, দেশ বিদেশের অবিস্মরণীয় প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা, এবং নিজ জাতীয়তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব।

জগৎ এবং জীবনের প্রতি মধুসূদনের যে-দৃষ্টি, সে হচ্ছে মহাকবির দৃষ্টি। ভাষাকে সত্যিকার ক্লাসিক মর্যাদায় ভূষিত করতে চেয়েছিলেন তিনি এবং সেইজন্যই উপমা প্রয়োগে এবং চিত্রকল্পের প্রত্যক্ষতা ও স্পষ্টতার দিক দিয়েও তিনি চিরদিনই ক্লাসিকধর্মী। কাব্যদেহ নির্মাণে তাঁর একটি ভাবগাম্ভীর্য আছে, মহাকাব্যিক রস-আবেদন সৃষ্টিতে সমুন্নতি আছে, কল্পনার বিশালতা আছে, ভাস্কর্যসুলভ সৌকর্যের মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্যও প্রকটিত হয়েছে, এবং রোমান্টিক কবিসুলভ সংবেদনশীলতা থাকলেও ভাবাকুলতার যে সুদূরাভিসার তা' নেই: কাব্য কল্পনায় যেমন তিনি বিদেশীভাবের সঙ্গে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভারতীয় সংস্কারের এক শিল্পসুন্দর সমন্বয়-সাধন করেছেন, উপমা-প্রয়োগেও হোমারের প্রভাবকে স্বীকৃতি দিয়ে ভারতীয় আদর্শকে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছেন। উপমানের বিস্তৃতির দ্বারা মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য সৃষ্টি করেছেন; আবার বীরত্ব-ব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করার জন্য যেমন সিংহ, ব্যাঘ্র, দাবাগ্নিকে গ্রহণ করেছেন, তেমনি কখনো কখনো শিবের ললাটস্থিত অগ্নিকেও উপমান হিসেবে গ্রহণ ক'রে তাঁর অন্তরের ভারতীয় সংস্কারকেই জয়ী ক'রে তুলেছেন। উপমান শিল্পের এক অপরূপ প্রতিষ্ঠা হয়েছে তাঁর কাব্যে।

নূতন একটি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যেমন মহিমোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে বাঙলা কাব্যজগতে তাঁর স্রষ্টারূপে, তেমনি তাঁকে রসধর্মে কালোত্তীর্ণ করার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে তাঁর কাব্যমহত্ত্ব। মহৎ কাব্য দেশের লোককে নিজ অন্তরের গভীর সত্যকে নিবিয়ে দেয়, দেশের ঐতিহ্যকে চিরন্তনত্বের আদর্শে প্রতিষ্ঠা দিয়ে বিশ্বের দৃষ্টিকে আকর্ষণ ক'রে আনে; মধুসূদনের কাব্যমহত্ত্ব আমাদের বাঙলায় ঠিক তাই করেছে। তাঁর ভাবকল্পনা এবং তাঁর অংকিত প্রত্যেকটি চরিত্রই বাঙালী-হৃদয়ের গভীর আবেগ নিয়ে গড়া; চরিত্রগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেন অনেকটা বাঙালী হ'য়ে উঠেছে। তাই তাঁর কাব্যগুলি আমাদের চিরদিনকার প্রাণের বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মহৎকাব্যের আধুনিকত্ব চিরকালের। মধুসূদনও বাঙলা সাহিত্যের দেউল-অঙ্গনে চিরদিনকার আধুনিক কবি।

চণ্ডালিনী

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

হেথা উদাসীন শ্মশানে বসিয়া
কি হেরো গো তুমি চণ্ডালিনি ?
অঙ্গারে-ভরা ভয়াল প্রদেশে,
বিবাগিনী বেশে আলুথালু কেশে,
বিবিক্ত হাসি হাসিয়া কি শেষে
শ্মশানেশ্বরে ল'বে গো জিনি' ?
তাই ব'সে থাকো চণ্ডালিনি !

(২)

শ্মশান বন্ধু খাটে-খাটিয়ায়
বহি' আনে শব শ্মশান-দেশে।
চিতায় চিতায় কাষ্ঠ সাজায়,
'হরি'-ধ্বনিতে আকাশ বাজায়,
বৈশ্বানরের লোল রসনায়
স'পে দেয় দেহ হায় রে শেষে।

(৩)

ক্রন্দ-নরোল—'বল হরি'-বোল
অ-বাক্ শ্মশানে স-বাক্ করে।
ভস্মের ভারে, পোড়া অঙ্গারে
নির্ব্বেদময় দেখায় চিতারে ;
তুমি ব'সে একা তা'রই একধারে
প্রতীক্ষা করো কাহার তরে ?

(৪)

সে কি মহাশিব ? হেরিবারে তা'রে
তন্দ্রাও তব নয়নে নাই ?
মড়া-পোড়াবার জনতার ভিড়—
শ্মশান-বিষয়ে অন্ধ—বধির ;
দেহ নিয়ে তা'রা নিত্য অধীর ;
বোঝে না যে দেহ—চিতার ছাই।
পৃথিবী শ্মশান,—বোঝে না তো তা'রা—
শ্মশান ব্যতীত জীবনও নাই।

(৫)

বুঝি সবই বোঝো, এত তাই খোঁজো
চিতা-রহস্য সংগোপনে !
মুণ্ডমালিনী কালেশ্বরেয়ে
এ ভাবেই শুনি শুধু খুঁজে ফেরে ;
চণ্ডালিনি গো, তুমিও কি কেড়ে
নিতে চাও তা'রে জীবন-পণে ?

(৬)

শ্মশান-সুধার স্বাদ পেলে বুঝি !
শ্মশানে কি তাই নিয়েছ বাসা ?
চণ্ডালিনি গো, চিতা যত জ্বলে
দেহ-দাহ-করা বিলোল অনলে
মহাকালে বুঝি হেরো পলে পলে
চির-অপরূপ—মূর্ত্তি নাশা !

(৭)

শিখাও—শিখাও—মোরেও শিখাও
চিতার শিখায় পড়িতে পাঠ।
দেহ পুড়ে গেলে, বি-দেহ যা' থাকে—
চিনে নিতে দাও সেই আত্মাকে ;
সূতিকা-শিয়রে—চিতা-ফাঁকে ফাঁকে
লীলায় চলেছে তাহারই নাট।
চণ্ডালিনি গো, শিখাও আমারে
চিতার শিখায় পড়িতে পাঠ।

(৮)

চিতা শাশ্বত ;—জীবন সতত
সজ্ঞানে সেথা জ্বালাতে হবে।
পাবকে পুড়িলে যাহা ভঙ্গুর,
মোহ-মহামায়া সবই হবে দূর ;
শ্মশান-শিবের ডম্বরু-সুর
শ্রবণের দিনও আসিবে তবে।
—সজ্ঞানে সবই জ্বালাতে হবে।
সর্ব্ব সত্তা শ্মশানেশ্বর
সহজে তখন ল'বে গো জিনি'।
শ্মশান-পাগল করগো আমারে
নির্ব্বেদময়ী চণ্ডালিনি !

পদ্মাক্ষ
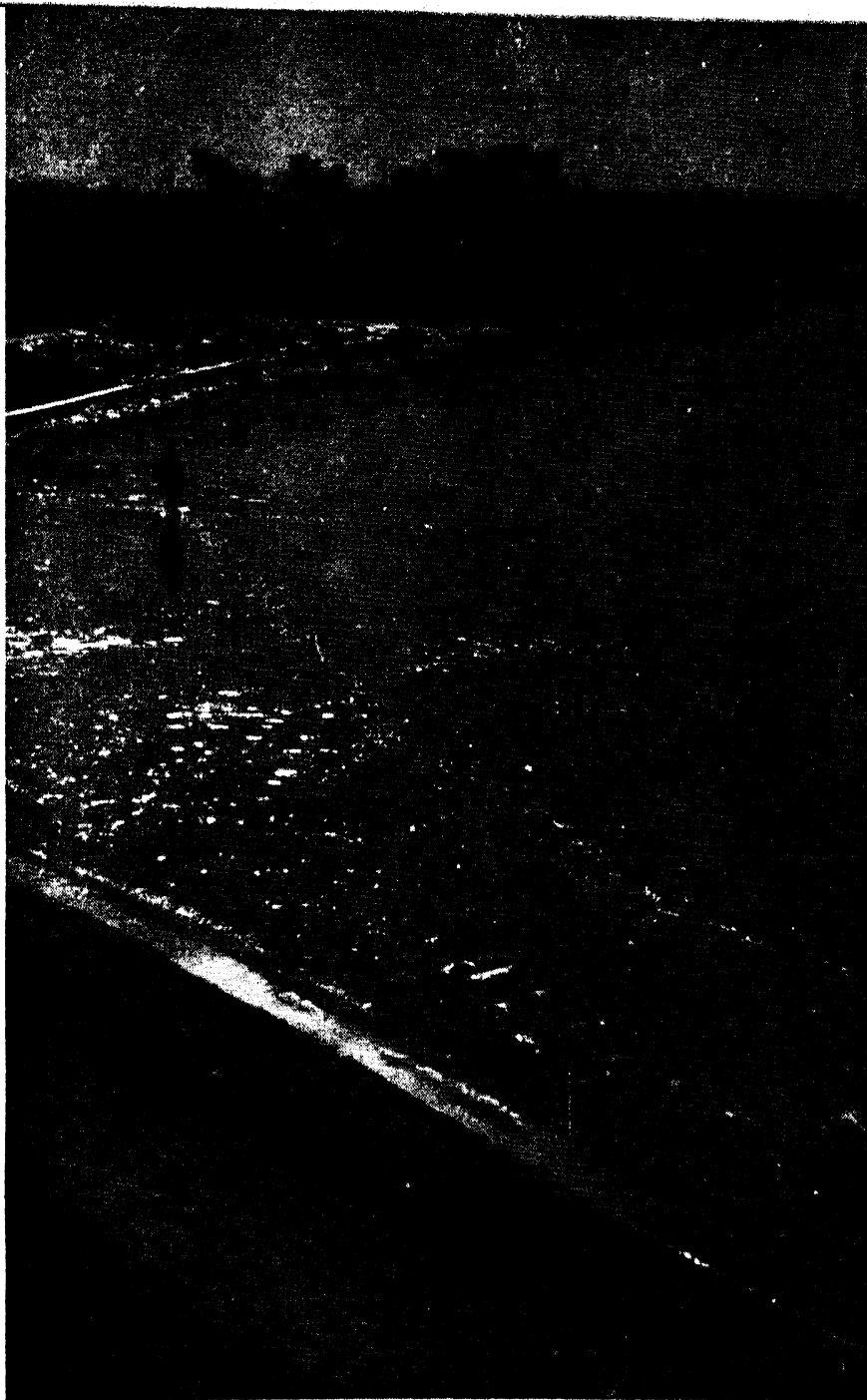
ফটো : চঞ্চল মিত্র

মধ্যমা

ফটো : প্রাণগোপাল পাল
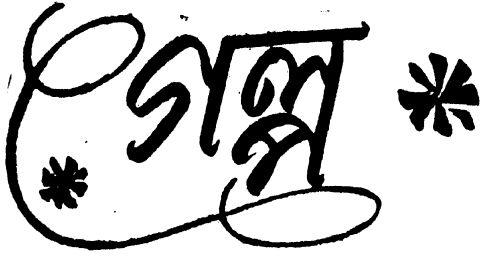
বাড়ী

শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী

সহরের উপকণ্ঠে একটি চমৎকার ছোট্ট বাড়ী দেখে কেমন ইচ্ছে হলো—দেখি বাড়ীটি কেমন! এইরকম একখানি বাড়ীই আমার চাই। বৃদ্ধবয়সে জীবনের বাকী ক'টা দিন কাটানোর পক্ষে এইরকম পরিবেশই তো দরকার। মোটর থামিয়ে রাস্তা পার হ'য়ে একটি ছোট বাঁশের গেট ঠেলে গিয়ে দাঁড়ালুম একটি ছোট বাগানের মধ্যে। বাড়ী ও বাগান—ছুইই নতুন। নানারকম বাহারী ফুলের চারা। ছুটি কলমী আমগাছ, পেয়ারাগাছ আর কলাগাছ। একপাশে একটি কুয়ো।—বাঃ, বাড়ীটি সুন্দর বটে। কেমন এক শান্তির ভাব যেন বাড়ীটিকে ছেয়ে অ'ছে। খানিক দ্বিধার পর এগিয়ে গিয়ে সম্মুখের দরজায় টোকা দিলুম। খানিক পরে এক যুবক দরজা খুলে বেরিয়ে এলো এবং আমায় অভ্যর্থনা কোরে নিয়ে গিয়ে ঘরের মেঝেয় আসন পেতে বসালো। ঘরখানি ধূপ আর বেল-ফুলের গন্ধে ভরা—কোনো খ'নে কোনো জিনিষ নেই—কেবল দেওয়ালে ছুটি বড়োবড়ো ছবি। সে বললে—তার স্বর্গগত বাবা মার ছবি।

আমাদের আলাপ গভীর হতে দেরী হলো না—জানতে পারলুম বিমল অর্থাৎ যুবকটি সংসারে সম্পূর্ণ একা। তার একমাত্র সম্বল এই বাড়ীটি ছেড়ে কিছুদিন বাইরে থাকতে চায়—তবে কোথায় পাবে তেমন এক জনকে যে ঠিক তার মতোই যত্নে রাখবে বাড়ীটি।

আমিও যে বাড়ীর সন্ধানে আছি, আর এই ছোট্ট চমৎকার বাড়ীখানির টানেই যে আমি হাজির হয়েছি—তা কথায় কথায় বিমলের অজানা রইলো না। বিমল খুবই আন্তরিকভাবে বললে—'আমি' একান্ত সুখী ও নিশ্চিন্ত হবো যদি আপনি আমার বাড়ীটির ভার নেন। টাকার জন্যে আমি মোটেই ভাবছি না—ভাবছি যোগ্য মানুষের জন্যে—যার হাতে আমার এই পরম প্রিয় নীড়টি স'পে দিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরতে পারি।—তারপর আমি ফিরে এলেও আপনার জায়গার অভাব হবে না।'

'তোমার এমন ইচ্ছে কেন হলো?' অবাক হয়ে বলি।

'সে কথা পরে জানতে পারবেন।'

যাই হোক বিমলের আন্তরিক অনুরোধ আর আমার ঐ শান্তির নীড় থাকার প্রলোভনে তার কথামত কদিন পর জিনিষ পত্র সমেত চলে এলাম 'স্নেহ-নীড়' এ। পরদিন বিমল তীর্থযাত্রায় বার হয়ে পড়লো—আমার হাতে দিয়ে গেলো একখানি পুরানো খাতা, বললে—'আপনার প্রশ্নের জবাব পাবেন এতে।'

* * 'পেছন হ'তে দেখলে দেখাবে ছুটি মাথা—প্রায় ঠেকে আছে। একটি আমার আর অন্যটি আমার মার। আমরা প্রায়ই বসে কাগজ নিয়ে বাড়ীর নক্সা আঁকি। ছোট্ট একটি ছবির মতো বাড়ী হবে। সামনে একটুখানি জমিতে ফুলবাগান—চাঁপা, টগর, বাঁধানো বকুল-তলা থাকবে—একটি গোলাপঝাড় তো অবশ্যই থাকবে। ফলের মধ্যে পেঁপে, পেয়ারা, লেবু আরও কতো কি গাছ থাকবে। আমাদের মধ্যে প্রায়ই এই নিয়ে মতান্তর হয়ে যায়। আমি এখন হ'তেই আমাদের স্কুলের মালীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছি ও হরেক রকম গাছের চারা আর বীজ যোগাড় করতে পারবো মনে করি। কিন্তু অতো রকম গাছগাছড়ায় ছোট জমিটা জঙ্গল করতে মা চান না। সাপ-খোপের ভয় হবে—পাতা পড়ে পড়ে নোংরা হবে। যে সব গাছ নিয়ে আমাদের কোনও ঝগড়া নেই—তাদের কোথায় লাগাতে হবে তা নিয়েও কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ মনের মিল হয়নি। মা হতাশ করুণ সুরে বলেন,—'না বিলু, তুই কিছুই বুঝিস না—ওদিকে একটা মস্ত ঝাঁকড়া মাথা বকুল গাছ উঠলে অত ফুলে আর শাক

সব্জী রোদ না পেয়ে মিইয়ে যাবে।'—আমি আমার কথাটা বোঝাতে থাকি। নক্সার ওপর লাল পেন্সিল দিয়ে আঁকজোক করি, আর বলি—'মা' একটু ভেবে ভাখো—জমীটা ন্যাড়া কোরে রাখলে কিরকম দেখাবে বলো তো।'

দুটো পাকা ঘর হলেই চলবে। টিনের চালের রান্না আর স্নানের ঘর। সামনে কুয়ো। আমি রোজ বালতী-বালতী জল তুলবো। সংসারের যা প্রয়োজন তা ছাড়াও বাগানের সব জল আমি একাই তুলবো। ভাড়া বাড়ীতে সকাল থেকে পাশের বাড়ীর বাসন মাজার শব্দে আর উনুনের ধোঁয়ায় আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। বাড়ীতে একটুও আলো-বাতাস পাইনা। তার ওপর বাড়ীয়ালা কলের জল নিয়ে নিত্যই অশান্তি ক'রে। সুতরাং আমি আর মা প্রায়ই নিজেদের একটি মনের মতো বাড়ীর স্বপ্ন দেখি। ছোটো একটি বাড়ী, সহর থেকে একটু দূরে গ্রামাঞ্চলে—এমন কি খরচ পড়বে? আমি গ্রামের স্কুলে পড়তে রাজি। নিজেদের বাড়ী, ফাঁকা জায়গা—এর একটা আকর্ষণ আছে আমার কাছে।

—'কতো খরচ পড়বে গো?' মা বাবার দিকে আশা—ভয় মিশ্রিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন। বাবা নক্সা দেখে একটু ভেবে বলেন,—'এই হাজার চারেক তো পড়বেই।' মা বলেন,—'আমার গয়না আছে হাজার দেড়েকের—বাকীটা তুমি অফিস হ'তে ধার পেতে পারো না?' আমি বাবার দিকে গোল গোল চোখ কোরে চেয়ে থাকি। বাবা একটু চুপ কোরে থেকে বলেন,—'ধার শুধবে কি কোরে? সুদও আছে।' আমরা বলি,—'খুব টেনে চালাবো। বাগানে শাক-সব্জী হবে—কেবল চাল ডাল মশলা কিনলেই হবে।' বাবা হেসে বলেন, 'আমার অফিস যাবার খরচ বেড়ে যাবে যে।' আমরা ভড়কে যাই। বাবা তখন সাহস দিয়ে বলেন,—'ভাখোনা—দু এক বছরের মধ্যে অবস্থার উন্নতিও হ'তে পারে।'

অবস্থার উন্নতির বদলে অবনতিই হলো। মার হঠাৎ অসুখ হলো ভয়ানক রকমের। ডাক্তারে ওষুধে যথাসর্বস্ব গেলো ও দেনাও প্রচুর হয়ে গেলো। শেষের কদিন মা আমায় বলতেন,—'বিলু, আমাদের আর নিজের বাড়ী হলো না রে।...আমিই সব নষ্ট কোরে দিলুম—কি রোগই যে ধরলো।...তোর বাবার এই কষ্ট। তুই মানুষ হোস্ তো আগেই বাড়ী করবি, আর বাবাকে সেই বাড়ীতে রাখবি।'

এ আজ প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। আজ বাবা ও মা কেউ নেই। বাবার জীবনবীমাটি জানি না সেই দুর্দিনে কি কোরে টিকে গিয়েছিল। সেই টাকাতেই লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়ালুম—আর বাকী টাকায় এই বাড়ীটি করলুম মায়ের নক্সা অনুযায়ী, আর তাঁর নামেই বাড়ীর নাম রাখলুম—'স্নেহনীড়'।

—প্রায় এক বছর হ'তে চললো একা এখানে বাস করছি। এখন আর পারছি না। চিরকাল বাবা মা সহরের এঁদো গলির ঘিঞ্জি ছোট্ট বাড়ীতে কি কষ্ট কোরেই কাটিয়েছেন। তবু বাড়ীটি প্রাণপণ কোরে তৈরী করালুম মায়ের আত্মার শান্তির জন্য। বাবাও অল্পদিন পরেই মায়ের কাছে চলে গেলেন—আমার বাড়ীতে তাঁর থাকা হয়নি। এ বাড়ী কি তাঁরা দেখছেন কোথাও থেকে?—এই প্রশ্নই আজ সঙ্গী আমার তীর্থ-যাত্রাপথে।'

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

"ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী
গরজে সিন্ধু চলিছে তরণী।" দ্বিজেন্দ্রলাল।

প্রায় ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে সাগর সন্নিকটে, বরিশালের বিশাল তরঙ্গাকুল নদীবক্ষে, রাত্রিকালে তণ্ডুলপূর্ণ একখানা নৌকা অনুকূল বায়ু ও স্রোতে তীরবেগে ছুটিতেছিল। তরণীর একমাত্র আরোহী একজন তরুণ স্বেচ্ছাসেবক। হঠাৎ একদল জলদস্যু নৌকা আক্রমণ করিল। বিংশ-শতাব্দীর প্রথম দশকে বরিশালের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে অসংখ্য নদীনালায় দিবাভাগেও ডাকাতের দল নৌকা আক্রমণ করিয়া, আরোহীদের হত্যা করিয়া, অর্থ ও দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিত। তখন সেখানে জলে কুমীর ও ডাকাত, এবং ডাঙ্গায় বাঘ ও সাপ একসঙ্গে বাস ও বিচরণ করিত।

ডাকাতের অতর্কিত আক্রমণে নৌকারোহী যুবক কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া দস্যুদের উদ্দেশে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—"এ বাবুর নৌকা।" অবস্থা বিশেষে মানুষ হিংস্র জন্তু মাত্র। কিন্তু নির্ভীক যুবকের মুখে 'বাবু' নাম উচ্চারণে ডাকাত দল মন্ত্রমুগ্ধ এবং মুহূর্ত্তমধ্যে শান্ত হইল এবং যুবকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া দস্যুদলপতি নিবেদন করিল "এই আকালের সময় নদীভর ডাকাত নামিয়াছে। আমরা বাবুর নৌকা পাহারা দিয়া আপনার গন্তব্যস্থল পর্য্যন্ত যাইব এবং বাবুর নৌকা অপর কোন দস্যুদলের আক্রমণ ও লুণ্ঠন হইতে রক্ষা করিব।

প্রত্যূষে নৌকা নদীতীরে সংলগ্ন হইলে যুবক বলিলেন যে তাঁহার গন্তব্যস্থল অদূরবর্ত্তী একটি গ্রামের ত্রাণকেন্দ্র এবং সেখানে স্থলপথে চাউলের বস্তা পৌঁছাইতে হইবে। ডাকাতেরা স্বেচ্ছায় বিনা পারিশ্রমিকে বস্তা বোঝাই চাউল মস্তকে বহন করিয়া ত্রাণকেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ কালে "বাবুর" উদ্দেশে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

উপর্যুক্ত ঘটনা বাংলা ১৩১৩ সালের। তখন বরিশালে দারুণ দুর্ভিক্ষ। যে "বাবুর" নামে ডাকাত দল চাউল লুণ্ঠনকারী ও ভক্ষক না হইয়া রক্ষক হইয়াছিল তিনি—"অশ্বিনীবাবু"—বরিশালের মুকুটহীন রাজা, দেশসেবক, নিখিল ভারতের সর্বজনবরেণ্য নেতা, পুণ্যশ্লোক অশ্বিনীকুমার দত্ত। তৎকালে 'বাবু' নাম শুনিলে বরিশাল জিলায় সর্বত্র যে কোন লোকের চিত্তদর্পণে অশ্বিনীবাবুর প্রেমঘন মূর্ত্তিই প্রতিভাত হইত এবং স্বতঃই তাঁহার উদ্দেশে মস্তক অবনত হইত। নৌকারোহী তরুণ স্বেচ্ছা-সেবকের নাম ডাঃ নিশিকান্ত বসু।

বরিশালপ্রাণ অশ্বিনীকুমারের প্রভাব ছিল অপরিসীম। স্বদেশী যুগে তাঁহার নির্দ্দেশে বরিশাল জিলার ৫২টি আবগারী সুরা বিপণির ৫১টিই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সালিশীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিতেন। ফলে গ্রামে গ্রামে জাতীয়বিদ্যালয়, ব্যায়ামাগার ও সালিশী সংস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। সরকারী বিচারালয়ের মোকদ্দমাসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় অনেকগুলি কোর্ট বা আদালত বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সর্বোপরি তাঁহার বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল। তখন বিলাতী লবণ দেশের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত। অশ্বিনীবাবুর নির্দ্দেশে হাট বাজারে বিলাতী লবণ বিক্রয় নিষিদ্ধ হয় এবং ক্রেতৃগণ বিলাতী লবণ দেখিলেই নদী নালায় ফেলিয়া দিতেন। অনেকগুলি হাট বাজারের মালিক ছিলেন প্রতাপান্বিত ঢাকার নবাব বাহাদুর। তিনি হুকুম জারি করিলেন, তাঁহার জমিদারী এলাকার হাট বাজারে লবণ বিক্রয় বাধ্যতামূলক। কিন্তু তাঁহারই মুসলমান প্রজাবৃন্দ প্রতিবাদ ঘোষণা করিলেন—

"বাবুর হুকুমে লবণ নিষিদ্ধ হইয়াছে; তিনি দুর্ভিক্ষে সকলকে অন্নদান করেন এবং রোগীদের চিকিৎসা ও সেবার বন্দোবস্ত করিয়া পথ্য দিয়া নিরাময় করেন ও বাঁচাইয়া রাখেন—সুতরাং কেবলমাত্র খাজনা আদায়কারক ভূম্যধিকারীর আদেশ অমান্য করা অপরাধ নহে, কিন্তু "বাবুর আদেশ সর্ব্বথা শিরোধার্য্য।" সর্বত্র লবণের কারবার বন্ধ হইল। সরকার এবং জমিদার উভয় পক্ষ পরাস্ত হইলেন। ১৯০৪—০৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে ইংলণ্ড হইতে ২,৫৮,২৭০ মণ লবণ আমদানী হইয়াছিল। পর বৎসর মাত্র ৮১,৪৪৪ মণ আমদানী হয়, কিন্তু তাহাও অবিক্রীত অবস্থায় নদী নালায় নিক্ষিপ্ত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশ লবণ সরবরাহ ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। কেবলমাত্র তমলুক নিমক এজেন্সীতে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ৯৮১,৮৩৫ মণ লবণ উৎপন্ন হইয়াছিল। বাংলার লবণ শিল্প বিদেশী প্রতিযোগিতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্তও বাংলার লবণ শিল্পের আংশিক পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় নাই। অথচ সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে কুটীরশিল্প হিসাবে লবণ প্রস্তুত হইলে সমগ্র দেশের চাহিদা পূরণ হইতে পারে। ১৯০৫-৬ সালে বিলাত হইতে লৌহজাত দ্রব্যের আমদানী ৮৬ লক্ষ টাকা কমিয়া যায়। বিলাতী চিনি লোপ পাইয়া দেশীয় গুড় চিনির স্থান অধিকার করে। স্বয়ং জিলা শাসকের চা প্রস্তুতির জন্য চিনি সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়। সালিশী সংস্থাগুলি এতদূর কার্য্যকরী হইয়াছিল যে পূর্ব্ববঙ্গ আসামের লাট ফুলার সাহেব এই সংস্থাগুলিকে ফরাসী ও মার্কিণ বিপ্লব যুগের 'কমিটি অব্ পাবলিক সেফ্টি' সংস্থার ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ এবং সম্পূর্ণ বিপজ্জনক মনে করিতেন এবং এগুলিকে নিষিদ্ধ ও ধ্বংস করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করেন। কিন্তু উক্ত লাটসাহেব যখন পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তাঁহার ১৪।৮।১৯০৬ তারিখের লিখিত পত্রে অশ্বিনীকুমারের সততা, দেশপ্রীতি, স্বার্থত্যাগ ও মহচ্চরিত্রের অজস্র প্রশংসা করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেন যে তিনি বৃটিশ সরকারের সহযোগিতা করিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে। বলা বাহুল্য, অশ্বিনীকুমারের পক্ষে এই অযাচিত উপদেশ পালন করা সম্ভব হয় নাই। ফুলার সাহেবের পদত্যাগের পর বিলাতী বর্জ্জন ও স্বদেশী আন্দোলন এত সাফল্যমণ্ডিত হয় যে বৃটিশ আইন সভায় বরিশাল সম্বন্ধে আলোচনার সময় ভারত-সচিব এবং পার্লামেণ্ট বরিশাল সমস্যাকে বিশেষ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করেন। লণ্ডন টাইমস্ পত্রিকায় অশ্বিনীবাবুর একচ্ছত্র আধিপত্য ও তথাকথিত স্বেচ্ছাচারের ঘটনাবলী প্রকাশিত হয়। তাঁহার নির্দ্দেশ সামান্যরূপেও অমান্য করার শক্তি কাহারও ছিল না। কেহ করিলে সমাজচ্যুত হইতেন। জেলাশাসকের ভৃত্যদের জিনিসপত্র ক্রয় করিবার স্বাধীনতা ছিলনা। এই প্রকার অনেক খবর বিলাতের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। অবশেষে ভারত-সচিব মর্লিসাহেব অনিচ্ছাস্বত্বেও মহাপ্রাজ্ঞ, ধীমান, দেশ-সেবক, অশ্বিনীবাবুকে ভারতসরকারের সুপারিসক্রমে ১৮১৮ সালের ৩ আইনে ধৃত ও অন্তরীণ করার প্রস্তাব মঞ্জুর করিতে বাধ্য হন।

১৯০৮ সালে অশ্বিনীকুমার লক্ষ্ণৌ কারাগারে নির্ব্বাসিত হইলেন। যুক্তপ্রদেশের লাটসাহেব ও তাহার অধীনস্থ বড় বড় কর্ম্মচারীরা অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় আলাপ করিতেন। স্বয়ং লাট সাহেব এ বিষয় প্রশ্ন করিলে অশ্বিনীবাবু জেলখানায় তাঁহার বাসগৃহের সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণের প্রান্তে অবস্থিত একটি পুরাতন পায়খানা ও তৎসংলগ্ন একটি নিম্ববৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া লাট সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "পায়খানা সরাইয়া নিম্ববৃক্ষমূলে একটী বেদী নির্ম্মিত হইলে সুশোভন হয়।" পরদিনই পায়খানা ভূমিসাৎ হয় এবং কয়েকদিনের মধ্যে নিম্ববৃক্ষমূলে একটি সুন্দর বেদী নির্ম্মিত হয়। অশ্বিনীকুমার বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করিয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ শীতকালে তাঁহার ব্যবহারের জন্য বেনারসী সাড়ির পাড় সংগ্রহ করিয়া জোড়া দিয়া লেপ তৈরী করিয়াছেন। উচ্চতম বৃটিশ রাজপুরুষগণ স্বেচ্ছাচারী হইলেও তাঁহাদের মধ্যে মহানুভবব্যক্তির আবির্ভাব দেখা যাইত। তাঁহারা প্রকৃত দেশভক্ত নেতাদের অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন।

অশ্বিনীকুমারের প্রধান কীর্ত্তি ব্রজমোহন বিদ্যালয়। শিক্ষাব্রতী হিসাবে বাংলাদেশে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও কলেজ সত্য, প্রেম, পবিত্রতার

বাণী ও পতাকা গ্রহণ করিয়া প্রকৃত মানুষ তৈরী করিয়াছে। অশ্বিনীকুমারের এক বিশিষ্ট পরিচয় আদর্শ স্কুলশিক্ষকরূপে। তাই ভগিনী নিবেদিতা দুর্ভিক্ষ সময়ে অশ্বিনীকুমার কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ত্রাণকেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া সোৎসাহে বলিয়াছিলেন—"স্কুলমাষ্টার অত্যুত্তম ও বিস্ময়কর সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং সেবা ও ত্রাণব্রত গ্রহণ করিয়া অপূর্ব্ব সাফল্যলাভ করিয়াছেন।" প্রাক্ স্বদেশী যুগ পর্য্যন্ত শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে অশ্বিনীবাবুর স্কুল ও কলেজের অকুণ্ঠিত প্রশংসার উল্লেখ দেখা যায়। রাজধানীর প্রেসিডেন্সী কলেজের সমকক্ষ শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসাবে ব্রজমোহন কলেজের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অশ্বিনীকুমারের শিক্ষা প্রভাবে ছাত্রদের নৈতিক মান এত উন্নত হইয়াছিল যে পরীক্ষা কেন্দ্রে কোন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করার প্রয়োজন ছিল না। ছাত্রগণ ছাপাখানা হইতে প্রশ্নপত্র আহরণ করিয়া শিক্ষকদের হস্তে প্রদান করিতেন।

বরিশালবাসী অশ্বিনীকুমারকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, নিঃসন্তান অশ্বিনীকুমারকে রোপিত বৃক্ষের প্রথম ফলটি উৎসর্গ করা হইত। তিনি বহুভাষাবিদ্ ছিলেন। তন্মধ্যে বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, উর্দ্দু, আরবী, পারসী, পালি, মারাঠী, হিন্দি ও গুরুমুখী ভাষায় তাহার রীতিমত পাণ্ডিত্য ছিল। এতদ্ব্যতীত তেলেগু, উড়িয়া, ফরাসী ও লাতিন ভাষায়ও অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভক্তিযোগ গ্রন্থের দেশেবিদেশে বহুল প্রচার হইয়াছে। তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা ভক্তিযোগ গ্রন্থেরও ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

আনন্দময় পুরুষ মহাত্মা অশ্বিনীকুমার ১৯২৩ সালের দিপালীর সন্ধ্যায় অনবরত হাততালি দিয়া ভগবন্নাম স্মরণ করিতে করিতে আনন্দসাগরে চিরতরে মিলিয়া গেলেন। সমস্যাসঙ্কুল বঙ্গদেশে বিশেষতঃ বর্ত্তমানের শিক্ষা সঙ্কট সময়ে পূতঃচরিত্র এবং আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তাঁহার কর্ম্মপন্থা সার্থক পরিকল্পনা ও কার্য্যাবলী যত অধিক আলোচিত হইবে এবং আদর্শরূপে গৃহীত হইবে, ততই দেশের কল্যাণ সাধনের পথ প্রশস্ত ও সুগম হইবে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অশ্বিনীবাবুর ঘটনাবহুল বিরাট জীবনের কোন ইতিবৃত্ত লেখা সম্ভব নহে। তাঁহার মহাপ্রয়াণের তিথি উপলক্ষে, তাই তাঁহাকে ভক্তিভরে স্মরণ করিয়া এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের প্রয়াস। তাঁহার জীবনই "সত্যমেব জয়তে"—মহাবাণীর অত্যুজ্জল নিদর্শন।

ঐ শিখা

মসউদ আর-রহমান

অই শিখা জ্বলে নেভে বার বার সভ্যতার ঘরে
স্থির হয়ে, কেঁপে কেঁপে। পৃথিবীকে কতবার আলো
দিল আর নিভে গেল; সব আলো নিঃশেষে ফুরালো!
তবু অই শিখা ফের জ্ব'লে ওঠে আশার উপরে।
অই শিখা কোন রাতে নীলনদ-সিন্ধু-গঙ্গা তীরে
অ্যাসিরিয়া-গ্রীস-রোমে জ্বলেছিল। তবুও ত কালো
সর্বনাশা ঝড় বয়ে বয়ে এনে ও'শিখা নিভালো
অ্যাটিলারা, চেঙ্গিসেরা; অন্ধকার ঘরে এল ফিরে।
ঝড়ের বাহক যা'রা, তা'রা আসে, কালের অতলে
কালো হয়ে ডুবে যায়। বুদ্ধ-যিশু-মহম্মদ কেন
আলো হয়ে রয়ে যায়?—রক্তের প্রদীপে লাল শিখা
জেলে দেয় ভালোবেসে; তাই বুঝি কালোর কবলে
কেউ ওরা যায় না'ক। আলোর দূতেরা এসে যেন
খুঁড়ে যায় পৃথিবীতে কল্যাণের গভীর পরিখা।

খজুরাহের স্মৃতি

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

রিক্‌শওয়ালা ছেলেটি নিবিষ্ট মনে, একের পর এক, পাতা উলটে যাচ্ছিল।…আমাকে ফিরতে দেখেই তাড়াতাড়ি বইটা মুড়ে রাখল।

বইখানা আর রেলের টাইম্ টেবলটা ওর জিম্মায় রেখে, একটা দোকানে খেতে ঢুকেছিলাম।

একটু বিরক্তির সঙ্গেই ব'ললাম—'ক্যা, তুম্ য়হ পঢ় সকতে হো?' (তুমি কি এটা পড়তে পার?)

ছেলেটি মাথা নেড়ে জানাল—না।

—'তো ক্যা ফোটো ঢুঁড় রহে থে? (তবে কি ছবি খুঁজছিলে?)…অগর য়হ কৌন ভাষা কী পুস্তক মা'লুম হোতা, তো সমঝ জাতা কী, য়হ ফিল্মি নহী।' (বইটার ভাষা জানা থাকলে বুঝতে যে, এটা সিনেমা পত্রিকা নয়।) মাথা নীচু করে, গুম হয়ে, ছেলেটি কিছুক্ষণ বইটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

হঠাৎ, তার চোখ হ'তে দু' ফোঁটা জল, বইয়ের মলাটের ওপর গড়িয়ে প'ড়ল।

—'ক্যোঁ, ক্যা বাত হো গয়া?' (কি হ'ল?) প্রশ্ন ক'রলাম। তাড়াতাড়ি নিজের শার্টের খুঁট দিয়ে মলাটের জলটা মুছে সে ব'লল—'জানি বাবু এটা বাঙ্গলা ভাষার বই। লেখা চিনি, কিন্তু আমি বাঙ্গলা পড়তে পারি না। হিন্দী প'ড়তে শিখেছি।'

ব'ললাম—'তুমি তো বেশ বাঙ্গলা বলতে পার দেখছি!'

ছেলেটি উত্তর দিল—'আমি তো বাঙ্গালী, তাই বল্‌তে পারি।'

—'তুমি বাঙ্গালী!'

—'হ্যাঁ বাবু। আমরা রিফিউজী। আরও অনেক রিফিউজী আছে। এখানে বেশীর ভাগ রিক্‌শাওলাই বাঙ্গালী। সবাই আমরা রিফিউজী।…আমার বাবা দেশের কথা বলতো, বাঙ্গলা বই পড়তে পা'রত। বাবা মরে গেল, তাই এখন রিক্‌শা চালাই।…বাঙ্গলা দেশ অনেক দূরে,…খুব সুন্দর দেখতে, না? বাঙ্গলা বইয়ে খুব ভাল ভাল কথা থাকে, তাই না?'

গলার স্বর বেরোতে চাইছিল না। কোনও রকমে ব'ললাম—'হুঁ।'

ছেলেটির চোখ দু'টিতে জল চিকচিক করে উঠল, মুখে খেলে গেল হাসির ঝিলিক।

জিজ্ঞাসা ক'রলাম—'তোমার নাম কি?'

—'হরি।'

রাজনৈতিক প্রয়োজনেই হ'ক, অবশ্যম্ভাবী কারণেই হ'ক, আর অদৃষ্ট গুণেই হ'ক, এরা বাস্তু হ'তে উৎপাটিত। এই ছিন্নমূল তরুদের যত ভাল মাটিতেই রোপনের আয়োজন হয়ে থাকুক না কেন, এদের মূল রয়ে গেছে বাঙ্গলারই মাটিতে। দেশ বিভাগের সময় যে ছিল এক বছরের শিশু হরি, সেও তাই আজ জানতে চাইছে, তার বাপ-ঠাকুরদা'র আবাস ভুমির কথা।…তার মাতৃভাষার জ্ঞান ভাণ্ডারে কি সম্পদ সঞ্চিত আছে, আর তা' থেকে সে কতটা বঞ্চিত তাই ভেবে কাঁদছে!

পেটের ক্ষুধা মেটানোর মত পুনর্ব্বাসন তার হয়েছে,—কিন্তু মনের ঐ ক্ষুধার?

সে ক্ষুধা কে মেটাতে পারে?

বোধহয় একমাত্র বাঙ্গলারই মাটি।…

বাঙ্গলার হরি কি আবার কোনও দিন বাঙ্গলার মাটিতে ফিরে আসবে? বাঙ্গলা দেশ কি আবার হরিদের ফিরে পাবে?

ঘটনাটার স্থান,—পান্নার বাস্ স্ট্যাণ্ড। সাতনা থেকে খজুরাহ যাওয়ার পথে পান্না, পূর্ব্বতন বিন্ধ্যপ্রদেশের একটি করদ রাজ্য। এখানে বাস্ প্রায় আধঘণ্টা থামে। তাই নেমে পড়েছিলাম। আর তখনই ওই কাণ্ড।

এর পর পথে প'ড়ল বারণবাবার স্থান। একটি বেদী

কাণ্ডারীয়া শিব মন্দির

বাঁধা গাছতলা। এখানে এক সাধু-পুরুষ ছিলেন। তাঁরই নামানুসারে স্থানটির নামকরণ হয়েছে।

এ পথে গেলে প্রত্যেক গাড়ীর ড্রাইভার বেদীটিতে একটি নারকেল ভেঙ্গে অর্ঘ্য দিয়ে যায়। এটি অবশ্য কর্ত্তব্য। যে তা' না করে তা'র গাড়ী দুর্ঘটনায় পড়ে,—এরূপ একটা প্রবাদ আছে।
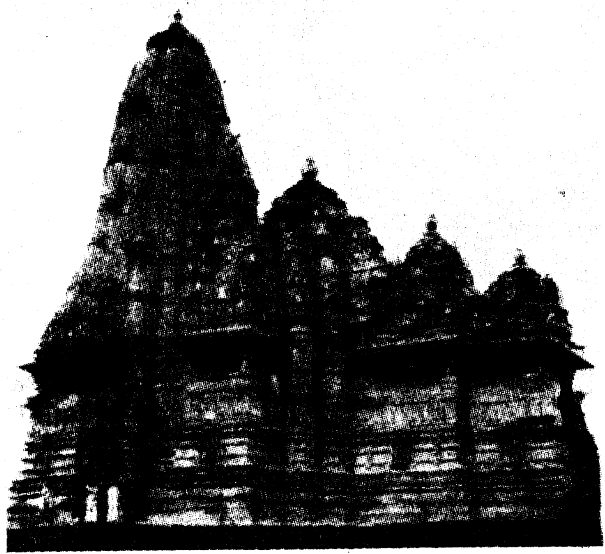
বেলা সাড়ে বারোটায় খজুরাহতে পৌঁছলাম। সাতনা হ'তে খজুরাহ, প্রায় ৭২ মাইল পথ।

খজুরাহের দর্শনীয় বলতে কতকগুলি মন্দির।···মোট পঁচাশীটি মন্দির ছিল, যার মধ্যে মাত্র কুড়িটির অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে।

সব মন্দিরই খৃষ্টীয় দশম হ'তে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হয়েছিল।

চৌসট যোগিনীর মন্দিরটিই সর্ব্বপ্রাচীন। দেবী দুর্গার চৌষট্টি সখীকে চৌষট্টি যোগিনী বলা হয়। ঐ যোগিনীদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত বলেই 'চৌসট-যোগিনী' নামকরণ হয়েছে। মন্দিরটির নির্ম্মাণকাল আনুমানিক ৯০০ খৃষ্টাব্দ।

কণ্টক নিষ্কাশন

মাতৃশক্তির উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য মন্দিরটি জগদম্বার।

অধিষ্ঠাত্রী দেবী মূর্ত্তিটির রং কাল হওয়ায়, স্থানীয় অধিবাসীরা এটিকে কালী বলে মনে করেন। আসলে কিন্তু ওটি পার্ব্বতী। [পার্ব্বতী প্রথমে কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। পরে তপশ্চর্য্যার ফলে বিদ্যুদ্‌বর্ণা গৌরাঙ্গী হ'ন।]

চতুর্ভুজ বা রামচন্দ্র মন্দিরটি অপূর্ব্ব দর্শন। একটি শিলালিপি হ'তে জানা গেছে যে, মন্দিরটি রাজা যশোবর্ম্মণ দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রতিষ্ঠা করেন।

খজুরাহের সবচেয়ে বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য, সুবিশাল কাণ্ডারীয়া শিব মন্দির। মনে হয়, এর সঠিক নাম কাণ্ডারী-শিব মন্দির।

হিন্দীভাষীদের গ্রাম্য উচ্চারণ ভঙ্গীতে হরিকে হরিয়া, মতিকে মতিয়া, কানাইকে কানাইয়া বলার মতই 'কাণ্ডারী' হয়তো কাণ্ডারীয়া হয়েছে। (পরমেশ্বর শিবের নামের সঙ্গে পারের কাণ্ডারী, ভবতারণ ইত্যাদি বিশেষণ যুক্ত হ'তে দেখা যায়।) এই মন্দিরটির আকর্ষণীয় বিষয়, এর অঙ্গসজ্জা। মন্দিরটির গায়ে অলঙ্করণ হিসাবে যে মূর্ত্তিগুলি আছে তাদের সংখ্যা প্রায় ৮৭২টি।

বংশী বাদিকা

অঙ্গ ধৌতি

খজুরাহের বাকী মন্দিরগুলির মধ্যে বিশ্বনাথ মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য।

রাজা যশোবর্ম্মণের পুত্র ধঙ্গ, মন্দিরটি নির্ম্মাণ করেছিলেন। তিনি 'মরকতেশ্বর' নামে, পান্না বা মরকতমণির তৈরী, যে লিঙ্গ-মূর্ত্তিটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটি বহুকাল পূর্ব্বেই অন্তর্হিত, অর্থাৎ অপহৃত হয়েছে।

কাণ্ডারীয়া-শিব, জগদম্বা ও অন্যান্য কয়েকটি মন্দিরে, বৃষস্কন্ধ পুরুষ মূর্ত্তি ও তাদের যুগল বা পার্শ্ববর্ত্তিনী স্ত্রীমূর্ত্তিগুলির দেহবল্লরী, নির্ম্মাতাদের অত্যুচ্চ ছন্দবোধের পরিচয় দিচ্ছে।

কতকগুলি নারী মূর্ত্তির ক'টিদেশে পাক দেওয়া এক ভঙ্গিমার সাহায্যে, নিম্ন ও উর্দ্ধ উভয় অঙ্গের সৌষ্ঠব যে ভাবে প্রদর্শিত হয়েছে তা' রূপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অতুলনীয়। শান্ত, বীভৎস, ভয়ানক, বীর, অদ্ভুত, করুণ, হাস্য এবং আদি রসের, অর্থাৎ সকল রসের চিত্রণ, স্থান পেয়েছে মন্দিরের গায়ে। সংশ্লিষ্ট ভাস্কররা যেন মন্দিরগুলির অঙ্গসজ্জার ভিতর দিয়ে, মানব জীবনের রূপ, রস ও ছন্দ সম্ভারের মহোৎসব করে গেছেন।

পৌরুষদৃপ্ত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

অধ্যাপক অজয়কুমার ঘোষ

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভার অন্তরালে তাঁর কাব্যপ্রতিভা অনেকখানি আচ্ছন্ন হয়েছে। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের একাধিক ক্ষেত্র তাঁর কৃতিত্বে ভাস্বর এবং নতুন সৃষ্টিতে উর্বর। তিনি কবি, নাট্যকার, হাসির গান ও দেশ-প্রেমাত্মক গানের রচয়িতা। এসব বিষয়ে তিনি অ-পূর্বপ্রভাবিত। এদের টেকনিক তাঁর সম্পূর্ণ স্বকীয়। তাঁর কাব্যের ভাষা, ছন্দ, বিষয়বস্তু ও দৃক্‌ভঙ্গিও অনন্যপরতন্ত্র। এসব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। কেউ কেউ সে আলোচনা করেওছেন। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গ সে আলোচনার বাইরে। আলোচ্য নিবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিগত ও কাব্যগত চরিত্রের একটি বিশেষ দিককে গ্রহণ করা হয়েছে। তা' এই প্রবন্ধের শিরোনামেও সঙ্কেতিত। অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রের ও কাব্যের অন্যতম লক্ষ্য ও লক্ষণ এদের ঋজু, শুভ্র অনমনীয় পৌরুষ। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে একটা পৌরুষদৃপ্ত ব্যক্তিত্বের স্পর্শ পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যে, নাটকে ও গানের পশ্চাতে যে কণ্ঠস্বর শুনি—সেটি পুরুষকণ্ঠ।

আজ বাঙালী জীবনের সর্বব্যাপী কাপুরুষতা ও নির্বীর্যতার দিনে পৌরুষের উদ্গাতা দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশে আমাদের বিনত চিত্তের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কাছ থেকে ঋজু ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

বিলেত প্রত্যাগত তরুণ দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বাঙালী সমাজের চারদিকের হীনতা, মূঢ়তা ও অনাচারে আক্রান্ত হ'লেন তখন তাঁর মধ্যে ব্যাহত ব্যক্তিত্ব বিদ্রোহের রূপ ধ'রে গর্জে উঠল, ফুঁসে উঠ্‌ল। সেই ঝাঁঝ ফুটে উঠেছে 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'এক ঘরে' নামে অপরিণত যুগের সাহিত্য গুণহীন দু'টি রচনায় আর সেই তেজের ঘনীভূত ও শিল্পমহিম রূপ দেখতে পাই তাঁর ব্যঙ্গমূলক অজস্র হাসির গানে, নাটকে, দেশাত্মবোধক গানে ও অন্যান্য কবিতায়।

ব্যক্তিজীবনে তিনি চিরদিন স্বাধীনচেতা, স্পষ্টবাদী (ফলে অপ্রিয় সত্যভাষী) ও ঋজু ব্যক্তিত্বের অধিকারী—কি সাহিত্য ক্ষেত্রে, কি চাকুরী ক্ষেত্রে—উভয়ত্রই। তাঁর চাকুরী জীবনের একটি প্রধান ঘটনা থেকেই তা' বোঝা যবে। নবকৃষ্ণ ঘোষের 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থে (৫১—৫৫পৃঃ) এবং দেবকুমার রায় চৌধুরীর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থে (পৃঃ ২৪১) বর্ণিত আছে সে ঘটনা। তদানীন্তন লেফটেনাণ্ট গভর্ণর স্যর চার্লস্ ইলিয়টের সঙ্গে জমির জরিপ সংক্রান্ত আইন নিয়ে প্রচণ্ড বিতণ্ডা হয়। সত্যনিষ্ঠ স্পষ্টভাষী দ্বিজেন্দ্রলাল মুখের ওপর সাফ ব'লে দিলেন যে ছোটলাট সাহেব বাঙলা দেশের জরিপের আইনজ্ঞ নন্ ব'লেই দ্বিজেন্দ্রলালের যুক্তি নাকচ করতে চাইছেন। সামান্য বাঙালী ডেপুটী হয়ে সাক্ষাৎ লাটসাহেবকে আইন-অনভিজ্ঞ বলার সৎসাহসের মূল্য দ্বিজেন্দ্রলালকে দিতে হয়েছিল। তাঁর প্রমোশন বন্ধ হ'ল। দ্বিজেন্দ্রলালও ছাড়বার পাত্র নন! এক প্রকাশ্য সভায় তিনি ব্যঙ্গ ভাষণ দিলেন, Honesty is not the best policy. স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট চ'টে লাল। ব্যাপারটি হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ালো। জজসাহেব দ্বিজেন্দ্র-লালের স্বপক্ষেই রায় দিলেন। তা'তে চাকরী গেল না ব'টে কিন্তু প্রমোশন বন্ধ হয়ে রইল।

তাঁর পুত্র দিলীপকুমারকে তিনি বল্‌তেন, "আর যাই করিস্ বাবা, দুটি কাজ করিস নি: মিথ্যাচার আর খোসা-মোদ।......আর একটি কথা সর্বদাই মনে রাখিস্—যে ঠিকে-ভুল হ'লে ভয় নেই যদি সত্যনিষ্ঠা থাকে, কিন্তু সত্যে যদি আঁট না থাকে তবে শেষে দেউলে হতেই হবে। কারণ জীবনের বনিয়াদই সত্য। তাকে ছাড়লে দাঁড়াবি কোথায়?" (স্মৃতিচারণ ১২ খণ্ড—পৃঃ ১৫)

এই সত্যনিষ্ঠা ও স্পষ্টভাষিতাই তাঁর রবীন্দ্র-বিরোধিতার প্ররোচক। নিজে তিনি স্পষ্টবক্তা, সাহিত্যের মধ্যেও তাঁর সেই স্পষ্টভাষণধর্মিতাকে অন্যতম বৈশিষ্ট্য ব'লে মনে করতেন।

রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিরোধ আজ বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়। এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না ক'রে এ'টুকু বলা যায় যে, রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রবিরোধ ব্যক্তিগত বিরোধ নয়, আসলে তৎসাময়িক দুই কাব্যাদর্শের বিরোধ। রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময়তার কবি, (দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় অস্পষ্টতার) আর দ্বিজেন্দ্রলাল স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষার কবি। 'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি যে ভাবের ধারণা করতে পারি সেই ভাব সম্বন্ধেই লিখি—আর আমি নিজের কবিতার মানে নিজে বেশ বুঝতে পারি।' কথাটার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট এবং খুব তাৎপর্যবহ। রবীন্দ্রযুগের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় কল্পনাদীপ্ত কাব্যরীতির পাশে দ্বিজেন্দ্রলালের স্পষ্ট ঋজু, খানিকটা অমসৃণ, অমার্জিত গদ্যায়িত কাব্যরীতি একটি বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। এই স্পষ্টভাষিতা ও অপ্রিয়সত্যনিষ্ঠা তাঁকে লোকসমাজে অনেকখানি অপ্রিয় এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে খানিকটা হীনপ্রভ ক'রে ফেলেছে, তবু এ'কথা অনস্বীকার্য যে বাঙ্‌লা সাহিত্যে তাঁর অনমনীয় পৌরুষদৃপ্ত কবিব্যক্তিত্ব স্বমহিমায় অপূর্ব ভাস্বর।

বাঙালী জীবনের যতকিছু হীনবীর্যতা, নষ্টামি, দুষ্টামি, ভণ্ডামি, গোঁড়ামির তিনি জীবন্ত প্রতিবাদ। এই একমাত্র কারণেই তাঁকে ব্যঙ্গকবির কলম ধরতে হয়েছে। 'ভক্ত' কবিতায় তিনি বলেছেন,

"ব্যঙ্গ-করি আমি? ব্যঙ্গ করি শুধু?
নিন্দা করি শুধু সকলে?
কভু না, আসলে ভক্তি করি আমি
ঘৃণা করি শুধু নকলে।"

তাই 'হিন্দু' চণ্ডীচরণ, বিরহ যাপন, গীতার আবিষ্কার, বদলে গেল মতটা, এমন ধর্ম নাই, Reformed Hindoos, বিলাত ফের্তা, হ'ল কি, ইত্যাদি কবিতায় আমাদের জাতীয় চরিত্রের ভণ্ডামি ও অন্ধ পরাণুকরণ ও কাপুরুষতাকে রসিকতার মোড়কে তীব্র নিন্দাবাণে বিদ্ধ করা হয়েছে। 'বিলাতফের্তা' কবিতার নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু অপূর্ব—

আমরা—বিলিতি ধরণে হাসি
আমরা—ফরাসী ধরণে কাশি
আমরা—পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালোবাসি।

'গীতার আবিষ্কার' কবিতার নিম্নোদ্ধৃত অংশে বাঙালী চরিত্রের ভীরুতা ও কাপুরুষতাকে তুলে ধরা হয়েছে—

দেখি যদি গৌরমূর্তির রক্তবর্ণ আঁখি
অমনি প্রাণের ভয়ে 'ওগো বাবা' ব'লে ডাকি
পালাই ছুটে ঊর্ধ্বশ্বাসে যেন বাঘে খেলে
চাদর এবং পরিবারে সমভাবে ফেলে।

কিংবা অন্যত্র,

সাহেব তাড়াহত, থতমত, অঞ্চলস্থ স্ত্রীর
ভূত ভয়গ্রস্ত, পগারস্থ, মস্ত মস্ত বীর
যবে সব কলম ধ'রে, গলার জোরে দেশোদ্ধারে ধায়
তখন আমার হাসির চোটে বাঁচাই মোটে হয়ে
ওঠা দায়।
(বলি ত' হাসব না)

(এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত উদ্ধার' ব্যঙ্গ কাব্যের বিপিন চরিত্রের কথা আমাদের মনে পড়ে।)

'জিজিয়া কর' কবিতা থেকেও উদ্ধার করা যায়—
পড়ে আমি চরণ তলায় নাকটি গুঁজে অনেক কাল
সইব সবই, নইত মানুষ; আমরা সবাই ভেড়ার পাল
যে যা' করিস্ দেখিস্ চাচা মোদের পৈতৃক প্রাণটা বাঁচা
শাঁসটা খেয়ে আঁশটা ফেলে দিস্‌রে দুটো দু'বেলায়।"

নির্বীর্য বাঙালীর ভীরুতাকে 'বাঙালী মহিমা' কবিতায়ও বিদ্রূপ করা হয়েছে। বাঙলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনকেও তিনি অব্যাহতি দেননি।

"খোলো ইতিহাস: সতের তুরস্ক প্রবেশিল
যবে গৌড়েতে
লক্ষ্মণ সেন ত' দিলেন চম্পট কচুবনে এক দৌড়েতে।
সে অপূর্ব সুমধুর আধ্যাত্মিক দীর্ঘ পলায়ন কাহিনী
যোগ্য ছন্দোবন্ধে বোধহয় আজো ভালো ক'রে
কেহ গাহেনি।"

নির্বীর্য বাঙালী তথা ভারতবাসীকে তিনি বীরধর্মে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছিলেন,

"ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয়গাথা
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে—শুন ঐ ডাকে
ভারতমাতা।

* * *

সমরে নাহি কভু ফিরাইব পৃষ্ঠ, শত্রু করে কভু
হব না বন্দী
ডরি না থাকে যা-ই অদৃষ্টে অধর্ম সঙ্গে করিনা সন্ধি
রব না, হব না দস্যুর ভৃত্য
সম্মুখ সমরে হয় বা মৃত্যু।"

উদ্ধৃত গানটিতে,, তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের বহু স্থলে, তাঁর দেশপ্রেমাত্মক গান এবং কোন কোন হাসির গানের সুরে এমন একটা বলিষ্ঠ গতিপ্রবাহ এবং পৌরুষ ফুটে উঠেছে যে সে যুগে তা সম্পূর্ণ অভিনব। বহুখ্যাত 'আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য, মানুষ আমরা, নহি ত মেষ'—কথাটাও খুব তেজের, খুব জোরের। 'হ'তে পারতাম' কবিতায় বাক্যবীর বাঙালী চরিত্রের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে।

'দেখ, হতে পারতাম নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয়না স্থির
তাই বাক্যবীরই রয়ে রইলাম চ'টে মটেই ত',
ইত্যাদি।

বহুখ্যাত 'নন্দলাল' কবিতায় ভীরু, দুর্বল মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ বাঙালীর জীবন্ত চিত্র তীব্র কশাঘাতে অপূর্ব শিল্পসুন্দর ভঙ্গিতে অঙ্কিত হয়েছে।

পৌরুষের মূলভিত্তি উচ্চ চারিত্র্যশক্তিতে ও মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'মেবার পতন' নাটকে তিনি মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করতে চেয়েছেন। মেবার পতনের বেদনা-সঞ্চার নয়, পরন্তু তার কারণ অনুসন্ধান নাট্যকারের লক্ষ্য। হিন্দু জাতির অনুদার সঙ্কীর্ণতা, অন্ধ জাতিবৈরিতা, গৃহযুদ্ধ, বিশ্বাসঘাতকতা, কাপৌরুষ ক্লীবতা ইত্যাদির তীব্র সমালোচনা করাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য। সগরসিংহ, গজসিংহের মতো উচ্ছিষ্টভোজী অ-মেরুদণ্ডী নির্বীর্যের দল এবং মহাবৎ খাঁর মতো স্বজাতিদ্বেষী চরিত্রের মাধ্যমে পরোক্ষে তিনি বাঙালী তথা ভারতীয় চরিত্রের দুর্বলতারই সমালোচনা ক'রেছেন। পরাধীনতার বেদনা ও গ্লানির চেয়েও পৌরুষের তথা মনুষ্যত্বের অভাব তাঁর কাছে চরম বেদনার কারণ হয়েছিল। 'মেবার পতনে' তাই তাঁর বক্তব্য, 'গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'।' তিনি বুঝেছিলেন যে পরাধীনতার কারণ শুধু বাইরের শত্রু নয়, আমাদের নিজেদের মধ্যেই সে কারণ বা বীজ নিহিত। সে বীজ পৌরুষহীনতা ও মনুষ্যত্বহীনতার। ব্যক্তিত্বহারা, হতচেতন, পরপদানত, কাপুরুষ বাঙালীর জাতীয় জীবনে তিনি মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করতে চেয়েছিলেন।

জীবনাচরণেও তিনি ছিলেন পৌরুষের পূজারী। তাঁর পুত্র দিলীপকুমারের গ্রন্থ থেকে সাক্ষ্য নেওয়া যেতে পারে—"পিতৃদেব ছিলেন নিজে অমিতবল, পৌরুষদৃপ্ত প্রতিভাধর—কথায় কথায় উদ্ধৃত করতেন মহাভারতের 'সর্বং বলবতাং পথ্যং সর্বং বলবতাং শুচিঃ'—অর্থাৎ বলবান কোন্ পথ্যে না পুষ্ট হয়, এমন কি আছে, যা পারে তাকে অশুচি করতে? এফিমিনেট বিশেষণটি উচ্চারণ করতে তাঁর ওষ্ঠাধর অবজ্ঞায় বাঁকা হয়ে উঠত।"

(স্মৃতিচারণ, ১।২ খণ্ড, পৃঃ ৬৫)

অন্যত্র, "পিতৃদেব ছিলেন যাকে ইংরাজীতে বলে Masculine বাঙ্লায় পুরুষসিংহ। যা কিছু মেয়েলি, পুরুষের মধ্যে তার বরদাস্ত করতে পারতেন না।"

(ঐ, পৃঃ ১২১)

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার, বরিশালের জমিদার দেবকুমার রায়চৌধুরী কপালের ওপরে দীর্ঘ বিলম্বিত চুল রেখেছিলেন ব'লে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর তীব্র সমালোচনা করতেন। 'সোরাব ও রুস্তম' নাটকের সারিয়ার মুখদিয়ে তিনি বলিয়েছেন, "পুরুষগুলো যদি স্ত্রীলোকের মতো লম্বা চুল রাখে, নাকি সুরে কথা কয়, অপাঙ্গে চায়, তাহলে স্ত্রীলোকদের একটা উপায় করতে হয়। যে-পুরুষ কেশের বেশের বেশি পারিপাট্য করে, তাদের দেখে আমার ভারি দুঃখ হয়।"

যেমন জীবনাচরণে, তেমনি সাহিত্যেও—কি ভাষায়, ছন্দে, বিষয়বস্তুতে ও প্রকাশভঙ্গির ঋজুতায় তিনি পৌরুষের পূজারী। ভাষায় অনতিললিত অমসৃণতার মধ্যে তাঁর কাব্যের পৌরুষ দীপ্যমান। তাঁর কাব্যের ভাষা মোটেই রমণীসুলভ রমণীয় নয়, তার সৌন্দর্য পুরুষের সৌন্দর্য। গদ্যগন্ধী অমসৃণ, অপেলব ও দৈনন্দিনজীবনে

ব্যবহৃত সাধারণ চল্‌তি ভাষায় তিনি অসাধ্যসাধন করেছেন। শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ রায়ের ভাষায় বলা যায়— "এই মৃদু মোলায়েম ভাষায় যে দুন্দুভি বাজাইতে পারা যায়, মধুসূদনের পূর্বে কেহ তাহা জানিত না বা বিশ্বাস করিত না। এই কৃশাঙ্গী ভাষার ভিতর হইতে যে ভ্রমের ঝর্ঝর রব বাহির করা যাইতে পারে···পূর্বে কাহারও ধারণা ছিল না।"

(নবকৃষ্ণ ঘোষের 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থের ৩০৩ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি থেকে)

পরিশেষে, ভাষার প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে। সেটি রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যভাষার পার্থক্য। অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথের ভাষার বৈশিষ্ট্য কেবল তার রমণীসুলভ লাবণ্য। এ'কথা সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষার দার্ঢ্য, পৌরুষ ও ওজঃশক্তির তুলনা নেই। তাঁর পূরবী ও বনবাণীর অনেক কবিতা, বীথিকা, প্রান্তিক, সেঁজুতি, পুনশ্চ, পত্রপুট, কাব্য-গ্রন্থের ভাষা কি পুরুষোচিত দার্ঢ্য শক্তিতে সুন্দর নয়? তবে রবীন্দ্রনাথের ভাষার পৌরুষ রাজপুত্রের মতো, তার সৌন্দর্য রাজসৌন্দর্য, তার বেশ রাজবেশ। আর দ্বিজেন্দ্র-লালের ভাষা যোদ্ধবেশী। এ'ভাষা সৈনিকের ভাষা। সমাজের অনাচার, অবিচার, ভণ্ডামি, নষ্টামি, দুষ্টামি ও কাপুরুষতার বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ। যোদ্ধার পোষাক যেমন অস্ত্রসজ্জিত, আটোসাঁটো ও বাহুল্যবর্জিত, দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষাও তেমনি শাণিত, সংক্ষিপ্ত ও পৌরুষদৃপ্ত। এখানে তাই অলঙ্করণসৌন্দর্য মুখ্য নয়, যুযুধান ব্যক্তিত্বের প্রকাশক ব'লেই এর সৌন্দর্য।

উদ্বেজিতা

অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

হৃদয়ের তীরে তীরে ভাবনার ঢেউ
তুমি এলে দীপালিকা।
গভীর বেদনা কোথা জানিল না কেউ
তবু জলে তনু শিখা।
পরম প্রেমের পেয়ে জ্বালা
কেন ছিঁড়ে দিলে ফুলমালা
কোন প্রতিদান চাহিলে না মুখ ফুটে
মরমের সম্পুটে!

চোখে মুখে বুকে তব যৌবন ছায়া
বাসনার রাঙারেখা।
মনের পাঁপ্‌ড়িগুলি মেলিয়াছে মায়া,
নয়নে অশ্রুলেখা।
সাথে লয়ে ঘাত প্রতিঘাত
শেষ হয়ে গেছে কত রাত!
এখনো বাতাসে লাগে ক্ষণ শিহরণ,
তবু কেন ক্রন্দন!

সুস্থ মনের সাথে আজো পরিচয়
কেন যে হোলোনা মোর!
ভাবি তাই অবিরল, প্রাণে ভয় হয়।
এখনো মোহের ঘোর
ঘিরে রয় নিশিদিন ধরি;
নানাসুরে আলাপন করি
যায় চলে, আসে যারা খেয়ালের স্রোতে
দূর বহু দূর হোতে।

জীবনে অনেক কথা ছিল কহিবার,
সময় ফুরায়ে যায়।
এই ধরণীতে সাধ ছিল রহিবার
প্রণয়ের সুষমায়।
বুকে নিয়ে প্রীতি ভালোবাসা,
করেছিনু অন্তরে আশা
এ চেতনা চিরতরে হবেনাকো হারা
নিবে আসে আঁখি তারা।

তবুও তোমারে পেয়ে হেথা নিরালাতে,
লভিনু পুলক মোর ঘুম-ভেজা রাতে।

বিদেশী
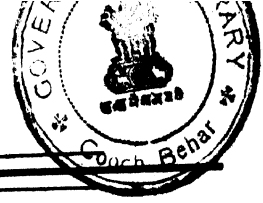
শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

বিদেশী যেদিন প্রথম এখানে এলো সেই দিনই কালীপদর মতো আরো অনেকেরই লোলুপদৃষ্টি পড়লো তার উপর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কালীপদর জয় হোল। বিদেশীকে কালীপদই পেলো।

বিদেশীর বয়স তেইশ চব্বিশ বছর। পাত্‌লা গড়ন, শ্যামলারং। মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল। তার দেহটি ঘিরে বেশ একটি চিকণ শ্রী আছে। বাদামি রং-এর সাড়ি পরে বাজারের মধ্য দিয়ে সে যখন চলে, তখন তার চোখে বিদ্যুৎ চমকায়।

বিদেশী পাকিস্তানে চোরাকারবার করে। তাকে দেখে প্রথম প্রথম সকলেই অবাক হয়েছিলো। এমন ভরা-যৌবন নিয়ে সে কেমন করে এমন ভয়ানক কাজ করবে। কিন্তু প্রথম প্রথম সকলে বিস্মিত হলেও তাদের বিস্ময় শেষ পর্যন্ত ফিকে হয়ে এসেছিলো। বিদেশীর দলে আরো কয়েকজন স্ত্রীলোক ছিলো। তারা সকলেই বিদেশীর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাদের দলে বিদেশীকে যেন একেবারে বেমামান বলে মনে হয়।

বিদেশীর হাবভাবে নোংরা চটুলতা কিছু নেই। চোরাকারবার করলেও তার কথাবার্তা বেশ শান্ত এবং সংযত। তাকে কোনদিন সংযমহীনতার পরিচয় দিতে দেখিনি। অথচ বিদেশীর কাজ বেশ দুঃসাহসের কাজ।

সীমান্ত অতিক্রম করে সে নির্বিবাদে পাকিস্তানে চলে যায়। যাবার সময় বেআইনীভাবে মাল নিয়ে যায়। পাকিস্তান থেকে ফিরে আসবার সময়ও মাল নিয়ে আসে। এই সব মাল উচ্চমূল্যে বিক্রি ক'রে প্রচুর মুনাফা করে সে। সাধারণতঃ রাত্রেই চলে এদের গোপন গতায়াত। রাত্রি গভীর হোলে এরা দল বেঁধে চলে যাবে নিস্তব্ধ মাঠটি পেরিয়ে পাকিস্তানে। কোন কোনদিন দিনের আলোতেও ওরা বেরিয়ে পড়ে। সীমান্তের জামগাছটা পিছনে ফেলে হন হন করে ঢুকে পড়বে পাকিস্তানে। পাকিস্তানের ভিতরেও অনেক দূর চলে যাবে। কোন কোনবার তিন চারদিন পাকিস্তানে কাটিয়ে আসে ওরা। হঠাৎ একদিন ধূমকেতুর মতো মালের বোঝা কাঁকালে ফেলে হিন্দুস্থানের ডেরায় এসে হাজির হয়।

পাকিস্তান থেকেও লোক আসে সীমান্তে। আবার কেউ কেউ সরাসরি হিন্দুস্থানের মধ্যেও চলে আসে। এখানে তিন চারদিন পর্যন্ত থাকে এবং মাল সংগ্রহ করে। শেষে বিভিন্ন মাল নিয়ে রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। উভয় দলের মধ্যে বেশ সৌহার্দ্য আছে। এমনি করে চলে এদের গোপন ব্যবসা। এই ব্যবসার ক্ষেত্রে পুরুষও নেমেছে, স্ত্রীলোকেরাও নেমেছে। পেটের দায়ে অনেক ভদ্রঘরের মেয়েও এই দুঃসাহসিক কাজে নেমেছে। মাঝে মাঝে এরা ধরাও পড়ে। তবে এদের পরিচিত পুলিশেরা এদের ধরে না। কখনো-সখনো বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন পুলিশ সীমান্তে কর্তব্য করতে এসে এদের পাকড়াও করে। ধরে নিয়ে যায়, কিছুদিন আটকা পড়ে থেকে আবার চলে আসে এবং গোপন ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়।

বিদেশী বিধবা। একেবারে বাল্যাবস্থায় নাকি একবার বিয়ে হয়েছিলো তার। কিন্তু দেহের ভাঁজে ভাঁজে দুরন্ত যৌবন ভাল করে ফুটতে না ফুটতেই স্বামী পরপারে চলে গিয়েছিলো। স্বামীর স্মৃতি বিদেশীর কাছে একেবারেই ফিকে হয়ে এসেছে। স্বামী মারা যাবার পর থেকে বিদেশী আর বিয়ে করেনি। ওকে দেখে এখনো কুমারী বলে মনে হয়। বয়স তার তেইশ চব্বিশ হলেও দেখতে আরো অল্প বয়স্কা বলে মনে হয়। দুর্মুখো যারা—তারা বলে বিদেশী

এর মধ্যে আরো একবার বিয়ে করেছিলো, তবে সে সে-কথা স্বীকার করে না।

শেষ পর্যন্ত কালীপদর কাছেই ধরা দিল বিদেশী। সে রাত্রি অন্ধকার ছিলো। হু হু করে হাওয়া বইছিলো। বাতাসে স্নেহের স্পর্শ ছিলো। বাতাসে মদিরতা ছিলো। মদিরতা ছিলো কালীপদর চোখে। শিহরণ ছিলো বিদেশীর মনে। ছোট্ট ঝোঁপটার মধ্যে ঝির ঝির করে হাওয়া দুলছিলো। অন্ধকারে আশে-পাশে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। শীত শীত বাতাসে কেমন ভয় ভয় ভাব ছিলো। আকাশে চাঁদ ছিলো না, আকাশে মেঘ ছিলো না। অনেক তারা ছিলো, অনেক—অনেক তারা। বিদেশী হারিয়ে গিয়েছিলো কালীপদর মধ্যে, বিদেশী ধরা দিয়েছিলো কালীপদর হাতে। কালীপদ পেয়েছিলো তাকে, সম্পূর্ণ করে পেয়েছিলো।

প্রথম প্রথম বিদেশী কিছুতেই ধরা দেয়নি। ধরা দিতে চায় নি। তবুও অন্যান্য সকলের চেয়ে কালীপদর প্রতি একটু পক্ষপাতিত্ব তার ছিলো। কালীপদ দায় দায়িত্বহীন পুরুষ—তিনকূলে তার কেউ নেই। বয়স তার বত্রিশ তেত্রিশ বৎসর। নাদুস-নুদুস কালো চেহারা। চুলগুলি ওলটানো এবং মুখখানি গোল। কালীপদ যাত্রাদলে প্রায়ই ঘাতক বা দৈত্যের পার্ট করতো। তাতে মানাতোও তাকে বেশ। দৈত্যের পার্ট করে করে ইদানীং কালীপদর হাবভাবেও দৈত্যপনা এসে গিয়েছিলো। গলার স্বর তার স্বাভাবিকভাবেই একটু চড়া ছিলো, ইদানীং আরো একটু বেশি চড়া হয়েছিলো। তবে সব মিলিয়ে তার মধ্যে একটি সতেজ পৌরুষভাব ছিলো। তবু বিদেশী প্রথম দিকে তাকে আমলই দেয় নি।

বিদেশী পাড়ার মধ্যেই থাকতো। একটা ঘর ভাড়া নিয়ে তারা কয়েকজন স্ত্রীলোক এক সঙ্গে থাকতো। ওরা সকলেই পাকিস্তানে যাতায়াত করে। বেশ কিছু মাল নিয়ে ওরা এক সঙ্গে পাকিস্তানে চলে যায়। ক'দিন আর ফেরে না। তারপর একদিন বিরাট মাঠটি পেরিয়ে হঠাৎ চলে আসবে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। কোন কোনদিন ওদের ভাষায় 'লাইন ক্লিয়ার' না থাকলে একেবারে গভীর রাত্রিতে ওরা বেরিয়ে পড়ে। তাও নিঃশব্দে যেতে হয় ওদের। বাগানপাড়াটা পেরিয়েই খোলা মাঠ। খোলা মাঠের মধ্যে পড়লে ওদের আর তেমন ভয় নেই। আধমাইলটাক পথ হেঁটে গেলেই জাম গাছটা পড়বে—ভারতের শেষ সীমা। তারপরেই পাকিস্তান। একেবারে সোজাসুজি ঢুকে পড়বে মালের বোঝা কাঁকালে নিয়ে অথবা কোমরে কাপড়ের নীচে জড়িয়ে বেঁধে। পাকিস্তানের পুলিশেরাও ওদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। কেউ কোন আপত্তি করেনা, নির্ব্বিবাদে চলেছে এদের ব্যবসা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। এতে যোগ দিয়েছে অনেকেই—ভদ্র, ইতর আবার বিদেশীর মতো স্ত্রীলোকেরাও। একটু ভদ্র এবং ভীতু গোছের যারা তারা সরাসরি পাকিস্তানে যায় না; সীমান্তের এ পার থেকেই মাল পাচার করে। তবে এদের মুনাফা একটু কম। নির্ভয়ে যারা পাকিস্তানে চলে যেতে পারে মাল নিয়ে, তাদের মুনাফা অনেক বেশি। কালীপদ এই বেশি মুনাফা ভোগকারিদের একজন। এই ক'রে কালীপদ টাকাও করেছে কিছু। এইভাবে টাকা উপায় করার অবশ্যম্ভাবী ফল যেগুলি সেগুলিও তার মধ্যে দেখা দিয়েছে। সে মদ খাওয়া ধরেছে। তবে সে ব্যভিচারী নয় বলেই শুনেছি। তার এখন অভাব একটি মেয়েমানুষের—স্ত্রীর নয়, মেয়েমানুষের। কালীপদ বিয়ে করতে চায় না।

একদিন সরাসরি কালীপদ বিদেশীকে বললে, চলো আমরা দু'জনে একসঙ্গে থাকি। এমন কথা বিদেশীকে অনেকের কাছ থেকেই শুনতে হয়েছে। তার শরীরটায় বেশ মাদকতা মেশানো ছিলো। সে যখন চটুল ভঙ্গিতে রাস্তা দিয়ে চলতো অনেকেরই চিত্তে দোলা লাগতো। বিদেশীকে নিয়ে ঘর বাঁধবার বাসনা অনেকেই মনে মনে পোষণ করেছিলো। এমন কি ঘরে যাদের স্ত্রী আছে তাদের মধ্যেও অনেকে এ প্রস্তাব করেছিলো। বিদেশী হেসে উড়িয়ে দিয়েছে তাদের প্রস্তাব। কাউকে কাউকে চটুল ভঙ্গিতে বলেছে, আবার বললে বৌদির কানে তুলে দেবো। কাউকে কাউকে রেগে গিয়েও অনেক কথা বলেছে। তারা নিরস্ত হয়েছে। কিন্তু কালীপদকে নিরস্ত করতে পারে নি বিদেশী। সেদিন পাকিস্তানের পথে মাল নিয়ে যেতে যেতে কথাগুলি বললে কালীপদ।

কালীপদ এখন এদের সঙ্গেই পাকিস্তানে যায়। আগে

সে একাই যেতো। এখন বিদেশীর দলের সঙ্গ নিয়েছে। এতে ওরাও খুশি হয়েছে। কালীপদ এবং আরো দুই একজন পুরুষ এদের দলের সঙ্গ নিয়েছে। দুই একজন পুরুষসঙ্গী এদের দলে থাকাতে এদের মনের জোর বেড়েছে। এতে দলের বর্ষিয়সী স্ত্রীলোকটিও কোন আপত্তি করে নি।

দলের সঙ্গে যেতে যেতে কালীপদ ও বিদেশী যেন একটু সঙ্গত কারণেই পিছিয়ে পড়লো। বাগানপাড়ার মাঠটার অর্দ্ধেকটা পেরিয়ে এসেছে তারা। আরো অর্দ্ধেক অতিক্রম করতে হবে তাদের। তারপর পড়বে জামগাছটা। জামগাছটার তলা দিয়ে হনহন করে চলে যাবে ওরা। তারপরই পাকিস্তান। ওদিকে পৌছুতে পারলেই এদিকের কোন ভয় থাকবে না। আস্তে আস্তেই কথাগুলো বললে কালীপদ।

ওর কথাতে বিদেশী হাসলো। চোখে বিদ্যুৎ হানলো। বললে, সে আর হবে না গো। বিয়ে করা বরই যেখানে কপালে টিকলো না, সেখানে আর নকল বর নিয়ে কী হবে ?

খিলখিল করে হেসে উঠলো সে। হাসির উচ্ছ্বাসে তার লতার মতো দেহটা দুলে উঠলো। কাঁকালের মালগুলো একবার ফসকে পড়ে যেতেই সেগুলো চেপে ধরলো বিদেশী। তার হাসির শব্দে পিছনে ফিরে তাকিয়েছিলো অনেকে। দলের বর্ষিয়সী স্ত্রীলোকটি ধমক দিয়ে বললে, আ: মর, রঙ্গ করার আর সময় পেলিনে। পুলিশের তাড়া খেলে রঙ্গ করা তোর মাথায় উঠে যাবে। পা চালিয়ে আয় বিদেশী !

স্ত্রীলোকটির ধমকানি খেয়ে বিদেশী কালীপদকে ফিস ফিস করে বললে, ও বুড়ি ঢ্যামনি আমাদের সন্দ করতে আরম্ভ করেছে গো। চলো আমরা পা চালিয়ে যাই।

এরপর বর্ষিয়সী স্ত্রীলোকটি কালীপদকে উদ্দেশ্য করেই বললে, তুমিই বা কেমন কালীপদ ! ওর সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে কী সব কথা বলছো !

কালীপদ হেঁকে বললে, ওই সব পুলিশের কথাই বলছিলাম গো।

বিদেশী আর একবার খিলখিল করে হেসে উঠলো। তার চোখের তারায় কৌতুক চিক চিক করে উঠলো। কালীপদর দিকে একবার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হেনে চটুল গতিতে এগিয়ে চললো সে। এগিয়ে চলতে চলতে বিদেশী আর একবার আপনমনেই খিলখিল করে হেসে উঠলো। বর্ষিয়সী স্ত্রীলোকটি ধমক দিয়ে বললে, আঃ মর, অতো হাসি কেনে !

পাড়াঘরে বিদেশীকে নিয়ে আজকাল বেশ গুঞ্জন উঠেছে। সে যে অনেক পুরুষের মন ভুলিয়ে বেড়াচ্ছে, এ সম্বন্ধে পাড়াঘরের মেয়েদের অনেকেরই বদ্ধ ধারণা জন্মেছে। বিশেষ করে যে সমস্ত কুলকামিনীরা তাদের স্ব স্ব স্বামী সম্বন্ধে বিবাহের প্রথম দিন থেকেই সন্দিহান, তাদের সন্দেহ দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। কোনদিন যদি স্বামী-বেচারীরা একটু বেশি রাত করে বাড়ি ফেরে তাহলে সেদিন তাদের কৈফিয়ৎ দিতে দিতে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বামী নামধারী ব্যক্তিগুলোকে থেতলে থেতলেও যখন তাদের মনের জ্বালা জুড়োল না, তখন প্রত্যক্ষভাবেই একদিন তারা দল বেঁধে বিদেশীকে আক্রমণ করলো। পাড়ার মধ্যে যে কুলকামিনীর কণ্ঠ-বিষের খ্যাতি (কুখ্যাতি ?) সর্বজনবিদিত (অনেকে আড়ালে একে খড়্গধারিণী দেবী চামুণ্ডা বলে থাকেন) তিনি সরাসরি বিদেশীর উপর চড়াও হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ওরে চোখখাকী ভাতারপুতের মাথাখাকী, বলি পুরুষগুলোর মাথা চিবোবার কি আর জায়গা পেলি নে ? না, এতোবড় দেশটায় আর জায়গা নেই ? বলি বেরোস কাঠের মতো ওই তো চেহারা। অতো দেমাক আসে কিসে লো তোর ? আর পুরুষগুলোরও বলিহারি যাই। এর চেয়ে একটা ঘাটের মড়া নিয়ে……

লম্বা লম্বা পা ফেলতে ফেলতে চলে এসেছিলো এই স্বামীগর্বিতা কামিনী। বলা বাহুল্য এর স্বামী ব্যক্তিটি সুযোগ্যা সহধর্মিণী ছাড়াও আরো দুই একজনের কাছে নিত্য যাওয়া আসা করে থাকেন। ঈষৎ লাল জাতীয় যে পানীয় আছে তাও নাকি তিনি নিয়মিত পান করে থাকেন।

বিদেশী সেদিন কারো কথারই কোন উত্তর দেয়নি। মুখবুজে সকলের কথা সহ্য করেছিলো। তার দলের অনেকে ঝগড়া করতে উদ্যত হয়েছিলো, বিদেশী থামিয়ে দিয়েছিলো সকলকে। সকলে চলে যাবার পর সে

কেঁদেছিলো। আকুল হয়ে কেঁদেছিলো। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়েছিলো। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। জানালার ফাঁক দিয়ে শেষ আলো এসে পড়েছিলো ঘরে। পাশের জিওল গাছটায় রোজকের মতো ফিঙেটা শেষ ডাক দিয়ে চলে গিয়েছিলো। বিদেশী ওঠেনি, আলো জ্বালেনি। সেদিন সারাদিন ধরে পেটেও কিছু দেয় নি।

সারারাত ধরে সেদিন অনেক ভেবেছিলো বিদেশী। এসব কাজ যারা করে—বিশেষ করে মেয়ে মানুষের পক্ষে এ ধরণের কথা শোনা নতুন কিছু নয়। তবু বিদেশীর মনে কথাগুলি বেজেছিলো বড়। সে তার কর্তব্য স্থির করে ফেললো। যতোদিন সে একা একা থাকবে ততোদিনই তাকে এ দুর্নাম সহ্য করতে হবে। যেমনই হোক তাকে একটা আশ্রয় অবলম্বন করতে হবে। সঙ্কল্প স্থির করার পর সে মনে একটু শান্তিও পেয়েছিলো। শেষ রাতের দিকে ঘুমও এসেছিলো চোখে।

পরের দিনই পাকিস্তানে গেলো বিদেশী। সঙ্গে গেলো কালীপদ এবং তার দলের অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা। কালীপদ এখন মাঝে মাঝেই বিদেশীকে আসল কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে এতোদিন বিদেশীর সম্মতি পায় নি। তার কথায় ফিকফিক করে হেসেছে সে, আসল কথাটাকে এড়িয়ে গেছে প্রত্যেক দিনই।

সেদিন পাকিস্তানে গেলো প্রচুর মাল নিয়ে। মাল বিক্রি করে লাভও করেছিলো প্রচুর। পাকিস্তান থেকে ফিরতে সেদিন ওদের একটু রাতও হয়েছিলো। খুশিমনে ফিরছিলো। নিঃশব্দে ফিরছিলো। কেবল মাঝে মাঝে কালীপদ ও বিদেশীর ফিস ফিসানি শোনা যাচ্ছিল। অন্ধকার রাত। আকাশে অগুণতি তারা। তারার মটরমালা। আশে পাশে ধানক্ষেত। ধূ ধূ প্রান্তরে একটানা ঝিল্লির ঝনক। ওরা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলছিলো।

সীমান্তের জাম গাছটা পেরিয়ে এলো ওরা। দীঘিটার কাছে কাছে চলে এসেছিলো। এ দীঘিটাও সীমান্তের দীঘি। খুব বড় দীঘি। এ দীঘি যে কবে খনন করা হয়েছিলো তা কেউ বলতে পারে না। এখন অবিশ্যি এতে জল বেশি থাকে না। মাঝখানটায় বেশ খানিকটা জল চিকচিক করে। বর্ষাকালে এর দেহে যৌবন আসে। অনেক ঢোলকলমী, শালুকফুল ফুটে থাকে এর দেহে। দীঘিটার বাঁ' পাশ দিয়ে সরু এক ফালি পায়ে হাঁটা রাস্তা চলে গেছে সোজা পাকিস্তানের দিকে। এ রাস্তায় রাত বিরেতে ওরাই চলে মালের বোঝা ঘাড়ে করে। এ ওদের গুপ্ত রাস্তা। বড় বেশি লোক এ রাস্তার খোঁজ রাখে না। ওরা বড় খেজুরবাগানটা পেরিয়ে সরু রাস্তাটার উপর এসে পড়েছে। রাস্তাটার আশপাশ ছোট ছোট ঝোপে ঝাড়ে ভর্তি। হঠাৎ সামনে টর্চের আলো পড়লো। ওরা হকচকিয়ে গেলো। ভয়ও পেলো। পুলিশ ছাড়া এই রাত্রে এভাবে টর্চের আলো আর কেউ ফেলবে না। তাও বোধ হয় স্থানীয় ফাঁড়ির পুলিশ নয়। তাদের দেখে ততো ভয় নেই! তবে এ কারা? নিশ্চয়ই অন্য কোন স্থান থেকে এসেছে গোপনে এদের ধরার জন্যে। পুনরায় টর্চের আলো জ্বলে উঠলো। সামনের ঝোপটায় আলো আটকে গিয়েছিলো তাই রক্ষে। একটু দূরে বাজখাই গলার আওয়াজও পাওয়া গেলো।

আর এগুতে সাহস হোল না ওদের। যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। মাথায় ও কাঁকালে কিছু কিছু মালও ছিলো। পলায়নী কাজটাকে সহজ এবং দ্রুততর করে নেবার জন্যে অনেকে মালগুলি ফেলে দিয়েই পালালো। এসব পরিস্থিতিতে দ্রব্যাদি ফেলে না পালালে বিপদে পড়তে হয় আরো বেশি। মালশুদ্ধ ধরা পড়লে মালও যাবে, জেলেও পচতে হবে। তার থেকে মালের উপর দিয়ে যাওয়াই ভাল। সেই ঘুরঘুট্টে অন্ধকারের মধ্যে কে কোথায় পালালো তার হদিশ পাওয়া গেলো না। মাঠের মধ্য দিয়ে কেউ দৌড়ে পালালো কেউ ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিল।

বিদেশী বেশখানিকটা ছুটলো। রাত্রির অন্ধকারে দীর্ঘ পথ হাঁটার ক্লান্তিতে বেশি ছুটতে পারলো না। ছোট ছোট বনের মধ্য দিয়ে ছুটতে গিয়ে একবার হোঁচট খেয়ে পড়েও গেলো। সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে 'মাগো' বলে একবার ডুকরে উঠলো। আবার পরক্ষণেই ছুট। তার সঙ্গীরা যে কে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে তার সংবাদ পেলো না। শরীর যখন একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখন পরিষ্কার দেখে একটি ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়লো বিদেশী। ঝোপটি বেশ ফাঁকা। আশেপাশে জোনাকিরা

জ্বলছে। বিদেশী বসে বসে হাঁপাতে লাগলো। জোরে কাউকে ডাকবারও উপায় নেই। কি জানি পুলিশেরা যদি পিছু নিয়ে থাকে। বিদেশী একা। নির্মেঘ আকাশের নীচে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের পাশে একটি ঝোপের মধ্যে সে একা। আচম্বিতে তার গা ছমছম করতে লাগলো। এর আগেও সে দুই একবার এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু এমনতরো নয়। এই মুহূর্তে কালীপদকে মনে পড়ে তার। কালীপদ যদি এই সময় তার পাশে থাকতো!

ঝোপের বাইরে যেন মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেলো। হ্যাঁ, পায়ের শব্দই বটে। শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। বিদেশী ভয়ে ভয়ে বসে থাকে। তবে কি পুলিশ এখানে তার অবস্থিতি টের পেয়েছে? সে ঝোপের ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু একটানা অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়লো না। অথচ পায়ের শব্দ ক্রমেই নিকটে এগিয়ে আসছে—একেবারে কাছে এসে গেছে। বিদেশী চরম মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলো। তার বুকের সঙ্গে আঁটা ছোট একটি মালের পুটুলীও ছিলো। সেটিকে একপাশে ঠেলে রেখে দিল।

ঝোপটার কাছে এসে পদশব্দ থেমে গেলো। ফিস ফিস কণ্ঠস্বর শোনা গেলো—'বিদেশী এখানে আছ নাকি?' চকিতে বিদেশী বুঝতে পারে এ কার কণ্ঠস্বর। মাঠের মধ্যে একা থাকতেও তার ভয় করছে। তাই পরিচিত কণ্ঠস্বরে তার সাহস বাড়ে অনেকখানি। বেরিয়ে পড়বারও উপায় নেই। পুলিশেরা কোথায় ওৎ পেতে বসে আছে হয়তো। বিদেশী ছোট্ট করে উত্তর দেয়—হ্যাঁ, আছি।

কালীপদ ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করলো। বিদেশীর পাশটিতে টুপ করে বসে পড়ে বললে, উঃ কি তাড়াটাই না খেয়েছি আজ!

বিদেশী গলার স্বর একেবারে নামিয়ে বললে, আমি এখানে আছি, তুমি জানলে কেমন করে?

কালীপদ বললে, তোমাকে এই দিকেই একবার ছুটতে দেখলাম কিনা। তোমাকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছিলাম. কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেলে আর ধরতে পারলাম না। তবে এখানে এসেছি আন্দাজে আন্দাজে। তুমি সেদিন এই ঝোপটা দেখিয়ে বলেছিলে না—যে কোনদিন যদি তাড়া খাই তবে এখানে এসে লুকিয়ে থাকবো। বেশ জায়গাটা, তাই না?

বিদেশী একথার উত্তর না দিয়ে বলে, উঃ তুমি আসার আগে কী ভয়ই না লাগছিলো!

কালীপদ আবেগভরে বললে, আমি যখন এসে গেছি, তখন আর তোমার ভয় নেই।

কালীপদ বিদেশীর হাত ধরলো। শক্ত সবল হাত দিয়ে বিদেশীর নরম হাতখানা চেপে ধরলো। বিদেশী আজ আর বাধা দিল না। বাধা দিতে চাইলো না। বিদেশী বুঝলো আর বাধা দিয়ে লাভও নেই। বিদেশী চিৎকার করতে পা তো, কালীপদকে তাড়িয়ে দিতে পারতো। কিন্তু গতকালের ঘটনার পরে বিদেশী নিজেই অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে। সে মনে মনে একটি বলিষ্ঠ আশ্রয় কামনা করছিল।

আকাশের তারাগুলি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। হাজার তারা, অসংখ্য তারা। ঝোপের মধ্য দিয়ে লতাগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখা যায় আকাশটাকে। একটা উল্কাপাত হোল আকাশে। একটা আগুনের পিণ্ড বিদ্যুৎ-গতিতে নীচের দিকে নামতে নামতেই মহাশূন্যে মিলিয়ে গেলো। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো বিদেশী, দেখলো কালীপদ।

কালীপদ বিদেশীকে কাছে টানলো। একেবারে কাছে। কালীপদর উষ্ণ নিঃশ্বাস বিদেশীর মুখের উপর এসে পড়লো। বিদেশী বাধা দিল না। বাধা দেবার সামান্যতম আগ্রহও দেখালো না। তার বেদনার্ত যৌবন আজ যেন সার্থকতা খুঁজে পেলো। আবেগভরে কালীপদ ডাকলো, বিদেশী!

বিদেশী উত্তর দিল, বলো।

—এতোদিন এতো ডাকেও সাড়া দাওনি কেন?

—সময় হয় নি বলে।

—আজ কি সময় হয়েছে?

—সময় হয়েছে বলেই তো সাড়া দিয়েছি।

—এখন থেকে আমাকে গ্রহণ করতে আর আপত্তি থাকবে না বলো।

—আপত্তি থাকার আর পথ রইলো কই। আমার উপর সব অধিকারই তো তোমাকে দিলাম।

কালীপদ নির্ভয়ে বিদেশীকে কাছে টেনে নিল আর একবার। বিদেশী চোখ বুজে কালীপদর বুকের উপর মাথাটা রাখলো।

ভোর হবো-হবো। পূবের আকাশটা ফিকে হয়ে এসেছে। পাশের ঝোপে ঝাড়ে নাম-না-জানা পাখিরা ডাক দিতে সুরু করেছে। মাঠের কোল জুড়িয়ে ঝুরু ঝুরু হাওয়া। এখানে আকাশে অনেক তারা। বিদেশী আর কালীপদ বেরিয়ে পড়লো। তারা হাত ধরাধরি করে পূবের আকাশটার দিকে বিনম্র দৃষ্টিতে তাকালো। তারপরে বাড়ির দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে চললো।

কবি-দ্বিজেন্দ্র

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত

কবির ইন্দ্র তুমি দ্বিজেন্দ্র এ মহাদেশের শ্রেষ্ঠগুণী
গম্ভীর তব কণ্ঠ-নিনাদ কর্ণকুহরে আজিও শুনি।
আজিও তোমার মর্মের বাণী গর্জনগানে গাহিছে ওই,
নূতন প্রভাতে বন্দনা-গানে আনন্দ সুরে মত্ত রই।
বাণীর দেউলে বেজেছে শঙ্খ উঠেছে সূর্য আলোকধারা
দিকে দিকে তার জ্যোতির কিরণ জাতিরে ক'রেছে
চিত্তহারা।
হে মহাতাপস! সঙ্গীতে তব ভক্তি বিতরে মুক্তি-প্রাণা
গরিমা-লুপ্ত দেশের ললাটে মন্ত্রের বলে শক্তি আনা।
ভ্রুকুটি তোমার বহ্নি জেলেছে পাপতাপ যত
দিয়েছ মুছে
জাতির দুঃখ বেদনা পুঞ্জ ইঙ্গিতে তার গিয়েছে ঘুচে।

* * *

সেদিন তোমার জাদুর লেখনী নাট্যে-কাব্যে
তুলেছে ঢেউ
বঙ্গ-বাণীর অঙ্গন তলে তোমারে কখনো
ভুলেছে কেউ!
যাদের প্রাণের প্রাঙ্গণ মাঝে ঢেলেছিলে
তুমি আলোকধারা
এ মহাজাতির চারণ কবির শীর্ষে তোমারে বসালো তারা।

জননীর গানে তুমি যে পাগল: আশিস তোমারে
ক'রেছে মাতা।
শত বরষের শুভখনে তাই তোমা-লাগি তাঁর আসন পাতা।
ভাবীকালে যদি নব কবি দল ভুলে গিয়ে তব কাব্য-প্রীতি
আপন মহিমা করিতে প্রচার ঢেকে রাখে তারা
তোমার স্মৃতি,
বঙ্গ-ভাষার জননী সেদিন মলিন আননে রহিবে চাহি:
"কোথা দ্বিজেন্দ্র! কবির ইন্দ্র, ইন্দ্রধনু সে আকাশে নাহি।"

* * *

শত বরষের কত অভিশাপে দেখেছিলে মা'র বিষাদ ছবি
অন্তর তাই উঠেছিল কেঁদে গিয়েছিলে ক্ষেপে পাগল কবি।
জাতিরে ডাকিয়া অভয় বাণীতে আশ্বাস তারে দিয়েছো মুখে
স্মরণ করালে আত্ম-গরিমা বিশ্বাস আনি দেশের বুকে।
সমুখে তাহার ইতিহাস তুলি ব'লেছিলে পুনঃ মানুষ হ'তে
দিকে দিকে তাই জেগেছে হৃদয় দুর্বার কোন্ জীবন
স্রোতে।
দামামা তোমার বেজেছিল বুকে জেগেছিল দেশ নতুন গানে
সুপ্তির ঘোরে জাগ্রত বাণী ঝঙ্কারি ওঠে নবীন প্রাণে।
মরিয়া যাহারা হ'য়েছে অমর তাদের প্রেরণা জাগালে তুমি,
সাধনা তোমার সার্থক হ'লো স্বাধীন হ'য়েছে স্বদেশ-ভূমি।

ভুবনেশ্বরে কংগ্রেস—

গত ৯ই ও ১০ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ২ দিন ভুবনেশ্বরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৮তম অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম দিন নূতন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার তামিল ভাষায় সংক্ষিপ্ত সভাপতির অভিভাষণ দান করেন। তিনি সমাজবাদ ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নূতন সমাজ গঠনের সার্বজনীন দায়িত্বের অংশ গ্রহণের জন্য ভারতের জনগণকে আহ্বান জানান। সভাপতির ভাষণের পর মৃত নেতাদের জন্য শোক প্রকাশ করা হইলে শ্রীএস-কে-পাতিলের প্রস্তাবে কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র প্রস্তাব গৃহীত হয়—তাহাতে বলা হয়—সক্রিয় সদস্যদিগকে বার্ষিক ১২ টাকা চাঁদা দিতে ও ৫০ জন প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ করিতে হইবে। শ্রীএন-ভি গাডগিল ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা গৃহীত হয়। শ্রীঅজিতপ্রকাশ জৈন গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পরদিন সকালের অধিবেশনে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বিকালে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণের পর শুক্রবার সন্ধ্যা ৭৷৷০টায় শ্রীনাদারের সমাপ্তি ভাষণের পর কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হয়।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা—

১০ই জানুয়ারী ভুবনেশ্বরে কংগ্রেস অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রস্তাবের আলোচনা কালে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গে হিন্দু নির্যাতন ও হিন্দুনিধনের প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি বলেন—বিশ্বের অন্যান্য দেশে যখনই কোন মানবগোষ্ঠীর উপর অত্যাচার হয়, তখনই ভারত তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় ও অত্যাচার বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করে। আজ যখন পূর্বপাকিস্তানে হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন চলিতেছে, তখন ভারত কি বসিয়া থাকিবে? পাকিস্তান এই নির্যাতন বন্ধ না করিলে—ভারতসরকার যাহাতে কঠোর ব্যবস্থা (চীনের বিরুদ্ধে যেমন করা হইয়াছে) অবলম্বন করেন, সে জন্য ভারতসরকারকে অনুরোধ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের অপর প্রতিনিধি শ্রীধীরেন ঘটকও শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের কথা সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কন্যাকুমারীতে স্বামীজির মূর্তি

কেরলের খ্যাতিমান রাজনীতিক নেতা শ্রীমন্নাথ পদ্মনাভনের নেতৃত্বে বিবেকানন্দ রকে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাহার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সংসদের তিন শতাধিক সদস্যের স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র কেন্দ্রীয় সরকার ও মাদ্রাজ সরকারের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। ঐ আবেদনে কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দশিলার উপর স্বামী বিবেকানন্দের এক মূর্তি নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছে। লোকসভার ও রাজ্যসভার যে ৩২৩ জন সদস্য ঐ আবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহাতে দেশের সকল রাজ্যের ও সকল রাজনীতিক দলের প্রতিনিধি আছেন। কাজেই জাতির অধিকাংশ লোক ঐ দাবীর সমর্থক। মাত্র একদল খৃষ্টান ধীবরের বিরুদ্ধতায় মাদ্রাজসরকার ঐ স্থানে মূর্তি প্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান আবেদন কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার অনুমোদনে অসম্মত হইবেন না।

কাশ্মীরে কেশ চুরিতে হাঙ্গামা—

কাশ্মীরের শ্রীনগরে হজরতবাল মসজিদে পয়গম্বর মহম্মদের পবিত্র কেশ রক্ষা করা ছিল। একদল দুর্বৃত্ত কাশ্মীরে গণ্ডগোল সৃষ্টির জন্য ২৬শে ডিসেম্বর ঐ কেশ স্থানান্তরিত করিয়াছিল। কাশ্মীর মুসলমানপ্রধান রাজ্য হইলেও অধিকাংশ মুসলমান জাতীয়তাবাদী, তাহারা স্বেচ্ছায় পাকিস্তানের সহিত যুক্ত না হইয়া ভারত রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইয়া আছে। তন্মধ্যে কয়েকজন দুর্বৃত্ত

মুসলমান সর্বদা কাশ্মীরের মুসলমানদিগকে মিথ্যা কথা বলিয়া উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। তাহারাই গণ্ডগোল সৃষ্টির জন্য কেশ চুরি করে। পরে ভয় পাইয়া ৪ঠা জানুয়ারী আবার ঐ পবিত্র কেশ যথাস্থানে রাখিয়া দেয়। কাশ্মীর পুলিস ও দিল্লীর পুলিশ জোর তদন্ত করায় দুর্বৃত্তরা ভয় পাইয়া কেশ ফিরাইয়া দিয়াছে। ফলে কাশ্মীরে কয়েক দিন গণ্ডগোল হইলেও তাহা থামিয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানে একদল অবাঙ্গালী মুসলমান হিন্দুদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করায় আবার ভারতে সম্প্রদায়িক অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ভারতরাষ্ট্র কঠোরতার সহিত দাঙ্গা দমন করিতেছে বটে, কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ দাঙ্গা দমনে তৎপর হয় নাই।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্মরণে—

২৩শে জানুয়ারী ১৯৬৪ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ৬৮-তম জন্মদিবস উপলক্ষে ভারত সরকারের ডাকবিভাগ ২ প্রকার নূতন টিকিট বাহির করিবেন—১৫ নয়া পয়সার টিকিটে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতীকের সহিত নেতাজীর ছবি ও ৫৫ নয়া পয়সার টিকিটে দিল্লী চলো লেখা চিত্র ছাপা হইয়াছে। নেতাজী আজও জীবিত আছেন কি না তাহা কেহ জানে না। ভারত সরকার নেতাজীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, ইহাই আনন্দের সংবাদ।

ঐ দিন ২ খানি রেকর্ডে তাঁহার ভাষণ প্রকাশ করা হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের ২৫শে ও ২৬শে জুন টোকিও হইতে নেতাজী দেশবাসীকে যে আহ্বান জানাইয়াছিলেন তাহার এক খানি বাংলা ও একখানি ইংরাজী রেকর্ড ২৩শে জানুয়ারী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ দিন নেতাজীর লেখা ১২০টি পত্র সম্বলিত এক পুস্তক প্রকাশিত হইল—চিঠিগুলি ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত লেখা। নেতাজীকে এই এই ভাবে স্মরণ করিয়া ভারতবাসী যেন নব শক্তি লাভ করে।

শ্রীজহরলাল নেহরু—

উড়িষ্যা তালচের হইতে ভুবনেশ্বরে ফিরিয়া ৫ই জানুয়ারী শ্রীজহরলাল নেহরু অসুস্থ হইয়া পড়েন। পরদিন ৬ই জানুয়ারী অসুস্থ শরীর লইয়াই তিনি কংগ্রেস-সভায় যোগদান করেন। ৬ই রাত্রিতে তাঁহার জ্বর হয় ও রক্তের চাপ বাড়িয়া যায়—কাজেই ৭ই হইতে তাঁহাকে ভুবনেশ্বরে উড়িষ্যার রাজ্যপাল ভবনে শয্যায় থাকিতে হয়। তিন দিন পূর্ণ বিশ্রামের পর তিনি সুস্থ হন ও ১০ই সকালে ঘরের বারান্দায় বসিয়া বই ও সংবাদপত্র পাঠ করেন। শ্রীনেহরুর অকস্মাৎ এই অসুস্থতায় দেশবাসী শঙ্কিত—তাঁহারা শ্রীনেহরুর দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া সর্বদা সর্বত্র প্রার্থনা করিতেছেন।

বার্তাজীবী সংঘে শ্রীনেহরু—

২৫শে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বোম্বায়ে ভারতীয় বার্তাজীবী সংঘের একাদশ বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি তথায় বলেন—দেশে বহু নূতন সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে দেখিয়া তিনি আনন্দিত—তিনি বার্তাজীবিগণকে অনুরোধ করেন—সকলে যেন গ্রামের সংবাদ অধিক পরিমাণে প্রকাশ করেন—গ্রামগুলিকে নূতন জীবন দান না করিলে ভারত সমৃদ্ধ হইবে না। তাহা ছাড়া সরকারী উদ্যোগে যে সকল উন্নয়ন কার্য সম্পাদিত হইতেছে, সেগুলির প্রচারও অধিক প্রয়োজন। বার্তাজীবীরাও নিজ কর্তব্যে অবহিত হইলে দেশ উন্নত হইবে এবং বার্তাজীবীরাও ব্যক্তিগতজীবনে উপকৃত হইবেন।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা—

শ্রীএম-সি-চাগলা সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কোবিদ এবং বহু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্বেই নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ১১ই জানুয়ারী কলিকাতায় আসিয়া সাংবাদিকদের নিকট বলেন—পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার অগ্রগতি কোন মতেই সন্তোষজনক নহে। রাজ্যের অস্বাভাবিক জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও শরণার্থীদের অবিরাম আগমনই এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী। শ্রীচাগলার এই স্পষ্টোক্তিকে আমরা অভিনন্দন জানাই। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার মত মনীষী অবশ্যই উহার প্রতিকার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইবেন।

তালচেরে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র—

৫ই জানুয়ারী রবিবার প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু উড়িষ্যারাজ্যের তালচেরে যাইয়া ২৫০ এম-ওয়াট তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঐ কেন্দ্র নির্মিত হইবে—তন্মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সি ৩ কোটি টাকা সাহায্য দিবেন। শ্রীনেহরু ঐ দিন তালচের হইতে টিকেরপাড়া যাইয়া একটি বাঁধের ভিত্তি স্থাপন করেন। ভুবনেশ্বর হইতে প্রায় ১০০ মাইল পশ্চিমে টিকেরপাড়া—মহানদীর উপর এই বাঁধ উড়িষ্যাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিবে। ২৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ঐ বাঁধ নির্মিত হইবে—উহা ৪১৭০ ফিট দীর্ঘ ও সমুদ্রস্তর হইতে ৪৫০ ফিট উচ্চ হইবে। ঐদিন ভুবনেশ্বরে ফিরিয়াই শ্রীনেহরু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বারুণী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র—

বারুণী উত্তর বিহারে অবস্থিত—স্থানটি কলিকাতা হইতে ২৫০ মাইল ও পাটনা হইতে ৬০ মাইল দূরে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার অর্থ-সাহায্যে যে বিরাট তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, গত ২রা জানুয়ারী হইতে তথায় বিদ্যুৎ উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে। ঐ কেন্দ্র হইতে ১৫ হাজার কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হইবে। দেশে যত অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। ভারতের প্রতি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইলে এরূপ বহু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

কলিকাতার নূতন সেরিফ—

কলিকাতা বাকুলিয়া হাউসের সন্তান, মেসার্স গঙ্গাধর ব্যানার্জি কোম্পানীর কর্মকর্তা শ্রীমোহনকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৬৪ সালের জন্য কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও গবেষক এবং ব্যবসায়ী মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি কাণ্ডি ও টোকিওতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থায় যোগদান করিয়াছিলেন।

ডাক্তার ত্রিগুণা সেন—

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটার (প্রধান কর্মকর্তা) ডাঃ ত্রিগুণা সেন সম্প্রতি পুনরায় ৪ বৎসরের জন্য রেকটার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পূর্বে ৩ বারে ১২ বৎসর ঐ পদে কাজ করিয়াছেন। এক সময়ে তিনি কলিকাতার মেয়র ছিলেন। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

কলিকাতা হাইকোর্টের নূতন রেজিষ্ট্রার—

শ্রীসরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এড্‌ভোকেট, এটর্ণী-এট্-ল কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রার পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। আইনের কৃতী ছাত্র শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বহুদিন যাবৎ হাইকোর্টের কাজে নিযুক্ত আছেন এবং নিজ কর্ম্মদক্ষতার গুণে সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

শ্রীসরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এতাবৎকাল তিনি হাইকোর্টের আদিম বিভাগের মাষ্টার ও অফিসিয়াল্ রেফারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন।

সদালাপী, ক্রীড়ানুরাগী, অক্লান্তকর্মী শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় স্বনামখ্যাত পরলোকগত এটর্ণী শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র এবং "ভারতবর্ষ" পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও অন্যতম স্বত্বাধিকারী স্বর্গত সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা।

আমরা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন কামনা করি।

পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত—

পাকিস্তানের যশোহর ও খুলনা জেলায় পাকিস্তানী মুসলমান কর্তৃক হিন্দুরা নির্যাতীত ও নিহত হওয়ায় গত

১০ই জানুয়ারী শুক্রবার কলিকাতার ছাত্রসমাজ সভা ও মিছিলের মাধ্যমে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ দিন গড়িয়ায় দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজের প্রাঙ্গণে পুলিশ ছাত্রগণের উপর গুলী বর্ষণ করায় বি-এ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ভূদেব সেন গুলীবিদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। ভূদেবের বয়স মাত্র ১৮ বৎসর—সে দক্ষিণ কলিকাতার বিশিষ্ট এডভোকেট শ্রীসত্যেন সেনের পুত্র। ঘটনাটি এমন শোকাবহ যে এ সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন। কে, কেন ঐ তরুণ ছাত্রকে হত্যা করিল, সে সম্বন্ধে ব্যাপক তদন্ত করিয়া অপরাধীর শাস্তি বিধান প্রয়োজন। স্বাধীন দেশের পুলিশ কর্তৃক এই উচ্ছৃঙ্খলতা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। আমরা ভূদেবের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

আর এম্ এস কর্মীর মৃত্যু—

৯ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার রাত্রিতে দাঙ্গার সময় আনন্দবাজারপত্রিকা অফিসের নিকট সুতারকীন ষ্ট্রীটে আনন্দবাজার পত্রিকা পোষ্টাফিসের আর, এম্, এস কর্মী শম্ভুনাথ শর্মা আততায়ী দ্বারা ছুরিকাহত হয় ও পরদিন শুক্রবার রাত্রি ৮টা নাগাদ সে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গিয়াছে। ডিউটি দিবার জন্য বাড়ী হইতে অফিসে আসার সময় সে আহত হইয়াছিল।

মহেশ্বরপাশা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত—

খুলনা সদরের অতি নিকটস্থ মহেশ্বরপাশা গ্রাম সর্বজন পরিচিত। গত ৫ই জানুয়ারী বা উহার কাছাকাছি কোন দিনে পাকিস্তানের দুর্বৃত্তেরা ঐ গ্রাম এমনভাবে পুড়াইয়া দিয়াছে যে তাহার চিহ্নও এখন দেখা যায় না। বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিয়া এক হিন্দু এই খবর দিয়াছে। যশোহর খুলনা জেলার আরও কত গ্রাম পুড়িয়াছে কে জানে?

দিল্লীতে শ্রীনেহরু—

অসুস্থ অবস্থায় কয়দিন ভুবনেশ্বরে থাকার পর শ্রীজহরলাল নেহরু বিমানযোগে ১২ই জানুয়ারী রবিবার দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়াছেন। ডাক্তারগণ তাঁহাকে ১৫দিন পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি কলিকাতার হাঙ্গামা সম্বন্ধে সরকারী কাগজপত্র দেখিতে চাহিলেও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁহাকে সে কার্যে বিরত করিয়াছেন।

১০ জন মনোনীত সদস্য—

নূতন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার ১১ই জানুয়ারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর ১০ জন মনোনীত সদস্যের নাম ঘোষণা করিয়াছেন—পরে আরও তিনজন মনোনীত সদস্যের নাম ঘোষণা করা হইবে। ১০জন হইলেন শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী, মোরারজী দেশাই, জগজীবনরাম, এস-কে পাতিল, ডি-সঞ্জীবায়া, সঞ্জীব রেড্ডী, অতুল্য ঘোষ, ফকরুদ্দীন আলি আমেদ, এস-নিজলিঙ্গাপ্পা ও গুলজারীলাল নন্দ। সি-রাজা গোপালন জেনারেল সেক্রেটারী ও অতুল্য ঘোষ কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। মোট ২১জন সদস্য লইয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইবে—তন্মধ্যে ৭জন নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া সদস্য হইয়াছেন।

নূতন ওয়ার্কিং কমিটি—

ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে শ্রীকামরাজ নাদার কংগ্রেসের নূতন সভাপতি হইয়াছেন—তিনি ২০জন সদস্য লইয়া নূতন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি করিবেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ৭ জন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্যগণ কর্তৃক ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন (১) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী (২) শ্রীচ্যবন (৩) শ্রীরাজা গোপালন্ (৪) ডাঃ রামসুভগ সিং (৫) শ্রীসাদিক আলি। ইহারা ৫জন পূর্বেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য ছিলেন—নূতন নির্বাচিত হইলেন ২জন (১) শ্রীবিজু পট্টনায়ক ও (২) শ্রীসুখদিয়া। নির্বাচনে দাঁড়াইয়াছিলেন—১৩ জন—পরাজিত হইলেন ৬জন (১) শ্রীচন্দ্র ভানুগুপ্ত (২) শ্রীমহাবীর ত্যাগী (৩) শ্রীকে-ডি মালব্য (৪) এস-এন-মিশ্র (৫) কে হনুমন্তিয়া ও (৬) ডাঃ এ-কে-মহতাব। শ্রীদরবারা সিং নির্বাচনে দাঁড়াইয়া শেষ মুহূর্তে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করিয়াছিলেন।

২৪ পরগণা জেলা সাহিত্য সম্মিলন—

আগামী ১৪ই মার্চ হইতে ১৭ই মার্চ (১৯৬৪) ৪দিন বারাসতে ২৪ পরগণা জেলা সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইবে। ঐ সম্মিলনে উদ্বোধকরূপে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, বিশেষ বক্তারূপে কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ, প্রদর্শনীর উদ্বোধকরূপে শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, চারুকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধকরূপে লেডী রাণু

মুখোপাধ্যায় যোগদান করিবেন। বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিবেন শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, কেন্দ্রীয়মন্ত্রী শ্রীহুমাউন কবীর, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীঅশোককুমার সরকার ও শ্রীপ্রমথনাথ বিশি, শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল, অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীঅখিল নিয়োগী, ডাঃ শ্রীরমা চৌধুরী, শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রভৃতি। সম্মিলনের জন্য বিশেষ সদস্য ২৫ টাকা, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য ১০ টাকা ও প্রতিনিধি ফি ৩ টাকা চাঁদা ধার্য হইয়াছে। শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কোষাধ্যক্ষ ও শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। সকল সংবাদ আদান প্রদানের জন্য কলিকাতা-১, ১০ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে ২৪ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ কার্যালয়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

পাঞ্চেন লামা বন্দী—

২৫শে ডিসেম্বর গ্যাংটকে খবর আসিয়াছে যে তিব্বতের ধর্মগুরু পাঞ্চেন লামা চীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নজরবন্দী হইয়া আছেন ও তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। তিনি কোথায় আছেন, কেহ জানে না—তাঁহাকে পিকিংয়ে চীনা জাতীয় সম্মিলনে যোগদান করিতে দেওয়া হয় নাই। দালাই লামা তিব্বত ত্যাগ করিয়া ভারতে আসার পর পাঞ্চেন লামা তথায় ধর্মগুরু ও দেশনেতা হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ কি তাঁহার রক্ষায় অগ্রসর হইবেন?

পরলোকে রাজেন্দ্র সিংজী—

ভারতের স্থলবাহিনীর প্রাক্তন সর্বাধিনায়ক রাজেন্দ্র সিংজী গত ১লা জানুয়ারী বোম্বায়ের সামরিক হাসপাতালে হৃদ্‌রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার স্ত্রী, এক পুত্র ও দুই কন্যা হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৯ সালে অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি রাজকোট রাজকুমার কলেজে, বিলাতে মেলবোর্ণে ও পরে স্যাণ্ডহার্ষ্টে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৯৪১ সালে উত্তর আফ্রিকায় জার্মাণ ও ইতালীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তিনি খ্যাতি ও উচ্চপদ লাভ করেন এবং পরে হায়দ্রাবাদ-অভিযানে সাফল্য লাভ করিয়া সর্বাধিনায়ক হন। ১৯৫৫ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—

গত ২৪শে ডিসেম্বর পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়ে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের মূল সভাপতি খ্যাতিমান লেখক ও সাধক শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁহার ভাষণে বলেন—পাশ্চাত্যের ভোগবাদী দর্শনে মুক্তি নাই। ভারতের সনাতন আদর্শকে আজ সাহিত্যে গ্রহণ করতে হবে। ভগবানের করুণাকে সাহিত্যে আবাহন করার সময় আজ
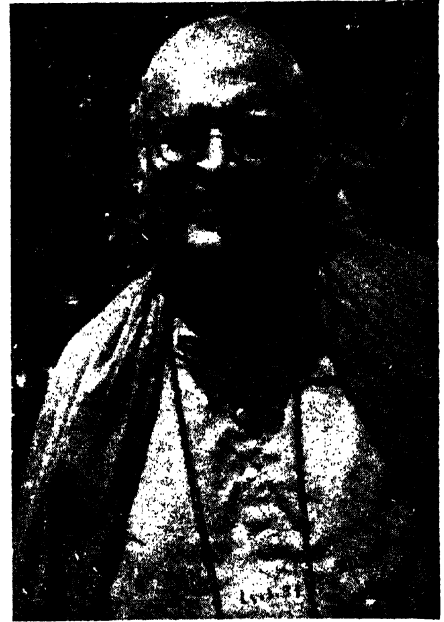
শ্রীদিলীপকুমার রায়

এসেছে। কি ভাবে মানুষ অমৃত হয় তার দিশা পেতে হলে, নানা দেশের মহাসাধক মহাপুরুষদের জীবনের সঙ্গে পরিচয় লাভ একটি উপায়। আর একটি উপায় যাঁরা ঋষিদৃষ্টি লাভ করেছেন—সেই তত্ত্বদর্শীদের প্রণাম, প্রশ্ন ও সেবা করে আশীর্বাদ লাভ করা। পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রীথানু পিলাই সম্মিলনের উদ্বোধন করে বলেন—জাতীয় সংহতির জন্য সারা ভারতে এক ভাষা চলা প্রয়োজন।

তিনি ইংরাজি ও মাতৃভাষা ছাড়া আর একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষার কথা বলেন। সম্মেলনসভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ ঐ দিন তাঁহার ভাষণে পাঞ্জাব ও বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা ঐতিহাসিক প্রমাণসহ বিবৃত করেন। মূল সভাপতি বহু সঙ্গীত গান করিয়া তাহার ভাষণকে সকলের মনোমুগ্ধকর করায় তাঁহার অপূর্ব সঙ্গীত শুনিয়া সকলে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হন।

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু—

গত ১লা জানুয়ারী সন্ধ্যায় কলিকাতা মহাজাতি সদন হলে জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে বসু মহাশয়কে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সভাপতিত্ব করেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহুমাউন কবীর সভার উদ্বোধন করেন, আচার্যের শিক্ষক ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু, তাঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব ও শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ সত্যেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা ও বিজ্ঞান জগতে তাঁহার দানের কথা বিবৃত করিয়া ভাষণ দেন। আমরা আচার্য সত্যেন্দ্রনাথকে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রদ্ধাভিবাদন জানাই ও প্রার্থনা করি তিনি শতায়ু হইয়া বিজ্ঞানের সেবা করুন।

ইতিহাস রচনার গুরুত্ব—

গত ২৮শে ডিসেম্বর পুণা সহরে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের আধুনিক ইতিহাস শাখায় সভাপতি হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী-কমিশনের উন্নয়ন অফিসার অধ্যাপক সুকুমার ভট্টাচার্য বলেন—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বৃটিশ ঐতিহাসিকদের রচনা উৎসাহব্যঞ্জক নহে। কিন্তু দেশী লেখকদের রচিত ইতিহাস পুস্তকও সাধারণ পাঠক বা শিক্ষাব্রতীদের মনে কোনপ্রকার অনুপ্রেরণা জাগাইতে পারে না। তিনি স্বাধীনতাসংগ্রামে মধ্যবিত্তশ্রেণীর অবদানের কথা ইতিহাসে বিস্তৃতভাবে লিখিবার জন্য সকল ঐতিহাসিকের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ স্মৃতি সভা—

গত ৫ই জানুয়ারী রবিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা মহাবোধী সোসাইটী হলে বিপ্লবী নায়ক স্বর্গত বারীন্দ্রকুমার ঘোষের ৮৫তম জন্ম দিবস উপলক্ষে এক জনসভা হইয়াছিল। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং সাংবাদিক শ্রীঅনিলধন ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীমাখনলাল কুণ্ডু প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। স্থায়ীভাবে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমারের স্মৃতিরক্ষার জন্য সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীআনন্দপ্রাণ গুপ্ত—

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনলজির (খড়্গপুর) লেকচারার ইঞ্জিনিয়ার শ্রীআনন্দপ্রাণ গুপ্ত রাশিয়া-সরকারের দুই বৎসরের বৃত্তি পাইয়া সে-দেশে গিয়াছেন।
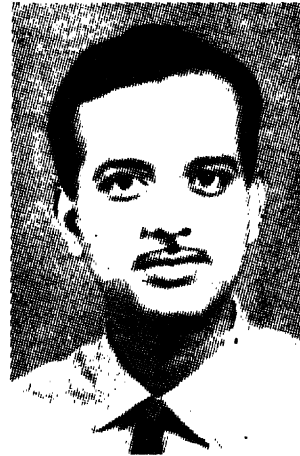
আনন্দপ্রাণ গুপ্ত

কংক্রিট বিদ্যার সর্বাধুনিক পরিণতি ও বৃহত্তম গৃহনির্মাণের আধুনিকতম পদ্ধতি শিক্ষার জন্যই অধ্যাপক শ্রেণীর এই বৃত্তি। শ্রীআনন্দপ্রাণের বয়স ২৬ বৎসর। ইনি সাহিত্যিক শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্তের পুত্র ও স্বর্গত ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্তের পৌত্র।

রসিক মোহন স্মরণোৎসব—

গত ২৬শে নবেম্বর সন্ধ্যায় কলিকাতা বাগবাজার হরনাথ শিক্ষা সংঘ ভবনে বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের ষোড়শবার্ষিক তিরোভাব উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রভুপাদ শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী সভাপতিত্ব করেন এবং সুকবি শ্রীপান্নালাল মাইতি প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বৈষ্ণবাচার্য রসিকমোহনের

ইরাণের মহামান্যা রাজকুমারী আসরাফ পালভী ও তাঁহার স্বামী ডঃ বুশেরীকে নয়াদিল্লীস্থ কুটীরশিল্প-বিপনীতে দেখা যাইতেছে।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে চ্যান্সেলার ডঃ জাকির হোসেন, প্রঃ এ, আবুবকর, প্রঃ বরিশ বরিশোভিক পিওট্রোভস্কি ও প্রঃ ইব্রাহিম পুরডাবুডকে অনারারী ডক্টর অব লেটার্স উপাধি এবং স্যার উইলিয়াম লরেন্স ব্রাগ, স্যার সি, ভি রমণ ও প্রঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে অনারারী ডক্টর অব সায়েন্স উপাধিতে ভূষিত করেন।

ছবিতে দেখা যাইতেছে ডঃ জাকির হোসেন স্যার সি, ভি রমণকে উপাধি পত্র প্রদান করিতেছেন।

গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিলে তদ্দ্বারা দেশবাসী উপকৃত হইবে।

২৪ পরগণা জেলা সাংবাদিক সংঘ—

গত ২৯শে ডিসেম্বর রবিবার বসিরহাট টাউনহলে ২৪ পরগণা জেলাসাংবাদিক সংঘের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হইয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার বলেন—অন্যান্য দেশে জাতীয় সংবাদপত্র ও আঞ্চলিক সংবাদপত্রের ভূমিকা পৃথক। সে সব দেশে বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য আছে অসংখ্য ছোট ছোট সংবাদপত্র। বাংলাদেশে দৈনিকগুলিকে উভয় কর্তব্য পালন করিতে হয়—সে জন্য নাগরিক রাজনীতি ও পৌর সমাচারের চাপে গ্রামের বার্তা অস্ফুট থাকিয়া যায়। সম্মিলনের প্রধান অতিথি হইয়া দৈনিক বসুমতীর বার্তা-সম্পাদক শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—মফঃস্বল সংবাদকে বাদ দিয়া সংবাদপত্র চালানো সম্ভব নহে। অশোককুমার যে আঞ্চলিক সংবাদপত্রের কথা বলিয়াছেন, আমাদের দেশে প্রতি মহকুমা সহর হইতে সেরূপ পত্র প্রকাশের চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানের আঞ্চলিক পত্রগুলিকে অঞ্চলের মুখপত্র করিতে পারিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

যোগক্ষেম উদ্বোধন—

গত ২৬শে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বোম্বায়ে যাইয়া জীবন বীমা কর্পোরেশনের নূতন কেন্দ্রীয় অফিস ভবনের উদ্বোধন করেন—ঐ ভবনের নাম দেওয়া হইয়াছে—"যোগক্ষেম"। মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত উদ্বোধন উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। দেশে জীবন বীমা রাষ্ট্রীয়করণের পর সর্বভারতীয় এই কেন্দ্রীয় কার্যালয় খোলার প্রয়োজন হইয়াছিল। এখন আর শুধু জীবন বীমা নহে, সাধারণ সকল বীমাই রাষ্ট্রীয়করণের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। বক্তৃতায় শ্রীনেহরু বলেন যে, তিনি কখনও জীবন বীমা করার পান নাই।

অধ্যাপক সত্যেন বসুর জন্মজয়ন্তীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথবসু ৭১ বৎসরে পদার্পণ করলেন। তাঁর এই জন্মদিনে তাঁর ৭০ বৎসর বয়সপূর্তির এক উৎসব তাঁর গুণগ্রাহীরা আয়োজন করেছিলেন। ১লা জানুয়ারী হতে আরম্ভ করে ৭ দিন ধরে সভা চলেছিল এবং রামমোহন লাইব্রেরীতে বিজ্ঞানের এক প্রদর্শনী হয়েছিল।

উৎসবের প্রথম দিন, লা জানুয়ারী, মহাজাতি সদনে অপরাহ্নে যে জনসভা হয়েছিল, এই নিবন্ধে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

মহাজাতি সদনে অনেক জনসভা দেখেছি। কিন্তু সেদিনের সভায় অভূতপূর্ব জনসমাগম হয়েছিল, তিল-ধারণের স্থান ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথের রাজনীতিক জীবন নাই, সরকারী কোন ক্ষমতা, ব্যবসায়ের কোন জাল তাঁর হাতে নেই। তাঁর জন্মদিনের এই শ্রদ্ধাঞ্জলির সভায় গুণগ্রাহীরা এসেছিলেন নিতান্তই মনের টানে, গুণের আকর্ষণে। আমাদের মনে হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্ল-চন্দ্রের পর ইনিই বাঙ্গালীর মনের মানুষ; জ্ঞান, কর্ম্ম ও হৃদয় দিয়ে তিনি সাক্ষাতে ও পরোক্ষে বহু বাঙ্গালীর চিত্তকে স্পর্শ করেছেন।

মঞ্চের উপর তাঁকে সম্মুখে রেখে পাশে পাশে বসে-ছিলেন সভার সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও ভারত সরকারের ভূতপূর্ব কৃষিমন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর। সমস্ত মঞ্চ পূর্ণ হয়েছিল বহু গুণিজনের দ্বারা। সত্যেন্দ্র-নাথের সহধর্মিণী ঊষাদেবী তাঁর কন্যা ও নাতি-নাতনীকে নিয়ে কাছেই বসে দেখ্‌ছিলেন স্বামীর স্নিগ্ধমুখচ্ছবি—গুরু, ভক্ত, শিষ্য, বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর সপ্রেম মধুর ব্যবহার।

বেদগান দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু হল। দেশ বিদেশের প্রথিতযশা মানুষদের চিঠি পড়ে শোনালেন অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায়। সবাই সত্যেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক জীবনের যশের সুখ্যাতি করে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও শান্তিময় দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন।

তারপর আসতে থাকল মালা—পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, যাদবপুর ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মালা দিলেন। বিজ্ঞান কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, বসু-বিজ্ঞান মন্দির, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স, সিরামিক ইনষ্টিটিউট, পদার্থ বিজ্ঞান সমিতি—আরো অনেকে মালা এনে সত্যেন্দ্রনাথকে দিলেন। যাঁরা প্রতিভূ হয়ে এসেছিলেন, দেখলাম, সকলেই মালা এনে পায়ের কাছে রাখলেন, প্রণাম করে আশীর্ব্বাদ নিলেন। মালা ও তোড়ায় মঞ্চের সম্মুখ ভাগে একটি উচ্চ-স্তূপ হল। অধ্যাপক বসুর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা ঊষাদেবীকেও মালা ও পুষ্পস্তবক দেওয়া হল।

বান্ধবদের পক্ষ হতে প্রশস্তিপত্র পাঠ করলেন শ্রীগিরিজা পতি ভট্টাচার্য। উৎসবের উদ্যোক্তাদের পক্ষ হতে একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি পঠিত হল। সমস্ত সভাকক্ষের সমবেত জন-মণ্ডলী উপরে ও নীচের সকল আসন পূর্ণ হয়েও আরও বেশী জনতা ছিল—পরম ঔৎসুক্যে শান্ত হয়ে এসব পাঠ শুনে পাঠান্তে জয়ধ্বনি করেছিল। তারপর আবার শান্ত হয়ে পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য উৎকর্ণ হয়েছিল।

অধ্যাপক শ্রীহুমায়ুন কবীর সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের গবেষণা ও তাঁর ব্যক্তিজীবনের বৈশিষ্ট্যের বিষয় আলোচনা করেন। শ্রীকবীর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে অধ্যাপক বসুর গবেষণা বিজ্ঞানের জগৎসভায় ভারত ও বাংলাকে সম্মানের আসন এনে দিয়েছে। তাঁর জীবনে বিজ্ঞানের সাধনার সঙ্গে জনকল্যাণের যে চেষ্টার মিশ্রণ হয়েছে তার বিস্তৃত আলোচনা করে শ্রীকবীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন সত্যেন্দ্রনাথের সমাজ সেবার

উল্লেখ করেন। উৎকৃষ্ট ছাত্র, বিজ্ঞানের সেবক, জনকল্যাণকর কর্ম্মী, বিখ্যাত অধ্যাপক, মানবদরদী, আত্মভোলা, বন্ধুবৎসল, হৃদয়বান অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথকে তিনি নিজের ও বাংলার গুণগ্রাহী জনসাধারণের পক্ষ হতে সম্বর্ধনা জানান। তাঁর এই জন্মদিন উৎসবে সকলের প্রার্থনা "তিনি যেন শতায়ু হন। তাঁর অবশিষ্ট জীবন যেন সুস্থ ও শান্তির জীবন পায়, ভারতের তথা বিশ্বের মঙ্গল সাধনায় যেন তাঁর জীবন আরও কর্মময় হয়ে ওঠে।"

শ্রীহারীতকৃষ্ণদেব সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্র বয়স হতেই বন্ধু। শ্রীদেব সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধুপ্রীতি ও পরদুঃখকাতরতার উল্লেখ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার শ্রীমল্লিকও নানা প্রশস্তি উচ্চারণ করেন।

অধ্যাপক ডাঃ দেবেন্দ্র মোহন বসু সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানী জীবনের সূচনার মনোজ্ঞ বিবরণ প্রদান করেন। প্রবন্ধ-লেখকের লিখিত "অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু"র জীবনীতে এই বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় দেওয়া হয়েছে।

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্র বয়স হতে আরম্ভ করে স্মৃতিকথা বলেন। তাঁর পরিসংখ্যান কাজেও যে সত্যেন্দ্রনাথ মূল্যবান সহায়তা করেছিলেন সে বিবরণ দিয়ে তিনি তাঁর মেধা, বুদ্ধি ও গবেষণা ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এই মনোজ্ঞ বিবরণের পর তিনি বিশেষ প্রীতিকর বর্ণনা দেন। তার মর্ম এই যে তিনি নানা কাজে যখন বিদেশে যান, তখন লক্ষ্য করেন, সে-দেশের অনেক বিখ্যাত মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের খবর জানতে চান এবং এমন প্রীতিপূর্ণভাবে তার সম্বন্ধে আলোচন করেন যেন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের কত আপন জন। এমনি ঘটেছিল, ফ্রান্স, জার্মানী, ইংলণ্ড ও ইজিপ্টে। ওসব দেশে থাকার সময় সত্যেন্দ্রনাথের সহৃদয় ব্যবহার ও বিস্তীর্ণ জ্ঞান তাঁকে এমনি জনপ্রিয় করেছে। সভার উদ্যোক্তাদের পক্ষ হতে অধ্যাপক বসুকে মূল্যবান বস্ত্রাদি উপহার দেওয়া হয়।

সভাপতির অনুরোধে সত্যেন্দ্রনাথ এক ভাষণ দেন। অতি সহজ সুন্দর বাংলায় তিনি প্রায় আধঘণ্টা ধরে তাঁর জীবনের নানা কথা বলেন। সংক্ষেপে এখানে তার মর্ম দিচ্ছি।

"বিজ্ঞানীর জীবন আমরা যাঁরা বেছে নিয়েছিলাম তাঁদের অনেকে এখন বেঁচে নেই। সে একটা যুগ, যখন দেশের মঙ্গলের জন্য কত আলোচনা, কত উৎসাহ, কত কাজ আমাদের ছাত্রদের দ্বারা হত। ছাত্রজীবনের পর আমরা এদেশে বিজ্ঞানের প্রচারের জন্য কাজে লেগে গেলুম। কতখানি হয়েছে জানিনে।

অনেক যে বাকী আছে, তা জানি। আর জানি, বিজ্ঞানের পথই পথ। ধর্মের সাথে তার বিরোধ নেই। মানুষের মঙ্গলের সহায়ক, জীবন ও জীবিকার পোষক এই বিজ্ঞানকে কোন কোন মানুষ অমঙ্গলের জন্য প্রয়োগ করেন এই অভিযোগ সত্য হলেও সব মানুষ লোভী স্বার্থপর পরদ্বেষী নয়। তাই বিদেশ হতে খাদ্য আসে, যন্ত্র আসে, শিক্ষা আসে। সারা দুনিয়ার মানুষ পরস্পরের নিকটতর হয়েছে। নিজ নিজ মনের কথা, দ্বন্দ্ব, চিন্তা, আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করে অপরকে জানাচ্ছে। আমরা তাঁদের চিন্তা, আবিষ্কারবুদ্ধি হতে ফল পাচ্ছি। আমরাও দিচ্ছি কিছু কিছু।

এই মৈত্রী প্রীতি মানুষকে বেঁচে থাকার ইচ্ছা, আশা দেয়। আবার সংসারের দুঃখতাপে কত মানুষ জীবন আর রাখতে চাচ্ছে না; কেউবা অনাহারে, কেউবা অপরের অত্যাচারে, কেউবা ঈশ্বরের দেখা পাননি বলে। সব জানবার বোঝবার চেষ্টা করেছি, কেবল বিজ্ঞান ধরেই থাকিনি, ছাড়িনিও বিজ্ঞান—কিন্তু সব কি জানা যায়—সব কি বোঝা যায়!

এ দেশের ধর্ম-নেতারা জাতি, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে একতাবদ্ধ সমাজ গড়েন নি। তাই কি আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে! ব্রাহ্মণেতর সমূহ চেষ্টা করেছিলেন জ্ঞান বৃদ্ধির। ফলে হল রামচন্দ্রের হাতে তাঁর শিরশ্ছেদ। জাতিও থাকল তলায় পড়ে।

দুর্দিন এসেছে বাংলায়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্রের আদি জীবন ছিল সমাজ সেবার। আজ তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। শুনেছি শ্রীকৃষ্ণ মথুরার রাজা হয়ে বৃন্দাবন ভুলেছিলেন। আশা করি, আমার প্রফুল্লভায়া বাঙ্গালীর দুঃখ ভুলবেন না।

আমাকে একশত বৎসর বেঁচে থাকতে আপনারা বলেছেন। ৭০ পূর্ণ হল। এখন অবসান হলে ক্ষোভ নেই। যদি বেঁচে থাকি তবে তা হবে উপরি পাওনা। সকলে আমাকে অনেক ভালবেসেছেন, অনেক পেলাম। আপনারা আমার প্রীতি অভিবাদন গ্রহণ করুন।

সভার শেষে কৃতজ্ঞতা জানাতে উঠলেন ডাক্তার বিষ্ণু চাটার্জি। সুন্দর ইংরাজী ভাষায় দীর্ঘকাল ধরে বহুজনের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা জানালেন।

তারপর একটি আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হল। কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্র সঙ্গীতের আসর। সত্যেন্দ্রের বন্ধু ডাঃ পশুপতি ভট্টাচর্যের বয়স ৭৫। তাঁর মিঠা গলার "ওহে সুন্দর' গানটি দিয়ে এই আসরের সুরু হল।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের মনের মানুষ। আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালীর কৃষ্টি ধারার দীপ আজ তাঁরই জীবনে আছে। সেই দীপমূলে আবার আমি আমার প্রণাম রাখলেম

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

শর্ম্মিষ্ঠায় যিনি যে অংশের ভার লইয়াছিলেন, তাহার তালিকা,—

যযাতি	প্রিয়নাথ দত্ত (পিতৃবিয়োগ হওয়ায় যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়)
মাধব্য	কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
মন্ত্রী	নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কপিল	শরচ্চন্দ্র ঘোষ।
বকাসুর	ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ (গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙায় তারাচাঁদ গুহ অভিনয় করেন।)
দৈত্য	তারাচাঁদ গুহ (তৎপরিবর্ত্তে নৃত্যলাল দে অভিনয় করেন।)
নগরবাসী	১ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২ রসিকলাল লাহা, ৩ ব্রজদুর্ল্লভ দত্ত।
পারিসদ্‌বর্গ	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ), প্রিয়নাথ শেঠ ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র।
চোপদার	দ্বারকানাথ মল্লিক ও মহেশচন্দ্র চন্দ্র (তৎ-পরিবর্ত্তে কৃষ্ণগোপাল ঘোষ অভিনয় করেন।)
দ্বারবান	যদুনাথ ঘোষ।
দেবযানী	হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শর্ম্মিষ্ঠা	কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।
পূর্ণিকা	কালিদাস সান্যাল।
দেবিকা	অঘোরচন্দ্র দীঘড়িয়া।
নটী	চুনিলাল বসু।
পরিচারিকা	কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।
নর্ত্তকী	(রত্নাবলীর নর্ত্তকীগণ) এবং মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
নট	ব্রজদুর্ল্লভ দত্ত।

সাহেবদিগের জন্য শর্ম্মিষ্ঠার ইংরাজী অনুবাদ মাইকেলই করেন। শর্ম্মিষ্ঠার আখড়াই ১২৬৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে আরম্ভ হয় এবং ১২৬৬ সালের ৩রা ভাদ্র প্রথম অভিনয় হয়। ইহার সাত আটবার অভিনয় হইয়াছিল। শর্ম্মিষ্ঠার বীণা বাজাইয়া গান গাইবার ব্যবস্থা বড় কৌশলে নিষ্পন্ন হইত। শর্ম্মিষ্ঠার অভিনেতা সেতার হাতে করিয়া পরদার উপর কেবল হস্ত চালনা করিয়া মুখে গাইয়া যাইতেন, আর নেপথ্য হইতে একজন সুপটু বাদক সেতার বাজাইতে থাকিতেন। কেবল রাজবাটীর স্ত্রীলোকদিগকে দেখাইবার জন্য একদিন শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয় হয়।

যখন পাইকপাড়ায় রাজাদিগের উদ্যোগে বেলগাছিয়ায় রত্নাবলী অভিনয় হয়, সেই সময়ে আহীরীটোলায় শকুন্তলার আখড়াই চলিতে থাকে। ১২৬৬ সালের প্রথমে (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যকালে) জনাই-এর মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের উদ্যোগে তাঁহাদের কলিকাতার আহীরী-টোলার বাড়ীতেই ইহার অভিনয় হয়। ৺জয়রাম বসাক ইহার রঙ্গালয়াধ্যক্ষ ছিলেন ও ৺অভয়চরণ গুপ্ত শিক্ষা

দিতেন। এই অভিনয়ের জন্য আহীরীটোলায় চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বর্ত্তমান বাজারের পাশের হল প্রস্তুত হয়। অভিনেতৃদিগের নাম যথা—

দুষ্মন্ত	অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
বিদূষক	অঘোরনাথ পণ্ডিত (?)
কণ্ব	হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শার্ঙ্গরব	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
সারস্বত	নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়।
কঞ্চুকী	কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সারথি	মহাদেব ঘোষাল।
শকুন্তলা	অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
অনসূয়া	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রিয়ংবদা	গোপালচন্দ্র দত্ত।
গৌতম	রামগোপাল সুর।
মেনকা	পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

এই অভিনয় দর্শনার্থ ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ, ৺শরচ্চন্দ্র ঘোষ, ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ৺গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং হুগলী ও শ্রীরামপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সাহেবাদি উপস্থিত ছিলেন। প্রভাকর ও ভাস্করে ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইহার পর ১২৬৬ সালের মধ্যকালে এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের শেষে, প্রথমে বেলগাছিয়ায় রত্নাবলী অভিনয়ের পর ও শর্ম্মিষ্ঠা অভিনয়ের পূর্ব্বে মালবিকাগ্নিমিত্রের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে রাজা সার শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কঞ্চুকীর অংশ লইয়াছিলেন। বেলগাছিয়ায় এই নাট্যশালা তখন এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল।

যে সময়ে শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয় চলিতেছিল, সেই সময়ে ৺কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে ও চেষ্টায় সিন্দুরিয়াপটিতে "বিধবা-বিবাহ নাটকের" অভিনয় করিবার অনুষ্ঠান হইয়াছিল ও আখড়াই চলিতেছিল। সিন্দুরিয়াপটির ৺গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে ইহার স্থান হইয়াছিল। কেশববাবুই এখানকার শিক্ষক। ১২৬৭ সালের বৈশাখ মাসে ইহার প্রথম অভিনয় হয়।

অভিনেতৃবর্গের নাম—

কৃত্তিরাম ঘোষ	মহেন্দ্রনাথ সেন।
মন্মথ	প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
রামকান্ত	কৃষ্ণবিহারী সেন।
গুরুমহাশয়	হারাণচন্দ্র মজুমদার।
রামদেব তর্কালঙ্কার	অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার।
বর	যাদবচন্দ্র রায়।
বিধবাবিবাহের পক্ষীয় ব্যক্তি	ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী।
সুলোচনা	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।
পদ্মাবতী	গোপালচন্দ্র সেন।
সুখময়ীর পুত্রবধূ	নরেন্দ্রনাথ সেন।
রসবতী নাপিতানী	রাখালচন্দ্র সেন।

এই অভিনয়ে তিন জন প্রসিদ্ধ গায়ক গান করিয়াছিলেন—উমেশচন্দ্র ভদ্র, রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, ক্ষেত্রমোহন বসু এবং নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন যন্ত্রের বাদক ছিলেন,—পঞ্চানন মিত্র, গদাধর মিত্র, রসিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বেণীমাধব সোম। বেলগাছিয়ার অভিনয়ের ন্যায় এই অভিনয়ও অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। পাইকপাড়ার উত্তেজনায় এই অভিনয় খোলা হয়। প্রথমে "এডেলফি থিয়েটার" ভাড়া করিয়া এই অভিনয়ের প্রস্তাব হয়। ১০০৲ মাসিক ভাড়া চাওয়ায় সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া হলবিন সাহেবকে রঙ্গমঞ্চ ও দৃশ্যপটাদি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইহাতে চারি হাজার টাকা খরচ পড়ে। ৺মুরলীধর সেনই অধিক টাকা দেন, অবশিষ্ট টাকা চাঁদায় উঠে। তখনকার হরকরা পত্রে এই অভিনয়ের বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছিল।

ইহার পর শোভাবাজার-রাজবাড়ীতে নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা হইয়াছিল। কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, কুমার উদয়কৃষ্ণ দেব, গোপালচন্দ্র রক্ষিত, চন্দ্রকালী ঘোষ ও কালীকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি ইহার উদ্যোক্তা। ১২৭১ সালে ৺চমৎকারকৃষ্ণ ঘোষের বৈঠকখানায় ইহাদের আখড়াই প্রথম বসে। এই সময়ে প্রিয়মাধব বসু-মল্লিক, প্যারীমোহন দাস, মণিমোহন সরকার প্রভৃতি যোগ দেন। মাইকেলের "একেই কি বলে সভ্যতা" অভিনয় হয়।

শোভাবাজার "থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি সাধারণ না হইলেও ইহার কার্য্যাদি সোসাইটির উপযুক্ত নিয়মে সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ হইত। তজ্জন্য সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি কর্ম্মচারীও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৺চন্দ্রকালী ঘোষ ইহার সভাপতি এবং ডাক্তার উমেশচন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন। রাজা দেবীকৃষ্ণের বাড়ীতে ইহার অভিনয় হইত। তিনটি প্রকাণ্ড অভিনয় হইয়াছিল। কবিবর ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার অভিনয়দর্শনার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখনকার প্রধান সংবাদপত্র হিন্দু-পেট্রিয়টে ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। অভিনেতৃবর্গের নাম—

নববাবু	মণিমোহন সরকার।
কালীবাবু	কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
কর্ত্তা	প্যারীমোহন দাস (বৈষ্ণব)
মাতাল	ঐ
যন্ত্রিগণ	ঐ
বাবাজী	প্রিয়মাধব বসু মল্লিক।
বৈদ্যনাথ	
পাহারাওয়ালা	
খানসামা	জীবনকৃষ্ণ দেব।
চৌকিদার	
সার্জ্জন	কালীকৃষ্ণ বসু।
বারবিলাসিনী (১ম)	হরলাল সেন।
ঐ (২য়)	কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
প্রসন্নময়ী	ঐ
মুটে	কুমার উদয়কৃষ্ণ দেব।
কমলা (১)	ঐ
ঐ (২)	গোপালচন্দ্র রক্ষিত।
বাবু (১)	ঐ
ঐ (২)	কুমার ভুপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
দ্বারবান	ঐ
পয়োধরী (নর্ত্তকী)	কালিদাস সান্যাল।
নিতম্বিনী (ঐ)	রামকুমার মুখোপাধ্যায়।
মালী (বেলফুলওয়ালা)	উমেশচন্দ্র মিত্র (ডাক্তার)
বরফওয়ালা	অতুলকৃষ্ণ দেব।
গৃহিণী	জয়কৃষ্ণ বসু।
হরকামিনী	কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
নৃত্যকালী	কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।

শোভাবাজার রাজবাটির এই দলে পরে "কৃষ্ণকুমারী" অভিনয় হইবে বলিয়া আখড়াই আরম্ভ হয়। এই সময়ে বাগবাজার মদনমোহন-তলানিবাসী ৺নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় বন্ধুতাসূত্রে যাতায়াত করিতেন। ১২৬৪ সালের শেষে যখন কৃষ্ণকুমারী খুলিবার উদ্যোগ হয়, সেই সময়ে ৺কালিদাস সান্যালের সহিত রাজাদিগের মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি এবং গোপালবাবু দল ত্যাগ করিয়া আসেন। শেষে উভয়ের চেষ্টায় গোপালবাবুদিগের বাড়ীতে এক নাট্যসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। কালিদাসবাবু নিজে নলদময়ন্তী নাটক রচনা করেন এবং তাহারই আখড়াই আরম্ভ হয়। গোপাল বাবুর নাট্য চেষ্টা যে এই প্রথম স্ফুরিত হয় তাহা নহে। ইহার বৎসরেক পূর্ব্বে সিমলা-নিবাসী জয়গোপাল মিত্র ও নবগোপাল মিত্র মহাশয়েরা শ্রীবৎসচিন্তা-যাত্রার দল করিয়াছিলেন। সেই যাত্রার গাওনা গোপালবাবুদিগের বাড়ীতে একবার হইয়াছিল। এই যাত্রা শুনিয়াই গোপালবাবুর অভিনয়-স্পৃহা বলবতী হয় এবং শোভাবাজার রাজবাটীর কৃষ্ণকুমারীর দলে যোগ দেন। তাহার পর নিজবাটীতে থিয়েটারের দল বসাইয়া, মহা উৎসাহে শিক্ষা দিতে থাকেন। কর্তৃকর্ম্মা কালিদাস সান্যাল মহাশয়ই

এখানে শিক্ষকতা করেন। গোপালবাবু নিজেও শিখাইতেন। ১২৭১ সালের মধ্যকালে (১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষে) নলদময়ন্তীর অভিনয় হয়। এই সম্প্রদায়ের অভিনেতাদিগের নাম,—

নল	গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
বিদূষক	কালিদাস সান্যাল।
মন্ত্রী	নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
ভীমসেন	গগনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
কঞ্চুকী	শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী।
ব্যাধ	রসিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
ব্রাহ্মণ	গিরীশচন্দ্র মিত্র।
ঋষি	গিরীশচন্দ্র ঘোষ। *

* [বেঙ্গল থিয়েটার সুপ্রসিদ্ধ হাস্যরসের অভিনেতা স্থূলকায় গিরীশবাবুই এই ব্যক্তি। ৺বিহারীবাবুর প্রথম অভিনয় ৺কালীসিংহের বাড়ীতে, আর তাঁহার সহযোগী গিরীশবাবুর প্রথম অভিনয় বাগবাজারে]

দ্বারবান	অভয়চরণ পাল।
নট	ক্ষেত্রমোহন বসু।
দময়ন্তী (১)	আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
(২য়)	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সখিত্রয়	গোপালচন্দ্র মজুমদার, আনন্দলাল মিত্র, হরিদাস সরকার।
নটী	হরিশ্চন্দ্র কর্ম্মকার।

এই দল চারিবৎসর চলিয়াছিল। দুই বৎসর "নলদময়ন্তী" অভিনয় হইয়াছিল। চৌদ্দ বা পোনের বার ইহার অভিনয় হয়। ইহার মধ্যে বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে ভাটপাপাড়ায় ভট্টাচার্য্যদিগের বাড়ীতে, শিবপুরে চৌধুরীদিগের বাড়ীতে যে সকল অভিনয় হয়, তাহা অতি উৎকৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন পাথুরিয়াঘাটায় বীরনৃসিংহ মল্লিকের বাড়ীতে, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে, ও বসুপাড়ায় গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ইহার অভিনয় হয়। এতদ্ভিন্ন গোকুল মিত্রের বাড়ীতে ও গোপালবাবুর নিজ বাড়ীতে কয়েকবার অভিনয় হইয়াছিল। পাথুরেঘাটার জয়রাম বসাকের বাড়ীতে ইহার যে অভিনয় হয়, তাহাই ইহার ড্রেস্ রিহার্সাল। এই অভিনয়ের এত সুখ্যাতি হইয়াছিল যে লোকে শকুন্তলা অভিনয়ের ন্যায় ইহার আদর করিত। মহারাজ মহাতাব্ চাঁদ বাহাদুর ইহার অভিনয় দেখিয়া এত প্রীত হন যে, তদবধি গ্রন্থকার ও অভিনেতা কালিদাস বাবু মহারাজের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হইয়া পড়েন। কালিদাসবাবু বর্দ্ধমানের রাজসরকারে চাকুরী করিতেন। দুই বৎসর পরে এই দলে "ইন্দুপ্রভা" নামে এক নাটক অভিনীত হয়। চটামহেশতলা-নিবাসী গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা; ইন্দুপ্রভাও পাঁচ সাতবার অভিনীত হইয়াছিল, তবে ইহা গোকুল মিত্রের বাটী ও গোপাল বাবুর নিজ বাটী ভিন্ন অন্যত্র অভিনীত হয় নাই।

এপর্য্যন্ত অনুষ্ঠাতা কোন ধনীর বাড়ীতে বা নির্দ্দিষ্ট স্থানে নাট্যাভিনয় সীমাবদ্ধ ছিল, অন্যত্র গিয়া অভিনয় করার প্রথা তৎকালে ছিল না। বাগ্‌বাজারের এই নলদময়ন্তীর দল প্রথম বিদেশে যাইয়া সে প্রথা পরিবর্ত্তন করেন। ইন্দুপ্রভা গ্রন্থের বিচিত্রবাহুর অংশ গোপালবাবু গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই দলের পরিচয় দিবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী দলের পরিচয় এই স্থলেই দিতে হইতেছে। উত্তর কালে এই শেষোক্ত দলের সঙ্গে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের বিশেষ সংস্রব ঘটিয়াছিল। এই দলের অন্যতম অভিনেতা গিরীশচন্দ্র মিত্র ও আনন্দলাল মিত্র ৺গোকুল মিত্রের বংশধর। এই গিরীশ বাবু একজন উত্তম সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি। নলদময়ন্তীর সহিত যে ঐকতান-বাদ্য বাজিয়া ছিল, তাহার বাদকদল অভিনেতৃগণ হইতে ভিন্ন নহে। অবশেষে গিরীশবাবু একটি স্বতন্ত্র বাদকদল গঠন করেন। এই দলে বাগ্‌বাজার ও শ্যামবাজার-নিবাসী কতিপয় যুবক যোগ দেন, তন্মধ্যে বসুপাড়া নিবাসী ৺গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ডাক্তার দুর্গাদাস করের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রাধামাধব করের নাম উল্লেখ করিতে হইতেছে। এই দুই ব্যক্তিই ভবিষ্যতে বাঙ্গালার আদি সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। এই বাদক দলে এক জন মুসলমান যুবক যোগ দেন। তিনি ছিঙ্গুল খাঁ ওরফে হেম বাবু নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি এক-

ব্রনসঙ্গীতজ্ঞ ও রহস্যরসপটু অভিনেতা ছিলেন। উত্তরকালে ন্যাশানাল থিয়েটারে ইনি অভিনয়ও করিতেন এবং সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন।

যখন গিরীশ মিত্রের এই বাদকদল গঠিত হয়, সেই সময়ে ভবানীপুরে "অবৈতনিক নাট্য মন্দির" নামে একটি থিয়েটারের দল গঠিত হয়। এখানে উমেশচন্দ্র মিত্রের রচিত সীতার বনবাস নাটক অভিনীত হয়। ১২৭২ সালের চৈত্র মাসে (১৮৬৬। মার্চ্চ মাসে) ৺ নীলমণিমিত্রের বাটীতে (সার রমেশচন্দ্র মিত্রদিগের পুরাতন বাটীতে) ইহার প্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের সঙ্গে ভবানীপুরের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বাদক সর্ রমেশচন্দ্র মিত্রের ভ্রাতা কেশবচন্দ্র মিত্রের ঐকতান-বাদক সম্প্রদায় বাজাইয়া ছিলেন।

এই সময়ে বাগ্‌বাজারের গিরীশচন্দ্র মিত্রের বাজনার দলের খুব সুনাম হইয়াছিল। ভবানীপুরে ৺জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এই বাগ্‌বাজারের দল একদিন বাজাইতে যান। বাজনায় স্থানীয় কেশববাবুর দলের অপেক্ষা বাগ্‌বাজারের দল সুযশ অর্জ্জন করিয়া আসেন। এই সুখ্যাতির পর নগেন্দ্রবাবু গিরীশবাবুর দল ত্যাগ করিয়া বসুপাড়ায় নিজবাটীতে এক বাজনার দল বসান। রাধামাধববাবু ও হিঙ্গুল খাঁ নগেন্দ্রবাবুর দলে মিলিত হন। ক্রমশঃ গিরীশবাবুর দল ভাঙ্গিয়া নগেন্দ্রবাবুর দল পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

এই বাগবাজারের একতান-বাদন দলের দুই এক বৎসর অগ্রে শ্যামপুকুরনিবাসী ৺ব্রজনাথ দেব "শ্যামপুকুর একতান-বাদন সম্প্রদায়" নামে এক বাজনার দল করেন। ইঁহারই দলে প্রথম ক্ল্যারিওনেট বাঁশী বাজান আরম্ভ হয়। তখনও কর্নেট বাজান হইত না। তাঁত ও তারের যন্ত্র সমস্ত, পিকলো, ক্ল্যানেটবাঁশী, জলতরঙ্গের বাটীও এই দলে একত্র বাজান হইত। এতদ্ভিন্ন শঙ্খ বাজাইয়া সুর দেওয়া হইত। ডি সুরে কনসার্ট বাজান হইত, বাছিয়া বাছিয়া ডি-সুরের শাঁখ আনা হইয়াছিল। যতক্ষণ বাজনা হইত, শানাইয়ের পোঁ-ধরা হিসাবে এই শাঁখে সেইরূপ সুর দেওয়া হইত। এই দল হইতে রাধামাধববাবু ক্ল্যারিওনেট বাঁশী ক্রয় করিয়া আনেন বাগ্‌বাজারের দলে এই বাঁশী বাজিত। ব্রজবাবুর বাজনার দল প্রথম চৈত্র মেলায় বাজাইয়াছিলেন। নাটককার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ এই ব্রজবাবুর ভগিনীপতি।

এই সময়ে নানাদিকে নাট্য-চেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বে যেমন কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব ও শকুন্তলার একটা যুগ গিয়াছিল। এই যুগে সেইরূপ "পদ্মাবতীর" আদর বাড়িয়াছিল।
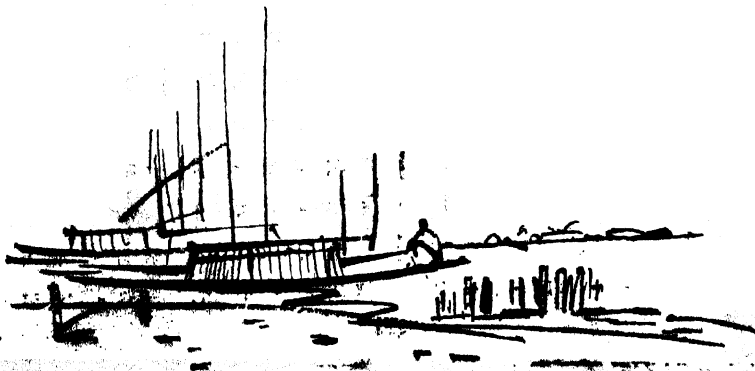
[ক্রমশঃ

বাপুজি-স্তুতি

জয়তি জয়তি ভারতগতি বাপুজি মুনীশ্বরঃ।
সুখনিদান মোচনদিন মোহন সৃষ্টিকরঃ ॥১

বিহগগান সিন্ধুতান ঝঙ্কৃত পূতস্বরঃ।
সত্যধর্ম কৃত্যমর্ম বিঘোষণ তৎপরঃ ॥২

ভেদবুদ্ধি নাশসিদ্ধি দৃপ্তজীবন ধরঃ।
অন্তশুদ্ধি প্রেমবৃদ্ধি নিত্য বিভূতিচরঃ ॥৩

জয়তি জয়তি জনগণনতি প্রাণপাত্রবরঃ।
রামনাম পরমকাম মায়া মোহহরঃ ॥৪

কথা : ডক্টর যতীন্দ্রবিমল

স্বরলিপি : শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক

ন ন র্স ধ ধ প | প মধ প মজ্ঞ ম জ্ঞ | জ্ঞ - ম প ন র্স | নধ মা ধ প - - |
জ য় তি জ য় তি ভা - র ত- গ তি বা - পু জি মু নী - - শ্ব রঃ - -

ন ন র্স ধ - প | প মধ প মজ্ঞ ম জ্ঞ | জ্ঞ - ম প ন র্স | নধ প ধ প - - |
সু খ নি দা - ন মো - চ ন- দি ন মো - হ ন সৃ ষ্ টি- - ক রঃ - -

প প প জ্ঞম জ্ঞ ম | প - প প - প | প - ন ন র্স র্জ্ঞ | র্জ্ঞ - র্র র্স - - |
বি হ গ গা - ন সিন্ - ধু তা - ন ঝং - কৃ ত পূ - ত - স্ব রঃ - -

র্স - র্র র্র - র্জ্ঞ | র্র র্স র্র ন - র্স | র্স র্স ন ধ ধ ন | ন - ন র্স - - |
স - ত্যধ - র্ম কৃ - ত্য ম - র্ম বি ঘো - - ষ ণ তৎ - প রঃ - -

ন ন র্স ধ - প | প মধ প মজ্ঞ ম জ্ঞ | প প মপ জ্ঞ মপ | জ্ঞ - স স - - |
স - ত্যধ - র্ম কৃ - ত্য ম- - র্ম বি ঘো - - ষ ণ তৎ - প রঃ - -

জ্ঞ - জ্ঞ জ্ঞ র জ্ঞ | র স র স ণ্ স | র গ র গ ম প | জ্ঞ জ্ঞ র স - - |
ভে - দ বু - দ্ধি না - শ সি - দ্ধি দৃ - প্ত জী - ব ন - ধ রঃ - -
প - প জ্ঞম জ্ঞ ম | প - প প - প | প - ন র্স জ্ঞ´ জ্ঞ´ | জ্ঞ´ র্র র্র র্স - - |
ভে - দ বু - দ্ধি না - শ সি - দ্ধি দৃ - প্ত জী - ব ন - ধ রঃ - -
ন - র্র র্র জ্ঞ´ র্র জ্ঞ´ | র্স নর্র র্স ণ ধ ম | জ্ঞ ম - পর্স ধর্র র্সজ্ঞ´ | জ্ঞ´র্র র্স র্স র্স - - |
আ ত্ ম শু দ্ধি - - প্রে -- ম বু - দ্ধি নি ত্য - বি - ভূ - - তি - - চ রঃ - -
ন ন ন ন ন ন | ন ন র্স ন র্স র্স | র্সর্র র্স র্র ণ ধ - | র্স র্র জ্ঞ´ র্র - - |
জ য় তি জ য় তি জ ন গ ণ ন তি প্রা - - ণ পা - ত্র - ব রঃ - -
র্র - র্গ র্গ র্ম র্ম | র্ম জ্ঞ´র্ম জ্ঞ র্র র্স র্স | ন - - র্স - র্র | ন র্স র্র নর্স ধ ম |
রা - ম না - ম প র - ম কা - ম মা - - য়া - - - - - - - -
প - - ম ধ ধপ | মজ্ঞ - - - - - | জ্ঞ ম প ন র্ম জ্ঞ´ | জ্ঞ´ - র্র র্স - - ||
মো - - হ - হ রঃ - - - - - - মা - য়া - মো - হ - হ রঃ - -

বাউল গান

শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী

বাউলের গান অনেকেরই ভাল লাগে। আমার লাগেনা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। সেদিন একটি সভায় বাউল গান হইতেছিল। বন্ধুর অনুরোধে অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিতে হইয়াছিল। এই আমার প্রথম শ্রবণে বাউলের প্রতি প্রথম অনুরাগ তাহা নয়। বাউল গান বাউলের মুখে আরও অনেকবার শুনিয়াছি, বাউল দেখিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়াছি, তাহাদের বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে তাহাদের অনেকেরই যে এক একটা বিশেষ সাধন-প্রণালী আছে তাহার সম্বন্ধে আমার সন্দেহ এখনও দূরীভূত হয় নাই।

ছেলেবেলায় দেখিয়াছি আমার ঠাকুরদাদার কাছে এক বাউল মাঝে মাঝে আসিতেন। তাঁহার নাম ছিল আশানন্দ বাউল। খুব সাধারণভাবে থাকিলেও তাহার ভাব ছিল উত্তম, আর তিনি ছিলেন অসাধারণ সাধক পুরুষ। একখণ্ড হলুদ রংএর কৌপীন মাত্র ধারণ করিয়া তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন। একগাল দাড়ি তাঁহার মুখশ্রীকে যেন মুনি-ঋষির গাম্ভীর্য দিয়াছিল। অথচ তিনি যখন কথা বলিতেন তখন মনে হইত—এক সরলচিত্ত বালক যেন তাহার সরল প্রাণের কথা বলিতেছে। আমরা খুব অল্পবয়সের ছিলাম, তাঁহার অনেক কথাই বুঝিতাম না—তবু মনে ভাবিতাম তিনিও আমাদের মতই একজন। আমাদের মতই অল্পজ্ঞ আর অতি অল্প বয়সের, তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ, তিনি ছিলেন গভীর ভাব নিষ্ঠ। তাঁহার একটি আখড়াবাড়ী ছিল। সেখানে রাজা ছিলেন আশানন্দ বাউল। আশে-পাশে যত প্রতিবেশী তারা ছিল আখড়াবাড়ীর প্রজা, আর আনন্দ উৎসবে অংশীদার উদ্‌যোগী কর্মী। গোবর্ধন যাত্রা উপলক্ষে সেখানে পাহাড় সাজানো হইত, কৃষ্ণলীলার সং প্রদর্শনী হইত। কদিন পর্যন্ত যাত্রাগান কীর্তন প্রভৃতি আনন্দে হাজার হাজার লোক তৃপ্তিলাভ করিত। বাউল বড় দেখা দিতেন না। তাঁহার অন্তরঙ্গ কয়েকটি শিষ্য লইয়া প্রায় তিনি ঘরের মধ্যে থাকিতেন। দেখা যাইত ভোগ আরতির সময় বাউল বাহিরে আসিয়াছেন। তাঁহার হাতে তেল মাখা বংশদণ্ডসার দোতারা বা গোপীযন্ত্র। মাঝে মাঝে বৈষ্ণবীও ক্ষুদ্রাকৃতি মধুর আকৃতি-

মূলক খঞ্জনী হাতে তাঁহার সহিত আসিয়া যোগ দিতেন। বাউল যখন কীর্তনে আপনভোলা হইয়া নাচিতে আরম্ভ করিতেন, মনে হইত দিব্যলোকে আনন্দলগ্ন উপস্থিত হইল। শ্রোতা ও দর্শক অনেকে অধৈর্য হইয়া সেই নৃত্যে যোগ দিত। তখন শতকণ্ঠে কৃষ্ণ-গোবিন্দ-গোপাল নামে আখড়া মুখরিত হইয়া উঠিত—মঙ্গল রোলে। এইতো তাঁহার বহিরঙ্গ দর্শন।

কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। বাউলের গুণে তাহারা মুগ্ধ, আর মহিমা কীর্তনে সহস্র মুখ। তাহারা বলিতেন—আশানন্দ হাত দিয়া বাতাসা হরির লুট দিতেথাকিলে পাত্র আর শূন্য হয় না, বাতাসা ফুরায় না, যত দেন ছড়াইয়া ততই পাত্র ভরিয়া উঠে। ভোগের পর মন্দিরে যাইয়া একবার তিনি দৃষ্টিপাত করিলে যত লোক প্রসাদ গ্রহণ করুক না কেন প্রসাদের আর অভাব হয় না। কত রোগী তাহার ঔষধ নয় শুধু জলপড়াতে সুস্থ নীরোগ হইয়াছে। তিনি এমন সব গাছের মূল জানেন যে তাহা ধারণ করিলে কঠিন কঠিন ভয় হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। একবার একটা লোক সর্পদংশনে মরিয়াই গিয়াছিল, বাউলের কাছে আনার পর তিনি লোকটির কানে কি একটা পাতার রস দিলেন আর সেই মৃত লোক যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল। কোথায় কোন্ প্রসূতি গর্ভবেদনায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ, কে যেন ছুটিয়া আসিয়া বাউলকে সেই সংবাদ জানায়—আর সঙ্গে সঙ্গে বাউল হাতে তুড়ী দিয়া বলেন 'যা যা খালাস হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরকে হরির লুট দিতে বলিস্। এমন সব অদ্ভুত ঘটনা বাউলের আখড়ায় নিত্য ঘটত। সেদিন কে একটি মরা বাছুর টানিয়া আনিয়া আখড়া বাড়ীর দোর গোড়ায় ফেলিয়াছে। সকাল বেলা বাউল ফুল তুলিতে বাহির হইবেন দেখিলেন সেই গোবৎসটিকে। তাহার দয়া হইল, তিনি কাছে গিয়া বলিলেন 'ওঠ ওঠ'। বাছুর ছুটিয়া তাহার মায়ের কাছে গেল।

কয়েকজন গঞ্জিকাসেবী সন্ধ্যার অন্ধকারে আসিয়া আখড়ার ছোট একটি ঘরে বসিত। কোনো কোনো দিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে স্থানটি ধোঁয়াটে হইয়া থাকিত। বাউলের কিন্তু স্বভাব-আরক্ত চক্ষু কোনোদিন অধিকতর আরক্ত বলিয়া দেখা যায় নাই। এমনি করিয়া তাহার দিন কাটিত।

একদিন আসিলেন দূরদেশযাত্রীর একটি দল। তাহারা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়াছেন, আশানন্দের গুরু-ভ্রাতার শিষ্য ও শিষ্যা ইহাদের কয়েকজন। সেদিন উৎসব চলিল সারাদিন। খাওয়া-দাওয়া আদর-আপ্যায়ন চন্দন আর ফুলের মালার ছড়াছড়ি। কত ফুল যে আঙ্গিনায় ছড়ানো হইল, আর কতবার সেই বিহ্বল নরনারীর প্রেমালিঙ্গন দেখিয়া যেন কেমনতর লাগিল। তাঁদের প্রমত্ত-চিত্তের ঐকান্তিক আনন্দ সঙ্গীত লহরী, তাহাদের সহনৃত্য, মধুর কণ্ঠে কীর্তন উন্মাদনা একটি অভিনব পরিবেশ সৃষ্টি করিল সেদিন। বুঝলাম বাউল তাহার নিজের একটা বিশেষ ধরণের ভাব বহন করে—যেটি অন্য সাধারণের কাছে সর্বদা বোদ্ধব্য নয়। তাহাদের এই প্রাণঢালা প্রীতির ভূমিকায় উন্নীত হওয়ার জন্য যে সহজ সাধনা, তাহা অতীব গূঢ় রহস্যাবৃত অথচ অফুরন্ত প্রাণময়।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনায় প্রেমোন্মাদনার আদর্শ বলিতে প্রবৃত্ত কৃষ্ণদাস বাউল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। মহাপ্রভুর চরণে আকৃষ্টহৃদয় রঘুনাথের পরিচয়ে 'চৈতন্যের বাউল কে রাখিতে পারে' বলিয়াছেন। বিশেষ করিয়া অদ্বৈতপ্রভু জগদানন্দকে দিয়া যে তর্জা সংবাদ পাঠাইয়া ছিলেন তাহাতে দেখা যায়, তিনি বলেন—

বাউলকে কহিও লোক হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥

বাউল বলিয়া অদ্বৈত সদগৃহস্থ নিজেরও পরিচয় দিয়াছেন। সন্ন্যাসী-শিরোমণি মহাপ্রভুকে 'বাউল' বলিয়া তাঁহার মত্ততার সূচনা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, সংসারাসক্ত সাধারণ আত্মভোলা জীবগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি 'আউল' কথাও ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে তৎকালেও আউল বাউলের পার্থক্যের একটা সন্ধান করা যাইতে পারে। প্রাচীনকাল হইতেই আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই, সহজীয়া, কর্তাভজা প্রভৃতি বহু গোষ্ঠীর কথা শুনা যায়। ইহাদের নিষ্ঠা ও চরিত্র শাস্ত্রীয় সাধনার পথ হইতে ব্যতিক্রম। সাধনচর্যায় এমন কতগুলি ব্যবহার তাহাদের মধ্যে প্রচলিত যাহা কোনো সুসংগঠিত সমাজে অচল। শাস্ত্র সদাচার দার্শনিকপ্রসিদ্ধ মতবাদ ছাড়াই ইহাদের [illegible]

নিয়ম মীমাংসা ও আচারক্রম দেখা যায়। তাহাদের বেশ, ভাব, চর্যা প্রভৃতির পার্থক্য থাকিলেও মোটামুটি রাধাকৃষ্ণ ভজনপরায়ণ বৈষ্ণবের মতই জীবনধারণ করেন। কোথাও পীত বহির্বাস কৌপীন, আর কখনও আলখাল্লা জাতীয় অঙ্গাবরণ ধারণ করিয়া কোনো এক তারের যন্ত্র হাতে বাউলকে দেখা যায়। ভাবপ্রমত্ততা তাহাদের বিশেষ লক্ষণ। গান করেন বাউল—

তাইতো বাউল হৈনু ভাই
এখন বেদের ভেদ বিভেদের
আরতো দাবি দাওয়া নাই।

সহজীয়া সম্বন্ধে আধুনিকতম গবেষণায় বৌদ্ধ সহজযানের কথা স্বীকার করিতে হয়। বাংলার তান্ত্রিক রূপায়ণে বৌদ্ধপ্রভাব সহায়তা করিয়াছে বহুলাংশে। বৈদিক কর্মকাণ্ডের যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত প্রদেশগুলি অনেকাংশে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াই ছিল। ভাবপ্রবণ বাংলার মাটিতে অনুকরণধর্ম স্বাভাবিক মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। সেই ক্ষেত্রে সহজযানের চর্যা নানাকারে অনুসৃত ও অনুকৃত হইয়া ফলে সংসারবিরাগী বিভিন্ন প্রকার সাধকগোষ্ঠী দেখা দেয়।

চৈতন্যের আবির্ভাব সামাজিক ও ধার্মিক জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন আনিয়াছিল। মেলা মহোৎসব বিভিন্ন গোষ্ঠীর সম্মেলন সংকীর্তন ধর্মান্তরগ্রহণ মতান্তর পরিবর্তন শুদ্ধীকরণ বেশান্তরগ্রহণ ত্যাগ বৈরাগ্যআদর্শসংপ্রসারণ প্রভৃতি বিশেষ করিয়াই নিয়মিতভাবেই ঘটিতেছিল। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পরেও শ্রীনিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র সেই সমাজের অধিনায়ক স্বরূপে অদ্ভুত পরিবর্তন আনিয়াছিলেন। আর্যেতর সমাজের বা সমাজচ্যুত মতবাদ নির্মুক্ত বহু লোক বীরভদ্রের প্রচেষ্টায় সাধুসমাজে স্থান লাভ করিবার সুযোগ পায়। বারহাজার নাঢ়া ও তেরহাজার নেঢ়ী তাহার সঙ্গে ছিল বলিয়া প্রবাদ। এই সমাজে গান্ধর্ব-রীতিতে বিবাহ প্রচলন করিয়া তিনি একটি নতুন গোষ্ঠীর পত্তন করেন। হিন্দুসমাজ তাহার প্রচেষ্টায় আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছিল এবং এই গোষ্ঠীকে আত্মসাৎ করিয়া লয়। সমাজসংস্কারকগণের অগ্রদূত বীরভদ্রের কথা আমরা অনেকে ভুলিতে বসিলেও বৈষ্ণবগোষ্ঠী ভুলিতে পারে না। বাউলেরা আজও গৌর-নিত্যানন্দ সঙ্গে বীরভদ্রকেও স্মরণ করেন।

তাহারা গান করেন,নিত্যানন্দের ঘাটে অদান খেয়া বয়, সেখানে পার হইতে কাহাকেও আর কড়ি দিতে হয় না। গুরুর কৃপা বাউলের কাছে পরম সম্পদ। গুরুবাদের প্রাচীন পন্থা হইতে ইহারা নতুন একটি দিক্ আবিষ্কার করিয়াছেন। জাতিবর্ণনির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তি গুরু হইতে পারে। এখানে হিন্দুমুসলমানেরও কোন বিচার নেই। আত্মনাথ বাউল বলেন "গুরুর হাতের প্রদীপ লইয়া দেখ্ রে অথাই গুহায় বইয়া, আত্মযোগে সতেজ হইয়া তবে পরম মরম পাবি"। এই মরমিয়ার আত্মকথা তাহার গুরুবাদের ভিত্তি। এই গুরুকে পাইবে বলিয়া সে বসিয়া থাকে। সে গান গায়—

"গুরুর চরণ পাব বলেরে বড় আশা ছিল।
আশা নদীর তীরে ব'সে আশায় আশায় জনম গেল।
চাতক রইল মেঘের আশে
মেঘ বরিষে অন্য দেশে
বল চাতক বাঁচে কিসে।"

এই গান চিরন্তনী আশার গান, প্রাণের গান, মর্মের বাণী। গুরুর কাছেই পরপারের টিকিট পাওয়া যায়। এখানে না আসিলে তাহার বৃন্দাবন যাওয়া হয় না। তাহার ভোলামন বৃথাই অন্যত্র ঘোরাফেরা করে। সে গান করে—

"ইষ্টিশন হয় গুরুর চরণ
টিকিট কর ও ভোলামন"।
টিকিটে না করলে পরে
কেমনে যাবি বৃন্দাবন।"

মানুষের মধ্যে যে আরও একটি প্রাণময় পুরুষ আছে তাঁহাকেই সে খোঁজে। সে বলে—

তত্ত্বেকতত্ত্বে মন মানে না
মনের মানুষ চাইই চাই।"

এই মানুষ খুঁজিবার আশায় তাহার গতির বিরাম নাই। সে আক্ষেপ করিয়া বলে "মানুষের মধ্যে মানুষ আছে, আরে তারে চিন্লি না।" তাঁহাকে কোথায় পাইবে এই বলিয়া সে অস্থির। সে বলে "আমার মনের মানুষ যেরে, আমি কোথায় পাব তারে"। নিত্য মানুষের সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই ভোলামন শান্ত হইয়া অন্তরতম সত্তার দিকে

উন্মুখ হয়। এই ভাবোন্মুখীকরণ ধর্ম—বাউলের সঙ্গীতেই ইহার প্রতিষ্ঠা। সহজিয়ার গান আর বাউল সঙ্গীত দুইএর মধ্যে বেশ একটু ব্যবধান আছে। সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলেই উহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। পদাবলীকীর্তন বা রসকীর্তনের সহিত একতারার যে স্থূল পার্থক্য তাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। লীলা বর্ণনপ্রধান রসকীর্তন, আর ভাববর্ণনপ্রধান বাউল সঙ্গীত। বাউলেরা রাধাকৃষ্ণ প্রেমসঙ্গীত করেন না—একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে যে গানই তাঁহারা করুন না কেন, উহার মধ্যে ভাবাংশকে রঙ্গিণ করিয়া তোলাই বাউলের চাতুর্য। কীর্তন রচনার প্রধানতম অভিব্যক্তি লীলারসপরিবেশদক্ষতায় মিলন, বিরহ, ভাবরচনা, সঙ্গীত-লহরীর সংযোজনা, রসকীর্তনের পূর্ণাবয়ব চিত্রসৃষ্টি চিত্ত-মনোহারী খণ্ড খণ্ড ভাবমাধুর্য সংমিশ্রণে বাউল সঙ্গীত মর্মবাটিকায় বিচিত্র শোভায় সমৃদ্ধ করিয়া থাকে। সহজিয়া পদে বহু প্রকার গ্রন্থি যোজনা দেখা যায়। এইগুলি তাহাদের সাধন সঙ্কেত।

মানব দেহেই তাহারা চোদ্দভুবন কল্পনা করেন। দেহই তাহাদের ক্ষেত্র ও বৃন্দাবন। এই দেহেই তাহাদের স্বর্গ ও নরক। ইহা লইয়াই সাধন এবং সিদ্ধি। দেহজাত কোন পদার্থ ইহাদের দৃষ্টিতে অপবিত্র নয়। সাধনায় অটলতার অভিলষিত। গোপন সাধনার কথার সঙ্গে দেহ সম্বন্ধকে তাহারা কোথাও অস্বীকার করেন নাই অথচ দেহাতিরিক্ত সত্ত্বায় উন্নীত হওয়ার জন্যই তাহাকে অটল হইতে হইবে। "জলেতে নামিবি জল না ছুঁইবি" প্রভৃতি সাধনার উপদেশ রহিয়াছে। সে স্নান করিয়াও চুল ভিজাইবে না। রান্না করিয়াও হাঁড়ি ছুঁইবেনা। সে সতী হইতেও চাহে না, অসতীও হইতে চাহে না, পতির সঙ্গে প্রেম করিবে অথচ জানিতে দিবে না। সহজিয়া ও বাউল এই দুইয়ের মধ্যেই ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাধান্য। তবে একটি দেহকে লইয়া, অপরটি ভাবকে লইয়া বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে। শেলী এবং কিট্‌স্ এই দুই কবির মধ্যে যে পার্থক্য পণ্ডিতেরা বিশেষভাবে উহার সমালোচনা করিয়াছে। কিন্তু সহজিয়া ও বাউলের ধারাবাহিক সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারতীয় দর্শন প্রাণসত্ত্বা, দৈবসত্ত্বা ও অধ্যাত্মসত্ত্বার যে নিপুণ বিচার করেন কোন দেশে সেরূপ বিচার নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা। অন্তর্জগতের লুকানো সত্ত্বাকে বাহিরে আনিয়া ভোগের লালসা অধ্যাত্মবাদীর সহজাত, দেহে আত্মার ব্যাপ্তি দেহাভিন্ন রূপেই তাহার অভিব্যক্তি; কাজেই দেহকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আবার অনিত্য দেহকে অবলম্বন করিয়া যে প্রচেষ্টা উহাও যে ভঙ্গুর তাহাও অজানা নাই। এই জন্যই দেহভিন্ন এমন এক অভিব্যক্তির প্রয়োজন, যেটি দেহ হইয়াও দেহধর্মী নয়, আত্মসত্ত্বা হইয়াও দেহের ন্যায় ব্যবহার্য। এই আত্মঅনাত্ম যোগাযোগেই বাউল গানের তাৎপর্য। ইহাদ্বারা কেহ যেন মনে না করেন যে, অসম্ভব বস্তুর সন্ধানেই বাউল বাতুল হইয়া ছন।

বাউল বাতুল নয়, বাউল ব্যাকুল। এই ব্যাকুলতা তাহার সঙ্গীতে একটি মধুর মঞ্জীর ধ্বনির রণনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার আশা, উৎকণ্ঠা, লালসা এবং আর্তি অন্তরে বিরামবিহীন সঞ্চারে ঝংকার তুলিয়াছে। তাহার থমকে গমক দোতারার ঝংকার আর খঞ্জরির চাঞ্চল্য মিলিত হইয়া অন্তরে প্রেমের মঞ্জরীকে নাচাইয়া তুলিয়াছে। সহজিয়ার সহজ দৃষ্টিতে ভিতর বাহির একাকার হইয়া গিয়াছে। সে অভিলষিত কিশোরীকে দেখিতে পাইয়াছে। তাই শুনি "উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী নয়নতারা"। বাউলের চোখে বাহির দুয়ারে লেগেছে তালা, তোর ভিতর দুয়ার খোলা। মায়া নদীর এপার ওপারের ব্যবধান তাহাকে আকুল করিয়াছে। প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সে গান করে—

> "তুমি ওপার হতে বাজাও বাঁশী
> আমি এপার হতে শুনি
> অভাগিয়া নারী আমি
> সাঁতার নাহি জানি।"

নিত্যানন্দের জন্মস্থান বীরভূমের আশেপাশে বহু প্রসিদ্ধ বাউল বাস করিতেন। জীবনে ঔদাস্য, সংসারে বিতৃষ্ণা, বিষয়ে অনভিনিবেশ, আর জনসঙ্গত্যাগ ছিল তাঁহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। লৌকিক ব্যবহার হইতে জীবনটিকে তুলিয়া একপাশে ধরিয়া রাখাই ছিল তাহাদের স্বভাব। এই নিরালা প্রাণের মাধুরী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রেখাপাত করিয়াছে। একটানা সকল সুখদুঃখনিরপেক্ষ

বাদল ধারার মধ্যে তিনি বাউলকে আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার একতারার গান শুনিয়াছেন।

"বাদল বাউল বাজায় বাজায়রে
বাজায় রে একতারা।"

শান্তিনিকেতনে একাধিকবার তিনি বাউলের গান শুনিয়াছেন। বাউলের ছন্দ, সুর তিনি সঙ্গীতে, কাব্যে রূপ দিয়াছেন। ব্রহ্মসঙ্গীতে বাউল সুরের অনেক গান আছে। কীর্তন, টপ, রামপ্রসাদী, প্রভৃতির মত বাউলসুর নিজস্ব মাধুর্যে এক। ভাটিয়ালি পল্লীসঙ্গীত, জারী, তরজা, প্রভৃতি বাউলের মধুরতা হরণ করিতে পারে নাই। উদাস প্রাণের একটানা প্রেরণা কোন্ সুদূরের সংবাদ বহন করিয়া আনে বাউল সঙ্গীত, তাহা সহসা বুঝিয়া ওঠা যায় না।

লিরিক কাব্যের সঙ্গে তুলনা করিলেও দেখা যাইবে ইহার মধ্যে যে সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম সংবেদন উহা অন্যত্র দুর্লভ। ফকিরের কেরামতি আছে, ঝাড়, ফুক্, জড়ি, বুটি, দোয়া আছে কিন্তু তাহার এরূপ মনমাতানো পাগলকরা গান নেই। আমাদের বাউলের অভাবনীয় ক্ষমতার সঙ্গে তার সঙ্গীত আছে, আর আছে, প্রাণের অতলে আনন্দ শিহরণ আনিয়া দিবার মত দিব্য বল।

তারের যন্ত্রে সুর সমন্বয়ের বাতায়ন চিরমুক্ত। একতারার একটি তারেই বাউলের বিভিন্ন রাগিণী ও ছন্দের সমন্বয় হয়। আবার অনুরূপ ভাবেই তাহার মনের দেউলে 'বাউল' বিভিন্ন দেবতার পূজার সমারোহ করেন। এখানে কোন জাতি, গোষ্ঠী বা সমাজের সীমা তাহার ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না, আর করেও না। তাহার মনপাখী অনন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়ায় মুক্তির গান গাহিয়া, আর মর্ত্যের মানুষকে তাহার জীবনের স্বচ্ছন্দ গরিমায় লুব্ধ করিয়া। মাটিতে লুটাইয়াও ধূলি লাগে না তাহার গায়। দেহের গান গাহিয়াও সে অনাসক্তির প্রদীপ জ্বালাইয়া দেয় প্রতিটি মানুষের মনের কোণে। ইহকাল, পরকাল, বন্ধন ও মুক্তি, আসক্তি ও অনাসক্তির দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ জীবনই বাউলের আদর্শ।

এত মৃত্যু মাঝে

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

মৃত্যু! শুধু মৃত্যু!
চারিধারে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে।
বিদ্বেষের বিষাক্ত ছুরিকা
হাতে নিয়ে ফিরিছে দুশ্‌মন।
তার বক্ষে ঠাঁই নেই
মায়া মমতার।
মৃত্যুর বিমূর্ত প্রতীক!
জানে না সে কেন হত্যা করে!
আদিম ঘাতক বুঝি হননের
আনন্দে মাতাল।

আছে ব্যাধি, আছে জরা,
আছে লক্ষ রোগের বীজাণু,
আসে ঝড়, আসে ঝঞ্ঝা
অপঘাত, ভূকম্পন
প্রলয়ের মহাকলরোল

মৃত্যুর জয় ডংকা বাজে অবিরাম
দশ দিকে।

মৃত্যুর এ মহা শ্মশান
দগ্ধ ধরিত্রীর বুকে
তবু জন্ম নেয়
শ্যাম-শস্য ফুল-ফল।
সবুজ ঘাসেরা স্নান করে
রাত্রির শিশিরে।

তবু জ্বলে সৌন্দর্যের আলো।
গোলাপের রাগে
সুন্দরীর রক্তিম কপোলে।
মানুষের বুকে
দয়া-মায়া প্রেম-ভালবাসা
তবু জেগে রয় মৃত্যু-হীন।
এত মৃত্যু মাঝে!
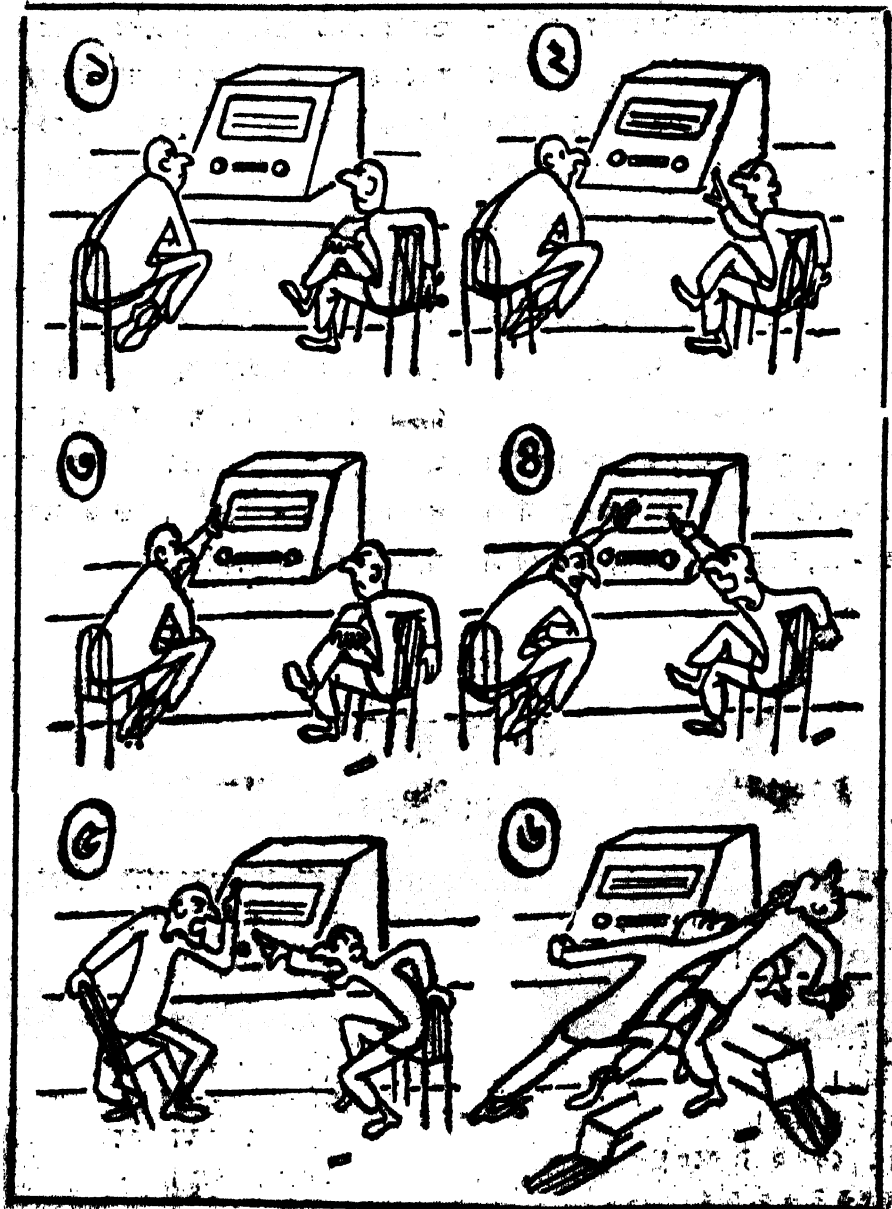
রণ-বিধ্বস্ত জার্ম্মাণ জাতি

উপানন্দ

দূর কোন্ অতীতের অন্ধহারা যুগে ধীরে ধীরে মানুষ বেরিয়ে এলো তার অরণ্য জীবন ত্যাগ করে, তারপর তার মনে এলো নানা কল্পনা আর পরিকল্পনা। স্ফুরণ হোতে লাগলো তার বুদ্ধিবৃত্তি। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সুরু হোলো সভ্যতার আলোকে তার পদক্ষেপ। ক্রমে বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠী—সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে ব্যাপক ভাবে নানা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো, শেষে যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে আরম্ভ করলো বসতি স্থাপন করতে। ভাষাগত ভিত্তিতে গড়ে উঠ্‌লো এক একটি স্বতন্ত্র সমাজ। স্বাতন্ত্র্য বজায় করে এক একটি সমাজবদ্ধ জাতি অগ্রসর হোতে সুরু করলো আপনার বৃদ্ধি বিস্তারের দিকে। ইন্দোজার্ম্মান পরিবার এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এর টিউটানিক শাখা থেকে জন্মলাভ করেছে জার্ম্মাণ উপজাতিবৃন্দ। এই সব উপজাতি ছিল বিচ্ছিন্ন হয়ে। নিম্নপর্য্যায়ভুক্ত স্যাক্সন আর ফ্রিসিয়ারা ছিল উত্তরে, ফ্রাঙ্করা ছিল পশ্চিমে, থুরিন্-গিয়ানরা ছিল মধ্য জার্ম্মাণীতে, এ্যালেম্যান্নিরা ছিল সোয়াবিয়াতে, আর ব্যাভেরিয়ানরা ছিল দক্ষিণে। ইউ-রোপের ভূখণ্ডে এদের দৈনন্দিন জীবনের ওপর আলোক সম্পাত করলেন শার্লমেন। তিনি রাজনৈতিকতার প্রয়োজনে এদের সকলকে কাছে টেনে নিলেন। ঐক্যবদ্ধ হোলো তারা শার্লমেনের অধিনায়কতায়।

ষোড়শ শতাব্দী এদের কাছে হয়ে উঠ্‌লো গুরুত্ব-ব্যঞ্জক। ১৬১৮ খৃঃ থেকে ১৬৪৮ খৃঃ পর্য্যন্ত ত্রিশটী বছর ধরে চল্‌লো যুদ্ধবিগ্রহ, কিন্তু নিষ্পত্তি হোলোনা ধর্ম্মসংক্রান্ত দ্বন্দ্বকলহ। এলো ভয়াবহ পরিস্থিতি, ধ্বংস আর উচ্ছেদে ব্যাহত হোলো মানুষের অগ্রগমনের অভীপ্সা। জার্ম্মাণী হয়ে উঠ্‌লো ইউরোপের সামরিক রঙ্গভূমি। এই ভূমি আজও অবলুপ্ত হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এখনও আত্মগোপন করে আছে সামরিক বহ্নি।

এই সম্মিলিত জাতি যে রাষ্ট্রমণ্ডল গড়ে তোলে, তাকে 'রাইখ' বলা হয় অর্থাৎ জার্ম্মাণ রাষ্ট্রমণ্ডল। মধ্যযুগে যুদ্ধের সমাপ্তির পর নেদারল্যাণ্ড রাইখের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করলো। অষ্টাদশ শতাব্দী জার্ম্মাণ জাতির ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সভ্যতার নব নব উন্মেষ ও জ্ঞান প্রজ্ঞানের নব নব ভাবধারা জাতির জীবনে সৃষ্টি করলো স্বর্ণ যুগ। এই সময়ে এলেন অনন্য-সাধারণ মনীষিরা জার্ম্মান জাতিকে উন্নত করবার জন্যে, এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাক্-কাণ্ট, গোয়েটে, শীলার প্রভৃতি। তখন ব্রাণ্ডেনবুর্গ প্রাসিয়া ক্রমবর্দ্ধমান, সুরু হয়েছে তার উন্নয়ন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এলো আবার দুর্দিন। যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হবার সুযোগ হোলোনা জার্ম্মাণ জাতির। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বত্রিশ জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র-কর্ণধার যোগ দিলেন দিউৎসার-বাণ্ড পরিমণ্ডলে। উন্মুক্ত রাজকীয় মর্য্যাদাসম্পন্ন সহরগুলি

উঠলো গড়ে। পরবর্তীকালে দেখা দিল নবদিউৎসার বাও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে। এই পরিমণ্ডল হোলো রাইখের অগ্রদূত। এর সম্রাট হোলেন প্রাসিয়ার অধিপতি। পাঁচশো বছর ধরে অষ্ট্রিয়াই জুগিয়ে এসেছে জার্ম্মাণ সম্রাট। এই অষ্ট্রিয়াই শেষে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, রাইখের সঙ্গে ত্যাগ করলো সমস্ত সম্পর্ক।

এর পর গড়ে উঠলো নূতন জার্ম্মাণ রাষ্ট্রমণ্ডল। এর প্রথম চ্যান্সেলার বা রাষ্ট্রপতি হোলেন অটো ফন বিসমার্ক। এঁরই আবির্ভাবের ফলে জার্ম্মানীর জাতীয় শক্তি সুদৃঢ় হোলো। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাতির দ্রুত অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হোতে লাগলো, সৌভাগ্য লক্ষ্মী হোলেন জাতির উপর সুপ্রসন্ন—শ্রমশিল্পোৎপাদনেও এলো সাফল্যগৌরব। জার্ম্মাণীর জীবনযাত্রামানও হয়ে উঠলো খুব উঁচু। সমগ্র পৃথিবী রাইখকে জানালো অভিবাদন। জ্ঞানবিজ্ঞানে শিল্পকলায় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে জার্ম্মানীর দ্রুত অগ্রগমন পরিলক্ষিত হোলো। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আদর্শ সমাজ বিধান প্রবর্ত্তন করলো জার্ম্মানজাতি

নব্যশিল্পের প্রবর্ত্তক ছিলেন বয়েট (১৭৮১-১৮৫৩) গোয়েটের আমলের লোক। আলফ্রেড ক্রুপ (১৮১২-১৮৮৭) রূঢ় অঞ্চলে ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। রেলওয়ে শিল্পের প্রবর্ত্তক বর্জ্জিশ (১৮০৪-১৮৫৪), তড়িৎ-শিল্পের প্রবর্ত্তক হব্যনার ফন্ জীমেন্স। ক্রুপকেও ছাপিয়ে উঠেছে হুগো ষ্টিন্নেসের নাম। তড়িৎশিল্পে জীমেন্স পরিবার বার্লিনকে জগৎপ্রসিদ্ধ করেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখালেন ডাক্তার বিয়ার।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ও আমরা দেখেছি জার্ম্মানীর অসাধারণ শক্তি। সেদিন এ জাতি মানব মনের মহা-সম্ভাবনাকে আশ্রয় করে বহুদূর এগিয়ে গেছে, অর্জ্জিত হ'য়েছে সেদিন তার পর্ব্বতবিচূর্ণকারী মহাশক্তি। প্রথম মহাযুদ্ধে সে স্বপ্ন দেখেছিল বিশ্বজয়ের, কিন্তু বিধাতা বিরূপ হোলেন। ১৯১৪ খৃঃ থেকে ১৯১৮ খৃঃ পর্য্যন্ত চললো মহাযুদ্ধ। জার্ম্মান-একতা যুদ্ধে পরাজয়ের পরও শিথিল হোলো না। উল্লেখযোগ্য রাজ্যকেও সে হারালো। এর পর জার্ম্মান রাষ্ট্রমণ্ডল রাইখ হোলো গণতান্ত্রিক। এ যুদ্ধে হৃতসর্ব্বস্ব হয়েও জার্ম্মানরা নতুন তেজের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিল। কিন্তু আবার জাতির অন্তরে রক্তাক্ত বেদনায় জন্মগ্রহণ করলো অসন্তোষ। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিশ্বের অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিস্থিতিতে দুর্ব্বল হয়ে পড়লো জার্ম্মানীর 'উইমার রিপাবলিক'। দ্রুত বেকারসমস্যা বৃদ্ধি হোতে থাকে। ১৯৩২-৩৩ সালে ষাট লক্ষ লোকেরও বেশী বেকার দেখা গেলো জার্ম্মানীতে। এ সুযোগ নিয়ে এলো একটি ক্ষুদ্রতম মানুষ ঝঞ্ঝার মত, যার পশ্চাতে ছিল শুধু একটি শক্তিসম্পন্ন দল। এই দলের নেতা গণবক্তা এডলফ হিটলার। জার্ম্মানীর ভাগ্যাকাশে ধূম্রকেতুর মতই এসে দাঁড়ালো হিটলার। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে রাইখের অধিনেতা হোলো হিটলার। গণতান্ত্রিক আনুকূল্যে ভোটের প্রহসনের মাধ্যমে রাইখের সর্ব্বাধিনায়কত্ব পেয়ে একেবারে রাইখের রূপ পরিবর্ত্তন করলো। ক্ষমতা-প্রমত্ত প্রতিষ্ঠিত হিটলারের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে এলো জার্ম্মানীর চরম দুর্দ্দৈব। বিশ্বযুদ্ধের প্রথম ধাক্কায় একান্তভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠলো উৎকট জাতীয়তাবাদ। উৎকট জাতি প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে এলো উৎকট জাতিবিদ্বেষ। হিটলারের নাৎসী দল কী অমানুষিক বর্ব্বরতার আশ্রয় নিয়েই না ইহুদী নির্য্যাতন ও বিতাড়ন সুরু করলো। মানুষ মারা আর মাটি দখল করা এই হোলো পরম লক্ষ্য। কল্যাণ ধর্ম্মের আদর্শ হয়ে গেল নিশ্চিহ্ন। জার্ম্মানী রাজ-নৈতিকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হোতে পারলো না। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হোলো ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, শেষ হোলো ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। শোচনীয় শোকাবহ পরিস্থিতির মধ্যে সম্পূর্ণ পরাজিত জার্ম্মান জাতি আর্ত্তনাদ করে উঠ । এই জাতির ইতিহাস ষোড়শ শতাব্দী থেকে সুরু করে বিংশ শতাব্দীর উপর্য্যুপরি দুইটি মহাযুদ্ধের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বিধ্বস্ত না হোতো, তা হোলে আজ জার্ম্মান জাতি মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুরোধা হয়ে বিশ্বের বহু কল্যাণ করতে পারতো। প্রাচীন আর্য্যজাতির মহান্ ঐতিহ্যকে এরা আরও মহিমান্বিত করতে সক্ষম হোতো।

১৯৪৫ সালের জুন মাসে জার্ম্মান রাইখের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলি বিভক্ত হয়ে চতুঃশক্তির অধিকারে এলো। অধিকারীর দল পেলো সার্ব্বভৌম শক্তি জার্ম্মানীর উপর কর্তৃত্ব করবার। ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত বার্লিন ছিল জার্ম্মান রাইখের রাজধানী। দ্বিখণ্ডিত হোলো। পূর্ব্বাঞ্চলে

কর্তৃত্বতার নিল সোভিয়েট শক্তি। ১৯৬১ সালের ১৩ই আগষ্ট থেকে পূর্ববার্লিনের সঙ্গে পশ্চিম বার্লিনের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটলো - কাঁটা তার, প্রাচীর আর মৃত্যুজাল দিয়ে পূর্ব্ব বার্লিন কর্তৃপক্ষ জার্ম্মানীর প্রাণপ্রবাহকে দিল শুষ্ক করে। সোভিয়েট অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে গণতান্ত্রিকতার আবহাওয়া নেই, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিলোপ সাধন ঘটে গেছে। পশ্চিম বার্লিন হামবুর্গ সহরের চেয়েও বড়ো, কুড়িলক্ষ লোকেরও বেশী এখানকার অধিবাসী। জার্ম্মানীর পশ্চিম অঞ্চল ব্রিটিশ, মার্কিণ ও ফ্রান্সের অধীনে রইলো ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত। সেপ্টেম্বরেই গঠিত হোলো জার্ম্মানীর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র—'দি ফেডারেল রিপাব্লিক অব জার্ম্মানী।' এর রাজধানী হোলো বন। ৫ই মে ১৯৫৫ সালে জার্ম্মানীর নব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুরোপুরি স্বাধীনতা পেয়ে পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের সঙ্গে সাম্মিলিত হয়েছে। আজ সে পেয়েছে সর্ব্বাধিকার। পৃথিবীর নানা দেশের সঙ্গে সে আজ মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ। আজ সে দ্রুত এগিয়ে চলেছে উন্নতির উচ্চশিখরে। মানবের কল্যাণ সম্ভাবনার অবশ্যম্ভাবিতাকে রূপ দেবে যারা, এই জার্ম্মানী তাদের একজন হবে কিনা কে-ই বা সে কথা বলতে পারে!
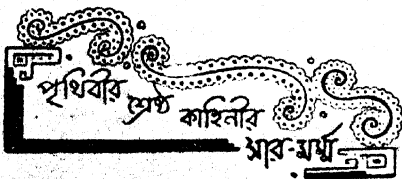
—

কাউন্ট লিও টলষ্টয়

রচিত

দি লঙ্ এক্সাইল্

(The Long Exile)

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পরের দিন সকালে প্রহরী এসে কয়েদখানার লোহার ফটক খুলে দিতেই অন্য কয়েদীদের দলে যোগদান না করে একাকী চুপচাপ বেরিয়ে এলো বাইরের উন্মুক্ত-আঙ্গিনায় ···ঘৃণায় সঙ্গী মিকারের পানে ফিরেও তাকালো না সে একবার। কিন্তু জেলখানার উন্মুক্ত-আঙ্গিনায় বেরিয়ে এসেও আক্শ্নেকের মনের দ্বন্দ্ব অশান্তি ঘুচলো না··· মিকারের উপর ঘৃণা আক্রোশও মিটলো না কিছুতেই। এমন কি, ভগবানের নাম-গান করেও, তার মনের সন্দেহ-গ্লানির উপশম হলো না এতটুকু···দিবারাত্রই আক্শ্নেকের মন পাথরের মতোই ভারী হয়ে রইলো—কোনোমতেই ভুলতে পারলো না সে মিকারের আচরণের কথা।

এমনিভাবেই মর্ম্মান্তিক-অশান্তির মধ্যেই কেটে গেল সুদীর্ঘ পনেরো দিন। একদিন নিশুতি-রাতে···তালা-বন্ধ কয়েদখানার বিরাট কামরায় মিকার আর অন্য কয়েদীরা সবাই তখন সারাদিনের হাড়-ভাঙা-খাটুনীর পর গভীর নিদ্রায় অচেতন···শুধু আক্শ্নেকের চোখে ঘুম নেই·· একা-একা অন্ধকার-কামরায় সে চিন্তাকুলভাবে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ তার নজরে পড়লো কয়েদখানার নিরালা এক কোণে কয়েদীদের শোবার-জায়গার তক্তার নীচে একরাশ মাটি কাঁকরের স্তূপ জড়ো হয়ে রয়েছে। ব্যাপার কি ভালো করে দেখবার জন্য কৌতূহল-ভরে আক্শ্নেক ঘরের মেঝেতে জড়ো-করা সেই মাটি কাঁকরের স্তূপের কাছে এগিয়ে আসতেই হঠাৎ লক্ষ্য করলে যে মিকার অতি-সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে কয়েদীদের সেই শোবার-জায়গার তক্তার নীচে থেকে বেরিয়ে এলো।

নিঝুম-রাতে মিকারকে এভাবে চোরের মতো চুপি-চুপি জেলখানার কয়েদীদের শোবার-জায়গার তক্তার তলা থেকে আচমকা বেরিয়ে আসতে দেখে আক্শ্নেক তো অবাক! ব্যাপার কি?···এত রাতে সকলের দৃষ্টির অগোচরে মিকারের এই অদ্ভুত-আচরণের মানে কি?··· কোনো বদ্-মতলব নেই তো ওর মনে?···বিস্ময়াভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে আক্শ্নেক মনে মনে এ সব কথা চিন্তা করছে···এমন সময় মিকারের হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো তার দিকে! তাকে দেখেই মিকার ক্ষণেকের জন্য হক্চকিয়ে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলো। আক্শ্নেক কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে, মিকারকে যেন আদৌ দেখতে পায়নি সে—এমনি ভাণ করে, নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে

পড়ছিল···এমন সময় মিকার হঠাৎ তার সজোরে হাতখানা চেপে ধরে তাকে আটকালো···আক্শেনকের কানের কাছে মুখখানা এগিয়ে-এনে চাপা-গলায় সে বললে,—চুপ !···এইমাত্র চোখের সামনে যে সব ব্যাপার ঘটতে দেখলে, এ সব কথা ঘুণাক্ষরেও কারো কাছে প্রকাশ কোরো না ! তাহলেই সর্ব্বনাশ !···আমি মতলব করেছি পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে সাইবেরিয়ার এ কয়েদ-খানা থেকে চম্পট দেবো ! তাই সকলের চোখের আড়ালে রাত নিশুতি হলে রোজ আমি এমনিভাবে চুপিচুপি কয়েদ-খানার মেঝে খুঁড়ে সুড়ঙ্গ-পথ বানাচ্ছি···আর সকাল হলেই অন্য কয়েদীদের সঙ্গে জেলের কামরা ছেড়ে কাজ-কর্ম্মের জন্য বাইরে বেরুনোর সময়, সবাইকার দৃষ্টির অগোচরে জুতো-জামার ফোকরের মধ্যে লুকিয়ে এ সব মাটি-কাঁকর সন্তর্পণে বয়ে নিয়ে গিয়ে বাগানের কোণে ফেলে দিয়ে আসি ! অন্য কেউ বুঝতেই পারে না যে রোজ রাতে আমি কি কীর্ত্তি করছি ! কাজেই কয়েদ-খানার কারো মনেই কোনো সন্দেহ জাগে না আমার সম্বন্ধে !···বুঝলে এখন ব্যাপারটা !

মিকারের আজব কাণ্ড-কারখানা আর কথাবার্তা শুনে আক্শেনক তো স্তম্ভিত ! আক্শেনককে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চাপা-গলায় মিকার তাকে শাসিয়ে বললে, —শোনো ভায়া···সাফ্ কথা বলে রাখছি তোমায় !··· আমার কথামতো কাজ করো তো তোমাকেও আমি কয়েদখানার এই বন্দী-জীবন থেকে মুক্তি দিতে পারি··· কামরার কোণের ঐ সুড়ঙ্গ-পথের ফোকর দিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে সোজা জেলখানার বাইরে চম্পট দিতে পারবে। কাজেই এখানে কারো কাছে এ সব কথা ফাঁশ না করে যদি তুমি চুপচাপ থাকো তো প্রাণে বাঁচবে ! না হলে তোমার রক্ষা নেই !··· কারো কাছে এ কথা ফাঁশ হলে, শুধু যে আমি ধরা পড়ে সাজা পাবো তাই নয়···তোমারও দফা শেষ করে ছাড়বো আমি···যে উপায়েই হোক্—তোমাকে খুন করে আমি তার শোধ তুলবো·· কথাটা মনে রেখো কিন্তু !

মিকারের শাসানী শুনে রাগে ঘৃণায় আক্শেনকের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো ! চাপা-স্বরে তীব্র-প্রতিবাদ জানিয়ে সে জবাব দিলে,—ইতর···শয়তান কোথাকার ! প্রাণ বাঁচানোর লোভে তোমার মতো এভাবে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে লুকিয়ে পালানোর চেয়ে আজীবন কয়েদখানায় পচে মরাও ঢের ভালো ! এমন কাপুরুষের মতো পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর এতটুকু বাসনা নেই আমার !···তুচ্ছ প্রাণের মায়ায় কাতর নই আমি !···খুনের ভয় কি তুমি দেখাবে আমায় ?···বহুদিন আগেই তো তুমি আমার জীবন-নাশ করেছো···কাজেই আজ আবার নতুন করে খুনের ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই ! মিথ্যা ও ভয় দেখিয়ে আমাকে টলাতে পারবে না তুমি !·· তোমার এই জঘন্য-কীর্ত্তির কথা সকলের সামনে ফাঁশ করবো কি না—সেটা আমার খুশী !···ভগবান আমাকে দিয়ে যেমনটি করাবেন···সেই কাজ আমি করবো ! তোমার ঐ মিথ্যা হুমকীতে ভয় পেয়ে আমার পথ আমার কর্ত্তব্য থেকে আমি এতটুকু সরে দাঁড়াবো না !···

এ কথা বলেই দৃপ্ত-ভঙ্গীতে এক ঝটকায় মিকারের কবল থেকে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে আক্শেনক ঘৃণায়-বিরক্তিতে দূরে সরে গিয়ে কয়েদখানার কোণে তালা-আঁটা লোহার-কপাটের গরাদের পাশে একা দাঁড়িয়ে বাইরে নিশুতি-রাতের অন্ধকার আকাশের পানে দৃষ্টি মেলে দিয়ে আপন মনে অতীত-দিনের নানান্ পুরোনো কথা চিন্তা করতে লাগলো !

আক্শেনকের আচরণ দেখে মিকার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো ···কিন্তু সাহস করে তার সঙ্গে আর ঘাঁটাতে এগুলো না ···আড়চোখে আক্শেনকের পানে সন্দিগ্ধ-দৃষ্টি হেনে সে নিঃশব্দে ফিরে গেল কয়েদখানার নিরালা-কোণে নিজের শয়ন-তক্তার আশ্রয়ে ! [ক্রমশঃ

চিত্রগুপ্ত

ধরো, বার্ষিক পরীক্ষার পর বড়দিনের ছুটিতে তোমরা দল বেঁধে পিকনিকে বেরিয়েছো···এমন সময় যদি তোমাদের কেউ প্রশ্ন করে যে জ্বলন্ত-উনানের উপর কাগজের তৈরী ঠোঙা বা পাত্র রেখে সেই পাত্রে চায়ের জল গরম করতে পারো ? তাহলে তোমরা সকলেই হয়তো বলবে—এ কাজ অসম্ভব !···উনানের আগুনের আঁচে কাগজের ঠোঙা বা পাত্র বসালেই তো নিমেষে সেটি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে··· কাজেই সে পাত্রে জ্বলন্ত-উনানের উপর চায়ের জল গরম করা আদৌ সম্ভব নয় ! কিন্তু বিজ্ঞানের বিচিত্র বিষয়ে যাঁদের অল্প-বিস্তর ধারণা জ্ঞান আছে, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে বলবেন,—মোটেই না ! এ কাজ এমন কিছু দুঃসাধ্য-কঠিন নয়···সামান্য বুদ্ধি খরচ করলেই অনায়াসেই হাসিল করা যায় !

কথাটা বাস্তবিকই ঠিক ! কারণ, বিজ্ঞানের দৌলতে এমন কাজ খুব সহজেই হাসিল করা যায় !·· কিন্তু কি উপায়ে ?···শোনো তাহলে - তোমাদের আজ সেই বিশেষ উপায়ের আসল-রহস্য শিখিয়ে দিই। মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে ধৈর্য্য ধরে সামান্য চেষ্টা করলেই, খুব সহজে তোমরা এমন অদ্ভুত-মজার খেলা দেখিয়ে অনায়াসে নিজেদের আত্মীয়-বন্ধুদের রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে।
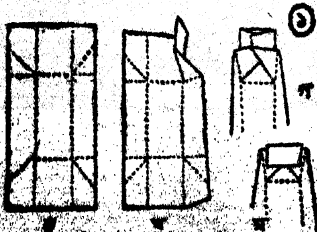
উপরের ১নং ছবিতে যেমন নমুনা দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনি-ধরণে ঈষৎ-পুরু এবং বেশ শক্ত-মজবুত এক টুকরো কাগজ নিয়ে উপরোক্ত-ছাঁদে ঠোঙা বা পাত্র বানিয়ে নাও। উপরোক্ত-প্রথায় নিখুঁত-ছাঁদে ও পরিপাটিভাবে কাগজের ঠোঙা বা পাত্রটি রচনা করবার পর, সেটির দুইপাশের কিনারায় দুটি কাগজ-আঁটার উপযোগী তারের 'ক্লিপ্' (Metal Paper-Clip) এঁটে দাও। তবে
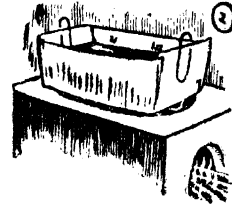
হুঁশিয়ার··· 'ক্লিপ্' আঁটবার সময়, সর্ব্বদা খেয়াল রেখো যে ঠোঙা বা পাত্রের কোথাও যেন জল প্রবেশের এতটুকু ফাঁক না থাকে ! কারণ, অসাবধানতা অথবা তাড়াহুড়ো করে তৈরী করার ফলে, কাগজের পাত্র বা ঠোঙার কোথাও কোনো ফাঁক থাকলেই, সে ফাঁকের ভিতর দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা করে জল বেরিয়ে গেলেই—মজা মাটি !··· এমন কি, শেষ পর্য্যন্ত এই খেলা দেখানোও সম্ভবপর হবে না ! সুতরাং গোড়া থেকে এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

যাই হোক, এমনিভাবে সুষ্ঠু-ছাঁদে কাগজের ঠোঙা বা পাত্রটি তৈরী করে নিয়ে, সেটিতে জল ভরে দাও। তারপর খুব সন্তর্পণে জল-ভরা ঐ কাগজের ঠোঙা বা পাত্রটিকে তুলে নিয়ে সযত্নে বসিয়ে রাখো—জ্বলন্ত-উনানের আগুনের আঁচে। তবে খেয়াল রেখো—আগুনের আঁচে বসানোর সময়, জ্বলন্ত লেলিহান-শিখার কোনো স্পর্শ যেন কাগজের ঠোঙার বা পাত্রের উপরাংশে ও কোণায়···অর্থাৎ, যে-অংশে জল-ভরা নেই, সেখানে না লাগে কোনো রকমে। কারণ, কোনো কারণে সে সব অংশের কোথাও আগুনের লেলিহান-শিখার ছোঁয়াচ লাগলেই, কাগজ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের এই আজব-খেলার মজাও পণ্ড হবে আগাগোড়া। সুতরাং খেলা দেখানোর সময় এদিকে নজর রাখতে ভুলো না। এ কাজ সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন করতে পারলেই দেখবে, জ্বলন্ত-উনানের আঁচে-বসানো জল-ভরা ঠোঙা বা পাত্রটি বেমালুম অক্ষত-অবস্থ

অবস্থায় রয়েছে এবং আগুনের তাপের ফলে, কিছুক্ষণ পরেই ঠোঙা বা পাত্রের ভিতরকার জল বুদ্‌বুদ্ তুলে দিব্যি ফুটন্ত হয়ে উঠেছে। তোমাদের এই আজব কেরামতি দেখে তখন আত্মীয়-বন্ধুরা সবাই যে শুধু বিস্ময়ে অভিভূত হবেন তাই নয়, বিজ্ঞানের বিচিত্র কারসাজিতে খেলায় এতখানি মুন্সীয়ানা দেখানোর জন্যও সবিশেষ তারিফ করবেন তাঁরা সকলে।

এমন আজব-কাণ্ড কেন ঘটে—জানো ?···উনানের আঁচে জল গরম হবার সময়, আগুনের শিখা থেকে যে তাপ উৎপন্ন হয়, সেটুকু সবই আকর্ষণ করে নেয় কাগজ···এবং সেই উত্তপ্ত-কাগজ থেকে যে তাপ উৎপন্ন হয়—সেটি আগাগোড়া শুষে নেয় ঠোঙা বা পাত্রে-রাখা জল। আগুনের শিখা থেকে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তার মাত্রা কোনোমতেই ২১২° ফারেন্‌হিটের (212°) Fahrenheit বেশী হয় না। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ঠোঙা বা পাত্রের কাগজের তাপমাত্রাও কোনো সময়েই এর চেয়ে বেশী হয় না···এবং এই কম তাপমাত্রার ফলেই, জলন্ত-আগুনের আঁচে উত্তপ্ত হলেও কাগজ সহজেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় না। এবারের মজার খেলাটির এই হলো আসল বৈজ্ঞানিক-রহস্য।

মনোহর মৈত্র

১। ছবির হেঁয়ালি ঃ

উপরের ছবিতে এলোমেলো-ছাঁদে একরাশ রেখা আঁকা রয়েছে। একরাশ এই এলোমেলো-রেখাগুলির মাঝে চিত্রকর-মশাই সুকৌশলে এঁকে রেখেছেন—ছুটন্ত একটি কুকুরের ছবি। বুদ্ধি খাটিয়ে চেষ্টা করে ছাখো তো—তোমরা কেউ সেই ছুটন্ত-কুকুরের ছবিটির সন্ধান পাও কিনা! এ ধাঁধার উত্তর পাঠানোর সময় তোমরা কিন্তু সঠিক ভাবে কুকুরের দেহের অংশে আগাগোড়া রঙীন-পেন্সিলের দাগ এঁকে ভরাট করে পাঠিও। চিত্রকর-মশাইয়ের আঁকা আসল-ছবিটির সঙ্গে তোমাদের যার রঙ-করা ছবিটি হুবহু মিলে যাবে, পরের মাসে আমরা ছাপার হরফে তার নাম প্রকাশিত করে দেবো—মনে রেখো!

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

২। রাত্রির পরে যদি তুমি
হাত বাঁধো ভাই—
তার তরে [illegible]
[illegible]

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি'র উত্তর ঃ

১।

উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, সেই উপায়ে কায়দা করে নানান্ ছাঁদে কালো ও শাদা রঙের টালিগুলিকে ঠিকমতো সাজাতে পারলে, অন্ততঃপক্ষে আরো ২০ রকম ছাঁদের বিচিত্র-সুন্দর নক্সা রচনা সম্ভব হবে।

২। কপি

৩। আনাতোল ফ্রান্স

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

বুলা ও সুজিত রায় (কলিকাতা), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা) পুতুল, সুষমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), কুলু মিত্র (কলিকাতা), সত্যেন, সঞ্জয়, মুরারি ও সুনীল (ভিলাই), পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), কবি ও লাড্ডু হালদার (কোরবা), রিণি ও রনি মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই), দেবকী সিংহ (নওয়াদা), মিঠু ও বুবু গুপ্ত (কলিকাতা), পিন্টু, বুতাম ও বাপি গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), শর্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), শুভা, সোমা, অরিন্দম ও কল্পনা বড়ুয়া (বোড়াল), কার্ত্তিক ও ভবানী (কাশীপুর, পুরুলিয়া)

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

পিন্টু হালদার (বালী), সুনীরা ও সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), ইন্দুবালা ও সুবর্ণলতা দেবশর্মা (কলিকাতা), জয়ন্তী, সুরভী, সুজিতা, জয়নী চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), রণজিৎ দাস (পাটনা),

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

বাণী, শুভ্র ও পার্থ হাজরা এবং অলক কুণ্ডু (আড়ুই), শাশ্বত ও শর্মিলা গোস্বামী (যাদবপুর)।
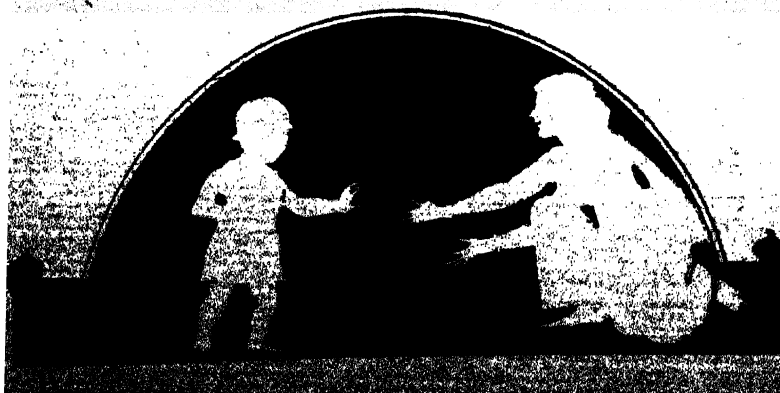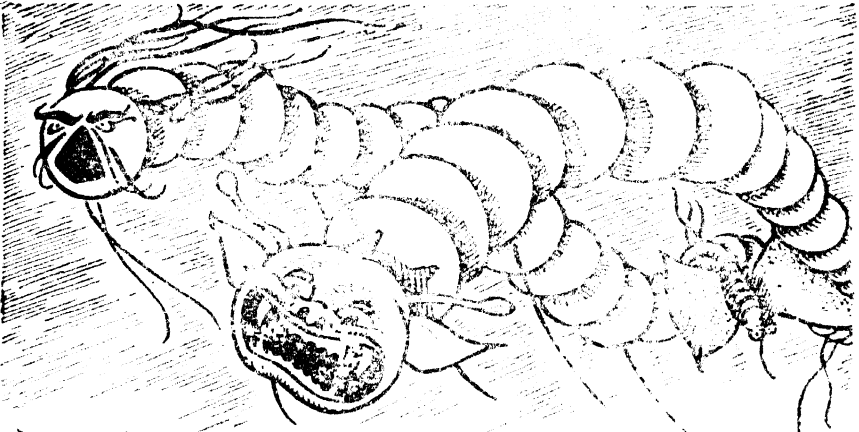
উপরের ছবিতে কিম্ভূত-ছাঁদের যে বিরাটাকার ঘুড়ি দুটি দেখছো, সেগুলি হলো চীনদেশের 'ড্রাগন-ঘুড়ি' (THE DRAGON-KITES)। ওদেশী প্রাচীন পুরাণ-রূপকথার কাহিনী অবলম্বনে বিচিত্র 'ড্রাগনাকৃতিতে' এই সব ঘুড়ি রচিত হয় বলেই, এগুলির নাম রাখা হয়েছে — 'ড্রাগন-ঘুড়ি'। নানা ছাঁদের রঙীন কাগজের টুকরো দিয়ে এমনি ঘুড়ি তৈরী করা হয় অভিনব কৌশলে। এ সব ঘুড়ি দেখতেও যেমন অপরূপ-সৌখিন... আকাশের বুকে ভেসে থাকতেও তেমনি পটু। তবে এ ঘুড়ি ওড়ানোর কায়দা-কানুন রপ্ত করা রীতিমত কঠিন ব্যাপার... দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলেই এ কাজ আয়ত্ত করা যায়। সাধারণতঃ পাল-পার্বণ উপলক্ষ্যেই ওদেশী লোকজনেরা
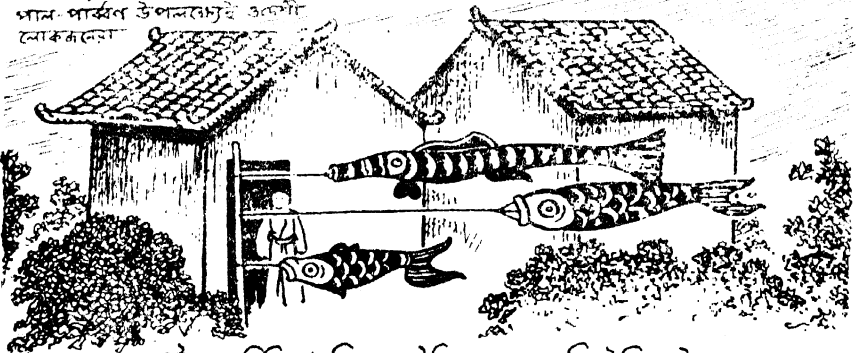
এই সব বিচিত্র-অভিনব সৌখিন-সুন্দর ঘুড়ি উড়িয়ে উৎসব-আনন্দে মেতে ওঠে। 'ড্রাগন-ঘুড়ির' মতোই আরেক-ছাঁদের ঘুড়ি হলো — রঙ-বেরঙের কাগজ দিয়ে তৈরী 'মাছ-ঘুড়ি' (THE FISH KITES)। আমাদের দেশের মতো চীনদেশেও ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ চলে আসছে অতি প্রাচীন-আমল থেকে। ওদেশী লোকজনের কাছে ঘুড়ি হলো আত্মার প্রতীক... মুক্ত-বিহঙ্গের মতো মানুষের আত্মাও স্বাধীন-স্বচ্ছন্দ্যগতিতে অনন্ত-উন্মুক্ত আকাশের অবাধে ভেসে বেড়াক — এই তাঁদের ধারণা। চীনদেশের মতো জাপানেও এমনি বিচিত্র ঘুড়ি ওড়ানোর রীতি সুপ্রচলিত হয়েছে। আমাদের দেশে 'বিশ্বকর্মা পূজো-উপলক্ষ্যে' যেমন দেখা যায়, জাপানেও তেমনি 'চেরী-ফুল ফোটার' উৎসবে এমনি ধরনের হাজার-হাজার ঘুড়ির ভীড়ে সারা আকাশ ছেয়ে যায় — সবাই আনন্দে ঘুড়ি ওড়ায়।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন চণ্ডীগড় অধিবেশন

শ্রীপথিক

দিবে আর নিবে
মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে

এই বাণী ভারত-আত্মারই বিকাশের সাধনার মন্ত্রবীজ। এই মন্ত্রই নানাভাবে বিচিত্রতার মধ্যে ঐক্য অনুভব করে ও জাতির মর্মলোকে ছন্দায়িত, রসায়িত। ভারতের সাহিত্য সেই রসের পরিবেশন করে আসছে ব্যাস-বাল্মীকির যুগ হতে।

বাঙ্গালীর সবচেয়ে গর্ব তার ভাষা ও সাহিত্য। বাঙ্গালী তার সাহিত্যের মাধ্যমে বিশ্ব-আত্মীয়তার কথা যত প্রকাশ করেছে, এমনটা খুব কম দেখা যায়। উনিশ শতকের বাঙ্গালী-প্রতিভা প্রাদেশিকতার সংকীর্ণতা অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, আলিঙ্গন করেছে। সেই গৌরব বাঙ্গালীর, বাঙলা সাহিত্যের বিশ্ব জয়ের জয়টীকা।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, সেই তিলকে পরিশুদ্ধ হ'য়ে বছর বছর ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে আঞ্চলিক ভাষার সম্মান প্রদর্শন ক'রে আসছে। নানা ভাষার সহিত নিজের ঐক্য অনুভব করেছে, মিলেছে—ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে পরস্পরে আবদ্ধ হয়েছে।

এ কাজ আরম্ভ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে।

তারপর হ'তে বহু চিন্তাবিদ-পণ্ডিত-সর্বজনশ্রদ্ধেয়দের পরিচালনায় সম্মেলনের যাত্রা হয়েছে মুখর, নানাভাবের আদান-প্রদানে জেগেছে নব নব পরিকল্পনা ও শক্তি।

এবার সম্মেলনের ৩৯তম অধিবেশন হয়ে গেল চণ্ডীগড়ে, পাঞ্জাবের নব রাজধানীতে। বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব, একদিকে প্রেরণা, অপরদিকে হুংকার—যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ আবিষ্কার ক'রেছিল।

চণ্ডীগড়—নূতন পরিকল্পনার নূতন নগর। ফরাসী-স্থপতির চিন্তাধারায় নগরীর শোভা—জ্যামিতিক রূপকল্পনা দর্শকদের মন প্রসন্ন হয় কিনা জানি না, তবে বিস্ময় জাগে—অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকতে চায়। নানা রংয়ের মশলা সর্বত্র ছড়ান। তবে খুবই নির্জন, একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন। সাধারণের ভীড় নেই, বিরাট বিরাট পাষাণের ছড়িয়ে পড়া এক একটি রাস্তা আর বাড়ী। তবে সবটাই সুপরিকল্পিত—একদিন ভারতের সবচেয়ে সুন্দর নগরী বলে বিবেচিত হবে বলে আমাদের মধ্যে অনেকে বলেছেন। ২৪শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিকাল ৩টায় টেগোর থিয়েটার হলে' অধিবেশন আরম্ভ হয়। জাতীয় সংগীতের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডক্টর এ, সি, জোশী (উপাচার্য, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়) উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন,

"It is hoped that the Chandigarh Session of the Nikhil Bharat Banga Sahitya Sammelon will serve to forge new links between the literary and cnltural circles of Punjab and Bengal for the mutual benefit of both. From this stawdpoint the inclusion in the Programme of the conference of a Punjabi Literary Session and a joint Kavi Darbar of Bengali and Punjabi poets should be of special interest."

সম্মেলনের কর্মপন্থা ও চণ্ডীগড়ের তথা পাঞ্জাবের তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক বিবরণও ডক্টর জোশী ভাষণে উল্লেখ করেন।

উদ্‌বোধনী ভাষণে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রীপত্তম এ থাণু পিল্লাই বলেন,

"We hear a good deal now-a-days of national integration. The Bengali Literary Conference acted on the basis of this idea and

held its annual meetings in states and parts of the country other than Bengal, almost from its very inception,……"

তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে জাতি কত বড় সম্পদ দান করতে পারে সে সম্পর্কে বলেন।

পরিশেষে বলেন,

"I would suggest that the idea of holding such conferences be taken up by literateurs in other Indian languages also."

স্বাধীন ভারতের সমৃদ্ধি ও গৌরবের প্রেরণা সাহিত্যের মধ্যে রূপ লাভ করার জন্য শ্রীপিল্লাই বাঙালী সাহিত্যিকদের পথ-প্রদর্শক হবার জন্য আবেদন জানান। তারপর সম্মেলন সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ তাঁর ভাষণ পাঠ করেন। ভাব ও তথ্যসমৃদ্ধ ভাষণে শ্রীদাশ উপস্থিত সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ করেছেন।

বাঙলা ও পাঞ্জাবের বিভিন্নমুখী মিলনের কথা উল্লেখ করে শ্রীদাশ বলেন, "অন্ধকার পুরাকালে বৈদিক গাথা রচনা করতে করতে আর্যরা পঞ্চনদে প্রবেশ করেছিলেন। ক্রমে পূর্বাভিমুখে এগোতে এগোতে পশ্চাতের সঙ্গে সংযোগ প্রায় ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। আজ আমরা আবার নূতন গাথা নিয়ে চিরন্তনের নব রচনার সন্ধানে সেই দেশে এসেছি। অতিথিরূপে নয়, আত্মীয়রূপে। আজ আমাদের পুরাবৃত্ত হোক সম্পূর্ণ, হোক সার্থক।"

মূল সভাপতি শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁর বিরাট ভাষণ কখনও পাঠে, কখনও গানে (বাংলায়, ইংরাজীতে, হিন্দীতে, জার্মানিতে, ফরাসীতে) সকলকে একটা বিশেষ লোকে নিয়ে যান। বেদ, উপনিষদ হ'তে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ পর্যন্ত নানা তথ্য উত্থাপনে ভারতবর্ষের মর্মসত্যের পরিচয় দান করেন।

সাহিত্য সেই সত্য হ'তে যদি বিচ্ছিন্ন হয়, ভ্রষ্ট হয়, তবেই সাহিত্যের মৃত্যু। ভারত-আত্মার বাণীকে যুগোপযোগী করে সাহিত্যে পরিবেশন করার জন্য তিনি বিশেষ ভাবে বলেন। শ্রীযুত রায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বহু ঘটনা এবং বহু মনীষীর সম্পর্ক ভাব-তন্ময়-চিত্তে বর্ণনা করেছেন।

সমাজ ও সংস্কৃতি অধিবেশনের উদ্‌বোধনে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বলেন, সমাজ ও সংস্কৃতির 'চিন্তাধারায় সাহিত্য বিশেষ স্থান লাভ করেছে।'

পুরাতন বিধি ব্যবস্থাকে নূতন ও বৈজ্ঞানিক সূত্রধারায় মানব কল্যাণের দিকে পুনরায় নিয়োজিত করতে হ'বে। শ্রীচন্দ্র জীবনের সহ-অবস্থানের কথা গভীরভাবে তাঁর ভাষণে বর্ণনা করেন। উক্ত অধিবেশনের সভাপতি শ্রীকেশবচন্দ্র বসু তাঁর ভাষণে নূতন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগীর উপর মানব সমাজের কল্যাণ-পথ নির্দেশ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

পাঞ্জার কলা-একাডেমি এবং সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শ্রীএইচ, সি, খান্না সমাজ ও সংস্কৃতিতে সর্ব-ভারতীয় মনোভাবের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখবার জন্য তাঁর বক্তৃতায় বলেন। তিনি উপস্থিত সকলকে, চিন্তাবিদদের অনুরোধ করে বলেন, আজ আর কোন একটি প্রাদেশিক চিন্তা-ধারায় সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশে সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে গভীর মনোনিবেশ একান্ত প্রয়োজন। ভারতের সভ্যতার মর্মমূলে যে সত্য এতদিন উচ্চস্তরে বিরাজিত ছিল, আজ প্রয়োজন তার সম্পূর্ণ রূপায়ণ গণ-জীবনে—প্রত্যেকটি কর্মপ্রবাহের মধ্যে জাগ্রত করা।

ঐদিনই বিকালের অধিবেশন হয় বঙ্গ সাহিত্য শাখার। উদ্‌বোধনী ভাষণে ডক্টর লাল সিং বলেন, নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের চণ্ডীগড় অধিবেশনকে বাঙলা ও পাঞ্জাবের বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া ঐক্যসূত্রটিকে স্বাধীন ভারতে পুনরায় স্বর্ণ-অক্ষরে চিহ্নিত করে। বাঙলার সাহিত্যের দিক্‌পালদের নাম উল্লেখ করে শ্রীলাল পাঞ্জাবের সাহিত্য স্রষ্টাদের প্রেরণা লাভ করতে বলেন। সভাপতি শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর ভাষণে গুরু নানকের একটি বাণী উদ্ধার করে বলেন—"যে কবি হতে চায় তাকে নির্ভর ও নির্বৈর হতে হবে। অর্থাৎ সে কাউকে এবং কিছুকে ভয় করবে না, তেমনি কারও সম্বন্ধেই তার কোন বিদ্বেষ বা বৈরিতা থাকবে না।" শ্রীমিত্র ভারতের রাষ্ট্রপতির একটি কথা উল্লেখ করে বলেন—No great literature can be produced unless men have the courage to be lonely in their minds, to be free in their thoughts and to express whate

ever occurs to them." উক্ত দুইটি বাণীকে কেন্দ্র করে শ্রীমিত্র সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের পরিচয় দান করেছেন।

শ্রীমিত্র পাশ্চাত্য চিন্তার অনুকরণের প্রতি সবিশেষ কটাক্ষপাত করেন। আমাদের রামায়ণ মহাভারতের চিন্তাধারায় ভারতের জনগণমানস তৃপ্ত—সে সম্পর্কে 'শ্রীমিত্র' বলেন।

তিনি আরও বলেন—'সাহিত্যের কাছে আমাদের আশা অনেক। সে আশা নির্ভর করছে আগামীকালের শক্তিমান্ লেখকদের উপরই। আজকে যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত কীর্তিমান্ লেখক—তাঁরা আর কদিন এ দায়িত্ব বহন করতে পারবেন? আজকের তরুণদেরই বংসে ও কীর্তিতে আর একটু এগিয়ে এসে এ ভার গ্রহণ করতে হবে।"

পাঞ্জাবের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমোহনলাল মাতৃভাষায় শিক্ষা বিস্তার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ৩ দফা ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করে ঘোষণা করেন যে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে।

সম্মেলনের শেষের দিনের অধিবেশন পাঞ্জাব সাহিত্য শাখা। ডক্টর সুকুমার সেনের অনুপস্থিতিতে সম্মেলন সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ অধিবেশনের উদ্‌বোধন করেন। সভাপতি ডক্টর ভাই যোধসিংহ। বাঙ্‌লার মনীষার প্রভাব পাঞ্জাবের কবি ও সাহিত্যিকদের কি ভাবে কার্যকরী হয়েছে তা বর্ণনা করেন। পাঞ্জাবের বীর্যবত্তাও কি-ভাবে বাঙ্‌লার কবি ও সাহিত্যিকদের নূতন রূপ দান করেছে শ্রীসিংহ উল্লেখ করেন।

বিকালের অধিবেশন হয় চারুকলা শাখার। ডক্টর এম, এস, রণধো উদ্‌বোধন করেন। সভাপতি শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য নাটকের সূত্র আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে করতে আধুনিক যুগে বিশ্বরূপার স্থান ও গৌরব সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন।

ঐদিন রাত্রিতে কবি সম্মেলন হয়। পাঞ্জাবের প্রায় ১৭জন কবি এবং বাঙ্‌লার ২।৩জন এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন।

তিন দিনের অধিবেশনে যথাক্রমে পাঞ্জাবের কেন্দ্রীয় নাট্য সংস্থা; বাঙ্গালী ক্লাব কর্তৃক 'কাঞ্চন রংগ' এবং বিচিত্রানুষ্ঠান (কাবুলিওয়ালা, হিন্দী) অনুষ্ঠিত হয়।

গোচর ফল

উপাধ্যায়

গ্রহরা রাশিচক্রে অনবরত এক রাশি থেকে অন্যরাশিতে সঞ্চারের মাধ্যমে পরিভ্রমণ করে চলেছে। যখন যে রাশি আশ্রয় করে যে রকম ফল দেয়, তখনই তাকে বলা হয় গোচর ফল। জাতকের জন্মরাশি থেকে গ্রহরা যখন যে রাশিতে থেকে যে ধরণের ফল দেয় তাই বলা হয় গ্রহের গোচর ফল। এরকম জন্মরাশি থেকে গ্রহের গোচরফল, সমস্ত পঞ্জিকাতেই প্রদত্ত হয়ে থাকে। এসব ফল অতিস্থুল, সকলের পক্ষে মিলেনা, আর মিল্‌বার ও সম্ভাবনার অবকাশ কম। তারও কারণ আছে, সাধারণ গোচর ফল গণনার সময় অষ্টবর্গশুদ্ধি দেখা হয়না। ব্যক্তিগত কোষ্ঠীর ভেতর থাকে অষ্টবর্গ গণনার ফলাফল, গোচর ফল গণনায় অষ্টবর্গ শুদ্ধি দেখা আবশ্যক, তাছাড়া নব তারাচক্রও ফল নির্ণয়ের সময় আবশ্যক। তনু ভাবাধিপতি শুভ তারায় থাক্‌লে দৈহিক সুখ স্বচ্ছন্দতা, ধনভাবপতি শুভতারায় থাকলে ধনাগমাদি হয় ইত্যাদি, কারণ যদি কোন গ্রহ গোচরে (তাৎকালিক আশ্রিত রাশিতে) শুভ থাকে, আর যদি নব তারা চক্রে অশুভ নক্ষত্রে অবস্থান করে, তা হোলে কথিত শুভ ফল দেবেনা, সেইরূপ গোচরে অশুভ থাকলেও গ্রহ যদি নবতারা চক্রস্থ শুভ তারা গত হয়, তা হোলে গোচর নির্দ্দিষ্ট অশুভ ফলের নাশ হবে। গ্রহের মধ্যে শনি, রাহু, কেতু ও বৃহস্পতি যথাক্রমে ২॥, ১॥, ১ বৎসর ব্যাপী এক রাশিতে থাকে এজন্য এরা মন্দগামী গ্রহ। চন্দ্র, বুধ, রবি, শুক্র, মঙ্গল এরা প্রতিরাশিতে ২।০ ১৮, ৩০, ২৮, দিন থাকে বলে শীঘ্রগামীগ্রহ। গোচর গণনা করতে হোলে গ্রহগণের তাৎকালিক অবস্থান জানা আবশ্যক। এক্ষেত্রে পঞ্জিকা দেখে আগে ঠিক করে নিতে হবে গ্রহরা কোথায় কি ভাবে আছে। পঞ্জিকার প্রত্যেক মাসের প্রথমে একটি রাশিচক্রে গ্রহ বিন্যস্ত থাকে, আর তার নীচে থাকে মাস মধ্যে গ্রহগণের সঞ্চার। প্রত্যেক দিনের বাম পার্শ্বে থাকে দৈনিক গ্রহস্ফুট। গোচর ফল নির্ণয়ের সময় এগুলি অত্যাবশ্যক। তাছাড়া জন্মকুণ্ডলীর দশাদি ফলের প্রতি লক্ষ্য রেখে গোচর বিচার উচিত। বলবান শুভপ্রদ গ্রহের দশান্তর্দ্দশা কালে গোচরোক্ত অশুভ ফলের নাশ ও হ্রাস হয়ে থাকে। রাশি প্রবেশ কালে এক একটি গ্রহ এক এক রকম ফল দেয়।

রবি ও মঙ্গল প্রবেশ কালে, বৃহস্পতি ও শুক্র রাশি গমনের মধ্য সময়ে, চন্দ্র ও শনি রাশি ত্যাগ কালে, আর বুধ সকল কালে ফল প্রদান করে। রবিদগ্ধ গ্রহের ফল সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সামান্য, রবি থেকে দ্বিতীয় রাশিতে স্থিত গ্রহের ফল সঞ্চার কালে, তৃতীয়স্থ গ্রহ সমস্ত রাশিতে ভোগ কালে, চতুর্থস্থ রাশি ভোগাবসান কালে, পঞ্চমে ও ষষ্ঠে—স্থিতগ্রহ সর্ব্বকালে অধিক ফল, সপ্তমে ও অষ্টমে স্থিত গ্রহের ফল অস্থির, নবম ও দশমস্থ গ্রহের ফল অবসান কালে, একাদশ ও দ্বাদশ স্থিত গ্রহ সঞ্চার কালে আশুফল-প্রদ হয়।

যে রকম চন্দ্র থেকে গোচর গণনা হয়ে থাকে, সেই রকম ভাবে লগ্ন ও রবি থেকেও সেই প্রকারে গোচর ফল

গণনা করা হয়, আর অন্যান্য গ্রহ থেকেও সেইরূপ হোতে পারে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে লগ্ন থেকে জাতকের নিজের, চন্দ্র থেকে মাতার, রবি থেকে পিতার, মঙ্গল থেকে ভ্রাতার, বুধ থেকে মাতুলের, বৃহস্পতি থেকে পুত্রের আর শুক্র থেকে স্ত্রীর শুভাশুভ গণনা করা যেতে পারে। এই গোচর গণনায় এক রাশিতে দীর্ঘকাল স্থায়ী বৃহস্পতি, শনি ও রাহুর অবস্থান বিচার্য্য। চন্দ্রাধিষ্ঠিত রাশিকে চন্দ্র লগ্ন বলে। জন্ম নক্ষত্রের প্রারম্ভ থেকে এই লগ্নের আরম্ভ, প্রত্যেক নক্ষত্রের মান ১৩ অংশ ২০ কলা।

চন্দ্র থেকে অংশগত বার্ষিক সঞ্চার ও তার ফল জানতে হোলে, দেখতে হবে চন্দ্র কোন্ রাশির কত অংশে অবস্থিত, সেই অংশ থেকে পর পর পরবর্ত্তী অংশকে জীবনের এক এক বৎসর কল্পনা করে নিতে হয়। চন্দ্র প্রত্যেক বৎসর এক এক অংশে চলেছে মনে করতে হবে। প্রথম অংশে প্রথম বৎসর, দ্বিতীয় অংশে দ্বিতীয় বৎসর, তৃতীয় অংশে তৃতীয় বৎসর, এম্নিভাবে চিন্তনীয়। চন্দ্র ঐ ভাবে গমন কালে যে অংশে শুভগ্রহযুক্ত বা দৃষ্ট হবে, সেই অংশ নির্দ্দিষ্ট বৎসরে শুভ ফল, আর যে অংশে পাপ গ্রহযুক্ত বা দৃষ্ট হবে, সেই বৎসর অশুভ আর মিশ্রে মিশ্র ফল হবে।

অংশ গণনা অসুবিধা হোলে যে নক্ষত্রে চন্দ্র অবস্থিত সেই নক্ষত্রাবলম্বনে ঐ রকম গণনা হোতে পারে। তবে কোন নক্ষত্রের শেষভাগে বা চতুর্থ চরণে চন্দ্র থাকলে তার পরবর্ত্তী নক্ষত্র থেকে গণনা সুবিধাজনক, অথবা অনুপাতে যে কয় মাস হয়, ধরে নিলেও চলতে পারে। আর এক রকমে উক্ত গণনা সমাধা হোতে পারে। জন্মদিন থেকে প্রত্যেক দিনকে এক এক বৎসর মনে করে ঐ প্রকারে ফল ঠিক করা যায়।

সূর্য্য থেকে ৬০ অংশ বা ডিক্রির মধ্যে গ্রহরা শীঘ্রগামী হয়। ৬১ থেকে ৯০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত সমগামী, ৯১ থেকে ১২০ পর্য্যন্ত মৃদুগামী, ১২১ থেকে ১৮০ ডিক্রি পর্য্যন্ত বক্রগামী, ১৮১ থেকে ২৪০ ডিক্রি পর্য্যন্ত অতি বক্রগামী, ২৪১ থেকে ৩০০ ডিক্রি পর্য্যন্ত সরলগামী, ৩০১ থেকে ৩৬০ ডিক্রী পর্য্যন্ত শীঘ্রগামী। রাহু ও কেতু সর্বদা বক্রগামী। চন্দ্র ও রবি সর্বদাই শীঘ্রগামী। মঙ্গলের বক্রগতিকাল ৭৬ দিন, বুধের ২৪ দিন, শুক্রের ১২ দিন, বৃহস্পতির ১৭০ দিন, শনির ১৮৫ দিন।

কর্কট রাশিতে রবি যুক্ত চন্দ্র নিস্ফল হয়। লগ্ন থেকে চতুর্থে বুধ, পঞ্চমে বৃহস্পতি, দ্বিতীয়ে মঙ্গল, ষষ্ঠে শুক্র ও সপ্তম স্থানে শনি অবস্থান করলে শুভাশুভ ফল কিছুই দেয় না। সুতরাং নিস্ফল হ'য়ে থাকে।

মনুষ্য দেহের মধ্যে নাদ চক্রে রবি, বিন্দু চক্রে চন্দ্র, চক্ষুতে মঙ্গল, হৃদয়ে বুধ, উদরে বৃহস্পতি, শুক্রে শুক্র, নাভি দেশে শনি, মুখে রাহু আর হস্ত ও চরণে কেতু অবস্থিত।

— —

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফলাফল

মেষ রাশি

অশ্বিনীজাত ও ভরণী জাত ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক, কৃত্তিকা জাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্টফল। পিতার রোগ, ভোগ, আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনা। ধনভাব শুভ। বাত স্ফোটকাদি রক্তপাত ও বায়ু প্রকোপের আশঙ্কা। মাতৃ হানি যোগ। প্রতিপত্তি, স্বাচ্ছন্দ্য। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে শুভ। কিন্তু সম্পত্তি সংক্রান্ত নূতন সমস্যার উদ্ভব হোতে পারে। চাকুরি জীবীর পক্ষে শত্রুবৃদ্ধি ও নানারকম গোলমালের দরুণ চিত্তের উদ্বেগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীর পক্ষে শুভ। বিক্রয় অপেক্ষা ক্রয়বাণিজ্যে অধিকতর শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

বৃষ রাশি

মৃগশিরাজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট, রোহিনী জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, কৃত্তিকা জাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। ভ্রাতার রোগভোগ, কর্ম্মোন্নতি, অশান্তি, অধীন ব্যক্তি হোতে প্রতারণালাভ, নূতন কোন পরিকল্পনায়লাভ যোগ। বাড়ীওয়ালা কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে স্বাভাবিক। মামলা মোকর্দ্দমায় জয়লাভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ, চাকুরিক্ষেত্রে আকস্মিক পরিবর্ত্তন যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উন্নতি যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ

কিন্তু আকস্মিক কারণে অর্থনাশের কারকতা আছে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মিথুন রাশি

পুনর্ব্বসুর পক্ষে নিকৃষ্ট। আর্দ্রা ও মৃগশিরার পক্ষে মধ্যম। পত্নী ও সন্তানের পীড়া। গুরুস্থানীয়ের সঙ্গে মনান্তর। দেহভাব শুভ। আত্মীয় বিয়োগ। মামলা মোকর্দ্দমায় অর্থনাশ। ধনভাব উত্তম। সম্পত্তি বিষয়ে জটিল সমস্যা। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে শুভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে সন্তোষজনক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অধিক শুভপ্রদ। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয় ভঙ্গ। বিদ্যার্থীর পক্ষে বাধা।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসুজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। অশ্লেষাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পুষ্যার পক্ষে নিকৃষ্ট। মাসটি বিশেষ ভালো নয়। স্ত্রীর আকস্মিক রোগ ভোগ। গুরুজন থেকে অশান্তিলাভ। সন্তানের ভাগ্যোন্নতি। দেহভাবশুভ, পুরাতন কোন সূত্র ধরে অর্থোপার্জ্জনে সাফল্যলাভ। বাড়ীওয়ালা কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটি মন্দ নয়। চাকুরি ক্ষেত্রে উন্নতি বিলম্বিত হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে আশাহুরূপ সাফল্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে ক্ষতি মনস্তাপ ও অখ্যাতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

সিংহ রাশি

মঘাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তর ফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। বিবাহাদি যোগ। দেহ ভাব স্বাভাবিক। লটারিতে বা অন্যভাবে অর্থপ্রাপ্তি যোগ। প্রতিযোগিতামূলক কার্য্যে জয়। ভ্রাতৃস্থানীয় বা নিকটাত্মীয়ের মারাত্মক পীড়াযোগ। মামলা বা কলহের দরুণ কিছুক্ষতি। বাসস্থান সংক্রান্ত গোলযোগ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। চাকুরি জীবীর উন্নতির আশা আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে পরোপকার-পরায়ণতার জন্য তীব্র মানসিক আঘাত প্রাপ্তি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

কন্যারাশি

চিত্রার পক্ষে নিকৃষ্ট। হস্তার পক্ষে উত্তম। উত্তর ফল্গুনীর পক্ষে মধ্যম। দেহভাব শুভ। স্বাস্থ্যোন্নতি। গুরুস্থানীয়ের বিয়োগাশঙ্কা। অপ্রত্যাশিত লাভ ও অর্থ-প্রাপ্তি। সম্পত্তি বিষয়ে শুভ। কর্ম্মস্থলে বিশৃঙ্খলতা। সন্তানের জন্য অশান্তি। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারীও কৃষি জীবীর পক্ষে মধ্যম। চাকুরিজীবীর পক্ষে একই ভাবে যাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে আশানুরূপ। স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে ক্ষতির আশঙ্কা। চাকুরিজীবী নারীর কর্ম্মোন্নতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

তুলা রাশি

চিত্রার পক্ষে উত্তম, স্বাতীর পক্ষে মধ্যম, বিশাখার পক্ষে নিকৃষ্ট। ভাগ্যলাভে বাধা। শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। পারিবারিক অশান্তি। শত্রুবৃদ্ধি। মাতার রোগ ভোগ। গৃহনির্ম্মাণে বাধা। আয় অব্যাহত। নূতন ঋণের সম্ভাবনা। নূতন ভাবে কর্ম্মপ্রবর্ত্তনের কারকতা আছে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মন্দ নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে শুভ। চাকুরি জীবির পক্ষে খ্যাতি ও মর্য্যাদাবৃদ্ধি, কিন্তু আর্থিকোন্নতি নেই। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভপ্রদ নয়।

বৃশ্চিক রাশি

জ্যেষ্ঠার পক্ষে উত্তম, অনুরাধার পক্ষে মধ্যম, বিশাখার পক্ষে নিকৃষ্ট। দেহভাব শুভ। পত্নী ও গুরুস্থানীয়ের পীড়াযোগ। পুত্রসন্তান লাভের যোগ। সন্তানের উন্নতি। কর্ম্মস্থল শুভ, বুদ্ধির বলিষ্ঠপ্রভাবে কর্ম্মসাফল্য। গৃহনির্ম্মাণ। আয়ভাব শুভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে আশানুরূপ। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মন্দনয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

ধনু রাশি

মূলা ও পূর্ব্বাষাঢ়ার পক্ষে উত্তম, উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্যমন্দ নয়। ধনভাব শুভ। বাসস্থান সংক্রান্ত গোলযোগ। উন্নতির যোগ। যানবাহন ও ভৃত্যসংক্রান্ত

গোলযোগ ও অশান্তি। নিজের শৈথিল্য হেতু একাধিক সুযোগ নষ্ট হোতে পারে। ব্যবসাক্ষেত্রে আশাতীতভাবে সুযোগ। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি ভালো বলা যায় না। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে শুভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে নিকৃষ্ট, ধনিষ্টার পক্ষে উত্তম, শ্রবণার পক্ষে মিত্র। দেহভাব শুভ। আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি ও ধনক্ষয়। কর্ম্মস্থলে পরিবর্ত্তন যোগ। বক্রপথে অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ। সন্তানের পীড়া। বাড়ীওয়ালা, ভূমাধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মধ্যম। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ বলা যায় না। স্ত্রীলোকের পক্ষে দাম্পত্যকলহ ও প্রণয়ভঙ্গ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্র পদজাতব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। দেহভাব শুভ। ব্যয় সঙ্কোচ সত্ত্বেও অপরিমিত ব্যয় হেতু ঋণ। পত্নী ও সন্তানের পীড়া। সম্পত্তিনাশের সম্ভাবনা। অতি লোভের পরিণতি অপ্রীতিকর ঘটনা সৃষ্টি করবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ নয়; চাকুরিজীবির পক্ষে মধ্যম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে অর্থনাশ ও যশোহানি যোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মীন রাশি

রেবতীর পক্ষে উত্তম। পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। দেহভাব শুভ। অর্থাগমযোগ প্রবল। এতদসত্ত্বেও ব্যয়াধিক্যহেতু দুশ্চিন্তা। সম্পত্তি লাভের সম্ভাবনা। নিকটাত্মীয়ের বিয়োগ। মাতার পীড়া। স্ত্রীর স্বাস্থ্যোন্নতি। পুত্রকন্যার বিবাহে বাধা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে সাংসারিক সূত্রে সমসাময়িক অশান্তি যোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উন্নতির যোগ।

— —

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নফল

মেষ লগ্ন—

দেহভাব শুভ। ভাগ্যোদয়। শত্রুবৃদ্ধি। বন্ধু দ্বারা ক্ষতি। পিতার রোগভোগ। ধনাগম। পত্নীর স্বাস্থ্যহানি চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষ লগ্ন—

ভ্রাতার রোগভোগ, নিজের স্বাস্থ্যোন্নতি। আর্থিক উন্নতি। কর্ম্মোন্নতি। পদমর্য্যাদা লাভ। ব্যবসায় উন্নতি। মানসিক অবস্থা ও পারিবারিক অবস্থা উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রীতিপদ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

মিথুন লগ্ন—

নানাপ্রকার বাধা ও বিশৃঙ্খলা, কাজকর্ম্মে অশান্তি। আর্থিক উন্নতি। সন্তানভাব শুভ। বন্ধু বিয়োগ। আত্মীয় বিরোধ। কর্ম্মক্ষেত্র শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মনস্তাপ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অশুভ।

কর্কট লগ্ন—

গুরুজন থেকে অশান্তি লাভ। স্ত্রীলোকের জন্য ক্ষতি। সন্তানের ভাগ্যোন্নতি। সম্মান ও খ্যাতি। কর্ম্মোন্নতি। বেকার ব্যক্তির কর্ম্ম লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

সিংহ লগ্ন—

শরীর ভাব শুভ। সন্তান পীড়া। ভাগ্যোন্নতি। তীর্থ পর্য্যটন। নূতন গৃহনির্ম্মাণ। ব্যবসা বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে কিঞ্চিৎ বাধা।

কন্যা লগ্ন—

স্ত্রীর সহিত মতবিরোধ। পারিবারিক অশান্তি। কর্ম্ম সাফল্য। শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতা। শত্রুবৃদ্ধি যোগ। সন্তানের উন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

তুলা লগ্ন—

স্নায়ুগত পীড়া। পীড়াদি কষ্ট, চিকিৎসা বিভ্রাট। ব্যয়াধিক্য। ধনাগম। বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতির অভাব। কর্ম্মস্থানে বাধা বিঘ্ন। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাভঙ্গ ও প্রণয়ভঙ্গ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

বৃশ্চিক লগ্ন—

শারীরিক অবস্থা মন্দ নয়। মানসিক উদ্বেগ ও ও অশান্তি। বৈষয়িক ব্যাপারে ভ্রাতার সহিত মতানৈক্য। সন্তানসন্ততির স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। বন্ধুবান্ধবের চেষ্টায় চাকুরিপ্রাপ্তি বা পদোন্নতি। ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি। পত্নীর স্বাস্থ্যোন্নত। দাম্পত্য সুখ। চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে উত্তম সুযোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ধনু লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক সুখস্বচ্ছন্দতা। দাম্পত্য সুখ। ধসন্তানসন্ততির বিদ্যায় উন্নতি লাভ। পিতার উন্নতি। আর্থিক অশান্তি। পারিবারিক সুখ। চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ীর উন্নতি ও সাফল্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

মকর লগ্ন—

দেহপীড়া। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা। ধনাগম। সম্বন্ধ লাভ। সন্তান সন্ততির বিবাহ। কর্ম্মক্ষেত্রে সহকর্ম্মীদের সহিত মতানৈক্য হেতু কিছু অশান্তি ভোগ। ব্যবসা বাণিজ্যে আশানুরূপ ফল লাভের অভাব। স্ত্রীলোকের পক্ষে সময়টি ভালো নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কুম্ভ লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। বাত বেদনা। হঠাৎ আঘাতপ্রাপ্তির যোগ। উত্তম বন্ধু লাভ। ধনাগম। কর্ম্মক্ষেত্র শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে ভালমন্দ মিশ্র। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মীন লগ্ন—

রক্তঘটিত পীড়া বা বেদনাসংযুক্ত পীড়া। ধনলাভ যোগ। আকস্মিক অর্থলাভ। সন্তানসন্ততির লেখা-পড়ায় উন্নতি। ভাগ্যস্থানের ফল মধ্যবিধ। মাতৃরিষ্টি, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

তুলসীকৃত রামায়ণোক্ত নারীধর্ম

নির্বাণপ্রিয়া

রাম-সীতা অরণ্যে প্রবেশ করিলে ঋষি ও ঋষিপত্নীগণ তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিলেন। মুনীশ্বর বিনয়পূর্বক প্রণাম জানাইয়া প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভো, আমার বুদ্ধি যেন তোমার চরণকে কখনও ত্যাগ না করে। সুশীলা বিনীতা সীতা ঋষি-পত্নী অনসূয়া দেবীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অনুসূয়ার হৃদয় প্রসন্ন হইল। তিনি সীতাকে নিকটে বসাইয়া মিষ্টবাক্যে নারীর ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন :

মাতাপিতা ভ্রাতা হিতকারী।
মিতপ্রদ সব শুনু রাজকুমারী॥
অমিতদানী ভর্তা বৈদেহী।
অধম সো নারী জো সেব ন তেহী॥

হে রাজকুমারী, তুমি শোন, মাতা পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি হিতকারীরা যাহা দিতে পারেন তাহার সীমা আছে। কিন্তু স্বামী অমিত দাতা, তাঁহার দানের সীমা নাই। সেই নারী সকলের অধম—যে সেই স্বামীর সেবা না করে।

ধীরজু ধরম মিত্র অরু নারী।
আপদকালে পরখিয়হি চারী॥

ধৈর্য্য, ধর্ম, মিত্র ও স্ত্রী আপদকালে চারটিকেই পরীক্ষা হইয়া থাকে।

ঐসেহু পতিকর কিয়ে অপমানা।
নারী পাব জমপুর দুখ নানা॥
একই ধরম এক ব্রত নেমা।
কায় বচন মন পতিপদ প্রেমা॥
জগ পতিব্রতা চারি বিধি অহহীঁ।
বেদ পুরাণ সন্ত সব কহীঁ॥

এই প্রকার স্বামীর অপমান করিলে নারী যমালয়ে গিয়া নানা দুঃখ ভোগ করে। নারীর একই ধর্ম একই ব্রত-নিয়ম হইতেছে কায়মনোবাক্যে—পতির চরণে প্রেম রাখা। জগতে চার জাতীয় পতিব্রতা নারী রহিয়াছে, এ কথা বেদ পুরাণ ও সাধুরা বলেন :—

উত্তম কে অস বস মন মাহীঁ।
সপনেহুঁ আন পুরুষ জগ নাহীঁ॥
মধ্যম পরপতি দেখই কৈসে।
ভ্রাতা পিতা পুত্র নিজ জৈসে॥

উত্তম পতিব্রতা নারীর স্বপ্নেও মন এই ভাবে বিভাবিত থাকে যে আর অন্য পুরুষ জগতে নাই। মধ্যম পতিব্রতা নারী অপরের স্বামীকে নিজের পিতা, ভ্রাতা বা পুত্রের মত দেখেন।

ধরম বিচারি সমুঝি কুল রহঈ।
সো নিকিষ্ট তিয় স্রুতি অস কহঈ॥
বিনু অবসর ভয় তে রহ জোঈ।
জানহু অধম নারি জগ সোঈ॥

যে নারী শুধু ধর্ম ভয়ে কুলে থাকে সে নিকৃষ্ট। আর যে

শুধু সুযোগের অভাবে কুলত্যাগ থেকে বিরত থাকে সে সকলের অধম।

পতি বঞ্চক পরপতি রতি করঈ
রৌরব নরক কলপ মত পরঈ ॥
ছন সুখ লাগি জনমসত কোটী।
দুখ ন সমুঝ তেহি সমকো খোটী ॥

যে নারী পতিকে বঞ্চনা করে, পরপতির সঙ্গে রতিসুখ ভোগ করে, সে শতকল্প রৌরব নরকে কষ্ট পায়। ক্ষণিকের সুখের জন্যে যে শত কোটী জন্মের দুঃখ অগ্রাহ্য করে, তাহার মত অধম আর কে আছে?

বিনু শ্রম নারি পরম গতি লহঈ।
পতিব্রত ধরম ছাড়ি ছল গহঈ ॥
পতি প্রতিকূল জনম জহঁজাঈ।
বিধবা হোই পাই করুণাঈ ॥

যে নারী পাতিব্রত্য অকপটে পালন করে, বিনাশ্রমে সে পরমপতি প্রাপ্ত হয়। যে নারী পতির প্রতিকূল, সে পর-জন্মে যেখানেই জন্ম লয় সেখানে তরুণ বয়সে বিধবা হয়।

পতিব্রতা রমণীর পক্ষে তুলসীদাসের বাণী সর্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

—

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

২

কাপড়ের উপর 'বাটিক্'-পদ্ধতিতে রঙীণ নক্সা-চিত্রণের জন্য যে সব সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, ইতিপূর্বেই (অগ্রহায়ণ, ১৩৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) তার মোটামুটি হদিশ দিয়েছি। এবারে 'বাটিক্'-শিল্পের নক্সা-চিত্রণের' পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

উপরের 'নমুনা-চিত্রে' (Pattern-Design) দেখানো নক্সানুসারে, 'বাটিকের' কাজের উপযোগী সুতী বা রেশমী কাপড়ের টুকরোটির ঠিক মাঝখানে প্রয়োজনমতো আকারে ও নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে যথাযথভাবে ১নং নক্সার প্রতিলিপি' এঁকে অথবা 'ট্রেসিং' (Tracing) করে নিন। এ কাজ সারা হলে নিম্নের ২নং চিত্রে যেমন
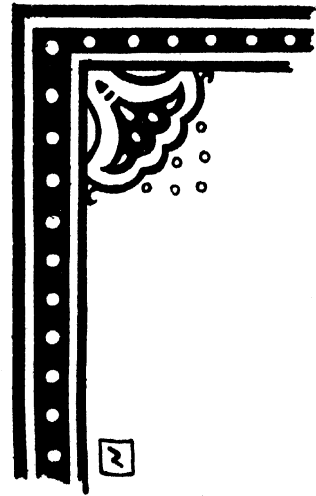
দেখানো হয়েছে ঠিক তেমনি ধরণে 'বাটিকের' কাজের উপযোগী কাপড়ের চারিদিকের কিনারায় আগাগোড়া সুষ্ঠু-ছাঁদে 'পাড়' বা 'বর্ডারের' (Border) 'নক্সা-প্রতিলিপি এঁকে কিংবা 'ট্রেসিং করে ফেলুন। তাহলেই ছিবি

পরিপাটি-ছাঁদে 'বাটিকের' কাপড়ের উপর 'নক্সা চিত্রের' কাজ শেষ হবে। বলা বাহুল্য কাপড়ের কিনারায় 'প. বা 'বর্ডার' রচনার জন্য উপরে যে 'নক্সা-নমুনাটি' দেওয়া হয়েছে, সেটি কিন্তু 'আংশিক-চিত্র' বা Sectional Design'। এটিতে দেখানো আছে, দুই কিনারার 'পাড়ের' কোণ (Corners) কি ছাঁদে রচনা করতে হবে—তারই নমুনা। এই নমুনা অনুসারে কাপড়ের চারিদিকের কিনারায় আগাগোড়া লম্বালম্বি-লাইনে পুরো 'পাড়' বা 'বর্ডার' রচনা করা আদৌ কঠিন ব্যাপার নয়··· যাঁরা নিজের হাতে শিল্প কাজকর্ম্ম করেন, তাঁদের পক্ষে এ কাজ নিতান্তই সহজসাধ্য···এমন কি সামান্য চেষ্টা করলেই শিক্ষার্থীরাও অনায়াসে এই ধরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সেরে নিতে পারবেন।

কাপড়ের উপরে 'নক্সা-চিত্রণের' কাজ শেষ করবার পর, 'মোমের প্রলেপনী' (Waxing-Procedure) দেবার পালা। এ কাজটি কাপড়ের উপরে 'বাটিক্' পদ্ধতিতে শিল্প কারুর পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য অঙ্গ। কাজেই এ কাজটুকু আগাগোড়া সুষ্ঠু এবং নিখুঁত-পরিপাটিভাবে সম্পন্ন করতে না পারলে কারুশিল্পীর সকল পরিশ্রম ও অর্থব্যয় পণ্ড হবারই সম্ভাবনা। সুতরাং 'বাটিক্'-শিল্পের কাজের সময় এ ব্যাপারে সদা-সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

'বাটিক'-পদ্ধতিতে কাজের জন্য কি ধরণের মোম ও মোম দেবার সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, সে প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেই (অগ্রহায়ণ, ১৩৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) আলোচনা করেছি, তাই তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আপাততঃ, 'বাটিকের' কাজ করবার সময় কি পদ্ধতিতে 'মোমের প্রলেপনী' দিতে হয়, তারই মোটামুটি হদিশ দিচ্ছি।

প্রয়োজনমতো পরিমাণে 'মোম' সংগ্রহ হবার পর, গোড়াতেই উনানের আঁচে পরিষ্কার একটি পাত্র বসিয়ে সেই পাত্রে মোমটুকু গলিয়ে তরল করে নিন। আগুনের তাপে মোমটুকু আগাগোড়া গলে তরল হয়ে গেলে পাত্রের সেই 'তরল-মোমেতে প্রয়োজনমতো পরিমাণে 'রজন' (Resin) মিশিয়ে দিন এবং এই 'মিশ্রণটিকে' কিছুক্ষণ উনানের আঁচে রেখে বেশ ভালোভাবে ফুটিয়ে নিন। খানিকক্ষণ ফোটানোর পর, ফুটন্ত মোম ও রজনের 'মিশ্রণটিতে' যখন দেখবেন যে বুদ্বুদ বা ফেনা ওঠা থেমে গেছে, তখনই বুঝবেন—মোমটি 'বাটিক্' কাজের উপযোগী হয়ে উঠেছে।

এবারে প্রয়োজনানুযায়ী সরু, মোটা বা মাঝারি ধরণের ভালো তুলিতে অল্প একটু 'তরল মোম' তুলে নিয়ে 'বাটিকের' কাজের উপযোগী সূতী বা রেশমী কাপড়ের যে সব অংশে কালো রঙের 'নক্সা' চিত্রিত করা রয়েছে, সেই সব জায়গায় সযত্নে ও পরিপাটিভাবে 'মোমের-প্রলেপন' দিন। এ কাজের সময় বিশেষ নজর রাখবেন—তুলিতে যেন বেশী পরিমাণে 'তরল মোম' ব্যবহার করা না হয়। কারণ নক্সার উপরে 'তরল-মোম' প্রলেপনের সময়, অল্প-মোমের বদলে যদি বেশী মোম ব্যবহার করা হয়, তাহলে কাপড়ের বুকে আঁকা 'নক্সা চিত্রটি' প্রয়োজনাতিরিক্ত মোম লাগানোর ফলে, ধেবড়ে গিয়ে রীতিমত বেয়াড়া-অসুন্দর দেখাবে। এছাড়া আরো একটি বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। সেটি হলো—তুলির সাহায্যে 'বাটিকের' কাপড়ের উপর 'তরল মোমের' প্রলেপন দেবার সময়, সর্বদা মোম বেশ গরম-অবস্থাতেই লাগাবেন···কারণ, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কাপড়ের উপর 'মোমের-প্রলেপনের' কাজটুকুও আবার সুষ্ঠুভাবে করা চলে না। সুতরাং মনে রাখবেন—'বাটিক্' পদ্ধতিতে কাজের সময় কাপড়ের উপর খুব শীঘ্র শীঘ্র 'মোমের-প্রলেপন' দিতে হবে··· দেরী হলেই, মোম ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এবং শিল্পকর্ম্মেরও নানান অসুবিধা ঘটবে। 'ঠাণ্ডা-মোমের' প্রলেপ লাগালে, অচিরে এবং অতি সহজেই সেটি নিশ্চিহ্ন হয়ে কাপড়ের উপর থেকে উঠে যাবে। পক্ষান্তরে, খুব বেশী 'গরম-ফুটন্ত' হয়ে উঠলেও আবার কাপড়ের উপরে সে মোমের প্রলেপন লাগানোর নানান অসুবিধা দেখা দেবে। বহুক্ষণ উনানের আঁচে উত্তপ্ত হবার ফলে, পাত্রের 'তরল-মোম' যদি খুব বেশী 'গরম-ফুটন্ত' হয়ে ওঠে, তাহলে সেটি থেকে ধোঁয়া জাগবে। এ ব্যাপার ঘটলেই বুঝবেন যে অতিরিক্ত-উত্তপ্ত হবার দরুণ, পাত্রের মোমটুকু জলে যাচ্ছে। অতিরিক্ত-উত্তপ্ত হবার ফলে, মোম জলে গেলে, সে মোম দিয়ে সুষ্ঠুভাবে 'বাটিক্-শিল্পের' কাজ করা যায় না। কারণ, 'জলা-মোমের' প্রলেপ লাগালে, কাপড়—

বুকে রঙের ছোপ ধরা রোধ করা সম্ভব নয়…'পোড়া মোমের প্রলেপ লাগানো স্থানগুলির ভিতর দিয়ে সহজেই রঙ প্রবেশ করে এবং শেষ পর্য্যন্ত 'বাটিকের' শিল্পকাজটিও আগাগোড়া ধ্যাব্ড়া অসুন্দর দেখায়। কাজেই 'বাটিক'-শিল্পের কাজের সময় কতখানি গরম 'মোম' ব্যবহার করে তুলির সাহায্যে কাপড়ের উপর প্রলেপ দিতে হবে, তার সঠিক-ধারণা থাকা প্রয়োজন। সে ধারণা অবশ্য কয়েকদিন সযত্নে অনুশীলন করলে অনায়াসেই সঞ্চয় করা সম্ভব। তবে মোটামুটিভাবে হদিশ দিয়ে রাখি যে অতিরিক্ত-উত্তপ্ত হবার ফলে, 'তরল মোম' থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখলেই, পাত্রটিকে সাঁড়াশীর সাহায্যে সন্তর্পণে ধরে উনানের আঁচ থেকে কিছুক্ষণ নামিয়ে রেখে দেবেন এবং কাজের ফাঁকে মোমটুকু খুব বেশী ঠাণ্ডা হয়ে যাবার আগেই সেটিকে পুনরায় পূর্ব্বপ্রথানুসারে উনানে বসিয়ে প্রয়োজনমতো 'গরম-ফুটন্ত' করে নেবেন। যথাযথ গরম অবস্থায় থাকলে, 'বাটিকের' কাপড়ের একদিকে সেই 'তরল মোমের' প্রলেপ লাগালে, অপরদিকেও সেটি পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে…অন্যথায় এমন ব্যাপার ঘটে না সচরাচর। তবে প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা যায় যে সুষ্ঠু পরিপাটিভাবে কাজ করতে হলে, সর্ব্বদাই 'বাটিকের' কাপড়ের দুই দিকেই সমানভাবে 'তরল মোমের' প্রলেপ দেওয়াই সমীচীন। মোটা কাপড় হতে এ প্রথা অনুসরণ করা একান্ত দরকার…মিহি কাপড়ের উপর 'বাটিকের কাজ করবার সময় অবশ্য সর্ব্বদা দু'পিঠে 'তরল-মোমের প্রলেপন' না দিলেও চলে। নিখুঁত পরিপাটি ছাঁদে 'বাটিকের' শিল্প করতে হলে কিন্তু মিহি মোটা উভয়ধরণের কাপড়েরই দু'পিঠে 'তরল মোমের প্রলেপন' দেওয়া সেরা উপায়।

আগামী সংখ্যায় 'বাটিক্'-পদ্ধতিতে সুতী ও রেশমী কাপড়ের উপর রঙ করার বিষয় আলোচনার বাসনা রইলো। [ক্রমশঃ

—

এমব্রয়ডারীর নতুন নক্সা

সুলতা মুখোপাধ্যায়

সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজকর্মের অবসরে সৌখিন সেলাইয়ের নানা রকম বিচিত্র সুন্দর শিল্প-কাজ করে গৃহ-সজ্জার বিবিধ উপকরণ রচনার দিকে প্রত্যেক সুগৃহিণীরই বিশেষ আগ্রহ আছে। তাই আজ তাঁদের সূচী-শিল্পের কাজের সুবিধার জন্য বিশেষ এক ধরণের অভিনব নক্সা-নমুনার প্রতিলিপি সাদরে উপহার দিচ্ছি। এবারের এই নক্সা নমুনাটিকে এমব্রয়ডারীর কাজ করে সহজেই 'টেবিল-ক্লথ', 'পর্দ্দা', সোফা কৌচের ঢাকা, বিছানার বালিশ, কুশন ঢাকা প্রভৃতি নানান উপকরণ অলঙ্করণের ব্যাপারে 'রানার' (Runner) বা 'পাড়' হিসাবে ব্যবহার করা চলবে।
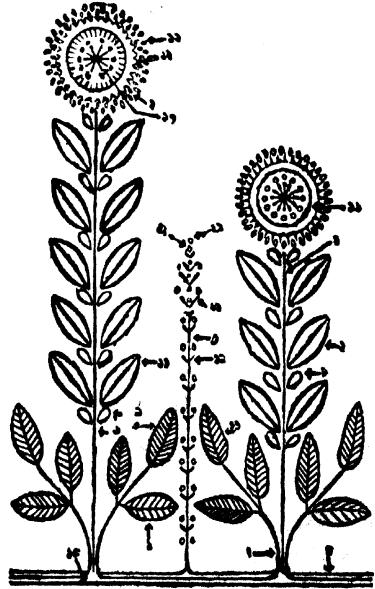
উপরে ফুল-পাতার বিচিত্র নক্সাদার যে নমুনাটি প্রকাশ করা হলো, এমব্রয়ডারী-প্রথায় সূচী-শিল্পের কাজ করে সেটিকে 'রানার হিসাবে নিখুঁত-ছাঁদে ফুটিয়ে তোলার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন—গোড়াতেই

তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। সূচী-শিল্পের এই বিচিত্র নক্সা-নমুনাটিকে সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন—৪৮″ ইঞ্চি × ১৬½″ ইঞ্চি মাপের খদ্দর, লিনেন-জাতীয় কাপড়ের টুকরো, ৬ লচ্ছি (Skeins of Beige Coloured Embroidery Chords) হাল্‌কা-বাদামী রঙের এমব্রয়ডারী সূচী-শিল্পের উপযোগী রেশমী সুতো, ৩ লচ্ছি টিয়াপাখীর পালখের মতো সবুজ রঙের রেশমী এমব্রয়ডারী সুতো, ২ লচ্ছি গাঁদা ফুলের রঙের মতো হলদে রেশমের এম্‌ব্রয়ডারী সুতো, ১১ লচ্ছি গাঢ়-সবুজ রঙের রেশমী এম্‌ব্রয়ডারী সুতো এবং ১ লচ্ছি কালো রঙের রেশমের এমব্রয়ডারী সুতো। এছাড়া আরো দরকার—½″ ইঞ্চি মাপের ও ৫০″ ইঞ্চি চওড়া শাদা রঙের ৬ লচ্ছি রেশমী এম্‌ব্রয়ডারী সুতো, ভালো মজবুত গড়নের ৫ নং এম্‌ব্রয়ডারী সূচী-শিল্পের উপযোগী একটি ছুঁচ এবং কাঁচি।

উপরোক্ত উপকরণগুলি জোগাড় হবার পর, সেলাইয়ের কাপড়টিকে যথাযথ-ছাঁদে (৪৮″ × ১৬½″) ছাঁটাই করে নেবার পর, সেটিকে পরিপাটিভাবে ইস্ত্রি চালিয়ে আগাগোড়া সমান বা সমতল করে নেবেন। ইস্ত্রি চালিয়ে এভাবে সমান করে নেবার সময়, কাপড়টির চার পাশে অন্ততঃপক্ষে ২½″ ইঞ্চি কিনারা মুড়ে আগাগোড়া সমান-ছাঁদে 'পটি' বানিয়ে নেবেন। এ কাজটুকু সেরে নেবার পর, সূচী-শিল্পের কাপড়টির লম্বালম্বি দিকের দুই প্রান্তে ১″ ইঞ্চি মাপের 'পটি' বা 'কিনারা' মুড়ে সুচারু-ছাঁদে 'হেমিং' সেলাইয়ের (Hem Stitch) কাজ করুন এবং অন্য দুই পাশের 'কিনারায়' ½″ ইঞ্চি মাপে 'পটি মুড়ে উপরোক্ত প্রথায় 'হেম' সেলাই দিন। এমনিভাবে সূচী-শিল্পের কাপড়টির চার প্রান্তে 'কিনারা' বা 'পটি' রচনার পর, সেটিকে আগাগোড়া পরিপাটিভাবে ইস্ত্রি করে নিন। তাহলেই কাপড়ের টুকরোটি পুরোপুরি এম্‌ব্রয়ডারী সূচী-শিল্পের কাজের উপযোগী হয়ে উঠবে।

এ কাজের পর, কাপড়ের উপরে নক্সার প্রতিলিপি মুদ্রণের পালা। নক্সার প্রতিলিপি-মুদ্রণের জন্য প্রথমেই পরিচ্ছন্ন একটি শাদা কাগজের উপরে ফুল-পাতার প্যাটার্নটি নিখুঁত-ছাঁদে এঁকে নিতে হবে এবং তারপর সেটিকে কাপড়ের উপরে সুষ্ঠুভাবে বসিয়ে রেখে ও তার নীচে কার্বন-কাগজ পেতে পেন্সিলের রেখার দাগ টেনে পুরো নক্সা-নমুনাটিকে এঁকে নিতে হবে। এ কাজটুকু সুষ্ঠুভাবে সারতে পারলেই, কাপড়ের বুকে আগাগোড়া নিখুঁত ছাঁদে নক্সা-নমুনার প্রতিলিপিটিকে চিত্রিত করা যাবে।

এবারে ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে কাপড়ের বুকে নক্সা-নমুনা প্রতিলিপি ফুটিয়ে তোলার পালা। এ কাজের সময় নিম্নোক্ত-পদ্ধতি অনুসারে সেলাই করতে হবে। অর্থাৎ—উপরের ছবিতে দেখানো বিভিন্ন সংখ্যা-চিহ্নিত অংশগুলিকে যথাযথ-রঙের রেশমী সুতোর সাহায্যে নিম্নোক্ত রীতিতে সূচী শিল্পের কাজ করতে হবে। যথা,—

হালকা বাদামী রঙের সুতো—১নং চিহ্নিত অংশ—(পাতা) —'সাটিন-ষ্টিচের' (Satin Stitch) সাহায্যে সেলাই করবেন।

গাঁদা ফুলের রঙের সুতো ২ হালকা বাদামী রঙের সুতো ৩ নং চিহ্নিত অংশ—(ফুলের কুসুম ও পাতার কিনারা) —'ব্লাঙ্কেট ষ্টিচের' (Blanket Stitch) সাহায্যে সেলাই করবেন।

টিয়াপাখীর পালকের মতো সবুজ রঙের সুতো ৪, কালো রঙের সুতো ৫, গাঢ় সবুজ রঙের সুতো ৬, হাল্‌কা-বাদামী রঙের সুতো ৭ নং চিহ্নিত অংশ—(পাতার ডাঁটা, জমির কিনারা, ফুলের ডাঁটা ও পাতার ডাঁটা)—'ষ্টেম্-ষ্টিচের' (Stem-Stitch) সাহায্যে সেলাই করবেন।

টিয়াপাখীর পালকের মতো ৮ সবুজ রঙের সুতো ৯ নং চিহ্নিত অংশ—ছোট পাতার নিচয়—'ডবল ডেজী-ষ্টিচের' (Double Daisy Stitch) সাহায্যে সেলাই করবেন।

কালো রঙের সুতো ১০, গাঁদা ফুলের রঙের সুতো ১১নং চিহ্নিত অংশ—ফুলের পাপড়ির বহিরাংশ—'ডেজী-ষ্টিচের' (Daisy Stitch) সাহায্যে সেলাই করবেন।

কালো রঙের সুতো ১২ নং চিহ্নিত অংশ—ফুলের পাপড়ির মধ্যভাগের অংশ—'ফ্লাই-ষ্টিচের' (Fly-Stitch) সাহায্যে সেলাই করবেন।

গাঢ় সবুজ রঙের সুতো ১৩নং চিহ্নিত অংশ—পাতার অংশ—'ওপন-ফিশ্‌বোন্ ষ্টিচের (Open Fishbone Stitch) সাহায্যে সেলাই করবেন।

টিয়াপাখীর পালকের মতো সবুজ রঙ ১৪ হাল্কা বাদামী রঙের স্থতো ১৫ কালো রঙের স্থতো ১৬ নং চিহ্নিত অংশ—(পাতার অংশ, নিম্নাংশের পাড় বা কিনারা, ও ফুলের পরাগ)—'চেন ষ্টিচের' (Chain Stitch) সাহায্যে সেলাই করবেন।

হাল্কা বাদামী রঙের স্থতো ১৭, গাঢ়-সবুজ রঙের স্থতো ১৮, কালো রঙের স্থতো ১৯নং চিহ্নিত অংশ—(ফুলের কেশর, নবোদ্ভূত-পাতার অংশ)—'ষ্ট্রেট-ষ্টিচের' Straight Stitch) সাহায্যে সেলাই করবেন।

টিয়াপাখীর পালকের মতো সবুজ রঙের স্থতো ২০, গাঁদা ফুলের মতো হলদে রঙের স্থতো ২১, কালো রঙের স্থতো ২২নং চিহ্নিত অংশ—ফুলের পরাগ, ফুলের কুঁড়ি ও পাতার কুঁড়ি)—'ফ্রেঞ্চ-নট্' পদ্ধতিতে সেলাই করবেন।

সুষ্ঠুভাবে উপরোক্ত পদ্ধতিতে এমব্রয়ডারী সূচী-শিল্পের কাজ করলেই সহজ সুন্দর উপায়েও পরিপাটি-ছাঁদে ফুটে উঠবে এবারের এই অভিনব সূচী-শিল্পের নক্সা নমুনাটি।

বারান্তরে, আরো কয়েকটি নতুন নক্সা-নমুনার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

—
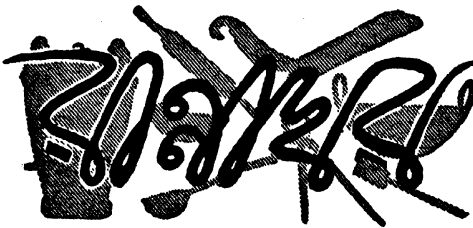
স্থধীরা হালদার

এবারে বলছি—ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের পরম-প্রিয় সুস্বাদু-মুখরোচক অপরূপ একটি আমিষ-খাবার রান্নার কথা।

এ খাবারটি রান্নার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ এই অভিনব আমিষ খাবার রান্নার জন্য চাই—একসের মাংস, একপোয়া পেঁয়াজ, একপোয়া পালংশাক, একপোয়া বড়-সাইজের পুরুষ্টু লাল টোম্যাটো, বড় বড় সাইজের পাঁচ-কোয়া রসুন, গোটা আষ্টেক বা দশেক শুকনো লঙ্কা, চায়ের চামচের দু'চামচ চিনি, আন্দাজমতো পরিমাণে ঘি, গরম-মশলা, নুন এবং অল্প খানিকটা কাশ্মিরী-লঙ্কার গুঁড়ো।

এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগেই টোম্যাটোগুলিকে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে কিছুক্ষণ গরম-জলে চুবিয়ে রেখে পরিপাটিভাবে সেগুলির খোসা ছাড়িয়ে রাখুন। তারপর ডেকচিতে আন্দাজমতো পরিমাণে ঘি দিয়ে, সেটিকে উনানের আঁচে বসিয়ে পেঁয়াজকুচিগুলিকে বেশ বাদামী-রঙের করে ভেজে নিন। পেঁয়াজকুচি ভেজে নেবার পর, অনুরূপ-প্রথায় উনানের আঁচে ডেকচি বসিয়ে রসুন-বাটা ও লঙ্কা-বাটা দিয়ে ভালো করে ভেজে ফেলুন। কিছুক্ষণ এভাবে ভাজার ফলে, রন্ধন-বস্তু থেকে বেশ সুগন্ধ বেরুতে থাকলেই, উনানের আঁচে বসানো ডেকচিতে খোসা-ছাড়ানো টোম্যাটোগুলিকে ছেড়ে হাতা বা খুন্তীর সাহায্যে কয়েকবার ভালোভাবে নাড়াচাড়া করুন। এবারে রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে খানিকটা চিনি মিশিয়ে দিন এবং পুনরায় দু'চারবার হাতা বা খুন্তীর সাহায্যে রান্নাটিকে নাড়াচাড়া করেই, উনানের আঁচে বসানো ডেকচিতে পালংশাক ও মাংসের টুকরোগুলিকে আগাগোড়া সুষ্ঠুভাবে কসে নেবার পর, রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে অল্প একটু নুন ও জল মিশিয়ে দিয়ে রান্নাটিকে উনানের আঁচে দমে বসিয়ে রাখুন। খানিকক্ষণ নরম-আঁচে দমে বসিয়ে রাখার ফলে, মাংসের টুকরাগুলি আগাগোড়া বেশ নরম ও সুসিদ্ধ হলে, অল্প-অল্প ঝোল থাকতে থাকতেই রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে সামান্য গরম-মশলা মিশিয়ে দিন এবং কিছুক্ষণ আগুনের তাপে ফুটিয়ে নেবার পর, ডেকচিটিকে উনানের উপর থেকে নামিয়ে ফেলুন। তাহলেই রান্নার পালা শেষ হবে।

রান্নার কাজ শেষ হলে, রন্ধন-পাত্রে রাখা খাবারটির উপর সামান্য একটু কাশ্মিরী লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে ডেকচির মুখটি ঢাকা চাপা দিয়ে বন্ধ রেখে দিন। তাহলেই প্রিয়জনদের পাতে পরিবেষণের সময় খাবারটি খেতে যে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে আর এতটুকু সন্দেহের কারণ থাকবে না।

পরের সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি বিচিত্র-উপাদেয় ভারতীয় খাবারের রন্ধন-প্রণালীর কথা আলোচনা করবার বাসনা রইলো।

শ্রী'শ'—

বিলাতের চিত্রজগতে চিত্র প্রযোজক

শ্রীউমেশ মল্লিক (লণ্ডন)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এখানে কাজের নানা ভাগ এমন করে ভাগ করা থাকে যাতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সমন্বয় রেখে পা ফেলে একই তালে এগিয়ে চলে। কোথাও গণ্ডগোল হবার যো নেই। প্রত্যেকে প্রত্যেকের পদ মর্য্যাদাকে শ্রদ্ধা ও স্বীকার করে চলে। যেমন পরিচালক lighting camera manকে আদেশ দেন তিনি আবার সে আদেশ দেন camera operaterকে—বৃটিশের সেই নীতি proper channel—এ ক্ষেত্রেও বজায় আছে, সুতরাং কোথাও কোন গণ্ডগোল হয় না।

Art Directorএর কাজ এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগেই বলেছি যে এখানে আবহাওয়ার অনিশ্চয়তার জন্য এদের সব কিছুই studioএর ভেতর করতে হয় সুতরাং ডাক পড়ে Art directorএর সর্ব প্রথম। তাঁকে script দিয়ে দেওয়া হয়। সেই script থেকে তিনি directing boardএ দৃশ্যগুলো আঁকার পর মডেল্ তৈরী করেন; তারপর সেই মডেল নিয়ে পরিচালক-প্রযোজকদের আলাপ-আলোচনা হয়,এমন কি কোন দৃশ্যের কোন অংশে কোথায় camera বসান হবে সে সম্বন্ধেও বিচার হয়ে থাকে।

Art directorএর গুরুত্বটা আরও বেশী করে উপলব্ধি করা যায় যখন matchingএর ব্যবস্থা হয়। যেমন ডেন্‌হাম্ স্টুডিওতে একটা Monticarloর দৃশ্য তোলা হচ্ছিল, আমি সে ছবিতে কাজ শিখছিলাম। নাম হ'লো Look before you love,অভিনেত্রী ছিলেন Margaret Lockwood অভিনেতা হলেন "সেক্সপিরিয়ান অভিনেতা" নরম্যান ও ল্যাণ্ড।

ঘটনার বিষয় বস্তু হ'লো চাঁদনী রাত্রে Monticarloর বড় বাগানের বারান্দায় নায়ক-নায়িকা প্রেমালাপ করছেন। দূরে সমুদ্রের জল চাঁদের আলোতে চিক্ চিক্ করছে। দূরে সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে বাড়ীগুলো থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথমে এর establishing shotএ অর্থাৎ আবহাওয়া monticarloর সৃষ্টি করবার জন্য আসল ছবিটা সমুদ্রের ধারের—"পেনারমিক ভিউ" তুলে নিয়ে এলেন। তারপর পয়সা বাঁচাবার জন্য সেই আসল দৃশ্যের নকল দৃশ্য করলেন studioর ভেতরে। যখন বারাণ্ডার চত্বরে প্রেমালাপ হচ্ছে সেটা Montecarloতে সত্যিকারের করতে গেলে অভিনেতা অভিনেত্রী প্রভৃতি সদল বলে unit নিয়ে গেলে গাড়ী ভাড়া, হোটেল ভাড়া, union fee ইত্যাদিতে পড়ে যাবে ছবির খরচ অত্যন্ত। সুতরাং আসল monticarloর দৃশ্যের সঙ্গে match করে নকল monticarlo করা হ'লো studioতে।

এক্ষেত্রে দেখলাম প্রায় তিনতলার সমান একটা monticarloর দৃশ্য আঁকা হয়েছে ঠিক আসল দৃশ্যের মত। তারপর এই আঁকা দৃশ্যের ঘর-বাড়ীগুলোর জানালা দরজাগুলোকে ফেশ তুলি দিয়ে গাঢ় করে দেওয়া হচ্ছে। Arc lamp দিয়ে তারপর চাঁদ সৃষ্টি করা হচ্ছে আসল দৃশ্যের মত করে। সমুদ্রের জল চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে দেখাবার জন্য এই তিনতলার দৃশ্যের যেখানে যেখানে সমুদ্রের জল আঁকা আছে সেখানে লাইলনের মশারী অতি সূক্ষ্মভাবে বসিয়ে দেওয়া হ'লো। সেই মশারীতে দেওয়া হ'লো কেতা দুরস্তভাবে studiosএর নকল আলোর ছটা। আসল দৃশ্যের খোলা জানলা থেকে আলো ঠিকরে পড়বার আভাস দেখাবার জন্য এরা নকল

দৃশ্যের জানলাগুলো blade দিয়ে অতি সূক্ষ্মভাবে কেটে তার পিছনে ছোট ছোট ইলেক্‌ট্রিকের "বাল্ব" এমন কায়দা করে বসিয়ে দিল যে বলবার কথা নয়।

পটভূমিকায় এই দৃশ্যকে Stndrios তে রেখে নকল বারাণ্ডা বসিয়ে Montecarlo র matching দৃশ্য করে ছবি হ'তে লাগলো। পরদিন Rushes এ আমরা ছবি দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। establishing shot এর আসল দৃশ্যের সঙ্গে নকল দৃশ্যের লুকোচুরি মোটেই ধরা গেল না। এখানে বলে রাখি Rushes মানে Rush work অর্থাৎ রোজকার কাজ রোজ বিনা সম্পাদনায় ছবি Print করে দেখে নেওয়া হয় কেমন ছবির কাজ চলছে। আগের আগের দৃশ্যের সঙ্গে continuity অর্থাৎ সমতা বজায় আছে কিনা ইত্যাদি, জামা কাপড় সাজ পোষাক, কে'থায় কে কিভাবে কাকে কি কথা বলেছিল, তা দেখে নেওয়া আর কি? আর এক ক্ষেত্রে আমি কাজ শিখছিলাম আর একটা ছবিতে—নাম তার—Sleeping car to Trieste. Trieste হ'লো ইটালীর একটা সহর। চিত্রের গল্পাংশটা হ'লো একটা ফ্রান্স থেকে ইটালী যাওয়ার ট্রেণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। প্রায় ৯০ ভাগ ছবি এই ট্রেণের মধ্যেই নেওয়া। করলে কি এরা—ডেল্ হতাম ষ্টুডিওতে প্রায় হাওড়া স্টেশনের মত একটা নকল স্টেশন। বাকী প্রায় ৫।৬টা নকল Engine সমেত তৈরী করলো ষ্টুডিওর মধ্যেই। এতে বাইরে গিয়ে রেলের লাইনের ছবি নিতে যেতে হ'লো না সদল বলে। আসল স্টেশনে না গিয়ে নকল স্টেশন ষ্টুডিওজ্ এর মধ্যে তৈরী করে ছবিটা অল্প খরচে শেষ করা এই উদ্দেশ্য।

গাড়ী ছুটে যাচ্ছে রেলওয়ে লাইনের ওপর দিয়ে যখন', তখন আসে পাশের ঘর বাড়ী ছুটে যাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করলো যে ভাবে Studios এর মধ্যে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। করলে কি এরা—প্রকাণ্ড ঢোলক্ যা আমরা দেখে থাকি বাজনার সঙ্গে, সেই রকম একটা প্রকাণ্ড ঢোলকের ওপর শিল্প নির্দেশক আঁকলেন ঘর বাড়ী মাঠ খেত খামার ইত্যাদি। Studio এ তারপর ঐ ঢোলকের মত জিনিষটাকে গাড়ীর কামরায় জানলার বাইরে রেখে দিল। অর্থাৎ ঐ পটভূমিকাকে পিছনে রেখে চিত্র অভিনেতাকে নকল ট্রেণের বগীর জানালার কাছে বসতে বলা হ'লো। কথাবার্ত্তা তিনি যখন বলছেন বা বাইরে তাকিয়ে দেখছেন তখন ঐ পটভূমিকায় আঁকা ঢোলকের মত জিনিষটাকে ধীরে ধীরে একজনকে চক্রাকারে ঘোরাতে বলা হ'লো।

ছবিতে যখন দেখা গেল চিত্রের এই অংশটি পরের দিন Rushes এ, তখন ঐ আবহাওয়া সৃষ্টি করার ক্ষমতাটাকে স্বীকার না করে থাকতে পারা গেল না।

এ ছাড়া Bacon proiection তো আছেই।

এই সঙ্গে বলে রাখি এ দেশের পেশাদারী ছুতোর বা কামার জাতীয় লোকদের—যাদের এ বিষয়ে কাজে নেওয়া হয় তাদের অদ্ভুত কাজ করবার ক্ষমতা।

দেখতে দেখতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে নকল একখানা ট্রেণের বগীকে যেমন বিভিন্ন অংশ জোড়া দিয়ে অর্থাৎ নকল বগীর জানলা দরজা জোড়া দিয়ে একটা নকল ট্রেণের বগী তৈরী করতে পারে, ঠিক তেমনি দেখতে দেখতে সেই ট্রেণের বগীর জানালা দরজা খুলে আর একটা জিনিষ চাহিদা মত হুকুম তামিল করতে পারে।

এদের বলতে হয় না—ওরে হাত চালিয়ে কাজ কর বা বাইরে গিয়ে কাজের সময় বিড়ী ফুঁকো না যখন কাজের দরকার।

সব সময়ে এরা তটস্থ হয়ে বসে থাকে কখন তার কাজের ডাক পড়বে। এজন্যে কাউকে তাড়া-হুড়া চীৎকার করতে হয়না। কাজ চলে ঘড়ীর কাঁটার মত। সব নিজের নিজের বিভাগের দায়িত্বকে এরা মাথা পেতে স্বীকার করে নেয়, সম্মান করে। এর আর একটা কারণ হ'লো এরা ক্ষেত্র বিশেষে মাইনে পায় প্রায় হাজার টাকারও বেশী, তাছাড়া আছে এদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

এদের যেখানে একজনের কাজের দরকার হয় সেখানে কাজের মান যাতে উঁচু ধরণের হয় সে জন্যে এরা এক জন লোকের পরিবর্ত্তে দুজন লোককে নিযুক্ত করে থাকে।

কলকাতায় অধিকাংশই আমরা একজন লোককে নিযুক্ত করে তাকে খাটিয়ে নেই গাধার মত এবং পয়সা দেবার সময় তাকে চেষ্টা করি যত কম পয়সা দিতে। এরা এখানে তা করেনা। কারণ এরা মনে করে এরকম মনোবৃত্তি আত্মঘাতী। এতে আন্তরিক ভাবে কাজ কর-

মুক্তি প্রতীক্ষিত "বিভাস" চিত্রে উত্তমকুমার ও ললিতা চট্টোপাধ্যায়

বার যে আগ্রহ তা কাজের চাপে মাঠে মারা যায় এবং ফলে ইচ্ছা থাকলেও তারা তাদের প্রতিভাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না—সুতরাং কাজের ক্ষতি হয়ে থাকে।

আর একটা হলো Stuido এর মধ্যে শৃঙ্খলতা বজায় রাখার অদ্ভুত ব্যবস্থা। দায়ী এর জন্য পরিচালকের প্রধান সহকারী। আমাদের মত কলকাতায় পরিচালককে এখানে সব বিষয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ছুটো ছুটি করতে হয়না। যার যা কাজ সে তার দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে থাকে, ফলে চিৎকার, হৈ-হৈল্লা চেঁচামেচির কোন প্রকার বালাই নেই এখানে। তবে কোন প্রকার কোন বিষয়ে কাজের খেলাপ হ'লে এদের বিধিব্যবস্থা ও দেখবার মত। পাড়া মাথায় করে এখানকার লোক ঝগড়া করেনা। আকারে প্রকারে এরা কথা বার্ত্তার মধ্যে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় ভদ্রভাবে—কে কার কাজে গাফিলতী করছে। তাও প্রকাশ্যভাবে নয় পরোক্ষভাবে। ছোট কাজ করছে বলে যে কথায় বার্ত্তায় বাপ পিতামহ করবে সে প্রকার মনোবৃত্তি এখানে নেই। এরা মানুষ, মানুষের সমান অধিকার দেয়—বরং একজন ঘটনা চক্রে আর একজনের থেকে যে বড় কাজ করে বলেই যে মাথা কিনে নিয়েছে তা নয়।

যে বড় কাজ করে সে নিজের ব্যবহারে অপরকে জানিয়ে দেবার চেষ্টা করে যে—সে ঐ পদ মর্য্যাদার যোগ্য ব্যক্তি। Unionএর যে নিবাচিত পাণ্ডা হয়তো সে Studio এর দরওয়ান, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে Studio এর

মালিক তাকে সম্মান করে বলে। এক্ষেত্রে বলে রাখি যে Union যে কড়া—এ কথাটা আমি যে শুনেছিলাম তা পদে পদে সত্য।

একটা উপমা দিলেই বুঝতে পারবেন। Sleeping car to trieste এই চিত্রে একদিন স্টেশনের ভীড়ের দৃশ্যে কোম্পানী আড়াইশো লোকের মধ্যে ২০০ আসল লোক নিল এবং ৫০ জন মানুষ প্রমাণ কাঠের মানুষের মূর্ত্তি wood cut figureকে তৈরী করে ভীড়ে বসিয়ে দিল মানুষের বদলে, স্টেশনের দৃশ্যে। হঠাৎ শুনা গেল কানা ঘুষায় যে—সে দিনের কাজ Unionএর পর বন্ধ হয়ে যাবে, কেন না Unionএর লোক strike করবে।

তাদের দাবী ৫০ জন মানুষ প্রমাণ wood cut figure ভীড়ের দৃশ্যে ব্যবহার করায় unionএর সভ্যদের নেওয়া না হওয়ায় সভ্যদের যোগ্য দাবী থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

সভ্যদের নেওয়া হ'লে সভ্যরা পয়সা পেতো এ ক্ষেত্রে তাদের না নেওয়া হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করেছেন। শুনে প্রসিদ্ধ পরিচালক John Paddy Carstaior এবং বিশেষ প্রযোজক George H. Brown এরা তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এর আগে আমাকে নিয়ে গোলযোগ হয়েছিল। ভীড়ের দৃশ্যে আমি আর পাঁচজনের মত যাত্রী হিসাবে ছবিতে ট্রেনে গিয়ে উঠেছিলাম শুধু মজা করবার জন্য।

যা হোক পরিশেষে সেই wood cutএর মূর্ত্তিগুলোকে ফেলে দেওয়া হ'লো। unionএর সভ্যদের তার বদলে দাঁড় করান হ'লো। ক্ষতি হ'লো একটা দিনের কাজের। আর্থিক ক্ষতি মোট ৪০ চল্লিশ হাজার টাকা। মাত্র এক দিনের কাজ বন্ধ থাকায় ঐ টাকার ক্ষতি।

এই রকম নানা ভাবে নানা ছল ছুতো করে union তাদের নিজের কর্ত্তৃত্ব বজায় রেখে থাকে, যার ফলে এ বিষয়ে প্রত্যেকে unionকে মেনে চলে মনে প্রাণে। কখন কোন সভ্যর মাথায় ভূতচেপে বসবে কে জানে? তাকে কেন্দ্র করে সুরু হয়ে উঠবে একটা প্রচণ্ড ঝড়। যতক্ষণ না union এর দাবী মেনে চলা হয়েছে, ততক্ষণ চলবে strike সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ এক রকম তাদের union এর মর্জির ওপর নির্ভর করে কাজ করে থাকেন।

তাই ব্যক্তি বিশেষের কাউকে আন্তরিকভাবে বিলাতের Sludio গুলোতে কাজ শেখবার সুযোগ দেবার ইচ্ছা থাকলেও এই union এ বিষয়ে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কেউ চায় না তারই জন্য Studioতে strike চলবে, ফলে মাত্র এক জনের জন্য হাজার হাজার টাকার ক্ষতি হয়ে থাকবে। সুতরাং সাধু সাবধান। আজ কাল ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের এদেশে উজাড় করে এসে ঢোকায় প্রতি union এর মনোবৃত্তি আরও রক্ষণশীল হয়ে উঠেছে—এরা ভাবে সব সময়ে আজ কাল সে যে কোন কাজই হোক না কেন—যে বিদেশী লোকের পরিবর্ত্তে নিজেদের লোক ইংরাজদের গ্রহণ করা উচিত কিনা? দেখা গেছে বিদেশীর গুণ শতগুণের হ'লেও জাতীয়তার দিকে দৃষ্টিদিয়ে এরা নিজেদের লোক কে প্রথমে গ্রহণ করে।

কাজ শেখবার পর আমার প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল A. C. T অর্থাৎ Association of Cinematograph Technician এর সভ্য হওয়ার। আসল হলো এই Union যে বিষয়েই চিত্র জগতের লোক কাজ করাল, এক প্রযোজক ছাড়া এ Union এর সভ্য হতে হবে—কেননা আকারে প্রকারে অক্টোপাসের মত এর বাহু বন্ধনকে স্বীকার না করে উপায় নেই। এদের হুকুম তামিল না করলে কোন প্রযোজকের সাধ্য কি যে কাউকে চিত্র জগতে কাজ দেয়। প্রায় কুড়ি বছর হ'লো এ প্রতিষ্ঠানের সেই একই সেক্রেটারী এবং একই প্রেসিডেণ্ট। নিজস্ব আমার মত যে, এ প্রতিষ্ঠান এক-দলীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এদের যুক্তি অদ্ভুত। ইংরাজ ছেলেদের প্রবেশ পত্রের কোন বালাই নেই। বিদেশী হ'লেই নানা প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং নানা অছিলায় এরা বিদেশীদের সিনেমা জগতে ঢুকতে দিতে রাজী নয়। জাহাজের সেই ইংরেজদের মত এরাও বলে যে, ইংরেজ বহু চিত্রজগতের লোক "অনাহারে অনিদ্রায়" মারা যাচ্ছে কাজের অভাবে, সুতরাং তাদের কর্ত্তব্য প্রথমে এই ভাগ্যহত ইংরেজদের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা। সম্প্রতি এই Union এর সঙ্গে ২১৪ জন প্রযোজকের মামলা মকদ্দমা হয় Union এর "ডিকটেটরী" মনোভাবকে কেন্দ্র করে। এঁরা চান

প্রযোজকরাও এঁদের তাঁবে কাজ কর্ম করবে। যা অনেক নাম-করা প্রযোজক রাজী হন না।

যা হোক A, C, T এর এখন নাম বদল হয়েছে টেলিভিশনের গোড়া পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে। এতে টেলিভিশনের লোকেদেরও সভ্য হবার Unlon নির্দ্দেশ হয়েছে—যার ফলে A, C, T এখন A, C, T, T নামে প্রচলিত। মধ্যে মধ্যে এরা বিদেশীদের কোন নির্দ্দিষ্ট ছবির জন্য Union এর সভ্য নিযুক্ত করে, ফলে ব্যক্তি বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট ছবিতে কাজ করতে পারে।

এখানে সিনেমা জগতের বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন Union আছে, যা A, C, T, Tর অন্তর্গত। যেমন Hairdresser দের Union ইত্যাদি। এক Union এর লোক অ'র Union এর কাজে হাত দেয়না। ধরুন "আলোর সুইচটা নিভিয়ে দিতে হ'লে সেই Union এর লোককে ডাক দিতে হবে, আপনি বা আমি ঐ Union এর সভ্য না হলে সামান্য মাত্র এ কাজটাও Studio তে করতে পাব না বা করবো না। এই হ'লো চিত্র জগতের Union এর বিধি নির্দ্দেশ। এর এতটুকু ব্যতিক্রম হলেই Strike চলবে। এ Strike হবার আগে কোন প্রকার হৈ চৈ হয় না।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে সভ্যরা মিটিং এর কথা জানিয়ে দেয় নিজের নিজের বিভাগে। Lunchএর সময় meeting বসে। দু চার কথায় সংক্ষেপে সেক্রেটারী জানিয়ে দেয় Union এর মনোভাব। দেখতে দেখতে Studio ছেড়ে বার হয়ে যায় সব কালের পুতুলের মত। এদের কাজ চলে ঘড়ীর কাঁটার মত। Unionই হ'ল সেখানে মালিক। ইচ্ছা অনিচ্ছা তাদের ওপর কাজ চলে। এ হেন Unionকে ঠকিয়ে রাখা ভীষণ ব্যাপার।

এ দেশে ছবি করা ভারতবর্ষ থেকে অনেক সোজা। এর কারণ নানা রকম।

এ দেশে ছবি করবার একটা বিধি নির্দ্দেশ আছে। মেনে চললে তা ছবি করবার নানা প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। তবে মিলে মিশে ইংরাজদের সঙ্গে এ বিষয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত। তাও নির্ভর করে ব্যক্তি বিশেষের ওপর প্রধানতঃ।

এ ক্ষেত্রে একটা কথা উপলব্ধি করা সহজ হবে যে এরা নিজের লোকের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। মেলা মেশায় আদব কায়দায় এদের সঙ্গে এক হয়ে না গেলে, এরা কোন দিনই বিদেশীর সঙ্গে কাজ করতে রাজী হবেনা। যা হোক এদের তাঁবে থাকলে এখানে ছবি করা সোজা, তার কারণ আগেই বলেছি পরিবেশক প্রথমে ৬০।৭০ ভাগের টাকা আগাম দিয়ে থাকে। অবশ্য এ টাকা পেতে গেলে প্রথমে চিত্র নাট্য, দ্বিতীয় বাজেট, তৃতীয় চিত্র-তারকা—এ বিষয়ে পরিবেশকের সঙ্গে মতের মিল হ'তে হবে। এক মত হ'লে তবে টাকা পাবার সম্ভাবনা থাকে। বাদ বাকী ৩০ ভাগ প্রযোজক যোগাড় করে বিদেশ থেকে—যেখানে ছবির বাহির দৃশ্যের কাজ হবে সেখান থেকে।

অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশক ৭০ ভাগ টাকা দিতে রাজী হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে এ টাকা পাওয়ার ভাগ নির্ভর করে। যদি পরিবেশক ৬০ ভাগ টাকা দিতে রাজী হয় তা হ'লে ৪০ ভাগ টাকা যোগাড় হ'তে পারে অন্য রকমে। গভরণমেণ্টের তহবিল National Film Finance Corporationএর কাছে ২০ ভাগ নিয়ে আর বাদ বাকী ২০ ভাগ দেখাতে হয় নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করে। অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে আপোষে একটা নিষ্পত্তি হয় যে ১০ ভাগ টাকা ছবি মুক্তি হওয়ার পর আদায় করার দাবী—যা কেউ এখন করবে না। আর বাদ বাকী ১০ ভাগ দেখাতে হয় কাগজে কলমে প্রযোজকের fee হিসাবে।

আবার অনেক ক্ষেত্রে পয়সাওয়ালা লোক কিছু টাকা উপরি fee নিয়ে তার Bankএর টাকা ছবি করার জন্য জামিন দাঁড়ায়। ফলে প্রযোজকদের fee ইত্যাদিতে প্রথমে হাত পড়ে না। আমার ছবিতে যেমন দাঁড়িয়েছিল ক্রোড়পতি লোক বন্ধু মাননীয় ডেরিফ উইল।

যা হোক এ সমস্ত নির্ভর করে ব্যক্তি বিশেষের টাকা পয়সা যোগাড়ের বুকের পাটার ওপর। আর একটা বিষয় এদেশে আছে, যাতে কোম্পানীর টাকা মার না খায় অযথা হৈ হৈ করে। মহরত ইত্যাদির পরে এবং টাকা ছবি তৈরী হওয়ার আগেই ফুঁকে যাতে না যায় সেদিকে কড়া দৃষ্টি দেওয়ার। সরকারের এখানের নিয়ম ছবি আরম্ভ করবার পূর্ব্বে একজনকে দাঁড় করান, যিনি মুক্ত

কণ্ঠে গভর্ণমেণ্টকে জানাবেন যে ছবি শেষ হওয়ার যা টাকা লাগে তা তিনি দিতে প্রতিশ্রুত আছেন।

কোন ব্যক্তিবিশেষকে এত বড় জোর গলায় বলতে দেখা যায় না। কারণ এখানের ছবির এই যে ৫০।৬০ লক্ষ টাকার জামিন এটা খুব কম লোকই দাঁড়াতে পারেন —যার আর্থিক সঙ্গতি সরকারকে সন্তুষ্ট করতে পারে। দাঁড়ায় এ জন্যে এক কোম্পানী নাম তার Film Finance Corporation এরা হলেন Insurance companyর মত এবং এরা জামিন দাঁড়াবার জন্য যথেষ্ট টাকা দাবী করে বসেন। কারণ এদের দায়িত্ব সব থেকে বেশী। এলিজাবেথ টেলারের "ক্লিওপেট্রা" ফিল্ম এক্ষেত্রে নজির হিসাবে ব্যবহার করা চলে। ছবি যদি নির্দিষ্ট টাকার মধ্যে শেষ হয়, তাহ'লে এরা এদের প্রাপ্য টাকা কম নিয়ে থাকেন।

Film Finance Corporationকে ভয় করে চলে সকলে। খুঁটিয়ে তারা "বাজেটের" প্রতিটি বিষয়ে যাচাই করে দেখে। পরিবেশক গভর্ণমেণ্টের তহবিলের লোক রাজী হ'লেও এরা যদি প্রয়োজকের প্রাপ্য টাকা কম করবার আদেশ দেয় তাহ'লে কোম্পানীকে সে আদেশ মাথা পেতে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ জামিন না দাঁড়ালে ছবি হওয়া সম্ভবপর নয়।

তবে এদেশেও নানা বখেড়া আছে ছবি করায়। যেমন চিত্র তারকাদের কেন্দ্র করে। পরিবেশক টাকা আগাম দেওয়ার আগে চিত্রতারকাকে সে সম্বন্ধে চুটিয়ে দেখে নেন। চিত্রতারকা সম্মতি দেবার আগে চিত্রনাট্য পড়ে থাকেন।

চিত্রনাট্য পড়বার সময় এদেশের চিত্রতারকরা সব চিত্রনাট্য নিজে পড়ে থাকেন না। যে যে পাতায় চিত্র-তারকার অংশ আছে তা তাঁরা প্রথমে "পিন্" দিয়ে এঁটে নেন এবং দেখেন সারা ছবিতে তাঁর অংশ কত মিনিটের আছে, কতকগুলো Close up আছে ইত্যাদি। পড়ে এগুলো চিত্র-তারকা তাঁদের Agent বা সহকারীদের সবটা চিত্রনাট্য পড়বার অনুরোধ করেন। এই সব লোক যদি চিত্র তারকার সঙ্গে ছবির অভিনয়ের অংশ গ্রহণ করা বা না করা নিয়ে একমত হন, তখন চিত্র তারকা সেই মতামত ব্যক্তিবিশেষকে জানিয়ে দেন। অনেকক্ষেত্রে এই মতামত নির্ভর করে অভিনেত্রীর ওপর। অনেকে চিত্র অভিনেত্রীকে প্রথমে জেনে নেন এবং চিত্র-অভিনেত্রী মনোমত না হ'লে চিত্র-অভিনেতা প্রথমেই এ বিষয়ে অমত করে থাকেন।

আর একটা বখেড়া আছে যে চিত্রতারকা মত করলেন প্রযোজক তাঁর সঙ্গে ঠিকঠাক করলেন, কিন্তু হয়তো পরিশেষে ছবিটা হ'লো না সে ক্ষেত্রে চিত্রতারকা বা তাঁর Agent এ "অপরিসীম" ক্ষতি বলে মকদ্দমা প্রযোজকের বিরুদ্ধে করতে পারেন। আবার চিত্রতারকা না হ'লে পরিবেশনা পাওয়া সম্ভাবনা হয় না। হয়তো অনেক ক্ষেত্রে চিত্র-প্রযোজক টাকা যোগাড় করতে পারলেন না সময়মত কোন কারণে, চিত্রতারকা অন্য ছবির তাগিদে হাত ছাড়া হয়ে গেল ফলে ছবি বন্ধ হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। সে ক্ষেত্রে প্রযোজকের প্রাণপণ পরিশ্রমই হ'লো সার।

চা পান ও ঠোঁটের ব্যবধানের দূরত্বের মধ্যে শত অঘটনের যে ইঙ্গিতের ইংরেজী প্রবাদ আছে তার সারবত্তা বোধ হয় এক মাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় ছবির জগতে।

তা হ'লেও কি আতিশয্যে, কি আড়ম্বরে, কি অনিশ্চয়-তার রহস্যে কি দুঃসাহসের প্রলোভনে চিত্র জগতের তুলনা হয় না।

* * *

ই, আই, এম, পি কর্তৃক সাংবাদিক পুরস্কৃত

ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশন বিগত ১৪ই নভেম্বর তাদের কার্যকরী কমিটীর এক জরুরী বৈঠকে বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পে গবেষণা ও 'বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস' পুস্তকরচনার জন্য 'রূপমঞ্চ' সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়কে ২০০১৲ (দুই হাজার একটাকা) পুরস্কারে ভূষিত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এসো-সিয়েশনের এক বিশেষ সভায় শ্রীমুখোপাধ্যায়কে উক্ত পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হবে। স্মরণ থাকতে পারে যে সর্বভারতে বাঙলাদেশেই স্বর্গতঃ হীরালাল সেন প্রথম চিত্র নির্মাণ করেন—শ্রীমুখোপাধ্যায় এই তথ্য তাঁর ইতি-হাসে প্রমাণ করেন এবং রাজ্য সরকারের স্বীকৃতি পায়। সর্বভারতে চিত্র প্রতিষ্ঠান থেকে এই সর্বপ্রথম একজন সাংবাদিককে এই সম্মানে ভূষিত করা হলো।

সম্পাদনা: শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ভারতবর্ষ—ইংল্যাণ্ড ১ম টেষ্ট ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ৪৫৭ রান (৭ উইকেটে ডিক্লে: বি কুন্দরাম ১৯২, ভি এল মঞ্জরেকার ১০৮, ডি এন সরদেশাই ৬৫ এবং এম এল জয়সীমা ৫১ রান। টিটমাস ১১৬ রানে উইকেট পান)

ও ১৫২ রান (৯ উইকেটে ডিক্লে: কুন্দরাম ৩৮। টিটমাস ৪৬ রানে ৪ এবং মর্টিমোর ৪৯ রানে ২ উইকেট।)

ইংল্যাণ্ড ঃ ৩১৭ রান (জে বি বোলাস ৮৮, কেন ব্যারিংটন ৮০। বোরদে ৮৮ রানে ৫ এবং দুরানী ৯৭ রানে ৩ উইকেট পান)

ও ২৪১ রান (মাইক স্মিথ ৫৭, মর্টিমোর ৭৩ নট আউট এবং ফিল সার্প ৩১ নট আউট। কৃপাল সিং ৬৬ রানে ২ এবং নাদকার্ণী ৬ রানে ২ উইকেট)—৫ উইকেটে।

মাদ্রাজে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের প্রথম টেস্ট খেলা ড্র গেছে। এই নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত ৩০টি খেলায় ১২টি খেলা ড্র গেল—ভারতবর্ষে ৮টি এবং ইংল্যাণ্ডে ৪টি। অপরদিকে জয়লাভের সংখ্যা ইংল্যাণ্ডের ১৫ এবং ভারতবর্ষের ৩।

ভারতবর্ষের অধিনায়ক পাতৌদির নবাব টসে জয়লাভ করেন ভারতবর্ষ—ইংল্যাণ্ডের টেস্ট সিরিজে ৩০টি টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের টসে জয় এই নিয়ে ১৭ বার।

প্রথম দিনের খেলায় ভারতবর্ষের ২৭৭ রান দাঁড়ায় ২ উইকেট পড়ে। উইকেটে অপরাজিত থাকেন বুধি কুন্দরাম (১৭০ রান) এবং বিজয় মঞ্জরেকার (২০)। কুন্দরামের শতরান করতে ১৯৭ মিনিট সময় লাগে। শেষের ১০ রাণ করতে তিনি বেশী সময় নিয়েছিলেন—৪০ মিনিট। টেস্ট ক্রিকেটে ভারতীয় উইকেট-কীপারদের মধ্যে কুন্দরামই প্রথম সেঞ্চুরী করলেন। ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের টেস্ট শিরিজে উইকেট-কীপার হিসাবে কুন্দরামের সেঞ্চুরী নজির। ইংল্যাণ্ডের উইকেট-কীপার ইভান্স ১৯৫২ সালে লর্ডস মাঠে ভারতবর্ষের বিপক্ষে সেঞ্চুরী ক'রে প্রথম নজির স্থাপন করেছিলেন। সরদেশাই এবং কুন্দরম দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ১৪৩ রাণ তুলেন; এই রান ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড। পূর্ব্ব রেকর্ড ১৩১ রান—জয়সীমা এবং মঞ্জরেকার (বোম্বাই, ১৯৬১-৬২)।

দ্বিতীয় দিনে ৪৫৭ রানের মাথায় (৭ উইকেটে) ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। কুন্দরম ৯২ রান ক'রে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রানের রেকর্ড করেন। আর ৮ আর করলেই কুন্দরমের ২০০ রান পূর্ণ হ'ত। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে এক

ইনিংসের খেলায় কোন ভারতীয় খেলোয়াড়ই ২০০ রান তুলতে পারেন নি। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল ১৭৯ রান—বিজয় মঞ্জরেকার (দিল্লী, ৮৯৬১-৬২)।

ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় দিনে চা-পানের পর থেকে ব্যাট ক'রে ৬৩ রান করে, উইকেট পড়ে ২টো।

তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের রান দাঁড়ায় ২৩৫ (৪ উইকেটে)। অর্থাৎ সারা দিন ব্যাট ক'রে ইংল্যাণ্ড আরও দুটো উইকেট খুইয়ে পূর্ব্ব দিনের ৬৩ রানের সঙ্গে মাত্র ১৭২ রান যোগ করে। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার খেলায় এই রান খুবই কম।

চতুর্থ দিনে ৩১৭ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। দলের সর্ব্বোচ্চ রান করেন জে বি বোলাস, ৮৮। বোরদে চতুর্থ দিনে মাত্র ২৬ রানে ৪টে উইকেট পান এবং ১৪ ওভার মেডেন পান ২৭ ওভার বল দিয়ে। চা-পানের ৫০ মিনিট আগে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু হয়—ভারতবর্ষ তখন ১৪০ রানে এগিয়ে ছিল। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে দেখা গেল ভারতবর্ষের ১১৬ রান দাঁড়িয়েছে, উইকেট পড়েছে ৬টা।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ভারতবর্ষ তার ১৫২ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষনা করে। তখন খেলা শেষ হ'তে আর ২৭০ মিনিট সময় বাকি ছিল। ইংল্যাণ্ডের জয়লাভের জন্যে ২৯৩ রানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই রান উঠেনি ; ইংল্যাণ্ডের ২৪১ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় খেলা ভেঙ্গে যায়।

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা ৩য় টেষ্ট ঃ

অস্ট্রেলিয়া : ২৬০ রান (বুথ ৭৫ এবং সিম্পসন ৫৮ রান। পোলোক ৮৩ রানে ৫ এবং পারট্রিজ ৮৮ রানে ৫ উইকেট)

ও ৪৫০ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেঃ, বোনো ৯০, লরী ৮৯, ও'নীল ৮৮ এবং ম্যাকেঞ্জী ৭৬। পোলোক ১২৯ রানে ২ এবং পারট্রিজ ১২৩ রানে ৫ উইকেট)।

দক্ষিণ আফ্রিকা : ৩০২ রান (পোলক ১২২, গডার্ড ৮০ এবং ব্ল্যাণ্ড ৫১ রান। ম্যাকেঞ্জী ৭০ রানে ৩ এবং বেনো ৫৫ রানে ৩ উইকেট পান)

ও ৩২৬ রান (৫ উইকেটে। ব্ল্যাণ্ড ৮৫, গডার্ড ৮৪ এবং পিথে নট আউট ৫৩ রান। হক ৪৩ রানে ২ উইকেট)।

সিডনীতে অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা বে-সরকারী তৃতীয় টেষ্ট ক্রিকেট খেলা ড্র রেখে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া ৬ ঘণ্টারও বেশী সময় ফিল্ডিং ক'রে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসের ৫টা উইকেট পায় ; তাদের দ্বিতীয় ইনিংস নামিয়ে দিতে পারেনি।

অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ব্যাট করে। খেলার প্রথম দিনেই অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ২৬০ রানের মাথায় শেষ হয়। খেলার বাকি সামান্য সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ১১ রান করে, উইকেট পড়ে একটা।

দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার রান দাঁড়ায় ২৯৪ (৮ উইকেটে)।

তৃতীয় দিনে ৩০২ রানের মাথায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস শেষ হলে তারা অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের রানের থেকে ৪২ রানে অগ্রগামী হয়। এই দিনের বাকি খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৪ উইকেট খুইয়ে ২৪৩ রান করে।

চতুর্থ দিনে অষ্ট্রেলিয়া ৪৫০ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। দক্ষিণ আফ্রিকা ১ উইকেটে এই দিনের বাকি খেলায় ৬১ রান তুলে দেয়।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসে শেষ পর্য্যন্ত ৩২৬ রানে গিয়ে দাঁড়ায় (৫টা উইকেটে)।

রোহিণ্টন বারিয়া ট্রফি ঃ

মাদ্রাজ : ১১৯ রান (এ জি সত্যেন্দ্র সিং নট আউট ৫০ রান। অজয় দিভেচা ৬৪ রানে ৫ এবং সূর্য্যকান্ত মোর ১৭ রানে ৩ উইকেট)

ও ৪১১ রান (মুরারী ৮০, বল্লাল ৭৭ নট আউট, সত্যেন্দ্র সিং ৭০ এবং এন রাম ৬৩ রান। এম হাই ৮৩ রানে ৪)

বোম্বাই : ৪৫১ রান (অশোক মানকড় ১৫২, সুধীর নায়েক ৭০, ইউ কে রাও ৬৯ এবং এ ভি দিভেচা ৫৬ রান। টি আর রঘুরমন ৫৪ রানে ৪ এবং সত্যেন্দ্র সিং ১২০ রানে ৩ উইকেট পান)

ও ৭৫ রান (১ উইকেটে। নায়েক ৪৫ নট আউট)

রোহিণ্টন বারিয়া ট্রফির ফাইনালে (আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা) বোম্বাই ৯ উইকেটে মাদ্রাজ দলকে পরাজিত করে। এই নিয়ে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দল ১৯ বার রোহিণ্টন বারিয়া ট্রফি জয়ী হ'ল।

খেলার চতুর্থ দিনে মাদ্রাজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৪১১ রানের মাথায় শেষ হলে খেলায় জয় লাভের জন্যে বোম্বাই দলের আর মাত্র ৭৪ রানের প্রয়োজন হয়। বোম্বাই দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ১টা উইকেট খুইয়ে ৭৫ রান তুলে ৯ উইকেটে জয়ী হয়।

রোভার্স কাপ ফুটবল ঃ

১৯৬৩ সালের রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা মাঝপথে বন্ধ রাখা হয়েছিল। ফাইনাল খেলা হয়েছে ১৯৬৪ সালে। ফাইনালে অন্ধ্র পুলিস দল ১—০ গোলে ইষ্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করে। গত বছরের ফাইনাল খেলাটি ড্র যাওয়াতে অন্ধ্রপুলিস এবং ইষ্টবেঙ্গল দলকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল।

আলোচ্য ১৯৬৩ সালের ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল দল দুর্ভাগ্যের দরুণ পরাজয় স্বীকার করেছে। প্রথমার্দ্ধের খেলা শেষ হ'তে চার মিনিট বাকি, ইষ্টবেঙ্গল দলের গোল মুখে বল গেল। অন্ধ্র পুলিস দলের আক্রমণভাগের একজনের অফ সাইড হয়েছে এই ধারণায় ইষ্টবেঙ্গলদলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা রেফারীকে আবেদন জানিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। এই সুযোগে অন্ধ্র পুলিশ দল গোল দেয়। এই গোলটি রেফারী বাতিল করেননি। এই গোলের আগে এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দলের একাধিক গোল করার সুযোগ নষ্ট হয়—বারে এবং গোল পোষ্টে বল লেগে ফিরে এসেছে এমন ঘটনা তিন চারটি ছিল। সুতরাং দুর্ভাগ্যের দরুণ ইষ্টবেঙ্গলকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে বললে বিজয়ী অন্ধ্র পুলিস দলের উপর কোন অবিচার করা হয় না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অন্ধ্র পুলিস দল (পূর্ব্বনাম হায়দাবাবাদ পুলিস) উপর্যুপরি ৫বার (১৯৫০ ৫৪) রোভার্স কাপ জয় করে উপর্যুপরি সর্ব্বাধিকবার রোভার্স কাপ জয়ের রেকর্ড করেছে। এই নিয়ে অন্ধ্র পুলিস দল ৯বার কাপ পেল।

শকুন্তলা ঃ শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা।

শিল্পী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ লাহার 'শকুন্তলা' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ দেখে চমক লাগল। এর প্রথম মুদ্রণেই মহাকবি কালিদাসের অনন্য নাটকটির সরল-স্বচ্ছন্দ অনুবাদ দেখে মন খুসি হয়েছিল, দ্বিতীয় সংস্করণ একেবারে রাজমহিমায় দেখা দিয়েছে। কালিদাসের গল্পটি তো চমৎকার করে বলা হয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্পীর আঁকা অসংখ্য রঙিণ ছবি, কমলারঞ্জন ঠাকুরের বর্ণ-বিচিত্র প্রচ্ছদপট, পাতায় পাতায় স্কেচের অবারিত সমারোহ। অথচ এই চিত্রসজ্জা স্থূল রুচিহীন নয়—উপহার পাওয়ার এবং দেবার মতো অতি মনোরম একটি শিল্পবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

তুলি আর কলম একসঙ্গে মিললে যে মণি-কাঞ্চন যোগ হয়, শ্রীযুক্ত লাহার 'শকুন্তলা'য় তার আর একটি প্রমাণ পাওয়া গেল। গদ্যে পদ্যে তাঁর হাত সমান খোলে—পড়তে পড়তে তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে। এ বইয়ের আরো বৈশিষ্ট্য এই যে বাড়ীর ছোটদের হাতে যেমন অসঙ্কোচে তুলে দেওয়া যায়, তেমনি বড়োরাও এ বই সমান আনন্দে পড়তে পারেন।

বইখানির সমাদর অবশ্যম্ভাবী। শোভনতার দিক থেকে দাম আশাতীত সুলভ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[প্রকাশক ঃ আর্ট ইউনিয়ন। রঙিণ ছবিগুলি স্বয়ং লেখকের আঁকা, প্রচ্ছদ ও রেখাচিত্র শিল্পী কমলারঞ্জন ঠাকুর। দাম ছয় টাকা।]

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট , কলিকাতা ৬

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ৩।২।৬৪ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষের সূচী

একপঞ্চাশত্তম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—তৃতীয় সংখ্যা

ফাল্গুন—১৩৭০

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্রসূচী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী "ভারতবর্ষ" পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ক বিবরণ

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা—২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট), কলিকাতা—৬।

২। প্রকাশনার সময়-ব্যবধান—মাসিক।

৩। মুদ্রাকরের নাম—শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট), কলিকাতা—৬

৪। প্রকাশকের নাম—শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট), কলিকাতা—৬

৫। সম্পাদকের নাম—(১) শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—কামারহাটি, ২৪ পরগণা।
(২) শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

৬। যে সকল অংশীদার মোট মূলধনের এক-শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম ও ঠিকানা—

(১) শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, (২) শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, (৩) শ্রীরমেনকুমার চট্টোপাধ্যায়—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, (৪) শ্রীদীপেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ওরফে শ্রীপ্রদীপকুমার চট্টোপাধ্যায়—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, (৫) শ্রীমতী প্রভা দেবী—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

আমি শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১লা মার্চ, ১৩৬৬ সাল

স্বাক্ষর—শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য
প্রকাশক
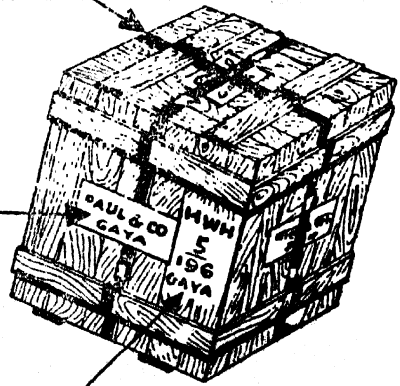
ফুল-সজ্জা

শিল্পী : ভি, মেহেরা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ফাল্গুন—১৩৭০

দ্বিতীয় খণ্ড | একপঞ্চাশত্তম বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

কবির দৃষ্টিতে

কালীচরণ ঘোষ

সাকার ও নিরাকার ভগবান্ লইয়া মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব অতি প্রাচীন। ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিভেদের ইহা এক মূলীভূত কারণ। আবার একই ধর্ম্মের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ভগবানের এই দুইরূপ লইয়া বিতণ্ডার অন্ত নাই। মূর্ত্তি-পূজা আছেই এবং একেবারে তাহা কোনওদিন তিরোহিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। নিরাকার দেবতার কল্পনা সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু মূর্ত্তিতে অধ্যাত্ম-গুণ আরোপ করিয়া গ্রহণ করা এক শ্রেণীর জ্ঞানী বিচার-শীল লোকের পক্ষে দুরূহ। এ সকল কলহের উপরের বস্তু সাকার বা নিরাকার দেবতাকে আঁকড়াইয়া রাখিবার মত যে মন, তাহা হইল অচলা দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন বিশ্বাস। তাহারই সাহায্যে মানুষের মনের একটা প্রচণ্ড ক্ষুধা, তীব্র অভাব দূর হইয়া থাকে।

দুই পক্ষের যুক্তি আপাতদৃষ্টে বিপরীতমুখী। এক মত, নিরাকারবাদীদের উদ্দেশ্যে লিখিত, "মানিলাম, তাঁহারা মূর্ত্তিপূজা করেন না, কিন্তু তাঁহারা নিরাকারের উপাসনা করেন। একথা হইতেই পারে না। কারণ জ্যোতিবাচক ও গুণবাচক পদার্থের জ্ঞান সাকার।" (যতীন্দ্রমোহন সিংহ: সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব)।

উত্তরে বলা হয় "কোনও স্বভাবভক্ত যখন মূর্ত্তিপূজার

মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন তখন তিনি আপন অসামান্য প্রতিভাবলে মূর্ত্তিকে অমূর্ত্ত করিয়া দেখিতে পারেন। তাঁহার প্রত্যক্ষবর্ত্তী কোনো সীমা তাঁহাকে অসীমের নিকট হইতে কাড়িয়া রাখিতে পারে না; তাঁহার চক্ষু যাহা দেখে তাঁহার মন বিদ্যুৎবেগে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়, বাহিরের উপলক্ষ তাঁহার নিকট কেবল অভ্যাসক্রমে থাকে মাত্র। তাহাকে দূর করিবার কোনো প্রয়োজন হয় না; বিশ্বসংসারই তাঁহার নিকট রূপক, প্রতিমার ত কোনো কথাই নাই—যে লোকের অক্ষরজ্ঞান আছে সে যেমন অক্ষরকে অক্ষররূপে দেখে না, সে যেমন কাগজের উপর 'গা' ও 'ছ' দেখে তখন ক্ষুদ্র গ'এ আকার ছ দেখে না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনশ্চক্ষে শাখাপল্লবিত বৃক্ষ দেখিতে পায়। তেমনি তিনি সম্মুখে স্থাপিত বস্তুকে দেখিয়াও দেখিতে পান না, মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তঃকরণে সেই অমূর্ত্ত আনন্দ উপলব্ধি করেন। 'যতো বাচো নিবর্ততন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। (রবীন্দ্রনাথ—"সাকার ও নিরাকার"—রচনাবলী ১৩শ খণ্ড পৃঃ ৯৬৭)

বঙ্কিমচন্দ্র "হিন্দু কি জড়োপাসক" প্রবন্ধে এ তর্কের একটা মীমাংসা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার কথায়, "যতক্ষণ আমার অঙ্গুলিটি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে ততক্ষণ ঐ অঙ্গুলিটি চেতনাময়, কিন্তু অঙ্গুলিটি কাটিয়া ফেলিলে, উহা আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে উহাতে আর চেতনা থাকে না, তখন উহা অচেতন জড় পদার্থ।

"এই সমগ্র বিশ্ব চৈতন্যময় এক পুরুষের দেহ। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তির আধার সকল অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি পদার্থ সকল সেই দেবতার অঙ্গ বিশেষ। অগ্নিকে যদি সেই এক চৈতন্যময় পুরুষের অঙ্গ বলিয়া জানি, অগ্নিকে যদি সেই চৈতন্যময় পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখি, তবে অগ্নির চেতনা আছে বলিয়া বুঝিব। আর যিনি অগ্নির সহিত সেই চৈতন্যময়ের কোন সম্বন্ধ দেখিতে পান না তাঁহার কাছে অগ্নি জড়পদার্থ।

* * * *

"হিন্দুরা জড়োপাসক নহে। * * * আজকাল যাহাকে জড়পদার্থ বলা হয়—যেমন অগ্নি, বায়ু, নদ, নদী, পর্ব্বত ইত্যাদি, ইহারা হিন্দুদের কাছে চৈতন্যময় চেতনাযুক্ত পদার্থ।"

এইরূপ বাদানুবাদ সাহিত্যের ভার বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু সাকার বা নিরাকার কোনোটাই নয় অথচ ইহার দুইটি কবিরা একই সঙ্গে দেখিয়াছেন। স্বামীজীর একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণে রাখা যাইতে পারে। যখন তিনি বলিলেন 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার'। তবে কেন অন্ধকারে হাতড়াইয়া পথ আবিষ্কারের নিদারুণ প্রচেষ্টা। তর্ক আর মাথা ফাটাফাটি করার প্রয়োজন কোথায়? চক্ষুর ঝাপসা আবরণ দূর হইলে সাকার বা নিরাকার রূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। মন তাহা গ্রহণ করিবার মত প্রস্তুত হইলে সকল বিতর্কের অবসান সম্ভব।

এ সম্বন্ধে বাঙ্গলার কবিদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা চারিদিকে ভগবানের অস্তিত্ব দেখিতেছেন, কোথায় কিভাবে তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। যুক্তিতর্কের অবকাশ নাই।

তাহার পরিচয় দিবার পূর্ব্বে একজন অক্লান্তকর্ম্মী, দার্শনিকতত্ত্ব আলোচনার সময় যাঁহার ছিল না, তাঁহার একটা মতের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

একদিন সম্রাট নেপোলিয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পাদরী ধর্ম্মযাজক নয়, তাঁহার এক সেনাপতি (Bernhard) যে তিনি ভগবান্ বিশ্বাস করেন কি না। তাহা যদি হয়, ভগবান্ বস্তু কি? তাঁহার স্বরূপ জানার উপায় আছে কি না? তিনি কি ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন?

প্রতিটি মুহূর্ত্ত যাহার রাষ্ট্রের কল্যাণের কথা চিন্তা করিতে হইতেছে, শত্রুর আক্রমণ রোধ করিবার জন্য সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী প্রচারের জন্য সমরক্ষেত্রের কথা চিন্তা করিতে হইতেছে, লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন-মরণ যাহার উপর নির্ভর করিতেছে, তাঁহার উত্তর তদুপযোগী সহজ এবং ত্বরিত।

নেপোলিয়ান বলিলেন, তাঁহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা না করিলেও চলিত। তাঁহার কথায় বলিতে গেলে দাঁড়ায়—আমি নিজেই কি জানি আমি কি বিশ্বাস করি? মানুষের প্রতিভা কি কেহ চক্ষে দেখিয়াছে—কর্ম্ম ক্ষেত্রে তাহার প্রকাশ হইতে তাহা প্রমাণিত হইয়া থাকে। ভগবান্

সেইরূপ, আছেন চক্ষে দেখা যায় বা যায় না, তাহার আলোচনা অবান্তর।

"What is God. Do I know what I believe? Very well, I will tell you. Answer me: How do you know that a man has genius? Is it anything that you have seen? Is it visible—genius? what then can you believe of it? We see the effect, from the effect we pass to the cause. we find it, we affirm it, we believe it. Is it not so? Thus upon the field of battle, when the action commences though we do not understand the plan of attack, we admire the promptitude the efficiency of the manœuvers, and exclaim, 'a man of genius!' where in the heat of the battle victory wavers, why do you first turn your eyes towards me? yes, your lips call me. From all parts we hear but one cry, 'The Emperor, Where is he? his orders?' what means that cry? It is the cry of instinct, of general faith in me, in my genius.

Very well. I have also an instinct, a knowledge, a faith, a cry, which involuntarily escapes me. I reflect. I regard nature with her phenomena. and I exclaim god? I admire the cry. there is a god.

এই কথাই কবিরা বলিয়াছেন, "চোখ থাকে ত, ছাখ না চেয়ে।" সকল কবি একই ভাব প্রকাশ করিলেন। ভাবের সমতা এবং প্রকাশমাধূর্য্য লক্ষ্য করিলে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। তাহারই কয়েকটি উদ্ধৃত করিলে বক্তব্য স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল মন্দিরে প্রতিমা পূজার কথা ভাবিয়া বড়ই সংশয়াকুল হইয়া পড়িয়াছেন। বলিলেন—

"প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে,
এ বিশ্ব নিখিল তোমার প্রতিমা।
মন্দির তোমার কি গড়িব মা গো।
মন্দির যার দিগন্ত নীলিমা।
তোমার প্রতিমা শশী তারা রবি,
সাগর নির্ঝর, ভূধর, অটবী,
নিকুঞ্জ ভবন, বসন্ত পবন,
তরু, লতা, ফল, ফুল মধুরিমা।

*　　*　　*

যে দিকে তাকাই এ নিখিল ভূমি
শতরূপে মা গো বিরাজিছ তুমি,
বসন্তে কি শীতে, দিবসে নিশীথে,
বিকশিত তব বিভব গরিমা।'

অতুলপ্রসাদ বুঝিতেছেন যে তিনি নানারূপে নিজেকে ধরা দিয়াছেন। তবুও প্রশ্ন আছে—

কে তুমি হে সুন্দর?

সে সুন্দরের রূপের প্রকাশ:

কভু নবীন ভানু ভালে, কভু ভূষিত নীরদ মালে
কভু বিহগ কূজিত কুহক কণ্ঠে গাহিছ অতি সুন্দর।
কভু নির্ম্মল নীল প্রাতে,
কনক কিরীট মাথে,
অভ্রভেদী অচলাসনে
রাজিছ অতি সুন্দর।
কভু পুষ্পিত নব কুঞ্জে
তব নৈশ বংশী গুঞ্জে
কভু পীত জ্যোৎস্না বসন শ্যাম,
মূরতি অতি সুন্দর।"

রজনীকান্ত প্রকৃতির অলঙ্কারের মধ্যে বিভিন্ন রূপগুণের প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াছেন:—

পূর্ণ জ্যোতিঃ তুমি ঘোষে দিনপতি,
অশনি প্রকাশে অসীম শকতি
বিহঙ্গম গায় তব যশোগীতি,
চন্দ্রমা কহিছে তুমি সুশীতল।
উদ্বেলিত সিন্ধু তরঙ্গ উত্তাল,
প্রকাশে তোমার মূরতি করাল।
মরীচিকা ঘোষে তব ইন্দ্রজাল
শিশির কহিছে তুমি নিরমল।

পুষ্প কহে তুমি চির শোভাময়,
মেঘবারি কহে মঙ্গল আলয়,
গগন কহিছে অনন্ত অক্ষয়,
ধ্রুবতারা কহে তুমি অচঞ্চল।
নদী কহে তুমি তৃষ্ণা নিবারণ,
বায়ু কহে তুমি জীবের জীবন।
নিশীথিনী কহে শান্তিনিকেতন,
প্রভাত কহিছে সুন্দর উজ্জ্বল॥"

কবির উপলব্ধি হইয়াছে—

"আছ, অনল অনিলে চির নভোনীলে
ভূধর সলিলে গহনে,
আছ, বিটপী লতায় জলদের গায়,
শশী তারকায় তপনে॥

অজ্ঞাত কবি দেখিয়াছেন—

"কুসুম বিতরে তব মধুরিমা,
সমীরণ কহে তোমার সুষমা,
নদ নদী গিরি বন উপবন
মহিমা তোমার প্রচারে গো—"

অন্য এক কবি নানা ভাবে তাঁহার আত্মপ্রকাশ দেখিতেছেন, কিন্তু মনের দ্বন্দ্ব কাটে নাই; সন্দেহে মন আকুল হইতেছে—

"কোথায় লুকায়ে একাকী বসিয়ে
করিতেছ নাথ লীলা অভিনয়?

কিন্তু তিনি এ বিশ্বাস রাখেন—"তুমিই ত
ফুটাইছ রবি শশী নীলাকাশে
অযুত অগণ্য তারা তার পাশে,
বন উপবন কুসুম বিকাশে,
হাসে মাতৃকোলে মানব তনয়।"

প্রকৃতি, নেপোলিয়নের 'গড্' নিজ মহত্ত্ব প্রকাশে ব্যক্ত। যাহা বিরাট, তাহা আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সে সকলের প্রকাশের পরিচয় দিতেছেন:

"তাঁহার আরতি করে চন্দ্র তপন,
দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব শরণ
তাঁর জগত মন্দিরে।
অনাদিকাল, অনন্ত গগন
সেই অসীম মহিমা মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন
আনন্দ-নন্দ-নন্দ রে।
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি,
পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি—
কতই বরণ, কতই গন্ধ,
কত গীত, কত ছন্দরে॥
বিহগ গীত গগন ছায়,
জলদ গায় জলধি গায়,
মহা পবন হরষে ধায়,
গাহে গিরিকন্দরে॥"

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন প্রতিটি জাগতিক বস্তুর সাহায্যে। তাঁহার সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন ঘটিয়াছে। যেখানে যে রূপটি দিলে বিশ্ব-বিমোহিনী মূর্ত্তি চক্ষের সমক্ষে ভাসমান হয়, তাহাই লক্ষ্য করিয়া কবি আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছেন। বলিতেছেন ধরিত্রীকে

"বিবিধ বরণে বিভূষিত করে,
তার উপরে তোমার নামটি লিখেছ।"

কোথায় কোনরূপ লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার পরিচয়ে পাই—

"পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা
রেখা নয় সে তোমার দয়াল নামটি লেখা।
'সুন্দর নামটি তোমার বিহঙ্গ অঙ্গে আঁকা
'প্রেমানন্দ' নাম নয়নে লিখেছ।
চন্দ্রাতপ তুল্য গগনমণ্ডল
দীপালোকে যেন করে ঝলমল
তার মাঝে ইন্দুকরে সুধাসিন্ধু
'সুধাসিন্ধু' নাম 'তায় অঙ্কিত করেছ।
জলেতে লিখেছ 'জগত জীবন'
পবন হিল্লোলে হয় দরশন
জলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন,
'জ্যোতির্ম্ময়' নামে জগৎ দেখাতেছ।
তৃস্তরে প্রস্তরে তাবত চরাচরে,
'সর্ব্বব্যাপী" নাম লিখেছ সাক্ষরে—"

কবিরা ভগবানের কোনও বাঁধাধরা রূপের জন্য কাঁদিয়া আকুল হন নাই। এই জগৎ প্রপঞ্চে বিবিধ প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া পরম আনন্দ, পরম পরিতৃপ্তি, চরম সূক্ষ্ম অনুভূতি লাভ করিয়াছেন।

অতি সরলভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল পূর্ব্ববর্ত্তী কবির ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

"বিরাজিত তিনি আকাশে ভুবনে
বিশাল বিশাল নীল পারাবারে।
তেজস্বী যাঁর তেজে প্রভাকর
যাঁহার সৌন্দর্য্যে শশাঙ্ক সুন্দর,
মধুরতা যাঁর রয়েছে বিস্তার
অযুত অযুত তারকার হারে।
যাঁর অপারতা অনন্ত গগনে,
গাম্ভীর্য্য যাঁর জলদ জীবনে,
করুণা যাহার নিত্য অনিবার
নিরখি নিরখি অখিল সংসারে।
কোমল কুসুমে যাঁর কোমলতা,
নির্ম্মল নীহারে যাঁর নির্ম্মলতা,
পবিত্র নির্ঝরে যাঁর প্রেম করে,
মহিমা যাঁহার জীমূত প্রচারে।"

কবি যোগেন্দ্রনাথ সেন, ভাবগম্ভীর ভাষায় জানাইতেছেন—

"সুমহান বিশ্বচক্রে উঠিছে ঝঙ্কার যাঁর
যাঁর প্রেমে মাতোয়ারা চন্দ্রসূর্য্য পারাবার।
যাঁর শ্রীচরণ স্পর্শে শুষ্ক হৃদে ফুল ফুটে,
মরুভূমে নদী ধায় পাষাণেও উৎস ছুটে।
কবিতা প্রসূনে যাঁর বিমণ্ডিত নীলাম্বর,
ভাবের তরঙ্গে যাঁর তরঙ্গিত চরাচর,
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ যাঁহারে গায়,
হৃদয়ের যন্ত্র বাজে প্রেম মন্দাকিনী ধায়।
বিরাট অসীম যিনি, বিশ্বরূপ ব্যোমকেশ,
আদি নাই অন্ত নাই, যাঁহার নাহিক শেষ;
সময় পয়োধি পারে যাঁর সিংহাসন রাজে,
যথায় মঙ্গল করে প্রকৃতির বীণা বাজে।
মধ্যাহ্ন প্রদোষ উষা গাইছে আরতি যাঁর

* চ *

বাসুদেবকে সহচর করিয়া বেচারা অর্জ্জুন—হে কৃষ্ণ, যাদব, সখা সম্বোধনে বেশ আনন্দে দিন যাপন করিতে ছিলেন। তাহার পর যখন তাঁর প্রকৃতরূপ দর্শন করিলেন, তখন বিহ্বল হইয়া ফুকারিয়া উঠিলেন, "অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে"—অদৃষ্টপূর্ব্ব তোমার রূপ দেখিয়া মনে খুব আনন্দ হইতেছে বটে, কিন্তু ভয়ে আমার মন ব্যাকুল হইতেছে। এ রূপ তুমি সম্বরণ কর।"

এই রূপের বিবরণে আছে, তোমার আদি অন্ত মধ্য কিছুই ত পাওয়া যায় না (শশী সূর্য্য নেত্রং), স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, এই উভয়ের অন্তর, অর্থাৎ অন্তরীক্ষ, এবং সমুদয় দিক একমাত্র তোমা কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে (দ্যাবা-পৃথিব্যোরিদমন্তরং হি, ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ)। এখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সে সবই ত প্রকৃতির রূপ। তারই মধ্যে সুন্দরকে নয়নগোচর করিবার জন্য প্রাণের কতই না ব্যাকুলতা! তাহাতেই অনাবিল অবসাদহীন অক্ষয় আনন্দ লাভ হইতে পারে। সাধারণ বুদ্ধিতে যাহাকে 'অসুন্দর' ভীষণ নির্ম্মম বলা হয়, তাহার মধ্যেও সৌন্দর্য্য আছে, কোনও মহদুদ্দেশ্য তাহাদের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। তাহা অবিমিশ্র অকল্যাণ নয়, সীমাবদ্ধ বুদ্ধির নিকট এইরূপ প্রতিভাত হয় মাত্র।

এই আনন্দ আকারে নিরাকারে সকলের মধ্যে পাওয়া যায়। আকার নিরাকার ব্যাপ্ত করিয়া "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" বসিয়া আছেন। যে যাহার সাধন মত, বিশ্বাস মত সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। আর প্রকৃতি ত সাক্ষাৎ সাকার ও নিরাকার, তাহার মধ্যে মনোনিবেশ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলে সচ্চিদানন্দ রূপ একাধারেই নয়নগোচর হইয়া থাকে।
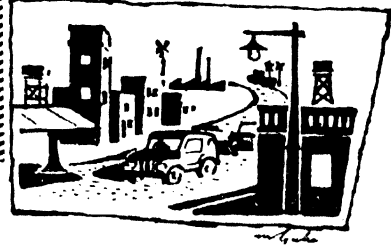
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

…রাত হয়ে আসে।…আঁধারে জলে ওঠে দু একটা তারার আলো। বনের বাইরের ডাঙ্গায় শিয়ালগুলো ডাকছে, ক্ষুধা আর লালসা ভরা সেই চীৎকার।

…হঠাৎ কার জুতার শব্দ শুনে ফিরে চাইল।

…একি আলোও জালোনি যে বৌ।

—চমকে ওঠে কদম। শন শন হাওয়া বইছে গাছ গাছালির মাথায়। শিয়ালের ডাকও থেমে গেছে আতঙ্কে। অন্য বড় কোন জানোয়ার বন থেকে বের হয়েছে। নিষ্ফল আক্রোশে সে বসে বসে ল্যাজ ঝাপ-টাচ্ছে, গায়ের বিশ্রী বোটকা গন্ধে শিয়ালগুলো পালিয়েছে।

…এগিয়ে আসছে পানুদাস।

—ভুবন অনেক করে বলল। তা কেমন আছো।

কদম স্থির কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানায়—আসুন।

ঘরের ভিতরেই পানুদাস আবছা অন্ধকারে বসল। কি কাযে বের হয়ে যায় কদম। গলাতুলে বলে--কাছে এসে বসো, একটু গল্পগাছা করা যাক।

আর আলো নাই বা জ্বাললে—বেশ তো মুখ, আঁধারি রাত—

মহাজন প্রাণবল্লভ দাসও ধান পিতলের হিসাব ভুলে কাব্যিক হতে চায়। কি এক ব্যাকুল কামনার আগুনে জ্বলছে তার সারা দেহ মন। কদমকে দেখেছে—আবছা অন্ধকারে দেখেছে রূপবতী অফুরানযৌবনা কোন মোহময়ী নারীকে।

…পানু দাসের সারা দেহে কেমন অসহ্য তীব্র একটা জ্বালা। ওদিক থেকে কোন সাড়া নেই।

অপেক্ষা করছে পানুদাস—ওৎ পেতে আছে বুভুক্ষু কোন জানোয়ার অন্ধকার বনের আড়ালে।

ওদিক থেকে কোন সাড়া নেই।

…রাত কত জানে না।

নিশুতি গাঁ—কোনদিকে যাবে জানে না কদম। পালাচ্ছে।

বাঁশবনের মাথায় জ্বলছে জোনাকীর আলো—কাঁপছে সে পাতা কাঁপার মতই।

হঠাৎ কাকে দেখে যেন ধরা পড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

—তুমি!

…অশোক ফিরছিল কোঅপারেটিভ অপিস থেকে বাড়ীর দিকে, হঠাৎ নির্জন পথের ধারে ওকে দেখে একটু অবাক হয়। চমকে ওঠে কদমবৌ—ছোটবাবু!

—এতরাত্রে?

কদম যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে, আর সহ্য করতে পারছে না সে এই নিদারুণ দুঃখ আর অপমান। অশোক ওকে চুপকরে থাকতে দেখে একটু বিস্মিত হয়।

—কি হয়েছে কদম ?

কি করে জানাবে কদম এতবড় অপমানের কথাটা, কিইবা করতে পারবে ও। বিরাট একটা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ওর শক্তি কতটুকু! সহজ কণ্ঠে বলে—এমনি বাড়ীতে এসেছিলাম, বাসায় ফিরছি।

—এই পথে? প্রশ্ন করে অশোক।

কেমন যেন ধরা পড়েগেছে কদম। মুহূর্তমধ্যে রহস্যময়ী নারী সহজভাবেই বলে ওঠে—ভাবলাম এসেছি যখন গাঁয়ে একবার তোমার সঙ্গে দেখাই করে যাই।

আমার সঙ্গে কেন ?

…অশোকের দিকে চেয়ে থাকে কদম।

নির্জন মিশমিশে কালো অন্ধকার। বাঁশবনে হুহু বাতাসের লুটোপুটি। কেমন আজ নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার জন্যই মেতে উঠেছে সর্বনাশা নারী।

হাসছে! হাসি আসে। জীবনকে ব্যঙ্গ করার তীব্র মধুর হাসি।—জানিনা। কোনদিনই তোমাকে বোঝাতে পারিনি। সময় ও পেলামনা। সময়ও যে আমার নাই ছোটবাবু।

কদম দাঁড়ালনা। এতক্ষণ যে কান্নাটাকে চেপে রাখবার চেষ্টা করেছিল—দুর্বার বেগে সেই চাপাকান্নাই যেন ফেটে পড়বে এই বার। ভয়ে সরে গেল কদম। পালিয়ে গেল।

…আলেয়ার আলোর কোন স্নিগ্ধতা নেই, তাকে ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ করা যায় না। ও আশা তাই কোনদিন করতে সাহস করেনি কদম।

…তাই দেখাদিয়েই প্রকাশ করবার আগেই সরে গেছে বার বার। আজ ও তাই গেল।

—কদম!

অশোক ডাকছে ওকে। দূর থেকে কদম দাঁড়াল না। আঁধারেই মিলিয়ে গেল!

কিন্তু যাবে কোথায়! রুদ্ধশ্বাসে এসে দাঁড়াল কাজলা দিঘীর উচু পাড়ের উপর,যেখানে এসে পথটা শেষ হয়েছে। তারপই ওই দিঘীর অতলকালো জল—ছায়া নামা জল। কালো জলে হাজারো তারার চিকমিকি!…

—কেমন শুদ্ধ কোন শান্তির দিকে এগিয়ে চলেছে কদমবৌ। অন্ধকারে একটা শব্দ ওঠে জলের বুকে। তলিয়ে যাচ্ছে—হিম হয়ে আসে।

কদমের সব জ্বালা একটা কালো যবনিকা, অতল কালো আঁধার দুচোখ ভরিয়ে দেয়। হারিয়ে যাচ্ছে সে!

হারিয়ে গেল দিঘীর অতলে।

পালাল—এই দুঃখ, কামনার আগুন জ্বালা জীবন থেকে সরে যাচ্ছে অনেক দূরে—কোন নাল স্বপ্নের দেশে।

সকালের আলো ফুটে উঠেছে। ভুবন তখনও অসাড়ে পড়ে আছে। পাঁচুদাস ক্ষুব্ধ ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। ভুবনও এসে গর্জায়—আসুক সে মাগী, সতী! কেটে ফেলাব ছাপ।

…তখনও নেশার ঘোরে পড়ে আছে—স্বপ্ন দেখছে কদমকে উচিত শিক্ষা দিচ্ছে সে। বেদম প্রহারে জর্জরিত করে তুলেছে। সকালের রোদ এসে পড়েছে।

হঠাৎ কাদের ডাকাডাকিতে নেশার জড়তা ভেঙ্গে গেল। এমোকালী—ষষ্ঠীচরণ ডাকছে।

—একবার এসো গাঁয়ে!

—কেনে ?

—দরকার আছে। বিশেষ দরকার—এখুনিই।

গর্জে ওঠে ভুবন—বৌটা পালিয়েছে উখানেই বোধ হয়। অ্যাঁ—চল মাগীর চুলের মুঠি ধরে তুলে আনবো। সতী! গাঁ-ময় পিরীতের নাগর ছড়ানো তার—ঘরবসত করবে ক্যানে ?

টলতে টলতে আসছে ভুবন। চোখ দুটো তখনও লাল করমচার মত।

কাজলা দিঘীর কাঁকুরে পাড়ে রীতিমত ভিড় জমে গেছে। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা অনেকেই জুটেছে। মিষ্টি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার দুচোখে জল।

…কদম ডুবে মরেছে। হয়তো নিষ্কৃতি পেয়েছে কুকুর শিয়ালের টানা ছেঁড়া থেকে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অশোক।

গত রাত্রের সেই কথাটা মনে পড়ে। কি যেন বলতে চেয়েছিল কদম—কিন্তু পারেনি। একটা পুঞ্জীভূত অভিযোগ জমা হয়েছিল—কিন্তু কেন? কার বিরুদ্ধে—কি সেই নালিশ—কেউ জানল না।

…অতুলকামার ছানিপড়া চোখ মুচছে আর স্তব্ধ মৈনাকের মত দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ ভুবনকে আসতে দেখে জ্যামুক্ত ধনুকের মত লাফ দিয়ে উঠে ওর গালেই সজোরে বসিয়ে দেয় একটা চড়। গর্জন করছে বুড়ো।

—তুই! তুই-ই মেরে ফেললি আমার ঘরের লক্ষীকে। তোর লোভ আর পাপই হল কাল। সেই পাপেই সব হারালাম আমি! ছেলে!…শত্তুর! কাল-শত্তুর।

ওকে সরিয়ে নিল অশোক। বৃদ্ধ তখনও ফুসছে অসহায় রাগে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভুবন।

দুচোখে তার বিস্মিত চাহনি, দেখছে কদমকে।

সুন্দর সুঠাম দেহটা ফুলে উঠেছে—তবু দুচোখের দৃষ্টি তার তখনও তেমনি। সেই নীরব ঘৃণা আর অভিশাপ ফুটে উঠেছে।

…ধিক্কার দিয়ে গেল এই জীবনকে—কুৎসিত ওই মানুষগুলোকে।

পানুদাসও এসেছিল।

ওই মৃতের তীব্র চাহনির দিকে চেয়ে—সরে গেল সে। ভয় পেয়েছে পানুদাস!

একজন শুধু আর্তনাদ করছে—ওই নারাণঠাকুর।

আধপাগল অসহায় ভাষাহীন লোকটা চীৎকার করছে—অব্যক্ত ভাষায়। তারও সব গেছে ওই কারখানার আগুনে।

ঘর গেছে—গেছে জীবনের সব আশা ভরসা। সনাতনও তাকে ফেলে গেছে। অমানুষ করে দিয়েছে তার সব আত্মীয় পরিজনকে।

আর কদম! সে শুধু দিয়ে গেল এ দিনের উপর তীব্র অভিশাপ—আর নীরব ধিক্কার।

…সরে এল মিষ্টি লোহার। ওর মৃত্যুর কারণটা সে একমাত্র কিছুটা জানে। …তাই নিজেও শিউরে উঠেছে অজানা আতঙ্কে আর ভয়ে।

কদমের মৃত্যু তাই স্তব্ধ এই পল্লীর বুকে নীরব তীব্র একটা আলোড়ন এনেছে।

…কাঁদছে অতুলকামার। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অশোক। নিষ্ফল রাগে ফুলছে এমোকালী।

…ভুবন ফিরে চলেছে গ্রামের বাইরে কারখানার দিকে। সারামন বিষিয়ে উঠেছে। একটু তীব্র উগ্র পানীয় চাই—কেমন সব চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে আসে। কি যেন হারিয়ে গেল তার—হাঁা কিছু একটা হারিয়ে গেল এতদিন যা তার ছিল খুব নিকট হয়ে।

সকালের গেরুয়া রোদ গাঢ়তর হয়ে উঠছে।

রোদের তাপ বাড়ছে—ধূ ধূ জ্বালাপোড়া রোদ উঠবে রুক্ষ কাঁকুরে ডাঙ্গার বুক ফুঁড়ে, কেমন এমনি একটা জ্বালার সংক্রমন ভুবনের অসাড় মনে। পাখীর ডাকও কানে আসেনা।

পিছনের ওরা চেয়ে রয়েছে তার দিকে—বিচিত্র প্রশ্নভরা চাহনিতে।

অবনীবাবুর কণ্ঠস্বর কানে আসে।

—ব্লাডি ফুল।

…লাল চোখ দুটো মেলে ওর দিকে একবার চাইবার চেষ্টা করে মাত্র ভুবন। আবার চলতে থাকে।

কেমন যেন অমানুষের মত চলছে—পা দুটোর উপরও নিজের বশ নেই। তবু চলছে—চলছে ভুবন।

একদিকে মৃত্যু আর হতাশার অন্তহীন অন্ধকার, তবু এদের চলাও থামেনি। নোতুন উদ্যমে—নোতুন উৎসাহে এরা লেগেছে।

এমোকালীর মনে কদমবৌ এর মৃত্যুটা কঠিন আঘাত হেনেছে—স্তব্ধ হয়ে গেছে অশোকও। অতুল কামার অসহায় দর্শকের মত দেখেছে আর কেঁদেছে নিষ্ফল অভিযোগে।

অশোক এই আঘাতটাকে—অপমানকে সহজ ভাবেই নেবার চেষ্টা করেছে।

এমনি অপমৃত্যু—জীবনের এমনি অপচয় সে ইতি-পূর্বেও দেখেছে। প্রীতিও আজ তার কাছে মৃত—মৃত অতীত; কারিগর লোকটাকে দেখেছিল—সেও বদলে গেছে। এই পরিবেশ থেকে কলের মানুষ কলের জগতেই ফিরে গেছে।

হারিয়ে গেছে সনাতন—গঙ্গামণি নারাণ ঠাকুরের জগৎ থেকে, তারকরত্ন অতীতের একটি প্রবল প্রতাপান্বিত জীবনধারা—তাও নিঃশেষ হয়ে গেছে। জীবন মণিমালাও সরে গেছে নোতুন ভাবে বাঁচবার আশায়। ভুবন মেনে নিয়েছে এই জীবনকে—কদম বৌ পারেনি সহ্য করতে এর তীব্র নীলাভ গরল জ্বালা।

কেবল সংঘাত আর পরাজয়ে ভরা এই জীবন।

তবু বাঁচতে হবে—বাঁচবার পথ খুঁজতে হবে, এই জীবনকেই সহনীয় করে তুলে।

…ওদের পরাজয়ের আঘাত তাই অশোকের মনে আনে উৎসাহ—এমোকালীও তারই উত্তাপে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

—বুকটা জলে ওঠে ছোটবাবু। বৌদি মরে গেল—কি অপমান আর জালায়।

অশোক জবাব দেয়—ওতে জলুনি থামবেনা কালী, আগামী দিনের গ্রামে তার মানুষকে অন্যসুন্দর ভাবে বাঁচবার পথ যদি দেখতে পারো—এই জ্বালা থেকে অনেকে নিষ্কৃতি পাবে।

—কিন্তু এই সহ্য করে কায করতে হবে?

বলে অশোক—হবে। নিজে জলে ছাই হ'য়ে ধূপ গন্ধ বিলোয়। গন্ধ দিয়ে ফুলও ফুরোয়। তুমি আমিও ফুরিয়ে যাবো ওই জালা নিয়েই। জালা আছে বলেই তো কায করি—ঝর্ণার নুড়ি পাথর আছে বলেই তো স্রোত।

অতুল চুপকরে বসেছিল, বলে ওঠে—ঠিক বলেছ ছোটবাবু।

বৃষ্টির পর মাটির বতর এসেছে। আকাশ বাতাসে কাল বৈশাখীর বিগত চিহ্ন, মাঠময় ছড়িয়ে আছে সার গোবর।…ভিজে রসবতী মৃত্তিকা। দুএকজন মাত্র মজুর নেমেছে মাঠে। বাকী অনেকের হালগরুও নেই।

ফণীবাবু অবনীরায় মাঠের আলে দাঁড়িয়ে কি দেখছে। —ধরণী বলে ছানু যে বল্লে—ঝিলিবাদ থেকে সাঁওতাল আনবেক।

অবনী গজগজ করে—বতর চলে যাচ্ছে, তারা আসবে কবে? ব্লাডি ফুলস্।

ধরণী থামিয়ে দেয়—থামো অবনী, ইংরিজি ছেড়োনা। কি হবে তাই ভাবো।

হঠাৎ কিসের শব্দে ওরা পিছন ফিরে চাইল। কালো বাদামী রং এর একটা বিকট যন্ত্র মাঠের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কয়েকজন লোকও দেখাযাচ্ছে আশে পাশে।

চমকে ওঠে অবনী—ট্রাক্টর!

দামোদরের ব্যারেজ হবার সময় ওরা দেখেছে যন্ত্রগুলো—কি তার ক্ষমতা তাও দেখেছে, কিন্তু তাদের গ্রামের মাঠে ওই সব দেখবে কল্পনাও করেনি। ধরণী আর্তনাদ করে।

—তবে কি জমি-জারাত আবার ক্যানেলে যাবে ফণী?

এগিয়ে যায় তারা।

ঠিক নিজেদের চোখকেও তারা বিশ্বাস করতে পারে না।

…এমোকালীই হবে! হ্যাঁ কালীচরণই মাথায় একটা ন্যাকড়ার টুপি লাগিয়ে ট্রাকটার চালাচ্ছে—ধারালো ফলার ধারে উঠে আসছে চাপ চাপ নরম ভুসভুসে মাটি।

বাতাসে তারই মিষ্টি সোঁদা গন্ধ।

নিঃশ্বাস নিতে বুক ভরে আসে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অনেকখানি জমি চাষ দেওয়া, মই ঘোরান হয়ে গেছে।

বীজ ছড়াচ্ছে ওরা সরস ভুরো মাটিতে।

…পা দেবে যাচ্ছে।

—অঁ অঁ! চীৎকার করছে নারাণ ঠাকুর।

দুহাতের মুঠোয় তুলে নিয়েছে চন্দনের মত মিহি মাটি, ছিটুচ্ছে সামনের দিকে—আর চীৎকার করছে খুশিতে পাগলের মত।

…সব হারাবার দুঃখ সে ভুলেছে।

মাটির ভুলে যাওয়া সেই মিষ্টি সৌরভ—যৌবন স্বপ্নকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

…যৌথ চাষের প্রথম পর্য্যায় সুরু হয়েছে।

আলের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে অশোক।

ওপাশ দিয়ে ফণী অবনী ধরণীর দল নীচু পগার দিয়ে নেমে গেল। দূর পথের দিকে চেয়ে থাকে।

—ছানু সকালের বাসেই ফিরবে লোকজন নিয়ে?

চিন্তিত মনে জবাব দেয় ধরণী—তাইতো বলেছিল।

ফণী সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতেই বলে—বতর দু তিনদিন থাকবে দাদা, আর মাঝিরা ও পাকা চাষী একবার মাঠে নামলে হয় দেখবা হালের বজার।

অবনী পুরোনো ইংরেজীর বুলি ঝাড়ে।

—ফারো ফলোড ফ্রি। বুঝলী। ছানু—লেট আস্ সি ছানু।

এরা ঘাবড়ে গেছে ওদের তোড় জোড় দেখে।

ফণী বলে—শেষকালে ধামাও যাবে,রাজ্যিও হারাবে নাকি মামা।

ধরণী চিন্তায় পড়েছে—জানি না বাবা। তবে ওদের ওই প্যাঁচে পা দোবনা।

অবনীও সায় দেয়—অল্ রাইট্। দেখনা মারামারি লাঠালাঠি বাধলো বলে ওদের মধ্যে।

···রোদের তাত বাড়ছে। ধু ধু রোদ। গরু বাছুরও টিকতে পারবে না। কিন্তু ওদের ট্রাক্টর ঠিক চলছে।

··খালে-খন্দে জমা জল পাম্প দিয়ে তুলে শুকনো মাটিকে সরস করে বতর আনছে—আবার চাষ দিয়ে চলেছে।

নীচেকার কুমারী মৃত্তিকা বহু যুগ পর দেখছে আলো হাওয়ার মুখ মুক্তির আনন্দে তারা নীরব খুসির সুবাসে ভরে তুলেছে আকাশ।

··মিষ্টি চমকে উঠেছে। শিউরে উঠেছে কদমের এই নিষ্ঠুর মৃত্যুতে। আজ মনে হয় সে একা—জীবনের কোন আশা আলো নেই। কোন পথ নেই।

হঠাৎ তাই আজ নোতুন করে চেনে জীবনকে। চলার পথে থমকে দাঁড়িয়ে চারি দিকে চাইছে—নোতুন করে আবিষ্কার করে পথের ধারেই কি এক অবলম্বন তার জন্য রয়ে গেছে।

··যৌবনের উন্মাদনা দিয়ে দেখা এ পৃথিবী নয়, ভাল লাগা—আর ভালবাসার মাঝে ফিরে ফিরে নিজেকে আবিষ্কার করার আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে।

কি তিথি জানেনা, চাঁদ উঠেছে বেণু বনসীমায়, কুচলে গাছের সবুজে লাল টুকটুকে ফলগুলোয় ছেয়ে গেছে ওর বুক।

পাখী ডাকা রাত্রি।

মহুয়া সৌরভ মাখা বাতাস।

—মিতে, বড় ডর লাগে মিতে।

অবিনাশও ওর দিকে চেয়ে থাকে। ফিসফিসানি বাতাসে কিসের কান্নার শব্দ। কদমের অতৃপ্ত আত্মা যেন কাঁদে চিরন্তন নারীর মাঝে।

—একা বোঝা বওয়ার বড় জ্বালা মিতে। আজ রূপ নাই, গুণ নাই, বাতিল্ল পুঁজির মেয়ে মানুষ তাকে কিসের আশায় ভালবাসবে বলো ?

ওকে আজ কাছে টেনে নেয় অবিনাশ।

···বহু দিন পর শূন্যমন পূর্ণ হয়ে ওঠে—মিষ্টির। তবু হু হু করে মন।

—ভয় কিসের মিতেন!

বলে ওঠে মিষ্টি—সহরের ভয়—দুগ্গোপুরের ডর। ওই আমাদের সব খাবে, ঘর—সুখ—শান্তি—সব। তোমাকে ও কুনদিন টেনে লেবে, একজনের মত তুমিও সেদিন সব ফেলে পালাবে ওরই নেশার টানে।

হাসে অবিনাশ সেদিন মরেই যাবো মিষ্টি।

—কেনে ?

বলে চলেছে অবিনাশ—ধড়ে বেঁচে থাকবো, মনটা মরে যাবে। আমার বাঁশীতে সুর জাগে এই মাটির সুর—এই মাটিতে কালবৈশাখী নামে—ঝড় ওঠে, তারই সুর বাজে আমার বাঁশীতে মেঘরাগে, রাগের তারায় তারায় নিঝঝুম বনে কান্না জাগে, কত জনের কত মনের কান্না—ললিত রাগে তাই বেজে ওঠে; ফুলফোটা বনে ভ্রমরের গুনগুনানি নানা রংএর রংবাহার সানাইএ বসন্তের সুরে আমেজ আনে। গোঁসাই প্রভুর নাম শুনেছিস্ মিতেন—জ্ঞান গোঁসাই বিষ্ণুপুরের!

মিষ্টি ভক্তিভরে মাথা নোয়ায়—অয় বাপ, শুনবো নি ?

—তিনি বলতেন—শালগাছ দেখেছিস অবা—বনের ভিতর থেকে মাটিতে শিকড় গেড়ে মাথাতুলে আকাশে বনের সীমানা ছাড়িয়ে; তেমনি সহরে যাবি মাথা তুলতে—জয় করতে, মূল শেকড় থাকবে তোর মাটিতে পেঁতা—সেই ত যোগাবে তোকে বেঁচে থাকবার রস—সব সবুজ।

আমি দেখেছি মিতেন—এই আমার ঘর, সহরের ভাড়াটে আমি, দুদিনের যাত্রী।

চুপ করে থাকে মিষ্টি! ওর চোখের কোলে কি এক মধুর স্বপ্নের আবেশ। ক্লান্ত পথহারা দুজনে আজ যেন একটী মনের গহনে নিজেদের একাত্ম করে তোলে। বলে ওঠে মিষ্টি।

—ভেবেছিলাম ঠকে গেছি।

—কিন্তু!

—দেখলাম বাঁচবার জন্য ভালবাসার দরকার মিতে, ঠকে ঠকেও মানুষ ভালবাসে। বেঁচে আছি ভালবাসাটা তারই সাবুদ।

হাসে অবিনাশ—আবার ঠকবে তুমি!

—নিজেকে আজ ওর আমন্ত্রণে সঁপে দেয় মিষ্টি। ফুরিয়ে ফুরিয়ে দিয়েও নিজেকে যেন ফিরে পেতে চায়, বাঁচতে চায়; অফুরাণ প্রাণমন তাই ভরে ওঠে প্রীতির প্রসাদে। হাসছে মিষ্টি—ঠকেও জিতবো মিতে।

কদমের মৃত্যু ব্যর্থ হয়নি, অনেককে কাযের মাঝে এগিয়ে দিয়েছে। মিষ্টির মনে নিবিড় হতাশার মাঝে বাঁচবার আগ্রহ এনেছে।

জীবন সেদিন বাড়ী গিয়ে অবাক হয়ে যায়। সদর রাস্তা থেকে গ্রাম অবধি কাঁকুরে ডাঙ্গার অস্তিত্ব আর নেই। তারকবাবু জমিদারী যাবার আগে পাচ টাকা নামমাত্র সেলামীতে যে ডাঙ্গা বন্দোবস্ত করেছিল একে তাকে—সেই ডাঙ্গার বুকে দুতিন হাত মাটি ফেলে দিয়ে জমি তৈরী করা হয়েছে—তাতে চাষ দিয়ে পাকা করে টিউবওয়েল থেকে জল তোলা হচ্ছে।

তৃণবিহীন বন্ধ্যা প্রান্তরে ফুটে উঠেছে সবুজ স্বপ্ন। মাঝ দিয়ে চলে গেছে পথটা—বন থেকে বের হয়েই সবুজের স্পর্শ; পিচ পড়ছে রাস্তায়—পাশে বসেছে ইলেকট্রিক পোষ্ট।

থমকে দাঁড়াল পথের ধারে—চেনা যায় না। কি এক সম্ভাবনায় ওর শূন্য বুক ভরে উঠেছে।

চুপ করে গাছের নীচে দাঁড়াল জীবন—এ মাটির এই খানের আর যেন সে কেউ নয়। তার জীবনে সব শুধু হারাবার পালা। ঘর গেছে—গেছে খুকিও।

…মণিমালাও চলে গেছে! দুর্গাপুরে তর বাসায় গিয়ে কয়েকদিন ছিল মাত্র। ছোট বাড়ীখ'না পুরোনো গ্রামের সামিল।

—কি কায করো এখানে?

—কেন? প্রশ্ন করে জীবন।

দূরের ষ্টিলটাউনের সুন্দর বাংলো, বাসাবাড়ীর দিকে আঙ্গুল দেখায় মণিমালা—ওগুলো কাদের জন্য।

—ষ্টাফ্ কোয়ার্টারস্।

মণিমালা জবাব দেয় না, ওর পোষাকের দিকে চেয়ে থাকে। ময়লা খাকি প্যাণ্ট-সার্ট, তেলকালিমাখা। পরণে ভারি বুট। খানিকটা পদমর্য্যাদা অনুমান করে।

ক'দিন পরই চিঠিখানা দেখায়, বর্দ্ধমান টাউনে একটা চাকরী পেয়েছে মণিমালা।

—যাবো ভাবছি।

কথা বলে না জীবন। ওর দিকে চেয়ে বেশ অনুভব করে ওকে বাধা দেওয়া যাবে না। এমন একটা জায়গায় মণিমালা অপমানিত হয়েছে—সে কোন কথাই শুনবে না।

শোনেও নি।

মণিমালা চলে গেছে। এ যাবার অর্থ বোঝে জীবন।

চুপ করে বাড়ী আসছে।

—দাদাবাবু।

পাম্প মেসিনএর কাছ থেকে এগিয়ে আসছে কালী।

—বড়বাবুর অসুখ।

—হ্যাঁ, কেমন আছেন জানো।

—সারদাবাবু বলছিলেন কাল। একটু যেন সামলেছেন।

এগিয়ে চলে জীবন। ক্লান্ত পরাজিত একটি মানুষ।

…কালো পুরোনো ধ্বসে-পড়া বাড়ীখানা হারিয়ে গেছে নোতুন বাড়ীর ভিড়ে। ইলেকট্রিকের তারে বাতাস কাঁপে—রোদ জ্বলে।

বেলা বাড়ে। আকাশের সীমায় বনের দিগন্তে মেঘ জমেছে—পুঞ্জ কালো কালো মেঘ।

বর্ষা আসতে দেরী নাই।

…স্তব্ধ হয়ে যায় জীবন।

গ্রামের জীবনে কোন স্তব্ধতা আসে নি। জীর্ণ গাছ থেকে একটি পাতা ঝরে গেল।

মণিমালার চলে যাবার কথা ও বলতে পারেনি।

কাউকেও বলেনি।

তারকবাবু মারা গেছেন। পাতাজোড়ার একটি অতীতের গৌরবময় অধ্যায় নিঃশেষ হয়ে গেল।

নীরবে—নির্জনে।

অশোকও কায ফেলে এসেছিল—এসেছিল শুব্ধ পরাজিত ফণী—অবনীরায়—ধরণী মুখুয্যে। ওরা দাঁড়িয়ে দেখল শুধু।

পান্নু দাসও একবার উঁকি দিয়ে দেখেছিল তার পূর্বসূরীদের।

বলে ওঠে মিষ্টি—মাথাটা একবার নোয়াও দাসজী মশোয়। দোষে গুণে তবু একটা মানুষ ছিলেন। তোমার পুঁজি তো ওই আগেকার টুকুই। গুণের ভাঁড়ার তো বাড়ন্ত।

পান্নুদাস কথা কইল না। চুপকরে গিয়ে জিপে উঠলো। কি কাযে সদরে যাচ্ছিল—সেই দিকেই চলে গেল। সামান্য স্বাভাবিক একটা ঘটনা—তার মনকে বিন্দুমাত্র নাড়া দেবার সামর্থ্যটুকুও এর নেই।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে জীবন। এতদিন ধরে এতবড় বাড়ীটার সব স্পন্দনটুকু যে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তুলে এসেছে একটি মানুষকে কেন্দ্র করে, সবই নিঃশেষ হয়ে গেল।

সন্ধ্যার থমথমে অন্ধকার নেমেছে ধ্বসে-পড়া বাড়ীটার সর্বত্র। উঠোনে বাড়ীর বাগানে সুন্দর সুন্দর ফুলগাছগুলো অযত্নে মরে গেছে—গজিয়ে উঠেছে কাঁটা গাছ কুক্‌সিমা—কালকাসিন্দের ঝোপ; হলদে ফুলগুলো আঁধারে কেমন ম্লান চাহনিতে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে।

এ বাড়ীর একমাত্র বংশধর; কিন্তু সেও পারবে না এই ধ্বংসপুরীকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে। ধ্বসে পড়ছে এর সব ইট কাঠ দালান খিলান।

এরই কাঠ ইটে গড়ে উঠছে অন্য কোন নোতুন মানুষের ইমারত। সতীশ ভটচায তাই দিয়ে দালান তুলেছে।

…একদিকে ভাঙ্গে—গড়ে অন্যদিকে।

মায়ের চাপা কান্নায় জীবন একটু বিব্রতবোধ করে।

এতদিন সব চলে যাবার দুঃখ, অভাব সহ্য করেছে মা, কিন্তু বাবার মৃত্যুর আঘাত সে সইতে পারেনি, চাপাপড়া দুঃখের বোঝা আজ ওর সারা মনে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে।

কাঁদছে গুমরে গুমরে।

—বৌমাকে খবর দিবি না? সেও আসুক।

মা জেনেছে কোথায় ছেলের মনেও ভাঙ্গন ধরেছে। জীবন একটু চুপ করে থেকে জবাব দেয়।

—খবর দিয়েই বা কি হবে মা?

—কেন?

—সে আসবে না।

মা অসহায় দৃষ্টিতে ছেলের দিকে মুখ তুলে চাইল। সব চারিদিকে কেমন ভেঙ্গে পড়ছে—অন্ধকারে একটা চামচিকে উড়ে গেল, ঝুরঝুর করে বালি চূণ খসছে। কোথায় একটা ইটএর চ্যাংড়া খসে পড়ল।

চারিদিকে খসা আর ঝরার পালা। বাড়ীঘর—বিষয়-আশয় গেল। স্বামী গেল—বাইরের জীবনেও দেখেছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক—গৃহস্থের সব বন্ধন শুধু খসেই পড়ছে।

তারই মাঝে বাঁচবার সাধনা করে মানুষ।

মা তাই পরম স্নেহভরে জীবনের মাথায় হাত বোলাতে থাকে।

—মায়ে পোয়ে ওখানেই থাকবো গিয়ে বাবা।

জীবন অবাক হয়—সেখানে থাকতে পারবেন মা। নোংরা বাড়ী—মানে কলে কারখানায় কায করে—

হাসে মা—হোক বাবা। আমার তো সব গেল তবে আর মান অপমান বোধ এত কিসের। ছেলে যেখানে থাকে—মাও সেখানে থাকতে পারে। তোকে ভাবতে হবে না।

জীবন মায়ের দিকে চেয়ে থাকে। মণিমালা আজকের যুগের মানুষ, প্রতিবাদ বিক্ষোভ তার রক্তে। জ্বালা তার সারা মনে।

মা যেন সে যুগের উর্ধ্বে একটি মানুষ।

পরম তৃপ্তিভরে বলে জীবন—তবে চলো সেখানেই।

…দূরের দিকে চেয়ে থাকে; দুর্গাপুরের ব্লাষ্টফার্ণেসের আলোর সেই চোখ ধাঁধানো জ্বালাময় দীপ্তি অনেকটা যেন ম্লান হয়ে এসেছে।

গ্রামের পথে—হাসপাতালে—স্কুল বোর্ডিংএ জ্বলে উঠেছে বিজলী বাতি; কোথায় বাজছে রেডিওর সুর।

গ্রাম—সেই অন্ধকার গ্রামও যেন জাগছে নোতুন জীবনের জোয়ারে।

কানে আসে ডাঙ্গার বুকে ট্রাকটরসেড থেকে হাতুড়ির শব্দ—ইঞ্জিনটা চালু করে ওরা পরীক্ষা করছে।

…কেমন ভালো লাগে জীবনের।

শুধু তেল কালি—চিমনীর ধোঁয়া আর যন্ত্রের গর্জনই এখানে শোনা যায় না! কোথায় একটা গরু ডাকছে পরম স্নেহভরে তার বাছুরকে, বাঁশ বনে পাখী ডাকে, বাতাসে ওঠে আখের শালের গুড় জ্বালানী মিষ্টি গন্ধ।

মহুয়া ফুল ভরা ডাঙ্গা থেকে বাতাস আসছে—অন্ধকার সেই দিনগুলো মনে পড়ে।

সমৃদ্ধির দিন।

সেদিন ছিল তাদের একান্ত অজানার।

আজ যেন সেই সমৃদ্ধির ব্যক্তিবিশেষের জীবন থেকে এসেছে সামগ্রিক জীবনে—তারই প্রকাশ চারিদিকে।

…জীবন কথাটা ভাবছে—এখানে ঠাঁই তাদের ফুরিয়েছে। কেমন যেন পালাতে ইচ্ছে করে এখানে। চলেই যাবে।

মাকে তাই বলে ওঠে—তাহলে অশোকদাকে বলি—মত আমাদের আছে। এ বাড়ী রাখতে পারবো না মা, তার চেয়ে বেচেই দিই, দুর্গাপুরের আশপাশে গিয়ে ছোট একটা ঘর করবো।

মাও ভেবেছে কথাটা।

স্বামীর স্মৃতিতে তবু একটা পুণ্যপীঠ গড়ে উঠবে। ওরা কলেজ গড়বার চেষ্টা করছে—ওরা যদি কিছু দাম নিয়ে বাগান ছেড়ে দেয় কথাটা অশোকও জানিয়েছিল পরম সঙ্কোচভরে।

—মা আজ মত দিতে দ্বিধা করে না।

—তাই বল অশোককে। ধ্বসে ভেঙ্গে ভিটে নষ্ট হওয়ার চেয়ে কাযে লাগুক, সত্যিকার কাজে লাগুক, তিনিও খুসী হবেন।

…পাকাপাকিভাবেই যেন ওরা এ মাটি থেকে নিজেদের উৎখাতনামায় সই করে দিয়ে—অন্য জীবনে গিয়ে ঠাঁই খুঁজে নিতে চায়।

জীর্ণ পরিধান পরিত্যাগ করে যেমন নোতুন বাস গ্রহণ করে মানুষ—সহজ স্বাভাবিক গতিতে, আজ তারকরত্ন কেন তার ঊর্দ্ধতন সাতপুরুষের প্রতিষ্ঠিত রায় বংশ পাতাজোড়ার নোতুন মহীরুহ থেকে একটি ঝরাপাতার মত অনায়াসেই স্বাভাবিক গতিতে ঝরে পড়ল।

এতবড় ঘটনাটাও আজ সহজ হয়ে গেছে, তাদের সকলের কাছে।

রাতের আকাশে দূরে কোথায় পাখী ডাকছে—রাতজাগা একক একটি পাখী। জাগর রাত্রির প্রহরে ও যেন হারিয়ে গেছে।

আঁধার নেমেছে আবছা অন্ধকার।

গাঁয়ের এদিকটায় এখনও বিজলী বাতি আসেনি। দুইয়ে পড়া খড়ের ঘরগুলো মাটি নেবার জন্য তৈরী হয়েছে—কেমন দুর্বার সংগ্রাম করে এখনও তারা টিঁকে আছে। বাঁশবনে হু হু করে বাতাস।

…আকাশে দেখা দিয়েছে গ্রীষ্মশেষে বর্ষার মেঘ। ছেয়ে আসছে আকাশ জুড়ে। হঠাৎ কাদের ঢুকতে দেখে নারাণঠাকুর দাওয়ায় শুয়েছিল উঠে বসে।

…পিদিমটা জ্বালতেই অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে নারাণঠাকুর।

অব্যক্ত সেই আর্তনাদ মেশে গঙ্গামণির বুক-ফাটানো কান্নায়।

সনাতনকে ওরা নিয়ে আসছে। রুগ্ন বিকৃত পঙ্গু একটা মানুষ। গঙ্গামণির জমানো কান্নাটা আজ স্বামীর ভিটেতে এসে ফেটে পড়ে থান থান হয়ে মাথা ঠুকছে।

—ই আমার কি হলো গো। কেনে গেলাম। কেনেই যেতে দিলাম…ছেলেকে।

…লোকজন জুটে গেছে অনেকেই।

সনাতন দাওয়ায় বসে হাঁপাচ্ছে ক্লান্তিতে।

কিছুদিন আগে কারখানায় কায করতে গিয়ে বেকায়দায় মেসিনে পড়ে ডান পাখানা পিষে গেছে—হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কেটে ফেলতে হয়েছে পাটাকে।

কাঠের ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটছে যোয়ান সমর্থ মানুষটা। কাজ করবার ক্ষমতা নেই, বাতিল মানুষটাকে তাই আজ ওই জগৎ ফেরৎ পাঠিয়েছে—যেমন করে আখমাড়াই কলএর বাতিল ছিবড়েটুকু—সামান্য কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা করে।

গঙ্গামণির সেই তেজ কোথায় কর্পূরের মত উবে গেছে।

কে বলে—ঢেঁকি যতই মাথা নাড়ুক, আবার সেই গর্তেই ফিরে আসে দিদি। বাপ পিতেমোর ভিটে একে ছেড়ে গিয়েছিলে এখন ?

চুপ করে থাকে গঙ্গামণি। ভুলটা সেও বোঝে।

একটি লোক উঠে বসেছে—অবচেতন মনে মনে ইতি কর্তব্যও স্থির করে ফেলেছে। তার জীর্ণ দেহে আবার নারাণঠাকুর ফিরে পেয়েছে আগেকার সেই বল। আজ সে বাঁচবার, ওদের বাঁচাবার সাহসও সে অর্জন করেছে।

জীর্ণ বিছানাটায় শুইয়ে দেয় ক্লান্ত সনাতনকে।

নেমে আসছে—হঠাৎ ভিড় ঠেলে অশোককে এগিয়ে আসতে দেখে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ব্যাপারটা দেখেই বুঝতে পেরেছে অশোক—চমকে উঠেছে।

এ যেন নোতুন অভূতপূর্ব সমস্যা তাদের গ্রামজীবনে। একা সনাতন নয়—আরও কারা ফিরে আসবে এমনি সব হারিয়ে—কে জানে। তাদের দিতে হবে আশ্রয়—জীবিকার সংস্থান।

গঙ্গামণি কাঁদছে—কোথায় দাঁড়াবো বাবা, খাবো কি!

ভাবছে অশোক; অবাক হয়ে কথাভরা চাহনি মেলে চেয়ে থাকে সনাতনের দিকে এমোকালীও।

অন্তরে বাইরে ওরা নানা আঘাতে জর্জর হয়ে উঠবে সমস্যাবহুল জীবনে—নোতুন এই যুগের অভিশাপ না আশীর্বাদ এ—কে জানে।

তবু সইতে হবে। পথ খুঁজতে হবে সমাধানের।

বলে ওঠে অশোক—কেঁদোনা সোনার মা, একটা ব্যবস্থা যা হয় হবেই। ফিরে এসেছো—ভালই করেছ।

—ওখানে থাকলে যে ভিক্ষে করতে হতো বাবা!

গঙ্গামণি কান্নাভিজে কণ্ঠে বলে—চমকে ওঠে কালী।

—ভিক্ষে করতে হতো?

হাসে অশোক। ম্লান হাসি একটুকু। কালীচরণ জানেনা—সেখানে জাত মান সম্মানের কি দাম—কিসের মাপকাঠিতে তার মূল্য নির্ধারণ করা হয়—বলে ওঠে অশোক।

কায করবার সঙ্গতি যেদিন সেখানে ফুরোবে—সেদিন এ ছাড়া আর পথ কি? যে কোন সহর কলকারখানার আশেপাশে এমনি অনেককে খুঁজে পাবে, যাদের একদিন কোন পাঁড়াগাঁয়ে ঘর জমিজারাত ছিল, মান সম্মানও না থাকা ছিলনা। কিন্তু আজ সেখানে পথের ভিখারী।

—হ্যাঁ বাবা।

গঙ্গামণি ও কথাটা মানে। দুর্গাপুর আসানসোলেও এমন অনেককে দেখেছে সে।

নারাণঠাকুর এসব বোঝেনা, অব্যক্ত ভাষাহীন চীৎকারে সে ঘোষণা করে তার দুঃখ।

সান্ত্বনা দেয় অভয়—দেয় অশোক ইসারা করে।

—সব ঠিক হয়ে যাবে।

গঙ্গামণিও যেন ভরসা পায় তার কথায়।

রাত হয়ে আসে। একাই অশোক ফিরছে বাড়ীর দিকে। কোথায় জাগছে তখনও রাতজাগা পাখী। তারকবাবুর অন্ধকার পরিত্যক্ত বাড়ীটার কাছে এসে দাঁড়াল।

শূন্য বাড়ীটা আঁধারে ডুবে গেছে।

জীবন ওর মাকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু যাবার আগেও এবাড়ীর শেষপুরুষের মতই কায করে গেছে।

[ক্রমশঃ
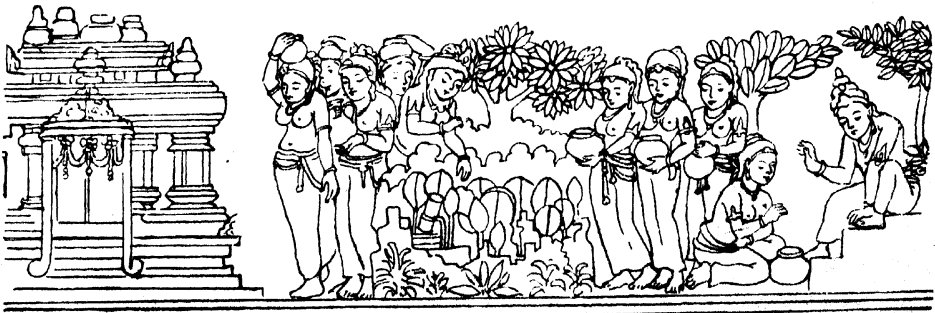
বর্ধমানে বাংলার মনীষী সঙ্গম
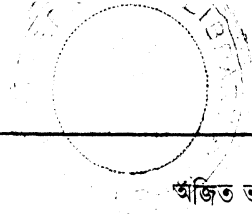
অজিত ভট্টাচার্য

প্রাচীন বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে বর্ধমানের ঐতিহ্য চিরদিন জড়িত, বর্তমানের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে যদি আমরা দুইশত বছর পূর্ব্বে থেকেও বর্ধমানকে দেখি তাহলেও তার গৌরববাহী ঐতিহ্যকে অনুভব করে আমরা আজও গৌরবান্বিত না হয়ে পারি না।

যে সব মনীষীর অবদান বর্ধমানের ইতিহাসের সাথে সমসূত্রে গ্রথিত তাঁদের কিছু কিছু ঘটনার অবতারণাই প্রবন্ধের আলোচ্য বস্তু।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র হতে আরম্ভ করে এখানে বহু গুণী জ্ঞানী সাহিত্য রসিকের আবির্ভাব ঘটেছে যুগে যুগে। বর্ধমানের রাঙ্গামাটি তাই ধন্য।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ধমান জেলায় ভুরসুট পরগণায় কৃষ্ণরাম রায় কর্তৃক এক ব্রাহ্মণ রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ফুলিয়ার এই মুখটি বংশে বাংলার প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস ও রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের তৃতীয় পুত্র মুকুট রায়ের বংশধর হলেন রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র। ১১০৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডুয়া ওরফে রাধানগর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। প্রচলিত কিংবদন্তী ভারতচন্দ্রের পুর্ব্বপুরুষ লছমি নারায়ণের সাথে বর্ধমান রাজবংশের বেশ সদ্ভাব ছিল না, বর্ধমানরাজ কর্তৃক লছমি নারায়ণের রাজ্য কয়েকবার আক্রান্ত হলেও তিনি সেই আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। কিন্তু গৃহ-শত্রুর চক্রান্ত তাঁর সমস্ত শক্তিকে ব্যাহত করে।

ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্র রায়ের পিতৃব্য রাজবল্লভ রায়ের চক্রান্তে ১৭১৩ খৃঃ বর্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্র ভুরসুট আক্রমণ ক'রে ভারতচন্দ্রের পিতৃরাজ্য অধিকার করেন। এর অল্পকাল পরেই ভারতচন্দ্র মঙ্গলঘাট পরগণার অন্তর্গত নওয়াপাড়া মাতুলালয়ে আশ্রয় নেন এবং এরই সন্নিকটে তাজপুরে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন। যতদূর জানা গেছে তিনি বর্ধমান মহারাজের অধীনে সম্পত্তি-সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে তদ্বির ও তদারকের জন্য ১৭৩৯ খৃঃ বর্ধমানে আসেন। এই কার্যকালে তিনি চার বছর অতিবাহিত করেন। সম্ভবতঃ বর্ধমানরাজ কীর্ত্তি-চন্দ্রের মাতার সাথে ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনাথের বিবাদ ও সম্পত্তির ব্যাপারে কোন গোলমালের জন্য এই সময়ের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে বর্ধমান রাজবাটী (বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের) সন্নিকট বোরহাট মহল্লায় তৎকালীন বর্ধমানরাজ-কারাগারে কিয়ৎকালের জন্য বিদ্যাসুন্দরের কবি ভারতচন্দ্রকে বন্দীজীবন অতিবাহিত করতে হয়।

কবির জীবনের এক স্মরণীয় ও ভয়াবহ জীবনের দিনপঞ্জীকে কেন্দ্র করে বিদ্যাসুন্দরের কবি ভারতচন্দ্রকে ঘিরে বর্ধমানের ঐতিহাসিক পটভূমিকা তাই এক বিশেষ দিক দাবী করতে পারে।

ভারতচন্দ্র ছিলেন অদ্ভুত ধীশক্তিসম্পন্ন মানুষ। তিনি কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়ে বর্ধমান রাজকারাগার হতে পলায়ন করেন। ভারতচন্দ্রের জীবনের এর পরবর্ত্তী ঘটনা নজির রেখেছে। কিন্তু বর্ধমানের মানুষ আজও ভুলতে পারেনি বিদ্যাসুন্দরের ভারতচন্দ্রকে। একটা চিরস্থায়ী আসন তাই সন্নিবিষ্ট হয়েছে ভারতচন্দ্রকে কেন্দ্র করে এক ঐতিহাসিক পটভূমিকায়।

বৃটিশ আমলে প্রথমদিকেও বর্ধমান শহর অস্বাস্থ্যকর ছিল না। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বায়ু পরি-বর্ত্তনের জন্য বর্ধমানে এসেছিলেন। রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্বাভাবিক জলনিকাশের পথ রুদ্ধ হয়, আর সেই কারণেই বর্ধমান শহর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে।

এই শহরে কিছুদিন অতিবাহিত করে গেছেন মহা-কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বর্ধমানের অন্যতম প্রসিদ্ধ

জলাশয় শ্যামসায়রে স্নান করে পরম তৃপ্তি পেতেন তিনি। যে সময়ের কথা বলছি বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সে সময় বর্ধমানে ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন এখানে এসেছিলেন বিদ্যাসাগরের অতিথি হিসাবে। মাইকেল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রায়ই বলতেন, বর্ধমানের শ্যামসায়র দেখে আমার কপোতাক্ষীর কথা মনে পড়ে। অবগাহন স্নান করে মাইকেল মনের তৃপ্তিতে সাঁতার কাটতেন। বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলতেন—"ওঠ কবিবর! এ জন্যই দেখছি তুমি রাজসভাকবি হতে পারনি"। বর্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতাল ও রাজকলেজের তীরবর্ত্তী ভূমিখণ্ডে অবস্থিত শ্যামসায়র তাই পবিত্র হয়ে আছে মহাকবি মাইকেল ও ঈশ্বরচন্দ্রের পূত পবিত্র স্পর্শে। বাংলাদেশের ভূগোলে পুরোণো একটা নাম বর্ধমান, এক গৌরবময় ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে রেখেছে বর্ধমানের কথা।

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পূত পুণ্য স্পর্শও বর্ধমানের ধূলিকণায় ধন্য হয়ে আছে। তেজগঞ্জ কালী-মন্দির ও দুর্লভা কালীমন্দিরে একাধিকবার ঠাকুর এসেছেন।

প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির দিকেও একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পূর্ণ অবদান বর্ধমানের আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীগণ ব্যতীত জন কয়েক ইংরাজ জনসাধারণকে জ্ঞানদানের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করেছিলেন। তাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ ষ্টিওয়ার্টের নামই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। তাঁরই সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বর্ধমানে প্রথম মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৬ খৃঃ ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের চেষ্টায় চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটির তত্ত্বাবধানে বর্ধমানে দুটি বাংলা স্কুল স্থাপিত হয়। বর্ধমানে এই হল সর্ব্বপ্রথম ইংরাজপরিচালিত স্কুল। ১৮১৮ খৃঃ স্কুলের সংখ্যা হয় দশ এবং ছাত্র সংখ্যা প্রায় একহাজার। বহু বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া ষ্টিওয়ার্টকে বর্ধমানে স্কুল পরিচালনায় অগ্রসর হতে হয়।

বিরুদ্ধবাদীরা রটনা করে শিশুদের বিদেশে রপ্তানীর জন্য সাহেব স্কুল খুলেছেন। স্বনামখ্যাত তারাচাঁদ দত্ত মহাশয় বর্ধমানে ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। ১৮৩৪ খৃঃ পণ্ডিতপ্রবর রসিককৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় যখন বর্ধমানের ডেপুটী কালেক্টর তখন রামতনু লাহিড়ী মহাশয় বর্ধমানে কোন স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। বর্ধমানে তখন আর বিদ্যালয় না থাকায় ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের পরিচালনাধীন কোন স্কুলে রামতনু লাহিড়ী মহাশয় শিক্ষকতা করেছিলেন ইহাই মনে হয়।(১)

তৎকালীন ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের প্রতিষ্ঠিত মিশনারী স্কুলের যথেষ্ট সুনাম ছিল। কলকাতা স্কুল সোসাইটির কিছুসংখ্যক শিক্ষক এই স্কুলে শিক্ষালাভের জন্য এসে-ছিলেন। বর্ধমান শহরের অদূরবর্ত্তী পুলিশ লাইনের সন্নিকটে কানাইনাটশাল নামক স্থানে ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের স্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ধমানে শিক্ষা বিস্তারকল্পে যাঁদের অবদান আমাদের কাছে স্মরণীয় নিঃসন্দেহে আমরা ক্যাপ্টেন ষ্টিওয়ার্টের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করতে পারি।

স্ত্রীশিক্ষায় বিশেষ করে বর্ধমান জেলায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এদেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার এক জটিল সমস্যা। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করে সর্ব্বপ্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেন ১৮৫৭ খৃঃ ৩০শে মে বর্ধমান জেলার জৌ গাঁয়ে। (২)

বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ধমান জেলায় নারো গ্রামে আরও একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৫৭ খৃঃ থেকে ১৮৫৮ খৃঃ মাত্র এক বছরের মধ্যে তিনি বর্ধমান জেলায় ১১টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

বর্ধমান জেলায় শিক্ষা বিস্তারে ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ ষ্টিওয়ার্ট ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম অনেকেই হয়তো বিস্মৃত হয়েছেন, কিন্তু বর্ধমানের ইতিহাসে শিক্ষা বিস্তারে এঁদের দান ছিল অপরিসীম।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে বঙ্গভারতীর একজন কৃতী সন্তান বর্ধমানের পবিত্র ভূমিতে সাহিত্য আলোচনা করে গেছেন, বর্ধমানের মানুষের কাছে তাই তাঁর স্মৃতি চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, তিনি হলেন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদের দেশ-

ব্যাপী বিক্ষোভ যখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সে সময়ে আবির্ভাব ঘটেছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি হাসির গানে। ১৮৮৪ খৃঃ কবি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এম্, এ, পাশ করেন। তার পর তিনি সরকারী বৃত্তি নিয়ে কৃষিবিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষালাভের জন্য বিলাত যান। ১৮৮৬ খৃঃ এফ্, আর, এ, এস্ ডিগ্রী নিয়ে বিলাতের কৃষি কলেজ ও কৃষি সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। বিলাত থেকে ফিরে অল্প কিছুদিন কৃষি বিভাগে চাকুরী করেছিলেন তিনি। এই সময়ে সামাজিক বিরোধিতা ও জাতি আচারের কুসংস্কার কবির মনকে উদ্বেল করে, তারই ফলে কবির ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কবিতা সমাজকে সুতীব্র আঘাত করবার প্রেরণা যুগিয়েছিল। বর্ধমানের রাঙ্গামাটীতে কবির লেখনী রূপ পেয়েছিল বিভিন্ন ব্যঙ্গ কবিতা ও হাসির গানের মাধ্যমে। কবি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তখন ছিলেন বর্ধমান স্টেটের সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার। ধন্য বর্ধমানের পূতপবিত্র ভূমিখণ্ড, যেখানে একাধিক সাহিত্যরসিক ও কবির আবির্ভাব ঘটেছে যুগে যুগে, কত ভাঙ্গা-গড়া ও উত্থান পতনের মধ্যে এগিয়ে চলেছে বর্ধমানের ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতি। * উনবিংশ শতকের সাহিত্য প্রবাহে এক বিশেষ দিকের সন্ধান দিলেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সাহিত্যের উন্মেষ বর্ধমানের পবিত্র ভূমিতে প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তাঁর যে বিশেষ সাহিত্য কীর্তি "পালামৌ"কে কেন্দ্র করে আজও বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা আছে, বর্ধমানে বসেই তিনি সে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা পর্য্যন্ত বঙ্গ-দর্শনে প্র, না, ব, এই ছদ্ম নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবজীবনীতে সে কথা উল্লেখ করে বলেছেন—"বর্ধমানে থাকবার সময়েই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্য সম্বন্ধ জন্মে।" তৎকালীন সঞ্জীব-চন্দ্রের সম্পাদনায় ভ্রমর নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ হত। তিনি বর্ধমানে থেকেই ভ্রমরের সম্পাদনা করতেন। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গ-দর্শন পুনঃ প্রকাশ হলে বর্ধমানে থেকেই তিনি তার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবজীবনীতে এ বিষয়ের উল্লেখ করে লিখেছেন—"১২৮৪ থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সঞ্জীবচন্দ্র বর্ধমানে বসেই বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা করেন।" অবশ্য সঞ্জীবচন্দ্রের পিতা যাদববাবু পত্রিকা ও যন্ত্রালয়ের তত্ত্বাবধান করতেন বলে বর্ধমানে থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা করা সহজ হয়েছিল। কেননা যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর দু'বছরের মধ্যে বঙ্গদর্শনের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়েছিল। সঞ্জীবচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন বর্ধমানে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, সঞ্জীবচন্দ্র তখন বিদ্যাশিক্ষার জন্য বর্ধমানে আসেন। এর আগে তিনি পড়তেন হুগলীতে। সেখানে সঙ্গ দোষে অল্প বয়সেই লেখা পড়ার প্রতি অমনোযোগী হয়ে ওঠায় তাঁর পিতা বিদ্যাশিক্ষার জন্য সঞ্জীবচন্দ্রকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। তাঁর ধারাবাহিক জীবন ইতিহাস আমরা তেমন পাই না, যা থেকে নির্দ্দিষ্ট করে বলতে পারা যাবে বর্ধমানে এসে তিনি কতদিন ছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী বলতে আমরা যতটুকু পাই তা হ'ল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা "সঞ্জীবজীবনী" পত্রিকার কয়েকটি খণ্ড। ছাত্র জীবনে আমরা যেমন তাঁকে একবার বর্ধমানে দেখি, তেমনই আর একবার তাঁকে দেখি চাকুরী জীবনে। চাকুরী নিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র প্রথম বর্ধমানে আসেন স্পেশাল সাব রেজিষ্ট্রার হয়ে। সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী প্রসঙ্গে বঙ্কিম চন্দ্র সেকথা উল্লেখ করে বলেছেন—"কিছুদিন পরে হুগলীর সাব রেজিষ্ট্রার পদের বেতন কমিলে গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় হওয়ায় তিনি বর্ধমানে প্রেরিত হইলেন।" এখানে তিনি ছিলেন বেশ আনন্দে। কারণ বর্ধমানের পরিবেশের সঙ্গে তিনি নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে বলেছিলেন, "বর্ধমানে সঞ্জীব চন্দ্র বেশ সুখেই ছিলেন। শৈশব থেকেই সঞ্জীবচন্দ্রের বেশ ঝোক ছিল ফুলের বাগানের উপর, আর নেশা ছিল সাহিত্য ও প্রাচীন পুঁথি পত্র নিয়ে আলোচনা করা। বিকালে অধিকাংশ দিনেই বাগানে নিজ হাতে মাটি খুঁড়ে ফুলের যত্ন করতেন তিনি। আর ঐ বাগানই ছিল তাঁর নিত্য বৈকালের সঙ্গী। সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন অদ্ভুত খেয়ালী প্রকৃতির মানুষ। প্রকৃত শিল্পীর মন ছিল তাঁর। তিনি দিনরাত আত্ম দর্শন, সাহিত্য চিন্তা ও বিভিন্ন পুঁথি পত্রের মধ্যে ডুবে থাকতে ভালবাসতেন। বড় একটা কারো সঙ্গে মেশবার

সুযোগ তাই তাঁর ঘটে উঠতো না। বর্ধমানে তাঁর একমাত্র বন্ধু বলতে ছিলেন পড়শী বিধুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই জন্য সঞ্জীবচন্দ্র তৎকালীন বর্ধমানের জনসাধারণের কাছে দেমাকী বলে পরিচিত হয়েছিলেন। ১২৮৩ সালে কবি নবীনচন্দ্র সেন জর্জ ফিল্ড সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বর্ধমানে এসেছিলেন। "আমার জীবনে" সেকথা উল্লেখ করে লিখেছেন—"আমি জর্জ্জ ফিল্ড সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, রাস্তার পাশে বৃহৎ হাতা শোভিত একটি বাংলোর বারান্দায় এক তেজঃপূর্ণ, গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি ব্রাহ্মণ, অনাবৃত দেহে বেড়াইতেছেন দেখিলাম। মূর্ত্তিটিকে দেখিয়া কোচোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এই লোকটি কে? সে বলিল সঞ্জীব বাবু। আমি প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। গাড়ী হাতায় লইয়া টিকিট পাঠাইয়া দিলাম, মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—কি জানি কি রূপ ব্যবহার করিবেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কার্ড পাইবামাত্র তিনি ছুটিয়া আসিয়া চিরপরিচিতের মত আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন।"

নবীনচন্দ্র তাঁর "আমার জীবনে" সঞ্জীবচন্দ্রের কথা লিখে না গেলে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই আমাদের অজানা থেকে যেত। বর্ধমানে এসে নবীনচন্দ্র শুনেছিলেন চাটুজ্জ্যে পরিবারের দেমাকের কথা। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের সাথে পরিচিত হয়ে সে ধারণা তাঁর দূরীভূত হল। "আমার জীবনে" সে কথার উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—"আমি মনে মনে ভাবিলাম, এই কি সেই ডেমাকি সঞ্জীব বাবু"। সঞ্জীবচন্দ্র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "জীবন স্মৃতিতে" বলেছেন—"সঞ্জীবচন্দ্র আলাপী লোক ছিলেন, গল্প করায় তার আনন্দ ছিল।"

অনুমানের উপর নির্ভর করে বলতে হচ্ছে, সম্ভবতঃ সঞ্জীবচন্দ্র ১২৮৫ সাল পর্য্যন্ত বর্ধমানে ছিলেন। কারণ বর্ধমান হতে যশোহরে বদলি হবার পর তিনি আর বেশী-দিন চাকুরী করেন নি।

১২৮৭ সালে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তিনি যশোহরে বদলি হয়েছেন। অপর দিকে দেখি ১২৮৫ সালে বঙ্গদর্শন ৬ষ্ঠ খণ্ড প্রকাশ হলেও ১২৮৭ সালে বঙ্গদর্শনের ৭ম খণ্ড প্রকাশ হয়। সঞ্জীবচন্দ্র তখন যশোহরে।

বর্ধমান রাজবংশের পটভূমিকায় রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের "জাল প্রতাপ" তৎকালীন বর্ধমানের এক ঐতিহাসিক চিত্রের অবতারণা করেছে। সঞ্জীবচন্দ্র তাই বর্ধমানের গৌরব। বর্ধমানবাসীর কাছে তাঁর স্মৃতি তাই অম্লান হয়ে থাকবে।

বাংলা সাহিত্যের রসরাজ (পঞ্চানন্দ) ইন্দ্রনাথের স্মৃতি-বিজড়িত পূত পবিত্র ভূমি বর্ধমান। জীবনের এক বিরাট অংশ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিবাহিত করেছিলেন বর্ধমানের বুকে। তাই "বর্ধমানে বাংলার মনীষী সংগমে" তাঁর কথা না বললে অপূর্ণ হবে সে আলোচনা।

এখানে ইন্দ্রনাথ প্রথম আসেন সম্ভবতঃ ১৮৭৭ খৃঃ হাইকোর্ট ছেড়ে বর্ধমানের কোর্টে ওকালতি করতে। কেন তিনি হাইকোর্ট থেকে বর্ধমান কোর্টে এসেছিলেন তার সঠিক কোন ইতিহাস আমরা পাই না। তবে তাঁর সাহিত্য স্ফুরণ যে এখানেই বহুলভাবে হয়েছিল একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ১৮৭৭ খৃঃ ইন্দ্রনাথ কলকাতায় একখানি ব্যঙ্গাত্মক মাসিক পত্র "পঞ্চানন্দ" পরিচালনা করতেন। পঞ্চানন্দের সম্পাদক থাকা কালীন ইন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে বর্ধমানে আসেন, বর্ধমানে এসেও বৎসরাধিককাল পঞ্চানন্দ চালিয়েছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বর্ধমানে তাঁর ওকালতির পশার জমে যায়। এই সময়ে বন্ধ হয়ে যায় "পঞ্চানন্দ"। এর পর তিনি ৺যোগেশ চন্দ্রের অনুরোধে "বঙ্গবাসীতে" লিখতে আরম্ভ করেন। বহুকাল তিনি "বঙ্গবাসীতে" লিখেছিলেন। পরে যোগেশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে সংকলনের ইচ্ছা প্রকাশ করে ইন্দ্রনাথের কাছে অনুমতি আদায় করে নেন। যাহা উত্তরকালে "পাঁচুঠাকুর" প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে ইন্দ্রনাথের রসানু-শীলন প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। তিনি ছিলেন সমজদার রসিক। বৈঠকী-গল্পে তখনকার দিনে তাঁর জোড়া ছিল অল্প। ইন্দ্রনাথ বর্ধমানে থাকাকালীন প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে সান্ধ্য বৈঠক বসত। তাঁর জীবনের বহু অংশ কেটেছে এই বর্ধমানে। আদালতে মোকর্দ্দমা করতে গিয়েও তিনি রসিকতার অবহেলা করতেন না। বর্ধমানের কোর্টে এক তন্তুবায় হাকিমের এজলাসে এক দিন ভীষণ গণ্ডগোল দেখে ইন্দ্রনাথ হাকিমকে বলেছিলেন—"এযে দেখছি

একেবারে সুতোহাটের গোল"। আর একদিন পদ্মমণি নামে এক মহিলা সাক্ষী দেবার পর আর এক ভদ্রলোক সাক্ষ্যদিতে কোর্টে উঠলে সে পক্ষের উকিল তাঁর নাম ধাম পেশা জিজ্ঞাসা করায় ইন্দ্রনাথ বললেন—"দেখছেন না? উনি পদ্মমণির অলি"। এরকম রসিকতা আদালতে নিত্যই হত। ইন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুদের অনুরোধে একবার বর্ধমানের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হয়েছিলেন। বর্ধমানে জলের কলের পত্তন তখনও হয়নি। ইন্দ্রনাথের অভিমত কিন্তু এই জলের কলের বিপক্ষেই ছিল। কারণ নানা সুবিস্তৃত ও সুগভীর সায়র শোভিত বর্ধমানে জলের কলের প্রয়োজন নাই, এই ছিল তাঁর অভিমত। কিন্তু ভোটে ইন্দ্রনাথের মতামত টিকল না। পরে তিনি পদপ্রার্থী না হয়ে সঙ্গীতের মাধ্যমে বলে ছিলেন—

"আমি চাই মিউনিসিপ্যাল মান
(যদি বল তা কেন চাই ?)
আমায় কেউ জানে না, কেউ মানে না
আমায় কেউ ডাকে না ভাঙ্গতে ধান,
(তাই) আমি চাই মিউনিসিপ্যাল মান।'

বর্ধমান শহরে জলের কলের প্রবর্তন হল। তখন এল আর এক বিপদ। রাস্তার কলে অধিকাংশ বড় বড় ঘরের লোকেরা জল নিতে নারাজ। গৃহ সংযোগের জন্য মিউনিসিপ্যাল অফিসে প্রত্যহই দরখাস্ত পড়তে লাগল। চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর তো ভেবেই অস্থির, এত লোকের জল সরবরাহ তিনি করবেন কি উপায়ে?

একদিন বারে রায় বাহাদুরকে এ নিয়ে চিন্তা করতে দেখে ইন্দ্রনাথ এক খানি কবিতা লিখে রায়বাহাদুরকে শুনালেন—

—"একি হল উপসর্গ, ঘরে ঘরে সংসর্গ
জল যোগান হল বুঝি দায়
রায় বাহাদুর! টাক্ ফুর ফুর
গাড়ু গামছা হাতে করে ভাবছেন উপায়"।

ইন্দ্রনাথের কথায় হাস্যরোল উঠল। রায় বাহাদুরও এথেকে বাদ গেলেন না।

বর্ধমানের সাহিত্য ইতিহাসকে জুড়ে ইন্দ্রনাথের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আসন তাই আজও রয়েছে। তাঁর জন্মভূমি গঙ্গাটিকুরীর নাম তাই এক নূতন ভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে বর্ধমান জিলার ভৌগোলিক তত্ত্বে।

১৩২১ সালে সাহিত্যানুরাগী বর্ধমানাধিপতি বিজয়চাঁদ মহাতাবের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু জ্ঞানী ও গুণীর পদস্পর্শে বর্ধমানে এক ঐতিহাসিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইতিহাসের পাতায় অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত সম্মেলন রূপে যা লিপিবদ্ধ আছে।

১৩২০ সালের চৈত্র মাসে ইষ্টার পর্ব্বের ছুটির সময় কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের শেষ দিনে বর্ধমানাধিপতি বিজয়চাঁদ মহাতাব বর্ধমানবাসী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বর্ধমান শাখার পক্ষ হতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনকে আগামী বর্ষে বর্ধমান নগরে আমন্ত্রণ করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন মহারাজের প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন করায় ১৩২১ সালে ১০ই শ্রাবণ বর্ধমান বংশগোপাল টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বর্ধমান শাখার আহ্বানে বর্ধমান জনসাধারণের এক সভা হয়। এই সভায় কার্য্যনির্ব্বাহক, পরামর্শ ও অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। সম্মেলন পরিচালন সমিতির পরামর্শ অনুসারে ২০শে, ২১শে ও ২২শে চৈত্র ইষ্টার পর্ব্বের ছুটির সময় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার দিন স্থির হয়।

এই ঐতিহাসিক সাহিত্য সম্মেলনের মূলসভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। তদ্ব্যতীতও শাস্ত্রী মহাশয় এই সম্মেলনের সাহিত্য শাখার কাজ সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করেছিলেন।

এ ব্যতীত ইতিহাসশাখায় শ্রদ্ধেয় যদুনাথ সরকার, দর্শনশাখায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, বিজ্ঞানশাখায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সভাপতির আসন অলংকৃত করে সম্মেলন পরিচালনা করেছিলেন।

বর্ধমান রাজবাটীর বিশাল সরস্বতী প্রাঙ্গণ জুড়ে সম্মেলনের মূল মণ্ডপ নির্মিত হয়েছিল। মণ্ডপের উর্দ্ধদেশ ও চতুষ্পার্শ্ব নানাবিধ মনোরম শ্বেত, রক্ত, নীলবস্ত্রে সুশোভিত করবার ব্যবস্থা পরিচালনা করেছিলেন স্বয়ং বর্ধমানাধিপতি বিজয়চাঁদ মহাতাব। দক্ষিণ পার্শ্বের মধ্যভাগে ছিল সভাবেদী। তার পাশেই অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দের স্থান, সম্মুখে প্রতিনিধিবর্গের, তার দুই পার্শ্বে দর্শকদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল।

সম্মেলনের ২য় দিন অর্থাৎ ২১শে চৈত্র মূল মণ্ডপকে দুই ভাগে বিভক্ত করে সাহিত্য ও দর্শন শাখার পৃথক ভাবে স্থান করা হয়। সরস্বতী প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে রাসমঞ্চের সন্নিকটে ইতিহাস শাখার জন্য এক তাঁবু খাটান হয়েছিল।

রাজনাট্যশালায় বিজ্ঞানশাখার স্থান করা হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সাহিত্য সম্মেলন হয়েছে ; কিন্তু বর্ধমানের এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের রূপ সম্পূর্ণ আলাদা। একথা শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় স্বীকার করে গেছেন, বর্ধমানে অনুষ্ঠিত অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মণ্ডপে দাঁড়িয়ে।

মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাবের ব্যবস্থাপনায় অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন এক ঐতিহাসিক সম্মেলনে রূপায়িত হয়েছিল। জনসাধারণের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা বাড়াবার জন্য এক সাহিত্য ও ইতিহাসের গবেষণা মূলক এবং ঐ সঙ্গে এক কৃষি প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল।

সরস্বতী মন্দিরের, রাসমঞ্চের ও রাজ বাড়ীর বহির্ভাগের কিছু অংশেও প্রদর্শনী দ্রব্যাদি রক্ষিত হয়েছিল। প্রস্তর ধাতু মুর্ত্তি, তাম্রশাসন, হস্তলিখিত পুঁথি, দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা, রাজবাটীর প্রাচীন অর্থশাস্ত্র এই প্রদর্শনীতে সংগৃহীত হয়। তদ্‌ব্যতীত বর্ধমান কৃষিপ্রধান স্থান বলে এখানে এক কৃষি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল। জনসাধারণের শিক্ষাপ্রদ আমোদ প্রমোদের উদ্দেশ্যে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ইতিহাস শাখার মণ্ডপে ছায়াচিত্রের মাধ্যমে বক্তৃতা দানেরও ব্যবস্থা হয়েছিল।

পাটনা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক 'সমসাময়িক ভারত' প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বিহারের বৌদ্ধ কীর্ত্তি সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ভূতত্ত্ববিদ্ শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বর্ধমানের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে বরাকরের শ্রদ্ধেয় মন্মথনাথ রায় কয়লা খনির উপর ছায়া চিত্রযোগে বিবিধ তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা ক'রে এই সম্মেলনের গুরুত্ব বর্ধিত করেছিলেন। সারা ভারতবর্ষ হতে লক্ষ লক্ষ সাহিত্যরসিক ও তথ্যানুসন্ধানী মানুষ সমবেত হয়েছিলেন এই সম্মেলনে।

মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাবের ব্যবস্থাপনায় বর্ধমানের ঐতিহাসিক গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রেখে এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

বর্ধমান আজও সেই গৌরবে গৌরবান্বিত যে, বর্ধমানের এই অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন দেশের সাহিত্য প্রচার সম্বন্ধে এক নূতন চেতনার সঞ্চার করে এক নব আদর্শের পথ দেখিয়েছিল। রাঢ়ের শাশ্বত বাণী তাই এই বর্ধমানকে ঘিরে। বাঙ্গলাদেশের প্রাচীন সংস্কৃতির এক বিশেষ অঙ্গ এই বর্ধমান, যার ঐতিহ্য স্মরণাতীত কাল হতে ইতিহাসের ক্রমবিবর্ত্তনের মধ্যেও কালের কষ্টিপাথরে এক অপরূপ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে রয়েছে। বর্ধমানবাসীর কাছে এটুকুই আজ সান্ত্বনা।

---

(১) ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ড, ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) স্ত্রীশিক্ষায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩৫
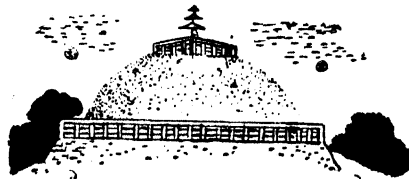
সেকালের বাণিজ্য ও পরিবহন ব্যবস্থা

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। তাই বুঝি মানুষ যুগে যুগে চেয়েছে বাণিজ্যের মধ্য দিয়েই তার ভাগ্য ফেরাতে। স্মরণাতীত কাল থেকেই তাই মানুষের চেষ্টায় আবিষ্কৃত হয় পরিবহনের সহজ পন্থা—মালপত্র দেওয়া নেওয়া আর ক্রয়বিক্রয়ের সুবিধার জন্য। অবশ্য এক দিনেই তা হয়ে ওঠেনি। বহু যুগ বহু বছরের চেষ্টায় এ সম্ভব হয়েছে। প্রথম যুগে মানুষের পরিবহনের প্রধান উপায় ছিল পশু। যার উপর মানুষ তার সম্ভার চাপিয়ে নিজের-ও জায়গা করে নিয়েছিল! কাঠের গুঁড়ির ওপর চেপেই বোধ হয় মানুষ প্রথম জলে ভাসতে শেখে। তখন সাঁকো বা ব্রিজের কোন অস্তিত্ব ছিলনা। ঐ গাছের গুঁড়িই সেই সাঁকোর কাজ করেছে। আধুনিক চক্রের ধারণাও বোধ হয় আসে ঐ গাছের গুঁড়ির গড়িয়ে যাওয়া দেখে। যাই হোক না কেন মানুষ তার নিজের অবস্থায় কোনদিন সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাই যুগে যুগে সে ছুটে চলেছে দূরান্তের নেশায় বহু দূরের পানে। সে চেয়েছে অপরকে জানতে আর জানাতে। তাই বিপদ ভয় তুচ্ছ করে সে পার হয়েছে দুস্তর মরু, খরস্রোতা নদী আর উত্তুঙ্গ পর্বত। এই ভাবেই বুঝি জাঁকজমকপূর্ণ প্রাচ্যের দ্রব্যসম্ভার আর পাশ্চাত্ত্যের দ্রব্যগুলি ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীতে। পথের দুর্গমতা আর এই বাণিজ্যের দুস্তর বাধাই মানুষকে করে তুলেছিল আগ্রহী তার দেশের সম্ভারকে অন্যদেশে প্রচার করার।

বহু প্রাচীন আর কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পথই প্রথমে ছিল এই বাণিজ্যে পরিবহনের একমাত্র উপায়। এই সব সম্ভার পরিবহনের পথ ছিল অতি দুর্গম। তার ওপর ছিল ভয়ানক বিপদ, আর করভার। পরে মানুষ তাই জলপথকেই তার পরিবহনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মেনে নিয়েছিল। ব্যবসায়ীদের চাপেই বোধ হয় সে যুগে ভাস্কো ডা গামা আবিষ্কার করেন উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে প্রাচ্যে গমনাগমনের সহজ পথ। সে যুগে তাই বর্ত্তমানের মতই স্থলপথের চেয়ে জলপথকেই গ্রহণীয় বলে মনে করা হয়েছিল শ্রেষ্ঠ পরিবহনের উপায় হিসাবে।

প্রাচীন যুগের পরিবহনের কাহিনীতে দেখা যায় দলে দলে সওদাগর চলেছেন তাদের বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার নিয়ে। কখনও ঘোড়ার পিঠে, কখনও গরুর গাড়ীতে, আবার কখনও বা উটের পিঠে চড়ে। মাঝে মাঝে তাদের জন্য পথের পার্শ্বে রয়েছে ছোট ছোট সরাইখানা বা চটি। এই সব চটিতে মেলে আহার, রাত্রিবাসের উপায়, আর ভারবাহী পশুদের খাদ্য ও পানীয়। রাত্রিতে বিশ্রাম করে আবার ভোরের আলো ফুটে উঠলেই শুরু হয় যাত্রা। সারারাত চলে পাহারা। গান আর আনন্দে কেটে যায় সময়।

ক্রমে ক্রমে প্রয়োজনের তাগিদে নতুন নতুন পথেরও সৃষ্টি হয়। ক্রয়বিক্রয়ও চলত নানা দ্রব্যের। নানা ধনী আর রাজা মহারাজার প্রয়োজনেও দেওয়া নেওয়া চলত নানা বিলাসদ্রব্যের। বিখ্যাত ছিল সার্দ্দিনিয়ার মেষের লোমে তৈরী ফ্লোরেন্টাইনের গরম কাপড়। জাভা, সুমাত্রা আর ভারতবর্ষ থেকে আসত কত রকমের রঙ। প্রাচীন গির্জার জন্য প্রয়োজন হত মিশরের স্বর্ণখচিত রেশমী কাপড়। আবার মিশরের মসজিদের জন্য প্রয়োজন ছিল ভেনিসিয়ার কারখানায় তৈরী আলোকাধারের বা লণ্ঠনের। কর্ণওয়ালের টিন, রাশিয়ার পশুলোম, চীনের পোর্সিলেন—সব কিছুরই চাহিদা ছিল অসামান্য। দক্ষিণ সাগর সৈকতের নুনের চাহিদা ছিল অত্যন্ত বেশী। বাল্টিক সাগর কূলের কড আর হেরিং মাছের ব্যবসায়ে ঐ নুনের প্রয়োজন হত। সমগ্র পৃথিবী জুড়েই চাহিদা ছিল প্রাচ্যের নানা মুখরোচক মশলার—যেমন লবঙ্গ, এলাচ দারচিনি ইত্যাদির। আর

চাহিদা ছিল নানা আকৃতির মণিমুক্তার। তাই পাশ্চাত্ত্যের লোভী ব্যবসায়ীরা দস্যুর মত ছুটে আসতে চেয়েছে যুগে যুগে প্রাচ্যের ভাণ্ডার লুঠ করতে।

সময়ের আবর্ত্তনে আর অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ের ফলে কতকগুলি পথ হয় নির্দিষ্ট আর চিহ্নিত। প্রাচ্যের কোন সুদূর শহর থেকে তাই একটি পথ চলে গেল এশিয়া মহাদেশে সর্বত্র। চীন আর পারস্যের রেশম বস্ত্রের সুনাম ছিল অত্যন্ত বেশী। তাই চীনদেশের কানসু থেকে গোবি-মরুভূমির দুর্গমতাকে অগ্রাহ্য করে স্থাপিত হল সেকালের শ্রেষ্ঠ রেশম ব্যবসায়ের পথ। মার্কো পোলোর বিবরণ থেকে জানা যায় এই পথ তের শতকেরও আগে থেকে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা জানত। কাশগর নামক জায়গায় ঐ রাস্তা মিলিত হয়েছিল অন্য আর একটি রাস্তার সঙ্গে। যে রাস্তা চলে গিয়েছে সেকালের বিখ্যাত কার্পেট ব্যবসায়ে কেন্দ্র বুখরায়। আবার দক্ষিণের আর একটি পথ গিয়েছে ইয়ারখণ্ড হয়ে পারস্য আর মেসোপটেমিয়ায়।

মধ্যযুগে সবচেয়ে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল মধ্যপ্রাচ্য, বাণিজ্য আর পরিবহনে। এর কারণ প্রাচ্য আর পাশ্চাত্ত্যের মধ্যস্থলে এর অবস্থিতির জন্য। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে জলপথে যোগাযোগ ছিল চীনের, জাবার, সুমাত্রার আর ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের। যে পথের শেষ হয়েছিল বিখ্যাত আতরের জন্মস্থান বসরায়। প্রাচীন সে যুগেও, কালিকট, ব্রোচ আর ক্যাম্বের রঙ, মশলা আর দামী পাথরের চাহিদা ছিল অসামান্য। এই সব জিনিসের প্রধান বাজার ছিল প্রাচীন ঐতিহাসিক ব্যাবিলনে। আশ্চর্য্য আর অকল্পনীয় মনে হলেও সে যুগে পশ্চিম এসিয়ার প্রধান বাণিজ্যের বাজার ছিল জাঁকজমকপূর্ণ মেসোপটেমিয়া আর পারস্যের অন্যান্য সহর। এই সব সহরের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল আরব্য রজনীর বিখ্যাত সহর বাগদাদ—মুসলিম ধর্মের পীঠস্থান। এইখানেই বাস করতেন খলিফা হারুণ-অল রসিদ। যার নাম অমর হয়ে আছে কাব্যে আর কাহিনীতে। এখান থেকেই পশ্চিমে চলে গিয়েছিল দুটি বিখ্যাত পথ। একটি অটোমান সাম্রাজ্যে বিস্তৃত, আর অন্যটি ইউফ্রেটিস নদীর তীর হয়ে দামস্কাস পর্য্যন্ত। এইটিই ছিল বিশ্বের প্রাচীনতম পথ। দামাস্কাস থেকে পথটি চলে গেছে জেরুজালেম ও কায়রোর দিকে। মাসে মাসে এনসেভ বা ধর্মযুদ্ধের জন্য পথটি ব্যবহার না হওয়ায় অন্য আর একটি পথের সৃষ্টি হয়। এই পথ চলে যায় প্রাচীন কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত। এখানেই জমা হত প্রাচ্যের বহু বহু বাণিজ্য সম্ভার! প্রাচীন রোমের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায় কনস্টান্টিনোপল। এখানে প্রস্তুত হত বিখ্যাত জরির আর বোনার কাজ।

বর্ত্তমানের মত সে যুগেও ছিল বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রাচ্যের ব্যবসায়ের স্থান ছিল কনস্টান্টিনোপল আর প্রতীচ্যের ভেনিস। কালের সঙ্গে সঙ্গে ভেনিসের সুনাম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কনস্টান্টিনোপলের সুনাম ব্যাহত হয়ে যায়। ফলে নষ্ট হয়ে যায় বিশ্বের একটি প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্র।

বর্ত্তমান কালের মতই সে যুগের বাণিজ্যে ছিল জলপথই প্রধান। কারণ পরিবহন খরচ এতে ছিল কম। যদিও বিপদ ছিল অসীম। খারাপ আবহাওয়া আর জলদস্যুর আক্রমণ ছিল সাধারণ ঘটনা। বন্দরে বন্দরে করের হার ছিল অত্যধিক। কায়রোর সুলতান এর ফলে বাৎসরিক চার কোটি টাকা কর আদায় করতেন। অন্যান্য জায়গাতেও ছিল বহু কর আদায়ের কেন্দ্র।

এইভাবেই মানুষ নতুনের আহ্বানে চিরকাল ছুটে চলেছে। তার চাহিদার ফলেই আবিষ্কৃত হয়েছে বাণিজ্য আর পরিবহনের নতুন নতুন উপায় আর পথ। আবিষ্কৃত হয়েছে বাষ্পীয় পোত, মোটর আর বিমান। সহজ হয়েছে গন্তব্যস্থল। তবুও স্বীকার করতেই হবে প্রাচীন সে যুগেই শুরু হয় মানুষের জয়যাত্রা।

আমার মনে পড়ে

শ্রীপান্নালাল ধর এম-এ; আই-পি-এস্

প্রাতরাশে বসিয়াছি। স্ত্রীর প্রতি তাকাইয়া দেখিলাম মুখে যেন একটু বেশী হাসি। অকারণে একবার হাসিয়াও উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন, না কিছু না। অকারণে চামচ দিয়া পেয়ালায় টুন্‌টুন্ আওয়াজ তুলিলেন। লক্ষ্য করিলাম, শাড়ীটি যেন আজ একটু বেশী পরিপাটি। চুড়ীগুলিও যেন একটু বেশী ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। মস্তকের বামপার্শ্বে একটি পুষ্পগুচ্ছ গোঁজা আছে দেখিলাম। এবার চশমার ফাঁক দিয়া তীর্য্যগ্ দৃষ্টি হানিয়া দেখিলাম—খোঁপাটিও বেশ শক্ত করিয়া বাঁধা অর্থাৎ কাঁটাগুলি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইবার ভয় নাই। তদুপরি খোঁপাটিকে জড়াইয়া একটি শুভ্র যুঁই ফুলের মালা।

চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। খবরের কাগজে ইহার কারণ নিশ্চয় লেখা হইবে না। কাজেই উহা সরাইয়া রাখিলাম। ইত্যবসরে আমার ত্রয়োদশীয়া কন্যা দুইটি পুষ্পস্তবক দিয়া কহিল, "Dad and Mum, congratulation on your 15th marriage anniversary" দ্বিতীয়া কন্যা যোগ দিয়া কহিল, "And many happy returns."

চম্‌কিয়া কন্যাদ্বয়ের প্রতি তাকাইয়া রহিলাম। ধীরে ধীরে ১৫ বৎসর পূর্ব্বের একটি দ্বিপ্রহরে ফিরিয়া গেলাম।

খর সূর্য্য দিল্লীর বারখাম্বা রোড পুড়াইয়া দিতেছিল। মোটর সাইকেলে যাইতেছিলাম। হঠাৎ কল বিকল হইয়া গেল। দৈত্যটাকে টানিতে টানিতে রাস্তার পাশে দাঁড় করাইয়া কপালের ঘাম মুছিতেছিলাম। এমন সময় শুদ্ধ হিন্দীতে নারীকণ্ঠে প্রশ্ন শুনিলাম, "ক্যা, ম'য় কুছ্ মদৎ কর্ সেকতী ?" জনমানবশূন্য রাস্তায় নারীকণ্ঠ শুনিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম। প্রশ্ন কর্ত্রীকে দেখিলাম শালোয়ার কামিজ পরিহিতা অষ্টাদশী তরুণী, দক্ষিণ হস্তে পুস্তক দিয়া রৌদ্রতাপ এড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন। ভঙ্গীমাটি ভাল লাগিয়াছিল। নিজেকে সামলাইয়া সাইকেলটিকে দেখাইয়া কহিলাম। "জী, আগর মেহের-বানিসে দোচার মিনিট ইস্‌কো দেখ্‌ভাল্ করেঁ তো এক মিস্ত্রী বুলালুঁ।" মিস্ত্রী আনিয়া দেখিলাম শ্রীমতীজী বিকল সাইকেলটি সম্পূর্ণ দখল করিয়া উহার pilion seat অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। আজ মনে পড়িতেই হাসিয়া ফেলিলাম।

কিন্তু।

১৫ সেকেণ্ড, ১৫ মিনিট, ১৫ দিন, ১৫ মাস, ১৫ বৎসর। মহাকালের বড় ঘড়িটা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া চলিয়াছে। সে ঘড়িতে দম লাগে না। সে ঘড়ি কোন দিন বিগড়ায় না। হিমের রাতে পাতাঝরার শব্দে কাহারও ঘুম ভাঙ্গে না। পাতা দেখা যায় প্রত্যুষে, মালী যখন পাতাগুলি জড় করিতে আসে। জীবনবৃক্ষ হইতে কত পাতা রাতের পর রাত ঝরিয়া পড়িল, ঘুম কিন্তু ভাঙ্গে নাই। আজ কন্যা দুইটি যেন ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল। ফুল-গুলি লইয়া কন্যা দুইটির শিরশ্চুম্বন করিয়া স্ত্রীর প্রতি তাকাইলাম। দেখিলাম উহার চক্ষু দুইটি চিক্ চিক্ করিতেছে।

চায়ের পেয়ালায় মুখ দিলাম। হৃদয় কিন্তু উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। স্মৃতি-সরযূতে আজ মন্থন শুরু হইয়াছে। আজ যেন উহা উজান বহিয়া চলিয়াছে। কত বৃক্ষ, কত তীর্থ, কত দৃশ্য উহার দুইকূলে। ইহাকে স্পর্শ করিয়া, উহাকে শিরশ্চুম্বন করিয়া, কোথাও বা একটু থামিয়া কুলুকুলু কলগুঞ্জন তুলিয়া পুনরায় ছুটিয়া চলিয়াছে। বিস্মৃতির শুষ্ক বালুরাশি আজ আর উহাকে ধরিয়া রাখিতে

পারিতেছে না। দিল্লী, আগ্রা, ব্যাঙ্গালোর, পুণা, বোম্বে, পেশোয়ার, করাচী, কোহাট্, রাজমক্, পরাচীনর, আম্বালা, ইম্ফল, আরও কত জায়গা। নানা জায়গার চিত্রবিচিত্র যে মণিকোঠার অন্দর-মহলে আঁকা হইয়া রহিয়াছে আজ তাহা দেখিতেছি।

আম্বালায় আসিলেন অমলা। ভুরু ও গুম্ফের ঈষৎ সংকোচন ও বিস্তারে যে বিদ্রূপের সৃষ্টি হয় তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিলেন। লাহোরে আসিলেন মৃদুলা। অপূর্ব রূপসম্ভারে ডালি সাজাইয়া পাইপের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অনিশ্চিতের ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হইয়া তিনি বিদায় লইলেন। পুণায় আসিলেন নৃত্যপরা চটুলা লাস্যময়ী ললিতা। মদিরার উচ্ছল ফেনরাশির সহিত তিনিও মিলাইয়া গেলেন। যৌবনের দ্বিপ্রহরগুলি এই-ভাবে আগুনের হলকা ছড়াইতে ছড়াইতে কাটিতেছিল।

একটি রাতের কথা আজ বেশ মনে পড়ে। পশ্চিমের এক ফৌজী ক্লাবে মহিলাটিকে দেখেছিলাম। যৌবনে শরীর সমুদ্রে যে তরঙ্গ দুইটি উঠিয়াছিল তাহা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। অনর্গল কথা বলিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে হাত দুইটি নাড়িতেছেন যেন ভারতনাট্যমের নানা প্রকারের মুদ্রা দেখাইতেছেন। মুখে যদিবা "এতটুকু" বলেন, তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ একত্রিত করিয়া তাহা আবার বুঝাইয়া দেন। শাড়ীপরিহিতা হইলেও দৃশ্যভাবে একটি পা অন্য একটি পায়ের উপর রাখিতেছেন। পরে হস্তদ্বয় জানুদেশে চাপ দিয়া মুখখানি সম্মুখে আগাইয়া কথাগুলির উপর emphasis বা জোর দিতেছেন। মাঝে মাঝে চক্ষুর উপর চক্ষু রাখিয়া হঠাৎ হাসিয়া নিশ্চুপ বসিয়া থাকিতেছেন। তখন মনে হইত চক্ষু দুইটি এক কালে কথা কহিতে পারিত।

'ডান্‌সে'র সময় মহিলাটি যখন চোখের উপর চোখ রাখিতেন, অধরে তখন হাসি থাকিত মৃদু, ওষ্ঠ হইত ঈষৎ স্ফুরিত। শরীর তিনি সম্মুখে মেলিয়া ধরিতেন।

একদিন শেষরাতে নাচের শেষে তিনি বলিলেন, আমাকে বাড়ী রেখে আসবে নটি বয়?

কেন জানিনা রাজি হইয়া গেলাম। বাড়ী পৌছিলে তিনি আমাকে ভিতরে ডাকিয়া বসাইলেন। Drink দিয়া ভিতরে গেলেন, "এখুনি আস্‌ছি বলে।"

গেলাসে মুখ লাগাইয়া এলোমেলো কথা ভাবিতে-ছিলাম। মধ্যরাত্রে একটি সুন্দরী মহিলাকে বাড়া পৌছাইবার সময় যেসব দৈত্যদানব মনের আস্তাকুঁড়ে দাপাদাপি করিয়া বেড়ায় তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিবার বয়স আমার তখন হইয়াছে।

পশ্চাতে খুট করিয়া শব্দ হওয়াতে তাকাইয়া দেখিলাম, দেখিলাম, বাহিরে বারান্দায় অস্পষ্ট আলোকে একটি তরুণী দাঁড়াইয়া, হাতে আমার টুপী ও গরম ওভারকোট। বাহিরে আসিলে তরুণী কহিলেন, "যার সঙ্গে এসেছেন তিনি আমার মা। এই আপনার কোট, এই আপনার টুপী, ঐ সামনে গেট", বলিয়া অঙ্গুলী সংকেতে গেট দেখাইয়া দিলেন। অস্পষ্ট আলোকে তাহার চক্ষু দুইটি হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলিতেছিল। আজিও যেন দেখিতে পাই।

* * *

কত কথাই না মনে পড়ে। মনে পড়ে নতুনদিকে।

নতুনদি।

সেই নতুনদি, শৈশবে যাহার কথা শুনিয়াছি।

কৈশোরে যাঁহাকে দেখিয়াছি বকুল তলায়।

যৌবনে তাঁহাকেই দেখিলাম আমার গৃহপ্রাঙ্গণে। সেদিনের কথা বুঝি কোনদিনই ভুলিব না।

বর্ষা নামিয়াছে। বাংলার বর্ষা। জলভারে আকাশটা সেদিন অনেকখানি নীচে নামিয়া আসিয়া অশ্বত্থ ও তাল গাছ দুইটির মাথা প্রায় ছুঁইয়া ফেলিয়াছে। উহাদের ফাক দিয়া দূরে নারিকেল গাছটার মাথাটাত' প্রায় দেখাই যাইতেছে না। অজস্র জলধারা নামিয়াছে, তালগাছ বাহিয়া, বটগাছ বাহিয়া, কলাগাছের পাতা বাহিয়া। আকাশ নিঃশেষে নিজেকে ঢালিয়া দিয়া যেন বলিতেছে— 'শান্ত হও, শান্ত হও, শান্ত হও। আমার জলে যদি তোমার মুখে হাসি ফোটে তবে তাই নাও, তাই নাও, তাই নাও।'

ক্রন্দসী বসুন্ধরার হতাশ্বাস বারিধারায় বুঝিবা ধুইয়া যাইবে। আকাশের নৈকট্যে দুঃখ, ক্লেশ, জ্বালা বুঝিবা আর থাকিবে না। সব কিছু ধুইয়া যাইবে, ক্লেদ যাইবে, ক্লান্তি যাইবে, মালিন্য যাইবে।

পূবের জানালা দিয়া বারিধারা দেখিতেছিলাম।

বুঝিবা একসময় তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম। চমক ভাঙ্গিল বাহির বারান্দায় যখন কে গাহিয়া উঠিল—

ভালই যদি বাসবি ভবে
ভালবাসার লোক খুঁজে নে
(নইলে) ভাল'র ভাল পাবি না যে
আপন মনে মরবি কেঁদে।
দিন ফুরাবে সন্ধ্যা হবে
(ও তোর) কেউ যে কাছে রইবে নারে
শেষের দিনে কার কোলে তোর
ভবের বোঝা হালকা হবে।

বুকের ভিতরটা কেমন যেন মুষড়াইয়া উঠিল। ছুটিয়া বাহিরে অসিলাম, দেখিলাম নতুনদি।

স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি,

হাতে একতারা।

রুদ্ধশ্বাসে ডাকিলাম, "নতুনদি তুমি ?"

নতুনদির গান থামিয়া গেল।

তিনিও কম বিস্মিত হন নাই। ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া আমার দিকে আগাইয়া আসিলেন। কাছে আসিয়া আমার দিকে তাকাইয়াই হাসিয়া ফেলিলেন।

কহিলেন "আরে, ভাইটি যে। আজ ত' নাড়ু নেই ভাই, কি দেব তোমায় ?"

নতুনদির হাতদুটি ধরিয়া কহিলাম, "তুমি এসেছ এই আমার সৌভাগ্য। আর যখন এসেছ তখন তোমার হাতের নাড়ুও জুটবে নিশ্চয়।"

নতুনদিকে লইয়া ভিতরে আসিলাম। একবার ভাল করিয়া তাহাকে দেখিলাম। নদীতে অস্তরাগ পড়িলে স্রোতধারা যখন চিক্‌মিক্ করিতে থাকে তখন কেহ যদি প্রশ্ন করেন, সৌন্দর্যটি কাহার ? অস্তরাগের না স্রোত-ধারার ? তখন কোন সদুত্তর আশা করা যায় না। কিন্তু সমস্ত মিলিয়া যে একটি বিরাট শান্ত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয় তাহা অনুভব করিতে মোটেই কষ্ট হয় না। তেমনি জীবন স্রোতে যখন যৌবনের অস্তরাগ পড়িপড়ি করে তখন এমনি দুর্লভ ঝিলিমিলি সৌন্দর্য্যের দেখা মেলে।

মুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, "তুমি কিন্তু তেমনি সুন্দর আছ নতুনদি।"

নতুনদি খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসি আর থামিতে চায় না। চোখ দুটিতেও বিদ্যুত খেলিয়া গেল। কিন্তু সে বিদ্যুতে জ্বালা ছিল না। মাত্র চিক্‌মিক্ করিয়াই মিলাইয়া গেল। হাসি থামিলে কেবল কহিলেন, "সত্যি ?"

মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, "হ্যাঁ।"

ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। ভৃত্য বাতি দিয়া গেল। এবার নতুনদি আমাকে ভাল করিয়া দেখিলেন।

বলিলেন, "তুমি কিন্তু বেশ বড় হয়েছ ভাই।"

হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাই বুঝি ?

নতুনদি মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, "হঁা।"

পরে খানিকক্ষণ মাটির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া আমাকে কহিলেন, "আমাকে ত এবার যেতে হয় ভাই।"

"সে কি, কেন ?" জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলাম।

কহিলেন, "এখানে থাকলে তোমার বদনাম হবে যে।"

এবার হাসিয়া ফেলিলাম। কহিলাম, "বদনাম অনেক হয়েছে নতুনদি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, নতুন করে কিছু হবে না।"

নতুনদি কহিলেন, "কিন্তু আমার যদি বদনাম হয় তবে ?

কহিলাম, "যদুদাকে আনিয়ে নেব।"

যদুদার নাম শুনিয়া নতুনদি ভীষণ চমকাইয়া উঠিলেন। বাম হাতে অজান্তে ডান বুকটা চাপিয়া ধরিলেন। পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "তাঁকে ত আর পাবে না ভাই।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন পাব না ? কি হয়েছে তাঁর ?

নতুনদি বহুক্ষণ পাথরের মত নিশ্চল বসিয়া রহিলেন। পরে মৃদু স্বরে কহিলেন, "শিল্পী তিনি, সুন্দরের পূজারী। তোমার নতুনদির এমন কি আছে যে চিরকাল তাকে ধরে রাখতে পারবে ?"

চীৎকার করিয়া উঠিলাম। কহিলাম, "মিছে কথা নতুনদি, তুমি ত' তেমনি সুন্দর আছ।"

নতুনদি এবার হাসিতে চাহিলেন। কিন্তু চক্ষু দুটিতে জল আসিয়া হাসিতে বাধা দিল। বলিলেন, "দূর বোকা, ভাইয়ের কাছে নতুনদির সৌন্দর্য্য আর শিল্পীর কাছে নারীর সৌন্দর্য্য কি এক জিনিস রে।"

মাথা হেঁট হইয়া গেল। বুঝিলাম যদু বোষ্টম নতুনদিকে ছাড়িয়া গিয়াছে। মন কিন্তু একথা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। তাই জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কেমন করে হ'ল নতুনদি ?"

নতুনদি বাহিরে অন্ধকারের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর কহিলেন, "ছুটির দিনে যে বকুল গাছ তলায় তুমি বসে থাকতে, একদিন দেখি তোমার যদুদা আর আন্নু বোষ্টমী সেখানে বসে আছেন! কাছে গিয়ে দেখি আন্নু বোষ্টমীর হাতদুটি তোমার যদুদার হাতে ধরা পড়েছে। এক মিনিট দাঁড়িয়ে দেখলাম, পরে বাড়ী ফিরে এলাম।"

নতুনদির চোখদুটি চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিল। একটু থামিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "ওদের বেশ মানিয়ে ছিল রে।"

দেখিলাম মুক্তার মত দু ফোঁটা জল চোখ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার পর ?"

কহিলেন, "তার পর আবার কি ? বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম আমার রাখাল রাজ আছেন। আমার আবার ভাবনা কি ?"

নতুনদি থামিলেন।

বাতাসের ঝাপটায় বাতি হঠাৎ নিভিয়া গেল।

বাহিরে অজস্র বারিধারার শব্দ।

ভিতরে কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত্ত। হঠাৎ অন্ধকারে একতারা বাজিয়া উঠিল,—

একতারা তার একতারে নয়
দুই তারে সে যে বাঁধা
ও তোর একতারে গান নন্দদুলাল
অন্যতারে বাঁধা রাধা
ও তুই বাজাস যত বাজবে তত
শুধুই রাধা রাধা।

নতুনদি গাহিয়া চলিয়াছেন। কণ্ঠ হইতে সুরতরঙ্গ একটির পর একটি বাহির হইয়া আসিতেছে। চম্পক অঙ্গুলী একতারার তারে সুরজাল সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

অতি সন্তর্পণে বাতি জ্বালাইয়া দেখিলাম নতুনদির চক্ষু দুইটি হইতে অঝোরে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। মুছিয়া দিবার কেহ নাই। মুছিবারও তাড়া নাই। নিশ্চুপ বসিয়া রহিলাম। মন কিন্তু চলিয়া গেল ফেলিয়া আসা দিনগুলির প্রতি।

ক্ষুদ্র একটি শহর। তাহারই এককোণে ক্ষুদ্রতর একটি বাড়ী। মহাড়ম্বরে লেখাপড়া মাত্র আরম্ভ করিয়াছি। বহির্জগতে বহির্জগৎ—মনোরাজ্যে মাত্র তুলি বুলান আরম্ভ করিয়াছে। আমার মনোরাজ্যে যাহারা তুলি বুলাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে যদুবোষ্টম ছিলেন অন্যতম। পাড়ার দুইমাইল দূরে যেখানে ডাকাতে জঙ্গল শুরু হইয়াছে তাহারই এককোণে যদুবোষ্টম কুঁড়ে তুলিয়া নীড় বাঁধিয়াছিলেন। কি শীতে, কি গ্রীষ্মে, কি বর্ষায়, ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটিতেই যদুবোষ্টম নামকীর্তন করিয়া পাড়া পরিক্রমা করিতেন। দূর হইতে যেমন তিনি নিকটতর হইতেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরও তেমনি অস্পষ্ট হইতে স্পষ্ট ও স্পষ্টতর হইত। আমিও নিদ্রা হইতে তন্দ্রায় ও তন্দ্রা হইতে জাগিয়া উঠিতাম। গলায় তুলসীর মালা, হাতে খঞ্জনী সদাহাস্যময় শ্যামবর্ণ মানুষটি চোখের সামনে যেন ভাসিয়া উঠিত। অন্যদিকে নিদ্রার মধ্য দিয়া নামধ্বনি সলিতার মত পাতলা হইয়া হৃদয়ে ঢুকিয়া তোলপাড় শুরু করিয়া দিত। পাশে ছোট ভাইটি তখনও অকাতরে ঘুমাইত। কেবল মাতা ঠাকুরাণী উঠি উঠি করিতেন। পূবের জানালা দিয়া বেলগাছটি অস্পষ্ট দেখা যাইত। ওদিকে তাকাইতাম না, পাছে ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়া ফেলি। শীতের প্রত্যূষে দক্ষিণের শিউলী গাছতলাগুলি ঝরাফুলে ভরিয়া থাকিত। গ্রীষ্মে চাঁপা গাছটি অন্ধকার থাকিতেই সুগন্ধ ছড়াইত। বর্ষার বারিধারার টিপ্‌টিপ্ ঝুপ্‌ঝুপ্ শব্দ যদুদার নামগানের সহিত সমানে তাল রাখিয়া চলিত।

যদুদার কুটীরে কোনদিন যাই নাই। কারণ ভ্রাতাদের কঠিন নিষেধ ছিল। কিন্তু কুটিরটির বাহিরে প্রাঙ্গণের দক্ষিণে যে বকুল গাছটি ছিল ছুটির দিনে দ্বিপ্রহরে তাহার তলায় বসিয়া কাটাইতাম। একদিন বসিয়া বিশ্বের ভাবনায় মগ্ন হইয়া গিয়াছি। হঠাৎ চাহিয়া দেখি একটি মহিলা সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। চমকিয়া উঠিতেই মহিলাটি হাতের রেকাব ও গেলাস মাটিতে রাখিয়া কহিলেন। কি ভাই ধ্যান ভাঙল ? নাড়ু দুটি খেয়ে নাও, তারপর গল্প করা যাবে।

সেই নাড়ুর কথাই আজ নতুনদি ঠাট্টা করিয়া বলিলেন। কি গল্প সেদিন করিয়াছিলাম তাহা আজ মনে নাই। তবে তাঁহার চক্ষু দুটিতে সেই মায়া, সেই যাদু দেখিয়াছিলাম—যাহা দেখিতাম আমাদের ধবলী গরুটির দুই চোখে। মায়ের কোলে দুরন্ত শিশু বুঝি বা ঐ চোখ দুটিতে চোখ রাখিয়া ধীরে ধীরে আপন চক্ষু মুদিয়া ফেলে।

যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "নতুনদি, তোমাদের বাড়ী যাওয়া আমাদের নিষেধ কেন ?"

তখন ঐ চোখ দুইটি হইতে দুফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু চকিতে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন,"সব বাড়ীতেই কি সবার যেতে আছে ভাই ?

সেদিন বুঝি নাই যে নতুনদির চোখ দুইটিতে মেঘ ঘনঘটা করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মাত্র দুফোঁটা জলই তিনি ফেলিতে দিয়াছিলেন। বাকিটুকু একটুকরো রাম-ধনুর হাসি হাসিয়া ঢাকিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। সেদিন হাসিটুকুই দেখিয়াছিলাম। হাসির পিছনে জল দেখিবার বয়স আমার তখনও হয় নাই। আজ বুঝিতে পারি সব হাসি কিন্তু হাসি নয়।

—সেই নতুনদি।

গান কখন থামিয়াছে জানি না। নতুনদির কণ্ঠস্বরে জ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম। নতুনদি তখন কহিতেছিলেন, "ছিঃ ছিঃ লজ্জার কথা। ভাইটির কাছেও ধরা পড়ে গেলাম।"

কিছু পূর্বে বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। আবার অশ্রান্ত আবেগে বৃষ্টি শুরু হইল। একতারা নামাইয়া রাখিয়া নতুনদি জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। বৃষ্টির ঝাপটায় ঘর ভাসিয়া যাইতেছিল। বাতির সলিতা একটু উসকাইয়া দিতেই ঘর আলোয় ভরিয়া গেল। সেই আলোয় নতুনদি'কে নূতন করিয়া দেখিলাম। কুন্তল বাঁধা গুচ্ছে গুচ্ছে কাণ দুটির পাশ দিয়া সামনে নামিয়া আসিয়াছে। তাহার মাঝে নতুনদির মুখখানি আরও সুন্দর দেখাইতেছিল।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, আচ্ছা নতুনদি ; তুমি যদুদাকে সত্যি সত্যি ভুলতে পেরেছ ?

নতুনদি আবার চমকাইয়া স্থির হইয়া গেলেন। মনে হইল বুকের মধ্যে কি যেন খুঁজিলেন। পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "কি জানি ভাই, বুঝি বা হেরে গেলাম। প্রেমই বল, আসলে কিন্তু নিষ্প্রাণ পায়ে ফুল দিয়ে তৃপ্তি হয় না। মন চায় রক্তমাংসের দুটি পা।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তাই বুঝি ঠাকুর আসেন বারবার মানুষের রূপ ধরে।

বাহিরে বারিধারা অশ্রান্ত আবেগে পড়িতেছিল। যখন থামিল, নতুনদি তখন চলিয়া গিয়াছেন।

কলকাতা—জানুয়ারী'৬৪

অমিতাভ বসু

পাঁচটায় নীরবতা মানুষেরা আবদ্ধ খোঁয়াড়ে
শীতের সন্ধ্যাটা যেন মৃতের মতন,
চাপ চাপ ধোঁয়া আর কুয়াশায় ঘিরে
শহরের বুকে যেন ধরেছে পচন।
কার্ফু, মিলিটারী বুটে বেয়নেটে
শহরের বুকটাই গেছে যেন ফেটে,
পার্কে বকুল গাছে বসন্ত স্বপন

কৈ ভাবে আজ আর মানুষের মন।
ফুলের কেয়ারী আর ধুপের সুভাব
কাঁসর ঘণ্টা আর মসজিদে নামাজ
সব ভুলে মানুষের মনে দেখি আজ
হিংসার সে কি এক মত্ত প্রকাশ।
তবু জানি একদিন এর হবে শেষ
হিন্দু না মুসলিম—এ আমার দেশ॥

সেকালের বেলগাছিয়া ভিলা

সঞ্জীবকুমার বসু

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা থেকে সোজা পূব দিকে যে রাস্তা চলে গেল দমদমের দিকে, সেই পথে খানিকটা গেলেই ডান দিকে দেখতে পাওয়া যাবে বিরাট বাগান-বাড়ী সহ এই 'বেলগাছিয়া ভিলা'কে। সেকালে এই পথ দিয়ে বহু গণ্যমান্য লোক যাতায়াত করতেন, ধরতে গেলে তাঁদের মধ্যে সবাই এই ভিলাতে একবার না এসে থাকতে পারতেন না। বহু মনীষীর পায়ের ধূলো পড়েছে এই বাড়ীতে। বহু ঘটনা জড়িয়ে আছে এখানকার মাটিতে। বাঙ্গালী যতদিন বেঁচে থাকবে তার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ততদিন বেলগাছিয়া ভিলার নাম লেখা থাকবে। শত বছর আগে এখান থেকেই শুরু হয়েছিল বাংলা নাট্যশালার আন্দোলন। বিস্মৃতির তলে তলিয়ে গেছে সেই সব দিনের কথা। কিন্তু ইতিহাস তো অস্বীকার করা যায় না, সে যে যুগ যুগ ধরে কথা বলে যাবে—আর সেই কথাই পরবর্তী যুগের লোকদের শুনতে হবে।

সেক্সপীয়ার বলেছেন—এ জগৎটাই রঙ্গমঞ্চ, আর প্রত্যেক মানুষই এই রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা। এই সংসার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার জন্য কোন কোন অভিনেতা এমন রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন যে, শত বছর পরেও মানুষ তাকে দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করে, স্মরণ করে সেই সব অভিনেতাকে—যাঁদের বৈশিষ্ট্যের কথা ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা থাকে। বেলগাছিয়া ভিলা এই রকম একটা ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চ।

যে দিন এবাড়ীতে প্রথম এলাম—সেদিন মনের মাঝে ভেসে উঠল সেই সব দিনের কথা। সমস্ত বাড়ীটা ঘুরে ফিরে দেখলাম, আর মনে হতে লাগল—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নাটুকে রামনারায়ণ, প্যারীচরণ মিত্র, মহারাজা বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন ও রাজা সৌরেন্দ্র-মোহন ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মনমোহন বসু এবং গৃহস্বামী প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের কথা। আরও মনে পড়ে গেল অষ্টম এডওয়ার্ড, যুবরাজ ও যুবরাণী প্রভৃতি রাজপুরুষদের এই বাড়ীতে আসা-যাওয়া ও সম্বর্দ্ধনার কথা।

১৮৫৭ সালের ১লা জুলাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ দুশো বিঘা বাগান বাড়ী সহ এই 'বেলগাছিয়া ভিলা' কিনে নেন। এই বাড়ীর পূর্ব্ব নাম ছিল 'অকল্যাণ্ড ভিলা।' তখন এর মালিক ছিলেন ওয়ারেন্ হেষ্টিংস। কোম্পানীর আমল থেকেই এই বাড়ীর ইতিহাসের সূত্রপাত। প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র দুই ভাই ছিলেন কান্দি ও পাইকপাড়া রাজকুলের বংশধর। এঁদের ডাক নাম ছিল হরিমোহন ও রামমোহন। নবাবী আমলের পর থেকেই এই রাজবংশের পত্তন হয় এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের আমল হতে কান্দি ও পাইকপাড়া রাজবংশ ধন-সম্পদে ফেঁপে উঠে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ ছিলেন খাঁটি হিন্দু। নিজের জন্মভূমি কান্দিতে তিনি 'শ্রীশ্রীরাধা-বল্লভ জিউ' বিগ্রহের সেবার বিশেষ ব্যবস্থা করেন এবং আজও সেই বিগ্রহ কান্দিতে প্রতিষ্ঠিত আছে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃভক্তি ছিল প্রবল। মায়ের শ্রাদ্ধে তিনি হাজার হাজার লোককে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়ন করেন। ধনী দীন সবাই এই উপলক্ষে তাঁর বাড়ীতে সমবেত হন। তখন সমস্ত দেশেই একটা বিরাট হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল যে, গঙ্গাগোবিন্দের মায়ের শ্রাদ্ধ। এই উপলক্ষে তিনি ২০ লক্ষ টাকার উপর ব্যয় করেন। তাছাড়া ঘোড়ার ডাক বসিয়ে সুদূর পুরী থেকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ এনে তিনি মাতৃশ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁর পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণকে সোনার পাত্রে নিমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়ে সে যুগে কান্দী ও পাইকপাড়া রাজবংশের গৌরব বাড়িয়েছিলেন। আর সেই পৌত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ একদিন হঠাৎ রজক

কন্যার 'বেলা যে যায়' ধ্বনি শুনে রাজবংশের বিপুল বৈভব, মান-সম্ভ্রম, প্রিয়তমা পত্নী কাত্যায়নী দাসী ও শিশুপুত্র কুমার শ্রীনারায়ণ সিংহের আকর্ষণ মৃৎপাত্রের মত দুই পায়ে ঠেলে রাধা কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হয়ে বৈরাগীর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে চলে যান এবং 'লালাবাবু' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। লালাবাবু বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জিউ, শ্রীমতী রাধা ও ললিতা সখী পরিবেষ্টিত মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে রোজ অতিথি সেবার ব্যবস্থা করা হয়। লালাবাবু প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর কুঞ্জে অতিথি সেবার ব্যবস্থা থাকলেও তিনি দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত কুঞ্জের অন্ন-গ্রহণ করিতেন না। বৈরাগীর বেশে নিত্য নূতন শুধু মাত্র একটি দ্বারে "মাধুকরী" করে ভিক্ষার অন্নে জীবনধারণ করতেন এবং সেই অন্নই লালাবাবুর অন্ননামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যে দিন তিনি ভিক্ষা পেতেন না সে দিন উপবাসী থাকতেন।

লালাবাবুর জীবনের আরও একটি ঘটনা শুনা যায়। কোন একটা ব্যাপার নিয়ে পিতার সঙ্গে তাঁর একবার মনোমালিন্য হয়, তখন লালাবাবু শোভাবাজার রাজবাড়ীতে চলে আসেন এবং কিছুদিন সেখানে থাকার পর তিনি পুরীতে গিয়ে পুরীর রাজার অধীনে চাকরী নেন। কয়েক বছর পর লালাবাবু পুরীর রাজার সমস্ত সম্পত্তি কিনে নেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন লালাবাবু পিতার মৃত্যু সংবাদ পান, তখন রাজাকে সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে তিনি বৃন্দাবনে চলে যান। পিতার মৃত্যু খবর শুনে তিনি আরো ব্যাকুল হন। জীবনের প্রাচুর্য্য লালাবাবুকে দিতে পারেনি শান্তি, তাই গৃহ ছেড়ে গৃহের বাইরে একান্ত নির্জ্জনে ভগবৎপ্রেমে মত্ত হয়ে তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন।

দিল্লীতে তখন বাহাদুর শা'য়ের রাজত্ব। লালাবাবু বৃন্দাবনে এসে শুনতে পান কিছুলোক বাহাদুর শা'কে গিয়ে নালিশ করেছেন যে, লালাবাবু দেশদ্রোহিতার কাজ করেছেন। এই অভিযোগে বাহাদুর শা তাঁকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। বৃন্দাবনে এসে বাহাদুর শা'র লোকেরা যখন লালাবাবুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান, সেই সময় তাঁর সঙ্গে প্রায় ২১ হাজার ভক্ত দিল্লীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। লালাবাবুর সঙ্গে এত লোক এসেছে শুনে তো বাহাদুর শা অবাক হলেন। তিনি বললেন—যে লোকের পিছনে এত জনসমর্থন থাকতে পারে তিনি তো দেশদ্রোহী হতে পারেন না। বাহাদুর শা'র নির্দ্দেশে যথাসময়ে লালাবাবুকে দরবারে উপস্থিত করা হল। তাঁর সৌম্য মূর্ত্তি দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। বাদশা বিনীত ভাবে লালাবাবুকে বললেন—আপনি আমার শত্রু নন—বন্ধু। কাজেই আমি আপনাকে কি পুরস্কার দিতে পারি? লালাবাবু তখন বললেন—আমি তো বৈরাগী মানুষ আমার কিছু দরকার নেই। কিন্তু বাহাদুর শা সে কথা শুনলেন না; তিনি কোমর থেকে তরবারী খুলে লালাবাবুর হাতে দিয়ে বললেন—এটাই আপনাকে পুরস্কার দিলাম। অগত্যা সেই নিয়েই লালাবাবু বৃন্দাবনে ফিরে এলেন। ইতিহাসের পাতায় লালাবাবুর মত ত্যাগী পুরুষ কম দেখা যায়। 'ভক্তমাল' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদক কৃষ্ণদাস বাবাজী লালাবাবুর ধর্ম্মগুরু ছিলেন। যৌবনে যে লালাবাবু সংসারের আকর্ষণ কাটিয়ে বৈরাগীর বেশ ধারণ করেছিলেন, জীবন সায়াহ্নে এই রাজ বৈরাগী তাঁর প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির ও সেবাকুঞ্জের আকর্ষণ কাটিয়ে গোবর্দ্ধন গিরির নিভৃত গুহায় আত্মানুসন্ধানের সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। কলকাতায় জগন্নাথের ঘাট ও মন্দির আজও লালাবাবুর ধর্ম্মপরায়ণতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। লালাবাবুর এক-মাত্র পুত্র তাঁর তিন পত্নীকে অপুত্রক রেখে মারা যান। তখন তাঁরা লালাবাবুর স্ত্রী কাত্যায়নী দাসীর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন।

বেলগাছিয়া ভিলার আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিক ভাবে কিছু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়ে, সেইজন্য লালাবাবুর প্রসঙ্গ এখানে একটু আলোচনা করে নিলাম। এবার গত শতকের বেলগাছিয়া ভিলার অবদানের কথা আলোচনা করব।

উনিশ শতকে বাংলা দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে বিশেষ করে নাট্যশালার ইতিহাসে রাজা প্রতাপচন্দ্রের ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই রাজ-পরিব র হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে 'বেলগাছিয়া ভিলা'তে যে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন তাহা 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তখনকার দিনে

অনেক গণ্যমান্য ও শিক্ষিত লোকের মতে এর মত সুন্দর নাট্যশালা ও উচ্চাঙ্গের অভিনয় ইতিপূর্ব্বে আর হয় নি। এই ব্যাপারে সে যুগের বহু ইংরেজীশিক্ষিত ও নবীন বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরাও জড়িত ছিলেন। এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনয়ের পর কলকাতার অভিজাত মহলে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে এই রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জা ও গীতিবাদ্য এমনই সুন্দর যে এর আগে আর কোথাও দেখা যায় নি। গৌরদাস বসাক তাঁর স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন যে, বেলগাছিয়া নাট্যশালার অভিনয় ও কাহিনী সকলের পরিচিত। তাঁর বিবরণ হতে বেলগাছিয়া নাট্যশালা সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি। এই বেলগাছিয়া নাট্যশালাতেই প্রথমে দেশীয় ঐক্যতানবাদনের প্রবর্ত্তন হয়। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পাল এই ঐক্যতানের দল গঠন করেন। বেলগাছিয়ার নাট্যশালার সাজসজ্জা ও ষ্টেজ প্রভৃতির জন্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। নাট্যশালার পরিচালনার ব্যাপারে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রাজাদের পরামর্শদাতা ছিলেন। অভিনেতাদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজীশিক্ষিত বাঙ্গালী ছিলেন। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁর প্রতিভা এমন জীবন্ত বাস্তবরূপ অধিকার করেছিল যে, তিনি রঙ্গমঞ্চের 'গ্যারিক' আখ্যায় অভিহিত হন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্রও একটি চরিত্রে অভিনয় করেন। দর্শকদের মধ্যে কলকাতার বহু দেশী ও বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকতেন। একবার সপরিবারে বাংলার লেপ্টনান্ট গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কেশববাবুর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখেন। রত্নাবলী নাটক ছয়-সাতবার বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়, পরে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দিয়ে এই নাটকটি ইংরেজী অনুবাদ করান হয়। এর জন্য রাজারা মাইকেলকে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেন। রত্নাবলী নাটকটি অভিনীত হয় ১৮৫৮ সালের ৩১শে জুলাই শনিবার। এর লেখক ছিলেন রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

এর পর আমরা মাইকেল মধুসূদনকে দেখতে পাই এই নাট্যশালাতে। রত্নাবলী নাটকের অভিনয় দেখে তাঁর নাটক লেখার ইচ্ছা মনে জাগে। ১৮৫৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে মাইকেল 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকটি এখানে অভিনীত করেন। প্রকৃতপক্ষে মাইকেল মধুসূদনের নাটক সর্ব্বপ্রথম এই বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হবার পর এই রাজপরিবার মধুসূদনকে বাংলায় নাটক লেখার জন্য বহু অর্থ ও উৎসাহ প্রদান করেন। একথা সত্য যে মাইকেল যদি এই রাজপরিবারের সাহায্য ও সান্নিধ্য না পেতেন তবে তাঁকে হয়ত আমরা আজ অন্য ভাবে দেখতে পেতাম। মধুসূদন যখন মাদ্রাজ থেকে বদলি হয়ে কলকাতায় পুলিশকোর্টে অনুবাদকের চাকরীতে প্রবেশ করেন, সেই সময় কেউ তাঁকে চিনত না, গৌরদাস বসাক তখন এই রাজপরিবারের সঙ্গে মাইকেলের পরিচয় করিয়ে দেন। যে স্থানে মাইকেলের নাটকটি অভিনীত হয়েছিল সে জায়গাটা আজও আছে। এই রাজপরিবারের সংস্পর্শে আসার পর থেকে মাইকেল নিজের দিকে ফিরে তাকান এবং বুঝতে পারেন এইখানেই তাঁর বিকাশের পথ। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের দানের কথা স্বীকার করে মাইকেল বলেছেন—"যদি ভারতবর্ষে নাটকের পুনরুত্থান হয়, তবে ভবিষ্যৎ যুগের লোকেরা এই দুইজন উন্নতমনা পুরুষের কথা বিস্মৃত হইবে না—ইহারাই আমাদের উদীয়মান নাট্যশালার প্রথম উৎসাহদাতা।" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই পরিবারের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁরা বিধবা বিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরকে বিশেষ সাহায্য করেন। এই রাজবাড়ীতেই 'হডসন' সাহেব বিদ্যাসাগর ও তাঁর মা ভগবতী দেবীর প্রথম ছবি আঁকেন।

১৮৭৫ সালে যখন অষ্টম এডওয়ার্ড, যুবরাজ ও যুবরাণী-রূপে বাংলাদেশে আসেন,তখন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক এই বেলগাছিয়া ভিলায় সম্বর্দ্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে অষ্টম এডওয়ার্ড যুবরাজ ও যুবরাণী এই বাড়ীতে কয়েকদিন অবস্থান করেন। অষ্টম এডওয়ার্ডের ব্যবহৃত ঘর ও শয্যা আজও অক্ষত অবস্থায় রক্ষিত আছে। বেলগাছিয়া ভিলাতে এসে এই রাজ-বংশের আর দুইজন খ্যাতিমান পুরুষের নাম না করলে এই ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এঁদের একজন হলেন রাজা প্রতাপচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শরৎচন্দ্র সিংহ

আর একজন হলেন রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ। কুমার শরৎচন্দ্র ছিলেন স্থাপত্যবিদ্যাবিশারদ, ফটোগ্রাফার ও চিত্রকলার উপাসক। কান্দি রাজপ্রাসাদ, কাশীপুরের দেবালয় ও ঐতিহাসিক বেলগাছিয়া ভিলা তাঁর স্থাপত্য বিদ্যার ও সৌন্দর্য্য বোধের পরিচয় বহন করছে। অধ্যাপক আস্কার ব্রাউনিং তাঁর 'টুর অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে 'বেলগাছিয়া ভিলা' ও তার পিকচার গ্যালারীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এই গ্যালারীতে বিশ্ববিখ্যাত র‍্যাফেল, গুডরিনি, টিসেন, ডেনসিটার, কনষ্টোপন প্রভৃতি খ্যাতনামা চিত্রশিল্পীদের ছবি আজও সুন্দরভাবে রক্ষিত আছে। কুমার শরৎচন্দ্র কেবল ললিত-কলার উপাসক ছিলেন না, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও সামাজিক কাজে ছিলেন অগ্রণী। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সভা তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ দানশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বর্দ্ধমান মানহানির মামলায় 'ইংলিস ম্যান' সংবাদপত্র অধুনা 'ষ্টেটস্‌ম্যান' সংবাদপত্রের তৎকালীন মালিক ও সম্পাদক রবার্ট নাইট যখন বিপন্ন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাঁকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করে বিপদ্‌মুক্ত করেন। ওরিয়েণ্টাল বীমা কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা যখন শোচনীয় তখন তাঁরা ইন্দ্রচন্দ্রের শরণাপন্ন হন, তখনও ইন্দ্রচন্দ্র তাদের প্রচুর অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। সেই সময় যদি এই দুই প্রতিষ্ঠান অর্থ সাহায্য না পেতেন, তবে হয়ত তাদের অস্তিত্ব বিলুপ হবার সম্ভাবনা ছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীর দরবারে কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ ও শরৎচন্দ্র সিংহ নিমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন এবং দরবারে মেডেল ও প্রথম শ্রেণীর ইংরাজ সেবক হিসাবে 'কাইজার হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত হন। এই বাড়ীর আরও একটি ইতিহাস আছে তা হয়ত অনেকে জানেন না—১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে বোম্বাই শহরে, কিন্তু সেই অধিবেশন সম্পর্কে প্রাথমিক প্রস্তুতি সভা বসে এই 'বেলগাছিয়া ভিলা'তে।

সেকালের এই 'বেলগাছিয়া ভিলা'তে বহুপ্রকার স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে তার জন্য একালের 'বেলগাছিয়া ভিলা'র বংশধরেরা গৌরব বোধ করেন। কলকাতার ইতিহাসের পাতায় বেলগাছিয়া ভিলা'র নাম চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে। শতবছর পরেও যেন একথা সগর্বে ঘোষণা করছে।

প্রবাসী ছেলের চিঠি

শ্রীসুশীলকুমার সেনগুপ্ত

জানিস মা তুই চুপটি ক'রে ভাবিস্ যখন ব'সে—
একলা আমি কেমন আছি এই অচেনা দেশে।
ঠিক তখনই তোরই কাছে
আমার এ মন লুকিয়ে আছে,
কোলের 'পরে শুয়ে শুয়ে
মুখের দিকে দেখছে চেয়ে
হাসছে কত জড়িয়ে তোকে, নিচ্ছে খেয়ে চুমো,
ভাবছে : বুঝি ব'লবি এবার—'খোকন-সোনা ঘুমো''

সন্ধ্যা প্রদীপ নিয়ে হাতে আঁচল দিয়ে গলে
প্রণাম করিস ঠেকিয়ে মাথা যখন তুলসী তলে
সারা আকাশ তারায় তারায়
চেয়ে থাকে আলোক মালায়
তখন তাদের পানে চেয়ে
দেখিস মাগো অবাক হ'য়ে
আঁধার-আকাশ-তারার চোখে আমার দিঠি ভাসে ?
আমার কথা মা তোর কাছে বাতাস বেয়ে আসে !

পাষাণ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে মা তুই ভাবিস যবে,
তোরই চোখের খোকন-মণি ফিরবে আবার কবে ?
নাড়িয়ে দিয়ে তুলসী পাতা
বলি তখন আমার কথা
আঁধার বুকে লুকিয়ে থেকে
মুচকি হেসে তোমায় ডেকে—
'বল্ না মাগো বাড়ীর মত—খোকন সোনা ঘুমো ;
দিয়ে আমার রাঙা ঠোঁটে মিষ্টি দুটো চুমো !'

"মালিনী"-র নাট্যদ্বন্দ্ব

অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য "মালিনী"র তত্ত্ব কথা এবং ভাবমূল্য সম্পর্কে অনেক সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু "মালিনী" নাটকের গঠন সম্পর্কে আলোচনা বিরল। প্রথমতঃ তার কারণ হয়তো এই যে "প্রকৃতির পরিশোধ" থেকে "মালিনী" পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে কখানা কাব্যনাট্য লিখেছিলেন, তাদের মধ্যে একটি ভাবমূল্য বা তত্ত্ব কথাই প্রধান হয়ে উঠেছে—তা হোল এক কথায় প্রথা এবং হৃদয় ধর্মের দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয়তঃ "মালিনী" একাংক নাটক বলেও হয়তো গঠন সম্পর্কে সমালোচকের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। কাব্যনাট্য মালিনীর গঠন সম্পর্কে বিচারের স্বল্পতা যে কারণেই ঘটে থাক্, অনুরূপ প্রচেষ্টা আমাদের কৌতুহলোদ্দীপক ফলাফলের সম্মুখীন করে।

কোন নাটকের গঠন বিচার প্রসংগে প্রথমেই মূল নাট্যদ্বন্দ্বটি খুঁজে বের করার দিকে সমালোচকের ঝোঁক থাকা স্বাভাবিক এবং দ্বন্দ্বের পর্যায়গুলি অনুসরণ করে নাটকের একটি গর্ভসন্ধি বা 'Climax' খুঁজে বের করবার চেষ্টাও তাঁর পক্ষে যুক্তিযুক্ত। আশ্চর্যের বিষয় 'মালিনী'র সমালোচক এই বিষয়ে বিভ্রান্ত হন। "মালিনী" নাটকের ভূমিকায় "ট্রেভেনিয়ানে'র গ্রীক নাট্যকলা-সম্পর্কিত মন্তব্যের উপরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"সেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ।" "মালিনী" একাংশ নাটক বলে মূল দ্বন্দ্বের বিভিন্ন পর্যায়গুলির খুঁটিনাটির হিসেব এড়িয়ে গেলেও নাটক যখন তখন একটি মূল দ্বন্দ্ব নাটকে আদ্যন্ত বিরাজ করবে—অন্ততঃ উপরের অভিমতের আলোকেও এটুকু প্রত্যাশা সমালোচকের পক্ষে খুবই সংগত। তথাচ "মালিনী"তে কোন পূর্ণবিকশিত মূল নাট্যদ্বন্দ্ব নেই। একথা বলবার আগে অবশ্য আমাদের দেখে নিতে হবে "মালিনী"র প্রচলিত সমালোচনায় মূল নাট্যদ্বন্দ্ব সম্পর্কে কোন্ কথা বলা হয়েছে।

"বিসর্জন" নাটক "মালিনী"র পূর্বে রচিত হওয়ায় এবং "বিসর্জন" নাটকে প্রথাধর্ম এবং হৃদয়ধর্মের দ্বন্দ্ব, ব্রাহ্মণ রঘুপতি এবং রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বলে—এবং সম্ভবতঃ "মালিনীতেও আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং নবধর্মলব্ধ রাজকন্যা গোড়ার দিকে সংঘর্ষ সৃষ্টি করেছে বলে, "মালিনী', নাটকের মূল দ্বন্দ্ব বিসর্জনের অনুরূপ সাধারণতঃ এই রকম কথা মনে করা হয়। একজন সমালোচক লিখেছেন:—"দুটি নাটকেই চিরাচরিত সনাতন প্রথা ও ধর্মের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া নাট্যবস্তুকে রূপায়িত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।... ..."মালিনীতেও" দেখি সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে মানবধর্ম বিশ্বধর্মের প্রতীক একটি ধর্মকে দাঁড় করাইয়া দু'য়ের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা হইয়াছে।১ এই সমালোচক আরও বলেছেন—"মালিনীর স্বল্পভাষণের পরিমিতি ও সংযম, আখ্যান বস্তুর সংগতি ও সংহতি "বিসর্জনে" আমরা আশাই করিতে পারি না।২ শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও "মালিনী" নাটকে আপধর্মের বিরুদ্ধে হৃদয়ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলেই মনে করেন।৩ সাধারণতঃ এই কথাই সর্বাধিক সমর্থিত।

আমাদের বক্তব্য এই যে, "মালিনী" নাটকে "দুয়ের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা হইয়াছে", কিন্তু দ্বন্দ্বের কোন সমাপ্তি দেখান হয়নি। তজ্জন্য প্রথা ও সত্যের দ্বন্দ্বকে "মালিনী" নাটকের মূল দ্বন্দ্ব বলে মেনে নেওয়া যায় না। নাটকটি সেই দ্বন্দ্বের দ্বারাই বিধৃত একথাও বলা চলে না। নাটকে, সচরাচর, লেখক দুটি সত্যের দ্বন্দ্ব দেখান একটিকে জয়যুক্ত করবেন বলে। অন্ততঃ যে

১ ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা

২ রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা-ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়,

৩ ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস

নাটকে প্রথাধর্ম এবং হৃদয়ধর্মের দ্বন্দ্ব দেখান লেখকের উদ্দেশ্য সেখানে আদর্শবাদী লেখক একটি সত্যের জয় দেখানর জন্যই নাটক লিখে থাকেন। "বিসর্জনে" রবীন্দ্রনাথ যেমন করেছেন—শুধু তাই নয়, এইরূপ স্থলে লেখক আদর্শের জন্য চরিত্রকে খর্বও করে থাকেন। "বিসর্জনে" রঘুপতির চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ যেমন করছেন, "মালিনী"তে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার বরং বিপরীতই করেছেন। বিপক্ষ ক্ষেমঙ্করকেই তিনি সর্বোজ্জ্বল করে এঁকেছেন। নায়িকা 'মালিনীর' চরিত্রকেই বরং তিনি দেবী থেকে মানবীর স্তরে নামিয়ে এনেছেন। আচার-ধর্মের বিরুদ্ধে হৃদয়ধর্মকে জয়যুক্ত করবার পক্ষে এগুলি কখনো নিশ্চয় সুপ্রশস্ত নয়। "মালিনী" নাটক পরে শেষ করবার পর ক্ষেমঙ্করের চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য অনেক বেশি পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণ করে থাকে। বিশেষতঃ "বিসর্জনে" প্রথাধর্ম এবং হৃদয়ধর্মের দ্বন্দ্বকে নাটকের মূল দ্বন্দ্ব বলে মেনে নেওয়া যায়, কারণ মূল দ্বন্দ্বটি সমস্ত নাটক বিধৃত করে আছে, দ্বন্দ্বের একটি চূড়ান্ত মুহূর্তও আছে। "বিসর্জন" নাটকের শেষে মূল নাট্যদ্বন্দ্বের একটি পরিণতি বা সমাপ্তি আছে। কিন্তু "মালিনী" নাটকে প্রথাধর্ম এবং হৃদয়ধর্মের দ্বন্দ্বের ঐরূপ কোন উপসংহার দেখান হয়নি। এখানে দ্বন্দ্বের আদি আছে, কিন্তু দ্বন্দ্বের অন্ত নেই। "মালিনী" নাটক পড়ে প্রথাধর্মের ওপর হৃদয়ধর্মের নিশ্চিত জয় হল বলে পাঠকের কোন প্রতীতি হয় না। "বিসর্জনের" মূল নাট্যদ্বন্দ্ব "মালিনী"রও মূল নাট্যদ্বন্দ্ব—একথা সুতরাং বলা যায় না। "মালিনী" নাটকের গোড়ায় কিন্তু প্রথাধর্ম এবং হৃদয়ধর্মের সুস্পষ্ট একটি দ্বন্দ্ব আছে। অথচ দ্বন্দ্বটি অগ্রসর হয়নি বেশীদূর। ক্ষেমঙ্করের সৈন্য আনয়নে বিদেশ যাত্রা পর্যন্ত এগিয়ে নাটকের দ্বন্দ্বটি শেষাংশে চরিত্রের ভীড়ে হারিয়ে গেছে। নাটকের শেষ দৃশ্যটি স্মরণ করুন। বিপক্ষ ক্ষেমঙ্কর জীবিত। কিন্তু শৃঙ্খলবদ্ধ। তার বিদ্রোহ হয়েছে বিধ্বস্ত। বন্ধু সুপ্রিয় মৃত। অর্ধমৃত এই ক্ষেমঙ্করের ভবিষ্যৎ পুনরভ্যুত্থানের সম্ভাবনাও নেই। কেন না রাজা সজাগ হয়েছেন। অপরদিকে দেখি মালিনী জীবিত। "মালিনী" কিন্তু দেবী থেকে মানবীর স্তরে অবনমিত। এই প্রণয়ীবিমুক্ত জীবন্মৃত মালিনী হৃদয়ধর্মের প্রচার করবার আর উপযুক্ত নেই। এমতা-বস্থায় প্রথাধর্ম বা হৃদয়ধর্ম কোন পক্ষেরই সুষ্ঠু জয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল না। বিরুদ্ধবাদী বক্তা এক্ষেত্রে অবশ্য বলতে পারেন যে "মালিনী"তেও প্রথাধর্মের ওপর হৃদয়-ধর্মের জয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—নৈতিক ভাবে। সুপ্রিয়ঘাতী ক্ষেমঙ্করকে ক্ষমা করে "মালিনী" হৃদয়ধর্মের আদর্শকে নৈতিকভাবে জয়যুক্ত করেছে। অথচ "মালিনী" ক্ষেমঙ্করকে ক্ষমা করেছে একমাত্র হৃদয়ধর্মের অনুরোধে—একথার নিশ্চিত প্রমাণ কোথায়? একমাত্র রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে প্রমাণ আছে, সেখানে তিনি লিখেছেন—"এই ভাবের উপরে মালিনী স্বতঃই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।" ৪—ইত্যাদি। বিপক্ষবাদী বক্তা বলবেন, রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা মেনে নিতে আমরা আপত্তি করব কেন? বিপক্ষবাদীর বক্তব্যের দু'টি উত্তর আছে। প্রথমটি এই যে— কাব্যনাট্য "মালিনীর" প্রথম প্রকাশ হ'ল ১৩০৩ বংগাব্দ। "মালিনীর" ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৩৪৭ বংগাব্দে। রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় ৪৪ বছর বাদে ভেবেচিন্তে "মালিনী" সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, নাটক রচনাকালে নাটকের মধ্যে সেই উদ্দেশ্যটি ছিল বলে, তিনি নিজেই যে পরিষ্কার জানতেন না, তা কয়েক ছত্র আগে ভূমিকাতেই বলে গেছেন। তিনি লিখেছেন "কবিতার মর্মকথাটি তখন থেকেই যদি রচনার মধ্যে জেনেশুনে বপন করা না হ'য়ে থাকে, তবে কবির কাছেও সেটা প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠতে দেরী লাগে।" অর্থাৎ "মালিনীর" মধ্যে কোন মর্মকথা আছে, তা রবীন্দ্রনাথের কাছে পরিষ্কার হ'য়ে উঠতে ৪৪ বছর দেরী লেগেছিল। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাকে চরম হিসেবে মেনে নিলে গুণান্ধতা প্রকাশ হয়, যুক্তির মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় না। দ্বিতীয় বক্তব্য হোল যে,—ক্ষেমঙ্করকে "মালিনী" ক্ষমা করেছে হৃদয়ধর্মের অনুরোধে—পাঠ্য নাটকের ভিত্তিতে পুরোপুরি সে কথা মেনে নেওয়া যায় না। যায় না ব'লেই ক্ষেমঙ্করকে "মালিনী" কেন ক্ষমা করল তাকে ঘিরে অনবরত নতুন অনুমান গড়বার অবকাশ সকল সমালোচ-কেরা পেয়েছেন। কেউ বলেছেন, ক্ষমা করল মালিনী ক্ষেমঙ্করের প্রতি নবোদিত প্রেমে, ৫ কেউ বলেছেন ক্ষমা

৪। মালিনীর ভূমিকা : রবীন্দ্রনাথ

৫। রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ : শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

করল মালিনী মঞ্চকৌশলের অনুরোধে, ৬ কেউ বলেছেন, ক্ষমা করেছে মালিনী প্রতিহিংসাপরায়ণতার প্রভাবে। ৭ মালিনী ক্ষমা করেছে হৃদয়ধর্মের থেকে, একথা প্রমাণ না করলে কিন্তু মালিনী নাটকে হৃদয়ধর্ম বিজয়ী হয়েছে, এরূপ বলা যায় না। এও বলা যায় না—নাটকের দ্বন্দ্বের কোন নিষ্পত্তি হোল। অথচ রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার ব্যাখ্যাটি নিঃশর্তে স্বীকার করে না নিলে—তা প্রমাণিত করাও যায় না। তাই দেখি টমসনের মত প্রাজ্ঞ রবীন্দ্র-সমালোচকও মালিনীকে "a shadow gril", বলতে বাধ্য হয়েছেন। আর যে নাটকের দ্বন্দ্বের স্বরূপটি পরিস্ফুট করার জন্যে নাটক-লেখকের ভূমিকা হবে একমাত্র অবলম্বন, তার নাট্যগঠন নিশ্চয়ই ত্রুটিযুক্ত বল'তে হবে। রবীন্দ্রনাথের লেখা মালিনীর ভূমিকাটিই সবের বড় প্রমাণ যে পাঠ্য নাটকের ভিত্তিতে মালিনীর নাট্যদ্বন্দ্বে হৃদয়ধর্মের আদর্শ জয়যুক্ত হয়েছে বলে বোধ হয় না। রবীন্দ্রনাথ তা বুঝেছিলেন, তাই ৪৪ বছর বাদে মালিনীতে অপরিহার্য একটি ভূমিকা লিখতে ব্যস্ত হয়েছিলেন।

আসল কথা, "মালিনী" কাব্যনাট্য পড়ে, কোন ধর্মের বিজয়ের দ্বারা আমরা অভিভূত হই না, অভিভূত হই কতকগুলি চরিত্রের দ্বারা। "মালিনী" নাটকে গোড়ার দিকে একটি দ্বন্দ্ব প্রথাধর্ম এবং হৃদয়ধর্ম নিয়ে ফুটে উঠেছে-নাটকের প্রারম্ভটি তাই আদর্শমুখ্য। কিন্তু শেষাংশটি নিশ্চিতভাবে কোন আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে না। নাটকটির শেষে দ্বন্দ্বটি চরিত্রের ভীড়ে হারিয়ে গেছে। নাটকের শেষাংশটি অতএব হয়েছে চরিত্রমুখ্য। এই দ্বিধার পরে মালিনীর নাট্যদ্বন্দ্বটি বিপর্যস্ত হয়েছে। রবীন্দ্র-নাট্যসমালোচক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য "মালিনী" কাব্য-নাট্যের চরিত্রমুখ্যতা সম্বন্ধে সমালোচনা করেও ইংগিতটি পরিস্ফুট করেন নি। ৮ "মালিনী" নাটকে এ'রকম হ'ল কেন? দ্বন্দ্ব দিয়ে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ সেই দ্বন্দ্বকে কেন সম্পূর্ণ করলেন না? রবীন্দ্রনাথ "বিচিত্রপ্রবন্ধ" গ্রন্থে "নববর্ষ-" প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"যে কবির তাল আছে, কিন্তু কোথাও সম নাই, যাহার মধ্যে কেবল উদ্যম আছে আশ্বাস নাই, তাহার কবিত্ব উচ্চকাব্য শ্রেণীতে স্থায়ী হইতে পারে না। শেষের দিকে একটা কোথাও পৌঁছাইয়া দিতে হইবে, এই ভরসাতেই আমাদের চিরাভ্যস্ত সংসারের বাহির হইয়া কবির সহিত যাত্রা করি—পুষ্পিত পথের মধ্য দিয়া আনিয়া হঠাৎ একটা শূন্য গহ্বরের ধারের কাছে ছাড়িয়া দিলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।" অনতিদূর কালবৃত্তের মধ্যে রচিত (১৩০৮) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা তিরস্কৃত করেছিলেন, "মালিনীতে" তা নিজেই করেছিলেন কেন? "মালিনীতে" দ্বন্দ্বের একটি শেষ দেখব ব'লে আমরা যখন উৎকণ্ঠিত, তখন দ্বন্দ্বটি তার প্রাধান্য হারিয়ে ফেলল কেন? কাব্যনাট্য বলে রবীন্দ্রনাথ দ্বন্দ্বকে খর্ব করেছেন এ কথা বলা চলে না। 'বিসর্জন'ও রবীন্দ্রনাথের লেখা কাব্যনাট্য।

এ সমস্ত সমালোচনা করলে সহজেই বোধ হয় যে, কাব্যনাট্য মালিনীতে "আখ্যানবস্তুর সংগতি ও সংহতি" ৯ তেমন বেশী নেই। সমালোচকবৃন্দ, ঘটনার দ্রুতিকে ঘটনার সংগতি বলে ভুল করেছেন। প্রকৃত কারণ, "মালিনী" কাব্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত স্বয়ং একটি দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত হয়েছিল। রবিচিত্ত ছিল, ঋষি এবং কবির একটি ভারতীয় সমন্বয়। ঋষি স্বরূপ তিনি "মালিনী" নাটকে দু'টি আদর্শের দ্বন্দ্ব দেখিয়ে একটিকে জয়যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। বিশেষতঃ "মালিনী" কাব্যনাট্য লেখবার সময় তাঁর চিত্তটি ধর্মের স্বরূপ এবং শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে বড় ছিল। কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট একটি কাহিনীর মধ্যে কতকগুলি চরিত্র রূপায়নের কাঠামো তিনি অবলম্বন করেছিলেন। এই স্বপ্নদৃষ্ট কাহিনী এবং চরিত্রগুলির সংগে আদর্শটি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মাপসই হ'তে পারেনি। কারণ, কাব্যনাট্যের দ্বন্দ্ব অগ্রসর হ'লে তাঁর কবিচিত্তটি চরিত্রের মোহে পড়ে গেছে এবং চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করতে বিশেষ বেদনা পেয়েছে। ঋষির কাছে আদর্শ বড়, কিন্তু আর্টিষ্টের কাছে চরিত্র বড়। যে মুকুন্দরাম আর্টিষ্ট ছিলেন, তাঁর কাছে কালকেতুর চেয়ে ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রই প্রিয়তর ছিল। কাব্যনাট্যের দ্বন্দ্বের

৬। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা : ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়

৭। রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ : শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

৮। রবীন্দ্রনাট্যপরিক্রমা : ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৯। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা : ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়

আদর্শ থেকেও চরিত্রের বিকাশ মালিনীর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে অধিকতর অভিভূত করেছে। নাটকের নেশায় দ্বন্দ্ব দিয়ে শুরু করেও রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের মোহে তাই তাকে ফেলেছেন হারিয়ে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ ব্যাপারে কিছু আশ্চর্য ছিলনা, কেননা গতানুগতিক আদর্শ এবং চরিত্রাঙ্কনে সহজেই তিনি ক্লান্ত বোধ করতেন। এক্ষেত্রে প্রকৃতির পরিশোধ থেকে আদর্শ বিতরণ ক'রে তিনি ক্লান্ত হয়েছিলেন। তাই বিরুদ্ধাদর্শী ক্ষেমঙ্করের চরিত্র তিনি সব থেকে উজ্জ্বল ক'রে এঁকেছেন। ম্লান ও হতগৌরব হ'য়ে পড়েছে হৃদয়ধর্মের আদর্শ মালিনীর চরিত্র। "বিসর্জনের" দ্বন্দ্ব "মালিনী" নাটকের মূল দ্বন্দ্ব হ'লে তা কখনো হ'ত না। ঋষির ওপর আর্টিষ্ট এভাবে জয়লাভ করেছে। "বিসর্জনে" রবীন্দ্রনাথ আদর্শের অনুরোধে চরিত্রকে একবার খর্ব করেছিলেন। মালিনীতে তাই আদর্শের দ্বন্দ্ব দিয়ে শুরু করেও নাটকের শেষাংশে চরিত্র সম্ভাবনাকে খর্ব করতে তাঁর প্রাণে বেজেছে। তাই "মালিনীতে" দ্বন্দ্ব অপ্রধান হয়ে পড়েছে। "মালিনীতে" তাই দ্বন্দ্বের সমাপ্তি নেই, নাট্যদ্বন্দ্বের তাই চূড়ান্ত মুহূর্ত বা climax ও নেই। উদ্দেশ্যবাদী জর্জ বার্ণাড শ' একবার যেমন বলেছিলেন যে চরিত্র বেশ এগিয়ে যাবার পর—"and then I have no more control over them than over my wife !"

"মালিনী"তেও তাই ঘটেছে। তাই "মালিনী" কাব্যনাট্যে দ্বন্দ্বের পরিস্ফুট সমাপ্তি নেই। তাই climaxও নেই। এই জন্যই তা আদর্শপ্রধান ভাবে শুরু হয়ে চরিত্রপ্রধান হয়ে শেষ হয়েছে। তার জন্য আদর্শ বিচার করলে নাটকের প্রথাধর্মের ও আচারধর্মের দ্বন্দ্বটি যেন "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" বলে পাঠকের মনে হয়। এই দিক দিয়ে বিচার করলে নাটকের গঠন খুব সংহত ও সংগত বলে বোধ হয় না।

আমার মাঝে উঠুক ফুটে তোমার পরিচয়

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

"তুমি সবার মাঝে আছো" বলি কিন্তু এ ঠিক নয় ;
এমনি বলে নিত্য করি মিথ্যা অভিনয়।
সবার মাঝে কই তাহলে—
তোমায় পূজি অশ্রুজলে ?
দুঃখীজনে পায়ে দলি,—কেন এমন হয় ?
জানি যদি সত্যি তুমি বিশ্বভুবনময় !
আমরা বলি—"তোমারই সব, আমার কিছুই নয়।"
(তবে) আমার আমার বলে কেন দিই গো পরিচয় ?
সত্যি আমার কিছুই তো নাই,
যা কিছু সব তোমার দেওয়াই
(আমার) কপট, মুখো'স দাওগো খুলে
আমিত্ব পাক লয় :
(তোমার) চরণতলে হোক আজিকে
আমার পরাজয়।
লোক দেখান পূজা আমার থাকনা পড়ে দূরে—
হৃদয় আমার ঝঙ্কৃত হোক তোমার বীণার সুরে।
মিথ্যা মোহের বাঁধন খুলে
ঐ চরণে নাওগো তুলে,
(আমি) হৃদয় কোণে হেরি নিতি
রূপ তব চিন্ময়—
আমার মাঝে উঠুক ফুটে
তোমার পরিচয়॥

কোণারক

শ্রীমতী সাধনা সেন

সাহিত্যের ক্লাশে একদিন "বলেন্দ্রনাথ" পড়তে গিয়ে 'কোণারকের' কথা প্রথম মনে রেখাপাত করেছিল। লেখক বলেন্দ্রনাথের অনবদ্য ছন্দময় ভাষায় সে বর্ণনা যেন জীবন্ত রূপ নিয়ে আমার মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত ছিল। সেদিনই মনে মনে আশা করেছিলাম যদি কখনও সুযোগ আসে, এই বিপুল অতীতের পুরাতন কাহিনীর গৌরব আমার মনের চিত্রশালায় অঙ্কিত করে নেব।

তারপর অন্ততঃ বেশ কয়েকবছর কেটে গেছে। জানিনা লেখকের রচনাশৈলীর অনবদ্য অনুপ্রেরণায়, অথবা কোণারকের ভাবময় চিত্রশিল্পের বর্ণনায়—, আমার ভাবলোকের আলোকে কোণারকের চিত্রটি প্রতিনিয়তই আমাকে হাতছানি দিয়ে বেরিয়ে পড়ার নির্দ্দেশ দিয়ে এসেছে। তাই অবশেষে রওনা হয়ে পড়লাম এই অর্কক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে একসময়—।

পুরী থেকে কোণারকের বাস ছাড়লো যখন—তখন সবে সকাল সাতটা। সূর্য্যদেব তাঁর সাতঘোড়ার রথ তখন আকাশের দিকে জোরকদমে ছুটিয়ে দিয়েছেন। এমনি এক মনোহর দিনে আমাদের রথও ছুটে চল্ল উড়িষ্যার নবনির্ম্মিত হাইওয়ে দিয়ে কোণারকের পথে। দুধারের দৃশ্যে চমৎকারিত্ব এমন কিছু না পেলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অপ্রতুলতা ছিল না। বিশেষ করে বাংলার গ্রামের সাথে যাদের যোগাযোগ কিছুটা ছিল বা এখনও আছে, তাদের কাছে এ সৌন্দর্য্য সত্যিই অভিনন্দিত হবে।

বেশ কিছুটা চলবার পর এল বালিয়াড়ির পথ। পুরী থেকে সোজা সমুদ্রপথে কোণারকে গেলে মাত্র সতের মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু বাসের পথ একটু ঘুরপথ হওয়ায়, এ দূরত্ব দ্বিগুণত্বে পর্য্যবসিত হয়েছে। এই বালিয়াড়ি দেখে মনে হয়, এক কালের সমুদ্র আজ দূরে সরে গিয়ে যে ভূমির সৃষ্টি করেছে তা আজও ঊষর ধূসর থাকলেও দু একটা বাবলা গাছের আবির্ভাবে সুদূর ভবিষ্যতে তার শ্যামল অবস্থিতির আশ্বাস দিচ্ছে। একদা হাস্যলাস্যময়ীতরঙ্গমালাসুশোভিত চন্দ্রভাগা নদী যেন অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতির মতই ক্ষীণকায়া হয়ে প্রবাহিতা। এখন যেন তার বুকে গৈরিক আঁচলের স্পর্শ লেগেছে। শুধু বন-শাপলার দল তার সাদা ফুলের পাপড়িগুলো মেলে দিয়ে কি এক শ্বেতশুভ্র প্রাণের আকৃতি প্রকাশ করতে প্রয়াসী।

খানিকবাদে আমাদের গাড়ী এসে থামল একেবারে কোণারকের সামনে। এক অদ্ভুত উন্মাদনা নিয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে সেই বিশাল কীর্ত্তিকে জানালাম আমার হৃদয়ের অনাবিল ভক্তিশ্রদ্ধা। সেই বিশালতা, সেই সুমহান উদারতা, সেই সুবিস্তৃত পাষাণমন্দির আমার হৃদয়ে যে বিমূঢ় ভাব এনে দিল তার প্রথম চমক কাটলে প্রথমেই দেখতে পেলাম নাটমন্দিরের দ্বারদেশ। একদা সমগ্র উড়িষ্যা দেশ জুড়ে যে ধর্ম্মযুদ্ধ চলেছিল বহুযুগ ধরে, এখানে রয়েছে তারই ভাব-প্রকাশ। তখন নরসিংহ দেবের রাজত্ব। সে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। উড়িষ্যার বৌদ্ধ জনসাধারণের দাবীকে কিছুটা ক্ষুণ্ন করে তিনি এই সৌরমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। তাই নাটমন্দিরের দ্বারদেশে রূপায়িত করেছেন তাঁর রাজকীয় ধর্ম্মের এই ইচ্ছাকে। নাটমন্দিরের দ্বারদেশে দেখি দুটি হাতীর উপর দাঁড়িয়ে আছে দুটি সিংহমূর্ত্তি। এই সিংহমূর্ত্তি যদিও কিছুটা বৈদেশিক স্থাপত্যের ভাবকল্পরূপে রূপায়িত, কিন্তু তবুও অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে নিতে এতটুকুও কষ্ট হয় না। হাতী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতীক। তাই জনসাধারণ যে ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাকে রাজকীয় ধর্ম্ম পরাস্ত করে উন্নত গৌরবে সমুদ্ভাসিত হবে, এতে আর বিচিত্র কি? যুগে যুগে সবলের প্রকাশ এই ভাবেই হয়। নাট-মন্দিরের গায়ে বহু নারীমূর্ত্তি বিভিন্ন নৃত্যছন্দে বিরাজিত। ওড়িসি নৃত্যকলার বিভিন্ন প্রকাশসহ স্তম্ভগুলি পাষাণ ছাদভার একদা বহন কোরত। সেই ছাদ আজ মিউজিয়মের সংগ্রহশালায় ভগ্ন অবস্থায় শোভা বর্দ্ধন করছে।

একদা এই নাটমন্দিরে ওড়িসি নৃত্যে কুশলী দেব-নর্ত্তকীর দল নানা ভঙ্গিমায় দেবতাকে নৃত্যে-লাস্যে-ছন্দে বন্দনা জানাত, তখন ধর্ম্ম ও সমাজ দেবতাকে পরিতুষ্ট করতে লৌকিক জীবনের লৌকিক আনন্দকে উপেক্ষা করেনি। পরবর্ত্তীকালে ধর্ম্মের অন্তরাল থেকে এই দেবনর্ত্তকীদের দেবতার প্রতিভূস্বরূপ পুরোহিতবৃন্দ অসামাজিক কাজ করাতে বাধ্য করত। ক্রমে সমাজ ব্যবস্থা একে মেনে নিলেও অসংশয়ী জনগণের মনে অবিশ্বাস আসতে বাধ্য হয়েছিল। পরে এইসব দেব-নর্ত্তকীর দেবভাবে আর তারা আস্থা রাখতে পারে নি। তাই পুঞ্জীভূত ঘৃণা এত ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃত্যকলা ওড়িসি নৃত্যের অবলুপ্তি একান্ত অপরিহার্য্য হয়ে পড়ল। দেবতার অলৌকিকত্ব লৌকিক তত্ত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়ায় সংশয়ী জনমন সমাজেও তার আলোড়ন তুলেছিল। তাই ওড়িসি নৃত্যকলার নানা ভঙ্গিমার আত্মপ্রকাশ এখন এই নাটমন্দিরের গায়েই শুধু সীমিত থাকত—যদি না এই বিংশ শতাব্দীতে নতুন দৃষ্টভঙ্গী নিয়ে ভারতের নটরাজ উদয়শঙ্কর তার উদ্ধারসাধন করতেন।

মূল মন্দিরটি এই নাটমন্দিরের পরেই অবস্থিত। চব্বিশটি তেজী রজ্জুবদ্ধ ঘোড়া যেন একটি সুন্দর রথ টেনে নিয়ে চলেছে। রথের চাকায় যে পাথরের জালির কাজ আছে তা দ্রাবিড়-স্থাপত্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। মন্দিরটি অসামান্য তবু মিথুন মূর্ত্তিগুলিতে শিল্পকলার যে বাস্তব অথচ কুৎসিৎ প্রকাশ রয়েছে তাতে শিল্প গৌরব ক্ষুণ্ণ ও সংকুচিত হয়েছে সন্দেহ নেই। বিরাট পাষাণ মন্দিরের চারিদিকটাই নিটোল। তখনও কলিঙ্গবাসীরা খিলানের কাজ জানত না। তাই সিঁড়িগুলিও নিটোল। সূর্য্যদেবের নানারকম মূর্ত্তি নাকি মন্দিরের চারিদিকে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন শুধু দুটি আছে। একটি অশ্বারোহী মূর্ত্তি। অপরটি দণ্ডায়মান সূর্য্যমূর্ত্তি চন্দ্রভাগা নদীর দিকে তাকিয়ে আছে বরদাতারূপে। মূর্ত্তিগুলির অনুপম সুষমাময় দেহসৌষ্ঠব ও নিখুঁত গড়ন প্রাচীন ভাস্কর্য্যের উন্নত অনুশীলনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতিটি কারুকার্য্য, বেশবাস, অলঙ্কার-সমৃদ্ধি প্রাচীন কলিঙ্গের ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন বহন করে। সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় উঠলে দেখা যায় ঐ দূরে সমুদ্র সরে গেছে। একদা সমুদ্রের শুভ্র ফেনরাশি শুভ্রভক্তি নিবেদন করত প্রতিদিন তার তরঙ্গমালার উচ্ছল প্রকাশে। সেদিন এই মন্দিরের পদতলেই তরঙ্গমালা বারবার আছড়িয়ে পড়ে জানাত হৃদয়ের অসীম শ্রদ্ধা। মনে পড়ে যায় পুরাণের কথা—যেদিন রাজকুমার শাম্ব পিতার অভিশাপে কুষ্টরোগে আক্রান্ত হয়ে এই স্থানে বারো বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন ও রোগমুক্ত হয়েছিলেন সূর্য্যদেবের অসীম দয়ায়। সেদিনের তাঁর সেই অন্তরের আকুতি ও ভক্তি সমুদ্রের তরঙ্গমালার শীর্ষদেশে বিরাজিত শুভ্র ফেনের মত উচ্ছল অথচ সংহত ছিল। তাই তো তিনি এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন এমনভাবে—যাতে করে সেই তরঙ্গমালার শুভ্র প্রকাশ প্রতিদিন এই মন্দিরের পদতলে আছড়িয়ে পড়ে।

মন্দিরের চূড়া থেকে দেখা যায় কিছুদূরে প্রবাহিতা চন্দ্রভাগা নদীকে। আর তখনই ধর্ম্মপদের কথা মনে পড়ে যায়। বারোবছর তার পিতা বাড়ী থেকে নিখোঁজ। পিতা তখনকার কলিঙ্গ দেশের শ্রেষ্ঠ স্থপতি ছিলেন। রাজ আহ্বানে এই মন্দির নির্ম্মাণের ভার পড়ল তাঁর উপর। পিতা এই কাজ গ্রহণ করায় দ্বাদশ বৎসর পুত্রের সাথে পিতার হয়নি কোন সাক্ষাৎ। অতঃপর লোকমুখে খবর পেয়ে ধর্ম্মপদ এইখানে এসে বৃদ্ধ পিতাকে অতি চিন্তাকুল দেখেন। মন্দিরের সব কাজই শেষ হয়েছে—শুধু সোনার কলসটি বসাবার জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হচ্ছে জ্যামিতির শাস্ত্র অনুযায়ী তা ঠিক নির্ভুল হচ্ছে না। অথচ রাজাদেশ আগামী দিনের সূর্য্যাস্তের মধ্যে মন্দির সমাপ্ত না হলে প্রাণদণ্ড অবধারিত। ধর্ম্মপদ জ্যামিতিক অঙ্ক কষে নির্ভুলভাবে কলসী স্থাপন করলেও পিতার বিষাদময় মুখমণ্ডল তার অন্তরে নিদারুণ ব্যথা দিল। তিনি জানতে পারলেন যে আজকের এই একটি শিল্প নির্দ্দেশনায় পিতার এই দ্বাদশ বৎসরের শিল্প সাধনা নাকি ব্যর্থ হতে চলেছে। এই মন্দির-চূড়া থেকে তাই ধর্ম্মপদ লাফিয়ে পড়লেন ঐ চন্দ্রভাগার সলিলে—এইভাবে এক মহান্ ভবিষ্য-শিল্পীর হল মহান জীবনের অবসান।

এই মন্দিরকে ঘিরে এমন নানা জনরব, নানা উপকথা আজও উড়িষ্যার ঘরে ঘরে শোনা যায়। শোনা যায় বারো বছরের রাজস্ব সমুদ্রের বালুতটে এই মন্দির নির্ম্মাণে নিঃশেষিত হয়েছে।

আজ এই মন্দির শুধু পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দূরদূরান্ত হতে ভ্রমণকারীর দল এই মন্দিরের অপরূপ শিল্পকলা দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে চলে যান। কোণারক পড়ে থাকে শুধু অসীম অনন্ত আকাশতলে স্মৃতিভার নিয়ে—যেন কোন অতীত কাহিনীর উপসংহার।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আবার আমি ফিরে এলাম বাস্তবের কঠোর ক্ষেত্রে। বাস কণ্ডাক্টর হেঁকে চলেছে—"সন্ধ্যা হয়ে এল, আপনারা সব আসুন চলে।" সামনে তাকিয়ে দেখি, দূর দিগন্তে সূর্য্য অস্তমিত, আর তার লাল রশ্মির আভা মন্দিরের গায়ে যেন একমুঠো আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে। আমার মনে হল সে যেন কোন করুণ চিতা-দৃশ্যের রক্তিম আভা!!

(পূর্বপ্রকাশিতেরপর)

তেরো

বিষ্ণুঠাকুর (একটু থেমে চোখ বুজে থেকে): আমার পিতৃদেব ছিলেন পাটনার সংস্কৃত অধ্যাপক। আমার দেবভাষায় হাতে খড়ি হয় প্রথম তাঁর কাছে। তার পর কলেজে সংস্কৃতে এম্-এ পাশ করি বাইশ বৎসর বয়সে। এম্-এতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই ও প্রথম হই। তার পরের বৎসর ইংরাজীতে এম্-এ দিয়ে ডবল—এম্-এ হই। ফলে আমার বাজারদর বেড়ে গেল হু হু ক'রে। নানা জায়গা থেকে আসতে লাগল সম্বন্ধ। আসবে না কেন? শুধু যে পিতৃদেবই সঙ্গতিপন্ন ছিলেন তাই নয়, মাও ছিলেন ধনী পিতার একমাত্র কন্যা ও সন্তান। সবাই জানত তাঁর টাকা আমিই পাব।

আমার একদিকে যেমন রূপসী স্ত্রীকে ঘরণী পাবার লোভ ছিল সাড়ে পনের আনা, অন্যদিকে ঠিক তেম্নি দারুণ ভয় ছিল—বিয়ে থা ক'রে একরাশ ছেলেমেয়ের বাপ হ'য়ে সাংসারিয়ানার চাপে যদি হাঁপিয়ে উঠি! আরো পরিষ্কার ক'রে বলি: আমার মধ্যে পাশাপাশি দেখতে পেতাম দুটি স্ববিরোধী প্রবণতা: একটি—মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার প্রবল ইচ্ছা—বিশেষ ক'রে রূপসী বা গায়িকা মেয়েদের—অন্যটি হ'ল সাধুসঙ্গের বিপর্যয় আকাঙ্ক্ষা। ঠাকুরের বিচিত্র লীলায় এ-আত্মবিরোধ ঘটে অনেক সাধকেরই ক্ষেত্রে: যে-অনুপাতে তারা ভগবানের দিকে ঝোঁকে, ঠিক সেই অনুপাতেই তাদের টানে নারীর সঙ্গলিপ্সা। আমার গুরুদেবের মুখে শুনেছি-এ অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে তাঁকেও যেতে হয়েছিল, এবং তিনি বল পেয়েছিলেন প্রধানতঃ তাঁর স্বপ্নলব্ধ গুরুদীক্ষার শক্তিতেই। আর এ-উল্টোপাল্টামির লীলাখেলা শুধু যে আমাদের দেশের সিদ্ধ মহাত্মাদের ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাই নয়, ওদের দেশেরও নানা ধর্মপ্রচারক সেণ্ট ও মনীষীর মধ্যেও দেখা যায়। যথা, সক্রেটিস, প্লেটো, সেণ্ট পল, লয়েলা, সেণ্ট ফ্রান্সিস, সেণ্ট থেরেসা, গেটে, রুসো, শেলি, নেপোলিয়ন, টলস্টয়, ওয়েল্‌স্ আরো কত মহাপ্রাণ কীর্তিমন্ত মনীষী কবি গুণী যাঁদের কীর্তির গুণে এ-জাতীয় নানা কুকীর্তির কথা মানুষ ভুলে গেছে। (একটু থেমে হেসে) The old old story বাবা! মানবচরিত্রের মূলধারা দেশে দেশে ও কালে কালে একই খাতে ব'য়ে চলেছে—আর সে-খাত আঁকাবাঁকা—কখনো সত্যার্থীকে দেয় এগিয়ে – কখনো পিছিয়ে। আমাদের মহাভারত রামায়ণ ভাগবত ও নানা পুরাণের ঋষিকবিদের প্রজ্ঞার সাক্ষ্যও এই: যে দেবাসুরের সংঘাতের মধ্যে দিয়েই মানুষের আত্মা পিছুটান কাটিয়ে উর্ধ্বচারী হয় – বাধার মধ্যে দিয়েই বিকাশ। যাক্ শোনো।

গান গাইতে পারার দরুণ আমার ক্ষেত্রে মেয়েদের সঙ্গলাভের পথ যেন আরো খুলে গেল—শুধু তাদের সাম্নে গান গেয়েই নয়, অনেককে গান শেখাতে গিয়েও বটে। ফলে নানা অশুচি চিন্তার জন্যে চিত্তগ্লানি হ'ত খুবই, অথচ মেয়েদের ছোঁয়াচ কাটাবার মতন মনের জোর খুঁজে পেতাম না নিজের মধ্যে। আরো একটা জিনিষ দেখতে পেতাম এই সূত্রে: যে, মেয়েরা আমার সংস্পর্শে আসতে

না আসতে আমার এই দুর্বলতার খবর পেত, যেমন বাতাসে পরিমলের মধ্যে দিয়ে মৌমাছিরা খবর পায় কোন্ গাছে ফুল ফুটেছে। এ-গ্লানিকর অধ্যায়ের কথা বেশি বলতে চাই না, কেন না এ-দুর্বলতা বিশ্বজনীন। তবু এ-প্রসঙ্গ পাড়লাম—তুমি দেবদ্রোহী শক্তিদের কারসাজির কথা তুললে ব'লে। কারণ আমি বারবার লক্ষ্য করেছি যে, সাধুদের সঙ্গ পেয়ে যেম্নি মনে হয়েছে নিজেকে পবিত্র, যেম্নি মনে জোর পেয়ে আত্মপ্রসাদকে প্রশ্রয় দিয়ে ভাবতে সুরু করেছি বেশ এগিয়ে চলেছি তর তর ক'রে—সেই পিছুডাকের টানও প্রবল হ'য়ে উঠে নানা ফুশলানিতে চেয়েছে আমাকে দ-য়ে জমাতে। তবু যে কয়েকবার হোঁচট খেয়েও মুখ থুবড়ে পড়ি নি, টোপ খেয়েও বঁড়শিকে এড়াতে পেরেছি - সে শুধু সাধুদেরই কৃপায় আর গুরুশক্তির জোরে—আমার নিজের চরিত্রবলে নয়। কিন্তু ঐ সঙ্গে একটা মস্ত লাভও হয়েছিল এই যে, আমার কৈশোরেই সাধুসঙ্গের মহিমায় আমার বিশ্বাস গভীর হ'য়ে গ'ড়ে উঠেছিল। তাই তো নারীসঙ্গ আমাকে উতলা করার সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটতাম তাঁদের আশীর্বাদে দুর্বলতা জয় করতে—আর প্রতিবারই অন্তর্দ্বন্দ্বের গহন লগ্নে তাঁদের কাছে দরবার করতে না করতে আমার মানস-কুরুক্ষেত্রে বেজে উঠত মা-ভৈঃ-এর দেবশঙ্খ। (একটু হেসে) বাবা, সাধুসঙ্গের মহিমার প্রথম ও শেষপাঠ আমি পেয়েছি মনের প্রাণের তপোবনে, কোনো বাইরের বেদ বেদান্ত শাস্ত্র পুরাণ থেকে নয়। আমার কাহিনীটা আর একটু এগুলেই একথার ভাষ্য পাবে যে, এ সংসারে শাস্ত্রের শাস্ত্র হ'ল সাধুবাণী ও গুরুসঙ্গ।

আমি শৈশবেই দেবভাষাকে ভালোবেসেছিলাম, কিন্তু আরো ভালোবেসেছিলাম গান। পাটনায় রীতিমত কীর্তন শিখতাম এক নামজাদা কীর্তনীর কাছে। কিন্তু একটু শিখে আমার সাধ মিটত না। আমার তৃষ্ণা ছিল অফুরন্ত। কাজেই কলেজের ছুটি হ'লেই বেরিয়ে পড়তাম ভবঘুরে হ'য়ে ছুটতাম—যেখানেই গাইয়ের খবর পেতাম—দুদিন তিনদিন একসপ্তাহ একমাস। আর সর্বত্র শুধু যে গান শুনতাম তাই নয়, নিজেও গাইতাম ভজন কীর্তন ও বাউল নানা আসরে।

চোদ্দ

বিষ্ণুঠাকুর (একটু থেমে): আমার এক বিধবা পিসিমা থাকতেন কাশীতে তাঁর একটি মাত্র ছেলেকে নিয়ে। তাঁর অবস্থা বেশ ভালো ছিল। পিসেমহাশয় ছিলেন জমিদার—যথেষ্ট টাকা রেখে গিয়েছিলেন। পিসিমা আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, আরো ভালোবাসতেন আমার গান। আমি এম্-এ পাশ করার পরেই তিনি খুসি হ'য়ে উঠে আমাকে তাঁর কাছে এসে মাসখানেক কাটিয়ে যেতে নিমন্ত্রণ করলেন। লিখলেনঃ "কিন্তু বাবা, সপ্তাহে তিনচারদিন কীর্তন গাইতে হবে আমার ঠাকুর ঘরে।"

আমি গাইতাম মহানন্দেই, কারণ পিসিমার গঙ্গামুখী ঠাকুর ঘরটিতে আমার গান জ'মে উঠত দেখতে দেখতে। কাশীর জ্ঞানী গুণী ভক্ত ও ভক্তিমতীরা আসতেন ভিড় ক'রে।

নন্দিনীদের বাড়ী ছিল পিসিমার বাড়ীর কাছেই—দুটো মোড় বাদে…পাঁচ মিনিটের রাস্তা। কাজেই বলা বাহুল্য সেও আসত—প্রথম প্রথম তার মার সঙ্গে, তারপরে—মানে একটু ঘনিষ্ঠ মতন হ'তেই—একাই। ফলে গানের পরে একটু একটু ক'রে আলাপও জমল বৈ কি।

পিসিমার কাছে এসেই শুনেছিলাম মাসখানেক আগে মাণিকের কাণ্ডঃ সে সত্যিই মোক্ষদাকে চেয়েছিল প্রবল ভাবে, তাই নিজে এসে পিসিমাকে সব কথা খুলে ব'লে তাঁকে হাতেনাতে ধরেছিল—মোক্ষদাকে ছাড়া আর কাউকেই মালা দেবে না এইই ছিল তার পণ। পিসিমা ঘটকালি করতে রাজি হন নি, কারণ তিনি ছিলেন দারুণ গোঁড়া হিন্দু, বিধবা বিবাহের নাম শুনলেও উঠতেন জ্ব'লে। কিন্তু মোক্ষদাকে তিনি সত্যিই স্নেহ করতেন, তাই বলতেন মাঝে মাঝেই নন্দিনী ও তার মার অত্যাচার উৎপীড়নের কথা—বলতে বলতে তাঁর চোখে জল ভ'রে আসত।

শুনে প্রথমদিকে আমার ওদের উপর খুবই রাগ হয়েছিল বৈ কি। কিন্তু নন্দিনীর রূপমোহে পড়তে না পড়তে সব রাগ গেল উবে—আরো এই জন্যে যে, সে দুদিনেই আমার কীর্তনের—ও বিশেষ ক'রে কণ্ঠস্বরের—দারুণ ভক্ত হয়ে উঠল। একে রূপসী, তার উপর আমার

গানের—বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষায়—"নব অনুরাগিণী।" ফল যা হবার: ভবিতব্য—আমরা পরস্পরের দিকে ঝুঁকলাম—যাকে সাহেবি ভাষায় বলে "প্রেমে পড়া।" পড়াই বটে—তবে এমন পড়া যে ওঠা ভার!

সংস্কৃত কবিদের উপমায় সুন্দরী যুবতীর রূপকে বলা হয়েছে দীপশিখা, যুবককে—পতঙ্গ। শাস্ত্রীদের উপমা—আগুন ও ঘি। গদ্যের ভাষায়, যৌবনের রক্তে নেশার আবেশ হয় দেখতে দেখতে। আমাদেরও হ'ল। নন্দিনীর মন আমার দিকে আরো ঝুঁকল মাণিকের কাছে প্রত্যাখ্যাত হবার ঘা খাওরার ফলে। তাছাড়া সে সত্যিই ভালোবাসত—আর আমি যে যৌবনে গান গেয়ে আসর জমাতে পারতাম একথা তোমরা নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করবে না। নন্দিনী প্রায়ই বলত—আমার গান আর মাণিকের গান—"কিসে আর কিসে, ধানে আর তুষে!"

পিসিমা ছিলেন বুদ্ধিমতী। আমাকে অনেক বোঝালেন একদিন। আমিও বুঝলাম বৈ কি। কিন্তু মন বুঝলেও যে প্রাণ বোঝে না—কে না জানে? আর বোঝে না কেন তার ভাষ্য অনাবশ্যক, কেবল ভবভূতির একটি শ্লোক মনে পড়ে:

"তব স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ—
অর্থাৎ
তোমার পরশনে বিবশ ইন্দ্রিয়ে আবেশ ছায়।
চেতনা শিহরিয়া অমনি মূর্ছিয়া পড়ে নেশায়।"

এমনি সময়ে একদিন দুপুরবেলা পিসিমা বললেন যে, সকালে নন্দিনীদের এক দাই এসে খবর দিয়ে গেছে—মোক্ষদাকে ওরা সকালে খুব মেরেছে। "বেচারী!" বললেন পিসিমা গাঢ় কণ্ঠে, "ওকে বেঁধে মারা হচ্ছে, কিন্তু উপায় কী বল?"

আমার মনে এবার সত্যিই বিতৃষ্ণা জাগল। রুখে উঠে পণ নিলাম—এমন মেয়ে ও মার সঙ্গে মিশব না কিছুতেই। আরো, নন্দিনী যে চপল প্রকৃতির মেয়ে সেটা বুঝতে তো দেরি হয় নি। ফলে ফের কাশীতে দু একটি সাধুর কাছে যেতে আরম্ভ করলাম বল পেতে। বলও পেলাম বৈ কি। গানের সময় নন্দিনীর দিকে তাকানো পর্যন্ত ছেড়ে দিলাম। খেদ যে হ'ত তা নয়, কিন্তু নন্দিনীর রূপের হাতছানি মনকে দুর্বল করলেও ওদিকে সাধুসঙ্গের-ফলে-পাওয়া বিবেকবুদ্ধি এসে হাজিরি দিত বল দিতে। সুরু হ'ল ফের কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র ক'রে তোলার সেই সনাতন যুদ্ধ।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তবু পিসিমার ওখান থেকে চ'লে যেতে পারলাম না কিছুতেই। কথায় বলে শত্রুর শেষ রাখতে নেই। কিন্তু যেখানে শত্রু উর্বশী মেনকার ছদ্মবেশে হানা দেয় সেখানে নানা কুযুক্তি এসে সৎসঙ্কল্পকে নাকচ ক'রে দেয় সহজেই। দেবদ্রোহী শক্তিরা আমার মনে এ-যুক্তি পেশ করল পৌরুষের অছিলায়, বললাম আমি সঘনে: "পালিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা—ও কাপুরুষেরই সাজে। তাছাড়া মোহিনীকে যখন মায়া ব'লে চিনতে পেরেছি তখন আর ভয় কি? আমি যদি না ঝুঁকি, কেউ কি আমায় টলাতে পারে?

এই ধরণের আরো কত মনভোলানো বীর বাণী!

নন্দিনীর বুঝতে দেরি হ'ল না। হঠাৎ পেলাম ওর এক চিঠি: "লোকের কথায় বিশ্বাস করবেন না—একটিবার অন্ততঃ আসুন আমাদের এখানে, বিশেষ কথা আছে—তবে নিরালায় নৈলে হবে না।"

অমনি ফের মন বিষম দুর্বল হ'য়ে গেল—সব সাধু সংকল্প গেল উবে উষার আলোর কুয়াশার মতনই—এক মুহূর্তে। মহাভারতের একটি শ্লোকও মনে পড়ে স্বয়ং ভীষ্ম বলেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে—(ভীষ্ম কি মহাজ্ঞানী ছিলেন না?)—"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাৎ চাপি বিষাদাপ্যমৃতং পিবেৎ।"*

শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেয়ের সেই সনাতন দ্বন্দ্বকে জীইয়ে রাখতে এইভাবে কতশত কুযুক্তিই না মোহিনী সুবুদ্ধির ছদ্মবেশে এসে কলিঠাকুরের তল্পি বয় বাবা! নচিকেতাকে যম সাবধান করেছিলেন এই ব'লে যে, শ্রেয়োমার্গ ধরলে স্বর্গলাভ হয়। আর প্রেয়োমার্গ ধরলে সর্বনাশ। কিন্তু কলিঠাকুরের মোহিনী মুক্তি এই সূত্রটিকে উলটে বলে: "প্রেয়ই সরস, শ্রেয় নীরস। (একটু হেসে) কাজেই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রইল না—জেনে শুনেই শ্রেয়কে বিদায়

* দুষ্কুল থেকেও স্ত্রীরত্ন আহরণ করবে—বিষ ছেঁকেও করবে সুধাপান।

দিয়ে বরণ করলাম প্রেয়কে—ফাঁদকে ফাঁদ জেনেও পা বাড়ালাম বীরভঙ্গিতে—গেলাম নন্দিনীদের ওখানে তার সঙ্গে নিরালায় আলাপ করতে। অমনি নন্দিনী মোহন হেসে আমাকে টলিয়ে দিল—রাজী হ'লাম তার ওখানে গান গাইতে।

একটা মিথ্যা যেমন দশটাকে টেনে আনে, তেমনি একটা চ্যুতির ফলে ঘটে আরো দশটা স্খলন। আমারো ঘটল: নন্দিনীর ওখানে গানের নিমন্ত্রণ নেবার সময় কলিঠাকুর কানে ফুশলেছিলেন: "মাত্র একদিন গাইছ তো—এতে এত ভয়ের কী আছে? তাছাড়া সামনের মাসে তো ফিরে যাবেই পাটনায়—যখন ওকে বিবাহ করবে না জানো তখন একটু মেলামেশার রস চাখ্‌লেই বা—তুমি তো আর ধনুর্ধর দত্তাত্রেয় মুনির চেলা নও যে নারীকে 'কৌটিল্যদম্ভসংযুক্তা সত্যশৌচবিবর্জিতা' ব'লে দূর ছাই করতে বাধ্য?" ······ইত্যাদি ইত্যাদি সে কত চমৎকার চমৎকার যুক্তি!

কিন্তু মজা এই যে, কোনো যুক্তিকে শুভবুদ্ধি কু ব'লে চিনলেও তার আফিংকে একটু সেবন করতে না করতে আবেশ আসে ঘনিয়ে, ফলে গীতার পরিভাষায় সেই "তামসী বুদ্ধি"—ই জয়ী হয়ে যার প্ররোচনায় "অধর্মকেই ধর্ম মনে হয়—অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তামসাবৃতা—সর্বার্থান্ বিপরীতান্ চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী।" আমারও হ'ল: প্রথমে নন্দিনীর ওখানে একদিন, তারপর আর একদিন···তারপরে সপ্তাহে তিন চারদিন ক'রে আসর জমাতে সুরু ক'রে দিলাম অকুণ্ঠেই। বোঝালাম নিজেকে: "দোষ কী? ঠাকুরের নামই তো করছি?" দেখেও দেখলাম না কার কাছে করছি ঠাকুরের নাম! পিসিমার ওখানে আসত ভক্ত সাধু সন্ত, নন্দিনীর ওখানে—নানা জাতের সৌখীন শ্রোতা—ফ্যাশেনেবল্ নবকুলকামিনী। কিন্তু গান গাইতাম আমি এমন চমৎকার যে, তারাও মুগ্ধ হ'ত। খুসি হয়ে বোঝালাম নিজেকে: এইই তো চাই অভক্তদের মধ্যেও ভক্তির গান করা। বিপরীত বুদ্ধি আর কার নাম?

পিসিমার বুঝতে বাকি রইল না—হাওয়াটা কোন্ দিকে বইছে। শেষে বললেনও একদিন আমাকে যে, নানা লোকে নানা কথা বলছে। আমি পিঠ পিঠ উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে জবাব দিলাম: "পিসিমা! বিবেকানন্দ বলতেন 'লোক না পোক', জানো তো? লোকে কী না বলে? তাছাড়া আমি তো আর দিন পনেরোর মধ্যেই প্রস্থান করব···তুমি ভেবো না, আমি সজাগ আছি।" পিসিমা মুখ ভার করে বললেন: "কিন্তু এত ঘন ঘন গাওয়া বাবা"—আমি তাঁকে খুসি করতে অন্য সুর ধরলাম: "কি জানো পিসিমা? আমি রূঢ় হ'তে চাই না। তাছাড়া মোক্ষদার সঙ্গে আমার দেখা হয় গানের আসরে। সেও গান শুনে আনন্দ পায়। কালও নন্দিনী ফের বলছিল: আহা, ও-বেচারীর তো আর কোনো পথ নেই একটু শান্তি পাবার—আপনার কীর্তন শোনা ছাড়া···" পিসিমা এর পরে আর কীই বা বলবেন? কারণ কথাটার মধ্যে কিছু সত্যের মিশেল ছিল—মোক্ষদা নিজেও তাঁকে ঠিক এই কথাই বলেছিল একদিন—যে, আমার ভজনই তার মরুজীবনে একমাত্র তৃষ্ণার জল। আর ঠিক এই সময়ে নন্দিনী চালও বদলে ছিল—আরো আমাকে বোঝাতে চেয়ে যে, মোক্ষদাকে ওরা যত্নেই রেখেছে। তাই আমার সামনে সে বারবারই মোক্ষদাকে সাদরে ডেকে বসাত নিজের পাশে, বলত: "বৌ ভারি গান ভালোবাসে বিষ্ণুদা! ওর কণ্ঠস্বরও এমন মিষ্টি যে কী বলব! কিন্তু হ'লে হবে কি, এমন বিষম লজ্জা যে কারুর সামনেই গাইবে না।" এই ধরণের অতি নরম স্তুতি। গানের পরেই কিন্তু ওকে ভিতরে পাঠিয়ে দিত—পাছে সে আমার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পায়। কিন্তু যতক্ষণ আমি গাইতাম মোক্ষদা এমন তন্ময় হ'য়ে শুনত যে প্রতিবারই আমার মন গৌরবী তৃপ্তিতে ভ'রে উঠত। সঙ্গে সঙ্গে আমি মনকে বোঝাতাম: "না না, নন্দিনীরা ওকে মারধোর করবে কেন? লোকে কত মিথ্যাই না রটায়—কে না জানে?" ···ইত্যাদি।

থেকে থেকে ওর বিষণ্ণ কমনীয় মুখখানি মাঝে মাঝেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত—সন্ধ্যাতারার স্নিগ্ধ উদাস রেশে। কিন্তু এ-ভাবে সে-কল্পনাকে আমি উড়িয়ে দিতাম 'কবিয়ানা' নাম দিয়ে। দেওয়া কঠিন হ'ত না, কারণ ঠিক এ সময়ে আমার জাগ্রত মনের সাড়ে পনের আনা জুড়ে বসেছিল নন্দিনীর রূপ হাবভাব হাসি চাহনিই বলব।

আমি মনে মনে জানতাম পিসিমার কথাই ঠিক—আমার আর কালবিলম্ব না ক'রে সোজা পাটনা ফেরা উচিত ছিল। কিন্তু মনে হ'ত—নন্দিনী ও মোক্ষদা দুজনেই কষ্ট পাবে—আহা! তাছাড়া দুদিন পরে তো যাচ্ছিই, এত তাড়া কী? নন্দিনীর সঙ্গে যে আমার বিবাহ হ'তে পারে না ওরা তো ভালো ক'রেই জানে। নন্দিনীর মাকে পিসিমা বলেছিলেন দুতিন বার জোর দিয়েই যে, আমার পিতৃদেব গোঁড়া হিন্দু—বিধবা বিবাহের বিরোধী।

নন্দিনী একথায় আরো একটু উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠে থাকবে—বাধা পেলে কামনারা প্রবল হয় কে না জানে? কেবল আমার কাটান্ ছিল সাধুসঙ্গ—সাধুরা এ জগতের রঙ্গিণী মেয়েকে বিবাহ করার বিরোধী জানতাম তো, তাই আমার মন কামনায় দুর্বল হ'লেও বিবশ হয়নি। বিবাহ করব না স্থির ক'রে ফেলেছিলাম।

এমন সময়ে একদিন নন্দিনী আমার গানের আসর বসালো ওদের সুন্দর বাগানে—চাঁদের আলোয়। আমার গান খুব জ'মে উঠল। ঘণ্টা দুই গাইবার পর তার মা অন্য সব অতিথিদের বিদায় দিয়ে আমাকে নন্দিনীর জিম্মায় রেখে ভিতরে গেলেন আমার খাবারের ব্যবস্থা করতে।

চাঁদের আলোয় ফুলবাগানে এমন পরমাসুন্দরীকে কাছে পেয়ে আমার মনে আবেশ জেগে উঠল—বিশেষ যখন পরমাসুন্দরী গাঢ়কণ্ঠে ব'লে বসলেন: "এমন কণ্ঠ কোথায় পেলেন আপনি?"

আমি হেসে বললাম: "কিন্তু তুমি তো শুনেছি কীর্তন তেমন পছন্দ করো না।"

নন্দিনী বিরস কণ্ঠে বলল: "কে বলল? মাসিমা?"

আমার পিসিমাকে সে মাসিমা ডাকত।

আমি মিথ্যা বললাম: "না। তবে লোকমুখে শুনেছি—তুমি চটকদার টপ্পা ঠুংরি গজল কাওয়ালিই বেশি ভালোবাসো।"

নন্দিনী বলল: "লোকে কী না বলে বিষ্ণুদা? তাদের তো এমন অপবাদ রটাতেও বাধে না যে আমরা মোক্ষদাকে অষ্টপ্রহর পিষে মারছি তিলে তিলে। আমরা এত আদর যত্ন করি ওকে—কিন্তু কয়লাকে কে কবে ধুয়ে শাদা করতে পেরেছে বলুন? স্বভাবে যে অকৃতজ্ঞ সে নিন্দুক আর মিথ্যুক হবে না তো কী হবে বলুন?"

আমার মনটা একটু বিমুখ হ'ল, বললাম: "কি রকম? ও তো শুনেছি কথাই কয় না।"

নন্দিনী বলল বাঁকা হেসে: "কয় না আবার! ডুবে ডুবে জল খায়। চায় নি ও এক নাগরকে ফাঁদে ফেলতে? কিন্তু ওর কথা যেতে দিন। আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে।"

আমার বুকের রক্ত দ্রুত বইল: "কি?"

ও বলল: "আমাকে আপনার কয়েকটি গান শেখাতে হবে। আমি ছাড়ছি নি।"

ইতিপূর্বে পাটনায় একটি সেন্টিমেণ্টাল মেয়েকে গান শেখাতে গিয়ে বিপদে পড়েছিলাম - মেয়েটির অন্য জায়গায় বিবাহ স্থির হ'তে সে জলে ডুবে মরতে চায়। তার উপর নন্দিনীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতায় পিসিমা বিরোধী ছিলেন তো, কে জানে হয়ত বাবাকে লিখে বসবেন এবার? মোট কথা, নন্দিনীকে গান শেখাবার লোভ জাগলেও এ নিয়ে ফের একটা গণ্ডগোল হয় এ আমি চাইতাম না সত্যিই। তাই একটু আম্‌তা আম্‌তা করে শেষে বললাম: "কিন্তু আমি শুধু কীর্তন গাই—তা আবার সেকেলে পদাবলী, জানোই তো।"

নন্দিনী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল: "আপনি যাই গান আমার কানে মধু ঢালে। আপনি যা শেখাবেন তাই শিখব আমি।" বলেই আমার দুহাত চেপে ধরল: "না করবেন না, লক্ষ্মীটি। আপনি তো মেয়েদের গান শেখান—তার উপর এখন আপনার পড়াশুনোও শেষ হয়েছে।

ওর স্পর্শে আমার অঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মনে কেমন যেন একটা আশঙ্কারও ছায়াপাত হ'ল। আমি ওর মুঠো থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম: "মেয়েদের গান শেখাতাম বটে—কিন্তু···মানে··· আজকাল আর শেখাই না।"

নন্দিনী হেসে বলল: "কেন? ভয় করে?"

আমি বললাম লজ্জা পেয়ে: "ঠিক ভয় নয়, তবে—"

নন্দিনী এবার হেসে গড়িয়ে পড়ল, বলল: "ভরসা পাই না—এই তো? কিন্তু আমি ভরসা দিচ্ছি যে, বিপদে

ফেলব না। শুধু গানই শিখব। না, দুটি পায়ে পড়ি আপনার—অন্তত দুতিনটি কীর্তন অ মাকে শেখাতেই হবে। কথা দিন - শেখাবেন ?"

ব'লেই আমার কাঁধে মাথা রাখল। সঙ্গে সঙ্গে কী যে হ'ল ব'লে বোঝাতে পারব না—যার ঈষৎ স্পর্শেও আমার বুকে ডমরু বেজে উঠেছিল তার উষ্ণদেহের ছোঁওয়ায় প্রবল কামনা উঠল জেগে। ভুলে গেলাম এক সাধুর কথা "বাবা! আমাদের দুর্নাম রটেছে যে আমরা মেয়েদের মজাই—কিন্তু সত্যি কথাটা এই যে মজাবারজন্যে হাতছানি দিয়ে ডাকে সব আগে ওরাই।"

কিন্তু শুধু দেবদ্রোহী শক্তিরাই যে পাকে ফেলতে হানা দেয়, তাই তো নয়, ঠাকুরের কৃপাশক্তিও আসে ত্রাণ করতে। তাই ঠিক এই সময়েই নন্দিনীর মা এসে বললেন—খাবারের জায়গা হয়েছে।

সেদিন রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম হ'ল না। ওকে কাছে পেতে মন চাইছিল বৈ কি—কিন্তু নেশার আবেশ কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত বুদ্ধির ধুক্তিকে কু ব'লে চিনতে পারলাম—আর অমনি শুভবুদ্ধি ব'লে উঠল: "না না না, উপযাচিকাকে প্রশ্রয় দিলে ডুববে। "উপযাচিকা" মনে হতেই কি একটা অশুচিভাব যেন মনকে বাড়ি মারে। যা চাই তাকে বেশি কাম্য মনে হয় যখন তাকে ছুঁতে পেরেও ধরতে পারি না। উল্টোদিকে যে নিজে থেকে গায়ে ঢ'লে পড়ে তার বাঞ্ছনীয়তা কমে যায়ই যায়—যদি না অবশ্য মানুষ কামনার সঙ্গে মাতাল হয়ে উঠে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারায়। আমার সে-অবস্থা হয় নি। সবে গোলাপী নেশা জ'মে উঠছিল—এম্‌নিসময়ে এ কী বেসুরার উৎপাত।

মন অধীর হ'য়ে উঠল। তাছাড়া নারী সম্পর্কে আমার দুর্বলতা থাকলেও বলেছি—আমি চাইতাম না স্বৈরিণীর হাতের খেলার পুতুল হ'য়ে শেষটায় দশচক্রে ভগবান্ ভূতের অবস্থা—কি না ঘোর সংসারী। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে দুঃখ পেয়েছি প্রচুর, কিন্তু হারমানার মুখেও আশ্চর্য ভাবে বেঁচে গেছি বারবার—বিশেষ ক'রে বহু সাধুসঙ্গের সঞ্চিত পুণ্যফলেই বলব। সে সব ঘটনা ফলিয়ে বলতে গেলে একমাসেও কুলুবে না তাই শুধু এই পর্বেরই ইতি করি আরো কয়েকটি উপলব্ধির খবর দিয়ে।

সেদিন রাত্রে আমি নানাদিক থেকেই মনকে যাচিয়ে নিয়ে প্রত্যক্ষ করলাম তিনটি সত্য; এক, শুধু আমার নিজের মনের জোরে আমি আমার শুভ সংকল্পে অটল থাকতে পারব না; দুই, নন্দিনীর আহ্বান একবার উপেক্ষা করলেও দুর্বলতা ফের আমাকে পেয়ে বসলে ঠেলতে পারব কিনা সন্দেহ: তিন, পালিয়ে আত্মরক্ষা করব ভাবতেও পৌরুষের অভিমানে বিষম লাগে। কাজেই এ-সমস্যার একমাত্র সমাধান: রক্ষাকবচ চাই—অর্থাৎ গুরুকরণ: যে-ক'রেই হোক দীক্ষা এবার আমাকে নিতেই হবে। সাধনা নেব এ তো আমি ঠিকই করেছিলাম, কেবল গুরুর মত গুরু পাই কোথায়—এই ছিল দুর্ভাবনা। কিন্তু শুনেছিলাম সময় হ'লেই গুরু আসেন, আর সময় আসে চাওয়ার মত চাইলে তবেই। তাই ঠিক করলাম—প্রার্থনা করতেই হবে সদ্‌গুরুর জন্যে। শুধু এ-সাধু ও-সাধু ক'রে বহুদক হ'লে চলবে না, হ'তে হবে স্থিতধী কুটীচক। আর কুটীচক গুরুর খুঁটি বিনা হ'তে পারে কে? এই সূত্রে দেখতে পেলাম আরও একটা আশ্চর্য জিনিষ: যে, যে-দেবদ্রোহী শক্তিরা রূপমোহে মত্ত ক'রে আমার সাধনার আদর্শ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল তারা আমাকে পাকে ফেলতে গিয়েই হ'য়ে দাঁড়ালো মুক্তিদিশারি—দেখিয়ে দিল যে, গুরু বিনা গতি নাই! করুণার নামই তো অঘটন ঘটানো।

পনেরো

বিষ্ণুঠাকুর (গাঢ়কণ্ঠে): আমি পরদিন গঙ্গাস্নানে গিয়ে অনেকক্ষণ কৃষ্ণনাম জপ করলাম, শেষে প্রার্থনা করলাম চোখের জলে: "গুরু বিনা যদি আমার পতন হয় তবে গুরুর কাছে আমায় পৌঁছে দাও প্রভু!"

প্রার্থনার পরে চোখ খুলতেই দেখি—এক জ্যোতির্ময় দিব্যকান্তি জটাজূটধারী মহাপুরুষ! তিনি আমাকে ইসারা করলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাঁর পিছু পিছু গিয়ে তাঁর কুটীরে পৌঁছতেই তিনিববললেন: তিনি ফের যাবেন মানস সরোবরে—শুধু তিনটি শিষ্যকে দীক্ষা দিতে তাঁর কাশীতে আসা। তাঁর রামনগরের আশ্রমেই থাকবেন তিনি আট মাস। শেষে আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ ক'রে বললেন: "অবিশ্বাস কোরো না বাবা,

মনে রেখো গীতার কথা যে, শ্রদ্ধাবান্ই জ্ঞানের অধিকারী হয়।"

তাঁর জাদুস্পর্শে মুহূর্তে আমার সব সংশয় গ'লে আলো হ'য়ে গেল। কৃতজ্ঞ চোখের জলে বললাম তাঁকে সব কথা —কিছুই না লুকিয়ে। তিনি বললেন মৃদু হেসে: "জানি বাবা! আর তাই তো তোমাকে শক্তিদীক্ষা দিতে এসেছি।" ব'লে আমার কানে মন্ত্র দিলেন। আমার মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে এক অসহ বিদ্যুৎপুলক ব'য়ে গেল। আমি সম্বিৎ হারালাম।

সম্বিৎ ফিরে এলে পর আমি ধীরে ধীরে গুরুদেবকে বললাম সব কথা। তিনি হেসে বললেন—তিনি সব দেখতে পেয়েছেন। অনেক কিছু ব্যাখ্যা ক'রে শেষে বললেন: নন্দিনীকে আমার কাছে পাঠিয়েছে দেবদ্রোহী শক্তিরা আমার সাধক জীবনকে ধ্বংস ক'রে দিতে। তাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করতেই হবে। কিছুদিনের জন্যে বদরী-নারায়ণে তাঁর আশ্রমে থাকলে মনের জোর ফিরে পাব —ইত্যাদি। তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ ক'রে বললেন: "বদরীতে অনেক কিছু দেখতে পাবে যা অভাবনীয়' কিন্তু পিতৃদেবের মত নিতে গেলে সব পণ্ড হবে, কারণ তিনি কিছুতেই মত দেবেন না—যেতে হবে পালিয়ে 'এক কাপড়ে' যাকে বলে।

হিমালয়ের নানা তীর্থদর্শনের ইচ্ছা আমার অনেকদিন থেকেই ছিল, কাজেই মহা উৎসাহে পরদিনই ধরলাম হরিদ্বারের ট্রেন। সেখান থেকে বাসে যাব বদরীনারায়ণ। পিতৃদেবকে তার করলাম লক্ষ্ণৌ থেকে: "মাসতিনেক হিমালয় ঘুরে পাটনায় ফিরব আমার জন্যে যেন খোঁজাখুঁজি না করা হয়।"

প্রায় তিনমাস বদরীনারায়ণ কাটিয়ে যখন পাটনায় ফিরলাম বাবা সাগ্রহে বুকে টেনে নিলেন। মা কেঁদে সারা। সে এক সীন! ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে সন্ন্যাসী না হয়ে! কী আনন্দ! ধুম পড়ে গেল। বাবা মাকে বললেন: এবার ছেলের বিয়ে দিতে হবেই হবে। আর গড়িমসি নয়।

আমি তাঁকে এতদিন বলি নি আমার গুরুদেবের কথা। কিন্তু বিবাহের প্রসঙ্গ উঠতে বলতেই হল যে গুরুদেবের অমতে বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। বাবা শুনে বিষম রেগে গেলেন। গুরু ফুরু বুঝি না। আমার কথা শুনতেই হবে।

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে সেইদিনই রাতের ট্রেন ধ'রে পরদিন সকালে হাজির হলাম রামনগরে গুরুদেবের আশ্রমে। তিনি বললেন বিবাহ আমাকে করতে হবে বটে, কিন্তু কবে ও কাকে তিনি পরে বলবেন। আরো অনেক কথা বলে শেষে বললেন: "তুমি এখন কিছুদিন আমার কাছেই থাকো—কিন্তু তোমার পিসিমাকে খবর দিও না যে তুমি এসেছ কাশীতে!"

আমি একটু দুঃখিত হলাম বৈ কি, কিন্তু মনে মনে সত্যিই তো চাইতাম আমার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে তাই গেলাম না পিসিমার ওখানে। কে জানে নন্দিনী যদি ফের চেপে ধরে—ভয়ও করে আবার লোভও হত। বলতে গুরুদেব হেসে বলেছিলেন: "বাবা, যেখানে মন বেশি দুর্বল সেখানে প্রলোভনকে দূরে রাখাই বিধি। যেখানে বুকে জোর নেই সেখানে বজ্রধ্বজ বিরাটবক্ষ ব্রহ্মচারীর ভঙ্গি করা মূঢ়তা। তাছাড়া তুমি জানো না তো—গুরুমন্ত্র নেবার পরে কতরকম অভাবনীয় অনর্থ এসে বাদ সাধে। তাই এখন শুধু সাধনা ক'রে চলো যাতে সেই কৃষ্টিলাভ করতে পারো। নৈলে শুধু যে বিপদ কাটবে না তাই নয়—আরো বিপদে পড়বে জেনো। কারণ তুমি না জানলেও আমি জানি যে, তুমি সাধনা নিয়েছ ব'লেই বিরুদ্ধশক্তিরা আরো জোট বেঁধেছে তোমার তপোভঙ্গ করতে। বাবা, অপ্সরারাও এই সব শক্তির চর হ'য়েই আসত মুনিঋষিদের যোগভ্রষ্ট করতে—এ রূপকথা বা কবিকল্পনা নয়—অক্ষরে অক্ষরে সত্য।"

আমি একটু দমে গিয়ে বললাম: "কিন্তু সাধনাই যদি আমার স্বধর্ম হয় তবে আমাকে বিবাহ করতে হবে কেন গুরুদেব? ঘোর সংসারী হ'তে আমার বিষম ভয় করে।" গুরুদেব হেসে বললেন: "সাধনা নেবার পরে সাধককে সব আগে শিখতে হয় একটি জিনিষ— স্বেচ্ছাবিহারের নির্দেশে চলতে না চেয়ে গুরুর ইচ্ছাকেই বরণ করতে। আমি তোমাকে তোমার চেয়ে অনেক বেশি চিনি, তাই বলছি যে, তুমি বিবাহ না ক'রে সাধনা করতে পারবে না—গৃহী হ'য়েই তোমাকে যোগসিদ্ধ হতে

হবে। কিন্তু কী হবে বা হওয়া উচিত এসব জল্পনা-কল্পনা নিয়ে মিথ্যে ভেবেচিন্তে এ-প্রশ্নের কোনো কূলকিনারা হবে না জেনো। তাই আত্মসমর্পণের মন্ত্র জপ ক'রে—পরমহংসদেবের ভাষায়—বেচারী গুরুকেই বকল্‌মা দিয়ে দেখ না একবার—পরিণাম শুভ হয় কি না। তাছাড়া তুমি তো সংস্কৃতে পণ্ডিত, মহাভারতের ভক্ত, মনে নেই ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে কী বলেছিলেন: 'পর্যায়যোগাৎ বিহিতং বিধাত্রা কালেন সর্বং লভতে মনুষ্যঃ' * তাই তুমি এখন থেকে পণ নেও—ঝোঁকের মাথায় চলা ছেড়ে দেবে। কোন্ পথে কী ভাবে সিদ্ধিলাভ হবে সে-দুর্ভাবনা রেখে, ঠাকুরকে ডেকে ও গুরুবাক্য মেনে শুধু নিজের চিত্তশুদ্ধির দিকে ষোলো আনা মন দাও—বুঝলে ?"

আমি ঠিক খুশি হ'তে না পারলেও গুরুর কথা শিরোধার্য ক'রে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলাম। কিছুদিন পরে পাটনায় ফিরে গেলাম। মা বাবা পাছে বেশি বললে আমি বিবাগী হয়ে যাই এই ভয়ে আমাকে আর বিবাহ করতে বলতেন না। আমি নিজের মতন থাকতাম—তাঁরা বাধা দিতেন না। কোথাও যেতাম না—শুধু মাঝে মাঝে রামনগরে যেতাম গুরুসঙ্গ ও তাঁর নির্দেশ পেতে। ফলে সাধনায় বেশ মন ব'সে গেল—গুরুর কৃপায়ই বলব। নৈলে হঠাৎ একলা হ'তে পারলাম কেমন ক'রে ?

ষোলো

বিষ্ণুঠাকুর (একটু চুপ ক'রে থেকে): এখানে ফের একটু পিছিয়ে গিয়ে বলতে হবে, নন্দিনীদের কাহিনী—যা পরে শুনেছিলাম মোক্ষদার মুখে।

আমি হঠাৎ পিসিমার ওখান থেকে কাউকে না ব'লে নিরুদ্দেশ হ'তে পিসিমা ব্যস্ত হ'য়ে বাবাকে তার করেন। তিনি উদ্বিগ্ন হওয়া সত্ত্বেও নিরুপায় হ'য়ে শান্ত সুরেই পিসিমাকে আমার টেলিগ্রামের খবর জানিয়ে আশ্বাস দেন যে, আমি হিমালয়ে ঘুরতে বেরিয়েছি, মাস তিনেক বাদে ফিরব কথা দিয়েছি, খোঁজ ক'রে ফল নেই।

আমি চ'লে যেতে নন্দিনী রাগে জ্বালায় ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে উঠল। তার মাও বলা সুরু করলেন যে, মোক্ষদাই গোপনে চিঠি লিখে আমার মন ভাঙিয়েছে। ফলে হ'ল এই যে—এর পরে তিনি ওকে পিসিমার সঙ্গেও আর দেখা করতে দিতেন না—কেবল ঘরের কাজে নির্দয়ভাবে খাটাতেন দাসীর মতন।

এমনি সময়ে এলো অর্ধোদয় যোগ। আমি পাটনা থেকে গেলাম ফের রামনগরে গুরুদেবের আশ্রমে। ওদিকে নন্দিনীর মা মেয়েকে নিয়ে গেলেন গঙ্গাস্নানে। কিন্তু যাবার আগে মোক্ষদাকে রেখে গেলেন তার শোবার ঘরে তালা চাবি দিয়ে বন্ধ ক'রে রেখে।

ও আর সইতে পারল না। ঠিক করল গঙ্গায় ডুবে মরবে। বিছানার চাদর ছিঁড়ে ঝুলিয়ে দিয়ে সেই দড়ি বেয়ে জানলা টপ্‌কে রাস্তায় প'ড়ে সোজা এল দশাশ্বমেধ ঘাটে।

এদিকে গুরুদেব আমাকে বললেন—দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করতে। তখনও তত ভিড় জমে নি। তাই সহজেই চোখে পড়ল মোক্ষদা গঙ্গাজলে হাতজোড় ক'রে প্রার্থনা করছে চোখ বুঁজে—দুগাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে···শুনতে পেলাম না ও মৃদুস্বরে কী বলছে, কিন্তু ওর চিন্তার ছবি ভেসে উঠল হঠাৎ আমার মনে—যাকে তোমরা বলো টেলিপ্যাথি। কিছুদিন যোগ করবার পরেই আমার মনে সময়ে সময়ে এর ওর তার চিন্তা উঠত ভেসে—কখনো কখনো দূরের অনেক ঘটনাও পরিষ্কার দেখতে পেতাম। কাজেই আমি অকুণ্ঠেই ওর হাত চেপে ধরলাম দশাশ্বমেধ ঘাটে—তত লোক হয়নি ব'লে একটু সুবিধাও হ'ল কথা বলবার। "না, জেনে শুনে পাপ করলে মা কোলে টেনে নেন না। তাছাড়া তুমি মরবে কেন ? আত্মহত্যা মহাপাপ।"

ও আমার পানে তাকিয়েই দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। পরে বলল মুখ তুলে ধরা গলায়: "না, আমি বাঁচতে চাই না। আমি অপয়া অলক্ষ্মী—যেখানেই যাই আসে অশান্তি। আমার মরাই ভালো। মা গঙ্গা আমাকে নিন আজ। আমি পালিয়ে এসেছি। আমার আর কোথাও ঠাঁই নেই।" আমি ওর কব্‌জি দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধ'রে বললাম: "আছে। আমার

---

* যে ভাবে ঘটবার বিধাতাই তার বিধান করেন—মানুষ সব কিছুই পায় যথাপর্যায়ে।

গুরুদেবের আশ্রমে। এসো।" গুরুদেবের আশ্রমের কথা এত জোর দিয়ে কেন বললাম কে বলবে?

সতেরো

বিষ্ণুঠাকুর (ধরা গলায়): গুরুদেব ওকে দেখেই গভীর স্নেহে ব'লে উঠলেন: "এসো এসো মা, আমি তোমারই অপেক্ষা করছিলাম।" ও আশ্চর্য হ'য়ে বলল: "আমি···আমি আসব আপনি জানতেন?" গুরুদেব হেসে বললেন: "হ্যাঁ মা, এবং আরো অনেক কিছু জানি, শুধু তোমার অতীত জীবনের নয়—তোমার ভবিষ্যৎ জীবনেরও। তাই বলছি—তোমার শুধু যে দুঃখের রাত কেটে গেছে তাই নয়, ভবিষ্যতে তুমি অনেকেরই দুঃখের রাতে উষা হ'য়ে এসে দাঁড়াবে।"

শুনেই ও তাঁর পায়ে মাথা রেখে ভেঙে পড়ল। শুধু কান্না আর কান্না।

তারপরে কত কী যে ঘটল বাবা—সে সব বলার সময় নেই। কেবল মনে পড়ে একটি সাহেবি প্রবচন: "Truth is stranger than fiction" আর সে যে কী সব অঘটন—পরে বলব একদিন ফলাও করে। এখন বাকিটুকু বলি শোনো—যতটা পারি সংক্ষেপেই বলব।

মোক্ষদাকে আমি গুরুদেবের আশ্রমে নিয়ে তুলেছিলাম খানিকটা বাধ্য হ'য়েই বৈ কি। কারণ বলাই বাহুল্য যে, ওকে নিয়ে বাবার কাছে যাওয়া সম্ভব ছিল না—পিসিমার কাছে তো নয়ই। কিন্তু গুরুদেবের কাছে পৌঁছতেই তিনি ওরই অপেক্ষা করছিলেন—একথা শুনে আমি থ হ'য়ে গেলাম। গুরুদেব তারপরে বললেন অনেক কথা প্রায় একঘণ্টা ধ'রে—কী ভাবে দুঃখ আমাদের খেই ধরিয়ে দেয় অমৃতলোকের, কোন্ পথে গুরু শক্তি পান ইষ্টের কাছ থেকে, বড় আধার কাকে বলে, আর কেন বড়কে আরো বড় হ'তে হ'লে অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়—এই ধরণের সে যে কত চমৎকার চমৎকার কথা! সবশেষে বললেন: "আর একটি রহস্যের শুধু আভাষ দিয়েই থামব মা! এ দুনিয়ায় যা কিছু ঘটছে তার পূর্ণ ব্যাখ্যা পেতে হ'লে যা চোখে দেখা যায় না তার অন্ততঃ কিছুটার খবর পাওয়া দরকার—যাকে বলা যেতে পারে নেপথ্যতত্ত্ব—Occultism এই নেপথ্যলোকে নানা সজাগ শক্তিদের জটলা। আমরা, যোগীরা, তাদের ক্রিয়াকলাপ ও গতিবিধির খবর রাখি ব'লে এজগতের অনেক কিছুর শুধু যে ভাষ্য করতে পারি তাই নয়, এ জ্ঞানের আলোয় তাদের অনেক কালের পাল্টা চাল চেলে বাজি জিৎতে পারি। তাই আমি বিষ্ণুকে পাঠিয়েছিলাম দেখতে পেয়েছিলাম ব'লে যে, তুমি লক্ষ্মী মা আমার দশাশ্বমেধ ঘাটে জলে ডুবে মরতে আসছ। নেপথ্যশক্তিরা তোমাকে মারতে চেয়েছিল কেবল এই জন্যেই নয় যে, তুমি বড় আধার—এজন্যেও বটে যে, তোমার সঙ্গে বিষ্ণুর শুভদৃষ্টি হ'লে সে-মিলনের ফলে তোমাদের উভয়ের সাধনার সিদ্ধিও সমৃদ্ধ হবে এবং তার ফলও হবে ব্যাপক। একথা তোমরা জানো না—কিন্তু নেপথ্যশক্তিরা হাড়ে হাড়ে জানে ব'লেই চেয়েছিল যাতে তুমি মরো এবং বিষ্ণু নন্দিনীর ফাঁদে পড়ে। অবিশ্যি, বিষ্ণুর দুর্বলতার ছিদ্র দিয়েই তারা এসেছিল ও নন্দিনীকে ঠেলেছিল তার দিকে। কিন্তু শুধু তারাই যে কিস্তি দিতে পারে তা তো নয়, সাধুরাও পারেন—আর বিষ্ণু সাধুসঙ্গ চাইত ব'লে এবং তুমি তার শক্তি হবে ব'লে তাঁদের আশীষশক্তি তোমাদের রক্ষা করবার খানিকটা সুযোগও পেয়েছিল। এই ভাবে আবহমানকাল তাঁর লীলার বিকাশ হয়ে এসেছে প্রতি মানুষের মনের কুরুক্ষেত্রে দৈবী ও আসুরী শক্তির লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে। আর যেখানেই দৈবী শক্তিরা বেশি প্রকট হয়, সেখানেই আসুরিক শক্তিরাও আরো জোট বেঁধে হানা দেয় বাদ সাধতে যুক্তি, তর্ক, নিরাশা, অবিশ্বাস, মোহ, বিজ্ঞতা, অভিমান, আত্মপ্রসাদ আরো কতরকমের মুখোশ প'রে। কিন্তু শেষমেশ তাদের হার হয়ই হয়—যদিও প্রথম দিকে তারা জেতে অনেক সময়েই। তাই উপনিষদে বলেছে: 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্' - অর্থাৎ জগতে আখেরে সত্যের দেবদূতরাই বাজি জেতেন, মিথ্যার চরেরা নয়।' এসব তোমাদের বলছি আজ শুধু একটি উদ্দেশ্যে: তোমাদের এ মিলন ঠাকুর চান ব'লেই এই মিথ্যার চরেরা চায় ভাংচি দিতে। তাই তোমাদেরও অবহিত হ'তে হবে—তাদের ফুশলানিতে কান দিলে চলবে না—আর জিৎতে হলে আত্মসমর্পণ করতে হবে ঠাকুরের কাছে—চলতে হবে গুরুর নির্দেশে। কারণ কেবল তাহলেই বাধারা বাদ সাধতে এসে শুধু যে হার মানতে বাধ্য হবে তাই নয়—হারিয়ে

দিতে চেয়ে দেবে আরো এগিয়ে। কারণ প্রাণলীলার যত সত্য আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে সত্য হ'ল এই যে, ঠাকুরের হাতে লাগাম দিলে তিনি রথ চালাবেন—যে-পথে ধর্ম ডাকে, জয় নিশ্চিত আর সিদ্ধির ফল ফলতে বাধ্য: অর্থাৎ, সার্থক পরার্থ নিষ্ঠায়।"

গুরুদেব একটুও বাড়িয়ে বলেন নি। মোক্ষদার সঙ্গে তাঁর আশ্রমেই আমার বিবাহ দেবেন স্থির করবার সঙ্গে সঙ্গেই একের পর এক বাধা এসে পথ আগলে দাঁড়ালো। প্রথম পিতৃদেবকে লিখতেই হ'ল এবার যে, গুরুদেব আমার ভার নিয়েছেন, আমি স্থির করেছি—দিন পনেরো বাদে গুরুদেবের আশ্রমেই মোক্ষদাকে বিবাহ করব। তিনি তৎক্ষণাৎ পিসিমাকে টেলিফোন করলেন আশ্রমের ঠিকানা দিয়ে ও বললেন যেকোনো উপায়ে এ বিবাহ ঠেকাতেই হবে। পিসিমা মোটর পাঠালেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে। ঠিক সেই সময়ে গুরুদেব আমাকে আশ্রমে রেখে গিয়েছিলেন প্রয়াগে এক শিষ্যের মৃত্যুশয্যায়। যাবার সময় ব'লে গিয়েছিলেন দুতিন দিন বাদেই ফিরবেন ও তারপরের পূর্ণিমায় আমাদের বিবাহ দেবেন। আমি পিসিমার সারথির হাতে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলাম যে, গুরুদেবের অনুমতি না নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারব না। চিঠি পেয়ে এবার তিনি নিজেই ছুটে এলেন। মোক্ষদা ঠিক সেই সময়ে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল। পিসিমার সুবিধা হ'য়ে গেল, আমাকে একলা পেয়ে বললেন —পিতৃদেব টেলিফোনে তাঁকে বলেছেন এ-বিবাহে তাঁর মত নেই। আমি বললাম: "তাঁর মত হবে না আমি জানতাম।" পিসিমা তখন কেঁদে ফেলে আমার হাত ধ'রে বললেন: "ওরে, বাপের মনে কষ্ট দিতে নেই, লক্ষ্মী বাবা আমার! এমন কাজ করিস নে।" আমি বললাম: "তুমি কী বলছ পিসিমা? মোক্ষদাকে আমি কথা দিয়েছি যে!" পিসিমা এবার রেগে উঠে শাপমন্যি দেওয়া সুরু করলেন। বললেন: "আমি জানি ঐ অলক্ষ্মীই যত নষ্টের মূল—" বলে যা মুখে আসে তাই ব'লে ওকে গালমন্দ করা সুরু করলেন। আমি কানে আঙুল দিয়ে বললাম: "ছি ছি, ও নিষ্কলঙ্ক মেয়ে—তুমি তো নিজেই বলতে। পিসিমা বলতেন: "আমার ভুল হয়েছিল। নন্দিনী ঠিকই বলত: 'ও ডুবে ডুবে জল খায়। ও এক স্বামীকে খেয়েছে তোকেও খাবে।" ব'লে ফের কান্না সুরু করলেন: "লক্ষ্মী বাবা আমার—কথা রাখ্—ওকে ছাড়। তোর জন্যে কত ভালো ভালো মেয়ে পথ চেয়ে আছে। 'তুই কেন এমন অপয়া বিধবাকে বিয়ে করতে যাবি?" আমি মুস্কিলে পড়ে বললাম: "ও গঙ্গায় ডুবে মরতে এসেছিল পিসিমা। ওর ভার নিয়েছি আমি! ওর আর তো ঘরে ফিরবার পথ নেই—" পিসিমা বাধা দিয়ে বললেন: "ওর ভার আমি নেব কথা দিচ্ছি—যদি ও তোকে ছেড়ে দেয়।" ব'লে তিনি চোখে আঁচল দিয়ে বললেন: "তোর মা লিখেছেন—তুই বিধবা বিবাহ করলে তিনি বিষ খাবেন। এমন পাপ-কর্ম করিস নে বাবা।" তখন আমি প্রথম দুর্বল বোধ করলাম, বললাম: "আচ্ছা পিসিমা, গুরুদেব ফিরে আসুন, সব কথা তাঁকে জানিয়ে তোমাকে বলব—মানে যদি তোমার প্রস্তাবে তিনি রাজী হন।"

আঠারো

বিষ্ণুঠাকুর (একটু হেসে): পিসিমা চ'লে যাবার পর সত্যিই ভাবনায় পড়লাম। কারণ আমি সত্যিই ভাবতে পারি নি যে পিসিমা মিথ্যা বলতে পারেন। তাই বিশ্বাস করেছিলাম তাঁর কথা যে, মা বলেছেন আমি এ-বিবাহ করলে তিনি বিষ খেয়ে মরবেন।

মোক্ষদা গঙ্গাস্নান সেরে ফিরে আমার মুখ দেখেই ভয় পেয়ে গেল। বলল: "কী হয়েছে?" আমি বললাম: "কিছু না।" ও বলল: "রাস্তায় মাসিমার মোটর দেখলাম। তিনি আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কী হয়েছে বলো। কিছু লুকিয়ো না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।" অগত্যা তখন সব কথা বলতে হ'ল। শুনে খানিকক্ষণ ও গুম্ হ'য়ে রইল, তার পরে বলল: "না। আমি এর পরে কিছুতেই তোমাকে বিবাহ করব না। মাসিমা সত্যিই বলেছেন—আমি অলক্ষ্মী অলক্ষ্মী অলক্ষ্মী—তাই যেখানেই যাই, আসে অমঙ্গল অশান্তি।" ব'লেই ভেঙে পড়ল কান্নায়: "কেন আমাকে বাঁচালে তুমি? কেন আশ্রয় দিলে আমার মতন অলক্ষ্মীকে? কেন কেন কেন?"

(একটু হেসে) কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তিরাই তো একমাত্র সত্য নয় বাবা। তার চেয়েও বড় সত্য হ'ল ঠাকুরের কৃপা, গুরুর প্রসাদ। হল কি, গুরুদেবের শিষ্য তাঁর প্রসাদে

সেরে ওঠাতে তিনি ফিরে এলেন—আর ঠিক এই সময়েই।

সব শুনে গুরুদেব মৃদুহেসে ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন: "তুমি অলক্ষ্মী নও মা, লক্ষ্মীপ্রতিমা। আরো বড় কথা—তুমি বিষ্ণুর শক্তি।" ব'লে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: "তোমার মা বিষ খেয়ে মরবেন বলেছেন—একথা সম্পূর্ণ বানানো বাবা। কিন্তু এসবও অবান্তর। আসল কথা হ'ল—ঠাকুরের নির্দেশ, তাকেই তোমাদের মেনে চলতে হবে দীক্ষা নেওয়ার পরে। আর আমি তোমাকে বলছি—ঠাকুরের নির্দেশ এই যে, তুমি বিষ্ণুর সহধর্মিণী হ'লে ও শুধু যে গৃহী যোগী হ'য়ে কৃতকৃত্য হবে তাই নয়—বহু লোককে দিশা দেবে পরম সার্থকতার।"

মোক্ষদা মুখ তুলে বলল: "কিন্তু গুরুদেব, উনি বাপের ত্যজ্যপুত্র হ'লে আমাদের চলবে কী ক'রে? গুরুদেব হেসে বললেন: "মা, ঠাকুরের 'পরে যে নির্ভর করে তার চলাচলের ভারও তিনিই নেন। এ শুধু আমার কথা না—গীতায় বলেছেন তিনি নিজে। তাই বলছি: তোমাদের সংসার রথের চাকা অচল হবে না—নিশ্চিন্ত থাকো। আর আপাততঃ বিবাহের পরে তোমাদের যোগজীবন সুরু হবে আমারি আশ্রমে—এই তাঁর নির্দেশ। তার পর তোমাদের কখন কী করতে হবে, কী ভাবে চলতে হবে আমি ব'লে দেব।" ব'লে আমাকে বললেন: "অবশ্য যদি গুরুশক্তিতে আস্থা না থাকে, কি গুরুবাক্যে বিশ্বাস না হয় তো চলো। তোমার নিজের ইচ্ছায়—এ মা-টির ভার আমিই নেব।"

আমার বুকের মধ্যে অশ্রুসাগর দুলে উঠল, গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে বললাম: "এই গঙ্গার সামনে শপথ করছি গুরুদেব যে আপনার নির্দেশেই চলব এখন থেকে।"

প্রহ্লাদ (উদ্দেশে প্রণাম ক'রে): ধন্য আপনি!

বিষ্ণুঠাকুর (একটু চোখ বুঁজে থেকে): না বাবা, ধন্য আমি নই। আমি সেসময়ে যে কী দুর্বল ছিলাম জানো না তো। ধন্য বলো সেই গুরুশক্তিকে, যে এই দুর্বলের বুকেও আত্মসমর্পণের বল সঞ্চার করেছিল। ধন্য তাঁর দৃষ্টিশক্তি—যার আলোয় তিনি যে শুধু পথের দিশা দিতেন তাই নয়—সে-আলোয় দেখিয়ে দিতেন আমাদের পদে পদেই—আমরা কী ভাবে না জেনে এই নেপথ্য-শক্তিদেরই বাহন হয়ে চলি, কেন মোক্ষদাকে আমার কাছছাড়া করার স্বপক্ষে এতশত প্রাজ্ঞ যুক্তি বন্ধুভাবে এসে আমাদের মন ভাঙাতে চাচ্ছে। কিন্তু সে পরের কথা, বলব আর একদিন। আজ বলি তার পর কী হ'ল।

(একটু হেসে) আবার দুজনে তাঁকে প্রণাম করে উঠে বসার পরে তিনি বললেন আমাদের মাথায় হাত রেখে: "বাবা, একটু কথা নিশ্চয় জেনো: যে, যদি মোক্ষদা বড় আধার না হ'ত, যদি সে তোমার যোগ সাধনার সহায় না হ'ত, তবে দেবদ্রোহী ব্যক্তিদের মহলে তাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার এতশত চেষ্টা নাট্যরঙ্গ ঈর্ষাদ্বেষ ক্রোধ কেঁপে উঠত না—এত টিটিক্কার পড়ত না—বন্ধুরাও মুখ ফেরাত না—তোমাদের নিরাশ্রয় করবার ভয় দেখিয়ে।

(একটু থেমে) কিন্তু দিনে দিনে শুধু যে এই দেবদ্রোহী শক্তিদের লীলাখেলাই প্রত্যক্ষ করতাম তা নয় বাবা। এই সূত্রে আরো গভীর ভাবে উপলব্ধি করতাম পদে পদেই যে, আমাদের ধারণ ক'রে আছে ঠাকুরের অদৃশ্য কৃপা প্রত্যক্ষ গুরুশক্তির বজ্রমুষ্টি দিয়ে। সেবিচিত্র লীলার কাহিনী আর একদিন বলব। আজ শুধু আর একটু বলবার আছে: সেটা এই যে, কৃপা এসেও আসে না—আমরা তাকে ধুলো পায়েই বিদায় করতে চাই ব'লে। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) বাবা, এমনিই আমাদের স্বভাব যে, কৃপা যদি উঁকিও মারে খিড়কি দোরে, তো আমরা সিংদরজা খুলে ডাক দিই কৃপার বিরুদ্ধে ব্যূহবদ্ধ আসুরিক শক্তিদের। মানুষের চরিত্রের মধ্যে এ-আত্মবিরোধের কবে কিনারা হবে কে বলবে?

[ক্রমশঃ

মণ্ডলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী

প্রাতঃস্মরণীয় মহান্-সন্ন্যাসী স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের মানসপুত্র তপোমূর্ত্তি আনন্দপীঠাচার্য্য মণ্ডলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ আর ইহলোকে নাই। বিগত ৫ই অক্টোবর, ১৯৬২ তারিখে মহাসপ্তমী তিথিতে শেষ রাত্রি ৫টা ১৫ মিনিটের সময়ে সজ্ঞানে প্রণব জপ করিতে করিতে নশ্বর শরীর পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলীন হন। ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের প্রথম প্রেসিডেণ্টরূপে তিনি দীর্ঘকাল আশ্রমের সাধুসেবা, দেব সেবা ও গোমাতা সেবায় ব্রতী ছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনটি ছিল কর্মময় এক উজ্জ্বল আদর্শপূর্ণ। তিনি ছিলেন মহান্ আদর্শের প্রতীক। মুখে বলার চেয়ে কর্ম্মের দ্বারা আদর্শ প্রচারের ছিলেন পক্ষপাতী। তাই সর্ব্বদা তাঁহার বাক্যে ও কর্ম্মে ছিল গরমিলের অভাব। ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের সকল প্রকার উন্নতির মূলে ছিলেন তিনি ও তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি মহারাজ।

বঙ্গজননীর প্রথম সুসন্তানরূপে তিনিই পরমহংস সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের শিরোমণি মণ্ডলেশ্বরপদ অলঙ্কৃত করেন ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে। তিনি বিদেহ মুক্ত হওয়ায় একটি প্রায় শতাব্দীর ইতিহাসের অবলুপ্তি ঘটল। স্মৃতির পৃষ্ঠায় তাঁহাকে ধরিয়া রাখার চেষ্টা মন্দমতির পক্ষে একটি অপ-প্রয়াস মাত্র। ধরা না দিলে যাঁহাকে ধরা যায় না—বোঝা যায় না, তাঁহাকে প্রকাশের চেষ্টা বালসুলভ চপলতা আর কি ?

জীবনমাত্রেই মৃত্যুভয়ে ভীত। কিন্তু "মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান"—যাঁহারা ভাবেন তাঁহারা সাধারণের বোধগম্যের বাহিরে। অল্পবুদ্ধি পুরাণো ক্ষয়িষ্ণু তুলাদণ্ডে মাপিতে যাইলে তাঁহার মূল্য হ্রাস করিয়া ফেলার সম্ভাবনা অধিক। অন্তিম দিন পর্য্যন্ত ভাবেতে ও শাস্ত্রোক্ত বিধিতে অচল ও অটল থাকিয়া অনেকের তথাকথিত পাণ্ডিত্যে মুদ্গরাঘাত করিয়াছেন তিনি। অকপট জিজ্ঞাসুর নিকট তিনি ছিলেন কুসুমাদপি কোমল; আর পাষণ্ডের নিকট বজ্রাদপি কঠোর।

সন ১২৭৮ সালে ২৭শে ফাল্গুন শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহাকুমার অন্তর্গত পাথরাইল গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম পরেশচন্দ্র। পাথরাইল টাঙ্গাইল হইতে চারিমাইল দক্ষিণে অবস্থিত। তাঁহার পিতামহ ৺রামরুদ্র লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার পাবনা জেলার অন্তর্গত সাটিয়া গ্রামের বসতবাটী যমুনার গর্ভে বিলুপ্ত হইলে পাথরাইলে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁহার দুই পুত্র—ঈশানচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্র। ঈশানচন্দ্র একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। পত্নী-বিয়োগের পর হইতে তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিতেন। তিনি নিরামিষভোজী, একাহারী ও একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। কনিষ্ঠ গিরীশচন্দ্র স্বগৃহে টোল স্থাপন করিয়া ১৫।২০ জন বিদ্যার্থীর অধ্যাপনা কার্য্য করিতেন। ইনিই পরেশচন্দ্রের পরমপূজ্য পিতৃদেব। তাঁহার চারিপুত্র—যোগেশচন্দ্র, পরেশচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, ও দুর্গেশচন্দ্র। মাতা শ্রীমতী রাজ-কুমারী দেবী ছিলেন অতিশয় ধর্মপ্রাণা ও শীলস্বভাবযুক্তা দয়ালু মহিলা। ৺গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় ইংরাজী—১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ৯৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

পরেশচন্দ্র ময়মনসিংহ জেলাস্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই ছাত্রজীবনেই তাঁহার সহিত ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামের নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক, পরবর্ত্তী কালের স্বামী ভবানন্দ গিরি মহারাজের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তিনি পরেশচন্দ্র হইতে নিম্ন-শ্রেণীতে পাঠ করিতেন। অনন্তর পরেশচন্দ্র রাজসাহী কলেজে এক বৎসর অধ্যয়নের পর কলিকাতা সিটি

কলেজে ভর্ত্তি হন। এখান হইতে তিনি এফ-এ পাস করেন।

এফ-এ পাস করিবার পর তাঁহার বিবাহ হয় পাবনা জেলার সাপল্লার ৺কাশীশ্বর রায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী বনমালা দেবীর সহিত। পরবৎসর স্ত্রী বিয়োগের পর দ্বিতীয়বার পাবনা জেলার পেঙ্গুয়ার ৺ব্রজসুন্দর মজুমদার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী দেবীর সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় হয়। তাঁহার চারিটি কন্যার জন্ম হয়। তাঁহাদের মধ্যে দুইটির বিবাহ ঘটে ও দুইটি অকালে পরলোকগমন করেন।

তাহার পর তিনি কাশীমবাজারের মহারাজা ৺মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের সহায়তায় পি-এল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে লক্ষ্ণৌতে ডেড্‌-লেটার অফিসে চাকরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কয়েক মাস পরে উক্ত চাকরি পরিত্যাগ করিয়া 'আউধ'-রোহিলখণ্ড রেলওয়ে' অফিসে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ মেলায় যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি উক্ত রেলের চাকরিও ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার দ্বারাই তাঁহার সাধু মহাত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সৎসঙ্গপ্রীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে তিনি লাহোর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে হরিদ্বারে প্রথম আগমন করেন। তিনি ছিলেন লাহোর কংগ্রেসের ডেলিগেট।

চাকরি চলিয়া যাওয়ায় তিনি পুনরায় পি-এল পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন এবং ময়মনসিংহ জেলা আদালতে যাইয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। তাঁহার জ্ঞান পিপাসার নিবৃত্তি না হওয়ায় তিনি অধ্যয়নও করিতে থাকেন। তাঁহার অদম্য অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি এম-এ এবং বি-এল ডিগ্রীও লাভ করেন।

কয়েক বৎসর প্র্যাক্‌টিস করার পর তিনি তাঁহার সিনিয়ার উকিল শ্রীপ্রসন্নকুমার গুহঠাকুরতা মহাশয়ের সহিত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পুরীধাম ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আগমন করেন এবং ৪৭নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটের এক ছাত্রাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়েই পুণ্যপুঞ্জের উদয়ে ২১১নং হ্যারিসন রোডেস্থ বাটীতে তাঁহাদের সহিত স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের মিলন হয় এবং কয়েকদিন পরে প্রসন্নকুমার ও পরেশচন্দ্র উভয়েই তাঁহার নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

পরেশচন্দ্র অনুশীলন সমিতিরও সভ্য ছিলেন। সেই সময়ে মহান যোগী স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের যশোগানে বাংলাদেশ মুখরিত। স্বদেশী আন্দোলনের অনেকেরই ধারণা ছিল সিদ্ধযোগীর নিকট যোগশক্তি ও দৈবীশক্তি লাভ করিয়া আসুরিক শক্তিকে পরাভূত করিবেন—বিদেশীকে সাগরপারে তাড়াইয়া দিবেন। তাই অনেকেই এবম্বিধ মহান উদ্দেশ্য লইয়া পুণ্যশ্লোক তপোমূর্ত্তি অসীম শক্তির অধিকারী স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের নিকট আগমন করেন। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শ্রীগুরুদেব যাহার দ্বারা যে কার্য্য সম্ভব তাহাকে সেই কার্য্যেই অনুপ্রেরিত করেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যতীন মুখার্জীকে স্বদেশী আন্দোলনের নেতারূপে জীবনের অস্তিমদিন পর্য্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে অমিতবিক্রমে সংগ্রাম করিতে। কিন্তু পরেশচন্দ্র ও তাঁহার বাল্যবন্ধু নিখিলেশ্বরের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয় ভিন্নমুখে। আচার্য্যদেবের সংস্পর্শে তাঁহারা ধীরে ধীরে দ্বিতীয় আশ্রম হইতে চতুর্থ আশ্রমের হন অধিকারী।

সন ১৩২৩ সালে কার্ত্তিকমাসে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী কুমুদিনী দেবী ডিপথিরিয়া রোগে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি হরিদ্বারে আগমন করেন এবং একমাস অবস্থান করিয়া শ্রীগুরুর নিকট তত্ত্ববোধ মণিরত্নমালা পাঠ করেন। উক্ত পুস্তক তিনি শ্রীগুরুর আওতায় বোম্বাই হইতে আনয়ন করেন। এই সময়ে বেদান্ত আলোচনাই ছিল তাঁহার একমাত্র ধ্যানের বস্তু। অনন্তর তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় এবং বিষয় বিষবৎ হওয়ায় কয়েকমাস পরে হরিদ্বারে পুনরায় গমন করেন ও শ্রীগুরুর নিকট বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তখন হইতে তিনি বাণপ্রস্থী পরেশ নামে গণ্য হন। এই সংবাদ বৃদ্ধ পিতা গিরীশচন্দ্র প্রাপ্ত হইয়া স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের নিকট অবিলম্বে তাঁহার পুত্রকে ফেরত পাঠাইতে পত্র দেন। কিন্তু পুত্র পিতৃভক্ত হইয়াও শ্রীগুরুর আশ্রয় ত্যাগ না করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ভারতীজীর সহিত বিকানীর ও

বোম্বাই পরিভ্রমণ করিয়া নাসিক কুম্ভে যোগদান করেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে পেটের ঘায়ের জন্য তিনি কলিকাতায় ক্যাম্পবেল হাঁসপাতালে ডাঃ কে, কে, ব্যানার্জীর চিকিৎসাধীনে ভর্ত্তি হন। তিনবার তাঁহার পেট অপারেশন করা হয়। কিন্তু তথায় নীরোগ না হওয়ায় টি, বি, সন্দেহে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই সময় রায়সাহেব শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার খাবার পাঠাইতেন। এই বৎসরেই তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। তখন স্বাস্থ্যোদ্ধারের নিমিত্ত স্বামীজী মহারাজের আদেশে তাঁহাকে পুরীধাম পাঠান হইল। যাইবার পূর্বে তিনি শ্রীগুরুমহারাজকে বলিয়াছিলেন,—"আজও আমার সন্ন্যাস হইল না।"

পুরীধামে তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। "স্বামিজীর নিকট তার এলো—বাণপ্রস্থী পরেশের শেষ অবস্থা।' তখন সন্ধ্যার সময়, স্বামিজী মহারাজ স্বামী মহানন্দজী, নাগেশানন্দজী, ময়মনসিংহের উকিল প্রসন্ন কুমার গুহঠাকুরতাকে পুরী পাঠিয়ে দিলেন। তাঁদের সঙ্গে ১০০্ টাকা দিলেন; আর বলে দিলেন—বাণপ্রস্থীর দেহকে সন্ন্যাসীর দেহ বলে যেন ব্যবহার করা হয়; ইহা দ্বারা সমুদ্রে তার মৃতদেহের জল সমাধি দেওয়ার ব্যবস্থা যেন করা হয়। বাণপ্রস্থী হলেও সে সন্ন্যাসী।

সে রাত্রি কেটে গেল, স্বামিজী মহারাজ ভোরে সরোজ বাহাদুরকে ডেকে বল্লেন, 'সরোজ, কিছু বেদনা, আঙুর, আপেল কিনে পরেশের জন্য তৈয়ার রাখ, যেন বিকেলবেলা কোনো লোকের সঙ্গে উহা পাঠানো যেতে পারে।' সরোজ বাহাদুর সেই কথার উপর বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করলেন না; তিনি মনে করেছিলেন, এতক্ষণে ব্রহ্মচারীর দেহান্ত হয়ে গিয়ে থাকবে।

মধ্যাহ্নে ভোগের পর স্বামিজী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ফলাদি কিনে রাখা হয়েছে কিনা? সরোজ বাহাদুর বল্লেন, মহারাজ, গতদিন যাঁর জলসমাধির ব্যবস্থা করেছেন, এই ফল কি তাঁর কোনো কাজে লাগবে?' স্বামিজী তাকে জোরের সহিত বল্লেন,—'যে ভোলাগিরি পরেশের জলসমাধির কথা বলেছিল, সে ভোলাগিরিই তাকে এখন পরেশের জন্য ফল কিনতে বলছে। সংশয় কিসের? যা' এখনি ফল কিনে নিয়ে আয়।'

এটা হলো কলিকাতা হ্যারিসন রোডের দৃশ্য। আর ওদিকে রোগী যখন মৃত্যুর কবলে পড়ে অসাড় অবস্থায় ডবল নিউমোনিয়ার যন্ত্রণায় মুমূর্ষু, তখন শেষরাতে দেখা গেলো—রোগীর ফুসফুস দু'টিই রোগমুক্ত হয়ে পড়েছে। ইহাই শ্রীগুরুর কৃপা। ক্রমে আরোগ্য লাভ করিয়া ব্রহ্মচারী পরেশ ফিরিয়া আসিলেন কলিকাতায়।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শীতকালে শ্রীগুরু স্বামী ভোলানন্দজী মহারাজ ছিলেন অসুস্থ। সেবারে প্রয়াগে ছিল অর্দ্ধকুম্ভ। স্বামিজী মহারাজ বাণপ্রস্থী পরেশকে ২২্ টাকা দিয়া প্রয়াগকুম্ভে মণ্ডলেশ্বর স্বামী জনার্দ্দন গিরিমহারাজের নিকট হইতে তাঁহারই নামে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পাঠাইলেন এবং তিনিই 'মহাদেবানন্দ' নাম মনোনীত করিয়া বলিয়া দেন।

অনন্তর হরিদ্বারে কিছুকাল অবস্থান করিবার পর তিনি মণ্ডলেশ্বর স্বামী মঙ্গলগিরি মহারাজের প্রেরণায় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পরিব্রাজক জীবন আরম্ভ করেন। একেবারে পাণিপাত্র হইয়া তিনি মথুরা, বৃন্দাবন, রাজপুতানার তীর্থ সমূহ, দ্বারকা, বোম্বাই ও রামেশ্বর ভ্রমণ করেন। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় বিদেহমুক্ত সন্তদাস কাঠিয়া বাবাজীর নিকট নিবাস করেন। সেই সময় তাঁহাদের মধ্যে নিরন্তর শাস্ত্রালোচনা হ'ত এবং উভয়ে পরস্পরের গভীর প্রেমে আবদ্ধ হন। পরে তিনি ভেরাবল (সৌরাষ্ট্র) হইতে জলপথে বোম্বাই সহরে আগমন করেন। সেখানে রাঘবানন্দ (গুলালবাড়ী মহল্লায়) মঠে একদিন অবস্থানের পর স্বামী বৈদ্যনাথজী ও স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজীসহ রামেশ্বর তীর্থে শুভাগমন করেন।

রামেশ্বর প্রভৃতি দক্ষিণ দেশের তীর্থ ভ্রমণান্তে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভ পর্বান্তে তিনি নিঃস্ব অবস্থায় যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী পরিভ্রমণ করেন। সাথী ছিলেন স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ। পরে উভয়েই উক্ত বৎসরেই কাশ্মীর গমন করেন। কাশ্মীর হইতে স্বামী শিবানন্দজীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকী তিনি লাহোর গমন করিয়া শীতলা মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথা হইতে বিকানীরে তিন মাস

বাস করিয়া পশুপতিনাথ হইতে যাত্রা করিয়া আসামের নানা স্থান দর্শনান্তে তিনি পরশুরাম কুণ্ডে উপস্থিত হন। অনন্তর ১৯২৮ সালে বর্দ্ধমান জেলার আমোদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশ মুখার্জী মহাশয়ের নিকট কিছুকাল কাটাইয়া বিহার প্রদেশে গোরখপুরের নিকট হরপুরে যাইয়া চাতুর্মাস্য ব্রত করেন।

এই সময়ে স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ ছিলেন ভীষণ অসুস্থ ও আশ্রম সম্বন্ধে খুবই চিন্তিত। তিনি সর্বদাই শরীর ত্যাগের কথা প্রকাশ করিতেছিলেন। তিনি ১২ই জুলাই এক পত্রে লিখলেন, 'এখানে গদীতে বসে গুরুকুল রক্ষা করার মতো উপযুক্ত ব্রাহ্মণ শরীর, বিদ্বান্ সাধু চাই, যে উপদেশ দিতে পারে, এমন সাধুর প্রয়োজন।'

পরের দিন এক পত্রে শ্রীযুত যতীশচন্দ্র মিত্রের নিকট লিখলেন,—তোমাদের ভার তোমরা নাও। এ শরীরটাকে রেহাই দাও। গৃহস্থের ধন গৃহস্থ রাখ।

দশদিন পরে (২৩শে জুলাই ১৯২৮) তিনি আবার কলকাতায় ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথের নিকট লিখিতেছেন,—'মোহান্ত চাই। বিনা অধিপতিতে চলিবে না। গদী রক্ষাকর্তা থাকা চাই। দীক্ষা দেয়া, উপদেশ করা, কণ্ঠী দেওয়া, গদী রক্ষা করার মতো যোগ্য, বিদ্বান, ব্রাহ্মণ-শরীর, সন্ন্যাসী মোহন্তের প্রয়োজন।' এই পত্রের শেষে লিখিলেন—'মহাদেব গিরিকে গদীতে বসাইতে পারিলে তোমাদেরই সুবিধা হইবে। কারণ ভাষা, বুলি, আচার, ব্যবহার, তোমাদের সঙ্গে মিলিবে, সেও লায়েক আছে। সেইজন্য যদি তোমাদের সুবিধা চাও ত, মহাদেব গিরিকে বিশেষভাবে অন্বেষণ করিয়া উপস্থিত কর।

উক্ত পত্রের ৯ দিন পরে (২।৮।২৮) লিখিতেছেন,—'প্রথমে মহাদেব গিরিকে স্বীকার ও সন্তোষ করাও। সে যাহাতে এখানকার ভার নিতে স্বীকার করে, সেইমত কাজ কর। যদি সে ভার নিতে স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার পরামর্শ মতো ট্রাষ্টি বা কমিটি কর। যেমন তোমাদের গুরুকে অধিষ্ঠাতা করিয়া তাঁহার আদেশ মতো তোমরা সম্পত্তি রক্ষা করিয়া আসিতেছ, সেইরূপ মহাদেব গিরিকে অধিষ্ঠাতা করে, তাহার সহিত মিল মিশ করে তাহার সন্তোষ ও পরামর্শ মতো যেমন ভাবে ট্রাষ্ট ডিড্ করিলে চলিতে পারে, তাহাই কর।"

হরপুর হইতে তিনি যতীশবাবুর পত্র পাইয়া হরিদ্বারে শ্রীগুরু সমীপে উপস্থিত হন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহাকে মোহান্ত পদে অভিষিক্ত হইতে অনুরোধ করা হয়। তিনি এক পত্রে ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জীকে লিখিয়াছিলেন যে,—"I am the disciple of a Sannyasi and not of a Mohanta." কিন্তু যথাসময়ে শ্রীগুরুর ইচ্ছায় উপযুক্ত শিষ্যের এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হয়।

কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে কুরুক্ষেত্রে যাইবার তাঁহার ইচ্ছা হইল প্রবল। কিন্তু স্বামিজী মহারাজ তাঁহাকে হরিদ্বারে রাখিয়া স্বয়ং হাওড়ায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সামন্তের সহিত কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। লাহোরে মালের-কোটলা, খুরদা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া তিনি হরিদ্বারে ফিরিয়া আসেন এবং কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামান্তে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হন। কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি অসুস্থ অবস্থায় চৈত্রমাসে এক বড় ভাণ্ডারা দেন এবং সমাগত মণ্ডলেশ্বরগণের পূজার ভার অর্পণ করেন স্বামী মহাদেবানন্দজীর উপর। সেই সময় স্বামিজী মহারাজ স্বয়ং স্বামী মহাদেবানন্দজী মহারাজকে ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের মোহন্তপদে মনোনীত করেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ৮ই মে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে হরিদ্বারে প্রাতঃস্মরণীয় স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ ব্রহ্মলীন হন। স্বামী মহাদেবানন্দজী মহারাজ সেই সময় অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্রীগুরুমহারাজের আদেশে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। কলিকাতার মর্গান কোং এর সলিসিটর একটি উইল লিখিয়া হরিদ্বারে স্বামিজী মহারাজের নিকট পাঠান। ভুলের জন্য তাহাতে বিশেষ প্রয়োজনীয় একটি প্যারা বাদ পড়ে। তাহার সংশোধনের নিমিত্তই তাঁহার কলিকাতায় গমন।

১১ই মে, ১৯২৯ তারিখে মোহন্ত মহারাজ কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ২২শে মে দিবসে শ্রীগুরুমহারাজের ভাণ্ডারা দেন। স্বামিজীর দেহান্তে আশ্রম পরিচালনা বিষয়ে মতের গরমিল হওয়ায় শিষ্যদের মধ্যে তিনটি দল হইয়া যায়। মোহন্তজী মহারাজের অনেক চেষ্টায় তিন-দলকে মিলাইয়া এক ট্রাষ্ট ও এক ডেডিকেশন ডিড কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা এডভোকেট শ্রীব্রজলাল

শাখা মহাশয়ের সহায়তায় ও সৌজন্যে প্রস্তুত করেন। এদিকে মোহন্ত স্বামী শিবদয়াল গিরিজী লালতারাবাগ ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য উকিলের চিঠি দেন। তিনি আশ্রমের বিরুদ্ধে মোকর্দমা করিতে প্রস্তুত। তখন শ্রীগুরুকৃপায় ও মোহন্ত মহারাজজীর বিলক্ষণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে ৪০,০০০৲ (চল্লিশ হাজার) টাকায় উক্ত লালতারাবাগ ক্রয় করা হয়।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উজ্জয়িনীর কুম্ভে স্বামী নরসিংহগিরিজী মহারাজ নিরঞ্জনী আখড়ার আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগ কুম্ভে মণ্ডলেশ্বর স্বামী নরসিংহগিরি মহারাজজী ও মোহন্ত স্বামী জয়কৃষ্ণগিরিজীর শুভ প্রচেষ্টায় স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ আনন্দ আখড়ার আচার্য্য পদ অলঙ্কৃত করেন। সেই সময়ে সাধুসমাজের উপর তৎকালীন সরকারের কুদৃষ্টি পড়িয়াছিল। স্বামী মহাদেবানন্দজী উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, আইনজ্ঞ ও বঙ্গ দেশীয় বিধায় সাধুসমাজ তাঁহাকে যোগ্য সম্মান প্রদান করেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যে, তিনি সাধু সমাজের হিতার্থে সরকারের সহিত জোরদার সংগ্রাম করিবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাকে সেভাবে পাওয়া গেল না—পাওয়া গেল একজন উচ্চকোটী সন্ন্যাসীরূপে। বলা বাহুল্য সাধুসমাজ ইহাতে তাঁহার উপর অধিকতর প্রসন্নই হইয়াছিলেন।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারের পূর্ণ কুম্ভের পূর্বেই ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের মুখ্য মন্দির তিনটি নির্মিত হয়। পশ্চাৎ মন্দিরের বারান্দা ও মহাবীরজীর মন্দির তৈয়ারী হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভের সময়েই সন্ন্যাসিগণের বাসের নিমিত্ত অনেকগুলি পাকা ঘর এবং ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভোলানন্দ সাঙ্গবেদ বিদ্যালয় ভবনটি নির্মিত হয়। ইহার পূর্বে বিদ্যালয় ছিল ভোলাগিরি ধর্মশালায়। এই বিদ্যালয়ে মধ্যমা পর্য্যন্ত পড়ান হইয়া থাকে। বিদ্যার্থীগণের মধ্যে সাধুও গৃহস্থ উভয়েই থাকিতে পারেন। সংস্কৃত ভাষা ও বেদ প্রচার এবং বিদ্বান সাধুসৃষ্টির মহান উদ্দেশ্যেই এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

সুদীর্ঘকাল ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের অধ্যক্ষ ও আনন্দ আখড়ার পীঠাচার্য্যরূপে শ্রীগুরুমহারাজের গুরুদায়িত্ব জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত গভীর নিষ্ঠা ও সতর্কতার সহিত পালন করেন। তিনি ক্ষয়িষ্ণু বাংলার অগণিত গণমানসে আশার আলো প্রজ্বলিত করেন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগের অর্দ্ধকুম্ভে বার্দ্ধক্য হেতু গদীত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুমহারাজের গুরুদায়িত্ব তদীয় গুরুভ্রাতা মণ্ডলেশ্বর স্বামী স্বরূপানন্দগিরি মহারাজের স্কন্ধে ন্যস্ত করেন।

তিনি একজন অসাধারণ বৈদান্তিক ছিলেন। তিনি বলিতেন,—"এসব শ্রীগুরু মহারাজের অসীম কৃপায় সম্ভব।" শাক্ত ও বৈষ্ণবপ্রধান বঙ্গদেশে বেদান্ত প্রচারে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর হইতে এই মহতী উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় সমগ্র ভারতে মণ্ডলী সহ বহুবার পরিভ্রমণ করেন। বিশেষ করিয়া অবিভক্ত বাংলা, বিহার, আসাম ও উত্তরপ্রদেশই ছিল তাঁহার ধর্মপ্রচারস্থল। তিনি বিলাতের বড় বৈদিক পণ্ডিত মিঃ কিথের (Mr. Keith) এক সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণ করেন। মিঃ কিথ অবশ্য পত্রদ্বারা ইহা স্বীকার করেন। তিনি বিংশাধিক পুস্তক রচনা করিয়া শাস্ত্রের অনেক জটিলতত্ত্ব সাধারণের বোধগম্যের উপযোগী করিয়াছেন। তিনি আনন্দবাজার, উদ্বোধন, ভারতবর্ষ, শিবম্, হিমালয় প্রভৃতি ভারতের ইংরাজী ও বাংলা পত্রপত্রিকায় বহু মূল্যবান নিবন্ধাবলী প্রকাশ করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের মুখপত্র অধুনালুপ্ত 'শিবম্' মাসিক পত্রিকার তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা।

কলেজে অধ্যয়নকালে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের লেকচার হইতে জ্ঞাত হন যে, "বেদ চাষার গান।" শ্রীগুরু মহারাজের সংস্পর্শে আসিবার পর তাঁহার সে দৃঢ় সংস্কার বিদূরিত হয়। বেদই একমাত্র নিত্য সত্য এ বিষয়ে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে। তিনি শ্রীগুরুমহারাজের আদেশেই বেদাঙ্গ সহিত সমস্ত বেদ ও ষড়দর্শনাদি সকল ধর্মশাস্ত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়া সমগ্র ভারতে বেদের প্রচারে আত্মোৎসর্গ করেন। সমস্ত ঋগ্বেদ তাঁহার অধিগত ও কণ্ঠস্থ ছিল। অন্তিম সময়ে শিষ্য ভক্তগণকে বলেন,—"আমি আমার গুরু মহারাজের আদেশ সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াছি। এখন আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে। তোমাদের যথেষ্ট উপদেশাদি দিয়াছি এবং তোমাদের জন্যই অনেক পুস্তকও লিখিয়াছি। উক্ত উপদেশাদি পালনের দ্বারা তোমরাও স্ব স্ব জীবন সার্থক কর।" ইহা হইতে তাঁহার পঠনপাঠনের রুচিবোধের নিদর্শন পাওয়া

যায়। ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের পুস্তকালয় তাঁহারই এক অপূর্ব সৃষ্টি। ইহা তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল।

সাধুজীবনে অনেক সময় অনেকের নানাপ্রকার সংশয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। একদা হরিদ্বারে গীতার ক্লাসে প্রসঙ্গক্রমে তিনি তাঁহার জীবনের এক পুরাণো ঘটনা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন,—"একবার আমার মনে হইল—তাইতো সাধু তো হইলাম, কিন্তু খাইব কি? কোথা হইতে অন্ন জুটিবে? তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি বলিল—আরে তুমি তো আর মূর্খ নও; কয়েকটি ছাত্র পড়াইলেই তোমার একার উদরপূর্ত্তি হইয়া যাইবে। যুক্তিটি মনঃপুত হইল। তাই নিশ্চিন্ত রহিলাম। কিন্তু জানি না যে, ইহা আমার ভ্রান্ত ধারণা। অন্তর্যামী শ্রীগুরুদেব বলিলেন,—'কি সন্ন্যাসী হইয়া ছাত্র পড়াইয়া খাইবে! ইহা সন্ন্যাসীর কর্ম—কোন শাস্ত্রে আছে? সন্ন্যাসীর পক্ষে এরূপভাব পোষণ করা সম্পূর্ণ অনুচিত। যাও বেটা, এখনই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গঙ্গায় স্নান করিয়া পবিত্র হও।' আমি আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া শ্রীগুরুসমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ তাঁহার আদেশ পালন করি।"

জ্যোতিষশাস্ত্রে সাধারণতঃ পঞ্চম দশায় জাতকের মৃত্যু বর্ণিত থাকে এবং শুভাশুভ কর্ম্মানুযায়ী আয়ুর হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব। পূজ্যপাদ স্বামিজী জ্যোতিষীগণের ভবিষ্যৎ বাণী প্রত্যেক বারেই ব্যর্থ করিয়া অপর একটি পার্থিব বসন্তের অধিকারী হইতেন। তিনি তাঁহার সেবক, স্বামী ভবানন্দ গিরি মহারাজের শিষ্য স্বামী অচ্যুতানন্দ গিরি মহারাজকে ডাকিয়া বলিতেন,—"অচ্যুত, জ্যোতিষীরা আমায় সর্বংসহা বসুন্ধরার ক্রোড় হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না।" তিনি বলিতেন,—"আমাদের পূর্বপুরুষগণ ৺দুর্গাপূজার সময়ই সজ্ঞানে শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং পূর্বপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করা আমার পক্ষেও সমুচিত।" তাই বর্তমান বৎসরে সমুচ্চকণ্ঠে তিনি পূর্বেই তাঁহার সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন এবং পূর্ণ কুম্ভের পর হইতে তিনি ধীরে ধীরে পার্থিব বিষয় হইতে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নিস্পৃহ হইতে থাকেন। বিপুল ঐশ্বর্য্যের উপর অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাঁহার মত নিরহঙ্কার ও বিরক্ত মহাপুরুষ অধুনা অত্যন্ত বিরল। প্রথমে তিনি প্রভাতকালীন জলযোগ গ্রহণ বন্ধ করেন। মাসাধিককাল পরে রাত্রাহার বন্ধ করেন এবং দ্বিপ্রহরের ভোজনের মাত্রাও কমাইতে থাকেন। অনন্তর তিনি সকলের সহিত সর্ব্বপ্রকার বাক্যালাপ ও অন্নগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখেন।

এইরূপ একটি আকস্মিক সংবাদ চতুর্দিকে প্রচারিত হইলে শিষ্য, ভক্ত ও গুণমুগ্ধগণ তাঁহার দর্শনে হরিদ্বারে সমবেত হইতে থাকেন। তাঁহাদের সকলের অনুরোধে পুনরায় স্বল্পমাত্র আহার করিতেন। তাহাও দুই একদিন অন্তর। তাঁহার মুখে কেবল প্রণবমন্ত্রও শিবনাম ধ্বনিত হইতে থাকে। তখন তিনি সর্বত্র শ্রীগুরুমহারাজের অমরাত্মার দর্শন করিতেন। শাস্ত্রের 'সর্বং গুরুময়ং জগৎ' তাঁহার এই সময়ের ব্যবহারে প্রকাশিত। তিনি বলিতেন,—"গুরুদেবের অসীম কৃপা আমার উপর নিহিত।" তাঁহাকে প্রায়ই নিম্নোক্ত কবিতাটি উচ্চারণ করিতে দেখা যাইত—

> "গুরুদেব বিনা নাহি ভাগজাগে।
> গুরুদেব বিনা নাহি প্রীতি লাগে॥
> গুরুদেব বিনা নাহি শুদ্ধহৃদম্।
> গুরুদেব বিনা নাহি-মোক্ষ পদম্।

তিনি কখনও কখনও ভোলানন্দ সাঙ্গবেদ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণদত্ত শাস্ত্রী মহোদয়ের সহিত শাস্ত্রালাপও করিতেন। কিন্তু ইহা ভিন্ন জাগতিক চর্চা ছিল তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ বিষবৎ ও উপেক্ষিত।

তাঁহার শরীর শান্তের পূর্ব্বে একবিংশ দিবস তিনি কোনপ্রকার খাদ্য গ্রহণ করেন নাই। কেবলমাত্র পুণ্য সলিলা পতিত পাবনী গঙ্গাজল বিন্দু বিন্দু পান করিতেন। কিন্তু কোনপ্রকার ঔষধ গ্রহণ করেন নাই। এই সময়ে অনেকেই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হন। কিন্তু এস্থলে স্বামী অচ্যুতানন্দজী, ব্রহ্মচারী চিন্ময়ানন্দজী ও পুরাতন ভাণ্ডারী ও শিষ্য শ্রীশোভারামজীর সেবা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বামিজী মহারাজের এইপ্রকার ভাবাবেশে অনেকেই নানাপ্রকার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। অনশনে শরীর ত্যাগ আত্মহত্যার নামান্তর। কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—আত্মাকে না জানিয়া যাহারা কুমার্গে গমন করে ও কুক্রিয়ায় আসক্ত; তাহারাই আত্মার হননকারী। আর যাঁহারা আত্মাকে জ্ঞাত হইয়া জাগতিক সকল বস্তুর, নশ্বরত্ববোধ

করিয়া প্রায়োপবেশনে, দেহত্যাগ করেন তাঁহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞ বলা হইয়া থাকে। জাবাল উপনিষদে এইরূপ সমর্থন পাওয়া যায়। সন্ন্যাসী ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা জানিয়া জলে বা অগ্নিতে বা অনশনে শরীর পরিত্যাগ করিতে পারেন।

মহারাজ থাকিয়াও আর আমাদের মধ্যে নাই। সে স্নেহের স্পর্শ পাইবার উপায়ও নাই। আজ নাই সে তাপিতের বিশাল মহীরুহ। অশ্রুপাতে বক্ষ ভাসাইলে, হাহাকারে দিগন্ত কাঁপাইলে ব্যর্থতা ঘিরিয়া দাঁড়াইবে। মহাপুরুষের জীবনই বেদ। সেই বেদাদর্শ স্ব স্ব জীবনে পালন করিতে পারিলে অনন্ত-দুঃখে নিবৃত্তি ও পরমা-শান্তির প্রাপ্তি সম্ভব। ভাগ্যবান্ তাঁহারা যাঁহারা প্রাণের টানে সেই বিশ্বাত্মাকে আজও ধরিয়া রাখিতে সক্ষম।

যুগাচার্য্য মহাপুরুষদিগের মধ্যে ব্যবহৃত যে "শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ" বিশেষণদ্বয় শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা মহারাজের সমগ্র জীবনে বিশেষ করিয়া শেষের কয়মাসে মূর্ত হইয়া ওঠে। শঙ্করভাষ্যে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "শ্রোত্রিয়ম্—অধ্যয়নশ্রুতার্থসম্পন্নং, ব্রহ্মনিষ্ঠং—হিত্বা সর্ব্বকর্ম্মাণি কেবলেঽদ্বয়ে ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যস্য সোঽয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠঃ।"

শোনা যায় স্বামী অমলানন্দগিরিমহারাজ ও 'শোভারামজী ভাগ্যবান্। ইহারাই মহারাজের অন্তিম বিদায়ের সময় ছিলেন উপস্থিত। এক চামচ গঙ্গাজল পান করিয়া প্রণব উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি মহাশান্তি লাভ করেন। চিকিৎসকগণের ভবিষ্যৎ বাণী সবই ব্যর্থ হইয়া যায়। বিদায় বেলার ভৈরবী রাগিণী উঠিল গগনে —ভূমার ক্রোড়ে ভূমা পড়িলেন ঘুমায়ে। পূজ্যপাদ মহারাজের ঘটনাবহুল জীবনচরিতের ইহা একটি ক্ষুদ্র আলেখ্য মাত্র। মহারাজের প্রকাশিত জীবনী, পুস্তকাবলী এবং লোকমুখে শ্রুত কাহিনীর ইহা সংকলন। তিনি এত বিশাল ও এত গভীর যে তাঁহাকে বলিয়া শেষ করা অসম্ভব। কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের ভাষায় বলিতে হয়,

> "বলবো কত তাঁহার কথা
> ব'লে কথা ফুরায় না কো ?
> সৃষ্টি তাঁহার চির কিশোর
> কোন কালেই বুড়ায় না কো।"

বাঙ্গলা কাব্যে ছন্দের বন্ধন-মুক্তি ও মধুসূদন

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গলাভাষায় সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনের কৃতিত্ব মাইকেল মধুসূদনের। বেলগাছিয়া নাট্যশালার সংস্পর্শে এসে তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' রচনার সময়েই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত না হলে বাংলা নাটকের উন্নতি একরকম অসম্ভব। তাই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ওপর ভিত্তি করে তিনি 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য রচনা করেন এবং তা পড়ে কাব্যানুরাগী মাত্রেই তাঁকে অভিনন্দিত করেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন এক কথায় বাঙ্গলা সাহিত্যের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। মধুসূদনের পূর্বেকার কবিগণ চরণের মধ্য মিল ও অন্ত্য মিল ব্যবহার করতেন এবং ভাবকে নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষরের গণ্ডীর মধ্যে প্রকাশ

করতে হত। মধুসূদন ছন্দের এই কৃত্রিম বাধাগুলিকে দূরে সরিয়েছিলেন, প্রবর্তন করলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। 'মেঘনাদবধকাব্যে' মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগের চূড়ান্ত সাফল্য দেখা যায়।

'মেঘনাদবধকাব্য' প্রকাশিত হবার পর কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' মধুসূদনকে যে মানপত্র দিয়েছিল, তাতে তাঁর এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভূয়সী প্রশংসা জানিয়ে লেখা হয়েছিলো: 'আপনি বাঙ্গলা ভাষায় যে অনুপম অশ্রুতপূর্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে।'

সাধারণতঃ প্রবহমান পয়ারকেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলে। এখানে একটি ভাব প্রথম চরণে শেষ না হয়ে পরবর্তী চরণে প্রসৃত হয়, অর্থানুসারে আসতে হয় বলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে ছেদ এবং যতির বিচ্ছেদ ঘটে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান গুণ প্রবহমানতা, মিল থাকা বা না থাকা এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য নয়। পয়ারের মত অমিত্র ছন্দেও আট ও ছয় মাত্রার চরণ: তবে পয়ারের মত এখানে প্রতি চরণে অর্থের সমাপ্তি ঘটেনা। তাই এক চরণ থেকে অন্য চরণে অর্থ বাহিত হয়। যতির স্বাধীনতাই মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'মেঘনাদবধ কাব্যের একটি উদ্ধৃতি দেখা যাক্—

'এই কথা শুনি আমি। আইনু পূজিতে॥
পা দুখানি * *। আনিয়াছি। কৌটায় ভরিয়া॥
সিন্দূর*; করিলে আজ্ঞা।* সুন্দর ললাটে॥
দিব ফোঁটা * *।

এখানে অর্থানুসারে না থেমে যদি মিত্রাক্ষরের ভঙ্গীতে যতি চিহ্ন অনুসরণ করি, তা হলে দ্বিতীয় চরণে পা দুখানি কৌটায় ভরেআনবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের হৃদ্‌কম্প হবার সম্ভাবনা। কবি বুদ্ধদেব বসুর মতে—"মাইকেলের যতিস্থাপনের বৈচিত্র্যই ছন্দের ভূত-ছাড়ানো জাদুমন্ত্র। কী অসহ্য ছিলো 'পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল'-র এক ঘেয়েমি, আর তার পাশে কী আশ্চর্য মাইকেলের যথেচ্ছ যতির উর্মিলতা।......যতিপাতের এই বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গেই যে ছন্দে প্রবহমানতা এসে অন্তহীন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিলো, এ কথাটা তৎকালীন অনুসন্ধানীর দৃষ্টিগোচর হয়নি। প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন কারণে যদি নাও হয়, শুধু বাঙ্গালা ছন্দে প্রবহমানতার জনক বলেই মাইকেল উত্তর পুরুষের প্রাতঃস্মরণীয়।

সংস্কৃত অনুপ্রাস ব্যবহার অমিত্রচ্ছন্দের অন্যতম প্রধান অলঙ্কার। একটি চিঠিতে মধুসূদন লিখেছিলেন—'I have used more অনুপ্রাস and যমক than I like, but I have done so to deceive the ear as yet unfamiliar with Blank Verse' সমালোচক দীননাথ সান্যাল বলেছেন—'মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দী কবিতার সংযত অনুপ্রাস পাঠকের কানে মিলের অভাবটি সুন্দর রূপে পূরণ করিয়াছে।'

'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে' অমিত্রাক্ষরে ছন্দের প্রথম পদক্ষেপ বলে তাতে যথেষ্ট শৈথিল্য দেখা যায়, কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সেই শৈথিল্যের অনুপস্থিতিই সব নয়, এই কাব্যে তা পরিণত, গতিশীল এবং সুরসমৃদ্ধ। এ সম্বন্ধে মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: 'See the difference in language and verrification, if in nothing else, between Tilottama and Meghnad.

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরে ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন যুগোপযোগী অসাধারণ শব্দসম্পদ। Milton-এর 'Grand Style'-এর উপাদানগুলির মধ্যে প্রধান 'Poetic Diction'। মধুসূদনও Milton ও Tosso-র Poetic Diction" স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ছন্দের ঝঙ্কার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য অনেকখানি নির্ভর করে যুক্ত অক্ষরের ওপর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'মাইকেল মধুসূদনও ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণধ্বনি এবং তরংগিত গতি অনুভব করা যায়।'

মধুসূদনের পরে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিরা অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করলেও তাঁরা কেউ মধুসূদনের মত সাফল্য অর্জনে সক্ষম হননি।
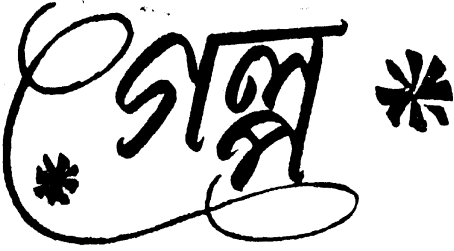
এ্যাক্সিডেন্ট

শ্রীসুনীলচন্দ্র সেন

১

এ্যাক্সিডেন্ট! এ্যাক্সিডেন্ট!

রাস্তায় লোকের ভীড় জমে যায়।

সোমনাথবাবু প্রাণপণে ব্রেক চেপে ধরেও এ্যাক্সিডেন্টটা এড়াতে পারলেন না।

রোজকার মত রিটায়ার্ড সিভিলিয়ান বিপত্নীক সোমনাথ সান্যাল সন্ধ্যার সময় গাড়ী করে লেকে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে একমাত্র মেয়ে পাহাড়ী। সোমনাথবাবু যখন দার্জিলিংয়ের ডেপুটি কমিশনার তখন তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্ম হয়। বড় আদরের ধন। তিনি ওর নাম রাখতে চেয়েছিলেন মণিকা। কিন্তু পাহাড়ী দেশে জন্ম বলে স্ত্রী নাম রাখলেন পাহাড়ী। স্ত্রী ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন মেয়ের স্বভাবের সঙ্গে নামটি খুব সুন্দর মিলে যায়। পাহাড়ী গাছে ওঠে, ঘোড়ায় চড়ে, বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। এক কথায় খুব ছটফটে ও চটপটে। সোমনাথবাবুর বিয়ের অনেক পরে পাহাড়ীর জন্ম হয়। কিন্তু পাহাড়ী অল্প বয়সেই মাতৃহীনা হয়। তাই পাহাড়ী বাধাহীনভাবে বেড়ে ওঠে। বিপত্নীক সোমনাথবাবুর একমাত্র সম্বল এই মেয়ে। অধুনা রিটায়ার করে ল্যান্সডাউন রোডের ওপর প্রকাণ্ড বাড়ী করেছেন। এখন একমাত্র চিন্তা পাহাড়ীকে পাত্রস্থ করা। তিনি একটু উন্মনা হয়ে গাড়ী চালাচ্ছিলেন। রাসবিহারী এভেনিউ ও ল্যান্সডাউন রোডের জংসনে হঠাৎ একটা লোক জাম্প দিয়ে তাঁর গাড়ীর সামনে এসে পড়ে। সোমনাথবাবু প্রাণপণে ব্রেক চেপে ধরেন। গাড়ী একটু জাম্প করে থেমে যায়। লোকটি বেঁচে যায়। কিন্তু গাড়ীর কাচে মাথা ঠুকে পাহাড়ীর মাথা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে। সোমনাথবাবু দিশাহারা হয়ে নিজের গায়ের সাদা পাঞ্জাবী ছিঁড়ে পাহাড়ীর মাথায় পট্টি বেধে জনতার জঞ্জাল সরিয়ে কোন রকমে পাশের ডাক্তার খানায় পাহাড়ীকে নিয়ে হাজির করেন। পাহাড়ীর মাথার সাদা পট্টি মুহূর্তে লাল হয়ে যায়।

—ডাক্তারবাবু, শীঘ্র আমার মেয়েকে দেখুন।

উদ্‌ভ্রান্তের মত ডাক্তার রমেন মৈত্রকে বলেন সোমনাথবাবু।

রমেন পাহাড়ীর মাথার ক্ষতস্থানটা পরিষ্কার করে ধুয়ে দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়। পাহাড়ী রমেনের দিকে খানিক তাকিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

—একি হোল ডাক্তারবাবু, আমার মেয়ে যে অজ্ঞান হয়ে গেল। ও আমার একমাত্র মেয়ে। ওকে আপনি বাঁচান ডাক্তারবাবু, আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

হাত কচলিয়ে বিনীতভাবে বলেন সোমনাথবাবু।

রমেন পাহাড়ীর নাড়ী পরীক্ষা করে একটা ইঞ্জেকসন দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ীর জ্ঞান ফিরে আসে। চোখ চেয়ে একবার রমেনের দিকে ও একবার বাবার দিকে তাকায়।

সোমনাথবাবুর চোখে মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

—আপনার মেয়ের কিছুই হয়নি। এখন বাড়ী নিয়ে যেতে পারেন। কাল সকালে একবার কেমন থাকেন খবরটা দিয়ে যাবেন।

মৃদু হেসে বলে রমেন।

—আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ ডাক্তারবাবু। কাল সকালে যদি একবার দয়া করে আমাদের বাড়ী গিয়ে

আপনার রোগীকে দেখে আসেন তো আমাদের খুব উপকার হয় ডাক্তারবাবু।

অনুনয়ের সুরে বলেন সোমনাথবাবু। রমেনের দিকে তাঁর নাম ঠিকনার একটা কার্ড এগিয়ে দেন।

—আমার যাবার কোন প্রয়োজন নেই মিঃ সান্যাল। তবে আপনি যখন বিশেষ অনুরোধ করছেন তখন আমি নিশ্চয়ই যাব।

কার্ডটা পকেটে রেখে হেসে বলে রমেন।

—এই তো দিব্যি উঠে বসেছেন। মাথায় কোন যন্ত্রণা নেই তো?

হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে রমেন।

—আসুন ডাক্তার মৈত্র। আমি বেশ ভালই আছি। কাল যে-আমার এ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছিল আজ তা একটুও বুঝতে পারছি না।

খসে পড়া বুকের কাপড় ঠিক করে হেসে বলে পাহাড়ী।

—শুনে খুব খুশি হ'লাম। আপনার বাবা কাল যে রকম ভয় পেয়েছিলেন তা দেখে প্রথমটা আমিও ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

পাহাড়ীর চোখে চোখ রেখে হেসে বলে রমেন।

—আমার বাবা অল্পেতেই নার্ভাস হয়ে পড়েন। আমি একমাত্র মেয়ে কিনা।

হেসে জবাব দেয় পাহাড়ী।

—তাই খুব আদুরে।

কথার পৃষ্ঠে কথা ছোঁড়ে রমেন।

—এই যে ডাক্তারবাবু, আপনি এসেছেন। আমি খুবই খুশি হ'লাম। ও যে আমার কি দুরন্ত মেয়ে তা আপনি জানেন না। তাই ওর জন্যে আমার সব সময় ভয়। ওর নামেতেই বুঝতে পারবেন ওর প্রকৃতি।

হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকেন সোমনাথবাবু।

হঠাৎ সোমনাথবাবুর উপস্থিতিতে রমেন ও পাহাড়ী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

—আপনার মেয়ে দুরন্ত প্রকৃতির জন্যই কালকের এ্যাক্সিডেণ্টটা সামলে নিতে পেরেছেন। উনি যদি ললিত লবঙ্গলতা হতেন তাহলে ভয়ের কারণ ছিল।

সোমনাথের হাসির সুরে সুর মিলিয়ে বলে রমেন। পাহাড়ীর চোখে মুখেও হাসি দেখা দেয়।

—আপনি ওকে 'আপনি' বলছেন কেন ডাক্তারবাবু? ও আপনার থেকে বয়সে ছোট এবং আপনার রোগী।

আবার হেসে বলেন সোমনাথবাবু।

—আর আমি বুঝি আপনার থেকে বয়সে বড় তাই আপনি আমাকে 'আপনি' বলছেন?

হেসে প্রশ্ন করে রমেন। হেসে ফেলেন সোমনাথবাবু। হেসে ফেলে পাহাড়ী। ঘরময় হাসির তুবড়ি ফাটে।

—আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত হতে অপারগ মিঃ সান্যাল। আপনি ধনী। আপনার শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ের জন্য আপনি অনেক ধনী ও কৃতী পাত্র পাবেন। আমি সবে ডাক্তারী পাস করে প্র্যাকটিস শুরু করেছি। রোজগার নেই বললেই চলে। দেশ থেকে বিতাড়িত। থাকবার স্থানও নেই। অতএব আমার মত এক সহায়-সম্বলহীন ডাক্তারের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে কেন দেবেন? না না এ হতে পারে না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন মিঃ সান্যাল।

সোমনাথবাবুর প্রস্তাবের উত্তরে একদিন মাথা নীচু করে নিজের অক্ষমতা জানায় রমেন।

—আমি তিরিশ বছর সিভিলিয়ানের চাকরি করেছি রমেন। ধনী এবং কৃতীপাত্র হয়ত অনেক পাব; কিন্তু চরিত্রবান পাত্র সত্যই দুর্লভ। চরিত্রই মানুষের অলঙ্কার। তাছাড়া তুমি নিজেকে ছোট মনে করছ কেন রমেন। তুমি গরীব হতে পার; কিন্তু তুমি ছোট নও। আমার একমাত্র মেয়ে। ওকে বিয়ে করে তুমি বিলাত চলে যাও। নিজের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ করে এসো। সমাজের পাঁচজনের একজন হও।

বেশ আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বলেন সোমনাথবাবু।

২

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজে। 'স্টাডি'তে বসে একখানা নতুন মেডিকেল জার্নাল পড়ছেন বিলাত

ফেরত বিখ্যাত ডাক্তার রমেন মৈত্র। ঘড়ির ঘণ্টার শব্দে বইয়ের পাতা থেকে চোখ গিয়ে পড়ে ঘড়ির দিকে। নাঃ, বারোটা বেজে গেল এখনও পাহাড়ী ফিরল না। দিন দিন ফেরার সময়টা বেড়েই যাচ্ছে। এর একটা বিহিত করা দরকার। জার্নালটা বন্ধ করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পেছনে চোখ ফেরাতেই পাহাড়ীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়। দরজায় দাঁড়িয়ে পাহাড়ী। মুখে মৃদু মৃদু হাসি।

—বাড়ীতে ফিরবার কি দরকার ছিল। বাকী রাত-টুকু বাইরে কাটিয়ে এলেই তো পারতে।

রমেনের স্বরে ঘৃণা।

—তুমি কি আমার চরিত্রে সন্দেহ কর নাকি ?

রুখে দাঁড়ায় পাহাড়ী।

—তোমার চরিত্রে আমি সন্দেহ করি না। সোমনাথ-বাবুর মেয়ে বন্য হতে পারে; কিন্তু চরিত্রহীনা নয় তা আমি জানি। কিন্তু আমি বিলাতফেরত ডাক্তার। সমাজে আমার একটা 'পজিসন্' আছে। তোমার কুৎসায় আমি সমাজে কান পাততে পারি না তা জানো ?

বেশ জোরের সঙ্গে বলে রমেন।

—বিলাত ফেরত ডাক্তার! ভারী অহঙ্কার দেখছি! বলি বিলাত তো গিয়েছিলে আমার বাবার পয়সায়। তার এত অহঙ্কার আসে কোথা থেকে শুনি!

ব্যঙ্গের সুরে বলে পাহাড়ী।

—যদি তোমার আমাকে পছন্দ না হয় তো তোমার পথ দেখতে পার পাহাড়ী। আমার সঙ্গে থেকে সমাজে আমার মাথা হেঁট করতে পারবে না। আর আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। মেয়েটার প্রতিও কি তোমার একটুও মায়া মমতা নেই ? ওকে একলা ফেলে রেখে পরপুরুষের সঙ্গে রাত দুপুর পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লজ্জা করে না তোমার ?

কর্কশস্বরে প্রশ্ন করে রমেন। তার চোখে টাটা ফার্নেসের আগুন জ্বলে।

—তোমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াটাই আমার জীবনে একটা 'এ্যাক্সিডেণ্ট'। তুমি ভুলে যেয়ো না সিভিলিয়ান সোমনাথ সান্যালের 'সোসাইটি গার্ল' পাহাড়ীরও সোসাইটিতে একটা দাম আছে। আমার বাবা আজ বেঁচে নেই কিন্তু আমার সামাজিক 'পজিসন্' এখনও অটুট। মধ্যবিত্ত ঘরের বৌদের মত স্বামীত্বের পদতলে আমার নিজস্ব সত্তাকে বিলিয়ে দিতে পারব না। তুমি তোমার সামাজিক 'পজিসন্' নিয়ে থাকো আমি চললাম।

গলায় ব্যঙ্গ ও চোখে বিদ্যুৎ হেনে পাশের ঘরে ঢোকে পাহাড়ী।

চার বছরের ঘুমন্ত মেয়ে বনশ্রীর কপালে একটা চুমো দিয়ে গট্‌মট্ করে রাস্তায় নেমে পড়ে পাহাড়ী। বনশ্রী একবার চোখ মেলে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বিলাতফেরত ডাক্তার রমেন মৈত্র।

৩

বৃষ্টি থেমে গেলেও রাস্তায় লোক চলাচল প্রায় বন্ধ। আকাশ মেঘে ভরা। যে কোন সময় আবার ভারী বৃষ্টি নামতে পারে। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ফুলস্পীডে গাড়ী চালাচ্ছে বনশ্রী।

—গাড়ীর স্পীড কমিয়ে দে মা এ্যাক্‌সিডেণ্ট হবে।

রমেনবাবুর স্বরে ভীতি।

—আমার মা এ্যাক্‌সিডেণ্টে মরতে পারলে আমাদের এ্যাক্‌সিডেণ্টে মরতে ভয় কি বাবা!

বি-এ পাশ বনশ্রীর ঠোঁটে হাসি। চোখ রাস্তার দিক থেকে ফেরায় পাশে উপবিষ্ট পিতার দিকে। মুহূর্তের মধ্যে পাশের গলি থেকে একটা গাড়ী বেরিয়ে ধাক্কা দেয় ওদের গাড়ীটাকে। বনশ্রী রাস্তায় ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। রমেনবাবু ও রাস্তার লোকে ধরাধরি করে ওকে নিয়ে যায় হাসপাতালে। একটি কেবিনে ভর্তি করে দিয়ে রাত্রের মত একজন নার্স এর জন্যে নিযুক্ত করে বাড়ী ফেরেন রমেনবাবু।

—মা, মাগো, একটু জল।

রাত চারটে। বনশ্রীর জ্ঞান হয়।

—এই নিন জল।

নার্স ওর মুখে জল ঢেলে দেয়।

—মা, মাগো, আমি কোথা ?

জল খেয়ে বনশ্রী এদিক ওদিক তাকায়।

—আপনি ঘুমোবার চেষ্টা করুন। আপনার মা কাল সকালেই এসে পড়বেন।

রোগীকে সান্ত্বনা দেয় সেবিকা নার্স।

বনশ্রী একটু কাত হয়ে উঠে ভাল করে তাকায় নার্সের দিকে।

—আপনি উঠবেন না। শুয়ে পড়ুন। নাহলে আপনার কষ্ট বেড়ে যাবে। নার্স বনশ্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

—এই তো আমার মা। মা, তুমি তাহলে বেঁচে আছ? 'এ্যাক্সিডেণ্টে' তুমি মরনি? আর তো আমি তোমাকে ছাড়ব না মা। তখন আমি ছোট ছিলাম। তাই তুমি আমাকে ছেড়ে চলে এসেছিলে। এখন আর তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারবে না মা।

নার্সের হাতে পরিচিত ছোঁয়া পেয়ে বনশ্রী বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসে দু'হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে।

—কি যা তা বকছেন আপনি। আপনার মা কাল সকালেই এসে পড়বেন। আপনি এখন ঘুমোন।

নার্স বনশ্রীর হাত ছাড়িয়ে বনশ্রীকে বিছানায় শুইয়ে দিতে চায়।

বনশ্রী ব্লাউজের ভেতরের বুকের খাঁজ থেকে একটা ছোট ব্যাগ বের করে তার ভেতর থেকে পাহাড়ীর একখানা ফটো বের করে।

—এখনও কি তুমি স্বীকার করবে না যে তুমি আমার মা? যে রাত্রে তুমি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ী ছেড়ে চলে যাও তখন আমি ঘুমিয়ে থাকলেও আমার কিছুটা জ্ঞান ছিল। পরদিন সকালবেলা বাবাকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন যে 'এ্যাক্সিডেণ্টে' তুমি মারা গেছ।

আমার শিশুমন সেকথা বিশ্বাস করে নি। মায়ের চুমার পরশ যে মেয়ের কাছে পরশমণি। ড্রয়ার থেকে তোমার এই ছোট্ট ফটোটা আমি বের করে নি। সেই থেকে এই ফটোটা আমার নিত্যসঙ্গী। আমাকে সমস্ত বিপদ আপদ থেকে তুমি দূরে রেখেছ। আজ যে এতবড় 'এ্যাক্সিডেণ্ট' হোল তাও আমার বিশেষ কিছু হয়নি। তোমার বয়সী কাউকে দেখলেই আমি ফটোটার সঙ্গে মিলিয়ে নি। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমি তোমাকে ফিরে পাবোই। আজ 'এ্যাক্সিডেণ্টের' ভেতর দিয়ে ভগবান আমার ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন।

নার্সের হাতে ফটোটা দিয়ে বলে বনশ্রী। তার চোখে মুখে পূর্ণ দীপ্তি।

—আমার মা। আমার হারানো রতন।

ফটোটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে চোখেমুখে অনির্বচনীয় আনন্দ ফুটিয়ে বনশ্রীকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে পাহাড়ী। চুমোয় চুমোয় গাল ভরে দেয়।

মেঘ কেটে গিয়ে পূব আকাশে সূর্য দেখা দেয়।

অশান্ত চিত্তে কেবিনে ঢুকে রমেন এ দৃশ্য দেখে হতভম্ব।

পাহাড়ী দু'হাতে রমেনের পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় ছোঁয়ায়।

রমেন পাহাড়ীর মাথায় হাত রাখে।

সকালের মিষ্টি রোদের মত তিনজনের মুখেই মিষ্টি হাসি ফুটে ওঠে।

আলো আর কালো

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলো, আলো, আরো আলো
আমি চলেছি, পূর্বাস্য হয়ে
যাত্রাপথের শপথ নিয়ে
ভোরের আগের যে প্রহরে আলোর সুরে
কিঙ্কিণী বাজে কালো রাতের বাঁকে
উদয় পথের নেপথ্যে
অরুন্ধতী জাগে সপ্তর্ষিদের মাঝে
দিব্যদ্যুতিতে কাঁপে শুকতারা আর জ্যোতিষ্কের দল
কাকজ্যোৎস্নার শেষ আবেশে প্লাবন চঞ্চল
আদেশ শুনেছি ঋষির শতপথ ব্রাহ্মণের
উপনিষদকার বলেছেন অন্ধকার থেকে আলোয়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
স্নান করেছি কণ্ঠে নিয়েছি মন্ত্র
জীবনের অমৃতধ্যানে হয়েছি কল্যাণব্রত
করেছি অন্নদান নিরন্নদের, ভীতত্রস্তদের অভয়
সমাহিতসত্ত্ব মূর্ত বোধিসত্ত্বের মত
এসেছে মৈত্রী-ভাবনা করুণা
জৈবিক প্রেরণায় আর নেই মত্ততা
অর্থ উপার্জনে নেই মন
নামের মোহে ধরেছে বিতৃষ্ণা
জ্ঞানের চর্চায় হতে চেয়েছি প্রশান্ত
যোগাসনে বসেছি তৎপর,
সবাই বললে—সাধু, সাধু, ধন্য তুমি বরেণ্য
তবু নখর হয়ে উঠলো দিন
প্রখর হয়ে উঠলো জীবনবোধ
মুখর হলো মনের অলিগলি সীমার সীমানা
কী পাইনি তার হিসাবনিকাশে নয়
কী পেয়েছি তার পাওনা মেলাতে,
নেমে পড়লাম পথে. মাখলাম ধূলি গায়ে
তুলে নিলাম জঞ্জাল. অভিশপ্ত বিষাক্ত বীজ
রাত্রির গভীরে তার পেলেম দেখা
তামসীর গহিন গিরিকন্দরে
মনের অরণ্যের বন্দন মর্মরে
আকাশময় সপ্রত্যয়ে, অগ্রণী অগ্নিশিখার মত
জ্বলছে সে স্বয়ম্প্রভা ভিতরে বাহিরে
ডাকছে তমুতট শিখরের উদগ্র চূড়ায়
ভোগবতীর তীরে, মর্মান্তিক প্রগলভতায়
সব কিছু তুচ্ছতায়, লুব্ধতায়
শর্বরীর স্বপ্ন তখনও ভাঙেনি
কামনার বাড়বানলে পূর্ণ আহুতি পড়েনি
প্রতীকের উপাসনায় পঞ্চ-মকারের উপচার,
রাতের কোলাহলে রতিজ্ঞ মুহূর্তগুলি
রভস উচ্ছ্বাসে তখনও উদ্বেল ;
তাকে দেখলাম রংএ রেখায়, চাকচিক্যে
ঋতুরঙ্গরসিকার দ্রুত ঝঙ্কৃত সুরে
দেখলাম লালসার অবারিত আরতিতে
লোভন আবিষ্কারের শোভন অভিসারে
দেখলাম ধরা দিচ্ছে সে বাহুর আলিঙ্গনে
অধরের মদির আলিম্পনে,
মৃত্যুনীল উন্মাদনার স্পন্দনে ;
আমার ব্রহ্মচারী দেহ শিউরে উঠলো
সেই কদর্য কঠোর অশুচি স্পর্শ দেখে
কই বিস্ফুরিত হলো না ত হরকোপানল
রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্রের বহ্নিবাণ
পঞ্চশরে যা দগ্ধ করেছিলো,
হাসলে সে খলখল করে
আমার গলিত মনের শবাসনা
সন্ধ্যার সান্ত্রক্ষণে কাণে কাণে বললে
অন্ধকার থেকে আলোই শেষ কথা নয়
মৃত্যু থেকে অমৃতত্বই গতির পরিণতি নয়
আলো থেকে অন্ধকারেও যাতায়াত করতে হয়
জীবন মানেই দুই, উভয় ভারতীর উভয় তীর
যাত্রা যেখানে হবে একত্তর
শংকরীর আর ভয়ঙ্করীর
কালের আর আলোর
যাওয়ার আর আসার
ছাড়ার আর পাওয়ার
পূরবীর আর বিভাসের
সূর্যদেব হাত ধরে মিলিয়ে দেন যাদের
সকালে সন্ধ্যায় জীবনের নগ্ন নিকষে
আমি কবি, শুনেছি তার কথা,
সকল কালের জীবন দেবতার ব্যথা
তাই চলেছি ফিরে, মিল থেকে অমিলে
মাত্রা থেকে অমাত্রায়
আলো থেকে অন্ধকারে
কপালিনী উলঙ্গিনীর খোঁজে
সেই কালোরূপেই আমি আজ মজবো
সব আলো যেখানে ডুবেছে,
সবশেষের সমাধি মন্দিরে
সব আরম্ভের যেখানে সুরু।

"ম্যাথু-আর্ণল্ড প্রতিভার রূপরেখা"

ডাঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন)

ভিক্টোরীয় যুগ বিজ্ঞান, গণতন্ত্র ও বৈষয়িক উন্নতির যুগ। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে উনবিংশ শতাব্দী উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এই যুগেই সূচিত হয়েছিল। ধর্ম ও বিশ্বাসের বনিয়াদ আস্তে আস্তে শিথিল হ'য়ে আসছিল। অতীতের ঐতিহ্যকে মানুষ বাসি-ফুলের মালার মত ছুঁড়ে নূতনের আবাহন গীতি গাইতে স্থুরু ক'রল। কবি টেনিসন ভিক্টোরীয় যুগের সমস্ত হাসি-কান্না আর চাওয়া-পাওয়াকে তার রূপ দিয়েছেন। তিনি ধর্ম ও বিজ্ঞান, বিশ্বাস ও নাস্তিক্যবাদ, যুক্তি ও কল্পনার সমন্বয়সাধন করতে পেরেছিলেন। ব্রাউনিং তাঁর ধর্ম-বিশ্বাসের বনিয়াদে যাতে কোন ফাটল না ধরে তাই ইটালীকেই তাঁর যৌবনের লীলানিকেতন, তাঁর বার্দ্ধক্যের বারাণসী করে ফেললেন। কিন্তু ম্যাথু আর্ণল্ড তাঁর স্পর্শকাতর চিত্ত নিয়ে একান্ত অসহায়ের মত দেখলেন যে অবিশ্বাসের ঢেউ বারে বারে এসে ইংল্যাণ্ডকে আঘাত করছে। যতবার তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন অতীতের বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকতে, ততবার দেখলেন তাঁর যুগের অধিকাংশ লোকই কালাপাহাড়ের মত বিশ্বাসের বনিয়াদকে খানখান করে চুরমার করেছিল। এই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোটানায় পড়ে আর্ণল্ড পর্যুদস্ত হ'য়ে যাচ্ছিলেন। আর্ণল্ড চেয়েছিলেন তাঁর স্বরচিত "পলাতক জিব্সির" মত ভিক্টোরীয় যুগের কুহেলিকা ও মায়া-মরীচিকা থেকে অনেক দূরে পালিয়ে যেতে—কিন্তু সেটা যখন সম্ভব হ'ল না তখন তিনি বেদনাবিহ্বল চিত্ত নিয়ে দর্শক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই বেদনার প্রকাশ পেল তাঁর কাব্যে ও তাঁর সমালোচনায়।

ম্যাথু আর্ণল্ড জন্মেছিলেন অত্যন্ত নীতিপরায়ণ, ধর্মনিষ্ঠ পরিবারে। তাঁর বাবা ডাঃ টমাস আর্ণল্ড ছিলেন খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষক। তিনি ইংল্যাণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, লেখাপড়ার চেয়েও নৈতিক চরিত্রের মূল্য অনেক বেশী। এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ম্যাথু আর্ণল্ড নৈতিক উন্নতিকে জীবনের চরম অভীষ্ট বলে মনে করেছিলেন। ডাঃ আর্ণল্ড যখন রাগবি স্কুলের হেডমাষ্টার, তখন ম্যাথু আর্ণল্ড উইনচেষ্টার স্কুলে পড়ছিলেন। আর্ণল্ড তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বের জন্য অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। উইনচেষ্টার স্কুল ছেড়ে তিনি তাঁর বাবার স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। স্কুলে থাকাকালীন তার কবিপ্রতিভার উন্মেষ হয়েছিল। সমস্ত ছাত্রদের সঙ্গে কাব্য প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। "এল্যারিক এ্যাট রোম" তাঁর প্রথম কাব্য।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে আর্ণল্ড অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যালিয়ল কলেজে ভর্ত্তি হলেন। আর্ণল্ড ও তাঁর বন্ধুরা "ডিকেড" নামক একটি মজলিসের প্রতিষ্ঠা করেন। দশজন সদস্য ছিলেন বলে মজলিসের নাম হ'ল ডিকেড। তখন অক্সফোর্ড মুভমেণ্টের ঢেউ সারা ইংল্যাণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর্ণল্ডের বন্ধু ক্লাফ সেই ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে গেলেন। কিন্তু আর্ণল্ড তাঁর বিশ্বাস অটুট রাখতে পেরেছিলেন। প্রথম যৌবনে ধর্ম ও অধর্ম, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের প্রশ্ন তাঁর মনে বিশেষ সাড়া জাগায় নি। তাঁর জীবনের মালঞ্চে বসন্তের প্রথম আবির্ভাব দেখা দিয়েছে। রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ ভরা পৃথিবী তাঁর কাছে এক নূতন বারতা এনে দিয়েছিল। অক্সফোর্ডের ছাত্রদের মধ্যে কাব্য প্রতিযোগিতায় প্রথম হলেন 'ক্রমওয়েল' কবিতা লিখে। তখন ম্যাথু আর্ণল্ডের বয়স পুরো একুশ হয়ে উঠেনি। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত সংবাদ এল ডাঃ টমাস আর্ণল্ড দেহত্যাগ করেছেন। ম্যাথু আর্ণল্ডের জীবনের আলো আর রং এক মুহূর্ত্তে মুছে গেল।

ছোট ছোট আট জন ভাই বোন আর বিধবা মা। ভাই-বোন সকলেই ছাত্রছাত্রী। কিন্তু ডিগ্রী না নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সমীচীন নয়। তাই তিনি বি, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। অমন মেধাবী ছাত্র, কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে তাঁর স্থান হ'ল না। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্লাক বলেছিলেন, ম্যাথ্ যতই কম পড়াশুনো করুক না কেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নীচে সে কখনো নামবেনা, দ্বিতীয় শ্রেণীতেই তার স্থান হ'ল।

কয়েক মাস বাবার স্কুলে শিক্ষকতা করলেন। যিনি ভবিষ্যতে ইংল্যাণ্ডে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করেছিলেন তাঁর অজস্র রচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর নিজের কিন্তু শিক্ষকতা বেশীদিন ভাল লাগল না। লর্ড ল্যান্সডাউন তখন ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা। আর্ণল্ড তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন। বড়লোকের বাড়ীর আদব কায়দার জৌলুসে চোখ একটু ধাঁধিয়ে গিয়েছিল বৈ কি। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে আর্ণল্ড-এর অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে ইংল্যাণ্ডের প্রতিটি স্তরের লোকের তিনি সুনিপুণ বিশ্লেষণ করেছিলেন এই অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি হিসাবে।

কাজের চাপ কম। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কবিতার সুবর্ণ অঞ্জলি। সাতাশ বছরে প্রথম কাব্য সঞ্চয়ন প্রকাশিত হ'ল "ট্রেড রেভেলোর এ্যাণ্ড আদার পয়েমস্" নামে। ভিক্টোরীয় যুগ রোমান্টিক যুগ। সে যুগে মানুষের জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। কিন্তু তিনি হারিয়ে যাওয়া গ্রীক কবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গ্রীক আর্টের সংযম ও সুমিতি নিয়ে এলেন তাঁর কাব্যে। তাই সেযুগের পাঠক ও পত্রিকাগুলি আর্ণল্ডকে সমাদর জানালেন না। এতবড় কবিপ্রতিভা এতটুকু স্বীকৃতি পেলে না।

নিঃসন্দেহে একটু দমে গেলেন আর্ণল্ড। কিন্তু তখন তাঁর জীবনে মধুমাস দেখা দিয়েছে। মার্গারেট তখন তাঁর জীবনের রঙ্গমঞ্চের নায়িকা। একটুকু ছোঁয়া লেগে, একটুকু কথা শুনে তাঁর দিন কাটছে সুইজারল্যাণ্ডে বেল ভিউ হোটেলে। বন্ধু ক্লাফকে লিখলেন যে তিনি তখন এক জোড়া নীল চোখের রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যস্ত। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই মোহ কেটে গেল। আর্ণল্ড বুঝলেন, মার্গারেট উর্বশীর মত—নহে মাতা, নহে কন্যা, প্রজাপতির মত উড়ে বেড়ানই তার কাজ। গৃহলক্ষ্মী হবার মত তার বাসনাও নেই, সাধ্যও নেই। "টু মার্গারেট" কবিতায় বিদায়ের সুর বেজে উঠেছে। শুধু বিদায়ের সুর নয়, বেদনার সুর।

ফিরে এলেন লণ্ডন। কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হ'ল দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ—"এম্পিডোক্‌ল্‌স অন্ এটনা"। ভিক্টোরীয় পাঠক আগের বারের মতই মুখ ফিরিয়ে রইলে। এই সময় তাঁর দেখা হল ফ্যানীনলুসী ওয়াইট-ম্যানের সঙ্গে। ফ্যানীর বাবা হাইকোর্টের জজ। আর্ণল্ড আগে নিজেকে ভুলেছিলেন একজোড়া নীল চোখের মোহিনী মায়ায়। এবার একজোড়া ধূসর শান্ত চোখ। তাতে মোহিনী মায়া নেই। আছে কল্যাণস্পর্শ আর নীড় রচনার আমন্ত্রণ। আর্ণল্ড বিয়ের প্রস্তাব কর্লেন। জজ সাহেব শুধু বল্লেন, চাকরীতে উন্নত না হলে কিছুই হবে না।

আর্ণল্ড চাকরীর উন্নতির জন্য লর্ড ল্যান্সডাউনকে ধর্লেন। প্রাইমারী স্কুলের ইন্‌স্পেক্টরের চাকরী জুটল। ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাকে জীবন দেবতার পায়ে আত্মবিসর্জন কর্তে হ'ল। পাঁচ থেকে এগারো বছরের ছেলেমেয়েদের অংক, ভূগোল ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য আর্ণল্ডকে সারাদিনই ঘুরে বেড়াতে হ'ত। সারা জীবনই তাঁকে এই কাজ কর্তে হয়েছে। যখন ইংল্যাণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী আর্ণল্ডের কাছে শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতেন বা পরামর্শ চাইতেন, তখনও আর্ণল্ড সামান্য বেতনভুক্ স্কুল-ইনসপেক্টর মাত্র।

বিয়ে করার জন্য তাঁকে ইনস্পেক্টর হ'তে হয়। মস্ত বড় মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছিল। কিন্তু মূল্য দিয়ে তিনি পারিবারিক সুখ শান্তি দুই-ই পেয়েছিলেন। ফ্যানী লুসী—যাঁকে আর্ণল্ড আদর করে ফ্লু বলে ডাকতেন—তিনি তাঁর জীবন পাত্র মাধুরী দিয়ে কানায় কানায় ভরে দিয়েছিলেন। তাঁদের বিবাহিত জীবনের প্রত্যেকটি দিন ছিল মধুচন্দ্রিকা।

আর্ণল্ডের চারটি ছেলে ও দুটী মেয়ে হয়েছিল। সামান্য

কিছু দিনের ব্যবধানে তিনটি ছেলে মারা গেল। বাড়ীতে যখন শোকের ছায়া নেমেছে তখনও আর্ণল্ড ভেঙে পড়েন নি। তাঁর ঈশ্বরের প্রতি এত গভীর বিশ্বাস ছিল যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ঈশ্বরের মঙ্গলস্পর্শ অনুভব করবার শক্তি তাঁর ছিল।

বিয়ের দুবছর বাদে আর্ণল্ড তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ কর্লেন। আগেকার কাব্যগ্রন্থ দুটির লেখক ছিলেন "এ"। সেসময় আর্ণাল্ড নিজের পুরো নাম প্রকাশ কর্তে সাহস করেন নি। এবারের লেখক ম্যাথু আর্ণল্ড। কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধ হিসাবে তিরিশ পাতার একটি দীর্ঘ ভূমিকা প্রকাশিত হল। ভূমিকাটি শুধু রোমান্টিক পাঠক দের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য হাতিয়ার মাত্র নয়। কাব্যসমালোচনার ইতিহাসে ভূমিকাটি অপূর্ব অবদান। তিনি গীতিকাব্য এবং স্বানুভূতি-প্রধান সাহিত্যের যুগে জন্মগ্রহণ করে গীতি কাব্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কর্লেন। আর তাঁর কাব্যও তাঁর ঘোষিত নীতির বাহন হয়ে উঠল। এবার জনগণ তাঁর কাব্য সহজেই গ্রহণ কর্ল। কিন্তু মজার কথা যে আর্ণল্ড সবসময় নিজের ঘোষিত নীতি অনুসরণ কর্তে পারেন নি। অনেকসময় গীতিকাব্যর দেবীর হাতের কাঁকনের স্পর্শে তাঁর কল্পনা হাজার গানে মুখর হ'য়ে উঠেছিল।

দুটি বছর বাদে চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হল। কিন্তু এবার পাঠকেরা ততটা সমাদর দেখালেন না। আর্ণল্ডের কবিপ্রতিভা ছিল। কিন্তু পাঠকের ঔদাসীন্যেই হোক বা জড়বাদী ভিক্টোরীয় যুগে তাঁর কবি প্রতিভার সম্পূর্ণ উন্মেষ সম্ভব হয়নি বলেই হোক, আর্ণল্ডের কবিতা কল্পনার পূর্ণ স্রোতের প্রসাদ লাভ করে নি। ক্রমেই ধারা বিশীর্ণ হ'য়ে আসছিল। বস্তুতঃ চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের বার বছর বাদে শেষ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শেষ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর তিনি একুশ বছর বেঁচে ছিলেন। এই একুশ বছরে তিনি সাতটি কবিতা মাত্র লিখেছিলেন। আর্ণল্ডের প্রত্যেকটি কবিতায় বেদনার আভাস। মৃত্যু, বিরহ, বিচ্ছেদ—এই হ'ল তাঁর কবিতার মূল সুর। অন্যান্য সমসাময়িক কবি যখন তাঁদের কাব্যে আশার বাণী—উচ্চারণ করছিলেন, আর্ণল্ড তখন যুগের ব্যাধি ও মৃত্যুর কথাই বারে বারে উল্লেখ করছিলেন। তাঁর বাবার মৃত্যুর সম্বন্ধে লিখলেন "রাগবি চ্যাপেল", যুগের মৃত্যু সম্বন্ধে লিখলেন—"ওবারম্যান", "স্কলার জিপসি", এবং "সাটারিউস"; ছোটভাই এর মৃত্যু উপলক্ষে লিখলেন "কার্নাক" এবং "সাদার্ন নাইট"। হাইনের মৃত্যুতে রচিত হল "হাইনেজ গ্রেভ"। গ্যাটে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং বায়রনের মৃত্যু উপলক্ষে লিখলেন—"মেমোরিয়াল ভার্সেস" চার্লট ব্রন্টির মৃত্যু উপলক্ষে লিখলেন-"হাওয়ার্থস্ চার্চ-ইয়ার্ড" ক্লাফ সম্বন্ধে লিখলেন—"থার্সিস"। এ সবত শুধু মৃত্যুর কবিতা। তাঁর সব কবিতায়ই বেদনাতে চিত্তের করুণ প্রকাশ।

অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কবিতার অধ্যাপক এর পদ খালি হল—আর্ণল্ড নির্বাচিত হলেন। এর মানে এই নয় যে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইনস্‌পেক্টরের পদের গ্লানির হাত থেকে মুক্তি পেলেন। নাবিক সিন্ধুবাদের কাঁধে যেমন ভূত চেপেছিল ঠিক তেমন ইনস্‌পেকটরের পদ জগদ্দল পাথরের মত তার বুকে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে চেপে ছিল। অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ছিল যে কবিতার অধ্যাপক কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বছরে কয়েকদিন কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন। পাঁচ বছর এই চাকরীর মেয়াদ। আর্ণল্ডের প্রথম বক্তৃতা হল—আধুনিক সাহিত্য। আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক সাহিত্য তাঁর বিষয় হলেও তিনি প্রাচীন গ্রীক কাব্য ও সাহিত্যের উপযোগিতা সম্বন্ধেই আলোচনা করেন।

কিছুদিন বাদেই প্রকাশিত হ'ল তাঁর প্রথম ও শেষ নাট্যকাব্য "মেরোপি"। মিল্টন প্রমুখ কয়েকজন ইংরেজ কবি গ্রীক্ নাট্যকারদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের নাটকেই গ্রীক কাঠামোর মধ্যে আধুনিকতার সুর কিছুটা ধ্বনিত হয়েছিল। আর্ণল্ড গ্রীক্ সাহিত্যে পারঙ্গম। গ্রীক ভাবধারায় তিনি অনুপ্রাণিত। তাই তিনি গ্রীক আঙ্গিক গ্রীক্ সুর গ্রীক্ ভাবধারাকে তাঁর নাটকে রূপায়িত করলেন। কিন্তু পাঠকেরা অনড়, অচল হয়ে রইলেন। আর সুইনবার্নের "আটালাণ্টা ইন ক্যালিডন" নাটক পড়ে গদগদ হ'য়ে উঠলেন।

আর্ণল্ড এ সময় কিছুদিন সখের রাজনীতি করেছিলেন। তার ফলশ্রুতি হ'ল "ইংল্যাণ্ড এ্যাণ্ড দি ইটালীয়ান্ কোয়ে-

লেন"। তিনি ভেবেছিলেন এই বই লিখে গ্লাডষ্টোন তাঁকে কোন অ্যাম্বাসাডার পদে নিযুক্ত করবেন। কিন্তু বৃথাই চেষ্টা। গ্লাডষ্টোনের করুণা হলনা। কিন্তু শিক্ষা-মন্ত্রী তাঁর অকৃপণ দাক্ষিণ্য দেখালেন আর্নল্ডকে শিক্ষা-বিষয়ক কমিশনার নিযুক্ত করে।

আর্ণল্ড ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ভ্রমণ করে সে সব দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্য-বেক্ষণ করে এলেন। তারই বিবরণ প্রকাশিত হল—"পপুলার এডুকেশন ইন ফ্রান্স" বই এ। শিক্ষাজগতে একটা সাড়া পড়ে গেল। সেই সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য জগতেও সাড়া পড়ে গেল তাঁর হোমার বিষয়ক বক্তৃতা-মালায়। এ, ই, হাউসম্যান বলেন যে ইংল্যাণ্ডের সমস্ত সমালোচনার বই একদিকে রেখে আর্ণল্ডের শীর্ণকলেবর "হোমার"কে অন্যদিকে রাখলে দেখা যাবে যে "হোমার" ধারে ও ভারে সবার চেয়ে বড়। ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ হোমার অনুবাদকগণের অনুবাদ সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে আর্ণল্ড অনুবাদ সম্বন্ধে নিজের মূল্যবান্ মতামত ব্যক্ত করেন। কিন্তু আর্নল্ডের তিক্ত সত্যকথা প্রকাশে দুজন অনুবাদক ফ্রান্সিস নিউম্যান ও ইচাবড রাইট ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলেন। তাঁদের ক্ষ্যাপামি প্রকাশ পেল তাঁদের আর্ণল্ডের বিরুদ্ধে রচনায়। আর্ণাল্ড পরের বছর "হোমার সম্বন্ধে শেষকথা" বইএ এ আলোচনার উপর যবনিকা পাত কর্লেন।

কবিতা সৃষ্টিধর্মী। আর্ণল্ডের সমালোচনাও সৃষ্টিধর্মী। তার সমালোচনা তাজা ফোটা ফুলের মত। বর্ণে, গন্ধে, রূপে, মাধুর্য্যে, প্রাণের উচ্ছ্বাসে, চৈতন্যের মহিমায় মহীয়ান হ'য়ে উঠেছে তাঁর সমালোচনা সাহিত্য। শুধু সাহিত্য সমালোচনা নয়, শিক্ষা বিষয়ক সমালোচনা কয়েকবছর বাদে প্রকাশিত হ'ল। তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা "এ ফ্রেঞ্চ ইটন" মাধ্যমিক শিক্ষা জগতে এই ছোট বইখানা একটা বিরাট আলোড়ন জাগাল।

পরের বছর প্রকাশিত হ'ল সে যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচনার বই, "এসেজ ইন্ ক্রিটিসিজম" বা প্রবন্ধ-সংগ্রহ। আরিষ্টটলের যুগ থেকে শত শত সমালোচক হাজার হাজার প্রবন্ধ লিখেছে। কিন্তু আর্ণল্ড সমালোচনার সংজ্ঞাই পরিবর্ত্তিত কর্লেন। তিনি স্পষ্টভাবে বল্লেন সমালোচনা মানে একটা শিল্পকার্য্যের দোষগুণ বিচার নয়। সমালোচনার অর্থ বিশ্বের সুন্দর ভাবধারাকে সম্যকরূপে জানা ও সেই ভাবধারাকে প্রচার করা। আর্ণল্ডের বিশ্বাস, ইংল্যাণ্ডে ভাবধারা শুকিয়ে এসেছে। তাই ফ্রান্স, জার্মাণী ও অন্যান্য দেশ থেকে নতুন ভাব নিয়ে আসতে হবে।

সমালোচকদের হ'তে হবে বস্তুলীন। বাইরের ভাব দিবে আর নিবে, মিলিবে মিলাবে—এই ছিল আর্ণল্ডের ঈপ্সিত। ইংল্যাণ্ড এইভাবেই ভাবরসপুষ্ট হবে, সমালোচকদের গীতাবর্ণিত অনাসক্তি অর্জন কর্তে হবে। বস্তুত আর্ণল্ড গীতার অনাসক্তির কথা তাঁর প্রথম প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধসংগ্রহ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আর্ণল্ডের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল, কিছু নিন্দাও জুটল। কিছু তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকা সোরগোল তুল্ল এই কারণে যে—আর্ণল্ড ইংল্যাণ্ডকে ছোট করে ফ্রান্সকে বড় করে তুলে ধরেছেন। যতদিন আর্ণল্ড বেঁচে ছিলেন, কিছুসংখ্যক ইংরেজদের কাছে তিনি এই অপবাদ পেয়েই গেছেন। কিন্তু পরে সকলেই বুঝেছিলেন যে আর্ণল্ড ইংল্যাণ্ডকে ব্যাকুলভাবে ভালবেসেছিলেন বলেই ইংল্যাণ্ডের দোষত্রুটি দূর কর্তে চেয়েছিলেন।

সাহিত্য সমালোচক থেকে নৃতত্ত্বের সমালোচক। মস্ত বড় ব্যবধান। কিন্তু দুইএর সমন্বয় সাধন কর্লেন আর্ণল্ড তাঁর "স্টাডিস্ ইন্ কেল্টিক লিটারেচার"এ। কেল্ট জাতি অর্থাৎ ওয়েলস ও আয়র্লাণ্ডের অধিবাসীদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য পর্য্যালোচনা করে তাদের সাহিত্যিক অবদানের কথা সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ কর্লেন। শুধু কেল্ট নয়, জার্মান ও ফরাসী জাতির বৈশিষ্ট্যও সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করেন। তাঁর প্রধান উপপাদ্য বিষয় হোল যে একজন ইংরেজে ৩টি ধারার সমষ্টি—ফরাসী, জার্মান ও কেল্টিক।

নৃতত্ত্বের সমালোচক থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমালোচক। "কালচার এ্যাণ্ড অ্যানার্কি" বা "সংস্কৃতি ও অরাজকতা" রাজনৈতিক ও সামাজিক সমালোচনার—ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থানাধিকার করে আছে। অক্সফোর্ডে কবিতার অধ্যাপকের পদ তিনি দশবছর অলংকৃত করে ছিলেন। "কালচার অ্যাণ্ড অ্যানার্কি"র প্রথম অংশ

অক্সফোর্ড বক্তৃতামালার শেষ বক্তৃতা। তখন লণ্ডনবাসী সকলেই ভোটাধিকার পাবার জন্য বিশেষ উত্তেজিত। হাইড পার্কে ক্ষিপ্ত জনসাধারণ রেলিং বেঞ্চি প্রভৃতি চুরমার করে ফেল্ল। সৈনিকগণ নীরব দর্শক হয়েই রইল। ম্যাঞ্চেস্টার, গ্লাসগো ও লীডস প্রভৃতি স্থানে জন ব্রাইট জনসাধারণকে জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তেজিত করলেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যায়ের আভাস দেখা দিল। তাই তিনি "কালচার এ্যাণ্ড এ্যানার্কি"তে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। শুধু সামাজিক ও রাজনৈতিক অরাজকতার কথাই তিনি বলেন নি। বুদ্ধি ও নীতির বিপর্যয় দেখা দেবে, এই আশংকা তাঁর মনে জেগে উঠেছিল। এই বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাবার একটিমাত্র উপায় কালচার বা সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি সম্বন্ধে চিরকাল নানা মুনির নানা মত প্রচার হয়েছে। আর্ণল্ড-এর মতে 'কালচার' এবং 'ক্রিটিসিজম' অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিশ্বের ভাবরাজ্যের সঙ্গে পরিচয় 'কালচার'এর অন্যতম লক্ষ্য। প্রত্যেক মানুষকে সম্পূর্ণ-ভাবে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। শুধু বৈষয়িক উন্নতি ভিক্টোরীয় যুগের জনসাধারণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। উপকরণের দুর্গ গড়ে তোলার প্রয়াসে তারা জ্যোতির্ময় আত্মার স্বরূপ ভুলে যাচ্ছিল। দেহসর্ব্বস্ব জাতি দেহের সুখের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করছিল। কিন্তু মন তাদের কাঙাল, বুভুক্ষু হয়েই রইল। আর্ণল্ড ইংরেজজাতিকে তিন ভাগে ভাগ করলেন –'বার্বেরিয়ান' বা 'অভিজাত সম্প্রদায়', 'ফিলিষ্টিন' বা 'মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়' এবং 'পপুলেস' বা 'জনসাধারণ'। এই তিন সম্প্রদায়ের সবচেয়ে ভালটুকু নিয়ে রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

আর্ণল্ড ইংরেজকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু মোহাবিষ্ট জাতির এই আঘাতের প্রয়োজন ছিল। আর্ণল্ড জাতির গুরু বা 'প্রফেট' হয়ে উঠলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁর প্রিয় পুত্রকে স্বীকৃতি দিলেন। লর্ড স্যালসবারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে আর্ণল্ডকে ডি, সি, এল উপাধিতে ভূষিত করে তাঁকে "মূর্ত্তিমান মাধুরী ও আলোক" বলে সম্বোধন করেন। আর্ণল্ড তাঁর 'কালচার এ্যাণ্ড এ্যানার্কি'তে 'মাধুরী ও আলোকের' প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছিলেন। তাই এই সম্বোধন।

কিছুদিনের মধ্যেই 'ফ্রেণ্ডসিপস্ গার্ল্যাণ্ড' বা বন্ধুর উদ্দেশ্যে মালিকা রচনা করেন। এখানেও ইংরেজ জাতিকে মোহাবেশ থেকে জেগে ওঠার আমন্ত্রণ। কিন্তু এখানে আঘাতের সঙ্গে হাস্যরস আছে। আর্ণল্ডের হাস্যরস যে কত মধুর আর কত নিষ্করুণ হতে পারে তারই পরিচয় রয়েছে প্রতি পংক্তিতে।

সামাজিক সমালোচনা থেকে এবার ধর্মসংক্রান্ত সমালোচনা। এখানেও মনীষীর দৃঢ় বলিষ্ঠ প্রত্যয়পূর্ণ পদক্ষেপ। এত বিভিন্ন বিষয়ে পরিক্রমা বোধ হয় সমসাময়িক কেউই করেননি। এমনকি কার্লাইল ও রাস্কিনও নন। এই পর্য্যায়ে তার লেখা—'সেইণ্ট পল্ এ্যাণ্ড প্রটেস্ট্যাণ্টিজম", "লিটারেচার এ্যাণ্ড ডগমা", "গড এ্যাণ্ড দি বাইবেল" এবং "চার্চ এ্যাণ্ড রিলিজন।" সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে আর্ণল্ড ধর্মালোচনা করেছেন। কবি যখন ধর্মালোচনা করেন তখন বাইবেল একখানা কাব্য হয়ে ওঠে। আর্ণল্ড যীশুর অলৌকিক কাহিনী বিশ্বাস করেন নি। বিশ্বাস করেছেন সেই মানবপুত্রের মনুষ্যত্বকে, কাঁটার মুকুট পরা দরদী মানুষকে। গোঁড়া পুরোহিত দল এমন কি গ্লাডষ্টোন পর্য্যন্ত ক্ষেপে উঠলেন। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ আর্ণল্ড তাঁর বিশ্বাস থেকে একচুলও নড়লেন না।

এর পর আর্ণল্ড মাত্র ৪ খানা বই লিখেছিলেন। "আইরিশ এসেজ", "ডিসকোর্সেস ইন অ্যামেরিকা", এবং 'এসেজ ইন ক্রিটিসিজম" (২য় পর্য্যায়) এবং "মিক্সড এসেজ" সাহিত্য ও রাজনীতি এই বইগুলির উপজীব্য। 'ডিসকোর্সেস্ ইন আমেরিকা' আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতামালা। 'এসেজ ইন ক্রিটিসিজম" প্রকাশিত হল আর্ণল্ডের মৃত্যুর পর। এই প্রবন্ধগুলি মোটামুটি ইংরেজ কবিদের সম্বন্ধে। এই বইয়ের প্রথম এবং প্রধান প্রবন্ধে আর্ণল্ড কবিতার এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা লিখেছেন। সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি ঘোষণা করলেন—"জীবনের সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য – জীবনের মূল্যায়নের জন্য, দুঃখ বেদনায় সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য, কবিতার একান্ত প্রয়োজন হবে। কাব্যহীন বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ। আজকালকার ধর্ম্ম ও দর্শন কবিতাকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজেরা লোকান্তরিত হবে।"

মৃত্যুর দু'বছর আগে আর্ণল্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইনস্পেক্টরের পদ থেকে অব্যাহতি পেলেন। গ্লাডষ্টোন চিরকালই আর্ণল্ডের বিরোধিতা করে এসেছিলেন। আজ তিনি আর্ণল্ডকে "ইংল্যাণ্ডের সাহিত্য ও কাব্যলক্ষ্মীর সেবার স্বীকৃতি হিসাবে" আড়াইশ' পাউণ্ড পেনসনের ব্যবস্থা করেন।

বড় মেয়ে লুসীর বিয়ে হয়েছিল আমেরিকায়। মেয়ে আর নাতনী বাপের বাড়ী আসছেন। লিভারপুলে জাহাজ ভিড়বে। তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য একটা বেড়া ডিঙিয়ে লাফ দিলেন। বৃদ্ধের পক্ষে হঠকারিতা। কিন্তু পিতৃস্নেহ নিয়ম মানে না। সেই খানেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। আর উঠলেন না। একটি বিরাট প্রতিভামাত্র নয়, একটি যুগ, একটি মহৎ ঐতিহ্য, একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের অবসান হল। না, অবসান হয়নি। আর্ণল্ডের নশ্বর দেহ ধূলোয় মিশে গেল! কিন্তু তাঁর অবদান জাতির অক্ষয় সম্পদ হয়ে রইল। আজও তাঁর বাণী নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত অম্লান। অম্লান আলোক-তীর্থের চিরযাত্রী হয়ে তিনি অনাগত যুগের পথিকৃৎ হয়ে রইলেন।

ইংরেজী সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ও জন ষ্টেইন্ বেক

ডক্টর শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য এম্-এ (লণ্ডন) পি-এইচ-ডি (লণ্ডন)

বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায় যাঁরা ফুল ফুটিয়েছেন তাঁদের নাম কালের বালুচরে চিরদিন আঁকা থাকবে কিনা কেউ বল্‌তে পারে না। তাঁদের অনেকের সাহিত্যসৌরভ কালের গণ্ডী পেরোতে পারবে কি না কে জানে? তবে স্থানের গণ্ডী পেরিয়ে এই সব মনীষীর অবদান যে মানবমনে দোলা দেয় এবিষয়ে সন্দেহ নেই। এমনি সাহিত্যিকের সংখ্যাও খুব বেশী নয়। আর তাঁদের সাহিত্যপ্রতিভার অন্যতম স্বীকৃতি হিসাবে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এবছরে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন John Stein Beck. সম্প্রতি তিনি এই পুরস্কার ও সম্বর্দ্ধনা লাভের জন্যে ষ্টকহলমে আমন্ত্রিত হন। সেখান থেকে ফিরবার পথে তিনি কয়েকদিন লণ্ডনে ছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্যে বিশেষ বিশেষ মহলে বিপুল আগ্রহ দেখা দেয়।

কিন্তু এমনি আগ্রহ সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায়নি। যাই হোক বি, বি, সি থেকে David Stride এর উদ্যোগে এই বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সঙ্গে ঘরোয়া আলাপ আলোচনার সুযোগ ঘটে। তাঁকে দেখেই মনে হয় যে লেখক বিশেষ শক্তির অধিকারী—দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ ও প্রাণময়। পুরুষোচিত তাঁর করমর্দন। মুখে যেন দৃঢ়তার ছাপ। কমনীয়তার কোন চিহ্ন নেই। মাথায় অল্প অল্প চুল, মুখে ছোট্ট একটুখানি দাড়ি। বেশভূষার কোন সমারোহ নেই—সাদাসিদে কালো একটি সুটই তাঁকে যেন বেশ মানিয়েছিল। কথায় বার্ত্তায় একটা দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। দৃষ্টি গভীর ও মর্ম্মভেদী।

নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কথা ব'লে অবাক হ'তে হয়। নিজের সম্বন্ধে খুব একটা উচ্চধারণা তাঁর কথায় প্রকাশ পায় না। বরঞ্চ নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে তিনি বিচার করতে চান। সত্যিই এই গৌরবের অধিকারী কে? তাঁর মতে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর সাহিত্যিক হলেন Carl Sandburg। তিনি একাধারে কবি ও সাহি-

ত্যিক। Lincolnএর যে জীবনী তিনি সৃষ্টি করেছেন তা সত্যিই অপূর্ব্ব। নিজের সম্বন্ধে মিথ্যা অহমিকা তাঁর নেই—তাই তিনি মুক্তকণ্ঠে যুগের মনীষীদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল—বিংশ শতাব্দীর লেখকদের মধ্যে কার প্রভাব উত্তরকালের সাহিত্যিকদের ওপর সবচেয়ে বেশী? তখন তিনি নিঃসংশয়ে উত্তর দিলেন—'আমার বিশ্বাস Sherwood Andersonই হ'লেন এযুগের সাহিত্যসম্রাট। কারণ তার লোকোত্তর প্রতিভা সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন পথের নিশানা দিয়েছে।

Steinbeck প্রতিভার পূজারী, তাই Sherwood Andersonএর মনীষার কাছে তিনি বার বার তাঁর সশ্রদ্ধ নতি জানিয়েছেন। সেখানে তাঁর নিরপেক্ষ স্বচ্ছ সমালোচক মন সত্যকে আবিষ্কার করেছে। সাহিত্যিক Steinbeck এর জন্ম হয় ক্যালিফোর্নিয়ার ছোট্ট একটি পল্লী Salinusএ—১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

বাবার দিক থেকে জার্ম্মান রক্ত তাঁর ধমনীতে রয়েছে—আর তাঁর মায়ের জন্ম হ'ল উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে। তাই দুই জাতির সংমিশ্রণে এই মনীষার অভ্যুদয়। অবশ্য ক্যালিফোর্নিয়ার মুখর পরিবেশে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতির সঙ্গে তিনি সুপরিচিত—আর তাঁর সাহিত্যেও তার প্রভাব সুস্পষ্ট। আবার ইংল্যাণ্ডেও তিনি অপরিচিত আগন্তুক নন—গ্রেট বৃটেনের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ। তাঁর সাহিত্য সাধনার ধন তিনি আহরণ ক'রেছেন Somersetএর সমৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ প্রকৃতির কোলে। ১৯৫৯ সালের বেশীর ভাগ দিন কেটেছে এইখানে। লেখক সস্ত্রীক এই নিভৃত পল্লী পরিবেশে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটিয়েছেন। খ্যাতির নেশা তাঁর মধ্যে ছিল না—সাধারণের সঙ্গে মিলে মিশে জীবনের অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করেছেন তিনি। এখন তাঁর দৃষ্টি প'ড়েছে বৃটেনের King Arther and His Knights-এর দিকে। তাই তাঁর রচনার বহুলাংশ উদ্দিষ্ট হয়েছে সেই দিকে। এ ছাড়া তিনি আরও বই লিখেছেন—যেমন Torfilla Flat, of Mice and Meu, The Grapes of Wrath, The man is down can never Row ইত্যাদি তাঁর Grapes of Wrath একটি বিশিষ্ট রচনা। কিন্তু এই রচনায় তাঁর রচনাশৈলী উপযোগী হয়েছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্বীকার ক'রতে কুণ্ঠিত হননি যে এই রচনাশৈলী ঠিক পরিবেশের উপযোগী নয়। তবে আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখায় তিনি পৌছিয়েছেন—এই বয়সে তাঁর রচনাভঙ্গী বদলান তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে লেখার আনন্দেই তিনি এই রচনায় হাত দিয়েছিলেন। সাহিত্য ও রাজনীতি প্রসঙ্গেও তিনি তাঁর মন্তব্য প্রকাশ ক'রেছেন। রাজনীতির কুপ্রভাব তাঁর জীবনে কম বিড়ম্বনা আনেনি। সাহিত্যিক মন নিয়ে তিনি যা রচনা করেছেন—নানাভাবে তার রাজনৈতিক ভাষ্য যোজনা ক'রতে চেয়েছেন বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী। সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহের জন্যেই রাজনীতির দিকে তার দৃষ্টি ফেরাতে হয়েছে। রাজনীতি তার পেশা নয়।

নানাকারণে Stein Beck আত্মপ্রচারের বিরোধী। বোধহয় সত্যিকারের সাধক মন কোনদিনই প্রচারের পক্ষপাতী হয় না। তাই সাংবাদিক অধিবেশনে কোন কিছু বলতেও তাঁর এত দ্বিধা। বিশেষ কুণ্ঠার সঙ্গেই তিনি লণ্ডনের এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে কোন কিছু মন্তব্য পেশ করা ধৃষ্টতা মাত্র। অনেকে এটা হয়ত তার বৈষ্ণব বিনয় বলতে পারেন—কিন্তু ষ্টেইনবেকের এই সন্তর্পণশীল মনোভাবকে তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ উপাদান বলা চলে। সত্যকে তিনি বোধ হয় আপেক্ষিক বলে মনে ক'রেছেন—তাই সুদূর ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে কোন কিছু বলাকে সঙ্গত বলে তিনি মনে করেন না। সাহিত্যিকের যে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে—দ্রষ্টা ও মনীষী Stein beck তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। আর তিনি বিশ্বাস করেন যে আত্মগৌরব বা আত্মপ্রচার যেকোন সাধনারই অন্তরায়। কবির কথায় বলতে গেলে বলতে হয়—"নিজেরে করিতে গৌরবদান, আপনারে শুধু করি অপমান" মনীষী লেখকের ব্যক্তিগত জীবনে এই সত্য যেন ধরা দিয়েছে।

অভ্যাস হেরে যায় যা'র কাছে

দীপ্তি সেন গুপ্তা

'নিয়ে যান আপনার মেয়ে। আর এক মুহূর্তও আমরা এ'ধরণের মেয়ে রাখতে রাজী নই। নার্সিং-কলেজের নামে কলঙ্ক।' ক্রুদ্ধ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গর্জে উঠে-ছিলেন।

ভদ্রলোকের কিছু বলার ছিলো না। তাঁর গম্ভীর, থমথমে মুখটার দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিলো যে আঘাতটা এ মুহূর্তে পেলেন তা অতি অপ্রত্যাশিত।

ধীর পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালো করবী। মুখ তার বিবর্ণ, ভয়ে অপমানে, দামী শাড়ী পরণে। তখনো এক মুখ লাল্‌চে প্রলেপ মাখানো। কিউটেক্সের একটা ফোঁটা এখনো জল্‌জল্ করছে। আর ঠোঁটের রংয়ের সঙ্গে মিলিয়ে লিপষ্টিক ঘষা। দেহ সজ্জাটাও তার যেন একটা নিয়মিত অভ্যাস—অপর কয়েকটা অভ্যাসের মতোই। ঘটনাগুলো ক্ষণিকের জন্যেই যেন ওকে স্পর্শ করে যায়। তারপর আবার চলে এক নিয়মে। দেখে বোঝা যায় না, ঘটিত ব্যাপারটার কোন জট পড়েছে ওর মনে।

কেউ বলে—'ও কিছুটা বোকা। কেউ বলে, দেহ-সজ্জার জন্যে ও কিনা করতে পারে—দেখনা, প্রায়ই হঠাৎ কোথায় চলে যায়।'

কিন্তু ওই দেহ-সজ্জাও আজ কিছুটা এলোমেলো। মুখের প্রলেপ আর কিউটেক্সের ফোঁটা-টাও কেমন জলো-জলো হয়ে আছে ঘামে। হওয়া স্বাভাবিকই। মেয়ের রূপ আর প্রসাধনের দিকে চেয়ে তীব্র ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন তখন মোহিতবাবু।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের জ্বলন্ত দৃষ্টি তখন পিতার উপর থেকে সরে গিয়ে কন্যার উপর নিবদ্ধ। মাথা তুলতে পারে না করবী। বড়ো একটা আঘাতের প্রত্যাশায় ও নত হয়ে থাকে। কিন্তু সব পক্ষই তখন নীরব। হঠাৎ মোহিতবাবু উঠে দাঁড়ান। প্রতিনমস্কার জানাতে বোধ হয় ভুলে গেলেন। বেরিয়ে গেলেন ধীরে ধীরে—যেন সত্তাবিহীন একটা নীরেট প্রাণী।

আর তখনো করবী দাঁড়িয়ে আছে পুতুলটির মতো। নীরব—নিথর। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ক্রোধ এবার মুষ্ট্যাঘাতে ভেঙ্গে পড়ে—'যাও। শিগ্‌গির চোখের সামনে থেকে চলে যাও। নার্সিং-কলেজের আর ছায়া মাড়িওনা। নিজের ব্যবসা চালাও গে।'

ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে করবী। রুম্‌এ এসে স্যুট্‌কেস্ আর হোল্ডল গুছোতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। রুম্-মেটরা সব স্তব্ধ হয়ে দেখছিলো। আজ একজন সঙ্গী ওদের কমে যাচ্ছে, এ ভেবে মন খারাপ হয়নি ওদের। ওদের মনে বিরাট আঘাত হেনেছে করবীর অপরাধের গুরুত্ব। দেখলে মনে হয় রীতিমতো ভালো মানুষ। আজ ওই নির্দোষ মুখটা ঘৃণা ছাড়া আর কিছু কুড়োতে পারল না। মীরার বাক্যাঘাতে স্পষ্ট হয়ে উঠে তা। 'দেখো আমাদের জিনিষপত্র যেন সরিয়ে নিও না। কড়া নজর রাখ্‌বি গীতা।'

অবশ্য গীতাকে আর কড়া নজর রাখতে শিখিয়ে দিতে হয়না। ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গিয়েছিলো ওই মেয়েটির জন্যেই।

করবী নির্বাক হয়ে গেছে। অনেক দিক থেকে অনেক আঘাত আসে, আর তা'র নীরবতার মধ্যে চুর-মার হয়ে আবার শুদ্ধ হয়ে যায়। সাংঘাতিক অপরাধে অপরাধিনী করবী। ব'ড়ো ব'ড়ো দুটো নতুন কাঁচি ও সরিয়ে নিয়েছে। আর সঙ্গে একটা ব্লাড্-প্রেসার-মাপক যন্ত্র। ডাক্তার, বেয়ারা সবাই যখন চলে গিয়েছিলো রুম্ থেকে ঠিক সেই মুহূর্তেই। কখন থেকে জিনিসগুলো

আঠার মতো আটকে রেখেছিলো তার দৃষ্টি। তারপর একবার চিরদিনের অভ্যাস বসেই ঝক্‌ঝকে কাঁচিগুলোর ওপর ওর অবাধ্য হাতটা এসে পড়েছিলো।

মোহিতবাবু মুখ রাখবার জায়গা পান্‌নি।

তিনি যখন ষ্টেশনে পৌছে গেছেন করবী তখন সুটকেস্, হোল্ডল নিয়ে রিক্‌'য় চেপেছে। পিতাও যেমন চান্ না মেয়ের সাক্ষাতে থাকতে, মেয়েও বাবার চোখের আড়ালে থাকতে পার্‌লে বাঁচে। বাড়ীতে এসেও এভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল করবী।

স্বস্তি পাচ্ছিলেন না মোহিতবাবু। এক সময় ওকে ডেকেই বল্‌লেন—তোমার ভালো চেয়েছিলাম। তা' যখন কর্‌তে পার্‌লাম্ না—আর করতে দিলেনা তুমিই, বরঞ্চ আমার মুখে চুণ-কালি লেপে ঘৃণ্য করে তুল্‌লে মানুষের চোখে, তখন তোমার উপায় তুমিই দেখো।'

কোন সাড়া না পেয়ে আবার বললেন—'নইলে আমা-কেই ব্যবস্থা করতে হবে। দোষ যখন আমারই।'

সবটা দোষ আজ মোহিতবাবু নিজের গায়ে মেখে নিচ্ছেন। কারণ, তিনি বুঝতে পারছিলেন ছোট থাক্‌তেই যে অভ্যেসটা গড়ে উঠেছিলো করবীর, তা তাঁর সস্নেহ-প্রশ্রয়েই বেড়ে উঠেছে।

কতোদিন সার্ট বা কোটের পকেট থেকে অদৃশ্য হয়েছে এক টাকা, দু' টাকার নোট। কিন্তু তিনি ততো খেয়াল করেননি। পরে মাঝে মাঝে যখন দশ টাকার নোট পকেটের মায়া ছাড়াতে লাগ্‌লো, কুঞ্চিত হ'ল তাঁর ললাট। দু'জনার সংসারে মেয়ে ছাড়া আর কে-ই বা নেবে? ঝি-চাকরেরা তো আর এ'দিকটায় আসেই না। আর তা ছাড়া, সারাদিনই তো মেয়ে ঐ ঘরটায় খেলছে, পড়ছে। ওর চোখের সামনে কে-ই-বা নিয়ে যাবে? মেয়েকে জিজ্ঞেস করে অবশ্য কোন সুফল পাননি। তবে যেদিন দেখেন, মেয়ের গলায় ঝুলানো একটা ঝুটো মুক্তোর মালা বা হাতে একরাশ নতুন কাঁচের চুড়ি—মেয়ের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন।

মনে মনে হেসেছেন মোহিতবাবু—'ওর চাহিদা মতো ঠিক সময়ে কিছু দিতে পারিনে। তবে ও করবে না কেন এমনটা।' স্ব-কৃত খাম-খেয়ালিপণার খেসারৎ হিসেবে কয়েকটা নোট ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছেন—নিজের পছন্দ মতো জিনিস কিনে নিও। আর টাকা হাতে না থাক্‌লে আমায় বল্‌বে, কেমন?'

ভুল করেছিলেন মোহিতবাবু এই ভেবে যে, তাঁ'র দেওয়া জিনিস মেয়ের পছন্দ হবে না। আরো ভুল করেছিলেন—পকেট শূন্য করে কখনো রাখেন নি। নিজ পছন্দ মতো জিনিস কেনবার জন্যে মেয়ে হাতের কাছে বাবার পকেটে যা' পেয়েছে তাই নিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বাবার সপ্রশ্ন দৃষ্টির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ও বুঝতে পারতো—বড়ো অন্যায় করেছে। দোষ স্বীকার করাটা তখন লজ্জাকর বলে মনে হ'ত। তাই ও এড়িয়ে যেতো বা মিথ্যে বলতো। সেই করবী আজ পর্যন্ত পুরনো অভ্যাসটা ছাড়তে পারল না। এত পেয়েও পরিবর্তন তা'র হলো না।

ঝিমিয়ে-পড়া স্বরে মোহিতবাবু বলেছিলেন আবার—'যথাসাধ্য দেখে-শুনে তোমায় পাত্রস্থ করবো। ওখানে যদি তুমি নিজ সুখ-সুবিধাটুকু বুঝে নিতে না পার, মানিয়ে নিতে না পার সবার সঙ্গে, তবে আমার কিছু করণীয় নেই। এরপর থেকে তোমার ভাগ্য তোমার হাতে। ক্ষণিকের লোভে পড়ে তোমার সর্বনাশ করো না করবী। সবই তো তোমার জিনিসই হ'বে। আজ না হোক্, কাল।'

সত্যি! অল্পদিনের মধ্যেই মা-বাবা, ভাই-বোনের হাসি-কোলাহলে পূর্ণ এক সুন্দর সংসারে চলে এল করবী। সুন্দর স্বামী পেলো ও। রূপে গুণে, স্বভাবে-চরিত্রে কোনোদিকেই হেয় নয়।

ভাবতে চেষ্টা করে করবী। এরা সব তার নিজের লোক। এদের সুখ-দুঃখের নিত্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যেমন, তেমনি এদের প্রতিটি জিনিসপত্রেও তা'র অধিকার। ঘর-বাড়ী থেকে আরম্ভ করে অনেক চোখ-জুড়োনো জিনিসও নিত্য ভোর হ'লে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। ঐ তো টেবিলের ওপর ঝক্‌ঝকে রূপোর ফুলদানীগুলো। ঐ তো কাচের সরবৎ সেটগুলো, কিংবা ঐ যে জ্বলজ্বল করছে ওর স্বামীর হাতে হীরের আংটিটা—এ' সবই তো ওর বিয়ের সময়ের পাওয়া উপহার। 'সব। স-ব আমার'। বারবার আবৃত্তি করে করবী।

কিন্তু আংটিটা কেন ওর স্বামীর হাতে? ফুলদানী-

গুলো কেন ওর ঘরে নয়? আর সরবৎ-সেট্‌গুলোই বা কেন সবাই ব্যবহার করছে? কেউ মুখেও বল্‌ছে না 'এ জিনিস করবীর।' যে যখনই ব্যবহার করছে এমন অমর্যাদার সাথে এগুলো ধর্‌ছে যে মনে হচ্ছে কারো কেনা সম্পত্তি নয় এগুলা। সেদিন ছোট-ননদ যখন একটা কাচের গ্লাস নিজ অসতর্কতা বশতঃ ভেঙ্গে ফেললো, মৃদু ধমকের সুরে শাশুড়ী ডেকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তবে সবগুলো জিনিস কি ওর শাশুড়ীরই? ভাবটা তো এমন-ই করেন। অথচ এগুলো আমার বিয়েতে দেওয়া।" করবীও এবার একটা কাঁচের গ্লাস ভেঙ্গে ফেলে। এ' তার ইচ্ছাকৃত। কিছু বললেন না এবার শাশুড়ী। করবী মনে মনে দগ্ধ হ'ল—আমি কি পর? ওঁর মেয়ের মতো আমাকেও সাবধান করে দিলে আমি কি রাগ করতাম?' 'বোধ হয় জিনিসগুলো আমার বলেই কিছু বলতে সাহস পান্‌নি।' শেষ পর্যন্ত এমন একটা ধারণা করে তৃপ্তি পেলো করবী।

সেদিন ওদের বাড়ীটা বেশ গমগমে হয়ে উঠেছিলো। তা'র সম্পূর্ণ অপরিচিতা কে একজন এসেছে। খাওয়া-দাওয়া হ'ল প্রচুর। চমৎকার গান গাইলে মেয়েটা। ওর স্বামীর প্রশংসা-ধন্য চোখ বারবারই ওই মেয়েটির চোখে মিলিত হচ্ছিলো। অবাঞ্ছিত দৃশ্যটা করবীর দৃষ্টি এড়ালো না। করবী স্বামীকে এ'ভাবে নিজের দৃষ্টির আড়ালে ফেলে যেতে ইতস্ততঃ করছিলো। তবুও শাশুড়ীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বৈকালিক খাবার প্রস্তুতির জন্যে যেতে হ'ল ওকে। 'এই ফাঁকে বোধ হয় কিছু একটা হয়ে যাচ্ছে। কি করছে ও এখন?' বারবারই খুঁচিয়ে তুল্‌লো ওকে এ ধরণের চিন্তা, মেয়েটির তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া কামনা করলো। অবশ্য সন্ধ্যে হ'লেই সুমিতা বাড়ীর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে হাসি-খুসী-মাখা হয়ে গেছে। 'সকলের মন জয় করে গেছে যেন ঐ মেয়েটি'। মনে মনে বলে করবী।

রাতে স্বামীর কাছে এসে এ কথাটাই শুনবে ও' আশা করেছিলো, কিন্তু হঠাৎই দৃষ্টি পড়লো স্বামীর হাতের ঐ আঙ্গুলে। চমকে উঠে করবী—আংটিটা কই? হীরের আংটিটা?

উত্তরে চুপ করে শুয়ে থাকে দীপঙ্কর।

করবীর বুক দপ্‌দপ্‌ করে উঠে। তবে কি? তবে কি ঐ মেয়েটি? ঐ মেয়েটিকেই ওর স্বামী উপহার দিয়েছে? ওঃ! অক্লেশে একটা হীরের আংটি দিয়ে দিতে পারলো যা'কে, ও যে কি বস্তু স্বামীর চোখে—তা' বুঝে উঠতে ওর বাকী রইল না। নিশ্চয় দিয়ে দিয়েছে। নইলে এতো চুপ্‌চাপ্‌ কেন?

—'কি করেছো আংটিটা? বলো?'

—'আমার যা ইচ্ছে তাই করেছি। এখন কথা বলো না।'

—'তোমার ইচ্ছে? এটা কি তোমার জিনিস যে তোমার ইচ্ছে ফলাবে?'

—'অযথা প্রশ্ন করোনা করবী। এটা তোমার জিনিসও নয় যে তোমার ইচ্ছে ফলাবে।'

—'ওঃ। এগুলো আমার জিনিস নয়? আমার বিয়েতেই দিয়েছেন আমার বাবা। ছিঃ ছিঃ। লজ্জা করেনা পরের জিনিসকে নিজের বলে ভাব্‌তে?'

—কি বল্‌লে? তুমি আমার পর? অর্থাৎ আমি তোমার পর। তাই তো বোঝাতে চাইছো? ওঃ। বুঝেছি। একটা হীরের আংটির মূল্য তোমার কাছে বেশী হয়ে উঠেছে। তোমার মন যে এত নীচু তা জানতাম না।'

বিছানা থেকে ছিটকে ওঠে যায় দীপঙ্কর। একটা বাণাহত প্রাণী যেন। সার্টের পকেট থেকে একতাড়া নোট নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে ওর কোলের ওপর। 'নাও। এর দাম। এর দামের চেয়ে বেশীই বরং দিয়ে দিচ্ছি।'

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে করবী। এত তেজ? আর এতো দেমাক? কিসের এত দেমাক? একটা অদ্ভুত জেদ করবীকেও পেয়ে বসে। দানে প্রতিদান। সারা শরীর জ্বল্‌তে থাকে। চোখে ঘুম নেই। চোখের সাম্‌নে ঝুলছে ব্রাকেটে ঝুলানো সার্টটা এই মাত্র যা'র গহ্বর থেকে একতাড়া নোট এসে পড়্‌লো। এ' সার্ট'টা থেকেই ও অনেক টাকা পরম যত্নে আলমারীতে তুলে রেখেছে লোক-চক্ষুর অগোচর এক জায়গায়। বুকপকেটে দামী পার্কার পেন্‌টি আর বুকের ঐ সোনার চেন-ওয়ালা বোতামগুলো নিয়ে এখনো অসহায়ভাবে একটু একটু ঝুল্‌ছে সার্ট'টা।

মন-মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ভাব্‌তে ভাব্‌তে। ওর কোন অধিকারই নেই এই ঘরের সব জিনিসপত্রে। তা'র স্বামী নিজ ইচ্ছা-বশে সবই করতে পারে। আর ও পারেনা। পারে না কি ও? করবীও যদি দামী কোন জিনিস ওর স্বামীর মত না নিয়ে দিয়ে দেয় কাউকে? ওর স্বামী ওর মত না নিয়ে দিয়ে দিলো আংটিটা! দিয়ে দিলো তার পরম কাম্য জনকে। আর ও দিবে না কেন? কেমনই বা লোকটি, চট করে আংটিটা দিয়ে দিলো? আবার বলতে মাত্র চট্‌ করে প্রতীকার করে ফেললো। ওর টাকা আছে। প্রতীকার করতে পারে। কিন্তু করবীর কি আছে?

যতোক্ষণ জেগে রইলো বাজে চিন্তা আচ্ছন্ন করে রইল মনটা। একবার ফিরে চায় স্বামীর পানে। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে বোধ হয়। করবী একা জেগে আছে। এলোমেলো চিন্তা সব। হঠাৎ করে আবার চোখের সাম্‌নে ঝকঝক করতে থাকে ঝুলানো সার্টটার বুকে সোনার বোতামগুলো আর পার্কার-পেনটা।

পরদিন বেরোনোর সময় গায়ে সার্টটি চড়িয়ে বোতাম লাগাবে যখন, স্তম্ভিত, বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করে দীপঙ্কর সোনার বোতামগুলো নেই। সঙ্গে পার্কার পেন্‌টিও উধাও। এ আবার কি খেলা করবীর? করবীর কাছে এসে বলে—'এই। আবার কি মজা দেখ্‌ছো? দাও ওগুলো।

'—'কোন্‌গুলো?'

—'বাঃ। বোতাম, পেন্‌?'

—'তুমি কি ভেবেছো আমি চুরি করেছি?'

—'ছিঃ ছিঃ। ও কথা আমি ভাবতে যাবো কেন? তুমি মজা দেখছো এই বলছিলাম।'

—'মজা দেখছি?'—'হ্যাঁ, মজা দেখছো।' সস্নেহ বিশ্বাসের স্বর তার কথায়।

করবী কিছুক্ষণ কৌতুহলী চোখ দুটো মেলে ধরলো। কি তাকিয়ে দেখলো দীপঙ্করের চোখে মুখে। হঠাৎই ত'ার মনে হয়, 'সব দীপঙ্করের অভিনয়। ওর পরিচয় কালই পেয়ে গেছে করবী।

—'দাও। আমার লেট্‌ করিয়ে দিচ্ছ যে।'

—'আমি নিইনি।' চির অভ্যস্ত সুরে বলে ওঠে করবী।

—'নাওনি? কী আশ্চর্য্য।'

—'না।' মিইয়ে আসে করবীর কণ্ঠস্বর।

অফিসে নিজস্ব রুমে বসে ভেবে ভেবে কোন কিনারা করতে পারছিলো না দীপঙ্কর। ভাব্‌লো বাড়ী গিয়ে না হয় আবার আলমারী সুটকেস খুঁজে দেখা যাবে। ও বোধ হয় মনের ভুলে এ'গুলোও আলমারীতে রেখে দিয়েছিলো। অবশ্য করবীর পক্ষেও রেখে দেওয়া খুবই সম্ভবপর ছিলো। আরো তো এমন করেছে ও। টাকা, পয়সাও তো অনেকবার লুকিয়ে রেখে রেখে ও মজা দেখেছে। শেষ পর্যন্ত হয়রাণ হয়ে আল্‌মারী, স্যুট্‌কেস্‌ নাড়া দিলেই সব পেয়ে গেছে। করবীকে ঐ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করলেই ও বল্‌তো—'এতো অসতর্ক কেন তুমি? সাবধান যাতে থাকো তাই এই করেছি।' কিন্তু আজ ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। প্রথম কথাগুলোতে করবীর তীব্র ঝাঁজ মেশানো ছিলো! ওকে আর ঘাঁটাতে চায়না দীপঙ্কর। আবার না হয় খুঁজেই দেখা যাবে। তবে আপাততঃ একটা সস্তা দামের পেন্‌ই কিনে নেওয়া যাক।

আগেকার চিন্তা ভাব্‌না মনের গ্লানিমা সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঝর্‌ঝরে হয়ে ও বাড়ীর পথে রওনা হ'ল। বাড়ীর গেটে পৌছে বোন্‌টাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্ফূর্তির সুরে হেসে হেসে কথা বল্‌তে থাকে—কিরে? বন্ধুরা বুঝি এখনো কেউ আসেনি? এভাবে দাঁড়িয়ে আছিস্‌ যে?'

—'বাঃ। বৌদি যে এইমাত্র চলে গেলেন। তাই—'

'চলে গেলেন? কোথায়?'

—বাড়ী থেকে নাকি চিঠি এসেছে, তাঐ মশায়ের শরীর ভালো নয়। তাই তাড়াতাড়ি করে চলে গেলেন বৌদি।'—'ওঃ।—'জানো দাদা। বৌদি যাওয়ার সময় আমাকে এই পেন্‌টা দিয়ে গেছেন।' জামার কলারে অাঁটা পেন্‌টা বের করলে ও।

—আরো জানো। বৌদি না শুভোকে একটা সোনার বোতামের চেন্‌ প্রেজেণ্ট করেছেন।'

শক্ত হয়ে উঠে দীপঙ্করের চোয়ালের হাড়।

মহাশ্বেতা

ফটো : রামকিঙ্কর সিংহ

উন্মীলন

ফটো : রথীন চক্রবর্ত্তী
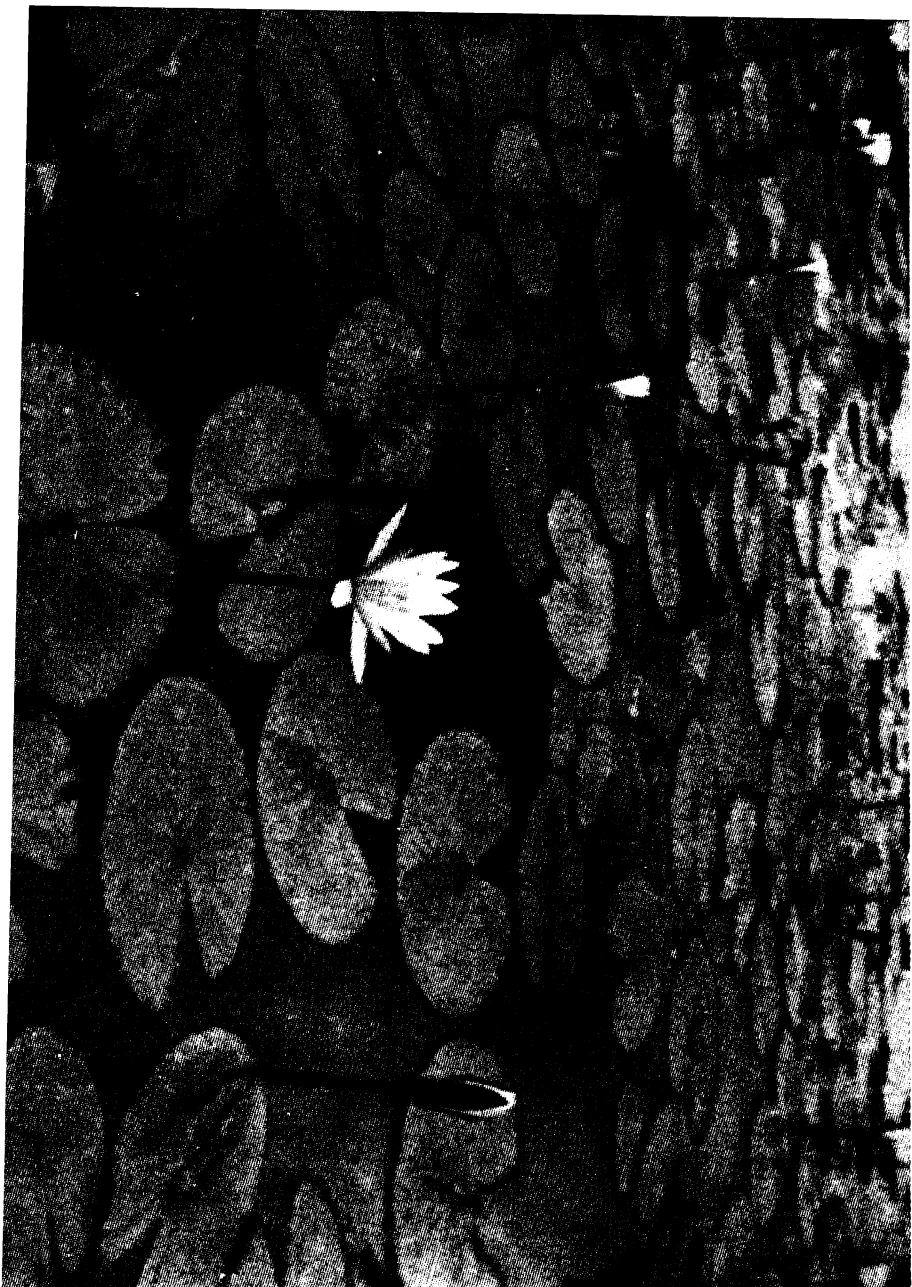
—'বৌদি খুব ভালো। না দাদা? আমরা কিন্তু বৌদির সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম। মা'ও বলেছিলেন, কিন্তু বৌদি কাউকে সঙ্গে নিতে চাইলেন না।'

কিছু না বুঝতে পেরে দীপঙ্কর ঘরে এলো। দেখে টেবিলে অনাদৃতভাবে চাবিটা পড়ে আছে। কেউ কি ঘরে আসেনি এর মধ্যে? চাবিটাও কেউ গুছিয়ে রাখতে পারলো না? আবার ভাব্‌লো। কেউ তো এদিকটায় বড় একটা আসেনা। তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরিয়ে এক হেঁচকা টানে আলমারিটা খুলে ফেলে। সাম্‌নেই এক তাড়া নোট্‌। যেমন বাঁধা ছিলো ঠিক তেমনটিই আছে। কি নিয়ে তবে করবী গেল। পথ-খরচা তো কিছু নিতে পারতো? ক্ষিপ্র হাতে ও টাকাগুলো পকেটে ফেলে একটা দামী বাক্স বের করে হীরের আংটিটা গলিয়ে নিলো আঙুলে। ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে ভাবে—'কি দরকার ছিলো কথা বাড়ানোর? সোজা, সরল উত্তরটা দিয়ে দিলেই হ'ত তখন।'

কিন্তু দীপঙ্কর কোনোদিনও বুঝতে পারবেনা সুমিতার ব্যাপার নিয়ে ওদের দু'জনার মধ্যেই যে মন-কষাকষিটা হয়ে গেছে, তা'র ফলে কতদূর রূপান্তরিত হয়ে গেল করবী।

স্বামীজি-স্মরণে

বিমলকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

কাঁদিছে ক্রন্দসী ধরা দীর্ণ-হাহাকারে;
ক্ষুধিতের, পীড়িতের অশান্ত চীৎকারে,—
পূর্ণ আজি' দিক্‌বিদিক্। দুঃশাসন
টানে বস্ত্র ধরি' অহর্নিশ। ক্রন্দন,—
সে অরণ্যে রোদন মাত্র। কপটতা
আজি' কুটিল শার্দূল সম মানবতা
করিছে সংহার। তীব্র লোভ দানবের
অক্টোপাশ সম,— অহরহ মানবের
রক্ত করে পান। দুর্নীতির অন্ধকার
রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজি'। সবলের অত্যাচার,—
ভয়াল-লোলুপ-ক্ষুধা—তোলে হাহাকার
অসহায় পীড়িতের। অধম-বিলাস
রচিয়াছে শয্যাজাল। হেরি রুদ্ধশ্বাস
আজিকে বিচার।
কোথায় উদ্গাতা-ঋষি!—
যে শোনাবে বাণী কম্বুনাদে; দিবে নাশি'
সর্ব আবিলতা শোনায়ে অভয়-বাণী;
জাগাবে "মাভৈঃ" মন্ত্রে;
পুঞ্জীভূত-গ্লানি—
হ'বে অবসান বক্ষ হ'তে ধরণীর।
কোথায় বিবেক তুমি,—ভারত-বাণীর
মূর্তি!—"জীব-প্রেম" মহামন্ত্র শোনাও
আবার; হে সাগ্নিক!—আবার জ্বালাও
কর্ম-যজ্ঞ—হোমানল!
দেশ দেশান্তরে—
জন্মশতবর্ষ তব আজি' পালিবারে
করিয়াছে আয়োজন। এ শুভ-লগন—
যাবে কি বৃথাই শুধু,—না করি' অর্পণ
নবীন-শাশ্বত কিছু?—ধূপের আলো
ধাঁধিবে নয়ন শুধু,—না নাশিয়া কালো
অন্ধকার?—ভাবীকাল করুক বিচার!
তোমা স্মরি' আমি শুধু করি নমস্কার।

মৌর্যযুগে ভারতের বৈদেশিক কর্মতৎপরতা

কৃষ্ণা মিত্র

আধুনিক পৃথিবীতে সরকারের কর্মদক্ষতা যে অনেকাংশেই বৈদেশিক কর্মতৎপরতার উপর নির্ভরশীল তা সর্বজন-বিদিত। আর এই বৈদেশিক নীতির সাফল্যের উপরই দেশের সুনাম অনেকটা নির্ভরশীল। আধুনিক ভারতের বৈদেশিক নীতিতে বিশ্বশান্তির জন্যে সর্বৈব চেষ্টা হচ্ছে ও হ'য়েছে। বিশ্বের যে কোন অঞ্চলেই শান্তি ব্যাহত হ'য়েছে সেখানেই ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আক্রমণ-কারীকে বলিষ্ঠস্বরে নিন্দা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু বারবার এই কথা ব'লেছেন যে ভারতের নীতি হ'ল শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান এবং এই নীতি ভারতের শাশ্বত চিরন্তন নীতি। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের পুরাকালের বৈদেশিক কর্মতৎপরতার বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রাচীন ভারতের সব যুগের বৈদেশিক কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে আলোচনা এক সুদীর্ঘ বিষয়। তাই এই প্রবন্ধে শুধু মাত্র মৌর্যযুগের বৈদেশিক কর্মপদ্ধতির সামান্য পরিচয় দেওয়া হ'ল। মৌর্যযুগই প্রাচীন ভারতের প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ শাসন ব্যবস্থা সংহতির যুগ। খৃষ্টপূর্ব ৩২১ অব্দ থেকে খৃষ্টপূর্ব ১৮৪ অব্দ পর্যন্তই মৌর্যশাসনের যুগ। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সমস্ত উত্তর ভারত অধিকার করে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্য্যন্ত তাঁর রাজ্য-সীমা বিস্তৃত করেছিলেন। গ্রীক সেনাপতি সেলুকাসকে পরাজিত ক'রে তাঁর রাজ্যসীমা আফ্‌গানিস্তান ও বেলুচিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হ'য়েছিল। তাঁর পৌত্র অশোকের সময়ে এই সীমা আরও বহুদূর বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে, যার পরিধি ছিল কাবুল নদী থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত আর শ্রীনগর থেকে শ্রীরঙ্গপত্তন পর্যন্ত। বৈদেশিক নীতি, প্রতিরক্ষা সংস্থা, পৌরসভা, আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সমস্ত বিষয়েই এক অভূতপূর্ব প্রগতি এই যুগে সূচিত হ'য়েছিল। সাধারণতঃ দুটি বিষয়ের উৎস থেকে এই যুগের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে পারা যায়। প্রথমটি হ'ল গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ, আর দ্বিতীয়টি কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'। এ'ছাড়া অশোকের শিলালিপিগুলো থেকেও সে সময়ের অনেক মূল্যবান খবর সংগ্রহ করা যায়।

চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস ছিলেন গ্রীক-রাজদূত। মৌর্য রাজধানী পাটলিপুত্রে তিনি আনু-মানিক ৩০৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বসবাস ক'রেছিলেন। তাঁর সুবিখ্যাত বিবরণী 'ইণ্ডিকা'তে তিনি সে যুগের ভৌগোলিক বিবরণ, জনসাধারণ ও তাদের আচার ব্যবহার, বিভিন্ন শাসন সংস্থা প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। কৌটিল্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের প্রধান পরামর্শদাতা। তিনি চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত। তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' পুস্তকটি সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রথম অর্থনীতি ও রাজনীতি সংক্রান্ত রচনা। বহুযুগ আগের রচনা হ'লেও এর মধ্যে যে অসাধারণ জ্ঞান ও ধীশক্তির পরিচয় আছে তা অতুলনীয়। তাঁকে প্রাচ্যের 'ম্যাকিয়াভেলি' নামে অভিহিত করা হ'য়ে থাকে।

কৌটিল্যের অনুশাসনে রাজাই রাজ্যের সর্বেসর্বা এবং দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। রাজা মন্ত্রী নিয়োগ ক'রতেন এবং শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ ক'রতেন। মেগাস্থিনিস ও কৌটিল্য দু'ধরণের মন্ত্রীর উল্লেখ ক'রেছেন, এক মন্ত্রী আর এক অমাত্য। এ'ছাড়া মন্ত্রীপরিষদ সমষ্টিগতভাবেও রাজ্য শাসন ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ ক'রতেন।

আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা ছাড়াও বৈদেশিক দপ্তরের কর্মতৎপরতার জন্যে বিশেষ সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল। কৌটিল্যের রাজনীতিতে যুদ্ধ, শান্তি ও নিরপেক্ষনীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সাম (Negation) দান (Persuation) ও ভেদ (Conciliation)

প্রভৃতি নীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের ভাষায় বৈদেশিক নীতির আর এক নাম 'ন্যায়' এবং একথাও তিনি ব'লেছেন যে, যে রাজা সুষ্ঠু পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা ক'রতে পারেন তিনি পৃথিবীজয়ী হ'তে পারেন। রাজা প্রয়োজনবোধে নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বন ক'রতে পারেন যদি তিনি দেখেন যে কোন অংশে যোগদান ক'রে তাঁর রাজ্যের কোন বিশেষ লাভ হবার সম্ভাবনা নেই অথবা তাঁর শত্রুবিলোপের সহায়তা হবে না। কৌটিল্য ব'লেছিলেন যে রাজা তাঁর পার্শ্ববর্তী রাজ্য জয় ক'রে নিজের শক্তিবৃদ্ধিতে সচেষ্ট হবেন। রাজা অশোকের সময়ে এই নীতির কিছুটা পরিবর্তন হ'য়েছিল তাঁর ধর্ম জয়ের ভিত্তিতে।

বৈদেশিক দপ্তরের কর্মীদের কৌটিল্য সাধারণতঃ চার ভাগে ভাগ ক'রেছেন যথা—দূত, নিস্রন্তার্থ (Nisrantartha), পরিমিতার্থ (Parimitartha) ও শাসনহর (Sasanhara)। প্রথম পদটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল পদ এবং একমাত্র বিশেষ দায়িত্ব ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই এই পদে নিয়োগ করা যেতে পারে এবং তাঁদের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যতুল্যই বিচার করা হ'ত। দ্বিতীয়পদের অধিকারী সাধারণ মন্ত্রী সমতুল্যই ছিলেন। তৃতীয় পদাধিকারী কর্মচারীদের বিশেষ ধরণের বৈদেশিক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হ'ত। চতুর্থ কর্মচারীদের দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন সংবাদাদি বিভিন্ন সরকারীমহলে আদানপ্রদান করা। দূতের প্রধান কাজ ছিল পররাষ্ট্রের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান, চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি। তবে তখন স্থায়ী দূত নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল না। দূত পররাজ্যের জনসাধারণের অবস্থা, রাজার জনপ্রিয়তা, সৈন্য সংস্থা প্রভৃতির বিস্তারিত খবর সংগ্রহ ক'রতেন। এক কথায় তখন দূতকে গুপ্তচরও বলা যেতে পারত' অনেক সময়েই। কৌটিল্য সংবাদসংগ্রহের জন্যে দূতকে বিভিন্ন ছদ্মবেশধারণের পরামর্শও দিয়েছেন। এ' ছাড়া গুপ্তচর বিভাগের ভাগ ছিল দু'রকম, সমস্থা বা স্থায়ী এবং সঞ্চারী বা ভ্রাম্যমাণ।

বৈদেশিক নীতিতে সম্মানীয় পদ্ধতিই সাধারণতঃ অনুসরণ করা হ'ত। একটা সাধারণ বিশ্বাস ছিল এই যে, যে রাজা দূতকে বধ করেন তিনি সপারিষদ নরক বাস করেন। বৈদেশিক কর্মচারীরা রাজ্যের মধ্যেও বহু রকম সুবিধে ভোগ ক'রতেন এবং শত্রুদের হাতে বিশেষ লাঞ্ছনা পেতে হ'ত না। মেগাস্থিনিস ব'লেছেন যে দেশের জনসাধারণ শান্তিপূর্ণভাবেই জীবনযাপন করতেন এবং সৈন্যবাহিনী কোন অত্যাচার বা পীড়ন ক'রত না। এক কথায় বলা যেতে পারে যে মৌর্যযুগে যে সুসংবদ্ধ বৈদেশিক কর্মপদ্ধতি গ'ড়ে উঠেছিল তা' ভারতের ইতিহাসে প্রথম এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীর ইতিহাসেও আগে অনুরূপ দেখা যায় নি'।

চোখের দুখ্

শ্রীরায়

বধু বিরহিত আঁখি মোর,
পারেনা সম্বরিতে লোর ;
তার প্রিয় স্বামী, হয়ে গেছে চুরি
পালায়ে গিয়েছে চোর।
যেই—নররূপে কাছে পায়,
শুধু তার পিছে পিছে ধায় ;

"এস এস প্রিয়া", বলে ডাক দিয়া,
সাড়া কেবা দিবে তায় ?
কিসে তারে দিব সান্ত্বনা ?
সে যে হয়ে থাকে আনমনা,
অশ্রু কণার, গাঁথে শুধু হার
করি প্রিয়া কল্পনা।

সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

পণ্ডিত অনাথশরণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ

যুগাচার্য, বিশ্ববরণ্যে স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষে একবৎসর ধরিয়া পৃথিবীব্যাপী নানাবিধ সভাসমিতি, প্রবন্ধ-আবৃত্তি-ভাষণ প্রতিযোগিতা, শিল্প-শিক্ষামূলক-প্রদর্শনী, সঙ্গীতানুষ্ঠান, নাটকাভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইতেছে।

এই সকলের মধ্যে একটি অভিনব অর্ঘ্য সাজাইয়াছেন পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। তিনি একাধারে গবেষণা-সুপণ্ডিত এবং নাটক-কবিতা সঙ্গীত-রচনাকুশল সুকবি। এক্ষেত্রেও তিনি গবেষণা এবং কাব্য, এই উভয় দিক্ হইতেই দুটী অপূর্ব সুন্দর শ্রদ্ধার্ঘ্য রচনা করিয়া সকলের অশেষ আনন্দবর্ধন করিয়াছেন। প্রথমটী হইল তাঁহার স্বামী বিবেকানন্দের সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষায় রচিত জীবনী "বিবেকানন্দ-চরিতম্" (চম্পূ-কাব্যম্)।

"ভারত-বিবেকম্" নামক সংস্কৃত নাটকের একটি দৃশ্যে খেতড়ির মহারাজের ভূমিকায় (বাঁ-দিক থেকে) শ্রীঅনিন্দসুন্দর চট্টোপাধ্যায়, স্বামিজীর ভূমিকায় শ্রীঅনিল-কান্তি দত্ত, মহারাজের বন্ধুর ভূমিকায় শ্রীঅসীমসুন্দর চট্টো-পাধ্যায় এবং নর্ত্তকীর ভূমিকায় শ্রীমতী উর্মি চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাইতেছে।

অতি সুললিত গদ্যেপদ্যে বিরচিত এই সংস্কৃত জীবনীটী নিখিল-বিশ্ব-স্বামী-বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী কমিটি হইতে প্রকাশিত হইয়া বিদ্বৎসমাজের প্রভূত প্রশংসা-ভাজন হইয়াছে।

দ্বিতীয়টী হইল ডাঃ যতীন্দ্রবিমল-বিরচিত স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ক সর্বপ্রথম সংস্কৃত নাটক "ভারত-বিবেকম্"। ইহা প্রাচ্যবাণী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়া জনসাধারণের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। দ্বাদশ-দৃশ্যসম্বলিত এই নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎকার হইতে আরম্ভ করিয়া পার্লামেন্ট অফ্ রিলিজনের জন্য চিকাগোয় স্বামীজির গমনোদ্যোগ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী অতি সহজ সরল সুমধুর অথচ প্রসাদগুণবিমণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় এবং প্রকৃত কবিজনোচিতভাবে ডাঃ যতীন্দ্রবিমল উপস্থাপিত করিয়াছেন। নাটকটীর আরেকটী প্রধান সম্পদ হইল ইহার অজস্র সুমধুর কবিতা ও সঙ্গীত। ইহার মধ্যে কয়েকটী শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় সঙ্গীতের অপূর্ব সংস্কৃত অনুবাদ। অপরগুলি ডাঃ যতীন্দ্রবিমলের স্বরচিত।

কিন্তু বিশেষ করিয়া, এই নাটকটীর অভিনয়ো-পযোগিতা অসীম। সেজন্য ইহা বহুস্থানে বহুবার অভিনীত হইয়া সহস্র সহস্র দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়াছে। যথা:—

(১) কলিকাতাস্থ বিশ্বরূপা থিয়েটারের উদ্যোগে। সভাপতি নিখিল-বিশ্ব-স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (১-১১-৬২)

(২) নিখিল-ভারত-বঙ্গ সংস্কৃতি চতুর্ব্বিংশ সম্মেলন, গোরক্ষপুর (স্বামী বিবেকানন্দ অধিবেশন)। (২৮-১২-৬২)

(৩) কলিকাতাস্থ মহাজাতি সদনের ট্রাষ্টীগণের উদ্যোগে। সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। (১৭-১-৬৩)

(৪) রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা। সভাপতি—শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। (১৭।২।৬৩)

(৫) বিবেকানন্দ সোসাইটী, শ্যাম স্কোয়ার, কলিকাতা। (২৬।১।৬৩)

(৬) রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, পায়রাডাঙ্গা, নদীয়া। সভাপতি—শ্রীমৎ স্বামী সেবানন্দ পুরী। (৯।২।৬৪)

(৭) রামকৃষ্ণ আশ্রম, নিমপীঠ, চব্বিশ পরগণা। সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বুদ্ধানন্দ। (২৫।২।৬৩)

(৮) রামকৃষ্ণ সেবায়তন, বরাহনগর। সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ। (২৬।২।৬৩)

(৯) ডাঃ রঘুবীরের "সরস্বতী বিহার" ও শ্রীজয়দয়াল ডালমিয়ার "রামায়ণ বিদ্যাপীঠ", নয়াদিল্লী, সভাপতি দিল্লীস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি শ্রীমৎস্বামী স্বাহানন্দ। (১৩।৪।৬৩)

(১০) নিখিল মহারাষ্ট্র স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব কমিটি, বোম্বাই। সভাপতি প্রাক্তন রাজ্যপাল কে, এম, মুন্সী। (২৬।১০।৬৩)

(১১) শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। সভাপতি শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। (৩০।১১।৬৩)

(১২) পদ্মবিভূষণ ডাঃ রাঘবনের "সংস্কৃত-রঙ্গম্", মাদ্রাজ। সভাপতি বিচারপতি শ্রীরামচন্দ্রম্। (৩১।১।৬৩)

(১৩) শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি, ব্যারাকপুর। (১০।১১।৬৩)

(১৪) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বরাহনগর। (১৫।১১।৬৩)

(১৫) ভারতী-ভবন, বার্ণপুর। (২৪।১১।৬৩)

(১৬) স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সমিতি, পুরুলিয়া (২৬।১১।৬৩)

(১৭) স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সমিতি, পাটনা। (৪।১২।৬৩)

(১৮) বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলন—পার্কসার্কাস, কলিকাতা (২।১।৬৪)

(১৯) স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সমিতি, হুগলী। (২।২।৬৪)

(২০) রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্ কালচার, কলিকাতা। (মার্চ, ১৯৬৪)

মাত্র কিঞ্চিদধিক এক বৎসরেই একই বিষয়ে বহু স্থানে এরূপ সংস্কৃত নাট্যাভিনয় (প্রত্যেকটাই বহু সহস্র দর্শকের সম্মুখে) সত্যই বিস্ময়কর। তথাকথিত "মৃত" সংস্কৃত ভাষাকে আপামর জনসাধারণের নিকট এরূপে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন যিনি সেই ডাঃ যতীন্দ্র বিমলকে অজস্র ধন্যবাদ।

ব্যারাকপুরে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

বিগত ১০ই নভেম্বর, ১৯৬৩ আমরা দলবলসহ ব্যারাকপুরে গমন করি শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির সাদর আহ্বানে। স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সমিতি কর্তৃক

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী রচিত রাজেন্দ্রপ্রসাদের জীবনী-সংবলিত "ভারত-রাজেন্দ্রম্" নাটকের অভিনয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীর একটি দৃশ্যে—মধ্যস্থলে দণ্ড-হস্তে বিহারের সর্ব্বজনপ্রিয় রাজ্যপাল শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গারকে দেখা যাইতেছে। তাঁর ডান পার্শ্বে রাজেন্দ্রপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদকে দেখা যাইতেছে। তাঁর ডান পার্শ্বে রামকৃষ্ণ-মিশনের স্বামী—শ্রীবীতশোকানন্দ উপবিষ্ট আছেন।

আয়োজিত সভার সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে বহু সহস্র ভক্ত নরনারী সাগ্রহে সমবেত হন আমাদের সংস্কৃত অভিনয় "ভারত-বিবেকম" দর্শনের জন্য। ব্যারাকপুরে পূর্বে কোনদিন সংস্কৃত অভিনয় হয় নাই। সেজন্য আমাদের মনে যথেষ্ট ভয় ছিল সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারিব কিনা,ভাবিয়া। কিন্তু কার্যকালে দেখিলাম, রাত্রি সাতটা হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত সকলেই চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া অভিনয়ের সুধারস আনন্দে পান করিলেন এবং দেখিয়া বড়ই কৃতার্থ বোধ করিলাম। সভান্তে নব-ব্যারাকপুরস্থ প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের

অধ্যক্ষ শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। ইহাদের আদর যত্ন কোনদিন ভুলিবার নহে।

বার্ণপুরে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

বার্ণপুরের "ভারতী-ভবন" একটি সুবিখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা। শিল্পনগরী বার্ণপুরের বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইহার অতি সুন্দর হলে হয়। আমাদের "ভারত-বিবেকম্" সংস্কৃত নাটক ইহার উদ্যোগে প্রাচ্যবাণী কর্তৃক বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয় বিগত ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৬৩। "ভারতী-ভবনের" সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার সহযোগিগণ আমাদের আহারবিহার এবং অভিনয়াদির অত্যুৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়া আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের এবং বার্ণপুরের উচ্চপদস্থ অফিসার শ্রী এ কে মৈত্র ও তাঁহার নামে বিদেশিনী, অথচ প্রাণে ভারতীয়া পত্নীর সস্নেহ আতিথ্যের তুলনা নাই। এই আভিজাত্যপূর্ণ ধনী, শিল্পনগরীর বিদেশীভাবাপন্ন অধিবাসীগণও যে মনে প্রাণে কিরূপ সংস্কৃত জননীর সেবক, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া বিশেষ ধন্য হইলাম।

পুরুলিয়ায় সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

পরের দিন সকালেই বার্ণপুর হইতেই পুরুলিয়ায় চলিয়া যাই পুরুলিয়াস্থ স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব সমিতির সাদর আহ্বানে। তাঁহারা বহু সমাদরে পুরুলিয়া হইতে আমাদের জন্য একটি "বাস" প্রেরণ করেন! দুই ধারের অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা পরমানন্দে তিন ঘণ্টার মধ্যে পুরুলিয়াস্থ রামকৃষ্ণমিশনের "রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে" উপস্থিত হইলাম। কি অপূর্ব সুন্দর, শান্ত স্নিগ্ধ স্থান এইটী! অতি বিস্তৃত, উদার উন্মুক্ত ভূমিভাগের মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়, আবাস ভবন, অতিথি-ভবন প্রভৃতির সুরম্য হর্ম। অতিথি ভবনের ব্যবস্থা অত্যুৎকৃষ্ট। আশ্রমের অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দ এবং অন্যান্য স্বামীজীর আদরাপ্যায়ন চিরস্মরণীয়। ইহাদের প্রদর্শনীটীও অতি চমৎকার হয়।

সুবিস্তৃত সভাস্থলে দ্বিসহস্রাধিক জনসমাগম হয়। প্রথমে মহিলা সভার উদ্বোধন করেন শ্রদ্ধেয়া ডাঃ রমা চৌধুরী। তাঁহার স্বভাব সুলভ সুললিত ভাষণে সকলেই বিশেষ পরিতৃপ্ত হন। পরিশেষে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দান করেন শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দ।

তাহার পরে, সন্ধ্যাকালে (২৫শে নভেম্বর ১৯৬৩) ঐ স্থলেই আমাদের সংস্কৃত নাটক "ভারত-বিবেকম্" সুগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে অতি সুন্দরভাবে অভিনীত হয়। আশ্রমটী সহর হইতে বহু দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, অতি শীতের মধ্যেও বহু ভক্তজন শেষ পর্যন্ত থাকিয়া পরমানন্দভরে অভিনয়ের রস উপভোগ করেন। সত্যই সে এক অদ্ভুত, প্রাণোদ্দীপক দৃশ্য। পরের দিন প্রত্যুষে আমরা বাস্-যোগে কলিকাতাভিমুখে রওয়ানা হই। পথের দৃশ্য অতি সুন্দর।

পাটনায় সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

পাটনার "রাজেন্দ্র-স্মৃতি সমিতি" প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্রপ্রসাদের পূত জীবনী অবলম্বনে ডক্টর যতীন্দ্রবিমলকে একটি সংস্কৃত নাটক রচনা ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে সাদর আমন্ত্রণ জানান। ইহাতে সকলের মধ্যেই বিশেষ কৌতূহলের সঞ্চার হয়, যেহেতু এরূপ অত্যাধুনিক বিষয়ে সংস্কৃত নাটক রচনা ও অভিনয় রসোত্তীর্ণভাবে করা সম্ভবপর কিনা, তাহাই প্রশ্ন। কিন্তু ডক্টর যতীন্দ্রবিমল এরূপ কার্যে সিদ্ধহস্ত, এবং অত্যাধুনিক বিষয়ে তাঁহার রচিত সংস্কৃত-নাটক "ভারত-জনকম্", "দেশবন্ধু-দেশপ্রিয়ম্" ও "সুভাষ-সুভাষম্" বহুবার বিশেষ প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছে। সেজন্য তিনি অত্যল্প সময়ের মধ্যে "ভারত-রাজেন্দ্রম্" নামক সংস্কৃত নাটক রচনা ও অভিনয়ের ব্যবস্থাদি করিয়া ফেলিলেন। অভিনয় হইল স্বর্গত রাজেন্দ্রপ্রসাদের জন্মতিথি ৩রা ডিসেম্বর ১৯৬৩, পাটনার সুবিখ্যাত রবীন্দ্র-ভারতী হলে। পৌরোহিত্য করেন রাজ্যপাল শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার। স্বর্গত রাজেন্দ্রপ্রসাদের সুযোগ্য পুত্রদ্বয় শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ ও শ্রীধনঞ্জয়প্রসাদ প্রমুখ বহু গণ্যমান্য, জ্ঞানীগুণীজনের সানুগ্রহ উপস্থিতিতে আমাদের অভিনয় সেদিন বিশেষ জমিয়া উঠে।

নাটকাভিনয়ের সকলপ্রকার সুবন্দোবস্ত করেন রাজেন্দ্র স্মৃতি সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সহায় এবং বিহার নাট্য-পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীজ্ঞান সহায়। তাঁহাদের ঋণ অপরিশোধ্য। বিহার বিশ্ববিদ্যা-

৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে "প্রাচ্য-বাণী"র সংস্কৃত-পাঠন নাট্যসঙ্ঘের সদস্যমণ্ডলীকে পাটনাস্থ রবীন্দ্র-ভবনে শ্রদ্ধেয় রাজ্যপাল এম, অনন্ত-শয়নম্ আয়েঙ্গার মহোদয়ের সঙ্গে ডক্টর যতীন্দ্র বিমলের "ভারত-বিবেকম্" অভিনয়ের পরে স্বামীজির মূর্তির ডান পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখা যাইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দের ডান পার্শ্বে পাটনাস্থ রামকৃষ্ণাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বীত-শোকানন্দ উপবিষ্ট আছেন।

দণ্ডায়মান (রাজ্যপালের বামপার্শ্ব থেকে) অধ্যাপিকা শ্রীমতী শান্তি চক্রবর্তী ; শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মিত্র ; অধ্যক্ষ ডাঃ রমা চৌধুরী ; শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীঅসীমসুন্দর চট্টোপাধ্যায় ; (বিবেকানন্দের ভূমিকায়) শ্রীঅনিল কান্ত দত্ত ; গায়ক শ্রীপূর্ণেন্দু রায় ; গায়ক শ্রীগৌরী কেদার ভট্টাচার্য ;

উপবিষ্ট : (রাজ্যপালের বাম পার্শ্ব থেকে) শ্রীমৃণাল-কান্তি দত্ত, বালকসহ স্থানীয় অভিনেতৃদ্বয় ; শ্রীঅনিন্দ্যসুন্দর চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীমতী উর্মি চট্টোপাধ্যায় ; অধ্যক্ষ ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও অধ্যাপক শ্রীজ্ঞান সাহা (বিহার সংস্কৃত নাট্য-পরিষদের সম্পাদক)

লয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী অদিতি দে নানাভাবে আমাদের সাহায্যদানে সাগ্রহে অগ্রসর হন।

৬ঠা ডিসেম্বর ১৯৬৩ ঐ একই "হলে" পাটনা স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সমিতির উদ্যোগে আমাদের সংস্কৃত নাটক "ভারত-বিবেকম্" অভিনীত হয়। ইহার পুরোভাগে ছিলেন পাটনা রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় স্বামী শ্রীবীতশোকানন্দ। তাঁহার স্নেহ ও উৎসাহ সত্যই অতুলনীয়। প্রারম্ভে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল ও ডক্টর রমা চৌধুরী যথাক্রমে অতি সুন্দর সংস্কৃত এবং ইংরেজী ও বাংলায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দিয়া সকলকে বিশেষ মুগ্ধ করিলেন। ঐদিন সভায় পৌরোহিত্য করেন রাজ্যপাল পরম শ্রদ্ধেয় বিদ্বদাগ্রগণ্য শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার এবং তিনি প্রায় তিন ঘণ্টাকাল সাগ্রহে বসিয়া থাকিয়া সমগ্র অভিনয়টী পরম তৃপ্তির সহিত দর্শন করেন।

পরমশ্রদ্ধেয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত অনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার মহাশয়ের অতি সহজ সরল, সুমধুর ব্যবহারের কথা কোনও দিন ভুলিবার নহে। তিনি তাই একজন মাটির মানুষ—যা' প্রকৃত পণ্ডিতের হওয়া উচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ সর্বজনবিদিত; এবং সে জন্য সমগ্র দেশের পণ্ডিত সমাজ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। অভিনয় দর্শনে তুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার আশীর্বাদস্বরূপ যে দুইশত টাকা প্রাচ্যবাণীকে দান করিয়াছেন, তাহা আমাদের চিরকালের পাথেয় হইয়া রহিল॥

সেইদিন পাটনা সহরের বহু জ্ঞানী গুণী ভক্ত সাধুজন সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই উভয়ের উচ্চ প্রশংসা করেন। সভান্তে শ্রদ্ধেয় রাজ্যপাল মহাশয়, ডাঃ বিমান-বিহারী মজুমদার প্রমুখ অনেকে ডক্টর চৌধুরীদম্পতীদ্বয় এবং অভিনয়ে অংশগ্রহণকারিগণকে হার্দিক অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন।

পার্লামেণ্ট্ অফ্ রিলিজিয়নে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের পরিসমাপ্তি-

রূপে পার্কসার্কাসে নিখিল বিশ্ব বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে বিশ্বধর্ম—মহাসম্মেলনে "ভারত-বিবেকম্" নাটকের অভিনয় হয় ২রা জানুয়ারী, ১৯৬৪। সুবিশাল সভামণ্ডপে পাঁচ হাজারেরও অধিক দর্শক আড়াই ঘণ্টাকাল নীরবে নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া এই সংস্কৃত অভিনয়ের রস উপভোগ করেন। তাহাতে আমরা বড়ই অনুপ্রাণিত হইলাম। এই সভায় বহু বিদেশী জ্ঞানিগুণী, ভক্তজন উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় নাটকটির উৎকর্ষ এবং অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য সাধুবাদ প্রদান ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন।

হুগলীতে সংস্কৃত-নাট্যাভিনয়।

২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪, স্বামী বিবেকানন্দ শততম জন্ম-বার্ষিক উৎসবের তত্ত্বাবধানে আমাদের "ভারত-বিবেকম্" সংস্কৃত নাটক অতি সুষ্ঠুভাবে অভিনীত হয়। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বসু, অধ্যক্ষা শান্তিসুধা ঘোষ প্রভৃতির সস্নেহ ও সাগ্রহ সহযোগিতায় নাটকটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

ডক্টর রমা চৌধুরীর স্বামীজী সম্বন্ধীয় ভাষণ চিত্তাকর্ষক ও সকলের বিশেষ আনন্দের কারণ হয়।

উপসংহার

অতি আনন্দের বিষয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য বিষয়রূপে নির্ধারিত হউক বা না হউক, সংস্কৃত সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও প্রচার-প্রকাশের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হউক বা না হউক, সংস্কৃত কোনদিনই ভারতবাসীর চিত্তকেন্দ্র থেকে অপসারিত হয় নাই, হইতে পারেনা। উপরন্তু সংস্কৃতকেও যে সর্বজন-বোধ্যই কেবল নয়, সর্বজনোপভোগ্যও করা যায়, তাহাও নিঃসন্দেহ। এই উভয় বিষয়েরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা বারংবার আমাদের সমগ্র দেশব্যাপী ভ্রমণ হইতেই পাইতেছি। একটি সংস্কৃত সংস্থা যে বৎসরের পর বৎসর এইভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে সাদর আমন্ত্রণ লাভ করিয়া গড়ে ২০।২৫ টি করিয়া সংস্কৃত অভিনয় প্রতি বৎসর করিতেছে সহস্র সহস্র দর্শককে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি দেয়, তাহাতে সংস্কৃতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়॥

এই প্রসঙ্গে শ্রীমৎ স্বামী বীতশোকানন্দজীর পত্রখানা একান্ত উৎসাহপ্রদ। তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া এবং সকলের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া এই প্রবন্ধটি সমাপ্ত করিতেছি।

৭-১২-১৯৬৩

ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

রামকৃষ্ণ মিশন,
পাটনা।

মান্যবরেষু,

আশা করি ভগবৎকৃপায় মঙ্গলমত কলিকাতায় পৌছিয়াছেন। আমাদের বহুবিধ ত্রুটি সত্ত্বেও আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতার জন্য আমরা আপনাদের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

'ভারত-বিবেকম্" অভিনয় সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হইয়াছিল। অভিনয় দর্শনে বিহারের রাজ্যপাল ছাড়াও পাটনা সহরের সর্বশ্রেণীর বিশিষ্ট নাগরিকেরা উপস্থিত ছিলেন। পাটনা হাই-কোর্টের বিচারপতি, বিশিষ্ট আইনজীবী, পদস্থ সরকারী কর্মচারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা প্রভৃতি যাঁহারা অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে 'ভারত-বিবেকম্' অভিনয় পাটনার সংস্কৃতি জীবনে একটি বিশিষ্ট ঘটনা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর আশীর্বাদ আপনাদের উপর নিত্য বর্ষিত হউক এবং আপনারা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ভারত সংস্কৃতির গৌরব বর্ধন করুন।

আপনি ও শ্রীমতী চৌধুরী আমার আন্তরিক প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করিবেন এবং নাট্যপরিষদের অপর সভ্য ও সভ্যাদের দিবেন। ইতি

আপনাদের
বীতশোকানন্দ।
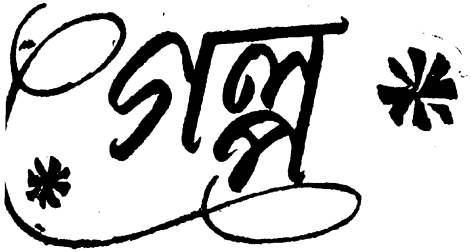
রূপান্তর

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

আমি এক রূপোপজীবিনী।

বলা প্রয়োজন যে ঐ বৃত্তি আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়। একরূপ বল প্রয়োগেই আমার মা-ঠাকুমা আমার স্কন্ধে তুলে দিয়ে গেছে এ পেশা। বিরক্তিবোধ করেছি প্রথম, এমনকি রাগ করেও অনেকদিন পালিয়ে বেড়িয়েছি।

কিন্তু শেষটায় হার মান্‌তে হোলো নিজের কাছে নিজেকে। একদিন দু'দিন করে অভ্যাসে দাঁড়ালো।

অভ্যাসই সব। তারপর আর কাউকে বল্‌তে হোতো না। মেয়েরা যেমন পুজোর উপকরণ ধীরে ধীরে সাজিয়ে গুছিয়ে ঠাকুরের সাম্‌নে তুলে দেয়, ঠিক তেমনি করেই নিজের সামান্য রূপকে নানা অংগরাগের অলংকারে অসামান্য করে তুলে সাঁঝের বেলা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌তুম দরজার একপাশে।

ঐ মায়ামৃগের ফাঁদে পা' বাড়াতে দেখেছি অনেককে। যেমন এসেছে—তাদের মনোরঞ্জনও করেছি সাধ্যমত। তারাও উপযুক্ত নগদমূল্য দিয়ে এ'তুচ্ছ দেহপশারিণীর জীবনকে সার্থক ও ধন্য করেছে।

ক্ষণবসন্তের মত ভঙ্গুর যৌবনের কেটে গেল কয়েক বছর।

কোন একদিন এক 'নাগরের' সঙ্গে এক কারখানা দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। দেখ্‌লাম, জিনিষগুলো আপনা-আপনি তৈরী হ'য়ে বেরিয়ে আসছে। অদ্ভুত লাগ্‌লো। এই অদ্ভুতভাব যে কখন আমার মনের কোণেই বাসা বেঁধেছিল, তা' কি করে জানবো?

অভ্যাসের শেষ পরিণতিই কি যান্ত্রিকতা? আমার মনোভাব হ'য়ে দাঁড়ালো ঠিক এ রকম। হয়তো দেহের-ও।

নিজেই অনেক সময় বুঝতে পারতুম না, সন্ধ্যাটি লাগার মুখে কখন নিজেকে পণ্য-রূপে সাজিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে গেছি। বুঝ্‌তেও পার্‌তুম না কখন খরিদ্দারকে চোখের ইসারায় ডেকে নিয়ে নিজের এই রঙ্‌মাখানো রূপকে তাদের সম্মোহিত দৃষ্টির সাম্‌নে তুলে ধরে কৃত্রিম অভিনয়ের দ্বারা মনোরঞ্জন করে তুলেছি! বুঝ্‌তে যখন পেরেছি, তখন গেছি আশ্চর্য হ'য়ে। শুধু ভেবেছি, ঐরূপ কি করে সম্ভব হোলো!

একদিন......

বাঁধা সময়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। আশে-পাশে আমারই মত আরো কত হতভাগিনী। মাঝে মাঝে অকারণ তাদের বিশ্রী প্রগল্‌ভ হাসি। এমনি হাসি তাদের যেন ব্যাধি।

ফুল-ওয়ালা মালা সাজিয়ে হেঁকে গেল। অনেকেই কিন্‌লো সে মালা,—আমিও নিলাম একগাছি।

কিছু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, এক তরুণ সুপুরুষ দাঁড়িয়ে আমার সাম্‌নে। এক দৃষ্টিতেই তাকে চেনা যায়, কিন্তু ধরা যায় না। চমৎকার উজ্জ্বল তার গায়ের রঙ্‌। সৌম্য বলিষ্ট চেহারা। সুকুমার মুখ। অভিজাত বেশবাস। ক্ষণিকের জন্যে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলাম হয়তো। বিস্ময় ভাঙ্গলে মনে হোলো, ভদ্রলোক বোধহয় ভুল করে এসেছেন। কিন্তু আমাকেই যখন তিনি ইংগিত কর্‌লেন, তখন-ও মনে হোলো, এ হয়তো আমারই দৃষ্টিভ্রম। কিন্তু দৃষ্টিভ্রম যে নয়, একটু পরেই বুঝ্‌তে পারলুম।

আবার তিনি ঈসারা কর্‌লেন।

এবার আমার বুক কাঁপতে লাগলো। সেই ভাবেই পেছন ফিরে ঘরের দিকে চল্‌তে লাগলুম। তিনি আমার

ঠিক পেছনেই আস্তে লাগলেন। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস আমার চুল স্পর্শ কর্‌তে লাগ্‌লো।

ঘরে এলুম। তিনিও এলেন।

তাঁর আগমনের ফলে আমার ঘরের দীনতা চারিদিক থেকে প্রকট হয়ে উঠে আমাকেই চেপে ধরলো যেন। এতদিনের এত নোঙরামি আমার চোখেই পড়েনি। বিছানা মলিন, তাকিয়া বালিসের ওয়াড়গুলো তালি দেয়া, ঘরের চারপাশের দেয়ালে লালরঙের দাগ, পিক ফেলার চিহ্ন, গোটা দুই সস্তাদরের অর্দ্ধ-উলঙ্গ স্ত্রীমূর্তির ছবি দেয়ালের গায়। দেখে নিজেই শিউরে উঠলুম।

ভদ্রলোক কিন্তু এসব ফিরেও তাকালেন না। বসলেন না কোথাও। সোজা আমার মুখোমুখী এসে দাঁড়ালেন। যা কোনদিন হয়নি, তাই হোলো। আমি অমনি মুখ নীচু কর্‌লুম। বুক তেমনি ঢিবঢিব কর্‌ছে। সহসা মনে হোলো, এমনি রঙ্‌ পাউডারে এনামেল করা মুখ আর যার কাছেই হোক—এঁর কাছে তোলা যায় না। আমার ভেতরের দৈন্য আমি ছাড়া আর কে জানবে?

এবার ওঁর কথা কানে এলো, গলা যেন ভারী-ভারী।

বল্‌লেন: মুখ তোল, আমি শুধু দেখেই চলে যাব।

তুললুম মুখ। কিন্তু অনেক দেরীতে। ঠোঁট দুটো যেন অকারণ কাঁপতে লাগ্‌লো। হাতের তালুদুটো ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা। কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করছে।

তিনি দেখ্‌লেন। অপলক চোখেই দেখতে লাগলেন। সে দৃষ্টিতে কি ছিল, মনে কর্‌তে পারিনে, আর ঠিক বোঝাও গেল না।

অনেকক্ষণ পর এক দীর্ঘশ্বাস পড়লো। আমি মুখ নীচু করে নিলাম। তারপর পকেট হাতড়ে কি বের কর্‌লেন। যা' বের কর্‌লেন, তার খস্‌খসে আওয়াজ আমার পরিচিত।

এবার শান্ত স্নিগ্ধ গলায় বল্‌লেন: নাও ধরো। এবার আমি চলে যাব।

হাত দুটো অনড় হয়ে রইলো আমার। কিছু একটা বল্‌তে চাইলেম, কথা খস্‌লো না।

এত আনন্দ, এত বিস্ময় বোধহয় আমার এই বিশ-বছরের জীবনে হয়নি।

তিনি আবার একই কথা উচ্চারণ কর্‌লেন।

হাত দুটো এক করে তুললুম এবার। যেন ভিক্ষা চাইছি।

যা পকেট থেকে তুলেছিলেন, তার সবগুলো আমার দু'হাতের মধ্যে ঢেলে দিলেন।

লক্ষ্য কর্‌লুম, তিনি আমার স্পর্শ দোষ থেকে দূরে থাকতে চাইছেন।

তারপর তিনি যা' বলেছেন তাই কর্‌লেন। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তবে যাবার আগে এক টুকরা কাগজ আমার বিছানার ধারে রেখে শুধু বলে গেলেন, আমার ঠিকানা। যদি প্রয়োজন বোধ কর, সংবাদ জানাবে।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাবার শব্দ কানে এলো। তখনো ঘরের মধ্যে আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে। হঠাৎ জড়তা কেটে যেতে আমি ছুটে বাইরে এলুম। হাতের মুঠির মধ্যে একতাড়া নোট ধরাই আছে। চিৎকার করে কাকে ডাক্‌তে গেলুম,—গলায় স্বর ফুটলো না। সে কি অসহ্য পুলকের উন্মাদনায়, না, হঠাৎ ওঁর চলে যাবার ব্যথায়—ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লুম না।

একটা স্বপ্নের মত মনে হোলো—যেন ঘুম থেকে এই-মাত্র জেগে উঠলুম।

এই সময় নীচু থেকে একরাশ তীক্ষ্ণ বিশ্রী হাসি ছুরির ফলার মত আমার কানে যেতে আমার পরিচয় আর পরিস্থিতি নতুন করে প্রকটিত হয়ে উঠলো যেন।

আশ্চর্য, উপরোক্ত ঘটনার পর থেকে আমি সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেলুম।

আমার ব্যবসা, আমার পশার, সব বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় হ'লো। প্রয়োজন না হলে নীচে নামি না আমি। সন্ধ্যার দেহ-পশারিণীর দল থেকে আমার নামটা কেটেই দিলাম একরকম।

সঙ্গিনীরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। সে ঠাট্টা-বিদ্রূপ অত্যন্ত বিশ্রী আর অভদ্র বলে মনে হয়। আমার ঘর থেকে মদের গ্লাস বোতলগুলো সরিয়ে ফেলেছি একদিকে। অন্য দিকে মার্জিত করে ফেলেছি ঘরখানা। সেইদিনের পর থেকে আমার মন যেন অসম্ভব রকমের ভদ্র আর শুচিবাই-গ্রস্ত হ'য়ে উঠেছে।

একটা কথা সেই থেকে মনে উঁকি মারছে! আবার হয়তো উনি আসবেন। এজন্যে আমার প্রস্তুত হয়ে থাকা

চাই এবং প্রস্তুত হওয়া চাই। যা ইতর, যা কুৎসিত, যা অমার্জিত, সে সবের উর্ধ্বে উঠতে হবে আমাকে। সবক্ষণের জন্যে এই ধ্যান, এই চিন্তা আমাকে সব কাজে ভুলিয়ে রাখলো!

এমনি করে দিন গেল। দিনের পর মাস। মাসের পর বছরও ঘুরে গেল।

তিনিও এলেন না।

অনেক প্রতীক্ষা যখন ব্যর্থ হ'তে চল্‌লো, তখন একটা কথা মনে হোলো। সে কথাটা ভুলিনি। তাঁর ঠিকানাটি। এইটি-ই ছিল আমার শেষ সম্বল। পাছে তিনি কিছু মনে করেন, এই ভয়েই দেইনি। কিন্তু আর অপেক্ষা করলুম না।

তবু অনেক ভয়ে-ভয়ে চিঠিটা দিলুম। বেশি কথা নয়, মাত্র দুটি ছত্র। বেশী লিখলে পাছে তিনি কিছু মনে করেন। তবে উত্তরের আশা মোটে-ই করিনি।

কিন্তু আশ্চর্য, উত্তর এলো। এলো বেশ তাড়াতাড়ি। তা'তে শুধু একটি কথা লেখা :

'আস্‌বো।'

এবং এলেন ও।

যে বেশে এলেন, তার ব্যাখ্যা আমি করতে পারবো না। কী দীন, শ্রীহীন চেহারা। ছিন্নভিন্ন পরিধেয়। একমাথা রুক্ষ চুল একগাল দাড়ি। পরিচয় না দিলে হয়তো চিন্‌তেই পারতুম না। আমার ঘরে ঢুকেই তিনি বিছানায় আর মেঝেয় দুবার বমি করলেন। পকেট থেকে বোতলটা ছিটকে পড়ে যেতে গোটা ঘর মদে ছড়াছড়ি হ'য়ে গেল। বিশ্রী দুর্গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে গেল।

স্থাণুর মত নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভুলে গেলাম, আমার এখন কি করা উচিত।

একবছর আগের ঘটনা মনে হোলো। ঠিক এমনি ভাবেই ত সেদিনও এমনি দুর্বার বিস্ময়ে দাঁড়িয়েছিলুম, কিন্তু সেই বিস্ময়ের সঙ্গে আজকের এমনি বিস্ময়ের কত বড়ই না পার্থক্য! কি ভিতরে, কি বাইরে।

শিল্পী

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম. এ,

ব্যথাতুর নীরব বিস্ময়ে প্রশ্ন জাগে মনে—
বিজ্ঞানের অবদানে বিশিষ্ট এ যুগে,
যন্ত্রের কারাগারে রুদ্ধশ্বাস প্রেম যেথা,
শিল্পীর স্থান কোথা?

দানবের আরণ্যক জিঘাংসার বলি
আজ তুমি, আমি—সকল পৃথিবী।
কালের দিগন্তে যেন সঞ্চারিত
শ্বাপদের হিংস্রতার অশুভ সংকেত।

সত্যকার সর্বনাশা বিষে নীল—এ পৃথ্বীর
শিল্পিসত্তা নিঃশেষিতপ্রায়,
বিদ্বেষের বিস্ফোরণে
মানুষের বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে।

অনুচ্চার ক্রন্দনে, নিশ্চল
নিশ্চুপ কেন তুমি?
দীপ্তিময় আলোর পরশে, শিল্পি!
শীতার্ত্ত এ মনে বসন্তের ইসারা আনো।
অশ্রুভাঙা ভাষায় কর সঞ্জীবন
সত্য-শিব-সুন্দরের মূর্ত্তি চিরন্তন।

স্বপ্ন চারণা শুধু নহে, চিরায়ত চৈতন্য স্পন্দনে
তোমার ছবিতে কবি, কাহিনীতে
কায়ালাভ করে—
যেন ইতিহাস হয়ে ওঠে সমুজ্জ্বল দিন।
প্রাণান্তিক প্রতীক্ষার হোক্ অবসান।
মিথ্যা কবি মৃত্যু বিজ্ঞাপন।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১২৭০ সালে পাথুরেঘাটায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের (তখনও রাজা হন নাই) বাড়ীতে একটি নাট্য-সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। যতীন্দ্রমোহনের পৈতৃক বাটিতে (৬৫ নং পাথুরেঘাটায়) ইহার রঙ্গমঞ্চ হয় নাই। পাথুরেঘাটার ঠাকুর গোষ্ঠির আদি বাড়ীতে (৺গোপীমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে ৬৬নং পাথুরেঘাটায়) অর্থাৎ তখনকার ৺ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর হলে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। এই স্থানে ১২৭১ সালে (১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) "মালবিকাগ্নিমিত্র" অভিনীত হয়। পাইকপাড়ার রাজাদিগের যত্নে ১২৬৬ সালে ইহার অভিনয়ে যে সকল অভিনেতা অভিনয় করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই অভিনয়ে যোগদিয়াছিলেন। পাইকপাড়ার অভিনয়-শিক্ষক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ই এখানে শিক্ষক হইয়াছিলেন। ঠিক কোন্ তারিখে "মালবিকাগ্নিমিত্র" প্রথম অভিনীত হয় এবং কাহারা কোন্ অংশ লইয়া অভিনয় করেন, তাহা জানা যায় নাই। ইহার পর যতীন্দ্রমোহন রামনারায়ণ তর্করত্নের নূতন নাটক "কংসবধ" অভিনয় করিবার উদ্যোগ করেন, কিন্তু অসুবিধায় উহা পরিত্যাগ করা হয়। এই সময়ে পুস্তকাভাবে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিজে "বিদ্যাসুন্দর" নাটক রচনাপূর্ব্বক আখড়াই দেওয়ান। নয় দশ বার অভিনয়ের মধ্যে নিম্নে একটি তারিখ দেওয়া গেল,—

১ম	১২৭২।২৩শে পৌষ,	শনিবার	(১৮৬৬।৬	জানুয়ারী	)
২য়	,, ২৭শে পৌষ,	বুধবার	(১৮৬৬।১০	জানুয়ারী	)
৩য়	,, ২৯শে মাঘ,	শনিবার	(,, ১০	ফেব্রুয়ারী	)
৪র্থ	,, ৭ই ফাল্গুন	"	(,, ১৭	,,	)
৫ম	,, ১২ই ফাল্গুন	,,	(,, ২৪	,,	)

এই অভিনয়ের সময়ে রেবার রাজা কলিকাতায় আসিয়া মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের মরকতকুঞ্জ নামক উদ্যানে বাস করেন। বিদ্যাসুন্দরের আখড়াই তখন শেষ হইয়া গিয়াছে, খুলিবার উদ্যোগ হইতেছিল। ১২৭২ সালের ১৯এ পৌষ (১৮৬৫।৩০ ডিসেম্বর) তারিখে যতীন্দ্রমোহন তাঁহাকে স্বভবনে নিমন্ত্রণ করেন। ইঁহাকে আপ্যায়িত করিবার জন্য এই দিনই বিদ্যাসুন্দরের ড্রেস-রিহার্সালের ব্যবস্থা করা হয়। এই দিন যতীন্দ্রমোহনের নিজ পরিজন ও রেবার রাজার দলবল ব্যতীত আর কেহ উপস্থিত ছিল না। তৃতীয় অভিনয়ে বিজয়নগরম্‌এর মহারাজ দর্শক ছিলেন। এই সময়ে য়ুরোপ হইতে নবাগত থেরেস পুশার্ড নামক এক প্রসিদ্ধ বাদক টাউনহলে স্বীয় বাদ্যকৌশল শুনাইয়া লোককে চমৎকৃত করিতেছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ যতীন্দ্র ও শৌরীন্দ্রমোহনের সহিত তিনি পরিচিত হন। বিদ্যাসুন্দরের তৃতীয় অভিনয়ে পুশার্ড্ নিমন্ত্রিত হইয়া বেহালা বাজাইয়াছিলেন। তখনকার য়ুরোপীয় বাদ্যযন্ত্রবিক্রেতা "বার্কিষ,

ইয়ং" কোম্পানীর দোকানের অধ্যক্ষ রিজলে এই চতুর্থ অভিনয়ে পুশার্ডের বাজনার সহিত পিয়ানো বাজাইয়া ছিলেন।

বিদ্যাসুন্দরের অভিনেতৃগণের নামাদি,—

রাজা বীরসিংহ	রাধাপ্রসাদ বসাক।
মন্ত্রী	হরিমোহন কর্ম্মকার।
গঙ্গাভাট	গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সুন্দর	মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
ধূমকেতু	হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিদ্যা	মদনমোহন বর্ম্মা।
হীরামালিনী	কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।
সুলোচনা	ষষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায়।
চপলা (১)	যদুনাথ ঘোষ।
ঐ (২)	ফটিক ওরফে হরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
বিমলা	নারায়ণচন্দ্র বসাক।
প্রতিবাসী	অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়।
প্রহরী	ব্রজদুর্লভ বসাক।

এই সঙ্গেই প্রথমাভিনয় হইতেই "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" নামক একখানি প্রহসনেরও অভিনয় হয়। ১৩ জানুয়ারী তারিখের "বেঙ্গলী" পত্রে তাহার তদানীন্তন সম্পাদক গিরীশচন্দ্র ঘোষ এই অভিনয়ের সুখ্যাতি করিয়া এক বিবরণ লেখেন।

এই বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ের সঙ্গে বাঙ্গালা সাধারণ নাট্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের একটু সম্বন্ধ ছিল। এই অভিনয়ের সময়ে অর্দ্ধেন্দুবাবু আত্মীয়তাসূত্রে যতীন্দ্রমোহনের বাড়ীতে থাকিতেন। এই তাঁর প্রথম অভিনয় দর্শন। তিনি এই-খানে থাকিয়াই অভিনয়বিদ্যার সমস্ত ব্যাপারগুলি দেখিবার ও বুঝিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। তিনি যখন স্কুলে পড়িতেন তখনও তিনি নাট্যের কোন সম্পর্কে ছিলেন না।

যতীন্দ্রমোহনের এই নাট্যসম্প্রদায়ে ক্রমশঃ ১ "মালবিকাগ্নিমিত্র", ২ "বিদ্যাসুন্দর", ৩ "যেমন কর্ম্ম-তেমনি ফল" ৪ "বুঝলে কি না," ৫ "মালতীমাধব", ৬ "উভয়-সঙ্কট", ৭ "চক্ষুদান", ৮ "রুক্মিণীহরণ", ৯ "রসাবিষ্কারবৃন্দক" অভিনীত হইয়াছিল এবং এই দল অনেক দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। রুক্মিণীহরণের অভিনয় পর্য্যন্ত যতীন্দ্রমোহনের নাট্য সম্প্রদায় একটানে চলিয়াছিল। তাহার পর বন্ধ থাকে, পুনরায় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে "রসাবিষ্কারবৃন্দক" নামক ক্ষুদ্র দৃশ্য কাব্য রচিত ও অভিনীত হয়। এই সকল অভিনয়ের সঙ্গে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত একতানবাদন সম্প্রদায় বাজাইতেন। তাহাতে অধিকাংশ দেশী যন্ত্র বাজিত। বেহালা ব্যতীত বিদেশীয় অন্য কোন যন্ত্র ছিল না, ফুঁদিয়া বাজাইবার কোন যন্ত্রও ছিল না। ইহা "শৌরীন্দ্রমোহনের কনসার্ট" নামে খ্যাত হইয়াছিল। বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় হইতেই নাটক ও প্রহসন একত্র অভিনয়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

পাথুরেঘাটায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে চতুর্থ পুস্তক "মালতীমাধব" নাটক ১২৭৪ সালের ১৫ই আশ্বিন (১৮৬৭।৩১ সেপ্টেম্বর) বৃহস্পতিবার প্রথম অভিনীত হয়। ইহা আট দশ বার অভিনীত হইয়াছিল। এক রাত্রিতে কেবল সাহেববিবিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অভিনয় দেখান হয়। এইদিন লর্ড লরেন্স উপস্থিত ছিলেন। মালতীমাধবের গানগুলি বনওয়ারী লাল রায় নামক একব্যক্তি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময়ে শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি "কৃষ্ণকুমারী" নাটকের আখড়াই বসান। ১২৭২ সালের ১০ই শ্রাবণ (১৮৬৫।২৪ জুলাই) সোমবারে ইহার প্রথম অভিনয় হয়। সে অভিনয় কেবল বন্ধুবান্ধবের দর্শনার্থ প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১২৭৩ সালের ১লা পৌষ (১৮৬৭ ১২ ফেব্রুয়ারী) শনিবারে ইহার প্রকাশ্য অভিনয় হয়। * [এই প্রকাশ্য অভিনয়ে ছোটলাটের বাদক-দল বাজাইয়া ছিল।] এই অভিনয়ের সময়ে এই নাট্যসমিতির ব্যবস্থা অতি সুন্দর ছিল, নিম্ন তাহার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহার একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ছিল,—

কালীপ্রসন্ন সিংহ	(সভাপতি)
রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সহকারী সভাপতি।
কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	সদস্য।
কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	"
চন্দ্রকালী ঘোষ	"

রূপলাল মিত্র	"
বরদাকান্ত মিত্র	"
মণিমোহন সরকার	"
কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	ধনাধ্যক্ষ।
" আনন্দকৃষ্ণ " "	সম্পাদক।
প্যারীমোহন দাস (বৈষ্ণব)	সহকারী সম্পাদক।

এতদ্ভিন্ন কতকগুলি কর্মচারী ছিলেন,—

কুমার শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ।
রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
কুমার শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারীমোহন দাস	শিক্ষক
রূল (প ?) লাল মিত্র কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর শ্রীবরদাকান্ত মিত্র প্যারীমোহন দাস	মুদ্রাযন্ত্র-সংক্রান্ত কর্মচারী
রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র বাহাদুর শ্রীবরদাকান্ত মিত্র	একতান-বাদন সম্প্রদায়ের নেতা।
কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ " " কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ " "	"হলের" তত্ত্বাবধায়ক
বরদাকান্ত মিত্র রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতুলকৃষ্ণ দেব	সাজঘরের তত্ত্বাবধায়ক
চন্দ্রকালী ঘোষ রূপলাল মিত্র	অভ্যর্থনাকারক
বরদাকান্ত মিত্র কালীকমল নস্কর জীবনকৃষ্ণ দেব অতুলকৃষ্ণ দেব মণিমোহন সরকার	কর্মচারী-প্রধান

প্রতি মঙ্গল, শুক্র ও রবিবারে ইঁহাদের নাট্যাভ্যাস হইত। ১৮৬৭।১১ ফেব্রুয়ারী হিন্দু-পেট্রিয়টে এই অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই অভিনয়ে প্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত ছিলেন মাত্র, নাট্যসম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন না।

এই অভিনয়ে যাঁহারা যে ভূমিকা লইয়া অভিনয় করেন তাহার বিবরণ,—

সূত্রধার	ক্ষেত্রমোহন বসু
ভীমসিংহ	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
বলেন্দ্রসিংহ	প্রিয়মাধব বসু মল্লিক
সত্যদাস	কুমার আনন্দকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
জগৎ সিংহ	কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
নারায়ণ মিশ্র	বেণীমাধব ঘোষ
ধনদাস	মণিমোহন সরকার
দূত	বেণীমাধব ঘোষ
ভৃত্য	জীবনকৃষ্ণ দেব
কৃষ্ণকুমারী	কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
অহল্যাবাই	কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
তপস্বিনী	কুমার উদয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর
মদনিকা	রামকুমার মুখোপাধ্যায়
১ম সহচরী	শ্রীহীরালাল সেন
২য় সহচরী	নকুড়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পাথুরেঘাটার রাজবাড়ীতে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ের ঠিক পরেই পটলডাঙ্গা আড়পুলিতে "আড়পুলি-নাট্যসমাজ" স্থাপিত হয়। এখানে প্রথমে "মহাশ্বেতা" পরে "শকুন্তলা" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা" অভিনীত হয়। কেহ কেহ বলেন, এই দুই নাটক ছাতুবাবুর বাড়ীতে অভিনীত নাটকদ্বয় হইতে বিভিন্ন এবং এই সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি কর্তৃক রচিত। ১২৭৩ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে) এই সম্প্রদায়ের প্রথম অভিনয় হয়। ইহার পর এইদলে শ্রীযুক্ত নিমাই চরণ শীলের "চন্দ্রাবলী" নাটক ও "এঁরাই আবার বড় লোক" নামক প্রহসন অভিনীত হয়। "প্রাণীবৃত্তান্ত" প্রণেতা সাতকড়ি দত্ত এই দলের সম্পাদক (সেক্রেটারী) ছিলেন।

যে সময়ে বাগবাজারে নগেন্দ্রবাবুদিগের বাজনার দল খুব জোরে চলিতেছিল, সেই সময়ে সিমলা শুঁড়ীপাড়ায় শুঁড়ীদিগেরই বাড়ীতে পদ্মাবতী অভিনয়ের এক অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বাগবাজারের বাজনার দলের নগেন্দ্রবাবু আসিয়াই এখানে শিক্ষকতা এবং নিজে কঞ্চুকী সাজিয়া অভিনয় করিতেন। উত্তর কালের ন্যাশানাল থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রবাবুর প্রথমাভিনয়ের পরিচয় এই। ১২৭৩ সালের প্রথমে (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দেই) এই দলের প্রথমাভিনয় হয়।

এই সময়ে কলিকাতায় নাট্যামোদের একটা প্রবল স্রোতঃ বহিয়াছিল। প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা হইয়াছিল। তন্মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের বিবরণ সংগৃহীত হয় নাই, হওয়াও সুসাধ্য বা সম্ভবপর নহে। এই সময়ে কলিকাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুর এবং শিবপুরেও নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা হইয়াছিল।

পাথুরেঘাটায় বিদ্যাসুন্দর অভিনয় হইবার সময়ে জোড়াসাঁকো ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে এক নাট্যসমাজ স্থাপিত হয়। ইহার নাম "জোড়াসাঁকো অবৈতনিক নাট্যসমাজ।" গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উভয় পুত্র ৺গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার পৃষ্ঠপোষক। কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণ বিহারী সেন ও প্যারীচাঁদ মিত্রের পুত্র হীরালাল মিত্র এবং গুণেন্দ্রবাবু পরামর্শ করিয়া মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী অভিনয়ের প্রস্তাব করেন। আখ্‌ড়াই ও রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত আরম্ভ হয়। শেষে গণেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে কোন সমাজ-হিতকর নাটকাভিনয়ের কল্পনা হয়। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি নাটকের ন্যায় নূতন কোন সামাজিক নাটকের জন্য ইহারা চেষ্টা করেন। শেষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে ২০০৲ পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বহু বিবাহ সম্বন্ধে নাটক লেখাইবার ব্যবস্থা করা হয়। তখনকার অগ্রণী নাটককার রামনারায়ণ তর্করত্ন "নবনাটক" লিখিয়া আনেন। ১২৭৩ সালের ২৩ বৈশাখ তারিখে প্রকাশ্য সভায় তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। ৺প্যারীচাঁদ মিত্র সভাপতি ছিলেন। ইহার পর গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ একটি কমিটি করিয়া সেই নাটকের অভিনয় করিতে অগ্রসর হইলেন। কমিটিতে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺শ্রীনাথ ঠাকুর, (৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺রাধানাথ ঠাকুরের পৌত্র), শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নীলকমল মুখোপাধ্যায় ছিলেন। ১২৭৩ সালের ২২ পৌষ (১৮৬৭।৫ই জানুয়ারী) ইহার প্রথম এবং ১২৭৩।১২ ফাল্গুন (১৮৬৭।২০ ফেব্রুয়ারী) ইহার শেষ বা নবম অভিনয় হয়।

অভিনেতৃবর্গের নাম

গণেশবাবু	অক্ষয়কুমার মজুমদার।
সুধীর	সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
বিধর্ম্মবাগীশ	আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
চিত্ততোষ	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।
গ্রাম্য	শৈলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ঘোষো	ঐ

নাগর	নীলকমল মুখোপাধ্যায়।
নট	ঐ
দণ্ডাচার্য্য	ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়।
কৌতুক	মতিলাল চক্রবর্ত্তী।
সুবোধ	বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
সাবিত্রী	সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
চন্দ্রলেখা	অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
অচলা	থাকভূষণ মুখোপাধ্যায়।
কমলা	দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
বিমলা	রাধাবিনোদ চট্টোপাধ্যায়।
চপলা	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
চন্দ্রকলা	মণিলাল মুখোপাধ্যায়।
সাধ্বী	রামগোপাল মজুমদার।

এই অভিনয় এপর্য্যন্ত অভিনীত সমস্ত পুস্তকের অভিনয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুসঙ্গত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তফী মহাশয় বলেন, এই অভিনয় দেখিয়াই তাঁহার অভিনয় সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিবার শুনিবার ও জানিবার বাকী ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইয়া গেল। এই অভিনয়ের সুখ্যাতি কলিকাতার সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

[ক্রমশঃ

শোপেনহয়ারের দুঃখবাদ

শ্রীমনীন্দ্র দত্ত

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক অর্থার শোপেনহয়ারের বিচিত্র জীবনী পর্যালোচনা করলে জানা যায়, তরুণ বয়সে পিতার আত্মঘাতী হবার পরে মায়ের উচ্ছৃংখল জীবনযাত্রার প্রতিবাদে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যান এবং তারপরেও তার মা আরও দীর্ঘ চব্বিশ বছর বেঁচে থাকা সত্বেও একটি দিনের জন্যও মার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি। তিনি কখনও দারপরিগ্রহ করেন নি। পারিবারিক জীবনের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত বাস করেছেন একটি বোর্ডিং হাউসে। বন্ধুবান্ধব তাঁর কেউ ছিল না। একটি মাত্র সঙ্গী ছিল তাঁর প্রিয় কুকুর—যার নাম আদর করে রেখেছিলেন 'আত্মা।' শহরের বাচালরা অবশ্য কুকুরটির নাম দিয়েছিল 'ইয়ং শোপেনহয়ার।'

ছাত্রজীবনে ইওরোপে থাকা কালে তৎকালীন ইও-রোপের যে দুর্বিসহ শোচনীয় দৃশ্য তাঁর চোখে পড়েছিল তার বীভৎসতা পাষাণের অক্ষরে লেখা হয়ে গিয়েছিল তরুণ শোপেনহয়ারের মনের পটে। ফ্রান্সের মহাবীর নেপো-লিয়নের ইওরোপ আক্রমণ ও তাঁর প্রতি-আক্রমণের ফলে সারা ইওরোপের তখন নাভিশ্বাস উঠেছে। মস্কো পুড়ছে। সুদূর সেণ্ট হেলেনার নির্জন দ্বীপে ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস ফেলছে নেপোলিয়নের বিশ্বজয়ী কামনা। বোলোন থেকে মস্কো পর্যন্ত প্রতিটি দগ্ধ শস্যক্ষেত্র, প্রতিটি ভস্মীভূত গৃহ আর প্রতিটি সৈনিক-কবর যেন অ,র্তকণ্ঠে ঘোষণা করছে—জগৎ ও জীবনের চরম ব্যর্থতার বাণী।

ব্যক্তিগত জীবন ও পারিপার্শ্বিক জগতের এই পটভূমিকায়ই শোপেনহয়ারের দার্শনিক দুঃখবাদ ও জীবন-বিতৃষ্ণার জন্ম। দর্শনের ইতিহাসকার রাইট লিখেছেন : It was the sight of the great distress of the poor in Central Europe during the

economic depression subsequent to the Napoleonic wars that made him a pessimist. আবার উইল ডুরান্ট লিখেছেন : A man who has not known a mother's love—and worse, has known a mothers hatred—has no cause to be infatuated with the world. কিন্তু শোপেনহয়ারের দুঃখবাদ কেবলমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা ব্যর্থতার প্রতিফলন, এ ধারণা করা সমীচীন হবে না। দর্শনশাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্য। বিশেষ করে প্রাচীন গ্রীসের প্লেটো আর আধুনিক জার্মেনীর কান্ট—এই দুই দিক্‌পাল দার্শনিকের দর্শন-গ্রন্থসমূহ তিনি পাঠ করেছেন সত্যসন্ধানীর গভীর মনোনিবেশ সহকারে। তাই তাঁর দুঃখবাদের কারণ তিনি অনুসন্ধান করেছেন জগৎ ও জীবনের মূলতত্ত্বের গভীরে। একটা বিস্তারিত দার্শনিক বিশ্লেষণের উপরে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ The word as will and idea-র প্রতিটি ছত্রে প্রতিটি অধ্যায়ে প্রগাঢ় মনীষা ও প্রখর বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আর সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য তাঁর প্রদীপ্ত ও স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গী। যেন দর্শনশাস্ত্রের জটিল আলোচনাই নয়। সহজ সরল ঋজু। তাঁর সামগ্রিক মতবাদের মূল কথা : জগতের মূলাধার হচ্ছে ঈপ্সা। ঈপ্সা থেকে সঞ্জাত হয় সংঘর্ষ। আর সংঘর্ষ থেকে দুঃখ। কি সেই দুঃখনাশের প্রকৃষ্ট পন্থা ? ঈপ্সার বিনাশ। নির্বাণ। সহসা শুনলে মনে হবে—কাণ্ট, হেগেল, স্পিনোজার দেশের মানুষের কণ্ঠ নয়, কথা বলছে যেন প্রাচ্য ভারতের বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ !

শোপেনহয়ারের ঈপ্সা-দর্শনের বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এ প্রবন্ধে নেই। শুধু তার বিচিত্র প্রাণবান বক্তব্যের একটা সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র এখানে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি।

শোপেনহয়ার বলেছেন, এযাবৎকাল দার্শনিকরা একটা মৌলিক ভ্রান্তির বশবর্তী ছিলেন। তাঁরা ধরে নিয়েছেন, চিন্তা এবং চৈতন্যই মনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তাই মানুষকে তাঁরা বলেছেন rational animal. কিন্তু এ ধারণা ভুল। সচেতন বুদ্ধির অন্তরালে থেকে যে শক্তি মানুষকে প্রতি পদক্ষেপে পরিচালিত করছে সে তার দুর্বার সংগ্রামী ঈপ্সা বা will. যুক্তিসিদ্ধ বলেই একটা জিনিষ আমরা চাই না। বরং বলা চলে—জিনিষটি চাই বলেই তার স্বপক্ষে আমরা যুক্তি খুঁজি। ঈপ্সা যেন "একটি শক্তিমান্ অন্ধ মানুষ যে তার কাঁধে বয়ে বেড়ায় একটি চক্ষুষ্মান্ পঙ্গু লোককে।" লজিক দিয়ে কি কোন মানুষকে দিয়ে কিছু করানো যায় ? যায় না। কাজ যদি চাও—তাহলে আবেদন কর মানুষের স্বার্থের কাছে, তার ইচ্ছার দরবারে। খাদ্য সংগ্রহে, জীবন-সঙ্গীর সন্ধানে, আর সন্তানসন্ততির কামনায় যুগ যুগ ধরে মানুষের যে রক্তাক্ত সংগাম, সে তো তার বিচার বৈদগ্ধ্যের পরিচয় বহন করে না, তার একমাত্র নিয়ামক বেঁচে থাকবার ইচ্ছা, পরিপূর্ণ জীবনের তাগিদ—will to live and to live fully.

এই জীবন-ঈপ্সা শুধুমাত্র মানুষেরই অন্তরশায়ী মূল সত্তা নয়। মনুষ্যেতর যত জীব, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, এমন কি জড় পদার্থেরও মৌলিক সত্তা এই ঈপ্সা। একেই আমরা বলতে পারি মানবসাধনার বহু-আকাঙ্ক্ষার ধন পরম সত্তা। বিশ্বজগতের যত কিছু আকর্ষণ-বিকর্ষণ,—চৌম্বিক, বৈদ্যুতিক, মাধ্যাকর্ষণি,—সবই এই ঈপ্সার লীলামাত্র। যে-টানে গ্রহ-নক্ষত্র ঘোরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, যে-টানে জীব-জগৎ এগিয়ে চলে নব নব রূপ-পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে, যে-টানে প্রিয়তমা আকর্ষণ করে প্রিয়তমকে, সব—সবই সেই এক ঈপ্সারই বিচিত্র প্রকাশ।

বাঁচবার এই ইচ্ছা সর্বত্রগামী। এর একমাত্র শত্রু মৃত্যু। কিন্তু সেই সর্বধ্বংসী মৃত্যু পর্যন্ত এই ঈপ্সার কাছে পরাভূত হয়। 'মৃত্যু তার চরণ-বন্দনা করি মাগে পরাজয়। জীবমাত্রই মরণশীল। তবু নব নব জন্মের ভিতর দিয়ে মৃত্যুকে সে অতিক্রম করে। ব্যক্তির বিনাশ হয়। কিন্তু জীবন মৃত্যুহীন। তাই দেখতে পাই, প্রজনন-জীবনের অনিবার্য ধর্ম—তার প্রধানতম প্রবৃত্তি। এই প্রজনন-ধর্মের ভিতর দিয়েই ঈপ্সা মৃত্যুকে জয় করে।

কিন্তু হায় ! জীবনের এই সাধিক ঈপ্সাই জগৎকে দুঃখের আগার করে তুলেছে। সর্বম্ দুঃখম্ দুঃখম্। প্রথমতঃ অভাব থেকেই ঈপ্সার জন্ম। সাধ্যের চেয়ে সাধ সব সময়ই বড়। একটি সাধ যদি মিটল, দশটি সাধ অপূর্ণই রয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পুঞ্জীভূত হল ব্যর্থ-বাসনার বেদনা। তৃষ্ণা সীমাহীন, তৃষ্ণাপূরণের ক্ষমতা

বড়ই ক্ষুদ্র। শোপেনহয়ার লিখেছেন: এ যেন ভিখারীর ভিক্ষালাভ। সে ভিক্ষা তাকে আজ বাঁচিয়ে রাখে শুধু কাল পর্যন্ত তার দুঃখকে প্রসারিত করে দিতে।"

শুধু কি তাই? জীবন মানেই তো জীবন-সংগ্রাম। কবি টেনিসনের ভাষায়: Nature is red in tooth and claws. প্রকৃতির বুক জুড়ে চলেছে অবিশ্রাম রক্তাক্ত সংগ্রাম। অন্নের সংগ্রাম, প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, রাজ্যের সংগ্রাম। Homo homini lupus, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নেকড়ের সম্পর্ক। সুখ নেই, শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। সর্বম্ দুঃখম্ দুঃখম্।

কিন্তু এই সর্বব্যাপী দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণের কি কোন উপায় নেই? কোন পথ খোলা নেই ঈপ্সার এই রক্তাক্ত নখর থেকে আত্মরক্ষার? হয় তো আছে। সে পথ মৃত্যু—প্রয়োজন হলে আত্মহত্যা। এক কথায় ঈপ্সার বিলুপ্তি সাধন। কিন্তু হায়! আত্মহত্যাকে ভয় করে না জীবন। মৃত্যুকে দেখে সে হাসে। এক একটি স্বেচ্ছা-মৃত্যুকে অতিক্রম করে শত শত নব জন্ম। আত্মহত্যা অর্থহীন নির্বোধের কাজ। ব্যক্তির মৃত্যু হয়। কিন্তু পরম সত্তার? জীবনের? ঈপ্সার? সার্বিক নির্বাণের কোন পথ আছে কি?

একমাত্র পথ জীবনের উৎসমুখকে অবরুদ্ধ করা—ঈপ্সাকে জয় করা—ঈপ্সার প্রধানতম প্রকাশ প্রজনন-বাসনার বিনষ্টি সাধন করা। শোপেনহয়ারের নিজের কথায়: 'The satisfaction of the reproductive impulse is utterly and intrinsically reprehensible because it is the strongest affirmation of the lust for life' তাই মানুষ যত স্ত্রীজাতি সম্পর্ক রহিত হবে, ততই তার মঙ্গল। নারী-রূপের মোহ হতে মানুষ যতই মুক্তি লাভ করবে প্রজননের এই হাস্যকর অর্থহীন নাটকের ততই দ্রুত যবনিকা নামবে। কেন একই ব্যর্থ নাটকের পুনঃভিনয়ের এই হাস্যকর খেলা? কবে মানুষ এই ঈপ্সার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলতে পারবে: জীবনের মোহ মিথ্যা—মৃত্যুতেই পরম শান্তি? সেই দিন ঈপ্সার সার্বিক ক্লান্তি আর মনুষ্যজাতির চরম বিলুপ্তির ভিতর দিয়ে আসবে তার মোক্ষ।

স্বল্প কথায় এই হলো দার্শনিক শোপেনহয়ারের দুঃখবাদের ভূমিকা। শোনা যায় প্রথম জীবনে শোপেনহয়ার স্বেচ্ছাচারী যৌবনের পূজারী ছিলেন। কয়েকটি ব্যর্থ-প্রণয়ের ঘটনাও নাকি ঘটেছিল তার জীবনে। তাই কি তার রচনায় কৌমার্যের এত স্তুতিগান? তাই কি বিবাহিত জীবনের প্রতি তাঁর এত বিরাগ? তাই কি নারীজাতির প্রতি এত ঈর্ষা ও বিদ্বেষের ঝড় বয়েছে তাঁর লেখনীমুখে?

আরো শোনা যায়, পরিণত বয়সে ইন্দ্রিয় মোহমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই সব উচ্ছ্বাস অনেক পরিমাণে পরিমিত হয়েছিল—নিরংকুশ দুঃখবাদ ও জীবন-বিতৃষ্ণার উপরেও লেগে ছিল আশা ও আশ্বাসের প্রলেপ। শোপেনহয়ারের জীবনেতিহাস থেকেও এই ধরণের কিংবদন্তীর সমর্থন পাওয়া যায়। জীবনের একেবারে শেষের অধ্যায়ে এসে তিনি তাঁর দার্শনিক মতবাদের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। খ্যাতি ও যশের মুকুট উঠেছিল তার শুভ্র শিরে। ১৮৫৮ সালে তাঁর সপ্ততিতম জন্মদিবসে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ থেকেই তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করে অভিনন্দন এসেছিল। মাত্র কয়েকটি লাইনে তাঁর এ সময়কার একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন উইল ডুরান্ট: 'The great pessimist became almost an optimist in his old age; he played the flute assiduously after dinner, and thanked time for ridding him of the fires of youth.'

কবি সুরদাসের কাব্যের উৎস

গোপী ভট্টাচার্য

এমন কিছু আছে ভারতের মাটিতে—যার জন্য এখানকার মানুষ যুগ যুগ ধরে অনুসন্ধান করে চলেছে কোন আনন্দ-ঘন পরমাত্মাকে, যিনি সকল রসের আকর, নিজেকে দুর্লভ করবার জন্যে মানুষের ভীড় থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে লক্ষ লক্ষ কামনা বাসনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন মানুষকে। তথাপি জলহাওয়ার গুণেই বোধহয় এখানকার মানুষ সেই অরূপরতনকে লাভ করবার জন্যেই জাগতিক মায়ার বন্ধনকে তুচ্ছ করে তাঁর দিকেই ধাবিত হচ্ছে। শিশুকে রঙীন খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখার মতই এ জগতের কামনা-বাসনা। কিন্তু যেশিশু সেই রঙীণ খেলনা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কেঁদে চলে সে পাবেই মাকে। অর্থাৎ সেই শিশুর জননী নিজেই আর স্থির থাকতে পারবেন না। শিশুকে কোলে নিয়ে আদর দিয়ে তাকে শান্ত করবেনই। ভারতের মাটিকে সিক্ত করেছে এই সরল বিশ্বাস। এই শিশুদের কান্নায় জগত জননী কি না এসে থাকতে পারেন? কাজ ফেলে তাঁকে ছুটে আসতেই হবে।

আবার আর এক ধারা হোল প্রেম। চোখের জল এ পথেরও পাথেয়। চোখের জলে ভালোবেসে যাওয়া। নীরবে নির্জনে নিরন্তর প্রেম নিবেদন করা। এ প্রেমের টানও এমনি যে প্রেমঘনকে ছুটে আসতেই হবে প্রেমিকের কাছে। কোন ফাঁকি নেই এ বিশ্বাসের মধ্যে। সহজ সরল সত্য বিশ্বাস। তবে কাঁদার মত কাঁদতে হবে। ভালোবাসার মত ভালোবাসতে হবে। যুগে যুগে ভারতের মাটিতে এই পথে কত মানুষ লাভ করেছে বিশ্বজননীকে, প্রেমঘনকে। যে পাওয়ার মধ্যে আছে অনন্ত শান্তি, অনাবিল আনন্দ। যার ছোঁয়ায় মনে প্রাণে উথলে ওঠে রসের সাগর। এমনি এক প্রেমিক হলেন কবি সুরদাস। অষ্টছাপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। আনুমানিক ১৪৮৪ খৃঃ (১৫৪০ বিক্রমাব্দ) রুণকতা গ্রামে জন্ম হয় তাঁর। সাত ভাই এর মধ্যে কনিষ্ঠ সুরদাস। বংশ পরিচয়ে জানা যায় সুরদাস পৃথ্বীরাজের সভাকবি বিখ্যাত রাসো রচয়িতা সারস্বত ব্রাহ্মণ কবি চন্দের বংশ সম্ভূত। সুতরাং সুরদাসের মধ্যে বাল্যকাল হতে যে কবিত্ব শক্তির উন্মেষ হয় তার মূলে রয়েছে তাঁর পূর্বপুরুষের সংস্কার। শোনা যায় যে, সুরদাসের ছয় ভাই ও আত্মীয়স্বজন যুদ্ধে নিহত হন। সেই সময় মুসলমান আধিপত্য বিস্তারের যুগ। সুরদাস একরকম নিরাশ্রয় হয়ে সহায় সম্বলহীন হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে অন্ধকার রাতে এক কূপের মধ্যে পড়ে যান। সেখান থেকে উদ্ধার পাবার আশায় তিনি একান্তভাবে ভগবানকে ডাকতে থাকেন। শেষে ভক্তের ডাকে ছুটে আসেন ভগবান। এই ঘটনায় অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায় সুরদাসের। মুখে মুখে শ্রীহরির লীলা মাহাত্ম্য রচনা করে সুর সংযোগে তা গেয়ে শোনাতে থাকেন সকলকে।

বল্লভাচার্য এই সময়কার একজন খ্যাতিমান পণ্ডিত। বেদ ও উত্তর মীমাংসার ভাষ্যকাররূপে তিনি তখন বিদগ্ধজনের শ্রদ্ধাভাজন। তিনি প্রতিপন্ন করলেন নিরুপাধি ব্রহ্মই সৃষ্টি লীলার অন্যতম কারণ। জীবের জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ বিশেষ। জড় শুধু সৎময়। চিৎ ও আনন্দ নেই এখানে। কেবল পরব্রহ্ম কৃষ্ণই নিত্য ও সচ্চিদানন্দময়। কৃষ্ণ লীলা আদি অন্তহীন। জীবনকাল একমাত্র তাঁর "পুষ্ট"তেই (অনুকম্পাতেই) গোলকের নিত্য বৃন্দাবনে গমন করতে পারে। তাই বল্লভাচার্য ঘোষণা করলেন "পুষ্টিমার্গ' একমাত্র পথ। যা ভিন্ন জীবের সচ্চিদানন্দ অনুকম্পা লাভের আশা নেই। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ যাকে পোষণ করছেন তার আর অন্য বিগ্রহ তোষণের আবশ্যক কি? কৃষ্ণের অনুকম্পা লাভই

জীবের একমাত্র আশ্রয়। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে নিজের পুষ্টিমার্গের কথা প্রচার করলেন বল্লভাচার্য।

আগ্রা মথুরার কাছে গউঘাট নামে এক গণ্ডগ্রামে তখন সুরদাস হরিকীর্তন করে চলেছেন নিত্য। বৃন্দাবনের পথে যেতে বল্লভাচার্য শুনলেন সুরদাসের মধুঢালা কণ্ঠের লীলা সঙ্গীত। মুগ্ধ হলেন আচার্য। দেখলেন ভজনরত ভক্তকে। তাঁর দুচোখে অবিরাম ধারা। আচার্য ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন সুরদাসকে। আচার্য বললেন—আমার সারাজীবনের পরিশ্রম আজ সার্থক। এতদিনে একজন সত্যিকার প্রেমিকের দেখা পেলাম। বুঝতে পারছিনা আজ আমি—কে ধন্য।

বল্লভাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন সুরদাস। তারপর গুরু আর শিষ্যে অতিবাহিত করলেন কয়েকদিন কৃষ্ণ গুণগানে। আচার্য অবশেষে বুঝলেন মহার্ঘ রত্ন এই সুরদাস। যে জন মুখে মুখে অজস্র পদ রচনা করে সুললিত সুর সংযোগে নিবেদন করতে পারে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে, তার স্থান লোকচক্ষুর অগোচর এই গউঘটে নয়—তাঁকে বসাতে হবে কৃষ্ণের লীলা নিকেতন বৃন্দাবনে। যেখানে প্রেমিকের অশ্রুযমুনায় কেলী করবেন কালোবরণ।

গুরুর আদেশে বৃন্দাবনে চলে এলেন সুরদাস। বল্লভাচার্যের আদেশে তাঁর শিষ্য পুরণমল ছত্রী ১৫২০ খৃঃ নির্মাণ করে দিয়েছেন শ্রীনাথজীর বিরাট মন্দির। এই মন্দিরে এসে উঠলেন সুরদাস। দিনরাত কৃষ্ণলীলা কীর্তনে মেতে উঠল গোবর্ধন। সুরদাসের সুরের টানে শ্রীনাথজীর মন্দিরপ্রাঙ্গণ ভক্তসমাগমে পূর্ণ হয়ে উঠল।

সারাটি জীবন সুরদাস এখানেই অতিবাহিত করেন। এখানে বসেই তিনি নিত্য নতুন পদ রচনা করেছেন আর তাতে সুর সংযোজনা করে শুনিয়েছেন সমাগত রসিক জনকে। তাঁর রচিত পদাবলীর সংখ্যা প্রায় তিন সহস্রের কাছাকাছি। সেই সমস্ত পদাবলীর একমাত্র বিষয় বস্তু হোল বালক কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা। ভাব ও ভাষার লালিত্যে পদগুলি এত উচ্চাঙ্গের ও এত মর্মস্পর্শী যার আর তুলনা হয় না। শেষজীবনে আবার তিনি অন্ধ হয়ে যান। আজীবন শ্রীনাথজীর মন্দিরে ভজনা করে ১৫৬৪ খৃঃ গোবর্ধনের কাছে পারসৌলী গ্রামে তাঁর দেহত্যাগ হয়। মৃত্যুকালে বল্লভাচার্যের পুত্র বিঠ্‌লনাথ গোস্বামী ভক্ত প্রেমিকের চির বিদায় গ্রহণে চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন। তিনি বলেছিলেন :—

এতদিন তোমার প্রেমের ছত্র ধরে আমাদের বিরহ আতপ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলে—তোমার তিরোধানে আজ থেকে বৃন্দাবন ছত্রহীন হোল।

এই বিঠলনাথ গোস্বামী যে আটজন কৃষ্ণভক্ত কবিকে শ্রেষ্ঠ বলে 'অষ্টছাপ' ঘোষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন সুরদাস। তারপর যথাক্রমে নন্দদাস, কুম্ভনদাস, তাঁর পুত্র—কৃষ্ণদাস, পরমানন্দ দাস ছীতস্বামী, গোবিন্দ দাস ও চতুর্ভূজ দাস।

ভারতীয় সাহিত্যে ভক্তি কাব্যের যুগে যে সব কবি নিজেদের রচনা নৈপুণ্যে অমর হয়ে আছেন সুরদাস তাঁর মধ্যে অন্যতম প্রধান। সুরদাস কবি হবার জন্যে সাধনা করেননি। যে কাব্য প্রবাহ তাঁর মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ঝরণা ধারায় বেরিয়ে এসেছে তার জন্যেও তাঁকে সাধনা করতে হয়নি। তিনি যেন একখানি বীণাযন্ত্র। বীণকার স্বয়ং কৃষ্ণ। সুরদাসরূপী বীণায় দিনরাত সেই পরম বীণকার ঝংকার তুলেছেন।

সুরদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি একজন সাধক কবি। তাঁর নিষ্কাম ভক্তির মধ্যে দিয়ে, সুর ও সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে যে কাব্যপ্রবাহ নির্গত হয়ে এসেছে, কাব্য জগতে তা আজ অমূল্য হয়ে আছে। সুরদাস জন্মকবি। তাঁর মুখ দিয়েই যেন পূর্ণব্রহ্ম নিজের বাল্যলীলা বর্ণনা করে গেছেন। সংসারের মধ্যে বাস করেও সুরদাসের রচনার মধ্যে কোথাও দৈহিক কামনা বাসনার ছায়া মাত্র পড়েনি। পুনরুক্তি দোষ ঘটেনি। পদাবলীর পর পদাবলীতে শুধু—বৈচিত্র্য আর নূতনত্ব। ভারতীয় সাহিত্যে কৃষ্ণ-লীলা বর্ণনার যে মাধুর্য সুরদাসের রচনার মধ্যে আছে তার সমকক্ষ আর কোন রচনা আছে বলে মনে হয় না। সুরদাস তাই কবি হিসেবে অদ্বিতীয়—অতুলনীয়। কবির সমস্ত রচনাই ব্রজভাষায় রচিত। সুরদাসের হাতে পড়ে ব্রজভাষা এক নূতন সমৃদ্ধ ভাষায় পরিণত হয়। সুরদাসের পরবর্তী কবিরা প্রায়ই ব্রজভাষার কাব্যরচনায় প্রয়াসী হয়েছেন।

সুরদাসের কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে সুরদাস কোন দীর্ঘ কাব্য গ্রন্থ রচনা

করেননি। খণ্ড খণ্ড আকারে কৃষ্ণের বাল্য-লীলাকে বিষয়-বস্তু করে অজস্র সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর সহস্রাধিক পদাবলী যে গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তার নাম সুরসংগ্রহ বা "সুরসাগর"। দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম—"সাহিত্যলহরী" এবং তৃতীয় গ্রন্থের নাম "সুরসারাবলী"। এই সুরসারাবলী গ্রন্থ কবির ৬৭ বৎসর বয়সের রচনা একথা সুরদাস নিজেই স্বীকার করে গেছেন। উক্ত তিনখানি পদাবলী গ্রন্থের মধ্যে "সুর সাগর" সমধিক প্রসিদ্ধ ও রসিক-চিত্তহারী। নন্দ-যশোদার বাৎসল্য, কৃষ্ণের প্রতি গোপ-বালাদের প্রেম, কৃষ্ণদর্শনের জন্য আকুলতা প্রভৃতি মধুর দিকটি সুরসাগরের সহস্রপদের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে—

"মৈয়া করহি বঢ়েগী চোটী
কিতীবার মোহি দুধ পিয়ত ভঈ
য়হ অজহুঁ হৈ ছোটী।"

বালক কৃষ্ণ মা যশোদাকে বলছেন, মাগো! আমার কেশচূড়া কতদিনে বড় হবে বল না? দুধ খেয়ে খেয়ে কতদিন হয়ে গেল, কিন্তু আমার কেশ-চূড়া সেই আগের মত ছোটই রয়ে গেল। বলনা মা কবে আমার কেশ লম্বা হবে। বেণী বাঁধার মত হবে?

"তূ জো কহতি বল কী বেঁণ্যা,
কৈহৈ লাঁবী মোটি।
কাঢ়ত গুহত অহ্বাবত ওঁছত,
নাগিন সী ভূঁই লোটি।"

—তুমি রোজই বল দাদার (বলরামের) মত আমারও বেণী হবে। আঁচড়াতে, বিনুনী করতে, ধুতে, মুছতে, নাগিনীর মত মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, কিন্তু কোই? কিছু হচ্ছে না তো? আর কবে হবে?

"কাঁচো দূধ পিয়াবত পচি-পচি
দেত ন মাখন রোটী।
সুর স্যাম চির জিব দৌউ ভৈয়া
হরি হলধর কী জোটি।"

—দাদার মত আমার বেণীও লম্বা হবে বলে রোজ তুমি আমাকে ঘটি ঘটি কাঁচা দুধ খাওয়াও। আমার কাঁচা দুধ খেতে একটুও ভালো লাগে না। আমার ভালো লাগে শুধু মাখন আর রুটি খেতে। তা তুমি কিছুতেই খেতে দাও না আমাকে। সুরদাস বলছেন, হরি আর হলধর এই দুই ভাই যেন চিরজীবী হয়।

"মৈয়া মোহি দাউ বহুত খিনায়ো
মোসো কহত মোল কো লীনী
তোহি জসুমতি কব জায়ো?
গোরে নন্দ যশোদা গোরী,
তুম কত স্যাম শরীর?"

—একদিন বালক কৃষ্ণ অভিমানভরে মা যশোদার কাছে নালিশ জানালেন—দাদা আমায় যা তা বলেছে। আমাকে বলে আমি নাকি তোমার ছেলে নই। আমাকে নাকি তুমি কিনে এনেছ? আর বলেছে বাবা (নন্দ) ফর্সা, তুমি ফর্সা, দাদাও ফর্সা—তবে আমি কালো হলাম কেন? দাদার কথা কি সত্যি মা?

সহস্রপদের মধ্যে বালক কৃষ্ণের এমনি কত মান-অভিমান, এদের আব্দারের নিখুঁত চিত্র মধুর ভাষায় অঙ্কন করা আছে—যা পড়তে পড়তে মনপ্রাণ আপনা হতেই অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শীর মত সুরদাস এইরূপ মাধুরী বর্ণনা করেছেন।

প্রেমভক্তিই কবি সুরদাসের কাব্যের উৎস একথা নিঃসন্দেহে বলা হয়। প্রেমের স্পর্শ আছে বলেই সুরদাসের কাব্য বিশ্বের রসিক মনকে সিক্ত করতে পেরেছে। শুধু ভারতীয় সাহিত্যে কেন, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের মাপকাঠিতে বিচার করলে সুরদাসকে একজন উচ্চপর্যায়ের মহাকবি আখ্যায় ভূষিত করলেও বোধহয় তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হয় না। তিনি সর্বকালের সর্বজাতিরও সর্ববর্ণের চির-অমর কবি। তাঁর মত আদর্শবান্ প্রকৃত কবির কাব্য আরো ব্যাপকভাবে অনুশীলন করবার দিন এসেছে। সুরদাসের কাব্য বিশ্বের ঘরে ঘরে নিত্য পূজার বস্তু।

গুজব ও হুজুক

শ্রীজয়দেব রায়

সাধারণ মানুষ গুজব ও হুজুক ভালবাসে। এ বাতিকটি সামাজিক মানুষের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। একসঙ্গে কয়জন মিললেই নিজেদের মধ্যে যেসব আলোচনা হয়, সেগুলির মধ্যে গুজবই থাকে বেশী। ক্রমে বৈঠকে বৈঠকে গুজব ছড়িয়ে পড়তে থাকে। প্রতিবেশীদের কুৎসা, সরকারের নিন্দা, সিনেমা অভিনেত্রীদের রূপগুণ—এগুলিও লোকমুখে শোনা গুজবের উপরেই নির্ভর করে।

রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে সামাজিক জীব এই কুৎসা-গুজব রটনা করে আসছে। শ্রীরামচন্দ্রকে স্বয়ং এই গুজবের ভয়ে সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করতে হয়। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 'অশ্বত্থামা হত' এই গুজব প্রচার করেই দ্রোণাচার্যকে ঘায়েল করা হয়।

এই শ্রেণীর গুজব ঐতিহাসিক যুগে বহু চলিত ছিল—মহারাজ লক্ষ্মণ সেন সপ্তদশ পাঠান অশ্বারোহীর ভয়ে সিংহাসন ছেড়ে নাকি পালিয়ে যান—এ গুজব বহুদিন ধরে চলে এসেছে। অন্ধকূপহত্যাটা ইংরেজ লেখকদের রটানো একটা গুজব—সিরাজকে মহাদুর্জন বানানোর জন্যে। এই গুজবের উপর নির্ভর করে স্মৃতিস্তম্ভও তোলা হয়েছিল। সিপাই বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় একটি গুজব থেকে—বুলেটের কার্তুজে গোরু-শূকরের চর্বি আছে বলে রটে গেল—দাঁত দিয়ে তা কাটতে হত, সিপাইরা ধর্ম যাবে এই ভয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল।

যুদ্ধের সময়ে প্রচার বা 'প্রপাগ্যাণ্ডা' একটি বিরাট অস্ত্র—যত রকম ভাবে শত্রুপক্ষকে হেয় ক'রে তার পরাজয় সংবাদকে ফলাও করে বর্ণনা করা হয়, তাদের অত্যাচারের কল্পিত কাহিনী প্রচার ক'রে প্রতিপক্ষের মনোবলকে দুর্বল ক'রে দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়।

গত যুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার নিয়ত প্রচার করত 'গুজবে কান দেবেন না'। সে সময়ে গুজব ছড়ানোর জন্যে শাস্তিও দেওয়া হত। কিন্তু অত বিপুল পরিমাণ গুজব আর কোন সময়ে উৎপাদিত হয় নি। মানুষের মন তখন শঙ্কিত, জাপানী বোমা পড়বার বেশ সম্ভাবনাও ছিল, কাজেই জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করবার সঙ্গে সঙ্গে গুজব রটে গেল—জাপানীরা এগিয়ে আসছে, অমনি কলকাতা ফাঁকা হয়ে গেল। সমস্ত লোক যেভাবে প্রাণ ভয়ে দিগ্‌বিদিকে ছুটেছিল আজ তা ভেবে বিস্ময় লাগে। কিন্তু গুজবেরও একটা সময় আছে—মানুষ তিক্তবিরক্ত হয়ে যখন আবার কলকাতায় ফিরে আসতে লাগল তখন সত্যিই বোমা পড়ল। কিন্তু ভয় তখন ভেঙে গিয়েছে।

হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার সময়ে যতটা সত্যিকারের সংঘর্ষ হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী ভয়াবহতা সৃষ্টি করেছিল এই গুজব। বলতে কি দাঙ্গা হাঙ্গামাকে জিইয়ে রেখেছিল এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির দ্বারা প্রচারিত গুজব। খুন-জখম, দাঙ্গাহাঙ্গামা, চুরিডাকাতি, রাহাজানি আকসারই হয়—এগুলির সম্বন্ধে যতটা গুজব রটে ততটা কিন্তু নয়।

গুজবের মূলে কতকটা সত্য হয়তো থাকে, এই সত্য লোক মুখে মুখে অতিরঞ্জিত হতে থাকে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে গল্প বানাবার একটা লিপ্সা আছে, সামান্য ঘটনা কি হলে তার মনোমত হত সে তাই কল্পনা করে নেয়। সুরেন-বাবুর পায়ে পিঁপড়ে কামড়ালে তিনি পা চুলকাচ্ছিলেন—কথাটা অতিরঞ্জিত হতে হতে জনার্দনবাবুর কানে গিয়ে পৌঁছালো যে তাঁকে কাল কেউটে কামড়েছে, বাঁচার আর আশা নেই। কথায় বলে যা 'রটে তার অর্ধেক তো বটে—' কিন্তু অর্ধেক সত্যের উপর এত প্রলেপ পড়ে যে, তা আর চিনবার উপায় থাকে না।

নির্বাচনী যুদ্ধের সময়েও এই গুজব অস্ত্র দিয়ে প্রতি-পক্ষকে হেয় করার চেষ্টা করা হয়। উভয় পক্ষ উভয়-পক্ষকে বিদেশী রাষ্ট্রের বা মুনাফাখোরদের দালাল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। গণপতিবাবু শেঠ চমনলালের কাছ থেকে দেড় লাখ টাকা ঘুষ নিয়েছেন—খবরটা এমনভাবে রটতে লাগল যে, সবাই শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেও ফেলল। শেষকালে গণপতিবাবু হেরেও গেলেন, কপর্দকশূন্য হয়ে

পড়লেন, না খেতে পেয়ে মারাও গেলেন। কিন্তু তখনও লোকের বিশ্বাস তিনি সেই দেড়লাখ টাকা পেয়েছেন।

গুজব মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে এমন ভাবে বিকল ক'রে দেয় যে, কেউ বিচার ক'রে ভেবেচিন্তে দেখে না, সত্যের সন্ধান বা উদ্ধার করবার চেষ্টাও করে না। আগে বিশ্বাস ছিল—বুঝি অশিক্ষিত লোকের মধ্যে এসব গুজব সৃষ্টি হয়, কিন্তু তা নয়। তবে শিক্ষিত লোকেদের গুজব শিক্ষিত ধরণের।

পরীক্ষার সময়ে ছাত্রদের মধ্যে নানা গুজব রটে, বহুবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছে এই ধরণের গুজব রটায় অনেকে বিভ্রান্ত হয়েছে। ছাত্রদের অবচেতন মনে প্রশ্নপত্র ফাঁস হোক এই ধরণের একটা ইচ্ছা থাকে—আর তা থেকেই এ শ্রেণীর গুজবের জন্ম হয়। এই গুজবে ক্ষতি হয় খুব, অনেক ছেলে ঐ গুজবের প্রশ্ন নিয়েই পরীক্ষার আগের ২৮ ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়, অন্য কিছু পড়ে না।

কতকগুলি গুজবের সৃষ্টি এইভাবে মনোগত ইচ্ছা আর চিরকালীন বিশ্বাস থেকে। মেয়েদের মনে এই ধরণের গুজবের চলন খুব বেশী। শাশুড়ী বউকে পছন্দ করবে না —এটাই তারা স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়, তা থেকে বুড়ী বউটাকে খেতে দেয় না—এমন কি বুড়ী ভালমানুষ বউটাকে ধরে ধরে ঠেঙ্গায়', 'খুন্তি গরম ক'রে ছেঁকা দেয়' ইত্যাদি গুজবের সৃষ্টি।

অনেক সময়ে রাগ, রোষ বা হিংসা থেকে এ শ্রেণীর অপবাদের সৃষ্টি হয়। যে লোকটার উপর আমার আক্রোশ আছে তাকে যতদূর সম্ভব অসৎ, ধূর্ত, দুর্জন প্রমাণ করবার জন্য তার বিরুদ্ধে মিথ্যা গুজবের সৃষ্টি করা হয়। এধরণের অকারণ আক্রোশ থাকে বিত্তশালীদের উপর দরিদ্রদের; পণ্ডিতদের উপর মূর্খদের। দরিদ্র চেষ্টা ক'রে ধনীকে কঞ্জুষ বানাবার, মূর্খেরা চেষ্টা ক'রে পণ্ডিতদের চরিত্রহীন বানাবার। অপরের টাকা সকলেই বেশী দেখে।

গুজব রটল ঘুষ নিয়ে শিবদাসবাবু ৫ লাখ টাকা জমিয়েছে, মারা গেলে দেখা গেল দেনার দায়ে তার বিক্রি হয়ে গিয়েছে মাথার চুলও। রথীনবাবুও ঘুষের চার্জে পড়েন—পুলিশ তদন্ত হয়, ব্যাঙ্কে তাঁর সামান্য কিছু টাকা ছিল, তিনি বেকসুর খালাস পেলেন, কিন্তু সেই যে রটে গেল ব্যাঙ্কে তাঁর ৬০ লাখ টাকা ছিল, তা থেকে তাঁকে বিশ লাখ খরচ করতে হয়েছে।

গুজব রটানোর মধ্যে অনেক সময়ে স্বার্থ থাকে। গুজব রটিয়ে বাজারদরের তারতম্য ঘটায় স্বার্থপ্রণোদিত ব্যক্তিরা। গুজব যারা শোনে তাদের কাছে বিষয় বস্তুর গুরুত্বের তারতম্য আছে। যেমন, মনোজবাবু লটারিতে তিনলাখ টাকা পেয়েছেন—মনোজবাবুকে যদি আপনি না চেনেন এই গুজব নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। প্রকৃত তথ্য পরীক্ষার অভাবে অনেক সময়ে গুজবের গুরুত্ব কমে যায়। ফিনল্যাণ্ডে একটি লোকের দুটি মাথা—এ ধরণের খবর কাগজে প্রকাশিত হয়, কিন্তু তথ্য নির্ণয় সহজ নয় বলে কেউ বিশেষ গুরুত্ব দেয় না।

গুজবের প্রসঙ্গে হুজুকের কথা ওঠে—এক এক সময়ে দেশে এক একটা হুজুক আসে—দেশের সবাই তাতে মেতেও ওঠে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র এরকম দেখা যায়। যেখানে কোন লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্য নেই, হৃদয়ের যোগ নেই, আন্তরিকতা নেই, লাভ ক্ষতির হিসাব নেই—বিচার বিবেচনা ছাড়া কিছু নিয়ে গতানুগতিক মাতামাতি গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসান তাই হুজুক।

রবীন্দ্রজয়ন্তীর হুজুক, শতবার্ষিকীর হুজুক, রবীন্দ্রনাথের লেখা না পড়ে, না বুঝে! অসহযোগ আন্দোলনে কতকটা হুজুক ছিল, কারণ, জাতীয়তা বোধ বা প্রকৃত দেশভক্তি তখন ছিল না। সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস, ট্রাম পোড়ানো, বাস পোড়ানো হুজুক। নব্য কবিদের কবিতা না বুঝে নির্বিচারে তাই নিয়ে মাতামাতি, কাগজে কাগজে বাড়াবাড়ি করা এবং আগেকার কবিদের গালাগালি করাও হুজুক ছাড়া কিছু নয়।

সার্বজনীন পূজার নামে হুজুক—কারণ, এ পূজায় ভক্তি নেই, ধর্মজ্ঞান নেই। নগরকীর্তনের হুজুক, দোলের হুজুক—সবাই মিলে রাস্তায় রাস্তায় উধ্বর্বাহু হয়ে কীর্তন করা হুজুক ছাড়া আর কিছু নয়! বাজি পোড়ানোর হুজুক লাগে প্রত্যেক বৎসর কালীপূজার সময়ে। পুণ্য যোগে গঙ্গাস্নানের হুজুকে সারা দেশ এসে জোটে কালীঘাটে।

প্রতি বৎসর কলিকাতায় ফুটবল খেলার এক হুজুক আসে, ছেলেবুড়ো সবাই রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, পুলিশের গুঁতো খেয়ে ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি করে—এ-ও তো হুজুক।

হুজুকের প্রধান যোগানদার খবরের কাগজ, তারা নানাভাবে পাঠকদের হুজুকে মাততে উৎসাহিত করে। 'জন অভিমত' সৃষ্টি করার মালিক তো তারাই।

কলকাতা হচ্ছে হুজুকের একটা প্রধান আড্ডা—তা না হলে এমন সব তুচ্ছ কারণে সহরে শোভাযাত্রা বা মিছিল বেরোত না। খাদ্য আন্দোলন কিংবা উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য মিছিল বা'র হলে তার একটা সঙ্গত কারণ আছে, কিন্তু 'লেবাননে মার্কিন সেনা অপসারণ চাই' কিংবা 'কাটাঙ্গার দাবি মানতে হবে—জাতীয় মিছিল শুধু মাত্র হুজুকের নিদর্শন।

ফুটবল খেলা দেখার মধ্যে না-হয় খেলোয়াড়ী মনোভাব আছে, কিন্তু বক্সিং বা কুস্তীর লড়াই দেখবার জন্যে ভিড় করাকে হুজুক না বলে কি উপায় আছে? একটা মানুষকে পিটছে কিংবা দলছে দেখে সবচেয়ে মনে আমরা বোধহয় পুলকই অনুভব করি! নারীহরণ বা বলাৎকারের মামলা দেখবার জন্যে আদালতে ভিড় করিও ঠিক সেই একই উদ্দেশ্যে।

জলসা হচ্ছে আর একটা হুজুক—আমাদের দেশ এত গীতরসিক হয়ে পড়েছে যে সারা বৎসর ধরে পাড়ায় পাড়ায় জলসা হচ্ছে। শীতের দিনে সারারাত প্যাণ্ডেলের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকে গান শুনছে দেখেছি। সিনেমার নটনটী ও গায়কগায়িকাদের দেখবার জন্যে লোকের আকুলতা দেখে অবাক লাগে।

বোম্বাই-এর কোন নটশেখরকে দেখবার জন্যে রাস্তায় এত ভিড় হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত পুলিশকে নাকি লাঠি চার্জ করতে হয়েছে। ভি-আই-পি-দের দেখবার জন্যে দমদম থেকে রাজভবন পর্যন্ত সারা পথের দুধারে কাতারে কাতারে লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা করে—এ-ও তো হুজুক।

কে দেবে উত্তর ?

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

যে নিজে জাগিয়া রয়
সেই যে জাগাতে পারে পরে।
ঘুমন্ত যে-জন
তার সাধ্য কোথা
অপরে জাগায় ?
যদি সে নিদ্রার ঘোরে
কিংবা স্বপ্নমাঝে
কহে 'জাগো' কহে 'ভাঙ্গো ঘুম'
সেই ডাকে নিদ্রিত কি জাগে ?

আজি এই উপ মহাদেশে
কিংবা পৃথিবীর বুকে
কেউ কি জাগিয়া আছে ?
যদি থাকে কেন সে ডাকে না ?
যদি ডাকে কেন তার ডাকে সাড়া নেই ?

কেন এই অনাচার ? কেন অত্যাচার ?
মানুষের মুণ্ড নিয়ে খেলা ?
কেন কেউ দেখে নাকো চেয়ে
কোন বর্বরতা মাঝে শ্বেতাঙ্গ শিক্ষক
দিল প্রাণ ?

কেউ জেগে নেই !
তবে কে জাগাবে জনতায় ?
কে জাগাবে আশা ? কে ভাঙ্গিবে ভুল ?
কে জানাবে 'অভীঃ' মন্ত্র ?
সুপ্ত মানবতা বোধে কে দেবে চেতনা ?
কে রোধিবে প্রাণ নিয়ে খেলা ?
কে আনিবে শান্তি স্বস্তি ?
এ প্রশ্নের
কে দেবে উত্তর ?

সমুদ্রের তলায় উপনিবেশের কল্পনা

উপানন্দ

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে চাঁদে যাওয়ার গল্প লিখেছিলেন জুলভার্ণে। তখন ওটিকে মানুষ নিছক কাল্পনিক কাহিনী রূপে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু আজ মানুষ একশো বছরের মধ্যে চাঁদে যাবার উদ্যোগ পর্ব্ব সুরু করেছে, একদিন হয়তো একদল মানুষ চাঁদের মধ্যে ঢুকে যাবে। চাঁদের ভিতর গিয়ে উপনিবেশ স্থাপনের জন্যে মানুষ যেমন উঠে পড়ে লেগেছে, তেমনিভাবে সে সমুদ্রের তলায় গিয়ে বসবাস করবার দিকেও খুব ঝোঁক দিয়েছে। আজ তাকে ডাকছে মহাকাশ, তাকে ডাকছে মহাসমুদ্র। একদিন সে পাখীর মত উড়তে চেয়েছিল মহাকাশে, আজ তা সম্ভব হয়েছে। সে চেয়েছিল সমুদ্রের ভেতর ডুব দিয়ে তার গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত তোলপাড় করতে, তাও বাস্তবে রূপ নিয়েছে। রূপোলি মাছের মত চলেছে সে সাগরের ভেতর ঘুরে বেড়াতে। ঋষি বলেছেন—চরৈবেতি, এগিয়ে চলো। মানুষ ঋষিবাক্য অবহেলা করেনি। আজকের মানুষ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

সমুদ্রের অতল গর্ভে চলেছে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ করা হচ্ছে সমুদ্রের ভেতর তার কার্য্যকলাপ। এ সম্পর্কে বহু প্রতিষ্ঠান গবেষণাকার্য্যরত। তা ছাড়া গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক সংস্থা। ওয়ার্লড কংগ্রেস অন আণ্ডার ওয়াটার এ্যাক্টিভিটিস—এর এক অধিবেশনে বলেছেন ফরাসী সমুদ্রবিজ্ঞানী জ্যাক্ ইভকুস্তো অত্যাশ্চর্য্য কথা। তিনি বলেছেন, আগামী পঞ্চাশ বছর মধ্যেই মানুষ জলের নীচে সুরক্ষিত সহর তৈরী করে বাস করবে। এই সব জলমানুষ স্থলচরের মতই অক্লেশে ঘোরা ফেরা করবে, কাজ কর্ম্ম করবে, ঘর সংসার করবে, আর নিঃশ্বাস নিতে পারবে। এখন সমুদ্রের নীচে নামতে গেলে ডাঙ্গার মানুষকে কৃত্রিম বিশেষ শ্বাসপদ্ধতিতে কাজ চালাতে হয়, তখন আর তা হবে না। যে শ্বাসক্রিয়া স্থলচরের পক্ষে এনে দেয় শ্বাসরোধজনিত মৃত্যুর অবস্থা, তা ক্রমাগত দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটনের মাধ্যমে শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ স্বাভাবিক গতিতে চালাতে থাকবে। মানুষ তখন আজকের মত ডুবুরির স্তরে থাকবে না, জল থেকে অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে দৈনন্দিন জীবন যাত্রা চালাবে। তখন ঘটবে তার দৈহিক বিবর্ত্তন। নাম হবে জলমানুষ। তাঁর কথা সমুদ্রতত্ত্ববিদ্ আর জীববিজ্ঞানীরা মন দিয়ে শুনলেন। কুস্তো আজীবন সমুদ্রসন্ধানী, নৌবিভাগে কাজ করবার সময় সমুদ্রের নীচে ডুবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কত ফটোই না তুলেছেন, সমুদ্রের অতলান্ত রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন তিনি, কাজেই সভার সকলেই তাঁর কথাগুলিকে উপেক্ষা করতে পারলেন না।

সার আলিষ্টার হার্ডি আগেই সমগ্র বিশ্বকে শুনিয়েছেন সম্ভবত ষাট হাজার বছর আগে—প্রাণীরা জলের ভিতর জীবন যাত্রা অবলম্বন করেছিল, আবার তারই পুনরাবৃত্তি

হবার সময় হয়েছে, কেননা সকলের অগোচরে প্রাণী জগতে দেখা দিয়েছে অনুরূপ অবস্থার পটভূমি। সেই ষাট হাজার বছর কি তারও আগে আমরা যখন জলে বাস করতাম তখন ভগবান মৎস্য অবতার হয়েছিলেন। এম্নি ধারণা স্বভাবতই মনে জাগে। মানুষ হয়ে উঠবে হোমো একোয়াটিক্স—পায়ে চলা পথ ধরে আর চলবে না, সমুদ্র তলে চলে যাবে, ডাঙ্গাতে নাও ফিরে আসতে পারে। জলের তলে গড়ে উঠবে সহর—আর নতুন সভ্যতা নতুন দিনের জল-মানুষের চেষ্টায়। এ কথাই বলেছেন কুস্তো। মন দিয়ে শুনেছেন সমুদ্রতত্ত্ববিদ আর জীববিজ্ঞানীরা। কুস্তো আজীবন সমুদ্র-সন্ধানী, নৌবিভাগে কাজ করবার সময় সমুদ্রের নীচে ডুবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কত ফটোই না তুলেছেন, আর পেয়েছেন সমুদ্রের বহু রহস্যের সন্ধান। সার আলিষ্টর হার্ডি আগেই শুনিয়েছেন, সম্ভবতঃ ষাট হাজার বছর আগে প্রাণী জগতের জীবন যাত্রা সুরু হয় জলের ভেতর, আবার তারই পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা আছে, কেননা সকলের অগোচরে প্রাণীজগতে বিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে। সেই ষাট হাজার বছর কি তার আগে আমরা যখন জলে বাস করতাম, তখনই বোধ হয় ভগবান মৎস্য-অবতার হ'য়েছিলেন আমাদের জন্যে। সাগরমন্থনের কথা আমাদের শাস্ত্রে আছে।

যা হোক মানুষ হয়ে উঠবে হোমো-একোয়াটিক্স, স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ চলবে জলের ভেতর পায়ে চলা পথ ধরে, হেটে হেটে পা ব্যথা করতে হবে না—সমুদ্রতলে মানুষ চলে যাবে উপনিবেশ স্থাপনের জন্যে, ডাঙ্গাতে নাও সে ফিরে আসতে পারে। গ'ড় উঠবে সহর জলের তলে, আর দেখা দেবে নতুন সভ্যতা—কুস্তো এই সব কথাই বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন। এঁর লেখা বই 'দি' সাইলেণ্ট ওয়ার্লড' ১৯৫৩ সাল থেকে খুব জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে। এই বই থেকে ছবি তুলেছে হলিউড। ছবিখানি দেখবার জন্যে বিশ্বের নানা দেশের সিনেমা হল ভরে উঠেছে অসংখ্য দর্শক জনতায়। মানুষের মনে দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্য। জলের ভিতর বাস করবার কী আগ্রহই না মানুষের মনে!

কুস্তোর এখন বয়স তিপান্ন বছর। অল্পবয়স থেকেই ইনি সমুদ্রের সঙ্গে আত্মীয়তায় আবদ্ধ হয়েছেন। এখন ইনি ছত্রিশটি জাতির এ্যামেচার ডুবুরিদের সংস্থা ওয়ার্লড আণ্ডার-ওয়াটার ফেডারেশনের প্রেসিডেণ্ট। কুস্তো বলেছেন—আপাততঃ বাস্তব চিন্তার খাতিরে মেনে নিতে হচ্ছে যে একমাইলের নীচে আমাদের শারীরিক কাঠামো নাও টিঁকতে পারে। তবে আমাদের শরীর বদলে না যাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে সমুদ্রের তলায় ঘরবাড়ী তৈরী করে নতুন সংসার পাতাতে। নতুন পরিবেশের উপযোগী দৈহিক পরিবর্ত্তন কোন সাংমেরিনের ক্লিনিকে ঘটানো সম্ভব হবে বলেই কুস্তোর ধারণা ও বিশ্বাস। ইনি বলেন, পরিবর্ত্তনটা শিশু দেহে অস্ত্রোপচার করেও সম্ভব হবে।

এরই মধ্যে কুস্তোর বক্তৃতার পর সমুদ্রতত্ত্ববিদ্ ও জীব-বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তান যখন হিন্দু নিধনে ব্যস্ত, তখন এঁরা সমুদ্রের তলায় কি ভাবে উপনিবেশ স্থাপন হবে সে সম্বন্ধে গবেষণায় রত। কুস্তো বলেছেন জলমানুষ কথাটার মানে হচ্ছে' মাছ-মানুষ। এর বেঁচে থাকার কোন অসুবিধে হবেনা। বাতাসে যে ভাবে আমরা অক্সিজেন নিই, জল থেকে তা সে একই ভাবে নেবে। ইনি বলেন, বৈজ্ঞানিকরাই এর ব্যবস্থা করবেন। তাঁদের আবিষ্কারের ওপর নির্ভর করছে সমুদ্রের তলায় বাস করার পরিকল্পনা। ভারশূন্য অবস্থা মহাকাশে যে পরিস্থিতি সৃষ্টিকরে, অনুরূপ পরিস্থিতিও ঘটতে পারে গভীর সমুদ্রতলে। দীর্ঘকাল ধরে সমুদ্রতলে প্রচুর পরিমাণে পরমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে, তেজস্ক্রিয়তা স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে মাত্রার বাহিরে চলেগেছে। আকাশে মাটিতে বা জলে এভাবে বিস্ফোরণ যে ভয়াবহ পরিস্থিতি এনে দেবে, এরূপ অভিমত ও ব্যক্ত করেছেন কুস্তো।

কুস্তোর মতামতের গুরুত্বই যে, সকল সমুদ্রতত্ত্ববিদ্ ও গবেষকই দিচ্ছেন এরূপ কোন নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না, তবে সবাইকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সমুদ্রতলে বাস করার পক্ষে সম্ভব হবে কি না অনুসন্ধান চালিয়ে গবেষণারত রয়েছেন বহুসংস্থা। সমুদ্র তলে স্বচ্ছন্দে চলা ফেরা সম্ভব হোলে অনেক গুপ্তধন যে খুঁজে পাওয়া যাবে, এ সম্পর্কে সকলেই একমত। মূল্যবান ধাতুর খনির অস্তিত্ব আছে বলে অনেকের ধারণা, তা ছাড়া সোনা, মুক্তা, মণিমাণিক্য, তেল, পরমাণবিক বিস্ফোরণের

পক্ষে প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়ম এসব পাওয়া যাবে। আর পাওয়া যাবে পৃথিবীর ভৌগোলিক খবরাখবর, সম্ভব হবে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, সম্ভব হবে অধুনালুপ্ত আদিম প্রাণীদের সন্ধান, সহজ উপায়ও বেরিয়ে পড়বে আন্তর্জাতিক পরিবহন বা যোগাযোগের—সামুদ্রিক গুপ্তধনের অধিকার নিয়েও চলেছে লোভাতুর মনের অনুচিন্তন।

সমুদ্রের ভিতরটা যেন স্বপ্নের দেশ—পাতালপুরীর কাহিনী শুনি আমরা অবাক হয়ে। জলপরী, শঙ্খমালা, মৎস্যকন্যা, নীল-অরণ্য, সোনালি-পাহাড় শৈশবে আমাদের মনে কতই না রেখাপাত করে। বিজ্ঞানের আনুকূল্যে আমরা যদি পাতালপুরীতে গিয়ে উপনিবেশ গড়তে পারি, মন্দকি? ডাঙার মানুষগুলো তো আজ আমাদের ধ্বংসের চেষ্টা করছে দাঙ্গা করে, যুদ্ধ বাধিয়ে না খেতে দিয়ে, আর নরমেধযজ্ঞ করে। এদের জন্যে সুখস্বচ্ছন্দে আর শান্তিতে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে প্রস্তাের পরিকল্পনা সার্থক হোলে, আমরা চলে যাবো সমুদ্রের তলায়, এদিকে তো গ্রহ নক্ষত্রে যাবারও ব্যবস্থা হচ্ছে—দেখাযাক্ কোন্ দিকে পাড়ি দেওয়া যায়।

——

কাউন্ট লিও টলষ্টয়

রচিত

দি লঙ্‌ এক্সাইল্

(The Long Exile)

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কথায় বলে—ধর্মের কল বাতাসে নড়ে! কাজেও তাই ঘটলো! পরের দিন সকালে কয়েদখানার কুঠরীর গরাদ-আঁটা দরজা খুলে নিত্য-নৈমিত্তিক নিয়মে কয়েদীদের বাইরের উঠানে নিয়ে যাবার সময় ঘটনাচক্রে ঘরের কোণে গতরাত্রে মিকারের খোঁড়া সুড়ঙ্গ-পথের ফোকরটি সরকারী-পেয়াদাদের চোখে পড়ে গেল। দেখা মাত্রই তারা কয়েদখানার অধ্যক্ষের কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে এ খবরটি জানালো। খবর শুনেই কয়েদখানার অধ্যক্ষ এলেন তদারকে একের পর এক সকল কয়েদীকেই কড়া-ধমক দিয়ে শাসালেন—পাজী···শয়তান কোথাকার! ভালো চাস্ তো বল্ শীগগির তোদের মধ্যে কোন্ হতভাগা এ কাজ করেছে!···খাঁটি জবাব কবুল না করলে, এমন সাজা দেবো যে···

বেশীরভাগ কয়েদীই জবাব দিলে যে তারা এ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানে না···কেবল দু'চারজন কয়েদী, যারা মিকারের এই বে-আইনী কাণ্ড-কারখানার কথা একটু-আধটু জানতো তারা সবাই কঠোর-শাস্তির ভয়ে কয়েদখানার অধ্যক্ষের কাছে সে কাহিনী বেমালুম চেপে গেল! মিকারও ঝানু-কয়েদী···সরাসরি তাকে প্রশ্ন করেও কয়েদখানার কড়া-অধ্যক্ষ গরাদ-ঘেরা কুঠরীর মেঝেটি বে-আইনি ফোকর-খোঁড়ার কোনো হদিশই আদায় করতে পারলেন না। এমন সময় হঠাৎ তাঁর নজর পড়লো আক্শ্যেনকের পানে···আক্শ্যেনক্ বেচারী তখন একা কয়েদখানার এককোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছিল। কয়েদখানার পেয়াদা থেকে সুরু করে কর্ত্তারা কয়েদীরা সকলেই আক্শ্যেনক্‌কে বীর-শান্ত, ধার্ম্মিক আর সত্যবাদী বলে বিশেষ সুনজরে দেখত। তাই তাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কয়েদখানার অধ্যক্ষ সরাসরি তার কাছে এগিয়ে এসে শুধোলেন—ওহে বুড়ো···তুমি তো শুনেছি ভারী খাঁটি-ধার্ম্মিক লোক···বলতে পারো···এই সব চোর-ছ্যাঁচোড় পাজী বদমাইসগুলোর মধ্যে কোন্ হতভাগা আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাবার মতলবে কুঠরীর মেঝেতে ফোকর খুঁড়েছে?···

আক্শ্যেনকের খানিক দূরেই দাঁড়িয়েছিল মিকার··· কয়েদখানার অধ্যক্ষের শাসানী শুনেই তার বুকের ভিতরটা আতঙ্কে কেঁপে উঠলো···এই বুঝি আসল-কথাটা ফাঁস হয়ে যায় শেষ পর্য্যন্ত! এতটুকু টুঁ-শব্দটি না করে উদ্বিগ্ন-দৃষ্টিতে সে তাকালো আক্শ্যেনকের পানে!

কয়েদখানার অধ্যক্ষের প্রশ্ন শুনে আকৃশ্চেনক্ পড়লো মহা-সমস্যায়! মনে-মনে সে ভাবলো,—তাই তো···কি করি!···আসল কথা সব যদি খুলে বলি তো মিকারের আর রক্ষা নেই···শাস্তি অনিবার্য্য!···অথচ সত্য কথা না বললেও ওদিকে ঈশ্বরের কাছেও অপরাধী হতে হয়, আর কয়েদখানার চাবুক-প্রহারের শাস্তি থেকেও নিস্তার মিলবে না! কাজেই উপায় কি?···তবে মিকার যে অপরাধী—সন্দেহ নেই! শুধু লুকিয়ে কয়েদখানার কুঠুরীর মেঝেতেই যে সে অন্যায়ভাবে পালানোর পথ খুঁড়ে অপরাধ করেছে তাই নয়···বিনা দোষে আমার সারা জীবনটাও এই কয়েদখানার কয়েদী হয়ে কলঙ্ক-দুর্দ্দশার গ্লানিতে সর্ব্বনাশ করে দেবার জন্যও পুরোপুরি দায়ী সে!···মিকারকে ক্ষমা···তাকে রক্ষা করবো আমি! ···কেন?···কি জন্য?···তার অপরাধের ফলে, দীর্ঘ এতগুলো বছর মুখ বুজে যে অপরিসীম দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে আসছি আমি···এবারে মিকার নিজে হাড়ে-হাড়ে সে জ্বালা অনুভব করুক! তবেই সে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করবে—অন্যায়ভাবে অকারণে অপরের জীবন চির-বিপন্ন করার প্রতিফল!···না মিকারের অন্যায় অপরাধের ক্ষমা নেই···আমার এই দুর্দ্দশা-ভোগের দাম তাকেও দিতে হবে তিলে-তিলে দুর্দ্দশা-ভোগ করেই···তবেই কড়াক্রান্তিতে উশুল হবে তার অন্যায়-আচরণের বাকী-বকেয়া হিসাব!

বুড়ো আকৃশ্চেনক্‌কে এমনি গভীর চিন্তায় বিভোর হয়ে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কয়েদখানার অধ্যক্ষ বিরক্তি-ভরে ধমকে উঠলেন,—কৈ হে···কোনো জবাব দিচ্ছো না যে?·· কথাটা কানে যায়নি বুঝি?···চটপট বলে ফেলো তো সত্যি কথাটা···কোন হতভাগা শয়তান এই কয়েদখানার কুঠুরীতে এমন ফোকর খুঁড়ে রেখেছে!···

কয়েদখানার অধ্যক্ষের কড়া-ধমকে আকৃশ্চেনকের চমক ভাঙলো···ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে সে যেন কি ভাবলো···তারপর শান্ত-কণ্ঠে ধীরে ধীরে জবাব দিলে,—এ কাজ কে করেছে—আমি জানি!···কিন্তু তার নাম আমি বলবো না কারো কাছে!

আকৃশ্চেনকের জবাব শুনে কয়েদখানার অধ্যক্ষ বিরক্তিভরে রুষ্ট-কণ্ঠে শুধোলেন,—তার মানে?···

অবিচলিত কণ্ঠে স্থিরভাবে আকৃশ্চেনক্ বললে,—ভগবানের আদেশ নেই···তাই তার নাম আমি প্রকাশ করবো না কোনোমতেই! এজন্য আপনি আমাকে যে শাস্তি দিতে চান···দিন—মাথায় পেতে নেবো···আপনার শাসনাধীন কয়েদী আমি!···তবে কয়েদখানার কুঠুরীতে লুকিয়ে ফোকর খুঁড়েছে যে, তার নাম আমি বলবো না!

আকৃশ্চেনকের স্পষ্ট জবাব শুনে কয়েদখানার অধ্যক্ষ রাগে-আক্রোশে জ্বলে উঠলেন···ক্ষিপ্তকণ্ঠে ধমক দিলেন,—বটে! এতখানি স্পর্দ্ধা!···এখনি শায়েস্তা করছি তোমায়···

অবাধ্যতার অপরাধে কয়েদখানার অধ্যক্ষের আদেশে আকৃশ্চেনকের নির্ম্মম-শাস্তির ব্যবস্থা হলো···কিন্তু শাস্ত্রী-পেয়াদাদের প্রবল পীড়ন ও শত পীড়াপীড়ি সত্বেও তার মুখ থেকে কোনোমতেই মিকারের নাম প্রকাশ করা সম্ভবপর হলো না! এমন কি জুলুম চালিয়ে ভয় দেখিয়ে, ফন্দী-ফিকির খাটিয়ে কোনো কৌশলেই কয়েদখানার কর্ত্তা-পেয়াদারা কেউ আকৃশ্চেনকের মুখ থেকে একতিল খবর আদায় করতে না পেরে অবশেষে হাল ছেড়ে দিলেন।

এত হাঙ্গামা-ঝঞ্ঝাটের ফলেও, আকৃশ্চেনকের ধীর-শান্ত ধার্ম্মিক-স্বভাবের এতটুকু পরিবর্ত্তন ঘটলো না··· আগের মতোই সে একা চুপচাপ কয়েদখানার নিরালা-কোণে আপন-মনে নিত্য-নৈমিত্তিক হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর কাজ আর অবসর-সময়ে ঈশ্বরের নাম-গান করেই দিন কাটাতে লাগলো।

একদিন নিশুতি-রাতে কয়েদখানার তালাবদ্ধ কুঠুরীতে তক্তার শয্যায় শুয়ে কয়েদীরা সবাই তখন নিদ্রায় অচেতন···আকৃশ্চেনকের চোখেও সবেমাত্র তন্দ্রার আমেজ এসেছে, এমন সময় হঠাৎ তার হুঁশ হলো, কে যেন চুপিচুপি এসে শয্যার পদ-প্রান্তে দাঁড়ালো! আকৃশ্চেনকের তন্দ্রা গেল ঘুচে······অন্ধকারের মাঝেই আগন্তুকের পানে ভালো করে তাকিয়ে দেখে—মিকার! এত রাতে মিকারকে চুপিচুপি শয্যার প্রান্তে এভাবে এগিয়ে আসতে দেখে আকৃশ্চেনক্ চমকে উঠলো···চাপা-

গলায় পরুষকণ্ঠে প্রশ্ন করলে—কি মতলব তোমার? এত রাতে···এভাবে চোরের মতো?

মিকার কিন্তু নিস্তব্ধ···কোন জবাব দিলে না সে··· যেমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনিই রইলো!

তার এই অদ্ভুত আচরণ দেখে আক্‌শ্যেনক্ ধড়মড় করে শয্যা ছেড়ে উঠে বসলো···চাপা-গলায় ধমক দিয়ে বললে, —কি চাও তুমি?···শীগগির বলো···নাহলে এখনি শান্ত্রী-পেয়াদাদের ডেকে···

কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই, মিকার আক্‌শ্যেনকের আরো কাছে সরে এসে চাপা-স্বরে মিনতি জানিয়ে বললে, —ইভান্ দিমিত্রিচ্···আক্‌শ্যেনক্···আমাকে ক্ষমা করো ···ক্ষমা করো!

মিকারের এই অদ্ভুত আচরণ দেখে আক্‌শ্যেনক্ তো অবাক্! বিস্ময়-দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকিয়ে সে বললে,—ক্ষমা?···তোমায় ক্ষমা করবো?··· কেন?···

মিকারের দু'চোখ অশ্রু-সজল···আক্‌শ্যেনকের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে পড়ে অনুতপ্তভাবে সে বললে,— তোমার এই কলঙ্ক···এতখানি দুর্দ্দশা···সারা জীবনটা তোমার যে এভাবে তছনছ হয়ে গেল···সে সবই আমার জন্য···আমারই দোষে! আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগে, সেবার নিজনিহির-শহরের মেলায় বেশাতী-বেচতে যাবার পথে নিশুতি রাতে গাঁয়ের সরাইখানায় সহচর-সঙ্গী সেই ঘুমন্ত সদাগর বেচারীকে আমিই খুন করেছিলুম—নিজের হাতে তার বুকে ধারালো ছোরা হেনে!···পাছে ধরা পড়ি, এই ভয়ে আমার হাতের সেই রক্ত মাখানো ছোরাখানাকে চুপিচুপি লুকিয়ে রেখেছিলুম তোমার তোরঙ্গের ভিতরে।···তোমাকেও খুন করতে এগিয়েছিলুম···কিন্তু, এমনই বরাত জোর তোমার যে বুকে ছোরাখানা গেঁথে দেবো···হঠাৎ বাইরে কি যেন একটা শব্দ শুনলুম··তাই তাড়াতাড়ি হাতের ছোরাখানা তোমার তোরঙ্গের মধ্যে গুঁজে রেখে ঘরের জানলা টপ্‌কে সোজা চম্পট দিয়েছিলুম··কেউ এতটুকু ধারণাও করতে পারেনি যে আসল-খুনী কে!···

মিকারের কথা শুনে আক্‌শ্যেনক্ স্তম্ভিত হয়ে গেল ···কি বলবে, কিছুই ভেবে স্থির করতে পারলো না··· পাথরের মূর্ত্তির মতো স্তব্ধ হয়ে সে অপলক-দৃষ্টিতে মিকারের পানে তাকিয়ে রইলো।

মিকারের চোখে তখন জলের ধারা নেমেছে···আবেগ ভরে দু'হাতে আক্‌শ্যেনকের পা দুটি জড়িয়ে ধরে সে মিনতি জানালো,—ইভান্···ইভান্···আমাকে ক্ষমা করো ···আমাকে ক্ষমা করো···মিথ্যা-অপরাধে তোমাকে দোষী বানিয়ে যে অপরাধ আমি করেছি—তার ক্ষমা নেই··· জানি!···তবু···তবু···তুমি আমায় ক্ষমা করো!··ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি—কয়েদখানার কর্ত্তাদের কাছে সব কথা আমি খুলে বলবো···নিজের দোষ কবুল করবো··· বলবো—সে রাতে সরাইখানায় আমিই সেই ঘুমন্ত-সদাগরের বুকে ছোরা বসিয়ে খুন করেছি··আমিই আসল খুনী···আসামী···শাস্তি আমারই পাওয়া উচিত—তোমার নয়! সব কথা শুনলে, তাঁরা জানবেন—তুমি নির্দ্দোষ··· মিথ্যা-অপরাধে অকারণেই এতকাল কয়েদখানায় বন্দী হয়ে রয়েছো!···তাঁরা তোমায় মুক্তি দেবেন···তুমি আবার ফিরে যেতে পারবে দেশে···তোমার নিজের ঘরে··· তোমার বৌ আর ছেলেমেয়েদের কাছে!

মিকারের কথা শুনে উদার-দৃষ্টিতে কয়েদখানার গরাদ-আঁটা ফটকের বাইরে রাতের অন্ধকার আকাশের পানে তাকিয়ে হতাশভাবে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে আক্‌শ্যেনক্ বললে—আমার বৌ···আমার ছেলেমেয়ে!···তারা আজ কোথায়···কে জানে!···ফিরে যাবো···তাদের কাছে!·· এতকাল পরে! কোথায় যাবো!···স্ত্রী স্ত্রী আমার বেঁচে নেই আজ!···আর ছেলেমেয়েরা··তারাও সবাই এতদিনে ভুলে গেছে আমায়!···নিজের ঘর···তাও নেই আমার··· সবই হারিয়েছি আমি—এখানে এই কয়েদখানায় কয়েদী হয়ে এসে! কোথাও যাবার আজ জায়গা নেই আমার এতটুকু—এই বিরাট দুনিয়াতে!···কয়েদখানার এই কুঠুরী ছেড়ে কোথাও যাবার কোনো বাসনা নেই আমার!··· জীবনের বাকী দিনগুলো এমনিভাবে এখানে পাথর-ঘেরা এই কয়েদখানার কন্দরেই···

অ্যাক্‌শ্যেনকের বাকী কথা শেষ হবার সুযোগ মিললো না···অঝোর-ধারে কাঁদতে কাঁদতে আকুলভাবে অ্যাক্‌শ্যেনকের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে মিকার বললে,—না, না, না ইভান্···আমায় ক্ষমা করতেই হবে! তোমার উপর

যে অন্যায় আমি করেছি, তার জন্য সারাক্ষণ কি অসহ্য অন্তর্জ্বালা যে ভোগ করছি, তা তুমি বুঝবে না! প্রতি মুহূর্ত্তে এ যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে, আজীবন কয়েদখানায় বন্দী হয়ে মুখবুজে হাড়ভাঙা খাটুনীর কষ্ট আর পেয়াদাদের চাবুক-প্রহারের জ্বালা সহ্য করা অনেক ভালো! দুঃসহ এই অন্তর্জ্বালা থেকে আমায় মুক্তি দাও, ইভান্ দিমিত্রিচ্ ··ক্ষমা করো আমাকে!··পাপের বোঝা আর আমি বইতে পারি না··আমায় বাঁচাও···মনে শান্তি পেতে দাও!···আমি শয়তান···ক্ষমারও অযোগ্য···তবু···আমায় ক্ষমা করো তুমি!···ক্ষমা করো···দোহাই!

মিকারের কান্না দেখে অ্যাক্শ্যেনকের দু' চোখেও জল ভরে এলো। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে, মমতা-ভরে মিকারের মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে শান্তকণ্ঠে সে বললে,—তুচ্ছ মানুষ আমি···আমি তোমাকে ক্ষমা করবার কে!··মঙ্গলময় ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করবেন, ভাই··তাঁর কাছেই শুধু ক্ষমা মেলে!

ঈশ্বরের কথা মনে জাগতেই, অ্যাক্শ্যেনকের অশান্ত-বিক্ষুব্ধ মন অপূর্ব্ব শান্তিতে ভরে উঠলো···কয়েদখানার উঁচু পাচিলের ওপারে অন্ধকার আকাশের কোণে চুমকীর মতো জ্বলজ্বলে শেষ-রাতের ছোট্ট তারাটির পানে অপলক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে একমনে ঈশ্বরের নাম-গান করতে লাগলো!

* * *

পরের দিন সকালে পেয়াদারা এসে কয়েদীদের কুঠরীর গরাদ-আঁটা লোহার ফটক খুলতেই মিকার ব্যাকুলভাবে ছুটে গেল কয়েদখানার কর্ত্তার কাছে। সেখানে হাজির হয়ে সে তার পুরোনো অপরাধের কাহিনী আগাগোড়া খুলে বলে কয়েদখানার কর্ত্তার কাছে নিরপরাধী অ্যাক্শ্যেনকৃকে বেকসুর মুক্তিদানের জন্য আবেদন জানালো।

মিকারের কৈফিয়ৎ শুনে কয়েদখানার কর্ত্তা অবশেষে আসল খুনী-আসামীর সঠিক পরিচয় পেয়ে মনে মনে খুবই অনুতপ্ত হলেন···মিকার আর শান্ত্রী-পেয়াদাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি আর একমুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করে সটান এসে হাজির হলেন কয়েদখানার কুঠরীতে—বৃদ্ধ কয়েদী অ্যাক্শ্যেনকের কাছে।

কিন্তু মুক্তি দেবেন কাকে?···কয়েদখানার কুঠরীতে এসেই সবাই দেখেন—কঠিন কাঠের তক্তার শয্যায় পরম-শান্তিতে চোখ দুটি মুদে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে বৃদ্ধ-কয়েদী অ্যাক্শ্যেনক্···প্রাণের তিলমাত্র স্পন্দন নেই তার দেহে, তবু ঠোঁটের কোণে তখনও সুস্পষ্ট ফুটে রয়েছে ম্লান হাসির রেখা··· যেন স্বপ্নের ঘোরে অপরূপ আনন্দে ভরে উঠেছে তার মন।

সমাপ্ত
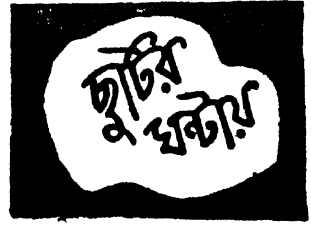
চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের বিজ্ঞানের আরেকটি আজব-মজার খেলার কথা বলছি। এ খেলাটির নাম দেওয়া যেতে পারে—'ঘূর্ণীজল আর ছিপির কারসাজি'। খেলাটি খুবই অভিনব···সামান্য চেষ্টা করলেই, তোমরা অনায়াসেই এ কারসাজি দেখিয়ে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের অনায়াসেই তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে।

এ খেলাটি দেখানোর জন্য বিশেষ কিছু সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই··শুধু একটি ছিপি-সমেত বড় সাইজের কাঁচের বোতল, লম্বা একটি লোহার তার কিম্বা পশম-বোনার কাঠি, 'কর্কের' (cork) তৈরী পাতলা ছাঁদের আরেকটি ছিপি এবং একপাত্র জল জোগাড় করলেই কাজ

মিটবে। ফর্দ্দমতো এই সব প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ হবার পর, উপরের ১নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে,

ঠিক তেমনিভাবে বোতলটি অর্দ্ধেক জলে ভরাট করে নাও। তারপর বোতলের ছিপির নীচে গর্ত্ত করে সেই গর্ত্তে লম্বা লোহার তার অথবা পশম বোনার কাঠিটিকে এঁটে দাও। তবে নজর রেখো—বোতলের ছিপির নীচে গর্ত্তের ভিতরে লম্বা লোহার তার বা পশম-বোনার কাঠিটি এঁটে দেবার সময়, সেটিকে এমন কায়দায় বসাতে হবে যে তার প্রান্তভাগটি যেন জল-ভর্ত্তি কাঁচের বোতলের তলদেশ থেকে অন্ততঃপক্ষে ইঞ্চিদুয়েক উপরে থাকে বরাবর। এ কাজটুকু সুষ্ঠুভাবে সারা হলে, অপেক্ষাকৃত ছোটসাইজের অন্য ছিপিটির মাঝখানে পরিপাটি ছাঁদে বেশ বড় একটি গর্ত্ত রচনা করে, সেই গর্ত্তের মধ্যে দিয়ে উপরের ১নং ছবির ভঙ্গীতে বোতলের ভিতরে-রাখা ঐ লম্বা লোহার তার বা পশমের কাঠিটি পরিয়ে দাও। তাহলেই উপরের ১নং ছবির ছাঁদে বোতলের ভিতরে-রাখা লম্বা ঐ লোহার তার বা পশম-বোনার কাঠিটির নীচের প্রান্তে ছোট সাইজের 'কর্কের' ছিপিটিকে সহজেই এঁটে বসানো যাবে। 'কর্কের' ছিপিটিকে এভাবে এঁটে বসানোর সময় কিন্তু বিশেষ নজর রাখতে হবে—'কর্কের' ছিপির মাঝখানে যে গর্ত্তটি রচনা করেছো, সেটির ভিতর দিয়ে লোহার তার বা পশমবোনার কাঠিটি যেন অবাধে অনায়াসেই উপরে ও নীচে যাতায়াত করতে পারে। কারণ, এ কাজে ত্রুটি ঘটলেই, কারসাজির মজাটুকু একেবারে পণ্ড হয়ে যাবে। সুষ্ঠুভাবে এ সব কাজ সারতে পারলেই—উদ্যোগ-পর্ব্বের ব্যবস্থাদি শেষ হবে।

এবারে আসরে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে খেলার আজব-কারসাজি দেখানোর পালা। খেলা-দেখানোর সময়, ম্যাজিসিয়ানদের মতো বেশ মুরুব্বী-ভঙ্গীতে দর্শকদের সাদরে আহ্বান জানিয়ে বলবে যে তাঁদের মধ্যে এমন কেউ আছেন, যিনি জল-ভর্ত্তি কাঁচের বোতলের ভিতরকার লোহার ঐ লম্বা তার বা পশম-বোনার কাঠির নীচের প্রান্তে এঁটে বসিয়ে-রাখা 'কর্কের' ছিপিটিকে কোনোভাবে হাতে দিয়ে স্পর্শ না করে সুকৌশলে সেটিকে কাঠি থেকে খুলে এনে সহজেই জলের বুকে ভাসিয়ে দিতে পারেন! খেলার কলা-কৌশলের মর্ম্ম অজানা থাকার ফলে, দর্শকদের সকলেই যখন বারবার চেষ্টা করেও এ কাজ হাসিল করতে পারবেন না···তখন হাসিমুখে এগিয়ে এসে আসল-কারসাজিটি দেখিয়ে তাঁদের তাক্ লাগিয়ে দাও। অর্থাৎ, —সটান আসরে দর্শকদের সামনে-রাখা টেবিলের কাছে সরে এসে ছিপি-আঁটা জল-ভর্ত্তি কাঁচের বোতলটিকে সযত্নে হাতে তুলে নাও এবং উপরের ২নং ছবির ভঙ্গীতে বোতলটিকে ধরে বারকয়েক বেশ সজোরে ঘূর্ণীপাক দিয়ে ঘুরিয়ে, পুনরায় সেটিকে টেবিলের উপরে খাড়াখাড়িভাবে বসিয়ে রেখে দাও। তাহলেই দেখবে—এভাবে ঘূর্ণীপাকের ফলে, বোতলের ভিতরকার জলটুকুও সজোরে ঘুরতে সুরু করেছে এবং সেই ঘোরার দরুণ—উপরের ২নং ছবির ভঙ্গীতে বোতলের ভিতরে কাঁচের-দেয়ালের গায়ের দিকের জল ক্রমশঃ উথ্‌লে উঁচু হয়ে উঠছে, আর বোতলের মাঝখানের জল নীচে তলিয়ে চলেছে। ঘূর্ণীপাকের ফলে বোতলের ভিতরকার জল যত বেশী জোরে ঘুরবে, মাঝ-খানের নিম্নতা ততই বেশী গভীর হবে এবং এই কারণেই লম্বা লোহার তার বা পশম-বোনার কাঠিতে এঁটে-রাখা ফুটো-সমেত 'কর্কের' ছিপিটিও ক্রমশঃ জলের ঘূর্ণীপাকের এই উর্দ্ধ-নিম্নগতির স্রোতাকর্ষণে বোতলের মাথার উপরকার ছিপিতে-আঁটা লম্বা লোহার তার বা পশম বোনার কাঠির প্রান্তদেশ থেকে নিজেনিজেই দিব্যি সহজেই উন্মুক্ত হয়ে আসবে—কারো হাতের স্পর্শমাত্রও প্রয়োজন নেই!

'ঘূর্ণীজল আর ছিপির কারসাজির' এই হলো আসল রহস্য।

—

মনোহর মৈত্র

১। আজব হেঁয়ালি ঃ
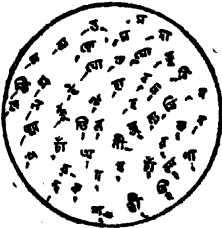
উপরের ঐ গোলাকার-চক্রের ছবিটির ভিতরে এলো-মেলো ভাবে ছড়ানো রয়েছে বাংলা ভাষায় লেখা মোট ৪৮টি বিভিন্ন ধরণের হরফ। বুদ্ধি খাটিয়ে এই হরফগুলি যদি যথাযথভাবে সাজাতে পারো। তাহলে সহজেই খুঁজে পাবে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে বিশিষ্ট-অংশ গ্রহণ করেছিলেন এমন পাঁচজন বিখ্যাত দেশ-সেবক ও দেশ-সেবিকার নাম। এখন চেষ্টা করে ত্থাখো তোমরা—যদি ঐ উপরের ছবিতে দেখানো 'হেঁয়ালি-চক্রের' ভিতর থেকে ভারতের বিশিষ্ট নেতা ও নেত্রীদের প্রত্যেকের নাম সঠিকভাবে খুঁজে বার করতে পারো।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

এক পায়ে দাঁড়িয়ে
ঘোরে বন্‌বনিয়ে,
শিশুদের প্রিয় খেলা…
বলে ত্যালো এই বেলা !

রচনা ঃ দিলীপকুমার ও রঘুনাথ দত্ত
(বাঁশবেড়িয়া)

৩। দেখিতে সুন্দর অতি, বনমাঝে রয়,
মস্তক উপরে তার ডালপালা হয়।
নিরামিষভোজী সে যে—খায় ঘাস-পাতা,
ল্যাজটি কাটিলে হন—আরাধ্য-দেবতা !

রচনা :—চম্পারাণী ধর
(কলিকাতা)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি'র উত্তর ঃ

১। উপরের ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে, ঠিক তেমনি-ভাবে 'হেঁয়ালী-ছবির' বিশেষ-বিশেষ জায়গাগুলি রঙীন কালি বা পেন্সিলের দাগ টেনে ভরাট করে দিলেই, সহজেই চিত্রকর-মশাইয়ের আঁকা 'ছুটন্ত-কুকুরের' চেহারার সন্ধান মিলবে।

২। নিশাচর

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

সুমা, পুতুল, টাবলু ও হাবলু মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), কুলু মিত্র (কলিকাতা), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), রিণি ও রণি মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই), বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), পুপু ও ভুটিন (কলিকাতা), সত্যেন, মুরারি, সঞ্জয় ও সুনীল (ভিলাই), কবি ও লাড্ডু হালদার (কোরবা)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

শর্ম্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), পিণ্টু, বুতাম ও বাপি গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

পুলিন, রহমান, সন্তোষ ও মজিবর (বড়কালিয়ারি), চৈতালী ও মিঠু বসু (কলিকাতা), বাণী, গদাই, খোকা, বুলু, বুড়ো, গোপা, মুনি ও মঞ্জু (কলিকাতা)।

সিমলার পথে

শতদল গোস্বামী

শীতকালে সাধারণত কেউ সিমলায় বেড়াতে যায় না। তা সত্ত্বেও আমি যে যাব সে বিষয়ে অনেকদিন আগেই মন স্থির করে রেখেছিলাম। নিখিল-ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে কলকাতা থেকে চণ্ডীগড় যাচ্ছি—আর সেখান থেকে সিমলা ঘুরে না এলে ভ্রমণ তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সুতরাং প্রচণ্ড, সাংঘাতিক, কল্পনাতীত ইত্যাদি নানা বিশেষণে শীতের ভয়াবহ ভয়ঙ্কর রূপটি ফুটিয়ে তোলা সত্ত্বেও আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে না পারায় হিতৈষীরা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল।

বলাবাহুল্য, শীতকালে শৈল শিখরে বাস করার অভিজ্ঞতা আমার এই হিতৈষীদের কারো ছিল না। আমারও না। তবে মনে জোর রেখেছিলাম এই ভেবে—শীতকালে সিমলা-বাসীরা যদি সেখানে কাটাতে পারে, আমিই বা পারবনা কেন। এই যুক্তিটা অবশ্য সর্বজনগ্রাহ্য নয়, এ-নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী তর্কাতর্কিও চলতে পারে। আমি অবশ্য যুক্তিতর্কের মধ্যে না গিয়ে সোজাসুজি সিমলা যাওয়াই স্থির করলাম।

চণ্ডীগড়ে এবার ডেলিগেটের সংখ্যা প্রচুর হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই সিমলা বেড়াতে যাবেন শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। পুরনো এম-এল-এ হোস্টেলের তিনতলার একটি কক্ষে আমরা পাঁচবন্ধু স্থান পেয়েছিলাম। শচীন দত্ত, অনিল সেন, সজ্জন সিংহ, বৈদ্যনাথ মাহাতো এবং আমি। আমরা এই পাঁচজন একত্রে সিমলা ভ্রমণ করব।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনিল ছাড়া আর তিন বন্ধুর মত পরিবর্তন হয়ে গেল। তাঁরা এ-যাত্রায় আর সিমলা ভ্রমণে যেতে পারছেন না। কেননা, ওঁরা খবর পেয়েছেন সিমলায় নাকি এখন দারুণ বরফ পড়ছে, অত্যধিক ঠাণ্ডায় তাঁরা কাহিল হয়ে পড়তে রাজী নন। বেঁচে থাকলে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বন্ধুদের মত পরিবর্তনে কিছুটা নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম। উৎসাহ দিল অনিল। বলল, ঘাবড়াবার কারণ নেই। এ-দেশের শীতের সঙ্গে কয়েক দিনেই আমাদের

'সিমলার পথে' প্রবন্ধের ফটোগ্রাফ লেখক কর্তৃক সংগৃহীত

বেশ হৃদ্যতা জমে গেছে। এ-শীতে অসুখ করেনা। আর করলেও, তার দাওয়াইও সঙ্গেই আছে। অমোঘ এবং অব্যর্থ—মকরধ্বজ। সর্দি কাসি জরজর ভাব, এক পুরিয়াতেই যথেষ্ট। তা ছাড়া হার্টের পক্ষেও এটা ধন্বন্তরী।

শুনে ভরসা হল।

২৬শে ডিসেম্বর সম্মেলন শেষ হল। ঐ দিন সকালে ভাখরা ও নাঙ্গল বাঁধ দেখতে গিয়েছিলাম, ফিরলাম অনেক

রাতে। পরদিন বন্ধুত্রয় আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতা অভিমুখে রওনা হলেন। অনিলকে সঙ্গে নিয়ে চললাম বাস-স্ট্যাণ্ডে। কিন্তু সিমলার টিকেট সেদিন মিলল না। পরদিন সকালের বাসের টিকেটও বিক্রি হয়ে গিয়েছিল—অগত্যা দুপুরের বাসে দুটো সীট অগ্রিম রিজার্ভ করে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

২৭শে সারাদিন এবং ২৮শে একবেলা চণ্ডীগড়েই থাকতে হবে। সম্মেলন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব বাসস্থানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। ল' কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সরকার মশায় আশ্বাস দিয়েছিলেন—ডেলিগেটরা ইচ্ছে করলে তাঁর কলেজ হোস্টেলে যতদিন খুশি কাটাতে পারেন। অতএব আমরা দু-জন ল' কলেজ হোস্টেলে গিয়ে উঠলাম। কয়েকজন ছাত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন, চা খাওয়ালেন।

গত পাঁচদিনে চণ্ডীগড়ের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেছি। পাহাড়সংলগ্ন এলাকায় পাঞ্জাবের নতুন রাজধানী গড়ে উঠছে। সর্বত্রই কর্মচাঞ্চল্য। শহরটি নানা এলাকা বা সেক্টরে ভাগ করা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পথ ঘাট, নানা ডিজাইনের ঘরবাড়ি, প্রতিটি বাড়িতে ফুল বাগান। ইউনিভার্সিটি, সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্ট, বিধান সভা, রবীন্দ্রভবন, হাসপাতাল প্রভৃতি ইমারতগুলি দেখবার মতো। ডাল হ্রদের অনুকরণে এখানে একটি আকর্ষণীয় লেক তৈরি করা হয়েছে। বেড়ানোর পক্ষে এই পরিকল্পিত শহরটি অদূরভবিষ্যতে ভারতের অন্যতম প্রধান শহরের মর্যাদা পাবে—সে বিষয়ে দ্বিমতের কারণ নেই।

২৮শে ডিসেম্বর। সিমলার বাস ছাড়বে বেলা ১টা ১৫ মিনিটে। বেলা ১২টার মধ্যেই আমরা বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে হাজির হলাম। ডেলিগেটদের প্রধান অংশ পূর্বেই বাস বা ট্রেন যোগে সিমলা রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। আমরাই বোধ হয় শেষ দল। না, শেষ মুহূর্তে আরও কিছু ডেলিগেটের দর্শন পাওয়া গেল।

এই বাস স্ট্যাণ্ড বা বাসের আড্ডা থেকে বিভিন্ন শহরে বাস যাতায়াত করে। পাতিয়ালা, কালকা, সিমলা, আম্বালা, দিল্লি, জলন্ধর, অমৃতসর প্রভৃতি নিকট ও দূরপাল্লার পথে যেতে হলে এই বাস ভ্রমণ যেমন অপরিহার্য, তেমনি আরামদায়ক। এখানে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের ওঠা নামা লক্ষ্য করছিলাম, এমন সময় স্যুট-কোট পরিহিত এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এসে জিগেস করলেন, আপনারা কি সবাই সিমলা যাচ্ছেন?

যাচ্ছি শুনে তিনি শিউরে উঠে বললেন, আমার কথা শুনুন, যাবেন না।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

আমাদের সঙ্গে এক বৃদ্ধ দম্পতি যাচ্ছিলেন, তাঁদের দিকে ইসারা করে এই হিতৈষী-ভদ্রলোক বললেন, ঠাণ্ডা মশায়, ঠাণ্ডা। সিমলায় বরফ পড়ছে, সে যে কি নিদারুণ ঠাণ্ডা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। আমি কলকাতার 'অমুক' ওষুধ কোম্পানীর রিপ্রেজেনটেটিভ – বছরে তিনবার আমাকে এ-অঞ্চলে ঘুরতে হয়। এখানকার শীতের অভিজ্ঞতা আপনাদের নেই, আমার আছে। তাই বলছি ফিরে যান। এই শীতে সিমলায় গেলে নির্ঘাৎ ওঁরা 'কোলাপ্‌স' করবেন।

এই দম্পতির দুই পুত্রও সঙ্গে যাচ্ছিলেন। একজন বললেন, সোয়েটার-কোট-ওভারকোট-গরমচাদর-মাঙ্কি-ক্যাপ-মাফলার ইত্যাদি আটরকম গরম পোশাক পরেছেন বাবা, তা সত্ত্বেও ঠাণ্ডা লাগবে?

ভদ্রলোক গর্জন করে বললেন, লাগবে। আপনাদের অভিজ্ঞতা নেই, কিছু জানেন না। সিমলায় গিয়ে বুঝতে পারবেন—সে কি বরফের রাজ্যে এসে পৌঁছেছেন। রাতে যখন হিমপ্রবাহ বইবে, আর লেপ কম্বলের তলায় শুয়েও যখন ঠকঠক করে কাঁপবেন—তখন ঠ্যালা বুঝতে পারবেন।

হঠাৎ চেয়ে দেখি পাশে অনিল নেই। কোথায় গেল? না, বেশিদূর যায়নি। একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে এক পুরিয়া মকরধ্বজ বের করে মুখে ঢেলে দিল। তারপর এক টুকরো আদা কচকচ করে চিবুতে লাগল। চোখাচোখি হতে বলল, শিল-নোড়াও সঙ্গে আছে, কিন্তু এখন আর ওষুধ ঘষার সময় নেই।

নির্দিষ্ট সময়ে বাস ছাড়ল। চণ্ডীগড় থেকে সিমলার দূরত্ব ৭২ মাইল। যেতে ছ'ঘণ্টা লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পিঞ্জোরের বিখ্যাত মোগল উদ্যানের পাশ কাটিয়ে কালকায় গিয়ে পৌঁছুলাম। এখান থেকে কিছু

কমলালেবু, কলা ও লজেন্স কিনলাম। কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে বাস পুনরায় চলতে শুরু করল। এইবার সত্যিকার পর্বত আরোহণ আরম্ভ হল।

যতই উপরে উঠছি নতুন বিস্ময় আর চমকে অভিভূত হয়ে পড়ছি। পাহাড়ের অনুপম সৌন্দর্য, নির্মেঘ ঘোলাটে আকাশ, কখনও সূর্য পাহাড়ের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে, কখনও বা প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত সূর্য-কিরণের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে পাহাড়ের চূড়া আলোকিত হয়ে উঠছে। সতর্ক হাতে বাস চালাচ্ছে সর্দারজি, তার হাতেই আমাদের পঞ্চাশজন প্রাণীর ভাগ্য নির্ভর করছে। একটু অসতর্ক হলে আর কথা নেই, যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। প্রতি মুহূর্তে বাসের গতিপথ পরিবর্তন হচ্ছে—কখনও উপরে উঠছে, কখনও নিচে নামছে, আর অনবরত বাঁক ঘুরছে। এই বাঁকের মুখে কতবার যে আমাদের বাস উপর থেকে আগত মিলিটারি লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হতে হতে 'একটুর জন্য' রেহাই পেয়েছে, তার হিসেব নেই। কোথাও দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কুটির, কোথাও বা বহু নিচে সঙ্কীর্ণ জলাশয়। কোনো পাহাড় রুক্ষ কর্কশ, কোনোটায় বা সবুজের সমারোহ। উঁচু নিচু পাহাড়ের গাত্রে কি ভাবে যে এ-দেশী লোকেরা প্রাণপাত পরিশ্রম করে ফসল ফলায়, না দেখলে কল্পনা করা যায় না। পাইন ও অন্যান্য দীর্ঘদেহী বৃক্ষশ্রেণী সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গলা আর পা দুটি যত দূর সাধ্য সম্মুখে প্রসারিত করে গোরু-ছাগল সন্তর্পণে ঘাস পাতা অন্বেষণ করে চলেছে। উল্লেখযোগ্য ফুলের সমারোহ চোখে না পড়লেও বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি ও নানা জাতীয় পাখির দেখা মাঝে মাঝেই পাওয়া যাচ্ছে। শুকনো ডাল পালা মাথায় করে ঘরে ফিরে চলেছে পাহাড়ী মেয়ে পুরুষ। হৃষ্ট-পুষ্ট কুকুর পথের পাশে দাঁড়িয়ে কৌতুহলী দৃষ্টিতে বাসের দিকে তাকিয়ে ল্যাজ নাড়ছে। কোনো কোনো উত্তুঙ্গ পাহাড়ের মাথায় বরফ জমেছে। কখনও বা রেল লাইনের পাশ কাটিয়ে কখনও বা তাকে উঁচু বা নিচু রেখে বাস এগিয়ে চলেছে। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভায় পাহাড়-গুলিকে মনোরম দেখাচ্ছে। আর কাঁচের জানালার ফাঁক দিয়ে অবাঞ্ছিত শীতল হাওয়া ঢুকে যাত্রীদের সন্ত্রস্ত করে তুলছে।

এ-পথে ধরমপুর একটি বিখ্যাত স্থান। এখানে পাহাড়ের গায় প্রচুর ঘরবাড়ি ছবির মতো সুন্দর দেখায়। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে কসৌলীতে একটি আদর্শ স্বাস্থ্য-নিবাস গড়ে উঠেছে। এরপর সোলন, সোলনেও অনেক ঘরবাড়ি দোকান চোখে পড়ল। এখানে বাস বেশ কিছুটা সময় বিশ্রাম নেয়। আমরা বাস থেকে নামলাম। চা খেলাম। বাদাম ভাজা, মিষ্টি এবং মুড়ি কিনলাম। কলের জলে হাত ধুতে গিয়ে টের পেলাম বরফ জলে হাত দিয়েছি। এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলাম, এবার কাঁপুনি শুরু হল। তাড়াতাড়ি বাসে গিয়ে ঢুকলাম।

সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে হেডলাইট জ্বালিয়ে বাস সর্পিল গতিতে এগিয়ে চলেছে। বাসভ্রমণের প্রথম পর্বে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার যে আনন্দ আর উত্তে-জনা ছিল, দীর্ঘক্ষণ বাসে থাকার ফলে তার যে অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে, যাত্রীদের অসহিষ্ণু মনোভাবই তার সাক্ষী। যদিও পথের ধারে মাইল-পোষ্ট পোঁতা আছে, তা লক্ষ্য করেও নবাগত যাত্রীদের কণ্ঠে বার বার ধ্বনিত হচ্ছে—কত দূর? আর কত দেরি?

অকস্মাৎ আমাদের সম্মিলিতকণ্ঠের উল্লসিত জয়ধ্বনিতে নিস্তব্ধ পাহাড় উপত্যকা বনভূমি মুখর হয়ে উঠল। আলো আলো আলো! সিমলা শহরের আলো দেখা যাচ্ছে দূরে। এ যে কি বিস্ময়কর দৃশ্য—না দেখলে কল্পনা করা যায় না। মনে হচ্ছিল—মণিমুক্তা খচিত নীলাম্বরী শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে আকাশবধূ যেন আমাদের দিকে লাজুক চোখে চেয়ে আছে। নিজের সত্তাকে ভুলে গিয়ে দেহ মনের ক্লান্তি ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে শুধু দেখতে লাগলাম হরেক রকম আলোয় উদ্ভাসিত শৈলপুরীর আশ্চর্য সৌন্দর্য! এ আগাগোড়া অবাস্তব বলে ভ্রম হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আমরা যেন পথ ভুলে কোন্ এক স্বপ্ন রাজ্যে হঠাৎ এসে প্রবেশ করেছি। এই হঠাৎ পাওয়া সম্পদ, হাজার আলোর ফুলঝুরি, স্বপ্নময় পরিবেশ আমার মনে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ এনে দিল। একটি অবর্ণনীয় অবিশ্বাস্য এবং অবিস্মরণীয় সন্ধ্যা আমার মনের মণি-কোঠায় চিরদিনের জন্য আঁকা হয়ে গেল।

স্বপ্নের ঘোর কাটতে না কাটতেই বাস গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেল। কুলিদের চিৎকার, হট্টগোলে আর ভিড়ের

মধ্যে বাস থেকে নেমে একটু ফাঁকায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের মালপত্রের তদারক করছিল অনিল। একটি অল্পবয়সী কুলির পিঠে দুটো বেডিং, সুটকেস, ব্যাগ ইত্যাদি চাপিয়ে দিয়ে তার পিছু পিছু চলতে লাগলাম। আমরা কালীবাড়িতে উঠব। সেখানে পূর্বেই চিঠি দিয়ে স্থানসংগ্রহের ব্যবস্থা করে রেখেছিল অনিল। তা না হলে ডেলিগেটদের অপ্রত্যাশিত ভিড়ে, অনেকের মতো আমাদেরও চরম অসুবিধায় পড়তে হত।

কিন্তু কালীবাড়ির পথ যে এত ঘোরালো এবং ওঠা যে এত কষ্টসাধ্য, জানা ছিল না। শুধু কালীবাড়ির পথই বা বলি কেন, এখানকার অধিকাংশ পথই গগনস্পর্শী। সুতরাং এ ধরণের অপরিচিত ও অনভ্যস্ত খাড়াই পথে আমাদের মতো সমতলবাসীর পক্ষে ওঠা যে কতখানি শ্রম সাধ্য—তা এবার মর্মে মর্মে টের পাচ্ছি। সারাদিনের বাস ভ্রমণে ক্লান্ত চরণ দুটি পদে পদেই বিদ্রোহ ঘোষণা করছিল। কাজেই, দু'এক মিনিট চলার পরেই রাস্তার উপর সটান বসে পড়ে বিশ্রাম নিতে হচ্ছিল। ভাগ্যিস, রাস্তায় লোক চলাচল করছিল না, তা হলে তাদের সামনে রীতিমত হাস্যাস্পদ হতে হত। দু মণের উপর বোঝা পিঠে বেঁধে আমাদের কুলি অনায়াসে উপরে উঠতে লাগল। আমরা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ধীরে ধীরে বিশ্রাম নিতে নিতে এবং হাঁপাতে হাঁপাতে এক সময়ে কালীবাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। আর নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই যখন ধূমায়িত চায়ের কাপ হাজির হল, দেহ মনের অবসাদ এক মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। রাতে মাংস ভাত খেয়ে নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। ঘুম আসতে বিলম্ব হল না।

পরদিন বেশ একটু বেলাতেই ঘুম থেকে উঠলাম। আকাশ কুয়াসাচ্ছন্ন। সূর্যের ক্ষীণ আলো দেখতে না দেখতেই চকিতে মিলিয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা কন্‌কনে শাণিত হাওয়া ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে। কালীবাড়ির ছাত থেকে কুয়াসার আবরণে ঢাকা ছন্দোবদ্ধ পাহাড়গুলিকে অতিকায় নিদ্রিত প্রাণীর মতো দেখাচ্ছিল। আকাশের এক কোণে রক্তিম বর্ণের রেখাগুলি যে সূক্ষ্ম কারু-কার্যের বৈচিত্র্যময় আলপনা আঁকছিল, সেই রমণীয় মুহূর্তকে ক্যানভাসে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য, বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীপূর্ণ চক্রবর্তী মশায়ের তুলি সক্রিয় রয়েছে দেখলাম।

ভারতে যতগুলি স্বাস্থ্যকর শৈলনিবাস আছে, উচ্চতায় সিমলা তাদের মধ্যে দ্বিতীয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৭২০০ ফুট। প্রথম স্থান অধিকার করেছে উটি—এর উচ্চতা ৭৫০০ ফুট। কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে সিমলা ইংরেজদের আমলে শুধু যে অদ্বিতীয় ছিল তাই নয়,বর্তমানে হিমাচল প্রদেশের প্রধান শহর হিসেবেও সিমলা এ যুগেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এর পরিচ্ছন্ন পথঘাট, নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী, ঘরবাড়ি, হোটেল, রাষ্ট্রপতি ভবন, ফুটবল মাঠ, স্কেটিং গ্রাউণ্ড, বড় বড় অফিস, ব্যাঙ্ক, স্কুল, কলেজ, বাজার, চার্চ সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশ-বিদেশের ট্যুরিস্টদের ভিড়ে সিমলার পথ ঘাট মুখর হয়ে ওঠে।

এখানকার প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র মল রোডে অবস্থিত। এই স্থানটি বেশ প্রশস্ত এবং কিছুটা সমতল। বেড়ানো এবং বিশ্রামের পক্ষে আদর্শ। এই পথের দুধারে বেঞ্চ এবং গ্যালারি পাতা আছে। স্বাস্থ্যান্বেষীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে বসে রৌদ্রসেবন করে। এখানথেকে পাহাড়ের দৃশ্যাবলী খুব চমৎকার দেখায়। এই পথের প্রবেশ মুখে লালা লাজপত রায়ের স্ট্যাচু আছে—এটি পূর্বে লাহোরে ছিল, ১৯৪৮ সালে এখানে আনা হয়। এই পথের অন্যপ্রান্তে মহাত্মা গান্ধীর মর্মরমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। মল রোডের নিচে স্কেটিং গ্রাউণ্ড। আবহাওয়া ভাল থাকলে সকাল এবং সন্ধ্যায় স্কেটিং দেখতে প্রচুর ভিড় জমে। হিমাচল প্রদেশের 'ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অফিস' এই মল রোডে। টুরিষ্টরা এখান থেকে ভ্রমণ-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে। রবিবারে এখানকার দোকানপাট বন্ধ থাকলেও, সকালে এই অফিস খোলা আছে দেখে সেখানে ঢুকে পড়লাম।

সিমলার 'অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান'-এর মধ্যে 'জাকো হিল এবং 'প্রসপেক্ট হিল' উল্লেখযোগ্য। এদের উচ্চতা এবং মল রোড থেকে দূরত্ব যথাক্রমে ৮,০৫০ ফুট ও এক মাইল এবং ৭,১৩৭ ফুট ও তিন মাইল। আমরা প্রথমটাতে আরোহণ করব, স্থির করলাম।

'জাকো হিল'-এ ওঠা এক প্রাণান্তকর পরিচ্ছেদ

দীর্ঘ খাড়াই পথ ভেঙ্গে উপরে উঠছি তো উঠছি। দুধারের বাড়িঘর ছাড়িয়ে পথ এঁকেবেঁকে বড় বড় গাছের সারির ভিতর দিয়ে কোথায় যে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে, নিচে থেকে তার হদিশ মেলে না। পাহাড়ের মাথা গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। রোদের চিহ্ন নেই, গাছগুলির আড়ালে কুয়াশা যেন পথ হারিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে। বাতাসে শীতের তীব্রতা থাকলেও, আমাদের ক্লান্ত শরীরে তখন ঘাম ঝরছে। ইতিমধ্যে ক্ষণস্থায়ী মৃদু বর্ষণও হয়ে গিয়েছিল। পথের স্থানে স্থানে বরফ জমে রয়েছে দেখলাম। বৃষ্টির জল এবং বরফের মিতালির ফলে যে কোনো মুহূর্তে পা পিছলে যেতে পারে। তাই খুব সতর্কতার সঙ্গে পা টিপে টিপে এগুতে হচ্ছিল। এ-সব ক্ষেত্রে লাঠি উপযুক্ত অবলম্বন; তা জানা সত্ত্বেও আমরা লাঠি কিনতে ভুলে গিয়েছিলাম। এই 'জাকো-হিল'এ উঠে মনে পড়ল ছোটবেলায় পড়া একটা কবিতার কথা :

'উঠিয়া পর্বত চূড়ে ধরণীরে হেরি দূরে
পথের তো দুঃখ কষ্ট ভ্রম মনে হয়।'

সত্যিই তাই। পথের দুঃখ কষ্টের কথা এক মুহূর্তে ভুলে গিয়ে অপলক চোখে শুধু দেখতে লাগলাম ঢেউ-খেলানো পাহাড়গুলির আশ্চর্য সমাহিত রূপ। সিমলায় এসে এই পাহাড়ে না উঠলে ভ্রমণের আনন্দ থেকে অনেকখানি বঞ্চিত হ'তে হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার পক্ষে এই স্থানটি পরম রমণীয়। এখানে একটি মন্দির আছে—হনুমান মন্দির। মন্দিরের চত্বরে এবং এর আশে পাশে মিশ্রির দানার মতো জমাট বেঁধে বরফ পড়ে আছে। বহুদূরে উচ্চশ্রেণীর পাহাড়গুলি বরফের টুপি প'রে আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছে। বেলা ১১টা বাজে। সূর্য তখনও যথারীতি কুয়াসার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। তার সেই 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'তে কোন্ কোন্ ভাগ্যবান পাহাড়ের চূড়া আলোকিত হয়ে উঠবে, তা আগে থেকে আন্দাজ করা শক্ত। ক্যামেরা হাতে উপযুক্ত আলোর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছটফট করছি, কিন্তু বৃথাই। এখানকার পটভূমিকায়, সূর্যের অসহযোগিতার জন্য মনের মতো ফোটো তোলা সম্ভব হল না।

তারপর কালীবাড়িতে ফিরে এসে স্নানাহার শেষ করে পুনরায় যখন শহর প্রদক্ষিণে বেরুলাম, আকাশ তখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল পথঘাটে শীতল আবহাওয়ার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে চমৎকার লাগছিল। আর সন্ধ্যায় কালীমন্দিরে গায়কদের সুরেলা কণ্ঠে শাক্ত পদাবলী ও বৈষ্ণব পদাবলীর পরিচিত গানগুলি যখন ধ্বনিত হচ্ছিল, পুণ্যার্থী বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীর ভিড়ে, প্রসাদ বিতরণে, আরতি এবং ধূপ চন্দনের গন্ধে—এ-পরিবেশ মধুর হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু যে-প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিলাম,—অর্থাৎ সিমলায় 'স্নো' পড়তে দেখব,—তা দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের মতে এখন যে-কোনো মুহূর্তে তুষারপাত শুরু হতে পারে। তাপ-মাত্রা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, শুভ লগ্নের জন্য হিমপ্রবাহ বিনিদ্র প্রহর গুণছে—আবহাওয়ায় একটা থমথমে ভাব—হয়ত তুষারপাত শুরু হবার গোপন প্রস্তুতি চলছে তলে তলে।

সিমলায় এসে তুষারপাত দেখা হল না। হিংস্র হিম-প্রবাহের সঙ্গে পরিচয়ও ঘটল না আমাদের। স্বাভাবিক ঠাণ্ডার মধ্যে দুটো সোয়েটার এবং একটা গরম চাদর সম্বল করে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা সিমলার পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। একটিমাত্র লেপ গায়ে জড়িয়ে রাতেও আরামে নিদ্রা গেছি। শীত অসহ্য মনে হয়নি।

তুষারপাত না দেখলেও, পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই কাঁচের জানালার মধ্য দিয়ে অভিনব দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। বরফ বরফ বরফ! পাহাড়ের চূড়ায়, বাড়ির ছাতে কার্ণিশে, পথে ঘাটে, গাছের মাথায়, বরফের প্রলেপ পড়ে এই শৈলপুরীকে অনন্যসাধারণ মহিমায় ভূষিত করেছে। আজ কুয়াসার চিহ্নমাত্র ছিল না, সূর্য-কিরণের অপার দাক্ষিণ্যে পাহাড়-উপত্যকা-বনভূমি রহস্য-ময় হয়ে উঠেছে। রিক্ত ঋতুর এই অভিনব শ্বেত-সজ্জা দেখে হৃদয় মন কানায় কানায় ভরে গেল।

সিমলায় প্রথম সন্ধ্যা দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, আজকের সকালে পাওয়া এই অপ্রত্যাশিত রোমাঞ্চটুকু তার সঙ্গে যোগ করে নিলাম।

পশ্চিমবঙ্গের দুর্দ্দশা—

কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ হইতে মহম্মদের পবিত্র কেশ চুরি করিয়া কাশ্মীরবাসী একদল মুসলমান তথায় দাঙ্গা হাঙ্গামা করিলে তাহার পরই পূর্ব পাকিস্তানবাসী অবাঙ্গালী মুসলমানগণ পাকিস্তানবাসী হিন্দুদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তাহার ফলে হাজার হাজার হিন্দু পাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতে আরম্ভ করে। সে জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের ঘটনা। তাহার পর হইতে গত দেড় মাস কাল সমানে পূর্বপাকিস্তানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলিতেছে। ইহার পর পাকিস্তানীদের প্ররোচনায় পশ্চিমবঙ্গবাসী একদল মুসলমান এখানকার হিন্দুদের সহিত বিবাদ বাধাইয়া পশ্চিমবঙ্গে অরাজকতা সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে কয়েকদিন কলিকাতা সহরেও মানুষ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কঠোর হস্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনের চেষ্টা পাইয়াছে বটে, কিন্তু এই দেড় মাসের হাঙ্গামায় পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুরা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সরকার মুসলমানদিগকে ক্ষতিপূরণ দানে যত অধিক আগ্রহ ও তৎপরতা দেখাইয়াছেন, ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদিগকে ক্ষতিপূরণ দানে তত তৎপর হন নাই। এ জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভ দেখা যাইতেছে। পূর্ববঙ্গে এই দেড় মাসে ২০ হাজার বা তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী হিন্দু নরনারীকে হত্যা করা হইয়াছে—কত নারীকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে তাহার হিসাব নাই। হিন্দুর কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি লুন্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। যে সকল হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার একাংশ নিহত হইয়াছে, অপরাংশ কপর্দকহীন অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। পাশপোর্ট ভিসা প্রভৃতির অজুহাতে পথে কত হিন্দু যে অসহায় অবস্থায় না খাইয়া জীবন মাত্র লইয়া আছে, তাহারও হিসাব নাই। প্রথমে খুলনা জেলায় হাঙ্গামা আরম্ভ হয়, তাহার পর তাহা পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, এমনকি চট্টগ্রামে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। সে হাঙ্গামা আজও চলিতেছে (২০শে ফেব্রুয়ারী)—কবে যে বন্ধ হইবে, কেহ বলিতে পারে না। এ সম্পর্কে কয়েকজন—কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না, শ্রীঅশোককুমার সেন, শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েকবার কলিকাতায় আসিয়াছেন ও কয়েকহাজার উদ্বাস্তু হিন্দুকে দণ্ডকারণ্যে লইয়া তথায় তাহাদের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। দণ্ডকারণ্যের বর্তমান পরিচালক শ্রীশৈবালকুমার গুপ্ত খুব তৎপরতার সহিত এই সকল উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্যে লইয়া গিয়া পুনর্বাসন দান করিয়াছেন। বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যভারত—এমন কি মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্র রাজ্যেও যাহাতে বাঙ্গালী উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়, সে জন্যও কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করিতেছেন। পূর্বপাকিস্তান হইতে শুধু উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা চলিয়া আসিতে বাধ্য হয় নাই—বহু নিম্নবর্ণের হিন্দু, এমন কি সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতিও অত্যাচারিত হইয়া পলাইয়া আসিয়াছে। আসামের দিকের লোক আসামে প্রবেশ করিয়াছে—তবে অধিকাংশ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চলিয়া আসিয়াছে। এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য দেশের নেতারা সর্বদা আলাপ আলোচনা করিতেছেন—তাঁহারা পাকিস্থান কর্তৃপক্ষের সহিত এ বিষয়ে আলোপ আলোচনা করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ কোন আপোষের কথা শুনিতে চান না।

সবার উপর পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার পাকিস্তানী গুপ্তচর প্রবেশ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী মুসলমান অধি-

বাসীদের উত্তেজিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে পাকিস্তানী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে। অতীব পরিতাপ ও দুঃখের কথা—পশ্চিমবঙ্গের শাসনকর্তারা তাহাদের কঠোর হস্তে দমন না করায় তাহাদের কাজ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। এমনও শুনা যায় যে বহু মুসলমান সরকারী কর্মচারী এই সকল পাকিস্তানী গুপ্তচরদিগকে গোপনে সাহায্য দান পর্য্যন্ত করিয়া চলিয়াছেন। এমন কি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহুমাউন কবীর সম্বন্ধে একখানি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রত্যহ যে সব সংবাদ প্রচার করিতেছেন, তাহার কিয়দংশ সত্য হইলেও সে সংবাদে স্তম্ভিত হইতে হয়। বিপন্ন মুসলমানদিগকে সাহায্য দানের ব্যপদেশে তাহাদের প্রতি যে অত্যধিক আনুকূল্য প্রকাশ করা হইয়াছে, এ বিষয়ে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি একমত—সকলে একবাক্যে সে কাজের নিন্দা করিতেছেন।

২।৪ দিন পূর্বেও কলিকাতায় একদল মুসলমান অধিবাসী যে ভাবে সরকারী কার্য্যে বাধা দিয়াছে, তাহার পরও সরকার কেন নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন—তাহা বুঝা যায় না। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ইদের দিন পশ্চিমবঙ্গবাসী হাজার হাজার মুসলমান কোন্ সাহসে ভারত সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখাইয়া পাকিস্তান সরকারের প্রতি আনুকূল্য দেখাইয়াছে এবং সেই রাজদ্রোহিতার পরও তাঁহাদের প্রতি সরকার কেন কোন কঠোর ব্যবস্থা করেন নাই—তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা যায় না।

প্রাক্তন বিচারপতি, বর্তমানে এম-পি শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিত্যালয়ের পরিচালক বিশিষ্ট কোবিদ ডাঃ ত্রিগুণা সেন প্রভৃতির মত লোকও সরকারের অনাচারের প্রতিবাদ করিয়া কোন ফল পাইতেছেন না। পশ্চিমবঙ্গের কয়েক কোটি মুসলমান বাস করে। যদি তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা এইভাবে বাড়িতে দেওয়া হয়, তাহার পরিণাম কি হইবে, তাহা চিন্তাও করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গবাসী যে সকল মুসলমান অন্যায় আবদার করিয়া চীৎকার করিতেছেন বা প্রকাশ্যে ও গোপনে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কেন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে না? অন্য দিকে, মুসলমান পল্লীর মধ্যে যে সকল হিন্দু বাস করে, কলিকাতার মত সহরেও কেন তাহাদের সর্বদা ভীতির মধ্যে বসবাস করিতে হইবে? যে সকল হিন্দুর আত্মীয়-স্বজন পাকিস্তানে নিহত বা নিখোঁজ হইয়াছে বা সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য আজও পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতে সমর্থ হয় নাই, তাহাদের কি উত্তেজিত বা দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই? পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা এ সকল বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি। এক দিকে যেমন সকল উদ্বাস্তুর উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনই দুষ্ট-মনোভাবাপন্ন মুসলমান অধিবাসীদের কঠোর হস্তে দমনের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের এই দুর্দিনে শাসন কর্তৃপক্ষ কঠোর না হইলে সমগ্র জাতি একদিন দারুণ বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ৬৭তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ভারতসরকার দুইটি স্মারক ডাক-টিকিট বাহির করেন এবং এই উপলক্ষে গত ২৩শে জানুয়ারি নূতন দিল্লীতে যে অনুষ্ঠান হয় তাহাতে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী সীতা বিশ্বাসকে নেতাজী ডাক-টিকিটের একটি বিশেষ অ্যাল্বাম্ উপহার প্রদান করেন।

গত ২৬শে জানুয়ারীর "রিপাবলিক দিবসে" নূতন দিল্লীর রাজপথে যে বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল তাহাতে অংশগ্রহণকারী এন, সি,সি বালিকা দলকে মার্চ্চ করিতে দেখা যাইতেছে।

নূতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী—

গত ২৫শে জানুয়ারী—রাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণণ প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুকে সাহায্য করিবার জন্য ২জন নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন (১) প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীকে দপ্তরবিহীন মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে—তিনি সকল দপ্তরের কাজ পর্য্যবেক্ষণ করিবেন ও সকল মন্ত্রীর কাজে সাহায্যদান করিবেন (২) প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীদামোদর সঞ্জীবায়াকে শ্রম ও কর্ম-সংস্থান বিভাগের মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছে। শ্রীশাস্ত্রী গত দেড়মাস কাল যেরূপ দক্ষতা, তৎপরতা ও শ্রমশীলতার সহিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাজ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে শ্রীজহরলালের স্থান পূর্ণ করিতেই দেখা যায়। তাঁহার বয়স মাত্র ৬০ বৎসর—তিনিই হয় ত পরে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিবেন।

কলিকাতা শহরে গুণ্ডামী—

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা সহরের মধ্যে বেনেপুকুরে কলিকাতার পুলিস কর্পোরেশনের কাউন্সিলার সালাউদ্দীনকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করিতে গেলে প্রায় একহাজার মুসলমান পুলিসকে বাধা দেয় ও আক্রমণ করে। ফলে পুলিশের গাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও কয়েকজন পুলিশ আহত হয়। অবশ্য সালাউদ্দীনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ হাঙ্গামা করার জন্য বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই হাঙ্গামা দমনে পুলিশের যতটা কঠোর হওয়া উচিত ছিল পুলিশ তাহা হয় নাই। এই ঘটনায় কলিকাতার অধিবাসীরা আতঙ্কিত হইয়াছে। যদি কলিকাতাবাসী মুসলমানদিগকে এইভাবে হাঙ্গামা করিতে দেওয়া হয় এবং অধিকতর কঠোর হস্তে হাঙ্গামা বন্ধের ব্যবস্থা করা না হয়, তাহা হইলে কলিকাতা অচিরে এক অরাজকতা-পূর্ণ অবস্থার মধ্যে পড়িবে, সন্দেহ নাই। আমরা কলিকাতার শাসন কর্ত্তৃপক্ষকে অধিকতর কঠোরতার সহিত হাঙ্গামা দমন করিতে অনুরোধ করি।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বাংলার একজন খ্যাতিমান দেশকর্মী ও স্বাধীনতালাভের পর কয়েক মাস তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান ছিল ঢাকা জেলার মালিকান্দা গ্রামে। পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচারের সংবাদে বিচলিত হইয়া তিনি নিজে তথায় যাইয়া দেশবাসীর অবস্থা দেখিবার জন্য পাকিস্তান সরকারের অনুমতি প্রার্থনা

করিয়াছিলেন। পাক সরকার সে অনুমতি দেন নাই। তাঁহার মত ধীর, স্থির, পণ্ডিত ব্যক্তিকেও পাক-সরকার বিশ্বাস করেন না—ইহাই তাঁহাদের কার্য্যধারা।

হারে ভাতা পাইবেন। ২৫ লক্ষ কর্মী এ সুযোগ পাইবে ও এ জন্য সরকারের মাসিক ৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়িবে। আশা করা যায় রাজ্য সরকারসমূহ

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের অসুস্থতার জন্য উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন অস্থায়ী-ভাবে রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করেন। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ভারতের প্রধান বিচারপতি শ্রীপি, বি, গজেন্দ্রগাদকর নূতন দিল্লীতে ডঃ জাকির হোসেনকে শপথ গ্রহণ করান।

বেলগাছিয়া এলাকার উন্নয়ন—

কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত পরামর্শ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতা বেলগাছিয়ায় পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার উন্নয়নের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ এঞ্জিনিয়ার শ্রীসুধাংশু মিত্র এ বিষয় সি-এম্-সি-ও'র চিফ এঞ্জিনিয়ার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাবলিক হেল্‌থ এর চিফ এঞ্জিনিয়ারের সহিত এক যোগে এ কাজে হাত দিয়াছেন। আগামী বর্ষায় জল জমা বন্ধ হইলে লোক উপকৃত হইবে।

মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি—

কেন্দ্রীয় সরকারের যে সকল কর্মচারীর বেতন মাসিক ৩৯৯ টাকা পর্যান্ত তাঁহাদের সকলের মহার্ঘ ভাতা মাসিক ২ টাকা হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে—৭ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে এ সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই হইতে কর্মচারীরা বর্দ্ধিত

কেন্দ্রের মত তাঁহাদের কর্মীদের ভাতা বাড়াইবার ব্যবস্থা করিবেন।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি—

রাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণের চক্ষু রোগের জন্য তিনি অসমর্থ হওয়ায় গত ৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কয় দিনের জন্য উপরাষ্ট্রপতি ডাক্তার জাকীর হোসেনকে রাষ্ট্রপতির কাজ করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। যে সময়ে ভারতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সকলকে আতঙ্কিত করিয়াছে, সে সময়ে একজন মুসলমান রাষ্ট্রপতি হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। পাকিস্তান যাহাই করুক না কেন, ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ ভারত-বাসী মুসলমানদিগকে সর্ব-প্রকার সুবিধাদানে কখনও কুণ্ঠিত হন না ইহা ভারতরাষ্ট্রের বিশেষত্ব।

সরোজিনী নাইডু—

স্বর্গতা কংগ্রেস-নেত্রী সরোজিনী নাইডুর ৮৫তম জন্ম দিবস উপলক্ষে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভারতসরকার তাঁহার

স্মৃতিতে ১৫ নয়া পয়সার ডাক টিকিটে তাঁহার ছবি ছাপিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালীর মেয়ে, উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া মাদ্রাজী ডাঃ নাইডুকে-বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতাশক্তি তাঁহাকে কংগ্রেসে নেতৃত্বদান করে—তাহা ছাড়া ইংরাজীতে লিখিত তাঁহার কবিতা ও সাহিত্যে তাঁহার স্মরণীয় দান। পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা সরোজিনীর কন্যা।

"রিপাবলিক্ দিবসে" নূতন দিল্লীর ন্যাশনাল্ ষ্টেডিয়ামে যে নৃত্য-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে অংশগ্রহণকারী পাঞ্জাব প্রদেশের নর্তক-দলকে পাঞ্জাবের বিখ্যাত "ভাঙ্গরা" নৃত্য প্রদর্শন করিতে দেখা যাইতেছে।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী—

প্রবীণ রাজনীতিক ও অর্থনীতিক পণ্ডিত শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী দিল্লীতে কেন্দ্রীয় পরিবহন নীতি ও সংযোগরক্ষা কমিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন। পরিকল্পনা কমিশনের অসহযোগিতা, কয়েকটি রাজ্যসরকারের সহযোগিতার অভাব ও বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুসন্ধানে বিরূপতার জন্য তিনি সভাপতি পদ গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মত একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির পদত্যাগে দেশের ক্ষতি হইবে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

কাশ্মীর সমস্যা—

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান হওয়া সত্বেও ঐ রাজ্য স্বেচ্ছায় ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। স্বাধীনতালাভের পর উহার একটি ছোট অংশ নিজেদের স্বাধীন কাশ্মীর বলিয়া ঘোষণা করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে গিয়াছিল। সেখানকার অধিবাসীরা পাকিস্তানীদের প্ররোচনায় মধ্যে মধ্যে সমগ্র কাশ্মীর রাজ্যকে পাকিস্তানের মধ্যে পাইবার আবদার করে ও সে জন্য চীৎকার করে। কাশ্মীরে কয়েক দিন দাঙ্গা হাঙ্গামার পর কেন্দ্রীয়মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর চেষ্টায় সেখানে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ সেখানে গোলমাল ধরিয়া রাখিতে চায়। পাকিস্তানের পক্ষ হইতে তাহাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীভুট্টো জাতিসংঘের সভায় কাশ্মীর সম্বন্ধে আলোচনার প্রস্তাব করিয়া তথায় গমন করে ও কাশ্মীরসমস্যা সমাধানের জন্য জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করে। বলা বাহুল্য কাশ্মীর সমস্যার সমাধান বহুদিন পূর্বে হইয়া গিয়াছে এবং কাশ্মীর ভারতের অন্যতম রাষ্ট্ররূপে ভারত রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া কাজ করিতেছে। শ্রীভুট্টোর প্রস্তাবের উত্তর দিবার জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা জাতিসংঘের সভায় যোগদান করিতে যান। প্রথম দিকে আমেরিকা ও ইংলণ্ড শ্রীভুট্টোকে সমর্থন করে। চাগলা শুধু সুপণ্ডিত নহেন, সুবক্তা। তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি ও ইংলণ্ডে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি এবার জাতিসংঘে পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্তরে যে ভাষণ দেন, তাহা নানা কারণে তাৎপর্য্যপূর্ণ। তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন, কাশ্মীর সমস্যা বলিয়া কোন সমস্যা নাই। পাকিস্তান ভারতের সহিত বিবাদ করিবার জন্য সর্বদা কাশ্মীরে গোলমাল করিবার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য শ্রীচাগলা নিজে একজন মুসলমান। তাঁহার মুখে শ্রীভুট্টোর কথার উত্তর শুনিয়া সমগ্র পৃথিবীর লোক স্তম্ভিত হইয়াছে। শ্রীভুট্টো শ্রীচাগলার কথার উত্তর দিতে না পারিয়া

কোন এক অছিলায় জাতিসংঘের সভা ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে ফিরিয়া আসিয়াছে। কাশ্মীর সমস্যা বলিয়া যে কিছু নাই, তাহা এবার ভাল করিয়া প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। ওদিকে কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদে পয়গম্বরের চুল যে পাকিস্তানী গুপ্তচররা চুরি করিয়াছিল. তাহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে ও দুষ্কৃতকারীরা ধরা পড়িয়াছে। কাশ্মীর এখন ভারতের মধ্যে থাকিয়া শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হউক, সকলেই ইহা প্রার্থনা করিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট—

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ও বিধান পরিষদে পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬৪-৬৫ সালের আয়ব্যয়ের খসড়া হিসাব উপস্থিত করিয়াছেন। এ বৎসর রাজস্ব খাতে ব্যয় অপেক্ষা আয় ৫ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা অধিক হইলেও মূলধন নিয়োগ খাতে আয় অপেক্ষা ব্যয় ৮ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। কাজেই বাজেটে মোট ঘাটতি হইবে ২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। সরকার ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্ট্রি ফি বাড়াইবেন ও ভূমিরাজস্ব হইতেও অতিরিক্ত এক কোটি টাকা আয় করিবেন। অন্যদিকে সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের মহার্ঘভাতা বাড়াইয়া ব্যয়ের পরিমাণ বর্দ্ধিত করা হইবে। নূতন অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার বাবু এবার বাংলা ভাষায় ৮০ মিনিট বক্তৃতা দিয়া বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় বাজেট বক্তৃতা এই প্রথম।

প্রজাতন্ত্র দিবসে উপাধি লাভ—

গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে যাহাদের উপাধি দানে সম্মানিত করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। পদ্মবিভূষণ হইয়াছেন (১) লেখক কাকাসাহেব কালেলকার ও (২) কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ। কবিরাজ মহাশয় বাঙ্গালী ও ভারতবর্ষের লেখক। তাঁহার এই উপাধিলাভে বাঙ্গালী জাতি গর্বিত এবং সকলের পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাকে প্রণাম জানাই। ১৮জন পদ্মভূষণ ও ৯২জন পদ্মশ্রী উপাধি পাইয়াছেন —পদ্মভূষণ দলে আছেন— ইস্পাত, খনি ও ভারী এঞ্জিনিয়ারিং মন্ত্রণালয়ের উপদেশক শ্রীঅনিলবন্ধু গুহ, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দিল্লীর সংবাদ-বিভাগের অধিকর্তা শ্রীভোলানাথ মল্লিক, কলিকাতায় বৈজ্ঞানিক ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তনমন্ত্রী ডাঃ রফিউদ্দীন আমেদ ও অমৃতবাজার পত্রিকা ও অমৃত সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। পদ্মশ্রী উপাধি পাইয়াছেন—বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর—শ্রীপি-সি (প্রতুলচন্দ্র) সরকার ও দিল্লীর নিউক্লিয়ার মেডিসিনের ভারপ্রাপ্ত লেঃ কঃ সন্তোষকুমার মজুমদার। লেঃ কঃ নিখিলেশ বসু রাষ্ট্রপতির সেবাপদক লাভ করিয়াছেন। আমরা ডাঃ আর-আমেদ, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও শ্রীপি-সি সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। শ্রীপি-সি-সরকারের সহিত গত প্রায় ২০ বৎসর ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান।

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত সমাবর্তন উৎসবে বাংলার প্রবীণ কবি ও সাহিত্যিক কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়কে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক প্রদান করিয়া সম্মানিত করা হইয়াছে। আমরা কবিবরের এই সম্মানলাভে তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই ও তাঁহার সুদীর্ঘ শান্তিপূর্ণ জীবন কামনা করি।

গোপন-কথা

আধুনিকা-তরুণী—অপদার্থ!···পই-পই করে বললুম তোমাকে যে আমাদের বিয়েটা ভালোয়-ভালোয় চুকে যাবার আগেই এ খবর যেন ক্ষুণাক্ষরে বাবা-মা বা বাড়ীর কারো কানে না পৌছায়···আর এদিকে তুমি কিনা শেষে সব কথা ফাঁশ করে ··

প্রেমিক-তরুণ—বারে···তোমার কথামতোই তো সবাইকে আমি সেই কথাই বলে আসছি এতদিন—কেউ যেন আমাদের বিয়ের কথা কোনোভাবেই ফাঁশ না করে!

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা
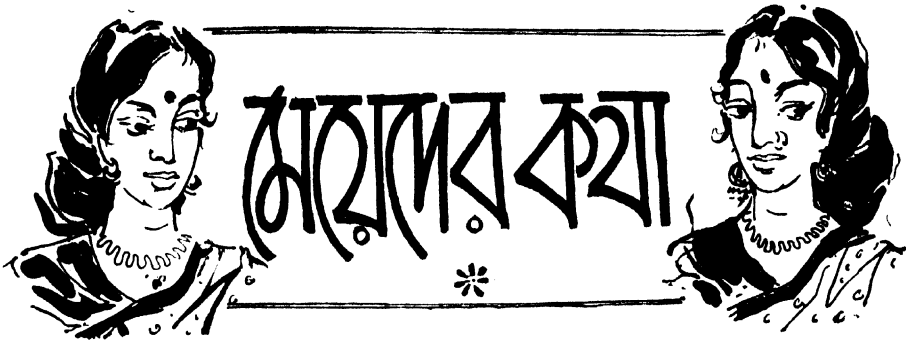
"তুলসীকৃত রামায়ণোক্ত নারী ধর্ম"

(আলোচনা)

বাসবী দত্ত

ভারতবর্ষের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত নির্বাণপ্রিয়া দেবীর প্রবন্ধ পড়ে আমাদের আনন্দ ও কৌতুক যুগপৎ উৎপন্ন হয়েছে। আনন্দ হয়েছে এ জন্য যে নির্বাণ-প্রিয়া দেবী সংসার ধর্মে নিস্পৃহ হইয়াও সংসারধর্ম পালনের জন্যে এমন উপদেশরাশি তুলসীদাসের রামায়ণ থেকে আহরণ করেছেন। আর কৌতুক বোধ করছি এ জন্যে, সেই নারীধর্মকে ভুলতে পারাই যে যুগের কৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই যুগের নারী হয়ে তিনি কেমন করে সেই নারী ধর্মের গুণগান করতে সাহস পেয়েছেন ?

নারীর ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই ভাবতে হবে, নারীর ধর্ম পুরুষের ধর্ম থেকে সম্পর্কমুক্ত নয়। পুরুষের ধর্ম যেখানে যথারীতি পালিত হয়, সেখানে নারীর সংশ্লিষ্ট কর্তব্য-অবহেলা সত্যি সত্যি দোষের। কিন্তু যেখানে পুরুষ তার কর্তব্যে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবান নয়, সেখানে নারীকে একতরফা পতিধর্ম পালনের উপদেশ উন্মত্ততার লক্ষণ। অপহৃতা সীতার জন্যে রাম জীবনপণ সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু এ যুগের রামেরা অপহৃতা সীতার জন্যে কী কর্তব্য পালন করছেন ? তাঁরা তো অপহৃতা সীতাদের কথা ভুলে থাকতে পারলেই ভাল থাকেন, আর অপহর্তাদের শাস্তিদান, আর অপহৃতা সীতাকে উদ্ধার করা যে তাঁদের মহান্ কর্তব্য সে কথা কখনও ভাবতেও প্রস্তুত নন। এ হেন রামেদের প্রতি রামায়ণোক্ত নারীধর্ম পালনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ যুগের রামেরা সত্যের ধার ধারে না, প্রজারঞ্জনের বদলে ওরা প্রজাশোষণ করে। ভ্রাতৃপ্রেমের বদলে ওদের বুকে ভ্রাতৃহিংসার অনল দাউ দাউ করে জ্বলছে। পত্নী প্রেমের বদলে ওদের হৃদয়ে পরনারী লালসার লেলিহান শিখা। এ সকল রামের প্রতি পতিভক্তির উপদেশ অসার প্রলাপ বাক্য নয় কি ?

সে যুগের রাম ছিলেন বীর। এ-যুগের রামেরা কাপুরুষ। তাদের ভাই লক্ষ্মণেরা শুধু উদাসীন নয়, ক্লীব। তারা ভ্রাতৃজায়াহরণের দুঃখে বিন্দুমাত্র দুঃখিত নয়। তারা ভাবে কেন শুধু শুধু রাবণের সঙ্গে ঝগড়া করে নিজের শান্তি নষ্ট করি ? নিজের জীবন বিপন্ন করি ? নিজের প্রাণ তাদের কাছে নারী জাতির সম্মান মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশী প্রিয়। তারা শুধু কয়টি শান্তি বাণী আউড়ে বা রাবণের সঙ্গে কোলাকুলি করে নিজের সুখ শান্তি বজায় রাখতে চায় !

এ সকল রাম আর লক্ষ্মণের প্রতি এ যুগের সীতা আর উর্মিলারা কি রকম আচরণ করবে তা অবশ্য চিন্তা করে দেখবার মত নয়। যেরকম আচরণ তারা পতিদের প্রতি করছে, তাই বরং যথেষ্ট মনে হবে।

আসল কথাটা এই—পতিধর্ম পালনের উপদেশগুলি যে-সব স্বামী নিজ নিজ স্ত্রীকে পড়ে শুনিয়েছেন তাদের একথা স্মরণ রাখবার দিন এসেছে। একতরফা নারীধর্ম পালনের উপদেশ ছড়িয়ে পুরুষের রাজত্ব করবার দিন আর নেই। নারীর কাছ থেকে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে হ'লে পুরুষকে বীর হতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল হতে হবে, নারীর মর্যাদার জন্যে জীবনপণ করতে হবে, তখনি আপনা হতে নারীর হৃদয়ে শ্রদ্ধাভক্তি জাগ্রত হবে। কতকগুলি ভীরু কাপুরুষ, আত্মসুখনিরত, অপদার্থ পুরুষকে ভক্তি আর সেবা করে নির্বাণ লাভ করা যাবে, এ যুগের নারীরা আর তাতে বিশ্বাস করে না।

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

'বাটিক্'-পদ্ধতিতে মিহি ও মোটা সুতী আর রেশমী কাপড়ের উপর নক্সা চিত্রণের জন্য সচরাচর যে সব বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করা হয়, সেগুলির প্রস্তুত-প্রণালী বিশেষ ধরণের—সাধারণ-নিয়মানুযায়ী জল-রঙ বা তেল-রঙ দিয়ে 'বাটিক্' কারুশিল্পের কাজ করা চলে না।

ইতিপূর্ব্বে যেমন হদিশ দিয়েছি, সেইভাবে 'বাটিক্'-শিল্পের কাজের উপযোগী মিহি বা মোটা কাপড়ের দু' পিঠেই সুষ্ঠুভাবে 'তরল-মোমের প্রলেপন' দেবার পর, বিশেষ-ধরণে তৈরী বিভিন্ন রঙ ব্যবহার—ভালো তুলির সাহায্যে সযত্নে ও নিখুঁত-পরিপাটি-ছাঁদে সেই কাপড়ের উপর নক্সা-চিত্রণের কাজ করতে হবে। 'বাটিক্'-পদ্ধতিতে নক্সা-চিত্রণের জন্য বিশেষ ধরণের যে সব রঙ ব্যবহার করা রীতি, সেগুলি তৈরী করতে হলে দরকার—মখি-খয়ের, তুঁতে, বাইক্রোমেট প্রভৃতি উপকরণ। 'বাটিক্'-শিল্পের জন্য একান্ত-প্রয়োজনীয় এই সব রঙ কি উপায়ে তৈরী করা যাবে, আপাততঃ, তারই মোটামুটি হদিশ দিই।

রঙ তৈরী করার সময়, গোড়াতেই উপরোক্ত উপকরণ-

গুলি, অর্থাৎ মখি-খয়ের, তুঁতে আর বাইক্রোমেটের টুকরো গুলিকে আলাদা-আলাদাভাবে মিহি-ছাঁদে গুঁড়ো করে ফেলুন। এগুলি যথাযথভাবে গুঁড়িয়ে নেবার পর, তুঁতে এবং বাইক্রোমেটের মিহি-গুঁড়ো আলাদা করে দুটি বিভিন্ন
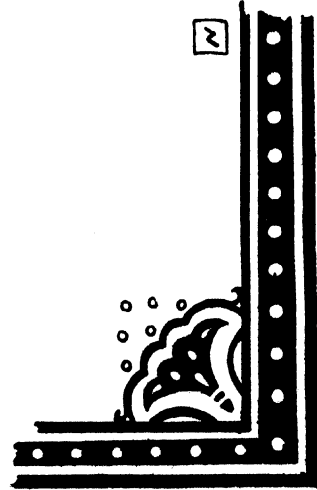
রঙের পাত্রে রেখে দিন ও মিহি-ছাঁদে গুঁড়ানো মখি খয়েরটুকু অপর একটি পাত্রে তুলে আলাদা সরিয়ে রাখুন। এবারে উনানের আঁচে হাঁড়ি বা ডেকচি বসিয়ে, সেই পাত্রে

আড়াই সের পরিমাণ জল ফুটিয়ে নিন। জলটুকু গরম ফুটন্ত হলে আলাদা-আলাদাভাবে তুঁতের ও বাইক্রোমেটের গুঁড়ো-রাখা রঙের পাত্র দুটিতে চায়ের কাপের তিন-কাপ পরিমাণ ফুটন্ত-জল মিশিয়ে দিন এবং পরিচ্ছন্ন দুটি—কাঠির সাহায্যে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে বিভিন্ন পাত্রে-রাখা ফুটন্ত-জল-মেশানো তুঁতে আর বাইক্রোমেটের গুঁড়ো আগাগোড়া ভালোভাবে গুলে নিন। এমনিভাবে গুলে নেবার ফলে, তুঁতে আর বাইক্রোমেটের মিহি-গুঁড়ো জলের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেলেই বুঝবেন—এ কাজ শেষ হয়েছে। এবারে তুঁতে আর বাইক্রোমেট মেশানো রঙের পাত্র দুটিকে সযত্নে আলাদা সরিয়ে রেখে, উনানের আঁচে-বসানো ফুটন্ত-জলের পাত্রে মষি-খয়েরের গুঁড়ো ঢেলে দিয়ে অন্ততপক্ষে আধঘণ্টাকাল রেখে এই 'মিশ্রণটিকে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিন। 'মিশ্রণটি' এইভাবে ফোটানো হলে, উনানের উপর থেকে পাত্রটিকে নামিয়ে কিছুক্ষণ খোলা-বাতাসে রেখে জুড়োতে দিন। তারপর বিভিন্ন পাত্রে রাখা তিনটি 'ফুটন্ত-মিশ্রণই' জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে, 'বাটিক'-পদ্ধতিতে সূতী কিম্বা রেশমী কাপড়ের উপর তুলির সাহায্যে বিভিন্ন রঙ ফলিয়ে নক্সা-চিত্রণের কাজ সুরু করবেন।

রঙ-তৈরীর মতোই, 'বাটিক্'-পদ্ধতিতে নক্সা-চিত্রণের কাজও করতে হবে বিশেষ ধরণের উপায়ে। আপাততঃ তারই মোটামুটি পরিচয় দিচ্ছি।

'বাটিক্'-পদ্ধতিতে কাপড়ের উপর রঙ ফলিয়ে নক্সা-চিত্রণের সময় বিশেষ একটি রীতি অনুসরণ করলে, কাজের সুবিধা হবে অনেকখানি। এই বিশেষ-রীতি অনুসারে, কাজের সময় বিভিন্ন রঙের পাত্রগুলিকে পাশাপাশি সারি দিয়ে সাজিয়ে রাখা দরকার। অর্থাৎ, সারির প্রথমেই সাজিয়ে রাখবেন মষি-খয়েরের রঙ গোলা পাত্র, মাঝখানে থাকবে তুঁতে-গোলা পাত্রটি এবং তার পাশেই রেখে দেবেন বাইক্রোমেটের গুঁড়ো মেশানো রঙের পাত্রটিকে। কারণ 'বাটিক্' শিল্প কার্য্যের সময়, কাপড়ের টুকরোটিকে সর্ব্বপ্রথমে ছুপিয়ে নিতে হবে ঐ মষিখয়েরের 'মিশ্রণে'। মষিখয়েরের পাত্রে অন্ততপক্ষে প্রায় আধঘণ্টাকাল রেখে কাপড়ের টুকরোটিকে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ছুপিয়ে নেবার পর, সেটিকে প্রথম পাত্রের 'মিশ্রণ' থেকে তুলে, ঐ পাত্রের উপরেই ধরে রেখে সযত্নে হাতের মৃদু চাপ দিয়ে নিঙ্ড়ে সম্পূর্ণরূপে 'খয়েরী জল' ঝরিয়ে ফেলুন। এভাবে জল-ঝরানোর সময়, কাপড়ের টুকরোতে সঞ্চিত রঙ যেন এতটুকু ঐ পাত্রের বাইরে পড়ে আদৌ অপচয় না হয়...অর্থাৎ, সব রঙটুকুই যেন মষি-খয়েরের পাত্রের ভিতরেই ঝরে পড়ে। কারণ, অসাবধানতার ফলে, এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করে তৈরী রঙ পাত্রের বাইরে পড়ে নষ্ট হলে, শুধু লোকসানই নয়, কাজের অসুবিধাও ঘটবে সবিশেষ। কাজেই গোড়া থেকে এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। মষি খয়েরের মিশ্রণে ছুপিয়ে নেবার ফলে, কাপড়ের টুকরোটি আগাগোড়া বেশ হাল্কা-খয়েরী রঙের রূপ ধারণ করবে। এমনিভাবে কাপড়ের টুকরো থেকে মষি-খয়েরের রঙটুকু সম্পূর্ণরূপে ঝরিয়ে নেবার পর, সেটিকে পুনরায় অবিকল ঐ আগের মতো প্রথায় দ্বিতীয় রঙ...অর্থাৎ, তুঁতের গুঁড়ো-মেশানো পাত্রের 'মিশ্রণে' আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ছুপিয়ে নিতে হবে। তবে এ 'মিশ্রণে' কাপড়ের টুকরো-টিকে আগের বারের মতো আধঘণ্টাকাল ছুপিয়ে রাখার আবশ্যক নেই...আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে অন্ততপক্ষে মিনিট পনেরোকাল ছুপিয়ে নিলেই চলবে। যাই হোক, কাপড়ের টুকরোটিকে এমনিভাবে দ্বিতীয় বা তুঁতের গুঁড়ো মেশানো পাত্রের রঙে ছুপিয়ে নেবার পর, পুনরায় আগের বারেরই অনুরূপ-প্রথায় সম্পূর্ণরূপেই সেটি থেকে রঙ ঝরিয়ে নেবেন। দ্বিতীয় রঙে, অর্থাৎ তুঁতের গুঁড়ো মেশানো পাত্রে ছোপানোর ফলে, কাপড়ের টুকরোর হাল্কা-খয়েরী বর্ণ আরো গাঢ়-সুন্দর উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। অতঃপর, কাপড়ের টুকরোটিকে পুনরায় পূর্ব্ব-প্রথানুসারে তৃতীয় বা বাইক্রো-মেটের গুঁড়ো-মেশানো রঙের পাত্রে প্রায় মিনিট পনেরো-কাল নাড়াচাড়া করে আগাগোড়া ভালোভাবে ছুপিয়ে নেবার ফলে, সেটির খয়েরী-বর্ণ যখন আগের চেয়ে আরো উজ্জ্বল-গাঢ় ও পরিপাটি-সুন্দর হয়ে উঠবে, তখন রঙের পাত্র থেকে তুলে সেটিকে সযত্নে নিঙড়ে 'মিশ্রণ'-মুক্ত করে নিলেই মোটামুটিভাবে 'বাটিক'-পদ্ধতিতে কাপড়ের জমীতে রঙ-ফলানোর কাজ শেষ হবে। তবে 'বাটিক'-পদ্ধতিতে কাজের সময়—বিশেষ করে হাতের চাপ দিয়ে

নিঙড়ে কাপড়ের টুকরো থেকে রঙ-ঝরানোকালে প্রতিবারই সজাগ-দৃষ্টি রাখতে হবে যে সেটি যেন কোনো-মতেই বেশী জোরে চাপ দিয়ে নিঙড়ানো বা অযথা চটকানো না হয়। কারণ, তার ফলে, কাপড়ের দু'পিঠে 'তরল-মোমের যে প্রলেপন রয়েছে, তাতে ফাট ধরে যায় এবং সেই ফাটলের ভিতর দিয়ে রঙের 'মিশ্রণ' সেঁধিয়ে 'বাটিক'-শিল্পের উপকরণটিকে বেয়াড়াভাবে অসুন্দর করে তোলে। কোনো কোনো 'বাটিক্'-কারুশিল্প বিশেষজ্ঞের মতে অবশ্য 'তরল-মোমের' প্রলেপনে অল্পস্বল্প সূক্ষ্ম-ধরণের ফাটল সৃষ্টি হওয়া ভালো···কারণ, শিরা-উপশিরার ছাঁদের সেই সব সূক্ষ্ম সুন্দর ফাটা-দাগের ভিতর দিয়ে এলোমেলো-ভাবে রঙ প্রবেশ করে কাপড়ের বুকে বিচিত্র অভিনব যে রেখা রচনা করে তার বৈশিষ্ট্যগুণেই 'বাটিক্-শিল্প সামগ্রীটি আগাগোড়া অপরূপ শ্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠে। তবে কথায় বলে—'সর্ব্বম্ অত্যন্তম্ গর্হিতম্'···সকল বিষয়েই আধিক্য দোষ যেমন অমার্জ্জনীয় অপরাধ···এ ক্ষেত্রেও তাই। সুতরাং 'বাটিক্' কারুশিল্পের কাজ করতে হলে এদিকে সচেতন-দৃষ্টি রাখা যে একান্ত প্রয়োজন—সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি দরকারী কথা বলে রাখি। ইতিপূর্বে 'বাটিক্'-পদ্ধতিতে শিল্প-সামগ্রী রচনার উপকরণাদি যে তালিকা ও পরিমাণ দেওয়া হয়েছে সেটি উপরোক্ত নক্সানুযায়ী ছোট খাট জিনিষের উপযোগী। বড় বড় সামগ্রী রচনায় সব কিছুই যে সেই অনুপাতে বেশী লাগবে—সে হিসাব 'বাটিক্'-কারুশিল্পী নিজেই অনায়াসে নির্দ্ধারণ করে নিতে পারবেন। কাজেই সে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই আপাততঃ। বরং যে কথা বলছিলুম, তারই জের টানা যাক্!

রং-করা কাপড়ের টুকরোটিকে সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে নেবার পর, সেটির দু'পিঠে যে মোমের প্রলেপ রয়েছে সেই প্রলেপ মুছে ফেলার পালা। মোটামুটিভাবে সূতী বা রেশমী কাপড়ের জমী থেকে মোমের প্রলেপ মুছে ফেলতে হলে—রঙ-করা কাপড়ের টুকরোটিকে বেশ খানিকক্ষণ গরম-ফুটন্ত জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে দিলেই দেখবেন—কাপড়ের জমীর প্রায় বেশীর ভাগ অংশ থেকেই মোমের পাতলা আবরণ বেমালুম মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে ···যেটুকু বাকী রয়েছে, গরম জল আর সাবান দিয়ে কেচে নিলেই সেটুকুও সহজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কাপড়ের জমী থেকে মোমের আস্তরণ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর, 'বাটিক্-কারুশিল্পের নক্সাদার সৌখিন-সামগ্রীটিকে সযত্নে রৌদ্রতাপহীন ছায়া-শীতল স্থানে খোলা-বাতাসে মেলে রেখে আগাগোড়া শুকিয়ে নিতে হবে।

[ক্রমশঃ

—

সৌখিন ব্লাউশের প্যাটার্ন

মৃন্ময়ী দেবী

শীতকাল শেষ হয়েছে—দিকে দিকে আবার জেগেছে নবীন-বসন্তের সাড়া! আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, ফুলে-ফলে, তৃণে-পল্লবে নিখিল-বিশ্বের সর্ব্বত্রই আজ আনন্দের জোয়ার বইছে—চারিদিকেই বিচিত্র রঙের খেলা···বসন্ত-সমাগমে সবার রঙে রঙ-মেশানোর আগ্রহে মানুষের মনে জেগে উঠেছে—বসন-ভূষণ, অলঙ্কার-আভরণ, প্রসাধনী-রূপচর্চ্চায় নিজেকে সর্ব্বতোভাবে সুন্দর সুসজ্জিত করে তোলার সৌখিন বাসনা। চিন্তাশীল-কবি-শিল্পীদের মতে, নারী-জাতিই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের প্রতীক ·· তবে নারীজাতির এই রূপ সৌন্দর্য্যের অনেকখানি নির্ভর

করে সুচারু, সুরুচিশীল যথাযোগ্য বসন ভূষণ ব্যবহারের

উপর। এবারে তাই বসন্তকালে মহিলাদের পরিধানোপযোগী বিচিত্র-অভিনব সৌখিন ছাঁদের দুটি বিভিন্ন ব্লাউশের নক্সা-নমুনা প্রকাশিত করা হলো। এ দুটি ব্লাউশের জন্ম মিহি অথবা মোটা ধরণের সুতী ও রেশমী কাপড় উভয়ই ব্যবহার করা চলবে।

৩৯২পৃষ্ঠায় ১নং চিত্রে যে ব্লাউশের নমুনাটি দেখানো হয়েছে—সেটি পাশ্চাত্যপরিচ্ছদের রীতি অনুসরণে পরিকল্পিত এবং অপেক্ষাকৃত সাধাসিধা প্যাটার্ণের। সাধারণভাবে, অফিস, স্কুল, কলেজ, বাজার প্রভৃতি স্থানে কাজে বেরুনোর সময় মহিলাদের পরিধানোপযোগী পরিচ্ছদ হিসাবে ব্যবহার করা চলবে। এ ধরণের ব্লাউশের প্যাটার্ণটি রেশমী এবং সুতী দু'ধরণের কাপড়েই বানানো যায়, তবে আমাদের মনে হয়—এ পোষাকটির পক্ষে নক্সাদার সুতীর কাপড়ই আরো বেশী মানান সই দেখাবে।

উপরের ২নং চিত্রে যে বিচিত্র ব্লাউশের নমুনাটি দেখছেন, সেটি বেশ অভিনব সৌখিন-ছাঁদের। এ নমুনাটি পরিকল্পিত হয়েছে [illegible] ভারতীয় পোষাকের আদর্শানুসারে—[illegible] পরিচ্ছদের [illegible] আমাদের [illegible] বাঙালী জাতীর যে পরিচ্ছদ [illegible] ছাঁদে রচিত হয়েছে পাশের ব্লাউশটি। মহিলাদের পক্ষে এ ধরণের ব্লাউশ, 'আটপৌরে' হিসাবে ব্যবহারের চেয়ে, 'পোষাকী' হিসাবেই আরো বেশী মানানসই হবে। এ ব্লাউশটি লিনেন ও খদ্দর জাতীয় সুতীর কাপড় এবং সাটিন প্রভৃতি রেশমী কাপড়ের সাহায্যে বানানো হলেই সুশ্রী ও সুন্দর দেখাবে। চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, সেইভাবে ব্লাউশের হাতার প্রান্তে এবং বুকের পটিতে সরু বা ঈষৎ চওড়া রঙীণ কাপড়ের নক্সাদার 'পাড়' বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। চওড়া পাড়ের বদলে মানানসই ধরণের যে কোনো এক রঙা কাপড়ের সরু 'পাইপিং' সেলাই করেও এই ব্লাউশটিকে অলঙ্কৃত করা চলবে।

আপাততঃ মহিলাদের পরিধানোপযোগী 'পোষাকী' এবং 'আটপৌরে' দুই ধরণের ব্লাউশের নমুনা দেওয়া হলো—পরের মাসে এমনি ধরণের আরো কয়েকটি নতুন প্যাটার্ণের পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

—
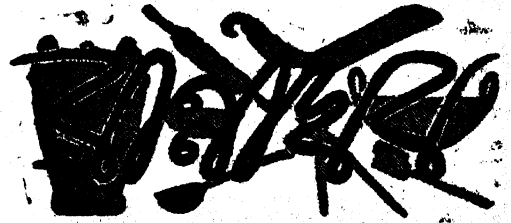
সুধীরা হালদার

এবারে বলছি, ভারতবর্ষের পাঞ্জাব-অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ প্রিয় অভিনব-সুস্বাদু এক-ধরণের আমিষ-খাদ্য রান্নার বিচিত্র পদ্ধতির কথা। এ খাবারটির নাম দেওয়া যেতে পারে—'পালং-টোম্যাটো গোস্ত'!

পাঞ্জাবী-প্রথায় এই অপরূপ মুখরোচক আমিষ-খাদ্যটি রান্নার জন্ম উপকরণ চাই—একসের মাংস, একপোয়া পালং শাক, একপোয়া লাল-রঙের বড় টোম্যাটো, এক-পোয়া পেঁয়াজ, বড়-বড় [illegible] রসুন, [illegible] [illegible] ঘি [illegible]

আন্দাজমতো পরিমাণে নুন, খানিকটা কাশ্মিরী লঙ্কার গুঁড়ো, আট-দশটি শুকনো লঙ্কা এবং আন্দাজমতো পরিমাণে গুঁড়ো বা আস্ত গরম-মশলা।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, প্রথমেই পেঁয়াজগুলিকে কুচিয়ে নিন এবং টোম্যাটোগুলিকে কিছুক্ষণ গরম-জলে ডুবিয়ে রেখে. সেগুলির খোশা ছাড়িয়ে ফেলুন। তারপর পরিষ্কার একটি ডেক্‌চিতে আন্দাজমতো পরিমাণে ঘি দিয়ে, রন্ধনপাত্রটি উনানের-আঁচে বসিয়ে ফুটন্ত-ঘিয়ে পেঁয়াজ-কুচো ছেড়ে, সেগুলিকে ভালোভাবে ভেজে নিন। ফুটন্ত-ঘিয়ে ভাজার ফলে, পেঁয়াজের কুচোগুলি আগাগোড়া বেশ বাদামী-রঙের হয়ে উঠলে. উনানের আঁচে-বসানো রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে লঙ্কা-বাটা ও রসুন-বাটা ছেড়ে, হাতা বা খুন্তির সাহায্যে রান্নায় মশলাটিকে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে বেশ ভালোভাবে ভেজে নিন। তবে হুঁশিয়ার, এভাবে রান্নার মশলা ভাজার সময় সর্ব্বদা নজর রাখতে হবে যে সেটি যেন যথাযথভাবে নাড়াচাড়ার অভাবে রন্ধনপাত্রের তলদেশের গায়ে সেঁটে গিয়ে 'ধরে' না যায়।

এমনিভাবে ভাজার ফলে, রান্নার মশলা থেকে সুগন্ধ বেরুতে সুরু করলেই, রন্ধন-পাত্রে খোশা-ছড়ানো টোম্যাটোগুলিকে ছেড়ে দিয়ে হাতা বা খুন্তির সাহায্যে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে, আন্দাজমতো পরিমাণে কিছু চিনি মিশিয়ে দিন। তারপর রন্ধন-পাত্রের এই 'মিশ্রণটিতে' পালংশাক ও মাংসের টুকরোগুলি ছেড়ে দিয়ে রান্নাটিকে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে কষে নিন। মাংস-কষা হলে, উনানের আঁচে-বসানো রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো নুন ও ফুটন্ত-জল মিশিয়ে রান্নাটিকে কিছুক্ষণ 'দমে' বসিয়ে দিন।

খানিকক্ষণ এভাবে 'দমে' বসিয়ে রাখার ফলে, মাংসের টুকরোগুলি আগাগোড়া বেশ নরম ও সু-সিদ্ধ হবার পর কাই-কাই ধরণের অল্প-অল্প 'ঝোল' থাকতেই রান্নাটিতে আন্দাজমতো পরিমাণে গুঁড়ো বা আস্ত গরম-মশলা মিশিয়ে উনানের আঁচের উপর থেকে সযত্নে রন্ধন-পাত্রটি নামিয়ে রাখুন। তাহলেই অভিনব পাঞ্জাবী-প্রথায় 'পালং-টোম্যাটো-গোস্ত' খাবার রান্নার কাজ শেষ হবে।

অতঃপর, পরিবেশনের পালা! সুষ্ঠুভাবে রান্না করতে পারলে, অপরূপ সুস্বাদু-মুখরোচক আমিষ-জাতীয় এই পাঞ্জাবী খাবারটি খেয়ে আপনাদের আত্মীয়-বন্ধু-প্রিয়-জনেরা সকলেই যে পরম-পরিতৃপ্ত হবেন, সে কথা বলাই বাহুল্য!

নান্য পন্থা

শান্তশীল দাশ

তবু এই অন্ধকার পার হয়ে যেতে হবে—
পার হয়ে যেতে হবে অপমৃত্যু ভয়:
জীবনের কাছে এসে মানবেই তারা পরাজয়,
দূরে দূরে থাকে যারা—অশরীরী ভীরুতার ছায়া,
ছুঁড়ে দেয় অসংখ্য সংশয়।

এ-জীবন অমৃতের অংশ এক—অপমৃত্যু নেই:
ভুলে গেছি একেবারে। ভুলিয়েছে এই
বিংশ শতাব্দীর দম্ভ। আড়ম্বর, শুধু আড়ম্বর—
সংখ্যাতীত আয়োজন। তবু মৃত্যুকেই—
মেনেছি সমাপ্তি বলে—হেরে গেছি মৃত্যুর কাছেই।
বারে বারে মৃত্যু তাই আসে আর হানা দিয়ে যায়;
ভরে দেয় এ-জীবন চরম গ্লানির ব্যর্থতায়।
খোঁজেনাকো তবু কেউ সেই পথ, স্থির অচঞ্চল,
জ্যোতির্ময়—দিকে দিকে ওঠে তাই ক্ষুব্ধ বেদনায়
দীর্ঘশ্বাস, ঝরে অশ্রুজল।

সেই পথে যেতে হবে; নেই আর অন্য কোন পথ:
শুনতেই হবে সেই ডাক আর
নিতে হবে নূতন শপথ।

লগ্নানুসারে গ্রহগণের শুভাশুভ ফল নির্ণয়

উপাধ্যায়

মেষ লগ্নে জাতকের পক্ষে শনি বুধ ও শুক্র অশুভফলদাতা। রবি ও বৃহস্পতি শুভদাতা। বৃহস্পতি ও শনির সাধারণ ভাবে যোগাযোগ হোলে রাজযোগের ফল দেয় বটে, তবে তা আংশিকভাবে পাওয়া যায়। শুক্র দ্বিতীয়াধিপতি ও সপ্তমাধিপতি, বুধ তৃতীয়াধিপতি ও ষষ্ঠাধিপতি এবং শনি দশমাধিপতি ও একাদশাধিপতি। তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ ও দ্বাদশের অধিপতি অশুভদাতা। বুধ তৃতীয়াধিপতি ও ষষ্ঠাধিপতি হেতু মন্দ। শুক্র দ্বিতীয়াধিপতি ও সপ্তমাধিপতি। শুক্র নৈসর্গিক শুভগ্রহ। কেন্দ্রাধিপতি শুভগ্রহ হওয়ার দরুণ শুক্র অশুভফলদাতা। দ্বিতীয়াধিপতি হেতু প্রধান মারক। এজন্য মেষলগ্নের ব্যক্তির পক্ষে শুক্র আদৌ শুভদাতা নয়। শনি দশমাধিপতি ও একাদশাধিপতি। দশমাধিপতি পাপগ্রহহেতু শনি শুভদাতা এবং একাদশাধিপতি হেতু অশুভদাতা। কিন্তু মেষজাতব্যক্তির পক্ষে অশুভ হবে, কেননা মেষলগ্নের অধিপতি মঙ্গলের শত্রু বুধ শনি ও শুক্র। অত এব দশমাধিপতি হওয়া সত্বেও শনি মেষলগ্নের ভালো করতে সক্ষম নয়। বৃহস্পতি ও রবি শুভ। রবি পঞ্চমাধিপতি এবং বৃহস্পতি নবমাধিপতি ও দ্বাদশাধিপতি। রবির একটি ক্ষেত্র। পঞ্চমস্থান তার ত্রিকোণ। এ জন্য গ্রহটি সম্পূর্ণ শুভফল দাতা। বৃহস্পতি ত্রিকোণাধিপতি হওয়ার দরুণ শুভ, দ্বাদশাধিপতি হওয়ার দরুণ অশুভফলদাতা হোলোনা। কেননা মেষলগ্নের অধিপতি মঙ্গল বৃহস্পতির মিত্র। বৃহস্পতি নবমাধিপতি এবং শনি দশমাধিপতি ও একাদশাধিপতি। বৃহস্পতির সঙ্গে শনি সম্বন্ধ করায় বিশেষ রাজযোগ হবারই কথা, কিন্তু শনি একাদশাধিপতি হওয়ায় কিছু দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। সম্পূর্ণ রাজযোগের ফল পাওয়া যাবেনা। জ্যোতিষীরা বলেন, কোন গ্রহের ভালোমন্দ প্রভাব যখন সমতুল্য হয়ে পড়ে তখন তার কাছ থেকে ভালো আশা করা যায়না, মন্দ ফলই সে দেয়।

যখন কোন গ্রহ দুইটি মারকস্থানের অধিপতি হয়, তখন নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সেই গ্রহই জাতকের জীবন হানি করবে। যেমন মেষ লগ্নের পক্ষে শুক্র দ্বিতীয় ও সপ্তমাধিপতি। সুতরাং এর দশা অন্তর্দশায় জাতকের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বৃষলগ্ন জাতকের পক্ষে বৃহস্পতি, শুক্র ও চন্দ্র অশুভফলদাতা। শনি ও রবি উত্তম। বৃষলগ্নের জাতব্যক্তির পক্ষে শনি একাই রাজযোগকারক। বৃহস্পতি অষ্টমাধিপতি ও একাদশাধিপতি এজন্য অশুভ। শুক্র শুভগ্রহ হয়ে কেন্দ্রাধিপতি ও ষষ্ঠাধিপতি হওয়ার দরুণ অশুভ। চন্দ্র তৃতীয়াধিপতি, এ জন্য অশুভ। রবি নৈসর্গিক অশুভগ্রহ, কেন্দ্রাধিপতি হওয়ার দরুণ শুভ। শনি একাই নবম ও দশমাধিপতি অর্থাৎ কেন্দ্র ও ত্রিকোণের অধিপতি হেতু শুভ। বুধ দ্বিতীয়াধিপতি ও পঞ্চমাধিপতি। গ্রহটি শুক্রের মিত্র। বুধ ও শনির সহাবস্থান বা সম্বন্ধ হোলে উত্তম রাজযোগ। দশা ও অন্তর্দশা অশুভ ও মারক না হোলে গ্রহরা যত অশুভই হোক্ না কেন, জাতকের মৃত্যুদাতা হয় না। শুক্রের মিত্র হওয়ার জন্যই বুধ দ্বিতীয়াধিপতি হওয়া সত্বেও শুভ ফলদাতা। মঙ্গল সপ্তমাধিপতি

ও দ্বাদশাধিপতি। কিন্তু শুক্রের শত্রু। এজন্য অশুভ গ্রহ হয়ে কেন্দ্রাধিপতি হওয়া সত্বেও দ্বাদশাধিপতি হেতু দোষযুক্ত। অতএব গ্রহটি বৃষলগ্নে জাত ব্যক্তির মারক। বৃহস্পতি উত্তম ভাবে অবস্থিত ও দৃষ্টিযুক্ত হোলে মৃত্যুদাতা হবে না।

মিথুনলগ্নের পক্ষে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবি অশুভ। বৃহস্পতি সপ্তম ও দশমাধিপতি হেতু অশুভ। কেননা শুভগ্রহ কেন্দ্রাধিপতি হোলে অশুভ এবং জাতকের মারক হয়। বৃহস্পতির অপেক্ষা মঙ্গল বিশেষ মারক। কেননা একে মঙ্গল নৈসর্গিক অশুভগ্রহ, তার ওপর ষষ্ঠ ও একাদশাধিপতি। চন্দ্র অশুভ। শুক্র একাই শুভদাতা। শুক্র ও বুধের উত্তমভাবে সংযোগ হলে রাজযোগ হয়। শনি বৃহস্পতির সঙ্গে সম্বন্ধ করলে মেষলগ্নের মত ফল দেবে। চন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে মারক হবে না। শুক্র বুধের মিত্র। এজন্য দ্বাদশাধিপতি হওয়া সত্বেও ত্রিকোণাধিপতি হেতুশুভ। বৃহস্পতি ও শনির সম্বন্ধ রাজযোগকারক নয়। নিষ্পাপ বুধ অশুভদায়ক। শনি অষ্টমাধিপতি ও নবমাধিপতি। এজন্য এর কাছ থেকে শুভ ফল আশাকরা যায়না। মিথুনলগ্নের পক্ষে শনি একাই রাজযোগ ভঙ্গকারক ও অশুভপ্রদ।

কর্কটলগ্নের পক্ষে শুক্র শনি ও ও বুধ অশুভ। বৃহস্পতি ও মঙ্গল শুভ ফলদাতা, মঙ্গল একাই রাজযোগ কারক। গুরুভৌম সংযোগ রবি মারক নয়। শনি প্রভৃতি অশুভ, প্রদ গ্রহরা মারক হবে। শুক্র চতুর্থ ও একাদশাধিপতি। শুক্র নৈসর্গিক শুভ গ্রহ কেন্দ্রাধিপতি হওয়ার দরুণ অশুভ একাদশাধিপতির জন্য ও অশুভ। শনি সপ্তম ও অষ্টমাধিপতি। কেন্দ্রাধিপতি হেতু শুভ হোলেও অষ্টমাধিপতি হওয়াতে অশুভপ্রদ। বুধ তৃতীয় ও দ্বাদশাধিপতি হেতু অশুভ। কর্কট একটি শুভলগ্ন, এখানে চন্দ্র ও বৃহস্পতি থাকলে জাতকের জীবনে সর্ব্বোত্তম সাফল্য ঘটে। জলরাশি হওয়াতে এলগ্নের জাতক হৃষ্টপুষ্ট ও উদার হয়। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম লগ্ন ছিল কর্কট, আরলগ্নে ছিল চন্দ্র ও বৃহস্পতি।

সিংহলগ্নের পক্ষে শনি, শুক্র ও বুধ অশুভ। মঙ্গল একাই শুভ ফল দাতা। শুক্র ও গুরুর সম্বন্ধে রাজযোগ কারক। বৃহস্পতির সঙ্গে মঙ্গলের সম্বন্ধ হোলে উত্তম ফল দেয়। শনি মারক হোলেও জাতকের মৃত্যুকারক হবেনা। মারক লক্ষণাক্রান্ত হোলে বুধ ও অন্যান্য অশুভ গ্রহ জাতকের মৃত্যু ঘটায়। শুক্র ও বুধ সম্পূর্ণভাবে অশুভ। চন্দ্র দুর্ব্বল ও দুঃস্থানগত হোলে সিংহ লগ্নের জাতকের প্রবল মারক হয়, আর চন্দ্রের দশায় মৃত্যু ঘটে। শুক্র ও মঙ্গলের সম্বন্ধ হোলেও রাজযোগ হবে।

কন্যালগ্নে জাত ব্যক্তির পক্ষে চন্দ্র মঙ্গল ও বৃহস্পতি অশুভ। শুক্র শুভ গ্রহ। বুধ এবং শুক্র মুখ্য যোগ কারক। শুক্র দ্বিতীয়াধিপতির জন্য প্রধান মারক, কিন্তু ত্রিকোণের অধিপতি হেতু রাজযোগ কারক। মঙ্গল প্রভৃতি মারক লক্ষণাক্রান্ত অন্যান্য পাপগ্রহ মারক। শনি পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভাবের অধিপতি। ত্রিকোণপতি অপেক্ষা ত্রিষড়ায় পতি প্রবল, এজন্য শনি অশুভদায়ক। নৈসর্গিক শুভগ্রহ বৃহস্পতি চতুর্থ ও সপ্তম ভাবের অধিপতি অর্থাৎ কেন্দ্রাধিপতি, এজন্য অশুভ। চন্দ্র একাদশাধিপতি হেতু অশুভ। মঙ্গল তৃতীয় ও অষ্টমাধিপতি এজন্য অশুভ। রবি দ্বাদশাধিপতি, কিন্তু অন্য কোন রকম অশুভ সংযোগ না হোলে গ্রহটী বিরুদ্ধ হবেনা।

তুলা লগ্নে জাতকের পক্ষে বৃহস্পতি, রবি ও মঙ্গল অশুভ। বুধ ও শনি শুভদাতা। শনি একাই রাজযোগ কারক। চন্দ্র ও বুধের সমাবেশে রাজযোগ হয়। মঙ্গল মারক হোলেও জাতকের জীবন হন্তা হবেনা। বৃহস্পতি ও অন্যান্য পাপগ্রহগণ মারক লক্ষণাক্রান্ত হোলে মৃত্যুদাতা হবে। বৃহস্পতি তৃতীয় ও ষষ্ঠাধিপতি এজন্য অশুভ। মঙ্গল দুইটি নিধন স্থানের অধিপতি দ্বিতীয় এবং সপ্তম। তা ছাড়া মঙ্গল তুলার অধিপতি শুক্রের শত্রু, এজন্য নৈসর্গিক পাপগ্রহ হয়ে কেন্দ্রাধিপতি হওয়া সত্বেও শুভ ফল দাতা হবেনা। চতুর্থ ও দশমাধিপতি শনি বৃষলগ্নের নবম ও দশমাধিপতি শনির ন্যায় প্রবল রাজযোগ কারক হোতে পারেনা। বুধ দ্বাদশাধিপতি হওয়া সত্বেও তুলাধিপতি শুক্রের মিত্র ও নবমাধিপতি হওয়ায় শুভ। রবি একাদশাধিপতি হেতু অশুভ। বুধ ও চন্দ্রের সম্বন্ধ সংযোগে শুভ হবে। তুলালগ্নের শুক্র অশুভ। কেননা শুভগ্রহ কেন্দ্রাধিপতি হেতু অশুভ এবং নিধনাধিপতি হেতুও অশুভ। মীন, বৃষ, তুলা ও ধনু লগ্ন শুভ, কেননা এদের অধিপতিগণ শুভ গ্রহ।

বৃশ্চিক লগ্নে জাতকের পক্ষে বুধ, শুক্র, শনি ও মঙ্গল অশুভ। বৃহস্পতি ও চন্দ্র শুভ। রবি ও চন্দ্রের সম্বন্ধে রাজযোগ কারক। বৃহস্পতি প্রধান মারক। বৃহস্পতির দশায় মৃত্যু। বুধ প্রভৃতি পাপগ্রহগণও মারক লক্ষণ-যুক্ত হোলে মারক। শনি মঙ্গলের শত্রু এবং তৃতীয় ও চতুর্থাধিপতি। কেন্দ্রাধিপতি হওয়া সত্ত্বেও নৈসর্গিক পাপ-গ্রহ শনি তৃতীয়াধিপতি হওয়ার জন্য অশুভ। শুক্র মঙ্গলের শত্রু। এজন্য বৃশ্চিক লগ্নের জাতকের পক্ষে আদৌ শুভ নয়, কেন্দ্রাধিপতি ও দ্বাদশাধিপতি হেতু বিশেষ অশুভ। যে সব গ্রহ পঞ্চম ও নবমাধিপতি, তারা সব চেয়ে জাতকের শুভানুধ্যায়ী। যদি দ্বিতীয়াধিপতি শুভগ্রহ হয়ে নবম কিম্বা দশম গৃহে থাকে, অথবা উত্তম যোগাযোগে বলবান হয়, তা হোলে সে জাতকের মৃত্যু দেবেনা—অথবা জীবনে বিপদের কারকও হবেনা।

ধনুলগ্ন জাতকের পক্ষে শুক্র একাই অশুভ। বুধ ও রবি শুভগ্রহ। বুধ ও রবির সম্বন্ধ রাজযোগকারক। শনি প্রবল মারক। শুক্রাদি পাপগ্রহগণ মারাত্মক দোষ-যুক্ত হোলে মারক হবে। বৃহস্পতি কেন্দ্রপতির জন্য অশুভ দায়ক। দ্বিতীয়পতি হোলেও পঞ্চমপতি হেতু জাতকের পক্ষে মঙ্গল শুভ হবে। রবি ও বুধের সহাবস্থান, পূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় প্রভৃতি হেতু রাজযোগ। শনি, রবি ও মঙ্গলের সঙ্গে সম্বন্ধ করলে, মারকত্বাদুষ্ট হোলেও মৃত্যুদাতা হবেনা। মঙ্গল বৃহস্পতির মিত্র। সুতরাং দ্বাদশাধিপতি হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চমাধিপতি হেতু মঙ্গল শুভদাতা। রবি ভাগ্যাধিপতি হেতু শুভ। চন্দ্র অষ্টমাধিপতি হেতু অশুভ হয়নি, কেননা রবি চন্দ্র মারক সম্পর্কে ব্যতিক্রম।

মকর লগ্ন জাতকের পক্ষে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও চন্দ্র পাপ গ্রহ। শুক্র ও বুধ শুভগ্রহ। শনি স্বয়ং মারক, মঙ্গলাদি পাপ গ্রহগণও মারক লক্ষণ বিশিষ্ট হোলে মারক হয়। শুক্র প্রবল রাজযোগকারক। রবি অষ্টমপতি হোলেও অশুভপ্রদ হবেনা, কিন্তু শুভ ফল দাতাও হবে না। কেন্দ্রাধিপতি হওয়া সত্ত্বেও একাদশাধিপতি হওয়ার দরুণ পাপগ্রহ মঙ্গল অশুভপ্রদ। বৃহস্পতি তৃতীয়াধিপতি ও দ্বাদশাধিপতি হেতু অশুভ। চন্দ্র সপ্তমাধিপতি হেতু অশুভ। শুক্র পঞ্চমাধিপতি ও দশমাধিপতি এজন্য উত্তম, কোণাধিপতি হওয়ার কেন্দ্রাধিপত্য দোষ নষ্ট হয়েছে।

বুধের সঙ্গে শুক্রের যোগ শুভপ্রদ। কুম্ভ লগ্নেজাত ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও চন্দ্র পাপগ্রহ, একমাত্র শুক্র শুভ গ্রহ। মঙ্গল ও শুক্র রাজযোগকারক। বৃহস্পতি প্রবল মারক। বুধাদি গ্রহগণ মারক দোষ দুষ্ট হোলে মারক হয়। রবি মারকপতি হোলে ও মারক হয়না, শনি দ্বাদশপতি হোলেও লগ্নপতি কেন্দ্রপতি হওয়ার জন্য শুভ। মঙ্গল তৃতীয়াধিপতি ও শনির শত্রু হওয়ায় কেন্দ্রাধিপতি হওয়া সত্ত্বেও শুভপ্রদ নয়। বৃহস্পতি দ্বিতীয়াধিপতি ও একাদশাধিপতি, এজন্য অশুভ। চন্দ্র ষষ্ঠাধিপতি, এজন্য অশুভ। শুক্র চতুর্থ ও নবমপতি এজন্য শুভ। যেখানে গ্রহগণ ভালোমন্দ সমতুল্য, জ্যোতিষের মতে সেখানে তারা মন্দ ফলই দেয়।

বহু জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত বলেছেন, বৃষলগ্নে নানাপ্রকার অশুভগ্রহ সংযোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ অপেক্ষাকৃত ভালো, কুম্ভ-লগ্নে উত্তম গ্রহসংযোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও দুঃখকষ্ট তাকে পেতেই হবে, কুম্ভলগ্নজাত ব্যক্তিকে অপমান, লাঞ্ছনা, সমাজে অপবাদ ও নিন্দা, দুরারোগ্য ব্যাধি, গুরুতর ক্ষতি, সমাজ সংসার থেকে নির্ব্বাসন প্রভৃতি কোন না কোন ঘটনায় জীবনে বিড়ম্বনা ভোগ করতে হবে। কুম্ভলগ্নের ব্যক্তির জীবন স্বচ্ছন্দ গতিতে চল্লেও শেষে পতনও অশেষ দুর্দ্দশা ভোগ হবেই। যত ভাল যোগই থাকুক না কেন রাশিচক্রে, তার জীবনের পরিণতি হবে অশ্রুজলে। এজন্যেই কুম্ভলগ্নকে নিন্দিতলগ্ন বলা হয়েছে। কিন্তু বৃষলগ্নে জাতব্যক্তির রাশি চক্রে যত খারাপই গ্রহ সমাবেশ হোক্ না কেন, সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করলেও শেষে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য শান্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবেই। বরাহমিহির যবনাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই কথাই বলেছেন।

মীনলগ্নের জাত ব্যক্তির পক্ষে শনি, শুক্র, রবি ও বুধ পাপ। মঙ্গল ও চন্দ্র শুভ। গুরুভৌম যোগে রাজযোগ। দ্বিতীয় পতি হোলেও মঙ্গল মারক হবে না। শনি প্রভৃতি পাপগ্রহগণ মারকলক্ষণাক্রান্ত হোলে মারক হবে। বৃহস্পতি প্রথম ও শেষ কেন্দ্রাধিপতি, কোন মারকস্থানে থাকলে গ্রহটি জাতকের হন্তা হোতে হবে। কোন শুভ গ্রহ কেন্দ্রাধিপতি মারকলক্ষণাক্রান্ত হোলে সর্ব্বাপেক্ষা নিহন্তা হবে। রবি ব্যতীত শনি, শত্রু ও বুধ বৃহস্পতির শত্রু। রবি বৃহস্পতির মিত্র। রবি বৃহস্পতির মিত্র। রবি [illegible]

মাত্র গ্রহ এবং তা ষষ্ঠ। ষষ্ঠাধিপতি হেতু রবি শুভদাতা হোতে পারে না। শনি একাদশ ও দ্বাদশাধিপতি এজন্য সম্পূর্ণ অশুভ। শুক্র তৃতীয় ও ষষ্ঠাধিপতি, এজন্য অশুভ। বুধ চতুর্থ ও সপ্তমাধিপতি। পাপসংযুক্ত বুধ শুভদাতা। চন্দ্র পঞ্চমাধিপতি এবং মঙ্গল দ্বিতীয়াধিপতি ও নবমাধিপতি মঙ্গল বৃহস্পতির মিত্র, এজন্য দ্বিতীয়াধিপতি হোলেও মারকত্ব দুষ্ট হবে না, ত্রিকোণাধিপতি হওয়াতে অত্যন্ত ফল দেবে।

—

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফলাফল

মেষ রাশি

অশ্বিনীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম ও ভরণীজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। গুরুজন বিয়োগ, আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনা। ধনভাব মধ্যম। বায়ু প্রকোপের আশঙ্কা। প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তৃতি। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে শুভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। রোহিণীজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। মৃগশিরাজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। কর্ম্মোন্নতি। অর্থাগম। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মন্দ নয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে বাধা ও আশাভঙ্গ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে আশানুরূপ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

মিথুন রাশি

মৃগশিরাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পুনর্ব্বসুর পক্ষে মধ্যম। আর্দ্রার পক্ষে নিকৃষ্ট। পত্নীর জীবন সংশয় পীড়া। শারীরিক অসুস্থতা। ধনভাব উত্তম। সম্পত্তি লাভের সুযোগ। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী, ভূম্যধিকারী, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। চাকুরিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে পারিবারিক অশান্তি ও মনস্তাপ। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

কর্কট রাশি

অশ্লেষাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, পুষ্যার পক্ষে মধ্যম, পুনর্বসুজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। মানসিক অস্বচ্ছন্দতা মধ্যে মধ্যে শারীরিক কষ্ট, সন্তানের উন্নতি, ভ্রাতার পীড়া। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে উত্তম। চাকুরিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মন্দ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

সিংহ রাশি

উত্তর ফাল্গুনী জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পূর্ব্বফল্গুনী ও মঘাজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। দৈহিকভাব শুভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মন্দ নয়। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কন্যারাশি

উত্তরফল্গুনীর পক্ষে উত্তম। হস্তার পক্ষে মধ্যম। চিত্রার পক্ষে নিকৃষ্ট। দেহ ভাব আংশিক শুভ, মধ্যে মধ্যে অসুস্থতা। স্ত্রীর পীড়া। স্বজনহানি। কর্ম্মস্থল শুভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে স্বাভাবিক। চাকুরিজীবীর পক্ষে মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

তুলা রাশি

বিশাখার পক্ষে উত্তম, চিত্রার পক্ষে মধ্যম, স্বাতীর পক্ষে নিকৃষ্ট। আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও শত্রুবৃদ্ধি। আয়ভাব উত্তম। ভূমিক্রয়। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে আংশিক ক্ষতি। চাকুরির ক্ষেত্র মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশানুরূপ নয়। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

বৃশ্চিক রাশি

অনুরাধার পক্ষে উত্তম, জ্যেষ্ঠের পক্ষে মধ্যম, বিশাখার পক্ষে নিকৃষ্ট। দৈহিক ও মানসিক ভাব শুভ। পুত্রসন্তানের উন্নতি, গৃহনির্ম্মাণ। কর্ম্মসাফল্য, বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। চাকুরিজীবীর পক্ষে উন্নতিযোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ধনু রাশি

পূর্ব্বাষাঢ়ার পক্ষে উত্তম। উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে মধ্যম, মূলার পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্যোন্নতি ধনভাব শুভ, কর্ম্মে আংশিক বাধা, পারিবারিক অশান্তি, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা। চাকুরিজীবীর পক্ষে আশাভঙ্গ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মনস্তাপ ও শত্রু বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

মকর রাশি

শ্রবণার পক্ষে উত্তম। উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে মধ্যম, ধনিষ্ঠার পক্ষে নিকৃষ্ট। দৈহিক ও মানসিক কষ্ট, অর্থাগম, লটারীতে প্রাপ্তিযোগ। পারিবারিক অশান্তি, ব্যয় প্রবণতা, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে পীড়াভোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

কুম্ভ রাশি

শতভিষার পক্ষে উত্তম, পূর্ব্বভাদ্রপদ জাতব্যক্তির পক্ষে মধ্যম, ধনিষ্ঠার পক্ষে নিকৃষ্ট। দৈহিক ও মানসিক কষ্ট। ধনাগমে বাধা। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মধ্যম। চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে আয় বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম।

মীন রাশি

উত্তরভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, রেবতীর পক্ষে মধ্যম। পূর্ব্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। দেহভাব আশানুরূপ নয়। পীড়াদি কষ্ট। ধনাগম। ব্যয়বৃদ্ধি। স্বজন বিয়োগ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে আশানুরূপ। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নফল

মেষ লগ্ন—

কর্ম্মক্ষেত্রে গোলযোগ। শত্রুহানি। আয়বৃদ্ধি। দাম্পত্যকলহ ও মানসিক অশান্তি। পুত্রকন্যার পীড়া। চাকুরিজীবীর পক্ষে আশাভঙ্গ। ব্যবসায়ীর পক্ষে অর্থদণ্ড। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

বৃষলগ্ন—

শারীরিক সুস্থতা। ভাগ্যোদয়। কর্ম্মখ্যাতি। কর্ম্মোন্নতি। ব্যবসায়ে কিঞ্চিৎ বাধা। পারিবারিক কলহ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মিথুন লগ্ন—

শারীরিক অসুস্থতা। ভাগ্যোদয়ে বাধা, ব্যয়বৃদ্ধি, স্বজন-বিরোধ, আশাভঙ্গ শেষার্দ্ধে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কর্কট লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা। প্রণয়বৃদ্ধি। স্বজন-বিয়োগ। অর্থাগম। পুত্রকন্যাদির পীড়া, স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য। আয়বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মন্দ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

সিংহ লগ্ন—

শারীরিক কষ্ট। মনস্তাপ। স্ত্রীর পীড়া। কর্ম্মক্ষতি ব্যবসাবাণিজ্যে কিঞ্চিৎ দুর্ভোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কন্যা লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতা। পারিবারিক অশান্তি। স্বজনবিরোধ। পুত্রকন্যাদির জন্য দুশ্চিন্তা। শত্রুহানি। সন্তানের উন্নতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

তুলা লগ্ন—

শারীরিক অসুস্থতা, আয়বৃদ্ধি, মানসিক কষ্ট, কর্ম্মস্থলে অশান্তিবৃদ্ধি, স্ত্রীলোকের পক্ষে মন্দ নয়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

বৃশ্চিক লগ্ন—

মানসিক উদ্বেগ, শারীরিক উন্নতি। কর্ম্মক্ষেত্রে শুভ, উন্নতির লক্ষণ আছে। দাম্পত্যপ্রীতি। ব্যবসায়ীর পক্ষে সুযোগ সুবিধার অভাব, স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

ধনু লগ্ন—

শারীরিক স্বচ্ছন্দতা। মানসিক উদ্বেগ। পারিবারিক অশান্তি। অর্থাগম। কর্ম্মপরিচালনায় বিশৃঙ্খলতা। চাকুরিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মকর লগ্ন—

শারীরিক অসুস্থতা, ব্যয়বৃদ্ধি, আশাভঙ্গ, আর্থিক উন্নতি, ভ্রমণ, স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কুম্ভ লগ্ন—

কর্ম্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাট, দৈহিক ও মানসিক অবনতি। নানাপ্রকার অশান্তি। স্বজনবিয়োগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মীন লগ্ন—

শত্রুবৃদ্ধি, ব্যয়বৃদ্ধি, আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। সন্তান-সন্ততির উন্নতি। পারিবারিক অশান্তি। কর্ম্মক্ষেত্রে গোলযোগ। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

শ্রী'শ'—

॥ বিভাস ॥

ডাক্তার তারকেশ্বর রায়—অচিনপুর গ্রামের সর্ব্বময় কর্ত্তা, অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী আর বিভাসের ভাগ্য-বিধাতাও। এঁরই কম্পাউণ্ডার এই সুদর্শন, সুকণ্ঠ তরুণ বিভাস মুখোপাধ্যায়, গৃহ থেকে যাকে বিনা দোষে বিতাড়িত করেছে তার ভ্রাতারা—আশ্রয় দিয়েছে তাকে এই তারকেশ্বর তাঁর বাড়ীতে। কিন্তু, কেন?—তারকেশ্বরের পুত্রবধূ বিদ্যুৎ ও কন্যা পদ্মার সান্নিধ্যে ও সাহচর্য্যে এসে বিভাসের মনে জেগেছে দ্বন্দ্ব ও সংশয়, অশান্তি আর অনিশ্চয়তা। একদিকে মনিব ও আশ্রয়দাতা ডাক্তার তারকেশ্বর আর অন্যদিকে বিদ্যুতের প্রেরণা ও পদ্মার প্রেম এবং সর্ব্বোপরি মনুষ্যত্বের প্রতি, সত্যের প্রতি তার আকর্ষণ তাকে উজ্জীবিত করে তুলল মাথা তুলে দাঁড়াতে পাষণ্ড, পিশাচ তারকেশ্বরের বিরুদ্ধে, যে তারকেশ্বর এই গৃহ

*

ষ্টুডিওর বাইরে বাংলা চলচ্চিত্রের সমুজ্জ্বল তারকা

শর্ম্মিলা ঠাকুর।

*

হতে বিতাড়িত, কপর্দকহীন, নিরাশ্রয়, অভুক্ত বিভাসকে আশ্রয় ও অন্ন দিয়েছিল নিজের পাপ ও প্রতারণা কার্য্যে অনুচর রূপে পাবার জন্য। তারপর?—তারকেশ্বরের ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকে কি অব্যাহতি পেল বিভাস? পেল কি পদ্মাকে? অচিনপুর কি অব্যাহতি পাবে তারকেশ্বরের করাল গ্রাস থেকে? আর বৌদি বিদ্যুৎ? তিনি কি তারকেশ্বরের সপক্ষে, না তাঁর পতনই দেখতে চান। আর আছে তারকেশ্বরের ভৃত্য রাম্ব—তাঁর পাপকার্য্যের সাক্ষী ও সহায়। সে কি তারকেশ্বরকে ভক্তি করে, না ঘৃণা করে? আর তারকেশ্বরের স্ত্রী ভুবনেশ্বরী? কেন তিনি এত নিস্তব্ধ, এত অন্তরালবাসিনী? কি তাঁর মনের কথা?

এই "বিভাস" চিত্রটিতে আছে এই সব সংশয়, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ। উত্তম-অনুভা-বিকাশ অভিনীত এই চিত্রটি অভিনয়ের দিক থেকেও সাফল্য লাভ করেছে। বিশেষ করে রাম্ব, ভৃত্যের ভূমিকায় বিকাশ রায়ের অভিনয়ে তাঁর অভিনয় প্রতিভা আরও বিকাশ লাভ করেছে। বিদ্যুৎ-এর ভূমিকায় অনুভা গুপ্তর অভিনয়ে বিদ্যুৎ-এর দীপ্তি না থাকলেও স্বচ্ছ, সুন্দর ও সাবলীল হয়েছে। নায়ক বিভাসের ভূমিকায় উত্তমকুমার মোটামুটি ভাল অভিনয়ই করেছেন। আর নায়িকা পদ্মার ভূমিকায় নবাগতা ললিতা চট্টোপাধ্যায়ের ললিত ভঙ্গিমা নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় হয়েছে, তবে তাঁর বাচন ভঙ্গিমা আরও উন্নতির অপেক্ষা রাখে। ডাক্তার তারকেশ্বর রায়ের ভূমিকায় কমল মিত্র স্থানে স্থানে তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। জগদীশ চক্রবর্ত্তীর ছোট্ট ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যালের অভিনয় এবং ছায়া দেবীর ভুবনেশ্বরীও মনে রাখবার মতন।

চিত্রটির দৈর্ঘ্য বেশী হওয়ায় মাঝে মাঝে একঘেয়ে লাগলেও এবং পরিণতিটিও অতি নাটুকে হলেও মোটামুটি চিত্রটি দর্শকদের ভাল লাগবে বলেই মনে হয়। আর, ডি, বনশল্-এর এই চিত্রটি পরিচালনা করেছেন শ্রীবিষ্ণু বর্দ্ধন এবং নেপথ্য সঙ্গীত গেয়েছেন শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

খবরাখবর ঃ

ভারত সরকারের উদ্যোগে এবং তথ্য ও বেতার দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় আগামী নভেম্বর মাসে ভারতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমে দিল্লীতে পরে কলিকাতা, বোম্বাই, ও মাদ্রাজে সপ্তাহব্যাপী এই উৎসব অনুষ্ঠানে পৃথিবীর নানা দেশের কয়েকটি উৎকৃষ্ট চিত্র প্রদর্শিত হবে।

* * *

স্বামী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ জীবনীচিত্র "বীরেশ্বর বিবেকানন্দ" শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে। লোক চিত্র-প্রতিষ্ঠানের এই চিত্রটি পরিচালনা করেছেন মধু বসু এবং কাহিনী রচনা করেছেন কথা-সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। সুর যোজনা করেছেন অনিল বাগচী এবং নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অমরেশ দাস। অন্যান্য ভূমিকাগুলিতে আছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, বিপিন গুপ্ত, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি। চিত্রটির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ত্রিবান্দ্রম, মাদ্রাজ, মাদুরা, ত্রিচিনাপল্লী, কেরালা, রামেশ্বর, কন্যাকুমারিকা প্রভৃতি দক্ষিণের প্রসিদ্ধ স্থানগুলির দৃশ্যাবলী এতে স্থান পেয়েছে।

* * *

"উত্তমকুমার ফিল্মস"-এর "জতুগৃহ" চিত্রটি আগামী মাসেই মুক্তিলাভ করবে। সুবোধ ঘোষের গল্প অবলম্বনে নির্ম্মিত এই চিত্রটির পরিচালনা করেছেন তপন সিংহ এবং ভূমিকালিপিতে উত্তমকুমার ছাড়াও আছেন অরুন্ধতী, বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, কাজল গুপ্ত প্রভৃতি।

* * *

খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী মঞ্জু দে পরিচালিত "স্বর্গ হতে বিদায়" চিত্রটিও শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে। দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায় প্রধান চরিত্র দুটিতে আছেন এবং পার্শ্বচরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন অনুভা গুপ্ত, বিকাশ রায়, সুমিতা সান্যাল, জহর রায়, দীপক মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

* * *

"উত্তম চিত্র"-র পরবর্ত্তী ছবিটি ইষ্টম্যান্ কলারে তোলা হবে। বিশ্বজিৎ ও রাজশ্রী নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন এবং চিত্রটি পরিচালনা করবেন হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়।

* * *

রাশিয়ায় "রামায়ণ"

ভারতের মহাকাব্য "রামায়ণ"কে রাশিয়ায় নাটকাকারে প্রথম মঞ্চস্থ করা হয়েছিল ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে। তারপর দীর্ঘ তিন বৎসর এই নাটক অভিনীত হয়েছে এবং গত ২৬শে জানুয়ারী

"রামায়ণ" নাটকে সীতার ভূমিকায় সোভিয়েট শিল্পী M. Kupriyanova

ভারতের রিপাব্লিক্ দিবসে মস্কোতে এই "রামায়ণ" নাটকের শততম অভিনয় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নাটকটি রচনা করেছেন Madame Gusseva-Potabenko. তিনি এখন ভারতেই আছেন এবং ভারতীয়দের রাশিয়ান্ ভাষা শিক্ষায় সাহায্য করেন এবং সংস্কৃত ও রাশিয়ান্ ভাষায় তুলনামূলক বিষয় নিয়ে পড়াশুনাও করেন।

রামায়ণের মতন বিরাট মহাকাব্যকে মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে মঞ্চে দেখান সহজ নয়। কিন্তু Madame Gusseva এই দুরূহ কার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেছেন। রাশিয়ান অভিনেত্রীদের কাছে শাড়ী পরানাইতো একটা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়! তার ওপর ভারতীয় ভঙ্গী ও প্রকাশ রীতিও অভ্যাস করা রীতিমত কঠিন হয়ে ওঠে। মস্কোস্থিত ভারতীয় দূতাবাস অবশ্য এই দিক থেকে অনেক সাহায্য করেছেন ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধীয় প্রামাণ্য চিত্র প্রভৃতি দিয়ে। সোভিয়েট শিল্পীরাও লাইব্রেরীতে গিয়ে ভারতীয় সাহিত্যের থেকে সযত্ন পরিশ্রমের দ্বারা অনেক কিছু শিক্ষালাভও করেন।

সঙ্গীত নৃত্য ও নাটকের মাধ্যমে এই নাটকটি পরিবেশিত হয়। শুধু সোভিয়েট শিল্পীরাই এই নাটকে অভিনয় করেছেন এবং রাশিয়ান ভাষার মাধ্যমেই। শুধু একটি সংস্কৃত শ্লোক "সত্যমেব জয়তে" তিন বার রামের মুখ দিয়ে বলান হয়েছে। প্রথম যখন দশরথ রামকে সাবধান করে দেয় তাড়কা রাক্ষসীর সঙ্গে যুদ্ধের আগে তখন রাম উত্তরে এই কথা বলে। দ্বিতীয়বার রাম বলে বালীর সঙ্গে যুদ্ধের সময় এবং তৃতীয় বার রামকে দিয়ে "সত্যমেব জয়তে" বলান হয় যখন রাম রাবণকে নিহত করে। এই কথাটি রাশিয়ান বালকবালিকাদের এতই ভাল লেগেছে যে অনেক স্কুল ও পাইওনিয়ার ভবনে লিখে রাখা হয়েছে। ভারত সোভিয়েট সাংস্কৃতিক মৈত্রীতে এই "রামায়ণ" নাটকটি একটি বিশিষ্ট অবদান বলেই সবাই মনে করেন।

* * *

সোভিয়েটে "শকুন্তলা"

রাশিয়ার রিগা ব্যালে থিয়েটারও আর একটি ভারতীয় কাব্যকে রুশ ভাষায় নৃত্য-নাট্যে রূপায়িত করেছেন। ভারতের মহাকবি কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকটিকে সম্প্রতি এঁরা নৃত্য-নাট্যের রূপ দান করেছেন। ল্যাটভিয়ার প্রধান শহরে এই নৃত্য-নাট্যটি প্রথম অনুষ্ঠিত হয় এবং রুশ সমালোচক ও দর্শকদের মুগ্ধ করে। এই নৃত্য-নাট্যটির সাফল্যের অনেকখানি কৃতিত্ব হচ্ছে রুশ নৃত্যবিদ সার্জির এবং তাঁকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী মায়া রাও ও শিবশঙ্কর নামে দু'জন ভারতীয় নৃত্যশিল্পী।

রুশ ও ভারতীয় নৃত্য-রীতির এক সুন্দর সমন্বয় সাধন করা হয়েছে এই নৃত্যনাট্যে। ব্যালে রীতির সহিত ভারতীয় নৃত্যের 'মুদ্রা,' 'ভাব' ইত্যাদি আঙ্গিকও অনুসরণ করা হয়েছে নিষ্ঠার সঙ্গে। সাজসজ্জা এবং মঞ্চপরিকল্পনাতেও ভারতীয় ভাব অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের 'ময়ূরনৃত্য,' উত্তর ভারতের 'মার্গনৃত্য' এবং মধ্যপ্রদেশের 'ঢোলক-নৃত্য'র সাহায্যে "শকুন্তলার" নৃত্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। সুরকার বালসানিয়ান্ ভারতীয় রাগ ও লোক সঙ্গীতের সুরের সাহায্যে 'সিম্ফনি' রচনা করেছেন। ভারতীয় ও পাশ্চাত্যের সুর, সঙ্গীত, নৃত্য ও আঙ্গিকের এক অপূর্ব্ব মিশ্রণে মহাকবির 'শকুন্তলা' এক নবরূপ ধারণ করেছে।

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ড

দ্বিতীয় টেষ্ট—বোম্বাই ঃ

ভারতবর্ষ : ৩০০ রান (সেলিম দুরাণী ৯০ এবং চান্দু বোরদে ৮৪ রান। প্রাইস ৬৬ রানে ৩, নাইট ৫৩ রানে ২, লার্টার ৩৫ রানে ২ এবং টিটমাস ৫৬ রানে ২ উইকেট পান)।
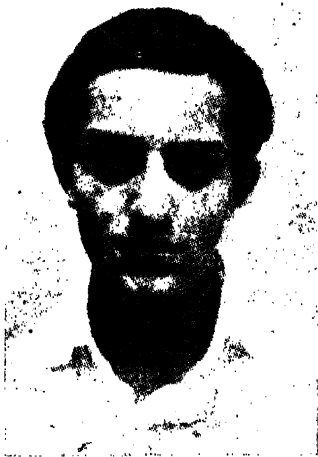
২৪৯ রান (৮ উইকেটে ডিক্লে:। দিলীপ সরদেশাই ৬৬, এম এল জয়সীমা ৬৬ এবং বিজয় মঞ্জরেকার নট আউট ৪৩ রান। টিটমাস ৭৯ রানে ৩, নাইট ২৮ রানে ২ এবং প্রাইস ৪৭ রানে ২ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড : ২৩৩ রান (ফ্রেডী টিটমাস ৮৪ নট আউট, মাইক স্মিথ ৪৬ এবং প্রাইস ৩২ রান। চন্দ্রশেখর ৬৭ রানে ৪ এবং দুরাণী ৫৯ রানে ৩ উইকেট পান)

ও ২০৬ রান (৩ উইকেটে। বোলাস ৫৭, বিন্কস ৫৫, স্মিথ নট আউট ৪০ রান। চন্দ্রশেখর ৪০ রানে ১, দুরাণী ৩৫ রানে ১ এবং জয়সীমা ৩৬ রানে ১ উইকেট)।

পাতৌদির নবাব
ভারতের অধিনায়ক

বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্ট খেলা ড্র যায়। ভারতবর্ষের অধিনায়ক পাতৌদির নবাব টসে জিতেন। প্রথম দিনের খেলায় ভারতবর্ষের ৬টা উইকেট পড়ে ২২৫ রান দাঁড়ায়। উইকেটে অপরাজিত থাকেন বোরদে (৫৮ রান) এবং দুরাণী (৭৩ রান)

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের কিছু আগে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৩০০ রানের মাথায় শেষ হয়। সেলিম দুরাণীর শত রান পূর্ণ হ'তে ১০ রান বাকি ছিল। এই দিন ভারতবর্ষ শেষ ৪টে উইকেটে ৭৫ রান করে। সপ্তম উইকেটের জুটিতে বোরদে এবং দুরাণী ১৫৩ রান যোগ করেন—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে নতুন রেকর্ড এবং যে কোন দেশের বিপক্ষে ভারতবর্ষের পক্ষে পূর্ব্ব রেকর্ডের সমান।

মাইক স্মিথ
অধিনায়ক—ইংল্যাণ্ডের

বাপু নাদকার্নী

প্রথম রেকর্ড স্থাপন করেন মানকড় এবং আপ্তে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে, পোর্ট অব্ স্পেন, ১৯৫৩ সালে।

দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষ ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ১৪৪ রানের মধ্যে ৬টা উইকেট পায়। উইকেটে অপরাজিত থাকেন টিটমাস (১৯ রান) এবং প্রাইস (২১ রান)।

তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৩৩ রানের মাথায় পড়ে যায়। খেলার বাকি ১৩০ মিনিট সময়ে ভারতবর্ষ একটা উইকেট হারিয়ে ৯১ রান তুলে—ফলে ভারতবর্ষ ১৫৮ রানে অগ্রগামী হয়। উইকেটে অপরাজিত থাকেন মেহেরা (৩১ রান) এবং সারদেশাই (৪২ রান)।

চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষ ২৪৯ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। তখন চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হ'তে ২০ মিনিট বাকি ছিল। সুতরাং ইংল্যাণ্ড দল মোট ৩৫০ মিনিটের খেলা হাতে পেয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। জয়লাভের জন্যে তাদের ৩১৭ রানের প্রয়োজন ছিল। চতুর্থ দিনের ২০ মিনিটের খেলায় তারা কোন উইকেট না খুইয়ে ১৭ রান করে।

পঞ্চম দিনে ইংল্যাণ্ডের খেলায় জয়লাভের কোন চেষ্টা ছিল না। সাড়ে ৫ ঘণ্টা ব্যাট করে তারা তিনটে উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৮৯ রান করে—মোট রান দাঁড়ায় ২০৬ (৩ উইকেটে)।

তৃতীয় টেস্ট—কলকাতা ঃ

ভারতবর্ষ : ২৪১ রান (দিলীপ সরদেশাই ৫৪ এবং বাপু নাদকার্নী ৪৩ নটআউট। জন প্রাইস ৭৩ রানে ৫ এবং ডোনাল্ড উইলসন ১৭ রানে ২ উইকেট পান) ও **৩০০ রান** (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। এম এল জয়সীমা ১২৯ রান। লার্টার ২৭ রানে ২, টিটমাস ৬৭ রানে ২ এবং পারফিট ৭১ রানে ২ উইকেট পান)।

ইংল্যাণ্ড : ২৬৭ রান (কলিন কাউড্রে ১০৭ এবং জে বি বোলাস ৩৯ রান। দেশাই ৬২ রানে ৪, দুরানী ৫৯ রানে ২ এবং নাদকার্নী ৩৮ রানে ২ উইকেট) ও **১৪৫ রান** (২ উইকেটে। মাইক স্মিথ ৭৫ নটআউট এবং কলিন কাউড্রে ১৩ নটআউট)

ক'লকাতায় ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় টেস্ট খেলা ড্র যায়।

এম এল জয়সীমা

ভারতবর্ষ টসে জয়ী হয়ে প্রথম দিনের খেলায় ৯টা উইকেট হারিয়ে ২৩০ রান করে। উইকেটে অপরাজিত থাকেন নাদকার্নী (৩৩) এবং চন্দ্রশেখর (১৫)। দ্বিতীয় দিনে ২৪১ রানের মাথায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। নাদকার্নী ৪৩ রান করে নটআউট থাকেন। ১০ম উইকেটে নাদকার্নী এবং চন্দ্রশেখরের জুটি ৫১ রান যোগ ক'রে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষের ১০ম উইকেট জুটির নতুন রানের রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল—৪৩ রান (রুশী মোদী এবং এস জি সিন্ধে, লর্ডস, ১৯৪৬)। প্রথম ইনিংসে দলের সর্ব্বোচ্চ ৫৪ রান করেন দিলীপ সরদেশাই—উইকেটে ছিলেন ১৩৭ মিনিট এবং বাউণ্ডারী মেরেছিলেন ৬টা।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড তাদের প্রথম ইনিংসের খেলায় ১৪৯ রান করে, ৩টে উইকেট খুইয়ে। নটআউট থাকেন কলিন কাউড্রে (৪১ রান) এবং জিম পার্কস (২৯ রান)।

তৃতীয় দিন ঝির ঝিরে বৃষ্টির দরুণ ২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট খেলা বন্ধ রাখা হয়েছিল। ৩ ঘণ্টা ৫ মিনিটের খেলায় ইংল্যাণ্ড আরও চটে উইকেট হারিয়ে ৮৬ রান যোগ করে। ইংল্যাণ্ডের রান দাঁড়ায় ২৩৫ (৭ উইকেটে)। অপরাজিত থাকেন কলিন কাউড্রে (৯০ রান) এবং ফ্রেডী টিটমাস (১২ রান)।

চতুর্থ দিনে ২৬৭ রানের মাথাতে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। ইংল্যাণ্ডের অত্যন্ত মন্থর গতিতে রান করার দরুণই তৃতীয় টেষ্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। ইংল্যাণ্ড তাদের প্রথম ইনিংসের ২৬৭ রান তুলতে ৫১৩ মিনিট সময় নেয়। দ্বিতীয় দিনে ২৯৫ মিনিট খেলে মাত্র ১৪৯ রান তুলেছিল। কলিন কাউড্রে ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করেন। নিজের ১০৭ রান তুলতে তাঁকে ৩৭১ মিনিট উইকেটে থাকতে হয়েছিল। বাউণ্ডারী করেছিলেন ১৭টা। চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষ বোলিং এবং ব্যাটিংয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। ভারতবর্ষের রমাকান্ত দেশাই মাত্র ১০টা বল দিয়ে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসেয় শেষ তিন জন খেলোয়াড়কে (কাউড্রে, টিটমাস এবং লার্টার) আউট করেছিলেন, এ দিকে ইংল্যাণ্ডকে মাত্র ২ রান করতে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা থেকেই দ্রুত গতিতে রান করে। ৩৫ মিনিটে দলের ৫০ রান ওঠে—জয়সীমা একাই ৪০ রান করেছিলেন। চতুর্থ দিনের খেলায় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮০ রান দাঁড়ায় (২ উইকেটে)। উইকেটে অপরাজিত থাকেন জয়সীমা (১০৩ রান) এবং মঞ্জরেকার (৪ রান)। জয়সীমা তাঁর ৯৮ রানের মাথায় পারফিটের বলে বাউণ্ডারী ক'রে ১০ রান পূর্ণ করেন। এই শত রান করতে তাঁকে ২৪০ মিনিট উইকেটে থাকতে হয়েছিল। বাউণ্ডারী মেরেছিল ১৩টা। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় জয়সীমার পক্ষে এই দ্বিতীয় সেঞ্চুরী। তিনি তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী (১২৭ রান) করেন ইংল্যাণ্ডেরই বিপক্ষে (দিল্লীর ৩য় টেস্ট, ১৯৬১-৬২)। ইডেন উদ্যানে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের টেস্ট খেলায় জয়সীমাকে নিয়ে এ পর্য্যন্ত তিনজন সেঞ্চুরী করলেন। অপর দু'জন—ডি জি ফাদকার (১১৫ রান) ১৯৫১—৫২ এবং কলিন কাউড্রে (১০৭ রান, ১৯৬৪)। কাউড্রের সেঞ্চুরী ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ইডেন উদ্যানের টেস্ট খেলায় প্রথম সেঞ্চুরী।

পঞ্চম দিনে লাঞ্চের পর আধঘণ্টা খেলে ভারতবর্ষ

দিলীপ সারদেশাই
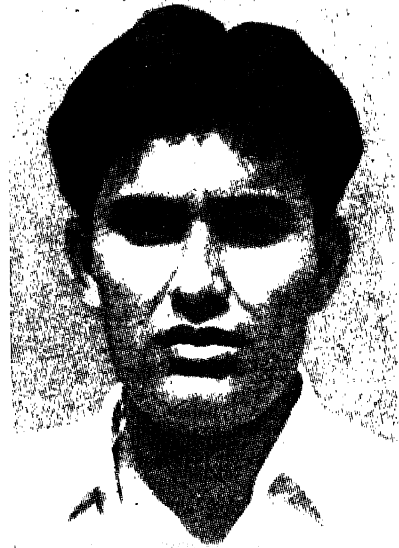
সেলিম দুরাণী

৩০০ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। তখন খেলার সময় ছিল ১৭০ মিনিট। ভারতবর্ষ ২৭৪ রানে অগ্রগামী ছিল। ইংল্যাণ্ড ১৭০ মিনিটের খেলায় দুটো উইকেট খুইয়ে ১৪৫ রান তুলেছিল।

চতুর্থ টেষ্ট—দিল্লী ৪

ভারতবর্ষ ঃ ৩৪৪ রান (হনুমন্ত সিং ১০৫, জয়সীমা ৬৭, সরদেশাই ৪৪ এবং কুন্দরন ৪০ রান। টিটমাস ১০০ রানে ৩ এবং মর্টিমোর ৭৪ রানে ৩ উইকেট)

ও ৪৬৩ রান (৪ উইকেটে। পাতৌদির নবাব ২০৩ নট আউট, চান্দু বোরদে ৬৭ নট আউট, কুন্দরন ১০০ এবং জয়সীমা ৫০ রান। উইলসন ৭৪ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড ঃ ৪৫১ রান (কলিন কাউড্রে ১৫১, পিটার পারফিট ৬৭ এবং জে বি বোলাস ৫৮ রান। চন্দ্রশেখর ৭৩ রানে ৩, কৃপাল সিং ৯০ রানে ৩ এবং নাদকার্নী ৯৭ রানে ৩ উইকেট।

দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের চতুর্থ টেষ্ট খেলা ড্র যায়।

টসে জয় লাভ ক'রে ভারতবর্ষ প্রথম দিনের খেলায় ৪টে উইকেট খুইয়ে ২৪৭ রান করে। উইকেটে অপরাজিত ছিলেন হনুমন্ত সিং (৭৯ রান) এবং বোরদে (২২ রান)।

দ্বিতীয় দিনে বেলা ২টা ২০ মিনিটে ৩৪৪ রানের মাথায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। এইদিনে বাকি ৬টা উইকেট পড়ে ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিনের ২৪৭ রানের সঙ্গে মাত্র ৯৭ রান যোগ হয়। ভারতবর্ষ মন্থর গতিতে রান ক'রে। প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩৪৪ রান তুলতে ৫১১ মিনিট সময় লেগেছিল।

হনুমন্ত সিং ১৫ মিনিট উইকেটে থেকে শত রান করেন—বাউণ্ডারী করেন ১৫টা। হনুমন্ত সিংকে নিয়ে এ পর্য্যন্ত এই ৭ জন ভারতীয় তাঁদের খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করেছেন ঃ

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে লালা অমরনাথ (১১৮ রান, বোম্বাই, ১৯৩৩), আব্বাস আলি বেগ (১১২ রান, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৯) এবং হনুমন্ত সিং (১০৫ রান, দিল্লী, ১৯৬৪); পাকিস্তানের বিপক্ষে দীপক সোধন (১১০ রান, ক'লকাতা, ১৯৫২) এবং নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে এ জি কৃপালসিং (১০০ নট আউট, হায়দরাবাদ, ১৯৫৫)। তাছাড়া ইংল্যাণ্ড দলের পক্ষে রঞ্জিৎ সিংজী (১৫৪ নট

কলিন কাউড্রে

আউট, ম্যাঞ্চেস্টার ১৮৯৬) এবং পাতৌদির স্বর্গীয় নবাব ইফতিকার আলী (১০২ রান, সিডনি, ১৯৩২-৩৩) সেঞ্চুরী করেছিলেন অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে ১২৪ রান করে, উইকেটে পড়ে দুটো। উইকেটে অপরাজিত থাকেন মাইক স্মিথ (১৬ রান) এবং উইলসন (২ রান)।

তৃতীয় দিনে অত্যন্ত ধীরগতিতে ব্যাট ক'রে ইংল্যাণ্ড আরও তিনটে উইকেট খুইয়ে পূর্ব্বদিনের ১২৪ রানের সঙ্গে মাত্র ২৩০ রান যোগ করে—রান দাঁড়ায় ৩৫৪ (৫ উইকেটে । কাউড্রে এই সিরিজে তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরী করেন, কমপক্ষে চারবার আউট হ'তে গিয়ে বেঁচে যান। এইদিনে উইকেটে অপরাজিত থাকেন কাউড্রে (১০২ রান) এবং পার্কস (৩২ রান)।

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৪৫১ রানের মাথায় শেষ হয়। তৃতীয় দিনে রান ছিল ৩৫৪ (৫ উইকেটে) এবং এইদিনে বাকি পাঁচটা উইকেটে মাত্র ৯৭ রান ওঠে দু'ঘণ্টার খেলায়। ভারতবর্ষ ১০৭ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। এবং দুটো উইকেট খুইয়ে ১৬৬ রান করে। উইকেটে অপরাজিত থাকেন কুন্দরন (৭৩ রান) এবং পাতৌদির নবাব (৩১ রান)।

পঞ্চম দিনে ভারতবর্ষ হাত থেকে ব্যাট ছাড়েনি। ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ৪৬৩ (৪ উইকেটে)। পাতৌদির নবাব ডাবল সেঞ্চুরী (২০৩ নটআউট) করেন—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষের এই প্রথম ডাবল সেঞ্চুরী এবং এক ইনিংসের খেলায় সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল ১৯২ (কুন্দরন, মাদ্রাজ, ১৯৬৪)। তবে পাতৌদির নবাব একাধিকবার আউট হওয়া থেকে রক্ষা

পেয়েছিলেন এবং চা-পানের পর ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করতে না দেখে ইংল্যাণ্ড দলও খেলায় হাল ছেড়ে দেয়—খেলাটা একটা প্রহসনে দাঁড়ায়। চা-পানের সময় ভারতবর্ষের রাণ ছিল ৩৩৫ (৪ উইকেটে)—পাতৌদির নবাব ১১৫ এবং বোরদে ২৭ রাণ। চা-পানের পর খেলা কোন অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল তার একটা উদাহরণই যথেষ্ট হবে। পারফিটের এক ওভারে ছ'টা বলের মধ্যে পাঁচটা বল খেলে পাতৌদির নবাব ২০ রাণ করেন (২-৪-৪ ৬-৪)। দ্বিতীয় ইনিংসে উইকেট-কিপার বুধি কুন্দরণের সেঞ্চুরী রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য—ইংল্যাণ্ড ভারতবর্ষের টেস্টে উইকেট-কীপার হিসাবে কুন্দরনই তু'টি সেঞ্চুরী করেছেন। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে উইকেট-কীপার হিসাবে সেঞ্চুরী করেছেন গড্‌ফ্রে ইভেন্স—১০৪রান (লর্ডস, ১৯৫২)। পাতৌদির নবাব এবং চান্দু বোরদে পঞ্চম উইকেটের জুটিতে ১৯০ রাণ তুলে অপরাজিত থাকেন—যে কোন দেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে পঞ্চম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রাণ।

পঞ্চম টেষ্ট—কানপুর ঃ

ইংল্যাণ্ড : **৫৫৯** রান (বেরী নাইট ১২৭, পিটার পারফিট ১২১, ব্রায়ান বোলাস ৬৭, জিম পার্কস ৫১ নট আউট। জয়সীমা ৫৪ রানে ২ এবং নাদকার্নী ১২১ রানে ২ উইকেট পান)।

ভারতবর্ষ : **২৬৬** রান (দিলীপ সরদেশাই ৭৯ এবং বাপু নাদকার্নী ৫২ নট আউট। টিটমাস ৭৩ রানে ৬ এবং প্রাইস ৩২ রানে ২ উইকেট পান)।

ও **৩৪৭** রান (৩ উইকেটে বাপু নাদকার্নী ১২২ নট আউট, সরদেশাই ৮৭, তুরাণী ৬১ নট আউট এবং কুন্দরম ৫৫। টিটমাস ৫৯ রানে ১, পারফিট ৬৮ রানে ১ এবং পার্কস ৪৩ রানে ১ উইকেট পান)।

কানপুরে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের পঞ্চম টেস্ট খেলাও ড্র গেল—ফলে ১৯৬৪ সালের টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলাই অমীমাংসিত থেকে গেল। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এইভাবে একটা টেস্ট সিরিজের পাঁচটা খেলাই অমীমাংসিত থেকেছে ইতিপূর্বে তু'বার : ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতবর্ষ বনাম পাকিস্তান এবং ১৯৬০-৬১ সালে ভারতবর্ষ বনাম পাকিস্তান।

ভারতবর্ষের অধিনায়ক পাতৌদির নবাব পঞ্চম টেস্ট খেলাতেও টসে জয়ী হন—ফলে ১৯৬৪ সালের টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলাতেই তিনি টসে জয়ী হন। তাঁকে নিয়ে এইভাবে একটি সিরিজের পাঁচটি খেলাতেই টসে জয়ী হ'লেন ৭ জন অধিনায়ক। পূর্বের ৬ জন অধিনায়ক যথাক্রমে : এফ. এস জ্যাকসন ইংল্যাণ্ড), অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯০৫ সালে, এম এ নোবল (অষ্ট্রেলিয়া), ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯০৯ সালে, এইচ জি ডিন (দক্ষিণ আফ্রিকা), ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯২৭-২৮ সালে, জে ডি সি গডার্ড (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ), ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৪৮-৪৯ সালে, এ এল হাসেট (অষ্ট্রেলিয়া), ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৫৩ সালে এবং কলিন কাউড্রে (ইংল্যাণ্ড), দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৯৬০ সালে। এক দলের অধিনায়ক সিরিজের পাঁচটা খেলারই টসে জয়ী হয়েছেন কিন্তু একটা খেলাতেও জিততে পারেননি এবং সিরিজের পাঁচটা খেলাই ড্র—টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের ১৯৬৪ সালের টেস্ট সিরিজ সেই দিক থেকে প্রথম নজির সৃষ্টি করলো।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯২৭-২৮ সালের টেস্ট সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক এইচ জি ডিন পাঁচটা খেলাতেই টসে জয়ী হয়েছিলেন এবং এই সিরিজও অমীমাংসিত ছিল; কিন্তু ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের ১৯৬৪ সালের টেস্ট সিরিজের মত নিস্ফলা ছিল না—দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইংল্যাণ্ড তুটো ক'রে টেস্টে জয়ী হয়েছিল আর একটা খেলা অমীমাংসিত ছিল।

ভারতবর্ষের অধিনায়ক টসে জয়ী হয়ে ইংল্যাণ্ডকে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ ছেড়ে দেন, ভেবেছিলেন কান-পুরের উইকেটে প্রথম ব্যাট করতে গিয়ে ইংল্যাণ্ড খুবই অসুবিধায় পড়বে। কিন্তু ফল উল্টো হয়। প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যাণ্ড ৩টে উইকেট হারিয়ে ২৫২ রান করে এবং দ্বিতীয় দিনের খেলা ভাঙ্গার দশ মিনিট আগে ৫৫৯ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভারতবর্ষ বাকি সময়ে এক উইকেট খুইয়ে ৯ রাণ করে। তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম

ইনিংসের রান দাঁড়ায় ১৪৫ (৪ উইকেটে)। ফলে ফলো-অন থেকে ছাড়ান পেতে ভারতবর্ষের ২১৫ রানের প্রয়োজন হয়—হাতে জমা থাকে ৬টা উইকেট।

চতুর্থ দিনে চা-পানের ১৫ মিনিট আগে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২৬৬ রানের মাথায় শেষ হয়। ভারতবর্ষ শত চেষ্টা করেও ফলো-অনের হাত থেকে রেহাই পেল না। বাপু নাদকার্নী ৫২ রান ক'রে নট আউট থাকেন। দলের ১৮৮ রানের মাথায় সারদেশাই দলের সর্ব্বোচ্চ ৭৯ রান ক'রে আউট হ'লে তাঁর শূন্য স্থানে নাদকার্নী খেলতে নামেন। দলের অতি সঙ্কট সময়। হাতে আর মাত্র তিনটে উইকেট, এ দিকে 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও ১৭২ রানের প্রয়োজন ছিল। লাঞ্চের সময় রান দাঁড়ায় '০৭ (৭ উইকেটে)—উইকেটে ছিলেন দুরানী এবং নাদকার্নী। অর্থাৎ 'ফলো অন' থেকে ছাড়া পেতে তখনও ভারতবর্ষের ১৫৩ রানের প্রয়োজন ছিল। দলের ২২৯ রানের মাথায় দুরানী, ২৪৫ রানের মাথায় বালু গুপ্ত এবং ২৬৬ রানের মাথায় শেষ উইকেট চন্দ্রশেখর আউট হ'ন। নাদকার্নী তাঁর নট আউট ৫২ রান তুলেছিলেন ১৪২ মিনিট উইকেটে থেকে—বাউণ্ডারী করেছিলেন ৭টা।

ভারতবর্ষ ২৯৩ রানের পিছনে পড়ে চতুর্থদিনের বাকি ১০৫ মিনিট সময়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় একটা উইকেট হারিয়ে ৮৬ রান তুলেছিল। উইকেটে অপরাজিত ছিলেন নাদকার্নী (৩৯ রান) এবং কুন্দরন (৩০ রান)।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষদিনে ইংল্যাণ্ড অনেক পরিশ্রম এবং থলিতে যতরকম খেলার কৌশল ছিল তা প্রয়োগ করেও ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করতে পারেনি। নাদকার্নী ভারতবর্ষের পরিত্রাতার ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন। কুন্দরণ, সারদেশাই এবং দুরাণীর সহযোগিতায় তিনিই পরাজয়ের মুখ থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করেন। প্রথম ইনিংসে ৫২ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ১২ রান ক'রে নাদকার্নী নট আউট ছিলেন। টেষ্ট ক্রিকেটে নাদকার্নীর এই প্রথম সেঞ্চুরী। এই নিয়ে তিনি ২৬টা টেস্ট ম্যাচ খেললেন ; টেস্ট ক্রিকেটে বর্ত্তমানে তাঁর পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে মোট রান ১০৮৮, এক ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রান ১২২ (নটআউট) এবং ১৬৪৫ রানে ৫০টা উইকেট। আলো১্য পঞ্চম টেষ্ট খেলার দ্বিতীয় ইনিংসে নাদকার্নী-কুন্দরনের দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ৫০৯ রান, নাদকার্নী সারদেশাইয়ের তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ১৪৪ রান এবং নাদকার্নী-দুরাণীর অসমাপ্ত চতুর্থ উইকেটের জুটিতে দলের ৭৭ রান উঠেছিল।

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের ১৯৬৪ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্যাটিংয়ে ভারতবর্ষের পক্ষে শীর্ষস্থান পেয়েছেন বাপু নাদকার্নী (মোট রান ২৯৪ এবং গড় ৯৮.০০)। অপর দিকে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে কলিন কাউড্রে (মোট রান ৩০৯ এবং গড় ১০৩,০০)। উভয় দলের পক্ষে সর্ব্বাধিক মোট রান করেছেন বুধি কুন্দরন (মোট রান ৫২৫ এবং গড় ৫১,৫০)। বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় ভারতবর্ষের পক্ষে শীর্ষস্থান পেয়েছেন রমাকান্ত দেশাই (৯৭ রানে ৪ উইকেট, গড় ২৪.২৫) এবং ইংল্যাণ্ডের পক্ষে জন্ প্রাইস (৩৮৩ রানে ১৪ উইকেট, গড় ২৭.৩৫)। ভারতবর্ষের পক্ষে সর্ব্বাধিক উইকেট পান সেলিম দুরানী (৪৭১ রানে ১১ উইকেট, গড় ৪২.৮১) এবং ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ফ্রেড টিটমাস (৭৪৭ রানে ২৭ উইকেট, গড় ২৭ ৬৬)। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সর্ব্বাধিক মোট রান করেন ব্রায়ান বোলাস—৩৯১ রান (গড় ৪৮.৮৭)।

টেষ্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

১৯৬৪ সালের টেস্ট সিরিজ নিয়ে ভারতবর্ষ এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ৯টা টেস্ট সিরিজ খেলা হ'ল। ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় ৬ বার, ভারতবর্ষের ১ বার (১৯৬১-৬২) এবং সিরিজ অমীমাংশিত ২ বার (১৯৫১-২ এবং ১৯৬৪)। টেস্ট খেলার ফলাফল : খেলা ৩৪, ইংল্যাণ্ডের জয় ১৫, ভারতবর্ষের জয় ৩ এবং ড্র ১৬।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্ব্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ২।৩।৬৪ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষের সূচী

একপঞ্চাশত্তম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—চতুর্থ সংখ্যা

চৈত্র—১৩৭০

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্রসূচী

করছেন আগ্রায়, ম্যাগসেইসেকে একটি শিশু রোগীকে আদর করিতে দেখা যাইতেছে, ১১। পরলোকগত পণ্ডিত যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ, ১২। দিল্লীতে একটি কলাপ্রদর্শনী উদ্বোধনীতে শিক্ষা মন্ত্রী চাগলা, ১৩। ছাটাই (কার্টুন) ১৪। তারকা সমাবেশ—(বাম দিক থেকে) কানন দেবী, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, সুচিত্রা সেন, সত্যজিৎ রায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মঞ্জু দেকে মন্ত্রী জগন্নাথ কোলের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

লেখ-সূচী

চিত্র-সূচী

বিশেষ চিত্র

লেখ-সূচী

শক্তিপদ রাজগুরুর একখানি নামকরা উপন্যাস

গৌড়জনবধূ

যিনি কালের অখণ্ড স্রোতকে মুহূর্তের ইঙ্গিতে স্তব্ধ করেছেন—প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন হৃত মনুষ্যত্বকে মর্যাদার আসনে—চৈতন্যহীনতার অন্ধকারে জেলেছেন নবচৈতন্যের অনির্বাণ শিখা—সমবেত প্রতিরোধ, অবিশ্বাস আর অবমাননা যাঁর পদপ্রান্তে আত্ম-সমর্পণ ক'রে সার্থকতায় মহীয়ান হ'য়ে উঠেছে—সেই অখণ্ড অমিয়

শ্রীচৈতন্যদেবের শুভ আবির্ভাবের পটভূমিকায় রূপায়িত

সুবৃহৎ উপন্যাস।

গৌড়বঙ্গের একটি বালিকা-বধূর দৃষ্টিতে তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় রূপান্তরের প্রতিচ্ছায়া।

দাম—৫'৫০

—অন্যান্য উপন্যাস—

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

শহরের অতি আধুনিক পরিবেশ হইতে শ্বাপদসঙ্কুল সুদূর সুন্দরবনের আরণ্য পরিবেশে নিক্ষিপ্ত কুমারীর জটিল হৃদয়-দ্বন্দ্ব—রোমাঞ্চকর বিচিত্র পরিবেশে অপরূপ।

ছায়াচিত্রে প্রদর্শিত।

দাম—৩'৫০

কেউ ফেরে নাই ৭-৫০

কাজলগাঁয়ের কাহিনী (২য় সং) ৫,

মণিবেগম (৩য় সং) ৬-২৫

জীবন-কাহিনী (ছায়াচিত্রে রূপায়িত) ৪-৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

[illegible] কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট — কলিকাতা-৬

পরম তৃপ্তি
বাটা পামবিচ পায়ে দিয়ে।
এর সরেস চামড়া আর মনোজ্ঞ
ফ্যাশানে আপনি তুষ্ট হবেন,
উপরন্তু মুগ্ধ হবেন এর
উন্নত নির্মাণকৌশলে। পেরেক-
মুক্ত এই নতুন কৌশল।
Bata
PALMBEACH

হোলি

শিল্পী :
শ্রীঅসিতরঞ্জন বসু

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

—সাম্প্রতিক কালের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস—

প্রফুল্ল রায়ের
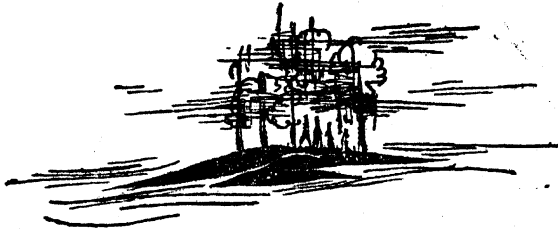
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

এ কাহিনী সেই আন্দামানের—বৃটিশ আমলে যেখানে কুখ্যাত সেলুলার জেল আর পেনাল কলোনির পত্তন হয়েছিল। এখন সেখানে অরণ্য সংহার ক'রে গড়ে উঠছে **পুব বাঙলার উদ্বাস্তুদের উপনিবেশ।**

চারধারে নোনা জল—মাঝখানে মিঠে মাটি। এই মাটিতে অরণ্যের সঙ্গে, সমুদ্রের সঙ্গে, সাপ-কানখাজুরা-সরীসৃপ আর প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই ক'রে উপনিবেশ গড়তে গড়তে উদ্বাস্তুরা প্রমাণ করেছে হাজার মৃত্যুতেও মানুষ মরে না। হাজার অপচয়ের পরও তার প্রাণশক্তি অফুরন্তই থাকে।

এই বিরাট ক্লাসিক উপন্যাসের পটভূমি আন্দামান। এর চরিত্রগুলি পুব বাঙলার সেই সব সংগ্রামী মানুষ—যারা মৃত্যুকে জয় করেছে—প্রতি মুহূর্তে জীবনের যন্ত্রণাকে **যারা উপলব্ধি ক'রেছে।**

প্রফুল্ল রায় সেই জাতের লেখক, যাঁরা জীবনকে অধ্যয়নই করেন না, উন্মোচনও করেন। পুব বাঙলার সেই মৃত্যুঞ্জয় মানুষগুলির আন্দামান দ্বীপে উপনিবেশ গড়ার কথা ব'লতে ব'লতে তিনি জীবনের গভীরতাকে স্পর্শ ক'রেছেন। এই মহৎ উপন্যাস সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যকে অসামান্য মর্যাদা দেবে।

দাম—আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

চৈত্র—১৩৭০

দ্বিতীয় খণ্ড | একপঞ্চাশত্তম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

ঋগ্বেদের দেবী অদিতি

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী এম-এ

বিশাল ঋগ্বেদ সংহিতার বহুস্থানে দেবী অদিতির কথা পাওয়া যায়। বহু সূক্তেই তিনি নানা ভাবে স্তুত হইয়াছেন। কোথাও আকাশ বা মাতা পৃথিবীরূপে কোথাও দেবমাতা রূপে, কোথাও দেবীবাক্ রূপে, আবার কোথাও বা দক্ষকন্যা বা দাক্ষায়ণী রূপে তিনি উপাসিত হইয়াছেন। দেবী অদিতির এই সব দেবীরূপ ছাড়া একটি ঋষিরূপও ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে তিনি স্বয়ং ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলস্থ ২৮শ সূক্তের কয়েকটি মন্ত্র তাঁহার বলিয়া বেদাচার্য্য-গণ মনে করেন। এতদ্ব্যতীত কোন কোন বেদাচার্য্যের মতে ১০ম মণ্ডলের ৭২ সংখ্যক সূক্তটিও দেবী অদিতিরই। ইহা ছাড়াও ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলেরই ১৫৩ সংখ্যক সূক্তের ঋষি হিসাবে ইন্দ্রমাতাগণের মধ্যে দেবী অদিতিও একজন, ইহা সহজ বুদ্ধিতেই ধরিয়া লওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই অদিতি দেবীকে ঋষি হিসাবে এবং দেবমাতা ও দক্ষকন্যা হিসাবে কি কি ভাবে পাই, তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

দেবী অদিতির নাম বৈদিক সাহিত্যে বহুস্থানে, উল্লিখিত হইলেও স্পষ্টভাবে তাঁহার কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়না। বেদ-মন্ত্র-ব্যাখ্যাতা আচার্য্য যাস্ক (সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব

৭ম-৮ম শতাব্দী) তদীয় নিরুক্ত গ্রন্থে দেবী অদিতিকে দেবমাতা এবং মধ্যস্থানবর্ত্তী দেবীগণেরমধ্যে "প্রথমগামিনী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (নিরুক্ত ৪।২২ এবং ১১।২২)। যাস্কের পূর্ব্ববর্ত্তী বেদাচার্য্য ও নিরুক্তকারগণের (অন্ততঃ-পক্ষে ২৫।২৬ জনের কম হইবেনা) রচিত গ্রন্থসমূহ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় তাঁহাদের মতামত জানিবার উপায় নাই। নিরুক্তের পরবর্ত্তী বিখ্যাত গ্রন্থ "বৃহদ্দেবতায়" অদিতি দেবীর জন্মবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। বৃহদ্দেবতা শৌনকের রচিত বলিয়া জানা যায়। বেদে ব্যবহৃত শব্দসমূহের এবং সেই হেতু বেদমন্ত্রসমূহের অর্থ যাঁহারা সম্যকরূপে জানেন, তাঁহারাই হইলেন নিরুক্তকার বা শব্দার্থবিৎ মন্ত্রার্থবিদ্। বৃহদ্দেবতাকে নিরুক্ত গ্রন্থ বলা না হইলেও ইহা এক প্রকার নিরুক্তগ্রন্থই বটে। কারণ এখানে শব্দার্থ এবং মন্ত্রার্থ নির্ণয়ের সূত্রাদিও আছে (দ্বিতীয় ও অষ্টম অধ্যায়)। আর আছে সমগ্র ঋগ্বেদের সূক্ত ও মন্ত্রসমূহের কোন্ কোন্ সূক্তে বা মন্ত্রে কোন্ কোন্ দেবতা উদ্দিষ্ট ও স্তুত হইয়াছেন, তাহার ধারাবাহিক বিবরণী। মন্ত্রাদির সঙ্গে জড়িত ঋষিগণের মধ্যেও অনেকের নাম বৃহদ্দেবতায় উল্লিখিত আছে। সুতরাং বৃহদ্দেবতা একাধারে নিরুক্ত এবং দেবকোষ ও মন্ত্রকোষ, একথা বলা চলে। এতদ্ব্যতীত বেদ-মন্ত্রাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও আচার্য্য পরম্পরায় প্রাপ্ত ইতিবৃত্তসমূহও বৃহদ্দেবতায় যথাসম্ভব বিবৃত আছে। দেবী অদিতি সম্পর্কিত ইতিবৃত্তটি ঠিক এরূপই একটি কাহিনী। অতীত যুগের প্রখ্যাত এক বেদাচার্য্য কর্ত্তৃক বর্ণিত বেদমন্ত্রের ইতিহাস বা আখ্যানের একটি বিশেষ মূল্য অবশ্যই আছে। সুতরাং বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে বর্ণিত আখ্যান বা ইতিহাসকে ঠিক এই ভাবেই দেখিতে হইবে। অধ্যাপক Macdonell এর মতে বৃহদ্দেবতায় বিবৃত ঋক্-মন্ত্র সংশ্লিষ্ট আখ্যানগুলিই এই শ্রেণীর আখ্যায়িকা সংগ্রহের প্রাচীনতম নিদর্শন। তিনি বলেন :—

The comparatively large proportion (one-fourth) of narrative which it contains, in illustration of the hymns of the Rig-vedas, is thus the earliest collection of epic matter which we possess, dating as it does from a period when the mahabharata could only have been in an embryonic state—(Introduction to brihaddevatap XXIII)। কথাটি খুব সত্য হইলেও, বৈদিক ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদসমূহেও মাঝে মাঝে আখ্যায়িকার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এক সঙ্গে এতগুলি আখ্যায়িকা আর কোনও গ্রন্থেই নাই। যাস্কের নিরুক্তে আখ্যায়িকার সংখ্যা সে তুলনায় নগণ্যই বলিতে হয়। macdonell vedic mythology নামক বিখ্যাত গ্রন্থের উৎস এই বৃহদ্দেবতা। কিন্তু প্রভেদ এই যে, যে স্থলে যাস্ক ও শৌনক "ইতিহাস" কথাটির স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন, macdonell সেখানে ইতিহাস অর্থে বুঝিয়াছেন "mythology ও epic matter", বা প্রকারান্তরে প্রাচীন যুগের কল্পিত বা কিংবদন্তীমূলক কাহিনী। অনুবাদের যথার্থতা এখানেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মূলগ্রন্থ পড়া না থাকিলে এ সব অনুবাদগ্রন্থদ্বারা প্রতারিত বা ভুলপথে চালিত হওয়ার সম্ভবনাই অধিক।

বৃহদ্দেবতার একটি সংস্করণ পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্র-লাল মিত্র কর্ত্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে ১৮৯২ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। অপর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন prof macdonell আমেরিকা হইতে ইংরেজী ১৯০৪ সালে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৃহদ্দেবতা যাস্ক-কৃত নিরুক্তের পরবর্ত্তী। কারণ বৃহদ্দেবতার বহুস্থলে যাস্কের মতামতের উল্লেখ ও সমালোচনা করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে আচার্য্য কাত্যায়ন কৃত বেদের সর্ব্বানুক্রমণী ও বাজসনেয়ি অনুক্রমণীতে বৃহদ্দেবতার মতামত বহুস্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং বৃহদ্দেবতার স্থান, নিরুক্ত ও সর্ব্বানুক্রমণীর মধ্যবর্ত্তী। বৃহদ্দেবতা ও সর্ব্বানুক্রমণী, উভয়ই আবার পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ উভয় গ্রন্থই প্রাচীন বৈদিক রীতি অনুযায়ী রচিত, অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রাদির নিয়ম কানুন অনুযায়ী নহে। অধ্যাপক macdonell এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। এবারে পাণিনির কাল নির্দ্ধারিত হইলেই সর্ব্বানুক্রমণী ও বৃহদ্দেবতার কাল নির্দ্ধারণ সহজসাধ্য হয়। পাণিনির প্রসিদ্ধ বর্ত্তিককার কাত্যায়ন পাটলিপুত্রের শেষ নন্দরাজের মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। অতএব এই বার্ত্তিক-কার কাত্যায়ন নিঃসন্দেহে খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকের লোক ছিলেন। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী রচনার সঙ্গে সঙ্গেই

না অব্যবহিত পরেই বার্তিক বা Supplementary রচনার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই, একথা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝা যায়। উভয়ের মধ্যে বেশ কিছুকাল অবশ্যই গত হইয়াছিল। এ কারণেই ঐতিহাসিক ডঃ হেমচন্দ্র রায়-চৌধুরী, পাণিনি খুব সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর লোক ছিলেন, বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ছিলেন (Materials for the Study of the Early history of the Vaisnava Sect)। এই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে, সর্ব্বানুক্রমণী রচয়িতা আচার্য্য কাত্যায়নকে অন্ততঃপক্ষে খৃঃ পূঃ ৫ম শতকের প্রথম পাদে ফেলিতে হয়। বৃহদ্দেবতা সর্ব্বানুক্রমণীর পূর্ব্বে রচিত। সুতরাং বৃহদ্দেবতার রচনা-কাল নিঃসন্দেহে খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কোন এক সময়, রচিত, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসমীচীন হইবে না বলিয়াই বিশ্বাস। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে দুইটি সূত্রে (২।৪।৬৩ এবং ৬।৩।১০৬) যাস্ক ও শৌনক প্রবর্ত্তিত দুই বেদচর্চ্চা-কারী সম্প্রদায়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং এই দুই বেদাচার্য্য নিঃসন্দেহে পাণিনির বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। সম্প্রদায় গঠিত হইয়া তাহা সুপরিচিত হইতে বেশ কিছু সময় সে যুগে লাগিত। অধ্যাপক Macdonell পাণিনিকে খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতকের লোক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি খুব সম্ভবতঃ বার্ত্তিককার কাত্যায়নের কাল জানিতেননা। আর জানিলেও কাত্যায়ন যে নন্দরাজবংশের মন্ত্রী ছিলেন, এ খবরটি রাখিতেন না। সুতরাং তাঁহার নির্দ্ধারিত পাণিনির কাল, এবং সেই হেতু বৃহদ্দেবতার রচনাকালও (অন্ততঃপক্ষে খৃঃ পূঃ ৪০০ সাল) নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। বৃহদ্দেবতা ব্যতীত অনুবাকানুক্রমণী, আর্যানুক্রমণী, ছন্দোঽনুক্রমণী এবং ঋগ্বিধান নামক শৌনক রচিত আরও ৪টি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন পণ্ডিত বেদাচার্য্য যাস্ককে খৃঃ পূঃ ৫ম শতকে বা চতুর্থ শতকেও ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা জানেন না যে যাস্কের নাম কেবল পাণিনীর অষ্টা-ধ্যায়ীতেই নহে, শুক্ল যজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণেও উল্লিখিত আছে। সুতরাং যাস্ক সম্পর্কে ছেলেখেলা না করাই ভাল। যাস্করচিত নিরুক্ত যে বৃহদ্দেবতারও পূর্ব্ববর্ত্তী, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অবশ্য যাস্ক একটি গোত্র-নাম বটে। নিরুক্তকার যাস্ক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি যাস্ক না হওয়াই স্বাভাবিক। তথাপি তিনি নিঃসন্দেহে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৮ম বা পঞ্চম শতাব্দীর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী।

ঋগ্বেদের ঋষি অদিতি

এবার আমরা ঋষি রূপিণী অদিতি দেবীকে ঋগ্বেদে কি কি ভাবে পাই, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ঋগ্বেদ ৪।১৮ সূক্ত:—এই সূক্তে দেবতা এবং ঋষি উভয়ই হইলেন ইন্দ্র ও অদিতি, মতান্তরে ইন্দ্র, অদিতি ও ঋষি বামদেব। সমগ্র সূক্তটি এই দুইজনের বা তিনজনের কথোপকথনে পূর্ণ। সুতরাং সূক্তটির ইতিহাস সম্পর্কে অতীতে কিছু মতভেদ ছিল বলিয়া মনে হয়। বৃহদ্দেবতার মতে ইহা দেবরাজ ইন্দ্রের জন্ম-বিষয়ক সূক্ত। মাতৃ-গর্ভস্থ ইন্দ্র গর্ভ হইতে চিরাচরিত সহজ পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, দেবী অদিতি (ইন্দ্র-মাতা) ইহা জানিতে পারিয়া প্রাণভয়ে গর্ভস্থ সন্তানকে তিরস্কার করেন। আচার্য্য সায়ণ অন্য এক প্রাচীন মত অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা ঋষি বামদেবের জন্মবিষয়ক বৃত্তান্ত। বামদেব মাতৃগর্ভ হইতে মাতার পেট চিরিয়া বাহির হইতে সঙ্কল্প করিলে, তাঁহার মাতা ইহা জানিতে পারিয়া, প্রাণভয়ে দেবরাজ ইন্দ্র ও ইন্দ্র-মাতা অদিতির স্তব করেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া উভয়ে আসিয়া বামদেবকে তিরস্কার করেন, এবং তাঁহাকে মাতৃগর্ভ হইতে সহজপথে বাহির হইয়া আসিতে পরামর্শ দেন।

ঋগ্বেদ ১০।৭২ সূক্ত। এই সূক্তটির ঋষি বৃহস্পতি, মতান্তরে দেবী অদিতি দাক্ষায়িণী। সূক্তটির আরম্ভ এরূপ:—দেবতাগণের জন্মবৃত্তান্ত সুস্পষ্ট রূপে বলা হইতেছে। ভবিষ্যতে যখন স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হইবে, তখনও দেবগণ স্তুতিবাক্য দেখিবেন, ইত্যাদি। সূক্তটিতে দেবী অদিতির ৮ পুত্রের কথা বলা হইলেও তাঁহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করা হয় নাই।

ঋগ্বেদ ১০।১৫৩ সূক্ত। এই সূক্তের ঋষি ইন্দ্রমাতাগণ (ইন্দ্রমাতরঃ), দেবতা ইন্দ্র। সদ্যঃপ্রসূত ইন্দ্রের নিকট যাইয়া তাঁহার মাতাগণ সেবা করিতেছেন, এবং তাঁহারই প্রসাদে উৎকৃষ্ট ধনলাভ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, "হে ইন্দ্র, তুমি তেজ ও বলবীর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছ; তুমি বৃত্রহন্তা ও সূর্য্য সখা; তুমি স্বীয় শক্তিতে সমুদয় জগৎ অভিভূত করিয়া রাখিয়াছ ইত্যাদি।

এই সূক্তটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়া মনে হইলেও ভাষ্যকারগণ ইহার তাৎপর্য্য স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই। এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, পূর্ব্ববর্ত্তী ইন্দ্রের দেহান্ত হইয়া পুনর্জন্ম লাভ হইয়াছিল। নতুবা সদ্যোজাত শিশু ইন্দ্র ধনদানের অধিকারী, বৃত্রহন্তা, সূর্য্য-সখা ইত্যাদি কিরূপে হইলেন?

এই ইন্দ্রমাতাগণের মধ্যে (সংখ্যায় মোট ১৩জন) যে প্রসূতি অদিতি দেবীও ছিলেন, তাহা আমরা একটু পরেই দেখিতে পাইব।

ঋগ্বেদে আদিত্যগণ :—উপরে উদ্ধৃত সূক্তগুলি ব্যতীত ঋগ্বেদের ২।২৭ সূক্তে ৬জন আদিত্যের নাম পাওয়া যায় :—যথা, মিত্র, অর্য্যমা, বরুণ, দক্ষ, ভগ ও অংশ। ৯ম মণ্ডলের ১১৪ সংখ্যক সূক্তে আবার ৭জন আদিত্যের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু কোন নামের উল্লেখ করা হয় নাই। এই সূক্তের ঋষি স্বয়ং কশ্যপ। আদিত্য নাম হইতে বুঝা যায়, অদিতির সঙ্গে ইঁহাদের সম্বন্ধ আছে।

দাক্ষায়ণী বা দক্ষকন্যা অদিতি

এবার আমরা বৃহদ্দেবতা হইতে দেবী অদিতির পিতৃ-পরিচয়, বিবাহ, এবং সন্তান-সন্ততির বিবরণী দিতেছি। বৃহদ্দেবতার ৫ম অধ্যায়ের ১৪৩—১৪৮, এই ৬টি শ্লোকে কাহিনীটি সংক্ষেপে নিবদ্ধ আছে। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রাজাপত্যো মরীচির্হি মারীচঃ কশ্যপো মুনিঃ।
তস্য দেব্যোঽভবজ্জায়া দাক্ষায়ণ্যস্ত্রয়োদশ ॥১৪৩
অদিতি দিতির্দনুঃ কালা দনায়ুঃ সিংহিকা মুনিঃ।
ক্রোধা বিশ্বা বরিষ্ঠা চ সুরভির্বিনতা তথা ॥১৪৪
কদ্রূশ্চৈবেতি দুহিতৃঃ কশ্যপায় দদৌ স চ।
তাসু দেবাসুরাশ্চৈব গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ ॥১৪৫
বয়াংসি চ পিশাচাশ্চ জজ্ঞিরেঽন্যাশ্চ জাতয়ঃ।
তত্রৈকা ত্বদিতি দেবী দ্বাদশাজনয়ৎ সুতান্ ॥১৪৬
ভগশ্চৈবার্য্যমাংশশ্চ মিত্রো বরুণ এব চ।
ধাতা চৈব বিধাতা চ বিবস্বাংশ্চ মহাদ্যুতিঃ ॥১৪৭
ত্বষ্টা পুষা তথৈবেন্দ্রো দ্বাদশো বিষ্ণুরুচ্যতে।
দ্বন্দ্বং তথাস্ত তজ্জজ্ঞে মিত্রশ্চ বরুণশ্চ হ ॥১৪৮

অর্থাৎ প্রজাপতির পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ মুনি বা ঋষি। এই কশ্যপের ১৩জন দেবপত্নী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ছিলেন দাক্ষায়ণী বা দক্ষকন্যা। যথা :—অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, মুনি, ক্রোধা, বিশ্বা, বরিষ্ঠা, সুরভি, বিনতা ও কদ্রূ। দক্ষ এই তেরজন কন্যাকে কশ্যপের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সকল পত্নীর গর্ভে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, বয়াংসি, পিশাচ এবং অন্যান্য জাতীয় সন্তানসন্ততি জন্ম-গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা অদিতির গর্ভে দ্বাদশ পুত্রের জন্ম হয়। তাঁহারা হইলেন :—ভগ, অর্যমা, অংশ, মিত্র, বরুণ, ধাতা, বিধাতা, মহাদ্যুতিমান্ বিবস্বান্, ত্বষ্টা, পুষা, ইন্দ্র এবং সর্ব্বশেষে বিষ্ণু। ইঁহাদের মধ্যে মিত্র ও বরুণ ছিলেন যমজ। অদিতিকশ্যপের এই দ্বাদশ পুত্রই বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থে (ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ইত্যাদি) এবং মহাভারত ও পুরাণাদিতে দ্বাদশাদিত্য নামে খ্যাত। বিষ্ণু ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া তাঁহার এক নাম হইয়াছিল উপেন্দ্র। বৃহদ্দেবতায় দেববংশ ও ঋষিবংশ সম্পর্কিত এ জাতীয় বহু আখ্যান বর্ণিত আছে। বর্ত্তমানে প্রচলিত মহাভারত ও প্রাচীনতম কয়েকটি পুরাণ বৃহদ্দেবতার পরে রচিত হইয়া থাকিলে, এসব গ্রন্থে বর্ণিত দেবতা ও ঋষি সম্পর্কিত আখ্যানসমূহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎস হিসাবে বৃহদ্দেবতাকে মনে করা অযৌক্তিক হইবে না। কশ্যপপত্নী ত্রয়োদশ দক্ষ কন্যার নাম মহাভারতের আদিপর্ব্বে প্রায় অবিকলভাবেই পাওয়া যায় (২৫২০ শ্লোক) যথা :—

অদিতির্দিতির্দনুঃ কালা দনায়ুঃ সিংহিকা তথা।
ক্রোধা প্রধা চ বিশ্বা চ বিনতা কপিলা মুনিঃ ॥
কদ্রূশ্চ…ইত্যাদি—

শ্লোক দুইটির রচনাভঙ্গী ও শব্দ-বিন্যাস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তফাৎ এই যে, বৃহদ্দেবতায় উল্লিখিত বরিষ্ঠা ও সুরভির বদলে মহাভারতে প্রধা ও কপিলার নাম পাওয়া যায়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, কোনটি আগের, আর কোনটি পরের। রচনাভঙ্গী ও ভাষার দিক হইতে বিচার করিলে বৃহদ্দেবতা নিঃসন্দেহে প্রচলিত মহাভারত হইতে প্রাচীনতর। সুতরাং মহাভারতের এই শ্লোকটি বৃহদ্দেবতা হইতেও গৃহীত হইয়া থাকিতে পারে। তবে এ ব্যাপারের আর একটি দিকও আছে। দেবতা ও ঋষি সম্পর্কিত আখ্যানগুলি বৃহদ্দেবতা রচয়িতার মত শাকপুণি, ঊর্ণবাভ,

ভাগুরি, যাস্ক প্রভৃতি প্রাচীনতর বেদাচার্য্যগণও জানিতেন, এই অনুমান সঙ্গত কারণেই করা যায়। যাস্কের নিরুক্তের বহু স্থলে মন্ত্রার্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে "তত্রেতিহাসমাচক্ষতে" কথাটি লিখিত আছে। ইহার অর্থ এই যে, প্রাচীন বেদাচার্য্যগণ এসব স্থলে ইতিহাস আছে বলিয়া মনে করিতেন। আর ইতিহাস ও পুরাণ প্রবক্তাগণের (যাহাদের কথা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে) কাছেও যে এ সমস্ত কাহিনী অপরিজ্ঞাত ছিল না, ইহাও অনুমান করা যায়। সুতরাং আখ্যানগুলি পৃথক্ পৃথক্ সূত্র হইতেও মহাভারত ও পুরাণাদিতে আসিয়া থাকিতে পারে।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই অদিতি-পিতা দক্ষ কে ছিলেন? বৃহদ্দেবতা মতে তিনি দেববংশীয় একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, সন্দেহ নাই, যাহার কন্যাগণও সকলেই দেবী ছিলেন। বৈদিক গ্রন্থসমূহে, এবং মহাভারত ও পুরাণাদিতে দক্ষকে একজন প্রজাপতি বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি একজন শ্রেষ্ঠ রাজা বা সম্রাট-স্থানীয় পুরুষ। কিন্তু তিনি কি সত্য সত্যই একজন প্রজা-পালক (প্রজাপতি) ঐতিহাসিক রাজা ছিলেন? না একজন কল্পিত পুরুষমাত্র ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর শুক্ল-যজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। এখানে দেখা যায়, দক্ষপ্রজাপতির বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে কোন এক প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, এবং এই গ্রন্থের রচনাকালেও সেই বংশ সগৌরবে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং দক্ষপ্রজাপতি সত্যই একজন কল্পিত পুরুষ বা রাজা ছিলেন না। দাক্ষায়ণ যজ্ঞ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের ২ কাণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণের ভূমিকায় প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ পণ্ডিত Eggeling লিখিয়াছেন :—

This peculiar modificatiou of the new & full moon sacrifice seems to have been originated and generally to have been practised among the dakshayanas, a royal family which was evidently still flourishing at the time of our author—Satapatha Brahmana—Translated by Eggeling—S. B. E. series. অর্থাৎ দাক্ষায়ণগণ বা দক্ষবংশীয়গণই বিচিত্ররূপে রূপায়িত এই পৌর্ণমাসীয় নূতন যজ্ঞটির প্রবর্ত্তক এবং প্রধান অনুষ্ঠাতা ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহাও সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই রাজবংশ এই গ্রন্থরচনার কালেও সগৌরবে রাজত্ব করিতেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া আমরা শতপথ-ব্রাহ্মণের ৪র্থ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত কয়েকটি মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ নিম্নে দিতেছি :—

প্রথম মন্ত্র :—আদিতে প্রজাপতি সন্তান কামনায় এই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় মন্ত্র :—তিনিই দক্ষ, এবং যেহেতু তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই যজ্ঞ করেন, সেহেতু ইহার নাম হয় দাক্ষায়ণ যজ্ঞ। ইত্যাদি—

তৃতীয় মন্ত্র :—পরবর্ত্তীকালে ঋষি প্রতিদর্শ শ্বৈক্র এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং তিনি এ সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া সে যুগে বিবেচিত হইতেন। ..

৪র্থ মন্ত্র :—সৃঞ্জয় দেশীয় সুপ্লন্ সাঞ্জয় শ্বৈক্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এই যজ্ঞ-বিধি আয়ত্ত করেন। তিনি আরও একটি নূতন যজ্ঞ-বিধি আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সুপ্লন এগুলি আয়ত্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা মাত্র সৃঞ্জয়গণ (পরবর্ত্তী যুগের পাঞ্চাল-গণ) বলিতে লাগিলেন, "এই সুপ্লন্ দেবগণের সহিত এ রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।" সুতরাং তদবধি সুপ্লনের নাম হইল সহদেব-সার্ঞ্জয়, এবং এই নামেই পরবর্ত্তীকালেও পরিচিত ছিলেন। এই সুপ্লনের যজ্ঞের ফলে অচিরকাল মধ্যেই সৃঞ্জয়গণের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি ঘটিল। তাঁহারা ধনে ও জনে বিশেষভাবেই পরিবর্দ্ধিত হইলেন।…

৫ম মন্ত্র :—এই দাক্ষায়ণ যজ্ঞ পরবর্ত্তীকালে ঋষি দেবভাগ শ্রৌতর্ষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। এই দেবভাগ শ্রৌতর্ষ কুরু ও সৃঞ্জয়, এই উভয় রাজ্যেরই রাজ-পুরোহিতের পদে বৃত হইয়াছিলেন। একটি মাত্র রাজ্যের রাজ-পুরোহিতের পদই যথেষ্ট সম্মানের বস্তু। তায় আবার একই সঙ্গে দুই দুইটি রাজ্যের প্রধান পুরোহিতের পদ! ইত্যাদি—

ষষ্ঠ মন্ত্র :—(আরও) পরে দাক্ষায়ণ-পার্বতি পুনরায় এই একই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং অদ্যাবধি তদ্-বংশীয়

দাক্ষায়ণগণ রাজ-সম্মানের অধিকারী। সুতরাং প্রকৃত মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া যে কেহ এই যজ্ঞ করিবেন, তিনিই নিঃসন্দেহে রাজ-সম্মানের অধিকারী হইবেন।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের প্রধান ঋষি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রমাণ অনুসারে এই যাজ্ঞবল্ক্য কুরুরাজ পরীক্ষিতের পৌত্র শতানীকেরও কিছুকাল পর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান বা সিদ্ধান্ত করা যায় (তৃতীয় অধ্যায়—তৃতীয় ব্রাহ্মণ;—জনক সভায় জারৎকারব আর্ত্তভাগ বনাম ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য)। শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থটি খুব সম্ভবতঃ তাঁহার নিজের রচিত নয়, তাঁহার কোন শিষ্য প্রশিষ্যের রচিত হইবে। সুতরাং এই দক্ষবংশীয় রাজাগণ যে অন্ততঃপক্ষে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যেরও পরবর্ত্তীকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ দেখা যায়না। দক্ষবংশের প্রতিষ্ঠাতা দক্ষপ্রজাপতি ও পরবর্ত্তী যুগের দক্ষ-পার্বতি যে দুইজন ভিন্ন ব্যক্তি, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। একজনের উপাধি প্রজাপতি, অপর জনের শুধু "পার্বতি"। এই দুইজনের অন্তর্বর্ত্তীকালে শতপথ ব্রাহ্মণের প্রমাণ অনুসারেই প্রতিদর্শ শ্বৈক্র ও তৎশিষ্য সুপ্লন্ সাঞ্জয়, এবং দেবভাগ শ্রৌতর্ষ, অন্ততঃপক্ষে এই তিনজন ঋষি বর্ত্তমান ছিলেন। শেষোক্তজন আবার একই সঙ্গে কুরু ও সৃঞ্জয়, এই উভয় রাজ্যেরই রাজপুরোহিতের পদে বৃত ছিলেন। ঋষি দেবভাগ শ্রৌতর্ষ প্রতিদর্শ শ্বৈক্রের অন্যতর শিষ্য ছিলেন কিনা, তাহার কোন উল্লেখ নাই। তবে তাঁহারা তিনজন, এবং দক্ষবংশীয় রাজা দক্ষ-পার্বতি, সকলেই যে প্রাচীন বৈদিক যুগের, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দাক্ষায়ণ যজ্ঞ-বেত্তা আদি মানব-ঋষি প্রতিদর্শ শ্বৈক্র সম্ভবতঃ দক্ষ-রাজবংশেরই কোন এক পুরোহিত ছিলেন, এবং তিনি রাজাদের রাজধানীতেই সাধারণতঃ বসবাস করিতেন। কারণ তিনি নিম্নভূমিতে অবতরণ করিয়া সেখানকার কোন রাজবংশের পৌরোহিত্যে বৃত হইয়াছিলেন, ইহার উল্লেখ নাই। তৎশিষ্য সুপ্লন সাঞ্জয়, এবং পরবর্ত্তীকালের দেবভাগ শ্রৌতর্ষ, উভয়েই এই যজ্ঞ-বিধি জ্ঞাত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা মাত্রই রাজপুরোহিতের পদে বৃত হন, ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সে যাহা হউক, দক্ষ-পার্বতি নামটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। পর্বত-রাজ বা পার্বত্য প্রদেশের রাজা, পার্বতি শব্দের এই সরলার্থ ধরা হইলে, প্রজাপতি দক্ষ-বংশীয় দক্ষ-পার্বতি নিশ্চয়ই কোন এক পার্বত্য প্রদেশের রাজা ছিলেন। পুরাণাদিতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী, হরিদ্বার-সংলগ্ন কনখলেই দক্ষ প্রজাপতির রাজধানী ছিল বলিয়া লিখিত আছে। হরিদ্বার-বাসীগণ আজও পর্য্যন্ত এই কনখলকেই দক্ষরাজার রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সুতরাং আদি রাজা প্রজাপতি দক্ষ ও তদ্‌বংশীয় দক্ষ-পার্বতি ও অন্যান্য দক্ষ বা দাক্ষায়ণগণ এই কনখলেই রাজত্ব করিতেন, ইহা বেশ বুঝা যায়। কনখলের কতকগুলি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষকে আদি দক্ষ-রাজার প্রাচীন প্রাসাদ বলিয়া পাণ্ডাগণ ও স্থানীয় লোকেরা দেখাইয়া থাকেন। ইহা সত্য না হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ আদিরাজা দক্ষ প্রজাপতি তদূরের কথা, তাঁহার বহুকাল পরবর্ত্তী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সময়ে কিংবা তৎপরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত প্রাসাদও এত দীর্ঘকাল মাটির উপরে থাকিতে পারেনা। এগুলি হয়, আরও অনেক পরবর্ত্তীকালের দক্ষ রাজবংশ কর্ত্তৃক, নতুবা তৎস্থানে রাজ্যস্থাপনকারী অপর কোন রাজবংশ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া থাকিতে পারে। মহাভারতের যুগের পরবর্ত্তীকালে রচিত একমাত্র শতপথব্রাহ্মণেই সম্ভবতঃ এই রাজবংশের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অন্যত্র কোথাও এরূপ স্পষ্ট উল্লেখ আছে বলিয়া আমার জানা নাই। মহাভারত এবং পুরাণাদিতেও এই রাজবংশাবলীর কোন ধারাবাহিক উল্লেখ চোখে পড়ে নাই। সুতরাং ইতিহাসের কোন্ অধ্যায়ে দেবতা প্রতিষ্ঠিত এই মহাকুলীন রাজবংশের পতন ঘটিয়াছিল, তাহা আজ আর জানিবার উপায় সম্ভবতঃ নাই। এমনও হইতে পারে যে, সমতল ভূমির প্রবলতর কুরু ও সৃঞ্জয় রাজ্যের চাপে পড়িয়া এই রাজবংশ অধিকৃত রাজ্য পরবর্ত্তীকালে হিমালয় প্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এবং এজন্যই মহাভারত ও পুরাণাদিতে উদ্ধৃত রাজবংশ তালিকায় তাঁহাদের নাম নাই। বস্তুতঃ এই সমস্ত গ্রন্থে হিমালয়ের কয়েকটি তীর্থস্থান ব্যতীত কোন রাজবংশাবলীর উল্লেখ দেখা যায় না। কারণ ইহাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল সমতলভূমির রাজবংশসমূহ।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, ঋষি দেবভাগ শ্রৌতর্ষ এই বিচিত্র দাক্ষায়ণ যজ্ঞবিধি আয়ত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু

ঋষি প্রতিদর্শ শৈখ্রের প্রত্যক্ষ শিষ্য তিনি খুব সম্ভবতঃ ছিলেন না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কারণ শৈখ্রের সাক্ষাৎ শিষ্য সুপ্লনের মৃত্যুর পরই তাঁহার কুরু-পাঞ্চাল দেশে আগমন ও পৌরোহিত্য গ্রহণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যত দূর মনে হয়, তিনি শৈখ্রের পরবর্ত্তী অপর কোন দক্ষবংশীয় পুরোহিতের নিকট হইতে এই বিদ্যা লাভ করেন। শ্রুতের পুত্র এই দেবভাগ শ্রৌতর্ষের নাম ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় (৮৩১৯)। এই উল্লেখকে তাঁহার প্রাচীনত্বের দ্যোতক বলিয়া মনে করা যায়। সেখানে লিখিত আছে যে, ঋষি দেবভাগ যজ্ঞ সম্বন্ধীয় এক অতি বিচিত্র পশু বিভাগ জানিতেন। কিন্তু তিনি এই বিদ্যা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ স্বীয় অর্জ্জিত বিদ্যার ফল-ভোগ তাঁহার অদৃষ্টে বেশীদিন ঘটে নাই, এবং তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে কোন উপযুক্ত শিষ্য তৈরী হইবার পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি কুরু ও সৃঞ্জয় বংশের কোন্ কোন্ রাজার পৌরোহিত্যে বৃত হইয়াছিলেন, তাহা লিখিত থাকিলে তাঁহার সময় নির্দ্ধারণ করা কিছুটা সহজসাধ্য হইত। এই দেবভাগ শ্রৌতর্ষ বা তৎপূর্ববর্ত্তী সুপ্লনের পিতৃভূমি উত্তর প্রদেশ হইতে হিমালয়ের প্রান্তদেশে অবস্থিত হরিদ্বারের দূরত্ব খুব বেশী ছিলনা।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি শেষ করিবার পূর্ব্বেদক্ষের জামাতা ঋষি কশ্যপের সন্তান-সন্ততির পুনরুল্লেখ করিব। বৃহদ্দেবতায় শুধুমাত্র দেবী অদিতির দ্বাদশ পুত্রের কথাই স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কশ্যপের অপর দ্বাদশ পত্নীর গর্ভে যে সকল সন্তান-সন্ততি জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম (দেবতা ?), অসুর, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, বয়াংসি, পিশাচ ও অন্যান্য জাতিরূপে সাধারণভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। বৃহদ্দেবতার অনুবাদক অধ্যাপক Macdonell উরগ ও বয়াংসি অর্থে পুরাণের সর্প এবং পক্ষীই বুঝিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। ঋষির ঔরসে, দেবীর গর্ভে দেবতা গন্ধর্ব্ব রাক্ষস—পিশাচ ইত্যাদির সঙ্গে সর্প এবং পক্ষীর জন্ম বিচিত্র বা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। ঋষি কশ্যপকে প্রজাপতি আখ্যা দেওয়া হইলেও তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি অবশ্যই ছিলেন না। সুতরাং তাহার পক্ষে দেবতা-মনুষ্য ইত্যাদি ব্যতীত অন্য জাতীয় জীবসৃষ্টি যুক্তিসঙ্গত বা শ্রুতি সঙ্গত বলিয়া মনে করা যায় না। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই তালিকায় কোন পশুর উল্লেখ নাই। পশু কি সর্প এবং পক্ষী হইতেও অধম ? সুতরাং এই উরগ এবং বয়াংসি অর্থে শৌনক সম্ভবতঃ মানুষই মনে করিয়া থাকিবেন, যাহারা হয়ত সর্পরূপী ও পক্ষীরূপী কোন কোন দেবতার উপাসক হইয়াছিলেন বলিয়া পরিণামে প্রতীকেরই পদবী-লাভ করিয়াছিলেন। এই ভাবে নাগ-দেবতার উপাসকগণ নাগ বা সর্প উপাধি, এবং পক্ষী দেবতার উপাসকগণ পক্ষী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রকৃত রহস্য সম্ভবতঃ ইহাই। দুর্ভাগ্য ক্রমে বৃহদ্দেবতার কোন প্রাচীন ভাষ্যগ্রন্থ পাওয়া যায়না। তাহা হইলে সম্ভবতঃ এই বেদাচার্য্যের প্রকৃত মনোভাবের কিছুটা আন্দাজ করা যাইত। পরবর্ত্তী কালে মহাভারত ও পুরাণাদিতে নানা আখ্যায়িকার মধ্যে এই নাগ ও পক্ষী জাতীয়গণ সর্প এবং পক্ষীরূপেই চিত্রিত হইয়াছেন, দেখা যায়। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে সার্পরাজ্ঞী নামে এক অতি উচ্চ পর্য্যায়ের ঋষিকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শৌনকের বৃহদ্দেবতায় সার্পরাজ্ঞী বা নাগরাণীর দৃষ্ট সূক্তের (১৮৯তম সূক্ত) সবিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে। বাসুকী নামে একটি গোত্রের সাক্ষাৎও আমাদের দেশে পাওয়া যায়। আক্ষোভ্য, অনন্ত ও বাসুকী এই গোত্রের তিনটি প্রবর। তথাকথিত সর্প-প্রধান গণের নামের সঙ্গে এই ঋষিগণের নাম সাদৃশ্য তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়না কি ? নাগোপাধিক বাসুকী ও অনন্ত ঋষিকে পুরাণাদিতে পরবর্ত্তী যুগে সর্প হিসাবেই চিত্রিত করা হইয়াছে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে নাগবংশীয় ঋষি আস্তিক কর্ত্তৃক রাজা জনমেজয়ের নাগবধে (সর্পবধে) বাধাদানের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এরূপ উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যায়। কশ্যপবংশীয় নাগগণের কেহ কেহ সম্ভবতঃ কাশ্মীর অঞ্চলে বসবাস করিতেন। কাশ্মীরের অনন্তনাগ, ভেরী-নাগ প্রভৃতি স্থান হয়ত প্রাচীন যুগের সেই নাগ-প্রধান গণের স্মৃতিই বুকে লইয়া বর্ত্তমান আছে। তবে তাঁহাদের অধিকাংশই সম্ভবতঃ প্রাচীন যুগসমূহে ভারতের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলেই বসবাস করিতেন, এবং পরে ভারতের নানা স্থানে বিস্তৃত

হইয়া পড়িয়াছিলেন। নাগ বা শিশুনাগ বংশীয় নাগ রাজাদের সাক্ষাৎ আমরা মগধে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীতে পাই। পরবর্ত্তী সালে কনিষ্কের সময়ও আমরা পশ্চিম ভারতে নাগ-বংশীয় রাজাগণের উল্লেখ পাই। তাহারও কিছুকাল পরে গুপ্ত-সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ও তৎপুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সঙ্গেও মথুরা অঞ্চলের নাগরাজাদের বহু যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। সুতরাং নাগ শব্দটি দেখিলেই তাহাকে সর্প বলিয়া ধারণা করা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। Cunninghamএর মতে তক্ষক নাগের বংশধরগণ তক্যাক্ বা তকিয়াক্ নামে এখনও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাঠান জাতির এক শাখা হিসাবে বর্ত্তমান আছেন। পক্ষী জাতীয় মানুষের বংশধরগণও হয়ত আমাদের মধ্যেই অন্য কোন নামে মিশিয়া আছেন। তাঁহারা সকলেই আদিতে দেববংশীয় বা আর্য্য পিতা-মাতারই সন্তান ছিলেন। সুতরাং বংশ-মর্য্যাদায় আর্য্যই ছিলেন, অনার্য্য নহে। মহাভারতের যুগের মহারাজ জরাসন্ধ ও তদবংশীয়গণেরও পরবর্ত্তী যুগের শিশুনাগবংশীয় রাজাগণের রাজধানী রাজগৃহে (বর্ত্তমান রাজগির) মহাভারতের সভাপর্ব্বে উল্লিখিত "মণিনাগের মন্দির" এখনও মনিয়ার মঠ নামে পরিবর্ত্তিত আকারে দাঁড়াইয়া আছে।

আমার তরী ডুবল ভাবি মনে

কুমারশঙ্কর রায়শর্ম্মা

আমার তরী ডুবল ভাবি মনে।
ঝঞ্ঝাবাতে পড়ি
উঠল ভীষণ নড়ি,
এমন বাধা এল কি কুক্ষণে।
জীবনে মোর ফাগুন যবে আসি
দিল দোলা মনে
ভুলিনি সে ক্ষণে
ভুলিনি তার অরূপ মোহ-হাসি।
আমার এ মন ঝঙ্কারিছে আজো—
স্বার্থ-কুটের রাশি
সকলি ভুল ; হাসি
আবার চির ফাগুন তুমি সাজো।

হ'লনা আর মনের কথা শোনা।—
সামাল দিতে তরী
ব্যাকুল মনে মরি,
হ'লনা আর সুরের জাল বোনা।
কঠিন আঘাতে শংকা দিল ভরি
আমার মনে। এল
বিপদ এবার। গেল
মালা আমার ঢেউএর জলে পড়ি।
মিলন আমার ঘুচল ফাগুন মনে।
কঠিন লোল-আঁখি
পারবে না কো সে কী ?
আমার তরী ডুবল ভাবি মনে॥

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রহ্লাদ : তারপর গুরুদেব? বিবাহ হ'ল?

বিষ্ণুঠাকুর : হ'ল—কিন্তু বলে না—there is many a slip between the cup and the lip? ঠিক যে-মুহূর্তে আত্মসমর্পণের শেষ মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে যাব : যে, আমি শুধু গুরুরই দাস, আর কারুর নই—ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার দুর্বলতা এক বিপর্যয় অনিচ্ছার রূপ ধরল। ওকে গুরুদেবের আশ্রমে টেনে তুলে যে-বিমল আনন্দে মন ছেয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ দেখি সে-আনন্দ একেবারে উবে গেছে চিরদিনের জন্যে ওর ভার নিতে হবে এই দুর্ভাবনায়। এ-দুর্ভাবনার আরো একটা কারণ—ওকে তো তখন চিনতাম না, ভালোও বাসি নি। শুধু দয়া ও আশ্রয়-দানের পৌরুষগর্বই উড়ে এসে আমার সমস্ত মন জুড়ে বসেছিল। ভালোবাসার মর্ম তো তখন জানতাম না, তাই নন্দিনীর জন্যে হঠাৎ প্রবল কামনা জেগে মন যেন কালো হ'য়ে গেল—বিবাহের ঠিক আগের রাতে: কিছুতেই ঘুম আসে না। সে কত আথাল পাথাল চিন্তা! অনেকক্ষণ ছটফট ক'রে শেষরাতে স্বপ্ন দেখলাম, নন্দিনী আমার পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে পাগলের মত কাঁদছে : "আমাকে ছেড়ে যেও না—আমি তাহ'লে বাঁচব না।"

ভোরবেলা উঠে মন শুধু যে অস্থির হ'য়ে উঠল তাই নয়, নন্দিনীর জন্যে উদ্দাম চঞ্চল হ'য়ে উঠল। মোক্ষদা গিয়েছিল গঙ্গাস্নানে। আমি সেখানে গিয়ে ওকে সব খুলে বললাম—কিছুই গোপন না ক'রে। শুনে ও যেন পাথর হ'য়ে গেল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম, বললাম : "কী হয়েছে?" ওর সাড় এল। আমার দিকে স্থিরনেত্রে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে বলল : "বেশ। কেবল এখন—আমার একটা কথা রাখবে? গুরুদেবকে সব খুলে বলো।" আমি চমকে উঠলাম : "কী? নন্দিনীর কথা?" ও বলল : "হ্যাঁ।" আমি শিউরে উঠে বললাম : "সে আমি পারব না।" ও বলল : "কেন পারবে না? যিনি তোমার জন্যে এত ভাবেন—যাঁকে তোমার গুরু ব'লে বরণ করেছ, তাঁকে সব বলতে পারবে না এ কেমন কথা?" আমি বললাম : "তুমি পারো?" ও বলল : "তাঁকে বলতে পারি না, কারণ তিনি আমার গুরু নন। তবে এমন কিছু নেই যা তোমাকে বলতে আমার বাধে।" আমি অবাক্ হ'য়ে বললাম : "আমি? কী বলছ তুমি?" ও বলল : "হ্যাঁ তুমিই আমার গুরু, কাল রাতে স্বপ্নে পেয়েছি আমি। এখন তুমি আমাকে গ্রহণ করো বা না করো, আমি তোমাকেই গুরু ব'লে জানব ও মানব—যেখানেই থাকি না কেন।" ব'লে একটু থেমে জলভরা চোখে বলল : "কাল আমি কী পেয়েছি শুনবে? পেয়েছি মন্ত্র—আর তোমার কাছেই—না, তোমার এ-বাইরের মূর্তির কাছে নয়,—যে তুমি নন্দিনীর মতন মেয়ের জন্যেও আকুলি-বিকুলি করো—মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছি আমি তোমার অন্তর যিনি আলো ক'রে আছেন তাঁরই কাছে। সেই তুমি—অর্থাৎ আসল তুমি—কাল শেষরাতে জ্যোতির্ময় রূপ ধ'রে আমাকে আশীর্বাদ ক'রে বললে যে, আমাকে শিষ্যা ব'লে তুমি পায়ে ঠাঁই দিয়েছ, আর আমি তখনি গিয়ে লুটিয়ে পড়লাম তোমার পায়ে :

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়?
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ওদুটি কমল পায়।"

ব'লেই আমার পায়ে মাথা রেখে সে কী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না!

আমার সব দ্বিধা কেটে গেল। মনে শুধু যে হঠাৎ জোর এসে গেল তাই নয়—চোখের সামনে বিছিয়ে গেল এক পবিত্র আলো—সে যে কী নীল আর সুন্দর আলো—আহা, আজও ভাবতে চোখে জল আসে ঠাকুরের অপার করুণার কথা ভেবে। কারণ সে-আলো তো যে-সে আলো নয় বাবা, সাক্ষাৎ নীলমণি ঠাকুরের শ্যামল অঙ্গের আলো। ওকে উঠিয়ে জড়িয়ে ধ'রে বললাম: "আমাকে ক্ষমা করো মোক্ষদা, আমি তোমাকে চিনতে পারি নি। মন যার কামনাবাসনার ডাকে অধীর হ'য়ে ওঠে, গুরুর কৃপা পেয়েও যার অন্তরে সংশয় আসে, সে পবিত্রতার মর্ম বুঝবে কেমন ক'রে বলো? আমি এখনো মনে করি—প্রতিভায়, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে আমি কেওকেটা নই। কিন্তু আসলে আমি আজো অজ্ঞানই বলব—কেন না যা জানলে গীতার ভাষায় 'জানার আর কিছু বাদ থাকে না' সেই পরমার্থের জ্ঞানই আমার হয় নি। কেবল এইটুকু আমি জানি যে, আমি মনেপ্রাণে সত্যজিজ্ঞাসু—এখানে আমার ফাঁকি নেই। তাই না আমার চোখের ঠুলি আজ গুরুকৃপায় খ'সে পড়ল, আমি দেখতে পেলাম তোমাকে তোমার স্বরূপে, 'আমার রক্ষাকবচ হ'য়ে তুমি যে এসেছ ঠাকুরের কৃপায় কৃপায়, কৃপায়'—বেজে উঠল আমার বুকের তারে। আমার সংশয়গ্রন্থি আজ ছিন্ন হয়েছে, তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি ব'লে, অস্থিরতার আঁধারে এসেছে এই বিশ্বাসের আলো যে, সত্যসন্ধানের তীর্থযাত্রায় তুমি আমার সহযাত্রিণী হ'লে আমার প্রতি বাধা হবে সহায়, শৃঙ্খলেও বেজে উঠবে নূপুর। তাই আমি গুরুদেবের নির্দেশে চলব প্রতিপদে কথা দিচ্ছি। তুমি আর কেঁদো না।"

সেদিন পুণ্য ঝুলন পূর্ণিমার আলোয় নির্জন গঙ্গাতটে আমাদের বিবাহ হ'ল—গুরুদেবের পৌরোহিত্যে। পিতৃদেব আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন। বন্ধুবান্ধবেরা মুখ ফেরালো, পিসিমা মোক্ষদাকে অভিশাপ দিয়ে আমাকে লিখলেন যে আমার আর মুখদর্শন করবেন না। এককথায় আমরা হলাম পুরোপুরি অকিঞ্চন—ঠাকুরের বরে গুরুর মাধ্যমে।

উনিশ

প্রহ্লাদ (রুদ্ধশ্বাসে): তারপর গুরুদেব?

বিষ্ণুঠাকুর (গাঢ়কণ্ঠে): তারপর আর কী? ভাষায় কি তার বর্ণনা করা যায় বাবা, সে-অপূর্ব তীর্থযাত্রা?—সেই দুই অকিঞ্চনের জড়ে ঝড়ে আঁধারে আলোকে হাত ধরাধরি ক'রে চলা লক্ষ্যপথে—কাঁটায় ফুল ফুটিয়ে, বিষের মধ্যেও সুধার সন্ধান পেয়ে, পদে পদে গুরুর নির্দেশে চ'লে ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণের আলোয় নিজেকে চিনে! গুরুদেবের আশ্রমে আমরা একবৎসর ছিলাম কারুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না ক'রে। তারপরে তাঁর কয়েকটি শিষ্য ক্রমে আমাদের সহায় হ'ল—বিশেষ আমার কীর্তনে আকৃষ্ট হ'য়ে। আমরা নিলাম আকাশবৃত্তি।

তারপর এমনও দিন গিয়েছে যখন দু'তিন দিন অন্ন জোটে নি—শুধু গঙ্গাজলে ক্ষুধানিবৃত্তি ক'রে কীর্তন করতে হয়েছে। কিন্তু তারপরে যখনই ও যতবারই আর সব আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ঠিক তখনই এসেছে যাকে জ্ঞানদাস বলেছেন "অচলা চপলা" আর একবার নয়—বারবার। (গাঢ়কণ্ঠে) আর···আর সব শেষে এলো পবিত্রতার চিত্তশুদ্ধির পরম উপলব্ধি—যার ছোঁওয়ায় সব কামনা বাসনার বন্ধন পড়ল খ'সে, অমনি অন্তর উঠল গেয়ে: 'অনপেক্ষ' অবস্থা লাভ হয়েছে। যতবারই ঠাকুরকে ডেকেছি মনে প্রাণে যে, শুধু তাঁরই আশ্রয় চাই আর কারুর নয়—ততবারই ঘটেছে একটা না একটা অঘটন, সঙ্গে সঙ্গে মিলেছে অকূলে আশ্রয়। গুরুদেবের এক ধনী শিষ্য দিল আমাদের তাঁর গঙ্গামুখী বাগানবাড়ি। আশ্রমের পত্তন হ'ল।

তারপর সুরু হ'ল সাধন-জীবনের আর এক নতুন বিচিত্র অধ্যায়: কেবল একলা সাধনার নয়—দুজনে মিলে একমুখী সাধনার দীক্ষা—যার কথা গুরুদেব বলেছিলেন। শেষে প্রেমের আলোয় যখন কামনার কালির লেশও রইল না, তখনই প্রথম বুঝলাম প্রেম কী বস্তু। কিন্তু সে উপলব্ধি মুখে বলবার নয় বাবা, কেন না যার হয় নি তাকে বোঝানো যায় না যে, কামনার লেশ থাকলেও সে-প্রেমের উপলব্ধি হয় না, হ'তে পারে না, যার রংকে চণ্ডীদাস উপাধি দিয়েছেন "নিকষিত হেম"। আর এ উপলব্ধি আমার হ'ল আমার নিজের তপস্যায় নয়—ওর সংস্পর্শে। নারী সম্বন্ধে

দুর্বলতার আর চিহ্নও র'ল না। আজো মনে পড়ে বাবা, গুরুদেবের একটি ভবিষ্যদ্বাণী: "ওকে তোমার হ'য়ে আমি বরণ করেছি কেন জানো? আমি দেখতে পেয়েছি ব'লে যে,ও এসেছে তোমার শক্তি হ'য়ে—রক্ষাকবচ হ'য়ে। এ কথার অর্থ তুমি বুঝবে সেদিন যেদিন পূর্ণ চিত্তশুদ্ধির বরে মুক্তিলাভ করবে সব অহঙ্কার ও কামনাবাসনার গ্লানি থেকে। সেদিন বুঝবে যে, তোমার জীবনে ঠাকুরের নির্দেশ নানাভাবে এলেও তাঁর কৃপার প্রত্যক্ষ প্রতিমা হ'য়ে এসেছে ঐ একরত্তি মেয়ে—স্বভাব-যোগিনী, সাধন-সঙ্গিনী।

* * * *

ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা নিটোল হ'য়ে উঠল, শুধু ভেসে আসে গাছের পাতার মৃদুমর্মর!...

একটু বাদে চোখ মুছে প্রহ্লাদ বলল: "আশীর্বাদ করুন গুরুদেব যে,কৃপার যে-উপলব্ধি আপনার হয়েছে তার কিছু প্রসাদ যেন আমরাও পাই।" ব'লে প্রণাম করল তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে। তিনি তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ ক'রে বললেন: "পাবে বাবা পাবে—যদিও আমি যেভাবে পেয়েছি সেভাবে হয়ত নয়।"

প্রহ্লাদ মুখ তুলল: "মানে?"

বিষ্ণুঠাকুর: লক্ষ্য এক হ'লেও পথ প্রত্যেকেরই ভিন্ন তো। তাই সদ্‌গুরুর কর্তব্য শুধু থেইটি ধরিয়ে দেওয়া! লক্ষ্যের পথে চলতে হবে কী ভাবে কোন্ ছন্দে—সে-নির্দেশ আসবে কেবল তোমার অন্তর থেকে। আমি শুধু এসূত্রে একটি কথা তোমাকে বলতে চাই আজ: যে, আমি এতদিন তোমার যে উপলব্ধির পথ চেয়ে ছিলাম সে-উপলব্ধি তোমার হয়েছে ব'লে আমার মন আজ গান গেয়ে উঠেছে। শুধু শিষ্যই তো গুরুর মুখ চেয়ে থাকে না বাবা, গুরুও যে থাকে শিষ্যের মুখ চেয়ে। "তোমার কেবল একটি বাধা ছিল—বা আড়াল বলাই ভালো। সেটা আজ ঘুচে গেছে। তাই আজ তোমার জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সুরু হ'ল।"

প্রহ্লাদ: "আড়াল? কী আড়াল গুরুদেব?"

বিষ্ণুঠাকুর: তোমার মনে একটু অভিমান জমেছিল—"আমি বড় আধার।" তাই আমি পথ চেয়ে ছিলাম—কবে আঘাত পেয়ে তোমার চোখ খুলবে।

প্রহ্লাদ: আঘাত?

বিষ্ণুঠাকুর: হ্যাঁ বাবা। তোমার এ-আঘাত পাওয়ার দরকার ছিল ঠেকে শিখে যে, শুধু যে মহাদেব ও গৌরী যা পারল তুমি পারলে না তাই নয়, রমা-যে-রমা—যাকে তুমি নিজে দীক্ষা দিয়েছ—সেও গভীর শোকের বিষাদকে জয় করতে পারল শুধু তুমিই হেরে গেলে। এই দীনতার অনুভূতি তোমার যখন এল—অর্থাৎ যখন তুমি উপলব্ধি করলে যে, নিজেকে বড় মনে করলে মানুষ ছোট হ'য়েই যায়, যে অকিঞ্চন হয় সেই পায় জগন্নাথকে—তখনই তোমার শেষ আড়াল ঘুচে গেল। প্রত্যেক সাধককেই কোনো না কোনো সময়ে তার নিজের চরিত্রের সব চেয়ে বড় বাধাকে এই ভাবে জয় করতে হয় অনেক ভুগে তবে —সাহেবরা যাকে বলে crossing the last hurdle. (থেমে ঈষৎ হেসে) কিন্তু কৃপা পাওয়া আবার আর এক ফ্যাসাদ বাবা, অর্থাৎ দায়িত্ব আছে। এর ভাষ্য এই যে, এবার তোমাকে গুরু হ'তে হবে।

প্রহ্লাদ (সকুণ্ঠে): না না, এখন না গুরুদেব—মিনতি করি—অযোগ্যকে দেবেন না এ-গুরুভার।

বিষ্ণুঠাকুর (হেসে): এর পরেও আত্মধিক্কার? গীতায় ঠাকুর বলেন নি কি—নাত্মানম্ অবসাদয়েৎ? কিন্তু থাক এসব ফাল্‌তো কথা। আমি তোমাকে আজ বলতে চাই একটি কথা। মন দিয়ে শোনো। (একটু থেমে) আমাদের দেশে ব্রহ্মবিদ্যা—পরাবিদ্যা—আজো জীবন্ত আছে, গুরুশিষ্যপরম্পরায় তার আলো আমাদের সাধকেরা বহন ক'রে এসেছেন ব'লে। এ আলো হ'ল কর্মোজ্জ্বলা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির আলো। এর জের টেনে চলা যায় না, অর্থাৎ সাধনা পূর্ণসিদ্ধির প্রসাদ পায় না, যদি শিষ্য গুরুর দীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করার পরে তার অধিকারী শিষ্যদেরও সেই দীক্ষা না দেয়। বিদ্যা যে অর্জন করেছে তার একটি মস্ত দায়িত্ব আছে—সে-বিদ্যায় আরো পাঁচজনকে দীক্ষা দেওয়ার। এ-দায়িত্বকে স্বীকার করা চাই আরো ব্রহ্ম-বিদ্যার ক্ষেত্রে। কারণ যদিও ব্রহ্মবিদ্যা দেওয়া যায় কেবল অধিকারীকে—কিন্তু এ-অধিকারীকেও গ'ড়ে পিঠে নিতে হয় পদে পদে। আমি গুরুর কাছ থেকে যে-আলো যে কৃপা যে-শক্তি পেয়েছি, যে-চিত্তশুদ্ধি ও ভক্তিসুধার স্বাদ পেয়ে অমৃত হয়েছি সে-স্বাদ কি ঠাকুর দিয়েছেন

আমাকে কেবল আমার জন্যে? না। ঠাকুর আমাদের দেন তো জমাবার জন্যে নয়—শুধু বিলোবার জন্যে খাটাবার জন্যে, বাড়াবার জন্যে। খৃষ্টদেবের সেই বিখ্যাত কথিকাটি স্মরণ করো: প্রভু বিদেশযাত্রার সময়ে তিনটি ভৃত্যকে কিছু কিছু টাকা দিয়ে গেলেন রাখতে। দুজন সেটাকা খাটিয়ে বাড়ালো। প্রভু ফিরে এসে খুসি হ'য়ে তাদের বখশিশ দিলো। তৃতীয় ভৃত্যটি বলল: প্রভু, আমি কত যত্নে আপনার দেওয়া টাকাটি বাক্সে রেখেছি দেখুন। প্রভু তাকে ধমকে জরিমানা করলেন সে টাকাটি কেড়ে নিয়ে। বাবা, পাবার সঙ্গে সঙ্গে দেবার দায়িত্বও স্বীকার করতেই হবে, নৈলে সে পাওয়া সত্য হ'তেই পারে না। এইজন্যেই গীতায় বলেছে—যে কেবল নিজের জন্যেই রাধে সে পাপের অন্ন মুখে তোলে। তাই যার স্বধর্ম গুরু হওয়া তাকে শিষ্যবরণ করতেই হয় আরো এই কারণে যে, শিষ্যকে দীক্ষা দিয়ে অধিকারী ক'রে তুলতে না পারা পর্যন্ত অধ্যাত্মবিদ্যার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায় না। তা-ছাড়া ভাগবতে বলেছে 'গুর্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষু' কিনা শুধু গুরুরূপ সূর্যের কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞানচক্ষুর প্রসাদেই মানুষ সেই দিব্যদৃষ্টি পায়—যার প্রসাদে সে দেখতে পায় কিসে কী হয়—নিষ্কাম হ'তে পারে মানুষ কোন্ সাধনায়। এ-যুগের অবিশ্বাসীরা প্রায়ই ফাঁকা বৈজ্ঞানিক বুকনি আওড়ে গুরুবাদকে বাতিল করতে চায়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দূরবীণ দিয়ে গুরুবাদের অনন্ত আকাশের অগুন্তি জ্ঞানের নীহারিকার কতটুকুই বা দেখতে পাওয়া বলো? গুরুবাদের মর্মজ্ঞ হ'তে পারে কেবল সেই ভাগ্যবান্ যে অনুগত শিষ্য হ'য়ে আত্মাভিমান জয় ক'রে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হয়েছে। কেমন জানো? বৈজ্ঞানিক ভাষায়ই একটি উপমা দেওয়া যায়—বিদ্যুতের প্রবাহ চালু করতে হ'লে চাই conductor, বটে তো? রবার কি কাঁচের মধ্যে দিয়ে এখানকার বিদ্যুৎ ওখানে পৌঁছে দেওয়া যায় না—ধাতুর তার চাই। ঠিক তেম্নি গুরুশক্তির বিদ্যুৎও কারুর হৃদয়ে পৌঁছে দিতে হ'লে চাই দীক্ষারূপী conductor; অর্থাৎ দীক্ষা নিয়ে শিষ্যের হৃদয়কে গ্রহিষ্ণু receptive ক'রে নিতে না পারলে ব্রহ্মবিদ্যাকে দাতার হৃদয় থেকে গ্রহীতার হৃদয়ে সংক্রামিত করা যায় না। আমার গুরুদেব একটা কথা প্রায়ই বলতেন যে, দীক্ষালব্ধ উপলব্ধিই সংক্রামক বুদ্ধিবাদের বাহাদুর থিওরিদের সাজিয়ে বড় জোর শোভাযাত্রার মিছিল জাঁকানো যেতে পারে, তার বেশি নয়।

কিন্তু একটা কথা: গুরু যে হবে তাকে হ'তে হবে নিষ্কাম নির্লোভ আত্মজিৎ। এর জন্যে চাই ভগবানে নির্ভর। তুমি আজ যখন সদ্‌গুরু হ'য়ে ফুটে উঠেছ তখন তোমাকে পুরোপুরি ভগবানের 'পরে নির্ভর করতে হবে। শুধু যে মনে রাখতে হবে কিছুই তোমার নয় তাই নয়—অন্নচিন্তা অর্থচিন্তাও ছাড়তে হবে, নিতে হবে আকাশ-বৃত্তি। এর নাম ভিক্ষাজীবী হওয়া নয় বাবা, এর নাম আত্মকেন্দ্রিকতা ছেড়ে ভগবৎকেন্দ্রিকতাকে বরণ করা। 'মনে রাখবে—শিষ্য বা অনুরাগীদের কাছ থেকে যা কিছু পাবে সব তিনিই দিচ্ছেন তোমাকে তাদের 'মাধ্যমে। কেন? না, তুমি তাদের দান গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদানে তাদের বিলোতে পারবে ভগবৎকৃপা। তারা দেবে তোমাকে ইহলোকের অনিত্য পাথেয়, প্রতিদানে তুমি দেবে তাদের নিত্যলোকের শাশ্বত পাথেয়—পারের পারাণি। এরি নাম সদ্‌গুরুর স্বধর্ম—গুরুরূপ সূর্যের বরে দিব্যদৃষ্টির প্রভাপ্রসাদ বিলোনো। বুঝলে?

প্রহ্লাদ (প্রণাম করে): বুঝেছি গুরুদেব। আপনার কথা শিরোধার্য।

কুড়ি

বন্দনা ও রমা প্রহ্লাদ ও সাবিত্রীকে স্টেশনে তুলে দিতে এল। রমা বলল: "মামাবাবু! আমার মনে কেবল একটি ভয় আছে, পাছে বাবা এবার আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান। আপনি বলবেন তাঁকে যে, আমার বিয়ে দেওয়ার জন্যে তাঁকে ভাবতে হবে না। আমি চিরকুমারী থাকব।"

প্রহ্লাদ ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ ক'রে বলল: "বলব, কিন্তু সে শুনবে ব'লে মনে হয় না, মা!"

সাবিত্রী টুকল: "কিন্তু বিয়ে করবে না কেন মা? গুরুদেব তো বলেন, বিয়ে না করলে পূর্ণ যোগ হয় না—বিশেষ ক'রে মেয়েদের।"

রমা: কোনো কোনো মেয়েদের তো হ'তেও পারে?

সাবিত্রী (বন্দনাকে) : পারে কি ? গুরুদেব কী বলেন ?

বন্দনা (ইতস্তত: ক'রে) : গুরুদেব কোনো বিষয়েই অনড় অচল বিধান দেন না। যেমন গৃহস্থকে বলেন ঘরে থেকে যোগ করলেই স্বধর্ম পালন করা হবে—তেম্নি এও বলেন যে, সন্ন্যাসী হবার সংস্কার নিয়ে যারা জন্মেছে তারা গৃহস্থাশ্রমে থাকলে স্বধর্ম ভ্রষ্ট হবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি খুব জোর দিয়েই বলেন যে, এরকম বিশ্ববিতৃষ্ণ সংস্কার নিয়ে খুব কম সাধকই জন্মায়। (রমার দিকে ফিরে) কিন্তু কিছু মনে করিস নি ভাই, তুই বিয়ে করবি না কেন ? (হেসে) আমি তো ভাবতেই পারি না তুই গেরুয়া প'রে বনবাসে চিম্‌টে হাতে ক'রে হোমের আগুন উস্কে দিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বলছিস নচিকেতার স্ত্রীসংস্করণ ব'লে: মরার পরে মানুষ দেবতা হয়, না অপদেবতা—সেই খবরই আমায় বলো, আর কোনো বর চাই না আমি। (ওর চিবুক ধ'রে) এমন রূপ এমন মুখ—কালিদাসের ভাষায় "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা"কে কি সন্ন্যাসিনীর ভেখ মানায় দিদি ?

রমা (লজ্জায় ঈষৎ রাঙা হ'য়ে) : তুমি কী যে বন্দনাদি ! মুখের কোনো আগল নেই। গুরুদেবের সাম্‌নে—

প্রহ্লাদ (হেসে) : আমি সেরকম গুরু নই মা, যার নাম "মহদ্ভয়ং বজ্রম্ উদ্যতম্।" বলতে কি, আমার বাধ্য গুরু হবার দৃশ্য যখন আমি একটু ধ্যানে দেখার চেষ্টা করি, তখন আমার মনে হয় আমার প্রিয় কবির অপূর্ব মেবারপতন নাটকে সগর সিং-এর একটি খেদ—যখন জাহাঙ্গীর বললেন তাকে উদয়পুরে রাণা হ'য়ে বসতে। সগর সিং কেঁদে বলেছিলেন : "এ ভারি অন্যায়, মুঠোর মধ্যে পেয়ে আমাকে রাণা ক'রে দেওয়া !"

সবাই হেসে ওঠে, হাসি থামলে প্রহ্লাদ রমাকে বলল : "তাই মা একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই—সোজা প্রশ্ন, কিন্তু সোজা উত্তর চাই। প্রশ্নটি এই—তুমি কি মনে করো তুমি চিরজীবন সন্ন্যাসিনী থাকলে সুখী হবে ? বিয়ে করতে কি তোমার একটুও ইচ্ছে হয় না ?"

রমা মাটির দিকে তাকিয়ে আরো লাল হ'য়ে উঠল। ঠিক এই সময়ে গার্ড বাঁশি বাজালো। বন্দনা হেসে টুপ্‌ ক'রে বলল : "ঠাকুরের দয়ার কি শেষ আছে বোন্‌ ? দেখ্‌, কী সময়ে তিনি বাঁশি বাজালেন গার্ডের ছদ্মবেশে !"

ট্রেণে উঠে বসতেই প্রহ্লাদ সাবিত্রীকে শুধালো : "বন্দনা অমন ঠাট্টা করল কেন জানো ?"

সাবিত্রী (আশ্চর্য হ'য়ে) : তুমি জানো না সত্যি ?

প্রহ্লাদ : কী ?

সাবিত্রী : রমা ধ্রুবকে ভালোবাসে।

প্রহ্লাদ (মেঘলা মুখে) : ও: !—(একটু পরে) কিন্তু সে তো সাত হাত জলের তলে।

সাবিত্রী (বিস্মিত) : মানে ?

প্রহ্লাদ : সে তো এখন বিলেতে।

সাবিত্রী : তাতে কী ?

প্রহ্লাদ : না, কিছু না, তবে ওদেশে গেলে মানুষ যে কী বিষম বদ্‌লে যায়—সময়ে সময়ে যেন চেনাই যায় না। ও একটু চঞ্চল তো স্বভাবে।

সাবিত্রী : কী যে বলো ? আমের বীজে কখনো আমড়া ফলে ? সেদিন জাপান থেকে কী লিখেছে তোমাকে ধর্মের সম্বন্ধে ?

প্রহ্লাদ (হেসে ফেলে) : ঠিক সময়ে ধম্‌কেছ। অভিবাদন। আর ভাবব না ধ্রুবর সম্বন্ধে।

একুশ

প্রহ্লাদ কাশী থেকে ফিরেই দেহুতে দুটি ধর্মার্থী দম্পতীকে দীক্ষা দিল। কয়েকদিনের মধ্যেই রটে গেল : গুরুজি আকাশবৃত্তি নিয়েছেন, গুরুজি ঠাকুরের দর্শন পেয়েছেন গুরুজি হয়ত এবার দণ্ডকমণ্ডলু নিয়ে বনে চলে যাবেন···এমনি রকমারি গুজব !

মানুভাই খবর পেয়ে ছুটে এল—আরো এই জন্যে যে গৌরীর হঠাৎ জলে ডুবে যাওয়ার খবর পেয়ে গুরু আশ্রম ধর্ম ভগবান্‌ মন্ত্র তন্ত্র সব কিছুর পরেই তার ধূমল ক্ষোভ দাউ দাউ ক'রে জলে উঠেছিল। তা ছাড়া চরিত্রহীন হ'লেও গৌরীকে শুধু যে সে ভুলতে পারে নি তাই নয়, যাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে ধ'রে নিয়েছিল হাতের পাঁচ, সে দূরে চ'লে গিয়ে তার কাছে প্রায় একমাত্র বাঞ্ছিতার

রূপেই আসত কামনার কাঁটাবনে ও কল্পনার স্বপ্নলোকে। শুধু এই জন্যেই গৌরীর জীবদ্দশায় রমা প্রহ্লাদের শিষ্যা হয়েছে শুনে ও বিরক্ত হ'লেও মুখে প্রহ্লাদকে একটি কথাও বলে নি—গৌরী ফিরে এলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে ভেবে। কিন্তু তার হঠাৎ জলে ডুবে যাওয়ার পরে বহুদিনের নিরুদ্ধ আক্রোশকে আর সে দাবিয়ে রাখতে পারল না—স্থির করল প্রহ্লাদকে যা মুখে আসে ব'লে মনের ঝাল মেটাবেই মেটাবে।

মোটরে এসে ভোঁ ভোঁ ক'রে হর্ন দিতেই প্রহ্লাদ বেরিয়ে এল: "একী! মনুদা! বাইরে থেকে ঘন ঘন শৃঙ্গধ্বনি কেন? ভিতরে এসো।"

মনুভাই: না, আমার কাজ আছে—শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি—

সাবিত্রী (ছুটে এসে): দাদা! আসুন আসুন। (ব'লেই চোখে আঁচল)

অগত্যা মনুভাই ভিতরে এসে বসল।

খানিকক্ষণ নিশ্চুপ।

সাবিত্রী: দিদির শ্রাদ্ধে কাশী গেলেন না কেন দাদা?

মনুভাই (আতপ্ত কণ্ঠে): শ্রাদ্ধ আবার কি? আপনি তো জানেন বোঠান, কুসংস্কারে আমি বিশ্বাস করিনা।

সাবিত্রী (চম্‌কে): ও!

প্রহ্লাদ: তাহ'লে আমার কাছে এলে কেন? আমাকে অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তীর্ণ করতে?

মনুভাই (ঝাঝালো স্বরে): না, ওঝা হ'য়ে ভূত ছাড়াতে—ধর্মের ভূত। শুনলাম তুই না কি আকাশবৃত্তি নিয়ে গুরুগিরি সুরু করেছিস?

প্রহ্লাদ: আকাশবৃত্তি নিয়েছি সত্যি—কেবল—

মনুভাই: থাম্। আমি তোর সাফাই শুনতে আসি নি, শুধু কান মলে দিতে এসেছি—এত দেখেও তবু তোর চৈতন্য হ'ল না? আকাশবৃত্তি? পাগলামি ছাড়।

প্রহ্লাদ: ঠিক বুঝলাম না। কী এমন দেখলাম যার পরে আকাশবৃত্তি হ'য়ে ওঠে পাগলামি?

মনুভাই: কী দেখলি—দু দুটো জলজ্যান্ত মানুষ ধর্ম করতে গিয়ে অপঘাতে মোলো—মালতীটা বেঁচে গেছে কেন জানি না—বোধ হয়—এখনো দীক্ষা নেয় নি ব'লেই।

প্রহ্লাদ: পাগলামি করছে এখন কে দাদা?

মনুভাই: কে? তুই—তুই—তুই। যাকে বলে—মিডসামার ম্যাডনেস! আকাশবৃত্তি নিয়ে অনাহারে মরবি নাকি? চোখ দুটো কি মুখ সাজানো? ঘরে কি স্ত্রীপুত্র নেই? আপনি কী বলেন বোঠান? না, এতে আপনিও সায় দেন? Oh! the limit!

সাবিত্রী: দাদা, আমার কথা তো আপনার অজানা নেই। আমি চিরদিনই চেয়েছি ওঁর সহধর্মিণী হ'তে।

মনুভাই: ব্রাভো বৌঠান, ব্রাভো! এমন না হ'লে আর kindred spirit—soul mate! ভিক্ষুর হাত ধ'রে ভিক্ষুণী—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি—spectacular, per excellence! (হাততালি)

সাবিত্রী: দাদা! কেন অনর্থক রাগ করছেন? একটু ঠাণ্ডা হোন। চা ক'রে আনি?

মনুভাই: থ্যাংক্‌স্ বোঠান। না আমার সময় নেই—আমি শুধু ওকে বাঁচাতে এসেছি—যদি পারি অবশ্য। (প্রহ্লাদকে) এই শেষবার বলছি—ওরে মতিচ্ছন্ন! এবার প্রকৃতিস্থ হ—in the name of sanity and horse sense!

প্রহ্লাদ (হেসে): তোমার "স্বস্থমতি"-র রায় কি এই যে, ধর্ম কর্ম সবই পাগলামি?

মনুভাই: শুধু পাগলামি নয়—পিন্টো ঠিকই বলে—plus মাৎলামি!—এই ধর্ম ধর্ম ক'রেই আমরা ডুবেছি।

প্রহ্লাদ: আর বিজ্ঞানের বর্ম চর্ম প'রে ওরা শান্তির সমুদ্রে চিৎসাঁতার কাটছে, না?

মনুভাই: কা বকছিস পাগলের ম'ত! কোথায় ওরা আর কোথায় আমরা! They are everywhere—জলে স্থলে আকাশে, আর আমরা nowhere—মানে, পাতালে। ওরে গর্দভ! Science is salvation, নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।

প্রহ্লাদ: কেবল দুঃখ এই যে, অয়নটা ওদের টেনে এনেছে প্রায় চিরশয়নের রসাতলে। সেদিন পড়ছিলাম ওদের দেশেরই তিনচারজন দিক্‌পালের লেখায় যে, নাস্তিক্য সায়েন্সই মানুষকে আজ দিয়েছে—যে-মন্ত্র তুমি এইমাত্র

আওড়াবে তার আধুনিক সংস্করণ "ধ্বংসং শরণং গচ্ছামি।" মানুষ তাই তো নামতে নামতে শেষে পৌঁচেছে অ্যাটম বোমার নরকে। সেই সায়েন্স হ'ল কিনা স্যালভেশন! ফুঃ!

মন্টুভাই: ফুঃ—মানে? what do you mean, you must? সায়েন্স মানুষের উপকার করে নি বলতে চাস? প্রেস, মোটর, রেল, ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, সিনেমা, রেডিও, ইলেকট্রিসিটি, এয়ারোপ্লেন, মেডিসিন, সার্জারি—এ সবই ফক্কিকারি যে বলে—

প্রহ্লাদ (বাধা দিয়ে): আমি যা বলি নি তা আমার মুখে নাই বা চাপালে দাদা! বিজ্ঞান মানুষের কোনো উপকার করে নি এমন কথা যে বলে সে মূঢ়। আমি শুধু বলতে চাই যে, বিজ্ঞান শুধু মানুষের বাইরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যেরই ব্যবস্থা করতে পারে, তার এক তিলও বেশি না। স্যালভেশন? ভূতের মুখে রামনাম?

মন্টুভাই: শুধু বাইরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য? সায়েন্স মানুষকে কত enlightment, জ্ঞান, সাহস দিয়েছে—কত মিথ্যা ভয়ের সুপারষ্টিশনের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে—অস্বীকার করতে পারিস?

প্রহ্লাদ: না। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার নতুন ভয়ের ভূত চাপিয়েছে—আর এ-ভূত যে-সে-ভূত নয়—দস্তের কবন্ধ ব্রহ্মদৈত্য—একেবারে শ্মশানশান্তি—শুধু মানুষের না, জীব জন্তু কেউই বাঁচবে না অ্যাটম দৈত্যের প্রলয়তাণ্ডবে—না, একটু অত্যুক্তি হ'য়ে গেল, হয়ত উত্তর দক্ষিণ মেরুতে কয়েকটা জলচর মাছ সগৌরবে নব জলরাজ্যে প্রতিষ্ঠা করতে পারেও বা—ছত্রপতি তিমিরাজকে বরফের সিংহাসনে বসিয়ে।

মন্টুভাই: তুই কী প্রলাপ বক্‌ছিস বল্ তো—raving like a boozing idiot! সায়েন্সের এ-বি-সি-ও না জেনে—

প্রহ্লাদ: আশা করি বার্টরাণ্ড রাসেল সাহেব সায়েন্সের এ-বি-সি জানেন? সেদিন তিনি নিউইয়র্ক টাইম্‌সে লিখেছেন একটি প্রবন্ধে যে, এ-বৈজ্ঞানিক কুরুক্ষেত্রের অবসানে শুধু যে কোটি কোটি লোক কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জ'লে পুড়ে মরবে তাই নয়—আসবে নিশ্চিহ্নপর্বের যুগ—যদি দুচার কোটি বাঁচেও তাদের সন্তানরা হবে বিকলাঙ্গ, জড়ভরত, বা উন্মাদ। কিন্তু এ-কুরুক্ষেত্রের মডার্ণ ব্রহ্মাস্ত্র—হাইড্রোজেন বোমার পাহাড় তৈরি ক'রেও কাপালিক মহাবৈজ্ঞানিকদের মন খুসি হয় নি, তাঁরা রাষ্ট্রপতিদের তাঁবেদার হ'য়ে আদা জল খেয়ে লেগেছেন বার করতে—আরো কম সময়ে আরো বেশি মানুষের ভবলীলা সাঙ্গ করা যায় কী উপায়ে—আর তাকেই বিজ্ঞানরত্ন উপাধি দেওয়া হবে—যে বার করতে পারবে একটি বোমায় এক একটি প্রদেশকে এমন ভাবে উৎসাদন করতে যে শকুনি পর্যন্ত থাকবে না সে হাড়ের শ্মশানে।

মন্টুভাই: রাবিশ্! পিন্টো বলে এসবই ইডিয়টিক অ্যালার্মিষ্টদের ভূতের ভয় দেখানো।

প্রহ্লাদ: তোমার সবজান্তা পিন্টোর মহাবাণী করজোড়ে মেনে নিতে বাধছে শুধু এই জন্যে যে, আণবিক বোমার কীর্তিকলাপ ইতিমধ্যেই কিছু দেখেছি আমরা।

মন্টুভাই (সবাঙ্গে): ফুঃ! দেহুতে ব'সে দেখেছিস তো শুধু কয়েকটা মনগড়া মূর্তি—হ্যালিউসিনেশন—আর—

প্রহ্লাদ (পাশের দেরাজ থেকে একটি চিঠি বার ক'রে): তবে শোনো, শুধু দেহুতে ব'সে দেখা নয়—ধ্রুব বিলেত থেকে আমেরিকা হ'য়ে এখন জাপানে—কয়েক মাসের মধ্যেই ফিরবে। গত সপ্তাহে সে লিখেছে বৌকে (চিঠি খুলে) না, পালালে চলবে না দাদা,—বোসো শুনতেই হবে। (পড়ে):

"মা! জাপানে এসে বড় আনন্দেই ছিলাম। কী সুন্দর যে এদের দেশ! কিন্তু হঠাৎ আমার হরিষে বিষাদের কথা ব'লে একটু মন হাল্কা করতেই আজ এ-চিঠি লিখতে বসেছি—কোথা থেকে জানো?—জাপানের বিখ্যাত নাগাসাকি বন্দর থেকে। এখানে পরশুদিন এসেছি বাবার এক জাপানী শিষ্যের অতিথি হ'য়ে। তার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়েছে আরো এই জন্যে যে, সে বিজ্ঞানের শক্তিকে সর্বার্থসাধিকা উপাধি দেয় না। বাবার মুখে শুনতাম আমরামনে আছে? যে, বিজ্ঞান আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে যেমন মঙ্গল করেছে তেমনি আমাদের শ্রদ্ধা বিশ্বাসের ভিৎ জখম ক'রে নাস্তিকতার দীক্ষা দিয়ে ক্ষতিও করেছে প্রচুর। সেদিন কথায় কথায় বন্ধুকে একথা বলতে না বলতে বন্ধু—এঁর নাম নোগুচি—বাঁকা হেসে

বললেন: 'প্রচুর ক্ষতি কী বলছ ধ্রুব? এই বৈজ্ঞানিক বস্তুতান্ত্রিক গুরুদের ধামাধরা শিষ্য হ'য়ে আমরা যে-ঢালু পথে গড়াতে সুরু করেছি সে-পথের শেষ হতে পারে কেবল আত্মঘাতের রসাতলে।' ব'লে সেদিন এই শহরে প্রথম আণবিক বোমা পড়ার কাহিনীর বর্ণনা করলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। প্রথম বোমা শ্মশান ক'রে দেয় সুন্দরী হিরোশিমা নগরীকে। দ্বিতীয় বোমা পড়ে এই শহরে—নাগাসাকিতে—১৯৪৫ সালে, ৯ই আগষ্ট তারিখে। নোগুচি বললেন সে সময়ে তিনি ছিলেন এখানে। সে-চোখে-দেখা মুষল-পর্বের যে-বর্ণনা তিনি দিলেন মা, তার কী নাম দেব জানি না, শুনে শুধু হতভম্ব হ'য়ে যেতে হয়। ভাবো: একটি মাত্র বোমায় শহরের এক-তৃতীয়াংশ ধূলিসাৎ হ'য়ে মারা যায় ৩৯০০০ নরনারী শিশু, আহত হয় ২৫০০০—ভাবতে পারো? আর শুধু মৃত্যু নয়, বন্ধু বললেন: সে যে কী যন্ত্রণাময় মৃত্যু ধ্রুব—ভাবা যায় না! স্বচক্ষে না দেখলে আমি নিজেই হয়ত বিশ্বাস করতে পারতাম না, কারুর হাত উড়ে গেছে, কারুর চোখ, কারুর পা—কয়েকজনের দেহে চামড়া নেই—শুধু আছে দগদগে ঘা—যেমন পশুপক্ষীদের ছাল ছাড়ালে হয় না? —ঠিক তেমনি নোগুচি বললেন তীব্র কণ্ঠে: 'ধ্রুব! মানুষ নাস্তিক বিজ্ঞানের জয়ধ্বনি করতে করতে আজ হ'তে চলেছে পিশাচ।' বলতে বলতে তাঁর দুচোখ জলে ভ'রে এল: 'আর কখন ওরা বোমা ফেলল ভাবো ভাই একটিবার: ঠিক যখন জর্মনি ও ইতালি হার মেনেছে—রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেছে জাপানের বিরুদ্ধে। আমরা জানতাম যে, আর বড় জোর দুতিন মাস—তার পরে আমাদের মিত্রশক্তির শরণাপন্ন হ'তেই হবে। তবু যে ওরা দু'দুটো মানুষের গড়া শহরে নরকের বীভৎস ঝাণ্ডা উড়িয়ে এমন পৈশাচিক কাণ্ড করতে পারল—সে-হাহাকার এমন ব্যাপক হ'তে পারত কি যদি বিজ্ঞান তার জোগান না দিত? মানুষ অবিশ্যি চিরদিনই মারামারি কাটাকাটি ক'রে এসেছে—কারণ ভিতরে ভিতরে আমরা আজো বর্বরই আছি। কিন্তু গথ, হুন ভ্যাণ্ডালদের মতন বর্বরেরাও এহেন বীভৎস হত্যার রক্তরাঙা দেয়ালি জ্বালতে পারে নি। তাই বুঝি এযুগের নবমুক্তিদাতা বৈজ্ঞানিক ঘাতক এগিয়ে এলেন, বললেন রাষ্ট্রপতিকে উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে: আর ভাবনা নেই মহারাজ! জানেন না তো—আহারমিত্রা ভুলে রাক্ষসী রিসার্চ ক'রে আমি কী অপূর্ব মারণাস্ত্র বার করেছি! এর আগে আকাশ থেকে গোলা ছুড়ে নানা শহরে নানা বাড়িঘর ভেঙেছি বটে, কিন্তু হায়রে বেশির ভাগই বেঁচে গেছে বোমার সংখ্যা তথা শক্তি কম ছিল ব'লে। তাই কাপালিক তপঃশক্তির হোমানলে এমন রাক্ষসী কৃত্যাকে সৃষ্টি করেছি যে আর চিন্তার কোনো কারণ নেই—সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দেব এবার। বেশি বোমার আর দরকার হবে না—এক একটা বোমায় এক একটা প্রদেশ শ্মশান হ'য়ে যাবে, নিশ্চিন্ত থাকুন। প্রাণই তো আনে যত রাজ্যের জঞ্জাল—তাই প্রাণলীলার সমাপ্তিই হ'ল সত্যিকার মুক্তি। আর জ্ঞানীরা বলেন শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তার এর পরে—দেখুন না—এমন বোমা বার করলাম ব'লে—যার ধ্বংসশক্তি হিরোসিমা নাগাসাকির বোমাযুগলের লক্ষ গুণ হবে। যে কথা সেই কাজ—' বললেন বন্ধু নোগুচি মৃদু হেসে—'এরই মধ্যে মুক্তিদাতা বৈজ্ঞানিক যে-হাইড্রোজেন বোমা বানিয়েছেন তার একটি বা দুটিতে লণ্ডন বা নিউইয়র্ক বা টোকিয়োর মতন বিরাট শহরও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ছেয়ে যাবে শুধু মরা স্ত্রী-পুরুষ জীব জন্তু শিশুদের হাড়ের ধূলোয়, রক্তের কাদায়। এ মিথ্যে ভূতের ভয় দেখানো নয় ভাই, আমেরিকার রণবীররা প্রমাণ করে দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক আঁক ক'ষে যে মাত্র একদিনের আণবিক যুদ্ধেই রুশ ও আমেরিকার ত্রিশ চল্লিশ কোটি মানুষ মারা যাবেই যাবে এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে একজনও থাকবে না আই-উইটনেস-রিপোর্ট লিখতে। প্রিন্সটন য়ুনিভার্সিটির বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ হার্মান কাণ Hermann kahn তাঁর বিখ্যাত Thermonuclear war গ্রন্থে সম্বোধন করেছেন রণচণ্ড রাজেন্দ্রদের: মাভৈঃ! তিনশো কোটি ডলার খরচ ক'রে রাজ্যজোড়া মাটি খুঁড়লেই এমন আশ্চর্য নিরাপদ ভূগর্ভদুর্গে আশ্রয় পাওয়া যাবে যেখানে বহু আমেরিকান বেঁচে যাবে। শুধু তাই নয়, তিনি বলেছেন যে, তিনি ইচ্ছে করলে এমন এক যন্ত্র বার করতে পারেন—নাম Dooms-day Machine যার প্রসাদে এক মুহূর্তে এ-দিন দুনিয়ার স্রেফ চেহারা বদলে যাবে—প্রাণের চিহ্নলেশও থাকবে না। তবে তাঁর হৃদয়খানি নাকি মাখনের ম'ত কোমল, তাই বলছেন: "এরকম যন্ত্র তৈরি করা দুঃসাধ্য না হ'লেও এখন 'এরকম যন্ত্র সৃষ্টি

না করাই ভালো।" উঃ! বৈজ্ঞানিকের করুণার কি তল পাওয়া যায় ভাই?'

"ভাবছ সব বেশি বেশি ক'রে বলছি, না? কিন্তু একটুও অত্যুক্তি করিনি মা। নোগুচির কাছে কালই দেখলাম এ-বইটি—যাতে কাণ সাহেব লিখেছেন অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি সাজিয়ে—কেন আণবিক যুদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভাবতে পারো মা, কোথায় পৌঁচেছে এযুগের আশ্চর্য আশমানীরা—যারা এই ঢঙে কথা কয়, আর কোটি কোটি সভ্য মানুষ সসম্ভ্রমে শোনে—কেউ ক্ষেপে উঠে বলে না: 'না, আমরা বৈজ্ঞানিক হাইড্রোজেন বোমার বা চাঁদে ঢু মারায় কীর্তি দেখে অবাক্ হ'তে চাই না, চাই শান্তির রাজ্যে সবাক থাকতে ছবি আঁকতে গান গাইতে, সুষমার আলোয় নিত্য নব আনন্দের দর্শন পেতে,সবশেষে ধর্মের পথে চ'লে প্রতি জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা ক'রে এই মাটির পৃথিবীকে অমরাবতী করতে! নোগুচি আরো বলছিলেন মা, নাগাসাকি ও হিরোশিমাতে বোমা পড়ার পরে না কি হাজার হাজার রোগী তিলে তিলে মরেছে অসহ্য যন্ত্রণায় —ক্যান্সারে, যক্ষ্মায় পক্ষাঘাতে—কত লোক পাগল হ'য়ে গেছে, কত বিকলাঙ্গ জড় শিশু জন্মেছে। কয়েকটি এখন যৌবন লাভ করেছে, কিন্তু রয়ে গেছে বামন, বীভৎস, পঙ্গু!

মন্নুভাই (অতিষ্ঠ হ'য়ে): কিন্তু কী সব ইর্‌রেলেভ্যা'ণ্ট প্রলাপ বকছিস বল্ তো। ধর্ম ধর্ম করলে ব্রেণ অকর্মণ্য হ'য়ে যায়—পিণ্টো ঠিকই বলে।

প্রহ্লাদ: প্রলাপ? কিসে?

মন্নুভাই: নয় তো কী? পিণ্টো বলে বিজ্ঞানের শুধু একটি মাত্র লক্ষ্য—তথ্যের নিরীক্ষা আর বস্তুজগতের নানা উপাদান অণুপরমাণুর শক্তিকে পরীক্ষা ক'রে সত্যের আলোকস্তম্ভ গড়া। এ-সত্য moral, অর্থাৎ সুনীতি দুর্নীতির উপরে—ফরাসীরা যাকে বলে: "an-dessus de la melee." কিন্তু ধার্মিকরা কী করে বুঝবে একথার মর্ম—যাদের ব্রেণ ধর্মের পাঁকে নির্জীবতার ধ্যান ক'রে প'চে গেছে?

প্রহ্লাদ (হো হো ক'রে হেসে): তুমি যখন ধার-ক'রে-পাওয়া বিলিতি বুকনির আগুন নিয়ে বৈজ্ঞানিক বুলির ফুলঝুরি কেটে চলো মন্নুদা, তখন আমার কী মনে হয় শুনবে? আমি ছেলেবেলায় যখনই কোনো কিছু চেয়ে না পেয়ে কান্নাকাটি করতাম, বাবা আমাকে নিয়ে যেতেন সার্কাসে। সেখানে সবচেয়ে ভালো লাগত আমার রং চং মাখা সংদের নানা ভঙ্গি—অমনি হাসতে হাসতে ভুলে যেতাম সব দুঃখ। ক্লাউনদের কাপ্তেনি আর কিছু না পারুক, এটা পারে।

মন্নুভাই (আতপ্ত): তোর এত বড় আস্পর্ধা—?

প্রহ্লাদ (করজোড়ে): ক্ষমা মন্নুদা, ক্ষমা। তোমার ধার করা-বুলি শুনে বিদূষকদের ধার-করা মুখোষের কথা মনে প'ড়ে গেল যে, কী করব বলো? কিন্তু মনে রেখো তুমিই প্রথম ছোবল মেরেছিলে, নৈলে আমি ফোঁশ করতাম না। (সুর বদ্‌লে) মরুকগে। হানাহানি ছেড়ে দুটো ভালো কথা বলি শোনো—(সুর ক'রে) বিনতি সুনো প্রভু মেরী শরণ পড়া হুঁ তেরী। আমার হাসি পেয়েছিল এই জন্যে যে, Science is moral, কথাটা শুনতে গুরুগম্ভীর হ'লেও আসলে হ'ল যাকে সাহেব-পুরাণে বলে বস্তাপচা প্ল্যাটিটিউড—অর্থাৎ যারাই একটু ভাবে তারা সবাই জানে এবং মানে যে, কোনো তথ্যলব্ধ শক্তির সঙ্গেই সুনীতি দুর্নীতির সম্বন্ধ নেই। সে-শক্তি দিয়ে যখন মানুষের হিতসাধন করি তখন সে হয় সু, যখন অনিষ্ট করি তখন সে হয় কু। একটা দৃষ্টান্ত দেই: অনেকেই দেখেছে যে কুস্তি করলে দেহের শক্তি বাড়ে। আচ্ছা। এ-তথ্য জানার পরে আমার ইচ্ছা হ'ল আমি ঠিক করলাম কুস্তি-কসরৎ ক'রে দৈহিক শক্তি বাড়ানো যাক। বেশ। অতঃপর সে-শক্তি দিয়ে আমি যখন নারীধর্ষণ করি—তখন আমি সমাজের শত্রু, পাপী; যখন কোনো সতীকে দুবৃত্তের ধর্ষণ থেকে রক্ষা করি তখন সমাজের বন্ধু, পুণ্যবান্। কাজে কাজেই এই বলকে পাপী বা পুণ্যবান্ বললে সেটা হ'য়ে ওঠে হাসির কথা। কেমন তো? আচ্ছা। ঠিক তেমনি সায়ান্সের সাহায্যে অ্যাটমের বুক চিরতে পারলে অজস্র শক্তি—atomic energy—পাওয়া যায় এটা একটা তথ্য। এই তথ্যকে জেনে আমার মনে হ'ল—পরমাণুকে চিরে শক্তি যোগাড় করা যাক। এখন, এই শক্তি একটা জাগতিক শক্তি, সুতরাং moral অর্থাৎ না পাপী না পুণ্যবান্—এটেই তো। পাপ পুণ্যের প্রশ্ন ওঠে—যখন সে-শক্তিকে প্রয়োগ করি। যখন সে-শক্তি

দিয়ে আমি শহরে শহরে অজস্র বিজলি বাতি জ্বেলে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাই তখন আমি সমাজের বন্ধু, মহাত্মা, আর যখন সে শক্তি দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারি তখন আমি সমাজের শত্রু, দুরাত্মা। ধার্মিকরা একথা বুঝবে না কেন? এ তো নীতিসংহিতার প্রথম পাঠ।

মনুভাই: Fallacious—কুযুক্তি। বিষ্ণু ঠাকুর, ধ্রুবর মতন ধার্মিকরা বোঝে না, তাই বৈজ্ঞানিককে দোষ দেয় যখন কেউ নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা ফেলে। এজন্যে দায়ী কেবল সে, যে বোমা ফেলল।

প্রহ্লাদ: না—এইখানে আমি আপত্তি করব। কারণ বৈজ্ঞানিকেরা আপ্রাণ চেষ্টায় অ্যাটম বোমা তৈরি করেছেন শুধু এক উদ্দেশ্যে—লক্ষ লক্ষ মানুষ মারতে। মানুষ যুদ্ধে পিশাচ হ'য়ে ওঠে জেনেশুনে তার হাতে তুলে দিচ্ছেন এমন অস্ত্র—যা দিয়ে তার পৈশাচিক বৃত্তি চরিতার্থ হয়। আমেরিকায়, ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রাশিয়ায় হাজার হাজার বৈজ্ঞানিককে মোটা মাইনে দেওয়া হচ্ছে রিসার্চের জন্যে। কিসের রিসার্চ? না, সবচেয়ে কম সময়ে কোন্ মারণাস্ত্রে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায়। এ কাপালিক যজ্ঞের যাজ্ঞিক আজ কারা? ধর্মক্ষেত্রের শক্তিভক্তি-প্রেমবাদীরা, না কুরুক্ষেত্রের বৈজ্ঞানিকেরা? আরো একটা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটাকে দেখা যেতে পারে দাদা! বৈজ্ঞানিকেরা যখন বিদ্যুৎ-কে খাটিয়ে মানুষের নানা অভাব মোচন করতে যান তখন তোমরা তাঁদের জয়ধ্বনি করো হুহুঙ্কারে:—দেখ কী উপকারই না করছেন তাঁরা বিশ্বমানবের! এখানে ভুল বলো না—কারণ এ কুযুক্তি নয়, সুযুক্তিই বটে—এই নীতি অনুসারে যে, যে কোনো শক্তি দিয়ে কেউ মানুষের মঙ্গল সাধন করলে তাকে বলা চলে বৈকি যে, সে মানববন্ধু—

মনুভাই (সোৎসাহে): Exactly—তাই তো বলছিলাম—

প্রহ্লাদ (করজোড়ে): কী বলছিলে, পরে শুনব, কেবল তোমার কাছে কেনা হয়ে থাকবো দাদা যদি আগে এ-অবোধকে একটু বুঝিয়ে বলো—তাহ'লে কেন সে-বৈজ্ঞানিকদের আমি মানবশত্রু উপাধি দিতে পারব না—যারা আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে অ্যাটম বোমার পাহাড় জড়ো করে—জেনেশুনে যে এসব প্রয়োগ করা হবে কোটি কোটি মানুষকে মারতে। জেনেশুনে যে, অ্যাটম বোমার radio-active বিষবর্ষণের ফলে শুধু যে লক্ষ লক্ষ লোক অপঘাতে ম'রে ভূত হবে তাই নয়—যারা বেঁচে থাকবে তাদের মধ্যেও হাজার হাজার লোক ক্যান্সার পক্ষাঘাত যক্ষ্মায় মরবে তিলে তিলে, হাজার হাজার শিশু জন্মাবে-বিকলাঙ্গ, বীভৎস, নির্বোধ ও পাগল। তোমাদের সাহেব-পুরাণ বলে না কি দাদা—you can't have the argument both ways? বৈজ্ঞানিকদের রেজিমেণ্ট প্রকৃতির নানা শক্তিকে দিয়ে যখন মানুষের মঙ্গল করেন, তখন তাঁদের মহাপুরুষ বরেণ্য বলব—অথচ যখন তাঁরা জেনেশুনে কোটি কোটি নিরস্ত্র মানুষের জন্যে নরকযন্ত্রণার ব্যবস্থা করেন—(বলেন হারমান কান-এর মতন অম্লান-বদনে যে কেন আণবিক যুদ্ধ হ'লই বা)—তখন নরকের অস্ত্র জোগানো সত্ত্বেও তাঁদের স্বর্গের বাসিন্দা উপাধি দিয়ে পূজা করব, এ হয় না। তবু এতবড় কুযুক্তিকে আমরা সুযুক্তি ভেবে আজ ঠিক ভুল করছি শুধু এই জন্যে যে, সায়েন্সের বাইরের চেকনাইয়ে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার ফলেই বুদ্ধিও এভাবে ঘুলিয়ে গেছে। তাই না গীতার ঠাকুর বলেছেন: "সাবধান! অধর্মকে ধর্ম ব'লে যে উল্টো বোঝায় তার নাম "তামসী বুদ্ধি"। আমরা যেপথেই চলি না কেন, সময়ে সাবধান না হ'লে এই তামসী বুদ্ধির মরণদশা আমাদের পেয়ে বসেই বসে, যার ফলে সব কিছুই উল্টো দেখি—দুর্বুদ্ধির মোহান্ধকারে বা অজ্ঞানের ছায়ান্ধকারে। তাই বলি দাদা—নানা বৈজ্ঞানিক শক্তি দিয়ে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর জন্যে বৈজ্ঞানিকদের গুণগান করতে চাও করো চুটিয়ে—কেবল দোহাই তাদের নাস্তিক কাপালিকতার সমর্থন কোরো না—আমাদের মধ্যেকার আসুরিক প্রবৃত্তির তাঁবেদার হ'য়ে। বিজ্ঞান amoral এই কুযুক্তি দিয়ে এমন বোকার ম'ত কথা বোলো না যে, ধন মান যশ প্রতিষ্ঠার লোভে প'ড়ে বৈজ্ঞানিক যে অ্যাটম বোমার নরমেধযজ্ঞে আহুতি দিচ্ছেন তার জন্যে দায়ী তাঁদের তামসী বুদ্ধি নয়—দায়ী কেবল তারা, যারা সে-যজ্ঞোদ্ভব রাক্ষসী কৃত্যাকে দিয়ে বিশ্বধ্বংস করতে ক্ষেপে ওঠে।

মনুভাই (কী বলবে ভেবে না পেয়ে): কিন্তু পিপ্লেটো—

প্রহ্লাদ (পিঠে হাত রেখে) : দাদা, একটু শান্ত হও, তোমার বদ্‌গুরু এই পিণ্টো মহাপ্রভুই হচ্ছেন তোমার evil genius, তাকে ছেড়ে অনুতপ্ত হ'য়ে তোমার সদ্‌গুরু মহাগুরুর পায়ে প'ড়ে তুকারামের অভঙ্গ ধরো, কেঁদে বলো (সুর ক'রে) "তুকা ম্হণে পন্ঢরিনাথা—ক্ষমা করী অপরাধা।" তাহ'লে তোমার অজ্ঞানতিমিরান্ধ চক্ষু বেচারী তাঁর জ্ঞানাঞ্জনশলাকার ছোঁওয়ায় দেখতে পাবেই পাবে যে, Science is amoral এ জাতীয় বুলি শুনতে ভারিক্কি হ'লেও আসলে অপলকা, কেন না যেমন ধর্মের মূল্যায়ন করবার সময়েও মানুষ সব আগে জানতে চাইবে—ধর্মের ছোঁওয়ায় সে আরো মহৎ সুন্দর সহিষ্ণু ও পবিত্র হ'য়ে স্বর্গের সিঁড়িতে ওঠে না—ভণ্ড দর্পী নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর হ'য়ে নরকের ঢালুপথে গড়িয়ে চলে—ঠিক তেম্‌নি বিজ্ঞানের বেলায়। শুধু বিজ্ঞানই বা কেন বলি, মানুষ যা কিছু পায় বা সৃষ্ট করে তার দাম কষতে হবেই হবে তাতে ক'রে তার অন্তর্জীবনের সম্পদ বাড়ল না কমল সেই নিকষে।

মনুভাই (একটু বিপন্ন হ'য়ে) : এ কী সব হাবিজাবি বকছিস—balderdash! পিণ্টো বলতে চায়—অ্যাটম-চিরে পাওয়া শক্তি দিয়ে মানুষ মারার জন্যে বৈজ্ঞানিক দায়ী নয়—দায়ী মানুষের স্বভাব। বৈজ্ঞানিক শুধু এই শক্তির খবর দিয়েই খালাস।

প্রহ্লাদ : বলিহারি যুক্তি পিণ্টো প্রফেটের! মানুষের বিলাস-উপকরণ বাড়ানোর জন্যে, বাইরের আলোর দেয়ালির জন্যে আমরা বৈজ্ঞানিকদের স্তব করব :

বিজ্ঞানী হি প্রাণধাতা, তন্নাম জপ সর্বদা
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা

অথচ যখন তারা প্রাণপণ গবেষণা ক'রে বিষাক্ত গ্যাস, গোলাগুলি—সবশেষে হাইড্রোজেন বোমা আমাদের হাতে তুলে দেবে মানবজাতির উচ্ছেদ করতে, তখন বলব এজন্যে দায়ী শুধু মানুষের স্বভাব! তোমার পিণ্টো মহাপ্রভুকে একবার সামনাসামনি পেলে একটি মাত্র প্রশ্ন করতাম তাঁকে : "হে বিচক্ষণ! মানুষের স্বভাব যে কত সহজে হিংস্রক নিষ্ঠুর মোহমত্ত হয়ে ওঠে একথা জেনেও কি ভবাদৃশ বৈজ্ঞানিকেরা তার হাতে জুগিয়ে দেন নি বিশ্বমারণ অস্ত্র?" আমাদের ঋষিরা বলেছেন—কোনো তপঃশক্তি বা বিভূতিই তাদের হাতে জুগিয়ে দিতে নেই, যারা কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য জয় করে নি। তোমাদের বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন : দূর ওসব হ'ল ধর্মের কথা, আমি ধর্মাধর্মের ধার ধারি না, আমার লক্ষ্য শুধু মানুষকে শক্তিমান্ করা—তার ফলে সে সার্থকই হোক বা উচ্ছন্নই যাক। শুনে গড়পড়তা অবোধরা বলল : "বাহবা!" আত্মঘাতী অন্ধরা বলল : "আমরা নরকেই যেতে চাই। বন্ধু, তুমি সহায় হ'লে আরো সহজ হবে নরকেযাওয়া।"—

—অম্‌নি বৈজ্ঞানিক বললেন : "বেশ বেশ! নরকের রক্তপঙ্কিল রাজপথ আমি তৈরি ক'রে দেব যদি শুধু তুমি আমাকে বাহাল করো, ধন মান দিয়ে স্তবস্তুতি করো, মালমসলা জোগাও, ল্যাবরেটরি গ'ড়ে দাও। চুক্তি হ'ল—বৈজ্ঞানিককে সমাজ চাঁদা তুলে দেবে টাকা, আর বৈজ্ঞানিক প্রতিদানে তাকে পাঠাবে জাহান্নমে—মারণাস্ত্র জুগিয়ে! চমৎকার চুক্তি—প্রায় গেটের কাউন্টের সঙ্গে মেফিস্টফিলিসের চুক্তির দোসর! আত্মা নেই, ভগবান্ নেই, ধ্যান নেই, করুণা নেই, বিশ্বপ্রেম নেই, সাধুসন্ত নেই, আছে শুধু ম্যাটার আর দেহসুখ, শক্তির মদ আর নাস্তিক ইন্দ্রিয় তৃপ্তি।

মনুভাই (রুষ্ট) : তোর মতিচ্ছন্ন হয়েছে, তাই আত্মা ভগবান সাধুসন্ত গুরুগিরির জয়ধ্বনি করছিস। সাধু সন্ন্যাসীরা কী করেছে শুনি?

প্রহ্লাদ : তাঁরা দুশ্চর তপস্যায় নিজেদের দুষ্প্রবৃত্তির মোড় ফিরিয়েছেন কল্যাণী বৃত্তির দিকে, করেছেন নিজেদের স্বভাবের রূপান্তর ; কিন্তু মুস্কিল এই যে, এ-স্বভাবকে ঢেলে সাজানো খুব কঠিন ব'লে সাড়ে পনের আনা মানুষই আত্ম-শোধনের এ সাধনাকে বরণ করতে নারাজ। তবু যাদের চোখ আছে তারা দেখতে পায়—সত্যিকার সাধু সন্ন্যাসী মুনি ঋষি জীবন্মুক্তেরা মানুষের কত মঙ্গলসাধন করেছেন। শুধু কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য, শংকরাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, রমণ মহর্ষি, সন্তদাস, শ্রীবিষ্ণু ঠাকুর প্রমুখ মহাপুরুষের দিব্য জীবনই নয়—যুগে যুগে হাজার হাজার অখ্যাতনামা সাধকসাধিকার মধ্যেও তাঁদেরই দীক্ষার ঝলকে ফুটে উঠেছে এক অপরূপ আলোকলোকের আভাস—বিশ্বাস না হয় তোমার রমাকে দেখে এসো, কী অপরূপ হ'য়ে ফুটে উঠেছে ঐ একরত্তি মেয়ে—আর তলব করো তোমার পিণ্টোর কলেজের গবেষক ধুরন্ধরদেরকে—তারা

বলুক বুকে হাত দিয়ে যে, গভীর দুঃখে শোকে তারা নাস্তিক-বিজ্ঞানের বস্তুবিচারে রমার মতন শান্তি পেয়েছে।

মন্থুভাই (রাগে আগুন হ'য়ে) : আমি শুনেছি রমার গুরু হ'য়ে ব'সে তুই তাকে সেই ড্যাম্‌ড্‌ হিপক্রিসির পথে চালাচ্ছিস—যে-পথে পা দেওয়ার পাপেই গৌরীর অকাল-মৃত্যু হ'ল। হবে না? মিথ্যাচার, pretension, ভণ্ডামি, obscurantism, কুসংস্কারের পথে কখনো সদ্‌গতি হ'তে পারে কারুর? না, শুধু সাধু সন্ত, মা গঙ্গা জয় গুরু জয়গুরু ব'লে বগল বাজালেই সশরীরে স্বর্গে পৌছানো যায়? আমি ভেবেছিলাম রমাকে দুদিন পরে আনাব তার শোক একটু কম্‌লে। কিন্তু আজ তোর কথাবার্তা শুনে বুঝতে পেরেছি—আমি কী ভীষণ ভুল করেছি তাকে তোদের মতন মতিচ্ছন্নদের আওতায় রেখে—বিষ্ণুঠাকুরের ম'ত হামবড়া হাম্বাগ বদমায়েসরাই তো যত নষ্টের মূল—নৈলে—

প্রহ্লাদ (কানে আঙুল দিয়ে) : ব্যস্‌, থামো মন্থুদা। গুরু নিন্দা শোনাও মহাপাপ। (উঠে সাবিত্রীকে) এসো বৌ। ইন্দ্রায়ণী নদীতে ডুব দিয়ে গুরুমন্ত্র জপ ক'রে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

মন্থুভাই (হকচকিয়ে গিয়ে) : মানে?

প্রহ্লাদ : সে তুমি বুঝবে না মন্থুদা, কিন্তু এর পরে আর না।

ব'লেই হতবুদ্ধি অতিথির পানে আর না তাকিয়ে সাবিত্রীকে নিয়ে সোজা ইন্দ্রায়ণী নদীতে গিয়ে ডুব দিয়ে প্রহ্লাদ প্রার্থনা করল : "মা, আমাদের কান অশুচি, মন মলিন হয়েছে গুরুনিন্দা শুনে। তুমি শুদ্ধি দাও : ওঁ জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়! তারপরে সাবিত্রীর সঙ্গে গুরুবন্দনা গাইল :

"ওঁ ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্‌।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥"

[ক্রমশঃ

কাব্য ও সৌন্দর্য

শ্রীরাধাশ্যাম চক্রবর্তী

সে যুগের কবি কালিদাস আর এ যুগের রবীন্দ্রনাথ। কালের দিক থেকে বিস্তর ব্যবধান, কিন্তু কাব্যকলার দিক থেকে দূরকে নিয়ে এসেছে অতি নিকটে। সেই কোন অতীতে কবি নিপুণ হস্তে একের পর এক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন; বল্কলবসনা শকুন্তলা হতে আরম্ভ করে রাজ-সভার অপার ঐশ্বর্য কিছুই বাদ পড়ল না। একদিকে মেঘের লীলাচঞ্চল গতিভঙ্গী, অন্যদিকে আশ্রম মৃগের গ্রীবাভঙ্গী সব কিছু মিলিয়ে সৌন্দর্যের অপূর্ব সমারোহ কবিচিত্তে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কবিচিত্তের এই মূল তথ্যটি আমাদের কাছে বহুদিন অজ্ঞাত ছিল, আমরা কেবল জেনে আসছি 'উপমা কালিদাসস্য'। এতেই যেন কবি কালিদাসের সবটুকু জানা হয়ে গেল। তাই যখন পাশ্চাত্ত্য সমালোচকেরা কবি কালিদাসের সৌন্দর্যোপলব্ধির স্বরূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন তখন আমরা ভেবে বললাম—তাইত!

কবি কালিদাস যে বীজ রোপণ করলেন তা পত্রপুষ্পে সুশোভিত হয়ে দেখা দিল বাংলা কাব্যে। অবশ্য রবীন্দ্র-নাথের পূর্ব পর্যন্ত এর স্বরূপটি কেউ ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়না। বাংলা সাহিত্যে গীতি কাব্যই হোক বা মঙ্গল কাব্যই হোক, সবই ছিল ভাবপ্রধান, সেখানে সৌন্দর্যের স্থান ছিল গৌণ। কাব্যের ভাল মন্দ বিচার করা হত তার সাধন পদ্ধতির ধারা বা আদর্শবাদ নিয়ে। তার কারণও ছিল যথেষ্ট। তখনকার দিনের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল ধর্মপ্রচারের বাহক ও ধারক হিসাবে। তাই হৃদয়ের ব্যাকুলতা সেখানে মুখ্য। সেজন্য

কবিকৃতির যে সুষ্ঠু রীতি পদ্ধতির দরকার সে বিষয়ে তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন উদাসীন। তবে মাঝে মাঝে দুএকজনের ভিতর যে এর সম্যক্ পরিচয়বোধ ছিল না এমন কথা বলা চলে না। যেমন বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ও ভারতচন্দ্র। এর ভিতর দুজন ছিলেন সভাকবি, আর একজন ছিলেন সাধককবি; সেজন্য এঁদের কাব্যকলায় সৌন্দর্যানুভূতি থাকলেও সাবলীল গতিভঙ্গী কিছুটা ছিল ব্যাহত।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবন থেকেই এর সন্ধানে ফিরছিলেন, কিন্তু সত্যকারের পথ খুঁজে পেতে তাঁরও বেশ কিছুদিন সময় নিয়েছিল। তিনি খুঁজতে বের হলেন অসীম সৌন্দর্যের সন্ধানে। অরুণরাঙা পথে দেশবিদেশ ঘুরে রাজকন্যার খোঁজে চলল তাঁর সেই সাধনা। তিনি কি পেয়েছিলেন আর কি পাননি সে বিচারের ভার সমালোচকদের উপর ছেড়ে দেওয়া রইল।

এখন কাব্যের এই সৌন্দর্য কি তাই বিচার্য বিষয় The thing of beauty is joy for ever. এই beautyকে আমরা কি ভাবে গ্রহণ করেছি তা দেখতে হবে। আমরাও ত বুক ফুলিয়ে বলি 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে Beauty'র যে স্থান দেওয়া হয়েছে তার তুলনায় আমাদের 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' একটু অন্য ধরণের। আধ্যাত্মিকবাদের ছোঁয়াচ লাগিয়ে তাকে বিশুদ্ধ করা হয়েছে। সে যাই হোক, সৌন্দর্যবোধ মানুষের চিরন্তন ধর্ম। পশুদের মধ্যে সৌন্দর্য উপলব্ধির কোন বালাই আছে বলে মনে হয় না। জীবনধারণের জন্য খাদ্য লাভই তাদের চরম কাম্য। মানুষের কথা স্বতন্ত্র; জীবন ধারণের জন্য খাদ্য বস্ত্র বাড়ী ঘর প্রভৃতির প্রয়োজন থাকলেও যতক্ষণ পর্যন্ত মনের সন্তুষ্টির প্রয়োজন না মিটছে ততদিন পর্যন্ত শান্তি নেই। থাকবার জন্য ইট কাঠ দিয়ে বাড়ীঘর তৈরী করলেই ত যথেষ্ট, কিন্তু এতেও মানুষ সন্তুষ্ট নয়; তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুদৃশ্য করে তুলতে হবে। এই সাজিয়ে গুছিয়ে সুদৃশ্য করে তোলার পিছনে রয়েছে মানুষের সৌন্দর্যানুভূতি। আবার উপলব্ধির স্তরও বিভিন্ন, কখন বা দর্শনে, কখন বা শ্রবণে। এই রকম আরও কত কি! একটি ফুল দেখে বলছি কি সুন্দর ফুল বা ঘ্রাণ নিয়ে বলছি কি সুমিষ্ট গন্ধ; এক একটি গানের সুর কর্ণকুহরে অপূর্ব ঝঙ্কার তোলে; এই যে অনুভূতি, এর পিছনে কাজ করছে মানুষের সৌন্দর্যবোধ। আবার অন্যদিকে দেখতে পাই চিত্রকর তুলির টানে সৌন্দর্য সৃষ্টি করছেন; র‍্যাফেলের ম্যাডোনা বা দা ভিঞ্চির মোনালিসা তাই চিত্রজগতে অমর। দিনের পর দিন এমন কি বছরের পর বছর কেটে গিয়েছে এই সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে। যেগুণে চিত্রকর অপূর্ব চিত্র সৃষ্টি করছেন, সেই একই গুণে কবি তাঁর কাব্য প্রতিভায় শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শন করছেন। তাই তাঁরা স্রষ্টা ও শিল্পী। বিজ্ঞান ও কলায় পার্থক্য এখানে। বিজ্ঞান শেখায় জানতে—বাস্তব জিনিষ কাজে লাগিয়েই তার কাজ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু কলা শেখায় সূক্ষ্ম মার্জিতবোধ ও তার প্রয়োগ কৌশল। এই যে সূক্ষ্ম মার্জিত বোধ, এর দ্বারাই জাগ্রত হয়েছে সৌন্দর্যানুভূতি।

সাহিত্যে সৌন্দর্য বলতে প্রকৃত যে কি বুঝায় তার এখনও কোন সংজ্ঞা নির্ণয় হয়নি। সবই যেন ভাসা-ভাসা। বামন অবশ্য বলেছেন—সৌন্দর্যই অলঙ্কার; এই মতই আজ পর্যন্ত চলে আসছে। অনেকের মতে অলঙ্কার বাইরের সাজ সজ্জা, তাঁরা বলতে চান অলঙ্কার স্ত্রী অঙ্গের ভূষণের ন্যায়; সোনার গহনা পরিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু ভেবে দেখলে এর সারবত্তা যে কতটুকু তা বিবেচনা সাপেক্ষ। শকুন্তলার রূপ সৃষ্টি করতে কালিদাসের কয় মণ সোনার প্রয়োজন হয়েছিল, অথবা রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতায় সোনার আলোঝলমলই বা কতটুকু? সে ত আর কেউ নয়, শাশ্বত চিরন্তন, তাই কবির মনে অনন্ত জিজ্ঞাসা—

'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী।'

তাই সমস্ত সৌন্দর্যের রূপ পেয়েছে উর্বশীর মধ্যে, শকুন্তলার মধ্যে। ইংরাজীতে যাকে বলে ornament, তা দিয়ে সৌন্দর্য বিচার চলে না। রসগঙ্গাধরে তাই জগন্নাথ এই সৌন্দর্য তত্ত্বটিকে অন্যভাবে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন রমণীয়ার্থ প্রতিপাদক শব্দের নাম কাব্য। এখন এই রমণীয়ার্থ প্রতিপাদক শব্দ কি তাই বিবেচ্য। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, অলৌকিক চমৎকারিত্ব বা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সংসর্গ বর্জিত। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়, যা অপ্রয়োজনের কাজ। সবাই কাজে

ব্যস্ত, নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই; কিন্তু যে শিল্পী সে একমনে করছে শিল্পের সাধনা; সমস্ত কাজ ফেলে দিয়ে আলস্যের সহস্র সঞ্চয়ই তার পাথেয়।

আনন্দোপলব্ধির দুটো ধারা দেখতে পাই, একটা ভাব-মূলক অন্যটি সৌন্দর্যমূলক। বৈষ্ণব পদাবলী বা শাক্ত-পদাবলীতে দেখতে পাই ভাবোচ্ছ্বাসই আনন্দগানের মূল হেতু। সৌন্দর্যবোধ এখানে গৌণ। সৌন্দর্যবোধ ও ভাবাবেগ এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে যথেষ্ট। ভাবোচ্ছ্বাসে কোন বিচারের স্থান নেই কিন্তু সৌন্দর্যো-পলব্ধি বিচারের অপেক্ষা রাখে। এখানে চাওয়ার আনন্দ নেই আছে পাওয়ার আনন্দ। ভাব কতকটা স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে হয়। দিনের পর দিন তাকে কাট ছাঁট করতে হবে। প্রয়োজন মিটে গেলেই তার কর্তব্য শেষ হয়ে যাবে না, তিল তিল করে তিলোত্তমার সৃষ্টি করতে হবে—নইলে সৃষ্টির সার্থকতা কি? কবি লিখছেন বসে ভাবের অনুপ্রেরণায়,কিন্তু তাকে শেষ করলে চলবেনা, তাকে সুষমামণ্ডিত করে তুলে ধরতে হবে জগতের সামনে। নবীনচন্দ্র বা বিহারীলাল—তাঁদের কি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস কম ছিল! কিন্তু তাঁদের ভাবাবেগ যতটা ছিল তাঁরা ততবড় কবি হতে পারেন নি। একজন হয়ে রইলেন পাগলাঝোরা আর একজন ভোরের পাখী। আরম্ভ করলে আর শেষ নেই।

অন্যদিকে অনেকে বলে থাকেন কবিসঙ্গীত বা বাউল সঙ্গীত এদেরও ত কাব্যের পর্যায়ে ফেলা যায়। যায় বই কি! তবে সৌন্দর্যের কষ্টিপাথরে মোটেই নয়। এর যা কিছু প্রয়োজন তা ভাবের দিক থেকে। প্রাণের আকৃতিই একে কাব্যের পর্যায়ে টেনে এনেছে। নইলে এর মূল্য কতটুকু। কিন্তু প্রকৃত কাব্য সৃষ্টিধর্মী। সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে হলে গ্রহণ বর্জনের নীতি গ্রহণ করতে হবে—পতি-ব্রতা হিন্দু রমণীর পক্ষে শাঁখা সিঁদুরই যথেষ্ট কিন্তু রাজা রাণীর ক্ষেত্রে জমকালো পোষাক পরিচ্ছদ চাই—আবার গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন ও কমণ্ডলু হলেই চলে যায়। বাস্তব ক্ষেত্রের এই নিয়ম চলছে কাব্যের ক্ষেত্রে। ভাবের আবেগে অনেক কিছুই ত বলা যায়, কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে তার কতটুকু প্রয়োজন আর কতটুকু অপ্রয়োজন তাও বিচার করতে হবে। নইলে সার্থক কাব্য রচিত হবে না। সেই জন্যই দেখা যায় রবীন্দ্রকাব্যে এত পাঠান্তর। একবার লিখলেই ত চলত, কিন্তু এতে তৃপ্তি নেই; সব সময়ই যেন মনে হচ্ছে কোথায় কোন খুঁত থেকে গেল। বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্পর্কে একটা মূল্যবান্ কথা বলেছেন। প্রত্যেকেরই লিখবার দিকে আগ্রহ দেখা যায়; কিন্তু সেই লেখা ভাল হল কি মন্দ হল সেদিকে কারও খেয়াল নেই। তাই তিনি তরুণ লেখকদের একটু সৎ উপদেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক লেখকই যদি তাঁর লেখা ছাপবার পূর্বে দু চার মাস ফেলে রেখে দেন তবে খুব ভাল হয়। কেননা সেই লেখাটা ভাল হল কি মন্দ হল তা যাচাই করে নেওয়া সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথও সেই একই কারণে তাঁর মূল লেখার অনেক পরিবর্তন করেছেন।

সৌন্দর্যের মূল উৎস অন্তরের অনুপ্রেরণা কিন্তু তা প্রকাশ করবার সামর্থ্য থাকে কজনের। গলা মিষ্টি থাকলে ত চলবে না, সুর সংযোগে তাকে মূর্ত করে তোলা চাই, নইলে সবই বিফল। যাঁরা তা করতে পারেন তাদেরই দেওয়া হয় উচ্চ আসন। কুন্তক অবশ্য এটাকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে—কোন সাধারণ বস্তু নিয়ে কবি তাঁর প্রতিভাবলে সেই বস্তুকে সুন্দর ও ভঙ্গীযুক্ত বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করেন ও শ্রোতার আহ্লাদ উৎপাদন করেন। তা হলে দেখ—সৌন্দর্য সৃষ্টিতেই আনন্দ। কিন্তু এই আনন্দ বা হ্লাদন ব্যাপারের সহিত বাস্তবতার একটু পার্থক্য আছে। অনেকে হয়ত বলতে পারেন—তাস, পাশা, দাবা খেলেও ত আনন্দ পাওয়া যায়। কাব্যানন্দ ঠিক এ ব্যাপার নয় তাই একে বলা হয়ে থাকে অলৌকিক; সে জন্য অলৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেই করতে হবে সৌন্দর্য বিচার। অনেক সময় রুচির পার্থক্যের জন্য সৌন্দর্যবোধের তারতম্য দেখা যায়। কিন্তু একথা ঠিক যে যাঁরা প্রকৃতই সোনা চেনেন তাঁরা কোনটা খাঁটি আর কোনটা নকল—তা ঠিকই দেখিয়ে দিতে পারেন। তাই সাহিত্য বিচারে প্রকৃত জহরীর বিচার নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কাণ্ট বলেন, যা সুন্দর তা সকলের নিকটই সুন্দর, যেটুকু মত বৈষম্য তা ইন্দ্রিয়ধর্মবোধের জন্য। ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ যে ভাল লাগা বা মন্দ লাগা তা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে জন্য আগেই বলে রাখা হয়েছে এটা অলৌকিক।

অনেকে বলে থাকেন নদীর বাঁক ফেরাতেই তার সৌন্দর্য। রবীন্দ্রকাব্য আলোচনা করলে এই সত্যই বিশেষ করে চোখে পড়ে। গতানুগতিক ভাবধারায় সৌন্দর্য সৃষ্টি করা কঠিন, তাই মাঝে মাঝে উত্থান পতনের ভিতর দিয়ে তাকে যাচাই করে নিতে হয়। ভাল আবৃত্তি করতে হলে কণ্ঠস্বর উচু নিচু করতে হবে, নইলে তা হবে সাপের মন্তর। শেলি, কীটস্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সৌন্দর্যতত্ত্বটিকে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তাদের কাব্য বিশ্বজনবন্দিত। বৈচিত্র্যই সৌন্দর্যের প্রাণ, রবীন্দ্রনাথ জীবনের যে বৈচিত্র্য উপলব্ধি করেছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করে বাংলা ভাষাকে এমন এক স্তরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলেন যা কল্পনাতীত। বিশ্বের দরবারে তাই পেল শ্রেষ্ঠ আসন।

এই সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে পাশ্চাত্য মনীষীদের যে একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল তা বেশ বোঝা যায়, তবে তাঁদের মতবৈষম্যও ছিল যথেষ্ট। সাধারণতঃ এঁদের ভিতর ছিল দুটি দল। এঁদের ভিতর এক সম্প্রদায়ের মত ছিল এই যে মানুষ যেমন নিজস্ব প্রতিভার দ্বারা সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তেমনি প্রাকৃতিক পরিবেশেও সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই মতের যাঁরা সমর্থক ছিলেন তাঁদের মধ্যে বার্ক, কাণ্ট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য কিন্তু পরবর্তীকালে হিগেল, ক্রোচে প্রভৃতি মনীষীগণ এই মত উপেক্ষা করেছেন। তাঁদের মতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোন স্থান নেই; যা কিছু সৌন্দর্য তা মানুষের দ্বারাই সৃষ্ট। কিন্তু আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অস্বীকার করতে পারি না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অস্বীকার করলে কবি কালিদাসকেই অস্বীকার করতে হয়; কেননা তিনিই ত ছিলেন স্বভাব সৌন্দর্য বর্ণনায় সিদ্ধ হস্ত। বাংলা কাব্যই হোক বা সংস্কৃত কাব্যই হোক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে গ্রহণ করেই এগোতে হবে নইলে সাহিত্যের প্রকৃত বিচার সম্ভব হবেনা। তবে তার ভিতর সূক্ষ্ম কলা কৌশল কতটুকু তাই নিয়ে আমাদের সৌন্দর্যোপলব্ধির বিচার। এই গুণের জন্যই কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ আমাদের এত প্রিয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শী পূজা

অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ মজুমদার

প্রথমে মা মহাকালী দ্বিতীয়ে মা তারা।
তৃতীয়ে ষোড়শীরূপে পুরিলে ত্রিপুরা॥

ষোড়শী—মাতৃকারূপ দশমহাবিদ্যারূপের একটি প্রকাশ। দক্ষদুহিতা শিবসীমন্তিনী সতী পিতার বিরাট যজ্ঞে নিমন্ত্রিতা হন নাই, কেন না দক্ষ শিবের উপর বিরূপ এবং শিবনিন্দুক। তবু দেখলেন অন্যান্য ভগিনীদিগকে, তাঁরা অলঙ্কার শোভিতা হয়ে ও নানা ধন ও পদমর্য্যাদার ঐশ্বর্যের দীপ্ত বিকাশে আকাশপথ আলোকিত করে চলেছেন। সতীও মহাদেবের অনুমতি পাবার জন্য তাঁর ধ্যানভঙ্গ করে তাঁর মত পরিবর্ত্তন করবার জন্য ব্যগ্র, শিব প্রজ্ঞাবলে সতীর মৃত্যুযোগ দেখে তাঁকে নিরস্ত করবার জন্য সচেষ্ট। শিব ও শক্তির পরস্পরের উপর আধিপত্যের দ্বন্দ্ব বড়ই আনন্দ ও শঙ্কাজনক। শেষে মায়াপ্রভাবে দশমহাবিদ্যারূপে তাঁর কাছে ভয়ানক দৃশ্য উপস্থাপিত করলেন। শিব পিছু হটলেন এবং তাঁকে যেতে দিলেন, সতীর হল জয়। তাই ষোড়শীরূপ শিবের বড়ই মনোহারিণী।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সাধন-যজ্ঞের সমাপ্তি টেনে দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর সেবায় ও আশ্রয়ে দিনাতিপাত করিতেছেন। এমন সময়ে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে দেশের কতকগুলি মেয়ের সঙ্গে এবং তাঁর পিতার রক্ষণাবেক্ষণে মা দক্ষিণেশ্বরে হাজির হলেন। অনভ্যাসের পথ হাঁটা তাঁর সহ্য হয় নাই, জ্বরে কষ্ট পাচ্ছেন। ঠাকুর অত্যন্ত খুসী হয়ে দুঃখ করে বললেন,

"এতদিনে এলে বাবু, আর কি আমার সেজবাবু আছে যে তোমার পূজো করবে? যাক্ চিন্তা করো নি, এই ঘরেই বিছানা করে শুয়ে পড়ো।" হৃদয়কে ডেকে ডাক্তার-বদ্যির ব্যবস্থা করতে বললেন। শ্রীমা নিশ্চিন্ত হলেন এবং তাঁর পিতাও সুস্থ চিত্তে ২।৩ দিন থেকে দেশে ফিরে গেলেন।

এতদিনে শ্রীমা পতিদেবতাটিকে জানবার সুযোগ পেলেন। রাত্রে তাঁর কাছে থাকা বিপজ্জনক ব্যাপার, কখন কি ভাবসমাধি হয়, সর্ব্বদাই তটস্থ থাকেন। প্রথম প্রথম ভয় পেয়ে হৃদুকে ডাকাডাকি করে তুলেছিলেন রাতদুপুরে, সে জানে কি অবস্থায় কি নাম বা মন্ত্র শোনালে সংজ্ঞা ফিরে আসবে, ক্রমশঃ নিজে ওসব শিখে নিলেন। কিন্তু তাঁর খোঁজ রাখতে গিয়ে, মায়ের রাত্রে একেবারেই ঘুম হতো না। ঠাকুর জানতে পেরে তাঁকে নহবৎখানার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। বনের পাখী খাঁচায় বন্ধ হলো। মা রান্নাবান্না করে সকাল সকাল ঠাকুরের স্নানাহারের ব্যবস্থা করে দিতেন। মধ্যে মধ্যে স্ত্রীভক্ত কেউ এলে মায়ের সাথী হ'তেন। কোন্ ভক্ত কি খেতে ভালে-বাসেন, কে কি রকম ভুলো মন, কার পানে চুণ কম দিতে হবে, কাকে দিতে হবে লঙ্ক', মা সব ঠিক ঠিক জেনে গেলেন। তাঁর সেবা আপনা ভুলে জগৎ ভুলে—একমাত্র ধ্যান জ্ঞান স্বামীসেবা।

ঠাকুর দেখলেন সময় উপস্থিত হয়েছে—মায়ের মধ্যে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তিনি ষোড়শী পূজার আয়োজন করতে চেষ্টিত হলেন। দীনু পুরোহিত ঠাকুরের কক্ষেই পূজার ব্যবস্থা করলেন একটি মৃণ্ময় ঘটে। সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত হওয়ার পর, ঠাকুর শ্রীমাকে ডেকে পাঠালেন। একটী নববস্ত্র পরিধান করে মা ঘটের বাম-দিকে একটি কম্বলাসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর বিধিমত ৺পূজা করলেন ধূপদীপ জ্বেলে আরতি হলো, শাঁখ বাজলো. নৈবেদ্য হলো নিবেদিত। শ্রীমা ৺পূজা নিরীক্ষণ করতে করতে কেমন একটা প্রগাঢ় ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলেন, চেষ্টা করেও সংজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছিলেন না। ক্রমশঃ ঠাকুর পূজা করতে লাগলেন, ত্রিপুরেশ্বরীকে আহ্বান করে শ্রীমায়ের দেহমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করলেন। দুইজনে বহুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। প্রহর অতিক্রম করার পর ঠাকুর রামকৃষ্ণ চক্ষুরুন্মিলন করে শ্রীমাকে পুষ্পাঞ্জলিসহ এতদিনের সাধনার ফল এবং মুক্তি জ্ঞান অসম্মোহ সমস্ত ডালি দিলেন শ্রীচিন্ময়ীর শ্রীচরণে।

ঠাকুরের আশঙ্কা দূরীভূত হলো। মাকে প্রথমে পরীক্ষা নিয়েছেন—"তুমি কি আমাকে সংসার পথে বাঁধতে এসেছো?" জিগ্যেস করতে সারদামণি মা বললেন—না তা কেন? আমি তোমায় ঈশ্বর লাভের সহায়তা করতে এসেছি। মা একবার ঠাকুরকে শুনিয়ে বলেছিলেন এক স্ত্রীভক্তকে—পেটের একটিও ছেলে কি মেয়ে নেই মা বলে ডাকতে—এই যা দুঃখ। শুনে রামকৃষ্ণ বললেন—ওকে বলো যে একসময় এতো ছেলেমেয়ে মা বলে ডাকবে যে, ওঁকে হাঁপিয়ে উঠতে হবে) সে কিছু নয়। ভক্তরা ক্রমশঃ মায়ের আদর যত্নে তাঁর বশ মানলেন, বুঝলেন বাপের চেয়ে মা দয়ালু। একদিন লাটু বসে ধ্যান করছেন সন্ধ্যা-বেলা। মা একতাল আটা মাখছেন। এবং এক হাতে মাখা, বেলা সেঁকা বেশ পরিশ্রম সাপেক্ষ। ঠাকুর বলছেন ওরে লেটো তুই ছোঁড়া যাঁর ধ্যান করছিস্ তিনি ঐ দেখ্ রান্নাঘরে তোদের জন্য ময়দা মাখছেন। এসব রেখে এখন তাঁকে সাহায্য কর গে যারে বোকা ছেলে। লাটু তাড়াতাড়ি উঠে সেদিকে গেলেন।

ঠাকুর যদিও সন্ন্যাস নিয়েছিলেন কিন্তু স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেননি। তাঁকে কেমন করে ঘর সংসার করতে হয়, প্রদীপের সল্‌তে কেমন করে পাকাতে হয়, কেমন করে যানবাহন আরোহণ অবরোহণ করতে হয় তাও শিখিয়েছেন।

যাই হোক ষোড়শী পূজার অনেক পরে young Bengalএর আবির্ভাব হয় ঠাকুরের আসরে। সবাই প্রথম থেকে মায়ের আদরে মুগ্ধ। সারদা মায়ের দারোয়ান বলে নিজের পরিচয় দিতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের অদর্শনের পর, প্রথম প্রথম সাধু ও গৃহীভক্তরা মায়ের কথা বিশেষ খেয়াল করেন নি, এক নরেন্দ্রনাথ ছাড়া। তিনি আমেরিকা যাওয়ার প্রাক্কালে ঘুষুড়ির ঠিকানায় মাকে পত্র দিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়েছিলেন এবং অনুমতি পেয়ে ছোট ছেলের মত মাঝরাতে নাচতে আরম্ভ করেছিলেন। যাই হোক মা কামারপুকুরে অতিকষ্টে—এমন কি নুনেরও অভাব হয়েছে খাওয়ার সময়;—শাক ভাত খেয়ে দিন কাটালেন.

অসুখে ভুগলেন। স্বামী সারদানন্দ তাঁকে কলিকাতায় এসে থাকবার জন্তে ধরে পড়লে প্রথমেই রাজী হন নি। সাহায্যের প্রসন্নময়ীকে ঠাকুর শ্রদ্ধা করতেন এবং জীবিত অবস্থায় তাঁর পরামর্শ নিতে বলতেন। মা এখন তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলেন; তিনি বললেন—হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাবে, তোমার অত ভক্তিমান শিষ্য রয়েছে, পুত্রের অভাবে তারাই তোমার পুত্র, সেবক এবং সেবার অধিকারী, নিশ্চয়ই তাদের কাছে যাবে।

মায়ের কলিকাতা আগমন ঠাকুরের প্রয়াণের পর একটি আনন্দজনক ঘটনা। কত ভক্ত, পুত্র কন্তা দীন তাঁর চরণে দীক্ষা নিয়ে উদ্ধার হলেন গণে শেষ করা যায় না। তিনি অত্যন্ত সহজ হয়ে সবাইকে সেবা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতেন স্বরূপ সম্বন্ধে। দু একজন তাঁকে স্বপ্নে দেখেছিলেন, যেমন নট গিরীশ ঘোষ। জয়রামবাটি মায়ের বাটিতে তিনি বিশ্রাম নিতে যেতেন। মা নিজহাতে তাঁর বিছানার চাদর, গায়ের গেঞ্জী পরিষ্কার করে দিয়েছেন। অতিথি সংকার ঠিক মায়ের মত। কয়েকজন গ্রামবাসী খেতে বসেছে ৺জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে। তারা মুসলমান, নলিনী মায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী—দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাদের পাতে তরকারী দিচ্ছে। মা দেখতে পেয়ে অসন্তুষ্ট হলেন। ছিঃ ওরকম করে কি পরিবেশন করে। আমি দিচ্ছি ওদের, তুই অন্ত কাজে যা বাপু। আমার সব সন্তান। শরৎ যেমন আমজেদও তেমনি। আহা, তোমরা কিছু মনে করো না বাপ। আমি তোমাদের দিচ্ছি, পেট পুরে খাও। তবে না দেবী আবির্ভূতা মানবী কলেবরে। রাখাল মহারাজ বলতেন—আমরা কি মূর্খ হেথা সেথা তীর্থ করতে ঘুরি আর জগজ্জননী মহামায়া যে ঘোমটা টেনে আমাদের মধ্যে সবার সেবা করছেন সেটা নজরেই পড়ছে না—হতভাগ্য আমরা।

ক্রমে উদ্বোধন লেনের বাড়ী তৈরী হ'লো এবং মা গৃহ-প্রবেশ করলেন। সেখানটি একটি তীর্থস্থান, আজও শ্রীমায়ের স্নেহের পরশ সেখানের আকাশে বাতাসে পাওয়া যায়। মা বেরিয়েছেন দেশভ্রমণে। দক্ষিণ ভারতে তাঁকে দর্শন করবার জন্ত হাজার হাজার মদ্রদেশবাসী সমবেত হয়েছেন এবং জানিয়েছেন তাঁদের শ্রদ্ধাভক্তি, তাঁদের ভালোবাসা। তাদের ভাষা, মা নাই বা বুঝলেন সে কথা। তাঁদের দিকে অনিমেষে চেয়ে হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন। সবাই হেসে কেঁদে একাকার করেছে এবং তাদের অন্তরের অন্তস্থলে শ্রীমায়ের আসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুধীরা দিদি, নিবেদিতা, গৌরী মা, যোগীনময়, গোলাপ মা পেয়েছেন তাঁর আন্তরিক ভালবাসা ও স্নেহ। রাধু নামে মস্তিষ্কবিকৃতা ভাইঝি কত অত্যাচার করেছে সব হাসি মুখে সহ্য করেছেন। ভাইদের ঝগড়াঝাটি, স্বার্থের জন্ত সামান্ত জমিজরাত নিয়ে কলহ মিটিয়েছেন। ক্রমে মা বৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন। প্রায়ই জ্বরে ভুগছেন। স্বামী সারদানন্দ চিন্তিত, আর বোধহয় মাকে রাখা যাবে না। ইচ্ছাময়ী যা ঠিক করেন তাই হবে। ক্রমে রাধুর ছেলেকেও আর দেখছেন না। শ্রান্ত হয়ে দিনের শেষে ঘরে যাবার উদ্যোগ করছেন এবং মহাপ্রয়াণ করলেন।

মা যা শিখিয়েছেন নিজের কাজে, ব্যবহারে, কথায়, দৃষ্টিপরশে তার ফল সুদূরপ্রসারী, এখনও মায়ের পরিচয় সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় নি। পিতাকে যে স্বপ্নে জগদ্ধাত্রী বালিকা রূপে দেখা দিয়েছিলেন, কজন তার তাৎপর্য্য বুঝলো। আমাদের জন্ত তিনি অগাধ ধনরত্ন রেখে গেছেন। আমরা যেন চিনে নিই এবং জীবন ব্যয় করি সচেতন সাহসে, এবং জীব সেবায় তাঁকে অনুসরণ করে কৃতার্থ হই।

গৃহস্থালীতে শুধু শৃঙ্খলা নয়, পরন্তু পরিশ্রম অনেক লঘু হয়ে যায়।

শুনেছি, সহর অঞ্চল, ধোঁয়া ধুলাতো হবেই। কণ্টি-নেণ্টের সহর দেখেছি। এ জাতীয় ধোঁয়াতো নেই। বার্লিনের বাতাসই স্বতন্ত্র। কয়লা জ্বালালে ধোঁয়া হবেই। গ্যাসে বা ইলেকট্রিকে খরচা প্রায় সব দেশেই বেশি, তবুও লোকে নগরীতে কয়লার আগুনে রাঁধে না—শীতের দেশেও। জনৈক ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোককে জানি। তাঁর কোয়ার্টারে সব প্রকার ব্যবস্থাই আছে। মাসিক পাঁচ টাকা ব্যয় কম, তিনি কয়লাই পোড়ান। অবশ্য তিনি কলিকাতায় বাড়ী তুলছেন। যার মাসিক পঞ্চাশ টাকা আয়, তার পক্ষে গ্যাসের আগুন নিশ্চয়ই বড় বিলাস; কিন্তু সবলোকের আয়ও চিরদিন এদেশে এত কম থাকবে না। আর কয়লার ধোঁয়াই যদি আমাদের ধাতস্থ হয়, আয় বাড়ানর তো দরকার নেই, দরকার হাসপাতাল বাড়ানর।

গ্যাসটা একটা উদাহরণ মাত্র। কলকারখানা, রেল, মোটর ইত্যাদি সবই অনিয়ন্ত্রিত ভাবে সহর ও তার বাতাসকে কলুষিত করছে। বৈদ্যুতিক ট্রেণ, বৈদ্যুতিক বাস চালু হলে অবস্থা কিছু ভাল হবে। অপরদিকে বিবেচনা করুন, কলিকাতার কটা বাড়ী বসবাসের উপযুক্ত? শুধু ভাড়া বাড়ী নয়, এদেশের অধিকাংশ বসত বাড়ীও আরাম ও সৌন্দর্য্যের মান হিসাবে বর্ত্তমান ইউ-রোপে অচল। স্বল্প মূলধনে নগরীতে বাড়ী করা অন্যদেশে সম্ভব নয়। কারণ ঘর বাড়ী ব্যক্তিগত সম্পত্তি—যদিও বা হয়, সমগ্র নগরের উৎকর্ষের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। আমি অত্র কলিকাতার বস্তির কথা তুললাম না। সাধারণত যাকে আমরা মনে করি বস্তির বহির্ভূত, তার বড় অংশও বস্তুতঃ বস্তি। পুনরায় বিবেচনা করুন, কলিকাতার একটা বড় অংশ বর্ষায় জলমগ্ন হয়ে থাকে। বিজ্ঞজনে বলেন, শোচনীয় পরিবেশে বসবাস শরীর ও মনের ওপর বিষের ক্রিয়া করে। ইউরোপের সঙ্গে, বিশেষ পশ্চিম বার্লিনের সঙ্গে তুলনা করে আমি ত আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে এই অবস্থাতেও কলিকাতাবাসীর কিছু কার্য্যক্ষমতা ও চিন্তা শক্তি বজায় আছে। কলিকাতা ভারতের গৌরব। এদেশে আধুনিক শিক্ষা সভ্যতার প্রচার প্রসার হয় কলিকাতার মাধ্যমে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনও প্রধানতঃ কলিকাতা হতে সারা ভারতে সঞ্চারিত হয়। জগৎ সভায় কলিকাতার স্থান রয়েছে এবং জগৎসমক্ষে এই কলিকাতাকে উপস্থাপিত করার মত কালিমামুক্ত করতেই হবে।

শ্রদ্ধেয় সরকার মহাশয় সাত্বিক ভাবাপন্ন। বলেন, গঙ্গাতীরে আছি, সেইত মহা সৌভাগ্য। গঙ্গাতীরে বিচরণ করেছি। পুণ্যসলিলার তটে বহু সৎপুরুষও আসন করেছেন, আর বহুজনে ভক্তিভরে আগ্রহ নিয়ে তথায় জমায়েত হয়েছেন। বিকাল সন্ধ্যা অতিবাহিত করার পক্ষে উত্তর কলিকাতায় আর কি উত্তম স্থান হতে পারে? কিন্তু চারপাশ হতে ভেসে আসে সিমেণ্ট চুন সুড়কি আর পাট খড়ের ধুলা। পরমার্থ মাথায় থাক, বায়ুসেবন দূরে যাক, গঙ্গাতীর অসহনীয় হয়ে ওঠে। এখন ধরুন যদি গঙ্গাতীরে প্রশস্ত উদ্যান থাকত, বায়ুসেবন হোক আর বৈঠক হোক, দুটোই কি ভাল হত না? অন্যত্র এই রকমটাই দেখেছি। বার্লিন সহরের এক সীমানা ধরে বয়ে যাচ্ছে হাফেল নদী। দুপাশে প্রশস্ত উদ্যান, পরিষ্কার ঝকঝকে রাজপথ ও কৃত্রিম উপবন। নিজের মোটর গাড়ী থাকে আরামে বেড়াতে যেতে পারেন। অল্পব্যয়ে বাসে বা রেলেও যাওয়া যায়। প্রাকৃতিক দৃশ্য, আলোবাতাস সকলের জন্য উন্মুক্ত, যার ইচ্ছা ভোগ করে নিন। উপভোগ করেনও বার্লিনবাসী। নদনদী, জলাশয়, বায়ু—আকাশ জল সাধারণের সম্পত্তি, সেটা তবে এজমালি নর্দ্দমা নয়। যত খুসী নোংরা ফেললে গঙ্গার পক্ষেও অসহনীয় হয়ে পড়বে। কলিকাতার বাতাস ত দূষিত হয়ে পড়েছে বহুদিন হল। শুধু একটা সহর নয়, দুকূলের সমগ্র দেশের ওপর নির্ভর করে নদী-নালার স্বাস্থ্য। মধ্যইউরোপে অনেক ক্ষেত্রে নদনদী অব্যবহার্য্য হয়ে গিছল অনিয়ন্ত্রিত ময়লা নিক্ষেপের ফলে। পরে লোকের চেতনা হয় ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় এবং অপর দিকে নষ্ট জলধারাকে উদ্ধার করার কাজও চলেছে। জার্মানীর দুর্ভাগ্য, দেশটা দু ভাগে বিভক্ত। তবুও অন্ততঃ পক্ষে পশ্চিম জার্মানীতে সকলেই এ বিষয়ে অবহিত ও বিরাট সংস্কার কার্য্য চলছে। বাতাস যাতে দূষিত না হয়ে পড়ে সে বিষয়েও আইন ও নিয়ন্ত্রণ আছে জার্মানীতে।

ভারতবাসী শোনা যায় প্রকৃতির ভক্ত। কলিকাতায় গাছপালা নেই, আছে সাইনবোর্ড। কলিকাতাবাসী গাছ-পালা দেখতে যান শিবপুর বাগানে; তথায় আবার প্রচণ্ড ভীড়, এমন কি লাউডস্পীকার যোগে গানও চলতে দেখেছি। পথে হাওড়ার ওপর দিয়ে যেতে হয়। বার্লিন সহরের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে দেখেছি বিরাট সরোবর, আর মনুষ্য রোপিত বন। কি অপরূপ দৃশ্য! গাছপালা অনেকটা দার্জ্জিলিঙের ঘুম অঞ্চলের মত। তথায় পরি-ভ্রমণ করুন, বসে থাকুন, যা আপনার অভিরুচি। চতুর্দ্দিকে নয়নাভিরাম দৃশ্য ও শান্তি বিরাজ করছে। একবেলা সেখানে কাটালে সপ্তাহের শ্রান্তি দূর হয়ে যাবে। তুলনা করুন, কলিকাতার জীবনটা আমাদের কোন পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কথা হল, সহরকে পরিবর্ত্তন করা সম্ভব কি না? অন্তরায় অবশ্য অনেক আছে। কিন্তু অন্যদেশে সম্ভব হয়েছে রুদ্ধ নষ্টপ্রায় নগরকে পুনর্গঠন করা। যুদ্ধবিধ্বস্ত বার্লিন সহর ত কয়েক বছরে নতুন করে গড়ে উঠেছে। বিগত প্রায় পাঁচ বছরে নিজের চোখের ওপর দেখলাম কি রূপান্তর। প্রথম অন্তরায় গতির নিয়ম। চেষ্টা বিনা গতানুগতিকতা পাল্টায় না। দ্বিতীয়ত কলিকাতায় জমির দাম অত্যধিক। তৃতীয়ত কলিকাতায় লোকের চাপ দৈনন্দিন বাড়ছে বই কমছে না। কলিকাতা নগরীর বহুবিধ চরিত্র। রেল নদীপথের সংযোগস্থল, বড় বন্দর ও ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র কলিকাতা। এছাড়া কলিকাতা বাংলা সরকারের খাস দপ্তর। অসহায় উদ্বাস্তুদের কলিকাতা একটা আশ্রয়শিবির। কলিকাতায় ছোট মাঝারি বহু কলকারখানাও রয়েছে। কলিকাতার বক্ষ হতে চাপ কমান আশু প্রয়োজন, অনুমান করি। যাঁরা নতুন কল-কারখানা স্থাপনে আগ্রহশীল তাঁদের প্রতি আবেদন, স্থান নির্ব্বাচনটা বেশ ভেবে দেখতে। রাস্তাঘাট, যানবাহন ও বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রসারের ফলে অন্যত্রও কারখানা করা চলে; জমির দামও সস্তা। শুধু কারখানা নয়, লোকজনের বসবাসের জন্য জমির কথাও বিবেচ্য।

কলিকাতা হতে নিদেন পক্ষে কিছু কিছু সরকারি দপ্তরও স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন বলে মনে করি। আমি কোন মোগল বাদশাহের নকল করতে বলছি না। জমি বাড়ীর দাম কলিকাতায় খুব চড়া। সরকারি সম্পত্তি বিক্রয় করে ঐ অর্থে কলিকাতা হতে বেশ দূরে নতুন স্বতন্ত্র নগর পত্তন করা যেতে পারে। কার্য্যবশতঃ অন্য পাঁচজনেও বসবাসের জন্য তথায় যাবেন, বেসরকারি বাড়ী-ঘর দোকান পসারও গড়ে উঠবে। লাভ দ্বিবিধ। কলি-কাতার ওপর চাপ কমবে ও অন্য একটা নগর গড়ে উঠবে। বাংলা দেশেত কলিকাতার বাইরে নগর বলতে কিছু নেই। পাশ্চাত্য দেশের মাপকাঠিতে দার্জ্জিলিং এদেশে একমাত্র সুষ্ঠু সহর। যাহোক, কলিকাতায় যারা থেকে যাবেন, তাঁদের বসবাসের জন্য সহরটা ঢেলে সাজাতে হবে। বিশেষজ্ঞেরা নকসা ও পরিকল্পনা দেবেন। কলিকাতার রাস্তাঘাট, যানবাহনের ব্যবস্থা, বসবাস, খেলা-ধূলা প্রভৃতি চিত্তরঞ্জনের সকল ব্যবস্থাই শুধু উন্নততর নয়, সুন্দরও করতে হবে। করা কি সম্ভব? প্রথমেই বলেছি, ইচ্ছা থাকলে পথও পাওয়া যাবে। পাশ্চাত্যদেশেও অবাধ কলকারখানা ও বসতি স্থাপনের ফলে বহু জন-পদ বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছিল এবং এখন সংস্কারের ফলে নতুন কলেবর গ্রহণ করেছে ও করছে। লোকে সচেষ্ট হলে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। পূর্ব্ববার্লিন ভিন্ন রাজ্য, তথায় সাঁজে বাতি জ্বলে না, বাড়ীঘর পথঘাট এখনও পর্য্যন্ত অর্দ্ধভগ্ন। একই সহরের একাংশ এখনও হীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে, আর অপর অংশ অর্থাৎ পশ্চিম বার্লিন চেষ্টার ফলে কি প্রাণবন্ত ও প্রফুল্ল। উন্নত সহরের দৃষ্টান্ত এদেশেও রয়েছে। দার্জ্জিলিঙের উল্লেখ করেছি; এই কলিকাতা সহরেরই কোন কোন অঞ্চল অনেক সুষ্ঠু, কিন্তু তথায় কজনের স্থান আছে। পশ্চিম বার্লিনে ঘরবাড়ী কি পরিচ্ছন্ন, নয়নাভিরাম ও আরাম-দায়ক। বাসগৃহ, সাধারণ লোকের আয়ের পক্ষেও অপ্রাপ্য নয়। অবশ্য উল্লেখ করতে হবে তথায় এক-জনের আয়ে দশজন নির্ভরশীল নন এবং এক পরিবারে লোক সংখ্যাও কম। আর আকাশ, বাতাস, মুক্ত প্রান্তর, নদ-নদী, সরোবর, বন, উদ্যান সকলের পক্ষেই উন্মুক্ত ও উপভোগ্য। কলিকাতাবাসী তথা এই দেশের লোকে কি সুন্দর বৃহৎ জীবন হতে চিরদিন বঞ্চিত থাকবে? নিজেদের পৌরুষে আমরাও কি উন্নত শহর গড়ে তুলতে পারি না—যা অন্ততঃপক্ষে ভবিষ্যৎবংশীয়দের বসবাসের উপযুক্ত হবে। একটা মহানগরী কেবলমাত্র নগরবাসী বা অতিথিদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়, পরন্তু সমগ্র দেশের বৃহৎ স্বার্থের সঙ্গে তার যোগ। বহুজনের সৃষ্টিশক্তি, শিল্প-কৌশল ও চিন্তাধারার সে বাস্তব রূপ। বস্তুতঃ কলিকাতা বাঙ্গালীর পরীক্ষা স্থল।
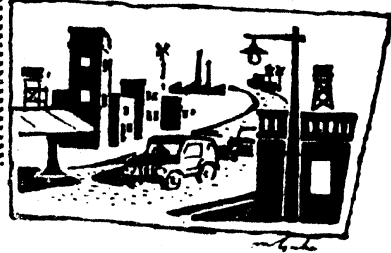
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এতখানি নীচে নামবে জীবন ঠিক ভাবতে পারেনি অশোক। কলেজের জন্য বাড়ীটা কিছু টাকা নিয়ে ছেড়েদিতে রাজী হয়েছিল তার মা। জীবনও ভেবেছিল, যা পায় তাই নিয়েই চলে যাবে।

কিন্তু ফাঁক থেকে পানু দাশ সব যেন ভেস্তে দিল। টাকা আর প্রলোভনে জীবনকে বিভ্রান্ত করতে তার দেরী লাগেনি। তার দুর্গাপুর কারখানায় ভাল কায দেবে—সেই সঙ্গে এ বাড়ীর জন্য, বাগানের জন্যও দাম দেবে ভালোই।

কথাটা গোকুলই পাড়ে চুপিচুপি, এককালে জীবনের বন্ধু ছিল, আজ এসেছে জীবনের বিপদে সাহায্য করতে।

জীবন তখনিই রাজী হয়ে যায়। সেই রাত্রেই পানুর জিপ তাকে নিয়ে চলে যায় সদরে।

কথাটা জানতে পারে যখন, তখন আর করবার কিছুই নেই। পাকা দলিলপত্র হয়ে গেছে। সাক্ষী ইসাদীও ঠিক করেছে রাতারাতি গোকুল।

ওই ধরণী মুখুয্যে আর ফনীবাবুই হল সনাক্তদার—অবনী রায় মূল ইসাদী।

...গজরায় এমোকালী।

রক্তের দোষ ছোটবাবু, শালা বেইমান। আর ওই গোকলে—কালীর অতীতের সেই দিনগুলো মনে পড়ে। সেদিন ওই পাপকে শেষ করে দিতে পারতো। তারকবাবুর খামারের আগুনে ফেলে দিলেই একটা পাপ শেষ হতো গ্রামের, কিন্তু পারেনি।

পানু দাশ! তাকেও ক্ষমা করতে পারে না। ভুবনকে কিনে নিয়েছে—কদমবৌ কেন অমনি করে মরল তা কিছুটা অনুমান করতে পারে।

...তিলেতিলে ওদের সমবেত অত্যাচার আজও বেড়ে চলেছে। তারকবাবুর দিন গেছে—ওরই প্রাসাদে তাই আর এক অভিশাপের মত আজ বাসা বাঁধতে চায় পানু দাশ—এ যুগের বনস্পতির গায়ে নোতুন পরগাছার মত।

সে দিন কিছু করতে পারেনি অশোক।

...রাত অন্ধকার। থমথমে বিরাট বাড়ীটার গায়ে ভারা বাঁধা, মেরামত সুরু করেছে পানু দাশ। ওপাশে তৈরী করছে গ্যারেজ,...বাগানের জায়গাটাও সাফ-সুতরো হচ্ছে বিদেশী গাছপত্র বসাবে। এদিক ওদিকে দু একটা আলো যেন হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। প্রাসাদের ভিত্তি-স্থাপনা হবে পানু দাসের। আবছা অন্ধকারে কাদের দেখে সরে দাঁড়াল অশোক গাছ গাছালির নীচে। ওরা এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ...হাসির শব্দ শুনে চমকে ওঠে অশোক।

...ও হাসির সুর তার চেনা। অতীতের কত স্বপ্ন-জড়ানো ওই হাসি।

প্রীতিকে আজও সে ভোলেনি।

ছায়ামূর্তিদুটো হঠাৎ যেন খুব কাছাকাছি এসে পড়ে, …চমকে ওঠে অশোক। পায়ের নীচের মাটি যেন থর-থরিয়ে কাঁপছে। পাশুর নিবিড় বন্ধনে কোথায় হারিয়ে যায় প্রীতি। সাগ্রহে কোন নবজাতক স্বৈরিণী নিজেকে ধরা দেয় ওই জানোয়ারের বন্ধনে।

দুচোখে ওদের উন্মত্ত আদিম লালসা।

…তারাগুলো চমকে ওঠে।

নিজেকে সরিয়ে নিয়ে হাঁপাচ্ছে প্রীতি অসহ্য উত্তেজনায়। বলে ওঠে,—সিলি বয়।

হাসির সুরে নিষেধ নয়—উন্মাদ আমন্ত্রণ ছড়ানো।

সরে গেল অশোক, পায়ে হাঁটা পথ দিয়ে পালাচ্ছে সে, ঘৃণা আর অসহায় ক্ষোভে জ্বলছে সারা মন।

মুখের উপর কে যেন তার তীব্র কশাঘাত হেনেছে।

ওদের হাসির শব্দ তখনও ধারাল ছুরির ফলার মত সর্বাঙ্গে বিঁধছে। পালাল অশোক। নিদারুণ অপমান আর অসহ্য জ্বালায় সে আঁধারে আত্মগোপন করল।

কোথায় যেন গিয়ে পড়েছে স্বপ্নের ঘোরে।

চমক ভাঙ্গে শিখার ডাকে—তুমি! হঠাৎ কোত্থেকে!

গ্রামের ওই বুকচাপা জঘন্য পরিবেশ থেকে নোতুন-ডাঙ্গার মুক্ত হাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল অশোক। কেন যে এই দিকেই এসেছিল জানেনা। একটা দুঃসহ জ্বালা, পোকায় ধরা সমাজের জীবনের সেই আদিম রূপটাকে বহুকাল পর দেখে শিউরে উঠেছিল।

তার মনের কল্পনা দিয়ে ভালবাসা দিয়ে যে মহিমাময়ী মূর্তির একটু অবশেষ ছিল, সেই মানসীর আজ চরম অপ-মৃত্যুতে ব্যথাই পেয়েছে অশোক, দুচোখের চাহনিতে তারই প্রকাশ। শিখার দিকে চেয়ে থাকে। ওর কথার জবাব দিল না।

—বসো!

শিখাও অবাক হয়ে গেছে ওকে এই অবস্থায় দেখে। বলে ওঠে অশোক—সব যেন বিশ্রী ঠেকে শিখা, সর্বাঙ্গে এর দগদগে ঘা, একে বাঁচানো যাবে না। বৃথা চেষ্টা।

শিখা কথা বলেনা। ওকে দেখছে গভীর সমবেদনার চাহনিতে। অতীতের দেখা সেই মন আবার তার সুরে ভরে ওঠে।

প্রথম ভালবাসা—সেই পাটনার গঙ্গার ধারে সন্ধ্যাগুলোকে ভেবেছিল মিথ্যা স্বপ্ন—বহু দেখা, বহু পথঘুরেও তাকে ভোলেনি।

যাচিয়ে নিয়েছে। দেখেছে অজ্ঞাতেই সে কোনদিন ভালবেসে ফেলেছে; আজ আবার নোতুন করে তাকে পরখ করতে সুরু করেছে। বলে ওঠে শিখা।

—ভালবাসার বোধ যেখানে নেই—সেখানে ওটা বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। আসল পুঁজি যার নেই—সেইতো চায় লুট করতে।

—হয়তো তাই!

অশোকও মনেমনে কথাটা বিশ্বাস করে। মনের দিকথেকে দেউলিয়া হয়ে যাওয়াটাই উচ্ছৃঙ্খলতার মূল-কারণ। ওদের দুজনেরই মন বলে কিছু নেই। তাই ওরা ক্ষণিকের লুটে নেওয়াটাই আনন্দের বলে মনে করেছে।

…মেঘ জমেছে, রাতের আকাশ ভরে উঠেছে পুঞ্জমেঘের আস্তরণে। বর্ষার ধারাস্নান নামে অতর্কিতে।

বৃষ্টি এল? ব্যস্তহয়ে ওঠে শিখা।

তাইতো! অশোক বিব্রত বোধ করে।

—একটু দেখে যাবেন না? শিখা ইতস্তত করে।

—না, ভেজা অভ্যাস আছে।

বেগে বের হয়ে যায় অশোক। শিখা ঠিক বুঝতে পারেনা। অশোক যেন তাকে এড়িয়ে গেল। রাত-নির্জনে দুজনের মনের এই সাময়িক একটা মিষ্টি সুরও শিখার মন ভরিয়ে তোলে।

জোরে বৃষ্টি নেমেছে।

ঝাপসা হয়ে আসে গাছপালা, আবছা হয়ে ওঠে আলোগুলোও।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে শিখা। অশোকের অতর্কিতে আসা—ওর চোখ মুখের সেই অসহায় বেদনাহত ভাব কেমন যেন বিচিত্র ঠেকে তার কাছে। অশোকের মনের বেদনাটা যেন প্রকাশ-পথ খুঁজতে এসেছিল তার কাছেই।

…কথাটা অশোকও ভাবে। কেমন একটা ভুল করে ফেলেছিল সে। শিখার মুখটা তখনও মনে পড়ে।

শান্তমধুর একটি অনুভূতি আনা চাহনি। বহু দুঃখ কষ্ট আর পথচলার অভিজ্ঞতায় জীবনকে দেখেছে।

…সফেন উচ্ছলতা নেই—আছে তাতে শান্ত সমাহিত একটি ভাব। শিখা আজ বুদ্ধির দীপ্তিতে সংযত অথচ ভাস্বর।

…বাড়ীর কাছে এসে দাঁড়াল। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে—গাছে পাতায় বৃষ্টির ধারাস্নান, মাটির বুক থেকে উঠছে মিষ্টি গন্ধ।…কলকলিয়ে জল চলেছে, মাঠগড়ানী জল।

বাড়ী ঢুকে অবিনাশকে বসে থাকতে দেখে অবাক হয় অশোক।

—তুমি!

অবিনাশ বলে ওঠে—ভিজে যে চুবে এসেছেন ছোটবাবু!

হাসে অশোক—বসো, কাপড়টা বদলে আসি। চলে গেল ভিতরে। অবিনাশ চুপকরে বসে আছে। মনে ওর খুশির সুর। বাইরে বৃষ্টির ধারাস্নান চলেছে, মাঝে মাঝে গর্জে ওঠে মেঘ—গুরু গুরু শব্দে। স্তব্ধ পৃথিবী কাঁপছে।

…একটা সুর—বৃষ্টির সুরের ধ্রুপদে পড়েছে মেঘ-মৃদঙ্গের গুরু গম্ভীর বোল তেহাই। মন কোন দূর স্বপ্ন জগতে ছুটে যায়।

…অনেক দূরে। এতদূরে কোনদিনই যায় নি। কোলকাতা—আসানসোল সহরে, এলাহাবাদ—বেনারসও গেছে বাজনা শোনাতে। আজ এসেছে আর ও দূর থেকে তার স্বীকৃতি।

—কি খবর?

অশোককে ঢুকতে দেখে ওর হাতে তুলে দেয় চিঠিখানা।

—ইংরাজী ফরম একটু ভর্তি করে দিতে হবে। তা যাবো ওখানে বাজাতে?

—খুশী হয় অশোক—নিশ্চয়ই যাবে। দিল্লী থেকে ন্যাশন্যাল প্রোগ্রাম পাচ্ছো—তারপর বিভিন্ন বেতার ষ্টেশনে চেইন প্রোগ্রাম—নিশ্চয়ই যাবে তুমি।

খুশীতে অবিনাশের মন ভরে ওঠে।

বৃষ্টি ধরে আসছে। থমথমে কালো আকাশ। বৃষ্টি ভেজা আমন্থর বাতাসে ভেসে উঠেছে বকুল গন্ধ।

…তখনও বিজলী ঝলসে ওঠে মাঝে মাঝে।

—ক'দিন পর ফিরবো ছোটবাবু।

—তাহোক, তবু যাবে তুমি। গ্রাম থেকে সবাই গেল শুধু নিজেদের পেটের ভাতের সন্ধানেই, ভিড়ে হারিয়ে গেছে তারা। তুমি যাবে এ মাটির থেকে জীবনের অমৃতসঞ্চয় নিয়ে দেশ-দেশান্তরের মানুষকে তারই স্পর্শ দিতে।

অবিনাশ ওর কথাগুলো শুনে চলেছে স্বপ্নাবিষ্টের মত। মন ভরে ওঠে একটি সুন্দর অনুভূতিতে, ওই তার মনের অতলের না-বলা-কথা—যে কথাটি সে বারবার বলতে চেয়েছে, প্রকাশ করতে চেয়েছে তার সুরে সুরে।

চুপকরে থাকে মিষ্টি।

দুচোখে ওর জল, বার বার জীবনে এসেছে এমনি নির্ভর, সান্ত্বনা। কিন্তু সবাই একে একে যেন তার হারিয়ে গেল।

হাসে অবিনাশ।

ফিরে আসবো মিষ্টি, তোদের ছেড়ে থাকতে পারবো না। এ মাটি এ গ্রাম এই পরিবেশ থেকে ভিন্ন আমি নই।

মিষ্টির মনে ভরসা আসে। যাদের এদ্দিন দেখেছি অবিনাশ সে জাতের নয়, এরা হারায় না।

—তোমার পথ চেয়ে থাকবো মিতে।

—আমিও।

অবিনাশ ওকে কাছে টেনে নেয়। তবু দুদিনের জন্য হারাতেও মন চায় না মিষ্টির। চোখের জল মুছে মনকে বোঝায়।

অবিনাশ চলে গেল দূর পথের দিকে।

ধরণী মুখুয্যে অবনীরায়এর দল স্তব্ধ হয়ে গেছে। ঠকেছে অবনীই সব থেকে। পানু দাশকে ফাঁক ফিকিরে সস্তায় তারকবাবুর বাড়ীটা কিনিয়ে দেবার পরই চানু কেমন কায গুছিয়ে নিয়ে সরে গেছে। কিছু দালালী দোব বলেছিল, তাও পায়নি। ক'দিন যাবার পর জবাবই দিয়ে দেয় পানু দাশ।

—অনেক পড়ে গেছে কাকা, ওসব আর দিতে পারবো না।

অবাক হয় অবনী। শেষ পাওনা পাবার আশায় বলে

ওঠে।—তবে সে সাঁওতাল কুলি কিছু ব্যবস্থা করে দেবে চাষবাসএর জন্যে।

—এ্যা। আমি বলেছিলাম? পান্থ যেন আকাশ থেকে পড়ে।

—না ছান্থ বলেছিল।

পান্থ বলে ওঠে—তাকেই বলুনগে।

পান্থ এড়িয়ে গেল। ছান্থরও সময় নেই। এদিকে বৃষ্টি নেমেছে। অফুরাণ বর্ষা। মাঠে মাঠে জল বাধিয়ে গেছে। লকলকিয়ে উঠেছে ওদের যৌথ চাষের বীজ ধান। সবুজ হয়ে উঠেছে সার গোবরে।

ভালো জমি ছাড়াও কঠিন ডাঙ্গার বুক ফেঁড়ে বার করা জমিতেও চাষ পড়েছে। নরম মাটিতে ওরা পাথনা দিয়ে ধান পোতবার আয়োজন করে চলেছে। মুনিষ কামিন যারা ছিল তারাই জুটেছে। বাউরীপাড়ার নিতে বাউরী হয়েছে সর্দার। কান্দী—পটু—গদাই আরও কজন বীজ পুতে চলেছে। নারাণ ঠাকুর মেঘজমা আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে খুশি ভরে, পায়ে হাতে জলকাদা—মাথায় আগেকার মত একটা গামছা জড়িয়েছে। মুখে চোখে খুশীর আভা। এই জীবনেই সে অভ্যস্ত—এ মাটির সঙ্গে আগেকার সেই হারাণো সম্বন্ধটা খুঁজে পেয়েছে।

—ছোটবাবু! অ অশোক।

অশোক বর্ষাতি চাপিয়ে আলের ওদিক থেকে আসছিল। হঠাৎ অবনী রায়ের ডাকে দাঁড়াল। পিছনে রয়েছে ধরণী।

—একটু কথা ছিল বাবা।

—বলুন। অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে।

—মানে, একেবারে কি পথে বসবো ছেলেপুলে নিয়ে? ওই তো জমির অবস্থা। পড়ে পড়ে জল খাচ্ছে—চাষ আবাদও নাই।

নিতে বাউরী এসে দাঁড়িয়েছে। ধরণীর দিকে চেয়ে থাকে। অশোকের আগেকার সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে, ধরণী মুখুয্যেই অতীতে একদিন নিতেকে মেরেছিল খামারে, এক আঁটি ধানও দেয়নি, মেরে বের করে দিয়েছিল—অস্বীকার করেছিল তার পরিশ্রমের মূল্য।

সেই ধরণী মুখুয্যে আজ অনুনয় করে।

—কোথায় যাবো বাবা। হ্যাঁরে নিতে—এতকাল তোরাই তো সব করেছিস। এবার না দেখলে কে দেখবে। কথাটা যেন আর্তনাদের মত শোনায়।

—একটু ভেবে দেখি। সময়ও আর নেই, হাতে অনেক জমি রয়েছে।

—আমাদেরও কথা ভাবো অশোক। সব গেছে—যাদের বিশ্বাস করতে গিয়েছি—সেইখানেই ঠকেছি।

হাসে অশোক—এখানেও ঠকবেন না এই বা বিশ্বাস কি?

অবনী রায় আজ যেন খানিকটা বুঝেছে। বলে ওঠে—সবাইকে নিয়ে যারা কায করে চলেছে এত বড় কায, আরও সবাই যাদের বিশ্বাস করে—সেখানে আমাকেও বিশ্বাস করতে হবে অশোক, আমিও যে তাদের একজন।

অশোক একটু আশ্চর্য হয় ওর কথায়। ঠকে ঠকেই বুঝেছে ওরা।

—বৈকালেই যাবো ওখানে। যা হয় করো। চলে গেল ওরা।

বৃষ্টির মেঘ ঢাকা থমথমে আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকে অশোক—দূরে শাল বনের মাথায় নেমেছে বৃষ্টির সাদা ছায়া; গান গাইছে মাঠের কোন চাষী।

সবুজ আর হলুদএ মেশামিশি। অশোক কি যেন দুস্তর সাধনার শপথ নিয়েছে—কঠিন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার শপথ। ওরা সবাই সুখী হবে—জীবনকে শত দুঃখ কষ্ট আর প্রলোভনের মাঝে সহনীয় করে তুলতে।

দূরে ভেসে আসে কারখানার ভোঁএর শব্দ। দুর্গাপুর কারখানার কাঠিন্যের পাশে তারা নোতুন জীবন গড়ার শপথ নিয়েছে। কঠিন এ পথ।

সবুজের মাঝে—এদের খুশীর মাঝে মাথা তুলে রয়েছে পান্থদাশের নোতুন বাড়ীটা—সাদা ঝকঝকে চুণকাম করা বাড়ী। তারক রায়এর জায়গায় ওই যেন বহাল হয়েছে, উদ্ধত শাসন আর শোষণের প্রতীক হিসাবে।

...ওর দলেও গেছে অনেকে; গেছে ভুবন—কদমবৌ। আশ্রয় পেয়েছে, প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, গোকুলের মত সমাজের পাপ অনেকে। বঞ্চনা করেছে জীবনরত্নকেও। বাড়ী ছাড়া উৎখাত করে মজুর হতে বাধ্য করিয়েছে।

...মাথায় তুলেছে সতীশ ভটচাযের মত ধর্মের বেসাতি করা ধূর্ত সম্প্রদায়কে; ওদের লোভের মূলে উৎসাহ দান

করেছে। গ্রহ নক্ষত্রের নজীর দিয়ে উৎসাহিত করেছে ফাটকাবাজীর খেলায়।

…বাড়ী উঠেছে সতীশ ভটচাযের। দোতলা বাড়ী। ‥এখন পাসুদাশ আর দুর্গাপুরের মহাজনরা তার মুখাপেক্ষী।…পোষাক আশাকও বদলেছে।

—গ্রামপ্রান্তে সেই নিরাশ্রয় গ্রামদেবতা ভৈরবনাথ তেমনিই অনাদৃত পড়ে আছে। সতীশ ভটচায ওখানে রস শাঁসের সঞ্চয় নেই দেখেই দেবতাকে আকাশের নীচে পরিত্যাগ করেই নিজের পথ দেখেছে।

তেমনি তেতুলতলাতেই পড়ে আছেন অনাদৃত শিলাভূত দেবতা। সতীশ ভটচায জানে মনে মনে—ওটা নেহাৎ পাথরই। আর কিছু নয়।

শিখাকে দেখে দাঁড়াল অশোক। বৈকালের ছুটির পর একটু বের হয়েছে বেড়াতে; ডাঙ্গার পরেই মাঠের সীমানা। মেঘ ভাঙ্গা গাঢ় হলুদ রোদ গাছগাছালির মাথা রাঙ্গিয়ে তুলেছে। পাখীডাকা বৈকাল।

—তুমি? এই জলকাদায়।

শিখা এগিয়ে আসে। অশোকের দিকে চেয়ে বলে ওঠে—দেখতে এলাম। সত্যি আমিই অবাক হই মাঝে মাঝে।

—কেন?

—ক বছরেই কত পরিবর্তন ঘটেছে।

হাসে অশোক—শুধু কি বাইরেই। এর ভিতর বাইরে বদলানো সুরু হয়েছে শিখা।

সন্ধ্যার আলো নামছে।

সুন্দর পৃথিবী, সবুজ শ্যাম শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। পাখী ডাকছে, দিনশেষের পরিক্রমা সারা কুলায় ফেরা পাখীর দল এল বিশ্রাম আর নিবিড়শান্তির নীড়ে।

…ভাবছি কিছুদিন বাইরে যাই—শিখা বলে ওঠে।

—কেন? কি একটা বেদনা অনুভব করে অশোক।

এতকাল ও মিশিয়ে ছিল এ মাটির সঙ্গে—ওর অভাবটা জানতে পারেনি। অবচেতন মনে পেয়েছে একটা ভরসা—জোর। এগিয়ে গেছে তার কাছে।

বলে ওঠে—যেও না শিখা! ওর কণ্ঠস্বরে, কি এক দুর্বার আকর্ষণে একটা প্রজাপতি উড়ে চলেছে ফুলের সন্ধানে বৃষ্টিধৌত ঘন সবুজ কোন পত্রাবরণের ওদিকে।

কথায় কথায় প্রান্তরের শেষে ঝুপিবনের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে তারা চড়াইএর মাথায়। যতদূরে চোখ যায় ঢেউ খেলানো সবুজ আর সবুজ, ওদিকে নোতুন ইস্কুল হাসপাতাল গ্রামসীমা।

…দূরে সন্ধ্যা নামছে, জেগে উঠছে ব্লাষ্টফার্নেসের আলোর ঝলক।

…শিখা চমকে ওঠে—কাঁপছে।

—তুমি যাবে না শিখা, অনেক দিন অনেক পথ ঘুরে দেখলাম, আমিও বাঁচতে চাই। তাই বোধ হয় চারিপাশ—আমার পরিবেশ আগামী মানুষের পরিবেশকে: সুন্দরতর করে তোলবার চেষ্টা করেছি।

শিখার সারা শরীরে কি এক বিচিত্র অনুভূতি।

চুপ করে থাকে সে। এ ভাগ্য তার কাছে কল্পনা।

বলে ওঠে অশোক—তুমি কি রাজী নও। অনেকেই হতে চায় না। টাকা—প্রভূত টাকা নেই, শুধু বেঁচে থাকা। তেমনি একটি মানুষকে কেউ স্বীকৃতি দিতে চায় না শিখা।

প্রীতির কথা মনে পড়ে। সেও ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে। শিখাও তাদের জাত। আর্তনাদ করে ওঠে শিখা।

—না-না। ও কথা বলো না। কিন্তু আমার পরিচয়, আগেকার ইতিহাস—

—এ যুগের পথে অনেক বাধা, পাপ দুঃখ ছড়ানো। তাকে এড়িয়ে নয়, স্বীকার করেই পথ চলতে হবে শিখা।

শিখা কথা বলে না, দুচোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রু। কাঁদছে সে।

…ওকে আজ কাছে টেনে নেয় অশোক। সংযত কণ্ঠে বলে ওঠে শিখা।

—চল, ফেরা যাক।

—হ্যাঁ!‥

ব্যাপারটা একজনের দৃষ্টি এড়ায় নি। সে প্রীতি। ক'দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। প্রশান্ত এখন বড় ব্যবসায়ী; পানুদাসের বন্ধু।

বাবার ওখানে নয়—পানুদাসের নোতুন কেনা ওই তারকবাবুর প্রাসাদে অতিথি। প্রশান্তও যেন নাগালের

বাইরে চলে গেছে। অবশ্য প্রীতির তাতে কিছু আসে যায় না।

তার পথেই চলেছে সে।…ব্যাকুল হয়ে জীবনের সব ঐশ্বর্য লুটে নেবার সন্ধানে চলেছিল—ব্যর্থ হয়েছে। হয়েছে তাই ব্যাকুল। মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছে।

…আজ বৈকালের ওই দৃশ্যটা দেখে মনে হয়—জীবনে এই প্রীতি—ভালবাসার স্পর্শ থেকে সে বঞ্চিত। অশোককে আজ স্বীকৃতি না দিয়ে পারে না। গ্রামে এসে অবাক হয়ে গেছে—এ কোন নোতুন করে গড়া গ্রাম।

…গড়ে উঠছে নোতুন ভবিষ্যৎ। মনে মনে তাই ওই অপরিচিতা শিখাকে হিংসা করে।… সরে গেল বনের অন্য দিকে।

…অশোক ফিরছে, তারকবাবুর প্রাসাদের নাম হয়েছে দাস-ভবন। বাগানের ধারে এসে থমকে দাঁড়াল। প্রীতিও দাঁড়িয়েছে ওকে দেখে।

—চলে যাবে অশোক; সেই রাত্রের নোংরা দৃশ্যটা চোখের উপর ভেসে ওঠে—আজ প্রীতি হারিয়ে গেছে। তাকে আর স্মরণেও আনতে চায় না।

প্রীতি হাসছে।—বাঃ বেশতো চাষার মত চেহারাখানা করেছ।

—দুধ ঘি খেয়ে মটর হাঁকাতে পারলাম কই। তাই রোদ জল সয়ে মাঠে মাঠেই ঘুরছি। দেখলাম—এ-ও বেশ আনন্দের।

চুপ করে গেছে প্রীতি—চোখ মুখে ফুটে ওঠে অসহায় একটা ভাব।

বলে—তাই ছিল ভালো অশোক, আগেকার সেই দিনগুলো। মনে হয় শুধু এখন দৌড়ুচ্ছি আর দৌড়ুচ্ছি। আশপাশের কাউকে দেখলাম না, চিনে আপন করে নিতেও পারলাম না। একদিন পথের ধারেই ব্যর্থ শূন্য হয়ে পড়ে যাবো মুখ থুবড়ে। এই দৌড়বাজীর পথে কেউ কারোও জন্য দাঁড়ায় না—দুঃখ বোধ করেনা—ভালবাসে না।

অশোক ওর কথায় একটু অবাক হয়। রাত অন্ধকারে প্রীতি যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে। অসহায় এ যুগের ব্যর্থ একটি কান্না।

বলে ওঠে—কই বললেনা—বাবার ওখানে যাওনি কেন? গিয়েছিলাম—কিন্তু বাবা বললেন—আমি নাকি স্বামীকে পরিত্যাগ করেছি, তাঁর ঘরেও আমার ঠাঁই হবে না।

—তাই নাকি! চমকে ওঠে অশোক।

হাসছে প্রীতি—কে কাকে ত্যাগ করেছে—কে জানে? তার শুনেছি এ রকম বান্ধবী আরও অনেক আছে। তার জবাব বাবাকে দিই নি। দিয়ে লাভ নেই—ভাবছি ফিরেই যাবো কলকাতার বাড়ীতে।

বলে ওঠে অশোক—তাই যাও। এখানে না থাকাই ভালো।

প্রীতি বলে ওঠে—হয়তো তাই। দেখতে এসেছিলাম এখানে কোথাও এতটুকু আমার চিহ্ন আছে কিনা। দেখলাম—কোথাও নেই কিছুই।

একটু থেমে প্রশ্ন করে প্রীতি—একদিন তুমি আমাকে ভালবাসতে—

—ওকথার আজ দামকি! থামিয়ে দিতে চায় অশোক।

—না, সব দোষ আমার। তোমাকে—কাউকে—নিজেকেই ভালবাসতে পারিনি অশোক। মনের সেই দৈন্যের জন্যই আজ দেউলিয়া হয়ে গেছি। সব আমার হারিয়ে গেল।

কথার জবাব দিলনা অশোক। মনে হয় আবছা অন্ধকারে প্রীতির ডাগর দুটো চোখ ছলছলে হয়ে ওঠে।

ওরা ওই ছুটে বেড়ানোর দলের অনেকেরই যেন এ গোপন মনের কথা। সেই দৈন্য ভুলতেই তারা নিজেকে ভুলতে চায়, গা ভাসিয়ে দেয় উচ্ছৃঙ্খলতা আর বিলাসের দুর্বার স্রোতে।

সরে গেল অশোক। সারা মন কি একটা দুঃখে বিধুর হয়ে ওঠে, দেখেছে এত বাহ্যিক আনন্দের অন্তরে অপরিসীম বেদনা, বুকজোড়া হতাশা আর কান্না।

…বাড়ী ফিরে থমকে দাঁড়াল।

সন্ধ্যার মেঘমেদুর আকাশে বেজে উঠেছে একটা সুর, তৃপ্তি আর আনন্দের সুর। শূন্যতার মাঝে ওর স্পর্শ সব দুঃখকে সহনীয় বরণীয় করে তুলেছে।

অবিনাশ-এর সানাই বাজছে। এ মাটির অন্তরের

অফুরান রূপ রস বর্ণ সম্ভার—বনসীমার সবুজ সানন্দসাড়া এমানুষের অন্তরের চিরআনন্দলোককে স্পর্শ করেছে।

…আবছা আলোয় দেখে রেডিওটা খোলা—দূর দিল্লী কেন্দ্র থেকে বাজাচ্ছে অবিনাশ, অবিনাশ বায়েন। পাতা-জোড়ার একটি মানুষ আজ সীমা থেকে অসীমের দিকে ঘোষণা করেছে এমাটির নাবলা সুর অধরা শ্যামস্পর্শ।

—ছোটবাবু!

…চেয়ে দেখে অশোক—স্বৈরিণী মিষ্টির দুচোখের জল। মুখে তার খুশির আভা।

—মিতে ফিরে এলে তুমি একটা মেডেল দিও উকে। হাসে অশোক, কালীচরণ আরও অনেকে।

অবিনাশকে আজ বাইরের জগৎ স্বীকৃতি দিয়েছে—অবিনাশের মাধ্যমে তারা স্বীকৃতি দিয়েছে এ মাটির মানুষের অন্তরকে—তার রূপ মাধুর্যকে।

মিষ্টির দিকে চেয়ে থাকে অশোক—ও বাঁচবার সঞ্জীবনী মন্ত্র পেয়েছে। অফুরান ভালবাসার স্বাদেস্পর্শে ও বেঁচে থাকবে, যার এতটুকু স্পর্শের জন্য কাঁদে রূপবতী ঐশ্বর্য্যবতী প্রীতি। কেঁদে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল কদম বৌ।

যার সন্ধান করেছে অশোক আর শিখা তাদের দুজনকে কেন্দ্র করে নিভৃত নিরালা কোন বনের সবুজে।

এ যুগের সব গ্লানি বেদনার গরল জ্বালা সইবার ওই যেন একমাত্র অবলম্বন।

সুরটা দুঃসহ কোন বেদনার সুরে বর্ণময় হয়ে ওঠে, বনতলে প্রজাপতি রঙ্গীণ ডানা মেলে ফিরছে ব্যাকুল বেদনায় ফুলের সন্ধানে। আকাশের তারার রোশনীতে মৃত্তিকার জন্য সেই চিরন্তন ব্যাকুলতা।

…অবিনাশ ওদের নাবলা কথা প্রকাশ করেছে সুরের স্পর্শে।

…বেঁচে আছে বৃদ্ধ অতুল কামার। চোখ দুটোতে ছানি পড়ছে। আবছা হয়ে আসে দৃষ্টি। মেজ ছেলে কার্তিকের ছোট বেটাকে নিয়ে পথে বের হয় মাঝে মাঝে।

হু হু বুক কাঁপে—মন কাঁদে।

ভুবন চলে গেছে দুর্গাপুর কারখানায়; কদমবৌ হারিয়ে গেছে কবে।

তবু বেঁচে আছে।

বর্ষার শেষ। ঢালু জমিতে সবুজের ইসারা। বনের দিকে চলেছে—চারিদিকে মাঠ, উষর প্রান্তরে আজ সবুজের স্পর্শ। রোদলেগে মেঘ ভাসা আকাশ রঙ্গীণ হয়ে উঠে—ওপাশে আবার কালো পুঞ্জমেঘ।

…নাতিটা বলে চলেছে।

—বুঝলা দাদু, সব সবুজ, লকলক করছে ধান আর ধান। দূরে ওই বনপর্য্যন্ত।

আঁধার দুটো চোখে কি যেন দেখবার চেষ্টা করে অতুল। ব্যাকুল হয়ে ওঠে—পারেনা। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে তার। আগামী দিনের ওই নাতির চোখেই দেখছে সে পৃথিবীকে।

—তারপর।

—উই একঝাঁক বক উড়ে আসছে দাদু, কারখানার দিক থেকে। চলেছে মাঠের উপর দিয়ে। শুনছ—

—হ্যাঁ!

বাতাসে ওই বলাকার পাখার শন শন বিধুনন। উষর মরুতীর হতে সুধাশ্যামল ধান ছায়া খেত বনতলের দিকে চলেছে তারা কালো মেঘের কোলে।

—মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে বুড়োর!…মনে উধাও ডানার ওই সুর।

সবুজ এর স্বপ্ন।

কার পায়ের শব্দে ফিরে চাইল বুড়ো।

—ছোট বাবু!

—হ্যাঁ।

—ভাবছি চোখ দুটোর ছানি কাটিয়ে আসবো। না'লে নোতুন করে দেখতে পাচ্ছিনা কিছু। ভেবেছিলাম—সবই গেল যখন তখন আর বেঁচে লাভ কি! দেখলাম—বাঁচার আনন্দ ফুরোয় না ছোটবাবু। তাইতো বাঁচতে চাই—দেখতে চাই আবার নোতুন পৃথিবীটাকে।

ছোট্ট ছেলেটা চীৎকার করে ওঠে—উই দাদু! আর এক ঝাঁক—

…সবুজ ধানখেত—যতদূর চোখ যায় সবুজ আর আগামী দিনের ফসলের সম্ভাবনায় তৃপ্ত ধরিত্রী। মেঘঢাকা আকাশবলাকা চলেছে।

পিছনে ভেসে আসে কারখানার ভোঁএর শব্দ—দূর পথ আসতে আসতে ওটা যেন বাতাসের স্তরে স্তরে হারিয়ে যায়।

ঘণ্টা বাজছে—ইস্কুলের ঘণ্টা। মৃদু গম্ভীর স্বরে কোন উদার আহ্বানের মত শব্দটা বৈকালের নির্জনখেত—বন-ভূমি চড়াই এর বুক ভরে তোলে।

অতুলের পাকা চুল উড়ছে—উড়ছে ওর জীর্ণ উত্তরী। পাশে দাঁড়িয়ে খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে ছোট্ট ছেলেটা উড়ন্ত বলাকার শ্রেণীর দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকছে।

—আয়, আয়—আয়।

ওরা উড়ে গেল—দূরে—অনেক দূরে।

বুড়োর বুজে আসা চোখে জল নামে—কদমবৌকে মনে পড়ে। এদিনে সে রইলনা।

সমাপ্ত

কুমারসম্ভবের চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

মহাভারতের বনপর্ব্বের অন্তর্গত কিরাতপর্ব্ব। মহাবীর অর্জ্জুন গিয়েছিলেন অস্ত্রের সন্ধানে হিমালয়ে। তিনি তপস্বী, বীর, মুনি, ঋষিদের নিকট শুনেছিলেন—বহু শক্তিধর দেবতা বাস করেন হিমালয়ে। ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, শূলপাণি শঙ্কর প্রভৃতি। এদের সন্তুষ্টি সাধন করতে পারলে অমোঘ-শক্তি অস্ত্র লাভ করা যাবে। জ্ঞাতিশত্রু কৌরবগণের সঙ্গে সংগ্রাম অনিবার্য্য। অস্ত্রগুরু দ্রোণ এখন কৌরব পক্ষে।

ফাল্গুনি আর কালক্ষেপ করলেন না। হিমাদ্রির উত্তর মধ্য পথ দিয়ে ক্রমশঃ পূর্ব্ব উপত্যকায় এলেন। মহাভারতকার বল্লেন, সেটি কিরাত দেশ। বড় গভীর অরণ্যে ভরা। দিবারাত্রির তারতম্য করা কঠিন। নদী প্রস্রবণ যত, আরণ্য প্রাণীও তত। ভয়াল সর্প, ভীষণ শূকর, ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র, তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা সরীসৃপ, সূচ্যগ্র শৃঙ্গ হরিণ, উগ্রচণ্ড মহিষ, বেগবান্ গম্ভীরহুঙ্কার বলীবর্দ্দ —সবারই স্থান কিরাত ভূমিতে। আবার কুসুমিত লতা, স্নিগ্ধ কোমল কৃষ্ণসার, বনকুহচারী ময়ূর ময়ূরী, মধুর কান্তস্বর কোকিল, কিরাত ভূমিতে যুগে যুগে সুখে থাকে। অর্জ্জুন এখানে এলেন শূলপাণির সাক্ষাৎ লাভের আশায়। কতদিন কেটে গেল সেখানে। মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর আকৃতি বণিতাসহায় কিরাতদের দেখা মেলে। প্রাণে সাড়া পান না—এরাই শূলপাণির আত্মীয় কিনা। শুধু মেলে, প্রত্যেকের হাতেই শূল (বর্শা)। প্রায় নগ্ন দেহ, পিঙ্গল উৰ্দ্ধ কেশজাল, নির্লোম তাম্রাভ মুখ। কণ্ঠে অস্থিনাল মালা, বাহুগ্রন্থিতে সদ্যমারিত সম্বর হরিণের চর্ম্ম। মণিবন্ধে অস্থিনাল মালিকা। আর মুখে কি এক অব্যক্ত দুরুচার্য্য সঙ্কেতের ভাষা। এমনি-ভাবেই মহাভারত বর্ণনা করে চলেছেন কিরাত দেশের, আর কিরাতি পরিবেশের কথা নিয়ে।

তা নিয়ে ভারত পুরাণের অধ্যায় ও সর্গগুলি এ যুগের পাঠকশ্রোতাদের মন আকর্ষণ করে মাত্র, মস্তিষ্কে নূতন ক'রে কোন কিছু জানার সম্ভাবণা আনেনা।

কিন্তু আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর মহাকবি কালিদাস তাঁর বিখ্যাত "কুমার সম্ভব" কাব্যে ঐ কিরাত দেশের একটি অদ্ভুতকর্ম্মা ও বরণীয় এবং ভারতীয়দের চিরপূজ্য দম্পতি জীবন নিয়ে অপরূপ এক কাব্য রচনা ক'রেছেন। সে কাব্য 'কুমার সম্ভব'। এই দম্পতি বাস করতেন কিরাত দেশ বা নাগদেশে। পর্ব্বতের একটি নাম নগ। নগের উপত্যকার বাসিন্দা নাগ। নগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় নগাধিরাজ, অপর নাম হিমালয়। নগ-রাজের বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাকবি অনেক কথাই লিখেছেন, তার মধ্যে বহুস্থলে যথার্থ সত্যেরও পরিচয় দিয়েছেন—

নাগভূমির কিরাতবৃন্দ যায় সিংহ শিকার করতে, পথ তো নাই, আছে শুধু পার্ব্বত্য শিলার বন্ধুর উপত্যকা, অরণ্যের গাঢ় আঁধার আর মাঝে মাঝে গলিত তুষার, তা হোক, কিন্তু পথ পাওয়া কষ্ট হয়না, গজ মুক্তা পড়ে থাকে সেখানে, ঐ চিহ্ন ধরেই তারা এগিয়ে চলে সিংহ শিকারে, আরণ্য গজ নিহত করে কেশরী যে দিকে গিয়েছে সেই দিকেই পড়ে থাকে তাদের নখরপাতিত গজ-মুণ্ডের মুক্তাবলী। আবার ক্লান্ত হ'য়ে যখন কিরাতের দল ফিরে আসে, নগরাজের ঝরণাকণায় মেশান বায়ুতে তাদের শরীর স্নিগ্ধ হয়।

মহাকবি সে দেশের বাসিন্দাদিগকে স্থানে স্থানে কিরাত বলেই আখ্যাত করেছেন। এই কিরাতের দেশ অর্থাৎ নাগ দেশের একটি মাননীয় পরিবার নগ পরিবার। সে পরিবারে মাননীয়া রমণী মেনকা, স্বামী তাঁর নগাধিরাজ। এঁর প্রথম পুত্র মৈনাক। ইনি নাগ বংশেই বিবাহ করেছিলেন।

মহাকবি লিখলেন,—

অস্যূত সা নাগবধূপভোগ্যং মৈনাকং

মল্লিনাথ লিখলেন—

নাগবধূপভোগ্যং—নাগকন্যাপরিণেতারম্।

তারপর আর একটি কন্যা হয়, তার নাম উমা। ইনি নাগ-কুলবীর শূলপাণি শঙ্করের ঘরণী হয়েছিলেন।

যে মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ, শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতি ছত্রে আর্য্যপ্রবর্ত্তিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ছাপ বারে বারে লিপিবদ্ধ করেছেন, সেই মহাকবি কুমারসম্ভব কাব্যের প্রথম দিকটির বর্ণনায় নাগবংশের কোন কথাতেই এতটুকু বর্ণাশ্রমের উল্লেখ করেন নাই। তবে আর্য্য আচার দিয়ে ভূষিত করেছেন।

তারপর উমার শৈশব যৌবনের অপরূপ অঙ্গলাবণ্যের মনোহর বর্ণনা। কেশাগ্র থেকে নখাগ্র পর্য্যন্ত, প্রতি অঙ্গের প্রতিটি ভূমিকা কি মাধুরীতে ভরা। কিন্তু বিমর্ষ হয় মন উমার নাসিকার জন্য, মহাকবি একটি অক্ষরও কোনছলেই নাসিকার জন্য পাত করেন নাই। নাগ দেশের নর-নারীর ঐ একটি অঙ্গেরই অনুল্লেখ রেখে দিতে হয়। যাঁরা নাগরমণীর যৌবনভরা মুখ দেখেছেন, তাঁদের কাছে স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্যে ঐ একটি মাত্র অঙ্গকেই নির্লেপ সাম্য দেখেছেন। মহাকবিও তাই এড়িয়ে গিয়েছেন।

সমগ্র নাগভূমিতে আজও একটি প্রথা বিদ্যমান। নাগাদের মধ্যে বহু বংশ থাকলেও খোকি,কেসারি,খাপেগা, মেজুর, কেলুরি,পোকরি, নিম্হরি, সোচরি, জোরি,জোহরি ইত্যাদি থাকলেও একটি ব্যাপারে প্রত্যেক বংশের মিল আছে। যৌবন আসার সঙ্গে সঙ্গেই রমণীরা আপন আপন প্রিয়তম নির্ব্বাচন করে নেয়। তারা প্রিয়তমকে বলে পণ্য, তাছাড়া তাতে যদি তারা বহুবল্লভাও হয় সে কোন দোষের নয়। মহাকবি কুমারসম্ভব কাব্যে এই ব্যাপারটি সাহিত্যের মধুররসে জীর্ণ করে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন।

নারদ একদিন নগরাজের কাছে উমাকে দেখে বলেই ফেল্লেন 'আপনার একন্যা বহুবল্লভা হবেনা, একপত্নী হবে এবং প্রেম দিয়ে হরের মন জয় করে নেবে।

সমাদিদেশৈকবধূং ভবিত্রীং
প্রেম্না শরীরার্দ্ধভাজাং হরস্য।

এ ইঙ্গিত নাগাদের দেশীয় প্রথাকে লক্ষ্য করেই। কারণ আর্য্য সংস্কারের কোন উচ্চ শ্রেণীর পরিবারের কন্যার জন্য এরূপ ভবিষ্যদ্ বাণী গৌরবের নয়, এবং বহুবল্লভা হবেনা একথা জানানও সম্মানজনক নয়।

মহাকবির আর একটি ইঙ্গিতও একান্ত সত্য। দেবী উমা যখন শিবসমীপে যাতায়াত করেন, তারই একটি দিনে, যেদিন মদনের বাণ নিক্ষিপ্ত হবে সেদিনের বর্ণনায় বলেছেন, পার্ব্বতী একখানি রাঙা কাপড় পরেছিলেন। সেটি মেখলা, নিতম্বের উপরে ছিল ফুলের মালা, সেটি বার বার শিথিল হয়ে পড়ছিলো।

নাগাদের মধ্যে আজও যারা প্রাচীন রীতিনীতি পরিত্যাগ করেন নি, তাঁদের চল্‌তি আচারে কুমাররা পরবে—কাল রঙের পীচ্যুঙ্ অর্থাৎ—একহাত চওড়া কাল রঙের মোটা কাপড়, তার গায়ে থাকবে লাল রঙের সুতোয় বোনা ফুল, চওড়া পাড়।

আর যারা বিবাহিত তাদের পরণে থাক্‌বে হাটু পর্য্যন্ত একখানি কাপড়, নাম তার জঙ্ গুপি। রঙটি হবে নীল। চারটি সাদা সুতোয় বোনা ফুল থাক্‌বে। আর তার চারদিকে তারার মত লাল দাগ। এই 'জঙ্ গুপি' কাপড় সহজে কেউ পরতে পায় না। অর্থাৎ বিবাহিত ও ভদ্র শান্ত হ'য়ে সংসার জীবন যাপন করা বিশেষ মেহনতের ব্যাপার। আসঙ্গলাভ যতই হোক, তাতে ফলাফল কিছু নেই, বীরত্ব ব্যঞ্জনাই থাকে তাতে, কিন্তু বিবাহিত জীবনের অব্যবহিত পূর্ব্বভূমিকা স্বল্প ব্যয়ে হয়না, বিশেষ ধরণের উৎসব হবে, কয়েকটা বস্তীতে নিমন্ত্রণ যাবে তাদের কাছ থেকে, বর্শা, ধান, সম্বর মাংস বন্যশূকর ইত্যাদি উপঢৌকন আসবে। বনিতা-সখা সবাই হয়, কিন্তু দাম্পত্য জীবন সকলের ভাগ্যে হয় না।

আর যে সব মেয়ে কুমারী হয়েই রয়েছে, তাদের কটি থেকে জঙ্ঘার ওপর পর্য্যন্ত এক খানি লাল রঙের কুমারী কাপড় জড়ান থাকে, এরও নাম 'পীম্যুঙ্। খোঁপায় থাকে খাসেম ফুলের মালা। এ মালা কেউ কেউ নিজস্বেও ঝুলিয়ে দেয়। আর সাধারণতঃ সব নারীই তার অনাবৃত

বক্ষের ওপর কড়ির মালা, হরিণের সরু কাল শিঙের মালা পরে থাকে। মহাকবির উক্তি—

আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং

বাসো বসানা তরুণার্করাগং। (কুমার)

তারপরেই—

স্রস্তাং নিতম্বাদবলম্বমানা

পুনঃপুনঃ কেশরদামকাঞ্চীম্।

এই প্রসঙ্গে মহাকবির আর একটি উক্তিও লক্ষণীয়। এই প্রবন্ধের প্রথমের দিকে সে কথার উল্লেখ করেছি। সেটি নাগকন্যাদের বহুবল্লভা হওয়া এবং নাগকুমারও বহুবল্লভ হলে তা দোষের নয়। উমা যখন শঙ্করের চরণে প্রণিপাত করলেন তখন তিনি তাঁকে আশিস বাণীতে বল্লেন,

'অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহীতি"

তুমি সেই পতি লাভকর যিনি আর কোন রমণীতে আসক্ত নন। মহাকবির লেখনীর চাতুরীতে নাগা দেশের সহজ আচারটি আর্য্য আচারের ছাঁচে নূতন রূপ পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আরও বল্‌তে হয়। মহাকবি উমার মাতৃপিতৃ পরিচয় দিতে পেরেছেন, এমনকি উমার ভ্রাতৃ-পরিচয়ও দিয়েছেন। টীকাকার সেখানে বলেছেন, যে মেয়ের ভাই না থাকে তাকে বিবাহ করা সমীচীন নয়, কিন্তু শঙ্করের বেলায় সে কথার উল্লেখ নাই। নাগ দেশের নিয়ম এই যে, যে মেয়েটিকে গৃহিণী করা হয় কিংবা সঙ্গিনী করা হয় তার মাতৃপিতৃ পরিচয় এমন কি বংশের পরিচয়ও জানতে হয়—বংশ বল্‌তে—থোকী, কেমারি, থাপেগা, মেজুর, ধেলুরি, পোথরি, নিহুরি, সোচরি, জোরি ইত্যাদি বংশ।

পুরুষের বেলায় তার বীরত্ব ও গোষ্ঠীমর্য্যাদাই বড়। মাতৃপিতৃ পরিচয়ের কোন প্রয়োজন নাই। এ ক্ষেত্রে হয়তো অনেকে বল্‌বেন, শঙ্কর ভগবান—তাঁর মাতৃপিতৃ পরিচয়ের সম্ভাবনা কোথায়?

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, প্রভৃতি আরও অনেক ভগবৎ স্বরূপ আছেন যাঁদের মাতৃপিতৃ পরিচয় জানা তো তাঁদের পূজা উপাসনার আর একটি অঙ্গ। কিন্তু শঙ্কর কি আরও অজ্ঞ কিছু? পরবর্ত্তী যুগে শঙ্করকে রুদ্রাবতার ব'লা হ'য়েছে। এই অবতারবাদ পুরাণের একটি নিজস্ব ধারা প্রবর্ত্তন। এ প্রবন্ধে তা অনালোচ্য।

মহাকবির কাব্যে নাগদেশের এবং নাগবংশীয়দের একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কিত ক'রেছেন, যা আজকের দিনেও নাগা পাহাড়ে এবং নাগাদের মধ্যে হুবহু মিল।

যৌবনান্তং বয়ো যস্মিন্ নান্তকঃ কুসুমায়ুধঃ

রতিখেদ সমুৎপন্না নিদ্রা সংজ্ঞা বিপর্য্যয়ঃ

অর্থাৎ নাগা পাহাড়ের অধিবাসীদের যৌবন থাকে অটুট, আর রমণীঘটিত ব্যাপার ছাড়া শত্রুতা হয় না, আর ঐ সম্পর্ক ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে নিদ্রারও অবসর হয় না।

সর্ব্বদা সতর্ক থাক্‌তে হয়, সর্ব্বদা অরণ্যে ভ্রমণ করতে হয়, নইলে তাদের জীবিকা হয় না, চাষ বাণিজ্য বলে তো কিছু নাই।

আর একটি চিত্র—

ভ্রূভেদিভিঃ সকম্পোষ্ঠৈঃ লক্ষিতাঙ্গুলিতর্জ্জনৈঃ

যত্র কোপৈঃ কৃতাঃ স্ত্রীণাং আপ্রসাদার্থিনঃ প্রিয়াঃ।

ওখানের যুবকসম্প্রদায় রমণীলোভে আকুল হৃদয়, নাগা যুবতীদের তর্জ্জন গর্জ্জন, ওষ্ঠাধরের দংশন ভীতিতেই কবলিত মন, যুবতীদের প্রসন্নতা সাধন ছাড়া অন্য সাধনার নামও নাই সেখানে। এই বিংশ শতাব্দীতেও তা একান্ত সত্য।

গৌরীর তপস্যা বর্ণনার ভিতর দিয়ে তখনকার এবং এখনকার নাগাদের একটি চিরাচরিত আচারকেই মহাকবি অপরূপ রূপ দিয়েছেন, যদিও তা পুরাণে আছে। সেটি হ'চ্ছে স্বয়ম্বর।

নাগা রমণীর বিবাহ হয় পরে, নির্জ্জনে এসে স্বয়ম্বরা হয় পূর্ব্বে। এটি আজও ঘটে। মহাকবির আর্য্য আচার বর্ণনায় সেটি তপস্যার রূপ নিয়েছে। বিবাহের অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে—সেই কন্যাকে বিবাহ করা চলবে কি না—কেউ এসে মেরাঙে মোড়লদের ব'ল্লে সে কথার যাচাই হয়, তারপর তারাই গিয়ে ঘটকালি করে এবং তীর ধনু বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র পাঠান হয়। আর সম্বর হরিণের মাংসও বিনিময় হয়। বিবাহের সময় কন্যা অন্য অলংকার পরে না, তার হাতে বর্শা, ছোরা, তীর, ধনু দেওয়া হয়, এবং খুব ধারাল খড়্গে মুখ দেখান হয়। আয়নায় নয়। এ রীতি বর পক্ষেও।

এ-কথাগুলি শুধু আজকের সত্য নয়। মহাকবিরও দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি গৌরীর বিবাহে তাঁর হাতে বাণ দেখেছেন। এ ছাড়া বিংশ শতাব্দীর নাগাকন্যারা যেমন

বিবাহের পূর্ব্বে সাদা সরষে এবং কচি দূর্ব্বার ছোট লতা ধারণ করে এবং নাভির উপরে একখণ্ড রেশমী কাপড় বাঁধে, গৌরীর বিবাহেও তাই।

সা গৌর সিদ্ধার্থ-নিবেশবদ্ভি-
দূর্ব্বাপ্রবালৈঃ প্রতিভিন্নশোভম্।
নির্ণাভি কৌশেয় মুপাত্ত বাণং
মভ্যঙ্গ নেপথ্য মলংচকার॥

কুমারসম্ভব ৭ম।৭ শ্লোক

নাগ জাতির জাতীয়তা এখনও এই রকম যে কোন বিবাহ উৎসবে কিংবা নিজেরই বিবাহে তারা নরকপাল (মাথার খুলি) মাথায় পরে, এবং মেরাঙ থেকে আনা ধুনীর ছাই গায়ে মাখতে হয়। শূলপাণির বিবাহের চিত্রে মহাকবি লিখছেন—

বভূব ভস্মৈব সিতাঙ্গরাগঃ
কপালমেবামলশেখর শ্রীঃ।

কুমার ৭ম।৩২।

নাগারা বীরের জাত, নরকপাল, নরমুণ্ড তাদের গৃহসজ্জার অঙ্গ, ভয়ঙ্কর ময়াল, এবং বিষধর পাহাড়িয়া সাপও তাদের গৃহশোভা এবং অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করে। বিবাহকালীন শঙ্কর—

"যথা প্রদেশং ভুজগেশ্বরাণাং
করিষ্যতা মাভরণান্তরত্বম।

কুমার ৭।৩৪

নাগরাজের গৃহের উদ্দেশে বহির্গত হবার সময়—

"আত্মানমাসন্ন গণোপনীতে
খড়্গে নিষক্ত প্রতিমং দদর্শ

কুমার ৭।২

তীক্ষ্ণধার ও উজ্জ্বল খড়্গে মুখদর্শন করলেন।

নাগকুলবীর ভগবান শঙ্করকে মহাকবির ভাষায় যেভাবেই চিত্রিত করা হোক না কেন তাতে তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রতি পূর্ণ মর্য্যাদা জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং নাগা জাতির পরিবেশ পরিজনেরও একটি নিছক চিত্রও কুমারসম্ভব কাব্যে প্রদর্শন করা হ'য়েছে। বহু পুরাতন ভারতের একটি চিন্তাধারা ছিল—বিশেষ শক্তিশালী পুরুষকে ঈশ্বর ব'লে স্বীকার করা। তাঁর আধ্যাত্মিক ও শারীরিক বলের বিশেষ ক্ষমতাকে 'বিভূতি বিকাশ' বলেও মানা হোতো, পূর্ব্বেই যে তা মানা হোতো তা নয় আধুনিক বা পরিবর্ত্তিত ভারতবাসীর জীবনধারাতেও সেই রেশ চলে আসছে। কালে কালে তা সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হলে তার সঙ্গে মন্ত্রতন্ত্রের ধারাও প্রবর্ত্তিত হোতো এবং বৈদিক সাহিত্যের নামধারার সঙ্গে অভিন্ন করে অবতারবাদও প্রতিষ্ঠা করা হয়। তা যাক্ সে কথা। প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তেও নাগা জাতির পরিবেশ পরিজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে এ প্রবন্ধটি সমাপ্তির দিকে আনি—

নাগলোকের ভূপ্রকৃতি

হিমালয়ের অন্যতম উপত্যকাকেই নাগা দেশ বলা হয়। এখানের ভূপ্রকৃতির বাহ্য রূপ বড় বন্ধুর ও আরণ্যক। ভারতের অন্য যে কোন প্রদেশের কৃষিজাত কিংবা গৃহপালিত ফল ফুলের চাষ আবাদ নাগাভূমিতে হয়না বল্লেই হয়, অথবা সে রকম চেষ্টাও যে লক্ষণীয় হয়েছে তা দেখা যায় না (স্বাধীন ভারতের আগে অবশ্য)। ভূমি খনন করে জল তোলা, কিংবা পুষ্করিণী করা কিংবা বাঁধ দিয়ে জলাধার করার কোন প্রয়াসই নাই সেখানে। প্রকৃতির স্বাভাবিক ঝরণাগুলিই সেখানের জীবন রক্ষয়িত্রী। নাগাভূমির আরণ্যক বৃক্ষ লতাগুলি ভারতের বৃক্ষ লতার পিতামহ পিতামহী এমনি তাদের আকৃতি। বৃক্ষলতার যে সব ফল ফুল হয় তাদের স্বাদ গন্ধও ভারতের ফল ফুলের সঙ্গে তুলনা করা যায়না, অথচ ভারী মনোরম। তবে নামগুলি আমাদের মস্তিষ্কে আলোড়ন আনে। ভেরপাং, জীম্বো, আখুসী, থাপুঙ্কু, খুঙ, গুঙ, এবং গুক্ আর লতাগুলির মধ্যে সাঙলিয়া, খেজাঙ, থাতাংবি, থাসেম, মেশিহেঙ, সাপেথ, খুঙ ইত্যাদি।

ওখানে প্রসিদ্ধ নদীটির নাম 'টিমু'। এই নদীর বহু ধারা আর ঝরণা বয়ে নাগলোকের জীবনকে সরস করে রাখে।

পথ ঘাট

সমস্ত দেশটাই লাল্‌চে তামাটে রঙের নুড়িতে ভরা পাহাড় ভাঙ্গা সরু সরু পথে আবদ্ধ, তাও সমানভাবে কোন একটা পথ আর একটার সঙ্গে মিশে যায়নি, একটা ঝরণায় গিয়ে শেষ হ'য়ে যায়। এসব পথ কিন্তু কারও তৈরী নয়, এই পাহাড় নুড়ির পথেই নাগারা স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করে।

তবে একমাত্র কোহিমা শহরটি সমতল, এখানে কতকগুলি বাঙ্গালী, আসামী, মাড়োয়ারী, গুজরাটি, ভুটিয়া এসে বাস করে এবং কিছু লোক নাগাদের দেশীয় জিনিষ কিনে বাণিজ্য করে।

বাণিজ্য দ্রব্য

নাগাদের আনা জিনিষ মানে পাহাড়ী শুক্‌না মরিচ, আনারস, পাহাড়ী আপেল, বাঘের চামড়া, হরিণের শিঙ, কস্তুরী, ওক কাঠ আর পাইন কাঠ এবং পাহাড়ী কমলা-লেবু।

খাদ্য

নাগাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য যদিও ভাত মাংস, কিন্তু সমতল ভূমির অর্থ না এলে এদের চাল সংগ্রহ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না, তাই এদের অধিকাংশ দিন বন্য মহিষের মাংস, বন্য শূকর মাংস, চিতা বাঘের মাংস, সম্বর হরিণ ও বন্য মুরগীর মাংস দিয়েই ক্ষুধার আহার্য্য সমাপন করতে হয়। আর প্রাকৃতিক কারণেই হোক অথবা স্বভাব-অভ্যস্ত কারণেই হোক, এরা বন্য মধু পান করে প্রায় সারাক্ষণ। সেই মধু বুনো হ'লদে মাছির তীব্র ঝাঁজ, রোহি মধু। এতে শরীরও গরম থাকে এবং পিপাসা কম লাগে

বাসস্থলী

নাগাদের মধ্যে যাদের যৌবনের তেজ কিছু কম হয়ে যাচ্ছে এমন বয়সেই এরা সাধারণতঃ ঘর সংসার করে এবং স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অনেকটা শান্ত হয়ে থাকতে চায়। তারা তখন গোষ্ঠীবদ্ধ হ'য়ে বাস করে। পাহাড়ের উঁচু গা কেটে কিংবা পাহাড়িয়া গুহা পেলে সেখানেই বাস করে। এরাই পাহাড়িয়া পণ্য নিয়ে বাণিজ্যে বের হয়। কিন্তু কোন সময়ই এরা রমণী-সঙ্গী না হয়ে থাকে না।

যারা কুমার এবং বৃদ্ধ তারা থাকে মেরাঙে। মেরাঙের অর্থ পবিত্র আশ্রম।

আকৃতি ও স্বাস্থ্য

নাগাপাহাড়ের রঙ যেমন খাঁটি তামার মত, তেমনি নাগা জাতিরও। চোখের রঙ পিঙ্গল। পুরুষদের মাথায় রুক্ষ ও খাঁচাখোচা চুলের বোঝা, কিন্তু চাকার মত রেখা টেনে মাথার চারদিক কামান। মাসের বেশীর ভাগ দিনই এরা কামিয়ে নেয়। মুখে গোঁপ-দাড়ি খুব কম। বুকের পরিধি প্রশস্ত, দৃঢ়, মাংসল, মধ্যস্থলে কোন লোম হয়না। বাহু দু'টি যেমনি বিশাল তেমনি তেজে ভরা। কটি থেকে উর্দ্ধাঙ্গ পর্য্যন্ত, শীত ঋতু ছাড়া অন্য ঋতুতে অনাবৃত থাকে। স্ফীত নাক, স্থূল অধর ওষ্ঠ। চোখ দুটি কারও কারও ভাসা ভাসা থাক্‌লেও সাধারণতঃ ছোট। চোখের মণিতে আদিম যুগের হিংস্রতা। কান বড়, হাতের থাবা যেমন, বড় আঙ্গুলের গাঁঠ তেমনি মোটা আর বেঁটে। নখগুলি ছাটে কম, হয়তো ধারাল অস্ত্রের কাজ করারই সুযোগ রাখে। হাতে বর্শা নাই এমন কেউ হাত দেখেছে বলে শোনা যায় না। পিতলের চাকা হয় এদের নারী-পুরুষের কানের অলংকার। মেয়েদের একটু বৈশিষ্ট্য রাখা হয়, সেই অলংকারের পাশে লাল রেকাটি ঝোলান থাকে।

সাধারণ নাম

সেঙাই, বেঙকিলান, রেঙ্কাকিল, সিজিটো, থাপেগা, জামাংসুর, পিঙলে, লিজানু, সাঙ্কাম থাবা, ওঙলে, জেভে-মাঙ, ফাসাও, নজলি, নঙলে, কাজা ইত্যাদি।

মেয়েদের নাম

বেঙসানু, সারুয়ামারু, শালুনারু, পলিঙা, উমিঙা মেহেলী, নাকপেলিবা, লিজামুলাঙ্টু, ইটিভেন নড়িলো, মাঙ্গেমা ইত্যাদি।

এদের সংকেত

নাগারা যখনই দূর পথে শিকারে বের হয়, সঙ্গে রমণী নিয়ে বের হ'লেও কিছুটা নিরাপদ স্থানে তাকে রেখে যায়, তার কাছে অস্ত্র তো থাক্‌বেই, আর থাকে একটি সংকেত বাঁশী। পাঁচ দশ গজের পর থেকেই অরণ্যের আড়াল পড়ে যায়, কেউ কাউকে দেখতে পায় না। তখন পরস্পর সংকেত বাঁশীতেই জানতে পারে পরস্পর নিরাপদে আছে কিনা এবং কোন দিকে কত দূরে আছে। সংকেত বাঁশীটি হচ্ছে দুখানি বাঁশের ফালি বা চেঁচাড়ি। একটুকরা কাপড় হাতে রেখে সেই বাঁশফালি দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করতে পারে। সেই শব্দেই বন্য বিপদের সংকেত করা যায় এবং শত্রুপক্ষের কোন বলাৎকার ঘটছে কিনা তাও জানা যায়। সব চেয়ে অদ্ভুত সেই শব্দের দ্বারা ওরা বলে দেয়, কোন দিক থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে।

যদি কোন সময় মেয়েরা অপর পক্ষে স্বেচ্ছায় বা

অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে তবে তখনি নিকটের ঝরণার ধারে গিয়ে বসে, আখণ্ড পাতা বিছিয়ে দেয় তাই হয় আত্মসমর্পণ। এই সময় আর কোন অত্যাচার করা নাগাদের মধ্যে জঘন্য অপরাধ। কিন্তু সেই রমণী তার হাতের মেরিকিৎসু (ছোরা), খেনিসী (হাতবর্শা) কিছুতেই হাত ছাড়া করবে না।

মেরাঙ্

নাগাজাতির কোন উপাস্য দেবদেবীর মঠ মন্দির নাই, কিন্তু সামাজিক রীতিনীতির পবিত্র নির্দ্দেশ তারা পালন করে মেরাঙ্ থেকে। যে গ্রাম বড় সেখানে থাকে কয়েকটা মেরাঙ্। মেরাঙ্ না থাকলে গ্রামের মর্য্যাদা থাকেনা। মেরাঙ্ মানে আশ্রম। চারিত্রিক সৌন্দর্য্য তার ভিত্তি। মেরাঙে থাকে কয়েকজন হারান যৌবনের মানুষ। এরা মোড়ল। এরা গ্রামের কাজের উপদেশ দেয়, বিবাহের পূর্ব্বে এদের কাছ থেকে রমণীর পরিচয়, বংশমর্যাদা যাচাই হয়। অর্থাৎ কোন বাড়ীর মেয়ে এটি। যে বাড়ীতে বীর, পরপক্ষ বিজয়ী, ভয়ঙ্কর মানুষের মুণ্ডশিকারী জন্মেছে, তারই মর্য্যাদা বেশী। মেরাঙে কিন্তু মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ।

মেরাঙ তৈরী হয় পাহাড়ী বাঁশ দিয়ে। দরজাও বাঁশের। ছাউনী হয় পাহাড়ী লতা পাতায়। যেগুলিতে বন্য ধানের খড়ের ছাউনি থাকে, তার মর্য্যাদা বেশী। মেরাঙের দরজা থাকে জানালা থাকে, না। দরজার দু' পাশে বড় দুটো বর্শা থাকবেই। বর্শার মাথায় গাঁথা থাকবে বন্য মহিষের মাথা। ঘরের ভিতরে দেওয়ালে আঁকা থাকে বীভৎস জন্তুর আকৃতি। বন্য মহিষের রক্তে আঁকা। এ খুব মাঙ্গলিক চিহ্ন। ঘরগুলি ৩০ হাতেরও উঁচু হয়। দেওয়ালও বাঁশের। তাতে ঝোলান থাকে বাঘের মাথা, সম্বরের লেজ, মানুষের কঙ্কাল। কোনো কোনো মেরাঙে মানুষের মাথাও থাকে।

মেরাঙের পরিবেশ

মেরাঙকে ঘিরে—নাগারা কুটির বাঁধে। ওই তাদের গ্রাম। মাঝে মাঝে সরু সরু পাহাড়ী পথ। পথের দু-পাশে বাঁশের মাচা। এই মাচায় তারা শোয়, যারা অবিবাহিত, আর যারা ভোরে শিকার করতে বের হবে। যারা বিবাহিত তারা মাত্র শিকারের পূর্ব্বরাত্রিই মেরাঙে কাটায়, কারণ অপবিত্র দেহ বাস নিয়ে শিকার যাত্রা ঘৃণা ও পাপের।

মাচার ওপরে নীচে রাশীকৃত বর্শা, তীর, ধনু, ঢাল, কেৎসু রাখা হয়, শত্রু যেন ভুলক্রমেও এখানে এসে না পড়ে। শীত নিবারণের দড়ির লেপ ব্যবহার করা হয়। (দড়ির লেপ কুটির শিল্প, মণিপুর কোহিমায় কিনতে পাওয়া যায়)।

কৃষি

সমতল ভূমি পেলে নাগারা চাষও করে, তবে সমবায় নীতিতেই ওদের চাষ, সে সব ক্ষেত্রে ধানের চাষ, শশা, টেরিসা ফল, বন কলা, রাহমু ফল, জোয়ার।

ঘর সংসার

নাগা মহিলাদের বয়স ৩৫।৪০ পার হলেই ঘর সংসারের জন্য শিল্পচর্চ্চা রাখে। দুপুরের আলস্য তাদের কম। পুরুষরাও যোগ দেয় সে সময়টা। বাঁশের চাঁচাড়ি, এবং তাই দিয়ে তুলোর পাঁজ, সুতো, আর সেই সব সুতোর লেপ। এগুলি নিজেরা কোহিমার বাজারে বেচে এবং বিনিময়ে সূঁচ, সুতো, নুন কেনে। বেতের ঝুড়ি, বেতের মোড়াও করে।

সময় কাটাবার উপকরণ নিয়ে কুটির শিল্প গড়বার ফাঁকে ফাঁকে ওরা শোনে ধর্ম্মের অতি-কাল্পনিক কাহিনী। কাহিনী শুনতে ওদের খুব উল্লাস। কিন্তু তাতে অবিশ্বাস-মূলক একটি কথা কইলেই বিপদ। তাই নিয়ে বিষম হত্যাকাণ্ডও ঘটে যায়। কাহিনীগুলি কিন্তু সমতলবাসী হিন্দুদের ধর্ম্মীয় চরিত্রেরই উপকথা। সমতলবাসীদের বলে আসান্যরা। পাদ্রী খৃষ্টানদের সঙ্গে মেলামেশার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নাগারা সমতলবাসীদের সৌহার্দ্দ আগ্রহের সঙ্গে কামনা করতো, কিন্তু পাদ্রীরা তাদের এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছে যে নাগাদের সমতলবাসীরা পরম শত্রু।

প্রাকৃতিক বর্ণনা আর ফসল তোলা এবং দৈব কোপ নিয়ে এরা সহজ প্রকৃতির গান গায়। সুর যেন ভারতের সাঁওতালী। মেয়েরাই গায় বেশী। পাদ্রীদের দয়ায় নাগারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদল প্রাচীন আর একদল নবীন। প্রাচীন পন্থীরা—কোহিমা, মোকচন্ন সহরে ছেলেমেয়েদের যেতে দেয় না। তাদের বোঝান হয়—ওরা শয়তান। একান্ত আবশ্যকীয় নুনটুকুর জন্য

ওরা মেরাভের মারফৎ সংগ্রহ করে তবুও তারা সহরে যাবে না।

আর নবীনের দল (আজকাল এদের সংখ্যাই বেশী) পাদ্রী খৃষ্টানদের আহার ব্যবহারে বিশেষ রপ্ত হয়ে পড়েছে, ফাদার তাদের জীবনে সর্ব্বময়। শিক্ষা দীক্ষা সবই ফাদারদের গড়া বিদ্যালয়ে (স্বাধীন ভারত হওয়ার পর হিন্দী ভাষা অবশ্যপাঠ্য এবং তারই মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ চলছে)।

এইভাবে নাগাদের গড়ে তুলতে পাদ্রী খৃষ্টানদের অনেক বেগ পেতে হ'য়েছে। বাণিজ্য বিনিময়ের মাধ্যমে প্রচুর টাকা ঢেলে দিয়েছে তারা, প্রলোভন ছিল টাকা। উৎকৃষ্ট কাপড়, জামা, নুন, চমৎকার রান্না-করা মাংস। এরজন্য কিন্তু অনেক ইওরোপবাসীকে প্রাণও দিতে হয়েছে, তবু তারা সে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের ভূমি হ'য়েও ভারতবাসী নিজেদের কোন ধর্ম্ম, কোন সংস্কৃতি প্রচার করে নি। পাদ্রীরা শুধু একটি সর্ত্ত রাখে 'ক্রশ' আঁকো, 'ক্রশ' পর। আর সামান্য শিক্ষিত হলেই মেরী ও তাঁর পুত্র যীশুর নাম লও। পাদ্রীরা নাগাদের কাছে ফ্রেণ্ড (নাগা ভাষায় আসোহায়া) হয়ে আছে।

গৃহধর্ম্মের প্রতীক

বাঙ্গালীর বাড়ীতে যেমন উঠানের সামনে বাগানের ধারে একটি মনসা কিংবা তুলসী গাছ পোঁতার রীতি আছে, নাগাদের মধ্যে আছে একটি গোল পাথর বসান থাকে, সেটি প্রেত-আত্মার প্রতীক। কোন অশুভ কথার আলাপে কিংবা কোন নিকটআত্মীয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এরা তৎক্ষণাৎ সেই পাথরটির কাছে মুরগী বলি দেয়।

চিকিৎসা ও চিকিৎসক

প্রাচীনপন্থী নাগাদের মধ্যে চিকিৎসা ব্যাপারে একটি অদ্ভুত রকমের ব্যবস্থা আছে। নাগাদের ধারণা মানুষের শরীরে সহজে কোন ব্যাধি হয় না, ব্যাধির হেতু কোন প্রাকৃতিকও নয়। তবে যে ব্যাধি হয় তা 'অনিজা'র জন্য। অনিজা আরণ্য দেবতা। তাঁর পূজা না হ'লে কিংবা তাঁর কাছে কোন অপরাধ করলে মানুষকে তিনি কষ্ট দেন, ব্যাধি দেন, ক্ষত বিক্ষত করে দেন। এ জগতের কোন কিছুর সঙ্গে তাঁর তুলনা করলে তিনি কুপিত হন।

যখনই অনিজার কোপ হবে তখনই তামন্থ্যকে ডাক্‌তে হবে। তামন্থ্য মানে চিকিৎসক। তামন্থ্য লতাপাতার রস খাইয়ে মাখিয়ে বলে দিতে পারেন অনিজার কোপ কমছে না বাড়ছে। রোগের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে মুরগীর বলিদানের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হবে। তামন্থ্য অনিজার প্রতিনিধি। তাঁর সম্মাননা করতে হয় (ভিজিট) ধান, জোয়ার, বর্শা। তাঁর কথায় কোন সন্দেহ ক'রতে নাই।

মৃতদেহের সৎকার

অনিজার কোপেই যখন মানুষের ব্যাধি ও মৃত্যু; তখন তার দেহের অবশেষকৃত্য নিয়ে মানুষের করবার কিছু নাই, অলক্ষ্য শক্তি অনিজার উদ্দেশ্যেই তাকে ত্যাগ করতে হয়। তাই তারা খুব উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে মৃতদেহকে গভীর খাদে গড়িয়ে দেয়।

তবে এমনও ঘটেছে মৃত্যুর প্রকৃত স্বরূপ জানতে না পেরে অনেকের দেহকে এমনিভাবে গড়িয়ে ফেলে দিয়েছে—তারপর সে হয়তো কোনও রকমে বেঁচে গেলে তার আবাসভূমিতে সে আর ফিরে আসতে চায় না, ডাইনী তাকে গ্রাস করেছে এমনি কাণ্ড ঘটিয়ে দেবে আত্মীয় স্বজন। এইজন্যে অনেকে সত্যি সত্যি ডাইনী হয়ে—কোন গুহায় একা থাকে।

তাছাড়া আর এক রকম ডাইনী হয়—যে সব পুরুষ বা রমণী নিজেদের জৈবক্ষুধার বাসনায় অতৃপ্ত থাকে অথচ দেহের বল লাবণ্য আর কাউকে আকর্ষণ করে না তারা নিজদিগকে ডাইনি সংজ্ঞায় আখ্যাত করে গ্রামের একটু দূরে বাস করে। সবে মাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের প্রলুব্ধ মনকে নানা রকম জড়ী-বুটীর সাহায্যে, পোড়া চুল, কিছু ছাই লোম, নখ, ইত্যাদি দিয়ে এবং অদ্ভুত উদ্ভট শব্দ করে—বলে তোর অভীষ্ট সিদ্ধি হবে। ধান, জোয়ার, বর্শা মাংস, আমার জন্যে নিয়ে আয়।

এরা আবার অনেক সময় নায়ক নায়িকার ঘটকও হয়। ঘটক মানে টেকোয়েভ, কেজিমু!

নাগাজাতির মধ্যে শ্রেণী ভাগ আছে, তাদের মধ্যে

লোহটা নাগা, আঙ্গানী নাগা, সাংটানা নাগা—এরা বংশ মর্য্যাদা অপেক্ষা শ্রেণী মর্য্যাদায় কুলীন। এদেরই বংশে রাণী গাই-ডিলিও ছিলেন শিক্ষিতা রমণী, এবং ইংরাজ বিদ্বেষী ও গান্ধীজীর অনুরাগিণী। পরে তিনি প্রকাশ্য অহিংসা সংগ্রামে যোগ দিয়ে বৃটিশের কারাবরণও করেছিলেন। তিনি নাগাদের মধ্যে প্রাচীন পন্থায় আস্থা রক্ষা ও পাদ্রীদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকার জন্য নাগাদিগকে উদ্বুদ্ধ করতেন।

বর্ত্তমান নাগা সম্প্রদায়ের সামাজিক উন্নতি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে থাকলেও প্রাচীন পন্থীদের সংখ্যা কম নয়।

বাংলার লোকশিল্প

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলার পল্লী চিত্রের প্রকাশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নগরে দেখতে পাওয়া যায়। পটের উপর ছবি আঁকা, মাটির পাত্রের উপরে, বসবার পিঁড়ি, পাটি, কুলা, ধুনুচী, বাঁশ ও বেতের জিনিষ প্রভৃতির উপর নানা ধরণের রংয়ের মিশেল দিয়ে ছবি আঁকার অভ্যাস বাংলা দেশের প্রায় সব জায়গাতেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যেমন পূর্ববঙ্গে তেমনি পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের চিত্র চর্চা খুবই উল্লেখযোগ্য। ছবি আঁকার সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর নিবিড়তর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ব্রত, পূজা, ধর্মীয় উৎসব প্রভৃতি উপলক্ষে গ্রামের মেয়েরা দিশী উপকরণ দিয়ে ছবি আঁকতেন। নানা জিনিসের উপর ছবি আঁকা বা চিত্রকর্ম করা ছাড়াও দেওয়ালে ছবি আঁকার প্রথা গ্রাম অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম অঞ্চলে দেশজ চিত্রকর্মের অনেক সুন্দর, সুন্দর নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ ক'রে দেওয়ালে আঁকা ছবির অনেক নমুনা পল্লী অঞ্চলে দেখা যায়। বিলিতী মতে যাকে ফ্রেস্‌কো পেন্‌টিং বলা হয়, তেমন ধরণের ছবি সাধারণ গ্রামের লোকেরাও আঁকবার চেষ্টা করে। সেই জাতের ছবি আঁকা হয় ঘরের দেওয়ালে, ঘরের পাশে প্রাচীরের গায়ে, গ্রামের কুয়োর ধারে, ইঁটের গাঁথুনীর কোন পাকা দেওয়ালের উপর, আবার অনেক সময় ফুল, ফল গাছের চারদিকে যে বেড়া দেওয়া থাকে সেই বেড়ার উপর কাপড়ের আস্তরণ দিয়ে তার উপরেও গ্রামীণ শিল্পীরা ছবি এঁকে থাকেন। এই ধরণের দেওয়ালের উপর আঁকা ছবি বিশেষ ক'রে বীরভূম, বাঁকুড়া ও ২৪ পরগণার পল্লী অঞ্চলে অনেক দেখতে পাওয়া যায়। সাঁওতাল পল্লীগুলোতে দেখা যায় মাটির ঘরের কাঁচা দেওয়ালের উপর। সাঁওতালী গৃহস্থ পুরুষ ও মেয়েদের আঁকা চমৎকার সব ছবি, ফুল, ফল, হরিণ, বাঘ, ছাগল, লতা, পাতা, পাখী সাঁওতালদের রোজ দেখা এমনি সব নানা জীবজন্তু ও বস্তুর ছবি। শিল্পীরা অব্যক্ত সৌন্দর্য্যকে কত লীলায়িত ভঙ্গীতে, কি মনোরম পরিবেশের মধ্যে প্রকাশ করেন। আর সেই প্রকাশ হয়ে ওঠে খাঁটি দেশজ শিল্পের বিচিত্র রূপায়ণ। দেওয়াল চিত্রের প্রচলন পূর্ববঙ্গে তেমন ছিল না। তার কারণ বোধহয় এই যে পূর্ববঙ্গ নদীবহুল অঞ্চল, সেখানকার মাটি খুব নরম। নরম মাটিতে শক্ত কাঠ আর বাঁশ দিয়ে ঘর তৈরী করতে হয়। কারণ মাটি দিয়ে ঘর তৈরী করলে সেই ঘর খাল, বিল, নদীর জলের তোড়ে টিঁকতে পারে না। তবে দেওয়াল চিত্রের নমুনা না দেখা গেলেও পূর্ববঙ্গে অন্য কতকগুলো বিশেষ ধরণের শিল্প কর্মের প্রচলন ছিল। চালের গুঁড়ো দিয়ে আল্পনা দেওয়া, কাঁথা, বালিশের ঢাকনা, বরণ ডালা, নারকেলের দড়ি, শিকা, চিত্রিত পিঁড়ি, কাঠের পুতুল ইত্যাদি বিচিত্র শিল্প তাঁরা নিজের হাতে গড়ে তুল্‌তেন। গ্রামের লোকদের নিজ হাতে তৈরী এই বিচিত্র লোকশিল্প গ্রামের হাটে, ঘাটে, মাঠে,

গ্রামের মেলায়, বৈঠকী মজলিশে সব জায়গায় পরম আদরের সঙ্গে গৃহীত হ'তো, সবাই এই শিল্প-সৃষ্টিকে সম্মান করতো, ভালোবাসতো। পূর্ববাংলা এমনিতেই লোকসঙ্গীতের দেশ। পূর্ববাংলার আকাশে, বাতাসে, নদীর জলধারায়, মেঘের হাল্কা ভেলায় করুণ মধুর লোকগীতির আশ্চর্য ছায়াপাত রয়েছে, আর সেই সঙ্গে আছে সংগীতরসিক দরদী মনের শিল্পানুরাগ। পল্লী বাংলার জনসাধারণ নানা জিনিসের মধ্যে শিল্পকে রূপায়িত করে থাকেন। শিল্পের প্রভাব অক্ষর পরিচয়ের মধ্যেও আছে। সরল ও বাঁকা রেখায় রেখায়িত ক'রে অক্ষর রচনা করা হয়। যেমন 'ক' লিখতে সরল ও বাঁকা দুই জাতের রেখার প্রয়োজন। বর্ণ পরিচয়ের মধ্যেও শিল্প-বোধের পরিচিতি নিহিত আছে। পল্লী অঞ্চলের মেয়েরা দেখা যায় গোবর দিয়ে মাটির ঘর লেপে, তারপর ঘরের দেওয়ালে আল্পনা দেয়, চিত্র অঙ্কন করে। দেওয়ালে আঁকবার জন্য রং হিসেবে কালো, লাল, সাদা, রঙ্গীণ মাটি প্রভৃতি তাঁরা ব্যবহার করেন। পদ্মফুল, দুর্গা মূর্তি, গণেশ মূর্তি, লক্ষ্মী মূর্তি, তারপর ফল, ফুল, গাছ, লতা-পাতা এমনি সব জিনিস হয়ে ওঠে ছবির বিষয়বস্তু। এই সকল বস্তুকে নানাভাবে অলঙ্কৃত করে তারপর আঁকা হয়। আবার কোন কোন ঘরের দেওয়ালে শুধুমাত্র আল্পনা দিয়েই চিত্রকর্ম করা হয়ে থাকে। আল্পনার ধরণ আবার অনেক রকমের। পদ্মফুল, লতা, ধানের ছরা আর মানুষের পা প্রভৃতি দিয়ে আল্পনার পরিকল্পনা করা হয়। অজন্তা গুহার ভিতরে দেওয়াল চিত্রগুলোর মধ্যে দেখা যায় পদ্মফুল কত বিচিত্রভাবে কত অগুনতি সংখ্যায় আঁকা রয়েছে। অজন্তার গুহাচিত্রে পদ্মফুলের অন্তহীন বৈচিত্র্য-প্রাচুর্যের জন্য অনেক বিশিষ্ট শিল্প সমালোচনা অজন্তার গুহাচিত্রের মধ্যে বাংলাদেশের শিল্প চর্চার আভাস দেখতে পান। বৌদ্ধ সাহিত্যে পদ্মফুল পবিত্রতার প্রতীক, বৌদ্ধধর্মের মূল ভাবধারার মধ্যেও পদ্মফুল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। সেই কারণে অজন্তার গুহা চিত্রে প্রচুর পদ্মফুলের নিদর্শন থাকা সম্ভব। তবে অজন্তার চিত্রে বাংলাদেশের চিত্রকলার প্রতিভাস কতটুকু রয়েছে, তা আলোচনা ও বিচার সাপেক্ষ হলেও অজন্তার শিল্পকলা যে বাংলার শিল্পকে প্রচুর পরিমাণে প্রভাবান্বিত করেছে তা'তে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অজন্তা গুহার ভেতরে যে দেওয়াল চিত্র তা একজনের আঁকা নয়, একই সময়ে আঁকাও নয়। বহু শিল্পী বহু বছর ধরে তিল তিল করে ঐ আশ্চর্য সুন্দর চিত্রাবলী অঙ্কিত করেছেন। আর গুহার ভেতরে আঁকা বলে শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরেও ঐ শিল্প অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কিন্তু সাধারণ পল্লী অঞ্চলের বাসগৃহের দেওয়ালে যে চিত্র অঙ্কিত হয় তা তো এত দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারে না। ঘরের দেওয়ালের চিত্রমাত্র অল্প কিছুদিন স্থায়ী থাকে। আর ঐ চিত্র সাধারণভাবে একজন শিল্পীই এঁকে থাকেন। মাটির ঘরের দেওয়ালে চকখড়ির রং, গেরি মাটির রং বা বিভিন্ন জাতের সহজ লতাপাতা পচিয়ে তার রং দিয়ে যে বিচিত্র সব ছবি আঁকা হয়, সেই ছবি বেশীদিন স্থায়ী থাকে না। বীরভূম, বাঁকুড়া ও সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালী পল্লীগুলোর মাটির ঘরের মাটির দেওয়ালে এমনি অনেক ছবি দেখতে পাওয়া যায়। খুবই স্বল্পশিক্ষিত বা প্রায় নিরক্ষর সাঁওতালী পুরুষ আর মেয়েদের শিল্পবোধ আশ্চর্য সুন্দর। মনে হয় তারা যেন নিঁখুত শিল্পকলাকে আশ্রয় করেই বেঁচে থাকে। সম্পূর্ণ দিশী মাটির রং দিয়ে ছবির চিত্রণ ছাড়াও সাঁওতালী মেয়ে পুরুষরা নৃত্য-গীতেও খুবই পটু। সাঁওতালীদের দেখে মনে হয় তারা যেন সারা জীবনটাই নাচে, গানে ও শিল্পের বিচিত্র রূপায়ণে উৎসব করে কাটিয়ে দেয়। তাদের সব কাজে গ্রামীণ লোকশিল্পের স্বতস্ফূর্ত রূপ মূর্ত হ'য়ে ওঠে। মনেহয় সাঁওতালীদের যেন সরল, সহজ গ্রাম্য প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক খুবই নিবিড় আর ঘনিষ্ঠ। বাংলা দেশের সকল অঞ্চলের লোক-শিল্পের পরিবেশ দেখলে মনে হবে এখন যেন সেই শিল্পকে আশ্রয় করে একটা পরিবর্তনের যুগ চলেছে। লোকশিক্ষা, লোক পল্লীশিল্প ও লোক সংগীতের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার নিজস্ব সত্বা ও প্রাণরস জীবন্ত হয়ে উঠে। বাংলার যে নিজস্ব শিল্প, যুগ যুগ ধরে যে শিল্পকলা বাংলার গণজীবনকে আনন্দে উপলব্ধিতে রসানুভূতিতে উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে, তাই গ্রাম অঞ্চলের শিল্প কলার রূপায়ণের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। আর দেওয়ালে আঁকা শিল্প

চিত্রণ বাংলার নিজস্ব লোক চারুশিল্পের মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য।

দেওয়ালে, আল্পনায়, সুতোর কাপড়ে, বেত ও বাঁশের ঝুড়ি চুপড়িতে, পাথরে, কাঠে, বইয়ের মলাটে, পিতল ও তামার বাসন-পত্রে, কাঁথায়, মাটির জিনিসে বাংলার লোকচারুশিল্পের বিভিন্ন রকমের নিদর্শন রূপায়িত হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন আঙ্গিকের সাহায্যে ও নানাবিধ পদ্ধতিতে কত রকমের যে নক্সা আঁকা হয়ে থাকে, তার সীমা-পরিসীমা নেই। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের বিভিন্ন স্বরূপ বিভিন্ন আঙ্গিককে আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠে। বাঙ্গালার রূপবোধ, বাঙ্গালা জীবনের হাসি, কান্না, ব্যথা, বেদনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতের আঙ্গিককে আশ্রয় ক'রে রূপায়িত হয়ে উঠে। আর এই সব বিভিন্ন রূপায়ণের মধ্যে মাটির ঘরের দেওয়ালে আঁকা ছবির নিজস্ব একটা স্বরূপ আছে। মধ্যযুগে বাংলা দেশকে মগধের চিত্রশালা বলা হ'ত। আধুনিক কালেও বাংলার চিত্রশিল্প বিশেষ ভাবে উজ্জ্বল আর তার মধ্যে লোক চারু শিল্পের বৈশিষ্ট্য আজো পর্যন্ত জীবন্ত আর শিল্পের প্রাণরসে ভরপুর।

—শিখা—

শ্রীতপন চট্টোপাধ্যায়

১

আকাশের বুকে ঐ চাঁদ আর তারাদের মেলা,
স্নিগ্ধতা আনেনা এ চোখে।
সুন্দরের স্বপ্নদেশে সবই জানি লুকোচুরি খেলা,
বাস্তবে এ জীবনভরা দুঃখ আর শোকে।

২

বিচিত্র ধরিত্রী, এই বিচিত্র সংসার,
এরই স্তরে স্তরে জানি অসংখ্য বেদনা আছে জমা।
দিনের আলোর শেষে শুধু অন্ধকার,
এখন নেমেছে বুঝি গভীর ত্রিযামা।

৩

হেথা ভালবাসা বিস্তৃত ধুঁ ধুঁ মরুভূমি,
তৃষ্ণার্ত শুধু ছুটে মরে।
তবু আকাশের বুকে ঐ চাঁদ আর তারাদের মেলা—
সুন্দরের অভিনয় করে।

৪

চারিদিকে পাপ আর কলঙ্কের আগুন,
সত্য হারায়েছে তার উজ্জ্বল্ নয়ান।
জীবন প্রকৃতিতে তাই নেই যে ফাগুন,
শুধু হেরি দিকে দিকে মিথ্যা—প্রবঞ্চনা।

৫

সংসার সংসার নয়, বিস্তৃত সাগর—
ব্যথাতুর মানুষের সীমাহীন উষ্ণ অশ্রুজলে।
সুবিশাল জীবনক্ষেত্র আজি দিগম্বর,
আগুন লেগেছে জানি জীবনের সোনালী ফসলে।

৬

সময় হয়েছে এখন মিথ্যার চাই অবসান।
আমিও জ্বালাতে চাই আগুনের বীভৎস বিভীষিকা।
অসত্যের বুক ফেঁড়েছুটে যাক্ প্রলয়ের বান,
ছুটে যাক্ চিত্তের বেগমান বিধ্বংসী শিখা।

৭

এ শিখা—বহ্নিশিখা।
কিন্তু এতে নেই জেনো বিন্দুমাত্র ধোঁয়া।
এ শিখার গতিপথে চিহ্নিত রবে জয়টিকা,
জেনো এ শিখায় আছে বিপ্লবের ছোঁয়া।

৮

অস্তমিত জীবন রবি: পড়ে এলো বেলা।
তবু বিভেদ বিস্মৃত প্রায় স্বর্গ-নরকে।
আকাশের বুকে ঐ চাঁদ আর তারাদের মেলা,
স্নিগ্ধতা আনেনা এ চোখে।

শেষ বসন্তে
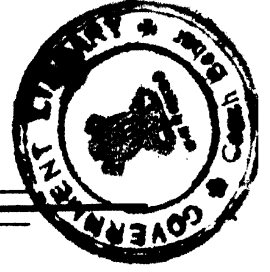
রথীন সরকার

ট্রেন ছাড়তেই নজরে পড়লো মাঝপথে যে ভদ্রমহিলা উঠে ওপাশে জাঁকিয়ে বসেছেন তিনি যেন তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছেন অপলক নেত্রে। কেমন একটা অগাধ বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে।

চোখাচোখি হতেই গৌতম চোখ নামিয়ে নিল। মনে হলো কোথায় যেন ভদ্রমহিলাকে দেখেছে। অথচ কিছু মনে করতে পারছে না। তবে কি তার কোন পরিচিত কেউ? কোন আত্মীয়? যাকে গৌতম ভুলে গেছে কিন্তু ভদ্রমহিলা ভুলতে পারেননি। কিংবা কোন ফাংশানে কি কোন মিটিং-এ ক্ষনিকের পরিচিতি। তারপর সময়ের সমূদ্রে হারিয়ে যাওয়া হাজার হাজার চেনা অচেনা মহিলার মুখ।

কিন্তু গৌতম কিছুতেই মনে করতে পারলো না। স্মৃতির পাতা উলটিয়েও তার কোন হদিশ পেল না।

লিলুয়া আসতেই ট্রেন ফাঁকা হয়ে গেল। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো গৌতম—সাতটা দশ। অথচ এরই মধ্যে বাইরে অন্ধকার জমাট হয়ে নেমেছে। সে অন্ধকার ভেদ করে দৃষ্টি চলে না। কেবল রেলের কামরাটুকু ছাড়া পৃথিবীর আর কোন অস্তিত্ব যেন নেই। সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে গাড়িটা যেন অন্ধকার এক মহাসমুদ্রে পাড়ি জমাচ্ছে।

রাত বাড়তেই গৌতমের অস্বস্তি বাড়লো, কেবল মনে হতে লাগলো কোথায় যেন ভদ্রমহিলাকে দেখেছে। ভদ্র-মহিলা যেন তার চেনা পরিচিত। অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছে না। ভীড়ের মধ্যে আত্মগোপন করবার তবু একটা সুযোগ থাকে—একটা স্বস্তি পাওয়া যায়। কিন্তু ফাঁকা ট্রেনে সমগ্র দৃষ্টি তখন শুধুমাত্র একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়। ঘুরে ফিরে নজর সেখানেই থমকে দাঁড়ায়। নিজেকে বড় বেশী প্রকটিত মনে হয়। আর মুখোমুখি বসে থাকা তখন একটা মস্তবড় বিড়ম্বনা হয়ে উঠে।

—শুনছেন?

গৌতম চমকে ফিরে তাকালো। দেখলো ভদ্রমহিলা তারই দিকে ঝুঁকে পড়েছেন একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে। গৌতম নিজেকে বড় বেশী বিব্রতবোধ করলো। বললো, আমাকে বলছেন?

ভদ্রমহিলা বললেন, হ্যাঁ, এটা কোন স্টেশান?

—লিলুয়া।

—আচ্ছা মধুপুরে ক'টায় গিয়ে পৌছুবে ট্রেণ?

—আজ্ঞে তা তো জানিনে।

ভদ্রমহিলা চুপ করে থাকলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, আপনি কোথায় নামবেন?

—গিরিডি।

—ও।

ভদ্রমহিলা আবার চুপ করলেন। আর গৌতম এত-ক্ষণ পরে তাকিয়ে দেখবার সুযোগ পেল। দেখলো: ভদ্রমহিলার বয়স হয়েছে, অথচ এত কাছে থেকেও তা নজরে পড়েনি। হয়তো পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ কিংবা তারও বেশী। তবু কোথাও এতটুকু বার্ধক্যের ছায়া নামেনি। কেমন একটু কমনীয়তা আর লালিত্যের সুষমা তাঁর সর্বাঙ্গে। যেন যৌবন শেষবারের মতো যাই যাই করেও যেতে পারেনি।

গৌতম এবার অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করলো। বললো, আপনি কি মধুপুরেই থাকেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।
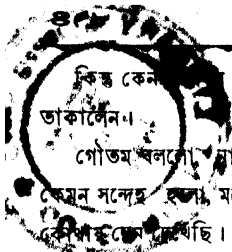
কিন্তু কেন [illegible] তো? ভদ্রমহিলা চোখ তুলে তাকালেন।

গৌতম বললো, না মানে এমনি আর কি। হঠাৎ কেমন সন্দেহ হলো, মনে হলো আপনাকে যেন চিনি—কোথায় যেন দেখেছি।

ভদ্রমহিলার চোখ দুটো এবার বিস্ফারিত হলো, বললেন, তাই নাকি! আশ্চর্য তো, অথচ আপনাকে যে কোথাও দেখেছি বলে তো আমার মনে হচ্ছে না।

গৌতম বললো. হচ্ছে না, স্মরণ করতে পারছেন না তাই।

—তা হবে।

ভদ্রমহিলা দৃষ্টিটাকে আবার জানালার বাইরে ছুড়ে দিলেন। যেন জমাট বাঁধা অন্ধকারকে ভেদ করে তিনি চলমান দৃশ্যগুলোকে নিরীক্ষণ করবার চেষ্টা করছেন।

আর গৌতমের মনে হলো ভদ্রমহিলা যেন বড় বেশী রহস্যময়ী। বড় বেশী রহস্য ঘিরে রয়েছে তাঁর চতুর্দিকে। নইলে এই মুহূর্তে গৌতমের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে অমন একটা জলজ্যান্ত মিথ্যা কথাই বা বললেন কেমন করে! নাকি ভদ্রমহিলা নিজেকে গোপন করতে চান? হয়তো তাই। অথচ গৌতম তো দেখেছে সেই ব্যাকুল দৃষ্টি। অগাধ কৌতুহল আর গভীর বিস্ময়—যা গৌতমের দৃষ্টিকেও এড়িয়ে যেতে পারে নি।

কিন্তু তবু গৌতম জিজ্ঞাসা না করে পারলো না। বললো, আচ্ছা আপনি কি কখনও গিরিডি গেছেন?

—গিরিডি?

—হ্যাঁ।

—গিয়েছি। ভদ্রমহিলা বললেন, খুব ছোটবেলায় একবার গিয়েছিলাম তখন আমার বয়স বারো।

—কোথায় উঠেছিলেন?

—বেনিয়াডি'তে।

—ও।

গৌতম চুপ করলো।

ভদ্রমহিলা হাসলেন—বললেন, আপনার সন্দেহ যেন এখনও নিরসন হয়নি!

গৌতম বললো, হলো আর কই। সেই তখন থেকে তো কেবলই একটি মেয়ের কথা মনে পড়ছে—যার সঙ্গে আপনার বেশ একটা সামঞ্জস্য রয়েছে। অথচ—

—অথচ সেই মেয়েটি আমি হতে পারলাম না দুর্ভাগ্য আমার। ভদ্রমহিলা হাসলেন।

গৌতম বললো, দুর্ভাগ্য আপনার নয় দুর্ভাগ্য আমার। আমিই সেই মেয়েটিকে হারালাম।

—তাই নাকি!

গৌতম বললো, হ্যাঁ তাই।

ভদ্রমহিলা এবারও হাসলেন। চোখের কোণে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললেন, তাহলে তো শুনতে হয় সে কাহিনী। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

গৌতম বললো, না বলতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে কতকগুলো সর্তে আপনাকে রাজী হতে হবে। রাজী আছেন?

ভদ্রমহিলা বললেন, শুনি সে নমুনা।

গৌতম বললো, প্রথমতঃ আপনার নাম ধাম পরিচয় দিতে হবে।

—বারে, তা তো দিলাম। ভদ্রমহিলা এবার বাধা দিয়ে উঠলেন।

গৌতম বললো, তাতে যে স্পষ্ট হয়নি। দ্বিতীয়তঃ আপনি কোন মিথ্যের আশ্রয় নিতে পারবেন না। আর তৃতীয়তঃ তেমন যদি কোন ঘটনা আপনার জীবনে ঘটে তবে তা অকপটে বলতে হবে।

—ওরে বাবা, এ যে আসামীর মতো হলফ করিয়ে নিচ্ছেন। শেষে অতবড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদি তা পালন করতে না পারি?

গৌতম বললো, তাহলে আমাকেও মুখ বন্ধ করতে হবে।

ভদ্রমহিলা হাসলেন, বললেন, না অতবড় স্বার্থত্যাগ করতে পারবো না, তার চেয়ে আপনার সর্ত মানতে রাজী আছি।

একটি জংশন স্টেসানে গাড়ি থামতেই গৌতম উঠে দাঁড়ালো। বললো, চায়ে আপত্তি আছে আপনার?

—না।

—তবে আসুন না গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক্। অনেকক্ষণ ও বস্তু পেটে পড়েনি কিনা।

ভদ্রমহিলা বললেন, কিন্তু আমিই বা আপনার কাছে অনর্থক ঋণী হবো কেন ?

—বেশ তো হবেন না। গৌতম হাসলো, সে ঋণ না হয় আপনিও এক সময় শোধ করে দেবেন।

ভদ্রমহিলা আর কোন কথা বললেন না। চুপ করে থাকলেন। গৌতম এবার জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ডাকলো, এই চা—চা ইধার আও।

চা-ওয়ালা এগিয়ে আসতেই গৌতম দু ভাঁড় চায়ের অর্ডার দিল। তারপর এক ভাঁড় ভদ্রমহিলার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, কি হলো—কথা বলছেন না যে ?

—কি বলবো বলুন ? ভদ্রমহিলা মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, কথা তো এবার আপনারই শুরু করবার পালা।

কিন্তু গৌতম সে কথার উত্তর করলো না। ভাঁড়ে একটা দীর্ঘ চুমুক দিল। তারপর সেটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। বললো, হ্যাঁ, তাহলে শুরুই করা যাক্। কিন্তু তার আগে নিজের নাম ধাম পরিচয়টা দিই—পাছে আবার সন্দেহের উদ্রেক হয়।

—আপনি তো আচ্ছা সিরিয়স লোক! ভদ্রমহিলার চোখ দুটো ছোট হয়ে এলো।

গৌতম বললো, সিরিয়াস আর হতে পারলাম কই। তাহলে তো জীবনটা এমন বরবাদ হয়ে যেত না। তা যাক্, আমার নাম গৌতম রায়, জীবিকা প্রফেসারী, আপাততঃ গন্তব্য গিরিডি। আর আপনার ?

—আমার! আমার আবার কি বলবো। ভদ্রমহিলা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন—আমার পরিচয় তো আগেই দিয়েছি। নাম মিস্ মায়া সেন, পেশা মাষ্টারী, গন্তব্য মধুপুর।

গৌতম এবার একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল, চমকে ফিরে তাকালো। আশ্চর্য! তাই তো এতক্ষণ নজরেই পড়েনি—ভদ্রমহিলা তাহলে অবিবাহিত। অথচ বাঙালী মেয়েরা এত বয়স অবধি অবিবাহিত থাকে না। তবে কি ভদ্রমহিলার স্বামী জোটেনি ? নাকি তারই মতো কোন সুপ্ত বেদনা মনের অন্তঃস্থলে ঘুমিয়ে রয়েছে! যা তাঁর সমস্ত জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে, বিবাহিত জীবনের উপর বিদ্বেষ—একটা ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। ইচ্ছা হলো গৌতম জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু এই মুহূর্তে গৌতম তা কিছুতেই পারলো না। বাইরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলো।

ট্রেণ ছাড়তেই ভদ্রমহিলা বললেন, কি হলো, চুপ করলেন যে ? এবার আরম্ভ করুন।

গৌতম নিজেকে সজাগ করে তুললো। বললো, হ্যাঁ এবার আরম্ভই করা যাক্। তখন কতই বা বয়েস, পঁচিশ ছাব্বিশ। বি-এ পরীক্ষা দিয়ে পূজোর ছুটীতে বেড়াতে গিয়েছি গিরিডি। মামার বাড়ি। অদ্ভুত দেশ। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড় আর তারই মাঝে একটা ছোট্ট শহর। জনহীন নিরিবিলি। কিন্তু বছরের একটি সময়ে এই শহরটাও সরগরম হয়ে উঠে। বিশেষত ভাদ্রের শেষ থেকে কার্তিকের শুরু অবধি। এই কটি মাস লোকের আনাগোনা শুরু হয়। ফাঁকা বাড়িগুলো আবার মুখর হয়ে উঠে, শহরের চঞ্চলতা বাড়ে—যেন বিশীর্ণা নদী বন্যার জল পেয়ে আবার উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

সেবারও একটি পরিবার এলো বাড়ির পাশে দিল্লী থেকে। পরিবারটি খুব একটা বড় নয়। স্বামী স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ে। ছেলেটির বয়স বছর বারো, আর মেয়েটির বয়স সতের আঠার।

কিন্তু হলে হবে কি। ঐটুকু সংসার অথচ এত হৈচৈ যে মনে হতো কিছু একটা যেন লেগেই আছে। চাকর বাকররাও এক মিনিট ফুরসৎ পেতো না। সব সময় তটস্থ হয়ে থাকতে হতো।

ক্রমে ক্রমে আলাপ পরিচয় হলো। ভদ্রলোক একদিন বললেন, চলে এসো না হে, বাড়িতে তো বসেই—থাকো তাস-টাস খেলা যাবে।

বললাম, যাবো একদিন।

—না না যাবো নয়, আজই চলে এসো। ভদ্রলোক হাঁ হাঁ করে উঠলেন, সন্ধ্যে বেলায় কোন কাজ-টাজ আছে তোমার ?

বললাম, না কাজ আর কি।

ভদ্রলোক বললেন, অলরাইট চলে এসো তবে।

সন্ধ্যেবেলায় সত্যি সত্যিই ভদ্রলোক লোক পাঠিয়ে তলব করলেন। যেতে হলো। একটা লজ্জা আর সংকোচ নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভদ্রলোক সে সংকোচ

আর লজ্জাকে রাখতে দিলেন না। বললেন, এই যে এসো এসো, কি নাম হে তোমার ?

বললাম, গৌতম রায়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ গৌতম, বাড়িতে বসে থাকবে না—তাতে মন মেজাজ ভালো থাকে না। অবাধে চলে আসবে নিজের ছেলের মতো। গল্প গুজব তাস টাস খেলা যাবে। ইয়ং ম্যান বাড়িতে বসে থেকে থেকে সময়ের অপব্যয় করবে কেন ?

পরে শুনেছিলাম ভদ্রলোকের নাম সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়। রেলের একজন টুরিং অফিসার। আপাততঃ এখন দিল্লীতে আছেন, পরে কোথায় যাবেন কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু সে রাত্রিতে তাসের আসর আমাদের জমেনি। মঞ্জু বারবারই ভুল করছিল। আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। একটা লজ্জা আর সংকোচ নিয়ে সমস্তক্ষণ মুখ নীচু করে বসেছিল।

পরদিন আবার গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক তখনও সান্ধ্য ভ্রমণ করে ফেরেননি। মঞ্জুর মা এগিয়ে এলেন, এই যে এসো ভাই এসো। তোমার মেশোমশাই বেড়াতে বেরিয়েছেন এক্ষুণি ফিরবেন তুমি ততক্ষণ বসো।

বসলাম। কিছুক্ষণ পরে মঞ্জু এসে দাঁড়ালো। বললো, মা জিজ্ঞাসা করছেন—আপনি চা খান ?

বললাম, পেলে খাই, না পেলেও আপত্তি নেই।

মঞ্জু হাসলো। বললো, আপনি বসুন আমি আপনার চা নিয়ে আসি।

মঞ্জু চলে যেতে আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম—আসবাবপত্র বলতে বিশেষ কিছু নেই। খান দুই টেবিল আর খানচারেক চেয়ার। কিছু বই—আর একটা ফুলদানিতে দুদিনের বাসীফুল শুকিয়ে রয়েছে। তবু তারই মধ্যে একটা ছন্দ আছে, একটা অদ্ভুত সুষমা ছড়িয়ে রয়েছে। একটা যত্নপ্রসূত লালিত্যও।

কিছুক্ষণ পরেই মঞ্জু ফিরে এলো চা নিয়ে। কাপটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

বললাম, বসুন না দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

মঞ্জু বসলো না। পা দিয়ে মেঝে খুঁড়তে খুঁড়তে বললো, আমাকে আপনি আপনি করছেন কেন, আমি আপনার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট। আমার নাম মঞ্জু—আপনি আমার নাম ধরেই ডাকবেন।

বললাম, বেশ আপনার যখন আপত্তি তখন নাম ধরেই ডাকবো।

মঞ্জু আর কোন কথা বললো না। সময় নিঃশব্দে গড়িয়ে চললো। একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি—কেউ কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি না। মঞ্জু তেমনিই আঙুল দিয়ে মেঝে খুঁড়তে লাগলো।

অনেকক্ষণ পরে বললাম, আমি তাহলে আজ উঠি।

মঞ্জু বললো, এখনি উঠবেন ?

—হ্যাঁ উঠি।

—কিন্তু বাবা এক্ষুণি ফিরবেন।

বললাম, তা হোক, আজ আর মেশোমশাইকে বিরক্ত করবো না। বরং আর একদিন না হয় আসবো।

এরপর দিন সাতেক যেতে পারিনি। বিশেষ কাজে আটকে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক একদিন দেখি—নিজেই এসে হাজির—গৌতম আছো নাকি হে, গৌতম ?

আমি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলাম—কে ? মেশোমশাই, আসুন আসুন।

ভদ্রলোক বললেন, না হে না বসবো না। ভাবলাম তুমি আর যাচ্ছো না—তা দেখেই আসি। শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো হে ?

বললাম, না না শরীর তো আমার বেশ ভালোই আছে। মানে বিশেষ কতকগুলো কাজে আটকে গিয়েছিলাম কিনা তাই—

ভদ্রলোক বললেন, তা ভালো। শোন আজ ও বেলায় দিকে একটু আসতে পারবে ?

—আজ !

—হ্যাঁ আজ। মানে বিশেষ একটা জরুরী কথা আছে—তা এসো না হে ওবেলায় একটু সময় করে।

বললাম, আচ্ছা যাব।

ভদ্রলোক বললেন, তাহলে ঐ কথাই রইলো, আমি আজ চলি বুঝলে।

সন্ধ্যে বেলায় গেলাম। ভদ্রলোক বাইরের বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুয়ে সন্ধ্যার হাওয়াটুকু উপভোগ করছিলেন।

আমাকে দেখে উঠে বললেন, এই যে এসো হে। এইমাত্র তোমার কথাই ভাবছিলাম। বসো বসো—

বসলাম। ভদ্রলোক বললেন, একটা উপকার করতে পারবে?

বললাম, বেশ তো বলুন কি করতে হবে। আমার যতটুকু সাধ্য তা আমি অবশ্যই করবো বৈকি।

ভদ্রলোক বললেন, মানে আমরা উশ্রী ফলসে একটা চড়ুই ভাতি করতে চাই। তুমি যদি আমাদের সাথে থাকো তো বিশেষ উপকার হয়। কিছুই তো চিনিনে, সবই অপরিচিত—তবু সঙ্গে থাকলে একটা ভরসা।

গৌতম চুপ করলো। একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো।

ভদ্রমহিলা বললেন, তারপর?

গৌতম বললো, তারপর সেই চিরাচরিত কাহিনী। একটা অদ্ভুত আনন্দ তার উল্লাসের মধ্যে দিয়ে সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়েছে। মঞ্জু পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটাছুটি করে বেড়িয়েছে ছোট শিশুর মতো। খাঁচায় বন্দী বনের পাখী হঠাৎ মুক্তি পেলে যেমন উল্লসিত হয়ে উঠে—ঠিক তেমনি। উশ্রী ফলসের ধারে চুপচাপ বসে থেকেছি। লক্ষ লক্ষ জলের ধারা হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে পাহাড়ের সানুদেশে ঝাঁপিয়ে পড়ে খলবল করে দুর্বার বেগে ছুটে চলেছে—সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মঞ্জু বলেছে—কি সুন্দর না?

বলেছি, ঠিক তোমারই মতো।

মঞ্জু হেসেছে বলেছে, আমি বুঝি খুব সুন্দর?

বলেছি, অন্ততঃ আমার চোখে তাই।

মঞ্জু আর কোন কথা বলেনি। চুপচাপ বসে থেকেছে স্থিরচক্ষু হয়ে। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি মঞ্জুর মুখে পড়ন্ত রোদের লুকোচুরি—সমস্ত মুখমণ্ডলে লজ্জাবশতঃ একটা রক্তিমাভা। ফুরফুর করে হাওয়ায় উড়ছে দু' একটি চুল, ভেসে আসছে মাংস পোলাওয়ের উৎকট গন্ধ। আর সব কিছু ছাপিয়ে অবিশ্রান্ত একটা ঝরঝর শব্দ।

অনেকক্ষণ পরে মঞ্জু বলেছে, চলো উঠি।

—চলো।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মঞ্জু বলেছে, এটা কি ভালো হলো?

—কোনটা?

—এই এমন করে আমাদের মেলামেশা?

বলেছি, ভালো মন্দ বিচার করে তো প্রেম আসেনা মঞ্জু। অনর্থক শুধু শুধু কেন ভয় পাচ্ছো। অন্ততঃ তুমি আমাকে ভরসা দাও, বিশ্বাস করো মঞ্জু—তুমি যে আমার সারাজীবনের ভরসা।

মঞ্জু ম্লান হেসেছে বলেছে, ভরসা!

—হ্যাঁ ভরসা।

—কিন্তু সে ভরসা যদি সারা জীবন না দিতে পারি?

বলেছি, তাহলেও দুঃখ করবো না। ভাববো ভরসা নাই বা পেলাম -তবু তো একদিন তোমার সান্নিধ্যে এসেছি এটাই কি কম। সেই স্মৃতিটুকু আজন্ম বুকে ধরে দুঃখকে ভুলবার চেষ্টা করবো।

মঞ্জু হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছে, না না তুমি অমন করোনা অমন করোনা গৌতম। অমন করে আমাকে বেঁধো না। আমাকে মুক্তি দাও। কি হবে অমন করে জীবনটাকে তছনছ করে?

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। জীবনটা যদি এত ছোট হতো, এত ছোট করে ভাবতে পারতাম, তাহলে তো কোন সমস্যাই থাকতো না।

পরের রবিবারে গিয়েছিলাম পরেশনাথে। তার পরের রবিবারে বরাকরে। মঞ্জু তেমনি অবাধে মেলামেশা করেছে—এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনি। তেমনি ছুটাছুটি করেছে পাহাড়ে পাহাড়ে। সমানে হেঁটেছে, বরাকর নদীতে সাঁতার কেটেছে সমানে পাল্লা দিয়ে।

কিন্তু তবু বুঝি একদিন সময় ঘনিয়েই আসে। কলেজের ছুটী ফুরিয়ে এলো, বিদায় নিতে গেলাম মঞ্জুর কাছে। মঞ্জু বললো, চিঠি দিও।

বললাম, দেব।

—হ্যাঁ হ্যাঁ অন্ততঃ রোজ একখানা করে চিঠি দিও।

বললাম, তাই দেব।

কিন্তু কে জানতো যে মঞ্জুই একদিন আমাকে ভুলে যাবে। সমস্ত দিন কাজকর্মের পর রোজ একখানা করে চিঠি দিতাম। যথা সময়ে সে চিঠির উত্তরও আসতো। আর মেকি আনন্দ! মনে হতো পৃথিবীতে এত সুখী বোধ

হয় আর কেউ নয়। কিন্তু সে চিঠিও একদিন কমে আসতে লাগলো। লক্ষ্য করলাম—রোজ থাক সপ্তাহে একখানা করে চিঠিও মঞ্জু দেয় না। ক্রমে ক্রমে কমতে কমতে সে চিঠি মাসে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর আপনা আপনিই একদিন বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আমি তবু কোন অনুযোগ কোন অভিযোগ করিনি। কি হবে অভিযোগ করে! পরে শুনেছিলাম, মঞ্জুর বিয়ে হয়ে গিয়েছে বিলাত ফেরৎ বড় একজন ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে। তবু আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি: হে ভগবান, ওরা যেন সুখী হয়, ওরা যেন শান্তিতে থাকে। ওরা আমাকে ভুলে যাক্।

কাহিনী শেষ করে গৌতম চুপ করলো।

আর ভদ্রমহিলা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, কিন্তু তাবলে আপনি জীবনটা এমন করে নষ্ট করে দেবেন?

গৌতম বললো, কই না—জীবনটা তো নষ্ট করিনি। সে যে আজও আমার অন্তরে জাগরুক হয়ে বেঁচে আছে।

—হুঁ।

ভদ্রমহিলা একটা অস্ফুট আর্তনাদ করলেন।

গাড়ি তখন ছুটে চলেছে বাইরের গাঢ় অন্ধকারের বুক ভেদ করে। যেন অনন্ত মহাশূন্যে সবেগে ছুটে চলেছে অনন্ত—অনন্তকাল ধরে।

ভদ্রমহিলা বললেন, কিন্তু এও তো হতে পারে যে সে সমস্তই ভুল।

—কি ভুল?

—এই আপনারই মতো সে আর কোন দ্বিতীয় সঙ্গী খুঁজে নেয়নি। আজও প্রতীক্ষায় রয়েছে আপনারই পথ চেয়ে।

গৌতম বললো, না না তা হতে পারে না। আর তাই যদি হয় তবু আমি সাহস করে যাচাই করতে পারবো না। পাছে এই সত্যটাই রূঢ় হয়ে দেখা দেয়।

ভদ্রমহিলা আর কোন কথা বলতে পারলেন না। গৌতমও চুপ করে রইলো। একটা অনন্ত নিস্তব্ধতা, একটা দুর্বার সময় গড়িয়ে চললো।

অনেকক্ষণ পরে গৌতম বললো, কিন্তু আপনি? আপনি কেন বিয়ে করলেন না মিস্ সেন?

ভদ্রমহিলা হাসলেন। বললেন, সময় হলো না বলে।

—না না এ আপনি মিছে কথা বলছেন। গৌতম বাধা দিলো, অন্তরের বেদনাকে জোর করে লুকোতে চাইলেই কি লুকোনো যায়?

ভদ্রমহিলা এবার চোখ তুলে তাকালেন—বললেন তাহলে শুনবেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ শুনবো বৈকি।

—কিন্তু সে যে নিতান্তই মামুলি।

—তাহোক। গৌতম বললো, তবু আপনি বলুন।

ভদ্রমহিলা বললেন. একটা বয়স আছে মানুষের—যে বয়সটা সব কিছু সুন্দর করে দেখতে শেখায়। মোহাঞ্জন লাগে চোখে। আর তাইতেই ছেলে মেয়েরা এত বেপরোয়া হয়ে উঠে। গুরুজনেরা ভয় পান ঐ বয়সটাকে। তখন কতই বা বয়স—বাইস তেইস। সিক্সথ ইয়ারে পড়ি। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম ক্লাশের সেরা ছাত্র কল্যাণ সোম কখন আমার মনটা চুরি করে নিয়েছে আমারই অজ্ঞাতে। হয়তো ওর শান্ত গাম্ভীর্য আর ব্যক্তিত্বই আমাকে এত গভীর ভাবে আকর্ষণ করতে পেরেছিল।

যাই হোক ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়লো। তারপর অন্তরঙ্গতা। সব শেষে মন দেওয়া নেওয়ার খেলা শুরু হলো। কিন্তু কে জানতো যে ওর সবটাই ছিলো মুখোশ, কেবল কথার ফুলঝুরি দিয়ে আমার চোখ দুটো ধাঁধিয়ে দিতে চেয়েছিলো। হলও তাই। একটা বিদেশী কোম্পানীর সাহায্য নিয়ে বিলেত গেল—আর ফিরলো না। সর্বশেষ খবর হলো—ওখানে নাকি মেম বিয়ে করে এখন সুখেই ঘরকন্না করছে।

ভদ্রমহিলা চুপ করলেন।

গৌতম বললো, কিন্তু এ আপনার মিছে অভিমান।

—কিসের কথা বলছেন?

গৌতম বললো, একটা ছেলে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলেই যে আপনি তার উপর অভিমান করে সমস্ত শাস্তি মাথা পেতে নিয়ে জীবনটা এমন ভাবে ধ্বংস করবেন এ আপনার ভারি অন্যায়।

ভদ্রমহিলা হাসলেন। বললেন, ন্যায় অন্যায়ের মাপ-কাঠি দিয়ে সব সময় বিচার করা যায় না গৌতমবাবু! এই আপনার জীবনটা দিয়েই দেখুন না!

গৌতম আর কোন কথা বলতে পারলো না। চুপ-চাপ বসে রইলো মুখোমুখী, যেন কেউ কাউকে দেখছে না, কেউ কাউকে চেনে না, জানে না, বোঝে না। কেবল ভাসা ভাসা দৃষ্টি দিয়ে তারা পরস্পর পরস্পরের বিস্মৃত স্মৃতি-গুলোকে নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

রাত্রি দশটায় গাড়ি মধুপুরে এসে পৌছুতেই ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালেন। গৌতমও।

ভদ্রমহিলা বললেন, একি আপনি এখানে নামবেন নাকি ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আপনি যে বললেন গিরিডি যাবেন ?

—না। আপাততঃ এখানেই নামবো স্থির করলাম।

—সেকি !

—হ্যাঁ।

ভদ্রমহিলা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুলো না। কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে গৌতমের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, কিন্তু কোথায় উঠবেন আপনি ?

—কেন আপনি যেখানে উঠবেন।

—সে তো একটা মেয়েদের হোস্টেল।

গৌতম আর সহ্য করতে পারলো না। মুহূর্তে তার সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। বললো, কেন মঞ্জু, তোমার ঘর কি আমার ঘর হতে পারে না ?

ভদ্রমহিলা তবু একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে চাইলেন, এ আপনি কি বলছেন !

গৌতম বললো, ঠিকই বলছি মঞ্জু ঠিকই বলছি—তুমি আর আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। একবার হেরেছি কিন্তু তা বলে আর বারবার হারতে চাইনে। এই দেখ। বলে পকেট থেকে একটা নাম ধাম লেখা কার্ড বের করে দিতেই ভদ্রমহিলা চমকে উঠলেন, একি এটা কোথায় পেলেন আপনি ?

গৌতম বললো, তোমার এটাচি কেসে।

—উঃ।

—কি হলো ?

মঞ্জু এবার ভেঙ্গে পড়লো। বললো, না আর পারলাম না গো পারলাম না—আমারই হার হলো।

গৌতম হাসতে লাগলো মৃদুমৃদু। বললো, কিন্তু যাই বলো, চোর আমি ঠিকই ধরেছি।

—তা আবার ধরবে না। মঞ্জু এবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, এক চোর যে আরেক চোরকেই খুঁজে ফেরে। ওটাই যে তার স্বভাব।

—না ঠিক তাও নয়। গৌতম বাধা দিলো, এক চোর আরেক চোরকে কি আর সাধে খুঁজে ফেরে—সে যে সহাবস্থান করতে চায়।

—হয়েছে হয়েছে আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই। মঞ্জু ফিক করে হেসে ফেললো। বললো, লজ্জা সরমের মাথা তো একেবারে চিবিয়ে খেয়েছো দেখছি। ছিঃ, পারলে তুমি এই এক গাড়ি লোকের মধ্যে এমন ভাবে অপদস্থ করতে ?

—তুমিই বা অমন ভাবে পালিয়ে যাচ্ছিলে কেন ?

মঞ্জু বললো, সাধ করে কি আর পালিয়ে যাচ্ছিলাম, তোমার মতো ডাকাতের হাতে সারা জীবনটা জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে পালিয়ে যাওয়া ঢের ভালো।

—তাই নাকি !

—হ্যাঁ তাই। কি লাভ হতো পরিচয় দিয়ে বেশতো ছিলাম। দেখলাম তুমি তেমনিই ভালোবাস, তেমনিই স্নেহ আর শ্রদ্ধা কর। অন্ততঃ আমি যে সেইটুকুই চেয়েছিলাম। বাঁচতে চেয়েছিলাম তোমার মধ্যে—তাইতো পালিয়ে যেতে চেয়েছি।

কিন্তু তুমি—তুমি আমাকে বাঁচতে দিলে কই ?

গৌতম এবার কি একটা বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু মঞ্জু সে কথায় কর্ণপাত করলো না। দরজার কাছে ছুটে গিয়ে ঝুঁকে পড়লো। ডাকলো, এই কুলি—কুলি ইধার আও।

পল্লী-শিক্ষা প্রসংগ

অধ্যক্ষ শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী

স্বাধীন ভারতে, ভারত সুন্দরতর হোক, ভারতবাসী মাত্রই এই কামনা করেন। প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী-ই চাহেন যে তাহার দেশ শ্রীসম্পদে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করুক, জ্ঞান গরিমায় উন্নত হোক, চরিত্রবলে বলীয়ান হোক এবং সর্বোপরি—আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করুক। এ বাসনা আমাদের আজিকার নহে,—বহু দিনের। স্বাধীন ভারতের প্রথম উষার আগমনের সংগে সংগেই আমাদের অন্তরে এই প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই দিন হইতেই এই জ্ঞান গৌরবোজ্জ্বল ভারত দর্শন ইচ্ছায় আমরা অনাগত ভবিষ্যতের প্রতি অধীর আগ্রহে চাহিয়া আছি।

কিন্তু ভারত স্বাধীন হইয়াছে আজ দীর্ঘ দিন। এই দীর্ঘ দিনে ভারত কি আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্তির পথে বিশেষ কিছু অগ্রসর হইয়াছে? বর্তমান ভারতের শ্রীসম্পদ, ভারতের চরিত্র, ভারতের নৈতিক ও মানসিক আদর্শ কি সেই পরাধীন ভারত অপেক্ষা বিশেষ কিছু উন্নত হইয়াছে? সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতেই হইবে—আমাদের সে স্বপ্ন বাস্তবতার পথে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। রাষ্ট্র তাহার কর্তব্য অবহেলা করিয়াছে, দেশ-নেতাগণ উদাসীন কিংবা জনগণের প্রচেষ্টার ও সহযোগিতার অভাব এ বিষয়ে রহিয়াছে—এরূপও বলা চলে না। কারণ দেশের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও পরিযোজনা হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। তথাপি কেন আমাদের এই অবস্থা, ইহা একটী গভীর চিন্তনীয় বিষয় ও সমস্যা সন্দেহ নাই।

আমাদের মনে হয় ভারতের পল্লীশিক্ষা সমস্যা এবং উপরোক্ত সমস্যা একই ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পল্লীই ভারতের প্রাণ—ভারত পল্লীপ্রধান দেশ। ভারতের অধিবাসীগণের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০জনই পল্লীবাসী। সুতরাং তাহাদের উন্নতি কিংবা অবনতি, ভারতেরই উন্নতি তথা অবনতির কারণ। দেশের জনসংখ্যার তিনচতুর্থাংশই যদি অশিক্ষিত থাকিয়া যায় তবে অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশ যতই উন্নত ও শিক্ষিত হোক না কেন তদ্দ্বারা একটা দেশ উন্নত হইতে পারে না। ব্যষ্টির উন্নতিই যে সমষ্টির উন্নতি নহে, এ সত্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। কিন্তু স্বাধীন ভারতেও শিক্ষামূলক যাবতীয় পরিকল্পনা ও শিক্ষা প্রচার প্রচেষ্টা পল্লীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

কেন? পূর্বেই বলিয়াছি, ভারত পল্লীপ্রধান দেশ। ভারতের পল্লীর প্রধান জীবিকা কৃষি ও শিল্পকলা। ভারতের ধন-সম্পদই বলি, আর জনসম্পদই বলি, সবই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ঐ দুই উদ্যোগের উন্নতির উপর। সুতরাং দেশকে উন্নত করিতে হইলে উহার উন্নতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কিন্তু দেশের শিক্ষা পরিচালনা পদ্ধতির দ্বারা ইহা স্বীকৃত হয় বলিয়া মনে হয় না।

'পল্লী উন্নয়ন' কথাটা আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি, সন্দেহ নাই। কিন্তু সন্দেহ হয় শিক্ষিত জনগণের মধ্যেও উহার প্রকৃত অর্থ অল্পসংখ্যক লোকই হৃদয়ঙ্গম করেন। যদি ইহা সত্য না হইত, তবে ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি বহু পূর্বেই সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইত।

শিক্ষা ত সর্বপ্রকার উন্নতির কেন্দ্রস্থল। কিন্তু 'শিক্ষা' শব্দের অর্থ আমাদের মধ্যে কয়জন প্রকৃতরূপে জানেন, তাহাই সর্বপ্রথম বিচার্য। পরাধীন ভারতে আমরা দেখিয়াছি শিক্ষা অর্থে, কতকগুলি পুস্তক কণ্ঠস্থ করা ও সেই কণ্ঠস্থীকৃত বিষয়গুলি কাগজের উপর উদ্গীরণ করা এবং তাহা হইতে যে কোন জিজ্ঞাসার উত্তর অনতিবিলম্বে প্রদান করা। প্রারম্ভিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি শিক্ষা পর্যন্ত সর্বত্রই ঐ একই অর্থে শিক্ষা-শব্দ প্রযুক্ত হইতে দেখিয়াছি—নিম্ন ও উচ্চ শিক্ষার পার্থক্য থাকিত শুধু পুস্তক সংখ্যার উপর। আজ ভারত স্বাধীন। আজও কিন্তু স্বল্পাধিক পরিবর্তিত আকারে শিক্ষা অর্থে তাহাই বুঝিতেছি। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা কি ইহাই? যে শিক্ষা জীবনের সংগে যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারিল না,

দেশের প্রাণ-ধারণে সাহায্য করিল না, দেশকে নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতির পথে লইয়া গেল না ; কেবল দুর্বোধ্য ও আড়ম্বরপূর্ণ কতকগুলি বুলি আওড়াইতে শিখাইল, তাহাই কি শিক্ষা ? আমাদের মনে হয় 'শিক্ষা' শব্দের ইহা অপেক্ষা ভ্রমপূর্ণ পরিভাষা আর কিছু হইতেই পারে না। অথচ পরাধীন ভারতে তথা বর্তমানেও আমাদের শিক্ষা এই-রূপই।

ইহা ভিন্ন অন্যদেশের অনুকরণে আজো আমাদের শিক্ষা একান্ত সহরকেন্দ্রিক। যাহারা আধুনিক শিক্ষায় তথাকথিত শিক্ষিত হন, তাহারাই প্রায় গ্রামের প্রকৃত পরিচয় বিস্মৃত হ'ন। দেশের প্রাণস্বরূপ—পল্লীর প্রতি তাহাদের ঘৃণার অন্ত থাকে না এবং শুধু এই কারণেই পল্লীর প্রাণ আজ শুষ্ক ও নির্জীব। পল্লী কতকগুলি অজ্ঞ মূর্খ ও অন্ধ লোকের বাসভূমি ভিন্ন কিছুই নহে। সুতরাং 'পল্লী উন্নয়ন কল্পে আমরা যাহাই করি না কেন তাহাই নিরর্থক হইয়া পড়ে অজ্ঞানতার প্রভাবে।

কোন গ্রামে মনে পড়ে না, একটা ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখিয়াছি। বর্তমান শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত মাত্রের-ই পল্লীর প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জাগে, যদিও তাহা অকারণ নহে। সুতরাং তথায় ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকিবে কি করিয়া ? গ্রামগুলির প্রতি জনগণের যেরূপ ঔদাসিন্য, রাষ্ট্রেরও প্রায় তদ্রূপই। তথাকার পথঘাট জলাশয়, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাত্রা প্রভৃতির যাবতীয় পরিবেষ্টনই জঘন্য ও পংগু।

সুতরাং ভারতকে উন্নত শ্রীসম্পন্ন দেখিতে হইলে আমাদের দৃষ্টিকে পল্লী অভিমুখী করিতে হইবে। আমাদিগকে ফিরিতে হইবে ত্যক্ত পল্লীর বুকে। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ ও অনুসরণ আমাদের পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, শিক্ষা দেশের ভৌগোলিক স্থিতির উপর বহুলাংশে নির্ভর করে এবং যেহেতু পাশ্চাত্য পরিস্থিতি আমাদের সর্বপ্রকার পরিস্থিতি হইতে ভিন্ন, সেকারণে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিও ভিন্ন হইবে। একের পক্ষে যাহা অমৃত, অপরের পক্ষে তাহাই গরল।

সুতরাং আমাদের শিক্ষা ব্যাপারের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজন :—

প্রথম। পল্লী শিক্ষা প্রসারের প্রস্তাবনা। পল্লীর প্রতি আমাদের সহানুভূতির একান্ত অভাব। পল্লী-শিক্ষা প্রসারে সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক প্রয়োজন এই সহানুভূতির। গ্রামে গ্রামে জনগণকে বুঝাইতে হইবে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা যে মানুষকে অমৃতত্বে লইয়া যায়, শিক্ষা যে প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার, শিক্ষা যে জীবন-যাত্রার পথকে সুগম্য ও ও সুখপ্রদ করিয়া তোলে এই সত্য গ্রামে গ্রামে প্রচারিত করিতে হইবে। এই প্রচার কার্যে উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের সাহায্য লইতে হইবে অধিক মাত্রায়। মনে রাখিতে হইবে—অজ্ঞ চিত্তে উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ সর্বদাই অধিক কার্যকারী।

দ্বিতীয়। গ্রামে উন্নত ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন। আমরা দেখিয়াছি—পল্লীতে উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে গ্রামস্থ শিক্ষালাভেচ্ছু সকলকেই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সহরস্থ বিদ্যায়তনের শরণাপন্ন হইতে হয়। ইহারই ফলে গ্রাম একমাত্র অশিক্ষিতের বাসস্থান হইয়া পড়ে। সুতরাং রাষ্ট্র যদি এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া প্রয়োজন বোধে প্রারম্ভিক বেতন বর্ধিত করিয়া দিয়াও সুশিক্ষক নিয়োজিত করিয়া গ্রামে গ্রামে উচ্চ বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুশিক্ষা লাভের সুযোগ করিয়া দেং, তবে অত্যল্প সময়ে-ই পল্লীগুলি শিক্ষিতের আবাসভূমি হইয়া পড়িবে নিঃসন্দেহ। সহরবাসের ফলে যে ঘৃণা গ্রামের প্রতি হইত তাহারও নিরসন ঘটিবে।

তৃতীয়। গ্রাম্য জীবনযাত্রার সহায়। সহরে যে সকল সুযোগ ও সুবিধা পাওয়া যায় যথা :—বিশুদ্ধ পানীয়, প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র ও সুচিকিৎসক, বিনা শুল্কে সার্বজনীন পাঠাগারের প্রয়োগ দ্বারা শিক্ষা, গমনাগমনের সুনির্মিত পথঘাট, ডাকঘর প্রভৃতির ব্যবস্থা পল্লী অঞ্চলেও হওয়া উচিত। এইরূপ হইলে গ্রামস্থ জনগণ সুখলাভের লালসায় আর সহরের প্রতি ধাবিত হইবে না। ফলে বর্তমান পরিত্যক্ত গ্রামগুলি আবার জনসম্পদে পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

চতুর্থ। গ্রামে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলন। স্বল্প শুল্কে কিংবা বিনাশুল্কে রাষ্ট্রকে ইহা করিতে হইবে।

পঞ্চম। পাঠক্রম। বর্তমানে আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের কোন সম্বন্ধই নাই। শিক্ষা ও জীবনযাত্রা বর্তমানে ভিন্নপথগামী। পর-অনুকরণই যে ইহার

জন্য দায়ী এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া ভারতের জীবন যাত্রার সহায়ক শিক্ষার প্রচলন অনতিবিলম্বে একান্ত প্রয়োজন। ভারতের ন্যায় পল্লী ও কৃষি প্রধান দেশে শিক্ষাকে যদি জীবন যাত্রার সহায়ক করিতে হয়, তবে-শিক্ষা কৃষি ও উদ্যোগ-কেন্দ্রিক হওয়া ভিন্ন উপায় নাই। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষার পাঠক্রমকে দুই ভাগে বিভক্ত করা প্রয়োজন। (ক) ফলিত বিভাগ ও (খ) পাঠ্য বিভাগ।

(ক) বিভাগে থাকিবে কৃষি, উদ্যানবিদ্যা, এবং গ্রাম্য শিল্প—(যেমন লৌহ শিল্প, কাষ্ঠ শিল্প, চর্ম শিল্প, বেত্র শিল্প, প্রভৃতি উটজ শিল্পকলা। শিক্ষার্থীর রুচি ও জীবিকার্জনের রুচি অনুযায়ী—যে কোন বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) বিভাগে থাকিবে সামাজিক ইতিকথা, ভৌগোলিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক শাসন সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞান। ইহা ভিন্ন থাকিবে মাতৃভাষা, ব্যবহারিক গণিত, নাগরিকতা। অনিবার্য রূপে শিক্ষা দিতে হইবে এই সব।

ষষ্ঠ। বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যচর্চার প্রবর্তন। ভারত গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় গুরু ব্যায়াম ভারতে অসাধ্যের-ই কারণ হইয়া থাকে। অথচ পল্লী-বাসীকে এ বিষয়ে আলোক দিবার জন্য ব্যবস্থাই নাই। সুতরাং অভিজ্ঞ ও অনুভূতি সম্পন্ন কতিপয় শিক্ষকের উপর এ ভার ন্যস্ত করিতে হইবে। তাহারা জনগণকে বুঝাইয়া এ শিক্ষা বাধ্যতা মূলক করিবে। দেহের সহিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সুতরাং কাহার ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহাকে বাধ্যতামূলক না করিয়া, ইহার উপকার প্রদর্শন করিয়া, গ্রামবাসীগণকে এ কার্যে নিয়োজিত করিতে হইবে।

সপ্তম। যাবতীয় শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা করা। একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা সহজবোধ্য ও আনন্দ দায়ক হইয়া থাকে।

পরিশেষে শিক্ষার সহিত ধর্মের—সংযোগ যেন বিচ্যুত হইয়া না যায়—সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্র হইতে ধর্মকে নির্বাসিত করাই মনে হয় যুগধর্ম। আধুনিক শিক্ষা যে মানুষকে বহির্মুখী ও শান্তিহারা করিয়া তোলে, শিক্ষা ক্ষেত্র হইতে ধর্মের পরিত্যাগ-ই তাহার কারণ কিনা কে বলিবে। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আমরা অনুকরণ করি; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের শিক্ষার ধর্ম নীতিকে আমরা অস্বীকার করি। সে দেশের শিক্ষার নীতি বলে—

"The study of bible, already justifiable on literary grounds, has after claims for recognition in the Carriculum, Since no boy or girl can be counted as properly educated unless he or she has been made aware of the existance of a religious interpretation of life," এ প্রসংগে শিক্ষাবীর স্বামী বিবেকানন্দের বাণী স্মরণ করি—"Religion is the innermost Cause of Education—ধর্ম শিক্ষার আভ্যন্তরিক সত্তা। আমাদের মনে হয় সর্বধর্ম সার গীতা অধিকতর উপযুক্ত ভাবে এ স্থান অধিকার করিতে পারে।

ধর্মের সহিত শিক্ষার নিত্য যোগ কল্পে বিদ্যালয়ের নিত্য কার্যারম্ভের পূর্বে শিক্ষক ও ছাত্রগণকে একত্রিত হইয়া প্রার্থনা করিবার রীতি প্রবর্তিত থাকা প্রয়োজন। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে ধর্ম বিষয়ে ধর্মের সহিত জীবনের সম্বন্ধ বিষয়ে, সহজ বোধ্য ভাষায়, গল্পের আকারে বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিলে এ বিষয়ে সুফল ফলিবে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় সার্বজনীন ভাষা

শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ একটি বিচিত্রদেশ, আর বিচিত্র রকমের তার ভাষা। সুদূর প্রাচীন কালথেকেই এর এ রকম অবস্থা। প্রাচীনকালে সংস্কৃতভাষার প্রভাবে অন্য ভাষাগুলো মাথা তুলতে পারেনি। কিন্তু তথাপি কালক্রমে অশোকানুশাসনের ভাষা, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্ট ভাষাও আত্মপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলো। প্রাকৃত আরও বহুরকমের ছিল (যথা মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী, চূলিকা-পৈশাচী, আবন্তী, প্রাচ্যা, বাহ্লীকী, দাক্ষিণাত্যা, শবরী, রক্তিকা, পাঞ্চালা) তার আর ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কোনটিই কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলো না। মগধরাজ শিশুনাগ, শূরসেনরাজ কুবিন্দ, কুন্তলরাজ সাতবাহন এবং উজ্জয়িনীরাজ সাহসাঙ্ক তাঁদের অন্তঃপুরে এক রকম ভাষা প্রয়োগ করবার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। এ কথা রাজশেখর (৯ম শতাব্দী) তাঁর কাব্যমীমাংসায় উল্লেখ করে গেছেন :—

"শ্রূয়তে হি মগধেষু শিশুনাগো নাম রাজা। তেন দুরুচ্চারান্ অষ্টৌ বর্ণান্ অপাস্য স্বান্তঃপুর এব প্রবর্তিতো নিয়মঃ। টকারাদয় শ্চত্বারো মূর্দ্ধন্যাস্তৃতীয়বর্জম্ উষ্মাণস্ত্রয় ক্ষকারশ্চেতি॥"

"শ্রূয়তে হি সূরসেনেষু কুবিন্দো নাম রাজা। তেন পরুষসংযোগাক্ষরবর্জম্ অন্তঃপুর এবেতি সমানং পূর্বেন॥"

"শ্রূয়তে চ কুন্তলেষু সাতবাহনো নাম রাজা। তেন প্রাকৃতভাষাত্মকম্ অন্তঃপুর এবেতি সমানং পূর্বেণ॥"

"শ্রূয়তে চোজ্জয়িন্যাং সাহসাঙ্কো নাম রাজা। তেন চ সংস্কৃতভাষাত্মকম্ অন্তঃপুর এবেতি সমানং পূর্বেণ॥"

সুতরাং ভাষাগত অসুবিধা প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে ছিলো। কিন্তু তখন সংস্কৃতের প্রভাব বেশী থাকায়, সংস্কৃতের মাধ্যমেই বিভিন্ন প্রদেশীয় লোকের সঙ্গে সকলে কথাবার্তা বলত। এমনকি তাতেও অসুবিধা বোধ করায়, কোন কোন রাজা তাঁদের রাজ্যে একটা সার্বজনীন (কৃত্রিম) ভাষা করার চেষ্টা করেছিলেন। অন্ততঃ রাজশেখরের কাহিনীটুকু সেকথারই ইঙ্গিত দেয়।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, জাতীয় জীবনে ভাষার একটা বিশেষ স্থান আছে। সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটা সার্বজনীন বা আন্তর্জাতিক ভাষার প্রয়োজনীয়তা আছে।

'আন্তর্জাতিক ভাষা' বলতে আমরা সাধারণতঃ সে ভাষাই বুঝে থ কি, যা পৃথিবীর সব মানুষ সমভাবে বুঝতে ও বলতে পারে। এই এক 'বিশ্বজনীন ভাষা'র অবস্থান দু' প্রকারে হতে পারে—স্বাভাবিক নিয়মে, অথবা কৃত্রিম উপায়ে। ভাষার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও স্বাভাবিক গতির দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যায় যে, সুদূর অনাদি অনন্ত কাল হতেই পৃথিবীতে বহুভাষা বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন ভাষা বা ভাষা-গোষ্ঠী হতেই আজ পৃথিবীতে উপভাষা সহ প্রায় তিন হাজার সংখ্যক ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। কাজেই স্বাভাবিক নিয়মে যখন একটি ভাষা 'আন্তর্জাতিক ভাষা' হিসেবে খ্যাতিলাভ করতে পারেনি, তখন অন্য উপায়ে কোনও এক ভাষাকে আন্তর্জাতিকরণের চেষ্টা চলেছিল পাশ্চাত্তাভূখণ্ডে। সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুদূর অতীতে Francis Bacon, Descartes. Francis Lodurch (লোদুর্থ), Thomas Urquhart (উরকুহার্ট), Cave Beck, Dalgarnos (দলগারনোস্), Bishop Wilkins, Sudre প্রভৃতি মনীষিগণ লাতিন, কোইনে গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, classical arabic, negro africa, hausa মধ্যযুগের ফ্রাঙ্কো-ফেনেটিয়ান্, রোমান্স, ইংরেজী ইত্যাদিকে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে গণ্য করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। বিশেষ করে ইংরেজীর, শব্দাবলীকে সরলকরে সি, কে, অগডেন মহাশয় 'basic English' প্রচার করেছিলেন। কিন্তু কোনও একটা দেশ বা জাতির ভাষাকে সমস্ত

পৃথিবীর আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে গণ্য করান সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কাজেই তাঁদের প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নি।

বিশ্বমানব যাতে সহজ শিক্ষায়, স্বল্প আয়াসে, ব্যাকরণের জটিলতা দূর করে,অল্পসংখ্যক শব্দাবলীর মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের সহিত কথাবার্তা বলতে পারে—এক সূত্রে গ্রথিত হতে পারে—সে উদ্দেশ্যে গত শতাব্দী হতে আধুনিক কাল পর্যন্ত নানা কৃত্রিম নবীন আন্তর্জাতিক ভাষার সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে। ভাব ও কল্পনা এবং কার্যকারিতার দিকে লক্ষ্য রেখে জার্মাণ ক্যাথলিক ধর্মযাজক যোহান মার্টিন শ্লেয়ের ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কৃত্রিম ভোলাপুক (volapuk) ভাষার প্রচার করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—Menade bal puki bal, অর্থাৎ এক বিশ্বমানবের জন্য এক ভাষা। এই ভোলাপুক বা 'পৃথিবীর ভাষা'র অবস্থান কালেই সেণ্টমার্ক্সের বোপাল, বয়ের এর স্পেলিন, ফীওয়েগের এর দিল, দোরময় এর বালটা, আরনিমের ভেল্টপাল এবং বোল্লাকের লাং ব্লু প্রভৃতি বহু কৃত্রিম ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল। কিন্তু কোন ভাষাই বেশীদিন থাকতে পারেনি। লড উইগ লাজারুস জামেনহোফ এর 'এস্পেরান্তো' পূর্বোক্ত সব আন্তর্জাতিক কৃত্রিমভাষাকে পরাভূত করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলো। ঠিক এমনি ভাবেই পিয়ানোর 'লাতিনে সিনে ফ্লেক্সিওনে', হগরেনের 'ইণ্টারগ্লোসা' এবং ইয়েস্‌পেরসনের 'নোভিয়াল' একে একে মাথা তুলে দাঁড়ালো। তা' ছাড়া ইদো ইডিওম নিউট্রাল গ্লোরো, রো, মোং লিন—আরও কতকি একে একে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চাইলো। তা' ছাড়া, গত শতাব্দীতে বিভিন্ন উপায়ে অনেক কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি করে একটা সার্বজনীন ভাষা করবার চেষ্টা চলছিলো। সে উদ্দেশ্যে পর্তুগীজ জারগণ, ফ্রেঞ্চ জারগণ, স্পানীস জারগণ, ইতালীয়ান্ জারগণ, চিনুক্ জারগণ, এমনকি ইংলিস্ জারগণেরও সৃষ্টি হয়েছিল। পরে তা' থেকে আবার পিজন ইংলিস ও বীচলামার এর উৎপত্তি হয়েছিলো। শুধুকি তাই পিজন ইংরেজীর অনুকরণে পিজন মালয় (যাকে pasar বা bazaar মালয়ও বলে), ফ্রেঞ্চ ও পর্তুগীস পিজন, তাগালোগ স্প্যানীস-পিজন এবং নিগ্রো ইংলিসও হলো। কিন্তু এ সকল ভাষার স্বাভাবিক জীবনীশক্তি না থাকায় ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেল। এ ভাবে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আরও কত ভাষাকে সাধারণীকরণের জন্য চেষ্টা চলেছিলো তার আর ইয়ত্তা নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার ডাচ বাসিগণ আফ্রিকাআন্‌স্‌কে যেরূপ মূল্য দিয়েছিলো, ঠিক সেরূপ মূল্য দিল পশ্চিম আফ্রিকায় পর্তুগীস্‌কে এবং ডাচ্ গিনিতে টাকী-টাকী বা নিগ্রো তোঙ্গোকে। এরূপে জির্ত্ত তোঙ্গো, গুল্লানিগ্রো, আরাওয়াক, কবীর, গুম্বো বা ক্রিওলে ফ্রেঞ্চ এবং আরও কত কি ভাষা সার্বজনীনতার দাবী নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো, কিন্তু কালের কপোলতলে এদের অস্তিত্ব আর রইলনা। কারণ এগুলো সবই পণ্ডিতের খেয়াল খুশী মত বা বিচারমত গড়া কৃত্রিমভাষা। স্বভাবজাত বা সিদ্ধভাষা নয় বলে এগুলোর প্রাণ বা জীবনী শক্তি ছিলনা। মানুষের মনো মরুভূমিতে প্রবেশ করতে না করতেই শুকিয়ে বিলীন হয়ে গেল। তাদের জন্ম জানল বটে, কিন্তু অবস্থানের অনুভূতি হলনা! তা ছাড়া, এ সমস্ত ভাষার একটা মস্ত রকমের ত্রুটী ছিল। এগুলো সবই ইউরোপীয় আবহাওয়ায় তৈরী হয়েছিল। ভারতীয় পরিবেশে এরা কোন দিনই মানুষ হয়নি। সুতরাং আমাদের ক্ষেত্রে এগুলোর একটিও প্রযোজ্য নয়।

বর্তমান ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে একথা অনেকটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে জনগণের হিতার্থে ভারতীয় রাষ্ট্রের ঐক্যের প্রতীক ও প্রকাশক এরূপ একটি ভাষার দরকার, যা ভারতবাসী সহজেই বুঝতে ও ব্যবহার করতে পারবে। এই "নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা" জনগণের যত বেশী উপযোগী ও কার্যকরী হবে, ভারতের তাবৎ রাজকার্য পরিচালনার পক্ষে তত বেশী সুবিধে হবে। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কোনও একটি প্রচলিত ভাষার সহ-অবস্থান, কতটা কার্যকরী তা একবার ভেবে দেখা দরকার।

এখানকার ভাষাসমূহ আলোচনা করে দেখা গেছে যে, ভারতবর্ষে মূলতঃ চারটি ভাষাবর্গের অবস্থান আছে—(১) ইন্দো-ইউরোপীয়, (২) দ্রাবিড় (৩) অষ্ট্রো-এশিয়াটিক, এবং (৪) ভোটীয়-চীনীয়। এ সকল ভাষাবর্গের অন্তর্গত যে সমস্ত ভাষা ও উপভাষা ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে,তাদের সংখ্যা হলো ৮৫৪। এর মধ্যে ৩৪৫টি হচ্ছে উপভাষা, ২৮৪ টি ভোটীয় বর্মীয় গোষ্টির ভাষা; ৪৮টি

ইরানীয় ৩৬টি দার্ডিক এবং ৪৬টি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা। ভারতের রাষ্ট্রভাষা বিচারে এদের ধরবার কোন সার্থকতা নেই। ভারতের ভাষাজীবনে এদের প্রভাব থাকলেও প্রসার অত্যন্ত অল্প। এ ছাড়া, আরও প্রায় ২৪টি ভাষা অন্যভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এগুলো আধুনিক কালে আগত অল্প সল্প লোকের মধ্যে সীমিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু যে ভাষা সভ্যতার অগ্রগতিতে, সংহতি শক্তিতে এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সুনিয়ন্ত্রিত, 'নিখিল ভারত রাষ্ট্র ভাষা' বিচারে তাদেরি মর্যাদা বা স্থান আছে। সে দিক দিয়ে দেখলে মাত্র ২১টি প্রধান সাহিত্যিক ভাষাকেই স্বীকার করে নিতে হয়। এগুলো সাহিত্যে ও শিক্ষায় এবং পরিবার ও বিশিষ্ট সমাজের বাহিরে অবস্থিত বৃহত্তর জীবনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ভাষা গুলির মধ্যে—(১) বাঙ্গালা, (২) আসামী, (৩) উড়িয়া (৪) মৈথিলী (৫) ভোজপুরী (৬) আবধি (৭) বুন্দেলী, (৮) হিন্দী, (৯) উর্দু (১০) হিন্দোস্তানী (১১) মারাঠী, (১২) রাজস্থানী, (১৩) গুজরাটী (১৪) সিন্ধী, (১৫) পাঞ্জাবী, (১৬) কাশ্মীরী, এবং (১৭) নেপালী আর্য গোষ্ঠীর অন্তর্গত। আর, (১৮) তেলুগু (১৯) কানাড়ী, (২০) তামিল, ও (২১) মালয়ালম্ দ্রাবিড় গোষ্ঠি ভুক্ত। ধ্বনিতত্ত্বে ও রূপতত্ত্বে এবং বাক্যরীতি ও শব্দশক্তিতে একে অন্য হতে পৃথক্। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে কোনও একটি প্রচলিত ভাষা ভারতের জাতীয় জীবনের ঐক্যের বিধায়ক হবে কিনা, তার বিচারের ভার ভবিষ্যতের ওপর।

আমাদের মনে হয়, ভারতের মত বিশাল বহু ভাষাময় ও জনবহুল দেশে অন্ততঃ পক্ষে দুই বা দুই এর অধিক ভাষা রাষ্ট্রকার্যে ব্যবহৃত হলে ভাল হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কথা বিচার করলে এর নজির কিছুটা মিলবে। এমন অনেক রাষ্ট্র আছে, যেখানে দু-দুটি করে ভাষা রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকৃত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন—আফ্গানিস্থানে ফারসী ও পোশ্‌তো; সুইজার-ল্যাণ্ডে জরমান, ফরাসী, ইতালীয়ান ও রেতো রোমান; কানাডায় ইংরেজী ও ফরাসী, বেলজিয়ামে ফরাসী ও ফ্লেমিশ; এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজী ও আফ্রিকান্‌স্ সুতরাং ভারতের ক্ষেত্রেও এটা প্রচলিত হতে পারে। ভারতের জনগণের 'মাতৃভাষা' যার যেমনটি আছে, ঠিক তেমনটিই থাকবে, উপরন্তু একটা কৃত্রিম সহজ ও সরল ভাষার তৈরী করতে হবে, যা হবে ভারতের 'এস্পেরান্তে'। ভারতের প্রধান ভাষার শব্দাবলীতে অনেক সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডার আছে। এ সকল ভাষা থেকে, আবশ্যকমত বিদেশীয় ভাষা থেকেও, শব্দ সংগ্রহ করতে হবে। এভাবে যুগোপযোগী সহজ ও সরল সংস্কৃত প্রভাববহুল কোনও এক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা যেতে পারে কিনা, তাও একবার ভেবে দেখা দরকার। জনগণের মাতৃভাষার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হলে, এ ভাষা গ্রহণে কারও কোন আপত্তি হবেনা। আপাততঃ এটা ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বাহক এবং ধর্ম ও কর্মের সহায়ক হবেনা। এ ভাষা হবে কেবল ভারতের রাষ্ট্রের রাজকার্যের ভাষা। কর্ম ক্ষেত্রে, ব্যবসারক্ষেত্রে ও অর্থনৈতিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে এ ভাষা হবে বলবতী। প্রদেশ হতে প্রদেশান্তরে এর সাহায্যেই ভারতীয় জনগণ নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করবে; এর মাধ্যমেই তাদের জাতীয় জীবনের ঐক্য ঘটবে। এ ভাষাটি এমন হবে যে এর কর্মশক্তি, প্রসার-শক্তি ও অধিকারশক্তির ওপরেই এর প্রতিষ্ঠা ও সর্বজনীনত্ব নির্ভর করবে। এভাবে যদি নিখিল ভারত এস্পেরান্তো ভাষার সৃষ্টি হয়, তা হলে ভারতবর্ষ একটা ভাষা-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রও হবে। ভারতের জাতীয় জীবনে এরূপ একটি সর্বজনীন ভাষার প্রয়োজন আছে।

তা ছাড়া, শিক্ষাও সংস্কৃতিমূলক যোগসূত্র স্থাপনের জন্য সংস্কৃতকেও রাখতে হবে তার যথোপযোগী মর্যাদা দিয়ে। প্রয়োজন বোধ হলে যাতে এ ভাষায়ও মানুষ কথা বলতে পারে তারও ব্যবস্থা রাখতে হবে। সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবশ্য সংস্কৃতকে একটু সরল ও সহজ করতে হবে। প্রয়োজন বোধে বিদেশীয় শব্দকে সংস্কৃত করে নিতে হবে। ভারতবাসীর সংস্কারে ও কথাবার্তায় সংস্কৃতের ছাপ বিদ্যমান। ইংরাজী জনগণের ভাষা না হলেও শিক্ষার ভাষা হতে কোন আপত্তি নেই। ভারতের ভাষা সমস্যা ব্যাপারে সংস্কৃতবহুল কৃত্রিম ভাষার কোন স্থান আছে কিনা—তাহা জনমতের অপেক্ষাধীন।

আনাতোল ফ্ৰাঁস

শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত

যে একটিমাত্র প্রতিভাকে সমগ্র ফরাসী গদ্য-সাহিত্যের মুকুটমণি এবং 'ফরাসী' শব্দেরই প্রায় সমার্থক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে তিনি আনাতোল ফ্রাঁস। ক্লাসিকাল কাব্যে অনুরূপ মর্যাদা দাবি করতে পারেন আর একজন—অতুলনীয় রাসীন। রাসীন দিয়েছেন ফরাসী মনের দার্ঢ্য, সামর্থ্য, সমুচ্চতা, স্বচ্ছতা—ভাষা তাঁর হাতে পেয়েছে সংযমের পরাকাষ্ঠা, অব্যর্থ গতি। আনাতোল দেখিয়েছেন ফরাসীর বহুধারা—তাঁর রহস্য-প্রিয়তা, তাঁর শ্লেষোক্তি, তাঁর সরল ও সুঠাম ভাষায় এনেছে এক বহুবর্ণিল প্রাণবন্যা; চিন্তায় সমৃদ্ধি এবং ভাবে অতলস্পর্শী গভীরতা সত্ত্বেও তাঁর হাতে বাণীশিল্প হয়েছে লঘুপক্ষ; তাঁর পরিচ্ছন্ন মন কোথাও অস্পষ্টতা কিছু রাখেনি, কোথাও অসংলগ্নতা ও অবহেলার স্থান হতে দেয়নি।

যুক্তিবাদিতা আর স্বচ্ছচিন্তা ফরাসী মনের বিশেষত্ব, ফরাসী-গদ্যের বিশেষ গুণ বললেও চলে। আনাতোল ফ্রাঁস ফরাসীর হয়ে পেয়েছেন উভয় গুণই—একটু আধটু নয়, পরিপূর্ণ মাত্রায়। তিনি আবার স্বদেশ অতিক্রম করে হয়েছেন বিশ্বের প্রতিনিধি, আধুনিক বিশ্বমানবের প্রতিনিধি। কি রকমে? আধুনিক মনের প্রকৃতি কি সেটি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারব।

উনবিংশ শতাব্দীর সায়াহ্নে আর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে আধুনিক মন হল উগ্র 'বৈজ্ঞানিক'—অর্থাৎ মস্তিষ্কচারী যুক্তিবাদী, সে সিদ্ধান্তে পৌছায় যুক্তির পরম্পরা বেয়ে—এক বা একাধিক জানা থেকে নূতনতর সত্যে। এই বিচারসিদ্ধ জ্ঞান হল নিষ্কাশিত সত্য—ইন্‌ফারেন্সিয়াল্ নলেজ। কিন্তু খণ্ডসত্যের উপর, জড়ের উপর বনিয়াদ করে অসীম ও অখণ্ড সত্যের দিকে মানুষী অনুসন্ধিৎসার অভিযান বিশ্বপ্রকৃতির সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান এক ক্রমবৃদ্ধির এবং ক্রমপরিবর্তনের ধারা বেয়ে তাকে সংশয়াকুল করে তোলে। যা ছিল চিরসত্য, অব্যয়, অক্ষয়, তা হয়ে দাঁড়ায় দেশকালপাত্রনির্ভর সত্য, আংশিক সত্য। আর যা মাত্র এখানে সত্য, একক্ষেত্রে সত্য, অন্যখানে বা অন্যক্ষেত্রে সত্য নয়, তাকে পূর্ণ সত্যই বা বলি কি করে? তা মিথ্যারই নামান্তর। শেষ কথা তাহলে জানা যায় না, শাশ্বত সত্য বলেও কিছু পাই না। যা আছে বা যা পাই, তা সাময়িক সত্য—আগামী কালের নূতনতর জ্ঞান ও বৃহত্তর সত্য তাকে যে নাকচ করে দেবে না তাও বলা যায় না। সন্দেহবাদের স্কেপ্‌টিসিজমের এই হল রহস্য। অগম্য অলব্ধ দূরের কাছে ব্যর্থ হয়ে মানুষ শেষে হয়ত একেবারে হতাশ হয়, নয়ত একটা দুরন্ত ক্ষোভের বশে একান্ত নিকটের কাছেই অন্ধভাবে আত্মসমর্পণ করে—জড়ের পূজারী হয়।

বুদ্ধির চর্চা করে বিচারের সূক্ষ্মতম ধারা বেয়ে বিজ্ঞানী মনের চূড়ায় পৌছিলেন আনাতোল। তারপর জড়বাদীর সন্দেহফল ভক্ষণও করলেন। এক ইহসর্বস্ব জীবন-দর্শন তাঁকে তখন গ্রাস করল। কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে পৌছে রিক্ততার মধ্যে তাঁর হল নবজন্ম। যে সৌন্দর্য-বোধ, যে শুচিশুভ্র আনন্দ হৃদয়ে চাপা পড়েছিল তর্কের ধুলাবালিতে তা সামান্য অনুকুল মৌসুমী বায়ু পেয়ে শতদল মেলে ধরল। একদা তিনি বলছিলেন, মানুষের সার্থকতা আত্মক্লেশের কৃচ্ছ্রতার মধ্যে দিয়ে নয়, উদাসীন শুষ্কতার মধ্যে দিয়ে নয়; তিনি বলছিলেন তা সুন্দরের মধ্যে দিয়ে আনন্দের উপাসনায়। প্রচলিত ধর্মাচারের বিরুদ্ধে 'তাইস'-এর বাণী এই বিপ্লবের বাণী। তাইস মূঢ় পাফনুসিয়াসদের জন্যে সে বাণী রেখে গিয়েছে—তার যৌবন রসোচ্ছিন্ন অনুপম তনু মৃত্যুর কোলে উৎসর্গ করে।

তারপর আনাতোল যেন ছাড়িয়ে গিয়েছেন ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ, জড়ের সীমানাও। তাই বহু অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় এসে তিনি বললেন—

"দিনের প্রকাশ হতে আমার মনও একখানি শ্বেত পদ্মফুলের মতো নিজেকে খুলে ধরল, আমি জানলাম

আমাদের দুঃখ-দুর্দশার মূল বাসনা—সেই বাসনাই আমাদের চোখে ঠুলি পরিয়ে জিনিসের সত্যরূপ দেখতে দেয় না; বিশ্ব-বিষয়ে এই সত্যদৃষ্টি যদি পেতাম আমরা—তবে দেখতাম যে আকাঙ্ক্ষা করবার নেই কিছুই, আর তাহলে আমাদের দুঃখ-দুর্দশারও হত অবসান···নিরহঙ্কার হও, হও বিনম্র, মধুরস্বভাব। প্রবৃত্তি হল যেন মৃত্যু অক্ষৌহিণী সেনা—যেমনভাবে মত্তহস্তী খড়ের ঘর নিষ্পিষ্ট নিশ্চিহ্ন করে তেমনি তাদের ধ্বংস কর। বাসনার সহস্র ভোগ্যবস্তু পেয়েও তোমার তৃপ্তি হবে না, সমুদ্রের সমস্ত জল দিয়েও যেমন নিবৃত্তি হয় না তৃষ্ণার।"

জড়বাদীর রাজ্য থেকে এখানে আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছি অন্তর্লোকে। যুক্তিবুদ্ধির চেয়ে অন্য এক জিনিস প্রধান হয়ে উঠেছে এখানে—তা উপলব্ধিগম্য, তা চলে হৃদয়ের অন্তস্তল বেয়ে, বুদ্ধির ওপারে।

কিন্তু এ কী হল? আধুনিকের সত্য দর্শনের সঙ্গে অহঙ্কারের, ঔদ্ধত্যের, ক্রূরতার, বাসনার কী সম্পর্ক? শিল্পী তাহলে প্রবেশ করেছেন সত্যোপলব্ধির জগতে—তারই জন্য প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি। সমষ্টিগত জীবনে যে আদর্শের অনুসরণ তারও মূলসূত্র এইখানে—বিপ্লব বাহিরের নয়, আকারের প্রকারের নয়, অন্তত ততখানি নয়, যতখানি ভিতরের, ব্যক্তির মধ্যে, তার প্রকৃতিতে ও গঠনে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর শেষ উপন্যাসের (La Revolte des Anges বা 'দেবদ্রোহ') উপসংহার করছেন আনাতোল এই অর্থপূর্ণ কথাগুলি দিয়ে:

"আমাদের কৃতিত্বে সেই বুড়ো অথর্ব ভগবান এখন পৃথিবীরাজ্য থেকে গদীচ্যুত, আর এই বিশ্বে সকল চিন্তাশীল জীবই তাকে অবজ্ঞা কিম্বা ডোন্টকেয়ার করে। কিন্তু মানুষ ইয়ালদাবাওথকে না মানলেও বড়ো একটা কাজ করে না যদি সেই ইয়ালদাবাওথের প্রেতমূর্তিকেই ভিতরে আসন দেয়, যদি তারই মতো স্বভাব পায় সে—পরশ্রীকাতর, নিষ্ঠুর, কলহ-প্রিয়, দেহলোভী, শিল্প সৌন্দর্যের শত্রু; কী লাভ সেই হিংস্র বিশ্বস্রষ্টাকে তাড়িয়ে যদি মানুষ কর্ণপাতই না করে মিত্র দেবশক্তিদের—ডায়োনিসস্, আপোলো এবং 'মিউজ' দেবীদের—অমৃত ভাষণে? আমাদের ক্ষেত্রে—আমরা, যারা স্বর্গের প্রাণী, অপার্থিব দেবশক্তি—আমরা আমাদের অত্যাচারী ইয়ালদাবাওথকে কেবল তখনই বিনাশ করতে পারব যখন আমাদের ভিতরে অজ্ঞানতা এবং ভয়কে বিনাশ করতে পেরেছি।"

ভারতীয় উপনিষদ এবং প্রাক্-উপনিষদদ্রষ্টারাও বলতে পারতেন এই কথা—অজ্ঞানই মানুষের শত্রু, মানুষের ঊর্ধ্বগতির অন্তরায়, আত্মবোধের পথে প্রধান বাধা। আধুনিকের হয়ে আনাতোল শেষে আকর্ষণ করছেন সমস্যার এই একেবারে মূল ধরে। উত্তরণের বা উদ্ধারের পথ তিনি অবশ্য সাধক দার্শনিকের ভঙ্গি ও ভাষায় প্রকট করে দেন নি, তবে প্রবুদ্ধ শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে তার আভাস ও ইঙ্গিত দিয়েছেন, আর আরম্ভ করবার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট—অহংকারনাশ, সাত্ত্বিকগুণের চর্চা, বাসনা-কামনা বর্জন, জ্ঞানের উদ্রেক এবং ভয় পরিহার। এই রকমে শান্ত স্থির হৃদপদ্ম উপরের আলোর অজস্র ধারা বর্ষণে পুষ্ট হয়ে আপন সহস্র দল মেলে—উপমাটিও ইন্দ্রিয়বিলাসী য়ুরোপের মনীষী নিয়েছেন মনে হয় যেন ভারতীয় সাধনার প্রাচীন ঐতিহ্য-ভাণ্ডার থেকে।

নিঃসঙ্গ সুর

জীবেশ মৈত্র

গাঁশুদ্ধ লোক জানে ভুপেটা চিরকেলে গোঁয়ার। যেমন গোঁয়ার তেমনি বেকুব। না হলে ১৯৪৭ সালের পর এত জল ইচ্ছামতী দিয়ে গড়িয়ে গেলেও কিনা হিন্দুস্থান আর পাকিস্থানের ফারাকটি বোঝেনা?

বল্লেই বলবে—চ্যাংখালি আর দৌলতগঞ্জ এর মধ্যে ফারাকটা হয় কি হিসাবে শুনি? চেরডা কাল একসঙ্গে উঠাবসা, চাষ আবাদ.আর আজ হল দৌলতগঞ্জ পাকিস্থান, আর চ্যাংখালি হিন্দুস্থান?···ওসব বাপু আমার মাথায় ঢোকে না।

শোন একবার কথা! সাধে কি আর···আচ্ছা সেদিনের কথাটাই বলি তাহলে। বৃষ্টি হয়েছে কদিন আগে। জমিতে 'জো' বসেছে। বোশেখ মাসের 'জো' বলে কথা। এবেলা 'জো', তো ওবেলা মাটি টান। চাষার মনটাও অমনি। বলে, যম যদি আসে তাকেও বসে থাকতে হবে। চাষা বলবে—ডেঁড়াও, আগে 'জো' রাখি তারপর অন্য কথা।

ভুপে উঠেছে সেই রাত থাকতে। সুর্যি ঠাকুরের তখন বাড়ী কোথায়? এমন কি পুবে ফর্সাও দেয়নি, কাক কোকিল ডাকেনি। কেবল মুশলমান পাড়ায় এখনও যে দু এক ঘর মানুষ আছে, তাঁদেরই কারুর মটকায় মোরগ দু' একবার বাক্ দিয়েছে।

সেই তখন ভুপে ঘুম থেকে উঠেছে। বলদ দু'টোকে ঘানি পানি খাইয়ে বেরুবে—তার আগেই লক্ষ্মীমণি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। খুঁটে বাঁধা এক পালি মুড়ি আর একটু গুড় শুদ্ধ গামছাখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে জলের ঘটিটা এগিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়। হুঁকো, কলকে আর বিচুলির নুটি গুছিয়ে না দিলে আবার কার কাছে যাবে তামাক খেতে?

এ সব ব্যাপারে লক্ষ্মমণির এতটুকু এদিক ওদিক হয় না। তার পর ভুপের একখানা হাত চেপে ধরে মিনতি করে, এট্টু সকাল সকাল ফিরো আজ। শরীরডাও তো দেখতে হয়?

এ কথা শুনলে রাগ হয় না কোন মুমুন্দির? ভুপে বলে—জমি কি তোর বাপের যে. যা বলবি তাই? বলেই এক ঝটকায় লাঙ্গল কাঁধে ফেলে সে রাস্তায় পা বাড়ায়। গাঁ ছাড়িয়ে যখন সে মাঠের কিনারে, তখন একরকম তাকে চমকে দিয়েই যেন বাঁ দিকের আম গাছে একটি কোকিল ডেকে ওঠে, দেখা দেখি কাক, কোকিল, ঘুঘু, শালিক, বটের আরো যে কত পাখী! যেন পাখীর রাজ্যি। সঙ্গে সঙ্গে আকাশের দরজা খুলে এক চিলতে ঝিরঝিরে হাওয়া ভেসে আসে। আঃ! প্রাণ মন যেন জুড়িয়ে যায়।

যাবেনা? দেবতারা যে অন্তরীক্ষে হাওয়া খেতে বেরোন এই সময়। বাপ পিতামহ আমল থেকে এর কোন ব্যাত্যয় নেই। লাঙ্গল নামিয়ে ভুপে এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে। কিন্তু এক মুহূর্ত সময়ও কি আর নষ্ট করবার উপায় আছে?

উঠে লাঙ্গলে গরু জুতে সে মনে মনে মা ধরণীকে প্রণাম করে। সেই সঙ্গে তার মাঠের কাজ শুরু। গরুর ল্যাজে একটা মোচড় দিতেই লাঙ্গলের ফলাটা বসে যায় মাটির মধ্যে।

ইতিমধ্যে পুবদিক আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে-কাঁচের মত স্বচ্ছ। অন্য সব পাখীর স্বর ছাপিয়ে একটি কোকিলের গলা কেবলি পরদায় পরদায় চড়ছে। আর তার সঙ্গে পাল্লাদিয়ে রোদের তেজ।

ভুপে যখন জোয়াল থেকে গরু দুটোকে ছেড়েদিল তখন সুর্য্যিদেব ঠিক মাথার ওপর। সেই কোন ভোরে

উঠে এই তিনপোর বেলা পর্য্যন্ত নাগাড়ে লাঙ্গল চষা বড় চাট্টিখানি কথা নয়। তবু যে ধান জমিটার তেয়ার শেষ করতে পেরেছে এতেই সে খুসী।

গরু দুটোকে ছেড়ে দিয়ে এসে ভুপে একটু বসলো উত্তরের বাবলা গাছের ছায়ায়। সবে দু' একটা ফুল ফুটতে আরম্ভ করেছে গাছে। দু' চারটে হলুদ ফুল তার আশে পাশেও ছড়িয়ে আছে।

একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল সে। আর যায় কোথায়? যা হবার তাই হল। কুলেটা যে এখনও সাঁয়া, সে কথাটাও কি একবার মনে হল না তোর? যখন খেয়াল হ'ল তখন কুলে পগার পার বর্ডারের পিল্লে পেরিয়ে একেবারে দৌলতগঞ্জের সীমানায়। সঙ্গে সঙ্গে ভুপেও উঠে দে ছুট। কিন্তু তার একবারও মনে হল না যে ওটি হিন্দুস্থান নয়—পাকিস্থান।

কিন্তু সে কুলের সঙ্গে ছুটে পারবে কেন? সারাদিন লাঙ্গলটেনে এমনিতেই পা দুটো ন্যাতা। আর কুলেও হয়েছে তেমনি। যেন তাকে ব্যঙ্গ করেই দ্বিগুণ জোরে ল্যাজ তুলে ছুটতে সুরু করল।

এমন সময় সামনে ছাদেরকে দেখে ভুপে যেন হালে পানি পেল। চেঁচিয়ে বল্ল—ছাদের ভাই, গরুডা ফিরাও।

শুনে ছাদের লাঙ্গল ছেড়ে এলো। কুলেকে বাগার দিয়ে বলল—তা হারে ভুপে, তুই যে বড় এপার এয়েচিস? আন্ছাররা দেখলে সে এখুনি ধরবে।—

আরে ফেলে থোও তোমার আনছার। আমার নাম ভুপে বিশ্বাস। আমারে ধরবে আনছার?

কিন্তু গ্রহের ফের দেখো। তার মুখের কথা শেষ না হতেই তিন্ তিনটে জলজ্যান্ত আনছার। ছাদের বল্ল—ভুপে এই বেলা পালা শিগগিরি।

—ওরা কারা ছাদের ভাই।

—আনছার! বাঁচতে চাসতো পালা এই বেলা। ভুপে আর কথা বাড়াল না। কুলের ল্যাজে কসে একটা মোচড় দিয়ে দিল এক ছুট। এপার চলেও এসেছিল ঠিক। কিন্তু ঝোপের মধ্যে যে একটা খানা আছে সেটা আর তার নজরে পড়েনি। পড়বি তো পড় একেবারে সেই খানার মধ্যে।

ছাদের ব্যাপারটা স্পষ্ট দেখেছিল। অনেকক্ষণ তাকে উঠতে না দেখে সে মহা ফাঁপরে পড়ল। ভুপে যেখানে পড়েছে, সেটা হিন্দুস্থানের মধ্যে। নজরের মধ্যে ব্যাপারটা, কিন্তু হলে হবে কি? এযেন পাহাড় পর্ব্বতের ব্যবধান।

তবু মানুষের মন বলে কথা। আজই না হয় ওটা হিন্দুস্থান; তা হলেও তো এতদিনকার একটা চেনাশোনা দহরমমহরম। এখন সে করে কি?

আর একটু চেঁচিয়ে ডাকল—ভুপে! তোর হ'লটা কি? পড়ে যে আর উঠছিসনে? বেশী জখম হয়নি তো?

—মন লাগছে পা-টা বোধ হয় একেবারেই গিয়েছে ছাদেরভাই। আমাকে এটুসখানি ধর।

…এমন বিপদে কি মানুষে পড়ে?

ছাদের বল্ল—শেষে যদি কেউ দেখেটেখে ফেলে?

…কেউ দেখবে না। তুমি এটুসখানি ধরে দাঁড় করিয়ে দাও। দেখি যদি কোন রকমে যেতে পারি।

আর্তনাদের মত শোনায় ভুপের কথাগুলো। ছাদের অস্থির হয়ে উঠল। সতর্ক চোখে একবার সে চারদিকটা তাকিয়ে দেখল।…পুলিশ টুলিশ তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ছাদের ভাবল, বেরিয়ে তো পড়ি, তারপর যা করে আল্লা।

অতি সতর্ক উত্তেজনায় এক পা, দু'পা করে এগিয়ে গেল ছাদের। নিশ্বাসের সঙ্গে যে বুকের উঠাপড়া তারই ঢিপঢিপানি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে নিজের কানে। ভারী পা ফেলে ফেলে সে যেন এক অজানা অরণ্যে ঢুকতে যাচ্ছে।

অরণ্য যে, তাতে তার ভুল নেই। ছাদের এক মুহূর্ত্তের জন্যেও অনুমান করতে পারলো না যে, তিনজোড়া শ্বাপদ চক্ষু তাকে অনুসরণ করছে। কর্কশ জিভে থাবা চেটে প্রস্তুত তারা।

শেষ পর্য্যন্ত ভুপের কাছে পৌছতে পারল না ছাদের। মাঝ পথে এসে হঠাৎ তার চলা থেমে গেল। মনে হল আকাশখানা যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল।…গুড়ুম গুম্। সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়া অন্ধকার।

আওয়াজ শুনে ভুপে চমকে উঠে মাথা উঁচু করে একবার দেখতে চাইল ব্যাপার। উঃ! ধরণী একেবারে রক্তে লাল।

একে সারাদিন অসহ্য খাটুনি। এখন পর্য্যন্ত পেটে কিছু পড়েনি বল্লেই হয়। তার উপর দুরন্ত আঘাত। ভুপে আর সহ্য করতে পারল না। মাথার মধ্যে তার ঝিমঝিম করে উঠল, তারপর সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

বোশেখ মাসের সূর্য্য মাঝ আকাশ পেরিয়ে গিয়েছে। তামাটে আকাশখানাকে যেন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে।

একটা ঘুঘু ডাকছিল দূরের বাবলা গাছে।…ঘুঙুর-ঘুঙ, ঘুঙুর-ঘুঙ। কোন বিদেহী আত্মা যেন একান্তে অশ্রু ঝরিয়ে চলেছে এই রুক্ষ প্রান্তরে।

সে সুর কারও কানে পৌছুল না।

সাহিত্যের সন্ধান

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরবো না গো আর
তোমারে করি নমস্কার

নমস্কার করি আপনাদের, মায়েদের, ভায়েদের, গুণীজ্ঞানীদের, সাধু-সজ্জনদের, আমার কবি বন্ধুদের, আর রেখে যাই আমার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি এই শ্যামলা দেশের মাটিতে, বিশ্বময়ীর আঁচল যেখানে পাতা, সব পরিচয়গ্রাসী নিঃশব্দ ধূলিরাশির মধ্যে—যার সঙ্গে আমার নাড়ীর ঘনিষ্ঠতা, রক্তের যোগ, স্নেহের টান, ভালবাসার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মনে পড়ছে আজ থেকে ষাট বছর পূর্বে কবিগুরু এক অপূর্ব উন্মাদনার দিনে ভায়ের হাতে রাখী পরিয়ে বলেছিলেন—একবার তোমার চিত্তকে প্রসারিত করে দাও, হিমাচলের পাদমূল হতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত, নদীজালজড়িত পূর্বসীমান্ত থেকে শৈলমালা বন্ধুর পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত—আজ বাংলা দেশের সমস্ত ছায়াতরু নিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারায় অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে সেই নিস্তব্ধ শুচি রুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের বন্দেমাতরম গীতিধ্বনি একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক্, একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো—

বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান

সেদিন ছিল শুধু মনমাতানো প্রাণভোলানো দিন নয়, উন্মোচনের উন্মীলনের দিন, উদ্বোধনের লগ্ন, ভারত পথ-পথিক হোতাদের, উদ্গাতাদের উদ্গীতের দিন যাঁরা বলেছিলেন—

এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কবিগুরু আয়ুর শেষ সীমায় পৌঁছে তার শেষকৃত্য সম্পাদন করেছিলেন এই পুণ্যক্ষেত্রে। মেদিনীপুর তীর্থরূপ নিয়ে তাঁকে আহ্বান করেছিল। বঙ্গ-সাহিত্যের উদয় শিখরে যে দীপ্তিমানের আবির্ভাব হয়েছিল অস্তদিগন্তের প্রান্ত থেকে—তাঁকে প্রণাম জানিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। আমরাও জানাই সেই আদি কবিকে যিনি লিখে গেছেন—জল পড়ে, পাতা নড়ে।

সেদিন যে দেশজননীকে আমরা বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে চোখের জলে অভিষিক্ত করেছি, যার জন্য বুকের রক্ত দিয়ে তর্পণ করতে চেয়েছি—তার একদিকে ছিল 'জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্র, পরিকীর্ণ পশু কঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেত নৃত্য, আর একদিকে ছিল আপক ধান্যভারনম্র সুজলা সুফলা শস্যক্ষেত্র, যেখানে প্রসন্ন প্রভাত-সূর্য প্রতিদিন মুছিয়ে নেয় শিশিরবিন্দু।' শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্ধলুপ্ত অবশেষের মর্য্যাদাহীনতা থেকে সেই আহিতাগ্নিকে পরম যত্নে লালন করেছিলেন যাঁরা তাঁরাই বাংলার বৈষ্ণব বাউল শাক্তশৈববৌদ্ধ মহাজনতার কবি, তার চারণ, তার চাষী, তার কথক, তার পাঠক, তার সীতা, তার সাবিত্রী, তার দময়ন্তী শৈব্যা হরিশ্চন্দ্র প্রহ্লাদ, রাম লক্ষ্মণ অর্জুন যুধিষ্ঠির। এই ত আমার শাশ্বত উত্তরাধিকার, তারই উত্তরসাধক রামমোহন থেকে রবীন্দ্র-নাথ, মাইকেল, বঙ্কিম শরৎ তারাশংকর জগদীশচন্দ্র প্রফুল্ল-

মানালি

(কুলু ভ্যালি—কাশ্মীর)

ফটো : রবীন চক্রবর্ত্তী
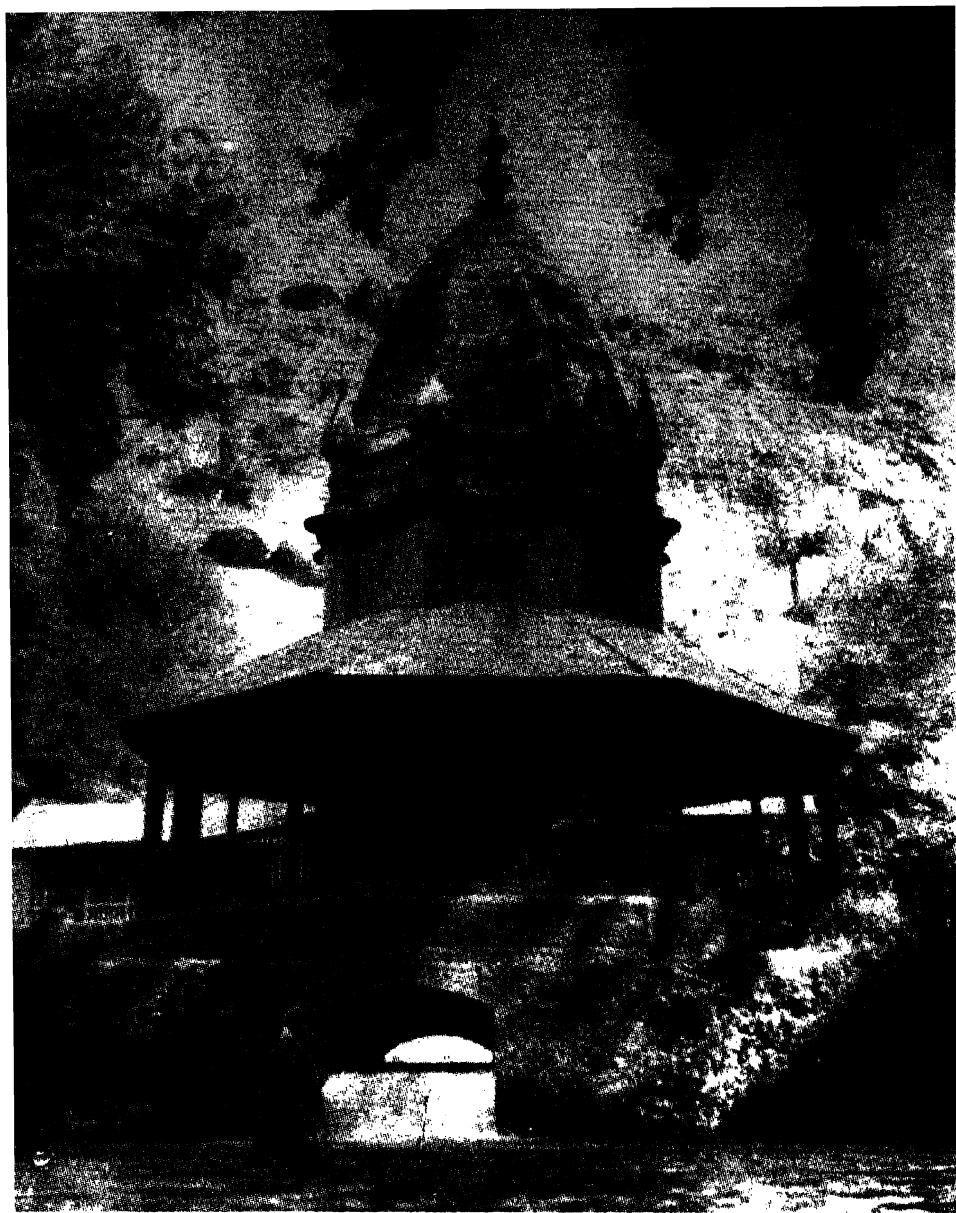
প্রাচীনতম শিবমন্দির (কাশ্মীর)   ফটো : সন্তোষকুমার দাস

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

চন্দ্র, মেঘনাদ, সত্যেন বসু, তারই উত্তরযোগী পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অরবিন্দ, মানস সরোবরে প্রস্ফুটিত শতদল—তাঁদেরই হাত থেকে আমরা সে দান গ্রহণ করেছি যত ঋণী হয়েছি, কিন্তু সেই পিতৃঋণকে স্মরণ করছি কই—জানি এই জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে, আমার দৃষ্টি শুধু পিছনে পড়ে থাকবে না, বলবে—চরৈবেতি, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, কিন্তু সে সার্থকতার তীর্থ কোথায়, কোথায় সেই স্বপ্ন যা বাঁধবে পূবকে পশ্চিমকে, জ্ঞানকে বিজ্ঞানের সঙ্গে, অন্ন হবে বহু, টেকনোলজি শুধু যন্ত্র-দানবকেই সম্মান দেবেনা, শেখাবে 'যে মানব আমি, সে মানব তুমি কন্যা'।

আজকের এই পল্লীবাসরে সমাগত কবি সমাজকে শুধু সশ্রদ্ধভাবে নিবেদন করবো সেই কথাটি—যা সত্য যা সনাতন, যা, দেশকালপাত্র রুচি নিরপেক্ষ—

কাঙ্গাল আর করবে কত
যদি নয়নে নজর না থাকে
প্রেম যদি না মিললো খ্যাপা
তবে সাধন ভজন কদিন রাখে

বাংলা দেশের হৃদয় হতে জননী এইরূপেই বেরিয়েছিলেন, কাব্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ছিল এই বাদশাহী মোহর, তাকে ভাঙিয়ে কানাকড়ার কড়ি করে ফেলেছি আমরা। উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীরা এই সত্য দর্শন করেছিলেন এবং এক রসায়নের স্বপ্নও দেখেছিলেন, শুধু প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের নয়, শুধু জড় বিজ্ঞানের সঙ্গে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের নয়, শুধু অভাবের সঙ্গে প্রাচুর্যের নয়, পল্লী বাংলার সঙ্গে সহর বাংলার। শত শত স্কিম, উন্নয়ন নীতি, সেচ বিদ্যুৎ স্কুল কলেজ হেলথ্ সেণ্টার সত্ত্বেও এই বিভেদ শুধু স্পষ্ট নয়, অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। কেন, তার শুধু বহিরঙ্গে বিচার, materialistic interpretation দরকার নয়, অন্তরঙ্গে বিশ্লেষণও প্রয়োজন। জানি আমার ক্রুদ্ধ নবীন বন্ধুর দল (angry young men) এখনি বলবেন—মশাই, romantic extravagance ছেড়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের বুলি, ঝুলি থেকে বারে বারে বের না করে সোজা ভেলকুন লকড়ির একটু সমাধানের ইঙ্গিত দিন দিকিন্, বেঁচে থাকার সমস্যাটাই হচ্ছে আসল, সত্যি, চতুর্দ্দিকে রোদনভরা বেদন, কান্নার রোল, হা-হুতাশের গঞ্জনা—গেলো, গেলো, সব গেলো, দেশ ভাঙলো, সমাজ ভাঙ্‌লো, মন ভাঙলো, দেবতার দেউল শূন্য, ঋত্বিক অনাগত, দীপ জ্বলে না, অন্ধকার কাটে না, তমসা দূর হয়না। দীর্ঘ যাত্রা পথের প্রতিটি উপলখণ্ডে মিশে আছে নিঃসহায়ের বেদনা, মাটির প্রতিটি ধূলিকণায় স্তব্ধ হয়ে আছে ব্যথিতের দীর্ঘশ্বাস, দিকে দিকে শুধু অভিসম্পাত, অক্ষম আস্ফালন, মনুষ্যত্বহীন পরাজিত মনোভাবের বিকার, বিদ্বেষ কলুষ ক্লেশ গ্লানি পরশ্রীকাতরতা। সুস্থ সমাজ নয়, আনন্দিত চেতনা নয়, বিকৃতভঙ্গুর উপবাসী দেহ ও মন। সবার উপরে আছে অন্নচিন্তা চমৎকারা। উদয়াস্ত তারই চেষ্টায় আমাদের ছেলেরা ছোটে, মেয়েরা জোটে, অনেকেই আজ কল্যাণী গৃহিণী সীমন্তিনী নয়। যুগদেবতার রথ পিষে চলেছে, জীবনের মুক্তধারা ঘুলিয়ে যাচ্ছে, দিনান্তে নিশান্তে পথপ্রান্তে ফেলে আসা মন গজরাচ্ছে। সেই সনাতন অভাব, সেই গতানুগতিক অভিযোগ সংসার সমুদ্র মন্থনে যে হলাহল ওঠে তাকে কণ্ঠে ধরবার শক্তি কোন নীলকণ্ঠের তা জানিনা। এইত তথাকথিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর গৃহের ছবি—শ্রীহীন হ্রীহীন—তার সাহিত্য কোথায়, কাব্য লিখবে কে, সংস্কৃতির উচ্চাসনের কল্পনা করবে কে··· প্রাণ নেই; চিন্তার উদার আতিথ্য নেই, ধৈর্যশীল ক্ষমা নেই, আনন্দউজ্জল পরমায়ু নেই। মেয়েরা পায়না পতি, ছেলেরা পায়না শিক্ষা, ঘরণীরা পায়না ঘর,—সমাজ ভাঙে মন ভাঙে, ঘর ভাঙে, জীবন হয় দ্রুত, মরণ দ্রুততর

অর্ধাশনে অনশনে দাহ করে নিত্যক্ষুধানলে
শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল, দেহের নাই শীতের সম্বল
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার।

এর উপরতলায় মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান সৌভাগ্যবতীদের কথা ছেড়েই দিলাম, তাঁদের দৃষ্টি দিল্লীর তখত্ তাউসে, বালীগঞ্জের তালীকুঞ্জে, লণ্ডনে, নিউইয়র্কে, মস্কোয়। তাঁরা জীজিবেষ শতংসমাঃ। জানি এবং সসম্ভ্রমে স্বীকার করি যে আমাদের লোকায়ত্ত সরকারের বহু পরিকল্পনা, বহু অর্থব্যয়, বহু মনন ও চিন্তনের ফলে দেশের নানা কর্মের সূচনা হয়েছে, নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, নদীর উপর বাঁধ পড়ছে, আকাশে চিমনী উঠছে, বিদ্যুৎশক্তি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জীবনযাত্রার রথকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে—প্ল্যান স্কীম পরিকল্পনা, ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালেজন

দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা, শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্য নীতির প্রসার সবই চলেছে আইন মাফিক, নিয়ম মত, সরকারী খাতায় মোটা মোটা অঙ্কের খরচের হিসাবও লিপিবদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু কর্তার ভূত নড়েও না, ছাড়ে না, তোতা-পাখীর পেটে সংস্কৃতির উন্নয়নের দেশহিতকর বহু প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার কাঠখড় মালমশলাগুলো গজগজ করুক, আমরা জয়ধ্বনি করি—জয় হোক্ মানুষের, ঐ নব জাতকের, ঐ চিরজীবিতের। নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান সে যে ধুঁকছে,—কাকে ডেকে বলবো উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, এই নাও তোমার প্রাণ, এই তোমার ধ্যান, স্বপ্ন সফল করো এই নাও তোমার মানুষ হবার সাধনার উপকরণ। তখনি আসবে ছুটে দল মাদলের উতলধারা বাদল ঝরে অর্থাৎ দল ও উপদলীয় দলাদলি, সামান্য বিরোধকে অসামান্য করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা, প্রতিষ্ঠান যাক্ ডুবে, প্রতিষ্ঠা হোক অহমিকার, কর্তৃত্বের···আমরা ভুলে যাই দেশ মানে মাটি নয়, দেশ মানে মানুষ, তাই বারে বারে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করবো যে আমরা শুধু আত্মবিস্মৃত জাতি নই, আত্মঘাতী জাতি—এই মনোভাব আমাদের প্রত্যেক শুভ-চেষ্টাকে শুভবুদ্ধিকে বিষজর্জর করে তোলে, আত্মবিনাশ মত্ততা জাগায়।

দুঃখ যেন জাল পেতেছে চারিদিকে
চেয়ে দেখি যার দিকে
সবাই যেন দুরগ্রহদের মন্ত্রণায়
গুমরে কাঁদে যন্ত্রণায়
লাগছে মনে এই জীবনের মূল্য নেই
আজকে দিনের চিত্তদাহের তুল্য নেই
যেন এ দুখ অন্তহীন
ঘর ছাড়া মন ঘুরবে কেবল পন্থহীন

কিন্তু শুধু কান্নায় মানুষ বাঁচে না, বাঁচতে পারে না, আজ জানতে হবে কোন্ আলোকের অববাহিকায় এই নিরন্ধ্র অন্ধকারের হবে সমাধি, কোন্ নবনচিকেতার নব অভীপ্সায় রাত্রির তপস্যা দিনের সন্ধান দিবে। আজ ভাগ্যের বিড়ম্বনাকে পৌরুষের আকর্ষণ করে নিতে হবে, অকরুণ অদৃষ্টকে আশীর্বাদে পরিণত করতে হবে, সেখানে নৈয়ায়িকের সূক্ষ্মযুক্তি, বিতর্ক, বন্ধ্যাবুদ্ধিগর্ব, রন্ধ্রসন্ধানের আগুন লাগানো দৃষ্টি চলবে না, সেখানে চাই পরিপূর্ণভাবে ভালোবেসে কর্ম উদ্যোগ, প্রাদেশিকতার অভিমানে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে এই শস্যশ্যামল বাংলাদেশ যেন সম্পূর্ণ হয় তার জন্য, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের কবি মনীষীরা ভারতপথপথিকরা এই নতুন ইঙ্গিতই দিয়ে গেছেন, আমাদের শিল্পী, আমাদের কবি, আমাদের কর্মী, আমাদের দেশনায়ক, আমাদের সাহিত্যিক—যজ্ঞসম্ভব তপোজ্জ্বল মূর্তি গড়ে উঠেছে, পূর্ণাহুতির সমিধ, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে, কাজ দিয়ে, গান দিয়ে। বাইরের দিকে চাইলে হয়তো দেখা যাবে তার দৃষ্টি ফেরানো পশ্চিমের দিকে—জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস রাষ্ট্রবোধের চেতনা—আমরা শুনেছি নূতন করে অনুশীলনের ছন্দ, নূতন করে কর্ম-যোগের ব্যাখ্যা, নূতন বন্দেমাতরম, নূতন গীতাঞ্জলি, নূতন জনগণমন-অধিনায়ক পথ পরিচায়কের পরিচয়, নূতন ভাগবতজীবনের কথা, নূতন জীব শিব মন্ত্র, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্তভাবনাহীন, শুধু ভাবের গদগদ মোহে; ভাষার চাকচিক্যে চিন্তার আবিলতায় নয়, একটা অপূর্ব দার্ঢ্য, বলিষ্ঠতায়, ঋজুতায়, কর্মকুশলতায়, নিষ্ঠায়, সেবায়। এই তো আমাদের উত্তরাধিকার, এই তো আমাদের সাধনার শেষ কথা, জীবনের বড় সম্পদ, পূর্বসূরীদের কাছে যা পেয়েছি তা কী আমরা তুলে দিয়ে যেতে পারবো আমাদের উত্তর-পুরুষদের কাছে—আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, তপতপস্যা, প্রেম ভালবাসা। জানি তার্কিক তর্ক তুলবেন, ওহে বাপু, কল্পনার আকাশ থেকে নেমে এসে শক্ত মাটিতে পা দাও ত বাপু, অন্নবস্ত্রের ছোট্ট সন্ধানটি দাও, তারপর যতো পারো ঐতিহ্য সংস্কৃতি কাব্যকথার তালিকা পেশ করো—এখানে যে জ্বলবে রাবণের চিতা, বুভুক্ষুর হাহাকার, প্রবঞ্চিতের দাহ, অক্ষমের আস্ফালন পীড়িতের দীর্ঘশ্বাস। আমি জানি এ কথার মূল্য আছে, কিন্তু তারও পিছনে আছে ততঃ কিম্—আমার মনের অনন্ত জিজ্ঞাসা, অনন্ত আস্পৃহা—একটি অমৃতভাণ্ডের জন্য। সেইখানেই বসে আছেন কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক—জানি সে গ্রাম, সে অরণ্য, সে মন, সে মানুষ, সে প্রেম, সেই বহতা নদী, সেই শস্যশ্যামল প্রান্তর, উত্তুঙ্গ গিরিশিখর নিয়ে রোমান্টিক ভাববিলাসিতার যুগ নেই। জীবনের অভি-

গলির ভিতরে যে দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য বিরহ কামনা বেদনা-লোভ লাস্য মূক হয়ে রয়েছে তাকে প্রকাশ করতে, তার ব্যাখ্যান বিচার বিশ্লেষণ করাই আজ কবির কাজ—সে সাহিত্য হবে কঠিন, নিষ্ঠুর, জীবনরসে জারিত, সেখানে থাকবে না শিবসুন্দরের কল্পনা, আবেগময় বাগবিস্তার। এ কথা শুধু বাংলার নয়, ভারতবর্ষের নয়, সারা পৃথিবীর। ইংলণ্ডে একযুগে ইয়েটস্. এলিয়ট, অয়ডেন, স্পেণ্ডার, ডেলুইস একটা Cause খুঁজে বেড়িয়েছিলেন, সাহিত্যে তার স্পর্শ দিয়েগেছেন—আজকের তরুণরা কি এদেশে কি ও দেশে "are far more interested. in producing some thing hard hitting, some thing that will make an immediate impact।

চিরকালের মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন হচ্চে—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম—কে সে সমবর্ততাগ্রে—অমৃত কাহার ছায়া, কার ছায়া মহান মরণ—সেই কোন দেবতারে হবি মোরা করি সমর্পণ, হিরণ্যগর্ভের দ্যুতি কি তাঁরই প্রকাশ, সবিতার কবিতা কি তাঁরই আবেশ। দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে মানুষের মনে জাগরণে ধেয়ানে তন্দ্রায় এই প্রশ্নই নানা রকমে উঠেছে—চরম আকুতি নিয়ে, পরম প্রার্থনা রূপে—কে সে দেবতা, কোন সে শক্তি, কি সে ছন্দ ভোরের ভোরাইয়ের গানে সে জিজ্ঞাসা করেছে, দিনের তপ্ত আলোয় কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে প্রশ্ন করেছে, পশ্চিম সাগরতীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সে জানতে চেয়েছে কে তুমি, কী তুমি, কোন পথ গ্রাহ্য; কোন পথ বাহ্য—উত্তর মেলেনি। রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকারে মহাতামসীর কোলে বসেও মা মা বলে ডেকে তার সেই এক প্রশ্ন মেঘাঙ্গী বিগতাম্বরাকে—দেখা দাও, দেখা দাও, বলে দাও, জানিয়ে দাও, শিখিয়ে দাও, আমি দেখবো—নয়ন ন তিরপিত ভেল—আমায় চোখ দাও—

> জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথ গামী ভবতু মে
> অসুনীতে পুনরাস্মাসু চক্ষু, পুনঃ প্রাণমিহ
> ন ধেহি ভোগম্
> জ্যাম্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম, অনুমতে মৃড়য়
> নঃ স্বস্তি—

প্রাণের নেতা আমাকে চোখ দাও, আমি উচ্চরান্ত সূর্যকে দেখবো, সাবিত্রীমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সেই জ্যোতিকে আমায় ভোগ দাও, আমায় প্রাণ দাও। সত্যকাম জাবাল আচার্য ছাড়াই ব্রহ্মবিৎ হয়েছিলেন, উপদেশ পেয়েছিলেন 'অন্যে মনুষ্যেতঃ'। মানুষ শুধু বাঁচতে চায়না, সে জানতে চায়, সে প্রকাশ করতে চায় I Exist, I Know, I Express, তার সীমার বাইরে যা, আর সীমার মধ্যে যা। এই দুইএর মধ্যেই তার কল্পনা রঙীণ হয়েছে, তার ব্যঞ্জনা রসায়িত হয়েছে, তার প্রকাশ রূপে রসে ছন্দে গানে রচনা শৈলীতে সমৃদ্ধ হয়েছে—সব মানুষের মনেই এই দ্বৈতের লীলা, তার দোলা অন্তরে আর বাহিরে, চিদাকাশে নীলাকাশে, কারুর কাছে সেটা স্পষ্ট, কারুর কাছে সেটা অস্পষ্ট—যে মেতেছে এই উন্মোচনের খেলায়—যে বলেছে—হে প্রকাশবান্, অন্তবান্, জ্যোতিষ্মান্ ঘোমটা খোলো, সমস্ত আয়তে অর্থাৎ প্রাণে চক্ষুতে শ্রোত্রে মনে সব কলায় তোমায় দেখবো, খোলো খোলো দ্বার, অপাবৃনু, মহাপ্রকৃতি হাত ধরে তাকে দেখিয়ে দিচ্ছেন এই স্বরূপের সম্ভোগলীলা। তার একদিকে আছে কাম কামনা, আশা আকাঙ্ক্ষা ভয় লোভ মোহ আর একদিকে প্রেম ভালবাসা, তপস্যা জ্ঞান, আনন্দে বিধৃত চেতনা অপরিমেয় মন। তাই সে সাড়া দেয় শুধু রূপে, ভোগে, বাক্যে নয়,—অরূপ প্রতীকে, ত্যাগেও। এই চিরন্তন প্রকাশকে মূর্তি দেবার যিনি চেষ্টা করেন তিনিই কবি—প্রাচীন গুহামানব থেকে আজকের রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সেই একই মন্ত্রের সাধক, একই পথের যাত্রী—এই প্রকাশময় জগতের আনন্দ যজ্ঞে তাঁদের নিমন্ত্রণ, সন্দেশ রসগোল্লা থেকে চিড়েদই এঁটো কাঁটা যে যা পারো লুটে পুটে নাও নিজের গ্রহিষ্ণু মন দিয়ে। গুহার মধ্যে যখন দেখি রেখার আঁচড়ে হাতিকে বোঝাবার জন্য একটা অতিকায় জন্তুর আভাস, সিংহকে বোঝাবার জন্য একটা কিম্ভূতকিমাকার কেশর ফোলানো জন্তুর প্রতিকৃতি, দেখি মহেঞ্জদড়ের চিত্রে এক নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টি পশু দেবতার কল্পনা, দেখি, বহু Heirgly phics. Cunei form wntng আকা জোকা Clay tablet এ গিল গামেশের কাহিনী, বা পুরোণো প্যাপিরাসে লেখা ইখনা টোনের সৌরগাথা, বা হামিরাবুর আইন বা ভূর্জ্জপত্রে উপর স্তব, রসেটা ষ্টোন বা বুক অফ. দি ডেড"

তখন ভাবি, এ সবই হচ্চে কবিমনের প্রকাশের ভঙ্গীর বিভিন্ন ধারা। জন্ম নিচ্ছেন শিল্পী স্রষ্টা দ্রষ্টা এক কথায় কবি—যিনি মনীষী, যিনি দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের জনক আলঙ্কারিক আনন্দ,বর্ধনাচার্য্য কবিতাকে বলেছেন রসাত্মক বাক্য, দণ্ডী বলেছেন শ্লেষ –শ্লিষ্টমস্পৃষ্ট শৈথিল্যং গাঢ়বন্ধ—ওজঃ যেখানে আছে, সেদিনের রসিক সমালোচক অভিজ্ঞান শকুন্তলার নান্দীবাক্যটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য ষ্টাইলের চমৎকারিত্ব শ্রেষ্ঠ কাব্য ও সাহিত্যের একটি অব্যভিচারী লক্ষণ– তয়া কবিতয়া কিং বা তয়া বণিতয়া চ কিম্, পদবিন্যাস মাত্রেণ যয়া নাপহৃতং মনঃ—মন হরণ করা চাই। নগরনির্জনাহতে বনলতা সেনকেই টানুক আর আকাশলীনা সুরঞ্জনাকে বজ্রগর্ভ মেঘ দেখা দিক ক্লান্ত শহর পরে। শ্রীঅরবিন্দ বললেন—Poetry is a rhythmic Speech which arises at once from the heart of the seer and the distant house of truth···The greatest poets are those who had a large and powerful interpretative and intuitive vision and where poetry arises out of the revealatory utterance of it.

রবীন্দ্রনাথও এই সত্যটিকে আর এক ভাবে প্রকাশ করলেন

আমি ত সাধক নই,
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি
এপারের খেয়ার ঘাটায়
সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার ভাঁটায়
নিত্য কহে নিয়ে ছায়া আলো
মন্দ ভালো
সে তরঙ্গ নৃত্যেছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীতে
চিত্ত যবে নৃত্য করে আপন সঙ্গীতে
এ বিশ্ব প্রবাহে
যে নিঃশ্বাস তরঙ্গিত নিখিলের
অশ্রুতে হাসিতে
তারে আমি ধরেছি বাঁশীতে

আমরা বলবো—এ জানাও 'বেদাহমেতং'এর সামিল। এ প্রণাম রূপের কাছে, রসের কাছে, জীবের কাছে, বিশ্বের কাছে, বিশ্বাতীত যিনি, তিনি যে ভোক্তা মহেশ্বর, তিনি ও যে ঐ অণুতে রেণুতেই প্রবিষ্ট—তিনি যে বিষ্ণু। সত্য ধরা দেয় খণ্ডভাবে প্রাণরূপে, প্রাণ আবার শক্তি তরঙ্গের বিচ্ছুরণ—সে শক্তির দ্যোতনা মহাপ্রকৃতির প্রকাশে, শুধু সীমার রেখায় নাম ও রূপে মিলিত হয়েছে বলেই সেই অখণ্ডতার পরিচয় আমরা পাই না—কবির কাছে তার আভাস আসে প্রাণের কলকল্লোলে জীবনের স্রোতে—এই হলো তার পশ্যন্তী বাণী—কবি সেই অর্থে সাধক—প্রাণ সাধক, রূপ সাধক, রস সাধক—তিনি রোমান্টিকই হোন্, বাস্তবতন্ত্রীই হোন্। সেকালের বৈদিক কবি যে প্রাণকে দেখেছিলেন আকাশে, বলেছিলেন—যদি আনন্দ না থাকতো বিশ্বয়ে যদি মন না জেগে উঠতো—একালের অতি আধুনিক পশ্চিমী সাহিত্য সমালোচকও সেই কথাই বললেন, কবিতার মূল কথা হচ্ছে—Some thing vital is released, some thing organically rhythmical (Edwin Markham)। সাহিত্য 'value empty art' নয় বা মিউজিয়ামও নয়। জীবনের ক্লেদ, দ্বিধা, অনাচার, অত্যাচার, অবিচার, অসুস্থ মানসিকতার প্রতিফলনই সাহিত্যের শেষ—আসলে মৃন্ময়ী মনের এই চিন্ময়ী বৃত্তি—তাই তো আমরা ছুটি গুরুর কাছে, ছুটি জ্ঞানীর কাছে, যাই বিদ্বজ্জন সভায়, শিক্ষার মন্দিরে, বিজ্ঞানীর বীক্ষণশালায়, মাথা খুঁড়ি পাথরের দেবতার কাছে,—

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন?
তোর অথিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন।
গুরু যে তোর বরণ ডালা, গুরু যে তোর
মরণ জ্বালা
গুরু যে তোর হৃদয় ব্যথা, (যে) ঝরায় দুনয়ন
কারে প্রণাম করবি মন

কথা নয়। অবক্ষয়ের কালিমা—শ, ওয়েলস্, গল্‌সওর্য়াদি, ফষ্টারেও দেখেছি কিন্তু প্রীতি, ত্যাগ, শুচিতা মানবিকতাও আছে। ফষ্টারের Howard's End পড়ুন, Panic ও Emptinessএর সঙ্গে আছে একটা সুনিষ্ঠ সন্ধান। শ্রীঅরবিন্দের কথায় বলি—

We have seen the sign of Thor and the
hammer of new creation

A seed of blood in the soil and a flower of
blood in the skies
We march to make of earth a hell and
call it heaven
We mock at God we have silenced the mutter
of priests at his altar
... ...
We have made the mind a cypher
We have strangled thought with a cord
... ...
We are born in humanity's sun set to the
Night is our pilgrimmage

কিন্তু মানুষের উপরে বিশ্বাস হারাণো পাপ—

এ কুৎসিৎ তাণ্ডব যবে হবে শেষ,
মানব তপস্বী বেশে চিতাভস্ম শয্যা বলে এসে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে ধ্যানের আসনে

কারণ

আমরা পাখীর জাত—
আমরা হেঁটে চলার কথা জানিনা, আমাদের
উড়ে চলার ধাত

মুখে আমরা বলি বটে,—বুদ্ধ শংকর চৈতন্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গান্ধীজী বিনোভার কথা, বারে বারে আওড়াই —শরণং গচ্ছামি বা সোঽহম বা চিদানন্দময় শিবোঽহং শিবোঽহং বা ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা বা জীবে দয়া নামে রুচি বা জীবই শিব বা আমার জীবনই আমার বাণী বা সমাজায় ইদম্, তবু 'করা' আর 'হওয়া' যতক্ষণ বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্রের মত দুই ঋষির মন্ত্রে প্রেমে মিলিত না হয় ততক্ষণ মানুষের কল্যাণ যজ্ঞ বারে বারে ব্যাহত হবেই। সামাজিক জীবনে কর্ম যজ্ঞের নির্দেশ হচ্চে যে, ব্যক্তিকে আহুতি দিতে হয় সমষ্টির কাছে, কল্যাণবোধের কাছে, শ্রেয়োবোধের কাছে। বৈশ্বানর অগ্নি তৃপ্ত হন শুধু সেই অন্নে যে অন্ন বহু হয়, যা প্রাণকে উল্লসিত করে, মনকে সংহত করে, বিশেষ বিরাট জ্ঞানকে প্রবুদ্ধ করে তবেই আনন্দং পরমানন্দং।

উপনিষদে আর একটি প্রশ্নোত্তর আছে। ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহণের সামনে দুই ব্রাহ্মণ তর্ক তুলেছিলেন—সামগানের মধ্যে (অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে) যে রহস্য আছে তার প্রতিষ্ঠা কোথায়। দালভ্য বলেছিলেন—এই পৃথিবীতে স্থূল প্রত্যক্ষই সমস্ত রহস্যের চরম আশ্রয়। প্রবাহণ জবাব দিয়েছিলেন—তাহলে তোমার সত্য অন্তবান হলো, সীমায় এসে ঠেকলো। সত্য যেমন অনন্ত, কাব্যও তেমনি অগাধে দীক্ষা—কবি হচ্চেন প্রবাহন্ তাকে বহন করে নিয়ে চলেছেন শুধু রূপ থেকে অরূপে নয়, সীমা থেকে অসীমে নয়, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে নয়, জীবনের স্বাদ বর্ণ গন্ধময় সমগ্রতাটাকে নূতন রসালোকের বর্ণচ্ছটায়—

গৈব মাহি গুরু দেও মিলা পায়া হাম পরসাদ
মস্তক মেরা কর ধরা দক্ষ্যা হম্ অগাধ

রন্ধ্রহীন অন্ধকার ভেদ করে আমার গুরু আলো হয়ে প্রকাশিত হলেন—আমি কিছু পেলাম তাঁর প্রসাদ, তিনি আমার শির ধরে আশীর্বাদ করলেন, আমার হলো অগাধে দীক্ষা।

প্রেম পিয়ালা নূরকা আসিক ভর দীয়া,
মৈঁ মতওয়ালা কীয়া

জ্যোতির পিয়ালায় প্রেমময় তার প্রেম ভরপুর করে দিলেন, আমি হয়ে গেলাম মাতাল। এই রসায়ন পান করেই আলোক মাতাল মানুষ।

হরে পটংবর পহিরি করি, ধরতী করৈ সিংগারে
তাই তো সবুজ পটাম্বরে ধরিত্রী এমন শৃঙ্গারময়।

মানুষ জন্মায়, তার দিন এগোয়, চলে জীবনযাত্রার রথ এ পথে ও পথে, আসে ক্ষুব্ধ অন্তরের তপ্ত নিঃশ্বাস, ক্ষুধাতুর কামনা, বৃদ্ধ সংসারের কর্কশ কোলাহল, তবু তারই মাঝে সে কাজ করে অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গের নগর প্রান্তরে—সে চোখ মেলে সে চেয়ে থাকে, বুঝতে চেষ্টা করে বুদ্ধি দিয়ে, বোধি দিয়ে—কেন জল পড়ে, কেন পাতা নড়ে, কেমন করে নারকেল গাছের আড়ালে সূর্যোদয় হয়। তারপর একদিন হয়তো সব কিছু ভাবনা বেদনা নিবিড় চেতনার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে নিবদ্ধ হয়ে জেগে ওঠে—ভালো লাগে, ভালোবাসি। এই তো প্রথমজা অমৃত, দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি—কবি হচ্চেন সেই সৃষ্টি যজ্ঞের প্রথম লগ্নের বিচিত্র দূত।

সেকালের সমালোচকের মত একালের ক্রিটিকও বলবেন—"এতো হলো কাব্যি"। আজকের যুগে এই

রোমান্টিক গদগদ ভাব নিয়ে কী চলে, মানুষের কথা বলুন, তার অভাব অনশন অনটনের কথা, তার কামকামনা আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, তার জীবন যৌবন ধন মান তনু মনের কথা, তার ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির কথা সোজা খাড়া ঋজু ভাষায়।

ভারতবর্ষ অবশ্য আমাদের ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস ভবভূতির মত কবিকে দিয়েছে, শূদ্রকের মত নাট্যকারকে, বিষ্ণুশর্মার মত গল্পলেখককে, যাজ্ঞবল্ক্য গৌতম শংকরের মত দার্শনিককে, পাণিনি কাত্যায়নের মত বৈয়াকরণিককে, পিঙ্গলের মত ছন্দশাস্ত্রজ্ঞকে আর্যভট্ট বরাহমিহির ব্রহ্মগুপ্ত ভাস্করাচার্যের মত জ্যোতির্বিদ গণিতজ্ঞকে, চরক সুশ্রুতের মত চিকিৎসাশাস্ত্রবিৎকে, কৌটিল্যের মত অর্থশাস্ত্রকারকে, নাগার্জ্জুনের মত রাসায়নিককেও দিয়েছে। আজকের যুগেও এই বাংলাদেশে পেয়েছি ত্রয়ীকে—বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎকে —যাদের কথায় শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন "achievment enough in a Country. বঙ্কিম তার সাহিত্যে প্রথম আসন দিয়েছিলেন নৈতিক মানুষকে (Ethical man) রবীন্দ্রনাথ জোর দিলেন Aesthetic Sense এর উপর, সত্যশিবসুন্দরের উপর, শরৎচন্দ্র ছিলেন ভাবময়-পুরুষ Emotional man হোক তার প্রধান উপজীব্য। শরৎ পরবর্ত্তী শিল্পী মানসে নৈতিকবোধ সুন্দরের চেতনা, ভাবের অবগাহন নেই তা নয়, কিন্তু আরো সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এলো সাহিত্যে সেই মানুষ যে জৈবিক তাড়নায় ঘোরে যে স্থূল কামনাকে শুধু অবচেতনে রাখেনা, যে মানুষ অর্থ নৈতিক, সামাজিক, দাবীকে অস্বীকার করেনা, যে মানুষ প্রোলেটারিয়াট, যে মানুষ অন্নহীন, যে মানুষ দুঃখী। অথচ এই সবগুলির সংমিশ্রণেই মানুষের শুধু সামাজিক সত্তার বিকাশ হয়না, তার আধ্যাত্মিক চেতনাও প্রবুদ্ধ হয়। সাহিত্য অর্থাৎ কাব্য গল্প নাটক এরই সুষ্ঠু প্রকাশ। কে কতটুকু বাস্তবপন্থী, কে কতটা আদর্শবাদী, কার লেখায় qualitative গুণ বিকশিত বা quantitative মূল্য বেশী, এর নির্ধারণের মাপ কাঠি শুধু যুগোচিত জীবনবোধ নয় একটা শাশ্বত জীবন বেদও। আসল সাহিত্যের রূপ সেইখানে। যুগে যুগে রুচিনীতি নিরীখ রচনাশৈলী বদলায়, কিন্তু চিরকালের একটা ছাপ হয়তো লেগে থাকে যুগাতীত সাহিত্যে রসোত্তীর্ণ হয়ে। সেক্সপীয়রের হাতে ম্যাকবেথ পুলিস কোর্টের বিবরণী হয়নি, কালিদাসের হাতে কুমারসম্ভবের হরগৌরী সম্বাদের সম্ভোগকাহিনী বর্ণনাতিশয্যে রংএর প্রলেপে রুচিদোষদুষ্ট হলেও বিদ্যুৎবন্ত ললিত বণিতাদে মদন প্রলাপ বা শৃঙ্গার কাহিনী হয়নি। রোঁলা বলতেন—সূর্য যেমন কিরণ বিকীরণ করেন নিক্ষিপ্ত হয়ে, তেমনি সাহিত্যও জীবনকে রূপরেখা দেন কৈবল্যহীন হয়ে—It is neither moral nor immoral,।

তনু প্রকাশেন বিয়ের তারকা প্রভাত কল্পা শশিনেব শর্বরী বাংলার ঘাটে মাঠে পল্লী বাটে আমরা এই ধরণের এক অদ্ভুত 'কাব্যি' পেয়েছি, তার কথা বলেই শেষ করি। এ যেন প্রথমজ অমৃত—তার পদাবলীতে, তার গাথায়, গানে সুরে, ছড়ায় বাউলের কণ্ঠে বৈরাগীর একতারায়, শাক্তের মা মা ধ্বনিতে। আসলে সবই হচ্চে মধুরের না হোক্ বিধুরের সাধনা—আমাদের সবারই নিমন্ত্রণ সেই আনন্দ যজ্ঞে—ধন্য হলো, ধন্য হলো আমার জীবন। তিনিত শুধু দ্যুলোকে ভূলোকে আলোকে পুলকে নন, সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাসে, সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতে দূরে অস্তিকে তিনি যে সকাম, অকাম, আপ্তকাম, সর্বকাম। একেই জানতে চেয়েছে মানুষ—যা তাকে আকর্ষণ করে সেইতো কৃষ্ণ, যিনি হরণ করেন তার দুঃখতাপ তিনিইত হরি, যিনি প্রাণারাম, রমণ করেন আমার হৃদয় পুরে তাঁকেই নাম দিই না কেন রাম, নামে কি যায় আসে,—প্রাণ স্রোতের পেছনে আছে, শক্তি বীর্য তেজ ওজঃ ঐশ্বর্য। সব মিলিয়ে এক কথায় বললাম, কবির ভাষায় তিনি হচ্ছেন রস—ঋষির সব ধ্যান, বৈজ্ঞানিকের সব মনন, দার্শনিকের সব চেতনা কবির সব কাব্য সেই চিরসারথির রথচক্রমুখরিত পায়ে চলার ইতিহাসের দ্বার উন্মীলনেরই পালা, অপাবৃণুর সাধনা, রসো বৈ স এর প্রকাশ—সেই রস "সর্বগঃ" সর্বগামী।

বাংলাদেশে একদিন মেঘমেদুর তামসী রাত্রিতে সেই চিরন্তনীর অভিসার যাত্রার সুরুহোল—রাধে গৃহং প্রাপয়

সঙ্করধর সুধা মধুরধ্বনি মুখরিত মোহন বংশম

বলিতদৃগঞ্চল চঞ্চল মৌলিক কপোল বিলোলাবতংসম

পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তীর পর এলেন বিদ্যাপতি— পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেল। লাখলাখ যুগ চলে যায়,

হিয়ার জুড়ন না হয়, জাগলো আর এক কবির অন্তরে রাধিকার অন্তরের উল্লাস।

আকুল শরীর মোর বেআকুল মন

তারপর

প্রেমরস নির্যাস করিতে আস্বাদন
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়
অবতীর্ণ হইল কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়

চৌদ্দশত সাত শক মাস সে ফাল্গুন
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হইল শুভক্ষণ

শ্রীবাসের অঙ্গনে অদ্বৈতাচার্য তখন কীর্তন করছেন, তার মনে লাগলো সাড়া—মিশ্র হইল আনন্দে বিহ্বল।

শচী মা নাম রাখলেন নিমাই—লোকে বললে—চাঁদের মত ছেলে, নাম দাও,

গোরাচাঁদ গৌর, গৌরাঙ্গ
পূর্ণিমার চান্দ সনে চন্দন বাটিয়া গো
কে গড়িল গৌরতনু খান্

…　…　…　…

অরুণ কিরণখানি তরুণ অমৃত ছানি
কোন বিধি নিরমিলা দেহা

পথ হলো ঘর, ছুটে আসে চাষী, গৃহী, রাজা-প্রজা ধনী-নির্ধন, তিনি বলেন—ওগো ধন নয়, মান নয়, যশ নয়, ঐশ্বর্য নয়—আমার ঠাকুর শুধু একটু ভালবাসার কাঙাল—শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়। মহাপ্রভু চলেছেন নীলাচলে, জগতের নাথ তাকে ডাকছেন—মন্দিরে ঢুকতে যান, বিগ্রহকে জড়িয়ে ধরেন—আর কি পাওয়া মারতে আসে—ধরে ফেলেন সার্ব্বভৌম—বেদান্তের মহাচার্য্য—ব্যাসসূত্রের ব্যাখ্যা করেন—শুনে যান তিনি কিন্তু কোন প্রশ্ন নেই—কেন, কে এই শ্রুতিধর স্মৃতিধর—তারপর বোঝেন—গাঢ়ং গাঢ়ং নীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ—নীলাচল থেকে দাক্ষিণাত্য, গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দ এলেন, আমি যে শূদ্র—তাতে কী, তবে তারে কৈলা প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, গায় শুনে পরম আনন্দ

একদিন সন্ধ্যাবেলায় স্নান সেরে মহাপ্রভু বসে আছেন, রায় রামানন্দ এসে হাজির—সাধ্যনির্ণয় কী—রায় কহে—স্বধর্মাচরণ, বিষ্ণুভক্তি ইত্যাদি—

প্রভু বলেন—এহ বাহ্য, আগে কহ আর

রায় বলে—গীতার নবম অধ্যায়ে আছে কৃষ্ণে কর্ম সমর্পণ, যৎ করোষি যদশ্নাসি…

প্রভুর মনঃপূত হয় না—আগে কহ আর

আচ্ছা ভক্তি প্রধর্মহারিণী, জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি, ব্রহ্মভূতো প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি

তাও নয়

আচ্ছা জ্ঞানবর্জিতা ভক্তি, জ্ঞানশূন্যা ভক্তি, অর্থাৎ ভগবানের ঐশ্বর্য জ্ঞান আর নেই

প্রভুর টনক নড়ে—এহো হয়, আগে কহ আর

আচ্ছা প্রেমভক্তি, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম, হ্যাঁ, এ উত্তম, কিন্তু

শেষ পর্য্যন্ত পৌছলো কান্তাপ্রেমে রাগানুরাগে, প্রেমাবিদ্দীপদীপনম্ মহাভাবে—মোদন মাদন পেরিয়ে, হ্লাদিনী সঙ্গিনী সংবিৎ মিলিয়ে অধিরূঢ় মহাভাবের স্বরূপ। কিন্তু এই লীলার পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে কোথায়—সর্বোত্তম যে নরলীলা, নরবপু তাহার সহায়। তাই মানুষকে নিয়ে খেলার সুরু, মানুষকে নিয়েই লীলার শেষ Divinity of humanity, humanity of divinity ! শিবই জীব, জীবই শিব—মানুষের সামগ্রিক জীবনের এই হচ্ছে কাহিনী, এই হচ্ছে প্রতীক (legend and Symbol)—সর্বভূতে প্রেম সাধনাই তার সর্বোত্তম চেতনা—শুধু নিজের ব্যষ্টির ব্যক্তির আত্মিক জীবনে নয়, সর্ব স্তরে, সব ভাবে, সত্তায়, চিন্তায়, নীতিতে রীতিতে কর্মে ধর্মে। প্রেমের অবিনাশী রূপই একমাত্র সত্য, তাই হিংসা কণ্টকিত পৃথিবীতে এই লোভ লাভ কামনার যুগে নীচতা ক্ষুদ্রতার পারিপার্শ্বিকে এর চেয়ে বড় কথা মানুষের আর নেই—

রক্ত দিয়ে কি লিখিব, প্রাণ দিয়ে কি শিখিব
কী করিব কাজ
তোমার আহ্বান বাণী সফল করিব, বাণী
হে মহিমময়ী

কাঁপিবে না ক্লান্ত কর ভাঙিবেনা কণ্ঠস্বর
ছুটিবেনা বীণা
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি রব জাগি
দীপ নিভিবেনা,

এই আহ্বান এলেই দিনপূর্ণহবে, পৃথিবীর ধূলি মধুময় রসময় হবে—তখনি বলতে পারবো আমার সমস্ত নাও, সমস্ত ঘুচিয়ে দাও, তবেই তোমার সমস্ত পাব—মহাসম্পদ তোমারে লভিব, সব সম্পদ খোয়ায়ে. মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে। এই সাধনার মূল পদ্ধতি যোগযাগ, মন্ত্রতন্ত্র, আচার ব্যাহানুষ্ঠানের ঊর্দ্ধে একটি পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন—আত্মসম্প্রসারণ,—

একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে
ঘনশ্রাবণ মেঘের মত রসের ভারে নম্র নত
সমস্ত মন পড়ে থাক্ তব ভবনদ্বারে
একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে
নানাযুগের আকুল ধারা মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে
একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে।

---

* বঙ্গীয় কবিপরিষদের রামগড় (মেদিনীপুর) কবি মহা সম্মেলনের প্রধান অতিথির ভাষণ রূপে লিখিত।

তুমি হেথা নাই

শ্রীঅমরনাথ গুপ্ত

তোমারে খুঁজেছি আমি হায়—
স্নিগ্ধ বন-ছায়,
আকাশে বাতাসে
পৃথিবীর নিশ্বাস-প্রশ্বাসে
কোথাও তুমি নাই,
মনে হয় বারে বারে তাই
ভুলে যাওয়া সে অতীত স্মৃতি
জনম লভিল কেন হয়ে নব গীতি
ভগ্ন বক্ষের অন্তস্থলে—
আশা ভরা নয়ন জলে।
হয়তো এ আমার ভুল ;
তবু মোর বাগিচার ফুল
আজ ফোটে আগেকার মত
অবহেলা করি তারে যত।

তুমি নাই আমি আছি—থাকিব আমি
কালের স্রোতেতে ভেসে কোথা যাব নামি'
সে কথা ভাবিবার নাই অবকাশ
তুমি সে রেখেছ ঢেকে
মনের আকাশ।
আলোকে আঁধারে
বারে বারে
তোমারে ভুলিতে চেষ্টা করি যত
আমার নিকটতম হও তুমি তত—
ছায়া হতে রূপ নিয়ে
দু'হাত বাড়ায়ে দিয়ে
সম্মুখে দাঁড়াও—তাই
ভুলে যাই—
তুমি হেথা নাই।

ইতিহাসের কথা

উপানন্দ

তোমরা যারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী, এযাবৎ পড়ে আসছ আর্যরা ভারতবর্ষে অভিবাসন করেন। তাঁরা বহিরাগত। এখানে কৃষ্ণকায় অসভ্য বর্ব্বর মানুষ বাস করতো, ভারতবর্ষ আক্রমণ করে আর্য্যরা কৃষ্ণকায় অসভ্য জাতিকে পরাজিত করেন আর বসবাস সুরু করেন। কত বছর আগে তাঁরা ভারত আক্রমণ করে প্রবিষ্ট হন, তাও পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০০ বৎসরে আর্য্যদের ভারতে আগমন, এই কথাই ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়েছে। একশো বছর ধরে এই লেখাই আমরা পড়ে আসছি। আর্য্যদের বাস যে কোথায় ছিল, সে সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত হয়নি—এ সম্পর্কে সুদূরপ্রসারী কল্পনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। খুসি-মাফিক কথার মূল্য কতটুকু তা সহজেই অনুমেয়। কানে একবার যা ঢুকে যায়, তাকে বের করা বড় কঠিন। ফলে ঐতিহাসিক সত্যরূপে গৃহীত হ'য়েছে যে আর্য্যজাতি নামে এক জাতি ছিল, আর এই জাতি খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০০ বছরে ভারত আক্রমণ করে। আর্য্যরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল, এরূপ কথা ভারতের বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে পাওয়া যায়না, অতিকথা বা জনশ্রুতি হিসাবেও কোন নিদর্শন নেই। আর্য্যদের ভারতবর্ষ আক্রমণ, আগমন আর বসতি স্থাপন প্রভৃতি কথা শুনিয়েছেন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ, যার মূলে রয়ে গেছে সত্যের অপলাপ।

ভারতবর্ষ ইংরাজের অধিকারে এলে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতের বহু অমূল্য পুঁথি লণ্ডনের কুক্ষিগত হয়। এই সব লুণ্ঠিত পুঁথির মধ্যে কি লেখা আছে তা জানবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠে শ্বেতাঙ্গজাতি। ফলে সংস্কৃত শিক্ষার জন্যে সারা ইউরোপে চাঞ্চল্য ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম আমলে যে সব ইংরেজ ভারতে সংস্কৃত শিক্ষা করলেন, তাঁদের অনুবর্ত্তন ও উপদেশ অনুযায়ী একদল পাশ্চাত্য পণ্ডিত সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য ভাষাগুলির পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে এলেন যে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাষাগুলির সাদৃশ্য আছে। বোপ সাহেব ভাষাপুঞ্জের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বাচক শব্দগুলি নিয়ে গবেষণা পূর্ব্বক একখানি তুলনা-মূলক ব্যাকরণ তৈরী করলেন, তাতে তিনি দেখালেন যে ইন্দো-ইয়োরপীয় ভাষাগুলির জননীই সংস্কৃত ভাষা। এর ভাবস্তন্য পান করে আর এর ভাষা শুনে অন্যান্য ভাষা রূপায়িত ও সজীব হয়ে উঠেছে।

ইনি সংস্কৃত ভাষাকে বিশ্বে বিশেষ মর্য্যাদা দেওয়াতে এক শ্রেণীর পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গাত্রদাহ হোলো। ফলে বোপ সাহেবের মত খণ্ডন করলেন জার্ম্মানীর ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ক্রুগম্যান সাহেব। তিনি বললেন সংস্কৃত হচ্ছে ইন্দো-ইয়োরপীয় ভাষাপুঞ্জের সমগোত্রীয়। তিনি মৃত সংস্কৃত ভাষার পুনরুজ্জীবন করে কতকগুলি এমন সব শব্দ

সংগ্রহ করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলেন, যাতে জীবনের স্পন্দন হওয়া তো দূরের কথা, সংস্কৃতকে হেয় প্রতিপন্ন করার পথই রচিত হোলো। এঁর ইঙ্গিত আর ইংরাজের উস্কানি থেকে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হোলো, তা অত্যন্ত হাস্যকর, লজ্জাকরও বটে। জার্মাণ ভাষাতত্ত্ববিদ ম্যাক্সমূলারের ভ্রান্তিবিলাস প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্য্যাদাহানিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে গেছে। তাঁর অনূদিত বেদ ও সংস্কৃত গ্রন্থগুলির ভেতর বহু জল ঢুকে গেছে, ভুলের তো কথাই নেই, অথচ ম্যাক্সমূলার বলতে মহা-সিন্ধুর এপার ও ওপারের লোক একেবারে অজ্ঞান হয়ে যান। তাঁর আনুকূল্যেই ব্রিটিশ শাসক গনের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়েছিল, এজন্যে তাঁরা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। এজন্যেই তোমরা ইতিহাসে ছেলেবেলা পড়ছ—মিশরই পৃথিবীতে প্রথম সভ্যতার আলোক সম্পাত করে, আর মিশরীয় সভ্যতাই সমগ্র বিশ্বকে জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্পকলার পথ দেখিয়েছে। প্রাচীনতম ভারতীয় সভ্যতাকে কোণঠেসা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের এই চক্রান্ত এখন ক্রমে ক্রমে ধরা পড়ছে। বৌদ্ধরা যেমন হিন্দুর সমস্ত দেব দেবীকে বুদ্ধের পদ প্রান্তে রেখে চেষ্টা করেছিল বুদ্ধের মহিমা কীর্তন করতে, তেমনিভাবেই শিকাগোতে বিশ্বধর্মমহাসম্মেলন ঘটিয়ে খৃষ্টান জগত চেষ্টা করেছিল খৃষ্টান ধর্মকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে প্রতিপন্ন করতে। কিন্তু যা সত্য, তাকে বিলুপ্ত করা কঠিন। তাই বত্রিশ বছরের তরুণ হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কাছে খ্রীষ্টান জগত ভীষণ ধাক্কা খেয়ে আজ পর্য্যন্ত বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন ডাকতেই সাহস করলো না। কেননা ঐ মহাসম্মেলনে হিন্দুর ধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়ে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে। যাহোক ম্যাক্সমূলার বললেন- ইন্দো-ভারতীয় ভাষাভাষীরা এক সঙ্গে বাস করতো অন্ততঃ দশ হাজার বছর আগে, তারপর তাদের পৈতৃক বাসভূমিতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে তারা পৃথিবীর নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। একদল আর্য্যরা ঐ বাসভূমি ত্যাগ করে ঘুরতে ঘুরতে শেষে ভারতে আসে। ভারতবর্ষে তখন অসভ্য জাতিরা ছিল, ভারতের সভ্যতায় কোন অবদান ছিলনা। ম্যাক্সমূলারের ধারণাটাই অকাট্য বলে মেনে নেওয়া হোলো, ফলে দেখা গেল খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ বৎসরে আর্য্যরা সিন্ধু উপত্যকায় এসে পৌঁছেন পৃথিবীর কোন এক অজানা প্রান্ত থেকে। এই অজানা প্রান্তে আর্য্যদের প্রাচীন বাসভূমির কথা ম্যাক্সমূলারের মুখ থেকে বেরোতেই চতুর্দ্দিকে সেই কথা প্রতিধ্বনিত হোলো। সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা সমর্থন করলেন ম্যাক্সমূলারের কথা। ফলে সমস্যার সমাধান ও যেন হয়ে গেল। ব্রিটিশ পদানত ভারতীয় জাতির পশ্চাতে যে বিরাট ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আছে তাকে অপহরণ করে, আর তার অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করে, ভারতবাসীর অস্থিতে মজ্জায় ঘুণ ধরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোলো। কেননা কোন সুপ্রাচীন গৌরবসমৃদ্ধ মহান জাতিকে বহু কাল ধরে শাসন করা সম্ভব নয়, একদিন না একদিন সে জাতি তার স্বরূপ উপলব্ধি করে স্বাধীন হয়ে উঠতে পারে—এই সব আলোচনা হয়েছিল লণ্ডনের গুপ্ত বৈঠকে, তাই আমরা দেখ গজনীর মামুদ, নাদির শাহ প্রভৃতি ভারতের যতখানি সর্বনাশ সাধন করেছে, তার চেয়ে ঢের বেশী ক্ষতি করেছে ইংরাজ ভারতবর্ষের মসনদে বসে, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সর্ব্বপ্রকার নিদর্শন ও অমূল্য পুঁথিগুলি আত্মসাৎ করে।

বাঙ্গালীর গৌরব রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় মহেঞ্জোদারো থেকে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন তুলে না ধরলে, গর্ব্ব করবার মত কিছুই থাকতো না তোমাদের কাছে দিয়ে যাবার মত। ম্যাক্সমূলারের সময় থেকে বহুল পরিমাণে ভারত, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিসর, ক্রীট ও গ্রীস দেশ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সংগ্রহ হয়েছে; এখনও উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশের মন্দির থেকে মূল্যবান শিল্প নিদর্শন ভারতের বাইরে গোপনে চলে যাচ্ছে ভারতীয় সভ্যতার হননের উদ্দেশ্যে। যেসব দ্রব্য থেকে সে সব তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, আর গবেষণা হয়েছে, সে গুলি ম্যাক্সমূলারের অনুমানসিদ্ধতত্ত্বগুলিকে খণ্ডিত করেছে। হেমিটিক জাতি অধ্যুষিত ক্রীট ও মিসর থেকে গ্রীকরা তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি পেয়েছে। তারা আর্য্যসংস্কৃতি বা ভাষাতাত্ত্বিক শ্রেণীভুক্ত নয়। তারা হেমাইট জাতির অন্তর্ভুক্ত। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম-সপ্তম শতাব্দীতে গ্রীক ভাষায় ছিলনা মহাপ্রাণ বর্ণ। প্রথম মহাপ্রাণ বর্ণ তারা মিসরীয়দের কাছ থেকে পায়। খৃষ্টপূর্ব্ব

অষ্টম শতাব্দীর আগে গ্রীকরা লিখতে পড়তে জানতো না। ফিনিসীয় ব্যবসায়ীদের লিখন পদ্ধতি, ভাব ও ভাষা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলে মনে করতো। কিন্তু ভারতবর্ষ যে খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচহাজার বছর আগে থেকেই লিখনপদ্ধতি কৌশল আয়ত্ত করে সভ্যতার অনেকখানি পথে এগিয়ে গিয়েছিল, সিন্ধু উপত্যকা থেকে তা খননের মাধ্যমে যে সব শীলমোহরাঙ্কিত ব্রাহ্মী লিপি পাওয়া যায় সেগুলি প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট নিদর্শন। গ্রীকদের নিরক্ষরতাই সুস্পষ্ট প্রমাণ করছে যে তারা হিন্দুর সঙ্গে একত্র বসবাস করেনি। আর্য্যগোষ্ঠীর বংশ পরম্পরায় হিন্দুরা পেয়েছে ঋক্‌বেদ, কিন্তু গ্রীক কিম্বা ইউরোপীয়দের কিছুই নেই। অতএব ইউরোপীয়েরা আর্য্যশাখা সম্ভূত বলে দাবী করতে পারেনা। ধর্মের ক্ষেত্রেও ইউরোপীয়দের সঙ্গে হিন্দুদের আকাশ পাতাল তফাৎ। বৈদিক দেবতাদের নাম গ্রীক্‌ ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিরা জানতো না। সুতরাং তারা হিন্দুদের সঙ্গে ম্যাক্সমূলার কথিত প্রাচীন পৈতৃক ভূমিতে বাস করেনি, এটি প্রমাণিত হচ্ছে। ভারতের বাইরে ইন্দো-আর্য্য পৈতৃকভূমির সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং আর্য্যদের প্রাচীন পৈতৃক ভূমি ভারতবর্ষ। আর্য্য শব্দ ঋগ্বেদে ভদ্র সম্মানিত ব্যক্তির উদ্দেশে প্রয়োগ করা হোতো। পরে আর্য্যাবর্ত্ত গঠনের পর জাতীয় নাম আর্য্য হয়। ইউরোপীয় কোন ভাষা উপভাষায় আর্য্য শব্দ নেই। সুতরাং ইউরোপীয় জাতিরা আর্য্য ভাষার অনার্য কথোপকথনে অভ্যস্ত। বৈদিক যুগে আর্য্যরা ভারতবর্ষ থেকে সমুদ্রযাত্রা করে নানা দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করতে যেতেন, জাহাজ ধ্বংসের কথা, ও সমুদ্র থেকে ঐশ্বর্য্য সম্পদ প্রাপ্তির কথা, আর বৈদিক ভারতের মানুষের সমুদ্র উপকূলে বাসের কথা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে পানি, যদু, আরামি প্রভৃতি নৌবিদ্যাবিশারদ জাতির উল্লেখ আছে। মিসরে যদু বংশ রাজত্ব স্থাপন করেছিল তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। মিসরকে সভ্য করেছে ভারতবর্ষ। বৈদিক যুগে জাতিভেদ ছিলনা। পুরোহিত সম্প্রদায়ও ভারতের বাইরে বৈশ্যবৃত্তি নিয়ে ব্যবসা করতে যেতো, সে সত্য ও উদ্ঘাটিত হয়েছে। ঋগ্বেদের এই সব তথ্য সম্পদ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, আর্য্য জাতিত্ববাদের ধারণা যা পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন, সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আর্য্যরা ছিলনা গ্রাম্য মেষপালক জাতি, তারা ম্যাক্সমূলারকথিত অদ্ভুত মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে বাস করতোনা। মহেঞ্জোদাড়ো, হারাপ্পা প্রভৃতি স্থান খনন করে আমরা যে সব অমূল্য সম্পদ পেয়েছি, তা দেখিয়ে গর্ব্বভরে আমরা বলতে পারি ভারতবর্ষ থেকে সভ্য মানুষেরা পৃথিবীর নানাদেশে গিয়ে রাজ্য বিস্তার করেছে, জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পকলার শিক্ষা দিয়েছে, ধর্ম্মের কথা শুনিয়েছে আর ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করেছে। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে উদ্দেশ্য করে ঠিকই বলেছেন—

'প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে—'

বিজ্ঞান বিচিত্রা

মুর্গীদের নির্বোধ বলে যতোটা কুখ্যাতি আছে আসলে তারা ততটা নির্ব্বোধ নয়' —পশ্চিম জার্ম্মানীর একজন মুর্গী বিশেষজ্ঞ মুর্গীদের ভাষা এমন ভাবে আয়ত্ত করেছেন যে, তাদের নানা সমস্যা সমাধানের জন্যে দেশবিদেশের মানুষ তাঁর শরণাপন্ন হয়। তাঁর নাম এরিখ বেউমের। মুর্গীদের কথা বোঝার গৌরব একমাত্র তিনিই দাবী করতে পারেন। তাঁর মতে শুধু ডাকার জন্যেই তারা ডাকেনা। এতোকটি বিশেষ শব্দে তারা সঠিক কিছু বোঝাতে চায়।

বহু কষ্টস্বীকার করে ইনি মুর্গীদের কক্‌ কক্‌ কথার অর্থ খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর সেই গবেষণার ফলাফল মুর্গীদের চালচলনের সূত্র নামে পরিচয় লাভ করেছে। ডাঃ বেউমার শিশুকাল থেকেই মুর্গীদের চালচলন খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে থাকেন। ডাক্তারী পড়ার সময় অধ্যাপকদের যখন তিনি মুর্গী সম্পর্কে নিজের কথা বলেন, তখন তাঁরা হেসে উড়িয়ে দেন। পরে ভুল বুঝতে পেরে বেউমারের অভিজ্ঞতা ও গবেষণা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

ডাঃ বেউমারের মতে পোষ মানাবার ফলে মুর্গীদের বোধশক্তি বা বুদ্ধি লোপ পায় না। অধিকন্তু এর ফলে শব্দে হাবভাবে চালচলনে তাদের অনেক রকম ফের হয়েছে। তিনি বলেন, মুর্গীদের সমাজ জীবনের প্রধান হচ্ছে মোরগ। তার কথা অনুযায়ী সকলকে চলতে হয়। সে সব সময় সতর্ক থাকে, বিপদ বুঝলেই যথাসময়ে মুর্গীদের সাবধান

করে দেয়। তার জোর আওয়াজের হ্রস্ব হুকুমের মানে হচ্ছে মহাবিপদ। রাত্রে মুর্গীরা ঘুমোবার সময় মোরগ মাঝে মাঝে কুকু শব্দ করে। একে বলা হয়েছে সতর্কতা-মূলক ধ্বনি অর্থাৎ আস্তানার কাছে অপরিচিত কোন কিছুর আবির্ভাব হয়েছে। বাচ্চার মা না হলে মুর্গীরা অবশ্য সাধারণতঃ কম সন্দেহ ব্যতিক হয়, কিন্তু তাদেরও নিজস্ব ভাব প্রকাশের ভঙ্গী আছে। ডাঃ বেউমার মুর্গীদের ভাষা সম্পর্কে একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন যা মানুষের বেলায় খাটেনা। যতো জাতেরই মুর্গী হোক, তাদের বুলি এক।
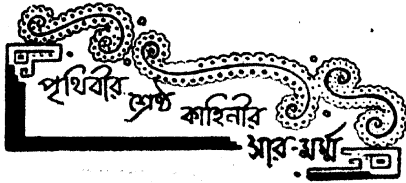
আলেকজান্দার ডুমা
রচিত

দী কাউণ্ট অফ্ মণ্টি ক্রিষ্টো

সৌম্য গুপ্ত

১৮১৫ সালের কথা। দিগ্বিজয়ী-বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তখন পরাজিত-বিপর্য্যস্ত হয়ে ক্ষুদ্র এল্‌বা দ্বীপে নির্ব্বাসিত ·· ফ্রান্সের সিংহাসনে অষ্টাদশ লুই তখন রাজা হয়ে বসেছেন ···ফরাসী দেশে তখন দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম দল—'রয়ালিষ্ট' (Royalists) অর্থাৎ রাজা লুইয়ের পক্ষে—দেশের শাসনভার এখন একরকম এই 'রয়ালিষ্ট' দলের হাতে। দ্বিতীয় দল হলো—'বোনা-পার্টিষ্ট' অর্থাৎ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অনুরক্ত-দল··· এ দল চক্রান্ত করছেন, উদ্যোগ-আয়োজন করছেন কোনো-রকমে নির্ব্বাসিত নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে, উদ্ধার করে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসাবেন।

ফ্রান্সের এমনি দুর্দ্দিনে, ১৮১৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 'ফ্যারাও' নামে একখানি মালবাহী পাল-তোলা জাহাজ এসে পৌছুলো মার্সেল্‌স্‌-বন্দরে! জাহাজখানির পৌছুনোর কথা ২৭শে তারিখে—কিন্তু এলো একদিন পরে! জাহাজের ক্যাপ্টেনের সহকারী (Mate) এডমণ্ড দান্তে · বয়স মাত্র উনিশ বছর···এ বিলম্বের জন্য তার কৈফিয়ৎ তলব হলো!

জাহাজের মালিক মোরেল নিজে জাহাজে উঠে এসে এ কৈফিয়ৎ তলব করলেন—সেই সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন, এডমণ্ডের মুখ মলিন—সে যেন দারুণ বেদনাহত! মোরেল শুধোলেন,—ব্যাপার কি, এডমণ্ড···তোমাকে এমন বিমর্ষ, অবসন্ন দেখছি কেন?

নিশ্বাস ফেলে কম্পিত-কণ্ঠে এডমণ্ড বললে,—ফিরতি-পথে জাহাজে দারুণ বিপদ ঘটে গিয়েছে, হুজুর!···ফেরবার পথে ক্যাপ্টেন লেক্লেয়ারের হয় সাংঘাতিক অসুখ—এবং সেই অসুখেই তিনি জাহাজেই মারা গিয়েছেন!···

খবর শুনে মোরেল চমকে উঠলেন! এডমণ্ড জানালে,—অন্তিমকালে ক্যাপ্টেন আমার হাতে একটি প্যাকেট দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, সে প্যাকেটটি আমি যেন এল্‌বায় পৌঁছে দিয়ে আসি। তাঁর সেই অন্তিম-ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য আমি জাহাজ চালিয়ে এল্‌বা হয়ে তবে এখানে আসছি—তাই দেরী হলো!

নিশ্বাস ফেলে মোরেল বললেন,—তুমি উচিত কাজ করেছো! কিন্তু জানো, তোমার এল্‌বায় যাবার জন্য পাঁচজনে তোমাকে রাজ-বিদ্রোহী 'বোনাপার্টিষ্ট'-দলের বলে সন্দেহ করতে পারে! জানো, সে সন্দেহের পরিণাম?···

এডমণ্ড বললে,—কিন্তু সে-প্যাকেটে কি ছিল, তা আমি জানি না···ক্যাপ্টেন আমাকে ইঙ্গিতেও তার কোনো আভাস দেননি! সেখানে জাহাজ থামতে একজন লোক প্যাকেটের সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে তাঁর হাতে আমি প্যাকেটটি দিই···তিনি তখন আমার হাতে এই চিঠিখানি দিয়েছেন—প্যারিসে এক ভদ্রলোকের হাতে এ চিঠিখানি পৌছে দিতে বলেছেন।

দুজনে এ সব আলোচনা হচ্ছে, এমন সময় জাহাজের

'মালখানার' অধ্যক্ষ ড্যাঙ্গ্লার্স সেখানে এসে হাজির হলো। তাকে দেখে এডমণ্ড মোরেলকে বললে,—পথের বিপদের কথা এঁর কাছে আপনি সব শুনুন···আমি এখন যাই জাহাজ-নোঙর করবার কাজে!

এডমণ্ড চলে গেল তার কাজে···ড্যাঙ্গ্লার্স সবিস্তারে বর্ণনা সুরু করলো—ফেরবার পথে জাহাজে ক্যাপ্টেনের সঙ্কট-পীড়া হলো···মাথার ব্যামো···মৃত্যুর আগে এডমণ্ডের হাতে প্যাকেট দিয়ে অনুরোধ—ফিরতি পথে সেটি এল্‌বায় কোন-একজন লোকের হাতে দিয়ে যেতে হবে···আর সে যদি কোনো চিঠিপত্র দেয় তাহলে সে চিঠিও যথাস্থানে পৌঁছে দিতে হবে! ক্যাপ্টেন মারা গেলে তাঁকে সলিল-সমাধি দেওয়া হয়···তারপর এল্‌বায় যেতে মানা করেছিলুম ···বলেছিলুম—এল্‌বায় বোনাপার্টির আস্তানা···ওদিকে গেলে বিপদ···তা শুনলো না! ক্যাপ্টেন মারা যাবামাত্র ওর উপরেই যেন জাহাজের ভার—ও যেন ক্যাপ্টেন! মানা শুনলো না তার জন্য একদিন দেরী হলো আমাদের মার্সেল্‌সে পৌঁছুতে! এল্‌বায় যাওয়া উচিত হয়নি এডমণ্ডের!

মালিক মোরেল বললেন,—এডমণ্ড বুদ্ধিমান ছেলে··· ও কখনো অন্যায় কিছু করতে পারে না! ভালো বুঝেই ও এ কাজ করেছে!

ড্যাঙ্গ্লার্সের ললাট হলো কুঞ্চিত। সে বললে,—হ্যাঁ, ছোকরা-বয়স···এ-বয়সে মানুষ মনে করে—সে যেমন ভালো সব বোঝে, এমন আর কেউ বোঝে না! নিজের উপর বিশ্বাস হয় এত বেশী যে কারো বা কিছুর পরোয়া করে না। ক্যাপ্টেন মারা যাবার পর থেকে এডমণ্ডের হাবভাব যা হয়েছে, যেন ঐ এ জাহাজের ক্যাপ্টেন!

মোরেল বললে,—হ্যাঁ, তাই হবে···শীঘ্রই সেই ব্যবস্থা করছি!

ড্যাঙ্গ্লার্সের বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্বললো!···ঐ ছোকরা এডমণ্ড হবে জাহাজের ক্যাপ্টেন!···আর ড্যাঙ্গ্লার্স!—চিরদিন 'মালখানার' চাবি নিয়ে চৌকিদারী করবে···মালপত্রের হেফাজতী করে দিন কাটাবে!···

দুদিন পরে জাহাজের কাজকর্ম শেষ করে এডমণ্ড ছুটি পেয়ে বাড়ীতে চললো···বাড়ীতে বুড়ো বাপ—বাপের সঙ্গে দেখা করতে—ড্যাঙ্গ্লার্সের বুকে হিংসার আগুন প্রধূমিত হতে লাগলো। সে স্থির করলো,—এডমণ্ড হবে ক্যাপ্টেন! কখনো না! আমার হাতে কলকাঠি আছে, যে চাকা ঘুরিয়ে দেবো—এডমণ্ডের ক্যাপ্টেন হওয়া কি, মেটগিরিও থাকবে কিনা সন্দেহ! এ জাহাজের ক্যাপ্টেন হবো আমি —মঁশিয়ে ড্যাঙ্গ্লার্স!···

বাড়ী এসে এডমণ্ড বুড়ো বাপকে খবর দিলে, মালিক মোরেল সাহেব আমাকে জাহাজের ক্যাপ্টেন করবেন—এমনি আশা দিয়েছেন।

ছেলের এ বয়সে এমন পদোন্নতি···বাপ শুনে খুসী হলেন। তিনি বললেন,—তোমার এ উন্নতি—ভগবানের আশীর্ব্বাদে! ছেলের উন্নতি, ছেলের মর্য্যাদা, বাপকে কতখানি সুখ, কতখানি গৌরব দেয়—আমি তা জানছি, এডমণ্ড!

বাপের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে এডমণ্ড চললো মার্সে-ডিজের সঙ্গে দেখা করতে! মার্সেডিজ্ রূপসী কিশোরী —পিতৃমাতৃহীনা···সে থাকে এক দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়ের বাড়ী—আশ্রিতা। আত্মীয়ের তরুণ পুত্র ফার্নান্দ্ তাকে নিত্য উত্যক্ত করে—তাকে বিবাহ করতে হবে। কিন্তু ছোটবেলা থেকে এডমণ্ডের সঙ্গে মার্সেডিজের খুব ভাব··· দুজনে দুজনকে প্রাণের সমান ভালবাসে—এখন দুজনে বিবাহ হবে—কথা পাকা। এডমণ্ড জাহাজে কাজ করে —জলে-জলে ঘোরে···ফার্নান্দ্ থাকে ঘরে—সে খালি মার্সেডিজ্‌কে বিরক্ত করে—ফার্নান্দ্‌কে বিবাহ করতে হবে! মার্সেডিজ্ বার বার আপত্তি জানায়···বলে,— না, না, না···হাজার বার তোমাকে বলেছি, না! তোমাকে আমি বিবাহ করবো না! আমি ভালবাসি এডমণ্ডকে··· এডমণ্ডও আমায় ভালবাসে···আমি এডমণ্ডকে বিবাহ করবো! ফার্নান্দ্ শাসায়,—তাকে আমি মেরে ফেলবো! মার্সেডিজ্ জবাব দেয়,—এডমণ্ড যদি মারা যায়, আমিও মরবো···আত্মহত্যা করবো!···

সেদিনও ফার্নান্দ্ ঐ এক কথা বলে জ্বালাতন করছে মার্সেডিজ্‌কে···মার্সেডিজ্‌ও বিরক্ত হয়ে তাকে বলছে, —না, না, না···এমন সময় দরজায় ডাক,—মার্সেডিজ্···

···এ যে এডমণ্ডের কণ্ঠ! মার্সেডিজ্ ছুটে বেরিয়ে এলো···তারপর···দুজনে কত কথা···কত হাসি!···

ফার্নান্দ্‌কে দেখে এডমণ্ড জিজ্ঞাসা করলো,—এ লোকটি কে?

মার্সেডিজ্‌ বললো,—এর নাম ফার্নান্দ্‌...সম্পর্কে আমার ভাই হয়! দুজনে আলাপ করো!

এডমণ্ড করমর্দ্দনের জন্য সাদরে হাত বাড়াতেই, ফার্নান্দ দু' চোখে অগ্নিদৃষ্টি হেনে সটান্‌ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল—ক্ষিপ্ত-পশুর মতো আক্রোশে! সহরের পথে ঘুরতে-ঘুরতে একটা সরাইখানার সামনে গাছতলায় ফার্নান্দের দেখা ডাঙ্গ্‌লার্সের সঙ্গে...ডাঙ্গ্‌লার্স ছায়ার মতো এডমণ্ডের পিছনে ঘুরছে! ফার্নান্দ্‌কে দেখে ডাঙ্গ্‌লার্স বললে,—কি হে ফার্নান্দ্‌...চিনতেই পারছো না যে...আমি তোমার পুরোনো বন্ধু ডাঙ্গ্‌লার্স!...এসো...এসো...একসঙ্গে বসে খানা-পিনা গল্পসল্প করা যাক্‌ দুজনে মিলে!

কোনো জবাব না দিয়ে ফার্নান্দ্‌ গম্ভীরভাবে ডাঙ্গ্‌লার্সের খানা-টেবিলের কাছে এগিয়ে এলো। তাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ডাঙ্গ্‌লার্স আগ্রহভরে পাশের খালি চেয়ারখানা এগিয়ে দিয়ে বললে,—বসো!...কিন্তু চেহারাখা করেছে'—দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনো কিশোরীর কাছে বিবাহের কথা বলেছিলে...সে প্রত্যাখ্যান করেছে!

ডাঙ্গ্‌লার্সের কথা শুনে ফার্নান্দ্‌ একটি নিশ্বাস ফেলে বললে,—তাই বন্ধু, তাই! সেই ব্যাপারটি ঘটেছে!...আমি মার্সেডিজ্‌কে বিবাহ করতে চাই...কিন্তু মার্সেডিজ্‌ কিছুতেই রাজী নয়। সে বিবাহ করতে চায় ঐ এডমণ্ড দান্তেকে!...তিনদিন পরেই নাকি বিবাহ হবে...আমি নিজের কানে শুনেছি—ওদের দুজনের বিবাহের তারিখের কথা! দেরী চলবে না...দান্তে নাকি তার জাহাজের ক্যাপ্টেন হবে এবার!

ডাঙ্গ্‌লার্স বললে,—বটে!...

নিশ্বাস ফেলে ফার্নান্দ্‌ বললে,—হ্যাঁ!...কিন্তু এ বিবাহ আমি হতে দেবো না!...ভেবেছিলুম—দান্তের বুকে ছুরি বসাবো ওকে মেরে ফেলবো...কিন্তু মার্সেডিজ্‌ বলে,—দান্তে যদি মারা যায় তো সেও সেইদণ্ডে আত্মহত্যা করবে! তাই তো আমার সমস্যা!...

ফার্নান্দের কথা শুনে ডাঙ্গ্‌লার্সের মুখে বক্র-হাসির রেখা ফুটে উঠলো...সে বললে,—চিন্তা করো না বন্ধু!...দান্তেকে খুন করার প্রয়োজন নেই। আমি এমন মন্ত্র জানি যে মন্ত্রের জোরে দান্তে বাছাধনকে আজীবন কারাগারে বন্দী থাকতে হবে...তুমি মজাসে পারবে তোমার মার্সেডিজ্‌কে বিবাহ করতে।

ফার্নান্দ্‌ বললে,—কিন্তু কি করে তা হবে? দান্তে কারো কিছু ক্ষতি করেনি কখনো...কাকেও খুন করেনি...কোনো অপরাধ করেনি কোনোদিন!

হেসে ডাঙ্গ্‌লার্স বললে,—না, তা করেনি! তবে, জানো না তো রাজ্যের বিধি...কেউ যদি 'বোনাপার্টিষ্ট' হয়—মানে, এল্‌বা-দ্বীপে নির্ব্বাসিত নেপোলিয়ন বোনাপার্টির গুপ্তচরের কাজ করে, আর সে কাজের জন্য এল্‌বার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, তাহলে তার কি নির্ম্মম শাস্তির ব্যবস্থা আছে! এ ধরণের লোকের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা—'গিলোটিন', না হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড!

ফার্নান্দ্‌ বললে,—কিন্তু এডমণ্ড দান্তে...

বাধা দিয়ে ডাঙ্গ্‌লার্স বললে,—আমি জানি, দান্তে এবারে দেশে ফিরতি-পথে জাহাজ নিয়ে এল্‌বায় গিয়েছিল...সেখানে কি যেন একটা পুলিন্দা দিয়ে, এল্‌বা থেকে একখানি গোপন-চিঠি নিয়ে এসেছে। তার প্রমাণ আছে!

ফার্নান্দ্‌ বললে,—তুমি সে প্রমাণ দেবে?...

মাথা নেড়ে ডাঙ্গ্‌লার্স জবাব দিলে,—উঁহু! আমি এর মধ্যে থাকবো না...নিজে যদি ফ্যাসাদে পড়ি শেষে!...বরং আমি একখানি উড়োচিঠি ছাড়বো আদালতের নামে...তাতে শুধু এ খবরটুকু জানাবো...বাস্‌—তাহলেই আর দেখতে হবে না...দান্তে বাছাধন বেমালুম সাফ্‌ হয়ে যাবে!

মতলব জাগার সঙ্গে সঙ্গেই সরাইখানার টেবিলে বসে ডাঙ্গলার্স তখনি একখানি চিঠি লিখলো আদালতের বড়কর্তার নামে—তবে চিঠিতে নাম সই করলো না...কোনো ঠিকানাও দিলে না...শুধু লিখলো—এডমণ্ড দান্তে এল্‌বায় গিয়েছিল...সেখানে পুলিন্দা পৌঁছে দিয়ে একখানি গোপন-চিঠি নিয়ে এসেছে...প্যারিসে ওর সঙ্গী একজন 'বোনাপার্টিষ্টের' হাতে!

আদালতের বড়কর্ত্তার নামে উড়োচিঠি লিখে ডাঙ্গলার্স দিলে ফার্নান্দের হাতে...এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করে ফার্নান্দ নিজের হাতে ফেলে দিয়ে এলো পোষ্ট-অফিসের ডাক-বাক্সে!

ক্রমশঃ
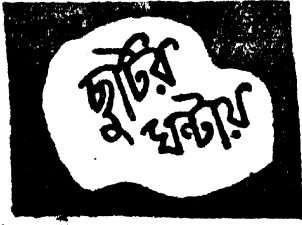
চিত্রগুপ্ত

এবারে বিজ্ঞানের যে নতুন খেলাটির কথা তোমাদের বলছি সেটি ভারী আজব মজার। এ খেলার কলা-কৌশল খুবই সহজ-সরল···তাছাড়া খেলাটি দেখানোর জন্য নিতান্ত টুকিটাকি যে কয়েকটি উপকরণ প্রয়োজন, সেগুলি জোগাড় করা এমন কিছু দুঃসাধ্য-কঠিন বা ব্যয়বহুল ব্যাপার নয়···তোমাদের প্রত্যেকের বাড়ীতেই এগুলি অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারবে। তবে উপকরণ সামান্য হলেও, খেলাটির কলা-কৌশল ভালোভাবে রপ্ত করে নিয়ে, তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে এটি ঠিকমতো দেখাতে পারলে, তাঁদের সবাইকে তোমরা যে রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দেবে—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গ ক্রমে, আরো বলা যেতে পারে যে, এ খেলাটি থেকে শুধু যে নিছক আনন্দ-উপভোগ করবে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের অভিনব-বিচিত্র বিশেষ একটি রহস্যময়-তথ্যেরও সুস্পষ্ট-পরিচয় পাবে।

এই মজার খেলাটি দেখাতে হলে, যে সব সাজ-সরঞ্জাম দরকার, আপাততঃ তারই একটা মোটামুটি ফর্দ্দ জানিয়ে রাখি তোমাদের। অর্থাৎ, এ খেলা দেখানোর জন্য চাই—একটি মোমবাতি, একবাক্স দেশলাই, অন্ততপক্ষে তিন-চার ইঞ্চি লম্বা ও চওড়া মাপের চৌকোণা-ছাঁদের এক টুকরো কার্ডবোর্ড বা কোনো বাঁধানো বই-খাতার শক্ত মলাট। এই কয়েকটি সামান্য ঘরোয়া-সামগ্রী জোগাড় করতে তোমাদের কারো কোনো অসুবিধা হবে না বলেই ধারণা হয়।

যাই হোক, এবারে বলি শোনো—এ খেলার মজার কলা-কৌশলের কথা।

খেলাটি দেখানোর সময়, গোড়াতেই খুব সাবধানে দেশলাই-কাঠির সাহায্যে মোমবাতির পল্‌তেটিকে জ্বালিয়ে নাও। পল্‌তেটি জ্বালিয়ে নেবার পর, মোমবাতিটিকে পাশের ছবির ভঙ্গীতে খাড়া-সিধাভাবে সমতল টেবিল বা ঘরের মেঝের উপরে বসিয়ে রাখো। এ কাজ সারা হলে দর্শকদের মধ্যে কাকেও ডেকে এনে জ্বলন্ত-মোমবাতির সামনে দাঁড় করিয়ে তাঁকে বলো—মোমবাতির জ্বলন্ত শিখার দিকে সজোরে ফুঁ দিতে। তোমার কথামতো জ্বলন্ত-মোমবাতির শিখার দিকে তিনি সজোরে ফুঁ দিলেই দেখবে যে সনাতন রীতি-অনুসারে বাতাসের ধাক্কায় বাতির শিখাটি তাঁর মুখের বিপরীত-দিকে হেলে পড়েছে। এটুকু হলো—খেলার অবতারণা মাত্র···আসল-মজা সুরু হবে এ ঘটনার পর থেকে। অর্থাৎ, সেই দর্শকটি মোমবাতির জ্বলন্ত-শিখার দিকে ফুঁ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে বলবে যে, এবারে এমন বিচিত্র-কায়দায় আবার ফুঁ দিন যে মোমবাতির শিখাটি যেন তাঁর মুখের বিপরীত-দিকে হেলে না পড়ে, বরং তাঁর মুখের পানেই এগিয়ে যায়! আসরে সকলের সামনে নিজের সম্মান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তিনি হয় তো বার-বার নানান্ কায়দায় মুখের সামনে খাড়াভাবে সাজিয়ে রাখা মোমবাতির জ্বলন্ত-শিখার পানে জোরে ও আস্তে ফুঁ দিতে থাকবেন···কিন্তু তাঁর সেই ফুঁয়ের বাতাসের ধাক্কায় প্রতিবারই মোমবাতির জ্বলন্ত-শিখা আগের মতোই তাঁর মুখের বিপরীত-দিকে হেলে পড়বে···কোনোমতেই উল্টোদিকে, অর্থাৎ, তাঁর নিজের মুখের পানে এগিয়ে আসবে না! এমনিভাবে বার-বার চেষ্টার পর তিনি যখন শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হয়ে হার মানবেন, তখন ঐ তিন-চার ইঞ্চি লম্বা চওড়া মাপের চৌকোণা-কার্ডবোর্ড বা বই-খাতার মলাটের টুকরোখানি হাতে তুলে নিয়ে উপরের ছবির ভঙ্গীতে খাড়া-সিধাভাবে সাজিয়ে-রাখা জ্বলন্ত-মোমবাতির শিখার সামান্য দূরে রেখে কার্ডবোর্ডখানির অন্তদিক থেকে তুমি সজোরে ফুঁ দাও। তাহলেই দেখবে—মোমবাতির জ্বলন্ত-শিখা আর আগের মতো তোমার মুখের বিপরীত-দিকে হেলে পড়ছে না···
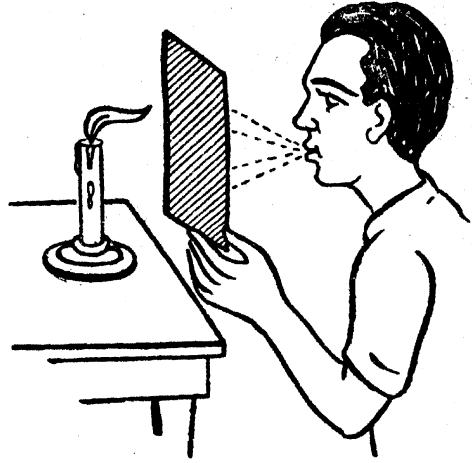
বরং সেটি এবারের বিজ্ঞানের রহস্যময়-বিচিত্র রীতি-অনুসারে বার-বার সহজেই এগিয়ে আসছে তোমার মুখের পানেই! তোমার আজব-কারসাজি দেখে দর্শকরা সবাই যে তখন অবাক হয়ে পঞ্চমুখে এই অভিনব গুণপনার তারিফ্ করবেন—সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ!

খেলার আজব-রহস্যের সন্ধান তো পেলে, এবার নিজেরা রপ্ত করে নাও এর মজার কলাকৌশল। পরের সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি নতুন খেলার হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

মনোহর মৈত্র

১। ছবির হেঁয়ালি :

উপরের ছবিতে আমাদের খামখেয়ালী চিত্রকর-মশাই কিম্ভুতকিমাকার এক জানোয়ারের ছবি এঁকেছেন। চিত্রকর-মশাই বলছেন যে তিনি আলিপুরের চিড়িয়াখানার নানান্ পাখী-জন্তু-জানোয়ারের দেহের নানান্ অংশের টুকরো মিলিয়ে এই আজব-প্রাণীর চেহারাটি এঁকেছেন। তোমরা বলতে পারো—কোন কোন প্রাণীর দেহের কি কি অংশ মিলিয়ে এই কিম্ভূতকিমাকার জীবের চেহারাটি আঁকা হয়েছে?

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

এক ভদ্রলোক কিছু লেবু নিয়ে এসে একদল ছেলের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। ঐ দলে চারজন ছেলে ছিল। দলের প্রথম ছেলেটিকে যত লেবু দিলেন, দ্বিতীয় ছেলেটিকে তার তিনভাগের একভাগ দেওয়া হলো। তৃতীয় ছেলেটি পেলো—দ্বিতীয় ছেলেটিকে যত লেবু দেওয়া হয়েছিল, তার তিনভাগের একভাগ এবং চতুর্থ ছেলেটি পেলো—তৃতীয় ছেলেটিকে যত লেবু দেওয়া হয়েছিল, তার তিনভাগের একভাগ। ভদ্রলোকের কাছে মোট চারশো লেবু ছিল। বলতে পারো—প্রথম ছেলেটি কয়টি লেবু পেয়েছিল?

রচনা : চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (লাউপুর)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি'র উত্তর :

১। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, লোকমান্য তিলক।
২। লাট্টু
৩। হরিণ

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), কবি ও লাড্ডু হালদার (কোরবা), মিণি ও রবি মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই), বুদ্ধু ও বিজু (কলিকাতা), কুলু মিত্র (কলিকাতা), পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), সন্তোন, সঞ্জয়, মুরারী ও সুনীল (ভিলাই), চৈতালী ও সুদীপ্ত বসু (কলিকাতা), হাবু, বাবু, শামু, মামণি ও চম্পা ধর (কলিকাতা), বাণী, শুভ্র, ও মিলন (আড়ুই শাকনাড়া), অরুণচন্দ্র ও মীনা সরকার (কালাইন), পুলিন সিন্‌হা, বজলে রহমান ও এন, রায় (ওকড়াবাড়ী), রেখা ও লেখা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), কাজল রায় (দমদম্), সুপ্রিয়া, অলকানন্দা ও নির্মলেন্দু দাস (কৃষ্ণনগর), রীতা, শেলি, ভাইটু ও কাজল সেন এবং মিলি বসু (বর্দ্ধমান),

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

মিঠু ও বুবু গুপ্ত (কলিকাতা), শর্মিষ্ঠা ও সংঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), বাপি, বুতাম ও পিন্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), পিন্টু হালদার (বালি), বিশ্বনাথ ও দেবকী সিংহ (নওয়াদা), বুটুন, গাব্বু ও মন্টি সিংহ (মদনপুর), সুভাব, বাবলু, কৃষ্ণা, গীতা ও চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (লাউপুর) সুনীতিকুমার, মনোরম', গৌরীবালা ও মদনমোহন মিশ্র (রাগপুর)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বুলা ও সুজিত রায় (কলিকাতা), পদ্মা ও বুবু মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই), রাণা ও বুলা (কলিকাতা), প্রণব গঙ্গোপাধ্যায় (বারাণসী), গোলোক, শেখর, ঝিলমি, প্রবীণা, চারু ও শশাঙ্ক (পাটনা)।

খেলনা-পুতুলের ইতিকথা

পৃথ্বী দেবশর্ম্মা রচিত ও চিত্রিত

বাঘের মতো চেহারার এই বিচিত্র-ছাঁদের কাঠের পুতুল-খেলনাটি নিয়ে খেলা করতো খৃষ্টাব্দ ২০০ আমলের মিশর দেশের ছোট ছেলেমেয়েরা। একালের প্রত্নতাত্ত্বিক-গবেষকরা সেকালের এই মজার খেলনাটি খুঁজে পেয়েছেন প্রাচীন ধ্বংশ-স্তূপের ভিতর থেকে।

খৃষ্ট-জন্মের বহু যুগ-যুগান্তকাল আগে আদিম মানব-সমাজের ছোট ছেলেমেয়েরা মনের আনন্দে খেলা করতো কাদা-মাটি দিয়ে গড়া এমনি ধরণের বিচিত্র নানা রকম সুন্দর-সুন্দর পুতুল নিয়ে।

হাঁসের-পিঠে-সওয়ার এই লম্বা-দাড়িওয়ালা বিচিত্র-ছাঁদের পুতুল নিয়ে খেলা করতো প্রাচীন যুগের গ্রীক্-রাজ্যের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা। এই ধরণের সৌখিন-পুতুলের রীতিমত কদর ছিল পুরাকালের লোকজনের কাছে।

আর কাদা-মাটির তৈরী কালো-রঙের এই যে বিচিত্র-ছাঁদের খোকা-পুতুলটিকে দেখছো, এমনি-ধরণের খেলার সামগ্রী নিয়ে মনের আনন্দে খেলা করতো পুরাকালের রোম-রাজ্যের ছোট ছেলেমেয়েরা সবাই।

রাসে গোপী প্রার্থনম্

মূল সংস্কৃতঃ

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থ

চন্দ্রচারুকর চুম্বিত গগনে ফুল্লকুসুমচয়সুরভিতপবনে
চঞ্চল চরণে ধাবতি হরিণে
মিলিতুমিহ ত্বং কিং ন ত্বরসে ?
গায়তি কুঞ্জে কোকিল পুঞ্জে
মধুকরনিকরে গুঞ্জন মুখরে
তরুগণবিটপে সশিখিকলাপে
কহ বত রমণীবল্লভ ! রমসে।
রাসমণ্ডলমত্র সুশোভং কুসুমগুচ্ছকৃতলোচনলোভম্ !

জলধররম্যং নীলকদম্বং
ত্যজসি কথং নো বিরহং সহসে ?
তব শুভবিগ্রহদর্শনকামা বয়মিহ মিলিতা ললিতা বামাঃ।
স্বজনবিযুক্তা বিজনমুপেতা
জানন্নপি নচ্ছলতো দয়সে।
এহি বিরহদহনাকুল হৃদয়াং শীতলয় ত্বং প্রিয়তম ! দয়য়া
রোদিতি রজনী হিমকণজননী
ননু কথমকরুণভাবং বহসে ?

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থের অপরূপ পদলালিত্যে ও ভক্তিভাবে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর "রাসে গোপীপ্রার্থনম্" গানটির আমি অনুবাদ করেছি যাতে একই সুরে দুটি গানই গাওয়া যায়। বাংলা অনুবাদটি ত্রিমাত্রিক তালে গাইতে শিখলেই যে-কোনো সঙ্গীতজ্ঞ মূল গানটি সেই সুরের ছকে সহজেই ফেলতে পারবেন কেবল তাল বদলে—অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক ছন্দে গেয়ে।

ইতি।—সুরকার

চারুচন্দ্রিকা মগ্ন গগনে কুসুম গন্ধ বিধুর পবনে
চপল চরণে খেলিছে হরিণ, তবু তো তুমি আসিলে না ?
গাহিছে কোকিল উছলি' কানন, ফুলে ফুলে
অলি করে গুঞ্জন,
ময়ূর কলাপ মেলি' নাচে দেখ, তুমি শুধু দেখা দিলে না !
দেখ, মরি, রাসমঞ্চ কেমন কুসুমগুচ্ছে শোভে বিমোহন !

অম্বুদসম ঘেরে কদম্ব, তুমি তো সম্ভাষিলে না !
দরশন পেতে বন্ধু, তোমার ছেড়ে প্রিয়পরিজন সংসার
এসেছি অবলা বাহিরে বিজনে, তুমি তো আলো
হাসিলে না।
বিরহের তাপে আকুল-হৃদয় করো গো শীতল ঝরায়ে প্রণয়,
অশ্রুশিশিরা রজনী কাঁদিছে, তুমি যে ভালোবাসিলে না।

স্বর ও অনুবাদ— —শ্রীদিলীপকুমার রায়

না না র্সনা ধনা ধপা ধা I গা পা ণধা নর্রা র্সা না I র্সা র্রা র্রা র্রা র্রা র্সনা I

চা রু চন্ দ্রি কা ম - ন্থ গ গ নে ফু স্ব ম গ ন্ ধ

র্সা র্গা র্রা নর্রা র্সা না I র্সা র্সা র্সনা ধনা না না I পধা ধা ধা মপা পা পা I

বি ধু র প ব নে চ প ল চ র ণে খে লি ছে হ রি ণ

সা রা গা পা ধা না I গা র্গা র্রা র্সা -া -া I

ত বু তো তু মি আ সি লে না - - -

তু মি শু ধু দে খা দি লে না - - -

তু মি তো স ম্ ভা ষি লে না - - -

তু মি তো আ লো হা সি লে না - - -

তু মি যে ভা লো বা সি লে না - - -

সা সা সা পা পা -া I রা রা রা ধা ধা -া I ক্ষা ক্ষা ক্ষা না না না I

গা হি ছে কো কি ল উ ছ লি কা ন ন্ ফু লে ফু লে অ লি

পা পা পা র্সা র্সা -া I র্সা র্গা র্রা নর্রা র্সা না I ধা র্সা না পনা ধা ধা I

ক রে গু - ঞ্জ ন্ ম যূ র ক লা প মে লি' না চে দে খ

র্সা র্সা র্সা পা পা পা I না -া না মা মা -া I ধা ধা ধা গা -া গা I

দে খ ম রি রা স ম - ঞ্চ কে ম ন ফু স্ব ম শু চ্ ছে

পা পা পা সা সা -া I সা র্সা র্সা রা র্রা র্রা I গা র্গা র্রা না রা র্সা I

শো ভে বি মো হ ন্ অ ম্ বু দ স ম ঘে রে ক দ ম্ ব

গা মা মা পা পা ধা I মা ধা পা মপা গা মা I গা মা পা ক্ষা পা ধা I

হ র ষ ন পে তে ব ন্ ধু তো মা য় ছে ড়ে প্রি য় প রি

দা ধা না র্রা র্সা -া I মা র্রা র্রা না র্গা র্গা I পা না না পা র্রা র্সা I

জ ন স ং সা র্ এ সে ছি অ ব লা বা হি রে বি জ নে

র্সা র্সা ণা ধা ধা ণা I পা পা ধা ণা ধণধা পা I পা ধা পধপা মা গা মা I

বি র হে র তা পে আ কু ল হৃ দ য় ক রো গো শী ত ল্

মা পা ধা মপা পা -া I ধা -া ণা পধা পা পা I পা ধা র্সা র্রা র্গা র্রা I

ঝ রা য়ে প্র ণ য় অ - শ্রু শি শি রা র জ নী কাঁ দি ছে

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ইহার পর বটতলায় ৺জয়চাঁদ মিত্রের পুত্র শ্রীপাচকড়ি মিত্রের উদ্যোগে ৩১৯ নম্বর চিৎপুর রোডের বাড়ীতে "পদ্মাবতী" অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। ১২৭৪ সালের ৩০ ভাদ্র (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর) শনিবার ঐ বাড়ীতে উহার প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। অভিনেতাদের নাম,—

ইন্দ্রনীল	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।
মন্ত্রী, সারথি, কঞ্চুকী, অঙ্গিরা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
কলি	জীবনকৃষ্ণ সেন।
বিদূষক	মণিমোহন সরকার।
নাগরিক ১ম	চণ্ডীচরণ ঘোষ
ঐ ২য়	পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
দ্বারবান ১ম	কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শচী	হেমচন্দ্র ঘোষ
গৌতমী	পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
মুরজা	শীতলচন্দ্র বসু।
পদ্মাবতী	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
বসুমতী	হরিদাস দাস (বৈষ্ণব)
পরিচারিকা	অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

বিহারীবাবু অভিনয় শিক্ষা দিতেন। গায়ক জোয়ালা-প্রসাদ ও বাদক নিতাই চক্রবর্ত্তী (রামাৎ বৈষ্ণব) সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন। দুই একটি অভিনয়ে মাইকেল উপস্থিত ছিলেন। বাগবাজারনিবাসী ৺শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (যিনি ন্যাশনাল থিয়েটারে "নীলদর্পণে" দেওয়ান সাজিতেন, তিনি) এই দলে ছিলেন, কিন্তু কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। পদ্মাবতীর অভিনেতা শিববাবু স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

এই সময় চোরবাগানে "চোরবাগান অবৈতনিক থিয়েটার" স্থাপিত হইয়াছিল। কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি এই থিয়েটারের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। "ঊষা-অনিরুদ্ধ নাটক" অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বংশের এক শাখা (শ্যামলাল ঠাকুরের দৌহিত্র) হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় জামাতা) ও "আপনার মুখ আপনি দেখ" প্রণেতা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। চোরবাগানের কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে (কানাইবাবুদের বাড়ীতে) এই সমিতির অভিনয় হইত। এই অভিনয় দেখিয়া ভোলানাথবাবু হেমেন্দ্রবাবুর নিকট প্রস্তাব করেন, যদি অভিনয় করিতে হয়, তবে এ সকল যাত্রার উপযোগী বিষয় অভিনয় করিয়া ফল কি? যাহাতে দেশাচার সংশোধিত হয়, এরূপ সামাজিক বিষয়ের অভিনয় করাই উচিত। তাহার পর

পরামর্শ স্থির হইল, হেমেন্দ্রবাবু অভিনয়ের উদ্যোগ করিবেন, ভোলানাথবাবু একখানি উপযুক্ত পুস্তক লিখিয়া দিবেন। এই সূত্রে ভোলানাথবাবু "বুঝলে কি না" প্রহসন লেখেন। এই সময়ে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-বংশের এক শাখা উপেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুত্র অতীন্দ্রনন্দন ঠাকুর স্বীয় বাটীতে (১০ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে) একটী একতান-বাদনের দল গঠন করেন। একদিন অতীন্দ্রবাবুর বৈঠকে ভোলানাথবাবু "কিছু কিছু বুঝি" নামে নূতন প্রহসন লইয়া উপস্থিত হইলেন। উহা অভিনয় করাই স্থির হইল। কয়লাহাটায় (রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট, জোড়াসাঁকো) বৈদ্যনাথ মল্লিকের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে (যে বাড়ীতে হেমেন্দ্রবাবুরা থাকিতেন সেই বাড়ীতে) অভিনয় করিবার ব্যবস্থা হয়। হেমেন্দ্রবাবু ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর উপর দল গঠনের ভার পড়িল। নাট্যাভিনয় কার্য্যে অর্দ্ধেন্দুবাবুর এই হাতেখড়ি। চোরবাগানের কানাই বাবু সেক্রেটারী হইলেন। ইঁহাদের বন্ধু ব্যাটরানিবাসী মধুসূদন মুখোপাধ্যায় নামক এক জন অয়েল-পেণ্টার, ইঁহাদের নাট্যশালা-চিত্রণের ভার পাইলেন। অতীন্দ্রবাবু, হেমেন্দ্রবাবু ব্যতীত ৺রমানাথ ঠাকুরের পৌত্র শশীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঁহাদের একজন পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ এই দলের আয়োজন হইল। মুস্তফী মহাশয়ের স্বরভঙ্গী ও অনুকরণ-পটুতাই তাঁহার শিক্ষকতার অনুকূল হইল। ১২৭৪ সালের ১৭ কার্ত্তিক (১৮৬৭।২রা নভেম্বর) শনিবারে ইহার প্রথমাভিনয় হয়। মুস্তফী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বাল্যবন্ধু সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর এই দলে যোগদান করেন। তিনি রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণের ভার প্রাপ্ত হন। এই কার্য্যে তাঁহারও এই হাতেখড়ি, তিনি ইহাতে স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনেতাদের নাম,—

নট	গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
খদ্যোতেশ্বর	বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়
দন্তবক্র	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
মুরাদআলী	" "
চন্দনবিলাস	" "
গুরুজী	শশিভূষণ দাঁ
কম্বু	বেণীমাধব মিত্র
বিনোদ	যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
চন্দনবিলাসী	ধর্ম্মদাস সুর
বরদা	পূর্ণ মুখোপাধ্যায়
বৈষ্ণবী	কার্ত্তিকলাল মিত্র

এতদিন যেখানে যত প্রহসনের অভিনয় হইয়াছিল, এই প্রহসনের অভিনয় সে সমস্ত অপেক্ষা মনোরম হইয়াছিল। এই অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুবাবু তিনটি বিভিন্ন অংশের অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, বিভিন্ন স্বরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে সুসঙ্গত প্রকারের অভিনয়ে তাঁহার নিপুণতা এই সময়েই পূর্ণ বিকশিত ও প্রদর্শিত হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার এক অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "মৃত্তিকেরে বাবা মৃত্তিকে" অর্থাৎ অন্য সকলকে মাটী করিল। মুস্তফী মহাশয় ও ধর্ম্মদাস সুরের এই প্রথম অভিনয়, এই অভিনয়েই তাঁহাদের জীবনের গতি ফিরিয়া গেল।

এই স্থানে বাঙ্গলার সাধারণ নাট্য সমাজের প্রধান অভিনেতৃগণের ও স্থাপয়িতৃগণের কে কবে প্রথম কোথায় কি অভিনয় করেন, তাহার একটা তালিকা দিতেছি,—

নাম	সময়	পুস্তক	ভূমিকা	স্থান
৺বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	১২৬৩ ফাল্গুন	কুলীনকুলসর্ব্বস্ব	স্ত্রীচরিত	চড়কডাঙ্গা জয়রাম বসাকের গলি
৺শরচ্চন্দ্র ঘোষ	ঐ	শকুন্তলা	"	ছাতুবাবুর বাড়ী
গিরীশচন্দ্র ঘোষ (স্থূলকায়)	১২৭১	নলদময়ন্তী	ঋষি	বাগবাজার মদনমোহনের বাড়ী
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৭৩	পদ্মাবতী	কঞ্চুকী	শুঁড়িপাড়া
জীবনকৃষ্ণ সেন	১২৭৪ ভাদ্র	"	কলি	বটতলা
অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী	১৭ কার্ত্তিক ১২৭৪	কিছু কিছু বুঝি	দন্তবক্র	কয়লাহাটা
			মুরাদআলী	"
ঐ		ঐ	চন্দনবিলাস	"
ধর্ম্মদাস সুর	ঐ	ঐ	চন্দনবিলাসী	"

গিরীশচন্দ্র ঘোষ (প্রসিদ্ধ নাটককার), অমৃতলাল বসু, রাধামাধব কর, মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু প্রভৃতি স্বনামখ্যাত অভিনেতারা কেহই এত অধিক পূর্ব্বে নাট্যে মিলিত হন নাই।

শিবের ঘরে কেষ্টার মেয়ে,
পেঁচার মত রৈল চেয়ে,
শকুনি ঢাকা গঙ্গায় নেয়ে করলে পলায়ন॥
খেয়েছি অসহ্য মদ
দিয়েছি কার কেশে পদ,

"কিছু কিছু বুঝি" অভিনয়ে মাইকেল ব্যতীত শরচ্চন্দ্র ঘোষ, গৌরদাস বসাক, কাশীপ্রসাদ ঘোষের পুত্রগণ, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভগিনীপতি) উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয়ে নিম্নলিখিত গানটি গীত হয়—

"ওরে নেশাতে ঢুলু ঢুলু করে ডুনয়ন।
রাবণ মারিল রামে কাঁদে দুর্য্যোধন॥
না বুঝে করেছি নেশা
কোথায় আমার রৈল পেশা
এলকেশে এলকেশা, করিবারে রণ।
দময়ন্তী ভয়ে কেঁচো,
পদ্মীরে পেয়েছে পেঁচো
বিদ্যে হল গর্ভবতী, ঠাকুরের লিখন॥
এতো নহে কম বিপদ, কামড়ো না এখন॥
একি হল দাঁতের জ্বালা,
লোকালয়ে বিষম জ্বালা,
কানেতে করিল কালা, বিকট বদন॥

এই গানটি সুপ্রসিদ্ধ "ওরে নেশাতে ঢুলু ঢুলু করে ডুনয়ন, কোথায় রহিল আমার সে বিধুবদন॥" (ইত্যাদি) গানের সুরে ও তাহারই শ্লেষ (Parody) রূপে রচিত। ভোলানাথবাবুই গানটির রচয়িতা। তখন কবি, পাঁচালী, খেউড়ের আমোদে দেশ পরিপূর্ণ! কবিতায় শ্লেষ বিদ্রূপ পাইলে লোক আমোদে নাচিয়া উঠিত। এতদ্ব্যতীত তখন যুবক এবং ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিরিক্ত মদ্যপান, বিলাস এবং আমোদের স্রোত এমন অঙ্গীভূত হইয়া

পড়িয়াছিল যে মদ্যপান করি না বলিতে লোকে লজ্জাবোধ করিত। এ সময়ে যে সকল নাট্যসম্প্রদায় গঠিত হইত, প্রত্যেক সম্প্রদায়েই মদের স্রোত বহিয়া যাইত। মদের অকাতর ব্যয় করিতে না পারিলে তখন দল জমান দুরূহ হইত। অনেক দলে এই মদের জন্য অভিনয়ের সময়েও অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিত। যখন দেশের রুচির এই অবস্থা, তখন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় (ইনি তখনকার যাত্রা, পাঁচালী তরজার ছড়া ও পালা বাঁধিতেন) গ্রন্থকার হওয়াতে অতর্কিত ভাবে গানটি "কিছু কিছু বুঝি'র দলে গীত হইয়াছিল। গানটিতে পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি অভিনয়ের প্রতি কটাক্ষ ছিল, গালি ছিল না।

"এলকেশে এলকেশী"—শ্রীযুক্ত (মহারাজা) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীর নাট্যশিক্ষক কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

"দময়ন্তী ভয়ে কেঁচো"—বাগবাজারের নলদময়ন্তীর অভিনয়ের প্রতি লক্ষ্য।

"পদীয়ে পেয়েছে পেঁচো"—বটতলায় পাঁচকড়ি বা পঞ্চানন মিত্রের উদ্যোগে পদ্মাবতীর যে অভিনয় হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য।

"বিদ্যে হল গর্ভবতী, ঠাকুরের লিখন"—যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীর বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ের প্রতি লক্ষ্য।

"শিবের ঘরে কেষ্টার মেয়ে"—শোভাবাজারের রাজা শিবকৃষ্ণের বাড়ীতে কৃষ্ণকুমারী অভিনয়কে লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

"শকুনি ঢাকা গঙ্গায় নেয়ে"—ঐ সময়ে গঙ্গার অপর পারে শকুন্তলার অভিনয় হইবার উদ্যোগ হইতেছিল। সেই দলের প্রতি শ্লেষোক্তি।

"খেয়েছি অসহ্য মদ"—সাধারণতঃ মদ্যপ অভিনেতার প্রতিলক্ষ্য।

"একি হল দাঁতের জ্বালা"—শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতি লক্ষ্য।

[ক্রমশঃ

হ্রদ-নগরী

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

হে হ্রদ-নগরি, নয়নাভিরাম
প্রীতি-পুলকিত আলোকের ধাম,
খুঁজিতে খুঁজিতে হেথায় এলাম
শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে।
তোমার আলোক তব সমীরণ,
আলাপ-আকুল গৃহ-বাতায়ন,
অলিন্দে বোনা আল্‌তো স্বপন
কী যেন কি যায় ক'য়ে!

(২)

গৃহবলিভুক পাখী-পাখালীরা
প্রাঙ্গণ-পাশে সুখে করে ক্রীড়া;
পালিত প্রাণীরা করে ঘুরা-ফিরা,
ডাকে কভু খুশীভরে।
রাজপথ-পাশে শাখী সারি সারি
কত কথা কয় শাখা-বাহু নাড়ি';
পুষ্প-পাতারা করে ঠারাঠারি,
আলো লোফালুফি করে।

(৩)

উজল আলোকে করে ঝিলমিল্
মেঘ-ফুল-বোনা অতি অনাবিল
আকাশ-চাঁদোয়া নির্ম্মল নীল;
শোভা তব তা'রই তলে
পরাণে পরাণে পিয়াসার আশা,
চারু চমকিত ভীরু ভালোবাসা,
চকিত থকিত ফেনায়িত ভাষা
বুনিয়া বুনিয়া চলে।

(৪)

হে হ্রদ-নগরি, সরণী বাহিয়া
আবেগ-উৎস-ধারায় নাহিয়া,
গুন্-গুন্-গান নীরবে গাহিয়া
এসেছি তোমারই গেহে।
আহ্বান-লিপি পাঠালে গোপনে,
প্রতীক্ষা তা'রই ছিল নাকি মনে!
কত কাল ধ'রে তা'রই আয়োজনে
নিয়োজিত ছিলে স্নেহে।

(৫)

শ্রান্ত চরণ—ক্লান্ত এ কায়া;
সমাদর-ভরা তবু তব মায়া
নিভৃত এ চিতে ফেলে চলে ছায়া।
উতলা পরাণে তাই।
তোমার মাধুরী চুরি করে নিয়ে,
তা'রই নিষেবিত রস-ধারা দিয়ে,
নিজেই নিজেরে রসেতে রসিয়ে
গত ব্যথা ভুলে যাই।

(৬)

আমি যাযাবর—ঠাই হারা নর
পথে গ'ড়ে চলি চলন্ত ঘর
কত অনাদর—কত সমাদর
স্মৃতির ঝুলিতে ভরি।
কত ভুলে যাই, কত ফেলে যাই,
কত কী আবার হারায়ে কুড়াই,
পথেই পথের পাথেয় ফুরাই
স্বপনও ভাঙিয়া গড়ি।

(৭)

এই ভাঙা-গড়া চিরদিন কার;
কালের বেলায় হয় তো বা তা'র
স্মৃতি-রেখা থাকে লহরী-লীলায়;—
ইতিহাস তা'রই নাম।

হে হ্রদ-নগরি, তুমি তব বুকে
তা-ই বুঝি ধ'রে রাখো স্মৃতি-সুখে!
তা'রই উল্লাস হেরি ওই মুখে,
বুঝি মানুষেরও দাম।

(৮)

তুমি দাম দিলে, তব আহ্বানে
যেতে যেতে পথে বুঝি তব টানে
পান্থ-পরাণ লভিল পরাণে
ক্ষণ-বিরতির সুধা।
হঠাৎ হঠাৎ হয়তো এ ভাবে
কেহ তো জানে না কখন্ কে পাবে
হ্রদ-নগরীতে যাহে মিটে যাবে
ঐহিকতারও ক্ষুধা

(৯)

হে হ্রদ-নগরি—মহাফেজখানা
ভাণ্ডারে তব জানা—নাহি-জানা
পুঞ্জিত সুধা; তা'রই যে নিশানা
মেলে যে নিমন্ত্রণে।
এরই লাগি' বুঝি পরাণ ধারণ!
এরই লাগি' বুঝি চলা অ-বারণ!
অমরত্বেরও স্বাদ আহরণ
চকিতে শুভ ক্ষণে।

(১০)

হে হ্রদ-নগরি, কিরণ তোমার
ঝল্‌মল্ করে; দীধিতিতে তা'র
শ্রান্ত পান্থ পায় আপনার
পন্থে চলার ভাতি!
ভয় নাই আর, সঙ্গ পেয়েছি;
বুঝি প্রাণে মনে ইহাই চেয়েছি;
এরই পিপাসায় এ পথও বেয়েছি;
আসুক্ এবার রাতি।
ভয় নাই আর নিভুক এবার
নিশারও দিশারীবাতি।
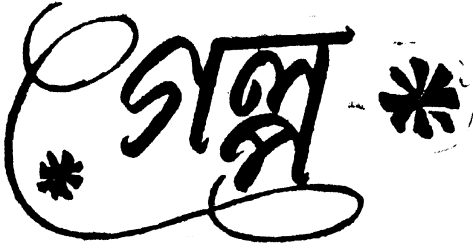
একটি মুকুলের বৃন্তচ্যুতি

কল্যাণী রায় চৌধুরী

গাঢ় নীল রংএর ল্যাণ্ডমাষ্টার গাড়ীখানা যখন দমদমের দুকামরা বিশিষ্ট কোয়ার্টারের সামনে এসে দাঁড়ালো, সারা তল্লাটের দৈনন্দিন জীবনে একটি ঢিল পড়লো যেন—শান্ত পুকুরের জলে যেমন ঢিল পড়ে। এক সাথে এ বাড়ী ও বাড়ী থেকে কয়েক জোড়া উৎসুক চোখ ইসারায় ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসায় কথা কয়ে গেল। গাড়ী থেকে নেমে এলেন মিসেস্ ব'ব্যাল—ডিসেম্বরের কন্‌কনে ঠাণ্ডাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যেন একখানা জর্জ্জেট শাড়ী সারা অঙ্গে জড়ানো, নাইলন ব্লাউজের হাতা দুই ইঞ্চি, কোমরের উপরে চার ইঞ্চি, আর কাঁধের নীচে চার ইঞ্চি নিষিদ্ধ এলাকা বাঁচিয়ে ব্লাউজের ছাটকাট। চোখে গগল্‌স এবং হাতে মর্য্যাদার থলি।

মিসেস বটব্যাল বাড়ীর ভেতরে এলেন—খোকার মা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে বল্‌লেন—"এস ভাই এস, কি যে ভাগ্য আমার, তুমি খোকাকে নিতে এসেছ। ও খোকা এসো প্রণাম করো।" ন্যাড়া মাথা নিয়ে এক পা দুপা করে খোকা এগিয়ে এলো, আস্তে আস্তে মিসেস্ বটব্যালের পায়ের ধূলো নিয়ে হাসি হাসি মুখ করে পাশে দাঁড়ালো,—মিষ্টি মিষ্টি চোখে পিট্ পিট্ করে হেসে হেসে বল্‌লো—"আজই যাব মা?" "হ্যাঁ বাবা, তোমার কাকীমা যে তোমাকে নিতে এসেছেন।" কাকীমা! খোলা খোলা চোখে বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে কাকীমাকে একবার ভাল করে দেখে নেয় খোকা, তার মা, দিদি, দিদিমা এ পাড়া ও পাড়ার মাসীমা কারো সাথেই মিল নেই কাকীমার। তবু মা বলছেন কাকীমা, হ্যাঁ কাকীমাই তো, ও শুনেছে বাবার আপন মামাতো ভাই হয় কাকাবাবু। কাকীমার চেহারা কি সুন্দর। কোথায় যেন কোন্ চিত্রতারকার সাথে মিল ও আছে,—আর এই কাকীমার বাড়ী থাকা, সে তো মহা স্ফূর্ত্তির ব্যাপার। কাকাবাবুর গাঢ় নীল রংএর মস্ত বড় গাড়ী। গল্পের স্বপনপুরীর মত নাকি কাকাদের বাড়ীটা! একটা অশান্ত সদ্য ডানা উঠা পাখী কল্পনার পাখায় ভর করে কাকীমার বাড়ীর দিকে ছুটে যেতে চায়, মুক্তি চায় উদার আকাশের মাঝে। দমদমের কোয়াটারের ছোট্ট উঠানে আকাশভরা সূর্য্যের আলো উছলে পড়ে কিন্তু, ঘরের মধ্যে নিরুত্তাপ ভাই বোন-গুলোর সাথে রোজ সোনার সকালে মুড়ি আর নুন নিয়ে মারামারি করতে হবে না। ডিসেম্বরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় একটা সূতীর সোয়েটার পরে দুপুরের কন্‌কনে ঠাণ্ডা ভাত ঠাণ্ডা তরকারী দিয়ে পরম তৃপ্তিতে যারা খায় সেই পিণ্টু, নন্তু, ভণ্টু, সন্তুটা আর ভোলাটা থাকগে পড়ে এখানে··· সে মস্ত বড় হবে জীবনে। লেখাপড়া শিখবে, বাবার আপিসে ঐ যে নতুন নতুন সব ইঞ্জিনীয়ার—ও তাদের মত বড় হবে—অনেক টাকা আনবে। মাকে আর সকাল বেলা উঠে বাসন মাজতে হবেনা-দিদিটাকেও একটা শাড়ী কিনে দেবে—কাকীমার মত শাড়ী। দিদি ওকে কত ভাল-বাসবে তাহলে। মার আমসত্বের হাঁড়ি থেকে লুকিয়ে বেশী করে আমসত্ব এনে দেবে খোকাকে। আর ঐ ভোলাটা—ওটাকে কিছু দেবেনা খোকা—যেমন হাড় জিল্‌জিলে তেমনি পাজী। রোজই তো একলা দু'খানা রুটী খায়—তাইতেই তো মায়ের রুটী থাকে না। বাবার দুধের বাটীটা আবার জল দিয়ে ধুয়ে খায়, এমন হাড়-হাবাতে! দেখতে দেখতে পিণ্টু, নন্তু, ভণ্টু, সন্তু আর ভোলা আস্তে আস্তে গুটী গুটী করে মায়ের চারধারে ঘিরে আসে—একটা শোলমাছ যেমন একদল ছানা নিয়ে

মাঝ পুকুরে থমকেদাঁড়ায়—আর খাবি খায়, তেমনি ঢোক গিলে গিলে মা বলেন তোরা সব প্রণাম কর কাকীমাকে। পিল-পিল করে এক পাল হাড় জিল্‌জিলে ন্যাড়া নিরুত্তাপ ছেলে প্রণাম করে কাকীমাকে। দেখতে দেখতে কয়েকটি উৎসুক মুখ দেখা দেয় খোকনদের কোয়ার্টারে, ইতিমধ্যে যে যার বৈকালিক প্রসাধন সেরে আগন্তুককে দেখতে এসেছে। খোকার মা চা করে আনেন—চা আর দোকানের কেনা নিমকি। মিসেস বটব্যাল মৃদু আপত্তি করে চা এর পেয়ালায় চুমুক দেন, নিমকিগুলো ভাগ করে দেন সারিবদ্ধ ক্ষুধার্ত্তদের মধ্যে, সমস্ত ঘরে একটি হুড়োলুটি শুরু হয়ে যায়—আবার থেমেও যায় নিমেষে। ইতিমধ্যে খোকন তার টিনের রঙ্গীণ স্যুটকেসটা গুছিয়ে একেবারে তৈরী হয়ে দোর গোড়ায় দেখা দেয় বলে—"আমার হয়ে গেছে কাকীমা।" ঠাকুরমা বলেন—তোমার মাকে প্রণাম করো খোকন। মাকে প্রণাম করে ঠাকুরমার পায়ের ধুলো নিতে নিতে—আবার ঠাকুরমার কাছ থেকে আদেশ আসে—তোমার বাবার ফটোতে প্রণাম করো খোকন—এবারে ঠাকুরমার গলা একেবারে কান্নায় আচ্ছন্ন। বাবার ফটোটাকে প্রণাম করে, ঐ ফটোর তলায় রাখা ফুল, থেকে একটি ফুলে মাথায় ছোঁয়ায় খোকা, তারপর ফুলটি রেখে দেয় পকেটে। তারপর উঠে আসে কাকীমার সাথে কাকীমার গাড়ীতে—শীতের স্বল্পায়ু প্রহর ইতিমধ্যে শেষ হয়ে আসে, পশ্চিম আকাশের আবির গোলা আলোতে খোকার চোখে সবই ঝাপসা হয়ে যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওর ঠাকুরমা, দিদি, পিণ্টু, নন্তু, ভণ্টু, সন্তু, ভোলা সকলকেই ঝাপসা দেখে খোকন—দুহাত দিয়ে একবার বুঝি মুখও ঢাকে। মার ক্ষীণ দেহখানাকে বেষ্টন করে আছে নতুন-কেনা থানখানা—সব রিক্ততা সব দুঃখের নিশানা হয়ে। গাড়ী ততক্ষণে কোয়ার্টারের গেট পেরিয়েছে—বিশাল আকাশ একটুকরো ছেঁড়া মেঘের মত মনে হয়—মার ক্ষীণ সাদা থান জড়ানো দেহটাকে। ঝড়ে বিধ্বস্ত একটি নৌকার ছেঁড়া পালের মত মায়ের সাদা আঁচলটা দূরে মিলিয়ে যায়।

চৌরঙ্গীর আলোর রোসনাই-ধাঁধানো চোখে খোকা দেখে। সে আলো চোখ ধাঁধায়, কিন্তু মায়ের চোখের মত উজ্জ্বল নয়। পিণ্টু, সন্তু, ভোলাকে পড়ার সময় সে আলোর ভাগ দিতে হয় না। তাই সেই আলো পর পর চোখ ধাঁধানো তবুও কেমন যেন ফিকে-ফিকে।

কাকীমা জিজ্ঞেস করেন—এ রাস্তায় আগে এসেছ খোকন?—হ্যাঁ এসেছি।

—কার সাথে এলে।

—একলাই এসেছি—বাবার জন্য ওষুধ কিনে নিতে।

—ও তাই নাকি? তুমি তাহলে এ রাস্তা জান।

—বাবার অসুখের সময় আমরা এই রাস্তা দিয়ে রোজই হাসপাতালে যেতাম। জানেন কাকীমা, বাবার সব দামী দামী ওষুধের দামই আমরা কোম্পানী থেকে পাব?

—করুণা মেশানো সুরে কাকীমা বলেন—ও আচ্ছা।

—জানেন কাকীমা, বাবাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোম্পানী থেকে ট্রাকও পেয়েছিলাম আমরা। একটি কুকুর তো একেবারে চেপটেই গেল গাড়ীর তলায়। ট্রাক পাওয়া, গাড়ীর তলায় কুকুর চেপটে যাওয়া, আর বাবার অকালে মৃত্যু—এর মধ্যে কোন যোগসূত্রই তার শিশু মনে আর খুঁজে পায় না তাই কথাটা বলে—নিজের মনেই কেমন বেওকুভ বনে যায়। সব কিছু কেমন ওলট পালট, কেমন তালগোল পাকানো মনে হয়—খোকার কাছে। কাকীমার সুন্দর শাড়ী, মায়ের সন্ত কেনা মোটা থান, চৌরঙ্গীর আলোর রোশনাই, কোম্পানীর ট্রাকে বাবার মৃতদেহ—চন্দনে চর্চ্চিত। আর নীল সুন্দর গাড়ীখানাতে বসে আছে খোকা—সবই বাস্তব, কিন্তু কেমন যেন খাপছাড়া—পৃথিবীতে যা সত্য তাই কি এমনি একান্তই খাপছাড়া।

সাদার্ণ এভিনিউর মস্ত বাড়ীর ফটকে এসে থামে গাড়ীখানা। দারোয়ান এসে গেট খুলে দেয়। দুধারে মৌসুমী ফুলের কেয়ারী-করা লাল কাঁকর আর সাদা নুড়ির রাস্তা ধরে এগিয়ে আসেন কাকীমা, তাঁর পেছনে পেছনে আসে খোকা। মিসেস্ বটব্যাল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলেন—চা নিয়ে এসো বেয়ারা, আর খোকার জন্য দুধ এনো। চা আসে সুন্দর টি-পটে করে, সাথে রকমারি বিস্কুট, খোকার জন্য দুধও আসে। খোকা কেন দুধ খাবে—এ প্রশ্নের মোকাবিলা নিজের মনেই

করার চেষ্টা করে খোকা—দুধ খেতেন তার বাবা, দু-তুবার কার্শিয়াং টি, বি, সেনেটরিয়াম থেকে ফেরৎ বাবা। অসুখ না হলে যে কেউ দুধ খায়—এ ত জানা ছিল না তার! ভোলাটা মাঝে মাঝে খেতে চাইতো বটে, আর মা মারতেন; এতদিন যাবৎ খোকা ভেবেছিল দুধ খেতে চাওয়ার অবশ্য পাওনাটা হলো, মার খাওয়া, এবং এটাই বুঝি নিয়ম। কিন্তু এখানে বুঝি অসুখ না হলেও দুধ খাওয়ার নিয়ম। বিস্ময়ে ধাক্কা লাগে খোকার। মিসেস্ বটব্যাল চলে যান—খোকা তেমনি বসে থাকে।

বেয়ারা এসে খোকাকে তার ঘরে নিয়ে যায়। বা! এই মস্ত ঘরখানাই তার। ঘরের এক কোণে শুভ্র নরম বিছানা। বইএর শেলফ, পড়ার টেবিল, টেবিলে টাইম-পিস্, উজ্জ্বল আলো। ঠিক সাড়ে আটটায় খাবার টেবিলে ডাক পড়ে। খাবারের সুগন্ধ এসে নাকে ঢোকে—সন্তু, পন্তু, ভোলা আর দিদিটাতো সেই দুপুরের ঠাণ্ডা ভাতের সাথে ঠাণ্ডা তরকারি···একি খোকন খাচ্ছনা কেন? খাও, সুপটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে—কাকাবাবুর গম্ভীর উদাত্ত গলায় আহ্বান! সুপ খাওয়া বুঝি এখানকার রেওয়াজ! কিন্তু সুপটা নোনা—নোনা লাগে কেন? তাড়াতাড়ি হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে সুপের প্লেটখানাই ধরে চুমুক দেয় খোকা—আর এ যাত্রা চোখের জলটা অন্ততঃ সকলের কাছ থেকে আড়াল করতে পারে। রাত্রে নরম বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করে খোকা। বাবা হাসপাতালে যাওয়ার আগে প্রায়ই শক্ত বিছানা নিয়ে খিটিমিটি করতেন মায়ের সাথে। মা তো নিজের গায়ের লেপখানাই পেতে দিয়েছিলেন—সেটা ছেঁড়া ছিল, কিন্তু ওটাই মায়ের একমাত্র সম্বল—বাবা তবু খুশী হননি। আর লেপটা ছেড়ে দিয়ে বেচারা মা কি গায়ে দিয়ে শুতেন কে জানে! কাঁচের শার্সীর ভেতর দিয়ে এক ঝাঁক তারা দেখা যাচ্ছে আকাশে—মিটি মিটি করে কাঁপছে যেন—ঠাণ্ডায় কাঁপছে নাকি? নন্তু, সন্তু, ভোলা যেমন রোদ ওঠার আগে কাঁপে রোজ সকালে!

কবি

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যা কিছু কহিতে চাই, রঙ ধরে তায়
আপনার হাসি গান অশ্রুর ব্যথায়।
সামালিতে নারি। গুঞ্জরি গুঞ্জরি বাজে
মোর যত কাব্যগান কাকলীর মাঝে
বুকের কাহিনী মম।
উদাসীন হয়ে
সুখে দুঃখে অনুদ্বেগে শিল্পী মন লয়ে
সুন্দরের উপাসনা—নাহি আসে মম।

ধরণীর দুঃখ সুখ হোক তুচ্ছতম
তাহে চিত্তে অমুখন দোলা .
মোর লাগে।
তারি দোল শিহরণে দুঃখে অনুরাগে
হাসি ও অশ্রুর আমি শুধু জাল বুনি;
তাত্বিকের উপদেশ কিছু নাহি শুনি।
কাব্য তাহা হল কিনা চাহিনা জানিতে
হাসি কাঁদি ভালবাসি লেখনীর গীতে।

পশুপতিনাথের দেশে

শ্রীসুধীর ব্রহ্ম

দুর্ভেদ্য নৈসর্গিক পরিখা ও প্রাকারে বেষ্টিত হিমালয়ের ক্রোড়ে বিস্তীর্ণ এক স্বাধীনরাজ্য পার্ব্বত্য-দৃশ্য গরিমায় অধিষ্ঠিত। দেবের আবাসভূমি একদা এই প্রদেশ ছিল নরের অগম্য। নেপালের অনেক স্থানে হিন্দু জাতির প্রাচীন ইতিহাস গুপ্ত হয়ে লুকিয়ে আছে। সেই আদিম সুসভ্য পরাক্রান্ত হিন্দুস্থানবাসীর সঙ্গে পৃথিবীর আর কোন জাতির সাদৃশ্য বা জ্ঞাতিবন্ধন না থাকাই ছিল তখন স্বাভাবিক। এখন এই বিচিত্র রাজ্যে প্রবেশ করতে কোন বাধা নেই। বুদ্ধদেবের জন্মস্থল কপিলাবস্তু নগর আমাদের সকলের কাছে আজ এক তীর্থস্থান। সাধারণতঃ শিব-

চতুর্দ্দশীর দিন মাত্র নেপালে যাওয়ার ছাড়পত্র মিলতো। উপস্থিত সেই নিয়মও শিথিল করা হয়েছে; যে কোন ভারতীয় নাগরিক এখন যে কোন সময়ে নেপাল ঘুরে আসতে পারে। নেপালের দক্ষিণে ঘন জঙ্গলে শিকারীরা আসে হাতী, বাঘ ও গণ্ডারের সন্ধানে; আর উত্তর দিকে রয়েছে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেষ্ট, মাকালু, অন্ন-পূর্ণা ইত্যাদি। প্রতি বৎসর এখানে সমবেত হয় বিশ্বের সকল পর্ব্বত অভিযানকারী দলগুলি, কারণ নেপালের উত্তর থেকেই পর্ব্বত আরোহণ অপেক্ষাকৃত সহজ।

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে নেপাল ভ্রমণের ইচ্ছা জাগল। পাটনা থেকে নেপাল যেতে প্লেনে সময় নেয় এক ঘণ্টারও কম। পথের দৃশ্য উপভোগ করা চাই; তাই হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপে প্রভাতে মোকামা স্টেশনে নেমে পড়লাম। ষ্টীমারে গঙ্গা পার হয়ে সামরিয়া ঘাটে এলাম; সেখান থেকে উত্তর বিহারের ট্রেন মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, বরৌনী প্রভৃতি শহর অতিক্রম করে আমাকে বৈকালে সগৌলীতে পৌছে দিল। সগৌলীতে একদা যুদ্ধ ঘটেছিল ইংরাজদের সঙ্গে নেপালীদের এবং নেপালীরাই হয়েছিল পরাজিত। সন্ধির সর্ত্তানুসারে ঠিক হয়েছিল নেপালের ডাক ও পররাষ্ট্র বিভাগে বৃটিশের থাকবে আংশিক কর্তৃত্ব। সগৌলী থেকে সোজা এক ট্রেণ রাতে রক্সৌলে পৌছে দিল। এই রক্সৌল ষ্টেশনটি সম্প্রতি ১৬২ লক্ষ টাকা খরচে পুনর্নির্ম্মাণ করা হয়েছে। ২৯শে জানুয়ারী ১৯৬১ সালে রেলওয়ে মন্ত্রী জগজীবনরাম বলেছেন :—

"Raxaul was the gateway to Nepal and the remodelled station building constructed on the model of Pasupatinath temple was a symbol of friendship and goodwill between India and Nepal"

ও, টি রেলের রক্সৌল স্টেশনের পাশেই নেপাল রাজ্যের রেল স্টেশন। আগে দলে দলে যাত্রী পদব্রজে বীরগঞ্জ যাবার জন্য কাতারে কাতারে অপেক্ষা করত,নাড়ী টেপানো ডাক্তার ও সীমান্তের কাষ্টমস কর্ম্মচারীদের প্রতীক্ষায়। ছাড়পত্র, Identity card ইত্যাদি পরীক্ষা না হলে নেপাল সীমান্তে কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। এখন আর সে সবের হাঙ্গামা নেই।

এইখানেই ভারতীয় এলাকা শেষ হল; সুরু হল নেপাল রাজ্য। ভারত ও নেপালের সীমারেখার উপর এই সুগম সমতল স্থানটিতে প্রহরীরা সব সময় পাহারা দিচ্ছে। সমস্ত রাতটা রক্সৌলে কাটিয়ে ভোর ৫টায় আমলেখগঞ্জএর এক টিকিট কিনলাম। ভারতীয় মুদ্রা নেপালে অচল। কাজেই মুদ্রা বিনিময় করতে হল। আমলেখগঞ্জের ভাড়া নিল নেপালী মুদ্রায় ২ টাকা ৪০ পয়সা অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রা এক টাকা নয় আনা। নেপাল

রেলওয়ে বীরগঞ্জ বাজারের সঙ্কীর্ণ পথকে আরও সঙ্কীর্ণ করে চলেছে। ট্রেণটিতে যাত্রীর অভাবে মালগাড়ী জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। যখন ভারত সীমানার ছোট নদীতে জল নেবার জন্য ট্রেণটি দাঁড়িয়ে গেল, তখন দেখি নিকটেই এক ধর্ম্মশালা। ভারত সীমানা থেকে বীরগঞ্জের দূরত্ব মাত্র তিন চার মাইল, কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও শিবরাত্রি ভিন্ন অন্য সময়ে এখানে পৌছান দুরূহ ব্যাপার ছিল। বীরগঞ্জের এই ধর্ম্মশালা এখন প্রায় পরিত্যক্ত। সেই পাকা ঘর-বাড়ী, রন্ধনশালা, কূপকে এখন আমি ট্রেণে বসে বিদায় জানালাম। ট্রেণ মন্থর গতিতে ঘোর জঙ্গলের মধ্যে এল; ছোট বড় গাছের ডালপালা জানালার মধ্যে এসে অঙ্গ স্পর্শ করে, প্রভাত সূর্য্যের লাল আভা সর্ব্বাঙ্গে তখন ছড়িয়ে পড়ে। ট্রেণের গতি ঠিক যেন কলকাতায় রিক্সা চলার মত। কল্পনা রাজ্যের দ্রুত গতির সঙ্গে মোটেই যেন খাপ খায় না। নেপাল রেলওয়ে শেষ হল আমলেখগঞ্জে। এই চব্বিশ মাইল পথটি অতিক্রম করতে ছোট লাইনের ট্রেণটি সময় নিল পুরো পাঁচ ঘণ্টা।

রেলওয়ে প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে আমলেখগঞ্জ এখন একটি নূতন শহরে পরিণত। এখান থেকে কাঠমাণ্ডু যেতে হলে ১০৭ মাইল পথ মোটর বাসে যেতে হবে। পথ ভাল নয়; সংস্কার কাজও তখন চলছিল। কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাস চলার অনুমতি আছে। সমগ্র পথের মধ্যে ১১টি ঘাঁটিতে বাস থামবে। মাঝখানে আবার আবগারী বিভাগের লোকেরা যাত্রীদের বাক্স, পেঁটরা খুলে পরীক্ষা করে দেখবে। কড়া হুকুম, নেপালের মধ্যে কোন নিষিদ্ধ মাল যেন প্রবেশ না করে। যা' হউক আমলেখগঞ্জের একটি হোটেলে বাঙ্গালী-খাদ্য দই-ভাতও জুটল। সকাল ১০॥ টার মধ্যে আহার শেষ করে দেখি, অতিরিক্ত যাত্রী সংখ্যায় সব কটি মোটর বাস ভর্ত্তি। বেশী টাকার লোভে যাত্রী ও মাল বোঝাই কাজ তখনও চলছিল। ডিসেল ইঞ্জিনযুক্ত একটি লরী চালকের সঙ্গে অগত্যা চুক্তি করতে হল। দশ টাকা ভাড়ায় সে আমাকে কাটমাণ্ডু নিয়ে যাবে। সব যাত্রীবাহী বাস ও লরী একই সঙ্গে প্রথম check postএ দুপুর দুইটা নাগাৎ এসে থেমে গেল। সকলের সঙ্গে আমাকেও সুটকেস ও বিছানা খুলে নেপালের সরকারী কর্ম্মচারীদের দেখাতে হল। চুরিয়ামাটির চড়াই

বহুযুগের ওপারে নির্ম্মিত এই ধরণের কাঠের মন্দির নেপালের পথে প্রান্তরে দেখা যায়।

ভেঙ্গে আমার লরীটি এক সুদীর্ঘ অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করল। চালক খুবই সতর্কতার সঙ্গে ঐ অপ্রশস্ত গহ্বরটির মধ্যে ঘণ্টায় পাঁচ মাইল বেগে যাচ্ছিল। তবু মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল—গাড়ীর সঙ্গে যেন সুড়ঙ্গের দেওয়াল প্রায় লেগে যাচ্ছে। খোলা লরীর মধ্যে বসে চারদিকের দৃশ্য বেশ উপভোগ্য হচ্ছিল বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে মাথা বাঁচাবার জন্য আমাকে নীচু হয়ে বসতে হচ্ছে। সামনে ও পিছনের বাস থেকে যাত্রীরা বলে উঠল "বলো পসুপথিনাথ বাবা কি জয়"। সুড়ঙ্গের মধ্যে একজায়গায় খানিকটা আলো এসে পড়ল; দেখি যে মুক্ত আকাশে রোদের মধ্যে চাঁদের ফালি, মনে এনেছিল নিশ্চিন্ততার আনন্দ। সুড়ঙ্গের বাইরে সুরু হল তরাইয়ের জঙ্গল-ঢাকা পাহাড়ের সারি। কোথাও বন কেটে নূতন বসতি তৈরী হয়েছে, আর নূতন স্থাপিত গ্রামের পাশে চরে বেড়াচ্ছে আকারে ছোট পাহাড়ী গাভীর দল। এই ভাবে তিন ঘণ্টা নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে ভীমপেদীতে পৌছালাম। আমালেখগঞ্জ থেকে ভীমপেদীর দূরত্ব ২৪ মাইল। ভীমপেদী বাজারের পাশ দিয়ে রেল লাইনের তার কাঠমাণ্ডু পর্য্যন্ত চলে গেছে। বিদ্যুতের সাহায্যে পাথর চালান করা হচ্ছিল এক মুল্লুক থেকে আর এক মুল্লুকে। কিন্তু বিকেল হওয়ার সঙ্গে নেমে এল শীতের হাওয়া। কাজেই গরমজামা পরে এবার আশ্রয় নিলাম লরীচালকের পাশে। অস্তগামী সূর্য্যের লাল আভা পর্ব্বতশৃঙ্গের স্থানে স্থানে যেন আগুন ধরিয়ে দিল; সাদা মেঘের টুকরো গুলি লাল হয়ে উঠল কখন।

ভীমপেদী থেকে থানকোট যাওয়ার একটি ১৮ মাইল

কাঠমাণ্ডুর প্রাচীন কাষ্ঠমণ্ডা

পায়ে হাঁটা পথ আছে। থানকোট থেকে অবশ্য বাসে করে কাঠমাণ্ডু পৌছান যায়। আমি হাঁটতে প্রস্তুত নই, তাই নবনির্ম্মিত ত্রিভুবন রাজপথের উপর দিয়ে ২৫ মাইল লরীতে কাঠমাণ্ডুর দিকে চলেছি। চীসাপানীর ভীষণ চড়াই ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমেছে। নেপাল পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত কর্ম্মীরা সেই ঢালুর উপর চওড়া রাস্তা তৈরী করছে। বড় বড় পাথরের টুকরো পথে জমাট বেঁধে রয়েছে। এই বন্ধুর-পথ ধরে শেষ পর্য্যন্ত 'মহিষদহে' এলাম। কোথাও কোথাও কুলীরা কাজ ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়াল, লরী তবে পথ চলতে পারল। এই ভাবে রাতের ঘন অন্ধকারে আট হাজার ফুট উপরে 'সিঙ্গভঙ্গ'এ এলাম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শরীর অবসন্ন, ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়েছি চালকের পাশে। ডিজেল ইঞ্জিনের উত্তাপ গায়ে এসে লাগছে। উঁচু নীচু এক পথের মধ্যে গাড়ীটা থেমে গেল। সামনে সব যাত্রীবাহী বাস ও লরীগুলি দাঁড়িয়ে পড়ল। রাত আটটার পর কোন যান বাহন ঐ check post অতিক্রম করতে পারে না। এখন রাত কাটাই কোথায়? এক German tourist তাঁবু খাটাতে লেগে গেল খোলা মাঠের মাঝে। আমার বিছানা পত্র সে বহন করে নিয়ে এল এক মেটো দোকান ঘরে। গরম চা পান করে কয়েকজন যাত্রীকে নিয়ে P. W.D Bunglowতে গেলাম। Overseer Mr. Mittra তখন কয়েকজন বাঙ্গালী বন্ধুর সঙ্গে তাস খেলছিলেন। অনুমতি প্রার্থনা করলাম আমাদের গাড়ীগুলিকে ছেড়ে দিতে; অন্যথায় এই রাতে অসুবিধায় একশেষ হবে আমাদের। তিনি একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে জানালেন যে তিনি নিরুপায়। নিরুৎসাহ হয়ে ফিরে এলাম দোকান ঘরে।

German touristএর তাঁবুতে আশ্রয় নেবার প্রস্তাব পেলেও চাঁদনি রাতে জঙ্গলের খোলা জায়গায় থাকলাম না। বাঙ্গালীর চামড়ায় খোলা তাঁবুতে অত হিম ঠাণ্ডা সইবে না। দোকানের লাগোয়া বস্তি বাড়ী দুতলা ঘরেরই অনুরূপ। বস্তির দ্বিতীয় তলায় রাত কাটান স্থির করলাম, আর খাদ্যের ব্যবস্থা হল লুচি ও আলুসেদ্ধ। অপর এক ঘরে নেপালীরা কাজ সেরে প্রায় দুইহাত লম্বা-চওড়া অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে হাত পা সেঁকছে। জঙ্গল থেকে আনা কাঁচা কাঠ শুকনা কাঠের মত জ্বালিয়ে রেখেছে। প্রচুর ধোঁয়ার মধ্যে চারপাশে বিছানা করে পিতা-মাতা পুত্র ও পুত্রবধূ একত্রে রাত কাটায়। শয়ন-কক্ষ স্বল্প পরিসর, তাই তাদের সঙ্কোচশূন্য না হয়ে উপায় নেই। বস্তির মধ্যে ঝগড়া নেই। এখনও চকমকি পাথরে দিয়াশলাই ও চেলাকাঠের আগুন দিয়ে প্রদীপের কাজ চালায়। গাছের গুঁড়ি কেটে নানা ধরণের পাত্র তৈরী করেছে—এগুলি তাদের নিত্য ব্যবহার্য্য। যোগ্য মাটির অভাবে মেটো বাসন পাওয়া যায় না। রাতের মত শুয়ে পড়লাম। লামা গুরুঙ্গ, তমঙ্গ জাতীয় নেপালীদের কথাবার্ত্তা পূর্ব্বে শুনার সুযোগ ঘটেনি। নেপালীদের ভাষা তিব্বতীয়, কিন্তু গোর্খা রাজভাষা হওয়ায় তারই ব্যবহার বেশী। কৌতূহল বশতঃ একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে সে জাতিতে লামা। আমাদের দেশে যেমন বৈরাগী বা সন্ন্যাসী কোন কারণে গৃহী হ'লে, তার সন্তানেরাও নিজেদের বৈরাগী নামে পরিচিত করে—সেই রকম বৌদ্ধ ভিক্ষু গৃহস্থ হলে তার সন্তানসন্ততি লামা পদবী গ্রহণ করে। কখন ঘুমিয়ে পড়লাম, এদিকে ভোর না হতেই German সাহেব এসে জানাল যে সে নাকি সারা রাত তাঁবুতে বসে কাটিয়েছে। রাতের আঁধার তখন কাটেনি। যাত্রীবাহী সব বাসগুলির সাথে আমার লরী চলল কাঠমাণ্ডুর পথে। কুজ্ঝটিকা সমাচ্ছন্ন নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু সহরে অবশেষে পৌছান গেল। সহরের মধ্যস্থলে মানস সরোবর হোটেলে উঠলাম।

কাঠের মন্দির অর্থাৎ সংস্কৃতে কাষ্ঠমণ্ডপ থেকে কাঠমাণ্ডু কথাটি এসেছে। নেপালের এই বৃহৎ নগরটি

খৃঃ পূর্ব্ব ৭২৩ এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন কাষ্ঠমণ্ডপ কান্তিপুর নামে প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান নগরটি সমুদ্রতল থেকে ৪৫০০ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। সহরের সর্ব্ব-বৃহৎ বাজার 'ইন্দ্রচক।' বিলাতি পণ্যদ্রব্যে সুশোভিত সেই বাজার অনেকটা কলকাতার বড়বাজারের মত। রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত ও প্রস্তরনির্ম্মিত। রাস্তার দুপাশে দুতলা বাড়ী। কাঠের তৈরী বারান্দায় কত কারুকার্য্যই না রয়েছে। ছোট ছোট জানালা থাকায় অধিকাংশ ঘর দিনের বেলায় অন্ধকারময়। রুচির পরিবর্ত্তন হওয়ায় এখন দেখি কলকাতার মত কয়েকটি নবনির্ম্মিত অট্টালিকা। সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বাড়ীগুলি 'টুনিখিল' নামে এক বিরাট ময়দানের চারদিকে শোভা পাচ্ছে। ময়দানটি দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল। সাধারণতঃ এইখানে কুচকাওয়াজ হয়। মধ্যে রয়েছে তিনটি ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি (১) বীর শামসের (২) জঙ্গবাহাদুর (৩) ভীমসেন থাপা। পূর্ব-দক্ষিণ কোণে চন্দ্রশামসের নির্ম্মিত শ্বেত সৌধ সিংহদরবার ও জঙ্গবাহাদুর নির্ম্মিত থাপাথলির দরবার। খাস সেক্রেটেরিয়েট, বিধান সভা, আকাশবাণী ও নেপাল সরকারের গুরুত্বপূর্ণ আফিসগুলি সিংহদরবারে রয়েছে। ছাড়পত্র নিয়ে সিংহদরবারে প্রবেশ করলাম। উদ্যানের মধ্যে এক জলাশয়ে ভবনের অপরূপ প্রতিবিম্ব পড়েছে। বিরাট এক হলঘরে বৈদ্যুতিক আলোর হরেক রকমের ঝাড়, রাণাদের ব্যবহৃত কত আসবাবপত্র। কাঁচের তৈরী প্রকাণ্ড এক ঘড়ী—কিনতে খরচ হয়েছিল প্রায় লক্ষ টাকা। বিধান ভবনের চারদিকের প্রাচীরগাত্রে রাণাদের শিকার চিত্রগুলি Oil Painting এর মধ্যে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সিংহ দরবারের বিরাট এলাকার একাংশে প্রধানমন্ত্রীর আবাসস্থল। টুনিখিলের পশ্চিম দিকে বীর হাসপাতাল ও দরবার স্কুল। উত্তরে রাণী পুকুর ও বীরশামসেরের অতি সুশোভন প্রাসাদ 'লাল দরবার'। চারশত বৎসর পূর্ব্বে পুত্রশোকাতুরা পত্নীর সান্ত্বনার্থে রাজা প্রতাপমল্ল রাণী পুকুরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারতের সব তীর্থ থেকে পবিত্র বারি সংগ্রহ করে এই সরোবরটিতে রাখা হয়েছিল। পুকুরের মধ্যে একটি মন্দির, কিন্তু কেবলমাত্র বৎসরের নির্দ্দিষ্ট দিনে নাকি বিগ্রহ দর্শন করা চলে। দক্ষিণে এক প্রকাণ্ড

নেপালের মহারাজাধিরাজ কর্ত্তৃক স্কুলে পারিতোষিক বিতরণ

পাথরের হাতির উপর প্রতাপমল্ল ও রাণীর প্রতিমূর্ত্তি। পূর্ব্ব দিকে বীরশামসেরের কীর্ত্তি বীরলাইব্রেরী, নেপালের গ্রন্থাগার থেকেই বাঙ্গলা ভাষায় সবচেয়ে প্রাচীন লিপি 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' পাওয়া গেছল। শ্রদ্ধেয় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের গ্রন্থাগার থেকে বাঙ্গলা ভাষার এই অমূল্য রত্ন উদ্ধার করেছিলেন। তাছাড়া প্রসিদ্ধ 'ভৃগু-সংহিতার' মূল পাণ্ডুলিপি নেপালেই পাওয়া গেছে। নেপালীরা জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল। জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করে তারা ঔষধ সেবন করে। বীরশামসের কাঠমাণ্ডু সহরে ড্রেণ ও কল বসানর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, আর চন্দ্রশামসের আনিয়েছিলেন বৈদ্যুতিক আলো। লাল দরবারের উত্তরে রয়েছে রাণা পরিবারের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য সুদৃশ্য প্রাসাদগুলি, আর পর্ব্বতের পাদদেশে রয়েছে বৃটিশ রেসিডেন্সি। কাঠমাণ্ডু সহরের মধ্যস্থলে মচ্ছিভবন ও গোরক্ষনাথ মন্দির উল্লেখযোগ্য। একটি গাছের কাঠ থেকে শেষোক্ত মন্দিরটি নির্ম্মিত।

বীর লাইব্রেরীর নিকটেই ঘণ্টাঘর; পাশ দিয়ে এক রাস্তা বাগমতীর পশ্চিম তীর দিয়ে চলে গেছে। পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি; সেই তিন মাইল রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার বাহুল্য নেই। দূর থেকে শ্রীশ্রীপশুপতিনাথের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া দেখা গেল, ঘণ্টার শব্দ জানিয়ে দিল মন্দির এসে গেছে। বাগমতীর তীরে অসংখ্য ধর্ম্মশালা ও লম্বা বারান্দা—নীচে নদীতীরে স্নানঘাট। বহুদূরবিস্তৃত সেই পাকা ঘাট পশুপতিনাথ মন্দির পর্য্যন্ত চলে গেছে। সাধু সন্ন্যাসী, নরনারী সিক্ত বস্ত্রে স্নানাহ্নিকে ব্যস্ত। পশুপতি

নাথের বৃহৎ ভবনের প্রবেশ মুখে নীচের চত্বরে অসংখ্য মন্দির। একদিকের চত্বরে পাষাণময় শত শত শিবলিঙ্গ; উপরে কিন্তু কোন আচ্ছাদন নেই। দ্বিতীয় মহলের মধ্যস্থলে পশুপতিনাথের মূল মন্দির। চার ধারে প্রশস্ত ও উচ্চ রোয়াক। সামনের রোয়াকে দুটি প্রশস্ত ও উচ্চ প্রস্তর স্তম্ভে লম্বমান প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলছে। পশ্চিম ধারে চৌতারার উপর গণ্ডশৈলাকার পিত্তলময় প্রকাণ্ড বৃষ। মন্দিরের সম্মুখভাগে কৃতাঞ্জলিপুটে উপবিষ্ট ৬৭টি পাষাণময় সুগঠিত মূর্ত্তি। সেই পুরুষ-প্রতিমূর্ত্তিগুলি নাকি পূর্ব্বতন মহারাজাদের। মন্দিরে চারটি সোপান-শ্রেণী চারদিকের চার দরওয়াজার মুখে রয়েছে। এক রকম ধাক্কা খেতে খেতে ভিতরের দ্বারে উপস্থিত হলাম। যাত্রীরা দুধ, পঞ্চামৃত পশুপতিনাথের মস্তকে চড়াতে ব্যস্ত। যথেষ্ট ভীড়ের মধ্যে মন্দিরের ভিতরকার বৃষ ও পঞ্চমুখ-বিশিষ্ট পশুপতিনাথের সারে তিন ফিট উচ্চ বিগ্রহ নজরে এল। অষ্টভুজের দক্ষিণ চার হস্তে রুদ্রাক্ষমালা ও প্রত্যেক বাম হস্তে কমণ্ডলু। মস্তকে স্বর্ণমুকুট ও স্বর্ণছত্র। মস্তকের ঠিক উপরে কয়েকটি সর্প। বিগ্রহ স্পর্শ করার নিয়ম নেই।

পশুপতিনাথ ভবনের উত্তরে কৈলাশনাথ নামে এক উচ্চ ভূমিখণ্ড। বাগমতী নদী সুন্দরভাবে স্থানটিকে বেষ্টন করে রয়েছে। তীরে গৌরীমাতার শিলাময়ী মূর্ত্তি; উপরে প্রকাণ্ড এক উচ্চভূমিতে কিরাতেশ্বর মহাদেব। গাছ পালা ঘেরা এক ঢালু পথ নীচের দিকে চলে গেছে। যাত্রীরা সব চলল সেই দিকে। ঐ স্থান যেমন প্রাচীন তেমন রমণীয় এবং মৃগস্থলী নামে কথিত। বেশ খানিকটা নীচে গুহ্যেশ্বরী মাতার মন্দির—এখানেও পূজা-পাঠের একদণ্ড নিবৃত্তি নেই। একটী সেতু অতিক্রম করেই বোধাস্থানে পৌছালাম। বোধাস্থান নেপালের অন্তর্গত হলেও তিব্বতের টুকরো বললেই চলে। বোধাস্তূপের তিব্বতী নাম 'চৈত্যরত্ন', আর নেপালি নাম নেপাল চৈত্য। শোনা যায় সম্রাট অশোক ইহা সর্ব্বপ্রথম নির্মাণ করেছিলেন। স্তূপকেন্দ্রে রয়েছে স্বর্ণমণ্ডিত শিখর। স্তূপ পরিধির চারধারে লোকের বসতি। বাসিন্দা প্রায় সবই ভোটীয়; তবু এদের মধ্যে নানা জাতি বিভাগ আছে। এই স্থান নাকি শীতকালে তিব্বতের মত তুষারাবৃত হয়। ফেরার পথে এক সুযোগ মিলল।

কলকাতার নেপালী ভাইস্‌কন্‌স্যালের ছোট ভাই 'শ্রীবাসওয়াস্ত'এর সঙ্গে পথে আলাপ হল। সে আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে এল। নেপালীদের ঘরোয়া আবহাওয়া বোধ হয় কোন পর্য্যটকই ভুলতে পারে না। সভ্যতার আলোক থেকে বঞ্চিত নেপাল অধিবাসীর সেদিনের সেই সব ব্যবহার, আচরণ, হাসিমুখে অভিবাদন আজও ভুলতে পারি না। শ্রীবাসওয়াস্তের পিতা ও পরিবারবর্গ কলকাতার এই নাগরিককে বন্ধুভাবে গ্রহণ করে নিল। স্থানীয় দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখানর জন্য এক ভদ্রলোক আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ভোটগাঁওতে। নেপালের উত্তর সীমার শেষ বস্তি ভোটগাঁও। সহরের আকার ঠিক শঙ্খের মত। কাঁকর বিছানো চড়াই ও উৎরাই পথের মাঝে মাঝে ঝরণা, মেটো পাথরের পাহাড়, সহরের পূর্ব্ব পাশ দিয়ে কাবেলী গঙ্গা, এক রাস্তা চলে গেছে কুম্ভকর্ণ পর্ব্বতের দিকে। স্থানীয় লোকপ্রবাদ যে রামরাবণের যুদ্ধে রামের বাণে কুম্ভকর্ণের মস্তক ছেদন করে এই পর্ব্বতে আনা হয়েছিল। কাবেলী গঙ্গার একটি শাখা পর্ব্বতের গা ঘেঁষে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে চলে গেছে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে কুম্ভকর্ণ পর্ব্বতে নেপালীরা মেষ চরাতে আসে। পর্ব্বতের ওপর একটি ধর্ম্মশালা আছে, আর সেখান থেকে পঞ্চাশ মাইল উত্তরে যোগীদের আবাসভূমি ধবলগিরি, দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে আমি গেলাম গুরুদত্তাত্রেয়ের পীঠস্থানে। চার-পাঁচতলা অট্টালিকার মধ্যে দত্তাত্রেয় শিবের মূর্ত্তি—তিনটি মস্তক, তিন হাত ও তিনপদ বিশিষ্ট বিগ্রহ।

নেপালে প্রায় আড়াই হাজার মন্দির। শতাব্দী ত্রিশ থেকে নেপালের স্থানে স্থানে ছোট রাজ্য গড়ে উঠেছিল, যেমন কাটমাণ্ডু, ভোটগাঁও ও পাটন। কিম্বদন্তী আছে যে পাটন অর্থাৎ প্রাচীন ললিতপট্টন বা অশোকপট্টন মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক স্থাপিত ও সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। নেপালের অর্দ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'স্বয়ম্ভুপুরাণে সম্রাট অশোকের নেপাল-যাত্রা বিবরণ লিখিত আছে। ভারত হ'তে ভিখনা-টৌরী-পোখরা হয়ে তখন লোকে নেপাল আসত। পাটন নেপালের বৃহৎ নগর ও কাঠমাণ্ডু থেকে ১২ মাইল দূরে এক উচ্চভূমির উপর অবস্থিত। পাটনের প্রাচীন বিহার এখনও পুরাণো নামেই প্রসিদ্ধ।

উপস্থিত সেখানে ভিক্ষু নামে পরিচিত বহু লোকের বাস; অধিবাসী প্রায় সবই বৌদ্ধ এবং নেয়ার। এই স্থানে অশোক একদা সপরিবারে এসেছিলেন। তাঁহার কন্যা চারুমতির সঙ্গে নেপালরাজ দেবপালের বিবাহ হয়েছিল। রমণী জীবনের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তিনি স্বনামে ও স্বীয় ব্যয়ে 'চারুবিহার' স্থাপন করেছিলেন। সহরের চারধারে মন্দির-চৈত্যের ছড়াছড়ি। প্রাচীন কৃষ্ণমন্দিরের কাজ সত্যই উল্লেখযোগ্য। গলির পথে বিছানো ইঁট, প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচায়ক। পুরানো রাজপ্রাসাদগুলি সত্যই দর্শনীয়। রাস্তা ও গলির অবস্থা জঘন্য, চারধারে আবর্জ্জনার মধ্যে শূকরের পাল চরে বেড়াতে দেখলাম। অবশ্য নূতন জলের কল সহরের মধ্যে বসান হচ্ছে। সেই প্রাচীন সহর একদা কতটা উন্নত হয়ে উঠেছিল সেগুলি এখানকার প্রাসাদ স্তম্ভ ও পাথরে খোদাই অক্ষরমালা স্তূপ ও প্যাগোডা দেখলে বোঝা যায়। পাটনের বৌদ্ধমন্দির 'মৎস্যেন্দ্রনাথ' নামে প্রসিদ্ধ। দেবতাকে পূজা করার সেই প্রাচীন ঐতিহ্য আজো বেঁচে আছে প্রত্যহের নানা উৎসবের মধ্যে। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের অপূর্ব্ব এক সংমিশ্রণ রয়েছে তাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে।

পাটন থেকে ফেরার পথে কাঠমাণ্ডুর বাইরে শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধতীর্থ স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির দর্শন করলাম। সুদূর চীন থেকে কোন যুগে কোন বোধিসত্ত্ব মহাত্মা এখানে এসে বিপুল হ্রদকে রমণীয় উপত্যকায় পরিণত করেছিলেন; হ্রদে ফুটল শতদল, উৎসারিত হল পবিত্র বারি, প্রকাশিত হলেন স্বয়ম্ভূ ভগবান। বর্ত্তমান মন্দিরটি এক টিলার উপর অবস্থিত। অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে ওঠার সময় দেখা যায় কয়েকটি কাল পাথরের বিরাট মূর্ত্তি প্রশস্ত সোপানগুলির ধারে শোভিত। কিছুকাল পূর্ব্বে এই জায়গা সম্পূর্ণ মেরামত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। মন্দির প্রাঙ্গণে যে ছোট মন্দির বা অট্টালিকা রয়েছে সেগুলি কোনটাই স্বয়ম্ভূপুরাণে বর্ণনার ন্যায় প্রাচীন নয়। রমণীয় স্থানে মন্দিরযুগল স্থাপিত। মন্দিরের সুড়ঙ্গ চূড়াটি নাকি সুদূর চন্দ্রাগড়ী থেকে দেখা যায়। নিকটেই রয়েছে মঞ্জুশ্রী নামে এক সুন্দর মন্দির। আর কাঠমাণ্ডুর পশ্চিমে প্রায় সাত মাইল দূরে নেপালের স্বনামখ্যাত 'মুক্তিনাথ'।

পাহাড়ী পথ দিয়ে ফিরে চলেছি। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পিঠে বোঝা নিয়ে নিচের দিকে কত সহজেই না নেমে চলেছে। নেপালীরা বেঁটে, হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ; মুখ চেপ্টা হলেও রং পরিষ্কার। মেয়েরা যেমন পরিশ্রমী, তেমন নৃত্যগীতপ্রিয়। মেয়েরা ঘোমটা দেয় না। রং বেরঙ্গের পোষাক পরে এই সব শ্রমজীবীরা যখন ঢোল বাজিয়ে নাচ করে, তখন গানের ভাষা না বুঝলেও তাদের প্রাণপ্রাচুর্য্যের প্রতিচ্ছবি ভোলা যায় না। উৎসবে যোগ দেবার সময় দীর্ঘ-বসন অর্থাৎ পঁচিশ ত্রিশ গজের কাপড় কুঁচিয়ে পরে তারা সভ্যভব্যতার পরিচয় দেয়। গত আদমসুমারীতে নেপালের জনসংখ্যা ছিল ৮,৪৭৩,৪৭৮; তন্মধ্যে ২৯৩,৮৫৩ জন লোক বৎসরে ছয়মাস স্বদেশে অনুপস্থিত থাকে। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপস্থিত বহু স্কুল কলেজ স্থাপিত রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা একসঙ্গে পড়তে পারে; রাতেও কলেজে পড়ার সুযোগ আছে। ইণ্টারমিডিয়েট কলেজএর এক বাঙ্গালী ছাত্র আমাকে নিমন্ত্রণ করল তাদের পিক্‌নিকএ যোগ দিতে। বিভিন্ন ভাষাভাষী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশার এ এক অপূর্ব্ব সুযোগ। প্রভাতে মিলিত হলাম কলেজ প্রাঙ্গণে।

প্রায় শতখানেক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তিনখানি মোটর বাস কাবেরীর পথে যাত্রা করল। কাঠমাণ্ডু থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে এই স্থানটির দৃশ্য পরম রমণীয়। রাণারা এখানকার ঘন জঙ্গলে শিকার করতে আসেন! উঁচু নীচু পথের মাঝে কখনও কখনও বাসটি চলতে চলতে থেমে যায়। ছেলেমেয়েরা অনুরোধ করে—আমিও যেন বাস থেকে নেমে তাদের সঙ্গে হৈ হল্লা করি। বাঙ্গালী ছাত্রটি আমার ইণ্টারপ্রেটর হয়ে পাশে বসে আছে। আমার বাসটিতে পিক্‌নিকএর রসদ ছাড়া একটি জীবন্ত ছাগলও ক্রমাগত ভ্যা ভ্যা করে সকলকে অতিষ্ঠ করে রেখেছিল। গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটি ছোটখাটো পাকা ঘর রয়েছে—শিকারীরা নাকি রাতে এখানে আশ্রয় নেয়। খোলা এক সমতল ভূমি, পাশ দিয়ে কাবেরী নদী প্রবাহিত। চারদিকে জঙ্গল ও পাহাড়ের শোভা দেখতে দেখতে প্রাতঃরাশ সুরু করলাম। চিড়ে ভাজা, কপির তরকারী, চাটনী—সুস্বাদ না হলেও ক্ষুধা মেটান চলে। অবশেষে একপ্রকার মিষ্টি বরফি

পেস্তা ও বাদামের সঙ্গে তৈরি উপরে রয়েছে, কুচান পাতা ছড়ান। আমি মাত্র দুটি বরফি খেয়ে চা পান করলাম। কিন্তু আর সকলে ঐ বরফির অনেকগুলি করে টুকরো খুবই আনন্দের সঙ্গে খেয়ে নিল। অতিথিপ্রিয়তা নেপালী স্ত্রী-পুরুষের একটা স্বভাবজাত সংস্কার। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মাস্টবর অতিথিকে নিয়েই ব্যস্ত। একদল ডাকে তাদের সঙ্গে নাচ গানের আসরে যোগ দিতে, অপরদল বলে মধ্যাহ্নের আহার প্রস্তুতের কাজে আমাকে জোগান দিতে। প্রত্যেক নেপালীদের কাছে কুকরী নামে ছোট ও ভারী এক ভুজালি থাকে! কাটারির মত দুদিক বাঁকা না হলেও কুকরীর পৃষ্ঠদেশ পুরু আর ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ। ডগা সূচের মত সূক্ষ্ম। ছোট হাতল দেওয়া সেই অস্ত্রটিতে পঁচিশ ত্রিশ বৎসরেও মরচে পড়ে না। শুধু কুকরী হাতে গুর্খা সৈন্য প্রথম ইউরোপীয় সমরে নেমে যোদ্ধা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এই অস্ত্র হাতে পেলে নেপালীরা বাঘ শিকারেও ভয় পায় না। এক নেপালী ছাত্র দেখি ছাগলটিকে খুব আদরের সঙ্গে চিঁড়ে ভাজা খাওয়াচ্ছে, আর অপর এক ছাত্র ঐ কুকরীর এক কোপে ছাগলের গলাটি কেটে ফেলেছে। রক্তক্ষরণ এক হাতে বন্ধ করে ছাগ দেহটিকে গরম জলে ফেলা হল। লোমগুলি অতি সহজেই ছেড়ে গেল। ঐ কুকরির সাহায্যে ছাগদেহ খণ্ডাকারে বিভক্ত করা দেখে, আমি পাহাড়ে উঠে গেলাম। জঙ্গলের মধ্যে প্রায় তিন ঘণ্টা ঘুরে নীচে এসে দেখি মধ্যাহ্ন আহার প্রস্তুত। হাত মুখ ধুতে বসেছি, হঠাৎ মনে হল অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে; কাবেরীর স্রোত যেন আমাকে হাত বাড়িয়ে টেনে নিতে চায়। হাতড়ে হাতড়ে পশ্চাদপসরণ করেছি, কিন্তু চলার ক্ষমতা ক্রমশঃ যেন লোপ পেতে বসেছে। দলের কয়েকটি ছাত্র আমাকে ধরাধরি করে মাঠে শুইয়ে দিল। আমি শুয়ে শুয়ে দেখছি যে আমার মত শায়িত রয়েছে আরও কয়েকটি ছাত্র। দুটি ছাত্রী গাছের তলায় বসে তখনও বমন করছিল। বরফির উপর যে পাতা ছড়ান ছিল সেগুলি হচ্ছে সিদ্ধি গাছের পাতা। ভাঙের নেশা যে কি, সেই অভিজ্ঞতা আমার প্রথম। চোখের সামনে গোলাকার বিন্দুর ছড়াছড়ি, আমি যেন শূন্যে উঠছি। কত কল্পনা যে এক সঙ্গে মাথায় এসে গেল, সেগুলি পৃথক করে এখানে লেখা সম্ভব নয়। কলকাতা থেকে কতদূর নেপালের কোন এক প্রান্তে আমি নিরুপায় হয়ে শুয়ে আছি। অসহায় ভাবে জানালাম যে জ্ঞান হারালে তারা যেন আমাকে বাসের মধ্যে তুলে নেয় —আমাকে হোটেলে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব যে তাদের! বাঙ্গালী ইণ্টারপ্রেটর বন্ধুবর আমার কথাটি বুঝল বটে, কিন্তু আর সকলেই এক সঙ্গে পরমানন্দে আহারে মশগুল। আমাকে তাদের সঙ্গে আহার করার জন্য কতই না অনুরোধ। অভুক্ত এই বাঙ্গালীটিকে তারা বাসে তুলে দিয়েছিল, দু-পাশে দুটি ছাত্রীর কড়া প্রহরাধীনে। শেষ পর্য্যন্ত আমি আমার হোটেলে ফিরে আসি। পরদিনই কাঠমাণ্ডুকে বিদায় জানিয়ে কলকাতা রওনা হলাম।

শেষের অভিজ্ঞতাটি তেমন তৃপ্তিদায়ক না হলেও, নেপালের বহু সুরম্য স্মৃতি আমার মনকে ভারাতুর করে তুলল যাত্রাকালে। এই কদিনের প্রত্যহ পরিচয়ে কত মানুষ কত মুখ, আকাশ নদী অরণ্য স্মৃতিমুখর হয়ে থাকল হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে। বহু অমিলের মধ্যে আমাদের সঙ্গে নেপালী সমাজের কোথায় যেন একটি সুগভীর জীবন-বোধ অনুভব করলাম। মনে পড়ল কবিবর প্রমথনাথের কাব্যাংশটি :—

"ও নেপালী, বাঙ্গালী তোর ভাই
তোদের না হয় হিমালয়ে বাস,
আমরা না হয় সমতলে পড়ে'
দারুণ গ্রীষ্মে করি হাঁস-ফাঁস।
তোরা না হয় আব্ হাওয়ার গুণে
বীরের জাতি বলে' পা'স্ মান,
আমরা না হয় জল-বায়ুর দোষে
কলম পিষে হচ্ছি হয়রাণ!
আমাদের এই সমতলে মিশল
তোদের গিরিমালা,
আমরা যেমন কালো রে ভাই, তোরাও
তেম্‌নি কালো!"

নারীর ধর্ম

কল্যাণী গুহ

নারীর ধর্ম কি এ নিয়ে যে তর্কের ঝড় একটা বইছে তা লক্ষ্য করে বড় ঔৎসুক্য অনুভব করেছি। তাই দু একটা কথা না বলে স্থির থাকতে পারছি না। একদিকে নির্বাণপ্রিয়া দেবীর বর্ণিত ধর্ম যেমন সুপ্রাচীন ভারতের নারীর সতীধর্মের মহিমাকে প্রকাশ করেছে, অপর দিকে বাসবী দেবীর প্রবন্ধে তেমনি বর্তমান যুগের নারীজাতির জীবন সমস্যা প্রতিভাত হয়েছে। বর্তমান যুগের নারী রামায়ণ যুগের নারীর মত পুরুষের উপর নির্ভর করে বেঁচে নেই, দস্তুরমত পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে চলছে। মেয়েরা স্কুলে কলেজে ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে, চাকুরী ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করছে, নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করছে, রাজ্য চালনায় অংশ গ্রহণ করছে। এমতাবস্থায় নারী আর রামায়ণের যুগের নারীর মত, বা তুলসীদাসের যুগের মত পুরুষের উপর নির্ভরশীল নয়। তখন পূর্ণ নির্ভরের মূল্য হিসাবে পুরুষকে যা দিতে হ'ত তা হচ্ছে একনিষ্ঠ পতিভক্তি। তাই পতিভক্তির মর্যাদা ঐ যুগে এত বেশী ছিল।

বাসবী দেবীর মতে ঐ রকম পতিভক্তি ভোগ করতে হলে পতিদেবতাদের রামের মত হতে হবে। কিন্তু রামের মত হওয়া যদি এ যুগের পুরুষদের পক্ষে সম্ভব হত তবে নারীর ধর্ম নিয়ে এই বিতর্কই উত্থাপিত হ'ত না। দেশ ও সমাজের চেহারাই অন্য রকম হত। মানুষের নীতিবোধ লোপ না পেলেও ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। রাম ও তুলসীদাসের যুগের নৈতিক মানদণ্ড নিয়ে সমাজ আজ আর পরিচালিত নয়। এ দেশের সমাজের শিক্ষিতা নারীরা পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে মেতে উঠেছে।

কিন্তু এই মেতে ওঠ, এই অনুকরণপ্রিয়তা আমাদের এ দেশের নারীদের পক্ষে কতটা মঙ্গলজনক হবে বা দুঃখজনক হবে—তা কি আমরা ভাল করে চিন্তা করে দেখেছি? আমার তো মনে হয় তা আমরা দেখছি না। আমরা কেউ ভেবে দেখছি না, বিদেশীদের অনুকরণ আমাদের কোন পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। যাদের অনুকরণ আমরা করছি তাদের কথা একবার ভেবে দেখা দরকার। আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীগৌরকিশোর ঘোষের প্রবন্ধ 'বিলাত দেশটা' থেকে জানা যায়, "মাঝ বয়সী পুরুষেরা এখন আইবুড়ো থাকতেই পছন্দ করে। তার মানে এই নয় তারা সাধু পুরুষ বনে গিয়েছে। আসল কথা ৩৫ বছরের উপরে বয়স পেরিয়ে যাওয়া পুরুষেরা বান্ধবী চায়, বউ চায় না।" তার কারণ, "একদল সাফ বলেছে, তারা মেয়ে মানুষের নামগন্ধও সইতে পারে না। তাদের আজকাল আর মেয়ে বলা ঠিক নয়। আচারে, ব্যবহারে, পোষাকে-আশাকে ওরা এখনকার পুরুষের বাবা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় দল এতটা কঠোর নয়। তারা মেয়েদের সঙ্গ ভালবাসে

আকাঙ্ক্ষা করে। তবে চায় তারা প্রেমিকা হয়েই থাক, বিয়েতেই এই দলের আপত্তি। তৃতীয় দল বলেছে তারা বিয়ে করতে চায় না এই কারণে যে বউরা অযথা তর্ক আর কথা কাটাকাটি করে তাদের মন মেজাজ নষ্ট করে দেয়। যে মেয়ে প্রেমিকা অবস্থায় কোমল বাহুবল্লরী আলোতোভাবে গলায় দিয়ে কপোত কূজনে কাণে সুধা ঢেলে দেয়, সেই মেয়েই বিয়ের আঙটি আঙ্গুলে পরার পর থেকে কর্তৃত্বের রাশ টেনে স্বামী বেচারার গলায় ফাঁস পরাতে চায়।

এদেশের শিক্ষিত সমাজে এই জাতীয় নর-নারীর আবির্ভাব ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে। ফল হয়েছে বিলেতের মেয়েদের মধ্যে যে কর্মনিপুণতা, শৃঙ্খলাজ্ঞান, সময়নিষ্ঠা রয়েছে সে সকল সদ্‌গুণ আমাদের মেয়েদের মধ্যে প্রকাশ না পেয়ে, প্রকাশ পাচ্ছে সে-সব অসদ্‌গুণ যাতে পুরুষেরা নারী-বিদ্বেষী হয়, অথবা নারীকে নিয়ে শুধু প্রেমবিলাসের স্বপ্ন দেখে,—বিয়ে করতে রাজী হয় না, অথবা শান্তি-নিকেতনী ঢঙে দু-একটি মধুর বাণী শুনে বিয়ে করে শেষে মোড়লীর চোটে পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে।

যে শিক্ষায় নারীজাতির অন্তরের সদ্‌গুণরাজি বিকশিত না হয়ে তাদের মধ্যে শুধু কুরুচি আর কদাচার বৃদ্ধি পায়, সে শিক্ষা ভয়ংকর বিপজ্জনক। ইহাতে নারীর জীবনই যে শুধু অশান্তির হবে তা নয়, পুরুষের জীবনেও অশেষ দুর্গতি নেবে আসবে, তারা উচ্ছৃঙ্খল হবে। আর সে উচ্ছৃঙ্খলতার ফলস্বরূপ সমাজের শিক্ষিতা অশিক্ষিতা সকল নারীর জীবন বিষময় হবে। তাই আজকের যুগের শিক্ষিতা নারীদের বিদেশী উচ্ছৃঙ্খলতাকে অনুকরণ করতে যাওয়ার আগে একটু থেমে ভাববার সময় এসেছে।

কাপড়ের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গত সংখ্যায় রঙ-করা কাপড়ের জমীর উপর থেকে মোমের প্রলেপ মুছে ফেলার যে পদ্ধতির কথা বলেছি, তেমনিভাবে 'বাটিক্'-কারুশিল্প সামগ্রীটিকে সম্পূর্ণরূপে মোমের আস্তরণহীন করে সযত্নে গরম-জল আর সাবান দিয়ে কেচে ছায়া-শীতল স্থানে খোলা-বাতাসে মেলে রেখে আগাগোড়া শুকিয়ে নেবার পর, সেটিকে পরিপাটিভাবে ইস্ত্রি করে ফেললেই শিল্প-সামগ্রী রচনার কাজ শেষ হবে।

ইতিপূর্ব্বে যে পদ্ধতিতে সুতী বা পশমী কাপড়ের জমীতে 'বাটিক'-কারুশিল্পের নক্সাদার সৌখিন-সামগ্রী রচনার কথা বলেছি, সেটি হলো 'এক-রঙা' (Mono-colour Batik Designing Procedure) 'বাটিক' কলাকারুর প্রথা। একাধিক রঙের সাহায্যে 'বাটিক্'-শিল্পের কাজ করতে হলে, কাপড়ের টুকরোটিকে সর্বপ্রথম

সব চেয়ে 'হাল্কা-রঙে' রঞ্জিত করে নিতে হবে। তবে এই হাল্কা-রঙে রঞ্জিত করে নেবার আগে, কাপড়ের
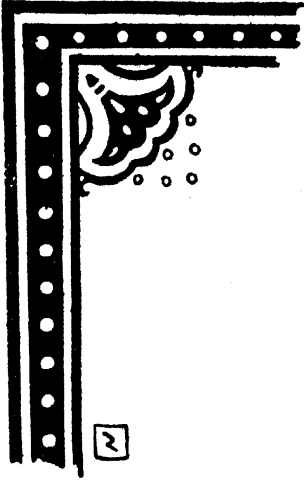
টুকরোটির যে সব অংশ শাদা বা রঙের স্পর্শহীন রাখা প্রয়োজন, সেই অংশগুলিকে পূর্বপ্রথানুসারে তরল-মোমের প্রলেপন দিয়ে ঢেকে নেওয়াই হলো একাধিক-রঙে 'বাটিক্' শিল্পের কাজ করার রীতি। এমনিভাবে বিভিন্ন অংশে তরল মোমের প্রলেপন দেবার পর, কাপড়ের টুকরোটিকে হাল্কা-রঙে রঞ্জিত করতে হবে। এ কাজ সারা হলে, কাপড়ের টুকরোটির যে সব অংশে ঐ হাল্কা রঙের নক্সাদার ছোপ বজায় রাখা দরকার, সেই অংশগুলিকে পুনরায় তরল মোমের আস্তরণে ঢেকে রাখবেন এবং কাপড়ের টুকরোটিকে দ্বিতীয় রঙে রঞ্জিত করে নেবেন। প্রথম বা হাল্কা রঙের চেয়ে দ্বিতীয় রঙটি যে গাঢ় হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। ঠিক এমনি প্রথাতেই কাপড়ের টুকরোটির যে সব অংশে দ্বিতীয় রঙটিকে বজায় রাখতে হবে, সেই অংশগুলিকে তরল মোমের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে, তৃতীয় রঙে রঞ্জিত করে নেবেন। মোটকথা, 'বাটিক্'-শিল্পের কাজের জন্য যত বেশী ও বিভিন্ন ধরণের রঙ ব্যবহার করা হবে, ততবারই উপরোক্ত প্রথানুসারে কাপড়ের জমীর বিভিন্ন অংশগুলিকে তরল-মোমের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে আলাদা-আলাদা রঙে সুরঞ্জিত করে নিতে হবে। বাটিক্-পদ্ধতিতে একাধিক রঙে সুতী বা রেশমী কাপড় রঞ্জিত করার এটিই হলো চিরাচরিত রীতি। তবে এই রীতি অনুসারে সুতী বা রেশমী কাপড় রঙ করার সময়, আরো কয়েকটি জরুরী বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ খেয়াল রাখা দরকার। অর্থাৎ, একাধিক রঙের সাহায্যে 'বাটিক্'শিল্পের কাজ করতে হলে, সর্ব্বদা মনে রাখবেন—প্রথম রঙটি যেন হাল্কা-ধরণের হয়, দ্বিতীয় রঙটি হবে তার চেয়ে গাঢ়, তৃতীয় রঙটি আরো গাঢ়-ধরণের, চতুর্থটি তৃতীয়ের চেয়েও অপেক্ষাকৃত গাঢ়তর ...এমনি নিয়ম মেনেই ক্রমশঃ হাল্কা থেকে গাঢ় রঙ ব্যবহার করে চলবেন এবং কাজ শেষ করবেন সব চেয়ে গাঢ় অর্থাৎ ঘন কালো রঙে কাপড়ের টুকরোর বিশেষ বিশেষ অংশগুলিকে পরিপাটিভাবে সুরঞ্জিত করে তুলে। প্রসঙ্গক্রমে সরল একটি দৃষ্টান্ত দিলেই, ব্যাপারটি আরো সহজ-বোধগম্য হবে। ধরুন, হলদে, বাদামী আর কালো —এই তিনটি বিভিন্ন রঙের সাহায্যে 'বাটিক্'-শিল্পের কাজ করছেন। এক্ষেত্রে প্রথমেই হলদে, তারপর বাদামী এবং সব শেষে কালো রঙে 'বাটিক্'-শিল্পের উপযোগী সুতী বা রেশমী কাপড়টিকে সুরঞ্জিত করে নিলেই সুচারু-ছাঁদে কারু সামগ্রীটি রচিত হয়ে যাবে। তবে হুঁশিয়ার—'বাটিক্'-শিল্পের কাজ করবার সময় কদাচ গরম-জলে রঙ গুলবেন না...সর্ব্বদা শীতল জলে রঙ গোলাই হলো এ কাজের চিরন্তন রীতি। শীতল জলের বদলে গরম জল মেশানো রঙ ব্যবহার করলে সুষ্ঠুভাবে 'বাটিক্'-পদ্ধতিতে শিল্প-কাজ করার যে সব অসুবিধা ঘটে...সেগুলির হদিশ আমরা ইতিপূর্বেই দিয়েছি —তাই আর তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। মোটামুটি ভাবে উপরোক্ত নিয়মাবলী মেনে কাজ করলে যে কোনো শিক্ষার্থীই অচিরে 'বাটিক্'-শিল্পকলায় সবিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারবেন বলেই ধারণা হয়।

সৌখিন ব্লাউশের প্যাটার্ন

মৃন্ময়ী দেবী

গত সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিশ্রুতিমতো এবারেও শীতান্তকালে পরিধান-উপযোগী আরো দুটি অভিনব-সৌখিন ছাঁদের ব্লাউশের নমুনা উপহার দেওয়া হলো। এ দুটি ব্লাউশই 'পোষাকী' এবং 'আটপৌরে' হিসাবে অনায়াসেই ব্যবহার করা চলবে।

উপরের ১নং চিত্রে যে বিচিত্র ব্লাউশের নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটি সুদৃশ্য-সৌখিন হলেও, অপেক্ষাকৃত সাধাসিধা ধরণের। সাধারণভাবে অফিস, স্কুল, কলেজ, বাজার প্রভৃতি স্থানে কাজে বেরুনোর সময় মহিলাদের পরিধানোপযোগী পরিচ্ছদ হিসাবে বিশেষ মানানসই হবে বলেই ধারণা হয়। এ ধরণের ব্লাউশের প্যাটার্ণটি সুতী এবং রেশমী—উভয়বিধ কাপড়েই বানানো চলবে। তবে আমাদের মতে, এই প্যাটার্ণের ব্লাউশটি সুতীর চেয়ে রেশমী কাপড়েই আরো বেশী মনোরম দেখাবে—বিশেষভাবে সেটি যদি জরীর বা রেশমী সুতোর বুটিদার দক্ষিণ-ভারতীয় রেশমের কাপড়ের সাহায্যে রচিত করা হয়। এই ধরণের নাতি-দীর্ঘ হাতাওয়ালা ও চওড়া গলার অংশ বিশিষ্ট ব্লাউশটি মহিলাদের গ্রীষ্মকালে পরিধানোপযোগী আরামপ্রদ পরিচ্ছদ হবে বলেই আমাদের ধারণা।

উপরের ২নং চিত্রে সুদৃশ্য কুঁচিদার ও সরু 'পাইপিং' বা 'পাড়' বসানো সুপ্রশস্ত গোল-গলাওয়ালা বিচিত্র-সৌখিন ছাঁদের যে ব্লাউশের নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটি 'আটপৌরে' পরিচ্ছদ-হিসাবে ব্যবহারের চেয়ে 'পোষাকী' হিসাবেই বিশেষ উপযোগী ও মানানসই হবে। এ ব্লাউশটি যে কোনো হাল্কা-ধরণের নক্সাদার রঙীন-ছিটের সুতী বা রেশমী কাপড়ে বানানো যেতে পারে। গরমের দিনে এই ধরণের উন্মুক্ত-গলা ও হাত-বিহীন সৌখিন সুন্দর ব্লাউশ মহিলাদের পক্ষে সবিশেষ আরামপ্রদ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। অযথা-আড়ম্বরহীন এই ব্লাউশের ছাঁট-কাট সেলাই নিতান্তই সহজ-সরল এবং সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে যে সব সুগৃহিণী অল্প বিস্তর সীবন-শিল্পচর্চ্চা করেন, তাঁদের পক্ষে ঘরে বসেই নিজের হাতে ছাঁট-কাট সেলাই করে এমনি প্যাটার্ণের ব্লাউশ বানানো খুব একটা দুঃসাধ্য-কঠিন ব্যাপার নয়। রচনা-পদ্ধতি নিতান্তই সহজ-সরল হলেও, এ ধরণের ব্লাউশ কিন্তু মহিলাদের চারু-অঙ্গে অপরূপ সৌখিন-সুন্দর ও খুবই মানানসই দেখায়। মোটকথা, এ ধরণের বিচিত্র ব্লাউশটির পরম বৈশিষ্ট্যই হলো—এর একান্ত সহজ-সরল-সুন্দর ছাঁদ বা 'প্যাটার্ণ'। ছাঁদ বা 'প্যাটার্ণ'টি সহজ-সরল হলেও, ব্লাউশটি আগাগোড়াই অপরূপ আভিজাত্য-মণ্ডিত। এই কারণেই এমনি ছাঁদের ব্লাউশ 'আটপৌরে' হিসাবে সচরাচর গৃহে ব্যবহারের চেয়ে বিশেষ সময়ে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে 'পোষাকী' হিসাবে সৌখিন-মহিলাদের ব্যবহারোপযোগী হবে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বারান্তরে, এই ধরণের আরো কয়েকটি অভিনব-বিচিত্র নতুন-নতুন প্যাটার্ণের ব্লাউশ রচনার হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

—

সুধীরা হালদার

রন্ধন-কলায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে বাঙলাদেশের বিশিষ্ট একটি স্থান আছে—বিশেষভাবে মিষ্টান্ন, মৎস্যাদি আমিষ-খাদ্য এবং বিবিধ নিরামিষ-ভোজ্য রান্নার ব্যাপারে। বাংলাদেশের অভিনব ছানার সন্দেশ, রসগোল্লা, মালপোয়া প্রভৃতি মিষ্টান্নের অপরূপ সুস্বাদে ভারতের সকল প্রদেশের অধিবাসীরাই পরম পরিতৃপ্ত··· প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাই আজ বাঙলাদেশেরই বিচিত্র-মুখরোচক বিশেষ এক-ধরণের মিষ্টান্ন রান্নার কথা বলছি। এ খাবারটির নাম—'কুমড়োর মালপোয়া'। মিষ্টান্ন-জাতীয় উপকরণ-হিসাবে হলেও, এ খাবারটি রান্নার জন্য অবশ্য ছানা ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই···আধসের কুমড়ো, একপোয়া চিনি, একমুঠো ময়দা বা আটা, আন্দাজ মতো পরিমাণে খানিকটা ঘি এবং গোটা পাচ-ছয় ছোট এলাচ জোগাড় করতে পারলেই অভিনব-সুস্বাদু এই বিচিত্র মিষ্টান্ন বানানো চলবে।

উপরের ফর্দ্দমতো উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, প্রথমেই কুমড়োর ফালিটিকে দু'টুকরো করে পরিপাটিভাবে খোসা ছাড়িয়ে নিন। তারপর উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে. সেই পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে জল ভরে খোসা-ছাড়ানো কুমড়োর টুকরোগুলিকে আগাগোড়া সু-সিদ্ধ করে ফেলুন। কুমড়োর টুকরোগুলি ভালভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবার পর, উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে নেবেন এবং কুমড়োর টুকরোগুলিকে আগাগোড়া জল ঝরিয়ে অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে তুলে রাখুন।

এবারে পুনরায় উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সেই পাত্রে চিনির রস পাক করুন। চিনির রস পাক হয়ে যাবার পর, ভিন্ন-পাত্রে তুলে-রাখা সু-সিদ্ধ কুমড়োর টুকরোগুলিকে বেশ মিহি-ভাবে চটকে মেখে 'মণ্ড' বানিয়ে ফেলুন এবং সেই 'মণ্ডের' সঙ্গে আন্দাজমতো পরিমাণ ময়দা বা আটা এবং ছোট এলাচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিন।

এ কাজ সারা হলে, রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে ঘি দিয়ে, সেটিকে পুনরায় উনানের আঁচে বসিয়ে গরম ও গলিত করে নিন। ঘিটুকু গলে গরম এবং ফুটন্ত হলেই, ময়দা ও ছোট এলাচের গুঁড়ো-মেশানো কুমড়োর মণ্ডটি থেকে মালপোয়ার আকারে বিভিন্ন টুকরো বানিয়ে, হাতা বা খুন্তীর সাহায্যে গরম-গলিত ঘিয়ে সেগুলিকে ভালো-ভাবে ভেজে নিন। ফুটন্ত-ঘিয়ে ভাজার ফলে, মালপোয়ার আকারের টুকরোগুলির আগাগোড়া বেশ বাদামী-রঙের হলেই, হাতা বা খুন্তীর সাহায্যে সেগুলিকে সযত্নে রন্ধন-পাত্র থেকে তুলে সদ্য-পাক-করে-রাখা চিনির রসের পাত্রে ডুবিয়ে রাখুন। অন্ততঃপক্ষে, আধঘণ্টাকাল চিনির রসে ডুবিয়ে রাখার ফলে, কুমড়োর মালপোয়ার টুকরোগুলি আগাগোড়া বেশ টুপ্‌টুপে হয়ে উঠলে, সাদরে প্রিয়জনদের পাতে পরিবেশন করুন। আপনার হাতে-রান্না করা অভিনব মুখরোচক 'কুমড়োর মালপোয়া' মিষ্টান্নটির সুস্বাদে তাঁরা যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন, সে কথা বলাই বাহুল্য!

বাঙলাদেশের বিচিত্র-উপাদেয় 'কুমড়োর মালপোয়া' রান্নার এই হলো মোটামুটি প্রণালী।

পরের সংখ্যায় এমনি ধরণের আরো একটি অভিনব-মুখরোচক ভারতীয় খাদ্য-রন্ধন-প্রণালীর কথা আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

—

বর্তমান পরিস্থিতি—

ভারতবর্ষ তথা পশ্চিম বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির কথা চিন্তা করিলে যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। গত তিন মাস কাল পূর্ব পাকিস্তানবাসী সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দুগণ সেখানকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় অর্থাৎ মুসলমানগণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া হাজারে হাজারে নয়, লক্ষে লক্ষে ভারতরাষ্ট্রের আসাম, বিহার, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের উপর কিরূপ অকথ্য অত্যাচার করা হইয়াছে, তাহা লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা যায় না—কত হিন্দু রমণী যে ধর্ষিতা হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। পূর্ব-পাকিস্তানবাসী প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা কলিকাতায় পিতাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছে—মুসলমানরা আমাকে ও আমার মাতাকে নিকা করিয়াছে। কি অবস্থায় একজন রমণী এই কথা জানাইতে বাধ্য হয়, তাহা অবর্ণনীয়। সীমান্ত পথ দিয়া পাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসার সময় শুধু হিন্দুদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করা হয় নাই, তাহাদের সকলকে—স্ত্রী-পুরুষ যুবা বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে—অর্থহীন ও উলঙ্গ করিয়া ভারতবর্ষে পাঠানো হইতেছে। ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ সকলের একই অবস্থা! রংপুর হইতে খবর আসিয়াছে, তথায় প্রকাশ্যভাবে হাট বসাইয়া হিন্দু রমণীদিগকে বিক্রয় করা হইতেছে—অবস্থানুসারে এক হাজার টাকায় একজন হিন্দু যুবতী বিক্রীত হইয়াছে। কত বাড়ী যে পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কত ধন সম্পত্তি যে নষ্ট করা হইয়াছে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই।

এইরূপ অবস্থায় গত তিন মাস কাল প্রত্যহ প্রায় কয়েক সহস্র করিয়া বিপন্ন, ভীতিগ্রস্ত, লুণ্ঠিত ও ধর্মান্তরিত নরনারী পূর্ব-পাকিস্তান হইতে পশ্চিম বাংলায় আগমন করায় পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ১৭ বৎসর পূর্বে বঙ্গবিভাগ হইয়াছে—পূর্বপাকিস্তান মুসলমানশাসিত রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। এই ১৭ বৎসর ধরিয়া কয়েক কোটি হিন্দু অধিবাসী পূর্ব বাংলায় তাহাদের পিতৃভূমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। এত অধিক লোকের—প্রায় কয়েক কোটি অধিবাসীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সহজ কথা নহে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচুর অর্থসাহায্য সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তু সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে সমর্থ হয় নাই। এখনও হাজার হাজার উদ্বাস্তু—১৫।১৬ বৎসর পূর্বে পাকিস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা সত্ত্বেও—যে ভাবে দুর্দশার মধ্যে বসবাস ও দিনযাপন করে, তাহা দেখিলে হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রই বিচলিত হইয়া থাকেন। এই পুনর্বাসন ব্যবস্থার ত্রুটি অনেক, সে ত্রুটির কারণ অনুসন্ধান করিয়া লাভ নাই। যে সকল ব্যক্তি, সংঘ বা প্রতিষ্ঠান এই সকল অব্যবস্থার জন্য দায়ী, তাহারা আমাদেরই দেশবাসী—ভাগ্য দোষে বা কর্মফলে তাহাদের দ্বারা কার্য্য সুসম্পাদিত না হইয়া বিপরীত ফল দান করিয়াছে। সেই পুরাতন উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হওয়ার পূর্বেই—আমাদের এই নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। গত ৩ মাস কাল প্রতি দিন কিছু-সংখ্যক করিয়া উদ্বাস্তু আগমনের ফলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের শরণাপন্ন হয় ও উভয়ে মিলিত ভাবে বহু সহস্র উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করিতে বাধ্য হয়—সে সকল উদ্বাস্তুকে একটি কেন্দ্রে কয়েকদিনের জন্য রাখিয়া ক্রমে ক্রমে দণ্ডকারণ্য প্রদেশে ধীরে ধীরে পাঠাইয়া পুনর্বাসন দান করার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় দণ্ডকারণ্যে স্থান খুবই কম—সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উড়িষ্যা, বিহার, মধ্য ভারত, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানের রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন—যেন প্রতি রাজ্যতেই এই সকল উদ্বাস্তুর কয়েক হাজার করিয়া পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়। এই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে ভারতবর্ষকে বহু কোটি টাকা ব্যয় করিতে

হইবে। একদল চিন্তাশীল দেশনেতা পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে লোক বিনিময়ের প্রস্তাব করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার লোকবিনিময় ব্যবস্থা সম্ভব ও সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। গত ৩ মাস ধরিয়া পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলার ফলে ভারতের নানাস্থানে কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাও দেখা দিয়াছে। তবে অত্যাচারের তুলনায় সে হাঙ্গামা উল্লেখযোগ্য নহে।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ও তৎকালীন দেশবিভাগের সময় ভারতরাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ বলিয়া ঘোষণা করার ফলে কয়েক কোটি মুসলমান অধিবাসী ভারতে বাস করাই স্থির করিয়াছিল। এখন দেখা যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে এক দলের মন হইতে পাকিস্তানপ্রীতি চলিয়া যায় নাই। তাহারা ভারতে বাস করিয়াও পাকিস্তানের গুপ্তচরের কাজ করে এবং ভারতের মুসলমান-প্রধান স্থানগুলিকে ভবিষ্যতে পাকিস্তান বলিয়া ঘোষণা করার ইচ্ছায় সে বিষয়ে কার্য্য করিয়া থাকে। বর্তমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মূলে ঐ সকল মুসলমান অধিবাসীর কার্যকলাপ কতকটা কাজ করিতেছে বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ইতি-মধ্যে পুব পাকিস্তানের বহু মুসলমান অধিবাসী গোপনে — বিনা পাসপোর্ট ও ভিসায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ত্রিপুরা ও আসামে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। আসাম রাজ্যে হিসাব করিয়া দেখা যাইতেছে, তথায় কয়েক লক্ষ পাকিস্তানী মুসলমান প্রবেশ করিয়াছে ও তাহারা আসামকে পাকিস্তান করিয়া ঘোষণা করার চেষ্টা করিতেছে সে জন্য আসাম সরকার ঐরূপ অন্যায়ভাবে প্রবেশকারী মুসলমানদিগকে আসাম হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

ভারতের অভ্যন্তরের অবস্থাও ভাল নহে। এক দল চীন-প্রেমিক কম্যুনিষ্ট ভারতরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার বিরূপ সমালোচনা করিয়া ভারতের একদল বিপথগামী অধি-বাসীকে বিভ্রান্ত করিতেছে। তাহার ফলে বহু কল-কারখানার শ্রমিক অযথা অন্যায় দাবী করিয়া কল-কারখানায় গণ্ডগোল সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। সে হাঙ্গামা থামাইবার জন্য ভারত রাষ্ট্রকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী টি, টি, কৃষ্ণমাচারী ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেট পেশ করিতে লোকসভায় যাইতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুকেও দেখা যাইতেছে।

ভারতরাষ্ট্র সকল রাজনীতিক দলকে সমান অধিকারদানের চেষ্টার ফলে ঐ সকল দেশদ্রোহী নেতারা ভারতের মধ্যে থাকিয়া নানাভাবে ভারতের ক্ষতি করিয়া থাকে। তাহাদের অবিলম্বে কঠোর হস্তে দমন করা প্রয়োজন।

কাশ্মীর সমস্যা আজও সুমীমাংসিত হয় নাই। কাশ্মীর মুসলমানপ্রধান রাজ্য হইলেও তাহার অধিকাংশ অধিবাসী ভারতের মধ্যে থাকিবার ইচ্ছা বহুবার বহু প্রকারে প্রকাশ করায় কাশ্মীর এখন ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাজ্যে পরিণত করা হইয়াছে। কিন্তু কাশ্মীরের পার্শ্ববর্তী পশ্চিম পাকিস্তানবাসী একদল গুপ্তচর প্রায়ই কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া কাশ্মীরে গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা করিয়া থাকে। ভারতবিরোধী বৃটিশ ও মার্কিণ রাজনীতিকেরা

কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার করিয়া কাশ্মীরের লোককে বিক্ষুব্ধ করিবার চেষ্টা করে। সে জন্য বিদেশীদের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া আজও পাকিস্তান সরকার ভারত অধিকৃত কাশ্মীর পাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে চীৎকার করে ও গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধানেও ভারত-রাষ্ট্রকে কঠোরতার সহিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বাধীন হইবার পর ভারত তাহার জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অধিক মনোযোগ দেওয়ায় সে তাহার সামরিক শক্তি-বৃদ্ধির জন্য অধিক চেষ্টা করে নাই—সে জন্য দেড় বৎসর পূর্বে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের পর হইতে ভারতকে সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে অধিক যত্নবান হইতে হইয়াছে। বর্তমানে বিদেশ হইতে সমর-উপকরণ আমদানী করিয়া, সমর সরঞ্জাম নির্মাণের কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ও কারখানাগুলিতে অধিক শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া, সৈন্য-বাহিনীতে বহু সংখ্যায় নূতন লোক গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বহুগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে। বর্তমানে ভারতের সর্বত্র বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ আয়োজনও আরম্ভ হইয়াছে। সব দিক দিয়া ভারত এখন তাহাকে বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। সেদিন প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ঘোষণা করিয়াছেন যে পাকিস্তান বারবার সকল চুক্তির মর্য্যাদা ভঙ্গ করিয়া ভারতরাজ্যে অন্যায়ভাবে প্রবেশ করিয়া থাকে-এখন ভারতীয় সৈন্যরা প্রয়োজন বোধ করিলেই পাকিস্তানের সীমা পার হইয়া পাকিস্তানে প্রবেশ করিবে ও প্রয়োজন মত পাকিস্তান সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিবে। শ্রীনেহরুর এই উক্তি প্রকাশিত হওয়ার পর শুধু পাকিস্তান সরকার ভীত হয় নাই, ইংলণ্ড ও আমেরিকার যে সকল রাজনীতিক এতদিন পাকিস্তানকে অন্যায়ভাবে সমর্থন করিতেছিল, তাহাদের মুখেও ভীতির কথা উচ্চারিত হইয়াছে। বর্তমান ভারতের নেতা শ্রীনেহরু যুদ্ধপ্রিয় ব্যক্তি নহেন—তিনি এত দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ না করিয়া শান্তিরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে আর তাঁহার পক্ষে শান্তি রক্ষা করিয়া থাকা সম্ভব হইতেছে না। আজ যুদ্ধ বাধিলে ভারত গত ১৭ বৎসর ধরিয়া যে সকল উন্নতিমূলক কার্য্য করিয়াছে, সেগুলির অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইবে। ভারতের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার কথা চিন্তা করাও তখন কঠিন হইয়া পড়িবে। এই কারণেই শ্রীনেহরু যুদ্ধ চাহেন না। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে যুদ্ধ প্রায় অনিবার্য্য। অন্ততঃ পাকিস্তান আক্রমণের পথে বাধা দিয়া পাকিস্তানকে পুনরাক্রমণ না করিলে ভারতবাসী শান্তিতে ভারতে বসবাস করিতে পারিবে না। এখন দেশবাসী সকলকে সকল প্রকার দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। আজ সকল ভারতবাসীর শ্রীনেহরুর কথা ধীরভাবে চিন্তা করিয়া কর্তব্য নির্ণয়ের দিন সম্মুখীন হইয়াছে।

সম্প্রতি নাগাল্যাণ্ডে সফরকালে ভারতীয় স্থল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল জে, এন, চৌধুরীকে সর্বত্র বিশেষরূপে সম্বর্দ্ধনা জানান হয়।

ছাত্র বিক্ষোভ—

কয়মাস পূর্বে একটি ছাত্র দক্ষিণ কলিকাতা গড়িয়ায় তাহার কলেজের প্রাঙ্গণে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়—সে সময়ে সহরের নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছিল এবং কর্তৃপক্ষ হাঙ্গামা দমনের জন্য পুলিসকে কঠোরভাবে কর্তব্য সম্পাদনের আদেশ দিয়াছিলেন। দুঃখের কথা, স্বাধীনতা লাভের ১৭ বৎসর পরে আমাদের দেশের একদল পুলিশ ইংরাজ শাসনের সময়ের মনোভাব

ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহারা নিজদিগকে দেশের জনগণের সেবক মনে না করিয়া দণ্ডমুণ্ডের কর্ত বলিয়া মনে করে। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আজও পুলিস সাধারণ মানুষের বিপদের সময় তাহাদের সাহায্য করিতে প্রায়ই অগ্রসর ত হয় না, বরং অযথা মানুষকে হায়রাণ করিয়া থাকে। সেজন্য সাধারণ লোক খুব বেশী বিপদে না পড়িলে পুলিসের সাহায্যপ্রার্থী হয় না। গত ৩ মাস ব্যাপী সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় দেখা গিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের পুলিস শান্তিরক্ষার অজুহাতে বহু নিরপরাধ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া অযথা তাহাদের কষ্ট দিয়াছে। ইহা লইয়া নানাস্থানে একদল নেতা যে গণ্ডগোল করিয়াছেন, সে কথা সর্বজনবিদিত। ঐ সকল নেতার অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও আংশিক সত্য। এত অধিকসংখ্যক পুলিস কর্মচারী থাক সত্ত্বেও পুলিস বিভাগ অভিযোগ করেন, তাহাদের কর্মীর সংখ্যা পর্যাপ্ত নহে। অথচ এ বিষয়ে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, কর্মীর দলের সকলে ভাল করিয়া কর্তব্য পালন করেন না। সে যাহা হউক, ছাত্র ভূদেব সেনের মৃত্যু লইয়া গত কয় মাস ধরিয়া কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সম্প্রদায় যেভাবে সর্বত্র গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও সমর্থন করা যায় না। প্রথম হইতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ভূদেব সেনের হত্যাকারীর সম্বন্ধে সরাসরি পুলিসী তদন্ত করার কথা বলেন এবং ছাত্র সম্প্রদায় ও অধ্যাপকবৃন্দ এ বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী করেন। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বিধান সভায় এক সুদীর্ঘ বিবৃতি পাঠ করিয়া এ বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের অসুবিধার কথা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। অপরাধীর শাস্তি হউক, এ বিষয়ে সকলে একমত হইলেও ছাত্রগণের দাবী প্রথমাবধি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নাকচ করায় গণ্ডগোল দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং জনমত মুখ্যমন্ত্রীর কার্য্য সমর্থন করে নাই। অপরপক্ষে ছাত্রগণ হরতাল ও ধর্মঘট করায় তাহার সুযোগ লইয়া কলিকাতার একদল দুর্বৃত্ত বহু স্কুল কলেজের আসবাবপত্র ধ্বংস করিয়া যে তাণ্ডব-লীলার সুযোগ লইয়াছে, তাহাও দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সমর্থন করিতে পারেন নাই। একদিকে পাকিস্তান ও চীন ভারতের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতেছে, পাকিস্তানী গুপ্তচরের দল সে জন্য ভারতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেশের সর্বত্র গোলমাল পাকাইয়া তাহা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলিয়া ঘোষণার চেষ্টা করিতেছে ও সেই সঙ্গে চীন-পন্থী কমিউনিষ্টরা ঐ দলে যোগদান করিয়া দুষ্কৃতকারীদের কার্য্যে সাহায্য দান করিতেছে, অন্যদিকে যদি এ সময়ে ছাত্রগণের আন্দোলনের ফলে দেশের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধির সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এ দুর্দিনে দেশকে রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িবে। ভারত আজ সত্যই বিপন্ন—কারণ ভারতকে হয়ত শীঘ্রই চীন ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইবে, এ সময়ে যদি ছাত্রগণ আবার নূতন করিয়া হাঙ্গামা সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে ভারতের পক্ষে আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করিয়া বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধ করা কি করিয়া সম্ভব হইবে—সে বিষয়ে সকলের ধীরভাবে চিন্তা করা কর্তব্য। দেশের এই দুর্দিনে আমরা সকলকে শান্তিরক্ষা করিবার আহ্বান জানাই এবং ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইলে আমাদের সে বিষয়ে যে প্রস্তুতি প্রয়োজন, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে নিবেদন জানাই।

বাঙ্গালীর গৌরব—

দুইজন প্রাক্তন রাজ্যপাল ও খ্যাতিমান ভারত-সেবক শ্রীআর-আর-দিবাকর ও শ্রীকে-এম-মুন্সী বোম্বায়ে ভারতীয় বিদ্যাভবন নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া দেশের সর্বত্র ভবন গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয় খুলিতেছেন। সেই প্রতিষ্ঠান হইতে বঙ্গ-গৌরব আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনী প্রকাশিত হইল—রচনা করিয়াছেন ভারতবর্ষের লেখক, বাঙ্গলার খ্যাতিমান বৈজ্ঞানিক শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত। ইংরাজিতে লেখা গ্রন্থের দাম আড়াই টাকা। জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। আমরা প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থকার উভয়কে অভিনন্দিত করি। বিদ্যাভবন কর্তৃপক্ষ আচার্য্য বসু মহাশয়ের জীবনী প্রকাশ করিয়া বড় কাজ করেন নাই, তাহা একজন বাঙ্গালী লেখকের লেখনী প্রসূত হওয়ায় বাংলা ও বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ভারতের অতিথি

সোভিয়েট পার্লামেণ্টারী ডেলিগেশন্ দল গত মাসে ভারত সফরে আসিয়াছিলেন। লোক সভায় স্পীকার সর্দ্দার হুকুম সিং-এর সহিত তাঁহাদের দেখা যাইতেছে।

জার্ম্মান ডেমোক্রেটিক্ রিপাবলিক্ এর উপ-প্রধান মন্ত্রী হের ব্রুনো লিউস্নার ভারত সফরে আসিয়াছিলেন। এখানে তাঁহাকে (সর্ব্ব বামে) এবং তাঁহার দলকে সর্দ্দার হুকুম সিং-এর সহিত দেখা যাইতেছে।

ফিলিপাইনসে্ এর পরলোকগত প্রেসিডেন্ট ম্যাগ্‌-সেইসে-র পত্নী তাঁহার ভারত সফরকালে বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্য নির্মিত আগ্রায় ম্যাগ্‌সেইসে হাসপাতাল করেন। চিত্রে শ্রীমতী ম্যাগ্‌সেইসেকে একটি শিশু রোগীকে আদর করেতে দেখা যাইতেছে।

মেদিনীপুর রামগড়ে মহাসম্মিলন—

গত ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী শনি ও রবিবার মেদিনী-পুর জেলার চন্দ্রকোণা রোড রেল ষ্টেশন হইতে অদূরে রামগড় নামক স্থানে স্থানীয় জমিদার রাজা শ্রীরণজিৎকিশোর সিংহ সাহসরায়ের আহ্বানে তাঁহার বিরাট রাজভবনে বঙ্গীয় কবি পরিষদের প্রথম বার্ষিক মহাসম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্মিলনের মূল সভাপতি ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার অভিভাষণে তাঁহার দেখা কয়েকজন সাহিত্যসেবীর আদর্শ ও জীবন কথা বিবৃত করিয়া তাঁহার সাহিত্য সেবার বিবরণ দান করেন। জালালাবাদ মহাকাব্যের লেখক কবি শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্যকে কবি পরিষদের পক্ষে এক অভিনন্দন দান করিয়া সম্মানিত করা হয়। প্রথম দিনে এই দুই অনুষ্ঠানের পর বৈষ্ণব পণ্ডিত মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এক ভাষণে সাহিত্যের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিলে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কবিকঙ্কণ শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন। দ্বিতীয় দিন রবিবার সকালে নাট্য সাহিত্য শাখায় শ্রীমন্মথ রায় সভাপতিত্ব করেন এবং অধ্যাপক সাধন ভট্টাচার্য্য নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধে ভাষণ দেন। রবিবার সন্ধ্যায় কবি শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে কাব্য শাখার অধি-বেশনে বহু কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। তথায় শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার, শ্রীসুধীর বাগচী, শ্রীমতী যূথিকা দাস শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায়, শ্রীশিব নারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রধান অতিথি সুপণ্ডিত শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ সভায় পঠিত হইয়াছিল। সম্মিলনে মেদিনীপুর ও অন্যান্য জেলার বহু কবি সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। রাণী শ্রীমতীপুষ্পলতা সাহসরায় সাহিত্য সরস্বতী তাঁহার গৃহে সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন ও ঐ অঞ্চলের প্রায় ২ হাজার লোক ২দিন সম্মিলনে যোগদান করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

বিশিষ্ট পণ্ডিতের তিরোধান—

একে একে নিভিছে দেউটি, সমগ্র ভারতের পণ্ডিত সমাজে ন্যায়শাস্ত্রের জন্য বাংলা দেশের বিশিষ্ট খ্যাতি ছিল। আজ তাহা নির্বাপিত প্রায় হইতে চলিল। বাংলার তথা ভারতের নৈয়ায়িককুলচূড়ামণি অসংখ্য
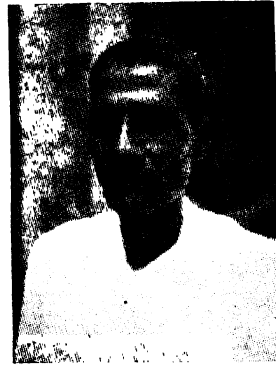
পণ্ডিত যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ

তর্কতীর্থ দর্শনাদিতীর্থের গুরু যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ মহাশয় ২৪শে পৌষ বৃহস্পতিবার রাত্রে পুত্র কন্যা স্বজনের

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীএম, সি, চাগলা নয়া দিল্লীতে জাতীয় কলা প্রদর্শনী উদ্বোধন কালে একটি চিত্রের অঙ্কনরীতি দেখিতেছেন।

সামনে ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে পরলোক গমন করেন। ফরিদপুর জিলার তুলারডাঙ্গীগ্রামের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় উমাকান্ত ন্যায়রত্নের ঔরসে ও গঙ্গামণি দেবীর গর্ভে ১২৮৮ সালে ভাদ্রমাসে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পরিস্ফুট হয়। কোটালীপাড়ার বিশিষ্ট নৈয়ায়িক আশুতোষ তর্করত্নের চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্রের প্রাথমিক পাঠ শেষ করিয়া মূলাজোড় কলেজে পণ্ডিত-কুলপতি শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। তাঁহার নিকট হইতেই নব্য-ন্যায়ের সরকারী উপাধি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়া স্বর্ণপদকাদি লাভ করেন। ইঁহার প্রতিভা, বিনয় ও নিষ্ঠার জন্য সার্ব্বভৌম মহাশয়ের প্রিয়তম ছাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেন। মূলাজোড়ের অধ্যয়ন সমাপ্তির পর অধ্যাপনাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হয়। তাঁহার বহু ছাত্র বর্ত্তমানে বিভিন্ন প্রদেশে যশস্বী অধ্যাপক রূপে খ্যাত হইয়াছেন। ব্রজশাস্ত্রী মহাশয়ের অনুরোধে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীতে আচার্য্য রূপে দীর্ঘদিন কাজ করিয়া পরে নবদ্বীপ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ও সর্ব্বশেষে হালিসহরে নিগমানন্দ সারস্বত আশ্রমেও ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে সংস্কৃত কলেজে যে পণ্ডিত সম্মেলন হয় তাহাতে তাঁহাকে তর্ক-চূড়ামণি উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সরকার তাঁহার আজীবন বার্দ্ধক্য ভাতা ১০০৲ করিয়া দিয়া আসিতে-ছিলেন। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আগ্রহে সংস্কৃত কলেজের গবেষণা গ্রন্থমালার একটী কঠিন ন্যায়গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষার পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্ত্তা ছিলেন। বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ও সংস্কৃত কলেজ গভর্ণিং বডীর সদস্য শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার তথা ভারতের নব্যন্যায়জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। পণ্ডিতসমাজ এই সদালাপী নিরভিমান নৈয়ায়িকের কথা কোন দিনই ভুলিবেন না।

ফণীন্দ্রনাথ জন্মোৎসব—

গত ৮ই মার্চ রবিবার সকালে ২৪ পরগণা জেলার পানিহাটি-সোদপুরে বি-টি রোডস্থ মীনা সিনেমা হলে পানিহাটি পৌরাঞ্চলের অধিবাসীদের উদ্যোগে এক সভায় স্থানীয় সমাজসেবী কর্মী শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬৭ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। সভায় প্রায় ২ শত লোক উপস্থিত হন। পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সভার উদ্বোধন করেন, প্রবীণ অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভায়

পতির আসন গ্রহণ করেন ও কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত হন। বিশিষ্ট কোবিদ শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সোদপুরের অধ্যক্ষ শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য, পানিহাটির শিক্ষাব্রতী শ্রীইন্দুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুখচরের সমাজসেবী শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রভৃতি ভাষণ দেন ও পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী উৎসবের মঙ্গলাচরণ করেন। উৎসব সমিতির সম্পাদক শ্রীঅমিয়কুমার সেন ফণীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন পত্র দান করেন ও উৎসব কমিটির কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন এবং কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান শ্রীশিশিরকুমার মিত্র সভার শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। স্থানীয় বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ফণীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন পত্র ও নানাবিধ উপহার প্রদান করা হয়। নিকটস্থ সকল গ্রামের অধিবাসীরা দলে দলে উৎসবে যোগদান করিয়া ফণীন্দ্রনাথের আজীবন সমাজসেবা ও জনকল্যাণকর কার্য্যের স্বীকৃতি দান ও প্রশংসা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীকুমারবাবু এক সুদীর্ঘ ভাবব্যঞ্জক ভাষণে ফণীন্দ্রনাথের সাহিত্য সেবা, রাজনীতি আলোচনা ও মানব সেবার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। উৎসব উপলক্ষে লিখিত ফণীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্বলিত এক পুস্তিকা সভাস্থলে বিতরিত হইয়াছিল।

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস শতবার্ষিক—

গত ১লা মার্চ রবিবার নদীয়া জেলার মাজদিয়া রেল ষ্টেশন হইতে কয়েক মাইল দূরে কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত নাথপুর গ্রামে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের পৈতৃক বাটিতে একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার সহিত বিশ্বাস মহাশয়ের জন্ম শতবার্ষিক উৎসব পালন করা হইয়াছে। সকালে রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জেলা স্কুল পরিদর্শক শ্রীঅমর চক্রবর্ত্তী নাথপুরে যাইয়া স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করেন—স্তম্ভগাত্রে মর্মর প্রস্তরে লেখা হইয়াছে যে ঐ স্থানে কর্ণেল বিশ্বাসের পিতৃগৃহ ছিল। সুরেশচন্দ্র যৌবনে ব্রেজিলে যাইয়া সেখানকার সৈন্য দলে যোগদান করেন ও সেখানেই দেহত্যাগ করেন তাঁহার জন্মের শতাধিক বর্ষ পরে তাঁহার দেশবাসী স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণের উদ্যোগে তাঁহার জীবন কথা প্রচারিত হওয়া সত্যই দেশের পক্ষে গৌরবের বিষয়। ১লা মার্চ বিকালে নাথপুরে ঐ সম্পর্কে এক জন সভা হয়। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভায় সভাপতি হন ও কবিকঙ্কণ শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছাড়াও স্থানীয় চন্দননগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীজ্যোৎস্নাময় মজুমদার, বাণপুরের কবি শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায়, মাটিয়ারী বানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুলেখক শ্রীশিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, স্থানীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীঅজিত কুমার বসু, স্থানীয় উন্নয়ন অফিসার শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বণিক, ভাজন ঘাটের শিক্ষক শ্রীঅমল চট্টোপাধ্যায় নাভপুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীবলাই কৃষ্ণ বিশ্বাস প্রভৃতি সুরেশচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছিলেন। ঐ উপলক্ষে সুরেশচন্দ্রের জীবন ও কার্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা লইয়া স্মরণিকা নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। সুরেশচন্দ্রের কোন জীবন কথা পাওয়া যায় না—উৎসবের উদ্যোক্তাদের এ বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করিতে আমরা অনুরোধ জানাই।

পথ চলতে

বেলা দে

যাই হোক শেষ পর্য্যন্ত গিন্নি তো বাড়ী ফিরলেন কোন রকমে হাত-পা কেটে ছিড়ে একাকার করে। অথচ হাজারবার বলেছিলাম ট্যাক্সিতে করে চলো, তা হলোনা। সখ কত! দোতলা বাসে করে হাওয়া খেতে খেতে যাব! নাও, এখন হাওয়া খাও! অবশ্য আর একটু বেকায়দায় পড়লে হাওয়ার বদলে উনি খাবি খেতেন। সে কত কথা—আজকাল সবাই তো ট্রামে বাসে যাওয়া আসা করছে, আমি কি হাত গুণতে জানি যে আগে থেকে বুঝতে পারব আমের খোসায় পড়ে পা পিছলে যাবে? বলবো কি, মাসে বাতেরই ওষুধ কিনছি প্রায় কুড়ি টাকার, কাজেই এখন আমের খোসার দোষ দিলে কি হবে? এদিকে বয়েসটা যে দিন দিন বাড়ছে এটা কোনো সময় বুঝতে চাইলেন না। আর আমিই বা কি করে বুঝবো বলুন? এখনো লাল ডুরে শাড়ী পরছেন, মাসে স্নো পাউডার, সাবান কিনছেন তিরিশ চল্লিশ টাকার, লাল, নীল রুডিস ছাড়া পরেন না। আমি তো মাঝে মাঝে পদ্মার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি।

যাক্ গে এসব কথা—এখন শুনুন আমার বিপদটা। গিন্নির বেলফুলের মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে নিজে তো চোখে ধুতরো ফুল দেখলেন আর আমাকেও রাস্তার মাঝখানে মাথা হেঁট করালেন। উনি তো পা পিছলে পড়ে খালাস। সে কি কাণ্ড! রাস্তার একদল লোক হো হো করে হেসে উঠলো! একদল লোক আহা উহু করে ছুটে এসে আমাকে ডিঙ্গিয়ে হাত-পা ধরে তুলতেই ব্যস্ত! কেউ বলে হাঁসপাতালে চালান কর, কেউ বলে সামনের ডাক্তারখানায় নিয়ে চলুন। আর একদল চললো বাসের ড্রাইভারকে মারপিট করতে, আর আমি বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলুম আর পুলিশের জেরার জবাবদিহি করতে লাগলুম। প্রায় আধঘণ্টা পরে হুকুম পেলাম আপনার স্ত্রীকে বাড়ী নিয়ে যেতে পারেন। নিজের পা দু'টো তো খোঁতো করলেনই, মাঝখান থেকে পুজোর কেনা চল্লিশ টাকা দামের শাড়ীটা দু'টুকরো করলেন। বাস থেকে নামবার সময় বললুম হাতটা ধরে নামো—ওঁর লজ্জা করলো—এদিকে রাস্তায় যখন উবুর হয়ে পড়লেন তখন রাস্তার লোকেরা শেষে হাত পা টানাটানি করলো তাও আমায় দাঁড়িয়ে দেখতে হল! আর তা ছাড়া আমি যে গিন্নির হাত ধরে তুলবো সে সুযোগই বা পেলুম কোথায়? রাস্তার ছোকরার দল ছোঁ মেরে ওঁকে তুলে নিলে যেন ভাগাড়ে মরা পড়েছে।

বলব কি গিন্নিকে নিয়ে পথে বেরুলেই একটা-না-একটা বিপদ লেগেই আছে। এই সেদিন ছোট ভাইকে গেলেন হঠাৎ আদিখ্যেতা করে দেখতে! সেও কি কম দুর্ভোগ হল? শিয়ালদা ষ্টেশনে গেছি, উনি ছোট ভাইয়ের সংসার দেখতে যাবেন বায়না ধরেছেন—প্ল্যাটফর্মে গাড়ী দাঁড়িয়ে। হঠাৎ জানলার ধারে ওঁর ভাইয়ের পুরনো ঝি মোক্ষদাকে দেখতে পেয়ে একেবারে হাম্‌লে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে উঠে গিয়ে বসলেন—ওদিকে গার্ডসাহেবের বাঁশীও বেজে উঠলো, গাড়ীও ছুটলো। চলন্ত ট্রেনে আমিও উঠতে বাধ্য হোলাম। কি গাড়ী, কোথায় যাবে, কিছুই আমায় জিজ্ঞেস করতে দিলেন না। আমিও গুড়ের নাগরীর মত একজনের একটা ভুষির বস্তার ওপর কোন রকমে জায়গা করে বসে পড়লাম। চলেছি তো চলেছি হঠাৎ খেয়াল হলো গাড়ী অন্য লাইনে দৌড়াচ্ছে—ততক্ষণে প্রায় পনেরো মাইল চলে এসেছি। একটা ষ্টেশনে শুনলাম তিন মিনিট দাঁড়াবে—হন্তদন্ত হয়ে নেমে পড়ে মেয়েদের গাড়ীতে খোঁজ করলাম—দেখি, নিশ্চিন্তে দুজনে বসে খোস-গল্প করছে! তাও শুনলাম সে ঝি নাকি ওঁর ভাইয়ের বাড়ীতে এখন আর কাজ করেন না—দেশে

যাচ্ছেন। উপরন্তু আমি কেন গিন্নির সঙ্গে মাঝখানে দেখা করিনি তার কৈফিয়ৎ চাইতে এলেন গিন্নি। ব্যাপার দেখুন, আমি ট্রেণে জায়গা পেয়েছি ভূষির বস্তার ওপর—দরজায় লোক বাদুড়-ঝোলা হয়ে ঝুলছে—তার উপর কানের গোড়ায় তারস্বরে ফেরিওয়ালাদের চিৎকার! তার মধ্যে রাজনীতির তর্ক নিয়ে ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের মধ্যে হাতাহাতি হবার জোগাড়—এই ফাঁকে গাড়ী কখন লাইন বদলে ডানদিকে চলতে সুরু করেছে সেটা আমি কি করে লক্ষ্য করি বলুন তো?

তারপর ষ্টেশনে তো নেমে পড়লাম দুজনে—সেখানে এসে শুনলুম কলকাতার গাড়ী আসতে এখনো দুটি ঘণ্টা দেরী আছে। সেই রোদ্দুরে বসে চার আনার স্যাঁতানো চানাচুর চিবুলুম। সেই গাড়ী লেট্ করে এলো, কাজেই সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে দেখে সোজা কলকাতার টিকিট কিনে বাড়ী ফিরে এলুম। এরপরও সেদিন আমায় নিয়ে বেরুলেন—হাটবাজার করতে। বললেন—বিশেষ কিছু কিনবো না, পদ্মর একজোড়া আটপৌরে শাড়ী আর হেবোর দুটো হাফপ্যান্ট্। বলবো কি, সেই শাড়ী আর প্যান্ট্ পছন্দ করতে দেড় মাইল ফুটপাত ধরে হাঁটতে হোল, আর মাঝে মাঝে ফুটপাত বদল করতে ওঁকে প্রায় তিনবার বাস আর মটরের চাকার তলা থেকে টেনে বার করতে হয়েছে। এইখানেই শেষ নয়—এক ফাঁকে নিজের রং বেরংয়ের ব্লাউস কিনলেন প্রায় দেড় ডজন, হেবোর সার্ট দুটো, গামছা এক জোড়া, ফুটপাতের বোতাম, টিপ্ কল, এ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র, কাঁচের গেলাস, বাটী, রেকাবী, এ ছাড়া বোদা ল্যাংড়া আম কুড়িটা, কুরুনী, কাটারি দু' চোখে যা দেখছেন তাই কিনছেন। দুটো র‍্যাশান ব্যাগ ভর্ত্তি হয়ে গেল। তখনো ফুটপাতে ওঠাবসার শেষ নেই।

ওদিকে বাজার করার মধ্যেই তেড়ে বৃষ্টি নামলো! ধারে কাছে কোনো গাড়ী বারান্দা নেই। কাক ভেজা ভিজে ঐ লটবহর নিয়ে উঠলুম এক তেলেভাজার দোকানের মধ্যে—সেখানে গিন্নিকে খুসী করতে আট আনার তেলে-ভাজা কিনতে হলো। হাঁটুর ওপর রাস্তার জল ভেঙ্গে দু'টাকার রিক্সা ভাড়া দিয়ে বাড়ী এসে পৌছালাম প্রায় রাত দশটায়। বাড়ী এসে দেখি, অর্দ্ধেক জিনিস দোকানে দোকানে ফেলে এসেছেন। হাফ্প্যান্ট হেবোর ফুলপ্যান্টে দাঁড়িয়েছে। রেডিমেড্ সার্ট প্রায় কনুইতে এসেছে। গামছা দুটোর ম ঝখানটা কাটা। কাঁচের জিনিসপত্র সব ফাটা আর দাগী। সেই রাত্রিতে বৃষ্টিতে ভেজার জন্যে তেড়ে জ্বর—চারদিন বিছানায় শয্যাশায়ী—ওষুধ কিনতে বেশ কিছু টাকা গেল।

তবুও বাইরে বেরুবার সখ্ মেটেনি। ফাঁক পেলেই সামান্য কাজের দোহাই দিয়ে পথে বেরুতে ভোলেন নি।

ভ্রান্তি

মনোজকুমার ঘোষ

এমনি আজন্ম এই বাড়ীটির পরিখা পেরিয়ে
(নিশ্ছিদ্র সুখের সাথে যেহেতু আমার ধ্রুবতারা
ভাবেনি অন্যের চেয়ে স্বৈর্য তার কতোটুকু বেশী;)
যখন-ই আমায় পেলো আমার অচেনা পরদেশী
রিক্ত মনের সুরে তার অনুপম সাড়া দিয়ে
আমার সুখের মাঝে আমি যেন হই দিশাহারা।

সেইটুকু পাই যদি শেষ বিদায়ের ক্ষণে ক্ষণে
নিঃশেষে বিমুগ্ধ প্রাণ হোক পরাজিত লাঞ্ছিত—
এই তো হৃদয় মাঝে বেদনার মধুরিমা সুর হয়ে বাজে
যদিও একান্তভাবে অবশেষে পেয়ে আমি
সিঁদুরের সাঁঝে
ধূসর রাতের বুকে মিশে যাবো অবাধ্য চরণে:
সুখ যদি পুড়ে যায় বেদনার অংশভোগে কেন কুণ্ঠিত?

ভেবোনা আমার চাওয়া আমার পাওয়ার চেয়ে বেশী;
অনিঃসীম শূন্যতাঘেরা এ দিনের সবটুকু দিয়ে
প্রাবৃষায় মাথা পেতে চাইনি প্রেমের বারিধারা:
সুনিপুণ যোদ্ধবেশে করেছি নিজেরে বাণীহারা;
অথচ সুখের রণে হেরে গিয়ে আমি হই খুশী
দিনের আলোর শেষে অন্ধ দিনের স্মৃতি ব'য়ে।

সেই স্মৃতি সুপ্ত থাক এই দুনিয়ার কোনো মনে
বেঁচে থাক কাঁটা হয়ে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে যদি
সুখের সোনার তরী ভেসে যায়
অনন্ত ইচ্ছার অস্তিত্বে:
হৃদয়-দীধিতি-দীপ্র মধুর সাগর-সঙ্গমে—
আমায় এ ভালোবাসা শেষ হয় যদি কোনো ক্ষণে
নিঃসীম সাগরে শুয়ে ভেবো তুমি ছিল সেই নদী।
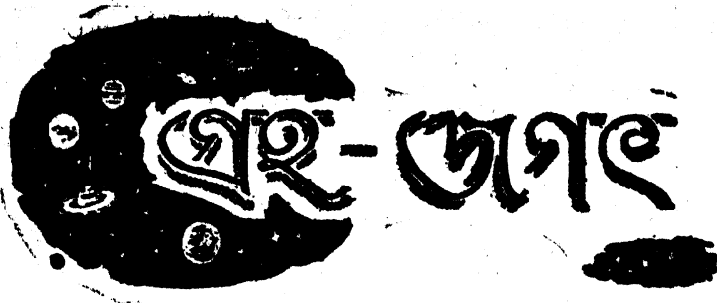
সন ১৩৭১ সালের বর্ষফল

উপাধ্যায়

সন ১৩৭১ সাল বিশ্বের নানা দিকে অশুভ বার্ত্তাবহ রূপে সক্রিয় হয়ে উঠবে। বিদায়ী বর্ষের চৈত্রমাসে পড়েছে পাঁচটি রবিবার। এরূপ যোগ অশুভব্যঞ্জক। ফলে দুর্ভিক্ষ, মড়ক, রোগ, বিপ্লব, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের সংঘর্ষ, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হবে। দাঙ্গা হাঙ্গামা, রক্তপাত ইত্যাদি বহু দেশকে বিপন্ন করে তুলবে। ভারতের নানা দিকে বহু মানীয় ব্যক্তি হবে—ওলাউঠা, বসন্ত, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও গলপ্রদেশের রোগে অনেক লোক ক্ষয় হবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ধ্বংসাত্মক কার্য্য কলাপের জন্ত ভারত বিব্রত হয়ে উঠ্‌বে, বাধ্য হয়ে তাকে প্রতিরোধ করে নাম্‌তে হবে রুদ্ররূপ নিয়ে সংঘর্ষের ভিতর,—শান্তিপূর্ণ অহিংসাত্মক নীতি ও পদ্ধতি রক্ষা করে চলা অসম্ভব হয়ে উঠবে। ভারতের শাসনতন্ত্র, শাসনব্যবস্থা ও মন্ত্রীদলের মধ্যে পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আশঙ্কা করা যায় কয়েক জন বিখ্যাত ব্যক্তির জীবন হানি, রাজদণ্ড বা গুপ্তভাবে প্রাণ সংহার! যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন আকস্মিক ভাবে হবার আশা করা যায়, তার ফল খুব শুভই হবে। এবারও বিস্মৃত গণনায়ক মহামানবের আবির্ভাব ভারতবর্ষে সম্ভাবনা আছে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবেনা, গুরুতর পরিস্থিতির আশঙ্কা করা যায়! কাশ্মীরে দেশব্যাপী ব্যাপক নরহত্যার সম্ভাবনা আছে। আষাঢ় মাসের পরই ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের গুরুতর বিপদ ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা। আকস্মিকভাবে বিপন্ন হবে পূর্ব্ব পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, সিকিম ও কাশ্মীর। এই বিপন্নতার মূলে থাকবে ভারতে অবস্থিত সংখ্যাগুরু পঞ্চমবাহিনীর সক্রিয় নেপথ্য ভূমিকা। দুর্ব্বল বাদীর প্রাত্যহিক তোষণ নীতি যে বর্ব্বরতার গতিকে নিষ্ক্রিয় করতে পারেনা, বরং সর্বনাশের দাবানল সৃষ্টি করতে পারে, সেই সত্যই ভারতীয় রাষ্ট্রের অধিবাসীরা বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করবে। 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' চাণক্যের অভিজ্ঞতাপ্রসূত বাণীকে অবহেলা করে, আর শক্তিবাদকে শবে পরিণত করে, তারা নিজেদের ভুল বুঝে অনুতপ্ত হবে, এ বৎসরই তারা বুঝবে ক্লৈব্যগত প্রেমবাদ এ যুগে অচল—শক্তি সঞ্চয় ও শক্তি প্রকাশ করাই যুগ ধর্ম্ম। এবৎসর তাদের বিভ্রান্ত নীতির উপযুক্ত শিক্ষালাভ হবে। আশার বিষয়, এ বৎসর থেকে ভারতীয় রাষ্ট্র ধাক্কা খেয়ে মহাশক্তির উপাসক হয়ে সর্ব্ব-কার্য্যে উন্নতির পথে দ্রুত ভাবে অগ্রসর হবে। দেশকে অধঃ-পতনের মুখে যারা টেনে নিয়ে চলেছে, তাদের অনেকেই জনগণের কাছে নির্য্যাতিত হোতে পারে। এই বৎসর শোনা যাবে জনশক্তির রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি। ব্যবসায়ীদের অবস্থা মন্দ হবে। সুবিধাবাদী দুর্নীতিপরায়ণ ও চোরাকারবারী-দের অনেকেই শাস্তি ভোগ করবে—বহুলাংশে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। বহির্বাণিজ্যে এবৎসর ভারত বিশেষ লাভ-বান হবে। ভারত সীমান্তে শত্রু পক্ষের রুদ্ররূপ প্রকাশ পাবে, এজন্ত ভারতের কুম্ভকর্ণ নিদ্রা না ভাঙ্‌লে বিপদ ঘনীভূত হবে। ভারতের ভিতরে শত্রুরা এর মধ্যেই বহু-সংখ্যক গুপ্তচর ছেড়ে দিয়েছে, তারা রাষ্ট্রঘাতী কার্য্য

কলাপে, জয় চাঁদ, মীর জাফর প্রভৃতির ভূমিকা অবলম্বন করে বাহিরে শান্ত শিষ্ট ভদ্র লোকের মুখোস পরে আছে, আর সর্ব্ব ঘটে হয়ে রয়েছে জনার্দ্দন। এদের সম্বন্ধে রাষ্ট্র পরিচালকগণের বিশেষ দৃষ্টি ও সমুচিত দণ্ড দেওয়া এই চৈত্র মাস থেকেই সুরু করা উচিত। আলোচ্যবর্ষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বিব্রত হবে। মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের ভাগ্যে বিশেষ দুর্দ্দশা ভোগ। রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে জনশক্তির বিক্ষোভ, প্রবল আন্দোলন, অসন্তোষ ও ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ প্রকাশ পাবে। এবৎসর ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা নৈরাশ্যজনক। ভারতীয় রাষ্ট্রের কতিপয় বিখ্যাত রাজনীতি-বিশারদ, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও সাহিত্যিক মহাপ্রস্থান করবেন। জনৈক বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিরও তিরোভাব। শ্রমজীবিসম্প্রদায়ের অসন্তোষ ও ধর্মঘট। কলিকাতার ট্রাম কোম্পানির কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট ও গোলমালের অবতারণা করবে, ফলে জনসাধারণের অসুবিধা ভোগ করতে হবে। রাজনৈতিক দলাদলির ক্ষেত্রে মারপিঠ পর্য্যন্ত হোতে পারে। দেশের ভেতর বিদ্রোহ ও বিপ্লবের আশঙ্কা থাকায় পূর্ব্ব থেকে সকলেরই সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য্য পরিচালনা সময়ে সময়ে ব্যাহত হোতে পারে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদলের উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হওয়ার দরুণ প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকারকে একটু অসুবিধায় ফেলে দেওয়া হবে। বিমান ও নৌবহরে পঞ্চম বাহিনীর কার্য্য কলাপ প্রকাশ পেতে পারে। উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলগুলি সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্যে কালাতিপাত করবে। এই সব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ, চুরি ডাকাতি, উপদ্রব, লুণ্ঠন, হত্যা, ঝটিকা বন্যা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করা যাবে। শ্রাবণ মাসের মধ্যভাগ থেকে দুর্ঘটনাগুলি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠবে ভারতের উত্তর ও পূর্ব্বাংশ। এখানে ভূমিকম্প, প্রবল ঝটিকা, বন্যা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি প্রকট হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবৎসর জনপ্রিয় হোতে পারবেন না। রাজনৈতিক আন্দোলন গুরুতর ভাবে হোতে পারে। কোন বিশিষ্ট মন্ত্রীর পদত্যাগের সম্ভাবনা। অন্নসমস্যা জটিল হবে। বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার স্বাস্থ্যহানি, পীড়া কিম্বা প্রাণহানির যোগ আছে। কোন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকের তিরোধান। বাংলার স্থানে স্থানে ঝড় বৃষ্টি, বন্যায় শস্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা। পশ্চিম বাংলার ব্যবসায়ীদের পক্ষে নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হোতে হবে। তা ছাড়া দেশের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা রক্তপাত, দুর্ঘটনা, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি চলবে। এ বৎসর পশ্চিমবাংলার দুঃসময়। বাঙালীর কোণঠেসা হবার আশঙ্কা। পাকিস্তানের অবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সমস্যা সঙ্কুল। পাকিস্তানে বিদ্রোহ ও অন্তর্বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। বিদায়ী বৎসরের মতই পাকিস্তানী লীলা চলবে আলোচ্য বর্ষে। বহু লোকক্ষয়, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্ত পাত, খাদ্যাভাব, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ প্রভৃতি পূর্বপাকিস্তানে ঘটবে। রাশিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক নিহত হোতে পারেন, সরকার জনসাধারণের অপ্রিয়ভাজন হবে। ভারতের মত সেখানে ও পঞ্চম বাহিনী ও গুপ্তচর বৃদ্ধি পাবে। বিরুদ্ধ দলের পসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। কতিপয় বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়কের জীবন বিপন্ন হবে। পর-রাষ্ট্রের সহিত বিবাদ ক্রমে যুদ্ধে পরিণত হবে। চীনের সঙ্গে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। সামরিক কারণে ব্যয়বাহুল্য ও তজ্জনিত রাশিয়ায় অর্থনৈতিক সঙ্কট। বৎসরের শেষে রাশিয়ায় বহু অমঙ্গলজনক অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। চীনে গৃহ বিবাদ প্রবল আকার ধারণ করবে। শাসনতন্ত্রের বিপর্য্যয় ঘটবে। দুর্ভিক্ষ ও অর্থাভাব প্রবল হবে। দেশে দেখা দেবে বিদ্রোহ ও বিপ্লব। পৌষ মাসের পর মাও সেতুং ও অপর কয়েকজন প্রধান রাষ্ট্র কর্ণধারের বিপদ ও প্রাণহানি। চীন এবৎসরে ভারত আক্রমণ করতে পারবে না। বিশ্ববাসীর কাছে চীন লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে, শেষে ভারতের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হবে। ইংলণ্ডের ও দুর্বৎসর। আর্থিক সঙ্কট, শ্রমিক ধর্মঘট ও নানা আভ্যন্তরীণ গোলযোগ। মন্ত্রীসভার মধ্যে মতানৈক্য হেতু বিবাদ উপস্থিত হবে। কোন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিদের প্রাণহানি যোগ। লণ্ডনে আকস্মিক দুর্ঘটনা, আফগানিস্তানে কমিউনিষ্ট প্রভাব। ব্রহ্মদেশে রাজনৈতিক গোলযোগ, বিদ্রোহ, রক্তপাত ও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ। সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রনায়কের জীবন বিপন্ন। আমেরিকায় মন্ত্রীসভাও শাসন তন্ত্রের পরিবর্ত্তন হবে। ভীষণ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটবে। ফলে জন সাধারণের দুর্দ্দশা চরমে উঠবে। বহু লোক

ক্ষয় ঘটবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে। সরকারের বিপক্ষে বিদ্রোহ, আন্দোলন, ষড়যন্ত্র প্রভৃতির সম্ভাবনা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিনায়কের জীবন বিপন্ন হোতে পারে। বাণিজ্য ব্যবসায় সুবিধাজনক নয়। রাশিয়ার সাম্যনীতি জার্মানীতে বিস্তৃতি লাভ করবে। ফ্রান্সে রক্ত পাত, আর্থিক বিপর্য্যয়, অসন্তোষ, খাদ্যাভাব প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হবে। ফ্রান্সের সহিত চীনের আঁতাত প্রহসনে দাঁড়াবে। আরবের সময় ভালো যাবে। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির যোগ। আয়ার ল্যাণ্ডে এবার বহু লোকক্ষয়।

পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই এবৎসর অশুভ ঘটনার বাহুল্য আছে। ভারতে ঘোরতর ঝড় বৃষ্টি, বহু লোকের প্রাণ হানি ও অর্থ সঙ্কট। কোথাও শুভ ফলের সম্ভাবনা নেই। এ বৎসর ছিন্নমস্তা সভ্যতার নিজ মুণ্ডকেটে রুধির পানই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, আর সভ্যতার রাজপথে প্রবহমান হবে রক্তস্রোত, রাজনৈতিক জুয়াড়ীদের অক্ষ ক্রীড়ার ভ্রমাত্মক চালে।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফল

মেষ রাশি

ভরণীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, কৃত্তিকার পক্ষে মধ্যম আর অশ্বিনীজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্যভাব শুভ, মাসের শেষার্দ্ধে পিত্ত প্রকোপ, গৃহে নবজাতকের আবির্ভাব, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, আর্থিক অবস্থা অতীব উত্তম, বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে শুভ। প্রথমার্দ্ধ চাকুরিজীবির পক্ষে অনুকূল, পদোন্নতি ও অনুরূপ মর্য্যাদা বৃদ্ধি। বেকার ব্যক্তির কর্ম্মলাভ, সামরিক বা পুলিশ কর্ম্মচারীর সম্মান, পদক প্রভৃতি লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে সন্তোষজনক। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম, অনেকের সন্তান সম্ভাবনা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, রোহিণী ও মৃগশিরার পক্ষে মধ্যম ও একই প্রকার। ভ্রমণে অবসাদ, পারিবারিক সুখশান্তি লাভ। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, দ্বিতীয়ার্দ্ধে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হেতু সন্তোষ ও সুখ লাভ। আর্থিক অবস্থা উত্তম, আয়বৃদ্ধি ও লাভ। ব্যয়বাহুল্য, বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে শুভ। চাষের নব প্রবর্ত্তনের দিকে গেলে ক্ষতি হবে। চাকুরির ক্ষেত্রে উন্নতি ও অনুকূল আবহাওয়া, বেকার ব্যক্তির কর্ম্মলাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির আয় অতীব উত্তম, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ। বাপের বাড়ী থেকে দুঃসংবাদ পেয়ে মর্ম্মাহত হবে, প্রণয়ের ক্ষেত্র শুভ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্য লাভ।

মিথুন রাশি

পুনর্ব্বসুজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, মৃগশিরার পক্ষে মধ্যম, আর্দ্রার পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। স্বাস্থ্যহানি, শারীরিক অসুস্থতা, সাধারণ দৌর্ব্বল্য, ভ্রমণান্তে অবসাদ, ধারালো অস্ত্রে আঘাতপ্রাপ্তি, পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা কিন্তু পরিবার বহির্ভূত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য। নবজাতকের আবির্ভাব, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, আর্থিকক্ষেত্র সন্তোষজনক নয়। শেষার্দ্ধ শুভ ও আয়বৃদ্ধি যোগ, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মধ্যম। চাকুরির ক্ষেত্রে প্রথমার্দ্ধ শুভ নয়, শেষার্দ্ধ মন্দ যাবে না। পদোন্নতি হবার সম্ভাবনা, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। সিনেমা ও মঞ্চশিল্পীর অতীব উত্তম সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসু ও অশ্লেষার পক্ষে উত্তম, পুষ্যার পক্ষে নিকৃষ্ট। জ্বর ও অনুরূপ পীড়া। রক্তের চাপবৃদ্ধির সম্ভাবনা। শেষার্দ্ধে পারিবারিক শান্তির ও ঐক্যের অভাব। স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য, আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। ব্যয়বৃদ্ধি, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ নয়। চাকুরির ক্ষেত্র মোটামুটি ভালো যাবে, যারা বৈদেশিক দূতাবাসে বা সমুদ্র পারের বৈদেশিক সংক্রান্ত বিভাগে যারা কর্ম্মলিপ্ত, তাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে অতীব শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সুবিধাজনক নয়।

সিংহ রাশি

পূর্ব্বফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, উত্তর ফল্গুনীর পক্ষে মধ্যম। মঘার পক্ষে নিকৃষ্ট, উদর ও গুহ্য পীড়া, মূত্রাশয় পীড়া, জ্বর, রক্তের চাপ বৃদ্ধি, চক্ষুরোগ প্রভৃতি। পারিবারিক ক্ষেত্রে ও বাইরে অশান্তি, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে শুভ নয়। চাকুরির ক্ষেত্রে নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি, উপরিওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা। শেষার্দ্ধ শুভ, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, শিল্পী, গায়িকা, অভিনেত্রীর পক্ষে বিশেষ শুভ ও সাফল্যলাভ। বিদ্যার্থী নারীর পক্ষেও উত্তম, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

কন্যারাশি

উত্তরফল্গুনীজাত ব্যক্তির উত্তম, হস্তা ও চিত্রার পক্ষে সমান ও মধ্যম ফল। স্বাস্থ্য ভালো যাবে, উদরের কিছু গোলযোগ, গুহ্যস্থানে প্রদাহ প্রভৃতি শেষার্দ্ধে সম্ভব। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা। আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে অনুকূল। চাকুরীজীবির পক্ষে বিশেষ শুভ, জনপ্রিয়তা অর্জ্জন, পদের প্রতিপত্তি, উপরওয়ালার সুনজর, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে প্রথমার্দ্ধ বিশেষ শুভ, শেষের দিকে আয় হ্রাস। স্ত্রীলোকের পক্ষে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা, চাকুরিজীবি মহিলার পক্ষে কিঞ্চিৎ শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

তুলা রাশি

বিশাখার পক্ষে উত্তম, চিত্রার পক্ষে মধ্যম, স্বাতীর পক্ষে নিকৃষ্ট। মামলা মোকর্দ্দমার সম্ভাবনা, স্বাস্থ্যের অবনতি। সন্তানাদির পীড়া, পারিবারিক কলহ ও অশান্তি। প্রথমার্দ্ধে আর্থিক ক্ষতি, প্রচেষ্টায় নৈরাশ্য, ব্যয় বৃদ্ধি, শেষার্দ্ধ আশা-ব্যঞ্জক ও অর্থাগম। ঋণ পরিশোধ, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধি-কারী ও কৃষিজীবির পক্ষে আশাপ্রদ। চাকুরিজীবি মাসের প্রথমার্দ্ধে উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবে, শেষার্দ্ধ শুভ হবে। অধীনস্থ কর্ম্মচারী বা ভৃত্যের জন্য অশান্তির সৃষ্টি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে কিছু শুভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। ভ্রমণযোগ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে ভালো বলা যায় না।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখা ও জ্যেষ্ঠার পক্ষে উত্তম, অনুরাধার পক্ষে মধ্যম। শারীরিক অসুস্থতা, রক্তপাত, অজীর্ণ, জ্বর, আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি, শেষার্দ্ধে দুর্ব্বলতা এমনকি দুর্ঘটনা ও আঘাত প্রাপ্তি হোতে পারে। সন্তানাদির পীড়া। পারিবারিক অশান্তি কলহ স্বজনবিরোধ। আর্থিক ক্ষেত্র অশুভ, ক্ষতির সম্ভাবনা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে গতানুগতিকভাবে মাসটি চলে যাবে। চাকুরিজীবির পক্ষে ভালো বলা যায়না. নানাপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার সমাবেশ কর্ম্মক্ষেত্রে হোতে পারে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে সময়টি মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ নয়, কেবল ছায়াছবি ও মঞ্চশিল্পীর পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

ধনু রাশি

পূর্ব্বাষাঢ়া জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, উত্তরাষাঢ়া জাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম, মূলার পক্ষে নিকৃষ্ট। পারিবারিক শান্তি। শেষার্দ্ধে সামান্য পারিবারিক কলহ। স্বজন-বিরোধ। উদরঘটিত পীড়া ও হজমের গোলমাল। আর্থিক অবস্থা বিশেষ সন্তোষ জনক। নানাভাবে অর্থা-গম। লাভ ও সাফল্য। শেষদিকে নগদ টাকার টান ধরবার সঙ্গে সঙ্গে তা হাতে এসে যাবে! আর্থিক ব্যাপারে অদূরে ভ্রমণ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে সুবিধাজনক নয়। চাকুরি জীবির পক্ষে প্রথম দিকটা মন্দ নয়, শেষের দিকে একটু অসুবিধাজনক পরি স্থিতি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে এক ভাবেই যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম। বিশেষতঃ ছায়াছবি ও মঞ্চাভিনেত্রী, সঙ্গীতশিল্পীর পক্ষে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা। অনেকের কন্যা সন্তান হবে।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে উত্তম। শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার পক্ষে মধ্যম। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। সামান্যই বায়ু পিত্ত প্রকোপ। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা। সন্তান জন্মগ্রহণ-জনিত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা। প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে শুভ নয়। চাকুরির ক্ষেত্রে প্রথমার্দ্ধ ভালো যাবেনা, শেষার্দ্ধ অনেকটা ভালো। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি

জীবির পক্ষে মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম। পিত্রালয় থেকে শুভ সংবাদ লাভ। ছায়াছবি ও মঞ্চাভিনেত্রী, গায়িকা প্রভৃতির পক্ষে সর্ব্বোত্তম সুযোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কুম্ভ রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, ধনিষ্ঠার পক্ষে মধ্যম, শতভিষার পক্ষে নিকৃষ্ট। শরীর ভেঙে পড়বে, উদরে ও বুকে ব্যথা ও যন্ত্রণা, শ্বাসপ্রশ্বাসের পীড়া, চক্ষুকষ্ট প্রভৃতি। সাধারণ দুর্ব্বলতা। পারিবারিক শান্তি থাকলেও মানসিক অশান্তি। বাইরে থেকে দুঃসংবাদপ্রাপ্তি, স্বজন বিরোধ, কলহ বিবাদ প্রভৃতি সম্ভাবনা। সন্তানদের স্বাস্থ্যহানি। এমাসে আর্থিক দুর্গতি। ব্যয়বৃদ্ধি চুরি ও প্রতারণার দরুণ অর্থহানি। ভ্রমণের সময় সতর্কতা আবশ্যক। কেননা পয়সা কড়ি জিনিষ পত্র চুরি হবার যোগ আছে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে আশাপ্রদ নয়। চাকুরির ক্ষেত্রে সতর্কতা দরকার। চাকুরিজীবির পক্ষে মাসটা একভাবে যাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটি আশানুরূপ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদ ও রোহিণী জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তর ভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। দৈহিক অবস্থা সুবিধাজনক নয়। জ্বর পিত্ত কোপ প্রভৃতি। শেষার্দ্ধে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, রক্তের চাপ বৃদ্ধি ও চক্ষু পীড়া। পারিবারিক কলহ ও অশান্তি। আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব। ব্যয় বৃদ্ধি ও ক্ষতি। প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা শেষার্দ্ধ অনেকটা ভালো। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়, চাকুরি জীবির পক্ষে বিশেষ দুঃসময়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি জীবির পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। চিত্র ও মঞ্চাভিনেত্রী গায়িকা প্রভৃতির খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি।

—

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নফল

মেষ লগ্ন—

ব্যবসায়ে লাভ। অর্থোপার্জ্জনে আংশিক বাধা। শেষার্দ্ধে অর্থাগম। ভ্রাতাভগ্নীর জন্য মনোকষ্ট। পিতৃপীড়া, এমন কি পিতৃবিয়োগ। আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। চাকুরিজীবির পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষলগ্ন—

ব্যয়ের সাংক্রন্ত রক্ষায় অপটুতা। চোর জুয়াচোরের ভয়। ভ্রাতার রোগভোগ। মানসিক উদ্বেগ, আর্থিক উন্নতি। কর্ম্মসাফল্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে মন্দ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মিথুন লগ্ন—

বন্ধুবিয়োগ, আর্থিক উন্নতি, স্বাস্থ্যহানি, কর্ম্মস্থল শুভ। বুদ্ধির ভুলে কাজকর্মে অশান্তি। বন্ধু দ্বারা অর্থলাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা।

কর্কট লগ্ন—

স্ত্রীলোক থেকে ক্ষতি, গুরুজনের জন্য অশান্তিভোগ, অর্থাগম, সাফল্যলাভ, ভাগ্যোন্নতি ও খ্যাতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

সিংহ লগ্ন—

স্বাস্থ্য স্বাভাবিক। ব্যবসায়ে ধনাগম। মানসিক উদ্বেগ। সন্তানের পীড়া। আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

কন্যা লগ্ন—

ভালো সময়। কর্ম্মেসাফল্যলাভ। অগ্রজ থেকে অশান্তি। অযথা অর্থব্যয়। ভ্রমণ। সন্তানের পীড়া। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাপ্রদ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

তুলা লগ্ন—

মানসিক বল ও উদ্যমের অভাব। শত্রুবৃদ্ধি। গৃহনির্ম্মাণে বাধা। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার মৃত্যুতুল্য পীড়া। পারিবারিক অশান্তি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মোটামুটি ভালো বলা যায়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

বৃশ্চিক লগ্ন—

স্বাস্থ্য ভালো বলা চলে না, অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু মস্তিষ্ক পীড়া, পারিবারিক অবস্থা উত্তম, কর্ম্মস্থলে উন্নতি, যশও প্রতিষ্ঠালাভ, সন্তানের উন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ধনু লগ্ন—

কর্ম্মোন্নতি, নূতন জমি সংগ্রহের চেষ্টা, পত্নীর অসুস্থতা, গৃহ নির্ম্মাণ যোগ। আর্থিক উন্নতি ও কর্মসাফল্য লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

মকর লগ্ন—

ভাগ্যোদয়, দাম্পত্যকলহ, প্রীতিভঙ্গ, সহকর্ম্মীদের সঙ্গে মতানৈক্য হেতু অশান্তি, ব্যবসা বাণিজ্যে আশানুরূপ ফলের অভাব। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কুম্ভ লগ্ন—

পত্নীর স্বাস্থ্য হানি। মানসিক উদ্বেগ, গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি যোগ, বাত বেদনা। স্নায়বিক দুর্বলতা। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশানুরূপ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

মীন লগ্ন—

বেদনা সংযুক্ত পীড়া। ধন লাভ। সন্তান সন্ততির লেখা পড়ায় বিশেষ উন্নতি। ব্যয় বৃদ্ধি। ভাগ্যোন্নতি। কর্মস্থলে অশান্তি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্য লাভ।

ছাঁটাই
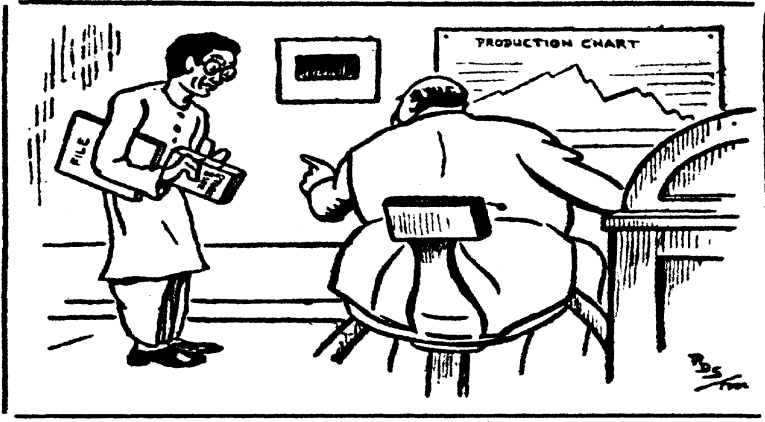
কেরাণী—(সবিনীতভাবে)আজ্ঞে···একটা কথা জিগগেস করবো স্যার ?···

মালিক—কি ?

কেরানী—আজ্ঞে, কর্ম্মচারী-ছাটাইয়ের যে ফর্দ্দটা কাল আপনি টাইপ করতে পাঠালেন, তাতে কি আমারও নাম আছে স্যার ?···

মালিক—না ! সে ফর্দ্দ ছেপে আসার আগেই তুমি তো বিদায় হচ্ছো !

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

রসতত্ত্ব

অধ্যক্ষ ডঃ ক্ষেত্রমোহন বসু

অলংকার শাস্ত্রে রসতত্ত্বের আলোচনা আছে। নাট্যাচার্য ভরতমুনি 'নাট্যসূত্রের' ষষ্ঠাধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

"শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥"

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত এই আটটি রস বলিয়া গণ্য। উদ্ভট প্রণীত 'কাব্যালঙ্কার-সারসংগ্রহে' অতিরিক্ত শান্তরস যোগ দিয়া নবরসের কথাও আছে।

"শৃঙ্গারহাস্যকরুণ রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥"

এবং সাহিত্যদর্পণকার বাৎসল্যরসকে অতিরিক্ত ধরিয়া দশম রসের কথাও বলিয়াছেন।

"অথ মুনীন্দ্রসম্মতো বৎসলঃ।
স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলং চ রসং বিদুঃ॥"

নিম্নে উক্ত রসগুলির 'স্থায়ীভাব' কি কি তাহা পর্যায়ক্রমে লিখিত হইল।—

রস॥ (১) শৃঙ্গার, (২) হাস্য, (৩) করুণ, (৪) রৌদ্র, (৫) বীর, (৬) ভয়ানক, (৭) বীভৎস, (৮) অদ্ভুত, (৯) শান্ত, (১০) বাৎসল্য।

স্থায়ীভাব॥ (১) রতি, (২) হাস্য, (৩) শোক, (৪) ক্রোধ, (৫) উৎসাহ, (৬) ভয়, (৭) জুগুপ্সা, (৮) বিস্ময়, (৯) শম [নির্বেদ], (১০) বাৎসল্য-স্নেহ।

স্থায়ীভাব কি?—ইহা অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষ, উহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে; কিন্তু, স্বরূপতঃ বিনাশশীল হইলেও উহা সংস্কাররূপে অন্তঃকরণে চিরস্থায়ী হয়। স্থায়ীভাব সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণকার বলিতেছেন—

"অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ॥"

অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ কোন প্রকার 'সঞ্চারী' ভাবই যে ভাবের তিরোধান ঘটাইতে পারে না, যাহা আস্বাদাঙ্কুর-কন্দ-স্বরূপ, তাহাই 'স্থায়ী' ভাব।

রূপগোস্বামী তাঁহার 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে কিছু বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন।—

"অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ীভাব উচ্যতে॥"

অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাবসমূহকে বশীভূত করিয়া যে ভাব উত্তম রাজার ন্যায় বিরাজ করে, তাহাকে স্থায়ীভাব বলে। অবিরুদ্ধভাব হইতেছে মিত্রভাব ও উদাসীনভাব; লজ্জা, বোধ, উৎসাহ, প্রভৃতি মিত্রভাব, এবং গর্ব, হর্ষ, সুপ্তি, প্রভৃতি উদাসীনভাব; আর বিরুদ্ধভাব হইতেছে—বিষাদ, দৈন্য, মোহ, শোক, ক্রোধ, ত্রাস, প্রভৃতি। মনে রাখিতে হইবে এগুলি সবই ব্যভিচারী ভাবের অন্তর্গত। ভাবার্থ এই,—যিনি উত্তম রাজা তিনি তাঁহার মিত্রপক্ষ, উদাসীন পক্ষ ও শত্রুপক্ষকে স্বীয় প্রভাবে যেরূপ বশে আনিতে পারেন, সেইরূপ স্থায়ীভাব অবিরুদ্ধ-বিরুদ্ধ উভয় ভাবকেই বশে আনিয়া নিজের পুষ্টিসাধনে নিয়োজিত করিতে পারেন।

রস শব্দের দুইটি অর্থ,—আস্বাদ্যবস্তু এবং রস-আস্বাদক যিনি [রসিক]। কবিকর্ণপুর বলেন, যে আস্বাদ্যবস্তুর আস্বাদন লাভে চিত্তের দ্রবতা জন্মে সেই চমৎকৃতিই হইতেছে রসের প্রাণবস্তু।—

"রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসোরসঃ।
"তচ্চমৎকারসারত্বে সর্বত্রৈবাদ্ভুতো রসঃ॥"

অলঙ্কারকৌস্তুভ

চমৎকারের কারণ হইল অনির্বচনীয় সুখাতিশয্যের অনুভূতি, এজন্য বলা যাইতে পারে যে, সেই চমৎকারিত্বময় সুখই হইল 'রস'। সাহিত্যদর্পণকারের 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্—যদি মানা যায় তবে বলা যাইতে পারে যে, যাহাতে রস নাই তাহা কাব্য হইতে পারে না, এবং কোন কাব্যে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য থাকিলেও উহা যদি রসহীন হয় তবে উহা কাব্য নয়। অগ্নিপুরাণ বলিতেছেন,—

"বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবনম্।"

কবিকর্ণপুরের মতে কবির অসাধারণ চমৎকারিণী রচনাই

কাব্য—কবিবাঙ্‌নির্মিতং কাব্যম্‌। 'কাব্যপ্রকাশরচয়িতা মম্মথভট্ট প্রাকৃত কাব্যের ফলের কথা বলিয়াছেন, যথা, যশঃ, অর্থপ্রাপ্তি, ব্যবহারিক জগতের অভিজ্ঞতালাভ, পরম সুখপ্রাপ্তি ইত্যাদি; কিন্তু কবিকর্ণপুর 'অলঙ্কারকৌস্তভে' ভগবদ্‌বিষয়ক অপ্রাকৃতকাব্যের কথা বলিয়াছেন।—যে কবি শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ চিন্ময়রসাত্মক (divine rasa) কাব্যরচনাকালে পরমানন্দ অনুভব করেন তিনি যে পরম-ফললাভ করেন, তাহা পূর্বোক্ত যশাদিপ্রাপ্তির আনন্দের তুলনায় অনির্বচনীয়। প্রাকৃত কাব্যরসিকগণ প্রাকৃত কাব্যের রসাস্বাদনজনিত আনন্দকে "ব্রহ্মাস্বাদসহোদর" বলিয়াছেন।

আবার, প্রাকৃতকাব্য রসাত্মক হইলেও যে কোনও ব্যক্তি সেই কাব্যরসের আস্বাদনে যোগ্যতা অর্জন করে না, কারণ, রত্যাদি বাসনা না জন্মাইলে রসের অনুভূতি হয় না। রংগালয়ে যাইয়া অভিনয় দর্শনে যে অনির্বাচ্য আনন্দ [সুখ] উপভোগ করিবার অভিলাষ দর্শকমাত্রেরই হৃদয়ে উদয় হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন; এই আকাঙ্ক্ষাই হইল 'রতি'; এই আকাঙ্ক্ষা যাহার থাকে না সে রংগালয়ে যায় তামাসা দেখিবার জন্য, রসাস্বাদনের উদ্দেশ্যে নহে। তাই সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলিতেছেন,—

"ন জায়তে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদি বাসনাম্‌।
নির্বাসনাস্তু রঙ্গান্তঃ কাষ্ঠকুড্যাশ্মসন্নিভাঃ॥"

এই প্রকার বাসনারহিত দর্শকগণ রংগশালার কাষ্ঠ, দেয়াল ও প্রস্তরের ন্যায়।

সাহিত্যদর্পণকার বলিতেছেন যে, উহা দ্বারা মানুষ চিত্তের অনুকূল কোন বস্তুর প্রতি তন্ময়ীভাব বা আসক্তি লাভ করিয়া নিজেকে সুখী বোধ করে।—

"রতির্মনোঽনুকূলার্থে মনসঃ প্রবণায়িতম্‌।"

যাহাকে দেখিলে, যাহার কথা শুনিলে, যাহাকে স্পর্শ করিলে, যাহার সৌরভ আঘ্রাণ করিলে আমরা আপনাকে সুখী অনুভব করি তাহাকেই আমরা সুন্দর বলি। প্রতি নরনারীর নিকট এই সৌন্দর্য রুচিও সংস্কারভেদে স্বানুভব-সংবেদ্য। এই 'রতি'কে আলংকারিকগণ 'ভাব'ও বলিয়া থাকেন।

কাব্যরসের আস্বাদন করিতে হইলে কাব্যে বর্ণিত বিষয়বস্তুর জ্ঞানের প্রয়োজন, এ জন্য তাহাতে চিত্তের একাগ্রতা ও তন্ময়তালাভ আবশ্যক; অর্থাৎ, এ সম্বন্ধে প্রয়োজন হইতেছে চিত্তের নির্মলতা, চিত্তের কোন আবিলত্ব থাকিলে তন্ময়তা আসিবে না, রসোপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে। চিত্তে যদি রজোগুণের প্রাধান্য থাকে তবে চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটিবে, তমোগুণের প্রাধান্য থাকিলে বিষয় বস্তুর সম্যক্‌ জ্ঞান জন্মিবে না! এজন্য রজঃ ও তমোহীন সত্ত্বগুণ থাকিলে চিত্ত নির্মল হইবে। সত্ত্বগুণান্বিত সামাজিকগণই রসগ্রহণে অধিকারী এবং তাঁরাই সহৃদয় সামাজিক বলিয়া কথিত হন। কিন্তু মায়িক রজঃ, তমঃ ও সত্ত্বগুণের অতীত না হইলে চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক হয় না—হ্লাদিনীশক্তি চিত্তে আবির্ভূতা হয় না!

নব্য অলংকার শাস্ত্রের জনক আনন্দবর্ধনাচার্য তাঁহার 'ধ্বন্যালোক' নামক গ্রন্থে বলিতেছেন যে, ভাবহীন জ্ঞান ও জ্ঞানহীন ভাব ইহার কোনটিই মানুষের হৃদয়ে স্বতঃসিদ্ধ রসাস্বাদনাভিলাষকে চরিতার্থ করিতে সমর্থ নয়।

"যা ব্যাপারবতী রসান্‌ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা
দৃষ্টির্যা পরিনিষ্ঠিতার্থবিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।
তে দ্বে অপ্যবলম্ব্য বিশ্বমখিলং নির্বর্ণয়ন্তো বয়ং
শ্রান্তা নৈব চ লব্ধমব্ধিশয়ন! ত্বদ্‌ভক্তিতুল্যাসুখম্‌॥"

তাৎপর্য এই,—"নানা প্রকার রসকে আস্বাদন করাইবার জন্য সদা সমুদ্যত কবিগণের নিত্য নবীন প্রতিভাময়ী দৃষ্টি [জ্ঞানহীন ভাব] ও অব্যভিচারী প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ পারমার্থিক বস্তুতত্ত্বের প্রকাশে সমর্থ যে প্রমাণ পরতন্ত্র জ্ঞানীপুরুষগণের দৃষ্টি [ভাবহীন জ্ঞান]—আমরা এই উভয় প্রকার দৃষ্টির সাহায্যে এই অনন্তবৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বরহস্যের উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইয়া আজীবন পরিশ্রম করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। হে ক্ষীরোদশায়িন্‌ রসঘন চিদানন্দময় পুরুষ! তোমাকে ভালবাসারূপ যে ভক্তিরস, সে রসাস্বাদনরূপ সুখ কিন্তু এই উভয়প্রকার দৃষ্টির সাহায্যে আমরা লাভ করিতে পারিলাম না।"

রসাস্বাদই মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ। কিন্তু এ কীরূপ রস? প্রাকৃত কাব্যে কল্পিত স্ত্রী পুরুষরূপ নায়িকা-নায়ককে আলম্বন করিয়া যে রস সহৃদয় সামাজিকগণের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হয়? অথবা, প্রাপঞ্চিক আলম্বনাদির ভাবনাবহির্ভূত বৈষয়িক সুখ হইতে বিভিন্ন কোন শাশ্বত আলম্বন রসিত অনির্বাচ্য রস? উপনিষদ্‌ বলিতেছেন,—

"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দীভবতি—
কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ
আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ ॥"

সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই রস। সেই রসস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া এই সংসারী মানব আনন্দের সহিত নিত্যযুক্ত হয়। রসরূপ আনন্দ যদি না থাকিত, তাহা হইলে এ সংসারে কে স্পন্দিত হইত? কেই বা জীবিত থাকিত? সেই আনন্দ-স্বরূপ রসই আকাশের ন্যায় অনাবৃত, সর্বব্যাপী ও অখণ্ড।

এই রসই যদি পরমপুরুষার্থ হয়, তবে কাব্যে বা নাটকে বা কোন বর্ণনায় সে রস নাই। আবহমান কাল যে কাব্য সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে তাহা রসের উৎস নহে, তাহাতে রস নাই, কারণ তাহা প্রাপঞ্চিক অশাশ্বত বস্তুর বর্ণনায় সমুজ্জল, তাহা রসাভাস, তাহাতে রসের গন্ধ আছে মাত্র, —যেখানে "সঃ" সেইখানেই "রস"। তাই রূপগোস্বামী বলিতেছেন,—

"সর্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্বস্বৈর্ভক্তৈরেবাহুরস্যতে ॥"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

এই যে ভগবৎস্বরূপভূত রস তাহা ভক্তিহীন নরনারী কর্তৃক লাভ করা দুরূহ, যে ভক্তগণের ভগবৎপাদপদ্মই সর্বস্ব কেবল তাঁহারাই সেই ভগবৎস্বরূপ রসের আস্বাদন লাভে সমর্থ।

সেই ভক্তির অধিকারী সম্বন্ধে রূপগোস্বামী বলিতেছেন,—

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখাস্যত্র কথমভ্যুদয়ে ভবেৎ ॥"

ভোগলিপ্সা ও মুমুক্ষা এই দুই পিশাচী হৃদয়ে যে পর্যন্ত বর্তমান থাকে সে পর্যন্ত হৃদয়ে ভক্তি-সুখের (রসের) উদয় হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

এখন ভক্তিরস সম্বন্ধে বলিব। যে সমস্ত বস্তুর মিলনে কোন আস্বাদ্য বস্তুর চমৎকারিত্ব আনিয়া উহাকে রসে পরিণত করে সেই সমস্ত বস্তু হইল উক্ত রসের সামগ্রী। সিতা, ঘৃত, মরীচ ও কর্পূরের মিলনে 'দধি' 'রসালা' নামক রসে পরিণত হয়, এজন্য উক্ত সিতাদি হইল রসালার 'সামগ্রী'। কৃষ্ণরতি রসে পরিণত হয় কতকগুলি সামগ্রীর মিলনে। কৃষ্ণরতি একটি স্থায়ীভাব। এই স্থায়ীভাবের সহিত কি কি সামগ্রী মিলিত হইয়া রস [কৃষ্ণভক্তি] তাহা চৈতন্যচরিতামৃতকার বর্ণনা করিয়াছেন।

"স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব ॥
সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি "রস" হয় অমৃত-আস্বাদনে ॥"

চৈ, চ, ২।১৯।১৫৪-১৫৪

ভক্তিরসের সামগ্রী চারিটি,—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারিভাব।

মুখ্য কৃষ্ণরতি পাঁচ প্রকার,—শান্তি, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। একই কৃষ্ণরতি বিভিন্ন আশ্রয়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন একই দীপের আলোকরশ্মি বিভিন্ন বর্ণের কাচের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইলে বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া নির্গত হয় তদ্রূপ। শান্তভক্তের কৃষ্ণ-রতিকে বলে শান্তরতি; দাস্যভাবের ভক্তের কৃষ্ণরতিকে বলে দাস্যরতি, ইত্যাদি। সেইরূপ, শান্তরসে শান্তরতি স্থায়িভাব, দাস্যরসে দাস্যরতি স্থায়িভাব, ইত্যাদি। এই শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রস যথাক্রমে উক্ত পাঁচটি মুখ্যারতির সহিত বিভাবাদি চারিটি সামগ্রীর মিলনে উৎপন্ন। পূর্বে যে হাস্যাদি অষ্ট [শ্রীরূপের মতে সাতটি] রসের অবতারণা করিয়াছি তাহাদের বলে 'গৌণ' রস,— 'মুখ্য'রস ঐ শান্তাদি পাঁচটি। শান্তদাস্যাদি পঞ্চরতি যেমন সর্বদা অবিচ্ছিন্নভাবে এক একভাবে ভাবিত ভক্ত চিত্তে প্রবাহিত, হাস্যাদি রতি সেরূপ থাকে না; কোনও আগন্তুক কারণ বশতঃ হাস্যাদির উদয় হয় ও পরক্ষণে বিলয় হয়, এজন্য উহারা সাময়িকী। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু যে গৌণীরতির কথা বলিয়াছেন তাহার সংখ্যা সাত; যথা— হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ্সা।

"হাসো বিস্ময় উৎসাহঃ শোকঃ ক্রোধোভয়ং তথা।
জুগুপ্সা চেত্যসৌ ভাববিশেষঃ সপ্তধোদিতঃ ॥"

সর্বসমেত এই দ্বাদশটি রস লইয়া শ্রীরূপাদি বৈষ্ণবাচার্যগণ রসতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন।

বিভাব কাহাকে বলে? সাহিত্যদর্পণকার বলেন, বিভাব রত্যাদির উদ্বোধক,—

"রত্যাদ্যুদ্বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ"। উদ্বোধক অর্থে হেতুস্বরূপ। বিভাব দ্বিবিধ,—আলম্বন ও উদ্দীপন।

যাহাকে অবলম্বন করিয়া জননীর বাৎসল্যরতির অস্তিত্ব সেই সন্তান হইল বাৎসল্যরতির আলম্বন। এখানে সন্তান 'বিষয়রূপ' আলম্বন, এবং জননীও 'আশ্রয়রূপ' আলম্বন। সেইরূপ, নায়কনায়িকাদিকে অবলম্বন করিয়া যে মধুররসোদ্গম হয়, এজন্য একজন অপরজনের আলম্বন, অনন্যভাবে বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। যে সব বস্তু চিত্তস্থিত ভাবকে উদ্দীপিত করে তাহাদের উদ্দীপন-বিভাব বলে। যথা, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, চেষ্টা, সাজসজ্জাদি [প্রসাধন], স্মিত [মন্দহাসি], বংশী, শৃংগ, নূপুর, কম্বু [দক্ষিণাবর্ত পাঞ্চজন্য শংখ], পদচিহ্ন, তুলসী ; অথবা সাধারণ নায়ক সম্পর্কে চন্দ্র-চন্দন-কোকিলকূজন-ভ্রমর-গুঞ্জন, প্রভৃতি।

অনুভাব কাহাকে বলে ? অনু অর্থাৎ পরে যাহা জন্মে তাহা অনুভাব। কোনও বস্তুর অনুভাব হইতেছে সেই বস্তুর পরিচায়ক বহির্বিকার বা লক্ষণ। যেমন, জ্বরের প্রভাব [লক্ষণ] শরীরের উত্তাপ [temperature], ক্রোধের প্রভাব চক্ষুর বা মুখমণ্ডলের রক্তিমা। ভক্তের চিত্তস্থিত যে কৃষ্ণরতি তাহা বাহিরে অনেক প্রকার বিক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে—যথা, নৃত্য, বিলুণ্ঠন, গীত, চীৎকার, হুঙ্কার, দীর্ঘশ্বাস, অট্টহাস্য প্রভৃতি ; আবার রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প, স্বেদ, স্তম্ভ, পুলক, বৈবর্ণ্যও অনুভাব হইতে পারে। এজন্য, অনুভাব দুই শ্রেণীর,—(১) উদ্ভাস্বর [নৃত্যগীতাদি] ও (২) সাত্ত্বিক [অশ্রুপুলকাদি] সাত্ত্বিকভাব আটটি।

ব্যভিচারীভাব কাহাকে বলে ? "ব্যভিচারী" শব্দটি সাধারণ আভিধানিক অর্থে [কদাচারী বা ভ্রষ্টাচারী অর্থে] ব্যবহৃত হয় নাই। বি+অভি+চারী=ব্যভিচারী। বি [বিশেষরূপে] +অভি [স্থায়ীভাবের অভিমুখে]+চারী [গমনকারী]—অর্থাৎ বিশেষ অভিমুখ্যের সহিত স্থায়িভাবের দিকে গমন করে যাহা তাহা ব্যভিচারীভাব। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাই বলিতেছেন,—

"বিশেষেনাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি"।

এজন্য স্থায়ীভাব ব্যতীত অন্যকিছুর সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। ইহার অপর নাম "সঞ্চারী" ; এই ব্যভিচারীভাব [কৃষ্ণরতির] গতিকে সঞ্চারিত করে বলিয়া ইহাকে সঞ্চারীভাবও বলা হয়। ইহাদের সংখ্যা তেত্রিশ। নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শংকা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি (মৃত্যু), আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিথা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ। ইহারা অস্থায়ী। সাগরে তরঙ্গের মত উহারা রত্যাদির উপর কখনও আবির্ভূত হয় কখনও তিরোহিত হয়।

বুঝাগেল যে, বিভাব রত্যাদি স্থায়ীভাবের উদ্বোধক বা 'কারণ' ; অনুভাব, উক্ত রত্যাদি স্থায়ীভাবের বহিঃপ্রকাশ বা 'কার্য', ব্যভিচারীভাব স্থায়ীভাবের উপর সঞ্চরণ করে, আবির্ভাব-তিরোভাবের দ্বারা স্থায়ীভাবের অনুকূলতাচরণ ও পুষ্টিসাধন করে। সাত্ত্বিকভাব, অনুভাবের অন্তর্গত হইলেও ইহা সত্ত্বসম্ভূত চিত্তের বিকার ও বাহ্যলক্ষণ। এজন্য, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের পরস্পর সংযোগে যাহার নিষ্পত্তি হয় তাহাই 'রস'।—

"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ।"

বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন

সপ্তবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন (১৩৭০)

শ্রীসন্তোষ রায়

একশো আটাশ বছর আগে ফাল্গুনের এক শুক্লা রজনীর শেষে, আসন্ন প্রত্যূষে এক নতুন আলোকের বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল এক শিশু—বাবলা আর বাঁশঝাড়ে ঘেরা পল্লী বাংলার এক অখ্যাত গ্রামের এক অতি দীন কুটিরে। সেই শিশুর বিভূতি, তার দীপ্তির ছটা উত্তরকালে সেই গণ্ডগ্রাম থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে শুধু সমগ্র বাংলা তথা ভারতকেই উদ্ভাসিত করেনি, তার আভা ভারত অতিক্রম করেও ছড়িয়ে পড়েছিল জগতের বিভিন্ন প্রান্তে। সেই দীপ্তি আজও অম্লান।—সেই শিশুই ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং তার আবির্ভাবপূত পল্লীগ্রাম—হুগলী জেলার কামারপুকুর।

সেই কামারপুকুর আজও পল্লীগ্রাম হলেও, আজ আর অখ্যাত নয়। সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে সুন্দর মন্দির, অতিথিশালা এবং শিক্ষায়তন ও ছাত্রাবাস। তাছাড়া, সরকারী সহায়তায় ও সাধারণের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা বিদ্যামহাপীঠের বিরাট সৌধ। যে গ্রাম এককালে দুরধিগম্য ছিল, তাও আজ নতুন-নতুন রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণের ফলে সহজগম্য হয়ে উঠেছে।

সেই পুণ্যক্ষেত্র কামারপুকুরে এবারে বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের সপ্তবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে তিন দিন ব্যাপী, গত ২৩শে, ২৪শে ও ২৫শে ফাল্গুন ১৩৭০ (ইং ৭, ৮ ও ৯ই মার্চ, ৬৪) শনি, রবি ও সোমবার। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় একশত সভ্য-সভ্যা প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেছিলেন, তাছাড়া স্থানীয় নিকটবর্তী অঞ্চলের সহস্রাধিক সাহিত্যানুরাগী প্রতিদিন বিভিন্ন অধিবেশনে যোগদান করে সম্মেলনকে সাফল্য মণ্ডিত করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে একটি বলিষ্ঠ অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় এবং সমিতির সম্পাদক হন, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা বিদ্যামহাপীঠের অধ্যক্ষ শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। সম্মিলনের সমগ্র উদ্যোগ আয়োজনের প্রায় একক দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন মহাবিদ্যাপীঠের সম্পাদক, সমাজসেবী ও দেশকর্মী অধ্যাপক শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে সম্মেলনকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য পিতা-পুত্র শ্রীবিমলাকান্ত ও অধ্যক্ষ শ্রীবিনয়কৃষ্ণ তাঁদের সহকর্মী ও ছাত্রবৃন্দের সঙ্গে অক্লান্ত নিষ্ঠায় পরিশ্রম করেছেন।

৭ই বেলা ১১টার ট্রেনে সম্মেলনের মূল সভাপতি, শাখা-সভাপতি ও বিশিষ্ট বক্তাদের নিয়ে সম্মিলনের কর্মকর্তারা ও প্রতিনিধিগণ একত্রে প্রায় ৭৫ জন তারকেশ্বরের ট্রেণে কামারপুকুর যাত্রা করেন। তারকেশ্বরে পূর্বাহ্নেই তিনটি বাস নির্দিষ্ট করা ছিল, তাতে করেই সকলে হরিণখোলা পর্যন্ত গমন করেন। হরিণখোলায় মুণ্ডেশ্বরী নদীর উপর কাঠের সেতু ভগ্ন হওয়ায় যাত্রীদের কিছু দুর্ভোগ ঘটে,—বাস থেকে নদীর ধার পর্যন্ত হেটে এবং খেয়ায় নদী পার হয়ে অপর পারে পুনরায় নির্দিষ্ট বাসে সকলে চড়েন। কামারপুকুরে পৌছাতে প্রায় ৪টা বাজে। সম্মিলনের দুইজন সদস্য ডাঃ শম্ভুচরণ পাল ও শ্রীজয়দেব দত্ত ব্যবস্থাপনার জন্য পূর্বদিনই কামারপুকুর পৌচেছিলেন।

বিদ্যামহাপীঠের সুপ্রশস্ত কক্ষে প্রতিনিধি এবং অন্যান্য সভাপতি ও বক্তাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। মূল সভাপতি শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী এবং বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের সুব্যবস্থাযুক্ত অতিথিশালায় ব্যবস্থা হয়েছিল। মহিলাদের জন্য কিছু

দূরে একটি স্বতন্ত্র গৃহে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং মহিলাদের সেইস্থান থেকে সভামণ্ডপে যাওয়া-আসার জন্য দুটি জীপও রাখা হয়েছিল। দূর পল্লীগ্রামে যেখানে যাওয়া আসা খুব সুগম নয় সেই স্থানে সাময়িক ব্যবস্থা যা' করা হয়েছিল তা' মোটামুটি ভালোই।

বিশ্রাম ও জলযোগের পর সন্ধ্যা ৬টায় পুণ্যক্ষেত্রের শান্ত-সমাহিত পরিবেশে বিরাট চন্দ্রাতপের নীচে সম্মেলনের জন্য নির্দিষ্ট সভামণ্ডপে সাহিত্যানুরাগী প্রতিনিধি ও দর্শকদের এক আশাতীত জনসমাবেশে সম্মিলনের মূল অধিবেশন শুরু হয়। উদ্বোধন সঙ্গীত উদাত্ত কণ্ঠে পরিবেশন করেন সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধক পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় উপস্থিত হতে পারেননি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন উপস্থিত হতে না পারায় তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ ও বিদ্যামহাপীঠের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়ে সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, এবং অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের বিবৃতি পাঠ করেন সম্পাদক শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এরপর সম্মিলনের সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে সম্মিলনের সহসভাপতি শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সম্মিলনের ইতিবৃত্ত, আদর্শ ও বক্তব্য নিবেদন করেন। তিনি বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেন—"সাহিত্যই জাতীয় চরিত্রের দর্পণ স্বরূপ। সাহিত্যই জাতির মন এবং চরিত্র গঠনের সর্বাপেক্ষা সার্থক উপায়। পূর্বপাকিস্তান এবং পশ্চিমবঙ্গ একই ভাষাভাষী। যদি এই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে কখনও কোনও বোঝাপড়া ও সম্প্রীতি স্থাপনের সম্ভাবনা থাকে তো, তা সাহিত্যের মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব।......"

তারপর সম্মিলনের সাধারণ সচিব শ্রীসুরেন নিয়োগীর পক্ষে সম্মিলনের অন্যতম সচিব শ্রীকেশব মুখোপাধ্যায় সম্পাদকীয় বিবৃতি ও কার্যসূচী নিবেদন করেন।

বিবৃতির পর নিম্নলিখিত পরলোকগত ব্যক্তিদের আত্মার কল্যাণ কামনাকরে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১। ডঃ শিশিরকুমার মিত্র ২। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩। সুকুমার সেন আই, সি, এস, ৪। ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৫। ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ৬। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৭। তিনকড়ি দত্ত ৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য।

এরপর সম্মিলনের উদ্যোগে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের অবদান বিষয়ে যে ভাষণ প্রতিযোগিতা ২৩, ২, ৬৪ তারিখে মহাজাতি সদন সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রথম স্থান অধিকারী বেলুড় বিদ্যামন্দিরের ছাত্র শ্রীতপন দেবকে সম্মিলনের পক্ষে 'শর্বাণী স্মৃতি বিবেকানন্দ পদক' পুরস্কার অর্পণ করেন মূল সভাপতি শ্রীনরেন্দ্র দেব।

এরপর মূল সভাপতির অভিভাষণে শ্রীনরেন্দ্র দেব সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করে বর্তমান সাহিত্য প্রসঙ্গে বলেন—"দিন বদলের পালার সঙ্গে আমাদের জীবন ধারারও পরিবর্তন ঘটছে, সমাজ এগিয়ে চলেছে। মানুষের সংস্কার, অভ্যাস ও আদর্শও বদলে যাচ্ছে।......

...সাহিত্যের আদর্শও বদলে যাচ্ছে। অতি আধুনিক সাহিত্যের গতি চলেছে নব রোমান্সের বাস্তবতার সন্ধানে যার ভিত্তি কঠিন কঠোর এই মাটির পৃথিবীতে, কল্পলোকে স্বপ্নরাজ্যে নয়। জীবনের নিষ্ঠুর নগ্নসমস্যা যা আজকের মানুষকে দিশেহারা করে তুলেছে, সেই সমস্যা-পীড়িত নরনারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক দুর্গতজীবনের কাহিনীই অতি আধুনিক কথা সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে উঠেছে। মানুষ হতভাগ্য হলেও তার জীবন একেবারে শুষ্ক রসহীন পাষাণে পরিণত হয় না। উপলখণ্ডেও যেমন রংএর জলুস দেখা যায়, রেখার বৈচিত্র্য দেখা যায়, অধঃপতিত মানুষের সমাজেও রোমান্সের নিঃশেষ মৃত্যু হয় না। আধুনিক সাহিত্য আমাদের কাছে এতকালের অবজ্ঞাত সেই মানুষগুলির জীবনরহস্য প্রকাশ করে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করেছে এবং আমাদের এত দিনের এক-পেশো সাহিত্যকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছে। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক উপন্যাসগুলি নিছক কাহিনী-সর্বস্ব নয়; রোমান্সই তাদের একমাত্র মূলধন নয়। এর মধ্যে আছে ইতিহাসের তথ্য, সমাজের এতাবৎ অপ্রকাশিত তত্ত্ব।......

...বর্তমান কথাসাহিত্য মানব জীবনের ও সমাজের বাস্তব চিত্র এঁকে আমাদের চোখের সামনে আয়নার মতো ধরেছে। সে সত্যের স্বরূপ দেখে শিউরে উঠলে সত্য কখনও মিথ্যা হয়ে যাবে না।"

রাত্রে বিষ্ণুপুরের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণ রাগসঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং পরে চন্দননগরের 'নট ও নাট্য' সম্প্রদায় চন্দ্রগুপ্ত নাটক অভিনয় করেন।

পরদিন সকালে কথা সাহিত্যের অধিবেশন বসে। সভাপতি শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত হতে না পারায় অধ্যক্ষ শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন,—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরকুমার মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, নক্ষত্র রায়, মুরারি মহিন্তামণি, মনোরঞ্জন গুপ্ত, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্তা দীপ্তি দাশগুপ্ত।

শ্রীশাস্ত্রী বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ও ছোট গল্প বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা করেন। তিনি বর্তমানের উপন্যাস সম্বন্ধে বলেন,—বৃহৎ উপন্যাস লেখার একটা ঝোঁক এসেছে এবং তার জন্য একটা অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা চলেছে। এ কারণে উপন্যাসের মানেরও অবনতি ঘটছে। বঙ্কিমের উপন্যাসের আয়তন আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার কথা সাহিত্য ও উপন্যাস সম্বন্ধে বলেন,—বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের যে নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে তা খুবই স্বাভাবিক। ...কল্লোল যুগের প্রচেষ্টাকাল পার হয়ে গেছে। আজ বিস্তৃতির এবং বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি অধিক।...বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি বলেন, মনস্তত্ত্বকে বঙ্কিম গভীর ভাবে দেখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সমাজের গণ্ডি ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারেননি।...শরৎচন্দ্র চরিত্রকে কাহিনীর আগে রেখে এবং সামাজিক সমস্যার প্রশ্ন উত্থাপন করে উপন্যাস সৃষ্টির যে পথ খুলে দিয়ে গেছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।...প্রেমের সংগ্রামী ও কঠোর রূপ শরৎচন্দ্রের রচনায় রয়েছে, কিন্তু সাহসের অভাবে তিনি তাঁর নায়ক-নায়িকাকে পূর্ণ রূপ দিতে পারেননি।"

শ্রীসুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে, বর্তমান সাহিত্যিকরা যে তাঁদের সৃষ্টির সাহায্যে পাঠকের মনের রস-পিপাসা মেটাতে পারছেন না এবং কোনও পথের সন্ধান দিতে পারছেন না—সে সম্বন্ধে একটি বেদনাজনক জিজ্ঞাসা উত্থাপন করেন।

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত বলেন যে,—"যে কোনও সৃষ্টি আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখি, তার অলক্ষ্যে একটা বুনিয়াদ থাকে। শাশ্বত বস্তু সেই বুনিয়াদের মধ্যে থাকে—সাহিত্যের প্রাসাদও সেইরূপ বুনিয়াদের ওপরই নির্মিত হয়ে থাকে।...শ্লীলতা ও অশ্লীলতার সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন। যে সৃষ্টি অসৎ প্রবৃত্তির দিকে আকৃষ্ট করে তাই অশ্লীল। সাহিত্যে যেমন রস সৃষ্টি করতে হবে, তেমনি তাকে সংযতভাবে পরিবেশন করারও দায়িত্ব থাকা দরকার।...রসে এবং বশে থাকাই সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি।"

সভাপতি শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু সমগ্র আলোচনার উপর একটি সংক্ষিপ্ত এবং মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। বৃহৎ উপন্যাস রচনা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, এটা কোনও একটা সমস্যা নয়—লেখকের মনে যে ঔপন্যাসিক চেতনা আসে তা' সব সময়ে অল্পকথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া বর্তমানের ঔপন্যাসিকরা লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে এক সূতায় বাঁধবার চেষ্টা করেছেন।

বিকাল সাড়ে তিনটায় শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রবন্ধ শাখার অধিবেশন বসে। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীপ্রফুল্ল দাশগুপ্ত, ও ডাঃ বঙ্কিম শেঠ এবং চিত্রশিল্পী শ্রীপূর্ণ চক্রবর্তী চিত্রকলা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। 'শিল্প সংস্কৃতি—রাজা-রাণী মন্দির, ভুবনেশ্বর' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীবীরেন রায়।

সভাপতি অধ্যাপক সেনশাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন..."আমাদের মধ্যে যে কবি-পুরুষ আছেন, তিনি নব-নব সৃষ্টির মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকাশ করেন, আর যিনি মননশীল পুরুষ তিনি বিচার বিশ্লেষণ করেন, তর্ক-যুক্তির আশ্রয় লন, স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন করেন। এই মনস্বী পুরুষের আত্মপ্রকাশের বাহন গদ্য,—সাহিত্য, শিল্প সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার কৌতূহল জাগ্রত। এই ধীমান পুরুষই নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন, আর এই প্রবন্ধ যখন সাহিত্য গুণে মণ্ডিত হয়, তখন আমরা তাহাকে বলি প্রবন্ধ সাহিত্য।

...আমরা জানি, কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে হইলে

দুইটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন,—সংহত ও পরম্পরা-যুক্ত চিন্তা ও ঋজু প্রকাশ ভঙ্গি।"

ইহার পর প্রবন্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি 'কয়েকজন বিস্মৃতপ্রায় বা বিস্মৃত প্রবন্ধ-লেখকের সম্বন্ধে উদ্ধৃতি সহযোগে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন; এবং উপসংহারে বলেন,—"একালের প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য না করিয়াও এ-কথা বলা যায় যে বাঙ্গালীর জীবনে আজ ব্যাপকভাবে চিন্তার দুর্ভিক্ষ বা দৈন্য প্রকট হইয়াছে এবং প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনীষীর অভাব ঘটিয়াছে।…আজ জাতির পরম দুর্দিনে, জাতি যখন প্রায় জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন সময়ে, সেই ঋজু মেরুদণ্ডসম্পন্ন মনস্বী লেখক কোথায়, যিনি বহুশ্রুত অথচ দেশপ্রেমিক, যিনি সহস্র বিপর্যয়ের মধ্যেও মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইতে পারেন? কে এই দুরূহ ব্রত সাধনে প্রস্তুত হইবেন?…

…আজ প্রবন্ধকারদের নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে। তাঁহারা একদিকে হইবেন রসস্রষ্টা, অপর দিকে আচার্য বা লোকশিক্ষক। বাঙ্গালী পাঠক গুরু-গম্ভীর বিষয় পড়িতে চাহে না বলিয়া অভিযোগ করিলে চলিবে না, পাঠকদের জঠরে যাহাতে জারকরসের আধিক্য ঘটে, সমাজচিকিৎসক রূপ প্রবন্ধকারদের সেই ব্যবস্থাই করিতে হইবে।"

শিশু সাহিত্যের জন্য স্বতন্ত্র কোনও অধিবেশন না-হওয়ায় প্রবন্ধসাহিত্য অধিবেশনেই শিশু সাহিত্যের আলোচনা হয়। শিশু সাহিত্য বিষয়ে শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবীর প্রবন্ধ তাঁর অনুপস্থিতিতে পাঠ করেন শ্রীপ্রফুল্ল দাশগুপ্ত। শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা তাঁর প্রবন্ধে বলেন—"…এখন সাহিত্যে তথা শিশুসাহিত্যিকের নীতি কথাটা হাস্যকর হয়ে গেছে। আবার শিশু সাহিত্যের কাছে নেই সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া—যাতে চড়িয়ে শিশুকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক অনাস্বাদিত অলৌকিক জগতে পৌঁছে দিতে পারা যাবে। অথচ, না-পারার বেদনাবোধ আছে। কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ তার চেতনা আছে।

কাজে কাজেই তর্ক উদ্দাম হয়ে উঠছে। শিশু-সাহিত্যিক কোন পথ ধরে চলবেন, তার মীমাংসা হচ্ছে না। অবশ্য কোনও ব্যাপক চিন্তাই কখনো আলোচনার মাধ্যমে একটা নিশ্চিত মীমাংসায় পৌঁছতে পারে না, তবু আলোচনাই জীবনের লক্ষণ।……"

উপসংহারে তিনি বলেন—"শিশু-সাহিত্যিকদের কাছে একটি মাত্রই অনুরোধ তাঁরা যেন শিশুসাহিত্যের জন্য কলমধরার সময় নিজের বাড়ির ছেলেমেয়েগুলির কথা একবার হৃদয়ে আনেন। যে কথা সেই ছেলেমেয়েদের মুখে শুনলে তাঁর নিজের পিত্ত জ্বলে ওঠে, সে ধরণের কথা যেন তাঁর গল্পের ছেলেমেয়েরা না বলে, আর যে কুশ্রীতা বা যে বিটকেলমি নিজের ছেলেমেয়েদের চোখে পড়লে তিনি বিচলিত হন, সেই ধরণের দৃশ্যের অবতারণা তাঁর শিশুসাহিত্যের মধ্যে না করেন।"

এরপর শ্রীউৎপল হোম রায় শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

ঐদিন সন্ধ্যায় কাব্যশাখার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনুপস্থিতিতে সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী।

স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন,—কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল বটব্যাল, মুরারি মহিন্তামণি, সুধাংশু চৌধুরী, সলিল মিত্র, বীরেন রায়, আবদুর রহমান কবিরত্ন, অনিল চন্দ্র, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, নিত্যগোপাল পাল, বিনয়কৃষ্ণ তরফদার, অজিতকুমার ভট্টাচার্য এবং সৌরীন্দ্রকুমার দে।

শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী তাঁর ভাষণে বলেন,—"পঠিত কবিতাগুলির মধ্যে আজকের দিনের বেদনায় আভাস পেলাম। আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে গ্রহণ করেই কবিতা জন্ম লাভ করে। কাব্য এমন একটি শিল্প, যাকে সুস্পষ্ট কতকগুলি সংজ্ঞা দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না।—

…কবিতা জীবনের মহৎ আশ্রয়—এর কোনও তুলনা নেই।…মানুষের সীমিত জীবনের সুখস্রোতে পাওয়া না-পাওয়ার অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারে আনন্দের মাধ্যমে সঙ্গীত।

…মহৎ শিল্প বুদ্ধি করে, পরামর্শ করে, কসরৎ দিয়ে হয় না। আপনা হতে হয়ে ওঠাই শিল্পের বৈশিষ্ট্য।"

রাত্রি আটটায় ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত শ্রীশ্রীজননী সারদামণির পুণ্য জীবনী অবলম্বনে বিরচিত

সঙ্গীত বহুল সংস্কৃত নাটক—"শক্তি-সারদম" পরিবেশন করেন 'প্রাচ্যবাণী'র শিল্পীবৃন্দ। ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও রমা চৌধুরী উভয়েই উপস্থিত থেকে অভিনয় পরিচালনা করেন। বহু বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিসহ সহস্রাধিক দর্শক এই অভিনয় উপভোগ করেন।

পরদিন ৯ই মার্চ, ৬৩, সকালে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের জন্য কোনও অধিবেশনের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ইতিপূর্বেই বহু প্রতিনিধি জয়রামবাটি ও নিকটস্থ বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। এই দিন সকালে একটি বিশেষ বাস-এর ব্যবস্থা করে চল্লিশজন প্রতিনিধি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্য জন্মস্থান বীরসিংহ দর্শন করিতে যান। গড় মন্দারণের প্রাকারের ধ্বংসস্তূপও দেখা যায়।—এগারটায় ফিরে স্নানাহার ও দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের পর বিকাল ৪টায় নাট্য-সাহিত্যের অধিবেশন বসে। নাট্য-সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীসাধনচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং উদ্বোধক শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী উভয়েই অনুপস্থিত থাকায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ডাঃ ইন্দুভূষণ রায় ও শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর লিখিত উদ্বোধনী ভাষণ পাঠ করেন সম্মিলনের অন্যতম সচিব শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার দে; আলোচনায় যোগদান করেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকেশব মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ নির্মল সরকার।

সভাপতি ডাঃ ইন্দুভূষণ রায় তাঁর ভাষণে নাটক ও নাট্যসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আলোচনা করেন। যুগের পরিবর্তন নাট্যসাহিত্যের ও অভিনয় পদ্ধতির পরিবর্তন হবেই এবং হওয়া প্রয়োজন—একথা স্বীকার করে, তিনি বর্তমানে নাটক ও অভিনয়ের উৎকর্ষতার অভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। নাটকের ভাষা ও সংলাপ যে অভিনয়কে কত উন্নত এবং দর্শককে কত প্রভাবিত করে তা' তিনি কয়েকটি আবৃত্তির সাহায্যে বুঝিয়ে দেন। বর্তমানে আঙ্গিক, আলোকসম্পাত ও আনুষঙ্গিকের প্রাধান্যের জন্য অভিনয় ব্যাপারটি পরোক্ষ হয়ে গেছে, সে কারণেই প্রকৃত নিষ্ঠাবান অভিনেতার সাক্ষাৎ মেলে না।

মূল সভাপতি শ্রীনরেন্দ্র দেবও আলোচনায় যোগদান করেন।

সন্ধ্যায় বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশন বসে—সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন বিজ্ঞানাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী শ্রীসহায়রাম বসু। স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞানাচার্যকে মাল্যদান করা হয়। 'অক্সিজেন' বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত।

সভাপতি মহাশয় তাঁর অভিভাষণে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তাঁর দৃঢ় মত ব্যক্ত করেন। এই বিষয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্বের সকল উন্নত দেশেই মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষতাই বর্তমান সভ্যতার মাপকাঠি, আমাদেরও মাতৃভাষার মাধ্যমেই বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য অতুল এবং বিজ্ঞান শিক্ষা দানের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী, পরিভাষার জন্য অপেক্ষা না করে অবিলম্বে ব্যবস্থা শুরু করে দেওয়া দরকার—পরিভাষা আপনা থেকেই গড়ে উঠবে। বহু দিনের পরাধীনতার ফলে আমাদের নিজের ভাষার ওপর আমরা আস্থা হারিয়ে ফেলেছি; আমরা মনে করি, ইংরাজী ছাড়া গতি নেই। এই ভুল ভাঙ্গতে বাংলা ভাষার চর্চা অধিকতর নিষ্ঠার করতে হবে এবং দেশবাসীর কাছে বাংলা ভাষার মাধ্যমেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে হবে।

এর পরই সমাপ্তি অধিবেশনে মূল সভাপতি শ্রীনরেন্দ্র দেব তিন দিন ব্যাপী অধিবেশনের আলোচনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরে সম্মেলনের পক্ষ থেকে শ্রীপ্রফুল্ল দাশ গুপ্ত অভ্যর্থনা সমিতির ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব সহ ছ'টি প্রস্তাব উত্থাপন করলে শ্রীকেশব মুখোপাধ্যায় সমর্থন করেন এবং সেগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এরপর অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনকে এবং যাঁরা এই সম্মেলনকে সাফল্য মণ্ডিত করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

রাত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা 'অলীক-বাবু' নাটক অভিনয় করে সকলকে পরম পরিতৃপ্তি দেন।

অধিবেশনের তিন দিন ব্যাপী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,

বিষ্ণুপুর শাখা প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষ্যে বাংলা পত্র-পত্রিকারও একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল।

সম্মিলনের সুযোগ্য সাধারণ সচিব শ্রীসুরেন নিয়োগী বার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থাপনার কঠিন-সাধ্য দায়িত্ব যোগ্যতার সহিতই পালন করেছেন। তাঁকে যথোচিত সহায়তা করেছেন সচিবদ্বয় শ্রীকেশব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার দে এবং সম্মেলনের কোষাধ্যক্ষ শ্রীপ্রফুল্ল দাশগুপ্ত ও সংগঠন সম্পাদক শ্রীঅনিল চক্রবর্তী। অধিবেশনগুলি সাধারণ সচিবের পক্ষে পরিচালনা করেন উপরোক্ত দুই সচিব।

১০ই মার্চ ৬৪, মঙ্গলবার প্রত্যুষে প্রতিনিধিগণ পুণ্য ভূমির ধূলিকণা মাথায় ও সর্বাঙ্গে গ্রহণ করে স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করেন

জলে-ডাঙ্গায়

—আব্রাহাম রচিত

শ্রী'শ'—

॥ পুরস্কার ॥

১৯৬৩ সালের শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্রের সম্মান বাংলা ছবির ভাগ্যে এবার মিলল না। অনেকেই হয়ত আশা করেছিলেন সত্যজিৎ রায়ের "মহানগর" চিত্রটিই এবার শ্রেষ্ঠ চিত্র রূপে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল হিন্দী চিত্রই এবার শ্রেষ্ঠ বলে মনোনীত হল। খাজা আহম্মদ আব্বাসের "শেহর অওর সপ্না" ১৯৬৩ সালের শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্র রূপে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ পদক লাভ করেছে। আর "মহানগর" পেয়েছে তৃতীয় পুরস্কার। বাংলার বিমল রায়ের হিন্দী চিত্র "বন্দিনী" এবং উত্তমকুমার প্রযোজিত ও অসিত সেন পরিচালিত বাংলা চিত্র "উত্তর ফাল্গুনী" শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক চিত্ররূপে রাষ্ট্রপতির রৌপ্য পদক লাভ করেছে। 'উত্তমকুমার ফিল্মস'-এর সদ্যমুক্ত "জতুগৃহ" চিত্রটিও 'সার্টিফিকেট অফ মেরিট' পেয়েছে।

বাংলা চিত্র এ বৎসর শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মান না পেলেও, বাংলা ছবি যে পিছিয়ে পড়ে নি এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। বাঙ্গালী অভিনেত্রী, বাঙ্গালী পরিচালক এবং বাংলা চিত্রের সুনাম আজ বিদেশেও পরিব্যাপ্ত, পুরস্কারে সম্মানিত। কিন্তু তবু বলব বাংলা চিত্রের অগ্রগমন ঠিক আশানুরূপ হচ্ছে না। প্রগতির ছাপ, নতুনত্বের স্বাদ, অভিনয়ের কুশলতা, পরিচালনার দক্ষতা—সবই আছে, কিন্তু ব্যাপকভাবে নয়, ছাড়া ছাড়া ভাবে। যখন একটি চিত্রে এর সবকটির সমাবেশ ঘটে তখন তা স্ফুলিঙ্গের আকারে উদ্ভাসিত হয়ে চিত্র জগতকে আলোকিত করে তোলে। কিন্তু এ রকম ছবি সবসময় তৈরী হয় না। অনেক সময় রাষ্ট্রিয় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্রও সর্ব্বগুণান্বিত হয় না। সাধারণ ভাল বিকেই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে সত্যকার উৎকৃষ্ট চিত্রের অভাবে। কিন্তু ব্যাপকভাবে উৎকৃষ্ট চিত্র নির্ম্মাণ করতে না পারলে সামগ্রীক ভবে চিত্রের উন্নতি হয়েছে বলা চলে না। পুরস্কার পাওয়া সত্বেও বাংলা ও সর্ব্বভারতীয় সবরকম চিত্রের পক্ষেই এই কথা বলা চলে। তাই বাংলা তথা ভারতীয় চিত্র নির্ম্মাতাদের অনুরোধ তাঁরা যেন পুরস্কার লাভ করে বা দু'একটি বিদেশী সম্মানে সন্তুষ্ট হয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ না করে সামগ্রীক ভাবে কি করে চিত্রের—সর্ব্বস্তরের চিত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি করা যায় সেই চেষ্টাই যেন করেন।

*　　*　　*　　*

খবরাখবর ঃ

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের বহু পঠিত উপন্যাস "পদ্মানদীর মাঝি"-কে চিত্রে রূপায়িত করবার ব্যবস্থা হয়েছে। সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদারের পরিচালনায় ও 'এস, আর, ফিল্মস'-এর প্রযোজনায় শীঘ্রই চিত্রটির সুটিং আরম্ভ হবে।

*　　*　　*　　*

প্রযোজক আর, ডি, বন্শল একটি ব্যয়বহুল ভোজপুরী চিত্র নির্ম্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। চিত্রটির নাম "মেরে মন মিতবা" এবং এর সুটিং শীঘ্রই কলিকাতায় আরম্ভ হবে। ছবিটির প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করবেন নাজ, হেলেন, সুজিতকুমার, বেলা বসু, বিপিন গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী ও 'শেহর অওর সপ্না'-খ্যাত নবাগত দিলীপরাজ।

*　　*　　*　　*

"অন্তরাল" নামের একটি নতুন চিত্র নির্ম্মিত হবে অগ্রদূত গোষ্ঠীর পরিচালনায়। অভিনয়াংশে থাকবেন বিকাশ রায়, অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, ছায়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি। ছবিটির সুটিং আগামী মাসে আরম্ভ হবে।

*　　*　　*　　*

"আলোর পিপাসা" নামের একটি নতুন ছবির বহির্দৃশ্য পাটনা, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে গৃহীত হবে।

ছবিটির পরিচালক তরুণ মজুমদার তাই তাঁর কলাকুশলীদের নিয়ে যাত্রা করে গেছেন ঐ সব স্থানের উদ্দেশে।

* * * *

"মহুয়া বনের ছায়া" নামে একটি নূতন ধরনের চিত্র নির্মিত হচ্ছে। পরিচালনা করছেন সুধীর মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করবেন পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, পদ্মা দেবী, লিলি চক্রবর্ত্তী, আশীষকুমার ও সুমিতা সান্যাল।

* * * *

'ঈগল ফিল্মস' ইষ্টম্যান্‌কলারে "আম্রপালী" নামের একটি ব্যয়বহুল চিত্র নির্মাণ করছেন। চিত্রটির মহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে অজন্তা গুহায় এবং এর অধিকাংশ দৃশ্যের সুটিং হবে অজন্তার বাস্তব পটভূমিকায়। প্রধান ভূমিকায় আছেন সুনীল দত্ত ও বৈজয়ন্তীমালা। চিত্রটি পরিচালনা করছেন 'প্রফেসর'-খ্যাত ট্যাগুন এবং প্রযোজনা করছেন এস, সি, মেহরা।

* * * *

'গুপ্তনী প্রডাক্‌সন্স'-এর "নিশাচর" চিত্রটির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত এই অপরাধ চিত্রটির পরিচালনা করেছেন ভূপেন রায়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, সুমিতা সান্যাল, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

* * * *

দেশে বিদেশে ঃ

"এপ্রিল ফুল" নামের একটি ব্যয়বহুল চিত্র ইষ্টম্যান্‌ কলারে তুলছেন প্রযোজক-পরিচালক সুবোধ মুখোপাধ্যায়। চিত্রটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দশ মিনিট ব্যাপি একটি জল-নৃত্যের (water ballet) দৃশ্য। এই নৃত্যের জন্যে ফরাসী রাজধানী প্যারিস থেকে পনেরটি নর্ত্তকীকে আনা হবে এবং নৃত্য-পরিকল্পনাও করা হবে একটি ফরাসী শিল্পীর দ্বারা। ছবির নায়িকা সায়রা বানু এই জল-নৃত্যে প্রধান ভূমিকায় থাকবেন এবং বোম্বের কোনও হোটেলের সুইমিং পুল-এ এই নৃত্য দৃশ্যটি গৃহীত হবে। নায়কের ভূমিকায় আছেন বিশ্বজিৎ এবং অন্যান্য ভূমিকায় দেখা যাবে সজ্জন, আই-এস-জহর, নাজিমা, চাঁদ উসমানী প্রভৃতিকে। চিত্রটির গল্পাংশ লিখেছেন সুবোধ মুখোপাধ্যায় এবং সঙ্গীত রচনা করেছেন শঙ্কর জয়কিষণ।

* * * *

মার্ক রবসন-এর "Nine Hours to Rama" চিত্রে গান্ধীজীর চরিত্রাভিনেতা জে, এস, কাশ্যপ্‌ এবার নিজে গান্ধীজীর একটি কাহিনী চিত্র নির্মাণ করবার মনস্থ করেছেন। কয়েকজন নাম করা লেখকের সাহায্যে তিনি ইতিমধ্যে ছবিটির গল্পাংশ লিখে ফেলেছেন এবং ভারত সকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁদের অনুমোদনের জন্য। প্রাক্তন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও তেহরী গারওয়াল্‌ ষ্টেটের চীফ্‌ সেক্রেটারী এবং বর্ত্তমানে অভিনেতা কাশ্যপ নিজেই এই চিত্রে গান্ধীজীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন। "নাইন্‌ আওয়ারস্‌ টু রাম"-এ গান্ধীজীর ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি ইতিমধ্যেই ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রশংসা লাভ করেছেন। শ্রীকাশ্যপ জানিয়েছেন যে প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক বিমল রায়ের উপরই তিনি এই চিত্রটির পরিচালনা ভার দিতে চান। চিত্রটি হিন্দী ভাষাই হবে। তবে একটি ইংরাজী সংস্করণও তৈরী হতে পারে।

* * * *

ব্রিটিশ চিত্র প্রযোজক Richard Attenborough ও গান্ধীজীর জীবনী নিয়ে একটি চিত্র নির্মাণ করতে ইচ্ছুক। তিনিও তাঁর এই গান্ধী-চিত্রের একটি স্ক্রিপ্ট ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন অনুমোদনের জন্য।

* * *

মালয় ও সিঙ্গাপুরে টেলিভিসন্‌ চালু হওয়ায় ভারতীয় চিত্রের রপ্তানি ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে আরম্ভ হয়েছে। ঐ দু'টি দেশে বেশ কিছু ভারতীয় চিত্র রপ্তানি হয়ে থাকে; কিন্তু টেলিভিসন্‌ চালু হওয়ার ছয় মাসের মধ্যেই ভারতীয় চিত্রের চাহিদা হ্রাস পেতে আরম্ভ করেছে। প্রায় ১০০০০০ টেলিভিসন্‌ সেট ইতিমধ্যেই ওদেশে বিক্রি হয়ে গেছে। শীঘ্রই Kuala Lumpur-এও টেলিভিসন্‌ চালু করা হবে বলে জানা গেছে।

* * *

আমেরিকাতেও টেলিভিসন্‌ চালু হবার পর চিত্র ব্যবসায় বিশেষ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। টেলিভিসনের আকর্ষণে অনেকেই চলচ্চিত্র দেখা কমিয়ে ফেলেন। কিন্তু অধুনা চলচ্চিত্র দর্শকের সংখ্যা বাড়তির পথে বলে ওখানকার বাণিজ্য বিভাগ জানিয়েছেন। তাঁদের প্রদত্ত সাপ্তাহিক গড় পড়তা সংখ্যা থেকে জানা যায় যে ১৯৬১ সালে ৪১,৬০০,০০০; ১৯৬২ সালে ৪২,৫০০,০০০ এবং ১৯৬৩ সালে ৪৩,০০০,০০০ দর্শক চলচ্চিত্র দর্শন করেছেন।

তারকা সমাবেশ

(বামদিক থেকে) কানন দেবী, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, সুচিত্রা সেন, সত্যজিৎ রায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মঞ্জু দেকে মন্ত্রী জগন্নাথ কোলের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

খুব সম্ভব টেলিভিসন্ দেখতে দেখতে একঘেয়ে লাগায় মার্কিণ দর্শকদের মনের এই পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

*   *   *

হলিউডের Academy of Motion Picture Arts and Sciences-এর যে বার্ষিক 'Academy Award' অনুষ্ঠান এই এপ্রিল মাসে হবে, তাতে পাঠাবার জন্য "Call of the Flute" নামে ইষ্টম্যানকলারে তোলা ভারত সরকারের ফিল্ম-ডিভিসনের ডকুমেণ্টারী চিত্রটিকে মনোনীত করা হয়েছে। এই প্রামাণ্য চিত্রটি মণিপুরে গৃহীত হয়েছে এবং এতে রাধাকৃষ্ণ নৃত্য, লাস্য নৃত্য, প্রভৃতি কয়েকটি নৃত্য দৃশ্য আছে। ছবিটি শীঘ্রই সর্ব্বভারতে মুক্তি লাভ করবে।

*   *   *

২৯শে মে, অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ শহরে যে চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হবে তাতে পাঠানর জন্য ভারত সরকার কর্তৃক তপন সিংহ পরিচালিত 'উত্তমকুমার ফিল্মস'-এর "জতুগৃহ" চিত্রটি মনোনীত হয়েছে।

*   *   *

হলিউডের বিখ্যাত 'ভিলেন্' (দুর্ব্বৃত্ত) চরিত্রাভিনেতা পিটার লোর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নিজের বাড়ীতে বিছানার নিকট তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খুব সম্ভব হৃদরোগের আক্রমণেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। কিছুদিন আগে হলিউডের আর একজন খ্যাতনামা অভিনেতা অ্যালান্ ল্যাড্-এরও অনুরূপভাবে মৃত্যু হয়েছে।

মৃত্যুকালে লোর বয়স ৫৯ বৎসর হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী ও এক কন্যা আছেন। পিটার লোর জন্ম হাঙ্গেরীতে। ছেলেবেলায় তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে নাটক দলে যোগ দেন, কিন্তু সুনাম অর্জ্জন করেন চলচ্চিত্রে নেমে। বহু ভয়াবহ দুর্ব্বৃত্ত চরিত্রকে পিটার লোর চলচ্চিত্রে অবিস্মরণীয় করে রেখে গেলেন।

সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

বিশ্ব হেভীওয়েট মুষ্টি যুদ্ধ ঃ

বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান সনি লিস্টন বনাম ক্যাসিয়াস ক্লে'র বিশ্ব-খেতাবের লড়াইয়ে ক্লে শেষ পর্য্যন্ত সপ্তম রাউণ্ডে টেকনিক্যাল নক্-আউটে জয়ী হয়েছেন। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফ্লয়েড প্যাটারসনকে প্রথম রাউণ্ডেই নক্-আউট ক'রে লিস্টন প্রথম বিশ্ব হেভী-ওয়েট চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন। লিস্টন পুনরায় ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে প্যাটারসনকে প্রথম রাউণ্ডেই নক-আউট করে তাঁর বিশ্ব-খেতাব সম্মান অক্ষুন্ন রাখেন। ক্যাসিয়াস ক্লের বিপক্ষে লিস্টনের এই লড়াইটি ছিল খেতাব-অক্ষুন্ন রাখার দ্বিতীয় লড়াই। ক্লের হাতে লিস্টনের এই পরাজয় তাঁর পেশাদারী খেলোয়াড়-জীবনের দ্বিতীয় পরাজয়। ক্লে গত ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকের লাইট-হেভীওয়েট বিভাগে স্বর্ণ পদক লাভ করেছিলেন। লিস্টনের বিপক্ষে ক্লের এই লড়াইটি ছিল তাঁর পেশাদারী খেলোয়াড়-জীবনের ২০তম লড়াই।

জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান :

ক'লকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে ২১তম জাতীয় এবং দ্বিতীয় আন্তঃরাজ্য ক্রীড়ানুষ্ঠানের এ্যাথলেটিক্স বিভাগে পাঞ্জাব সর্ব্বাধিক পদক অর্জন ক'রে শীর্ষস্থান লাভ করে। দ্বিতীয় স্থান পায় মহারাষ্ট্র। প্রথম স্থান অধিকারী পাঞ্জাব পায় ৪২টি পদক (স্বর্ণ ২৩, রৌপ্য ১৩ এবং ব্রোঞ্জ ৬)। বাংলা দেশের পদক সংখ্যা ছিল ২৭ (স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ৮ এবং ব্রোঞ্জ ১৫)। পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে বাংলা দেশ কোন স্বর্ণ পদক অর্জ্জন করতে পারেনি। বাংলা মোট ৪টি স্বর্ণ পদক পায়—বালিকা বিভাগে ৩টি এবং বালক বিভাগে ১টি। পুরুষ বিভাগে বাংলার পদক ছিল মোট ৬টি (রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ৪), মহিলা বিভাগে মোট ৫টি (ব্রোঞ্জ ৫), বালক বিভাগে মোট ৮টি (স্বর্ণ ১, রৌপ্য ৩ এবং ব্রোঞ্জ ৪) এবং বালিকা বিভাগে মোট ৮টি (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ৩ এবং ব্রোঞ্জ ২)।

এ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠানে সর্ব্বাধিক ৩টি ক'রে স্বর্ণপদক লাভের গৌরব লাভ করেন মাত্র দু'জন—বালক বিভাগে পাঞ্জাবের পার্ভিনকুমার এবং বালিকা বিভাগে দিল্লীর জর্জিনা ওয়েকফিল্ড। এই সর্ব্বাধিক স্বর্ণপদক লাভ ছাড়াও পার্ভিনকুমার হ্যামার থোতে নতুন ভারতীয় রেকর্ড (দূরত্ব ৫৩.৭৬ মিটার) এবং জর্জিনা ওয়েকফিল্ড ২০০ মিটার দৌড়ে নতুন ভারতীয় রেকর্ড (সময় ২৭.৪ সেঃ হিটে) স্থাপন করেন।

যাঁরা তিনটি এবং দু'টি ক'রে স্বর্ণপদক অর্জ্জন করেছিলেন তাঁদের তালিকা :

পুরুষ বিভাগ

২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড় : মাখন সিং (পাঞ্জাব)।

মহিলা বিভাগ

২০০ ও ৮০০ মিটার দৌড় : ষ্টিফি ডিসুজা (মহারাষ্ট্র)।

সটপুট ও জাভেলিন : এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট পাঞ্জাব)।

বালক বিভাগ

২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড় : নোয়েল তির্কি (বিহার)।

লং-জাম্প এবং ট্রিপল-জাম্প : কে পি চন্দ্রশেখর নায়ার (কেরালা)।

সটপুট, ডিসকাস এবং হ্যামার : পার্ভিন কুমার পাঞ্জাব)।

বালিকা বিভাগ

৫০, ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড় : জর্জিনা ওয়েকফিল্ড দিল্লী)।

নতুন রেকর্ড

পুরুষ বিভাগ

গুরবচন সিং (দিল্লী)

১১০ মিটার হার্ডলস :

সময় : ১৪.৪ সেকেণ্ড (হিট)

দয়াল সিং (পাঞ্জাব)

৮০০ মিটার দৌড় :

সময় : ১ মিঃ ৫০.২ সেঃ

মহিলা বিভাগ

৮০০ মিটার দৌড় : ষ্টিফি ডিসুজা (মহারাষ্ট্র)
সময় : ২ মিঃ ২২.৬ সেঃ (ফাইনাল)

সটপুট : এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট (পাঞ্জাব)
দূরত্ব : ১১.১৪ মিটার

বালিকা বিভাগ

২০০ মিটার দৌড় : জর্জিনা ওয়েকফিল্ড (দিল্লী)
সময় : ২৭.৪ সেঃ (হিট)

৪ × ১০০ মিটার রীলে : বাংলা। সময় : ৫৩ সেঃ

বালক বিভাগ

৪০০ মিটার দৌড় : নোয়েল তির্কি (বিহার)
সময় : ৫১.১ সেঃ

হ্যামার থ্রো : পরভীন কুমার (পাঞ্জাব)
দূরত্ব : ৫৩.৭৬ মিটার

জাতীয় জিমন্যাস্টিক

চূড়ান্ত ফলাফল : ১ম দেবাশীষ মণ্ডল (সার্ভিসেস)—১০৬.৯৫ পয়েন্ট, ২য় ভিকাজী ভোঁসলে (সার্ভিসেস)—১০০.৬০ পয়েন্ট, ৩য় ত্রিলোক সিং (সার্ভিসেস ৯৮.২০)—পয়েন্ট।

জাতীয় সাইকেল প্রতিযোগিতা

চূড়ান্ত ফলাফল : পাঞ্জাব ৩৬ পয়েন্ট, রেলওয়ে ১৭, মহারাষ্ট্র ১২, সার্ভিসেস ৯, বিহার ৬, মহীশূর ৫, উড়িষ্যা ২, বাংলা ২ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ১।

জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা

চূড়ান্ত ফলাফল : দলগত চ্যাম্পিয়ান—সার্ভিসেস (৪৮ পয়েন্ট), রানার্স-আপ—রেলওয়ে (২০ পয়েন্ট)।

জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

চূড়ান্ত ফলাফল : ১ম সার্ভিসেস (৪৬ পয়েন্ট), ২য় মাদ্রাজ (২০ পয়েন্ট), ৩য় মহারাষ্ট্র (১৩ পয়েন্ট), ৪র্থ বাংলা এবং দিল্লী (১১ পয়েন্ট)।

বাংলার পক্ষে প্রথম স্থান

বালিকা বিভাগ

হাই জাম্প : শিখাশ্যাম রায়
উচ্চতা : ১.৩৫ মিটার

লং জাম্প : রুবি নন্দী
দূরত্ব : ৪.৮৪ মিটার

৪ × ১০০ মিটার রীলে : বাংলা
সময় : ৫৩ সেঃ (নতুন রেকর্ড)

বালক বিভাগ

পোল ভল্ট : মধুসূদন গাঙ্গুলী
উচ্চতা : ৩.১৭ মিটার

এ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠানে দুটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—৪০০ মিটার দৌড়ে প্রখ্যাত দৌড়বীর মিলখা সিংয়ের দ্বিতীয় স্থান লাভ এবং মহিলা বিভাগের ১০০ মিটার দৌড়ে গত সাত বছরের চ্যাম্পিয়ান ষ্টিফি ডি' সুজার (মহারাষ্ট্র) দ্বিতীয় স্থান লাভ।

জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য টেবল টেনিস ঃ

নিউদিল্লীর রেলওয়ে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ২৫তম জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের অনুষ্ঠানে বোম্বাই, মহিলাদের অনুষ্ঠানে রেলওয়ে এবং বালকদের অনুষ্ঠানে হায়দরাবাদ দলগত চ্যাম্পিয়ান খেতাব লাভ করেছে। পুরুষদের দলগত অনুষ্ঠানে বোম্বাই এইবার নিয়ে উপর্যুপরি ১০ বার 'বার্ণা-বেলাক' কাপ জয় ক'রে সর্ব্বাধিক বার জয় লাভের রেকর্ড করলো।

পুরুষদের দলগত বিভাগ : ফাইনালে বোম্বাই দল ৫—০ খেলায় মাদ্রাজকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ১০ বার 'বার্ণা-বেলাক' কাপ জয় করে।

মহিলাদের দলগত বিভাগ: ফাইনালে গত ৩ বছরের বিজয়ী রেলওয়ে ৩—০ খেলায় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে 'জয়লক্ষ্মী' কাপ জয় করে।

জুনিয়র দলগত বিভাগ: ফাইনালে হায়দরাবাদ ৩—০ খেলায় উত্তরপ্রদেশকে পরাজিত ক'রে 'রামানুজন কাপ' জয় করে।

ব্যক্তিগত বিভাগ—ফাইনাল

পুরুষদের সিঙ্গলস:

জয়ন্ত ভোরা (বোম্বাই) ২৩-২১, ১২-২১, ২১-১৮, ১১-২০ ও ২১-১৭ পয়েন্টে রতীশ চাচাদকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস: মহারাষ্ট্রের নীলা কুলকার্ণি ২২-২০, ২১-১৭, ১৫-২১ ও ২১-১৭ পয়েন্টে ঊর্মিলা মেহানকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস: জয়ন্ত ভোরা এবং রতীশ চাচাদ ২১-১৫, ২১-১৮ ও ২১-১১ পয়েন্টে পি পি হালদাঙ্কার এবং জে এম ব্যানার্জিকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস: পি পি হালদাঙ্কার এবং কুমারী মীনা পারাণ্ডে (রেলওয়ে) ২৩-২১, ২২-২৪, ২১-১৪ ও ২১-৬ পয়েন্টে ভি রামচন্দ্রন এবং কুমারী এ ব্ল্যাকলেকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

বালকদের সিঙ্গলস: মীর কাসিম আলী (হায়দরাবাদ) ২১-১১, ২১-৭ ও ২১-১১ পয়েন্টে পি এন সাহকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

জাতীয় লন টেনিস ঃ

দিল্লীর জিমখানা কোর্টে জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় বৃটেনের শ্রীমতী এ্যালেন মিলসের ব্যক্তিগত সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রতিযোগিতার তিনটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে জয়লাভ করেন।

পুরুষদের সিঙ্গলস: গত বছরের বিজয়ী রমানাথন কৃষ্ণন (ভারতবর্ষ) ৬ ১, ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে এ আর মিলসকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস: জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লাল ২—৬, ৬—৩, ৬—৩, ৩—৬ ও ৮—৬ গেমে রমানাথন কৃষ্ণন এবং নরেশকুমারকে পরাজিত করেন।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ

মাদ্রাজে ২০তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মহারাষ্ট্র ১-০ গোলে অন্ধ্রপ্রদেশকে পরাজিত ক'রে 'সন্তোষ ট্রফি' জয় করেছে। ১৯৫৪ সালে তারা তৎকালীন বোম্বাই নামে ২-১ গোলে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত ক'রে প্রথম সন্তোষ ট্রফিজয়ী হয়েছিল। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের মধ্যে এই নিয়ে তিনবার ফাইনাল খেলা হ'ল। ১৯৫৬ সালের ফাইনালে অন্ধ্রপ্রদেশ (তৎকালীন নাম হায়দরাবাদ) ৪-১ গোলে মহারাষ্ট্রকে (তৎকালীন নাম বোম্বাই) পরাজিত করেছিল। পরবর্তী বৎসরেও (১৯৫৭) এই দুই দল ফাইনালে খেলেছিল এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ৩-০ গোলে জয়ী হয়েছিল। সুতরাং মহারাষ্ট্র দু'বার পরাজয় স্বীকার ক'রে তৃতীয়বারের চেষ্টায় অন্ধ্রপ্রদেশকে পরাজিত করলো।

সেমি-ফাইনাল খেলার একদিকে অন্ধ্রপ্রদেশ ? গোলে রেলওয়েকে এবং অপরদিকে মহারাষ্ট্র ৪-০ গোলে মাদ্রাজকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছিল। মাদ্রাজ দলের কাছেই কোয়ার্টার-ফাইনালের পুনরনুষ্ঠিত খেলায় বাংলা পেনালটি গোলে (০-১) পরাজিত হয়েছিল। প্রথমদিন ১-১ গোলে খেলাটি অমীমাংসিত ছিল।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা ঃ

দিল্লীর লেডী হার্ডিঞ্জ মাঠে অনুষ্ঠিত ২৯তম জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী রেলওয়ে দল ২-১ গোলে গত বছরের রানার্স-আপ সার্ভিসেস দলকে পরাজিত ক'রে 'রঙ্গস্বামী কাপ' জয় করেছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটি ১ গোলে ড্র ছিল। রেলওয়ে দল এই নিয়ে ৬বার ফাইনালে খেলে ৬বারই জয়লাভ করলো। ১৯৩০ সালের প্রতিযোগিতাটি লীগ প্রথায় খেলানো হয়েছিল এবং রেলওয়ে দল লীগের চূড়ান্ত তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। সুতরাং জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে দলের জয়লাভের সংখ্যা বর্তমানে সাত—প্রতিযোগিতার ইতিহাসে অভিনব রেকর্ড। প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক চ্যাম্পিয়ান জয়ী হয়েছে পাঞ্জাব—১২বার ফাইনালে খেলে। ১৯.. সালের লীগের খেলায় পাঞ্জাব রানার্স আপ হয়েছিল।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে ৪।৪।৬৪ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত